ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

৯ম বর্ষ : প্রথম খণ্ড

শুক্রবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৭৬—শুক্রবার, ৯ শ্রাবণ, ১৩৭৬

Friday, 9th May, 1969—Friday, 25th July, 1969.

লেখক ... বিষয় ও পৃষ্ঠা

৯ম বর্ষ | ১ম খণ্ড | ১ম সংখ্যা | মূল্য দুই টাকা

Friday, 9th MAY, 1969. শুক্রবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৭৬ Rs. 2.00

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অলংকরণ : শ্রীনিতাই ঘোষ

অমৃত

পরলোকে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন

আমাদের এই সংকলনের কাজ যখন প্রায় সমাপ্তির দিকে তখনি আকস্মিক বজ্রপাতের মতো খবর এল, আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর মতো রাষ্ট্রনায়কের মনীষা ও সুপরামর্শ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে বেদনাবোধের কোনো সীমা নেই আমাদের, কিন্তু পরলোকগত রাষ্ট্রপতির আদর্শই যে আমাদের ভবিষ্যতের কর্মপথে নতুন প্রেরণা জোগাবে তাতেও আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। ডঃ জাকির হোসেনের চরিত্র ছিল কর্ম জ্ঞান ও প্রীতির ত্রিবেণীসঙ্গম। ত্যাগে সাহসে ও চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বহু জাতিগোষ্ঠি ও ধর্মসম্প্রদায় অধ্যুষিত এই ভারতরাষ্ট্রে একতার প্রতীক এই মহান নেতা অগণিত নর-নারীর হৃদয়ে অমরতা লাভ করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

কবিপ্রণাম

অমৃতের নববর্ষে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভকামনা ও সাদর সম্ভাষণ জানাই।

বাংলাদেশে বৈশাখ হল কবির মাস। কবিপক্ষ উদযাপিত হচ্ছে সর্বত্র। বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল অঙ্গ হল কবি-প্রণামের এই বিনম্র ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথকে হারিয়ে যেন বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে আরও আপন করে পেল তাঁর কবিতায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যের উত্তরাধিকারে। কবি নিজে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে গেছেন যে, তাঁর সঙ্গীতের মধ্যেই তিনি যেন বেঁচে থাকেন মানুষের মনে। আজ কবির গান জনজীবনের গভীরে, বাঙালীর ধমনীতে মিশে গেছে একাকার হয়ে। যেমন করে রামপ্রসাদের গান, বাউলের গান এই দেশের আকাশে বাতাসে, ধূলোমাটিতে, নদীজলে ভেসে বেড়ায়, রবীন্দ্রনাথের গানও তেমনি আমাদের নিশ্বাসের মতো অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে।

এ হল আমাদের গৌরবের দিক। পঁচিশে বৈশাখ বাংলাভাষী সকল মানুষকে ঘরে ফেরার ডাক দিয়ে যায়। আপনজনকে আপন করে চিনে নেবার এক শুভ মুহূর্ত হল এই দিনটি। সীমান্তের ওপারে যে বাংলাদেশ, সেখানে কবির জীবনের বহু শ্রেষ্ঠ দিন কেটেছে। পদ্মার বোটে, শিলাইদার কুঠিবাড়িতে, সাজাদপুরে, রামপুর-বোয়ালিয়ার নদীপথে, পতিসরের ছায়াঘন পল্লীভবনে। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে, ছিন্নপত্রে, গল্পগুচ্ছের উজ্জ্বল পংক্তিতে, অজস্র কবিতার ছত্রে সেই দিনগুলোর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথকে জনতার থেকে দূরে রাখার জন্য সেখানে শাসককুল কম চেষ্টা করেনি। বাংলাভাষা যাঁদের প্রাণ, পাকিস্তানের সেই নবজাগ্রত বাঙালীরা সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে রবীন্দ্রনাথকে আবার হৃদয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দুই বাংলার চোখের মণি। তিনি সর্বজনের কবি।

রবীন্দ্রনাথকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করার সময় এসেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের গবেষণার প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁকে আমরা কতটুকু নতুন করে পাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের পুঁথিগত পদ্ধতিতে এই স্কুল-পালানো কবিকে আমরা কতটুকু জানতে পারি? বিশেষত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিচিত্র জগাখিচুড়ি আমদানি হয়েছে, আমদানি-করা নানা উদ্ভট চিন্তার বদহজমে তা ক্রমশই দুষ্পাচ্য হয়ে উঠছে। সাহিত্যেও যেন আমরা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছি। জীবনের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে গড়ে ওঠে যে-সাহিত্য, যার সঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের অস্তিত্বের রাখিবন্ধন, সেই মহৎ সৃষ্টির জন্য আমরা আর কত দিন প্রতীক্ষা করব? মানুষ তো শুধু ভাতের জন্য বাঁচে না। ভাতের পরেও তাকে অন্য কিছুর জন্য বাঁচতে হয়। কারণ সে চিন্তাশীল জীব। তার আবেগও আছে, যুক্তিও আছে। সেই গোটা মানুষের জন্যই তো মহৎ সাহিত্যের উত্তরাধিকার যা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। তাকে নতুন সমৃদ্ধির দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সাহিত্যিকদের এ-বিষয়ে এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সাহিত্যের মাধ্যমে জীবন-সত্য প্রতিফলিত হয়। আজও সেই আলোকেরই প্রার্থনা করি আমরা কবির জন্মদিনে। তিনি আমাদের কাছে জ্যোতির ধ্রুবতারা। তাঁকে স্মরণ করেই আমরা নববর্ষের এই সাহিত্যসংখ্যায় ছোটগল্পের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলাম। গল্প লেখাও তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন।
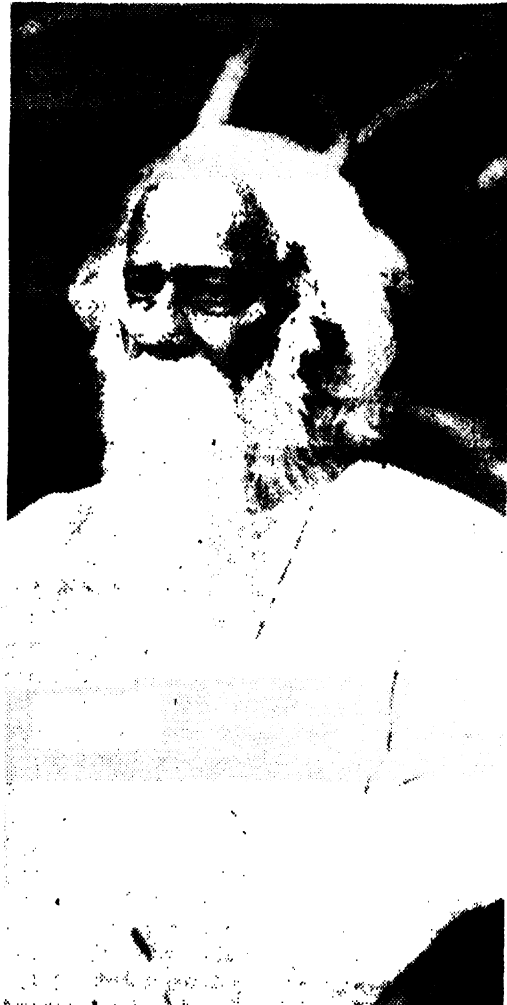
রবীন্দ্রনাথ এবং গ্রিমের একটি গল্প

সোনার তরীর দ্বিতীয় কবিতা 'বিম্ববতী'র বস্তু যে রূপকথা থেকে নেওয়া তা তিনি নিজেই নির্দেশ করেছেন। এখন কথা হল, কোন্ রূপকথা, কোথাকার রূপকথা। এ প্রশ্ন উঠেছিল এবং সে প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছিলেন (১৯২৪) যে গল্পটি তিনি তাঁর এক ভাইঝির মুখে শুনেছিলেন (সোনার তরী ১৯৬৫ সংস্করণ 'রচনা প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)। আসলে গল্পটি বাংলাদেশের অথবা ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলেরই নয়, য়াকোব ও বিলহেল্ম্ গ্রিম কর্তৃক সংগৃহীত জার্মাণ রূপকথা (প্রথম খন্ড প্রথম প্রকাশ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, ইংরেজী অনুবাদ—বাছাই করা গল্পের—প্রথম প্রকাশ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে)। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি কীরূপে শুনেছিলেন জানি না তবে গ্রিমের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে তিনি কাহিনীকে নিজের মনের মতো ছাটকাট করে নিয়েছিলেন। সেইটুকু দেখানো আমার এই লেখার উদ্দেশ্য। বিম্ববতী সকলেরই পড়া আছে ধরে নিতে পারি। গ্রিমের গল্পটি অনেকের পড়া নেই বলে আশংকা করি। তাই গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

শীতের দেশের এক রূপসী রাণী জানালার ধারে বসে সেলাই করছিল আর বাইরে বরফ পড়া দেখছিল। হঠাৎ তার আঙুলে ছুঁচ বিঁধে গিয়ে তিন ফোঁটা রক্ত পড়ল জানালার আবলুস কাঠের গা বেয়ে বরফের উপর। তা দেখে রাণীর মনে হল, অমনি যদি একটি মেয়ে হয়—বরফের মতো সাদা, রক্তের মতো রাঙা, আবলুসের মতো কালো। সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে জন্মালো—বরফের মতো সাদা, রক্তের মতো রাঙা, আবলুসের মতো কালো। তার নাম রাখা হল তুষারবতী।

(গল্পটির এখানে কিছু কিছু রূপান্তর প্রচলিত ছিল মধ্য ও উত্তর ইউরোপে। তার একটি অনুসারে রাণীর একটি মেয়ে হয়েছিল ঐ রকম। তার পরে রাণী মারা গেলে রাজা আবার বিবাহ করলেন। এ রাণীর খুব গর্ব যে তার মতো সুন্দরী আর নেই। এই রূপান্তর ইংরেজী সংস্করণে আছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গল্পটিতেও তাই।)

রাণীর কাছে মায়ামুকুর ছিল। প্রায়ই তাতে নিজের মুখ দেখত, আর প্রশ্ন করত :

বলত মুকুর দেয়ালে খাড়া,
এ চাকলায় কোন মেয়ে সুন্দরী বাড়া?

মায়ামুকুর থেকে উত্তর আসত :

তুমি রাণী, এ চাকলায় সুন্দরী বাড়া।

এদিকে তুষারবতী যেমন বড় হচ্ছে তার রূপও দিন দিন বাড়ছে। যখন তার বয়স সাত হল তখন একদিন মুকুর থেকে জবাব এল :

রাণী তুমি সবার বাড়া সুন্দরী জানি
তবে তুষারবতী হাজার গুণে সুন্দরী মানি

শুনে রাণী হিংসায় জ্বলে উঠল। সে তখন জল্লাদের হাতে তুষারবতীকে দিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে। বলে দিলে যেন সে মেয়েটাকে মেরে ফেলে তার ফুসফুস আর যকৃত এনে দেয়। জল্লাদ মেয়েটিকে বনে নিয়ে গেল কিন্তু মায়া পড়ায় তাকে সে মারতে পারলে না। এক শুয়োরের বাচ্চা মেরে তার ফুসফুস আর যকৃত রাণীকে এনে

সুকুমার সেন

দিলে। রাণী তা নুন দিয়ে সিদ্ধ করে খেয়ে নিলে। এদিকে তুষারবতী অসহায় হয়ে বনে ঘুরতে লাগল। সন্ধ্যা হবার একটু আগে সে সাত পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট বাড়ী দেখতে পেলে। দরজা খোলা দেখে সে ভিতরে ঢুকল। ঢুকে দেখে যে ছোট একটি টেবিলে ছোট ছোট সাতটি ডিসে ও গেলাসে খাদ্য ও পানীয় সাজানো আছে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে এত কাতর যে থাকতে না পেরে প্রত্যেক ডিস থেকে একটু করে খাবার খেলে আর প্রত্যেক গেলাস থেকে এক ঢোক করে জল খেলে। তারপর পাশের ঘরে ঢুকে সাতটি ছোট ছোট খাটে সাতটি বিছানা পাতা দেখে পছন্দমতো একটিতে শুয়ে পড়ে তখনি ঘুমিয়ে গেল।

বাড়ীটি ছিল সাতভাই বামনের। তারা পাহাড়ের গায়ে খনি থেকে সোনা তোলে। সকালে যায় আর সন্ধ্যায় ফেরে। সেদিন ঘরে ফিরে ঘুমন্ত মেয়েটিকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। দেখে তাদের মায়া হল। তার ঘুম ভাঙালে না। সকাল হলে তারা তুষারবতীর বৃত্তান্ত সব শুনে নিয়ে বললে, তুমি যদি এখানে থাক আর আমাদের ঘরকন্না দেখ তোমার কোনই ভাবনা নেই। আমাদের বাড়ীর মধ্যে তোমার মা (সৎ-মা) অনিষ্ট করতে পারবে না। তুষারবতী রাজি হল। তারপর কাজে যাবার সময় বামনেরা তাকে সাবধান করে দিলে, কাউকেই যেন সে বাড়ীর চৌকাট ডিঙোতে না দেয়।

তুষারবতী মারা গেছে ভেবে রাণী নিশ্চিন্ত। সে আর প্রত্যহ মুকুরকে সে প্রশ্ন করে না। একদিন কী খেয়াল হল সে মুকুরকে জিজ্ঞাসা করলে :

বলত মুকুর দেয়ালে খাড়া
এ চাকলায় কোন্ মেয়ে সুন্দরী বাড়া?

মুকুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে :

রাণী তুমি সবার বাড়া সুন্দরী জানি,
সাত পাহাড় পারে তুষারবতী
হাজার গুণে সুন্দরী মানি।

তবে তো মেয়েটা মরেনি। ভেবে রাণীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মায়াবিনী সে ছুটল বুড়ী ফেরিওয়ালার সাজ ধরে সাত-পাহাড়ের গায়ে তুষারবতীর খোঁজে। পৌঁছল সাত বামনের বাড়ীতে। দরজা বন্ধ দেখে টোকা মারলে আর হাঁকলে—লেস-ফিতা নেবে গো। ভালো ভালো লেস-ফিতা। মেয়েটি জানালায় এসে জিজ্ঞাসা করলে, কী জিনিস? বুড়ী বললে, ভালো ভালো লেস-ফিতা আছে। তুষারবতী ভাবলে একে ঢুকতে দিতে দোষ কী! সে দরজা খুলে দিলে বুড়ী এসে জিনিস দেখালে। মেয়েটির পছন্দ হল লেস। ফেরিওয়ালী লেস পরিয়ে দেবার ছলে তার গলায় ফাঁস দিয়ে মরার মতো করে ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সন্ধ্যা বেলায় বামনেরা ঘরে ফিরে দেখে মেয়েটি যেন মরে পড়ে আছে। তারা তার গলার ফাঁস খুলে দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করলে। সব কথা শুনে তারা বললে, এ কাজ রাণীর। এর পর থেকে তুমি খুব সাবধানে থাকবে, কিছুতে কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দিও না।

ফিরে যখন রাণী তাড়াতাড়ি মায়া-মুকুরকে শুধিয়ে নিশ্চিন্ত হতে গেল :
বলত মুকুর দেয়ালে খাড়া

এ চাকলায় কোন্ মেয়ে সুন্দরী বাড়া ?
মুকুর বললে :

রাণী তোমারে সবার চেয়ে সুন্দরী জানি।
তবে সাত বামনের ঘরে তুষারবতী
হাজার গুণে সুন্দরী মানি।

রাণী বুঝলে মেয়েটা মরেনি। তখন করলে কি, সে একটা চিরুণীতে বিষ মাখিয়ে আর এক বুড়ীর মূর্তি ধরে সাত বামনের বাড়ীতে গেল। গিয়ে হাঁক পাড়লে, জিনিস কিনবে গো। মেয়েটি বললে, না—দরজা খুলবো না। ফেরিওয়ালী বললে, জানালা দিয়ে দেখ কেমন ভালো চিরুণী। তুষারবতী এবারেও ভোলে পড়ল, দরজা খুলে দিলে। আর বুড়ী তার চুল আঁচড়িয়ে চিরুণীর গুণ দেখাবার ছলে তার মাথায় চিরুণির দাঁত বসিয়ে দিলে। মেয়েটি অমনি বিষের জ্বালায় ঢলে পড়ল। তখন বেলা পড়ে এসেছে। বুড়ী খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। একটু পরেই বামনেরা এল। তুষারবতীর অবস্থা দেখে ব্যাপার বুঝলে। তার চুলে একটা চিরুণী গোঁজা রয়েছে দেখে সেটা যেমনি খুলে নিলে অমনি তুষারবতী বেঁচে উঠল।

সকালে উঠে রাণী মুকুরকে প্রশ্ন করতে সংগে সংগে উত্তর এল :

রাণী তোমারে সবার চেয়ে সুন্দরী জানি।
তবে সাত বামনের ঘরে তুষারবতী
হাজার গুণে সুন্দরী মানি।

শুনে রাণী হিংসায় দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। সে ভাবলে, এবারে যেমন করে হোক মেয়েটাকে নিকেশ করতেই হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে সে একটা চমৎকার দেখতে আপেল নিলে। তার সাদা দিকটা ভালো, লাল দিকটা গরল বিষে পূর্ণ। তারপর সে চাষা বউ সেজে সেই আপেল নিয়ে সাত পাহাড়ের ওপারে সাত বামনের ঘরে গেল। ভালো আপেল আছে নেবে গো। বলে ডাক দিলে। এবারে তুষারবতী বামনের কথা মানলে, সে কিছুতেই দরজা খুললে না। তখন রাণী জানলার বাইরে থেকে আধখানা আপেল নিজে খেয়ে বাকি আধখানা জানলা গলিয়ে তুষারবতীকে খেতে দিলে। আধখানা চাষা বউকে খেতে দেখে তুষারবতী বাকিটায় কামড় দিতে দেরি করলে না। সেই দিকটাই ছিল গরল বিষ পোরা। কামড় দিতেই সে ঢলে পড়ল। রাণী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলে, অবশেষে তার মৃত্যু ঘটেছে স্থির করে চলে গেল। বাড়ী ফিরে এসেই রাণী মুকুরকে প্রশ্ন করে মনোমত উত্তর পেলে।

রাণী তুমিই এ চাকলায় সুন্দরী বাড়া।
এতদিনে রাণী হাফ ছেড়ে বাঁচল।

এবার আর বামনেরা তুষারবতীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে না। সুন্দরী মেয়েটির অবিকৃত দেহকেও তারা অন্ধকার মাটির তলায় কবর দিতে চাইলে না। তারা একটি কাঠের কফিন করে তাতে তুষারবতীকে শোয়ালে, উপরে সোনার অক্ষরে তার নাম লিখলে, আর ঘরের কাছে এক পাহাড়ে চূড়ায় সে কফিন রেখে দিলে। ভাইয়েদের একজন না একজন সর্বদা পাহারায় রইল।

কিছুকাল পরে এক রাজার ছেলে ঘুরতে ঘুরতে সেই সাত পাহাড়ের দেশে এসে কফিনে তুষারবতীর দেহ দেখলে। দেখে তার এত ভালো লাগল যে সেখান ছেড়ে যেতে তার মন সরল না। সে বামনদের বললে, এটি আমাকে দাও, যত সোনা লাগে তোমাদের দেব। তারা কিছুতেই রাজি হল না। তখন রাজার ছেলে বললে, আমি এখান ছেড়ে নড়ব না, আমি একে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। রাজার ছেলের অবস্থা দেখে শেষে বামনদের দয়া হল। তারা বললে, বেশ নিয়ে যাও। রাজার ছেলে তা বাড়ী নিয়ে গেল এবং সর্বদা নিজের কাছে রাখলে। খাওয়া দাওয়ার সময়েও কফিন কাছে থাকা চাই। এই কারণে কফিন সর্বদা নাড়াচাড়া করতে হত। হঠাৎ একদিন নাড়াচাড়ার সময়ে তুষারবতীর মুখের মধ্যে যে আপেলের টুকরো ছিল তা বেরিয়ে পড়ে। অমনি সে বেঁচে উঠল।

তারপর তুষারবতীর বিয়ে হল রাজার ছেলের সংগে। খুব ধুমধাম। রাণীকেও নিমন্ত্রণ করা হল বিয়ের ভোজে ও নাচে। রাণী খুশি হয়ে সাজগোজ করলে নিমন্ত্রণে যাবার জন্যে। তারপর মুকুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে :

বলত মুকুর দেয়ালে খাড়া
কোন মেয়ে এ দেশে সুন্দরী বাড়া ?
মুকুর বললে—

তুমি তো এদেশে সুন্দরী জানি,
তবে রাজপুত্রের বউ হাজারগুণ
সুন্দরী মানি।

হিংসায় জ্বলতে জ্বলতে রাণী ছুটল নিমন্ত্রণ সভায়। সেখানে তুষারবতীকে রাজার ছেলের বউ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু এখন সে আর করে কি। ভোজ খেতে হল। নাচেও যোগ দিতে হল। নাচের জন্যে হালকা জুতো তৈরি ছিল তার জন্যে। তাতে ছিল মন্ত্রপড়া। সেই জুতো পরে নাচতে নাচতে রাণীর দু পা পুড়ে গেল, অমনি সে মরে গেল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গল্পটির মেজা-মুড়ো ছাঁটাই হয়েছে। 'ছোবড়া—অর্থাৎ সাত পাহাড়ের ওপারে সাত বামনের আশ্রয়ও—বাদ পড়েছে। আছে শাঁসালো বীজটুকু। সে

হল সৌন্দর্যের গর্ব ও ঈর্ষা আর সে ঈর্ষার জ্বালায় নিজেরই মানুষকে বার বার হত্যার চেষ্টা। কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন। মূল কাহিনীতে রাণী মেয়েকে (অথবা সৎমেয়েকে) মেরে ফেলবার চারবার চেষ্টা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও তাই। তবে সামান্য গরমিল আছে। গ্রিমের গল্পে প্রথম বারে মেয়েটিকে বনে পাঠানো হয়েছিল মেরে ফেলার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে হল দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টা। 'বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া'। দ্বিতীয় বারে গ্রিমের গল্পে লেস পরাবার ছলে শ্বাসরুদ্ধ করা, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিষফুলের মালা পরিয়ে সে কাজ করা। 'পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা'। গ্রিমের গল্পে তৃতীয় বারে বিষমাখা চিরুণি পরানো, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে হল শেষ চেষ্টা, যদিও চিরুণির উল্লেখ নেই। 'মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে'। গ্রিমের গল্পে শেষ বারে বিষ-আপেল খাওয়ানো, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তা তৃতীয় প্রচেষ্টা। 'বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া'।

কফিনে অচেতন দেহ তুষারবতীর ও রাজার ছেলের প্রেমের কোন উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ 'বিম্ববতী' কবিতায় করেন নাই। শেষে অবশ্য দুজনের বিবাহের ইঙ্গিত আছে। 'কনকদর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।'।

গ্রিমের গল্পে মুকুরে প্রতিবিম্ব পড়ার ব্যাপার নেই, মুকুর যেন কথা বলত। (গল্পটির এক রূপান্তরে মুকুর হল রাণীর পোষা কুকুরের নাম। তার কথা বলা অসংগত নয়।) রবীন্দ্রনাথ মুকুরকে কথা না বলিয়ে কাহিনীকে আরও সুসংগত করেছেন। সেই সূত্রে বিম্ববতী—এই চমৎকার নামটিও পেয়েছেন। নামটি—দুজনকেই খাটে। মেয়েটির পক্ষে 'বিম্ব' মানে প্রতিবিম্ব, রাণীর পক্ষে 'বিম্ব' মানে মুকুর। অর্থাৎ মেয়েটির পক্ষে 'যার প্রতিবিম্ব পড়ে,' রাণীর পক্ষে 'যে মুকুরের অধিকারিণী'। গ্রিমের গল্পে নাম তুষারের সাদা এক টুকরো (Schneewittechen, বা Scheewaisschen)।

গ্রিমের গল্পের পরিসমাপ্তি টিউটনিক রূপকথার অনুযায়ী। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পরিসমাপ্তি অত্যন্ত সুসংগত।

আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রাণী, টুটি গেল প্রাণ—
সর্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে। ভূমে পড়ি তার পাশে
কনকদর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।।

শেষে ধুয়া-ছত্র দুটি জুড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে মূল গল্পে দর্পণের কথা-বলার ইসারা করেছেন।

বাংলা ছোটগল্প

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস কতোদিনের, পণ্ডিতেরা তা নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক করুন। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, ছোটগল্প ততোদিনের পুরনো যতোদিন আগে তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষা, দোষ দেওয়া শক্ত। কারণ মনে করে দেখুন, প্রাকৃতপৈঙ্গলের সেই শ্লোক, একালের বাংলায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায়—ওগরা ভাত, কলার পাতা, গাওয়া ঘি, সঙ্গে দুধ, মৌরলা মাছ, প্রিয়তমা দিচ্ছে, পুণ্যবান ব্যক্তি খাচ্ছে—এই নেহাতই বাঙালী পরিবেশের মধ্যেই একটি গল্পের বীজ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। কিন্তু এভাবে কষ্ট-কল্পনার পথে না গিয়েও বলা যায়, বাংলার নিজস্ব জিনিস রূপকথা আর লোককাহিনীগুলি সুস্পষ্টভাবেই এক-একটি ছোটগল্প।

সে যাই হোক, আধুনিককালে বাংলা ছোটগল্পের গোড়াপত্তন ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। আর শুধু তাই নয়, ছোটগল্পকে তিনি সিদ্ধির পথেও বহুদূর পর্যন্তই পেঁাছে দিয়েছেন। তাঁরই পথ অনুসরণ করে ছোটগল্পের আঙিনায় পরবর্তীকালে একে একে দেখা দেন শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী এবং আরো কতো দিকপাল। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের পর ছোটগল্পের রাজ্যে দেখা দেয় একটা হাওয়া-বদলের লক্ষণ। তাতে একদিকে ঘটল যেমন বিষয়বস্তুর বিস্তার, অন্যদিকে দেখা দিল আঙ্গিকের পরিবর্তন। আর মনোভাবের দিক থেকেও দেখা দিল রূঢ়তা-মাধুর্য, হতাশা-আশাবাদ, রোমান্টিকতা-বাস্তবতার বহু বিচিত্র বিন্যাস। বাংলা গল্প ক্রমে তিরিশের যুগে এসে হয়ে উঠল পৃথিবীর প্রায় যে কোনো দেশের গল্পসাহিত্যের সমকক্ষ।

মোটামুটি বাংলা ছোটগল্পের সেই ঐশ্বর্যকেই সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ সংকলনে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর পর্যন্ত সময়টিই আমাদের গল্পনির্বাচনের সীমারেখা। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে সংকলনের আয়তন যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায় সেদিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হয়েছে। আর তাই পঁচিশটি গল্পের মধ্যেই শেষ করতে চেয়েছি আমাদের নির্বাচনের কাজ। বলাই বাহুল্য, এ সংকলনে যাঁদের গল্প স্থানাভাবের জন্যে সংগ্রহ করা গেল না, তাঁদের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে অক্ষুণ্ণ। অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের দ্বিতীয় একটি সংকলন প্রকাশের সুযোগ ঘটলে তাঁদের এবং বিশেষ করে নতুন কালের কথাশিল্পীদের ছোটগল্প সংগ্রহ করাই হবে আমাদের আনন্দজনক দায়িত্ব।

বর্তমান সংকলনে গল্পকারদের জন্মকাল ধরে সময়ানুক্রমিকভাবেই গল্পগুলি সাজাতে চেষ্টা করেছি আমরা। কিন্তু সময়মতো লেখা সংগ্রহ না করতে পারায় কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে।

বাংলা ছোটগল্পের মান প্রতিদিন নতুন দিগন্তের আবিষ্কারে উন্মোচিত হোক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

প্রথম ঘটনা

দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে কাল সকালে সাতকড়ি বাড়ি ফিরবে।

সাতকড়ি এতদিন কোথায় ছিল তাহার হিসাব দিতে হইলে মধুডাঙ্গার সেই ঘটনাটা বিবৃত করিতে হয়।

কোন্ যুগে কার আমলে কি কোন রাজার রাজত্বের সময় মধুর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা লইয়া গবেষণা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আজ পর্যন্ত এদিককার কেহ মনে করে নাই। মধু হিন্দু ছিল কি মুসলমান ছিল, উগ্র ক্ষত্রিয় ছিল কি সদগোপ ছিল তাহাও কেহ জানে না—জানে কেবল ইহাই যে, বহুদিন পূর্বে মধু নামে এক দুর্ধর্ষ দস্যু এই স্থানে বাস করিত। স্থানের নাম আগে ছিল পীতাম্বরপুর—তাহার পর মধুর নামে নাম প্রচলিত হইয়া এখন এই পীতাম্বরপুরকে সবাই বলে মধুডাঙ্গা।

দিগন্ত বিস্তৃত তৃণবৃক্ষহীন দুস্তর এই ডাঙ্গার কোথায় নাকি মধুর দুর্গ ছিল ভূগর্ভে—সরকারী কোনো গুপ্তচর সেই দুর্গ এবং দুর্গেশ্বর মধুকে কোনদিন খুঁজিয়া পায় নাই।

মধু গেছে কিন্তু মধুডাঙ্গা আছে, এবং পথপ্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র এই মধুডাঙ্গা গ্রামে ঝুলনের দিন এক মেলা বসে। কিন্তু মধুডাঙ্গার এই মেলা নামে মেলা—তেমন কিছু নয়। মাত্র দশ-বারোখানা দোকান বসে, বটি কড়াই প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম হরেক রকমের খেলনা, আরশি-বসানো টিনের কৌটা, কাঠের চিরুণী কাঠের মালা, ফিতে, ঘুনসি, সূচ, সূতা, পাঁপর ভাজা, ঘুঘনি, পান, সিগারেট আর নানান আকারের নানান স্বাদের নানান রঙের আর নানান গন্ধের বিবিধ মিষ্টান্ন—বালক-বালিকার আর গৃহস্থের লোভনীয় এবং ক্রেয় যা তাহাই কেহ গরুর গাড়িতে, কেহ নিজের মাথায় কি পিঠে চাপাইয়া লইয়া আসে, আর চট টানাইয়া বসিয়া যায়। কিন্তু সমারোহটা ভিতরে বেশী।

রাধামাধব বিগ্রহের প্রশস্ত আর উচ্চ-শির মন্দির, তার সম্মুখেই নাটমন্দির, তার এদিকে চত্বর, চত্বরের দক্ষিণে অতিথিশালা—সাধু-বৈষ্ণবের বিশ্রাম আর ভোজনের স্থান।

সন্ধ্যা লাগিতেই বড় বড় আলো জ্বালাইয়া কীর্তন শুরু হইয়া গেল। অসংখ্য লোক কীর্তনরস গ্রহণ করিতে বসিয়া গেছে—দেড় মাসের শিশুটিকে লইয়া এক জননীও আসিয়াছেন—শতাধিক বর্ষ বয়স্ক এক অন্ধ বৃদ্ধকে আনিয়া বাড়ির লোকে একেবারে সম্মুখে বসাইয়া দিয়া গেছে। সক্ষম লোকের তো কথাই নাই।

কীর্তনের আসরে অনেক লোক থাকিলেও সেখানেই সবাই নাই, বাইরে গাছের তলায় স্থানে স্থানে বৈষ্ণবীগণসহ বাবাজী বসিয়া আছেন—তাঁহাদের কোনো কাজ নাই গল্প চালাইতেছে কেবল। ওদিকে কেউ ইট পাতিয়া আগুন করিয়া কড়াইয়ে চাল সিদ্ধ করিয়া লইতেছে—রাধামাধবের প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ তাহার হয় নাই, যেমন হইয়াছে বৈষ্ণবীগণসহ ঐ বাবাজীর। ধোঁয়ায় ধূলায় স্থানটা বড় অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। আরো যাহারা বাহিরে আছে তাহারা সবাই যেন ক্লান্ত—যে বেড়াইতেছে সে গা দুলাইয়া বেড়াইতেছে, যে বসিয়া আছে সে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া আছে যে শুইয়া আছে সে পিঠ দুমড়াইয়া হাঁটুর সঙ্গে মাথা ঠেকাইয়া শুইয়া আছে, একটি ভিখারিণী বসিয়া বসিয়া নির্বিকার চিত্তে তার ছেলেটির দিকে তাকাইয়া আছে—ছেলেটি ধূলা লইয়া মাথে পুরিতেছে—দোকানগুলি খোলাই আছে। বাইশ তেইশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে একটি মণিহারী দোকানের সম্মুখে বসিয়া কাহারও জন্য যেন ঘুনসি বাছাই করিতেছিল, দুগাছা বাছিয়া লইয়া তার দাম দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল তার পাশেই একটা অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আছে—

মেয়েটি সরিয়া গেল।

মেয়েটির অপরিচিত ঐ লোকটিই সাতকড়ি, প্রাণপ্রিয় দুইটি বন্ধুসহ সে মধুডাঙ্গায় মেলায় আসিয়াছে ফুর্তি করিতে। কি রকম ফুর্তি সে এতক্ষণ করিয়াছে এবং কি রকম ফুর্তি সে রাতভোর করিত তাহা কেহই জানে না, সে-ও জানে না, কিন্তু সে চরম ফুর্তিতে যে প্রচণ্ড বাধা পড়িয়া গেল তাহা সবাই জানে।

ফুর্তি চরমে তুলিতে যাইয়াই মধুডাঙ্গার মেলা হইতে তাহাকে সবান্ধবে যাইতে হইল গিরিধরপুরের থানায়—ফুর্তি করা শেষ হইল না, গুরুতর একটা অপরাধের দরুণ আদালতের বিচারে তাহার কারাদণ্ড হইল, সেই কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অর্থাৎ ফুর্তির শখ নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া যাইবার পর, সাতু কাল বাড়ি ফিরিবে। আজ মাসের কোন তারিখ তাহা এ-বাড়ির কেহ জানে, কেহ জানে না। কিন্তু এত লোকের কে একজন যেন নিঃশব্দে হিসাব রাখিতেছিল, হঠাৎ সে প্রচার করিয়া দিল, কাল সাতু বাড়ি আসিবে। কাল ৭ই।

চারিটি ভাইয়ের ভিতর সাতকড়ি দ্বিতীয়। ছোট দু ভাই বিদেশে থাকে, তবু বাড়িতে লোকের ভিড়, ভিড়ের ভিতর সাতকড়ির স্ত্রীও বর্তমান। সাতকড়ির স্ত্রী মাখনবালাও দিন গণিতে শুরু করিয়াছিল, কিন্তু অন্যভাবে, স্বামীকে পুনরায় চোখে দেখার দিনটি সে দুরুদুরু বুকে ভয়ে ভয়ে গণিতেছিল—গণিতে গণিতে অবশ হইয়া একদিন সে গণিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—শুরুর সূত্রটা মনে ছিল, আর গণনার শেষ দিনটি বিভীষিকার মতো সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার বুকে কাঁপাইয়া তাহাকে জর্জর করিতেছিল, কিন্তু একটি একটি করিয়া মাঝখানকার অসংখ্য দিন তাহার অসাড়ে উত্তীর্ণ হইয়া গেছে—আর সে ভাবিতে চাহে নাই মনে মনে চোখ বুজিয়া অন্ধ হইয়া সে সেই আগামী দিনের শেষ দিনটাকে প্রাণপণে অনন্ত অন্ধকারে মুছিয়া দিয়াছিল..... ভয়াবহ সেই দিনটি সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ মাথা তুলিয়াছে—মাখন চমকিয়া উঠিল। মাঝখানে ছোট একটা রাত্রি, সূর্য কাল আবার উঠিলে তখন স্বামী আসিবেন—মাখনের জীবনের শংকা প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। সুদীর্ঘ উৎকণ্ঠাব্যাপী জীবন আর দিনগুলিকে এত সংক্ষিপ্ত তার কোনদিন মনে হয় নাই; সাতকড়ি যেদিন যায়

সেদিনের তখন কেবল প্রভাত, আজ এই সন্ধ্যা—

মাখনের মনে হইতে লাগিল, মাঝখানে কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিয়াছে, নিঃশ্বাসটি শেষ করিয়া ফেলা হয় নাই, বুক যেন নিঃশ্বাসের ভারে দুর্বহ হইয়া আছে। ইহারই মধ্যে দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। বাড়িতে আরো লোক আছে—সবাই সাতুর আপন, কেউ ভাজ, কেউ মা, কেউ আর কিছু। কিন্তু এতগুলি পরমাত্মীয় থাকিতেও মাখনের মনে হইয়াছে, সমগ্র ব্যাপারের সঙ্গে তাহারই লিপ্ততা যেন সকলের চেয়ে বেশী—সেই বেশি করিয়া জড়ানো, সে স্ত্রী; বাহির হইতে আসিয়া স্বামীর কোন ক্ষেত্রটা সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে কেহ কখনো বোধ হয় মন খুলিয়া বসে নাই, তবু একটা তাহার আধিপত্যের পরাকাষ্ঠা লোকে যেন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিয়াছে; একটি স্থানে সে সর্বস্ব, সর্বগ্রাসী, সতত জাগ্রত; সে তাহার দাবী পূর্ণতম মাত্রায়, একটি অণু পরিমাণ প্রাপ্যের মায়া ত্যাগ, আর দাবি লঙ্ঘন সহ্য না করিয়া অশেষ শক্তিশালিনী দশভূজার মতো দশ হস্তে কাড়িয়া টানিয়া ছিনাইয়া আদায় করিয়া লইবে—ইহা যেন মানুষের চৈতন্যের মতো যেমন সহজ তেমনি অকুণ্ঠ ব্যাপার।

কিন্তু সে ক্ষমতা সে দেখাইতে পারে নাই; সংসারের প্রত্যেকটি লোকের কাছে এই অক্ষমতার লজ্জায় তাহার মুখ হেঁট হইয়া গেছে। বিবাহের পর শাশুড়ী কতবার আভাসে-ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, ছেলের বন্ধন সে-ই, জীবনের শৃঙ্খলা সে-ই, সৌষ্ঠব শ্রী-সৌন্দর্য সম্মান একমাত্র তাহারই হাতে, সবারই সেই মত; বাড়ির বাহিরের লোকেরও সেই ইচ্ছা, সেই জ্ঞান, মাকে ডিঙ্গাইয়া, একটি অগ্রজ দুইটি অনুজকে অতিক্রম করিয়া সে-ই সব—একটি লোকের জন্য এই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য স্থানটি অকপটে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে কাহারো বাধে নাই; কেহ ইতস্ততঃ সন্দেহ করে নাই; শাশুড়ী যেন পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন; তাহার অস্তিত্বই যেন একটা অপরাজেয় অপরিহার্য শাসনবাণী—তাহাকে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। কিন্তু আজ সে পরাস্ত—শাসন দণ্ড ধূলায় লুটাইতেছে; সে আজ এত তুচ্ছ অকর্মণ্য গুরুত্বহীন যে, তাহার থাকা না-থাকার একই মূল্য। দুনিয়ার লোকে কি বলিতেছে কি ভাবিতেছে তাহা সে জানে না; কিন্তু স্বামীর জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইয়া সে ত সরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তাহার পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র: স্বামীর সত্তার বাহিরে যে জীবন্ত পৃথিবী রহিয়াছে তাহার সঙ্গে সংযোগ তাহার স্বামীকেই বৃন্ত করিয়া, স্বামীকেই বৃন্তরূপে পাইয়া সে চারিদিকের আবহমণ্ডলে ফুটিয়া আছে—তাহার পরিচয়ই ঐ।

ঐ পরিচয় চলিতেছিল—

কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হইয়া গেল—পৃথিবী তাহার পথ ছাড়িয়া উল্টাইয়া পড়িল, যেখানে যে বস্তুটি সুবিন্যস্ত ছিল বলিয়াই সে সুখে ছিল, স্বাভাবিক ছিল, একটি বার চোখের পলক না পড়িতেই তাহারা মিলিয়া মিশিয়া বিকৃত একাকার হইয়া তাহার সেই পৃথিবী ছন্নছাড়া মৃতের শ্মশানে রূপান্তরিত হইয়া গেল......

স্বামী জেলে গেলেন—

সে কুঞ্জ মক্ষিকার গীতিগুঞ্জরণে মুখর ছিল, প্রচণ্ড আঘাতে সে এলাইয়া পড়িল, যে আকাশ আলোর মালা, মেঘের ঢেউ, বায়ুর কম্পন দিয়া সাজানো ছিল, তাহা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল; ভাবনার দল গন্ধ আর বুকের তৃষ্ণা দিয়া নির্মিত যে নীড় অনন্য ছিল তাহার চিহ্নও রহিল না; মন্দিরের নিত্য অর্চনোৎসব বন্ধ হইয়া গেল, ফুলের বুকের মধুরস তিক্ত হইয়া উঠিল; যে পথে সে আলো দেখিত, যে পথে সে গান শুনিত, যে পথে সুধা ঝরিত, চক্ষের নিমেষে সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া জগতের সঙ্গে তাহার আর কোন সম্পর্ক রহিল না......

কিন্তু তাহার এই চরম দুর্গতির অংশ লইতে কেহ বুক বাড়াইয়া আসিল না; তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা ছি-ছি রব তাহাদেরই গৃহকেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ছড়াইতে ছড়াইতে যেখানে সত্য সত্যই আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই শেষতম প্রান্তরেখা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে—জীব-জগৎ শিহরিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া আছে......এই দুর্বিষহ লজ্জা অখণ্ড গুরুভার আর অন্ধকার একখানা মেঘের মতো কেবল তাহারই বুকে জুড়িয়া অক্ষয় হইয়া রহিল—'আমিও তোমার সঙ্গে আছি' বলিয়া ভার বণ্টন করিয়া লইতে কেউ আসিল না।

স্বামীর অপরাধ গুরুতর, এত যে, তাহার চিন্তাই সহ্য হয় না; মানুষ কোনদিন তাহা সহ্য করিতে পারে না—সন্তানের জননী হইয়া, কুলের বধূ হইয়া, স্বামীর স্ত্রী হইয়া, নারী তাহা ক্ষমা করে নাই; ভগবানের নাম যার বুকে আছে, পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই—এ জ্ঞান যার আছে সে তাহা ক্ষমা করে নাই। স্বামী এমনি অচিন্তনীয় অপরাধ করিয়া জেলে গিয়াছিলেন; মুক্তি পাইয়া কাল ফিরিয়া আসিবেন। কাল ৭ই। গৃহের আর সবাই উৎকণ্ঠিত, ভৃত্যটি পর্যন্ত; বিমর্ষে থাকিয়া থাকিয়া তাহারা শ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।—সেই শ্রান্তির মাঝেই যেন তাহাদের লজ্জাবোধের সমাধি হইয়াছে; তাহাদের মনে নাই, কি কারণে তাহাদের সেই পরমাত্মীয়টি এতদিন গৃহে নাই। কিন্তু কোনদিন একেবারে না থাকিলেই যেন ভাল হইত

রাত্রি তখন গভীর।

মাখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া একবার ভগবানকে সে ডাকিল......এত বড় আকাশের যেখানে যে জ্যোতিঃ-বিন্দুটি ছিল, মেঘের গাঢ় প্রলেপে তাহা একেবারে চিহ্নহীন হইয়া গেছে; থই থই অন্তহীন কালোর পাথারে পৃথিবী ডুবিয়া গেছে; তাহার শ্বাস বহিতেছে না—মাখনের অন্তর কাঁদিতে লাগিল......

কালোর অতলগর্ভে অবতরণ করিয়া কাহারা যেন মন্থনে রত হইয়াছে—তাহারা তাহাদের হারানো রত্ন খুঁজিতেছে; তাহাদের হাতের শব্দ নাই, পায়ের শব্দ নাই, মুখে শব্দ নাই—কেবল চক্ষু দুটি দপদপ করিতেছে......

তাহাদের নির্মম অবিশ্রান্ত দণ্ডপ্রহারে আবর্ত-কেন্দ্র হইতে ঢেউ ছুটিতেছে—আগে ধোঁয়া তাহার পর ফেনমুখী হলাহল উদ্গীরিত হইতেছে...সেই জ্বালাময় হলাহলের পাত্র হাতে লইয়া কে যেন অগ্রসর হইতে লাগিল; কালোর মাঝেই কালো মূর্তিটি স্পষ্ট—যেমন নিঃশব্দ তেমনি দৃঢ় তেমনি মন্থর। ঐ হলাহল তাহাকে পান করিতেই হইবে—নিস্তার নাই। কতদূর হইতে কালোর স্তর লণ্ঠন ঠেলিয়া ঠেলিয়া মূর্তি অগ্রসর হইতেছে—তাহার গতির বিরাম নাই; অনন্তকাল ধরিয়া সে যেন আসিবেই— পথের শেষ নাই......

কবে একেবারে সম্মুখে পৌঁছিয়া হলাহলের পাত্রটি তাহার হাতে দিবে। বড় জা গোলাপ সর্বাগ্রে উঠিয়াছিল—সে উঠানে নামিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া সবাই দেখিল, মাখন মূর্ছিত হইয়া উঠানে পড়িয়া আছে।

শাশুড়ী ছুটিয়া যাইয়া বধূর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন। আজ এখনই ছেলে আসিবে যে! আজ ৭ই। গোলাপ দু' মিনিটে তিন বালতি জল তুলিয়া ফেলিল; নিতু মাখনের মুখে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল, কাকীমা? কাকীমা?

সাতকড়ির দাদা সতীশ দরজার আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া ফিরিয়া গেল। গোলাপ নিতুকে সরাইয়া দিয়া মাখনের মাথায় জল ঢালিতে লাগিল, বিরাজ পাখা করিতে লাগিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই মাখন চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে করিতে পারিল না যে, যে দৃশ্যটি মনে পড়িতেছে সে দৃশ্যটি স্বপ্নে দেখিয়াছিল, কি সত্যই ঘটিয়াছিল! বিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা কেমন আছ? কিন্তু মাখনের মন ছিল কুহেলিকাচ্ছন্ন—শব্দ গঠিত করিয়া উত্তর দিতে তাহার দেরি হইল। বিরাজ আবার ঐ প্রশ্নই করিলেন, কিন্তু মাখন কিছু বলিবার পূর্বেই সতীশ নামিয়া আসিল—

বিরাজ বলিলেন—কোথায় যাচ্ছিস?

সাতুকে আনতে যাচ্ছি মা......

—যা।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—বউমা উঠে নে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন কি করে?

—তাই ত ওকে শুধোচ্ছি। তুই ভাবিসনে, ভালই আছে। অর্থাৎ সাতকড়িকে আনিতে যাইবার পক্ষে বউমায়ের জন্য উৎকণ্ঠায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

—'যাই' বলিয়া সতীশ বাহির হইয়া গেল। ধরিয়া আনিবার দরকার সাতুর ছিল কিনা কে জানে; কিন্তু একা একা, যেন

অনিমন্ত্রিতের মতো, গৃহে প্রবেশ করিতে সে সংকোচ বোধ করিতে পারে—তাহারই নিবারণকল্পে বিরাজ এবং তাহার বড় ছেলে সতীশ পরামর্শপূর্বক সহজভাবে একটু চেষ্টা করিলেন—সতীশ আগুয়ান হইয়া তাহাকে আনিতে গেল। বিরাজ ও বড় বউ তখন মাখনকে লইয়া পড়িলেন—

—অসুখ করেছে? মাখন নির্জীবের মতো বসিয়াছিল; বলিল, না।

—তবে, ভয় পেয়েছিলে?

—না।

—তবে?

মাখন বলিল—রাত্তিরে ঘুম হল না; বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন কেমন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি—জানিনে। বলিয়া মাখন উঠিল। নিতু তখন মাখনের কাপড় ধরিয়া আহ্লাদে লাফাইতে লাগিল। অনেক বেলায় সতীশ ফিরিল, কিন্তু একা। ছোটবউকে সুস্থভাবে চলিতে ফিরিতে দেখিয়া বিরাজ সেদিকে নির্বিঘ্ন হইয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন—সতীশকে একা ফিরিতে দেখিয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—সাতু কই?

সতীশ ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—সে এল না।

—এল না? কোথায় গেল? এতদিন দর্শন ও প্রাপ্তি আসন্ন হয় নাই—অনিবার্য বিলম্ব সহিতেছিল; কিন্তু আজ সে প্রতি মুহূর্তে নিকটতর হইতে হইতে একেবারে সম্মুখে না আসিয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইল! বিরাজের বুক কাটকাট করিতে লাগিল......

সতীশ বলিল,—চলো ভিতরে, বলছি। ভিতরে আসিয়াই বিরাজ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: তাকে আনতে পারলিনে কেন? কোথায় গেল সে?

—কি জানি কোথায় গেল! জেলের বাইরে এসে সে বলল, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। বলে সে কি কাজে গেল জানিনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার—

সাতুর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার কি দুরবস্থা ঘটিল তাহা সতীশ বলিল না; বোধ হয় মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে একটু বিব্রত বোধ করিয়াই পাশ কাটাইল।

বিরাজ বলিলেন, সে হয়তো তখুনি এসে তোকে না দেখতে পেয়ে অন্যদিকে চলে গেছে!

বিরাজের এ অনুমান সত্য নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু সতীশের নিকট হইতে কোন জবাব আসিল না। বিরাজের চোখে সেই যে জল দেখা দিল সে জল নিজেও থামিল না, তিনিও চেষ্টা করিয়া থামাইলেন না—জলের সঙ্গে নিঃশ্বাসও বহিতে লাগিল...কিন্তু মাখনের সকল দুঃখ আর অসহিষ্ণুতার উপর যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিল এই বেদনাটাই যে, যে পুত্র সমুদয় পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে তাহাদের সবাইকে এমন করিয়া পাঁকে ডুবাইয়া লইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে সে-পুত্র কেমন পুত্র। এই চোখের জল সর্বকালের এবং সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অবমাননা — জননীর বুকের স্নেহের অংগে কলঙ্কের কালিমা লেপন। ইহা অভদ্র।

বিরাজের একবার চোখ মুছিবার সময় মাখন বলিল,—পথ চেয়ে আছ বৃথাই মা, দিনের আলোয় মানুষের সামনে দিয়ে আসার উপায় তাঁর নেই। তিনি আসবেন সন্ধ্যার পর।

শুনিয়া বিরাজের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তিনিও বধূর ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছিলেন, ঐ কথায় তাহাকে তিনি তীব্রতর চক্ষে লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন, বউমা তোমার মান-অভিমান আর রাগের ভংগী আমার ভাল লাগছে না। তোমার মুখ দিয়ে বিষ পড়ছে। অমন বিষ-মুখ করে থেকো না তুমি, মুখ অমন বিষ করে ছেলের সামনে যেতে পাবে না শুনে রাখো! তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো, আমরা তোমার গুরুজন। আমাদের সামনে—

কিন্তু মাখন হঠাৎ পিছন ফিরিল দেখিয়া বিরাজ যাহা বলিতেছিলেন তাহার গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন—শেষ কথাটাই অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত সতেজে বলিয়া দিলেন,—যাও, কিন্তু সাবধান।

একটু নিঃশব্দ হইতেই সতীশ গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি মা?

—যাই… বলছি গিয়ে। বলিয়া বিরাজ ছোট বউয়ের আচরণ অর্থাৎ তাহার দুঃখের আর ক্ষোভের কথা, বড় ছেলের কানে ঢালিতে বসিয়া গেলেন, কিন্তু সুখ কি দুঃখ কিছুই পাইলেন না। এই ঘাটাঘাটিতে সতীশের লজ্জা করিতে লাগিল, বলিল, বড়বউকে বলো সে-ই বুঝিয়ে বলবে এখন। বলিয়া সে মুখ নামাইল। মায়ের নিঃশব্দ চোখের জল আর সবার মুখের তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া সতীশ ভাইকে আর একবার খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু গম্য—অগম্য ইতর-ভদ্র কোন স্থানেই নিরুদ্দিষ্টের সাক্ষাৎ মিলিল না—কোথায় গেলে সাক্ষাৎ মিলিবে সে সন্ধানও মিলিল না। এই সংবাদ বিরাজ পাইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং খানিক শুইয়াই রহিলেন, তারপর তিনি মুহুর্মুহু ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন, মাখনের রকম দেখিয়া উৎকণ্ঠার উপর তাঁহার ক্রোধ জন্মিতে লাগিল—তথাপি তাঁহার মুখের শব্দ বন্ধ হইয়া রহিল। তাঁহার মুখে আজ ভাত উঠিল না।

কিন্তু ফলিল মাখনের কথাই।

সন্ধ্যার পর বার-দুয়ারের চৌকাঠে ঠাকুমার কোলের কাছে বসিয়া নিতু বলিতেছিল,—কাকা কখন আসবে ঠাকুমা? কোথায় গিয়েছে কাকা?

বিরাজ বসিয়া যেন বিশেষ ঘোরে ঝিমাইতেছিলেন, বলিলেন : তা জানিনে।

—এতদিন কোথায় ছিল?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। নিতু বলিতে লাগিল,—কাকা অনেকদিন বাড়িতে আসেনি, নয় ঠাকুমা? কেন আসেনি? কোথায় ছিল এতদিন? আমার জন্যে কি আনবে?

পরম স্নেহাস্পদ বালক পৌত্রের কৌতূহল নিবৃত্তির দিকে ঠাকুমার কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। বালকের এমনি ধারা শতেক প্রশ্নে যে মিনতি আর যে আগ্রহ দেখা দেয়, 'বিরাজের প্রাণের' আনন্দপ্রবণ অন্তঃস্রোত তাহার স্পর্শে চিরকাল নাচিয়া উঠিয়াছে, আজ তা তাঁহার অজ্ঞাতেই মুহূর্তের জন্য একবার চোখের পাতা ভারি করিয়া তুলিল মাত্র, কিন্তু মনে পড়িল না যে সবই বিষদৃশ। নিতু চুপ করিবার পর বাড়ি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বিরাজ অনমনা হইয়া রহিলেন—

বিরাজ আনমনাই ছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া তিনি দেখিলেন, আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা একটি লোক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না—'সাতু'? বলিয়া তিনি প্রকৃত সজীব ব্যক্তির মত লাফাইয়া উঠিলেন, সাতু গায়ে-মাথার আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিয়া জননীকে প্রণাম করিল এবং পরক্ষণেই হৈ-চৈ বাধিয়া গেল। নিতু চিৎকার করিয়া সংবাদ রাষ্ট্র করিতে লাগিল, 'বাবা,' কাকা এসেছে, মা, কাকা এসেছে, কাকীমা কাকা এসেছে' বলিতে বলিতে সে কাকার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া আর তার হাত ধরিয়া নাচিতে লাগিল……

'আয়' বলিয়া বিরাজ অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার পিছন পিছন সাতু বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী ব্যতীত আর সবাই একত্র হইয়া সোৎসুকে দাঁড়াইয়া আছেন। দাদাকে সে প্রণাম করিল, বউদিকেও প্রণাম করিল, দাদার ছোট ছেলেটাকে সে দেখিয়া যায় নাই—এটা আবার করে হল? জিজ্ঞাসা করিয়া সাতু ডান হাতের দুটি আঙুলে তাহার গন্ড স্পর্শ করিল।

দাদার বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। "আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় পালিয়েছিলি?" বিস্মিত এই প্রশ্নটি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকবার তার মনে উঠিয়াছিল, কিন্তু কেন পালাইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া বোধ হয় চক্ষুলজ্জার বশেই সে নিঃশব্দে সরিয়া গেল, যাকে সন্তুষ্ট করিতেও সে কোনো সম্ভাষণও মুখে ফুটাইতে পারিল না।

বউদি গোলাপ কেবল জিজ্ঞাসা করিল—ভাল আছ?

সাতু বলিল,—তোমাদের আশীর্বাদে। বলিয়া হাসিল। হাসিটা হঠাৎ কটু মনে হইয়া গোলাপের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। তাহার হেঁশেল ছিল—মুৎফরক্কা অভ্যর্থনার পর সে সেখানেই গেল।

বিরাজ ছেলেকে অবলোকন করিতেছিলেন; তাঁহার চক্ষুলজ্জাও নাই, হেঁশেল নাই, ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন,—বড় রোগা হয়ে গেছিস। ভেতরে অসুখ নেই ত?

সাতু নিজের গায়ের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল : হাসিয়া বলিল, —না। কিন্তু বড় কষ্ট দিয়েছে, মা!

শুনিয়া মায়ের চোখে জল আসিল—বলিলেন, —আজ সারাদিন খেয়েছিস?

সাতু তাহাদের আড্ডায় আজ যা খাইয়াছে সে জিনিস এ-বাড়িতে রান্না হওয়া দূরের কথা, প্রবেশই করে না। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিল, কিছুই খাইনি মা।

—কিছুই খাসনি? আ-হা-হা……আর্তনাদ করিয়া বিরাজ হাঁকিলেন,—ছোট বউমা, রান্না হল? বলিয়া উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত সবুর না করিয়া তিনি নিজেই রান্নার তদারক করিতে রান্নাঘরের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং রান্না সমাপ্ত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইলেন, ছোট বউ ব্যাধিকাতর দুর্বল ব্যক্তির মতো জড়সড় হইয়া এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে গা ঠাসিয়া বসিয়া আছে…

খুবই লক্ষ্য করা—এ ব্যাপারটা মুলতবী রাখিয়া বিরাজ জানিতে চাহিলেন—বড় বউমা, রান্না হল? সাতু সারাদিন কিছু খায় নি।

'এই হল মা'—বলিয়া বড়বউ হাঁড়ি আর কাঠি লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বিরাজ অবেলায় রান্নাঘরের আমিষ মাটি ডুলিয়াও মাড়ান না, কিন্তু এখন বড় তাগিদ ছিল, মুলতবী ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিতে তিনি আমিষ মাটির উপর দিয়াই ছোট বউয়ের দিকে আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন; গলা খুব খাটো করিয়া বলিলেন,—তুমি অমন করে বসে আছ যে? ইত্যবসরে তাহার বিরহী ছেলেকে দেখা এবং দেখা দেওয়া বিরহিণী বউয়ের উচিত ছিল বলিয়া বিরাজের মনে হইল।

মাখন কথা কহিল না, তাহার মাথা মাটির দিকে আরো ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিরাজ বলিতে লাগিলেন,—ছেলের শরীরের দিকে চেয়ে আমার মন ভাল নেই, বউমা! এমন সময় তুমি আমায় জ্বালিও না বলছি। ওঠো।

মাখন মুখ তুলিল না, বলিল—উঠে কি করব?

—করবে আবার কি? নেচে বেড়াতে তোমায় কেউ বলছে না। ছেলের সামনে তুমি মুখ অমন বিষ করে থাকতে পাবে না—বলিয়া মহা রাগতভাবে মাথায় মস্ত একটা ঝাঁকি দিয়া বিরাজ প্রস্থান করিলেন।

সাতু ইত্যবসরে তাহার দেড় বৎসরের পরিত্যক্ত গড়গড়াটা বাহির করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহার প্রিয় তরকারিগুলি প্রস্তুত করিতে বধূদ্বয়কে হুকুম করিয়াই বিরাজ কর্তব্য সম্পাদনপূর্বক নিশ্চিন্ত হন নাই, সাতুর শ্রান্তিহারী এবং সুখজনক শৌখিন তামাক আর টিকেও আনাইয়া চাকরটাকে কি কারণে কে জানে সে দিনের মতো ছুটি অর্থাৎ বাহির করিয়া দিয়াছেন।

সাতু চটপট তামাক সাজিয়া লইয়া টানিতে বসিল। নিতু তার ছড়ানো পায়ের ফাঁকে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় ছিলে কাকা এতদিন?

বালকের ঐ একই প্রশ্ন—

কিন্তু একবারও তাহার উত্তরের আশা মিটিল না, ভূতপূর্ব বাসস্থান সম্বন্ধে সাতু একটা অপ্রকৃত উত্তর গড়িয়া না তুলিতেই বিরাজ রান্নাঘর হইতে সেখানে আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—তোর সে কথায় বারবারই কাজ কিরে লক্ষ্মীছাড়া? পালা এখান থেকে। বলিয়া নিতুর সোহাগ সুখ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে তিনি দাঁড় করাইয়া দিলেন।

সাতু চিরদিন সপ্রতিভ—

নিতুর প্রশ্নে এবং ভর্ৎসনা দিয়া মায়ের এই চাপা দিবার চেষ্টায় তাহার মনে ঘুণাক্ষরেও একটু বিকার উপস্থিত হইল না, বলিল—আহা বসুক না! বলিয়া সে নিতুকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া বসাইল, কিন্তু নিতুর তখন আর খবর জানিবার উৎসাহ নাই।

বিরাজ সাতুকে দেশের খবর, অর্থাৎ পরিচিত মানুষের জন্ম মৃত্যু বিবাহের খবর শুনাইতে লাগিলেন, সাতু তাহা তামাক টানিতে টানিতে শুনিতে লাগিল।

আহারের ঠাঁই হইল দুই ভাইয়ের পাশাপাশি। সাংসারিক কথাই সংসারে বেশী এবং প্রবল। দাদা সতীশের সঙ্গে এবং মায়ের সঙ্গেও সাতু আহারে বসিয়া যথেষ্ট লিপ্ততার সঙ্গে সে আলোচনা করিল এবং অকুণ্ঠিতভাবে আর দীর্ঘ ভাষায় স্বীকার করিল যে, ঋণ যাহা হইয়াছে তাহার কারণ সে-ই।

সতীশ ভাতের থালার দিকে এবং বিরাজ সাতুর মুখের দিকে তাকাইয়া ঋণ সম্বন্ধে

তাহার বক্তব্য শুনিলেন—দুঃখের কথা উচ্চারণ করিলেন না।

ভোজনে সাতু বৃক-তুল্য—কিন্তু আজ তাহাকে অল্পেই তৃপ্ত হইতে দেখিয়া জননী বিরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন—কই, খেলিনে তেমন?

—পেটের খোল চুপসে গেছে মা, না খেয়ে। ভেবো না, ক্রমশঃ আবার বড় হবে বলিয়া সাতু মাতৃহৃদয়কে অভয় দিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

আনন্দের মাঝেই আহার সমাধা হইল। সাতু তামাক সাজিয়া লইয়া শয়ন-কক্ষে যাইয়া বিছানায় বসিল।

মাখন ভাতের থালা সামনে লইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল।

গোলাপ কাতর স্বরে বলিল,—খা......

দু' গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই মাখন হাত টানিয়া লইল। গোলাপ সে দিকে একবার বিষণ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিল—আর বলিল না কিছুই।

বহু যোজন দূরে ঝড় উঠিলে নাকি সমুদ্রের নিবাত তটেও তাহার ঢেউ আসিয়া লাগে। মাখনের মনের কথা গোলাপের অজানা নাই, মাখনের বুকের বেদনা যেন নিঃশ্বাস বায়ু চালিত হইয়া তাহার বুকে বাজিতেছিল—

তবু সে একবার বলিল, ভাই, আমার মাথা খাস......

মাখন বলিল,—দিদি, আমায় বিষ দাও। বড় বউ ছলছল চক্ষে বাম হস্তে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল।

ছোট বৌমার খাওয়া হ'ল?—জানিতে চাহিয়া বিরাজ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন—অকারণেই তাঁহার মনে হইতে ছিল ছোট-বউ উচ্ছৃঙ্খল পূর্বক বিলম্ব করিতেছে।

বড় বউ বলিল—হয়েছে।

ছোট বউয়ের দিকে তাকাইয়া বিরাজ বলিলেন—তবে বসে আছ কেন?

হেঁশেল বড় বউমা সারবে'খন, তুমি আঁচিয়ে যাও তোমার ঘরে। —বলিতে বলিতে তাঁহার নজরে পড়িয়া গেল সাতুর খাওয়া থাল খানা। থালাখানা তাঁহার সাক্ষাতে তুলিয়া আনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সাক্ষাতের উপর ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় সেই উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রে ছোটবউ ভাত লয় নাই দেখিয়া, অর্থাৎ স্বামীর প্রতি বধূর এই ঘৃণা প্রকাশে, বধূর প্রতি দারুণ অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া বিরাজের যে কেমন ঠেকিতে লাগিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে কথা তিনি মোটেই তুলিলেন না; কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—কথা বলছ না যে?

কি কথা তিনি বধূর মুখে শুনিতে চান তাহা তিনিই ভালো করিয়া জানেন না। কোথায় একটু খিঁচ্ছার যেন ছিল—তাহাকে নির্বিষ করিতেই তিনি তাঁহার ক্ষমার অধিকারের আর আকাঙ্ক্ষার সাথে খুঁজিয়া মরিতেছেন, বধূর মুখের কথায় যদি তাই একটু পান, কিন্তু মুশকিল এই যে, এই কথা লইয়া গলা চড়াইবার উপায় নাই।

আরো মুহূর্ত দুই অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া বিরাজ পুনরায় বলিলেন, মনের ঝাঁজ যেন গলিয়া গলিয়া মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল : "কথা কইছ না যে তবু? কার হাতে তুমি পড়েছ তা জানো? আমার হাতে। আমায় ঘাঁটিয়ে কেউ নিস্তার পায়নি।'

বলিবার কিছুই ছিল না বলিয়াই মাখন তথাপি কিছু বলিল না। বড় বউ মধ্যস্থ হইয়া আসিল, বলিল—তুমি যাও মা। আমি ওকে দিয়ে আসছি।

যাওয়া ছাড়া বিরাজের আর গতিই ছিল না। পাথরে আঘাত কে কত করিতে পারে! মনে মনে ছোট বউয়ের মুথা চিবাইতে চিবাইতে তিনি চলিয়া আসিলেন।

বড় বউ যাইয়া মাখনের হাত ধরিল। বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সাতকড়ি মধুডাঙ্গায় মেলার ঘটনাই চিন্তা করিতেছিল—সেখানকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আর দুর্বিপাকের বহর ভাবিতে ছিল, দৈব নিতান্তই বিমুখ, নতুবা ধরা পড়িবার ত কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। সঙ্গীরা পাকা লোক। সতর্কতা অবলম্বন করিতে কোনো দিকেই ত্রুটি হয় নাই—মেয়েটির সংগ লইয়া পায় পায় তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল—ঘুণাক্ষরেও তাহাকে টের পাইতে দেয় নাই।

দোকানপাট বন্ধ হইয়া মেলার স্থানটা ক্রমে নিদ্রিত নির্জন হইয়া গেল। কীর্তন তখন দুনে চলিতেছে, জমিয়াছে বেশ; কীর্তনওয়ালা থামিয়া নাহিয়া উঠিয়াছে—তবু তার বসিবার নামটি নাই, খোল-বাদকগণ যেন নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে...

নাট-মন্দিরের ভিড়ের বাহিরে একটা টিনের চালার কাঠের খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া মেয়েটি ঢুলিতেছিল। হঠাৎ প্রচন্ড একটা হরিধ্বনিতে চমকিয়া সজাগ হইয়া সে বোধ করি গায়ে হাওয়া লাগাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানের আওতায় বাতাস ভাল বহিতেছে না, মেয়েটি ধীরে ধীরে গলির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল......

তারপর যা ঘটিল, তা চক্ষের পলকে—মেয়েটির মুখের উপর কাপড় চাপা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহখানা শূন্যে উত্তোলিত হইয়া তীব্রবেগে চলিতে লাগিল।

অদূরে বিস্তৃত বাগিচা—

কেজো অকেজো ছোট-বড় গাছে আর ঝোপ-জঙ্গলে বাগিচা পরিপূর্ণ। কিন্তু বিধাতা এমনি অপ্রসন্ন যে, গভীর রাত্রে বনাভ্যন্তরেও তিনি একজন দর্শককে পূর্ব হইতেই স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিল।

তারপর মামলা; অত্যন্ত তোড়জোড়, অসংখ্য যাতায়াত, অজস্র অর্থব্যয়, কত কি বিশৃঙ্খলা কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট......

তারপর সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস; দেহের শক্তি যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়া ওরা কাজে লাগাইয়াছে—নিদারুণ দাসত্ব সহ্য করিতে হইয়াছে।

দুঃসহ পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে বলিয়া সাতুর কিন্তু নিঃশ্বাস পড়িল না—মেয়েটির মুখখানা তাহার মনে পড়িল—নয়নাভিরাম, কালোর উপর উলকির ফোঁটা, স্বাস্থ্য অতি সুন্দর, চক্ষু দুটি গেঁয়ো হাবা—দেখিলেই তা বোঝা যায়। মেলায় একা আসিয়াছিল, না সঙ্গী-সাথী কেহ ছিল কে জানে। এখন সে কোথায়, কেমন তার দশা, তাই বা কে জানে!

সাতু উহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় দরজার খিলের শব্দ পাইয়া সে ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, মাখন আসিয়াছে—সে আরো দেখিল যে, সে মেয়েটির চেয়ে মাখন সুন্দর......

বলিল—এতক্ষণে দেখা দিলে! এস।

কিন্তু মাখন স্বামীর আহ্বানে পোষ-মানা কি মন্ত্রমুগ্ধ মানুষটির মতো সরাসরি শয্যায় না যাইয়া দূরে দেয়ালের দিকে যাইয়া দাঁড়াইল তার সোহাগপূর্ণ সাদর আহ্বান সে শুনিতে পাইয়াছে কিনা তাহাই সাতু বুঝিতে পারিল না।

স্বামীর সঙ্গে মাখনের মিলনের একটা সূত্র না থাকিয়া পারে নাই; কিন্তু প্রাণের আঁশে আঁশে যোগের স্রোত প্রবেশ করিয়াছিল এ-কথা বলা চলে না। সংসর্গজ স্তিমিত একটা কোমলতা জন্মিয়াছিল—মাঝে মাঝে তাহা ফুটিত, তার উপর, কোথায় ভয়াবহ দন্ডপানি একজন শাসক বসিয়া আছেন—তিনিও টানিয়া লইয়া প্রকাশ্য একটা স্থানে জোড় মিলাইয়া দিয়াছিলেন—মাখন তা অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বামীকে মাখন চিনিয়াছিল। মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে, ভাষা শুনিয়া চেনে, চাহনি দেখিয়া চেনে চিনিবার দিকে এমন উগ্র ভাবে সচেতন প্রাণের কাছে প্রাণের পরিচয় গোপন রাখা যেমন কঠিন, চিনিতে পারিবার পর সেদিকে চোখ বুজিয়া থাকাও তেমনি কঠিন। সুখের হোক, দুঃখের হোক, তবু স্পর্শ ছিল—সুখে দুঃখে মিশ্রিত হইলেও এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অনিচ্ছাই প্রবল হইলেও, কর্তব্যের দায় আর প্রেরণা ছিল, অভিমান বোধ ছিল, আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিল—

সব লুপ্ত হইয়া গেছে—মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর নিপতিত জলবিন্দুর মতো সে এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে, তাহার উদ্দেশ নাই।

মাখন স্বামীর চোখের উপর চোখ পাতিয়া রাখিল। সে দৃষ্টির অর্থ কি সাতু তাহা বুঝিল না—সে বুঝিল না যে, দু জনাই মানুষ হইলেও তাহাদের জগৎ বিভিন্ন কোনো অপরিচিত জগতের অনভ্যস্ত আত্মা যেন এই জগতের আত্মার কাছে বন্দী হইয়া আসিয়াছে—পুরুষের দিকে স্ত্রীর এই দৃষ্টি বিভীষিকার সম্মুখে মূর্ছিতার বিহ্বল দৃষ্টি—নিঃশব্দ আর্তনাদ......

সাতু হাসিতে লাগিল, বলিল—বড়ই অভিমান যে! ডাকছি, তা আসা হচ্ছে না। ঢং দেখলাম বিস্তর। সেও হয়েছে, এস এখন, না আমাকেই উঠতে হবে!

মাখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া একবার ঢোক গিলিল—তাহার বুক ধড়ফড় করিয়া সর্বাঙ্গ যেন কাঠ হইয়া যাইতেছে......

সাতু উঠিতে উঠিতে বলিল,—উঃ। বলিয়া বিরক্তি আর শ্লেষ প্রকাশ করিয়া সে উঠিল।

মাখন কেবল সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল—কোথায় সে যাইতে চায় সে জ্ঞান তাহার নাই, যাইবার স্থান নাই, তবু নিজেকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়া সে কেবলি সরিয়া দেয়ালের বাহিরে যে অশেষ উন্মুক্ত পৃথিবী, যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে চলিয়াছে—তাহার স্থূল অবয়ব কেবল ত্বকের উপর পশ্চাতের কঠিন বাধা অনুভব করিতেছে। দেয়ালের সঙ্গে ঘর্ষণে তাহার পিঠের চামড়া কাটিয়া গেল।

সাতু অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে—তাহার স্পর্শটা আসিয়া মাখনের সর্বশরীরে যেন বিষাক্ত হুলের মতো বিদ্ধ হইতে লাগিল...

কিন্তু দেহ সংকোচনের অবকাশ আর নাই—পর মুহূর্তেই তার সংকুচিত আড়ষ্ট সর্বাবয়ব যেন রুদ্ধ বায়ু বাহিরের দিকে নির্গত করিয়া দিয়া বাহিরের চাপ বাহিরের দিকেই ঠেলিয়া দিল—সর্বান্তঃকরণ বিদ্যুতের আগুণে জ্বলিয়া লাল হইয়া সহসা প্রাণপণে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইল......

সাতু তাহা দেখিল—এমন ব্যাপার না দেখিয়া উপায় নাই; কিন্তু সাতু তাহা গ্রাহ্য করিল না; তা করিবার মতো মন তাহার হইলে সে জেলে যাইত না। বলিল, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, একটা কথা আছে না? অমন করে চাইলে কি হবে! আমার—

বলিতে বলিতে মাখনকে হাত তুলিতে দেখিয়া সাতু থমকিয়া দাঁড়াইল। মাখনের হাত তুলিবার ভঙ্গীটি বড় অসাধারণ—তাহার উদ্দেশ্য যেন শুধু আত্মরক্ষা নয়, তাহার উপরে মারাত্মকই কিছু। সাতু যতই দুর্জয় হউক, আর এখানে-সেখানে সে যতই ভুল করুক, এবারে সে ভুল করিল না, আর ভয় পাইল; হটিয়া আসিয়া বলিল, মারবে নাকি?

মাখন বলিল—আমায় ছুঁও না।

—যদি ছুঁই?

শুনিয়া সাতুর বুক কাঁপিয়া উঠিল—নিজের হাতে হামেশাই থাকে বলিয়াই

তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল, তীক্ষ্ণ একখানা অস্ত্র তাহার স্ত্রীর বাঁ হাতে আছে—আঁচলে তা ঢাকা আছে।

সাতু ফিরিল; প্রাণভয়ে পালাইবার মতো করিয়া ছুটিয়া যাইয়া দড়াম করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে চেঁচাইয়া ডাকিল,—মা?

বিরাজ অবশ্য তখন জাগিয়াই ছিলেন—এক ডাকেই সাড়া দিয়া ছেলের ব্যাকুল কণ্ঠ কানে বাজিতেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—"কি রে? কি হল রে?" বলিয়া উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করিতে করিতে তিনি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সাতু বলিল,—বউকে বের করে আনো ও-ঘরে আমি যাব না। মারবে বলছে।

বিরাজ ঠিকরাইয়া উঠিলেন : মারবে বলেছে?

—তা' পারে। ওর কাপড়-চোপড় ঝেড়ে দেখ—ছুরি ছোরা বোধ হয় ওর কাছে আছে।

শুনিয়া বিরাজ হতজ্ঞান হইয়া গেলেন। বড় কষ্টে দীর্ঘদিন তাঁহার কাটিয়াছে, উৎকণ্ঠায় তাঁর স্নায়ু উঠিয়া পড়িয়া অবিরাম ঝম ঝম করিয়া বাজিয়াছে, শ্রান্ত শান্তিহীন হইয়া গেছে, ছেলের ক্লান্ত শীর্ণ চেহারার দিকে চাহিয়া তাঁহার কিছুই ভাল লাগে নাই, তাহার উপর এই বধূরই পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরক্তিতে আর বধূর অমানুষিক একগুঁয়ে আচরণে ক্রোধের তেজে তাঁহার রক্ত তখনো ফুটিতেছিল...

এখন ছুরি লইয়া সেই বধূ তাহার পুত্রকে খুন করিতে উঠিয়াছে, আচমকা এই খবর পাইয়া তাঁর মাথার হাড় পর্যন্ত আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল—

'কই?' বলিয়াই যখন তিনি বধূর উদ্দেশে ধাইয়া গেলেন, তখন তিনি উন্মাদ—হিতাহিত ন্যায়-অন্যায় বুঝিবার হুঁশ লোপ পাইয়া গেছে......

চোখে পড়িল, বধূ কোনে দাঁড়াইয়া আছে। কেমন করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তাঁহার চোখে পড়িল না, ছোরা-ছুরির ভয়ও তিনি করিলেন না, লাফাইয়া যাইয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন, ঘাড় ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিলেন এবং ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই তাহাকে বারান্দায় আনিলেন, উঠানে নামাইলেন, উঠান পার করিলেন, বধূর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া সদর দরজায় খিল খুলিলেন—

বলিলেন—যা চুলোয়। বলিয়া ঘাড়ে শেষ ধাক্কা দিয়া তাহাকে সদর দরজার বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—তাহার পর খিল আঁটিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

উপরে সতীশের কানে গেল খিলের শব্দটা, জিজ্ঞাসা করিল—সদর দরজা কে খুলেছে?

সাতু উত্তর করিল,—মা, তারপর অত্যন্ত দুঃখিতভাবে এবং নিম্নতর কণ্ঠে নিজের সম্বন্ধে একটা কথা সে বলিল, জেলই আমার ছিল ভালো।

জগদীশ গুপ্ত

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সাধারণ পাঠকদের ইচ্ছা পূরণের আনন্দ জুগিয়ে, নিমন্ত্রণের আসরে লোভনীয় খাদ্যবস্তুতে রসনাকে তৃপ্ত করার মতই তাদের রুচির তৃপ্তিবিধানই যে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সাফল্যের নিরিখ মনে করতেন, তাঁর নিজের উক্তিতেও তার প্রমাণ মেলে : 'গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয় 'আহা বেশ।' তবে আবার গল্প কি? আমি এই লাইনে চলছি।...তোমাদের হরিদাসবাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে 'রামের সুমতি'র নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে। এই সমালোচনাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।' সহজ ভাবালুতায়, একদিকে পতিতা নারীর ওপর মহিমার মনোরম বর্ণাঢ্য আবরণ রচনায়, অন্যদিকে আদিরসের চতুর প্রচ্ছন্ন পরিবেশনে তথা পাঠকচিত্তকে মোহাবিষ্ট করার কৌশলপূর্ণ আয়োজনে শরৎচন্দ্র যে কিভাবে চরিত্র ও আচরণের বাস্তবভিত্তিক ন্যায়কে, কার্যকারণসম্বন্ধসূত্রকে লঙ্ঘন করেছেন, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'শেষের পরিচয়'-এর সমালোচনায় তীক্ষ্ণভাবেই নির্দেশ করেছেন। 'রমণী কোন গুণে সবিতাকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করিয়াছিল, শেষের পরিচয়ে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াও তার পাত্তা পাওয়া যায় না', 'মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি শরৎসাহিত্যে সুলভ হইলেও রজবাবুর সেদিনকার, অর্থাৎ সবিতার গৃহত্যাগের দিনের, দুঃখ বিপদে রাখালের অথবা কাহারো মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করে নাই', 'অকর্মা পুরুষকে প্রশ্রয়ের হালকা সুরে ভর্ৎসনা আর নিরন্তর কবা শরৎচন্দ্রের টেকনিকে গভীর অনুরাগের লক্ষণ', 'মনে মনে যৌনলীলার রসানুভূতি ঘটিতে ঘটিতে স্ত্রী-পুরুষের রহস্যালাপ, পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া সুচতুর মন্তব্য, প্রশ্ন, ইঙ্গিত এবং ছলাকলা প্রভৃতির বিন্যাসে সজাগ নৈপুণ্য আছে বলিয়াই শরৎচন্দ্র বহুস্থলে ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন', 'পদস্খলিতা বহুচারিণী নারী দৈবাৎ এক সময়ে একেবারে মনের মতন নিরেট নিটোল প্রেমের পাত্রটি পাইয়া গেলে তাহার অঙ্কশায়িনী হইয়া স্বীয় প্রেমের মর্যাদা নষ্ট করিতে এবং পুরুষটির আত্মার অধোগতি ঘটাইতে অর্থাৎ কলুষ সৃষ্টি করিতে নারাজ থাকে, আর, সেই নারী পুরুষটিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে বাধ্য করে, ইহা শরৎচন্দ্রের নিজস্ব আবিষ্কার না হইলেও তিনি খুব আড়ম্বর করিয়া গৌরবময় ঐ যৌনত্যাগকে খুব প্রাধান্য দিয়াছেন। এই ত্যাগের মহিমা ঘোষণা তিনি পুনঃ পুনঃ করিয়াছেন এবং বহুবার একই-দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়ায়...ঐ গৌরব ঘোষণার আবেদন অন্তর্হিত হইয়া খানিক কমিক ভাব আসিয়া গেছে'—শেষের পরিচয়ের বিদ্রূপকঠিন সমালোচনার এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিতেই বোঝা যায়, জনপ্রিয় রম্যকাহিনী ফাঁদার প্রতি কল্লোল-যুগের বিশিষ্ট শিল্পী জগদীশচন্দ্রের আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল।

শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে পতিতার কিংবা সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষণা যতই থাকুক, তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে সমাজ-জীবনের বাস্তব রুক্ষ ক্লেদাক্ত চেহারার মুখোমুখি হতে চাননি, তার প্রচলিত ছকে আঘাত করেননি। কল্লোল যুগের অন্যান্য শিল্পীদের মত জগদীশচন্দ্রের রচনায়ও সংস্কারমুক্ত বাস্তবদৃষ্টি দেখি। এই দৃষ্টির শৈল্পিক বিন্যাসও আশ্চর্য তীক্ষ্ণ। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'ভারতী'র লেখক-লেখিকাদের গল্পরসপূর্ণ কাহিনীর গতানুগতিক সরল কাঠামো তিনি বর্জন করেছেন। গল্পরস পরিবেশনে শিল্পী বিন্দু-মাত্র আগ্রহী ছিলেন না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ আনন্দ প্রত্যাশার অভ্যাসিক চেতনার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ এবং নিষ্ফলতার দুঃখ ও নৈরাশ্যময় নিয়তির মর্মান্তিক অমোঘতাকে তিনি কাহিনীর স্থূল সরল বিন্যাসে নয়, জটিল সাংকেতিকতাময় নকশায়ই রূপ দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পের অন্ধকার জগতে মানুষ নির্মম অন্ধ নিয়তির শিকার (রতি ও বিরতি), কখনও বা মানুষের নীচতা ও ইতরতা অনেকটা নিয়তির মতই অন্ধ-শক্তিতে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিটিকে ধ্বংস করে (পামর, গতিহারা জাহ্নবী), রোমান্টিক স্বপ্ন বাস্তবতার সংস্পর্শে ভেঙে যায় (শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী, রসাভাস), সামান্য ঘটনায়, একটি মুহূর্তে জীবনের শূন্যতা ধরা পড়ে (মহিম সর্বাধিকারীর মন, অপহৃত আকাশকুসুম), মানুষের জান্তবপ্রবৃত্তিসর্বস্ব স্বার্থপরতা অন্যের জীবনে দুঃসহ আঘাত হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, কোনও কোনও লেখকের মত বিদেশী উপন্যাসের দৃষ্টান্তে এই জগৎ চিত্রণে জগদীশচন্দ্র শহরের শিক্ষিত সমাজ, কিংবা তার নীচু তলার অন্ধকার জীবন, অথবা ভিখারী, গণিকা ভবঘুরে গুণ্ডা প্রভৃতির মত বোহেমিয়ান চরিত্রকে নয়, গ্রামীণ, মফস্বলীয় বাঙলার সাদামাঠা জীবনধারাকেই উপজীব্য করেছেন।

'রতি ও বিরতি', 'পুরাতন ভৃত্য', 'ভরা সুখে', 'নিঠুর গরজী', 'আমার শত্রু নিপাত যাক', 'যাহা ঘটিল তাহাই সত্য' ইত্যাদি গল্পে জগদীশচন্দ্র মানুষের আনন্দ সুখ ইত্যাদির প্রত্যাশাকে ইন্দ্রিয়চেতনা, স্বার্থময় প্রবৃত্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন, এবং এই ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনায়ই নিয়তির নিষ্ঠুর বঞ্চনা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। রতি ও বিরতিতে নিয়তির চরম আঘাতের দৃশ্যটি অসামান্য। 'রামের কাঁপতে কাঁপতে বালিশের তলা হাতড়িয়ে দেশলাই এবং কাঠি বার করা, সেটার জ্বলে ওঠা এবং তারপরেই মাটিতে পড়ে নিভে যাওয়া, একটি নিমেষের আলোকেই সুবৃহৎ ফণা দেখা, 'বিস্তৃত হইয়া আছে', এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পরই মৃত্যুদূতের উল্লেখ—'শিয়রে বিষধর

দেশলাইয়ের দ্বিতীয় কাঠিটির বা তৃতীয় কাঠিটির আলোকে সর্বনাশের । অনেকটা পরিমাণে লক্ষ্যগোচর অবশেষে কুপীর প্রচুর আলোকে তথা নিয়তির নিষ্ঠুর ছোবলের দৃশ্যটির উন্ঘাটন—'ছেলের বুকে াতে ছিদ্র হইয়া ছিদ্র দিয়া ার করিয়া রক্ত পড়িতেছে' র আলোর 'প্রচুর' বিশেষণটিও ময়)—এইভাবেই পর পর অনেকগুলো সুসংলগ্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তর মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পেতে যে তার মর্মন্তুদ দুঃসহতার চূড়ান্ত, তম বিন্দুটিতে এসে পৌঁছোয়। ঘটিল তাহাই সত্য'-তে নিয়তির তর ব্যঙ্গাত্মক চিত্রণও উল্লেখযোগ্য : ধবের বড়ো ছেলে ঘণ্টুর মত হলের সম্বন্ধেও তার কোষ্ঠী দেখে ষী দীর্ঘজীবন ও অশেষ সুখ-গ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ফলে তাঁর র সুখ-আনন্দের স্রোত প্রবাহিত। ধব শুভ্রতার ভক্ত, মা ছোটখোকার াদা কাপড়ের ওপর কালো সুতো কাঁথা সেলাই করলে তিনি সহ্য করতে না। তাঁকেই একদিন সপরিবারে র নির্মম আঘাতের দৃশ্যটি দেখতে ছোটখোকার শরীর নিঃস্পন্দ—বুকের উপর যে সাদা কাঁথা রহিয়াছে, পর ছোট ছোট পায়ের দাগ—ঠিক পায়ের মাপের।' এই ঘণ্টুর কোষ্ঠী করে জ্যোতিষী রায় দিয়েছিলেন, নবের প্রতিভা আর ব্যক্তিত্ব লইয়া রঞ্জন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সহস্র বিপত্তি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া অতটা যে শেষ পর্যন্ত উঠিবে. জ্যোতিষা-কোষ্ঠী সে বিষয়ে একেবারে দহ'. ঘণ্টু কর্তৃক ছোট খোকার এই 'উঠিবে' যে কী মর্মান্তিক স হয়ে দাঁড়ায় শেষ অংশের বর্ণনায় ত তা প্রকাশিত : 'প্রথম মুহূর্তটায় া মুখেই শব্দ ফুটিল না—কাঁদে ত লাগিলেন. সিঁড়িতে ঘণ্টুর পায়ের উঠিয়া আসিতেছে'—'উঠিবের' ভবিষ্যৎ আসিতেছে'-র নিষ্ঠুর বর্তমানে য়।

সাভাস' গল্পে দেখি, কুলত্যাগিনী ক ব্যবসায়ীর ভূতপূর্ব রক্ষিতা সুখ-দর্শনে মুগ্ধ হৃদয়নাথ তার সঙ্গে মিলনের স্বপ্নে বিভোর হয় : তাহারা—এই অব্যাহত পরম ই করিবে দিশেহারা, স্পর্শকে তম, মিলনকে পূর্ণতম, আলিঙ্গনে দগ্ধ আন্তরিকতায় উচ্চতম—তাহাদের করিবে অনুচ্চারিত শব্দে মুখর, করিবে অনন্যের অর্থে পূর্ণ, করিবে অচিন্তনীয় রসে এমান যে, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ ত হইয়া এক সময় মূর্ছার মত প্রকম্পিত অসাড়তার মাঝে তাহারা হইয়া যাইবে'—একটি বাক্যেই বিশেষণ পদের এবং সবশেষে স্বপ্নের বিশেষণ পদের রেটরিক ভাষায় অন্য একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সুর্বমুখীকে কলহমত্ত হতে দেখে (হৃদয়নাথকে দেখিয়ে সে বলে, ঐ যে বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা না নিয়ে ঘরে; আঁট গণ্ডা ভরতি হোক) হৃদয়নাথের মোহভঙ্গের সূত্রেই ব্যঙ্গাত্মক ব্যঞ্জনা লাভ করে। এই ব্যঙ্গ 'তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে' আরও নিষ্ঠুর। গল্পের নায়িকা গিরিজা তার সতীনপুত্রসহ বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়েই খুশি : স্বামী বৃদ্ধ, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? নেশার ঘোরে দিবাস্বপ্ন দেখিয়া যাহারা মনে করে, ইহাই সত্য, ইহাই সুখ. ইহাই শেষ আর ইহাই সার্থকতা, তাহারা কৃপার পাত্র। অপরাহ্নের সূর্য কি সূর্য নয়?' এই বিশেষ্য পদগুলোর এবং সবশেষে 'কৃপার' প্রয়োগে গিরিজা অন্যান্যদের করুণা করার পর নিজেই যেভাবে নিষ্ঠুর আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, তা তীক্ষ্ণভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে. এই পদগুলোর রেটরিক তার নিজের অবস্থারই পরিচিতি হয়ে উঠেছে। তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধের ভয়াবহ শূন্যতাকে উদ্ঘাটিত হতে দেখি : তাদের ছেলে চন্দরকে নিয়ে ঝগড়ার সময় গিরিজা আর তার স্বামী বংকু একটি ছেলেকে বলতে শুনল—'দেমাক দেখ! বুড়োর বেটা। চন্দর তার বাবার নাতি, জানিস তোরা?' এই সময় ছেলে ঘরে ঢুকলে—'বংকু তখন কালের সীমাহীন প্রাচীনত্বের আর জীর্ণতার সঙ্গে একাকার হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে...গিরিজা তার দ্বাবিংশতিবর্ষের একটি অতি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর ঘুরপাক খাইতেছে'...।

'কর্ণধর পালের গমন ও আগমন' গল্পে গ্রামের কুমোর কর্ণধরের বিধবা মেয়ে দেবী-দাসী তার প্রেমিকের সঙ্গে পলায়ন করলে গ্রামের নারী পুরুষদের রসনা মুখর হয়ে ওঠে। কর্ণধরও গ্রাম ছাড়ে। কিছুদিন পর তার পরিত্যক্ত ভিটেয় এক প্রাসাদ তৈরী হয়, এক জমিদার তার সঙ্গিনীসহ সেখানে আসেন, সেই সঙ্গিনীই দেবীদাসী জানতে পেরে নারীরা ক্রোধে ঘৃণায় উত্তেজিত হয়। গ্রামের দুজন বিশিষ্ট নারী দেবীদাসীকে ভর্ৎসনায় জর্জরিত করতে গিয়ে তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা করে প্রণামী পান 'শয্যার দিকে চাহিয়া একটা অপবিত্রতার চিত্র মনে পড়িয়া এবং একটা অপবিত্রতার ছোঁয়াচ লাগিতেছে মনে করিয়া উহাদের মন গুটাইয়া আসিতেছিল—টাকা পাঁচটি প্রণামী পাইয়া সংকুচিত মন তৎক্ষণাৎ বিস্তৃতি লাভ করিল—তা ছাড়া লক্ষ্মীর দৃষ্টি লাগিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে একটা প্রফুল্লতাও লাভ করিল'—এই দীর্ঘ বাক্যের বিশেষ চালেই সংকোচ ও কুণ্ঠার পর্যায়ক্রমে কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়ার দোলার পর 'বিস্তৃতি লাভ করিল', 'প্রফুল্লতা লাভ করিল' সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগে গ্রামীণ সমাজের প্রতীক এই নারীদের হীনতা ক্ষুরধার ব্যঙ্গেই রূপায়িত। চার পয়সায়

এক আনা'র হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া একটি আনিকে ঘিরে একটি দরিদ্র পরিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের কামনার আলোড়ন জাগে। 'কারখানার নূতন আনি—একটুও ময়লা হয় নাই। জাল জিনিষ নয়। ক্ষয় হয় নাই—একেবারে খাঁটি আনকোরা তরতাজা জিনিষ—অত্যন্ত নগদ জিনিষ—মূল্য চার পয়সা। ইহার বিনিময়ে অনেক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, এত যে, তার হিসেব করিতে বসাই ভুল'—প্যারিন্থিসিসে আনির এক একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখে, 'জিনিষ'-এর পুনরাবৃত্তিতে কাশীদের দারিদ্র্য এবং আনিটিকে ঘিরে তাদের স্বার্থের উত্তেজনার নিষ্ফলতা কঠিন বিষাদে ব্যঞ্জিত। সামান্য তুচ্ছ একটা আনিই এই দরিদ্র পরিবারের পক্ষে নিষ্ঠুর শোচনীয় ছলনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'গতিহারা জাহ্নবী' এবং 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' এই দুটি গল্পে জগদীশচন্দ্র দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করেছেন। রূপেগুণে অতুলনীয় কিশোরীর আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ দুশ্চরিত্র স্বামীর নির্বোধ ইতরতায় আহত হলে সে বাপের বাড়ী চলে যায়, স্বামীর চরিত্র শোধিত না হলে শ্বশুরবাড়ীতে আর ফিরে যাবে না শ্বশুরকে জানিয়ে দেয়। স্ত্রী কর্তৃক স্বামী পরিত্যাগের এই অভাবনীয় ঘটনায় গ্রামের লোকেরা উত্তেজিত হয়। কিশোরী যেদিন আবিষ্কার করে সে সন্তান-সম্ভবা সেদিন চিরাচরিত সামাজিক অভ্যাস অনুযায়ী মাতৃত্বের আনন্দ ও গৌরব অনুভব করার পরিবর্তে তার যন্ত্রণা ও গ্লানির সীমা থাকে না : স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া করিয়া ইহকাল ও পরকালব্যাপী কলুষ মর্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল, এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত—ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ইপ্সিত নহে ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ। সর্পের যেমন বিষদাঁত থাকে, ঐ পুরুষটির অন্তরে তেমনি একটি জ্বালাময় প্রবৃত্তি আছে—এই সন্তান তার সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চিহ্নমাত্র — বিবাহিতা পত্নীর গর্ভের সন্তানের যে মূল্য লোকে দিয়া থাকে ইহার সে মূল্য নাই'...। এই অংশে লেখকের নিজস্ব কণ্ঠস্বর একটু বেশী স্পষ্ট হওয়ায় এবং ঘটনা ও শাখা কাহিনীর বিস্তারেও গল্পটি সম্পূর্ণভাবে সার্থক হতে পারেনি। 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' তীক্ষ্ণ এবং সার্থক গল্প। একটি অসহায় মেয়েকে ধর্ষণ করার অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করে সাতুর বাড়ী ফেরার আগের দিনটিতে তার স্ত্রী মাখনবালা ঘৃণ্য অপরাধী স্বামীর সংস্পর্শে আসার আশংকায় বিচলিত হয় : 'স্বামীর অপরাধ গুরুতর, এত যে, তাহার চিন্তাই সহ্য হয় না। মানুষ কোন দিন তাহা সহ্য করিতে পারে নাই—সন্তানের জননী হইয়া, কুলের বধূ হইয়া, স্বামীর স্ত্রী হইয়া, নারী তাহা ক্ষমা করে নাই'—এই দীর্ঘ জটিল বাক্যে অসমাপিকা 'হইয়া'র সঙ্গে নারীর বিভিন্ন পরিচয়গুলো যুক্ত হয়ে সাতুর অপরাধের গুরুত্ব এবং সে সম্বন্ধে মাখনের বিতৃষ্ণা তীব্রভাবেই প্রকাশিত হতে দেখি। সাতুর মা বিরাজ পুত্রের অপরাধ বেমালুম ভুলে গিয়ে যে স্নেহাতিশয্যে উথলে ওঠেন তা মাখনের অসহ্য লাগে। পুত্রবধূর কঠিন নিঃস্পৃহতায় তিনি ক্রোধে টগবগ করে ফুটতে থাকেন। অবশেষে আদরের পুত্রের আবির্ভাব ঘটে। তার ভাইপো নিতু কাকা এতদিন কোথায় ছিল, এ প্রশ্ন বার বার করেও উত্তর পায়নি, কাকা আসার পরও সে প্রশ্ন করে, 'কোথায় ছিলে কাকা এত-দিন?...বালকের ঐ একই প্রশ্ন।' বিরাজ এসে কর্কশ ধমকে সমগ্র বাড়ীতে বিবেকের প্রতীক এই কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেন। 'তোর সে কথায় বারবারই কাজ করে লক্ষ্মীছাড়া? পালা এখান থেকে।' এইভাবেই সাতুর কলঙ্কিত অতীত সম্বন্ধে নিতুর সারল্যের প্রশ্ন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পরিণত বয়স্কা জননী বিরাজের বোধহীনতার ব্যঙ্গে অর্থ-পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর যোগ্য পুত্র সাতুও নিজের অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। তার ধারণা ছিল, এত বড়ো অপরাধের পরও যে তার সংসারে নিজের স্থানটিতেই ফিরে এসেছে, দীর্ঘ প্রবাসের পর যেমন লোক ফিরে আসে। শোবার ঘরে স্ত্রীর রূপযৌবনলুব্ধ (তার চোখে পড়ল, ধর্ষিতা মেয়েটির চেয়ে মাখন সুন্দর) সাতুর সোহাগ প্রচেষ্টায় মাখনের দৃঢ় কঠিন প্রতিরোধে সন্ত্রস্ত সাতু দরজা খুলে বাইরে এসে তার মাকে ডেকে বলে, বউ তাকে মারতে চাইছে। বিরজা ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে অসহায় মাখন-বালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন : 'চোখে পড়িল, বধূ কোণে দাঁড়াইয়া আছে। কেমন করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা তাঁহার চোখে পড়িল না।...লাফাইয়া যাইয়া তাহার সম্মুখে পড়িলেন, ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিলেন এবং ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই তাহাকে বারান্দায় আনিলেন, উঠানে নামাইলেন, উঠান পার করিলেন, বধূর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া দরজার খিল খুলিলেন—বলিলেন, যা চুলোয়। বলিয়া ঘাড়ে শেষ ধাক্কা দিয়া তাহাকে সদর দরজার বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন'—এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপূর্ণ বর্ণনায় বিরাজের আঘাতের প্রতিটি ক্রিয়ার সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র উল্লেখে বিরাজ তথা এই সমাজের বিবেকহীনতার পটে মাখনের লাঞ্ছনা মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে।

'কর্ণধর পালের গমন ও আগমন', 'গতিহারা জাহ্নবী', বিশেষত 'কলঙ্কিত সম্পর্ক'-এর মত দু একটি গল্প ছাড়া বেশীর ভাগ গল্পেই সমাজপটবিধৃত ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে কোনও গভীর প্রশ্ন দেখা যায় না। মানুষের জীবন নিয়তির শিকার এ ব্যাপারটি জগদীশচন্দ্রের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার মতই। কখনও কখনও আভাষে ইঙ্গিতে সামাজিক প্রশ্ন ও সমালোচনা-মূলক ব্যঞ্জনা এলেও তাঁর অধিকাংশ গল্পেই দেখা যায়, তিনি জীবনকে নিয়তির অন্ধ ক্রিয়ার অসংলগ্নতায়ই গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর পাত্রপাত্রীরা নিয়তিনির্দিষ্ট অস্তিত্বের কেন্দ্রটিতে স্থির থাকে, চৈতন্যের দ্বন্দ্বে আলোড়িত হয় না। এই নিয়তিপরবশ্যতার ত সামাজিক পটভূমির কোনও বোধই অবান্তর। যে শিল্পে জীবন নৈরাজ্যিক, সমস্ত ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও তাকে খুব তাৎপর্য-গভীর মনে হয় না। কেমন ভাবে বাঁচা যায় এই বোধেই ত শিল্প প্রতীকী মূল্য পায়, ব্যক্তির যন্ত্রণা নিষ্ফলতা জীবনের অপরিমেয়তার অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে।

তবু, এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ছোট-গল্পের কুশলী শিল্পী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়, স্মরণীয় তাঁর নিষ্ঠা ও সততার জন্য, ভাবালুতার অশ্রুজলসিক্ত বাঙলা সাহিত্যে তাঁর নির্মোহ দৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক লোভবিমুখ শিল্পমাধ্যমগত সচেতনতার জন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পমেজাজে, তাঁর রচনাভঙ্গিতে বাক্যের বিশেষ চালে জগদীশচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট মানিকবাবুর পূর্বসুরীরূপেও তিনি আমাদের স্মরণীয়। তাঁর মত শক্তিমান শিল্পীর সম্বন্ধে উপন্যাস পাঠকের উদাসীন, অনবহিত, এমন কি কোন কোন পণ্ডিত সমালোচকের কথাসাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি স্থান পাননি, এ আমাদেরই দুর্ভাগ্য ও লজ্জার বিষয়।

পুঁইমাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
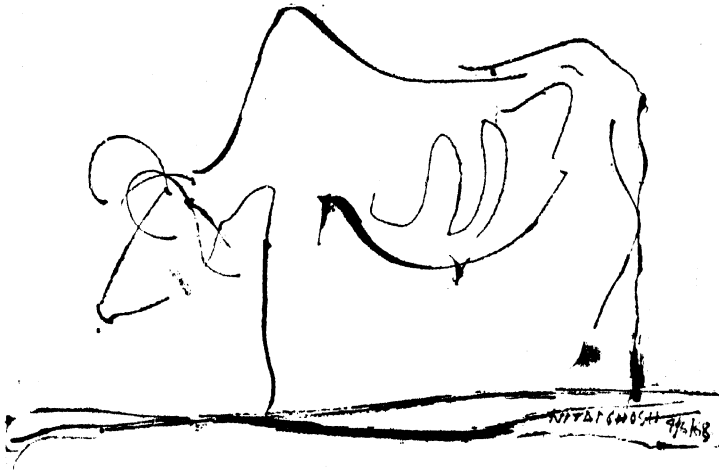
য়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি কিছু দাও তো, তারক-খুড়ো গাছ একটু ভাল রস আনি।

ী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের বসিয়া শীতকালের সকালবেলা ল তেলের বোতলে ঝাঁটার-কাটি দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার ন জমানো তেলটুকু সংগ্রহ করিয়া খাইতে ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া ড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো নই না, এমনকি বিশেষ কোনো বলিলেন না।

য়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন—কি বসে রইলে যে?......দাও না একটা আঃ ক্ষেন্তি টেন্তি সব কোথায় গেল তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

পূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, অত্যন্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা —তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে

র অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে র মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা র অব্যবহিত পূর্বের আকাশের ব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া ড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু মামতা করিয়া কহিলেন—কেন......কি ...কি......

পূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্ত সুরে -দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি—করতে হয় অন্য সময় করো। তুমি নো না, কি খোঁজ রাখ না? অত বড় র ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে য় কি করে তা বলতে পার? গাঁয়ে র রটেছে জানো?

য়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা কেন?...কি গুজব?

গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে দের বাড়ি। কেবল বাগ্দী দুলে রে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দর-গাঁয়ে বাস করা যায় না। সমাজে গেলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

য়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে লেন, অন্নপূর্ণা পূর্ববৎ সুরেই বলিয়া উঠিলেন—একঘরে করবে াকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরী-দের চণ্ডীমণ্ডপে এ সব কথা হয়েছে! আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না—ও নাকি উচ্ছুগ্গু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ি, বাগ্দী-বাড়ি উঠে বসে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার! একঘরে! সবাই একঘরে করে-ছেন এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর! ওঃ!.........

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এখন কঠিন কথা?—আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।......হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হ'ল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?—পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু! আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে? ক্ষেন্তি মা এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ এ যে...

চোদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ি ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁইশাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে এক-জনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই তিন পাকা পুঁইপাতা জড়ানো কোন দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো, রুক্ষ ও অগো-ছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দুটা ডাগর ডাগর ও শান্ত সরু সরু কাচের চুড়িগুলা দু' পয়সা ডজনের একটি সেপটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁইপাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ির কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুণ দুটো পয়সা বাকি আছে. আমি বললাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দুটো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁইশাকগুলো—ঘাটের ধারে রায়-কাকা বললে, নিয়ে যা......কেমন মোটা মোটা...........

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁঝের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা, আহা কি অমৃতই তোমাকে তারা দিয়েছে...পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত......নিয়ে যা...আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে তাদের নিজেদের কষ্ট করে কাটতে হলো না......যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে...ধাড়ী মেয়ে, বলে দিয়েছি না তোমায় বাড়ির বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এপাড়া সে-পাড়া করে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না? কোথায় শাক, কোথায় বেগুন আর-একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ—ফ্যাল্ ফেলছি ওসব......ফ্যাল্।

মেয়েটি শান্ত ও ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা

করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো—যা, ফের যদি বাড়ির বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো.........

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কীর অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না; অনেকগুলো ডাঁটা এদিক-ওদিক ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।...সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আমতা আমতা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলে-মানুষ খাবে বলে......তুমি আবার......বরং.........

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবি দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে করে যা, যা......তুই যা, দূর করে বনে দিয়ে আয়.........

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দুটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যত সাধের জিনিস হোক, পুঁইশাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলায় স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না—নিঃশব্দে খিড়কী-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সংগে সংগে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়িতেই পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আব্দার করিয়া বলিয়াছিল—মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের।.........

বাড়িতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কীর-দোরের আশপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকীগুলো কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া একরূপ চুপি-চুপিই পুঁইশাকের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু-এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁই-শাকের এক টুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নেই। পুঁইশাকের ওপর তাহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ, তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্ন-পূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডাল হইতে শুকনো লংকা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকালবেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন—সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে—স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না কি ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে। তারা কি স্বভাব? রাম বল, ছ'সাত পুরুষের ভঙ্গ, পচা গোত্তির। পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন—তা সমাজের সে সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশী দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি ষোলো বছরের........

সহায়হরি বাধা দিয়ে বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয়.........

—আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোর আর ষোলোয় তফাৎ কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক—তাতে আমার দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেলে, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে? আশীর্বাদ হওয়াও যা, বিয়ে হওয়াও তা, সাতপাকের যা বাকী এইতো? সমাজে বসে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখবো, এ তুমি মনে ভেব না। সমাজে বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল। ...পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না? ......গরীব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক করে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলো? জজ-মেজেস্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ি, বাগান, পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল। দুই ভাইয়ের অভাব কি?

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করে দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সংগে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেক দিনের সুদ পর্যন্ত বাকী — শীঘ্র নালিশ হইবে ইত্যাদি। এ গুজব শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা দুপক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হোক পাত্র-পক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েক মাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠি সহায়হরি উঠানে বাতবীলেবু গাছের ... দিয়া যেটুকু নিতান্ত কাঁচা রাঙ্গা ... আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আ... মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষে... আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে ... মা ঘাটে গেল.........

সহায়হরি একবার বাড়ির পাশে ঘা... দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, ... নিম্ন স্বরে বলিলেন—যা, শীগ্‌গির সা... খানা নিয়ে আয় দিকি। কথা শেষ ক... তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তা... টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় এক... কি জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্ক দ... নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভ... একটা লোহার সাবল দুই হাত ... আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়ি... তৎপরে পিতাপুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মু... দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল—ইহা... ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ই... কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দে... চলিয়াছে।.........

অন্নপূর্ণা স্নান সারিয়া সবে কা... ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার জোগাড় করি... ছেন—মুখুয্যে-বাড়ির ছোট খুকী দু... আসিয়া বলিল—খুড়ীমা, মা বল্লে দি... খুড়িমাকে গিয়ে বল, মা ছোঁবে না, তু... আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগু... বার করে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে-বাড়ি ও-পাড়ায় যাইবার পথে ... বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভা... রাংচিতা বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতে... সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ ... হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ... ঝোলা হলদে পাখী আমড়া গাছে... এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আংগুল দিয়া দেখাইয়া বলিল-খুড়ীমা, খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা-... পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আ... একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটা... মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ-খুপ ক'রি... একটা আওয়াজ হইতেছিল......কে যেন ... খুঁড়িতেছে......দুর্গার কথার পরেই হঠা... সেটা বন্ধ হয়ে গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে... খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, প... চলিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা যাইতে ... যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ খুপ শব্... আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু... বিলম্ব হইল। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন ক্ষেন্তি ওঠানের রোদ্রে বসিয়া তেলের বা... সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি... তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া... দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুন ধরাইবার... উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে... বলিলেন এখনও নাইতে যাস্‌নি ... কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই ... যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটু... খানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পদে...
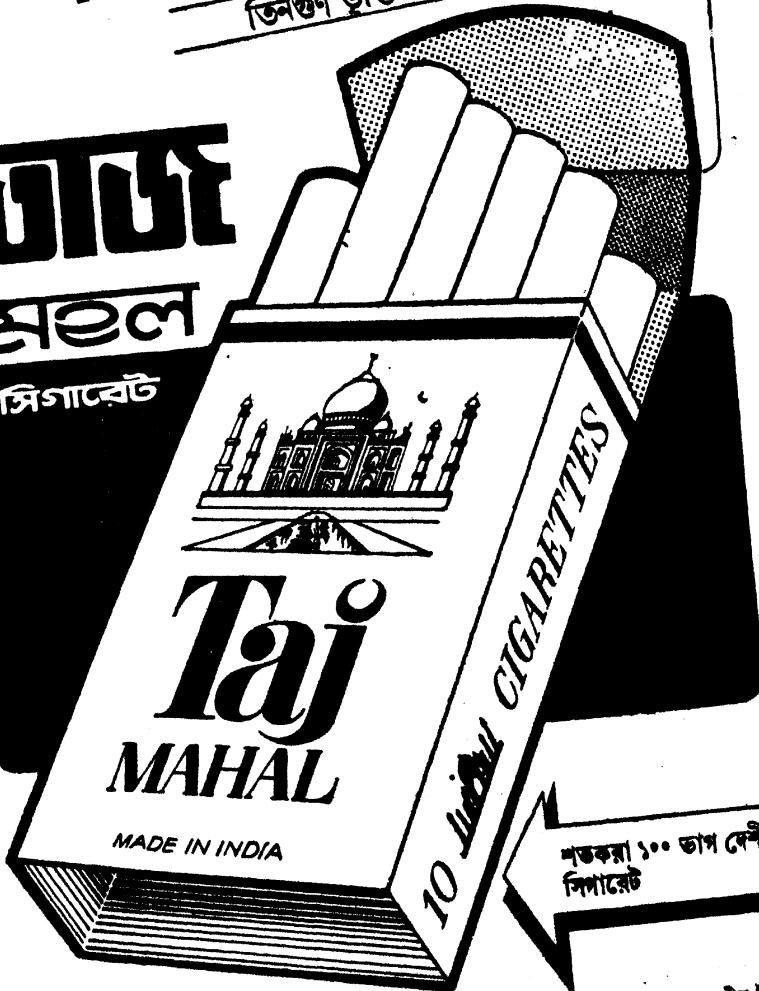
ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও-পাড়ার ময়না চৌকিদার রোজই বলে—কর্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এ দিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আসো না, এই বেড়ায় গায়ে মেটে আলু ধ'রে রেখেছি, তা দাদা-ঠাকুর বরং…………

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে বসে খানিকক্ষণ আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি! না আমি কখন? কক্ষণো না, এই ত আমি………সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিনকাল গিয়েছে এককাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না।……আমি সব জানি, মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে, আর কি-দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কিসের খুপখুপ শব্দ……তখনি আমি

বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিক দূরে গেলাম আবার দেখি শব্দ…তোমার তো ইহকাল নেই পরকালও নেই, চুরি করতে ডাকাতি করতে যা ইচ্ছে কর, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।……

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ি ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি, এ-দিকে একবার আয় তো, শুনে যা………মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্ততঃ করিতে করিতে মার নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দুজনে মিলে তুলে এনেছিস—না?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে একবার বাড়ির সম্মুখস্থ বাঁশ-ঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস নে যে বড়ো? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল—হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—পাজী, আজ তোমার পিঠে আস্ত কাঠের চেলা ভাঙ্গব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছ মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন কালে, সেই এক-গলা বিজন বন, তার মধ্যে দিন-দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোঁসাইরা চৌকীদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাবে? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব—তা ব'লে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা?

দু' তিনদিন পরে একদিন বৈকালে, ধুলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস………

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙ্গা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহাউৎসাহে তরকারীর আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যাম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উর্ধ্বমুখে এক খণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে; ফল-মূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাততঃ তার বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে—দিনের আলো এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন—দূর পাগলী, এখন পুঁইডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে?

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে। আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে।…একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুজ্জো-বাড়ি হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি এই শীত?…

—আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো…

—হাঁ দে মা, এক্ষুনি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচরকম হতে পারে, বুঝলি নে? সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভাল করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?…
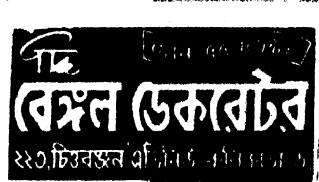
জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপ। বহু
দর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা
তে সহায়হরি কালো সার্জের এই জামাই
া মূল্যের জামাটা ক্রয় করিয়া আনেন।
'ড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু
্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর
তে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন
মাটা গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ
্রায়হরি কখনোও রাখিতেন না। জামার
'মান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল
—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের
্য উহা থাকিত।

পৌষ-সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা
টা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড়
া চটকাইতেছিলেন—একটা ছোট বাটিতে
 বাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নিচে
টা কলার পাত পাড়িয়া এক থাল
রকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে
ন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই,
রণ, সে যেখানে-সেখানে বসে, বনে-
াড়ে ঘুরিয়া ফেরে; তাহার কাপড়-চোপড়
স্ত্র-সম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি
তান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া
শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান
দ নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্ন-
র্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন;
ট মেয়ে লক্ষ্মী হঠাৎ ডান হাতখানা
তিয়া বলিল—মা, ঐ একটু...

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটু-
নি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল
চটি দ্বারা বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া
টুকু লক্ষ্মীর প্রসারিত হাতের উপর
লেন। মেজো মেয়ে পুঁটি অমনি ডান
তখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া,
র সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায়
কটু...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে
রিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে
হতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা
ছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি নিয়ে আয়
ন্তি, ঐ নারকেল থালাটা, ওতে তোর
ন্যে একটু রাখি।...ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে
রিকেলের উপরের থালাখানা, যাহাতে
টা নাই, সেখানে সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা
হাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া
লেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল—জ্যাঠাইমারা
নেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙা-দিদি ক্ষীর
রী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ-বেলা
র হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ
মন্ত্রণ করেছিল, সুরেশ-কাকাকে আর
পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও-বেলা ত
ায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি, এইসব
য়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ক্ষীর
লে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদি
লছিল, ক্ষীরের পুর না হলে কি আর
াটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন
আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাই দিয়ে
করে, সে তো কেমন লাগে?

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি
তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে
প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদির ওইসব কথা।
খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা?
ক্ষীরের পুর ঘি দিয়ে ভাজলেই কি আর
পিঠে হয়? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ি
দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দুখানা
পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা, কেমন একটা
ধরা-ধরা গন্ধ, আর পিঠেতে কখনো কোনো
গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে
ছাই খেতে হয়।

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া
ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা
করিল—মা, নারকোলকোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে
বসে খাস্ নে। মুখ থেকে পড়বে না কি
হবে, যা ঐ দিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা
কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া
খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ-
স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া
সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না
যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব
করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—
ওরে তোরা সব এক-এক টুকরো পাতা পেতে
বোস দেখি, গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল-
ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ-প্রস্তাব
যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ
দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা,
বড়দি পিঠেই খাক। ভালবাসে। ভাত বরং
থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে
রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি
অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকালের
খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও
খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে
খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা
দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশ-
খানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি
আর নিবি? ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্ত-
ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা
তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির
মুখ-চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা
চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে
হয়েছে, মা ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নাও,
ওতেই কিন্তু...সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলি তুলিতে
তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ
একটু অধিক ভোজনপটু মেয়েটির দিকে
চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—
ক্ষেন্তি আমার যে-ঘরে যাবে, তাদের অনেক
সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজেকর্মে
বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে
নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক
দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালীতে
ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে
বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব
বেশী কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথমে
অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু
পাত্রটি সম্পত্তিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ি,
সিলেট-চুণ ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু' পয়সা
করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড়
দুর্ঘট কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে
অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে
একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, পরে পাছে
ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময়
তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া
জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের
জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু
বলিতে পারিলেন না।

বাড়ির বাহিরে আমলকীতলায় বেহারারা
সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী
একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখি-

লেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেহেদি-ফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে!...তার এই অত্যন্ত অগোছালো নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিলেন। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো... বাবাকে পাঠিয়ে দিও—দুটো মাস তো...

ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন—তোর বাবা তোর বাড়ি যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক—তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল—না, যাবে না বৈকি?...দেখো তো কেমন না যান!...

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু-হু করিত—তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ি নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনের মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে ওমনি বলিবে—মা, বলব একটা কথা, ঐ কোনটা ছিঁড়ে একটুখানি?

এক বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন—ও তুমি ধরে রাখ, ওরকম হবেই দাদা! আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—নাঃ, সব তো অ র...তাছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব।... তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছ'টি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও-টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার...

—তারপর বললাম টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম করেও তিনটে টাকার কম হবে না, ভেবে দেখলাম কিনা? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে...ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাঘাতে ঘরের মত খায়...আরও কত কি? পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না বুঝলে?...

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দুজনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তারপর?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে-শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এরকম হয়, যেমনি মেয়ে, তেমনি বাপ; পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!...পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ-অঞ্চলে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি—প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্ক সুরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তাঁর খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে...

—দেখতে পাওনি?

—নাঃ! এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে।...যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল।...চর কি ঠিক করলে?...পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না।...

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, অত্যন্ত বৃদ্ধলোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকুলি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন করে ফেললে কেন?

পুঁটি কহিল—আচ্ছা, ওতে একটু নুন দিতে হয় না?

—ওমা, দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে...

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—সরে এসে বোস না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল...খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুঠি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন...দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মত ফুলিয়া উঠিল।...

পুঁটি বলিল—মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাসনে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ির পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে...

পুঁটি ও রাধী খিড়কী-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্‌খস্‌ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠেখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হাঁটিয়া আসিয়া খিড়কী দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।...

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিলি?

পুঁটি বলিল—হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখানে থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে, সেখানে ফেলে দিলাম।...

তারপর সে-রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে...রাতও তখন খুব বেশী।...জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ির পিছনের বনে একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠক্‌-রু-রু-রু শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল... যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে...বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই। মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।...

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণকে আমি দেখিনি। দেখার বড়ো বাসনা ছিল। সব ইচ্ছা মানুষের পূরণ হয় না। আমারও হয়নি। তবে আমি ওঁর একটা বড়ো ফটো দেখেছি। ফটোটা আমার এক অগ্রজ সাহিত্যিকের বসার ঘরে টাঙানো। তিনি দীর্ঘদিন বিভূতিভূষণের খুব কাছাকাছি ছিলেন। তাঁকে মাঝে মাঝে বিভূতিভূষণের গল্প বলতে শুনেছি। গল্প শুনতাম আর ফটোর দিকে তাকাতাম। বিভূতিভূষণ তাঁর বড়ো বড়ো চোখে ফটো থেকে আমাকে দেখতেন, আমি সোজা তাকাতে পারতাম না। তাকালেই চোখদুটো জীবন্ত হয়ে উঠত, সরল অকপট চাউনি অথবা মনে হয় তিনি এমন এক চোখ মনের ভিতর গোপন করে রেখেছেন যার রহস্য আমার মত মানুষের পক্ষে আবিষ্কার করা কঠিন। মনে মনে মাথা নিচু করে কথা বলতাম শুধু, আপনাকে আমি দেখিনি বিভূতিভূষণ। বড়ো ইচ্ছা হয় জানতে আপনি কিভাবে কথা বলতেন, কিভাবে হেঁটে যেতেন। নির্জন নিঃসঙ্গ বনভূমির নিসর্গ শোভা দেখতে দেখতে আপনার চোখ সরল বালকের মতো নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হতো। অথবা নদীর ধারে কোন মন্দিরের চাতালে বসে আপনি যখন পাখপাখালির ডাক শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন, তখন যদি সামান্য সময়ের জন্য আপনার সামনে বসে সেই ভন্ডুল মামার গল্প শুনতে পেতাম অথবা প্রিয় মোরিফুলের বাস নিতে পারতাম কি ভালোই না লাগত।

আমরা একালের মানুষ বিভূতিভূষণ। আপনি জানেন না এখন আমাদের মানুষেরা চাঁদের কক্ষপথ ঘুরে এসেছে। যা শুনছি আগামী দশ বছরের ভিতর আমরা চাঁদে চলে যাব। বিভূতিভূষণ আমরা খুব বেশী আধুনিক, ভাষা এবং সাহিত্য নিয়ে নানা-রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে, যারা আমাদের চেয়ে তরুণ তারা বলছে, গল্পে কাহিনী খুঁজলে চলবে না। নিরাবয়ব, বায়ুহীন, আলোহীন এখন গল্পের কাঠামো হবে। বিষয়বস্তু শূন্য। এমন একটা অবস্থায় আমি কি করি বলুন ত। আপনার গল্পে যে কাহিনী আছে। আপনি যথার্থ গল্প লিখেছেন। অন্ধকার বনভূমির ভিতর একটিমাত্র জোনাকির আলো সহসা যেমন অন্ধকারকে বিষণ্ণ করে তোলে, আপনার গল্পের তেমন বিষণ্ণতা কেবল কাজ করে। আমি পড়তে পড়তে কাতর হয়ে পড়ি। জলের ভেতরে মাছ যেমন ক্রমে তলিয়ে গিয়ে আশ্রয় খোঁজে আমি তেমন আপনার গল্পে ডুব দিয়ে মণিমাণিক্যের সন্ধান করি। আপনার গল্পের মানুষেরা বড় বেশী রক্তমাংসের। বিভূতিভূষণ, আমি গ্রামের মানুষ। গ্রামে অধিক সময় কেটেছে। এখন কিন্তু সে গ্রাম আপনার নেই—তবু আপনার চরিত্রেরা তেমনি আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সহসা যেন আপনার গল্পের হাজু সহরের অন্ধকার গলিপথে উঁকি দিচ্ছে। হাজু সম্পর্কে গ্রামের সকলের কি ভীতি। হাজু মেয়েটি চোর। যা সামনে পাবে তাই চুরি করবে। কেবল খাই খাই। ওর হাতির খোরাক যোগাতে না পেরে মুখোজ্যেরা ছাড়িয়ে দিয়েছে। হাজু এখন বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে। তার-পর এক পৌষের দিনে মহকুমা শহরে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়েছেন—বেশ শীত পড়েছে, ফেরবার পথে একটা সরু-গলি অতিক্রম করছিলেন, কে যেন তখন আপনাকে ডাকল, জ্যাঠামশাই। আপনি তাকালেন পেছনে। বললেন, কে? এই যে আমি, অন্ধকার গলিপথ থেকে গলা ভেসে আসছে। একটি মেয়ে রঙিন শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে আছে। খদ্দেরের আশায় সে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গ্রামের সহৃদয় জ্যাঠামশাইকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এখন আর হাজুর সে দিন নেই। সে নটী। তার ঘরে কত লোক আসে। হাজু প্রায় জোর করে আপনাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। সে কাপডিসে চা খায়। কাপডিস কিনেছে এবং স্বচ্ছল জীবন যাপনের অধিকারী সে। সে গর্ব করে আপনাকে দেখালো সব। যে মেয়েটির জন্য গ্রামে কেউ ছিল না, যে গ্রামের শশা, কুল-কামরাঙা চুরি করে খেত, পেটের জ্বালায় কুলকামরাঙা চুরি করতে গিয়ে মধু চক্রবর্তীর হাতে যে একদিন মার খেয়েছে, সে এখন নিজের এই ঘর, আসবাবপত্র দেখাতে পেরে কি আনন্দিত। বিভূতিভূষণ হাজুকে কিছুতেই কেন জানি আর আমার বারবনিতা মনে হল না। ঘরের ছোট লোনাটির মতো তার চোখ টলটল করছিল। বারবনিতার জীবন যাপনে কোন দুঃখ নেই তার। বরং সে এখন আত্মপ্রত্যয়ে স্থির। এই পৃথিবীতে তারও কিছু একটা করবার আছে। গল্প পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমি একালের মানুষ—গল্পে কাহিনী খুঁজলে চলবে না। ভয়টা এত বেশী যে কেউ দেখে ফেলল এই ভয়ে তাড়াতাড়ি চুরি করে চোখ মুছে হাসতে থাকলাম। আমরা এখন হাসবার সময় হাসতে জানি না, কাঁদবার সময় একটু ভাল করে কাঁদতে পারি না—বড় দুঃখে দিন কাটছে বিভূতিভূষণ।

এই যেমন ধরুন তারানাথ তান্ত্রিকের কথা। তারানাথের স্বভাব ভালো ভালো সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান করা। বিশেষ করে সে যদি আবার তান্ত্রিক হয় তবে তারানাথ

সব কাজ ফেলে তার পিছনে দিনরাত লেগে থাকবে। সেই তারানাথ এক সময় কিছু অলৌকিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অর্জন করেছিল। কিন্তু তার ব্যবহার যথার্থ ছিল না। যথা-সময়ে তারানাথ তার বিষয় আশয় হারিয়ে কায়ক্লেশে দিন যাপন করছিল। এ-সময়েই তারানাথের সঙ্গে আপনার দেখা হয়। তারানাথ আপনাকে চন্দ্রদর্শন করাতে চায়। তার ক্ষমতা কতদূরে এই বৃদ্ধবয়সে একবার শেষ পরীক্ষা দিতে চায়। তারানাথ গল্প আরম্ভ করল। কবে কিভাবে সে বীরভূমে এক শ্মশান পাগলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পায়—আসলে পাগলী এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। তারানাথ নদীর ধারে এক মহাশ্মশানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। ছেঁড়া একটা মড়ার কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়চোপর পরনে তেমনি মলিন তার জটপাকানো চুল। তারানাথকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বলল, বেরো এখান থেকে। তারানাথ নাছোড়বান্দা লোক — সে পাগলীকে কিছুতেই ছেড়ে এল না। তারপর নদীর ধারে সেই মহাশ্মশানে অন্ধকারের ভিতর অলৌকিক সব ক্রিয়াকান্ড—যা আপাত চোখে বিশ্বাস করা যায় না, আমরা একালের মানুষেরা বিজ্ঞানসম্মত উপায় ভেবে যখন অস্থির তখন কিন্তু আপনার পাগলী এমন সব ভৌতিক কান্ড করে বেড়াচ্ছে, এমন ভয়াবহ সব ঘটনা ঘটাচ্ছে—মনেই হয় না আদৌ অবিশ্বাস্য— যাদুমন্ত্রে যেন আপনি আমাদের সেই জগতে নিয়ে গেলেন। সব ভৌতিক রহস্য, রোমাঞ্চকর দৃশ্য একের পর এক ফুটে উঠতে থাকল। আচ্ছা, আপনার এইসব অলৌকিক ক্রিয়া-কান্ডে খুব বুঝি বিশ্বাস ছিল? যদিও কোথাও আপনি কোন স্থির সিদ্ধান্ত রাখেননি। ফলে গল্পে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দিকটা এত বেশী নাড়া খায়, তখন আর তারানাথ তান্ত্রিককে আমরা একালের মানুষেরা পর্যন্ত অবিশ্বাস করতে পারি না। তারানাথ যেন ইচ্ছা করলে আমাদেরও সময়ে অসময়ে চন্দ্রদর্শন করাতে পারে।

কিশোরীর বৌ সুশীলার কথা মনে আছে? কতদিন আগে সব লিখেছেন, ভুলে যাবার কথা। সরল গ্রাম্য মেয়েটি দু চোখ ভরে স্বামীকে দেখত। স্বামীর বুকে শুয়ে গল্প শুনতে চাইত। আহা সুশীলার কি নিষ্ঠুর পরিণতি, সুশীলাকে মুখরা ভাবতে আমার বড় কষ্ট হয়। মুখরা দজ্জাল বলে সংসারে সকলে তাকে ঘৃণা করে। স্বামীর অন্য মেয়ের প্রতি টান আছে ভেবে ঠাকুরের থান থেকে শেকড় তুলে আনে যে মেয়ে এবং গুলে খাওয়াতে পারলেই স্বামী আর অন্যমুখো হবে না—মনে পড়ছে না আপনার? সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছিয়ে করতে পারে না, রাত্রে কিশোরী বাড়ী ফিরলে কেবল এটা-ওটার বায়নাক্কা, যার শ্বশুরের একমাত্র কাজ মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া—তবু আপনার মনে পড়ছে না, শাশুড়ীর একমাত্র কাজ পুত্রবধূর গুষ্ঠি উদ্ধার করা—বর্মাচ ও বৌমা দুটো ভাত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় দুটো কিছু রাঁধ, হাতে পায়ে ধরতে কেবল বাকি রেখেছি। কার কথা কে শোনে? এই বেলা দুপুরের সময় রাণী এলেন নেয়ে। অবোধ সুশীলা রক থেকে সমানে জবাব দিচ্ছিল, মাইনে করা দাসী ত নই। আমি যখন পারব তখন রান্না চড়াবো। শাশুড়ী খুন্তি হাতে তেড়ে আসছিল—আর তখন ছোট এক দশ বছরের বালক, রংটা বড়ো কালো, ম্যালেরিয়ায় শরীর জীর্ণশীর্ণ, পরনে অতি ময়লা একটা গামছা, প্রচণ্ড শীতে তার গায়ে কিছু নেই। সে ছোট একটা বাখারীর ছড়ি নিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকল। বালকটি পাশের গাঁয়ের আতর আলির ঘরামির ছেলে। সে উঠোনে দাঁড়িয়ে বগল বাজাচ্ছিল এবং নানারকমের সুরে হাপু গান গাইছিল। শ্বশুর রামতনু বলল, থাম থাম। এখন ওসব দেখবার সখ নেই। আপনার সৃষ্ট চরিত্র সেই গ্রাম্য বালা সুশীলা অবাক হয়ে হাপু গাওয়া দেখছিল। ছেলেটি গান থামিয়ে বাইরের রকে চলে গেলে সুশীলা সন্তর্পণে তার কাছে চলে গেল। বলল, তোর বাড়ী কোথায় রে? —হরিশপুরে

মা ঠাকুরুন। ...তুই বুঝি হাপু গাস, হ্যারে তোর এতে চলে! রামতনুর কথায় বালক অত্যন্ত দমে গিয়েছিল, সুশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির সুর চিনতে পেরে তার হঠাৎ কান্না এসে গেল—বড় কষ্ট আমাদের সংসারে—এই শীতে মা ঠাকুরুন...। সুশীলা বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়া আমি আসছি। ঘরের মধ্যে ঢুকে কান্নার বেগ অতি কষ্টে সামলে আলনা থেকে একটা মোটা চাদর চুপি চুপি ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল, নিয়ে যা। শিগগির যা। কেউ যেন না দেখে।... এতক্ষণে মনে পড়ছে তবে। 'মৌরিফুল' গল্পে সুশীলার প্রতি আপনি কেন এত নিষ্ঠুর হলেন। আহা কি মেয়ে, এমন গ্রাম্য বালা, গাছপালা, মাঠের ভিতর অথবা রুদ্দুরে মেয়েটির মুখ যখন ভেসে ওঠে, স্বামীকে মিথ্যা হত্যার দায়ে অপমানিতা মেয়েটির মুখ যখন ভেসে ওঠে, তখন আর রাতে আমাদেরও ঘুম আসে না। কত রাত পর্যন্ত সুশীলার মত আমরাও না ঘুমিয়ে থাকি। জানালা সব খোলা, বাইরের জ্যোৎস্না ঘরে আসছে। সুশীলা স্বভাবে অবোধ। লাঞ্ছনা অপমান এর আগেও সে কতবার সহ্য করেছে, কতবার স্বামীর হাতে মার খেয়েছে। কিন্তু চুপি চুপি শেকড় গোলা জল খাওয়াতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। এ-অপমানে তার চোখের জল সারারাত বাঁধ মানছিল না। এই সুশীলার জন্য আমাদের এ-কালের মনটাও আর্দ্র হয়ে ওঠে। আমরা যখন সংসারে নানারকমের গ্লানির ভিতর দিনযাপন করে অতিষ্ঠ তখন আপনার মৌরিফুলের সুশীলা কি যেন সব ভালবাসার সুষমা প্রকাশ করতে থাকে। অবোধ মেয়েটির মৃত্যুর করুণ দৃশ্য পড়তে পড়তে আমরা বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। আরো কত গল্প মণিমাণিক্যের মত বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে রেখেছেন। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল', 'স্বপ্ন বাসুদেব', 'আহ্বান' এমনিভাবে কত আর নাম করব। নদী বন মাঠ, ফুল ফলের জগত অথবা পাখীর ডাক—সে যে কি এক জগতে সময়ে অসময়ে বিভূতিভূষণ আপনি আমাদের নিয়ে যান, গল্প পড়তে পড়তে কখনও আমরা উড়ুবিল্ব গ্রামে পৌছে যাই অথবা ভদ্রাবতী নদীর তীরে শাল পিয়ালের বনে সরস্বতী দেবীকে বন্দী দেখে কেমন আঁৎকে উঠি। কিন্নর দল গল্পে শ্রীপতির বৌ, কি সুন্দর তার মুখশ্রী, লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মুখ, গায়ের রঙ যেন প্রাণখোলা হাসির মতো—কলকাতার মেয়ে, শ্রীহীনা এক গ্রামে এসে সকলকে আপন করে নিল। গান-বাজনার বড় সখ। সময় পেলেই শ্রীপতির বৌ তানপুরা নিয়ে বসে। ক্রমে শরৎকাল এসে গেল। কলকাতা থেকে ভাইবোনদের নিয়ে এল। যে গ্রামের বৌঝিরা গ্রাম্য কলহে মেতেছিল এতদিন, তাদের প্রাণে যেন নতুন প্রাণের সাড়া জাগল। শ্রীপতির বৌ মেয়েদের নিয়ে থিয়েটার করছে। কি অসামান্য অভিনয়! কি গলা! গ্রামের মেয়ে বৌরা মুগ্ধ হয়ে গেল। শ্রীপতির বৌয়ের ভাইবোনেরা দেখতে যেমন সুন্দর, যেমন চোখ তেমনি চুল আর তেমনি তাদের অভিনয়। সখ করে সব ভাইবোনদের ওর জ্যাঠামশাই বলত কিন্নর দল। তারপরেই দেখি কিন্নর দল ভাঙতে আরম্ভ করেছে। একে একে ওর ভাইবোনের মৃত্যুর খবর এল। শেষে যেন শ্রীপতির বৌর পালা। শ্রীপতির বৌর মৃত্যু গ্রামে এক অন্ধকারের ছায়া ফেলল। বাপের বাড়ী ছেলে হতে গিয়ে সে আর ফিরল না। তার সেই মধুর কণ্ঠ সকলের চেনা। কত জ্যোৎস্না রাতে গ্রামের বৌ-ঝিদের বসিয়ে সে চাতালে গান গেয়েছে। তেমন দৃশ্যের কথা ভোলা যায় না। গভীর রাতে গ্রামময় মাঠময় যেন এক আবেগবিহ্বল কণ্ঠ, গানের সুর, দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। চকিতে গ্রামবাসীরা জেগে গেল। এ-কার গলা। এতো শ্রীপতির বৌয়ের। সে তো ইহলোকে নেই। আদিগন্ত জ্যোৎস্নায়—কি এক রহস্য তখন খেলা করে বেড়াচ্ছিল। আর শ্রীপতি কলকাতা থেকে আনা তার স্ত্রীর একখানা রেকর্ড নিভৃতে নীরবে বাজাতে বাজাতে স্মৃতিভারে গভীর বেদনায় ডুবে যাচ্ছিল।

বড় তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে আপনি লিখেছেন 'তুচ্ছ' গল্প। মেয়েটির অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছে। ওর কপালে সিঁদুর, হাতে সোনা বাঁধানো শাঁখা। মুখখানা বেশ ঢলঢলে। চোখ দুটো বড় বড়। আপনি বললেন, তুই কার মেয়ে রে? মেয়েটি মাটির দিকে মুখ রেখে বলল, বিশ্বনাথ কামারের। কিছুক্ষণ পর আপনি বাড়ীর ভিতর ঢুকে দেখেন মেয়েটি মাঝের ঘরের মেঝেতে চুপচাপ বসে আছে। আঁচল নাড়ছে। কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছে না। কামারদের মেয়ে, কে কথা বলবে বেশীক্ষণ! আপনাকে দেখেই মেয়েটি বলল, কাকাবাবু ও কিসের ছবি? —ও আমার ফটো। জবাবে আপনি বললেন। —আপনার ছবি! কেমন অবাক চোখে ফটোটা দেখতে থাকল। আরও বিচিত্র সব ছবি টানানো দেয়ালে, সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে সব, দেখে কি যেন এক মধুর বিস্ময়ে ডুবে যাচ্ছে। সে আমোদ পাচ্ছে। সে একা বসে আছে ওতে ওর কোন দুঃখ নেই। দিব্যি একা একা বসে—এই ঘরে যে সে বসে থাকতে পেরেছে—বাবুদের বাড়ীতে এমন সাজানো-গোছানো ঘর—সে দেখতে দেখতে মনের ভিতর অন্য এক মন নিয়ে আপনমনে বিহ্বল হয়ে আছে, তখন আপনি কি করেন বিভূতিভূষণ? আপনি যেন মেয়েটির কাছ থেকে আনন্দের ভাগ নেবার জন্য, অথবা মেয়েটির মনের ভিতর যে আনন্দ সুখ সুখ খেলা করছিল তাকে চুরি করে দেখার জন্য—আপনি মাথায় যে গন্ধের তেল মাখছিলেন, সেই তেল দেখিয়ে বললেন, খুকি মাখবি? কত ইচ্ছা মেয়ের গন্ধ তেল মাথায় দেয়। সে মাথা নিচু করে হাঁ বলল। আর আপনি দুহাতে, কত যে ভালবাসা আপনার, এক গণ্ডুস গন্ধ তেল মেয়েটির মাথায় দুহাতে মেখে দিলেন। সমস্ত জীর্ণতা, সংস্কার এবং সংকীর্ণতা ধুয়ে মুছে গেল। যখন আপনার দিকে তাকিয়ে অনাদৃতা মেয়েটি লজ্জা পেল, তখন আপনি বললেন, কি রকম গন্ধ রে?

মেয়েটি বলল, চমৎকার কাকাবাবু।

আমাদের কাছে এ-রহস্য এক দীর্ঘ বাল্যবেলার মতো নির্জন। শাদা জ্যোৎস্না রহস্যময় বাল্যবেলাতে। শুধুমাত্র একটি তরমুজের ফুল নিভৃতে ফুটে আছে। সকলের অলক্ষ্যে, তাবৎ জীব এবং জীবনের অলক্ষ্যে সে গন্ধ ছড়াচ্ছিল। আকাশ, মাটি এবং নক্ষত্রসকল যেন সে ঘ্রাণ নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। স্থির হয়ে আছে।

বিভূতিভূষণ, আমি আপনার একেবারে সামনে মাটিতে বসে আছি। একটু গন্ধের তেল সেই অনাদৃতা মেয়েটির মতো আমাকেও দেবেন? বলবেন, কি রকম গন্ধ রে?

আমি বলব, আহা তুলনা নেই বিভূতিভূষণ।
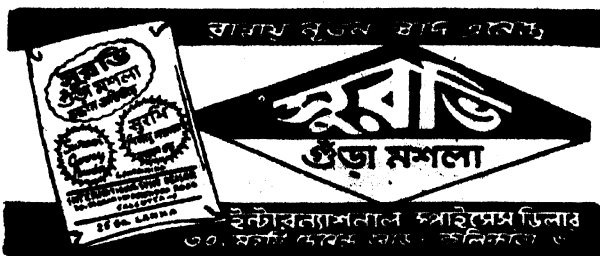
শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা কঙ্কালীর এস্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে, 'ভোজবাজি—ছারকাছ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশ পথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটি সাইন-বোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি সার্কাস'। লেখাটার এক পাশে একটা বাঘের ছবি অন্যপাশে একটা মানুষ, তাহার এক হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্ন-মুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজ-বাজি অর্থে 'গোলকধামে'র খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজবিবিকা কবর', তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষে একটা পর্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ, বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপর শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখে থাবা দুইটি ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাঘটা চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপা পুরিয়া দেয়। সরল পল্লীবাসিরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রোধ করে দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া ওঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়, সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম, দুম, দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী প্রকাণ্ড একজোড়া করতাল বাজায়, ঝন-ঝন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে, বড়? ওই বড় বা—ঘ।

বেদেনী প্রশ্ন করে, বড় বাঘ কি করে? —পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলো শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে একটা তীক্ষ্ন অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বার বার বাঘটা গর্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল স্পন্দিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এছাড়া বেদেনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর গোটা কয়েক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর একটা বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেকটা বড় এবং কায়দাকরনেরও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটা ঘোড়া, একটা গোরুর গাড়ির উপর প্রকাণ্ড একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে!

গরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তারপর আক্রোশ-ভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখানো আছে। ক্রুর নিষ্ঠুরতা-পরিব্যঞ্জক একধারার উগ্র তামাটে রং আছে— শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নিচেই নাকে একটা খাঁজ, সাপের মত ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সম্মুখের দুইটা দাঁত কেমন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংস্র ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসা ক্রোধে, ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চক-মক করিয়া উঠে তেমনই ঝম-মক করিয়া উঠিল; সে বলিল, দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরের ডোঁকা ছেড়্যা!

রাধার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে বলিল, কে বটে, মালিক কে বটে?

কি চাই? তাঁবুর ভিতরে আর একটা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটেরও অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সরল ও দড়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা হাল্কা দেহ, তাজী ঘোড়ায় যেমন একটা মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হাল্কা, অথচ সরল দৃঢ় শরীরে তেমনি একটা লাবণ্য আছে। রং কালোই, নাকটি টিকালো লম্বা, চোখ দুটি সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুটির ওপরে তুলি আঁকা গোঁফের মত এক জোড়া গোঁফ সুচাগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল, গলায় ঝুলানো একটা সোনার ছোট চৌকা তক্তি। সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল! দুইজনেই দুই-জনকে দেখিতেছিল।

কি চাই? —নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নিচের বায়ুস্তর ভুর ভুর করিয়া উঠিল।

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিয়া মাতালের হাসি হাসিল, বলিল, সে হবে, আগে মদ খাও টুক্চা।

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে দ্রুত-তম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, রাধিকা। কখন আসিয়া শম্ভুর পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইবা?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্বাক হইয়া গেল।
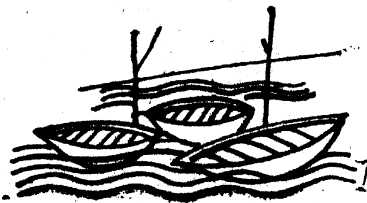
কালো সাপিণীর মতো ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিণী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সুতোর মত সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্ধ-নিমীলিত ভ্রূভঙ্গের মদিরদৃষ্টি দুটি চোখে, সুচোলো চিবুকটিতে—সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিঃশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় নেশা। শুধু রাধিকারই নয়, বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত-রূপ-বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের মধ্যে একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মত ধারের ইঙ্গিত, চারিত্রিক হিংস্র তীক্ষ্ন উগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিন্ড পর্যন্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিল খিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময়বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল,—ব্যাক হয়্যা গেল যে নাগরের?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল, বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব। এস।

কথা সত্য, এই অদ্ভুত জাতটি মদ কিনিয়া কখনো খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায় কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনও ছাড়ে না।

শাসন বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের এ অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিঃশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাত; নতুবা—। সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তুই আইলি কেনে এখেনে?

রাধিকা এবারও খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার! আমি মদ খাবে নাই?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকের পাখীর মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও এক রাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া হে; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটা পাতায় কতকগুলা মুড়ি, পেঁয়াজ, লংকা, খানিকটা নুন; দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাস। একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধুলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া উর্ধবাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মত লাগিয়া আছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুমার বেদেনী? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিত পদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল, কি নাম গো তুমার বাজিকর?

নূতন বাজিকর কাঁচা লংকা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে?

নাম বটে কিষ্টো বেদে।

তা গালি দিব কেনে?

তুমার নাম যে রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্ত হস্তে, কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, কই কালীয়া দমন করো দেখি কিষ্টো, দেখি!

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল; কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হস্তে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো কেউটের বাচ্চা! আহত সর্পশিশু হিস হিস গর্জনে মুহূর্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল; শম্ভু চিৎকার করিয়া উঠিল, আ—কামা। অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে টাঁক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিল এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুইটি কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগে সে মুহূর্ত পূর্বের ওই সাপটার মতই ফুঁসিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে?

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বলল্যা গো দমন করতে। —বলিয়া সে এবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাধিকা মুহূর্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার ওপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটা পেট্রোম্যাকস আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনো খাটানো হয় নাই। রাধিকার চক্ষু দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল; আরও একটু দূরে আর একটা গাছের নিচে নামাজ পড়িতেছে কিষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা পূজা করে, মঙ্গলচন্ডী ষষ্ঠীর ব্রত করে। কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরান-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু-পুরান—কথাগান করে, তাহারা নিজেদের বলে পটুয়া, বিপুল চিত্রকরের জাতি। বিবাহ আদান-প্রদান সমগ্র ভাবে ইসলাম ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ।

বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়, অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়। কিন্তু এ নূতন তাঁবুর মতো সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনো খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল, উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া সে বাঘটাকে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতা-ব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম, মুখে হিংস্র হাসির মতো ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ,—অতি করুণ, খসখসে লোমগুলা দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিন ঘিন করিয়া উঠে। কতবার সে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ওই বাঘটার প্রতি, যাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধস্বরে শম্ভু বলিল, তু জানছিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না জেনে না আমি! তু-ই জানছিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল,—ওরে মড়া, বুড়ার নাচন দেখতে কার কবে ভাল লাগে রে? আমারে বলে, তু জানছিস সব!

শম্ভু মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মত ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল, ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিনীর মত গর্জন করিয়া উঠিল, কি বুললি বেইমান?

শম্ভু আর কোন কথা বলিল না, অংকুশভীত বাঘের মত ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ, তুই তো বুড়ো! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো। তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি। সাপ, বাঁদর, ছাগল এ সবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ,—ধামা বুনিত, চেয়ার-পাল্কির ছাউনী করিত, ফুলের সৌখিন সাজি তৈয়ারী করিত; তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশী। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত; সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস; রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদের সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশী। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদের আরও কতবড় গুণ ছিল! তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ, এবং লেখা-পড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এই জন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরা গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার! আর শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মত। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে। তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির ওপর সাদা সুতার খুব ঘন ঘন ঘর কাটা শাড়ী পরিতে রাধিকা খুব ভালবাসিত, শিবপদ বারো মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু আর এক বিগত যৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উন্মত্তদৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত; সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল, এই বেদেনী, দেখি তুর সাপ কেমন?

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, নাগরের শখ দেখি যে খুব! পয়সা দিবা?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পয়সা দিব না; তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা? যেমন অদ্ভুত চেহারা তেমনিই অদ্ভুত কথা; বলে বাঘ দেখাইবে। সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সত্যি বুলছ?

বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ? সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। রাধিকা সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, ঐ বাঘ নিয়া তুমি কি কর?

লড়াই করি, খেলা দেখাই।

হ্যাঁ?

হ্যাঁ, দেখবি তু? বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা হাতে ধরিয়া তুলিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, তু এইবার সাপ দেখা আমাকে।

রাধিকা সে কথায় উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল, ওটা তুমার পোষ মেনেছে?

হি হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি, বাঘিনী পোষ মানাইতে আমিও ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, একবিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিন কয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছিছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদের অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ তাহার আজ নিঃশেষিত হইয়াছে। দুঃখেই দিন চলে আজকাল; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা, এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজ-পোষাক, চোখ রাঙা, সেই তখন বলিতেছিল, কেনে, ইথে দোষটা কি হলো? তুম'রা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হচ্ছে। খেলা দেখবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কি হল?

শম্ভু চিৎকার করিয়া উঠিল, খেল দেখাবেন খেলোয়াড়ী আমার! অপমান করতে আসছিস তু!

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বে উত্তেজিত হইয়া রাধিকা একটা ইঁট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মারিয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে বলের মত সেটাকে লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর ইটটাকে লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল! বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়েকটা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইঁট কুড়াইয়া লইল; শম্ভু তাহাকে নিবৃত্ত করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল, এই মেলার বাদেই বাঘ লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাৎ, ফেলে দে খুলো।

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাৎ খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে!

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরৎ দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে
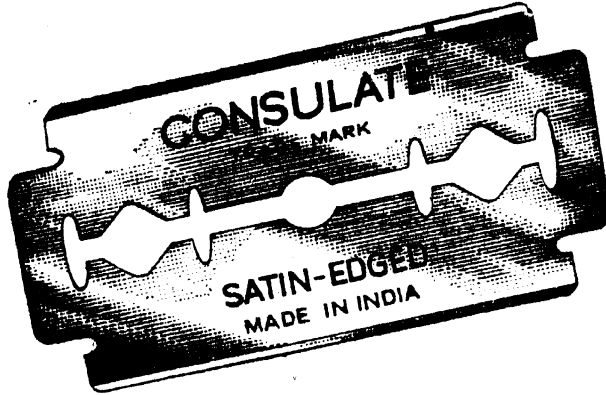
বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর !

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, কাল পুলিশে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিব।

ওদিকে টিয়া পাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিণ্টো লড়াই করিল, ইঃ—একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা।

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! সংগে সংগে আক্রোশেও ফুলিতে-ছিল। তাঁবুটা আগুনে ধরিয়া ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া যায়। কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুনে ধরাইয়া দিলে কেমন হয় ?

পরদিন প্রভাতে উঠিতে রাধিকার একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই, সে বোধ হয় দুই চারজন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিণ্টোর তাঁবুর চারপাশে পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। একি ? সে সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, দারোগা তাহার আপাদ মস্তক দেখিয়া বলিলেন, ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব !

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল, কি কসুর করলাম হুজুর?

মদ আছে কিনা দেখব আমরা, ডাক বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন, কিন্তু সে তাঁহার ভুল ভাঙিল না। সে বলিল, ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে—হুজুর—

আচ্ছা ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আলগা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিণ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া তাহাকে জানাইয়া দিয়া রাধিকা বলিল, পুলিশ আসছে, বসে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তনা-দানরত মাতার মত শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনেই কিণ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন, এ তাঁবু তোমার ? সেলাম করিয়া কিণ্টো বলিল, জী, হুজুর !

দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কিনা দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মত মিশাইয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়াছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিশকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে।

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল, রাধিকার সে-দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল, খাবা, ছেলে খাবা ?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বলিল, সব মাটি করে দিছিস তু। উয়াকে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিশে খবর দিয়ে এলাম, আর তু করলি এই কান্ড!

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গতি রাত্রের কথা। সত্যই একথা শম্ভু তো বলিয়াছিল ! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ন হইতে এ তাঁবুতেও খেলা আরম্ভ হইবে। শম্ভু আপনার জীর্ণ পুরাতন পোশাকটা বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙার মত সরু প্যান্টালুন আর একটা কালো রঙের খাটো-হাত কোট। রাধিকার পরনে পুরোণো ঘাঘরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুল হাতা বডিস। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত; কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞার ক্ষোভে তাহার যেন [illegible] মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উহা-দের তাঁবুতে কিণ্টোর সেই [illegible] বিড়ালীর মত গাল-তোটা, [illegible] মত স্থলাঙ্গী মেয়েটা পড়িয়াছে [illegible] টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর [illegible] সবুজ সাটিনের একটা জালিকাটা [illegible] কাঁচুলি ঢঙের বডিস, কুৎসিত মেয়েটাকেও যেন সুন্দর দেখাইতেছে, উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনের আওয়াজের মত একটা রেশ শেষকালে ঝংকার দিয়ে উঠে। আর এই কতকালের পুরানো ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক, ছি— !

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজনা থামাইয়া হাঁকিল, ও-ইব-ড়-বা-ঘ!

রাধিকা রুদ্ধ স্বর কোন মতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বড় বাঘ কি করে?

শম্ভু খুব উৎসাহ ভরেই বলিল, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সংগে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে চিবোয় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বন্ধ বন-চারী সিংহ আর্তনাদের মত গর্জন করিল।

সংগে সংগে ও তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল, মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার শরীর যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। ক্রুর হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিণ্টো হাসিতেছে, রাধিকার সহিত চোখা-চোখি হইতে সে হাঁকিল, ফিন একবার।

তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীয় বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবলতর গর্জনে হুংকার দিয়া উঠিল, রাধিকার চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মত কিণ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুর তাঁবুতে অল্প কয়টি লোক সস্তায় আমোদ করিবার জন্য ঢুকিল, খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কি উটা?

কেরাচিন। আগুন লাগায়ে দিব উহা-দের তাঁবুতে। পুরা পেলম নাই, দু' সের কম রইছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে।

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, লিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল, দাউ দাউ ক'রে জ্বলবেক যখন।

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিণ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরৎ দেখাইতেছে, উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিতে লাগিল। দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, এখন নয়, সেই—নিস্তব্ধ রাতে।

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে। বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই। বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, গাঢ় অন্ধকার থমথম করিতেছে, সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালাইল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে লাগিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল, অভিমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে। সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ওদিকটা পর্যন্ত পুড়িয়া তবে এদিকে মেলাটার লোক আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মতই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া শন শন করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁফাইতে আরম্ভ করিল।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতর একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাড়িয়া মাথাটা গলাইয়া দিল, সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার। সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তাহার কাছেই এই যে কিস্টো একটা অসুরের মতো পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে! রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতেই লাগিল, কিস্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কী সাহস! উঃ, বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলা কি নিটোল। তাহার আশেপাশে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিস্টো নাচিয়া ফেরে। ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন। দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্তে যাহা করিয়া বসিল তাহা স্বপ্নের অতীত, সে উন্মত্ত আবেগে কিস্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিস্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল, হাঁ, চুপ।

কিস্টো চুমায় চুমায় তাহার মুখ ভরিয়া দিল, দাঁড়াও, মদ আনি।

না, চল, উঠ এখুনেই ইখান থেকো পালাই চল।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁফাইতেছিল।

কিস্টো বলিল, কুথা?

হুই দেশান্তরে।

দেশান্তরে? ই তাঁবুটাবু—

থাক পড়্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?

সে নিম্নস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া—তাহার উপর দুরন্ত যৌবন—কিস্টো দ্বিধা করিল না, বলিল, চল।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল, দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।
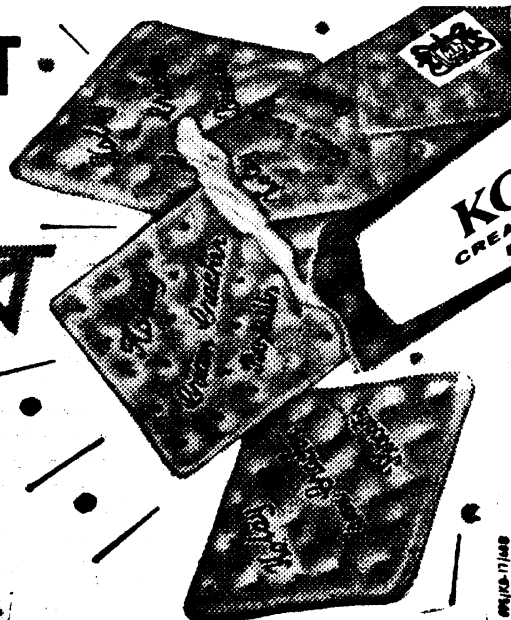
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক প্রখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক বললেন, তারাশংকর সম্পর্কে লিখবে কী? একটা বিরাট প্রতিমূর্তি—সূর্যালোকে জাজ্বল্য; পায়ের নীচে দাঁড়ালে তো কিছুই দেখবে না। পিদিম জেলে দেখাবে নাকি?...উনি হেসে উঠলেন হো হো করে। কথাটা ভয় পাইয়ে দেবার মত। তবু দমে পড়লাম না। সপ্রতিভ জবাব দিলাম, বাইরে থেকে এগোলে তাই বটে—তবে সে পথে আমি যাচ্ছিনে। প্রতিমূর্তির বাইরে যে-তারাশংকর, তাঁকে নিয়েই আমার যত বড়াই। কতকালের চেনা মানুষ!

এইরকমই ভেবেছি বরাবর। আজও তাই ভাবি। কতকালের চেনা মানুষ: আর সেই মানুষ আমার কতকালের চেনা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন—কখনও কাস্তেহাতে, মুঠোয় ধানের শীষ, সারা গায়ে সোঁদা মাটির ছোপ, ঘাসের কুটো, খড়ের কুটো, সামনে শ্যামলে সবুজে বিস্তীর্ণ মাঠ—শিয়রে যাদুকর কুয়াসার নীল ব্যাপকতা, কখনও কোন সন্ধ্যারাতে খেয়ানৌকোর বিষণ্ণ পাটনী, কখনও সাপের ঝাঁপির সামনে হাঁটুগেড়ে বসা বেদে, আবার কখনও শান্ত সন্ন্যাসী—রক্তলাল চক্ষু, বাহুতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পিঙ্গল কেশে জটা ...কত রূপেই না মনে ভেসেছে! তবে বাংলাদেশের বাউলপুরুষ বলেছেন, এই মানুষেই মানুষ আছে বসে। সেই আসল মানুষটি বড় রহস্যময়। বড় বিচিত্র তার আবরণ। সেই আমায় ধরিয়ে মেরেছিল—অস্থির করেছিল। খেলা করছিল আমায় নিয়ে।

একে যদি তার জীবনরহস্য বলি, সব গোল মিটে যায়। এ রহস্যের যে স্বাদ—তা রৌদ্ররসের। রাঢ়ের মাটির গন্ধে সে স্বাদ আজীবন প্রাণভরে নিয়েছি। এতে যেটুকু বা বিষণ্ণতা আছে, তাও একসময় হঠাৎ ফেটে পড়ে। দাউ দাউ জ্বলে ওঠে। 'জলসাঘরে'র বিষণ্ণ সম্রাটকেও পরিণামে দেখলাম 'তুফানকে' সজোরে কশাঘাত করে বিপুলবেগে দিকশূন্য প্রান্তরে ছুটেছেন। চরম বিস্ফোরণ! 'বাতি নিভিয়ে দে—বাতি নিভিয়ে দে—জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর'...আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।'

তারাশংকর ছাড়া জীবনের এ ভয়ংকর, অমোঘ সত্যের দিকে, ইতিহাসের গভীরতর বাস্তবতার দিকে, আর কার সাধ্য ছিল হাত ধরে এনে পৌঁছে দিতে? আমার মনের ভিতর, কে জানে কেন, চিরচেনা শাক্তভূমি রাঢ়ের এক দীর্ঘদেহী উদ্ধত কঠিন মুখবিশিষ্ট সন্ন্যাসী লালচোখে কটাক্ষ হেনে বলেন—কী দেখছিস ব্যাটা! দ্যাখ্, ভাল করে দ্যাখ্। আমার হাত ধরে সন্ন্যাসী এমনি করে জীবনকে দেখতে বলেন। সত্যাসত্য ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য সুন্দর-অসুন্দরকে একাকার করে, স্থানকালচেতনা লুপ্ত করে, ঈশ্বরের মত সামনে এসে দাঁড়ায় জীবনের বিগ্রহ। যখন ফিরে আসি, কপালে আমার মানুষ নামে বিগ্রহের চরণচর্চিত কিছু সিঁদুররেখা। পৌত্তলিক হয়ে ফিরি।

সাহিত্য আলোচনায় আঞ্চলিকতা বলে একটা কথা আছে। ও নিয়ে মাথাব্যথার কিছু দেখি না। এক অর্থে ওটা সকল ক্ষেত্রেই খাটে। সব সাহিত্যিকই আঞ্চলিক-ভিত্তিতে লেখেন। কিন্তু যখন কোন সমালোচক গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলেন, তারাশংকর রাঢ়পল্লী অঞ্চলের মাটি ও মানুষকে সাহিত্যে অবিনশ্বর করেছেন—আমার কেমন যেন মনে হয়। রাঢ়, পল্লী, মাটি, ইতরজন বা নিম্নস্তরের মানুষ......এইসব শব্দ আমার কাছে অতিমাত্রায় অযথা ঠেকে। আসলে এগুলো তো নিছক পরিপ্রেক্ষিত। জীবন শূন্যে ভাসে না, মানুষ অদৃশ্য প্রেত নয়; তার মাথার ওপর যেমন আকাশ আছে, পায়ের তলায় আছে মাটি। মানুষটিকে দেখাতে তার পরিপ্রেক্ষিতটিও দেখাতে হয়—শুধু শিল্পে কেন—সর্বক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা অনিবার্য শুধু নয়—স্বতঃসিদ্ধ। ময়ূরাক্ষীঘাটের তারিণীমাঝি—দুর্ভিক্ষ বা বন্যা—কিংবা তার বৌ সুখী—এরা সব একেকটি উপাদান। এরা গল্প নয়। গল্প হচ্ছে অন্যত্র—যেখানে প্রকৃতি ও জীবনের ভয়ংকর যুদ্ধে প্রিয়তমা নারীকেও পিছনে অবহেলায় ফেলে মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায়। এ ব্যাপারটা অন্য কোথাও অন্য রূপেও ঘটতে পারত। পাঠক হিসেবে আমরা এটুকুর জন্যেই ব্যগ্র থাকি। ময়ূরাক্ষী কোথায়, তারিণী মাঝি কী ডায়ালেক্টে কথা বলে ইত্যাদি নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, তাদের পক্ষে অবশ্য জেলা গেজেটিয়ার পড়া বা সামর্থে কুলোলে সেখানে গিয়ে সরেজমিন দেখাশুনাই প্রশস্ত। আমার শুধু আশ্চর্য লাগে, যে-অস্তিত্ববাদী চিন্তাভঙ্গী নিয়ে হইচই চলে, কতদিন আগে 'তারিণীমাঝি'তে তার নিঃশঙ্ক অবস্থান!

আমি এখানে তারাশংকরের ছোটগল্প নিয়েই স্বল্প আলোচনায় উৎসুক হয়েছি। অন্তত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তথাকথিত 'আঞ্চলিকতা'র উল্লেখ আমার প্রচণ্ড অপছন্দ। প্রকৃতি ও মানুষ, আর মানুষ ও ইতিহাস—আপাতদৃষ্টে এই সম্পর্কগুলো গাণিতিক ছকে এইরকম সাজানো যায়ঃ প্রকৃতি মানুষ ইতিহাস। যদিও প্রধানত এই প্রতিপাদ্যটি উপন্যাসের মধ্যেই খেলে ভালো, ছোটগল্পেও যে একে ব্যবহার করা যায়—সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তারাশংকরই দেখিয়েছেন আমাদের। রবীন্দ্রনাথের হাতেই একরকম বাংলা ছোটগল্পের দরজা খুলে গিয়েছিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতি-মানুষ' নিয়ে যতটা ব্যস্ত ছিলেন, 'মানুষ-ইতিহাস' নিয়ে ততটা নয়। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্বও তাঁর

গল্পে চোখে পড়ে। কিন্তু তারাশংকরে এসে ছোটগল্পরীতির নতুন বাঁকে এসে আমরা উপস্থিত হই। ইতিহাসচেতনা অর্থাৎ যা আসলে মহাকালচেতনারই বহিরঙ্গ, তারাশংকর তার সাহায্যে ছোটগল্পের অন্তর্নিহিত বাস্তবতায়, তার প্রতিপাদ্যে, নতুন আলো ফেললেন। আমার ধারণা, আঞ্চলিকতার মত স্থূলে ইনফরমেশন সর্বস্বতার দরুন নয়, তারাশংকরের এই নতুন আলোর ঝলকানিতেই আমরা শেষঅব্দি বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। জীবনকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা দেখিনি। এই ইতিহাসচেতনার গুণটি শিল্পের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ক্লাসিক শিল্পের অন্যতম প্রধান গুণ।

এখানে সবিনয়ে উল্লেখ করা ভালো যে তারাশংকরের ছোটগল্পের প্রকৃত মূল্যোনিরূপণ করার সামর্থ বা সঙ্গতি আমার নেই। সে-কাজ বিদগ্ধ পন্ডিতব্যক্তির। আমি নিতান্ত এক ভক্ত পাঠক হিসেবে অতিশয় শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে শুধু আমার বক্তব্যটাই নিবেদন করতে চেয়েছি। গুণীজনে যেন অনুগ্রহ করে কোন ভুল বুঝবেন না।

আমরা—ভারতীয়রা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বংশপরম্পরা জীবন সম্পর্কে একটি কথা বিশ্বাস করি। তা হচ্ছে : জীবন অবিনশ্বর। এবং সেইহেতু আমাদের ধারণা : জীবন এক পরম প্রজ্ঞারই বিচিত্র রূপ। পরমপ্রজ্ঞা ধ্রুব বলেই সর্বভূতে—তাবৎ প্রকৃতি ও পুরুষে তার অস্তিত্ব। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে জীবনকে নির্বিচারে সর্বত্র অস্তিত্ববান বলে স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা—কেউ যখন রামকৃষ্ণদেবের মত মুসলমানবেশে নমাজ পড়তে বসেন, কিংবা শ্রীচৈতন্যের মত—কিংবা গান্ধীজীর মত 'অচ্ছুত'কে কোল দিতে বাহু প্রসারিত করেন—আমরা বিস্মিত হই। এবং একই কারণে তারাশংকর সম্পর্কে সমালোচক বলেন, তিনি 'নীচের দিকে নেমে গিয়ে ইতরসাধারণ'কে চিত্রিত করেছেন—আমরা বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় বলি : সাধু, সাধু! কিন্তু সত্যি বলতে কী, এর মধ্যে আদৌ বিস্ময়কর কিছু নেই। এই তো আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিক্ষা! বস্তুত তারাশংকর তথাকথিত ভঙ্গীতে 'নীচে নেমে' যান নি—তিনি স্বয়ং মহাকালের কোলে বসে থাকবার জন্মভাগ্য পেয়েছেন বলেই, শুধু চারপাশে তাকিয়ে দেখেছেন। মানুষ আর মানুষ...প্রকৃতি আর মানুষ...ইতিহাস আর মানুষ। তখন কেই বা জলসাঘরের বিষণ্ণ বাদশাহ, কেই বা মাঠের চাষা মুকুন্দ পাল,—'হরিপদ কেরানী আর আকবর বাদশাহ' একাকার। বাউলপুরুষের সেই আসল মানুষটি নিয়েই তো পৃথিবী চলেছে। খোলসের ভিতর প্রাণ, মুখোসের নীচে মুখ—তাই নিয়েই যদি বিশ্বপ্রকৃতির কারবার হয়, নীচে নামবার দরকার হয় না—চাই শুধু একজোড়া শাণিত চক্ষু।

তারাশংকরের ছোটগল্প সেই শাণিতচক্ষুর দর্শন। আমরা সাহিত্যে কাহার, বাউরী, বেদে, রাজমিস্ত্রী, চাষা, ডাইনী বিকলাঙ্গ দেখেই চমৎকৃত হবার ভান করেছি। কিন্তু এই তো অনিবার্য ছিল বাংলাদেশে। ইতিহাসকে যদি বিস্মৃত না হই,—বাংলাদেশের প্রাণভোমরাটি কোথায় ধুকধুক করছিল, তারাশংকর টের পেয়েছিলেন। আর্যরক্তের অমূলক বড়াই চুরমার করে জীবনের ভয়ংকরের হাত ধরে প্রবেশ করেছিলেন এক নির্বিকার শাক্ত সন্ন্যাসী—উপাস্য তাঁর ভীমাভৈরবী মহাকালী, মহাকৃষ্ণভুজে ধৃত খর যেমন খড়্গ, তেমনি বরাভয়—যেমন সংহারের রক্তবিন্দু, তেমনি সৃজনের বীর্যকণিকা! অসুন্দরের মধ্য দিয়ে সুন্দর আবির্ভাবের যে জীবনদর্শন, তারাশংকরের প্রতিটি ছোটগল্পের স্রষ্টা সেই। 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পের ভীষণতম পরিণতির পাশাপাশি যখন দেখি চাষী মুকুন্দ পালকে দলিত করে পথের পাশে ফেলে তার ফসলের গাড়ি গ্রামে ঢুকে যাচ্ছে—আর রক্তাক্ত হাতে তার একমুঠো ফসলের শীষ চাকিতে অনুভব করি, না, না—এহ বাহ্য! আমার শ্রমের ফসল আমার বুক মাড়িয়ে ফিরে যায় ঘরে, আমার আর ফেরা হয় না। আরো অনেক মানুষ সেখানে বেঁচে—সেখানে আমার ফসল যায়, আমি যেতে পারি না! এতো সেই 'সোনার তরী' কবিতা! না—ভয়ংকর বিনাশ শেষ নয়। এর পরও ওই সত্যাভাষ আছে—আমার ফসল মানুষের কাছেই চলে গেছে! সর্বহারা ব্যক্তিটিকে অবিনশ্বর জীবন দিচ্ছে ইতিহাসের গৌরব।

তীব্র ইতিহাসচেতনার ফলেই তারাশংকর সমকাল সম্পর্কে সমান আগ্রহী। সমকালের প্রতিটি ঘটনা তাঁকে উত্তেজিত করেছে। 'তিনশূন্য' গল্পের কথা ভাবলে আজও আমার মগজ ঠান্ডা হয়ে পড়ে। জীবন নিছক আদিম অন্ধশক্তির সাকার বিগ্রহ বলে মানলে এ গল্পের ব্যাখ্যা ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু 'তিনশূন্যের' প্রতিহিংসা আমাদের পৌঁছে দেয় যুগযুগান্তকালের প্রচ্ছন্ন এক অভিমানবোধে। ইতিহাসের নিয়তিকে আবিষ্কার করে গায়ের জ্বালা জুড়োই। অবশ্য নিছক শ্রেণীবিদ্বেষ নিয়ে এ সৃষ্টি সম্ভব নয়—ইতিহাসে জীবনের ভূমিকা এবং স্বয়ং জীবনের মধ্যকার ভয়ংকর এক শক্তি নিয়ে তারাশংকর আজীবন মগ্ন।

যেহেতু তারাশংকরের চোখে জীবনের রুদ্র ভয়ঙ্কর লীলা ধরা পড়েছে, তাই অনিবার্যভাবে তিনি বেদে-বেদেনীদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। উন্মূল জীবনেরও একটা গভীর প্রচ্ছন্ন আশ্রয় রয়েছে—উদ্ভ্রান্ত পাখিই যেমন সব নয়, গাছের পাখিও রয়েছে সেটা [illegible] আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। আর সাপ-সাপিনী! চরিত্র তো বটেই, প্রতীকে—সত্তার তারা একাত্ম। বস্তুত সাপ নিয়ে এত মারাত্মক খেলায় সাধ আর কোন শিল্পীর মধ্যে আমি দেখিনি! শুধু কি সাপ? 'কালাপাহাড়ে'র মত জানোয়ারকেও তারাশংকর চরিত্র করেছেন। আসলে সবই তো জীবন—সবখানেই প্রকৃতি, কাম ও প্রেম, প্রয়োজন ও সৌন্দর্যচেতনার তীব্র দ্বন্দ্ব—তারপর বেরিয়ে পড়ে জীবনসত্য। একেই বলি জীবনরস। তারাশংকর মুখ্যত জীবনরসের সেরা রসিক। তাই একদিকে তাঁর গৃহ, অন্যদিকে সন্ন্যাস। একহাতে তাঁর পোষা পায়রা, অন্যহাতে শিকারী বাজ।

কোথাও যেন পড়েছিলাম, তারাশংকরের ছোটগল্প একটু অসাধারণ—কিছু অস্বাভাবিক দেহে বা মনে—এমন ধরনের চরিত্রের বিষম প্রাদুর্ভাব! এ অভিযোগের কারণটা যে মূলত ভিত্তিহীন, তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হলেই বোঝা যায়। দেহ বা মনের বিকৃতিতে তারাশংকরের পক্ষপাত এ ব্যাখ্যা অর্থহীন। কেননা একটা কথা বোধ করি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। জীবন নদীর স্রোতের মত। কোথাও মৃদু বাধা পড়লেই সে তৎক্ষণাৎ সোচ্চার হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়—তার প্রাণশক্তি—তার গতি ও বেগের নানান সত্য মুহূর্তে স্পষ্টতর হয়। শান্ত নিস্তরঙ্গ স্রোতে জীবন প্রকৃতির পটভূমিতে জড়বৎরূপে উদ্ভাসিত হতে পারে—সেটা তার গভীর বা আসল সত্য নয়। রূপের আড়ালে যে সত্তা—তা একমাত্র প্রত্যক্ষ হতে পারে তখন, যখন দ্বিতীয় কোন বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব থাকে। হয়ত জীবনের এই দ্বিতীয় শক্তিই প্রতিঘাত সৃষ্টি করে জীবনকে সতেজ ও সোচ্চার রাখে। তারাশংকর তাই যেন সবার আগে ওই বিরোধের জায়গাগুলোতেই চোখ রেখেছেন। হৃদয় ও বুদ্ধি দুয়ের সহযোগিতায় জীবনকে বাংলা সাহিত্যে এমন করে কজনই বা দেখেছেন!

•

দু বছর আগে মহাবোধি সোসাইটির সাহিত্য সভায় তারাশংকরকে প্রথম চাক্ষুষ দর্শন করেছিলাম। মুহূর্তে আমার মন কেমন করে উঠল। এ কাকে দেখছি? কই, কোথায় আমার সেই চিরচেনা মনের মানুষটি—দীর্ঘ পিঙ্গল কেশ, গলায় রুদ্রাক্ষ রক্তবসনধারী রাঢ়ের সন্ন্যাসী—হাত ধরে যিনি বলেছিলেন, কী দেখছিস্ ব্যাটা, ভালো করে দ্যাখ—ওতে ভয় পাবার কিছু নেই? এই মহান রুদ্ররূপী উদ্ধত সন্ন্যাসীর হাত ধরেই না দেখে এসেছিলাম জলসাঘরের বিষণ্ণ সম্রাটদের?...আজও মানুষ তারাশংকরের কাছে যেতে আমার পা ওঠে না কারণ, যে আছে মনে, তাকে দেখেই আমি সুখী।

হীরার আংটির হীরাটা যখন আলগা হইয়া যায়, তখন আর তাহা আঙুলে পরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নয়। হীরা অলক্ষিতে পড়িয়া হারাইয়া যাইতে পারে। বিত্তরী, সাবধান!

ক্ষেত্রমোহনের আংটির হীরা অনেকদিন আগেই হারাইয়া গিয়াছিল! শোকটা সে সহজেই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল এবং ঝুটো পাথর দিয়া কাজ চালাইতেছিল। অপরিচিত কেহ হয়তো হঠাৎ দেখিয়া ভুল করিতে পারিত, কিন্তু অন্তরঙ্গদের মনে কোনো মোহ ছিল না।

ক্ষেত্রমোহন যে একজন ভদ্রবেশী মিষ্ট-ভাষী জুয়াচোর তাহা তাহার স্ত্রী চপলা জানিত। চপলার বয়স বাইশ বছর। রূপ ও যৌবন দুই আছে—সন্তানাদি হয় নাই। তাহার রূপ-যৌবনের মধ্যে একটা তীব্র তেজস্বিতা ছিল—চোখধাঁধানো উগ্র প্রগল-ভতা। বাইশ বছর বয়সে বাঙালী মেয়ের যৌবন সাধারণত থাকে না—যাহা থাকে তাহা পশ্চিম দিগন্তের অন্তরাল। চপলার মধ্যে কিন্তু কোন অভাবনীয় কারণে যৌবন টিঁকিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের উপর যে নিগ্রহ হইয়াছিল, তাহারই ফলে হয়তো এমনটা ঘটিয়াছিল। মনের সহজাত বৃত্তি ও সংস্কারগুলি যখন নিপীড়িত হইয়া অন্ত-র্মুখী হয়, তখন তাহারা কোন্ পথে কি রূপ ধরিয়া দেখা দিবে বলা দেবতারও অসাধ্য। ফ্রয়েড সাহেব এই অতল সমুদ্রে চাটগেঁয়ে খালাসীর মত 'পুরণ' ফেলিতেছেন বটে—কিন্তু বাম মিলে না।

ক্ষেত্রমোহন লোকটা নিরম্বু বদমায়েস। মোসাহেবী করা ছিল তাহার পেশা। বড়-লোকের সদ্যবয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের অপ্সরা-লোকের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু সে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত। বেহুঁশ মাতালের পকেট হইতে মনি-ব্যাগ চুরি করিতে তাহার বাধিত না। কিন্তু সে নিজে মদ খাইত না। এবং অন্য মকার সম্বন্ধেও তাহার একটা স্বাভাবিক নিস্পৃহতা ছিল। অপ্সরালোকের দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

শঙ্করাচার্য সত্যই বলিয়াছেন—এ সংসার অতীব বিচিত্র!

চপলা যখন প্রথম স্বামীর চরিত্র জানিতে পারে, তখন ভীত বিস্ময়ে একেবারে অভি-ভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর কিছুদিন কান্নাকাটির পালা চলিল। ক্ষেত্রমোহন সস্নেহে যত্ন করিয়া চপলাকে নিজের চার্বাকনীতি বুঝাইয়া দিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে চপলা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে আর মোহ ছিল না।

ট্রাম-ঘর্ঘরিত সদর রাস্তার উপর একটি সরু বাড়ির দোতলায় গোটা দুই ঘর লইয়া ক্ষেত্রের বাসা। শয়ন ঘরের একটা জানালা সদর রাস্তার উপরই। সেখানে দাঁড়াইলে পথের দৃশ্য দেখিবার কোনো অসুবিধা নাই।

সেদিন বৈকালে চপলা সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়াছিল, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল। উৎফুল্ল ক্ষেত্র-মোহন ঘরে ঢুকিল।

ক্ষেত্রের বয়স ত্রিশ—সুশ্রী চটপটে বাক-পটু। সে হাসিতে হাসিতে চপলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। আজ রাত্তিরেই—বুঝলে? গুদাম সাবাড়—মাল তস্রুপাত।'

চপলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল—জ্বলজ্বলে চোখ-ঝলসানো হাসি। তাহার দাঁতগুলি যেন একরাশ হীরা, আলোয় ঝকমক করিয়া উঠিল। ক্ষেত্রের এ হাসি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তবু সে লোভ সামলাইতে পারিল না, একটা চুম্বন করিয়া ফেলিল।

বুকে হাত দিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া চপলা বলিল, 'কি হল?'

চপলার কাছে ক্ষেত্রের কোনো কথাই গোপন ছিল না। বরং কেমন করিয়া কাহার নিকট হইতে টাকা ঠকাইয়া লইল, কাহাকে মাতাল করিয়া পকেট-বুক হইতে নোট চুরি করিল, এসব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চপলার কাছে গল্প করিতে ভালবাসিত, বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। এখন সে জানলার গরাদ ধরিয়া সোৎসাহে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তোমাকে অ্যাদ্দিন বলি নি। এক নতুন কাপ্তেন পাকড়েছি; বেশ, শাঁসালো জমিদারের ছেলে—কলকাতায় ফুর্তি করতে এসেছে। নরেন চৌধুরী নাম। ফড়েপুকুরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে একলা আছে। তাকে মাসখানেক ধরে খেলাচ্ছি।

'ছোঁড়ার বয়স বেশি নয়—তেইশ-চব্বিশ। কিন্তু হলে কি হ'বে, এরই মধ্যে অনেক বুড়ো ওস্তাদের কান কেটে নিতে পারে। একেবারে একটি হর্তেল ঘুঘু। এই দেখ না, এক মাস ধ'রে তেল দিচ্ছি এখনো একটি সিকি পয়সা বার করতে পারিনি। শালা মদ কিনবে তাও আমার হাতে টাকা দেবে না; নিজে গিয়ে বোতল কিনে আনবে, নয়তো দারোয়ান ব্যাটাকে পাঠাবে। তার থেকে দু পয়সা বাঁচাব, সেগুড়ে বালি। পাঁড় মাতাল; কিন্তু মদের গেলাস ছোঁবার আগে কি করে জান? টাকা-কড়ি, মায় হাতের আংটি পর্যন্ত দেরাজে বন্ধ ক'রে চাবিটি ঐ শালা দরোয়ানের হাতে দিয়ে বলে, যাও, মৌজ কর। এই বলে তাকে একেবারে বাড়ির বার করে দেয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকে—চণ্ডাল ব্যাটাচ্ছেলে।'

চপলা মন দিয়া শুনিতেছিল, এই আকস্মিক উত্তাপে সকৌতুকে হাসিয়া ফেলিল, বলিল, 'তবে যে বললে সব ঠিক করে ফেলেছি?'

ক্ষেত্র মুখের একটা বিরক্তি-সূচক ভঙ্গি করিয়া বলিল, 'দেখলুম, ও-শালা পগেয়া বদমায়েসকে সহজে ঘায়েল করা যাবে না, একেবারে ঘাড় মটকাতে হবে। আমারও রোখ চড়ে গেছে— আজ রাত্রে ঠিক করেছি ব্যাটার দেরাজ ফাঁক করব। এই দেখ, চাবি তৈরি করিয়েছি।' বলিয়া পকেট হইতে কয়েকটা চকচকে চাবি বাহির করিয়া দেখাইল!

"চুরি করবে?"

'হ্যাঁ। ঢের খোশামোদ করেছি, আর নয়, এবার একহাত ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দেব। টাকা-কড়ি ব্যাটা দেরাজে বেশি রাখে না—কোথায় রাখে ভগবান জানেন; কিন্তু একটা হীরের আংটি আছে, রাত্রে বেরুবার সময় সেটা দেরাজে বন্ধ করে রেখে যায়। সেইটের ওপর টাঁক করেছি। উঃ! কী হীরেটা

মাইরি, চপলা, যদি দেখ চোখ ঝলসে যাবে। দাম হাজার টাকার এক কানাকড়ি কম নয়। যদি পাঁচ শো টাকাতেও ছাড়ি, কেষ্ট স্যাকরা লুফে নেবে।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়?'

'সে ভয় নেই। বন্দোবস্ত সব পাকা করে রেখেছি। আজ এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ব্যাটা বেরুবে, সমস্ত রাত বাড়ি ফিরবে না।' বিমনাভাবে ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'কোথায় যাবে কিছুতেই বললে না, হয়তো নাটরাজ থিয়েটারের সৌদামিনীর কাছে—কিন্তু সৌদামিনী তো মেনা মিত্তিরের; যাক গে, যে চুলোয় খুশি যাক। আসল কথা, এগারোটার পর ব্যাটা বাড়ি থাকবে না। দরোয়ানটা বেরুবে—তার ব্যবস্থা করেছি। বাস, গলির মোড়ে ওৎ পেতে থাকব, কর্তারাও বাড়ি থেকে বেরুবেন আর আমিও সুট ক'রে গিয়ে ঢুকব। তারপরেই গুদাম সাবাড়—মাল তছরুপাত। 'শালা লুট লিয়া—শালা লুঠ লিয়া—' রাস্তার দিকে তাকাইয়া ক্ষেত্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই বিড়ালের মত লাফ দিয়া জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'স'রে এস—স'রে এস, ও পাশের ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে।'

চপলা সরল না, বলিল, 'কে?'

'নরেন চৌধুরী—স'রে এস।

'কি দরকার? আমাকে তো আর চেনে না।'

'তা বটে!' তারপর ঘরের ভিতরের অন্ধকার হইতে উঁকি মারিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'ঐ দেখতে পাচ্ছ, ফরসা মতন চেহারা, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতে হরিণের শিঙের ছড়ি? উনিই নরেন্দ্র চৌধুরী। হাতের আঙটিটা দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।' চপলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া হাসিল; পড়ন্ত দিনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, মনে হইল, যেন একরাশ হীরা ঝরিয়া পড়িল—'হীরেটার দাম কত বললে?'

'হাজার টাকা', ক্ষেত্র বিছানার উপর গিয়া বসিল—'বেশিও হতে পারে। এবার তোমার ঝুমকো গড়িয়ে দেবই, বুঝেছ? ঐ কেষ্ট স্যাকরাকে দিয়েই গড়িয়ে দেব—সস্তায় হবে। অনেকদিন থেকে তোমায় বলে রেখেছি—'

রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই চপলা বলিল, 'হুঁ।'

ক্ষেত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'চলে গেছে, না, এখনো আছে?'

চপলার ঠোঁটের ওপর একটা ক্ষণিক হাসি খেলিয়া গেল, ক্ষেত্র তাহা দেখিতে পাইল না।

চপলা বলিল, 'মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে।'

'ফিরে আসছে?' ক্ষেত্রর কপালে উৎকণ্ঠার ভ্রূকুটি দেখা গেল। 'তাই তো, আমার বাসার সন্ধান পেয়েছে নাকি? ব্যাটা যে রকম কুচুটে শয়তান! তুমি সরে এস। কে জানে—'

চপলা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া রহিল। খানিক পরে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলে গেছে।'

'যাক, তা হ'লে বোধহয় এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।' বলিয়া ক্ষেত্র একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা যেন অন্যমনস্কভাবে ক্ষেত্রের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে, না?'

ক্ষেত্র একগাল হাসিল—'পারে না! টাকার জন্যে পারে না এমন একটা মানুষ দেখাও তো দেখি। খুন-জখম জাল ফেরে-ব্বাজি—দুনিয়াটা চলছে তো ঐ টাকার পেছনে। আর তাতে দোষই বা কি? টাকা না হ'লে কারুর একদণ্ড চলে? আমি যে ব্যাটার ঘাড় ভাঙতে যাচ্ছি, তার মধ্যে আমার অন্য স্বার্থও আছে। ব্যাটা আমাকে বড় হয়রান করেছে। যেমন ক'রে হোক ওর ঐ আঙটি গাপ করবই।'

আলস্য ভরে দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া চপলা গা ভাঙিল। তারপর বলিল, 'যাই, চুল বাঁধি গে।'

* * *

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ক্ষেত্র গলির মোড়ে আড্ডা গাড়িল। ঠিক সম্মুখে ফড়ে-পুকুরের রাস্তা পূর্ব-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, গলির মুখ যেখানে গিয়া তাহার সহিত মিশিয়াছে সেখানে একটা কাঠের আড়ৎ আছে—সেই আড়তের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে সহজেই পথচারীর দৃষ্টি এড়ানো যায়। রাস্তায় গ্যাস কাছাকাছি নাই।

এখান হইতে নরেন চৌধুরীর বাসার সদর বেশ দেখা যায়—বড়জোর বিশ গজ। রাস্তার উপরেই দরজা। দরজা খুলিলে ভিতরে একটা ছোট গলি, গলির দুই ধারে দুইটি ঘর, রাস্তার উপরেই। বাহিরের দিকে জানালা আছে।

ক্ষেত্র দেখিল, পারে একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। এইটাই আসল ঘর। ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে, সেই টেবিলের ডানদিকের দেরাজে—

ক্ষেত্র পকেটে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে। সে মনে মনে হিসাব করিল, কাজ শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগিবে না। তাহার হাত নিশপিশ করিতে লাগিল, একটা স্নায়ুবিক অধীরতা তাহার শরীরকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। লোকটা কতক্ষণে বাড়ির বাহির হইবে?

ক্ষেত্র বিড়ি ও দেশলাই বাহির করিল। বিড়িতে ফুঁ দিয়া ঠোঁটে ধরিয়া দেশলাই জ্বালিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। না, কাজ নাই। গলিতে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গলির দুই ধারে বাড়ি। কে জানে, যদি কেহ দেশলাইয়ের আলো দেখিতে পায়। ধূমপানের সরঞ্জাম ক্ষেত্র আবার পকেটে রাখিয়া দিল। হাতে ঘড়ি ছিল, চোখের খুব কাছে আনিয়া দেখিল, এগারোটা বাজিতে পাঁচ মিনিট। সময় হইয়া আসিতেছে।

এমন সময় নরেন চৌধুরীর ঘরে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়া গেল। ক্ষেত্র নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া একদৃষ্টে সদর-দরজা পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এইবার!

সদর-দরজা খুলিয়া নরেন চৌধুরী বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্র কাঠগোলার দেয়ালে একেবারে বিজ্ঞাপনের পোস্টারের মত সাঁটিয়া রেল। নরেন ফুটপাতে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল। ক্ষেত্র সহস্র চক্ষু হইয়া দেখিল, তাহার হাতে আঙটি আছে কিনা! না, নাই। আবার সে ধীরে ধীরে চাপা নিশ্বাস ফেলিল। নরেন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

এইবার ক্ষেত্র অন্ধকারে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। নরেনের পরিপাটি সাজ-সজ্জা সে এক নজরে দেখিয়া লইয়াছিল। এই সব নিশাচর প্রজাপতিদের প্রতি তাহার মনে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ ঘৃণার ভাব ছিল। সে মনে মনে বলিল, 'অভিসারে বেরুলেন!' কোনো একজন স্ত্রীলোক ইহাকে দোহন করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া শেষে ছোবড়ার মত দূরে ফেলিয়া দিবে, ইহা ভাবিয়া সে মনে বড় তৃপ্তি পাইল। করুক, করুক, সোনার চাঁদকে একেবারে ন্যাঙটা করিয়া ছাড়িয়া দিক।

কিন্তু এদিকে দরোয়ানটা এখনো বাহির হইতেছে না কেন? খোট্টাটার আবার কি হইল? ভাঙ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই তো?

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্র ঘড়ি দেখিল, সওয়া এগারোটা। তাই তো। কি হইল? দরোয়ান আগে বাহির হইয়া যায় নাই তো? না, তাহা হইলে নরেন দরজায় তালা লাগাইয়া যাইত। তবে—দরোয়ানটা কি সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল? তাহাকে সরাইবার জন্য ক্ষেত্র এত মেহনত করিয়াছে—সারকুলার রোডে ময়দা-কলের বস্তিতে তাড়ির আড্ডার সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, আর শেষে—এই সময় খোট্টা দরোয়ান বাহির হইল। দরজায় তালা লাগাইয়া পাগড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে নাগরা ঠক-ঠক করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার সময় উপস্থিত। দরোয়ানের নাগরার শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর, ক্ষেত্র কাঠগোলার ছায়ান্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথ নির্জন—বাধা বিপত্তির কোনো ভয় নাই। কিন্তু দুই পা অগ্রসর হইয়া ক্ষেত্র আবার ফিরিয়া আসিল। কাজ নাই, আর একটু যাক। যদি দরোয়ানটা কিছু ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়া থাকে, হয়তো আবার ফিরিয়া আসিবে।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল, দরোয়ান ফিরিল না। তখন ক্ষেত্র অন্ধকার হইতে বাহির হইল। বেশ স্বাভাবিক দ্রুত পদে, যেন নিজের বাড়িতে যাইতেছে এমনভাবে, দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া বেশ শব্দ করিয়া দরজা খুলিল। তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

ক্ষেত্রের পকেটে একটা বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, সেটা এবার সে জ্বালিল—একবার চারিদিকে ফিরাইয়া দেখিয়া লইল। তারপর বাঁদিকের দরজার উপর ফেলিল।

দরজায় তালা লাগানো। ক্ষেত্র একটা চাবি বাছিয়া লইয়া তালায় পরাইল, খুট করিয়া শব্দ হইল। তালা খুলিয়া গেল।

টর্চের আলো নিবাইয়া ক্ষেত্র ঘরে ঢুকিল। ঘরে কোথায় কি আছে সবই তাহার জানা ছিল। সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া গিয়া রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ঘরের দিকে ফিরিয়া টর্চ জ্বালিল।

টর্চের আলো একটা টেবিলের উপর গিয়া পড়িল। টেবিলের উপর বিশেষ কিছুই নাই—কাগজ চাপা, ব্লটিং প্যাড, দোয়াত, কলম। টেবিলের আশেপাশে দুই-তিনটা চেয়ার অস্পষ্টভাবে দেখা গেল।

ক্ষেত্র আর কালক্ষয় না করিয়া কাজে লাগিয়া গেল, টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া সে দেরাজ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। ডানধারের দেরাজগুলো খোলা, কিন্তু বাঁ ধারের দেরাজের সম্মুখে একটা কবাট আছে—তাহার গায়ে চাবির ঘর। ক্ষেত্র সেই কবাটের গায়ে চাবি প্রবেশ করাইয়া সন্তর্পণে ঘুরাইল। কবাট খুলিয়া গেল।

চারটি দেরাজ, নরেন উপরের দেরাজে আঙটি রাখে—ক্ষেত্র দেরাজের ভিতর আলো না ফেলিয়াই তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিল। কাগজপত্র ও পানের ডিবা তাহার হাতে ঠেকিল, কিন্তু আঙটির পরিচিত ক্ষুদ্র কেসটি হাতে ঠেকিল না। তখন সে দেরাজের ভিতর আলো ফেলিয়া দেখিল, আংটি নাই।

আংটি নাই? কোথায় গেল? প্রথমটা ক্ষেত্র কিছু বুঝিতেই পারিল না। সে এতই স্থিরনিশ্চয় ছিল যে, এই অভাবনীয় ব্যাপারে যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর তাহার বুকের ভিতরটা দুর-দুর করিয়া উঠিল।

তবে কি—?

সে একবার ঘরের চারিপাশে চাহিল, টর্চটা ঘরের কোণে কোণে ফেলিয়া দেখিল, না, কেহ নাই। সে ভয় করিয়াছিল, নরেন তাহাকে ধরিবার ফাঁদ পাতিয়াছে—তাহা নয়।

হয়তো আঙটিটা দ্বিতীয় দেরাজে আছে। মেঝেয় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ক্ষেত্র দ্বিতীয় দেরাজ খুলিল। একেবারে শূন্য—তাহাতে একটা আলপিন পর্যন্ত নাই।

তৃতীয় দেরাজ। সেটাও শূন্য। চতুর্থ দেরাজও তাই। ক্ষেত্রের কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল। নাই—কিছু নাই। আঙটি তো দূরের কথা, একটা পয়সা পর্যন্ত নাই।

আলো নিবাইয়া অন্ধকার ঘরে ক্ষেত্র কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তাহার বুক ধক-ধক করিতে লাগিল। নরেন নিশ্চয় সন্দেহ করিয়াছিল, তাই তাহাকে ঠকাইবার জন্য—

কিন্তু না, নিশ্চয় আছে। হয়তো তাড়াতাড়িতে নরেন ডানদিকের খোলা দেরাজেই

আংটি রাখিয়া গিয়াছে। ক্ষেত্র আবার আলো জ্বালিয়া ডানদিকের দেরাজগুলো খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোনটাতেই কিছু পাইল না। কতকগুলো মদের বিজ্ঞাপন, স্ত্রীলোকের ছবি, গোটা কয়েক অশ্লীল বিলাতী উপন্যাস—

এতক্ষণে ভূতের মত একটা ভয় ক্ষেত্রকে চাপিয়া ধরিল, তাহার মনে হইল, এই শূন্য বাড়িখানা তাহার চুরির ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছে। এই ঘরটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আর পলাইতে পারিবে না।

এই সময় দূরের কোনো গির্জার ঢং-ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ঘড়ির আওয়াজ ক্ষেত্রের কানে বোমার আওয়াজের মত লাগিল। বারোটা! এতক্ষণ সে এখানে আছে? যদি কেহ আসিয়া পড়ে? নরেনই যদি ফিরিয়া আসে?

ক্ষেত্র আর দাঁড়াইল না। দেরাজগুলো খোলাই পড়িয়া রহিল, সে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তারপর বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। বাড়ির বাহির হইয়া ভয়ার্ত চোখে একবার চারদিকে তাকাইয়া। কাহাকেও দেখিতে পাইল না, পাড়া সুষুপ্ত। তখন স্খলিত হস্তে সদরের তালা বন্ধ করিয়া হন-হন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার বাসা যে দিকে, সে ঠিক তাহার উল্টা মুখে চলিয়াছে তাহা সে জানিতে পারিল না।

* * *

একটার সময় ক্ষেত্র নিজের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে তাহার মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে, ভয় আর নাই। এমন কি, অহেতুক ভয়ে দেরাজগুলো খোলা রাখিয়া পলাইয়া আসার জন্য সে একটু লজ্জা বোধ করিতেছে। কিন্তু বিস্ময় তাহার কিছুতেই ঘুচিতেছে না। নরেন কি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছিল? তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব—নরেন আংটি পরিয়া বাহির হয় নাই ইহা সে স্বচক্ষে ভাল করিয়া দেখিয়াছে, তবে আঙটিটা গেল কোথায়?

ক্ষেত্র নিজের সিঁড়ির দরজার কড়া নাড়িল। তাহার উপরে উঠিবার সিঁড়ি স্বতন্ত্র, তলার বাসিন্দার সহিত কোনো সংযোগ নাই। তাই প্রতিবেশীকে না জাগাইয়া রাত্রে যখন ইচ্ছা সে বাড়ি ফিরিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে চপলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ক্ষেত্র কোনো কথা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। চপলা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন ঘরে আসিল, তারপর বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ক্ষেত্র জামা খুলিতে খুলিতে ভাবিতেছিল, চপলা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে! কিন্তু চপলা যখন কোনও প্রশ্ন করিল না, তখন সমস্ত কথা বলিবার জন্য তাহার নিজেরই মন উশখুশ করিতে লাগিল। মুখে-চোখে জল দিয়া আলোটা কমাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, 'আজ ভারি আশ্চর্য ব্যাপার হল। ঘুমুলে নাকি?' ব্যর্থতার কুণ্ঠায় তাহার স্বর নিস্তেজ।

চপলা উত্তর দিল না, কেবল গলার একটা শব্দ করিল মাত্র। ক্ষেত্র বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, চপলা চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, তাহার ডান হাতটা চোখের উপর রাখা। অল্প আলোয় চপলার মুখ ভাল দেখা গেল না।

'আঙটিটা পেলুম না, বুঝলে?'

চপলার নিকট হইতে কোনো সাড়া আসিল না। সে ঘুমাইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য ক্ষেত্র তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল—'জেগে আছ, না, ঘুমুলে?'

চপলার মুখের উপর হাতটা একটু নড়িল। সংগে সংগে তাহার আঙুলের উপর আলো ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

ক্ষেত্র সূচীবিদ্ধের মত বিছানায় উঠিয়া বসিল। চপলার হাতখানা টানিয়া নিজের চোখের সম্মুখে আনিয়া বিকৃত চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, 'আংটি! এ আংটি তুমি কোথায় পেলে?—তুমি কোথায় পেলে—'
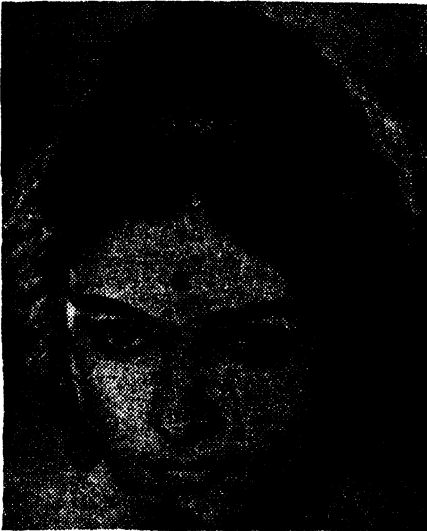
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্রীশ বর্ধন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—এই নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চার শ্রেণীর গল্প মনে ভিড় করে আসে : রোমাণ্টিক, ঐতিহাসিক, গোয়েন্দা ও অলৌকিক। বলা বাহুল্য, বাংলাসাহিত্যে এই চার শ্রেণীর গল্পের লেখক বলতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একক নন। আরও অনেকে আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরদিন্দুবাবুকে আলোচনার মধ্যে কেন টেনে আনা হল, এ নিবন্ধে তাই নিয়ে ভাবা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্রর যে ধ্বনিময় ভাষা এবং ডিটেল-এর কাজ (আবহ ও চরিত্রচিত্রণের সূক্ষ্মতা), এবং পরশুরামের বাকসংযম ও পরিমিত কৌতুকবোধ যা কিনা তীক্ষ্ণ, প্রচ্ছন্ন এবং গভীর অর্থবহ—একই সঙ্গে মিশেছে শরদিন্দুর ভাষায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে কারণে ইতিহাসে স্মরণীয়, পরশুরাম কীর্তিমান—শরদিন্দু সেই একই ধারা-বৈচিত্র্য নিজ লেখনীতে অন্বিত করে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যেন বিপরীত মেরুর সমন্বয় ঘটেছে তাঁর গল্পে। তাই তাঁর সৃষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্কিমশৈলীকে। আবার, পরশুরামের কৌতুকবোধ যেমন ফল্গুধারার মতই মূল-গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গভীরে প্রবেশ করে, শরদিন্দুর কৌতুক-অশনিও অনেক ক্ষেত্রে বিবেককে জাগ্রত করে। 'মন্দলোক' গল্পে ঋতুর মা'র প্রস্তাব শুনে ডাক্তারবাবুর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল। কারণ, পতিতা-কন্যা ঋতুর শুভ বলিদান কার্যটা ডাক্তারবাবুর মত সৎপাত্রের দ্বারা ঋতুর মা সম্পন্ন করতে চেয়েছিল। বিড়ম্বিত ডাক্তারের অবস্থা ভেবে হাসি পায় ঠিকই। কিন্তু মন্দলোকের কৃতজ্ঞতা বোধ, তার দীন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান পূজারিণীর মত উপকারীর পদপ্রান্তে রেখে যাওয়ার কাহিনী অনেকেরই বিবেককে কশাঘাত করে নাকি?

শরদিন্দুবাবু এ যুগের লেখক নন। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালে। আজ তাঁর বয়স ৭০ বছর। চোদ্দ বছর বয়স থেকে তাঁর কবিতা ও গল্প লেখার অভ্যাস। তখন থেকেই বিষয় আর প্রকাশভঙ্গী—এই দুই ব্যাপারে আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটানোর কৌশল নিয়ে তিনি সাধনা করেছেন। ফলে, ৭০ বছর বয়সেও এই চার জাতের গল্পে তিনি এখনো তুলনারহিত। দীর্ঘ ৫৬ বছরেও তাঁর মুন্সিয়ানা প্রায় অব্যাহত।

বিষয়ের সঙ্গে প্রকরণের গরমিল ঘটলে পরিণামটা হয় ছানাকেটেযাওয়া দুধের মত। গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একান্ত অবহেলিত এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

একথা ঠিক যে প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব রচনাশৈলী আছে। তাঁর লেখার রচনারীতি একবার দানা বেঁধে গেলে আর সহজে পালটায় না। কিন্তু তার মধ্যেই সামান্য মোচড় দিয়ে অনেক বৈচিত্র্য আনা যায়, যে ভঙ্গি দিয়ে গোয়েন্দা গল্প জমানো যায়, সেই ভঙ্গি দিয়েই যদি ঐতিহাসিক গল্প জমাতে বসি, তাহলে সার্থকতার আশা না রাখাই ভাল। ভাষারও অদলবদল ঘটে। অলৌকিক গল্পের ভাব ও ভাষা দিয়ে রোমাণ্টিক গল্পের আবহ সৃষ্টি করতে যাওয়াটা নিশ্চয় ঠিক হবে না।

এসব কথা যে অজানা, তা নয়। কিন্তু শরদিন্দুবাবুর সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই গতানুগতিক সূত্রেরই পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে রচনারীতিকে অপরিবর্তিত রাখতে গিয়েই না যত বিপর্যয়। এই কারণেই সামাজিক গল্পের লেখক গোয়েন্দা গল্পে এসে কূল পান না। সে গল্পও উতরোয় না। অথবা রহস্য-গল্পের লেখক সহসা ঐতিহাসিক গল্পে হাত দিয়ে বানর গড়ে বসেন। এই রচনা-রীতি বিভ্রাটের জন্যই অবহেলিত হয়ে রইল অলৌকিক গল্প। যার ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি একেবারেই স্বতন্ত্র।

শরদিন্দুবাবুর সাফল্য এইখানেই। তিনি চুয়াচন্দন-এর মত মিষ্টি গল্প লিখেছেন পুরোনো বাংলার পটভূমিকায়। এখন বাংলার ঘোর দুর্দিন। সহজিয়া সাধনার নামে অনাচার চলছে। সেই পট-ভূমিকায় নদের নিমাইয়ের সহযোগিতায় তিনি চুয়া নামক রূপসীর রাক্ষস-বিবাহ দিলেন বেনের ছেলে চন্দনের সঙ্গে। কৌতুকময় ভাষা, ভয়াল-রস, এবং বীররস সহযোগে সে যুগের একটা নিখুঁত চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। ফলে গল্পটিও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু 'চুয়াচন্দন'এর প্রকাশভঙ্গি নিয়ে তিনি "বহুরূপী" লিখতে বসেননি। এ গল্প ভূতের গল্প। তাই ভাব ও ভাষাও সম্পূর্ণ পৃথক। প্রেত-কাহিনী বলেছেন সাবলীল ভঙ্গিমায়। কিন্তু রোমাঞ্চ পরি-বেশন করেছেন ক্লাইমাক্সে পৌঁছে। গোড়া থেকেই গা ছমছম করেনি—করেছে গল্পের শেষে—যখন দেখা গেল ঘরের বরোদা বাতাসে মিলিয়ে গেছে—মানুষ-বরোদা দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়।

গল্পের বিষয়ানুসারে ভাষাপ্রয়োগের মন্ত্রগুপ্তি করায়ত্ত বলেই শরদিন্দু-সৃষ্ট ব্যোমকেশ-কাহিনী অপাংক্তেয় গোয়েন্দা-সাহিত্যকে জাতে তুলতে পেরেছে। গোয়েন্দা-কাহিনী ধ্বনিময় শব্দভারাক্রান্ত হলে রহস্য-রস গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণাঢ্য ভাষার প্রয়োগ ঐতিহাসিক গল্পে যে সার্থকতা আনতে পারে, গোয়েন্দা-গল্পে তা ততখানি ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ, গোয়েন্দা-কাহিনীর মূল উপজীব্য রহস্য, উৎকণ্ঠা, কৌতূহল। মুখ্য এই তিনটি রস সৃষ্টি করার জন্যে বাক্‌সংযম প্রয়োজন, শরদিন্দুবাবুর তা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে লেখনীর দু'চারটি আঁচড়ে এক-একটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা। চরিত্র-চিত্রণ ছাড়াও পরিবেশ সৃষ্টি করা গোয়েন্দা-গল্প লেখকের একটা অবশ্য-কর্তব্য। তাছাড়া ঘটনার সংস্থাপনের কুশলতা, বর্ণনার নৈপুণ্য ইত্যাদি গুণগুলি থাকার ফলে পাঠকের প্রত্যাশা বিফলে যায়নি।

রহস্য-কাহিনী এবং গোয়েন্দা-কাহিনীর মধ্যে ভেদ আছে। রহস্য-কাহিনীর মুখ্যরস রহস্যময় আবহ। যা মানুষের জ্ঞান

বা যুক্তির অতীত তাই রহস্য। সূত্র বা মস্তিষ্কের খেলা সে ক্ষেত্রে গৌণ। এ জাতীয় গল্প রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। রহস্য সৃষ্টির মুন্সিয়ানা থাকলেই হল। সেই সঙ্গে থাকা দরকার নিষ্ঠা, বাস্তববোধ ও চরিত্র-চিত্রণ দক্ষতা। একটি ভালো প্রেমের গল্প বা করুণ রসের গল্পরচনার ক্ষেত্রে এগুলি যেমন দরকার, ভালো রহস্য-গল্প রচনার ক্ষেত্রেও এগুলি অপরিহার্য।

কিন্তু গোয়েন্দা-গল্প, ইংরাজীতে যাকে বলে ডিটেকটিভ স্টোরী, সে ক্ষেত্রে আরও বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। কারণ, গোয়েন্দা-গল্পের সঙ্গে সিঁড়িভাঙা অংকের সাদৃশ্য আছে। শার্লক হোমসের বিখ্যাত অবরোহ রীতি মেনে গোয়েন্দা-গল্পের শুরু, বিস্তার ও পরিণতি। এই তিন খণ্ডে গোয়েন্দা-গল্পকে সাজাতে হয় এবং তার সমাধানটি আগেই ভেবে নিতে হয়। অর্থাৎ সমগ্র গল্পের সরলীকরণ ছকটি বিপরীত দিক থেকে পূর্বেই কল্পনায় ধারণ করতে হয়। সেই সঙ্গে রহস্য-গল্পের রহস্যবোধ, বাস্তব-গল্পের নিষ্ঠা, বাস্তববোধ, চরিত্র-চিত্রণ ও পরিবেশ-অংকনক্ষমতাও থাকা দরকার। এ রচনা তাই দুরূহ।

শরদিন্দুবাবুর ব্যোমকেশ খাঁটি গোয়েন্দা। শার্লক হোমসের মতই মস্তিষ্ক-চালনায় অভ্যস্ত। বিবিধ সূত্র নিয়ে রহস্য-ধাঁধার মধ্যে তাঁর আনাগোনা। তাই শরদিন্দুর গোয়েন্দা-গল্প বুদ্ধি-উজ্জ্বল। যা বুদ্ধি-উজ্জ্বল, মানব-মনে তার আবেদন চিরন্তন। যেমন, 'মাকড়শার রস' ও 'অগ্নিবাণ' গল্প দুটি। দুটি গল্পই একাধিকবার পড়েও পুরোনো হয় না। একেই বলে লেখনী-প্রসাদ। অথচ, গোয়েন্দা-গল্প সম্পর্কে একটা কথা প্রায় শোনা যায়, এ ধরনের কাহিনী নাকি পাঠকরা দ্বিতীয়-বার পড়তে চান না। কারণ, সমাধান প্রথম পাঠেই জানা হয়ে যায়। কৌতূহলও তিরোহিত হয়। কিন্তু কৌতূহল, রহস্য, উৎকণ্ঠা ছাড়াও যে গল্পে সাহিত্যের মণি-মাণিক্য আছে, তার মূল্যায়ণ রুচির মাপ-কাঠিতেই হয়। তাই শার্লক হোমস যেমন চিরন্তন, দুপঁ যেমন চিরন্তন, ব্যোমকেশও তেমনি চিরন্তন। প্রকৃত সাহিত্য কালজয়ী। শরদিন্দু-সাহিত্যও কালজয়ী।

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ চিন্তাশীল পুরুষ। তাই তাঁর সমাধানের মধ্যে থাকে ধীশক্তির ছাপ, সংলাপের মধ্যে, তদন্ত পরি-চালনা ও জেরার মধ্যে যুক্তির ঝলক। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। ফরাসী দেশে যে কারণে জীবনীমূলক সমালোচনার এত প্রচলন, যেখানে বোদলেয়র সম্পর্কে সার্ত্রের রচনা সমাদৃত, ঠিক সেই সব কথা স্মরণ রেখেই আমি এখানে শরদিন্দুবাবুর গোয়েন্দা-গল্প প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই।

শরদিন্দুবাবু আইন পড়তে শুরু করে-ছিলেন ১৯২১ সালে কলকাতায়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ফলে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই মুঙ্গেরে ফিরে যান। ১৯২৫-২৬ সালে তিনি পাটনা থেকে আইন পাস করে মুঙ্গেরে ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁর পিতাও আইনবিদ ছিলেন। পিতার জুনিয়র রূপে তিন বছর কাজ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি ওকালতি ছেড়ে পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বংশপরম্পরায় যে জীবিকা চলে এসেছে, তা ত্যাগ করলেও যুক্তির ধার গোয়েন্দা-সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অমর চরিত্র শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়াল চিকিৎসক ছিলেন। রোগীকে জেরা করে রোগের উৎস বার করার কৌশলটি তিনি তাঁর গুরুর কাছে শিখেছিলেন এবং সাহিত্যেও সেই জেরার আভাস দিয়েছিলেন।

আধুনিককালে পেরি ম্যাসন গোয়েন্দা-চরিত্র ও এ-এ-ফেয়ার সিরিজের স্রষ্টা স্ট্যানলী গার্ডনারও আইনবিদ ছিলেন।

যুক্তি ধারালো না হলে এবং কেস সাজানোর উকিলি-ক্ষমতা না থাকলে হয়ত শরদিন্দুবাবুর ব্যোমকেশ পাঠকদের তৃপ্তি-দানে এতটা সক্ষম হত না। এ শিল্প কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনী তথ্য জানার মূল্য যে কতখানি, তা বুঝতে পারি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গোয়েন্দা-গল্প লেখকের দায়িত্ব অনেক। একজন কথা-সাহিত্যিকের যে দায়িত্ব, তা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। এ সব দায়িত্ব অন্যান্য ছোটগল্প-লেখককে না পালন করলেও চলে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, গুরুদায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের বরাতে যে কৌলীন্য লাভ ঘটে, গোয়েন্দা-কাহিনী-কারের ভাগ্যে তা জোটে না। এ দুর্ভাগ্য সব দেশের লেখকেরই।
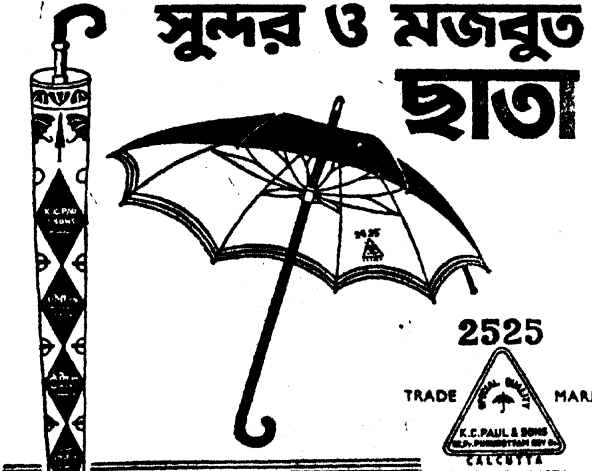
কিন্তু এ হেন উন্নাসিক পরিবেশের মধ্যে শরদিন্দুবাবু একনিষ্ঠভাবে গোয়েন্দা-গল্প লিখেছেন এবং ভাষা ও ভাব—এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। অন্যান্য শক্তিমান কথাসাহিত্যিকরা এই বিশেষ শাখাটিকে অবহেলা করেছেন—সে অবহেলা উন্নাসিকতার জন্যে যত না হোক, অক্ষমতার জন্যে তো বটেই। শরদিন্দুবাবু কিন্তু এই বৃদ্ধবয়েসে এখনো কথা-সাহিত্যের এই দুর্বল ও ক্ষীণ শাখাটিকে পুরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

বাংলা সাহিত্যে রহস্যকাহিনীর আদি স্রষ্টাদের লেখনীতে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প লেখা হয়েছে। সেসব গল্পের ভাষা ছিল সহজ, অথচ রসাশ্রিত। ঠাসবুনন প্লট, সরল গতি, কক্ষচ্যুত মোটেই নয়। তাই কৌতূহ-লোদ্দীপক। 'দারোগার দপ্তর'এর স্রষ্টা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এই গুণাবলীর জন্যই বাঙালী পাঠকের চিত্তবিনোদন করতে পেরেছিলেন। পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নামও বিশেষ-ভাবে উল্লেখ।

রহস্যরচনা জনপ্রিয়। যা জনপ্রিয়, তার গুণাবলী ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। আধুনিক ডিটেকটিভ গল্প সেই কারণেই অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেও উন্নাসিক সমালোচকবৃন্দের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে পরিপূর্ণ মর্যাদা পায়নি।

অথচ মানব-মনের এই আদিমতম অনু-ভূতির প্রাঞ্জল প্রকাশকে তাচ্ছিল্য করা

উচিত নয় বলেই রবীন্দ্রনাথও 'ডিটেকটিভ' গল্পটি লিখেছিলেন। কিন্তু কেউই অক্লান্ত পরিশ্রমে রহস্য-সাহিত্যের এই ধারাটিকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন নি। শরদিন্দুবাবু এই প্রথার ব্যতিক্রম। তাই নানা বিচিত্র ধারার মধ্যে দিয়ে এ জাতীয় কাহিনী আজ বাংলা সাহিত্যে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁর গল্পে পাঁচকড়ি দে'র সরলগতি, কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক প্লটের আভাস পাই। প্রিয়নাথবাবুর তদন্তকৌশল ও ঘটনা-[illegible] দেখি। সবার ওপরে দেখি জীবন্ত চরিত্রের সমাবেশ—যা এতাবৎকাল দেখা যায় নি—যা তাঁর নিজস্ব মুন্সিয়ানা—বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষা, ভাব ও প্রকরণের আশ্চর্য সমন্বয়। বাংলা সাহিত্য চিরদিন শরদিন্দুর কাছে ঋণী থাকবে এই কারণে।

কোনো এক সমালোচক একদা বিদ্রূপ করেছিলেন, ডিটেকটিভ বই লেখা হয় বয়স্ক শিশুদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। তা সত্ত্বেও আঠারো শতকের ইংলণ্ডে প্রকাশিত নভেল অব টেরর' এবং ১৮৪১ সালে পো'এর গোয়েন্দা-গল্প পাঠকসমাজে প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। অনেক সমালোচকের উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণ আছে: শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে এই রচনার উৎকর্ষ যাই হোক না কেন, 'টেরর' বা ভীতি-কাহিনী বহুজনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। এর সাদৃশ্য অনেক উচ্চস্তরের শিল্পকর্মের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং স্কট, ব্রান্টি-ভগিনীদ্বয়
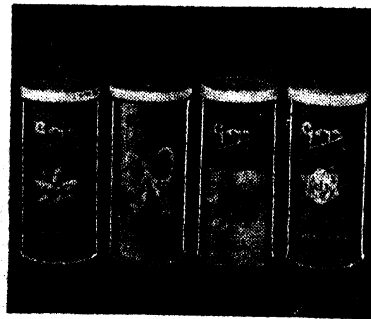
ও শেলীর কবিতার পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করে।' (শঙ্কা-শিহর)।

বাংলা সাহিত্যেও এই প্রভাব দেখা যাচ্ছে ইদানীং। বহু কথাসাহিত্যিকের শিল্প-কর্মে হত্যার রহস্য, অপরাধরহস্য ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রভাব থেকে বিদেশী সাহিত্যও রেহাই পায়নি। যেমন কামুর 'আউটসাইডার' ও সেই বিখ্যাত নাটক 'ক্লপপারপাজ'।

এই প্রসঙ্গে নিবন্ধকারের ধারণা, ভবিষ্যতের সাহিত্যজগতে এই যে রসগত বিষয়-বিভাগ, যেমন প্রেমের গল্প, রহস্য-গল্প—এই শিল্পগত বা রসগত বিভাগ হয়তো এক সময়ে মুছে যাবে। তারই প্রাগ-লক্ষণ হয়ত আভাসিত হচ্ছে সাম্প্রতিক রচনাবলীতে। যেমন অপরাধবোধ, রহস্যের আবছা আভাস বহু উপন্যাসের মৌল ভিত্তি, তা কি এই অনুমানেই আমাদের পৌঁছে দেয় না যে ভবিষ্যতের কথাসাহিত্য হবে একটি অবিভাজ্য রসপরিকল্পনা?

আরও একটি কথা। পো এবং শেলী দুজনেই মূলত রোমান্টিক কবি। শরদিন্দু-বাবুর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একটি কাব্য-সংকলন (যৌবনস্মৃতি)। প্রেমেন্দ্র মিত্রও কবি। এঁদের সকলেরই গোয়েন্দাসাহিত্য-প্রীতি লক্ষণীয় নয় কি?

শরদিন্দু-রচিত অলৌকিক গল্পসমূহের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে জন্মান্তর রহস্যমূলক গল্প। অতিপ্রাকৃত দুনিয়া সম্পর্কে কৌতূহল বিশ্বব্যাপী। এ জাতীয় গল্প অনেক লিপিবদ্ধ হয়েছে। জন্মান্তর রহস্যমূলক গল্প থিয়জফি বা পরলোক-তত্ত্বের কোঠায় পড়ে। এ গল্পের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। ছায়াভাস, অবচেতন অনুভূতি, বিচিত্র স্বপ্নজাল—এই নিয়েই এই কাল্পনিক সাহিত্য। বিশুদ্ধ ফ্যানটাসি। কাজটি অত্যন্ত কঠিন। একটি অতীত জগতের ইল্যুশন সৃষ্টি করে তার মধ্যে এ যুগে গ্রাহ্য স্বাভাবিক সংলাপ প্রতিষ্ঠা করা, অথচ স্বপ্নবৎ পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রাখা বড়দরের শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। শরদিন্দুবাবু এ শিল্পে যে কতবড় শিল্পী 'রক্তসন্ধ্যা' গল্পে সে প্রমাণ আছে। কসাই গোলাম কাদের, দুর্গাচরণ ব্যানার্জী রোডে সহসা ভীষণ চীৎকার করে লাফিয়ে পড়ল এক অপরিচিত ফিরিঙ্গীর ওপর। উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করতে করতে বলতে লাগল—'ভাস্কো-ডা-গামা, এই আমার স্ত্রীর জন্য—এই আমার কন্যার জন্য—এই আমার পিতার জন্য।'

সঙ্গতি আর অসঙ্গতি, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ, অভিজ্ঞতা ও কল্পনা, ইতিহাস আর বাস্তব—এই দুই বিপরীত জগৎকে যিনি এক উজ্জ্বল অথচ অস্পষ্ট ধোঁয়ার সেতু দিয়ে বাঁধতে পারেন তিনিই সার্থক স্রষ্টা। এ চিন্তা অন্যভুবন সংকলনের ভূমিকাতেও প্রকাশ পেয়েছে। শরদিন্দুবাবু এই পলকা সেতু নিপুণ হাতে রচনা করেছেন। প্রকাশ-ভঙ্গি ও ভাষার কুশলতার জন্যে পাঠক মুগ্ধ, আকৃষ্ট হয়েছে। তাই একাধারে ঐতিহাসিক গল্প জন্মান্তর রহস্যমূলক-গল্প রচনায় প্রাজ্ঞ শরদিন্দু আজও অপরাজেয়। তাঁর বর্ণাঢ্য ও ধ্বনিময় ভাষা সার্থক হয়ে উঠেছে এ জাতীয় গল্পের পরিবেশ রচনায়।

দেহের নশ্বরত্ব যেমন অবধারিত, আত্মার অস্তিত্ব তথা অমরত্ব তেমনি প্রতি-পাদ্য। শরদিন্দুবাবু কিন্তু এ তত্ত্বে বিশ্বাসী বলেই মনে হয়। জীবনান্তে অজানা জগৎ নিয়ে যে বিভীষিকা, তাই নিয়েই অতি-প্রাকৃত অতীন্দ্রিয় রহস্যরস পরিবেশন করেছেন তিনি। থিয়সফিস্টদের মত মৃত্যু জীবনের পূর্ণচ্ছেদ কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। মানুষের মজ্জায় ও রক্তের মধ্যে রয়েছে কায়াহীন ছায়ার রহস্যময় আকর্ষণ। শরদিন্দুবাবু সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করেন নি। ডিকেন্স, পো, মেয়ার, ব্ল্যাকউড; জেমস, ডানসেনি, ডিনেসেনের মত অস্পষ্ট অদৃশ্য শক্তি, অজানা অবয়বহীন আতঙ্ক নিয়ে এমন ভৌতিক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন যা বাস্তবিকই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। যে অসীম যত্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহার', 'নিশীথে', 'জীবিত ও মৃত' বা 'মাস্টারমশায়' গল্পে 'অ্যাটমসফিয়ার' রচনা করেছেন, তার আভাস শরদিন্দুর দুঃস্বপ্ন-সৃষ্টির মধ্যেও দেখা যায়।

আজকের যুগ বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ। অতএব রহস্য-গল্পের কাঠামোয় অলৌকিকতা পাঠকের তৃপ্তিদায়ক নাও হতে পারে, কিন্তু মানবমনের সেই চিরকালের শিশু আজও কৌতূহলী চোখ নিয়ে চেয়ে আছে আঁধারের দিকে। এইখানেই আধুনিক সায়ান্স-ফিকশানের জন্ম। বিজ্ঞানসুবাসিত কল্পলোকের কাহিনী। শরদিন্দুবাবুর 'শূন্য শুধু শূন্য নয়' গল্পটি সেই জাতের। ওয়েলস বিজ্ঞানকে ছুঁয়ে কাহিনীকে নিয়ে গেছেন ফ্যানটাসি জগতে। জুল ভর্ন কিন্তু বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটির দিকেই বেশি ঝুঁকেছেন। এ যুগেও রেব্রাডবুরি ওয়েলস ধারা এনেছেন তাঁর সায়ান্স-ফিকশান গল্পে। আর ভর্ন ধারা অব্যাহত রেখেছেন আর্থার সি ক্লার্ক তাঁর গল্পসমূহে। বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিজ্ঞান-নিষ্ঠ সায়ান্স ফিকশান লিখেছেন। আবার পাঠককে ফ্যানটাসির জগতেও নিয়ে গেছেন। সত্যজিৎ রায়ও একনিষ্ঠভাবে এই সাহিত্যের দিকে ঝুঁকেছেন। শরদিন্দুবাবু কিন্তু ওয়েলস-ব্র্যাডবুরি ধারা এনেছেন 'শূন্য শুধু শূন্য নয়' গল্পে। গল্পটি অসাধারণ। 'বাজ পড়িয়া মানুষ অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহা কি সম্ভব? গৌরমোহন বিজ্ঞান জানে না, হয়তো বিজ্ঞানী ইহার ব্যাখ্যা জানেন। যদি না জানেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? বিজ্ঞানীরা কি সকল বিশ্ব-রহস্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন? এই যে অদর্শনা যুবতী তাহার হাতে হাত রাখিয়া বসিয়া আছে, সে কি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে? গৌরমোহন একটি আকাঙ্ক্ষা-ভরা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে ছায়া।'

বাংলা সাহিত্যে নবীনতম সায়ান্স-ফিকশান ধারাটিকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করবার ক্ষমতা শরদিন্দুবাবু যে রাখেন, তাঁর সম্ভাবনা উক্ত গল্পটিতে আছে। কেয়াতলার বাড়িতে শরদিন্দুবাবু প্রবন্ধকারকে কথা প্রসঙ্গে বলেওছিলেন, সায়ান্স-ফিকশান গল্প লেখার ইচ্ছে তাঁর আছে।
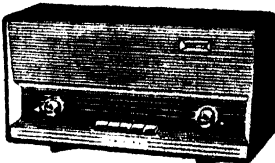
শালা হারামিকা বাচ্চা...

একটু চটলেই এই তার বুলি, কখনও স্বগত—কখনও প্রকাশ্যত। ছোট নিষ্ঠুর চোখ দুটো, মুখময় ছোট-বড় কতকগুলো আঁচিল, একটা ছোট আরও আছে ডান দিকের চোয়ালটার নিচে। ভ্রু নেই বললেই হয়। দাড়ি আছে। কটা, কোঁকড়ানো, অবিন্যস্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা ওলের উপর কটা চুল গজিয়েছে কতকগুলো। তাকে কেউ বোঝে না, সে-ও কাউকে বুঝতে চায় না। তাই উদীয়মান কমিউনিস্ট লেখক কমরেড দুলাল দত্ত যখন গল্প লেখার রসদ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তার বাড়ি গিয়ে জিন্না-গান্ধী সম্পর্কিত আলোচনা করে মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং পাকিস্তান যে কতদূর ন্যায়সঙ্গত তা বিচার করে তার প্রকৃত মনোভাব জানবার চেষ্টা করছিল তখন সে তার হলদে শ্বা-দন্ত বার করে হাঁ বাবু, হাঁ বাবু বলে সায় দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু মনে মনে সে আওড়াচ্ছিল — 'শালা হারামিকা বাচ্চা'—

সে জানে কপালে যে লেবেল সেঁটেই আসুক না কেন ফরসা জামা-কাপড়-পরা বাবুমাত্রেই শালা হারামিকা বাচ্চা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা হারামিকা বাচ্চাও সে অনেক দেখেছে কিন্তু তারা এমন স্বার্থপর ছদ্মবেশী নয়। এই 'বাবু'রাই 'আসলি হারামজাদ'—

কোট-প্যান্ট-পরা আচকান-চাপকান চড়ানো, খদ্দরধারী মোল্লা-মৌলভী, ডাক্তার-উকিল, হাকিম-ডেপুটি অনেক দেখেছে রহিম কশাই। তার চক্ষে সব শালাই হারামিকা বাচ্চা। সব শালা...

বিশেষ করে ওই দুলালবাবুর বাপটা। শালা সুদখোর। চতুর্থ পক্ষে বিয়ে করেছে হারামজাদা। তাগদের জন্য কচি পাঁঠার ঝোল খায় রোজ। ছেলেও হয়েছে একটা। নধরকান্তি শিশুটা পাশের গলিতে এসে খেলা করে যখন রহিম কশাই চেয়ে চেয়ে দেখে মাঝে মাঝে। জোঁকের বাচ্চা! বড় হয়ে রক্ত চুষবে। দুলালবাবু আবার দরদ দেখাতে এসেছেন আমাদের জন্যে—উড়ুনি উড়িয়ে পাম্পশু চড়িয়ে...শালা হারামিকা বাচ্চা...!

ঘোলাটে চোখ দুটোতে হিংস্রদীপ্তি ফুটে ওঠে। নড়ে ওঠে কটা কোঁকড়ানো দাড়িগুলো। ভারি ধারালো ছোরাটা চালাতে থাকে সে সজোরে।...প্রকাণ্ড খাসির রাং টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

পুরোহিত যেমন নির্বিকারচিত্তে ফুল তোলে, লেখক যেমন অসঙ্কোচে শাদা কাগজে কালির আঁচড় টানে, রাঁধুনী অবিচলিতচিত্তে যেমন জীবন্ত কই মাছগুলো ভাজে ফুটন্ত তেলে, রহিমও তেমনি ছাগল কুচো করে অকুণ্ঠিত দক্ষতা সহকারে একটুও বিচলিত হয় না।

একটা খাসি, একটা পাঁঠা, গোটা-দুই বক্‌রী প্রত্যহ জবাই করে সে। আধ সের পাঁঠার মাংস দুলালবাবুর বাপকে দিতে হয়। সুদস্বরূপ। কবে পাঁচশ টাকা ধার নিয়েছিল তা আর শোধই হচ্ছে না। ভিটে-মাটি সব বাঁধা আছে। সুদের সুদ তার সুদ...হিসাবের মার-প্যাঁচে বিভ্রান্ত হয়ে শেষে এই সোজা হিসাবে রাজী হয়েছে সে। রোজ আধসের কচি পাঁঠার মাংস। চতুর্থ পক্ষের অনুরোধে শালা ত রাজী হয়েছে।

কিন্তু এ-ও আর পেরে উঠছে না রহিম। এই দুর্মূল্যের বাজারে রোজ কচি পাঁঠা জোটানো কি সোজা কথা! এ অঞ্চলের যত কচি পাঁঠা ছিল সব তো ওই শালার পেটে গেল। রোজ কচি পাঁঠা পায় কোথা সে। অথচ শালাকে চটানো মুশকিল। এক নম্বর হারামি, হেলথ অফিসারটা পর্যন্ত ওর হাতে-ধরা...ওর কথায় ওঠে-বসে। একটু ইঙ্গিত পেলেই সর্বনাশ করে দেবে।... সেদিন সমস্ত দিন রোদে ঘুরে ঘুরে রহিম হতাশ হয়ে পড়ল। একটু ভয়ও হল তার। কচি পাঁঠা কোথাও পাওয়া গেল না। কী হবে কে জানে!

হঠাৎ মাথায় খুন চড়ে গেল তার। কচি পাঁঠা! চতুর্থ পক্ষে বিয়ে করেছে শালা কচি পাঁঠার ঝোল খাবে রোজ।

হারামিকা বাচ্চা। চিবুকের কটা দাড়িগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল।

তার পরদিন বাবুর বাবুর্চি বললে এসে—'কাল তুই যে মাংস দিয়েছিলি একেবারে ফাস্‌ট কেলাস। খেয়ে বাবুর দিল তর হয়ে গেছে। চেটেপুটে খেয়েছে সব...।'

রহিম নীরব।

কেবল দাড়ির গোটা-কয়েক চুল নড়ে উঠল। বাবুর্চি বলতে লাগল—'খোকাটাকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাই বাবুর মনে সুখ নেই, তা না হলে তোকে ডেকে বকশিশই দিত হয়তো। পাশের গলিতে খেলছিল—কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবু বলেছে, যে খুঁজে দিতে পারবে তাকে পঁচিশ টাকা বকশিশ দেবে। একটু খোঁজ করিস, বুঝলি...কি রে কথা কইচিস না কেন...' রহিম পচ করে একবার থুথু ফেলে নীরবে মাংস কুচোতে লাগল। তার চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছিল।

বনফুল

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

বনফুলের গল্পের সঙ্গে পরিচয় ছাপার অক্ষরে নয়, শোনায়। সে-সময়ে আমি নাইন কি টেন-এর ছাত্র। এতদিন খেলাধুলো নিয়ে মেতে ছিলাম, মাস-দুয়েক হল গল্প-উপন্যাস নিয়ে মেতে উঠেছি। রতনের কাছ থেকে যেদিন শরৎচন্দ্রের পণ্ডিতমশাই চেয়ে এনে পড়েছিলাম, সেদিন থেকেই এক বিস্ময়কর এবং হাসি-কান্না বিজড়িত এক আশ্চর্য আনন্দের জগত চোখের সামনে দেখা দিল। বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে শরৎচন্দ্রের বই জোগাড় করে আনছি আর পড়ছি। ঠিক মনে নেই তখন কোনো এক সময়ে 'মোহন সিরিজ'ও পড়তে সুরু করেছি। সেই সময়েই খোকাদার মুখে একদিন বনফুলের গল্প শুনেলাম।

পূর্ববাংলার এক ছোট্ট শহরে আমরা থাকতাম। আমাদের বাড়ির অদূরেই ছিল এক ফালি মাঠ। মাঠের একধারে ছিল কয়েকটা দেবদারু গাছ। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন। দেবদারু গাছের নিচে বসেছি আমি, রতন আর খোকাদা। আমাদের ধারণায় খোকাদা তখন সাহিত্যবিশারদ। দেশ-বিদেশের তাবৎ সাহিত্যের খবর তাঁর ভান্ডারে মজুত। শরৎচন্দ্রের লেখা নিয়ে এই মাঠে বসে রাত্রিবেলা পড়াশুনা শেষে প্রায়ই আলোচনা চলে। খোকাদার মুখে এর মধ্যে শেকসপীয়ারের অনেক নাট্যকাহিনীও জেনে ফেলেছি। সেদিন খোকাদা থালার মতো গোল সুন্দর চাঁদটার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, আজকে আমি তোমাদের আমাদের দেশের একজন শক্তিশালী লেখকের একটা ছোট গল্প বলব। বনফুলের 'তাজমহল' গল্পটা বললেন তিনি। মনে আছে, গল্প শেষে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারি নি। চুপচাপ বসেছিলাম চাঁদটার দিকে চেয়ে। ভাবছিলাম, সম্রাট শাহজাহানের তাজ-মহলের মাথার চাঁদটা থেকে ফকির শাহজাহানের কবরের শিয়রের চাঁদটা যেন অনেক বেশি উজ্জ্বল।

বনফুলের ছোটোগল্পের প্রতি নেশা ধরে গেল। পরে খোকাদাই একদিন বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প জোগাড় করে এনে দিলেন। মুগ্ধ হয়ে পড়লাম কশাই, শরশয্যা, তিলোত্তমা চান্দ্রায়ণ, নিমগাছ, গণেশজননী, অর্জুন মন্ডল, সনাতনপুরের অধিবাসী-বৃন্দ, বুধনী, শ্রীপতি সামন্ত। তখন কতক বুঝেছি, কতক বুঝিনি। কলেজে গিয়ে আবার পড়েছি। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। পরবর্তী সময়ে এর কতকগুলি ছোটোগল্প বার বার পড়েছি।

এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে এত ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যে বনফুল ছাড়া দু-চারজনের বেশি লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। মানবমনের কত বিচিত্র অন্ধিসন্ধি, চলার পথের কত বিচিত্র ঘটনা নিয়েই না তিনি গল্প লিখেছেন।

'সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ' পড়তে পড়তে নিজেদের সমাজকে আর চিনতে দেরি হয় না। চন্ডীমন্ডপে তাস পেটানো আর বসে বসে পরচর্চা করাতেই গ্রামবাংলার মানুষের দিন কাটে। প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বরবাবু আর শ্যামা ধোপানী একই দিনে গ্রাম থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। তাই সকলে ঠিক করে নিল বুড়ো বয়সে শৈলেশ্বরবাবু শ্যামাকে নিয়ে পালিয়েছেন। সকলেই একেবারে ছ্যা-ছ্যা করতে সুরু করল। শৈলেশ্বরবাবুর দলের লোকেরা ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করল আর বিপক্ষ দলের লোকেরা কুৎসায় সোচ্চার হয়ে উঠল। গ্রামে একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। এমনি সময় একদিন দেখা গেল শ্যামা ধোপানী ফিরে এসেছে। স্বামী পিরুর সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। সে নাকি মামারবাড়ি গিয়েছিল। বিপক্ষদলের মুখ তবু বন্ধ হয় না। পিরু নিশ্চয় টাকা খেয়ে সব চেপে গেছে। লেখক শেষে বলছেন:

> "শৈলেশ্বর মোক্তার আর ফিরিলেন না। কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়, কূপে পড়িয়া। গ্রামেই একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কূপ ছিল। তাহারই ভিতর হইতে তাঁহার গলিত শবদেহটা কিছুদিন পরে বাহির হইল।
>
> মল্লিকমহাশয় আবিষ্কার করিলেন।"

অন্য একটি গল্প—ধনুকধারী বিলু শিকারে গিয়ে মহুয়াগাছের তলায় একদিন সন্ধান পেল নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধনীর। যুদ্ধ করে বিয়ে করে আনল বুধনীকে। বিলটু বুধনীকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারে না। কিন্তু বুধনীর ছেলে হলো। ছেলে বুধনীর ভালোবাসা অনেকটা কেড়ে নিল। বুধনীকে সে আর আগের মতো পায় না। তাই একদিন শিশু-পুত্রকে সে হত্যা করল। ফাঁসি যাওয়ার আগেও তার মুখে শুধু এক চীৎকার—বুধনী-বুধনী-বুধনী! ভগবানের নামটা পর্যন্ত করল না।

গল্পের শেষ লাইন: নৃশংস হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না।

জজ-উকিলের সহানুভূতি বিলটু পায় নি বটে। কিন্তু পাঠকের সহানুভূতি থেকে বিলটু যে বঞ্চিত হয়নি একথা বলতে পারি। প্রেমের এমন তীব্রতার পরিচয় বিরল।

'গণেশজননী'তে হয়েছে মাতৃস্নেহের আশ্চর্য বিকাশ। 'গণেশ' একটি হস্তির নাম। একটি হাতির প্রতি এমন সন্তান-

বাৎসল্যের পরিচয় এক প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর নেই।

লেখকের কথাতেই গণেশ আর গণেশ-জননীর খানিকটা পরিচয় দিচ্ছি :

"গণেশে পান থেকে চুন খসবার জো নেই, তাহলেই গিন্নি তুলকালাম করবে। একশ বিঘে জমি আছে মশাই—যা কিছু হয় সব ওরই পেটে যায়—একটা হাতির খোরাক, বুঝছেন না? পুজোর সময় ওর সাজ করিয়ে দিতে হয়—এবার গিন্নি একটা রুপোর ঘণ্টা করিয়ে দিয়েছেন...স্যাকরার ধার শোধ করতে পারি নি এখনও..."

ভদ্রলোক আবার বলছেন : 'গিন্নি যখন নাইতে যায়, বালতি-গামছা শুঁড়ে করে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু পিছু যায়। গরমের দিনে রান্না-ঘরে বসে গিন্নী যখন রাঁধে ও শুঁড়ে করে পাখা ধরে হাওয়া করে।"

গণেশ অসুস্থ হয়েছে। দেখা গেল "একটা প্রকাণ্ড 'হলে' শতরঞ্জির উপর গণেশ গুম হইয়া বসিয়া আছে। একটি ক্ষীণকায়া মহিলা তাহার শুঁড়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে খাইবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতেছেন। সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড 'বাথটব'। কী একটা জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার পাশে লেবুর খোসার স্তূপ।

"খাও লক্ষ্মী তো—লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর বার্লি করে এনেছি। চেখেই দেখ না একটু—"

সত্যি এমন বাৎসল্যের বুঝি তুলনা নেই।

'তাজমহলে' পত্নীপ্রেমের এক উজ্জ্বল চিত্র পাই। এই পত্নীপ্রেম শাহাজানের পত্নীপ্রেমকেও ম্লান করে দিয়েছে।

একদিন এক গরিব বৃদ্ধ মুসলমান হাসপাতালে এলো। পিঠে একটা ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়িতে এক বোরখা-পরা মহিলা। মহিলা তার বেগম। 'ক্যাংক্রাম অরিস'-এ তার মুখের আধখানা পচে গেছে। ভীষণ দুর্গন্ধ। হাসপাতালের সব রোগী এমনকি মেথর পর্যন্ত আপত্তি করায় অদূরে এক গাছের নিচে রেখে বৃদ্ধ বেগমের চিকিৎসা করাচ্ছে। দিনরাত তার সেবা করে চলেছে। একদিন দেখা গেল নিজে বৃষ্টিতে ভিজছে। কিন্তু বেগমকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে বেগমের মাথার ওপর একটা কাপড় ধরে রেখেছে। পত্নীর মৃত্যুর পর গরিব বৃদ্ধ লোকটি শাহজাহানের মতো তাজমহল গড়তে পারে নি বটে। কিন্তু ইট আর কাদা দিয়ে হাতে বেগমের কবর গাঁথল। বৃদ্ধের নাম ফকির শাজাহান।

গল্প শেষে মনে হয়, সে 'ফকির শাজাহান নয়, পত্নীপ্রেমে সম্রাট শাহ-জাহানের চেয়েও সে বড়ো।

এবারে মানুষের ওপর ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের খানিকটা পরিচয় নেওয়া যাক।

'হাসির গল্প'-এর নায়ক হরিহর অসুস্থ, অসুন্দর। পাশেই রোগশয্যায় শায়িত একটি মেয়ে। বারান্দায় চীৎকার করে কাঁদছে একটি শিশু গৃহিণী রণচণ্ডী, দ্বারে পাওনাদার মুদির অশ্রাব্য কটূক্তি। এই পরিবেশে একটি হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে গরম জলে পা দুটি ডুবিয়ে 'ফুটবাথ' নিতে নিতে, মাথার যন্ত্রণা দূর করবার প্রয়াসে বাঁ হাতে রগ দুইটি টিপে ধরে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেন হরিহর। গল্প লিখতে হবে। ওই অবস্থায় গল্পের প্লট ভাবছেন। আজই দিতে হবে—সম্পাদকের তাগিদা। হাসির গল্প। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁর নাম।

আশা করি, ভাষ্যের প্রয়োজন নেই।

'ক্যানভাসার' গল্পেও জীবনসংগ্রামের এক নিষ্ঠুর পরিচয় উদঘাটিত।

তারস্বরে নিজের দাঁতের মাজনের প্রশংসা করছে ক্যানভাসার হীরালাল। তার ঝকঝকে সুন্দর দাঁতের দিকে সকলেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। হীরালাল জানায় এই মাজন ব্যবহার করেই তা হয়েছে।. ভৈরবের সঙ্গে ঝগড়া বাধতেই সব ফাঁস হয়ে গেল। ভৈরবের এক চপেটাঘাতে নকল দাঁত ছিটকে পড়ল মাটিতে। শুধু দাঁত নয়, তার কালো সুন্দর গোঁফ জোড়াও নকল। চড় খেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে হীরালাল বলল :

'কেন মারধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ—এই করে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটা মারা গেছে—

হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্তি হইলে সে বলিল, আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন।"

নকল গোঁফ আর দাঁত দিয়ে লোক ঠকানোর জন্য কোথায় রাগ হওয়ার কথা তা নয় গল্প শেষে আমাদেরও ভৈরবের মতো বলতে ইচ্ছে করে দিন এক কৌটা মাজন। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি লেখকের সহানুভূতি তখন আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে এইখানেই তো গল্পকারের বড়ো সার্থকতা।

'কাকের কাণ্ড' গল্পে কুসংস্কারের অসারতার কথা বলেছেন লেখক। দুপুর-বেলায় কাকের ডাক না কি অশুভ। পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনীদের অশুভ আশঙ্কায় জগত্তারিণী কাক তাড়াতে গিয়ে উঠোনে আছাড় খেলেন। মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে ছেলেমেয়েরা বিদেশ থেকে ছুটে এল। অনেকদিন বাদে ছেলেমেয়েদের কাছে

পেয়ে জগত্তারিণী খুশিতে উজ্জ্বল হলেন, রোগ এমনিতেই সেরে গেল। কাকটা অসময়ে ডেকেছিল বলেই জগত্তারিণী ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে কাছে পেলেন।

'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পে সাপের ওঝার প্রতি মানুষের মূঢ় আস্থা পরিহসিত হয়েছে।

'জাগ্রত দেবতা' গল্পেও অন্ধবিশ্বাস ও ভক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষ বর্ষণ করেছেন বনফুল।

সূক্ষ্ম স্যাটায়ারের পরিচয় পাই তাঁর 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পে। নকল ভদ্রতার মুখোস খুলে দিয়েছেন গল্পকার এখানে। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন নকল ভদ্রলোকেরা যাঁদের ছোটোলোক বলে তাঁদের মহত্ব।

বনফুলের গল্পের একটি বড়ো অংশের বিষয়বস্তু অতিঅলৌকিক। 'প্রতীক্ষা' 'মেঘলা দিনে', 'দেওয়াল', 'জবরদখল' 'অবর্তমান' প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট অতিঅলৌকিক গল্প। এখানে প্রতীক্ষা গল্পটির পরিচয়ই শুধু দিচ্ছি।

মরার আগে ইচ্ছাসুখে খেতে ইচ্ছে করল পেটুক বটুকভৈরব ঘোষের। ভরপেট খাওয়ার পরও সত্তরটা ল্যাংড়া আম খেতে পারত সে। রাজেন তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ করল। রাজেনের কাছথেকে বিদায় নেওয়ার আগে বটুক তাঁকে তার ওখানে, মানে পুরুলিয়ায় যেতে বললো। তার নিজের মিষ্টির দোকান আছে। সে তার প্রতীক্ষায় থাকবে।

দশ বছর পরে রাজেন কী একটা কাজে পুরুলিয়া গেল। স্টেশন থেকে বেরিয়েই বটুকভৈরবের সঙ্গে দেখা। রাত তখন বারোটা। বটুক উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে তার দোকানে আমন্ত্রণ জানাল। দেখা গেল একটু দূরে মাঠে একটি সুসজ্জিত খাবারের দোকান। রাজেন পরদিন আসবে জানিয়ে গন্তব্যস্থলে গেল। পরদিন সেই মাঠে গিয়ে দেখল কোনো দোকান নেই, একটু দূরের এক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলে সে দোকান পাঁচ বছর আগে উঠে গেছে, বটুকবাবুও মারা গেছেন।

আরো বহু গল্পই উল্লেখ করা যেতো। উল্লেখ করবার মতো গল্প তাঁর আরো আছে। কিন্তু আশাকরি, এ থেকেই তাঁর গল্পের বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে লেখকের কল্পনাশক্তি কতখানি বহুবিস্তারী। এবারে আসি তাঁর গল্পের প্রকৃতি, স্টাইল এবং মানের আলোচনায়।

ছোটো গল্পের একটা লক্ষণ তা আকারে ছোটো হবে। সেই হিসেবে বনফুলের গল্পগুলো যথার্থই ছোটো গল্প। অবশ্য ছোটগল্প আকারে ছোটো হবেই এমন কোনো কথা নেই। ছোটোগল্পের পরিচয় তার প্রকৃতিতে। যাক সে কথা। আমার কথায় আসি। এতো ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যে আর কেউ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। তার 'নিমগাছ' গল্পটি বইয়ের পাতার আধ পাতার মধ্যেই ধরে যায়। গল্পটি এই ঃ

কেউ ছালটা নিয়ে সিদ্ধ করছে। পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ। কেউ-বা ভাজছে গরম তেলে। খোস-দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে। চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে। এমনি কাঁচাই কিংবা ভেজে বেগুন-সহযোগে। যকৃতের পক্ষে ভারি উপকারী। কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক...দাঁত ভাল থাকে। কবিরাজরা প্রশংসনায় পঞ্চ-মুখ। বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হ'ন। বলেন—"নিমের হাওয়া ভাল, থাক, কেটো না।' কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না। আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে। শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ কেউ—সে আর-এক আবর্জনা। হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠল, "বাঃ বাঃ কী সুন্দর পাতা-গুলি...কী রূপ। থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার...এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাঃ"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল। কবিরাজ নয়, কবি।

নিম গাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।

ওই শেষের ছত্রটির জন্যেই গল্প। গল্প শেষে লক্ষ্মী বউটার জীবনযাত্রার চিত্রটা ছবি হয়ে ওঠে। শাশুড়ির লাঞ্ছনা, সকলের মুখ-ঝামটা সয়েও বউটি নীরবে সংসারের যাবতীয় কাজ করে চলেছে। ডাঁই করা বাসন মাজছে, ভাত রাঁধছে। তার দশা নিমগাছটারই মতো। গল্পটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা চলে 'নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা, নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ। অন্তরে অতৃপ্ত রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

"ছোটোগল্পের এই বৈশিষ্ট্যটি অধিকাংশ গল্প সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ছোটো-গল্প শুরু থেকেই দ্রুতগতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। বনফুলের গল্পও তাই। 'গীতি-কবিতা'র মতো ছোটোগল্পেও গল্পকারের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হবে। বিখ্যাত আইরিশ গল্পলেখক সিয়ান ও' ফাওলেইন-এর মতে গল্পকার তাঁর গল্পে Projects himself বনফুলের ছোটো-গল্পে গল্পের আড়ালে আমরা তাঁর ব্যক্তি-সত্তার পরিচয় পাই, পরিচয় পাই তাঁর সংবেদনশীল মনের, পরিচয় পাই প্রবহমান জীবন থেকে গ্রহণ করা প্রতীতির। একটা দিক দিয়ে বনফুলের লেখার সঙ্গে মোঁপাসার মিল আছে। উভয়ের গল্প শেষে 'Whip Crack' আছে। Whip Crack -এর বাংলা করলে দাঁড়ায় 'চাবুক হাঁকড়ানো'। ঠিক সে জিনিস অবশ্য বনফুলের নেই। বনফুলের গল্পের শেষে আকস্মিক চমক আছে। কিন্তু মোঁপাসার মতো Whip Crack বা আমেরিকার গল্পকার ও হেনরীর মতো kick তাঁর গল্পে নেই। সম্ভবত বাঙালীর স্বভাবগত নরম মানসিকতার জন্যেই বনফুলের গল্পের সমাপ্তিতে চাবুকের তীব্রতা নেই। সে চমকে রয়েছে নমনীয়তা। বনফুল মোঁপাসা বা ও হেনরী হয়ে উঠবেন—এ আমরা চাই না। 'বনফুল' স্রষ্টা। 'বনফুলে'র লেখায় আমরা বনফুলকেই পেতে চাই; পেতে চাই তাঁর মানসিকতা, তাঁর প্রতীতি তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিচয়। আর তা পেয়েছি বলেই তো বনফুলকে বাদ দিয়ে বাংলাসাহিত্যের ছোটোগল্পের ইতিহাস রচনা হতে পারে না। আমি বলব, উপ-ন্যাসের থেকেও বনফুল তাঁর ছোটো গল্পের মধ্যেই অধিকতর ভাস্বর। সেখানেই তাঁর ব্যক্তিসত্তার যথার্থ বিকাশ।

আর একটি কথা বলেই এ আলোচনা শেষ করছি। আজকাল অনেকে মনে করেন, গল্পের মাধ্যমে পাঠকের মনে আকাঙ্ক্ষিত effect সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ রচনা বা জমি তৈরী করা। খুব ছোটোগল্পে সে effect গভীর হবার অবকাশ পায় না। সেজন্য আজকাল পত্র-পত্রিকায় বনফুল-রীতির ছোটোগল্প লেখা হয় না বললেই চলে। কথাটি মেনে নিলেও বলতে হয় এটা নির্ভর করে গল্পকারের বিশেষ ক্ষমতার উপর। বনফুল সেই ক্ষমতার অধিকারী। অন্ততঃ তাঁর কয়েকটি গল্প আকারে ছোটো হয়ে পাঠকের হৃদয়ের মূলে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। 'কশাই' গল্পটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গল্পের শেষে 'চাবুক হাঁকড়ানো'ও তরুণ গল্পকারদের পছন্দ নয়। বাংলা সাহিত্যের হালআমলের গল্পলেখকরা মোঁপাসার থেকে চেকভ-রীতির বেশি ভক্ত। যুগে যুগে মানুষের রুচি পাল্টায়। মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। এক সময় মোঁপাসা-রীতির গল্পের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। আজ হয়েছে চেকভ-রীতির। এখনকার গল্পের চমক থাকে না, গল্প শেষ হয় সহজভাবে। কিন্তু গল্প শেষে পাঠকের অনুভূতির মূলে নাড়া লাগে। সম্ভবত তাই গল্পে বনফুলের অনুসারী আজকাল তেমন নেই। লেখা হচ্ছে না বটে, তবে আবেদন কমেনি। ও হেনরীর লেখার আবেদন কমতে পারে, কিন্তু মোঁপাসা এবং বনফুলের গল্পের আবেদন আজও অম্লান। বিশ্বাস করি, বাঙালি পাঠকদের কাছে বনফুলের গল্পের আবেদন দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। স্থায়ী হবে তাঁর অসামান্য শিল্প কুশলতার জন্যে, স্থায়ী হবে তাঁর মানবতাবোধের রসে সিক্ত ব্যক্তিসত্তার জন্য।

উড়ো খবর নয়— পোস্টকার্ডের চিঠি, সুধীর নিজ হাতে লিখিয়াছে—

বাবা, বহুদিন আপনাদের কুশল সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। শনিবার বারোটার গাড়িতে বাড়ি পৌঁছিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং বিস্তারিত সাক্ষাৎমতে নিবেদন করিব—

শনিবার অর্থাৎ আগামী কাল। নিবারণ তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে খবর জানাইলেন। পুরা দুইটি বছর অন্তে ছেলে বাড়ি আসিতেছে। ছুটি পায় নাই বলিয়া নহে, বরঞ্চ এতদিন ছুটি ছিল দিবা-রাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই। চাকরির উমেদারিতে এ যাবৎ যত হাঁটাহাঁটি করিয়াছে, তাহার সমষ্টিতে বোধ করি পদব্রজে ভারতবর্ষ হইতে ল্যাপল্যান্ড অবধি পরিভ্রমণ সারা হইয়া যায়। যাহা হউক চাকরি জুটিয়াছে, ভালো চাকরি—এবং এই প্রথম ছুটি।

পাঁজি খুলিয়া নিবারণ মনোযোগ-সহকারে শনিবার তারিখটার গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত পড়িয়া ফেলিলেন, একটা কিছু পুজো-পার্বণ চোখে পড়িল না। ছুটিটা কিসের সাব্যস্ত হইল না। বুধবারে ঈদের বন্ধ আছে বটে, চিঠির তারিখটা শনিবার কি বুধবার লিখিয়াছে—দৃষ্টি-বিভ্রম হইতে পারে, ভালো করিয়া আর একবার মিলাইয়া দেখিতে বালিশের নিচে হাত দিলেন, তারপর বিছানা উল্টাইয়া ফেলিলেন, তবু চিঠি পাওয়া গেল না। যতদূর মনে পড়ে, বালিশের তলায় রাখা ছিল, তবে যায় কোথায়?

চিঠি তখন চলিয়া গিয়াছে উত্তরের ঘরে বাদামতলার দিককার জানালার কাছে। চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে—চোর, কিরণমালা। চার-পাঁচ লাইনের চিঠি, কিন্তু খুকির জ্বালায় কথা কয়টা স্থির হইয়া পড়িবার জো আছে? থাবা দিয়া ধরিতে যায়। অবশেষে ছোট ননদ পটলীকে অনেক খোসামোদ করিয়া তাহার কোলে খুকিকে পাড়ায় পাঠাইয়া দিল। তারপর কিরণ এদিক-ওদিক চাহিয়া সবেমাত্র কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়াছে, আবার বিপদ! শাশুড়ী আসিয়া ঢুকিলেন। কিরণ চিঠি ঢাকিয়া ফেলিল। শাশুড়ি সেকেলে মানুষ, অতশত দেখেন না, আসিয়াই বলিলেন—বৌমা, বিছানার চাদর ওয়াড়-টোয়ারগুলো খুলে দাও তো শিগগির—এখন সেদ্ধ করে রাখি, ভোর থাকতে থাকতে কেচে দেব—কেমন?

বধূ সায় দিয়া বলিল—হ্যাঁ মা, কী রকম বিচ্ছিরি ময়লা হয়ে গেছে, দেখো না—

শাশুড়ি বলিলেন—খোকা বারোটার গাড়িতে যদি আসে তার আগেই সব কেচে দেব। নোংরামি মোটে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। আর তোমাকেও বলে দিচ্ছি মা, এরকম পাগলি মেয়ের মতো বেড়াতে পারবে না—কালকে সকাল সকাল নেয়ে ফিটফাট থেকো। যে যেমন চায় তেমনি থাকতে হয়। শহরে-বাজারে থাকে, বোঝ না?

আনন্দে কিরণের বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। হাসিও পাইল। খোকা—বুড়ো খোকা—অত বড় গোঁফওয়ালা ছেলে, এখনও মা কিনা খোকা বলিয়া ডাকেন।

এদিকে বাইরে নিবারণের গলা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাটা এই—নটবর কামার বছর আট-সাত আগে একটা বঁটি গড়াইয়া দিয়াছিল তাহার দরুন এখনো তিন আনার পয়সা বাকি। উক্ত পয়সার তাগাদা করিতে আসিয়া এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, তৃতীয় ব্যক্তি কেহ উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় মনে ভাবিত, ঐ তিন আনার পয়সা এখনই হাতে না পাইলে বেচারা সবংশে নির্ঘাত মারা যাইবে। কিন্তু নিবারণ বহুদর্শী ব্যক্তি, অপরে যে-প্রকার ভাবুক—নটবরের জন্য তাহার দুশ্চিন্তা হইল না। বলিলেন—বোসো, এইবারে ঠিক—আর একটা দিন মোটে—কাল সুধীর বাড়ি আসবে, কাল আর নয়, পরশু সকালের দিকে এসো একবার—পাই পয়সাটি অবধি হিসেব করে নিয়ে যেও। নাও কলকেটা ধরো—

বলিয়া হুঁকা হইতে নটবরের হাতে কলিকা নামাইয়া দিয়া আবার শুরু করিলেন—শোন নি নটবর, বল কি—শোন নি, কানে তুলো দিয়ে থাক না কি? আমার সুধীরের মস্ত বড় চাকরি হয়েছে, দেড়শ টাকা মাইনে—

কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া বলা নিবারণের অভ্যাস, এ গ্রামের সকলেই ইহা জানে। পাওনাদার এবং আত্মীয়-স্বজন বহুবার একথা শুনিয়াছে—চাকরি ঠিক হয়ে গেছে, এখন সাহেব বিলেত থেকে পৌঁছুতে যা দেরি। এবারে আর ভুয়ো নয়, আসছে মাসের পয়লা থেকে নিশ্চয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহেব কখনো বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছে নাই এবং মাসের পর মাস অনেক পহেলাই কাল-সমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে। সুধীরের চাকরির কথা তাই লোকে বড় বিশ্বাস করে না। তবে এবারের কথা স্বতন্ত্র। দোকানে বসিয়া হাপর টানিতে টানিতে নটবরও যেন কাহার মুখে শুনিয়াছে, সুধীরের ভারি কপাল-জোর, ভালো চাকরি পাইয়াছে। এখন ঐ দেড়শ টাকার কথা যদি বাদ-সাদ দিয়া অন্তত সত্যকার টাকা পঁচিশেও দাঁড়ায়, তবু নটবরের তিন আনা আদায় হইবার উপায় হইয়াছে। সে পুলকিত হইল।

নিবারণ পুত্রগর্বে স্ফীত হইয়া বলিতে লাগিলেন—সেদিন দাকোপার পাঁচু ঘোষের সঙ্গে দেখা—পিসি আর বৌকে নিয়ে কালীঘাট গিয়েছিল। সুধীর দেখতে পেয়ে এই টানাটানি—বাসায় না নিয়ে ছাড়লই না। পাঁচু বলে—দাদা, বলব কি, মস্ত তিন মহল বাড়ি ভাড়া করেছে, ঝি-চাকর যে কতগুলো গুনে ঠিক করতে পারলাম না। মাইনে দেড়শ আর উপরি সকালে আপিসে যায় খালি পকেটে, সন্ধেবেলা দু পকেট যেন ছিঁড়ে পড়ে। টাকার বোঝা নিয়ে হেঁটে আসতে পারবে কেন, গাড়ি করে ফিরতে হয়। দেখা হলে একবার পাঁচু ঘোষকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

নটবরের গা শিরশির করিয়া উঠিল—এই সেদিনের সুধীর, তাহার দোকানের সামনে দিয়া খালি গায়ে জেলেপাড়া হইতে মাছ ধরিয়া লইয়া আসিত। বলিল—তা, বেশ—বড্ড ভালো কথা, আর আপনার দুঃখ কী চৌধুরীমশাই, রাজেশ্বর ছেলে—

নিবারণ বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তোমরা পাঁচজনে ভালো বললেই ভালো। পাঁচু যা বললে—বুঝলে শুনে তাক লেগে যায়—পেত্যয় হয় না। রাজরাজড়ার কাণ্ডই বটে! শুনেছ বোধহয়, এবার আমরা বাড়ি-সুদ্ধ কলকাতায় চলে যাচ্ছি, সুধীর আসছে সেই সব ঠিকঠাক করতে—

নিবারণ চুপিচুপি কথা বলিবার লোক নহেন, বিশেষত ছেলের এই সৌভাগ্যের কথা। ঘরের ভিতর হইতে কিরণ শুনিতে পাইল, সুধীর দেড়শ টাকার চাকরি পাইয়া রাজরাজড়ার কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছে। কিরণ একবারও কলিকাতায় যায় নাই এবং সত্যিকার রাজারা যে কী প্রকার কাণ্ড করিয়া থাকে তাহাও সঠিক আন্দাজ করিতে পারে না। গ্রামে সখের থিয়েটার আছে, অতএব রাজা সে অনেকবার দেখিয়াছে—গায়ে ঝকমকে শরীর ঝকমকে পোশাক, মাথায় মুকুট। সুধীরের মাথার উপর মুকুট বসাইয়া দিলে কী রকম দেখায় তাহাই সে সকৌতুকে কল্পনা করিতে লাগিল। নিবারণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নয়, তাহা কিরণ জানে। তবু আজিকার কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে কিছুতেই প্রাণ চাহে না। অনেকবার অনেক আশা করিয়া শেষে সমস্ত মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, এবারে মিথ্যা হইলে সে মরিয়া যাইবে। এইটুকু জীবনে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, সে এক সাতকাণ্ড রামায়ণ। ছেলেবেলায় কিরণের মা মরিয়া গেলে বাবা আবার বিবাহ করেন। নতুন মা কিরণকে মোটে দেখিতে পারিত না। এখন আর তাহাকে বাপের বাড়ি লইয়া যাইবার নামও কেহ করে না।...সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, বাদাম গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠিল। কিরণের মনে হইল যেন কোন অনির্দেশ্য স্থানে বসিয়া তাহার অনেক দিনের হারানো মা তাকাইয়া দেখিতেছেন এবং বড় খুশি হইয়াছেন যে সুধীর রাজা হইয়াছে, আর সে—তাহার সেই জন্ম-দুঃখিনী মেয়ে, এতকালের পর হইয়াছে রাজার পাটরাণী। আয়না ও চুলের দড়ি পাড়িল, আবার ভাবিল—দূরে হোক গে, চুল বাঁধব না আর আজ, বেলা একেবারে গেছে। রান্নাঘরে আসিয়া উনান ধরাইতে গিয়া ভাবিল—এত সকাল সকাল কিসের রান্না! ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার যেন কী হইয়াছে, তাহাকে ঠিক ভূতে ধরিয়াছে...

পটলি পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া খুকিকে কিরণের কোলে ঝপ করিয়া ফেলিয়া দিল। তখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। কিরণ ডাকিল—ও পটলি, যাচ্ছিস কোথায়? শোন—সুশীলাদের বাড়ি গেছলি? তার বর নাকি এসেছে—কলকেতায় বাসা করেছে, তাকে নিয়ে যাবে, সত্যি? পটলি দৃকপাত না করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া উঠানে কুমির-কুমির খেলিতে গেল।

উঠানে যেন ডাকাত পড়িয়াছে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের কোলাহলে কান পাতা যায় না। পটলি হইয়াছে কুমির আর উত্তর ও পূর্ব ঘরের দাওয়া হইয়াছে ডাঙা। সেই ডাঙার উপর হইতে উঠানরূপ নদীতে সকলে যেই নাহিতে নামে, পটলি দৌড়াইয়া তাহাদের ধরিতে যায়। রান্নাঘর হইতে মেয়ে কোলে কিরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।...খুকির মোটে চারিটা দাঁত উঠিয়াছে, কিরণ খুকির গালের মধ্যে একবার একটা আঙুল দিয়াছে আর অমনি সে কামড়াইয়া ধরিল।

—ওরে রাক্কুসী ছাড় ছাড়—মরে গেলাম, ভারি যে দাঁতের দেমাক হয়েছে তোমার!

কিরণ হাত ছাড়াইয়া লইল। খুকি হাসিতে লাগিল। কিরণ খুকির দিকে তাকাইয়া মুখ নাড়িয়া বলে—অত হেসো না খুকি, অত হেসো না। সব মানিক পড়ে গেল, সব মুক্তো ঝরে গেল।...মেয়ে মোটে এইটুকু বুদ্ধি কত—সব বোঝে, চৌকাঠ ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, আবার হাততালি দিয়া বলে—তা-তা-তা—

কিরণ বলিল—হাঁ করে হাবলার মতো দেখছ কী? ড্যাবডেবে চোখ মেলে এক নজরে কী দেখছ আমার মানিক? খেলা দেখছ? তুমিও খেলো, বড় হও আগে। ঠাণ্ডা হয়ে বাবু হয়ে বোসো তো— এই যে দোলে—দোলে—

> দোলন দোলন দুলুনি,
> রাঙা মাথার চিরুনি
> বর আসবে যখনি
> নিয়ে যাবে তখনি—

খুকি তালে তালে কেমন দোলে। কিরণ মেয়েকে উপরে তুলিয়া কচি কচি নরম হাত—বুক-গাল চাপিয়া ধরিতে লাগিল। খুকির খুব আনন্দ হইয়াছে, মাথা নাড়ে আর টানিয়া টানিয়া বলে—বা-আ-আ-বা-বা। মেয়ে বাবাকে দেখে নাই, সুধীর বাড়ি হইতে যাইবার সময় কেবল মধুর সম্ভাবনার কথাটি জানিয়া গিয়াছিল। কিরণ ফিসফিস করিয়া বলিল—খুকি, দেখিস—দেখিস, কালকে বাবা আসবে—তোর খোকা বাবা—মার যেমন কাণ্ড—অত বড় ছেলে, এখনও খোকা—হি-হি ছেলেমানুষের মতো হাসিতে লাগিল। তারপর চারিদিক তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোনোখান হইতে শুনিতে পায় নাই তো? এমন সোনার চাঁদ তাহার কোলে আসিয়াছে—সুধীর তা জানে না, চোখে দেখে নাই, সুধীরের জন্য মনে করুণা হইল না। আবার রাগ হইল—এই তো চিঠিপত্র খবর পাইয়াছে, একবার কি এতদিনের মধ্যে মেয়েকে দেখিয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না?

সেইদিন গভীর রাতে কিরণ বিছানায় শুইয়া আছে, ঘুম আর আসে না। মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, দু-তিনবার উঠিয়া মাটির কলসী হইতে জল গড়াইয়া মুখে-চোখে দিল। এইবার ঠিক ঘুম আসিবে, চোখ বুজিয়া শুইল। বেড়ার ফাঁকে জ্যোৎস্না আসিয়া অনেকদিন আগেকার স্নেহস্পর্শের মতো সর্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। দুই বছর কম সময় নয়।...সুধীরকে গ্রামসুদ্ধ সকলে অকর্মণ্য ঠাওরাইয়াছিল, সেই সঙ্গে কিরণেরও দোষ পড়িয়াছিল, নাকি বরকে আঁচল ছাড়া হইতে দেয় না। শাশুড়ি স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, কিন্তু ওর চেয়ে মুখো-মুখি হইলেই বে ভালো হইত। শেষাশেষি এমন হইয়াছিল যে, সুধীর বাড়ি হইতে বাহির হইলে সে বাঁচে। মুখ ফুটিয়া একথা বলিতে কাহাকেও সাহস হইত না, কাহাকেও দোষ দিবার উপায় ছিল না, এক-এক সময় কিরণের মনে হইত—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ওঠে! যেদিন সুধীর রওনা হইল সেদিন সে খুশি হইয়াছিল, এখন সেসব কথা ভাবিলে কষ্ট হয়। আর লোকটিরও এমন ধনুক-ভাঙা পণ—চাকরি নাই-বা হইল, এতদিনের মধ্যে একবার বাড়ি আসিয়া গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত নাকি? কিন্তু সে দুঃখের দিন কাটিয়াছে, সুধীর হইয়াছে রাজা, কাজেই কিরণ রাজরাণী—কাল সে বাড়ি আসিবে। কাল এতক্ষণে—

আগামী কাল এতক্ষণে যে কী হইতেছে চক্ষু বুজিয়া সেই মনোরম ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়া হয়তো দেখিবে ক্লান্ত সুধীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, জলের গ্লাসটা খুঁজিতে খুঁজিতে হেরিকেন তুলিয়া কিরণ দেখিয়া লইবে। আলোটা মুখের কাছ দিয়া বারবার ঘুরাইবে, তবু চক্ষু খুলিবে না। পা ধুইয়া জলের ঘটি ঠনাত করিয়া তক্ত-পোশের নিচে রাখিবে, সজোরে জোরে খিল দিবে, তারপর খুকির মাথাটা বালিশের উপর সাবধানে তুলিয়া দিয়া মশারি গুঁজিতেছে—

সুধীর আলগোছে একখানা হাত বাড়াইয়া খপ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

আসলে সুধীর ঘুমায় নাই, ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া ছিল, কিংবা ঘুমাইলেও ইতিমধ্যে কখন জাগিয়াছে, আগে সাড়া দেয় নাই।

কিরণ বলিবে—বড্ড গরম, চল দাওয়ায় বসিগে। কেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখেছ?

সুধীর হাসিয়া বলিবে—ভয় করবে না? বাদামগাছে এক পা আর তালগাছে এক পা—ঐ যে মস্ত একটা কী দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ?

কিরণ বড় ভীতু। বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন রাত্রিতে সে রাগ করিয়াছিল, তারপরে সুধীর ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে এমন বিপদে ফেলিয়াছিল সেকথা ভাবিলে হাসি পায়। সে সময় কি বোকাই না ছিল!

কিরণ বলিবে—ভয় দেখাচ্ছ, আমায় কচি খুকি পেয়েছ নাকি?

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ আসিবে—কখনো না, কচি খুকি ভাবব—সর্বনাশ! কুড়ি পেরুল, বুড়ি হতে আর বাকি কী?

—এখন আমার মোটেই ভয় করে না—কী দেবে বলল, একলা-একলা এখনি খালের ঘাটে চলে যাচ্ছি। তারপর কিরণ হঠাৎ আর এক কথা জিজ্ঞেস করিবে—

কলকাতায় যে বাসা করেছ, সে নাকি তিনতলা? ছাত থেকে কেল্লা দেখা যায়? গড়ের মাঠ কতদূর? সুশীলার বর যেখানে বাসা করেছে সে বাড়ি চেন? তুমি আপিসে গেলে আমি দুপুরবেলা খুকিকে নিয়ে সুশীলাদের বাসায় বেড়াতে যাব কিন্তু—

অথবা এরূপও হইতে পারে।...হয়তো কাজ-কর্ম সারিয়া মেয়ে কোলে কিরণ যখন আসিয়া ঢুকিবে, তখন সুধীর শিয়রে আলো রাখিয়া নভেল পড়িতেছে। নভেল পড়া জে

ছাই—কিরণকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বই রাখিয়া দিবে। তারপর হাত ধরাইয়া বসাইবে। বলিবে—এত দেরি হল? মেয়ে কি গাঙের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে—মেয়ের বুঝি ...ান নাই!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখাইতে হইবে। ...ধীর পকেট হাতড়াইবে। ওমা, একছড়া ...সা হার চিকচিক করিতেছে, অতবড় হার ...টুকু মেয়ের জন্য। মজা দেখো না, চারটে দাঁত উঠেছে—তিন দিনের ভেতর দস্যি মেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চ্যাপটা করে দেবে।

বাপ নিজের হাতে মেয়ের গলায় হার পরাইয়া দিবে। কিরণ বলিবে—রাত্তিরটা গলায় থাকুক, কাল সকালে কিন্তু মনে করে হার খুলে নিও—ফের নীল কাগজে মুড়ে ভালোমানুষের মতো মার হাতে গিয়ে দিও। হ্যাঁগা, তাই করতে হয়—মাকে বোলো, মা এই তোমার নাতনীর হার নাও—মা খুশি হয়ে খুকির গলায় পরিয়ে দেবেন, সে কেমন হবে বলো তো?

ঘুমন্ত মেয়ে বাপের বুকে ন্যাকড়ার মতো লাগিয়া থাকিবে। সুধীর বলিবে—ইঃ একেবারে যে তোমার মতো হয়েছে—চোখ দুটো, গায়ের রঙ, গায়ের গড়ন, একচুল তফাৎ নেই—

সুখের হাসি হাসিয়া কিরণ বলিবে—কিন্তু নাকটা যে বাপের। বিয়ের সময় ঐ
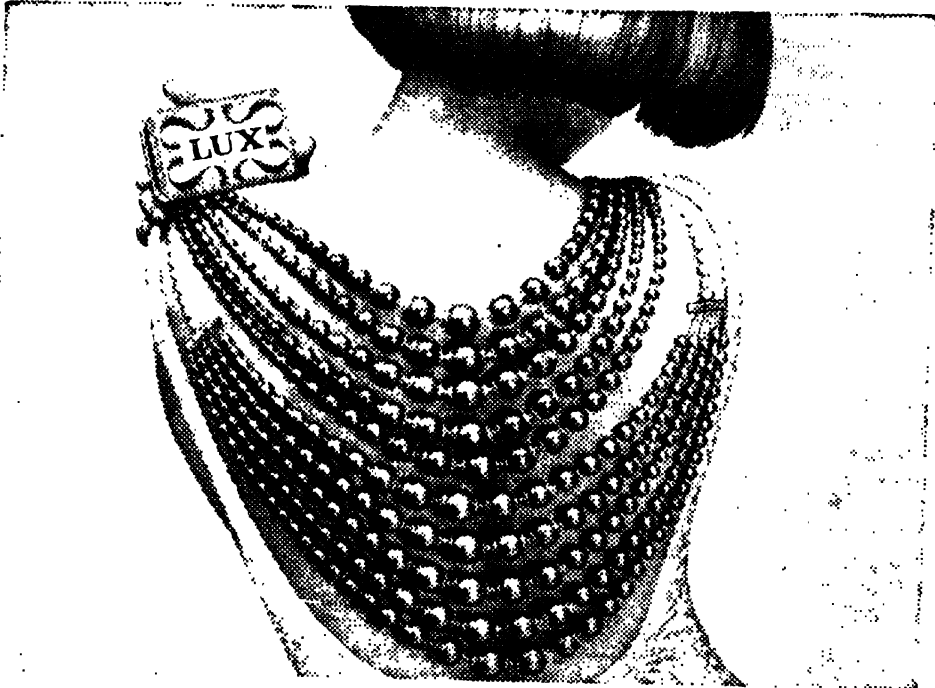
বোঁচা নাকের দাম ধরে দিতে হবে হাজার টাকা।

নাকের উচ্চতা কী পরিমাণ হইলে ঠিক মানানসই হয়, তাহার তর্ক উঠিবে—সেই তাহাদের পুরাতন তর্ক।

জ্যোৎস্নাময় চৈত্র-রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে ঘরকানাচে বাদামগাছের পত্রমর্মর ঘুমের ঘোরে খুকির ছোট্ট বুকখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাহির বাড়ির ভাঙা চন্ডীমন্ডপে তক্ষক ডাকে, চারিদিকের অতল নিস্তব্ধতার মধ্যে কিছুক্ষণ অন্তর তাহার রব শোনা যায়—কটরং-র-র তক্ষ-তক্ষ!...বিবাহের পরবর্তী স্বপ্নস্মৃতির টুকরা টুকরা আগামী দিনের মধুর কল্পনার সহিত মিলিয়া সেই রাত্রে একটি নিদ্রাহারা বিমুগ্ধ গ্রামবধূর মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালে রোদ না উঠিতেই ননদ-ভাজে খালের ঘাটে গিয়া বাসনের বোঝা নামাইল। বাসন মাজা তো উপলক্ষ্য, কেবল গল্প আর গল্প—এমনি করিয়া উহারা রোজ একপ্রহর বেলা কাটাইয়া আসে। স্টেশন হইতে সাঁকো পার হইয়া গ্রামে আসিতে হয়। কিরণ সাঁকো পিছন করিয়া বাসন মাজিতেছিল, হঠাৎ পটলি চেঁচাইয়া উঠিল—ওমা, এত সকালে এসে পড়ল? তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই কিরণ ঘোমটা টানিল। পটলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—ও বৌদি, কলাবৌ সাজলি কেন? আমি কার কথা বললাম? আসছে আমাদের মংলি গাইটা।

মংলি গরু আসিতেছিল ঠিক, কিন্তু পটলি যে ভঙ্গি করিয়া বলিয়াছিল, সেটা মংলির সম্পর্কে নিশ্চয় নয়। পোড়ারমুখী মেয়ে এই বয়সে এমন পাকা হইয়াছে।

কিরণ বলিল—তাই বইকি। তুমি বড্ড ইয়ে হয়েছ, গুরুজনের সঙ্গে ঠাট্টা—তোমায় দেখাচ্ছি—বড় রাগিয়া শাসন করিতে গিয়া পারিল না, শাসন করিবে, না হাসি চাপিবে?

এদিকে নিবারণ ভারি ব্যস্ত! উঠিয়া আগে বেড়ার গায়ে ছাতিমগাছের কয়েকটা ডাল ছাঁটিয়া দিলেন, পথটা যেন আঁধার করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর নিশি গাঙ্গুলির বাড়ি গিয়া বলিলেন—একটা টাকা হাওলাত দিতে পার গাঙ্গুলি? কালকে নিও—

গাঙ্গুলি নিরাপত্তিতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন। সুধীর বাবাজি আজ আসছেন বুঝি! বাজারে যাচ্ছ? সাজা তামাকটা খেয়ে যাও, বেলা হয় নি। আর আমার কথাটা মনে আছে তো?

নিশি গাঙ্গুলির কথাটা হইতেছে, সুধীরকে বলিয়া তাহার আপিসে বা অন্য কোথাও সেজছেলে হেমন্তর একটা চাকরি করিয়া দিতে হইবে। তামাক খাইয়া এবং গাঙ্গুলিকে বিশেষ প্রকারে আশ্বাস দিয়া নিবারণ উঠিলেন।

বাজারে মাছ কিনিতে গিয়া বিষম বিভ্রাট। চারিটা সরপুঁটি আসিয়াছে, তাহার ন্যায্য দর চার আনার বেশি এক আধলাও নয়। নিতান্ত গরজ বলিয়া পাঁচ আনা অবধি দর দিয়া নিবারণ ঘণ্টাখানেক ধন্না দিয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে খোসামুদ চলিতেছে— ও পারুয়ের পো, তুলে দে—অলেহ্য দর হয়নি, ছেলে বাড়ি আসবে, বড় চাকুরে—আমাদের মতো কচুঘেচু দিয়ে খাওয়া তো অভ্যেস নেই—দে বাবা তুলে দে। কিন্তু পারুয়ের পুত্র কিছুতেই ভিজিতেছিল না। এমন সময় অক্রুর মোড়ল আট আনা বলিয়া ধাঁ করিয়া মাছ ক-টা লইল।

নিবারণ একেবারে মারমুখী। অক্রুরও ছাড়িবে কেন—গতকল্য মণ দশেক গুড় বেচিয়াছে।

গুড়ের দর যাহাই হোক, একসঙ্গে অতগুলি টাকা গাঁটে থাকায় তাহার মেজাজ ভিন্ন প্রকার।

গ্রামের কয়েকজন নিবারণকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া হাত ধরিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু নিবারণের রাগ মিটে নাই—ছোটলোকের এত আস্পর্ধা। আসুক সুধীর, দেখা যাইবে কত ধানে কত চাল।

সুধীর যখন পৌঁছিল তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। আজ আর আসিল না সাব্যস্ত করিয়া বাড়িশুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়াছে, কিরণ এইবার চাবিটা মুখে দিবে। কী মনে করিয়া ওঘরে যাইতেছিল, এমন সময় দেখিল সাঁকোর উপর একটা ছাতি, শেষে আরও ভালো করিয়া দেখিল। তারপরে রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সুধীর আসিয়া ডাকিল—মা, ওমা, কোথায় সব?

সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে, টিনের একটি সুটকেশ স্টেশন হইতে নিজেই বহিয়া আনিয়াছে, কলিকাতার বাসায় যে অগুন্তি চাকর-বাকর তাহার একটাও সঙ্গে আনে নাই।

মা আসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন। পটলি খুকিকে কোলে লইয়া সামনে দাঁড়াইল। সুধীর এক নজরে চাহিয়া দেখিল, চেহারা মলিন রুক্ষ—সে শ্রী নাই, হয়তো চাকরির খাটুনিতে, তার উপর পথের কষ্ট।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটু জিরাইবারও অবকাশ হইল না, ইতিমধ্যে গ্রামের হিতাকাঙ্ক্ষীরা আসিয়াছেন। শ্রীদাম মল্লিক সকলের চেয়ে প্রবীণ, সুধীর সর্বাগ্রে তাঁহার পায়ের ধুলো লইল। মল্লিক মহাশয় বলিলেন—শুনলাম সব কথা নিবারণের কাছে, শুনে যে কী আনন্দ হল! এখন বেঁচেবর্তে থাকো, অখন্ড পরমাই হোক! বুড়ো বাপ-মাকে এইবারই নিয়ে যাচ্ছ তো? নিয়ে যাবে বইকি! গঙ্গায় চান করবে, হরিনাম করবে, এর চেয়ে আর ভাগ্যের কথা কি? আমাদের পোড়া কপাল—আমরাই পড়ে রইলাম পচা ডোবায়। বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

ভগবতী আচার্য কিঞ্চিৎ হস্তরেখাদি বিচার ও ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করিয়া থাকেন। বলিলেন—বলেছিলাম কিনা নিবারণ-দা, বৃহস্পতি তুঙ্গী—তোমার সুধীর রাজা হবে। ঊর্ধ্বরেখা আঙুলের গোড়া অবধি চলে এসেছে—বলি নি?

নিবারণের সে কথা মনে পড়ে না, কিন্তু ঘাড় নাড়িলেন।

নিশি গাঙ্গুলিও আসিয়াছিলেন। বলিলেন—বাবাজি, আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার পর একবার অবিশ্যি করে যেও—তোমার খুড়ীমা ডেকেছেন।

অমনি ড্রামাটিক ক্লাবের ছেলেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল—সে কি করে হবে? সন্ধ্যার পর সুধীরবাবু আমাদের রিহার্শাল দেখতে যাবেন যে। ওঁকেই এবার ক্লাবের সেক্রেটারী করা হবে—কালকে আমরা মিটিং করব।

সুধীর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—সেক্রেটারি আমাকে কেন? আমাকে বাদ দাও, আমি থিয়েটারের কিছু বুঝি নে।

দলের একজন বলিল—তাতে কি হয়েছে, আমরাই সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেব। এই ধরুন, আপাতত উদ্যান দুর্গ আর অন্তঃপুর-সংলগ্ন প্রাসাদ এই তিনটে সিন, গোটা পাঁচেক চুল দাড়ি, দুটো রয়াল ড্রেস আর একটা হারমোনিয়ম কিনে দেবেন—ব্যস। আমাদের নারদ যে কি চমৎকার গান গায় শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব, জুতসই একটা দাড়ির অভাবে অমন প্লেটা নামাতে পারছি নে।

গাঙ্গুলি পুনশ্চ বলিলেন—যেমন করে হোক একবার যেতেই হবে বাবাজি, নইলে তোমার খুড়িমা ভারি কষ্ট পাবে। সারাদিন
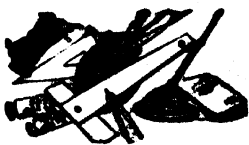
বসে বসে চন্দোরপুলি বানিয়েছে। আমি হেমন্তকে পাঠিয়ে দেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

অনেকের অনেকপ্রকার আবেদন, সুধীর উঠিল। জামা গায়ে দিবার জন্যে ঘরে ঢুকিয়া দেখে, সেখানে মাত্র একটি প্রাণী—একলা কিরণ চুল বাঁধিতেছে। কিরণের বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করিতে লাগিল, যে দুষ্ট এই সুধীর। কিন্তু তাহার সে দুষ্টামি আর নাই তো! শান্তভাবে জামাটা পাড়িয়া গায়ে দিল, একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না।

ভাবখানা এমন, যেন তাহারা দুটিতে রোজ একসঙ্গে ঘর-গৃহস্থালী করিয়া আসিতেছে।

পটলি খুকিকে আনিয়া বলিল—দাদা, একবার কোলে নাও না! দেখো, তোমায় দেখে কেমন করছে।

সুধীর দাঁড়াইল, একবার হাসিয়া মেয়ের দিকে তাকাইল, তারপর কহিল—এখন বড় ব্যস্ত রে। সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন—থাকগে এখন।

ড্রামাটিক ক্লাবের যতগুলি লোক—কেহই কলিকাতাবাসী ভাবী সেক্রেটারির সম্মুখে আপনার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিল না। ফলে রিহার্শাল যখন থামিল তখন চাঁদ মাথার উপরে। নারদ যাইবার মুখেও একবার ঘড়ির তাগাদা দিল। সুধীর বলিল—ব্যস্ত হবেন না, কালকের মিটিং-এ একটা এস্টিমেট ঠিক হবে।

দু-তিন জন আসিয়া সুধীরকে বাড়ি অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

দোরে খিল আঁটা, একটা জানলা খোলা ছিল। সুধীর দেখিল—মিটমিট করিয়া হেরিকেন জ্বলিতেছে, থালায় ও বাটিতে ভাত-ব্যঞ্জন ঢাকা দেওয়া এবং ঠিক তাহার পাশেই মাটির মেঝেয় কিরণ ঘুমাইয়া আছে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অবশেষে বেচারি ওখানেই শুইয়া পড়িয়াছে। মনটা কেমন করিয়া উঠিল, ডাকিল—কিরণ, ও কিরণ—

দু বছর আগেকার সেই ডাক একেবারে ভুলিয়া যায় নাই তো!

কিরণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দোর খুলিয়া দিল। সুধীর বলিল—তাড়াতাড়ি করছ কেন, বোসোই না। ভাতের দরকার নেই, গাঙ্গুলি-গিন্নির যা কাণ্ড—তিন দিন না খেলেও ক্ষতি হবে না।

কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল—তিন দিন থাকছ তো? বাবাকে আজ আসবার জন্যে লিখে দিলাম, পত্তোর পেয়ে মঙ্গলবার নাগাদ এসে পড়বেন—এ তিনটে দিন থাকতে হবে কিন্তু।

সুধীর বলিল—মোটে তিন দিন? এরি মধ্যে তাড়াতে চাও, ভারি নিষ্ঠুর তো তুমি! তিন মাসের কম নড়ছি নে—দেখে নিও।

—আচ্ছা, আচ্ছা—দেখব।

কিরণ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

—আর বড়াই কোরো না, মায়া-দয়া সব বোঝা গেছে! আমরা না হয় পর, নিজের মেয়েকেও কি একটিবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে না?

সুধীর বলিল—সে কথা তো বলবেই কিরণ, তার সাক্ষী ভগবান। তারপর মুখখানা অতিশয় ম্লান করিয়া কহিতে লাগিল—শরীরের কি হাল হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ তো? দু-বছর যা কেটেছে, অতি বড় শত্তুরের তেমন না হয়! জায়গা না পেয়ে একরকম রাস্তার ফুটপাথে শুয়ে কাটিয়েছি—এক পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কেটেছে, কদিন তাও জোটে নি। ভাগ্যিস রাস্তার কলের জলে পয়সা লাগে না!

কিরণের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বলিল—থাকগে, তুমি থামো। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যে দুঃখ কপালে লেখা ছিল, তা যাবে কোথায়? সে ছাই-ভস্ম ভেবে আর কি হবে বলো।

দুজনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকাইয়া আবার কিরণের মুখে হাসি ফুটিল।

ওগো, তুমি খুকিকে দেখলে না? এমন দুষ্ট হয়েছে—এইটুকু মেয়ে, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি।

সুধীর কহিল—দেখব না কেন? দেখছি তো।

কিরণ যেন কত বড় গিন্নি, তেমনি সুরে কহিল—ও আমার কপাল ঐ রকম দেখলে হয় নাকি? মেয়ে আমার সঙ্গে কত দুঃখ করছিল—বাবা আমায় কোলে নিল না, আদর করল না...তুমি খুকিকে একটা সরু হার গড়িয়ে দিও—নির্মলা দিদির মেয়েকে দিয়েছে, খাসা দেখায়।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—মেয়ে কথা বলতে শিখেছে নাকি?

—বলে না? সব কথা বলে, সে কি আর তোমরা বুঝতে পার? বলিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর আবার শুরু করিল—সেদিন বলছিল, বাবাকে একখানা ঠেলা-গাড়ি কিনে দিতে বোলো—তাই চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাব।

সুধীর হাসিল, বলিল—বটে, আবার গড়ের মাঠের শখ হয়েছে?

—কেন অন্যায়টা কিসের? খালি খালি চুপটি করে বাসায় বসে থাকবে বুঝি! তুমি ভাব, আমরা কিছু জানি নে। আমাকে না লিখলে কি হয়, শ্বশুরঠাকুর সব রাষ্ট্র করে দিয়েছেন।

—কি শুনেছ বলো তো?

—মস্তবড় বাড়ি ভাড়া করেছ, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছ—কোনটা শুনি নি? তাই তাড়াতাড়ি বাবাকে আসবার জন্যে চিঠি দিলাম, যাবার আগে একটিবার দেখা করে যাই—কতদিন দেখা হবে না।

সুধীরের মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গেল বলিল—এসব মিছে কথা কিরণ।

—কি মিছে কথা?

—এই বাসা করার কথাবার্তা। মতলব করেছিলাম বটে, কিন্তু সে সব আর হবে না।

প্রতি টানেই
আনন্দ উপভোগ
করুন!
অতি উত্তম
ভার্জিনিয়া
তামাক
আপনার
ধূমপানের
আনন্দের জন্য
বিশেষভাবে
মিশ্রিত
Esquire
Filter Tipped
CIGARETTES
MADE IN INDIA
এস্কোয়ার
ফিলটার টিপ্‌ড্

কিরণ বলিল—কেন হবে না—আলবত হবে। মাইনে-খাওয়া লোকে কখনও যত্ন করে? তোমার শরীরের দশা দেখে যে কান্না পায়। আমি তোমাকে কখনো একলা ছেড়ে দেব না।

—কিন্তু খরচ চালাবো কোত্থেকে?

—ও! বলিয়া কিরণ গম্ভীর হইল।

—কথা বলো না যে!

কিরণ কহিল—আমার খরচ বড্ড বেশী, আমায় নিয়ে কাজ নেই। বেশ তো, মাকে নিয়ে যাও। আমি যাব না, কক্ষনো তোমার বাসায় যাব না এই বলে দিলাম।

বলিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল।

সুধীর বলিল—রাগ হল? কতদিন বাদে এসেছি, আর এইরকম কষ্ট দিচ্ছ?

—আমি কষ্ট দিই, আর তো কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না, সেই ভালো। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিল—দু বছরের মধ্যে কখানা চিঠি দিয়েছ? দশখানা কি এগারখানা। সব বেঁধে ঐ বাক্সর মধ্যে রেখে দিইছি। বিকেলবেলা এসেছ, তখন থেকেই ভাব দেখছি। বুঝি—বুঝি—সব বুঝি।

কিরণ চোখ মুছিল।

সুধীর বলিল—বললে তো বিশ্বেস করবে না, আমি কি করব?

—কি আর করবে— তিন মহল বাড়ির ভাড়া জোটে, চাকর-বাকরের মাইনে জোটে, কেবল...থাকগে।

বলিতে বলিতে কিরণ চুপ করিল।

—তিন মহল বাড়ি ভাড়া করেছি আমি?

কিরণ বলিল হ্যাগো, আমি সব জানি।

সুধীর বলিল—না, লুকব না—আর কি জান বলো তো?

—মাইনে ছাড়া উপরি পাও, রোজ টাকায় আর নোটে পকেট ভর্তি হয়ে যায়। বলো ঠিক কি না?

সুধীর বলিল—ঠিক।

—ঢাকছিলে যে বড়!

সুধীর হাসিল।

বলিল—দেখছিলাম, তোমরা কে কি রকম দরদি—অভাবের কথা শুনে কে কি বল। বাসা ভাড়া হয়ে গেছে কিরণ, নিয়ে যাব না তো কি! তোমাদের সব্বাইকে নিয়ে যাব।

কিরণ রুখিয়া বলিল—আমি যাব না, কক্ষনো যাব না—বলেছি তো। খুকিকে কোলে নিলে না, বিকেল থেকে একটিবার হাসছ না, দুঃখটা কিসের শুনি? টাকাকড়ি হয়েছে—ছাই টাকা, আমরা তোমার টাকা চাইনি।

তখনও ম্লান হাসি ঠোঁটের ওপর ছিল।

সুধীর বলিল—এই যে কত হাসছি, দেখছ না? এত ঝগড়াও করতে পার তুমি, তোমার ও-স্বভাবটা আর বদলাল না!

—তোমার স্বভাব বদলেছে, সেই ভালো।

বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া সুধীর বলিল—সত্যি, আর রাগারাগি নয়। আজকে সারাদিন বড় কষ্ট গিয়েছে।

কিরণ বলিল—তবু তো একদন্ড জিরোন নেই এতখানি রাত অবধি।

—কি করব বলো? গাঙ্গুলিমশায় নাজোড়বান্দা—ছেলের চাকরি করে দিতে হবে। বলে এলাম, হেমন্তকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাব। কেশব ঘোষ, রাম মিত্তির, তারক চক্কোত্তি, সকলের চার সনের খাজনা বাকি—তার কড়াক্রান্তি হিসেব হয়ে গেল— কাল সকালে সব আসবেন—মিটিয়ে দিতে হবে। শ্রীদাম মল্লিক মশাই আপ্যায়ন করে বসিয়ে ঠিকানা টুকে নিলেন, গঙ্গাস্নানের যোগে সপরিবারে আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন। ক্লাবের ছেলেরা কাল মিটিং করবে, তাদের সিন-ড্রেসের এস্টিমেট হবে। বড়লোকের হাঙ্গামা কত! সবারই গরজ বেশী, কেউ ছাড়েন না, অব্যাহতি কোথায়?

এই সব বাজে কথা শুনিতে কিরণের মন চাহিতেছিল না।

বেশ করেছ—বড় কাজ করেছ। বলিয়া হঠাৎ ঘুমন্ত মেয়েকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিয়া হাসিতে হাসিতে হুকুমের সুরে বলিল—মেয়ে কোলে নাও—তোমার মতো অধৈর্য নয়, দেখো তো কেমন। নাও।

সুধীর কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করিল না। বলিল—আবার জেগে ওঠে এক্ষুনি কান্নাকাটি শুরু করবে। এ সব কাল হবে। ভারি ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন শুই।

ঠিক তাহার ঘণ্টা দুই পরে সুধীর খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। হেরিকেনের জোর কমানো ছিল, উস্কাইয়া দিয়া দেখিল—মেয়ের পাশে কিরণ বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। একখানা চিঠি লিখিল :

কিরণ, আমার সম্বন্ধে কিছু ভুল শুনিয়াছিলে। চাকরি পাইয়াছিলাম, তবে দেড়শ নয়—চল্লিশ টাকা। বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম—উহা তিনতলা নয়, পাকা মেঝে, চাঁচের বেড়া, টিনের ঘর। কিন্তু বাজারে মন্দা বলিয়া আজ সাতদিন চাকরির জবাব হইয়াছে। তোমাদিগকে লইয়া একসঙ্গে থাকিব। এই আশায় বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু যে অর্ধেক ভাড়া অগ্রিম দিতে হইয়াছিল, সেইটাই লোকসান। দু'বছর যে কষ্ট গিয়াছে তাহা ভগবান জানেন। শহরে বসিয়া আর উঞ্ছবৃত্তি করিতে পারি না, তাই দু-একদিন জিরাইতে আসিয়াছিলাম।

এই মাসের মাহিনার মধ্যে হোটেল-খরচ, বাসা-ভাড়া, আপিস-দারোয়ানের দেনা এবং বাড়ি আসিবার ট্রেন-ভাড়া বাদে সম্প্রতি হাতে এগার টাকা বার আনা আছে। চিঠির সঙ্গে দশ টাকার একখানা নোট গাঁথিয়া রাখিয়া যাইতেছি। উহা হইতে খুকির জন্যে গিনি সোনার হার, কেশব প্রভৃতির খাজনা শোধ, ড্রামাটিক ক্লাবের সিন-ড্রেস, গাঙ্গুলি-পুত্রের কলিকাতার রাহা খরচ এবং বাবা ও তোমার যদি অপর কোনো সাধ বাসনা থাকে, সমাধা করিও। আমার জন্য চিন্তা নাই—নগদ সাত সিকা লইয়া রওনা হইলাম।

পরদিন নিবারণ বলিতে লাগিলেন—আপিসের কাজে ঐ তো মুশকিল। দুপুর রাত্রে টেলিগ্রাম এসে হাজির, ভোর বেলা ইস্টিশানে পোঁছে দিয়ে এলাম। ওকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সাহেবের বিশ্বাস নেই—আপিসের হেড কিনা।

মনোজ বসু

মানব সান্যাল

মনোজ বসুর 'বাঘ' এবং 'নতুন মানুষ' গল্প-দুটি যখন প্রায় একই সময় প্রবাসী ও বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার অনেক আগেই বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগের সূচনা হয়ে গিয়েছে। প্রথম যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত জীবনাচরণের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল 'কল্লোলের' সংশয়াতুর মানসিকতা। এবং সেই সংশয় থেকে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন জীবনবোধ, যা 'কল্লোলের' বিদ্রোহী তরুণ পথিকদের রোমাণ্টিক ভাবালোকে আধুনিক নগর-সভ্যতার কৃত্রিম জীবনাচরণের ট্র্যাজেডিকে এক নতুন রূপে প্রতিবিম্বিত করেছিল।

মনোজ বসু কিন্তু কল্লোল যুগের অব্যবহিত পরেই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েও বিস্ময়করভাবে কল্লোলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রইলেন। রবীন্দ্রনাথ-শরচ্চন্দ্রের উত্তর-সাধকরূপেই তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভ। নগর-সভ্যতার কৃত্রিমতায় কল্লোল দেখেছিল মানুষের ট্র্যাজেডি। আর মনোজ বসু গ্রামবাংলার স্নিগ্ধ-শ্যাম প্রকৃতির পরিবেশে, প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনাকে ফুটিয়ে তুললেন তাঁর লেখনীতে।

অথচ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের বহু-বিচিত্র অগ্রগতিকে যাঁরা গভীরতম জীবন-চৈতন্য এবং বহুমুখী কলাবিধি ও ও *আঙ্গিক-নির্মিতির উদ্ভাবনে এক সার্থক* ভবিষ্যতের পথে ত্বরান্বিত করেছেন মনোজ বসু সেই আধুনিক ছোটগল্পকারদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

সংকীর্ণ পরিধি, অত্যল্প সময়সীমা, কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে গল্পের মূল বক্তব্যের অবতারণা, এবং আকস্মিক অথচ পরিপূর্ণ একটি ইঙ্গিতে সমাপ্ত এই হল আধুনিক ছোটগল্পের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য।

বস্তুত, আধুনিক ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উপাদান বা উপকরণ বড় কথা নয়, বরং আঙ্গিক-নির্মিতির বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষা এবং একটা গূঢ়ভাবের দ্যোতনায় গীতি-রসের স্পন্দনেই আধুনিক ছোটগল্পের সার্থকতা।

মনোজ বসুর প্রত্যেকটি ছোটগল্পে এই প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি আশ্চর্য নিষ্ঠার সংগে অনুসৃত। তাঁর খদ্যোৎ সংকলনের গল্পগুলি, যেগুলি তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিণত জীবনবোধের ফলশ্রুতি, সেই গল্পগুলিতে একটি নিটোল, ভরাট গল্পই মূল লক্ষ্য হয়ে না দাঁড়িয়ে বরং এক গভীর ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত নাটকীয়-তার আকস্মিক চমক, অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের বিচিত্র রস, এপিগ্রামের ধারাল শরাঘাত এবং সর্বোপরি এক বৃহৎ জীবনচৈতন্যের উপলব্ধি খণ্ড খণ্ড ভাবরূপের মধ্যে সামগ্রিক জীবন-সত্যকে আভাসিত করেছে।

মনোজ বসুর ছোটগল্পগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। দাম্পত্য-প্রেমের গল্প, ইতিহাসাশ্রয়ী রোমাণ্টিক গল্প এবং রাজনৈতিক গল্প। আর এই তিন ধরণের গল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনচৈতন্যের বিবর্তনের ধারাটিকেও সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

মনোজ বসুর অনুভূতিপ্রধান শিল্পী-মানসে গ্রামবাংলার প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ মানুষের স্বাভাবিক সুখ-দুঃখের কাহিনী স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। তাই পরবর্তীকালে যখন তাঁর দৃষ্টির পরিধি প্রসারিত হয়েছে, তাঁর জীবন-চৈতন্যের বৃহত্তর দর্পণে যখন দেশ ও সমাজের চেহারাটা ধরা পড়েছে, তখনও তাঁর ভাবলোকের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে প্রকৃতি-সান্নিধ্যে লালিত সহজ, সরল স্বাভাবিক মানুষ। তাদের জীবনের রোমান্স, মাধুর্য, বিরহ-মিলন সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, বিস্ময়-বেদনা স্মৃতি-স্বপ্নের খণ্ড খণ্ড ছবি তাঁর রোমাণ্টিক শিল্পী-মানসে একদিন রহস্য-সুন্দর রূপ নিয়ে ধরা পড়েছিল।

মনোজ বসু মূলত রোমাণ্টিক এবং আশাবাদী। তাই যা প্রত্যক্ষ শুধু তাকেই একমাত্র জীবন-সত্য বলে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর রোমাণ্টিক শিল্পী-মানসে জীবন-সত্য যে রহস্যের অবগুণ্ঠনে ধরা পড়ে, তাঁর ভাবলোকে জীবনের যে রহস্য-সুন্দর রূপটি ফুটে উঠে তাকেই তিনি রূপ দেন তাঁর ছোটগল্পে। বনমর্মর, প্রেতিনী ইত্যাদি গল্পগুলি তাঁর রোমাণ্টিক শিল্পীমানসের বিস্ময়কর উদাহরণ।

মানুষ কত সাধে, কত স্বপ্নে নীড় রচনা করে। কিন্তু অকস্মাৎ সেই স্বপ্ন-সাধের নীড়ে নেমে আসে দুর্ভাগ্যের অভিশাপ। প্রকৃতির নিষ্ঠুর আঘাত আর মানুষের অবিচারে, অত্যাচারে তার জীবন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। মানুষ চোখের জলে প্রশ্ন করে কেন এই দুঃখ? কেন এই দুর্ভাগ্যের অভিশাপ? মনোজ বসুর ছোট-

গল্পগুলি মানুষের এই অন্তহীন প্রশ্নে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের প্রচেষ্টায় তাঁর জীবন-দৃষ্টি ক্রমশ ব্যষ্টিজীবন থেকে সমাজ, রাষ্ট্র এবং দেশে প্রসারিত হয়েছে। এমনি করেই তাঁর ভাবলোক ব্যষ্টিজীবনের সংকীর্ণ পরিধিতে সীমিত না থেকে ক্রমশ এক সামগ্রিক জীবন-চৈতন্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

উলু, স্বপনের খোকা, অশ্বত্থমার দিদি, রায়রায়ানের দেউল, শ্রীবাসুদেবায় প্রভৃতি তাঁর প্রথমদিকের লেখা গল্পগুলি থেকে শুরু করে তাঁর শেষ পর্যায়ের লেখা সীমান্ত, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাজনৈতিক গল্পগুলিতেও সেই একই প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণের ব্যাকুলতা। শুধুমাত্র গল্পের পৃষ্ঠ-ভূমি ব্যষ্টি ও পারিবার জীবনের পরিধি থেকে দেশ ও সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।

তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'বনমর্মরের' গল্পগুলিতে এক রোমান্টিক কাব্যানুভূতি সূক্ষ্ম গীতিরসের স্রোতধারায় স্পন্দিত। গল্পগুলি বিশুদ্ধ রোমান্সের স্বপ্নলোকে অধিষ্ঠিত, কিন্তু রোমান্সের স্বপ্নাবেশ জীবনের গভীরতম উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। 'রাত্রির রোমান্সের' গার্হস্থ্য প্রেম-অভিমানের রস-মধুর চিত্র, কিংবা 'পিছনের হাতছানির' স্নিগ্ধ সমাবেরসের কাহিনীই হোক, আর বনমর্মরের রোমান্টিক আরণ্য-চৈতন্যের রহস্য-লোকই হোক, জীবনসত্য তার রোমান্টিক ভাবলোকে এক রহস্য-সুন্দর রূপ নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নীড়-শ্রয়ী বাঙালীর দাম্পত্য প্রেমের রোমান্স রচনায় তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। 'একদা নিশীথকালে', 'রাত্রির রোমান্স' 'পিছনের হাতছানি', 'ফার্স্টবুক ও চিত্রাঙ্গদা', 'চিরবিদায়', 'পিনাল কোড' প্রভৃতি গল্পগুলিতে তিনি বাঙালীর স্নিগ্ধমধুর কৌতুক-রসোচ্ছল দাম্পত্য-জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র এঁকেছেন নিপুণ শিল্পীর তুলিতে।

'খদ্যোৎ' সংকলনের গল্পগুলি তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। 'খদ্যোতের' পর্যায়ে লেখকের রোমান্টিক কাব্যানুভূতি এক নতুন শিল্পাদর্শে রূপান্তরিত হয়ে গভীর মননশীলতা এবং তীব্র, তীক্ষ্ম জীবন-সমালোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। গল্পগুলি প্রতীকের মাধ্যমে এবং একটি নিগূঢ় তত্ত্বের ইঙ্গিত কিংবা এক গুহা-নিহিত সত্যের ব্যঞ্জনায় কোন অনুকূল উপকরণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনার চেয়ে ব্যঞ্জনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। লেখকের ব্যক্তিত্বের দর্পণে জীবন-সত্যের যে প্রত্যয়রূপ ধরা পড়েছে, তা বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে বিচিত্র আঙ্গিক-নির্মিতির দ্বারা বৃহত্তর জীবনচৈতন্যে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্প যেন জীবনের উদ্দেশ্যে এক-একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। লেখক প্রতীকের আলো-আঁধারী লীলায় জীবনের এক-একটি খণ্ডসত্যকে প্রকাশের অভিলাষী। এই গল্পগুলিতে কোন নিটোল গল্প নেই। একটুকরো ঘটনা, একটি বিশিষ্ট ভাবানুভূতি কিংবা এক বিশেষ সংস্থান চলমান জীবনের এক-একটি ভাব-মূর্তিরূপে ধরা দিয়ে তাঁর ভাবানুভূতিতে এক নিগূঢ় সত্যের ব্যঞ্জনায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অসময়, শ্রীবাসুদেবায়, বাতুলাশ্রম, ঘড়ি-চুরি, পদ্ম, পোস্টমাস্টার, ভুবনমোহন, চাবুক ইত্যাদি গল্পগুলি লেখকের পরিবর্তিত শিল্পাদর্শের সার্থক প্রকাশ।

এই সংকলনের কোন কোন গল্পে ঘটনা ও চরিত্র উভয়দিক থেকে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাকস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'কুন্তলা সেনের প্রেমিক' গল্পটিকে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাকসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে।

আবার কতকগুলি গল্পকে সমকালীন দেশ ও সমাজের ভাষারূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'জননী জন্মভূমিশ্চ' 'কন্ট্রোল আমলে', 'লঙ্গরখানা', 'স্বাধীন ভারতে' 'মুখস্থ বক্তৃতা', 'রাজবন্দী' 'গান্ধিটুপি' প্রভৃতি গল্পে লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ ও কাল সচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি, মনোজ বসু রোমান্টিক জীবন-শিল্পী। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি তাঁর মানস-লোকের মর্মবাণীকেই নব নব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে রূপায়িত করেছে। বিবাহিত প্রেমের স্নিগ্ধ কাহিনী, পল্লী-প্রকৃতির দাক্ষিণ্য, অজ্ঞাত ইতিহাসের আলোছায়ার রূপায়ণ, কিংবা সমকালীন দেশ ও সমাজের ভাষা রচনা—সবই তাঁর মানস-লোকের আত্ম-কথন। মাথুর, বন-মর্মর, রায়রায়ানের দেউল এবং নিমন্ত্রণ প্রভৃতি গল্পগুলি তাঁর বিচিত্রমুখী এবং লীলাচঞ্চলী শিল্পসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'রায়রায়ানের দেউল' গল্পটিতে লেখকের বিশুদ্ধ রোমান্টিক কল্পনা অপূর্ব জীবন-রসে আর্দ্র হয়ে উঠেছে। গল্পটি এক ব্যক্তিপুরুষের আত্ম-প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ কাহিনী। দরিদ্র রামেশ্বর বাড়িতে তরুণী-বধূ এবং ছোট বৈমাত্র ভাইকে রেখে জীবিকার অন্বেষণে ঘর ছেড়েছিল, কিন্তু ঘরে ফিরে এসে দেখে তার ঘর শূন্য। দুঃখে এবং ঘৃণায় সে বৈমাত্র ভাইকে নিয়ে দেশত্যাগী হল। বিশ বছর পরে আবার যখন সে গ্রামে ফিরে এলো, তখন সে জায়গিরদার রায়-রায়ান। জায়গির নিয়ে সংঘর্ষ হল ভরত রায়ের সঙ্গে। ভরত রায় পরাজিত হলেন। তাঁর কন্যা মঞ্জরী হল রামেশ্বরের অন্তঃ-পুরে বন্দিনী। মঞ্জরীকে দেখে রামেশ্বরের মনে সাধ জাগল নতুন করে সংসার গড়ার। মঞ্জরীকে কেন্দ্র করে এক গৃহমন্দির প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল রামেশ্বর। সেই গৃহমন্দিরে দেবী-প্রতিষ্ঠা আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য মহাসমারোহে গড়ে উঠতে লাগল রায়রায়ানের দেউল, কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাত এলো শত্রুকন্যার হাত ধরেই। মিলনের ব্যর্থ প্রতীক্ষার লগ্ন-শেষে রামেশ্বর জানতে পারল তার কল্পনার মানসী তার বৈমাত্র ভাইএর বাগদত্তা বধূ। ভাগ্যের সংগে নিষ্ঠুর সংগ্রামে পরাজিত সেই স্বরাট পুরুষ তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিশাল কীর্তি রায়রায়ানের দেউলকে নিজের হাতে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে দীঘির অতল জলে ঝাঁপ দিল।

সমগ্র গল্পটিতে এক মহৎ ট্র্যাজেডির চিত্র কি আশ্চর্য দক্ষতার সংগে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মানুষের নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবনের অভিশাপ, নির্মম নেমেসিসের উদাত্ত খল এবং তার ট্র্যাজিক পরিণতি লেখকের রোমান্টিক কল্পনাকে জীবন মূল্যে সমৃদ্ধ করেছে।

মনোজ বসুর ছোটগল্পগুলিতে গীতিকবিতার রোমান্সরসের স্বপ্নাবেশ এবং দুঃখস্পর্শকাতরতা জীবন-সত্যের উপলব্ধি ও বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনার সংগে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

তাই বোধহয় লেখকের জীবনবোধের প্রারম্ভ যে বিশুদ্ধ রোমান্সের কুসুমিত স্বর্গরাজ্য, পরিসমাপ্তিতে সেই স্বর্গ-রাজ্যের মানসরূপসী নিষ্ঠুর বাস্তবের পদতলে অশ্রুসিক্ত মূর্তিতে বিধ্বস্ত, ছিন্নভিন্ন।

মনোজ বসুর নিজের কথাতেই বলা যায়, 'চোখের কত অশ্রু, অন্তরের কত উল্লাস দিয়ে যে আমার...গল্পগুলির সৃষ্টি।'

বিবাহের পর ব্যোমকেশ কয়দিন হইতে আমার কাছে একটা চাকুরির জন্য ঘুরিতেছে। বলিলাম,—এখানে আমি চাকরি পাবো কোথায়? তবে কলকাতায় যেতে চাও তো মামার কাছে লিখে দিতে পারি।

বড়বাজারে পিপুলের দোকান করিয়া মামা বিস্তর পয়সা করিয়াছেন। তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন : পরের জন্য মাথা না ঘামাইয়া নিজেই সোজা চলিয়া এস। গ্রামে বসিয়া কী কেবল পচিয়া মরিতেছ? চাকরি করিতে চাও তো একটা বন্দোবস্ত অনায়াসেই করিয়া দিতে পারিব। লোক আমারও চাই বটে, কিন্তু অনাত্মীয়, অপরিচিতকে আমার একেবারেই ভরসা হয় না। কি করিব, ব্যবসা করিতেছি। কতো লিখিব, নিজে তুমি একবার আসিতে পারো না?

মামার চিঠি পাইয়া মনে-মনে হাসিলাম। গ্রামে বসিয়া পচিয়া মরিতেছি বটে!

ব্যোমকেশকে বলিলাম—চাকরি করে কী হবে? তোমাকে কিছু জমি ছেড়ে দিচ্ছি, চাষ করো! খাজনা বাবদ কিছু চাই না, ফসল হলে কিছু ভাগ দিয়ো না-হয়। কেমন, রাজি?

ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিল। গরু-লাঙল কিনিবার পয়সা নাই, আমিই ধার দিলাম। কিছু মহৎ কীর্তি অর্জন করিতেছি এমনিভাবে কহিলাম,—জমিতে সুবিধে না করতে পারো তো এই ধার তোমার শোধ করতে হবে না।

মহাসমারোহে ব্যোমকেশ লাঙল ঠেলিতে লাগিল। জাঁকালো ভাষায় খবরের কাগজে এক রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলাম। বি-এ পাশ-করা ছেলে চাকুরির খোঁজে ফ্যা-ফ্যা না করিয়া নিজ হাতে জমি চষিতেছে—বড়-বড় হেডলাইনে খবরটা দিগ্বিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। ব্যোমকেশ ভাবিল, কী যেন একটা করিতেছি! আমি ভাবিলাম, মামার উপর খুব একটা প্রতিশোধ নেওয়া হইল যা হোক।

বাসন্তী প্রথমে এখানে আসিতে রাজি হয় নাই। কিন্তু চারিদিকের খোলা মাঠ, দূরে নদী ও নতুন ছবির মতো ঝকঝকে বাড়িখানি দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে শহরে মানুষ হইয়াছে, গ্রামের কথা শুনিতেই তাহার মনে গরুর গাড়ির ঢাকার একঘেয়ে করুণ আর্তনাদের মতো একটা ক্লান্তিকর অবসাদ আসিত। কিন্তু অপর্যাপ্ত বাতাসে আঁচল ফুলাইয়া নদীর পাড়ে যখন সে আসিয়া দাঁড়াইল তখন স্পষ্ট অনুভব করিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি আরো কালো ও গভীর এবং শরীরের শহুরে রুক্ষশ্রী সবুজ ও ঠান্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এতো বড়ো সাম্রাজ্যে তার কর্তৃত্ব অসীম : তাহার মুখের একটি কথায় জন-মজুর একশোখানা কাজ নিমেষে সমাধা করিয়া আনে। দেখিতে-দেখিতে তাহার হুকুমে সামনের জমিটা ফুলন্ত বাগান হইয়া উঠিল; দুইটি সিসু গাছ যেখানে ঘেঁসা-ঘেঁসি হইয়া ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নিচে বাঁশের একটি মাচা বাঁধা হইল—সেখানে সকাল বেলা সে পড়িবে ও বিকেলে বেড়াইয়া আসিয়া বিশ্রাম করিবে। বেড়ার গা বাহিয়া মালতীর লতা উঠিল, লোক লাগাইয়া আগাছা দূর করিয়া ছোট উঠানটি সে তাহার পায়ের তলার মতো নরম তকতকে করিয়া তুলিল। দিল্লির দেওয়ানি-খাস-এর সি লি ঙে র মতো বাসন্তীও এইখানে ফুলের অক্ষরে লিখিয়া দিল যে, স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে তো এইখানে, এইখানে!

বিবাহের দান-সামগ্রীর যাবতীয় জিনিস আসিয়া পৌঁছিল—দক্ষিণের ঘরটাকে ছোট-খাটো একটা ড্রয়িং-রুম বানাইয়া ফেলিলাম। বন্ধু-বান্ধবের বালাই নাই, আমরাই পরস্পরের নির্জনতা কথায় ও স্পর্শে, হাসিতে ও দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি। বাসন্তী যখন একা ঘরে বসিয়া রান্না করে ও আমি যখন একা ঘরে বসি
গল্প লিখি, তখনো আমরা নির্জন নই
যখন কিছু নেহাৎ করি না, তখনো আম
ও আলো, তারা ও অন্ধকার মিশি
আমাদের পারিপার্শ্বের শূন্যতাকে স্বপ
মতো আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

মা মারা যাইবার পর বাবা একা-এ
এইখানে বসিয়া বিস্তৃত আকাশের স
অপরিসীম বিরহ ভোগ করিতেছিলে
আমি তখন কলিকাতায় মেসে থাকি
কলেজে পড়িতেছি ও উনবিংশ শতাব্দ
শেষ দশকের যুবকের মতো কলেজ ঠিক
পালাইলেও শনিবার-শনিবার শ্বশুরাল
নিয়মিত আতিথ্য নিতেছি। এবং আশ
এই, গল্পে-গুজবে খাওয়া-দাওয়ার অস
ধানে রাত্রি যখন বেশি করিয়া ফেলিত
ও জোরে ঘন্টা বাজাইয়া লাস্ট ট্রামকে য
অনায়াসে চলিয়া যাইতে দিতাম, তখন
করিয়া মনে পড়িয়া যাইত যে আজ র
মেসে যাইবার কোনো পথ-ই আর খে
রাখি নাই। এবং শনিবারের রাতটাই য
যাই-কি-না-যাই এমনি মিথ্যা উত্তেজ
মধ্য দিয়া কাটাইয়া দিলাম, তখন নিশি
হইয়া রবিবারের রাতটাই বা ঘুমাইয়া লই
কী হইয়াছে! এমনি এক সোমবার ভো
অনিদ্রাক্লিষ্ট চক্ষু লইয়া মেসে ফিরি
আসিয়া দেখি আমার নামে একটা টেলি
কখন হইতে পড়িয়া আছে। খবর আর কি
নয়, বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন।

সে সব অনেক কথা। শ্বশুর-মহ
এখানেই একটা কাজ দেখিয়া ল
বলিলেন—মেয়েকে চোখের কাছে রাখি
ও পচা পুকুরের জল ঘাঁটিতে দিবেন
এমনি একটা অজুহাতে আমার জন্যে বা
ভাড়ার টাকা গুনিতেও রাজি হইয়া গেছে
কিন্তু গ্রামে যাইবার কী যে গোঁ ধ
বসিলাম, মনে হইল, ত্রেতা যুগে রাম হ
অবতীর্ণ হইলে সেই জোরে অনা
হরধনু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলি
পারিতাম। গ্রামে তো আসিল
বাসন্তীকে লইয়া আসিলাম। সে য
কেন না নাসাগ্রভাগ কুঞ্চিত করুক,
বড়ো আকাশ ও মাঠ-নদী ভরিয়া
প্রচুর জ্যোৎস্না তাহার দুই চোখে
কুলাইয়া উঠিতেছে না। বাপের বা
নিতান্তই সে পরগাছা ছিল, কিন্তু এই

সে সর্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে কোথায় যে তাহার আসন, এতো দিনে তাহা আবিষ্কারের পর তাহার আনন্দের আর সীমা নাই।

বাসন্তীকে লইয়া আসিবার সময় শ্বশুর-মহাশয়ের সঙ্গে ছোটোখাটো একটা বচসার সূত্র ধরিয়া ভীষণ কলহের অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গেল। তিনি সরাসরি বলিয়া বসিলেন : বাসন্তী যদি আমার কথার অবাধ্য হয়, তবে ওর মুখ আমি কখনো দেখবো না। বাসন্তীর মুখের দিকে তাকাইলাম,—সে ধীরে আমার পাশে সরিয়া আসিল। মেয়ের এই দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, মুখ বিকৃত করিয়া অস্ফুট একটা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। বাসন্তীকে লইয়া ট্যাক্সি করিয়া স্টেশনের পথে আসিতে আসিতে কহিলাম,—তুমি রামায়ণে সীতার মতোই একটা অসমসাহসিক সতীর দৃষ্টান্ত দেখালে।

রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বিয়ের সময় শ্বশুর-মহাশয় সখ করিয়া যাহা যৌতুক দিয়াছিলেন, স্পষ্ট রূঢ় কণ্ঠে তাহা দাবী করিয়া বসিলাম। খাট-টেবিল, আলনা-দেরাজ, বাসন-কোসন হইতে শুরু করিয়া বাসন্তীর চুলের পিন ও আমার ফাউন্টেন পেনের ক্লিপটি পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে শ্বশুরমহাশয় কড়া করিয়া একটা চিঠি দিয়াছিলেন বটে, যে এই সব জিনিস ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিতেও তাঁহার ঘৃণা হইতেছে, কিন্তু নিজের ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিবারো যে কোনোকালে তাঁহার অধিকার ছিল না সবিনয়ে এই কথাটাও তাঁহাকে জানাইয়া রাখিলাম। যাহা হোক, সেইখানেই যবনিকা পড়িল। কিন্তু বাসন্তী এতেও ক্ষান্ত হইল না, — সময়ে-অসময়ে কেবল নানা জাতীয় ক্যাটালগ লইয়া নাড়া-চাড়া করে, আর এটা-ওটা ফরমাজ করিয়া কলিকাতার সাহেব-পাড়ার দোকানগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বিয়েতে নগদ যাহা কিছু পাইয়াছিলাম তাহা দিয়া বইয়ে-আসবাবে ঘর-দুয়ার ভরিয়া ফেলিলাম। পা-পোষের মতো পুরু কার্পেট হইতে শুরু করিয়া দেয়াল-জোড়া বড়ো-বড়ো দিশি-বিলিতি ছবিতে ঘর-দুয়ার গমগম করিতে লাগিল।

নিজের শরীর সম্বন্ধে যতোটা না হোক, গৃহ-প্রসাধনে বাসন্তী একেবারে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি কিন্তু গৃহ ছাড়িয়া গৃহস্বামিনীকেই শুধু দেখিতেছি। বাসন্তীকে দেখিতে এখন কতো যে সুন্দর হইয়াছে ভাবিয়া তৃপ্তির কূল পাইতেছি না। প্রত্যেক ছবির প্রকৃত আবেদন যেমন তাহার পটভূমিতে, তেমনি অন্তরালহীন আকাশের প্রতিবেশের মধ্যে এতোদিনে তাহার সত্যিকার রূপ উদঘাটিত হইল! পায়ের রক্তাক্ত নখকণা হইতে সুরু করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত ভুরু দুটির চঞ্চল সংকেতে লাবণ্যের তরল একটি নদীরেখা নিঃশব্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বলিতাম,—এতো সব জিনিসপত্রে ঘর বোঝাই করছ, এ তোমায় দেখবে কে? লোককে দেখাতে না পারলে বিলাসিতার সুখ কী!

বাসন্তী কোমরে আঁচলটা জড়াইতে-জড়াইতে কহিত,—কে আবার দেখবে? আমি আর তুমি।

হাসিয়া বলিতাম— নিজেদের দেখার জন্যে নিজেরাই তো যথেষ্ট আছি। এ-সব বাজে আড়ম্বরে নিজেদের খালি সংকীর্ণ করে রাখা!

বাসন্তী সেই সব কথা শুনিবারই মেয়ে বটে! ততোক্ষণে পেট্রোম্যাকসটা ফিট করিলে তাহার কাজ দিবে।

জীবনে নতুন একটি আবহাওয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত গাঢ়, প্রথম চুম্বনের মতো রোমাঞ্চময়। চারিদিকে কেমন একটা মুক্তির নিমন্ত্রণ পাইতেছি, আকাশের প্রত্যেকটি তারা বাসন্তীর দেহের প্রত্যেকটি স্পর্শের মতো পরিচিত, ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বাসন্তীর দেহে নতুন স্বাদ, আমার অনুভূতিতে নতুন তীব্রতা! গ্রামের বিরাট সংগহীনতায়ও নিজেদের কিছু নির্জন লাগে না; যখন আমি ঘরে বসিয়া লিখি ও বাসন্তী রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করে, তখন প্রকৃতি শব্দে ও নিঃশব্দে আমাদের মতো পরস্পরের কাছে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। অথচ শহরের জন-বহুল বিপুল উৎসব-আয়োজনের মধ্যেও নিজেকে কতো একা ও অনর্থক মনে হইয়াছে।

এই নতুনতরো নেশা ছাড়িয়া আমি শহরে গিয়া চাকুরি করিব ও রাস্তায় চলিতে প্রতি মুহূর্তে গাড়ি-ঘোড়ার উৎপাত হইতে বাঁচাইয়া চলিবার স্নায়বিক উত্তেজনায় দিনের পর দিন ক্লান্ত হইতে থাকিব—শ্বশুরমহাশয় আমাকে কী ভাবিয়াছেন!

বাবা নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু এই ছোট সুন্দর বাড়িখানি, বিঘে পাঁচ-সাত আবাদি জমি, কয়েক ঘর প্রজা—এই দিয়াই আমি আমার জীবনকে সুদীর্ঘ একটি রবিবারের সুরে ভরিয়া নিতে পারিব। চাকুরি করিব কোন দুঃখে? জীবিকা-নির্বাহের ক্ষমাহীন কঠিন প্রতি-যোগিতার দ্বন্দ্ব এড়াইয়া এই যে অবারিত একটি আলস্য ভোগ করিতেছি কী বলিয়া ইহার তুলনা দিব! আমার এই অবকাশের আকাশ হইতে তারার স্ফুলিঙ্গের মতো কতো কাহিনী, কতো ঘটনা, কতো চরিত্র মূর্তিময় হইয়া উঠিবে কে বলিতে পারে!

রাত করিয়া গাছপালা ঝাপসা করিয়া নামিয়া আসিল। শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়া নতুন একটা গল্প লিখিতেছি। ইজিচেয়ারের গভীর কোলে ডুবিয়া গিয়া বাসন্তী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কান পাতিয়া দূরে নদীর তরল কোলাহল শুনিতেছি।

আবছা অন্ধকারে বাসন্তীকে কেমন যেন ক্লান্ত বলিয়া মনে হইল। মনে হইল গ্রামের এই অজস্র প্রশান্তি ধীরে ধীরে তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সে হয়তো গভীরতার বদলে বিস্তার কামনা করে—প্রচুর বৈচিত্র্যের মাঝে নিজেকে সে প্রকাশিত, বিকীর্ণ করিতে চায়—এইখানে তাহার আর ভালো লাগিতেছে না। এক-টানা বৃষ্টির শব্দে তাহার দীর্ঘশ্বাসটি স্পষ্ট কানে বাজিল।

পায়রার বুকের মতো তাহার নরম, তপ্ত দেহটিকে কোলে করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। জাগিয়া উঠিয়া সে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। কহিল,—আমার বড্ড ভয় করছে।

বলিলাম—ভয়? ভয় কিসের?

আর সে কথা কহিল না। আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

মোমবাতিটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। চারিদিকের রাশি রাশি কোলাহলও বাসন্তী সহ্য করিতে পারে না, তাহার ভয় করে। জনবিরল মাঠের মধ্য দিয়া ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দাম দীর্ঘশ্বাস তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে, সারারাত ঘুমাইতে দেয় না।

কিন্তু ভোর হইতেই আবার সেই নিঃশব্দতা। বাসন্তী পরিচিত জগতে নামিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়ে। হাসিমুখে জিনিসপত্র ঝাড়ে-পোঁছে, ঘর-দুয়ার ছুরির ফলার মতো ঝকঝকে করিয়া তোলে।

নদী কাল রাত্রে নাকি অনেক দূরে ভাঙিয়া আসিয়াছে—বাসন্তীকে লইয়া তাহাই দেখিতে চলিলাম।

বৃষ্টি পাইয়া ব্যোমকেশের ক্ষেত মাতা-মাতি সুরু করিয়াছে! গাঢ় সবুজে ফিকে সোনালির আভা দিয়াছে দেখা যায়। ব্যোমকেশের স্ফূর্তি আর ধরে না। সেও আমাদের সঙ্গে চলিল।

বেশি দূরে যাইতে হইল না নদীই যা হোক অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে এখনো আর্তনাদ থামে নাই। সর্বাঙ্গ ভরিয়া এখনো তাহার উত্তাল উৎসাহ। ভীষণ খাড়া পাড়! নিচে চাহিলে দস্তুর মতো পা কাঁপিতে থাকে। দাঁড়াইয়া আছ, অমনি তোমাকে বেষ্টন করিয়া মাটিতে প্রকাণ্ড একটা চিড় ধরিয়া গেল, সাবধান না হইলেই অমনি তোমাকে সুদ্ধ গ্রাস করিয়া বসিবে। দূরে চাহিলে মনে হয়, একটা ফিনফিনে সাদা সিল্ক-এর আঁচল ফাঁপাইয়া কে যেন সাঁতার কাটিতেছে—খালি পাড়ের কাছেই তাহার দিগবসনা রাক্ষুসি মূর্তি! কাল শেষ রাত্রের দিকে নটবর ভুমালির ঘরটা নিয়াছে—অল্পের জন্য ছেলেপিলে লইয়া সে বাহির হইতে পারিয়াছিল; চালের কুটাটি পর্যন্ত বাঁচাইতে পারে নাই। নদী একটু জুড়াইলে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে অন্তত তাহার স্ত্রীর গলার হাঁসুলিটা সে উদ্ধার করিতে পারে কি না। স্ত্রী মারা গিয়াছে পর এই একটিমাত্র চিহ্নই সে কোনোক্রমে আঁকড়াইয়া ছিল,—শত অভাবে পড়িয়াও তাহা সে বিক্রি করে নাই। কাহারো বাধা সে মানিবে না, জলটা একটু জুড়াইলেই সে নামিয়া পড়িবে। অমাবস্যা ছাড়িতে আর ঘণ্টা দুই মাত্র বাকি।

বাসন্তী বেশিক্ষণ সেইখানে আমাকে দাঁড়াইতে দিল না। গর্জমান বিরাট নদীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করে। মনে হয় ফেনময় বাহু বাড়াইয়া অলক্ষ্যে সে আমাদের দুজনকে ডাকিতেছে! পায়ের কাছের মাটিতে একটা চিড় ধরিতেই সন্ত্রস্ত হইয়া বাসন্তীকে লইয়া পলাইয়া আসিলাম।
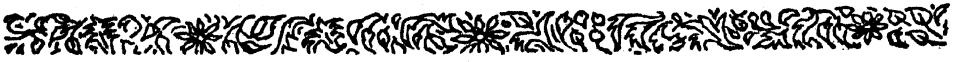
বিকেল হইলেই মা'র কোলে ঘুমন্ত খুকিটির মতো নদীর জল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাসন্তী এতোক্ষণে হাসিয়া কথা কহিতে পারিতেছে। দুজনে আবার বেড়াইতে বাহির হইলাম—ব্যোমকেশ অবশ্য এইবার সঙ্গে আসিল না। চলিতে চলিতে শ্মশান ছাড়িয়া একটা নির্জন মাঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছি। নদী ভাঙা প্রকাণ্ড অশ্বত্থের গুঁড়ির উপর পাশাপাশি দুজনে বসিলাম। সামনেই নদী—এখন দেখিতে নিতান্তই বাঙালি মেয়ের মতো নিরীহ : রুপালি গলায় মৃদু-মৃদু কথা কহিতেছে। যতো ভাবি নদীর দিকে বেড়াইতে আসিব না, ততোই নদী আমাদের কাছে টানিয়া আনে। আর যাইবই বা কোথায়? যেখানে যাইব, সেইখানেই নদী তাহার চঞ্চল ও সুনীল চক্ষু মেলিয়া রাখিয়াছে! দেখিতে-দেখিতে কতো কাছে যে আসিয়া আসিল। আমাদের বাড়ীর পশ্চিমে যে ঝাউগাছের সারি ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া আকাশকে সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, দেখি তাহা কোনদিক ফাঁকা হইয়া গেছে! এখন দক্ষিণটা একেবারে সাদা, সবুজের ঘন নীলের কোথাও এতোটুকু বাধা নেই—সেই অবিনশ্বরতার গাঢ় রঙ। এত বড়ো মূর্তির চেহারা দেখিয়া দুইজনে মনে-মনে ভীত হইয়া পড়ি, কিন্তু সেই ভয় পরস্পরের থেকে লুকাইতে গিয়া আরো সহজে ধরা পড়িয়া যাই।

যে-জায়গাটায় আসিয়া বসিলাম তাহা গাছ-পাতার আড়ালে কোনো একটি কুটিরের নিভৃত আঙিনা। কোনো চাষা-ভুষোর বাড়ি হইবে, নদী কাছে আসিয়া পড়ায় আগেই বিদায় নিয়াছে। ছোট উঠানটি ঘিরিয়া সংসারের ছোট ছোট চিহ্ন এখনো এখানে-সেখানে ছড়ানো আছে দেখিলাম। তাড়া-তাড়িতে সব জিনিস হয়তো সরাইতে পারে নাই—মানুষের প্রাণের চেয়ে কতোগুলি ডালা-কুলোর দাম তো আর বেশি নয়। তবু সেই পরিত্যক্ত, শূন্য ঘরের নিরানন্দ চেহারা দেখিয়া মন ভারি বিমর্ষ হইয়া উঠিল। এখন তাহারা কোথায় উঠিয়া গেছে না জানি!

বাসন্তী হালকা সুরে অনেক সব কথা কহিতে লাগল। সম্প্রতি এখানে সে ছোট-খাটো একটা পাঠশালা করিতে চায়—তিনে মাইনের ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পড়াইয়া তবু যা-হোক করিয়া দিন তাহার কাটিবে। আমি উহার আবদার চিরকাল পালন করিয়াছি, আজো কহিলাম—সরকার-মশায়কে বলে দেব, সামনের বাগানের ধারে তালপাতার ছাউনি দিয়ে একখানা ঘর তুলে দেবেন।

বাসন্তী ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—একটুখানি তো ঘর, তা আবার তালপাতার কেন? রাণীগঞ্জের টালি দেবে।

—একটুখানি বলেই তো তালপাতার বলছি।

—গরীব ছেলেমেয়েরা পড়বে বলেই বুঝি এমনি হেনস্তা করতে হয়? বেশ পাকা দালান হবে—উঁচু ক্লাসের ছাত্র জুটলে তুমিও মাস্টারি করতে পারো,—অবশ্যি আমি যদি দরখাস্ত মঞ্জুর করি। দুজনে কাজ পেয়ে বেঁচে যাবো। এমনি আর ভালো লাগে না।

বলিলাম,—খালি পাকা দালান হলেই চলবে?

—বা, বেঞ্চি-চেয়ার কিনতে হবে না? গ্লোব ম্যাপ, ব্ল্যাকবোর্ড, আলমারি—সে-সব ফর্দ আমি ঠিক করে রাখবো। সরকার-মশায়কে বলে তুমি কেবল টাকা জোগাড় করে দেবে।

—সে যে অনেক খরচ।

—টাকা তবে আছে কী করতে? এ তো আর বাজে কাজে উড়োচ্ছি না, দস্তুর-মতো দেশের কাজ।

—কিন্তু টাকা পাবো কোথায়?

—সরকার-মশায়কে বললেই তিনি বন্দোবস্ত করে দেবেন। কাজ ছাড়া আমি বসে কী করে থাকব? ওদিকে আমার ভারি-জাতের একটা অসুখ করুক, তখন তো উঠে পড়ে খরচ করতে সুরু করবে। বলো, ঠিক কি না।

তাহার একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক বক-শালিক উড়িয়া গেল। পাখার শব্দে অকস্মাৎ নিঃশব্দতাটা হঠাৎ স্বচ্ছ হইয়া আসিল। দূরে খেজুর গাছের মাথায় আকাশের কোলে একটি তারা উঠিয়াছে। সূর্য কখন ডুবিয়া গিয়াছে খেয়াল করি নাই।

অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেই নদীকে পিছনে রাখিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। যতো এগোই, ততোই মনে হয় নদীও যেন নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করিতেছে! পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি নিঝুম কালো নদী বালির বিছানায় গা এলাইয়া ঘুমাইতেছে,—কোথাও যেন এতটুকু নিঃশ্বাসের স্পন্দন নাই। দেখিয়া ভারি নিশ্চিন্ত হইলাম। বাসন্তী আমার দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া যেন হাসিল।

দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যে বাসন্তীর ইস্কুলের বাড়ি উঠিয়া গেল।

বাসন্তীর আনন্দ দেখে কে! নিতাই কামারের দুইটি ছেলে নিয়া সে অ-আ সুরু করিয়া দিল। ইহাদের একটিও যে ভবিষ্যতে হাইকোর্টের জজ হইবে না এমন কথা হলফ করিয়া বলিবার আর সাহস রহিল না।

দুপুরের আগেই বাসন্তী খাওয়া-দাওয়ার পাট তুলিয়া 'মাস্টার' ও ঘড়ি লইয়া ইস্কুলে গিয়া ঢোকে আর নিতাই কামারের দুরন্ত দুই ছেলে অক্ষর ভুলিয়া ততোই ঘরময় দাপাদাপি করিতে থাকে, বাসন্তীর উৎসাহ ততোই বাড়িয়া যায়। শাসন করিবার পদ্ধতিটা তাহার অতিআধুনিক। একটুও রাগ যেন সে নাই, বরং দুরন্ত ছেলে দুইটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমায়-চুমায় অতিষ্ঠ করিয়া উহাদের সায়েস্তা করিতে চেষ্টা করে।

অফিসঘরের কোণটায় বসিয়া আমি তাহা দেখি ও লিখিবার কিছু প্লট খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে একটি সন্তানকামনাতুরা নারীর নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা লইয়া গল্প লিখিবার ভাষা খুঁজিয়া বেড়াই।

গ্রামে সম্প্রতি কে-একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে যাগ-যজ্ঞ করিয়া নদী শুকাইয়া দিবে বলিয়া আমাদেরই সম্মুখের মাঠে তাঁবু গাড়িয়াছে। সেখানে আজ বড়ো ভিড়। পূজা যখন একটা হইবেই, প্রসাদ নিশ্চয় আর বাদ পড়িবে না—অতএব সেইখানে না গিয়া এইখানে বসিয়া ভালুকের মতো ভীষণ দুইটা অক্ষরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া তাহাদের অবয়বের অলৌকিক গঠন-প্রণালীটা আয়ত্ত করিতে হইবে নিতাই কর্মকারের ছেলেরা তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। বাসন্তীর আঁচলের তলা হইতে কখন ছুটিয়া পলাইল।

বাসন্তী বিরক্ত হইবার মেয়ে নয়। কখন আবার ইস্কুলের জন্য উমেদারি করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। এত করিয়াও ছেলেতে-মেয়েতে মিলাইয়া চার-পাঁচটির বেশি সে জোগাড় করিতে পারিল না। নদীতে গ্রাম লোপাট হইতে চলিল, বাসন্তীর হাতে দিগগজ হইবার জন্য কে এখানে সখ করিয়া বসিয়া থাকিবে?

সন্তানকামনাতুরা নারীর সেই গল্পটা আজ রাত্রে ঘুমাইবার আগে বাসন্তীকে শুনাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু নদীর গর্জনের সঙ্গে রাত্রির অপার নিঃশব্দতা মিলিয়া তাহাকে এমন অভিভূত ও ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রস্তাবটা পাড়িবার আগেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার শুইবার ভঙ্গিটা এত করুণ ও কৃশ যে মায়া হইতে লাগিল। নুইয়া পড়িয়া তাহার দেহে—রাত্রির নিঃশব্দতার মতো শীতল দেহে চুমা খাইলাম, কিন্তু সে একটুও সাড়া দিল না। ভাটির নদীর মতো নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল। আশ্চর্য, আমার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল, নদীর এই ক্ষিপ্ত উদ্বেলতা বাসন্তীর যৌবনকে ক্রমে-ক্রমে ম্লান, স্তিমিত করিয়া আনিয়াছে। নদীর লবণাক্ত, তিক্ত স্বাদের কাছে বাসন্তীর দেহের মদিরা অনেকাংশে জলীয়, তাহাতে আর সেই আনন্দময় জ্বালা নাই। নদী এখন এত প্রচণ্ড, এত নিদারুণ, এত অজস্র-উচ্ছ্বসিত যে বাসন্তীকে সে অনায়াসে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই অপ্রতিবাদ পরাভব ইহার আগে আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বাসন্তীর আর সেই লীলা নাই, সেই আবেগের আগুন তাহার নদীর জলে নিভিয়া গেছে। আমি বোধহয় দিনে-রাত্রে নদীর এই উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম—বাসন্তীকে আর চোখে ধরিল না।

গরুর তরি-তরকারি বেচিয়া দিন গুজরাইত, একদিন সপরিবারে সে আসিয়া আমার কাছে ইস্কুল ঘরে থাকিবার মিনতি জানাইল,—কাল রাত্রে তাহার ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার নদীর জলে উজাড় হইয়া গেছে। আজ রাতটা কোনো রকমে কাটাইয়া সে অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে—কোথায় যে যাইবে এখনো তাহা ঠিক করে নাই। বাসন্তীর থেকে চাবি চাহিয়া সরকার-মহাশয়কে দিয়া দরজা খুলাইলাম। উহাদের জায়গা হইল—এবং দেখিতে দেখিতে ইস্কুল ঘরটা বিচিত্র ধর্মশালার চেহারা নিয়া

বসিল। কাহারো নড়িবার নাম নাই। শেষে কেবল মনে হইতে লাগিল, নদী এই হতভাগাদের খুঁজিয়া ফিরিতেছে—উহাদের না সরাইলে হয়তো আমারই দরজার কাছে আসিয়া হানা দিবে! গরুর গাড়ি ডাকাইয়া পোঁটলা-পুঁটলিতে চিঁড়ে-ডাল বাঁধিয়া উহাদের পথ দেখিতে বলিলাম। রাজি না হওয়া ছাড়া উহাদের উপায় ছিল না—উহাদের তাড়াইবার জন্য বাসন্তী এমন বিজাতীয় গোঁ ধরিয়াছে! যদি ক্ষুধার তাড়নায় একদিন সকলে মিলিয়া লুঠ-তরাজ করিয়া আমাদের সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে! উহারা একে একে বিদায় নিল বটে, কিন্তু নতুন গৃহপ্রবেশের সম্ভাবনায় কেহ যে বিশেষ খুশী হইল এমন মনে হইল না। রাজা মিঞা তো ঝাঁজালো গলায় দস্তুর-মতো শাসাইয়া গেল যে, এমন করিয়া যে গৃহহীনদের তাড়ায়, রাক্ষুসী নদী তাহাকেও তাড়াইয়া ফিরিবে!

আমাদের অতিথিবৎসল না হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। কয়েকদিন পরেই আরেক দল লোক আসিয়া হাজির ইস্কুল-ঘরে আজ রাত্রের জন্য তাহাদের ঠাঁই দিতে হইবে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল,—কণ্ঠস্বরটা যে কাহার প্রথমে ঠিক চিনিতে পারিলাম না। জানলা ফাঁক করিয়া দেখিলাম লোকটার পিছনে একটি স্ত্রীলোক ও তাহাকে ঘন করিয়া ঘিরিয়া কতকগুলি শিশু ভিজা কাপড়ে হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে—এত বড়ো আকাশের তলে কোথাও তাহাদের এতটুকু আশ্রয় নাই। লণ্ঠন জ্বালিয়া ছাতা মাথায় দিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম এ আর কেহ নয়, আমারই প্রজা নবীন মাইতি। বুঝিতে বাকি রহিল না, নদী আমারো জমিতে থাবা বসাইয়াছে!

বলিলাম,—ঘরদোর সব গেলো?

নবীন গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—সব বাবু, কোনো রকমে সরে আসতে পেরেছি। আজই এমন ঝড়-বৃষ্টি করে না এলে আরো কিছুদিন থাকতে পারতাম। এখন আপনি জায়গা না দিলে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় যাই বলুন।

পরিষ্কার বুঝিলাম, তাহার কাছে যে বাকি-খাজনা পাওনা ছিল, নদী তাহাও কাড়িয়া নিয়াছে।

ধমক দিয়া উঠিলাম: সময় থাকতে সরতে পারিস নি? জিনিসপত্র কতক তো অন্তত বাঁচতো।

কিন্তু ধমকাইয়া তাহাকে কী করিব? স্ত্রী-পুত্র লইয়া যে বাঁচিতে পারিয়াছে, এই ঢের—তুচ্ছ কতগুলি জিনিস দিয়া তাহার কী হইবে?

নবীন মুখ কাচুমাচু করিয়া কহিল—তাড়াতাড়িতে এই মাদুর আর বালিশ দুটো শুধু নিতে পেরেছি—

ওদিক হইতে নবীনের ছোট ছেলে বলিয়া উঠিল: আর আমি আমার লাটাইটা, বাবা!

মুখ-চোখ বিবর্ণ করিয়া সরকার-মহাশয় ভয়ে-ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লেখা হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম: আজকে কী নতুন খবর?

সরকার-মহাশয়ের মুখে তক্ষুনি ভাষা জুয়াইল না। অনেক ঢোক গিলিয়া পরে কহিলেন,—আমগাছগুলি কাল গেছে।

বিস্মিত হইব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু খবরটা এমন মর্মান্তিক যে মনে হইল যেন এইমাত্র কোনো আত্মীয়তম পরম বন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনিতেছি। চমকাইয়া উঠিলাম: কোন আমগাছ?

—সব। সরকার-মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারিলেন না। মনে আছে গত বৎসর আমি বৈশাখের সন্ধ্যায় বাসন্তীকে লইয়া এই আমবাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়া নির্লজ্জ এই নদীর বন্যার মতো অকস্মাৎ আকাশে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। জোরে বাতাস ছাড়িতে কচি-কচি আম অজস্র শিলাবৃষ্টির মতো এখানে-ওখানে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কোঁচড় বাঁধিয়া বাসন্তী... সে কী আম কুড়াইবার ঘটা! ধুলোয় ... মাঠ-বাড়ি একাকার হইয়া গেছে, খানিক... গরম থাকিয়া সমস্ত শূন্য পাথরের ... ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, কোথায় কাহ... গরু-ছাগল ভয় পাইয়া চীৎকার পাড়িতেছে... বৃষ্টি এই আসিল বলিয়া! আর আকা... যেমন চেহারা, বৃষ্টি একবার আসিলে স... থামিবার নাম করিবে না। কিন্তু

শুনিবাব মেয়ে বাসন্তী নয়। হাওয়ায় চুল ও আঁচল এলো করিয়া প্রাণপণে সে আম কুড়াইতে লাগিল। ঝড় এমনি দুর্দান্ত যে তাহাকে প্রবল পুরুষস্পর্শের আলোড়নে একেবারে বিপর্যস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বলিলাম,—কেন এতো ব্যস্ত হচ্ছ? ঝড় থামলে চাকরকে পাঠিয়ে দেব, সব আম কুড়িয়ে নেবে। বাগান তো আমাদেরই—ভাবনা কিসের? বাসন্তী তবুও কথা শুনিল না। উন্মত্ত বাতাসে কাপড়ের প্রান্ত উড়াইয়া পিঠময় চুলের ঢেউ তুলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আম কুড়াইতে লাগিল। আবহাওয়াটি এত গম্ভীর ও এত ভয়ঙ্কর যে তাহাকে আমার অত্যন্ত অপরিচিত ও অপরিচিত বলিয়াই প্রখরতররূপে সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

বাসন্তীকে বলিলাম,—চলো, একবার দৃশ্যটা দেখে আসি।

নিজে তো যাইবেই না, আমাকেও সে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া রাখিল। খবরটা তাহার কাছে এত নিদারুণ যে শতপুত্রশোকে গান্ধারীর মতো সেও বোধহয় অন্ধ হইয়া যাইবে।

আজকাল আমরা আর বেড়াইতে বাহির হই না, স্থানের ও সময়ের সমস্ত পরিধি নদী অনায়াসে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। ঘরে বসিয়াই নদী দেখি, প্রচুর হাওয়ায় দেয়ালের প্রকাণ্ড ছবিগুলি মেঝের উপর ভাঙিয়া পড়ে। বিস্তৃত জলরাশির কিনারে মর্তের দুইটি প্রাণী মৃত্যুর প্রলোভন এড়াইয়া কোন রকমে একের পর এক মুহূর্ত গুনিতেছি!

তারপর আসিল ব্যোমকেশ। খবরটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার দরকার ছিল না, সময় থাকিতে বুদ্ধিমানের মতো হাটে গিয়া সে যে লাঙল ও বলদ বিক্রি করিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে তারিফ করিলাম—পয়সাটা ঠিক তাহারই প্রাপ্য কিনা তাহা আর বিচার করিয়া দেখিলাম না। কেবল এই-ই দুঃখ হইতে লাগিল যে, তাহাকে এইবার সত্যি-সত্যিই চাকরির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। কিন্তু খবরের কাগজের সম্পাদক সেই কথা জানিতে আসিবেন না; জানিলেও এত বড়ো ব্যর্থতার কথা সসমারোহে ছাপিবার আর তাঁহার আগ্রহ থাকিত না। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাভবের ব্যর্থতার মধ্যে মহিমা নাই, এই পরাজয় মানুষের নিজের সৃষ্টি নয় বলিয়া। এত দুঃখেও ব্যোমকেশ তাই সুখী হইতে পারিল না।

এইবার সময় হইল। শতলক্ষ হাত মেলিয়া নদী স্কুল-ঘরটাকে আক্রমণ করিয়াছে।

নবীন আগেই সরিয়াছে, অতএব তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার নাই। বাসন্তী বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—অমনি-অমনি যেতে দেবে নাকি?

এতো বড়ো বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও যদি বাসন্তী দার্শনিক না হয়, তবে কী করিতে পারি? বলিলাম,—কোন জিনিস তুমি আঁকড়ে ধরে রাখতে পারো শুনি? যা যায়, যাক্।

বাসন্তী কহিল,—কিন্তু টুল-চেয়ার-গুলিও তো বেচতে পারতে?

—কোথায় বেচবো? কিনবে কে? কতোই বা দাম পাওয়া যাবে? পয়সা যা পাবে তাও কি অমনি যাবে না খরচ হয়ে? ও নিয়ে মিথ্যে মন খারাপ করো না—দেখ, মৃত্যুর এমন চমৎকার চেহারা আর দেখেছ কখনো?

দক্ষিণের কোঠায় পাশাপাশি চেয়ারে দুইজনে বসিলাম। দেখিলাম, সরকার-মহাশয় লোক লাগাইয়া স্কুল-ঘরের জিনিস-পত্র বাহির করিতেছেন। মনে-মনে হাসিলাম, কোথায় এগুলি তিনি সরাইয়া রাখিবেন—কে ইহাদের বোঝা টানিয়া টানিয়া বেড়াইবে? তবু নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ইহাদের তুলিয়া দিতে সরকার-মহাশয়ের মন যেন কেমন করিতেছিল।

হাওয়ায় বাসন্তীকে একেবারে উড়াইয়া নিতেছে। নদী যত তাহার আবরণ কাড়িয়া লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে, ততই সে কুণ্ঠিত, ম্রিয়মাণ হইয়া এতটুকু হইয়া হইয়া যাইতেছে। ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো তাহাকে এমন দুর্বল লাগিল—এই বিরাট সৌন্দর্য-সমারোহের মাঝে সব এমন অকিঞ্চিৎকর মনে হইল যে সেই মুহূর্তে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না।

আমাদের চোখের সমুখে স্কুল-ঘরের একটা ধার নদীর মধ্যে ধসিয়া পড়িল। বাসন্তী সভয়ে একটা চীৎকার করিয়া উঠিতেই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কহিলাম,—ভয় কী!

বুকে মুখ গুঁজিয়া বাসন্তী কাঁপিতেছে; চাপা গলায় কহিল,—একেবারে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়লো যে।

—আসুক। বাড়ি নিতে এখনো দেরি আছে! পূর্বদিক ঘেঁসে চরও পড়ছে শুনছি—সবাই ত বলছিলো এই বর্ষাটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠতে পারলেই বেঁচে গেলাম। ভয় কী, বাসন্তী? আর যদি যায়-ই, যাবে—জিনিস-পত্র স্তূপাকার করে রেখে লাভ কী? দুজনে আবার ফাঁকা হয়ে যাবো।

বাসন্তী তেমনি মুখ গুঁজিয়া কহিল,—আমি চোখ মেলে তা দেখতে পারবো না। তার আগেই আমরা এখান থেকে পালাবো।

আস্তে-আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই স্কুল-ঘরটা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নিতাই কর্মকারের ছেলে মুন্সেফ-কোর্টের সামান্য একটা পেসকারও আর হইতে পারিল না।

এখন একেবারে নদীর কোলে শুইয়া আছি, ফুলের বাগানটাও গেছে। এখন এক পাড়ে আমি আর বাসন্তী, আর আমাদের সুমুখে নদী—স্রোতমুখর, ফেনিল, লালায়িত—সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া, কাড়িয়া তাহারই মতো আমাদের সে বস্তুর জগতে একবারে উলঙ্গ করিয়া দিবে।

কৌচগুলিতে ধুলো জমিতেছে, আলমারির কাঁচগুলি আর পরিষ্কার করা হয় নাই। কার্পেটটা জায়গায়-জায়গায় ফুটো হইয়া গিয়াছে—সেই দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। টিপয়ের উপর পিতলের বড়ো ডাবরে পাতাবাহারের গাছ দুইটা কবে মরিয়া গেছে—কে আর উহাদের আদর করিয়া জল দিবে। দেয়ালের বড়ো ক্লকটা বন্ধ, চাবি দিতে ভুলিয়া গেছি। অনেক দিন ধোপা আসিতেছে না—বিছানার চাদর ও বালিসের ওয়াড়গুলি এত ময়লা হইয়া গেছে যে, যেন তাহারই জন্য আমাদের চোখে ঘুম আসে না। ক্যালেন্ডারের তারিখ বদলানো হয় নাই কতদিন—জানিবার কিছু প্রয়োজন বোধ করি না। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কেবল সেই পরম ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিতেছি।

বাসন্তী অস্থির হইয়া বলিল,—এখানে থেকে কী হবে—চলো পালাই।

বলিলাম, — নাটকের শেষ অঙ্কটাই নাটকের সমস্ত। একেবারে যবনিকা পড়লে তবে উঠবো। এমন একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে তোমার কুণ্ঠা কিসের?

—এ আমি সইতে পারবো না।

—যা কিছু অসহ্য, তাইতেই তো তীব্র আনন্দ আছে। বলিয়া বাসন্তীর মুখে চুমা খাইলাম। যেন ভালো লাগিল না। উহার

চেহারা এই ঘর-বাড়ির মতো কেমন রুক্ষ, বিবর্ণ হইয়া গেছে। কতদিন উহাকে একটু আদর পর্যন্ত করি নাই। মৃত্যুর এই অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মাঝে ক্ষণভঙ্গুর প্রেমের অভিনয় করিতেও হাসি পায়।

ভিতরের উঠান ছাড়াইয়া খানিক দূরে সরকার-মহাশয় সময় থাকিতে ছোট-খাটো একখানি ঘর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সময় আসিলে এই বাড়ি ছাড়িয়া সেখানে উঠিয়া যাইব। তাহার পরেও যে নিস্তার নাই তাহাও সরকার-মহাশয় ভালো করিয়া জানিতেন; শুধু আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সরাইয়া রাখিবার জন্য হাতের কাছে একটা আশ্রয় থাকা উচিত। কোন জিনিসগুলি যে অধিকতর আবশ্যকীয়, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চট করিয়া ভাবিয়া নিতে পারিলাম না। বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনো লাভ নাই—সবগুলি জিনিসই একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার—কোনটা ছাড়িয়া কোনটার প্রতি যে সে পক্ষপাতিত্ব দেখাইবে সে একটা কঠিন সমস্যা। অতএব মত্র শুইবার খাটখানা, বিছানা-পত্র কাপড়-চোপড় ভরিয়া একটা বড় ট্রাঙ্ক, লিখিবার ছোট একটি টেবিল, এমনি মোটামুটি কয়েকটা জিনিস সরাইয়া রাখিলাম। আমার গল্পের খাতা ও বাসন্তীর গহনার বাক্সটা হাতের কাছেই রহিল নদী আসিয়া পড়িলে সেগুলিও সঙ্গে নিতে হইবে।

ছোট ঘরখানি—রাণীগঞ্জের টালিতে নয়, উলুখড়ে কোনোরকমে ছাওয়া হইয়াছে! ঢাকর সেই ঘরে একটি বাতি জ্বালিয়াছে দেখিলাম। বিপুলকায় গর্জমান নদীর পাড়ে বসিয়া ঐ মৃদু শিখাটিকে ভারি করুণ মনে হইতে লাগিল। বাসন্তী বলিল,—চলো, ঐ ঘরে আজই উঠে যাই।

অভয় দিয়া বলিলাম,—আজই কী! এখনো হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। আজ রাতটা অনায়াসে এখানেই ঘুমিয়ে নিতে পারবো।

জল, জল, ক্ষুরের মতো ধারালো, বিদ্যুতের মতো দ্রুত, — ধাবমান ঘোড়ার মতো ঢেউগুলি পাড়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িতেছে। কোথাও এতটুকু বিশ্রাম নাই, স্তব্ধতা নাই—ফুঁসিয়া-গর্জিয়া ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া অনড়, স্থবির মৃত্তিকাকে একেবারে চূর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিবে। অমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। সেই নিয়ত-বেগবান বিরাট শক্তির কাছে আমাদের অস্তিত্ব কেমন ম্লান, সংকুচিত হইয়া গেছে। পরিমিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমাদের এই জীবন ধারণের তুচ্ছতাকে নদী যেন চারিদিকের উগ্র খলহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।

জল আর জল—সাদা গাঢ় জল! বেগের প্রাবল্যে কোথাও এতটুকু বিশ্রামের রঙ নাই—ফেনায়িত, প্রখর সাদা অমন তীব্র শুভ্রতা চক্ষু মেলিয়া সহ্য করিতে পারি না।

রাত্রে কখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—ঘুমের মধ্যেও নদীর সেই ডাক শুনিতেছি। তাহার আর মনে নাই, প্রবল আর্তকণ্ঠে কী যেন সে চাহিতেছে! সেই ভাষা আমরা কি করিয়া বুঝিব।

হঠাৎ কোথায় কী একটা শব্দ হইল—হয় তো এক তাল মাটি পড়িল—সঙ্গে সেই শিমুল গাছটাও। ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখি পাশে বাসন্তী নাই। চারিদিকে প্রবল শব্দে ঝড় বহিতেছে—চিৎকার করিয়া উঠিলাম : বাসন্তী।

কোথাও এতটুকু সাড়া মিলিল না।

তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া পড়িলাম। আলো জ্বালিবার কথা মনেও হইল না। দেখি, দক্ষিণের দরজাটা খোলা, প্রচুর উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় ঘরের মধ্যে ধূলা উড়িতেছে—এত বাতাসে ও ধূলায় নিশ্বাস টানিতে কষ্ট হইতে লাগিল। আবার ডাকিলাম : বাসন্তী। অজস্র কণ্ঠে নদী ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল। স্পষ্ট মনে হইল, নদীর ডাকে বাসন্তী কখন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে বুঝি।

পাগলের মতো সামনের জমিতে ছুটিয়া আসিলাম। ঝাপসা অন্ধকারে খেজুর-গাছের নিচে কি-একটা কাপড়ের মতো চোখে পড়িল। কাছে আসিয়া দেখি—বাসন্তী নদীর পাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম,—এখানে উঠে এসেছ যে!

সে যেন কেমন করিয়া হাসিল; কহিল, —একটুও ঘুম আসছে না। বলিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রবল চাঞ্চল্যের তীরে তাহার এই ধ্যানময় স্তব্ধতা অত্যন্ত ভয়ংকর মনে হইল। তাহাকে বেষ্টন করিয়া এই নির্জনতা এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাকে আমার অতি-পরিচিত বাসন্তী বলিয়া যেন চিনিতে পারিলাম না।

গায়ে ঠেলা দিয়া কহিলাম,—এখানে বসে আছ কী করতে? ঘরে চলো!

বাসন্তী কহিল,—এই বেশ …
তুমিও আমার পাশে এসে বোস না।

তাহার পাশে বসিলাম; কিন্তু …
পর কী যে বলিব বা বলা যাইতে …
সমস্ত ভাষা নীরব হইয়া গেল। উহার …
দৃষ্টি মিলাইয়া আমিও জল দেখি…
তাহার পর জল কখন চোখ হইতে …
গিয়াছে—বাধাহীন অশরীরী বে…
আর কিছুই চোখে পড়িতেছে না।

বাসন্তীকে এত কাছে রাখিয়াও …
এই নদীর মতো অত্যন্ত নিঃসঙ্গ…
হইতে লাগিল। আগে তবু এখানে-…
কয়েকখানা নৌকা দেখা যাইত, …
তলায় বসিয়া মাঝিদের রান্না …
গুঞ্জনের শব্দ কানে আসিলে কতক…
নিশ্চিন্ত বোধ করতাম। সামনের …
ভাঙিয়া গেছে বলিয়া একটা গয়…
চাকার শব্দও আর শুনিতে পাই …
যেন বিরাট গতির ঘূর্ণিতে পড়িয়া …
নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে!

একটা শকুন অন্ধকারে পাখ…
করিয়া উড়িয়া গেল। সচেতন হইয়া …
দেখি বাসন্তীও কেমন অসাড়, …
হইয়া বসিয়া আছে। উহাকে আম…
কেমন ভয় করিতে লাগিল। গায়ে ঠে…
কহিলাম,—এখান থেকে উঠে চলো, …
এবার ভেঙে পড়বো।

বাসন্তী তবু নড়িল না। চকি…
হইল, উহার চোখে মৃত্যুর স্পর্শ …
এমন স্তব্ধ-মত্ততায় তন্ময় হইতে …
কখনো উহাকে দেখি নাই। নদী যেন …
উহাকে আমার বাহুবন্ধন হইতে …
নিবে! আর দেরি নাই!

আমাদের ঘিরিয়া সত্য-সত্যই …
খানি জায়গা লইয়া চিড় ধরিল। দু…
হাতে মাটি হইতে উহাকে বুকে …
কাড়িয়া লইলাম। কোনোদিকে না…

বাসন্তীকে বুকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিলাম,—দেখি আমারই বুকের উপর কখন সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে!

অবশ ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখন কেমন লাগছে, বাসন্তী?

দুর্বল হাত দুইটি দিয়া আমার গলা জড়াইয়া সে কহিল, ভীষণ ভয় করছে। আমাকে তুমি ধরে রাখো। আমায় ছেড়ে দিও না।

আমার স্নেহ দিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া রহিলাম। কহিলাম,—কেন তোমায় ছেড়ে দেবো? কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে রাখে?

লক্ষ লক্ষ ঢেউ তুলিয়া নদী আমাদের এই গভীরতম মিলনের মুহূর্তকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যেন উদ্দাম প্রবাহে এই মুহূর্তটিকে সে ভাসাইয়া নিয়া যাইবে।

তাহার পর আমাদের জীবনে সেই পরম লগ্নের আবির্ভাব হইল।

রাত অনেক হইয়াছে—অকূল আকাশ ভরিয়া জ্যোৎস্নার আর অবধি নাই। সেই পরিপূর্ণতম প্রশান্তির নিচে নদীর এই লেলিহান উন্মত্ততার কোথাও এতটুকু সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সময় থাকিতেই ছোট খড়ের ঘরে উঠিয়া আসিয়াছি। চাকর ছোট টেবিলের উপর তেমনি বাতি জ্বালাইয়া খাট জুড়িয়া বিছানা করিয়া রাখিয়াছে! কিন্তু রাতে আজ গল্প লিখিবার বা ঘুমাইবার কথা ভাবিতে গেলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়!

লিখিবার খাতা ও গয়নার বাক্সটার সঙ্গে আরো কিছু খুচরা জিনিস সরাইয়া ফেলিব ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু শেষকালে কেন জানি না আর হাত উঠিল না। কী ফেলিয়া কী নিব, নিয়াই বা কী করিব, কোথায় রাখিব, এমনি একটা মূঢ় সন্দেহে বা বৈরাগ্যে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তাহার চেয়ে বাসন্তীকে লইয়া মুক্তির এই উজ্জ্বল ও প্রখর উলঙ্গতা দেখিতে শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

লক্ষ-লক্ষ অমিতবিক্রম শ্বেতহস্তী আমাদের বাড়িটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—যে-বাড়িতে বাসন্তী কার্পেট ও কৌচ বিছাইয়া ড্রয়িং-রুম তৈরি করিয়াছিল, যে-বাড়ির ছোট একটি নিভৃত কোঠায় বসিয়া আমি যতো না লিখিয়াছি তাহার চেয়ে ভাবিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি বেশি, যে বাড়িতে প্রকৃতির পরিবেশে পরস্পর দুইজনের নিগূঢ় রহস্য সন্ধান ও সমাধান করিয়াছি, যে-বাড়িতে বাবা মা'র অপূর্ব বিচ্ছেদ-স্মৃতির স্বর্গটি রাখিয়া গিয়াছেন।

অথচ, আকাশে যে এখন প্রচুর নির্মেঘ জ্যোৎস্না—এই জ্যোৎস্না রাতে আমরা দুইজনে যে সিঁদুর-গাছের তলায় বাঁশের মাচার উপর বসিয়া কতো গল্প করিয়াছি—একথা কে বিশ্বাস করিবে?

অসহায় চোখের সামনে বাড়িটার মৃত্যু দেখিতে লাগিলাম। বড়ো বড়ো ছবি, কৌচ-টেবিল - চেয়ার - আলমারি, বাসন - কোসন, খেলনা-পত্র, বিম-বরগা, ইঁট-কাঠ, জানলা-দরজা—সব যেন একসঙ্গে কানের কাছে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সমস্ত কিছুর যেন প্রাণ আছে, দুঃখ অনুভব করিবার তীব্র ক্ষমতা আছে—আর আছে মৃত্যুর আক্রমণে আমাদেরই মতো কঠিন পরাঙ্মুখতা। কিছুতেই আশ্রয় ছাড়িবে না, মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, সাধ্যমতো সংগ্রাম করিবে, বাধা দিবে, আর্তনাদ করিবে। সহজে হার মানিবে না। বেগের সঙ্গে বস্তুর সেই অপরূপ যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে সারা দেহে ভয় ও বিস্ময়ের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে কে কবে পারিয়াছে? ঘন্টা খানেকের মধ্যে বাড়িটার আর চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না।

মুহূর্তে মধ্যে প্রকাণ্ড একটা মুক্তির আকাশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। সমস্ত কিছু আকাশের মতো সাদা হইয়া গেল।

সকালবেলার দিকে সরকার-মহাশয় গরুর গাড়ি ডাকিয়া আনিলেন। যাহা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা গাড়িতে বোঝাই হইল। বাসন্তীকে লইয়া ঘুর-পথে রেল ইস্টিশান-এর দিকে রওনা হইলাম।

খড়ের ঘরে সরকারমহাশয় কিছুকাল আরো থাকিবেন ও বর্ষার শেষেও যদি পূব দিকের চর মাথা চাড়া দিয়া না উঠে, তবে একদিন বাড়ির দিকে রওনা হইলেই চলিবে।

ট্রেনে চড়িয়া এতক্ষণে বাসন্তী সহজ করিয়া কথা কহিতে পারিল। আমরা কলকাতায়ই যে যাইতেছি ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে যে বাগবাজারে তাহার বাপের বাড়িতে গিয়া উঠিব না ইহাতে সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করিল। তাহার বাবা যে আমাদের এই পরাজয়ের লজ্জাকে সগৌরবে ব্যঙ্গ করিবেন, আমার স্ত্রী হইয়া তাহা তাহার অসহ্য।

বলিতে কি, মামার কাছে গিয়াও হাত পাতিলাম না। কালিঘাটের অঞ্চলে একটা বাড়ির একতলাটা ভাড়া লইলাম। দুইখানি মাত্র ঘর—একটিতে সামান্য কয়টি রান্নার সরঞ্জাম ও অন্যটিতে মেঝের মাদুর বিছানো শয্যা ছাড়া আর কোনো উপকরণ নাই। দেয়ালে একটিমাত্র ল্যাম্প জ্বলে ও গল্প লিখিবার কথা মনে না আনিয়া সেই আলোতে বসিয়া কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া-দেখিয়া দরখাস্ত লিখি।

নদী-স্রোতের মতো সময়ও উত্তাল বেগে সমানে আগাইয়া আসিতেছে। একটা ছোট-খাটো চাকরির জোগাড় করিয়াছি—নিজেরই একার চেষ্টায়। সেই অহঙ্কারে কিছু জিনিসপত্র কিনিবার ইচ্ছা হইল। বউবাজারে কোথায় খুব সস্তায় নিলাম হইতেছে—চার টাকা দিলে অনায়াসে ঘরে একখানা কাঠের টেবিল ও চেয়ার আসে। কথাটা ভয়ে-ভয়ে বাসন্তীর কাছে উত্থাপন করিলাম। বাসন্তী ম্লান হইয়া হাসিয়া কহিল,—ভাড়াটে বাড়ি, কখন উঠে যেতে হয় ঠিক নাই, জিনিসপত্র কাঁধে করে কোথায় ঘুরে বেড়াবে? এই বেশ আছি।

টেবিল-চেয়ার আর কেনা হইল না। চার টাকা দিয়া ঠিকে একটা ঝি রাখিলে বরং কাজ দিবে।

ভাড়াটে বাড়ি! কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তীরের বন্ধন হইতে নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

নদী আমাদের বাড়ী ভাঙিয়াছে, কিন্তু সময়ের স্রোত আমাকে ও বাসন্তীকে ধীরে ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল।

গেল সোমবার হইতে ছোট খোকাটার জ্বর—ডাক্তার একজন ডাকিয়া আনিলে হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে যদি সারে, মিছা-মিছি কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া এমন আর বিশেষ কী লাভ হইবে? আরো কয়েক দিন যাক।

ঝি'র সঙ্গে বাসন্তী নিতান্ত খেলো শহুরে ভাষায় ঝগড়া করিতেছে। উনুনের ধোঁয়ায় ঘর-দুয়ার সব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কে যেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝিকে তাড়াইবার জন্য তাগিদ দিতে বাসন্তী আসিল, না, বাকি মাসের মাহিনা লইয়া বিদায় হইতে ঝি আসিল, সহসা বুঝিতে পারিলাম না।

আপিসে যাইবার জামাটা বাসন্তীকে কত দিন সেলাই করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, তাহাতে তাহার গ্রাহ্য নাই। রোদে তোষক মেলিবার জায়গা নাই বলিয়া ছারপোকার কামড়ে রাত্রে একটু ভালো করিয়া ঘুমাইতেও পারি না। চাহিয়া-চিন্তিয়া তাজমহলের ছবিওয়ালা সুন্দর একটা ক্যালেন্ডার আনিয়া দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম, দুরন্ত ছেলে দুইটা কাড়াকাড়ি করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে।

নদীর হাত হইতে রক্ষা পাইলেও সময়ের হাতে আমাদের আর নিস্তার নাই।

শুনিতেছি আপিসে কর্মচারীদের ছাটাই শুরু হইয়াছে। আমি এখনো কোনো রকমে টিঁকিয়া আছি—তবে বলা যায় না। নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

তবু রাশি-রাশি ফেনিল জলের থেকে এ অনেক ভালো। টাইমপিস ঘড়িটির মতো হৃৎপিণ্ড মৃদু-মৃদু ধুক-ধুক করিতেছে—কোনো রকমে যে নিশ্বাস নিতেছি এই এক-রকম ভালো লাগিতেছে। তীব্র সুখের মধ্যে এই যে, শত দারিদ্র্যেও শ্বশুরের কাছে গিয়া হাত পাতি নাই—ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকেই না-হয় আরেকবার মামা'র পিপুলের দোকানে পাঠাইয়া দিব। সে না-জানি এখন কী করিতেছে!
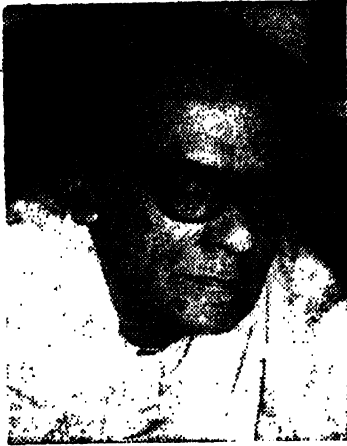
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অজিত মুখোপাধ্যায়

"মধ্যরাতের সে কান্নাটা কেমন অচেনা অদ্ভুত মনে হলো।

ওটা কি কোনো পাখির কান্না? কিন্তু কলকাতার পাথুরে আকাশে অমন পাখি কই?

না, মানুষের কণ্ঠস্বর। ভগ্ন, ছিন্ন, বাণবিদ্ধ।

'এত রাতে কে ওকে ফ্যান দেবে?' বললে দেবকুমার ম্লান শীর্ণ কণ্ঠে।"

(কালোরক্ত)

সেই ছেলেটার গল্প লিখেছেন অচিন্ত্য যার মাথায় পাথুরে আকাশ যাকে জন্ম দিতে মা ফুটপাত ছেড়ে চলে যায় নিরিবিলিতে। সংগে নিয়ে এসেছে আন্ডা-বাচ্চাগুলোকে। ফুটপাতেই কি, বা আস্তাকুঁড়েই কি সবখানেই সমান খিদে। মার এই গোঙানিতে তাদের হুঁস নেই, যেমন তাদের গোঙানিতে হুঁস নেই সমস্ত পৃথিবীর।......

যে জীবন আসছে সে আবর্জনা ছাড়া আর কী।

বর্তমান ভারতের করুণ অধ্যায়ের উদাহরণ স্বরূপ সেই ছেলেটাকে প্রকাশ্য রাজপথে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেই করুণ দৃশ্যটির কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত নয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিবরণী সমস্ত কাগজে বেরিয়েছে। সেই মন্বন্তরেরই একটি অতিপরিচিত ঘটনার প্রতি শিল্পী আলোকপাত করেছেন। দেখ, সেই যে প্রাণ...যে প্রাণের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই... যে প্রাণ অদ্যাবধি ল্যাবরেটারিতে জন্মগ্রহণ করল না......সেই প্রাণ কেমন অসহায়ভাবে নিরাশ্রিতভাবে সৌরালোক দর্শন করে।

সেই অসহায় ছেলেটির গল্প লিখেছেন অচিন্ত্য।

না, সারা পৃথিবী অকরুণ নয়।

বিভা আছেন।

'ওকে ঘরে নিয়ে যাই—' অতি সন্তর্পণে ন্যাকড়ায় জড়ানো জেলির মত তলতলে সেই এক ডেলা গরম লালিত মাংসকে বুকে তুলে নিল বিভা।

বিভা গরিব। মাথার উপরে চাল আছে এখনো, সুদিনে বিশ্বাস আছে। ভাগ্যের দয়ায় ছেলেটা বেঁচেও যেতে পারে বা।

ঘরে নিয়ে যান বিভা। কিন্তু খাওয়াবেন কী। ধুয়ে পাখলে ছেলেটাকে শুইয়েছেন এখন মান পাতায়, ন্যাকড়া জড়িয়ে টেনে নিয়ে এসেছেন বিশীর্ণ কোলের মধ্যে।

ছোট একটি বারুদের কণা। যেন মৃত্যু ও পরাজয়ের উপরে উড়ন্ত পতাকা। সমস্ত ক্ষুধা ও কাতরতার উত্তরে পরম নির্ভয় বাণী। কিন্তু এই বারুদ-বিন্দুর সংগে যে মিলবে সেই বহ্নিকণা কোথায়?

সারা জীবন ধরে অচিন্ত্যকুমার সেই বহ্নিকণার সন্ধান পেয়েছেন কিনা জানি না। সন্ধানও করেন নি বোধহয়। বারুদ-বিন্দু বিস্ফার কামনায় অধীর......এইটুকুই অচিন্ত্য দেখেছেন। অধীরতার কার্য-কারণ নিয়ে গবেষণা করেন নি।

কিম্বা তিনি ভাগ্যের দয়ায় ছেলেটা বেঁচে যেতে পারে বলে বিশ্বাস করেন।

ভাগ্যের প্রতি ভগবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস আছে, তিনি হিন্দুদর্শনে বিশ্বাসী। ইতিহাস চক্রবৎ ঘোরে এই তত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাস। সে যাই হোক, সেই প্রাণকণিকাটিকে করুণাময়ীর প্রতিনিধি বিভা দেবী বাঁচাতে পারেন না।

"কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদ উঠে আসতে তখনো অনেক বাকি। তবু মরা মুখটা চোখের দৃষ্টিতে অনুভব করে নিতে তার এক নিশ্বাসও দেরী হল না। তার গায়ে কোত্থেকে যে কালো-কালো পিঁপড়ে বেরে উঠেছে তার চলন্ত সার পর্যন্ত তার চোখে পড়ল।

উপরের থেকে ছাই-পাঁশ কুটোকাটা কিছুটা সরিয়ে নিয়ে ডাস্টবিনের মধ্যে ছেলেটিকে বিভা গোর দিলে।

সেই প্রাণ যদি কোথাও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে লালিত-পালিত হয়, তাহলে তাকে এই রূঢ় সংসারের সঙ্গে প্রচুর লড়াই করতে হয়। সংসার যেমন রূঢ় তেমনি নি[illegible] এই প্রচণ্ড রুক্ষতা নির্মমতার সংগে [illegible] করতে করতে তাকে রোগাক্রান্ত হতে[illegible] কিন্তু রোগের চিকিৎসার সামর্থ্যই [illegible] সেই মানুষটার। যদিও সে চাকরি ক[illegible]

"রেবতী পাংশুমুখে বল্লে, মাই[illegible] এখনো পাইনি। মাসের মোটে সতে[illegible] আজ।

ডাক্তার বল্লে—রোগ চৌদ্দদিন চৌদ্দ বছর অপেক্ষা করতে পারে, পারি না। দিন। তাছাড়া ইঞ্জেকশন[illegible] দাম দিতে হবে একস্ট্রা—

—কিছুই ত নেই—

ডাক্তার বল্লে,—নাচার। আমাদের চলে কি করে তা হলে বলুন?

অতিশয় সত্য কথা।—তোমার ব্যবসার থেকে আমার জীবনের দাম বেশি—এ অত্যন্ত বাজে যুক্তি। নি[illegible] নিঃসহায় ভাবে রেবতী চেয়ে [illegible]

(ধন্বন্[illegible]

কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা[illegible] তিন আনা সুদ কবুল করে সেই [illegible] চিকিৎসা করায় নিজের শরীরটার। সময় রোগার্ত রেবতীর মনে হয়, নেই...তার বাঁচবার অধিকার নেই।

উপরন্তু যখন সেই লোকটির [illegible] রোগে পড়ে...এবং যায়-যায় অবস্থা ছেলেটার, তখন লোকটি নিজের চি[illegible] জন্য সংগৃহীত অর্থ অকাতরে ঢেলে ছেলের চিকিৎসায়...কিন্তু ছেলেটি না।

লোকটির দীনাবস্থার বিবরণ ডাক্তারের মায়া জাগে; লোকটির চি[illegible] করে ডাক্তার। হয়তো বা ডাক্তারের মা[illegible] লোকটির রোগের কারণ গবেষণা করে[illegible] বার জন্যেই রাজি হয়...অথবা [illegible] ডাক্তারকে বিধাতার সঙ্গে তুলনা করে ডাক্তারের অহমিকা জাগে। ডাক্তার

সমস্ত বিদ্যে-বুদ্ধি ও প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করে লোকটির চিকিৎসা করে।

লোকটি ভাবে যেদিন সে সেরে উঠবে, সেদিন ও আবার স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াতে পারবে, অতি সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারবে—এই ওর সুখ! হয়ত সেই রোদ্রেই ও বেরিয়ে পড়বে,—কিম্বা হয়ত আর কিছু করবে যা মোটেই অসাধারণ নয়।

রোগের সমস্তরকম চিকিৎসা করে ডাক্তার। বিজ্ঞানের রাজত্ব উজাড় করে দিয়ে যেন একটি মানুষের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা চলে। লোকটির অবস্থা তবু দিন-দিন খারাপ হয়ে যেতে থাকে।

"ডাক্তার বল্লে,—বমিটা কখন হয়েছে?

প্রথমে কিছু বলতে চায় না, পরে বহু অভয় পেয়ে শিপ্রা বল্লে, কাল।

—এখনো নিকোন নি কেন?

শিপ্রা উত্তর দেয় না।

ডাক্তার বলে,—আপনাদের আর কেউ নিই?

ডাক্তার বলে,—বসুন, আমি এই ওষুধটা নিয়ে আসছি।

ওষুধ এনে রেবতীকে খাইয়ে দেয়। রেবতীর আর খাবার শক্তি নেই, কষ গড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার ভাবে, শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেই যাবে নাকি? কী লাভ থেকে? কে ওর রেবতী?

সমস্ত ঘরে দারিদ্র্যের কী কদর্য বীভৎসতা! বাসনপত্র ওলোট-পালোট, এঁটো তোলা হয়নি কতদিন থেকে কে জানে, নোংরা জামা-কাপড় আর পোড়া কয়লার ছাই, রোগীর বমিতে আর জামাতে একাকার! আর রেবতীর মুখটা কি বিকট, ভয়ংকর,—হাঁ-করা ঠোঁট দুটোর মাঝে কি কুৎসিত ঘৃণা!—ডাক্তারের সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল! আবার বল্লে—আপনাদের কেউ নেই আর?

শিপ্রা তেমনি ঘাড় নেড়ে বললে—কেউ নেই।" (ধন্বন্তরি)

যে লোকটা বাঁচার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালায়, যাকে বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়, সেই লোকটার কেউ নেই...নিঃসহায়। লোকটা, ফলে, মারা পড়ে একথা না বললেও চলে।

বিভিন্ন পটভূমিতে অচিন্ত্যকুমার এই লোকটাকে দেখেছেন, বিভিন্ন তার পেশা বিভিন্ন তার সামাজিক চরিত্র। ডাক্তার (ধন্বন্তরির) বাড়ি ফিরে গিয়ে এই লোকটির জন্য ছাদে পায়চারি করতে করতে নিজেকে অপরাধী ভাবছে। তার মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ করতল প্রসারিত করে ওর কাছে রেবতী জীবন ভিক্ষা চাইছে। যেন বলছে—যে জীবন আমার নিলে, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।

ঘরে ঢুকে ডাক্তার জানলা দিয়ে নিচে মুখ বাড়িয়ে দেখলে রেবতীর সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। কিছুই দেখা গেল না। খালি, এই শীতের রাতেও ফুটপাতের ওপর কতগুলি গৃহহীন পথিক শুয়ে আছে।

আর কিছু না।

চমৎকার গল্প ধন্বন্তরি।

রেবতী রোগের কাছে অসহায়, বিজ্ঞান বাঁচাতে পারে না। সোনামদ্দি (জমি) মামলার কাছে অসহায়, তাকে কোর্ট বাঁচাতে পারে না। হরেন্দ্র (হরেন্দ্র) সমাজের কাছে অসহায়, তাকে প্রেম বাঁচাতে পারে না।

কুরমান (নুরবানু) ধর্মের জন্য স্ত্রীকে বিসর্জন দেয়, আর মন্তাজ (বাঁশবাজি) ক্ষুধার জন্য পুত্র বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

রায়তি স্বত্বের জমি ছিল হুকুমালির। লড়াইয়ে গেছে সে কুলি-মজুরের ঠিকাদার হয়ে। যাবার আগে জমি বেচে দিলে সে সোনামদ্দির কাছে। প্রায় জলের দরে। (জমি)

সোনামদ্দির কি সহজে সুখভোগ, মানে জমি-ভোগ আছে কপালে?

হুকুমালির সঙ্গে ষড় করলে জলিল মুন্সি। নগদ দুশো টাকা দিয়ে আরেকটা কবালা লেখাপড়া করিয়ে নিলে। সোনামদ্দির কবালার যে তারিখ, তার চারদিন আগেকার তারিখ বসালে স্ট্যাম্প বেচার তায়দাদে। সেই মোতাবেক দলিল সম্পাদনের তারিখ দিলে। ফলে দাঁড়াল এই, জলিল মুন্সির কবালা সোনামদ্দির কবালার আগুড়ি হয়ে গেল।

প্রথম মামলায় দলিললেখক, ইসাদী সাক্ষি, নিশানদারক সবাই হলফান জবানবন্দি দিল জলিল মুন্সির দিকে। কিন্তু জলিল মুন্সির তঞ্চকী মমলা বেফাঁস হয়ে গেল। অধর্ম পরাজিত হল।

অধর্ম কি ধর্মকে সহজে ছাড়ে!

আপিল করল জলিল মুন্সি।

এদিকে মামলা-মোকদ্দমায় সোনামদ্দির বেহাল হবার দাখিল। খরচে খরচে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তার উপর আনাড়ি, অবুঝ, আদালতী কাণ্ড কিছুই জানে না। জলিল মুন্সি এরি মধ্যে কত তালাসী-তদবির আরম্ভ করে দিয়েছে। আপিলের মামলা কার ঘরে চালান করে নিলে সুফল হবার আশা তার তদবির। অমুক হাকিম নতুন সাবজজ হয়েছে, আপিল পেলেই হাতে মাথা কাটে, তার ঘরে নিয়ে চল। এর আবার উল্টোবুঝ আছে অমুক হাকিম। ঘোটা খসতে আর দেরি নেই, বেশি লিখতে বকতে চায় না, গম-গম করে সেরে দেবে। যা আছে তাই বহাল থাকবে। তার ঘরে নিয়ে চল।

নিম্ন আদালতের খরচ টানতেই সোনামদ্দি নাকাল, খরচ আর টানতে পারে না। বউ বলে, ধর্মের দুয়ার ধরে বসে থাক। এক আদালতের রায় যখন আমাদের দিকে হয়েছে, তখন সব আদালতের রায়ই হবে আমাদের দিকে। কোর্টে হাজির হবার দরকার নেই। দেখি, ধর্মের রায় কে ওলটায়।

বসে থাকলে মামলা চলে? বউ আমিরণ মামলা মোকদ্দমার কি জানে?

টাকার জোগাড় করতে হলে এখন, সোনামদ্দিকে হুকুমালির কাছ থেকে কেনা জমিটা বাঁধা দিতে হয়। কিন্তু মহাজনদের অতলান্ত উদর। বাঁধা রাখতে কেউ চায় না। সাফ কবালা দাও, জমি রাখি।

সোনামদ্দি ভেবেছিল, যে জমি নিয়ে মামলা সেই জমি বলে বোধহয় কেউ বাঁধা রাখতে চাইছে না। কিন্তু অতি সহজে খরিদ্দার এগিয়ে আসে।

নগদ টাকা দিয়ে কিনে নেয় খরিদ্দার, আমিরণকে না-জানিয়ে। সোনার জমি কী বাঁধা দিতে, কী বিক্রি করতে আমিরণ মোটেই রাজি নয়।

"তাই নগদ তিনশো টাকায় কিনল যুবনালি (খদ্দের)। দশ টাকা জমায় কোলরায়তি পত্তন নিল সোনামদ্দি। কবালা হল। কবুলতি হল। জমি রইল সোনামদ্দির নিজ চাষে।

আমিরন টুঁ শব্দটিও জানতে পেল না।

কিন্তু সোনামদ্দি কি জানত মামলাবাজ লোকেরা, দলিল দস্তাবেজ বিষয়ে ওয়াকেফহাল কুটিল মানুষদের বুদ্ধির প্যাঁচ কী ভাবে প্রযুক্ত হয়! জানে না।

কারণ, যুবনালির নামে জমি কিনেছে জলিল মুন্সি! নিজে!

ফলে, সোনামদ্দি জিতলেও জমি তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। হারলে তো কথাই নেই।

আরও কায়দা-কানুন আছে, জমি থেকে সোনামদ্দিকে নিঃস্বত্ব করার। মামলার হার-জিতের পরিণামে সোনামদ্দির হাত থেকে জলিল মুন্সি জমি কেড়ে নেয়নি। কেড়ে নিয়েছে একেবারে অন্য পথে, প্যাঁচের পথে।

জমি সোনামন্দির হাতে আছে, চাষ করছে, খাজনা দিচ্ছে, তবে তার ভাবনা কী। সাধারণ চাষীর ধারণা দখলের দুইপ্রকার রূপ ; এক—কাগজপত্র মানে দাখিলা-রসিদ। দুই—দখলি স্বত্ব। মানে কে জমি ভোগদখল করছে। সোনামন্দির দুই প্রকারের দখল আছে। খাজনা দেওয়ার ও ভোগ-দখলের দখল।

কিন্তু জলিল মুন্সি সে পথে গেল না। নিজে খাজনা বাকি ফেলে নিজের রায়তি-স্বত্ব নিলাম করালে, কেনালে চাচাত বোনাই দরবার মোল্লাকে দিয়ে। টাকা দিলে নিজে। নিলাম ইস্তাহার গোপন করলে। ঝাঁপিয়ে পড়ল সোনামন্দির উপর, দায়-রহিতের নুটিশ নিয়ে। সোনামন্দির কোল-রায়তি বিলোপ হয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে এল তারা মহবুবের হাত ধরে। বাড়ি-ঘর ভূমিসাৎ হয়ে গেল চোখের সামনে। জমির দিকে তাকাল। মনে হ'ল গৃহহারার মত তাকিয়ে আছে।

'কালোরক্তে' যে নতুন প্রাণ-স্পন্দন বর্তমান সভ্যতার কাছে অসহায়, যে রেবতী অসহায় রোগের কাছে, সেই রেবতীর 'প্রাণ-স্পন্দন' আর্ত চীৎকার করেছে সোনামন্দির বুকে। সরলপ্রাণ সোনামন্দির বুদ্ধি-বিবেচনা বিষয়ী সংসারী মামলাবাজ আইনবাজ জলিল মুন্সিদের বুদ্ধি-বিবে-চনার সঙ্গে কেন পেরে উঠবে।

হরেন্দ্র, পাঙখাপুলার হরেন্দ্র আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত নারীসঙ্গ বঞ্চিত। মাথার যন্ত্রণায় রাতে ঘুমোতে পারে না, সন্ন্যাসী বাওয়ালীর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই ছ' কুড়ি টাকা কন্যাপণ। এত টাকা সে কেমন করে সঞ্চয় করবে, তার রোজগার যে মাসে মাত্র আট টাকা। সুতরাং বিয়ের চিন্তা তার কাছে পীড়াদায়ক বৈকি। মেয়েটিকে আবার হরেন্দ্র মনে মনে ভালোবাসে। অনেক অনুনয় বিনয় করল হরেন্দ্র মেয়ের বাপের কাছে। বিনাপণে মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়ে দিয়ে জাতজন্ম খুইয়ে সমাজের বার হয়ে যেতে পারবে না। বিয়ে হল না। যুবতী মেয়ে অপহৃত হল একদিন। চলল মামলা। মামলা নিষ্পত্তির পর আশ্রয় পেল বেগুনি এক সন্ন্যাসীর অবলা আশ্রমে। এখনো হরেন্দ্র ধর্ষিতা প্রেয়সীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। কিন্তু এবার তাদের মিলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াল হরেন্দ্রের বাপ ভাই, পাড়া-প্রতিবেশী জ্ঞাতি কুটুম, স্বজাতি-বিজাতি—অর্থাৎ এক কথায় সমাজ। এমনকি জমি-দারের লোক পর্যন্ত খাপ্পা—তারা হরেন্দ্রর ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে দেবে। সন্ন্যাসী বাওয়ালী অর্থাৎ বেগুনির বাবা তড়পে বেড়াচ্ছে, বেগুনি যদি গাঁয়ে ঢোকে, কেটে কুচিকুচি করে শেয়ালের মুখে ধরে দিয়ে আসবে।

হরেন্দ্রর উপবাসী দেহমন যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেল না।

সমাজের কাছে হেরে গেল প্রেমিক মন। যে নারীসঙ্গ পুরুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রাপ্য, যে নারীসঙ্গ ব্যতিরেকে সৃষ্টি মানবসভ্যতা টিকে থাকতে পারে না, সেই চিরকালের কামনার ধন থেকে বঞ্চিত এক অসহায় পুরুষের কাহিনী হরেন্দ্র।

কত অসহায় হরেন্দ্র, যার মাত্র ছ' কুড়ি টাকা জোগাড় করার ক্ষমতা নেই বিয়ের জন্য। যদিও বা বিয়ের সুযোগ উপস্থিত হয়, অন্য বেশে, তবু সমাজের চোখ-রাঙানির ভয়ে সে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে দৃঢ় হাতে তুলে নিতে পারে না দুটি কোমল হাত। চূড়ান্ত অসহায় হরেন্দ্র।

ভীরু দুর্বল বোকা সৎ এবং সর্বোপরি অসহায় ব্যক্তিমানুষদের অচিন্ত্যকুমার দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে মমতার চোখে দেখেছেন এবং এঁকেছেন তাদের। অচিন্ত্য-কুমারের চোখ বারবার চলে গেছে সবার পিছে সবার নিচে। তারা কেমন করে ধর্ম, সমাজ, রোগ, শোক, দারিদ্র্য ইত্যাদির হাতে নির্মম ভাবে প্রপীড়িত হচ্ছে তাই দেখেছেন অচিন্ত্যকুমার। নুরবানু গল্পে ফরমান রাগের বশে তালাক উচ্চারণ করে বিপদে পড়ে। যখন একবার নয়, দুবার নয়, তিন-তিনবার তালাক উচ্চারণ করে ফেলেছে তখন যায় কোথা। ধর্মের খাতিরে স্ত্রীকে তালাক দিতে হয়! তার স্ত্রী নুরবানুকে বিয়ে করে সেই শয়তান, সমাজ-প্রধান ও উকিলদ্দি, যার দুষ্ট দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে স্ত্রীকে রাগের বশে তালাক দ্যায় ফরমান। বাধ্য হয়ে নুরবানু উকিলদ্দির খিল-দেয়া ঘরে ঢোকে।

উকিলদ্দির তালাক পেয়ে আবার ছুটে আসে নুরবানু পুরোনো স্বামী প্রেমিক-স্বামী, ফুরমানের কাছে। কিন্তু তখন ফুরমানের মন বিষিয়ে গেছে। সে স্ত্রীকে আর ঘরে নিতে চায় না।

সৎ পত্নী এবং প্রেমিকা নুরবানুর এখন কী গতি হবে?

আইনের জালে জর্জরিত প্রাজ্ঞ বিচারক অসহায় ভাবে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন এক আসামীর (মৃত্যুদণ্ড)। আসামীর দোষ প্রমাণিত, সে খুনী। তার মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনো বিচার প্রাপ্য নয়। কিন্তু বিচারক ভাবছেন, মানুষটাকে যদি মেরেই ফেলি, তবে আর কার বিচার, কার শাস্তি? মৃত্যুদণ্ডর বিরুদ্ধে যত যুক্তি যত চিন্তাই আসুক, বিচারক আইনের জালে বন্দী। তাঁকে চালিত করবে আইন। বিবেক নয়, বুদ্ধি নয়, জ্ঞান নয়, দর্শন নয়, কিছু নয়। তিনি আইনের রক্ষাকর্তা অর্থাৎ আইন তাঁর কর্তা। তিনি আইন নামক কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

কী করুণ আর অসহায় অবস্থা বিচারকদের।

অপূর্ব গল্প মৃত্যুদণ্ড।

সেই প্রাণ-স্পন্দন, সেই রেবতীকে আমরা পাচ্ছি নাকি এই বিচারকের মধ্যে? পাচ্ছি। আবার পাব বাঁশবাজিতে বেদখলে এবং রুদ্রের আবির্ভাবে। তিনটিই অচিন্ত্য-কুমারকে অমর করে রাখবে।

বাঁশবাজি দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে মন্তাজ। একোমেবমদ্বিতীয় জীবিকা। বর্তমানে মন্তাজ দারিদ্র্যে জরায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। পেটের উপর বাঁশের ব্যালান্স ঠিক রাখতে পারে না। বাঁশের ডগায় উঠে বাজি দেখাতে গিয়ে ছেলে, মানে বড় ছেলে পড়ে যায় মাটিতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ উল্টে দেয়। ভবলীলা সাঙ্গ হয়। তখন পরবর্তী সন্তান—শিশু সন্তান আর্তকণ্ঠে কেঁদে ওঠে, 'আমি নিঘ্‌ঘাত পড়ে যাব; মরে যাব আমি—এবার আমার পালা—'

"মন্তাজ কিছুই বলল না। আকুর (বড় ছেলে) হাত ধরে চলল হাসপাতালের দিকে।

'পড়ে যাব, মরে যাব।' কোন অদৃশ্য আল্লার কাছে শিশুকণ্ঠের করুণ অথচ কোন প্রতিকারহীন কাকুতি।

মন্তাজ কিছুই বলছে না। পাথুরে মুখে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য। উপায় কি, তাকে খেতে হবে তো।" (বাঁশবাজি)

ক্ষুধা...আদি অকৃত্রিম দুর্মোচ্য ক্ষুধার কাছে বাৎসল্য তুচ্ছ, পিতৃত্ব অসহায়। তার বড় করুণ ও নির্মম গল্প বাঁশবাজি।

অচিন্ত্যর একটি বড় গুণ, তিনি চরিত্রগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন। এই ফাঁকে বলে রাখি, তিনি বিচিত্র চরিত্র এঁকেছেন, স্বল্প পরিসরে তাদের সকলের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। মেথর, ধাঙড়, চাষী, চাপরাশি থেকে মৃত্যু-দণ্ডকারী বিচারক পর্যন্ত নানান শ্রেণীর চরিত্র এঁকেছেন। এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলি বাস্তবতার রক্ত-মাংসে গঠিত মনে হয়েছে।

যেমন 'বেদখলে' ইমানদ্দি নামে চাষীটি।

'বেদখল' অচিন্ত্যকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। আইন-কানুন, আইনরক্ষক, জমি-দারের আমলা থেকে নিজের ভাই পর্যন্ত এক ব্যক্তিমানুষকে তার হকদারি ভিটেমাটি মানে তার অস্তিত্ব থেকে উৎখাত করার কুটিল করুণ চিত্র এঁকেছেন 'বেদখল'এ।

আর রুদ্রের আবির্ভাব হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ের ছবি। সেই ব্যর্থ লড়াই। যে লড়াই করেছে রেবতী, করেছে ইমাসদ্দি, করেছে ফুটপাতের সেই প্রাণ-কণিকাটি, কিন্তু হেরে গেছে, বিপর্যস্ত হয়েছে।

প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক নদী উত্তাল হয়েছে, পাড় ভেঙে চলেছে। নদীর কিনারে মানুষের ঘর বাড়ি স্কুল আশ্রয় সব একে একে গ্রাস করছে। কোনো প্রতিকার নেই স্রোতকে ঠেকানোর। কোনো উপায় নেই সেই দূরে পলায়ন ছাড়া। কী করতে পারে মানুষ। চেষ্টা? তা করতে পারে। মনে করে, আশ্রয় ছাড়বে না, মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে, সাধ্যমতো সংগ্রাম করবে, বাধা দেবে, আর্ত-নাদ করবে। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে কে কবে পেরেছে?

কালের গ্রাস কে উপেক্ষা করতে পারে।

সেই অসহায় মানুষের, সভ্য মানুষের আর্তি রুদ্রের আবির্ভাবেও ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত।

এই হচ্ছে অচিন্ত্যকুমারের জীবন-দর্শন।

মাত্র কয়েকটি গল্পে অচিন্ত্যকুমার অবশ্যই সক্রিয় মানুষের ভূমিকা এঁকেছেন, যেমন 'আরোগ্য' এবং 'বিন্দু' গল্পে।

রোগের চিকিৎসার পয়সা নেই। চুরি করে জেলে গিয়ে, ওখানে হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে সেরে উঠল ছেলেটি। বার বার জেলে গেল, একবারকার জেলের মেয়াদে যে রোগ সারে নি। সেরে ওঠার পর ছেলেটি এতদিনকার অভ্যাসে অনিচ্ছাকৃত চুরি-করা টাকা মালিকের নামে মানি-অর্ডার করে দিল।

আর 'বিন্দু'তে প্রেমিক যুবক উপলব্ধি করল যে জীবনের উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র কোনকালে একেবারে শান্ত হবে না, এর মধ্যেই এক ফাঁকে ডুব দিয়ে চান সেরে নিতে হবে।

অচিন্ত্যকুমারের মূল জীবন-দর্শন ছাপিয়ে অনেক শাখা-উপশাখা ছড়িয়েছে। তিনি প্রেমের বিভিন্ন পরিস্থিতি অবলম্বনে করুণ ও হাস্যরসের গল্প রচনা করেছেন, গল্প রচনা করেছেন নানান ভাবনা কেন্দ্র করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অচিন্ত্যকুমার সার্থকতা অর্জন করেছেন। লিপিকুশলী, তীক্ষ্ণভাষা ব্যবহারকারী, সংলাপে অতি পারঙ্গম অচিন্ত্যকুমার চল্লিশ বৎসরকাল কলমের জোর বজায় রাখতে পেরেছেন: এর তুলনা পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে বিরল।

শনি ও মঙ্গলের,—মঙ্গলই হবে বোধ হয়, যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁপিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু দিনের জন্য ছুটি পাওয়া যায়—আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোন এক আশ্চর্য সরোবরে—পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়-বিদ্ধ করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনের কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেল বেলায় পড়ন্ত রোদে, জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তায় ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। নামলে দেখবেন, নিচু জলার মতো জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চলে গেছে। তারই ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘনজঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোনদিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখীরাও যেন সভয়ে সে-জায়গা পরিত্যাগ করে চলে গেছে। একটা স্যাঁৎসেঁতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড় রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদাজঙ্গলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে-নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দুধারে বাঁশ ঝাড় আর বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্য আরও দুজন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ অভিযানে তারা এসেছে—কে জানে আর কোন অভি-সন্ধিতেও!

তিনজন মিলে তারপর সামনে নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন, মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড় রাস্তায় উঠে ফিরতি কোন বাসের চেষ্টা করবেন কিনা যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদা জলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গোরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গোরুগুলি—মনে হবে পাতালের কোন বামনের দেশ থেকে গোরুর গাড়ির এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সেই গোরুর গাড়ির ছই-এর ভেতরে তিনজনে কোন রকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থা সর্বাধিক বস্তু কিভাবে সংস্থাপিত করা য সে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গোরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এ ছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চল সুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, অন্ধকার অরণ্য যেন সঙ্কীর্ণ এক সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু এক করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারে দেয়াল বু অভেদ্য কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটি অ চলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগি যাবে পায়ে পায়ে পথ যেন ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচি সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদে সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধ তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চা ধারে গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অ রীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মনে হ পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এ জগত শুধু আপনার চারিধারে। স সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্ন কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন ন

হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বা ঝঞ্ঝনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভে দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। এ গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসা একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা কর গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনা জানাবে—"এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে

ব্যাপারটা ভালো করে হৃদয়ংগম কর পর, মাত্র ক্যানেস্তারা নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড় সম্ভব কিনা কম্পিত কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপ উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়া আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানা যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতা ক্ষুধার্ত না হলে এই ক্যানেস্তারা নিনাদ তাকে তফাৎ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাই দূরে ব্যাঘ্রসঙ্কুল এরকম স্থানের অস্তি কি করে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্ করবেন ততক্ষণে গোরুর গাড়ি বিশাল এক মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষে বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধহয় উঠে এসেছে

তারই স্তিমিত আলোর আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দু-পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সে সব ধ্বংসাবশেষ—কোথাও একটা থাম, কোথাও একা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনো ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে; —যাদুঘরের নানা প্রাণীদেহ যেমন আরকের মধ্যে থাকে।

দু-তিনবার মোড় ঘুরে গোরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত্ত-পা-গুলো কোন স্থান থেকে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটা নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা, ভাঙা ছাদ, ধ্বসে-পড়া দেওয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসী জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্য-জাতির প্রতিনিধি হিসেবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করেছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ কখনো আগে পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভ্যাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভি-শাপের মতো থেকে থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপ-নার দুটি বন্ধুর একজন পান-রসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই মেঝের ওপর কোনরকমে সতরঞ্চির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার ওপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকাধ্বনি করতে সুরু করবেন, অপরজন পানপাত্র নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনি ক্রমশঃ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোন রহস্যময় বেতার-সংকেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও এদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হলে দেওয়াল ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুলীন। ম্যালে-রিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানো-ফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্তে কোথাও ইঁট বা টালি খসে পড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোন দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ-অট্টালিকার ধ্বংসের কাজে অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মৃত্যু সুষুপ্তিমগ্ন মায়া-পুরীর কোন গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনারকাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তরের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানলায় একটি আলোর ক্ষীণরেখা হয়তো আপনি দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথ রাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে চোখে তার ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে-ছায়া সরে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা মুছে গেছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদ্বুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখনো এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানিতে পারবেন না।

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখীর কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। একসময় ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য আরা-ধনার জন্যে শ্যাওলা ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়িপানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমতে বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকেপড়া বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখী ক্ষণে ক্ষণে যেন আপনাকে উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোন ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাৎলা কাঁচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাৎনার ওপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাৎনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাৎনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, 'বসে আছেন কেন? টান দিন।'

সে-কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে-যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে ওঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতি-যোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবান্তর বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন আপনার মৎস্য-শিকার-নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ-কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা করে হয়তো আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন—'কে আবার বলবে! এইমাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!'

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে, পুকুরঘাটের সেই অবান্তর করুণনয়না মেয়েটি আপনার পান-রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরও শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে। যে ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্য একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেন না।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে অবাক হবেন। এই বাড়িটিরই একটি ঘরে আপনাদের আহারের হয়তো ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছে থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরও বেশী করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব-কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপরতলার কোন ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরও গভীর, হয়ে উঠেছে মনে হবে—সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ করে তখন আপনারা একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত করে সে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, 'একটু শুনে যাও মণিদা।'

মণিদা আপনার সেই পানরসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন যামিনী অত্যন্ত কাতর-স্বরে বিপন্নভাবে বলছে, 'মা ত' কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কি বলবো।'

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ওঃ! সেই খেয়াল এখনো? নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ কেবলই বলছেন—সে নিশ্চয়ই এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস। কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার' পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য বেড়েছে যে কোন কথা বুঝোলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে, তখন ও'র প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে।'

'হুঁ এ ত' মুস্কিল দেখছি। চোখ থাকলেও না-হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।'

ওপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ন রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, 'তুমি একবারটি চলে মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠান্ডা করতে পারো।'

'আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।' — মণি এবার ঘরে ঢুকেই নিজের মনে বলবে, 'এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত পা পড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু পণ করে বসে আছে, কিছুতেই মরব না।'

ব্যাপারটা কি এবার হয়তো শুনতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ব্যাপার আর কি। নিরঞ্জন ব'লে ও'র দূর-সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে-ছোকরা এসে ও'কে বলে গেছল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে এসে ও'র মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুনছে।'

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, 'নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরে নি?'

'আরে সে বিদেশ গেছল কবে, যে ফিরবে! নেহাৎ বুড়ি নাছোড়বান্দা বলে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছল। এমন ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে-থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে-কথা ও'কে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তবে এক্ষুনি তো দম ছুটে অক্কা। কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?'

'যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?'

'তা আর জানে না! কিন্তু মার কাছে বলার উপায় ত' নেই। যাই কর্মভোগ সেরে আসি।' — বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো বলে ফেলবেন, 'চলো আমিও যাব।'

'তুমি যাবে!' মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

'হ্যাঁ, কোন আপত্তি আছে গেলে?'

'না, আপত্তি কিসের?' বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে-ঘরটিতে আপনি পেঁৗছোবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলায় সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানলা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায়-ঘরজোড়া একটি শীর্ণ তক্তা-পোশে ছিন্নকন্থা-জড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোশের এক পাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা যাবে; 'কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়লো, বাবা? তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে গেছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছি না। এবার ত' আর অমন করে পালাবি নে?'

মণি কি যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, 'না মাসিমা, আর পালাব না।'

মুখ না তুললেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিষ্পলক হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির বিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন 'আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই ত' এমন করে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনছি।'
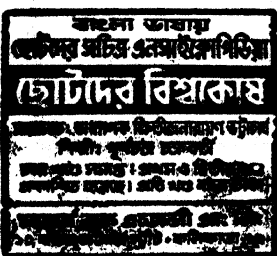
বৃদ্ধা এতগুলি কথা বলে হাঁপাবেন, চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোসের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে—ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরী এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরী নেই।

বৃদ্ধ আবার বলবেন, 'যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই—তা আমি কি জানি না? তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ—দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একবারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কি না করছে!'

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটি-বার তাকাতে আপনার ইচ্ছা হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

ধরা গলায় তখন আপনি শুধু বলতে পারবেন 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথানড়চড় হবে না।'

তারপর বিকেলে আবার গোরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকেই সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে 'আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল।'

আপনি হেসে বলবেন, 'থাক্ না। এবারে পারিনি বলে, তেলেনাপোতার মাছ কি বার বার ফাঁকি দিতে পারবে।'

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে একশো না দেড়শো বছর আগে, প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতি-বিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। সে-সব কথা ভালো করে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না আপনি শুধু নিজের হৃদয়স্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে শুনবেন,—'ফিরে আসব, ফিরে আসব।'

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছবেন তখন আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটোখাটো বিড়ম্বিত কটি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াশা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ-তোষক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে একশত পাঁচ ডিগ্রী, ডাক্তার এসে বলবেন 'ম্যালে-রিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?' আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলোয় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন, অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়ামোছা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। অস্ত-যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে যে তেলেনাপোতা বলে সত্যিই কোথাও কিছু নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোন দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তর রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

"দুঃখের তপস্যায় সবই অমৃত, পথেও অমৃত, শেষেও অমৃত। সফল হও ভালই, না হও ভালই। আসল কথা সফল হওয়া না-হওয়া নেই—তপস্যা আছে কিনা সেইটেই আসল কথা। সৃষ্টি তো স্থিতির খেয়ালে তৈরী নয়, গতির খেয়ালে। যা পেলুম তাও অহরহ সাধনা দিয়ে রাখতে হয়, নইলে ফেলে যেতে হয়। এখানে কেউ পায় না, পেতে থাকে—সেই পেতে থাকার অবিরাম তপস্যা করছি কিনা তাই নিয়ে কথা।..."

পুরী থেকে লেখা চিঠি। লিখছেন এক বন্ধু অপর বন্ধুকে। চিন্তায়-চেতনায় ঘরে-বাইরে অস্থির, উল্লোল কটি তাজা আর তরুণ প্রাণ নবতর জীবন-জিজ্ঞাসায় উদ্দীপ্ত, মুখর। অথচ মাথার ওপরে রবি-শশী তখনো আপন দীপ্তিতে অম্লান।

সময়টি কিন্তু উনিশ শো বাইশ সালে। তিরিশের যুগ শুরু হতে তখনো ঢের দেরী। অবশ্য এই পত্রালাপের অব্যবহিত এক বছর পরেই 'কল্লোল' সাহিত্যপত্রের আবির্ভাব এবং বাঙলার সাহিত্যাকাশে কতিপয় নতুন জ্যোতিষ্কের। যদিও তাঁদের অধিকাংশই তখন বিদেশী বইতে আপন দেশ খুঁজে পেতে চেয়ে অধিকতর আগ্রহী। রবীন্দ্র-বিরোধিতার আচকান গায়ে চাপিয়ে বুঝি শূন্যে অসি চালনাতেই মুখর, তৎপর বেশীর ভাগ। যে-অসিগাত্রে তখনো রবির কিরণ-লাগা ঝিকি-মিকি। এমন কি সব-শেষে রচনার নামটুকু অবধি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই হাত পেতে নিতে হয়।

যে-কোনো আন্দোলনেরই দুটো দিক আছে। হয় সাফল্য, নয় ব্যর্থতা। তাই বলে ব্যর্থ হবার সাধনা তো কেউ করে না। সেটা কাম্য নয় কারো। এঁরাও তা চান নি। তবু সেই চাওয়ার পেছনে কোথায় যেন ছিল প্রচণ্ড, প্রচ্ছন্ন এক অভিমানের তাড়না। যার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কাউকেই দায়ী করা যাবে না। সেটা অসমীচীন। বরং সেই মানা না-মানার কারণগুলি নিহিত ছিল দেশ-কালের সমসাময়িক অবস্থা আর ঘটনার গভীরে। আলোচনার প্রারম্ভেই সেই পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাস্রোতের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়াই হবে যথার্থ যুক্তিসংগত। নতুবা সমস্ত আলোচনাই হয়ে উঠবে সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেবার সামিল। কারণ সময় আর অবস্থার তাপে আর চাপেই তো ঘটে বস্তুর গুণগত পরিবর্তন, অংগার রূপান্তরিত হয় হীরকে।

তাহলে সেই ঘটনাগুলি কী? তৎকালীন ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলার সমাজ-সাহিত্য - রাজনীতির বিশাল পট-ভূমিকায় তার তাৎপর্য কতটুকু? উনিশশো বাইশের আগে-পিছে দেশে-বিদেশে সর্বত্র এমন কি ঘটনা ঘটে গেল যা ছিল অমোঘ, যা ছিল অবশ্যম্ভাবী, সতেজ আর বেগবান? যার ফলশ্রুতিতেই দেখা দিল এইসব তরুণ তাপসদের চিত্ত-বিক্ষোভ, নতুনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ?

তা হচ্ছে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব, রৌলট কমিটির সিডিশান রিপোর্ট প্রকাশ, জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি বর্জন, ভারত সংস্কার আইন, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন, শুরু, নেতাজীর সহযোগিতায় দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল গঠন, খিলাফৎ আন্দোলন, তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে নব্যতুর্কীর অভ্যুত্থান, প্রিন্স-অব-ওয়েলসের ভারত আগমনে দেশের সর্বত্র হরতাল পালন, প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক খিলাফৎ ও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের সমাবেশ বে-আইনী ঘোষণা। আর? বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাব। 'লিপিকা'র জন্ম। পত্রান্তরে শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' গল্পের প্রকাশ। ইতিহাসের দিগন্তে এক নতুন সম্ভাবনার রক্তিম উদ্ভাস।

এমনি সময়ে এলেন তিনি। শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাতে নয়, 'মহাসাগরের নামহীন কূলে হতভাগাদের বন্দরে' এক 'ক্লান্ত পদাতিক'। একা, স্বতন্ত্র, সংগীহীন। সকলের ভেতরে থেকেও যিনি ঠিক সকলের মত নন। 'গণ্ডায় আণ্ডা না মিলিয়ে' একা হয়েও যিনি অনন্য। কিন্তু এই আত্মপ্রকাশে তথাকথিত তারুণ্যের উচ্ছ্বাস কোথাও নেই, আছে এক সংহত আবেগ, যার সঙ্গে ঘটেছে মননের মেল-বন্ধন। সহজের পথ ছেড়ে দুরূহকেই পাবার এষণা। জীবনে জীবন যোগ করার এক দুঃসাধ্য সাধনা। এঁর নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোট-গল্পে এল হাওয়া বদলের পালা।

উনিশশো তিরিশ-একতিরিশের 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় 'শুধু কেরানী' আর 'গোপনচারিণী' গল্প দুটিই বোধ করি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প যা বাঙলা ছোটগল্পের স্বাস্থ্য নতুন করে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এবং প্রথম লেখাতেই কিস্তিমাৎ। এমন ঘটনা অতি অল্পসংখ্যক লেখকের জীবনেই ঘটেছে। এ জন্যে কব্জির জোর চাই। স্বধর্মে নিষ্ঠা থাকা চাই। প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখেছেন অনেক। সয়েছেন তারও বেশী। কিন্তু দেখা মানেই তো অভিজ্ঞতা নয়। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অবহেলিত সুখ-দুঃখের হাত থেকে অর্জিত যে-ধন তারই নাম অভিজ্ঞতা। এই দেখা আর অভিজ্ঞতার মিলনে জন্ম নিচ্ছে শিল্প। মহাকালের দরবারে নিরন্তর বিচার চলেছে তাদের। কেউ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে স্মৃতির স্বর্গে, সম্মানের সিংহাসনে। বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে কেউ। এখানে ক্ষমা নেই। পক্ষপাত/পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন এখানে অচল। মহাকালের গোলায় তাই সোনার ফসলই জাজানো থাকে চিরদিন।

ইটখোলায় তদারকি থেকে সাময়িক পত্রের সম্পাদনা, সেখান থেকে দৈনিকের দপ্তর ঘুরে চলচ্চিত্রের রঙ্গভূমিতে

অবতরণ—বিচরণের ক্ষেত্র সামান্য ছিল না তাঁর। আর এই বিচরণ-অভিজ্ঞতারই ইতিহাস ছড়িয়ে আছে 'পাঁক' উপন্যাসে, 'মিছিল'এ। [illegible] ভেতরেও তিনি হারিয়ে যান নি, ফুরিয়ে যান নি কোথাও। বরং বার-বার তাঁর অভিজ্ঞতার সোহাগায় মিশেছে অনুভবের সোনা। অথচ হারিয়ে যাবার সুযোগ ওৎ পেতেই ছিল, আছেও এখনো। অন্তত অনেকেই যখন পিছলে যাচ্ছেন, পুনরাবর্তন করছেন, তিনি তখন 'মনুস্বাদশ' লিখে আরেকবার আমাদের চমকে দেবার ক্ষমতা ধরেন, সাহস রাখেন। হয়তো এটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি একাই একটি যুগ, একটি ধারা। জীবনের যে জটিল গূঢ়েষণার সাক্ষাৎ মেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শীতল গবেষণাগারে প্রেমেন্দ্র মিত্র এক হিসেবে তারই পূর্বসূরি। আবার পরবর্তীকালে তাকেই তিনি বিস্তৃতি দিয়েছেন বিরাটের প্রতি, মহতের প্রতি এক তাপ-স্নিগ্ধ পিপাসা জাগিয়ে। যে কারণ কালের হিসেবে কল্লোলের হয়েও তিনি দলছাড়া। যাত্রার শুরু থেকেই তিনি পৃথক। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সাগর সঙ্গমে' আমাদের অসাড়, আড়ষ্ট করে, 'হয়তো' গল্পের নিষ্ঠুর রহস্যময়তা আমাদের হতচকিত করে। হৃদয়ের কোমলতম বৃত্তিগুলির গায়ে গা লাগিয়ে দিব্যি টিকে আছে মানুষের পাশব প্রবৃত্তিগুলি। আশা আর হতাশা যেন একই সচল মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ; যা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে আহত না হয়ে পারি নে।

কিন্তু সুখে-দুঃখে উদ্বেল, বিবর্ণ, বিষণ্ণ জীবনের সবটুকু বিষ নির্দ্বিধায় আপন কণ্ঠে ধারণ করে যিনি নীলকণ্ঠ, নিষ্ফল প্রেম ও নিরুৎসব জীবনের অন্ধকার ঘাটে-ঘাটে হালভাঙা জাহাজের সন্ধানে যিনি এখনো বিনিদ্র, জাগর, ক্লান্তিহীন—স্থান-কালের যথার্থ নিরিখে কী তাঁর ভূমিকা আর কতটুকু? বস্তুত কোন পর্যায়ে তাঁকে ফেলা যায়? 'চোখে পিচুটি' নিয়ে 'অক্ষম' সমালোচকের দল কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে একদিন তা নিশ্চয়ই স্থির করে ফেলবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিধাতা সম্পর্কে সংশয়ে, সন্দেহে নিরত অস্থির, কণ্টকিত যে-মানুষটি প্রবৃত্তির কঠিন পাশে আবদ্ধ মলিন মানবাত্মার বেদনায় আর্ত, আতুর; দুঃখে-দৈন্যে জর্জর, কদর্য সংসার ও জীবনের মুখোমুখি নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে যিনি নিরন্তর লাঞ্ছিত, অপমানিতের প্লানি-মুক্তির শেষে সুখ-স্বর্গের সন্ধানে তৎপর,—আসলে তিনি কবি। বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গেই যেন এদিক থেকে তাঁর আত্মার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর মনে হয়।

আর গল্প রচনায়?

সেখানে তিনি রাজা। তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

কবি-চেতনা তাঁর গল্পে রোমান্টিক অস্থিরতা ও নস্টালজিয়ার পরিবর্তে এনে দিয়েছে এক সতর্ক, সুসম গভীরতা ও পরিমিতিবোধ। রবীন্দ্রনাথের পরে মননমেধায় বোধ করি তিনিই সেই বিরল সার্থকনামা ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে প্রথম শ্রেণীর কবি ও গল্পকার। বাক্-রীতির নিপুণ সংযম তাঁর গল্পকে এক স্থির কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছে। যার প্রভাব পরবর্তী কালের অনেক লেখকের রচনায় প্রায় অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রতিফলিত। এবং এখানেই তাঁর জয়। একা হয়েও তিনি অনন্য। যদিও ভাষা ও শব্দের সহজ, অনাড়ম্বর ব্যবহার উপরন্তু তাঁর অপাত কাব্যময়তা আচমকা 'লিপিকা'র কথা মনে করিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা ভালো যে, 'লিপিকা'র অন্তর্গত কাহিনীগুলির কবিতা হয়ে ওঠাই মুখ্য। গদ্যের ঢিলে-ঢালা পোশাকে তারা কবিতার আসরেই জাঁকিয়ে বসতে চাইছে সবাই। সেক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প কবিতার হাত ধরে একেবারে সাধারণ্যে পৌঁছুবার তাগিদে অচঞ্চল। মাথায় তার ঘোমটা নেই, চোখে নেই ক্রীড়াবনত চাহনি। উদ্ধৃতির সাহায্য নিলেই বোধ করি পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা।

'তখন পাখীদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।

তাদের বিয়ে হল।—দুটি নেহাত সাদা-সিদে ছেলে-মেয়ের।

ছেলেটি মার্চেন্ট অফিসের কেরানী—বছরের পর বছর ধরে বড় বড় বাঁধানো খাতায় গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে আমদানি-রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—সলজ্জ সহিষ্ণু মমতাময়ী।

আফ্রিকা জুড়ে কালো কাফ্রী জাতের উদ্বোধন-হুংকারে সাদা বরফের দেশের আকাশ কেমন করে শিউরে উঠছে সে খবর তারা রাখে না। হলুদবরণ বিপুল মৃতপ্রতিম জাতি একটা কোথায় কবরের চাদর ছুঁড়ে ফেলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তাজা রক্তের প্রমাণ দিতে, সে খোঁজ রাখবার দরকার হয় না।

তারা বাংলার নগণ্য একটি কেরানী আর কেরানীর কিশোরী বধূ।'

কবিতা নয়, অথচ কবিতার মত। একবার পড়লে কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। কিন্তু গল্প। কী নিপুণ সংযম আর সাবধানতার সঙ্গে তুলির কটি সূক্ষ্ম আঁচড়ে আঁকা হয়ে গেল বাস্তব জীবনের এক নিখুঁত অথচ নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি! দেশ-কালের পরিচিত পটভূমিকায় মুহূর্তে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল দুটি সরল, সাদা-মাটা প্রাণের মানুষকে। তারা 'একটি কেরানী আর কেরানীর কিশোরী বধূ'। ভালোবাসা ছাড়া জীবনে যারা আর কিছুই চায় না, চেনে না, বোঝে না। ভালোবেসেই যারা পরস্পরকে পূর্ণ করে রেখেছিল। মৃত্যু এসে সেখানেই হাত রাখে। লেখক এখানে ঈশ্বরের মতই অবিচল, ক্ষমাহীন। কিন্তু মমতায় স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর। কবিতা এখানে গল্পের পথ আগলে দাঁড়ায় না। বরং হাত ধরে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসে—যেখানে হাজার লোকের নিত্য চলা-ফেরা।

তাঁর সৃষ্ট গল্পের চরিত্রগুলি যেন এক প্রশ্নলোকের অধিবাসী। জীবনকে কখনো এক বিশেষ স্থান-কালের পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখার স্বভাব তাঁর নয়। যে-আঞ্চলিকতা তারাশঙ্করের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অথবা যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতিচেতনা বিভূতিভূষণের গল্পে-উপন্যাসে বিন্যস্ত কিম্বা যে আন্তর্জাতিকতা অন্নদা-শঙ্করের শিল্পকর্মের প্রধান অবলম্বন, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেখানে মোটামুটি বলা যায় নিরুৎসুক। কিন্তু হিংস্র, নিষ্ঠুর, নির্মম নিয়তিবাদ এবং তার সহজ অথচ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির প্রতি নিবিড় আত্মীয়তাই যেন তাঁর গল্পগুলিকে স্বকীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলেছে। আগেই বলেছি, এদিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-কেই বরং তাঁর সমগোত্রীয় বলে মনে হয়। আর হয়তো জগদীশ গুপ্ত।

ভাষা-ব্যবহারে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। চিন্তার সঙ্গে স্বপ্নের এমন মেলবন্ধন, মাঝে মাঝে এমন বুদ্ধির চমক আর কোথায় দেখেছি মনে পড়ে না।

মিতভাষণ, বক্তব্যের সূক্ষ্ম উপস্থাপনা, নিখুঁত চরিত্রসৃজন ছাড়াও ইঙ্গিতধর্মিতা তাঁর গল্পের আরেকটি বিশেষ গুণ। উদা-হরণসহযোগে কথাটা বুঝিয়ে দিতে চাই।

'ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, 'ভর-সন্ধ্যেয় দরজা বন্ধ কেন লা বেগুন? খোলো না, কতক্ষণ দাঁড়াবো?'

স্থান-কাল-পাত্র মিলিয়েই তো গল্প। গল্পের পরিবেশ। ঘটা করে বলা না হলেও ক'টি মাত্র শব্দের সহায়তায়, একটি মাত্র বাক্যের বন্ধনে তা স্পষ্ট, প্রখর হয়ে ওঠে। উদ্ধৃত অংশটি তারই প্রমাণ। ভর-সন্ধ্যেয় গৃহস্থের ঘরের দরজা খোলা না রাখাই রীতি। কিন্তু এখানে বন্ধ রাখার জন্যেই 'বাড়িউলীর' তীব্র আপত্তি। তার কণ্ঠটি কর্কশ। এবং যার ঘরের দরজা বন্ধ তার নাম বেগুন। আর যেন বলার প্রয়োজন নেই। এদের আমরা মুহূর্তে চিনে ফেলি।

এমন আড়ম্বরহীন অথচ আড়ষ্টতাশূন্য শব্দের সংযত প্রয়োগেই তাঁর গল্পের শরীর গঠিত। তিল-তিল করে তৈরী হচ্ছে একটি অসামান্য শিল্প-প্রতিমা যার কোথাও মেদের বাহুল্য নেই, চড়া প্রলেপ নেই কোনখানে। না বলা কথাটিই ব্যক্ত করার তাগিদে গল্পটি এক জায়গায় এসে ব্রেক-কষে দাঁড়ায়। ভেতরে অফুরন্ত গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও সে তখন নিশ্চল। কী তীব্র, তীক্ষ্ণ, দ্যুতিময় সেই পরম মুহূর্ত।

'স্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মত হিংস্র গর্জন করছে। উঠে কোথাও সরে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পারে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কিছুতেই—আজ কোন দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।'

[illegible]গল্প অনেক আছে। [illegible] অভিনব আঙ্গিকে রচিত 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'। তেলেনাপোতায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে একদিন যামিনীর কাছ থেকে শহরে চলে এল, বহু-দিন ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর মনে হয় মেয়েটি হয়তো......কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র'। নিজের দেয়া প্রতিশ্রুতিই আজ তার কাছে মূল্যহীন, অবাস্তব, অন্যায় ঠেকে।

'মহানগরে' সরল, নিষ্পাপ রতনকে কি নিষ্ঠুরের মতই না জীবনের কুৎসিত জটিলতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন লেখক।

অন্যত্র মধুর দাম্পত্য জীবনের বন্ধন-কেই বিদ্রূপ করে সিদ্ধির সীমায় পৌঁছুতে চায় আরেক হীন, কদর্য বন্ধন। 'শৃঙ্খল' গল্পের উপসংহারে তারই পূর্ণ পরিচয় মেলে, 'প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে-শৃঙ্খল তাহারা ছিঁড়িলে আর বাঁচিবার সম্বল কি রহিল—জীবনের কি আশ্রয়? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।'

তেমনি গল্প 'ভস্মশেষ', 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'পুন্নাম'। —এক-একটি হীরের টুকরো।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ক্লান্তিহীন। মাঝে-মাঝে বিদ্যুচ্চমকের মত চতুর্দিক ঝলকে দেবার ক্ষমতা এখনো রাখেন। কারো-কারো ক্ষেত্রে বয়স হয়তো দেখার শক্তি বাড়িয়ে লেখার শক্তি কেড়ে নেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেলায় এই আপ্তবাক্য সত্য নয়। নব-নব সৃষ্টির তাগিদে তিনি এখনো অনির্বাণ, অফুরন্ত। প্রেমেন্দ্র এখনো আমাদের জীবন্ত বিস্ময়।
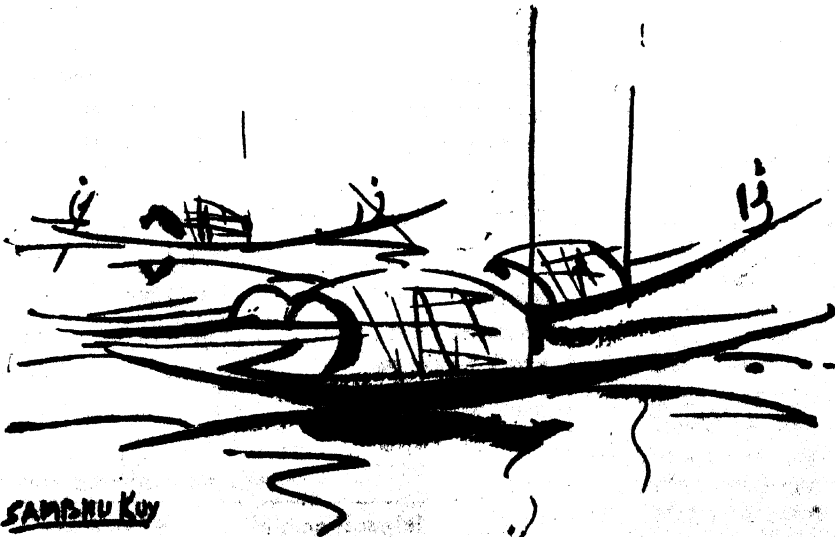
রেললাইন থেকেই দেখা যায় কতক-গুলি ছোট-বড় গাছের আড়ালে একখানি ভাঙা বাড়ি, সামনে ছোট্ট একটি ডোবা। বাড়ির চারিদিকে, ঘেঁটু আশশ্যাওড়া আরও কত কিসের ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল। বাড়ির ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। নোনাধরা দেওয়াল স্থানে স্থানে এত খয়ে গেছে যে, কি করে অমন বাড়িতে মানুষ থাকে ভাবতে বিস্ময় লাগে। বাড়ির চারিদিকের পাঁচিল মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে অন্দরের উঠোন পর্যন্ত দেখা যায়। খোয়া-ওঠা উঠোন। তার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত তার ঝোলানো, তাতে কয়েকখানা ছেঁড়া কাঁথা, ভিজে কাপড় ঝুলছে। ওইতেই অন্দরের মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে।

ডোবার বাঁধাঘাটের অবস্থাও সমান শোচনীয়। অন্ধকারে পা না ভেঙে নামা অসম্ভব। কিন্তু ওদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে একটা ছোট ছেলেও চোখ বুজে নামতে পারে। এই ঘাটটিই এ পাড়ার খিড়কি, ছোট ছোট পানায় তার জল এমন নীল হয়ে গেছে যে ছুঁতেও ঘৃণা হয়।

সকালবেলা। সবে সূর্য উঠেছে। একটি বৃদ্ধা বিধবা ঘাটের পৈঠায় বসে তামাকের গুল দিয়ে যে ক'টি দাঁত এখনও অবশিষ্ট আছে সেই ক'টি সযত্নে মার্জিত করছিল। আর একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক মাথায় আধ-ঘোমটা টেনে ঘাটের অপর প্রান্তে ঘাড় হেঁট করে নিঃশব্দে বাসন মাজছিল। চারিদিকে গাছের ঝিমিয়ে-আসা পাতায় কেমন একটা স্তব্ধতা এসেছে। তারই বিষণ্ণ ছায়া পড়েছে ডোবার নিস্তরঙ্গ নীল জলে।

একটি বউ ভাঙা বাড়ি থেকে মন্থর-পদে বেরিয়ে এসে ঘাটের মাথায় মুখ ঢেকে থমকে দাঁড়াল। কতই বা তার বয়স হবে? কুড়ি-একুশ, কি আরও কম। ছিপছিপে শরীর, কিন্তু তারও বাঁধন যেন আলগা হয়ে পড়েছে। গাছ থেকে লতার বাঁধন আলগা হয়ে গেলে লতার যে অবস্থা হয় তেমনি। যেন এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে। বউটি মুখ ঢেকে দাঁড়াল। ঘাটের এই দুটি মেয়ের কাছে মুখ দেখাতে তার ইচ্ছে করছে না। তার কাঁচা ঘাসের মতো কোমল লাবণ্য যেন কোথায় উবে গেছে। কোমল ত্বকে কর্কশতা এসেছে। মুখে কলঙ্করেখা দেখা দিয়েছে। চোখে জল নেই বটে, কিন্তু লাল, রক্তের মত লাল। আর তার মন পল্লবে বিশ্বের আশঙ্কার ছায়া এসেছে ঘনিয়ে। তারই ওপর মাথার মুখে চুলগুলি বাতাসে বাতাসে উড়ে উড়ে এসে পড়ছে। চোখের কোণে রাত্রি জাগরণের কালিমা।

বউটি ঘাটের মাথায় থমকে দাঁড়াল। পরিচিত মানুষের সামনে তার পা যেন চলতে চাইছে না। কিন্তু তবু থমকে দাঁড়ালে চলবে না। দিনের সব কাজই তার বাকি। বুড়ি শাশুড়ীর কাল থেকে কোমর যেন ভেঙে গেছে। আর উঠতে পারছেন না। স্তিমিত দৃষ্টি চোখের জলে অন্ধ হবার উপক্রম। তবু কান্নার এখনই হয়েছে কি? বলতে গেলে এখনও তো শুরুই হয়নি। এখনও মানুষটির শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, চোখ মেলে চাইছে, অতি কষ্টে দুয়েকটি কথাও বলছে। কিন্তু আর বোধ হয় বেশিক্ষণ নয়। হয়ত আজ দুপুরেই নিশ্বাস থেমে যাবে, চোখ মেলে চাওয়াও হবে শেষ। ডাক্তার মুখে কিছু বলেন নি বটে, কিন্তু তাঁর মুখ-চোখ দেখে বুঝতে আর কারও বাকি নেই। হয়তো দুপুরেই, কিংবা বড়-জোর সন্ধ্যায়। তার বেশী নয়। কান্নার শুরু হবে তখন। তখন থেকে সমস্ত জীবন-ভোর। সমস্ত জীবন-ভোর...সমস্ত জীবন-ভোর...সমস্ত জীবনভোর...

এর বেশি তরুবালা আর ভাবতে পারে না। একটি জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তারই সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বাকি জীবনগুলি সামনে চলতে থাকবে—এ যেন বিশ্বাস করার মতো কথা নয়। যাকে প্রত্যহ দেখছি, যার অস্তিত্ব প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করছি, অকস্মাৎ একটি বিশেষ মুহূর্তের পরে তাকে আর কোথাও দেখা যাবে না—এ কথা ভাবতে গেলেও মন হু হু করে, মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে, অকস্মাৎ পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গিয়ে সমস্ত মন বিস্বাদ ঔদাসীন্যে পরিপূর্ণ হয়। জীবনের যেন আর কোন মানেই থাকে না।

যে বৃদ্ধা পিছন ফিরে দন্তধাবন করছিল, তরুবালাকে সে লক্ষ্য করেনি। তরুবালা তখন ঘাটের শেষ পৈঠায় পৌঁছেছে। যে মেয়েটি বাসন মাজছিল, সে যেন তরুবালাকে দেখে সভয়ে সরে একটু সরে বসল। বৃদ্ধার দৃষ্টিও তার ওপর পড়তে সেও অপ্রয়োজনে একটু সরে গেল। সবাই জানে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই বধূটির দুঃখে বনের পাখীও কেঁদে উঠবে। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। এই অল্প সময়টুকু কেউ তাকে কোনো দুঃখ দিতে চায় না। এই ঘাটেই বাসন মাজা নিয়ে কতজনের সঙ্গে কত কলহই না হয়ে গেছে। ছোট ঘাট। তিনজন নামলেই চতুর্থ জনের আর পা ফেলবার জায়গা থাকে না। তাকে বাসনের গোছা হাতে করে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কোথায় কে পৈঠার ওপর চিবানো ডাঁট ফেলে গেছে; কার পাতের ভাত ঘাটের কোণে জড় হয়ে আছে, ফেলে দিতে মনে নেই; কার এঁটো বাসনে কারও পা ঠেকেছে, এই অবেলায় নেয়ে মরতে হবে; কলহের কারণের কি অভাব আছে? কিন্তু সে সব আজ নয়, বিশেষ করে এই বধূটির সঙ্গে কিছুতে নয়। ওর সিঁথির সিন্দুর এখনও জ্বলজ্বল করছে বটে, কিন্তু সে সিন্দুর চিহ্নের দিকে চাওয়া যায় না। সে যেন ওর সিঁথিকেই বিদ্রূপ করছে—মর্মান্তিক বিদ্রূপ। যে সীমন্তিনীর সকল গৌরব আর কিছু পরেই পথের ধুলোয় মিলিয়ে যাবে, তাকে প্রতিবেশিনীরা সকল গৌরব নিঃশেষ করে আজকেই মিটিয়ে দিতে চায়। যাকে ক'দিন আগে তারা গ্রাহ্যই করেনি, আজ তাকেই দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে।

বউটি সসঙ্কোচে ঘাটে নামল।

—নিবারণ কেমন আছে বৌমা?

বৃদ্ধা একবার গলাটা ঝেড়ে, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে।

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কিছু নেই। নিবারণের অবস্থা কাল রাত থেকেই খুব খারাপ। ভালো লক্ষণ যা ছিল, একটি

একটি করে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশা করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বোঝা উত্তর দিলে না। নিঃশব্দে মাথাটা নেড়ে ডান হাত দিয়ে ললাটের চুলগুলি সরিয়ে ফেললে। এই ক'দিনের রোগী-সেবায় আর দুর্ভাবনায় তার শরীর আধখানা হয়ে গেছে। শীর্ণ করপ্রকোষ্ঠে চুড়ি দুগাছি ঢল ঢল করছে। ওই দু'গাছি সরু চুড়িই আজ তার সম্বল। চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের পর তার গায়ের গহনা—অবশেষে ওই দু'গাছিতে এসে ঠেকেছে।।

প্রতিবেশিনীরা সহানুভূতিসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কাজ তাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে চলে গেল।

ফাল্গুনের শেষ। জলে এখনও শীত রয়েছে বেশ।

এই ডোবার সামনে চারিদিকের উঁচু পাড় বাইরের পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে রাখে। অকস্মাৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তরুবালা যেন বেঁচে গেল। মুমূর্ষু রোগীর অস্ফুট আর্তনাদ, পাণ্ডুর চোখের কাতর-দৃষ্টি, শিশুপুত্রের কখনও দাপাদাপি, কখনও চিৎকার,বৃদ্ধা শাশুড়ীর ভাষাহীন বিহ্বল দৃষ্টি—জরা-মৃত্যু-ব্যাধিগ্রস্ত বিপুল পৃথ্বী তার সমস্ত কুশ্রীতা নিয়ে এই গোষ্পদের সুগভীর নির্জনতায় তলিয়ে গেল।

তরুবালা মুখ ধোবার জন্যে ঘাটে এসেছিল। তার এখনও অনেক কাজ বাকি। সমস্ত রাত ছটফট করে এখন একটু নিস্তেজ হয়ে স্বামী ঝিমুচ্ছে। এখনই উঠবে বোধ হয়। কাছে কেউ নেই। সমস্ত রাত্রি জেগে শাশুড়ী এ ঘরে এলিয়ে পড়েছেন। ছেলেটা সকালে উঠে পুজোর রঙীন পাঞ্জাবীটা গায়ে দেবার জন্যে বেজায় ঝোঁক ধরেছিল। সেটা বের করে দিতেই ছুটতে ছুটতে পাড়ায় বেরিয়ে গেছে। স্বামীর কাছে কেউ নেই। রোগীর ঘুম, হয়তো এখনই উঠে পড়বে। তাকে ওষুধ দিতে হবে। কত কাজ। ছেলেটা একটু পরেই ফিরবে। গয়লা দুধ দিয়ে গেছে, সেটুকু গরম করে রাখতে হবে। নইলে ক্ষুধায় ছেলেটা কাঁদবে। কাল শাশুড়ীর একাদশী গেছে। তাঁর দ্বাদশীর ব্যবস্থা করতে হবে। আর নিজের জন্যে না হলেও, ওদের দুজনের জন্যেও তো দুটো ভাতে ভাত চাঁড়িয়ে দিতে হবে। মাত্র একটি মানুষেরই জীবনের তেল ফুরিয়ে এসেছে। সে যাবে, যারা থাকবে তাদের খেতেও হবে, খাটতেও হবে, সবই করতে হবে।

তরুবালার অনেক কাজ। কিন্তু ডোবার ঠাণ্ডা জল তাকে লোভ দেখাচ্ছে। সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে। উনিশ-কুড়ি বছরের তরুবালা আর পারে না। সে আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে এই সুশীতল একাকিত্বে যেন মগ্ন হয়ে গেল। বাইরের পৃথিবীর কিছুই আর খেয়াল রইল না।

খেয়াল রইল না নিজের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী অসংখ্য দুঃখ-দারিদ্র্য ও জীবন-সংগ্রামের দুর্ভাবনা। বুড়ি শাশুড়ী গঁজ-রি করেও আরও কতকাল বাঁচবেন কে জানে, কে জানে সে নিজেই কতকাল্লার পরমায়ু নিয়ে এসেছে। ছোট ছেলে একদিন বড় হবে, তাকে মানুষ করতে হবে,—কিন্তু সে পরের কথা পরে, আপাতত এই তিনটি প্রাণীর দৈনন্দিন দুবেলা দুটি গ্রাসের অন্ন কে জোগাবে সেই তো সমস্যা।

কিন্তু তরুবালা আর ভাবতে পারে না। গত পনেরো দিন ধরে সে কেবলই ভাবছে, কেবলই ভাবছে। ভেবে ভেবে তার দেহ-মন ভেঙে গেছে, মস্তিষ্কের ভাববার শক্তি লোপ পেয়েছে। একটু সে বিশ্রাম চায়। একটু বিস্মৃতি।

ডোবার নীল জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা। উঁচু পাড়ের আড়ালে পৃথিবীতে চলছে ভাঙা-গড়ার খেলা—অবিশ্রান্ত। ঝোপে ঝোপে ক'টি পাখী তুলেছে নিরবচ্ছিন্ন কূজন। তরুবালার সব ভুল হয়ে গেল......

সে ডোবার জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মুখ দিয়ে জল ছিটিয়ে আপন মনে খেলা করতে লাগল।

নিবারণ মস্তবড় লোক নয়। সে মারা গেলে তার নিজের নিভৃত কোণটি ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা যাবে না। না বেরুবে খবরের কাগজে ছবি, না লেখা হবে ইনিয়ে বিনিয়ে সত্যি-মিথ্যে নানারকম শ্রদ্ধাঞ্জলি। এক যদি কোনো বড়লোকের মোটর চাপা পড়ে মরতে পারত, কিম্বা পুলিশের গুলীতে, তাহলেও হত। কিন্তু সে মরছে নিতান্ত মামুলি ধরণে। দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগে অস্থি-চর্মসার হয়ে—আরও কোটি কোটি লোক প্রত্যহ যেমনভাবে মরছে। এমন মৃত্যুর কেই বা খবর রাখার উৎসাহ বোধ করে! আর কি উৎসাহই বা বোধ করবে? কেউউ কি তাকে চেনে? মানব-সভ্যতায় তার দান কি?

নিবারণ ক্যানভাসার। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল লাইনে সে ট্রেণে ফেরি করে বেড়ায় জি সি দত্তের বিখ্যাত নিমের মাজনের, জয়পুরের মানসিং গুলীর, নারকেল তেলের মসলার, সুগন্ধী ধূপ-কাঠির, আর মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা ঝন্‌ঝন্‌ কন্‌কন করার অব্যর্থ ও একমাত্র ওষুধ মাথলিনের!

তার বয়স পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, কি বড় জোর আটাশ অর্থাৎ তাকে দেখে বয়স বলা শক্ত।

নিবারণ সাধারণ বাঙালীর চেয়ে অন্তত চার ইঞ্চি বেঁটে রোগা। সে তুলনায় গোঁফ-জোড়া যথেষ্ট বড়। আর জুলফি নামাতে নামাতে গাল পাট্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাল মাংসহীন। চোয়াল চওড়া, আর সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে। নাকের গোড়াটা চ্যাপটা, কিন্তু ডগাটা বর্তুলাকার। হাঁ-মুখ অসম্ভব রকম বড়, আর পুরু পুরু ঠোঁট। আর কণ্ঠ? নিবারণ পাশের গাড়ীতে কথা বললেও এ গাড়ি থেকে শোনা যায়।

লোকটি ওরই মধ্যে একটু সৌখীন। গায়ে থাকে একটি সিল্ক, নয়তো লংক্লথের পাঞ্জাবী। পরণের কাপড় ধোপদুরস্ত। হাতে রিস্টওয়াচ। মাথায় চুলে পরিপাটি টেরি। এর সঙ্গে মিলত না তার জুতো। সময়াভাবে জুতোয় কালিও দিতে পারত না, মেরামতও করাতে পারত না। আর সময়ের অভাব ঘটত ক্ষৌরকর্মে। ক্যানভাসারের রবিবারও নেই, দোল-দুর্গোৎসবও নেই। সেই কারণে মুখমণ্ডল প্রায়ই শ্মশ্রুকণ্টকিত হয়ে থাকত।

ন'টার সময়ে যা-হোক দু'টি নাকে-মুখে দিয়ে তাকে বেরুতে হত এই যা-হোক দু'টির ব্যবস্থা করতেই তরুবালাকে উঠতে হত ভোর পাঁচটায়। নিবারণ একটু নিদ্রাবিলাসী। উঠতে তার সাড়ে সাতটা বেজে যেত। তাও কি সহজে? তরুবালা চা নিয়ে এনে কত সাধ্যসাধনা করে তবে ওঠাত। চোখ বুঁজে বুঁজেই নিবারণ চা-টুকু খেয়ে নিত। তার পরে একটু অবসাদ কাটলে, উঠে তেল মেখে, একেবারে দাঁতন করতে করতে নাইতে যেত—কি শীত, কি গ্রীষ্ম। স্নান করে এসেই খেতে বসা, তার পরে ন'টা সাতের ট্রেন ধরতে স্টেশনে দৌড়ান। যাওয়ার সময় তরুবালা হাসি-মুখে দুটি পান দিত—প্রত্যহ। এর আর ব্যতিক্রম ছিল না। খোকা নিজের হাতে বাপের মুখে পান দুটি তুলে দিত। কোন দিন প্রসাদ পেত, কোনদিন পেত না।

তারপরে ?

জি সি দত্তের বিখ্যাত নিমের মাজন চাই? মাজন? আপনারা অনেক দামি দিশি ও বিলাতি মাজন ব্যবহার করে দেখেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নিমের মাজনও একবার ব্যবহার করে দেখতে অনুরোধ করি। মহাশয়গণ, এ মাজনে কোন অদ্ভুত জিনিস নেই। এ আমাদের দিশি গাছ-গাছড়ায় তৈরি। এতে আছে আমলা হরিতকী, বহেড়া...দাঁত-নড়া, দাঁতে রক্ত-পড়া, দাঁতের গোড়া কনকন করা, দাঁতের পোকা প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ একদিনেই আরোগ্য হবে। এ আমাদের বাজে কথা নয়, মহাশয়গণ, যাঁদের দাঁত হল্‌ হল্‌ করে নড়ছে, কিম্বা মুখে এমন দুর্গন্ধ হয় যে কারও সামনে কথা বলতে সংকোচ হয়, এমন যদি এখানে কেউ থাকেন, তাঁকে একবার আমাদের এই মাজন পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি, এক মাসের ব্যবহারযোগ্য এক কৌটার দাম মাত্র দু পয়সা। একসঙ্গে তিন কৌটা নিলে মাত্র পাঁচ পয়সায় পাবেন। মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে চমৎকার সুগন্ধ হবে। যাঁর দরকার হবে চেয়ে নেবেন।

মুখের গন্ধ এত লোকের মধ্যে স্বীকার করতে কেউ রাজি নয়। যাদের দাঁত হল হল্‌ করে নড়ে তারাও এই ট্রেনে, মুখ ধোবার জল নেই কিছু নেই, এমন মহৌষধ ব্যবহার করে দেখতে সম্মত হয় না। তবু প্রয়োজন-মত কেউ কেনে, কেউ কেনে না।

নিবারণ বিখ্যাত মাজন ব্যাগে পুরে আবার একটা নতুন জিনিস তুলে চিৎকার আরম্ভ করে :

জয়পুরের মানসিং গুলি। চাই কারও? মহাশয়গণ, আমাদের নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি, একটু দয়া করে শুনবেন।

হয়তো কোন ভদ্রলোক একটু ঝিমুচ্ছিলেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বলেন, দয়া না করেও শুনতে পাচ্ছি মশাই, একটু আস্তে বলবেন।

নিবারণ অপ্রস্তুত হয় না, হাসে। গলা একটুও না নামিয়ে বলে চলে,—মুখস্থ বুলির মতো :

—মহারাজা আলমগীর এই গুলি ব্যবহার করতেন। হাসবেন না মহাশয়গণ, আপনাদের দেশে সব ছিল। কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যাতে বিলিতি ওষুধের দোকানের ছাপ মারা নেই, এখন আপনারা তার নাম শুনলেও হেসে উঠবেন! আমার কথায় আপনাদের বিশ্বাস হবে না মহাশয়গণ। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? এতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে, দেহের বল বাড়ে, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়, গলাধরা, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া, টন্সিলের ব্যথা সমস্ত আরোগ্য হয়। মূল্য একশো গুলির শিশি মাত্র চার আনা। আমার কাছে ছোট নমুনা শিশিও আছে। মূল্য চার পয়সা মাত্র। যার আবশ্যক হবে, চেয়ে নেবেন।

তারপর নারকেল তেলের মসলা। তার পরে মাথলিন।

সবই পরের পর নিবারণ তোতাপাখীর মতো গড়গড় করে বলে। যাদের ওষুধ, কি বলতে হবে তারা তা লিখে দিয়েছে। নিবারণ মুখস্থ বলে যায়। তার নিজের অবদান' মাঝে মাঝে 'মহাশয়গণ' কথা বসিয়ে দেওয়ায়।

ওর সাহিত্যিক কৃতিত্ব হচ্ছে সুগন্ধী ধূপের বেলায়। সেইজন্য এইটে সে সবশেষে বলে : রাত্রিবিলাসও বটে, আরতিবিলাসও বটে! যার যেমন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেবেন।

'বাসর-মজান', 'রাত্রি-বিলাস'—আর তার সঙ্গে 'আরতিবিলাস' এই তিনটে কথা তার নিজের আবিষ্কার এবং এই 'সাহিত্যিক' প্রচেষ্টায় সে বেশ গর্ব অনুভব করে। আরও কয়েকজন ধূপ বিক্রী করে, কিন্তু তারা শুধু বলে মহীশূরের সুগন্ধী ধূপ। নিবারণের 'ট্রেড মার্কা' যেন কেউ ব্যবহার না করে সেজন্যে তাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

নিবারণ তার 'ট্রেড মার্কের' ফল ভ্রাতৃবৃন্দের ওপর কিরকম হল—চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর বলে :

—যাঁরা অনেকদিন পরে বাড়ি যাচ্ছেন তাঁরা অন্তত এক প্যাকেট কিনে নিয়ে যান। দেখবেন সুগন্ধে ঘর মৌ মৌ করবে, মানুষের' মুখে হাসি ফুটবে, সুখে নিশি প্রভাত হবে, আর আমার ধূপের জয় জয়কার হবে। বাসর-মজান ধূপ। সুগন্ধে বাসর-রাত্রির কথা মনে পড়বে। নিয়ে যান। রাত্রিবিলাস ধূপ, আরতিবিলাসও বটে,—যাঁর যেমন দরকার। এক প্যাকেট মাত্র দু'পয়সা, পাঁচ পয়সায় তিন প্যাকেট। একরাত্রেই দামের চতুর্গুণ উশুল হবে। নিবারণ আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে। তার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলেই হোক, আর যে কারণেই হোক, ধূপটা বিক্রি হয় বেশ, মানে অন্য জিনিসের চেয়ে বেশি।

প্রায় কামরায় দু'একজন পরিচিত লোক থাকেন। ছ'বছর ধরে এই লাইনে সে ঘুরছে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে রসিকতা হয় :

—এই যে বাবুদাদা, আবার অনেকদিন পরে যে! কলকাতায় বাসা করেছেন? বেশ, বেশ, তাহোক্, বাসর-মজান ধূপ দু'প্যাকেট নিয়ে যান। এত সস্তায় এ জিনিস আর কোথাও পেতে হয় না!

বাবুদাদার 'না' বলবার উপায় থাকে না। ততক্ষণে নিবারণ তাঁকে দু' প্যাকেট ধূপ গছিয়ে দিয়েছে।

বাবুদাদা কেবল একবার বলেন, দু'-প্যাকেট নয়, এক প্যাকেট দিন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! নিবারণ হাসতে হাসতে বলে, এক প্যাকেটে কি হয়? কলকাতায় বাসা করেছেন...আবার কবে দেখা হবে...কিরকম! বড়বাবু নাকি? এই নিন আপনার সুবাসিত নারকেল তেলের মসলা। আজ শনিবার, জানি কিনা, আপনি আজ আসবেনই। আমি এই ছ'বছরের মধ্যে আপনাকে একটা শনিবারও বাদ দিতে দেখলাম না।

নিবারণ নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে।

—ক'প্যাকেট দোব! দুটো? চারটে?

বড়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, না, না। আজ আর দরকার হবে না। সেদিন দুটো নিয়ে গেছি, তাই এখনও ফুরোয় নি।

নিবারণ বড়বাবুর হাতে দুটো প্যাকেট গুঁজে দিয়ে বলে, সে প্যাকেট নয় বড়বাবু, আপনার জন্য স্পেশ্যাল তৈরি করে রেখেছিলাম। বাড়ি নিয়ে যান, যিনি সমঝদার তিনি বুঝবেন।

নিবারণ হো হো করে হাসলে।

প্রতি কামরাতে এমনি দু'একজন আছেই। কেউ দাদা, কেউ ভাই, কেউ বাবু। কিন্তু কারও নাম সে জানে না। তারও নাম কেউ জানে না। শুধু চেনার পরিচয়। নাম পাতিয়ে নিয়েছে নতুন করে। তাতে উভয় পক্ষেরই কাজ চলে যায় নির্বিঘ্নে। প্রতিদিনের লেনদেনে কোনো অসুবিধা হয় না। সেই কারণে এর চেয়ে ভালো করে চেনবার জন্যে কোনো পথেরই কৌতূহল এর চেয়ে বেশি এগোয় নি।

নিবারণের পৃথিবী বলতে এই। ঘরে মা, স্ত্রী একটা শিশুপুত্র,—আর বাইরে এরা। তার নামের কারবার নেই। মা, মা। মায়ের নাম থাকে না। স্ত্রী, ওগো। আর শিশুপুত্রের নাম এখনও স্থির হয় নি। যে যা খুশি তাই বলে ডাকে। তাতেই শিশু সাড়া দেয়। আর বাইরে একদল নামহীন, অপরিচিত বন্ধু।

এই নামের পৃথিবীতে তার কারবার একটু অদ্ভুত ধরনের। যত নামহীন লোক নিয়ে।

তার অসুখের খবর কেউ পেলে, কেউ পেলে না। কেউ জানলে, কেউ জানলেই না। কিন্তু সবাই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মনে মনে একবার বোধহয় অনুভব করলে।

তরুবালা ঘাটে গলা ডুবিয়ে রয়েছে তো রয়েইছে।

ওর যেন জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। কিছুরই আর খেয়াল নেই। ছোট মেয়ের মতো আপনমনে জল নিয়ে খেলাই করছে, খেলাই করছে,—সময়ের হিসাব নেই।

ঘোষাল-গিন্নি ঘাটে এসে সশব্দে বাসন নামালেন। তরুবালার কানে এ শব্দ পৌঁছুলই না। তাকে এমন নিশ্চিন্তভাবে জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখে ঘোষাল-গিন্নি ভাবলেন, নিবারণ বোধহয় ভালোই আছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, নিবারণ কেমন আছে বৌমা?

নিবারণ কে? নিবারণ কে? তরুবালা অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। কিছুই যেন সে বুঝতে পারেনি এমনি করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

তারপরে বিস্মৃতির তিমির বিদীর্ণ করে ধীরে ধীরে জেগে উঠল বাস্তব পৃথিবীর রূপ...যেখানে মায়ের চোখের সুমুখে মরে ছেলে, স্ত্রীর চোখের সুমুখে মরে স্বামী, ভায়ের চোখের সুমুখে মরে ভাই।

নিষ্ঠুর কদর্য পৃথিবী।

তরুবালার চোখের পল্লবে আবার ঘনিয়ে এল বিষণ্ণ ছায়া, ঠোঁটে জাগল নিরতিশয় অসহায়তা, আর দুই চোখ ভরে উঠল অসীম শূন্যতা।

তরুবালা মাথায় ভালো করে ঘোমটা দিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বললে, ভালো নেই খুড়িমা।

সামনের মরা আমড়া গাছের শুকনো ডালে একটা কাক এমন করে ডেকে উঠল যে দুজনেই ভয়ে ভাবনায় শিউরে উঠল।

সেদিন আর নয়, কিন্তু তার পরের দিন দুপুরের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। সকালেই নাভিশ্বাস উঠেছিল। ঘোষাল-গিন্নি চটপটে মেয়ে। ব্যাপার বুঝে সকালেই নিবারণের ছেলেকে দুটো ভাতে-ভাত নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জেদাজেদিতে তরুবালাকেও অমন অবস্থায় স্বামীকে ফেলে রেখে একবার থালার সামনে বসতে হয়েছিল, এক টুকরো মাছও মুখে দিতে হয়েছিল। এ নাকি প্রথা। প্রতিবেশিনীরা তাকে জোর করে স্বামীর কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘোষালবাড়ির রান্নাঘরে বসিয়ে দিয়েছিল। কে একজন এক টুকরো মাছও তার মুখে গুঁজে দেয়। এ নাকি লক্ষণ!

তখনই তরুবালা স্বামীর শিয়রে ফিরে আসে। কিন্তু কথা নিবারণের সকাল থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু চোখের দেখা। চোখ মেলে স্বামীর শেষ যন্ত্রণা দেখা। সেও অল্পক্ষণের জন্যে। দুপুরের মধ্যেই নিবারণ চলে গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই তার পার্থিব দেহের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট রইল না।

নিবারণের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আর পাঁচজনের মতোই অতি সামান্য। ট্রেনের জনৈক সহযাত্রীর মুখে এই ঘটনা শুনেছিলাম। ঘটনাও আজকের নয়, অনেকদিন আগের। কিন্তু আমাদের ট্রেন সেই পানাপুকুরের ধার দিয়ে চলবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল নিবারণকে, অনেকদিন পরে।

এই গতির জগতে মানুষের বিশ্রামের অবকাশ নেই। নিবারণের মৃত্যুর পর এই

পথ দিয়ে হাজার ট্রেন এসেছে, গেছে। হাজার হাজার যাত্রী, [illegible] সামনে এসে কাচিৎ কারও হয়তো [illegible] পড়েছে, একটি মুহূর্তের জন্যে। তেমনি করেও আমারও তাকে মনে পড়ল অনেক কাল পরে। ওই পানাপুকুরের অনেক পরিবর্তনই নিশ্চয় তারপরে হয়েছে। কিন্তু দেখে দেখে তা আর চোখে পড়ে না। ওরই মধ্যে নিবারণের স্মৃতি একটুখানি কোথাও বেঁচে আছে। ওদিকে চাইতেই একমুহূর্তের জন্যে তাকে একবার মনে পড়ল।

একবার মাত্র। তাও নিবারণের জন্যে নয়, বিশেষ কোনো একজন লোকের জন্যেও নয়। একবার শুধু মনে হল যাদের চিনতাম তাদের মধ্যে কত মানুষই নেই। চকিতে সমস্ত মন কেমন উদাস হয়ে গেল।

ট্রেন চলেছে ঝড়ের বেগে।

শ্রীরামপুর...শ্রীরামপুর......

নতুন স্টেশন সে পানাপুকুরের চিহ্নমাত্র নেই। আবার নতুন জগৎ, নতুন আবেষ্টনী। পাঁচ মিনিট আগের মন পাঁচ মিনিট পিছিয়ে পড়ল। তার হল মৃত্যু। আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সরোজ রায়চৌধুরী

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রবীণ খ্যাতিমান সাহিত্যরথী সরোজকুমার রায়চৌধুরী মশাই-এর একটি গল্পের শেষাংশের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হল।... এই গতির জগতে মানুষের বিশ্রামের অবকাশ নেই। নিবারণের মৃত্যুর পর এই পথ দিয়ে হাজার ট্রেন এসেছে গেছে। হাজার হাজার যাত্রী। এইখানে পানাপুকুরের সামনে এসে ক্বচিৎ হয়তো তাকে মনে পড়েছে, একটি মুহূর্তের জন্য। তেমনি করে আমারও তাকে মনে পড়ল অনেককাল পরে। ওই পানাপুকুরের অনেক পরিবর্তনই নিশ্চয় তার পরে হয়েছে। কিন্তু দেখে দেখে তা আর চোখে পড়ে না। ওরই মধ্যে নিবারণের স্মৃতি একটুখানি কোথাও বেঁচে আছে। ওদিকে চাইতেই এক মুহূর্তের জন্যে তাকে একবার মনে পড়ল।

......নিবারণের মৃত্যু এমন কিছু স্মরণীয় ঘটনা নয়—ট্রেনের সাধারণ একজন ক্যানভাসার মরলো কি বাঁচল তাতে কারই বা কী যায়-আসে! তুচ্ছ একটি প্রাণের প্রতি এই যে মমত্ববোধ এটাই এ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য! সামাজিক মান বা আর্থিক কৌলিন্য অথবা ঘটনার ঘনঘটার আয়োজন অথবা অস্বাভাবিক কোনও মনোবিকলনের মোচড় আমদানী না করে অনায়াসে পাঠকের মনের মণিকোঠায় আসন পেতে বসার অধিকার যে শিল্পীর আছে সরোজকুমার সেই জাত-শিল্পী। বিভূতিভূষণের 'ক্যানভাসার কৃষ্কলালের' মতো নিবারণও সাধারণ ফেরিওয়ালা, তার মৃত্যুও অসাধারণ কিছু নয়—কিন্তু তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তরুবালার ভাগ্যাকাশে যে নিশ্ছিদ্র তমিস্রা আসন্ন তা সাধারণ নয় উপরন্তু অনিবার্যও বটে! সেই সংকটের সম্মুখীন ভাগ্যের শিকারস্বরূপিণী 'তরুবালা ঘাটে গলা ডুবিয়ে রয়েছে ত রয়েছেই!' ...'ওর যেন জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। কিছুরই আর খেয়াল নেই। ছোট মেয়ের মত আপন মনে জল নিয়ে খেলাই করছে। সময়ের হিসাব নেই।' তরুবালার এই বেহিসাবটুকু যেন মানুষের বাঁচতে চাওয়ার, দুঃখ-দুর্দশাকে উপেক্ষা করারই প্রতীক হয়ে পাঠকের মনেও একঝলক রূপোলী রেখার ইঙ্গিত বয়ে এনে দেয়। অল্প কয়েকটি কথার মীনে-করা সূক্ষ্ম বাহুল্যবর্জিত রেখা একদিকে যেমন কঠিন বাস্তবকে আঁকে তেমনি আঁকে মানবমনের স্বভাবপ্রবণ জীবন পিপাসাকে। পানাপুকুরের ওই অগভীর সবুজে জল যেন মন্দাকিনীর অমৃতধারায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। বিষয় নির্বাচনের জন্যে সরোজকুমার অপরিচয়ের সুযোগ গ্রহণে বিমুখ। তাঁর সাহিত্যের চরিত্রগুলি এই আমাদের আশে-পাশেই রয়েছে। আর কাহিনীর উপাদানও নিতান্ত 'হামেশা'র ব্যাপার। শুধু দেখার এবং দেখানোর গুণেই তা পাঠকের মনে নতুন হয়ে ওঠে।

সামান্য একটুকরো পোড়া সিগারেট যে কতো মর্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে সে কথা কি রণধীর কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল?

এইখানে বিদগ্ধ সমালোচক হ্যাজলীটের একটি উক্তি মনে পড়ে : (Where Schiller burns a city Shakespeare drops a handkerchief). এ যেন তাই। রণধীর দেশপ্রেমের জন্য দ্বীপান্তরের নির্বাসন ভোগ করে ছ' বছর পরে ঘরে ফিরে দেখলে পত্নীর একনিষ্ঠ অনুরোধ বন্ধুজনের নিষ্ঠুর আঘাত অগ্রাহ্য করে স্বামীর ভিটে আগলে পড়ে থাকার মাশুল গুণতে গেছে যৌবন-লাবণ্যটুকু নিঃশেষে পুড়িয়ে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার শর্বরী এমনই গুণবতী যে, ওই সংকটের মধ্যে পড়াশুনো করে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কৃতসিদ্ধ হয়েছে! সে মুগ্ধ, বিস্মিত, কৃতজ্ঞতায় সে দ্রবীভূত! শর্বরীকে আর কোনোদিন কষ্ট পেতে দেবে না, এই সংকল্প গ্রহণ করল রণধীর। চলল সুখের নীড় রচনার যৌথপ্রচেষ্টা। কলকাতায় এসে রণধীর স্টেশনারি দোকানে চাকরী নিল আর শর্বরী হাসপাতালের নার্স হল। কিন্তু বাইরের সৌষ্ঠব ও স্বাচ্ছন্দ্যের পূজায় ওদের সেই প্রেম আস্তে আস্তে অবলুপ্তির দিকে ধেয়ে চলল! অবশেষে ডাক্তার বোস—ধূমকেতু হয়ে দেখা দিলেন। ছোট্ট একটুকরো পোড়া সিগারেট রণধীরকে জানিয়ে দিল যে, এ ঘরে বাইরের মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আর শর্বরী সেটা প্রথমে গোপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফেটে পড়ল। এই যে অনায়াস পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা এটাই সরোজকুমারের স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য! তাঁর দার্শনিক চরিত্র আমরা ধরতে পারি যখন দেখি যে, হাসপাতালের দারোয়ানের মারফতে রণধীর চিঠি পেল। সকালে ঘুম ভেঙে যখন সে নাইট-ডিউটি ফেরত স্ত্রীর আশায় প্রতীক্ষা করছে তখন পত্র মারফৎ জানল যে, শর্বরীর বিছানাটা পাঠিয়ে দিতে হবে কেন না ছুটির দিন ছাড়া নার্সদের হাসপাতালের বাইরে যাওয়া বারণ হয়ে গেছে।...... রণধীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চিঠিখানা বারবার পড়লে, যেন তার মন ঠিক বুঝতে পারছে না। তারপরে শর্বরীর বিছানা আর বাক্স বার করে দিলে।... খুব বড় জাতের শিল্পী না হলে এই দার্শনিক নির্লিপ্ততার অধিকারী হয় না। এখানে যদি তিনি আবেগ-উচ্ছ্বাসের কথার ছটা ছড়িয়ে পাঠকের মনে রণধীরের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন

তাহলে আর যা-ই হোক 'সিগারেটের টুকরো'র [illegible] ছোটগল্প আমাদের সাহিত্যকে [illegible] করতে পারতো না। [illegible] এই কারণেই; অনুজপ্রতিম কোনও এক লেখককে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, লেখার চেয়ে না-লেখা বেশি কঠিন। শুধু ওই পোড়া সিগারেটকে রণধীর মুখ কালো করে হাসতে দেখল। অজ্ঞাতসারে রণধীরও হাসল। তারপরে উঠে চা তৈরী করতে চলে গেল!...

লেখকের কাজ হল পাঠকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করা, পাঠককে নিজের চিন্তার সহযাত্রী করে তোলা। অর্থাৎ অন্যের মনে আলো ফেলে তাকে এমনই সচেতন এবং সজাগ করে তোলা যাতে করে সমস্যাকে সে তলিয়ে দেখতে পাবে এবং বৃহত্তর বা ভিন্নতর ক্ষেত্রেও সমাধানে তৎপর হবার তাগিদ সে আপনা থেকেই অনুভব করবে। লেখক কোনোকালেই গণিতের মাস্টার নন, তিনি চিত্রকর। এমনভাবেই সে চিত্র তিনি আঁকেন যাতে সমস্যার খুঁটিনাটি প্রকটিত হয়।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শিল্পী অতি অল্প-পরিসর স্থান পান, কাজেই সেখানে শুধু সমকাল নিয়ে কারবার করলেই চলে না, চিরন্তনের সুরকে মূর্চ্ছিত করে তুলতে না পারলে সে সৃষ্টি আপন নিয়মে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে। মানবমনের এই ভাষ্যকার একাধারে কবির আর্ষ-দৃষ্টি এবং সমাজতাত্ত্বিকের ব্যাপক উপলব্ধি—দুই গুণের সমাহারে গঠিত—সরোজকুমার এই দ্বিবিধ গুণের অভিপ্রকাশে বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী আসন অর্জন করেছেন, একথা আমি না বললেও তাঁর কিছু এসে যায় না! একথা তাঁর ঃ ওপিঠ, মুক্তি, দেহযমুনা, অকালবসন্ত ইত্যাদি গল্পে উজ্জ্বলভাবে ভাসমান।

'ব্যাঘ্রদেবতা' গল্পের মধ্যে যেমন পল্লী-গ্রামের জনচিত্রের প্রকাশ দেখতে পাই তেমন গ্রাম বাংলাদেশে বোধকরি আজও বিদ্যমান। শিল্পীর বর্ণনকৌশল কৌতূহলী পাঠককে যখন কৌতুকের শিখরদেশে পৌঁছে দিয়েছে তখনই যদি গল্পের শেষ হত তা হলেও নিশ্চয় ছোটগল্প তৈরী হতে পারত কিন্তু সেটা নিঃসন্দেহে সরোজকুমারের বৈশিষ্ট্যময় সৃষ্টির নিদর্শন হত না—আমরা দেখতে পেলাম কোনও বর্ষীয়সী নিহত বাঘটিকে দেবতা বানিয়ে দিলেন, তার পা ধুইয়ে দিয়ে। তেমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল পা ধোয়ানোর। সকালে যে বাঘটি গোটা গাঁকে ভীত সন্ত্রস্ত করেছিল,—কয়েক মিনিটের মধ্যে সে হয়ে পড়ল অবাধ্য দেবতা। দেবতার জন্মকে উপলক্ষ করে আরও একটি বিখ্যাত গল্প বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়েছে। পল্লীর সরল প্রাণে ভীতির বস্তু রহস্যের আকর বলেই অজ্ঞেয় দৈবত্ব পেয়ে থাকে। ব্যাঘ্র-দেবতায় সেই গ্রামসুলভ মনোভঙ্গীই সুন্দরভাবে ব্যক্ত!

'মুক্তি'র নায়িকা খুশিকে আমরা ভুলতে পারব না। প্রেমের এমন বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ আশ্চর্য, প্রশংসনীয়। কিন্তু লেখকের দার্শনিক নিরপেক্ষতা বাস্তবের রূঢ়তাকে কিছুমাত্র কোমল করার জন্য ব্যস্ত নয় এবং তাতে করে রসসৃষ্টি অসাধারণত্ব পেয়েছে। 'শনি-রবি-সোম', 'একটি সত্যকার প্রেমের গল্প', 'নীড়ের মায়া', মৃত্যুর রূপ এবং আরো অনেক ছোটগল্প সম্পর্কেই উচ্ছাস প্রকাশ করা যায় কিন্তু আশংকা হচ্ছে যে, আমার অপটু বচনভঙ্গী আগ্রহী পাঠকের মনে কৌতূহল জাগাতে পারবে না। কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, সরোজবাবুর লেখায় কি আধুনিকতা আছে? তার জবাবে বলব, না নেই, আধুনিকতার সীমাকে অগ্রাহ্য করে চিরন্তনতায় পৌঁছেছেন তিনি।

আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে (১৯২৭-এ) 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় 'রমানাথের ডায়েরী' লিখে সরোজকুমার তাৎকালিক সাহিত্যানুরাগীদের চমকে দিয়েছিলেন। তার আগে মাত্র একটি গল্পই তাঁর ছাপা হয়েছিল 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' নামে এক সাহিত্য সংকলনে। কিন্তু আত্মশক্তির মতো ডাকসাইটে কাগজের জন্যে গল্প লেখার কথা তিনি ভাবতেও সাহস করেন নি! যাক, তাঁর ভাষাতেই, তাঁর তখনকার মনের অবস্থাটা তুলে ধরি ঃ মুখে পাহাড় উড়াতে পারি, গদা ঘুরাতে পারি। ...কিন্তু গল্প লেখা? ওরে বাবা, ও যে নিজের ফাঁদে নিজেই পা দেয়া। শচীনদাকে (শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, আত্মশক্তির সম্পাদক এবং বিখ্যাত নাট্যকার) খোলাখুলিই বললাম ঃ না শচীনদা, ওই গপ্পো-টপ্পো আমার দ্বারা হবে না। ...কিন্তু দেখা গেল সরোজকুমারের শক্তি সম্পর্কে সম্পাদক শচীন্দ্রনাথের ধারণা অভ্রান্ত! রমানাথের ডায়েরী পড়ে কল্লোলের সম্পাদক দীনেশ দাস দৌড়ে এলেন শচীনবাবুর কাছে, সরোজবাবুর ঠিকানা চাই ইত্যাদি...! সেই শুরু হয়েছে যাত্রা। ১৯০৩-এর শিশু, ১৯২১-এর কারাবরণকারী তরুণ দেশব্রতী সাহিত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে সমাজকে যা দিয়েছেন তার পরিমাপ কালের হাতেই থাক।

সেই সব সুন্দর ছেলেরা আজ কোথায়, যাদের নিয়ে আমার কৈশোর সুন্দর হয়েছিল! মাঝে মাঝে ভাবি আর মন কেমন করে।

একজনকে মনে পড়ে। তার নাম সুকুমার। গৌরবর্ণ সুঠাম তনু, একটুও অনাবশ্যক মেদ নেই অথচ প্রতি অঙ্গে লালিত্য। চাঁদের পিছনে যেমন রাহু তেমনি চাঁদপানা ছেলেটার পিছনে রাহুর দল ঘুরত। তাদের কামনার ভাষা যেমন অশ্লীল তেমনি স্থূল। তাদের স্থূল হস্তাবলেপে সুকুর গায়ে আঁচড় লাগত। তা দেখে যাদের বুকে বাজত তাদের জনাকয়েক মিলে একটা দেহরক্ষা বাহিনী গড়েছিল। আমাদের কাজ ছিল তাকে বাড়ি থেকে ইস্কুল ও ইস্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নিঃস্বার্থ ছিলুম না। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। সুকু তা জানত, তাই আমাদের প্রশ্রয় দিত না। তার দরুন আমার অভিমান ছিল। থাকবে না? রাহুদের একজন আমার ডান হাত এমন মোচড় দিয়েছিল যে, আর একটু হলে হাতটা যেত। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।

কচিৎ তাকে একা পেতুম। পেলেই আমার বুকভরা মধু তার কানে ঢালতে ব্যগ্র হতুম। কিন্তু তার আগেই সে পাশ কাটিয়ে যেত। সে যে আমার প্রকৃত পরিচয় জানল না, একথা ভেবে আমার চোখে জল আসত। সময়ে-অসময়ে তাই তাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘুরতুম। ভিতরে ঢুকতে ভরসা হত না। কারণ সুকু একদিন আমাকে বলেছিল, 'তুই আমাদের বাড়ি অতবার আসিস নে খোকন।'

তখন ঠিক বুঝতে পারি নি কেন এত রূঢ়তা। পরে বুঝেছি ওটা রূঢ়তা নয়। সুকুর বাবা মফস্বলে গেলে তার মা'র সঙ্গে তার ঠাকুরমা'র বচসা বাধত। খোঁপা আর এলোচুলের সেই বচসা শুনে পাড়ার লোক জুটত তামাশা দেখতে। এতে সুকুর মাথা কাটা যেত। তার বাবা যখন ফিরতেন, মা'র কথায় কান দিতেন না, ঠাকুরমা'র কাহিনী বিশ্বাস করতেন। মাকে দিতেন মার। তা দেখে সুকুর ভাই-বোন বাবার পা জড়িয়ে ধরত, কিন্তু সুকু এত লাজুক যে, লুকিয়ে কাঁদত। প্রতিবার যা ঘোষণা করতেন তিনি বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, বাক্স-বিছানা নিয়ে সত্যি সত্যি বাইরের বারান্দায় দাঁড়াতেন। রাজ্যের লোক জড়ো হত তাঁকে দেখতে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। এতে সুকুর বাবার মাথা কাটা যেত, সুকুরও। চাকর এসে বলত, 'মা, একখানাও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না।' তা শুনে ঝি বলত, 'আর একটা দিন থেকে যাও, মা।' সেদিনকার মতো মা যাওয়া মুলতুবী রাখতেন। প্রতি মাসেই এই ব্যাপার। দুজনেই সমান মুখরা, যেমন মা তেমনি ঠাকুমা। একদিন সুকুর মা এমন মার খেলেন যে, গাড়ির অভাবে পেছপাও হলেন না, দুনিয়ার লোকের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন ও পায়ে হেঁটে রেলস্টেশনে গেলেন।

সুকুর ভাই-বোন লোকলজ্জায় তাঁর সাথী হল না, কিন্তু সবচেয়ে লাজুক যে সুকু সেই তাঁর হাত ধরে পথ দেখানোর ভার নিল। কাজটা সুকুর মা ভালো করলেন না। সুকুর বাবার মাথা হেঁট হল। তিনি সেই হেঁট মাথায় টোপর পরে শোধ তুললেন। খবরটা যখন সুকুর মা'র কানে পড়ল তিনি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে গেলেন। সবাই মিলে তাঁকে ধরে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখল। তখন থেকে তিনি নজরবন্দী।

মামারা সুকুকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইস্কুলে যাবার নাম করে সেই যে বেরোত ফিরত রাত করে। কেউ তাকে বকতে সাহস করত না, পাছে সে আত্মঘাতী হয়। শিবপুর হাটের তিন দিকে নদী। যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকে গেলে প্রায়ই নদীর ধারে পা আটকে যায়। সুকু পা ছড়িয়ে বসে, গা ঢেলে দেয়। কত নৌকা স্রোতের মুখে ভাসছে, উজান বেয়ে আসছে। কোনটাতে চালের বস্তা, কোনটাতে নতুন হাঁড়ি-কলসী, কোনটাতে খড়ের বোঝা। ছইয়ের চার কোণে মাকাল ফল ঝুলছে, ছইয়ের ভিতর তামা হুঁকো ঝুলছে। নৌকোর গায়ে কত রকম নক্সা। নক্সার কত রকম রঙ। নৌকোও কত রকম। জেলেদের ডিঙি, বারোমেসেদের নাও, গয়নার বোট, আরো কত কী। বাংলার প্রাণ নদী, নদীর প্রাণ নৌকো, নৌকোর প্রাণ মাঝি, মাঝির প্রাণ গান। সুকু একমনে গান শোনে আর গুনগুন করে সুর সাধে। এতেই তার শান্তি, এই তার সান্ত্বনা।

একদিন মেলা লোক যাচ্ছিল মেলা দেখতে। রঘুনাথপুরে রামনবমীর মেলা। তা বলে শুধু রামায়েৎ বৈষ্ণবরা নয়, নিমাইৎ বৈষ্ণবরাও আসে নানা দিগদেশ থেকে, জমায়েত হয় আউল-বাউল দরবেশরাও। এক দল কীর্তনিয়া গান করতে যাচ্ছে দেখে সুকুও তাদের নৌকোয় উঠে বসল। মেলায় গিয়ে সে দলছাড়া হল না, সে যদি বা ছাড়তে চায় দলের লোক ছাড়ে না! তারা একটা গাছতলা দেখে আস্তানা গাড়ল। সেখানে জোল কেটে বড় বড় হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। কুটনো কুটতে বসল দলের মেয়ে-ছেলেরা। বলতে ভুলে গেছি দলের কর্তা যিনি তিনি পুরুষ নন, নারী। তাঁর নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শুনে সুকু ধরে নিয়েছিল হিন্দু, আপনারাও সে ভুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান দরবেশ। তাঁর দলের পুরুষদের নাম শুনে মালুম হয় না মুসলমান না হিন্দু। ইসন-শা-ও আছে, আবার মনু শা-ও আছে। সুকু ধরে নিয়েছিল ওরা সকলেই হিন্দু। তাই আহার সম্বন্ধে দুবার ভাবে নি। কেবল পানের সময় 'পানি' কথাটা শুনে একটু খটকা বেধেছিল।

হরিদাসীরা মউজ করে রাঁধে-বাড়ে খায় আর গান করে। সুকুও তাদের শরিক। তার গলা শুনে হরিদাসী তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোর হবে'। এতদিন জীবন বিস্বাদ লাগত। এতদিনে স্বাদ ফিরল। সুকুর চোখে পৃথিবীর রূপ গেল বদলে। যেদিকে তাকায় সেদিকে রূপের সায়র। কানে ঢেউ তোলে হরিদাসীর কণ্ঠধ্বনি—

'এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
আমি নামি নামি মনে' করি মরণ ভয়ে—
নামলাম না।'

মেলা ভাঙল। সুকুর ভয় ভাঙল। মামারা যদি তাড়িয়েই দেন তবে আর আশ্রয়ের অভাব হবে না। তখন সে জানত না যে ওরা মুসলমান। জানল শিবপুর হাটে অন্যের মুখে। তখন তার আরো একটা ভয় ভাঙল। জাতের ভয়। সে মনে মনে বলল আমার জাত যখন গেছেই তখন দুঃখ করে কী হবে। যার জাত নেই তার সব জাতই স্বজাত। ওরা আমার আপনার লোক, আমিও ওদের।

দুই

অনুমতি না নিয়ে মেলায় যাওয়া, সেখানে মুসলমানের জাত খাওয়া, এসব অপরাধের মার্জনা নেই। মামারা মারলেন না, কিন্তু থালা-বাসন আলাদা করে দিলেন। সে সব মাজতে হল সুকুকেই। তাতে তার আপত্তি ছিল না। বরং দেখা গেল তাতেই তার উৎসাহ। মামীমাদের কাছ থেকে সিধা চেয়ে নিয়ে সে নিজেই শুরু করে দিল রাঁধতে। কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে উঠানের এক কোণে খেতে বসে। কেউ কাছে গেলে সবিনয়ে বলে, 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, জাত যাবে।' তার দশা দেখে তার মা দুবেলা কাঁদেন। একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না করলেই নয়, মামারা স্বীকার করলেন। তা শুনে সুকু বেঁকে বসল। বলল, 'মুসলমানের ভাত আরো কতবার খেতে হবে। ক'বার প্রায়শ্চিত্ত করব? গোবর কি এত মিষ্টি যে বার বার খেতে হবে।'

মামাবাড়ী থেকে চিঠি গেল বাবার কাছে। ইতিমধ্যে সংমা'র হয়েছিল যক্ষ্মা, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সুকুর বাবা একটা ছল খুঁজছিলেন সুকুর মা'কে ফিরিয়ে আনবার। চিঠি পেয়ে আপনি হাজির হলেন। সুকুকে কোলে নিয়ে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।' স্ত্রীকে বললেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। এসো আমার সঙ্গে।'

আবার সুকুদের বাড়িতে আনন্দের হাট বসল। আমরা তার পুরনো বন্ধুরা তাদের ওখানে দিন-রাত আসর জমালুম। এবার সে আমাদের বারণ করে না, করলেও আমরা মানতুম না। এ বলে, আমার সুকু। ও বলে, আমার সুকু। সুকু যেন প্রত্যেকের একান্ত আপন। ওর বাবা যদি ওকে ইস্কুলে ভর্তি না করে দিতেন আমরা রোজ রোজ ইস্কুল কামাই করে বিপদে পড়তুম।

শিবপুর হাটের সেই যে অভ্যাস সুকু সে অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারল না। [illegible] এক সময় ক্লাস থেকে পালায়, আমরা [illegible] দেখি সে নেই। আমাদের মহকুমা শহরে নদী আছে নিশ্চয়, কিন্তু নদীর ধারে ঘর বসতি, সুকুর তাতে অরুচি। সে [illegible] দরবেশ বৈষ্ণবের সন্ধানে। [illegible] সঙ্গ নেয়। তাদের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে [illegible] পরে বাড়ি আসে।

আমরা ততক্ষণ তার জন্যে ভেবে আকুল, তার খোঁজ নিতে এক-একজন এক-একদিন বেরোয়, পেলেও তাকে ডেকে সাড়া মেলে না। আমরা যেন তার আপনার লোক নই, যত রাজ্যের ফেরার আসামী ভেক নিয়েছে বলে ওরাই হয়েছে তার আপনার। সুকু যে ওদের মধ্যে কী মধু পায়, আমরা তো বুঝিনে। যত সব সিঁদেল চোর আর জাহাবাজ চোরনী গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায় কার কী সম্পত্তি আছে সেই খবরটি জানতে। তার পরে একদিন নিশীথ রাতে গৃহস্থের সর্বস্ব চুরি যায়।

সুকুকে আমরা সাবধান করে দিই যে কোন দিন চোর বলে সন্দেহ করে পুলিশ তার হাতে হাতকড়ি পরাবে। সে বলে, 'সন্দেহ মিটলে খুলেও দেবে।' আমরা বলি, 'কিন্তু কলঙ্ক তো ঘুচবে না। মুখ দেখাবি কি করে?' সে বলে, 'ওরা যেমন করে দেখায়।' ওরা মানে বাউল বোষ্টমরা।

সুকুর জন্যে আমাদের লজ্জার সীমা রইল না, দেখা গেল আমরাই ওর চেয়ে সলাজ। ওর সঙ্গে মিশতে আমাদের সংকোচ বোধ হল। প্রকাশ্যে মেলামেশা বন্ধ হয়ে এল, গোপনে মেলামেশা চলল।

হেডমাস্টারমশাই ছিলেন সুকুর বাবার বন্ধু। তিনি পরামর্শ দিলেন ওকে বোর্ডিং-এ রাখতে। ওর বাবা একদিন ওকে বোর্ডিং-এ রেখে এলেন। ওর তাতে আপত্তি নেই, বরং ছত্রিশ জাতের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনের আশা। আমরা কিন্তু হতাশ হলুম। বোর্ডিং-এর পাশেই হেডমাস্টারমশায়ের কোয়ার্টার। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে যে সুকুর কাছে যাওয়া-আসা করব সে সাহস ছিল না।

কিছুদিন পরে এক মজার ব্যাপার ঘটল। হেডমাস্টারমশাই একদিন স্বকর্ণে শুনলেন দুটি বালখিল্য বালক স্ফূর্তিতে গান করছে—

'যৌবন জ্বালা বড়ই জ্বালা
সইতে না পারি
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে
গলায় দিব দড়ি।
দুঃখ রে যৌবন প্রাণের বৈরী।'

মাস্টারমশাই তো দুই হাতে দুজনের কান ধরে টেনে তুললেন। অন্তরীক্ষে দোদুল্যমান ঐ দুটি প্রাণী অবিলম্বে কবুল করল যে সুকুই ওদের ও গান শিখিয়েছে। তখন তিনি সুকুকে তলব করলেন। সুকু বলল, 'সব সত্যি। দোষ ওদের নয়, আমার।'

মশাই বললেন, গোল্লায় যদি যেতে হয় তবে সদলবলে কেন? তুমি একা যাও।' এই বলে একটা গাড়ি ডেকে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

সেও বাঁচল, আমরাও বাঁচলুম। তার বাবা কিন্তু তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়লেন। ঘরে আটক করে রাখলে পড়াশোনা মাটি। ইস্কুলে যেতে দিলে সে ঠিকানা হারিয়ে ফেলে। [illegible] পাঠ নেয় তারা মাস্টার নয়, বাউল ফকির। কিছুদিন তিনি নিজেই তাকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেন, [illegible] পাহারার বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সে অঙ্কের খাতায় ইতিহাস ও [illegible]র খাতায় সংস্কৃত লিখে শিক্ষকদের উত্যক্ত করে তুলল। এটা যে তার ইচ্ছাকৃত তা নয়। সে নিজেই বুঝতে পারে না কেন এমন হয়। আসলে তার মন ছিল না পাঠে।

সুকুর মা তার বাবাকে বললেন, 'জানি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সেকালে কর্তারা এরকম স্থলে গিন্নীদের উপদেশ নিতেন।'

'শুনি তোমার উপদেশটা কী।'

'আমার ঠাকুরদার বিয়ে হয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। সুকুর বয়স পনেরো হলেও ওর যেমন বাড়ন্ত গড়ন—'

সুকুর বাবা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

তিন

ম্যাট্রিকে সুকু ফেল করল। আমি পাশ। বাধ্য হয়ে আমাকে বড় শহরে যেতে হল, ভর্তি হলুম কলেজে। চিঠি লিখে সুকুর সাড়া পেতুম না। ওর সঙ্গে দেখা হত ছুটিতে।

দিন দিন ব্যবধান বাড়তে থাকে। আমি যদি বলি 'তুই', সুকু বলে 'তুমি'। আমার কষ্ট হয়। ডাকলে আসে, না ডাকলে খোঁজ করে না। গেলে দেখা দেয়, কিন্তু প্রাণখুলে কথা কয় না। একদিন আমি কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলুম, 'সুকু, আমি কি তোর পর?' সে উত্তর দিয়েছিল, 'তা নয়। আমি হলুম ফেল-করা ছেলে, আর তুমি—'

আমি তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলুম, 'তোর জন্যে আমার সব সময় দুঃখ হয়।'

'কিন্তু আমি তো মনে করি আমার মত সুখী আর কেউ নেই। যেখানে যাই সেখানেই আমার ঘর, সেখানেই আমার আপনার লোক।'

বাউল ফকির দরবেশদের ও বলত আপনার লোক। ওরাও ওকে দলে টানত। রতনে রতন চেনে। আমাদের চোখে সুকু একটা ফেল-করা ছেলে, ওর পরকালটি ঝরঝরে। ওদের চোখে সুকু একজন ভক্ত। গুরুর কৃপা হলে একদিন পরমার্থ পাবে। আমাদের হিতৈষীপনার চেয়ে ওদের হিতৈষীতাই ছিল ওর পছন্দ।

হাজার হলেও আমি ওর পুরনো বন্ধু। বোধহয় তারচেয়েও বেশী। সুকু সেটা জানত, তাই আমাকে যত কথা বলত আর কাউকে তত নয়। তাকে দিয়ে কথা বলানো একটা তপস্যা। গান করতে বললে দেরী করে না, কিন্তু মনের কথা জানাতে বললে দশবার ঘোরায়।

সুকু নিজেকে সকলের চেয়ে সুখী বলে দাবী করলেও আমার অগোচর ছিল না যে ওর ভিতরে আগুন জ্বলছে আর সে-আগুনে ও পুড়ে খাক হচ্ছে। কাকে যে ভালবেসেছে, কে যে সেই ভাগ্যবতী তা আমাকে জানতে দিত না। আমি অবশ্য অনুমান করতুম কিন্তু পরে বুঝেছিলুম সে সব অনুমান ভুল।

নায়িকা-সাধন বলে ওদের একটা সাধনা আছে। সুকু নিয়েছিল এই সাধনা। প্রত্যেক নারীর মধ্যে রাধাশক্তি সুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তি যখন জাগে তখন প্রতি নারীই রাধা। যে কোন

নারীকে অবলম্বন করে রাধাতত্ত্বে পৌঁছান যায়। কিন্তু সে নারীর সম্মতি পাওয়া চাই। সুকু একজনের সম্মতি পেয়েছে এইখানেই তার গর্ব। এই জন্যেই সে বলে তার মতো সুখী আর কেউ নয়। অথচ তার মতো দুঃখী আর কেউ নয়। ভদ্রলোকের ছেলে ছোটলোকের সংগে খায়-দায়। গায়-বাজায়, শোয়া-বসা করে। ওকে নৌকো বাইতে, গরুর গাড়ী চালাতে, ঘর ছাইতে দেখা গেছে। ওর বাবা সম্মানী ব্যক্তি। তাঁর মাথা হেঁট। তিনি কিছু বলতে পারেন না এই ভেবে যে, ইতিমধ্যে তাঁর ছোটবৌ মরেছেন, ছেলেকে শাসন করলে যদি বড়বৌ আবার বাপের বাড়ী যান তবে আর একবার টোপর পরার মতো বল, বয়স নেই। মুখে বলেন, 'ওটাকে ত্যাজপুত্র করতে হবে দেখছি।' কিন্তু ভালো করেই জানেন যে সুকু তাঁর সম্পত্তির জন্যে লালায়িত নয়। সুকুর মা ওকে বকেন। কিন্তু বকলে সুকু বাইরে রাত কাটায়। তখন তিনিই ওকে আনতে পাঠান।

মজনু ফকির ওর গুরু। গুরুর উক্তি ও সুকুর প্রত্যুক্তি কতকটা এই রকম—

বাবা, কাঁদতে জনম গেল। যদি সুখের পিত্যেশ পুষে থাক তবে আমার আগে আইসো না। আমি তোমায় সুখের নাগাল দিতে নারব।'

'আমি চোখের জলে মানুষ হয়েছি। কাঁদতে কি ডরাই?'

'সারা জনম কাঁদতে রাজী আছ?'

'আছি।'

'আমায় দুষবে না?'

'না, হুজুর।'

'তবে তুমি সুখের সন্ধান ছেড়ে রাধার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ দেয় নিয়ো। যদি দুখ দেয় নিয়ো। কিছুতেই 'না' বোলো না। তার ছলকলার অন্ত নেই। তেঁই তোমায় বলি, কাঁদিতে জনম গেল রে মোর কাঁদিতে জনম গেল।'

সুকু সেই যে ফেল করল তার পরে আর পরীক্ষা দিল না। তার পড়াশুনা সেইখানেই সাঙ্গ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে পরীক্ষা দিতে হল, সে পরীক্ষা মাত্র একজনের কাছে। সে একজন তার নায়িকা। তার গুরুই তাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন, এইটুকু আমি জানি, এর বেশী জানিনে। আর যা জানি তা লোকমুখে শোনা, লোকের কথা আমি বিশ্বাস করিনে, যদিও ল্যাটিন ভাষায় প্রবাদ আছে, লোকের কথাই ভগবান-এর কথা।

একবার ছুটিতে বাড়ি এসে শুনি সুকু নিরুদ্দেশ। লোকে বলাবলি করছে সারী বোষ্টমী ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। মেয়েটি নাকি প্রথমে ছিল মোদকদের বৌ। অল্পবয়সে বিধবা হয়। পরে এক বৈষ্ণবের সংগে বৃন্দাবন যায়, সেখানে বেশ কিছুকাল থেকে চালাক-চতুর হয়। বৈষ্ণবটির কৃষ্ণপ্রাপ্তি হলে দেশে ফিরে সারী তার বিষয়-বাড়ী ভোগ-দখল করে। তারপর থেকে সুন্দর ছেলে দেখলেই সে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। সর্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। গুণের মধ্যে সে গাইতে পারে অসাধারণ। গান দিয়েই প্রাণ মজায়।

ছেলেদের অভিভাবকেরা অবশেষে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করেন। তখন জায়গা জমি বিক্রি করে বৈষ্ণবী একদিন নিখোঁজ হয়। তার সংগে সুকুও। সুকুর বাবা থানা-পুলিশ করেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তার মা কাতর হয়ে পড়েন।

সুকুর বাবা বললেন, 'খোকন, তুমি তো পাশ করলে, জলপানি পেলে, আমার ছেলেটি কেমন উচ্ছন্নে গেল। ছি ছি, একটা নষ্ট মেয়েমানুষের—'

তিনি মাথা হেঁট করলেন। রুমালে চোখ মুছলেন। সুকুর মা বললেন, 'যে ছেলে মা'র সংগে বনবাসী হয় সে কি তেমন ছেলে! আমার মন বলে সুকু আমার কোন কুকাজ করে নি। ওর সবটাই সু। কিন্তু কেন আমাকে বলে গেল না? আর কি ফিরবে!'

চার

পরবর্তীকালে সুকুর মুখে প্রকৃত বিবরণ শুনেছি। সব মনে নেই, যেটুকু মনে আছে লিখছি। সুকু, এ লেখা যদি কোন-দিন তোমার চোখে পড়ে, যদি এতে কোন ভুলচুক থাকে, তবে মাফ কোরো।

ওর নাম সারী, তাই ও সুকুকে শুক বলে ডাকত। শুক দেখতে সুন্দর, সারী তেমন নয়। কিন্তু সারী রসের ঝারী, শুক শুকনো কাঠ। বৃন্দাবনে থাকতে সারী হিন্দী বলতে শিখেছিল, যাত্রীদের সংগে মিশে দু-চারটে ইংরেজী বুকনিও। হিন্দী ও বাংলা গান যখন যেটা শুনত তখন সেটা কণ্ঠসাৎ করত। এমন একটি নায়িকা পেয়ে সুকু ধন্য হয়েছিল। সারী ও শুকের মতো দুজন দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে গানের সুধা পান করত। সুকুও জানত কত বাউল ফকিরের গান। সারীকে শোনাত।

সুকুর মতো আরো অনেকে আসত সারীর কাছে, তারাও আশা করত সারী তাদের আদর করবে। করত আদর, কিন্তু সে আদর নিতান্তই মৌখিক। রসের কথা বলে সারী তাদের ভোলাত। যাকে বলে সর্বনাশ সেটা অতিরঞ্জিত। এমন কি সুকুর বেলাও।

সারীর নামে যারা নালিশ করেছিল তাদের লোভ ছিল জমিখানার উপরে। কারো কারো লালসা ছিল নারীর প্রতিও। হতাশ লোলুপের দল অভিভাবকদের সামনে রেখে হাকিমের এজলাসে দাঁড়ায়। তখন সারীকে সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে শহর ছেড়ে যেতে হয়! সুকুর মতো আর যারা আসত তারা সেই দুর্দিনে তার সহায় হল না, যে যার পথ দেখল। কিন্তু সুকু তাকে ছাড়ল না, হাতে হাত রেখে বলল, 'একদিন মা'র সংগে গেছলুম, আজ তোর সংগে যাব।'

সারী বলল, 'আমি কি তোর মা।'

সুকু বলল, 'মাকে যেমন ভালো-বাসতুম তোকেও তেমনি ভালোবাসি।'

সারী রসিয়ে বলল, 'তেমনি?'

সুকু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'দুর! তেমনি মানে কি তেমনি?'

'তবে কেমনি?' সারী রঙ্গ করল।

'এমনি।' বলে সুকু বুঝিয়ে দিল।

তখন তারা পরস্পরের কানে মুখ রেখে এক সঙ্গে গান ধরল—

'আশা করি বাঁধিলাম বাসা,
সে আশা হৈল নিরাশা,
মনের আশা।
ও দরদী, তোর মনে কি এই সাধ ছিল!'

তারপরে রাত থাকতে পথে বেরিয়ে পড়ল। সারীর এক সই ছিল, বিনোদা গোপিনী। গ্রামে তার বাড়ী। সারা ও শুক সেইখানেই নীড় বাঁধল।

বিনোদা বলে, 'সই. তোর সঙ্গে কি ওকে মানায়! ও যে তোর ছোট ভাইয়ের বয়েসী।'

সারী বলে, 'গোপালও ছিল গোপীদের ছোট ভাইয়ের বয়েসী। কারো কারো ছোট ছেলের বয়সী।'

বিনোদা মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'আ মর! কার সঙ্গে তার তুলনা!'

সারী মাথা দুলিয়ে বলে, 'যা বলেছিস। তোর বরের সঙ্গে আমার বরের তুলনা!'

আসলে সারীর বয়স অত বেশী নয়. ওটা বিনোদার বাড়াবাড়ি। বিনির মনে কী ছিল তা কিছুদিন পরে বোঝা গেল. সে চেয়েছিল তার দেওরের সঙ্গে সারীর কণ্ঠি-বদল ঘটাতে।

সারী অবশ্য ও প্রস্তাব কানে তুলল না। ফলে বিনোদার আশ্রয় দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠল। একদিন শুক-সারী নীড় ভেঙে উড়ে গেল।

এবার গেল ওরা সুকুর চেনা এক দরবেশের বাড়ী। আহার সম্বন্ধে সুকুর বাছ-বিচার ছিল না, সারীর ছিল। ওরা আলাদা রাঁধে খায়, শুধু ফটিকচাঁদের আখড়ায় থাকে।

দরবেশ অতি সজ্জন। তাঁর ওখানে যারা আসে তারাও লোক ভালো, কী জানি কেন সারীর সন্দেহ জাগল সুকু তাদের একটি মেয়ের প্রীতিমুগ্ধ। সুকু সুপুরুষ বলে সারী তাকে সযত্নে পাহারা দিত। অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেখলে চোখা চোখা বাণ হানত।

তখন সুকুই অনুনয় করল, 'চল. আমরা এখান থেকে যাই।'

সারী অভিমানের সুরে বলল, 'কেন? আমি কি যেতে বলেছি?'

'না, তুই বলবি কেন? আমিই বলছি। এক জায়গায় বেশী দিন থাকলে টান পড়ে যায়। সেটা কি ভালো!'

'কিসের উপর টান? জায়গার না মানুষের?' এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে সুকুর মনে লাগে। সে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে যে সে দুর্বল। তখন সারী তাকে সানন্দে ধরা দেয়।

এমনি করে তারা কত গ্রাম ঘুরল, ঘুরতে ঘুরতে তাদের পুঁজি এলো ফুরিয়ে। কারও কাছে তারা কিছু চায়ও না, পায়ও না, নিলে বড়জোর চালটা, আলুটা, জ্বালানীর কাঠটা নেয়। সারী শৌখিন মানুষ, হাটে কিম্বা মেলায় গেলেই তার কিছু খরচ হয়ে যায়। পুঁজি ভাঙতে হয়।

সারী বলে, 'চল আমরা শহরে যাই।'

সুকু বলে, 'শহরে!' বলতে পারে না যে শহরে আত্মগোপনের সুবিধা নেই, লোকে বংশ-পরিচয় শুধাবে, পরিচয় দিলে কেউ-না-কেউ চিনবে সে কাদের কুলতিলক।

পাঁচ

যে শহরে তারা গেল সেটা উত্তরবঙ্গের একটা মহকুমা শহর। পশ্চিমের মতো তাদের সেখানে টমটম বা একাগাড়ি চলে। টমটম-ওয়ালারা পশ্চিমা দোসাদ।

টমটম পাড়ার একধারে পশু ডাক্তার-খানা। ডাক্তারটি পশুচিকিৎসায় যত না পারদর্শী তারচেয়ে ওস্তাদ গান-বাজনায় ও থিয়েটার করায়। সুকুর চেহারা দেখে ও গান শুনে তিনি তাকে তাঁর ছেলেদের মাস্টার রাখলেন। মাস দু-এক পরে যখন পশুদের ড্রেসারের চাকরি খালি হল তখন তিনি সাময়িকভাবে সুকুকেই বহাল করলেন।

সুকুর সারাদিনের কাজ হল টমটমের ঘোড়া, চাষীদের গরু ও বাবুদের কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগানো ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বেচারিদের করুণ চিৎকারে তার কান ঝালাপালা হলে প্রাণ পালাই পালাই করে, কিন্তু পালাবে কোথায়! সে যা রোজগার করে তাই দিয়ে সারী সংসার চালায়। মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ী গান গেয়ে সারীও কিছু কিছু পায়। তা দিয়ে কেনা হয় সখের জিনিস।

বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডাক্তারবাবুর বদলীর হুকুম এল। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুকুকে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুকু তো একা নয়। অগত্যা সুকুর যাওয়া হল না। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনি গান-বাজনার যম। সুকুর কাছে কাজ আদায় করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে আনাড়ি। তাঁর একটি শালা বেকার বসেছিল, সুতরাং এককথায় সুকুর চাকরি গেল।

ইতিমধ্যে টমটমওয়ালাদের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। তারা তার জন্যে দল বেঁধে দরবার করল। তাতে কোন ফল হল না, কারণ সুকুর না ছিল যোগ্যতা, না অভিজ্ঞতা, না মুরুব্বির জোর। যা ছিল তা দুর্নাম। তখন টমটমওয়ালারা বলল, আমরাই চাঁদা করে তোমাকে খাওয়াব, তুমি আমাদের গান গেয়ে শোনাবে।

একদিন দেখা গেল সুকু টমটম পাড়ার সভাগায়ক হয়েছে। তারা সভাসদ হাড়ি ডোম মুচি দোসাদ জেলে মালী প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণ। সুকু শুধু গান গায় না, গান ধরিয়ে দেয়। ছত্রিশ জাতের ঐকতান সঙ্গীতে পল্লী মুখর হয়। জলসা চলে রাত একটা অবধি, তারপর সুকু বাসায় ফিরে সারীর পায়ে সঁপে দেয় আধলা পয়সা ডবল পয়সা।

সুকু তার পরিচয় গোপন করেছিল। ভেবেছিল কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু টমটম পাড়ার সভাকবি হবার পরে সে এত দূর কুখ্যাত হল যে, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূর থেকে তার জন্যে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এখানে-ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে একদিন সে ধরা পড়ে গেল। খবরটা ক্রমে তার বাবার কানে পৌঁছল, বাবা এলেন না, কাকা এলেন তাকে নিতে।

কাকা এসেই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়ী গেয়ে বেড়ালেন ভাইপোর কীর্তি। গণ্য-মান্যরা শিউরে উঠলেন। ছি ছি! মেয়ে-মানুষ নিয়ে ভেগেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোক হয়েছে। ছি ছি!

সুকু কাকার কথা শুনল না। ভালো ছেলে হল না। তিনি অনেক করে বোঝালেন, লোভ দেখালেন, ভয় দেখালেন। যাবার সময় এমন একটা চাল চেলে গেলেন যার দরুন সুকুকে তুষের আগুনে পুড়তে হল।

সারীর বড় গয়নার শখ। কিন্তু কোথায় টাকা যে গয়না গড়াবে। খেতেই কুলোয় না। সারী বোঝে সব, কিন্তু থেকে থেকে অবুঝ হয়। সুকু মনে আঘাত পায়, ব্যথার ব্যথী বলে দ্বিগুণ লাগে।

গানের প্রলেপ দিয়ে বুকের বেদনা ঢেকে রাখে। দিন কাটে।

একদিন টমটমওয়ালাদের সভা থেকে সুকু সকাল সকাল ছুটি পেল। সারী যে তাকে দেখে কত খুশি হবে একথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরল। বাসায় ফিরে তার মনে একটু খটকা বাধল। সে ঠেলা দিয়ে দেখল ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ। ডাকল, 'সারী। ও সারী।'

মিনিট পাঁচ-সাত ডাকাডাকির পর দ্বার যদি বা খুলল কোথায় সারী! সারীর বদলে কে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং ঘোমটায় মুখ ঢেকে হন হন করে চলে গেল। চলনটা মেয়েলি নয় মোটেই। সুকু ভেঙে পড়ল। তার মনে হল সে মরে যাবে, বাঁচবে

না। মড়ার মতো কতক্ষণ পড়ে থাকল জানে না। যখন জ্ঞান হল দেখল সারী থরথর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে তার পা ছুঁতে চেষ্টা করছে. কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। সুকু পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল।

সে একটা রাত। দুজনের একজনের চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। বুকে দুর্জয় রোদন। দুজনেই নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

পরের দিন সারীই প্রথম কথা কইল, তাহলে এখন তুমি কী করবে?'

সারী তাকে এই প্রথম 'তুমি' বলল।

সুকু বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

'বাড়ী ফিরে যাবে, না এখানে থাকবে?'

সুকু ভেবে বলল, 'যেখানে তুমি সেই-খানেই আমার বাড়ী।'

'কিন্তু দেখলে না? আমি যে বেশ্যা।'

'তুমি কে তাই যদি জানি তো সব জানলুম। তুমি কী তা তো জানতে চাইনে।'

'আমি কে?'

'তুমি রাধা।'

এ উত্তর শুনে সারী স্তম্ভিত হল। এবার ভেঙে পড়বার পালা তার। সে এমন কাঁদল যে সুকুর মনে হল তার সর্বস্ব চুরি গেছে। অথচ তখনো তার গলায় দুলছিল একছড়া সোনার হার, সদ্যনির্মিত।

কাকার চাল ব্যর্থ হল। কিন্তু সারীর নামে যে সব কথা রটল তা কানে শোনা যায় না। সুকুর পথে মুখ দেখানো দায় হল। কিন্তু নিরুপায়। টমটমপাড়ার টিটকারি সে গায়ে মাখে না, ছোটলোকের রসিকতা মাথা পেতে নেয়।

এমন করে তাদের বেশী দিন চলত না। দৈবক্রমে সে শহরে এলেন এক ইউরোপীয় পর্যটক, তাঁর সঙ্গে গান রেকর্ড করার যন্ত্র। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সামনে সারী ও শুকে উভয়েরই ডাক পড়ল। সারীর গলা তাঁর এত ভালো লাগল যে তিনি তার সাত-আটখানি গান রেকর্ড করলেন। তার-পর সে সব রেকর্ড কলকাতার বন্ধুমহলে বাজিয়ে শোনালেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন এক রেকর্ড ব্যবসায়ী। তিনি সরা-সরি সারীকে লিখলেন কলকাতা আসতে।

সারী এল, তার গান নেওয়া হল। সে সব গানের আশাতীত আদর হল। সাহেবের সার্টিফিকেট না হলে এ দেশে বাংলা বইও বিক্রি হয় না। সারীর বরাতে জুটল সাহেব মহলের সুপারিশ। রেকর্ডের পর রেকর্ড করিয়ে সারী স্বনামধন্য হল। তখন তাকে বাস উঠিয়ে আনতে হল কল-কাতায়। বলাবাহুল্য, সুকু রইল সঙ্গে। তার গান কিন্তু কেউ রেকর্ড করতে চায় না, সাহেবের সুপারিশ নেই।

তারপরে সারী পড়ল এক ফিল্ম-ব্যবসায়ীর সুনজরে। তার রূপের জেল্লুস ছিল না, কিন্তু রসের চেকনাই ছিল। ভালো করে মেক্-আপ করলে তাকে লোভনীয় দেখায়। যারা ফিল্ম দেখতে যায় তারা লোভনকে শোভন বলে ভুল করে। সে ভুলের পুরো সুযোগ পেল সারী। ডিরেকটর তাকে পরামর্শ দিলেন ফিল্মী-গান শিখতে। লোকসঙ্গীত ছেড়ে সে 'আধুনিক' সঙ্গীত শিখল। কণ্ঠের কৃপায় সে তাতেও নাম করল। ধীরে ধীরে সারী তারা হয়ে জ্বলল। চার-পাঁচ বছর পরে যারা তার ফিল্ম দেখল তারা জানল না তার অতীত ইতিহাস।

অবশেষে একদিন শুভলগ্নে সারীর বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। কেউ আশ্চর্য হল না, কারণ সারীর আয় তখন হাজারের কোঠায়।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি চেঞ্জ থেকে ফিরছি। ট্রেনে ভয়ানক ভিড়। কোন-খানে একটিও বার্থ খালি নেই। বার কয়েক ঘোরাঘুরি করে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছি, এমন সময় একটা সার্ভেন্ট কামরা থেকে কে যেন আমাকে ডাক দিল, 'খোকা? খোকা না?' আমি পিছনে ফিরে দেখি সুকু।

ওর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে একরাশ গোঁফদাড়ি, গলায় একটা ক্রাউন কাঠের কি কালো কাচের মালা। কিটকাট চেহারা চাপরাশির মেলায় নেহাত বেমানান। হাতে একটা এক-তারা না আনন্দলহরী ছিল, সেটা বাজিয়ে মোটা গলায় গান করছিল একটু আগে—

'প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু
ধরো চিনে।'

আমাকে পিছন ফিরতে দেখে সুকু কামরা থেকে নামল। নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? জায়গা মিলছে না?'

আমি বললুম, 'এত রাত্রে কে আমার জন্যে জায়গা ছাড়বে!'

সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ফার্স্ট-ক্লাসে, যদিও আমার টিকিট সেকেন্ড ক্লাসের। দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, 'ও সারী। একবার খুলবে?'

সারীর বদলে সারীর স্বামী দরজা খুললেন। তখন সুকু আমার পরিচয় দিয়ে বলল, 'একটু কষ্ট করতে হবে এর জন্যে। আমার বাল্যবন্ধু।'

ভদ্রলোকের মুখে পাইপ, হাতে ডিটেক-টিভ নভেল ও পরনে সিলকের স্লীপিং সুট। ভদ্রমহিলার পরণেও তাই, উপরন্তু রংচংয়ে ড্রেসিং গাউন। তাঁরা বোধ হয় শয়নের উদ্যোগ করছিলেন।

সে রাত্রে আর কথাবার্তা হল না। আমি উপরের বার্থে সসংকোচে নিদ্রার ভান করে পড়ে রইলুম। কিছুতেই ঘুম আসে না। ভোরবেলা আসানসোল স্টেশনে সুকু এসে আমার খোঁজ করল। তার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে তার কাহিনী শুনলুম। বাকীটুকু বর্ধমান ও ব্যাণ্ডেলে।

হাওড়ায় শেষ দেখা বিদায়ের আগে সুকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'তোর পৌরুষ বিদ্রোহী হয় না? তোর আত্মসম্মান নেই?'

সুকু উত্তর দিয়েছিল, 'ও যে রাধা!'

অন্নদাশঙ্কর রায়

মিহির আচার্য

আজকের দিনে যখন শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পীর কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে ধরতে পারা যায় না সেই সময় সংখ্যায় অপ্রচুর হলেও এমন লেখকের অস্তিত্ব আমাদের কাছে পরম আশ্বাস ও তৃপ্তির বিষয় যাঁর মধ্যে শিল্পকর্ম ও শিল্পীব্যক্তিত্বের নির্ভুল প্রকাশ ঘটেছে।

নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে পারা যায় অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্যসংসারে এমন একটি বিরল দৃষ্টান্ত। সে হিসেবে অন্নদাশঙ্করকে 'জীবনশিল্পী' আখ্যা দিতে বাধা নেই। শিল্পকর্মকে অন্নদাশঙ্কর আরো দশটি বৃত্তির মতন নিছক একটি বৃত্তি মনে করেন না। শিল্প তাঁর কাছে জীবনায়ন, তাই তিনি আর্টিস্ট।

এই ধারার লেখকদের সাহিত্যের প্রেরণা তাঁদের ব্যক্তিগত দর্পণ। ব্যক্তিগত পরিধির বাইরে তাঁরা সাধারণত পদচারণ করেন না। ফলে তাঁদের নিজস্ব একটি সাহিত্যজগৎ গড়ে ওঠে — চিন্তার-দর্শনের-প্রত্যয়ের। পরিণামে এই লেখক সম্প্রদায় তথাকথিত 'জনপ্রিয়' হয়ে ওঠেন না। যেহেতু জনরঞ্জনকে তাঁরা সাহিত্যের লক্ষ্য বলে মনে করেন না, জীবনের পায়ে পায়ে যেমন আনন্দ চেতনায় বিকশিত হয়ে উঠেছে সেই সেই আনন্দ-উপলব্ধিকেই তাঁরা পাঠকদরবারে পরিবেশন করে ক্ষান্ত হন এই আশায় যে রসিকজন তাঁদের গ্রহণ করবেন।

রসিক বিদগ্ধমহলে অন্নদাশঙ্করের যে নির্দিষ্ট একটি স্থান রয়েছে এ সম্পর্কে নতুন ক'রে বলতে যাওয়াও একটা ধৃষ্টতা। অপরপক্ষে শিল্পাদর্শের কারণেই তিনি সর্বচিত্তহর হতে পারেন নি।

মনে রাখতে হবে অন্নদাশঙ্কর সাহিত্যরীতিতে বীরবলের একলব্য শিষ্য, যদিচ তিনি কল্লোল-গোষ্ঠীরই অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। সবিস্ময়ে লক্ষণীয় তাঁর শিল্পকর্মে —কী-পর্যবেক্ষণ, কী পরিবেশনায় অথবা মনোভঙ্গিতে কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মীয়তা নেই। সবুজপত্রের প্রতিই তাঁর আনুগত্য অধিক।

২

অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসে হোল্ টাইমার। বোধ করি মাঝে মাঝে স্বাদ-বদলাবার জন্যেই তিনি পার্ট টাইম ছোটোগল্পের কাজ করেছেন। আমার বিশ্বাস উপন্যাস-রচনার মেজাজই শিল্পীর উপযোগী, ছোটোগল্পগুলি তাঁর ব্যস্ত সময় থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া ফসল। নচেৎ তাঁর গল্পের ঝুড়িতে এখনো একশোর মতন গল্পও জমেনি কেন?

অন্নদাশঙ্করের প্রথম ছোটোগল্প 'দুর্জনায়' রচিত হয়েছে ১৯২৯-এ লন্ডনে। তারপর দেশে ফিরে লিখলেন 'বালিকাবধূ' ১৯৩০-এ। ১৯৩৩-৩৪-এ রচিত সাতটি ছোটোগল্প নিয়ে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'প্রকৃতির পরিহাস'· নজরবন্দী, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া, উপযাচিকা, স্ত্রীর দিদি, স্তনন্ধয়, বিভীষিকা ও চুপিচুপি। এই সাতটি গল্পের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত হয়েছে পুত্রচরিত এবং ১৭১ হেনরিয়েটা রোড গল্পদ্বয়।

অন্নদাশঙ্করের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'মনপবন', ১৯৪৬-এ প্রকাশিত। এখানে গল্পসংখ্যা সাতটি। মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না, দু'কান কাটা, সবার উপর মানুষ সত্য, হাসল সখী, জখমী দিল, বরের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী ও অজাতশত্রু।

১৯৫০-এ প্রকাশিত হল 'যৌবনজ্বালা'। আটটি ছোটোগল্প, যথাক্রমে দুর্জনায়, বালিকাবধূ, নিমন্ত্রণ, হেঁয়ালি, রূপদর্শন, নারী, অপ্সরা, যৌবনজ্বালা।

'কামিনীকাঞ্চন' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৪-তে। আটটি ছোটোগল্প। কামিনীকাঞ্চন, পথ গেছে হারিয়ে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, অভিমন্যুর ব্যূহ, ল্যাভেন্ডার, বান্ধবী, রাণীপসন্দ, নারীচরিত্র পুরুষভাগ্য।

'রূপের দায়' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৪-তে। সাতটি ছোটোগল্প। কতকালের চেনা, এই যদি ছিল মনে, আপ ট্রেন ডাউন ট্রেন, বজ্র আঁটুনি, ঠিকানা, পরীর গল্প ও লেডিকিলার।

এছাড়াও তাঁর 'কথা' শীর্ষক গল্পসংকলনে ১৯৬৫ পর্যন্ত রচিত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত সতেরোটি গল্প গ্রথিত হয়েছে। মীনপীয়াসী, রমতা সাধু, লখীন্দরের ভেলা, প্রমুখ গল্পগুলি এই গ্রন্থে আছে।

৩

অন্নদাশঙ্করের গল্পের লক্ষণগুলি চিহ্নিত করবার সময় শিল্পীর মানসিক গঠন এবং য়ুরোপ প্রবাসের অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের বিষয়টি সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার।

অন্নদাশঙ্কর প্রেমিক লেখক। প্রেমঘন দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন মানুষকে। যে মানুষ সর্বকালের সর্বযুগের এবং দেশকালনিরপেক্ষ। কাজেই আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে বিশ্বমানব মনের শোভাযাত্রা তাঁর গল্পে বিধৃত হয়েছে।

য়ুরোপের পটভূমিকায় প্রভাতকুমার সেকালের প্রথম গল্প লেখা শুরু করলেও অন্নদাশঙ্করের বিদেশী বাতাবরণে মুখ্য চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয়। এই সকল গল্পে কোনো ইঙ্গিতধর্মিতা বা ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতা নেই, নিছক গল্প-কথনের প্রেরণাতেই এই গল্পগুলির জন্ম।

প্রমথ চৌধুরীর মতনই 'উত্তমপুরুষে' গল্প-বলার প্রবণতা অন্নদাশঙ্করের অধিকাংশ গল্পেই দৃষ্ট হয়। গল্পের 'আমি' কখনো বক্তা, কখনো চরিত্র, কখনো ভাষ্যকার। এই স্টাইলে লেখকের স্বাচ্ছন্দ্য বোধকরি এই জন্যে যে শিল্পী হিসেবে তাঁর নির্লিপ্তিকে তিনি রক্ষা করতে পারেন। বিলেতের পরিবেশে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প-

গুলির মধ্যে রয়েছে দুর্জনার, পুত্রচরিত্র, হেনরিয়েটা রোড, স্তনন্ধয়।

এদের মধ্যে 'দুর্জনার' গল্পের স্বাদ আলাদা। উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে গল্পের ভারতীয় যুবক মিঃ চৌধুরী এবং তার বিদেশিনী বান্ধবী দেশকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে কী করে তাদের চেতনা-মুক্ত প্রাণের স্বপ্নজগতে বিহার করতে সক্ষম হল তারই অনবদ্য কাহিনী। অন্য তিনটি গল্পে উচ্ছৃঙ্খল ভারতীয় ছাত্র-সমাজের দায়িত্বশীল পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। 'পুত্রচরিত্রের' হরিশচন্দ্রের পুত্র হর্ষবর্ধন বাতাশারিয়া অর্থাৎ ভট্টাচার্য; '১৭১ হেনরিয়েটা রোডের' সরীসৃপ শিকদার; 'স্তনন্ধয়ের' নবনীমোহন বোধকরি এখনো ওদেশের দায়িত্বহীন ভারতীয় ছাত্রদের নির্লজ্জ ব্যঙ্গচিত্র।

কিন্তু স্বীকার করতে হয়, এই সকল গল্পে লেখক মাত্র কাহিনীকার হয়ে রয়েছেন, তাঁর নিজস্ব কোনো চিন্তা বা দর্শন প্রতিফলিত হয়নি। এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনেরও কোনো প্রয়াস নেই।

৪

দেশে ফিরে এসে অন্নদাশঙ্কর তাঁর জীবনের দ্বিতীয় গল্পটি লিখলেন 'বালিকাবধূ'। লেখকের একটি আশ্চর্য গল্প। এ যেন গল্পকারের জাত বদল হল। বয়ঃসন্ধি বালিকাবধূর যৌবনে উত্তরণের জাদুকরী গল্প। পুরুষের নিরাসক্তির মধ্যেও যৌবন কী করে বালিকামনকে বিকশিত করে তোলে তারই মিষ্টি গল্প।

এই গল্পটির কাহিনী চুম্বকে বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। নায়ক কনক মেনকার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করলেও বিলেতের প্রণয়িনী মে'র স্মৃতি ভুলতে পারছে না। মেনকাকে আদর করতে গেলে আশংকা হয় মে'র প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। মে'র স্মৃতি যতদিন না মিথ্যা হচ্ছে ততদিন কনক মেনকার মধ্যে মে'র স্মৃতিকে ধরে রাখতে চায়। মেনকাকে দিয়ে সে মে'র স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে চায়। যাতে মেনকা স্বামীসচেতন না হয় তার জন্য বয়স্কা মহিলাদের সঙ্গে তাকে মিশতে দেওয়া হয় না। তারপর হঠাৎ চাঁদের আলোয় বালিকাবধূর নারীরূপটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কনকের চোখে। মেনকার মধ্যে মে'র পরিণতি উপলব্ধি করে সে। কনক বুঝতে পারে যৌবন গোপনে গোপনে তার কাজ করে চলে!

৫

অন্নদাশঙ্কর গল্পের প্রয়োজনে স্ব-অনুভবের বাইরে যান না। তাই গল্পের বহিরঙ্গের বৈচিত্র্য-অন্বেষী যাঁরা তাঁরা হতাশ হবেন। অন্নদাশঙ্কর মূলত একটি নির্জন বৃত্তের অধিবাসী। সেদিক থেকে তাঁর গল্পের প্রিয় বিষয় : নারী-পুরুষের অন্তরঙ্গ জীবনের সমস্যা। অবশ্য সে-সমস্যা যৌনতার কূপে আটকা পড়েনি। তাঁর দৃষ্টি নারী-পুরুষের পূর্ণাঙ্গ অন্তর-প্রকৃতির দিকে। অনেকটা ইউনিভার্সাল পুরুষ-প্রকৃতির মতন।

এবং ধ্রুপদী লেখকের ধর্মিতায় লেখক সৃষ্ট সমস্যাকে শুধু ইঙ্গিতেই নিঃশেষ করেন না, মননশীল বিশ্লেষণের মারফত তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে তৃপ্তিলাভ করেন। এই ধরনের রীতিকে আবিষ্ক্রিয়া বলা যেতে পারে। ফলে পাঠকদের তরফ থেকে আর কিছু করার থাকে না। লেখক নিজেই সমস্যার জাল বোনেন এবং সমস্যা-মোচনের দায়িত্বও তিনি বহন করেন।

এই আলোতে অন্নদাশঙ্করের গল্প-গুলিকে বিচার করলে আখ্যানধর্মী বলা যেতে পারে। পরিণতিই মুখ্য। ধীরস্থির সূচনা, চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং উপসংহারে সুনির্দিষ্ট পরিণাম টেনে লেখক নিজে নিশ্চিন্ত হন এবং পাঠক-দেরও নিশ্চিন্ত করেন। পৃথিবীর বিশ্লেষণধর্মী লেখকদের সঙ্গে অন্নদা-শঙ্করের এইখানেই স্বাজাত্য। উপন্যাসের ক্ষেত্রে টমাস হার্ডি কিংবা গল্পের ক্ষেত্রে টমাস মান্ ঠিক এই ধারাতেই সাহিত্য-রচনা করেন।

অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে এ-প্রশ্নটা জাগছে : কল্লোল গোষ্ঠীর দিকপাল গল্প-কারদ্বয় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পপদ্ধতির সঙ্গে অন্নদা-শঙ্কর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে বাস করেন। এবং বিস্ময়ের বিষয় বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমারের উৎসাহেই অন্নদাশঙ্কর গল্পরচনার প্রেরণা পান। সবুজপত্রের প্রতি আনুগত্য দিয়েও অন্নদাশঙ্করের এই গল্পরচনাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

বোধ করি এটি লেখকের মানসিক গঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্যেই সম্ভব হয়েছে। অন্নদাশঙ্করের শিল্পী মেজাজ অত্যন্ত সিরিয়াস ধরনের এবং দর্শন-ভাবিত। অন্নদাশঙ্করের গল্পে স্যাটায়ার আছে, হিউমার আছে, অপরিমেয় আনন্দ এবং সৌন্দর্যও আছে, নেই সাধারণ মানুষের প্রাণখোলা হাস্যরস। নিশ্চয়ই এই সিরিয়াস মনোভঙ্গি বানানো ব্যাপার নয়, কর্ণের সহজাত কবচকুন্ডল।

এই বিশিষ্ট রচনারীতিই অন্নদা-শঙ্করকে রিয়্যালিস্ট করেছে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন জাগতে পারে : অন্নদাশঙ্করের গল্পনির্মাণরীতি 'আধুনিক' কিনা। সে-প্রশ্নের উত্তর : টমাস মান সেই অর্থে 'আধুনিক' কিনা! একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যদিচ ক্লাসিক রীতির ধারা আজকের দিনে ক্ষীয়মাণ তথাপি কেউ যদি তাঁর মানসিক গঠনের কারণেই ক্লাসিক আঙ্গিকে সাহিত্যচর্চা করেন তাহলে সে ব্যাপারকে নিশ্চয় 'অনাধুনিক' বলা যায় না। যেহেতু আগেই বলবার চেষ্টা করেছি সত্যিকার লেখকের স্টাইলের জন্মদাতা তার মানসিক গঠন। এই মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্যই সাহিত্যসংসারে শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মে বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য আনে। যে-বৈপরীত্য টলস্টয়ের সঙ্গে দস্তয়েভস্কির।

৬

নারী-পুরুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক-নির্ভর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে—নজরবন্দী, উপযাচিকা, স্ত্রীর দিদি দু'কান কাটা, রূপদর্শন, যৌবনজ্বালা ইত্যাদি। প্রতিটি গল্পই বিস্তারিত আলোচনা করে দেখানোর অবকাশ নেই কৌতূহলী পাঠক এই গল্পগুলিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা পুরুষ নারীর অনন্তলীলাই সবিস্ময়ে লক্ষ করবেন।

'নজরবন্দী' গল্পে ভক্ত পাঠক-পাঠিক পরিবেষ্টিত একজন খ্যাতনামা লেখকে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। মুগ্ধ পাঠিকাদে মধ্যে মঞ্জরী একজন। মঞ্জরীর প্রত্য জন্মেছে যে লেখকের সৃষ্ট নায়িকা সুম তারই মডেলে আঁকা এবং এই বিশ্বা মঞ্জরীকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে এসে লেখকের সকাশে পত্র-বিনিময়ের মাধ্যমে মৃত্যুকালে সে বলে গেছে লেখকই ত স্বামী। কল্প-জগতের এই বিশ্বাস সাধারণ মানুষ সত্য বলে ভুল করেছে।

'উপযাচিকা' গল্পে হিন্দু বিবাহপ্র সম্পর্কে লেখকের মনোভাব এই জাতীয় "আমি সত্যিই বুঝতে পারিনে কেমন ক লোকে অপরিচিত মেয়েকে বিয়ে কর আমার পাপ মন বলে, ওটা ভণ্ডামি অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তির জন্যে প্রত্যেকের ম যে ধিক্কার আছে সেই ধিক্কারটা মন্ত্র পড়ে শোধন করে নিলে নিজেকে অপরকে বঞ্চনা করতে আর বাধে না, ত সে তো কামপ্রবৃত্তি নয়, সে ধর্মসা বংশরক্ষা, কঠোর কর্তব্য ইত্যাদি। ত অপরিচিতা মেয়ের গায়ে হাত দিতে অ মতির দরকার হয় না, মন্ত্রটাই অনুমতি।"

'স্ত্রীর দিদি'র গল্পে বিয়ের থেকে নির্মলের স্ত্রীর দিদি সোহিনী স্ত্রী-রূপে পাবার অপূর্ণ বেদনা। শেফালী তার কাছে মাতৃজাতি। ত স্ত্রী বলে' কল্পনা করতে সংকুচিত তাই সে সোহিনীর ধ্যানে মগ্ন। এলা বাদের বাড়িতে নির্মল-সোহিনীর প্র বর্ণনায় লেখক অসাধারণ সংযমের পরি দিয়েছেন। গল্পের শেষাংশে মঙ্গেন্দ্রনা ভূমিকাটি কৌতুকরসের পরিবেশন করে এবং গল্পের ট্রাজেডিকে লেখক কৌ মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

'দু'কান কাটা' গল্পে সুকুমার বাউল ফকিরের কাছে বাল্যেই শিক্ষা গ্রহণ করেছে। মজনু ফকির গুরু, সারী বোষ্টমী সাধনের অবলম্বন। অবশেষে সুকুমার একদিন নিরুদ্দিষ্ট হল। উত্তর-বঙ্গের মহকুমা শহরে টমটম পাড়ার সভাগায়ক সুকুমার ওরফে সুকু। সারী যদিও বোষ্টমী তথাপি গহনার বড় শখ তার। শখ মেটাতে তাকে সুকুর কাকার ফাঁদে পড়তে হয়। তারপর সুরেলা কন্ঠের জোরে সারী স্বনামধন্য হল। অতঃপর চিত্রতারকা। অবশেষে এক অভিজাত পরিবারের বধূ। সুকুর পৌরুষ বিদ্রোহী হয় না। সারী যে আজো তার নায়িকা-সাধনের বাধা। গল্পের উপসংহারে লেখক সুকুমারের জীবনের ওপর বিচিত্র আলোক-পাত করেছেন। কৈশোরের বন্ধু সুকুমারের জীবনের ইতিবৃত্ত শুনে লেখকের চোখে তাকে দু'কান কাটা মনে হয়েছে।

'রূপদর্শন' গল্পে নয়নমোহন কৃষ্ণাকে বিয়ে করল। কুৎসিতদর্শন কৃষ্ণার পোড়া-রূপে মুগ্ধ নয়নমোহন। অথচ কৃষ্ণার মনে হয় নয়নমোহন প্রবঞ্চক। এগারো বছর ধরে ঠকিয়ে এসেছে তাকে। শারীরিক সম্পর্ক ওদের আগেই ছিল না, এবার মানসিক সম্পর্কও নষ্ট হল। কৃষ্ণা উন্মাদ হয়ে পড়ে।

অন্নদাশংকরের প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প এই পর্যায় থেকে তুলে ধরতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু এই মনোনয়নেও বিপদ কম নয়। কারণ মৌল আইডিয়া একই থাকলেও বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন দৃষ্টির গবাক্ষকে বেছে নিয়েছেন লেখক।

তবু আমার পক্ষপাতিত্বের দিক থেকে লেখকের 'যৌবনজ্বালা' গল্পটিই অধিক আকর্ষণীয় মনে হয়। উপসংহারে এই গল্পটির আলোচনা করেই আমার বক্তব্যের ছেদ টানবার ইচ্ছে পোষণ করি। তৎপূর্বে অন্নদাশংকরের কিছু ভিন্নধর্মী গল্পের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে।

৭

একটি চমৎকার গল্প 'চুপি চুপি'। যে-জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয় নিয়ে ভারত সরকার অধুনা একেবারে গলদঘর্ম সে-মহল যদি একটু খবর রাখতে পারতেন তাহলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এমন জোরালো বক্তব্যকে প্রচারের কাজে লাগাতে পারতেন! যেমন সম্প্রতি জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের টুকরো-টাকরা মতামতকে কাজে লাগাতে পেরেছেন! এবং কৌতুকের বিষয় এ-গল্প লিখেছেন লেখক ১৯৩৩-৩৪-এ।

উদ্ধৃতাংশ : বনোয়ারী ইন্দুকে বললে, "যখন তোমাকে চুপিচুপি একটা কথা বলে-ছিলুম তখন শুনলে এমন দুর্দশা হত না।" ইন্দু ফোঁস করে উঠল, "আবার সেই বেয়াদপি। মনে রেখো আমি তোমার স্ত্রী। রক্ষিতা নই।"

ফলতঃ ছটি সন্তানের জনক সৈনিক হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলেন।

৮

অন্নদাশঙ্করের আরো কিছু গল্প রয়েছে যেগুলি বক্তব্যপ্রধান। সে-বক্তব্য কখনো রাজনীতিক, কখনো সমাজনীতিক, আবার কখনো মানবিক।

মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না, সবার উপর মানুষ সত্য, জখমী দিল, অজাতশত্রু—মোটামুটি বক্তব্যভারি গল্প। কোথাও কোথাও এমন আশঙ্কা জাগতে পারে তত্ত্বের ভারে গল্পের রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা! হলেও বা কী এসে যায়? গল্পের মোড়কে একটা তত্ত্বকে পুরে দিলে নিশ্চয়ই গল্প-সরস্বতীর জাত খোয়া যায় না! তাহলে তো বারনার্ড শ'য়ের অধিকাংশ নাটককেই নাটক না বলে প্রবন্ধ বলা চলে! এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বা শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'-কে উপন্যাসের সম্মান দেওয়া যায় না কিছুতেই।

সমস্যাটাকে এইভাবে দেখলে ভালো হয় : কোনো লেখকের কখনো কখনো তত্ত্ব-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে এবং সে-তত্ত্বকে তিনি কোন্ মাধ্যমে রূপ দিতে স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন সে স্বাধীন বিচারের ভার লেখকের হাতে থাকাই ভালো। অন্তত লেখক যে নিছক গল্পও রচনা করতে পারেন সে-শক্তির প্রমাণ পরীক্ষিত।

বরং অগ্রগণ্য লেখকের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা অপরিসীম। তাঁর কাছে পাঠক শুধু স্টোরিটেলিং-ই কামনা করেন না, দেশ-সমাজ-মানুষ সম্পর্কে সুগভীর তত্ত্বও আশা করেন।

যেহেতু লেখক শুধু সাহিত্যের জলেরই মাছ নন, তিনি স্বকালের স্বদেশের স্বজাতির অতন্দ্র বিবেকও নিঃসন্দেহে।

এই তত্ত্বপ্রধান গল্পগুলি থেকে লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না।

...পরিণামে নোটনদির মনে হয়েছে ভারতীয় সৈন্যদলের হাতেই রয়েছে ভারত-বর্ষের মুক্তির চাবিকাঠি : "এরা একদিন দেশকে জয় করে নেবে, স্বাধীন করে দেবে। এতদিনে আমার প্রত্যয় হল যে ভারত সত্যিই স্বাধীন হবে, হবে এই উপায়ে।" মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না (১৯৪৩)

...বোকুর বিশ্বাস, "মানুষের জাত আছে, কিন্তু সে জাতের চেয়ে বড়, ধর্ম আছে, কিন্তু সে ধর্মের চেয়ে বড়। একটা আস্ত মানুষ যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমার মনেই থাকে না সে ইংরেজ আমি বাঙালী, সে ক্রিশ্চান, আমি হিন্দু। সে মানুষ, আমিও তাই।"

বোকুর বিশ্বাসভঙ্গ হল। বোকু রুদ্ধ-স্বরে বলে, "মানুষ বলে যাদের ভালো-বাসতুম তাদের একজন ম্যান নয়, ইংলিশ-ম্যান। আরেকজন ম্যান নয়, মুসলমান।" সবার উপরে মানুষ সত্য (১৯৫৪)

...জীবনে অজাতশত্রু হয়ে [illegible]াকা সম্ভব নয়! "সবচেয়ে দুঃখ হয় [illegible] যখনি আমি ওদের শত্রু। হায়রে! আমি শত্রু, আমি ওদের শত্রু! যে আমি একদিন অজাতশত্রু ছিলুম, সেই আমি আজ আমার পুত্রকন্যার শত্রু! ওরা আমার মুখ দেখতে চায় না। দেখে যখন টাকার দরকার হয়।" অজাতশত্রু (১৯৫৫)

৯

অন্নদাশঙ্করের রচনার মধ্যে যে গুণটি আমাকে চমৎকৃত করে তা হচ্ছে শিল্পীর অনীহা। সাধারণত এদেশে গরম পিঠের মতন উত্তপ্ত রচনাই সাধারণ পাঠকদরবারে সবিশেষ আদৃত। লেখক এবং রচনা উভয়ই উত্তেজনার আগুন পোহাতে ব্যস্ত।

যথার্থ শিল্পী নির্মোহ, বিজ্ঞানীর মতন নিরাসক্ত। তাঁর রচনায় কোথাও প্রয়োজনে উত্তপ্ত আবহাওয়া থাকতে পারে, কিন্তু স্রষ্টা নিজে উত্তেজিত হন না। কারণ রচনার সঙ্গে শিল্পী নিজে উত্তেজিত হলে তাঁর শিল্পীধর্ম ভ্রষ্ট হয়। এবং রচনাও অগভীর হয়ে পড়ে। যেহেতু শিল্পের আবেদন মানুষের মনের গভীরে।

বাঙলা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনা-রীতির নিদর্শন কম। সম্ভবত জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এই ধারার নজির রয়েছে।

১০

এবার অন্নদাশঙ্করের 'যৌবনজ্বালা' গল্পটির অবতারণা করে প্রসঙ্গ শেষ করি।

গল্পের নায়ক বিশ্বজিৎ নায়িকা রানি-চরিত্রকে ভুল বুঝেছে। য়ুরোপের আদব-কায়দায় গড়া রানি পুরুষের মেলামেশায় স্বাভাবিকভাবে সংস্কারমুক্ত। রানি বিশ্বজিতকেও তারই চিন্তার আদলে ভেবেছে। অনভিজ্ঞ বিশ্বজিৎ তাকে প্রেমিকারূপেই চিন্তা করেছে। এদিকে রানি এই সম্পর্ককে স্পোর্টস ছাড়া অন্য কিছু মনে করেনি।

চূড়ান্ত সুখ চায় বিশ্বজিৎ।

রানি বলে, "তুমি যখন বিয়ে করবে তখন আপনি বুঝবে যে তোমার স্ত্রী এ জিনিস আর কাউকে দিতে পারে না। এ কেবল স্বামীর জন্যে।"

বিশ্বজিৎ যৌবনজ্বালায় দগ্ধ।

রানির চোখে জল, "বন্ধু, তুমি কী আমার সর্বনাশ করবে? এই তোমার মনে ছিল?"

বিভ্রান্ত বিশ্বজিৎ শেষ পর্যন্ত আত্ম-হননের পথ বেছে নিল।

গল্পের সিদ্ধান্ত :

"পুরুষমাত্রেরই অবচেতন মনের গুহায় যেসব অন্ধ কামনা নিহিত রয়েছে খারাপ মেয়ের গন্ধ পেলেই তারা চরিতার্থতার জন্য ফাঁদ পাতে। সে যদি খারাপ মেয়ে না হয়ে থাকে তবে নিজের ফাঁদে নিজেকেই পড়তে হয়। তখন মরণ অনিবার্য।"

...টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে। ক্লাসে যাবার জন্য এবার প্রস্তুত হতে হয়। একটু যেন তেষ্টা পেয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। এখনই আবার ক্লাসে গিয়ে চেঁচাতে হবে—গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া ভাল। টেবিলের উপর মৌলবী সাহেবের পা দুটো নড়ছে। পাশেই পানের কৌটো। কৌটোটার ভিতর থেকে খানিকটা ভিজা খয়েরী নেকড়া বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই গা ঘিনঘিন করে—দিনরাত দাঁত খোঁটেন মৌলবী সাহেব আঙুল দিয়ে—হাত ধোয়া নেই কিছু না, সেই হাতেই পান বার করে খাবেন। অথচ কিছু বলবার উপায় নেই। এই সব অনাচারের মধ্যে রাখা জল খেতে মন সরে না। তাঁর দিককার দেওয়ালের পেরেক টাঙানো জল-তুলবার দাঁড়টা পেড়ে নিলেন পণ্ডিতজী। আর এক হাতে লোটা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি—পুজা আহ্নিক করেন—শুদ্ধাচারে থাকেন—কুক্কুটাণ্ড দেখলে বমি ঠেলে আসে। ছেলেদের স্কুলে যখন চাকরি করতেন, তখন তেওয়ারী চাপরাশীটা জল তুলে এনে দিত। এখানে সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনি; জেলা স্কুলের চাকরি থেকে পেনসন নেবার পর মেয়ে স্কুলে চাকরি নিয়েছেন। কিন্তু ক'টা টাকার জন্য নিজের আচার-বিচার বিসর্জন দিতে আসেন নি এখানে। স্কুলের দাইদের হাতের জল কি তিনি খেতে পারেন? লোটা মেজে নিজ হাতে ই'দারা থেকে জল তুলে, আলগোছে ঢকঢক করে খেয়ে যা তৃপ্তি, তা কি কখনও অপরের এনে দেওয়া জলে পাওয়া যায়?...

আজ মাস দুয়েক থেকে পণ্ডিতজীর মনটা ভাল যাচ্ছে না। একটি মুমূর্ষু মহিলার মুখ থেকে নির্গত একটি বাক্য, তাঁর কর্ণগোচর হবার পর থেকে অষ্টপ্রহর তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। বাক্য নয়, বাক্যের একটি শব্দ। না না, এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু নেই; এ হচ্ছে নিছক একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। মনের এই অস্থিরতার জন্য পণ্ডিতজী আজকাল নিজে উপযাচক হয়ে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে বেশী করে গল্প করা আরম্ভ করেছেন।

...আর যদি তিনি স্কুলের দাইদের হাতের জল খেতেনও, তা হলেও কি এখান থেকে চেঁচিয়ে দাইকে ডেকে এক গ্লাস জল আনতে বলতে পারতেন?...

"মৌলবী সাহেব, কোন একটা কাজে এখান থেকে দাই, দাই, বলে চীৎকার করতে লজ্জা করে না?"

"লজ্জা মনে করলেই লজ্জা। দাই বলতে দ্বিধা হয়তো হরখুরমা বলে ডাকলেই পারেন।"

...মৌলবী সাহেব ঠিক বুঝতে পারেন নি কেন এই দ্বিধা, কিসের এই লজ্জা। সে দ্বিধাটুকু ও'র মনে জাগে না যে কেন, তাই আশ্চর্য।...দ্বে বিধে—দ্বিধা—তদ্ধিতান্ত শব্দ।...

"মেয়ে স্কুলের পুরুষ শিক্ষক। আমাদের অবস্থাটা এখানে একটু কেমন কেমন না?"

আফিংখোর মৌলবী সাহেব এতক্ষণে চোখ খুললেন—পণ্ডিতজীর কথার সমর্থনে একটু রসিকতা করবার জন্য।

"আপনাদের সানসুকির্তে আছে না—হাংস মধ্যে বগুলা যথা—তেমনি আর কি আমরা এখানে।"

না। ঠিক এই ভাবটার কথ
পণ্ডিতজী বলতে চান নি। তব
মৌলবী সাহেবের কথার প্রতিবাদ সোজা
সুজি করতে পারলেন না। স্বভাবসুলভ
গাম্ভীর্য ভুলে একটু খোঁচা দিয়ে কথ
বললেন।

"আপনাকে আর বক বলি কি করে
বকের পালকের মত আপনার শাদা চুল আ
দাড়ি, আবার ভ্রমরের মত কালো হ
উঠেছে। আপনি বক কেন হতে যাবেন-
আপনি হলেন ভ্রমর।"

সম্প্রতি মৌলবী সাহেব আবার অ
একটা নতুন বিবি ঘরে আনবেন ঠি
করেছেন। কালো কুচকুচে দাড়িগুলোর মধ
আঙুল চালিয়ে তিনি হাসতে হাসতে জব
দিলেন—"হাতী চলে বাজারে, কুকুর ভা
হাজারে"।

"কিন্তু বুঝলেন কিনা মৌলবী সাহে
—সেই হাতী যখন পাঁকে পড়ে......"

মৌলবী সাহেব কথাটাকে শেষ কর
দিলেন না।

"আপনি চুল শাদা রেখেছেন ব
বলছেন। না? বগুলা-ভকত (বকধার্মি
দেখতে শাদাই হয়।" নি
রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল মৌ
সাহেব। সে হাসিতে যোগ দেবার চে
করেও পারলেন না পণ্ডিতজী। বকধার্মি
শব্দটা তীরের মত তাঁর মনের গভী
গিয়ে বিঁধেছে। আজ দুই মাস থেকে
কথাটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে, তারই স
যেন বকধার্মিক কথাটার সম্বন্ধ আছে।

আচমকা একটা স্পর্শকাতর জায়
ঘষটানি লেগেছে। মৌলবী সাহেব নি
খেয়াল-খুশীতেই অষ্টপ্রহর মশগু
পণ্ডিতজীর মুখ চোখের চকি
বৈলক্ষণ্য তাঁর নজরে পড়ল না।
টেবিল তোলা নড়ন্ত পা দুটোকে
হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল পণ্ডিতজীর
চাকরির জীবনে অনেক কিছুই গা-স
করে নিতে হয়। এখানে আসা থেকে অ
কিছুই সইয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে।
স্কুলে, তাঁদের গতিবিধি অবাধ নয়;
বাঞ্ছিতও নয়। স্কুল ঘর থেকে একটু
তাঁদের এই ঘরখানি। আগে ছিল স্
ঝাড়ুদারনীর ঘর। এখন সেই ছো
ঘরখানার মধ্যে পাতা হয়েছে এক
টেবিল, দুপাশে দুখানা চেয়ার। টে

খানাকে দিয়ে অলিখিত আইনে তাঁরা ঘরখানাকে হিন্দুস্থান পাকিস্থানে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন; একদিকে থাকে খাট, আর একদিকে থাকে বদনা। নিজের [illegible] নিয়ে তিনি বার হলেন ঘর থেকে। বহুকাল তিনি আর মৌলবী সাহেব এক সঙ্গে কাজ করেছেন জেলা স্কুলে। কিন্তু তাঁর পা-দোলান এত খারাপ এর আগে আর কখনও লাগে নি। ক্লাসে গিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পা-দোলানো তাঁর চিরকালের অভ্যাস। হেডমাস্টারমশায়রা বলে বলে হার মেনে গিয়েছিলেন; মৌলবী সাহেব তাঁদের ধমক পর্যন্ত গায়ে মাখতেন না। এমন একটা খোশমেজাজী লোক হঠাৎ তাঁকে বকধার্মিক বললেন কেন? নিজের জানতে তিনি তো মিথ্যাচার কখনও করেন না। টোলে পড়বার সময় কিশোর বয়সে একবার কৃচ্ছ্রসাধনার বাতিক জেগেছিল। তাঁর জীবন-যাত্রায় আজও তার রেশ রয়ে গিয়েছে। সৎ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক বলে পাড়ায় তাঁর খ্যাতি। তিনি নেপালের মহাকালী দর্শন করে এসেছেন, কলকাত্তাবালী কালীর চরণে জবাপুষ্প দেবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে, কামরূপ কামাখ্যায়ও তিনি সস্ত্রীক তীর্থ করে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও সদাচারের মধ্যে কোথাও তো একটুও ফাঁকি নেই। তিনি যা নন তা' দেখাতে তো কোনদিন চেষ্টা করেন নি। তবে কেন মৌলবী সাহেব তাঁকে বকধার্মিক ভাবলেন? টোলে পড়বার সময় সেখানকার পণ্ডিতমশাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, তিনি বলেছিলেন, "তুরন্ত, তুমি ব্যাকরণ পড়। কাব্য পড়ে কি হবে? বড় মনকে চঞ্চল করে ও জিনিস। বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বণিতা লতা। ইন্দ্রিয়াশক্তির অবলম্বনেই কাব্যের রস জীবিত্ত থাকে।" সেইজন্য গুরুর আদেশে, লঘু চাপল্যের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পণ্ডিতজী মেরুদণ্ডহীন কাব্যের বদলে ব্যাকরণ পড়েছিলেন। ব্যাকরণের বিধানগুলোর মতনই আষ্টেপৃষ্ঠে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। তার মধ্যে বিচ্যুতি নেই। তবে কেন মৌলবী সাহেব অমন কথাটা বললেন? না না, ওটা একটা নির্দোষ রসিকতা—কিছু না ভেবে বলা—ঠাট্টা করে কথার পৃষ্ঠে বলা কথা মাত্র। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। ও বিশেষণটা কখনই তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আর সেই মুমূর্ষুর উক্তির যে শব্দটি দু' মাস থেকে তাঁর মনে কিরকিচ করে বিঁধছে, সেটা একটা সর্বনাম, তার উপর বহুবচন। দুটোর মধ্যে কোন মিল নেই, কোন সম্পর্ক নেই। শব্দটা হচ্ছে "ওরা"। বাক্যটি হচ্ছে "ওরা কি ওই চায়!" এই 'ওরা' শব্দটিকে নিয়েই যত গোলমাল। সঃ তৌ তে—ওরার অর্থ তে।...

হঠাৎ নজরে পড়ল হেডমিস্ট্রেস নিজের কোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি আসছেন। চোখ নামিয়ে নিলেন; চোখাচোখি হয়ে গেলে অপ্রস্তুত হতে হত। হেডমিস্ট্রেস যখন আসছেন, তখন টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে নিশ্চয়। নিজেদের বসবার ঘরে পৌঁছে তবে মাটি থেকে চোখ [illegible] [illegible] পণ্ডিতজী। অকূল সমুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ এই ঘরখানি। [illegible] উপর পা-জোড়া নড়ছে। মৌলবী সাহেবের প্রায় সারাদিনই ছুটি, কেন না সব ক্লাসে উর্দু পড়বার মেয়ে নেই। সংস্কৃতের ছাত্রী এ স্কুলে কম নয়। পণ্ডিতজী নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, অভিভাবকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছাত্রী জুটিয়েছেন; নইলে মেয়েরা আবার আজকাল অন্য সব ফাঁকির বিষয় নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে কি করে, নৈতিক অনুশাসন আসবে কোথা থেকে,—একথা কেউ বুঝবে না! মৌলবী সাহেবের কিন্তু ছাত্রী জুটলো কিনা, সেসব বিষয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই।

তাঁর সঙ্গে কোন কথা না বলে ক্লাসে যাওয়া দেখায় খারাপ; ভেবে নিতে পারেন যে 'বকধার্মিক' বলবার জন্য চটেছেন তিনি, তাই পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করলেন—"ও মৌলবী সাহেব, ক্লাস নেই নাকি?"

মৌলবী সাহেব চোখ বুজেই উত্তর দিলেন—"আমার আবার টিফিনের পরের পিরিয়ডে কোনদিন ক্লাস থাকে নাকি?"

"বেশ আছেন মৌলবী সাহেব।"

"যে যেমন নসিব নিয়ে এসেছে।"

"আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ ঝিমুতে ঝিমুতে পা দোলান; আমি ক্লাস ঠেঙিয়ে আসি।"

নিজের অতর্কিতে তিনি আজ মৌলবী সাহেবের প্রতি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করছেন বারবার। কিন্তু যাঁকে বলা তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

"আরে ভাই, যে ক'টা টাকা মাইনে দেয়, তার বদলে দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে পা-দোলানর মেহনতই যথেষ্ট।"

পাটকরা চাদরখানা পণ্ডিতজী কাঁধের উপর সাজিয়ে নিলেন। পাকা গোঁফ-জোড়ার উপর হাতের উলটো পিঠটা বুলিয়ে নিলেন একবার। ঠিক আছে সব। হঠাৎ খটকা লাগল মনে—ছেলেদের স্কুলে চাকরি করবার সময়ও কি ক্লাসে পড়াতে যাবার আগে, চাদর ও গোঁফের বিন্যাস সম্বন্ধে এত সজাগ থাকতেন? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একটা বিষয় না স্বীকার করে উপায় নেই; চিরকাল তিনি নিজের জামা-কাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিতেন; ইদানীং ধোপার বাড়িতে দেন। তবে এসবগুলো ঠিক প্রসাধনকর্ম নয়। দাঁত খুঁটে হাত ধোবার মত, খেয়ে কুলকুচা করবার মত নির্দোষ অভ্যাস!...

ঘণ্টা পড়ল। পণ্ডিতজী ক্লাসের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর অসাক্ষাতে সবাই তাঁকে তুরন্ত পণ্ডিত বলে ডাকে। কিন্তু তিনি নিজের নাম দস্তখত করবার সময় লেখেন—তুরন্তলাল মিশ্র, ব্যাকরণতীর্থ। বাড়ির চিঠিতে পর্যন্ত। ব্যাকরণ যেমন তার অস্থিমজ্জায় ঢুকে গিয়েছে, ব্যাকরণতীর্থ পদবীটাও তেমনি তাঁর নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। প্রতি মাসে একবার করে আগে থেকে কোন সূচনা না দিয়ে, পুরনো পড়ার পরীক্ষা নেন পণ্ডিতজী। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে আজ এই ক্লাসের ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবেন।

...এই ক্লাসের মেয়েরা সবচেয়ে বেশী বকুনি খায় হেডমিস্ট্রেসের কাছে, সবচেয়ে বেশী চেঁচামেচি করে বলে। মহাংস শব্দঃ মহাচ্ছন্দঃ...। ছেলেদের দুষ্টু বলা চলে, কিন্তু মেয়েদের দুষ্টু বলতে বাধে। অবাধ্য কথাটাও ঠিক হয় না। হ্যাঁ, একটু চঞ্চল বেশী।... নৃত্যন-চকোরঃ—নৃত্যংশ্চকোরঃ...। কোন ক্লাসের শান্ত-অশান্ত হওয়া নির্ভর করে সেই ক্লাসের লীডারদের সাহসের দৌড় কতদূর, তারই উপর। কিন্তু তিনি চিরকাল লক্ষ্য করে আসছেন যে, সব ক্লাসের ছাত্ররাই সংস্কৃত পণ্ডিতের পিছনে লাগতে ভালবাসে। দেব ভাষার অনুস্বার বিসর্গসম্বলিত উচ্চারণগুলোই ছাত্রছাত্রীদের চোখে সংস্কৃত শিক্ষকদের ছোট করে দেয় কিনা কে জানে! ব্যাকরণের 'ষষ্ঠী চানাদরে' বিধানটি পড়াবার সময় হাসেনি, এমন ক্লাস তিনি দেখেন নি। প্রথম যখন চাকরিতে ঢোকেন, তখন ভাবতেন যে ইংরাজী না জানা পণ্ডিত বলেই ছেলেরা তাঁকে উপেক্ষা করে। কতকটা এইজন্য, আর কতকটা ক্লাসে পড়ানর সুবিধার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টা করে সামান্য ইংরাজী শিখেছিলেন। এর ফল কিন্তু হয়েছিল উল্টো; ছাত্ররা আরও বেশী করে তাঁর পিছনে লাগত। কিন্তু সেই সামান্য ইংরেজীর জ্ঞানটুকু তাঁর অতি গর্বের জিনিস। সুবিধা পেলেই ক্লাসে জানিয়ে দিতে ছাড়েন না যে তিনি ইংরাজী জানেন।

এই ক্লাসের লীডার মালবিকা। প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি তার প্রতিটি কথা থেকে ঠিকরে পড়ে; কিন্তু প্রগল্‌ভতা যেন আর একটু কম হলেই ভাল হত! ক্লাসের সজীব গুঞ্জনধ্বনি কানে আসছে।...

একটি মেয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখেই ক্লাসে খবর দিল—'তুরন্ত পণ্ডিত আসছে রে!' তিনি ক্লাসে ঢুকলেন হন হন করে—যেন একমিনিটও সময় নষ্ট করতে চান না। ছাত্রীদের মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ। হাসি চাপবার চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। ছেলেদের স্কুল হলে তিনি বেশ কয়েকটি চপেটাঘাত দিয়ে ক্লাস আরম্ভ করতেন; কিন্তু মেয়ে-স্কুলে তাঁর সেই চিরাচরিত পদ্ধতি অচল। মেয়েদের গায়ে কি হাত তোলা যায়? মায়ের জাত! দেবীর মত পূজ্যা কুমারীরা। তাঁদের যুগে এই বয়সের মেয়েদের কবে বিয়ে হয়ে যেত।

ক্লাসের উপযুক্ত বাতাবরণ ফিরিয়ে আনবার জন্য তুরন্ত পণ্ডিত চেঁচিয়ে সুর করে বললেন—'বা—আ-আই ইন্‌টেলেকট।' অর্থাৎ মতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কি

হয়? খুব সহজ প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ; এ শুধু গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছেন; পরে আস্তে আস্তে শক্ত হবে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রীরা বুঝে গেল, আজ গতিক সুবিধার নয়। অমন হন হন করে ঘরে ঢুকতে দেখে আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এতক্ষণে তিনি তাঁর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছেন লিলির দিকে। ক্লাসের মধ্যে একমাত্র এই মেয়েটির দিকে তাকাতে তাঁর মনে কোনরূপ সংকোচ আসে না। মেয়েটি কুরূপা।

"এসব নামতার মত কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। ইউ! ইউ বয়! তুমি বলো!"

সারা ক্লাস ফেটে পড়ল।

...কেন? হঠাৎ এত হাসির কি হ'ল? মালবিকাই নিশ্চয় আরম্ভ করেছে। ওঃ! অভ্যাসবশে ভুলে 'ইউ বয়' বলে ফেলেছেন! এরকম ভুল তাঁর হয় মাঝে মাঝে। আজ দিনটাই খারাপ যাচ্ছে, সকাল থেকে। আর বুঝি ক্লাসকে শাসনে রাখা যাবে না আজ! নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পণ্ডিতজী চোখ নামিয়ে নিলেন। মালবিকার মুখে কৌতুকের হাসি।

"একটা কথা বলি পণ্ডিতজী, কিছু মনে করবেন না। আপনার পইতাটা কানে জড়ান রয়েছে।"

...ছি, ছি, ছি! (পশ্যন—চকিতঃ—পশ্যংশ্চকিতঃ) ...লজ্জায় পণ্ডিতজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পইতাটা জামার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নেবার জন্য আরও জোরে সুর করে চেঁচালেন—"বা—আ—আই ইন্-টেলেকট্।"

উচ্চহাসির রোল তাঁর গলার সুরকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

হাসতে হাসতেই মালবিকা জিজ্ঞাসা করে—"আজ বুঝি ব্যাকরণের পুরনো পড়া ধরবেন পণ্ডিতজী?"

অন্যদিকে তাকিয়েই পণ্ডিতজী বললেন—"আবার ব্যাকরণ শব্দটির ভুল উচ্চারণ করছ? প্রতিদিন কি একবার করে বলে দিতে হবে?"

উপরের ক্লাসগুলোর সব মেয়েই বাঙালী। অবাঙালীদের আগেই বিয়ে হয়ে যায় বলে, তারা আর অতদূর পৌঁছতে পারে না। বড় ভাল লাগে পণ্ডিতজীর, এইসব বাঙালী মেয়েদের। ওরা হাসতে জানে; ওদের কথার ধ্বনি মৈথিলীর মত মিষ্টি; কিন্তু এক দোষ ওদের—সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ মোটেই করতে পারে না। বকতে গেলে, হেসে ফেলবে; কি করে শেখাবে বলো এদের! কিন্তু ওদের মুখের ভুল উচ্চারণের ধ্বনিটা শুনতে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছা করে, অনেকক্ষণ ধরে শোনেন। ...(মহতী-ইচ্ছা—মহতীচ্ছা)।... কুকুটাণ্ড-লোভী বাঙালী পুরুষরা কবে সাহেব হয়ে যেত; শুধু পারেনি এই মেয়েদের জন্য। নিষ্ঠায়, আচার-বিচারে পুরুষদের বিচ্যুতি-টুকু মেয়েরা পুষিয়ে দিয়েছে বলেই ওদের সমাজটা এখনও টিকে আছে। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল তাঁর কোনদিন মিটবার নয়।...

কোন্ কথায় কি প্রতিক্রিয়া হয় পণ্ডিতজীর উপর, সে সব ছাত্রীদের মুখস্থ।

"কেমনভাবে ব্যাকরণ উচ্চারণ করব পণ্ডিতজী?"

মালবিকার পাতা ফাঁদে ঠিক পা দিলেন তিনি।

"বলো—বিয়া-করণ—বিয়া-করণ।"

"বিয়া-করণ, বিয়া-করণ"—বিয়া আর করণ শব্দ দুটিকে ভেঙে আলাদা করে বলেছে সে। ক্লাস সুদ্ধ সবাই হাসছে। সকলেই নিশ্চিন্ত যে পণ্ডিতজীর পরীক্ষা নেবার ঝাঁজ আজকের মত কমিয়ে দিয়েছে মালবিকা।

"আবার বলো! ত্রিশবার বলো!"

...এই চটুলা মেয়েটিকে শাসনে রাখা শক্ত। কিন্তু মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল।... মাস দুয়েক আগের সেইদিনকার কথা তিনি ভোলেন নি। তখন তাঁর মাথায় অত বড় বিপদ। ছোট শালা স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল এখানে বেড়াতে। সৌখীন মানুষ; দিনে তিনবার চা না হলে চলে না। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে স্টোভ। কে বোঝাতে যাবে এইসব ছেলেছোকরাদের যে, বাপদাদারা এতকাল যা করে এসেছে তাই করাই ভাল। হ'লও কি তাই! স্টোভ ধরাতে গিয়ে শালাজের শাড়ীতে আগুন লেগে যায়। ভীষণভাবে পুড়ে যান তিনি। জামা-কাপড়ে আগুন লেগেছিল কিনা, তাই গলা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে বেগুন পোড়ার মত পুড়ে থসথসে হয়ে যায়। চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য। সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! এখনও মনে করলে গা শিউরে ওঠে।

কিন্তু আশ্চর্য, মুখখানি একটু পোড়ে নি! গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলে, কে বলবে যে তিনি পুড়ে গিয়েছেন। প্রথম একদিন তো অজ্ঞান হয়েই ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে তাঁর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা মোটেই ছিল না, যেতে পারলে যেন বাঁচেন।... সেই সময় বোঝা গিয়েছিল, মালবিকা মেয়েটি কত ভাল। এত প্রগল্‌ভতা সত্ত্বেও কত কোমল ওর হৃদয়। সে এসে বলেছিল—'পণ্ডিতজী, সীতা-কুণ্ডের সন্ন্যাসীর দেওয়া একটা পোড়ার ওষুধ মা জানেন, লাগাবেন কি? আস্ত ডাব পুড়িয়ে তয়ের করতে হয়। খুব ভাল ওষুধ, পোড়ার দাগ একেবারে থাকে না।'

তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁর শালার অ্যালোপ্যাথিক ছাড়া আর অন্য কোন ওষুধে বিশ্বাস নেই। মালবিকাকে সেকথা বললেন। তবু সে পরদিন ওষুধ নিয়ে হাজির তাঁর বাড়িতে। কোথা থেকে ডাব জোগাড় করেছে, কখনই বা মাকে দিয়ে ওষুধ তৈরী করিয়েছে, সেই জানে। কিন্তু সে ওষুধ ব্যবহার করা হয়নি—আজও কৌটায় অমনি পড়ে আছে। ব্যবহার করলে কি হ'ত কে জানে! তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এসে এত বড় অঘটন ঘটেছিল, তাই নিজেকে আজও দোষী মনে হয়; খানিকটা দায়িত্ব ছিল বৈকি। তাঁর ছোটশালার মুখের দিকে তাকান আর যেত না, শালাজ স্বর্গে যাবার পর। অনেক মৃত-পত্নীক দেখেছেন, কিন্তু অত মুষড়ে ভেঙে পড়তে আর কাউকে দেখেন নি। ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল! বড় অনুরাগ ছিল দুজনকার মধ্যে; সচরাচর দেখা যায় না অমন। এত অনুরাগ, তবু কেন স্বামীর সম্বন্ধে ওরকম ধারণা ছিল সেই পতিব্রতার?...

"হয়ে গেল ত্রিশবার? গুড্। Expound সমাস—অর্ধদগ্ধশরীরঃ।"

"অর্ধদগ্ধং শরীরং যস্য সঃ—বহুব্রীহি।"

"গুড্। কিন্তু অর্ধদগ্ধটুকু যে বাকি থেকে গেল।"

অর্থাৎ যথাতথা দগ্ধম্—সুপ—সুপেতি সমাস।"

"গুড্। কিন্তু চিংড়ী মাছলী খাওয়া বাঙালীরা দন্ত্য স উচ্চারণ করতে পারে না। শমাশ নয়, বলো সমাস। দন্ত্য স দিয়ে।"

"ও তো পণ্ডিতজী সামাসা হয়ে যাচ্ছে।"

"ওই ঠিক উচ্চারণ। ওই বলো দশবার!"

...কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখের আধো-আধো বুলি যে রকম ভাল লাগে, সেই রকমই ভাল লাগছে এই মেয়েটির শুদ্ধ উচ্চারণ করবার ব্যর্থ চেষ্টার ধ্বনি। সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মত এর মধ্যেও একটা মিষ্টতা আছে।

...মধুরাঃ ঝঙ্কারাঃ—মধুরাঝঙ্কারা।...

"হল দশবার? সিট্-ডাউন! এবার গৌরী তুমি বলো। Expound সমাস—মৃত-পত্নীকঃ। জোরে বলো, তাড়াতাড়ি দরকার নেই। ভয় কিসের?...আশন্-কতে। আশঙ্কতে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে। গুড্। সিট ডাউন। নেক্সট্। গীতা। নম্বর এক, তুমি বলো। আজকাল গীতা নামটা এত বেশী কেন তোমাদের মধ্যে? কিন্তু নামটি বেশ ভাল। ওরকম গ্রন্থ আর নেই পৃথিবীতে।"

...স্ত্রীর অনুরোধে, তিনি শালাজের মৃত্যুশয্যার পাশে গীতা পড়ে শুনিয়ে ছিলেন। তখন শেষ সময়। যাঁকে শোনান তাঁর তখন শোনবার বা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। আগের দিনেও শালাজ কথ[illegible] বলেছেন; জ্ঞান ছিল পুরো মাত্রায়। [illegible] কথাটি তাঁকে গত দু' মাস থেকে পীড়[illegible] দিচ্ছে সেটা তো তার আগের দিনেই বলা।[illegible] তাঁর স্ত্রী ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন তখ[illegible] শালাজের গায়ে। পুরুষ মানুষদের সে ঘ[illegible] যাবার উপায় ছিল না। তিনি পাশের ঘ[illegible] উৎকণ্ঠিতচিত্তে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু কো[illegible] ভরসা দেন নি রোগিণী সম্বন্ধে। ননদ ক[illegible] কি বলে চলেছেন...'খুব জ্বলছে? ওষুধ দি[illegible] লাগছে? ভাবনা কি, সেরে যাবে দি[illegible] কয়েকের মধ্যে। না, আবার কিসের? সার[illegible] না! কত লোকের কত শক্ত শক্ত রোগ সে[illegible] যাচ্ছে, আর তোমার এই ঘা-ফোস্কাট, সারবে না!'...

...'না না আমার আর বেঁচে দরকার নেই...ছিঃ, ওকথা বলতে নেই।'...

'আমার মরে যাওয়াই ভাল।'...'কি যে বলো। কেন, হয়েছে কি তোমার?'... এর পরের কতকগুলি কথা তিনি মাঝের বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে বুঝতে পারেন নি। একটু পরে আবার কানে এল...'না না সে সব ভেবো না তুমি। সর্বাঙ্গ পুড়েছে তোমার কোথায়? দেখ দিকিনি, এই ব্যথা বিষের মধ্যেও তোমার মুখখানি কি সুন্দর দেখাচ্ছে!'... 'ওরা কি ওই চায়'... যেন দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দটিও তাঁর কানে এল। অন্তরের তাগিদে বেরিয়ে এসেছে হৃদয় নিঙড়ানো কথা কয়টি। এই বাক্যটিই তাঁকে অস্থির করে তুলেছে গত দুই মাস থেকে। কথাটিকে মোটেই লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাণিনির সূত্রের মতই সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ। বহু টীকা ভাষ্য করেও আজও বোঝা গেল না, ঠিক কি মনে করে মহিলাটি ওই ওরা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।...

"পণ্ডিতজী, আমিও কি সমাসের উচ্চারণ অভ্যাস করব নাকি?"

"ও, তুমি। নো। তুমি বলো সন্ধি—তদ-ছবিঃ—কি হয়? তচ্ছবিঃ। গুড্। সখী-উত্তম—সখ্যুত্তম। গুড্। বাণী-ঔচিত্যম্। ঠিক হচ্ছে। বলো। হ্যাঁ। বাণ্যৌচিত্যম। গুড্। সিট্ডাউন। কিন্তু মূর্ধন্য ণ এর উচ্চারণ হ'ল না। তোমরা যে দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ণ এর একই উচ্চারণ কর। আচ্ছা এবার বাণী উঠবে। বাণী তোমার নামের উচ্চারণ কর। সংস্কৃত উচ্চারণ। বাংলা নয়। যে নামের উচ্চারণ করতে পারে না, সে নাম রেখে লাভ কি? দশবার বলো।"

এই চেষ্টায়, হাসির ধুম পড়ে গেল ক্লাসে। হেডমিস্ট্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে, একবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেলেন। পণ্ডিতজীর ক্লাসের সময় এ তাঁর ডিউটি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ক্লাস শান্ত হয়ে গেল। অপ্রতিভ পণ্ডিতজী কথার খেই হারিয়ে ফেললেন অল্প কিছুক্ষণের জন্য।

...মালবিকা আসছে। কেন তা তিনি জানেন। ফাঁকি দিতে পারলে ও ছাড়ে না; কিন্তু কি বুদ্ধিমতী!... ও গন্ধ তেল মাখে। পায়ের নখ কাটে না কেন?... সে এসে টেবিলের উপর থেকে বাইরে যাবার পাসটা নিয়ে গেল। ছেলেদের স্কুলে এ ব্যবস্থা ছিল না। এ স্কুলেও অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ক্লাসে 'পাস' এর ব্যবস্থা নেই। এ তিনি নিজে করেছেন, নিজের ক্লাসের জন্য। পকেটে করে নিয়ে যান প্রতি ক্লাসে। প্রথমে গিয়েই টেবিলের উপর রেখে দেন, যাতে মেয়েদের বাইরে যাবার সময় মুখ ফুটে কথাটা বলতে না হয়। শোভন অশোভন সম্বন্ধে এত সজাগ কেন তিনি মেয়েদের বেলায়, এত নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবার প্রয়াস কেন? এসব মেয়েরা তাঁর নাতনীর বয়সী; তবু কেন তিনি এদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারেন না? ছেলেদের স্কুলের সেই নিঃসংকোচ ভাব এখানে আসে না কেন?... ক্লাসে এর পরে কি প্রশ্ন করবেন, কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তিনি সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হেডমিস্ট্রেস একবার ক্লাসের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি হেনে চলে যাবার পর এমনিই হয়। স্ত্রী চ পুমাংশ্চ স্ত্রী পুংসৌ—দ্বন্দ্ব সমাস নিপাতনে সিদ্ধ—তাঁর বড় পছন্দসই প্রশ্ন, ছেলেদের স্কুলে থাকা কালের। নির্দোষ শব্দটি, কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করতে বাধল। আবার খটকা লাগল মনে—আচ্ছা, বাঙ্গালী ছেলেদের মুখের ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত বলা, তাঁর কানে কি এত মিষ্টি লাগত?...মনে পড়েছে আর একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। ছেলেদের ক্লাশে পড়াবার সময় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন—বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয় বলো। বিম্বোষ্ঠী ও বিম্বোষ্ঠা দুই-ই হয়, এই উত্তর তিনি আশা করতেন। কিন্তু এই প্রশ্নটি যে মেয়েদের ক্লাসের অনুপযোগী। এসব শব্দ ব্যবহার না করেও যদি পারা যায়, তবে দরকার কি! কে কোন্ মানেতে নেবে কে জানে। ব্রাহ্মণের ঘরের বাল-বিধবাদের মত, তাঁকেও যে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়; কে আবার কি কোথা থেকে বলে দেবে।...আচ্ছা ব্যাকরণের অমোঘ বিধানগুলি তো স্থানকালপাত্র নিরপেক্ষ। তবে তাঁর তাঁর পড়ানর উপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে কেন? মেয়েদের বেলা এক-রকম, ছেলেদের বেলা আর একরকম হয়ে যান কেন তিনি?...দুজনের মনের ভাবই যে আলাদা। আদর্শ ছাত্র শিক্ষককে গুরু বলে ভক্তি করে—সেটা ভয়ের সম্বন্ধ; ছাত্রীরা শিক্ষয়িত্রীদের দিদি বলে—সেটা ভালবাসার সম্বন্ধ;...কারণটা ঠিক মনের মত হল না।...

"লিলি! কাম টু দি বোর্ড।"

যখনই দিশেহারা পণ্ডিতজীর মুখে ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবার প্রশ্ন জোগায় না, তখনই তিনি লিলিকে ডাকেন। এই রুগ্না কুরূপা মেয়েটিই তাঁর খেই-হারানো নিবা-রণের ওষুধ।

"লেখো, ওরা শব্দের সংস্কৃত কি। এর মধ্যে আবার ভাবছ কি?"

"আমি ভাবছিলাম যে, আপনি সমাস, না হয় সন্ধি জিজ্ঞাসা করবেন।"

"বাঃ, বেশ জবাব। তাই শব্দরূপ জিজ্ঞাসা করলে পারবে না? তুমি হচ্ছ বিদুষীকল্পা—অর্থাৎ ঈষদূনা বিদুষী, বুঝেছ? সম্ভবত বোঝনি, শব্দরূপ যে জানে না, তার পক্ষে তদ্ধিত বোঝা কঠিন। ব্যাড, গো টু ইওর সিট।"

অযথা দরকারের চেয়েও চটে উঠেছেন পণ্ডিতজী। লিলির হাত থেকে খড়ি আর ঝাড়ন যথাস্থানে রাখবার; তারপর নিতেন।

এতক্ষণে নজরে পড়ল। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর আগে থেকেই লেখা আছে—"বিয়াকরণ শব্দটি দিয়া একটি বাক্য রচনা কর। উত্তর: মৌলবী সাহেবের ন্যায় পুনরায় বৃদ্ধ বয়সে শ্রীতাড়াতাড়িলাল মিশ্র, বিয়াকরণতীর্থে যাইবার মনস্থ করিয়াছেন। গুড। সিট ডাউন।"

মৈথিলী আর বাংলার লিপি একই। সেইজন্য পণ্ডিতজীর বাংলা পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। তুরন্ত শব্দটির হিন্দীতে অর্থ তাড়াতাড়ি। তাই তুরন্তলাল নামটা চিরকাল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের হাসির খোরাক জুটিয়ে এসেছে। চটুলা মালবিকা একদিন তাঁকে তুরন্তলাল নামটার মানে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল। দুষ্টু ছেলেরা তো চিরকাল বাইরে যাবার ছুটি নেবার সময় বলত — তুরন্ত ফিরে আসবো পণ্ডিতজী। শুনে ক্লাসসুদ্ধ সবাই হাসত, আর তিনি বেশ উত্তমমধ্যম প্রহার দিতেন তাদের। কিন্তু তিনি এখানে মনে মনে হাসেন ছাত্রীদের এই সমস্ত রসিকতায়। বাঙালী মেয়েদের সূক্ষ্ম মনের অন্ধিসন্ধি-গুলোর সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের সীমা নেই। বোর্ডের লেখাটি নিশ্চয়ই মালবিকার; হ্রস্ব ইকারটা রেফের মত করে লেখা। সেই জন্যই ক্লাস থেকে পালিয়েছে। শব্দবিন্যাসে কিন্তু বেশ রসনিপুণতা আছে। সারা ক্লাস থেকে একটা চাপা হাসির শব্দ কানে আসছে। মেয়েরা জানে যে, হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলতে হবে ভয়ে, পণ্ডিতজী কোনদিন নালিশ করতে যাবেন না তাঁর কাছে। তাই তাদের এত সাহস। মেয়েরা যে সব বোঝে। তারা যে সবসময় বলাবলি করে, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় পণ্ডিতজী অন্য শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে চোখ বুজে আড়ষ্ট হয়ে কেমন করে বসেছিলেন। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে, ক্লাসের ছাত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এ নিয়ে যে তারা কত সময় হাসিঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে।

পণ্ডিতজী ঝাড়ন দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করে নিয়ে লিখলেন—সঃ তৌ তে। "তে বহুবচন, তে মানে ওরা। তে শব্দটির সঙ্গে ইংরাজী they শব্দটির কিরকম মিল লক্ষ্য করেছ লিলি?" তিনি ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে মুখ করেই বলছেন। 'তে'র জায়গায় গিয়ে খড়িসুদ্ধ হাত থেমে গিয়েছে।... সেই সতীসাধ্বী মরবার আগের উক্তিতে বহুবচন ব্যবহার করলেন কেন? 'ওরা কি ওই চায়।' 'ওরা' বলতে তিনি কি বুঝে-ছিলেন? নিজের স্বামীর কথাই কি তিনি তখন ভাবছিলেন? 'ওরা' বলতে সমগ্র পুরুষ জাতিকে তিনি বোঝেন তো? তা' কি করে হবে। ওরূপ সামান্যীকরণ যে ভুল, সে-কথা নিশ্চয়ই তাঁর শালাজও জানতেন। তাঁর জানাশোনা আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই কত নিষ্ঠাবান সংযমী পণ্ডিত তিনি দেখে-ছিলেন। সকলে সেরকম হতে যাবে কেন। স্বামীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্যের তীব্রতা বয়স্কা ননদের সম্মুখের কমাবার জন্যই কি তিনি অনিচ্ছায় একবচনের বদলে বহুবচন ব্যবহার করেছিলেন? নিজের স্বামীর সম্বধেই বা ওরকম ধারণা হল কেন সে পতিব্রতার? কি ভেবে সে মহিলা 'ওরা' বলেছিলেন তিনিই জানেন। দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।...আচ্ছা এই ক্লাসের ছাত্রীরা তাঁকে আর মৌলবী সাহেবকে, একই শ্রেণীর লোক বলে ভাবে নাকি? ব্ল্যাক-বোর্ডের উপরকার লেখাটা দেখে ত তাই মনে হয়? কেন এরকম ভাবে?...কি দেখে তাঁকেও ওই দলে ফেলল?...

স্কুলের দাই চিঠি নিয়ে ক্লাসে এসে ঢুকল। খামে চিঠি এসেছে পণ্ডিতজীর। ডাকপিয়ন হেডমিস্ট্রেসের কাছে স্কুলের

ডাক দিয়ে যায়, তিনি তারপর যায় যায় চিঠি তার তার কাছে পাঠিয়ে দেন। দাই-এর হাত থেকে চিঠিখানা নেবার সময় খুব সাবধানে নিলেন পণ্ডিতজী, যাতে দাই-এর আঙুলের সঙ্গে তাঁর আঙুল না ঠেকে। এসব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি সদা-জাগ্রত। কিন্তু আজ প্রথম খটকা লাগল মনে। প্রশ্ন করলেন নিজেকে—পরস্ত্রীর ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবার জন্য এই এত শুচিবাই কেন?... কেন স্ত্রীলোকদের সম্মুখে সহজ ব্যবহার করতে পারেন না তিনি?

পণ্ডিতজী চিঠিখানা খুললেন। বড় শালা লিখেছেন তাঁর দিদিকে। এদেশে স্ত্রীর চিঠি স্বামীর নামেই আসে, তাই খামের উপর তাঁর নাম ছিল। ছোট শালার বিয়ে এক সপ্তাহ পরে; তাই বোন আর ভগ্নীপতিকে যেতে লিখেছেন। ছোট শালা কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হচ্ছিল না; অতি কষ্টে ধরেবেঁধে রাজী করান গিয়েছে।

চিঠি পড়েই কি জানি কেন পণ্ডিতজীর মেজাজ বিগড়ে গেল ছোট শালার উপর।... দুই মাসও কাটেনি। সবুর সইছে না! আর কিছুদিন পর করলেই তবু কতকটা শোভন হত!...

"লিলি, বুঝেছ—তে হচ্ছে বহুবচন। সাধারণত অনেক লোককে বোঝায়। কিন্তু বলতো একজন লোকের বেলায় কখন বহু-বচন ব্যবহার হয়? জান না? নেক্‌সট্! নেক্‌সট্! এনিবডি ইন দি ক্লাস? কেউ জান না?...(মালবিকা থাকলে পারত)...। গৌরবে বহুবচন হয় কেউ জান না? স্ত্রীর উক্তিতে পতির সম্বন্ধে উল্লেখের সময়, সম্মানার্থে বহুবচনের ব্যবহার হতে পারে। বুঝেছ?"

পণ্ডিতজী ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন—'গৌরবে বহুবচন।' লেখাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, নিজের বিবেককে আশ্বাস দেবার জন্য। এতক্ষণে তাঁর ক্লাসের দিকে মুখ ফেরাবার সময় হল। নজর পড়ল লিলির দিকে। কাঁদছে তাঁর বকুনি খেয়ে। ছেলেরা বিলক্ষণ প্রহার খেয়েও কাঁদত না, কিন্তু সামান্য কথাতেই মেয়েদের চোখে জল আসে। তিনি এমন কিছু রূঢ় ভর্ৎসনা করেননি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে কেঁদে ভাসাতে হবে!

"ললিতা, এবার তুমি বলো। সন্ধি। খুব সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তোমাকে। মধু-উৎসবঃ কি হয়? বানান করে বলো। গুড্। হ্যাঁ, দীর্ঘ উকার, মনে করে রেখো। সমাস কর—দ্বিতীয়া ভার্যা যস্য সঃ। হ্যাঁ। গুড্। সিট ডাউন। নেক্‌সট্। গায়ত্রী। তুমি ভ্রম সংশোধন কর এই বাক্যটির—ভ্রমরাঃ পুষ্পমধু পিবতুম ধাবন্তি। কি ভেবে বলো। হল না। এনিবডি ইন দি ক্লাস; কেউ পার না?...(মালবিকা এখনও ফেরেনি)!... পিবতুম ভুল। পাতুম হবে। মনে করে রেখো।"

...আজকে মালবিকাকে বেশ করে বকে দিতে হবে। একি অন্যায় কথা! গিয়েছে, সে কি এখন! সমস্ত ঘণ্টাটা বাইরে কাটিয়ে সে আসবে। প্রতিদিন সে এই করে! নাই দিয়ে মাথায় চড়েছে। এতটুকু আক্কেল নেই—অন্য মেয়েদেরও তো ঐ পাসখানা নেবার দরকার হতে পারে!

মেয়েরা সকলেই জানে যে, পণ্ডিতজীর সবচেয়ে কড়া ধমক হচ্ছে 'ব্যাড' শব্দটি। মালবিকা এসে ঘরে ঢুকল। তার মানে ঘণ্টা শেষ হবার আর দু-চার মিনিট মাত্র দেরী আছে। পাসখানা পণ্ডিতজীর টেবিলের উপর রাখবার জন্য সে এগিয়ে আসছে। তেলের গন্ধটা নাকে এল।... শোভনঃ—গন্ধ শোভনোগন্ধ। পায়ের আঙুলের নখ কাটে না কেন?

"অনেক দেরী হল তোমার।"

"আমি তো পণ্ডিতজী পরীক্ষা দিয়ে, বিয়াকরণ সামাসার উচ্চারণ শিখে, তারপর গিয়েছি।"

...মেয়েটি এমন সব কথা বলবে যে, না হেসে উপায় নেই। বড় বড় পাকা গোঁফের মধ্যে হাসিটুকু আটকে গেল। ক্লাসের মেয়েরাও হাসছে। পণ্ডিতজী হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললেন—"ক্লাস ফাঁকি দেবার শাস্তি হিসাবে তোমাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।"

'উচ্চারণের পরীক্ষা নাকি পণ্ডিতজী?'

অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বলেন— "না না। তুমি বলতো বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়?"

এত সহজ প্রশ্ন? মালবিকার মত ক্লাসে ফার্স্ট-হওয়া মেয়েকে? ক্লাসের মেয়েরা একটু অবাক হল।

"বিম্বোষ্ঠী, বিম্বোষ্ঠা দুই-ই হয়।"

এতক্ষণে পণ্ডিতজী নিজেকে সামলে নিলেন। গুড, সিট ডাউন, বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি। মালবিকা ফিরে আসবার এক মুহূর্ত আগেই যে উনি ঠিক করেছিলেন, আসামাত্র আগেই ওকে কড়া ধমক দিতে হবে—ব্যাড বলতে হবে। মুহূর্তের অসংযতচিত্ততায় তিনি ব্যাড বলতে ভুলে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়। আজ প্রথম এই স্কুলে বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন। ক্লাসের মেয়েরা কি তাঁর এই বিচ্যুতির কথা ধরতে পেরেছে? আতঙ্ক, বিষাদ, আর অনু-শোচনার ছায়া পড়ল তাঁর মনে। মনের কুহেলীর মধ্যে শুধু একটা জিনিস তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। 'ওরা' শব্দের অর্থ। ভদ্রমহিলা কাউকে বাদ দেননি। পক্ককেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পর্যন্ত না। অদ্ভুত অর্থবোধিকা শক্তি কথা কয়টির। বৃথাই তিনি গত দুই মাস থেকে একটি অবাধ্-বিবরকে লঘু করবার চেষ্টা করছিলেন, গৌরবে বহুবচন সূত্র দিয়ে। বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিলেন না। আত্মপ্রবঞ্চনাকে নিয়ে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা 'গৌরবে বহুবচন' কথা কয়টি মুছে দিলেন। মনের মধ্যে এতদিন-কার গোপা, আত্মগৌরবটুকুও মুছে গে[ল] এরই সঙ্গে।

"এসব তোমাদের দরকার নেই, বুঝলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসব প্র[শ্ন] কখনও আসে না।"

ঘণ্টা পড়ল, ক্লাস শেষ হবার। খ[ড়ি] গুঁড়ো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার ছ[লে] নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে দৃ[ষ্টি] নিবদ্ধ করে তিনি ক্লাস থেকে বেরি[য়ে] গেলেন।

ব্যাকরণের সমস্যাটা মিটেছে; বি অঙ্কের উত্তর মিলে যাবার পরিতৃপ্তি এর মধ্যে। নিজের উপর অপ্রসন্নতায় কিছু খারাপ লাগছে। সবাই সমান—মি মৌলবীসাহেব, ছোট শালা—সবাই।...প ঔৎসুক্যম—পত্তাবোৎসুক্যম...। শোভন ব রণের পথ দিয়ে তিনি মাটির দিকে তা বিশ্রাম-ঘরের দিকে চলেছেন। আকুল-আকৃষ্টঃ। সহস্র জোড়া কুতূহলী নিশ্চয়ই তাঁকে লক্ষ্য করছে,—চিনে নি সবাই তাঁকে—বিবস্ত্র, নগ্ন তিনি আ লজ্জার ভারে ঝুঁকে পড়েছেন—ঢুকবার আগে চৌকাঠে হোঁচট খেলেন।

টেবিলের উপর মৌলবী সাহেবের দুটো নড়ছে, অবিরাম গতিতে। এর জন্য টেবিলের উপর একখনা বই পর্যন্ত রাখ জো নেই।—পুস্তক হলেন সা সরস্বতী। এই বকধার্মিক বলা লোকটা চোখদুটোও খুলে রাখত পা দোলানর তাহলে আর তাঁর কানে পইতা জ অবস্থায় ক্লাসে যেতে হত না আজ।

"ও মৌলবী সাহেব, ঘুমিয়ে না একটা কথা বলছি—এতদিন বলি বলি ব বলিনি—কিছু মনে করবেন না। অ যদি আবার বিবাহ করেন, তাহলে মিস্ট্রেস আর স্কুল-কমিটির মেম্বররা হবেন।"

মৌলবী সাহেব চোখ বোঁজা অবস্থ ছড়া আওড়ালেন—"জো গুল কি জে হ্যায়, উসে কেয়া খার কা খটকা গোলাপ তুলতে চায় তার কি কখনও ভয় করলে চলে?"

...বলা বৃথা লোকটাকে।...অ লঘুম করোতি—লঘূ-করোতি। ঘ-এ উ হবে, বুঝলে মালবিকা।... আজকের চিঠিখানির কথা স্ত্রীর কাছে গেলে কেমন হয়? পোস্ট অফিসে চিঠিই তো হারিয়ে যায়। তাহলে তাঁবে যেতে হয় না ছোট শালার বিয়েতে।.. মেয়েমানুষদের চোখে ধুলো দেও অত সহজ! তারা যে সব ধরে ফেলে যে পুরুষদের মনের ভিতরটা দেখতে পায়।...কোন উপায় নেই তিনি চেষ্টা করে দেখবেন আজ। প্রথম জেনেশুনে মিথ্যাচার করা কিন্তু সত্যিই কি বকধার্মিকের এই মিথ্যাচার?

সতীনাথ ভাদুড়ী

আশা দেবী

জ্যাক লন্ডনের অপূর্ব রচনার ভিত্তি তাঁর বিচিত্র জীবন থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার ঐশ্বর্য। ডিকেন্সের লন্ডনের অভিজ্ঞতা এবং ওখানকার মানুষ সম্পর্কে অদ্ভুত উপলব্ধি তাঁর সাহিত্যের প্রাণ। সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখায়ও তেমনি একটি অপূর্ব বাস্তবতার ছাপ এবং অভূতপূর্ব উপলব্ধির স্পর্শ পাওয়া যায়। বিহারের গ্রাম, তার সাদা-মাঠা মানুষগুলো তার জলা-জঙ্গল, উষর অনুর্বর খোয়াফেলা রাঙা পথ: তার ফুলে ভরা অড়হড়ের ক্ষেত যেন তাঁর লেখাতে একটি নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। বিচিত্র চরিত্রের খ্যাতিমান স্রষ্টা হিসেবে তাকে বলা হতো "Diekens is London himself". আর সতীনাথকে বলা যায় বিহারের লেখনী-চিত্রকর। তিনি ঢোঁড়াই চরিত মানস ১ম ও ২য় খন্ড লিখে তার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেছেন।

'জাগরী' তাঁর বাংলা সাহিত্যে প্রথম পদক্ষেপ। একটি উপন্যাস লিখেই তিনি পাঠকের মন জয় করে ফেললেন—"এই এক উপন্যাসেই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছেন"—বলেছেন স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। বস্তুত যে কজন সৌভাগ্যবান লেখক একটি উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন সতীনাথ তাঁদের মধ্যে একজন।

রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিজীবনের মানবতাবাদে অনুপ্রাণিত সতীনাথ তাঁর 'জাগরী'কে সুরু করেছেন ফাঁসির সেল—আসামী বিলু। তার মন, তার সেই সময়ের চিন্তা এবং মানসিক অস্থিরতাকে সুনিপুণ মনস্তাত্ত্বিকতা দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। আবার আপার ডিভিসন ওয়ার্ড-এ বাবার শান্ত সংযত অথচ স্নেহ-প্রবণ পিতৃহৃদয়ের মর্মবাণী অসাধারণ সহানুভূতি দিয়ে এঁকেছেন। অন্যদিকে স্নেহময়ী মার ফাঁসির আসামী পুত্রের জন্য অস্থিরতা। অবশ্য মায়ের মন তার স্নেহ-কোমলতাকে যেন চোখের জলের তুলি দিয়ে আঁকা জীবন্ত ছবি—আওরাং—কিতা।

অগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় জেলে মহিলা বিভাগের একটি নিপুণ ছবিও পাওয়া যায় এই সঙ্গে। আর পাওয়া যায় ভাই হয়ে ভাইকে ধরিয়ে দেওয়ার: তারপর তার চলেছে অস্থির অপেক্ষা দাদার মৃতদেহ নেবার জন্যে। শেষে ফাঁসির আসামী বিলুর সরকারী আদেশে ফাঁসি রদ হয়ে যাওয়ার আনন্দময় পরিসমাপ্তি। নীলু বিলুর চরিত্র বোধ করি তিনি ছাড়া এমন করে আর কেউ আঁকতে পারতেন না। 'জাগরী'র মাধ্যমে আমরা এমন একটি মানুষের পরিচয় পাই যাঁর বুদ্ধিতে এবং চিন্তায় ক্ষুরধার দীপ্তি, পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ, পরিশীলিত মন, সদা-জাগ্রত শিল্পদৃষ্টি এবং স্নেহপ্রবণতায় ভরা একটি সরলতা—যিনি তাঁর লেখার মতোই মধুর।

সুন্দর এবং কল্যাণের স্রষ্টা সতীনাথের ব্যক্তিসত্তা ঔপন্যাসিকের চেয়ে স্বতন্ত্র। তাঁর ছোটগল্পে সাধারণতঃ দুই ধরনের গল্প পাওয়া যায়। এক ধরনের গল্পে তাঁর মানুষ-চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং মনস্তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্য ধরনের গল্পে পাওয়া যায় জীবনের অনাবিল হাস্যরসের স্বাদ। এই হাসি অশ্রুর যুক্তবেণী রচনা করে সতীনাথ তাঁর গল্পে অপূর্ব মর্মাস্বিতার দুর্লভ পরিচয় দিয়েছেন।

'মহিলা ইনচার্য' গল্পটিতে লেখক বলতে চেয়েছেন নাটোয়ারলালের স্ত্রীলোক-দের ওপর প্রভাব অসামান্য, মেয়েমহলে প্রতিপত্তির জন্য সে সর্বজনঈর্ষিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের, স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হলো। মহিলা-ইন-চার্জ নাটোয়ারলালের চরিত্র আঁকতে গিয়ে মানুষের চরিত্রের একটি চরম দুর্বলতার পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন। যাকে সাঁওতাল যুবতী থেকে আরম্ভ করে সবাই বিশ্বাস করে—যার কর্তৃত্ব সবাই মেনে নেয়, তাকেও নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালাতে হয়—জীবনের এ এক চরম প্রহসন।

'স্বর্গের-স্বাদ' গল্পে অপালাকে নিয়ে অত্রির যন্ত্রণা 'মা মরা অভিমানিনী মেয়েটিকে' নিয়েই তার যত দুশ্চিন্তা নিজের দারিদ্র্যের জন্য তিনি ভাবেন না আর কতদিনই বা বাঁচবেন! কিন্তু মেয়েটির সারা জীবন যে এখনও সামনে পড়ে। অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন: বিয়ের পর দিন কয়েকের জন্য অপালা পতিগৃহেও গিয়েছিল: কিন্তু একটা ত্বকরোগের জন্য তার দেহ সম্পূর্ণ নির্লোম হয়ে যাওয়ায় স্বামী তার সঙ্গে ঘর করতে অস্বীকার করে সেই থেকে সে পিতার কাছেই আশ্রিতা। পতি পরিত্যক্তা বলে পাড়ার মেয়েরা তাকে বিদ্রূপ করে এবং কুলক্ষণা বলে। বৃদ্ধ পিতা অত্রি অন্তরালে অশ্রুমোচন করেন।

গঙ্গুর বাড়ী যজ্ঞ। বিরাট আয়োজন। অত্রির ভোজবাড়ী থেকে নড়বার উপায় নেই। অপালাকে সেখানে দেখে সবাই বাক্যবাণে বিদ্ধ করছে। উপহাস করছে লোভী বলে। অপালার চোখ ফেটে জল আসছে। সহ্য করতে না পেরে হারা-উদ্দেশ্যে সে যজ্ঞবাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ভয়ডর অপালার চিরদিনই কম। রাত্রিতে একলা চলাফেরা করবার অভ্যাস তার আছে। সবরকম শিক্ষাই সে পেয়েছে অল্পবয়স থেকে। অত্রি সযত্নে মেয়েকে ধনুর্বিদ্যা ও অসি চালনা শিখিয়েছেন।

অপালা বেদনায় নিবিড় অরণ্য-পথে এগিয়ে চললো। মনে তার তখন আগুন জ্বলছে। নিজের ওপর তার জেগেছে চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা আর ধিক্কার। পথশ্রমে ক্লান্ত অপালা ভূমিতে এলিয়ে পড়লো এক সময়। আকাশে তারার দীপালি ইন্দ্রের সহস্র লোচনের মত তার দিকে যেন তাকিয়ে

রয়েছে। পড়ে থাকা কয়েকটা সোমপত্র কুড়িয়ে নিয়ে পথের শ্রান্তি দূর করবার জন্য সে চিবুতে লাগলো। অপালা চর্বণে মনোনিবেশ করতেই মথিত সোমের আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে সশরীরে সম্মুখে আবির্ভূত হলেন সহস্রাক্ষ পুরোহুত। ইন্দ্র অপালার অধর থেকে দন্ত-স্পৃষ্ট সোমলতার রস পান করলেন, বিনিময়ে অপালা লাভ করলেন নীরোগ দেহ, অপূর্ব রূপ, বহুমূল্য আভরণ ও রত্নালঙ্কার, পিতার ইন্দ্রলুপ্তে কেশদাম এবং পৈতৃক অনুর্বর ক্ষেত্রে অপরিমিত শস্যসম্ভার।

ঋগ্বেদ, অষ্টমমণ্ডলে ব্রহ্মবাদিনী অপালার যে কাহিনীটি আছে, সেইটি অবলম্বনে এই গল্প। কিন্তু বৈদিক যুগের পটভূমিকায় রচনায়, তার খুঁটিনাটি বর্ণনায় গণ্ডগ্রামের গৃহে ইন্দ্রযজ্ঞের সুনিপুণ পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং অপালা ও ইন্দ্রের সাক্ষাৎকারের উপস্থাপনে গল্পটি লেখকের শক্তি ও অধীতির এক চমকপ্রদ সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা সাহিত্যে বৈদিক যুগভিত্তিক এই জাতীয় দ্বিতীয় গল্প আছে কিনা সন্দেহ।

'পদাঙ্কে' ডাঃ বোসের ট্র্যাজেডি—বিদেশিনী স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধবয়স্য তরুণী ভার্যা রেবাকে গ্রহণ করে জীবনে তার অসাচ্ছন্দ। রেবাও কোনমতে স্বামীর মনের মত স্ত্রী হতে পারছে না। স্বামীকে সে ভয় করে—সমীহ করে কিন্তু সমকক্ষ হয়ে ভালোবাসতে পারে না। সে বেশ বুঝতে পারছে সে স্বামীর মন থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। শেষে একদিন মরিয়া হয়ে সমস্ত হীনমন্যকে পরিহার করে পূর্বস্ত্রী এর্মিলির পোষাকে তার সমকক্ষ হয়ে স্বামীর প্রেমের অধিকারী হয়েছে সে। আবার 'দাম্পত্য-সীমান্তে' গল্পে অসীমার জীবনের যন্ত্রণার আর একটি দিক দেখানো হয়েছে। লম্পট, মাতাল, চোরাকারবারী স্বামী নিজে অন্যায় করে অন্যায়ের বোঝা অনায়াসে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। স্ত্রী প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্যই কখনও পালন করে না, শুধু বিপদে পড়ে আত্মরক্ষার সময় মিথ্যে বলে নিরাপরাধকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে সাহায্য করবে, অসীমা এ অন্যায় কিছুতেই মেনে নেয়নি সে তীব্র প্রতিবাদ করেছে। আর এই প্রতিবাদের পরিসমাপ্তি শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সংসারের খুঁটিনাটি দেখবার নিপুণ বীক্ষাশক্তি এবং সহজাত শিল্পী মন ছিল সতীনাথের। তিনি তাঁর চারপাশের মানুষকে দেখেছেন, ভালোবেসেছেন নিবিড়-ভাবে—আর তাদের নিয়েই তার অপূর্ব সাহিত্যের সম্ভার সাজিয়ে তুলেছেন।

এক একটি গল্পে সতীনাথ এক অদ্ভুত রহস্যলোক সৃষ্টি করেছেন। এই গল্পগুলো যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজাজে অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে পৌঁছে গেছে, এদের বলতে পারা যায় স্বতন্ত্র স্বাদের রচনা। "রোগী" এই জাতের একটি গল্প। 'ন্যাচুরোপ্যাথ' ডক্টর সান্ডিল্যের দোকানে উপস্থিত হলেন এক অদ্ভুত রোগী। স্বাস্থ্য-বান, বিপুলকায় এক রাজপুত ভদ্রলোক। সারাটা জীবন ধরে বারে বারে তাকে সাপে কামড়ে চলেছে, অন্ততঃ সাতবার কামড়েছে, কিন্তু কোনোবার সর্পদংশনের বিষ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছোয়নি। আর ভদ্রলোকের দুটি পা যেন জলেপুড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। ডাক্তার তার কাহিনী পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন কিনা সন্দেহ, রোগীর সান্ত্বনার জন্যেই হয়তো একটা প্রেসক্রিপসানও করে দিলেন, তারপরে—রোগী চলে যেতে আবিষ্কার করলেন, তাঁর দোরগোড়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বিশাল এক ঢেমনা (দাঁড়াশ) সাপ।

এই সাপ কি নিতান্তই কাকতালীয়? সর্পভীত মানুষটি কি নিরোসিসে ভুগছে? তাহলে এই সাপের আবির্ভাব কেন? এ যেন কোনো একটা নিষ্ঠুর নিয়তি—একটা অলক্ষ্য অভিশাপ, শেষ সর্পাঘাত না হওয়া পর্যন্ত লোকটির বুঝি এই অভিসম্পাতের কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই।

এসব গল্পে অলৌকিকতার আমেজ আছেই। এর চেয়েও বিস্ময়কর গল্প "রহস্য"।

দোলগোবিন্দ চৌধুরীর মেয়েটির নাম 'ঘড়ি'। মেয়েটির একটা বিচিত্র স্নায়বিক ব্যাধি আছে—মাকড়শা দেখলেই তার ফিট হয়ে যায়। সেই সঙ্গে একটি অলৌকিক শক্তিও রয়েছে তার। বাড়ীতে যে পুরোনো আমলের বড় বিদেশী ঘড়িটা রয়েছে তার সঙ্গে যেন তার এক অদ্ভুত আত্মিক যোগ। এই ঘড়িটাকে সে ভালোবাসে। শুধু তাই নয়—এর ফলে সে পেয়েছে এক অসামান্য শক্তি—ঘড়ি না দেখেই নির্ভুলভাবে সময় বলে দিতে পারে। কিন্তু যেদিন ঘড়ির মধ্যে মাকড়শার জাল জমে সেটি বন্ধ হয়ে গেল, সেইদিন থেকে মেয়েটিও তার তৃতীয় দৃষ্টি হারিয়ে ফেললো।

কী বলা যায় একে? সাইকিক ফোর্স? কিন্তু গল্পের স্বাদ অনেকটা ন্যাথানিয়াল হথর্নের লেখার মতো—ঠিক সেই রকম একটা অস্বস্তিই নিয়ে আসে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর হাসির গল্পের মধ্যে অট্টহাস্যের অবকাশ নেই। কিন্তু মানব চরিত্রের আতিশয্যের ওপর রং তুলি বুলিয়ে এক একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। এসব গল্প কখনও মনকে মৃদু ব্যঙ্গে উচ্ছ্বসিত করে, কখনও প্রসন্ন কৌতুক বিচ্ছুরিত হয়ে যায়। 'বমি-কপালিয়া' গল্পে পিল্টু বোসের খোকা প্রথমবার গাড়ীর সিটে বমি করে তার টেনিস টুর্নামেন্টে সেমি-ফাইনাল খেলায় প্রথমবার জিতিয়ে দিলো। কিন্তু শেষবারে সে হাজার চেষ্টাতেও আর গাড়ীর সিটে বমি করলো না কাজেই হার হলো পিল্টু বোসের। পরিশেষে আবার পরাজিত পিতৃ-দেবকে পার্টিতে যাওয়ার লজ্জা-অপমানের হাত থেকে বমি করে বাঁচিয়ে দিলো সে। ব্যাপারটা কিছুই নয় কিন্তু সহজ কৌতুকে রস সৃষ্টি করবার ক্ষমতা লেখকের অসাধারণ।

'এক ঘণ্টার রাজা' এবং 'চরণদাস এম-এল-এ' লোকচরিত্র নিয়ে ব্যঙ্গের আর এক দিক। একদা ইনকাম ট্যাক্সের বড়-বাবু হরিশ আজ পেনসন নিয়ে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপে পরিণত। যারা একদিন তাঁর বাড়ীতে ধর্না দিয়ে কৃতার্থ হত, আজ তারা ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু তিনি এখনো চাকরিতে আছেন—এই ভ্রান্তিবশতঃ দুর্বিনীত উদ্ধত ঘাট মালিক হরিশবাবুকে যে নাটকীয় সম্মান দেখালেন—সেই তাঁর 'এক ঘণ্টার রাজত্ব'—চরণদাস এম-এল-এ—বিহারী জনগণের ভাষায় মাননীয় 'ইয়ে-মিলিয়ে সাহাব'—ফলে দুর্দান্ত তার মেজাজ। সরকারী সেনসার অফিসার মৌলভী সাহেব নিজের কর্তব্য করতে চেয়েছিলেন বলে চরণদাস প্রায় তাঁকে তেড়ে মারতে যান। অথচ সেই মৌলভী সাহেব যখন লোক-গণনা করতে গিয়ে তাঁর গুরু স্বামী সহস্রানন্দজীকে গণনা করে ফেললেন—তখন চরণদাসকে গিয়ে মৌলভী সাহেবের পা জড়িয়ে ধরতে হয়। গুরুদেবের নামটি লোকের মধ্য থেকে মেহেরবাণী করে কেটে দিতেই হবে, কারণ গুরু তো মানুষ নয়—দেবতা।

জীবনের সামান্য জিনিষকে অসামান্য করে তোলাই সার্থক শিল্পীর কাজ। এ কাজে সতীনাথ সিদ্ধহস্ত। ঘাসের আগায় শিশিরবিন্দু দেখবার চোখ সকলের থাকে না—কারু কারু থাকে। যাঁর থাকে তিনি জাত-সাহিত্যিক। মাত্র ৫৮ বছর বয়েসে—এ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল—এটা বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি।

রাঢ়ের জীবন-শিল্পসাহিত্যের রূপ-রেখায় রূপায়িত করার জন্য যদি তারা-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আঞ্চলিক সাহিত্যিক বলা যায়—সেই অর্থে সতীনাথও আঞ্চলিক সাহিত্যিক—তাঁর লেখায় রেখায় রেখায় বিহারের গ্রাম—নগর—আর মানুষগুলো যেন কথা বলে উঠেছে।

ক্ষণিক সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী হয়না কেন?

ঘন ঘন মাথা ঘষে আর গরম হাওয়ায় চুল শুকিয়ে বার বার ল্যাকার লাগিয়ে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে অনেকেই ব্যস্ত। এতে কিছুদিন আপনি অনেকের মুগ্ধ প্রশংসা অর্জন করবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্রমেই আপনার চুল তা'র সহজাত সাবলীলতা হারিয়ে ম্লান হয়ে উঠবে। এ সর্বনাশা পথ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। চুলের সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে হলে নিষ্ঠার সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি সহজ নিয়ম আপনাকে মানতেই হবে।

১ প্রতিদিন অন্ততঃ দু'বার ভাল করে চুল আঁচড়ানো

২ ভিজে চুল না বাঁধা

৩ স্নানের আগে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট জবাকুসুম তেল মালিশ করা

৪ সপ্তাহে মাত্র একদিন মাথা ঘষা

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KALPANA J.K.

হরিবিলাস সর্দার বিবাহসংক্রান্ত বিলটা কতদিন হইল পাশ হইয়াছে বলুন তো?... আপনি যে আঙুলে গুণিতে বসিয়া গেলেন! না, অত মাস তারিখ ধরিয়া হিসাবে দরকার নাই। মোটামুটি ছয় সাত বছর হইল, না?

তাহা হইলে আমার নায়িকা সোনিয়ার বয়স আঠারর কিছু বেশি, আর নায়ক মিঠুয়ার বয়স সম্ভবত পনেরো, দু'এক মাস কমই হইবে, বেশি তো নয়ই।

সোনিয়ার বাপের বাড়ি বিহারের একটি শহরের উপান্তে, শহরের ক্ষীণ আলো আর পাড়াগাঁয়ের অন্ধকারের সন্ধিস্থলে আর কি? বাপ প্রথমটা সর্দা অ্যাক্টের গোল-যোগটা অতটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না, শহরে ও রকম কত ঢেউ উঠিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। যখন ঢেউটা মিলাইয়া না গিয়া সত্যই দেশটাকে তোড়পাড় করিয়া তুলিল, তখন সে চিন্তিত না হইয়া পারিল না। ছেলের বাজার তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে, পাওয়াই দুষ্কর। অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া প্রায় ক্রোশ ছয়েক দূরে একটি নিভৃত পল্লীতে মিঠুয়ার সন্ধান পাওয়া গেল। তখন তাহার উচ্চতা সওয়া গজ আন্দাজ, সোনিয়ার চেয়ে ঠিক এক মুঠার উপর দুই আঙুলে বড়। বিবাহ হইয়া গেল।

মধ্যের এই ছয় সাত বৎসরের ইতিহাস বাদই দেওয়া যাক। কোনও রোমান্সের খোরাক নাই, নায়ক-নায়িকার মধ্যে কুল্যে দেখা সাক্ষাতের যো নাই তো রোমান্স! আপনাদের অত সহজে থামানো যাইবে না, জানি। জিজ্ঞাসা করিবেন অন্তরালের—অদর্শনের রোমান্স!......মিঠুয়ার তরফে যে কিছুই নাই, এ কথা বেশ নিঃসংশয়ে বলা চলে। ছেলেটা হাঁদা গোছের, খানিকটা বড় হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। নিয়মিতভাবে খাওয়া-দাওয়া, গরু-মহিষ চরানো আর ক্ষেতে ফসল তোলার বাহিরেও যে একটা দুনিয়া আছে, সে সম্বন্ধে তাহার অত খোঁজ-খবর নাই। তাহার 'মনোভাব' নামক জিনিসটাই গজায় নাই, সেক্ষেত্রে সোনিয়া সম্বন্ধে তাহার মনোভাবটা কি সে কথাই উঠে না। এক কথায় বলা চলে ছোঁড়াটা 'মাথায় বাড়িয়াছে', কিন্তু মাথার ভিতরে বাড়ে নাই।

অবশ্য সোনিয়ার কথা একটু ভিন্ন। একে মেয়ে, তায় যত অল্পই হোক না, শহরের একটু গন্ধ আছে। তাহা ছাড়া বয়সেও তো সে মিঠুয়ার চেয়ে বড়। এর উপর যখন ধরা যায় তাহার স্বভাবটাও স্বামীর মত হাঁদাটে নয়, তখন তাহার মনের জটিলতা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না। ঘর-কন্নার কাজের অতিরিক্তও তাহার কাজ আছে। কাপড়টি ছোবানো, সাজিমাটি দিয়া ঘাটে বসিয়া চুলের গোছা ধোওয়া, শহরে মার সঙ্গে কিছু বেচাকেনা করিতে গেলে শহরের হাওয়া একটু লক্ষ্য করা, বাঙ্গালীদের 'বেটি-বহুরা', কিভাবে কপালে টিপটি পরে, এদেশীরা হাতে কি ধরণের মেহেদির নকসা তোলে, মণিবন্ধে, বাজুতে, কণ্ঠের নীচে কি ধরণের উল্কি আজকাল চলতি—এই সব। সুবিধা পাইলে—ধরুন, মা যখন কাহারও বাড়িতে ধানটা ঝাড়িয়া দিতেছে, কিংবা দালটা বাঁছিয়া দিতেছে—সে সম-বয়সীদের দলে ভিড়িয়াও যায়—অবশ্য তাহার অবস্থার মেয়ের পক্ষে যতটা ঘনিষ্ঠ-ভাবে ভিড়া সম্ভব। মোট কথা মিঠুয়া যেথ-হয় যে সময়টা মহিষের পিঠে শুইয়া মাঠের মাঝে অকাতরে নিদ্রা দিতেছে, কিংবা ঘাড়ি-নাটায়ের ঝগড়ায় মার খাইয়া কান্নার চোটে পাড়া মাথায় করিতেছে, তাহার পত্নী সোনিয়া তখন সম-বয়সীদের কাছে এমন সব সংবাদ শুনিতেছে, যাহা তাহাকে নিজের সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করিয়া তুলিতেছে।

'অবস্থা যখন এবম্প্রকার, মিঠুয়ার বাপ বুধন মড়র একদিন হঠাৎ আসিয়া বেহাই বাড়িতে উপস্থিত হইল। রৌদি মহতো নেশাপানি আনিয়া বেহাইকে অভ্যর্থনা করিল। বুধনের মেজাজটা একটু যেন বেশী রুক্ষ, বলিল, 'এ তো ভাল কথা নয় সমুধি (বেহাই), টাকা নেই টাকা নেই বলে মেয়ের দ্বিরাগমন করাচ্ছ না, ওদিকে আমার যে মুখ দেখানো ভার। বেটীর চালচলন শহুরে হয়ে উঠছে—সে-দেশ পর্যন্ত এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল, অথচ তোমার যেন হুঁশই নেই। কবে তোমার টাকা হবে, মেয়েকে কায়দা-মাফিক বিদায় করবে, সে ভরসায় থাকলে তো চলবে না। আমি আজ এসেছিলাম শহরের দিকে, ফিরে গিয়ে জ্যোৎখীজীর (জ্যোতিষীজীর) কাছ থেকে দিন দেখিয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি মেয়ে পাঠাবার যোগাড় কর!'

বেহাই বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিল। ক্ষেতে মকাইটা হইয়াছে ভাল এবার, ফসলটা উঠিলে মেয়েকে বিদায় করিবে। হাত এখন নিতান্তই খালি, পাওনাদারদের কয়েক মাস সুদ পর্যন্ত দিতে পারে নাই, সেদিকে একটি পয়সারও আশা নাই...'এখন পাঠালে কিছুই করতে পারব না। সব সাধ আহ্লাদই বাকী থেকে যাবে......নাও সমুধি, তুমি আজ যে মোটেই গেলাস তুলছ না......'

ছেলের বাপ রাজি হইল না,—ছেলের বাপই তো! অষ্টমবার গেলাসটা ভরিয়া বলিল—'মনে সুখই নেই তো গেলাস ভরা। তুমি মেয়েকে এক বস্ত্রে, খালি হাতে পাঠিয়ে দাও, আমার জোটে দেব পরতে, না জোটে ন্যাকড়া পরবে। আমি ইজ্জৎদার লোক, আমার ইজ্জৎ বজায় থাকলেই হল।......তবে আসল কথাটা বলতেই হল সমুধি, আজ শহর থেকে আসার পথে কনিয়াকে (বধূকে) সখীদের সঙ্গে যে রকম বেহায়াপনা করতে করতে আসতে দেখলাম, তাতে......।'

পেটে অনেকখানি গিয়েছে, রাগিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রৌদিও যোগদান করিল। খানিকটা অশ্রু বিসর্জন করিয়া কহিল—'কে কার বেটী, কে কার বাপ? সব রামজীর লীলা! তুমি নিয়ে যাও তোমার কনিয়াকে সমুধি।'

বুধন গেলাসটা শেষ করিয়া শান্তভাবে একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিল,—'না হয় থাকই তবে মকাই পাকা পর্যন্ত। তুমি ইজ্জৎদার

লোক, তোমার কথাটা ঠেকব?—আমার মন [illegible] না?'
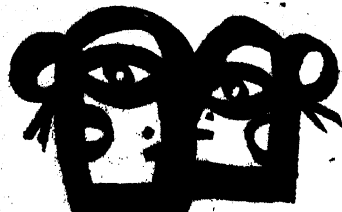
রৌদি তখন পাঠাইবার দিকেই ঝুঁকি-য়াছে, প্রবল বেগে হাত নাড়িয়া বলিল,—'না, না, সব আমার [illegible] সমুখি, যত শীগগির কাটানো যায় ততই মঙ্গল, বলে—

কহত কবীর শুনো রঘুনাথা

মায়াধার নরক পথ যাতা

—আমার নদী নরকেই নিয়ে যায়। নদীতে গা ভাসাতে চাই না।'

বুধন দুই হাঁটুর উপর হাতের কনুই দুইটা ন্যস্ত করিয়া বলিল, 'ঠিক বলেছ সমুখি—

অরে কৌন কিস্‌কা বেটা ভইয়া,
কৌন কিস্‌কা বাপ।
মায়াকা হও মুঠ্‌ঠি বানহে,
হাত পসারো—সাফ।

—কেই বা কার? মায়ার বশে হাত মুঠো করে ভাবছি—কি রত্নই না রয়েছে, খুলে দেখ—ফাঁকি......কাটিয়াতে আর আছে নাকি? দেখ তো। ......না থাকে দরকার নেই......এও একটা মায়াই বলতে হবে কিনা, যত এড়ানো যায় ততই ভাল।'

(২)

রৌদির বাড়িতে এই দার্শনিক বৈঠকের দুইদিন পরে মিঠুয়া বধূকে লইতে আসিল। মাথায় একটা গোলাপী চীনে সিল্কের টুপি, গায়ে সবুজ গেঞ্জির উপর একটা পাংলা পিরান, কোমরে হলুদ-ছোবানো কাপড়, হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মাথায় জবজবে করিয়া মাখা সরিষার তেল টুপির নীচের অংশটা ভিজাইয়া কয়েকটি ধারায় কপাল, গাল, ঘাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে—চোখে কাজল!

পথে এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনিয়াছিল, শ্বশুর বাড়ীর নিকট আসিয়া একটা কানে গুঁজিয়া দিয়া যথাসম্ভব শহুরে হইয়া লইল।

শ্বশুর-শাশুড়ি বাড়ি ছিল না। সোনিয়াকে তাহার দুই তিনজন সখী জোর করিয়া আনিয়া ঘরের ছ্যাঁচা বেড়ার আড়ালে দাঁড় করাইল—অবশ্য খুব যে জোর করিতে হইল, এমন নয়। বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া, নাক সিটকাইয়া সোনিয়া চাপা গলায় বলিল, 'ইস। কি ভারী মরদ রে আমার। ......আমি সোজা লোক? নিজে দেড় হাতের হলেও চার হাতের লাঠিই আমার!'

সবাই চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল।

একজন সখী বলিল, 'তুই তো ঐ বিড়ির মতই ওকে তোর কানে গুঁজে রাখবি সোনিয়া।'

অপর একজন বলিল, 'দেখিস, যেন বিড়ির মত ফুঁকে দিস নি তা বলে।'

আর একটা হাসির লহর উঠিল।

সব না বুঝিলেও বেড়ার আড়ালে যে একটা কিছু হইতেছে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া, মিঠুয়া সেটা বেশ বুঝিতে পারিল। নিজের পুরুষত্বটাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা গলা খাঁকারি দিয়া বাঁকিয়া চড়িয়া বসিল এবং তাহাতে আরও একটা কি মন্তব্যের সঙ্গে বেড়ার ও-ধারে প্রবলতর হাসির বেগ ওঠায় অসহায়ভাবে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

একটু যেন ভিতর হইতে ধাক্কা খাইয়া একটি মেয়ে একেবারে সামনে আসিয়া পড়িল। একটু থতমত খাইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুখে কাপড় দিয়া প্রশ্ন করিল, 'পহুনা (কুটুম), বেশ ভাল আছ তো?'

মিঠুয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল 'হুঁ'।

বলদ মহিষ সব কেমন আছে?' নিজেও হাসিয়া উঠিল, পাশেও দুই তিনটি কণ্ঠে হাসির শব্দ পাওয়া গেল। মিঠুয়া আরও ঘাড় গুঁজিয়া নিরুত্তর রহিল।

আর একটি মেয়ে দুইবার উঁকিঝুঁকি মারিয়া বাহিরে আসিল। অবশ্য এক ঝলক হাসিয়া আবার কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, 'আহা কচি ছেলে, দু'কোশ পথ হেঁটে এসে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গো। দুধ খেয়ে এসেছিলে পহুনা?'

মিঠুয়া তেলে-ঘামে একেবারে জবজবে হইয়া উঠিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া আড় চোখে দেখিল আর একটি বাহির হইয়া আসিল, একটু হাসিয়া বলিল, মুখ তোল তো পহুনা, ক'টি দাঁত হয়েছে দেখি। আহা, সত্যি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঘাড় তুলতে পারছে না।......আচ্ছা, ভাবনা নেই, যাবার সময় হেঁটে যেতে হবে না—মিতিনকে (সইকে) বলব কোলে করে নিয়ে......'

এমন সময় অপর একদিকে রৌদির গলায় আওয়াজ শোনা গেল। সে বাড়ি ছিল না, এই মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মেয়েরা যে যেখানে পারিল ছুট দিল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত রৌদির স্ত্রী এবং ভগ্নীও বাড়ি ফিরিল; পাড়ার বর্ষীয়সীদের ডাকিয়া রাত্ত বারোটা পর্যন্ত গান হইল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই সমস্ত ব্যাপার হইতেছে জানিয়া মিঠুয়া মেয়েগুলার হাতে খোয়ানো আত্মমর্যাদা আবার অনেকটা ফিরিয়া পাইল এবং রাতে দৈনন্দিন নেশা করিয়া শ্বশুর যখন তাহার চিবুক ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া অন্তত আর একটা দিনও থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন সে পূর্ণলব্ধ আত্মমর্যাদার [illegible] কোন ক্রমেই রাজি হইল না।

[illegible] বিকালে সাজগোজ করিয়া [illegible] দেওয়া একজোড়া রঙিন [illegible] উড়ানিটা কাঁধে ফেলিয়া সে [illegible] পুরুষের তেজে বউকে লইয়া বিদায় [illegible]।

[illegible]য়া যাইবে না বলিয়া বাড়ির মধ্যে খুব একচোট কান্নাকাটি, ওজর-আপত্তি করিল, চৌকাঠের বাহিরে [illegible] আর একচোট ধস্তাধস্তি করিল, [illegible] পর [illegible] একটানা কান্নার সুরে [illegible] হইল। মা, পিসি, পাড়ার [illegible] আর সখীরা কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামের প্রান্তে 'বড়হম্‌ দেওতার' (ব্রহ্মদেব) আস্তানা পর্যন্ত সঙ্গে গেল, তাহার পরে একবার গলা-জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়া সোনিয়াকে বিদায় দিয়া আস্তানার কদম-তলাটিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৩)

পথটা প্রায় পোয়াখানেক পর্যন্ত সোজা গিয়াছে। এটুকু সোনিয়া এমন ধীরে ধীরে চলিল যে, দুই তিনবার মিঠুয়াকে থামিয়া পড়িয়া তাহার অপেক্ষা করিতে হইল। আপত্তির যে-রকম নমুনা দেখিয়েছে, দূরত্ব বাড়াইয়া শেষকালে পলাইয়া যাইতেও পারে—শহুরে মেয়েকে বিশ্বাস নাই। মোড়টা ঘুরিয়া খানিকটা পরে কিন্তু তাহার যেন বোধ হইল, বধূর পদক্ষেপ একটু একটু করিয়া দ্রুত হইয়া উঠিতেছে। নূতন বধূ হইতে একটা ভব্য দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহাকেও গতিবেগটা বাড়াইয়া দিতে হইল। দেখিল, তাহাতেও নিস্তার নাই। তখন নির্জন রাস্তায় তাহার গা'টা যেন ছমছম করিতে লাগিল। —মেয়েটা ঘাড়ে পড়িবার দাখিল হইয়াছে, মতলবখানা কি?

হঠাৎ সোনিয়া চলিতে চলিতে থামিয়া গেল। মিঠুয়া অজ্ঞাতে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বধূর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মীয়া ভিন্ন এত বড় মেয়ের সহিত সে কখনও কথা কহে নাই, প্রবল অস্বস্তিতে পড়িয়া লাঠির মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে ঘোমটার মধ্যে থেকেই ফিস ফিস করিয়া প্রথম কথা ফুটিল, 'ইস্‌, দৌড়ানো হচ্ছে একেবারে!'

ইহা অতিমাত্রায় অপ্রত্যাশিত! মিঠুয়ার প্রথমটা কথাই যোগাইল না, একটু পরে জিভে ঠোঁট ভিজাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'বাঃ, তুমিই তো জোরে চলতে আরম্ভ করলে, আমি সে রকমভাবে চললে এগিয়েই যেতে!'

ঘোমটায় একটা ঝাঁকানি হইল, শব্দ বাহির হইল, 'গমার কাঁহাকে!' অর্থাৎ, গেঁয়ো কোথাকার!

মিঠুয়ার যাহা কিছু বুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, বধূর এরূপ সম্ভাষণে একেবারেই বিলুপ্ত প্রায় হইল। একটু পরে বলিল, 'বেশ, চল আস্তে আস্তেই!'

খানিকটা গেল। একটু পরে হঠাৎ পিছন ফিরিতে দেখিল—বধূর মাথায় ঘোমটা নাই, কখন খুলিয়া ফেলিয়াছে, সে সশংকভাবে মুখটা তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইল। ভাবিতে লাগিল—এ তো ভীষণ ফ্যাসাদে পড়া গেল, মাঝরাস্তায় কি করিয়া এই অভাবনীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পিছনে তাহার

জামার খ'ুটটা টান পড়িল। ফিরিয়া দেখিল, বধ্র মুখটা তাহার অন্তরের ভিতরেই অচঞ্চলভাবে আছে, তবুও তাহার আর সন্দেহ রহিল না যে, এ ঐ দুষ্টামিপনারই কাজ। প্রশ্ন করিল, 'কিছু বলছ?'

বধূ ঘোমটাসুদ্ধ মুখটা ব্যঙ্গের সহিত ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, 'কাকে?'

'আমায়?'

সোনিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল ,ও, ও'কে বলছে, মস্ত সমঝদার লোক কিনা! গেঁয়ো বুঝবে শুধু মোষ বলদের কথা।'

এরকমভাবে ঘা দিলে মিঠুয়ার মত লোকেরও লাগে, রাগে মুখটা ভার করিয়া বলিল, 'ছ্যাঃ, বুঝি কিনা বলেই দেখ না।'

'ঢের বলেছি আর ঢের বুঝেছ, চল এখন, সামনে লোক আসছে।'

ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। যখন আন্দাজ করিল লোকটা দৃষ্টিপথের বাহিরে চলে গিয়েছে, ঘোমটাটা খুলিয়া একেবারে পাশাপাশি আসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। বোধ হয় দুই-জনে মতলব করিয়া পথিকটিকে প্রবঞ্চনা করায় দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাটা আরও নিবিড় হইয়া গেল অবশ্য সোনিয়াই অগ্রণী, বলিল, 'গল্প করতে করতে চলনা, হাবা না বোবা?'

'কি গল্প বলব?—রাজারাণী না হুড়ারের?'

সোনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, 'মনসার (মিনসের) কথা শোন না! আমি কি খুকি যে বাঘ-ভূতের গল্প শুনব? তুমিই বরং দুধের ছেলে। কালকের কথা মনে আছে? —আমার মিতিনদের হাতে নাকালটা?'

মিঠুয়া চুপ করিয়া রহিল। সখীদেরই একটা কথা সম্বন্ধে সঙ্কেত করিয়া সোনিয়া বলিল, —'পা, ব্যথা করছে না তো?—যদি করে তো বল না হয়......'

শেষ করিতে না পারিয়া মুখে হাত দিয়া হাসিয়া উঠিল। মিঠুয়া লাঠিটা বাগাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তাদের সবগুলোকে আমি কাঁধে করে অমন পাঁচ ক্রোশ ঘুরে আসতে পারি—আমার নাম মিঠুয়া মড়র, হুঁ!'

'ওঃ, তাই তো গো! তা, তাদের বললে না কেন? তাহলে হনুমানজি বলে তোমায় পুজো করত!'

হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তিনিও রাম-লক্ষণ-সীতাজী—সবাইকে এক সঙ্গে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বেড়াতেন।......নাও, খানিকটা এগিয়ে যাও, একটা গ্রাম এসে পড়ল।...... এখন হাতে ধরে মড়রকে শেখাই দুপুরবেলা!'

নিজেও ঘোমটাটা টানিয়া দিল এবং গতি মন্দ করিয়া স্বামীর আর নিজের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান করিয়া লইল। গ্রামটায় বসতি বিরল, তবে রাস্তার দু'ধারে দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া দুয়ার আছে, বাইরে পর্যন্ত গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা কুটীর হইতে বাহির হইয়া, কোথাও বা রাস্তার মাঝে আসিয়া—'কনিয়া দে, দুলো বলিয়া দে'—বলিয়া দুলিয়া দুলিয়া ছড়া কাটিতে লাগিল। একটু বাহারে বোঝে, বর-কনের বয়সের তারতম্য লইয়া অল্প-মধুর মন্তব্য ছাড়িতে লাগিল।

(৪)

গ্রাম ছাড়াইয়া খানিকটা গিয়া রাস্তার ধারে একটা পুকুর পড়ে। রাস্তার একটু পাশেই বাঁধা বকুলগাছের তলায় রানভাঙা একটা পুরাতন ঘাট। লোকজন নাই কেহ। সোনিয়া বলিল, 'তেষ্টা পেয়েছে, চল একটু বসি।' মিঠুয়া বাহাদুরি দেখাইয়া বলিল, 'ইঃ দু'ক্রোশ তো পথ, তার মধ্যে আবার চারবার বসা। আমার তেষ্টা পায় নি।'

সোনিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, 'ভবে তুমি যাও।'

'আর তুমি?'

'আমি জিরিয়ে টিরিয়ে বাড়ি ফিরে যাব।'

যা মেয়ে দেখা যাইতেছে, ও তা পারে মিঠুয়া শুষ্ক মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং সোনিয়া ঘাটের রানায় একটা জায়গায় গিয়া বসিলে সেও গিয়া পাশে বসিল। সোনিয়া গা-টা দুলাইয়া লইয়া বলিল—'এখ কাণ্ডটা! আর জায়গা নেই নাকি যে একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়লে? আমরা পড়া-শোনা ভূত নাকি?'

মিঠুয়া অতিমাত্র অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে যে রকম উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে মনে করিয়াছিল খুব কাছে বসাটাই বরং অভিজ্ঞ নাগরিকের মত হইবে। বোকার মত একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, 'আর বসার মত পাকা জায়গা তো দেখছি না, তাহলে তো আমার নীচে বসতে হয়।'

সোনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, 'তাইতো গা—এত বড় অপমান! 'আমি......' হঠাৎ থামিয়া মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'কত বয়স হল? এগার?'

মিঠুয়া যথাসম্ভব জোর দিয়া বলিল, 'পন্দ্রহ্।'

সোনিয়া কথাটাতে মিঠুয়ার চেয়েও জোর দিয়া চোখ পাকাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি পন্দ্রহ্ বছরের মন্দ—অমুক মড়র—আমি বসব নীচে......!

নীচে বসবে না তো কোথায় বসবে?—আমার বয়স যে উনিশ!—বিশ্বাস হচ্ছে না?' বলিয়া তাহার উনিশ বছরের সমস্ত শরীর-খানি কপট দর্পে বিচলিত করিয়া, রানার

নীচে পা দুইটি ঝুলাইয়া, বিপরীত দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া বসিল।

একটু পরে ফিরিয়া দেখিল, পনের বৎসরের জীবটি নিজের পরাজয় মানিয়া লইয়া, জড়সড় হইয়া তাহার পায়ের কাছে, ঘাসের উপর বসিয়া আছে। একটু মুচকিয়া হাসিল, তাহার পর বলিল, 'বসে না থেকে দুটো ভালসারির (বকুলের) ফুল কুড়োও দিকিন। আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি।'

ফুল কি হবে?

'বাড়ি গিয়ে তোমায় ভেজে খাওয়াব,—হাঁদারাম—'

মুখ ধুইয়া অঞ্জলি করিয়া জল পান করিয়া উঠিল। ছোবানো শাড়ির কোঁচা দিয়া মুখ মুছিয়া মিঠুয়ার দিকে মুখটা হঠাৎ বাড়াইয়া বলিল, 'দেখ তো আমার কপালে টিকলিটা (টিপ) ঠিক আছে কি না।'

'এক পাশে সরে গেছে।'

'কোন দিকটায়?'

'ডান দিকে।'

সোনিয়া মেহদি রাঙানো তিনটি আংগুলের ডগা টিপ ছাড়া কপালের আর সব জায়গায় বুলাইয়া বলিল, 'কোথায়? বুঝতে পারছি না তো।'

'ডান দিকে ভুরুর ওপরে।'

সোনিয়া আবার সেইরূপভাবে হাত বুলাইয়া বলিল, 'কোথায়? দুৎ মিছে কথা, পড়ে গেছে নিশ্চয়।'

'না না, পড়েনি।'

সোনিয়া ঝগড়া করিবার মত করিয়া বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ! হ্যাঁ হ্যাঁ—পড়েছে, নিশ্চয় পড়েছে—চাষা।'

মিঠুয়া আশ্চর্য হইয়া গেল,—ঐটুকু ছোট কপালটায় হাত বুলাইয়া টিপটা কোথায় ধরিতে পারিল না, এ যে বিশ্বাস করা শক্ত। তা ছাড়া ইহাতে রাগ করিবার, ঝগড়া করিবারই বা কি আছে? একটু হতভম্ব হইয়া বলিল, 'যদি রাগ না কর তো দেখিয়ে দিই।'

'যদি খালি টিকলিটা খুঁটে নিয়ে বসিয়ে দিতে পার তো কিছু বলবো না, কিন্তু খবরদার, যেন......ন্যাককে কোন কাজ দিয়ে বিশ্বাস নেই।'

ন্যাকার হাতটা কাঁপিতেই ছিল, তাহার উপর বাঙালী প্যাটার্নের ক্ষুদ্র টিপটা বেশ একটু বাগড়াও দিল; খুঁটিতে গিয়া কপাল হইতে নাকে পড়িল, সেখান হইতে দুইটি ঠোঁটের মাঝখানে।

মিঠুয়া ভয়ে ভয়ে, যতটা সম্ভব আলগা-ভাবে সেটাকে উদ্ধার করিয়া কপালে বসাইয়া দিল এবং একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিল।

সোনিয়া দুইটি আঙুল দিয়া টিপটা একটু চাপিয়া দিয়া বলিল, "গেঁয়ো কোথাকার।"

মিঠুয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল, 'আবার ও কথা বলছ কেন?' দিই নি ঠিক করে খুব সাবধানে?'

'নিশ্চয় বলব, আমার খুশি। নাও চল। আকাঠ গেঁয়ো।'

আবার দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল। সোনিয়া কি ভাবিতেছিল, একটু পরে বলিল 'তুমি গেঁয়ো বললে চট; কিন্তু কাউকে যদি বল যে আমার গায়ে হাত দিয়ে কপালের টিপ পরিয়ে দিয়েছ তো সে আরও গেঁয়ো বলবে। মনে থাকে যেন।'

মিঠুয়া মস্ত বড় বুদ্ধিমানের মত বলিল, 'সে আমি বলতে যাব কেন? এতই বোকা নাকি?'

কথাবার্তা আরও অন্তরঙ্গতার সহিত হইতে লাগিল। পথের মাঝে লোক দেখিয়া যতবারই দুইজনে সরিয়া যাইতে লাগিল, লোক চলিয়া গেলে ততবারই আবার আরও কাছাকাছি হইয়া চলিতে লাগিল। সোনিয়া গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিল। শ্বশুর-বাড়ির কথা, ননদ, দেওর গরু মহিষ; নিজে শহরের কথাও বলিতে লাগিল। বাঙালী মেয়েদের কথা। কে এক বাঙ্গালী মেয়ে তাকে বড় ভালবাসিত, সোনিয়া তাহাদের বাড়ি ঘুঁটে যোগাইতে যাইত মাঝে মাঝে—তাহাকে আদর করিয়া বলিত, 'সোনাময়ী—মানে, সোনার তৈয়ারী। সে নাকি সুন্দর বলিয়া তাহাকে এই আখ্যা দিয়াছিল......বাবাঃ, বাবাঃ, বাঙালীর মেয়েরা এত মিথ্যাও জানে। সোনিয়া নাকি আবার সুন্দর।

মিঠুয়ার সাহস বাড়িয়াছে, একটু বোধ হয় জ্ঞানবুদ্ধিও হইয়াছে, পথ চলিতে চলিতে। বলিল, "মিছে কথা আর কি বলেছে। তুমি তো সুন্দরই।"

'নিজে যে সুন্দর সে ও রকম বলে—মানে, বাঙালীর বেটী নিজে সুন্দর বলেই আমার প্রশংসা করত।'

মিঠুয়া ঠিক বুঝিতে পারিল না, এর মধ্যে তাহারও প্রশংসা প্রচ্ছন্ন আছে কি না। যেন মনে হইল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই একটু বলিয়াছে এবং যে ক্রমাগতই এক-নাগাড়ে, 'গেঁয়ো, গেঁয়ো' করিয়া আসিয়াছে তার মুখে ভালই লাগিল কথাটা।

হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল, "বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। ইন্দারাটার পাশ দিয়ে ঘুরলেই আমাদের বাড়ির রাস্তা কিনা। আচ্ছা, আসবার সময় তুমি অত কান্নাকাটি করছিলে কেন বল তো? এখন তো বেশ..."

সোনিয়া একেবারে সচকিত হইয়া উঠিল। খপ করিয়া একগলা ঘোমটা দিয়া চাপা স্বরে উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল, 'সত্যি, এসে পড়েছি নাকি? আগে বলতে হয়,—এগিয়ে যাও,—এক্ষুণি এগিয়ে যাও—'

সংগে সংগে ঘোমটার ভিতর হইতে কান্নার সুর উঠিল। মিঠুয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'এ কি! এই ত দিব্যি ছিলে, বললে, আমাদের বাড়ি খুব ভাল লাগবে, আরও বললে...'

স্বামীকে বেশ একটু ধাক্কা দিয়াই—আগাইয়া সোনিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, 'বাড়ি যে এসে পড়েছে। গেঁয়ো ভূচ্চরকে নিয়ে কী ফ্যাসাদেই—'

অতঃপর নিজের গতি মন্দ করিয়া বেশ উচ্চ সুরেই বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিশু মুখোপাধ্যায়

মানব চরিত্রের বহুবিধ দুর্বলতার উপরই প্রধানত কথা-সাহিত্যের সৌধ রচিত হয়। নানা রসের সমন্বয়ে গড়া এই সৌধ বাক্‌-চাতুর্যের সৌকর্যে মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, তার মনে বিস্ময়, ভীতি, কৌতূহলের উদ্রেক করে। গল্পকারদের মধ্যে এবংবিধ ভাব-ধারার কোন বিশেষ একটি বা একাধিকের প্রতি প্রবণতা দেখা যায়। তবে একথা সর্বতোভাবে সত্য যে, বর্তমান এই আথা-ন্তরকালে অবক্ষয়ের যুগে, বিকৃত মানসি-কতার হাত হতে পরিত্রাণের অন্যতম ভেষজ হিসাবে নানা রসের মধ্যে যে হাস্য বা কৌতুক রস, তা যিনিই পরিবেশন করেন এবং যাঁর সাহিত্যের মধ্যে সেই রসের সহ-জাত প্রকাশ দেখা যায় তিনিই নিঃসন্দেহে রসিকাগ্রগণ্য এবং রসপিপাসুদের ধন্য-বাদার্হ।

একদিকে যে হাস্য-কৌতুক মানুষের জীবনকে সম্প্রসারিত করে, অপর দিকে জীবনের বিভিন্ন অসংগতি সেই হাস্যরসের উৎস হলেও সবকিছুর মধ্যেই যিনি আনন্দের উপাদান খুঁজেছেন, আনন্দ বিতরণের উপচার সাজিয়ে ধরেছেন, ইংরেজীতে যাকে বলে 'দি কমেডি ভিউ অব লাইফ', তা প্রবীণ সাহিত্য-শিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প রচনার মধ্যে এসেছে বহু বৈচিত্র্য নিয়ে -কৌতুকরসসৃষ্টির অপরিসীম কলা-কৌশলের সাহায্যে। গল্প ব্যতীত উপন্যাস, নাটক ও রম্যরচনাও তার সাহিত্যকীর্তিকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে সত্য, কিন্তু এস্থলে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র ছোটগল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং একথা সত্য যে, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি অপেক্ষা গল্পগ্রন্থের সংখ্যাই সমধিক।

প্রায় পাঁচ শতাধিক গল্প রচনা করেছেন বিভূতিভূষণ এবং এগুলি প্রায় চৌত্রিশখানি গল্পগ্রন্থের মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছে। সাহিত্যপথযাত্রী হিসাবে বিভূতিভূষণের যাত্রা শুরু হয় চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে, পাটনা কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্রাবস্থায়। বয়স তখন তাঁর প্রায় কুড়ির মত। সেই সময়েই 'প্রবাসী'র গল্প-প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম গল্প 'অবিচার' পুরস্কৃত হয় এবং প্রবাসীতেই সেটি প্রকাশ লাভ করে। আত্ম-প্রকাশের আকুতি বা লেখক হবার উচ্চাশা যেটিই উক্ত সময় বিভূতিভূষণকে প্রেরণা যোগাক না কেন, একথা নিশ্চয়ই তিনি তখন ধারণা করতে পারেন নি যে ভবিষ্যতে সাহিত্যের মাধ্যমে, হাস্যরসের স্নিগ্ধ প্রলেপে তিনি আপামর সাধারণের আধিভৌতিক জ্বালা-যন্ত্রণার বহুলাংশ উপশম করতে সক্ষম হবেন।

কবি সজনীকান্ত দাসের একটি কবিতায় বিভূতিভূষণ সম্পর্কে কয়েকটি পংক্তি যা আমার বক্তব্যের অনুকূলে প্রকাশিত হয়েছিল তা এখানে স্মরণ করি। তিনি লিখে-ছিলেন :

'দুঃখ-অনটন-জরা-ব্যাধি-
মৃত্যু-শোকময় ভবে,
বেদনা-যন্ত্রণা-জ্বালা-
পরিপূর্ণ মোদের সংসারে;
হাসি ও আনন্দ আছে, হে কবি,
বুঝিয়া অনুভবে
সহজে দেখালে সবে,
বাঁচাইলে আশার সঞ্চারে।'

এই কয়েকটি পংক্তির মধ্যেই কবি-সমালোচক সজনীকান্ত বিভূতিভূষণের সাহিত্যে হাস্য-কৌতুক রসের প্রাধান্য ও তার উপযোগিতা সোচ্চারে স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু এই হাস্য ও কৌতুক-রসের প্রাধান্য তাঁর গল্পগুলির মধ্যে থাকলেও গ্রন্থের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে এগুলি পর্যালোচনা করলে। প্রধানত একটা দার্শনিক নির্লিপ্ততা বিভূতি-বাবুর সমগ্র রচনাকেই আচ্ছন্ন করে আছে দেখা যায়। তাছাড়া সংকলন নিবেদনের জন্য যে আকার-প্রকার ও বাকছল তিনি গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে প্রক্ষোভ-এর স্থান স্বল্প হলেও, আসল যে রস-চিত্র তিনি পরিবেশন করতে চেয়েছেন, তার ভাব ও আদর্শে কোথাও তিনি চ্যুত হন নি। এটা গভীর পরিজ্ঞান ও বিশেষ মানসিকতার পরিচায়ক।

বিভূতিভূষণ একমাত্র কৌতুক-রসই পরি-বেশন করেননি। এই পরিহাস ও কৌতুক রসের গল্পগুলি ব্যতীত, সিরিয়াস টাইপ, করুণ বা অন্য কোন রসাশ্রিত গল্পও তাঁর অনেক আছে। যাঁরা 'হৈমন্তী', 'প্রশ্ন' বা 'আনন্দ নট' পড়েছেন, তাঁরা আমার উপ-র্যুক্ত উক্তির সমর্থনে সায় দেবেন। হাস্য-রসের বিভিন্ন দিক দেখাতে গিয়ে অনেক স্থলে বাকচাতুর্যের সংগে তীব্র ব্যঙ্গও এসে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। এর নিদর্শন হিসাবে 'ল্যান্সডাউন ও বিপিন পাল' গল্পের নাম করা যায়।

বিভূতিভূষণকে সর্বাপেক্ষা সার্থক-রূপে এবং সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, তাঁর করুণ-কৌতুক রসের অংগাঙ্গি মিলনের ছবি, গৌরবের প্রথম প্রকাশ 'রাণুর প্রথম ভাগ' ও ঐ সিরিজের গ্রন্থগুলির মধ্যে। এছাড়া ছোটদের জন্য লেখা তাঁর 'পোনুর চিঠি' ও 'দুষ্টু লোকদের কাহিনী'র মধ্যে আছে তাঁর মধুর বাৎসল্য রসের প্রকাশ। 'রাণুর প্রথম ভাগ' গ্রন্থখানি সম্বন্ধে একটি কবিতায় কবি নরেন্দ্র দেব একবার বলেছিলেন :

'রাণুর প্রথম ভাগ' হাতে এল
যেদিন আমার,
দেখিলাম সেদিনই আবির্ভাব
নব-প্রতিভার।'

সত্যিই নব-প্রতিভার সার্থক প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল রাণুর এই আশ্চর্যসুন্দর গল্পগুলির মধ্যে। অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রকাশ, চরিত্র-চিত্রণের কুশল প্রয়াস এবং ভাষাভঙ্গীর যথাযথ ব্যবহার, সেদিন ঘোড়শোপচারে ঢাক বাজিয়ে এই মিতভাষী, অনাসক্ত মানুষটিকে সাহিত্যের উচ্চাসনে বসিয়ে দিয়েছিল।

বহু হালকা 'ফান'-এর নিদর্শন আছে 'বাসর', 'সমুদ্রে', 'মেঘদূত' ও গণ্গা-ঘোষনার গল্পগুলির মধ্যে। 'বরযাত্রী' ও 'টার্নাসিজ' পাঠ করলে সেকালের দীনবন্ধু মিত্রের হাস্যরসাত্মক গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। কোথায় যেন 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' গল্পের লেখক দীনবন্ধুর বাক্যগঠন ও আলঙ্কারিক উপাদানের সঙ্গে বিভূতি-ভূষণের কিছু মিল নজরে পড়ে। উনিশ শতকের চাঞ্চল্যকর উদ্ভট ও হাস্যরসের লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে যে-ক্ষেত্রে অনেকে দীনবন্ধুর উত্তরসূরি হিসাবে অভিহিত করে থাকেন, সে-ক্ষেত্রে বিভূতি-ভূষণকে পরবর্তীকালে ত্রৈলোক্যনাথের মার্জিত সংস্করণ বললে কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না। অবশ্য বিভূতিভূষণের গল্প যে-ক্ষেত্রে আবার কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় বা অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা মার্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং স্নিগ্ধ ও সুস্মিত কৌতুকের দিব্য-জ্যোতিতে ভাস্বর, সে-ক্ষেত্রে ইদানীন্তনকালের একমাত্র রাজশেখর বসু ও পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল অনেকে মনে করে থাকেন।

এই রাজশেখর বসুই একস্থানে বিভূতি-ভূষণ ও কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কেদারনাথের লেখায় ভাবাবেগের কিছু বাহুল্য দেখা যায়, তার ফলে মুখ্য হাস্যরস স্থানে স্থানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের মাত্রাজ্ঞান অতি সূক্ষ্ম।'

প্রকৃতপক্ষে হাস্য-পরিহাসের রস যেখানে দানা বেঁধেছে, পাঠকের পেট ফুলে উঠেছে হাসির চাপে, সেখানে লেখকের ভাবাবেগ পরিহার ও সংযমিত বাক্য ব্যবহার বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা বৈকি! এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁরা হাসির গল্প বলছেন, শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁদের সে গল্প শুনে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, কিন্তু তাঁরা নিজে হাসছেন না! বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রেও ঘটেছে প্রায় অনুরূপ ঘটনা। অর্থাৎ তিনি লঘু চরিত্রের মানুষ না হয়েও, শুনিয়েছেন অনেক লঘু কথা, লঘু-চরিত্রের মানুষের মুখ দিয়ে। 'গোবিন্দ মাসী' 'হারজিত', 'বি এন ডবলু-র ব্রাঞ্চ লাইন', 'ওরা ও আমরা', 'রণরঙ্গিনী', 'গ্রাম সংস্কার' প্রভৃতি গল্প-গুলির বিভিন্ন চরিত্র তারই পরিচয় বহন করে।

ত্রৈলোক্যনাথের মত কৌতুক-মিশ্রিত উদ্ভট রসের গল্পও আছে বিভূতিভূষণের কয়েকটি। যেমন স্বরূপ মণ্ডলের মুখে বলা সেকালের জমিদারদের নিয়ে লেখা দুটি ছয়েক গল্প। যার মধ্যে 'গড়ের বাদ্যি' ও 'সম্পত্তি' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এতদ্ব্যতীত 'আশা' ও 'বৈরাগীর ভিটের' গল্প দুটি নিছক ভৌতিক পর্যায়ের গল্প। এ ধরনের গল্প তাঁর আরও দু-চারটি থাকলেও বিভূতিভূষণ কিন্তু ভৌতিক রহস্যের (myth) মিথ্যাকে সর্বদাই ভেঙে দিয়ে গেছেন।

কৌতুক রস ও উদ্ভট রস ব্যতীত রুদ্ররস বা বীররসের গল্পও বাদ পড়ে নি রসবেত্তা বিভূতিভূষণের হাতে। রুদ্ররসের বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে যেমন চৈতালী গল্পগ্রন্থের 'চৈতালী' গল্পকে ধরা যায় তেমনি বীররসের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় 'সত্যাগ্রহী' গল্পটিকে।

এইভাবে সুনিপুণ শিল্পী বিভূতিভূষণ বাৎসল্য থেকে আরম্ভ করে প্রায় সমূহ রসকেই স্পর্শ করে গেছেন বটে, কিন্তু তাহলেও, হাস্যরসের ছোঁয়াকে কোথাও তিনি একবারে এড়িয়ে যেতে পারেন নি—তাঁর মৌলিক সত্তার এই বৈশিষ্ট্য, ছিটেফোঁটা হলেও, কোন-না-কোন রূপে এসেই গেছে তাঁর সমগ্র গল্প-সাহিত্যের মধ্যে।

ছোট একটি ব্রাঞ্চ লাইন। এক জংসন স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আর এক জংসন স্টেশনে গিয়া থামিয়াছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি ছোটো ছোটো স্টেশন।

তা লাইনের সবকয়টি স্টেশনই দেখিতে প্রায় একরকম।

পয়েণ্টিং করা লাল ইটের তৈরী ছোট্ট একখানি ঘর, সম্মুখে একখানি ঢাকা বারান্দা, বারান্দার পাশে কাঠের বেঞ্চি পাতা, তাহার পাশেই ওজন করিবার লোহার যন্ত্র, জানালার গায়ে টিকিট কিনিবার ঘুলঘুলি।

ভিতরে একটি টেবিলের ওপর টেলিগ্রাফের যন্ত্র সাজানো। যিনি টেলিগ্রাফ করেন, তাঁহাকেই টিকিট দিতে হয়, তিনি স্টেশনমাস্টার—তিনিই সব। অ্যাসিস্ট্যাণ্টের বালাই এ-লাইনে নাই। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বলিতে একজন খালাসী। স্টেশনেও কাজ করে, আবার মাস্টারের বাড়ির কাজও করিয়া দেয়। মাস্টারের চাকর রাখার খরচটা অন্তত বাঁচে।

মন্দ নয়।

স্টেশনমাস্টার এইচ পি ব্যানার্জি। আসল নাম হরিপদ। মাহিনা বাহাত্তর টাকা। সুখে-স্বচ্ছন্দেই সংসার চলে। স্টেশনের কাছেই ঠিক তেমনি পয়েণ্টিং করা ইটের তৈরী দুখানি ঘরের একটি কোয়ার্টার—হরিপদ মাস্টারের সংসার। সংসার বলিতে একমাত্র তাহার স্ত্রী বীণাপাণি। ছেলেপুলে নাই। একা মানুষ—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট।

বীণার কাজকর্ম একরকম নাই বলিলেই হয়। ইঁদারা হইতে রামধনিয়া খালাসী জল আনিয়া দেয়, তাহার স্ত্রী লছমীর কল্যাণে ঘরঝাট দিতে হয় না, বাসন মাজিতে হয় না—শুধু দুবেলা দুটি রান্না।

আছে একরকম ভালোই। কষ্টের মধ্যে সে নিঃসঙ্গ, একাকিনী। এখানে আসিবার পূর্বে বীণা ছিল এক পল্লীগ্রামে—মামার বাড়িতে। সেখান হইতে আসিয়া অবধি কোথাও যাওয়া তাহার আর একটিবারের জন্যও ঘটিয়া ওঠে নাই। মনে হয়, এই আট বৎসর ধরিয়া সে যেন এই ছোট্ট খাঁচাটির মধ্যে বন্দিনী হয়ে আছে। আশপাশে এমন কেহ নাই যে, ডাকিয়া দুটো কথা কয়। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে শুধু ঐ খাঁচার মতো ছোটো ঘরখানি এত অপরিসর যে, দু-দণ্ড নড়িয়া চড়িয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইবারও উপায় নাই—এক লছমীর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কথা কহিতে তাহার ভালোও লাগে না।

হরিপদ খাইবার সময় বাসায় আসে। স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া খাইতে বসিলে পাখা হাতে লইয়া বীণা তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলে, হ্যাঁ গো, আর কতদিন? এখান থেকে তোমার বদলী আর কি হবে না ছাই?

হরিপদর সেই এক জবাব।

বলে, 'কই আর হয়।' বলে, 'কেন, জায়গাটা তেমন মন্দ নয় তো।' সব জিনিসই সস্তা। তরি-তরকারী তো একরকম কিনতেই হয় না, তাছাড়া কাল থেকে আধ সের দুধের বন্দোবস্ত করেছি, খাঁটি দুধ—একেবারে বিনিপয়সায়।'

বলিয়া একটুখানি গর্বের হাসি হাসিয়া হরিপদ তাহার মুখের পানে তাকায়। ভাবে বীণা হয়তো তাহার এই বুদ্ধিমত্তার তারিফ করিবে। কিন্তু তারিফ করা দূরে থাক, হাতের পাখা তখন তাহার অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলিতে থাকে, হেঁট মুখে বুকের আঁচলের পাড়টা সে বাঁ হাত দিয়া টানিয়া টানিয়া সোজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, মনে হয়, কথাটায় যেন সে কানেই দেয় নাই। হরিপদ কিন্তু না শুনাইয়া তৃপ্তি পায় না, বলে 'ঐখানে ঐ জানলায় দাঁড়ালে বাইরে দক্ষিণ দিকে উ-ই যে ঐ গাছপালায় ঢাকা গাঁ-টা দেখা যায়, ঐ গাঁ থেকে চাষাদের আর গয়লাদের ছেলেগুলো সব লাইনের ধারে গোরু চরাতে আসে। কচি কচি অমন ঘাস তো আর কোথাও পাবে না। রামধনিয়াকে দিয়ে গোরুগুলো কাল আটক করেছিলাম। বললাম, খবরদার বেটারা ঐ একটা গোরু কি বাছুর কোনোদিন যদি লাইনের ওপর কাটা পড়ে তো হাজার টাকা জরিমানা—একেবারে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারা তো কেঁদেই অস্থির। বলে, গাঁয়ে আর কারও বাড়ি এক আঁটি খড় নাই হুজুর, গোরু চরাবার 'বাথান' নাই, ছেড়ে দিলেই পেটের জ্বালায় হাঁ-হাঁ করে, লোকের ফসলে গিয়ে মুখ, এই লাইনের ধার ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই হুজুর।

বললাম, আমি যে চরাবার হুকুম তোদের দেব, তাতে আমার লাভ? রামধনিয়া এক সের বলেছিলো, কিন্তু এক সের আর হলো না, শেষে আধ সের করে খাঁটি দুধ, ঠিক হলো যে, ওরা নিজেরাই এসে কাল থেকে পৌঁছে দেবে।'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার বলে, 'কেমন ভালো হয়নি?' হাসিয়া একবার ঘাড় নাড়িয়া বীণা নীরবে সে-কথার জবাব দেয়। কিন্তু অমন বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া করিয়া খাইতে গেলে তো হরিপদর চলে না।

রামধনিয়া ছুটিয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া বলে, 'বাবু, টেলিগিরাপ'...ব্যাস্! সেদিনের মতো হরিপদের খাওয়া ঐখানেই শেষ।

হাতে জল ঢালিয়া দিয়া পান আনিয়া যে বীণা তাহার হাতে দিবে তাহারও অবসর নাই। 'পান ঐ রামধনিয়ার হাতে দিও।' বলিয়া হন্তদন্ত হইয়া হরিপদ ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। আবার কখন ফিরিবে কে জানে।

বীণা তাহার জানালার কাছটিতে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন হুশ হুশ করিয়া স্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায়। কোনোটা বা এই দিক দিয়া, কোনোটা বা ঐদিক দিয়া। কিন্তু যেদিক দিয়াই হোক, তাহার এই জানালাটির পাশ দিয়া সকলকেই পার হইতে হয়। এই ট্রেনে চড়িয়াই সেই যে আট বৎসর আগে সে এইখানে আসিয়া নামিয়াছে, তাহার পর আর কোনো দিনই তাহাকে ট্রেনে চড়িতে হয় নাই। ট্রেন দেখিতে তাহার বড়ো ভালো লাগে। জানালার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া ট্রেনের যাত্রীরা তাহারই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া চোখের সুমুখ দিয়া পার হইয়া যায়। বীণার দুটি ব্যথিত ম্লান ব্যাকুল চক্ষু পরম ঔৎসুক্যভরে তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। কোনোদিন হয়তো একটি মুখের চেহারা সে সারাদিন মনে করে রাখে, আবার কোনোদিন বা সব মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, মনে
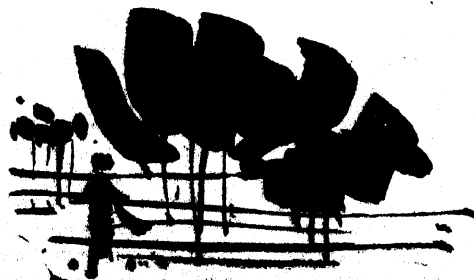
করিয়া রাখিবার মতো একখানি মুখও তাহার চোখে পড়ে না।

ট্রেন চলিয়া যায়। বীণা দেখে, দিগন্ত-বিস্তৃত শূন্য প্রান্তর, এদিকে ধানের মাঠে, ওদিকে ঐ মাঠের মাঝখানে, গাছপালায় ঢাকা ছোট্ট একখানি গ্রাম—দূরে—বহুদূরে, মাঠ-প্রান্তর পার হইয়া গিয়া অস্পষ্ট বৃক্ষ-শ্রেণীর মাথার উপরে নীল আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু ঘুরিয়া আসে, বীণার চোখের সমুখে তাহার ঐ সংকীর্ণ সংকোচিত খণ্ড পৃথিবীটার রঙ বদলায়।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে দেখে চারি-দিক খাঁ খাঁ করিতেছে, মাঠের মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। দূরে শুধু শুষ্ক প্রান্তরের মাঝখানে পত্রহীন কয়েকটি পলাশের গাছে রক্তরাঙা পুষ্পের সমারোহ। বৈকালের দিকে পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর কালো মেঘ দেখা যায়, মাঠের ধুলো উড়াইয়া ঘূর্ণিবায়ু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহার পর কোনো-দিন-বা বৃষ্টি নামে, কোনোদিন-বা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে শুরু করে।

দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসে। দিন-রাত্রি ঝনঝন করিয়া বৃষ্টি পড়ে। নিদাঘ-তপ্ত ধরিত্রী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। বীণা তাহার সেই ছোট্ট জানলার পাশে তখনো বসিয়া থাকে—দেখে বহুদূর হইতে বৃষ্টির ধারা ঝমঝম করিয়া তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে, চোখেমুখে তাহার বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া লাগে, তবু সে কোথাও উঠিয়া যায় না। তাহারও তৃষিত আত্মা যেন অজ্ঞাতে বর্ষণ কামনা করে, এদিকের দরজার ফাঁকে ঘন ঘন স্টেশনের দিকে তাকায়, স্বামী তাহার কাজ করিতেছে, কখন যে আসিবে তাহার কোনোও স্থিরতা নেই। মাঠঘাট সব জলে ভরিয়া যায়, দুপুরে দূরের গ্রাম হইতে জালি কাঁধে লইয়া লাইনের ধারে ডোবায় বাগদীর মেয়েরা মাছ ধরিতে আসে, ধানের মাঠে চাষীদের নিড়ান চলে, সূর্যাস্ত হইতে-না-হইতেই কড় কড় করিয়া ব্যাঙের ডাক শুরু হয়।

তাহার পর শরতের নির্মল আকাশে চাঁদ ওঠে। জ্যোৎস্নার আলোয় সবুজ ধানের মাঠের উপর দিয়া বাতাস বহিয়া যায়। রোমাঞ্চিত শস্যক্ষেত্রের শিহরণ যেন বীণার দেহে আসিয়া লাগে।

দেখিতে দেখিতে সবুজ ধানের মাঠ হলুদ হইয়া ওঠে। উত্তর দিক হইতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বয়। বীণা তাহার সেই ক্ষুদ্র বাতায়ন পার্শ্বের নির্দিষ্ট স্থানটি পরিত্যাগ করে না, গায়ে কাপড় জড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, চাষীরা ধান কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, গোরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া কাটা ধানের আঁটি লইয়া তাহারা গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

তাহার পরই বসন্ত। সুবিস্তীর্ণ এই প্রান্তরের মাঝখানে তাহাদের ঐ ছোট্ট ঘর-খানির ততোধিক ছোটো জানলার পথেও বসন্তের হাওয়া অনধিকার প্রবেশ করে। অপরিসর উঠানের একপাশে বীণা তাহার নিজের হাতে বেলফুলের যে-গাছটি পুঁতিয়াছে, তাহারও শুষ্ক শাখায় সাদা সাদা কয়েকটি কুঁড়ি ধরে।

এমনি করিয়া বছর কাটিয়া যায়।

জানলার বাহিরে প্রতিদিনই সেই একই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া বীণার জীবন যেন এইবার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

সকালের ট্রেনটা পার করিয়া দিয়া হরিপদ যখন বাসায় আসে, বীণা তখন রান্না করে। তাও সে রান্না করিতে করিতে উঠিয়া একবার স্বামীর কাছে আসিয়া বসে। হাসিয়া বলে, 'হ্যাঁ গো, তুমি বদলির দরখাস্ত করেছো, না, আমায় মিছে কথা বলে ভুলিয়ে রাখছো?'

হরিপদ তাহার জুতায় কালি ঘষিতে ঘষিতে মুখ তুলিয়া বলে, 'কেন গো, বদলি বদলি করে যে আমায় ক্ষেপিয়ে তুললে দেখছি!'

বীণা রাগ করিতে জানে না। মৃদু হাসিয়া আবার তাহার উনানের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ আর সে তাহাকে ক্ষেপাইবে না। খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া এটা-সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে ভাবে, রেল কোম্পানীর মতো নিষ্ঠুর কোম্পানী আর পৃথিবীতে কেহ নাই, স্বামী তাহার খাটিয়া খাটিয়া হয়রান হইয়া উঠিতেছে। ছুটি না থাক, অন্যত্র বদলি না করুক—স্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া দুদণ্ড কথা বলিবার অবসরও তো দেওয়া উচিত।

উনানে ভাত চড়াইয়া দিয়া হাত ধুইয়া বীণা আবার ঘরে আসিয়া ঢোকে। বলে, 'কেন আমি কি তোমার জুতো ঘষে দিতে পারি না?'

হরিপদ বলল, 'না, পারবে না কেন? আমিই ঘষছি, তাতে আর হয়েছে কী!'

তাহার পর বেচারা বীণা আর কোনোও কথা খুঁজিয়া পায় না। হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে স্বামীর জুতা ঘষা দেখিতে থাকে।

সেইদিন দুপুরে বীণা হঠাৎ এক সময় বলিয়া বসে, বিকেলের দুটো ট্রেনই নাকি উঠে যাবে শুনেছিলাম, কই গেলো না তো?'

হরিপদ বলে, 'ট্রেন উঠে গেলে তোমার ভারি দুঃখ হয়, না?'

বীণা জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

হরিপদ বলে, 'জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহলে আর লোক দেখা হয় না।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'না, পারলে না বলতে। বিকেলের ট্রেনদুটো উঠে যাওয়াই আমি চাইছি। উঠে গেলে বাঁচি।'

এবার হরিপদ বলে, 'কেন?'

এ কেন-র জবাব দিতে গিয়া বীণার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে। লজ্জায় সে তাহার গালদুটি রাঙা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া হাসিয়া বলে, 'যাঃ! এ-বাসায় একা থাকতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি! তোমার কি! তুমি তো লোকজনের সঙ্গে......'

বলিয়াই বীণা জানালার কাছে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়। বাহিরে চাহিয়া দেখে, ইঁদারাটার কাছে রামধনিয়ার পাঁঠী ছাগলটাকে একটা খুঁটির সঙ্গে 'দিক দড়ি' দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাছে লাইনে কাটা যায় বলিয়া লছমি এমনি করিয়াই গলায় তাহার একটি লম্বা দড়ি দিয়া রোজ বাঁধিয়া রাখে।

সুদীর্ঘ আট বছর পরে তাহাদের একঘেয়ে জীবনে হঠাৎ একদিন এক বৈচিত্র্য দেখা দিলো।

সন্ধ্যার ট্রেনখানা স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরিপদ তাহার কালো আল-পাকার কোট ও মাথায় গোল টুপিটা পরিয়া যাত্রীদের টিকিট লইবার জন্য একটা আলোর খুঁটির নীচে দাঁড়াইয়া। ট্রেন হইতে লোক নামিল মাত্র দুজন, উঠিল একজন। হঠাৎ কে যেন ট্রেনের হাতল ধরিয়া ডাকিল, 'হরিপদদাদা!'

পরিচিত কণ্ঠস্বর!

হরিপদ দেখিল, প্ল্যাটফর্মের আলোটা তাহার মুখে গিয়া পড়িয়াছে। চিনিতে দেরি হইল না।—'সুকুমার যে রে? নাম, নাম।—নেবে পড়!'

সুকুমার ছোকরাটি কী যেন বলিতে যাইতেছিল, হরিপদ তৎক্ষণে তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ি হইতে নামাইল, সঙ্গে মাত্র একটি সুটকেশ। গাড়ি ছাড়িয়া দিলো।

সুকুমার বলিল, 'তুমি যে এ-স্টেশনে আছ, সে আমি জানতাম না দাদা, তবে এই লাইনে যে আছো তা জানি। সেইজন্যেই তো প্রত্যেকটি স্টেশনে উঁকি উঁকি মেরে দেখছিলাম—যদি দেখা হয়ে যায়। ভালোই হল, অনেক দিন পরে দেখা হয়ে গেলো। তুমি ভালো আছো? বৌদি ভালো আছে?'

ঘাড় নাড়িয়া হরিপদ বলিল, 'হ্যাঁ ভালোই আছে। আচ্ছা, চল্, তোকে বাসাতেই রেখে আসি।' বলিয়াই সেই জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় দুজনে তাহাদের সেই ছোট্ট বাসার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। হরিপদ ডাকিল, 'ওগো, খোলো খোলো, দেখো, কে এসেছে দেখো।'

বীণা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতে আসিয়া দেখে স্বামীর সঙ্গে এক অপরি-চিত যুবক। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সে সরিয়া যাইতেছিল, হরিপদ বলিল, 'বিয়ের সময় মাত্র একবার দেখেছিলে, চিনতে পারবে না। আমাদের যোগেশমামার ছেলে গো—সুকুমার। এবার চিনলে তো?'

বীণা এইবার তাহার ঘোমটাটি ঈষৎ তুলিয়া দিয়া সুকুমারের মুখের পানে চকিতে একবার তাকাইয়া চোখ নামাইল।

সুকুমার তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'প্রণাম বৌদি, ওরকম লজ্জা যদি করেন তো এই আমি চললাম।'

বীণাকে বাধ্য হইয়া তাহার মুখের পানে আর একবার তাকাইতে হইল।

সুটকেশটা ঘরের ভিতর রাখিয়া হরি-পদর সঙ্গে সুকুমার কথা কহিতেছিল। বীণা তাহার জন্য চা তৈরি করিতে গেলো।

সুকুমার বলিল, 'কয়লার কারবার করছি কিনা, তাই একবার মানিকগঞ্জে যাচ্ছিলাম,

কাল সকালেই কিন্তু আমায় চলে যেতে হবে হরিপদদাদা।'

'আচ্ছা সে এখন দেখা যাবে। তুই বোস, তোর বৌদির সঙ্গে কথাবার্তা বল, ততক্ষণ আমি আমার কাজটা সেরে আসি।' বলিয়া হরিপদ স্টেশনে চলিয়া গেলো।

বৌদিদির চা তখনো হয় নাই।

একটা ঘরের মধ্যে একাই বা সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কেমন করিয়া!

উঠানের পাশেই ছোট্ট রান্নাঘর। সুকুমার উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিল।

'বৌদির ঘরকন্না দেখতে এলাম। বাঃ! এখনও লজ্জা বৌদি? না বৌদি, তাহলে আমি চললাম।'

বীণা এইবার তাহার মাথার ঘোমটা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া তাহার সে সুন্দর মুখখানি অনাবৃত করিয়া হাসিয়া বলিল, 'কেন যাবে কেন ঠাকুরপো? বিয়ে করেছো নাকি?'

সুকুমার হাসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না বৌদি, বিয়ে আর হলো না। হলে আপনাকে নেমন্তন্ন করব। যাবেন তো?'

বীণা বলিল, 'কেন যাবো না?'

চা তৈরি করিয়া চায়ের বাটিটি বীণা সুকুমারের কাছে আগাইয়া দিয়া বলিল, 'ভালো চা হয়তো হলো না ঠাকুরপো; তা কি আর করবে বলো, ঐ খেতে হবে।'

চায়ে চুমুক দিয়া সুকুমার বলিল, 'বৌদিদির হাতের তৈরি এ-ই আমার অমৃত। এর চেয়ে ভালো চা আমার জোটে না বৌদি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আলাপ জমিয়া উঠতে দেরি হইল না। বীণা আজ বহুদিন পরে কথা কহিয়া বাঁচিয়াছে। কথা যেন তাহাদের আর ফুরাইতে চায় না।

'রাত্রে তুমি কি খাও ঠাকুরপো? লুচি করে দিই খানকতক, কি বলো?'

'দোহাই বৌদি, রাত্রে লুচি আমি কোনোদিনই খাই না, আমি ভাত খাবো।'

বীণা বলে, 'ভালো তরিতরকারীর ব্যবস্থা কিছু নেই ঠাকুরপো, ভাত খেতে তোমার কষ্ট হবে। এমন হতচ্ছাড়া জায়গা—কিছু মেলে না।'

সুকুমার বলল, 'এবার আমি রাগ করব বৌদি, এ কী আরম্ভ করলেন আপনি? অত লৌকিকতা আমার ভালো লাগে না।'

বৌদিদি বলে, 'লৌকিকতা নয় ভাই, তুমি কি আর রোজ আসছো? পথ ভুলে হঠাৎ এসে পড়েছো, আর হয়তো এই বৌদিদিটির কথা তোমার মনেই থাকবে না—'

সুকুমার বলে, 'থাক। ভুলে যাবার মতো বৌদিদি আপনি নন। আপনাকে একবার যে দেখে, সে বোধহয় আর জীবনে ভোলে না।'

এ-কথার জবাব সে আর খুঁজিয়া পায় না, চোখ তুলিয়া সুকুমারের পানে একবার তাকাইয়াই মুখ নামাইয়া লেও ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'থাক।'

তাহার পর দুজনেই চুপ।

সুকুমারের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল। বাটিটি হাত হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আপনি এবার বোধহয় রান্না করবেন? আমি এইখানে বসে থাকলে আপনার লজ্জা করবে না তো?'

বীণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বলিয়া সে চৌকাঠের কাছেই একটি আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, 'ভালো করে এখানে চেপে বোসো ঠাকুরপো, তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

সুকুমার ভালো করিয়াই চাপিয়া বসিল।

পরদিন সকালেই সুকুমারের চলিয়া যাইবার কথা: বীণা বলিল, 'পাগল হয়েছো ঠাকুরপো, আজ কি তোমায় ভালো করে না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি কখনও। যেতে হয়, কাল যেও।'

এ-অনুরোধ এড়ানো শক্ত। বাধ্য হইয়া সেদিন তাহাকে থাকিতে হইল।

বীণা তাহার স্বামীকে রাত্রেই বলিয়া-ছিল, সকালে হরিপদ কোথা হইতে একটা মাছ সংগ্রহ করিয়া রামধনিয়াকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

সুকুমার বলিল, 'দাদাকে দেখছি স্টেশনের সব কাজই করতে হয়, বাড়ি এসে যে দু-দণ্ড বিশ্রাম করবে তারও ফুরসৎ মেলে না—না বৌদি? একা একা আপনার দিন কাটে কেমন করে বলুন তো?'

বাহিরে মাছটা পড়িয়া আছে, তাড়াতাড়ি সেটাকে কুটিবার ব্যবস্থা না করিলে এখনই হয়তো কাকে মুখ দিবে, তাই সে সলজ্জ একটু হাসিয়া একরকম ছুটিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল। মুখে কিছুই বলিতে পারিল না।

ব্যাপারটা যে সুকুমার বুঝিল না তাহা নয়, কথাটা বলা হয়তো তাহার উচিত হয় নাই, তাই সে কিয়ৎক্ষণ জানলার বাহিরে একদৃষ্টে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু তাহার নীরবতাও বীণার ভালো লাগিল না। মাছটা কোটা শেষ করিয়া হঠাৎ এক সময়ে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'অমন চুপ করে বসে রইলে যে ঠাকুরপো?'

হাসিয়া সুকুমার বলিল, 'ঝগড়া করবো আপনার সঙ্গে।'

বীণাও হাসিল। বলিল, 'করো না। পারবে?' বলিয়াই সে জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। আহারাদির পর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া সুকুমার বলিল, যাই একটু স্টেশনে বেড়িয়ে আসি।'

বীণা বলিল, 'এসো। খাঁচার ভেতর কাল থেকে বাস করে জীবন বোধহয় তোমার হাঁপিয়ে উঠেছে।'

সুকুমার তাহার বৌদির দিকে তাকাইয়া একটু হাসিল মাত্র।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসলে যে?'

সুকুমার বলিল, 'আমার যদি এই এক-দিনেই হাঁপিয়ে ওঠে, আপনার তাহলে আট বছরে কী হওয়া উচিত?'

তাচ্ছিল্যভরে বীণা বলিল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই মেয়েমানুষ, আমাদের উপায় কী?' বলিয়াই ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'বেশি দেরি কোরো না, আমি চা তৈরি করে রাখব।'

দেরি অবশ্য বেশি সে করে নাই, ফিরিয়া যখন আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, দরজার কড়া নাড়িবা মাত্র হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে লইয়া বীণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলো।

দেখা গেলো, বীণা বেশ করিয়া গা ধুইয়া ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, ভালো একখানি শাড়ি পরিয়াছে, জামা গায় দিয়াছে, পায়ে লাল টকটকে আলতা; হাতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি, জামাকাপড় হইতে ভুরভুর করিয়া সস্তা একটা এসেন্সের উগ্র গন্ধ বাহির হইতেছে। কিন্তু মানাইয়াছে চমৎকার। হঠাৎ দেখিলে দু-দণ্ড তাকাইয়া থাকিতে হয়। সুকুমার বলিয়া উঠিল, 'বাঃ! এ যে তোমায় দেখছি আর চিনতে পারা যাচ্ছে না বৌদি!'

সলজ্জ একটু হাসিয়া বীণা বলিল, 'কেন? অপরাধ?'

সুকুমার বলিল, 'অপরাধ নয় বৌদি, ছাই চাপা আগুনের ছাই উড়ে গেলে যেমন আগুন বেরিয়ে পড়ে, তোমার দেখছি আজ তাই হয়েছে। কাল থেকে দেখছিলাম চুল-গুলো উস্কোখুস্কো, ময়লা একখানা কাপড়, পায়ে আলতা ছিল না—সত্যি বৌদি, আজ আপনাকে একেবারে নতুন মানুষ বলে বোধ হচ্ছে।'

'তোমারও যে দেখছি মাথা খারাপ হলো ঠাকুরপো, আমার রূপ নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে 'আপনি' 'তুমি'-তে যে গুলিয়ে ফেললে।'

সুকুমার বলল, 'তা হউক বৌদি, আপনাকে 'আপনি' না হয় নাই বললাম, কিন্তু সত্যি বলছি বৌদি, তোমায় আজ ভারি ভালো দেখাচ্ছে। দেখো তো পায়ে আলতা না পরলে মেয়েদের কখনও মানায়! আজ তোমার ও-পায়ের উপর প্রণাম করতেও সুখ।'

বীণা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

'বাঃ হাসছো যে বৌদি? আমি কি মিছে বললাম?'

'না, সেজন্য হাসিনি, তুমি আলতার কথা বললে, তাই হঠাৎ হেসে ফেললাম। বাক্স খুলে দেখি—আলতা নেই। সে যে এখন ক'বছর ধরে নেই কে জানে! তখন কী করলাম জানো? ঐ দেখো।' বলিয়া বীণা আঙুল বাড়াইয়া বাড়াইয়া মেঝের উপর যে জিনিসগুলি দেখাইয়া দিল, সুকুমার সেগুলি চিনিতে পারিল না। বলিল, 'কী ওগুলো?'

বীণা বুঝাইয়া বলিল, 'আমাদের ঐ ইঁদারার পাশে কতগুলো ফণীমনসার গাছ আছে দেখেছো? ঐ গাছের ওগুলো ফল কি ফল জানিনে ভাই, ছোটোবেলায় আমরা ঐ দিয়ে আলতা পরতাম। আজও হঠাৎ আলতা পরার সখ হতেই লছমিকে ডেকে ছুরি দিয়ে ঐগুলি কেটে আনালাম। ভারি বিশ্রী কাঁটা, হাতে একবার ফুটলে আর সহজে বেরুতে চায় না। তাই খুব সাবধানে ঐগুলো বেছে বেছে টিপে টিপে লাল লাল

রাঙা দিয়েছে আলতা যখন আমি পরছিলাম, তখন তুমি দরজার কড়া নাড়লে। অতিকষ্টে হাসি চেপে তোমায় আমি দরজা খুলে দিলাম—দাঁড়াও ওগুলো ফেলে দিই।'—বলিয়া সেই কলাইকরার কলাগুলো মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া বীণা হাসিতে হাসিতে জানলা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সুকুমার বলিল, 'এতেই এমনি. তা না জানি সত্যিকারের আলতা পরলে...'

হাত নাড়িয়া বীণা বলিল, 'হয়েছে।' বলিয়াই একবার হাসিল। বলিল, 'নাঃ, এত প্রশংসা যখন করলে, তখন তোমার এক পেয়ালা চা আমায় দেখছি এনে দিতেই হলো। উনোন আমার ধরে গেছে। বেশি দেরি হবে না, বোসো।'

বলিয়া বীণা চা তৈরি করিতে গেল।

রান্নার কাছেই সুকুমার সেইখানেই বসিয়া বসিয়াই বলিল, 'প্রশংসা নয় বৌদি, সাজলে তোমায় সত্যি বড়ো সুন্দর দেখায়।'

রান্নাঘর হইতে জবাব আসিল, 'কিন্তু তাতে তো কিছু লাভ হবে না ঠাকুরপো. তুমি এবার খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দেখে বিয়ে করো। মেয়ে দেখবার ভারটা না হয় আমার হাতেই দিও।'

লজ্জায় সুকুমার চুপ করিয়া বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

সেইদিন রাত্রেই সুকুমারকে মানিকগঞ্জে যাইতে হইবে। না গেলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

সুকুমার বলিল, 'তোমায় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না বৌদি। সে-কথা না বললেও বুঝতে নিশ্চয়ই পেরেছো। আচ্ছা, ফেরার পথে যদি পারি তো না হয় একবার...'

'এসো।' কথাটা বীণার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না। সুকুমার যে এত শীঘ্র হঠাৎ আবার চলিয়া যাইবে, তাহা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল।

হরিপদ ইহারই মধ্যে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাঁকিয়া বলিল, 'তুই তবে আয় সুকুমার, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই।'

'যাই।' বলিয়া সুটকেসটা তুলিয়া লইয়া হরিপদর পিছু পিছু সুকুমারও বাহির হইয়া গেলো।

বীণার বাড়ির পাশ দিয়া যে গাড়ি পার হইয়া যায় এ দুদিন বীণা সে কথা ভুলিয়াই ছিলো; আজ এই অতিথিটি চলিয়া যাইবা-মাত্র দৃষ্টি তাহার সেইদিকেই নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

মানিকগঞ্জ যাইবার গাড়ি পার হইল প্রায় আধঘন্টা পরে। গাড়ির আরোহীদের মধ্যে ছিল সুকুমার জানলা পথে তাকাইয়া, আর সেই ক্ষুদ্র গৃহের বাতায়ন পার্শ্বে বীণা ছিল তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, আকাশে ছিল অজস্র জ্যোৎস্না, গাড়িতে ছিল আলো. অথচ কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না, বীণার অস্থির চঞ্চল দুটি চক্ষু-তারকার সম্মুখ দিয়া সশব্দে ট্রেনখানা পার হইয়া গেল।

শূন্য গৃহ আবার তেমনি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

আবার সেই একঘেয়ে একটানা জীবন!

দু-তিন দিন পরে আবার সুকুমারের ফিরিবার কথা। বীণা জানলার কাছে বসিয়া বসিয়া ট্রেন দেখে, আর ভাবে, আর দিন গোনে!

জানালার বাহিরে ধরিত্রীর যে ভগ্নাংশ-টুকু তাহার চোখের সম্মুখে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিভাত হইয়া আছে, চোখ বুজিলেই সে দৃশ্য তাহার মানশ্চক্ষে হুবহু ছবির মতো ভাসিয়া উঠে, সেটুকু দেখিয়া এখন তাহার এমন হইয়াছে যে, সে না দেখিয়াও বলিয়া দিতে পারে—লাইনের ধারে একটি হেলানো পালাল গাছের নিচে একটি উঁই-এর ঢিপি, পাশেই ছোট্ট একটি ডোবায় বারো মাস জল জমিয়া থাকে, তাহারই এক কোণে একটি রক্ত সাপলার ঝাড়, লালরঙের দুইটি শালুক সেখানে রোজই ফুটিয়া থাকিতে দেখে, ঝোপের ভিতর একটি ডাহুকদম্পতি বোধকরি তাহাদের বাসা বাঁধিয়াছে। দিনের বেলায় তাহারা কোথায় থাকে কে জানে, সন্ধ্যা হইলেই ডাহুক দুইটি তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া ঐ সাপলা ঝোপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বীণা জানে, সম্মুখে বীণার মাঠের তিনটা মাঠ বাদ দিয়া চতুর্থ মাঠের আলটা বাঁধা। দূরে একটা পুকুরের পাড়ে পাঁচিশটি তালের গাছ, দক্ষিণ দিক হইতে পাঁচটা গাছের পর যে ফাঁকটুকু আছে দিনের সূর্য সেইখানে গিয়া পৌঁছিলেই তাহার রঙ হয় লাল—বীণা তখন বুঝিতে পারে, সূর্যাস্ত হইতে আর দেরি নাই।

কিন্তু আজকাল তার ও-সবের দিকে যেন নজর কম, আজকাল সে দেখে শুধু মানিকগঞ্জ হইতে আসিবার ট্রেন। ট্রেনের জানলাপথে আরোহীদের মধ্যে সুকুমারের অনুসন্ধান করে। নিরাশ হইয়া শেষে চুপ করিয়া বসে। বহুদূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া ঠিক বলিয়া দিতে পারে—মালগাড়ি কি প্যাসেঞ্জার।

দুদিন যায়, তিনদিন যায়, চারদিনের দিন—তখনও সে আশা ছাড়ে না, মনে হয় সুকুমার আসিবে।

কিন্তু দিনের পর দিন পার হইয়া শেষে সপ্তাহ পার হইয়া গেল, সুকুমার আসিল না।

বীণা ভাবে, বিবাহ না করুক, ছেলেটি বেশ ভালো ছেলে, কয়লার কারবার করিয়া বেশ দু' পয়সা রোজগার করে। যে-মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে সে হয়তো তপস্যা করিতেছে। নিজের রোজগার ছাড়িয়া দিয়া এখানে তাহার এমনই বা কী আকর্ষণ যে, বসিয়া বসিয়া দুদিন গল্প করিয়া যাইবে। আসিতে সে পারে না, আর কেমনই-বা. আসিবে, আর সেই বা নিতান্ত স্বার্থপরের মতো তাহার আসিবার কথাই বা ভাবে কেন?

হরিপদর জামাটা বড়ো ময়লা হইয়াছিল, বীণাকে সে সেদিন ডাকিয়া বলিল. 'জামাটায় আজ একটু সাবান দিয়ে দিও তো!'

সাবান দিবার জন্য জামাটা সে উঠানে লইয়া যাইতেছিল, পকেটে কিছু আছে কিনা দেখিবার জন্য একটা পকেটে হাত ঢুকাইতেই ভারি মতো কী একটু বস্তু তাহার হাতে ঠেকিল—'এটা কি গো?'

জিনিসটা বাহির করিয়া বীণা দেখিল—লাল কাগজের বাক্সয় মোড়া তরল আলতার শিশি। জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গো, এটা তুমি পেলে কোথায়?'

আহারাদির পর হরিপদ একবার গড়াইয়া লইতেছিল, বলিল, 'দেখলে, কীরকম মনের ভুল। আজ চারদিন ধরে বলব বলব করেও ভুলে গেছি। সুকুমার সেদিন রাত্রের ট্রেনে মানিকগঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরছিল, গাড়ি থেকে আমায় ডেকে তোমার জন্যে ঐ আলতার শিশিটে দিয়ে গেছে, এত করে বললাম তা কিছুতেই নামল না, বললে, বড়ো জরুরি কাজ আছে দাদা, আজ আসি।'

অনেকক্ষণ ধরিয়া আলতার শিশিটা বীণা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল। খুলিয়া দেখিল, চমৎকার আলতা! রক্তের মতো লাল!

তাহার পর দেড় বৎসর পার হইয়াছে। সুকুমার আর আসে নাই। হরিপদর আরও চার টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

তখন বসন্তকাল। পলাশের ঝোপে. লাইনের ধারে, যেখানে সেখানে যখন তখন কোকিল ডাকিতে শুরু করিয়াছে। এমনি দিনে হরিপদর বদলির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া আসিল।

বদলি হইয়াছে প্রকান্ড এক জংসন স্টেশনে। সেখান হইতে বেশি দূরে নয়। বীণার মামার বাড়ির কাছেই।

কিন্তু হইলে কী হয়, বীণার যেন এখন আর সে উৎসাহ নাই। গত তিন-চার মাস তাহাকে ম্যালেরিয়া ধরিয়াছে। অত রূপ তাহার এই অল্পদিনের মধ্যেই কেমন যেন ম্লান হইয়া গেছে।

বাসার জিনিসপত্র রামধনিয়া বাঁধাছাঁদা করিয়া দিল। লছমি আসিয়া চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। যে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য বীণা একদিন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এই সুদীর্ঘ নয় বৎসরের পর বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে বীণার চোখে জল আসিল।

জংশন স্টেশনের চমৎকার কোয়ার্টার। বাড়িগুলোও বড়ো, উঠানে জলের কল, স্নান করিবার ঘর, চৌবাচ্চা, ইলেকট্রিকের আলো। চারিদিকে লোকজন, গাড়ি, ঘোড়া, সাহেব মেম—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোটোখাটো শহরের মতো জায়গা। লালফুলে ভরা প্রকান্ড একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ দরজার সম্মুখে একেবারে তাহাদের উঠানের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

হরিপদ হাসিয়া বলে, 'কেমন? হয়েছে তো এবার?'

বীণাও ম্লান একটুখানি হাসে। ঘাড় নাড়িয়া বলে, হ্যাঁ।

হরিপদ বলে, 'ভালোই হলো। এখানে এসে শরীরটা তোমার সারবে এবার। রেলের

একজন খুব বড়ো ডাক্তার আছে, কালই একবার ডেকে দেখাবো ভাবছি।'

বীণা বলে, 'না গো না, আর ডাক্তার দেখাতে হবে না। এমনিই সেরে যাবে।'

কিন্তু সারে না। স্নান করিতে গেলেই গায়ে জল ঠেকিবামাত্র শরীরটা তাহার কেমন শিরশির করিয়া ওঠে, স্পষ্ট জ্বরও হয় না, অথচ ভিতরে ভিতরে দিন দিন দুর্বল হইয়া যায়, তাহাতেই কোনোরকমে নিজের হাতেই সংসারের কাজকর্ম করে, স্নান করে, ভাতও খায়—অথচ মুখ ফুটিয়া স্বামীকে কোনোদিন কোনোও কথাই বলে না।

বলে না তো বলে না। হরিপদও নিজের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকে, ডাক্তার আনিবার কথা সে ভুলিয়া গেছে।

এখানে আসিয়া অবধি হরিপদর প্রায়ই রাত্রে 'ডিউটি' পড়ে, দিনের বেলা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

সেদিন সে অমনি ঘুমাইতেছে, রান্না সারিয়া হরিপদকে স্নান করিবার জন্য উঠাইতে গিয়া বীণা থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

বলিল, 'ওগো আমার জ্বর এলো।'

লেপের পর লেপ চাপা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াও হরিপদ বীণার কাঁপুনি আর থামাইতে পারে না।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লেপের তলা হইতে বীণা বলিল, 'ওগো তুমি রাত জেগেছো, যাও স্নান করো গে, করে নিজেই চারটি হেঁসেল থেকে—কী আর করবে লক্ষ্মীটি......' বলিয়া লেপের তলায় ছাতড়াইয়া ছাতড়াইয়া হরিপদর হাতখানা বীণা তাহার আগুনের মতো গরম হাত দিয়া ধরিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সে কান্না হরিপদ দেখিতে পাইল না।

'দাঁড়াও, আজই ডাক্তার আনছি।' বলিয়া সে স্নান করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

নিজেই ভাত বাড়িয়া খাইয়া হরিপদ ফিরিয়া আসিতেই বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'খেলে? ভালো করে খেয়েছো তো? কাঁসার সেই বড়ো বাটিতে মাছের ঝোল ছিল, কলাই-করা সেই সাদা রঙের—'

কথাটা হরিপদ তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না, বলিল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবই খেয়েছি। তুমি একটুখানি চুপ করে ঘুমাও দেখি। আমি ডাক্তার ডেকে আনি।'

বীণা তাহার মুখের ঢাকা খুলিয়া বলিল, 'না, তুমি যেও না। ডাক্তার ডাকতে হয়—এরপর ডেকো।'

এই বলিয়া সে একদৃষ্টে তাহার স্বামীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আমায় এক গ্লাস জল দিয়ে তুমি ঘুমোও। তোমায় আবার রাত জাগতে হবে।'

বীণাকে জল খাওয়াইয়া হরিপদ সত্যিই ঘুমাইল।

বৈকালে ঘুম ভাঙিতেই দেখে, বীণা বসিয়া বসিয়া একটা ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতেছে। হরিপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, 'ওকি! ও কি হচ্ছে?'

বীণা হাসিয়া বলিল, 'জ্বর আমার অনেকক্ষণ সেরে গেছে।'

হরিপদ বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'পাগল হলে নাকি?'

বীণা তাহার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখ গায়ে হাত দিয়ে।'

হরিপদ তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, সত্যিই তাই। জ্বর তাহার ছাড়িয়া গেছে।

বীণা বলিল, 'বড়ো খিদে পেয়েছে। কী খাই বলো দেখি?'

হরিপদ উঠিয়া দাঁড়াইল। জামা গায়ে দিয়া বলিল, 'দাঁড়াও আগে ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকি।' বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, 'ম্যালেরিয়া-পুরনো জ্বর, ও-অমনি আসে আর যায়।

খেতে দিন, কিন্তু একবার চেঞ্জে পাঠাতে পারলে ভালো হয়।'

হরিপদ খানিক ভাবিয়া বলিল, 'চেঞ্জে? পাড়াগাঁয়ে পাঠালে চলে?'

ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চলে।' বলিয়া তিনি ঔষধের প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলেন।

ঔষধ চলিতে লাগিল।

জ্বর অমনি আসে আর যায়। হরিপদ বুঝাইয়া বলে, 'দেখো, আমি কিছুদিন না হয় হোটেলেই খাই, আমার কোনোও কষ্ট হবে না। তুমি যাও দিন কতক মাসীমার কাছেই থেকে এসো গে, কেমন?'

বীণা বলে, 'না গো না, আমার কিছু হবে না, আমি বেশ আছি।'

হরিপদ রাগ করিয়া বলে, 'তোমার সঙ্গে কে পারবে বলো! বেশ থাকো, অমনি করে জ্বর আসুক আর অনাচার অত্যাচার করো, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকবে, এখন হোটেলে খেতে দিচ্ছ না, তখন আমায় নিজে রেঁধে খেতে হবে।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'মরি মরি, নিজে রেঁধে খাবার লোকটি কেমন! তখন তুমি আর-একটা বিয়ে করবে।'

হরিপদ আর জবাব দেয় না। রাগ করিয়া নীরবে বসিয়া থাকে।

বীণা তাহার রাগ ভাঙাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। বলে, 'না গো না, রাগ করলে? না না, বিয়ে তুমি করবে না আমি জানি। তোমার বিয়ে করবার সময় কোথায়?'

এমনি করিয়া রাগ-অভিমানের পালা চলিতে চলিতে বীণাকে একদিন রাজী হইতে হইল। বলিল, 'আচ্ছা তবে তাই, আমায় দিয়েই এসো বাপু, শরীরটা না হয় সারিয়েই আসি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

বীণা বলিল, 'আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলো—ওগো না ছি! হোটেলে আবার মানুষ খায়! তার চেয়ে এক কাজ করো, এখানে একটা রাঁধুনী বামুন পাওয়া যায় না?'

হরিপদ বলিল, 'আচ্ছা তাই না হয় একটা বামুন-টামুন দেখে বাড়িতে রান্না করিয়েই খাবো।'

বীণা বলিল, 'খাবো নয়। তোমায় আমি খুব ভালো করে চিনি। পকেটে অলক্তার শিশি রেখে যে চারদিন ভুলে যায়...... বামুন তুমি একটা নিয়ে এসো-ডেকে। তাকে আমি দেখিয়ে-শুনিয়ে দিই, দু-দিন রান্না করুক, আমি দেখি— তারপর......'

ব্রাহ্মণ এক ছোকরাকে পাওয়া গেল। নাম যতীন। সেখান হইতে ক্রোশখানেক দূরের একটা গ্রামে তাহার বাড়ি। রাঁধে ভালো। কাজকর্মও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বীণা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিল। তাহার পর স্বামীকে তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া ঠিক সময়ে স্নানাহার করিবার শপথ করাইয়া জানাইল যে, সে যাইতেছে বটে কিন্তু মোটেই সেখানে বেশিদিন থাকিতে পারিবে না, চিঠি লিখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসে।

'বাক্স আমি নিয়ে যাব না। দু-চারখানা কাপড় জামা তোমার ঐ টিনের হাতবাক্সটাতে যা ধরে তাই নিয়েই আমি চললাম। তারপর দরকার হয় মামীমা দেবেন, সেজন্য ভেবো না।'

দিন কয়েক পরে একটি দিনের মাত্র ছুটি লইয়া হরিপদ তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসিল।

বাপের বাড়ি কাছেই, কিন্তু সেখানে তাহার মাও নাই বাবাও নাই, মামার বাড়িতেই ছেলেবেলা হইতে মানুষ, তাই তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসা ছাড়া উপায় কী?

বীণার চিঠি আসে—সে ভালোই আছে। জ্বর একটু-আধটু মাঝে মাঝে আসে বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়, আসে আর যায়।

চিঠি পড়িয়া হরিপদ খুশি হয়। আহা, এতদিনের সাধ তাহার—বদলি হইয়া যদিই বা সে জংশন স্টেশনে আসিল, আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যেও সে সুখে বাস করিতে পায় নাই, এইবার সে সারিয়া আসিয়া আবার সেই আগের মতোই হাসিয়া খেলিয়া কাজ করিয়া বেড়াইবে।

কিন্তু দুনিয়ার বিধাতা বুঝি হরিপদর চেয়েও নিষ্ঠুর। তাহারই মতো অন্ধ।

এক মাস পার হইতে-না-হইতেই বীণার মামীমার কাছ হইতে চিঠি আসিল : 'বীণার যেমন জ্বর হইত, তেমনি জ্বর আসিতেছে, দিন চার-পাঁচ আগে জ্বরটা একটু বেশি করিয়াই আসিয়াছে, এখনও বন্ধ হয় নাই, কাল রাত্রে একটু বিকারের মতো হইয়াছিল, ভুল বকিতে বকিতে হঠাৎ বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেছে, জ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। তুমি বাবা একবার আমার এই চিঠিখানি পাইবামাত্র আসিও।'

চিঠিখানি পাইবামাত্র হরিপদর মাথা ঘুরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ স্টেশনমাস্টারের কাছে গিয়া ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া একশিশি ঔষধ লইয়া হরিপদ ট্রেনে চড়িয়া বসিল।

গ্রামে ঢুকিতে বুকখানা তাহার অজানা আতঙ্কে দুরুদুরু করিতেছিল, তবু

সে গ্রামে ঢুকিল। লোকজনের মুখের পানে তাকাইতে তাহার ভরসা হইল না। কোনো-রকমে মুখ নিচু করিয়া মামীমার ঘরের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেলো মামীমা নিজেই দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হরিপদকে দেখিবামাত্র তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিপদ তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে মামীমা বলিলেন, 'হয়ে গেছে বাবা, বীণা চলে গেছে।' আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। হরিপদ তখন মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে। চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইতেছে, ঠোঁট দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। এমন অকস্মাৎ সে যে চলিয়া যাইবে কে জানে!

মামীমা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। বীণার ঔষধের শিশিটা সেইখানেই কাত হইয়া পড়িয়া রহিল।

দেখা গেলো, শবদাহের জন্য গ্রামের লোকজন আসিয়া উঠানে জড়ো হইয়াছে। সুমুখে ঘরের মেঝের উপর বীণার মৃতদেহ আপাদ-মস্তক সাদা চাদর দিয়া ঢাকা।

চাদরখানা সরাইয়া দিয়া উন্মাদের মতো হরিপদ তাহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মামীমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'যাবার সময় কিছু বলে গেল না বাবা, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।'

কথাটা শুনিয়া হরিপদর কান্না যেন আরও বাড়িয়া গেল। বীণার সেই অর্ধ-মুদ্রিত ঘোলাটে দুইটি চক্ষুর পানে তাকাইতে গিয়াও সে আর তাকাইতে পারিল না। বুকের ভিতরটা তাহার মোচড় খাইয়া হুহু করিয়া উঠিতেই সে মামীমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, 'আসতে সে চায়নি মামীমা, আমি ওকে জোর করে পাঠিয়েছিলাম।'

নদীতীরে শ্মশানে বীণার মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে চোখের সুমুখে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলো।

হরিপদকে মামীমা বারবার করিয়া শ্মশান হইতে বাড়ি ফিরিতে বলিয়াছিলেন, শবযাত্রীরাও বারে বারে তাহাকে গ্রামে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু হরিপদ কাহারও কথা শুনিল না। অবস্থা তখন তাহার ঠিক পাগলের মতো। বীণার হাতের আটগাছি সোনার চুড়ি ও কানের দুলটি লইয়া ভিজা কাপড় পরিয়া ভিজা জামাটা কাঁধে ফেলিয়া নদীতীরের পথের উপর দিয়া হরিপদ চলিয়া গেলো। পুরোহিত তাহার পিছনে পিছনে কিছুদূরে ছুটিয়া আসিয়া কাঁচামাটির একটা ঢেলার মধ্যে খানিকটা চিতাভস্ম ও বীণার অস্থি কয়টি তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'পারো তো এইটি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিও, বুঝলে? দিতে হয়।'

মাটির ঢেলাটি হরিপদ হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল।

ট্রেনে চড়িয়া হরিপদ তাহার নির্দিষ্ট স্টেশনে নামিয়া বাসার দিকে চলিতে লাগিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রেললাইনের উপর দিয়া প্রকাণ্ড একটা সেতু পার হইতে হয়। তাহার উপর দিয়া হরিপদ ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে এই স্টেশনে কয়েকবার মালগাড়ি হইতে প্রচুর জিনিসপত্র চুরি যায়, তাই এখন এখানে বহুদূর পর্যন্ত ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা। আলোগুলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে লোহার লাইন, আর তার, আর গাড়ি। অদূরে 'লোকো-শেড'। কালো কালো প্রকাণ্ড দানবের মতো ইনজিনগুলো হুস হুস করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। ওদিকে ইলেকট্রিকের ইনজিন ঘর, ওদিকে কারখানা, ওদিকে যন্ত্র, ওদিকে কল। শুধু লোহা আর ইস্পাত। শুধু স্টীম আর আগুন! হরিপদর আপিসটা দেখা যাইতেছিল। কলের মতো লোকগুলো, সেখানে কাজ করিতেছে। মনে হইল, সে নিজেও ঐ কারখানার সামিল। যন্ত্রের মতো পরের ইঙ্গিতে সেও তাঁহার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের যাত্রাপথে অন্ধের মতো হাঁটিয়া চলিয়াছে। ছুটি নাই, অবসর নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই—মৃত্যুপথযাত্রী বীণাকে একটু দেখিবার অবসর পর্যন্ত নাই। বীণার কথা মনে হইতেই তাহার চোখের সুমুখে যেন হুহু করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—নদীতীরের সেই শ্মশান আর সেই চিতা। আর সেই ধূম, সেই আগুন, আর সেই নিঃসাড় নিস্পন্দ বীণার মৃতদেহ।... হাতে তাহারই অস্থি!

ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া হরিপদ সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা দিয়া তাহার কোয়ার্টারের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কোয়ার্টার। এইখান হইতেই সে জোর করিয়া বীণাকে মামীমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছিল। ঘরের বাহিরে একটা আলো জ্বলিতেছে। দেখিল,—যতীন ছোকরাটি বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হরিপদ তাহাকে আর জাগাইল না। ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিল। ভিজা কাপড় প্রায় শুকাইয়া গেছে। জামাটা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখিতে গিয়া ঠক করিয়া কিসের যেন শব্দ হইল। হাত দিয়া দেখিল, বীণার চুড়ি। বীণার চুড়ি ও দুল সে বীণার বাক্সেই রাখিয়া দিবে ভাবিয়া খাটের নিচে বালিশের তলা হইতে তাহার চাবির তোড়াটি বাহির করিয়া সে বাক্স খুলিল। বীণার সেই বাক্স। তাহারই নিজের হাতে সাজানো জিনিস। কিন্তু একি। থাকে থাকে কাপড়-জামা সব যেন লাল। মনে হইল সব যেন রক্তে ছোপানো। হরিপদ তাহার চোখ দুইটি ভালো করিয়া রগড়াইয়া লইল, দেখিল, না, চোখের ভুল নয়, সত্যিই তাই। কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কাপড়-জামাগুলি হরিপদ নামাইতে লাগিল। দেখিল, বাক্সের এককোণে সযত্নে রক্ষিত সুকুমারের দেওয়া সেই আলতার শিশিটি। ভাঙিয়া কোন্ সময় সমস্ত আলতা গড়াইয়া পড়িয়াছে।

কয়েকটি কাপড়ের তলায় দেখিল, তাহারই দেওয়া রেল কোম্পানীর একটি সাদা খাতা। খাতার কয়েকটি পাতা ছিঁড়িয়া চিঠির মতো কী যেন লেখা হইয়াছে, কাগজগুলি হরিপদ তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। বীণার হাতে লেখা কয়েকখানি চিঠি। কিন্তু চিঠির অধিকাংশ লাল আলতার দাগে অস্পষ্ট।

একখানি চিঠির কিয়দংশ সে পড়িতে লাগিল। লেখা আছে—

'ভাই ঠাকুরপো—' তাহার পর অনেক-গুলি অক্ষর কাটা! তাহার পর লিখিয়াছে, 'তোমাকে যে চিঠি দেবো কিন্তু ঠিকানা জানি না যে!'

সে চিঠিখানার আর কিছু পড়িবার উপায় নাই।

আর একখানি চিঠি! আগাগোড়া সবই লাল, মাঝখানে মাত্র কয়েক লাইন...... 'সাজলে আমাকে ভালো দেখায়। তুমি যে আমায় আলতা পরিয়া ভালো করিয়া সাজিতে বলিলে, কিন্তু কাহার জন্য সাজিব ভাই? কে দেখিবে?

চব্বিশঘণ্টা সে তাহার কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে তাহার কি আর দেখিবার অবসর আছে ছাই!...'

হরিপদর হাত হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাগজগুলি মাটিতে পড়িয়া গেলো। মাথার ভিতরটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল এবং তাহার দুই মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে মনে হইল যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লাল রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে অজস্র ইনজিন আর ধোঁয়া, কল আর কারখানা, টেলিগ্রাফের তার আর যন্ত্রের শব্দ!... ওদিকে হুইশল বাজিল, এদিকে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, রামধনিরাম চিৎকার, লছমির ঝগড়া......

টেলিগ্রাফ আসিয়াছে বীণার অসুখ, বীণা রাগ করিয়াছে, বীণা চলিয়া যাইবে। সত্যিই তো! তাহার অবসর কোথায়! তাহার অবসর কোথায়!...

কোয়ার্টারের মাঠে যাত্রা শুনিয়া যতীন এমন ঘুম ঘুমাইয়াছে যে, উঠিল যখন তখন প্রভাত হইয়া গেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, দরজা খোলা, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, বাবু কোন্ সময় আসিয়াছেন তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিতেই দেখে, বাবুর খালি গা, খালি পা, বাক্স খোলা, বাক্সের জিনিসপত্র ঘরময় ইতস্তত ছড়ানো, আর তাহারই মাঝখানে বাবু তাহার বাক্সের ডালির উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

আর—পাশের বাড়ির একটা সাদারঙের একটা পোষা বিড়াল বীণার সেই অস্থি-পিণ্ডটা লইয়া বড়ো মেঝের উপর পা দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া খেলা করিতেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মিহির সেন

শৈলজানন্দ গল্পলেখক হিসেবে যখন বাংলা সাহিত্যে প্রথম পদার্পণ করেন, বাংলা সাহিত্য তখন এক পর্বান্তরের মুখে।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীব্যাপী চরম নৈরাশ্য, নিরর্থকতাবোধ ও মানসিক নিরাপত্তার শিকার তখন উপনিবেশ ভারতবর্ষও। সামাজিক, অর্থনৈতিক এক অবক্ষয়ের চিহ্ন সমাজ-জীবনের সর্বত্র।

তারুণ্যের স্বাভাবিক ধর্মেই এই সমাজ-পটভূমি বিধৃত বিক্ষুব্ধ যুব-মানস তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেদিন। সাহিত্যে সে বিদ্রোহ প্রতিফলিত হয়েছিল সর্বপ্রকার সনাতন মূল্যবোধ, প্রচলিত শিল্পাদর্শ ও প্রথানুগ রীতি-প্রকরণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হিসেবে। পুরাতন সব কিছু অস্বীকারের মাধ্যমে।

কিন্তু এই অস্বীকৃতির বিকল্প হিসেবে শিল্পাদর্শের মহৎ কোন অঙ্গীকার সামনে না থাকায় এই বিদ্রোহ বেশির ভাগই ছিল বাহ্যিক ভাবোচ্ছ্বাস।

সাহিত্যে এই বিদ্রোহী তারুণ্যের মূল মুখপত্র ছিল সেদিন 'কল্লোল'। সহযোগী-- 'কালিকলম', 'প্রগতি' ও অন্যান্য কটি সহধর্মী পত্রপত্রিকা।

যদিও শৈলজানন্দর প্রথম গল্প 'কয়লা-কুঠি' প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক বসুমতী পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২৯) এবং একই বৎসরে প্রবাসী পত্রিকায় কয়লাখনি অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত রোজিং-রিপোর্ট ও অন্যান্য কয়েকটি গল্প পাঠকদের রীতিমত সচকিত করে তুলেছিল, তবু পত্রিকার জন্মাবধি কল্লোলের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ সংযোগই শৈলজানন্দকে পরবর্তীকালে কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত লেখক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শৈলজানন্দ ছিলেন কল্লোলের একজন অন্যতম উদ্যোক্তাও। কালি-কলমের সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এবং এসব পত্র-পত্রিকার তিনি ছিলেন অক্লান্ত লেখক।

কিন্তু নির্মোহ সাহিত্য-বিচারে শৈলজানন্দকে বোধ হয় পুর্ণত কল্লোলধারার লেখক হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। কল্লোলের সঙ্গে তাঁর যেটুকু যোগ তা বহিরাঙ্গিক কর্মের; মর্মের নয়। কল্লোলের মিলিত স্রোতধারায় তাঁরা হয়তো ছিলেন সমগ্র, কিন্তু শিল্প-চেতনা ও জীবনদর্শনের আপন গতিপথে শৈলজানন্দ ছিলেন স্বতন্ত্র।

শৈলজানন্দের সঙ্গে সমকালীন কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের আপাত মিল ছিল একমাত্র বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৈচিত্র্যে।

অনেক সময়েই দেখা যায়, পুরনো অভ্যাসে গা না ভাসিয়ে সৎ শিল্পীরাও বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং বিভিন্ন রীতি-নিরীক্ষার চমকের দিকে পা বাড়ান—এ ইতিহাসের পরীক্ষিত সত্য। কল্লোলধারার লেখকরাও সেদিন চরম অতৃপ্তিবোধ ও অকৃত্রিম ক্ষোভ থেকে গল্পের বিষয়বস্তু সন্ধানে পরিচিত পরিবেশের বাইরে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। কৃত্রিম সহুরে সভ্যতার আওতার বাইরে জীবন যেখানে অশিক্ষা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আদিম উদ্দাম, কিন্তু সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত—নতুন কোন জীবন-পটভূমির অনুসন্ধান করেছিলেন সেখানেই।

এই একই কারণে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মপ্রতারণা ও সীমাবদ্ধতায় অতৃপ্ত শিল্পী শৈলজানন্দ তাঁর গল্পের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আশৈশব পরিচিত সাঁওতাল জীবন ও কয়লাখনি অঞ্চলকে।

সাঁওতাল জীবনের নিরাবরণ আদিম সারল্য, সততা, প্রতিহিংসা, পৌরুষের উদ্দাম জীবনধারা দেখেছিলেন তিনি নিজস্ব পৈত্রিক বাসভূমি বীরভূমের পল্লীতে। আবার বিপরীতে, মাতুলালয় রানীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনির পটভূমিতে দেখেছিলেন তাদেরই

দীনতা হীনতার লাঞ্ছিত রূপ। সাঁওতাল জীবনের এই দ্বৈত রূপই তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে। যার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে তাঁর সাঁওতাল, সাঁওতালপল্লী, প্রতিবিম্ব, মজলিস্‌রোডের জননী, বনের হরিণ ছিল বনে প্রভৃতি অসংখ্য গল্পে।

কিন্তু শিল্পবোধ ও জীবনদর্শনগত মৌল-চেতনায় শৈলজানন্দ ছিলেন মূল কল্লোলধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কল্লোল-যুগের প্রধান দুটি লক্ষণ, যাকে অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত চিহ্নিত করেছেন—প্রবল বিরুদ্ধবাদ ও বিহ্বল ভাববিলাস-রূপে—শৈলজানন্দের রচনা প্রথমাবধি ছিল তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন বিরুদ্ধতা নয়, বিদ্বেষ নয়, উচ্ছাস বা আতিশয্য নয়, জীবনকে দেখেছিলেন তিনি এক প্রশান্ত সহানুভূতির দৃষ্টিতে। লেখকের আপন-কথায়, 'ভালয় মন্দয় মেশানো এই অসহায় মানুষগুলোকে ভালবেসেছিলাম। ভালবেসেছিলাম গোটা মানুষকে।'

এই 'গোটা মানুষ'কে ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর ভেতর কোন অহেতুক শুচিবায়ুগ্রস্ত ছুঁৎমার্গ ছিল না। নীচতা-হীনতা, লোভ-ঈর্ষাসহ গোটা মানুষকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে হাজির করেছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে যা বৃহৎ, যা মহৎ, যা কল্যাণকর সেই শক্তিকে খুঁজে বের করা। চিরন্তন জীবন-সত্যকে আবিষ্কার করা।

এই শিল্পদৃষ্টিই বহু ক্ষেত্রে শৈলজানন্দর গল্পকে জীবনের প্রত্যক্ষ উপায়ে নিছক তথ্য-চিত্র হবার আশংকা থেকে উত্তীর্ণ করেছে। আপাত-রুক্ষ জীবন-চিত্রেও এনেছে এক দেশকালাতীত গভীর ব্যঞ্জনা।

'নারীর মন' গল্পের পীরু মাঝির বউ ভুলির কথাই ধরা যাক। স্বামীর সঙ্গে ছোট বোন টুরনির ভাব দেখে ঈর্ষার আগুনে জ্বলছে ভুলি। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্বামীর হাতে নিগৃহীতা হয়। স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রথম বয়সের প্রেমিক ভোলাকে এনে উস্কায়, গায়ের জোরে সে যদি পীরু মাঝিকে হারাতে পারে তাহলে ভোলাকে সাঙা করবে ও। অথচ আশ্চর্য, ভুলি জানত, ভোলা পীর মাঝির হাতে পরাস্ত হবে। হলও তাই এবং পরাজিত ভোলার সামনে দাঁড়ান স্বামীর ক্রোধদৃপ্ত পৌরুষ দেখে ওর মন আনন্দে ভরে গেল। শুধু তাই নয়, 'আজ যদি তাহার সহিত স্বামীর সদ্ভাব থাকিত, তাহা হইলে সে হয়তো বিজেতা স্বামীর গলা জড়াইয়া সহস্র চুম্বনে তাহাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইত।'

কিন্তু নারীমনের রহস্য-সন্ধানই এ গল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই ঘটনার পর এক বস্ত্রে ভুলি স্টেশনে চলে আসে। টুরনির জন্য তখন ট্রেনের সামনে অস্থির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আড়কাঠি। টুরনি কুলি হিসেবে আসাম যেতে রাজী হয়ে আগাম টাকা নিয়েছে তার কাছ থেকে। ভুলি এসে সেই টাকার বিনিময়ে টুরনির বদলে ওকে কুলি হিসেবে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানায়। আড়কাঠির কাছে টুরনি যা ভুলিও তাই—মাথা গুণতিতে একজন পেলেই হল। ভুলির আর্জি মঞ্জুর করে তাই। ভুলিও সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে উঠে বসে। ট্রেন ছাড়লে চোখে পড়ে, টুরনি ছুটতে ছুটতে স্টেশনের দিকে আসছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শেষবারের মত একবার ছোট বোনকে প্রাণভরে দেখে নেয় ভুলি। চোখে জল।

এই চোখের জলেই গল্প শেষ। কিন্তু এই চোখের জলের মধ্য দিয়েই প্রতিহিংসা-পরায়ণা সাঁওতাল মেয়ে ভুলির চিরন্তন এক মহৎ প্রেমিকায় রূপান্তর।

এ রকম নজির ছড়িয়ে আছে শৈলজানন্দর অনেক গল্পেই।

এই স্বতন্ত্র সিল্প-চেতনাই শৈলজানন্দর রচনাকে স্বেচ্ছা-সংযমী করেছিল। কল্লোল-কালীন কিছু যুগলক্ষণ—আতিশয্য, উচ্ছাস, দৃষ্টিকটু আত্মপ্রক্ষেপণ বা জীবন সন্ধানের নামে যথেচ্ছ যৌন-জীবন চিত্রণের অত্যুৎসাহ, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কিছু করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করার দাপট—তা থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন শৈলজানন্দ। অথচ, গল্পের জন্য যে আদিম জীবন ও অন্ধকার কয়লা খাদকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি, তাতে তথাকথিত 'বাস্তবতা'র মোড়কে উগ্র যৌন-জীবন বর্ণনার অবারিত সুযোগ ছিল তাঁরই।

শুধু বিষয়-বর্ণনায় নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনেও শৈলজানন্দ যথেষ্ট সংযমী ছিলেন। মধ্যবিত্ত জীবনেরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যেটুকু পেয়েছেন তার বাইরে প্রায়শই হাত বাড়ান নি তিনি। বাড়ালেও, যে মুহূর্তে সে প্রচেষ্টায় সৌখীন-মজুদুরির ব্যর্থতা আশংকা করেছেন, সেই মজদুরির ব্যর্থতা আশঙ্কা করেছেন, সেই অভিজ্ঞতার গন্ডীতে।

শুধু জীবন-দর্শনই নয়, রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্যেও শৈলজানন্দ ছিলেন এক একক-ব্যতিক্রম। তাঁর রচনায় অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের বাগ-বৈদগ্ধ ছিল না। প্রেমেন্দ্র মিত্রর রীতি-কুশলতাও না। কিন্তু নিরাসক্ত, নির্মোহ এক স্বচ্ছ-প্রবাহ ছিল তাঁর রচনায় সম্পদ। শৈলজানন্দর সাহিত্যের পাঠ প্রত্যক্ষ জীবনের পাঠশালায়। বিদেশাগত কোন দর্শন বা রীতির প্রেরণা বা প্রভাব মুক্ত ছিলেন তিনি। অত্যন্ত সহজিয়া ভঙ্গীতে নিত্য প্রবাহিত পরিচিত জীবন-নাট্যের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে এক নিরাসক্ত দর্শকের মতই তুলে ধরেছেন তাই তাঁর সাহিত্যে। অনেক সময় যে নিরাসক্তকে জীবনের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্য বলে ভ্রম হবারও সম্ভাবনা থাকে। আত্মপ্রক্ষেপহীন এই নির্মোহ রচনাভঙ্গী থেকে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিকতার পূর্বসুরী কি শৈলজানন্দই?

গ্রামের মাঠ পেরিয়ে ট্রেনখানা দেখতে দেখতে অনেকদূর চলে গেল। কেবল তার অস্পষ্ট আওয়াজটা চারিদিকের বিশাল মাঠের বুকে ধুক ধুক করতে লাগলো। তারপরে শুধু রইলো নিঃঝুম নিরালা গ্রামের পথ।

মলিনাদি বললেন, পূর্ণবাবু, নামলেন ত মাঠের মাঝখানে, যাবো কোন্‌দিকে?

পূর্ণ বললে, একটু দাঁড়ান—স্টেশন-মাস্টারকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। আমি আসছি—।

বীণা চৌধুরী বললে, অমনি খোঁজ করবেন গোটা কয়েক ডাব যদি পাওয়া যায়।

আপনারা দাঁড়ান, আমি আসছি এক্ষুনি।—ব'লে পূর্ণ সোৎসাহে খোঁজ-খবর নিতে গেল।

মেয়েরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুব বেশী উৎসাহিত বোধ করছে মনে হোল না। তা ছাড়া স্টেশনটা বড়ই ছোট এবং এত যে সামান্য সেটা ওরা আগে কল্পনা করে নি। একা পূর্ণকে সম্বল ক'রে ওরা কতদূর কি করে উঠতে পারবে সেটা ভাবনার কথা বাকি।

একটু পরেই পূর্ণ ফিরে এলো। বললে, এনাৎপুরের ঘাট এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল, সেখানে গিয়ে নৌকা ধরতে হবে!

মলিনাদি একটু চমকে উঠে বললেন, পাঁচ মাইল! যাবো কিসে?

পূর্ণ বললে, হাঁটাপথ আছে শুনলুম, কিন্তু দক্ষিণগাঁ দিয়ে নাকি ঘুরে যেতে হয়।

আভা বললে, আপনি বুঝি আগে এতটা জানতেন না?

পূর্ণ হেসে বললে, মেয়েরা সঙ্গে থাকলে চারিদিকেই অকূল, দেখছেন ত?

বীণা বললে, ডাব পেলেন?

না,—ডাব কিম্বা চা কোনোটাই পাওয়া যায় না!

আভা ধমক দিয়ে বললে, অত ঘিবিয়ানা কেন শুনি? এক ঘটি জল গিললে তেষ্টা যায় না?

বীণা বললে, জল? এখানকার? যদি ম্যালেরিয়ায় ধরে?

মলিনাদি বললেন, অত ম্যালেরিয়ার ভয় নিয়ে কংগ্রেসের কাজে নামা ঠিক হয় নি বীণা।

আভা বললে, পূর্ণবাবু, আপনি ডোবালেন! কোথায় এনাৎপুর, কোথায় বা কুমোরপাড়ার মেলা! আসবার সময় বড়দা আমাকে ঠিকই বলেছিল। যমের বাড়ির চেয়েও দুর্গম!

বীণা বললে, মাঠ ত নয়, অগাধ জল!—এই ব'লে সে তা'র তৃষ্ণার্ত চোখ দুটো এদিক ওদিক প্রসারিত করতে লাগলো।

গ্রামের ফ্ল্যাগ স্টেশন। এখানে একটি বিশ্রামের জায়গাও আজো তৈরি হয় নি—জলখাবার ইত্যাদি ত দূরের কথা। স্টেশনের নীচে দিয়ে মানুষের আনাগোনার সামান্য একটি পথরেখা দূরে গ্রামের দিকে চলে গেছে। স্টেশনমাস্টার নতুন লোক, তিনি এদেরকে নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে আতিথেয়তা করতে সাহস পান না, কেননা এরা কংগ্রেসের লোক। অনুগ্রহ করার মধ্যে কেবল তিনি ব'লে দিলেন, কতদূরে গেলে গরুর গাড়ি পাওয়া যায়—এবং শ্রীমতী বীণার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দূরের গ্রাম থেকে আনা একঘটি টিউব-ওয়েলের জল! তাঁর কর্তব্যবুদ্ধি ওর বেশী এগোতে সাহস করলো না। তিনি এসে মেয়েদের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন। ইংরেজ রাজত্ব এখনো রয়েছে, কি করবো বলুন!

গাড়িতে রাত জেগে আসতে হয়েছে, সুতরাং যেমন ক'রেই হোক এনাৎপুরে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছতে হবে। স্টেশনের সীমানা পেরিয়ে এসে পূর্ণ অনেক পরিশ্রম এবং তম্বির-তদারকের পর দুখানা গরু-মহিষের গাড়ি ভাড়া করতে পারলো। কুমোর-পাড়ার মেলায় পৌঁছতে পারলে সেখানে সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত আছে। মেলাটা বসেছে গ্রামে, প্রধানত মেয়েদেরই উৎসাহে। ওখান থেকে ছোট শহরে যেতে গেলে প্রায় সাত ক্রোশ নদী পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু শহরে মেলা বসানো হয় নি। এই জেলার মেয়েরা,—যাদের মধ্যে দু'চারজন ওদের কলেজের সহপাঠিনী—তাদের বিশেষ আগ্রহ, দেশের প্রাণের ভিতরে গিয়ে কাজ করা। কর্মীদের কষ্ট অথবা হয়রানি এখানে বড় কথা নয়, আসল কথা, গ্রামকে বাদ দিয়ে আজকের দিনে কল্যাণজনক কোনও কাজেই নামা চলবে না।

ফসলকাটা চৈত্রের মাঠের মাঝখান দিয়ে দু'খানা গাড়ি উঁচুনীচু পথ ধরে চলেছে। মাথার উপরে ছই ভাঙা, গাড়ির জোড়জোড় আলগা। তাছাড়া চারটি জন্তুর সঙ্গে দুটি গাড়োয়ানের ভগ্ন ও ক্ষয়ক্ষীণ স্বাস্থ্যের এমনি সামঞ্জস্য ঘটেছে যে, ওদের নিয়ে খুব বেশীদূর যাওয়া চলবে না। মলিনাদি তাঁর ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বার ক'রে একটু-আধটু দেখে নেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অসমতল মাঠের ওলোট-পালটের হাত থেকে ক্ষণে ক্ষণে আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই তাঁর সময়টা কাটতে লাগলো। তাঁরা কলকাতার মেয়ে—গ্রাম এবং গরুর গাড়ি কোনোটাতেই অভ্যস্ত নন। কিন্তু তবু তাঁদের যেতে হবে, কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। কুটীরশিল্প প্রদর্শনীতে গিয়ে তাঁরা কয়েকদিন ধরে গ্রামবাসীদের কাছে বক্তৃতা করবেন। এ বিষয়ে তাঁরা গবেষণা করেছেন এবং শিক্ষাবিভাগের হাতে তাঁরা পুরস্কৃতও হয়েছেন। তাঁরা অযোগ্য নন।

মাথার উপর চৈত্রের খররৌদ্র। কোনদিকে জলাশয়ের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েরা সহজে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা প্রকাশ করতে চায় না, কিন্তু গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছবার অতিশয় ঔৎসুক্য লক্ষ্য ক'রে পূর্ণ সেকথা বুঝতে পারছিল। সামনের গাড়িখানায় ছিল বীণা আর আভা, তাদের কলরব অনেক আগেই থেমে গেছে; এবং মাঝে মাঝে দু'জনের অনুশোচনার ছিটেফোঁটা ওগাড়ি থেকে ছিটকে এ-গাড়িতে মলিনা ও পূর্ণর কানে এসে বিঁধছিল।

প্রায় ক্রোশ দুই পার হবার পর একটি ছোকরাকে পাওয়া গেল। পূর্ণ গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করলো, ওহে—শোনো শোনো।

বছর বারো বয়সের একটি কঙ্কালসার বালক ভীরু চক্ষু নিয়ে গরুর গাড়ির কাছা-

কাছে এসে দাঁড়াল। পূর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, এনায়েৎপুর আর কতখানি পথ হে?

ছোকরা আঙুল দিয়ে দেখালে, ঐ যে। আমাদের বাড়ি সেখানে।

মলিনাদি প্রশ্ন করলেন, ওখানে খাবার-দাবার কিছু পাওয়া যায়?

ছোকরা বললে, আপনারা কি চান?

মুড়ি, চিঁড়ে, মুড়কি...দুধ...

না, দুধ নেই। চিঁড়ে মুড়ি পাবেন।

বাজার আছে সেখানে?

ছোকরা জানালো, শনি-মঙ্গল ওখানে হাটের লোকেরা আসে। আজ বিষ্যুদবার!

মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। অর্থাৎ শুকনো চিঁড়ে মুড়কি ছাড়া আজকে আর কোনো আশা নেই। আভা বললে, আচ্ছা, এনায়েৎপুর থেকে কুমোরপাড়া কদ্দুর, ভাই?

ভাই সম্বোধনটি শুনে ছোকরা একটু যেন জড়োসড়ো হয়েই বললে, নৌকোয় গেলে কোশ তিনেক।

কখন পৌঁছবে?

আন্দাজ করে ছোকরা বললে, মেলায় যাবেন বুঝি?

সকলে সোৎসাহে বললে, হাঁ হাঁ...তুমি জানো দেখছি।

আমি যে ওখানে পুতুল নিয়ে যাই বেচতে।

কৌতূহলের অপর নাম নারী। সুতরাং ছেলেটা নানাবিধ প্রশ্নে বিপর্যস্ত হতে লাগলো। ছোকরার নাম ফকির। ঘরে তার এক দাদাভাই আছে,—সে নাকি পুতুল গড়ে। আজকাল রং পাওয়া বড় কঠিন। দাদাভাই-এর শরীর অসুস্থ, তবু তার তৈরী পুতুল নিয়ে ওই ছেলেটা কুমোরপাড়ার মেলায় দিয়ে আসে।

ফকির চলতে লাগলো দুখানা গাড়ির মাঝখান ধরে। সবাই মিলে তারা যখন এনায়েৎপুরে এসে পৌঁছলো, বেলা তখন তিনটের কম নয়।

বাঁশবাগানের এক মস্ত ঝোপ। গাড়ি দুখানা সেখানে একপাশে এসে দাঁড়ালো। কলকাতার লোক এবং জেলার মেয়েপুরুষ আজকাল ওই মেলার জন্য এই পথ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করছে, সুতরাং নবাগতদের দেখে ইতিমধ্যেই ওই ছোট্ট গ্রামটিতে সাড়া পড়েছিল। সুসজ্জিত, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা এই অজ্ঞাত অন্ধকার গ্রামের পক্ষে মস্ত বড় আকর্ষণ বৈকি। বিশেষ করে বালক-বালিকারা তাদের জীবনে এই প্রথম বিস্ময় উপভোগ ক'রে নিচ্ছে।

রৌদ্রের তাপে ওদের সকলের মুখ হয়ে উঠেছিল টকটকে, এতক্ষণে বাঁশবাগানের ছায়াতে এসে ওরা বাঁচলো। খদ্দরের শাড়ী ইত্যাদি পরিশ্রান্ত শরীরের পক্ষে [illegible] গুরুতর, কিন্তু উপায় নেই,—এ দৈন্য-দারিদ্র্যের মাঝখানে ওদের সৌখিন সাজ সত্যই বেমানান, একথা ওরা বোঝে। ওদের উন্নাসিক সংস্কার [illegible] মধ্যে শিশুর দলকে [illegible] ওদের ঝুড়ির মধ্যে ছিল খেলনা, বাঁশী, টিনের গাড়ি, চকোলেট, কাপড়ের টুকরো, সেগুলো ওরা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। ওরা বেশ সহজে ব'সে গেছে গাছের নীচে ঘাসের ওপর,—জমিয়ে গল্প ফেঁদেছে সবাইকে নিয়ে।

এমন সময় ফকিরকে নিয়ে পূর্ণ এসে দাঁড়ালো। বললে, চলুন মলিনাদি—এই, তোমরাও এসো—

কোথায়?

ফকিরদের ঘরে জায়গা পাওয়া গেছে। ছেলেটা বেশ ভালো। ওদের ওখানে হাত-পা ধুয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।

ফকিরদের ঘরে এসে ওরা উঠলো বটে, কিন্তু একটি অভাবনীয় নতুন সমস্যা দেখা দিল। ওরা লক্ষ্য করেনি, ঈশান কোণে কালো মেঘ মাথা তুলে উঠেছে। বাঁশবনে ইতিমধ্যেই ঝড়ের নিশ্বাস লাগতে আরম্ভ করেছে।

মলিনাদি চিন্তিত হয়ে বললেন, পূর্ণবাবু, ওদিকে দেখছেন? নৌকায় উঠতে সাহস হবে?

আভা ও বীণার মুখে আর কোনো কথা ফুটলো না।

চালাঘর বলতে গেলে একখানাই। আরেকটিতে সম্ভবত গরু-বাছুরের বাসা ছিল, সেটি এখন প্রায় জন্তুরও অগম্য। এদিক-ওদিক পা বাড়াবার উপায় নেই, সমস্তটাই জঙ্গলে সমাকীর্ণ। পাশেই একটা ডোবা,—সেই ডোবাটিও একটা বকুল গাছের ঝোপঝাড়ে আচ্ছন্ন। চালার অন্ধ অথবা আগল কোনোটাই নেই। ভিতরে এমন কোনো সামগ্রী দেখা যাচ্ছে না যাতে মনে হয়, একটা ঘরকন্না কোথাও কিছু আছে। এমন একটা শূন্য দারিদ্র্যের মাঝখানে মানুষের বাসা কেমন ক'রে যে দাঁড়িয়ে থাকে, সেটা হয়ত দেশের সেবায় না নামলে আর-সকলের মনে অবিশ্বাস্য ব'লেই থেকে যেতো। সুতরাং যেখানে অখণ্ড বৈরাগ্যে দম আটকে আসার কথা, সেখানে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে মলিনাদি ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

দূরের গ্রাম থেকে ফকির তার কোঁচড়ে চাউল কিনে নিয়ে ফিরছিল—এতক্ষণে জানা গেল। পশ্চিম দিকের গরুর ঘর থেকে বৃদ্ধ গলা বাড়িয়ে ডাকলো,—দাদু রে, চাল আনলি?

মেয়েরা সবাই মিলে বুড়োর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। সামনে মাটির তাল, এক হাঁড়ি জল এবং ছোটখাট দু'একটি সরঞ্জাম। বুড়ো শুয়ে রয়েছে একখানা ময়লা কাঁথার উপর। চোয়ালের হাড় এবং পাঁজরের কয়েকখানা গোনাগুনতি অস্থি ছাড়া তার শরীরের কোথাও মাংস নেই বললেই হয়। মেয়েদের দেখে লোকটা একটু উৎসাহ প্রকাশ করতে গিয়ে ভয়ানক কাশি আরম্ভ ক'রে দিল।

মলিনাদি ব্যস্তভাবে বললেন, থাক থাক, তুমি [illegible] যেয়ো না কর্তামশাই, আমরা [illegible]।

বুড়ো [illegible] মাস জ্বর ছাড়ে না, [illegible] নাই মা।

[illegible] বললে, ডোবার জল থাকতে জ্বর আর যাবে না [illegible] থেকে। ঢেঁকিগুলো সব বন্ধ হয়ে আছে। ঘর-ঘর আমাশা।

[illegible] বাইরে মেঘের গুরু-গুরু গর্জন শোনা গেল। মেয়েরা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এখানে নানাবিধ অসুবিধা—এই জঙ্গলের মাঝখানে আটকে গিয়ে ব'সে থাকলে তাদের চলবে না। মেলায় গিয়ে তাদের কাজে নামতে হবে, কাগজপত্র গোছাতে হবে,—এবং কলকাতায় অবিলম্বে একটি রিপোর্ট পাঠানোও দরকার।

বুড়ো তার নিজের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বীণার দিকে তাকিয়ে ছিল একাগ্র-ভাবে। বীণা এক সময় হেসে বললে, কী দেখছ কর্তামশাই?

বুড়ো বললে, তোমার চুলের গোছাটা কপালের ওপর তুলে দাও ত' মা!

কেন?

জরাব্যাধিগ্রস্ত অশীতিপর বুড়ো রুগ্ন মুখে এক প্রকার হাসি হাসলো। তার চোখের দৃষ্টিতে ছিল কেমন যেন নিগূঢ় অভিনিবেশ, অপলক এক প্রকার নিবিড়তা। মেয়েরা ঔৎসুক্যের সঙ্গে আরো কিছু প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু সেই নাটকীয় মুহূর্তে বাইরে পূর্ণর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

মলিনাদির সঙ্গে আভা এবং তার পিছনে বীণাও বেরিয়ে এলো। পূর্ণ এনে হাজির করেছে কিছু চাল ডাল, সব্জী এবং কিছু কাঠ। ফকির সেগুলি নামালে। পূর্ণ বললে, ভাতে ভাত ফুটিয়ে খাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

আভা বললে, নৌকা ছাড়বে কখন, পূর্ণবাবু?

পূর্ণ বললে, নৌকা যাবে না, আকাশের চেহারা খারাপ। তাছাড়া এখন বেরোলেও পৌঁছতে রাত দুটো। আমার সাহস নেই।

ফকির বললে, আপনাদের কিছু কষ্ট হবে না, আমি জল এনে দিচ্ছি নদী থেকে।

পূর্ণ বললে, তোকে আর জ্বর নিয়ে জল আনতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

ফকির সহাস্যে বললে, জ্বর! জ্বর ত সেই বর্ষা থেকে! ওতে আমার কিছু হয় না কর্তা।

বালকের চোখ দুটিতে কেমন যেন নিরুপায় কারুণ্য মাখানো—বড় মায়াময়। তার দিকে একবার তাকিয়ে বীণা বললে, নদীর ঘাট আমাদের দেখিয়ে দে, আমরাই জল আনছি।

অগত্যা মেয়েরা অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থা মানিয়ে নেবার চেষ্টায় লেগে গেল।

বীণা এক সময় চালায় ঢুকে বললে, কি হচ্ছে কর্তামশাই? এত অসুখে উঠে বসলে যে?

এই যে মা—বুড়ো বললে, দেখো দেখি, এটি চিনতে পারো?

পুতুল গড়েছ দেখছি। বেশ সুন্দর হয়েছে! ব'লে বীণা এসে সামনে বসলো।

কিন্তু পুতুলটিকে পরীক্ষা করতে গিয়েই সে সোল্লাসে বললে, এ কি এ যে আমার মূর্তি!

বুড়োর হাত কাঁপছে বার্ধক্যে। শুধু হাসিমুখে সেই পুতুলের নাকটি একটু নেড়ে বললে, হ্যাঁ, এইবার আদল আসে। ওদের গুলোও হয়ে গেছে মা।

বীণা অবাক হয়ে তাকালো। ইতিমধ্যে আভা ও মলিনাদির মূর্তিগুলিও বুড়ো শেষ ক'রে ফেলেছে। চোখের কোণ, ভ্রূরেখা, চিবুকের খোন্দল, কণ্ঠের পেলবতা, অধরে বিলীয়মান হাসির আভাস—সেটি পর্যন্ত। খোপার একটি পাশ,—তাও এসেছে সুন্দর হয়ে। আকাশে মেঘের ডাক শুনে আভা তার আয়ত চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল—সেই অপরূপ কপালকুণ্ডলাটি অবধি বুড়ো জীবন্ত ক'রে তুলেছে। এই বুকচাপা গ্রামের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনধারার প্রতি মলিনাদির করুণ সমবেদনাময় দৃষ্টি বুড়োর চোখ এড়ায় নি।

বৃষ্টি এসে পড়েছিল—ঘরখানায় এরই মধ্যে চাপা অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। এমন সময় আভা একটি মোমবাতি জেলে এনে ঢুকলো। তারপর ওরা একে একে সবাই এসে জড়ো হোলো। বৃদ্ধ শিল্পীর প্রতিভায় ওরা সকলেই মুগ্ধ—অনাদৃত এই ভাস্করের নিখুঁত রচনায় সকলে বিস্ময়াবিষ্ট। বুড়ো বললে, কিছু শক্ত নয় মা, এ সবাই পারে—চেষ্টা করলেই পারে। হাতের কাজ বৈ ত নয়।

পূর্ণ বললে, পুতুল গড়া হয়ত সহজ, কিন্তু ওর মধ্যে প্রাণ এনে দেওয়া কি যার তার কাজ?

প্রাণ!—বুড়ো পূর্ণর দিকে তাকালো। জরাচ্ছন্ন তার চোখে অশ্চর্য কৌতুহল, অসীম জিজ্ঞাসা। বললে, প্রাণ কোথায় দাদা-বাবু?

কেন, এই যে তুমি গড়েছ, এ একেবারে জীবন্ত।

বৃদ্ধের বোধহয় জানা ছিল না, তার হাতের গড়া পুতুলে কোথায় থাকে প্রাণ, অথবা জীবন। তিন পুরুষ ধ'রে পুতুল গড়ে, কিন্তু এমন কথা কারুকে বলতে সে শোনে নি। এরা শহরের লোক, তাই বোধহয় দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়। বুড়ো একটু অবাক হয়েই তাকায়।

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। ফকির গুটি গুটি এসে একপাশে বসে। ঢোকবার জন্য ওদের জানা ছিল। সুতরাং এক সময় আভা উঠে তাদেরই আনা বিছানাটা পাতে। তারপর বলে, ফকির, এই বিছানায় এসো ভাই। কর্তামশাই, তুমি থাবে কি? তোমরা দুজনে অসুখ-বিসুখ সারিয়ে তোলো দেখি।

অত্যন্ত ঘরোয়া কথা, অত্যন্ত অযাচিত আত্মীয়তা। বুড়ো এই অভিজাত তরুণ-তরুণীর মাঝখানে পড়ে কেমন যেন বাতিয়ে যায়। ফকির ওদের হুকুম অমান্য করে না। আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে ওঠে। বীণা বুড়োর [illegible] এমনি [illegible] হয়ে উঠেছিল যে, বৃষ্টির মধ্যে নিজে গিয়ে সে ঠাকুর্দা ও নাতির আহারের আয়োজন করে আনে। বুড়ো কেবল একসময় মৃদু গলায় বললে, উঠোনে গোটা দুই-তিন সাপ চ'লে বেড়ায় মা, একটু সাবধানে—

ওরা ভ্রূক্ষেপ করলো না।

একটি রাত্রির বাসস্থান। কিন্তু সভ্যতা থেকে অনেক দূরে, জগৎ-জোড়া জীবন-স্পন্দনের বাইরে। অরণ্য বললে ভুল বলা হবে—কেননা অরণ্যের নিবিড় তপস্যার মহিমা ও সৌন্দর্য এখানে নেই। সোনার বাংলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছবির মতন—তাও সত্য নয়। কারণ শ্রী কোথাও নেই, কোথাও নেই শোভা, জীবনের সঙ্কেত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা বিবর্জিত জঙ্গল-জটলার মাঝখানে যদি কয়েকজন শ্মশান-চারীকে কল্পনা করা যায়—তবে এই এলাকাপুরকে বুঝতে পারা যাবে। সন্ধ্যার পর সমস্তটা মৃত্যুর মতো অসাড়,—ব্যাঙের ডাকে, ডোবার মশায়, পতঙ্গে, পোকায় এবং রুদ্ধ-শ্বাস অন্ধকারে এমন একটা অবস্থা দাঁড়ালো যে, অভ্যাগতদের মনের চেহারাও নিস্তেজ হয়ে এলো।

আহারাদি এবং আনুষঙ্গিক কাজকর্ম শেষ করে ওরা আবার এসে বুড়োর কাছে বসলো। বুড়ো বললে, তোমরা এই পথ দিয়েই বুঝি ফিরবে, মা?

মলিনাদি বললেন, বুঝেছি আর একটা পথ আছে। তবে আমাদের ইচ্ছে, এই পথ দিয়েই ফিরি,—তোমাদের আর একবার দেখে যেতে পারবো। কেমন, সেই ভালো না?

বুড়ো বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, আমাদের গরীবের ঘর মা—তোমাদের কষ্ট হবে!

বীণা বলে, ওকথা বলতে নেই কর্তা-মশাই, দেশশুদ্ধ গরীব!

মলিনাদি বললে, আচ্ছা ধরো আমরা যদি এই গ্রামে এসে কিছু কাজ করি?

বুড়ো বলে, কাজ? কি কাজ মা?

এই গাঁয়েরই কাজ। তোমরা রোগে ভুগছ, ভাত-কাপড় পাচ্ছ না, জলের অভাব, পথঘাট নেই, হাট-বাজার বসে না—

বুড়ো অবাক হয়ে তাকায়। ওদিকে ফকির চুপি চুপি বিছানার ওপর উঠে বসে। এদের কথাবার্তায় কি যেন একটা অনুপ্রেরণা সে খুঁজে পায়। কিন্তু স্পষ্ট ক'রে সে কিছু বুঝতে পারে না।

মলিনাদি বললেন, আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলছি। ধরো, তোমাদের এই গ্রামে একটা জায়গা নিয়ে আমরা কয়জন বসলুম, এখানেই কাজের লোকের দল গড়ে তুলবো। সুতো কাটবে, তাঁত বসাবে,—অবিশ্যি প্রথম খরচপত্র আমরাই চালাবো।

পূর্ণ বললে, ধরো, তুমি পুতুল গড়তে পারো,—তোমার মতন [illegible] লোককে নিয়ে যদি পুতুল গড়িয়ে [illegible] যায়, তাতে টাকা পয়সা পাবে। তুমি নিজে চালাবে কারখানা।

বুড়োর চোখ দুটো জলে ওঠে। কিন্তু সে চুপ করে থাকে। একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসেছে তার জীবনে,—অথচ এরা কে, এরা কারা, কেন এই অযাচিত মমত্ববোধ, কেন বা এই কুহক, এই মোহজাল—বুড়োর রুগ্ন মস্তিষ্ক এসব যেন বরদাস্ত করতে পারছে না। ক্যাল ক্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে। কাশি আসে তার গলার ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা স্থানচ্যুত হয়ে যেন উঠে আসতে চায়। এই গাঁয়ের চেহারা ফিরবে! বুড়ো কারখানার মালিক হবে! তার নাতির আর কোন ভাবনা থাকবে না! তার এই কুঁড়ে চালায় ছয় বছর খড় ছাওয়া হয় নি, নতুন কাপড় কিনতে পারে নি আজ তিন বছর; গোটা চারেক গরু, ফকিরের একটা বউ, রূপোর গয়না, শীতকালের বিছানা—বুড়ো তার এই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আনন্দে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো।

তার গলায় ভয়ানক কাশি উঠে এলো এক সময় এবং যে এমন করেই কাশতে লাগলো, যেন তার পাঁজরের হাড়গুলি সেই কম্পন সে ধাক্কা আর সহ্য করতে পারবে না। ফকির তাড়াতাড়ি উঠে এসে বুড়োকে দুই হাতে জাপটে ধরলো।

পূর্ণর পাশে ব'সে মেয়েরা কাঠ হয়ে বুড়োর এই যন্ত্রণা দেখতে লাগলো। রোগ আর দারিদ্র্যের এই দৃশ্য নতুন নয়। ওরা কংগ্রেসের লোক। দেশের রুগ্ন উৎপীড়িত দরিদ্র মানবাত্মার সঙ্গে ওদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ,—ওরা আজ কঠিন হাতে দেশের এই অকল্যাণকে দূর করবার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠেছে। ওরা কাজ করবে, সেবা করবে—,—দেশের প্রাণের ঠাকুরের চোখের জল কত যে গড়িয়েছে, সে ওরা জানে।

মলিনাদি যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন।

তিনি বললেন, কর্তামশাই, তুমি আশীর্বাদ করো, আমরা যেন এসে তোমাদের কাজে লাগতে পারি,—জীবনের এত অপচয় যেন বন্ধ করতে পারি।

কী বলে মেয়েটি! এ কোন ভাষা! কোন্ দেবতার আশীর্বাদ! বুড়ো স্তব্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে কাশির ধকলে হাঁপাতে থাকে। তার শরীরে আগের মতো ক্ষমতা থাকলে ছেলেমেয়েগুলিকে কোলে নিয়ে সে কাঁদতে পারতো।

মলিনাদি, আভা ও বীণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পাশের ওই চালাটায় কোন-মতে রাত কাটিয়ে কাল ভোরে ওদের নৌকায় উঠতে হবে, কুমোরপাড়ার মেলায় পৌঁছুতে ওদের এত দেরি হবে, ওরা আগে জানে নি। সেখানে ওদের অনেক কাজ। [illegible] নেতারা অ [illegible],—সংবাদ-দাতারা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু [illegible] এই [illegible]

পথ দিয়েই ওরা ফিরবে, অন্যপথে যাবে না। এই গ্রামে ফিরে বুড়োর একটা ব্যবস্থা করা চাই। যেমন করে হোক, বুড়োর এই অসাধারণ শিল্পকৃতিত্বকে দেশের সামনে ওরা তুলে ধরবে, ছোটখাটো একটি কারখানা গড়ে দেবে, এদের এই মরণোন্মুখ জীবনযাত্রার কিছু প্রতিকার করবে। এই ওদের প্রতিশ্রুতি।

বিছানাগুলি ওরা ইতিমধ্যেই দান করেছে, ওদের তাতে কোন কুণ্ঠা নেই। এদিককার চালায় ঢুকে কোনমতে নিজেদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে ওরা একটু গড়াবে, এমন সময় দেখা গেল, ফকির গুটি গুটি এসে একপাশে দাঁড়িয়েছে। সে যেন কিছু বলবে।

পূর্ণ এগিয়ে গিয়ে বললো, কি রে ফকির?

ফকির মিনতি করে জানালো, তাকে একটা জামা দিতে হবে।

আভা বললে, জামা? জামা জুতো সব পাবি, ফকির! এই নে, এইটে গায়ে দিগে যা ততক্ষণ!

আভা তার গায়ের চাদরটি এনে ফকিরের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে সাদরে তা'র চিবুক নেড়ে দিল।

মলিনাদি বললেন, কাল সকালেই আমরা চ'লে যাবো ভাই। কিন্তু ক'দিন বাদেই আবার আসবো, এই পথ দিয়েই আসবো। এই টাকা ক'টা তুই রেখে দে, ক'দিনের খরচ চালাস, কেমন?

ফকির ভীরু কণ্ঠে বললে, আবার আসবে তোমরা?

নিশ্চয় আসবো,—পুতুল ক'টা কিনে নিয়ে যাবো। আর দেখিস, কত কাজ দেবো তোদের। ঠিক আসবো ব'লে গেলুম।

দশটা টাকা নিয়ে ফকির অন্ধকারে ওদিককার চালার দিকে চ'লে গেল। বীণা বললে, কী চমৎকার ছেলেটা! আমি ফেরবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবো ক'দিনের জন্য।

পূর্ণ বললে, বুড়োর যে অবস্থা, বাঁচলে হয়!

এ ঘরে এসে ফকির বুড়োর গা ঘেঁষে ব'সে পড়লো। বুড়ো বললে, কি রে দাদু?

আমাকে জামা দেবে বলেছে। তোমার পুতুল কিনবে। এই নাও টাকা!

বুড়ো বললে, এত দিলে?

ফকির বললে, ওরা আবার আসবে,— এই পথ দিয়েই যাবে!

সত্যি বলছিস, আসবে?

হ্যাঁ, আবার আসবে। একি, তোমার জ্বর বেড়েছে যে— এত জ্বর!

হবে না? বুড়ো শুয়ে ব'সেই যেন উদ্দাম চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে, বাড়বে না জ্বর? কি একটা হয়ে গেল বল্ দিকি? আমি—আমি বলতে পাচ্ছিনে কি যেন... কি যেন হয়ে গেল একটা।

আনন্দের প্রবল উত্তেজনাটা বুড়ো ওই ভাবেই প্রকাশ করতে গেল। কিন্তু শরীরে শক্তি কম,—উত্তেজনা সইতে না পেরে বুড়ো আবার শুয়ে পড়লো। ভয়ানক হাঁসফাঁস করছিল।

ফকির শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘণ্টা দুই বাদে তা'র চমকটা ভাঙতেই চোখ চেয়ে দেখলো, দাদাভাই সেই চারটি পুতুলকে একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে নিখুঁত ক'রে তুলছে। রুগ্ন শরীর ভেঙে পড়েছে, ঘাড় উঁচু থাকছে না, শ্রান্ত আঙুল চলতে চাইছে না, কোমরে এতটুকু জোর নেই— কিন্তু তবু সেই জরাব্যাধিগ্রস্ত উপবাসী বৃদ্ধ স্থবির তা'র সেই কারুসৃষ্টির লোভ ছাড়তে পারে নি। অতি যত্নে অতি সূক্ষ্ম কাজটুকু আজ রাত্রেই তা'র শেষ করা চাই।

ফকিরের তন্দ্রাতুর চোখ আবার ধীরে ধীরে বুজে এলো। ওদিকে মোমবাতিটুকুও এতক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এনাৎপুরের সবাই জেনেছে, এ গ্রামে কাজ আরম্ভ হবে। কত কাজ, কত ব্যবস্থা, কত প্রতিষ্ঠান। ফকির সব জায়গায় ব'লে বেড়িয়েছে। ওই বাঁশবাগানের ধারে বসবে কারখানা, গাজনতলায় তাঁতের ঘর, শিব-মন্দিরের ধারে ওষুধের দোকান। নৌকায় মাল আসবে শহর থেকে, কত কাপড় আর থান, টিনের খেলনা। হাটতলার রাস্তাটা পাকা হবে, মোটরগাড়ি চলবে। তাদের টিনের ঘর উঠবে, গরুর দুধ হবে, তা'র গায়ে জামা, পায়ে জুতো, তাদের আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

ফকির নিজের হাতে তাদের জঙ্গল কেটেছে, ডোবা থেকে পানা তুলেছে, ঘর-দোর সে গুছিয়ে রেখেছে,—ওরা আসবে। তা'র দাদাভাই আর উঠতে পারে নি, প'ড়ে রয়েছে বেহুঁশ হয়ে,—জ্বর বেড়েছে ক'দিন। ফকির কি একটা গোলমাল শুনে ঘাটের দিকে ছুটে যায়। ওরা এবার আসবে, এই ওদের পথ। কুমোরপাড়ার মেলা কয়েকদিন আগে ভেঙ্গে গেছে,—লোকেরা ফিরে যাচ্ছে এই পথ দিয়ে। কত সামগ্রী কিনেছে কত লোক, কত লোক পয়সা কামিয়েছে, কত লোকের অবস্থা ফিরে গেছে।

না, আজকেও ওরা এলো না। বেলা শেষ হয়ে গেল, নদীর দূরের পথ ধূসর গোধূলিতে ভ'রে গেল—ওদের নৌকা দেখা গেল না। সাত দিনের মধ্যে ওরা ফিরবে বলে গেছে, কিন্তু এক মাসের বেশী হয়ে গেছে। হয়ত দরিদ্র ফকিরের কথা ওদের মনে নেই। ফকিরের কান্না পায়।

আরেকদিন একখানা মহাজনী নৌকা দেখা যায়। ওই মস্ত নৌকায় ওরা আসছে কি? হ্যাঁ, ওই নৌকাই। অত ঐশ্বর্য আসবে বলেই এত দিন দেরি। ধনধান্যে ভরা, ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, সম্পদের ভারে টলোমলো—তাই অত বড় নৌকা! ওরা আসবে, অপার্থিব বিস্ময়ের মতো এসে পৌঁছবে ওরা—ভাগ্যলক্ষ্মীর আকস্মিক আশীর্বাদের মতো আবির্ভূত হবে ওরা—তাই ত এত দেরি, এমন অধীর অসহ্য প্রতীক্ষা!

কিন্তু মহাজনী নৌকা গান গেয়ে চ'লে যায়। আসে বৃষ্টি, আকাশ ভেঙে। ফকির ঘাটের মহুয়া গাছের তলায় বসে থাকে। আজো তার জ্বর বেড়েছে। শীতে সে কাঁপতে থাকে।

বীণাদি বলে গেছে, ফকির, তুই পরের সেবা করবি, গাঁয়ের কাজ করবি, সকলের মুখে অন্ন দিবি। বীণাদির সেই আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করেছে। বিছানাটা দিয়ে এসেছে সে গরীব হাঁদু মিঞার বউকে চাদরখানা বিলিয়ে দিয়ে এসেছে গাজন-তলায়। ঘরের চাল-ডালগুলি নিয়ে সে ভিক্ষা দিয়েছে, নগদ টাকাগুলি দিয়েছে খাজনা শোধে। তা'রা এখন রিক্ত, সম্পূর্ণ নিঃস্ব। কিন্তু ওরা এসে দাঁড়ালে ফকিরদের ঘর কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠবে ব'লেই আজ এমন নিঃস্ব হ'বার দরকার হয়েছে। সর্বস্বান্ত হ'তে পেরেছে পরের জন্য, তাই ফকিরের আজ এত আনন্দ!

বেহুঁশ জ্বর নিয়ে ফকির বৃষ্টিতে ভিজে ফিরে আসে।

জ্যৈষ্ঠের শেষে বর্ষা নামলো। ফুটো চালা দিয়ে জল নেমে দাদাভায়ের কাঁথা ভিজে যায়, কিন্তু দাদাভাইয়ের সাড়া নেই। বুড়োর শিথিল দেহটা বেঁকেচুরে ছড়িয়ে থাকে—মাঝে মাঝে একটু নড়ে, এই মাত্র। এই দু-মাস ধ'রে বুড়ো মাঝে মাঝে ফকিরকে ডেকে উদগ্রীব প্রশ্ন করেছে,— ফকির জানিয়েছে, ওরা আসবে, এই পথেই আসবে। বুড়ো অপেক্ষা করেছে অধীর আগ্রহে। ওরা আসবে, বুড়ো বিশ্বাস করে, ফকির পথের দিকে চেয়ে থাকে। পুতুল-গুলি ওরা নিয়ে যায় নি। সেই চারটি পুতুল। মলিনাদি, বীণা, আভা আর পূর্ণ। নিখুঁত সুন্দর সুহাস চারিটি নিষ্পাপ পুণ্যময় মূর্তি। ওদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা আছে, ওরা দরিদ্রের বন্ধু, নিরুপায়ের সেবক, ওরা পরদুঃখকাতর মহাপ্রাণ! ওরা আসবে, আসবে,—ওদের ফিরে আসতেই হবে। গ্রাম নৈলে ওদের চলবে না, গ্রাম ছাড়া ওদের আর কোন কাজ নেই,—এই ভাঙা খড়ের চালা, এই বাঁশবন, এই গাজনতলা, আর এই মৃত্যুমুখী শ্মশানে ওদের আসতেই হবে। ওরা আসবে, ফিরে আসবেই একদিন!

ফকির অধীর, অস্থির, অসহনীয় পুলকে সেই ভগ্নকুটীরের আশেপাশে চ'রে বেড়ায়। আবার এক সময় ছুটে আসে, দাদাভায়ের পাশে ব'সে তার পঞ্জরাস্থির উপরে হাত বুলোয়। মৃদুকরুণ সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তুমি অত ভাবছ কেন? ঠিক আসবে ওরা!

বুড়ো সাড়া দেয় না, নড়ে না। এমন সান্ত্বনা সে পেয়ে এসেছে দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ, কাল কালান্তর। শুধু চোখ দুটো মেলে দেখবার চেষ্টা করে—কিছু দেখতে পায় না, চোখ তা'র ঝাপসা হয়ে এসেছে। [illegible] বোলাটে রং ধরেছে।

ফকির সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এক সময় মিথ্যা কথা বলে, ওরা আসবে দাদাভাই, খবর পাঠিয়েছে।

বুড়ো আবার [illegible] কান্না করে। ফকির তার চেহারা দেখে ভীত হয়ে ওঠে। বুড়ো যেন তার ভগ্ন মৃত্যুময় দেহের বাঁধন খুলে এখনই লাফিয়ে উঠতে চায়। ফকির ব্যস্ত হয়ে বলে, না, না—উঠতে হবে না, ওরা চিঠি দিয়েছে, শীগগিরই আসবে।

বুড়ো যেন কোন্ দিকে তাকায়, ফকির আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই দু' মাসের মধ্যে তার দাদাভাইয়ের দৃষ্টিশক্তি কখন যে নষ্ট হয়ে গেছে, সেকথা ফকির একবারও জানতে পারে নি। বুড়ো অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে ফকিরকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করে। সে যেন বলতে চায়, ফকির, বাবু, আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, যে কটা দিন আমার মেয়েরা ফিরে না আসে। তোকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে যাবো।

কুমোরপাড়ার মেলা লোকে ভুলে গেছে। এক আধজন যারা এই পথ দিয়ে যেতো, তাদের মুখেও আর কিছু শোনা যায় না। পূর্ণ আর মলিনাদির দলটিকে আর কারো মনে পড়ে না। ফকিরের কাছে আছে তাদের দেওয়া এক টুকরো মোমবাতি। এটুকু সে রেখেছে পরম যত্নে। ওরা যেদিন আসবে এই মোমবাতির অবশেষটুকু জ্বালিয়ে ফকির ওদের আলো দেখাবে। অন্ধকারে ওরা পথ চিনবে।

কিন্তু আসবে কি ওরা? ওরা চলে গেছে নগরের জনারণ্যে—বহু জনতার মাঝখানে। ওরা মানী লোক, ওদের অনেক কাজ। ওরা গরীবের দুঃখ ঘোচায়, আর্তের সেবা করে, ওরা দান করে, দয়া করে। সমগ্র দেশের মহাজনতার আহ্বানে ওরা ছুটে গেছে বৃহত্তর সমাজের মাঝখানে—সেখানে কত সহস্র ফকিরের দুঃখ দুর্দশা আর কত লক্ষ দাদাভাইয়ের রোগ ভোগ ওদের ঘোচাতে হয়। এনাৎপুরের কথা ওদের হয়ত মনেই নেই। তারা অনেক বড়, কেননা তারা পায়ের ধুলো দিয়ে গেছে ফকিরদের চালাঘরে।—ফকিররা অনেক ভাগ্যবান, কেননা ওদের দেখা পেয়েছিল!

কোনো অভিমান নেই ফকিরের। আভাদি তার মনে পিপাসা জাগিয়ে গেছে। ক্ষুধা জাগিয়ে গেছে বীণাদি। ফকিরকে বড় হতে হবে, গ্রামকে তুলে ধরতে হবে। জীবনকে সে গড়ে তুলবে,—একদিন সে মস্ত বড় হবে। মলিনাদি তাকে আশীর্বাদ করে গেছে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে ফকির একদিন তাদেরই খুঁজে বার করবে।

আকাশ ভরে আষাঢ় নেমে আসে। বৃষ্টি ও ঝড়ের ঝাপটায় ভগ্ন জীর্ণ চালা ঘরখানা দোলে। পাশের বাঁশবনে যেন দানবেরই দৌরাত্ম্য লেগেছে। ঝড়ের দাপটে চালার বাকি খড়গুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে চলে যায়।

বুড়ো যেন অগাধ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে,—হাত বাড়িয়ে তাই সে আকুল হয়ে ধরতে চাইছে খড়ের কুটি। বুড়ো খায় নি অনেক দিন,—তার বেঁচে থাকাটাই এখন বিস্ময়। বুড়ো কাঁদে না,—অন্তিম বিছানায় শুয়ে সে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠতে চায়। সে শিল্পী, সে স্রষ্টা, সে পুতুলের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, প্রতিমা বানিয়ে তোলে।

কোনমতে ফকির সেই অবশিষ্ট মোমবাতিটুকু আজ রাত্রে জ্বালাতে বাধ্য হয়। বুড়োকে দেখে সে আজ ভয় পাচ্ছে, বুড়োর মুখের বিচিত্র আর্তস্বর শুনে বুকের মধ্যে তার ধকধক করছে,—বুড়োর ভ্রূকুটিকরাল চক্ষু যেন ময়-দানবের মতো ভয়ংকর! সহসা ফকির চেঁচিয়ে ওঠে, দাদাভাই, ও দাদাভাই......

ভাঙাস্বরে বুড়ো বিজবিজ করে কি যেন বলে প্রলাপের মতো।

ফকির চেঁচিয়ে বলে, কোথা যাবে তুমি দাদাভাই?

বুড়োর মুখের গহ্বর থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে অস্পষ্ট ভাষায়। বুড়ো তাদের ফিরিয়ে আনবে!

বুড়ো বোধহয় সমস্ত বাধা আর বার্ধক্য দুই হাতে ঠেলে এক সময় ওঠবার চেষ্টা করেছিল, হঠাৎ মুখ থুবড়ে বিছানার প'ড়ে গেল। তারপর একেবারে নিঃসাড়!

ফকির আর্তনাদ করে ওঠে, দাদাভাই—!

সাড়া নেই। আকুল কণ্ঠে ফকির আবার ডাকে। বুড়ো একটু নড়ে ওঠে এবার। এখনো মৃত্যু হয় নি, এখনো ওরা এলে দেখা হ'তে পারতো......মোমবাতির শেষ অবশেষটুকু এখনো ফুরোয় নি।

সহসা ঝড়ের ঝাপটা ভিতরে এসে ঢোকে। বৃষ্টির তাড়না ছুটে আসে। উপরের চালার একটা অংশ মড়মড় ক'রে কাত হয়ে পড়ল।

ফকির চীৎকার করে, দাদাভাই......ওই যে এসেছে ওরা!

বুড়ো চিৎ হয়ে পড়ে। ফকির কেঁদে ওঠে, ওই যে, ওই যে ওরা এসেছে, দেখতে পাচ্ছ না?

মৃত্যুর আগে বুড়ো ব্যাকুল হয়ে কি যেন খোঁজে। ফকির হাউ হাউ ক'রে বলসে, দেখতে পাচ্ছ না? এই যে তোমার সামনে। তোমার সামনে ওরা দাঁড়িয়ে, দাদাভাই!

বুড়ো বিশ্বাস করে না। ফকির তাড়াতাড়ি আর কিছু না পেয়ে সেই চারটি প্রাণময় পুতুলের পিঁড়ি দুই হাতে তুলে আনে, তারপর বুড়োর ঘোলাটে অন্ধ চোখের সামনে ধ'রে বলে, এই যে......এই যে এসেছে ওরা......চেয়ে দেখো দাদাভাই!

পুতুলগুলির দিকে চোখ তুলে বোধহয় বুড়ো ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝতে পারে, হ্যাঁ, ওরা এসেছে! অন্ধকারে যেমন জ্যোতির্লেখা দেখা যায়, যেমন ভ্রান্তিদর্শন ঘটে, মৃত্যুর আগে যেমন অবাস্তব দেবতার আকস্মিক দিব্যজ্যোতি দেখা যায়,—বুড়ো তেমনি যেন দেখতে পায়, ওরা এসেছে তার চোখের সামনে। ওরা এসে পৌঁচেছে,—ওরা মিথ্যা স্তোকবাক্যে তাকে ভুলিয়ে যায় নি। ওরা হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুতুলগুলি ফকির ধ'রে থাকে বুড়োর চোখের সামনে। মৃত্যুপথ-যাত্রীর মুখে-চোখে শান্তি ও আনন্দের আভাস নেমে আসে। কোনো বেদনাময় নৈরাশ্য, জীবনের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা, অথবা মানুষের প্রতি কোনো অবিশ্বাস—কিছুই সে রেখে গেল না, এইটুকু সান্ত্বনা!

তারপর? তারপর সেই দুর্যোগের অন্ধকারে ফকির একলা ব'সে ব'সে কাঁদে। মনে হয়, সমগ্র এনাৎপুরটাই যেন তার কণ্ঠনালীর মধ্যে বসে ভাঙাগলায় কাঁদে!

প্রবোধ কুমার সান্যাল

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

প্রবোধকুমার সান্যাল বললেই বিচিত্র এক পরিব্রাজক-সাহিত্যিকের ছবি ভেসে ওঠে। সে সাহিত্যিক চলেছেন যেন। হিমালয়ের পথে পথে চলেছেন। গহন-গিরি-কন্দর পেরিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে চলেছেন। হিমালয়-চরিতকে চিনে নিতে নিতে, আর চিনিয়ে দিতে দিতে চলেছেন। কিন্তু এই হিমালয়-চরিতকার যে মানুষেরও চরিত্র-রচনায় সিদ্ধহস্ত, দেবতাত্মা হিমালয়ের মতো তিনি যে মানবাত্মা লোকালয়ের ছবি আঁকতেও সুপটু, সে-প্রমাণ মেলে তাঁর গল্প-উপন্যাসে।

ছোট গল্পে আমাদের সকলের চেনা-জানা জগৎকে ঘিরে কারবার তাঁর। হিমালয়ের বদলে জীবনের চড়াই-উৎরাইকে ঘিরে তাঁর পথ-চলা।

এখানে এসে তাঁর গৈরিক মনটি গৃহী হল। তাঁর পরিব্রাজকের নিরাসক্ত যাযাবর মনে সংসারের ছোট-বড় দুঃখ-সুখ ছায়া ফেলল।

সেই ছায়াগুলো অদ্ভুত বড়ো। বড়ো বিচিত্র। কায়ার হদিস ওদের থেকে পাওয়া যায়। জীবনরঙ্গমঞ্চ হতে ভেসে-আসা কান্না-হাসির কলতান শোনা যায় ওদের থেকে।

ওরা রোম্যান্স-এর সাতরঙা রামধনু আঁকা কখনও; আবার কখনও একরঙে ঘোর নীল। ওরা যুগ-যন্ত্রণার প্রতিনিধি কখনও; আবার কখনও যুগোত্তীর্ণ জীবন-সত্যকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী। ওদের দিকে তাকালে সংসারের পরিবর্তিত পৃষ্ঠপটে জীবনকে খুঁজে পাই আমরা, কখনও বর্ণাঢ্য আর কখনও বিবর্ণ আজকের মানুষকে আমরা দেখতে পাই।

বাংলা ছোট গল্পে মানুষকে এইভাবে দেখাবার আয়োজন রবীন্দ্রনাথ করেন প্রথমে; এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন প্রবোধকুমার সান্যাল।

প্রবোধকুমারের ব্যঞ্জনাময় ভাষা ও বিদগ্ধ অন্তর্দৃষ্টি বাংলা ছোটগল্পকে নতুন ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করেছে এবং বিশেষ করে রোমান্টিক গল্প-রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে বিস্তৃত করেছে অনেক-দূর অবধি।

এই প্রসঙ্গে প্রবোধবাবুর 'ক্যামেরাম্যান' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-গল্পে মানব-প্রকৃতির একেবারে গভীর-গহন অনির্দেশ্যলোকে ডুব দিয়েছেন লেখক। দেখিয়েছেন, প্রতিভা যদি প্রবৃত্তির নীচের স্তরে নামে, তবে সে আত্মঘাতী হতে বাধ্য। অতনু বলতে গেলে আত্মঘাতী এখানে। বলতে গেলে ঠিক সেইরকম একটা নদী, যে নাকি কলকল খলখল করে ছুটতে ছুটতে অনেকটা যেন নিজের খেয়ালেই প্রতিভা নামক মরু-সমুদ্রের বুকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। অতনুর এই নিরুদ্দেশ-যাত্রার কাহিনী আঁকতে গিয়ে মর্মস্পর্শী সততার পরিচয় দিয়েছেন লেখক এবং সে পরিচয়কে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন নায়িকা প্রমীলার হৃদয়ের ভিতরকার ছবিটি দেখিয়ে।

ছবি সত্যি এখানে রূপে-রসে গতিময়, বর্ণে-গন্ধে প্রাণময়। একদিকে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যিক সত্যদৃষ্টির এবং অন্যদিকে প্রদীপ্ত বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে উদ্ধত হৃদয়াবেগের এমন মণি-কাঞ্চন যোগ বাংলা ছোট গল্পে সচরাচর দেখা যায় না।

এছাড়া রোমান্টিক শিল্পকর্ম হিসেবে 'গুহার নিহিত' গল্পটিরও জুড়ি মেলে না যেন। এ গল্পটিকে ঠিক সেই রকম একটি দুর্জ্ঞেয় গহ্বরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার রহস্য নাকি হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আমাদের সামনে একেবারে সজীব, প্রত্যক্ষ ও প্রোজ্জ্বল।

গহ্বরটি জমাট বিস্ময়ের আকর হয়ে উঠেছে এখানে; এবং সে গহ্বরে প্রাগৈতি-হাসিক সরীসৃপের মতো কিলবিল করছে একদিকে প্রিয়কুমারের এবং অন্যদিকে দেবী-রাণীর অশান্ত হৃদয়।

প্রিয়কুমার ভালোবাসল দেবীরাণীকে, আর বিয়ে করল প্রতিমাকে। ওদিকে দেবী-রাণী পড়ল চাকরীকে নিয়ে; আর ভালো-বাসাটা তুলে রাখল প্রিয়কুমারেরই জন্যে; এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের এই তুলে-রাখা ভালোবাসা যেখানে গিয়ে জড়ো হল, আমরা তাকে মনের গুহা বলি। আলোচ্য গল্পে প্রিয়কুমারের বাড়িতে দেবীরাণীর অতিথি হবার সুযোগে এই গুহার ওপর দীপ্ত-শুভ্র রবিরশ্মির প্রলেপ বুলিয়েছেন লেখক।

'তরঙ্গ' গল্পে প্রলেপ বুলোবার অন্য-রকম আয়োজন চোখে পড়ে। ওখানে কোনো এক রেলওয়ে স্টেশনে দুই পুরাতন প্রণয়ীর সাক্ষাৎকারকে ঘিরে রোমান্টিক পরিবেশ জমিয়ে তুলেছেন প্রবোধকুমার; এবং পরি-বেশটি ভাষার ঐশ্বর্য ও কল্পনার বিস্তারে হয়ে উঠেছে অনবদ্য। কিন্তু তবু বলবো, সব রোমান্টিক গল্পেই বিশিষ্টতার দাবী করতে পারেন না আলোচ্য লেখক; এবং কেন পারেন না, তা বলতে গেলে একটি উপমার আশ্রয় নিতে হয়। উপমাটি কয়েক দিন মাত্র আগে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কথাসাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে প্রবোধকুমার সান্যাল নিজেই ব্যবহার করেছিলেন। সাহিত্যের কী থাকবে, আর কী জীর্ণ-শীর্ণ পাতার মতো খসে পড়ে যাবে, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি সেদিন বলেছিলেন,—দেয়ালীর দিনে প্রদীপ জ্বালি আমরা। কিন্তু শেষের প্রদীপগুলো জ্বালাতে গিয়ে দেখি, আগের জ্বালানো অনেকগুলোই নিভে গেছে; আর জ্বলছে শুধুমাত্র কয়েকটা। সাহিত্যের বেলাতেও ঠিক তাই। কয়েকটা মাত্র থাকে, কিন্তু অনেক ক'টাই থাকে না।

আমরাও বলি, ঠিক কথা; থাকে না; এবং কালের হাওয়ার দাপটে প্রবোধবাবুরও

অথ রোমান্টিক গল্পই টি'কে থাকবে কিনা সন্দেহ। সন্দেহ 'ক্ষয়', 'রোগশয্যা', এবং 'গল্পের ভূমিকা'-জাতীয় রচনাকে নিয়ে।

কিন্তু সন্দেহ বা নিভু নিভু প্রদীপের কথা থাক আপাতত। আপাতত বরং যে প্রদীপগুলো জ্বলছে, তাদের নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মনে হয়, যেখানে মানব-মনোলোকের রহস্যময় ছবি এ'কেছেন প্রবোধকুমার, সেখানে তাঁর অনেক ছোটগল্পই সাহিত্যের দেয়ালী-উৎসবে চিরকাল আলোক ছড়াবে। 'বিষ', 'তৃতীয়া', 'সিংহাসন', 'এই যুদ্ধ' ও 'সর্বংসহা' এই শ্রেণীর ছোট গল্পের বিশিষ্ট উদাহরণ।

'বিষ' গল্পটিতে জীবনসমুদ্র মন্থন করে প্রবোধকুমার অমৃত পরিবেশন করেছেন। এককালের হিংস্র ও দুরন্ত পল্লী-মেয়ে টুনিকে তিনি আত্মহননে উদ্যতা শহুরে বধূরূপে এ'কেছেন। তাঁর আঁকাটা অসঙ্গত ঠেকে নি এই কারণে যে, টুনির অস্থির-অসংযত কৈশোর যেমন, স্থির-সংযত যৌবনও তেমনি এখানে বিশ্বাসযোগ্য করে চিত্রিত। এছাড়া নিরুদ্ধ কামনা-বাসনায় দগ্ধ যুবতী টুনির মনোবিকারও অস্বাভাবিক নয় কিছু। কেননা, কৈশোরে খরস্রোতা নির্ঝরিণী যে, যৌবনে ধীরস্রোতা হলেও বাধা পেলে সে তো কল্লোলিনী হবেই।

'তৃতীয়া'য় জীবনের কল্লোল নেই, স্তব্ধতা আছে। প্রণবেশ নামক একটি যুবকের জীবন-পাঁচালীকে ঘিরে এই স্তব্ধতা মুহূর্তের মধ্যে বিহ্বল করে তোলে আমাদের। কারণ, এখানে 'তৃতীয়া' সুলতার খাপছাড়া চরিত্র যেমন, হতভাগ্য প্রণবেশের জীবন-যন্ত্রণাও তেমনি অদ্ভুত ফুটেছে। প্রণবেশ যেন রূপকথার সেই যক্ষ—যে নাকি সম্পদকে ভোগ করতে চায় না, আগলে রাখতে চায়; ঐশ্বর্যকে খরচ করতে চায় না, জমা রাখতে চায়; যে নাকি ধ্বংস ও মৃত্যুর ছোবল থেকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখতে চায় তার স্ত্রীকে।

বাঁচবার জন্য এক প্রয়াস চোখে পড়ে 'সিংহাসন' গল্পে। ওখানে দেখি, বাঁচবার তাগিদেই হৃদয় নামক সিংহাসনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি। দেখি, ভালোবাসা দিয়ে হৃদয়কে যেমন জয় করা যায়, ঠিক তেমনি আবার করা যায় লালনও। এই ভালোবাসার জোরেই নগণ্য নরেন সিংহাসনের অধীশ্বর; আর এরই অভাবে বিত্তবান ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার এ এন চৌধুরী নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা। ললিতাকে সামনে রেখে নরেন ও 'মিস্টার'-এর হৃদয়-সিংহাসন বিজয়ের দ্বন্দ্বটি অপূর্ব সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে চিত্রিত।

সূক্ষ্মদর্শী মহৎ কথাশিল্পী প্রবোধকুমারকে 'এই যুদ্ধ' গল্পেও খু'জে পাই আমরা। এখানে দেখি, যুদ্ধটা আসলে সমাজনীতির সঙ্গে মানবনীতির, অধিকারের সঙ্গে ভালবাসার এবং এ-যুদ্ধ করতে গিয়ে তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে কুমারী বনশ্রী। রঞ্জিত ছলনায় মুখোস পরে প্রতারিত করেছে তাকে। মা-মরা একরত্তি ছেলেকে তার কাছে গছিয়ে দিয়ে 'ব্ল্যাক-মেইল' করার ফিকির খু'জেছে। কিন্তু কোনো ফিকিরই মানবনীতির দিক দিয়ে বনশ্রীকে পরাজিত করতে পারেনি। যুদ্ধে তারই জয় হয়েছে আপাততঃ এবং রঞ্জিতকে অপমান ও প্রত্যাখ্যান করে রঞ্জিতেরই ছেলেকে নিয়ে অন্তর্ধানের মধ্য দিয়ে এই জয়ের মঙ্গলশঙ্খধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে।

'সর্বংসহা' গল্পে বক্তব্য সোচ্চার নয় অতটা। কিন্তু বর্ণনার গুণে স্বল্প-পরিসরের মধ্যেই মধ্যবয়সী এক নারীর শোক-তাপ ও বিরহ-বেদনার কথাগুলো মুক্তোর মতো উজ্জ্বল।

মুক্তো অবিশ্যি আরও অনেক আছে প্রবোধকুমারের ছোটগল্পের আসরে। 'প্রেতিনী', 'পুতুল', 'আগ্নেয়গিরি' ইত্যাদি গল্পে অবহেলিত মানুষের যে বিশ্বস্ত চিত্রগুলো এ'কেছেন তিনি, মুক্তো ছাড়া আর কোন বস্তুর সঙ্গেই বা তাদের তুলনা করবো!

'প্রেতিনী' গল্পটিকে স্নেহ-ভালোবাসা-কাঙাল একটি প্রৌঢ়া নারীর দীর্ঘশ্বাস বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃতের' কাদম্বিনী মরে প্রমাণ করেছিল যে, সে মরেনি; আর এ-নারী বে'চে প্রমাণ করল যে, সে বাঁচেনি; প্রেতিনীর মতো নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় হয়ে থেকেছে। এবং মানুষকে ভালোবাসার বদলে সারাজীবন ধরে ভয়, অবজ্ঞা ও অপমান কুড়িয়েছে। প্রেতিনীর ভূমিকাভিনেত্রী দয়াময়ী জীবন-ভাষ্যকার প্রবোধকুমার সান্যাল-এর এক অনবদ্য সৃষ্টি। তার বেদনা বেদনার্দ্র করে আমাদের; তার বাঁধভাঙা ভালোবাসার প্লাবন জীবন সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসের পলিমাটিকে প্লাবিত করে।

'পুতুল' গল্পে প্লাবন অন্য এক মূর্তিতে আবির্ভূত। ওখানে মানুষই আসলে নিষ্প্রাণ পুতুল। আর খোদ পুতুল প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত। মর্মস্পর্শী সহৃদয়তার সঙ্গেই এই জীবনকে দেখানো হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে, সত্যিকারের শিল্পীর স্থান হল না পৃথিবীতে, চরম অনাদর ও অবহেলার মধ্যে পৃথিবী থেকে তাকে বিদায় নিতে হল। অখ্যাত-অজ্ঞাত বাংলার এক পর্ণকুটিরে অপরিসীম দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে শিল্পীর এই নিঃশব্দ মরণাভিসার গভীরভাবে স্পর্শ করে আমাদের এবং আমরা যেন দেখতে পাই, ফকির তার মৃত্যুপথযাত্রী দাদুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে দাদুরই নিজের হাতে গড়া পুতুল দেখিয়ে। বলছে, এরা সেই চারজন—যাদের জন্যে দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করেছে দাদু। এরা সেই এককালের বাবু অতিথিরা, যারা একদিন আসবে বলে কথা দিয়েছিল।

প্রায়-অচেতন মুমূর্ষু দাদু বিশ্বাস করে এ-কথা এবং এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই যেন জড়-পুতুল জীবনের সঞ্জীবনী-স্পর্শে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

পুতুল ঠিক সেই ধরনের মৃত্যুত্তীর্ণ একটি গল্প; যা' জীবনের পঙ্ককুণ্ডের যেমন পঙ্কজেরও খবর এনে দেয়, যা' একদিকে জীবনের বেদনা ও হতাশায় নীল; এবং অপরদিকে জীবনপঙ্কসম্ভব সহস্র-শতদলে শ্বেতশুভ্র।

শতদলের শুভ্রতা নিয়ে বিরাজিত 'আগ্নেয়গিরি' গল্পের নায়িকা কুসুমও। কিন্তু ট্র্যাজেডী এই যে, তার জীবন-শতদলটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার আগেই অস্পৃশ্যতা ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলেপুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এ-ধরনের কাহিনী এর আগেও হয়তো পড়েছি আমরা। কিন্তু 'ছোট-বড়ো'র ফারাক বোঝাতে গিয়ে তীর্থস্থানকে এমন করে কাজে লাগান নি কেউ। তীর্থভূমিতে দাঁড়িয়ে দেবতা সাক্ষী করে হিংস্র-আদিম মানবপ্রকৃতির লাভা-স্রোতের ছবিটিও এমন করে কেউ আঁকেননি।

আজও জীবন ও প্রকৃতির আশ্চর্য-সুন্দর সব ছবি আঁকতে আঁকতেই এগোচ্ছেন প্রবোধকুমার। কোনো কোনো ছোটগল্পে ধ্বংস, অবক্ষয় ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-থাকা চিরকালের মানুষকে তিনি তুলে ধরছেন। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বন্যাসঙ্গিনী', 'কল্পান্ত' ও 'আত্মজ্ঞান'। 'বন্যাসঙ্গিনী'তে বিধ্বংসী বন্যা তার ভৈরব-ভীষণ হাহাকারকে নিয়ে জীবন্ত। আর জীবন অপরিসীম এক বিষণ্ণতা নিয়ে অসহায় ও শ্রান্ত। এখানে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে মানুষ এবং বারো বছরের মেয়ে বন্যাসঙ্গিনী ভুনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে উদ্যত সেই হতভাগ্য মানুষদেরই শাশ্বত প্রতিনিধি।

সন্দেহ নেই, ঠিক এ-ধরনেরই আর একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় গল্প হল 'কল্পান্ত'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় শহর কলকাতাকে নিয়ে এ-গল্পটি লেখা। এবং এ সার্থক এই কারণে যে, এর নায়িকা পঁয়ত্রিশ বছরের বঞ্চিতা বিধবা ছোড়দি আটত্রিশ বছরে পৌঁছুবার পথে শান্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবনের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে যে অশান্ত, কৃত্রিম ও বিলাস-বহুল জীবনকে বেছে নিল, তা' একদিক থেকে দেখলে কল্পান্তসম্ভব বলে মনে হলেও অন্যদিক থেকে, অর্থাৎ যুদ্ধের কলকোলাহলে দেশ ও সমাজের পরিবর্তনের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। গল্পটির নায়িকা ছোড়দির পরিণতি বেদনাবিদ্ধ করে আমাদের এবং আমরা দ্বিধাহীন হয়েই যেন স্বীকার করি, জীবনের কাছে ছোড়দির দাবির প্রতি এতটুকু উপেক্ষা প্রদর্শন না করেও এই বেদনাবোধ জাগানোতেই লেখকের কৃতিত্ব।

'আত্মজ্ঞান' গল্পে কৃতী লেখক দেশ-বিভাগের বেদনা ও বিচ্ছেদকে জীবন্ত করে তুলেছেন। দেশ ও মনুষ্যত্ব যে সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে, এ-কথাটাই এখানে শিল্পসম্মত উপায়ে তুলে ধরেছেন তিনি।

আলোচ্য লেখকের শিল্পদৃষ্টির পরিচয় বক্তব্যপ্রধান গল্পগুলোতেও দুর্লভ নয়। এই শ্রেণীর গল্পের স্মরণীয় নিদর্শন 'আচার্যিদের বউ', 'ঐশ্বর্য', 'জুয়া' এবং 'স্বামী-স্ত্রী'।

'আচার্যদের বউ' গল্পে আসল দ্বন্দ্ব একালের সঙ্গে সেকালের নয়, শুভ্র-নম্র রক্ষণশীলতার সঙ্গে পঙ্কিল-উদ্ধত আধুনিকতারও নয়; দ্বন্দ্বটা আসলে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির, সমর্পণের সঙ্গে শাসনের। এই দ্বন্দ্বের চিত্র অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

এ ছাড়া অনন্যসাধারণ নিপুণতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন 'ঐশ্বর্য' গল্পেও। এ-গল্পটির বক্তব্য হল, আসল ঐশ্বর্যের মাপকাঠি টাকা পয়সা বা গাড়ি বাড়ি নয়,—হৃদয়,—হৃদয়নিহিত শান্তি ও প্রেম। এই শেষোক্ত দুটো জিনিসের অভাবেই প্রচুর বিত্তের অধিকারী রণেন ও সুচিত্রার জীবন অভিশপ্ত। 'অভিশপ্ত ঐশ্বর্যের ওরা ক্রীড়নক'। কিন্তু এদের পাশাপাশি শরদিন্দু ও মিনুর অবস্থা ঠিক এর উল্টো। দরিদ্র হয়েও সুখী ওরা। কারণ, বাহ্যিক নয়, আন্তরিক ঐশ্বর্যই ওদের সম্পদ। এই সম্পদের ছবি অতি অল্প কথায় সার্থক-ভাবেই পরিস্ফুট করেছেন লেখক। এবং এ ছাড়া 'জুয়া' গল্পে জীবন নিয়ে জুয়া-খেলার যে দৃশ্য তিনি পরিস্ফুট করেছেন, তা সত্যিকারের জুয়ার আসরকেও হার মানায়। এ-গল্পের জুয়াড়ী নবেন্দু হারতে হারতে, জিততে জিততে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, সেখান থেকে আর যা কিছুই হোক না কেন, সত্যিকারের জয়ের হদিস মেলে না।

অবিশ্যি জয়ী হতে পারে নি স্ত্রী-স্বাধীনতাকে ঘিরে লেখা সার্থক গল্প, 'স্বয়ম্বরা'-র স্বামীটিও। পরাজয়ের মধ্য দিয়েই তার রক্ষণশীলতা আমাদের শ্লেষ ও করুণা আকর্ষণ করেছে।

করুণা আকর্ষণের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে চোখে পড়ে মধ্যবিত্ত জীবনকে নিয়ে লেখা প্রবোধকুমারের গল্পগুলোতে। এই শ্রেণীর গল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'মুক্তি-স্নান'। এখানে পাই শান্ত ছোট্ট ও নিরুদ্বিগ্ন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে অতিথি-সমাগম-হেতু ঘূর্ণি-ঝড়ের চিত্র। ঝড়-শেষে স্নিগ্ধ-বিষণ্ণ ধারাবর্ষণ আছে এতে; এবং এই ধারাবর্ষণেরই নাম এখানে 'মুক্তিস্নান'। এই গল্পে দারিদ্র্যের চাবুক-খাওয়া লোভী ও অসহায় মানুষের যে করুণ ছবি এঁকেছেন লেখক, তা একদিকে যেমন হৃদয়-অরণ্যের বিপুল-বিচিত্র ফুলের সুবাসে সুবাসিত, অপরদিকে তেমনি কঠোর-কুটিল শ্বাপদদের আর্তনাদে হৃদয়-বিদারী। অবিশ্যি, সন্দেহ নেই, শেষেরটিরই প্রাধান্য এখানে এবং সে কারণেই জীবন-রঙ্গমঞ্চের অন্ধকার একটি প্রান্ত এখানে বর্ণনার বিদ্যুৎচমকে ঝলোমলো।

বর্ণনার বিদ্যুৎ-দীপ্ত প্রবোধকুমারের ঘটনা-প্রধানাত্মক গল্পেও প্রচুর আছে। কিন্তু সেখানে দীপ্তি এক এক সময় চোখ ধাঁধিয়ে দেয় পাঠকদের, আসল রস-বস্তুটিকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর কাছে পাঠকদের প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ করে না। এই শ্রেণীর গল্পের উদাহরণ হল 'হরপার্বতী সংবাদ', 'ঐতিহাসিক' এবং 'বিয়ের আগে বিয়ে'।

> তবু কেমন একটা অক্ষয়, অব্যয় পরিবেশ। প্রাচীন ছায়াময় শৈবালাচ্ছন্ন শিকড়গুলি মাটির ভিতর থেকে গাছের গলা জড়িয়ে তেমনই ওঠবার চেষ্টা করছে। পত্রপল্লবের আলো-ছায়ায় শরতের আকাশের সেই রহস্যজাল সৃষ্টি, আর নামহারা বনস্পতির মর্মরে সেই প্রাচীন যুগের নিঃশ্বাস! ওদের মুখে আজ আর কথা নেই।"

সিমলার চিত্র আছে 'ঐতিহাসিক'-এ। আর 'বিয়ের আগে বিয়ে'তে আছে গিরিডির চিত্র। তবে ঠিক আঁটোসাঁটো গল্প নয় এ: বরং বেশ যেন ঢিলেঢালা। গল্পটির গোড়ার দিকে নন্দরাণী-নিরঞ্জন কাহিনীর বিস্তার আর একটু ছোটো হলে ভালো হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কোনো কোনো ছোটগল্পে পরিব্রাজক প্রবোধবাবুকে খুঁজে পাই আমরা। 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' গল্পটিতে পাই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও মধ্য-ভারতের ছবি। যদিও এই ছবি বড়ো কথা নয় এখানে; বড়ো কথা হল ক্লেদাক্ত ও বিশীর্ণ জীবনের মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার অমৃত-শিখা।

এই অমৃত-শিখা নানাভাবে নানারূপে দেখা দিয়েছে প্রবোধকুমারের গল্পে। কখনও চেনা-জানা জীবনকে ঘিরে, আবার কখনও যুদ্ধের পটভূমিকায় দেখা দিয়েছে।

চেনা-জানা জীবনকে ঘিরে অতি সুন্দর একটি গল্প 'প্রশ্ন'। নগণ্য এক সরকারী কর্মচারীর কৌতূহল, শূন্যতাবোধ ও দিবা-স্বপ্নে এ গল্পটি আগাগোড়া বেদনাসিক্ত। স্বপ্নের মধ্যমণি গৌরী বেঁচে নেই। গল্পটি তাই শুরু থেকে শেষ অবধি মৃত্যুর গাঢ় নীল বিষণ্ণতায় রাঙানো।

বিষণ্ণতা অন্য এক মূর্তিতে প্রকাশিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা 'ছবি' গল্পে। যুগ কেমন করে তার পাওনা নেয়,—জীবনের নিষ্ঠুর অপচয় ঘটিয়ে মানবপ্রকৃতিকে কেমন মর্মান্তিকভাবে বীভৎস করে তোলে, তারই সজীব ইতিকথা এই 'ছবি'।

'ছবি'র পর আসে 'মুখবন্ধ'। এ গল্পটিও লেখা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পট-ভূমিতে। এতে পাই কন্ট্রাক্টারিতে হঠাৎ ধনী-হয়ে-ওঠা এক যুবকের সঙ্গে আভিজাত্য-গর্বিত এক দরিদ্র পরিবারের সংঘাতের চিত্র। এই সংঘাতে, যুবকটিরই জয় হয়েছে শেষ অবধি; গর্বিতা লাবণ্য বলতে গেলে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু যুবকটি প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে। এই প্রত্যাখ্যান ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এ যুগের মূল্যবোধহীনতার চিত্রটি সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত।

সন্দেহ নেই, এ ধরনের যুগচিত্র আরও অনেক আছে প্রবোধকুমারের ছোটগল্পে। কিন্তু তবু বলবো, কোনো একটা বিশেষ যুগের খণ্ডচিত্র নয়, অখণ্ড অনন্ত জীবন-স্রোতস্বিনীর সামনে দাঁড়িয়ে মহাজীবনের অনুধ্যানেতেই তাঁর আনন্দ। তিনি যেন 'বলাকা'র রবীন্দ্রনাথের মতো, 'দি গ্রেট হাঙার'-এর জোহান বোয়ার-এর মতো বলতে চান, "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!"

এই 'অন্য কোন্‌খানে'র সন্ধানে বেরিয়ে প্রবোধকুমার বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-সমীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। তবে জীবনকে তিনি যে দেখেছেন কিছুটা উদাসী ও নির্লিপ্তের দৃষ্টিকোণ থেকে, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমাদের।

প্রবোধকুমারের এই দেখার অনেকখানি যেন তাঁর নিজস্ব ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার ওপর নির্ভরশীল; গল্পের সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতার ওপর নয়। এবং নয় বলেই 'অসংলগ্ন', 'ভাই', 'ভৌতিক', 'বিস্ফোরক' ও 'মূলমন্ত্র' জাতীয় গল্প লিখতে পেরেছেন তিনি।

প্রবোধকুমারের ছোটগল্পের সবচেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য নিহিত আছে তাঁর উপমা-নির্বাচনে, ভাষায় এবং সংলাপে।

উপমা-নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো জায়গায় তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এমন উপমা তাঁর অনেক আছে, সেগুলো হিমালয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বাঙলাদেশের অধিকাংশ লেখকের পক্ষেই কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। যেমন,

> "বড় একটা নিঃশ্বাস প্রমীলার ভিতরে কোথায় যেন আটকিয়ে গিয়েছিল; তুষারের তীব্র বাতাসে জল যেমন জমে ওঠে।"

[ক্যামেরাম্যান]

প্রবোধকুমারের ছোটগল্পের ভাষা বলিষ্ঠ, কাব্যধর্মী ও ব্যঞ্জনাময়। অন্যায় ও অসত্যকে তীক্ষ্ণ ছুরির মতো ধারালো ঝকঝকে ভাষার কশাঘাতে জর্জরিত করার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই।

এছাড়া সংলাপ-রচনাতেও অসাধারণ সংযমী তিনি; তিনি অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। পরিবেশ বুঝে পাত্রপাত্রীদের মুখে উপযুক্ত কথা উৎসারণের ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দোসর খুব অল্পই আছে।

কিন্তু তবু কিছুতেই যেন খুশি হতে পারেন না তিনি। তাঁর অতি-আধুনিক ছোটগল্পগুলো পড়লে মনে হয়, গল্প নিয়ে এখনও যেন তিনি বিচিত্র সব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। অর্থাৎ, এখনও দেয়ালীর সেই প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন তিনি। বাঙলা ছোটগল্পের প্রাঙ্গণটিকে নিত্য নতুন আলোর স্পর্শে ভরিয়ে তুলছেন।

ফেরিওলার হাঁক শুনলেই নীলিমার মন রাস্তায় ছুটে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হয়তো ডাকে—'এই এসো—দোতলায়'। কি হয়তো চাকর দিয়ে ডেকে পাঠায়। পিঠের বোঝা নামিয়ে একটি ঘর্মাক্ত জীব সিঁড়ির ধারে এসে বসে, নীলিমা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কত জিনিস যে নেড়ে-চেড়ে দ্যাখে। চার আনার জিনিস কিনতে আধ-ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ফেরিওলারা অতি ভালো লোক, কথা খুব মিষ্টি, তাছাড়া তাদের সঙ্গে আজগুবী দরদস্তুর চলে। প্রথমে যা চাইলো তার প্রায় অর্ধেক দামেই হয়তো জিনিসটা দিয়ে যায়। তাও ফাঁকিতে।

কি জিনিস? ছিটের কাপড়, তাঁতের শাড়ি, কাঁচের চুড়ি, সিঁদুর, আলতা, চুলের কাঁটা, কত কী। আর বাবলুর জন্য পুতুল, আর এটা-ওটা। কতগুলো লোক আছে, তারা এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদে চিৎকার করে হেঁকে যায়—'চে-য়াই সাবান তরল আলতা।' পিঠের উপর বোঁচকার ভারে শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ তাদের বাঁকানো—ঐ বোঝা নিয়ে এত বড়ো শহরে কোথা থেকে কোথায় তারা চলে যায়, নীলিমার ভাবতে অবাক লাগে।

এদিকে শান্তনু ফেরিওলা পছন্দ করে না। তার বড়োলোকী মেজাজ, জিনিসের দরকার হলে নিউমার্কেটে গিয়ে ঝনাৎ-ঝনাৎ টাকা ফেলে নিয়ে এসো—হাঙ্গামা চুকলো। ফেরিওলা, জাপানি খেলো জিনিস, আর দরদস্তুর—তিনটের উপরেই তার নাক-সিঁটকোনো ভাব।

অথচ ঝনাৎ-ঝনাৎ-এর অভাব প্রায়ই ঘটে, এবং শান্তনুর মতে চললে ভালো জিনিস কেনার আশায় বসে থেকে-থেকে অনেক দরকারী জিনিস হয়তো কখনোই কেনা হতো না। তাছাড়া, সংসারে কত জিনিস দরকার, পুরুষমানুষ তার কী বোঝে।

না বুঝুক, নাক ঢোকানো চাই সবটাতেই। যেমন ধরা যাক, নীলিমা সেদিন তার ফেরিওলার কাছ থেকে দশ পয়সা করে আট গজ মার্কিন রেখেছে, শান্তনু মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'ওগুলো রাখলে কেন?'

নীলিমা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললে, 'রেখেছি তো রেখেছি, তুমি চুপ করো।'

শান্তনু সংক্ষেপে বললে, 'পয়সা নষ্ট।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! এদিকে বালিশের ওয়াড়গুলো সব ছিঁড়ে গেছে, তা নিয়ে প্যানপ্যান করতে তোমাকেই শুনি।'

'ও, এ দিয়ে বালিশের ওয়াড় হবে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এ অভাগিনীর একটা শেমিজ।'

'ঐ মোটা কাপড়ে তোমার শেমিজ!' আমাকে যদি বলতে—'

'তোমাকে বললে শেমিজ কিনতে তো ছুটতে হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকানে! তোমার বুদ্ধির দৌড় তো ঐ পর্যন্ত! হয়তো আধ-ডজন পিলোকেসও আসতো।'

'ভালোই তো। ভালো জিনিস তো ভালোই। তোমার শেমিজের জন্য আমি খুব চমৎকার একটা কাপড় কিনে আনবো, দেখো।'

'থাক, থাক, আমি গরিবমানুষ, আমার ওতেই হবে। তুমি আর তোমার ছেলে যত পারো বাবুগিরি কোরো।'

নীলিমা তক্ষুনি মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শেলাইয়ের কল নিয়ে বসে গেল।

শান্তনু একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে বললো, 'এই খেয়ে উঠলে, এক্ষুনি বসলে কল নিয়ে। ও-রকম করো বলেই তো মাথাধরা ছাড়ে না।'

'ওঃ আমার মাথা—তা ধরলেই বা কী, না ধরলেই বা কী? তোমার মাথা ঠাণ্ডা থাকলে বাঁচি।' চললো তারপর কলের ঘটর-ঘটর। শান্তনু আর কী করে, রবিবারের দুপুরবেলায় নভেল হাতে নিয়ে এপাশ-ওপাশ।

দুজনের কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। শান্তনু যা বলবে, নীলিমা ঝাঁ করে প্রতিবাদ করবে; তারপরে একপ্রস্থ ঝগড়া। জগতে এমন কোনো বিষয় নেই যাতে দু-জনে একমত।

সকালবেলায় একটা লোক হেঁকে যাচ্ছে—'আতাফল চাই! আতাফল!'

তক্ষুনি শান্তনু বলে উঠলো, 'ঐ যে তোমার কৃষ্ণের বাঁশি।'

নীলিমা বললে, 'ঠিক মনে করেছো। আতাফলের কথাই ক'দিন থেকে ভাবছি। তুমি ভালোবাসো না আতা?'

'ওসব বাজে ফলটল আমি খাইনে।'

'তা খাবে কেন। মনে করো বারো পেয়ালা চা খেলেই খুব হলো। রাখি কয়েকটা, আপিস থেকে এসে খাবে।'

আতাওলা এলো, ছ-টা ফল বেচে দিয়ে গেলো। শান্তনু বলে, 'সত্যি আমার এক-এক সময় ফেরিওলা হতে ইচ্ছে করে।'

'বড়ো সুখ কিনা! এই রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে ক-পয়সাই বা রোজগার। আহা—ওদের আবার স্ত্রী-পুত্র! কোথায় সব দেশে পড়ে আছে—বছরে বুঝি দেখাও হয় না।'

শান্তনু আবার একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছিলো; অন্যমনস্কভাবে বললে, 'হুঁ।'

'তোমার মার্কেটের জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ার চাইতে ওদের দুটো পয়সা দেয়া ঢের ভালো। ওরা যে কী অসম্ভব গরীব ভাবতে পারো না।'

'কেন বলো তো?'

'সেদিন এক বুড়োর কাছ থেকে চিনে সিঁদুর কিনলুম। আমাকে বললে—এ পাড়ার সকলে আমার কাছ থেকে নেয়, আপনিও নেবেন, মা?'

'ও, তোমার নতুন পুষ্যি হলো বুঝি?'

'বলে কী—আর পারিনে, মা, রোদে-রোদে ঘুরতে, কিন্তু কী করবো। মায়েরা সব বলেন—কত লোক তো সিঁদুর হেঁকে যায় কিন্তু তোমার মত জোরে আর-কেউ হাঁকে না। আমার ডাক শুনলেই চিনতে পারেন মায়েরা। জোরে কি আর শখ করে হাঁকি, মা, জোরে-না-হাঁকলে কেউ তো ডাকবে না আমাকে। এবারে কিছু পয়সা জমলেই দেশে চলে যাবো। —জানো, লোকটা হিন্দুস্থানি, দেশ মজঃফরপুরে, বৌ কবে মরে গেছে, এক মেয়ে আছে শুধু। বলছিলো, দেশে যাবার টাকা জমতে আরো দু-মাস নাকি লাগবে। আহা—মেয়ের জন্য মন কেমন করে না। আমি বলেছি ওর কাছ থেকেই সব সময় সিঁদুর কিনবো, কিন্তু বছরে মানুষের কতটুকুই বা সিঁদুর লাগে।'

শান্তনু বললে, 'এ-রকম কত আছে।'

'এত খাটে, কিন্তু কী পায়? কিছু না।'

'দু-আনা দিয়ে একটা হারমোনিয়াম-বাঁশী কিনেছি। বাবুল খুব খুশী।'

শান্তনু গম্ভীর হয়ে বললে, 'না-কিনলেই কি চলতো না? এমনি করে কত পয়সার অপব্যয় করো।'

'কী যে বলো। ছেলে বাঁশি নিয়ে বাজাতে শুরু করেছে, কেড়ে নেয়া যায় নাকি হাত থেকে!'

'এ নিয়ে তো বোধহয় পঞ্চাশটা বাঁশি কিনলে। ছেলেটা দু-দিন লাফালাফি করে, তার পরেই হয় ভাঙে, নয় ফেলে দেয়। এত পয়সা জোটাতে কি আমরা পারি!'

'কী আর করবে, শিশুরা ঐ রকমই। তা দু-আনার বাঁশি কবে আর কিনেছি। এক পয়সার বাঁশের বাঁশিগুলো—'

'এক পয়সা এক পয়সা করে কম হয় না।'

'ওঃ, খুব তো হিসেব শিখেছো। কবে এত সুবুদ্ধি হলো? বড়ো যে বলছো অপব্যয়, ফেরিওলাদের কাছ থেকে কত শস্তায় সব পাওয়া যায় তা জানো?

'শস্তাও যেমন, পচাও তেমনি।'

'সে তো ঠিকই! সেদিন দেড় টাকা দিয়ে বাকসওলার কাছ থেকে বাবুলের জন্য যে-কোটটা রেখেছি, সাধ্য ছিলো তোমার চার টাকার কমে কোথাও কোনো! আসল সার্টিন, আর কি সুন্দর ছাঁটকাট। তোমাকে পাঁচশো দিন বলে-বলে এই জামাটা কেনাতে পারলুম না। আর্মি-নেভিতে যাবার মতো অবস্থা হবে, তবে তো! তাও কতো সুবিধে—বাকি রাখা যায়, আস্তে-আস্তে দিতে গায়ে লাগে না।'

শান্তুনু সিগারেট ধরিয়ে বললে: 'এদিকে কত পয়সা যে বাজে খরচ হয়ে যায় তা তো ভাবোই না। খামকা কত কিছু কেন—কোনো কাজেই লাগে না সে-সব।'

'কাজে কোনটা লাগে আর না লাগে তুমি তার কী জানো! হাজার রকম ছোটো-খাটো জিনিসের ব্যবহারের ফল হচ্ছে তোমার শারীরিক আরাম। সেই জিনিস-গুলো তুমি তো আর চোখে দ্যাখো না।—'

'যথা — হাতা, খুন্তি, শিল-নোড়া ইত্যাদি। হার মানছি, এবারে একটা পান দিলে বাধিত হই।'

'এই তো—সেবারে পুরী থেকে ফেরবার সময় কটক স্টেশনে একটা জাঁতি কিনে-ছিলাম বলে রাগ করেছিলে। অথচ কি সুন্দর জাঁতিখানা, কি চমৎকার কাজে লাগছে।'

নীলিমা উঠে গিয়ে পান সেজে নিয়ে এলো। একটু পরে বললে, 'জানো ঐ বুড়ো ফেরিওলা বলে কী। ও আমাদের সমস্ত জিনিস দেবে—সাবান, পাউডার, এমন কি তোমার সিগারেট, তারপর মাসের শেষে দাম নেবে। আমরা যেসব সাবান-টাবান মাখি তার বাক্সগুলো পেলে ও ঠিক সেই জিনিস এনে দেবে। তোমার সিগারেটের একটা খালি টিন নিয়ে গেছে।'

মাস ভরে বাকিতে সিগারেট খাবার সম্ভাবনায় শান্তনু একটু উল্লসিত হয়ে বললে: 'বলো কী!'

নীলিমা বললে, 'তুমি যদি বলো ওকে ঠিক করি। বাবাঃ, তোমার ঐ নবকৃষ্ণ ভান্ডার যা চোর! বাকিতে যেমন দেয়, দাম নেয় ডবল! ওদের তুমি এ-মাস থেকে ছেড়ে দাও।'

'বেশ। তোমার ফেরিওলা দিয়ে সুবিধে হলেই হলো।'

'ও দিতে পারলে দিক না। কী বলো?'

'ভালোই তো। আমার সিগারেট কবে আনবে?'

'বলছে তো কাল নিয়ে আসবে।'

আর সত্যি পরের দিন শান্তনু আপিস থেকে ফিরে দ্যাখে, টেবিলের উপর আস্ত দু-টিন সিগারেট, আর তার সঙ্গে এক সেট ছবি-আঁকা জাপানী ছাইদান—একটা বড়ো থালার উপর চারটে ছোটো-ছোটো বাটি। নেহাৎ মন্দ না।

'কত দাম নিলে?'

'পাঁচ আনা বলেছে—এখনো দিই নি। সুন্দর না? তোমার পছন্দ হয়েছে? আর শস্তাও খুব।'

শান্তনু বললে, 'হুঁ।'

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে বললে, 'তোমার পছন্দ না হয় ফিরিয়ে দেবো। অ্যাশট্রে তো তোমার দরকার।'

সত্যি বলতে, ছেলের জন্য দু-আনার বাঁশি যতটা বাজে খরচ মনে হয়েছিলো, নিজের জন্য এই পাঁচ আনার অ্যাশট্রে ঠিক ততোটা মনে হলো না। দোমনাভাবে বললে, 'আচ্ছা, রেখেছো যখন—'

নীলিমা মুচকি হেসে বললে, 'তোমাকে দাম দিতে হবে না। আমি উপহার দিলুম তোমাকে ওটা।'

'ওঃ, এতই যখন দয়া, তখন দুটো টাকা আমাকে ধারও দিতে পারো। বড়ো উপকার হয়।'

'আমি গরিব মানুষ, দু-টাকা কোথায় পাবো। দু-আনা চার-আনা পর্যন্ত দৌড়।'

'কেন, সেবার আস্ত দুটো টাকা দিয়ে-ছিলে।'

'মনে আছে তা'হলে! দু-দিনের কথা বলে দুটো টাকা নিয়েছিলে, আর ফিরিয়ে দিলে না। চোর!'

শান্তনু হেসে বলে, 'গোড়া থেকে তা-ই। তোমাকে যখন মাতৃক্রোড় থেকে ছিনিয়ে এনেছিলুম তখন ডাকাত বলতে পারতে।'

নীলিমা বললে, 'ওগো ভালোমানুষ, দয়া করে আমার দুটো টাকা ফিরিয়ে দিতে ভুলো না। আমার কোটোতে কিছু নেই।' একটি পাউডারের কোটো ফুটো করে নিয়ে নীলিমা তাতে বাজার-ফেরৎ দু-চার পয়সা ফেলে রাখে, মাঝে মাঝে একটা দু-আনি কি সিকি, কদাচ একটি আধুলি বা টাকা। কোটোটা এক-এক সময় ওজনে খুব ভারি হয়ে ওঠে, কিন্তু তার আসল ভার বিশেষ-কিছু নয়, কেননা তার গহ্বরে বেশীর ভাগই তাম্রমুদ্রা। তবু সেটা অনেক সংকট থেকে বাঁচায় এবং সংকট প্রায়ই ঘটে বলে তার উদর এত বেশী টানা-হেঁচড়া চলে যেটা নীলিমার পছন্দ হয় না। সকালে উঠে দেখা গেলো বাজারের পয়সা নেই, ভৃত্য অপেক্ষমাণ; নীলিমা আড়ালে গিয়ে কোটো ঝেঁকে-ঝেঁকে পয়সা বের করে—ভৃত্য কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু ঝনঝন শব্দ শোনে কিনা কে জানে। পাউডারের তলানিতে শাদাটে হয়ে যাওয়া এক মুঠো তামার পয়সা চাকরের হাতে দিতেও কেমন খারাপ লাগে।

কিম্বা হয়তো বাড়িতে হঠাৎ কোনো আত্মীয়রা বেড়াতে এসেছেন, নীলিমা তাঁদের বসবার ঘরে বসিয়ে লুকিয়ে একটি আধুলি উদ্ধার করে আনে, মিষ্টিমুখে ভদ্রতা রক্ষা হয়।

একবার সেই কোটো থেকে দু-দুটো টাকা ধার করে শান্তনু আর ফিরিয়ে দেয় নি। নীলিমা সুযোগ পেলেই সেটা শোনায়।

শান্তনু তার শেষ কথা বললে, 'আমি তো তোমার কোটোর ভরসাতেই আছি—আর সম্প্রতি তোমার ফেরিওলার।' ঘরে বসে সিগারেট খেয়ে শান্তনুর মেজাজ বেশ ভালোই যাচ্ছিল, এর মধ্যে এক কাণ্ড। সকালবেলায় চা খেয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছে, এক বন্ধু বলেছে আধুনিক মেয়ে-দের বিরুদ্ধে দু-পৃষ্ঠায় সাধুভাষায় কিছু অসাধু বচন ঝাড়তে পারলে দশটা টাকা পাওয়া যাবে। বিষয়বস্তুটা আদৌ তার মনঃপূত নয়, কিন্তু দশটা টাকাও ছাড়া যায় না। কিছুতেই লেখা এগোচ্ছে না, সিগারেটের পর সিগারেট খামকা পুড়ে যায়, এদিকে ঘরের বাইরে নীলিমা অবিশ্রান্ত কার সাথে বকর-বকর করছে। খানিক পরে তার মনে হলো এ কোনো ফেরিওলা না-হয়ে যায় না। রাগে তার মুখ কালো হয়ে গেলো। কার সাধ্য এ-বাড়িতে একটু নিরিবিলি বসে কাজ করে। সব সময় বাজার বসেছে। এদিকে সে দশটা টাকার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে, ওদিকে নীলিমার কাণ্ডটা দ্যাখো। ঠিক আধুনিক মেয়েদের আক্রমণ করার মতোই যখন তার মনের অবস্থা এমন সময় নীলিমা ঘরে ঢুকে নিচু গলায় বললে—'শোনো ঐ ফেরিওলা টাকা চাইছে।'

'আমাকে কেন বলতে এসেছো ও-কথা?'

'কাকে বলবো তবে? শোনো ও বলছে এত জিনিস দিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না—টাকা না-পেলেই চলবে না ওর।'

'তাই বলে এক্ষুনি চাই ওর? এই মুহূর্তে?'

'বড্ড পিড়াপিড়ি করছে। গরিব মানুষ—ঠিকই তো, এত সিগারেট ও দেবেই বা কোত্থেকে। সবসুদ্ধ ছ-টাকা তেরো আনা হয়েছে।'

'এখন মাসের শেষ, কোথায় পাবো টাকা?'

'তাই তো ভাবছি।'

'আগে ভাবলেই ভালো করতে। যত রাস্তার লোক ধরে-ধরে এনে জোটাবে—কী বোকার মতো কাজ করো এক-এক সময়।'

শেষের কথাটা হজম করে অতি নিচু গলায় নীলিমা বললো, 'কাল আসতে বলবো ওকে? পারবে জোগাড় করতে?'

কাগজের দিকে গোটা দুই লাইনের আঁকিবুঁকির দিকে তাকিয়ে শান্তনুর শরীরটা যেন জ্বলে গেলো। চড়াগলায় বলে উঠলো, 'কোত্থেকে জোগাড় করবো? তুমি জানো না আমার অবস্থা? এখন আমাকে

ধার করতে ছুটতে হবে তো—আর চাওয়া-মাত্র ধারই বা কে দেবে আমাকে।'

নীলিমা প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বললে, 'ও তো বলেছিল মাসের শেষে নেবে, এ-রকম হবে জানলে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ফেরিওলারা তো এরকমই। জোচ্চোর, চোর, বাড়ির মেয়েদের ঠকিয়ে দু-পয়সা করাই তো ওদের পেশা। আর তুমিও যেমন। ফেরিওলা ডাকা ছাড়া আর কি সময় কাটাবার উপায় নেই?'

'দরকারেই ডাকি।'

'অদরকারেও ডাকো। জানো কিছু নেবে না, হাতে পয়সা নেই, তবু কত লোক ডেকে এক ঘণ্টা ধরে জিনিসপত্র ঘেঁটে ফিরিয়ে দাও। লজ্জাও করে না! আমি তোমাকে বলছি, কক্ষনো আর এ-বাড়িতে ফেরিওলা ডাকতে পারবে না।'

মুহূর্তে ঝলকে উঠলো নীলিমার চোখ। 'বেশ, আর ডাকবো না। এ বাড়ি তোমার, তোমার ইচ্ছে-মতোই সব হবে। কিন্তু এটা ঠিক জেনো, যত জিনিস আমি ওদের কাছ থেকে কিনি সবই তোমার আর তোমার ছেলের জন্য। নেহাৎ যা-না হলেই নয়, তা-ই। এই ছ-টাকা তেরো আনার মধ্যে পাঁচ টাকাই তোমার সিগারেটের দাম, তা মনে রেখো। আর সাবান—তাও তোমার। আর কয়েকটা কাঁচের গেলাস—তাও—'

'থাক, থাক আর হিসেব শুনতে চাইনে। এক্ষুনি বিদেয় করে আসছি ওকে।' এক ঠেলায় চেয়ারটা সরিয়ে শান্তনু বাইরে গিয়ে দেখে, বুড়োমতো একটা লোক সামনে প্রায় একটি মনোহারি দোকান সাজিয়ে বারান্দার বসে গামছা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে। রাগে শান্তনুর মুখ থেকে হিন্দী বেরিয়ে গেলো, 'এই ভাগো! বাহার যাও! আভি নিকোলো!'

শান্তনুর সঙ্গে তার সিগারেটসরবরাহ-কারীর প্রথম সাক্ষাৎ হলো এইরকম। লোকটা তার কুঁকড়ানো মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকালো শান্তনুর দিকে।

'ক্যায়া? মালুম নেই হোতো? বাহার যাও জলদি।' বলে শান্তনু ওর দু-একটা জিনিস পা ঠেলেও দিলে।

লোকটা কোনো কথা বললে না; মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে তার সব পসরা কুড়িয়ে নিয়ে বস্তা বাঁধলো, তারপর ঘাড়ে করে আস্তে-আস্তে নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

শান্তনু ঘরে ফিরে এসে বললে, 'আপদ গেছে। কক্ষনো আর ডেকো না বলে দিলাম।'

কথা বলতে গিয়ে নীলিমার ঠোঁট কেঁপে উঠলো, চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'খুব তো বীরত্ব করে এলে। তা ওটা আমার উপর করলেই ভালো করতে। ও বেচারা তো কোনো দোষ করে নি।'

নিষ্ঠুরতার একটা নেশা আছে, তারই ঝোঁকে শান্তনু বলে উঠলো, 'নাও, নাও' রাস্তার লোককে অত দয়া না-করে নিজের স্বামীকে একটু-আধটু দয়া করতে শেখো।'

নীলিমার ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো, দাঁতে-দাঁত চেপে বললে, 'এটাই তো তুমি জানাতে চাও যে, তুমি কর্তা, তুমি প্রভু! এ তো কবেই বুঝেছি যে আমি তোমার দাসী ছাড়া আর কিছুই নই—তোমার সব খুঁটিনাটি আরজি মেনে চললে মাঝে মাঝে একটু পিঠে হাত বোলাতে পারো বটে। আমার নিজের বলে কিছু আছে নাকি? আমি তো সেইরকমই চলি—তুমি যা ভালো না-বাসো তা না-করাটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বলতে পারবে, আমার নিজের শখ বলে কিছু আছে, নিজের খেয়ালে একটা টাকা কখনো খরচা করেছি? ভিখিরির মতো কুড়িয়ে-কাড়িয়ে দু-চার পয়সা যা জমাই তা-ই দিয়ে কখনো-কখনো এটা-ওটা কিনি বলেই তো তোমার এত রাগ। ঐ বুড়োকে তোমার সিগারেটের জন্যই ঠিক করেছিলুম — সব সময় হাতে পয়সা থাকে না, অসুবিধে হয়—'

'জানি, জানি আমি সিগারেট খেয়ে টাকা ওড়াই, এ-কথা কত আর শোনাবে। আমার বাবুগিরির মধ্যে ঐ তো এক সিগারেট। তা তুমি যা-ই বলো সিগারেট না-হলে আমার চলবে না। এত খেটে রোজগার করি এই সামান্য একটা বিলা-সিতাও কি আমার অন্যায়?'

'থাক, থাক, আর বোলো না। তুমি একা থাকলে তো ভালোই থাকতে, আমাকে বিয়ে করে গরিব হয়েছো, এ-কথাটা নাই-বা শোনালে। আমি এলাম, তারপর বাবলু এলো, কত বাড়লো খরচ, তোমার নিজের সুখ-সুবিধে সব গেলো, সবই জানি আমি। কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে? এত কঠিন দুঃখ কেন দিলে আমাকে? তোমার জীবনের সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজেকে মনে-প্রাণে বিলিয়ে দিয়ে ভাবি, এই তুমি চেয়েছিলে, আমাকে না-হলে তোমার চলত না, চলবেও না। ভুল, ভুল! আমরা মেয়েরা শুধু মনে-মনে খেলাঘর সাজাই, তা ছাড়া কী?' বলতে-বলতে নীলিমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

এদিকে শান্তনু হঠাৎ লক্ষ্য করলো ঘড়ির কাঁটা নটা ধরো-ধরো। পাগলের মতো ছুটে গেলো বাথরুমে, মাথায় দু-ঘটি জল ঢেলে এসে হাঁকে-ডাকে কেষ্টকে অস্থির করে তুলে, গোগ্রাসে কিছু ভাত গিলে পাৎলুন আর কোট চাপিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে ট্রাম ধরলো। নীলিমার সঙ্গে আর একটা কথা বললো না।

বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

আপিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই শান্তনু পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বের করলে, 'এই নাও তোমার ফেরিওলার পাওনা চুকিয়ে দিয়ো।' হেসে বললে কথাটা, হঠাৎ ঠাট্টার সুরে, যেন সকালবেলার ঘটনাটা এই একটুখানি হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চায়।

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

'তোমার কাছেই রাখো।'

শান্তনু আবার বললে, 'নাও।'

নীলিমা নিলে নোটটা, কাপড়ের আলমারীর দেরাজে রেখে দিয়ে বললে, 'চা খাবে এসো।'

খাবার টেবিলে বিরাট আয়োজন, নীলিমাই বসে-বসে করেছে ও-সব। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিলো শান্তনুর, দ্রুতবেগে খেতে শুরু করলো।

একটু পরে বললে, 'তুমি খাচ্ছো না?'

'আমিও খাচ্ছি।'

একটু শিঙাড়া ভেঙে মুখে দিলে নীলিমা, আধ পেয়ালা চা ঢেলে নিলো। হয়তো সে কেঁদেছে, হয়তো দুপুরে সে খেতে বসেও কিছু খেতে পার নি।

এদিকে শান্তনু আপিসে পেঁছেই যা-হোক করে সেই প্রবন্ধ লিখে বেয়ারার হাতে পাঠিয়ে দশ টাকা আনিয়েছে; লাঞ্চের সময় খুব খিদে পেয়েছিলো। তবু ভালো করে কিছু খায় নি, তাহলে নোটটা ভাঙাতে হবে। এমনি করে নোটটা উপার্জন ও রক্ষা করে বাড়ি নিয়ে এসেছে, কিন্তু নীলিমা একবার জিগেস করলে না কোথায় পেলো।' কথাগুলো সব মনে-মনে সাজানো ছিল; বলা হলো না। চাপা গুমোটে কাটলো সে রাত, কাটলো তার পরের দিন। আপিস থেকে ফিরে শান্তনু জিগেস করলে, 'তোমার ফেরিওলা টাকা নিয়ে গেছে?'

'না, আসে নি।'

'আসে নি? কাল আসবে দেখো—টাকা যখন পাবে, না-এসে যাবে কোথায়? কিন্তু শান্তনুর মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়লো। চার দিন কেটে গেলো, বুড়ো এলো না। শান্তনু বললে, 'নীলিমা কেমন হলো? আসে না কেন লোকটা?'

'কী জানি।'

'অসুখ করলো নাকি? তোমার তো আরো সব ফেরিওলা আছে — তাদের দিয়ে একটু খোঁজ করাও না।'

নীলিমা চুপ করে রইলো।

'রাস্তায় ওর ডাক শুনতে পাও না?'

'কই, না তো।'

'কাল মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করো।'

কিন্তু পরের দিনও বুড়োর সেই চড়া হাঁক-শোনা গেল না একবারও। তার পরের দিন রবিবার। শান্তনু সারা দুপুর ঘুমোতে পারল না। প্রায়ই উঠে-উঠে বারান্দায় যায়, মনে হয় বুড়োকে বুঝি দেখবে। কিন্তু কোথায়!

এক মাস কেটে গেল।

'কী আশ্চর্য,' শান্তনু হঠাৎ একদিন বললে, 'বুড়ো আর এলোই না।'

'নীলিমা বললে, 'এলো না তো।'

'কী হলো ওর বলো তো?' বড়ো ম্লান দেখালো শান্তনুকে, প্রশ্নটা বড়ো অসহায় শোনালো। হয়তো দেশে ফিরে গেছে ওর মায়ের কাছে—কী বলো?'

'হয়তো গেছে।'

হয়তো গেছে। হয়তো গাড়ি চাপা পড়েছে, হয়তো জ্বর হয়ে মরে গেছে—কি হয়তো কলকাতারই অন্য কোনো পাড়ায় ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে পথে-পথে ঘুরে গলা ফাটিয়ে চীনে সিঁদুর হেঁকে বেড়াচ্ছে, দেশে যাবার পয়সা জমতে এখনো ঢের দেরী। কে জানে।

বুদ্ধদেব বসু

ভবানী মুখোপাধ্যায়

একবার নিজের গল্প সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—"খুব সম্ভব আমি স্বাভাবিক গল্প লেখক নই। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল : ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে মনস্তত্ত্বের দিকে। এমন গল্প আমি কমই লিখেছি যার গল্পাংশ মুখে বলে দেয়া যায় না। এমন গল্প লিখেছি যাকে গল্পাকারে প্রবন্ধ বললে দোষ হয় না। পাত্র-পাত্রীর আলাপ আলোচনায় মনের অব্যক্ত চিন্তাধারায় অনেক পাতা ভরিয়েছি।"

স্বাভাবিক গল্প লেখক বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ নিটোল গল্প, যার আরম্ভ আছে, মধ্য আছে এবং শেষ আছে, বক্তব্য শেষ করে তবে কাহিনী শেষ সেই গল্প হয়ত লেখেন নি বুদ্ধদেব তবে তিনি যে গল্প লিখেছেন তা এক নতুন ধারা ও নতুন রীতির সন্ধান দিয়েছে বাঙালী সাহিত্য-পাঠককে। তাঁর যে গল্প একদিন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল অথচ যে গল্পটি তিনি কোনো সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন নি সেই 'রজনী হল উতলা' গল্পের মধ্যেই বুদ্ধদেব বসুর গল্পের যে সামাজিক পরিবেশ উত্তরকালে তাঁকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে তার এক ইঙ্গিত আছে। উচ্চবিত্ত বাঙালী সমাজের ইংরেজী কেতা-দুরস্ত সমাজের মানুষগুলি তাঁর অতি-পরিচিত এবং তাদের নীচতা, ক্ষুদ্রতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ন্যাকামো, পাকামো, মহত্ত্ব, বোকামী ইত্যাদি বিভিন্ন মনোভংগী বুদ্ধদেব বসু যে অনায়াস নৈপুণ্যে ফুটিয়েছেন তাঁর ছোট গল্পে তা এক হিসাবে তুলনাহীন। সমাজে সর্ব শ্রেণীর জীব আছে। উচ্চবিত্ত এবং স্বল্পবিত্ত দুই সমাজের মানুষ নিয়েই সাহিত্যিকের জগৎ। যেহেতু উচ্চবিত্তের গণ্ডিতে কোনো মানুষের জন্ম হয়েছে সেই হেতু সে সাহিত্যের সমাজে হরিজন হয়ে যাবে এমন কথা বলা যায় না। বুদ্ধদেব তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে একটা সুস্থ চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন এদের কথা লিখে, এদের সুখ দুঃখ ব্যথা ও বেদনার ছবি এ'কে। এইদিক থেকে হয়ত বুদ্ধদেবকে তাঁর বাল্য ও কৈশোরে মণীন্দ্রলাল বসুর রচনা অনুপ্রাণিত করে থাকবে। কারণ তিনি যখন কিশোর তখন বাংলার গল্প উপন্যাসে মণীন্দ্রলালের জমাট হাট। গোকুল নাগ 'পথিক' লিখেছিল মণীন্দ্রলালের ঢঙ-এ। উভয়েই ছিলেন ফোর-আর্টস গোষ্ঠীর অন্তর্গত। বুদ্ধদেব বসু এই তথাকথিত উন্নাসিক সমাজের সামগ্রিক রূপ তাঁর গল্প-উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু এই সব নয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'হতাশা' ও 'সুখের ঘর' এই গল্প দুটিতে যে জীবনের ছবি এ'কেছেন তা কিন্তু সাধারণ ঘরের গল্প, প্রতিদিনের গল্প। 'হতাশা'র নায়ক বেকার, তিরিশের যুগের বেকার বাঙালীর যে আকৃতি ছিল আজ সত্তরের কাছে পৌঁছেও তার রূপ অপরিবর্তিত, বুড়ো বাপ সন্তানের একটা কিছু ভালোরকমের কাজ হোক এই ভেবে উদ্বেগাকুল, আর তার স্ত্রীর মনে কত আশা। সে স্বামীকে সংবাদ দেয় তোমার চাকরীর খবর এসেছে। স্বামী প্রশ্ন করে—কী খবর? স্ত্রী বলেন—হয়নি। ভেঙে পড়েছেন শ্বশুরমশাই এই সংবাদে।

অনুপমের (বেকার নায়ক) মুখও কিছুক্ষণের জন্য ম্লান হয়েছিল, তারপর সামলে নিয়ে সে বলে ওঠে—ওঃ বাঁচলাম। হলে মুসকিলই হতো—বাবার জন্য না নিয়েও ত' পারতাম না—ইত্যাদি।

তিরিশের দশকে হতাশার ভঙ্গীটা ছিল এমনই দার্শনিক।

'সুখের ঘর' গল্পটিতে এক আশ্চর্য-আঙ্গিকের সাহায্য নিয়েছেন লেখক। বারটি দৃশ্যে এক নাটকীয় ঢঙ-এ সমস্ত কাহিনীটি পরিবেশিত। প্রথম দৃশ্যে আছে গ্রীষ্মকালের কালিঘাট পাড়ার দমবন্ধ গলির ময়লা মশারির আভ্যন্তরীন দাম্পত্যালাপ। স্বামীকে স্ত্রী বলেছে ছোটোলোক, স্বামী বলছে দেব লাথি মেরে মুখ গুঁড়িয়ে। দ্বিতীয় দৃশ্য—স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখছে স্বামী। স্বপ্নে বিনোদ বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে বড়োবাবুর গলায়। স্বপ্ন শেষ। তৃতীয় দৃশ্য—স্ত্রীর স্বপ্ন—সেই স্বপ্নে স্বামীর লালসাক্রান্ত আতংককর আকৃতি ধরা পড়ে আর চতুর্থ দৃশ্য—'অজাত মানুষের স্বপ্ন'। সেই অজাত মানুষ প্রার্থনা করছে আমাকে ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও, আমি জন্মাতে চাই না। বুদ্ধদেব অজস্র ভালো গল্প লিখেছেন। কিন্তু আমাকে যদি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচন করতে হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় এই গল্পটিকেই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে।

তাঁর আর একটি গল্প 'দাম্পত্য আলাপ'। এই গল্পের রচনারীতিও নাটকীয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনে বসে অতীতের কথা আলোচনা করছেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি শোক-সংবাদকে কেন্দ্র করে আলাপাচার। স্ত্রী আঁৎকে উঠেছেন শুনে যে মৃতা সুষমা দত্তকে তাঁর স্বামী চিনতেন। ধীরে ধীরে অতিশয় মর্যাদা-মণ্ডিত ভঙ্গীতে স্বামী বললেন অতীতের ইতিহাস, সুষমা দত্তের বিবাহ তিনিই উদ্যোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুষমা বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় যখন নায়ককে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো তখন তার চোখ দুটি লালচে।

নায়কের মনে হল বিয়ের রাতে সব মেয়েই কাঁদে—কিন্তু মেয়েটি অস্ফুট গলায় বলেছিল—আপনার মনে এই ছিলো—।

সবটুকু শুনে অবশেষে স্ত্রী বললেন—সত্যি তুমি বড়ো বোকা ছিলে।

এই গল্পটির মধ্যে একটি করুণ মধুর স্মৃতির যে ছবি লেখক এ'কেছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

'অতনু মিত্র সাবিত্রী বোস—আর বুলু' 'এমিলিয়ার প্রেম' প্রভৃতি গল্পে বুদ্ধদেবের কাহিনী অন্য এক জগতের সংবাদ এনেছে। অতনু মিত্র অর্ধ-ক্যাসানোভা জাতীয় পুরুষ। সে রীতি-মত কেতাদুরুস্ত পুরুষ। মেয়েদের সে চরিয়ে বেড়ায়। সে মেয়েদের পিছনে নয়, মেয়েরা তার পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু প্রেমের বিচিত্র গতি এই অতি স্মার্ট অতনু মিত্রের কাছে 'অপরিচয়ের বিস্ময় নিয়ে' এসে হাজির হল বুলু। মাত্র পনের বছরের সাধারণ মেয়ে বুলু। কিন্তু বুলুকে ছেড়ে সাবিত্রী বোসের মাকড়সার জালে তাকে ধরা দিতে হল। তবু তার জীবনে বুলু একটা স্বপ্ন, সে স্বপ্নের স্পর্শ এনেছিল।

'যেন স্বপ্নের মধ্যে বুলুর একটি হাত অতনু টেনে নিলো নিজের হাতে—চেপে ধরল মুখের উপর, মনে মনে বলল 'বুলু যেয়োনা, এখানে থাকো। আমার কাছে থাকো।'

ক্ষণিকের স্বপ্ন, আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল। লেখক এক অসামান্য কৌশলে অতনু মিত্রের জীবনে বুলুর স্বপ্ন সঞ্চার করেছেন। অতি পরিচ্ছন্ন ভঙ্গীতে এমন একটি রোমাণ্টিক কাহিনী পরিবেশন বুদ্ধদেব বসুরই নিজস্ব রীতি। 'অভিনয় নয়' বুদ্ধদেব বসুর আরেকটি বিখ্যাত গল্প। এখানেও নায়ক প্রতুল প্রণয়কুশল তরুণ। কিন্তু নায়িকা রমার 'প্রজাপতি-পণার উপকরণের অকুলান ঘটত না কখনো। মনোহরণের বিদ্যায় সে ছিল অ-জন্মসিদ্ধা।' সেই রমাকে কি করে বিয়ে করল প্রতুল তারই ইতিহাস সে বলছে বন্ধুদের কাছে। গল্পের প্রথমেই বলা হয়েছে অস্কার ওয়াইলডের কথা 'জীবনের চেয়ে আর্ট অনেক বড়ো—', তাই ভালোবাসা, ভালো-বাসার পাত্রীকে জয় করাটাও আর্ট। প্রতুল 'সীতা' নাটক দেখতে নিয়ে গিয়েছিল রমাকে। শিশিরকুমার ও প্রভা যেন জল-জ্যান্ত রাম ও সীতা। রমাকে অভিভূত করার জন্য চতুর্থ অঙ্কের পর আলো জ্বলতেই উঠে চলে গেল প্রতুল, এল পঞ্চম অঙ্ক সুরু হবার পরে। রমা তখনও রুদ্ধশ্বাস, তারপর 'বহুদূর থেকে ভেসে আসা শ্রীমতী প্রভার 'নাথ' উচ্চারণের সঙ্গে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ তিন ঘণ্টার অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মোচন করলো। আলো জ্বলল, মোহ ভাঙলো, শুরু হ'লো বাস্তবের কোলাহল। রমা কিন্তু মাথাই তুলছে না। ওকে ডাকতে হ'লো। উঠে দাঁড়াতে বেশ একটু সময় লাগলো ওর লালচোখ—কিন্তু ইচ্ছে করেই ওর চোখের দিকে তাকালাম না।'

তারপর ট্যাক্সিতে সুযোগ বুঝে প্রতুল ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে ডেকেছিল—সীতা।

সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো রমা। প্রতুল রমাকে বিয়ে করেছে। তার কাছে রমা তাই 'হাজার হোক মেয়ে'।

এই কাহিনীটির মধ্যে সেই চিরন্তনী নারী প্রকৃতির অসহায় অবস্থার এক মধুর ইঙ্গিত আছে। প্রতুলের মতে সব মেয়েরাই সমান।

এই কাহিনীটি বুদ্ধদেব বসুর প্রথম যুগের রচনার এক প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প।

আরেক শ্রেণীর গল্প বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন সেই প্রথম যুগে যার বেশী আলোচনা হয়নি। তাঁর রেখাচিত্র গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত 'রেখাচিত্র', 'জ্বর' ও 'মেজাজ' বাংলা সাহিত্যে এক অতুলনীয় সৃষ্টি। মানবিক চিত্তবৃত্তির বিভিন্ন ভঙ্গী নিয়ে এতো সংক্ষেপে এত স্বাভাবিক কাহিনী অতি অল্প সংখ্যক লেখকই লিখেছেন। 'জ্বর' গল্পটিতে সেইকালে 'ত্রিবেণী' পত্রিকায় ইংরাজীতে অনূদিত হওয়ায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

জ্বরের পরদিনের প্রভাত যেন ঝড়ের পরদিনের সকাল। রমাকান্ত তখন অন্য মানুষ।

"ভোরের দিকেই—তাহার জ্বর, গা-ব্যথা, চোখ জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গসমেত তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, শুধু রাখিয়া গিয়াছে দেহের ইন্দ্রিয়গুলির দুর্বলতা ও কর্ম-বিমুখতা। ঘরের সব জানলাগুলি খোলা—অনেক তাজা রৌদ্র আসিয়া মেঝের লুটাইয়া পড়িয়াছে।"

এমন সময় সুধা চা নিয়ে ঘরে এল।

"রমাকান্ত তাহার হাত ধরিয়া আস্তে টানিয়া বলিল—থাক চা—তুমি আমার কাছে এসে একটু বসো, সুধা।"

দুর্বল একখানি হাত দিয়া সুধার কটি বেষ্টন করিয়া বলিল—কাল সারারাত ভারী বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখছিলাম—যেন তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না।'

সুধা স্বামীর মুখের উপর পরিপূর্ণ একখানি দৃষ্টি রাখিয়া একটু হাসিল মাত্র।"

জ্বরবিমুক্ত রমাকান্ত এখন অন্য মানুষ।

'মেজাজ' গল্পটিও রেখাচিত্রের অন্ত-র্গত। এই গল্পের নায়ক একজন লেখক। তিনি লিখতে বসেছেন এমন সময় এলো পাড়ার ছেলেরা চাঁদা চাইতে।

ফলে মেজাজ গেল বিগড়ে। গল্প মাথায় উঠলো। তখন প্রায় ন'টা বাজে। এর পর যতগুলি ঘটনা ঘটে গেল সবই গল্পের নায়ক লেখকের কাছে বিরক্তিকর। ভাইপো টুকুর ওপর মেজাজ বিগড়ে গেল। লেখক ভাবছেন—'ওই থিয়েটারি লোকগুলি আসিয়াই আমার সর্বনাশ করিয়া দিয়া গেল।'

ফলে টুকুর ইংরাজী পড়া বলার সময় হয় না। সে বিরক্ত হয়ে বলে—"তোর ঠাকুমাকে বলগে, তিনি ফের এমন কথা বললে গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।" ফলে মা কাঁদলেন। বৌদির প্রতি বিরক্ত। পোস্টাফিসে যেতে হল। পথে ফাউণ্টেন পেন চুরি হল। ইত্যাদি অজস্র অঘটন।।

কিন্তুটা পেনটা চুরি হয়নি। বাকসটা খুলতেই দেখা গেল সেটি যথাস্থানে বিশ্রাম করছে। তাই মেজাজ তখনই পরিবর্তিত। বৌদি আসতে সে বলে—

'দেখছো তো বৌদি, আকাশ কী ব্লু, আর বাতাসটা কী সুইট!'

চমৎকার ছেলে তোমার টুকু। মা, আজ তোমাকে চশমার দোকানে নিয়ে যেতে পারি—' ইত্যাদি।

দুঃখের বিষয় বুদ্ধদেব বসু এই জাতীয় গল্প তাঁর পরিণত বয়সে আর বেশী লেখেন নি।

আরেক শ্রেণীর গল্প লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু যা বাংলা সাহিত্যে কম লেখা হয়েছে। সেই গল্প হল নায়কের ব্যক্তিগত জীবনের হতাশার ইতিহাস। 'বিরূপাক্ষদেবের কাহিনী' এই জাতীয় গল্প। 'মৃণালিনী সাহিত্য ভবনে'র মালিক এই বিরূপাক্ষদেব। তিনিও একটু লিখে-টিকে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে জানা যায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ট্রাজেডি।

বিরূপাক্ষবাবু যাবার সময় একটি কার্ড দিয়ে গেলেন। দেখা গেল সেই কার্ডে লেখা আছে তাঁর পূর্ব জীবনের নাম পার্বতীকুমার বিশ্বাস। যে নামে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেবের 'প্রেমের বিচিত্র গতি' নাটকীয় আঙ্গিকে রচিত। উত্তরকালে যে তিনি নাটকীয় রীতির রচনার প্রতি অধিকতর আগ্রহশীল হয়েছেন এই সব গল্পই অনেককাল আগে তার ইঙ্গিতদান করেছে। 'আকাশে যখন সাত তারা ফুটলো' গল্পটিও প্রায় একই আঙ্গিকে লিখিত।

'সুন্দরের জন্ম' আরেক জাতের গল্প। কয়েকটি ছেলে, রাস্তায় পড়ে থাকা কি একটা জিনিষ দেখে থমকে দাঁড়ায়। অনেক ভীড় জমে গেল। অবশেষে বুবুর উপর ভার দিয়ে সবাই চলে গেল। বুবু সবাই চলে যেতে এদিক ওদিক তাকিয়ে সেটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ি পালালো। বুবুর মা খুলে দেখলেন একটা কাঠের পুতুল কিন্তু ন্যাংটো। পুতুলটা মা লুকিয়ে রাখেন।

পরে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল। দর বাড়িয়ে বাড়িয়ে বুবুর মা বললেন পাঁচশোর কমে দেব না। পুতুলের মালিক ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত তাই দিলেন।

বুবু কিন্তু পাঁচশো টাকায় খুশী হয়নি। সে প্রশ্ন করে—পাঁচশো টাকা কি অনেক টাকা—মা?

বুবু কিন্তু পালালো—সে আর সইতে পারছে না।

"সুপ্রভা (বুবুর মা) তাকিয়ে দেখ-লেন। যেখানে বুবু দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখানে রোদ্দুরের পাশে পাশে ছায়া পড়েছে।—সুন্দর।"

এই জাতীয় গল্পই একালে আর দেখতে পাই না।

ভোরবেলা আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চারিদিকে পাহাড়ের সারি আকাশের বুকে গিয়া মিশিয়াছে, তাহাদের গায়ের উপর যেন ধোঁয়ার মত মেঘগুলি জমিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে ঝাপ্‌সা, মেঘলা করিয়া তুলিয়াছে। ভারি মিষ্ট ঝিরঝিরে হাওয়া, মনকে যেন অকারণে পুলকিত করিয়া তোলে।

চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে এই প্রথম সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে পা দিল। কলিকাতার গরম, কলিকাতার ধোঁয়া, কলিকাতার কোলাহল, ঐ সব আবেষ্টনীর মধ্যেই এতকাল কাটিয়াছে; স্কুল, কলেজ, অফিস, বাড়ি—সবই ঐটুকু সীমারেখার মধ্যে। কত আনন্দ, কত শোক, জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির পিছনে চিরকালের মত সেই একই পশ্চাৎপট রহিয়াছে—কলিকাতা। আজ এই চল্লিশ বছর পরে সে প্রথম তাহার চিরকালের অভ্যস্ত পশ্চাৎপটকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাই সমস্ত ব্যাপারটা যেন তাহার কাছে বিরাট বিস্ময়, অসীম কৌতূহল, প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা।

স্নান সারিয়া সে বাংলোর বারান্দায় আসিয়া বসিল। নির্জন, ভারি নির্জন; যেন পরম শান্তি, পরম বিশ্রামের মত সেই গভীর নির্জনতা তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আজ আর অফিস যাওয়ার তাড়া নাই। কিম্বা ছুটির দিনে তাস খেলিবার ডাক নাই, সে-সব সে পিছনে রাখিয়া আসিয়াছে; আজ তাহার নূতন জীবন আরম্ভ হইল—

দূরে পাহাড়ের দিকে চাহিয়া নিজের জীবনের একান্ত গতানুগতিকতার কথা ভাবিতে লাগিল। কোথাও কোন বৈচিত্র্য নাই, সব যথানিয়মে চলিয়া আসিয়াছে। পাঁচজন ছেলের সহিত বাড়িয়াছে, খেলিয়াছে, স্কুলে গিয়াছে; স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিয়াছে। তখনকার দিনে যেটাকে অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছিল, আজ তাহাই নিতান্ত একাকার বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার পর কলেজ ছাড়িয়াছে, বিবাহ হইয়াছে—বাবারই অফিসে চাকরিতে ঢুকিয়াছে; ইহাতেও সেই গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম হয় নাই—বাবা মারা গিয়াছেন, মা মারা গিয়াছেন, তাহার নিজের ছেলেমেয়ে হইয়াছে—তাহারা একটু একটু করিয়া বড় হইয়াছে, কিন্তু সকলের চারিপাশে সেই একটিমাত্র আবহাওয়া। চিরপরিচিত সেই কলতলা এবং সেই সংকীর্ণ বারান্দা—নীল আকাশের প্রসারতাকে বাধা দিয়া পূবে বোসেদের বাড়ি এবং দক্ষিণে মুখুয্যেদের; সবই সেই এক, পরিবর্তনহীন!

আজ ছুটি মিলিয়াছে। বুক দুর্বল, দেহে রক্ত কম, ডাক্তারেরা বলিয়াছেন চেঞ্জে না গেলে চলিবে না। তাই জোর করিয়া চিরপরিচিত, চিরাভ্যস্ত সংসারকে পিছনে রাখিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, নূতনত্বের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে।

এখানে তাহার মাসতুতো ভাই আছে—রেলের ওভারসিয়ার। বিবাহ করে নাই, বাংলো খালিই পড়িয়া থাকে। যাক্—আশ্রয় মিলিয়াছে ভালই।

সমস্ত রাত্রি সে গাড়িতে বসিয়াছিল, বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু তাহার জন্যও আজ কিছুমাত্র তন্দ্রালুতা নাই। এই একেবারে নূতন পারিপার্শ্বিকের অত্যাশ্চর্য অভিনবতা চোখ হইতে নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে।

ইন্দিরা বলিয়া দিয়াছে, পৌঁছেই চিঠি দিও। কখনও বাইরে যাও নি—কি বিপদে পড়বে, কে জানে!

বেচারী! সংসারের নাগপাশ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া আনা গেল না। খরচ বেশী—অসুবিধাও ঢের।...ছোট্ট টিপয়খানি টানিয়া লইয়া কাগজ কলম গুছাইয়া সে লিখিতে বসিল। সহসা তাহার মনে হইল এই তাহার প্রিয়া সকাশে দ্বিতীয় চিঠি!

শ্বশুরবাড়ি তাহার কলিকাতাতেই—চিঠি লিখিবার প্রয়োজন বেশী হয় নাই। তা-ছাড়া ইন্দু তাহার কাছ-ছাড়াও বড় একটা হয় নাই। তবু প্রথম যৌবনে প্রেমপত্র লিখিবার মোহে, কি একটা চিঠি সে লিখিয়াছিল, আবোল-তাবোল, যা-তা—সে কথা আজ মনেও নাই। তারপর একেবারে এই চিঠি—

কি বলিয়া সম্বোধন করিবে কে জানে! 'প্রিয়তমাসু' লিখিবে?...চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ইন্দিরার পঁয়ত্রিশ বছরের গৃহিণীর মূর্তি, বড় যেন লজ্জাবোধ করিতে লাগিল। না, 'প্রিয়তমাসু' আর লেখা যায় না। তাহার চেয়ে 'কল্যাণীয়াসু' বরং চলে। স্ত্রী সকল অবস্থাতেই কল্যাণীয়া—

সে 'কল্যাণীয়াসু' দিয়াই পত্র শুরু করিল। লিখিল,—

'কল্যাণীয়াসু—

আমি নির্বিবাদে ও নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। গাড়িতে বিশেষ ভিড় ছিল না, কিন্তু আমি মোটেই ঘুমাইতে পারি নাই। সমস্ত ব্যাপারটা এমন আশ্চর্য ঠেকিতেছিল আমার কাছে যে, অবাক হইয়া চাহিয়া বসিয়াছিলাম। তাছাড়া, তোমার ও ছেলেমেয়েদের কথা মনে হইয়া বড়ই খারাপ লাগিতেছিল।

এখানে জায়গাটি ভালই, চারিদিকে পাহাড় এবং খুব নির্জন। দাদার বাংলোটিও একেবারে নদীর গায়ে। দাদা ত প্রায় সব সময় লাইনেই থাকেন—তবে চাকরগুলি খুব ভদ্র, অত্যন্ত যত্ন করিতেছে। মোটের উপর আমার শারীরিক আরামের জন্য কোনও ভয় নাই। আমার জন্য ভাবিও না।'

এই পর্যন্ত লিখিয়া সে কলম থামাইল। আর কি লেখা যায়?...অনেক ভাবিয়াও বিশেষ কিছু মাথায় আসিল না। তখন সে শুরু করিল—'তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে এবং তুমি প্রায়ই চিঠি লিখিবে। ছোট খুকীকে সাবধানে রাখিও; বেশী যেন ঠাণ্ডা না লাগে। গোকুলকে নিয়মিত পড়াশুনা করিতে বলিও। সতীশের ছেলেমেয়েরা, মেজ বৌমা সব কে কেমন থাকে জানাইও। তোমার নিজের শরীর খুব সাবধান, বেশী অত্যাচার-অনিয়ম করিও না। কারণ এখন তুমি পড়িলে আর কে কাহাকে দেখিবে? ছেলেমেয়ে ও বাটীস্থ সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইও'—।

এই পর্যন্ত লিখিয়া সহসা সে যেন নিজে নিজেই অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল।

এইবার ইন্দিরার সম্বন্ধে কি লেখা উচিত? সে কলম হাতে করিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—

মনে পড়িতে লাগিল বিবাহের সময়ের কথা। লজ্জাজড়িতা নতমুখী বধূ ইন্দিরার কথা, তাহাদের প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ! তাহার পর একটু একটু করিয়া চারিপাশের গতানুগতিকতার মধ্যে সে কেমন ভাবে মিশিয়া গেল! সে তাহার পরামর্শদাত্রী, সে তাহার গৃহিণী, তবুও সে সেই চিরাভ্যস্ত সংসারেরই একটা অঙ্গ। ঘনিষ্ঠতা যত বাড়িয়া উঠিয়াছে, যত সে হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে আসিয়াছে, ততই যেন তাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু ভাবিবার সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছে; সে আছে, সে অপরিহার্য কিন্তু ঐ পর্যন্ত!

কিন্তু আজ সেই সংসার হইতে দূরে আসিয়া তাহারই কথা ভাবিতে মনটা যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল। আজ সহসা মনে হইল—সে ইন্দিরাকে ভালবাসে এবং সে কথাটা সে তাহাকে জানাইতে চায়! সে লিখিতে চায়—'এবং তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিও।' সমস্ত বুককে নাড়া দিয়া যেন মনে হইল, হ্যাঁ ইহাই সে চায়, বুক ভরিয়া বলিতে চায়, আমি তোমাকে ভালবাসি।

কিন্তু ছিঃ! তাহার কানের ডগা পর্যন্ত যেন লাল হইয়া উঠিল। দিনে দিনে তিলে-তিলে তাহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে, আজ আর তাহাকে প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণের মত 'তোমায় ভালবাসি' একথা লেখা যায় না। সংসারের সুখে-দুঃখে, নিভৃত পরামর্শে যে একান্ত আপন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সে আজ কেমন করিয়া শুষ্ক কালির অক্ষরে লিখিবে 'তুমি আমার ভালবাসা জানিও!' সে বড় লজ্জার কথা! আর এই চল্লিশ বছর বয়সে? ছিঃ!

সহসা যেন তাহার মনে হইল তাহার সত্তা তাহার দেহ হইতে পৃথক হইয়া বাহিরে বসিয়া তাহার এই চিঠি লেখার বিড়ম্বনা লক্ষ্য করিতেছে। একথার কোনই মানে নাই, অর্থহীন তবুও যেন সেই রকম কি একটা মনে হইতেছে। মনে হইতেছে যেন সে বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছে—তাহাকেই!

সে জোর করিয়া কলম দোয়াতে ডুবাইল, লিখিল—'এবং তুমি আমার—'

কিন্তু তারপর? কথাটার যে মীমাংসাই হয় নাই এখনও।

কি লিখিবে, 'আশীর্বাদ জানিও',—শুধু আশীর্বাদ? মনের মধ্যে আজ এই ভালবাসার আলোড়ন যেন তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল—সে ভাবিবার চেষ্টা করিল। ইন্দিরার গৃহিণী-মূর্তি, তাহার পঁয়ত্রিশ বছরের আঁট-সাঁট দেহ। তাহার মধ্যে আর কোন স্বপ্নের ঠাঁই আছে কি? সেই বকাবকি, ছেলেমেয়েদের শাসন, চাকরদের সঙ্গে বাজারের হিসাব বোঝা রান্নাঘরের ভীষণ তাপের মধ্যে ছোট বা'য়ের সঙ্গে রাঁধিতে বসা—

ইহার কাছে ভালবাসা নিবেদন, সে ত বৃথা! সে হয়ত বুঝিবে ইহা শুধুই চিঠি লেখার বাঁধা গৎ, ইহাই নিয়ম। চিঠির শেষের দিকটা সে হয়ত মনোযোগ দিয়া পড়িবেই না, একবার চোখ বুলাইয়া মেয়ের হাতে দিয়া বলিবে—আমার বালিশের নীচে রেখে আয়, আর বাজার বেলায় তোর কাকাকে একখানা পোস্টকার্ড আনতে বলিস। জবাব দিতে হবে।

এ ভালবাসা জানানোর মধ্যে যে বিশেষ কিছু আছে, সে একবারও সে-কথা ভাবিবে না, ভাবা সম্ভব নয়। আঠারো বছরের জীবন-যাত্রাকে পিছনে ফেলিয়া আজ সে নূতন করিয়া প্রেম নিবেদন করিতে চায়, এ-কথা কেমন করিয়া ইন্দু ভাবিবে? না—সে আবার দোয়াতে কলম ডুবাইল। কিন্তু শুধুই আশীর্বাদ—শুষ্ক আশীর্বাদ মাত্র?..... সে মিনিটখানেক ভাবিয়া লিখিল, 'এবং তুমি আমার আশীর্বাদ জানিও।'

দূরে পাহাড়ের চূড়া ছাড়াইয়া সূর্যদেব তখন মধ্যগগনে আসিয়াছেন। পাহাড়ের উপরকার মেঘলা আবরণ ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহার কঠিন বন্ধুর দেহ এখন চক্ষুর সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রশান্ত চৌধুরী

আমাদের সুমুখের বাড়িটায় বুটকু বলে একটা খোকা ছিল। তার হজম-টজম ভাল মতন হ'ত না। সেদ্ধ, ঝোল আর পোড়ের চালের ভাতটুকু ছিল তার বরাদ্দ। কাজেই ভালটা-মন্দটা খাওয়ার তার বড় লোভ ছিল।—সে যখন গল্প শুনত, তখন পক্ষীরাজ ঘোড়াটার আকাশে উড়ে যাওয়া, কিংবা সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাজকন্যার জেগে ওঠা, কিংবা মুলোর মতন দাঁতওলা রাক্ষসগুলোর বিদঘুটে কান্ডকারখানা,—কিছুই তাকে তেমন করে মশগুল করে তুলতে পারত না। সে কেবলই অন্যমনস্ক হত, ছটফট করত।—শেষ পর্যন্ত যেই না গল্পটা রাজপুত্তুর আর রাজকন্যের বিয়েটা পর্যন্ত গড়িয়ে যেত, অমনি তার চোখদুটো বড় বড়। তখন, যাঁরা তাকে গল্প শোনাতেন, সেই পিসি-খুড়িরা সেই বিয়ের নেমন্তন্নে কি কি ভাল-ভাল রান্নাবান্না হয়েছিল তার খুঁটিনাটি লিস্টি দিতে থাকতেন, আর বুটকুটা চোখ ড্যাবডেবিয়ে সেই হরেক-রকম মশলাদার গরগরে খাবারের নামগুলো শুনতে শুনতে ভরপেট খাওয়ার নকল উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত এক সময়।

ঐ বুটকুর মতন এক ধরণের উপোসী লোভী পাঠককে কোনও একটি বিশেষ নকল উত্তেজনায় ক্লান্ত করে দিয়ে তাদের ঘুম পাড়াবার জন্যে কলম ধরার দায় পোয়াতে হয়নি কোনোদিন গল্পকার গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে।—এ সৌভাগ্যে যত না তাঁর নিজের, তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের, অর্থাৎ তাঁর পাঠকবর্গের।

আবার, যে-রচনা লেখা হয় to force the public to re-consider its morals—ঠিক সেই ধরনের ঘুমভাঙানো গল্প রচনার দায়িত্বে কষে কোমর-বাঁধার পরিচয়ও বড় নেই তাঁর গল্পে।

কিন্তু হারাধনের গোঁফ নেই, কিংবা তার নাকটা টিকোলো নয়—একথা বললে যেমন হারাধনের আকৃতির আন্দাজ দেওয়া হয় না, লেখক গজেন্দ্রকুমার কোন ধরনের গল্প লেখেননি শুধু সেই কথা বললেও নিশ্চয়ই তেমনি তাঁর গল্পের প্রকৃতির আন্দাজ দেওয়া হল না।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের পরিসরটা বড় ছোট,—এমন কথা অনেকেই বলেন। সেই ছোট সুখ ছোট ব্যথায় ভরা যে-জীবনটা ক্রমাগত চলছে চলছে আর চলছে,—সেই আপাত-বৈচিত্র্যহীন চলমান জীবনের যে পরম মুহূর্তটি হঠাৎ কখনও পলকের জন্যে বিদ্যুৎচমকের মত ঝলসে উঠেই লোক-লোচনের অগোচরে হারিয়ে যায়, তাকে দরদী দৃষ্টিতে চোখ মেলে দেখে কলমের কালিতে ধরে রাখতে চান যাঁরা, ধরে রাখতে পারেন যাঁরা, গজেন্দ্রকুমার তাঁদেরই একজন।

সত্যিকারের গল্প-উপন্যাস যাঁরা লেখেন, জীবন সম্বন্ধে সত্য দেবার দায় তাঁরা এড়াতে পারেন না ঠিকই। কিন্তু গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের তফাৎটা এক জায়গায় বোধহয় এই যে, উপন্যাসে এই সত্যের পরিণতি দেবার দায় যতটা থাকে, গল্পের সে-দায় নেই।

উপন্যাসে আমরা জীবনের একটা সম্পূর্ণ গোটা কাহিনী চাই। গল্পে স্লাইস্ অফ লাইফ,—জীবনেরই একটা খণ্ড-মুহূর্ত। উপন্যাসে যদি চাই পুরো গোলাকার গোটা মালাটা, গল্পে ছোট এক টুকরো ফুলই যথেষ্ট। কিন্তু সে-ফুল শুধুমাত্র যে-কোনও একটা ফুল হলেই চলবে না, সেই ফুলের গায়ে থাকা চাই ছুঁচ বেঁধানোর সেই আঁচড়ের চিহ্নটুকু—যাতে করে তাকে সম্পূর্ণ জীবনের যে বৃত্তাকার মালা, তারই একটা খুলে আনা ফুল বলে চেনা যায়। যাতে বোঝা যায়, এ-ফুল জীবনের মাল্য হতে খসা।

গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্পে আমরা পাই সেই ফুল, যা মালাটার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আমরা পাই জীবনের সেই খণ্ড-মুহূর্তটিকে, যা আমাদের ভাবনাকে টেনে নিয়ে যায় সমগ্র জীবনটার দিকে।

গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্পে আমরা পাই একটা ক্ষণিক আবেগ বা অনুভূতি, বিচিত্র মেজাজ বা কল্পনার একটা আচমকা প্রকাশ, খন্ডজীবনের একটা স্ফুরিৎ কৌতূহলবোধ।—এটা যে সবসময় একটা সুনির্দিষ্ট জীবন-দর্শনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে তা নয়। ওঠবার দায়ও নেই কিছু। নিজের স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনেই আত্মপ্রকাশ করেছে। আর তাইতেই সে গল্প হয়ে উঠেছে। সার্থক গল্প হয়ে উঠেছে।

গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্পগুলি শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ-গল্পই; না-গল্প নয়। মন নামক বস্তুটির সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু তাই বলে মন নামক পদার্থটিকে মাত্রাতিরিক্ত আসকারা দিয়ে তার দৌরাত্ম্যে কাহিনীকে জখম করবার পক্ষপাতী নন তিনি।—আবার গল্পের মালমশলা জোগাড়ের জন্যে জীবন-জঙ্গলটার গহন কুটিল জটিল অচেনা পথে-বিপথে রোমাঞ্চকর রুদ্ধশ্বাস অভিযানে সাজো-সাজো রবে বেরোতে হয়নি তাঁকে। জীবনের সহজ অনাড়ম্বর প্রকাশের মধ্যেও যে অসাধারণ গল্পের যথেষ্ট উপাদান থাকতে পারে, সে-বোধ তাঁর পূর্ণমাত্রায়।

যা চোখ মেললেই দেখা যাচ্ছে, তা সহজে দেখা যাচ্ছে বলেই তো আর সেটা সামান্য নয়। যত সহজে তাকে দেখা যাচ্ছে, তত সহজে যে তাকে চেনা যাচ্ছে না;—সেইখানেই তো তার অসামান্যতা। দুবেলা সহজে দেখতে পেয়ে যাকে সাধারণ বলে মনে হয়েছে,—মনে হয়েছে যার দিকে আর বিশেষ করে নজর দেবার কিছু নেই, যার সম্বন্ধে বিশেষ করে আর কিছু ভাববার

নেই,—তারই দিকে আমাদের নজর টেনে, আমাদের ভাবনা টেনে, তার সঙ্গে আমাদের শুধু দেখা-হওয়ার নয়, চেনা-হওয়ার দূতিয়ালী করেছেন [illegible] গজেন্দ্রকুমার। আর তখন, সেই নিতান্ত সাধারণ কেমন করে বুঝি অসাধারণ হয়ে উঠে আমাদের মন কেড়েছে।—গল্পকার হিসেবে এইখানেই গজেন্দ্রকুমারের সার্থকতা।

কে এই সাধারণ, কিংবা কী এই সাধারণ, যা অসাধারণ হয়ে উঠতে চায় গজেন্দ্রকুমারের গল্পে?—কখনও তা একটা চরিত্র, কখনও তা একটা ছোট্ট ঘটনা, কখনও তা শুধু একটা বিশেষ মেজাজ, কখনও বা আর কিছু।

গজেন্দ্রকুমারের গল্প আটপৌরে জীবনের বেড়া টপকে না উধাও হয় তেপান্তরের মাঠে, না পালায় বক্রকুটিল কানা-গলির গোলকধাঁধায়। সংসারের বেড়া ধরেই দাঁড়িয়ে থাকে সে। শুধু কেমন করে বুঝি গোধূলির এক টুকরো [illegible]ড়ন্ত আলো এসে লাগে তার ছোট্ট কপালে;—গরীব-ঘরের কালোকোলো মেয়েটার চোখে তখন ভেসে ওঠে কিসের বুঝি অপরূপ রহস্য!

গজেন্দ্রকুমারের কোন্ গল্পটিকে আপনি তাঁর শ্রেষ্ঠগল্প বলে চিহ্নিত করবেন বলা আমার পক্ষে যেমন কঠিন, ঠিক তেমনি সহজ একথাটা বলা যে, তাঁর 'বিজয়িনী' গল্পটি পড়ে আপনার নিশ্চয়ই ছোট্ট মেয়ে টুকু-কে দেখতে ইচ্ছে করবে।—যে-জন্মদাতা রাখতে পারল না মেয়েকে নিজের হেফাজতে, দিতে পারল না আদর, দিতে পারল না খাওয়া-পরা, এমন কি নিজের পিতৃত্বটা পর্যন্ত স্বীকার করতে না পেরে হারিয়া-যাওয়া একটা অচেনা মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে যে জন্মদাতাকে নিজের হাতে মেয়েকে জমা দিয়ে আসতে হল থানায়, তারপর গা-ঢাকা দিতে হল,—সেই অক্ষম জন্মদাতার জন্যে মাতৃহীন যে-মেয়ের ছোট্ট বুকের মধ্যে দরদ উথলে ওঠে,—পরের বাড়ির ফাই-ফরমাশ খেটে বড় হতে হতে যে ছোট্ট এক রত্তি মেয়েটা ভাবতে পারে—"...যদি সত্যিই সে কোন দিন মানুষ হয়ে উঠতে পারে...লেখাপড়া শিখে চাকরি পায় কোথাও—সেই দিন সে বাবাকে খুঁজে বার করবে আবার। তাঁকে এনে নিজের কাছে রাখবে, তাঁকে আশ্রয় দেবে।"—তেমন মেয়েটাকে দেখার লোভ কি সংবরণ করা যায়?

'প্রবেশ ও প্রস্থান'-এর মিস্টার রাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের ঝক্কি পোয়াবার ইচ্ছে হয়ত আপনার নাও হতে পারে,—কিন্তু গল্পটা পড়বার পর আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে, একটা ঠক্ জোচ্চোরের লোক-ঠকানোর ফন্দি-ফিকিরের নিতান্তই সাধারণ ঘটনায় একটা মামুলি গল্প শেষ মুহূর্তে কেমন আশ্চর্য অবলীলায় ঘটনার এ-পার থেকে রসের ও-পারে গিয়ে দাঁড়াল!

গল্প যে কখন কীভাবে রসোত্তীর্ণ হয়! চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ, সুর, মেজাজ কখন কার হাত ধরে যে সে রসের ও-পারে গিয়ে পৌঁছতে পারে, কে বলতে পারে তা আগে থেকে?

গজেন্দ্রবাবুর 'অব্যক্ত' গল্পে সংসারের সাধারণ একটি কর্তা এই প্রথম এসেছে চেঞ্জে, একলা। পিছনে ফেলে এসেছে চির-পরিচিত আটপৌরে সংসারটাকে। চেঞ্জে এসে সে এই প্রথম চিঠি লিখতে বসেছে তার সেই গৃহিণীকে,—চারিপাশের এত দিনকার গতানুগতিকতার মধ্যে যে শুধুই চিরাভ্যস্ত একটা সংসারের অংশমাত্র, যে তার ছেলে-মেয়ের মা।—কিন্তু নতুন পারিপার্শ্বিকের অত্যাশ্চর্য অভিনবতার মধ্যে একলা নিজের মনের মুখোমুখী হয়ে বসে কী যে ঘটেছে,—হঠাৎ সেই গৃহিণীর মধ্যে প্রিয়াকে নতুন করে ফিরে পেতে চেয়েছে সে ব্যাকুল হয়ে। তারপর লজ্জিত হয়েছে।—শুরু করতে চেয়েছে 'প্রিয়তমাসু' দিয়ে,—শেষ পর্যন্ত লিখেছে 'কল্যাণীয়াসু'।—শেষ করতে চেয়েছে 'ভালবাসা' জানিয়ে,—জানাতে পেরেছে 'স্নেহাশীর্বাদ'টুকু মাত্র।

গজেন্দ্রকুমারের সকল গল্পের নায়কেরই একটা নাম আছে। কিন্তু 'অব্যক্তে'র এই কর্তাটির কোনও নাম দেন নি। লেখক শুধু বলেছেন 'সে'। এই 'সে' যে আপনিও, আমিও;—নির্দিষ্ট একটা নাম দিয়ে তাকে কি আপনার-আমার থেকে আলাদা করা যায় নাকি?

এ-গল্পের শুরুতে আছে মেঘাচ্ছন্ন একটা ঝাপসা পাহাড়। আর শেষকালে আছে,—"পাহাড়ের উপরকার মেঘলা আবরণ ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহার কঠিন বন্ধুর দেহ এখন চোখের সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে।"

গল্পটি অনবদ্য।

'আদিম' গল্পের প্রধান চরিত্রের অবিশ্যি নাম আছে একটা,—রমাসুন্দরী। বয়স তার একশোর কিছু বেশিও হতে পারে। ছেলেরা সব কবে মারা গেছে। নাতিদের মধ্যেও একজনমাত্র ছিলেন,—প্রৌঢ় অম্বরনাথ; তিনিও গেলেন আটচল্লিশে। বুড়ি এই শোকের বিন্দু-বিসর্গও টের পায় না। বোধ তার অসাড় হয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে শুধু আদিম একটা 'নোলা' মাত্র। সেই নোলায় সে তার সেই শেষ নাতিটির শ্রাদ্ধের দিনে লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার চুরি করে ফিরতে গিয়ে কিসের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে বুড়ি জ্বরে অচৈতন্য। শেষ অবস্থা বুড়ির। সেই অন্তিম মুহূর্তে বুড়ি হঠাৎ খুঁজে বসল তার এতদিনকার বড় আদরের নাতি অম্বরনাথকে।—আমার অমু, সে কোথায়?—তারপর তাকে ফিরে না-পাওয়ার শোক-টুকু নিয়ে বুড়ি মরল।—গল্পটিও ফুরোল। ফুরোল বটে, কিন্তু সে কি শুধু একটা বিশেষ বুড়ির কথা বলেই ফুরিয়ে গেল? আর কিছু না?

অনেক দিন ধরে জীবন-যাপন করতে করতে আমাদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি-গুলো কেমন অসাড় হয়ে যায়,—থাকে শুধু একটা আদিম জৈবিক যান্ত্রিক প্রবৃত্তি।—হঠাৎ একেক দিন কিসের ধাক্কায় ওলোট-পালোট হয়ে যায় সব। তখন হঠাৎ সেই হারানো অনুভূতিটার জন্যে আমাদের মন-কেমন করে। কালবৈশাখীর ঝড়ের ধাক্কায় হঠাৎ একদিন মনে পড়ে যায়, আমার অনেক ভালবাসার গোধূলির আকাশটাকে অনেক দিন দেখা হয় নি; সে কোথায়?—কিন্তু তখন আর ফিরে যাবার সময় নেই, অনেক দেরী হয়ে গেছে।—'আদিম' গল্পটি পড়ে আমার যেন এই কথাটাই মনে হয়েছে বারবার। লেখক যেন গল্পটিকে পৌঁছে দিয়েছেন প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষের অতীত অনুভবে।

'একটি ভোটকম্বলের কাহিনী'তে লেখকের এক নতুন ঢং, নতুন রসের আম-দানী। চৈতন্যদেবের নীরব ভর্ৎসনায় সনাতন গোস্বামী তাঁর গায়ের ভোটকম্বলটি এক ভিক্ষুকের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাটি নিয়েছিলেন;—এ হল ইতিবৃত্তের কথা। লেখক এই ইতিবৃত্তের কথাটা জানিয়ে দিয়ে গল্প শুরু করেছেন তার পর থেকে।—তিনি বলেছেন, ভোটকম্বল পেয়ে কি হল সেই ভিখিরির, তারই গল্প। গল্পের আরম্ভটা যেমন চমকপ্রদ,—গল্পের মাঝ-খানের কাণ্ডকারখানা তার চেয়েও বেশি। গল্পটি পড়লে যেন 'রীলে রেস্'-এর কথা মনে পড়ে।—ইতিহাস যেন দৌড়ে এসে তার হাতের দণ্ডটা ধরিয়ে দিল রূপকথার হাতে। রূপকথা তখন ছুটল 'ম্যাজিক স্কিন্'-এর দম নিয়ে, 'মাংকিস প'-এর ঢং-এ, 'আরব্যরজনী'র ম্যাজিক কার্পেটের উড়ন্ত গতিতে।—তারপর? রূপকথা ছুটে এসে তার পালা শেষ করে যেন সেই কাঠি ধরিয়ে দিল বাংলার বৈরাগী-বাউলের জীবন-দর্শনের হাতে।—শেষ হল রীলের দৌড়। গল্প ছুঁলো এসে সেই শেষ লাইন, যেখানে লেখা আছে,—"এই পথ, আর এই পথে পাওয়া ভিক্ষান্ন—এই তার ভাল, ঢের ভাল।

'অনুকল্প'—একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্প। কী অভিনব বিষয়বস্তু! অথচ গল্পের চলনটা কতই সাদাসিধে! বনেদী জহুরীরা যেমন কাগজের মোড়কে হীরে মুড়ে এনে খুলে দেখায়,—এ যেন তেমনি দেখানো!—গল্পটি তার অভিনবতার চমকটাকে কেমন 'টোন ডাউন' করতে করতে একটা প্রশান্তির মধ্যে এনে শেষ করেছে।

গজেন্দ্রকুমারের শ্লেষাত্মক গল্পগুলির মধ্যে 'সাবালক' গ্রন্থের চোর! চোর'! গল্পটির নাম এই মুহূর্তে আমার মনে পড়লেও, এ-ধরনের গল্প তাঁর আরো কিছু আছে, যেগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এযাত্রা আর সম্ভব হল না।

লেখকের আরো কিছু ভাল ভাল গল্পের সঙ্গে দু-এক আঁচড়ে অল্প কিছুটা পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল কঠিন মায়া, 'আর-এম-এস', 'স্ত্রিয়া-শ্চরিত্রম্', 'উৎসর্গ', 'ফাউল কাটলেটের ইতিহাস', 'পশ্চিম দিগন্ত', প্রভৃতি গল্প-গুলোর সম্বন্ধে কিছু বলি। কিন্তু কোনও কিছু বলার জায়গা নেই আর। এবারের মতন এইখানেই থামতে হচ্ছে।

দুটো বেণী দিয়ে গড়া প্রকাণ্ড খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো, হাতে ভারী ওজনের মোটা মোটা কংকণ, মিহি ক্রেপের শাড়ীর জমকালো টিস্যুর আঁচলটা অবহেলায় পিঠে ফেলা, পায়ের জুতোয় আর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগে শ্রীনিকেতনী শিল্পচাতুর্য—অতিআধুনিকার একখণ্ড নিখুঁৎ নমুনো কৃশাঙ্গী কস্তুরী, গাড়ী থেকে নেমে যেন হাল্কা হাওয়ার মতো ভেসে বাড়ীতে উঠে এলো।

উঠেই আসতে হয়, রাস্তা থেকে বাড়ীটা উঁচু।

প্রদীপ বলে 'বাইশতলা দেশ'।

মিথ্যে বলে না। উপরে-নীচে এখানে-ওখানে পথ আর বাড়ীর যেন গোলক ধাঁধা। কস্তুরীকে দেখে প্রদীপের একাধারে গৃহরক্ষক দেহরক্ষক সেবক পালক সব-কিছু, পাহাড়ী বালক নানকুটা হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে। তা'র চাকরী-দশায় এহেন অপরূপ অবির্ভাব কখনো ঘটে নি।

কস্তুরী ওর স্তম্ভিত ভাবটা উপভোগ করে আরো যেন ঝড় বইয়ে দেয়—ঘরে আবার চাবি লাগানো কেন রে? কী মুস্কিল! খোল খোল।

বলা বাহুল্য এমন দরাজ হুকুমের পর ইতস্তত করা সম্ভব নয়। নানকু সসম্ভ্রমে দোরটা খুলে দেয়।

ভ্যানিটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে দিব্য সপ্রতিভ ভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে কস্তুরী।

আর ঢুকেই প্রদীপের টেবিলের কাগজ-পত্র উল্টে-পাল্টে তচনচ করতে থাকে। কবি কোথায় কিছু লিখে ছড়িয়ে রেখে গেছে কি না।

ও বাবা! প্যাডের মধ্যে এ যে চিঠি! কস্তুরীকে মনে আছে তা'হলে! আজ মাস দুই-আড়াই তো প্রায় চিঠিপত্র বন্ধ। মাঝে মাঝে দু-এক ছত্র যা পাঠায় সে আর চিঠি নয় নেহাৎই দায়সারা কুশলবার্তা।

আরে এ যে রীতিমতো সাহিত্য!... চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে প্যাডটা খুলে ধরে কস্তুরী, তর সয় না।

বাসরে, এসব আবার কি লিখছে প্রদীপ!

'—রাত জেগে তোমায় চিঠিটা লিখছি কস্তুরী—রাত্রে আজকাল জেগেই থাকি প্রায়, কিছুতেই কেন জানি না ঘুম আসতে চায় না। তবু এই জেগে থাকা আমার খারাপ লাগে না। মনে হয় রাতে ঘুমিয়ে থেকে ভারী ভুল করি আমরা। ঘুমিয়ে থাকি তাই পৃথিবীর সমস্ত রহস্য আমাদের অজানা থেকে যায়। আমরা যখন সারা দিন স্থূলে প্রয়োজনের তাগিদে ছুটোছুটি করে মরি, তখন ঘৃণায় করুণায় বোবা পৃথিবী নিশ্চল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

রাত্রে যদি ঘুমিয়ে না পড়ে আমার মতো জানলায় এসে বসো কস্তুরী, তা'হলে অনেক কিছু জানতে পারবে। জ্ঞানের পরিধি কতো বেড়ে যাবে তোমা'র। ভারী আশ্চর্য লাগবে সুদীর্ঘকাল ধরে রাত্রিটা ঘুমিয়ে নষ্ট করে এসেছো বলে।

তুমি কি জানো কস্তুরী, রাত্রির অন্ধকারে অরণ্যে যে মর্মর ধ্বনি ওঠে সে ধ্বনি কিসের? তুমি হয়তো আজও জানো না সেকথা, আমি জানি।......

পাতায় পাতায় বাতাসের লীলামৃগয়ার মুখর চপলতা সে নয়, সে ধ্বনি কোটি কোটি অশরীরি আত্মার বিক্ষুব্ধ আর্তনাদ। প্রতিদিন প্রতিরাত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্ঠুর নিয়মের নিষ্করুণ আকর্ষণে যে সব হতভাগ্যরা আশা-আকাঙ্ক্ষার ভরাপাত্র নামিয়ে রেখে এই শোভাসম্পদময়ী ধরণী থেকে অসময়ে স্খলিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে—অনন্ত শূন্যের ক্ষুধার্ত জঠরে, দলে দলে উঠে আসে তারা, অন্ধকারের অসাবধান অবসরে। উঠে আসে—ছেড়ে-যাওয়া পুরনো পৃথিবীর বুকে। উঠে এসে অবাক হয়ে যায় তারা! বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যায়! ধিক্কারে স্তম্ভিত হয়ে যায় পৃথিবীর দুর্ব্যবহারে!...এসে চিনতে পারে না কিছু, খুঁজে পায় না নিজের পুরনো জায়গাটাকে। বুঝতে পারে না—কোথায় হারিয়ে গেলো, তা'কে হারিয়ে ফেলার গভীর ক্ষতচিহ্নটা? জানতো না—মমতাহীনা পৃথিবী হারিয়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমিষে মুছে ফেলে ক্ষতির সকল চিহ্ন। নতুন করে নিজেকে সাজিয়ে নেয় আগামী নতুনের জন্য।......

কাউকে হারিয়ে ফেলে হাহাকার করতে বসবে এতো সময় পৃথিবীর হাতে নেই।...

বুঝতে পেরে ওরা ক্ষুব্ধ অপমানে দলে দলে গিয়ে জড়ো হয় অরণ্যে অরণ্যে। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ওদের হতাশ হাহা-কার। যেন মাথা কুটে কুটে সাড়া তুলতে চায় মমতাহীনার প্রস্তরীভূত বক্ষপঞ্জরে। বুঝি মনে পড়িয়ে দিতে চায়...'আমি ছিলাম' 'আমি ছিলাম'...'একদা তোমা'র এই শোভাসম্পদের উপর ষোলো আনা অধিকার ছিলো আমার, এমন নির্মম ঔদাসীন্যে আমাকে ভুলে যেও না।' এক সময় ফিস ফিস করে কথা কয়ে ওঠে নিজেরা নিজেরা। নিঃশ্বাস ফেলে বলে — 'ভুলে গেছে আমাদের!'...'আমরা নেই!' তখন হয়তো ক্ষণকালের জন্যে অরণ্যানী স্তব্ধ হয়ে যায়, শুধু একটা অনুচ্চারিত 'হায় হায়' স্থির হয়ে থাকে।

আবার আছড়ে এসে পড়ে নতুন দল।

আবার তাদের ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাসে পাতায় পাতায় ওঠে মর্মর শিহরন। সারা রাত্রি ধরে চলে এই আনাগোনা, এই যাতায়াতি।

নিরুপায় অরণ্যকে সমস্ত রাত ধরে সহ্য করতে হয় অশরীরি আত্মাদের এই অদ্ভুত আক্রমণ। ঊষার আলো ফুটলে তবে অরণ্যের মুক্তি, তখন সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

প্রেতাত্মারা আলোর আভাসে সচকিত হয়ে ওঠে, বুঝতে পারে জীবিত প্রাণীর
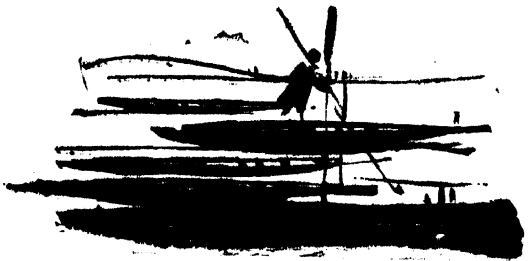
রাজ্যে এ তাদের অনধিকার প্রবেশ। বুঝতে পেরে ম্লান মুখে বিদায় নেয় তারা।

আমার এই অদ্ভুত কল্পনার খবর পেয়ে তুমি কি হাসছো কস্তুরী?...ভাবছো—দিনের আলোয় কি অরণ্যে মর্মরধ্বনি ওঠে না?...

ওঠে বৈকি। ওঠে!

সে ধ্বনি শাখাপত্রে বাতাসের লীলা-চাপল্যের। তখন কেউ ফিস ফিস করে কথা কয়ে ওঠে না।...কস্তুরী, দিনের আলোয় তুমি যদি অরণ্যের জটিলতায় ঘুরে বেড়াতে চাও, তখন যে শব্দ তুমি শুনতে পাবে, সে নিতান্তই তোমার নিজেরই পায়ের চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। তখন রহস্যহীন মৌন অরণ্য গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকবে তোমার দিকে। সারা রাত্রির মাতামাতির ইতিহাস দেখতে পাবে না তার মুখের কোনো রেখায়।

কস্তুরী, অরণ্যের এতো কাছাকাছি কখনো থেকেছো তুমি, যেখান থেকে জানলা খুললেই বনের গন্ধ পাওয়া যায়? গভীর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করেছো 'অরণ্য-মর্মরের সত্যকার ইতিহাস'?

না না!

নিশ্চয় তুমি এসব দেখো নি কস্তুরী, নিশ্চয় শোন নি এসব! যদি শুনতে পেতে—তাহলে পরীক্ষায় একটা বাড়তি ডিগ্রী আর কিছু পরিমাণ বেশী নম্বর আহরণের আশায় ইঁট-কাঠের অরণ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থেকে অমন দুরূহ তপস্যায় মগ্ন থাকতে পারতে না। তোমার এই তপস্যাটা কী হাস্যকরই আজ লাগছে আমার কাছে! আকাঙ্ক্ষার পরিধি কতো ছোট হয়ে গেছে আমাদের, ভাবলে তোমার বিস্ময় লাগে না কস্তুরী?

পড়ে হাসছো?

কিন্তু সত্যি বলছি, কেন জানি না রোজ রাত হলেই এই অদ্ভুত কল্পনায় যেন পেয়ে বসে আমাকে। কী হাস্যকর লাগে নিজেদেরকে!...কী তুচ্ছ লাগে দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের সহস্র খুঁটিনাটি!...

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে গেল এখানে—চিঠিতে খুলে লেখবার উপায় নেই। দেখা হলে বলবো। আমার মনে হয়, হয়তো এ সমস্ত সেই ঘটনারই প্রতিক্রিয়া। সত্যকার একটা পরীক্ষা না এলে—'

প্যাডটা উল্টে-পাল্টে দেখে কস্তুরী। নাঃ আর কোথাও কিছু লেখা নেই। নিশ্চয় রাত্রে লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কবি, তারপর ভোর না হতেই ছুটেছেন চাকরী বজায় রাখবার কঠোর তপস্যায়।

মৃদু একটু হাসি ফুটে ওঠে কস্তুরীর ঠোঁটের কোণে।

আহা বেচারা! ও কি জানতো সাড়ে তিনশো মাইল দূর থেকে হঠাৎ এসে পড়ে কস্তুরী ওর কাব্যির ওপর হানা দেবে?... নিশ্চয় আবার আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে দু-চারটে সিগারেট ধ্বংস করে নিয়ে মৌজ করে বসে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করতো কথার জাল বুনে বুনে। মধুর রসের প্লাবন বইয়ে ফেলেও কস্তুরীকে ভাসিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় নি বলেই বোধ-হয় এবারে অদ্ভুত রসের আমদানী করতে শুরু করেছে প্রদীপ!

'অরণ্য-মর্মরের সত্য ইতিহাস'!

রৌদ্রদগ্ধ বহিপ্রকৃতির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আর একবার হেসে ওঠে কস্তুরী। আহা বেচারা রে! শক্তিসামর্থ্য-ওয়ালা এতোখানি লম্বা-চওড়া পুরুষ জাতটাকে 'বিরহ' জিনিসটা কী কাবুই না করে ফেলে!...তা' নয়তো সমস্ত দিন খেটে-পিটে এসে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব কিনা মাঝ রাত্রে জানলা খুলে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বঞ্চিত আত্মাদের অতৃপ্ত হাহাকার শুনতে বসেন!

মাথা খারাপ! কিন্তু 'ঘটে যাওয়া ঘটনাটা' কি?

প্যাডটা চাপা দিয়ে রেখে ভ্যানিটি ব্যাগটা লুফতে লুফতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে কস্তুরী। বাচ্চা চাকরটাকে ডাক দিয়ে প্রশ্ন করে—ওহে বীরভদ্র, তোমার 'সাহেব' কখন ফিরবেন জানো?

পাহাড়ী ছেলেটার ভাগ্যে এমন একটি গরীয়সী প্রশ্নকারিণী কখনো জুটেছে কিনা সন্দেহ। তবে সে বিগলিত কৃতার্থে এক-গাল হেসে ভাঙা বাংলায় যা বলে সেটা কস্তুরীর পক্ষে খুব হৃদয়গ্রাহী হয় না। সন্ধ্যার আগে প্রদীপের ফেরবার কোন আশাই নেই নাকি।

আর এখন সবে বেলা এগারোটা।

অর্থাৎ কমপক্ষে এখনো ঘণ্টা সাতেক একা থাকতে হবে কস্তুরীকে! ট্রেনে এলে এইটি হতো না! যথারীতি খবর দিয়ে বেরিয়ে, অধীর আগ্রহে স্টেশনে অপেক্ষমান প্রদীপের কাছে এসে নেমে পড়তে পারলেই হয়ে যেতো। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে দিশে-হারা প্রদীপের সেই চেহারা কল্পনা করতে পারছে কস্তুরী।

তা নিজেই বসে কি কম কবিত্বটা করে বসেছে? যেই ইচ্ছে হলো আকাশে উড়ে চলে এলো! হঠাৎ এসে পড়ার মজাটাই মনে রেখেছে, অসুবিধেটা ভেবে দেখে নি তো!

এতোক্ষণ কি করবে সে? স্নান আহার সেরে নিয়ে দিব্যি নিটোল একটি ঘুম দেবে?

আরে ছিঃ, অসম্ভব!

তবে?

জুতোর চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে বনের ধারে ধারে?

উঁহু, রক্ষে করো বাবা!

তা'হলে?

প্রদীপের ঘর-সংসার তচনচ করে নতুন করে গোছাতে বসবে? 'পুঁথিগতপ্রাণা' হলেও কস্তুরী যে গৃহিণীপনার অযোগ্য নয়, একথা প্রমাণ করে দেবে প্রদীপের কাছে?...থাকগে যাক, কে অকারণ অতো খাটে! সংসার করতে যখন আসবে, দেখিয়ে দেবে একেবারে।...তবে কি ওর খাতাপত্র বই-কাগজ তল্লাস করবে বসে বসে? আরো কি কি উদ্ভট পাগলামীর নমুনা সংগ্রহ করতে পারা যায় তাই দেখতে?

দূর! মজুরী পোষাবে না!

সব থেকে ভালো, যতো ইচ্ছে আলিস্যি করে স্নানাহারপর্ব সেরে এই চাকরটার সঙ্গে গল্প জমানো।...হোক না বালকমাত্র, তবু কৃতার্থ হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। শিথিল ভঙ্গীতে খোঁপাটা খুলতে খুলতে ভ্রূভঙ্গী করে বলে—

—এই হাঁদারাম, তোর সাহেবের ঘর-বাড়ী সব তো এক কথায় আমার হাতে ছেড়ে দিলি, বল দিকিন আমি কে?

'হাঁদারাম' ঘাড় হেলিয়ে বলল—জানি, মেমসাহেব!

চমৎকার! কে তোকে বললো শুনি?

—কেউ বললো না। আমি বুঝছি।

—বেশ করছো। যাও এখন চানের জল দাও দিকি? হুঁ, তা'পর তোদের এখানে কিছু খেতে-টেতে পাওয়া যাবে তো?

—খুব! —যতোটা সম্ভব ঘাড় হেলিয়ে জবাব দেয় নানকু।

ভারী আশ্বাসের সুর ছেলেটার কণ্ঠে!

কস্তুরী হেসে ফেলে বলে—শুনে বাঁচলাম। তা কি খেতে দিবি একেবারে জেনেই প্রাণ শীতল করে যাই। কি আছে তোদের ভাঁড়ারে?

কথার সুখেই কথা কওয়া। খুশির পাত্র উপচে পড়লে এমনই হয় বোধহয়। পাহাড়ী ছেলেটা কস্তুরীর কৌতুক কথার অর্থ বুঝুক না বুঝুক, তবু উপযুক্ত শ্রোতার অভাবে ওর সামনেই নিজেকে ঝলসে তুলবে কস্তুরী।...গানের সুরের মতো হেসে উঠবে অকারণ, গেয়ে উঠবে এক লাইন গান। কথা বলবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

প্রদীপ অনুপস্থিত। তবু সারা বাড়ীতে তো তার উপস্থিতির বাতাস বইছে! এ বাড়ী কস্তুরীর, এ সংসারের ওপর যথেচ্ছ

স্বাধীনতার দাবী কস্তুরীর, ভাবতে কি অপূর্ব রোমাঞ্চ!

সত্যি! বইখাতা নিয়ে তখন চলে এলেই হতো প্রদীপের সঙ্গে।...নাইবা অনার্স নিতো, নাইবা হতো ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট!

কী লাভ হবে তাতে? কী ক্ষতি হতো এম-এটা যদি নাই দিতো? প্রদীপ 'বেচারা', না কস্তুরী নিজেই 'বেচারী?'

খোলা চুল আঙুলে জড়াতে জড়াতে কস্তুরী হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে—কই বল শুনি?

ছেলেটা মহোৎসাহে জানায়—চাল-ডাল আলু পিঁয়াজ ডিম মাখন ঘি আটা—কোনো বস্তুরই অভাব নেই সাহেবের ভাঁড়ারে। তবে যদি মেমসাহেবের মুরগীর মাংস খাবার বাসনা থাকে, কিঞ্চিৎ সবুর করতে হবে।...অবিশ্যি বেশী নয়, ছুটে গিয়ে ওই বনের ধারে মনিহারীর বৌকে খবর দিয়ে আসতে যা দেরী।

—মনিহারীর বৌ? সে আবার কে?

সাধারণ কৌতূহলে প্রশ্ন করে কস্তুরী। কিন্তু উত্তর শুনে কৌতূহল আর সাধারণ থাকে না, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

মনিহারীর বৌ!

সেই যে মনিহারী, সাহেবের 'টুরে' বেরোনোর সময় তলপী বইতো, সাহেবের গাড়ী আর বন্দুক সাফ্ করতো, যে মারা পড়লো — সাহেবেরই সেই বন্দুকের গুলিতে! তারই বৌ!...সাহেবের প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের কাছে মিছে কথা বলেছে বলে ওর আত্মীয়-কুটুমেরা একঘরে করে দিয়েছে কিনা!...ওই বনের মধ্যে একটা চালা তুলে নিয়ে একা থাকে সে এখন—মুরগী পোষে, ডিম বেচে, বেতের চুপড়ি বোনে।

তা'কে একবার খবর দিতে পারলেই কস্তুরীর বাসনা পূর্ণ হয়।...এমন কি ও এসে মাংস রান্না করে দিতে যেতে পারে পর্যন্ত। খুব ভালো রাঁধে ও। কতোদিন রান্না মাংস চুপি চুপি রেখে যায় সাহেবের জন্যে, সাহেব না জেনে তারিফ করেন এই আনাড়ি ভুত নানকুকে।

আঙুলের আগায় খোলা চুলের গোছা এ'টে এ'টে বসেছে, লাল হয়ে উঠেছে আঙুলের ডগা।...কিন্তু মুখটা? মুখটা অমন লাল হয়ে উঠেছে কেন কস্তুরীর? অদৃশ্য কোন রজ্জুতে কেউ ওর কণ্ঠনালীটা কি জড়িয়ে জড়িয়ে পাক দিচ্ছে? ও বসে পড়েছে—উঠোনে পড়ে থাকা তেলচিটে খাটিয়ার ওপর! ধুলোয় লুটোচ্ছে দামী শাড়ীর ঝকঝকে আঁচলটা!...এই তবে 'ঘটনা'?

অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বরকে এইটুকু মুক্তি দিতে পারে কস্তুরী—ও — এই মনিহারী গুলি খেলো কেন?

ছেলেটা অকপট সরলতায় ব্যক্ত করে, যদিও অপরের কাছে বলতে মানা কিন্তু কস্তুরী যখন নিতান্তই সাহেবের নিজের মেমসাহেব, তখন বলতে বাধা নেই। পুলিশ জানে বটে বন্দুক সাফ করতে গিয়ে হঠাৎ ভুলক্রমে গুলি ছুটে মারা গেছে মনিহারী, ওর বৌও বলেছে সেই কথা পুলিশের কাছে, কিন্তু আসল কথা তা নয়! রাতের অন্ধকারে সাহেব ওর চোখ দেখে বন-বিড়াল ভেবে ভয় খেয়ে গুলি করেছেন।

—ভয়? কিসের ভয়! মানুষকে বন-বিড়াল ভাববার মানে? আর্ত চিৎকার করে ওঠে কস্তুরী।

ছেলেটা হতাশ ভাবে দুই হাত উল্টে বলে—কি জানি মেমসাহেব। ও পাগলটা কেন যে রাতভোর জেগে জেগে সাহেবের জানলায় চোখ রেখে ঘর পাহারা দিতো কে জানে! ওর চোখ দুটো ছিলো ঠিক বন-বিড়ালের মতো। রাতে আগুনের মতো জ্বলতো।...ঘুমের ঘোরে উঠে সাহেব হঠাৎ ভয় খেয়ে—

ধীরে ধীরে ধাতস্থ হচ্ছে কস্তুরী।

গম্ভীরভাবে বলে — তা ওর বৌ পুলিশের কাছে মিছে কথা বলতে গেলো কেন?

ছেলেটা যেন কস্তুরীর অজ্ঞতায় অবাক হয়ে যায়। নিজে নিতান্ত বিজ্ঞের মতো বলে—না বললে সাহেবের নামে কেস হতো না?

—হতোই বা! উদ্ধত স্বরে বলে কস্তুরী—সাহেবের ফাঁসি হলে ওর কি লোকসান ছিলো? ওর নিজের স্বামী খুন হয়ে গেলো—

ছেলেটা নিজের ঠোঁটের উপর একটা আঙুল ঠেকিয়ে কণ্ঠস্বর খাটো করবার ইঙ্গিত জানায় কস্তুরীকে। চুপি চুপি প্রতি-প্রশ্ন করে—সাহেবের ফাঁসি হলে ওর আদমী বেঁচে উঠতো?

এত বড়ো মহৎ প্রশ্নের উত্তর সাধারণ মানুষের কাছে থাকে না। কিন্তু কস্তুরী কেন সেই মহানুভব নারীর কাছে কৃতজ্ঞ হচ্ছে না? যার একটিমাত্র কথায় ফাঁসি হয়ে যেতে পারতো কস্তুরীর স্বামীর! সে সুযোগ গ্রহণ না করে যে নিজের স্বামী-হন্তার প্রাণরক্ষা করেছে!

বরং আরো রূঢ় আরো ক্রুদ্ধ স্বরে মন্তব্য করে বসে কস্তুরী—নাই-বা বাঁচলো—মানুষ খুন করলে ফাঁসি হওয়াই তো উচিত!

পাহাড়ী ছেলেটা চমকে মুখ তুলে এক নিমিষ তাকিয়ে থাকে কস্তুরীর মুখের দিকে। তারপর গম্ভীরভাবে বলে চলে যায়—গোসলখানায় জল দিচ্ছি।

সাত ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় না, বেলা তিনটের মধ্যেই এসে পড়ে প্রদীপ। এরো-ড্রোমের এক ছোকরা কর্মচারী কি সূত্রে যেন চিনতো কস্তুরীকে, সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবর দিয়েছে প্রদীপকে।

ছুটে এসেছে প্রদীপ গাড়ীখানার 'হাওয়া গাড়ী' নাম সার্থক করে। ছুটে এসেছে বিস্ময় আনন্দ আর উৎসাহে জ্বল-জ্বল করতে করতে। নাঃ নিজেকে আর আটকে রাখতে রাজী নয় সে, ছোকরা চাকরটার সামনেই কস্তুরীকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আর কি!

কিন্তু আশ্চর্য!

কস্তুরী কী কঠিন আর কী নিরুত্তাপ!

জমাট কঠিন হিমশীতল এক খণ্ড বরফ স্বামীকে উপহার দেবে বলেই কি এই হিম পাহাড়ের দেশে ছুটে এসেছে কস্তুরী? রোদপড়া বরফের মতোই কী ভয়ানক ঝক-ঝক করছে ওর শাদা উজ্জ্বল চোখ দুটো!

—কি হলো কস্তুরী? শরীর খারাপ লাগছে?

—শরীর? হেসে ওঠে কস্তুরী—আশ্চর্য রকমের ভালো লাগছে। পাহাড়ে হাওয়ায় এখুনি খিদে বেড়ে যাচ্ছে!

প্রদীপ ব্যথিত স্বরে বলে—এলে যদি তো অমন দূরে কেন কস্তুরী? কী অদ্ভুত লাগছে তোমাকে! 'তুমি' বলে যেন চেনাই যাচ্ছে না!

কস্তুরী আর একবার হাসির ঝিলিক দিয়ে ওঠে—রাত জেগে 'ক্ষুধিত আত্মা'র নিঃশ্বাস শুনে শুনে তোমার পার্থিব দৃষ্টিটা কিছু খাটো হয়ে গেছে বোধহয়।

—ওঃ! তুমি আমার চিঠিটা পড়েছো বুঝি?...চমকে ওঠে প্রদীপ।...ওসব আমার অর্থহীন পাগলামি! দেখলে কেন? লিখে-ছিলাম তোমাকে, কিন্তু পাঠাতাম না। তুমি এসেই সব দেখে ফেললে?

—অন্যায় হয়ে গেছে না?

কস্তুরী বাঁকা কটাক্ষে বলে—হঠাৎ বড়ো অসুবিধেয় পড়ে যেতে হলো কেমন? যাক্ কালই ফিরছি, বেশী অসুবিধে বাড়াবো না।

ব্যাকুল প্রদীপ এ রহস্যের মীমাংসা করতে পারে না।

এমন হঠাৎ এসে পড়লো কেন কস্তুরী? এসেছে যদি তো এমন দুঃখের আবরণে ঘিরে রেখেছে কেন নিজেকে? কেন ওর স্বভাবসিদ্ধ প্রগলভতায় বেপরোয়াভাবে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঝুলে পড়ে বলছে না—'কী মজা করলাম বলো তো? কেমন জব্দ! চিঠি না দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে আর?'

যাক গে। এখন আর রহস্যভেদের চেষ্টা করে লাভ নেই।

রাত্রিটা তো হাতে আছে—সমস্ত দ্বন্দ্ব সমস্ত বাধা, যতো কিছু অভিমান আর ভুল বোঝার মধুর পরিসমাপ্তির আশ্বাস নিয়ে! এখন চলুক সাধারণ আতিথ্যের পালা।

তা সেটা উভয় পক্ষেই চলে। ভদ্রতা আর সৌজন্যে কে কতো নিখুঁত অভিনয় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে যেন।... চা খাওয়া সারা হতে বেলা পড়ে যায়।

প্রদীপ বলে—চলো কস্তুরী, বেড়িয়ে আসা যাক একটু।

—বেড়াতে? কোথায়?

—বনে-জঙ্গলে যেখানে তোমার খুশি। আজ সব তোমার ইচ্ছেয়—

কস্তুরী তীক্ষ্ন হেসে বলে ওঠে—বনের পথটা তোমাকে ভীষণভাবে টানে, তাই না?

প্রদীপ একটু থতমত খেয়ে ওর দিকে তাকায়, তারপর অবাক হয়ে বলে—ঠিক বলেছো কস্তুরী! সত্যিই, অরণ্য যেন অবিরত আমাকে আকর্ষণ করতে থাকে। কেন বলো তো?...নিজেই বুঝতে পারি না আমি কেন এমন হই। কতোদিন—মাঝরাতে ইচ্ছে করে বেরিয়ে পড়ি, দেখি কি রহস্য লুকোনো আছে ওখানে। কেন কিছুতেই ওকে ভুলে থাকতে পারি না আমি! তুমি বলতে পারো কস্তুরী, কেন এমন হয়?

—পারি! গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় কস্তুরী—বুনো পাহাড়ী মেয়েরা অনেক কিছু মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক জানে।

—ওর মানে? ও আবার কি একটা যা খুশি উত্তর হলো? ওকথা বললে যে—

—বললাম এমনি। চলো চলো। দেখে আসি—তোমার অরণ্যের আত্মাকে।

—দূর ছাই! প্রদীপ চেষ্টাকৃত সহজ স্বরে বলে—কি দু পাতা ছাই-পাঁশ বাজে কথা লিখে রেখে তোমার মাথাটাকেই বিগড়ে দিয়েছি দেখছি।

বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়।

কৃষ্ণপক্ষের মৃদু জ্যোৎস্না গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও হাল্কা কোথাও ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।...পায়ের চাপে চাপে শব্দ উঠছে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার।

আগে কিছু কিছু কথা হচ্ছিলো, ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেছে।

নির্বাক দুটি প্রাণী যেন কোন অমোঘ বন্ধনে বন্দী হয়ে যন্ত্রের মতো চলেছে পাশাপাশি।...

হঠাৎ এক সময় মৃদু একটু হেসে কস্তুরী বলে ওঠে — দেখো অরণ্যের জটিলতায় পথ হারিয়ে ফেলবে না তো?

প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটু চুপ করে থেকে স্থির স্বরে বলে—বোধ করি অমনি কেনো সন্দেহ তোমার পথকে জটিল করে তুলছে কস্তুরী। কিন্তু নিশ্চিন্ত থেকো, আমার পথ হারাবে না। আমার ধ্রুবতারা আছে।

—কই? কোথায়?

একটু দুর্বল আর ফ্যাকাশে শোনায় কস্তুরীর গলা।

—বাঃ, বলে খেলো হবো কেন? সে হলে নিজের জিনিস।

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কস্তুরী। সভয়ে বলে—বনের ভেতর ওখানে আলো কিসের?

—আলো নয় আগুন। শুকনো পাতা জ্বেলে ভাত রাঁধছে...ওকি ওকি পাথর ছুঁড়ছো কেন?...কী সর্বনাশ!—হঠাৎ একি—

পথ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া ভারী পাথরের টুকরোটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে কস্তুরী প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—দেখতে পাচ্ছো না। ওখানে কি যেন একটা বুনো জানোয়ার বসে রয়েছে?

—কী ভয়ানক! ও যে মনিহারীর বৌ! ওই তো পাতা জ্বেলে ভাত রাঁধছে। কিম্ভূত মতো বিশ্রী জোব্বাজাব্বা পরে আছে বলে ওইরকম দেখাচ্ছে। ওর গল্প করবো তোমার কাছে।...এখন বলছো জানোয়ার, শুনে বলবে দেবতা।...ও আমার প্রাণদাত্রী তা জানো? আচ্ছা—এখন পরিচয় করিয়ে দিই, পরে সব বলবো!...ওরে এই বৌ! এ—মনিয়ার বৌ রে—

পায়ে পায়ে দুজনেই বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে ততক্ষণে।

সাড়া পেয়ে আগুনের কাছ থেকে উঠে আসে মানুষটা। উঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। কথার উত্তর দেয় না, নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে-থাকা দুটো মানুষের দিকে।...

গাছের সারি এখানে পাতলা, জ্যোৎস্না যেন খানিকটা হাঁফ ফেলে বেঁচেছে। সেই মৃদু জ্যোৎস্নায় সামনাসামনি স্থির হয়ে থাকে দু'জোড়া চোখ।

খুব স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।... অস্পষ্ট হয়ে গেছে শিফন শাড়ী, ওমেগা ঘড়ি, জয়পুরী কঙ্কণ আর শান্তিনিকেতনী বটুয়া...অস্পষ্ট হয়ে গেছে বহু ব্যবহৃত ঘাগরার গায়ে বেরঙা ছিটের তালি, দড়াদড়া সেলাই! অস্পষ্ট হয়ে আছে সমস্ত পরিবেশ!

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শুধু দু'জোড়া চোখ।

কি আছে সে-চোখে?

প্রভু-পত্নীর প্রতি সসম্ভ্রম সমীহ?

স্বামীর প্রাণদাত্রীর প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা?

না। সে-চোখে আছে শুধু আদিম অরণ্যের নিবিড় ছায়া, অথবা ছায়া নয় আগুন। আগুন জ্বালাতে যারা জানতো না সেই গুহাবাসিনী আদিম প্রপিতামহীদের চোখে যে-আগুন ঝিলিক মারতো সেই আগুন!

পরিবেশটা সহনীয় করে তুলতে প্রদীপ বুঝি বলতে চেষ্টা করে—'কি রে রান্না করছিস?' কিন্তু গলা দিয়ে ওর স্বর ফোটে না। যেমন এসেছিলো তেমনি ফিরে যায় মনিহারীর বৌ, শুধু অবহেলার একটা সেলাম জানিয়ে।

ফেরার পথে হালকা হাসির ভঙ্গীতে কস্তুরী বলে—উঃ কী ভয়ানক চোখদুটো ওর! যেন জ্বলছিলো! ভাগ্যিস তোমার বন্দুকটা সংগে ছিলো না! থাকলে—হয়তো বা বনবিড়াল ভেবে গুলী করে বসতাম।

চমকে ওঠে প্রদীপ।...কে বললো ওকে?

মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে যায় ওর কাছে। ওঃ তাই! তাই এই ভাবান্তর কস্তুরীর! কিন্তু বেশ স্থির কৌতুকের ভঙ্গীতেই বলে—তবু ওর বাঁচাটা নিতান্তই ভাগ্য বলতে হবে, নইলে অস্ত্রের অভাব তো ছিলো না কস্তুরী? আদিম পৃথিবী সেই আদিম বর্বর যুগ থেকে এই সভ্যভব্য আণবিক যুগ পর্যন্ত মানুষের হাতের কাছে পাথরের টুকরোর জোগান ঠিকই রেখেছে!...প্রস্তর যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে যে সে-অস্ত্রে কাজ হয় না তা তো নয়?

আশাপূর্ণা দেবী

অজিত চট্টোপাধ্যায়
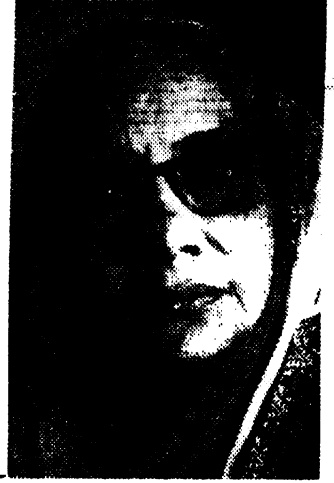
বাংলা সাহিত্যের আসরে আশাপূর্ণা দেবীর স্বচ্ছন্দ এবং অনায়াস আবির্ভাব। তাঁর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালে, — শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়। তারপর এই সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর ধরে অনেক গল্প লিখেছেন তিনি। তাঁর কলমের জাদুস্পর্শে অসংখ্য ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে এই দীর্ঘকালে। সংখ্যায় তারা বিশ, পঞ্চাশটি নয়,—কয়েক শ। সব গল্পের কথা লেখিকার নিজেরও আজ মনে নেই, এবং অতর্কিতে দেখলে কোন একটি গল্পকে দ্রুত নিজের বলে চিহ্নিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এবং ঠিক সে কারণেই এই স্বল্প পরিসরে আশাপূর্ণা দেবীর গল্প সমগ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং তার সঠিক মূল্যায়ন, তাঁর লেখার স্টাইল ও শিল্প-কৌশলের সমস্ত দিকে আলোকপাত করাও আমাদের পক্ষে এক দুরূহ কাজ। ফলে কয়েকটি মাত্র প্রতিনিধি-স্থানীয় গল্প নিয়েই আমাদের আলোচনার সীমারেখাকে সম্পূর্ণ করতে হয়েছে।

নিটোল একটি কাহিনী-নির্ভর হলেও আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলিকে মোটামুটি-ভাবে তিনটি ভাগে সাজানো চলে। প্রথম ভাগে ঘটনাই মুখ্য এবং এ জাতের গল্প-গুলিতে আখ্যায়িকারই প্রাধান্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে একটি বিশেষ মানুষের চরিত্রকে উপজীব্য করা হয়েছে। মনুষ্য-চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টাই এখানে প্রবল। এবং তৃতীয় ভাগের গল্প একটি অনুভূতি বা আবেগকে প্রকাশ করতে প্রয়াসী। আগেই বলা হয়েছে যে মূলত কাহিনী-নির্ভর হলেও আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলি বৃত্তান্তসিদ্ধ নয়। অর্থাৎ কাহিনীকে অবলম্বন করে গল্প গড়ে উঠলেও কাহিনী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও শেষ হয় নি। ফলে, এই অতৃপ্তির স্বাদ তাঁর গল্পগুলিকে সার্থক ছোটগল্পে রূপান্তরিত হতে সহায়তা করেছে। আর তা না হলে আশা-পূর্ণা দেবীর গল্পগুলি এমন অপরূপ তাৎপর্যময়, শিল্পকলামণ্ডিত, মানবচরিত্র বা জীবনতত্ত্বের উপর বিচিত্র আলোকপাতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত না। এছাড়া লেখিকার রচনার গুণে গল্প, কাহিনীর বৃত্তের সীমা-রেখাকে অতিক্রম করে পরিশেষে ইঙ্গিত-মূলক হয়েছে। এবং সমাপ্তির কাছে দ্রুত এবং আকস্মিক বাঁক নেওয়ার ফলে গল্পের বৃহত্তম ব্যঞ্জনধর্মিতার সৌন্দর্যের প্রকাশকে সম্ভব করেছে।

এই প্রসঙ্গে লেখিকার 'আকাশ-মাটি' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পের নায়ক 'সুবিখ্যাত বড়ুয়া কোম্পানীর অবিখ্যাত কর্মচারী রজনী ধর।' কাকার কাছে প্রহার খেয়ে বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল রজনী। তখন তার বয়স তেরো-চৌদ্দর মত। ভাসতে ভাসতে রজনী এসে উঠল আসাম উপত্যকায় অরণ্য-ছায়াময় বিরল-বসতি এক চা-বাগানে। এখানেই প্যাকবাবুর কাজ হল তার।

দশ বৎসর পরে আবার রজনী ফিরে এল তার কাকার বাড়ির দরজায়। শেওড়া-ফুলির বাড়িতে বিনা নোটিশে এসে দাঁড়াল রজনী। তাকে দেখে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল খুড়ি। রজনী দেখল খুড়ির পরনে থান ধুতি, বৈধব্যের সাজ। ছুটি ফুরোতেই আবার আসামে ফিরে গেল রজনী। কিন্তু খুড়িকে ভুলল না। মাসে মাসে পাঁচটি করে টাকা পাঠাতে লাগল তাকে।

তারপর দিন কেটেছে। রজনীকে সংসারী করে দিয়েছে খুড়ি। আসাম ছেড়ে বাংলা দেশে কাজ খুঁজে নেবার জন্য পই-পই করে অনুরোধ জানিয়েছে।

একদিন আসামে বসেই খুড়ির মৃত্যু-সংবাদ পেল রজনী। ইতিমধ্যে যথানিয়মে গুটি-কয়েক ছেলেমেয়েও হয়েছে তার। স্ত্রী সুরবালা করিৎকর্মা মেয়ে। রজনীর পাঠান সামান্য কটি টাকা সম্বল করেই দুটি ছেলেকে মানুষ করেছে সে। তারা চাকরী পেয়েছে। বড় মেয়েটার বিয়েও দিয়েছে সুরবালা।

বছরে দশ দিন ছুটি রজনীর। এত দিনে সে প্রায় প্রৌঢ়। তবু বাড়ি আসার আগে দশটা রাত্তির তার ঘুম হয় না। মাথার টাকে হাত বুলোয় রজনী। আর বুকের শাদা লোমগুলোয় বাড়ি আসার নামে নবযৌবনের উন্মাদনা অনুভব করে।

আর সত্যিই তো। আসামের চা-বাগানে কি হাল রজনীর। তেল চিটচিটে ময়লা একটা বিছানা। টিকিনের বালিস আর সস্তা মণিপুরী খেস পাতা। কাঠের দেওয়ালের গায়ে পেরেকে একটা হাঁড়ি টাঙানো থাকে। তাতে চিরজীবনের কাঠের আগুনের কালি। দিনান্তে একবার নামে, ভাত আর মুরগী একসঙ্গে সেদ্ধ হয় নুন হলুদ আর লংকার সংমিশ্রণে। রাতে লরী ড্রাইভার বসির শেখ রুটি বানায়। চালচুলোহীন, ফেরারী আসামী বসির। ওকে মনে মনে করুণা করে রজনী। ছুটির সময় শুধু ঘুরে বেড়ায় লোকটা। দেশে যেতে পায় না। স্বাদ পায় না স্বর্গসুখের। অথচ রজনীর হাতের মুঠোয় স্বর্গ আছে।

বছরে দশ দিন সেই স্বর্গের সিংহাসনে বসে রজনী। বউ সুরবালা যত্ন করে, ছেলে-মেয়েরা আজ্ঞাবহ দাসের মত চারপাশে ঘুর-ঘুর করে। আর খেতে বসে সম্রাট রজনী ধর বিহ্বল হাসি হাসে।

হঠাৎই কথাটা উঠল। কেন মিছেমিছি আসামে পড়ে আছে রজনী? ছেলেরা

মানুষ হয়েছে, মেয়েদের বিয়েও হল। তাহলে কেন শুধু শুধু বিদেশে কষ্টভোগ। কথাটা মধুর স্বপ্নের মত লাগল রজনীর কাছে। স্বর্গ হতে বিদায় নেওয়ার প্রয়োজন নেই? কথাটা এতদিন কেন ভাবে নি রজনী। তারপর চমৎকার সুন্দর একটি মেলোডি বা মূর্ছনার সৃষ্টি করেছেন লেখিকা। তিনি লিখছেন—'সদ্য-ফোটা শিউলি ফুলের গন্ধ উঠছে যেন দিক-দিগন্ত জুড়ে। উঠোনের নিম গাছটার পাতা বাতাসে ঝিরঝির করছে। দাওয়ার ধারের শুক্লা পঞ্চমীর হাল্কা জ্যোৎস্না একটি আলোর রেখা টেনে দিয়েছে, আর এই আকাশ-বাতাস, গাছ, মাটি মায় ঘরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত যেন একটি মোহময় স্নেহজাল বিস্তার করে রজনীকে মিনতি জানাচ্ছে,—থাকো, থাকো!'

বড় ছেলেও বলল,—'আমরাও ঠিক করেছি, বাবাকে আর ছাড়া হবে না।' তাই রজনী ধর পদত্যাগপত্রে সই করল। ছেলেকে দিল সেটি পোস্ট করতে।

গল্প যদি এখানেই শেষ হত তাহলে তাকে নিছক একটি বৃত্তান্ত বা আখ্যান-মূলক সমাপ্তি ছাড়া আর কিছুই বলা যেত না। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর গল্প এখানেই শেষ নয়। শেষ হয়েও তা শেষ হয় নি। সমাপ্তি হলেও তার পূর্ণ সমাপ্তির তখনও দেরি। এবং গল্প ধীরে ধীরে কিভাবে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী হল তার পরিচয় পাওয়া যাবে এর পরেই। অল্প কথায় তা হল,—

সকালের দিকে চিঠিখানায় সই করেছিল রজনী। বিকেলের দিকে সে প্রায় অস্থির হয়ে উঠল। এতক্ষণ সে শুধু ভেবেছে। চিঠিখানা কোথায় পোস্ট করবে দেবু। যদি না পৌঁছয়! কোম্পানী কি ভাববে তার সম্বন্ধে? এবং হঠাৎই তার সঙ্কল্প ঘোষণা করল রজনী। এখনই সে আসামে যাবে।

খাওয়া-দাওয়া ফেলে প্রায়-পাগলের মত বেরোল রজনী। ট্রেনে চেপে সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আর একটু হলেই রজনীকে বোকা বানিয়ে ফেলেছিল সবাই। ঘন সবুজ নিবিড় অরণ্যানীর মাঝখানে সেই ঘরটার আর কোনদিন যেতে পেত না রজনী। একটা বছরের মত সে নিশ্চিন্ত এখন।

লেখিকার আর একটি সার্থক ছোট-গল্প 'বৃন্ত'। কাহিনী-আশ্রয়ী হলেও গল্পটিতে একটি অনুভূতি বা আবেগ সুন্দরভাবে ফুটেছে। ছেলেবেলার বন্ধু হরিসাধনের বাড়িতে এসেছিলেন শিবানন্দ। স্কুল-মাস্টারী করেও বেশ সুন্দর গুছিয়ে বসেছেন হরিসাধন। খোলামেলা বাড়ি, পুকুর, খামার, এমন কি বাগান পর্যন্ত করেছেন হরিসাধন। তার মুখের প্রত্যেকটি রেখায় আত্মপ্রেমে মসৃণ পরিতৃপ্তির হাসি।

আর শিবানন্দ! পড়াশুনো নিয়েই এত দিন কাটিয়ে এলেন শুধু। জীবন-ভর শুধু বই কিনেছেন তিনি। কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ডি-ফিল পেয়েছেন। কিন্তু মাথা গোঁজবার এক টুকরো আশ্রয় করতে পারেন নি।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে নিজের বাড়ির পথ ধরলেন শিবানন্দ। বন্ধু এবং বন্ধুজায়া লাউ, মোচা ভর্তি একটি থলি গছিয়ে দিয়েছেন তাঁর হাতে। বলাবাহুল্য বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হতেই তা নিয়ে একটি তীক্ষ্ম মন্তব্য শিবানন্দকে নিঃশব্দে হজম করতে হল।

এর পরই মনের সেই অনুভূতি বা জীবনদর্শনকে উপস্থাপিত করেছেন লেখিকা। সংক্ষেপে তা এইভাবে বলা যেতে পারে।...অনেকরাতেও ঘুম আসে নি শিবানন্দের চোখে। আশ্চর্য! নিজেকে সমস্ত দিন কেন তাঁর পরাজিত সৈনিকের মত মনে হয়েছে? হরিসাধনের কি দেখে অত মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি? চোখ বুজে ভাবতেই বন্ধুর গোয়ালের ঘোরালো শিংগুলো গাঢ় কালো মোষগুলোর ছায়াই বার বার তাঁর চোখের সামনে ভেসে এল। ওই ছায়ারই আশে-পাশে রাত চারটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত খেটে অস্থির ওরা দুজন। এবং এই মুহূর্তে তাঁর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই খুব কুৎসিত মনে হল।

কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। এর পরও আরো কিছু বাকী।...ধীরে ধীরে একখানা বই বের করে আবার বারান্দায় ফিরে এলেন শিবানন্দ। স্ত্রী বা মেয়েদের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে। মোমের মত নরম শান্তিতে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন তিনি। রাস্তা থেকে এসে-পড়া আলোয় শিবানন্দ পড়তে লাগলেন।

গল্পের শুরুতেই খুব সুন্দর মনোজ্ঞ একটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন লেখিকা। বন্ধু হরিসাধনের গৃহে মোষ দেখে সভয়ে দু' পা পিছিয়ে এসেছিলেন শিবানন্দ। মোষ! এই বিস্ময়সূচক উক্তিটি দিয়েই গল্পের শুরু। কুশ্রীতার প্রতীক এই মোষের চার পাশেই বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর দৈনন্দিন জীবনের প্রসার। এবং এই বৃত্তে শিবানন্দের অগাধ অপরিচয়। শিবানন্দ বাস করেন তার নিজের বৃত্তে,—যেখানে রাস্তার আলোয় গভীর রাতেও তার পড়াশুনো চলে। গল্পটির নামকরণের এখানেই সার্থকতা।

কিন্তু লেখিকার 'অমর কণ্টক' নামক গল্পটিতে নারীমনস্তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করা যেন দুরূহ কাজ। ফ্রয়েডীয় অবচেতন-বাদের ভিত্তিতে এই কুয়াশাচ্ছন্ন জীবন-রহস্যের জটিল গ্রন্থিমোচন করলে মনে হবে সতীনের সন্তানের সম্পর্কে সীতার মনে একটি পাপচেতনা দীর্ঘদিন ধরেই যেন লুকিয়ে ছিল। ধৈর্য যেদিন সীমা অতিক্রম করে, সেদিন সীতা নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে নি। ছেলেটার খাবারে বিষ দিয়েছিল স্বহস্তে।

দোজবরে স্বামীর সংসার করতে এসে মৃতা সতীনের সন্তানকে দেখে প্রায় চমকে উঠল সীতা। বিকৃতগড়ন মাথাসর্বস্ব একটি জড় ছেলে। কণ্ঠ থেকে একটা অমানুষিক চিৎকার করে ছেলেটা। রোগগ্রস্ত কুকুর-বেড়ালের মত ভাষাহীন আর্তনাদ। স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিতে ছেলের পাশে নিজের শোবার জায়গা করল সীতা। উন্মত্ত নিখিল পুরো মানুষটাকে সাপটে ধরে প্রশ্ন করল,—আমার খিদে-তেষ্টার কি হবে?

কিন্তু সীতা পাথরের মত শক্ত। নিখিলের কাছে সে ধরা দেবে না। সমস্ত রাত ছেলেটা চিৎকার করে। কাছে গেলেই হাত, পা আর দাঁতের যথেচ্ছ ব্যবহারে বিধ্বস্ত করে সীতাকে। তবু সব সহ্য করে সীতা। দাঁতে দাঁত চিপে বলে, আমার হাতেই একদিন খুন হবি তুই, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

অতৃপ্ত বাসনায় নিখিল জর্জরিত। দিন-রাত্রি সীতার সঙ্গে তার কলহ। কিন্তু সীতা অনমনীয়। নিখিলের কাছে সে ধরা দেবে না। কিছুতেই না।

অবশেষে সেই অভাবিত দুর্ঘটনা ঘটল। ছেলের পায়ের ঠেলা খেয়ে পড়ে গিয়েছিল সীতা। কপাল ফেটে রক্ত। আর সেদিনই রান্নাঘরে খিল দিয়ে কি যে করল সীতা। পর দিন সকালে নিখিল দেখল ছেলেটা মরে কাঠ হয়ে রয়েছে। অনেক ভর্ৎসনা, গালাগালি শুনেও সীতার ঠোঁটে বিচিত্র হাসি। স্থির গলায় সে শুধু বলেছে,—'আশ্চর্যের কি আছে? বুদ্ধি থাকলে পথের কাটাটা কে না সরাতে চায়?...'

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প সৃষ্টি হয়েছে সংসারের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পরিণতিতে তা এক মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডী কিম্বা মধুর আশা-বাদের ইঙ্গিত। ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ, মানুষের মনের জটিল বিচার-বিশ্লেষণ এবং নিখুঁত চরিত্র বর্ণনা তাঁর গল্পগুলিকে এক আশ্চর্য মহিমায় উজ্জ্বল করে রেখেছে। স্বল্পতম ব্যাপ্তির মধ্যেও তাঁর ছোটগল্পে এক বৃহত্তম সত্যের প্রতিফলন।

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প পড়ে একটি সুন্দর উপমার কথা মনে আসে। তাঁর গল্পগুলি মাচা-ভরা পুঁই বা সিমলতার মত। মাচাটিকে যদি কাহিনী বলে কল্পনা করা যায় তবে প্রবর্ধমান লতাটি তাঁর গল্পের বিস্তার। কিন্তু সিমের লতাগুলি যেমন মাচা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখে অগ্রসর, তেমনি তাঁর গল্পও কাহিনীর আশ্রয় ত্যাগ করে পরিণতিতে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী এবং ইঙ্গিত-মূলক হয়ে ওঠে।

আর তাই গল্প শেষ হবার পরই শুরু হয় তার সত্যিকার আস্বাদন।

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করিতে গিয়া দলকে দল ধরা পড়িয়া যায়। এগার জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খাইয়া পালাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরে মাথা ভাঙ্গা পুলটার নিচে পেঁছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়াছিল। রাত্রে আরও ন'ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ি চিতলপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই। কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাও থান সহজ লয় স্যাঙ্গাৎ। উটি পাকবো। গা ফুলবো। জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে' যামু? খুনটো যদি না করতিস্—'

'তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।' 'এই জন্মে লা স্যাঙ্গাৎ।' বন কাছেই ছিল মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করে দিল। বলিল, 'বাদলায় বাঘ টাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছে গা। সাপে যদি না কাটে ত আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।'

'খামু কি?'

'চিড়া গুড় দিলাম যে? দুদিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম। রোজ আইলে মাইন্ষে সন্দ করব।'

কাঁধের ঘা'টা লতা-পাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দুষাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া, মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া দেহের কোন না কোন অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দুদিন দুরাত্রি সংকীর্ণ মাচাটুকুর ওপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল। রোদের সময় ভাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি এক মুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন-চারদিনের মতো চিড়া আছে বটে, কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে সে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্যে প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসীর জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসীটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসী জল ভরিয়া আনার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না।

অসহ্য ক্ষুধা পাইলে শুধু চিড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। এক হাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল। সবুজ রংয়ের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিনজুরি গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দুঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পরে দুঘণ্টা অন্তর চারিদিকের ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের জন্তু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুমবাড়ি গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুমবাড়ির বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কিভাবে দিন-রাত্রি কাটাইতেছে তিন-দিনের মধ্যে সে কথা একবারও তাহার মনে পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীর তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে বটে কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম ছুটানো তাড়ির নেশার মতই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কাঁচ পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নিচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসীটা এক সময় নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশে-পাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুমবাড়ি হইতে ফিরিয়া বিকাল বেলায় ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা

নারিকেল। ভিখুর জন্য একবাটি ভাত ও কয়েকটা পুঁটি মাছ ভাজা আর পুঁইচচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ওগুলো সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মই-এ শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল। ঘরের মাচার ওপর খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও এক রকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভালো হইল না। গাছের মরা ডালের মতো শুকাইয়া গিয়া অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকু তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময়ে বাড়ি ছিল না। ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বৌ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটি হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগ্দীর মেয়ে। দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বৌ-এর পিঠে এক ঘা বসাইয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়াও নেশার মধ্যে কিছু টের পাইতে তাহার বাকী রহিল না যে, কাজটা যত বড়ো কর্তব্যই হোক, সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারাল দা'টি বাঁহাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনোখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদান-প্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইরে' আমার বাড়ির থেইকা।— দূর হ'।

ভিখু বলিল, 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্দা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস্। আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু।'

'তোর বাজুর খপর জানে কেডা রে?'

'বাজু দে কইলাম, পেহ্লাদ, ভাল চাসত। বাজু না দিলে সা' বাড়ির মেজো-কর্তার মতো গলাডা তোর একখান কোপেই দুফাঁক কইরা ফেলমু, এই তরে আমি কয়া রাখলাম। বাজু পালি' আমি অখনি যামু গিয়া।' কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল। পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। হাত দিয়া রক্ত মুছিতে, মুছিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুর রাতে পেহ্লাদের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাগ্দী পাড়ায় বিষম হৈ চৈ বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ! ঘরকে আমার শনি আইছিলো গো। হায় সর্বনাশ।'

কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখে বেচারী ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটি জেলে ডিঙি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। একটি চ্যাপ্টা বাঁশকে হালের মতো করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোনরকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশীদূর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয়তো তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না। পুলিশ বহুদিন যাবত তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশে-পাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে। বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকা-লয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দুজন জোয়ান মানুষের কাছে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোরে ভোরে মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছাইয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় চোখে সে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তার সঙ্গে নাই যে সে মুড়ি কিনিয়া খায়? বাজারের রাস্তায় প্রথম যে লোকের সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দুটো পয়সা দিবান কর্তা।'

তাহার মাথার জটবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধুসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দড়ির মতো শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্র-লোকের বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল—'একটি পয়সা দিলেন বাবু? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন—'একটা দিলাম, তাতে হল না—ভাগ।'

এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা গাল দিয়াই বসে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া চাহিয়া সামনের মুড়ি-মুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতেখড়ি।

কয়েকদিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন-কানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গী ও ভাষা তাহার জন্ম ভিখারীর মতো আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু ক্ষণে ক্ষণে খ্যাপার মতো দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটা ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষত চিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্যে দারুণ গুমোটের সময়ও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তার ব্যবসার সবচেয়ে জোরাল বিজ্ঞাপন। এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতটি তাই সে বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে বসিয়া ভিক্ষা করে। সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে ইঁটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনদিন রাঁধে ছোটমাছ, কোনদিন তরকারী। পেট ভরিয়া খাইয়া বট গাছেতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুল গাছটার নীচে গিয়া বসে।

সারাটা দিন শ্বাস টানা' শ্বাস টানা' কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায় : হেই বাবা একটা পয়সা : আমায় দিলে ভগবান দিবো : হেই বাবা একটা পয়সা—'

অনেক প্রাচীন বুলির মতো 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ' শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারা দিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দু-তীর কাশে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিন্দু মাঝির বাড়ির পাশের ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওই-খানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরা একটি কাঁথা সে সংগ্রহ করিয়াছে। লোকের বাড়ির খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া আরাম করিয়া সে ঘুমায়। মাঝে মাঝে গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটলি করিয়া বালিশের মত ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জলো বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটলী খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশী নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতর-ভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায়, কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানীকে মারিতে উঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে খুশী হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে। নারী-সঙ্গ-হীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভাল লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনা-বহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর সেই আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কি আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বার বার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে। কিন্তু জীবনে একবারের বেশী পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগদীর সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার। সাত বছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল। কিন্তু দু' বছরের বেশী কেহ তাহাকে জেলে আট-কাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া সে পালাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থ-বাড়িতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনে দুপুরে পুকুর ঘাটে একাকিনী গৃহস্থ বধূর মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে। রাখুর বৌকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইয়া সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছ'মাস পরে রাখুর বৌকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসার পর পর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াই-য়াছে তাহার সবগুলির নাম এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা সে দা'য়ের এক কোপে দু'ফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কি জীবন তাহার ছিল, এখন কি হইয়াছে!

মানুষ খুন করিতে যাহার ভাল লাগিত সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটু টিটকারী দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি এখনো তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টা তাহার নাই। কত গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানী হিসাব মিলায়। বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে, ধারালো একটা অস্ত্র হাতে তাদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়োলোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্দু মাঝির চালটার নিচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে। ডানহাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আফশোসের সীমা থাকে না। সংসারে অসংখ্য ভীরু দুর্বল নরনারীর মাঝ-খানে এতবড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে। এমন কপালও মানুষের হয়?

তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আপশোষেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকিতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখা-রিনী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশী নয়, দেহের বাঁধুনিও আছে। কিন্তু একটা পায়ের হাঁটুর নিচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশী রোজগার করে। সে জন্য ঘা'টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিক্ষু মধ্যে মধ্যে তাহার কাছে গিয়া বসে। বলে, 'ঘা'টি সারবো না, লয়?'

ভিখারিনী বলে 'খুব! অসুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে 'সারা তবে, অসুদ দিয়া তাড়াতাড়ি সারাইয়া ল। ঘা'টি সারলে তোর আর ভিখ্ মাগিতে অইবো না, —জানিস? 'আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি তো।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পরান পা'টি দিয়া গাট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই কিসের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিনী নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, 'দুদিন বাদে তুই মোরে যখন খেদাইয়া দিবি, ঘা'টি মুই তখন পামু কোয়ানে?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিনী কোনমতেই রাজী হয় না। ভিখু ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার ভাটা বয়, শীতের আমেজে বায়ু-স্তরে মাদকতা দেখা যায়। ভিখুর চালার পাশে কলাবাগানে চাঁপা-কলার কাঁদি শেষ হয়ে আসে। বিন্দু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বৌকে রূপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না!

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখা-রিনীর কাছে যায়। বলে, 'আইচ্ছা ল, ঘা লইয়াই চল্!'

ভিখারিনী বলে—'আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া।'

'ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কি?'

'তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস্, তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।'

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মত জোয়ান দাড়িওলা এক খঞ্জ ভিখারী খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মতো ওর একটি পা হাঁটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে। বিশেষ যত্ন-সহকারে এই অংশটুকু সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আল্লার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম পা।

ভিখারিণী আবার বলিল, 'বসস্ যে? যা, পলাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো। কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে, 'আরে থো, খুন অমন সব হালাই করতেছে। উয়ার মতো দশটা মাইনষেরে আমি একা ঘায়েল কইরা দিবার পার্তাম, তা জানস্?'

ভিখারিনী বলে–'পারস্ তো যানা, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কি?'

'উয়ারে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ'।'

'ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি। তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মতো কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাবীব তো ভাগ, নাইলে গাল দিমু কইলাম।'

ভিক্ষু তখনকার মতো প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিনীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটা কিরা?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এত কাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই।

ভিখারিনী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে। 'ফের লাগতে আইছস্? হে'ই ও বুড়ীর কাছে যা।' ভিখু তাহার কাছে উঁচু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিনীর সামনে রাখিয়া বলে, 'খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।'

ভিখারিনী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশী হইলে বলে 'নাম শুনবার চাস? পাঁচী কয় মোরে, —পাঁচী। তুই কলা দিছস নাম কইলাম, এবারে ভাগ।'

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অতবড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশী হওয়ার মত সৌখীন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধুলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরে যেন গাল দিতেছে! পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তাহার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া।'

বসির বলিল—'ইদিকে ঘুরাফিরা কি জন্য? সেলাম মিয়া হতিছে! লাঠির এক-ঘায়ে শিরটি ছে'চ্যা দিমুনে।'

দু'জনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুল গাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল র', তোরে নিপাত করতেছি।'

বসির বলিল,—'ফের উয়ার সাথে বার্তাচিত করলি' জানে মাইরা দিমু, আল্লোর কিরে।'

এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার যাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনরায় তাহাকেই দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারীর অভাব নাই।

কোনরকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সা সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নিচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারিদিকে ঘেরা যেমন তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পাইলে কোন যুবতী ভিখারিনীই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজী হইবে না। অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয়ত সে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যে ভাবেই হোক আয় তাকে বাড়াইতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোন উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি-ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নাই, একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারও কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া এক হাতে সম্ভব নয়। পাঁচীকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিমু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক-একদিন বিমুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মত ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর মত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আরও কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা কটি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতখানিক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসর মত পাথরে ঘসিয়া ঘসিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে! এই অস্ত্রটিও সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল।

অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশভরা তারা তখন ঝিকমিক করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্যরাত্রের জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা নিয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর সহসা অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল।

নদীর ধারে ধারে আধ মাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ হাতি রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোট ছোট আলগলি দিয়া শহরের অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছাইল। শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু'মাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে পাশে মাইলখানেক বহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তার দু'দিকে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বাড়ি চোখে পড়ে। তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙ্গায় দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে খানিকটা জমি সাফ করিয়া পাঁচ-সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে। ভোরে উঠিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায়, পাঁচী গাছের তলায় পাতা জ্বালাইয়া ভাত

রাঁধে, বসির টানে তামাক, রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘায়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড় বিড় করিয়া বকে।

ভিখু একদিন ওদের পিছনে পিছনে আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ায় ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচু বনে দাঁড়াইয়া রহিল। ভিখারীর কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেয় নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া দিয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটি বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙ্গুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। এক হাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচিকে বলিল, 'চুপ থাক্'। চিল্লাবি ত তোরেও মাইরা ফেলামু।'

পাঁচী চেঁচাইল না ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, 'একটুকু আওয়াজ লয়, ভালা চাস ত একদম চুপ মাইরা থাক্।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া নিল।

দম নিয়া বলিল 'আলোটা জ্বালাইয়া দে, পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটিমাত্র হাতের সাহায্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্বের তাহার সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল—'দেখছস্? কেডা কারে খুন করল দেখছস্? তখন পই পই কইরা কইলাম, মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছারান দেও। শুইনে মিয়াবাইর অইল গোসা। কম কিনা, শির ছেঁচ্চা দিমু। দেন গো দেন, শিরটা আমার ছেঁচ্যাই দেন মিয়াবাই—' বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠাইরান বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক' হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরেও দিমু নাকি সাবার কইরা,—অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, —'কি করবি?'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভান করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুটি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশী উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশী হইল। বলিল, 'কি কি নিবি পুঁটুলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চাঁদ উঠবো, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু!'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উঠবো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে না' চুরি করমু। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্যি টুইকা থাকুম রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাউন লাগব।'

পায়ের ঘা নিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া যা বলিল, 'পায়ে কি তুই ব্যথা পাস্ পাঁচী?'

'হ', ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে পথ চলিতে লাগিল! পথের দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছ-পালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা!

হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকারে তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধাংশু ঘোষ

আঠাশ বছরের লেখক-জীবনে ছোট-গল্প লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত দুশ পাঁচটি। এছাড়া শেষ কয়েক বছরে এমন কিছু ছোটগল্প রচনা করেন যা একই সময়ে রচিত অথবা প্রকাশিত বিভিন্ন উপন্যাসের অংশ। শেষোক্ত গল্পের কোনগুলি মূলত গল্প হিসেবে রচনার পর উপন্যাসে সম্পৃক্ত এবং কোনগুলি মূলত উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোটগল্পে রূপায়িত হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। শেষোক্ত গল্প-গুলোকে যোগ করলে বলা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সংখ্যা সম্ভবত দুশ' আঠার। এছাড়া তিনি ছোট-দের জন্য অনেকগুলি গল্প লিখেছেন।

আশ্চর্য লাগে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ও আঠাশ বছরে ছোটগল্প লিখেছেন দুশ আঠারটি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কল্লোল যুগ বইটিতে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়কেও 'কল্লোল'-এর কুলবর্ধন বলতে চাইলেও, বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় সরকারীভাবে 'কল্লোল'-এর লেখক নন। প্রায় একই সঙ্গে এই দুজনের আবি-র্ভাব বিচিত্রা-য়। অবশ্য এই দুজনের এমন বাইরের মিল নেহাৎ কাকতালীয়। আসলে এই দুজনের লেখার মধ্যে ব্যবধান প্রায় মেরুপ্রতিম।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর আব-হাওয়ার অমিল প্রচুর। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর আবহাওয়া রবীন্দ্র-নাথকে যে মানসিকতা দিয়েছিল, যুদ্ধোত্তর আবহাওয়ায় কোনো বড় লেখকের তেমন মানসিকতা অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ বারংবার নিজেকে নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত প্রমাণ করলেও, বারংবার নিজেকে ঢেউয়ের চুড়োয় স্থাপন করলেও, মৃত্যুর আগের দুটি দশক তাঁকে প্রায় বিরোধী পরিবেশে নিশ্বাস নিতে হয়েছিল এবং সেই পরিবেশে অনি-বার্য ঐতিহাসিক কারণে নতুন লেখকদের আবির্ভাব হয়েছিল। এই নতুন কালের লেখকদের মধ্যে অরাবীন্দ্রিকতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনাহীন। তুলনাহীন এই কারণে যে, প্রথম বিদ্রোহী জগদীশ গুপ্ত যতই সৃষ্টিশীল হোন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্তরে, বিশেষত দ্বিতীয় পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্তরে বিচরণ করেননি। 'কল্লোল'-এর লেখকদের বাস্তববোধের সঙ্গে, তাঁদের রচনায় যক্ষ্মা-রোগ, নাগরিকতা, বিষণ্ণতা, মুনলাইট সোনাটা, হেলিওট্রোপ, সাঁওতাল পরগণা পটলডাঙা ইত্যাদির সঙ্গে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তের বাস্তববোধের মৌল পার্থক্য যত্নবান পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। তখন 'ভাষার তীক্ষ্ণতা, ভাষার নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি নর-নারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা আনন্দ ও উল্লাস জাগায়—তারই পাশাপাশি হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি তীব্র বিতৃষ্ণা জাগায়'—এই মন্তব্যের তাৎপর্য আর দুর্নিরীক্ষ্য থাকে না।

'কল্লোল'-এর লেখকদের যৌবনের উল্লাস এবং যৌন-ভাবনার উদ্দামতা তাঁদের লেখক-জীবনের প্রারম্ভিক পর্বের অন্তর-স্বভাব। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বড় লেখক তাঁরা 'কল্লোল' উঠে যাবার পর আরো অনেক দূরে এগিয়েছেন, অনেক জটিল পথ পার হয়ে এসেছেন। তাঁদের পরিণতি অনেক পরের ঘটনা। তাঁদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল 'কল্লোল' উঠে যাবার পর। সঙ্গত কারণেই তাঁদের প্রথম পর্বের উল্লাস ও উদ্দামতার তাপ মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গায়েও লেগেছিল, কিন্তু শুরুতেই তাঁর লেখায় বিদ্রোহীর বলিষ্ঠতা ও শিল্পীর সংযম ছিল। ফলে ওই তাপ তাঁকে দগ্ধ করেনি; তিনি দগ্ধ হয়েছেন অন্য আগুনে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, একুশ বছর বয়সের রচনা তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশিত হয়েছিল সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী'-তে।

বস্তুত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতি-হাস-নির্দিষ্ট পূর্বসূরি জগদীশ গুপ্ত। একই খাতে তাঁদের প্রাথমিক প্রবাহ। দ্বিতীয় পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য প্রায় অন্য এক মোহানা, প্রাথমিক স্পর্শ-গুলি থেকে মুক্ত, সমুদ্রের সমীপবর্তী। তথাপি জগদীশ গুপ্ত বিষয়ে তাঁর নীরবতা কেমন এক অভাববোধ জাগায়। শুধু অভাব-বোধ, অভিযোগ নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ওই সময়ের সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের স্থান এমনই সুনির্দিষ্ট যে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণেও জগদীশ গুপ্তের অথবা তাঁর কোন রচনার অনু-ল্লেখের ব্যাখ্যা মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ ১২৯৮ থেকে ১৩১১ পর্যন্ত ছেষট্টিটি ছোটগল্প লিখেছেন। গল্পগুলি কবিত্বময়, সনাতন আবেগের ফসল। ভাষা উপমা-নির্ভর, প্রতি ছত্রে প্রকৃতিবর্ণনা, গ্রাম-জীবনের ঘনিষ্ঠ বাস্তবতার বদলে এক সুদূর করুণ-মধুর স্বতন্ত্র জগৎ। ১৩২১ থেকে ১৩৪০ পর্যন্ত লেখা গল্পগুলি অবশ্য অন্য জাতের। সেখানে ব্যক্তির মূল্য-বোধের ওপর সামাজিক মূল্যবোধের অভিঘাত থেকে উৎসারিত বিপন্নতা, উপমা ও প্রকৃতিবর্ণনা অনেক কম, গল্প-গুলি ব্যক্তিনির্ভর বলে চরিত্র-বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যময়। উপমাপ্রয়োগে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় শুরু থেকেই উৎসাহহীন। প্রকৃতি তাঁর প্রথম পর্বের ছোটগল্পে উপস্থিত, প্রকৃতির আদিমতা। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটির আদিম প্রকৃতি আদিম মানবিক প্রবৃত্তির সাংকেতিক তাৎপর্য পেয়েছে। মনে হয়, শিল্পায়নের অগ্রগতির জন্য য-আরণ্যক হিংস্রতা শিথিল হতে বসেছে, 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু তার

উত্তরাধিকারী, তার জীবনকে আঁকড়ে থাকার জান্তব প্রবৃত্তি সর্বাত্মকরূপে প্রকৃতির অন্তর-স্বভাবের ইঙ্গিত বহন করে : 'মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে বাঁচিবেই।' ওই বনের অজস্র পিঁপড়ে, জোঁক, সবুজ সাপের জীবনযুদ্ধের সঙ্গে ভিখুর জীবন-যুদ্ধের মূলগত স্বাভাবিক মিল থাকলেও, তার পুরোপুরি বেঁচে থাকার যুদ্ধ অনেক বেশী হিংস্র। মনে রাখা দরকার, যে-অরণ্যে আশ্রয় পেয়ে ভিখু বাঁচতে চায়, সেখান থেকে বাঘও পালিয়ে বেঁচেছে। এই যুদ্ধের শেষে বেঁচে থাকতে পেরে ভিখুর 'ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ-সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশী নাচিয়া উঠিতে লাগিল।' তখন অন্য খিদে, তখন 'রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে। নারী-সঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তার ভালো লাগে না।' তখন 'বসিরের ডানদুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা' অত্যন্ত জরুরী জান্তব তাগিদে তিন আঙুল প্রবেশ করে।

ভিখু নিচুতলার মানুষ, কিন্তু 'সরীসৃপ' গল্পটির চারু বনমালী পরী তার থেকে অনেক উঁচুতলায়। তাদের জীবনে অন্যাবিধ নতুন জটিলতা থাকলেও, সেখানেও একই আদিম প্রবৃত্তি। এবং যেদিন চারু একঘরে পরী ও বনমালীকে আবিষ্কার করল সেদিন 'একটু বেশী রাত্রে খুব বাদল নামিয়াছে। খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎ-চমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল; প্রকৃতির সে এক মহামারী কাণ্ড।...... নিষুতি রাত, বাড়িটা এক-একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে।'

উপমা প্রয়োগের প্রতি মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের উৎসাহহীনতা, তাঁর গল্পের সচেতন নিরাভরণতা অসতর্ক পাঠকের দৃষ্টিও এড়িয়ে যায় না। তবে উপমা একেবারে নেই, এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। আছে এবং যেখানেই আছে—তার তীক্ষ্ণতায় লক্ষভেদ অনিবার্য। সেজন্য 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে নীলমণির মেয়ে শ্যামার অনুচ্চারিত অভিযোগের সেই বিখ্যাত উপমা : 'মেয়েটার মুখের চাহনি লঙ্কাবাটার মতো সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে।' দ্বিতীয় পর্বের গল্পে উপমা সংখ্যায় বেড়েছে। যেমন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটির শুরুতে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে পর পর দুটো উপমা : 'স্টেশনের বাতির মতোই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ। সে এদিক-ওদিক তাকায়। চোখের পলকে পলকে তার জানা-চেনা স্টেশনটি যেভাবে যাত্রীশূন্য হয়ে থাকে সেটা যেন ম্যাজিকের মতো ঠেকে তার কাছে।'

দ্বিতীয় পর্বে উপমার সংখ্যা বাড়লেও তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল সাংকেতিকতার ব্যবহারে। প্রথম পর্বের গল্পে এই সাংকেতিকতা একটু প্রকট, দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে অধিকতর নিপুণ এবং সূক্ষ্ম। যেমন প্রথম পর্বের গল্প "প্রাগৈতি-হাসিক"-এর শেষ অনুচ্ছেদটি : 'হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে, তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনো দিন পাইবেও না।' অথবা 'সরীসৃপ' গল্পটির শেষ অনুচ্ছেদ : 'ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটি এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপর পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।'

এই একটি মাত্র প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের সুবোধ ঘোষের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উল্লেখ করা সঙ্গত। সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পটির শেষ অনুচ্ছেদ, যেখানে গৃহস্থের মুরগী চুরি করে খেয়ে শেয়াল বালিতে রক্তমাখা মুখ ঘষছে, পাঠকের মনে পড়বে।

কিন্তু বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত সরল সাধারণ শব্দ প্রয়োগ করে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় এমন এক 'বিচিত্র জটিল বহুমুখী ইঙ্গিতময়তায় উত্তীর্ণ হয়েছেন যার তুলনা মেলা কঠিন। 'হলুদপোড়া' গল্পটির শেষের সেই কয়েকটি অবিস্মরণীয় কথা : 'তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্র কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, কে তুই? বল তুই কে? ধীরেন বলল, আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই' লিখেছেন এবং তিনি জানতেন 'যত অঙ্ক কষা শিখিলে ডি-এস-সি পাশ করা যায় তার চেয়ে ঢের বেশী খাটিয়া কবিতা লিখিতে না-শিখিলে কবিতা লেখা যায় যায় না।' তাঁর জীবন ছিল সর্ববিধ অর্থে শিল্পের প্রতি উৎসর্গিত। সেই উৎসর্গিত জীবনের আত্ম-উন্মোচন তাঁর 'শিল্পী' গল্পে। দুঃসহ দুর্দিনে মদন তাঁতির কাছে বাঁচবার তাগিদে শিল্পাদর্শ থেকে চ্যুত হবার প্রস্তাব আসে। কিন্তু মদন তাঁতি আপস করে না। 'আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না।' বেকার অলস পায়ে খিঁচ ধরায় সারা রাত ধরে খালি তাঁত চালায় মদন।

'তোর দাদা লেখাপড়া শিখে দুহাজার টাকার চাকরি করছে, তুই কী করলি বল তো, মানিক?' আত্মীয়দের এই ক্ষুব্ধ প্রশ্নের সুতীক্ষ্ণ জবাব জানা ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কঠিন আত্মপ্রত্যয়ে, অভ্রংলিহ অহংকারে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন 'শিল্পী' গল্পে, 'জীবনের জটিলতা'য়, 'মাশুল'-এ। 'শিল্পী'-র মদন, 'জীবনের জটিলতা'-র বিমল 'মাশুল'-এর মানবের চরিত্রে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি।

মদন বাঙলা দেশের গ্রামের দরিদ্র তাঁতি। কিন্তু সে শিল্পী। এমন শিল্পী যে আমাদের মনে করিয়ে দেয় নাৎসী জার্মানীর কথা, টমাস মানের পলায়নের কথা, স্টেফান্‌ৎ সাইগের আত্মহত্যার কথা। মদন তাঁতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন নাৎসীকবলিত ফ্রান্সের অন্তত একশ মহৎ লেখক ও আরো পাঁচশ পরিচিত লেখকের কথা যাঁরা দখলকারীদের সঙ্গে আপস করেন নি, তাদের অনুমোদনের যোগ্য কিছু লেখেন নি। 'শিল্পী' গল্পটি একটানে বাঙলা ছোট-গল্পকে পৃথিবীর সব ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্প-গুলির স্তরে উন্নীত করে। লরেন্স, কনরাড, কামু, কাফকার ছায়া ধরবার জন্য অনেক-দিন ধরে অজস্র আয়না সাজিয়ে যা আমরা অর্জন করেছি, 'শিল্পী' গল্পটিতে ত[illegible] থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অধিক গৌরবময় কিছু আমরা পেয়েছি।

প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজে কবি শিল্পীর প্রচুর প্রতিপত্তি ছিল। সে[illegible] অবস্থার মৌল পরিবর্তন সূচিত হল গ[illegible] শতাব্দীতে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, রাষ্ট্রে[illegible] ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে[illegible] বিশেষত ইউরোপে উনিশ শতকের শেষা[illegible] রাজনৈতিক নেতা, বড় ব্যবসায়ী আ[illegible] শিল্পপতিরা সমাজজীবনের চূড়োয় উ[illegible] গেলেন। কবি-শিল্পীরা হারালেন তাঁ[illegible] পুরোন প্রভাবপ্রতিপত্তি। তাঁরা কোণঠা[illegible] হয়ে গেলেন, সরে আসতে বাধ্য হলে[illegible] সমাজজীবনের খরস্রোত থেকে। শিল্প[illegible] য়নের ফলে সমাজজীবনে একজন ইঞ্জি[illegible] নীয়ার অথবা একজন চার্টার্ড এ্যাকা[illegible] উন্ট্যান্টের যে-প্রভাব, একজন শিল্পীর তা[illegible] রইল না। কিন্তু শিল্পীদের মন মৃ[illegible] আঘাতেও তীব্রভাবে কম্পিত হও[illegible]

স্বাভাবিক এবং ওই আঘাত, বলা বাহুল্য, মোটেই মৃদু ছিল না। ঊনিশ শতকের শেষার্ধে আহত অহঙ্কারী শিল্পীরা নিজেদের দিকে চোখ ফেরালেন, সমাজে নিজেদের ভূমিকার ব্যাখ্যা খুঁজলেন। আত্মউন্মোচন শুরু হল। এই কারণে তার আগে,- ঊনিশ শতকের শেষার্ধের আগে, পৃথিবীর সাহিত্যে শিল্পীচরিত্রের প্রাধান্য বিরলদৃষ্টান্ত। অন্তর্মুখী হয়ে শিল্পীরা প্রধানত দুটো জিনিস দেখলেন, নিজের মনের খবর যতটা জানা যায়, আর কারো মনের খবর ততটা জানা সম্ভব নয় এবং যে-কাহিনীর প্রধান চরিত্র শিল্পী সেই কাহিনীর প্রতি পাঠকদের আগ্রহ আছে, কারণ শিল্পীর মনের সৃজনশীলতার রহস্য সম্বন্ধে পাঠকদের অনুসন্ধিৎসায় কমতি নেই। কিন্তু শিল্পীরা সব সময় সরাসরি আত্মউন্মোচন করেন না: অনেক সময় মুখোস পরে আসেন। তার ফলে অতি-নৈকট্যের অসুবিধে কেটে যায়, একটু দূরে থেকে নিজেকে বিশ্লেষণের উদ্ঘাটনের সুবিধে হয়। তখন উঁচা কাপড় বোনা সম্ভব নয় বলে শিল্পী সারা রাত ধরে বিনিসুতোয় তাঁত চালাতে আসেন।

মনে রাখা দরকার, 'শিল্পী' গল্পটি লেখা হয়েছিল বাঙলা দেশের দারুণ দুর্দিনে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের অল্প পরে। ওই সময়ের চিহ্ন রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে: যেমন 'ছিনিয়ে খায়নি কেন', • 'সাড়ে সাত সের চাল' 'দুঃশাসনীয়'।

মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা ও দেশবিভাগের পর দেশের মানুষ, বিশেষত দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের একদল করে মানুষ, আমূলে বদলে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের ছোট-গল্পকে নতুন চরিত্র দিয়েছে এই দিনবদল। তিনি লক্ষ্য করেছেন, একদল মানুষের ভাবনা-বাসনা-সংস্কার অথবা এক-কথায় মনের গঠন এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যা বিপ্লবের সময়েই সম্ভব বলে আগে আমাদের ধারণা ছিল। এই জাতের লোকেরা অনেকগুলি গল্পের নায়ক। 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পের যোগী, 'আজকাল পরশুর গল্প'-র রামপদ এবং আরো অনেকের মন থেকে পবিত্রতার পুরোনো ধারণা, পুরোন সংস্কারের বালাই একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে। তাদের বউরা খেয়ে বেঁচে থাকবার জান্তব তাগিদে সদরে গিয়ে রাত্তিরে 'গতর খাটিয়েছে' জেনেও তারা বউদের ঘরে তোলে, স্ত্রীর অধিকার দেয়। 'হারানের নাতজামাই' গল্পের জগ-মোহন অবশ্য তার বউ ময়নাকে জেরা করে জানতে চায়, সে ভুবনের সঙ্গে শুয়েছিল কিনা। ময়না বলে, 'শুই নাই।' জগমোহন ব্যঙ্গ করে, 'শোও নাই। বেউলা সতী!' তথাপি নির্দ্বিধায় বলা যায় ময়না ভুবনের সঙ্গে শুয়েছে বললেও গল্পের শেষে মন্মথ ময়নার থুতনি নেড়ে দিতে হাত বাড়ালে জগমোহন সমান তেজে লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে উঠত, 'মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন, ওই লোকগুলো জাতবিচারের এক নতুন মাপ-কাঠি পেয়েছে। ওরা বলে, 'বহ্মান্ড সংসার পাল্টে গেছে, বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিথিমিতে,- মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত। যে খাটবে সে জাতের লোক, বাস্। আর সব বেজাত বজ্জাত। কেন? না, তারা চোর ছ্যাঁচড়। না, যারা খাটে তাদের অন্ন চুরি করে খায়। চোর বেজাতের দেবতা ধরম মোরা মানি না, মোরা সজ্জাত।' শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে এর নাম শ্রেণীচেতনা।

এই শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণী-সংগ্রাম দ্বিতীয় পর্বের অধিকাংশ গল্পের প্রধান উপজীব্য। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, এই গল্পগুলিতে শুধু ক্ষুব্ধ মিছিল, ধর্মঘট আর মারমুখো জনতা। উদ্বেগ, মমতা, স্মৃতি, স্বপ্নের আঘাতে এইসব গল্পের পাত্র-পাত্রীরাও বিচলিত। তবে 'চোর-ছ্যাঁচড়ের' প্রতি তাদের মনে তীব্র ঘৃণা। ঘৃণা তাদের কাছে একটি 'প্রচন্ড মহৎ হৃদয়াবেগ'। তাছাড়া একটি সুদীর্ঘ মিছিল অথবা কোনো ক্ষুব্ধ জনতার খুঁটিনাটি বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ কম। তিনি বরং ওই মিছিল থেকে, জনতা থেকে একটি ব্যক্তিকে বেছে নেন, ডুব দেন তার মনে এবং নির্মম নির্মোহ বিশ্লেষণে উদ্ঘাটন করেন অন্তর্লোক। অন্তর্লোক উদ্ঘাটনের পর দেখা যায়, এই লোকগুলোর বেঁচে থাকার বাসনা প্রচন্ড, তারা উদ্যত বেঅনেটের সামনে ভয়ে কাঁপে না, তারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার অধিকার দাবি করে, কারো অনুকম্পা প্রার্থনা করে না।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে দিবাকর ও আন্না স্টেশনে সশস্ত্র সিপাই দেখে ভয় পায়নি বুঝতে পেরে সিপাইদের ও তাদের সঙ্গীদের ঔদ্ধত্য ঘা খায়, তারাই প্রায় ভয় পেয়ে যায়। হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত ছোট বকুল-পুর গ্রামের মধ্যে লেখক আমাদের নিয়ে যান না, শুধু তার প্রান্তে পৌঁছে দেন। কারণ, ওই গ্রাম নিয়ে গল্প নয়। গল্প দিবাকর ও আন্নার নতুন মানসিকতা নিয়ে। যে গরুর গাড়িতে তারা ছোট বকুলপুরের প্রান্তে পৌঁছতে পারল, তার গাড়োয়ান গগনের মনের চেহারা নিয়েও গল্প, যার আন্নার ভাষায় 'নতুন গাড়ি হত...জোয়ান বলদ হত'...যদি না 'ভগবান মুখপোড়া একচোখো কানা' হতেন।

ইদানীং কিছু পদ্য অথবা গদ্য 'দ্রুত লেখা হচ্ছে'—এবংবিধ ঘোষণা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। ওই ঘোষণায় 'দ্রুত লেখা' বলতে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি লেখা বোঝানো হয়নি, তেমন হাস্যকর ব্যাপার অভাবনীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের দিকের অনেক গল্প গভীর অর্থে দ্রুত লেখা। গল্পগুলি লেখকের মিতভাষিতার উজ্জ্বল নজির। কোথাও এতটুকু উচ্ছ্বাসের অথবা ভাব-বিলাসের কুয়াশা নেই। যাদের জীবনে অবকাশ নেই, শুধু বেঁচে থাকার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম, তাদের নিয়ে লেখা গল্পের গতিও অতি দ্রুত। 'নেড়ী' গল্পটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ওই গল্পের তারার জীবনে যতকিছু ঘটেছে, তা নিয়ে একটা দোহারা চেহারার উপন্যাস হতে পারতো। কিন্তু লেখক ওই গল্পে দেড় হাজারেরও অনেক কম শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আলোচনার সুবিধের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিকে সাধারণত দুই পর্বে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু যত্নবান পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর দুই পর্বের গল্পগুলি স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও অজস্র বিন্দুতে পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়।

ফসিল

সুবোধ ঘোষ

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়, আয়তন কাটায় কাটায় সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজা আছেন, ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারৎ সব আছে। এক-কুড়ির উপর মহারাজার উপাধি। তিনি ত্রিভুবনপতি, তিনি নরপাল, ধর্মপাল ও অরাতিদমন। দু'পুরুষ আগে এ-রাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হতো, এখন সেটা আর সম্ভব নয়। তার বদলে আজকাল অপরাধীকে শুধু উলঙ্গ করে নিয়ে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক কালের কেল্লাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটকে বুনো হাতির জীর্ণ কঙ্কালের মতো দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভিতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ি আর তরবারির ঘটা, দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মতো তামা আর লোহার ঢাল।

সচিব আছে, সেরেস্তাদারও আছে। ক্ষত্রিয় তিলক আর মোগল তকমার অদ্ভুত মিলন দেখা যায় দপ্তরে। যেমন দুই যুগের দুই জাতের আমলাদের যৌথ প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করছেন। সেই অপূর্ব অদ্ভুত শাসনের তাপে রাজ্যের অর্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।

সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল অঞ্জনগড় শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসায় ছাওয়া রুক্ষ ফোকরে মাটির ডাঙা আর নেড়া পাহাড়। কুর্মি আর ভীলেরা দু' ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে—জমিতে সেচ দেয় ভুট্টা, যব আর জনার ফলায়।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসিল বিভাগ আর ভীল ও কুর্মি প্রজাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে চায় না। কিন্তু অর্ধেক ফসল দিতেই হবে। মহারাজার সুগঠিত পোলো টিম আছে। হয়শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হ্রেষারবে রাজ-আস্তাবল সতত মুখরিত। সিডনির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির উপর মহারাজার অপার ভক্তি। তাদের তো আর খোল ভূষি খাওয়ানো চলে না। ভুট্টা যব-জনার চাই-ই।

তসিলদার অগত্যা সেপাই ডাকে। রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে ক্ষাত্রবীর্যের স্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হয়। এক-ঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ, সব বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ভীলদের অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতাও ভেঙে পড়ে। তাই দলে দলে রাজ্য ছেড়ে সোজা গিয়ে ভর্তি হয় কোন ধাঙড়-রিক্রুটিং ক্যাম্পে। মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লী, কেউ কলকাতা, কেউ শিলং। ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না।

শুধু নড়তে চায় না কুর্মি প্রজারা। এ-রাজ্যে তাদের সাতপুরুষের বাস। ঘোড়া-নিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট-বড় এমন ঠাণ্ডা মাটির ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক-একটা ঝোপ, সালসা মতো সুগন্ধ মাটিতে। তাদের যেন নাড়ির টানে বেঁধে রেখেছে এই মাটি। বেহায়ার মতো চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়। ঋতুচক্রের মতো এই ত্রিদশার আবর্তনে তাদের দিন-সন্ধ্যার মুহূর্তগুলি ঘুরপাক খায়। এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্জনগড় থেকে দয়াধর্ম একেবারে নির্বাসিত নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের উপর দুঃস্থ জমা হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে আল্পনা আঁকা হাতির পিঠে জুলুস নিয়ে পথে বের হন প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি, সেখানে লাঠি চলবেই, আর দু-চারটে অভাগার মাথা ফাটবেই। চিঁড়ে আশীর্বাদ বা রামলীলা—সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়। প্রজারা সেইভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন আদায় উশুল আর তসিল চলছিল বটে, কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গদির গৌরব অটুট রাখা যায় না। নরেন্দ্রমণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টিমের খরচ। রাজবাড়ির বাপের কালের সিন্দুকের রুপো আর সোনার গদিতে ক্রমে ক্রমে হাত দিতে হয়, আর সিন্দুকও খালি হতে থাকে।

অঞ্জনগড়ের এই উদ্বিগ্ন অদৃষ্টের এক সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেন্টের পদে নিযুক্ত হয়ে এল নতুন একজন আইনবাগীশ উপ-দেষ্টা। আমাদের মুখার্জিই এল ল-এজেন্ট হয়ে। মুখার্জির চওড়া বুক যেমন পোলো মাঠে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহা-রাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে মুখার্জিই হয়ে গেল ডি ফ্যাক্টো সচিবোত্তম আর সচিবোত্তম রইল শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জি আদর্শবাদী। ছেলে-বেলায় ইতিহাস-পড়া মার্কিনী ডেমো-ক্র্যাসির স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে—যে সংসাহসী, সে কখনো পরাজিত হয় না। যে কল্যাণকৃৎ, তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জি তার প্রতিভার প্রতিটি পরমাণু উজাড় করে দিল তার স্টেটের উন্নতি সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেন্ট সাহেবকে—একদিকে যেমন কট্টর, অন্যদিকে তেমনি হমদরদ। প্রজারা ভয় পায় ভক্তিও করে। মুখার্জির

নির্দেশে বন্ধ হলো লাঠিবাজী। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড় করা হলো। স্টেটের জরিপ হলো নতুন করে, সেন্সাস নেওয়া হলো। এমনকি মরচে-পড়া কামানদুটোকেও পালিশ দিয়ে চকচকে করে ফেলা হলো।

ল-এজেন্ট মুখার্জিই একদিন আবিষ্কার করল, অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ। কলকাতা থেকে জিওলজিস্ট আনিয়ে সার্ভে ও সন্ধান করিয়ে একদিন বুঝতে পারে মুখার্জি, এই অঞ্জনগড় রত্নগর্ভ, এর গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেস্টসের স্তূপ। কলকাতার মার্চেন্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকরে মাটির ডাঙাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল মুখার্জি। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লায় এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাট গোয়ালিয়রী স্টাইলের প্যালেস। মার্বেল, মোজেয়িক, কংক্রিট আর ভেনিসিয়ান শার্শির বিচিত্র পরিসজ্জা। সরকারী গ্যারেজে দামী দামী জার্মান লিমুজিন, সিডান আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানী আইরিশ পনির অবিরাম লাথালাথি। প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—দিবারাত্র ধক্ ধক্ শব্দে অঞ্জনগড়ের নতুন চেতনা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চেন্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে মাইনিং সিন্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ধাওড়া, পাম্প-বসানো ইঁদারা, বাংলো, কেয়ারি-করা ফুলের বাগিচা, ক্লাব আর জিমখানা। কুর্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া হাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়, মুর্গি বলি দেয়, হাড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটছেন—দুটো নতুন পোলো গ্রাউন্ড তৈরী করতে হবে, আরো একশো বিঘা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে। নহবতের জন্য একজন মাইনে-করা ইটালিয়ান ব্যান্ড-মাস্টার হলেই ভালো।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের উপর ছড়িয়ে মুখার্জি বিভোর হয়ে ভাবে তার ইরিগেশন স্কিমটার কথা। উত্তর থেকে দক্ষিণ সমান্তরাল দশটা ক্যানেল। মাঝে মাঝে খিলান-করা কড়া গাঁথুনির শ্লুথ-বসানো বড় বড় ড্যাম। অঞ্জনা নদীর সমস্ত জলের ঢল কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভিতর থেকে চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মতো। প্রত্যেক কুর্মি প্রজাকে মাথাপিছু এক বিঘা জমি দিতে হবে বিনা সেলামিতে আর পাঁচ বছরের মতো বিনা খাজনায়। আউশ আর আমন, তাছাড়া একটা রবি, বছরের এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্শারী, আলু আর তামাক, দক্ষিণে আখ, যব আর গম, তারপর—

তারপর ধীরে ধীরে একটা ব্যাঙ্ক, ক্রমে একটা ট্যানারি আর কাগজের মিল। ব্যাঙ্ক-কোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ। শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মতো এক-একটি পরিকল্পনায় সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে রাজ্যশাসন লাঠিবাজী নয়, এও একটা আর্ট।

একটা স্কুল—এইটাতে মহারাজের স্পষ্ট জবাব—কভি নেহি। মুখার্জি উঠল। দেখা যাক, বুঝিয়ে বাগিয়ে মহারাজার আপত্তি টলাতে পারে কিনা।

মহারাজার কাছে মুখার্জি এগিয়ে যেতেই মহারাজা তার গালপাট্টা দাড়ির গোছাকে একটা নির্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জির সামনে এগিয়ে দিলেন দুটো কাগজ—এই দেখ।

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ দরবার আর দরবারের ঈশ্বর মহারাজ। আপনি প্রজার বাপ। আপনি দেন বলেই আমরা খাই। অতএব এ-বছর ভুট্টা, যব, যা ফলবে তার উপর যেন তসিলদারের জুলুম না হয়। আমরা নগদ টাকায় খাজনা দেব। আইনসম্মতভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব। ইতি দরবারের অনুগত ভৃত্য : কুর্মি সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো, বকলম খাস।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভিতর ঢুকে চারজন কুর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের ঘরের মেয়েলোককেও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে জখম করছে। আমরা মনে করি পেয়াদারা অন্যায় আর বে-আইনী কাজ করেছে এবং দাবি করি মহারাজের পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ-ব্যাপারের সুমীমাংসা হবে। ইতি সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন।

মহারাজা বললেন—দেখেছ তো মুখার্জি, শালাদের সাহস।

—হ্যাঁ দেখেছি।

টেবিলে ঘুসি মেরে বিকট চিৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়লেন—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি; দুদিন দুরাত দেখি।

মুখার্জি মহারাজকে শান্ত করে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভিতরে ভিতরে অনুসন্ধান করি, আসল ব্যাপার কি।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকি জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে। তবু তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা, একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা দুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরী কি জিনিস। ফয়জাবাদ স্টেশনে কোন বাবুসাহেবের একটা দশসেরী বোঝা ট্রেনের কামরায় তুলে দাও। বাস—নগদ একটি আনা, হাতে হাতে।

দুলাল বলেছে—ভাইসব, এই বুড়োর মাথায় যতটা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।

সিন্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেণ্ট, ছুটি, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ-সবই দুলাল কুলিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিন্ডিকেটও দুলালকে উঠতে বসতে তোয়াজ করে—চলে এস দুলাল। বল তো রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া করে দিচ্ছি। তোমার সব কুর্মিদের ভর্তি করে নেব।

দুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা সে হবে। তবে আপাতত কুলিপিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফত দেবার অর্ডার হোক।

—আচ্ছা তাই হবে। সিন্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দেয়। দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্মি একত্রিত হলো ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকা চুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়াল—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হলো।

এখন কি ভাবে করা উচিত। চিনে দেখ, কে আমাদের দুশমন, আর কেইবা আমাদের দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জত, এর উপর যে ছুরি চালাতে আসবে, তাকে আর কোনোমতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙা শঙ্খের মতো দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ে—ভাইসব, আজ থেকে মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ...।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দেয়—মাহাতোর জন্য। ঢাকঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা। তারপর যে যার ঘরে গেল ফিরে।

ঘটনাটা যতই গোপনে ঘটুক না কেন, মুখার্জির কিছু জানতে বাকি রইল না। এটুকু সে বুঝল—এই মেঘেই বজ্র থাকে। সময় থাকতে চটপট একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ফিউডল দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জত কমপ্লেক্সে জর্জর এইসব নরপালদের তাহলে সামলানো দুষ্কর হবে। বৃথা একটা রক্তপাতও হয়তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজে একহাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া যাক।

পেয়াদারা এসে মহারাজাকে জানাল—কুর্মিরা রাজবাড়ির বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলছে—বিনা মজুরীতে খাটলে পাপ হবে; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

ডাক পড়লো মুখার্জির। দুলাল মাহাতোকেও তলব করা হলো। জোড়হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়াল। মেষশিশুর মতো ভীরু, দুলাল যেন ঠকঠক করে কাঁপছে।

—তুমিই এসব শয়তানি করছ। মহারাজা বললেন।

—হুজুরের জুতোর ধুলো আমি।

—চুপ।

—জি সরকার।

—চুপ। মহারাজা জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল কাঠের পুতুলের মতো স্থির হয়ে গেল।

মহারাজা বললেন—ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের সাথে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুর্মি খনিতে কুলি হয়ে খাটতে পারবে না।

—জি সরকার আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেব।

—যাও।

দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল। এবার আদেশ হলো মুখার্জির উপর সিন্ডিকেটকে এক্ষুনি আদেশ দাও, যেন আমার অনুমতি না নিয়ে আমার কোন কুর্মি-প্রজাকে কুলির কাজে ভর্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র। যেহেতু আমরা নগদ মজুরী পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেইহেতু আমরা খনির সাহেবের কথা মান্য করতে বাধ্য। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না...আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে। রাজতহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়...আগামী শীতের সময় বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুড়ি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।

নোটিশের প্রত্যুত্তরে সিন্ডিকেটেরও জবাব এলো—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন শেষ হবে, নিরানব্বুই বছর পরে।

—কি রকম বুঝছ মুখার্জি? অগত্যা দেখছি ফৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খাল-কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কিনা?

মহারাজা আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, রুদ্ধ একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভিতর ছটফট করছে।

মুখার্জি সবিনয়ে নিবেদন করে—মন খারাপ করবেন না সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জি বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা?

সিন্ডিকেটের এই দুষ্ট উৎসাহেই কুর্মি সমাজের নাচানাচি। এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়?

দুলাল মাহাতোর কুঁড়েঘরের কাছে মুখার্জি এসে দাঁড়াল। ব্যস্তভাবে দুলাল বের হয়ে একটা চৌকি টেনে মুখার্জিকে বসতে দিল। মাথার পাগড়িটা খুলে মুখার্জির পায়ের কাছে রেখে দুলালও বসল মাটির ওপর। মুখার্জি এক এক করে সব বুঝিয়ে বলে। শেষে একটা অভিমানের সুরে ভেঙে পড়ে মুখার্জির কণ্ঠস্বর—একি করছো মাহাতো। দরবারের ছেলে তোমরা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জত লুট করে না। সিন্ডিকেট আজ না তোমাদের ভালো খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে, তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবরাই তখন দু-মুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।

মুখার্জির পায়ে হাত রেখে দুলাল বলে—কসম এজেন্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজ, তাঁর জন্য আমরা প্রাণ দিতে তৈরি। তবে ঐ দরখাস্তটা একটু জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জি দুলালের কুঁড়েঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল।—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেক দিন, এইবার দেখা গিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

স্নান, আহার আর পোশাক বদলাবার কথা মুখার্জিকে ভুলতে হলো আজ। একটানা ড্রাইভ করে থামল এসে সিন্ডিকেটের অফিসে।

দেখুন মিঃ গিবসন, রাজা-প্রজা সম্পর্কের মধ্যে দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের জন্য যে কোন সুবিধা দরবারের কাছে আবেদন করলেই তো পেয়ে যাবেন।

গিবসন বলে—মিস্টার মুখার্জি, আমরা মনিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে। নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে আরো লড়ব।

—সব কুর্মি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলছেন। স্টেটের এগ্রিকালচার তাহলে কি করে বাঁচে বলুন তো? ঝোঁকের মাথায় মুখার্জি তার ক্ষোভের আসল কারণটি ব্যক্ত করে ফেলল।

এগ্রিকালচার না বাঁচুক, ওয়েলথ তো বাঁচছে। এটা অস্বীকার করতে পারেন? গিবসন বিদ্রূপের স্বরে উত্তর দেয়।

তর্ক ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবুন মিস্টার গিবসন। কুলি ভর্তির সময় দরবার থেকে একটু অনুমোদন করিয়ে নেবেন, এই মাত্র। মহারাজা খুশি হবেন এবং তাতে আপনাদেরও অন্যদিকে নিশ্চয়ই ভালো হবে।

—সরি, মিস্টার মুখার্জি। গিবসন বাঁকা-হাসি হাসে।

নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল মুখার্জির কর্ণমূলে। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে অফিস ছেড়ে চলে গেল।

ম্যাককেনা এসে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার হে গিবসন?

—মুখার্জি দ্যাট মংকি অব অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছি। কোনো টার্মই গ্রাহ্য করি নি।

ঠিক করেছ। শুনেছ তো ওর ঐ ইরিগেশন স্কিমটার কথা। সময় থাকতে ভণ্ডুল করে দিতে হবে, নইলে সাংঘাতিক লেবারের অভাবে পড়তে হবে। কারবার এখন বাড়তির মুখে, খুব সাবধান।

—কোন চিন্তা নেই। পোষা বিড়াল মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভণ্ডুল করব। পরস্পর হাস্য বিনিময় করে ম্যাককেনা বললে—মাহাতো এসে দাঁড়িয়ে বে, ওকে ডেকে নিয়ে এস, আর সেই কাজটা এবার সেরে ফেল।

সিন্ডিকেটের অফিসের পেছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল মাহাতো। অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলে—এই যে দরখাস্ত তৈরী। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল। আজই দিল্লীর ডাকে ফেলে দেব।

সই করে মাহাতো। মাহাতোর পিঠ চাপড়ে ম্যাককেনা তাকে বিদায় দিল— ডরো মৎ মাহাতো, আমরা আছি। যদি ভিটে-মাটি উৎখাৎ করে, তবে চলে এস সব, আমাদের ধাওড়া খোলা আছে তোমাদের জন্য, সব সময়। ডরো মৎ।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জি শুধু আকাশ-পাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মতো সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের রথের সারথ্য আর বোধহয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতে তুলে দিতে হবে তার লাগাম।

কিন্তু মানুষগুলোর মাথায় ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনা-তাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিংবা সে নিজেই ভুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান, খাস কামরায়।

সচিবোত্তম ও ফৌজদার শুষ্কমুখে বসে আছে। মহারাজা কৌচের চারদিকে পায়চারি করছেন ছটফট করে। মুখার্জি ঢুকতেই একবার অপমানুৎকার করলে।

—নাও এবার গদিতে থুথু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বসো তার উপর আর স্টেট চালাও।

হতভম্ব মুখার্জি সচিবোত্তমের দিকে তাকায়। সচিবোত্তম তার হাতে তুলে দিল একটা চিঠি। পলিটিক্যাল এজেন্টের নোট।—স্টেটের ইন্টার্নাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্বে, আশা করি, দরবার শীঘ্রই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রূকুটি করেই বলল—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী এজেন্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজ চিৎকার করে উঠলেন। নিশ্চয়ই খুব সত্য কথা। আমি সব জানি মুখার্জি। আমি অন্ধ নই।

মুখার্জি—সব জানেন আপনি, এ কথার অর্থ কি সরকার?

—থাম, সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধুলো মাটি বেচে যে বেনিয়ারা পেট চালায় তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে? কে তাদেরকে ভিতর ভিতর এত সাহস দেয়?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের উপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে বাজন করে তাঁকে সুস্থ করতে লাগল। সচিবোত্তম ফৌজদার আর মুখার্জি ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ঝেড়ে মহারাজাই আবার কথা পাড়লেন।—ফৌজদার সাহেব এইবার আপনিই আমার ইজ্জৎ বাঁচান।

সচিবোত্তম বলল—তাই হোক, কুর্মিদের আপনি শায়েস্তা করুন ফৌজদার সাহেব,

আর আমি সিন্ডিকেটকে একটা সিভিল স্যুটে ফাঁসাচ্ছি। চেষ্টা করলে কন্ট্রাক্টের মধ্যে এমন বহু ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জির দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জি এরি মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজের চোখ ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পিছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে তা শশুক হলেও মুখার্জি আন্দাজ করে নিল। সত্যই তো, এদিকটা তার এতদিন চোখে পড়ে নি। তার ভুল হয়েছে। মহারাজের সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে তার শেষ কথাটা জানাল।— আমার ভুল হয়েছে সরকার। এবার, আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি নিশ্চয়ই যাবো।

মহারাজা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না মুখার্জি, কি যে বল। তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করি না। তবে পলিসি বদলাতেই হবে। একটু কড়া হতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না মুখার্জি।

শীতের মরা মেঘের মতো একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি, যেন মুখার্জির হাত-পায়ের গাটগুলিকে শিথিল করে দিয়েছে। দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। শুধু বিকাল হলে, ব্রিচেস চড়িয়ে বয়ের কাঁধে দুজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্ত সময়টা পুরো গ্যালপে খেপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে-বাঁয়ে বেপরোয়া অণ্ডারনেক হিট চালায়। কড়কড় করে এক-একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে। মুখের ফেনা আর ঘামের স্রোতে ভিজে চুপসে যায় কালো ওয়েলারের পায়ের ফ্লানেল। তবু স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে মুখার্জি চার্জ করে। বিপক্ষদল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্কর শেষ হবার পরেও বিশ্রাম করার নাম করে না মুখার্জি। অকারণে পোলো লনের চারদিকে বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভরে যেন স্পীড পান করে। খেলা শেষে মহারাজ অনুযোগ করেন—বড় রাফ খেলা খেলছ মুখার্জি। সেদিনও সন্ধ্যার আগে নিয়মিত সূর্যাস্ত হলো অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে। মহারাজা সাজগোজ করে লনে যাবার উদ্যোগ করছেন। পেয়াদা একটা খবর নিয়ে এল।—চোদ্দ নম্বরের পিঠ ধসেছে, এখনো ধসছে। নব্বইজন পুরুষ আর মেয়ে কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি সুসংবাদ। মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন।— সচিবোত্তম কোথায়? শিগগির ডাক। সিন্ডিকেটের দেমাক এইবার গুঁড়ো করব।

সচিবোত্তম এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের চোখের মতো তাঁর চোখ। বললেন—দুঃসংবাদ।

—কিসের দুঃসংবাদ?

—বিনা টিকিটে কুর্মিরা লকড়ি কাটছিল। জঙ্গলের রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুর্মিরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তারপর? মহারাজার চোয়াল দুটো কড়কড় করে বেজে উঠল।

—তারপর ফৌজদার গিয়ে গুলী চালিয়েছে। ছররা ব্যবহার করলেই ভালো ছিল। তা না করে চালিয়েছে মুঙ্গেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেট। মরেছে বাইশজন আর ঘায়েল পঞ্চাশ-জনের উপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাস এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে। মহারাজা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার চোখের সামনে পলিটিক্যাল এজেন্টের হুঁশিয়ারী চিঠিটা যেন চকচকে সূচীমুখ বর্শার ফলার মতো ভেসে বেড়াতে লাগল।

—খবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে?

—অন্ততঃ সিন্ডিকেট তো জেনে ফেলেছে। সচিবোত্তম উত্তর দিল।

মুখার্জিকে ডাকালেন মহারাজা।—এই তো ব্যাপার মুখার্জি। এইবার তোমার বাঙালী ইলম দেখাও, একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে মুখার্জি বলে—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটক করে ফেলুন।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কি আর লাঠি ও লন্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড়ল দুলালের ঘরের দিকে।

মুখার্জি বললো—আমার শরীর ভাল নয় সরকার, কেমন গা বমি বমি করছে। আমি যাই। (

চৌদ্দ নম্বরের পিট ধসেছে। মার্চেন্টরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছে। তৃতীয় সীমের ছাপটা ভাল করে টিম্বার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত পাথরের কুচি আর ধুলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যেন একটা আর্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আসছে বুম বুম বুম বুম। নরম পাথরের পিলারগুলি চাপের চোটে তুবড়ির মতো ধুলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরই মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পিটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যান্য ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝপথেই দারোয়ানেরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। কাজে যাও সব, কিছু হয় নি। কেউ ঘায়েল হয় নি, মরেও নি কেউ।

মার্চেন্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছে। গিবসন বলে—মাটি দিয়ে ভরাট করার উপায় নেই, এখনো দুদিন ধরে ধসবে। তবে হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজই নতুন একটা তৈরী করে রাখ। অন্ততঃ একশো নাম কমিয়ে দাও।

ম্যাককেনা বলে—তাতে লাভ কি হবে? দি মহারাজার কানে পৌঁছে গিয়েছে সব। তাছাড়া, দ্যাট মাহাতো, তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? কালকের সকালেই শহরের কাগজ-গুলি খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যান্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটি এনকোয়্যারি কমিটি, একটি গান্ধীয়াইট বদমাশও তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপার।

সে রাতে ক্লাবঘরে আর আলো জ্বললো না। একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠলো প্যালেসের একটা প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়লো মুখার্জির।

অভূতপূর্ব দৃশ্য! মহারাজা, সচিবোত্তম আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেনা, মুরে আর প্যাটার্সন। সুদীর্ঘ মেহগিনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেন্টারের ঠাসাঠাসি।

সস্মিত হেসে মহারাজা মুখার্জিকে অভ্যর্থনা করলেন।—মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জি। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন।

গিবসন সায় দিয়ে বলল—নিশ্চয়, অনেক ক্রামজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার সেটা মুখার্জির কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দেয়। নিরুত্তর মুখার্জি চমকে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ, তারপর শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে অবসন্নের মতো বসে থাকে।

গিবসন মুখার্জির পিঠ ঠুকে একবার বলে—এসব কাজে একটু শক্ত হতে হয় মুখার্জি, নার্ভাস হবেন না।

রাতদুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দনম্বর পিটের কাছে মোটরগাড়ি আর মানুষের একটা ভিড়। ফৌজদারের গাড়ির ভিতর থেকে দারোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাসটা টেনে নামাল। ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাস এল আরো। ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরের মুখে মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিল একে একে।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছলছল করেছিল মুখার্জির চোখ-দুটো। গাড়ির বাম্পারের উপর এলিয়ে বসে চৌদ্দ নম্বর পিটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অন্য কথা: অনেকদিন পরের একটা কথা। লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্ন-তাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল। অর্ধপশু গঠন, অপরিণত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যা-প্রবণ তাদের সাচ হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃ-পুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল। আর ছেনি হাতুড়ি, গাঁইতা কতগুলি লোহার রড আর কিম্ভূত হাতিয়ার। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধহয় একদিন আকস্মিক কোন ভূবিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি শাদা ফসিল: তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই।

সুবোধ ঘোষ

প্রফুল্ল রায়

সুবোধ ঘোষের নাম জানবার আগে থেকেই আমি তাঁর মুগ্ধ পাঠক, এমন অনুরাগী যে ভক্তও বলা যেতে পারে।

ঘটনাটা মোটামুটি চমকপ্রদ।

উনিশ শ একান্ন-বাহান্ন সালে আমরা মফস্বলের ক'টি ছেলে সবে কৈশোর পেরিয়েছি। যৌবরাজ্যে পা দিয়েই আর সবার মতো আমরাও চঞ্চলতা অনুভব করলাম—কিছু করা দরকার। আঠার বছর আগে কলকাতা থেকে তিন শ মাইল দূরে মৃদু নিষ্প্রভ বেগবর্ণহীন এক ছোট্ট শহরে অভিনব কী-ই বা করা যেত? দাগা বুলানোর মতো সেই পুরনো পথেই পা বাড়াতে হল। মড়া-পোড়ানো, ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা ম্যালেরিয়া বিতাড়নের জন্য পানাপুকুর সাফাই—বহুজনহিতায় জীবন সঁপে দেওয়া তো ছিলই। তার সংগে একটা লাইব্রেরি না খুললে ষোলকলা যেন পূর্ণ হচ্ছিল না। অতএব ব্যবহারের অযোগ্য এক ত্রিভঙ্গ ঘরে খানদুই ভাঙাচোরা আলমারি বসিয়ে টিনের সাইনবোর্ড লাগানো হল—'নবীন সংঘ পাঠাগার'। কিন্তু যা না হলে এত আয়োজন এত সাজসজ্জা বিফল সেই বস্তুটি কোথায়? বইয়ের খোঁজে বর্গীর মতো বাড়ি বাড়ি হানা দিতে লাগলাম। কিছু কিছু জুটলও। সে সব বইয়ের বেশির ভাগই বিয়েতে উপহার পাওয়া, রঙ-চঙে মলাট, ভেতরে ভেতরে চটকদার ছবি। পরে জেনেছি এদের সূতিকাগার বটতলা।

বইটই যোগাড় করে এনেই লিস্ট করতে বসে যেতাম। বইয়ের নাম, লেখকের নাম—সমস্ত নামাবলী টুকে রাখতাম। হিসেব তো মেলাতে হবে।

সেদিন দুপুরবেলা একখানা বই নিয়ে বিপদ বাধল। নাম টুকতে গিয়ে দেখি, মলাট-টলাট কিছু নেই। মলাট কেন, সামনে-পেছনের অনেকগুলো পৃষ্ঠাও খোয়া গেছে।

একান্ন-বাহান্ন সালে সাহিত্য-টাহিত্য সম্বন্ধে আমি ছিলাম অত্যন্ত উদাসীন। কচিৎ কখনো দু-একখানা বই যে না পড়েছি এমন নয়। কিন্তু গল্প-উপন্যাসের পাতায় পাতায় যে আনন্দের ভোজ সাজানো, আমার তাতে লোভ ছিল না। আদৌ আমাকে তা আকর্ষণ করত না। নেহাত বন্ধুরা লাইব্রেরি নিয়ে মেতেছে; আমাকেও দলে থাকতে হয়েছিল।

যাই হোক, মলাটহীন বইটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে টের পেলাম, সেটা কয়েকজন লেখকের ছোটগল্পের সংকলন। অন্য লেখক এবং তাঁদের গল্পের নাম তবু পাওয়া গেল। কিন্তু প্রথম গল্পটির নাম এবং তার লেখক একেবারে নিরুদ্দেশ। কেননা গল্পটার গোড়ার ক'টা পাতাই নেই।

বইটার নাম কী লিখব, গ্রন্থকারের জায়গায় কার নাম বসাব, ভাবতে এক পরিচয়হীন গল্পটার বাকি অংশটুকু পড়তে শুরু করেছিলাম। ঠিক পড়ছিলাম না, অন্যমনস্কের মতো চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর কখন আচ্ছন্ন হয়ে গেছি, জানি না।

গোটা গল্পটা নেই। সিকিভাগ থাকতে পারে, আধখানা থাকতে পারে, আবার তার চাইতে বেশি থাকাও অসম্ভব নয়। সেই অসম্পূর্ণ রচনা একবার পড়বার পর দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার অনেক, অনেকবার পড়ে ফেললাম।

সেসব দিনে বাঙলাসাহিত্য আমার কাছে অনাবিষ্কৃত মহাদেশ, তার কিছুই প্রায় জানতাম না। অবশ্য স্কুল-কলেজের কল্যাণে বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র, এমনকি বিভূতিভূষণ-তারাশংকর পড়তে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কারো রচনার সংগে এই লেখাটি মেলে না। সেই বয়েসে কতটুকুই বা বুঝি! তবু মনে হয়েছে, এর জাত আলাদা, স্বাদ আলাদা, এর সারা গায়ে অন্য সৌরভ মাখানো।

আগে যা গল্প-টল্প পড়েছি তার সব চরিত্রই আমার আজন্মের চেনা। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুললেই যেন চারপাশে তাদের দেখতে পাওয়া যায়, তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, হাত বাড়ালে ছোঁয়াও যায়। কিন্তু এই গল্পটির যারা কুশীলব—একলস ভীল ও কুর্মি, ল-এজেন্ট মুখার্জি, দুলাল মাহাতো, মাইনিং সিন্ডিকেটের মার্চেন্টরা, নেটিভস্টেট অঞ্জনগড়ের মহারাজা — আমার পরিচিত ভূমন্ডলে তাদের অস্তিত্ব ছিল না।

গোটা গল্পটা না থাকায় তার সম্পূর্ণ রসগ্রহণ সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেদিন আমাকে সব চাইতে যা চমৎকৃত করেছিল তা গল্পটির ভাষা। বার বার পড়তে পড়তে অনেক জায়গা কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

'সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে-আলপনা হাতীর পিঠে চড়ে জলুস নিয়ে পথে বার হন—প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনের কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়—রাজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষয়িষ্ণের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি, যেখানে জনতা আর জয়-ধ্বনি সেখানে লাঠি চলবেই আর দু-চারটে অভাগার মাথা ফাটবেই। চিঁড়ে আশীর্বাদ বা রামলীলা—এরই লাঠির সাহায্যে পরিবেশন করা হয়, প্রজারা সেইভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।' কিংবা লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা জাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি থেকে দেখছে কতগুলি দলিল! অর্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থি-কংকাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

অচেনা সৌরভময় এই বাক্যগুলি সেদিন সারাদুপুর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার যে রসনাগ্রে নাড়াচাড়া করেছি! কখনও জোরে কখনও ধীরে উচ্চারণ করে করে কান পেতে কতবার যে তাদের ঝংকার শুনেছি! তারপর বিকেলবেলা ছেঁড়া বইখানা নিয়ে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছি, এই গল্পটার নাম কী? এর লেখক কে? কেউ জানে না। বন্ধুরা কেন, সেই মফস্বল শহরের একজনও তার সন্ধান দিতে পারেনি।

তিপ্পান্নর মাঝামাঝি কলকাতায় চলে এলাম। ততদিনে সাহিত্যের সংগে আমার বন্ধুতা ঘটে গেছে। অদৃশ্য এক সিংদরজা

মুখ দিয়ে সে আমাকে তার বিস্ময়ের রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। বাঙলা সাহিত্যের বহু লেখকের রচনার সঙ্গে ততদিনে মোটামুটি মুখচেনাও হয়ে গেছে।

এত বই পড়েছি কিন্তু সেই গল্পটির সন্ধান কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশ্য কলকাতায় আসার পর নিরন্তর খুঁজে যাচ্ছিলাম। একদিন অভাবিতভাবে একখানা বই আমার হাতে এল। আর কী আশ্চর্য, যার পেছনে এতদিন অসীম উন্মাদনায় ছুটে বেড়িয়েছি সেই গল্পটি তার ভেতর রয়েছে।

গল্পটির নাম 'ফসিল'। লেখক : সুবোধ ঘোষ।

সুবোধ ঘোষের নাম জানবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত লেখা যোগাড় করে আনতে লাগলাম। বলতে দ্বিধা নেই সে-সময় তাঁর বই ছিল আমার সর্বক্ষণের প্রিয়তম সঙ্গী।

।। দুই ।।

'অমৃত' পত্রিকার এই সংখ্যাটি ছোট-গল্প সংখ্যা। সম্পাদকের নির্দেশ, সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা করতে হবে।

সুবোধ ঘোষের খ্যাতি এবং কীর্তি প্রায় কিংবদন্তীর মতো। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, মহাপুরুষ-জীবনী লিখেছেন, নৃতত্ত্ব ও নৌবাহিনী সম্পর্কে তথ্যমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। মহাভারতের উপাদান নিয়ে মনোহর প্রেমকাহিনী লিখেছেন। এ ছাড়াও নানা রসের নানা বর্ণের উপাদেয়, উপভোগ্য স্বাস্থ্যপ্রদ অজস্র রচনা তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। তবু আমার ধারণা, ছোটগল্পই তাঁর প্রাণপ্রতিম। সেখানেই তিনি সর্বাধিক স্বচ্ছন্দ, সবচাইতে সিদ্ধকাম।

।। তিন ।।

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার আগে বাঙলা ছোট-গল্পের রূপরেখাটি চোখের সামনে রাখা ভাল। তাতে তাঁর রচনার মর্মসন্ধান সহজ হবে।

বাঙলা সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে ছোটগল্পই কনিষ্ঠ। সবার ছোট কিন্তু সবচাইতে স্বাবলম্বী সবচাইতে পরিপূর্ণ, সবচাইতে কান্তিমান। অথচ এই তো সেদিন তার জন্ম।

বাঙলা ছোটগল্পের আদি পর্বের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মহত্তম ভাবনা জড়িয়ে আছে। তিনি আর কেউ নন; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অন্য নানাদিকের মতো এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই প্রথম পতিত জমি উদ্ধার করেছেন, কর্ষণ করেছেন, বীজ ছড়িয়েছেন। ফলত সোনালি ফসলের ঝাঁপি ভরে গেছে।

দু-চারটে ছোটগল্প লিখে পরবর্তী-কালের জন্য পথ কেটে দিয়েই কর্তব্য শেষ করে দেননি রবীন্দ্রনাথ। সযত্নে তিনি লালন করেছেন; পরম আদরে শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে বাঙলা সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, মহৎ মন ছোটগল্পের জগতকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। তাঁরা প্রভাত কুমার, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ অচিন্ত্যকুমার, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

যার পশ্চাৎপট এত কারুকার্যখচিত, এমন গৌরবময়, সেখানে একটি নতুন লেখকের পক্ষে মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ নয়। তবু সুবোধ ঘোষ এসেছিলেন। বিদ্যুৎচমকের মতো, নতুন মন্ত্রোচ্চারণের মতো। বিস্ময়চকিত বাঙলাদেশ দুটি সর্বাঙ্গশোভন ছোটগল্প হাতে পেয়েছিল— 'অযান্ত্রিক' এবং 'ফসিল'।

।। চার ।।

বাঙলা ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ কোন স্বর যুক্ত করেছেন, কোন বেগ বইয়ে দিয়েছেন এবার দেখা যাক।

তার আগে একটা কথা জেনে রাখা দরকার, মণিখণ্ডের মতো উজ্জ্বল চমকপ্রদ অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন সুবোধ ঘোষ। প্রেম-প্রণয় - ঈর্ষা-হিংসা বিদ্বেষ— অরণ্যের মতো জটিল মানবমনের এমন কোন দিক নেই যা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয় নি।

সুবোধ ঘোষের অগণিত লেখা থেকে মাত্র তিনটি গল্প আমি এখানে বেছে নিচ্ছি। 'অযান্ত্রিক' 'ফসিল' 'গোত্রান্তর'। প্রেমের গল্প, হৃদয়রাগের গল্প, ঈর্ষা-বিদ্বেষহীনতার গল্প অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু 'অযান্ত্রিক' বা 'ফসিল' কিংবা 'গোত্রান্তর' সুবোধ ঘোষ ছাড়া আর কারো পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। তাঁর রচনায় বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ এদের মধ্যে উপস্থিত। এগুলি তাঁর মনোভঙ্গির প্রতি-নিধিস্থানীয়। এদের মধ্যেই সুবোধ ঘোষের পরিণত ব্যক্তিস্বরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে।

সুবোধ ঘোষের আগে বাঙলা ছোট-গল্প মোটামুটি রবীন্দ্রানুসারী। আদি-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পকে মধ্যবিত্ত মনোলোকের সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে দিয়ে-ছিলেন যার সীমা খুব বেশি অতিক্রান্ত হয় নি। অবশ্য কল্লোলের লেখকরা ছিলেন। ছোটগল্পের দেহে তাঁরা চারুতা এনেছেন, চাকচিক্য ফুটিয়েছেন। কেউ কেউ বিষয়-বস্তুতেও অভিনবত্ব এনেছেন। ফলে বাংলা গল্পে কয়লাকুঠি এসেছে, গণিকা এসেছে, বেদেরা এসেছে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, ভিখিরী, জেলে-মাঝি, চোর-জোচ্চর—বাংলা গল্প সর্বং-সহার মতো সবাইকেই কোল দিয়েছে। এত বিচিত্রতা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত মনোভূমিই বাঙালী লেখকদের প্রকৃত স্বদেশ। প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারা-শঙ্কর, শৈলজানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বিভূতিভূষণের কয়েকটি গল্প বাদ দিলে রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে এসে কেউ বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন নি।

আরেকটা কথা, সুবোধ ঘোষের পূর্ববর্তী প্রায় সব গল্পেই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, এই শতকের গোড়া থেকে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে ঢেউ উঠেছিল বাঙালী লেখকেরা সে সম্বন্ধে অন্যমনস্ক। সময়ের একটা বৃহৎ অংশ আমাদের ছোটগল্পে প্রায় অনুপস্থিত।

এদিকে সময় বসে থাকছিল না। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নতুনকাল এগিয়ে আসছিল, তার পাশে যন্ত্রযুগের হাওয়া সমাজবাদ সাম্যবাদের হাওয়া নতুন বণিকতন্ত্রের হাওয়া, শ্রমজীবী মানুষের সচেতনতার হাওয়া। সুবোধ ঘোষ এই সময়কে ধরেছেন। শুধু ধরেনই নি, বাঙলা ছোটগল্পের হাত ধরে এককাল থেকে আরেককাল পৌঁছে দিয়াছেন। সেদিক থেকে তিনি সন্ধিকালের শিল্পী। 'অযান্ত্রিক' 'দলিল', বা 'গোত্রান্তর'—এই গল্প তিনটি বাঙলা সাহিত্যে স্থল-বিভাজিকা রেখার মতো সুবোধ ঘোষ এদের মধ্যে ছোট-গল্পের আলাদা ভূভাগ সৃষ্টি করেছেন, আলাদা মানচিত্র এঁকে এমন কণ্ঠস্বর শুনিয়েছেন, এমন বেগ সঞ্চার করেছেন। যা আগে আর কখনো আমাদের কর্ণ বা দৃষ্টিগোচর হয় নি। অন্তত এই কারণেও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

।। পাঁচ ।।

এবার সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যাক।

(ক) সুবোধ ঘোষ আশ্চর্য পরিমিত-বাক। কোথাও কোন কারণেই তিনি প্রগল্ভ হন না। সর্বত্রই তিনি অপ্রমত্ত, স্থির। যে সঙ্কেতটুকু পেলে মাঝারি-মাপের একজন লেখক হাজার পাতার মহাভারত ফেঁদে বসতে পারেন, সুবোধ ঘোষ তাকে হয়তো পাঁচটি লাইনেই ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর যে কোন রচনার চেহারাই অত্যন্ত গম্ভীর, সম্ভ্রান্ত।

(খ) সুবোধ ঘোষের ভাষা আমার কাছে বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কল্লোল এবং কল্লোলোত্তর লেখকরা প্রায় সবাই ভাষাকে রূপবান, সুকান্ত এবং লাবণ্যময় করে তুলেছেন। সেখানে সুবোধ ঘোষের ভাষা শক্তিমান। পড়তে পড়তে মনে হয় একটি সরল মানুষ এর পেছনে বসে আছেন এবং প্রতিটি অক্ষরে আপন ব্যক্তিত্ব মুদ্রিত করে দিয়েছেন।

শক্তিমানই শুধু নয়, তাঁর ভাষা ধ্বনি-ময়, ইঙ্গিতবহ। চোখের সামনে সুবোধ ঘোষের যে কোন বইয়ের একখানা পাতা খোলা থাকলে মনে হয় কারুকার্যময় ভাস্কর্য দেখছি।

(গ) নিঃসন্দেহে সুবোধ ঘোষ রিয়ালিস্ট। কিন্তু তাঁর বাস্তবতার আস্বাদ ভিন্ন। বাস্তবতা বলতে কদর্য কুৎসিত পীড়াদায়ক একটি ছবি অনেকেই ফুটিয়ে থাকেন। সুবোধ ঘোষের 'রিয়ালিজম' তার সঙ্গে মেলে না। সবচাইতে যা জঘন্য সবচাইতে যা গ্লানিকর তাকেও তিনি সুষমা দিয়ে ঘিরে রাখেন।

(ঘ) সুবোধ ঘোষের লেখার আরেকটি লক্ষণ কৌতুকবোধ। কৌতুককে তিনি কখনই উচ্ছ্বলিত হতে দেন না। মৃদু আভার মতো বাক্যাংশের গায়ে আলতো করে মেখে রাখেন।

।। ছয় ।।

বাঙলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, সুবোধ ঘোষ ইদানীং ছোটগল্প লিখছেন না।
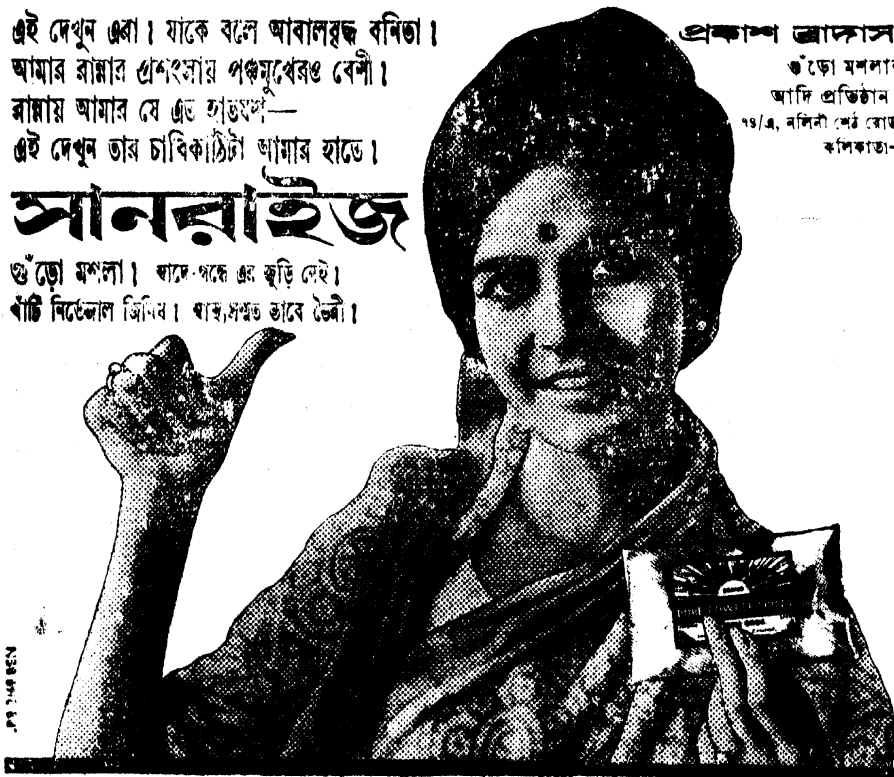
এ গল্পটা হয়তো না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম, কিন্তু লেখক জীবনের শুরু থেকেই ব্যক্তিগত সুখসুবিধে নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া নিজের সুখ অসুখের প্রশ্ন তো এখানে ওঠেই না, কারণ মিসেস চৌধুরীর বিশেষ অনুরোধেই এটা লেখা। তবু তিনি গল্পটা আমাকে যেভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেভাবে শেষ আমি করতে পারবো না বলে দুঃখিত। তিনি যেখানেই থাকুন এ গল্প যদি পড়েন, যেন আমায় ক্ষমা করেন।

সেদিনের সেই ঘটনার পর মিসেস চৌধুরী যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না। জানি না এই বই তার হাতে পড়বে কিনা, তবু যদিই তাঁর নজরে পড়ে, তাঁর অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি—লাবণ্য ভাল আছে, লাবণ্যর একটি ছেলে হয়েছে, লাবণ্য নাম রেখেছে...

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

মিসেস চৌধুরীর হয়তো মনে নেই সেই কথা।

কিন্তু আমার আছে।

রাত তখন প্রায় বারোটা। লাবণ্যর বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শেষে আমার বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছি। বৃদ্ধা না হোন, মিসেস চৌধুরীকে যুবতী বলা চলে না। তবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সেন্টের গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছিল। রুজ-মাখা গাল আর লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের ওপর যেন কে হঠাৎ কালি লেপে দিয়েছে।

বললেন—একটা ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি—তোমাকে একটা গল্প লিখতে হবে বিমল—

বললাম—ব্যাপার কী? কি হলো?

—তুমি কথা দাও লিখবে? তুমি অনেককে নিয়ে লিখেছ, এ-ও তোমারই সাবজেক্ট—

—খুলে বলুন—কী ব্যাপার?

মিসেস চৌধুরী বললেন—লাবণ্যকে নিয়ে তোমায় একটা গল্প লিখতেই হবে—

—লাবণ্য কে?

—বলবো তোমাকে সব কিন্তু আগে কথা দাও—লিখবে?

অগত্যা কথা দিতেই হলো।

মিসেস চৌধুরী বললেন—যত বদনাম শুধু আমাদেরই বেলায়, কিন্তু তবু তোমাকে বলি, আমাদের আর যা-ই দোষ থাকে, আমরা চরিত্রহীন নই। আমার বাড়ীতে যারা আসে, আমি তাদের কাছে যাই—তারা কেউ আমাকে সতী সাবিত্রী বলে না জানুক, আমাকে শ্রদ্ধা করে সবাই। অন্তত সমাজকে আমি ঠকিয়েছি এ-কথা কেউ বলবে না। আমার কাছে সরল সোজা কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল। কেউ বলতে পারবে না আমার ঘরে এসে কাউকে পুলিশের হেফাজতে পড়তে হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কি কিছু জানে না? জানে বৈকি! সব জানে। আমার কিসের কারবার, আমার পেট চলে কিসে—সবই জানে। কিন্তু তবু বলে না কেন? তুমি তো দেখেছ আমার বাড়ির পাশেই পুলিশের থানা—তাদের নাকের ওপরেই তো আমার কারবার চলছে—তবু কিছু বলে না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর মিসেস চৌধুরী অবশ্য আশা করেন না। তাই আমিও চুপ করে রইলাম।

কথা বলতে বলতে মিসেস চৌধুরীর আধাপাকা চুলের খোঁপা খুলে পড়লো। দুহাতে সেটাকে সামলে নিয়ে আবার বললেন—এই রাত্রির বেলা তোমার ঘরে বসেই বলছি, আমায় কেউ কুলত্যাগিনী বলে জানে, কেউ বা বলে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে—আমি সব জানি, সব স্বীকার করি, তোমাদের কাছেও আমি নিজেকে সতী সাবিত্রী বলে বড়াই করি না, আমি যা আমি তাই-ই। আমার সুটকেস-এর মধ্যে যেদিন মিস্টার চৌধুরী এক প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন—সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করিনি—তা ছাড়া তোমরা তো জানো, এক গ্লাস বিয়ার খেলে কী-রকম ভুল বকতে শুরু করি,—

কথা বলতে বলতে যেন হাঁফাতে লাগলেন। বললেন—তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বরাবর জানো নিশ্চয়ই সন্ধেবেলা তিন কাপ চা খেয়ে তবে আমার নেশা কাটে, আজ সত্যি বলছি তোমায় এক কাপ চাও জোটেনি কপালে—

মিসেস চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝবে একি অমানুষিক ঘটনা।

তারপর লজ্জা ত্যাগ করে বললেন—তোমার চাকরকে একবার জাগাও—চা করুক—

সত্যি মনে হলো মিসেস চৌধুরী এক নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন যেন। সে আঘাতে নেশার খোরাক পেতেও ভুলে গেছেন তিনি—এমনি কঠোর তার যন্ত্রণা। নইলে মিসেস চৌধুরীর মত মেয়েমানুষ এই রাত্রে নিজের ব্যবসা ছেড়ে আমার বাড়িতেই বা আসবেন কেন। অথচ সে আঘাত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও যেন তাঁর নেই। দুর্বল অক্ষম আক্রোশে তিনি যেন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন! আমিই বুঝি এখন তাঁর একমাত্র অস্ত্র, গল্প লিখে আমিই একমাত্র তার প্রতিকার করতে পারি যেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লাবণ্য কে আপনার?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলেন মিসেস চৌধুরী। বললেন—আমার কেউ না। আসলে আমার নিজের বলতে কে আর আছে বলো! আরো যেমন দশজন ছেলেমেয়ে আসে আমার বাড়িতে—লাবণ্যও তেমনি। এদের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক! কত মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, গুজরাটি, বাঙালী আসে—মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, কেউ এক ঘণ্টা, কেউ দু ঘণ্টা, কেউ তিন ঘণ্টা, কেউ বা সারা ঘর ভাড়া করে—

তিনখানা ফারনিশড্ ঘর আমার, ভাড়া নেয় —আবার কাজ ফুরোলে চলে যায়, লাবণ্যও ওদের মত একজন—আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কিসের?

লাবণ্যর সঙ্গে যদি কোনও সম্পর্ক নেই, তবে তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা, তাকে নিয়ে এই গল্প লেখানোর প্রচেষ্টা কেন, বোঝা গেল না।

মিসেস চৌধুরী বললেন—কিন্তু তা বলে কি তোমরা আমায় অর্থপিশাচ বলবে? এই যে তোমরা আমার ঘরে যাও, নিজের পয়সা খরচ করে খাও-দাও, স্ফূর্তি করো, কখনও ঘরভাড়া চেয়েছি? ছোটবেলায় এককালে কবিতা লিখেছি, তাই তোমাদের সঙ্গে মিশি, কিন্তু এ-লাইনে এসে আর ও সব হলো না—না হোক, সকলের সব জিনিস হয় না, ওই বাড়ীভাড়া থেকে যে কটা টাকা আসে, তাইতেই আমার শেষ জীবনটা একরকম কাটিয়ে দেব—

মিসেস চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝতে পারবে এ বিনয়ের কথা। যেমন তেমন করে কাটিয়ে দেবার মত জীবন তাঁর নয়। এ ক'বছরে অনেক টাকা তিনি কামিয়েছেন।

একটু থেমে বললেন—ফুলচাঁদকে তুমি দেখেছ?

বললাম—দেখেছি—

—তার মতন অতো বড়লোক, যে এক-কথায় দশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে সে-ও যখন প্রথমে ওই লাবণ্যর জন্যে আটশো টাকা খরচ করবে বলেছিল, আমি রাজী হইনি—আমি যত বড় ব্যবসাদার মেয়েমানুষই হই না কেন, এককালে তো আমিও ঘরের বউ ছিলাম, রোজ সকালে স্নান করে তুলসীতলায় জল দিয়ে আমিও তো প্রণাম করেছি—আমিও তো ছেলেমেয়ের মা ছিলাম—আজ না হয় তোমরা আমায় দেখছ অন্যরকম, এখন পাকা চুলে কলপ মাখি, তোবড়ানো গালে রুজ মাখি—

হঠাৎ মিসেস চৌধুরীর মুখে এ-কথা শুনে কেমন যেন অবাক লাগলো।

বললেন যাকগে, এসব কথা—আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে তুমি আমার ওখানে চলো—সব গল্পটা তোমায় বলবো—

—এখন? এত রাত্রে?

—তাতে কী হয়েছে?

শেষ পর্যন্ত সে-রাত্রে আমি অবশ্য মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাইনি। অনেক রাত পর্যন্ত মিসেস চৌধুরীই সমস্ত গল্পটা আমায় বলেছিলেন। গল্প যখন শেষ হলো তখন রাত প্রায় তিনটে।

চলে যাবার সময় আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলেন—লক্ষ্মীটি, এটা তোমায় লিখতেই হবে—তবে ওই শেষকালটা শুধু বদলে দিও—যেমনভাবে বললাম ওইভাবে শেষ করো—কেমন?

তারপর ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে বলেছিলেন—তাহলে কাল বিকেলবেলা আমার ওখানে যাচ্ছো তো?

পরের দিন ঠিক সময়ে গিয়েছিলাম মিসেস চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু দেখা তাঁর পাইনি। দরজায় তালা দেওয়া। শুনেছিলাম—মিসেস চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কোথায়, কেউ জানে না।

তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয়নি। অনেক গল্পের সূচনায়—যখন কী নিয়ে লিখবো ভেবেছি তখন মিসেস চৌধুরীর গল্পটার কথাও মনে হয়েছে বার বার। মনে হয়েছে—নিরঞ্জন আর লাবণ্যর গল্পটা লিখেই ফেলি। যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন তেমনি করেই না হয় শেষ করি। মিসেস চৌধুরী যেখানেই থাকুন এ গল্প তাঁর হাতে পড়তেও পারে। একদিন আমাকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন—সে স্নেহ সে ভালবাসার কিছুটা অন্তত তা হলে পরিশোধ হয়।

কিন্তু মন সায় দেয়নি।

ট্রামে বাসে সিনেমায় সংসারে সর্বত্র লাবণ্যকে খুঁজে ফিরেছে আমার মন। সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গীর ধারে গালে সস্তা আর আলতা মাখা ঠোঁট দেখে অনেকবার চমকে উঠেছি। ভেবেছি—এই-ই বোধহয় মিসেস চৌধুরীর লাবণ্য! লাবণ্যর জীবন হয়তো এইখানে এসেই থেমেছে। আবার কখনও কোনও নতুন পরিচিত পরিবারের শান্ত সান্ধ্য পরিবেষ্টনীতে পুত্রকন্যার আনন্দ পরিবেশে গৃহিনীর দিকে চেয়ে চোখ আমার অপলক হয়ে গেছে—এই-ই কি লাবণ্য? হয়ত নিরঞ্জনের উদার প্রেমের প্রাচুর্যে সে লাবণ্য এখন মহীয়সী হয়ে উঠেছে! কিন্তু তবু আমার অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা মেটেনি কোথাও। মিসেস চৌধুরীর কল্পিত পরিণতির সঙ্গে, লাবণ্যর বাস্তব জীবনের পরিণতির যেন কোথাও অসঙ্গতি ছিল। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কোনদিন তার কোনও সমাধান খুঁজে পাইনি।

তা নিরঞ্জনের মত পুরুষকে তো আজো দেখি সকালবেলা বাসে চড়ে আফিসে যেত। টেনেবুনে একশো টাকাই না হয় মাইনে পাক। টুইলের শার্ট আর মিলের কাপড়। এককথায় মোটা ভাত আর মোটা কাপড়। একটা পেট—একশো টাকায় একরকম চলে যায় বৈকি। আর লাবণ্য?

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—লাবণ্যও ছিল ওই নিরঞ্জনের মতো সাধাসিধে—পঞ্চাশ টাকা মাইনে আর পঞ্চাশ টাকা ডিয়ারনেস—

তা সত্যি! আমিও ভাবি, ও মাইনেতে ওর চেয়ে বিলাসিতা কী করে যায়। বিশেষ করে মেসের খরচ, বাস ভাড়া, টিফিন, তারপর দু-একদিন কি সিনেমাতেও যেত না?

মিসেস চৌধুরী বললেন—লাবণ্য রোগা হলে কি হবে ওর গালের তিলটার জন্যে সকলের ওকেই খুব পছন্দ হতো—তা লাবণ্যকে আমি কল্পনা করে নিতে পারি বৈকি। মিসেস চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে অনেক সময় ট্রামের মেয়েদের মিলিয়েও নিই। যেন মনে হয়—এক লাবণ্য আজ একশ লাবণ্য হয়ে সারা কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ের ওপর একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে একসঙ্গে যেতে দেখলে কেমন যেন মনে হয়—ওরা সেই নিরঞ্জন আর লাবণ্য। অফিসের ছুটির পর ওরা আজ চলেছে মিসেস চৌধুরীর ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের বাড়িটার দিকে। মাসের প্রথম দিক। পাঁচ টাকা দিয়ে এক ঘণ্টার জন্যে একটা ঘর ভাড়া করে ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসবে—ঘনিষ্ঠ হবে—একান্ত হবে—!

এক একদিন পেছন পেছন অনুসরণও করেছি ওদের। তবে কি মিসেস চৌধুরী আবার ব্যবসা শুরু করেছেন। সেই আগেকার মতন। সাহেব, মেম, মোটর, দোকান-পসার পেরিয়ে সামনের নিরঞ্জন আর লাবণ্য পাশাপাশি চলেছে। গায়ে টুইলের শার্ট। পায়ে মোটা কাবলি জুতো। পাশে গিয়ে দেখা যায়—নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছে আজ। আর তারই পাশে লাবণ্য। নতুন কেনা স্কার্ট শাড়িটা পরেছে আজ। কানের একটা দুল কেনবার পয়সাও নেই ওর। গলায় পরেছে ঝুটো মুক্তোর নেকলেস। একটু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পাশ থেকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। রাস্তার জনস্রোতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে না ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। ওদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে—ভালো করে দেখা চাই। মিসেস চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে আজো এদের কোনও অমিল নেই যেন। লাবণ্যর পায়ের চটিটার পর্যন্ত যেন কোনও পরিবর্তন হয়নি। এত বছর পরেও কি সেই চটিটাই পরছে। নিরঞ্জনও কি দশ বছর আগের সেই টুইলের শার্টটাও বদলায়নি আজ পর্যন্ত।

সেই বিকেলের আলো-ছায়ার মধ্যে জনবহুল রাস্তার স্রোতে মিসেস চৌধুরীর কাছে শোনা নিরঞ্জন আর লাবণ্য যেন আবার রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে হাজির হলো আমার সামনে।

নিরঞ্জন বলছে—এ শাড়িটা পরে তোমায় খুব ভালো দেখাচ্ছে কিন্তু—

—কত দাম নিলে এর?

আরো পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুনতে লাগলাম ওদের কথা।

নিরঞ্জন বলছে—দাম এখনও দিইনি, চেনা-শোনা দোকান—মাসে মাসে দু' টাকা করে দিলেই চলবে।

লাবণ্য বললে—কিন্তু কেন কিনতে গেলে শাড়িটা, তোমার জুতোটা তো বহুদিন ধরে ছিঁড়ে গেছে—জুতো এক-জোড়া কিনলে হত তোমার—

নিরঞ্জন বলে—আসছে মাসে চাকরিটা পাকা হলে কিনবো—তার আগে নয়—

লাবণ্য বলে—কিন্তু এখন থেকে কিছু টাকা তো জমানোও আমাদের দরকার—তা' না হলে আর কতদিন মিসেস চৌধুরীর ঘর ভাড়া নিয়ে চলবে—গত মাসে দু'দিনের ভাড়া এখনও বাকি আছে যে।

নিরঞ্জনের মুখটা দেখতে পাই এবার ভালো করে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের ভবিষ্যৎহীন দিন-যাপনের ক্লান্তির ফাঁকে ফাঁকে যেন কোথাও এক টুকরো আশা উঁকি মারে। লাবণ্য আর সে বাড়ি ভাড়া করবে একটা। একটা স্বাধীন দু'ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট। তিরিশ কিংবা চল্লিশ এমন কি পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবে। তারপর যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন সুদিন আসে, সেদিন...

নিরঞ্জন চলতে চলতে হঠাৎ বললে—একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েছি—জানো—

লাবণ্য চমকে ওঠে—কত ভাড়া?
—ভাড়া বেশি নয়, পঞ্চাশ—কিন্তু—

—সেলামী চায় বুঝি?

সেলামী ছাড়া বাড়ি পাওয়া কি সম্ভব নয়? চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়। চেষ্টা কি আর নিরঞ্জন কম করেছে? আজ দু'বছর ধরে পরিচয় হয়েছে।

অনেক দিন থেকেই চেষ্টা চলেছে। একটা বাড়ি পেলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে এমন করে আর মিসেস চৌধুরীর ঘর ভাড়ার জন্যে টাকা নষ্ট করতে হয় না। মাসে এখানে চারদিনই এলেই তো চার পাঁচে কুড়ি টাকা চলে গেল। এক-এক মাসে পাঁচদিন ছ'দিনও এসেছে। তবে মিসেস চৌধুরী লোক ভালো। ব্যবহার ভালো তাঁর। হাতে নগদ টাকা না থাকলে বাকিতেও চলে। তা' ছাড়া ক' ঘণ্টাই বা থাকে তারা। বাস-ট্রাম বন্ধ হবার আগেই বেরিয়ে আসতে হয়। তারপর আবার কতদিন পরে দেখা হবে! চলতে চলতে লাবণ্যর হাতটা ধরে নিরঞ্জন।

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমিও যেন এগিয়ে চলি। হঠাৎ মানুষের ভিড় আর দোকানপত্রের সার পেরিয়ে কখন নিরঞ্জন আর লাবণ্য কোথায় হারিয়ে যায়।

একলা একলা মিসেস চৌধুরীর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। হঠাৎ যেন স্বপ্নও ভেঙে যায়! সেই পরিচিত বাড়িটার সামনের ঘরে একদল সাহেব মেম সেজেগুজে বসে আছে, ভেতর থেকে পিয়ানোর শব্দ আসছে। মিসেস চৌধুরীর বাড়ির সেই নেপালী দরোয়ানটা আর সেলাম করলে না আগেকার মত।

মিসেস চৌধুরী বলতেন—টালীগঞ্জ থেকে বাসন্তী আসতো, চেতলা থেকে আসতো কল্যাণী, বেহালা থেকে আসতো টগর—কিন্তু এক-একদিন এক-একজনের সঙ্গে—চৌরঙ্গীর রাস্তা থেকে ধাকে পেত ধরে আনতো—কিন্তু লাবণ্য? বরাবর নিরঞ্জনকে দেখেছি সঙ্গে—নিরঞ্জনের যখন চাকরি ছিল না, ও-ই লাবণ্যই তিন মাস মেসের খরচ জুগিয়েছে ওর।

ঘর-ভাড়া হয়ত শহরে আরো অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এমন রুচি আর শালীনতা পাবে না। বাইরে থেকে বোঝবার কিছু উপায় নেই। সামনে অর্কিড আর মর্নিং গ্লোরি দিয়ে ঘেরা। পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চলে যাও ভেতরে। কোণাকোণি তিনটে ঘর। পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতর যেতে হবে। একটা ঘরে ইংলিশ খাট, একটা ড্রেসিং আয়না আর দুটো চেয়ার—আসবাব বলতে এই। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। ব্যবস্থা পুরোদস্তুর বিলিতি। এখানে টাকা খরচ করেও তো আরাম।

মনে আছে হঠাৎ মিসেস চৌধুরী তাস খেলতে খেলতে উঠে পড়লেন একদিন। জর্জেটটা সামলে নিয়ে বললেন—দেখি, ওদিকে গোলমাল কিসের—আমার তাস দিয়ো না ভাই—

বাইরে থেকে যেন খানিকটা বচসার শব্দ কানে এল।

তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে ডেকে উঠল মিসেস চৌধুরীর...অ্যালসেসিয়ানটা।

খানিক পরে মিসেস চৌধুরী ঘরে ঢুকে পাখার রেগুলেটারটা বাড়িয়ে দিলেন। বললাম ব্যাপার কী?

—আর বলো কেন, শেঠজি এসেছিল। ফুলচাঁদ শেঠ। মদে চুর একেবারে—একদিন বারণ করে দিয়েছি—তবু—

নির্বিকারভাবে আবার তাস খেলতে লাগলেন—নো বিড্—থ্রি ডায়মণ্ডস—

সেদিন অনেকদিন পরে সেই ফুলচাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, লম্বাচওড়া একটা মোটর হঠাৎ সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। দেখি ফুলচাঁদ। কে বলবে চল্লিশ বছর বয়েস। নিজেই ড্রাইভ করছে।

মুখ বাড়িয়ে হেসে বললেন—কী খবর স্যার? আমিও আশা করেছিলাম কিছু খবর পাবো। কিন্তু ফুলচাঁদই প্রশ্ন করলে—মিসেস চৌধুরীর খবর কিছু জানেন স্যার?

ফুলচাঁদ শেঠের ভাবনা নেই। হয় এ-পাড়ায় নয় ও পাড়ায়—যেখানে হোক আড্ডা ও খুঁজে নেবেই। মিসেস চৌধুরী না থাক—মিসেস সরকার আছে। নার্সিং হোম আছে। কত কী আছে কলকাতা শহরে। ছোকরা বয়েস। দিন-দিন যেন বয়েস কমছে ফুলচাঁদের। তিনটে আসল আর দুটো ভেজাল ভেজিটেবল ঘি-এর কারবার। গাড়িটা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সেদিনই সত্যি সত্যি বসলাম কলমটা নিয়ে। এবার লিখতেই হবে। মিসেস চৌধুরী যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সেইভাবেই শেষ করব না-হয়।

প্রথমেই লিখলাম—নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে সাপ্লাই অফিসের একতলার সিঁড়ির সামনে। লাবণ্যর অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। একে একে নামতে শুরু করেছে সবাই।

লাবণ্যও চমকে উঠেছে কম না। বললে—একি, তুমি?

নিরঞ্জন বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ তো কথা ছিল না তোমার আসবার—

—তা হোক, তবু এলাম—মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাবো—আজ বড় যেতে ইচ্ছে করছে—

—কিন্তু টাকা? টাকা এনেছ? আমার তো হাত খালি, শুধু বাস ভাড়াটা—

—সে একরকম বলেকয়ে ব্যবস্থা করা যাবে, আজ যেতেই হবে তোমায়—জানো লাবণ্য, আমার চাকরিটা চলে গেছে—

—সে কী?

মিসেস চৌধুরী শুনেছেন সে-সব কথা। তিনি জানতেন লাবণ্যর সে কৃচ্ছ্র-সাধনের ইতিহাস। ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া বন্ধ হলো লাবণ্যর সেইদিন থেকে। শুরু হলো সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে চড়া। টিফিন বন্ধ এক-একদিন নিজের জলখাবারটা রুমালে করে বেঁধে নিয়ে ভাগ করে খেয়েছে মিসেস চৌধুরীর ঘরে দরজা বন্ধ করে। চুলে তেল পড়তে লাগল এক-দিন অন্তর। স্নো ফুরিয়ে গেলে আর কেনা হলো না।

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—ওদের জন্যে দিলাম কনসেসন করে—আমার ঘরের ভাড়ার রেট পাঁচ টাকা বরাবর—ওদের জন্য ঠিক হলো তিন টাকা—তা-ও সব সময় নগদ দিতে পারত না—বাকি পড়ত—

কিন্তু ওদিকে টালিগঞ্জের বাসন্তীর তখন গায়ে ঢাকাই শাড়ি উঠেছে। চেতলার কল্যাণী নতুন একছড়া হার গড়ালো। বেহালার টগরও ব্রঞ্জের চুড়ি ভেঙে গিনি সোনার কঙ্কন গড়িয়েছে। বাজার গরম বেশ।

সে-বাজারে মিসেস চৌধুরীই বা ছাড়বেন কেন? ঘর ভাড়া পাঁচ টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা হলো। তাতেও খালি পড়ে থাকে না। খদ্দের এসে ফিরে যায় বাইরে থেকে। মিসেস চৌধুরীর টেলিফোন সারা-দিনরাত এনগেজড্ থাকে।

মনে আছে একদিন খুব ভয় পেয়ে-ছিলাম, আমি। দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া করে মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে—নতুন বইটা ওকে এক কপি উপহার দেবো। তারপর ও'রই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাবো জায়গায় জায়গায়। মিসেস চৌধুরী সাহিত্যিক না হোন, সাহিত্য-রসিক। ও'কে বই দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতাম। কিন্তু দূর থেকে দেখি, বাড়ির সামনে ভীষণ ভিড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ফুটপাথের ওপর লোক জমা হয়েছে। কয়েকটা পুলিশও সেখানে দাঁড়িয়ে। মনে হলো—নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল, কোনও কেলেঙ্কারী বেধেছে। এবারে মিসেস চৌধুরীর আর নিস্তার নেই। আমাদের আড্ডা ভাঙলো বুঝি।

যাবো কি যাবো না ভাবছি। শেষকালে আমরাও কি জড়িয়ে পড়বো। কথাটা ভাবতেই কেমন লজ্জা হলো। ছি-ছি! আমরা কি বিপদের দিনে ও'কে এমনি করেই ফেলে পালাবো! সেইদিন সত্যি প্রথম উপলব্ধি হলো—মিসেস চৌধুরী কতখানি একলা। পৃথিবীতে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার পর সারাজীবন একজন অভি-ভাবকের প্রয়োজন কেন এত অপরিহার্য।

মিসেস চৌধুরী, আপনি যেখানেই থাকুন, আজ অকপটে স্বীকার করছি—সেদিন আপনার জন্যে আমার মায়া হয়েছিল সত্যি!

যাক্ সে কথা। আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি বলেছিলাম—আজ বড় ভয় পেয়েছিলাম—আপনি তখন সালোয়ার পায়জামা পরে কোচে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করছিলেন—কেন?

কিন্তু উদ্বেগের লেশমাত্র ছায়াও আপনার মুখে ছিল না।

আমি বললাম—বাড়ির সামনে ভিড় দেখে ভাবলাম বুঝি পুলিশের হাঙ্গাম, কিন্তু—

পুলিশের নাম শুনে আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার কোচে হেলান দিয়ে-ছিলেন। বলেছিলেন—কিন্তু কী?

—কিন্তু দেখলাম ফুটপাথের ওপর বাঁদর নাচ হচ্ছে—আপনি হেসে বলেছিলেন—না, সে সব ভয় নেই, পুলিশ আমার কিছু করবে না—তবে ভয় ফুলচাঁদকে নিয়ে—

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন, ফুলচাঁদ আপনার কী করতে পারে?

আপনি বলেছিলেন—না, আমায় আর সে কী করবে? ফুলচাঁদ আমার চেয়ে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার টিকি বাঁধা—কিন্তু ভয় অন্য ব্যাপারে—

—অন্য কী ব্যাপারে?

—ভয় লাবণ্যর জন্যে—বলে আপনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আমি জিজ্ঞেস করিনি—কে লাবণ্য। কী তার পরিচয়!

আপনার হয়ত মনে নেই আপনি নিজের মনেই যেন বলেছিলেন—লাবণ্যকে ফুলচাঁদ বহুদিন থেকে চাইছে দু'শো পর্যন্ত খরচ করতে রাজী—আমিই রাজী হইনি—শেষে কোন্ দিন না—

মনে আছে এবারে আমি জিজ্ঞেস করে-ছিলাম—লাবণ্য কে?

আপনি সে প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনি তেমনি কোচে হেলান দিয়েই বলে-ছিলেন—ফুলচাঁদ যদি বাসন্তীকে চাইতো আপত্তি করতাম না—কল্যাণীকে চাইলেও চলতো—টগরের বেলাতেও কিছু বলবার ছিল না—আমি আধঘণ্টার মধ্যে টেলিফোনে আনিয়ে নিতাম—কিন্তু তা বলে লাবণ্য? ছি-ছি—

লাবণ্যকে আপনি কেন অতখানি সম্মান করতেন তা সেদিন কিছুটা যেন বুঝে-ছিলাম, আর কিছুটা যেন বুঝতে চেষ্টাই করিনি। সেদিন মিসেস চৌধুরীই কি জানতেন, তাঁর লাবণ্যকে নিয়ে গল্প লেখানোর জন্যে একদিন রাত বারোটায় সময় আমার বাড়িতেই আসতে হবে!

হয়ত মিসেস চৌধুরী নিজের জীবনে যা হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পেয়েছিলেন লাবণ্যর মধ্যে। হয়ত সেইজন্যেই ফুল-চাঁদের হাতে লাবণ্যকে তুলে দিয়ে নিজেকেই অপমান করতে চাননি! কে জানে!

তাই ফুলচাঁদের প্রস্তাবের উত্তরে মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—দু'শো কেন পাঁচশো টাকা দিলেও লাবণ্যকে পাবে না—ওর দিকে তুমি নজর দিও না ফুলচাঁদ—

কিন্তু ফুলচাঁদকে আপনি চিনতে পারেন নি। ফুলচাঁদ শেঠ জাত ব্যবসাদার। সাত পুরুষের ব্যবসাদার। কখন কিনতে হবে, কখন বেচতে হবে—তা সে জানে। সেও তাই ধাপে ধাপে উঠেছে। পাঁচশো'তে রাজি না হয় সাতশো। সাতশো'তে রাজি না হয় আটশো—আটশো'তে রাজি না হয়—

আজো যেন চেষ্টা করলে দেখতে পারি—দেখতে পারি—তেতলায় থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে নিরঞ্জন! পাশে লাবণ্য!

লাবণ্য যেন খুশীতে উজ্জ্বল—। বললে—দেখেছ, একটু মাটি নেই কোথাও বাড়িটাতে—

নিরঞ্জন বুঝতে পারলে না। বললে—কেন, মাটি দিয়ে কী হবে?

—একটা তুলসী গাছ প‍ুঁততাম—হিন্দ‍ু গেরস্থের বাড়িতে তুলসী গাছ রাখতে হয় যে—

নিরঞ্জন বললে—তা সে একটা টবে প‍ুঁতলেই চলবে—এই রান্নাঘরের পাশে—

—কিন্তু শোবার ঘর কোন্‌টা করবে?

—দক্ষিণের ঘরটাই তো ভালো সবচেয়ে। জানলা খ‍ুললে আকাশ দেখা যায়—

—একটা খাট কিন্তু কিনতে হবে আমাদের—

নিরঞ্জন হেসে উঠলো—সব‍ুর করো, সবে তো চাকরি হলো—আস্তে আস্তে হবে সব—আগে বাড়িটাই হোক—

বাড়ির মালিক বললেন—আমার এক কথা—ভাড়া চল্লিশ টাকা— যা সবাই দিচ্ছে আপনারাও তাই দেবেন—কিন্তু—

কিন্তু কী?

মালিক এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন, ব্যবসায় আমার অনেক লোকসান গেছে এদানি—এখন ওই বাড়ি ভাড়াতেই সংসার চলছে একরকম, তা সেলামী কিছ‍ু দিতে হবে আপনাদের—

নিরঞ্জন দমে গেল। লাবণ্যও ফিরে আসছিল। এমন ঘটনা প্রথম নয়। আগে জানতে পারলে—

তব‍ু নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে—কত?

যেন কম-সম হ‍লে দিতে তৈরী সে।

মালিক বললেন—বেশি না, আর সব টেনেণ্ট যা দিয়েছেন, তাই দেবেন—তার এক পয়সা বেশি নেব না—আমার কাছে সবাই সমান—

সাম্যবাদীর মতন পরম নিস্পৃহ ভঙ্গী করলেন তিনি।

—তব‍ু কত?

—প‍ুরোপ‍ুরিই দেবেন—ভাঙা-ভাঙতি ভালোবাসি না আমি—

তব‍ু দ‍ুর্বোধ্য হচ্ছেন দেখে দয়া করে খ‍ুলে বললেন—হাজারের কম আমি নিইনে—

ফ‍ুলচাঁদও সেদিন সেই কথাই বললে—আটশো'তে রাজি না হয় হাজার—

সংখ্যাটা প‍ুরোপ‍ুরি হলে যেন অন্য-রকম শোনায়। কিন্তু নিজের কানকে আপনি বোধহয় বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন মিসেস চৌধ‍ুরী। তাই হয়ত দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেন নি। তব‍ু কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে দেখা গেল না। আপনি তেমনি নির্বিকারভাবে টফি চুষতে লাগলেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই কি লাবণ্য আর নিরঞ্জনকে সামনে দিয়ে যেতে হয়! রাত তখন সাড়ে ন'টা। চটি ফটাস্-ফটাস্ করতে করতে চলেছে লাবণ্য। সারাদিন অফিসের খাটনির পর বাড়ি ফিরতে পারলে সে বাঁচে। আপনার মনে হলো—ও তো লাবণ্য নয়, আপনার ভাষাতেই বলি—আপনার বিগত জীবন, আপনার পরিশ‍ুদ্ধ আত্মা আপনাকে ব্যঙ্গ করে আপনার দিকেই পেছন ফিরে যেন চলে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবে না কোনওদিন।

আপনি সেখানে বসেই নেপালী দরোয়ানকে ডাকলেন—জঙ্গী।

জঙ্গী তিন লাফে এসে য়্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে স্যালিউট করার পর আপনি বললেন—লাবণ্যকে ডেকে দে তো—

লাবণ্য এল।

আপনি আপনার আত্মার ম‍ুখোম‍ুখি হয়ে দাঁড়ালেন। এবং সেই বোধ হয় প্রথম আর শেষবার।

তারপর তাকে আড়ালে নিয়ে এসে ফ‍ুলচাঁদের প্রস্তাবটা জানালেন। আপনার মনে হলো প‍ৃথিবীর প্রচ্ছদপটে আজ পর্যন্ত যত মান‍ুষের পদছায়া পড়েছে, সেই কোটি কোটি সংখ্যাহীন জনসম‍ুদ্রের তরঙ্গ যদি আবার উদ্বেলিত হয় তা হোক। নক্ষত্রহীন আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক আবার কক্ষচ্যুত কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যদি দিগ‍্ভ্রান্ত হয় তা হোক। তব‍ু আপনার আত্মা অচল অটল থাকবে!

লাবণ্য কিন্তু সমস্ত শ‍ুনে মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর যেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে—ওকে একবার জিজ্ঞেস করি মাসিমা—

মর্নিং গ্লোরির আড়ালে অন্ধকারে একলা অপেক্ষা করছিল নিরঞ্জন। লাবণ্য সেখানে গেল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কী যেন পরামর্শ হলো দ‍ুজনে। দ‍ূরে থেকে কিছ‍ু শোনা গেল না। তব‍ু আভাসে বোঝা গেল—একজন ব‍ুঝি বোঝাতে চাইছে আর একজন যেন কিছ‍ুতেই ব‍ুঝতে চাইছে না।

এক সময়ে লাবণ্য এল। আপনার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে—আমি রাজি—

কথাটা বোধহয় লাবণ্য একট‍ু আস্তেই বলেছিল, কিন্তু আপনি দেখতে পেলেন—ঘরের ভেতর ফ‍ুলচাঁদ সে কথা শ‍ুনে নতুন ধরানো সিগ্রেটটা ছ‍ুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আর—আপনি যে আপনি—আপনারও মনে হলো বারান্দায় চেইনে বাঁধা অ্যালসেসিয়ানটা যেন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো।

বললাম—তারপর?

মিসেস চৌধ‍ুরীর পাকা চুলের খোঁপাটা আবার একবার খ‍ুলে গেল। এবার সেটাকে আর সামলাবার চেষ্টা করলেন না। বললেন—তারপর? সেই প্রথম, সেই শেষ। আর আসেনি তারা আমার বাড়িতে—ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের লোকেরা আর কোনওদিন সে রাস্তায় হাঁটতে দেখেনি নিরঞ্জন আর লাবণ্যকে। জিজ্ঞেস করলাম—তবে কোথায় গেল তারা—

মিসেস চৌধ‍ুরী বললেন—আমিও তাই ভাবতুম—কোথায় গেল তারা। মনে হতো—সেও বোধহয় অন্য মেয়েদের পর্যায়ে নেমে এসেছে—টালিগঞ্জের বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করেছি, চেতলার কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করেছি—বেহালার টগরকে জিজ্ঞেস করেছি—তারা এখনও আসে কিন্তু বলতে পারে না কোথায় গেছে তারা—এমন কি ফ‍ুলচাঁদও না—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে হয়ত ওই ঘটনার পর নিরঞ্জন ত্যাগ করেছে তাকে—

—তাও ভেবেছি অনেকবার। হয়ত অবিশ্বাসে ম‍ুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিরঞ্জন—আর ওদিকে আত্মধিক্কারে হয়ত আত্মহত্যা করেছে লাবণ্য।

নিজের আত্মাকে আমি নিজের হাতে ট‍ুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পেরেছি জেনে মনে মনে খ‍ুব খ‍ুশীই হয়েছিলাম—সত্যি বলছি—খ‍ুবই খ‍ুশী হয়েছিলাম। মিস্টার চৌধ‍ুরী যেদিন বিয়ের পর আমার স‍ুটকেসের মধ্যে একটা প্রেমপত্র আবিষ্কার করে আমায় ত্যাগ করেছিলেন, তারপর জীবনে এই প্রথম এমন খ‍ুশী হতে পারা—সে যে কী আনন্দ। সে আনন্দে সেদিন বিকেলবেলা ঘ‍ুম থেকে উঠে তিন কাপের বদলে তিন—ত্রিক্কে—ন' কাপ চা-ই খেয়ে ফেললাম—

মিসেস চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি কথা বলছেন আর চোখ বেয়ে জল পড়ে তাঁর গালের রুজ ঠোঁটের লিপস্টিক চোখের সুর্মা সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা তাঁর আগে কখনও দেখিনি। কী যে করবো বুঝতে পারলাম না।

তারপর মিসেস চৌধুরী হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার করলেন।

আমার দিকে সেখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—তার পর এতদিন পরে আজ সকালবেলা এই চিঠি—চিঠি পড়ে আমি তো অবাক—

দেখলাম নিরঞ্জন আর লাবণ্যর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। পনেরোর সি কালী সরকার রোড, তেরো নম্বর সার্ট, আজকের তারিখ।

আমি মিসেস চৌধুরীর দিকে নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে চাইতেই তিনি বললেন—এখন সেখান থেকেই আসছি—

বললাম—কী দেখলেন?

—দেখলাম বিয়েতে যেমন হয় তেমনিই, লাবণ্য সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে চন্দনের ফোঁটা। নিরঞ্জনের গায়েও গরদের পাঞ্জাবী, মাথায় টোপর। হঠাৎ কোথা থেকে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে পড়েছে, এতদিন কোথায় ছিল তারা সব কে জানে! আজ হঠাৎ ওদের শুভাকাঙ্ক্ষীর আর আশীর্বাদকের অভাব নেই। বাড়িটাও ভালো, রান্নাঘরের পাশে একটা টবে তুলসী গাছ প্রতিষ্ঠা করেছে, শোবার ঘরে একটা খাট, দক্ষিণ দিকের জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়—আয়োজনও করেছে প্রচুর—কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম—ফুল-চাঁদের স্পর্শের কলঙ্ক কোথাও নেই এতটুকু—চন্দনের ফোঁটায় সব ঢেকে গেছে—কিন্তু আমার যেন কিছু ভালো লাগলো না—আমি জলস্পর্শ না করে সোজা চলে এলাম বাইরে, তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সমস্ত কলকাতাটা টো টো করে ঘুরে এখন এই রাত বারোটার সময় তোমার এখানে—

গল্প বলতে বলতে মিসেস চৌধুরী কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলেন। মনে হলো এখনি যেন তিনি নিবে যাবেন—

বললাম—তা হোক, তবু নিরঞ্জনের উদারতা আছে বলতে হবে—

মিসেস চৌধুরী দপ্ করে উঠলেন—তা থাকগে উদারতা, কিন্তু গল্পে তুমি ওদের বিয়ে দিতে পারবে না—শেষটুকু তোমায় বদলাতেই হবে—

কেন?

মিসেস চৌধুরী দম নিয়ে বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, আগাগোড়া সব ঠিক রেখে শেষকালটাতে বদলে দেবে—বিয়ে ওদের কিছুতেই দিতে পারবে না তোমার গল্পে—ওর আত্মায় ঘুন ধরেছে যে—আমি মিসেস চৌধুরী তার সাক্ষী—

বললাম—কিন্তু আত্মা তো মরে না—

—নিশ্চয় মরে, আলবৎ মরে, আমার আত্মা মরেছে—লাবণ্য মরেছে—বাসন্তী, কল্যাণী, টগর, সকলের মরেছে—আর তা ছাড়া যদি বিয়ে দিতেই হয় তো দু'দিন বাদেই ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিও—তারপর ধাপে ধাপে, লাবণ্যকে কল্যাণী, বাসন্তী আর টগরের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে, আর তারপর একদিন জীবনের শেষ অঙ্কে দেখাবে—লাবণ্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে আমার মতন...... পারবে না করতে? লক্ষ্মীটি, শেষটুকু ট্র্যাজেডি করে দিও—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন?

—ধরে নাও আমার শখ—আর কিছু নয়, একদিন আমাকে যদি তুমি ভালবেসে থাকো, আমিও যদি তোমার কোনদিন কোনও উপকারে এসে থাকি তো আমার এ অনুরোধটা রেখো ভাই—আর তা ছাড়া "অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর"— কথাটা মানো তো?

অতীতের সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে আর লাভ নেই আজ। তবু বলতে পারি, দশ বছর ধরে এ গল্পটা লেখার জন্যে আমার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। বন্ধু বান্ধবদের কাছে কতবার গল্প করেছি—কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু মানুষের সংসারে চোখের সামনে জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধের এত পরিবর্তন দেখেছি, এত অভাবনীয় বিস্ময়ের পরি-সমাপ্তি ঘটেছে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে যে, তা বলা যায় না। তবু সাহিত্যের কারবারে এসে দেখছি আজো জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণাই থাক, সাহিত্যে আমরা আজো তো ফরমুলা মেনেই চলি। তাই সধবা কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত পাগল করতে হয়—বিধবা রমাকে কাশী পাঠাতে হয় আমাদের। তাই—বিশ্বাস করুন মিসেস চৌধুরী—তাই আপনার অনুরোধ মতই গল্পটা শেষ করবো ভেবেছিলাম। লাবণ্যকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়ে দিতে পারলে আমিও আপনার মতই খুশী হতাম। তাতে গল্পটা 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর' এই সাধারণ প্রবাদবাক্যটারও একটা উদাহরণ স্থল হয়ে থাকতো। জীবনে না হোক—সাহিত্যে অন্তত তাই-ই ঘটে।

সেই জন্যেই তো বলেছিলাম যে, এ গল্পটা না লিখতে হলেই আমি খুশী হতাম!

কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস চৌধুরী, আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুরোধটা রাখতে পারলাম না।

কেন পারলাম না—তারও একটা কারণ আছে বৈকি। সেই কারণটাই বলি। লজ্জায়, ঘৃণায়, ধিক্কারে আমার মাথা নিচু হয়ে এলেও আমাকে তা বলতেই হবে!

সেদিন কলকাতার বাইরে সি-পি-র একটা কোলিয়ারী অঞ্চলে যেতে হয়েছিলো আমাকে। একটা লাইব্রেরীর উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতি পদের ভার নিয়ে। সভা হলো।

সভার শেষ ভীড় পাতলা হবার পর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল ওয়েল ফেয়ার অফিসার মিস্টার মজুমদারের বাড়ি।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভারি অতিথি-পরায়ণ। ছোট্ট বাঙলো। চারিদিকে বাগান করেছেন। ঘরটাও বেশ সাজানো। বেশ বোঝা গেল—গৃহের সর্বত্র গৃহিণীর একটি সুনিপুণ কল্যাণ হস্তের স্পর্শ লেগে আছে। চা পরিবেশন করতে লাগলেন মিসেস মজুমদার।

মিস্টার মজুমদার বললেন—মিসেস মজুমদার আপনার একজন ভক্ত, জানেন না বোধ হয়—ওই দেখুন আপনার সব ক'টা বই-ই কিনেছেন—

মিসেস মজুমদার সলজ্জভাবে হাসতে লাগলেন। সত্যিই পাশের আলমারিতে অন্যান্য বই-এর সঙ্গে আমার বই ক'টা রয়েছে দেখে নিয়েছি। আগেই।

মিস্টার মজুমদার আবার বললেন—এখানকার মহিলা সমিতিটা ও'রই তৈরী—আর আজকে যে লাইব্রেরীর উদ্বোধন হলো এ-ও ও'র চেষ্টায় বলতে পারেন—সভাপতি হিসেবে আপনার নাম তো উনিই প্রথম সাজেস্ট করেন।

নিজের প্রশংসায় মিসেস মজুমদার যেন বড় লজ্জিত হচ্ছেন বলে মনে হলো।

হয়ত তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পড়লো। হঠাৎ চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো একটি পাঁচ ছ বছরের ছেলে। সুন্দর দেহশ্রী। ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। সভায় এই ছেলেটিই আমার গলায় মালা পরিয়েছিল। ছেলেটি ঘরে ঢুকে মা'র কোলের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। বললাম এটি আপনার ছেলে বুঝি—কী নাম তোমার খোকা?

কাছে ডাকলাম তাকে।

ছেলেটি বিশুদ্ধ বাঙলায় বললে—নীলাব্জ মজুমদার—নীলাব্জ! বড় সুন্দর নাম দিয়েছেন তো—মিস্টার মজুমদার এবারো স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হেসে বললেন—এ নামও ও'রই দেওয়া, ও নাম দেওয়ার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে জানেন, আমাদের দু'জনের নামের প্রথম দুটো অক্ষর নিয়ে—ওর নাম হয়েছে নীলাব্জ—

ওদের দু'জনের নাম জিজ্ঞেস করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে কিনা ভাবছি।

মিস্টার মজুমদার নিজেই আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন—আমার নাম নিরঞ্জন, আর ও'র নাম লাবণ্য কিনা—তাই থেকে নীলাব্জ—কিন্তু আপনি আর একটি সিঙাড়া নিন—কি আর একটা সন্দেশ......

আমি কিন্তু ততক্ষণ নির্বাক হয়ে দেখছি।

দেখছি মিসেস মজুমদারকে, এতক্ষণ তো নজরে পড়েনি। তাঁর চিবুকের ওপরে ডান দিকে একটা কালো তিল জ্বলজ্বল করছে।

বিমল মিত্র

চিত্রা সেনগুপ্ত

অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত বাংলা সাহিত্যের আকাশে শ্রীবিমল মিত্রও নিঃসন্দেহে একটি প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র। আজকের বাংলা সাহিত্যের পাঠকের হৃদয়ে শ্রীমিত্র তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্যের গুণে স্থায়ী আসন কায়েম করে নিতে সক্ষম হয়েছেন—যে কৃতিত্ব সর্বকালের সাহিত্যস্রষ্টা মাত্রেরই কাম্য।

এই ছোট্ট প্রবন্ধে শ্রীমিত্রের মত বহু সার্থকসাহিত্যিসমৃদ্ধ লেখকের সাহিত্য-সামগ্রীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভব নয়। যদিও আমার আলোচ্য বিষয় তাঁর ছোটগল্প প্রসঙ্গেই আবদ্ধ, তবু এ ক্ষেত্রেও বড় জোর তাঁর গল্পের রূপ এবং রেখার ওপরই আলতো ভাবে কলম বোলান যায়। আমার প্রচেষ্টা সেইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

শ্রীমিত্রের গল্পের অনন্যতাই পাঠকের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। সহজ কথায় বলা যায় তাঁর অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দ গল্প বলার ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। তাছাড়াও টেকনিকের মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে নতুনত্বের সংযোজন ঘটিয়েছেন—যেটা পাঠককে আকৃষ্ট করে বেশী। মোঁপাসার মত ক্লাইম্যাক্স এন্ড সর্ট স্টোরি ধারার প্রবর্তক হিসেবে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে শ্রীমিত্র অন্যতম প্রধান লেখক। তাঁর 'জেনানা সংবাদ' গল্পে সোনপার সাহেবের উক্তির মধ্যে দিয়েই এ যুক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে। 'জীবন বিস্তীর্ণ, ব্যাপক—কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাকস আছে। সেখানে এসে গল্পের দাঁড়ি টানতে হয়।' অন্তত তাঁর প্রথম জীবনের রচনাগুলো যে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে মোঁপাসার ধারার প্রবর্তক হলেও তাঁকে অন্ধ অনুকরণ করেন নি শ্রীমিত্র। বরং দেশ-কালোপযোগী করার প্রচেষ্টাই তাঁকে বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা দিয়েছে।

মোঁপাসার মত তিনিও সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর দৃশ্যত সুন্দরের গভীরে হিংস্র, কুটিল কুৎসিত দিকটাকে তুলে ধরে তাদের অসঙ্গতি এবং ব্যর্থতার কারণগুলোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। মোঁপাসা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তঃসারশূন্য বুজরুকির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যেন তরবারি চালিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন চরিত্রগুলোকে।

কিন্তু শ্রীমিত্রের বিশিষ্টতা হল মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্রগুলির শত অসঙ্গতি এবং দৈন্য সত্ত্বেও পাঠকের মনে তাদের প্রতি সমবেদনার উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন 'জেনানা সংবাদে'র সুজাতা দাশ, মিসেস নন্দী, পুতুলদিদি, মিষ্টি দিদি, ঘরন্তী গল্পের মিসেস চৌধুরী লাবণ্য ইত্যাদি। এদের কারো জীবনদর্শনই সুস্থ নয়। তাদের চরিত্রের প্রকাণ্ড অসঙ্গতিকে শুধু চাপা দিয়ে রেখেছে বাইরের জাঁকজমক। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তেই এদের প্রকৃত রূপটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। পুনরুল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হলেও আবার বলছি ক্লাইম্যাকস এন্ড সর্ট-স্টোরীর মধ্যে দিয়েই এই ধরণের চরিত্রগুলো প্রকাশ করা সম্ভব।

শ্রীবিমল মিত্র সমাজের গরীব, অশিক্ষিত সরল অনাড়ম্বর মানুষগুলোর অসঙ্গতিকে দরদী শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন এবং নিপুণ তুলির আঁচড়ে সুন্দর করে এঁকেছেন। তাদের অসঙ্গতিকে ফোটাতে দ্বিধা করেন নি......দ্বিধা করেছেন শুধু চরিত্রগুলোকে বিকৃত করতে। যেমন বেলমতিয়া কুড়ি মিনিটের গল্পের ঠাকুর সাহেব আর দরবারলাল, ভেজাল গল্পের জ্যাঠাইমার জন্যে মনে দরদই জাগে আগে। যে জ্যাঠাইমা মিথ্যে কথা বলতে না পারার জন্যে চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি ছেড়ে দিতে কুণ্ঠা করেন নি, সেই জ্যাঠাইমাই জামাইয়ের মদের সুরাহার জন্যে অকপটে মিথ্যে বলতে পারলেন। চরিত্র স্খলনের এই বাস্তব দৃষ্টান্তটি একদিকে যেমন পাঠককে হতচকিত করে তেমনি যে সমাজব্যবস্থা এক অশীতিপর সরল বিধবাকে মিথ্যাচারের দিকে ঠেলে দেয় শ্রীমিত্র তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। জ্যাঠাইমাকে কিন্তু বিকৃত করেন নি। বরং এই সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জ্যাঠাইমার মত মানুষের জন্যে সহানুভূতিই জাগে পাঠকের মনে।

বহু জীবনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে শ্রীমিত্রের। তাদের জীবনের বৈচিত্র্যকে দরদী মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন। 'বংশধর' গল্পের রায়মশাই চরিত্রটি তাই বোধহয় এত সার্থক, এত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। নিঃসন্দেহে এই গল্পটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক সৃষ্টি।

অনেক লিখেছেন তিনি, তাঁর জীবনের লেখা এই গল্পটির সঙ্গে তাঁর পরবর্তীকালের আর কোন সার্থক লেখারই তুলনা খুঁজে পাই না আমি। যে সততা, যে নিষ্ঠা, সৃষ্টির যে বেদনা একটা মহৎ সৃষ্টির কাজে অনুপ্রাণিত করে স্রষ্টাকে... রায়মশাই চরিত্রটি তার সার্থক দৃষ্টান্ত। প্লট ভাল হলেই ভাল গল্প হয় না। কিম্বা ভাল লিখতে পারলেই লেখা সার্থক হয় না। আসল যে জিনিসের প্রয়োজন সেটা হল, সৃষ্টির জন্যে মনকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করা।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন লক্ষ্মী গর্ভিণী (পাঠক ক্ষমা করবেন যদি সঠিক কথাটি মনে করতে না পেরে থাকি)। অর্থাৎ গর্ভিণী নারীর মত তাঁর সন্তানকে জঠরে [illegible]

তিলে গড়ে তুলতে হয়। তারপর যথাকালে সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সার্থক সৃষ্টির জন্যে মনে মনে আপন সৃষ্টিকে পালন করতে হয়। তারপর চরম মুহূর্তটি এসে পেঁছিলে তবেই কলম তুলে নিতে হয়। প্রকাশক কিম্বা সম্পাদক মশাই-দের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে তাড়াহুড়া করে কিছু একটা লিখে ফেলার প্রলোভন জয় করতে না পারলে সৃষ্টি হয় বিকলাঙ্গ, অসুন্দর।

আমার ধারণা শ্রীমিত্র নিজেও সে সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছেন। তাঁর গল্প না লেখার গল্পের মধ্যে এর স্বীকৃতি রয়েছে। পুজো সংখ্যায় লেখার তাগিদ এড়াতে সম্পাদকের ভয়ে শ্রীমিত্র পালিয়ে গিয়ে উঠেছিলেন দূরে মহাবলীপুরমের রেস্ট হাউসে। কিন্তু সেখানে গিয়েও নিস্তার নেই। পেছনে পেছনে ধাওয়া করে এসেছে সম্পাদকের তাগিদ। শ্রীমিত্র প্রত্যুত্তরে লিখছেন—'আমাকে মুস্কিলে ফেলছেন আপনি। গল্প লিখব না বলেই তো এখানে চলে এসেছি।'......'এ যে কী যন্ত্রণা তা কেউ বুঝতে পারবে না। মানুষ হওয়া বেশ আরামের কিন্তু লেখক হওয়া বড় কষ্টের। সৃষ্টিই যে কষ্টের জিনিস। হাতের কাছে আর কাউকে পাই না। এমন কেউ নেই যাকে নিয়ে গল্প বানাই"। আশ্চর্য, তবু লেখা ছাড়া উপায় থাকে না আজকের যশস্বী লেখকদের।

শ্রীমিত্রের গল্প না লেখার গল্প তবু আশ্চর্য সুন্দর গল্প হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে এত প্রতিষ্ঠা এত সাফল্য এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি যে পরিতৃপ্ত নন এটাই মস্ত আশার কথা। এই গল্পে মিঃ চন্দ্রগেশনের কর্মদক্ষতা আর অনেস্টি ভবিষ্যতে একদিন সাফল্য এনে দেবার কামনা জানিয়ে বরেণ্য মানুষেরা যে তাকে ক্যারেকটার সার্টিফিকেটগুলো দিয়েছিলেন তা শুধু জীবনভোর বাক্স-বন্দীই রয়ে গেল।

কিন্তু এজীবনে আর সাফল্যই এল না মিঃ চন্দ্রগেশনের। আসবে আসবে করে কুড়ি বছর বয়স থেকে পঁয়ষট্টি বছর কেটে গেল তবু মিঃ চন্দ্রগেশনের প্রত্যাশার অন্ত নেই। তাই যে আসে রেস্ট হাউসে তাকেই ক্যারেকটার সার্টিফিকেটগুলো দেখিয়ে প্রশংসা আদায় করতে চেষ্টা করে। মিঃ চন্দ্রগেশন যেন আত্মপ্রবঞ্চনা করছে, নিজেই নিজেকে ঠকাচ্ছে। আশ্চর্য চন্দ্রগেশন যেন লেখকেরই অন্তর্বেদনার প্রতীক। এত যশ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও শ্রীমিত্র নিজের বিবেককে প্রবঞ্চিত করতে পারছেন না। 'আপনি আমায় ক্ষমা করুন (সম্পাদকমশাই) আমি ও পারব না আপনি যে সাহিত্যিকের কথা লিখেছেন তিনি যত ইচ্ছে কলা-কৌশল করুন, কলাকৌশল করে সার্টিফিকেট জোগাড় করুন...... আমাকে তাঁর দলে ফেলবেন না। আমি সার্টিফিকেট চাই না।'

নিঃসন্দেহে এক মহৎ সৃষ্টির অন্বেষায় শ্রীমিত্রর মত দরদী লেখকের এই অন্তর্দহন। হয়ত সেই কারণেই তিনি তাঁর চিরাচরিত গল্পের ধারা বিসর্জন দিয়ে লিখেছেন, আমেরিকা এবং ইন্ডিয়ার মত গল্প। গল্প দুটির জন্যে নিঃসন্দেহে পাঠকরা সাধুবাদ জানাবেন তাঁকে। আধুনিক ভারতের বাস্তব রূপকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। আর্টিস্ট সাপ্লায়ার এ সি চক্রবর্তীর মত ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির গ্রাজুয়েট তরুণ যুবককে কেন নারীদেহ পণ্যকে মূলধন করে সংসার প্রতিপালন করতে হয়, কেন মিঃ মজুমদারের মত নির্দয় আত্মভোগ-সর্বস্ব বর্বর মানুষগুলো কোন দক্ষতার গুণে ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্টের ফাইভইয়ার প্ল্যানিং-এর মত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো অধিকার করে রাখে, এই জিজ্ঞাসা এবং সমাজব্যবস্থার এই দুর্নীতির বেসাতি পাঠকের মনে আলোড়ন জাগায়। আগুন, সে যত নগণ্য স্ফুলিঙ্গই হোক......তবু সে আগুনই। তার নিজের মধ্যেই দাহ্য ক্ষমতা রয়েছে। কে জানে......কখন সে প্রতিশোধের লেলি-হান শিখা মেলে তেড়ে আসে, পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় অত্যাচার আর অবিচারের জঞ্জালের স্তূপকে।

শ্রীমিত্র একজন দরদী লেখক। তাই তাঁর এই অন্বেষা আর সমাজের প্রতি দায়িত্ব বোধ তাঁকে সস্তা সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে উৎসাহিত না করে এক মহাজিজ্ঞাসায় অস্থির করে তুলেছে। কী লেখেননি তিনি, কী লিখতে পারেন নি, কাদের কথা বলতে পারেন নি...সম্ভবত এ জিজ্ঞাসাই তাঁকে মহাবলীপুরমের রেস্ট হাউসে অন্তর্মুখী করে তুলেছিল একদিন। যে যুগে মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, মাথাগোঁজার মত নিশ্চিত আশ্রয়টুকু পর্যন্ত নেই, অভাবের সুযোগ নিয়ে যে সমাজ তাকে বাধ্য করেছে তাদের পাপের দোসর হতে, ক্ষুধার যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পেতে সরল সাধাসিধে মানুষগুলো আত্মহনন ছাড়া মুক্তির আর কোন দিশা খুঁজে পায় না —সেই অভিশপ্ত যুগে সাহিত্যিক কী শুধুই নির্বাক দ্রষ্টা হয়ে থাকবে?

কে জানে, শ্রীমিত্রের আজকের এই নব-অন্বেষার জন্যে অন্তর্দহনই কোন একদিন এই প্রশ্নের জবাব দিতে সোচ্চার হয়ে উঠবে কী না!

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান খুঁড়তে শুরু করল মোতালেফ, তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল, পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী—মাজু খাতুনকে। পাড়া-পড়শী সবাই তো অবাক, এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছরখানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজু খাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে, ছেলেপুলে ঝামেলা অবশ্য মাজু খাতুনের নেই, মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখেদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ঝামেলা যেন নেই, তেমনি মাজু খাতুনের আছেই বা কি? বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেতখামার রেখে গেছে সে, তার ওয়ারিশি পাবে মাজু খাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়ো শনের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি; তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানাকাটা ছবির মত চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজু খাতুনের, যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদার বাড়ির কাজীবাড়ির বউঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করেছে মাগী, ধুলো-পড়া দিছে চোখে।'

মুন্সীদের ছোটবৌ সাকিনা বলল, দিচ্ছে ভালো করছে। দেবে না? অমন চোখে ধুলাপড়া দেওয়ানেরই কাম, খোদা তো পাতা দেয় নাই চোখে। দেখছো তো কেমন চ্যাঁরাইয়া চায়, ধুলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করেছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা মোতালেফের। বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ ক'রে ঘোরে তার চোখ, অল্পবয়সী খাপসুরৎ চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে, কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে, যারই একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে, সেই হেঁকে বসেছে—পাঁচ কুড়ি সাত কুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম শেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার-উনিশ বছর হবে বয়সী রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ টলমল করছে মন, ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। [illegible] এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইতুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে, আসলে বয়স আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর, সেইজন্যই ইচ্ছা ক'রে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের।

রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চারকান্দার নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ, এক নজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের নীল লুঙ্গি পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারার চমৎকার খোলতাই হয় তার। তা ছাড়া এমন ঢেউ খেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের, খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম শেখের বাড়ীতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে—গতবার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার আর না দেখে শুনে যার তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম, গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে—মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে আসলে পুরিয়ে নিতে চায়, গুনাগার চায় সেই লোকসানের, আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ, সে গুনাগার দু-এক কুড়ি নয়, পাঁচ কুড়ি একেবারে তার কমে কিছুতেই রাজি হবে না এলেম, কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে।

মুখ ভার করে চলে আসছিল মোতালেফ আশ শেওড়া আর চোখ উদানের আগাছার জংলার ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুল-বানুর সঙ্গে। কলসী কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিক করে একটু হাসল ফুলবানু। 'কি মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি?

'চলব না? শোনলা নি—টাকার খাকতাই তোমার বা-জানের।'

ফুলবানু বলল, 'হু-হ শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি? পছন্দসই জিনিষ নেবা বা-জানের গুনা, তার দাম দেবা না?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাকতাইটা আসলে বাজানের নয়, বা-জানের মাইয়ার, হাটে-বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।' মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু। 'কেবল ধামায় ক্যান, পাল্লায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা সোনা-জহরৎ ওজন কইরা দেবা পাল্লায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন করে চলে যাচ্ছিল। 'ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা রাগ করলোনে? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব?' এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে—আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে বুঝেছে।

ফুলবানু বলল—'তাই বইলা অকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মত জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল—'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব, কিন্তু বিবিজানের থাকবেনি দেখবার?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব, তেমন বেসবুর বিবি ভাইবেবা না আমারে?'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে মোতালেফ, গেল মল্লিকবাড়ী, মুখুজ্যে-

বাড়ী, সিকদারবাড়ী, মুন্সিবাড়ী—কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকা নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের, ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে বেজায় ঝামেলা 'সাধ করে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেয়েও, শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার-পাঁচ কুড়ি খেজুরগাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ, গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড় কুড়ি গাছ বেশী হল, গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার, মেহনৎ কম নয়, এক-একটি করে এতগুলি রস গাছের শুকনা মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে, বালিকাদায় ধার তুলে তুলে জুৎসই ক'রে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যান গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেঁড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাত ভরে টুপ-টুপ করে রস-পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের, এতো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে, বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হোল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের, যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে। হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুরগাছের ভিতর থেকে মিষ্টিরস চুঁইয়ে পড়ে।

এতো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়া শুদ্ধ কেটে নিলেই হোল। এর নাম খেজুরগাছ কাটা, কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক-ওদিক হলে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা-রফা হয়ে যাবে। মরা মুখ দেখতে হবে গাছের, সে গাছের গুঁড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে, ঘেউরের পৈঁঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।

খেজুরগাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা, মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়ে ছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এসব তত্ত্বকথা আর বিধি-নিষেধও তার মুখের রাজকের মত অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে, সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ হাঁড়ি, রাজকের হাতে পড়লে সে রস গলা হাঁড়িতে উঠতো। তার হাতে খেজুরগাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত [illegible]। গাছের [illegible] ক্ষতি হোত, না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সংগে সংগে, সাকরেদ দু-চারজন আরো ছিল রাজকের—সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মত হাত পাকেনি কারো। রাজকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মত।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না, বাঁশের 'বাঁখারির ভারায় ঝুলিয়ে রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মত মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে—কিন্তু উনান কেটে জ্বালানি জোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালি গুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের উপর, শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় থেকে পয়সার কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে—তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমৎ মেহনৎ। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়ীতে নেই মানুষ সেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি ক'রে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজু খাতুনের ঝাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি?' ঘরের ভিতর থেকে মাজু খাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা? আমি মোতালেফ, শুইয়া পড়ছ বুঝি? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাপটা একবার খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজু খাতুন উঠে ঝাঁপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কবা, তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজু খাতুনের। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে, কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মিঞা, তার কমে পারব না, গতরে সুখ নাই এ বছর?'

মোতালেফ মিষ্টি ক'রে বলল, গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে, মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজু খাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা চাইর আনা কমে পারব না এবার?

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজু খাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ তামাসা থুইয়া দাও মিঞা, কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া?'

মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যই কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজু বিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায়?'

ইসারা ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট ক'রে খুলে বলল মনের কথা। কোন রকম অন্যায় সুবিধা-সুযোগ নিতে চায় না সে, মোল্লা ডেকে, কালমা প'ড়ে, সে নিকা করে নিয়ে যেতে চায় মাজু খাতুনকে, ঘর-গেরস্থালির ষোল আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজু খাতুন প্রথমে অবাক হ'য়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাশার আর মানুষ পাইলা না তুমি! ক্যান কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে, ত্যাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে?'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজু বিবি? কমবয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওন যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি?

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজু খাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি! আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা, তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি— আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে ত্যাগো তুলনা?'

তখনকার মত মোতালেফকে বিদায় দিলেও, তার কথাগুলি মাজু খাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না।

অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনে ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল, মোতালেফের সংগে পরিচয় অল্পদিনের নয়। রাজক যখন বেঁচে ছিল, তার সংগে সংগে থেকে যখন কাজ-কর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়ীতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই মাঝে মাঝে একটু হাল্কা ঠাট্টা তামসা চলত, কিন্তু তার বেশী এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো, মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজু খাতুনের ঘরে ছিল স্বামী, স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাঠখোট্টা, ধরনের ছিল রাজেকের। ভারি কড়া-কড়া চাঁছাছোলা ছিল তার কথাবার্তা, শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজু খাতুনের উঠানে আর মাজু খাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালি গুড়। হাতের গুণ ছিল মাজু খাতুনের, তার তৈরী গুড়ের সের দু পয়সা বেশী দরে বিক্রী হত বাজারে। রাজেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশীর ভাগ খেজুরগাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু-এক হাঁড়ি রস কোনবার ভদ্রতা ক'রে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ। কিন্তু আগেকার মত হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাসখানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু'আনা ক'রে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের, মাজু খাতুন গুড় চুরি ক'রে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রী করাচ্ছে সেই গুড়, ষোল আনা জিনিষ পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মতান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজু খাতুনকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধবুড়োদের দলের আরো করেছে দু-একজন, কিন্তু মাজু খাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়, ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশী

ধাড়াবাড়ি মজুমদার হাঁকি' দিতে এসেছে, তাদের কাছে কেউই দেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজু খাতুন, কিন্তু মোত্তালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ানো যায় না, তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খাপসুরৎ মুখখানাও কারোর নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোত্তালেফকে আরো আসতে হলো দু-এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রংয়ের জোনাকী শাড়ি পরে, রং বেরঙের কাচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোত্তালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজু খাতুন।

ঘরদোরের কোন শ্রীছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার আর আগোছালো হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে, মাজু খাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপে-পুঁছে ঝক-ঝকে তকতকে ক'রে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরণীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোত্তালেফের, সে আছে গাছে গাছে। পাড়ার আরো অনেকের—বোসদের, খাঁড়ুখোদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোত্তালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ করে দিচ্ছে রস। পাকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজু খাতুনকে মোত্তালেফ উঠানের পশ্চিমদিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জালা বসিয়ে তার সেই চালা ঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জ্বাল দেয় মাজু খাতুন। জ্বালানীর জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোত্তালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাকে কি কুলোয়। মাজু খাতুন এর পর ওর এর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পালা ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো করে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানীর জন্যে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, মনের মত মানুষ পেয়েছে যে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোত্তালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া দামে।

বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছ গাছ হাঁড়ি পাততে। তাজা বাঁশের একেকটি করে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে কাঁধের চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোত্তালেফ। সারা দিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমে থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে, তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ আনা সের। দুবেলা দুবার করে এতগুলি গাছ উঠতে নামতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে মোত্তালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম পড়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। [illegible] ছিল, গোটা

খোটা চিক-চিক করে। পায়ের নিচে দুর্বার মধ্যে চিকচিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোত্তালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়া-পড়শীরা অবাক হয়ে যায়।

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু' হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালী গুড় নিয়ে মোত্তালেফ নিজে একদিন উপস্থিত হোল চরকান্দার এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলো রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচের খুঁটের বাঁধা খুলে বার করল পাঁচ-খানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলম বলল, 'আগাম কিসের?'

মোত্তালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা কড়কড়ে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোত্তালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায়নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগেনি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাতে বুলোতে বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মিঞা? চাম তো শোনলাম নেকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান মাইয়া আমার।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোত্তালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোত্তালেফের দিকে, তারিফ করে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিষ আছে মেঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকে একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোত্তালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকী ছিল না। তবু মোত্তালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোত্তালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি?' মানের দায়ে, জানের দায়ে, বাধ্য হয়ে তাকে এই ফান্দ খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণে বাঁচে কি ক'রে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা, কিন্তু যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল, তা ছাড়াবো কেমনে।'

মনে এলেও মুখ ফুটে একথা বলল না মোত্তালেফ যে, মানুষ চলে গেলে তার গন্ধ পড়ে আর একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না। তা যদি থাকত, তা হলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরোতো। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোত্তালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি।'

মুখে চাপতে চাপতে আঁচল ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি?' মোত্তালেফ বলল, 'সাঁচা না' ত কি মিছা? শুইংগা দেইখো তখন নতুন মাইনষের নতুন গন্ধে ভুর-ভুর করবো গতর। দখিনা বাতাসে ফুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুর-ভুর করবে, কেবল সবুর

কইরা থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে গেল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজে মোত্তালেফের, দু-মাসের বেশী সবুর করতে হোল না ফুলবানুকে।

মাজু খাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি-ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোত্তি মেঞা, ভিতর সোন্দর নয়। এত শয়তানি, এত ছল চাতুরি তোমার মনে? গুড়ের সময় পিঁপড়ার মত লাইগাছিলা, আর গুড় নাই ফুরাইল, অমনি দূর দূর।'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই, মোত্তালেফের ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি পাতা।

ফুর্তির অন্ত নেই মোত্তালেফের মনে। দিন ভর কিষাণ-কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর। 'খুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন ঘর-গেরস্থালি। কাছে বস আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর! এ কয় মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা?'

মোত্তালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহু বেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিঃশ্বাস

নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

গাছির'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু গাছি'র কাছেও যে গাছের রস দুই—চাইর মাসেই ফুরায় ফুলবান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোয়াইয়া চোয়াইয়া পড়ে।'

মাজু খাতুন ফের গিয়ে, আশ্রয় নিয়েছিল, রাজেকের পড়ো পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতই দিন কাটবে! কিন্তু দিন যদি বা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। পাড়া-পড়শীরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'নাঃ, বউ বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা।' যেখানে যায়, বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজু খাতুনের। মনে হয়, সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাজির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগান্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ি-টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না কিছু। তাই মাজু খাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থ ঘরের বউই তার পছন্দ, তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজু খাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়েস কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, এক পঞ্চাশ' মাজু খাতুন খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ ওই রকমই তাঁর চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজু খাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান! ওসব কাম কোন কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ-কামলা খাটে ঘরামির কাজ করে, ক্যান বউ 'গাছি ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজু খাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল, রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুরগাছের ধারে-কাছেও সে যায় না, নিকা যদি বসে মাজু খাতুন, তার সঙ্গেই বসবে, রসের ব্যাপারে মাজু খাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে। ওয়াহেদ বলল, 'তা হলে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশী দেরী করতে চায় না।'

মাজু খাতুন বলল, 'দেরী কইরা কাম কি।'

দেরী বেশী হোলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজু খাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মত ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ নিশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত, তার হাতগুনা তো বাচলাম, কি কও ফুলজান?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ডর নাই? পাখা মেইলা কখন উরাল দেয় তার ঠিক কি।'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উরাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দমত সব পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইনষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'দেখি যদ্দিন আছে, নজরও ততদিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে-তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালবাসে ফুলবানু, হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে ধার করে পয়সা কেনে সেই মাছ।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান, তুমি তো বেশী ভক্ত না পানের। দিনরাত খালি ফুড়ুত ফুড়ুত তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্যে। দিন ভরিয়া পান খাবা। খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'ক্যান, আমার ঠোঁট এখনে বুঝি রাঙা না যে, পান খাইয়া রাঙাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর, তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙাইয়া নেও?'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙা হয় না, আর একজনের পান-খাওয়া ঠোঁটের রস লাগে।'

নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে, কিন্তু তাছাড়া কৃষান বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মতো নয়, সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কৃষাণ খাটে, পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয় মেলে। ভারি খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায়। মোতালেফের বর্গা জমির পাট খুব বেশী ওঠে না উঠানে, সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিঘা চারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ, পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়?

ফুলবানু বলে, হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে কেমনতেরা কথাই যে কও তুমি মেঞা?

নিজেদের পাট তো বেশী নয়, পাকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ীর জাগ-দেওয়া পাটও সে ছড়িয়ে দেয়, সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে যাবে তাহলে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে, অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউস ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, কোরিম হামিদ, আজিদ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাটি চলে না তার, হাত বড় 'ধীরচ', মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একেকদন্ড পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে আর না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলাবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়ীতে।'

যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল, সে সব জায়গায় সযত্নে চুন লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষানের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

ফুলবানু বলে, 'হে, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না। কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্ত ঘরের মাইয়া না আমি, না স'চাই আশমান গুনা নাইমা আইছি!'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন-কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশী দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশী গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। একাজে নামডাক আছে মোতালেফের, একাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই

সেরা। এ করেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়ি-দেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটবার ধুম লেগে আছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি রঙ্গরসিকতা। ধার-দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে, রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মত দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙে আসে চোখ। দু হাতে ঠেলে, দু হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোন অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু।

মানুষের গায়ের গরম না পেলে, শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানী চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডাল-পাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ।

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর, বুক কাঁপে। দু-এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়ীতে, কিন্তু এত রস একসঙ্গে সে কোন দিন দেখে নি, কোন কালে জ্বাল দেয় নি!

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমন তরো মাইয়া মানুষ তুমি, এত কইরা হইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই গুড় হইছে, এই নি খইন্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে, 'কেনবে না ক্যান্। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা! খাপসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে।

বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু-চার দিনের মধ্যেই কোনরকমে চলনসই গুড় তৈয়ারী করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না।

পুরান খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমন তরো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে; আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রয়েছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন সেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশী।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবারে স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না; কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে সেখে খুশি হচ্ছে না, খেয়ে খুশি হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বার-কয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোঁটা দেইখো নামবার সময় হইল কিনা ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে, 'হ-হ, চিনছি। আর বক বক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইনষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজু খাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ে কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজু খাতুন এমন করে মুখ ঝামটা দেয় নি, অস্বস্তি জানায় নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুরে নাগাদ কোত্থেকে এক বোঝা জ্বালানি মাথায় করে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাকাটির চালার দোরের কাছে, 'কি রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এলো না ফুলবাণুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবাণুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জ্বালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড়? সারে-সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জ্বালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ! যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণ কোণের জালাটার রস বেশী জ্বাল পেয়ে কি করে যেন ধরে গেছে একটু। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া করে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চিৎকার বেরুল,— 'কই, কোথায় গেলি হারামজাদি?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবাণু। বেলা বেশী হয়ে যাওয়ায় দু দিন ধরে স্নান করতে পারে নি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড়বড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোড়া-সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবাণু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুটি করে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারাম-জাদি, গুড় পুইড়া গেল, সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর পুলা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এই জৈন্যই গুড় খারাপ হয়, আমার অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে।'

ফুলবাণু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো তাই কইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তে মার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে, বুকে, পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবাণুর সর্বাঙ্গে বলল 'কঞ্চিতে সারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ। রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম সেখ এল চারকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধম-কালো, মেয়েকেও নিন্দা-মন্দ কম করল না।

ফুলবাণু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বাজান তোমার সাথে — এমন গোঁয়ার মাইনষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবাণু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থ ঘরে অমন বার বার অদল-বদল আর ঘর বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দুদণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-ঝাঁটি। দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিঠে গেলেও খানিক বাদেই আবার যেচে আপোষ করলো মোতালেফ। সেধে ভজে মান ভাঙলো ফুলবাণুর। পর দিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবাণু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস দুইডা

মাস কাইটা গেলে কোনরকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলবাজান।'

ফুলবাণু বলল—'কষ্ট আবার কি।' কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দু'জনের মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা, তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারোরই। বলেও জানে, শোনেও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে, গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবাণুর সঙ্গে বাড়ী এসে আর তর্ক-বিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ করে বসে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রস-ভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারেও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা-ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাজির শেখের সঙ্গে।

'সেলাম মেঞাসাব।'

'আলেকম আসেলাম।'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো, সব ছাওয়ালপাল ভালো তো—?'

মাজু খাতুনের কথাটা মুখে এসেও আনতে পারলে না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হে মেঞা ভালোই আছে সব।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত করে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই-তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা। ভালো গুড়।'

নাদের হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনকালেই খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস করে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমন-তরো ব্যাপারী? গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্যে কি? দুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। করন জানি, চাচায় দিছে।'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান আম।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, মিয়া তো যাইন আইজ। খাইয়া দ্যাখেন। দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস বাটখার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুণাগুণার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে, কথাগুলি কত মিথ্যা। পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারত-পক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না। তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা কওয়ায় এক সের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজী হয় নাদির, আর বাকী দু' সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর করে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজু খাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও-গুড় ছাওয়ালপানের খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও-গুড় ছোব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক-হাঠ নয়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজু খাতুন নিষেধ করে দিয়েছে নাদিরকে, 'খবরদার, ওই মাইনষের সাথে যদি ফের খাতির-নাতির কর, আমি চইলা যাব ঘরগুলা, রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজু খাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজেকর্মে সরেশ কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কান্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিনকয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দু'টি সেরা গাছের সবচেয়ে বড়ো ও ভালো দু' হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়া খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপটামো ফুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে, 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা?'

হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে; 'কেডা? ও, আপনে? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান মেঞাসাব?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির, কিন্তু মনে মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজু খাতুনের জন্য। যে-মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজু খাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও।'

নাদির ফিস ফিস করে বললো, 'আস্তে আস্তে,—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শোনতে পাবে। মাইনষের বাড়ী মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়াল ভারেও অমন কইরা খেদায় না মাইনষে।'

মাজু খাতুন বলল, 'তুমি বোকনা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পছন্দ কর, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে, একটুও ডরভয় নাই মনে, একটুও কি লাজ-সরম নাই?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজু খাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল, এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারেরও মধ্যে কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে, মাজু খাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে একটু একটু।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়িদুটি হাত থেকে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু?'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই কন না—দোষ কি তাতে।'

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নেই। কন যে, মোতালেফ মেঞা খাওয়াইবার জন্যে আসে নাই রস, সেইটুকু বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলার আগেই মাজু খাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্যে আনছে?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মেঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খদ্দেরের কাছে। এ-বছর এ ছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটেবাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।'

গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো আর বড় বড় চোখ ছলছল করে উঠেছে। চুপ করে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হোল না।

হঠাৎ যেন হুঁস হোল নাদির সেখের, বলল, 'ও কি মেঞা, হুঁকোই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুন কি নিবা গেল কইলকার?'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞা ভাই, নেভে নাই।'

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের যে কোন গল্পের মধ্যেই লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ তার মনের গহনে সহজে প্রবেশ করা কিন্তু খুব কঠিন কাজ। নরেন্দ্রনাথ সেই কৌশল অনায়াসে রপ্ত করেছেন। কি করে যে তিনি সেই অসাধ্য সাধন করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অতিরিক্ত বুদ্ধি-চর্চা লেখককে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে উন্নাসিক করে তোলে। তাই মননশীল রচনায় বুদ্ধির অমিতচর্চার আড়ালে হৃদয়ের ধর্মগুলি অলক্ষিত থেকে যায়। এই শ্রেণীর লেখকদের রচনা পাঠকদের চিত্তে সাময়িকভাবে হয়তো সাড়া জাগাতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের কাছে ঐ ধরনের রচনার কোন আবেদন না থাকায় তার আবেদন বেশী দিন স্থায়ী হয় না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে বুদ্ধির কসরত নেই কিন্তু হৃদয়ের কবোষ্ণ স্পর্শ আছে। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলির আবেদন আমাদের মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ের কাছে বেশী এবং সেইখানেই গল্পকার হিসাবে তাঁর সার্থকতা।

নরেন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত প্রায় চারশ'র মত গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা সর্বসমেত ছত্রিশটি। তাঁর গল্প-গ্রন্থগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজালে এরকম দাঁড়ায়—১। অসমতল (১৩৫২), ২। হলদে বাড়ি (১৩৫২), ৩। উল্টোরথ (১৩৫৩), ৪। পতাকা (১৩৫৪), ৫। চড়াই-উৎরাই (১৩৫৬), ৬। শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৯), ৭। কাঠগোলাপ (১৩৬০), ৮। অসবর্ণ (১৩৬১), ৯। ধূপকাঠি (১৩৬১), ১০। মলাটের রঙ (১৩৬২), ১১। রূপালি রেখা (১৩৬৩), ১২। দীপান্বিতা (১৩৬৩), ১৩। ওপারের দরজা (১৩৬৩), ১৪। একূল-ওকূল (১৩৬৩), ১৫। বসন্ত পঞ্চম (১৩৬৪), ১৬। মিত্ররাগ (১৩৬৪), ১৭। উত্তরণ (১৩৬৫), ১৮। পূর্বতনী (১৩৬৫), ১৯। অঙ্গীকার (১৩৬৬), ২০। দেবযানী (১৩৬৬), ২১। সভাপর্ব (১৩৬৭), ২২। স্বরম্বর্ধি (১৩৬৭), ২৩। ময়ূরী (১৩৬৮), ২৪। বিদ্যুৎলতা (১৩৬৮), ২৫। পত্র-বিলাস (১৩৬৮), ২৬। একটি ফুলকে ঘিরে (১৩৬৯), ২৭। বিনি সুতোর মালা (১৩৬৯), ৩০। রূপলাগি (১৩৭০), ৩১। চিত্রে কোঠা (১৩৭১), ৩২। প্রজাপতির রঙ (১৩৭২), ৩৩। অন্য নয়ন (১৩৭২), ৩৪। বিবাহবাসর (১৩৭৩), ৩৫। চন্দ্রমল্লিকা (১৩৭৪), ৩৬। সন্ধ্যারাগ (১৩৭৫)।

নরেন্দ্রনাথের এমন অনেক গল্প আছে যা কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এছাড়া তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপন্যাসিকও তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা বত্রিশ।

কল্লোল যুগের পর বাংলা সাহিত্যে যে কজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে। তিরিশ বছরেরও অধিক কাল ধরে তিনি গল্প লিখছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের বাংলা দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক চেহারাটি তাঁর গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রনাথ সমাজসচেতন শিল্পী। জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নয় বা জীবনকে বাদ দিয়ে নয়—এই দুঃখ-সুখে ভরা জীবনকে ভালোবেসে তিনি তাকে তাঁর গল্পে নানা রঙ এবং নানা রূপে সাজিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতলে'ই আমরা তাঁর এই সমাজ-সচেতনতা লক্ষ্য করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা দেশে দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, বেকারীর অভিশাপে গোটা সমাজজীবনে যে পচন এবং নৈতিক অবক্ষয় সুরু হয়েছিল তার সাক্ষ্য দেবে 'অসমতল' গ্রন্থের গল্পগুলি। বিশেষভাবে যে গল্পগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন সেগুলি হল নেতা, চোর, রসাভাস, আবরণ এবং পুনশ্চ।

কিন্তু শত অভাব-দৈন্য সত্ত্বেও মানুষের বিবেক লুপ্ত হয়ে যায় না। তাই 'জেতা' গল্পের নায়ককে দেখি তার বয়স্ক সহকর্মীর অবমাননার বিরুদ্ধে নিজের চাকরি যাবার বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে প্রতিবাদ করেছে। আর 'চোর' গল্পের নায়ক অমূল্য নিজে চুরি করাটাকে খুব বাহাদুরির কাজ বলে মনে করলেও এবং তার স্ত্রীকে একাধিকবার চৌর্যকর্মে উৎসাহিত করলেও শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী রেণু সত্যি যেদিন বিনোদবাবুর ঘর থেকে ঘড়ি চুরি করে নিয়ে এল সেদিন আনন্দ ত হয়ই নি বরং তার মনে হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 'আর যে চির-পরিচিত দুখানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোন সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ-ধ্বনিত মৃণালভুজ নয়, তাও আজ শ্রীহীন কলঙ্কিত।' 'আবরণ' গল্পের নায়ক বংশী তার স্ত্রীর জন্য যখন গণিকা সুখদার শাড়ীটা কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে তখনই সুখদার নগ্ন বীভৎস দেহের দিকে তাকিয়ে তারও স্ত্রী চাঁপার উলঙ্গ অনাবৃত দেহটির কথা মনে পড়েছে। আর একজন নারীকে নিরাবরণ করে সে তার স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র যোগাড় করতে পারে নি।

এই যুদ্ধের সর্বনাশা প্রভাব শুধু শহরে নয়, গ্রামেও সমানভাবে পড়েছে। তাই গ্রাম্য তাঁতী জৈনুদ্দিনকে পৈতৃক ভিটে ছেড়ে দু মুঠো অন্নের জন্য শহরে এসে কাঞ্চন মিঞার মত ধনী যুবকদের জন্য নিত্য নতুন নারী যোগাড় করে দিতে হয়েছে আর তার প্রাক্তন স্ত্রী ফতেমাকে শহরে এসে গণিকার ঘৃণিত পেশা বেছে

নিতে হয়েছে। বৃদ্ধা হেমাঙ্গিনীকে স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কলকাতার অনাথ-আশ্রমের কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি নিতে হয়েছে। আর পদ্মমণিদের পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে শহরে গোপনে চালের ব্যবসা সুরু করতে হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথের অসমতল' গ্রন্থের গল্পগুলি পড়তে পড়তে বিশেষভাবে দুজন কথাসাহিত্যিকের কথা মনে পড়ে যায়। একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর একজন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এ'দের ছোটগল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা দেশের যে বিপর্যস্ত, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অবক্ষয়িত রূপটি লক্ষ্য করা যায় তা নরেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ছোটগল্পেও উপস্থিত।

নরেন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পের সংখ্যা খুব কম নয়। প্রেমের গল্প রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'রস' গল্পটি বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ প্রেমের গল্প হিসেবে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবে। নরেন্দ্রনাথ একসময়ে যে কবিতা লিখতেন তার প্রমাণ দেবে এই গল্পটি। রস গল্পটি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন গদ্যে রচিত কবিতা পড়ছি। 'আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজু খাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফলের গন্ধ তার নিশ্বাসে।' —এ অংশটি পড়লে মনে হয় না কোন গল্প পড়ছি। মনে হয় গদ্যে রচিত কোন কবিতা পড়ছি। গল্পটি আগাগোড়াই মধুর রসে সিক্ত এবং সে রস গল্পটি পাঠ করার পর পাঠকের মনেও নিশ্চয়ই লেগে থাকে। এই রকম আবেগ-তপ্ত প্রেমের গল্প নরেন্দ্রনাথ খুব বেশী লেখেননি—পরবর্তীকালে একমাত্র 'সোহাগিনী' গল্পে এই জাতীয় তীব্র আবেগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রেমের গল্পে প্রেমের একটি স্নিগ্ধ প্রশান্ত রূপ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রেমের গল্পে প্যাশন প্রবল হয়ে দেখা দেয় নি। কখনও তাঁর প্রেমের গল্পগুলি পড়তে পড়তে আমাদের মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়, কখনও তা মিলনের বার্তা বার্তা বয়ে আনে ঠিকই—কিন্তু সে মিলনের রঙ উজ্জ্বল নয়, বরং ঈষৎ ম্লান বলেই মনে হয়। কখনও কোন ধূপকাঠিওয়ালার সঙ্গে কোন বাড়ীর ঝির হঠাৎ আলাপ হয়ে যায়—তারপর তাদের সেই আলাপ এক সময়ে প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই দুটি নিতান্ত অকুলীন পাত্র-পাত্রীর প্রেম সমাজের কাছে নিতান্ত উপেক্ষিত। 'একজন তরুণ ছেলে আর একটি তরুণীকে বিয়ে করবে, এর চেয়ে পরিহাসের ব্যাপার সংসারে যেন আর কিছুই নেই—যেহেতু ছেলেটি ফেরিওয়ালা, আর মেয়েটি বাড়ীর ঝি।' কখনও কখনও এই প্রেমের পাত্র-পাত্রীও বিচিত্র হয়। মৃত্যুপথযাত্রী রাজনৈতিক গুরু মুরারীর কথা ভেবে কুমারী সুজাতা সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। বন্ধুর কুরূপা স্ত্রীর প্রতি তার মন ফেরাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেবতোষকে নিজেরই তৈরী মিথ্যা স্নেহজালে অজ্ঞাতসারেই জড়িয়ে পড়তে হয়। আর বর্ষীয়সী মায়ের একদা প্রণয়প্রার্থী অধুনা বন্ধু ত্রিলোকেশবাবুর সঙ্গে অদ্ভুত খেলায় মেতে ওঠে অষ্টাদশী দিপ্তী। চাঁদ মিঞাও প্রেমের গল্প কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পের মধ্যে এটি একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

নারী-চরিত্র নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পেই প্রাধান্য পেয়েছে। নারীকে তিনি বিভিন্ন রূপে বিচিত্র পরিবেশে দেখিয়েছেন। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন তাদের রূপ। সেই রূপকেই তিনি তাঁর গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর গল্পে এমন অনেক নারীচরিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের কথা ভোলা অসম্ভব। তাঁর 'কুলপী বরফ' গল্পের গ্রাম্যবধূ নির্মলাকে ভোলা যাবে না। সামান্য কুলপী বরফ বানাতে পেরে তার কী অসীম তৃপ্তি! তেমনি ভোলা যাবে না। 'দ্বিচারিণী' গল্পের তরঙ্গকে—যে শহুরে শিক্ষিতা গৃহস্থবধূদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত—কিন্তু অনেক বেশী খাঁটি। ঘটনার চাপে পড়ে তাকে বাধ্য হয়ে মিথ্যা এবং ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে মিথ্যাবাদিনী হতে চায়নি। তাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে তরঙ্গ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছে, 'কেন এমন হোল?' 'অনধিকারিণী' গল্পের সুলতাকেও ভোলা সম্ভব নয়। সমস্ত জীবন ধরে সে একমাত্র সংগীতেরই সাধনা করতে চেয়েছিল কিন্তু সাধ্য না থাকায় তার পক্ষে সাধনায় সিদ্ধিলাভ আর সম্ভব হল না। তাঁর ছোটগল্পের এই রকম অনেক নারীচরিত্রকেই ভোলা সম্ভব হবে না। যেমন ভোলা সম্ভব নয় 'মহাশ্বেতা' গল্পের অমিতাকে, 'কুমারী শুক্লা' গল্পের শুক্লাকে, 'হলদে বাড়ি' গল্পের হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত অঞ্জনাকে, 'দাম্পত্য' গল্পের রমাকে 'সেতার' গল্পের নীলিমাকে, 'হাসপাতাল' গল্পের মায়াকে 'অভিনেত্রী গল্পের লাবণ্যকে কিংবা 'রূপসজ্জা' গল্পের রমাকে। কত বিভিন্ন রূপেই তাঁর গল্পে নারীকে দেখা গেছে। কখনো সে সেবিকা, কখনো প্রেমের সাহসে অশঙ্কিনী, কখনো লীলাসঙ্গিনী, কখনো ছলনাময়ী কখনো বা অভিনেত্রী। একথা অনস্বীকার্য যে নরেন্দ্রনাথের গল্পে পুরুষচরিত্র থেকে নারীচরিত্রের প্রাধান্যই বেশী। বরং নারী চরিত্রের তুলনায় তাঁর গল্পের পুরুষচরিত্রগুলি অনেক বেশী নিষ্প্রভ। কখনো তারা ব্যর্থ প্রেমিক, কখনো দৈহিক বা মানসিক রোগগ্রস্ত, কখনো নিতান্ত অকর্মণ্য, কখনো অর্থ গৃধ্নু, কখনো শরীরমুগ্ধ স্তাবক আবার কখনো বা পঙ্গু অসহায় শিল্পী। কখনও কখনও তাঁর গল্পে নারীর পাশে পুরুষকে নিতান্ত স্বার্থপরই মনে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'সেতার' গল্পটির কথা বলা যায়। নীলিমা তার অসুস্থ স্বামীকে সারিয়ে তুলবার জন্য গানের টিউশনি সুরু করেছিল। প্রথমে যা ছিল নিছক প্রয়োজনের তারপর দেখা গেল সেই সংগীতকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু যখনই সে খ্যাতির জগতে পৌঁছুবার সুযোগ পেল তখনই তার সদারোগগ্রস্ত স্বামী এসে সে সম্ভাবনার দ্বার স্বহস্তে রুদ্ধ করে দিল। 'রোগ' গল্পের নায়ক বিভূতি একটি অদ্ভুত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক। তার স্ত্রী যতদিন অসুস্থ হয়ে রোগশয্যায় শুয়েছিল ততদিন স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসার অভাব হয়নি। কিন্তু যখনি নীলিমা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সাধারণ মানুষের মত [illegible] করতে চেয়েছে তখনই তার প্রতি বিভূতির সমস্ত অনুরাগ বিরাগে রূপান্তরিত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের একাধিক ছোটগল্প অবলম্বনে একথা প্রমাণ করা চলে যে তাঁর গল্পে পুরুষচরিত্রগুলি নারীচরিত্রের পাশে নিষ্প্রভ এবং অনুজ্জ্বল বলে মনে হয়।

পূর্ববঙ্গের পটভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ অনেকগুলি ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে পূর্ববঙ্গের নদী-নালা, শ্যামল-বনানী এমন কি সেখানকার মানুষগুলির মুখের ভাষা পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার যে বেদনা সেই বেদনাবোধ তাঁর একাধিক গল্পে লক্ষ্য করা গেছে। যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছেন তাঁরা শুধু এক দেশ থেকে আর এক দেশেই আসেননি তাঁদের এতদিনের সযত্ন-লালিত বিশ্বাস ধারণাকে যেন পরিবেশের এবং পরিস্থিতির চাপে পড়ে বদলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সে প্রয়াসে সার্থক হননি। তাঁরা নতুন পরিস্থিতিতে, নতুন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন নি। তাই দেখি ফাগরপুর এম ই স্কুলের হেডমাস্টারকে তাঁর ছাত্রের সাবর্ডিনেট হয়ে কলকাতার ব্যাঙ্কে চাকরি নিতে হয় আর অসুস্থ স্বামীর পরিচর্যার জন্য ফরিদপুরে খড়িশার গাঁয়ের গৃহস্থবধূ তরঙ্গকে কলকাতায় এসে ঝিয়ের কাজ নিতে হয়। কিন্তু এই ভিন্ন পরিবেশে তারা কিছুতেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। তাই ব্যাঙ্কে একের পর এক সব ডিপার্টমেন্ট ঘুরবার পর হেডমাস্টারকে বেয়ারাদের সর্দারির ভার নিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত বেয়ারাদের মাস্টারি করতে হয়। আর তরঙ্গ কিছুতেই আর পাঁচজন ঝিয়ের মত হয়ে উঠতে পারে না।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের ভাষা নিরাভরণ। তাঁর ছোটগল্পের ভাষা সহজ সরল। অত্যন্ত সহজেই তা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের ভাষায় এই আপাত-সারল্যের অন্তরালে রয়েছে গভীর ব্যঞ্জনা। তাঁর ছোটগল্পগুলোর শেষে হয়তো কোন চমক বা স্টান্ট নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ছোটগল্পের পরিণতি হয়েছে গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যঞ্জনাময়। 'রস' গল্পের শেষ বাক্যটি হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেক বলল 'না মিঞাভাই, নেবে নাই' কিংবা 'অনধিকারিণী' গল্পের শেষ বাক্য : 'সুলতা আস্তে আস্তে বলল, ভিতরে আর যেতে পারলাম কই'; আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত সরল এবং সহজ বলে মনে হলেও তা তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর অর্থবহ।

রাজধানী
একসপ্রেস
গতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন রূপায়ণ
নিঃশব্দ ও ধুলোবালিমুক্ত, বিলাসবহুল ও আরামপ্রদ শীততাপনিয়ন্ত্রিত ট্রেনে মাত্র ১৭ ঘণ্টা ২০ মিনিটে হাওড়া থেকে দিল্লী ভ্রমণ করুন—ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার ভ্রমণের রোমাঞ্চ অনুভব করবেন। 'প্যানট্রি-কার'-এর সুন্দর আয়োজন রয়েছে, সেখান থেকে আপনার আসনে চমৎকার আহার্য—সন্ধ্যার চা, রাতের খাবার ও প্রাতঃরাশ—পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আছে। খাবারের জন্য আলাদা কোন দাম ধরা হবে না।
চ্লারবারেট অথবা স্লীপার-এ ভ্রমণ করুন
সপ্তাহে দু'বার—হাওড়া থেকে সোমবার ও শুক্রবার
নয়াদিল্লী থেকে বুধবার ও শনিবার
চেয়ারকার— ৯০ টাকা আহার্যসহ
স্লীপার— ২৮০ টাকা আহার্যসহ
পূর্ব রেলওয়ে
INDIAN RAILWAYS
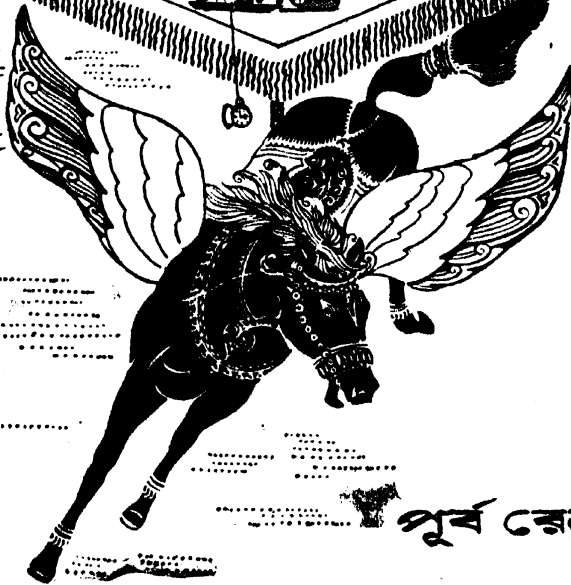
সকালে একটা পার্সেল এসে পেঁছেছে। খুলে দেখি এক জোড়া জুতো।

না, শত্রুপক্ষের কাজ নয়। একজোড়া পুরোনো ছেঁড়া জুতো পাঠিয়ে আমার সংগে রসিকতার চেষ্টাও করেনি কেউ। চমৎকার ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পায়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় দস্তুরমতো। ইচ্ছে করে বিছানায় শুইয়ে রাখি।

কিন্তু জুতোজোড়া পাঠাল কে? কোথাও অর্ডার দিয়েছিলাম বলেও তো মনে পড়ছে না। আর বন্ধুদের সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাঁক কারো আছে বলেও জানি না। তাহলে ব্যাপারটা কী?

খুব আশ্চর্য হব কিনা ভাবছি, এমন সময় একখানা সবুজ রঙের কার্ড চোখে পড়ল। উইথ বেস্ট কমপ্লিমেন্টস অব রাজাবাহাদুর এন আর চৌধুরী, রামগঙ্গা এস্টেট।

আর তখনি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আট মাস আগেকার এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকার-কাহিনী।

রাজাবাহাদুরের সংগে আলাপের ইতিহাসটা ঘোলাটে, সূত্রগুলো এলোমেলো। যতদূর মনে হয় আমার এক সহপাঠী তাঁর এস্টেটে চাকরি করত। তারই যোগাযোগে রাজাবাহাদুরের এক জন্মবাসরে আমি একটা কাব্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলাম। ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস চুরি করে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলাম তার দুটো একটা লাইন এই রকম :

ত্রিভুবন প্রভাকর ওহে প্রভাকর
গুণবান মহীয়ান হে রাজেন্দ্রবর।
ভূতলে অতুল কীর্তি রামচন্দ্র সম—
অরাতিদমন ওহে তুমি নিরূপম।

কাব্যচর্চার ফলাফল হল একেবারে নগদ নগদ। পড়েছি—আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খানখানাম হিন্দী-কবি গঙ্গের চার লাইন কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। দেখলাম সে নবাবী মেজাজের ঐতিহ্যটা গুণবান মহীয়ান অরাতিদমন মহারাজ এখনো বজায় রেখেছেন। আমার মতো দীনাতদীনের ওপরেও রাজদৃষ্টি পড়ল, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, প্রায়ই চা খাওয়াতে লাগলেন, তারপর সামান্য একটা উপলক্ষ্য করে দামী একটা সোনার হাতঘড়ি উপহার দিয়ে বসলেন এক সময়ে। সেই থেকে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমি। নিছক কবিতা মেলাবার জন্যে যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

রাজাবাহাদুরকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুরা বলে, মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নিছক গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষা। তা আমি পরোয়া করি না। নৌকো বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখেই বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড় ঝাপ্‌টার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তাই মাস আষ্টেক আগে রাজাবাহাদুর যখন শিকারে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন তখন তা আমি ঠেলতে পারলাম না। কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়া গেল। তাছাড়া গোরা সৈন্যদের মাঝে মাঝে রাইফেল উঁচিয়ে শকুন মারতে দেখা ছাড়া শিকার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাই নেই আমার। সেদিক থেকেও মনের ভেতরে গভীর এবং নিবিড় একটা প্রলোভন ছিল।

জংগলের ভেতর ছোট একটা রেল লাইনের আরো ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। নামবার সংগে সংগে সোনালী তক্‌মা আঁটা ঝক্‌ঝকে পোশাক পরা আর্দালি এসে সেলাম দিল আমাকে। বললে —হুজুর, চলুন।

স্টেশনের বাইরে মেটে রাস্তায় দেখি মস্ত একখানা গাড়ি—যার পুরো নাম রোল্‌স রয়েস, সংক্ষেপে যাকে বলে 'রোজ'। তা রোজই বটে। মাটিতে চলল না রাজহাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। চামড়ার খট্‌খটে গদী নয়, লাল মখমলের কুশন। হেলান দিতে সংকোচ হয় পাছে মাথার সস্তা নারকেল তেলের দাগ ধরে যায়। আর বসবার সংগে সংগেই মনে হয় —সমস্ত পৃথিবীটা চাকার নিচে মাটির ডেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক— আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

হাঁসের মতো ভেসে চলল 'রোজ'। মেটে রাস্তায় চলেছে অথচ এতটুকু ঝাঁকুনি নেই। ইচ্ছে হল একবার ঘাড় বার করে দেখি গাড়িটা ঠিক মাটি দিয়েই চলেছে, না দুহাত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর চাকাগুলো।

পথের দুপাশে তখন নতুন একটা জগতের ছবি। সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা-বাগানের বিস্তার, চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্র। দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।

ক্রমশঃ চা-বাগান শেষ হয়ে এল, পথের দুপাশে ঘন হয়ে দেখা দিতে লাগল অবিচ্ছিন্ন শালবন। একজন আর্দালি জানাল, হুজুর, ফরেস্ট এসে পড়েছে।

ফরেস্টই বটে! পথের ওপর সূর্যের আলো সরে গেছে, এখন শুধু শান্ত আর বিষন্ন ছায়া। রাত্রির শিশির এখনও ভিজিয়ে রেখেছে পথটাকে। 'রোজে'র নিঃশব্দ চাকার নিচে মড়মড় করে সাড়া তুলছে শুকনো শালের পাতা। বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো শালের ফুল ঝরে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে গায়ে। কোথা থেকে চকিতের জন্যে ময়ূরের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এল। দুপাশে নিবিড় শালের বন, কোথাও কোথাও ভেতর দিয়ে খানিকটা খানিকটা দৃষ্টি চলে, কখনো কখনো বুনো ঝোপে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো কাঠের গায়ে লেখা ১৯৩৫, ১৯৪০। মানুষ বনকে শুধু উচ্ছন্ন করতে চায় না তাকে বাড়াতেও চায়। এইসব প্লটে বিভিন্ন সময়ে

নতুন করে শালের চারা রোপন করা হয়েছে, এ তারই নির্দেশ।

বনের রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ভয়ও যে না করেছিল এমন নয়। এই ঘন জংগলের মধ্যে হঠাৎ যদি গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তাক বুঝে লাফ মারে একটা বুনো জানোয়ার তাহলে—

তাহলে পকেটের ফাউন্টেন পেনটা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোনো অস্ত্রই সংগে নেই।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—হ্যাঁরে, এখানে বাঘ আছে?

ওরা অনুকম্পার হাসি হাসল।

—হ্যাঁ, হুজুর।

—ভালুক?

রাজা-রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তর। ওরা বলল—হ্যাঁ হুজুর।

অজগর সাপ?

জী মালিক।

প্রশ্ন করবার উৎসাহ ওই পর্যন্তই এসে থেমে গেল আমার। যে রকম দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো প্রশ্নেই যে 'না' বলে আমাকে আশ্বস্ত করবে এমন তো মনে হচ্ছে না। যতদূর মনে হচ্ছিল গরিলা, হিপোপোটেমাস, ভ্যাম্পায়ার কোনো কিছুই বাকি নেই এখানে। জলু কিংবা ফিলিপিনোরও এখানে বিষাক্ত বুমেরাং বাগিয়ে আছে কিনা এবং মানুষ পেলে তারা বেগুন-পোড়া করে খেতে ভালোবাসে কিনা এ জাতীয় একটা কুটিল জিজ্ঞাসাও আমার মনে জেগে উঠেছে ততক্ষণে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম।

খানিকটা আসতেই গাড়িটা ঘস ঘস করে ব্রেক কষল একটা। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম—কিরে, বাঘ নাকি!

আর্দালিরা মুচকি হাসল—না হুজুর, এসে পড়েছি। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো। এসে পড়েছি সন্দেহ নেই। পথের বাঁদিকে ঘন শালবনের ভেতরে একটুখানি ফাঁকা জমি। সেখানে কাঠের তৈরী বাংলা প্যাটার্নের একখানি দোতলা বাড়ি। এই নিবিড় জংগলের ভেতরে যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

গাড়ির শব্দে বাড়িটার ভেতর থেকে দু-তিনজন চাপরাশী বেরিয়ে এল ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম বাড়ির সামনে চওড়া একটা গড়খাই কাটা। লোকগুলো ধরাধরি করে মস্ত বড় এক ফালি কাঠ খাদটার ওপরে সাঁকোর মতো বিছিয়ে দিল। তারই ওপর দিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল রাজাবাহাদুর এন আর চৌধুরীর হান্টিং বাংলোর সামনে।

আরে, আরে কী সৌভাগ্য। রাজা-বাহাদুর যে স্বয়ং এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে-ছেন আমার অপেক্ষায়। এক গাল হেসে বললেন, আসুন আসুন, আপনার জন্য আমি এখনো চা পর্যন্ত খাই নি।

শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থের হাসি হাসলাম এক গাল।

রাজা বাহাদুর বললেন—এত কষ্ট করে আপনি যে আসবেন সে ভাবতেই পারিনি। বড় আনন্দ হল, ভারি আনন্দ হল। চলুন চলুন ওপরে চলুন।

এত গুণ না থাকলে কি আর রাজা হয়। একেই বলে রাজোচিত বিনয়।

রাজাবাহাদুর বললেন—আগে স্নান করে রিফ্রেশ্‌ড হয়ে আসুন, টি ইজ গেটিং রেডি। বোয়, সাহাবকো গোসলখানামে লে যাও।

চল্লিশ বছরের দাড়িওয়ালা বয় নিঃসন্দেহ বাঙালী। তবু হিন্দী, করে হুকুমটা দিলেন রাজাবাহাদুর, কারণ ওটা রাজকীয় দস্তুর। বয় আমাকে গোসল-খানায় নিয়ে গেল।

আশ্চর্য এই জংগলের ভেতরেও এত নিখুঁত আয়োজন। এমন একটা বাথরুমে জীবনে আমি স্নান করি নি। র‍্যাকেটে তিন চারখানা সদ্য পাট ভাংগা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপ কেসে তিন-রকমের নতুন সাবান, র‍্যাকে দামী দামী তেল, লাইমজুস। অতিকায় বাথ্‌ টাব—ওপরে ঝাঁঝরি। নিচে টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে ধারাস্নানের ব্যবস্থা। একেবারে রাজকীয় কারবার—কে বলবে এটা কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল নয়। র‍্যাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাংগার ধুতি, সিল্কের লুংগি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।

বয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। নিয়ে গেল ড্রেসিং রুমে। ঘরজোড়া আয়না, পৃথিবীর যা কিছু প্রসাধনের জিনিস কিছু আর বাকি নেই এখানে।

ড্রেসিং রুম থেকে বেরুতে সোজা ডাক পড়ল রাজাবাহাদুরের লাউঞ্জে। রাজা-বাহাদুর একখান চেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে ম্যানিলা চুরুট খাচ্ছিলেন। বললেন, আসুন চা তৈরী।

চায়ের বর্ণনা না করাই ভালো। চা, কফি, কোকো, ওভালটিন, রুটি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট ঠান্ডা মাংস, কলা থেকে আরম্ভ করে পিচ্‌ পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।

সেই গন্ধমাদন থেকে যা পারি গোগ্রাসে গিলে চললাম আমি। রাজাবাহাদুর কখনো এক টুকরো রুটি খেলেন, কখনো একটা ফল, অর্থাৎ কিছুই খেলেন না, শুধু পর পর কাপ তিনেক চা ছাড়া। তারপর আর একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখুন।

—দেখলাম। প্রকৃতির এমন অপূর্ব রূপ জীবনে আর দেখিনি। ঠিক জানালার নিচেই মাটিটা খাড়া তিন চারশো ফুট নেমে গেছে, বাড়িটা যেন ঝুলে আছে সেই রাক্ষুসে শূন্যতার ওপর। তলায় দেখা যাচ্ছে ঘন জংগল, তার মাঝ দিয়ে পাহাড়ী নদীর একটা সংকীর্ণ নীলোজ্জ্বল রেখা। যতদূর দেখা যায়, বিস্তীর্ণ অরণ্য চলেছে প্রসারিত হয়ে; তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের প্রহরা।

আমার মুখ দিয়ে বেরুল—চমৎকার। রাজাবাহাদুর বললেন—রাইট্‌। আপনারা কবি মানুষ, আপনাদের তো ভালো লাগবেই। আমারই মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে মশাই! কিন্তু নিচের ওই যে জংগলটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি বড় সুবিধের জায়গা নয়। টেরাইয়ের ওয়ান্‌ অব দি ফিয়ার্সেস্ট্‌ ফরেস্টস্‌। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।

আমি সভয়ে জংগলটার দিকে তাকালাম। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট্‌! কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। চারশো ফুট নীচে ওই অতি-কায় জংগলটাকে একটা নিরবিচ্ছিন্ন বেঁটে গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে, নদীর রেখাটাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল একখানা পাতের মতো। আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দর। অফুরন্ত রোদে ঝলমল করছে অফুরন্ত প্রকৃতি—পাহাড়টা যেন গাঢ় নীল রঙ দিয়ে আঁকা। মনে হয়, ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ওই স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য যেন আদর করে বুকে টেনে নেবে রাশি রাশি পাতার একটা নরম বিছানার ওপরে। অথচ—

আমি বললাম—ওখানেই শিকার করবেন নাকি?

—ক্ষেপেছেন, নামব কী করে! দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারীর বন্দুক গিয়ে পৌঁছায় নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকে।

—মাছ ধরেন। আমি হাঁ করলাম : মাছ ধরেন কি রকম? ওই নদী থেকে নাকি?

সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। দরকার হলে পরে দেখতে পাবেন—রাজাবাহাদুর রহস্যময়ভাবে মুখ টিপে হাসলেন : আপাতত শিকারের আয়োজন করা যাক, কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবে। তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে আমার অনেক হাংগাম।

—কিছু বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর জবাব দিলেন না, শুধু হাসলেন। তারপর ম্যানিলা চুরুটের খানিকটা সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে বললেন—আপনি রাইফেল ছুঁড়তে জানেন?

বুঝলাম, কথাটাকে চাপা দিতে চাইছেন। সংগে সংগে জিহ্বাকে দমন করে ফেললাম আমি, এর পরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটা সংগত হবে না শোভনও নয়। সেটা কোর্ট-ম্যানারের বিরোধী।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন—রাইফেল ছুঁড়তে পারেন?

বললাম —ছেলেবেলায় এয়ার গান ছুঁড়েছি। রাজাবাহাদুর হেসে উঠলেন—

তা বটে। আপনারা কবি মানুষ, ওসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার আপনাদের মানায় না। আমি অবশ্য বারো বছর বয়সেই রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আপনি চেষ্টা করে দেখুন না, কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

উঠে দাঁড়ালেন রাজাবাহাদুর। ঘরের একদিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমি দেখলাম—এ শুধু লাউঞ্জ নয়, রীতিমতো একটা ন্যাচারাল মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগার। খাওয়ার টেবিলেই নিমন্ত্রণ ছিলাম বলে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, নইলে এর আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

চারদিকে সারি সারি নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র। গোটাচারেক রাইফেল, ছোট বড় নানা রকম চেহারা। একটা হুকের সঙ্গে খাপে আঁটা এক জোড়া রিভলবার ঝুলছে; তার পাশেই দুলছে খোলা এক-খানা লম্বা শেফিল্ডের তরোয়াল— সূর্যের আলোর মতো তার ফলার নিষ্কলঙ্ক রঙ। মোটা চামড়ার বেল্টে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ—রাইফেলের, রিভলভারের। জরিদার খাপে খানতিনেক নেপালী ভোজালি। আর দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানারকমের চামড়া—বাঘের, সাপের, হরিণের গো-সাপের। একটা টেবিলে অতিকায় হাতীর মাথা—দুটো বড় বড় দাঁত এগিয়ে আছে সামনের দিকে। বুঝলাম—এরা রাজাবাহাদুরের বীরকীর্তির নিদর্শন।

ছোট একটা রাইফেল তুলে নিয়ে রাজা-বাহাদুর বললেন—একটা লাইট জিনিস। তবে ভালো রিপিটার; অনায়াসে বড় বড় জানোয়ার ঘায়েল করতে পারেন।

আমার কাছে অবশ্য সবই সমান। লাইট রিপিটার যা, হাউইটজার কামানও তাই; তবু সৌজন্য রক্ষার জন্যে বলতে হল—বাঃ, তবে তো চমৎকার জিনিস।

রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে : তাহলে চেষ্টা করুন। লোড করাই আছে, ছুঁড়ুন ওই জানালা দিয়ে।

আমি সভয়ে তিন পা পেছিয়ে গেলাম। জীবনে বেকুবি অনেক করেছি। কিন্তু তার পরিমানটা বাড়াতে আর প্রস্তুত নই। যুদ্ধ ফেরৎ এক বন্ধুর মুখে তাঁর রাইফেল ছোঁড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা শুনেছিলাম—পড়ে গিয়ে পা ভেঙে নাকি তাঁকে এক মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। নিজেকে যতদূর জানি—আমার ফাঁড়া শুধু পা ভাঙার ওপর দিয়েই কাটবে বলে মনে হয় না।

বললাম—ওটা এখন থাক, পরে হবে না হয়। রাজাবাহাদুর মৃদু কৌতুকের হাসি হাসলেন। বললেন, এখন ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু একবার ধরতে শিখলে আর ছাড়তে চাইবেন না। হাতে থাকলে বুঝবেন কত বড় শক্তিমান আপনি। ইউ ক্যান ইঞ্জিলি ফেস অল দ্য রাস্কেলাস অব—অব—

হঠাৎ তাঁর চোখ ঝকঝকে করে উঠল। মৃদু হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে উঠলো মুখের পেশীগুলো : অ্যান্ড এ রাইভ্যাল—

মুহূর্তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। রাজাবাহাদুরের দুচোখে বন্য হিংস্রা। রাইফেলটা এমন শক্ত মুঠিতে বাগিয়ে ধরেছেন যেন সামনে কাউকে গুলি করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন তিনি। উত্তেজনার ঝোঁকে আমাকেই যদি লক্ষ্য ভেদ করে বসেন তাহলে—

আতঙ্কে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। কিন্তু ততক্ষণে মেঘ কেটে গেছে রাজা-রাজড়ার মেজাজ! রাজা-বাহাদুর হাসলেন।

—ওয়েল, পরে আপনাকে তালিম দেওয়া যাবে। সবই তো রয়েছে, যেটা খুশী আপনি ট্রাই করতে পারেন। চলুন, এখন বারান্দায় গিয়ে বসা যাক, লেটস্ হ্যাভ সাম এনার্জি।

প্রাতরাশেই প্রায় বিন্ধ্য পর্বত উদরসাৎ করা হয়েছে আর কী হলে এনার্জি সঞ্চিত হবে বোঝা শক্ত। কিন্তু কথাটা বলেই রাজা-বাহাদুর বাইরের বারান্দার দিকে পা বাড়িয়েছেন। সুতরাং আমাকেও পিছু নিতে হল।

বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল। এখানে ঢোকবার পরে এত বিচিত্র রকমের আসনে বসছি যে আমি প্রায় নার্ভাস হয়ে উঠেছি। তবু যেন বেতের চেয়ারে বসতে পেয়ে খানিকটা সহজ অন্ত-রঙ্গতা অনুভব করা গেল। এটা অন্তত চেনা জিনিস।

আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল এনার্জি কথাটার আসল তাৎপর্য কী। বেয়ারা তৈরীই ছিল, ট্রেতে করে একটি ফেনিল গ্লাস সামনে এনে রাখল—আল-কোহলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

রাজাবাহাদুর স্মিত হাস্যে বললেন—চলবে? সবিনয়ে জানালাম, না।

—তবে বিয়ার আনবে? একেবারে মেয়েদের ড্রিঙ্ক! নেশা হবে না।

—নাঃ থাক। অভ্যেস নেই কোনো-দিন।

—হুঁঃ, গুড কন্ডাক্টের প্রাইজ পাওয়া ছেলে। রাজাবাহাদুরের স্বরে অনুকম্পার আভাস : আমি কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সেই প্রথম ড্রিঙ্ক ধরি।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপার—সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা। সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যক। ট্রে বারবার যাতায়াত করতে লাগল; রাজাবাহাদুরের প্রখর উজ্জ্বল চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে এল ক্রমশ, ফর্সা লাল গোলাপী রং ধরল। হঠাৎ অসুস্থ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

—আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন?

এরকম একটা প্রশ্ন করলে বোকার মত দাঁত বের করে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই! আমিও তাই করলাম।

—বলতে পারলেন না?

—না।

—আপনি মানুষ মারতে পারেন?

এ আবার কী রকম কথা। আমার আতঙ্ক জাগল।

—না।

—তাহলে বলতে পারবেন না, ইউ আর অ্যাবসোলিউট্লি হোপলেস।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন রাজাবাহাদুর। বলে গেলেন : আই পিটি ইউ।

বুঝলাম নেশাটা বেশ চড়েছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে বসে রইলাম সেখানেই। খানিক পরেই ঘরের ভেতরে নাক ডাকার শব্দ। তাকিয়ে দেখি তাঁর লাউঞ্জের সেই চেয়ারটায় হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন রাজাবাহাদুর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি উড়ছে ভনভন করে।

সেইদিন রাত্রেই শিকারের প্রথম অভিজ্ঞতা। জঙ্গলের ভেতর বসে আছি মোটরে। দুটো তীব্র হেড-লাইটের আলো পড়েছে সামনের সংকীর্ণ পথে আর দুধারের শাল বনে। ওই আলোক-রেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটায় যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকার। রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারদিকে —অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়ে। এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দূরের কোন পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে, ঝোপের ভেতরে অজগর প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিণের পাল আর কোনো একটা খাদের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। কালো রাত্রিতে জেগে রয়েছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন।

রোমাঞ্চিত ভীত প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে আছি মোটরের মধ্যে। কিন্তু হিংসার রাজত্ব শালবন ডুবে আছে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতায়। শুধু কানের কাছে অবিশ্রান্ত মশার গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে—শালের পাতায় উঠছে এক একটা মৃদু মর্মর। আর কখনো কখনো ডাকছে বন-মুরগী, ঘুমের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে ময়ূর। মনে হচ্ছে এই গভীর ভয়ংকর অরণ্যের ভয়ংকর প্রাণীগুলো যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা নিশ্চিত কোনো মুহূর্তেরই প্রতীক্ষা করে আছে।

আমরাও প্রতীক্ষা করে আছি। মোটরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে বসে আছি আমরা—একটি কথাও বলবার উপায় নেই। রাইফেলের একটা ঝকঝকে নল এঞ্জিনের

পাশে বাড়িয়ে দিয়ে শিকারী বাঘের মতোই তাকিয়ে আছেন রাজাবাহাদুর। চোখ দুটো উদগ্র প্রখর হয়ে আছে হেড লাইটের তীব্র আলোক রেখাটার দিকে, একটা জানোয়ার ওই রেখাটা পেরুবার দুঃসাহস করলেই রাইফেল গর্জন করে উঠবে।

কিন্তু জঙ্গলে সেই আশ্চর্য স্তব্ধতা। অরণ্য যেন আজ রাত্রে বিশ্রাম করছে, একটি রাত্রের জন্যে ক্লান্ত হয়ে জানোয়ারগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে খাদের ভেতরে, ঝোপের আড়ালে। কেটে চলেছে মন্থর সময়। রাজাবাহাদুরের হাতের রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা একটা সবুজ চোখের মতো জ্বলছে, রাত দেড়টা পেরিয়ে গেছে। ক্রমশ উসখুস করছেন উৎকর্ণ রাজাবাহাদুর।

—নাঃ হোপলেস। আজ আর পাওয়া যাবে না। বহুদূর থেকে একটা তীক্ষ্ণ গম্ভীর শব্দ, হাতীর ডাক! ময়ূরের পাখা ঝাপটানি চলছে মাঝে মাঝে। এক ফাঁকে একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠল, রাত্রি ঘোষণা করে গেল শেয়ালের দল। কিন্তু কোথায় বাঘ, কোথায় বা ভালুক? অন্ধকার বনের মধ্যে দ্রুত কতকগুলো ছুটন্ত খুরের আওয়াজ—পালিয়ে গেল হরিণের পাল। কিন্তু কোনো ছায়া পড়ছে না আলোক-বৃত্তের ভেতরে। মশার কামড় যেন অসহ্য হয়ে উঠছে।

—বৃথাই গেল রাতটা।—রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি ভেঙে পড়ল : ডেভিল লাক। সীটের পাশ থেকে একটা ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে ঢাললেন গলাতে, ছড়িয়ে পড়ল হুইস্কির উগ্র উত্তপ্ত গন্ধ।

—থ্যাংক হেভেন্স। —রাজাবাহাদুর হঠাৎ নড়ে বসলেন চকিত হয়ে। নক্ষত্রবেগে হাতটা চলে গেল রাইফেলের ট্রিগারে। শিকার এসে পড়েছে।

আমিও দেখলাম। বহুদূরে আলোর রেখাটার ভেতরে কী একটা জানোয়ার দাঁড়িয়ে পড়েছে স্থির হয়ে। এমন একটা জোরালো আলো চোখে পড়াতে কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে এই দিকেই। দুটো প্রদীপের আলোর মতো ঝিক ঝিক করছে তার চোখ।

ড্রাইভার বললে—হায়না।

—ড্যাম।—রাইফেল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন রাজাবাহাদুর, কিন্তু পরমুহূর্তেই চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন—থাক, আজ ছুঁচোই মারব।

দুম্ করে রাইফেল গর্জন করে উঠল। কানে তালা ধরে গেল আমার, বারুদের গন্ধে বিস্বাদ হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র। অব্যর্থ লক্ষ্য রাজাবাহাদুরের—পড়েছে জানোয়ারটা।

ড্রাইভার বললে—তুলে আনব হুজুর?

বিকৃতমুখে রাজাবাহাদুর বললেন—কী হবে? গাড়ি ঘোরাও।

রেডিয়াম ডায়ালের সবুজ আলোয় রাত তিনটে। গাড়ি ফিরে চলল হাণ্টিং-বাংলোর দিকে। একটা ম্যানিলা চুরুট ধরিয়ে রাজাবাহাদুর আবার বললেন—ড্যাম্!

কিন্তু কী আশ্চর্য—জঙ্গল যেন রসিকতা শুরু করেছে আমাদের সঙ্গে। দিনের বেলা অনেক চেষ্টা করেও দুটো-একটা বনমুরগী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না—এমনকি একটা হরিণ পর্যন্ত নয়। নাইট শুটিংয়েও সেই অবস্থা। পরপর তিন রাত্রি জঙ্গলের নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চেষ্টা করা হল, কিন্তু নগদ লাভ যা ঘটিল, তা অমানুষিক মশার কামড়। জঙ্গলের হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ মিলল না বটে, কিন্তু মশাগুলোকে চিনতে পারা গেল। এমন সাংঘাতিক মশা যে, পৃথিবীর কোথাও থাকতে পারে এতদিন এ-ধারণা ছিল না আমার।

তবে মশার কামড়ের ক্ষতিপূরণ চলতে লাগল গন্ধমাদন উজাড় করে। সত্যি বলতে কী, শিকার করতে না পারলেও মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না আমার। জঙ্গলের ভেতরে এমন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন কল্পনারও বাইরে। জীবনে এমন দামী খাবার কোনো দিন মুখে তুলিনি, এমন চমৎকার বাথরুমে স্নান করিনি কখনো, এত পুরু জাজিমের বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে প্রথম দিন তো ঘুমুতেই পারিনি আমি। নিবিড় জঙ্গলের নেপথ্যে গ্র্যান্ড হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছি—শিকার না হলেও কণামাত্র ক্ষতি নেই কোথাও। প্রত্যেক দিনই লাউঞ্জে চা খেতে খেতে চারশো ফুট নিচেকার ঘন জঙ্গলটার দিকে চোখ পড়ে। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত শ্যামলতা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে অপরূপ প্রসন্নতায়। ওয়ান অব দি ফিয়ার্লেস্ট ফরেস্টস্! বিশ্বাস হয় না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বাতাসে আকার-অবয়বহীন পত্রাবরণ সবুজ সমুদ্রের মতো দুলছে, চক্র দিচ্ছে পাখীর দল—এখান থেকে মৌমাছির মতো দেখায় পাখিগুলোকে; জানালার ঠিক নিচেই ইস্পাতের ফলার মতো পাহাড়ী নদীটার নীলিমোজ্জ্বল রেখা—দুটো-একটা নুড়ি ঝকমক করে মণিখণ্ডের মতো। বেশ লাগে।

তারপরেই চমক ভাঙে আমার। তাকিয়ে দেখি ঠোঁটের কোণে ম্যানিলা চুরুট পুড়ছে, অস্থির চঞ্চল পায়ে রাজাবাহাদুর ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেন। চোখেমুখে একটা চাপা আক্রোশ—ঠোঁটদুটোর নিষ্ঠুর কঠিনতা! কখনো ভোজালি তুলে নিয়ে নিজের হাতের ওপরে ফলাটা রেখে পরীক্ষা করেন সেটার ধার। আবার কখনো বা জানালার সামনে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিচের জঙ্গলটার দিকে। আজ তিন দিন থেকে উল্লেখযোগ্য একটা কিছু শিকার করতে পারেননি—ক্ষোভে তাঁর দাঁতগুলো কড়মড় করতে থাকে।

তারপরেই বেরিয়ে যান এনার্জি সংগ্রহের চেষ্টায়। বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাঁক দেন—পেগ।

কিন্তু পরের পয়সায় রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বিলাস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটা দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর-সংসার আছে, একটা দায়িত্ব আছে তার। সুতরাং চতুর্থ দিন সকালে কথাটা আমাকে পাড়তে হল।

বললাম, এবারে আমাকে বিদান দিন তাহলে। রাজাবাহাদুর সবে চতুর্থ পেগে চুমুক দিয়েছেন তখন। তেমনি অসুস্থ আর রক্তাভ চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি যেতে চান?

—হাঁ, কাজকর্ম রয়েছে—

—কিন্তু আমার শিকার আপনাকে দেখাতে পারলাম না।—

সে না হয় আর একবার হবে।

—হুম্।—চাপা ঠোঁটের ভেতরেই একটা গম্ভীর আওয়াজ করলেন রাজাবাহাদুর : আপনি ভাবছেন আমার ওই রাইফেল-গুলো, দেওয়ালে ওইসব শিকারের নমুনা—ওগুলো সব ফার্স?

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না, তা কেন ভাবতে যাব! শিকার তো খানিকটা অদৃষ্টের ব্যাপার—

—হুম্!—অদৃষ্টকেও বদলানো চলে। রাজাবাহাদুর উঠে পড়লেন : আমার সঙ্গে আসুন।

দুজনে বেরিয়ে এলাম। রাজাবাহাদুর আমাকে নিয়ে এলেন হান্টিং বাংলোর পেছন দিকটাতে। ঠিক সেখানে—যার চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের অন্যতম হিংস্র অরণ্য বিস্তীর্ণ হয়ে আছে।

এখানে আসতে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। দেখি কাঠের একটা রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতো জিনিস সেই সীমাহীন শূন্যতার ওপরে প্রায় পনেরো-ষোল হাত প্রসারিত হয়ে আছে। তার পাশে দুটো বড় বড় কাঠের চাকা, তাদের সঙ্গে হুক লাগানো দু' জোড়া মোটা কাছি জড়ানো। ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আসুন।—রাজাবাহাদুর সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। একটা আশ্চর্য বন্দোবস্ত। ঠিক সাঁকোটার নিচেই পাহাড়ী নদীটার রেখা, নুড়ি-মেশানো সংকীর্ণ বালুতট তার দু' পাশে, তাছাড়া জঙ্গল জঙ্গল। নিচে তাকাতে আমার মাথা ঘুরে উঠল। রাজাবাহাদুর বললেন, জানেন এসব কী?

—না।

—আমার মাছ ধরবার বন্দোবস্ত। এর কাজ খুব গোপনে—নানা হাঙ্গামা আছে। কিন্তু অব্যর্থ।

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আজ রাত্রেই বুঝতে পারবেন। শিকার দেখাতে আপনাকে ডেকে এনেছি, নতুন একটা শিকার দেখাব। কিন্তু কোনো-দিন এর কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।

কিছু না বুঝেই মাথা নাড়লাম—না।

—তাহলে আজ রাতটা অবধি থাকুন। কাল সকালেই আপনার গাড়ির ব্যবস্থা করব।—রাজাবাহাদুর আবার হান্টিং-বাংলোর সম্মুখের দিকে এগোলেন : 'কাল সকালের পরে এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবে না। একটা কাঠের সাঁকো, দুটো কপিকলের মতো জিনিস। মাছ ধরবার ব্যবস্থা, কাউকে বলা যাবে না এবং কাল সকালেই চলে যেতে হবে। সবটা মিলিয়ে যেন রহস্যের খাসমহল একেবারে। আমার কেমন এলোমেলো লাগতে লাগল সমস্ত। কিন্তু ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, রাজাবাহাদুরকে বেশি প্রশ্ন করতে কেমন অস্বস্তি লাগে আমার। অনধিকার চর্চা মনে হয়।

বাংলোর সামনে তিন-চারটে ছোট ছোট নোংরা ছেলেমেয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, হিন্দুস্থানী কীপারটার বেওয়ারিশ সম্পত্তি। কীপারটাকে সকালে রাজাবাহাদুর শহরে পাঠিয়েছেন। কিছু দরকারী জিনিসপত্র কিনে কাল সে ফিরবে। ভারী বিশ্বাসী আর অনুগত লোক। মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন হুটোপুটি করে ডাকবাংলোর সামনে। রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোখে দেখেন ওদের। দোতলার জানলা থেকে পয়সা রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফা-লুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে। আজও ছেলেমেয়েগুলো হুড়োহুড়ি করে তাঁর চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। বলল—হুজুর, সেলাম।—রাজা-বাহাদুর পকেটে হাত দিয়ে কতকগুলো পয়সা ছড়িয়ে দিলেন ওদের ভিতর। হরির লুটের মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

বেশ ছেলেমেয়েগুলি। দুই থেকে আট বছর পর্যন্ত বয়েস। আমার ভারি ভালো লাগে ওদের। আরণ্যক জগতের শ্বাপদ-শিশুদের মতো সতেজ আর জীবন্ত, প্রকৃতির ভেতর থেকে প্রাণ আহরণ করে বড় হয়ে উঠছে।

সন্ধ্যার ডিনার টেবিলে বসে আমি বললাম, আজ রাত্রে মাছ ধরবার কথা আছে আপনার।

চোখের কোণা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন রাজাবাহাদুর। লক্ষ্য করেছি, আজ সমস্ত দিন বড় বেশি মদ খাচ্ছেন আর ক্রমাগত চুরুট টেনে চলেছেন। ভালো করে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটে চলেছে তাঁর।

রাজাবাহাদুর সংক্ষেপে বললেন—হুম্।

আমি সসংকোচে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন হবে?

একমুখে ম্যানিলা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে তিনি জবাব দিলেন—সময় হলে ডেকে পাঠাব। এখন আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। স্বচ্ছন্দে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

শেষ কথাটা পরিষ্কার আদেশের মতো শোনালো। বুঝলাম আমি বেশীক্ষণ আজ তাঁর সঙ্গে কথা বলি এ তিনি চান না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলাটা অতিথি-পরায়ণ গৃহস্থের অনুনয় নয়, রাজার নির্দেশ। এবং সে নির্দেশ পালন করতে বিলম্ব না করাই ভালো।

কিন্তু অতি নরম জাজিমের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে না। মাথার ভেতরে আবর্তিত হচ্ছে অসংলগ্ন চিন্তা। মাছ ধরা, কাঠের সাঁকো, কপিকল, অত্যন্ত গোপনীয়! অতল রহস্য।

তারপর এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন যে চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল তা আমি নিজেই টের পাই নি।

মুখের ওপরে ঝাঁঝালো একটা টর্চের আলো পড়তে আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। রাত তখন কটা ঠিক জানি না। আরণ্যক পরিবেশ নির্জনতায় অভিভূত। বাইরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝির ডাক।

আমার গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কার। সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার। রাজাবাহাদুর বললেন—সময় হয়েছে, চলুন। আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম—ঠোঁটে আঙুল দিলেন রাজাবাহাদুর। — কোনো কথা নয়, আসুন।

এই গভীর রাত্রে এমনি নিঃশব্দ আহ্বান—সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেন। কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমার। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো রাজাবাহাদুরের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলাম।

হান্টিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা মৃত্যুর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝির ডাক—চারদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, আজও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা—এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে আছে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পা-ও সরতে চাইছে না আমার। মুখের ওপরে একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত।

টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে রাজা-বাহাদুর আমাকে সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার কাছে নিয়ে এলেন। দেখি তার ওপরে শিকারের আয়োজন। দুখানা চেয়ার পাতা, দুটো তৈরী রাইফেল। দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর নয় সেলের হান্টিং টর্চটা নিচের দিকে ফ্লাশ করলেন। প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পুঁটুলির মতো কী একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।

আমি বললাম, ওটা কি রাজাবাহাদুর?

—মাছের টোপ।

—কিন্তু এখনো কিছু বুঝতে পারছি না।

—একটু পরে বুঝবেন। এখন চুপ করুন। এবারে স্পষ্ট ধমক দিলেন আমাকে। মুখ দিয়ে ভক ভক করে হুইস্কির তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থ নেই। আর কিছুই বুঝতে পারছি না আমি—আমার মাথার ভেতরে সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। একটা দুর্বোধ্য নাটকের নির্বাক দ্রষ্টার মতো রাজা-বাহাদুরের পাশের চেয়ারটাতে আসন নিলাম আমি।

ওদিকে ঘন কালো বনান্তের ওপরে ভাঙা চাঁদ দেখা দিল। তার খানিকটা ম্লান আলো এসে পড়ল চারশো ফুট নিচের নদীর জলে, তার ছড়ানো মণিখণ্ডের মতো নুড়িগুলোর ওপরে। আবছাভাবে যেন

দেখতে পাচ্ছি—কাঁপিকলের দড়ির সঙ্গে-বাঁধা সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছে বালির ওপরে। এক হাতে রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আছেন, আর এক হাতে মাঝে মাঝে আলো ফেলছেন নিচের পুঁটলিটায়। চকিত আলোয় যেটুকু মনে হচ্ছে—পুঁটলিটা যেন জীবন্ত অথচ কী জিনিস কিছু বুঝতে পারছি না। এ নাকি মাছের টোপ। কিন্তু কী এ মাছ—এ কিসের টোপ?

আবার সেই স্তব্ধতার প্রতীক্ষা। মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। রাজাবাহাদুরের টর্চের আলো থারে থারে পিছলে পড়ছে নিচের দিকে। দিগন্ত প্রসার হিংস্র অরণ্য ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরঙ্গিত একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা ঝকঝক করছে, যেন একখানা খাপ-খোলা তলোয়ার। অবাক বিস্ময়ে আমি বসে আছি। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। টোপ ফেলে মাছ ধরছেন রাজাবাহাদুর।

অথচ সব ধোঁয়াটে লাগছে আমার; কান পেতে শুনছি ঝিঁঝির ডাক, দূরে হাতীর গর্জন, শালপাতার মর্মর। এ প্রতীক্ষার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্য। শুধু হুইস্কি আর ম্যানিলা চুরুটের গন্ধ নাকে এসে লাগছে আমার। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে, রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির কাঁটা চলছে ঘুরে। ক্রমশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ক্রমশ যেন ঘুম এল আমার। তার পরেই হঠাৎ কানের কাছে বিকট শব্দে রাইফেল সাড়া দিয়ে উঠল — চারশো ফুট নিচে থেকে ওপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল প্রচণ্ড বাঘের গর্জন। চেয়ারটা শুদ্ধ আমি কেঁপে উঠলাম। টর্চের আলোটা সোজা পড়ছে নুড়ি-ছড়ানো বালির ডাঙাটার ওপরে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম ডোরাকাটা অতিকায় একটা বিশাল জানোয়ার সাদা পুঁটলির ওপরে একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সাপের মতো ল্যাজ আছড়াচ্ছে অন্তিম আক্ষেপে। ওপর থেকে ইন্দ্রের বজ্রের মতো অব্যর্থ গুলি গিয়ে লেগেছে তার মাথায়। এত ওপর থেকে দুর্নিবার মৃত্যু নামবে আশংকা করতে পারে নি। রাজাবাহাদুর সোৎসাহে বললেন—ফতে!

এতক্ষণে মাছ ধরবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। সোল্লাসে বললাম, মাছ তো ধরলেন, ডাঙায় তুলবেন কেমন করে?

—ওই কপিকল দিয়ে। এই জন্যেই তো ওগুলোর ব্যবস্থা।

ব্যাপারটা যেমন বিচিত্র, তেমনি উপভোগ্য। আমি রাজাবাহাদুরকে অভিনন্দিত করতে যাব, এমন সময়—এমন সময়—পরিষ্কার শুনতে পেলাম শিশুর গোঙানি। ক্ষীণ অথচ নির্ভুল। ও কিসের শব্দ।

চারশো ফুট নিচে থেকে ওই শব্দটা আসছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই! মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কিন্তু বড় দেরীতে। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার। কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?

—চুপ—একটা কালো রাইফেলের নল আমার বুকে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর। তারপরেই আমার চারদিকে পৃথিবীটা পাক খেতে খেতে হাওয়ায় গড়া একটা বুদ্বুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল। রাজাবাহাদুর জাপটে না ধরলে চারশো ফুট নিচেই পড়ে যেতাম হয়তো।

কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জংগলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেংগল মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর, লোককে ডেকে দেখানোর মতো।

তার আট মাস পরে এই চমৎকার চটি-জোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র দত্ত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাঠক অনেক ভক্ত পাঠকও কম নয়। আমার মতন একজন সাধারণস্বভাবী পাঠকের পক্ষে সমগ্রভাবে মানুষটিকে এবং তাঁর গল্প পড়ে কি মনে হয়েছে, এখানে তা-ই বলার চেষ্টা করছি। তাঁর গল্পের ভাল-মন্দের বিচারক যাঁরা আছেন, তাঁরা সে-কাজ করুন। এখানে বক্তব্য আমার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত।

আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বারো-তেরো বছর বয়সের কিশোর তখন। সম্ভবত ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। মাসপয়লা'-য় প্রথম কবিতা বেরোয়। লেখকের নামে ছিল ডাক নাম নারান। সেই থেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামের প্রচলন।

এই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হলেন তিরিশের কালের কনিষ্ঠতম কথাকার। চারের দশকের আরম্ভেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষকুমার ঘোষ ইত্যাদির মধ্যে এ'কে প্রধানত পাওয়া গেলেও তিরিশের কালের তারাশংকর, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির উত্তরাধিকারকে সার্থকভাবে বহন করার নান্দনিক কর্তব্য-চেতনা নিয়েই দেখা দিলেন।

কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য-ভাবনা তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে। উনিশ শ' তিরিশের যে মাসে তরুণ সংঘের যে বিপ্লবী আন্দোলন—সত্যাগ্রহ আন্দোলন—তাতে মেতে ওঠেন। তখন কিশোর বয়সের শেষের দিক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন লিখছেন কবিতা। একদিকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির আবেগে মেতে ওঠা, আর একদিকে কবিতার ছন্দ, মিলের মধ্যে নিজেকে গোপন করা। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরেই দেশ পত্রিকায় প্রথম কবিতা বেরোয়। নিজের পরাধীন দেশকে ভালবাসার কবিতা লিখছেন তখন।

বিপ্লবী রাজনীতির সূত্রে মাদারিপুর থেকে চলে এলেন বরিশালে—দিদির বাড়ি। বি এম কলেজে ভর্তি হলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু পেলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে। কলেজে পড়ার সময়েই জেলে যান। সম্ভবত সেটা উনিশ শ' ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ সাল। কলেজের ছাত্র, পড়তে ভালবাসতেন ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ, বার্নার্ড শ। রাজনীতিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছেন। কিন্তু পার্টি প্রোগ্রামই রাজনীতির শেষ কথা নয়—এ-বোধ তখন নারায়ণবাবুর মনে জাগতে শুরু করেছে। সমাজবাদ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া মানব-প্রীতি তাঁর একমাত্র সম্পদ হতে শুরু করেছে তখন থেকেই।

দেশ, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, প্রবাসী ইত্যাদিতে কবিতা লিখছেন তখনো। ছন্দ আর মিলের জগতেই তখনো ঘুরছেন। তখন ফরিদপুরে। মানুষকে আপন ভাবতে শিখছেন। বড় আপন হল মাটি, মানুষ। রাজনীতি তাঁকে উত্তেজিত করে, কিন্তু মাটি, মানুষ তাঁকে মুগ্ধ করে, ঘনিষ্ঠ, সহজ, রক্তের আত্মীয়তা এনে দেয়। আমার মনে হয়, একদা যেমন রবীন্দ্রনাথ পদ্মার চরের মাটিতে পা রেখে, মানুষকে দেখে গল্পের জগতে এসে গেলেন, নারায়ণবাবুও তেমনি মাটি ও মানুষের টানেই গল্প লিখে ফেললেন ফরিদপুরে বসেই।

গল্পের নাম 'নিশীথের মায়া'। ছাপা হল 'দেশে'। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তখন সম্পাদক। এটি একটি ঘটনা। ঘটনা এই কারণে, কবি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর পর থেকে একের পর এক গল্পগুলি লিখে চললেন। বরিশাল থাকতে থাকতেই লিখলেন 'ঝড় আসিতেছে,' 'বাঁচিবার অধিকার' ইত্যাদি গল্প। 'ঝড় আসিতেছে' গল্প সম্পর্কে নারায়ণবাবু একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, 'গল্পটি একটি চেনা মেয়েকে দেখে লেখা। তেমন উল্লেখযোগ্য গল্প যদিও নয়, তবু পরিচিত মেয়েটির কথা এই গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে ভাল লাগে। মেয়েটির পাকা দেখা হয়ে গেছে, বিয়ে হবে সামনের কোন একটি তারিখে। পুকুরের ঘাটে বসে গালে হাত দিয়ে কিছু একটা ভাবছে।' নারায়ণবাবুর কেন যেন মনে হল, মেয়েটির পছন্দ হওয়ার পর ও বিয়ের আগের মনের অবস্থা নিয়ে গল্প লিখলে কেমন হয়? এ গল্পের জন্ম সেখানেই।

'বাঁচিবার অধিকার' গল্পের সঙ্গে মাণিকবাবুর' আত্মহত্যার অধিকার'-এর কথা মনে হওয়া হয়তো স্বাভাবিক। নারায়ণবাবু তখন কলেজ-জীবনে এসে তাঁর প্রিয় লেখক অচিন্ত্যকুমার পড়ছেন, পড়ছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির রচনা। তারাশংকরের 'নারী ও নাগিনী' গল্পের সেই 'রোবস্টনেস' —পৌরুষের দীপ্তি, অচিন্ত্যকুমারের মাটি ও মানুষের এমন অন্তরঙ্গ কথা, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মম নিরাসক্ত জীবনাগ্রহ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের জটিল মানবমন অন্বেষণের গল্প নারায়ণবাবুর গল্পকার মনটিকে গড়ে তুলতে থাকে।

এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। নারায়ণবাবু প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়লেন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে। জীবন সম্পর্কে নতুন দীক্ষা নিলেন। যুদ্ধ, মন্বন্তর, গণবিক্ষোভ ও দেশ বিভাগজাত স্বাধীনতা—এ-সবের ক্ষেত্রফলে সেদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবনায় ও গল্পে বিভ্রান্তি নেই একটুও। তার কারণ ছিল একটি বিশুদ্ধ সময়-সচেতনা, জীবন-প্রেম মানুষকে ভালবাসা বা বলা যায় তিরিশের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া—তা-ই ছিল তাঁর সহজ ললাটলিখন তাই একটুও পথভ্রষ্ট হননি।

যুদ্ধ শেষ হল। দেশ বিভাগ হল। পঞ্চাশের ও ষাটের দশক কালের নিয়মে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল। এসবের মধ্যে যে গণ-বিক্ষোভ, সাহিত্যে যে প্রগতি লেখক আন্দো-

লনের স্বাক্ষর (যুদ্ধের সময়েই এই আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে)—তার সূত্র ধরলেন স্পষ্ট করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যান্য লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ ইত্যাদির সঙ্গে একভাবে পা ফেলে, হেঁটে।

এসব থেকে জীবনের বাসনা, মানুষকে ভালবাসার দীক্ষা দৃঢ়তর হয়েছে গল্প-লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বহু গল্পে তার প্রমাণ মেলে। বালক বয়স থেকে যৌবনের প্রথম পদক্ষেপ পর্যন্ত কবিতার ছন্দ-মিল চর্চা রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়া, তিরিশের অগ্রজ লেখকদের কাছ থেকে মাটি ও মানুষকে ভালবাসার গোপন দীক্ষা গ্রহণ, যুদ্ধকালীন মানুষের পক্ষে মানবতাকে অস্বীকার করে বীভৎসতায় সাধনাকে ঘৃণা—এসব বিষয় গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনটিকে গড়ে তুলেছে।

নারায়ণবাবুর গল্পে মানুষের মূল্য যে কত বড়, তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গেই জড়িত। তিনি বলেছেন, 'মানুষের হীনতা-দীনতা ও ক্ষুদ্রতার ছবি দেখেছি। মানুষের লোকালয়ের পরিচয়ও যে পাইনি তা নয়। কিন্তু এসব থেকে মানুষ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই বেড়েছে।' আরও বলেছেন, 'বাংলাদেশকে এত ভালবাসি' যেখানেই যাই বাংলাদেশকে ভুলতে পারি না।'

নিজের সম্পর্কে এই দুটি মন্তব্যই তাঁর ছোটগল্পের মূল লক্ষ্যকে স্পষ্ট করবে বলে আমার বিশ্বাস। নারায়ণবাবুকে যখন জিজ্ঞেস করেছি, তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প—কোনটা লিখতে বেশী ভালবাসেন? তিনি জোর গলায় বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই ছোটগল্প' উপন্যাস তো দায়ে পড়ে লেখা। ছোটগল্প লিখে অনেক বেশী তৃপ্তি পাই।' বাস্তবিকই চল্লিশের দশক কেন, পরবর্তী দুটি দশকের লেখকের মধ্যে নারায়ণবাবু ছোটগল্পে অভাবনীয়ভাবে সিদ্ধহস্ত লেখক। গল্পকার হিসেবে তিনি অতি-সতর্ক লেখক। অল্প বয়সের লেখায় মোপাঁসা, চেখভ তাঁকে কিছু প্রেরণা দিয়েছে। ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথ, গোর্কী, টলস্টয় তাঁকে মুগ্ধ করেছে, বিশেষ করে আকর্ষণবোধ করেছেন লরেন্সের রচনায়। গ্রাহাম গ্রীন মম, বেট্স, ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন তখন। বেশী বয়সে হেমিংওয়ে, ফকনার তাঁকে বেশ কিছু সময় ধরে রাখেন। তিনি বলেছেন, 'হাল আমলে ইতালীয়ান লেখক কার্লো এভরো, পিয়ানদেল্লো, জেরোম ওয়াডম্যান ইত্যাদির গল্পে ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করি।'

গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সচেতন-ভাবে কারোর দ্বারা প্রভাবিত হননি। নিজের পথে, নিজের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও কল্পনা-শক্তি নিয়ে গল্প লিখতে বসেন। লিখতে বসে তিনি তাঁর গল্পে তিনটি দিক মনে রাখেন। তাঁর মতে 'জীবনের ক্ষতি ও ক্ষত শেষ কথা নয়, জীবনকে ভালবাসাই একমাত্র সত্য।' আর ছোটগল্পে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, 'আইডিয়ার সার্থকটই সত্য, চরিত্রবৃত্ত সম্পূর্ণ হোক না হোক।' সবশেষে তিনি চেয়েছেন বাংলাদেশকে ভালবেসে ছোটগল্পেও তাকে না ভুলতে। অবশ্য নিজে তিনি যাই বলুন, চরিত্র-সৃষ্টিতেই তিনি অতি সুদক্ষ।

মানুষ জীবন, সময়। যে কোন একজন সং লেখকের এই তিনটি প্রধান আশ্রয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সময়কে একবারও বিস্মৃত হননি, মানুষকে হৃদয়ের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন, আর জীবনপিপাসাকে আকণ্ঠ ধারণ করেছেন। সময়কে সঙ্গী করে ঘুরেছেন হিমালয় (রায়, সিং ও ঘাটে এবং আজিজুল) থেকে শহর কলকাতার মনোহর-পুকুর রোড (হাড়), শাল-মহুয়া-ঘেরা সাঁওতাল পরগণা (বীতংস) থেকে পূর্ববঙ্গ (আবাদ), রামগঙ্গা এস্টেটের অরণ্যভূমি (টোপ), অতিসাধারণ গ্রাম (নক্রচরিত, দুঃশাসন), মফঃস্বল শহর (বৃষ্টি)—সবত্র।

জমিয়ে পরিবেশ তৈরি করে গল্প বলে মন্ত্রমুগ্ধ করার মত অসাধারণ ক্ষমতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সুন্দরলাল (বীতংস), ইব্রাহিম দারোগা ও নিশিকান্ত কর্মকার (নক্রচরিত), ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার দেবীদাস (দুঃশাসন), রামগঙ্গা এস্টেটের এন আর চৌধুরী (টোপ) পরাণ মণ্ডল (আবাদ), বুলাকিরাম (জন্মান্তর), অনিরুদ্ধ ও মমতা (মর্গ), কাফিলদ্দি মাঝি (কমলাবদন) ইত্যাদি দোষে-গুণে, ভুল-ভ্রান্তিতে জড়ানো মানুষগুলির কথা এমনভাবে শুনিয়েছেন তিনি, তারা সহজেই যেন রক্তের মমতায় আমাদের মনের কোমল কোণটিকে অধিকার করে বসে।

সেই সময়কে পাশে নিয়ে মানুষ আর জীবনের বাঁচার কথা বলার চেষ্টা। এ-বাঁচা মুক্ত যৌনতার বিকৃতি থেকে বাঁচা, পেটের ক্ষুধা থেকে বাঁচা, মানুষের জন্যে মানুষের বাঁচা, জীবনকে বলিষ্ঠ এক বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঁচা, নর-নারীর হৃদয়ের গোপনতম সম্পর্কের সুস্থতার জন্য বাঁচা। এই জীবনধারা এবং জীবনতৃষ্ণার অপরূপ রূপকার হলেন গল্পলেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলঙ্কবতী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
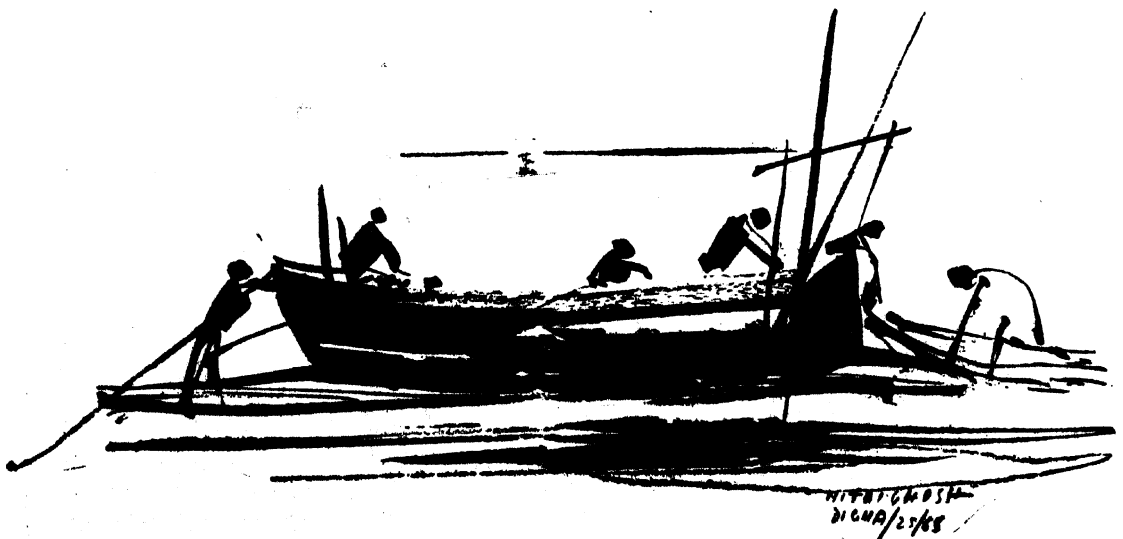
মায়াবল্লী পাহাড়টা দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত রাজস্থানকে যেন মাঝামাঝি চিরে দিয়ে গেছে।

উত্তর-পূর্ব পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রায় টঙের ওপর বসে আছে ভরতপুর। ছোট জায়গা। সকালের ঘুমভাঙা চোখ আকাশের দিকে চাইতে গেলে প্রথমেই পাহাড়ের গায়ে চোখ আটকে যায়।

একে তাকে জিজ্ঞাসা করতে বাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল। অবশ্য যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি সেই নিশানা বলে দিয়েছে। আমার কাছে সবই নতুন বলে হদিস পেতে সময় লাগছিল। তবু এ জায়গায় ভদ্রলোকটির নাম আছে বোঝা গেল। চারদিকে পরিচ্ছন্ন বাগান। মাঝখানের লালমাটির রাস্তাটা একেবারে বাড়ির সিঁড়ির গায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

গৃহস্বামীর নাম মাধব চতুর্বেদী। আমার পরিচিত নন, কখনো দেখিওনি তাঁকে। আমার বিশেষ একজন পরিচিত ভদ্রলোক তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভরতপুরে এঁর সঙ্গে শুধু দেখা করার জন্যেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন নি. সঙ্গে চিঠিও দিয়েছেন। শুনেছি, প্রাক্-স্বাধীনতার স্টেটের পদস্থ রাজ-কর্মচারী ছিলেন মাধব চতুর্বেদী। এখন অবসর নিয়েছেন।

এ জায়গায় একদিন থাকব কি সাত-দিন, নিজেও জানতাম না। ভালো আস্তানা পেলে আর ভালো লাগলে দিনকতক কাটাতে পারি। নয়তো সেইদিনই তল্পি-তল্পা গোটাতে পারি। মোট কথা, অবসর-প্রাপ্ত কোন ভদ্রলোকের ঘাড়ে চেপে বসার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। তবু প্রথমেই এঁর কাছে এলাম, কারণ, স্থানীয় অভিজ্ঞ কারো কাছে জায়গাটার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া দরকার।

ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে এতবড় বাগানঘেরা এমন ছবির মত বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে অস্বস্তি অনুভব করছি। পরনের খাকী ট্রাউজার, ছিটের বুশ শার্টের মলিনতা যেন বেশি করে চোখে পড়তে লাগল নিজেরই। কাঁধের খাকী ঝোলার মধ্যে যা আছে তাও এমন বাড়িতে খুব চলনসই নয়।

পায়ে পায়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির পরে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় এক প্রস্থ টেবিল চেয়ার। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি চাকর-বাকর যদি কাউকে দেখতে পাই। বারান্দার ওধারে ঘর থেকে একজন মহিলার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ঘটল। দুই-এক মুহূর্ত। মহিলা সরে গেলেন। একটু বাদেই তিনি ঘর থেকে বেরুলেন আবার। এবার শাড়ির ওপর গায়ে মাথায় বুকে একটা ঘন আকাশী রঙের ওড়না আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো। শুধু কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত অনাবৃত। ধীর শান্ত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। এমন ঢেকেঢুকে এলেন, অথচ কোথাও এতটুকু জড়তা আছে বলে মনে হল না. আমার নিজেরই কিছু বলা উচিত। কিন্তু বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে তিনিই স্পষ্ট হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই?

বললাম। তিনি স্বল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন আমাকে। আমার দিক থেকে আর বাক্‌স্ফুরণ হল না দেখে বললেন, বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

তেমনি শান্ত পায়ে প্রস্থান করলেন আবার। অনুমানে মনে হল ইনি গৃহ-স্বামিনী। শুধু মুখটুকু দেখে সঠিক বোঝা শক্ত। যৌবন যদি গিয়েও থাকে, যৌবনশ্রী প্রায় অটুট আছে। বারান্দার একটা চেয়ারে বসলাম। কেন জানি ভদ্রলোককে ভাগ্যমান বলে মনে হল। মহিলার শান্ত ঋজু ভাবটুকু বোধ করি মনে ছাপ ফেলে থাকবে। কিন্তু এমন কমনীয়তার ওপর এত বেশি আব্রু চোখে কি রকম ধাক্কা দেয়। কান, মুখের দু-পাশ এমন কি গলা পর্যন্ত ঢাকা। আবরণের আড়ালে থাকার প্রয়াসের থেকেও সরল নিষেধের ইঙ্গিতটাই যেন বেশি সুস্পষ্ট ঠেকে। ভাবলাম, হয়ত এটাই আভিজাত্য এখানকার।

মাধব চতুর্বেদী এলেন। নিজের অজ্ঞাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম. প্রৌঢ় কিন্তু স্বাস্থ্যোদ্দীপ্ত, সৌম্যদর্শন। পরনে ঢোলা পা-জামা আর পাঞ্জাবি। নমস্কার জানিয়ে পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে তাঁর হাতে দিলাম। আমায় বসতে আপ্যায়ন করে তিনি নিজেও বসলেন। চিঠি পড়ে সকৌতুকে তাকালেন আমার দিকে।

বেড়াতে এসেছেন?

পরিষ্কার বাংলা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ঘাড় নাড়লাম, পরে বলেই ফেললাম, আপনি তো সুন্দর বাংলা বলেন দেখছি?

হাসলেন একটু। —একটু আধটু শিখেছি। রাজস্থানে জয়পুর উদয়পুর ছেড়ে ভরতপুরে বেড়াতে এলেন?

ও-সব জায়গা ঘুরেই আসছি।

ও...এখানে কোথায় উঠেছেন?

বললাম, এই তো সবে আসছি, দেখে শুনে উঠব কোথাও. হোটেল আছে তো?

একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন তিনি। জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার জিনিসপত্র কোথায় রেখে এলেন?

হেসে ঝোলাটা দেখিয়ে দিলাম, সব এতেই আছে. সাজ থেকে শয্যা।

ঈষৎ বিস্ময়ে তিনি একবার ঝোলাটা এবং একবার আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, বাঙালীরা একটু বাবু মানুষ শুনেছিলাম, তার অন্যথা কথা। আপনি, অনুগ্রহ করে এই বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলে সম্মানিত হব।

এ ধরনের সৌজন্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত। তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম, সে কি কথা, আপনার নিশ্চয় অসুবিধে হবে। আমি বরং......

তিনি একখানা হাত তুলে নিরস্ত করলেন। বললেন, আমার নিশ্চয় কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। এতবড় বাড়িটিতে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী থাকি। আপনি যে ক-দিন খুশি এখানে থাকবেন। আপনার নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন।

কি বলি ভেবে পাচ্ছিলাম না। তিনি একজন ভৃত্যকে আদেশ দিলেন মাইজীকে ডেকে দিতে। ক্ষণকাল পরে সেই মহিলাটিই এলেন আবার। শাড়ির ওপর তেমনি ওড়না আঁটা। আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। তিনিও সবিনয়ে প্রত্যাভিবাদন জানালেন। আমি ফিরে বসতে তিনিও আসন নিলেন। মাধব চতুর্বেদী আমার পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। এবারে অবশ্য হিন্দিতে।... বাঙালী লেখক, আমাদের হেমরাজের বন্ধু —এই হেমরাজের চিঠি—কলকাতা থেকে রাজস্থানে বেড়াতে এসেছেন। এখানে হোটেলের খোঁজ করছিলেন. আমি ও'কে এখানেই থাকতে অনুরোধ করেছি।

মহিলা জবাব দিলেন, আমরা চেষ্টা করব ও'র কোন অসুবিধে যাতে না হয়, বা আতিথ্যে ত্রুটি না ঘটে।

চতুর্বেদী বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, আমি এক্ষুনি ও'র থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আর প্রাতরাশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তিনি চলে গেলেন। ভারি বিব্রত বোধ করছিলাম। মহিলাটির মধ্যে একটা বিচিত্র রকম অভিব্যক্তি—যাকে বলে পারসনালিটি আছে বটে। কিন্তু ও'র ওরকম ঠাণ্ডা ভাবটাও প্রায় অস্বস্তিকর। তাছাড়া, যাঁকে রীতিমত সুন্দরী বলে মনে হয় এবং ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে সেই রকম একজন মহিলা আপনার সামনে বসে, অথচ তাঁর দুটি চোখ, নাক, ঠোঁট এবং চিবুকের একটুখানি অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, সেটাই বা কেমন লাগে? তার পরেও চেষ্টা করলে তাঁর ঐ আপাদমস্তক জড়ানো বসনই যেন আপনাকে চোখ রাঙাবে।

কিন্তু ঠিক কিনা জানিনে, আমার এও মনে হল, মহিলাটিকে তাঁর স্বামীও রীতিমত সমীহ করেন। আমার পরিচয় দেওয়া, অথবা আতিথ্য গ্রহণের খবরটা দেবার সময়েও তাঁর মুখে একটু যেন বিনয় ভাব লক্ষ্য করেছি। মিসেস চতুর্বেদী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে তিনি দরাজ গলায় বললেন, বি অ্যাট হোম, স্যার। চান করবেন? না এই ঠাণ্ডায় আজ চান করে কাজ নেই, সহ্য হবে না। আমি রিটায়ার্ড ম্যান, এমনিতেই সময় কাটে না। তার ওপর আপনি লেখক শুনেছি, আর সহজে ছাড়ি? আপনাদের রবি ঠাকুরের কবিতা বোঝবার জন্যে আমি বাংলা শিখেছিলাম, জানেন?

জোরেই হেসে উঠলেন তিনি। এরকম শুনলে কার না ভালো লাগে। বললাম, রবি ঠাকুরের কবিতা সব বুঝতে পারেন?

কই আর পারি। বাংলা শেখার জন্যে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি, কিন্তু অনুভূতিটা তো আর পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। আপনাকে ধরে-বেঁধে এবারে গোটা-কতক লেখা বুঝে নেব।

খুব বিশ্বাস হল না। এরকম বাংলা যিনি বলেন, তিনি বাংলা লেখা ভাল বোঝেন বলেই আমার ধারণা।

প্রাতরাশ এলো। তারপর থাকবার ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল আমাকে। সাজানো-গোছানো সুবিন্যস্ত ঘর, কোনো কিছুরই অভাব নেই। দু-খানি কল্যাণী হাতের স্পর্শ সর্বত্র পরিস্ফুট। সেদিন কাটল। তারপর দিনও। অসম-বয়স্ক হলেও ভদ্রলোকের সংগে বেশ অন্তরংগতা জন্মে গেল। চতুর্বেদী সেই ধরনের মানুষ যিনি সহজে সকল বয়সের সমবয়স্ক হতে পারেন।

মস্ত সুবিধে তাঁর গাড়ি আছে। সকালে বিকালে সাগ্রহে নিজেই তিনি আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে লাগলেন। এখানে পাহাড়ে বেড়াবার আকর্ষণটাই সব থেকে বড়। পাহাড়ের গা ধরে সরু এক একটা রাস্তার মত উঠে গেছে। ধারে ধারে বিশাল পাথর। সেখানে বসে গল্প-গুজব করা চলে, পিকনিক করা চলে, কিন্তু সেগুলির ধারে এসে নিচের দিকে তাকালে মাথাও ঘোরে।

গৃহস্বামী দেখলাম শুধু অতিথি-পরায়ণ এবং সদাশয়ই নন, বেশ গুণীও। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় কাব্য আলোচনায় বসে আলোচনায় এবং প্রশ্নে আমাকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেললেন। বললাম, আপনাকে কবিতা বোঝাব কি, আপনার কাছে অনেক বাঙালী অনেক কিছু বুঝে নিতে পারে।

তিনি সহাস্যে জবাব দিলেন, তোমার অস্ত্রটি দেখছি ভালো, এবারে আমার মুখ বন্ধ করলে। গতকাল থেকে উনি আমাকে তুমি বলছেন, আর সেটা আমার বেশ ভালোই লাগছে। তার পরদিন বিকেলে নির্জনে ওরকম একটা পাথরের ওপর দুজনে বসে আছি। বললাম, মাধবজী, এবারে তো আমাকে যেতে হবে। কাল যাবো ভাবছি।

কেন, আর ভালো লাগছে না?

এর পরেও যার ভালো লাগবে না, সে নিতান্তই অমানুষ। যেতে মন সরে না।

তাহলে আর কটা দিন থেকে যাও না। বেড়াতে এসেছ যখন, একদিন যাবেই তো। আর হয়ত দেখাই হবে না।

কেন, আপনি কি ভরতপুর ছেড়ে নড়েন না?

তিনি ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, কই আর।

এই কটা দিনে আমার আর একটা অনুভূতি মনে জাগছে। এত হাসিখুশির মধ্যেও মানুষটি এক এক সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন যেন। মেঘের ওপর যেমন রৌদ্র ওঠে, অনেকটা সেই রকম মনে হয় তখন তাঁকে। আজকের অন্যমনস্কতায় খানিকটা গাম্ভীর্যও আছে।

এ কদিনের মধ্যে মিসেস চতুর্বেদীর সংগে আর চাক্ষুষ সাক্ষাৎও হয়নি। আড়াল থেকে তাঁর যত্নের আভাস পাই মাত্র। আর, সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে এক ঘুমোবার সময় ছাড়া ভদ্রলোকটিও প্রায় সারাক্ষণই আমার সংগে সংগেই আছেন। সেজন্যে নিজেই বেশি বিব্রত বোধ করতাম। ভদ্রমহিলা হয়ত বা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন আমার ওপর। কিন্তু সব মিলিয়ে যে অনুভূতির কথা বলছি নিজের কাছেই সেটা সুস্পষ্ট নয় খুব।

চতুর্বেদী বললেন, এদিকটায় একটু-আধটু ডাকাতের উপদ্রব আছে বলে লোক-চলাচল কম।

এমন শান্ত স্তব্ধ জায়গায় এরকম সংবাদ কার ভালো লাগে। বললাম, তাহলে তো এদিকটায় না এলেই হত?

চতুর্বেদী হাসলেন।—ডাকাতরা জানে। আমিও খুব কম ডাকাত নই। আজ তবু দু-জন আছি, প্রায়ই তো একাই এসে বসি এখানে। অত ধারে যেও না, এদিকটায় সরে এসো।

কেন, পড়ে যেতে পারি?

পড়ে যেতে পারো, ঠেলে ফেলেও দিতে পারি। হা-হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

হাসলাম আমিও।—শরীরখানা এ বয়সেও যা রেখেছেন, ঠেলে ফেলার কাজটুকু ধারে না বসলেও স্বচ্ছন্দে পারেন বোধ হয়।

তিনি জবাব দিলেন, এ বয়সের এ শরীরটা মিসেস চতুর্বেদীর হাতযশ, এর পিছনে আমার চেষ্টা নেই কিছু।

সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে নিচের দিকটা দেখলুম একবার। বললাম, একটা সুবিধে আছে, নিচে ওই পাথরের ওপর গিয়ে পড়লে প্রাণ বেরুতে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না, সংগে সঙ্গেই হাড় গুঁড়িয়ে আর মাথার খুলি চৌচির হয়ে সব শেষ।

চতুর্বেদী আস্তে আস্তে বললেন, সে রকম দৃশ্য এখানকার লোকে একবার দেখেছে—।

অবাক বিস্ময়ে তাকালাম তাঁর দিকে। তিনি বললেন, প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। ঠিক এই জায়গায় এখানকার একজন মস্ত আর্টিস্টকে ওরকম তালগোল পাকানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

মনে মনে শিউরে উঠলাম। আমার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে কি ভাবলেন তিনিই জানেন।—আচ্ছা, পরে একসময় বলব'খন গল্পটা।

এখনই বলুন না?

না, এখন ভালো লাগছে না।

তারপর দুদিন কেটে গেল। আর্টিস্টের প্রসঙ্গটা তিনিও আর উত্থাপন করলেন না,

আজিও ভুলে গেলাম। যাবার আগের দিন রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে এঁদের কথাই ভাবছিলাম। বিশেষ করে অদৃশ্যোবর্তিনীর কথা।

পরদিন সন্ধ্যায় গাড়ি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রতিদিনের মত সেদিনও মাধবজী আমার কাছে বসে পাইপ ধরালেন। হঠাৎ আর্টিস্টের কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম, সেই গল্পটা তো শোনা হল না মাধবজী?

পাইপ টানতে টানতে তিন বারকতক আড় চোখে নিরীক্ষণ করলেন আমাকে। পরে আমার দিকে ফিরে হাসি মুখে বললেন, গল্প পরে হবে। বিয়ে তো করোনি শুনেছি, কিন্তু কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছ কখনো?

এরকম একটা বেখাপ্পা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবু অম্লান বদনে বললাম, এন্তার—।

সে কি হে।

দেখতে ভালো হলেই ভালোবেসে ফেলি।

দরাজ গলায় হাসলেন তিনি। তারপর সহসা হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন, আমার স্ত্রীটিকে কেমন দেখলে?

আচ্ছা বিপদ। ভালো বললে নিজের কলে নিজে আটকাবো। হেসেই জবাব দিলাম, তাঁকে আর দেখলাম কোথায়? আপাদমস্তক তো ঢাকা।

মৃদু হাসতে লাগলেন মাধবজী। বললেন, ইউ আর এ ক্লেভার বয়। একটু থেমে, অনেকটা যেন আপন মনেই বললেন, একদিন ছিল জানো, যখন আমাদের মেয়েরা ইচ্ছে করে পরপুরুষের মুখ দেখলেও কলঙ্ক লাগত।

সে কী। আপনাদের মেয়েরা তো ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যেতেন।

দরকার হলে যেত। অন্য সময়ে দেহে অন্য কারো কামনার আঁচ লাগতেও দিত না। আজকের দিনে অবশ্য এ নিয়ম আর নেই, থাকা উচিতও নয়।

কিন্তু আপনার ঘরেই তো এ নিয়ম মানছেন একজন।

তিনি অন্যমনস্কের মত চেয়ে রইলেন আমার দিকে। হঠাৎ মনে হল ওই বিস্মৃতি-বিলগ্ন ঘনায়ত চোখ দুটিতে যেন একটা ব্যাথাতুর ভাব রয়েছে।

একটু বাদে বললেন, আর্টিস্টের গল্প শুনবে না? এসো।

গল্প শুনতে হলে আবার যেতে হবে কোথায় বুঝলাম না। তিনি আবারও আহ্বান করলেন, এসোই না।

অনুসরণ করলাম। ভিতরে আর কোনো দিন যাইনি। এদিকটা দেখলাম একটা আলাদা মহলের মত। একটা দরজা খুলে দিতে প্রকাণ্ড এক হলের মধ্যে এসে পড়লাম। দেয়ালের গায়ে গায়ে প্রমাণ আয়তনের তৈলচিত্রসম্ভার। নারী-মূর্তি সব। হাস্যে লাস্যে যৌবন-স্বরূপিণী নগ্ন নারী-মূর্তি। কারো দেহে এতটুকু আবরণ নেই।

মাধবজী বললেন, ভালো করে দেখো, লজ্জা কি...। কিন্তু তবু লজ্জা পাচ্ছি। ইচ্ছে থাকলেও লজ্জা পাচ্ছি। এরই মধ্যে একটি নারী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাঁর তিন চারখানা বিভিন্ন আলেখ্য টাঙানো। কানের কাছটা গরম ঠেকছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এঁরা সবাই কি এদেশের মেয়ে?

সবাই।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ালাম। মাধবজী সামনের দেয়াল-জোড়া তৈলচিত্রটি ইঙ্গিত করে বললেন, দেখো।

এবার নিস্পলক চোখে স্তব্ধ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সম্পূর্ণ নগ্ন দুটি নারী-পুরুষ. কিন্তু বহুক্ষণ চেয়ে থাকলেও এতটুকু গ্লানি স্পর্শ করবে না। সহজ সরল শুচিতার প্রতিমূর্তি। লজ্জা ভয় গ্লানি বিরহিত প্রথম নারী আর প্রথম পুরুষ। পুরুষটির হাতে জ্ঞানবৃক্ষের ফল। চোখে মুখে বিবেক এবং সংশয়ের অবিমিশ্র স্পন্দন। তার নগ্ন জানুতে মু--হাতে ভর করে মাটির ওপর বসে মুখের দিকে চেয়ে আছে। প্রথম নারী। মুখে আশা আকাঙ্ক্ষার অনাবিল প্রতীক্ষা।

আশ মিটিয়ে দেখতে লাগলাম। তবু দেখে আশ মেটে না। ওই নারীমূর্তিটি কি আমি কোথাও দেখেছি? না কি সকল পুরুষেরই মনের তলায় ওরকম একটি মূর্তি বিরাজ করছে, যাকে দেখলে মনে হয় বুঝি চিনি?

মাধবজী বললেন, এই ছবিখানা দেখাবার জন্যেই তোমাকে এখানে এনেছি। আচ্ছা, এবার এসো।

তাঁকে অনুসরণ করে ঘরে ফিরে এলাম। ফেরবার সময় আর অন্য ছবি-গুলোর দিকে তাকাতেও মন সরলো না। মাধবজী আবার আরাম-কেদারায় শরীর ছেড়ে দিয়ে পাইপ ধরালেন। তারপর ধীরে ধীরে যে কাহিনীটি ব্যক্ত করলেন তিনি, শুনতে শুনতে আমার স্থান কাল ভুল হয়ে গেল।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে। ভরতপুরের হাওয়ায় নারী প্রগতি দানা বেঁধে উঠছিল যাঁর জন্যে, তিনি এখানকার ডেপুটি পুলিস-সুপারের স্ত্রী কমলা দেবী। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটাও যখন এদেশে ভালো করে চালু হয়নি, তখন স্বামীর সঙ্গে তিনি বিলেত ঘুরে এসেছেন। অনেক আয়ু, অনেক সংস্কার, অনেক ভ্রূকুটি সহজ অবহেলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বনেদি ঘরের মেয়ে, বনেদি ঘরের বউ। মনের জোর আছে. তার চেয়েও বেশি রূপের। অনেক কিছুই সহজ ছিল তার পক্ষে। মেয়েদের নিয়েই একটা ক্লাব করেছিলেন প্রথম। কিন্তু তার আনাচে-কানাচে ছেলেদের আনাগোনা উঁকিঝুঁকি দেখে সকলকে অবাক করে দিয়ে একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, ছেলেরাও ইচ্ছে করলে ক্লাবে এসে যোগ দিতে পারেন। তাঁর অনুগত স্বামী পর্যন্ত প্রথম প্রথম এটা খুব সহজ-ভাবে নিতে পারেন নি। কমলা দেবী তর্ক করেন নি, হেসে বলেছেন, দেখই না সব রসাতলে যায় কিনা। মোট কথা, অভিজাত মহলে ছেলেমেয়েদের সহজ মেলামেশায় তখন একটা রোমান্টিক হাওয়া বইছে।

সেই সময়ে এই শিল্পীটিকে আবিষ্কার করলেন তাঁরা, অবশ্য শিল্পী বলে জানতেন না। নির্জন পাহাড়ে বেড়ানোটা তখন খুব বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু ডেপুটি পুলিস-সুপার যাঁদের সাথী, স্বয়ং পুলিস-সুপারও যাঁদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, তাঁদের আর ভয়টা কিসের? একদিন যে পাহাড়টিতে মাধবজী এবং আমি গিয়ে বসেছিলাম, পঁচিশ বৎসর আগে সদলবলে সেখানে অভিযানে এসে তাঁরা দেখেন, লোকটি সেই নির্জন পাথরটিতে আকাশের দিকে চেয়ে একা শুয়ে আছেন। পাশে তাঁর ক্যামেরা। এঁরা যেমন অবাক, লোকটিও তেমনি নারী-পুরুষের বাহিনীটি দেখে হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি একাই জয় করলেন এঁদের সকলকে, অমন সরল শিশুসুলভ মূর্তি বড় একটা দেখা যায় না। জলে-ভেজা দুটি ডাগর চোখ, শিশিরস্নাত মুখ, ঝাঁকড়া চুলে প্রায় বন্য সরলতা, সমগ্র কমনীয়তায় ভোরবেলাকার রূপের সঙ্গে কোথায় যেন মিল।

পুলিসসুপারই প্রথম জেরা শুরু করলেন, তুমি কে?

আমি? আমি ডুগার—শোভন ডুগার।

এখানে কি করছ?

আকাশ দেখছি।

মেয়েরা কলস্বরে হেসে উঠলেন। কোথায় থাকেন, কি করেন ইত্যাদি জেনে নেবার পর তাঁকে বলা হল, এভাবে একা এখানে এসে যে আকাশ দেখা হচ্ছে, ডাকাতের খপ্পরে পড়লে?

তিনি চিন্তিত মুখে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, ক্যামেরাটা তাহলে যেত বোধ হয়...।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষরাও হেসে ফেললেন এবার। ফিরতি পথে সঙ্গী একজন বাড়ল। তার আগে শোভন ডুগার অনেক-গুলো ছবি তুললেন সকলের।

এই ছবি তোলায় ঝোঁক কত সেটা পরে ক্রমশ বোঝা গেল। কিন্তু ঝোঁকটা শুধু মেয়েদের ছবি তোলার প্রতিই। ছ-মাস না যেতে তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন সকলেরই। মেয়েরা প্রথম প্রথম ছবি তুলতে

দিতে হয়তো বা একটু-আধটু আপত্তি করতেন। কিন্তু তাঁদের নেত্রীই হাল ছেড়ে দিলেন একদিন। —নাও বাপু, এই বসলাম, যেমন করে খুশি যতক্ষণ খুশি ছবি তোলো। এরপর সঙ্গিনীদেরও আর বাধা থাকল না। যেমন করে খুশি এবং যতক্ষণ খুশি ছবি তুলেও কিন্তু খুশি হতেন না ডুগার। বলতেন, তোমরা মেয়েরা কেউ সহজ পোজ দিতে জানো না, সকলেরই চোখে মুখে কৃত্রিমতা। মেয়েরা চটতেন, কিন্তু ভালওবাসতেন ওঁকে।

তারপর একদিন দেখা গেল শোভন ডুগার ডুব মেরেছেন। মেয়েরা চিন্তিত হলেন। এবার সত্যই কোনো ডাকাতে তাঁকে খতম করে দিল কিনা কে জানে? কমলা দেবী উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বামীকে তাগিদ দিতে লাগলেন, কোনো বিপদ ঘটল কিনা অনুসন্ধান করতে।

শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। তখনই শুধু জানা গেল, অসলে উনি চিত্র-শিল্পী। কিন্তু তাঁর শিল্পচর্চার বিষয়বস্তু শুনে ঝড়ের আগের স্তব্ধতার মত সবাই স্তব্ধ। শিল্পীর চতুর্দিকে মেয়েদের ফোটো-গুলি ছড়ানো, তারই থেকে তুলি আর রঙে এক একটা নগ্ন মূর্তির আবির্ভাব ঘটছে। ফোটোর থেকে শুধু মুখ এবং অভিব্যক্তি-টুকু তুলে নিচ্ছেন, বাকিটা কল্পনা। পুরুষ-দের অনেকেই জোর করে স্টুডিওতে এসে ঢুকলেন, নিজের চোখে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে গেলেন।

মেয়েরা একেবারে বোবা। এমন দেখতে অথচ এত শয়তানি। পুরুষদের বুকে আগুন জ্বলল। বড় বড় অভিজাত ঘরের মেয়েরা সংশ্লিষ্ট কাজেই আইন আদালত না করে নিজেরাই তাঁর বিচারের পরামর্শ করলেন। সদাসাধি বিচার। মর্যাদা বা আত্মসম্মানের হানি ঘটলে এদেশের লোক তখনো অম্লান বদনে বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। নিঃশব্দে তাকে নির্মম বিদায় দেওয়াটাই সাব্যস্ত হল।

স্বামীর মুখ থেকে কমলা দেবী শুনলেন সব। সকলের অজ্ঞাতে তিনি স্টুডিওতে এলেন। সাক্ষাৎ হল শোভন ডুগারের সঙ্গে দেখলেন তাঁর শিল্পচর্চা। ডুগার চুপচাপ বসে আছেন। তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন নিরীক্ষণ করে।

এভাবে জীবনটা হারাতে বসলে? ডুগার বললেন, জীবন যেতে পারে জানতাম, কিন্তু কাজটা হল না, এই দুঃখ।

কি কাজ?

যে কাজের মধ্যে বরাবর বেঁচে থাকতে পারতাম, সে রকম একখানা ছবি।

কমলা দেবী জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ডুগার বললেন, দুটি নারী-পুরুষের মূর্তি আঁকব ভেবেছিলাম, যাদের মধ্যে পাপ ঢোকেনি। নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক দুটি নারী-পুরুষ। কিন্তু চেয়ে দেখ, তোমাদের মুখ আমি অবিকৃত রেখেছি। অথচ নগ্ন প্রতিকৃতি কি বিষম নগ্ন।

কমলা দেবী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, নারীমূর্তি পেলে না, কিন্তু তেমন পুরুষমূর্তি পেয়েছ?

তোমাদের চোখ থাকলে সে মূর্তি দেখতে পেতে।

কিন্তু সত্যিই চোখ আছে কমলা দেবীর। দেখেছেনও। শুধু খেয়াল করেন নি। আজ খেয়াল করলেন, আর দেখলেন। ধীর-শান্ত দুই চোখ মেলে শুধু দেখলেনই।

এরপরে কোথা দিয়ে কি হল কেউ হদিস পেল না। এমন কি কমলা দেবীর স্বামীও না। দেখা গেল সশস্ত্র দুটি সৈনিক-পুরুষ অষ্ট প্রহর ডুগারের স্টুডিও পাহারা দিচ্ছে। পুলিস-সুপার ছিলেন কমলা দেবীর একান্ত গুণমুগ্ধ—ব্যবস্থাটা তাঁরই। কিন্তু ডেপুটি পুলিস-সুপার অর্থাৎ কমলা দেবীর স্বামীর কাছেও তিনি কারণ প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন, লোকটা এক ধরণের রোগগ্রস্ত, কি হবে তাকে হত্যা করে?

ক্রমশ অন্য সকলেরও উত্তাপ কমে এলো। শেষ পর্যন্ত বিকারগ্রস্ত বলেই ধরে নিলেন তাকে। শুধু ভদ্রসমাজে আর মিশতে না এলেই হল। সমাজে আর মিশতে এলেনও না শোভন ডুগার। পুলিস-সুপার পাহারা তুলে নিলেন।

কিন্তু কমলা দেবীর মধ্যে কি যেন একটা পরিবর্তন এলো। তাঁর স্বামী এবং সঙ্গীসঙ্গিনীরাও অনুভব করলেন সেটা। অনেকটা যেন স্থির হয়ে আসছেন। নিয়মিত ক্লাবে আসেন না, নিয়মিত বাড়িতেও থাকেন না।

ছ' মাস পরের কথা। শোভন ডুগারকে সবাই ভুলেছে। হঠাৎ একদিন রাষ্ট্র হল, জয়পুরে অত বড় ছবির এগজিবিশানে প্রথম হয়েছে শোভন ডুগারের একখানা ছবি, সে ছবির নাকি তুলনা নেই। দেশী-বিদেশী শিল্প-গুণভাজনরা বহু হাজার টাকা দাম দিতে চাইলেন ছবিখানার, কিন্তু শিল্পী সেটা বিক্রী করতে অসম্মত।

এখানে আবার একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সেটা আরো বাড়ল ছবিখানা এখানে ফিরে আসার পর। দলে দলে লোক আসতে লাগলো দেখতে। প্রথম মানব এবং প্রথম মানবী-মূর্তি। নগ্ন, কিন্তু অপরূপ। এই মানব-মানবীকে এখানকার লোক চেনে। তবু অভিভূত হল, মুগ্ধ হল। রাগতে পারল না। সেদিন যেন সবাই নতুন করে উপলব্ধি করল, কেন মানুষটা মেয়েদের ফোটো তোলার জন্যে এতখানি ব্যগ্রতা প্রকাশ করত। মনে মনে ভাবল, পাগল শিল্পীর কল্পনাসম্ভারের তুলনা নাই।

মুগ্ধ হলেন না, অভিভূত হলেন না শুধু একজন। তিনি কমলা দেবীর স্বামী। ডেপুটি পুলিস-সুপার। শুধু তিনি দেখ-লেন, শুধু তিনি জানলেন, কোনো ফোটো-গ্রাফ থেকে রূপায়িত হয়নি ওই নারী-মূর্তি।

এই পর্যন্ত বলে মাধব চতুর্বেদী থামলেন। আমি নিস্পন্দের মত বসে আছি, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি কর-লেন ডেপুটি পুলিশ-সুপার?

ডেপুটি পুলিস সুপার শিল্পীকে একদিন কাঁচপোকার মত টেনে নিয়ে এলেন সেই পাহাড়ের ওপর যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। যেখানে তুমি-আমি গিয়ে বসে ছিলাম সেদিন। শিল্পী সত্য গোপন করলেন না।

তারপর? রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করি।

তারপর নির্মম পশুর মত তিনি দু হাতে তাঁকে শূন্যে তুলে নিঃসীম অতল কঠিনের বুকে নিক্ষেপ করলেন।

বসে আছি।...বসেই আছি।

মাধবজী একসময় উঠে গেলেন। বাইরের আলো একসময় আবছা হয়ে আসতে লাগল। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে আমিও উঠলাম। জিনিসপত্রগুলো সব ঝোলার মধ্যে গুছিয়ে প্রস্তুত হলাম।

মাধবজী এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, রেডি?

হ্যাঁ।

চলো, স্টেশনে তুলে দিয়ে আসি।

তাঁর সঙ্গে বাইরে এসে থামলাম। দ্বিধান্বিতভাবে বললাম, মিসেস্ চতুর্বেদীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব না?

এক মুহূর্ত থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ওই ও ঘরে আছেন, দেখা করে এসো, আমি গাড়িটা বার করি।

তিনি চলে গেলেন। আমি বিপদগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে রইলাম অল্পক্ষণ। পায়ে পায়ে ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চুপচাপ বসেছিলেন মিসেস্ চতুর্বেদী। আমায় দেখে সচকিত আলনা থেকে ওড়নাটা টেনে নিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর আবৃত করলেন না। ওটা হাতেই রইল। আমি কিছু একটা আভাস পাচ্ছি কিনা সঠিক বুঝছি না। পঁচিশটা বছর বাদ দিয়ে দেখা এক মুহূর্তে সহজ নয়। তাছাড়া বাইরের আলোটা আরও কমছে, নিঃশব্দে তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে ফিরে এলাম।

মাধবজী গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছে এসে বলেই ফেললাম, একটা অনুরোধ মাধবজী, ওই ছবিখানা যাবার আগে আর একবার দেখাবেন?

মাধবজী গাড়ির দরজা খুলে দিলেন, বললেন, না, তোমার সময় হয়ে গেছে, ওঠো—।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
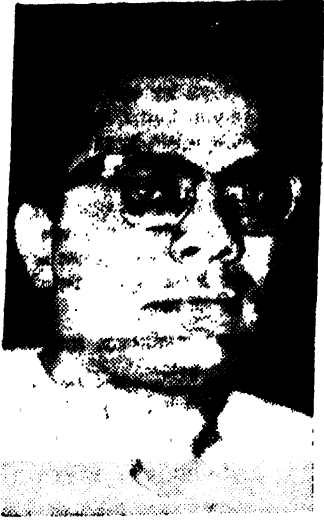
সুভাষ সিংহ

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কথাকারদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম অগ্রগণ্য।

মোটামুটি চল্লিশ দশকের লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বয়স বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ। লেখা শুরু করেন একটু বেশি বয়সে। সম্ভবত তিরিশ বছর বয়স থেকেই গল্প রচনা সুরু। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবনায়িকা'। এই গ্রন্থের একটি গল্প 'কলঙ্কবতী' প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে ক্ষমতাবান ছোটগল্প লেখক হিসেবে চিহ্নিত করে।

নিটোল গল্প রচনায় লেখকের সহজ নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায় প্রথম দিকের গল্পগুলি থেকেই। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটি খুব সহজ। 'কলঙ্কবতী' গল্পটা লেখকের উত্তমপুরুষ লেখা। লেখক তাঁর এক বন্ধুর চিঠি নিয়ে রাজস্থানের অন্তর্গত ভরতপুর নামে এক পাহাড়ী জায়গায় বেড়াতে এসেছেন। সেখানে মাধব চতুর্বেদীর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। গৃহস্বামীর গাড়িতে চেপে নানা জায়গায় বেড়ালেন। মিসেস চতুর্বেদীকে একটু অন্যরকম লাগল লেখকের কাছে। 'মহিলাটির মধ্যে একটা বিচিত্র রকমের অভিব্যক্তি—যাকে বলে প্যারসনালিটি আছে বটে। কিন্তু ও'র ও-রকম ঠান্ডা ভাবটাও প্রায় অস্বস্তিকর'। নানা জায়গায় ঘোরা, কাব্যালোচন (মাধব চতুর্বেদী রবীন্দ্রভক্ত)—লেখক গৃহস্বামীর সঙ্গে সারাক্ষণ, একমাত্র ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া। এজন্যে লেখক মনে মনে খানিকটা বিব্রত। কারণ মিসেস চতুর্বেদী।

ভরতপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন-দুপুরে মাধব চতুর্বেদী একটা গল্প শোনালেন লেখককে। তাঁর সঙ্গে লেখক একটা আলাদা মহলে এসে ঢুকলেন। সেখানে দেয়ালের গায়ে হাস্যে-লাস্যে যৌবন-স্বরূপিণী নগ্ন নারী-মূর্তি। বিশেষ এক-জোড়া তৈলচিত্রের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন গৃহস্বামী। এক জোড়া নগ্ন নারী-পুরুষ। লেখকের মনে হল এই নারীমূর্তি যেন কোথায়ও তিনি দেখেছেন। কিন্তু সঠিক মনে করতে পারছেন না।

মাধব চতুর্বেদী যে গল্প শোনালেন লেখককে তার নায়ক একজন শিল্পী। নাম শোভন ডুগার। পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। ভরতপুরের ডেপুটি পুলিশ-সুপারের স্ত্রী কমলা দেবী স্বামীর সঙ্গে বিলেত ঘুরে এসেছেন। একমাত্র তাঁর সমর্থনে শিল্পী শোভন ডুগার ভরতপুরে থেকে গেলেন। ছবি তোলা তাঁর ঝোঁক। বিশেষ করে মেয়েদের ছবি। হঠাৎ তিনি ডুব দিলেন কিছুদিনের জন্যে। তারপর জানা গেল তিনি আসলে একজন চিত্রশিল্পী। তাঁর শিল্পচর্চার বিষয়বস্তু শুনে সবাই স্তম্ভিত। তুলি আর রঙে এক একটি নগ্ন মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। ফল হোল খুব খারাপ। শিল্পীর জীবনসংশয় দেখে কমলা দেবী তাঁকে সাবধান করলেন। তারপর কয়েকটা মাস কেটে যায়। কমলা দেবীর মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল। শোভন ডুগারকে লোকে প্রায় ভুলতে বসেছিল। কিন্তু একদিন শোনা গেল জয়পুরে ছবির এগজিবিসনে প্রথম হয়েছে শিল্পীর একখানা ছবি। সেই ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন না একজন। তিনি কমলা দেবীর স্বামী। তিনি একদিন শিল্পীকে পাহাড়ের চূড়ো থেকে নির্মমভাবে নীচে ফেলে দিলেন।

বিদায়ের আগে লেখক মিসেস চতুর্বেদীকে দেখতে এসে যেন চমকে উঠলেন। 'পঁচিশটা বছর বাদ দিয়ে দেখা এক মুহূর্তে সহজ নয়।'

সংক্ষেপে এই হচ্ছে 'কলঙ্কবতীর' কাহিনী। ছোটগল্পের আলোচনায় বিশেষ বিশেষ গল্প সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। নইলে লেখক এই বলতে চান লেখকের গল্পে বাস্তবতা, কাব্যিকতা বা আদর্শবোধ ইত্যাদি ইত্যাদি—সব বলেও কিছু বলা হয় না, কিছুই বোঝান যায় না। 'কলঙ্কবতী' গল্পে একবারে শেষ মুহূর্তে এসে পাঠক একটু স্তব্ধ হয়ে যাবেন। ভাববেন মাধব চতুর্বেদী লেখককে কার গল্প শোনালেন। মিসেস চতুর্বেদী কে ? সব সময় তিনি আপাদমস্তক পোশাকে ঢেকে রাখতেন কেন ? কেন তাঁর চোখমুখে অমন বিষাদ লক্ষ্য করা যেত ? ধীরে ধীরে পাঠকের কাছে রহস্যের উন্মোচন হবে। অর্থাৎ লেখক সরাসরি সব কিছু বলে দিতে চান না। গল্প পড়ে পাঠক ভাবুন। ইঙ্গিতধর্মিতা ছোটগল্পের প্রাণলক্ষণ। আলোচিত গল্পটি সে কারণে উল্লেখযোগ্য। অথচ গল্পটি পড়তে কোথায়ও হোঁচট খেতে হয় না। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তন্ময় করে পড়া যায়। ক্লান্তি আসে না। আশুতোষবাবুর প্রথম দিকের ছোটগল্পেই উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

এ পর্যন্ত অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন লেখক। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চোদ্দ। বেশির ভাগ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। কোন কোনটির তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত। ব্যাপারটা রীতিমত অবিশ্বাস্য ঠেকে কেননা শোনা যায় যে, বর্তমান সময়ে প্রখ্যাত লেখকদেরই গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করতে প্রকাশকরা উৎসাহিত নন, কারণ পাঠক এক-টানা বড় লেখা পড়তে চান, উপন্যাসের পাল্লায় ছোটগল্প ক্রমশঃ পিছু হটছে।

সাপ্তাহিক পত্রিকার চাহিদার জন্যে নাকি ছোটগল্প এখনও টিকে আছে। হয়ত কথাটা সত্যি। কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত এর ব্যতিক্রম। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প সমান আকর্ষণীয় পাঠক ও প্রকাশকের কাছে। কারণ কী?

দু'রকমের লেখক আছেন। প্রথম ধরনের লেখকের সংখ্যা খুব কম। তাঁরা লেখকের লেখক। তাঁদের পাঠকসংখ্যা সীমিত। ওদেশের জয়েস বা মার্সেল প্রুস্তের নাম করা যায় এ প্রসঙ্গে। আমাদের রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কী লেখকদের লেখক নন? তাঁর পাঠকসংখ্যা কী আজও সীমিত নন?

দ্বিতীয় ধরনের লেখকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এ'দের জনপ্রিয় লেখক বলা হয়। শিক্ষিত সংবেদনশীল পাঠক যেমনি এ'দের পৃষ্ঠপোষক—তেমনি সাধারণ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষও এ'দের রচনা পাঠে আনন্দ পান। সাগরপারের লেখকদের নাম করতে গেলে ইংরেজ লেখক সমারসেট মমের উল্লেখ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় জাতের লেখক।

ছোটগল্প কী এবং কেন—এ নিয়ে পন্ডিতি আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। লেখকের ছোটগল্প আলোচনা প্রসঙ্গে মমের উল্লেখ এ কারণে প্রয়োজন যে, তাঁদের উভয়েরই গল্প সম্পর্কে ধারণা প্রায় এক এবং অভিন্ন। মমের মত লেখকও গল্পে সুনির্দিষ্ট আরম্ভ, মধ্যভাগে আসা এবং অন্তিম চমকে বিশ্বাস করেন। গল্পের শেষে এক ধরনের জার্ক লক্ষ্য করা যায়। পাঠক গল্প শেষ করে হঠাৎ ধাক্কা খান। বিহ্বল হয়ে ওঠেন। তারপর আস্তে আস্তে বিহ্বলতা কেটে যায়। চমক কেটে যায়। থাকে শুধু সঙ্গীতের অস্ফুট রেশ। অনেকদিন থাকে। এক সময় হয়ত ভুলে যান সবকিছু। আবার জীবনের বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত ভেসে ওঠে কোন মুখ, মনে পড়ে কারও সকরুণ দীর্ঘশ্বাস, একা অন্ধকার ঘরে বসে আশেপাশে পায়ের হাঁটাচলার শব্দ শুনতে পান।

এ রকম বেশ কিছু ছোটগল্প আছে লেখকের। কিন্তু স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি গল্পের আলোচনা করা সম্ভব। এবং তা করা দরকার। লেখকের ছোটগল্পে কী কী বৈশিষ্ট্য আছে একমাত্র গল্পালোচনার মাধ্যমেই সে সব পরিস্ফুট হবে।

'বাঁধাকপির ঝোল'ও যে গল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে—চেকভ তা স্বীকার করতেন। জীবনের কিছুই বাদ দেওয়া যায় না। যাঁর যেমন অভিজ্ঞতা আছে তাই তিনি কাজে লাগাবেন। কোনরকম পূর্বসিদ্ধান্ত নিয়ে লেখা কতদূর সার্থক হয় তা বিচার্য বিষয়। অর্থাৎ আধুনিক ছোটগল্প হতে গেলে অমুক অমুক লক্ষণ থাকা দরকার—নইলে গল্প হয়ত হবে কিন্তু তাতে আধুনিকতা থাকবে না—এ জাতীয় উৎকট ধারণা থেকে সৌভাগ্যক্রমে আশুতোষবাবু মুক্ত। তিনি গল্পের সঙ্গে কবিতার মিলন ঘটাতে চান নি, গল্পের ভিতর অন্ধ কল্পনার পরিশ্রম থেকে বিরত থেকেছেন! গল্প থেকে কাহিনী বাদ দিতে চান নি। বরং তাঁর গল্পের প্রধান আকর্ষণ মিঠোল কাহিনী। বিচিত্র ধরনের চরিত্র সৃষ্টি, বাংলার বাইরে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন পটভূমিকায় লেখা তাঁর কিছু গল্প নতুনত্বের দাবী রাখে। আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে যাঁরা তাঁর গল্পে বিবিক্ত মানুষের নিঃসঙ্গতা খুঁজবেন—হতাশ হবেন তাঁরা। মানুষের সঙ্গে সমাজের তথা রাষ্ট্রের সম্পর্কের দিকটা সম্বন্ধে অনবহিত নন লেখক। বিশ্ববাসী মানুষের আসঙ্গ লিপ্সার কথা তিনি সভয়ে এড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া তিনি জানেন, পশ্চিমের ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশঃ কোলাহল থেকে দূরে সরে আসছে, আশ্রয় নিচ্ছে আপন নিঃসঙ্গতার মধ্যে, যে নিঃসঙ্গতা শূন্যতার নামান্তর এবং যা পরিণতিতে মানুষকে ধ্বংসের দিকে, আত্মবিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যায়! আমাদের ভারতবর্ষের মত শিল্পে অনগ্রসর (পশ্চিমের বৃহৎ দেশগুলির তুলনায়) একটি দেশে ওই জাতীয় নিঃসঙ্গতার শিকার কটা লোক তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। এই মূল সত্য লেখক জানেন। তাই তিনি ধারকরা কোন দার্শনিকতা (অস্তিত্ববাদ, শূন্যতাবাদ ইত্যাদি) অথবা তাত্ত্বিক দিকের কথা ভেবে গল্প লিখতে বসেন নি। তাঁর কোন গল্পেই ওই জাতীয় ব্যর্থ অনুকরণের প্রচেষ্টা নেই।

লেখকের গল্প বলার ভঙ্গিটি খুব মনোরম। আর আছে প্রচ্ছন্ন কৌতুকবোধ। কিন্তু জ্বালা ধরে না। সবার ওপর মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি। ফলে লেখকের সৃষ্ট পাত্রপাত্রীর সঙ্গে পাঠকের নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর অধিকাংশ গল্পেই দেখা যায়। অনেক গল্পে দেখা যায় যে, লেখক সরাসরি গল্প সুরু করেন না। তিনি নিজে গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি কোথায়ও বেড়াতে যান। সেখানে সাক্ষাৎ হয় বিচিত্র কোন নারী বা পুরুষের সঙ্গে। তারপর গল্পের আভাস দেখা যায়। গল্প ধীরে ধীরে জমে ওঠে। পাঠকের উৎকণ্ঠাও সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে। গল্প শেষ হয় অভাবিত কোন জায়গায় এসে। দু'একটি ইঙ্গিত শুধু। কয়েকটি আঁচড়ে অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে ওঠে চরিত্র। এমন সংযম খুব কম লেখকের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

লেখকের ভাষা সহজ কিন্তু তরল নয়। অধুনা এক ধরনের সাংবাদিকসুলভ হাল্কা ভাষায় কতিপয় লেখক বাজার মাৎ করতে সচেষ্ট। আশুতোষবাবু সেদিক থেকে অনেক সতর্ক। ভাষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ কোন কোন রচনায় দেখা যায় কিন্তু কোথায়ও ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। দাড়ি কমা সেমিকোলন বাদ দিয়ে অথবা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দের সমাবেশ ঘটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে ভাষার ওপর নির্মম রোলার চালান নি। ফলে তাঁর গল্প পড়তে গিয়ে পাঠককে হোঁচট খেতে হয় না যা তিনি অভিধান খোলার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

নরনারীর মনের বিচিত্র গতি, বিশেষ করে নারীর জটিল মানসিকতার রহস্য উন্মোচনে লেখকের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। শুধু আশুতোষবাবু নন, প্রত্যেক সং লেখকের প্রবণতাই হচ্ছে মানুষের জটিল মানসিকতার অন্বেষণ। তবে এই অন্বেষণেরও রকমভেদ আছে। কোন কোন লেখক সমাজবিচ্যুত মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্ব খোঁজার ছলে অকারণ অশ্লীলতার আশ্রয় নেন—আসলে তাঁদের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন—পাঠকের, বিশেষত দুর্বলচিত্ত অল্পবয়সী যাঁরা তাঁদের মুর্ত কামনাকে উসকে দেন নারীদেহের বিশেষ বিশেষ জায়গার ন্যক্কারজনক বর্ণনার মাধ্যমে।

পুরুষের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব তবু করা যায়। কিন্তু নারী? দেবা ন জানন্তি। নারীমনের অতল সমুদ্রে ডুব দিয়ে একমাত্র হাবুডুবু খাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। যে মানুষ প্রতিদিন কাজকর্মে চলাফেরায় স্ত্রীর মধ্যে কোনরকম রহস্য বা অস্বাভাবিকতা দেখতে পান না, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি হয়ত স্ত্রীর আকস্মিক ব্যবহারে থমকে দাঁড়ান, বারবার বোঝার চেষ্টা করেন, শেষে হাল ছেড়ে দেন। শুধু বোকার মত খানিকটা হাসেন অথবা তাঁর মুখচোখে নেমে আসে অবাক-বিস্ময়।

এই রকম নারীমনের একটা বিশেষ দিকের প্রতি লেখক অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন তাঁর একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্পে। গল্পটির নাম 'একটি কোণের ঘর'। গল্পটি আয়তনে ছোট। এত স্বল্প পরিসরে নারী-হৃদয়ের বিশেষ রূপটি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা লেখকের অদ্ভুত সংযম আর পরিমিতিবোধের পরিচয়।

একটি কোণের ঘর-এর নায়িকা প্রভাতী বয়েস সাতাশ-আটাশ। বিবাহিতা। স্বামী সন্তান আর দেওরদের নিয়ে সুখের সংসার। বিয়ের সময় প্রভাতী শুধু সুশ্রী নয় সুন্দরীও ছিল। সাত আট বছরের বিবাহিত জীবনে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে মুটিয়ে গেছে। এ নিয়ে দেওররা এমনকি স্বামীও ঠাট্টা করে। একদিন প্রভাতী বারান্দার রেলিংয়ে কাপড় মেলতে এসে হঠাৎ লক্ষ্য করল রাস্তার ওধারে দোতলার একটা কোণের ঘরে হাঁ করে তাকিয়ে লোকটা। প্রভাতী গম্ভীর মুখে ঘরে ফিরল। পর পর কয়েকটা দিন লক্ষ্য করল। লোকটার সামনে একটা জলচৌকি। হাতে কলম। জলচৌকিতে কাগজ। তন্ময় হয়ে এদিকে তাকিয়ে। কী নির্লজ্জ! ক্রমশঃ ব্যাপারটা স্বামী জানল। তারপর দেওররাও। নতুন বয়সের ছেলে—তারা বরদাস্ত করতে চাইল না। অতি কষ্টে প্রভাতী তাদের আটকাল। কী দরকার একটা কেলেঙ্কারী কান্ড...... তাছাড়া ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে পাঁচকান হবে, লজ্জার ব্যাপার না? বারান্দার কতবার যে প্রভাতীকে আসতে হয় তার ঠিক

নেই। পায়রা দুটোকে চার পাঁচবার খব-গম খেতে দিতে হয়। জামা-কাপড় রোদে দেওয়া, রোদ থেকে তোলা—কাজের অন্ত নেই। নতুন একটা উপদ্রব জুটেছে—আকাশী রঙের পুরুষ পায়রা। ওটাকে সব সময় তাড়ানও একটা কাজ প্রভাতীর। নইলে এখানকার পুরুষ পায়রাটার জায়গা দখল করে নেবে। কয়েকদিন পরের কথা। নামী সাপ্তাহিক পত্রিকার একটা গল্প নিয়ে দেওরদের মধ্যে খুব হাসাহাসি। কী ব্যাপার ? প্রভাতী জানতে পারল সব। গল্পের নাম কপোত-কপোতী। দুটো পায়রাকে নিয়ে গল্প। লেখক ওই লোকটা যে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। সত্যিই কী ওর দিকে তাকিয়ে থাকত না ঘন্টার পর ঘন্টা মনো-নিবেশ সহকারে পায়রাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করত ?

গল্পের শেষ কয়েকটি লাইন : "বিছানায় প্রভাতী শুয়ে। বাহুতে মুখ ঢাকা। আলো জ্বলাতে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে মুখ থেকে হাত সরালো।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, মাথা ধরেছে নাকি ?

স্ত্রীর মাথা-ধরা রোগ আছে।

হুঁ। বাহুখানা আবারও চোখের ওপর উঠে এলো প্রভাতীর।

কিন্তু স্ত্রীর এই মাথা-ধরাটা যে তুচ্ছ নয়, নিরঞ্জনের খেয়াল ছিল না। সহাস্যে বলল, কি কান্ড, পড়েছ গল্পটা ?

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু রাগে যেন ফেটে পড়ল প্রভাতী। চোখ থেকে হাত নামিয়ে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, কান্ড রেখে তুমি আলোটা নেভাবে এখন ?

হকচকিয়ে গিয়ে নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিল।"

এরপর আশা করা যায় পাঠকের আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। প্রভাতীর এমন বিসদৃশ আচরণের অর্থ তিনি বুঝবেন। যদি না বুঝতে পারেন তবে লেখক নাচার। কারণ নায়িকার অস্বাভাবিক আচরণের ব্যাখ্যা করলে গল্পটা মাটি হয়ে যেত। যেখানে শেষ হয়েছে গল্প সেখান থেকে পাঠক নতুন করে ভাবনা সুরু করতে পারেন। চিন্তা করতে দোষ কী—প্রভাতীর আঘাতটা কোথায়, তার সুপ্ত মনের প্রত্যাশাই বা কী ছিল !

লেখকের গল্পপাঠে দেখা যায় যে তিনি বৈচিত্র্যসন্ধানী। অসংখ্য গল্প লিখে-ছেন তিনি। প্রত্যেকটি গল্প প্লট, বিষয়-বস্তু বা চিন্তাভাবনায় পুনরাবৃত্তি নয়। মানুষের চরম অসংগতি, বাঁচার তাগিদে তাদের উৎকেন্দ্রিক মনোভাব, স্বার্থপরতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জন—লেখক এদের সহানু-ভূতির চোখে লক্ষ্য করেছেন, কখনও এদের প্রতি প্রচ্ছন্ন কৌতুক করেছেন, কিন্তু অশালীন ব্যঙ্গ করেন নি।

'রিক্তি' লেখকের আর একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পে একজন স্নেহবান পিতার কন্যার মঙ্গলার্থে আত্মোৎসর্গের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সংস্কার কিভাবে একজন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিকে যুক্তিহীন করে তোলে, অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে—তার এক বেদনাদায়ক আলেখ্য এই গল্প।

খুব সংক্ষেপে গল্পটি হচ্ছে এই : ডকটর রামকিঙ্কর গোস্বামী, যিনি আকাশ-রহস্য নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন, অনেক মনীষীর চলিত ব্যাখ্যার ছিদ্র খোঁজেন—তিনি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বারবার পিছিয়ে যান। সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু জ্যোতিষীর সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা করেন। অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন অর্ধ-শিক্ষিত একজনের কথা কিছুতেই মন থেকে ভুলতে পারছেন না। এদিকে মেয়ের বিয়ে বিলেতফেরত সুদর্শন এক এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে ঠিক হয়েছে। এবার তিনি বাধা দিতে পারেন নি। কিন্তু মেয়ের যে রিষ্টিযোগ আছে। ফলে অকালবৈধব্য অথবা নিকটতম আত্মীয়বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। অনেক তর্ক করেছেন ডকটর গোস্বামী জ্যোতিষীর সঙ্গে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। সেই জ্যোতিষীও আজ আর নেই। বিয়ের দিন সবার সঙ্গে ডকটর গোস্বামী গল্প করলেন। হাসলেন অকারণে। টাকা পয়সার ভার দিলেন ছোট-ভাই-এর কাছে। তারপর বিয়েবাড়ির ব্যস্ততার মধ্যে এক সময় তিনি বেরিয়ে গেলেন। ঘন্টা দুয়েক বাদে তাঁর অনুপস্থিতি সকলে টের পেল। অনেক সন্ধানের পর তাঁর লাশ পাওয়া গেল রেললাইনের ধারে। প্রসন্ন শান্ত মুখ। চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে।

গল্পের শেষ দুটি লাইন : "দাদা লিখেছেন, তাঁর মেয়ে-জামাই এবার দীর্ঘায়ু হবে, সে সম্বন্ধে আর তাঁর একটুও সন্দেহ নেই। তিনি নিশ্চিন্ত।"

'রোশনাই' গল্পের নায়ক শম্ভুবাবু ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চাকুরে। তাঁর চাকরীর মেয়াদ শেষ হতে মাত্র দু'মাস বাকী। প্রায় হাজার টাকার মত মাইনে পান তিনি। অবসর গ্রহণের পর কিভাবে পাঁচটি ছেলেমেয়ের পড়াশুনা বিবাহ ইত্যাদি দেবেন, দিনরাত্রি তাই তাঁর একমাত্র চিন্তা। শম্ভু-বাবু অপচয় কোনরকমে বরদাস্ত করতে পারেন না। তাই ভাবী জামাই এক জোড়া ইলিশ মাছ বাড়িতে আনলে তিনি অপ্রসন্ন মুখে তাকে মৃদু তিরস্কার করেন। শম্ভু-বাবুর দিনরাত্রির ভাবনা, মোট চৌষট্টি হাজার টাকা (লাইফ ইন্সিওরেন্স, গ্র্যাচুইটি, প্রভি-ডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি মিলিয়ে) দিয়ে অবসর গ্রহণের পর ছেলেমেয়ে নিয়ে বাঁচবেন কি-ভাবে। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে বিরাট বিয়ের মিছিল দেখলেন। দুধারে সারি সারি আলোর ত্রিভুজ, মাঝে মাঝে বড় আলোর ঝাড়। নৌকার মাঝি গঙ্গু, তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু, দুজনের মধ্যে সুখ-দুঃখের কথবার্তা মাঝে মাঝে হয়—শম্ভু-বাবুর কাছে কথা প্রসঙ্গে জানাল যে, তার ছেলের বিয়েতে সে এমন আলোর রোশনাই দেখাতে পারে। শম্ভুবাবু জানালেন ওতে অনেক টাকার দরকার। গঙ্গু মাঝি রহস্যময় হাসিতে জানাল তার কাছে তেমন টাকা আছে—সারা জীবনের সঞ্চয়—আটশো টাকা। শম্ভুবাবু শুনে স্তম্ভিত। তারপর নতুন এক বোধের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেন তিনি। নিজেকে ভারী হালকা লাগল তাঁর। বাড়ি ফিরলেন একজোড়া রুপোর তালের মত চকচকে জোড়া ইলিশ নিয়ে।

লেখক পাতার পর পাতা জুড়ে শম্ভু-বাবুর বিশেষ মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন অতি নিপুণভাবে। বলা বাহুল্য 'রোশনাই' চরিত্র-প্রধান গল্প। আধুনিক ছোটগল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই গল্পে প্রতিফলিত। ভাবের একমুখিতা, নির্দিষ্ট বক্তব্য ও গল্পের শেষে বিদ্যুৎচমক। সংলাপও এ-গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের বিশেষ মানসি-কতাকে প্রকাশ করেছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ঘটনার ঘনঘটা বা নাটকীয় ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নিছক তাৎপর্যহীন 'গল্প' তিনি লেখেন নি। তাঁর প্রতিটি ছোটগল্প বিষয়বস্তু বা বক্তব্যে উজ্জ্বল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, তাদের আচার-ব্যবহার পাপ-পুণ্যবোধ—লেখক ঘনিষ্ঠভাবে এদের চেনেন, সে পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে। লেখকের কিছু গল্প আছে বাংলাদেশের বাইরের পটভূমিকায় রচিত। তিব্বতের পটভূমিকায় 'পার্বত্য'—আন্দামানের পটভূমিকায় 'দ্বীপ' বা গোরখ-পুরের পটভূমিকায় 'রাত্রির ডাক'। পটভূমি বদলের ফলে গল্পে ভিন্ন স্বাদ এসেছে। একঘেয়ে নগরকেন্দ্রিক (কোলকাতা) সাহিত্য-চর্চা পাঠকদের মধ্যে এক ধরনের বিবমিষা জাগিয়েছে। ফলে নতুন স্বাদের রচনার জন্যে তাঁরা উদগ্রীব।

প্রথম দিকে দেশাত্মবোধ গল্প রচনায় লেখকের প্রবণতা দেখা গেলেও আস্তে আস্তে তাঁর ঝোঁক যায় মনঃসমীক্ষণ রচনার দিকে। যুদ্ধ, দেশ-বিভাগ বা সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলে মানুষের সমস্তরকম মূল্যবোধ বিপর্যস্ত—লেখকের ছোটগল্পে সে প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু কোথাও সোচ্চার নন তিনি। এড়িয়ে যাননি কিছুই—সবই এসেছে তাঁর গল্পে একটু অন্যরকম ভাবে। বিকেল সাড়ে চারটের পটভূমি গল্পের শিল্পপতি নায়ক মহাদেব সান্যালের টাকার হিসেব কষতে কষতে হার্টফেল করে মৃত্যু কী প্রতীকী নয় ? এটি পাপবোধের গল্প। গল্পটি পড়তে পড়তে সার্ত্রের আলটোনা নাটকের কথা মনে হয়েছে। সেখানেও দেখা যায় ভারসাম্য হারিয়ে প্রায় বিকৃত মস্তিষ্কের একজনকে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে।

ছেঁড়া তমসুক

সমরেশ বসু

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সেই সময় খবরটা এল। একজন এসে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে কেমন একরকমের বিদ্রূপময় অথচ নির্বিকার-ভাবে হেসে খুব সাধারণ গলাতেই বলল, 'ওই যে, ওই সেই মেয়েটা, মারা গেছে।'

পৌষ মাস। অন্ধকার ঘনিয়েছে প্রায় ঘন্টা তিনেক আগেই। মফস্বল শহরের সদর-অন্দর, সব রাস্তাই এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে আসার কথা। হয়ও অন্যান্য দিন। কিন্তু আজ শনিবার। তাই এখনও কিছু লোকের আনাগোনা রয়েছে।

রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ভিড়টা একটু বেশী। কারণ, দোকান-পাট বেশী, আলোও বেশী আর মানুষের যাতায়াত ত আছেই। তার পর রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে ক্রমেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, দোকান-পাট কমে এসেছে।

আকাশে কুয়াশা, তারাগুলি মরা চোখের মত নিষ্প্রভ। ধুলো আর ধোঁয়ায় গোটা শহরটা উলঙ্গ-বাহার শাড়ির মত একটা অশ্লীলতার আবরণ জড়িয়েছে যেন। উত্তুরে বাতাসে শীতের কাঁটা। 'সিটি-ফাদার' ষাঁড়টা স্টেশনের বারান্দায় উঠে পড়েছে। রাস্তার কুকুরেরা আর মানুষেরা গরম আশ্রয়ের সন্ধান করছে।

সেই সময় খবরটা এল।

দক্ষিণের ফাঁকায়, রাস্তার উপরে, সেকেলে নিচু ছাদ, পোকা খাওয়া কড়ি-বরগা আর চুন-বালি খসা 'গণেশ কাফে'র ঘরে সংবাদটা এল। গণেশ কাফেতে তখন জম-জমাট আড্ডা। চায়ের কাপ-গেলাস-ভাঁড়, সবরকম পাত্রই জড় হয়েছে টেবিলের ওপর। প্রায় একটা গণতান্ত্রিক ঐক্যের মত। সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় ঘরটিকে গ্রাস করেছে।

মালিক লুঙ্গি পরে চাদর জড়িয়ে বসে আছে কাউন্টারে। নতুন লোক আসার সম্ভাবনা কম। এখন যারা আছে, তারা প্রতিদিনের, প্রায় সব সময়ের। অধিকাংশই স্থানীয় বেকার যুবক। কলেজ থেকে ফেল-করা, ভেগে পড়া, কিংবা পড়ুতে-না-পাওয়াদের ভিড়ই বেশি। ময়লা পাজামা, ধুতি, প্যান্ট, ছেঁড়া জামা, উসকো-খুসকো চুল আর পুরোপুরি খেতে-না-পাওয়া মুখের একটা লেপটা লেপটি দঙ্গল। অবশ্য এদের মধ্যে এদের দু-একজন ফিটফাট চকচকে, ভরপেট খাওয়া সুস্থ বন্ধুবান্ধব যে না দেখা যায়, তা নয়। তবে সেটা অনিয়মিত। খাপছাড়া, করুণা করুণা ভাব। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, পি-এস-পি, আর-এস-পি, স্কুল-কলেজ মিউনিসিপ্যালিটি, খুন-জখম মারামারি, প্রেম-ফুসলানো-হরণ, গান-বাজনা থিয়েটার এই শহরের আদি ও অন্ত এখানকার আলোচনার বিষয়। মায় সাহিত্য পর্যন্ত। চেঁচামেচি উত্তেজনা ত আছেই। হাসাহাসি গালাগালি আছে। হাতাহাতিও যে নেই, তা নয়। মাঝে মধ্যে ছুরিও বেরিয়ে পড়েছে ক্রুদ্ধ হুংকারের মধ্যে। হয়নি যদিও, তবু খুনোখুনির আশংকা দেখা দিয়েছে অনেকবার। আর এরই মধ্যে আবার কান্নাও আছে। রাত্রি আটটার সময়, আড্ডা তখন বেজায় জমজমাটি। কেরোসিন কাঠের পার্টিশান দেওয়া দুটি ছোট ছোট 'ফর লেডিজ'-এর খুপরিতেও আড্ডা জমেছে। যদিও লেডী নেই একজনও।

গণেশ কাফের মালিক গণেশও আড্ডার শরিক হয়ে গিয়েছে। বাতাসহীন চাপা ঘরটায় সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় একটি নরক-গুলজার-করা প্রেতছায়ার মত দেখাচ্ছিল সবাইকে। নানান রকমের কথা, হাসি ও বাদ-প্রতিবাদে সবাই যখন মশগুল, সেই সময়ে একটা নিত্য-নৈমিত্তিক পুরনো খবর বলার মত, হেসে নির্বিকারভাবে একজন এসে বলল, 'সেই, কলোনি-পাড়ার কাছে, ভটচার্জি পাড়ার রাধু বাড়ুজ্যের মেয়ে আমাদের ফেমাস বিজু, বিজলী হে বিজলী, মারা গেছে।'

নরকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ছায়াগুলি মন্ত্রপড়া জল ছিটুনোর মত অনড় নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল খবরদাতার দিকে।

একটু পরে একটা মোটাগলা শোনা গেল, 'কীভাবে?'

জবাব শোনবার আগেই আর একজন বলল, 'আজ বিকেলেও ত দেখেছি।'

আর একজন, 'হ্যাঁ, এখানেই ত দেখেছি সন্ধ্যের সময়।'

বলে সে একজনের দিকে তাকাল। যার দিকে তাকাল, সে দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে। তার সংগে সংগে আরও দুজন। চব্বিশ-পঁচিশের বেশী কারও বয়স নয়। তিনজনেই প্রায় এক সংগে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আজ আজই সন্ধ্যের সে ছিল। কিন্তু কীভাবে মারা গেল? কোথায় আছে?'

যে খবরটা এনেছিল, সে বলল, 'নির্মল স্যাকরার আম-বাগানের ধারে নর্থ কেবিনের কাছে, রেল-লাইনের ওপরে।'

'রেল-লাইনে?'

'হ্যাঁ। মালগাড়ির তলায় কাটা পড়েছে। আমি দেখে এসেছি। ঠিক গলার কাছ থেকে'—

'সুইসাইড নিশ্চয়? নইলে সেখানে রাত্রি বেলা কে যায়?'

ততক্ষণে সেই তিনজন বেরিয়ে গিয়েছে। তারপরেও গণেশ কাফের নিচু ছাদ ঘরটা খানিকক্ষণ যেন দম চেপে রইল। একটু পরে একজনের গলা শোনা গেল, 'আশ্চর্য! কিছু বোঝা যায় না আজকাল।'

গণেশ ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'সত্যি! আর এই রেল-লাইনটা যেন কী স্নাইরি।'

কেউ কেউ উঠল। বলল, 'যাই, দেখে আসি।'

সেই তিনজন ছুটতে ছুটতে অন্ধকার রেল-লাইন দিয়ে নর্থ কেবিনের কাছে এসে পৌঁছেছে। জায়গাটায় রাস্তার আলো আসে না। কেবিনের আলো এসে পড়বার সুযোগ পায়নি একটি গাছের জন্য। দুটি ভিমেক টিমটিমে রেল লণ্ঠন নিয়ে এসেছে কেবিনের কুলি। জি আর পি পুলিশও এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে তাদের টর্চ-লাইটের আলো। কিছু লোকের ভিড় ঘিরে রয়েছে ফোর্থ লাইনের একটা অংশ।

ওরা তিনজনে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। লাইনের দিকে একবার তাকিয়েই একই সংগে চোখাচোখি করলে তিনজনে। একটা অসহায় জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত তিন-জোড়া চোখ। তিনজনেই যেন পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছে, এটা বিজুই ত?

হ্যাঁ। বিজুই। চোখ নামিয়ে আবার দেখল তারা বিজলীকে। ঠিক ঘাড়ের কাছ থেকে মাথাটা কেটে গিয়েছে। জড়ান রুক্ষ বেণীটা পুরোপুরি এলিয়ে পড়ে আছে লাইনের মধ্যে। কিন্তু মাথাসুদ্ধ অনেকটা স্লীপারের উপর। মাথাটা লাইনের ভেতরে, শাড়ি-জড়ানো দেহটি লাইনের বাইরে পাথর আর ঘাসের উপরে। যেন প্রায় ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে।

রেল-লাইনের টিমটিমে আলো বিন্দুর মত চিক চিক করছে বিজলীর চেয়ে থাকা স্বচ্ছ চোখে। হাঁ-মুখটা খোলা, ঝকঝকে সাদা দাঁতে আলো পড়েছে। কপালের রক্ত টিপটা জ্বলজ্বল করছে এখনও। আর এদিকে ঘাড়ের কাছ থেকে খয়েরী-ডোরা কালোপাড় শাড়ির আঁচলটা ঠিক বুকের উপর দিয়ে টানা আছে। কোথাও যেন এতটুও অবিন্যস্ত হয়নি। কেবল বাঁ পায়ের থেকে শাড়িটা একটু বেশী উঠে গিয়েছে, ঘুমন্ত যে-রকম উঠে যায় মানুষের। হাতের লাল কাঁচের চুড়িগুলির কয়েকটা ভেঙে পড়ে আছে হাতের কাছেই। বাকীগুলি সবই আস্ত আছে। কোথাও রক্ত লেগে নেই। কেবল ঘাড়ের কাছে খয়েরী ডোরা কাটা শাড়িটা পেরিয়ে লাল ব্লাউজের বুকের উপর গড়িয়ে এসেছে একদলা রক্ত। শীতের উত্তুরে হাওয়ার টানে তা এর মধ্যে শুকিয়ে যেন বাসী হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া আর সব ঠিক আছে। যেন, ঘাড়ের সংগে মাথাটা জুড়ে দিলে, এখুনি বিজু ওর বিজলী চমক-হাসি হাসতে হাসতে উঠে বসে, চমকে দেবে সবাইকে। যে হাসিতে এই মফস্বল শহরের সবাই কোনও না কোনও দিন একবার চমকেছে।

বিজু, হ্যাঁ বিজুই। কলঙ্ক যার অঙ্গের ভূষণ ছিল। যে কলঙ্কিনীর কথা বলতে রসিয়ে উঠত শহরের ইতর ভদ্র। যাকে সহজলভ্য মনে করে সেই চিরকালের টোপ ফেলাফেলি খেলা অনেক হয়েছে, কিন্তু প্রচণ্ড আক্রোশে গর্জাতে হয়েছে নীরবে ও সরবে। অথচ যাকে কলেজের কয়েকটা পড়া কিংবা পড়তে পড়তে সরে-পড়া বখো দুর্বিনীত ছেলের সঙ্গে প্রায়ই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে নির্লজ্জের মত। সন্দেহজনকভাবেই রাস্তার উপর গায়ে গায়ে, জোরে হেসে-হেসে শহরের গায়ে জ্বালা ধরাতে দেখা গিয়েছে। এমন কি আজও দেখা গিয়েছে। এ সেই বিজলী, এই রেলেকাটা মেয়েটা।

গণেশ কাফের ওই তিনজন আবার চোখাচোখি করল। ওরা তিনজন সেই কয়েকটা বখো ছেলে, যাদের সংগে বিজুকে দেখা যেত সব-সময়। তাদের তিন জনেরই চোখের দৃষ্টি যেন গলায় দড়ি দেওয়া লাসের মত আরও উদ্দীপ্ত, একটা মহাশূন্যের মত অশেষ বিস্ময় ও প্রশ্ন নিয়ে যেন এখুনি চোখগুলি রক্ত কিংবা জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে ফেটে পড়বে।

বিজু, বিজুই ত। যে আজ বিকেলেও তাদের তিনজনের সংগে গণেশ কাফেতে ছিল। যার কথায়, হাসিতে, এমন কি রাগ ও অভিমানের মধ্যে, একবারও এই কাটা-পড়ার ছায়াও দেখা যায়নি।

তবে?

ভিড়ের মধ্যে কার একটি রসাল দীর্ঘ জু-ই-ই শোনা গেল। তারপর চাপা গলায়, 'জল্দি আভিজ্ঞজিয়া। শোন একবার।'

তিন-জোড়া চোখ সংগে সংগে ভিড়ের দিকে ফিরে গেল যেন খ্যাপা নেকড়ের মত। কাউকেই চেনা যায় না। রেল-লন্ঠনগুলি বিজলীর লাসকে মানান। বিজলীকে ঘিরে রয়েছে। ভিড়ের লোকগুলি অস্পষ্ট।

অচেনা আর চেনা লোকের গুঞ্জন একইভাবে চলছে। কে? কার মেয়ে? ও! সেই মেয়ে? কী হয়েছিল?

বুঝে নাও! হয়েছিল একটা কিছু নিশ্চয়। হবে, জানাই ছিল।

বিজলীর বাবা রাধুবাবুকেও দেখা গেল জি আর পি'র দারোগার পাশে। বিজুর দিকে ওঁর চোখ নেই। অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন কোল-বসা চোখে। খুবই অসহায়, তবু যেন একটা অপরাধীর ভাব। বিজলীর লাস কিংবা লাস দেখতে আসা ভিড়ের কারও দিকেই তাকাতে পারছেন না।

দারোগা জিজ্ঞেস করল, 'কত বয়স হয়েছিল আপনার মেয়ের?'

'তেইশ।'

'বিয়ে দেননি কেন?'

দারোগার মতই প্রশ্ন। রাধুবাবু বললেন, 'সংগতি ছিল না।'

'হুঁ। কী হল হে, লাস বাঁধ।'

একটি সেপাই জবাব দিল, 'বাঁশ নিয়ে জমাদার আসছে সার।'

'হুঁ।' দারোগা আবার বলল, 'থার্ড ইয়ার থেকে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল কেন আপনার মেয়ে?'

'ছ মাসের বেতন বাকী পড়েছিল, তাই!'

'উ', তাহলে বলছেন, কোন চিঠিপত্রই রেখে যায়নি?'

'না।'

'আঁ-হা! দেখবেন মশাই, চেপে-টেপে যাবেন না, পরে মুশকিলে পড়ে যাবেন।'

রাধুবাবু যেন ধরা-পড়া চোরের মত অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

দারোগার টর্চলাইট একবার ঝলকে উঠল কাটা বিজলীর ওপর।

লাস বেঁধে নিয়ে যাওয়ার লোকেরা এল। ওরা তিনজনে এগিয়ে গেল রাধুবাবুর কাছে। ওদের তিনজোড়া উদ্দীপ্ত চোখে একটা হিংস্র প্রশ্ন বাগিয়ে ধরা ছুরির মত চকচকিয়ে উঠল নিঃশব্দে। রাধুবাবুর কাছে তারা জানতে চায়, কী হয়েছিল। কেন মরেছে বিজলী।

রাধুবাবু তেমনি অসহায়ভাবে তাকালেন। বললেন প্রায় চুপি চুপি, 'এই যে শঙ্কর আর নরেশ এসেছ। ও, প্রভাতও এসেছ?'

হ্যাঁ, ওরা এসেছে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। রাধুবাবু কী জানেন, সেইটি বলুন। তারা জানতে চায় তাদের, হ্যাঁ তাদের বিজু যে হাসতে হাসতে এসেছিল 'গণেশ কাফে' থেকে, সে কেন গলা বাড়িয়ে দিয়েছে রেলের তলে।

রাধুবাবুও ওদেরই চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এতক্ষণে দেখা গেল, ওঁর কোল-বসা চোখ দুটি সর্দি-জ্বরের মত ভেজা-ভেজা লাল হয়ে উঠছে। দাঁতহীন ঠোঁট দুটি চাপছেন বারেবারে। বললেন, 'কিছু জানিনে। বিজুর তোমরা বন্ধু। তোমরা, তোমরা কিছুই জান না?'

শঙ্কর নরেশ আর প্রভাত আবার চোখাচোখি করল। বুঝল ওরা, রাধুবাবু সত্যি কিছু জানেন না। তবে? তবে কে বলবে? কে জানে?

তিনজনের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বিজলীর উপরে। ওরা চমকে পরস্পরের হাত চেপে ধরল। যেন নইলে ছিটকে বেরিয়ে যাবে কোথাও। দেখল, বিজলীর শ্যামলী মুখখানি ওর বুকের উপর বসিয়েছে জমাদারেরা। আর বিজলী এখন চেয়ে আছে ঠিক তাদের তিনজনের দিকে।

ওরা তিনজনেই যেন নিঃশব্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, বি-জু! বি-জু!

জমাদারেরা লাস কাপড়ে বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে নিল। দারোগা ডাকল, 'আসুন রাধুবাবু।'

ভিড় ছত্রভঙ্গ হল। একদল লেগে-থাকা মাছির মত চলল জি-আর-পি পুলিশ অফিসের দিকে লাসের পিছু পিছু।

ওরা তিনজনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সখানে। তারপর আরও খানিকটা উত্তর দিকে গিয়ে, আঁশশ্যাওড়ার জঙ্গল পেরিয়ে নির্জন আর অন্ধকার রেল-পুলটার উপরে গিয়ে উঠল। রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে, ঝুঁকে দাঁড়াল। জংশন স্টেশনের সর্পিল লাইন ক্রমশঃ এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে দূর-দূরান্তর।

উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, গোটা শহরটাকে ধোঁয়া গ্রাস করে ফেলছে।

ওদের তিনজনকেও একটা ভয়ংকর কিছু গ্রাস করে ফেলছিল। শত চেষ্টাতেও কারও গলা দিয়ে যেন একটি শব্দও বেরুল না।

কেবল নরেশ দম নিয়ে নিয়ে বলল, 'বিজু—বিজুটা......'

আর কিছু বলতে পারল না। কেবল মনে পড়ল, রোজকার মত আজকেও বিজু কেমন খিলখিল করে হেসেছিল বিকেলে।

তিনজনই চুপ করে রইল। ঝিঁঝিঁর চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

বিজুর খিলখিল হাসি ওদের তিনজনের বুকেই যেন বাজতে লাগল। তিনজনেই তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়। কিছুই দেখা যায় না। ওখানে লাইনের উপর হয়ত এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে। হয়ত এতক্ষণে শেয়াল এসে চাটতে আরম্ভ করেছে। আর ওরা তিনজন যখন চলে যাবে পুল থেকে নেমে, গভীর রাত্রে সেই খিলখিল হাসিটা হয়ত রেল-লাইনের লোহায় বেজে উঠবে: কেননা, বিজুর গলাটা ওই লাইনের উপরেই কাটা গিয়েছে।

ওদের তিনজনকে এখন যে-কোনও লোক পুলের উপর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে খারাপ কিছু সন্দেহ করত; যেন তিনটে ষড়যন্ত্রী কোন সর্বনাশের মতলব আটছে। ওদের ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড়, উসকো-খুসকো চুল, সর্বোপরি ওদের রক্তাভ চোখে কুটিল প্রশ্ন ও কঠিন প্রতিহিংসার একটা বাসনা দপদপ করছে।

মণিহারা অজগরটার মত দারুণ যন্ত্রণায় ও আক্রোশে যেন ওরা মনের অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছে বিজুর মৃত্যুর কারণটা। মনে পড়ছে। আজ যখন বিজু এল বিকেলে, ওরা বললে, 'বিজু তুমি লেট।' বিজু বললে, 'এখন থেকে লেট হতে হতে আর আসাই হবে না।' ওরা বললে, 'কেন?'

খিজু হেসে বললে, 'না রে, আমার বুঝি ব-খা হবে না। তোমাদের তিনজনের সঙ্গে ঘুরলেই আমার চিরকাল চলবে?' বলে জোরে হাসল।

কিন্তু কী এসে যায় তাতে? ও-কথা বিজু প্রায়ই বলত। নতুন কিছু নয়। হ্যাঁ। ওটা বিজুর প্রায়ই হত। মনে কোনও রাগ থাকলে কিংবা এমনি রহস্য করেও কতদিন বলেছে, 'আর আসা হবে না। আজকেই ইতি।' এরকম অনেক ইতি হয়েছে, কিন্তু তারপরে পুনশ্চের কোন অভাব হয়নি। সুতরাং বিজুর আজকের কথায় কিংবা ভাবে নতুন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে শেষ রেখাকে চিহ্নিত করা যায়।

তবে? তবে কী হল? ওরা তিনজনে একই সঙ্গে ফিরে তাকাল আবার লাইনের দিকে। তিনজনেরই যেন লাইনটার উপরে মাথা কপাল কুটতে ইচ্ছে করছে। কুটে-কুটে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, কেন, কেন বিজু?'

কিন্তু ওরা তিনজনেই মুখ চেপে রইল রেলিং-এ। কেননা, কপাল কুটে রক্তগঙ্গা বইলেও লোহার লাইনটা কিছু বলবে না।

শুধু বিজুকে ঘিরে ওদের পুরনো দিনগুলি আবর্তিত হতে লাগল। সেই দিনগুলি, যখন বিজলী ব্যানার্জি ছিল ওদের সহপাঠিনী।

যখন ওরা ছিল ছাত্র। যখন ওদের জীবনে ছিল ঝড়ের বেগ, ফেনিলোচ্ছল প্রাণ আর চোখে স্বপ্নের কাজল। যখন বিজু ক্লাসে আসত রাজেন্দ্রাণীর মত, আর ওরা ছিল যেন বিদ্রোহী প্রজা। রাণীর স্তুতি করেও ওরা বিদ্রূপ দিয়েই, বেয়াদপির হাসি থাকত ওদের ঠোঁটে ও চোখে। কিন্তু বিজু ছুটে যায়নি প্রিন্সিপালের ঘরে। খাঁটি রাজেন্দ্রাণীর মত শুধু হেসেই শান্ত করেছে সেই বিদ্রোহীদের। যে হাসিটা তখন থেকেই বিজুর কলঙ্কের সন্দেহ ঘনিয়ে এনেছিল সকলের মনে। আর সকলের মত ওরা তিনজনও সন্দেহ করত। কলঙ্কিনী জেনেই ওদের বিদ্রোহ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে চেয়েছে মাঝে মাঝে।

কিন্তু ছাত্র-জীবনের যেখানটায় শাকো রচিত ছিল নিশ্চিত আশ্রয়, আহার আর একটু ভালবাসা, ওদের সেই আসল নোকোটাই ছিল তলা-ফুটো। জীবনে যে ঝড়ের বেগটা ছিল, সেটা শুধু নোঙর ছিঁড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে সর্বনাশের মধ্যে। কলেজের প্রাঙ্গণ ছেড়ে কবে ওরা জীবনের আগুন লাগা অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদেরই মনে নেই। মানে সেই, বাইরের প্রাঙ্গণে এসে কলেজের দলাদলি ভুলে, কবে ওরা তিনজন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। বেকারি আর অনাহারের জ্বালায় কবে ওরা শহরের সেরা দুর্বিনীত ও বেয়াদপ বলে কু-খ্যাত হয়ে গিয়েছে, সে কথা ওরাও জানে না।

তার কি এক বিজলী ব্যানার্জিকে নিয়ে কোন একদিন ওরা একটা মস্তানি করত [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible] থাকত না [illegible] না [illegible] [illegible] আগুন এবং [illegible] [illegible] জীবন, নিরালা [illegible] উপর দেখা হয়ে যেত। রাজেন্দ্রাণীর চোখের কোণে সেদিন গভীর পরিখা। চোখ দুটি বড় বেশী ভাসা-ভাসা, করুণ। মুখখানি শুকনো, হাত ভরতি বাদাম ভাজা। মুখেও দু-একটি দানা ছিল।

ওদের তিনজনকে দেখে এক মুহূর্তে বুঝি লজ্জা পেয়েছিল বিজু। পরমুহূর্তেই সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার করুণ মুখে। বলেছিল, 'আপনারা এখানে?'

বিজলীকে দেখা মাত্র ওদের তিন-জনেরই জিভ্ চুলকে উঠেছিল বিদ্রূপ করার জন্যে। মনে মনে তৈরী হয়ে উঠেছিল পিছনে লাগার ফিকিরে।

কিন্তু বিজলীর কালো চোখ দুটিতে কী জাদু ছিল, ওদের ইচ্ছে পূরণ হয়নি। বরং সেই কুখ্যাত দুর্বিনীতেরা বিজুর গায়ে-পড়া আলাপে যেন একটু থিতিয়েই গিয়েছিল, বলেছিল 'এমনি।'

কিন্তু একটু রহস্যের আভাস যেন চিকচিক করে উঠেছে বিজুর কালো চোখে। বলেছিল, 'আরও কদিন দেখেছি এখানে আপনাদের।'

বলে হাতের মুঠি খুলে বাড়িয়ে দিয়েছিল তিনজনের দিকে। বলেছিল, 'নিন, বাদাম খান।'

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, বাদাম নিয়েছিল। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনজনের মুখে উপোষের ছাপ, ছেঁড়া-জামাকাপড় আর উসকো-খুসকো চুলে তিন-জনকে যতটা হতভাগা মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী মতলববাজের ছাপ ছিল ওদের চোখেমুখে।

ওদের তিনজনকেই একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল। কী বলতে চায় মেয়েটা? ওরা কেন আসে এই কালভার্টের কাছে, জানে নাকি সে? জানে নাকি, ওই অদূরের সাইডিং-এর পাশে থাক-দেওয়া রেল-স্লীপারগুলি সরাতে এসেছে ওরা? কেননা, স্লীপারগুলি একটি কাঠের গোলায় পৌঁছে দিলে তবে ওরা কিছু টাকা পাবে। টাকা ওদের চাই। নইলে বাঁচা যায় না। আর বাঁচবার অন্য কোন রাস্তা ওরা আবিষ্কার করতে পারেনি।

কিন্তু বিজলী ওদের কিছুই বলেনি। শুধু সেই হাসিটুকুই লেগে ছিল ঠোঁটের কোণে। বলেছিল, 'চলুন, শহরের দিকে যাওয়া যাক।'

অসম্ভব। কাজ হাসিল না করে কেমন করে যাবে ওরা? পা সরেনি তিনজনেরই।

বিজলী আবার বলেছিল, 'চলুন।'

আশ্চর্য! সে ডাক ওরা ফেরাতে পারেনি। যেন কোন সুদূর আবছায়া থেকে এক বিচিত্র রহস্যময়ী তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হাতছানি দিয়ে। নিয়ে গিয়েছিল ওদেরই পরেশ কাকের আস্তানায়। আর নিজের খিদের নাম করে একরাশ খাবার নিয়েছিল। বলেছিল, "টি এন্ড আর এর লাল টেনের মেয়েটাকে পড়াই। আজ মাইনে পেয়েছি, খাওয়া যাক।"

তখন ওদেরও চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল কালভার্টের কাছেই টি এন্ড আর-এর কোয়ার্টার। তাই বিজু তাদের দেখতে পেয়েছিল কয়েকদিন।

ওরা লোভীর মত খেয়েছিল। জানত, রাধু বাড়ুজ্যের একপাল পুষ্যিাধিকাধিক ঘরে কানাকড়িটি না থাকলেও বিজলীর অভাব নেই। তার মেলাই মক্কেল।

খেতে খেতেই তিনজনের মধ্যে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, "কলেজের খবর কী?"

বিজু ছোট মেয়েটির মত একমুখ খাবার নিয়ে বলেছিল, "ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন?"

"টাকা নেই।"

অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল ওদের। টাকা নেই, সবাই জানত। কিন্তু একথাও সবাই জানত, ব্রজেন পালের মত কাপ্তেন থাকতে, বিজলীর কোনও অভাব নেই।

উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী মকুন্দ পালের নিকৃষ্ট ছেলে ব্রজেন পাল। কিন্তু মকুন্দের মতে, সে-ত ভগবানের হাত। ওই হাতটি থাকলে গাধা পিটিয়ে নাকি ঘোড়া করা যায়। আর পালবংশে কলেজের মুখ দেখা সে-ই ত' প্রথম, অতএব বি-এ পাশ করতে দশ বছর লাগলেও ক্ষতি কী? নিকৃষ্টের পিছনে উৎকৃষ্ট টাকা থাকলেই ত গাধা একদিন ঘোড়ার মত হ্রেষাধ্বনি করতে পারবে।

সেই হ্রেষাধ্বনিরই বাসনায় খুরে মরা নাল থেকে মাথার শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত পোশাকে-আশাকে ব্রজেন একটি পাকা অশ্ব হয়ে গিয়েছে তখন। আমেরিকান কাট কোট প্যান্টের পকেটে তার উৎকৃষ্ট টাকা বাজত ঝন-ঝন করে। বিশেষ করে বাজিয়ে ফিরত সে বিজলীর পিছনে। কলেজ থেকে রাধু বাড়ুজ্যের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে দেখা গিয়েছে ব্রজেনকে। ব্রজেনের কথা শুনে মনে হত, বিজলীর শাড়ি, ব্লাউজ, বই-ফাউন্টেন পেনটি পর্যন্ত ওর টাকাতেই কেনা।

সবাই তাই বিশ্বাস করত। ব্রজেনের সঙ্গে তখন বিজলীকে এদিকে-ওদিকে দেখাও যেত। তাই, টাকা নেই শুনে ওদেরই গলায় খাবার আটকে যাবার দাখিল হয়েছিল।

বিজুর চোখে সেই রহস্যের ঝিকি-মিকি আরও কয়েকটা খুনশুটি দিয়েছিল খুলে। হেসে বলেছিল,

"কী হল?"

একজন জিজ্ঞেস করেছিল, "ব্রজেনের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে নাকি?"

পলকের জন্য বুঝি বিজলীর চিকচিক-চিক চোখ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল, ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু গিয়েছিল মরে।

পরমুহূর্তেই আবার হেসে বলেছিল, "ঝগড়া হবে কেন? যতটুকু ভাব দেখছেন, এখনও তাই আছে। ব্রজেন ত কখনও পেছন ছাড়ে না। আপনারা বোধহয় দেখেননি, ব্রজেন ছায়ার মত আমাদের পেছন-পেছন এসেছে। উঁকি দিয়ে দেখুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এই দিকে চেয়েই।"

ওরা উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে দেখে-ছিল, সত্যি ব্রজেন বাইরে দাঁড়িয়ে। চোখে তার অপেক্ষমান কুকুরটার কৃপা প্রার্থনার

দৃষ্টি। ঠোঁটে সিগারেট, দু-হাত প্যান্টের পকেটে।

ফিরে দেখছিল ওরা, বিজলীর ঠোঁটে যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি, আর সেই ওদের তিনজনেরই, বিজলীকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। ওদের দুর্বিনীত বুকেও মানুষের হৃৎপিণ্ডের অবশিষ্টাংশে টনটন করে উঠেছিল যেন একটু।

বিজু কেমন একটু হেসে আবার বলেছিল, "মেয়ে হয়ে ব্রজেনের টাকা কেমন করে নেওয়া যায় বলুন।"

সেই মুহূর্তেই বিজলীর দিকে তাকিয়ে থাকা চোখের চাউনি একেবারে বদলে গিয়েছিল ওদের। সেই মুহূর্তেই একটি মেয়ে-জীবনের সত্যের তত্ত্বকে আবিষ্কার করে, বিজলীর নতুন পরিচয়ে অপরাধী হয়ে উঠেছিল নিজেরা।

বিজলী তখন উঠে পড়েছিল। ওদের মধ্যেই কে যেন বলেছিল, "চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিজলীর চোখে আবার সেই রাজেন্দ্র-পরীর হাসি চমকে উঠেছিল।

বলেছিল, "ব্রজেনের জন্যে? তার দরকার হবে না। পেছনে ঘুরেই যখন ওর শান্তি, ও ঘুরুক। কিন্তু—"

বিজলীর চোখে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। একটু থেমে বলেছিল, "কালভার্টের ওই বিচ্ছিরি জায়গাটায় আপনারা আর যাবেন না। রেলের গুডস-শেডের ওখানটা থেকে পুলিশে বিনা দোষেও লোক ধরে নিয়ে যায়।"

বলে সে চলে গিয়েছিল।

ওরা তিনজন যেন বিজলীতারের শক খেয়ে থমকে তটস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেই ওদের ত্রয়ীকে ঘিরে বিজলীর শুরু। সেই-দিনই গণেশ কাফে থেকে গোটা শহরে মাছিরা ভ্যান ভ্যান করে উঠেছিল, তিন কুখ্যাতের সঙ্গে বিজলীর মিলনের কথা। রলেছিল, যার যেথা ঠাঁই।

তারপর সে-কাহিনীও পুরনো হয়ে গিয়েছে। এই তিন বছরে, ওই তিনজনের সঙ্গে বিজু তিনদিন ঘুরেছে। কবে ওরা 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' হয়ে গিয়েছে। কবে ওরা চারজনের এক সর্বক্ষণের অখণ্ড জুটি হয়ে গিয়েছে, নিজেদেরও বোধহয় মনে নেই। দেখে, শহরের টোপ-ফেলা খেলোয়াড়েরা অনায়াস ভেবে অনেকবার উৎসাহিত হয়েছে আর আক্রোশে দাঁত পিষেছে। ব্রজেন পিছন ছাড়েনি, ক্ষিপ্ত হয়েছে আরও। গোটা শহরের গায়ে অনেক জ্বালা ধরেছে। আজও ধরেছে।

আজও ধরেছে এবং ধরিয়ে বিজু নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল। কেন?

রেলপুলের উপর থেকে তিনটে অভিশপ্ত প্রেতের মত ওরা আবার ফিরে তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়। আর ওদের তিনজনেরই মনে হল, প্রথমদিন বিজুকে যে রহস্য ঘিরে ছিল, আজ সেই রহস্যই ওই ফোর্থ লাইনের উপরে শেষ-বারের জন্য গলা পেতে দিয়েছে। উদ্ঘাটনের কোন চিহ্নই সে রেখে যায়নি। শুধু তিনটি প্রেতাত্মা চিরকাল ধরে সেই রহস্যের সন্ধানে ফিরবে।

ফিরবে, আর জানতে চাইবে, কেন বিজু নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল? বিজু তাদের কালভার্টের সেই বিচ্ছিরি জায়গাটায় যেতে বারণ করেছিল, তারা আর যেতে পারেনি, তার পরে বিজু তাদের অনেক জায়গায় যেতে বারণ করেছে, তারা যায়নি।

কিন্তু বিজু কেন নর্থ কেবিনের কাল-আঁধারে, লাইনের উপরে এসে মরেছে? কেন বিজু?

জবাব পাওয়া যাবে না। কালকের শিশিরে-ভেজা লাইনটায় কোন চিহ্নও থাকবে না। কেবল অদূরের ক্রশ লাইনের কাছে, দু-ফুট উঁচু সিগন্যালের ওই লাল আলোটা জ্বলবে। এই থিতিয়ে আসা অন্ধকারে এখন ওই আলোর রক্তাভা বেশ গুঁড়ি মেরে মেরে গিয়ে ঠেকেছে ফোর্থ লাইনের বুকে। ওই রক্তাভ রেশটা চিররাত্রি ধরে দপ-দপ করবে একটি রক্তাক্ত ক্ষতের মত।

কিন্তু তার পরদিন রহস্যের একটি গ্রন্থি মোচন হল। সকলের জিহ্বা আর একবার লক-লক করে উঠল। বিকেলের দিকে মর্গ থেকে সংবাদ এল, বিজলী গর্ভবতী ছিল।

আর ওরা তিনজন নরেশ-প্রভাত-শংকর গণেশ কাফেরই 'ফর লেডীজ' খুপরীতে বসেছে মুখোমুখি। চোখে ওদের প্রজ্বলিত ঘৃণা দপদপ করছে। হিংস্র কুটিল সন্দেহে ওরা নিজেদেরই পরস্পরকে হানছে। ওদের গোটা জীবনের সব সর্বনাশ আজ নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি করবার উন্মাদনায় বসেছে কবুল করতে। কে? কে অকলঙ্ক বিজুকে এই কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে মেরেছে?

কবুল খেতে হবে, কেননা, তারা তিন-জন ছাড়া, বিজলীর এই সর্বনাশের শরিক আর কেউ হতে পারে না। শহরের সব বিষধরদের নির্বিষ করেই এই দুর্বিনীত ছন্নছাড়া ত্রিভুজকে সে নিজেই আশ্রয় করেছিল। একটি মেয়ে যতটুকু পারে, তার সবটুকু নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এই তিনজনেরই কাছে; তার সব সর্বনাশ, তার সব কলঙ্ক সে বন্ধক রেখেছিল এই তিনজনেরই কাছে, বন্ধুত্বের মূল্যে। সাহস প্রীতি আর স্নেহের মূল্যে। তাদের তিন-জনকে সর্বনাশের সব পথ থেকে নোংরা বীজাণুদের সমস্ত আশ্রয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মূল্যে, বিজু তার ভিতর-দুয়ারের কপাটও দিয়েছিল হাট করে খুলে। রাখেনি কোন সদর অন্দর। তাদের তিন-জনের পাশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজ আঙিনাটায় নিশ্চিন্ত হয়ে ফুটেছিল সে ফুলের মত। তারই সুযোগ নিয়ে কে তাকে খুন করেছে প্রকাশ করতে হবে। বন্ধুত্বের হাতে নিজেকে অবশ করে ছেড়ে দেবার তমসুক ছিল তাদেরই হাতে। তারাই কেউ ছিঁড়েছে সেই তমসুক। কবুল করতেই হবে।

সেই কবুল করববার জন্যেই, তিনজনে তারা কাঠের খুপরিটার মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হিংস্র হয়ে বসে আছে। কারও দিক থেকে কারও চোখ নামছে না। যেন প্রত্যেকেই শিকারী ও শিকার।

বাইরে গণেশ কাফের গুলতানি চলেছে রোজকার মতই। সেখানে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই, এই একই ছাদের তলায়, একটি খুপরিতে, একটা ভয়ংকর রক্তারক্তির উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে।

কুটিল সন্দেহে, চাপা ক্রুদ্ধগলায় হিসিয়ে উঠল, "আমি নয়, প্রভাত নয়, নরেশ নয়, তবে কে? কে, আমি জানতে চাই। আর কে ছিল তার আমরা ছাড়া?"

যেন ছোবল মারার আগে, কেউটের মত কাঁধ ঝাঁকিয়ে নরেশ গর্জে উঠল, 'আমিও তাই জানতে চাই। সে যে-ই হক, আমি তাকে দু হাতে টিপে পিঁপড়ের মত মারতে চাই।'

মানুষ যখন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তখন তার সবটাই নাটকীয় দেখায়। প্রভাত পকেট থেকে ওর সেই বিখ্যাত বোতাম-টেপা ড্যাগারটা বার করে, খুলে রাখল টেবিলের উপর। শাণিত ছুরিটার তীক্ষ্ণ ধার আজ রক্তলোলুপতায় যেন বড় বেশী চকচক করছে। সে ছুরিটা বিজলীর সামনে যতবার খুলেছে প্রভাত, ততবারই বিজলীর দু চোখে ঘনিয়ে এসেছে অভিমান। বলেছে 'কতদিন বলেছি তোমাকে প্রভাত, ওটা আমি দু চক্ষে দেখতে পারিনে। রেখে দাও।'

বলে নিজের হাতে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আজ বন্ধ করবার কেউ নেই।

সে বলল দাঁতে দাঁত পিষে, 'তাকে যখন আমি পাব, সে যতবড় বন্ধুই হক, তার বুকটা আমি উপড়ে ফেলব।'

কিন্তু এ শুধু কথা। তারপর?

ছুরিটার তীক্ষ্ণ ধার ওদের তিনজনের মুখেই যেন, হিংস্র হয়ে জ্বলতে লাগল। যেন হত্যা-উৎসবের আগে, মন্ত্রপূত অস্ত্রটাকে ঘিরে বসেছে ওরা ট্রাইবদের মত।

আগে ওরা রাগে ও ঘৃণায় যখন কোন কারণে রুদ্র হয়ে উঠত, তখন বিজলী ওদের শান্ত করত, শান্ত না হলে বিজু রেগেছে বিজু কেঁদেছেও।

আজ বিজু নেই। আজ ওরা সেই মূর্তি ধরেছে।

প্রভাত ছুরি বের করেছে, নরেশ ও সেই কালো বিশাল শরীরটার পেশীতে পেশীতে ঘষছে, শংকরের রক্তাভ বড় বা চোখ দুটিতে নেশা ধরেছে। যে-চোখ দেখে বিজু হাসতে হাসতে আঁচলের ঝাপ মেরেছে। বলেছে, 'এই, এই রাক্ষস, চো করেছে দেখ।' নরেশের পেশীশক্ত শরী বিজলীর ছোট হাতখানির চাপে কোনদিন নির্দয় দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারে নি।

ওরা প্রতিটি দিনের পাতা উল্টে দেখেছে, খুঁজছে, পরস্পরের প্রতিটি দিনের ব্যবহার, প্রতিটি দিন, কে কবে কেমন করে হেসেছিল। কতখানি বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল বিজুর। কোন্ দিন কে কতক্ষণ একল ছিল বিজুর সঙ্গে, বিজু কাকে কবে একটু বেশী স্নেহ করেছিল।

ওদের মনে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহে জড় লুকিয়েছিল হয়ত, কিন্তু তখন বিজ ছিল। রামধনুর মত সে কোন কালকু মেঘকে ঘন হতে দেয় নি। বুক চেপে হাঁ শ্বাপদ-অন্ধকার পারে নি ফিরে আসতে আজ ওদের সেই মন হতাশায়, অবিশ্বাস

সন্দেহে হিংস্র। সেই স্যাপসা-অন্ধকারটাই গ্রাস করেছে আজ তিনজনকে। তাই প্রতি-দিনের উনিশ-বিশ ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজছে ওরা। কে? কে হতে পারে? বিজুর নিশি-স্যাকরার আমবাগানের ধারে যাবার আগে, কাল বিকেলেও কে কেমন করে কথা বলে-ছিল তিনজনে, সেটাও ভাবছে ওরা। ভাবছে, তিনজনের মধ্যে, কাকে বাঁচাবার জন্যে, ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে নি বিজু?

এক সময়ে নিজেদেরই নিঃশ্বাসে চমকে উঠে ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর টেবিলের উপর ছুরিটার দিকে, যেখানে অনেক দিন বসেছে বিজু, আর বিজুকে ঘিরে ওরা বসেছে চেয়ারে।

সন্দেহ আর বিশ্বাস ওদের ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ওরা একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করবে। তবু বিজুর প্রতি-দিনের স্মৃতি ওদের মাঝে আনমনা করে তুলছে।

শংকর হঠাৎ ডাকে, 'প্রভাত।'

প্রভাত সন্দেহ করে আগে থেকেই রুক্ষ হয়ে জবাব দেয়, 'কী?'

নরেশ দুজনের দিকেই তাকায় তীক্ষ্ণ চোখে। শংকর বলে, 'বেচু পাঠক তার বুড়ি দিদিকে খুন করতে চেয়েছিল, মনে আছে?'

প্রভাত ভ্রূ কুঁচকে বলে, 'তাতে কী?'

'বেচু পাঠক তোকে দিয়েই খুন করাতে চেয়েছিল সম্পত্তির লোভে। তোকে নগদ দু হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, বেচু পাঠক দরজা খুলে রাখবে রাত্রে, তুই গিয়ে শুধু বুড়িটার গলাটা টিপে মেরে আসবি অন্ধকারে। ব্যস্ আর কিছুই নয়। এমনকি বেচু পাঠক পরে ধরিয়ে দিতে চাইলেও তোকে ধরবার কোন উপায় থাকত না।'

প্রভাত প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'কিন্তু তাতে কী হল?'

শংকর যেন প্রায় চুপি চুপি বলল, 'তুই তা করিস নি। বিজু তোকে বারণ করেছিল বলে।'

শংকরের গলার স্বরে প্রভাত আর নরেশ যুগপৎ চমকে ওঠে। দুজনেরই চোখে ঘৃণা আর উত্তেজনা ছাপিয়ে একটা নিশি-পাওয়া ব্যাকুলতা ওঠে ফুটে। ওদের তিনজনেরই চোখের উপর ভেসে ওঠে বিজুর মূর্তি।

হ্যাঁ, বিজু প্রভাতকে যেতে দেয় নি বেচু পাঠকের দিদিকে খুন করতে, খুন করার ভয়াবহ নারকীয়তার রূপ ওদের অনুভূতি থেকে বহুদিন বিদায় নিয়েছিল। ওদের সেই অনুভূতিটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বিজু।

যখন ওরা চাকরির জন্য দরখাস্তের পর দরখাস্ত করেছে, ভেড়ার পালের মত সর্বত্র লাইন দিয়েছে, চটকলের স্পিনার হবার আশাতেও গিয়েছে ছুটে আর ফিরে এসে হতাশায় ও অবসাদে পড়েছে ভেঙে, তখন, একটিই সৎ ও সত্যিকারের রাস্তা খোলা ছিল, মরা। খবরের কাগজের একটি শিরো-নামাকই ওরা বাড়াতে পারত, 'অনাহারের জ্বালায় যুবকের আত্মহত্যা'।

কিন্তু তা করেনি ওরা। তারই একটা রকমফের জীবনের যত ভয়াবহ অন্ধকার গোপন পথগুলি বেছে নিয়েছিল, কেননা ওরা দেখেছিল, এদেশে ওইটাই প্রশস্ত পথ।

সেই সময়েই বিজুর আবির্ভাব হয়ে-ছিল ওদের জীবনে। সে আগলে দাঁড়িয়ে-ছিল ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গগুলি।

সেই সময় দেখেছিল, ওদের রাজেন্দ্রাণীর মুখে ঠিক ওদেরই মত উপোষের ছাপ, তখন থেকে ওরা দু পয়সার বাদাম, চার পয়সার মুড়ি, দু গেলাস চা, বিজুর সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে। অনাহারের মধ্যেও সমস্ত লোভ জয় করেছে ওরা।

প্রভাত গোঙার মত খড়খড়ে গলায় বলল, 'হ্যাঁ, বিজু বারণ করেছিল। বলে-ছিল, বারণ না শুনলে সে মরবে। বিজু মরবে, তাই আমারও যত ঘেন্না হয়েছিল টাকার লোভে। বিজু বারণ করেছিল। বিজু তোকেও বারণ করেছিল শংকর। দাশু গাঙ্গুলী তোকে পাঁচশ টাকা দিতে চেয়ে-ছিল, শুধু ওর অপজিট পার্টির লিডার কেদার ঘটকের নামে, একটা মেয়েমানুষকে জড়িয়ে মিথ্যে বক্তৃতা দেবার জন্যে। ঘটক মানহানির মামলা করলে টাকা দেবার চুক্তি ছিল দাশু গাঙ্গুলীর। কিন্তু তুই যাস নি, বিজু বারণ করেছিল।' যেন মাতালের মত সুরহীন গলায় বলতেই থাকে প্রভাত, 'বিজু তোকেও বারণ করেছিল নরেশ। ডাক্তার তালুকদার তোকে মাসে তিনশ টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিল, শুধু তার স্মাগলিং-এর কর্ণারগুলির উপর নজর রাখ-বার জন্যে, দলের বিশ্বাসঘাতকদের ওপর স্পাইং-এর জন্যে। সেই চাকরি তুই নিস নি। বিজু তোকে বারণ করেছিল।'

বিজু তাদের বারণ করেছিল, এই কথাটা কাঠের খুপরির মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। বিজু তাদের ঘেন্না করতে শিখিয়েছিল। তাই তারা অন্ধ-সুড়ঙ্গগুলির মুখে পা দিয়ে ফিরে এসেছিল। তাই তারা এ-সংসারের সকল অনাহারীর সাধারণ দলেই এসে ভিড়ে-ছিল। বাঁচতে চেয়েছিল আর সকলেরই মত রোষে ও রাগে, কষ্টে ও কান্নায়।

আর তবু উপোসী বিজু, তাদের তিন-জনের তিলে তিলে-মরা মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে কখনও চোখের জল চাপতে পারে নি। মুখ নিচু করে, যেন অপরাধিনীর মত বলেছে, হয়ত আমার জন্যে, আমারই জন্যে তোমরা মরছ, হয়ত আমার ভুল হচ্ছে, তোমরা একটু ভাব।

কিন্তু তখন আর ভাববার কিছু নেই। একদিন যে-পথ থেকে ফিরে এসে ওরা বিজুকে ঘিরে ছিল সেই পথটাকে ওরা ঘৃণা করতে শিখেছিল। বিজু ফিরিয়ে দিতে চাইলেও ওরা ফিরে যেতে পারত না। পারবেও না। কারণ, ঘৃণা শুধু নয়, ওরা একটি ভালবাসাকে পেয়েছিল। একটি বিজুকে পেয়েছিল, যার সঙ্গে ওরা সংসারের লাঞ্ছিতদের হাটের মিছিলে চেয়েছিল শরিক হতে।

তাই, রাজেন্দ্রাণীর শোকবিমূঢ় চোখের জল তারা মুছিয়ে দিয়েছে। ওই কালো চোখে দপদপ করে আগুন জ্বালাবারই তাপ চেয়েছে তারা। মৃত্যুহীন নির্ভয়ের খিল-খিল হাসির ঝনঝনায় এ বিশ্ব-সংসার কেঁপে উঠুক, তারা তাই চেয়েছে।

সেই হাসি তাই শেষদিন পর্যন্তও হেসেছিল বিজু। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয়-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে সেই হাসিটাই তাদের অনেক নির্ভয়ের নিশান হয়েছিল।

সেই হাসিটা ছিনিয়েছে কে?

তারা কারা ছিল বিজুর জীবনের সব অন্ধি-সন্ধির খবর জানতে? অসহায় আর অপমানিত ভদ্রলোক রাধু বাঁড়ুজ্যেকে সপরিবারে, তিলে তিলে মরতে দেখেছিল তারা। শুধু তাদেরই তিনজনের জন্যে রাধু বাঁড়ুজ্যে তার আইবুড়ো মেয়ের কলঙ্কে মাতা নত করেছিলেন, সেই সবচেয়ে বড় কলঙ্কের গুপ্ত তথ্য কী, তা ত শুধু তারা তিনজন আর বিজুই জানত। তারা চার-জনের হাত ধরাধরি করে বাঁচা। তাদের বন্ধুত্ব।

বন্ধুত্বের সেই সুযোগ নিয়ে কে মেরেছে বিজুকে?

তিনজোড়া চোখের কুটিল সন্দেহ, ঘৃণায় দৃষ্টি কেউ কারও উপর থেকে নামাতে পারছে না ওরা।

কিন্তু শত অবিশ্বাস সন্দেহেও, ওদের ক্রোধের আগুনে আর তেমন করে ছুরিটার তীক্ষ্ণধার চক্ চক্ করছে না। অবসাদগ্রস্ত মনে শুধু একটা হাহাকার ওদের যেন গ্রাস করে ফেলেছে। শুধু মনে পড়ছে, বিজু ওদের কোথায় যেতে বারণ করেছিল, আগলে রেখেছিল কেমন করে। সর্বনাশীর মত কেমন করে সে তিনটি পুরুষের ছটি থাবার উপরে নিজেকে নিশ্চিন্তে মুক্ত করে দিয়েছিল।

'গণেশ কাফে'র ঘরে ভিড় কমে এসেছে। ক্রমেই চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে সামনের ঘরটা। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও কমছে।

নরেশ হঠাৎ যেন ছটফট করে উঠল। ছুরিটা হাতে নিয়ে সে দ্রুত চাপা গলায় বলল, 'আমি বলব, একটা কথা বলব।'

শংকর আর প্রভাত দুজনেই ফিরে তাকাল তার দিকে।

নরেশ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে, বলল, 'একদিন, সেদিন তোরা দুজনে ছিলিনে, কোথায় গেছিলি। এই ঘরে, আমি আর বিজু। বিজু হাসছিল, অনেক কথা বলছিল। কিন্তু আমার কী হল, আমি জানি নে। বিজুর শরীরের দিকে সেই যেন আমি প্রথম তাকালাম, সেই যেন প্রথম জানলাম, বিজুর রূপ আছে, যৌবন আছে, আশ্চর্য সুন্দর তার গঠন, আমি পাগলের মত দু হাতে জড়িয়ে ধরলাম বিজুকে। বিজু যেন একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।'

বলতে বলতে নরেশ প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু কেউ ওকে কিছু বলল না। দুজনেই স্থির তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে নরেশের দিকে।

নরেশ আবার বলল, 'জড়িয়ে ধরে আমি বারবার ডাকতে লাগলাম, 'বিজু বিজু। বিজুর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাকাতে আমার সাহসও হচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরে, বিজু দু হাত দিয়ে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কী বলছ নরেশ?' আমার চোখে বুঝি তখন রক্ত। ফিরে তাকালাম তার দিকে। দেখলাম, মুখে

চার হাসি, কিন্তু চোখে জল। সে যে আমার মাথায় হাত দিল, তখনি আমার কেমন হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। বিজু বলল, নরেশ, বাবা কোনদিন বিয়ে দিতে পারবে না। আমি নিজে যদি করি, কাকে করব, বল? তুমি যা চাইছ, তুমি নিতে পার। শংকর আর প্রভাতকে... আমি কী বলব? তুমি কি বলবে?' আমার তখন পালিয়ে যাওয়া কুকুরের মত অবস্থা। আমি দু হাতে মুখ ঢেকে রইলাম। বললাম, 'ক্ষমা কর বিজু, ক্ষমা কর।' বিজু আমার দু হাত ওর কোলের ওপর টেনে নিয়ে গেল। আরও কাছে এল আমার। বলল, 'তুমিও আমাকে ক্ষমা কর নরেশ। তুমি, আমি, প্রভাত, শংকর কেউ-ই আমরা ভিন্ন হয়ে যেতে পারব না আর। তাই কোনদিনই আর আমরা এসব পারব না।'

নরেশ নিঃশ্বাস নেবার জন্য একবার থামল। আবার বলল, 'এই, এই আমার একমাত্র অপরাধ বিজুর কাছে, তোদের কাছে। এই—এই—।'

বলতে বলতে তলিয়ে গেল নরেশের গলার স্বর।

কিন্তু প্রভাত আর শংকর তখন নিশি-পাওয়া জলের মত মুখ ঢেকে বসেছে। ওই একই অপরাধ, ভিন্ন জায়গায় একইভাবে ওরাও করেছে বিজুর কাছে।

একইভাবে প্রভাত অন্ধকার রাত্রে বিজুকে একা বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে সেই গাছতলায় দু হাতে টেনে এনেছিল কাছে। একইভাবে বিজুর দুটি ঠোঁটের পিপাসায় ছাতি ফেটে গিয়েছিল তার। কিন্তু তার মনে হয়েছিল বিজুর ঠোঁট যেন শবের ঠোঁট। ঠাণ্ডা, রক্তহীন অনড় শক্ত। পরমুহূর্তেই প্রভাতের বুকের মধ্যে একটা ভয়ংকর সর্বনাশের মত মনে হয়েছিল, বিজুকে চিরদিনের জন্য হারাবে সে। কিন্তু বিজুই তার ঠোঁটের স্পর্শ দিয়ে নির্ভয় করেছিল তাকে। শুধু সেই ঠোঁটে কোন অকূল থেকে ভেসে-আসা নোনা স্বাদ ছিল। সেই ঠোঁট নেড়ে সে বলেছিল, 'তা হলে আর দুজনের কাছে আমাকে মরতে হয় প্রভাত।'

একইভাবে এক বর্ষার রাতে, রেলের অন্ধকার ওভারব্রীজের নীচে শংকর বিজুর দুটি হাত চেপে ধরেছিল, যে হাত চেপে ধরার মধ্যে পুরুষ তার কিছুই গোপন রাখতে পারে না। তার বড় বড় চোখ দুটিতে দপদপ করে পতঙ্গ পুড়েছিল। বিজু শুধু অপলক চোখে তাকিয়েছিল রেললাইনের দিকে। একইভাবে সে শংকরকে শান্ত করেছিল। একই কথা বলেছিল, সে স্বৈরিণী হলে একই প্রাপ্য তিনজনকে দিতে পারত। তা যখন নয়, তখন বন্ধুত্বকে রক্ষা করার প্রয়াসই বিজুর জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।

বিজু বন্ধুত্বকে রক্ষা করেছিল। ওদের আত্মনাশের আর বন্ধুত্বের দুর্গের অটল প্রহরী বিজু। তবে? ওদের তিনজনের সর্বক্ষণের ছায়া আর কেউ ভেদ করেছিল নাকি? ভেদ করে কোথায় যাবে? বিজুরই কাছে ত? যে-বিজু তাদেরই সঙ্গে মরছিল আর বাঁচছিল। তাদের ফিরিয়ে এনেছিল, বারণ করেছিল, ভালবেসেছিল।

রাত হয়েছে। ঠাস ঠাস করে গণেশ কাফের দরজা বন্ধের শব্দে ওদের চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। ওরা উঠে পড়ল।

কিন্তু পরস্পরকে কেউ ওরা ছেড়ে দিতে পারবে না।

বাইরের রাস্তা ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় আবছা। শীতার্ত পথটা নরকের মত জনহীন আর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

কালকে ওরা কিছুই না জেনে, ফিরে যেতে পেরেছিল। আজকে ওরা ফিরে যেতেও পারছে না। বিজুর যে কলঙ্কে শহর ধিক্কার দিয়ে হেসেছে, সেই একই ধিক্কার দিতে গিয়ে, আর সকলের মত বিজুর বাবার চোখের সামনেও এই ত্রিমূর্তিই হয়ত ভেসে উঠবে। চিরকলঙ্কটা তাদেরই জন্য থেকে যাবে।

উত্তর দিকেই চলল ওরা। নিশি-স্যাকরার আমবাগানের ধারটাই টানছে যেন ওদের। একজন হন হন করে পার হয়ে গেল হেঁটে। যেতে গিয়ে লোকটা যেন চমকে গেল তাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন থমকে গেল এক মুহূর্তে। কুয়াশায় অস্পষ্ট দেখা গেল লোকটার উসকো-খুসকো চুল। বড় বড় উন্মাদ চোখ দুটিতে চকিতে যেন একটা ভয়ের ঝিলিকও চমকাতে দেখা গেল। এক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই, আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

কে? চেনা-চেনা লাগল যেন মুখটা। ব্রজেন না?

মনে হতেই ওদের তিনজোড়া চোখ, চোখাচোখি করল আর ওদের মনের মধ্যে সহসা কেমন চমকে উঠল। যেন কী একটা ঘটে গেল ওদের মধ্যে আর সে মুহূর্তেই তিনজনে ছুটে গেল ব্রজেনের দিকে। ছুটে গিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনেই। মুহূর্ত মাত্র সময় না দিয়ে, টুঁটি ধরে নিয়ে গেল সামনের সরু গলির মধ্যে।

কেন ঘিরে ধরল তিনজনে ব্রজেনকে, নিজেরাই জানে না। শুধু ব্রজেনের মুখে যেন ওরা কী দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে। যদি কিছু জানে ব্রজেন, বলুক। ঘোচাক সন্দেহ।

ব্রজেন হাঁপাচ্ছে। এই শীতে ওর একটি মাত্র পাতলা জামার বোতাম খোলা। প্যান্টটা জুতো ছাড়িয়ে নেমে গিয়েছে, ধুলোয় লুটোচ্ছে, যেন খুলে পড়বে এক্ষুনি। সেটাকেও ধরে আছে এক হাতে। সারা গায়ে ধুলো মাখা, যেন কোথায় গড়িয়ে এসেছে। ভয় নয়, চোখে ওর অস্থির উন্মাদ অস্বাভাবিক চাহনি।

বেসুরো ভাঙা গলায় দ্রুত বলল, 'কী কী চাও তোমরা? বিজু, বিজুর খবর?"

বিজু বিজু। ওই নামটা ওরা কারও মুখে থেকে আর শুনতে চায় না। দাঁতে দাঁত চেপে ওরা তাকিয়ে রইল ব্রজেনের দিকে। যদিও চোখে ওদের বিস্ময় চাপা থাকছে না। কেবল প্রভাতের হাতে ছুরিটা চক চক করছে। যেন সময় হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

আবার, একই গলায় আরও তীব্রভাবে বলল ব্রজেন, "বিজুর খবর চাও তোমরা? বিজুর?" বলতে বলতে ওর উন্মাদ চোখ দুটোতে হঠাৎ জল দেখা গেল। আর দু হাত বাড়িয়ে ধরল প্রভাতের হাত। প্রায় রুদ্ধ গর্জনের সুরে বলল, "তবে মার মার আমাকে মার।"

ওরা তিনজনেই যেন দারুণ বিস্ময়ে একটা ভয়ঙ্কর কিছুর কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

ব্রজেনের গলা ক্রমেই অতলে ডুবতে ডুবতে লাগল। তবু অস্থির গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমি, আমি সেই। আমাকে তাড়াতাড়ি মার, মেরে ফেল। আমি, আমি সে-ই। আমি তাকে তিন মাস আগে সাতশ টাকা দিয়েছিলাম। সে আমার কাছে এসে চেয়েছিল। নইলে তার বাপকে, তার মা-ভাই-বোনকে বাড়িওয়ালা এক রাত্রে বাইরে বার করে দিত। দু বছরের বাড়িভাড়া, আমি তাকে দিয়েছিলাম একটা সর্তে। যে সর্তে আমি তার পেছনে ছায়ার মত ঘুরছি। ছায়ার মত।"

ওরা তিনজনেই যেন ওত পেতে দাঁড়াল ব্রজেনকে টুকরো টুকরো করবার জন্য। ব্রজেনের গলা সহসা আরও চড়ল। বলল, 'মার, প্রভাত, শংকর, নরেশ, মার আমাকে। আমি সেই, বিজু যাকে সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করত, যার কাছে শুয়ে তাকে মরার যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল। যার ঠোঁটে, মুখে সে থুথু দিয়েছিল, অভিশাপ দিয়েছিল। তবু তার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল; আমি সেই, যে তাকে তবু লোভীর মত ছিঁড়ে খেয়েছে, অনেক দিনের লালসায়। আমি সেই, যে তাকে শেষবারের মত মেরেছে। মার মার আমাকে।"

কিন্তু খুনের নেশা কোথায় গিয়েছে তিনজনের। একটা অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনে তিনজনেই যেন চলচ্ছক্তি-রহিত, বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা উন্মাদ জন্তু, তাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মৃত্যুভিক্ষা করছে।

মৃত্যুভিক্ষার আর্তনাদ ওরা শুনছে। কিন্তু এখনও যেন সেই বিজুই ওদের হাত ধরে রেখেছে, যে তাদের সব পঙ্কিলতা আর পাপ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। মনে হল, ব্রজেনকে খুন করার নিষ্ঠুরতাকে বিজুই যেন দু হাত দিয়ে আগলে ধরে রেখেছে। ওরা দেখল, সেই পাশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজের ভিটেটায় এখনও ফুলটা ফুটে আছে, অম্লান।

সহসা ব্রজেনের গলার স্বর মোটা আর অস্পষ্ট শোনাল, 'মারতে পারলে না তোমরা। আমি কাল রাত্রি আটটা থেকে চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বুঝেছি, সে বেঁচে থাকলে আজীবন তার পিছে-পিছেই ঘুরতাম।' আবার ওর চোখে সেই উন্মাদ ভাব পুরোপুরি ফিরে এল। প্যান্ট হেঁচড়ে হেঁচড়ে, টলতে টলতে চলে গেল। গেল সামনের ঝুপসি জঙ্গলের দিকে।

ওরা তিনজন তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। তখনও ওদের নড়বার ক্ষমতা ছিল না। হয়ত ব্রজেন রেল-লাইনে মরতেই গেল যাক। ওরা ফেরাতে যাবে না। কারণ, ওদের বুকের মধ্যে তখন ফেটে পড়ার একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা টনটন করছে। তিনটি বুকে বিজুই তখন ফিস ফিস করে যেন বলছে, কেন, কেন বিজু মরেছে?

সমরেশ বসু

কল্যাণ সেন
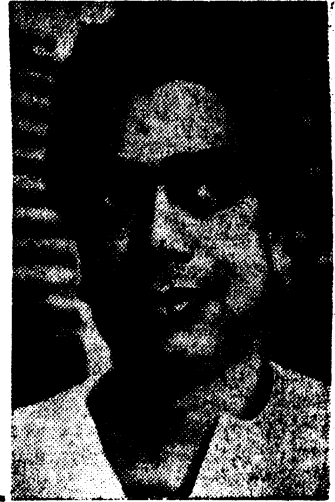
সেই পনেরো বছর বয়সে, হাফ-প্যান্ট আর পাজামা পরার দিনগুলোয়, কত নিষ্পাপ ছিলাম। মুখে কোনো দাগ পড়ে নি তখন। তখন আকাশ ছিল কত খোলা-মেলা, দিনগুলো কী উজ্জ্বল, আর রাত-গুলো কী অপার বিস্ময় আর স্বপ্ন নিয়ে আসতো আমার জন্য। জীবন তখন আমার কাছে যেন রূপকথার ভালবাসা আর বিশ্বাসেরই অন্য নাম।

সেই বোকা বোকা, ভীতু নিষ্পাপ জীবনের চারপাশে রাংচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল, তখন কতবার বিভূতিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে আমি 'রেললাইন' দেখতে গিয়েছি, কতদিন আলো নিভে এলে সোনাডাঙা মাঠের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছের আড়ালে দেখেছি অলৌকিক সূর্যাস্ত! কন্টিকারী ঝোপের ভেতর শুয়ে-শুয়ে সেই 'বিলাতযাত্রীর পত্র' পড়তে পড়তে আমার চারপাশেও কখন কার্তিকের বিকেল শেষ হয়ে যেতো। তখন তো আমি জানতাম কোথাও দুঃখ নেই, কোথাও মৃত্যু নেই, বিচ্ছেদ নেই কোথাও এ জীবনে।

কী সুন্দর এই বেঁচে থাকা! মানুষের মুখ তখন কী রকম ভালো।

কিন্তু কী যেন ঘটে গেল একদিন। আমার গায়ে আলো ফেলে একটা গুডস ট্রেন চলে গেল, লেকের জল কাঁপছে হাওয়ায়। অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, আমি শুয়ে আছি ঘাসের মধ্যে। না, আমি আকাশের তারা গুনছিলাম না, বাড়ি ফিরতে হবে, কিন্তু কে যেন টানছে আমাকে অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে। কে যেন আমার চাবুক মেরেছে আজ প্রথম। সমস্ত দুপুর পড়েছিলাম 'আত্মহত্যার অধিকার' তারপর 'প্রাগৈতিহাসিক'। ভালো বুঝতে পারি নি, চোখ জ্বালা করছিল। একটু একটু করে একটি নিষ্পাপ কিশোরের মুখের রেখা পালটে যাচ্ছিল, রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলাম—সব সত্যি? জীবন এইরকম নাকি রে?...বন্ধু উত্তর দেয় নি।

বাড়িতে মা গায়ে হাত দিয়ে বলেছে—কী রে, তোর মুখ-চোখ ওরকম লাগছে কেন? জ্বর হয়েছে নাকি? কিন্তু আমি কী বলবো? বুকের ভেতর যেন দলা পাকিয়ে উঠে আসছিল কিছু একটা; যার নাম জানি না আমি। আমার বিশ্বাস, আমার স্বপ্ন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কে যেন ছুঁড়ে ফেলেছে আমাকে নীচে। অন্ধকারে। চটকলের শ্রমিক, মজুর, চাষী, শ্মশানের ভিখারি, বেশ্যার জীবনের জটিল গোলক-ধাঁধার মধ্যে। সেই থেকে আমি জানলাম পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন।

কিন্তু তখনো আমি পড়ি নি আর এক-জনের লেখা। সমরেশ বসুর গল্প।

বন্ধু একদিন ছুটতে ছুটতে এলো আমার কাছে। হাতে একটা পত্রিকার 'শারদীয়া সংখ্যা'। বললো, পড়েছিস এই গল্পটা? দারুণ। ভাবা যায় না। আমি 'রোমের ইতিহাস' পড়ছিলাম, বললাম কী গল্প? পড়ে দ্যাখ — দেখলাম গল্পের নাম 'বিবরমন্ত্র', লেখক সমরেশ বসু। আমি কৈশোরের একদিন চাবুক খেয়েছিলাম, আর এখন তাজা চোখে আর মনে যখন গল্প বানাবার চেষ্টা করি, আর গোপনে গল্প পাঠাই পত্রিকার অফিসে, মেয়েদের দুঃখ নিয়ে লেখা গল্প; তখন আর একবার আমার অন্তর্গত রক্তের ভেতর পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, জীবন নামক জটিল ধারণাটি, সব ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠলো। ইচ্ছে হলো কোথাও বসে কারো জন্য, বোধহয় নিজের জন্যই, কাঁদি, জীবনের পাপময় শক্তির কাছে প্রার্থনা করি আর রেখ না আঁধারে......

তখন থেকে সমরেশ বসুর গল্প খুঁজে খুঁজে বার করা আমার অভ্যাস হয়ে উঠলো। পর পর পড়ে ফেললাম অনেক গল্প। 'আদাব', 'জোয়ার-ভাটা', 'পশারিণী', 'আলোর বৃত্তে'। এক দ্বীপ থেকে আর দ্বীপ আমি আবিষ্কার করে চললাম। ক্রমশ। ভাবতাম, কী করে লেখা যায় এরকম গল্প? যা পড়লে এক দারুণ কষ্ট, অথচ কষ্টটা কেন, বোঝানো যায় না, বুকে জমা হয়?

বন্ধু বললো — জানিস সমরেশ বসুর জীবনটাও এক দারুণ গল্পের মতো।

—কী রকম?

—শুনেছি কারখানায় কাজ করেছেন, ক্যানভাসের কাজ করেছেন। শ্রমিকদের মধ্যে থেকেছেন বস্তিতে সেই নোংরা জীবনে। সক্রিয় রাজনীতি করেছেন, এমন কী মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তিনি জেলও খেটেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন, সমরেশ বসু আমাকে এই যন্ত্রণাময় জীবনের সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া আর দুঃখজয়ের মহান আদর্শের কথা শিখিয়েছেন। কেমন আমাদের চোখ তৈরী করেছেন, অন্যজন মন।

আর জীবনের এই ব্যাপক অভিজ্ঞতা-কেই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। জীবন সম্পর্কে কোনো আরোপিত সংজ্ঞায় তাঁর

বিশ্বাস নেই। দেশভাগের মূল্য দিয়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি আর তার ফলে ছিন্নমূল মানুষের যে দুর্ভাগ্য আর বঞ্চনা, সমরেশ বসু তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ক্লান্ত, ব্যর্থ মানুষগুলোর সংগ্রামের শরিক হয়ে দেখেছেন মানুষের চোখের আগুন, বুকের আগুন, দেখেছেন ফসলের অধিকার রক্ষার জন্য মানুষের জীবনপণ সংগ্রাম। শুধু পেটের জন্যই স্বামীর প্ররোচনায় সন্ধ্যার অন্ধকারে স্ত্রীর মুখে রং মেখে রাস্তায় পুরুষ-শিকারের চেষ্টা, অথবা জীবিকার জন্য কী সুন্দর মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলে যাওয়া দুলাল আলীর।

জীবনকে সমরেশ বসু কী ভাবে দেখেছেন, অথবা বুঝতে চেয়েছেন? ড্রইংরুম-মার্কা ছিমছাম সুখের জীবন নয়। তাঁর কাছে জীবন গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটায় তালে তালে সংগ্রামের আগুনে দুলতে থাকে; কী নির্মম জীবিকাহীনতার জ্বালায় তারা একে অপরকে আঘাত করে, হত্যা করতে চায়, কিন্তু এই দুঃখের ভেতরই তারা মুগ্ধ হয়ে ওঠে, মুখের রক্ত ধুয়ে দেয় গঙ্গার জলে। মানুষের বিশ্বাস আর ভালবাসাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এখানে। অন্ধকার বস্তির কদর্য-জীবন, যেখানে ধোঁয়া আর পাপের নির্লজ্জতা দুর্গন্ধ ছড়ায়, নোংরা নর্দমা, জীর্ণ দেওয়াল, কানাগলি, ছানিপড়া চোখের মতো জ্যোতি-হীন করপোরেশনের আলো, মাতালের চিৎকার আর হ্যারিকেনের আলোয় খুপরির ভেতর থেকে হারমোনিয়াম আর গানের চটুল আওয়াজ—সমরেশ বসু সেই জীবনের গভীরে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর বিশ্বাস আর মমতা নিয়ে। জীবনকে ফাঁকি দিয়ে কোনো 'সব পেয়েছির দেশ' তিনি খুঁজে মরেন নি। বরং এই রূঢ়, রুক্ষ কঠিন বাস্তবতার মধ্যে মানুষের সমস্ত গ্লানি, পরাজয়, হতাশা, পাপপুণ্য বোধ অথচ অনমনীয় লড়াইয়ের শক্তিকেই তিনি বড় করে দেখেছেন। হয়তো এই দেখার চোখ কখনো কখনো রোমান্টিক হয়ে পড়েছে, কখনো মিশে গেছে মাত্রা-তিরিক্ত আবেগ, অথবা একটা বক্তব্যের প্রলোভন; তবু অন্ধকার থেকে মানুষের আলোয় ফেরার, তার উত্তরণের প্রাণপণ প্রয়াসটুকুকে তিনি উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন। কারণ তিনিও বিশ্বাস করেন হয়তো মানুষকে ধ্বংস করে ফেলা যায়; তবু অপরাহত সংগ্রামী মানুষের পরাজয় কখনো ঘটে না। তাই দেখা যায় তাঁর গল্পের দু'পা কাটা মার খেয়ে খেয়ে ঘাটা পড়া রাস্তার অবুঝ কুকুরের মতো সেই নরেন্দ্র কুণ্ডু, আবার যখন মুক্ত আলো-হাওয়ায়, আকাশের নীচে ফিরে আসে, গঙ্গায় স্নিগ্ধ জলধারার স্পর্শে মধুময় এই পৃথিবীর ধূলি বুকে তুলে নিতে চায়, তখন তার মনে হয়—'আঃ ফুলের মত। এই জীবন ফুলের মত। কুষ্ঠ কুৎসিত কীটের গর্ত থেকে বেরিয়ে এই কথাগুলি তার মনে পড়ে।' তার চার-দিকে যুঁই, বেলীর গন্ধ। 'আঃ এই না সেই মাটি! না, আমার এত আনন্দে বড় কষ্ট হচ্ছে।...' এ পৃথিবীতে তেমনি গঙ্গা গান গেয়ে যায়?' সমরেশ বসু এখানে পৃথিবীর হাসি দেখেছেন আর নরম ঘাস-গজানো মাটিতে জলের স্পর্শ জীবনকে পবিত্র করে তুলেছেন।

সমাজের সঙ্গে মানুষের বিবর্তন, তার আত্মিক-সমস্যা বার বার তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। বাঙলা দেশের এক চরম অস্থিরকালে কেটেছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়। যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, নামগোত্রহীন উদ্বাস্তু মানুষের বিড়ম্বিত জীবন আর তারপর কালোবাজারী, শঠতা আর বঞ্চনা দুর্নীতি আর ব্যভিচারে যখন কী অসহায় মানুষের মুখ, তখন একদিকে নজরুল ইসলামের মতো 'অমরকাব্য' লেখার বাসনা ছেড়ে 'যাহা মুখে আসে'—তাই বলতে চেয়েছেন, আবার অন্যদিকে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মূল্যহীনতার অন্ধকারে এবং চূড়ান্ত 'নাথিংনেসের' দিকে যখন চলেছে যখন আর কোনো পবিত্র আশ্রয় নেই তার জন্য, যখন বেঁচে থাকার এই ভড়ং থেকে আত্মহত্যা মনে হয় প্রার্থিত তখন এই যন্ত্রণাবিদ্ধ পাপিষ্ঠ মানুষের পতন আর বেদনাকেও তিনি বুঝতে চেয়েছেন। সমরেশ বসুও কাঁদতে চেয়েছেন, কিন্তু এই কান্নাই এক এক সময় বিদ্রোহের রং পেয়েছে, বিদ্রূপে জ্বলে উঠেছে। সমরেশ বসুর গল্প তাই এই সময়ের দলিল। মানবিকতাই তাঁর বিচিত্র বিমিশ্র জাতের গল্পগুলির প্রধান উপজীব্য।

কাল আমাদের বাড়িতে পাশের বাড়ির গিন্নি এসেছিলেন। আমি রান্না চাপাচ্ছি, মেজাজটা খুব ভাল নেই, ঠাকুরের শরীরটা কদিন ভাল যাচ্ছে না। নিজেই রান্না করছি। মনে দারুণ সন্দেহ ব্যাটার বোধ হয় আসলে কিছুই হয়নি এমন সময়ে পাশের বাড়ির গিন্নি এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন।

মাছগুলো ছেড়ে দিয়ে ফিরে একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, মুখখানি যেন তেলো হাঁড়ি, ভাঁড়ের দুধ দই হয়ে যাবার জোগাড়। শুধোলাম— "ও কি, আবার কি হল?"

জলচৌকির উপর বসে পড়ে বললেন—"দিদি, মনটা খুব খারাপ।"

বললাম, "সে কি! অনিলবাবু ভাল আছেন, ছেলে পাশ করেছে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, জায়গা-জমি কিনেছেন, মন ভালো হয়ে গেছে বলুন।"

বিষম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"না, হাসির কথা নয়, ছেলেমেয়ে জায়গাজমি দিয়ে কি হবে? জানেন নুটুর ভূগোল বইতে কি সাংঘাতিক কথা পড়ে এসেছি?"

মাছে অল্প একটু জল ঢেলে, তার উপর কুচি কুচি ধনেপাতা আর আস্ত আস্ত কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে বললাম,

"এ্যাঁ, তাই নাকি? ভূগোল আবার কি বলে?"

বললেন, "উঃ, জীবনে আমার সব স্পৃহা চলে গেছে। আপনি জানেন যে পৃথিবীটা ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে একদিন একেবারে হিমশীতল বরফে ঢাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে? তখন এইসব প্রাসাদ, মন্দির, কৃষ্টি শিল্প, বিজ্ঞান, কাব্য এ সবের কি হবে?"

হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন, 'আমাদের পুতির-পুতিদের কি অবস্থা হবে ভেবে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!"

মাছটা নামিয়ে রেখে দিলাম—"কি আপদ! এই ভেবে এত কষ্ট পাচ্ছেন? আপনি জানেন না এ্যাটম বোমা দিয়ে সব কৃত্রিম উপায়ে গরম করা হবে?"

'আঃ বাঁচালেন দিদি। সত্যি এম.এ পাশ করার কত সুবিধে? যাই এ-বেলার রাঁধা-বাড়ার জোগাড় করি গে, সারাদিন ভেবে ভেবে আর কিছু করে উঠতে পারিনি।'

এমনি ধারা ঘটনা প্রায়ই হয়। হয়তো রাত্রে একটা বই নিয়ে নিরিবিলি একটু বসেছি, দরজার কাছে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন, ভারি চুপচাপ ঠাণ্ডা মানুষটি এদিকে। আদর করে বসাই, কান পেতে থাকি আবার কি নতুন চিন্তা এল। বললেন—

'দিদি, ঘরকন্নার ওপর কখনো আপনার ঘেণ্না ধরে যায়?'

বললাম—তা আর যায় না? অনেক সময়েই যায়। কাঁচের বাসন ভাঙলে ছেলে অঙ্কে ফেল করলে, ধোপা দেরী করে এলে, ননদ এসে দু মাস থাকলে, হঠাৎ জিভ কামড়ে গেলে, ওর সঙ্গে খিটিমিটি লাগলে, সত্যি বলছি, এই সব বলতে বলতেই আমার সংসারের ওপর একটু একটু ঘেণ্না জন্মে যাচ্ছে।"

তিনি বললেন,—'না, দিদি আমি ওরকম ঘেণ্নার কথা বলছি না। আপনার কি কখনও মনে হয় না যে যীশু, শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংস, এমন কি স্বয়ং আমার গুরুদেব কেউ দুনিয়াটাকে যখন ভালো করতে পারছেন না, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই? যেদিকে তাকাবেন খালি পাপের গন্ধমাদন, ঠগ জোচ্চর নিষ্ঠুর দুষ্টু লোকেরা চারিদিকে আনন্দে বিচরণ করছে আর ভালো লোকরা কষ্ট পাচ্ছে?'

আমি চমকে উঠে বললাম—'এই রে। পাপের গন্ধমাদন বলতে মনে পড়ে গেল, আমার ছোট ভাজ আবার আমার কাঁচি নিয়ে গিয়ে ফেরৎ দেয় নি, ধর এবার ওকে ঠেসে।'

উঠেই পড়ি।

ভদ্রমহিলা আগে বোধ হয় খুব মাছের মুড়োটুড়ো খেতেন, নইলে চিন্তা করবার এত শক্তি পেলেন কোথায়? একদিন এসে বললেন—

"দিদি, একটা বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। এই যে কারো ছেলে হল, মেজ পিসিমার নাতনী হল, অমলা কমলা দুজনারই ছেলে হল, রমেনের বৌ—এরই বা হতে কতক্ষণ, এই এতগুলো লোক বেড়ে গেল, তার বদলে কই কেউ তো আমাদের মোল না? তাহলে কি করে চলবে? পাঁচটা জন্মাবে আর বড় জোর একটা মরবে, এমনিতেই শুনি রেশনের বাজার, কিছু পাওয়া যায় না, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওনাকে কি করে পেট ভরে খেতে দেব?"

আমি বললাম—"কি মুশকিল! আপনার যে ভাবনার আর অন্ত নেই। এই বিষয়ে অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা আগেই গবেষণা করে রেখেছেন, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, দেখবেন ঐ অমলা কমলার ছেলেপুলেরা হয় জলে ডুবে, নয় বোমা পড়ে, নয় গাড়ী চাপা পড়ে, নিশ্চয় অল্প দিনের মধ্যেই মারা যাবে। তছাড়া শীগগির দেখবেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই এইটুকু জায়গায় এতখানি ধান গজানো হবে, সবাই খেয়ে পরে সুখে থাকবে।"

"তাই বলুন।" নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যান।

পরদিন সকালে আবার এসে উপস্থিত। "দিদি, কাল যে অমলা কমলার ছেলেদের শীগগিরই মারা যাবার কথাটা বললেন, কথাটা ঠিকই। বোধ হয় কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকার লোকরা যুদ্ধে যত না মরেছে, গাড়ী চাপা পড়ে মরেছে তার চেয়ে ঢের বেশি। আমাদের দেশের লোকরা তো আরও আনাড়ি। ভাবছি অমলা কমলাকে জানিয়ে দেব কিনা, ওরা আবার ছেলেদের নামে কি সব কাগজ কিনে রাখবে বলছিল, মরেই যখন যাবে তবে আর পয়সা নষ্ট কেন?"

ব্যস্ত হয়ে বললাম, "না, না; অমন কাজ করবেন না, কে জানে হয়তো অমলা কমলার ছেলেরাই বেঁচে থাকবে, আমরা সবাই মরে যাব, কিছুই তো বলা যায় না।"

কোনও রকমে তাঁকে ঠাণ্ডা করি।

আরেক দিন আমিই একটু আঠা চাইতে ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম, দেখি গিয়ে বাড়ীর যা অবস্থা সে আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। জিনিসপত্র এদিকে ওদিকে ছড়ানো, চারধারে ধুলো ঝুল কালি, বুঝলাম নিশ্চয় কোনো দারুণ চিন্তা এসেছে। তিন তলার ছাদে গিয়ে দেখলাম হাসি হাসি মুখ করে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছেন! তবুও ভালো। আমাকে দেখেই ছুটে এসে পায়ে পড়ে বললেন—

"দিদি, দিন, দিন; চারটি পায়ের ধুলো দিন। আজ আমার মনটা যে কি খুসি সে আর কি বলব।"

জিজ্ঞাসা করলাম—'কেন বলুন তো? আমি আবার কোথাও আমার আঠার শিশি খুঁজে পাচ্ছি না, বলে খুব মন খারাপ করে এসেছি।' খুব হেসে আমাকে আঠার শিশি দিলেন, দিয়ে বললেন—'না, দিদি, এখনি যাবেন না, বসুন একটু মিষ্টিমুখ করে যান। আজ বড় আনন্দের দিন।'

কি আর করি, হাতে তেমন কাজও ছিল না, বসে রসগোল্লা টসগোল্লা খেলাম। বললেন—

'জানেন, ভেবে ভেবে পৃথিবীর সব দুঃখ দূর করে দেবার উপায় ঠিক করে ফেলেছি। এত সহজ উপায়টা যে এতোদিন কারো কেন মনে হয়নি তাই ভাবি।'

অবাক হয়ে বললাম 'তাই নাকি! সবাইকে শিখিয়ে দিন তা হলে।'

'শেখাবার কিছু নেই, পৃথিবীতে কেউ যদি বিয়ে না করে, সবাই যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল। সংসারে লোকই থাকবে না, তবে আর ক

পাবে কে? হাসছেন, দিদি, ভাবছেন বুঝি ঠাট্টা করছি। এই দেখুন, সত্যি সত্যি আমার ননদের ভাবী বেয়াই বাড়ীতে চিঠি লিখেছি, এ চিঠি বেয়াই পেলে, কখনই ননদের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না, এমনি করে একটু একটু করে, দুঃখের সম্ভাবনা দূর করতে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকি দিদি, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন যে।'

ভদ্রমহিলার স্বামীর সঙ্গেও আলাপ আছে আমাদের, দিব্যি মোটাসোটা হাসিখুসি মানুষটি, চোখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। একদিন বললেন—'দেখুন, আমার গিন্নির হাজার রকমের চিন্তা, কিন্তু আমার ঐ একটিমাত্র চিন্তা, গিন্নির চিন্তাগুলো যাতে কাজে পরিণত না হয়, এই এক চিন্তা। জানেন, কাল আমাদের একটা বড় ফাঁড়া কেটে গেছে।'

বললেন—'ভালো চিন্তাই বলুন আর মন্দ চিন্তাই বলুন, চিন্তাতে আমাদের বড় একটা এসে যায় না। আর শুধু আমাদের কেন, পৃথিবীতে কারই বা এসে যায়। যদি যেত, তবে এত ভালো লোক এত সব ভালো ভালো চিন্তা করে যাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াটার এ দুর্দশা কেন? গিন্নি যতক্ষণ শুধু চিন্তা করেই ছেড়ে দেন, আমরা একটুও মাইণ্ড করি না, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন উনি চিন্তাগুলোকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন, তখন আমরা বাড়ীশুদ্ধ সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি।

'বুঝলেন, কাল দেখলাম একটা নতুন চাকর এসেছে, কদমছাট করে চুল ছাটা, খাটো একটা নীল হাফ প্যান্ট আর ময়লা গেঞ্জি গায়, চোখ দুটো নাকের পাশ ঘেঁসে বসান। সব সময় চারিদিকে চাইছে। দেখেই আমার দারুণ সন্দেহ হল। গিন্নিকে বললাম—

'ওকে কোথায় পেলে? ও যদি পাকা চোর না হয় তো কি বলেছি। গিন্নি অবাক হয়ে বললেন— চোরই তো! চোর বলে কি ফেলে দেব? জেলে দিয়ে, শাস্তি দিয়ে, ঘেন্না করে, কোন চোরকে কখনো ভালো করা গেছে? চাকরি দেব না তো কি! ও বেচারা কি আবার চুরি করে খাবে? জানো ও সাতাশ বার জেল খেটেছে, তবু ওর স্বভাব বদলায় নি? জেলের দারোগা-বাবুর বৌ-এর কাছ থেকে আমার শোনা। তাই ওকে ডেকে নিয়ে এসেছি। এ বিষয় আমি অনেক চিন্তা করেছি, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। তুমি খালি আপিস যাও আর পয়সা রোজকার কর, তাই তুমি চিন্তা করবার সময় পাও না, নইলে বুঝবে আমি ঠিকই বলছি। আজ রাত্রে তোমার সোনার বোতাম, হাতঘড়ি আর ফাউণ্টেনপেন টেবিলে রেখে, দরজা খুলে শোব। দেখো, কিছু হবে না। বরং ওর একটা অনুতাপ আসবে। কত ভেবেছি এ বিষয়।'

বললাম—আমার সোনার বোতাম, হাত-ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন এ সম্মানের যোগ্য নয়। তোমার সোনার মাকড়ি দিয়েই পরীক্ষা হোক, আর কিছু দিয়ে নয়।'

'তাই, গিন্নি বললেন শেষ পর্যন্ত। আর [illegible] কি বলব, খাটে শোয়ামাত্র ভোঁস ভোঁস নাক ডাকা। কি বলব মশায়, আমারি চুরি করতে ইচ্ছা করছিল। চুপ করে মটকা মেরে পড়ে আছি। আর পা টিপে টিপে বাছাধন ঘরে ঢুকেছেন, যেই মাকড়ি পকেটে পুরেছেন, আমিও লাফিয়ে উঠে, তাকে জাপটে ধরে, চেঁচিয়েমেচিয়ে লোক জোগাড় করেছি। তারপর জেলের ছেলে আবার জেলে।'

একটু থেমে, একটা পান মুখে পুরে, ভদ্রলোক অল্প হেসে বললেন—'গিন্নির চিন্তাশক্তিকে আজ হার্নেস করে ফেললাম মশাই। উনি আসছে বছর স্কুল ফাইনেল পরীক্ষা দেবেন। অংক আর সংস্কৃতের মাস্টার ঠিক করেছি। এখন উনি, চিন্তা করবার বিষয় পেলেন—নর—নরা—নরো আর একটা বাঁদর একটা তেল মাখানো বাঁশ বেয়ে এক মিনিটে তিন ফুট ওঠে, পরের মিনিটে দেড় ফুট পিছলে পড়ে।

আচ্ছা তবে আসি।'

•

ছোট গল্প

ছোট গল্পে ভাবরসই বিশিষ্ট লক্ষণ। সেখানে কোন গৌণ কাহিনীর স্থান নাই। গীতিকাব্যের মত ছোট গল্পের রসও লেখক পাঠকের সহযোগী সহানুভূতির অনুকূল পরিবেশে পরিপূর্ণতা পায়।

—সুকুমার সেন।

•

ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল আকারগত নহে, অনেকটা প্রকৃতিগত। ছোট গল্পের আয়তন ক্ষুদ্র, সেজন্য ইহার আর্টও স্বতন্ত্র। ইহাতে জীবনের এমন একটি খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার স্বল্প পরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষ রকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই। উপন্যাসের মত ধীর মন্থর ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই, পাত্র-পাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের জন্য ইহাতে স্থানাভাব। গল্পের পরিণতি বা চরিত্র বিকাশের জন্য যে স্বল্প সংখ্যক ঘটনা ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেগুলিকে সুনির্বাচিত হইতে হইবে। কোনরূপে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ইহার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গল্পের যে অংশে ইহার যবনিকাপাত হইবে তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা পরিসমাপ্তির লক্ষণ থাকা চাই। পাঠকের মন যেন তাহাকে সমস্যা সমাধানের একটি ছেদ চিহ্ন বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত কারণের জন্য ছোট গল্পের আর্ট উপন্যাসের আর্ট অপেক্ষা দুরধিগম্য।

—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

•

উপন্যাসের সঙ্গে ছোট গল্পের প্রভেদ শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উভয়ের প্রাণ একই জায়গায়, যেন তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। উপন্যাসের ডালপালা ছাটিলে সে ছোট গল্প হয় না। ছোট গল্পকে পল্লবিত প্রসারিত করলে সে উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবেশ দ্বার খুলে দিয়ে বলে, "বিচরণ কর, আলাপ কর, প্রেমে পড়"। ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য সে একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখায় আর বলে, "যথেষ্ট দেখলে, আর দেখতে চেয়ো না।"

উপন্যাসকার ক্রমাগত সুতো ছাড়তে থাকেন, মাছকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপরে ডাঙ্গায় তোলেন। ছোট গল্পকার জাল ফেলে তখুনি তুলে নেন। ছোট গল্প হাউইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে গিয়ে দপ্ করে নিবে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সময়সাপেক্ষ। তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে। —অন্নদাশঙ্কর রায়

•

ছোট গল্পের আকার কত ছোট বা কত বড় হইতে পারে তাহা নির্ভর করে ঐ ফর্ম-এর উপরে, খুব ছোট হইলে এ ফর্ম-এর অবকাশ থাকে না তখন তাহা ছোট গল্প না হইয়া চুটকি গল্প হইয়া পড়ে; আবার খুব বড় হইলে ঐ বাঁধুনি ঢিলা হইয়া যায়।

আমি যাহাকে চুটকি বলিয়াছি তাহা ছোট গল্প নয়। এইজন্য যে, তাহাতে জীবনের গভীর স্রোতের তরঙ্গ-ভঙ্গও যেমন নাই, তেমনই রসেরও গূঢ়তা বা গাঢ়তা নাই। সমাজ-বিশেষের নিতান্তই উপরিভাগে, মানুষের চরিত্রে বা ব্যবহারে মুদ্রা দোষের মত যে সকল লক্ষণ নিতান্তই দৃষ্টিগোচর হয়—অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেও যে অভিজ্ঞতার উপাদান আছে, তাহাই কোথাও নীতি উপদেশ কোথাও ব্যঙ্গ বা কোথাও একটু সেন্টিমেন্টের আকারে উপভোগ্য করিয়া তোলাই চুটকি গল্পের কাজ। —মোহিতলাল মজুমদার

লীলা মজুমদার

সুনীল গুহ

জনৈক বন্ধু তার সাম্প্রতিক একটি মানসিক অশান্তির কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করছিলেন আমার কাছে। মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসেছিলুম আমরা। মাঝখানে একটি টেবিল। তাতে সামান্য কিছু সাময়িকপত্রের ভিড়। আমি বন্ধুর কথা শুনতে শুনতে একটি সাময়িকপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিলুম।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটি গল্পের দু' এক লাইন পড়ে ফেললুম। দু' এক লাইন পড়ার ফলে আরো কয়েক লাইন পড়ে যেতে হল। কী আশ্চর্য, মনটা অতঃপর আরো কয়েক লাইনের দিকে ধাবিত হল। এবং ক্রমাগত সেইভাবে লাইনের পর লাইনে যেতে থাকলাম। আর আমার বন্ধুটি ঠিক আগের মতই তার কাহিনীটি বলে যাচ্ছিল। সম্ভবত আমি তার কথায় দু' একবার 'হুঁ' 'হ্যাঁ' ও করে থাকব। তবে সেটা নেহাতই অন্যমনস্কভাবে, গল্পটা তখন আমাকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে।

বন্ধুটি তার কাহিনী বলে চলেছে, আমি চলেছি গল্পটি পড়তে পড়তে। আসল কথা আমি বন্ধুটির কথা শুনছিলুম না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটি, সেটি হল, একই সঙ্গে আমার পড়া এবং বন্ধুর গল্প বলা শেষ হলে, বিমুগ্ধ আমি হঠাৎ বলে উঠলুম,—'চমৎকার।'

বন্ধুটি আমার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। বললে,—'কী বলছ হে, তুমি একে চমৎকার বলছ?'

ওর কথায় আমার সম্বিত ফিরে এলো। বলা বাহুল্য আমি যুগপৎ লজ্জা ও কুণ্ঠায় এতটুকু হয়ে গেলুম। ব্যাপারটাকে প্রায় অপরাধের সামিল বলে মনে হল। যে কারণে বন্ধুটির দিকে তাকাতে পারছিলুম না।

ও আমার অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করে বলল,—'তুমি বোধহয় ওই আর্টিকেলটার দিকেই মন দিয়েছিলে?'

সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললুম,—'মনটা টেনে নিয়ে গেল ভাই, কিছু মনে কর্যো না ভাই।'

যাই হোক, বন্ধুটি আরেকবার সংক্ষেপে তার কাহিনীটি আমাকে বলে বুঝিয়েছিল। আর আমি যে গল্পটি পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম সে গল্পটির নাম "ছায়া," লেখিকার নাম লীলা মজুমদার।

অবশ্য এই লেখিকার লেখা সেই আমার প্রথম পড়া নয়। কিন্তু গল্পটি যে কোন কারণেই হোক আমার পড়া হয়নি। আর আশ্চর্য যে, অমন একটি ভালো গল্প আমার দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গিয়েছিল। আফসোস হচ্ছিল।

এ কথা হলফ করে বলা যায় যে, আজকের তরুণ-তরুণীদের কাছে লীলা মজুমদার সুপরিচিতা। কেননা আজকের তরুণ-তরুণীরা কৈশোরে তাঁর লেখা নিশ্চয় পড়েছেন। তাই তাঁর রচনা পড়ে কৈশোরে যেমন অভিভূত হয়েছি, তেমন যৌবনেও। আসল কথা জীবনের সেই প্রথমভাগে যেদিন থেকে গল্প কবিতা পড়ার ঝোঁক মাথায় চেপেছিল, সেদিন থেকেই তাঁর রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলুম। তারপর থেকে তাঁর বিচিত্র রচনাগুলির সঙ্গে বহুবার মুখোমুখি হয়েছি। এবং পাঠান্তে চমৎকৃত হয়েছি। অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিঃসন্দেহে আমাদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। নানান পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা পড়েছি, এখনো পড়ি। সাহিত্যের সংসারে তাঁর ক্রমোন্নতির পালায় আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত।

যেমন সাংবাদিকের ডায়েরীতে প্রভুল চক্রবর্তী আর তেরো নম্বরের কাণ্ডকারখানায় পাঠক পুলকিত না হয়ে পারবেন না। কী দায়িত্বপূর্ণ কাজে কর্মীরা কীভাবে আত্ম-নিয়োগ করে সেটা এই গল্পে অত্যন্ত স্পষ্ট করে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন। অথচ গল্প তৈরী করতে তিনি কখনো অতিরিক্ত কথার আয়োজন করেন না। তাঁর লেখার এই বৈশিষ্ট্যটুকু উল্লেখ করার দাবী রাখে। একশো এগারো নম্বর নামক এক ব্যক্তিকে খুঁজে বার করার জন্য প্রভুল চক্রবর্তী নির্দেশিত হয়েছিলেন, আর এই একশো এগারো নম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গুপ্তচরবৃত্তি করে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। সেই ব্যক্তি নাকি সরকারের নানান খবর বাইরে সরবরাহ করে দেশকে জগৎ সমক্ষে হাস্যাস্পদ করে তুলছে। তাই শ্রীচক্রবর্তী তেরো নম্বরের উপর ভার ন্যস্ত করলেন একশো এগারোকে ধরে দিতে। আর তেরো নম্বর উপরে ছিল পেশায় সাংবাদিক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে কাজ করত গোয়েন্দার। এই গোয়েন্দা সাংবাদিক কীভাবে একশো এগারোকে আবিষ্কার করেছিল, সেটি যেমন কৌতুককর, তেমনি গল্পের স্বাদে পরিপূর্ণ। ঠিক এই কারণেই তাঁর গল্প পাঠককে সহজে আকৃষ্ট করে।

যে সময়ে 'ছায়া' গল্পটি পড়েছি, সে সময়ে গল্প পড়ে সহজ আনন্দ আহরণের যতটা আগ্রহ ছিল, ততটা আগ্রহ ছিল না বিচার বিশ্লেষণের গভীরে যাওয়ার। যদিও সময় অনুপাতে সেটা স্বাভাবিক। তবু সেই বন্ধুর বাড়িতে বসে বন্ধুর বক্তব্য থেকে সরে গিয়ে ছায়া গল্পটির প্রতি যে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলুম এবং বন্ধুটির কাছে বিশেষ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলুম সেটা মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ত এবং অনেকদিন বাদে আবার নানানভাবে খুঁজে সেই গল্পটি পড়েছি। আবার ভালো লেগেছে। এই দ্বিতীয়বার পড়ার পরে নিজের সাধ্যমত এর স্বাদ ও রস নিয়ে কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি। দ্বিতীয়বারেও সেই আগের মতই আশ্চর্যজনকভাবে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য বলে রাখা ভালো যে, তাঁর কোন শ্রেষ্ঠ গল্প নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে না। তাঁর গল্পের এবং প্রায় সব গল্পের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছি। যদিও একজন পাঠক হিসেবে লীলা মজুমদারের ছোটগল্পের যে আলোচনা করছি, তারও সমালোচনা হতে পারে, তবু এ কথা স্পষ্ট করে দাবী করা যায় বাংলা ছোটগল্পের আসরে এই সুপরিচিতা লেখিকা তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্য-কর্মের জন্য পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী আসন লাভে সক্ষম হবেন। 'ছায়া' গল্পে গোপন-বাবু আর চৌধুরীমশায় কথা বলতে বলতে এক রহস্যের আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন। সেই থেকে গোপেনবাবুর মনে এক ভয়ের সঞ্চার। অবশেষে তিনি এক রহস্যময়ীর মুখোমুখি হলে গল্প এক সুন্দর পরিণতি লাভ করে।

আরো একটি বিচিত্র গল্পের নাম 'মোহ'। শ্রীমতী মজুমদারের স্বাভাবিক লেখনীর জোরে গল্পটি যেমন রসাল হয়ে উঠেছে, তেমন নায়কের পরিণতিতে মনটা দুঃখবোধে আক্রান্ত হয়। এই বৈশিষ্ট্য প্রায় লীলা মজুমদারের অনেক গল্পেই দেখেছি। সঙ্গতকারণেই এই গল্পটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় বিরত রইলাম।

আরেকটি ভিন্নস্বাদের গল্পের নাম 'স্বর্গ'। এই গল্পটি পাঠকের সঙ্গে কথোপকথনের ভাষায় শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কথা বলতে বলতে তিনি পাঠককে নিজের সঙ্গে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে স্বর্গের রূপ রস আস্বাদন করাবেন। যাতে পাঠক অভিভূত না হয়ে পারবেন না। তারপর স্বর্গের অনেক সুখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে অবশেষে যখন তিনি স্বর্গের মেমসাহেবকে শুধালেন,—পৃথিবীতে মরে গিয়ে স্বর্গে এসে হাঁস হল, এই হাঁসগুলি মরে গিয়ে কোথায় যাবে? তখন পাঠক ভীষণ মধুর স্বাদে আপ্লুত না হয়ে পারবেন না।

পরিশেষে এই লেখিকা সম্বন্ধে আরো যেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর কিশোরদের জন্য লেখা গল্পসমূহ আরো বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলা সাহিত্যে কিশোরদের জন্য লিখিত গল্পসমূহ যদি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়, তবে লীলা মজুমদারের গল্প নিশ্চয় একটি বিশিষ্ট আসন পাবে। যে কারণে, রাজশেখর বসু মহাশয় বলেছেন, 'তাঁর লেখা পড়ে মনে হচ্ছে যেন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের লেখা পড়ছি।'

তাঁর লেখা পড়তে পড়তে আমারও অনেক সময় মনে হয় কোথায় যেন এমন স্বাদের গল্প আরো পড়েছি। কাদের লেখায় যেন এমন বিচিত্র স্বাদ উপভোগ করেছি, কিন্তু পারি না ঠিক ধরতে। তাই রাজশেখর বসুর মত স্পষ্ট করে বলতে পারি না কিছু। তবু আবার বলব, লীলা মজুমদারের গল্প ভিন্ন স্বাদের।

ছোটগল্প : বিচিত্র চিন্তা

প্রমথ চৌধুরী

...সেকেলে ও একেলে অনেক গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে একমাত্র পাঠক হিসেবে—ঐতিহাসিক হিসেবে নয়। এই সূত্রে আমার এই জ্ঞান জন্মেছে যে ভারতবর্ষ হচ্ছে ছোটগল্পের আদি জন্মভূমি। এবং সেকালে এ-দেশে গল্প জন্মেছে ঢের—অথচ সে-সব গল্প সকালে জন্মে বিকেলে মরেনি। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক গল্প অমর। ভারতবর্ষের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। এ ইতিহাসের পরিবর্তন ইভলিউ-সনের কোঠায় ফেলা যায় না; কারণ, ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস মূল থেকে ফুল পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ইতিহাস নয়,—যুগে যুগে উত্থান পতনের ইতিহাস।

আমরা আজও বেঁচে আছি এবং মন নামক জিনিসটি আজও আমাদের দেহে আছে। আর, মানুষ যাকে সাহিত্য বলে—তা এই মনেরই সৃষ্টি অথবা লীলা। আমার বিশ্বাস যে, এ-যুগে এই সাহিত্যিক মনের স্পষ্ট প্রকাশ বাঙলাদেশেই বিশেষ করে দেখা যায়।

ছোটগল্প যখন সাহিত্যের একটি সনাতন ও প্রধান অঙ্গ—তখন বর্তমান বাঙলায় যে তা ফুটে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কি?

...ছোটগল্প বলবারও একটা আর্ট আছে, এবং আমার বিশ্বাস, এ আর্ট নভেল লেখার আর্টের চাইতেও কঠিন। কারণ, এ জাতীয় গল্পের উপাদানকে আগে মনে সাকার করে নিতে হয়, পরে তাকার মূর্ত করতে হয়। নভেলের মত এতে নানা কথা বলবার অবসর নেই।

তবে এ আর্ট কেউ কাউকেও শেখাতে পারে না। নিজের কল্পনাকে কি উপায়ে সাকার করা যায়, তা লেখক স্বয়ংই আবিষ্কার করবেন। ছোটগল্পের বিষয়ও যেমন বিচিত্র, তার আর্টও তেমনি বিভিন্ন।

ছোটগল্প গানও হতে পারে, ছবিও হতে পারে, এবং বলা বাহুল্য যে গান গাইবার আর্ট ও ছবি আঁকার আর্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপকথা সম্বন্ধে প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। উপকথা মাত্রেই রূপকথা—ও-শব্দের সংস্কৃত অর্থে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গল্পের ইতিহাস সুদীর্ঘ। মানুষের সেই আদিম যুগচেতনার প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সে ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-বেদনা, ঘৃণা-হিংসা, আসক্তির আবেগ মানুষের সীমিত বাস্তব-বোধকে কল্পনায় মুক্তি দিয়েছে।

মূলত আত্মতোষণ ও ইচ্ছাপূরণের সে গল্প নানা জটিল বিচিত্রধারায় বইতে বইতে শেষ পর্যন্ত নিজেকে চিনতে পেরে অনেক-খানি মোহমুক্ত যে হতে পেরেছে গত একশ বছরে বিদেশে এদেশে তার অজস্র প্রমাণ মিলবে।

কিন্তু মনের সস্তা [illegible] যতই [illegible] করেও গল্প আর নিছক [illegible] [illegible] না দেখা [illegible]

ইউরোপে আমেরিকায় গল্পের কলম বেঁকে দাঁড়িয়েছে। ছোঁয়াচ লেগেছে আমাদের এখানেও কিছু কিছু।

না, তোমাদের ও গৎ-বাঁধা গল্প ত বলবই না, কোনো গল্পই যা বলতে যাবো কেন?

জীবনটা তোমাদের কাছে ছিল দাবার ছকের মত। সে ছকের ঘুঁটির নাম-ধাম তোমরা সময় সুবিধে বুঝে পাল্টেছ। কখনো রাজা, কখনো মন্ত্রী, কখনো ঘোড়া, কখনো পিল কি নৌকো কি বড়েকেও দিয়েছ প্রাধান্য, নিয়মকানুনও পেঁচিয়ে তুলেছ দরকার মত, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ছক ছাড়া কিছু নয়। ঘরগুলো কি বল বিশেষের চাল তোমাদের মনগড়া, মাৎ বা মোক্ষ যা বলো সেও তাই। আমরা দুনিয়া আর জীবনকে তোমাদের কোন ছকেই মেলাতে পারিনি মস্ত মন নিয়ে, কোন ঘুঁটিই পাইনি এমন ধ্রুব যা ধরে থাকতে পারি নিশ্চিন্ত হয়ে। সুতরাং তোমরা যাকে গল্প বলে বোঝো সে আমাদের কলমে বেরুবে না—এই হল এ যুগের গল্পরাজ্যের বিদ্রোহীদের বক্তব্য।

সে বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝি না বুঝি, প্রশ্ন করতে পারি যে কি গল্প তাহলে তোমরা বলতে চাও?

যে গল্প তোমাদের শাস্ত্র মানে না—তার শুরুও নেই, শেষও নেই।

জবাবে বলা যায়, শুরু ত সত্যি বলতে গেলে কোন গল্পেরই নেই, শেষও না। শুধু তাকে এক জায়গায় ধরতে হয় একটা ইম্প্রেশন কিংবা বলা যেতে পারে একটা ঝিলিকের জন্য, যে ঝিলিক ক্ষণিক একটি

চমকের মধ্যে অনাদ্যন্ত জীবনরহস্যের চাবিকাঠির যেন আভাস দেয়।

এ জবাব দেবার সঙ্গেই কিন্তু পাল্টা উত্তরটাও অনুমান করতে পারি।

ওই জীবনরহস্য আর ইঙ্গিতময়তা, ওসব ধোঁয়াটে ধাপ্পা আমাদের জন্যে নয়। জীবন যদি রহস্যই হয় ত তার কুঞ্চিকা কোথাও মেলবার নয়। আমাদের গল্পের শুরু কি শেষ না-থাকা গূঢ় গোপন কোন ইঙ্গিতময়তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবার দায় মানে না।

এবার হয়ত বলে ফেলি, তবুও খেয়াল-খুশি মত শুরু ও শেষ করলেও যতটুকু কলমের কালিতে ফুটিয়ে তুলি তার একটা সংলগ্নতা ত থাকবে, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন উদ্দেশ্যের বাহন না হয়েও যে সংলগ্নতা সমগ্র প্রকাশটিকে একটি সার্থকতার বৃন্তে ধরে রাখে।

একটু বিস্তারিতভাবে তারপর বোঝবার চেষ্টা করি—সামনের এই চশমার খাপটা নিয়েও গল্প শুরু করতে পারা যায় নিশ্চয়। কালো খাপটা পড়ে আছে টেবিলের শাদা ঢাকনার ওপর। টেবিলল্যাম্পের আলো খোলা খাপটার ওপরের ডালার দিকে একটু ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে। অ্যাসট্রেটা অবধি। একটা কি ছোট্ট পোকা টেবিলের ঢাকনার সেই ছায়া প্রান্তরের ওপর দিয়ে বোঝাই যায় না এমন ধীরগতিতে চলেছে যেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। এই গল্প চশমার খাপে শুরু করে যেখানেই শেষ করি না কেন, শুরু ও শেষ যত সূক্ষ্ম বা ক্ষীণ সম্বন্ধই হোক; জড়িত না হলে ও গল্প বলতে বসাই বা কেন? যেদিকে চোখ ফেরাই, একটা না একটা কিছু ছবি আছেই। সে ছবি বাস্তবের দর্পণছায়া হবারও কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু একটি ফ্রেমের মধ্যে যখন রং কি রেখার অর্থহীন উচ্ছ্বাসকেও ধরি, তখন ছবির ফ্রেম একটা গূঢ়বিন্যাস তার মধ্যে দাবী করে, সে বিন্যাস বিশুদ্ধতম সঙ্গীতের শব্দসমাবেশের মত আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতি কি মামুলি আবেগে অনুবাদের অতীত হলেও।

এই পর্যন্ত বলেই মনে হয়, এ যুগের বিদ্রোহের কাছে যা হাস্যাস্পদ, সেই যুক্তিই অভ্যাস দোষে দিয়ে ফেলেছি। ওদেশের সবচেয়ে বেপরোয়া বিদ্রোহীদের কাছে ছবির ফ্রেম একটা অর্থহীন কুসংস্কার, সঙ্গীতের শব্দসমাবেশে বিন্যাসের অভ্যাস লজ্জাকর। গল্পে কি কবিতায় সংলগ্নতা একটা ভ্রান্তি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (ইম্প্রেসন)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।

ছোটগল্প উনিশ শতকের এক সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী—যা ইতঃপূর্বে অন্তত এই রূপে বিদ্যমান ছিল না। এ নভেলও নয়, রোমান্সও নয়। এ কবিতার মত ঐকভাবাশ্রয়ী—অথচ কল্পনামুখ্য নয়, জীবননির্ভর। আবার সেই জীবনের সামগ্রিকতার প্রতিচ্ছবিও এতে নেই—এতে খণ্ডতার ব্যবহার। সুতরাং এ বস্তু স্পষ্টই 'অভিনব'।

উনিশ শতকই ছোটগল্পের জন্মলগ্ন কেন— এ প্রশ্নের উত্তর এত সরল নয়। কিন্তু একটা জিনিস সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে, দান্তের তিমিরাভিসার আর পেত্রার্কের বিদগ্ধ রোমান্টিকতার যুগে নির্মোহ জীবনসন্ধানী জনসাধারণের শিল্পী বোক্কাচিও চার্চের দিকে—সামাজিক গ্লানির দিকে তাঁর জিজ্ঞাসা উদ্যত করে তুলে ধরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী, বিশেষ করে তার মধ্য ও শেষভাগ (ছোটগল্পের পূর্ণ আবির্ভাব যুগ) পৃথিবীর ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীর যন্ত্রণাকে দুঃসহ করে তুলেছে। ফ্রান্স এবং রাশিয়ায় এই যন্ত্রণা সবচেয়ে ভয়াবহ। স্তাঁধাল-মেরিমে-ফ্লোব্যার প্রমুখ লেখকেরা রিয়্যালিজমের পথে—সমাজ-সমালোচনায় যতখানিই অগ্রসর হোন—নাপোলিয়ঁ বংশের প্রতি তাঁদের অন্তরের মমতা ছিল, তাঁরা তখনো বিশ্বাস করতেন—ফ্রান্সই ইয়োরোপের মুক্তিদাতা। সিডানের রণক্ষেত্রে বিসমার্কের জয়ে মেরিমের মৃত্যু ঘটল—'স্যালাম্বোর' পরে ফ্লোব্যার আর এগোতে পারলেন না। মোপাসাঁ এলেন, চূড়ান্ত গ্লানির মধ্যে— আধুনিক ছোটগল্প হল যন্ত্রণার ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে—অন্তত মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে (যা ফ্লোব্যারও রাজতন্ত্রের মধ্যে পেয়েছিলেন) উপন্যাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু শূন্যতার আঘাতে তার উপকরণগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে—আদর্শ আর বিশ্বাসের উজ্জ্বল কৌণিক ধারালো খণ্ডগুলিকে লেখক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নগ্ন-তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ছুঁড়ে দিতে থাকেন। গী-দ্য মোপাসাঁও তাই দিয়েছেন। এমিল্ জোলা গণজীবনের বলিষ্ঠতায় বিশ্বাস করে উপন্যাসের পথে অবশ্য কিছু এগোতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তিনি ন্যাচারালিজমের পঙ্কে তলিয়ে গেছেন।

মহান শিল্পী হয়েও তুর্গেনেভ নিজের বুদ্ধির বৃত্তেই তৃপ্ত, ফ্লোব্যারের সহমর্মী—তাই 'ফাদার্স এণ্ড সন্স' কিংবা 'ভার্জিন সয়েলে'র মত ভাল উপন্যাস লিখেছেন। তলস্তয়ের গভীর ক্রীশ্চান মনন, তাঁর আশাবাদ—নব অভ্যুত্থানের প্রত্যয় তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখার সৌভাগ্য দিয়েছে। চেখভও আশাবাদী—কিন্তু সে আশা যে কী যন্ত্রণাগর্ভ—তাঁর 'ছয় নম্বর ওয়ার্ডে'ই সে পরিচয় আছে, তাই জিজ্ঞাসা-চিহ্নিত ছোটগল্পই চেখভের প্রধান অবলম্বন।

আমেরিকার ছোটগল্পও এমনি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। সেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কোনো বিপুল সংঘাত নেই বটে, কিন্তু আছে লেখকের ব্যক্তিক বেদনা ও ব্যর্থতার ট্রাজিডি। নিঃসঙ্গ উপেক্ষিত ন্যাথানিয়েল হথর্ন সেই বেদনাতেই আলো-ছায়ার মধ্যে 'পিউরিটান উচ্চারণাকে' ভাসিয়ে দিয়েছেন—ক্ষতবিক্ষত এডগার অ্যালান্ পো দেখেছেন তাঁর জানালার পাশে দাঁড়কাকের উজ্জ্বলন্ত দৃষ্টি করালনিয়তির মতো জেগে আছে। হয় সামাজিক সংকট—নয় ব্যক্তিক সংকট—উনিশ শতকের ছোটগল্পে এই দ্বিবিধ যন্ত্রণা বিদ্যমান। ছোটগল্প ফসলরূপেই এই সময় প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষভাগ—যা বিশেষ করে ছোটগল্পের কাল, তা প্রধানত রিয়্যালিজম এবং ন্যাচারালিজমের উত্তাল তরঙ্গে কলমন্দ্রিত। ইংল্যাণ্ডের বার্নার্ড শ আর জার্মানীর হাউপ্টম্যানের নাটকে, ফ্রান্সের এমিল জোলার উপন্যাসে আর চার্লস বোদ্ল্যারের কবিতায়, দুঃখবেদনার নিগূঢ় বাস্তবতা ও অতিবাস্তবতার উদ্বেলতা। জীবন-জিজ্ঞাসু, সত্যসন্ধী এবং নিষ্ঠুর ছোটগল্প তাই একালেই এত বেশি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।

জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলিকে যখন অর্থহীন মনে হতে থাকে, ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে, সমাজচেতনার সঙ্গে কোনো মতেই যখন সামঞ্জস্য ঘটতে চায় না—যখন প্রতি মুহূর্তে চতুর্দিকের সঙ্গে শিল্পীর সংঘাত—তখন রোমান্টিক কবি নাইটিঙেলের পাখা আশ্রয় করে 'স্ট্রেঞ্জ এণ্ড বিউটিফুল'-এর অভিসারে নভোযাত্রিক হতে পারেন, বুদ্ধির চোরাগলি থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন হৃদয়ারণ্যের ছায়ায়; কিন্তু গীতিকবির সগোত্র গল্প-লেখক যেন তীরবিদ্ধ পাখি। সে-পাখি আহতবক্ষে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—রক্ত-কর্দমের মধ্যে তাকে ছটফট করতে হয়। কখনো তার নির্বাপিত চোখে স্বপ্নময় আকাশের ছায়া ঘনায়, আবার কখনো বা মৃত্যুকালীন 'হংস-গীতি'তে সে সমাজ ও জীবনের ব্যাধিকে অভিসম্পাত জানিয়ে যায়। তাই ছোটগল্পের ভিতর আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-কল্পনার কথা থাকলেও উনিশ শতকে তা মূলত দুঃখবাদী। চেখভের মত জীবন-রসিক লেখকের গল্পের দীর্ঘশ্বাসিত বেদনাই তার পরিচয়। তার মধ্যে একটা কঠিন জিজ্ঞাসা—চারদিকের ব্যর্থতার প্রতি তার আর্ত অঙ্গুলি-নির্দেশ। অবশ্য দুঃখবাদ হয়েও তা সর্বত্র পরাজয়বাদ নয়। দুঃখের মধ্যেও কারো চোখে আশার আলো—তিনি চেখভ্; কারো বিশ্বাস—প্রকৃতির অম্লান সৌন্দর্যে 'এখনো অনেক রয়েছে বাকী'—তিনি আল্‌ফঁস দোদে; কেউ বা মানুষের চিন্তা-চেষ্টা-স্বপ্নকে এক অদৃশ্য শক্তির কঠোর ব্যঙ্গে তাড়িত হতে দেখেন—তিনি ন্যাথানিয়েল হথর্ন; কারো চোখে অনড় নিরন্ধ্র অন্ধকার—তিনি মোপাসাঁ।

জিজ্ঞাসাচিহ্নিত হয়েই ছোটগল্পের আবির্ভাব। তারপর তা অবশ্য বিশিষ্ট একটি শিল্পবস্তুতে পরিণত হল। এখন তার মধ্যে সবই এল। প্রেম এল, স্বপ্ন এল, আনন্দ এল, কান্না এল, হাসি এল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আকাশে ছোটগল্প লেখকেরা যেন সপ্তর্ষির মতো জিজ্ঞাসা রচনা করে অন্তর্জ্বালায় জ্বলেছেন—ধ্রুব-তারাটি যে কোনদিকে—তার সন্ধান তাঁরা এখনো পাচ্ছেন না।

তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কলারীতির দাবিও গল্পলেখকের অবশ্য মান্য। ছোটগল্প বিদ্রোহ আর প্রতিবাদকে যে অতি প্রত্যক্ষভাবেই উপস্থিত করবে—এমন কোনো শর্তও নেই। একটি বিশেষ প্রতীতির প্রতিক্রিয়া নানাভাবে আমাদের শিল্পের মধ্যে দেখা দিতে পারে; কখনো তা অতিব্যক্তরূপে আসবে, কখনো দেখা দেবে বক্রকুটিল পরোক্ষতার মাধ্যমে, কখনো বা নিজেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন করে রাখবে। ছোটগল্পের মধ্যে যুগমননের সন্ধান করতে হলে তাই অতি-স্পষ্টতার উপর নির্ভর করলে চলবে না। মনঃসমীক্ষণের কাজে যেমন অবাধ ভাবানুষঙ্গের ভিত্তিতে চিন্তার অসংলগ্ন সূত্রগুলিকে একত্র করে একটি অখণ্ডতার সন্ধান করতে হয়, তেমনি যুগচেতনাকেও সেইভাবে নানা বৈচিত্র্যে এবং বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে সন্ধান করে নেওয়া দরকার। মোপাসাঁর দেশাত্মবোধক গল্পে, শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও লালসার কাহিনীতে এবং কৃষকজীবনের চিত্রণে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব খণ্ড খণ্ডভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে; তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে এদের মধ্যগত ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করা আবশ্যক।

যে কোন যুগসন্ধির প্রতিক্রিয়া ঘটে দুদিকে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্কের ভিতর। তাই সংশয় ও বেদনার যুগের ফসল ছোটগল্প একাধারে ব্যক্তিমূলক ও সমাজমূলক। এই ব্যক্তিমূলক গল্পগুলির মর্মোদ্ধারই সবচাইতে কঠিন কাজ। এইসব গল্পের মধ্যে কখনো আত্ম-তান্ত্রিক বিষণ্ণতা, কখনো অবচেতনার ছায়া-সঞ্চরণ। পাঠককে অনেকখানি গভীরে প্রবেশই ব্যক্তিপ্রধান গল্পের গূঢ়নিহিত তাৎপর্য এবং সামাজিক অবস্থার সঙ্গে স্পষ্ট সংযোগটিকে নির্ণয় করতে হবে। চেখভের 'ডার্লিঙে'র সঙ্গে 'ছয় নম্বর ওয়ার্ডে'র মর্ম সম্বন্ধ এইভাবেই অনুসন্ধান করা দরকার। তাই উনিশ শতকের ছোট-গল্পের ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা-মূলকতার ধর্মটিকে বহুমুখী আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে : অভিধায়, লক্ষণার এবং ব্যঞ্জনায়; বুঝতে হবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কে।

আরো লক্ষণীয়, ছোটগল্পের যখন ব্যাপক আবির্ভাব, উপন্যাস তখন সংকুচিত। 'মহৎ অস্তি—মহৎ নাস্তি'—অথবা 'যেমন আছি তা-ও ভালো' এদের যে কোনোটি না থাকলেই যেন উপন্যাসের সংকট। মোপাসাঁপূর্ব ফ্লোব্যার কুণ্ঠিত, মোপাসাঁ-পরবর্তী জোলা প্রায় অসার্থক। তাই তখন খৃস্টান তলস্তয়েরও ধৈর্যচ্যুতি—'ক্রুটজার সোনাটা'র আবির্ভাব। তাই পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরিয়ে—একটা দার্শনিক নির্বেদে পৌঁছে, তবেই 'দি স্কারলেট লেটার' লিখতে পারলেন হথর্ন।

এ গেল আত্মিক কারণ। অন্য কারণও ছোটগল্পের পথ খুলে দিয়েছিল।

আমেরিকায় সংবাদপত্র ছোটগল্পকে আনুকূল্য করেছে। সাংবাদিকতার প্রয়োজনেই স্কেচধর্মী রম্যতার আবির্ভাব হয়েছিল ইংল্যান্ডের ট্যাটলার-স্পেকটেটর-র‍্যামব্লারে। হথর্ন, পো এবং হেনরি জেমস বিখ্যাত ম্যাগাজিনিস্ট, ফ্লোব্যার-ব্যালজাকের মুখ্য আশ্রয় পত্রিকা, মোপাসাঁ তাঁর তিনশোর উপর গল্প পত্রিকার প্রয়োজনেই প্রধানত লিখেছেন; চেখভকে ডাক্তারী পড়ার খরচ চালাতে হাসির নকসা দিয়ে পত্রিকার পাতায় হাত মকসো করতে হয়েছে—তারপর লিখতে হয়েছে গল্প। সংক্ষিপ্ত পরিসর—একটি মাত্র ভাব—একটি সংকটের সৃষ্টি করে পাঠককে নগদ বিদায় করা—এই স্থূল ব্যবসায়িক প্রয়োজনও উনবিংশ শতাব্দীর ছোটগল্প সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারণ। প্রসঙ্গত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গল্পের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথকেও মনে পড়তে পারে, তিনিও ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছিলেন 'সাপ্তাহিক হিতবাদীর' তাগিদেই। উনবিংশ শতকের সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের কিছু রোচক পরিবেশনের চেষ্টা আধুনিক ছোটগল্পের দ্বিতীয় জন্ম হেতু। সংক্ষেপে বলা যায়, উনিশ শতকের যুগমানস ছোট-গল্পের ভাবসত্তাকে জন্ম দিল এবং সংবাদ-পত্র তার কায়ারূপ নির্মাণ করল।

রথীন্দ্রনাথ রায়

উনবিংশ শতাব্দীকে 'ছোটগল্পের স্বর্ণ-যুগ' বলা হয়েছে। এই শতাব্দী শুধু ছোট-গল্পের স্বর্ণযুগই নয়, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভবভূমিও। মধ্যযুগের রোমান্স, নভেলা থেকে কথা-সাহিত্যের এই রূপটি সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতেই কেন আধুনিক উপন্যাসেরও উদ্ভব হল, সে কথাও বিবেচ্য। আধুনিক উপন্যাসেরও উদ্ভব হয়েছে অন্তত এক শতাব্দী আগে। ইংরেজী উপন্যাসের উদ্ভব কাহিনীর কথা বলতে গিয়ে সমালোচকরা 'রবিনসন ক্রুশোর' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এর আগে কাহিনী থাকলেও উপন্যাস ছিল না। উপন্যাস সৃষ্টির জন্য বিশেষ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। মধ্যযুগের রোমান্সের মধ্যে জীবন-বিচ্ছিন্ন কল্পনাবৃত্তির প্রাধান্য ছিল। উপ-ন্যাসে যে জীবনের ছবি ফুটে ওঠে, তা অধিকতর জীবনধর্মনিষ্ঠ ও বাস্তবমুখ

ডেফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং ইংরেজী কথা-সাহিত্যে যে বাস্তবমুখ জীবন-চিত্রনের চেষ্টা করেছেন, তার সঙ্গে পূর্ব-বর্তী কথা-সাহিত্যিকদের জীবন-চিত্রনের পার্থক্য আছে। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের পাঠক সাধারণের মধ্যেও ক্রমবর্ধমান পাঠস্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই 'সারকুলেটিং লাইব্রেরী' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক সংখ্যারও বৃদ্ধি হল। চাঁদাও খুব বেশি ছিল না—বছরে আধ গিনি থেকে এক গিনি ছিল চাঁদার হার। এই জাতীয় পাঠাগারে সবরকম বই-ই থাকত—কিন্তু উপন্যাসই ছিল এর প্রধান আকর্ষণ। উপন্যাসের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এই পাঠাগার-গুলির দায়িত্ব কম ছিল না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে উপন্যাসের নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নামক বহু আলোচিত বিষয়টি উপন্যাসের আবির্ভাবের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

উপন্যাসের উদ্ভবের সঙ্গে আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভবের একটি গভীর সংযোগ আছে। রূপ ও রীতির দিক থেকে স্বতন্ত্র হলেও কতকগুলি বিষয়ে উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের মিল আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে যেমন 'খাঁটি' উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না, তেমনি উপ-ন্যাসের জন্ম না হলে বোধহয় 'আধুনিক' ছোটগল্পের জন্ম সম্ভব হত না। যে-সমাজে উপন্যাস জন্মগ্রহণ করেছে, সেই সমাজেরই একটি 'বিশেষ অবস্থায়' ছোটগল্পের উদ্ভব হয়েছে। ইংরেজী ছোটগল্পের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পাঠক সাধারণের রুচি পরি-বর্তনের কথা বলা হয়েছে। এই শতাব্দীর অষ্টম দশকে তিন ভল্যুমের সুবৃহৎ উপন্যাসের কলেবর সংকুচিত হয়ে এক ভল্যুমে পরিণত হয়েছে। রুচি পরিবর্তনের এই পটভূমিকায় স্টিভেনসনের গল্পগুলি জন্মলাভ করেছে।

ছোটগল্পের অজস্রতা ও সমৃদ্ধির মূলে সাময়িক পত্রিকার দান বোধহয় সর্বাধিক। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে সাময়িক পত্রিকার প্রসার ঘটেছে। সাময়িক পত্রিকার তাগিদে ও পাঠক সাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে এই শতাব্দীতে আধুনিক ছোটগল্পের শুধু জন্মই হয়নি, বিচিত্রমুখী সমৃদ্ধি ঘটেছে। মোপাসাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই ফরাসী ছোটগল্প একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। এই যুগের ফরাসী ছোটগল্পের উৎকর্ষের মূলে সাময়িক পত্রিকার দান অনেকখানি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কথা-সাহিত্যের যে নূতন রূপ দেখা দিল, উনবিংশ শতাব্দীতে তা সংবাদপত্রের প্রয়োজন ও পাঠক সাধা-রণের রুচির তাগিদে ছোটগল্পের রূপ পরি-গ্রহ করল। আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী এডগার অ্যালেন পো নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন 'এসেনশিয়ালি এ ম্যাগাজিনিস্ট'। সংক্ষিপ্ততা, তীক্ষ্ণতা ও ঘনবদ্ধতার দিকে তার বিশেষ নজর ছিল। সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে থাকার জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই সংক্ষিপ্ত রচনার পক্ষপাতী ছিলেন।

হেনরি জেমসের অধিকাংশ রচনাই সাময়িক পত্রিকার জন্য লেখা হয়েছিল। তাঁর প্রথম গল্প নিউইয়র্কের 'কন্টিনেন্টাল মান্থলিতে' প্রকাশিত হয়, এরপর তিনি 'অ্যাটলান্টিক মান্থলি'তে গল্প প্রকাশ করেন। ইত্যবসরে তিনি নর্থ 'আমেরিকান রিভিউ-

এর জন্য অনেকগুলি সমালোচনা লেখেন (সমালোচনাগুলিতে রচয়িতার নাম ছিল না)। এই পত্রিকার সম্পাদক চার্লস এলিয়ট নর্টনের উৎসাহ ও আনুকূল্য তাঁর এই যুগের গল্প ও সমালোচনা লেখার প্রত্যক্ষ প্রেরণা দেয়। লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করার পর থেকে জীবনের শেষ সাঁইত্রিশ বছর তিনি অবিশ্রান্তভাবে লেখনী সঞ্চালন করেন। সাময়িক পত্রই তাঁর এই বিচিত্র রচনাসম্ভারকে আনুকূল্য করেছিল। মার্ক টোয়েনের বিখ্যাত হাস্যরসাত্মক গল্প ও স্কেচগুলি সাময়িক পত্রিকায়ই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তিনিও 'অ্যাটল্যান্টিক মান্থলি'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বাহনও সাময়িক পত্রিকা। তাঁর ছোটগল্পগুলিকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বটিকে বলা যায় হিতবাদীর যুগ—ছ সপ্তাহে তিনি ছটি গল্প লিখেছিলেন। ১২৯৮ সাল থেকে ১৩০২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরকে সাধনার যুগ বলা যায়। এই সময় তিনি ছত্রিশটি গল্প লিখেছিলেন। ১৩০৫ থেকে ১৩১৮ সালের প্রায় সমস্ত গল্পই 'ভারতী' ও নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল। 'সবুজপত্র'ই কবির গল্পের বাহন হয়ে উঠেছিল। ১৩২১ সাল থেকে ১৩২৪ সাল পর্যন্ত তিনি দশটি গল্প লিখেছিলেন—সবগুলিই সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। এক-একটি সাময়িক পত্রিকা যে এক-এক যুগে তাঁর ছোটগল্পের রচনাকে ত্বরান্বিত করেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ছোটগল্প রচনার মূলে সাময়িক পত্রিকার দাবীকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য কারণও বিদ্যমান। আধুনিক জীবনের দ্রুততা ও অস্থির-চাঞ্চল্য ছোটগল্পের প্রতি একটি স্বাভাবিক আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে। যন্ত্রযুগের কর্মঘন নাগরিক জীবন দীর্ঘবিন্যস্ত ধীর-মন্থর উপন্যাস পাঠের অনুকূলে নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধের মধ্যে বলেছিলেন : 'কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান, তাহাকে ভুলিতে হইবে যে, আপিসের বেলা হইতেছে।' আধুনিক কর্মচঞ্চল নাগরিক জীবনের পক্ষে দীর্ঘ উপন্যাস পাঠকের সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য হতে পারে। ছোটগল্প জীবনের দ্রুত তালের সঙ্গেই তাল মিলিয়ে চলেছে—সংক্ষিপ্ত অবকাশের সহচর হয়ে উঠেছে ছোটগল্প। দীর্ঘ উপন্যাস পড়ার অবকাশ কোথায়? ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জার, ট্রাম-বাসের যাত্রীরা তাদের স্বল্পতম অবকাশের মধ্যেও ছোটগল্প পড়তে পারে। ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসের চেয়ে মাসিক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোটগল্প পড়ায় বেশি আগ্রহ অনুভব করে।

পাঠকদের এই দাবী মিটিয়েছে এ যুগের মাসিক পত্র ও সংবাদপত্র। মাসিক পত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। সংবাদপত্রও লোকরঞ্জন ও সাহিত্যচর্চার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। বাঙলা সংবাদপত্রেও সংবাদ পরিবেশন ছাড়া নানা বৈচিত্র্য পরিবেশন করা হয়। রবিবারের সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদের সঙ্গে সাহিত্যও পরিবেশন করা হয়। মূল সংবাদপত্রের সঙ্গে 'সাপ্লিমেন্ট' যুক্ত করা হয়—অন্তত দুটি গল্প সেখানে থাকে। এইভাবে সংবাদপত্র ছোটগল্প পরিবেশন করারও ভার নিয়েছে। আধুনিক কালের ছোটগল্পের অনুকূল আবহাওয়া রচিত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী থেকেই এর সূত্রপাত ঘটেছে। 'টেল' জাতীয় আখ্যায়িকা ও ছোটগল্পের ধারা এই শতাব্দীতে অনেকটা পাশাপাশি চললেও শেষোক্ত প্রকরণটির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই শতাব্দীতেই।

ভূদেব চৌধুরী

মানুষের মন কেবল অতলান্ত বিস্ময়ের আকর নয়, তার গোটা জীবন পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার অভিঘাতে অপার জটিল। এই বিস্ময়-জটিলতার বিস্তার ও বৈচিত্র্য মানুষের গতিশীল চেতনার অতলে কেবলই গভীর-ব্যাপ্ত ছায়া ফেলেছে। ফলে, মানুষকে নিয়ে মানুষের ভাবনা ও চিন্তা, বিস্ময় ও আনন্দের অবধি নেই। জীবনের বহু-সর্পিলতায় বিচিত্র সেই রূপটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় খুঁজে ফিরেছে উপন্যাস-কলা। এ-পথে কেবল মনের অনুভব নয়, ইতিহাসের জ্ঞান, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিচারবুদ্ধির যৌক্তিকতা শিল্পীর হাতে জীবন-রচনার নিত্য-নব হাতিয়ার তুলে দিয়েছে; তাঁর শক্তিকে করেছে দুর্জয়। অষ্টাদশ শতকে পদার্থ ও জীব-বিজ্ঞানের উন্নতি, সেই সঙ্গে বিবর্তনবাদের জ্ঞান উপন্যাস-শিল্পীর সামনে জীবনের এক সীমাহীন প্রচ্ছদ তুলে ধরেছে। অনাদিকালের আদিম উৎস থেকে অনন্তকালের নিরবধি মোহনা পর্যন্ত কল্পনাতীত প্রসার। ব্যক্তি-মানুষের জীবনকে এই অনন্ত সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে আঠারো-উনিশ শতকের উপন্যাস-শিল্পী তিলে তিলে তার জটিলতার গ্রন্থিমোচন করেছেন। উপন্যাস-শিল্পীর জীবন-দৃষ্টি তাই অনন্ত-ব্যাপ্ত, বহুধাবিচিত্র। ছোটগল্পের শিল্পী সেই অপার-বিস্তৃত দৃষ্টিকে সংবদ্ধ করে একটি বিন্দুতে একান্ত-কেন্দ্রিত করেছেন। জীবন-সিন্ধুর অকূলপ্লাবী কল্লোচ্ছ্বাসকে এক মুহূর্তের গভীরতার মধ্যে আকণ্ঠ পান করে থাকেন তিনি। ছোটগল্পের শিল্প-শরীর বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে তুলে ধরে।

একটি জীবনকে অনন্ত জটিলতার মধ্যে পরিকীর্ণ করে শাশ্বত জীবনের মূর্তি রচনা করে উপন্যাস। আর অনন্তে প্রসৃত জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের অন্তরে একান্ত করে বিম্বিত,—সীমাবাজিত করে ছোটগল্প। সকল সার্থক গল্পের মন্ত্রই উপন্যাস ও ছোটগল্পও বস্তুময়, জীবন-রূপকে প্রতিফলিত করে থাকে নিজ নিজ শিল্প-রূপের মুকুরে। উপন্যাসের জীবন যেন পূর্ণিমা-রাতে জোয়ারের সমুদ্রে বিম্বিত জীবন-রূপ। একখানা ঢেউ হাজার-খানা হয়ে ফুলেফেঁপে আছড়ে পড়ছে,—বীভৎস আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ঢেউ-এর বুকে ঢেউ-এর মূর্ছা উচ্ছ্বসিত ফেনায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে,—নীল ঢেউ-এর চূড়ায় চূড়ায় শাদা ফেনার পুঞ্জ, কালোনাগের মাথায় যেন শুভ্র পদ্ম-রাগ মণি। মুহূর্তে জাগ্রত স-ফেন ঢেউ-এর শীর্ষে পূর্ণ চাঁদের আলো চকচক করে ওঠে; শাদা ফেনার মুকুরে সেই পূর্ণ আলোয় একটি মানুষের একটি রূপ হাজার-খানা হয়ে, হাজার ঢেউ-এর মাথায় চকিতে হেসে ওঠে। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যে। তারপর ঘোর গর্জনে ঢেউগুলি একে অন্যের 'পরে আছড়ে ভেঙে কুটি কুটি হয়ে যায়। শুভ্র-সফেনতা কালো জলের ভ্রূকুটি-তলে আত্মহত্যা করে বাঁচে। আরো পরে, অকূলে সমুদ্রের আলোড়নকে আমূলে পীড়িত করে আবার চলে শুভ্র-ফেনার জীবন-মুকুর রচনার প্রাণান্ত প্রয়াস। ঊর্মিমুখর সমুদ্রে সহস্র-বিভঙ্গ জীবনের উত্তাল-ক্ষুব্ধ রূপটিকে পূর্ণ-বিম্বিত করবার শিল্পমুকুর উপন্যাস।

আর, ছোটগল্পে, পূর্ণ চাঁদের আলোর দোলায় জীবন-শিল্পী নিজের অফুরন্ত রূপকে যেন বিম্বিত করে দেখেন, পদ্ম-দীঘির ফটিক জলে। পূর্ণিমা নিশীথের গভীর নিঃস্তব্ধতায় জলের তলায় দুটি প ছড়িয়ে ঘাটের পরে এসে বসে সারাদিনের বিস্রস্ততা-ক্লান্ত নিঃসঙ্গ জীবনের রূপ। ফটিক জল স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ—নিজের সামনে নিজের স্বচ্ছ পূর্ণ প্রতিবিম্বের পাশে অতল জলে ডুবে আছে পূর্ণ চাঁদ। পাশে, জীবনের পদ্মবন ঘুমিয়ে থাকে, ক্লান্ত মৌমাছিরাও আর গুনগুন করে না। কারণে-অকারণে দীঘির স্থির জলে চঞ্চলতা জাগে যদি, প্রশান্ত ঢেউ-এর ভাঁজে ভাঁজে তখনো জীবন-বিম্বটি পূর্ণরূপের উজ্জ্বলতায় কেবল হাসে আর কাঁপে। পরে কাঁপতে কাঁপতে আবার সুস্থির—সম্পূর্ণ অখণ্ড রূপের মাধুরিতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের উত্তাপ তাতে রয়েছে, রয়েছে তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সংগ্রামের বস্তু-নিবিড় স্পর্শ। কিন্তু, শিল্পীর নিঃসঙ্গ অনুভবের নিভৃত অতলতায় সকল বৈচিত্র্য সব বিস্তার ডুব দিয়েছে শ্বাসরুদ্ধ করে নিরুদ্ধ শ্বাস জীবনের সেই ডুবে-থাক মুহূর্তটিকে ছোটগল্পকার তুলে ধরেন তাঁর শিল্প-মুকুরে। জীবন সেখানে প্রাণচঞ্চল কিন্তু নিস্তরঙ্গ; সংসক্ত, কিন্তু গভীর, পূর্ণ হয়েও প্রশান্ত।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১ম বর্ষ
১ম খণ্ড

২য় সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 16th May, 1969 [illegible], ১৩৭৬ 40 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

জল সাপ কলাবতী

গত শুক্রবার ৫ই বৈশাখ বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'অমৃত'তে প্রকাশিত শ্রীসুধাংশু ঘোষের 'জল সাপ কলাবতী' গল্পটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এই গল্পটিতে দরিদ্র সমাজের প্রতি লেখকের দরদী মনের পরিচয় উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। নীলকন্ঠপুরের দরিদ্র মাঝিটি, যে দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি তার প্রতি লেখকের অন্তরের নিগূঢ় একাত্মতা গল্পের অন্যতম আকর্ষণ। আধুনিক সমাজের প্রণয়ের বিকৃত রূপটি তিনি তুলে ধরেছেন। মাঝির দরিদ্র অথচ সৎ জগতের ধ্বসে পড়া, জীর্ণ অভিজ্ঞতার মর্মস্পর্শী কাহিনী অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। গল্পের ভাষা চমৎকার। তবে গল্পের কয়েক জায়গায় আমার ধারণা এখনও ঘোলাটে।

লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়। 'তিতীর্ষা' সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা—১০।

বাংলা সাহিত্যের জয়যাত্রা

'অমৃত'-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে 'বাংলা সাহিত্যের জয়যাত্রা' শীর্ষক যে সময়োপযোগী নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে (শুক্রবার, ১৪ই চৈত্র, '৭৫), তার জন্যে নিবন্ধকারকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারে যে চিরন্তন সাহিত্যরস রয়েছে, তার থেকে বিশ্বের অনেক বাংলা-না-জানা সাহিত্যরসপিপাসু আজও বঞ্চিত। এবং এর অনতম কারণ, বোধ করি, বাংলা ভাষায় রচিত সার্থক গ্রন্থগুলির যথোচিত অনুবাদের আশ্চর্যজনক অনুপস্থিতি।

সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এই বিষাদময় পরিস্থিতিতে কয়েকজন স্মরণীয় সাহিত্যিকের বাংলা গ্রন্থের ইংরেজী ভাষায় সার্থক অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের 'জয়যাত্রা'র সংবাদ সত্যিই বহন করে এনেছে। 'পথের পাঁচালী', "গণদেবতা" ও "লাল সালু"র অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তার করেছে। এ অভিযান সার্থক। নিবন্ধকার যথার্থ বলেছেন : 'এই অভিযান নিঃশব্দ হলেও বিজয়ের তূর্যনিনাদে বাংলা সাহিত্য তার যথাযোগ্য সম্মানে সমাদৃত হবে। সাহিত্য আকাদেমীর পাঁচ হাজারী পুরস্কার না পেলেও বাঙালী সাহিত্যিকদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম।'

এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিদেশী ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে শ্রীআশিস সান্যাল সম্পাদিত "বেঙ্গলি লিটরেচর" শীর্ষক সাহিত্য পত্রটি উল্লেখযোগ্য। সার্থক অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা কবিতার ভূগোল-সীমানা বর্ধনে এর অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। বাংলা দেশের অন্যান্য সাহিত্য-পত্রও যদি এই ধরনের অভিযান সুরু করেন, তাহলে বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গনে আমাদের বাংলা সাহিত্যের মান বাড়বে বই কমবে না।

দুঃখের বিষয়, স্বাধীনোত্তর পর্বে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যে অনন্যসাধারণ মানসিকতার পরিচয় মেলে, তার সঙ্গে বিদেশী সাহিত্য-পাঠক-পাঠিকা যথোচিত পরিচিত নন। সার্থক তরুণ বাঙালী সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকর্মের সার্বিক মূল্য পাচ্ছেন কই! অথচ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সার্থক অনুবাদের ভূমিকা আরও সাফল্যজনকভাবে গ্রহণ করতে পারেন এবং বোধ করি একথা সকলেই স্বীকার করবেন তাঁদের নিরলস নিষ্ঠা ও আন্তরিক সহযোগিতায় বাংলা সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী বিজয় অভিযান আরও সফল হবে। মোহিত চক্রবর্তী। শিক্ষসত্র, শ্রীনিকেতন, বীরভূম।

মীরা দেবী প্রসঙ্গে

গত ১৪ চৈত্রের অমৃত পত্রিকার অঙ্গনায় সমাপ্ত অধ্যায়-এ মীরা দেবী প্রসঙ্গে প্রমীলা লিখেছেন 'স্বামী ডঃ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক', তা ঠিক নয়। ডঃ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন না, তিনি ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক ছিলেন।

অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রিজেন্ট পার্ক,
কলকাতা—৪০

হীরামনের হাহাকার

'হীরামনের হাহাকার' প্রসঙ্গে প্রথমে শ্রীনীলারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও পরে লেখকের মন্তব্য পড়লাম। লেখকের ব্যক্তিগত ধারনার সঙ্গে আমার নিজস্ব ধারনার কোন ফারাক নেই। দ্রুতগতি গোয়েন্দা কাহিনী বাজারে অনেক আছে—কিন্তু শুধুমাত্র দ্রুততাই কোন গোয়েন্দা কাহিনীর চরম ও পরম লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া অনুচিত। 'হীরামনের হাহাকারে'র চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব তার ভাষার সাবলীলতায় অনাবিল হাস্যরস পরিবেশনে ও সাহিত্যরসের পরিপূর্ণতায়। এই রসঘন ও রহস্যঘন কাহিনীতে তাই মন্থরতা অনিবার্য। লেখককে তাই অনুরোধ, শুধুমাত্র দ্রুততার তাগিদেই সাহিত্যরস থেকে পাঠকদের যেন তিনি বঞ্চিত না করেন। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয়, শ্রীঅদ্রীস বর্ধনের 'হীরামনের হাহাকার', শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আলোকপর্ণা' ও শ্রীমিহির আচার্যের 'ঘরে ফেরার দিন' সাম্প্রতিক অমৃতের অমৃতকুম্ভ।

মিহিরকুমার দেব পুরকায়স্থ
করিমগঞ্জ, আসাম।

বেতারশ্রুতি প্রসঙ্গে

আপনার বহুল প্রচলিত অমৃতে বেতার-শ্রুতি বিভাগের পুনঃসংযোজন নিঃসন্দেহে পাঠকবর্গকে আনন্দিত করেছে। এই বিভাগের মাধ্যমে আকাশবাণী ভবনের খেয়ালীপনা এবং কাজের ঔদাসিন্যের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিবাদ জানানো হয় তাতে আকাশবাণী ভবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হবে বলে মনে করি। অনুষ্ঠান সমালোচনা কালে শ্রবণকের সপ্রতিভ দৃষ্টি-ভঙ্গী পাঠকবর্গের নিকট সমাদৃত। কিন্তু শ্রবণক শ্রীরথীন ঘোষ ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দের কীর্তনের যে সমালোচনা করেছেন তা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। তিনি লিখেছেন (৭ই চৈত্র প্রকাশিত অমৃত) শ্রীঘোষের কীর্তনে কোন মাধুর্য বা আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু ঐ দিনের অনুষ্ঠান আমি শুনেছি এবং বলতে দ্বিধা নেই যে আমি এবং আমার বাড়ীর সকলেই মোহিত হয়েছি। শ্রীরথীন ঘোষের কীর্তন সম্পর্কে বহুজনেরই এক অমোঘ আকর্ষণ রয়েছে। 'খোলা মন' নিয়েই সেই-দিনের অনুষ্ঠানের বহু শ্রোতাদের যাঁরা প্রকৃতই কীর্তন শুনতে ভালবাসেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা রথীন ঘোষ এবং তাঁর সহশিল্পীবৃন্দের প্রশংসাই করেন। তাঁরা শ্রবণক মহাশয়ের 'চিত্ত দ্রবীভূত' এবং 'প্রাণ আকুল' হয় নি বলেই কি ঐ রকম বিরূপ সমালোচনা করেছেন?

অমিতাভ মোদক
চন্দননগর, হুগলী।

কেয়াপাতার নৌকো

অমৃততে প্রকাশিত প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকো' আমার খুব ভালো লেগেছে। সেই সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।

দেশ বিভাগের আগে জন্ম হলেও দেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। 'কেয়া পাতার নৌকো' পড়তে পড়তে সেই অদেখা দেশকে চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখেছি আমি। মা, ঠাকুরমার মুখে দেশের যে গল্প শুনেছি তারই প্রতিবিম্ব দেখেছি 'কেয়া পাতার নৌকোয়'। সুধা, সুনীতির মাঝখানে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি যেন। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও রাজদিয়ার হাটে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক কথায় কেয়া-পাতার নৌকো আমার ভীষণ ভালো লাগছে। প্রতি সংখ্যা অমৃতর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি আমি। লেখককে আমার অজস্র ধন্যবাদ জানাবেন।

সুবীর সেনগুপ্ত
লেকুলডাঙা, বাঁকুড়া।

সম্পাদকীয়

দেশে বিদেশে রাষ্ট্রভাষা

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে দেশে যতই তুলকালাম কান্ড ঘটুক, কেন্দ্রীয় সরকার তাতে মোটেই দমবার পাত্র নন। তাঁরা রাষ্ট্রভাষা প্রচারের জন্য নিজের হাতে যত অস্ত্র আছে সবগুলো একে একে ব্যবহার করছেন। অ-হিন্দীভাষী এলাকার অধিবাসীদের প্রধান ভয় এই যে, রাষ্ট্রভাষা প্রচলনের নামে বড় বড় চাকরীগুলোতে হিন্দীভাষীদের প্রাধান্য সৃষ্টির চক্রান্ত চলছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে হিন্দীতে পরীক্ষা দেবার নীতি চালু হতে চলেছে। হিন্দী এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যেগুলো অর্বাচীন তারা প্রথম শ্রেণীর এম-এ ও ডক্টরেট তৈরীর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বড় বড় চাকুরীগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ী ডিগ্রির তকমার জোরে দখল করা।

হয়তো শুনতে খুবই খারাপ লাগবে, কিন্তু এ ধরণের ঘটনা ঘটছে। সর্বভারতীয় চাকুরীগুলোতে অহিন্দীভাষীরা ক্রমশই পিছু হটছেন এবং যতই দিন যাবে ততই তাঁদের পশ্চাদপসরণ আরও লক্ষণীয় হবে। অথচ ভারতবর্ষের বিচিত্র ভাষাগোষ্ঠির লোকেরা কেন রাষ্ট্রভাষার নামে উর্ধবাহু হয়ে নাচছেন না এবং যথেষ্ট দেশাত্মবোধের পরিচয় দিচ্ছেন না তার জন্য হিন্দীপ্রেমীদের উষ্মার অন্ত নেই। একটা বিষয় তাঁদের কখনই বোঝানো যায় না যে, হিন্দী ছাড়া আরও অনেক ভাষা এই দেশে আছে এবং তাদের মধ্যে চৌদ্দটি ভাষা জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত। এই স্বীকৃত ভাষাগুলোর সমৃদ্ধি সাধনের জন্য রাষ্ট্র তৎপর হবে এমন সদিচ্ছা সংবিধানে ঘোষিত। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই ভাষার ক্ষেত্রে দিল্লীর কর্তাব্যক্তিরা সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর নীতি মেনে চলতে উৎসাহী। বলা বাহুল্য, হিন্দী অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা হল দিল্লীর সেই সুয়োরাণী।

হিন্দীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বছরে এক কোটি টাকা খরচ করেন। হিন্দীর সমৃদ্ধি হোক এতে কারও আপত্তি নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় কোষাগারে অর্থ জোগান দেন ভারতের সকল রাজ্যের লোক। তাঁরা কি এটা আশা করতে পারেন না যে, তাঁদের মাতৃভাষার সমৃদ্ধির জন্যও দিল্লীর দরাজ-দিল প্রকাশ পাবে। যাঁরা জাতীয় সংহতির কথা বলেন তাঁদের কাছ থেকে কি এটা আশা করা অন্যায় যে সকল ভাষার প্রতি তাঁরা সমদৃষ্টির পরিচয় দেবেন। কিন্তু আশা শুধু মিছে ছলনা। হিন্দীর অগ্রগতি অনেক মূল্যবান অন্যান্য ভাষার চাইতে। সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং রাজ্যসভায় জানিয়েছেন যে, বিদেশে ভারতের যে-সমস্ত দূতাবাস আছে সেখানে রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মচারীদের যতটা সম্ভব হিন্দী ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, দূতাবাসের নামের ফলকে, নিমন্ত্রণপত্রে, বিবৃতি ও বাণী প্রচারে হিন্দী ভাষাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিদেশীদের সংগে আলাপ-আলোচনার সময়েও হিন্দীই হবে মুখ্য মাধ্যম। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সরকারী নীতি অনুসরণ করেই নাকি এই নির্দেশ প্রচার করা হয়েছে। এর ফলে দূতাবাসগুলোতে অহিন্দীভাষী যাঁরা আছেন তাঁদের দশা কী হবে। ধীরে ধীরে তাঁদের স্থান দখল করবেন হিন্দীভাষী লোকেরা যেহেতু রাষ্ট্রভাষা ব্যবহারে তাঁরাই উত্তম। অথচ অন্যান্য স্বীকৃত জাতীয় ভাষা জেনেও এবং ইংরেজিতে পারদর্শী হয়েও অহিন্দী-ভাষীরা সেখানে পাত্তা পাবেন না। এ নীতি কতটা মারাত্মক ও অহিন্দীভাষীদের পক্ষে ক্ষতিকর তা কয়েক বছরের মধ্যেই বোঝা যাবে। তখন হিন্দী ভাষায় পারদর্শী নয় এই অজুহাতে বিদেশী দূতাবাসে অহিন্দীভাষীদের প্রেরণ বন্ধ হয়ে যাবে। রাষ্ট্রভাষার নামে ভারতের একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীরাই সর্বক্ষেত্রে পাবেন প্রাধান্য।

আঞ্চলিকতাবাদের প্রশ্ন নয়। বিচার করে দেখলে এখন পর্যন্ত যে কয়জন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা সবাই হিন্দী অঞ্চলের এবং একটি বিশেষ রাজ্যের অধিবাসী। দক্ষিণের একজন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার জন্য তাঁকে পাক্কা দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল উপরাষ্ট্রপতিরূপে। ভবিষ্যতে অহিন্দী অঞ্চলের কেউ যদি রাষ্ট্রপতি হন তাহলে তা হবে নেহাৎই রাজনৈতিক প্রয়োজনে। তা ছাড়া দক্ষিণ একটু সোচ্চার বলে হিন্দী প্রচার সেখানে রয়ে সয়ে হচ্ছে। পূর্ব বা পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের মৃদু প্রতিবাদকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিচার করলে এই ভাষাবিরোধ বৃহত্তর সঙ্কটেরই পূর্বাভাস। ভাষা নিয়ে জবরদস্তি করতে গিয়ে পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হবার মুখে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা ততটুকুই প্রয়োজন যতটুকু তার সরকারী কাজে লাগে। এবং তাও অন্যভাষাকে বরবাদ করে নয়। দিল্লীতে সরকারী দফতরখানায় হিন্দীর প্রচার ও প্রসার চলছে। হিন্দীভাষী রাজ্যগুলোতে ইংরেজির নামগন্ধও নেই। নিজেদের রাজ্যে যা ইচ্ছা তা করুন তাঁরা। কিন্তু পররাষ্ট্র দফতরে হিন্দী চালাবার এই প্রচেষ্টা অহিন্দীভাষীদের পক্ষে দুর্দিন। সময় থাকতে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নতুবা কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা যাবে যে পররাষ্ট্র দফতরে ও সর্বভারতীয় চাকুরীতে অহিন্দীভাষী এলাকার অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব কমে প্রায় শূন্যের অঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে।

পরলোকগত রাষ্ট্রপতি

ডঃ জাকির হোসেন

[বিশেষ আলোচনা ২৪২ পৃষ্ঠায়]

গান্ধী

অন্নদাশঙ্কর রায়

(চার)

গান্ধীজী তখনো জীবিত। স্বাধীনতার কিছুদিন বাদে একবার দার্জিলিং থেকে ফিরছি। শিলিগুড়িতে আমার কামরায় সহযাত্রী হন এক ইংরেজ মিলিটারি অফিসার। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি প্ল্যাটফর্মের এক নির্জন প্রান্তে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন অপর একজন সাহেবের সঙ্গে। যিনি তাঁকে তুলে দিতে এসেছিলেন। শেষের দিকে তাঁরা পাগলের মতো জড়াজড়ি করেন।

লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। বলেন, 'আমাদের দুজনের ব্যবহার দেখে আপনি হয়তো হকচকিয়ে গেছেন। ও হচ্ছে আমার দাদা। ওর সঙ্গে বিশ বছর বাদে আজকেই প্রথম দেখা। শেষ দেখাও বলতে পারি। আমি বৃটিশ আর্মির সঙ্গে এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দাদা চা বাগানের মালিক। সে থেকে যাচ্ছে।"

এরপরে তিনি যা বলেন তা আমার মনে খোদাই হয়ে আছে।

'দাদার সঙ্গে তর্ক করেই সময় কেটে গেল। দাদা বুঝতে পারছে না কেন আমরা এই সোনার দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কে আমাদের যেতে বাধ্য করছে। আমি ওকে বোঝাই, দাদা, মাইট ইজ রাইট। মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট। আমাদের সে মাইট কি আর আছে! কেমন করে থাকি!"

কথাটা ঠিক। ইংরেজদের মাইট ছিল, আর সেই মাইটের ধারক ছিলেন সেই মিলিটারি অফিসার। মাইট কমতে কমতে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে, সে দাপট আর নেই, তাই ওঁরা মানে মানে বিদায় নিচ্ছেন।

তেমনি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহীরা বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট। মিলিটারি অফিসারের কথাটার ঠিক উল্টোটি। তাঁর থীসিসের অ্যান্টি থীসিস।

রাইট বাড়তে বাড়তে যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে হাত বাড়ালেই সিদ্ধি। কিন্তু এমন সব ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে ষোল আনা সিদ্ধিলাভ আর হলোই না। তবু বোঝা গেল, রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট।

গান্ধীজীর বাণী সেই মিলিটারি অফিসারের বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। জোর যার ন্যায় তার নয়। ন্যায় যার জোর তার।

গায়ের জোর বনাম ন্যায়ের জোর এই দুই জোরের সংঘাত ত্রিশ বছর ধরে চলে। ওটি একটি এপিক সংগ্রাম। ও নিয়ে একদিন এপিক লেখা হবে। কিন্তু যেভাবে সে সংগ্রাম সারা হলো তাকে গ্লোরিয়াস এন্ডিং বলা শক্ত। মহাত্মার নিজের কথায় ওটা একটা গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের ইনগ্লোরিয়াস এন্ডিং।

অথচ এমনই নিয়তির বিধান যে পনেরই অগাস্ট তাঁকে যার থেকে বঞ্চিত করল তিরিশে জানুয়ারি তাই তাঁকে দিল। গ্লোরিয়াস এন্ডিং। গৌরবময় পরিসমাপ্তি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এপিক চরিত্র তাকে একদিন এপিকের বিষয়বস্তু করবে। তাকে নিয়ে এপিক উপন্যাস, এপিক নাটক, এপিক কাব্য রচিত হবে। আর তার মহানায়ক হবেন গান্ধীজী। আধুনিক মহাভারতের আধুনিক যুধিষ্ঠির তথা কৃষ্ণ।

গান্ধীজী বেঁচে থাকতেই আইডিয়াটা আমার মাথায় এসেছিল। তখন কিন্তু খেয়াল হয়নি যে কুরুক্ষেত্রই শেষ কথা নয়, তারপরে আছে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের শোচনীয় দেহাবসান। নতুন মহাভারতও সেই পুরাতন ট্র্যাজেডীর রূপান্তর। মন আমার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে এপিকের প্রয়োজনেই গান্ধীজীকে অপসৃত হতে হবে। বৃটিশ অপসরণ ও গান্ধী অপসারণ যেন একইসূত্রে গাঁথা। যেন মঞ্চ থেকে নায়ক আর প্রতিনায়ক উভয়েরই নিষ্ক্রমণ একই কালে। যেন একজনের প্রস্থানের পর আরেকজনের উপস্থিতি অর্থহীন।

গান্ধীবিয়োগের পর একদিন বহরমপুরের বিশিষ্ট নাগরিক রমণীমোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রমণীবাবুর মুখে শুনি যে গান্ধীজী একবার তাঁদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন। বাড়ীর একটি নবজাত শিশুকে দেখে আশীর্বাদ করেন। বলেন, দীর্ঘজীবী হও। দীর্ঘজীবী হও।

তখন রমণীবাবু বলেন, মহাত্মাজী, আপনিও দীর্ঘজীবী হোন। গান্ধীজী তা শুনে গভীর প্রতীতির সঙ্গে বলে ওঠেন—

"Believe me, Ramani Babu, I shall not live a day longer than necessary."

তাই হলো। যেই তাঁর প্রয়োজন ফুরোল অমনি তাঁর পরমায়ু ফুরোল। প্রয়োজনটা আমাদের দিক থেকে নয়, তাঁর দিক থেকে। আমরা তো তাঁকে কোনো দিনই নিষ্প্রয়োজন মনে করতুম না। এই দুর্ভাগা দেশের প্রয়োজনের তালিকাটি তো ছোট নয়। কিন্তু তাঁর দিকে তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাসের দিক থেকেও। বৃটিশ সৈনিক না থাকলে প্রথম সত্যাগ্রহী লড়বেন কার সঙ্গে? বৃটিশ রাজের সঙ্গেই অর্ধনগ্ন ফকিরের দ্বন্দ্ব। একের অন্তর্ধান অপরকে অনাবশ্যক করে।

তিনি অন্তরে অন্তরে বুঝতে পেরেছিলেন যে আর তাঁকে কেউ চায় না। 'কেউ' মানে 'কেউ কেউ'। তিনি তাঁদের পথের কাঁটা।

মর্ত্যলোকে মানুষের মুখে যে শেষ কথা শুনে যান সে কথা নাকি কতকটা এই রকম—তোমার অহিংসা দিয়ে কাজ করা যায় না। তোমার দিন গেছে।

হাঁ, এইটেই ছিল মূল প্রশ্ন যা নিয়ে তাঁর আপনার লোকদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। তাঁর মতে এমন কোনো সমস্যা নেই যার অহিংস সমাধান নেই। খুঁজলেই মেলে। যত্ন করে সন্ধান করো। মিলবেই মিলবে।

তাঁদের মতে অহিংসা কেবল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। সে উদ্দেশ্য যখন আর নেই সে উপায়ও তখন অকেজো। আর তাঁরা হলেন রাজনীতির লোক। সাধুসন্ত নন যে সবকিছু ফেলে অহিংসাব্রত নেবেন ও তামাম সমস্যার অহিংস সমাধান হাতড়ে বেড়াবেন। তাই যদি হয় তো সৈন্যসামন্ত আছে কী করতে! ক্ষমতার হস্তান্তর কিসের জন্যে?

সত্যাগ্রহ যে কোথায় এক নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল সেটাও একটা বিস্ময়। ত্রিশ বছর যা মঞ্চ জুড়েছিল, তা কি সত্য না মায়া? গান্ধীজী নিজেই বলতে আরম্ভ করেন যে তিনি এতদিন একটা মায়া নিয়ে পথ চলেছিলেন। এখন সে মায়া তাঁর নেই। তিনি মোহমুক্ত।

একথাও বলেন যে, এতদিন তিনি যাকে অহিংসা বলে ভ্রম করেছিলেন সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। দুর্বলের অস্ত্র। দুর্বল যখন বলবান হয়ে ওঠে, অন্য হাতিয়ার হাতে পায়, তখন হিংসায় ফেটে পড়ে।

আমার মন গান্ধীজীর এই খেদোক্তিতে সায় দেয়নি। ত্রিশ বছর ধরে কত বড়ো একটা শক্তি কত বড়ো একটা দেশকে ইঞ্জিনের মতো চালিয়ে নিয়ে গেল, কতদূর চালিয়ে নিয়ে গেল। তার সমস্তটাই কি দুর্বলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ?

গান্ধীজী অতি সাধারণ মানুষের কাছে অতি অসাধারণ তপোবল প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে যে সমবেতভাবে যা তারা করেছে তা সত্যি অসাধারণ। সমবেত যদি থাকত তা হলে আরো অসাধারণ কীর্তি রাখত। কিন্তু শেষের দিকে তারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল আর পরস্পরকে মর্মান্তিক আঘাত করে পর হয়ে গেল। এটা যেন ক্লাইমাক্সের পর অ্যান্টিক্লাইমাকস।

ট্র্যাজেডী সন্দেহ নেই। কিন্তু অহিংসা তা বলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ছদ্মবেশ হয়ে যায় না। সত্যাগ্রহ তা বলে মায়া হয়ে যায় না। মহাত্মার জীবনের কাজ অকারণ হয়ে যায় না। বিচার করলে দেখা যাবে যে ভারতের লোকশক্তির উচ্চতা বেড়ে গেছে আর সেটা গান্ধী নেতৃত্বের কল্যাণে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির নীচতায় সে উচ্চতার হানি হয়েছে তা ঠিক। আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে তা ঠিক। তা সত্ত্বেও আমরা এমন কিছু করেছি যা নিয়ে এপিক লেখা যায়। ত্রিশ বছর তো মিথ্যা নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজী একবার এক স্থানে বলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা একশো বছরের কাজ। তার কমে কি হবে?

কিন্তু জাগতিক অবস্থা সহায়ক হয়েছিল। তাই তাঁর সেই উক্তির ত্রিশ বত্রিশ বছরের ভিতরেই হলো। জাগতিক অবস্থা বলতে বোঝায় দু' দুটো মহাযুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধের মাঝখানে রুশ বিপ্লব, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে শ্রমিক শক্তির জয়। তা ছাড়া অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি। ক্যাপিটালিজমের সংকট। কমিউনিজমের প্রসার।

স্টালিনগ্রাডের পরেই আমরা কেউ কেউ ইউরোপের মানচিত্র নিয়ে বসি ও তার উপর মনের সুখে লাইন টানি। জার্মানীর সবটা তো রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ইংরেজ মার্কিনও তো লংকাভাগ করবে। জার্মানীর পার্টিশন অবধারিত। পরে যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে, তখন ইংরেজ মার্কিন কিছুটা এগিয়ে থাকবে। তাই যদি হয় তবে ওরা রাশিয়ার সঙ্গে লড়বে, না সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গেও লড়বে? এক সঙ্গে ক'টা ফ্রন্ট খোলা যায়? ভারতীয় ফ্রন্ট গুটিয়ে আনাই হবে ওদের নীতি। যদি ভারতকে তৃতীয় মহাযুদ্ধে মিত্ররূপে পাবার প্রয়োজন থাকে তবে তো স্বাধীন করে দিতে হবেই। অবশ্য স্বাধীন হবার পর ভারত মিত্র হবে কিনা অগ্রিম অংগীকার দিতে পারে না। মিত্রতার অংগীকার স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। বিনা শর্তে স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা আসছে, তার খুব বেশী দেরি নেই। তবে ঠিক কত দেরি তা তখনো বুঝতে পারিনি। তখন এই কথাই ভেবেছি যে স্বাধীনতা হলে তো গান্ধীজীর সংগ্রাম শেষ হয়ে যাবে, সংগ্রাম সারা হলে তো সেনাপতিত্বও সারা হবে, তারপরে কি তিনি বাঁচতে চাইবেন? বাঁচবেন? আমার তখন থেকেই আশংকা যে স্বাধীনতা যেই আসবে অমনি গান্ধীজীও চলে যাবেন। তাই মনে মনে বলেছি, হোক না স্বাধীনতার দেরি, তা বলে গান্ধীজীকে তো হারাতে পারিনে। বিচার করে দেখিনি যে স্বাধীনতার চেয়ে গান্ধীজীর প্রাণকে আরো বেশী মূল্যবান ভেবেছি। ইংরেজ চলে গেলেই গান্ধীজীও চলে যাবেন এটা আমার কাছে একটা ইনটুইশন ছিল। সেই জন্যে রাতারাতি স্বাধীনতা কামনা করিনি।

জাগতিক অবস্থা সহায়ক হলো। সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক অবস্থাও। আমি জানতুম যে দু' দুবার রুশদেশে বিপ্লব ঘটে গেল মুদ্রাস্ফীতির দরুণ। ভারতেও যে হারে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে তার পরিণতি বৈপ্লবিক না হয়ে পারে না। যুদ্ধ যদি দীর্ঘতর হয়, তবে যুদ্ধের মাঝখানেই বিপ্লব অর্থাৎ স্বাধীনতা ভূমিষ্ঠ হবে। গান্ধীজীরও ধারণা ছিল তাই। নানা কারণে যুদ্ধকাল সংক্ষেপিত হয়। তাই যুদ্ধের মাঝখানে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের রূপ নিয়ে স্বাধীনতা আসে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতাকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেও অহিংস মতবাদের মহাক্ষতি করে। অহিংসার চেয়ে হিংসার প্রতিপত্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। হওয়া উচিত ছিল এর বিপরীত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী শ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে কোথায় শান্তির ধ্যান করবে, না ধ্যান হলো হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা, রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিনের, ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর। অহিংসা যেন চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়। কোণঠাসা হয়ে সেবাগ্রামে নিবদ্ধ।

একেই বলে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। ভারতের স্বাধীনতা কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে, অহিংস মতবাদে দেশের লোকের বিশ্বাস কদম কদম পেছিয়ে পড়ছে। এটা এমন এক পরিস্থিতি যাতে গান্ধীজী অবিচল, কিন্তু তাঁর সহযাত্রীরা অবিচলিত নন। নেতাকে ত্যাগ করার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না, কিন্তু নীতিকে আঁকড়ে ধরা তাঁদের পক্ষে দিনকের দিন দুরূহ হয়। বৃটিশ সরকার নয়, মুসলিম লীগই দুরূহ করে।

নোয়াখালীর জন্যে আমার মনোবেদনা লক্ষ করে আমার মুসলিম বন্ধুরা বলেন, "ওর জন্যে দায়ী মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের হিংসা প্রতিহিংসায় মানুষের মনুষ্যত্ব বিগড়ে গেছে। মানুষগুলো কেমন যেন হয়ে গেছে।"

ভারতের মানুষ তো দুনিয়ার বার নয়! মনুষ্যত্ব বিগড়ে যায় দুনিয়া জুড়ে। সর্বত্র ওই একই তত্ত্ব। মাইট ইজ রাইট। মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট। আমাদের যা আছে তা আমার গায়ের জোরে রাখব। আমাদের যা নেই তা আমরা গায়ের জোরে কেড়ে নেব। গায়ের জোরই ন্যায়ের জোর।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ ছিলেন যিনি উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে স্থির থেকে শান্তস্বরে বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইজ অলওয়েজ মাইট। তাঁর মতবাদ থেকে তাঁকে টলাতে পারে এমন সাধ্য কার। তিনি শতবর্ষ পরমায়ু চেয়েছিলেন যাতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারেন। আর সকলের পালা যখন শেষ হবে, তখন তাঁর পালা আসবে। হিংসার দৌড় যতদূরই হোক না কেন, অহিংসার দৌড় তার চেয়েও বেশী। সেই জন্যে চাই দীর্ঘতর জীবন। হিংসাবাদীরা হয়তো সাময়িকভাবে জিতবে। কিন্তু আখেরে জিতবে প্রেম মৈত্রী অহিংসা।

আমরাও মহাত্মার শতায়ু কামনা করে অহিংসার আরো মহৎ পরীক্ষার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছিলুম। পরীক্ষা যদিও একজনকে কেন্দ্র করে তবু তার পরিধি সারা দেশ ও সারা বিশ্ব। মানুষের আত্মা কি সাড়া না দিয়ে পারে? আসবে, সেদিন আসবে। আমাদেরও চাই দীর্ঘতর জীবন। তার মানে অসীম ধৈর্য।

শেষ পর্যন্ত কী দেখা গেল? দেখা গেল অহিংসা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে না। স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু গৃহযুদ্ধ অপেক্ষা করতে পারে না। গৃহযুদ্ধের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে ব্রিটিশ অপসরণ ত্বরান্বিত হয়। অকালে ভূমিষ্ঠ হয় রক্তাক্ত যমজ শিশু। ক্রন্দনমুখর। রক্ত আর অশ্রু মুছে দেওয়াই হয় মহাত্মার মহত্তর কৃত্য। কৃত্যের মধ্যপথে নিধন।

হৃদয়টা হায় হায় করে ওঠে। সান্ত্বনা মানে না। বলে, এরকম তো কথা ছিল না। আমরা তো কেউ কখনো এরকমটা ভাবিনি। কেন তবে এরকম হলো?

না ভেবেছি তা নয়। ভেবেছি বইকি। মাঝে মাঝে ভেবেছি যীশুকে ইহুদীরা সহ্য করতে পারল না, ক্রুশে বিঁধে মারল। গান্ধী বেঁচে আছেন কী করে? তা হলে কি তিনি যীশুর মতো মহান নন?

আমার অনেক আগে মিসেস বেসান্ট ভেবে রেখেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর গান্ধী যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন প্রথম দর্শনেই মিসেস বেসান্ট বলেন, যীশুর মতো চোখ। এঁর পরিণামও কি যীশুর মতোই হবে?

স্বাধীনতা আর অহিংসা দুই হাতে

এই দুটি বর নিয়ে আসেন গান্ধীজী। আমরা স্বাধীনতাকেই চেয়েছি, অহিংসাকে চাইনি। স্বাধীনতার খাতিরে যেটুকু গিলতে পেরেছি গিলেছি। গিলে হজম করতে পারিনি। স্বাধীনতার দিক থেকে তাঁর যতটা মূল্য ততটা দিয়েছি, তার বেশী যদি দিয়ে থাকি তবে মহাত্মা বলে ভক্তি। কিন্তু তাঁর মতবাদ আমাদের আন্তরিক আনুগত্য পায়নি। সেটা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল অন্তহীন অপেক্ষা।

তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে অহিংসার পরীক্ষায় দেশের লোক বার বার সাড়া দিয়েছে ও তেমন সাড়া হিংসার পরীক্ষায় দেয়নি। আমাদের ভবিষ্যতের বাদশাহী সড়ক গান্ধীজীরই হাতে গড়া। সে সড়ক কোনোদিনই সরু গলি হবে না। জনগণকে নিয়ে যদি কোনোদিন জয়যাত্রায় যেতে হয়তো সে-ছাড়া আর কোনো সড়কে কুলোবে না। যাদের দরকার তাদের জন্যে থাকবে হিংসার রেল লাইন। তাতে আর ক'জনের যোগদান সম্ভব হবে! গতিবেগ হয়তো খরগোসের মতো হবে, কিন্তু কচ্ছপেরই তো জিৎ হলো উপকথায়। যীশু খৃষ্ট বলে গেছেন,

"The meek shall inherit the earth."

জনগণেরই ধরণীর উপর উত্তরাধিকার। যদি তারা নম্র হয়, অথচ নত না হয়। গান্ধীজী তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষায় শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কেমন করে।
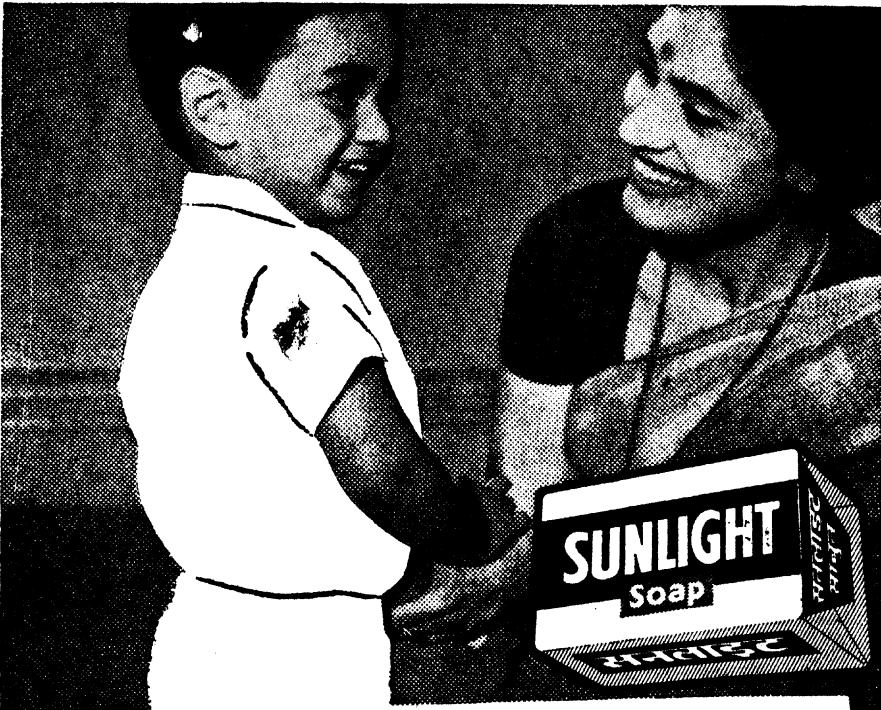
জানি আপনার বিড়ম্বনা স্বাভাবিক। তবু কী করবেন, দরজা খুলে ঘরে আপ্যায়ন করেছেন, বসতে দিয়েছেন, ভদ্রতার খাতিরেই। এবং যেটুকু শুনেছি, ভদ্র ব্যক্তিও আপনি নিশ্চয়ই, যথার্থ ভদ্র সজ্জন একজন—তবে তা সত্ত্বেও আমার স্ত্রীকে নিয়ে একদিন যা করেছিলেন, তা কী করে করতে পারলেন, সে প্রশ্ন জাগতে পারে। অবশ্য বিশ্বাস করুন, আমার মনে সে প্রশ্ন কোনোদিন জাগেনি। আমি ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছিলাম, মনে মনে বলেছিলাম, এরকম তো হয়েই থাকে। আর আজ তো ঝাঁজ এতটুকুও নেই, এসব কোন সেই মান্ধাতার আমলের কথা, নয় কি? না, সে জের টানতে আসিনি।

ভাবছেন, তবে এসেছি কী জন্যে, বা এত ভণিতা কিসের? জানি কথাটা আপনি ধরতেই পারছেন না, পারলে আঁৎকে উঠতেন এবং কথাটা যে কোনো ভণিতা না করে সোজাসুজি পেড়ে বসি আপনার কাছে, এমন সাহসও যেন পাচ্ছি না—তাই দেখলেন না, ঘরে ঢুকে কয়েক সেকেণ্ড কথাই খুঁজে পাইনি, আপনার অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে নীরব ছিলাম, উল্টে ফ্যাল ফ্যাল করে আপনার মোটা ফ্রেমের অভিজাত চশমাটার দিকে তাকাই, যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে নিচু হয়ে সুইচটা টিপলেন, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা ল্যাম্পশেডের বাতিটা জ্বাললেন, আর আলো মুহূর্তে ছিটকে গিয়ে পড়ল আপনার ধীর গম্ভীর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মুখের ওপর। এই প্রথম আপনার মুখটা ভালো করে দেখলাম, কারণ আগে যে-একটিবার মাত্র আমাদের দেখা হয়, সেই প্রায় তেইশ বছর আগের এক নির্মম গোধূলিতে, দাউ-দাউ চিতার শ্মশানঘাটে, তখন চোখ মেলে কাউকে দেখার মত মনের অবস্থা কারুরই ছিল না, না আমার না আপনার। তবু আজকের এই একটি দেখা-তেই আপনি আমায় ঠিক চিনে ফেললেন, আমার পরিচয়টা পর্যন্ত দিতে হল না একবার, বলে উঠলেন, 'ওঃ আপনি যে, কী মনে করে, আসুন আসুন'—ভারী আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি তো। তবে কি এতদিন শুধু আপনিই আমার মনে নন, আমিও আপনার মনে সমানই জেগেছিলাম?

যাকগে, আপনার ছেলের চিঠি পেয়েছেন নিশ্চয়ই, সে-কথাতেই আসছি। দুর্ভাগ্য-বশত আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, সে পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা আপনি কোনোদিন করেননি—তবে না না, তা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ একেবারেই নেই, নালিশ করতে আসিনি আপনার দরবারে। কেনই বা নেবেন আপনি পরিচয়, আপনার দিক থেকে তেমন কোনো কারণ তো ছিল না। আর আমিও দেখুন নিজে থেকে কখনো আসিনি, যদিও আসতে চেয়েছিলাম বহু বার, একদিন তো বিশেষ করে—এবং সেটা আমারই অপরাধ, কারণ সে আসাটা সেদিন ঘটে ওঠেনি বলেই আজ আসতে হচ্ছে এমন করে, আপনি-আমি উভয়েই আজ পৌঁছে গেছি যেন কোন প্রচণ্ড গিরিখাদের সামনে এমন একটি ভয়াবহ শেষ বিন্দুতে যে রক্ষা হয়তো আর সত্যই

নেই। এটা ঠেকানো যেত, যদি বহুদিন আগে আসতাম, পরিচয়টা করতাম—অর্থাৎ সেই যেটা চেয়েছিলাম, কিন্তু করিনি। অবশ্য যা করিনি তা করিনি, ও এখন সেই না-করার ফসল ফলতে চলেছে, এবং যে-সাংঘাতিক কথাটার তাগিদেই মূলত আসা আমার আজ, সেটা যদিও জরুরী, খুবই জরুরী, তবু ওরা যা করতে চাইছে, তার যেহেতু এখনো এক সপ্তাহ দেরী, দরকার পড়লে ওদের দুজনকে সব জানিয়ে চিঠি পাঠানোর সময় তো রয়েছে, নেই কি? থাকে তো লণ্ডনে, অন্তত আপনার ছেলে থাকে লণ্ডনে—না না, লণ্ডন নয়, কী যেন নামটা? সাসেক্স. হ্যাঁ, মনে পড়ছে, এবং সেখানেই কাণ্ডটা ঘটতে চলেছে—তাই তো লিখেছে, বলুন? দেখছি আপনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকাচ্ছেন আমার মুখের দিকে, ভাবছেন আমি এত কথা জানলাম কী করে, বিশেষত খবরটা আপনি নিজেই যখন হয়তো আজই পেয়েছেন, হয়তো এই বিকেলেরই ডাকে—কী, ঠিক বলছি কি? আপনার ধৈর্য প্রার্থনা করে মাত্র কিছুটা সময় ভিক্ষা চাইছি, যখন শেষ করব, উঠে যাবার জন্য পা বাড়াব, ততক্ষণে সবই বুঝতে পারবেন। কথাটা জরুরী, তা ঢুকেই ঝটপট বলে দিতে পারতাম, তবু ঐ যে বললাম, যা হয়নি, তা এখনো হয়নি, এক সপ্তাহ দেরী—আর সাসেক্স-এ চিঠি যেতে লাগে তিনদিন, কি বড় জোর চারদিন। তা ছাড়া তেমন তেমন দরকার পড়লে ট্রাংক কল-ও করা চলে—অনুমতি যদি দেন, না হয় আপনার টেলিফোনটাই ব্যবহার করব, আজই। ইচ্ছে করলে আপনি নিজেই কথা বলতে পারেন, অবশ্য সেরকম সিদ্ধান্ত যদি নেনই—সেক্ষেত্রে আপনার কথা বলাটাই ভালো হবে, কারণ ছেলে আপনারই, আমি তাকে কী বলতে যাব বলুন?

না, যা বলবার, তা বলতে এসেছি আপনাকেই ও তা সর্বাগ্রে আমার বলতে হবে একমাত্র আপনাকেই, কারণ এ ব্যাপারে আমরা দুজন যেন দুই বৈমাত্রেয় ভাই, সমগোত্র, একই নারীর অন্তরঙ্গ স্মৃতিতে আমাদের এক নয়, দুই নয়, গত তেইশটি বছর ক্ষতবিক্ষত। নীলিমা আমার স্ত্রী, আপনারও স্ত্রী, আমরা উভয়েই তাকে পাই বছর দুয়েকের জন্য, অবশ্য আমি প্রায় তিন বছর ধরে, আপনি দু বছর—নীলিমার কন্যা আমার ঘরে, পুত্র আপনার ঘরে। আত্মীয়তার বা সেই সমগোত্রের আর কত মিল চান বলুন। না-না-না, আপনি খামাখা বিড়ম্বিত হচ্ছেন, কারণ বিধিসম্মত কোনো বিবাহ আপনাদের হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক—হয়নি জানি, যেহেতু কই, ডাইভোর্সের কোনো প্রসঙ্গ তো আমি তুলিনি কখনো, নীলিমাও তোলেনি আমার কাছে—তবু সে আপনার স্ত্রীই ছিল, যেমন স্ত্রী সে ছিল আমারও। এবং সেই একই স্ত্রীরূপে আমাদের উভয়ের মনে সে জেগে রয়েছে আজও, তার মৃত্যুর এই তেইশ বছর পরেও। নইলে আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আপনিও কেন পরে একটা বিয়ে করলেন না বলুন তো? অনায়াসেই করতে পারতেন, কারণ কিসের অভাব ছিল আপনার—পয়সা, প্রতিপত্তি, সমাজসেবী বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাতি, তার উপর সুপুরুষ সৌম্যকান্তি চেহারা, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, স্নেহশীল, কোন গুণটা আপনার নেই? অবশ্য আবার বিয়ে আমিই বা করলাম না কেন সে-পাল্টা প্রশ্ন নিশ্চয়ই তুলতে পারেন, যদিও কি অর্থের ব্যাপারে, কি সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, কি আরো অন্যান্য অনেক ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার কোনো তুলনাই চলে না—আমি আরো অনেক সাধারণ মানুষ। তবু বলতে যাচ্ছিলাম যে কথাটা, বিয়ে আপনি পরে করেননি, যেমন আমিও করিনি, তার কারণ আমাদের উভয়ের কাছেই নীলিমা এক বড় সাংঘাতিক আপনজন ছিল, এমন একটি আপনজন যার শূন্য স্থান পূর্ণ আর কেউ করতে পারত না—এই দেখুন না, এখন তো পঞ্চাশের কোঠায় আমরা, তবু নীলিমার স্মৃতির সেই মধুময় জ্বলন্ত অনভূতিটা আছে বলেই যৌবন যেন এখনো আমাদের চৌকাঠে এসে নাড়া দেয়, তার কথা ভেবে এ-শ্যামল পৃথিবীকে ভালোবাসি, আপনিও চুরুট হাতে কখনো কখনো ধ্যানমগ্ন হন, যেমন এখনি হচ্ছেন। আর জানেন, আপনার এই ধ্যানী-ধ্যানী ভাবটা আমার বেশ লাগে, আপনার এই মূর্তিই আমি মনে মনে কল্পনা করেছি কত না অজস্রবার, যদিও সাক্ষাৎ পরিচয় কখনো হয়নি, চোখের দেখাটাও একবারের বেশি ঘটেনি আগে—অবশ্য খবরের কাগজে এটা-ওটা সভা-সমিতি উপলক্ষে আপনার ছবি নজরে পড়েছে বহুবার, এমনকি নীলিমার সঙ্গে আমার বিবাহের আগেও এক-আধবার, আর নীলিমা আপনার কাছে চলে যাওয়ার পর বা তার মৃত্যুর পর তো কত অজস্র বার, এবং তখন অর্থাৎ নীলিমার সঙ্গে আপনার জীবন জড়িত হওয়ার পর থেকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আপনার ও আমার মধ্যে অলক্ষ্যে কেমন একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল বলেই যখনই কাগজে ছবি বেরিয়েছে আপনার, ভালো করে তাকিয়েছি, আপনার ভাষণ বা বক্তব্য স্বভাবতই আরো মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি, ও তা পড়ে প্রায়ই নিজেকে বুঝিয়েছি, না, নীলিমা ঠিকই করে, কারণ সত্যিই আমি তার যোগ্য ছিলাম না, তার যথার্থ কদর বুঝতে পারে, এমন একজনকেই সে বেছে নেয়। আর এ-সম্বন্ধে তো দ্বিমতের অবকাশ নেই যে তাকে আমি পাই না চেয়েই, কোনো পরিশ্রম না করেই, কোনো মূল্য না দিয়েই, শুধু আত্মীয়স্বজন দেখে-শুনে একটা বিয়ে দেয়, এই মাত্র—কিন্তু তাকে যথার্থভাবে অর্জন করে নেওয়ার যে-ব্যাপারটা, সেটা আপনিই করেন, আমি করিনি। যাকগে, বলছিলাম আপনার ঐ ধ্যানী-ধ্যানী ভাবটার কথা, খবরের কাগজের ছবিতেও তার পরিচয় পেয়েছি, আর আজ তো সামনেই দেখছি ভালো করে, কল্পনার সঙ্গে সত্যকে যাচাই করে নিচ্ছি। আর তাই বলছি, আমার এই গায়ে-পড়া উপদ্রব আপনি আরো একটুক্ষণ সহ্য করুন, আপনার ধ্যান-গম্ভীর মুখে আরো কিছু রঙের পর রঙ তুলতে চাই, আপনাকে একটা গল্প শোনাতে চাই, যেটা শুধু আমার গল্পই নয়, অনেকটা আপনারও জীবনে যা ঘটে গেছে এবং যেটা আপনি নিজেই ঘটিয়েছেন, আসলে আমরা তিনজনে মিলে যেটা ঘটিয়েছি, বলুন, আজ চাইলেও কি তার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আপনি করতে পারবেন? এটা তাই আমাদের জীবনেরই গল্প, অন্তত সেই জীবনের একটা প্রকাণ্ড প্রধান বহমান জীবন্ত অংশের গল্প, এবং আষাঢ়ে কোনো কাহিনী নয় বা ঘটেছে বলেই শুধু সাধারণ নিছক কোনো সত্য ঘটনা নয়, বরং আমাদের অন্তরের ইতিহাস বলেই এটা সত্য আরো অনেক বেশি নিবিড় এক অর্থে। বলতে চেয়েছিলাম অনেক দিন ধরে, আসাটা হয়নি, এতদিনে সুযোগ মিলল—তবে আজ যা হয়ে গেল, যে-সর্বশেষ খবর এল, তারপরে এটা সুযোগ, না দুর্যোগ, সবটা শোনার পর সে-বিচার না হয় আপনিই করবেন।

তবে হ্যাঁ, ঐ যে বললাম না, তিন বছর ধরে তাকে পাই, সেটা ততটা সত্য নয়, অর্থাৎ আমার বিবাহিত জীবনের পক্ষে, কারণ তিন বছরের গোটা একটা বছর তো বাইরে কাটে, ঐ যখন চলে যাই আমেরিকায় ——অর্থাৎ বুঝছেনই, এবং সেটা আপনি জানেনও আমার অনুপস্থিতিতেই কন্যাটি জন্ম নেয়। তবু চ'লে যাই আনন্দেই, অন্তঃস্বত্বা স্ত্রী একলা ফেলে রেখেই, কারণ প্রিন্সটনের সেই নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা আমার পক্ষে হয় যেন বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যাওয়ার মত। দেখুন তো, এখনও যেমন রয়েছি, তখনও ছিলাম এক সামান্য নাম-হীন অধ্যাপক মাত্র, আমার চশমাটা আপনার মত মোটা ফ্রেমেরও নয়, অভিজাতও নয়, আর সেই চশমা দিয়ে তাকাই অতি সাধারণ এক প্রাইভেট কলেজের ক্লাসরুমে গাদা-গুচ্ছের ছাত্রছাত্রীর দিকে। এবং বলবার মত তেমন কোনো কাজও করিনি, বই-টই ছাপাইনি, সভা-সমিতি বলতেও শুধু আমাদেরই কলেজের দুয়েকটা ছোটখাটো অনুষ্ঠান, যেখানে এক-আধবার গেছি, হয়তো সামান্য চুটকোচাটকা বক্তৃতা-টক্তৃতাও দিয়েছি। তবু সেই আমাকেও দেখুন আমেরিকা খুঁজে বার করল, তাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বসল, কোনো তদ্বিরের দরকার পড়ল না, ভিক্ষা করতে হল না—কম ভাগ্য? তাই লাফিয়ে উঠি, নিমন্ত্রণটা নিয়ে নিই, বছরখানেকের জন্যে দেশ ছাড়ি—অবশ্য প্রিয়তমা পত্নীকে এভাবে একলা ফেলে যাচ্ছি, সেটা ভেবে উদ্বিগ্ন হই ঠিকই, বিশেষত সে তখন সন্তানসম্ভবা এবং হয়তো আট মাস চলছে তখন, এ-চিন্তায় স্বভাবতই উদ্বেগ আরো বাড়ে। তবু এ-ব্যাপারে নীলিমাও কিছু কম আগ্রহী ছিল না, যেন আমার থেকেও তার আগ্রহ বেশি, সে আমায় ঠেলতে থাকে, বলে, 'সে কি, আমার জন্যে এমন একটা সুযোগ তুমি হেলায় হারাবে? আর একবার গেলে এ-সুযোগ কি আর আসবে? না না, তা হয় না, তুমি যাবেই—তাছাড়া দিদি তো এসে পড়ছেনই, আমার এতটুকু অসুবিধে হবে না।' অবশ্য আমাকে এভাবে পীড়াপীড়ি

করে অত দূরে পাঠানোর পিছনে তখনই যে তার কোনো গূঢ় অভিসন্ধি ছিল—অর্থাৎ আমার প্রায় চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার সেই যে-ব্যাপারটা এবং পরেরও আরও কত কীর্তিকলাপ—না, এসব সম্বন্ধে তখনো সে কিছুই জানত না, সেরকম কোনো অভিসন্ধিই তার ছিল না, এমনকি সে যেরকম মেয়ে, তাতে তার প্রসঙ্গে অভিসন্ধি ইত্যাদির মত কথা যে উঠতে পারে, সেটা ভাবা পর্যন্ত যায় না। এবং সেটা ফলাও করে আমায় বলতেই বা হবে কেন, কারণ কী করে কী হল-না-হল, তার সবই তো আপনার নখদর্পণে—তাছাড়া মেয়েটার চরিত্র কী অসাধারণ শ্রদ্ধেয় ছিল, তার প্রতিটি আচরণ কী সততা ও আন্তরিকতার দ্বারা চিহ্নিত, সেটাও আমি যেমন জানি, আপনিও সমানই জানেন। নইলে এত অল্প সময়ে ও এত সহজে কী করে অমন বশীভূত হলেন আপনি বলুন তো—অসামান্যা রূপসী সে ছিল নিশ্চয়ই, মানছি, কিন্তু সেটাই সব নয়, হৃদয়ের ও চরিত্রের আশ্চর্য গুণটাও ছিল, আসলে এমন মণিকাঞ্চন যোগ কম নারীর মধ্যেই দেখা যায়। বিয়ের অল্প পরেই আমি সেটা বুঝেছিলাম এবং এখানে সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপারটা কী জানেন, কিছু তেমন না জেনেও আপনার প্রতি যে-শ্রদ্ধা বা সমীহের ভাবটা আমার, সেটাও পাওয়া পরোক্ষে তার কাছ হতেই—অর্থাৎ আমি ভাবতে বসি, সে যখন এমন একটা কাণ্ড করে ফেলতে পারল, তখন আপনিও নিশ্চয় অসাধারণ কোনো ব্যক্তি হবেন, নইলে আমি বিদেশে বলেই অন্য কোনো পুরুষের প্রতি সে আকৃষ্ট হবে, সে-পুরুষের যত লোভনীয় দিকই থাক না কেন, এবং সে-পুরুষের সে শয্যাসঙ্গিনী হবে, এমন মেয়ে তো নীলিমা নয়।

শুনতে আপনার ভালো লাগছে জানি, তাই প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার সেই সকালটির কথা বলি—নীলিমা তা আপনাকে বলেছিল কি? হয়তো বলে থাকবে, বলে থাকলেও আরো একবার শুনুন। যেদিন আমেরিকা থেকে ফিরলাম, এক মেঘলা দুপুরবেলা, তার পরের সকাল সেটা। না, সে-সকাল যদিও ভয়ংকর দুঃখের, তবু বলেইছি তো, যেহেতু আজ ঝাঁজ এতটুকুও নেই, যেহেতু আজ আমি প্রায় নিরাসক্তই বলতে পারেন, তাই প্রসঙ্গটা পাড়ছি এমন করে, এমন কি পাড়তে ভালোও লাগছে,

বিশ্বাস করুন। অবশ্য প্রথম যখন খবরটা শুনি নীলিমার মুখে, হয়তো তখন দুঃখও পাইনি, কারণ অমন সাংঘাতিক একটা আঘাতে দুঃখ পাওয়ার মত অবস্থা থাকে না, আসলে কোনো অনুভূতিই থাকে না, মনটা অবশ হয়ে যায়। ফিরি যেদিন, সেই দুপুরবেলা, সঙ্গে নবজাত মেয়ের জন্যে কিছু খেলনা, নীলিমার জন্যেও একটা হ্যান্ডব্যাগ এবং হয়তো নাইলনের একটা শাড়ীও, মনে নেই, এবং আরো কিছু কিছু উপহার, আমেরিকা থেকে কিনে এনেছি আমার সামান্য সাধ্যমত—ভাবুন তো, বিমানবন্দরে এসেছে মেয়ে, স্ত্রী, সে কী আনন্দ আমার, বিমান থেকে নামতে গিয়ে আমার পা টলছে, ভাবছি কতক্ষণে দেখব তাদের। যাকগে, সেই রাত্তিরের ঘটনা। নীলিমাকে আঁকড়ে ধরতে চাই, আকুল করে পেতে চাই, যা এত দিন, এত মাস ধরে পাইনি। আপনাকে সবই বলছি, আপনার কাছে তো লজ্জা নেই, কারণ সে-নারী যে নীলিমা, তাকে আমিও পেয়েছি, আপনিও পেয়েছেন। যাই হোক, সে-রাত্তিরে নীলিমার যতই কাছে আসতে চাই, সে ততই দূরে সরে যেতে চায়, বলে, 'আজ থাক, আজ তুমি ক্লান্ত।' আমি বলি, 'ক্লান্ত কোথায়?' বলে, 'না, তুমি ক্লান্ত, এত দীর্ঘ যাত্রার পর।' বলি, 'বহু দূর হতে আসছি ঠিকই, তবে এসেছি তো প্লেনে, মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই, শুধু যা একটা রাত্তির বসে কাটাতে হয়েছে, তবু মাঝে মাঝে ঘুমিয়েছি—বিশ্বাস কর, কোনো ক্লান্তিই নেই।' ও তবু বলতে থাকে, 'না, আজ থাক, আজ তুমি ক্লান্ত।' তার পরে আমিও উচ্চবাচ্য করি না, কারণ জানিই তো, কী দৃঢ়চেতা মেয়ে।

বিমান থেকে নেমে পর্যন্ত লক্ষ্য করিনি, কারণ লক্ষ্য করতে চাইনি, সে-প্রশ্ন মনে আসেই নি, তবু একটু মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকালেই বুঝতাম, এ আমার সে-নীলিমা নয়, তার মুখে যেন ইতিমধ্যে কোন এক যুগান্তকারী রূপান্তর সাধিত হয়েছে, কী কারণে সে যেন ভয়ানক বিষণ্ণ, ভয়ানক ভাবিত। যাই হোক, প্রশ্নটা মনে জাগেনি বলেই অন্তত একটা রাত্তিরের সুখ তো পেলাম, সুখ মানে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর সুখ, আর কিছু নয়। পরের দিন সকালেই, বোধ হয় চায়ের কিছু পরেই, সে আরম্ভ করল, সরাসরি, যেমন বাড়ী চড়াও হয়ে আজ আমি আপনার কাছে আরম্ভ করেছি—তবে তার সেই কাহিনী আজকের আমার গল্পের চেয়ে আরো অনেক অকপট, সম্পূর্ণ ভণিতাহীন, অতি সংক্ষিপ্ত। আরম্ভ করল আপনাদের দুজনের একসঙ্গে গ্রামে যাওয়া নিয়ে, জিপ-এ করে, সেই কোন পল্লী উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান না কী যেন আপনি ছিলেন, এবং সেই সমিতির সঙ্গে নীলিমা ও তার স্কুলের দুয়েকজন সহকর্মী শিক্ষয়িত্রীও কীভাবে জড়িয়ে পড়ে, সপ্তাহে একদিন করে আপনারা গ্রামে যেতে থাকেন, ধীরে ধীরে আপনি ও নীলিমা ঘনিষ্ঠ হন। জানি, আমি ছিলাম না বলেই নীলিমা সমস্ত সমস্যাটা কিছু

একটা নিয়ে মেতে থাকতে চেয়েছিল, আর সেটা কিছু অস্বাভাবিকও নয়। বাড়ীতে অবশ্য ছোট্ট মেয়েটা ছিল, তাকে সর্বক্ষণ দেখা-শোনার দরকার, কিন্তু গোড়ার দিকে নীলিমার দিদি আসেন এবং তিনি ছেড়ে না যেতেই আমার বৃদ্ধা মা এসে হাজির হন—আজ অবশ্য মা মারা গেছেন, অনেকদিন হল, তবু আমার কন্যার সারা শৈশবটাতে তিনিই ছিলেন তার মায়ের মত। যাই হোক, শেষে নীলিমা সেদিন যা বলে, তার সারাংশ আপনাকে শুনিয়ে কী হবে, আপনি তো সবই জানেন। আমি শুধু বলিহারি যাই নীলিমার সাহসটাকে, তার সততাটাকে, কারণ সে তো অনায়াসেই ব্যাপারটা আমার কাছে চেপে যেতে পারত, আমি আসার আগে কত সহজে কোনো ডাক্তার দেখিয়ে অন্য ব্যবস্থা করিয়ে নিতে পারত, এবং সবেই তো তখন তার শুরু, হয়তো তিন মাসের, কি তাও নয়। কিন্তু সে তা করল না, কারণ সে আমাকে ধাপ্পা দিতে কিছুতে চায়নি, বলে, 'আমি তোমার প্রতি অমানুষিক অন্যায় করেছি, প্রচণ্ড পাপ করেছি, কিন্তু সে-পাপ ঢাকতে গিয়ে অসত্য ভাষণের হীনতর পাপ করব না—এখন যা শাস্তি দিতে চাও, দাও।'

বুঝছেনই তো, শুনে স্তব্ধ হয়ে যাই। ও বলে, 'এখন যদি বল গর্ভপাত করিয়ে নিই, করিয়ে নেব।' আমার কথা আসে না মুখে, ও আবার বলে, 'অথবা যদি রাজী থাকো এ-সন্তানকে তোমার বলে নিতে, তাকে মানুষ করতে, তা হলে কোনো ডাক্তারের কাছেই যাব না।' তবু মুখে কথা আসে না আমার, চোখে নৃত্য করতে থাকে যা-কিছু দেখি, ঘরের ছাদ থেকে মেঝে, দেয়ালে টাঙানো নীলিমার সহাস্য মুখচ্ছবি, নৃত্য করতে থাকে আমার এতদিনের সাজানো-গোছানো সংসার। কখন পাশের ঘর হতে শিশুকন্যাটির গলা শুনি, হয়তো শুয়ে শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে ও মাঝে মাঝে কিছু বলার চেষ্টা করছে, সে-শব্দেও যেন বুকে শেল বিঁধতে থাকে। তবু হাজার হলেও সাধারণ মানুষই তো আমি, কী করব বলুন, তাই হঠাৎ বলে উঠি, 'কিন্তু কী করে এটা করলে তুমি নীলু?' এবার আমি নয়, ও-ই চুপ করে থাকে, তখন আবার বলি, 'তবে কি আমার প্রতি আকর্ষণ তোমার কমে গিয়েছে?' বলে, 'একেবারেই না, এতটুকুও না, এক চুলও না, বিশ্বাস কর,' বলে সেই প্রথম আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, এর আগে পর্যন্ত এতটুকু অসংযত ব্যবহার করেনি, এতটুকু অতিনাটকীয় কখনো হয়নি। আমিও তখন জাপটে ধরি তাকে, গভীর দুঃখে-বেদনায় তার চুলে ঠোঁট বুলোতে থাকি, আর ও কেঁদেই চলে, স্পষ্ট অনুভব করি, শার্টটা আমার ভিজে যাচ্ছে। কখন শান্ত হই, ওর মুখটা তুলে ধরি, চিবুকে হাত দিই, বলি, 'কিন্তু সুরেশবাবু, তাঁকেও তো তুমি শ্রদ্ধা কর, তাঁর প্রতিও তো তোমার আকর্ষণ আছে?' তখন ও আমার চোখে চোখ রেখে বলে, 'এবারও মিথ্যা বলব না, আকর্ষণ নিশ্চয় আছে, নইলে

যা করেছি, তা কি করতে পারতাম?' একটু থামে নীলিমা, পরে বলে, 'আসলে তিনি অত্যন্ত প্রশ্রয়ের ব্যক্তি, এবং এ-ব্যাপারে দোষ বা, পাপ বা, তা একমাত্র আমার, তাঁর নয়—কারণ তিনি পুরুষ মানুষ, প্রলুব্ধ হন এবং এক সময় তাঁর রাশ ছিঁড়ে যায়, তখন আমি কেন তাঁকে প্রশ্রয় দিলাম? না-না-না, তাঁকে দোষ দেব না। তবু এটাও বলছি, যা করেছি, তার ক্ষমা নেই জানি, ক্ষমা চাওয়ার মুখও আমার নেই—কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষমা যদি কর তুমি, তো জীবনে আর তাঁর সংগে দেখা করব না, বিশ্বাস কর।' আমার বুকে সমুদ্র উম্বেল হয়, বলি, 'একটু ভাবতে দাও।'

সেদিনটা কোনোরকমে কাটে, কেউই কারুর মুখোমুখি হলাম না, খাওয়ার টেবিলে নীরবে দুজনে মাথা নিচু করে রইলাম, রাত্তিরেও শুলাম না একসংগে। পরের দিন সকালে ডেকে বললাম, 'আমি ভেবে দেখলাম নীলু, এখন যা বলি, মেনে নেবে?' ও বলে, 'যা বলবে, মেনে নেব—যে-কোনো শাস্তি দিতে চাও, দাও।' বললাম, 'শাস্তির কথা নয়, এবং শাস্তি যদি তা হয়ও তো সে-শাস্তি তোমার যেমন, আমারও তেমনি। না নীলু, যে-সন্তান আজ তোমার গর্ভে, তাকে হত্যা করার কোনো অধিকার আমার নেই, তোমারও নেই, কারুরই নেই।' তখন ও জানতে চায় 'তবে?' বলি, 'আচ্ছা, তুমি যদি সুরেশবাবুর কাছে চলে যাও, তিনি তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করবেন?' মনে আছে, ও চমকে ওঠে, এবং একমুহূর্তের জন্যে যেন অস্বাভাবিক গম্ভীরও হয়ে পড়ে, পরে বলে, 'একথা কেন?' বলি, 'বলই না।' ও বলে, 'তিনি নিশ্চয় গ্রহণ করবেন, অমানুষ তিনি নন।' তখন বলি, 'তাহলে সেইটাই তুমি কর, আমাকে ছেড়ে তাঁর কাছে চলে যাও।' স্তব্ধতার কয়েকটি মুহূর্ত নামে, শেষে নীলিমা বলে, 'ভালো করে সব ভেবে দেখেছ?' বলি, 'দেখেছি।'

জানেন, মেয়েটাকেও, মানে আমাদের শিশুকন্যাটিকেও ওর সংগে পাঠাতে চেয়েছিলাম, ও-ই রাজী হয়নি, বলে, 'তাহলে তুমি কী নিয়ে থাকবে? না না, আমার শাস্তি সম্পূর্ণ হোক, আমি স্বৈরিণী মা, আমাকে জানার ওর কোনো দরকার নেই।' আর সেই হয় শেষ কথা তার সংগে, তাকে শেষ দেখাও। তার কয়েক মাসের মধ্যেই তো পৃথিবী ছেড়েও সে চলে গেল, আপনার পুত্রসন্তানটি প্রসব করার অল্প পরেই। আঘাতটা তার পক্ষে প্রচণ্ডই হয়, আর তা আপনিও অনুভব করেছিলেন নিশ্চয়ই, এবং হয়তো সেই কারণেই অত তাড়াতাড়ি মারা গেল। তবু সে বীরের মত নিজেকে দণ্ডিত করেছে, একদিনের জন্যেও আমার সংগে দেখা করতে চায়নি বা কোনো চিঠি পাঠায়নি—এক ঐ মৃত্যুর সময় একবার দেখতে চাওয়াটা ছাড়া, এবং সেটা স্বাভাবিকও। আপনি খবর পাঠিয়েছিলেন ঠিকই, আপনার লোকটি বাড়ী চিনে আসেও ঠিক, চিঠিও রেখে যায়—আমিই বাইরে ছিলাম। ফিরলাম যখন, ততক্ষণে আমাদের এত আদরের নীলিমা শুধু পরলোকেই নয়, মৃতদেহটা পর্যন্ত শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, চিতা জ্বলে উঠেছে—যাক গে।

আপনার ছেলেটিকে আপনি কিছুই জানতে দেননি জানি, অন্তত তা ধরে নিচ্ছি—আমার মেয়েটিকেও কিছু বলিনি কখনো, বলবার দরকারও পড়েনি, কারণ বোঝবার বয়স যখন তার হল, তত্দিনে তার মা মারা গেছে, এবং ছেলেবেলা থেকে মায়ের সম্বন্ধে সে এইটুকুই শুধু জেনে এসেছে যে যখন তার অতি অল্প বয়স, তখন থেকে সে মাতৃহারা। এভাবে নীলিমার এক কন্যা আমার ঘরে, এক পুত্র আপনার ঘরে বড় হতে থাকে—কেউ কাউকে দেখে না, চেনে না, একে অন্যের নামও শোনে না। এমন কি আমি নিজেই আপনার পুত্রের নাম জানতাম না এ্যাদ্দিন, মাত্র আজই জেনেছি—কী, সুনীল তো? দেখুন ঠিক বলছি কি না। দোহাই আপনার, এমন চমকে তাকাবেন না, আমার ভিতরে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়, গল্পের খেই হারিয়ে ফেলি—কারণ এইটুকুতেই অত আশ্চর্য যদি হন তো পরের কথাটা বলব কী করে, সেই যে-কথাটা আপনার এখনো অজানা এবং যেটা বলতেই মূলত আসা আমার? ছেলেটির নাম কিন্তু রেখেছেন ভারী চমৎকার, সুনীল—একটু সাধারণ, মানছি, পথে-ঘাটে এ-নামের অনেককে চোখে পড়ে, তাও মানছি, তবু ভালো লাগে কারণ নামটায় আপনাদের দুজনেরই ভারী সুষ্ঠু সম্মিলন এক, আপনার সু ও নীলিমার নীল। আর জানি, এর মধ্যেও পরিচয় নীলিমার স্মৃতির প্রতি আপনার প্রেম কত প্রগাঢ়—না নামটা নীলিমাই রেখে যায়, মরার আগে? জানি না। আমার মেয়ের নামটা অবশ্য তার মা-ই রাখে—ছেলে হবে কি মেয়ে হবে জানতাম না, আগে কিছু ঠিক করতে পারিনি, পরে মেয়ে জন্মানোর পর নীলিমা একটা নাম লিখে পাঠায় আমেরিকায়, জানতে চায় আমার কেমন লাগে। আমারও নামটা খুব পছন্দ হয়ে যায়, নীলিমার দেওয়া সেই নামই আজো আমার মেয়ের, বলা বাহুল্য—এবং আমার মেয়ের সে-নামটা আপনি জানেন না, আর তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তবু নামটা এখনি বলব না, আরেকটু ধৈর্য প্রার্থনা করি আপনার।

তার আগে যদি অনুমতি দেন, আরেকদিনের একটা ছোট্ট ঘটনা বলি—ঐ যে গোড়াতেই বলছিলাম না, বিশেষত একদিন আপনার কাছে বড্ড আসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসাটা হয়ে ওঠেনি, এটা সেইদিনের কথা। জানেন সুরেশবাবু, আমার মা তখন অনেকদিন গত হয়েছেন, মেয়ে আমার জীবনে সব, সে ইতিমধ্যেই বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে, বারো বছর বয়সেই প্রায় তার মাকে ছাড়িয়ে যায়—এবং নীলিমা তেমন লম্বা ছিল না, জানেনই তো—মেয়ের মুখেও মায়ের হাব-ভাবের অনেক ইংগিত খুঁজে পাই, যতটা পারি তাকে রাখি চোখে চোখে, দিনরাত্রি জুড়ে, কেবল তার ইস্কুল আর আমার কলেজের সময়টা বাদ দিয়ে। বহু বছর আগের এমন একদিন, সেটাও এক সকাল-বেলা, একটা ছুটির দিন, দাঁড়িয়ে আছি আয়নার সামনে অন্যমনস্কভাবে, হঠাৎ কখন সেই আয়নার যেন আমার বদলে আপনাকে দেখলাম—সংগে সংগে বিদ্যুতাহতের মত তাকাই, ভাবতে বসি, এটা কেন হল? এর আগে আপনাকে সাক্ষাতে দেখেছিলাম মাত্র আরো একটিবার, সেই শ্মশানঘাটে, তবু কী করে আপনার ছবিটা যেন মনে গেঁথে থাকে। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন সুরেশবাবু? আমি বহুকাল কষ্ট পাচ্ছিলাম একটা কথা ভেবে, এবং সেটা হল এই। যা হবার তা তো হয়ে গেছেই, নীলিমা মারাও গেছে, তবু সেই নীলিমাই যখন এক পরিবারের বাঁধনে আমাদের এভাবে বেঁধে দিয়ে গেল, তখন একই শহরে এমন সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত আমরা কেন বাস করব? কেন আমার মেয়ে চিনবে না তার ভাইকে, সেই ভাই চিনবে না তার বোনকে, আমিই বা কেন ঈর্ষা-দ্বন্দ্বের ওপারে গিয়ে আপনাকে আত্মীয় বলে চিনব না, গ্রহণ করব না? আপনি তো আমার চেয়ে এত

বুদ্ধিমান, এত গুণী ব্যক্তি, এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আপনিও কি আমারই মত-খুঁজেছেন? বিশ্বাস করুন, অন্তত আমার পক্ষে এটা একটা অত্যন্ত সত্য জ্বলন্ত প্রশ্ন ছিল বহুদিন ধরে, আজও আছে—এবং ক্ষমা করবেন, সেই কারণেই এখন বলতে ইচ্ছে করে, হায় ভাগ্য, অদৃষ্টের কোন নিষ্ঠুর নীরব অট্টহাসিতে হয়তো সে-প্রশ্নের একটা বাঞ্ছিত উত্তর আজ সত্যিই রূপায়িত হতে চলেছে। এখন সেটা পারেন তো ঠেকান, অবশ্য যদি তা চানই—আমি দেখুন কিছুই চাই না, অন্তত সেটা ঠেকাতে চাই না, বরং বলতে পারেন অদৃষ্টের সেই প্রহসন-হাসিটার অনুকরণেই ঠোঁটে আমেজ তুলতে চাই, বলতে চাই, বেশ তো, হোক না। দেখছি আপনাকে ক্রমশই ভ্যাবাচাকা খাওয়াচ্ছি, আপনার সময়ও নিচ্ছি, তাই মূল প্রসঙ্গে ঝটপট এসে পড়া যাক, তার আগে শুধু দুয়েকটি কথায় আগের প্রসঙ্গটা শেষ করে নিই—দয়া করে অমন আড়চোখে হাতের ঘড়িটার দিকে ঘন ঘন তাকাবার নাই বা চেষ্টা করলেন, শুনুন না এই আমার-আপনার গল্পটা, আজ যে বলতে আমার বড্ড ইচ্ছে করছে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এটা তা হলে ধরুন প্রায় বারো-তের বছর আগেকার কথা, সেই সকালটা, অর্থাৎ সেই যেদিন আয়নায় নিজের বদলে হঠাৎ আপনাকে দেখে ফেললাম। আসলে তার আগে থেকেও বহুদিন ধরে কেবলি আপনার কথা মনে হচ্ছিল, অহরহ নিজেকে নিজে দোষী সাব্যস্ত করছিলাম, ভাবছিলাম আপনি এগিয়ে না আসেন না আসুন, আমি কেন নিজের থেকে এগিয়ে যাব না আপনার দিকে, সম্প্রীতির বা ভ্রাতৃত্বের হাতটি বাড়াব না? কারণ মানুষ হিসেবে জন্মেছি বলেই যে আমরা সকলে ভাই, তা তো নয়, এখানে যে বন্ধন আরো অনেক প্রগাঢ়, আপনার কোমরের সঙ্গে আমার কোমর বাঁধা যে-দড়িটাতে, সে-দড়িটা যে আরো অনেক শক্ত, এক কথায় সে-দড়িটা যে আমাদের উভয়ের নীলিমা, এ-প্রচণ্ড সত্যটার দিকে প্রাণপণে চোখ বুঁজে আর কতকাল থাকব বলুন? বলুন তো, কেন আপনার সুনীল আর আমার......ঐ যাঃ, দেখুন তো, মেয়েটার নামটা প্রায় বলে ফেলেছিলামই আর কি, অথচ না-না-না, এখনো তো তা বলা উচিত নয়, এখনো সময় হয়নি, মাপ করবেন। যাইহোক, কেন আপনার ছেলেটি ও আমার মেয়েটি এভাবে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পৃথিবীতে বাস করবে, একে অন্যকে চিনবে না, জানবে না, বিশেষত তাদের জন্ম-গত অধিকার যখন একই অভিন্ন পৃথিবীতে বড় হওয়ার? তাই, হাসবেন না, দোহাই আপনার, কত কথাই না আমার মনে হচ্ছিল, কত নানা জল্পনা-কল্পনাই না মনে মনে আঁটছিলাম। এই যেমন, যাব আপনার কাছে, প্রস্তাব পাড়ব সকলে মিলে একসঙ্গে দার্জিলিঙ যাওয়ার, পরে একবার দেওঘরও যাওয়ার—বিহারের ঐ এলাকাটার সেই আশ্চর্য বৈরাগী প্রান্তর, ত্রিকূট পাহাড়ের কোলে সেই সপ্তাহে একদিন না দুদিন করে আদিবাসীদের হাট বসা, গরুর গাড়ীর ধুলোয় আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন, পথের ওপর পাতা সারি-সারি দোকানের সামনে দূর-দূর গ্রামের লোক গিজগিজ—এবং তারও পরে সকলে মিলে একবার বিষ্ণুপুরটাও না হয় ঘুরে আসা যাবে, কী মজাটাই না হবে, আমাদের সকলের কত আনন্দ, নীলিমার দুই ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে দৌড়োদৌড়ি করবে, চোর-চোর খেলবে মন্দিরের বিরাট বিরাট প্রাঙ্গণে, গোধূলির ঝোপঝাড়ের গন্ধ আমাদের নাসারন্ধ্র আকুল করবে। ভাবছেন, এসব জায়গা কেন? কারণ বিয়ের পর নীলিমাকে নিয়ে যে যাই এমন কতকগুলি স্থানে, অন্যত্র আরো কোথাও-কোথাও, যখন যেটুকু পেরেছি, আমার সামান্য সাধ্যমত। এবং কে জানে, তখন আপনিও হয়তো প্রস্তাব পেড়ে বসবেন আরো কয়েকটি জায়গার, যেখানে নীলিমাকে নিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন—আমি তো সে-সব জানি না, কী করে জানব বলুন। এবং তখন সেই সব সৌধ-প্রান্তর-গোধূলির মধ্যে আমরা আমাদের অতীতকে নতুন করে আবিষ্কার করব, একজনের নীলিমাকে আরেকজনের হাতে তুলে দেব নতুন করে, এবং এই বিনিময়ে আপনার-আমার মধ্যেও এক নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হবে, আমরা দুজন দুজনের চোখের দিকে চেয়ে হাসব এক অদ্ভুত অর্থপূর্ণভাবে, এক কথায়, আমরা সকলে মিলে এক হব একই অভিনব পরিবারের চেতনায়—বলুন, প্রস্তাবটা মনে ধরবার মত নয়? আর বলুন তো, এমন একটা প্রস্তাব যদি একেবারের জন্যেও পাড়তে না পারলাম এই অমূল্য-মহামূল্য মনুষ্যজন্মে তো মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন? সুরেশবাবু, আমাদের সকলের ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীটা যে ভয়ংকরভাবে সীমাবদ্ধ, তাতে যে কখনো কখনো দম বন্ধ হয়ে আসে, আসে না? আমরা যে মানুষ, ঘরে-ঘরে অনন্ত দেশে-দেশান্তরে একে অন্যের ভাই, তাই এই ব্যক্তিগতের গণ্ডীটা ক্রমশই বাড়াতে বাড়াতে তাকে বিরাট করে যে তুলতেই হবে, এবং সেটাই আমাদের একমাত্র নিয়তি, তাতেই আমাদের চরিতার্থতা সাধনের একমাত্র উপায়—বলুন, যে-আপনি এমন ভাবুক মানুষ, এমন গুণী ব্যক্তি, এ-কথা আপনারও কি মনে হয় না? নইলে সারা-জীবন থাকব কি শুধু নিজের নিজের ছোটখাটো স্বপ্ন নিয়ে, ঈর্ষায় অনিদ্র রাত্রি বুকে করে, অর্থাৎ, অর্বাচীনের মত বলতে হয়ই যদি তো বলি, আপনি আমার বউ ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বলেই কি আমার এই মহামূল্য মনুষ্যজীবনের প্রতিটি দিনরাত্রি ধরে আমি মনে মনে আপনার প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে থাকব? কী হাস্যকর ছেলেমানুষি, বলুন তো? এবং গণ্ডীটা যে আসলে কত ছোট, তার বাইরে বিস্তৃত জাগ্রত জীবন্ত স্পন্দমান মনুষ্য-পরি-বার যে কত বিচিত্র ও বিরাট ও সব সত্ত্বেও এক, তার পরিচয়ের আভাস তো নিজেই পাই যখন গণ্ডী থেকে একবার ছিটকে বেরিয়ে পড়তে হয়, সেই যখন সুদূর আমেরিকায় চলে যাই, বেড়ালের ভাগ্যেও শিকে ছিঁড়ে যায়। অবশ্য বলতে পারেন, আমেরিকায় যাই বলেই তো নীলিমাকে হারাই, নইলে কিছুই হত না—এবং সেটা ভেবে কখনো কখনো আক্ষেপ যে করিনি, অর্থাৎ কেন মরতে আমেরিকা যাই, এমন চিন্তা যে একটিবারের জন্যেও মনে জাগেনি, তা বলতে পারব না, বললে মিথ্যা বলব। তবু ঐ বৃহৎ মনুষ্য-পরিবারের কথাটাও সমানই সত্য জানবেন, আসলে অন্তত আমার নিজের পক্ষে আরো অনেক গভীর সত্য সেটা, ও তার চিন্তা আমার কত দিন কত রাত্রি মুখরিত করে তুলেছে। জানি, এসব কথা শুনে অনেকে আমায় পাগল ভাবতে পারে, কেউ-কেউ আমায় দাম্ভিক বা অসারগর্বী পর্যন্ত মনে করতে পারে—কিন্তু কী করি বলুন, বুকের সত্যটা যে বুকেরই সত্য, নিজেকে ধাপ্পা দিয়ে তো লাভ নেই।

অবশ্য এখন হয়তো জানতে চাইবেন, এবং চাওয়াটা স্বাভাবিকও, কেন তবে এলাম না সেদিন, এসে কেন সেই একসঙ্গে বাইরে যাওয়ার প্রস্তাবটা পাড়লাম না। কারণটা বলতে আপনাকে লজ্জা করছে, তবে সবই যখন বলছি, এটাই বা বাদ রাখি কেন? জানেন সুরেশবাবু, গরীব হওয়ার চেয়ে পাপ বোধহয় আর নেই, তাই দেখলেন তো, যদিও মানুষ নিয়ে এত বড় বড় কথা বললাম, এবং বিশ্বাস করুন, কথাগুলোকে সত্য বলে অন্তরে অন্তরে জানি, তাদের অনুভবও করি সত্য বলে এবং সেই অনুভবের দরুন হয়তো সব সত্ত্বেও নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ হই কখনো কখনো, তবু শেষ পর্যন্ত সেদিন যা আমার রাশ টেনে ধরল, আপনার কাছে আসতে দিল না, তা ঐ অর্থচিন্তাটা। মনে হল, নীলিমা আমাদের এক অর্থে আত্মীয় করেছে ঠিকই, তবু তার চেয়ে বড় সত্য যেটা এবং যেটা দৈত্যের মত সামনে দাঁড়িয়ে আছে অহরহ, সেটা আপনার সঙ্গে আমার আর্থিক অবস্থার প্রচন্ড তারতম্যটা। আয়নায় সেদিন নিজের মুখটাকে আবার ফিরে পাই কিছুক্ষণের মধ্যেই, এবং তখন ভালো করে দেখবার চেষ্টা করি গায়ের জামা-কাপড় ও আয়নায় প্রতিফলিত ঘরের অন্যান্য জিনিসের প্রতিচ্ছবি, আমার দৈন্য হাঁ করে চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে—হঠাৎ মনে হয়, আমি না হয় এত আন্তরিক উচ্ছ্বাস নিয়ে সত্যিই গেলাম আপনার কাছে, কিন্তু আপনি কী ভাববেন? এবং আত্মসম্মান জ্ঞান প্রচণ্ড বলেই আর্থিক অবস্থা নিয়ে আপনি আমায় কোনোরকম করুণা করতে বসেন, বা নীরব কটাক্ষ করবেন, সেটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। কারণ হয়তো সত্যিই, আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার এত আগ্রহ একমাত্র আমারই, আপনার দিক থেকে সে-আগ্রহ এতটুকুও নেই, আপনি হয়তো শুধু নীলিমার স্মৃতিটুকু নিয়েই সুখে আছেন, নীলিমার আগের এই সামান্য অধ্যাপক স্বামীর কী হল না হল, সেটা স্বভাবতই আপনার বিচারের মধ্যে পড়ে না। তাই

ভাবতে গিয়ে কখন এটাও সেদিন মনে হল, আপনার ছেলে ও আমার মেয়ে হয়তো ভাই-বোন হতে পারে, কিন্তু তারা দুটি বিভিন্ন ও অসম সমাজের আলো-আকাশ-হাওয়া-চিন্তায় মানুষ, এবং বোঝবার বয়স হয়েছে বলেই পরস্পরের সাহচর্যে হয়তো তারা আড়ষ্ট বোধ করতে বাধ্য, বিশেষত আমার মেয়েটি তো বটেই, কারণ প্রথমত সে মেয়ে ও ছেলেবেলা হতে মাতৃহারা, তাই স্বভাবতই আরো অনুভূতিপ্রবণ, দ্বিতীয়ত সে আপনার ছেলেটি হতে বছর দুয়েকের বড়, তাই বোঝবার ক্ষমতা তার আরো একটু বেশি, তৃতীয়ত এ-সাক্ষাতে বিড়ম্বনার বোঝা তারই আরো ভারী হওয়া উচিত, যেহেতু তাদের দুজনের মধ্যে দরিদ্র সে-ই, আপনার ছেলে নয়। আক্ষেপের সঙ্গে তাই বুঝলাম সেদিন, বড় বড় কথা, আদর্শবাদ, মহান মহান অনুভব, সবই চমৎকার জিনিস, তবু হায়, এক হব বললেই এক হওয়া যায় না, মাঝখানে পয়সা এসে দাঁড়ায়। এবং জানেন, হাস্যকর ঠেকলেও আরো কিছু কিছু কথা সেদিন মনে হয়—এই যেমন, আমি এবং আমার মেয়ে তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া ভ্রমণ করি না, কোন মুখে তবে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব পাড়ব। অতএব বুঝছেনই, আস্তে আস্তে গুটিয়ে বসি, সব উচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে কর্পূরের মত উবে যায়, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পর্যন্ত মনে হতে থাকে। এবং এটুকুও অকপটে স্বীকার করি, সেদিনই শেষ, তার পরে আর কখনো আপনার কাছে আসার জন্য ছটফট করিনি।

না সুরেশবাবু, এই শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের আরামেও দেখছি আপনার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘামের মত কী যেন সঞ্চিত হচ্ছে—আমার এই কাহিনীতে হয়তো আপনি ক্লান্ত বোধ করছেন, অথবা হয়তো ভাবছেন এতদিন যখন আসিইনি, আসার জন্যে ছটফটানি থেকে পুরোপুরি নিবৃত্তিই যখন পাই তো কোন বিচ্ছেয় কামড়াল আমায় হঠাৎ, কেন আজ আর না থাকতে পেরে এভাবে চলে এলাম। অথবা সন্দেহ কি জেগেছে আপনার ইতিমধ্যেই, এবং তাই দৃষ্টিটা যেন হঠাৎ আপনার এমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে আর ঐ চোখের অন্তরালে আপনার অন্ধকার অন্তরের যে-উদ্বেল সমুদ্রকে হয়তো প্রাণপণে শান্ত রাখতে চাইছেন, তার গর্জনের আভাসও যেন পাচ্ছি। না, এ-খেলা আর নয়, এ-সন্দেহে আর দোলাব না আপনাকে, শুনুন সুরেশ-বাবু, শোনার জন্যে প্রস্তুত হোন, প্রস্তুত হোক এই আসন্ন রাত্রি আর আপনার ঘর, এবং আমায় ক্ষমা করুন আপনারা সবাই—সুরেশবাবু, আমার যে-একমাত্র কন্যাটির কথা এতক্ষণ বলছিলাম, যে নীলিমারও কন্যা, তারই নাম অনুরাধা, আজ যে মিউনিকে। কিন্তু ও কী হল আপনার, বুকে কি হঠাৎ বেদনা বোধ হচ্ছে, কেন আপনি ওভাবে মুখ ঢাকছেন? শান্ত হোন ভাই, আপনার হাত দিন আমার হাতে—এখন দুজনে মিলে দেখি না, কী করা যায়। ভাই বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, কারণ ভাই-ই তো আমরা, দেখুন অদৃষ্টের তর্জনীতে আমরা দুজন আবার কেমন এক আশ্চর্য সম্বন্ধে জড়িয়ে পড়ছি। আমি-আপনি সামান্য মানুষ সুরেশবাবু, আমাদের আগেও মানুষ ছিল, পরেও থাকবে—সমগ্র মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা তো আমরা নই।

ক্ষমা চাইলাম, সত্যি, এবং তা বার বার চাইতে রাজীও আছি, কিন্তু আমার দোষটা কোথায় বলুন? আগে আসিনি, ঠিকই, সুনীল-অনুর যথার্থ পরিচয়টা তাদের দুজনকে দিইনি, তাও ঠিক—কিন্তু তারা দুজন যে একদিন এমন একটা সম্ভাবনাকে আলিঙ্গন করতে ছুটবে, এ-কথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল বলুন? তাছাড়া আমি একলাই নই, আপনিও তো কোনোদিন আসেননি আমার কাছে, আসতে তো পারতেন, সেই বদান্যতার হাতটা তো আপনিও এগোতে পারতেন—তবু করলেন না কিছুই। তাই এখন দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে, তা আপনাকে-আমাকে সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিতে হবে, নয় কি? আর দেখুন, আপনার ছেলের চিঠি আপনি আজ পেয়েছেন, ধরে নিচ্ছি আজই পেয়েছেন, আমার মেয়েরও চিঠি আমি পাচ্ছি আজই, ঐ বিকেলেরই ডাকে—তার আগে বিশ্বাস করুন, ঘুণাক্ষরেও এসব সম্বন্ধে কিছু জানতাম না। অনুর চিঠি তো প্রতি সপ্তাহেই পাই, এবং ব্যাপারটা নিশ্চয় আজ আরম্ভ হয়নি, প্রায় এক বছরের পুরোনো, অন্তত সেটাই তো বুঝছি আজকের চিঠি থেকে—তবু কই, এক লাইনের একটা আভাসও তো অনু কখনো দেয়নি, হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত আজকের এই চিঠি, সরাসরি আশীর্বাদ চেয়ে। অতএব বুঝছেনই তো, আরো আগে কি আমি আসতে পারতাম? এবং জানেন, একেবারেই আসছিলাম না, কারণ চিঠিটা পাওয়ার পর প্রচণ্ড দোটানার মধ্যে পড়ে যাই, কী করব বা কী করা উচিত, কিছুই মাথায় আসে না, হয়তো আধঘণ্টাটাক বিহ্বলের মত বসে থাকি। একবার ভাবি, যাকগে, ওরা যা করে করুক, আমি কিছুই জানাতে যাব না, না অনুকে, না আপনাকে—এবং সুনীলকে আমার কিছু জানানোর প্রশ্নও ওঠে না, সে আমায় চেনে না, কখনো দেখেওনি, এবং বলা বাহুল্য, আজও আমায় কিছু লেখেওনি সে। তাই ভাবি, যাকগে, কাউকে কিছু বলব না, ওরা যা পারে করুক—অদৃষ্টের অট্টহাসিটাকে শুধু নিজের বুকের মধ্যে বেঁধে আমার শেষ দিনগুলো নীরবে কাটিয়ে দেব। এবং দুঃখিত হওয়ার বা ভাববার হয়তো কিছুই নেই, কারণ বললামই তো, যাই হোক না কেন, পৃথিবী যেমন ছিল, তেমনি থাকবে। কখন আবার অন্য ভাবনাও জাগে, মনে হয়, না, অনুকে অন্তত কথাটা জানানো দরকার, এবং তাকে তা আমি জানাব—কারণ পাপই যদি হয় এটা তো সে-পাপ সে করছে না জেনে, কিন্তু আমি তার পিতা এবং আমি সব জানি, তাই জেনেশুনে এমন একটা পাপের দিকে তাকে কোন মুখে ঠেলে দিই। আর জানেন, জানি শুধু আমিই, এবং এখন আপনিও, কারণ আপনাকে বলছি বলেই, নইলে আপনিও কিছু জানতেন না। আপনি স্বনামধন্য ব্যক্তি, তাই সহজে আমার সম্মতি পাওয়ার জন্য অনু যে আপনার নামটা লিখবে, বলবে সুনীল অমুকের ছেলে, তাতে আর আশ্চর্য কী। শুধু আমার নামটাই সুনীল তার চিঠিতে করেনি, এবং সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি—নইলে আপনিও সঙ্গে সঙ্গে সব জেনে ফেলতেন, বুঝে ফেলতেন, আর তখন হয়তো হন্তদন্ত হয়ে নিজেই ছুটে আসতেন আমার কাছে, যেমন আমি এসেছি এখন আপনার কাছে। না সুরেশবাবু, আপনার পুত্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আমার নেই—কারণ সত্যিই তো, কেন সে আমার নাম করতে যাবে, আমি তো তেমন কেউ নই। বড়জোর হয়তো বলে থাকবে, তার অনুরাধা দর্শনের এক অধ্যাপকের কন্যা, অর্থাৎ অন্তত মোটামুটি সম্ভ্রান্ত পরিবারেরই—তবে সে কী লিখেছে না-লিখেছে, আপনিই জানেন, আমি তা কী করে বলি বলুন?

এই দেখুন, কেবলি পাঁচশো কথায় খেই হারিয়ে ফেলি—থাক, যা বলছিলাম। একবার তাই মনে হয়, অনুকে কথাটা জানাই, কারণ বাপ হয়ে সেটা জানানো আমার কর্তব্য, কিন্তু আপনাকে কিছু জানিয়ে দরকার নেই—কারণ যে-গাছের এক ডাল আমি, তারই অন্য ডাল যে আপনিও, এটা একটা বক্র রেখা যার এক শেষবিন্দুতে আমি, অন্য শেষবিন্দুতে আপনি, তাই যেন আপনার প্রতিও আমরা একটা কর্তব্য-বোধ থাকা উচিত, পালাই কী করে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় নীলিমার আশ্চর্য সাহসটার কথা, তার সততাটার কথা, এবং সিদ্ধান্ত নিই, না, সত্য যত ক্রূরই হোক, সেটা আমাকে জানাতে হবে, নিজেকে ধাপ্পা আমি দেব না। মনে হয়, ঐ তো নীলিমা যেন আমার সামনে আজ হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছে, কালের পর্দার ফাঁক দিয়ে আমার চোখে তার নিষ্পলক চোখ রেখে তাকিয়ে আছে—তাই উঠে পড়ি, আপনার বাড়ীর পথ ধরি।

সুরেশবাবু, ভেবে দেখুন ব্যাপারটা কী সাংঘাতিক। ওরা ভাই-বোন, সেটা তো রয়েছেই, ওদের বিপরীতগুলোও কী প্রচণ্ড। ভেবে দেখুন, আমরা ওদের মিলতে দিইনি, একে অন্যকে চিনতে দিইনি, তবু অদৃষ্টও যে মেতেছে এক মর্মান্তিক ষড়যন্ত্রে, ওদের এক করে ছাড়বেই, এখন সে-শক্তির বিরুদ্ধে আমি-আপনি আর কত হাত-পা ছুঁড়ব। কত রকম বিপরীত দেখুন, অনুর বয়স পঁচিশ, সুনীলের তেইশ—বয়স দুটো ঠিক বলছি তো? অন্তত কাছাকাছি হবে, আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। মোদ্দা কথাটা হল, মেয়ে ছেলের থেকে বোধহয় বছর দুয়েকের বড়—অবশ্য এমন বিয়ে যে হয় না, তা নয়, আজ-কাল তো আকছারই হচ্ছে। তারপর দেখুন মেয়ে গেল মিউনিকে, জার্মানীতে—দরিদ্র

পিতা, তাই একটা বৃত্তি যোগাড় করে সংস্কৃত সাহিত্যের উপর থীসিস লিখতে। আর আপনার ছেলে গেল ব্রিটেনের সাসেক্সে—হয়তো আপনার পয়সাতেই—পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে। ওদের তো দেখা হওয়ার কথা নয়, বিশেষত এর আগে স্বদেশে এক শহরে বাস করেও এবং একই মায়ের পেটের ভাইবোন হয়েও এতদিন যখন দেখা হয়নি। তবু না, অদৃষ্ট যে ছুটছে পিছনে, তাদেরও ছোটাচ্ছে, তাই মাঝখানে কোত্থেকে বুডাপেস্ট এসে হাজির হল সেখানকার ইউথ ফেস্টিভ্যালে দুজনের দেখা হয়ে গেল। এবং এত দুঃখেও হাসি পায়, দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একের প্রতি অন্যের সে কী প্রচণ্ড প্রেম—আমি জানি, অনুমান করতে পারি, সেই প্রথম দর্শনেই অনু-সুনীলের প্রাণ নিশ্চয় কেঁদে উঠেছিল, একজনের প্রতি আরেকজনের চোখ নীরবে বলে উঠেছিল, তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির! এবং সে-কথাটা যে কী ভীষণ সত্যি, তা তো আপনাকে বলতে হবে না সুরেশবাবু, কারণ জানেনই তো, ওরা যে প্রায় আক্ষরিক অর্থেও একই হিয়ার অংশ—একই শরীরের অংশ, বিশেষত অনুকে তো আপনি দেখেননি, দেখলে জানতেন তার মায়ের মত সে শুধু অসামান্যা সুন্দরীই নয়, তার মুখখানিও যেন বসানো নীলিমা। তাই যেন কোন গত জন্মের নিসর্গ সেই প্রথম দর্শনের দিনই ওদের দুজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার দুর্নিবার আকর্ষণে ওরা এগোতে থাকে সেই একমাত্র স্বাভাবিক পথে, যে-পথ একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট সব ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছে যুগযুগান্ত ধরে। আমাকে অনু খুলে অনেক কিছুই লিখেছে, হয়তো সুনীলের চিঠিও সমানই দীর্ঘ, তাই আমার মত হয়তো আপনিও জানেন যে, বুডাপেস্টের ক'টা দিন হু-হু করে কেটে গেলেও ওরা একে অন্যকে ছাড়তে পারেনি, কখনো সুনীল গিয়েছে মিউনিকে, কখনো অনু এসেছে সাসেক্সে। আর সেই সাসেক্সেই তো সাতদিন বাদে দুজনের বিয়ে হওয়ার কথা—দুই বাপকে ওরা দুজন তো আজ তাই লিখছে, আশীর্বাদ চাইছে, সব ঠিক বললাম তো সুরেশবাবু?

দেখছি আপনাকে কী যন্ত্রণার মধ্যে ফেলছি, তবু সব লজ্জার মাথা খেয়ে আবার ক্ষমা চাইব, বলব, অত অধীর হবেন না ভাই, কারণ হায়, আরো কিছু সাংঘাতিক কথা বাকী রয়ে গেছে এবং যেটা সম্বন্ধেও আপনি হয়তো কিছু জানেন না। বলছিলাম না, অনু আমায় অনেক কিছুই লিখেছে, কিন্তু একটা কথা সে ইচ্ছে করেই চেপে গিয়েছে, একটা প্রচণ্ড কথা সেটা এবং যেটা জানছি আমার এক বাল্যবন্ধুর চিঠি হতে—কাণ্ড দেখুন, তার চিঠিও পাচ্ছি আজ বিকেলেরই ডাকে। বন্ধুটি বহুকাল হতে লণ্ডনে প্রবাসী, সেখানকার স্কুল অব ইকনমিক্‌স-এ অর্থনীতির অধ্যাপক—মাঝে-মধ্যে এক-আধটা চিঠি পাঠায়, যোগটা রেখেছে, আমিও যখনি তার চিঠি পাই, সানন্দে উত্তর দিই। তবে না, নীলিমার সঙ্গে আপনার ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে সে কিছুই শোনেনি, আসলে নীলিমার কোনো কথাই সে জানে না, আমিই জানাইনি, এবং কেনই বা জানাব? যাক গে, অনুকে একবার লিখি, বেশ কয়েকমাস আগে, যে সে যদি কখনো লণ্ডনে বেড়াতে যায় তো আমার বন্ধুটির সঙ্গে যেন দেখা করে। জানি না কিসের থেকে অনুর এই সন্দেহ জাগে যে, এমন উদারপন্থী বাপ হয়েও তার ইচ্ছামত বিবাহে আমি হয়তো সম্মতি নাও জানাতে পারি—হয়তো ভেবেছিল, সুনীলের সঙ্গে তার বয়সের তফাৎটায় আমি খুব সুখী না বোধ করতে পারি এবং সেই কারণে হয়তো ...যাকগে, এখন নিশ্চয় অনুরই অনুরোধে পড়ে বন্ধুটি ওকালতি করছে, লিখছে যে অনু-সুনীলের গভীর সম্বন্ধটার আঁচ সে অনেকদিন আগেই পেয়েছে এবং অনু হতে ছেলেটি যদিও বয়সে ছোট, আমি যেন আপত্তি না করি, কারণ, ছেলেটি সর্বদিক থেকে সত্যিই চমৎকার। শেষে লিখছে—শান্ত হোন সুরেশবাবু, কান খাড়া করে শুনুন—লিখছে, এখন অমত করা সত্যিই উচিত হবে না, কারণ ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই বহুদূর গড়িয়েছে। সব সে খুলে বলতে পারছে না—তবু আশা রাখছে, আমি বুঝে নিতে পারব।

হ্যাঁ সুরেশবাবু, আমি বুঝে নিয়েছি, এবং জানি, আপনিও বুঝে নিচ্ছেন। দেখুন, সেই নীলিমার ঘটনাটারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে এখানেও—আমার মেয়ে, আমার সেই ছোট্ট মেয়েটা সুরেশবাবু, সে হয়তো আজ অন্তঃসত্ত্বা এবং আপনারই পুত্রের সাহচর্যে অর্থাৎ তারই সহোদর ভাইয়ের দ্বারা। কী, অদৃশ্যের হাতটা দেখছেন তো, এখনো ঠেকাতে চান আপনি? বলেইছি তো, আমি ঠেকাতে চাই না, তাতে আপনি যা খুশী বলতে চান বলুন, ইতিহাস আমায় অভিসম্পাত দেয় তো দিক। নীলিমাকেও সেদিন বলিনি গর্ভপাত করাতে, আজ অনুকেও বলব না। অনুর সেই সন্তান হয়তো ভূমিষ্ঠ হবে মৃত অবস্থায়, অথবা হয়তো সে সারাজীবন রুগ্নী থাকবে, ভুগবে রক্তের দোষে—এ-ধরনের সন্তান সম্বন্ধে তো ডাক্তাররা কতকিছু বলেন, আপনার তা জানা থাকতে পারে, আমি জানি না, জানতে চাইও না। আবার এমনও তো হতে পারে—হতে পারে না?—যে এমন প্রেমের সন্তান শেষে অতীব স্বাস্থ্যবানই হল, অসাধারণ বুদ্ধিমান হল, তখন? অবশ্য সেটা হলেও নীতির প্রশ্নটা থেকেই যায়, কিন্তু আমি দেখুন কত বন্ধন খুইয়ে এসেছি, আজ এ-বন্ধনটাও খোয়াব, তাতে আর কি। ক্ষমা করবেন, আমি যে দেখতে পাচ্ছি সুরেশবাবু, নীলিমা একদিন যে-রেখা টেনে যায়, তার মৃত্যুর পরে তার ছেদ পড়েনি, আর আজ দেখুন বৃত্ত কেমন সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

তবে জানেন, আমার সমস্যাটা আমারই, আমার সিদ্ধান্তটাও আমার একলার—সেটা আপনার ঘাড়ে চাপাব না। আপনি এখন ছেলেকে যা ভালো বুঝবেন, লিখবেন, অথবা চান যদি আজই তাকে টেলিফোন করতে, করবেন। শুধু অনুকে একটা উত্তর লিখেছি, সেটা ডাকে দেওয়ার আগে আপনাকে একবার পড়িয়ে যেতে চাই। চিঠিটা হল এই :

অনু মা,

সুনীল তোমার সহোদর ভাই, তার জন্ম তোমার মায়ের পেটে, সুরেশবাবু তার বাবা। সে অনেক কথা, পরে একদিন বলব'খন। তবু যা করতে চলেছ, তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার অসম্মতি নেই। কেন নেই, সেটাও খুলে বলা সময়সাপেক্ষ, এখন পারছি না। কিন্তু জেনেশুনে তোমরাই কি পারবে এবার সব রীতি-নীতির বিরুদ্ধে এমন উজান বাইতে? সে-সমস্যার সমাধান তোমাদেরই খুঁজতে হবে, আমি পারব না। যা ভাল বুঝবে, কোরো—এবং যা-ই কর না কেন, আমার আশীর্বাদ রইল।

বাপি

যাই হোক সুরেশবাবু, এ ব্যাপারে কি আপনার প্রতি, কি অনুর প্রতি, যতটুকু পারলাম, সব খোলসা করে গেলাম। আপনার সঙ্গে এক সম্বন্ধ সৃষ্টির কল্পনা করেছিলাম একদিন, অদৃষ্ট চেয়েছিল অন্য এক সম্বন্ধে—তাই বাড়ী চড়াও হয়ে এসে আজ হয়তো কষ্টই শুধু দিলাম, মার্জনা করবেন। দেখছি, কিছু বলার মত মনের অবস্থা এখন আপনার নেই, আমিও পীড়াপীড়ি করব না। শুধু যদি অনুমতি দেন, উঠি এবার, রাত্রি বেশ হল।

বিতর্কিত পুরুষ দ্য গলের অন্তর্ধান

দিলীপ মালাকার

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল ২৮ এপ্রিল। এটি একটি অঘটন। হঠাৎই ঘটে। মৃত্যু বা অপমৃত্যু থেকে নয়। রাজনৈতিক জুয়াখেলায় ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গল হেরেছেন। এবং তারই ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে তাঁর অন্তর্ধান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যেদিন থেকে জেনারেল দ্য গলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ফরাসী রাজনীতিতে, সেদিন থেকে দ্য গল অনেক সমাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করেছেন। এবং প্রত্যেকটি সংস্কারের জন্যে তিনি জনগণের মতামত ভোটে গ্রহণ করেছেন। শেষের দুটো সংস্কারের গণভোটে তিনি পরাস্ত হয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা মতন তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিলেন ২৮ এপ্রিল।

বিগত এগার বছর রাজত্বকালে দ্য গল অনেকবার রাজনৈতিক জুয়াখেলা খেলেছেন, যেমন ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চতুর্থ ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সংবিধান পাল্টে পঞ্চম ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সংবিধান রচনার জন্যে গণভোট। যার অপর নাম দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ ও না-র লড়াই। ১৯৫৮ সালে যখন আলজেরিয়ায় স্বাধীনতার লড়াই চরমে উঠেছে, রাজনৈতিক দলগুলো দিশেহারা, সামরিকবাহিনী চঞ্চল; তখন নেতৃত্ব নিলেন জেনারেল দ্য গল। সেদিন প্যারিসের রাস্তাঘাটে দেখেছিলাম প্রাণচঞ্চল্য। কেউ বলেছিল এটাই একমাত্র সমাধানের পথ; কেউ বলেছিল লক্ষণ শুভ নয়। সেদিনের দ্য গল ও আজকের দ্য গল রয়ে গেলেন বহুবিতর্কিত।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান রচনার জন্য গণভোট গ্রহণের পূর্বে দ্য গল তখনও রাজনৈতিক জুয়া খেলেছিলেন। তখনও তিনি দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন, 'আমায় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সুযোগ না দিলে আমি সব দায়িত্ব গ্রহণ করব না।' ফ্রান্সে তখন ঘরে-বাইরে বিপদ। দ্য গলের হুমকি তখন কাজে লেগেছিল। তিনি জিতেছিলেন। তারপর আবার হুমকি দেন ১৯৬১ সালে আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাবে। সে-বছরের গণভোটেও তিনি বলেছিলেন 'আমায় ভোট না দিলে আমি চলে যাব।' তারপর আবার তিনি হুমকি দেন ১৯৬২ সালে দুবার। একবার এপ্রিল মাসে আলজেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে, আরেকবার অকটোবর মাসে, ফ্রান্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন চালু করার জন্যে। প্রতিবারেই তাঁর হুমকি ও রাজনৈতিক জুয়াখেলায় তিনি জেতেন। কিন্তু শেষবারের গণভোট ছিল রাজ্যসভা বা 'সিনেট' উচ্ছেদ ও আঞ্চলিক সংস্কার আইন প্রণয়নের জন্যে। এইবারে তাঁর পরাজয় হল এবং তিনি বিদায় নিলেন।

১৯৪৫ সালের পর থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দ্য গল ফ্রান্সে অনেক সংস্কার সাধন করেছেন। ফরাসী চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংবিধান রচনায় ও সেটি চালু করার মূলেও দ্য গল। আগে ফরাসী মহিলাদের ভোট দেবার ক্ষমতা ছিল না। সেই আইন পরিবর্তন করে ফরাসী মহিলাদের ভোট-ক্ষমতাও দেন দ্য গল।

সর্বোপরি দ্য গলের সার্থকতা হল আফ্রিকার উপনিবেশগুলো ছেড়ে দিয়ে তাদের স্বাধীনতা দান। দ্য গলের অতিবড় শত্রুরাও সে-কথা স্বীকার করেন। দ্য গলের মতে একালে উপনিবেশ রাখা মূর্খামি। উপনিবেশ ত্যাগ করে বরং ওইসব দেশের সংগে মিত্রতা স্থাপনে আর্থিক ও রাজনৈতিক লাভ বেশী। এবং এই কারণে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্য গল ঘোঁট পাকাতে সাহস পেয়েছিলেন। তাঁর দলেও বেশ কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতা ছিল। তাদের নিয়েই দ্য গল সোভিয়েত ও আমেরিকার মধ্যে ভারসাম্য রাজনীতি চালাতেন।

মানুষ হিসাবে দ্য গল প্রতিভাশালী, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা কিন্তু বড় দাম্ভিক। দ্য গলের অতিবড় শত্রুরাও কোনোদিন দুর্নীতি, স্বজাতি-আত্মীয়পোষণ বা পক্ষপাতিত্বের দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেনি। তাঁর এক ছেলে সামরিকবাহিনীর অফিসার এবং জামাতা নৌবহরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁরা নিজের কাজের গুণে যা করেছেন, তার ওপর দ্য গল কোনোদিন পক্ষপাতিত্ব বা হাতে ধরে ওপরে তোলেননি। এইসব কারণে ফরাসী জনগণ দ্য গলকে সম্মান করে। তারা দ্য গলকে সমালোচনা করে তাঁর রাজনৈতিক ব্যর্থতার জন্যে।

প্রথম যৌবনে দ্য গল ফরাসী সমরবাহিনীর কাজে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় কিছুদিন ছিলেন। সে-সময়ে ও তারপরে জার্মানীর সামরিকশক্তি যাচাই করার সুযোগ তাঁর ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু পূর্বে যখন হিটলার জার্মানীর ক্ষমতা গ্রহণ করল এবং জার্মানীকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করল, তখন জার্মানীর সামরিক গুরুত্ব নিয়ে তিনি একখানা ছোট বই লিখে ফরাসী সরকারকে সাবধান করে দেন। হিটলারের সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল

ট্যাংক ও বিমান। সে-সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন দ্য গল। সে-সম্বন্ধে তিনি ফরাসী নেতাদের জানিয়েছিলেন। সে-কথায় তখন অনেকেই খুব গুরুত্ব দেয়নি। যুদ্ধ যখন লাগল, তখন হিটলারবাহিনী ট্যাংক ও বিমানবাহিনীর সাহায্যে ফ্রান্স কেন, প্রায় সমস্ত ইউরোপ দখল করে নেয় কয়েক মাসের মধ্যে। তখন কিন্তু টনক নড়ে সবার।

ফ্রান্স জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত হল। দ্য গল ফ্রান্স ছেড়ে চলে গেলেন লন্ডনে। সেখানে গিয়ে ফরাসী মুক্তিফৌজ গড়লেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় গঠিত হল লন্ডনে নির্বাসিত ফরাসী সরকার।

যুদ্ধ শেষ হলে দ্য গল দেশে ফিরে অস্থায়ী সরকার গড়লেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হল চতুর্থ সাধারণতন্ত্র। আড়াই বছর রাজনীতি করে বিরক্ত হয়ে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁকে নিয়ে গঠিত হল একটি রাজনৈতিক দল। যার অপর নাম গলিস্ট দল।

প্যারিসের কাছেই 'কলম্বে লে দোজ এগলিজ' নামে ছোট গ্রামে নির্বিবাদে কিছুদিন বিশ্রাম করলেন। এরই মধ্যে তিনি চার খণ্ডে বৃহৎ বই লিখলেন তাঁর স্মৃতি-কথা—দুই মহাযুদ্ধের কাহিনী।

ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হল। উত্তর আফ্রিকায় মরক্কো ও তিউনিশিয়ায় স্বাধীনতার লড়াই শুরু হল। তার কিছুদিন পরে আগুন জ্বলল আলজেরিয়ায়। ফরাসী সরকার মরক্কো ও তিউনিশিয়া ছাড়ল কিন্তু আলজেরিয়া ছাড়তে রাজী নয়। একদল দক্ষিণপন্থী বলল, আলজেরিয়া ফ্রান্সেরই একটি অংশ। কখনই ছাড়া যায় না। ফরাসী সামরিকবাহিনীর সঙ্গে আলজেরিয়ার যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়মিত লড়াই চলল কয়েক বছর ধরে। আর তাই নিয়ে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পতন হল। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে আমি প্যারিসে বসে দেখলাম অন্তত বারটি মন্ত্রিসভা। কয়েকটি মন্ত্রিসভা তিন সপ্তাহ থেকে দু' মাসের মধ্যে কুপোকাৎ হয়েছে।

এই অবস্থায় প্যারিসের রাস্তায়—কাফেতে জনগণের মুখে শুনেছি দ্য গল এলে এ-সমস্যার সমাধান হতে পারে। এমনকি সামরিকবাহিনীরও তাই মত।

১৯৫৮ সালের ১৩ মে তারিখে দ্য গল এলেন প্যারিসে। এসে সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন যে, দেশের স্বার্থে তিনি মন্ত্রিসভার ক্ষমতা গ্রহণ করছেন।

দ্য গল ক্ষমতা পেয়ে আলজেরিয়ার ব্যাপারটা আধাআধিভাবে মিটমাট করতে চেয়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন সোভিয়েত-বিরোধী। কারণ, তখন প্রতিটি কম্যুনিস্ট দেশ আলজেরিয়ার যোদ্ধাদের সাহায্য করত। শেষে তিনি আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হন।

আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পর তিনি সোভিয়েত, কম্যুনিস্ট ও এমনকি চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন। ওইসব দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের ব্যবসাও বেশ ফেঁপে উঠল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেনি। তাছাড়া দ্য গলের স্বাধীন মতকে খুব ভাল চোখে দেখত না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সুরু হয়ে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্য গলের বিরোধ। সে-বিরোধ এই সেদিন পর্যন্তও ছিল। এবং বিরোধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সে অবস্থিত তাদের সামরিক ছাউনি তুলে নিতে বাধ্য হয়। উপরন্তু উত্তর অতলান্তিক সামরিক চুক্তি থেকে ফ্রান্স সরে দাঁড়ায়।

দ্য গল গ্রহণ করেন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। যা পছন্দ করেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সমর্থন জানায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লাল চীন।

যে-কোনো কারণেই হোক গত কয়েক বছরে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল হয়। ঐশ্বর্য বাড়তে থাকে। পশ্চিম ইউরোপের কমন মার্কেটের প্রতিটি দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখে বৃটেন কমন-মার্কেটে প্রবেশ করতে চাইলে বাধা দিতে থাকেন দ্য গল। এই বাধাদানের ব্যাপারে দুটো কারণ আছে। একটি হল এই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যখন দ্য গল লন্ডনে আশ্রয় নেন, তখন চার্চিল সরকার দ্য গলকে অপমান ও উপেক্ষা করে। তার প্রতিশোধ তিনি পরে নিলেন। দ্বিতীয় কারণ হল এই যে, কমন-মার্কেট দলে একেই ভীষণ প্রতিযোগিতা, তার ওপর বৃটেন এলে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং ফ্রান্স যে নেতৃত্ব করছে তাই নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এই কারণেই তিনি বৃটেনের পথে বাধার সৃষ্টি করেন।

ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য একদিকে যেমন ফুলে-ফেঁপে ওঠে, তেমনি আরেক দিকে উপনিবেশ রক্ষার জন্যে কোন ব্যয় ছিল না। এই আর্থিক স্বচ্ছলতায় ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঁর আন্তর্জাতিক মূল্য বাড়তে থাকে। অপরদিকে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ ও রকেটের খরচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জর্জরিত। ফলে মার্কিন ডলারের অবস্থা খারাপ হয়। এর সুযোগ নিয়ে দ্যগল তাঁর টাকার গরম দেখিয়ে মার্কিন ডলারকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করেন। এর পেছনে এসে আবার দাঁড়ায় লাল চীন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে ১৯৬৮ সালের মে-জুন মাসের ছাত্রবিপ্লব ও একমাসব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘটে ফ্রান্সের উপার্জিত যত স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রা ছিল সব ব্যয় হয়ে যায়। ফরাসী মুদ্রার দাম পড়ে যায়। ওই থেকে শুরু হল দ্যগলের পতন।

১৯৬৮ সালের পয়লা জুলাই হল সাধারণ নির্বাচন। ফরাসী জনগণ ভয়ে ভয়ে দ্যগলের পক্ষে ভোট দেয়। দ্যগলের দল জিতল ও মন্ত্রিসভা গঠিত হল। কিন্তু অসন্তোষ কমল না। ফরাসী মুদ্রার অবস্থার উন্নতি হল না। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বাড়তেই থাকল।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে গিয়ে গণভোটের আশ্রয় নিলেন। গণভোটের খেলায় তিনি হারলেন এবং বিদায় নিলেন।

দ্যগল আগামী নভেম্বর মাসে উনআশী বছরে পদার্পণ করবেন। দ্যগল বিদায় নিলেন বটে কিন্তু তাঁর দল রইল। তাদের জন্যে তিনি পরামর্শ দেবেন। সুতরাং দ্যগল যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি চর্চা করবেনই।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্যগলের বহুমুখী ভূমিকার কথা কেউই অস্বীকার করবে না। আফ্রিকায় তাঁর প্রভাব যথেষ্ট। আফ্রিকার ফরাসীভাষী রাষ্ট্রে দ্যগল অনেকবার মারণ্দ্বিয়ানা দেখিয়েছেন।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অবসানকল্পে প্রথম থেকে প্রচেষ্টা করেছেন দ্যগল। আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে ভিয়েৎনামে শান্তি আসতে পারে সে কথা জানান দ্যগল। তাঁর প্রস্তাবমতে দুই ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিরা ও মার্কিন প্রতিনিধি প্যারিসে শান্তি বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছে গত এক বছর ধরে।

ইজরায়েল-আরব যুদ্ধের একটা সমাধানের প্রস্তাবও করেন দ্যগল। সেই প্রস্তাবের ওপর বৈঠক চালাচ্ছে চারটি বৃহৎ শক্তি। এখন দ্যগলের বিদায়ে সে প্রচেষ্টায় বিলম্ব ঘটবে।

১৯৫৯ সালে দ্যগল একবার বলেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লাল চীনের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ হবে। এবং তার ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন পশ্চিম ইউরোপের দিকে তাকাবে। চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংঘর্ষ বেধে গেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের প্রতি বেশ নরম। বরং বলা চলে মিত্রভাবাপন্ন।

দ্যগল আরও বলেছিলেন যে, লাল চীনকে অবজ্ঞা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সেদিক দিয়েও দ্যগল অনেকখানি সফল।

এক-একটি ইস্কুল যেন জাতীয় জীবনে এক-একটি দীপশিখা। কতো ঘরে জেনলেছে সে, কতো শিশুর কপালে এঁকেছে ভবিষ্যত অমরতার অম্লান জ্যোতি। এক-একটি ইস্কুলকে অনুসরণ করলেই তাই জানতে পাই আমরা জাতীয় জীবনের অজানা ইতিহাস—নবজাগরণের ধারা-পরম্পরা। 'মানুষ গড়ার ইতিকথায়' সেই অধ্যায়কেই তুলে ধরা হবে প্রতি সপ্তাহে।

হিন্দু স্কুল

ভাষণ শেষ হয়ে এল। শেষের দিকে আবেগে গলা ঈষৎ ভারী ও রুদ্ধস্বর। গ্যালারীর প্রতিটি কোণে, বিদায়-সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত কোলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের ও ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের মনে ছড়িয়ে পড়ল কথাগুলো—"তবে আমি নিশ্চিত জানি যে যেদিন আমার এই নশ্বর দেহ চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সেদিনও থাকবে আমার হৃদয়ের মাঝে শব্দ দুটি পাশাপাশি। ছাত্রেরা তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ কোন শব্দ দুটির কথা আমি বলছি। সে তোমাদেরই শ্রদ্ধেয় বিদ্যালয় 'হিন্দু স্কুল', শতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যে যা গড়া।" (অনুদিত)

এই ভাষণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি স্কুলের শতবর্ষ পথপরিক্রমা শেষ হয়ে শুরু হল দ্বিতীয় শতকের জয়যাত্রা। ওদিকে দরজায় দাঁড়িয়ে জুড়িগাড়ি। দীর্ঘ ষোল বছর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে রায়বাহাদুর রসময় মিত্র ফিরে যাচ্ছেন তাঁর চোরবাগানের 'রসময় আশ্রমে'। সম্বর্ধনার শেষে বিদায়ী বৃদ্ধ শিক্ষক গাড়িতে এসে উঠলেন। সেদিন কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় রাস্তার দুধারে লোক জমে গিয়েছিল। কারণ রসময় মিত্র আর তাঁর প্রিয় স্কুলে ফিরে আসবেন না, এই শেষ দিন। রাস্তার ভিড় হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, গুঞ্জন উঠল চারদিকে, প্রতিটি মানুষের চোখে ফুটে উঠেছে এই প্রাচীন স্কুল, তাঁর শিক্ষক-গোষ্ঠী ও ছাত্রদের সম্পর্কে নীরব প্রশংসার ঝর্ণাধারা। গাড়ি থেকে ঘোড়াগুলো খুলে নিয়ে কোলকাতার অভিজাতবংশের চারটি ছাত্র টেনে নিয়ে চলল সেই রথ। আধুনিক বাংলার বিস্মৃত দ্রোণাচার্যকে তাঁর একলব্য-শিষ্যরা সেদিন যে সম্মান দেখিয়েছিলেন, তার তুলনা ইতিহাসে নেই। সেই ইতিহাস রচিত হয়েছিল ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে।

তবে এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যুগে যুগে হিন্দু স্কুল বা সুদূর অতীতে 'হিন্দু কলেজে' ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের যে সুদৃঢ় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এ ঘটনা তারই একটি দিকের স্বাক্ষর মাত্র। এই ঐতিহ্য একদিনে কারুর একার চেষ্টায় গড়ে ওঠেনি। দেড়শো বছর ধরে হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষকের পরিশ্রমের ফসল এই ঐতিহ্য। স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য ছিল যাতে কোনদিনও এই সম্পর্কে চিড় না ধরে। তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি।

ব্যর্থ হতে পারে না কারণ কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এই স্কুল স্থাপিত হয় নি। সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অর্থহীন শাস্ত্রকচকচির হাত থেকে শিক্ষার প্রাণপ্রবাহকে মুক্ত করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তার জন্য প্রতিষ্ঠাতারা বিষয় হিসাবে বেছে নিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য। মাধ্যম হল ইংরাজী।

১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারী, সোমবার মাত্র কুড়িজন ছাত্র নিয়ে গরানহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার দিনে ইংরেজী স্কুলগুলোকে স্কুল না বলে কলেজ বলা হত। জাতি হিসেবে চিরকালই আমরা এক্সাজারেট করতে ভালবাসি। কলেজের প্রধান শিক্ষক হয়ে এলেন চন্দননগরের জেমস আইজাক ডি' আনসেলম। কলেজের গভর্নিং বডির নাম ছিল অধ্যক্ষ সভা। অধ্যক্ষ সভার সভাপতি হলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্ট। দুজন সম্পাদক। একজন ভারতীয় অপরজন ইউরোপীয়। ইংরেজরা এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হোক মনে মনে চাইলেও তখন সাহস করে বেশী কিছু করতে চাইতেন না, পাছে প্রজারা ক্ষেপে গিয়ে অনর্থ বাধিয়ে বসে। তাহলে ত কোম্পানীরাজকে দেশে কোর্ট অব ডিরেক-টরসের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই ইউরোপীয় সম্পাদক লেফটেনান্ট আর্ভিনকে সাক্ষীগোপাল সাজিয়ে রেখে দিশী সম্পাদক দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কলেজ পরিচালনা করতে লাগলেন। ট্রেজারার হলেন সে যুগের বিখ্যাত পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার জোসেফ ব্যারেটো। ব্যারেটো সাহেবের কাছে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কোলকাতার রইসদের দেওয়া চাঁদার টাকা, প্রায় লাখখানেক, নির্দিষ্ট সুদে গচ্ছিত রাখা হল। কলেজের খরচখরচা সুদের টাকায় চলে যাচ্ছিল। বাড়িভাড়া হিসেবে গোরাচাঁদ বসাক পেতেন আশি টাকা।

একটা কথা বলা দরকার—কলেজটা স্থাপিত হয়েছিল শুধু হিন্দুদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য। অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের এতে প্রবেশাধিকার ছিল না। অন্য সম্প্রদায় কেন, ঠিক করে বলতে গেলে বলা উচিত যে সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের ছেলেরা ছাড়া আর কেউ এই কলেজে পড়তে সুযোগ পেত না। কারণ গোড়া থেকেই এই কলেজ অবৈতনিক। চাঁদা-দাতাদের রেকমেনডেশন ছাড়া এখানে ঢোকার কোন পথ ছিল না। চাঁদার পরিমাণ ছিল ছাত্রপিছু পাঁচহাজার টাকা।

ধীরে ধীরে কলেজের সুনাম বাড়তে লাগল। ছাত্রসংখ্যাও নামের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলল। একদিকে যেমন ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে নতুন ডিপার্টমেণ্ট খোলার তাগিদ অধ্যক্ষ সভা অনুভব করলেন। এই নতুন ডিপার্টমেণ্ট অর্থাৎ বিজ্ঞান ক্লাস খোলার প্রয়োজনীয়তা হল প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যে। কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কোলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি জন হাবার্ট হ্যারিংটনের অনুরোধে বিলাতের 'বৃটিশ অ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি' কলেজকে প্রচুর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বই সাহায্য হিসেবে পাঠালেন। কিন্তু গরানহাটার বাসায় আর জায়গা নেই। এই জায়গার সমস্যা যখন কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করে তুলেছে ঠিক সেই সময়ে খবর এল ব্যারেটো কোম্পানী দেউলে হয়ে গেছে। কোম্পানীর কাছে জমা দেওয়া টাকার উদ্ধারের আর কোন আশা রইল না। নিরুপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ ছুটলেন হেয়ার সাহেবের ছ' হাজার টাকা সাহায্য না পেলে কলেজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠত। অথচ মজার ব্যাপার বিপদে যিনি রক্ষাকর্তা তাঁকে বা তাঁর পরম সুহৃদ, রাজা রামমোহন রায়কে গোড়া থেকেই কর্তৃপক্ষ অন্ত্যজের মত দূরে ঠেলে রেখেছিলেন। অথচ এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্ল্যান এঁটেছিলেন এঁরাই। রাজার প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য সেকালের সমাজের চাঁইদের মনঃপূত হয়নি। হেয়ারের নেটিভ-প্রীতি আবার ইংরেজরা সহ্য করতে পারতেন না। তাই কুড়িজন হিন্দু ও দশ-জন ইউরোপীয় নিয়ে গঠিত অধ্যক্ষ সভায় এঁদের স্থান ছিল না। এই ঘটনার পর কিন্তু ডেভিড হেয়ারকে অধ্যক্ষ সভায় নেওয়া হল।

কলেজের এই দারুণ বিপদের সময়, অধ্যক্ষ সভা সরকারের দ্বারস্থ হলেন। তখন লর্ড আমহার্স্ট এদেশের গভর্নর-জেনারেল। তাঁর সময়ে ১৮২৩ সালে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠিত হয় আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি ও

হিন্দু স্কুল
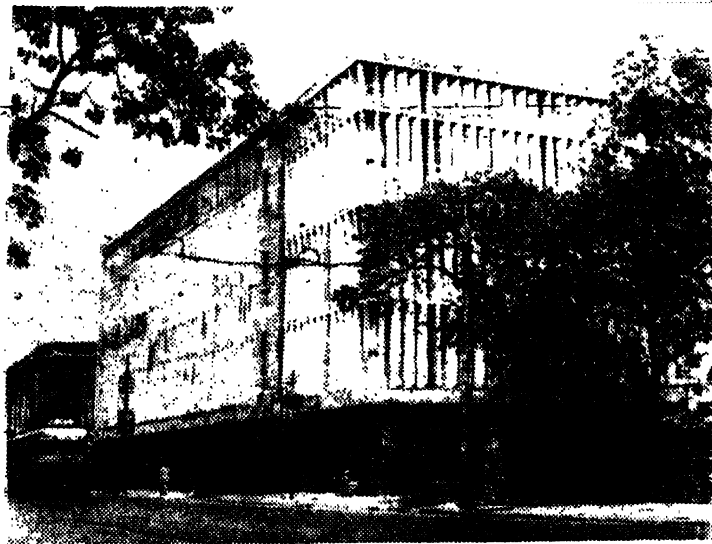
প্রসারের জন্য। এই কমিটির প্রথম সম্পাদক প্রখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন। কমিটির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠি লিখলেন। বিশপ হেবার চিঠিটি গভর্নর-জেনারেলের কাছে পৌঁছে দেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল যখন অর্থের অভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দ্বার এদেশে রুদ্ধ হয়ে আসছে, তখন সরকার কি করে লক্ষ লক্ষ টাকা কতগুলি প্রাচীন পুঁথি ছাপানো ও অর্থহীন শাস্ত্র-শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। রাজার চিঠির ইনডাইরেক্ট ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। কমিটি সংস্কৃত কলেজের জন্য বাড়ি তুলবেন স্থির করেছিলেন। ঠিক হল হিন্দু কলেজের জন্যও বাড়ি বানানোর খরচ কমিটি ঘাড়ে নেবেন। ১৮২৪ সালে হিন্দু কলেজের ভিত্তি সংস্কৃত কলেজের পাশে একই সঙ্গে স্থাপিত হল। এখন যেখানে সংস্কৃত হলেজ, হিন্দু স্কুল ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটা ছিল হেয়ার সাহেবের। ঐখানে ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজ উঠে এল। মাঝে তিন বছর সাময়িকভাবে বৌবাজারে একটা ভাড়াবাড়িতে গরানহাটা থেকে কলেজ তুলে আনা হয়েছিল। ঐ সময়ে প্রথম বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। স্কুলের প্রথম বিজ্ঞান-শিক্ষক ডি রস। বৌবাজারে আসার পর থেকেই গভর্নমেন্ট সায়েন্সের টিচারের মাইনে ও কলেজের বাড়িভাড়া দিয়ে আসছিল। সরকারী সাহায্য নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের উপর নজর রাখার জন্য অধ্যক্ষ সভায় সরকারী প্রতিনিধি নিতে হল। প্রথম সরকারী প্রতিনিধি হয়ে যিনি অধ্যক্ষ সভায় এলেন তিনি স্বয়ং ডঃ উইলসন।

জমি-বাড়ির সমস্যা মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট পরিবর্তনও কলেজের ইতিহাসে ঘটে যায়। কলেজ আর পুরোপুরি অবৈতনিক রইল না। পাঁচ টাকা মাস মাইনে দিতে পারলে যে-কোন হিন্দু ছেলে কলেজে ঢোকার সুযোগ পেত—রেকমেনডেশনের যুগ শেষ হয়ে গেল। এ-সময়ে হিন্দু কলেজে সাধারণ বৈতনিক ছাত্রদের পাশাপাশি হেয়ার সাহেবের স্কুল সোসাইটির স্কুলের ছেলেরাও পড়ত। সোসাইটির স্কুলের ছেলেদের জন্য কলেজে ৩০টি সীট রিজার্ভ ছিল—এর জন্য কলেজ মাস গেলে দেড়শো টাকা পেত সোসাইটির কাছ থেকে।

কলেজের কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাতেও এ-সময় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। বৌবাজার থেকে কলেজ স্ট্রীটের বাড়িতে উঠে আসার সময় একজন তরুণ অধ্যাপক এলেন কলেজে। তাঁর নাম হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও—জাতিতে ফিরিঙ্গি।

চার দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষার প্রবাহ আটকে থাকতে পারে না বলেই ডিরোজিও বিশ্বাস করতেন। নিজে ছিলেন ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক। ব্যক্তিগত জীবনে হিউমের দর্শনে বিশ্বাসী। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্ররা খোলা মন নিয়ে সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার জট ছাড়াতে এগিয়ে আসুক। কলেজের সীমাবদ্ধ সময়ে ছাত্রদের সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া সম্ভব হত না বলে তিনি তাঁদের তাঁদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন। ছাত্ররা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়—তিনি ছিলেন তাঁদের বন্ধু। ছাত্ররা ডিরোজিও বলতে ছিলেন অজ্ঞান। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যে তখনকার রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—ডিরোজিও হিন্দু ছেলেদের জাত মারছে, তাদের খৃস্টান করে তুলছে। আসলে সেকাল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ভাঙনের সময়। বহু পুরোনো দুর্গ বাইরের প্রচণ্ড আক্রমণে ধ্বসে পড়ছে। একদিকে ইংরেজী শিক্ষার আঘাত, অন্যদিকে রামমোহনের বৈদান্তিক ধর্মমতের প্রচার। কোনদিকে ধ্বসে-পড়া পাঁচিল জোড়া রাখতে না পেরে সমাজপতিরা গর্জে উঠলেন—তাড়াও ডিরোজিওকে। লোকটা অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন করে ছাত্রদের মাথা খাচ্ছে। তখনকার কোলকাতার হিন্দুসমাজের নেতারা প্রায় সবাই ছিলেন কোন না কোনভাবে হিন্দু কলেজের সঙ্গে জড়িত। তাই সমবেত চাপের কাছে অধ্যক্ষ সভা নতিস্বীকার করে সিদ্ধান্ত নিলেন ডিরোজিওকে তাড়ান হবে। খবর পেয়ে ডিরোজিও নিজেই পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন। তখন তাঁর বয়স মোটে বাইশ।

শিক্ষক স্কুল ছেড়ে চলে গেলেও, ছাত্রদের কিন্তু ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। তাঁরা নিয়মিত ডিরোজিওর বাড়িতে যেতেন। কিন্তু হঠাৎ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল—ডিরোজিও ১৮৩১-এ কলেরায় মারা গেলেন। সেদিনও তাঁর ছাত্ররা শিক্ষককে ভোলেননি। ডিরোজিওর অসুখের খবর শুনে তাঁর ছাত্ররা, মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সবাই ছুটে এলেন। ছ'দিন ধরে রাত-দিন তাঁরা আপ্রাণ সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। কিন্তু বাঁচাতে পারেননি ডিরোজিওকে। ডিরোজিও মরে অমর হয়ে রইলেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের মাঝে, যাঁরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রতিটি প্রধান ধর্মীয় সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলনে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আইন-সচিব মেকলের পরামর্শে গভর্নর-জেনারেল উইলিয়ম বেণ্টিক এদেশে শিক্ষার মিডিয়ম হিসাবে ইংরাজী চালু করলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ডঃ উইলসন কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। মেকলে তাঁর জায়গায় হলেন সম্পাদক। হিন্দু কলেজ এই সময় থেকে প্রায় পুরোপুরি সরকারী কলেজ হয়ে ওঠে।

যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশককে হিন্দু কলেজের ডিরোজিও যুগ বলা যায় তাহলে নিশ্চয়ই তৃতীয় ও চতুর্থ দশককে বলা যাবে রিচার্ডসন যুগ। ডেভিড লিসটার রিচার্ডসন কলেজে এসেছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে। পরে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। ডিরোজিওর ব্যক্তিগত চরিত্র, দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা ছাত্রদের মনে সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা সম্পর্কে একটি যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। রিচার্ডসন ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন সাহিত্যপ্রীতি। কে বলতে পারে রিচার্ডসনের শেক্সপীয়র আবৃত্তি শুনেই মধুসূদনের কবি হতে ইচ্ছা জেগেছিল কি না? মধুসূদন সম্পর্কে হিন্দু স্কুলে অনেক গল্প শোনা যায়। অঙ্কে কাঁচা মধুসূদন একবার নাকি ক্লাসে একটা কঠিন অঙ্ক টুক করে সলভ করে দিয়ে

ক্লাসমেট ভূদেব মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন—

"A Shakespeare or a Milton can be a Newton if he likes, but a Newton can never be a Shakespeare however hard he may try."

এ-যুগের প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন, ভূদেব ছাড়াও প্যারীচরণ সরকার, গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশনাথ রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, আনন্দকৃষ্ণ বসু। শিক্ষক হিসাবে রিচার্ডসন সেন্ট পারসেন্ট সাকসেসফুল। তাঁর পড়ানোর দক্ষতা সম্পর্কে মেকলে একবার বলেছিলেন—ভারত সম্পর্কে হয়তো সব ভুলতে পারি কিন্তু আপনার আবৃত্তি কোনদিনও বিস্মৃত হব না। ছাত্রদের ভালবাসতে জানতেন রিচার্ডসন, তাই তাঁর প্রতিও ছাত্রদের অনুরাগের কোন তুলনা ছিল না। বেথুন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে রিচার্ডসন চাকরী ছেড়ে দেন, এতে কলেজের ছেলেরা বেথুনের উপর ক্ষেপে গিয়ে পাবলিক মিটিংয়ে রিচার্ডসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে। 'হিন্দু কালেজ' তার প্রতিষ্ঠার মাত্র ছত্রিশ বছরের মধ্যে যত কৃতী ছাত্র দেশকে উপহার দিয়েছে তার কোন তুলনা এদেশে নেই। কলেজের কৃতিত্বের আসল কারণ ঐ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। ঐ সম্পর্কটুকু না থাকলে যে কি হয়, তা আজকের দিনের যে-কোন পেল্লায় বিল্ডিং-ওয়ালা স্কুলের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে
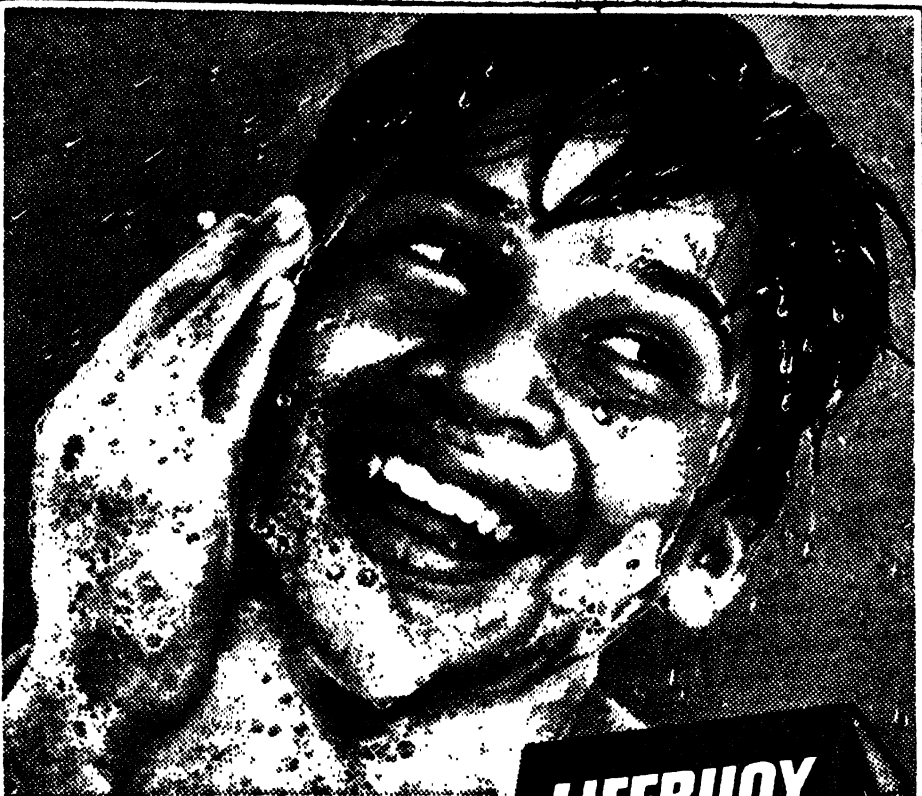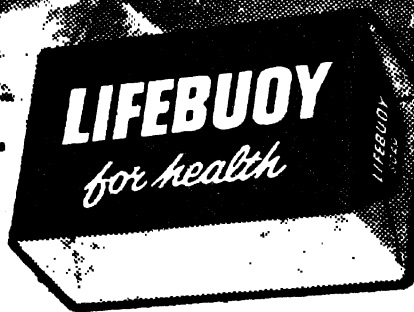
উঠে। ছেলেরা তাদের স্কুলকে ভালবাসে না—মাস্টারমশাইরা পারছেন না তাদের মনে স্কুলের প্রতি, শিক্ষার প্রতি ভালবাসা জন্মাতে। তাই সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু স্কুল এর ব্যতিক্রম।

হিন্দু স্কুল ব্যতিক্রম বলেই গত দেড়শো বছরের বেশী সময় ধরে দেশের সেরা ছাত্রদের গড়েপিটে মানুষ করে আসছে। ছাত্র গড়া-পেটার মাঝে স্কুলও বহু পরিবর্তনের উজান ঠেলে চলেছে। রিচার্ডসন চলে যাওয়ার কয়েক বছর পরে 'হিন্দু কালেজ' দু'টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়ে তৈরী হল প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল। হিন্দু স্কুল পুরোনো 'হিন্দু কালেজের' বাড়িতেই রয়ে গেল। পুরোনো নিয়ম-কানুন বজায় রেখে।

'হিন্দু কালেজে'র এই নব রূপায়ণের সময়েই জন্ম কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ইস্তক পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে আসছে। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮২ এই পাঁচ বছরে এই স্কুলের ছেলেরা পর পর পাঁচবার এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করে। এ-রেকর্ড বাংলাদেশের কোন স্কুলের নেই।

এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি আবার চোখে পড়ে ১৯০৩, ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে। চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র দত্ত ও ক্ষিতীশচন্দ্র সেন পালা করে এই তিন বছর এনট্রান্সে প্রথম স্থান দখল করেন। তখন স্কুলের হেডমাস্টার রসময় মিত্র। মিত্রমশাই স্কুলকে ভালবাসতেন, বিনিময়ে তিনি ভালবাসা পেয়েছিলেন, তাঁর সহকর্মী, ছাত্র ও কর্মচারীদের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য সংগঠক ও খাঁটি শিক্ষক। নিজের চারিত্রিক সততা তিনি চারিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন সহকর্মীদের মাঝে। তাঁর সময়ের বহু ঘটনার মধ্যে একটি নিশ্চয়ই এই স্কুলের পুরোনো ছাত্রদের কারু কারুর মনে থাকতে পারে। ক্লাস ফোরে তখন ইংরেজী পড়াতেন শরদিন্দুবাবু। একদিন শরদিন্দুবাবু ক্লাসে Salisbury উচ্চারণ করলেন স্যালিসবেরি। প্রাক্তন এডভোকেট-জেনারেল শংকরদাস ব্যানার্জি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—স্যার আমার বাবা কিন্তু বলেন সলস্‌বেরি। পরের দিন ডিক্‌সনারী দেখে এসে শরদিন্দুবাবু ক্লাসে ছেলেদের সামনে নিজের ভুল স্বীকার করেন। এতে কিন্তু তিনি একটুও লজ্জিত হননি। যেমন অতীতে লজ্জিত হতেন না এই স্কুলেরই স্বনামধন্য ছাত্র রামতনু লাহিড়ী নিজের ছাত্রদের কাছে ভুলত্রুটি শুধরে নিতে। সেই একই ট্র্যাডিশন চলে আসছে।

ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই 'হিন্দু কালেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু স্কুলেরও মিডিয়ম অব ইনসট্রাকশন বদলে গেল। ইংরাজীর জায়গায় এল বাংলা। আবার স্বাধীনতার পর প্রবেশিকা পরীক্ষার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে নিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হল সেকেন্ডারী বোর্ডের কাঁধে। ম্যাট্রিকুলেশনের জায়গায় এল স্কুল ফাইন্যাল। এক যুগও কাটল না স্কুল ফাইন্যাল ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য নতুন শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হল—হায়ার সেকেন্ডারী।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে স্কুলের জীবনেও আজ এসেছে বিরাট পরিবর্তন। হায়ার সেকেন্ডারী চালু হওয়ার পর পুরোনো বাড়িতে স্কুলের জায়গা কুলোনো দায় হয়ে ওঠে। তাই গত দশকের শেষাশেষি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পুরোনো বিল্ডিংয়ের চত্বরে এক পা হারা থার্ড ব্র্যাকেটের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে স্কুলের নতুন চারতলা বিল্ডিং। স্কুল পুরোনো বাড়ি সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদকে ছেড়ে দিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে এসেছে। এই বিশাল বাড়ির বিয়াল্লিশটি ঘরে ছড়িয়ে আছে স্কুলের ক্লাস রুম, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ, অফিস ইত্যাদি। সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ, কমার্স ও টেকনিক্যাল এই চারটি স্ট্রীম রয়েছে স্কুলে। প্রাইমারী, সেকেন্ডারী মিলিয়ে আজ আটশোর বেশী ছেলে এই স্কুলে পড়ছে। স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকার সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশী। বাংলা দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যসম্পন্ন স্কুলের বর্তমান কর্ণধার সত্যানন্দবাবুর সঙ্গে স্কুলের বিষয়েই সেদিন কথা হচ্ছিল।

চার বছর আগে সত্যানন্দ প্রামাণিক এই স্কুলে হেডমাস্টার হয়ে এসেছেন। গত চার বছরে এই স্কুলের কোন ছেলে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় ফেল করেনি। আনন্দময় স্নিগ্ধ হাসি প্রবীণ শিক্ষকের সারাটা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষ করে টেকনিক্যাল স্ট্রীমে এই স্কুলের ছেলেদের রেজাল্ট অন্যান্য সমস্ত স্কুলকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে সায়েন্স বা হিউম্যানিটিজের রেজাল্ট অত ভাল নয়। ভাল নয় কথাটার ভুল ব্যাখ্যা পাছে হয় তাই সবিনয়ে জানাই, স্কলারশিপ পাওয়াটা এই স্কুলের কাছে কিছুই নয়—বছর বছর স্ট্যান্ড না করলেও কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই বললাম যে, ফল ভাল হচ্ছে না।

ফলাফল নিয়ে যেমন চিন্তিত হেডমাস্টার মশাই তেমনি দেখলাম তিনি চিন্তিত স্কুলের লাইব্রেরীর বিষয়ে। স্কুল লাইব্রেরীর বইয়ের সংখ্যা আজ নেহাৎ মন্দ নয়—দশ হাজারের উপর। ঘরের অভাবে আলমারী ভর্তি বই ক্লাস রুমগুলোতে পড়ে আছে—কোন রিডিংরুম নেই। লোকের অভাবে বই ইস্যু করার সুষ্ঠু ব্যবস্থাও করা যাচ্ছে না। ছেলেদের পড়ার আকাঙ্ক্ষা মেটানোর ক্ষমতা আছে স্কুলের—কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে সবটাই মাটি হতে বসেছে।

সবচেয়ে বড় অভাব হল, স্কুলের কোন খেলার মাঠ নেই। এত পুরোনো নামী স্কুল, যার প্রতিটি পাই পয়সা যোগানোর দায় সরকারের, তার কেন খেলার মাঠ নেই এর জবাব কে দেবে? স্কুলের ভেতরে ছটাকখানেক সান বাঁধানো চত্বরে টিফিনের সময় ছোট ছোট ছেলেরা রাগবী কাম বাস্কেটবল ধরনের একটা খেলা খেলছিল। পাছে সান বাঁধানো চত্বরে খেলতে গিয়ে আছাড় খেয়ে ছেলেরা হাত পা ভাঙে, দেখলাম, কয়েকজন মাস্টার মশাই উদ্বিগ্নভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাই ওয়াচ করছেন। কত গভীর ভালবাসা থাকলে এই নিদারুণ ফাঁকিবাজির যুগে মাস্টারমশাইরা সারাদিনের পরিশ্রমের ফাঁকে কুড়ি মিনিটের টিফিনটুকুও ছেলেদের সামান্যতম সাহায্যে ব্যয় করতে পারলে মনে করেন তাঁদের ব্রত সার্থক। হিন্দু স্কুলে না গেলে অনেক দিনের একটা ভুল ধারণা হয়তো আজো ভাঙত না। এদেশে লোকে মাস্টারী করে পেটের দায়ে, ভালবেসে নয়। ভালবাসার অভাব ঘটেনি বলেই গত শতাব্দীর মত এ শতাব্দীতেও অজস্র কৃতী ছাত্র বেরিয়েছে এই স্কুল থেকে। কয়েকটি নাম উল্লেখ না করলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—সত্যেন বোস, রাসবিহারী মিত্র, কুলদাচরণ দাশগুপ্ত, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, তুষারকান্তি ঘোষ, কালিপ্রসাদ খৈতান, হরিহর শেঠ, বি সি চ্যাটার্জি, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি সি বসু প্রভৃতি।

দেড়শো বছরের বেশী সময় ধরে একটি স্কুল বাংলাদেশকে উপহার দিয়ে আসছে হাজার হাজার মণিমাণিক্য। এত দিয়েও সে কিন্তু নিঃস্ব নয়। নিঃস্ব হবে কি করে? হেয়ার সাহেব, রাজা রামমোহন, ডিরোজিও, রিচার্ডসন, রসময় মিত্রদের জীবনব্যাপী সাধনায় যে সমুজ্জ্বল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তারই কল্যাণে বর্তমান হিন্দু স্কুল, তার শিক্ষক গোষ্ঠী ও ছাত্র সম্প্রদায়।

—সন্ধিৎসু

সাহিত্য ও সংস্কৃতি || বিপ্লবী নায়ক

আরনেস্টো 'চে' গেভরা নামটি আজ সারা বিশ্বে সুপরিচিত। চে গেভরা এই নামেই তিনি খ্যাত। একালের এক বিস্ময়কর পুরুষ এই চে গেভরা। ফিডেল কাস্ট্রো কিউবার ফুলজেনসিও বাতিস্তার শাসন-চক্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছেন সেই সংগ্রামে এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল 'চে' গেভরার। চে কিউবা সরকারের কয়েকটি সরকারি পদে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে-ছিলেন। কাস্ট্রো যখন কিউবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন তখন 'চে' হয়েছিলেন অর্থনৈতিক মন্ত্রী, অনেক আন্তর্জাতিক সভা ও সম্মেলনে তিনি মহা আড়ম্বরে যোগ দিয়েছেন। তারপর সহসা সব ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপন করলেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে। ১৯৬৭-র ৭ই অকটোবর তারিখে 'চে' তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

> "Eleven months since our inauguration as Guerilla and the day is being spent without complications, even bucolically"

এরই চব্বিশঘণ্টার মধ্যে যে তাঁকে বলিভিয়ার সেনাদলের হাতে ধরা পড়তে হবে আর পরবর্তী চব্বিশঘণ্টার ভেতরই চল্লিশ বছরের এই ঘটনাবহুল জীবনের অবসান ঘটবে 'চে' সেই কথা উপরোক্ত মন্তব্য লেখার সময় কল্পনা করতেও পারেন নি। লাতিন আমেরিকান বিপ্লবের—সকল সম্ভাবনাও সেই মুহূর্তে লুপ্ত হল।

কাস্ট্রোর একটি নীতি হল বিপ্লবীর কর্তব্য হল বিপ্লব ঘটানো। এই নীতিকে রূপায়িত করার দায়িত্ব নিয়েই 'চে' বলিভিয়ায় গিয়েছেন কার্যকরীভাবে বিপ্লব সংঘটনে। কাস্ট্রোর আরেকটি নীতি হল বিপ্লবের পুরোভাগে যাঁরা থাকবেন তাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও চলবে! একটি গেরিলা বাহিনী পুরোভাগে থাকলেই হল। কিউবা-বিদ্রোহের এই হল অভিনবত্ব। 'চে' এই নীতি বলিভিয়ায় প্রয়োগ করার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

'চে' শিক্ষালাভ করেছিলেন চিকিৎসকের উপজীবিকার জন্য, কিন্তু রাজনৈতিক জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি বৈপ্লবিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আপনাকে যোগ্য করে তুললেন বিপ্লবী নায়ক করে। সশস্ত্র বিপ্লবী তাঁর চোখে তাই—

> "The highest level of human species—"

'চে' সম্পর্কে ফরাসী মনীষী জাঁ পল সাত্রে বলেছেন—

> "an outstanding complete human figure of the contemporary period."

'চে' গেভরার যে ডায়েরী সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তা নাকি নির্ভেজাল এবং ভূমিকা প্রসঙ্গে স্বয়ং কাস্ট্রো লিখেছেন—

> "We cannot, for the time being, reveal how this diary fell in our hands—"

দৈনন্দিন রোজনামচায় খুব বেশী চমকপ্রদ কথা নেই, এবং এই গ্রন্থের তেমন সাহিত্যিক মূল্যও নেই। তিনি পোকামাকড়, জীপ এবং লা পাজ বা হাভানা থেকে যোগাযোগের অভাবের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। আর গেরিলা যুদ্ধের ক্ষুদ্র বাহিনীর সাংগঠনিক এবং অভিযানগত সমস্যার কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর ডায়েরীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনও উক্তি নেই। 'চে'র একটি উক্তি কাস্ট্রো উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন, বিপ্লবীর ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে এই উক্তি উল্লেখযোগ্য—

> "This form of struggle gives us the opportunity to turn ourselves into revolutionaries. the highest state a man can reach; but it also allows us to graduate as men; those who cannot reach either of these two states must say so and give up the struggle."

ব্যক্তিচরিত্র হিসাবে 'চে' এক অপূর্ব মানুষ। আগুনেভরা মানুষ। অকুতোভয়ে আত্ম-বলিদানে সদা প্রস্তুত, সকল প্রকার দৈহিক ক্লেশ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত, এই মানুষটি অতি সাধারণ বিপ্লবীর মধ্যেও আত্মত্যাগ ও সহনশীলতার পরিচয় পেলে তাকে মর্যাদার আসন দিয়েছেন।

'চে'র শরীর অতিশয় জীর্ণ। হাঁপানি রোগে তিনি সবদা কষ্ট পেতেন। কিন্তু এই দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধও তাঁর অজানা ছিল না. তিনি বলতেন 'বারুদের গন্ধে আমার অসুখ সেরে যায়।'

'বিপ্লবীর কর্তব্য বিপ্লব করা' কাস্ট্রোর এই নীতিকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি বলিভিয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁর ডায়েরীর এক জায়গায় 'চে' লিখেছেন—

> "Friends call me a new Bakunin!"

তাঁর কাঁধের ঝোলায় ওষুধপত্রের সঙ্গে সর্বদা থাকত ট্রটস্কির কোনো একটি গ্রন্থ। রুশ বিপ্লবের কর্মীদের সঙ্গে 'চে' গেভরার পদ্ধতির পার্থক্য অনেক।

'চে' একদিকে যেমন বিপ্লবী তেমনই আবার অক্লান্ত লেখক। যে স্বল্পকাল মাত্র তিনি ধরাধামে ছিলেন তার মধ্যে এত প্রচুর লেখা রীতিমত বিস্ময়কর কান্ড। শুধু লেখা নয়, 'চে' ভালো বক্তাও ছিলেন। মাঝে মাঝে ছোট-বড়ো জনসমাবেশে তিনি যুক্তি-গ্রাহ্য এবং আবেগবর্জিত ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন। আগের শতকের ফুলঝুরি ভাষায় থিয়েটরী কেতায় বক্তৃতার তিনি বিরোধী ছিলেন। মার্কসীয় চিন্তাধারার ভাষ্যকার হিসাবে 'চে' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। VENCEREMOS- নামক গ্রন্থটিতে আরনেস্টো চে গেভরার কিছু বক্তৃতা ও রচনা সংকলন করে প্রকাশ করা হয়েছে। 'ভেনসেরিমোস' কথাটির অর্থ 'আমরাও পারি'। এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন জন গেরাসী। বক্তৃতার মত রচনাতেও 'চে' যেটুকু বলেছেন তার মধ্যে আছে স্পষ্ট উক্তি। পান্ডিত্যের পোশাক এঁটে ভাষা ও বক্তব্যকে তিনি শৃঙ্খলিত করেন নি। 'চে'র জীবনে আচরণে ও প্রকৃতির মধ্যে যে রোমান্টিক আকর্ষণ আছে তার মূলে আছে তাঁর এই রচনাবলীর আবেদন এবং স্পষ্ট ভাষণের প্রতি শ্রদ্ধা।

'চে'র চরিত্র ছিল বীরোচিত, কিন্তু তিনি নির্মম নন। দুর্দম কিন্তু হীন নন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সমর্থক কিন্তু তাহলেও তাঁর চিত্তে সরসতার অভাব ছিল না। ডায়েরীর মধ্যে অনেক মূল্যহীন

কথার মধ্যেও বিপ্লবী 'চে'র এই রোম্যান্টিক আকৃতিটুকু ফুটে উঠেছে। লক্ষ্যপথে পৌঁছানোর উদগ্র আগ্রহ তাঁকে কঠোর নিয়ামকে রূপান্তরিত করেনি। চরিত্রে কোথায় একটা মানবিক স্পর্শ ছিল, যার ফলে 'চে' স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত 'চে' বিশ্বাসী ছিলেন অনুনয়ে, উৎপীড়নে নয়। তাঁর ক্ষুদ্র গেরিলা বাহিনী ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল কিছু মৃত্যুর জন্য, কিছু আবার দলত্যাগীদের জন্য। তথাপি 'চে' একটিও নতুন গেরিলা সেনাকে সংগ্রহ করেন নি, যে এসেছে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে শুধু তাকেই গ্রহণ করেছেন।

জন গেরাসী 'চে'র এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে এক বিপ্লববিলাসী মহানায়কের অন্তরের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'চে'র জনপ্রিয়তার উৎস কোথায় তা জানা যায় এই বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী পাঠ করে।

'চে' তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

"time will tell what the prospects of the Bolivian revolution are—"

কাল নিষ্ঠুর। তার মুখে কুটিল হাসি, সে হাসির অর্থ ভেদ করা কঠিন। 'চে'র মৃত্যু ঘটেছে অতিশয় নৃশংসভাবে। বলিভিয়ার বিপ্লবও শেষ হয়েছে। কিন্তু জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না, ধুলোর অবহেলা তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। 'চে'র আত্মদানও তাই নিরর্থক নয়, কতকটা প্রতীকী আত্মদান বলা যায়। ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ আর এই ডায়েরীটুকু রেখে 'চে' চলে গেছেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুতেই ঘটেছে বিরোধীর পরাজয়। শোষণ, বঞ্চনা ও শোচনীয় দারিদ্র্যের কথা 'চে' বার বার বলেছেন, কিন্তু কোনো একটা পথনির্দেশ করার পূর্বেই তাঁকে নিহত হতে হয়েছে।

'চে' বলেছেন, সশস্ত্র বিপ্লবীর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ত্রিবিধ—(১) সুদৃঢ় মনোবল এবং সেই মনোভঙ্গী নিয়ে কাজ করা, (২) বেশ নির্জন একটি অঞ্চল, সেইখানে ঘাঁটি করতে হবে আর (৩) কিষাণদের সঙ্ঘবন্ধ করতে হবে (শহর অঞ্চলের সর্বহারাদের এই দল থেকে দূরে রাখতে হবে)। ডায়েরী পাঠে জানা যায় 'চে'র প্রথম দুটি বস্তুর অভাব ঘটেনি। এবং ধরা পড়ার পূর্বমুহূর্তে রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত এক কৃষক সমাবেশের দিকেই তিনি এগিয়ে চলেছিলেন। তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা প্রায় বাস্তবে পরিণত হতে চলেছিল। 'চে' লিখেছেন—

"The Government is disintegrating rapidly. It is a pity we don't have one hundred more men right now".

কিন্তু তিনি যা আশা করেছিলেন তা হয় নি। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যবৃন্দ আদর্শগত দ্বন্দ্বে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর গেরিলা বাহিনী যে দেশলাইয়ের কাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হবে আশা করা গিয়েছিল তা হয় নি। আর কিষাণদের ঘাঁটিও গড়ে ওঠেনি। তাই 'চে'কে লিখতে হয়েছে—

"We continue without incorporation of the peasants, without contacts of any kind."

পৃথিবীর সব বিপ্লবীই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট নিয়ে জন্মান, সবাই তাঁদের ছেড়ে যায় আর তাঁদের পথপরিক্রমা সর্বত্র একক। একলা চলরে মত সর্বকালে সর্বদেশের বিপ্লবীদের প্রেরণা দিয়েছে।

—অভয়ঙ্কর

---

(1) BOLIVIAN DIARY: By Ernesto 'Che' Guevara. Published by Jhonathan Cape—Price: 25 Shillings.

(2) VENCEREMOS: The speeches and writings of Ernesto 'Che' Guevara: Edited by John Gerassi: Published by Widenfied & Nicholson: Price: 50 Shillongs.

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

কলকাতায় মহাকবি গালিবের মৃত্যুশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত ২৫শে এপ্রিল সন্ধ্যায় রঞ্জি ইনডোর স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের স্পিকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। শ্রীমিত্র তাঁর ভাষণে গালিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন—'গালিব ছিলেন মানুষের কবি।' গালিব মৃত্যু-শতবার্ষিকী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী এম এ মজিদ সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন। গালিবের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন সর্বশ্রী আনন্দনারায়ণ মোল্লা, এম-পি, ফিরাক গোরখপুরী, আলকামা শিবলী, মণীন্দ্র রায়, ডাঃ এ এম ও গণি, শ্যাম নিগম, জেড এম সিদ্দিকি প্রমুখ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসৈয়দ বদরুদ্দোজা, এম-পি সকলকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন ছিল সারাভারত উর্দু মুসায়রা অনুষ্ঠান। প্রখ্যাত উর্দু কবিরা এতে অংশ গ্রহণ করেন। ফিরাক গোরখপুরী, মজরুহ্ সুলতানপুরী, আনন্দনারায়ণ মোল্লা, থেকে আরম্ভ করে তরুণতর কবিরাও এতে অংশ গ্রহণ করেন। চতুর্থ দিন, ২৮ এপ্রিল তর্মাসিলি মুসায়রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর। এ দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের সভাপতি শ্রীসতীকান্ত গুহ। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল অধ্যাপক নিয়াজ আহম্মদ খাঁ রচিত তর্মাসিলি মুসায়রা অনুষ্ঠানটি। স্থানীয় উর্দুভাষীরা এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান করেছেন, যা না দেখলে ভাবাই যায় না। ২৭ এপ্রিল থেকে শুরু হয় আলোচনা সভায় অনুষ্ঠান। ঐ দিন সকালে উর্দু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীআনন্দনারায়ণ মোল্লা। ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় ইরাণ সোসাইটি হলে সান্ধ্য অধিবেশনের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পৌরোহিত্য করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী, শ্রীমতী কুণ্ঠা জৈন প্রমুখও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ৩০ তারিখের আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমণীন্দ্র রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত উর্দু কবি ফিরাক গোরখপুরী। শ্রীসাত্তার সাহিদি, শ্রীআমীর রেজা কাজীম প্রমুখও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ১ মের আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ এম, জেড, সিদ্দিকি। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক নিয়াজ আহম্মদ খাঁ, অশিস সান্যাল, মনমোহন ঠাকুর, আব্বাস আলি খান বেকুন্দ। ঐ দিন রাত ৮টা থেকে কবি সম্মেলন আরম্ভ হয়। বাংলা, হিন্দি এবং উর্দু ভাষার অনেক কবি এতে অংশ গ্রহণ করেন।

এবারের 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করেছেন প্রখ্যাত হিন্দি কবি সুমিত্রানন্দন পন্থ। পুরস্কার দেওয়া হবে এ বছরের শেষ দিকে। তিনি যে গ্রন্থটির জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছেন, তার নাম 'চিদম্বর'। ডঃ টি গোপালন রেড্ডির সভাপতিত্বে মনোনয়ন বোর্ডের সভায় স্থির হয় যে, ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারতের পনেরটি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'চিদাম্বর'ই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। শ্রীপন্থ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২০মে আলমোরা জেলার এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'বীণা'। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'গ্রন্থি', 'পল্লব', 'ছায়া', স্বপ্ন, যুগান্ত, ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রকাশিত নাটক 'জ্যোৎস্না' সহৃদয়জনের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়। গদ্য সাহিত্যেও তাঁর অবদান অনুল্লেখ্য নয়। 'পাঁচ কহনীয়া', তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ।

বিদেশী সাহিত্য

গত কয়েক শতাব্দী ধরে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে নিগ্রোরা বসবাস করে আসছেন স্বাধীনভাবে। সেখানকার সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক জীবনে তাদের মর্যাদা নেই। মার্কিনী শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ হলেও জাতিগত পার্থক্যের জন্য তাঁরা সেই সভ্যতার প্রভাব থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন থেকে গেছেন। মূল ভূখণ্ড আফ্রিকার প্রতিই তাঁদের অন্তরের টান। সম্প্রতি আমেরিকার নিগ্রো সমালোচকেরা দাবী করছেন, কৃষ্ণকায় সাহিত্যিকদের হাতে একটি নতুন ধরনের সাহিত্যের উদ্ভব হচ্ছে—যার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে নিগ্রো সমাজের সুখদুঃখ, সংগ্রাম ও সাফল্য এবং জাতিগত মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। মার্কিনী সমালোচকেরা এই পরিবর্তনকে খুশিমনে গ্রহণ করতে পারছেন। বিষয়বস্তুর দিক তাদের রচনায় "ব্ল্যাক সেনসিবিলিটি"র প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভব করা যায়। মার্কিনী প্রকাশকরা অবশ্য এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন নন। নিগ্রোদের সম্পর্কে লেখা কিংবা নিগ্রো সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশে তাঁরা বিশেষভাবে উদ্যোগী। সম্প্রতি তাঁরা বের করেছেন 'ব্ল্যাক ভয়েসেস' এবং 'ডার্ক সিমফনি" নামে দুটি সংকলন গ্রন্থ। এ বই দুটি পড়তে পড়তে মনে হয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বজাতির কাছে সত্য হয়ে উঠতে চাইছেন নিগ্রো সাহিত্যিকেরা। একটি প্রবল আত্মস্বাতন্ত্র্যের মনোভাব ছায়া ফেলেছে সংকলন দুটির প্রায় প্রতিটি রচনায়।

সমালোচক হিসেবে এজরা পাউন্ড সারা পৃথিবীতে পরিচিত। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন? সেও তো কম বিস্ময়কর নয়। অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। কেউ কেউ আবার খুশিও হয়েছিলেন তাঁর আচরণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মার্কিন-বিরোধী বেতারভাষণের জন্য বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত হন। সেটা ১৯৪৫ সালের কথা। যথারীতি বিচার হলো, রায় বেরোল। কিন্তু প্রশ্ন জাগলো বুদ্ধিজীবীদের মনে। কেন এমন হলো?—এ প্রশ্নের প্রামাণ্য উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁরা এখনো। সম্প্রতি 'দি কেস অব এজরা পাউন্ড' নামে একটি বইতে বেতারভাষণ দেবার আগে এজরা পাউন্ড কি ভেবেছিলেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থা কেমন ছিল—সেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে নানারকম চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত কাগজের সাহায্যে।

জে ডি ফ্রডসাম ও চেঙ লী অনূদিত চীনা কবিতার একটি সংকলন বেরিয়েছে সম্প্রতি "অ্যান্থলজি অব চায়নীজ ভার্স" নামে। চীন কবিতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। বিশেষত আধুনিক চীনা কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। য়ুরোপে দু-চারটে প্রাচীন চীনা কবিতার সংকলন বেরোয়। এটিও তাদের মধ্যে একটি। এই সংকলনে তাঙ রাজত্বকালের তিপ্পান্ন জন উল্লেখযোগ্য কবির বেশ কয়েকটি রহস্যময় লিরিক কবিতা অনূদিত ও সঙ্কলিত হয়েছে।

আমেরিকান আকাদেমি অব আর্ট অ্যান্ড লেটার্স 'লোলিতা' এবং অন্যান্য বহু জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখক ভ্লাদিমীর নবকোভকে এবার পুরস্কার দানের জন্য মনোনীত করেছেন। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার। প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে একজন কবি, ঔপন্যাসিক, ভাস্কর, নাট্যকার কিংবা চিত্রশিল্পীকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। সম্প্রতি আকাদেমির সভাপতি জর্জ কেনান ঘোষণা করেন যে, আগামী মে মাসে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবকোভকে একটি স্বর্ণপদক ও এক হাজার ডলার নগদ পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে।

পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোক-সাহিত্য (আলোচনা) সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রকাশ। দে বুক স্টোর্স। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২ দাম দশ টাকা।

লোকায়ন চর্চায় বাঙলা দেশে যে আকস্মিক জোয়ার এসেছে, তা নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং বহু গুণী উৎসাহী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বাঙালী সংস্কৃতির একটি নতুন দিকের দ্বার উন্মোচন ঘটছে। খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু এই সংস্কৃতির দ্বার উন্মোচনে যে দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করা হচ্ছে, তা অধিকাংশ সময়েই মেনে নেওয়া সম্ভবপর হয় না।

শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বিস্তৃত অঞ্চলের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, তাতে গ্রন্থকারের অনেক পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থটি মোট সাতটি পর্বে বিভক্ত। রাঢ় ও পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের সংস্কৃতির, ধর্ম, লোক-উৎসব ও লোকসাহিত্য নিয়ে প্রথম পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, লোকগীতি, প্রবাদ, ছড়া নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলি রচিত। বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা নিয়ে মুন্সিয়ানার সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি। প্রবাদ, মিথ এবং লিজেন্ড সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। প্রচলিত আলোচনা-রীতির ধারায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য সীমাবদ্ধ। নতুন তথ্য আছে, নতুন কথা আছে অনেক। সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় দেশী-বিদেশী গ্রন্থের উদ্ধৃতি আরও কম দিয়ে, নিজের যুক্তির ওপর আস্থা রাখলে আরো ভালো হত।

●

BANKIM RACHANAVALI, Vol. III. Bankim Chandra Chatterjee. Edited by Jogesh Chandra Bagal. Sahitya Samsad, 32A, Acharya Prafullachandra Road, Calcutta-9.

বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা রচনার সঙ্গে বাঙালীমাত্রেরই পরিচয় রয়েছে। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এই মানুষটি কেবল বাংলাতে নয়, ইংরেজি ভাষায়ও সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। বহুদিন যাবৎ এই সমস্ত ইংরেজি রচনা ছিল দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি সাহিত্য সংসদ বঙ্কিম রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে এই সমস্ত রচনা সংবদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। পূর্ববর্তী দুটি খণ্ডের মত এটিও সম্পাদনা করেছেন শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি রচনাবলীতে আছে উপন্যাস, রাজমোহনস্ ওয়াইফ, প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্রের সংকলন, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি চিঠি, দেবী চৌধুরানীর বঙ্কিমচন্দ্রকৃত আংশিক অনুবাদ। রাজমোহনস্ ওয়াইফ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৪ খৃঃ ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে ধারাবাহিকভাবে। ১৯৩৫ খৃঃ প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অন দি অরিজিন অফ হিন্দু ফেস্টিভ্যাল, এ পপুলার লিটারেচার অফ বেঙ্গল, বেঙ্গলী লিটারেচার, বুদ্ধিজম্ অ্যান্ড দি সাংখ্য ফিলজফি, দি কনফেসনস্ অফ এ ইয়ং বেঙ্গল, দি স্টাডি অফ হিন্দু ফিলসফি, বৈদিক লিটারেচার প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমের বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিপ্রাখর্য এবং মনস্বীতার পরিচয় স্পষ্ট। 'লেটারস্ অন হিন্দুইজম' বঙ্কিমের অবিস্মরণীয় অসম্পূর্ণ রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় রচনাগুলিতে ফুটে উঠেছে।

সম্পাদনার দায়িত্বে শ্রীবাগল তাঁর সুনাম অনুযায়ী কাজ করেছেন। তিনি বর্তমানে অসুস্থ। এ-অবস্থায় এই ধরনের একটি গুরুত্ব-

পূর্ণ কাজ হাতে নেওয়া কতখানি দায়িত্ব-জ্ঞানের এবং দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক, তা সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীটি বেশ মূল্যবান। তাছাড়া আছে প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় মন্তব্য। সুন্দর এই গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

●

আগুন রাঙা (গল্প সংগ্রহ) — ছবি বসু। কথাশিল্প। ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের জীবন-সংকট এবং নতুন নতুন চিন্তাধারার অনুপ্রবেশে বাঙালীর জীবনচিন্তায় এসেছে বিরাট পরিবর্তন। সমাজসচেতন লেখকমাত্রেই এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছেন। শ্রীমতী ছবি বসু বিরাট কথাশিল্পী না হলেও তাঁর রচনার মধ্যে সমাজের প্রতি জাগ্রত দৃষ্টি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অধিকাংশ গল্পে মেয়েদের জগতের নানান সমস্যা এসেছে। সেই সঙ্গে আছে সংগ্রামের ক্ষেত্রে নারীত্বের অতুলনীয় মহিমা। আগুন রাঙা, ফাঁকি, একটি দশ পয়সা, কান্না, শিল্পী, জনক, দাগ, মেহমান, গাঙপারে কটা চোখ, সরীসৃপ—এই কয়েকটি গল্পে লেখিকার মুন্সিয়ানার ছাপ স্পষ্ট। উপলব্ধির আন্তরিকতা এবং বর্ণনা-নৈপুণ্যে এই কয়েকটি গল্প তুলনামূলকভাবে স্বতন্ত্র পর্যায়ের। তাছাড়া আরো অনেকগুলি গল্প আছে। অমৃতে তাঁর কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংগ্রহে সেগুলি স্থান পেয়েছে।

●

নীল দরিয়ায় (কাহিনী) — অজিত চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম ছয় টাকা।

পৃথিবীর আদিম বৃত্তিগুলির মধ্যে জলদস্যুতা প্রবীণ। বাণিজ্যের জাহাজ ঘুরে বেড়াত সমুদ্রের এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে। পণ্যসামগ্রী বিক্রি করত কোথাও, কোথাও ক্রয়। জলপথে এইসব সওদাগরী জাহাজ লুঠ করে নিত দস্যুরা। সেই মাল নিয়ে তারা বিক্রি করত কোন বন্দরে। জলদস্যুদের হাতে অসংখ্য মানুষ নির্যাতিত হয়েছে। সেই অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে বহু কাহিনীতে। জলদস্যুদের জীবন নিরুপদ্রব ছিল না। দুর্ধর্ষ আক্রমণ, আত্মকলহের মধ্য দিয়ে তাদের যে জীবন ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কের পর কলঙ্ক রচনা করে গেছে, সে-কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি লোমহর্ষক। প্রেম, হতাশা আনন্দ, উদ্বেগ, মরণপণ সংগ্রাম নিয়ে জলদস্যুদের যে ভিন্ন জীবন তারই আলেখ্য অজিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নীল দরিয়ায়'। অমৃত পাঠকের পরিচিত এই কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন গ্রন্থপ্রকাশ। পৃথিবীর প্রায় সব জাতির জলদস্যুদের কাহিনী আছে এই গ্রন্থে। সেই সঙ্গে আছে নারীদস্যুদের কথা, নৃশংসতায় যারা পুরুষকেও হার মানায়। কল্পনা নয়, ইতিহাসের তথ্য নিয়েই এই বিরাট গ্রন্থ রচিত।

বই পাড়ায়

ঠোঁটের ফাঁকে আলতো ক'রে স্ট্র রেখে কোল্ড কফিতে মৃদু চুমুক দিতে দিতে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাসের কাহিনী শুনছিলাম। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব বাঙলার ছেলে। সেখানকার জ্যোৎস্নারাতের গাং, বিল, চক আর তরমুজ ক্ষেতের মোহময়ী দৃশ্যের কথা বলতে বলতে দেখলাম অতীনবাবুর দৃষ্টি চলে গেছে কফি হাউসের চার দেওয়াল পেরিয়ে পূর্ব বাঙলার এক গ্রামে। তাঁর এই নতুন উপন্যাসটি পাঠকদের বেশ ভালোই লাগবে মনে করি। পূর্ব বাঙলা থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছেন যাঁরা তাঁদের স্মৃতি উদ্ভাসিত করবে—আনন্দে ভ'রিয়ে তুলবে তাঁদের অবসর মুহূর্ত। কলকাতার একটি স্বনামধন্য সাপ্তাহিক পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে। যথাসময়ে ঘোষণা জানতে পারবেন।

কফি হাউস থেকে নেমে আসতেই প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে দেখা। সহাস্যে অভিনন্দন জানালাম। তিনি এ বছর মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন। যুগান্তর পত্রিকা থেকে এটা দেওয়া হয়। প্রফুল্ল রায়ের এই সম্মানে প্রবীণ এবং নবীন সকল সাহিত্যিকই খুশি। তরুণ সাহিত্যিকদের প্রফুল্ল রায়ের মতো খ্যাতি আর কারো নেই। মাত্র একুশ বছর বয়সে পূর্ব পার্বতী লিখে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন, অল্প দিনেই পাঠকদের হৃদয় জয় করে ফেলেন। যতটুকু জানি, তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রফুল্ল রায়ের বইয়ের বিক্রি সবচেয়ে বেশি। হালে প্রফুল্ল রায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা [illegible] থেকেই এই বইটি নিয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু হ'য়ে গেছে। তাঁর দুইটি বই 'বাতাসের প্রতিধ্বনি' ও 'এখানে পিঞ্জর' শিগগীরই বেরুবে। প্রফুল্লবাবু 'এখানে পিঞ্জর' বইটির নামটা অবশ্য পাল্টে দেবার কথা ভাবছেন। সাহিত্যিক মহলে অজাতশত্রু এবং পরোপকারী বলে পরিচিত এই মানুষটিকে খোলা মন নিয়ে অভিনন্দন জানাতে পেরে আমরা নিজেরাও খুশি।

হাসিমুখে অভিনন্দন জানিয়ে দূরে থেকে এগিয়ে এলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। পরনে তাঁর ধুতি-পাঞ্জাবি। প্রফুল্লবাবু আর সিরাজ সাহেব দিন-কয়েক আগে একই সঙ্গে একই দোকান থেকে একই কাপড় কিনেছেন। দুজনেরই গায় তাই একই কাপড়ের পাঞ্জাবি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও লিখছেন অনেক দিন ধরে। সম্ভবত তাঁর ধারাবাহিক প্রথম উপন্যাস বন্যা বিশিষ্ট সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এ বেরিয়েছিল। পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হ'লো সেদিন। বন্যার নায়িকা লীলা—যৌবনোচ্ছলা লীলা। সত্য আর লীলার সাদামাটা জীবন একরকম কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ সত্যর বন্ধু সুখেন এলো। বন্যার বেগে ভাসিয়ে নিয়ে চলল লীলাকে। স্বামী ছাড়ল, গাঁয়ের বাস উঠিয়ে শহরবাসিনী হ'লো সে। কিন্তু ক্রমশ লীলা বুঝতে পারল সুখেন বহুবল্লভ। লীলার থেকে লীলার টাকাই তার বড়ো আকর্ষণ। লীলাকে আবার পিছু ফিরতে চাইছিল। [illegible] তখন সে [illegible] [illegible] [illegible] যমুনার নতুন উপাখ্যান ততক্ষণে সুরু হয়ে গেছে। লীলার সেখানে ফেরার পথ নেই।

বইটির শেষটায় অবশ্য কিছু রদবদল ক'রেছেন সিরাজ সাহেব। প্রথমে উপন্যাসে সত্য আর লীলার মিল ঘটিয়েছিলেন। এবারে বিচ্ছিন্ন করেই যার যার পথে তাকে চলতে দিয়েছেন। সন্দেহাতীতভাবেই উপন্যাসটি সুখপাঠ্য ক'রে তুলেছেন লেখক রচনার ও ঘটনার বিন্যাস কৌশলে।

একটু এগোতেই কনিষ্কের সঙ্গে দেখা। মুখে 'নত্যকার সেই হাসিটি। হাতে পেট মোটা ফোলিও ব্যাগ। জানি না, তার ভিতর কত নায়ক-নায়িকাকে বন্দী ক'রে রেখেছেন! প্রকৃত নামে কিন্তু তিনি কবি। নামটি বললেই চিনতে পারবেন নিশ্চিত। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার নাকি বাঘবন্দী করেছেন?'

সকৌতুকে উত্তর দিলেন, 'ক'রেছি। এখন দেখবার লোক পাওয়া গেলেই বেচারা লেখকের প্রাণটা বাঁচে।'

হেসে বললাম, 'কী নিয়ে লিখেছেন?'

বললেন, 'সুন্দরবন, কাঁথি, হিজলীর কৃষক আন্দোলন নিয়ে লিখেছি। চাষীরা উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে জঙ্গল সাফ ক'রে জমি আবাদ ক'রেছে, ফলিয়েছে সোনার ফসল। [illegible] জোতদার ইজারাদাররা কাড়তে এলো [illegible] সেই জমি—জমির ফসল। তার বিরুদ্ধে [illegible] রুখে দাঁড়িয়েছে [illegible] লড়াইয়ে। [illegible]

বৈকুণ্ঠের খাতা নয়, বইকুণ্ঠের খাতা—কেননা বইয়ের বিষয়ে কুণ্ঠা আমাদের বহুদিনের। অথচ বই পড়েই আমরা মানুষ হই, জীবনযুদ্ধে শক্তি অর্জন করি। তারপরেই আসে বইয়ের বিষয়ে ঔদাসীন্য। কিন্তু তা যদি না হয়, যদি আমরা পুরনো অভ্যাস ছেড়ে বুঝতে পারি, বই আমাদের কত বড় বন্ধু, কত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী, তাহলে একটি নতুন বইয়ের প্রকাশনা লগ্নকে আমরা অভ্যর্থনা জানাব। মানুষের সংসারে একটি নবজাতকের মতোই। বইকুণ্ঠের খাতায় আমরা এ ধরণের নবজাতক বইয়ের দিকে সম্ভ্রমে ও মমতায় দৃষ্টিতে তাকাব, বই আর তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে কৌতূহলী হব। আর তারই ভিতর দিয়ে পালন করব আমরা ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের দায়িত্ব।

উপকথার নামে নামঃ একটি সময়ের ইতিহাস

খবরটা শুনেছিলাম বই পাড়ায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন উপন্যাস "সূর্য কাঁদলে সোনা" বেরোচ্ছে পঁচিশে বৈশাখ। কৌতূহলের সূত্রপাত অবশ্য এখান থেকে নয়, বলা যায়, উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিক 'অমৃতে' বেরোচ্ছিল তখন থেকেই। তখন পুরো উপন্যাসটি পড়ার সুযোগ হয়নি আমার। সেজন্যে মনে মনে অতৃপ্তি ছিল। প্রেমেন্দ্রবাবুর যে কোনো লেখা সম্পর্কেই আমার এমনি আগ্রহ বরাবরের। এদিক থেকে হয়তো আমি নিরপেক্ষ পাঠক নই। আমার বাল্যকৈশোর ও প্রথম যৌবনের কিছু কিছু ভাবাবেগের সঙ্গে তিনি এখনো জড়িয়ে আছেন। স্মরণে পড়ে 'প্রথমা'র কবিতাগুলি, 'স্টোভ' 'তেলেনাপোতা আবিষ্কারের' মতো গল্পের স্মৃতি। কিছুকাল আগে, তাঁর স্বকৃত অনুবাদে আলব্যের কাম্যুর 'আউটসাইডার' পড়ছিলাম। এখনো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছিন্ন শৈল্পিক সম্পর্কে বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

নতুন উপন্যাসটি হাতে পেয়ে সেজন্যই যেন আর তর সইছিল না। প্রথম থেকে আবার পড়তে শুরু করলাম। একটি দুটি করে অধ্যায় পেরিয়ে যাচ্ছি। আর বিস্ময় নয়। পৃথিবীর একটি নবজাগ্রত চেতনার সঙ্গে আমার উপলব্ধির পরিচয় যেন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারে অবিস্মরণীয় কাহিনী দাস-ব্যবসায়ের দুর্বিষহ পরিবেশ, য়ুরোপীয়দের স্বর্ণলিপ্সা, নৌ-অভিযান প্রভৃতির মৌল সমস্যা ও প্রেরণা যেন সম্মিলিতভাবে একটি উপন্যাসের [illegible] দৃষ্টিতে [illegible]।

এ উপন্যাসে [illegible]

মোরালেস—এমনি সব দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক নাম। ঘনশ্যাম দাস এবং কুম্ভোদর রামশরণ তো রীতিমত বাঙালী চরিত্র। তবু এখানে কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রের আলাদা মূল্য নেই—কিংবা থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত গৌণ ব্যাপার। সকলেই যেন একটা সার্বিক জীবনচেতনার অংশীদার। যদিও প্রেম, বিরহ, জিঘাংসা, ষড়যন্ত্র, সমুদ্রবক্ষের একঘেয়েমি, ক্লান্তি, নাবিকদের জীবন ও একান্ত অচেনা-অপরিচিত মানুষের সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাৎকারও ঘটে যায় একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। তা ছাড়া বিদেশী-বিভাষী মানুষের সঙ্গে প্রাত্যহিক সম্বন্ধ ও যোগাযোগ, সংগ্রাম ও সংঘর্ষের নতুন নতুন ঘটনা তো আছেই। কয়েকজন স্বর্ণলোভী স্পেনীয় নাবিক ও অভিযাত্রীর কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল পেরুর কয়েক লক্ষ আদিবাসী। ঘটনার আবর্তে জন্ম নিয়েছে বহু উপকাহিনী। ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতার সঙ্গে লৌহযুগের বলীয়ান মানুষের সংঘাত। লৌহ-সভ্যতার আঘাতে ব্রোঞ্জ-সভ্যতার পতন ঘটল। রাশি রাশি সোনার দেশ পেরু স্বর্ণশূন্য হয়ে গেলো আধুনিক মানুষের লোভে, লিপ্সায়।

মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানেরই পরিবর্তন শুধু সেইসময়ে হয়নি, ইতিহাস জ্ঞানেরও পরিবর্তন হতে শুরু করেছে তখন থেকেই। কিংবা বলা যায়, নতুন ইতিহাস তৈরীর সূত্রপাত করলো এই অভিযাত্রীরাই।

পড়তে পড়তে বারবার প্রশ্ন জাগে, এ উপন্যাসের পটভূমি কি কেবল ছোট্ট স্পেন আর আটলান্টিকের ওপারের দেশ পেরু? —না, তা নয়। স্পেনীয় নাবিকরা কেবল পানামা আর মেকসিকোর সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করেনি, যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে সারা পৃথিবীর সঙ্গে। তারা শুধু শহর তৈরী করেনি, বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ ও সভ্যতাকে সমবেত করেছে একই আকাঙ্ক্ষায়। ভাষার ব্যবধানকে তারা তুচ্ছ করেছে, স্থানের দূরত্বকে তারা জয় করেছে।

মনে পড়ে যায় মার্কোপোলোর চীন-অভিযানের কাহিনী। ভারত ঘুরে গিয়েছিল মার্কোপোলোর জাহাজ। ভাস্কো-ডা-গামা [illegible] পথ ধরে আফ্রিকা ঘুরে ভারতে [illegible] কেবল দেশ আবিষ্কারের জন্য নয়, [illegible] প্রচার ও সোনার লোভে। [illegible]

না। যুগান্তরের সন্ধান তো এঁরাই দিয়েছেন। অবশ্য, তার আগে জানা হয়ে গেছে, পৃথিবীটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অসীম কিংবা অনন্ত-বিস্তৃত নয়, আকারে-প্রকারে কমলালেবুর মতো।

বাংলা কেন পৃথিবীর কোনো উপন্যাসের এত বড় পটভূমি আর আছে কিনা আমার জানা নেই। দেশ নয়, একটি সুবিস্তৃত সময় এ উপন্যাসের ভেতরে চারিত্রিক সজীবতায় ফুটে উঠেছে। মাথার ওপরে অনন্ত নীলাকাশ, বুকের ভেতরে দুঃসাহস ও আবিষ্কারের আনন্দ, চারদিকে অগাধ সুনীল জলরাশি। আর তার মাঝে মাঝে জেগে উঠছে কত অজানা-অচেনা দেশ, কত মানুষ, লোকজন, সভ্যতা-সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত। প্রেমেন্দ্রবাবু অপরিসীম দক্ষতায় সেইকালের স্বরূপ, সম্ভাবনা ও ব্যাপ্তিকে সহজে আত্মসাৎ করেছেন এই উপন্যাসে। সংলাপ, চিত্ররচনা এবং ঘটনার উপস্থাপনে উপন্যাসটি অবিস্মরণীয় বলেই মনে হয়।

অবশ্য যাঁরা প্রেমেন্দ্রবাবুর সমগ্র রচনার সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কাছে এ উপন্যাসটি নতুন কোনো বিস্ময় বলে মনে নাও হতে পারে। কারণ, প্রেমেন্দ্রবাবু জীবনে বহু অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তাঁর প্রতিটি রচনাই স্বতন্ত্র, নতুন এবং অভিনব। পুরোনো পথে অভিযান চালাতে তিনি নারাজ। কখনো সমকাল, কখনো ইতিহাস, কখনো গল্প কিংবা কবিতা নিয়ে তিনি নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'সূর্য কাঁদলে সোনা'ও তাঁর তেমনি আরেক সৃষ্টি। প্রেমেন্দ্রবাবু ঘনাদার গল্পে অনেক মজার মজার ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঘনাদার মুখ দিয়ে। তাতে আপাত অবিশ্বাস্য বহু বিষয়ের অবতারণা করেছেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত প্রকৃতির ঘনাদা কাউকে অখুশি করেন নি, প্রতিটি বিষয়েরই একটি করে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পাঠককে সাহায্য করেছেন তিনি।

ভাবতে কেমন অবাক লাগছিল, এ-উপন্যাসেও আবার সেই ঘনশ্যামের আবির্ভাব? মূল রহস্যটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ঘনাদার গল্পে যিনি অদ্ভুত চরিত্রের ফ্যানটাস্টিক মানুষ, তিনি এরকম একটি সিরিয়াস ঐতিহাসিক ঘনঘটার ভেতরে জায়গা পেলেন কিভাবে? —ছুটে গেলাম প্রেমেন্দ্রবাবুর কাছে। জিজ্ঞেস করলাম [illegible]

ঘনশ্যামের চরিত্রটা কি বাস্তব? ঘনাদাকে আমরা যতটা জানি, তাতে কি পাঠকের মনে সন্দেহের সুর বাজবে না?

প্রেমেনবাবু বললেন, "না বাস্তব নয়। ঘনশ্যাম নিঃসন্দেহে, কাল্পনিক চরিত্র। ঘনাদার গল্পে সে ইতিহাসকে নিয়ে মজা করেছে। যখন আমি ঘনাদার গল্প লিখি, তখন মনে হয়েছিল, বর্তমানকালের কথা লিখছি, এবার তার পূর্বপুরুষের কথা লিখলে কেমন হয়? সেই ভাবনা থেকেই ঘনশ্যামের সৃষ্টি। অবশ্য লক্ষ্য করে থাকবেন, ঘনাদার গল্পে তার কোনো পদবীর উল্লেখ ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। এখানে সে 'দাস' পদবী যুক্ত হয়েছে। ক্রীতদাস আর কিছু না দেয়? তখন তো 'দাস'-ব্যবসা শুরু হয়েছে।"

আমি বললাম, স্পেনের পটভূমিকায় বাঙালি 'দাস' কি বিশ্বাসযোগ্য?

—"হ্যাঁ, বিশ্বাসযোগ্য। তখন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসতে শুরু করেছে স্পেন-পর্তুগালের জলদস্যুরা। আমাদের দেশ থেকেও বহু লোককে ধরে নিয়ে গেছে সেই দস্যুর দল। তাদের কেনাবেচা করেছে বিদেশের বাজারে। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। বিদেশের উপযোগী করে আমি তার নাম দিয়েছি গানোদা।"

জিজ্ঞেস করলাম, এ উপন্যাসটি লেখার কথা আপনি কখন থেকে ভাবতে শুরু করেন?

প্রেমেনবাবু উত্তর দিলেন, "পাঁচ বছর।" তারপর একটু ভেবে বললেন, "ইতিহাস আমার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। ভূগোলও। ইতিহাস সম্পর্কে আমি প্রায় সারা জীবন ভেবেছি, চিন্তা করেছি, পড়াশোনা করেছি। এখনো করি।"

এবার আমার মনে একটি বেয়াড়া প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করলাম, সূর্য কাঁদলে সোনার ওপর অন্য কারো প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন কি?

বোধ হয় তিনি এমন একটা প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন না। তবু বিরক্ত না হয়েই বললেন, "অনেকে তো বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর স্কটের প্রভাব আছে বলে মনে করেন। হয়তো আছে। বঙ্কিমবাবু দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে স্কট না পড়লেও ভাবগত মিল থাকতে পারে। ইংরেজীতে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক ওয়াল্টার স্কট এবং ফরাসীতে (পরবর্তীকালে) আলেকজান্ডার দ্যুমা। আমি যখন গদ্য ঢঙের কবিতা লিখতে শুরু করি, তখন অনেকেই আমার মধ্যে ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু অনেক পরে, আমি হুইটম্যান পড়েছি এবং অনুবাদ করেছি।"

এবার আমি প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে অন্যভাবে বললাম, এ ধরনের বিশ্ব-পটভূমিকায় আর কেউ উপন্যাস লিখেছেন কি?

প্রেমেনবাবু বললেন "না। অন্তত আমার জানা নেই। বোধহয় পৃথিবীতেও এ ধরনের লেখা আর হয় নি। আমার উপন্যাসে যেমন ঘনশ্যামের মতো কাল্পনিক চরিত্র আছে, তেমনি কৌতুককর ঐতিহাসিক কিংবা অনৈতিহাসিক চরিত্র আছে জি এইচ কোল্টার এবং জনাথ ভারাজের উপন্যাসে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে এখন অনেকেই অবশ্য ইতিহাসের কাহিনী লিখেছেন। ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে জানেন য়ুরোপের সাহিত্যিকরা। জার্মান ভাষায় ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে যা লিখেছেন, তা জিটেল-এ কারেক্ট। বিশেষ তাঁর লেখায় তো লেপোলিয়নের যুগ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।"—তারপর ভেবে বললেন, "বিস্তৃত, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশ করতে না পারলে, সজীব করে তুলতে না পারলে ইতিহাসকে ধরা যায় না। কারণ, ইতিহাস তো কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার নয়, কিংবা কয়েক বছরেরও নয়। সে জন্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ঘটনাবহুল, জটিলতাপূর্ণ এবং বিস্তৃত।"

জিজ্ঞেস করলাম, ইদানীং তো বাংলা-ভাষায় প্রচুর ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হচ্ছে। আপনি সেগুলি পড়েন কি?

প্রেমেন্দ্রবাবু বোধ হয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছিলেন না। তিনি বললেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা সোজা নয়। ইতিহাসের কতকগুলি নাম-ধাম জোগাড় করতে পারলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় না। লেখককে সে জন্যে সেই কালের উপযোগী হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। সেই কালের মানুষের আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, রুচিপ্রবৃত্তি, সংস্কার ও আবেগ, শিল্প ও সাহিত্য—সবই যেমন জানা চাই, তেমনি একালের মনটা সেকালের পটভূমিতে মানানসই করে তুলতে হবে। না হলে, সবই বৃথা। আসল কথা, প্রত্যেকের। একালের কলকাতাকে দেখে কি পঞ্চাশ কিংবা একশ বছর আগেকার কলকাতাকে চেনা যায়? সেকালের রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি, লোকজন, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই ছিল আলাদা রকমের। যিনি সেই-কালের উপযোগী করে নিজেকে তুলতে পারবেন না—তিনি ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে ব্যর্থ হবেন।"

এবার আমি প্রশ্নের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলাম। বলা উচিত, চেষ্টা করছিলাম। বললাম, আপনি তো এতো বড় উপন্যাস আর কখনো লেখেন নি। এ বই লিখতে গিয়ে আপনার ক্লান্তি আসে নি?

—"না। এ-উপন্যাসটি লিখে গেছি এক-নাগাড়ে। কখনো ক্লান্তি বোধ করিনি বা থামিনি। অমৃতে আমি উপন্যাসটি লিখেছি প্রায় এক বছর দশ মাস ধরে। কখনো কিস্তি খেলাপ করিনি। অথচ, এর আগে কতবার কত মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজে লেখা দিতে গিয়ে কিস্তি খেলাপ করেছি। লিখে উঠতে পারি নি। এ উপন্যাসটি সপ্তাহে সপ্তাহে ঠিক লিখে গেছি।"

তাতে কি আপনার অন্য লেখা ক্ষতি-গ্রস্ত হয়নি?

—"হয়েছে। বড় লেখায় হাত দিলে আমি অন্য কোন রকমের সিরিয়াস লেখা লিখতে পারি না। কবিতায় অবশ্য আটকায় না। কেননা তার প্রসেসটা চলতে থাকে ভেতরে ভেতরে। সময় এবং সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে কবিতা লিখে ফেলি। তবে, পাঠকের সঙ্গে দাবা খেলি পরাশর বর্মার কাহিনী লিখে।"

—সূর্য কাঁদলে সোনাকে আপনার জীবনের সবচাইতে প্রিয় ও পরিশ্রমী লেখা বলা যায়?

—"আমার সব লেখাই প্রিয়, সব লেখাই আলাদা ধরণের। কোনো একটি বিশেষ টাইপের লেখা আমি বেশী দিন লিখতে পারি না। যখন যেটা লিখেছি, সিরিয়াসলি লিখেছি। গল্প লেখার সময়ে যেমন, কবিতা লেখার ব্যাপারেও তেমনি।"

বললাম, আপনার এ উপন্যাসটি কি কারো মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে বলে আপনি জানেন? পাঠক-পাঠিকারা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেছে কি?

—"নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অমৃতে প্রকাশের সময় বেশীর ভাগটাই পড়েছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। তবে সবটাই পড়েছেন, প্রচুর খুশি। প্রথমে আমার বিশ্বাসই হতে চায় নি। আমি তো পাঠকদের লেখা লিখি না। ...

কিছুদিন বলতে বলতে বিদেশী নামও আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসবে। যাই হোক, এটা অনেকেরই ভালো লেগেছে। আমি তো প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতাম, আমার বইতো পড়বে দুজন—এক, আমি আর যে প্রুফ দেখবে।"

এবার আমার মনে কৌতূহল জাগলো, আপনার পরের বই কি? তাতে কি এ বইয়ের প্রভাব থাকবে?

—"গত পাঁচ বছর আমি এ উপন্যাসটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম—একথা সত্য। তবু পরবর্তী বইতে তার কোন প্রভাব থাকবে না। চিরকালই আমি নতুনভাবে লিখতে চেয়েছি। আজও চাই। ভাবছি, শীঘ্রই আরেকটি উপন্যাসে হাত দেবো। সেটা ফর্ম ও কনটেন্টের দিক থেকে একেবারে আলাদা রকমের। আকারে প্রকারেও বেশ বড় হবে।"

—অমৃতে প্রকাশের সময় কোনো গোলমাল হয়নি? কোনো ঘটনা?

—"না, তেমন কিছু হয় নি। তবে, একবার পৃষ্ঠা নম্বর দিতে ভুল হয়েছিল। বোধহয় ১৫৪ পাতার জায়গায় ১৫৫ লিখে তো আমি ম্যাটার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তখন চার পাতার লেখা বাদ যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পরে অবশ্য তা বাদ যায় নি। অমৃত আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করেছে।"

আমার শেষ প্রশ্ন, এ বইয়ের উপাদান আপনি সংগ্রহ করলেন কোত্থেকে? কি ভাবে? এ জন্য কি আপনাকে নতুন করে ইতিহাসের বই পড়তে হয়েছিল?

তিনি বললেন, "না নতুন ভাবে আমাকে বিশেষ কিছু পড়াশোনা করতে হয়নি। কেননা, ইতিহাসে তো আমার চিরদিনই সমান আগ্রহ। তবে, বহু পত্র-পত্রিকা, বই, প্রবন্ধ থেকে আমি এ-উপন্যাসের উপাদান সন্ধান করেছি। একবার রাশিয়া থেকে তিনটি বই আমি উপহার পাই, তাতেও আমি খানিকটা অংশ পেয়েছিলাম যা আমার খুবই কাজে লাগছিল। তাছাড়া চট করে বলা মুস্কিল, আমি কোত্থেকে কি পেয়েছি।" তারপর যেন অনেকটা ব্যস্ত হয়ে তিনি আমাকে দুটো ইংরেজী বই দেখালেন। বই দুটোর নাম 'হিন্দু আমেরিকা?' আর 'সন্স অব শোকিং অর্ফ'। প্রথমটি চমনলালের লেখা, দ্বিতীয়টি এরিক উলফ-এর। আমার আগ্রহ এবং কৌতূহল তখন পরিবেশ-বিস্মৃত। প্রেমেন্দ্রবাবুও তখন [illegible] মধ্যে বয়সের ব্যবধান ভুলে যাচ্ছিলেন। তিনি বলে যাচ্ছিলেন, পেরু অঞ্চলের সভ্যতার আদি অনাবিষ্কৃত ইতিহাস ও উপকাহিনী। সেখানকার আদিবাসীদের বিশ্বাস [illegible], সূর্য কাঁদলে নাকি সোনা ঝরে পড়ে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রচ্ছদচিত্র

একটি সুসভ্য ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেখানকার মানুষের চলাফেরা জীবনযাত্রা সমুদ্র-অভিযান প্রভৃতির কথা বলতে বলতে তিনি নিবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলেন। পাশের ঘর থেকে একটি মানচিত্রের বই নিয়ে এলেন। আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, সামুদ্রিক স্রোতের গতিপ্রকৃতি। সমুদ্রের নীল জল কিভাবে এঁকে-বেঁকে বিভিন্ন দেশের প্রান্ত ছুঁয়ে এক দেশকে অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত করছে। আমার চোখের সামনে তখন [illegible] পূর্ব প্রান্তের বিরাট পর্বত-মালা, আর উত্তরে হিমালয়ের পারে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আমি দেখেছিলাম, আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অসংখ্য দেশ আর মহাদেশের উপকূল। প্রেমেন্দ্রবাবু আমাকে বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন ইতিহাসের সেই যুগ-সন্ধিকালের মানুষের কাহিনী। তখন আমার মনে আর কোনো জিজ্ঞাসা নেই, আর কোনো প্রশ্ন নেই, একটি সময়ের ভেতরে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করছিলাম। আমার ভেতরে ইতিহাসের অসংখ্য শেকড় ছড়িয়ে যাচ্ছিল, আর জড়িয়ে যাচ্ছিল।

"সূর্য কাঁদলে সোনা" সত্যিই যুগ-সন্ধিকালের এক অনন্য ইতিহাস! এবং সে ইতিহাস প্রেমেন্দ্রবাবুর পক্ষেই লেখা সম্ভব।

—[illegible]

আগের ঘটনা

[চল্লিশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আজ প্রবীণ জহুরী [illegible]। আর সেদিনের প্রেমিক শর্মিষ্ঠা আজই দোকানে বেচতে এলেন অনন্য স্মৃতিজড়ানো ব্রাজিল থেকে আনা নীলমণির কণ্ঠহার। কিনেছেন একালের বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। নেকলেস বোম্বেতে ডেলিভারী দেবার কথা ছিল।...হঠাৎ [illegible] বদল। রাজস্থানেই কণ্ঠহার ডেলিভারী দিতে হবে—নয়া ফরমান। আর তাতে পাওয়া গেল রহস্যের আভাস, বোঝা গেল ফেউ লেগেছে। [illegible] আসানের ভার নিয়েই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র কুঁজোর ছদ্মবেশে হাজির হলেন রাজস্থানে, ভীম দত্তের বাংলোয়। নাম তার এখন গুল মহম্মদ, জবরদস্ত খানসামা। অখণ্ড আলাদাভাবেই এসেছে এই বাংলোয়। রহস্য ঘনীভূত। ভীম দত্তের পোষা হীরামন মারা গেছে ইতিমধ্যে। বাংলোর একটি দেয়ালে [illegible] দাগ, মারা গেছে একটি মানুষ, উধাও হয়েছে ভীম দত্তের পুরনো পিস্তল। হারিয়ে যাওয়া বুলেট দুটোর খোঁজ পাওয়া গেল। কেউ রিভের খালি টিনও পাওয়া গেল খেঁকি উপেনের কাছ থেকে। কলকাতা থেকে ফিরল ভীম দত্তের প্রিয় খানসামা মেহের খান। কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢুকতে না ঢুকতে তাকেও যেন কে গুলি করে হত্যা করল। রহস্য গভীর থেকে গভীরতর। পুলিশ এল। ছদ্মবেশী ইন্দ্রনাথের উপর সন্দেহ সবচেয়ে বেশি। বড় কঠিন পরীক্ষা। উতরোতে পারবে তো গুল মহম্মদ?

এমন সময় এ বাড়িতে কয়েকদিনের জন্যে থাকতে এলেন ন্যাচারালিস্ট অঘোর মল্লিক। খবর পাওয়া গেল ভীম দত্তের কলেজ-ছেঁড়া মেয়ে রূপসী সাহানা দেবীও আসছেন।]

কথাটা শেষ করা হল না। তারের অপর দিকে লাখোটিয়া তাড়ার তুবড়ির মত কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। অগত্যা আবার মাউথপিসে থাবা চাপা দিলেন দৈত্য। বললেন—"আচ্ছা তেলকামড়া জ্বালিয়ে তো। বলছে আসতে ওকে হবেই।"

"তাহলে আসতে দিন", প্রধান অমাত্যের মতই পরামর্শ দিল উপেন।

"ঠিক আছে। আটটায় আসুন।" বললেন ভীম দত্ত।

খেঁকি উপেন বেরিয়ে গেল। শক্তিশালী মোটর ইঞ্জিন ফুঁসে উঠল। শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। ঘরে ঢুকল অঘোর মল্লিক। স্নান সেরে, পাইপ ধরিয়ে তিলকগুনে বাবু সেজে এসেছে। আসর জমানো দুচারটে প্রশ্নও নিশ্চয় জিভের ডগায় মজুদ ছিল। কিন্তু বেরসিক যক্ষপতি পাত্তা দিলেন না। রেডিও নিয়ে বসলেন।

যথাসময়ে খাবার টেবিলে খাবার এল। অবাক হন অখণ্ড।

কেননা, কলেজ-ছেঁড়া মানিক বাড়ি আসছে। অথচ দুদণ্ডও তর সইল না ভীম দত্তর। শুধু তাই নয়। সাহানার খাবারের কোনো আয়োজনও দেখল না।

ব্যাপার কি? বিস্ময়ের বুদবুদ ক্রমশ ফুলতে থাকে অখণ্ডর অন্তরের অন্দরে। খাবার আয়োজন না হয় পরে হলে চলে। কিন্তু ঘরের আয়োজন? মেয়ে আসছে বাপের কাছে, অথচ তার থাকবার জন্যে ঘর ঝাড়পোঁছ করার হুকুম দিলেন না ভীমদৈত্য।

[illegible]

রেখে অঘোর মল্লিকও চুরুট ধরল। দুচারটে টান মেরে বলল আয়েশী গলায়—"সত্যিই, কেন যে লোকে মরতে শহরে থাকে। ইচ্ছে যাচ্ছে, বাকী জীবনটা এইখানেই কাটাই।"

প্রমাদ গনল অখণ্ড। বারুদে আগুন লাগল বুঝি।

কিন্তু না। ভীম দত্ত যেন কিছু শুনতেই পেলেন না। নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। একদিকে রাখা কাকাতুয়ার দাঁড় খাঁ-খাঁ করতে লাগল। হীরামন নেই। কিন্তু তার আত্মা যেন হাহাকার করে ফিরছে আকাশে বাতাসে। মনটা খারাপ হয়ে গেল অখণ্ডর।

আটটা বাজল। মিনিট কয়েক পরেই একটা গাড়ি দাঁড়ানোর আওয়াজ ভেসে এল উঠোন থেকে।

অখণ্ড ভাবল, সাহানা এল উপেনের সঙ্গে।

কিন্তু ভীম দত্ত ভাবলেন অন্যরকম।

বললেন—"ডাক্তার এল। গুল মহম্মদ!" কুঁজো খানসামা আবির্ভূত হল। "ভদ্রমহিলাকে এখানে আনো।"

খটকা লাগল অখণ্ডর মনে। ভীম দত্ত কিরকম স্নেহময় পিতা? "এই বুঝি সাহানা এল"—এ ভাব তাঁর মধ্যে তো নেই-ই। উপরন্তু, গাড়ি না দেখেই দূর থেকেই তিনি বলেছিলেন, লাখোটিয়ার গাড়ি, সাহানার নয়।

অঘোর মল্লিক উঠে দাঁড়াল—"আমি চলি। [illegible] আপনার সঙ্গে, আমার [illegible]।"

[illegible]

"তাই নাকি?" অনেকটা বাঘের গজরানির মত শোনালো ভীম দত্তর গলা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল সকালেই আলাপ হয়েছে। বড় ভাল মানুষ।"

বলতে বলতেই আবির্ভাব ঘটল ডক্টর লাখোটিয়ার। স্নিগ্ধ হেসে দুহাত তুলে নমস্কার করলেন ভীম দত্তকে।

বললেন—"আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।"

"ধন্যবাদ," শীতলকণ্ঠ ভীম দত্তর। "অখণ্ডকে চেনেন?"

"আরে, কি ব্যাপার? আজকে গেলেন না তো?" যেন কতদিনের পরিচয়, এমনি গলায় বললেন লাখোটিয়া।

"খুব ব্যস্ত। বসুন না।"

বলে, নিজেই একটা চেয়ার এগিয়ে দিল অখণ্ড। ভীম দত্তর সৌজন্যবোধ মাঝে মাঝে কোথায় যে উবে যায়। তার উপর মেজাজ খিঁচরোলে তো রক্ষে নেই। যেমন এখন হয়েছে। ঠাণ্ডা চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন লাখোটিয়ার দিকে।

ধীরেসুস্থে বললেন ডাক্তার—"মিঃ দত্ত, জানি নিরিবিলিতে থাকা আপনি পছন্দ করেন। জেনেও উৎপাতের মত হাজির হলাম। অকারণে নয়। ব্যাপারটা সিরিয়াস।"

ভীম দত্ত কিন্তু পাহাড়ের মত অটল। মুখেও রা নেই।

লাখোটিয়া বললেন—"আপনার শান্তির কুঞ্জে সম্প্রতি যে অশান্তি ঘটল, আমি এসেছি সেই সম্পর্কে কিছু বলতে।"

পাহাড়ের গলায় এবার স্বর ফুটল। পাথরের মতই কঠিন স্বর—"অশান্তি বলতে আপনি—"

"মেহের খানের খুন হওয়াটা যে আপনার জীবনে কত বড় অশান্তি, তা আমি বুঝি, মিঃ দত্ত। মেহের আমারও প্রিয়পাত্র ছিল। আপনার সেবাও করেছে বহু বছর। সুতরাং খুনীকে ধরবার চেষ্টার কোনো ত্রুটি যে রাখছেন না, তা আমি জানি।"

"তা ঠিক। চেষ্টায় কোনো ত্রুটি নেই," তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন ভীম দত্ত।

"আমি যা বলতে এসেছি, মেহের খানের খুনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, সে বিচার পুলিশের। আপনি চাইলে এ কাহিনী পুলিশকেও বলতে পারেন।"

"আপনার কাহিনীটা আগে শুনি।"

"শনিবার সন্ধ্যার দিকে আমার আস্তানায় একটা লোক এসেছিল। নাম বলল বাসুকি ব্রহ্ম। আসছে কলকাতা থেকে। ব্রনকাইটিসে ভুগছে। আমি কিন্তু রোগের কোনো লক্ষণ দেখলাম না। তা সত্ত্বেও বখন থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করল, একটা কেবিন দিলাম তাকে।"

"তারপর?"

"রবিবার রাত্রে—মেহের খুন হওয়ার আগেই—একটা বিরাট গাড়ি হাঁকিয়ে কে যেন এল আমার ডেরায়। হর্নের আওয়াজ [illegible] গাড়ির [illegible]। লোকটা [illegible]

খ্ুঁজছিল। চাকর গিয়ে মিঃ ব্রুককে ডেকে আনল। দুজনে কিছুক্ষণ কি খোঁজ করল। তারপর গাড়িতে উঠে বসল মিঃ ব্রুক। গাড়ি গেল এইদিকে।"

"বেশ?"

"বাসুকি ব্রুককে তারপর থেকে আর দেখিনি। একটা সুটকেস কেবিনে ফেলে গেছে। জামা-কাপড়ে ঠাসা। সুটকেস নিতেও আর আসেনি।"

"আপনার বিশ্বাস, মেহেরকে সে-ই খুন করেছে?" ভীম দত্তর কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস।

"আমি কিছুই বিশ্বাস করি না। কার সঙ্গে কার যোগাযোগ, তা আমি কি করে জানব বলুন। আমি এলাম শুধু আপনাকে বলতে। কারণ পুলিশ এখন আপনার কাছে যাতায়াত করছে। খবরটা আপনিই ওদের দিয়ে দেবেন। দরকার মনে হলে বাসুকি ব্রুকের সুটকেশ দেখে যেতে পারে।"

"অলরাইট। আমি বলব'খন। যদিও আমার মনে হয়—"

"থ্যাংকিউ।" হাসল ডাক্তার। "আপনার অভিমত আমি জেনে কি করব বলুন," বলে উঠে দাঁড়াল। "চলি। উৎপাত করে গেলাম। দুঃখিত।"

"না, না, সে কি কথা," বললেন ভীম দত্ত। "কে জানে আপনার দ্বারাই হয়ত শেষকালে খুনী ধরা পড়বে।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক," সৌম্য হাসির ফাঁক দিয়ে বিদ্রূপ শর নিক্ষেপ করে অন্য কথায় চলে গেলেন লাখোটিয়া। "গোলাম হোসেন আছে কিরকম? বেচারী একের নির্বান্ধব হল।"

"গোলাম হোসেন আগেই মারা গেছে," বললেন ভীম দত্ত।

"সেকী! গোলাম হোসেনও মারা গেছে," ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছুক্ষণ গেল। তারপর যেন আপন মনেই বললেন লাখোটিয়া—"ভাল সময়ে এসেছি বটে। মনে থাকবে। আপনার মেয়ে আসেনি?"

"না," এক অক্ষরেই জবাব সারলেন ভীম দত্ত। বাড়তি একটা কথাও বললেন না।

"বড় ভাল মেয়ে।"

"থ্যাংকিউ। চললেন নাকি? দাঁড়ান, গুল মহম্মদ এগিয়ে দেবে।"।

"দরকার হবে না," বলে উঠল অখণ্ড। "আমিই এগিয়ে দিচ্ছি।" বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে আসবার সময়ে দেখল ইয়া মোটা একটা কেতাবে নাক ডুবিয়ে বসে রয়েছে অঘোর মল্লিক। উঠোনে নেমেই লাখোটিয়া ঘুরে দাঁড়ালেন।

"একটা চীজ!"

"কে?" অখণ্ড বলল।

"ভীম দত্ত। বুকের ভেতরটা কাছিমের খোলার মত শুকনো খটখটে। পোষা কুকুর মরলেও মন খারাপ থাকে। আর এ তো একটা জলজ্যান্ত মানুষ। অথচ কেমন নির্বিকার। পাষাণ বলে পাষাণ!"

"এঁরই নাম ভীম দত্ত। মেহের খানুম্‌ কাছে একটা পোকার সামিল।"

"পুলিশ এলে উনি না বলুন, আপনি [illegible] তো যা বললাম?"

[illegible] করল অখণ্ড। বলল—"মেহেরের খানের হত্যাকারীকে জালে ফেলবার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা ভীম দত্ত কিন্তু করছেন না।"

"তবে কে করছে?"

চুপ করে রইল অখণ্ড।

লাখোটিয়া বললেন—"বুঝেছি। ঠিক আছে, তেমন বুঝলে বাসুকি ব্রুকর ব্যাপার পুলিশকে নাও বলতে পারেন। ভাগ্যতারা আপনার কপালে জ্বলজ্বল করুক, এই কামনাই করি। চললাম।"

গাড়ি ফটক পেরোতেই বসবার ঘরে ফিরে এল অখণ্ড। যক্ষপতি আর ন্যাচারালিস্ট ছিলেন সেখানে। অখণ্ডকে দেখেই বললেন টাকার কুমীর—"ঢাকবাজানী স্ত্রীলোক।"

ঠোঁটকাটা অখণ্ড বলল—"কিছু মনে করবেন না। আপনার টাকার পাহাড় দিয়ে দুনিয়ার ভাল আপনি যা করেছেন, তার অনেক বেশি উনি করেছেন ওঁর দুটিমাত্র হাত দিয়ে।"

"অতএব উনি লাইসেন্স পেয়ে গেলেন যখন-তখন আমার ওপর চড়াও হওয়ার," ব্যঙ্গকঠিন স্বর ভীম দত্তর।

মুখের মত জবাব জিভের ডগায় এসে গেছিল। সামলে নিল অখণ্ড। আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই। হাওয়া এমনিতেই গরম।

ঘড়ি দেখল অখণ্ড। নটা বাজতে পনেরো। উপেন আর সাহানার কোনো পাত্তাই নেই। ব্যাপার কি?

দশটা বাজল। উঠে পড়ল অঘোর মল্লিক। মরুভূমির তোফা হাওয়া সম্পর্কে ছেঁদো মন্তব্য করে লম্বা দিল নিজের ঘরে। দশটা বেজে ঠিক পাঁচ মিনিটের সময়ে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। উঠোনে ব্রেক কষল ভীম দত্তর পেল্লায় গাড়ি। কাঠ হয়ে বসে রইল অখণ্ড। অসহ্য উৎকণ্ঠা।

কাঁচের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল, না, সাহানা নয়, উপেন নন্দী। একা।

ভীম দত্তকে একটি কথাও বলল না উপেন। ধপ করে বসল আরামকেদারায়। থমথমে আবহাওয়া স্নায়ুর ওপরেও চেপে বসতে লাগল।

কাঁহাতক মুখ বুজে বসে থাকা যায়? অখণ্ড গলাখাঁকারি দিয়ে বলল—"কাজ হল?"

"হ্যাঁ।" নিরস কণ্ঠ উপেনের।

"চললাম। ঘুম পাচ্ছে," বলে উঠে পড়ল অখণ্ড। ঘরে পৌঁছে শুনল কলতলায় জলের আওয়াজ। শাওয়ার খুলে স্নান করছে অঘোর মল্লিক।

নতুন ঘ্যাচড়া পড়ল। নিরিবিলিতে দুটো কথা বলাও আর যাবে না।

আলো জ্বালতেই পা টিপে টিপে দোরগোড়ায় দর্শন দিল কুঁজো খানসামা। মুখে আঙুল চাপা দিয়ে [illegible] দেখালো অখণ্ড। তারপর [illegible] ঘরের একপ্রান্তে গিয়ে নিম্নকণ্ঠে শুধোলো—"সাহানা [illegible] কোথায়?"

"[illegible] আলো বাড়ল।" [illegible] করল ইন্দ্রনাথ।

"চারঘণ্টা ধরে কি [illegible] করে এল উপেন বেটা?"

"মরুভূমির হাওয়া [illegible] চাঁদের আলো দেখল।" হাসল ইন্দ্রনাথ।

"গাড়ি বেরোনোর আগেই মাইল মিটার দেখেছিলাম। ফিরে আসার পর আবার দেখলাম। চারঘণ্টায় মোট বাহাত্তর মাইল গাড়ি হাঁকিয়েছে উপেন। অথচ এখান থেকে স্টেশন যেতে আসতে মাইল পনেরোর বেশি লাগা উচিত নয়।"

"আপনি একটা জিনিয়াস," সপ্রশংস দৃষ্টি অখণ্ডর।

"আরও আছে। উপেন এমন একটা জায়গায় গেছিল যেখানকার মাটির রঙ লাল। এই দ্যাখো।" বলে কাগজে মোড়া খানিকটা লাল মাটির গুঁড়ো দেখাল কদাকার কুঁজো।

"কোত্থেকে পেলেন? চাকায়?"

"তোমার মুণ্ডু। চাকার মাটি কোনকালে বালিতে ঝরে গেছে। এ মাটি পেলাম অ্যাকসিলেটরে। জুতোর শুকতলায় ছিল। তাই অ্যাকসিলেটরেও লেগেছে। লালমাটি আছে। ধারে কাছে এমনি জায়গা দেখছো?"

"উহুঁ।"

"তাহলে হেঁয়ালি আর একটা বাড়ল।"

"আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। অ্যালজেবরা আমার কাছে বিভীষিকা ছিল। কারণ তার মধ্যে হেঁয়ালি ঠাসা। এখন দেখছি অ্যাডভেঞ্চারেও হেঁয়ালি। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

আচমকা দরজার কড়া নড়ে উঠল। কে যেন অতি সন্তর্পণে কড়া নাড়ছে। বেশি শব্দ করতে চাইছে না।

সাঁৎ করে গুল মহম্মদ সরে গিয়ে বিছানার চাদর পাততে লাগল। দরজা ভেজানোই ছিল। ঠেলা মারতেই আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে গেল।

ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ালেন ভীম দত্ত স্বয়ং।

"আপনি?" অখণ্ড বাস্তবিকই বিস্ময়াবিষ্ট।

"চুপ!" মুখে তর্জনী চাপা দিলেন ভীম দত্ত। মার্জারের মত লঘু চরণে ঘরে প্রবেশ করলেন। গুলমহম্মদকে আঙুলের ইঙ্গিতে ঘর থেকে বার করে দিলেন। পা টিপে টিপে পৌঁছোলেন কলতলার দরজায়। পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। অঘোর মল্লিকের ঘরে যাওয়ার দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলেন খুব আলতো করে। তারপর এঘরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বললেন;

"আস্তে কথা বলবে। তোমার বাবাকে টেলিফোন করেছিলাম। এক্স-রে বলে একটা লোক কাল বিকেলে জয়পুর পৌঁছোচ্ছে [illegible] নিয়ে।"

[illegible]—

"[illegible] এখানে এসে [illegible]"

[illegible]

[illegible] প্রকাশ না পায়।"

"কিন্তু আপনি [illegible] তো—"

"আমার [illegible] অপ্তলো দামি জিনিস আমরা [illegible]। তুমি কাল সকালেই জয়পুর যাবে। এক্স-রে-কে বলবে বিকানীর মা এসে যোধপুরে যেতে। যোধপুরে বুধবার কাঁটায় কাঁটায় দুপুর বারোটার সময়ে স্টেট ব্যাংকের সামনে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। নেকলেস সেইখানেই ডেলিভারী নেব। তারপর হীরের হার নিরাপদে রাখার ভার আমার।"

"বেশ, যা বলেন।" হাসি ফুটল অখণ্ডর মুখে।

"কাল সকালেই গুলমহম্মদ তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে স্টেশনে। ট্রেনে যোধপুর যেও। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে বা বাসে করে বিকেলের আগেই জয়পুর পৌঁছোবে। স্টেশনেই এক্স-রে-কে বলবে যা বললাম। আর একটা কথা। এ প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে যেন প্রকা[illegible] না পায়। অঘোর মল্লিক তো নয়ই, এমন কি উপেনও যেন জানতে না পারে। বুঝেছো ?"

"বুঝেছি।"

"ফাইন! গুডনাইট।"

অতিকায় বন্য বেড়ালের মত লঘুচরণে ঘর থেকে উধাও হলেন ভীম দত্ত। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল অখণ্ডনারায়ণ।

মাথায় ছিট আছে নাকি লোকটার?

●

ভোর হল।...

কাঁচা হলুদের মত রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ল ধু-ধু বালুকাপ্রান্তরে।

মরুভূমিতে এসে অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছিল অখণ্ডর। কাক-পক্ষী ডাকার আগেই ঘুম ভাঙছে আজকাল। তাই সকাল-সকাল হাত মুখ ধুয়ে বসল ব্রেক-ফাস্ট টেবিলে। মন রইল কিন্তু অন্যদিকে।

সাহানা কি ফুসমন্তরে উবে গেল? ঢঙ্গী মেয়েটাকে দিব্বি টিট করা যেত। ডাটো বনাম ড্যাকরা—লড়াই মন্দ জমত না।

খাওয়া শেষ হল। আড়চোখে দেখল ভীম দত্ত উসখুস করছেন। কথাটা এবার পাড়া দরকার।

বলল অখণ্ড—"মিঃ দত্ত। একটা আর্জি আছে।"

"কি ?"

"এখনি বেরোতে হবে আমাকে। জয়-পুর যাবো বিশেষ দরকার।"

"যাও না।"

গুলমহম্মদকে বলে দিন, গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসুক স্টেশনে। আমি ট্রেনে যাবো।"

"ও, এই আর্জি। গুলমহম্মদ", গুলমহম্মদ [illegible] উঁচিয়ে দুহাতে লাটপট [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ভীম দত্ত। [illegible]

"কি বলছ ?" [illegible] ভীম দত্ত।

"চোপহর খাটছি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হেঁসেল ঠেলছি। তার ওপর গাড়ি চালানো। আমি কি টৰ্য্যাক্সি ড্রাইভার ?"

"হোয়াট ! জিভ ছিঁড়ে ফেলবো শুয়োর কোথাকার"। থর থর করে কাঁপতে লাগল ভীম-আঁচিল।

"ও-কে, ও-কে বস, আমি যাচ্ছি", রুদ্রমূর্তি দেখেই ঝপ করে নিভে গেল গুলমহম্মদ। কেঁচোর মত কুঁচকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পেছন থেকে মনে হলে যেন "হ্যাঞ্চ ব্যাক অভ নোতরদাম" ছায়া-ছবির কদাকার কুঁজো। চার্লস লটনের বিখ্যাত অভিনয়।

কিছুক্ষণ পর।

গাড়ি ফটক পেরুলো। বাংলো রইল পেছনে। হু-হু হাওয়ায় মনটা হাল্কা হল অখণ্ডর।

বেশ খানিকটা পথ আসার পর ভাঙা চশমার ফাঁক দিয়ে আড় চোখে তাকাল ইন্দ্রনাথ।

বলল—"জয়পুর যাওয়া হচ্ছে কেন ? নতুন গ্যাঁড়াকল মনে হচ্ছে ?"

"ধরেছেন ঠিক। বিগবসের হুকুম।"

"ভীম দত্ত পাঠাচ্ছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," বলে, গত রাত্রে ভীম দত্ত কি বলেছেন, তা রসিয়ে রসিয়ে বিবৃত করে খুব একচোট হেসে নিল। "দৈত্য-মশায় হুকুম যখন করেছেন, তখন এক্স-রে আর নেকলেস দেখে আসি।"

স্টিয়ারিং ছেড়ে দিল গুলমহম্মদ। দুহাত বুলিয়ে নিল কোমরে বাঁধা হীরের নেকলেসের ওপর।

অখণ্ড সকৌতুকে বলল—"আছে তো ?"

স্টিয়ারিং ধরে দাঁত বার করে হাসল গুলমহম্মদ।

"খুব যে শাঁখালুর মত দাঁত দেখিয়ে হাসছেন ? জানেন কাল ডকটর লাখোটিয়া এসে কি বলে গেছেন ?"

"কি ?"

"বাসুকি রহমই খুন করেছে মেহেরখানকে—উপেন নন্দী নয়।"

"খুলে বলো।"

খুলেই বলল অখণ্ড। গভীর রাতে আগন্তুকের আবির্ভাব এবং সেই গাড়িতে চড়ে রহস্য-বাংলো অভিমুখে রহমর অন্তর্ধান শুনে গম্ভীর হল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বলল—"এমনও তো হতে পারে, গাড়ির আগন্তুকই খুন করেছে মেহেরকে ? মরু-মঞ্চে মেহেরের আবির্ভাবের সংবাদ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে গেছে রহস্য-বাংলোয় ?"

"এই মরেছে! আমাকে জেরা শুরু করলেন দেখছি ? বলছি ধাঁধায় [illegible] আমার মাথা ঘুরছে।"

"না হে, তোমাকে এ খবর [illegible] নয়। [illegible] রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে। লোকটা কে ? কোত্থেকে এল ? কোথায় [illegible] ?"

"আমি জানি না। আস্তে চালান। বিকানীর এসে গেছে। এক কাজ করলে হয় না কি ?"

"ট্রেনের এখনো সময় আছে। এই ফাঁকে দাশরথীবাবুর ডেরায় ঢুঁ মেরে গেলে হয় না ? খবর পাওয়া যেতে পারে।"

"মন্দ বলো নি। চলো।"

গাড়ি চলল খবরের কাগজের অফিসের দিকে। পৌঁছোলো যথাসময়ে। তারপর যা খবর, জানা গেল, তা আরো রহস্যময়, দুর্বোধ্য, হেঁয়ালিভরা।

●

দাশরথী টেবিলেই ছিল। রেমিংটন সাহেবের অতি-পুরাতন একটা যন্ত্র নিয়ে প্রাণপণে খটাখট করছিল। ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ এবং সুদেহী অখণ্ডনারায়ণকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল।

●

"আসুন, আসুন। চা খাবেন, না, কফি খাবেন ?"

"ভাঁড়ের চা তো ?" হাসি হাসি চোখে বলল অখণ্ড।

"শুধু ভাঁড় নয়, হয়তো গুড়ও থাকতে পারে।"

"তাই আসুক।"

"মিস্ট্রি-বাংলোর নতুন নিউজ কি ?"

"হেডলাইন হচ্ছে ডকটর লাখোটিয়ার আবির্ভাব, সাব-হেডলাইন হল বাসুকি রহমই হত্যাকারী, তার পরের খবর হল ভীম দৈত্যর হুকুমে আমি জয়পুর যাচ্ছি," বলে ধীরে ধীরে সব বলল অখণ্ড।

ধুলোভরা টেবিলের ওপর তর্জনীর ডগা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে 'সাহানা' লিখল দাশরথী। তারপর ভালমানুষের মত মুখ করে বলল—"কি রকম বুঝছেন ?"

"কি রকম বুঝছি মানে ?" সন্দিগ্ধ কণ্ঠ অখণ্ডর।

"আহা বলছি, সাহানা যাঁর নাম, তিনি নিশ্চয় একটা মূর্তিমান রাগিণী। সময়টা কাটছে কেমন ?"

"রাগিণী, না, বাঘিনী। কিন্তু তিনি কোথায় ?"

"ও আবার কি কথা ! বলি, হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে তো?"

"ঠাট্টা নয়। সাহানা দেবীর আসবার কথা ছিল। কিন্তু আসেন নি তো।"

"কি বললেন ? আসেন নি ? তাহলে আমি কাকে দেখলাম ?" ঠাট্টার সুর মিলিয়ে গেল দাশরথীর কথা থেকে।

"কাকে দেখলেন মানে ?"

কাল বিকেলে যাঁকে ট্রেন থেকে নামতে দেখলাম স্টেশনে, উপেন নন্দী যাঁকে 'মিস দত্ত' নামে ডাকলো, নমস্কার করল, তাকে তো ভীম দত্তর মেয়ে বলেই মনে হল সুন্দরী, কিন্তু সারা শরীরে যেন ছুরির ঝলক।"

"আপনি সাহানাকে দেখেছেন," ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অখণ্ড। কিন্তু সে তো বাংলোয় পৌঁছোয়নি। উপেন [illegible] [illegible] ?"

(ক্রমশঃ)

আগামী সংখ্যায় 'সাহানা কোথায় ?'

শূন্য রাষ্ট্রপতি ভবন

নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনের শীর্ষে যে পতাকাদণ্ড রয়েছে সেখানে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত নিশান আর উড়ছে না। এই প্রথম ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন রাষ্ট্রপতিশূন্য হল। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথম মৃত্যু এসে রাষ্ট্রপ্রধানের আসন শূন্য করে দিল। মাত্র দিন দশেকের জন্য রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন তাঁর পাঁচ বছরের কার্যকালের প্রথম দু বছর পূর্ণ করে যেতে পারলেন না।

অত্যন্ত সহসা এই অভাবিত মৃত্যুর ছায়া গত ৩ মে তারিখে নয়াদিল্লীর ভবনকে ম্লান করল। সকাল বেলায় ডাক্তাররা এসেছিলেন রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করার জন্য ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম [illegible] করা ছিল। ডঃ জাকির হোসেন ডাক্তারদের অপেক্ষা করতে বলে বাথরুমে গেলেন। সেই যে তিনি গেলেন আর বেরোলেন না। যখন দরজা খুলে বাথরুমের ভিতরে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা গেল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী "হৃদযন্ত্রের উপর প্রচণ্ড আক্রমণে তিনি তিন মিনিটের মধ্যেই মারা যান। তাঁকে বাঁচাবার জন্য ডাক্তাররা যথেষ্ট চেষ্টা করেন সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।"

৭২ বছরের একটি সার্থক, নিবেদিত জীবন এইভাবে ফুরিয়ে গেল। পূর্ব-পুরুষের পরিচয়ে ডঃ জাকির হোসেন ছিলেন একজন আফ্রিদি। কবে তাঁর কোন পূর্বপুরুষ উত্তর-পশ্চিম থেকে এসে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ফারুকাবাদ জেলার ছোট শহর কায়েমগঞ্জে বসতি স্থাপন করেছিলেন সেটা পুরনো ও বিস্মৃত ইতিহাস; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস কখনই এ কথা ভুলবে না যে ডঃ জাকির হোসেন ছিলেন একজন মহান ভারতীয়, এই দেশের বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের জীবন্ত প্রতীক। ১৮৯৭ সালের [illegible] ফিদা হোসেন খানের তৃতীয় পুত্র জাকির হোসেন জন্মগ্রহণ করেন হায়দ্রাবাদ শহরে। জাকির হোসেনের বয়স যখন মাত্র ৮ বছর সে সময়ে তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর ১৪ বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান প্লেগ রোগে। ১৫ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন ১০ বছর বয়সের শাহজাহান বেগমকে। এটোয়া ও আলিগড়ে তিনি পড়াশুনা করেন। তিনি যখন আলিগড়ের ছাত্র সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে নিয়ে সেখানে এসেছিলেন। সেটা ১৯২০ সাল। পরবর্তী কালে ডঃ জাকির হোসেন বলেছেন, ঐ বছরই তাঁর জীবনের মোড় ফিরে গিয়েছিল। গান্ধীজী স্কুল-কলেজ বয়কট করে ছাত্রদের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য যে আহ্বান দিয়েছিলেন তাতে সাড়া দিয়েছিলেন জাকির হোসেন। কলেজ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। কি করবেন স্থির করে ওঠার আগেই ঘটনাচক্রে তিনি চলে গেলেন জার্মানীতে। সেখানে অন্যান্যদের মধ্যে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা) এ সি জি নাম্বিয়ার (সরোজিনী নাইডুর ভগ্নীপতি) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দেশে ফিরে এসে ডঃ জাকির হোসেন দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ভার নিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে, গান্ধীজী, ডঃ এম এ আনসারি প্রভৃতির সহায়তায় অর্থ-সংগ্রহ করে তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে স্বয়ংনির্ভর করে তুললেন।

আলিগড়ের যে শিক্ষার্থী একদিন গান্ধীজীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনিই নিজে শিক্ষাব্রতী হয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ১৯৩৭ সালে সর্ব-ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার ধারণা প্রকাশ করলেন। ডঃ জাকির হোসেন সাগ্রহে গান্ধীজীর পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিলেন।

মুসলিম লীগ ও তার নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার রাজনীতি যে সময়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং যে সময়ে জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলে পরিচিত গোষ্ঠীর অল্পসংখ্যক মানুষ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সন্দেহভাজন ছিলেন সে সময়ে ডঃ জাকির হোসেন ছিলেন একজন অবিচল জাতীয়তাবাদী, গান্ধীজীর ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে অটুট বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে যথেষ্ট। একবার একটি রেলওয়ে স্টেশনে একজন পুলিশ অফিসার যদি তাঁকে সময়মত দেখে চিনতে না পারতেন তাহলে তাঁকে হয়ত দাঙ্গাকারীদের হাতে প্রাণ দিতে হত।

স্বাধীনতার পর ডঃ জাকির হোসেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে যান। যে আট বছর তিনি সেখানে ছিলেন সে সময়টা ছিল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অত্যন্ত গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সময়। এইসব গোলযোগ মিটিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ডঃ জাকির হোসেনকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি বিহারের রাজ্যপাল ছিলেন। তারপর জওহরলাল নেহরুর পীড়াপীড়িতে তিনি উপরাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন। উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তিনি যে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেন তাতে সকলেরই প্রশংসা লাভ করেন।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর যখন কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে ডঃ জাকির হোসেনকে রাষ্ট্রপতির পদে দাঁড় করান হয় তখন সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, তিনি নির্বাচনে জিততে পারবেন কিনা। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীকোকা সুব্বা রাও পদত্যাগ করে ডঃ জাকির হোসেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন এবং বিরোধী দলগুলির সমর্থন পেলেন। এক লক্ষেরও বেশী ভোটে শ্রীরাওকে হারিয়ে দিয়ে তিনি ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনের জন্য যখন লড়াই চলছিল তখনই কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্রে লেখা হয়েছিল, ব্যক্তি হিসাবে ডঃ জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে তাঁদের কিছুই বলার নেই, তাঁদের লড়াই কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থীরূপে রাষ্ট্রপতির পদের জন্য দাঁড় করানোর নীতির বিরুদ্ধে।

ইদানীংকালে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কের প্রশ্নে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ জাকির হোসেন যদিও প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্র রাজ্য [illegible] প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হননি, [illegible] অনিবার্যভাবেই রাষ্ট্রপতি হিসাবে [illegible] এই বিতর্কের মধ্যে [illegible] হয়েছে। কিন্তু এটা [illegible] মত এমন একজন [illegible] মানুষ রাষ্ট্রপতি [illegible] রাজ্য-সম্পর্ক [illegible] হয়নি।

দ্য গলের পর

ফ্রান্সের জনগণের রায় স্পষ্ট : দ্যগলের সংস্কার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, একদা যিনি ছিলেন ফ্রান্সের পরিত্রাতা, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আধুনিক সংস্করণ বলে যাঁর খ্যাতি সেই চার্লস আন্দ্রে মরী জোসেফ দ্যগলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাঁর দেশবাসীর কাছে। সেই ১৯৪০ সালে জার্মানীর পদানত ফ্রান্সের বোর্দো শহর থেকে বিমানে লণ্ডনে উড়ে এসেছিলেন যে অখ্যাত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তাঁকে সেদিন ফ্রান্সের প্রয়োজন ছিল নাৎসীদের কাছে আত্মসমর্পণের লজ্জা থেকে ফরাসী জাতির গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য, ১৯৫৮ সালে যে-মানুষ ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ফ্রান্সের ভার নিতে প্রস্তুত এবং যাঁকে ডেকে সেদিন ফ্রান্সেও র[illegible] রাজপাট তুলে দিয়েছিলেন তাঁকে সেদিন ফ্রান্সের প্রয়োজন ছিল ঔপনিবেশিক বিদ্রোহের সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু আজকের ফ্রান্সে, যে ফ্রান্সে ৮০ লক্ষ শ্রমিক একসঙ্গে ধর্মঘট করে জীবন-যাত্রা অচল করে দেয়, যেখানে ছাত্ররা বিশ্ব-বিদ্যালয় অবরুদ্ধ করে দেয়, কৃষকরা ট্রাক্টর পথে নামিয়ে যান-বাহন অচল করে দেয়, সেখানে ৭৮ বছর বয়সের বৃদ্ধ দ্যগলের প্রয়োজন নেই। গত মে মাসে প্যারিসের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] যে [illegible] তাকেই [illegible]

বন্যের পরে পাঁচবার এই ধ্বনি নিয়ে তিনি দেশের মানুষের সামনে দাঁড়িয়েছেন এই বিশ্বাসে যে, দ্যগলহীন ফ্রান্স ফরাসীদের কল্পনার বাইরে। কিন্তু দ্যগলের যাদুও অফুরান নয়। 'আমার পর সর্বনাশ'—দ্য গলের এই কথার আর মানে নেই ১৯৬৮ সালের মে মাসের পর। কেননা, ফরাসীরা দেখেছেন, দ্যগলের ফ্রান্সও সর্বনাশের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব বিদায় দ্যগল। বিদায়, ফ্রান্সের পঞ্চম রিপাব্লিকের স্রষ্টা।

দ্যগল আজকের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সব চেয়ে জটিল চরিত্রের মানুষ। তাঁকে নিয়ে ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্রগুলির বিড়ম্বনার একশেষ হয়েছে। তাঁরই জন্য বৃটেন ইয়োরোপের বাজারে স্থান পায়নি, তাঁরই জন্য ন্যাটোর শক্তিজোট ঠুঁটো হয়ে গেছে, তাঁরই জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে বৃটিশ পাউণ্ড স্টার্লিং ও মহাশক্তিধর মার্কিন ডলার বার বার আঘাত খেয়েছে, তিনিই দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে মার্কিন বিরোধীদের ও ক্যানাডায় ফরাসীভাষীদের উস্কে দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী অ্যাটলান্টিক জোটের তত্ত্বের বিরুদ্ধে তিনি খাড়া করেছেন ফ্রান্সের প্রভাবাধীন ইউরোপীয় ঐক্যের তত্ত্ব। তাঁর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত নীতির কেন্দ্রে ছিল ফ্রান্স, তার অতীত গৌরব ও বর্তমান স্বার্থ। শার্লিমেন, চতুর্দশ লুই ও নেপোলিয়নের মত তিনিও ফরাসী জাতির জয়গৌরবের স্বপ্ন দেখেছেন। দীর্ঘদেহী, লম্বা-নাকা এই মানুষ ইদানীং কতকটা অবনত হয়ে পড়েছেন; কিন্তু তাঁর বাদশাহী মেজাজ একটুও নরম হয়নি। চোখে ভাল দেখতে পান না তিনি, [illegible]

রেখেছিলেন। ১৯৬৪ সালে যখন তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হয়েছিল তখন মেডিক্যাল বুলেটিন ১১ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছিল, যাতে তিনি নিজে বুলেটিনের বয়ান দেখে দিতে পারেন সেজন্য। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, "ব্যক্তিগত [illegible] জেনারেল চার্লস দ্যগলকে একবার [illegible] করে এনে বসাবার পর কে [illegible] তিনি শুধু চন্দ্রমল্লিকা প্রদর্শনীর [illegible] করেই খুশী থাকবেন ?"

দ্যগলের পর ফ্রান্সের চেহারা কি হবে? দ্যগলের স্ব-মনোনীত উত্তরাধিকারী জর্জ পম্পিদু (৫৭) হচ্ছেন, দ্যগলের নিজের ভাষায় "আজকের দিনের পোষাকে অষ্টাদশ লুই।" (নেপোলিয়নের পর ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ফিরে এলে অষ্টাদশ লুই রাজা হয়েছিলেন) একদা সাহিত্যের অধ্যাপক, তারপর সফল ব্যাঙ্কার, যুদ্ধ-পরবর্তীকালে দ্যগলের ঘনিষ্ঠ সহচর পম্পিদুর মধ্যে, বলাই বাহুল্য, দ্যগলের ব্যক্তিত্ব নেই। তাঁর মতামতও, যতদূর জানা যায়, দ্যগলের মত এমন প্রখর নয়। দ্যগলপন্থীদের পক্ষ থেকে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি নির্বাচিত হলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সঙ্গে ফ্রান্সের একটা নতুন বোঝাপড়ার পথ হয়ত উন্মুক্ত হতে পারে।

পম্পিদুর বিরুদ্ধে সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে একজন সর্বসম্মত প্রার্থী দেওয়ার যে চেষ্টা হয়েছিল সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মার্সাই শহরের সোস্যালিস্ট মেয়র [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কম্যুনিস্টরা দাঁড় করিয়েছেন প্রবীণ নেতা [illegible]।

সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি জন্মলাভ করল। বিশ্বশ্রমিক সংহতি দিবস ১লা মে জনসভায় কোলকাতা তথা ভারতের অধিবাসী শুনলেন : মহামানব লেনিনের পবিত্র জন্মদিবসে কম্যুনিস্ট বিপ্লবীরা নিজেদের দল "কম্যুনিস্ট পার্টি—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী" গঠন করেছেন। মনুমেন্টের পাদদেশে যখন নকসালী নেতা শ্রীকানু সান্যাল এই ঘোষণা করলেন তখন বিপুল অবিচ্ছিন্ন করতালি আর 'মাও-সে তুং জিন্দাবাদ', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

শ্রীসান্যাল বিশদভাবে নতুন দল গঠনের পটভূমিকা সেদিন ব্যাখ্যা করেন নি। অবশ্য তাঁর ছোট্ট একটি ঘোষণা সমস্ত তথ্য ও তত্ত্বকে জনতার সামনে সুস্পষ্টভাবে হাজির করেছিল। ঘোষণাটা এই : চীনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই দল গঠন করা হয়েছে। এবং প্রধান নেতা শ্রীচারু মজুমদারও দল গঠনে উৎসাহ দিয়েছেন।

সেদিন ময়দানের সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন কারও পক্ষে দলের বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হয় নি। কারণ সক্রিয় সমর্থক বা সভ্য যাঁরা ঐ সভায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা আগে থেকেই নতুন দলের প্রয়োজনীয়তা ও তাত্ত্বিক পটভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আর যাঁরা শ্রীসান্যালকে দেখবার জন্য মনুমেন্টের পাদদেশে ভিড় করেছিলেন তাঁরাও কেউ উত্তমকুমার-প্রেমিক নন। তথাকথিত নকসালবাড়ী আন্দোলনের হোতা শ্রীকানু সান্যালকে শুধু দেখবার জনাই আগ্রহে তাঁরা সমবেত হন নি। শ্রীসান্যাল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সূত্রকে প্রয়োগ করার কি নতুন কৌশল ও পথ ঘোষণা করেন তা শোনার জনাই সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে মনুমেন্টের পাদদেশে তাঁরা হাজির হয়েছিলেন।

শ্রীসান্যালের প্রথম সভা সুশৃঙ্খল [illegible] মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় নি। একদা যে [illegible] কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে [illegible] আন্দোলনকে [illegible] জন্য শ্রীসান্যাল ও তাঁর [illegible] সহকর্মীরা মিছিলে লড়াইয়ে একজোটে পাশ-চালনা করছেন, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে সেদিন সেই পূর্বতন কমরেডদের সঙ্গেই তাঁদের লড়াইয়ের মহড়া দিতে হয়েছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও নকসাল-পন্থীরা সেদিন অমিতবিক্রমে যেদিক থেকে ইট-পাথর আর কাঁদানে গ্যাস আসছিল সেদিকে ধাবমান হয়ে সাহসের অতুলনীয় পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয় আক্রমণকে প্রতিরোধ করে এমন কি প্রত্যাক্রমণ চালিয়ে বীরদর্পে মনুমেন্ট ময়দানের সভাকে অবশেষে অকুতোভয়ে সম্পন্ন করেছিলেন। রামায়ণের অহিরাবণের কাহিনী আজগুবি হতেও পারে। কিন্তু সেদিন নকসালপন্থী অহিরাবণের লড়াই-এর কায়দা দেখলে বুঝতে পারতেন 'রামায়ণ-কাহিনী'র নতুনভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

সে যা হোক, সেদিনকার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় পশ্চিম বাংলার উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তৃতা, এবং মনুমেন্ট ময়দানে শ্রীসান্যালের ভাষণ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। যে দিবসে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের বদলে যে লড়াই সংগঠিত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন যে, তিনি যদি চান তাঁর পুলিশকে কাজে লাগিয়ে এক-ঘণ্টার মধ্যে নকসালপন্থীদের খতম করে দিতে পারেন। শ্রীবসুর এই উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীসান্যাল ঐ উক্তিকে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের কণ্ঠস্বর বলে অভিহিত করেছেন। ক্ষমতা হাতে থাকলে এ হেন উক্তি যে স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসে এতে কোন সন্দেহ নেই। অতীতে ও বর্তমানে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এ হেন উক্তি করেছেন এবং এখনও করছেন। শ্রীবসুর একথা স্মরণ রাখা উচিত যে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে কোন দলকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। যদি তা করা যেত তবে কি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষের বুকে থাকতে পারতো? ভিয়েতনাম যখন [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] তখন তা মোটেই [illegible] নয়। [illegible] [illegible] [illegible] বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

অবশ্য শ্রীবসু [illegible] সঙ্গেই বলে-ছিলেন যে নকসালপন্থীদের রাজনৈতিক-ভাবে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। যাতে জনতাই নকসালপন্থীদের আখেরে শায়েস্তা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী খুবই ভাল। এবং এটা গণতান্ত্রিক। কারণ, গণতন্ত্রের মোদ্দা কথাটা হলো—একদল অপর দলকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে। অবশ্য শ্রীবসু জনতা থেকে নকসালীদের বিচ্ছিন্ন করবেন বলে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছেন, কিন্তু কিভাবে করবেন তার কোন হদিশ দেন নি। এই হদিশ নিরূপণের জন্য অপর একজন নকসালী নেতা শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য বলেছেন 'প্রমোদ-জ্যোতির ঠেঙাড়ে বাহিনী' নকসাল-বাদীদের জনতা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। দুই দলের নেতারাই সেদিন একে অপরকে সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল আখ্যায় ভূষিত করেছেন এবং একে অপরকে বিপ্লবের পরিপন্থী বলে গাল-মন্দও করেছেন। তাঁদের বক্তৃতা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তত কঠিন ও কঠোর সমালোচনা ধ্বনিত হয়নি। রামায়ণ, মহাভারতে গান্ধর্ব বাণের কথা উল্লেখ আছে। ঐ বাণ ছুড়লে নাকি শত্রু-পক্ষের মধ্যে বিবাদ লেগে যেত এবং নিজেরাই হানাহানি করে মরত। মনুমেন্ট ময়দান ও ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় সেদিন যেন সাম্রাজ্যবাদীরা গান্ধর্ব বাণ ছুঁড়েছিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় মার্কসিস্টরা যে কায়দা অবলম্বন করেছিলেন নকসালবাদীরাও তেমনি [illegible] আরম্ভ করে এখন [illegible] [illegible] [illegible] না।

তবে শ্রীচ্যবন যে উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হয় নকসালপন্থীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। যদি শ্রীচ্যবন সেইরকম কোন পন্থা গ্রহণ করেন, মার্কসবাদীদের ভূমিকা কি হবে তা আগে থেকেই বলা যায়। তাঁরা সভা-সমিতি করে শ্রীচ্যবনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করবেন, কিন্তু আন্দোলন সংগঠিত করে শ্রীচ্যবনকে গদীচ্যুত করবার জন্য এগিয়ে যাবেন বলে মনে হয় না। কারণ সতীনের ছেলেকে দিয়ে সাপ ধরানোই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে নিজের প্রাণের উপর কোন ঝুঁকি থাকে না। এই সুবর্ণ মার্গে যুগ যুগ ধরে বুদ্ধিমানরা বিচরণ করেছেন এবং এখনও যে করবেন এতে আর সন্দেহ কোথায়।

নকসালপন্থীরা মার্কসিস্টদেরই ভগ্নাংশ। কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার সময় যে সমস্ত অভিযোগ তোলা হয়েছিল প্রায় সেই সমস্ত অভিযোগ নকসালপন্থীরা পুনরাবৃত্তি করছেন মাত্র। নকসালপন্থীরা মনে করেন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত আর মার্কিস্টরা মনে করেন এখনও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্ব শেষ করতে হবে, এবং তারপরই সর্বহারার বিপ্লবের দিন আসবে। তাছাড়া সর্বহারার বিপ্লব করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। কিন্তু নকসালপন্থীরা মনে করেন সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবই মুক্তির একমাত্র পথ, তাই তাঁরা গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কথা বলেন। অর্থাৎ এক একটি এলাকায় সশস্ত্র কৃষকদের সংগ্রামের দুর্গ তৈরী হবে, আর সেই সশস্ত্র কৃষককুল শহরের দিকে যখন ধাবিত হবেন তখন মজুর শ্রেণী তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপ্লবী কর্মকান্ড সমাধা করবেন।

তাঁদের চিন্তাধারা যাই হোক, এদেশে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী যে নেই একথা বহুলাংশে সত্য। কারণ বর্তমান শ্রমিক আন্দোলন প্রায় মামলাবাজীতে পর্যবসিত হয়ে গেছে। শ্রমিকদের নিজস্ব দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংগঠিত করা গেলেও সমস্ত শ্রমিকের সাধারণ স্বার্থে সকলকে একত্রিত করে লড়াই করা এখনও সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা তাঁদের মাইনে আরও বাড়াবার কথা চিন্তা করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও কোন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ান না। হয়ত এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করেই নকসালপন্থীরা কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লবের কথা তুলেছেন। এবং তাঁদের এই চিন্তাধারাকে চীনের [illegible] সাহায্য করেছে [illegible] — আর [illegible] কথা [illegible]। ভারতবর্ষের [illegible] [illegible]

[illegible] হয় নি। কাজেই নকসালপন্থীরা এদেরই সংগঠিত করে বিপ্লবী কর্মকান্ড সমাধা করার পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। তাঁদের প্রকল্পকে রূপ দেবার জন্য নতুন কায়দায় তাঁরা দল পরিচালনা করবেন বলে স্থির করেছেন। তাঁদের দলীয় অফিস পরিকল্পিত "মুক্ত এলাকার" সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে তাঁরা নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবেন না। বর্তমানে তাঁদের যে খন্ড খন্ড সংগ্রাম চলছে—কেরালায়, পশ্চিমবঙ্গে কি ছিরিকুলামে তার মধ্যে নাকি একটি যোগসূত্র রয়েছে। কাজেই সংগ্রামের এলাকার সঙ্গে অফিস যুক্ত থাকলে কার্যত বিপ্লব সংগঠিত করার পক্ষে কোন অসুবিধা হবে বলে তাঁরা মনে করেন না।

অতএব, নতুন কায়দায় ও কৌশলে গড়ে তুলবে নতুন কম্যুনিস্ট পার্টি এক সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব। আর এই দলের আনুগত্য থাকবে চীনের প্রতি। আন্তর্জাতিকতা বিবর্জিত হলে কম্যুনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির রুশ আনুগত্য আছে। শুধু মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিই কি রুশ কি চীন কারও প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের কথা বলছেন না। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তাঁরা গুরুগিরি করার চেষ্টায় আছেন। কখনও রাশিয়াকে সমর্থন করছেন বা কখনও চীনা নীতির প্রতি প্রীতি দেখাচ্ছেন। আর তাই টিটো বা ডুবচেকের মতো তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত নতুন এক বৈজ্ঞানিক পথে চলছেন বলে দাবী জানাচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিচ্ছেদ আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু মনে হয় ভারতে কম্যুনিস্টরা চার শিবিরে বিভক্ত হতে চলেছেন। গোটা পৃথিবীব্যাপী প্রযুক্তি বিদ্যায় বিপ্লব আসার ফলে এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে উৎপাদনেও বিপ্লবের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। ফলে উৎপাদনের শক্তিগুলোর মধ্যে নতুন করে সম্বন্ধ সৃষ্টি হতে চলেছে। অন্যদিকে ধনবাদী সমাজব্যবস্থাও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কাজেই আগে যে সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে কেন্দ্র করে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হতো সেই সমস্ত উপাদান ক্রমশই লোপ পেতে সুরু করেছে। অতএব, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক দলকেই নতুন করে পারিপার্শ্বিকতার মূল্যায়নের উপর জোর দিতে হবে [illegible] সমাজব্যবস্থার [illegible] যে নতুন [illegible] [illegible]

এই সমস্ত প্রকৃতি ও আকৃতিগত পরিবর্তনের ফলস্বরূপ চিন্তাজগতে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। তাই অন্ধের শ্রীনাগি রেড্ডী পশ্চিম বাংলার কানু সান্যাল ও চারু মজুমদারের সঙ্গে সববিষয়ে সহমত হতে পারছেন না। দুজনেরই পরিপূর্ণভাবে চৈনিক প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও তত্ত্বগত বিষয়ে একমত হতে পারছেন না। [illegible] নকসালবাড়ীর হোতারা মার্কিস্ট কম্যুনিস্টদের বর্ধমান প্লেনামে থিসিস দেওয়ার অপেক্ষা না রেখেই নিজেদের সংগঠিত করছিলেন কিন্তু শ্রীনাগি রেড্ডি পাল্টা থিসিস রেখে তত্ত্বগত পার্থক্যকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু বর্তমানে যে কায়দা ও কৌশল অবলম্বন করে নতুন কম্যুনিস্ট পার্টি চলতে চাইছেন, শ্রীনাগি রেড্ডী তার সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। কারণ, তাঁরা মনে করেন ঐ পথে চললে নতুন দলকে ক্রমেই চে গেভরার কৌশলে গেরিলা যুদ্ধ করেই বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের পারিপার্শ্বিকতায় তা সম্ভব নয় বলে অনতিবিলম্বে নতুন দল জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুষ্টিমেয় এডভেঞ্চারিস্টরূপে পরিগণিত হওয়ার আশংকা সমধিক। শ্রীনাগি রেড্ডী তাই পন্থাগত ও কৌশলগত দিক থেকে শ্রীকানু সান্যাল ও শ্রীচারু মজুমদার থেকে ভিন্নমত পোষণ করছেন। ফলত, শ্রীনাগি রেড্ডীর সমর্থকরাও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আর একটি কম্যুনিস্ট দল গড়বার প্রয়াস পাচ্ছেন। শ্রীনাগি রেড্ডী যে পথের কথা বলছেন সেই পথেরও আবেদন আছে। এবং সেই পথকে অবলম্বন করে শ্রীরেড্ডী যদি দলের পত্তন করতে পারেন তবে মার্কিস্ট পার্টিতে আরও ভাঙনের সৃষ্টি হবে। সেই ভাঙনের প্রতিক্রিয়া এখন বোঝা যাবে না। কারণ মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তি যে দুটি রাজ্যে বেশী সেখানে দল গদীয়ান। ফলত, নতুন নতুন 'কম্যুনিস্ট' দল ভাঙ্গি হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতাচ্যুতি ঘটলেই নিন্দা প্রকাশ পাবে। আগে ঠিক তা ধরা পড়বে না। কাজেই চতুর্থ কম্যুনিস্ট পার্টি যদি গঠিত হয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। এবং সংখ্যা যদি আরও বাড়তে থাকে তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কি থাকবে? কারণ, মানুষের চিন্তাশক্তি বাড়ছে—জলে স্থলে এমন কি অন্তরীক্ষে সর্বত্রই প্রাকৃতিক নিয়মে নয়—বিধাতার মহোত্তম সৃষ্টি মানুষের প্রচেষ্টায় বিপ্লব ঘটছে। কাজেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব হচ্ছে, আর তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দল ভাঙছে, ভাঙবে অর্থনীতির বনিয়াদ আর সমাজ। অন্যের [illegible] যেন সেই [illegible]।

—[illegible]

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[শহুরে যুবক বিকাশ। ব্যাঙ্কের কর্মী। প্রমোশন নিয়ে এল পাড়াগাঁর আপিসে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্কবাবুর বাড়ি। চারদিকে জীর্ণতার গন্ধ; ধ্বসে পড়া বাড়ির মিছিল।

গ্রাম-বাঙলা সম্পর্কে ছিল তার রোমান্টিক আমেজ। কয়েক দিনেই চিড় ধরল তাতে। বদলে গেল চেহারা। দেখল শুধু বিবর্ণতার ম্লান আলো, তেতো স্বাদ। অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়ে দিল গ্রামের নানান চরিত্রের মানুষ। শশাঙ্ককাকাকে ঘিরেও রহস্যের জোনাকি।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। মনীষার দ্বিতীয় উপস্থিতি।

বিকাশ দেখল গোটা সমাজে ঘুনপোকা। চারদিকে ক্ষোভ আর ক্রোধের দাপাদাপি। মূল্যবোধ সব বিপর্যস্ত। এরই শিকার মনীষা, সোনালি আরো কত কে। খেটে মরছে মনীষা। সংসারের জন্যে ফুরিয়ে যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু করে। চোখের সামনে যেন আলো নেই। কেমন নিরুপায়।

সোনালির প্রতিও এক ধরনের মমতা। বিকাশের অস্তিত্বে আলোড়ন। শাঁখের করাত। মুখোমুখি দাঁড়াল নিজের।

দু'দিনের ছুটি নিয়ে এল কলকাতা। মনীষা আর বিকাশ। মাঝে অন্ধ পাঁচিল। ভাঙতে চাইল তা। বিকাশ মরীয়া। প্রস্তাব দিল বিয়ের। অন্ধগলিতে যেন কড়া নাড়ল। পরের দিন সিনেমায় যাবে ওরা। মনীষা আর বিকাশ। একটু ঠান্ডা হাওয়া যেন। সময় মাফিক আবার ফিরে এল বিকাশ নিয়োগী পাড়ায়। ট্রেনের মধ্যেই স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী কানাই পালের আরেক চেহারার দেখা পেল অচেনা যাত্রীর কণ্ঠে। নিয়োগীপাড়ায় ঢুকেই আলোর ফুলঝুরি। সুনুকে মনে পড়ল। সুনু-সুবর্ণা-সোনালি।

॥ পনেরো ॥

'শ্মশান ভালোবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি—'

উৎকট গলায় প্রচন্ড চিৎকারে শ্যামা-সংগীত। চকিত হয়ে বিকাশ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা বুড়ো জামরুল গাছের তলায় মেজদা বসে। সেখান থেকেই চলছে তার সংগীত-চর্চা।

'শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি—'

জামরুল গাছটায় অজস্র লাল পিঁপড়ে। তারই গোটাকয়েক ঘুরছে মেজদার গায়ে, তার চুলে দাড়িতে। কিন্তু বিন্দমাত্রও ভ্রুক্ষেপ নেই। সমান উৎসাহে চলছে গানটা।

কিন্তু দু লাইনের পরে আর এগোল না। এর পরে খানিক ইংরিজি আবৃত্তি। সেটা থামতে না থামতে আর এক প্রস্থ চিৎকার : 'চলে আয়—চলে আয়—'

কাকে এমন সমাদরের সঙ্গে ডাকাডাকি।

চোখে পড়ল মেজদার হাতে এক টুকরো রুটি। সেইটে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে সে। আর এক মনে ডেকে চলেছে—'আয়—চলে আয়—'

কাকের দল কাছাকাছি ছিলই। নেমে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। রুটির টুকরো নিয়ে উড়ে গেল কেউ কেউ, কোনো কোনোটা আবার উৎসাহের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে মেজদার দিকে এগোতে লাগল।

বেশ আছে লোকটা।

জানলা থেকে সরে আসতেই ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ছুটে এল মিতান্তকুমার নিয়োগী। হাতে গায়ে এক রাশ কালি। মুখেও লেগেছে খানিকটা।

'ব্যাপারটা কী নিয়োগীমশাই? এই সাতসকালে কালি মেখে প্রসাধন হচ্ছিল নাকি?'

উত্তর এল : 'মেজদি মারবে।'

'এই রকম সেজেছো বলে? তাতে মেজদির বলবার কী আছে? তোমার যদি মনে হয়ে থাকে যে এতেই তোমাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, তাহলে আইনত তোমার মেজদির প্রতিবাদ করবার কিছু নেই।'

সত্যিই বেশ দেখাচ্ছিল। ফুলো ফুলো ফর্সা গালের ওপর দিব্যি খোলতাই হয়েছিল কালির দাগ। যাকে বলে কনট্র্যাসট।

কিন্তু মিতান্তকুমারের পরের কথাটাতেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

'আমি মেজদির কালি ফেলে দিয়েছি।'

'আঁ—এটা তো ভালো খবর নয়।'

তৎক্ষণাৎ মেজদির প্রবেশ আর মিতান্তকুমার পত্রপাঠ বিকাশের পেছনে।

'বুড়ো, এদিকে আয়।' —কড়া গলায় ডাকল সুনু।

'না তুমি মারবে।'

'নিশ্চয় মারব।' —সুনু অভয় দিলে, 'আমার বই-খাতায় কালি ঢেলে দিয়েছ? তোমার কান দুটো যদি ছিঁড়ে না নিই, তা হলে—'

সুনু এগিয়ে এল এক পা, বুড়ো দু-হাতে জড়িয়ে ধরল বিকাশকে।

বিকাশ বললে, 'ও এখন আমার আশ্রিত। কিছু বলতে পারবে না।'

'আশ্রিত?' —সুনু রাগ করে বললে, 'আশ্রয়ে কতক্ষণ থাকবে সে আমি দেখব। খিদে পাবে না একটু পরে? চান করতে হবে না?'

'ততক্ষণে তোমার রাগ পড়ে যাবে।'

সুনু হেসে ফেলল এবার।

'আপনি জানেন না—কী ভীষণ পাজী। এক দোয়াত কালি ঢেলে আমার বই-খাতা সব শেষ করে দিয়েছে। বেরো বলছি বাঁদর কোথাকার। আমার পড়ার টেবিলে কী দরকার তোমার?'

'তোমাকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। বই-খাতায় কালি পড়লে বিদ্যে বেশি হয়—' বুড়োর পক্ষ থেকে কৈফিয়ৎ দিলে বিকাশ।

'ঠাট্টা করবেন না বিকাশদা।' —হাসতে গিয়েও সামলে নিলে সুনু : 'সব সময় বই-পত্তর টেনে এমন উৎপাত করে যে কী বলব।'

'শোনো বালিকা।' —বিকাশ গম্ভীর-ভাবে বললে, 'তোমার নিজের শিশুকালেও এ-সব ভালো ভালো কাজের অনেক রেকর্ড আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কান দুটো তোমার

যথাস্থানেই রয়েছে দেখা যাচ্ছে, কেউ তাদের উপড়ে নেয় নি।'

'আমি কক্ষনো করিনি ও-সব।'

'সেটা যাচাই করতে গেলে কাকিমাকে সাক্ষী মানতে হয়। তার ফল তোমার পক্ষে খুব ভালো না-ও হতে পারে। অতএব সসম্মানে বুড়োকে ছেড়ে দাও।'

সুনুর চোখ দুটো চকচক করে উঠল কৌতুকে। তারপর ডাকল : 'বুড়ো, আয়।'

'তুমি মারবে?'

'মারব না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

বুড়ো বেরিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ল সুনুর হাতে।

'এবার?'

বিকাশ বললে, 'উঁহু, কথার খেলাপ চলবে না। আমি সাক্ষী আছি।'

সুনু হেসে ছেড়ে দিলে বুড়োর হাত। আর সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে উধাও হল সে। সুনু চেঁচিয়ে বললে, 'শিগগীর নীচে মা ডাকছে না লক্ষ্মীছাড়া ছেলে। হাত-মুখ ধুয়ে দেবে।'

একটু চুপ। বাইরের বাগান থেকে কাকের কোলাহল—মেজদা বোধ হয় এখনো খাওয়াচ্ছে তাদের। এই পুরোনো গন্ধে-ভরা বিমর্ষ বাড়িটাও এতদিনে তার অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সামনের পোড়ো মহলটার হতশ্রী চেহারা আর অস্বস্তি বয়ে আনে না, মেজদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে কিংবা তার এক-আধটা বেয়াড়া চিৎকার শুনলে এখন আর ধক করে ওঠে না বুকের ভেতরে। একটি পরিবার, তার সহজ দুঃখ-সুখের জীবন, ছেলে-মেয়ে নিয়ে শান্ত নির্বিরোধ কাকিমার সংসার—এর মধ্যে তো সকলে নির্ভাবনায় দিন কাটিয়ে দেওয়া চলে। সব বেসুরো হয়ে যায় শুধু একটি মানুষের জন্যে—শশাঙ্ককাকা! খুব তো একটা অভাব নেই তাঁর—পুকুর, জমি, ধান নিয়ে এই সহজ জীবনের মধ্যে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দিতে পারেন তিনি। কানাই পালেরা যত খুশি বড়ো হয় হোক, তাঁর তাতে কী আসে যায়!

কিন্তু—

'রচনা বইটা একেবারে শেষ করে দিয়েছে—' ব্যাজার মুখে সুনু বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিকাশ ডাকল।

'শোনো।'

দোরগোড়ায় সুনু ঘুরে দাঁড়ালো।

'তোমার জন্যে একটা সেতার তৈরী করতে দিয়ে এসেছি কলকাতায়। কয়েক দিনের মধ্যেই আসবে।'

চোখে-মুখে উৎসাহের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না সুনুর। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

'কী, খুশি হলে না?'

সুনু একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'কী হবে?'

'তার মানে?'

'আপনি তো বাসা খুঁজছেন। পেলেই চলে যাবেন।'

আবার সেই প্রশ্নটা। ভেতরে ভেতরে একটু সঙ্কুচিত হল বিকাশ, একটা অপরাধের ছোঁয়া লাগল কোথাও। মনে পড়ল, মশারিটা ফেলে দিতে এসে সুনু বলেছিল, 'দোহাই আপনার বিকাশদা, এ বাড়ী ছেড়ে আপনি চলে যাবেন না।'

আজ আর সে অনুরোধ করল না। নিজের মতো করে একটা কিছু বুঝে নিয়েছে সে। জেনেছে বিকাশ এ বাড়ীতে আর থাকবে না।

একটু চুপ করে থেকে বিকাশ বললে, 'বাসা করে চলে গেলেই বা কী! তোমাদের এখানে আসতে বাধা হবে কেন?'

সুনু হাসল।

'তখন আপনি আর সময়ই পাবেন না।'

'কেন পাব না? কী আমার এত কাজ এখানে?'

আবার একটু হাসল সুনু। তারপর—বিকাশকে সম্পূর্ণ চমকে দিয়ে কিশোরী মেয়েটি আশ্চর্য গভীর গলায় বললে, 'এ বাড়ী থেকে যে চলে যায়, সে আর ফিরে আসে না।'

হঠাৎ ব্যাঙ্কে আবির্ভাব হল কানাই-বাবুর।

'নমস্কার। অনেকদিন দেখা নেই।'

তটস্থ হয়ে বিকাশ বললে, 'নমস্কার, বসুন।'

চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে শব্দ করে বসলেন কানাইবাবু। সহজভাবে তিনি বসেন না—নিজের অস্তিত্বটাকে চারদিকে জানিয়ে দেওয়াই তাঁর চরিত্র। ছোট ব্যাঙ্কের কাউন্টারগুলোতে একটুখানি নীরব চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল—চশমার তলা দিয়ে একবার মিটমিট করে চেয়ে দেখলেন প্রিয়গোপাল।

কানাইবাবু বললেন, 'কি রকম চলছে আপনাদের?'

প্রশ্নটার অনেক রকম অর্থ হতে পারে। ব্যাঙ্ক, শরীর, জীবনযাত্রা। বিকাশ বললে, 'আজ্ঞে ভালোই।'

একটু হাসলেন কানাইবাবু : 'সেদিন কালীবাড়ীর মীটিং-এ আপনাকে দেখে-ছিলাম।'

বিকাশ বিব্রত বোধ করল। নিয়োগী-পাড়ার দলবলের মধ্যে শশাঙ্ককাকার পাশে বসে ছিল সে। কানাইবাবু তাকে তাঁর প্রতিপক্ষ ঠাউরে বসে আছেন কিনা কে জানে।

'আমার কোনো উৎসাহ ছিল না—কাকাই ডেকে নিয়ে গেলেন—কৈফিয়তের ভঙ্গিতে জবাব দিলে বিকাশ। আর বলেই তার খারাপ লাগল। কানাই পাল তার মনিব নন যে তাঁর কাছে তাকে এইভাবে জবাব-দিহি করতে হবে।

কানাইবাবু রুপোর কেস খুলে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'সে আমি জানি, আমাদের এ-সব ব্যাপারে আপনার কোনো ইন্টারেস্ট থাকবার কথা নয়। কিন্তু বেশ একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হল তো?' —সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আবার একটু হাসলেন : 'এর আগে আপনাকে কী বলেছিলুম, মনে আছে? কলকাতার থেকে আপনারা অনেক রকম স্বপ্ন দেখে থাকেন, কিন্তু বাংলা দেশকে চিনতে আপনাদের দেরী আছে। সে যাক—চোট-ফোট লাগে নি তো কোনোরকম?'

'আজ্ঞে না। কিন্তু এই রকম একটা ব্যাপার নিয়ে যে—'

বাধা দিয়ে কানাইবাবু বললেন, 'এ হল আপনাদের কর্পোরেশন-অ্যাসেম্বলির একটা মিনিয়েচার সংস্করণ। আমাদের গণ্ডি ছোট—প্রবেমও ছোট। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কাউন্সিলার কিংবা এম-এল-এদের চাইতে উদ্দীপনায় আমরা পিছিয়ে আছি। বীররসের নমুনাও তো দেখলেন। একদিন কষ্ট করে আসুন না পঞ্চায়েতের বৈঠকে। আরো কিছু অভিজ্ঞতা হবে।'

'মাপ করবেন, আমার উৎসাহ নেই।'

'দেখা দরকার মশাই, জানা দরকার। নইলে কল্পনার একটা বাংলা দেশকে গড়ে নিয়ে বসে থাকবেন, তাকে কখনো চিনতে পারবেন না। কলেজ তো কলেজ, স্কুল-কমিটির মীটিং-এ কী হয় ভাবতে পারেন? লোকাল পলিটিকস যে কী জিনিস যদি একবার ভালো করে টের পান তো আপনার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে।'

এমনিতেই নিঃশ্বাস আটকে আসছিল বিকাশের। কী দরকার তার লোকাল পলিটিকসে? এ-সব করবার জন্যে তো সে এখানে আসে নি। কেন কাকা তাকে জোর করে এ-সব বীভৎস মীটিং-এ ধরে নিয়ে যেতে চান, কেনই বা কানাইবাবু তাকে জড়িয়ে নিতে চান সব কিছুর সঙ্গে? অথবা এই হচ্ছে এঁদের চরিত্র, কিংবা গ্রামের রীতি, কলকাতার মতো কেউ এ-সব জায়গায় নিজেকে আলাদা করে — একান্ত করে নিয়ে থাকতে পারে না—ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় তার সব নোংরামির শরিক হয়ে যেতে হয়।

ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে বিকাশ চুপ করে রইল।

কানাই পাল কিছু বুঝলেন কিনা তিনিই জানেন। নিঃশব্দে সিগারেট টানলেন
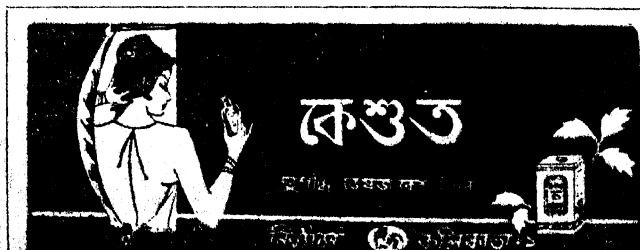
কিছুক্ষণ। তারপর : 'আমার পাশ-বইটা আপ-টু-ডেট করে দেওয়া দরকার। ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ণ দিতে হবে একটা।'

'নিশ্চয়।' —কাজের দায়িত্বে বিকাশ সচেতন হয়ে উঠল : 'কবে চাই বলুন।'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন।'

'কালকেই রেডি হয়ে যাবে। পাঠিয়ে দেব আপনাকে।'

'তার দরকার নেই, আমার লোক আসবে—' কানাইবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আচমকা বললেন, 'শুনেছি আপনি নাকি বাসা খুঁজছেন একটা।'

কথাটা কানাইবাবু কী করে জানলেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাও বিড়ম্বনা। কানাই পাল জানবেন না এমন একটা ঘটনা এখানে কিছুতেই ঘটতে পারে না। এমন কি, গাছের একটা পাতা খসলেও তাঁর কাছে খবর পেঁছোয়।

'ভাবছি।'

'যদি ইচ্ছে করেন—' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কানাইবাবু বললেন, 'আমি একটা খোঁজ দিতে পারি বোধ হয়। আমারই একটা বাড়ীতে দোতলায় খান-দুই ভালো ঘর খালি আছে—সংগে অ্যাটাচড বাথ। নীচে একটা গো-ডাউন রয়েছে কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

আস্তে বললেন না, কথাটা ছড়িয়ে গেল। বিকাশ একবার চেয়ে দেখল সামনের দিকে কাউন্টারে কুঁজো হয়ে বসে থাকা প্রিয়গোপালবাবু একবার সোজা হলেন, চোখ দুটো যেন মিটমিট করে উঠল তাঁর।

সংগে সংগে জবাব দেওয়া গেল না।

কানাইবাবু বললেন, 'আমি জানি, আপনার অস্বস্তিটা কোথায়। হয়তো শশাংকবাবু—'

এতক্ষণে একটা বিশ্রী ক্রোধে বিকাশের মাথার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। অর্থাৎ সে এখানে কেউ নয়। হয় কানাইবাবু নয় শশাংককাকা—এঁদের যে-কোনো একজনের মন জুগিয়ে চলতে হবে তাকে। ঠিক শাটল-ককের দশা—হয় এঁর র‍্যাকেটে নইলে ওঁর র‍্যাকেটে।

শুকনো গলায় বিকাশ বললে, 'আমি কোথায় বাসা ভাড়া নেব সে ভাবনা আমার। শশাংককাকার কী যায় আসে। আপনাদের দলাদলির মধ্যে আমি তো কোথাও নেই।'

'সে তো ভালো কথা।'—কানাইবাবুর চোখে চাপা কৌতুকের একটা ঝিলিক দেখা দিল : 'দরকার হলে বলবেন আমাকে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলব বৈকি।'

'আচ্ছা—নমস্কার—' কানাই বাবু বেরিয়ে গেলেন।

বিকাশ বসে রইল চুপ করে। সন্দেহ নেই—মানুষটি একটি চরিত্র। সেদিন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে তাকে গাড়ীতে তুলে-ছিলেন, নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের সেই বাগানবাড়ী কিংবা খামারবাড়ীতে। একে-বারে অন্তরংগ হয়ে গিয়েছিলেন বন্ধুর মতো, মদের গ্লাশ হাতে নিয়ে বিকাশকে শোনাতে শুরু করেছিলেন আত্মজীবনী। কিন্তু তারপরই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন স্বাভাবিক দূরত্বে—যেন সামাজিক পরিচয়ের অতিরিক্ত কোনো সম্পর্ক তাঁর আর তার সংগে নেই।

আসলে সে রাত্রিটা কিছুই নয়। কানাইবাবু এক-একদিন নিজের সংগে কথা বলতে চান। তখন বিকাশের মতো যে-কোনো একটা উপলক্ষ তাঁর দরকার।

বিরক্তিকর—সব কিছু বিরক্তিকর। কলকাতায় গিয়ে বিতৃষ্ণার মাত্রাটা আরো বেড়ে উঠেছে এবারে। মনীষা। ক্লান্তি। সিনেমা দেখাটার কোনো মানেই হয় না। মনীষার কাঁধের ঝোলায় একরাশ ওষুধপত্র। পেটের ভেতরে দুর্বোধ একটা চিনচিনে যন্ত্রণা—ডাক্তার বলেছে, স্টোন। হাইড্রান্টের ঢাকনাটার মতোই জীবনটা সিম্বলিক। চলতে চলতে রূঢ় নিষ্ঠুর সংঘর্ষ—নখ ফেটে রক্তারক্তি হয়ে যাওয়া। ভুতুড়ে নিয়োগীবাড়ী থেকেও জোর করে পালানো যায় না। কাকিমার বিষণ্ণ মুখ মনে পড়ে—সুনুর চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে।

অথচ, এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। খুব সহজ, খুব স্বাভাবিক হয়ে তার দিন-গুলো কেটে যেতে পারত। স্বাস্থ্যে ঝকঝকে হয়ে মনীষা এসে বলতে পারত : আমার সময় হয়েছে, এবার তুমি আমাকে নাও। যে-কোনো গ্রাম্য ভদ্র গৃহস্থের মতো শশাংককাকা স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করতে পারতেন, সুখী হতে পারতেন, একটি সুপাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন। অনেক টাকা আর মস্ত ব্যবসায়ের মালিক কানাই পাল গ্রামের রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে স্বচ্ছন্দে কলকাতায় গিয়ে আরো বড়ো প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তে পারতেন।

কিন্তু জীবনে সরলরেখা কোথাও নেই। অস্পষ্ট আলোয় উত্তর কলকাতার একটা সরীসৃপ গলির মতো সব—বাঁকে বাঁকে কোথা থেকে কোথায় চলেছে, যে পথ চেনে না—তার কাছে মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন!

বিকেলে বেরুতেই আজও সংগ নিলেন প্রিয়গোপাল।

স্যার, কানাই পাল বাড়ীর কথা বলছিল আপনাকে—না?'

ক্লান্তভাবে বিকাশ বললে, 'হুঁ।'

'যাবেন না স্যার ওর ওখানে। একটা শার্ক, একটা ক্যাপিটালিস্ট!'

ব্যাঙ্কের সে কেরানীই আর নন। এখন অন্য মানুষ। যে প্রিয়গোপাল এক সময়ে রাজনীতি করে জেল খেটেছিলেন, তিনি এখনো কথামৃতের সংগে সংগে একটা উগ্র বামপন্থী পত্রিকা পড়ে থাকেন।

বিরস মুখে বিকাশ বললে, 'কী করতে বলেন তা হলে? বাসা তো আমার একটা দরকার।'

'তাই বলে ওঁর বাড়ীতে থাকবেন?'

বিরক্ত হয়ে বিকাশ বললে, 'কেন, কানাইবাবু ক্যাপিটালিস্ট বলে? অদ্ভুত লজিক তো মশাই আপনাদের। কলকাতার অর্ধেক বাড়িওলাই তো ক্যাপিটালিস্ট—আপনাদের থিয়োরী অনুসারে তা হলে তো বাড়ীভাড়া নেওয়াই চলে না—ফুটপাথে পড়ে থাকতে হয়।'

'আমি ঠিক তা বলিনি—' প্রিয়গোপাল লজ্জিত হলেন একটু : 'মানে স্যার—ও-সব টাইপের লোকের কাছ থেকে একটু দূরে সরে থাকাই ভালো। যদি সময় থাকে, এখন একটু চলুন না আমার সংগে।'

'কোথায়?'

'সেই, যে বাড়িটার কথা বলেছি, স্টেশনের দিকে? বাড়ীর মালিক কেশব হালদারের তো কোনো আপত্তিই নেই, আমি ভাবছি, আপনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে—আপনাকে একবার দেখলে ওর বৌও—'

হিংস্র উত্তেজনায় গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল বিকাশের। তার মানে নিজে গিয়ে এখন ইন্টারভিউ দিতে হবে পাড়াগেঁয়ে একটি গিন্নীর কাছে, হয়তো হাঁটু গেড়ে করজোড়ে নিবেদন করতে হবে : 'মা জননী, আমি অতি সচ্চরিত্র যুবক, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি যে আপনার দুটি বালিকা কন্যার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানোর এতটুকু পাপ ইচ্ছেও আমার নেই!' বীভৎস!

কিন্তু রাগটা সামলে নিতে হল।

নীরসভাবে বিকাশ বললে, 'ও বাড়ী আমার দরকার নেই—ওঁদের বলে দেবেন।'

হন-হন করে জোর পায়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। কেমন বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইলেন প্রিয়গোপাল, চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল চশমার ভেতরে।

খানিকটা সামনে এগিয়ে আবার এক-রাশ অবসাদ আর বিরক্তিতে তার পা দুটো আলগা হয়ে এল। নিয়োগীপাড়ার পথ, পুরোনো গাছের ছায়া, দু পাশের ভাঙা বাড়ী আর ইঁটের পাঁজায় কবরের মতো একটা কুৎসিত ঠাণ্ডা—সব মিলে সারা শরীর শিউরে উঠতে চাইল। দরকার নেই এখন বাড়ী ফিরে, তার চাইতে বরং একবার ঘুরে আসা যাক ডাক্তার প্রভাকরের ওখান থেকেই।

কিন্তু স্কুলটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার ডাক পড়ল।

'বিকাশবাবু নাকি? শুনুন—শুনুন—' ডাক দিলেন সুনুর হেডমাস্টার কুমুদ সেনগুপ্ত।

(ক্রমশ)

রূপের আবরণ

অতীতের তুলনায় আমরা কতটা সুন্দর হয়েছি জানি না তবে আপামর সকলেরই সৌন্দর্যস্পৃহা বেড়েছে। রাস্তাঘাটে পা দিলেই একথাটা সহজে বোধগম্য হয়। তারপর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিলে তো কথাই নেই। সেখানে সবাই যেন ফ্যাশানের জ্যান্ত বিজ্ঞাপন। পোশাক ছাড়াও কথাবার্তা, চলন-বলন সবই মাপসই। ঠিক ঠিক ফ্যাশানের সঙ্গে মানিয়ে।

তারপর অনুষ্ঠানটি যদি ফ্যাশান-শোর হয় তাহলে তো কথাই নেই। ফ্যাশানের উদ্ভাবনক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। তাছাড়া কেমন মানায়। কোথাও একটুকু বেমানান নেই। দেখতে দেখতে নেশা ধরে যায়। তার মধ্যে মদিরতা আছে, আবিলতা নেই। তাই দু চোখ ভরে দেখা যায়। আর বিস্ময় মানতে হয় এবং সেই

সঙ্গে নিজেকেও ধন্য মানতে হয়, এরকম একটি যুগের প্রতিভূ-রূপে চিন্তা করে।

ইদানীং বিউটি কন্টেস্টের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশান-শো একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। তাই সৌন্দর্যপ্রতিযোগিতার আসর বসলেই ফ্যাশানের রূপেও দর্শকদের চোখ ঝলসে ওঠে। সৌন্দর্য তো স্বাভাবিক। কিন্তু সে পর্যন্ত গিয়ে বসে থাকলেই তো চলবে না। রূপের ঘষামাজা চাই। আবরণ-আভরণ চাই। তবেই তো রূপ খুলবে। বিদ্যুৎবরণা রূপটি চোখ ধাঁধিয়ে আমাদের মনে নতুন কুহক সৃষ্টি করবে। তাহলেই তো রূপের সার্থকতা। আর রূপের চিতা-ভাবনার দিগন্ত এভাবেই প্রসারিত হয়ে চলেছে দিনের পর দিন।

একদিন ছিল রূপ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। সেদিনও কথায় কথায় রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তো। এমনিভাবেই সংযুক্তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসতো পৃথ্বীরাজ। কিন্তু এরকমটা আর কজনের ভাগ্যে হতো। দুর্লভ ভাগ্যে সংযুক্তা ছিল রাজকুমারী। কিন্তু সাধারণ লোকের ঘরেও তো চোখ ঝলসানো রূপ

কম ছিল না। রূপের জ্বালায় সেদিন তারা বিব্রত হতো। তবুও ঘষামাজা ছিল না। নিজের খুশবুটুকু নিয়েই থাকতো। প্রতি-যোগিতা ছিল না তাই রূপচর্চাও ছিল না। বরং দুষ্টু লোকের চোখ এড়িয়ে এক শরীর রূপকে তারা প্রাণপণে আবডাল করে রাখতো। ফলে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্দরমহলের পক্ষপুট-ছায়ায় তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করতো।

সেদিনের পর অনেক দিবসরজনী পার হয়ে এলেও সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা খুব একটা প্রাচীর ডিঙোতে পারি নি। সত্যি কথা বলতে কি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতেই একচোটে আমরা অনেক বাধা-বন্ধন এবং পিছুটান কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। তারপর থেকেই কি পোশাক-আশাক, কি সৌন্দর্যচর্চা সব ব্যাপারেই হিসাবের গোড়ার কথা, কতটা এগুনো গেল। এ না হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। যদি এগুতেই না পারি তবে এতো সাধ-সাধনা বুকে রেখে লাভ কি? তাই চিন্তায় অনেকের ঘুম ছুটে যাচ্ছে। ফ্যাশানকারদের মুহূর্তের বিরতি-বিশ্রাম নেই। ক্রমাগত তাঁরা ভেবে চলেছেন। আবার তেমনি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন সৌন্দর্যদ্রব্যওয়ালারা। সবাই সব সময় শঙ্কিত, কখন শুনবেন আজকের আবিষ্কার কাল বাসি হয়ে গেছে।

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় এখন সবাই মহড়া নিতে ব্যস্ত। পৃথিবী জুড়ে একাধিক এবং বেশ কয়েকটি এ ধরনের আন্ত-র্জাতিক প্রতিযোগিতার আসর বসে। অসংখ্য রূপসী সেখানে সমবেত হয়। তারা আবার নির্বাচিত হয়ে যায় নিজেদের দেশ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই গোড়ায় সংখ্যাটা থাকে খুবই বৃহৎ। এখান থেকে যে বাজিমাৎ করতে পারবে তাকে সাজানোর জন্য কত না চিন্তা-ভাবনা। ফ্যাশানকারদের মাথার চুল উঠে যাবার জোগাড়। বিশ্বসুন্দরী * সাজানো-গোজানো নিয়েই কয়েক প্রস্থ ফ্যাশান বাজারে ঝমঝমিয়ে উঠলো। সবাই বিপুল উৎসাহে ঝুঁকে পড়লো। এমনি হচ্ছে প্রতি বছর, অসংখ্যবার।

বাইরের কথা ছেড়ে দিয়ে এই ছেঁড়া-ফাটা এবং বহু সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীর্ণ অথচ প্রাণবন্ত কলকাতা শহরের কথাই ধরা যাক না। সব ব্যাপারেই আগে এখানে পাত পড়ে। বিউটি কন্টেস্টের বেলাও তাই। কবে প্রথম সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসর বসে সেকথা আমার জানা নেই। কিন্তু ইদানীং যে সেটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে সে বিষয়ে অনেকেই আমার মতে মত মেলাবেন। বছরে বেশ কয়েকটি বিউটি কন্টেস্টের আসর বসে কলকাতায়। বছর তিনেক আগেও উদ্যোক্তাদের হা-হুতাশ করতে দেখেছি, প্রতিযোগীর সংখ্যা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। তাঁরা আরো অভিযোগ করেছেন, কলকাতা শহর স্বাভাবিক সংস্কার নিয়ে এখনো ঘোমটার আড়ালে। কিন্তু আজ তাঁরা এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন না। কোন অভিযোগ নেই। একেবারে চুপ মেরে গেছেন। কলকাতা মুখের মতো জবাব দিয়েছে। প্রতি-যোগীর সংখ্যা বেড়েছে আশাতীতভাবে এবং প্রতিটি বিউটি কন্টেস্টের আসরেই। আসলে, কলকাতা আড়ালে মুখ রেখে সব জিনিসটা দেখছিল। বুঝেসুঝে তবেই তো বেরুতে হবে। নাহলে শুধু শুধু মান খুইয়ে লাভ কি। সব বুঝেছে। তাই বেরিয়ে এসেছে। জবাবের মতো জবাব একেই বলে। রঙ্গভরা কলকাতার রসিকচিত্ত ডগমগ।

মিস ফেমিনা বিউটি কন্টেস্টের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার আসর এবারও যথারীতি বসেছিল কলকাতায়। প্রতিযোগীর সংখ্যা এবার রীতিমত আশাব্যঞ্জক। শুধু বিউটি কন্টেস্ট নয় সেই সঙ্গে একঘেয়েমি কাটানোর জন্য ছিল ফ্যাশান প্যারেডের বন্দোবস্ত। সবকিছুই এবার যেন অনেকখানি নতুন। পরিকল্পনা এবং আঙ্গিক। ঘোষক সবাইকে স্বাগত জানালেন। সুন্দরীদের একে একে মঞ্চে আহ্বান করলেন। নানাভাবে প্রতিযোগীরা নিজেদের সৌন্দর্য সম্পর্কে দর্শকদের সচেতন করে তোলার চেষ্টা করলেন। একজন প্রতিযোগীর অস্থির চোখ দুটো ঘুরেফিরে বেড়াতে লাগলো দশ দিকে।

তিন দফায় সৌন্দর্য বিচার আর তিন দফায় ফ্যাশান-শো। সৌন্দর্যের রাণীকে তো সাজাতে হবে তাই এত সব ফ্যাশানের বন্দোবস্ত। তাছাড়া কোন একটি বিশেষ পোশাকে তাকে সব সময় আটকে রাখাও চলবে না। তাহলেই একঘেয়ে হয়ে যাবে। তাই মুহূর্তে মুহূর্তে তাকে পরিবর্তিত পোশাকে সাজিয়ে রাখা চাই। তবেই সৌন্দর্য থাকবে অম্লান। অন্তত দেখে-শুনে ক্লান্তি আসবে না। ব্যবস্থা বেশ মনোরম। পোশাকও খুবই সুপরি-কল্পিত। কোন কিছুই বাদ যায় নি।

কিন্তু ফ্যাশান প্যারেডেও ক্লান্তির অবকাশ ছিল না। আবার শুরু হয়ে গেল বিউটি কন্টেস্টের দ্বিতীয় পর্ব। কয়েকজন বাদ-ছাদ হয়ে গিয়েছেন। যাঁরা টিঁকে আছেন তাঁরা সৌভাগ্যবান। আবার ওঁরা এসে দাঁড়ালেন। প্রথমবারের দ্বিধা-জড়তা অনেকটা কেটে গেছে। ওঁরা বেশ সহজ। ঘোষক ওঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানালেন। অধিকাংশই কলেজের পড়ুয়া এবং দু-একজন স্কুলেরও আছেন। ওঁরা কি কি ভালবাসেন। দর্শককুল পরিতৃপ্ত।

আবার ফ্যাশান প্যারেড। সারা মঞ্চ জুড়ে ওঁদের পদচারণা শুরু হলো। ঘোষক মিউজিকের নির্দেশ দিলেন। প্রেক্ষাগৃহ গমগমিয়ে উঠলো। পোশাকের বাহারে চোখ ফেরান যায় না। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা ঝমঝমিয়ে ওঠে। এই পোশাকের আলোকণ্ঠিই পরিবর্তিত রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান। একের তো আমরা

ছাড়পত্র দিয়েই রেখেছি। কিন্তু কয়েকটি পোশাক একেবারেই অর্থহীন। সেগুলি পরে কোনদিন রাস্তায় চলাফেরা একদম অসম্ভব। অন্তত আজ পর্যন্ত। তবে পোশাকের পোশাকী চিন্তা অবশ্য সেপথ দিয়ে খুব একটা হাঁটে নি। ফ্যাশানকারের যে মনে রয়েছে আধুনিকতার চিন্তা।

বিউটি কন্টেস্টের তৃতীয় দফা। ওদের বুক দুরুদুরু। তবু স্মার্টলি দর্শকদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন। ঘোষকের রসিকতায় একটু হাসলেন। প্রশ্নের জবাবও দিলেন। আবার সারি দিয়ে দাঁড়ালেন। শেষ প্রস্থে কেউ জানেন না, কে বাদ পড়বেন। কেউ জানেন না, কার জন্য অপেক্ষা করছে বিজয়ীর মুকুট। সবাই সমান আশঙ্কায় দুলছে। এরই মধ্যে শুরু হলো ফ্যাশান প্যারেডের তৃতীয় পর্ব। এবারকার ফ্যাশানের বৈশিষ্ট্য পুরুষদের অংশগ্রহণ। যদিও মেয়েরাই পাল্লায় ভারী। সৌন্দর্যের রাণীর পোশাকতালিকা শেষ হলো।

বিচারকের রায় ঘোষিত হলো। প্রথম হলেন শমিতা মুখার্জি। মিষ্টি হেসে শমিতা জানালো, ব্যারিস্টার হতেই তার আগ্রহ বেশি। কেন এই আগ্রহ? শমিতা একটু গম্ভীর হয়ে বললো, বাবা ছিলেন ব্যারিস্টার। কথা না বাড়িয়ে যাই অলকানন্দা চাকলাদারের কাছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ভীষণ খুশি। আর তৃতীয় স্থানাধিকারী শ্রীলা সে খুশির ভাবটা চেপে রেখেছেন যথাসম্ভব। কথাবার্তায়ও সেটা স্পষ্ট।

—প্রমীলা

ফটো : অমৃত

শাড়ির অরণ্যে

আমার এই পঞ্চাশোর্ধ্ব জীবনকালে কত রকমারি শাড়ির আমদানি দেখলাম—তার সীমা-সংখ্যা নেই। সেকালে কিন্তু এত হরেকরকম শাড়ি ছিল না। আমরা যখন বালিকা, মায়েদের পরতে দেখেছি—বোম্বাই শাড়ি, পার্শি শাড়ি আনারসী শাড়ি, মিহি-সুতোর রঙিন আদ্দির থানে কালো লেসের পাড় লাগানো একরকম শাড়ি। এগুলো সবই পোষাকী শাড়ির মধ্যে গণ্য ছিল। গাঢ় বেগুনি রং সিল্ক-রেশমী সুতোয় কাজ-করা পাড়—বোম্বাই শাড়ি। পার্শি সিল্কে শাড়ি ছিল পেঁয়াজ রং, গোলাপী রং, রেশমী লেসের পাড় ও আঁচল। আর কোনও রং ছিল কিনা মনে পড়ছে না। খুব সরু সুতোর মিহি পাতলা আনারসী শাড়ি—সারা গায়ে সরু সরু ডুরে। হালকা সবুজ রং, টিয়া রং, গোলাপী রং ইত্যাদি ছিল মনে পড়ছে। আরও ছোটবেলায় দেখেছি—দিদিমা-ঠাকুরমাদের আমলে অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে সবচেয়ে দামী পোশাকী শাড়ি ছিল—'রাসমণ্ডলের শাড়ি'। গাঢ় বেগুনি রং, ছবির মত সুন্দর। হাতেকরা এমব্রয়ডারির মত শাড়ির জমিতে কাজ।

প্রথমে শাড়ি পরেছি যখন (তখনকার দিনে পাঁচ-ছ' বছরের মেয়েরাও অনেকেই শাড়ি পরতো) পাছাপেড়ে শাড়ি, গঙ্গা-যমুনা শাড়ি, সাদা রং, নীল রং ও পেঁয়াজ রংয়ের ঢাকাই জামদানী—সারা গায়ে জরি ও সুতোর বড় বা ছোট বুটি দেয়া। এসব শাড়িই পরেছি মনে পড়ে।

পাছাপেড়ে শাড়ির ছিল—তিনটে পাড়। মাঝের পাড়টা কোমরের নিচে থাকতো। তখনকার এসব শাড়ি ছিল বিলিতি। গঙ্গা-যমুনা শাড়ি—সাদা খোলের ভেলভেট পাড়। একদিকে গাঢ় লাল এবং অন্যদিকে গাঢ় কালো পাড়। এক ইঞ্চি চওড়ার বেশি বড় পাড় দেখিনি। ১৯১৮-১৯ সনে প্রথম গরদের শাড়ি দেখি। হয়তো এর আগেই বের হয়ে থাকবে, সেটা মনে নেই। তখনকার গরদের শাড়ির মত আজকালকার গরদ নয়। খুব নরম অথচ ঠাস বুনোনের ছিল। সবচেয়ে বেশি দামী শাড়ি ছিল ২০।২৫ টাকা করে।

১৯২৩-২৪ সনে একরকম আটপৌরে তাঁতের শাড়ি বের হয়। লাল রং, বেগুনি রং, ছাই রং। তেমন মিহি সুতোর তৈরি নয়। পোশাকী শাড়ির মধ্যে দু-একরকম তাঁতের শাড়ি বের হয়, তার নাম মনে পড়ছে না। মাদ্রাজী তাঁতের শাড়ি তখন প্রথম দেখি। খুব সুন্দর হালকা রংয়ের দু-তিন রকম রংয়ের পাওয়া যেতো। জরি-মেশানো পাড় ও আঁচল, মিহি জমির শাড়ি। দাম চোদ্দ-পনেরো টাকা। ১৯২৭-২৮ সনে বের হল শান্তিপুরী সাদা খোলের মিহি জমির শাড়ি। দু-একরকম রংয়ের পাড়, শাড়ির ভিতরে বুটি। আর দেখা গেল একরকম খদ্দরের পাতলা শাড়ি, ঢাকাই শাড়ির ডিজাইনে পাড় ও বুটি। এ-শাড়ি তখন খুব চলেছে। নাম বলতো খদ্দরের জামদানী।

১৯২৯-৩০ সনে নানারকম নক্সা পাড়ের রঙিন মিলের শাড়ি বাজারে বের হল। সিনেমার নামে শাড়ির কতরকমের নাম। একরকম পোশাকী তাঁতের শাড়ি দেখলাম—'স্কার্টপাড় শাড়ি' তার নাম। একদিকে আট-দশ ইঞ্চি চওড়া পাড়, অন্যদিকে দু-তিন ইঞ্চি পাড়। নীল, কালো, গেরুয়া ইত্যাদি শাড়ির রং। সোনালি, রুপোলি, লাল, কালো রংয়ের পাড়। সস্তা দামের একরূপ ঝলমলে শাড়ি বের হয়, রেডিয়ো শাড়ি, নানা রং-বেরংয়ের পাটের শাড়ি, গোদাবরী শাড়ি ইত্যাদি। এসব শাড়ি খুব অল্পদিনই স্থায়ী ছিল।

১৯৩৩-৩৪ সন নাগাদ এল মুর্শিদাবাদী সিল্কে শাড়ি—তখনকার দিনে খুব ভাল পোশাকী শাড়ি। দাম পনেরো-ষোলো টাকা করে। টেকসই ঠাস বুনটের, আট-দশ ইঞ্চি চওড়া নক্সা-কাটা পাড়। প্রতিটি শাড়ির অভিজাত রং। আজকাল সেরকম সুন্দর মুর্শিদাবাদী শাড়ি আমার চোখে যেন পড়ে না। এরপর ধনেখালি শাড়ি ও ঢাকাই ভিটির শাড়ি বের হয়ে সকলের মন হরণ করলো। ধনেখালি এখনও চলছে, কিন্তু ভিটির শাড়ি কই আর তো দেখি না। কাগজের মত মচ্‌মচে ঠাস বনুটের। সাদা খোল, কালো রংয়ের ও ব্লু-ব্ল্যাক রংয়ের পাড়ই দেখেছি মনে হয়। টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ি কবে থেকে বাজারে প্রথম বের হল মনে পড়ছে না। তবে তখন যেসব মিহি ঠাস বুনটের টাঙ্গাইল শাড়ি দেখেছি, এখন যেন তেমন দেখি না।

তারপর তো ক্রমে ক্রমে কতরকম শাড়িরই আমদানি দেখলাম। হালকা রংয়ের, নানারকম রংয়ের জর্জেট শাড়ি, বাঙ্গালোর সিল্ক, মাইশোর সিল্ক, কাশ্মীর সিল্ক, কাঞ্জিভরম, বিষ্ণুপুরী সিল্ক, গাদোয়াল, আদোয়াল, চিনারপট্টম, শোলাপুরী, আসাম তসর ইত্যাদি আরও কত রকমের আছে, আজকালকার তরুণীরাই ভাল জানবে। ক'বছর আগে খুব টেরিলিন ও ডেক্রনের ঢেউ এসেছিল। প্রথমে ঝোঁকের মাথায় অনেকে কিনেছে, কিন্তু অল্পদিন পরই কিছুসংখ্যক মেয়েরা আর পরেনি। রুচিসম্পন্না মেয়েরা এসব ঝলমলে অতি পাতলা শাড়ি আমাদের সময়কার মত আজকালও পছন্দ করে না। চলতি এক বছরের মধ্যে আর এরকম শাড়ির খুব চাহিদা দেখছি। তাঁতের শাড়িতে প্লাস্টিক জরির পাড় ও আঁচল। চেক-কাটা ও ডুরেও দেখি। এগুলো রোলেক্স নামে চালু।

বছরে বছরে আরও অনেক রকম শাড়ির আমদানি দেখবো, এটাই স্বাভাবিক। তবে এ-কথা মনে হয় যে, পূর্বের ঢাকাই শাড়ি, টাঙ্গাইল শাড়ি, মুর্শিদাবাদী শাড়ী এবং গরদ ইত্যাদি বিশিষ্ট যেসব শাড়ি দেখেছি, আজকাল আর অত সুন্দর বুনটের শাড়ি চোখে পড়ে না। হয়তো ভবিষ্যতে—আমাদের না দেখতে পাবার দিনেও সেসব সুন্দর বুনটের শাড়ি আর ফিরে আসবে না।

—বেলা দাশগুপ্ত

এক নীলকণ্ঠ পাখীর গান ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

আমাকে কাঁদাতে পারো বলেই তো
বার বার তোমাকেই চাই
আমার কান্নার সাথী
তুমি কিংবা তোমার প্রতীক
কোনো ছবি কিংবা কোনো গান
অথবা সংলাপ
উল্লাসে উন্মাদ হয়ে উঠি
যে মুহূর্তে কিছু কাছে পাই।

আমাকে কাঁদাতে পারো বলেই তো
এতো করে তোমাকেই চাই
যন্ত্রণায় নীলকণ্ঠ আমি
তবু রাত্রি মনোরম শুক্লা সুষমায়
অশ্রুকণা তারা হয়ে জ্বলে
মুক্তার বিন্দুর মতো
আমরা কালের বুকে মালা হয়ে দুলি
তুমি আমি উভয়েই বুঝি জাতিস্মর
জন্মে জন্মে পরস্পর অন্যোরে কাঁদাই।

আমাকে কাঁদাতে পারো বলেই তো।
বার বার তোমাকেই চাই।

তোমার শরীরময় ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

শরীরে রাত্রির কোলাহল, ভাঁজে ভাঁজে জড়ানো সঙ্গীত—
শঙ্খের আবর্ত যেন বৃত্তমালা
সমুদ্রের শিরা-উপশিরা।
কোথায় আশ্রয় চাও? কোন্‌দিকে তাবুর সীমানা?
তোমার ঠোঁটের মধ্যে অস্ফুট সংলাপ খেলা করে,
এবং চোখের মধ্যে
আলো জ্বলে প্রদীপ্ত ইচ্ছায়।
তবু হাত ছুঁয়ে থাকো কোষবদ্ধ তীক্ষ্ন অসিধারা।

এখন জোয়ার নয়, অন্ধকারে, মেঘময় মাথার ওপর
গ্রীষ্মের রোদ্দুর ঢেলে
কারা ঢেকে দিতে চায় সঙ্গীতের মুখ?
তুমি তো লণ্ঠন জ্বালো, একে একে লণ্ঠনের আলোগুলি জেলে
পথময় তৈরী করো সুদীর্ঘ মিছিল!
তবু কেন হেঁটে যাও একা একা সীমান্তের ধারে?

কী আছে তোমার কাছে, তোমার উজ্জ্বল তীক্ষ্ন বুকে?
অশ্বের দুরন্ত শক্তি? পেশীতে পেশীতে তীব্র কোন্ কোলাহল?
তুমি তো চিনেছো রাত্রি,
স্খলিত বিষাদময় রাত্রির সংলাপ।
অশ্বের চিৎকার শুনলে
তুমি তীব্র ছিঁড়ে ফেলো রাত্রির খোলস।

তোমার শরীরময় সমুদ্রের সুসংবদ্ধ শিরা-উপশিরা।
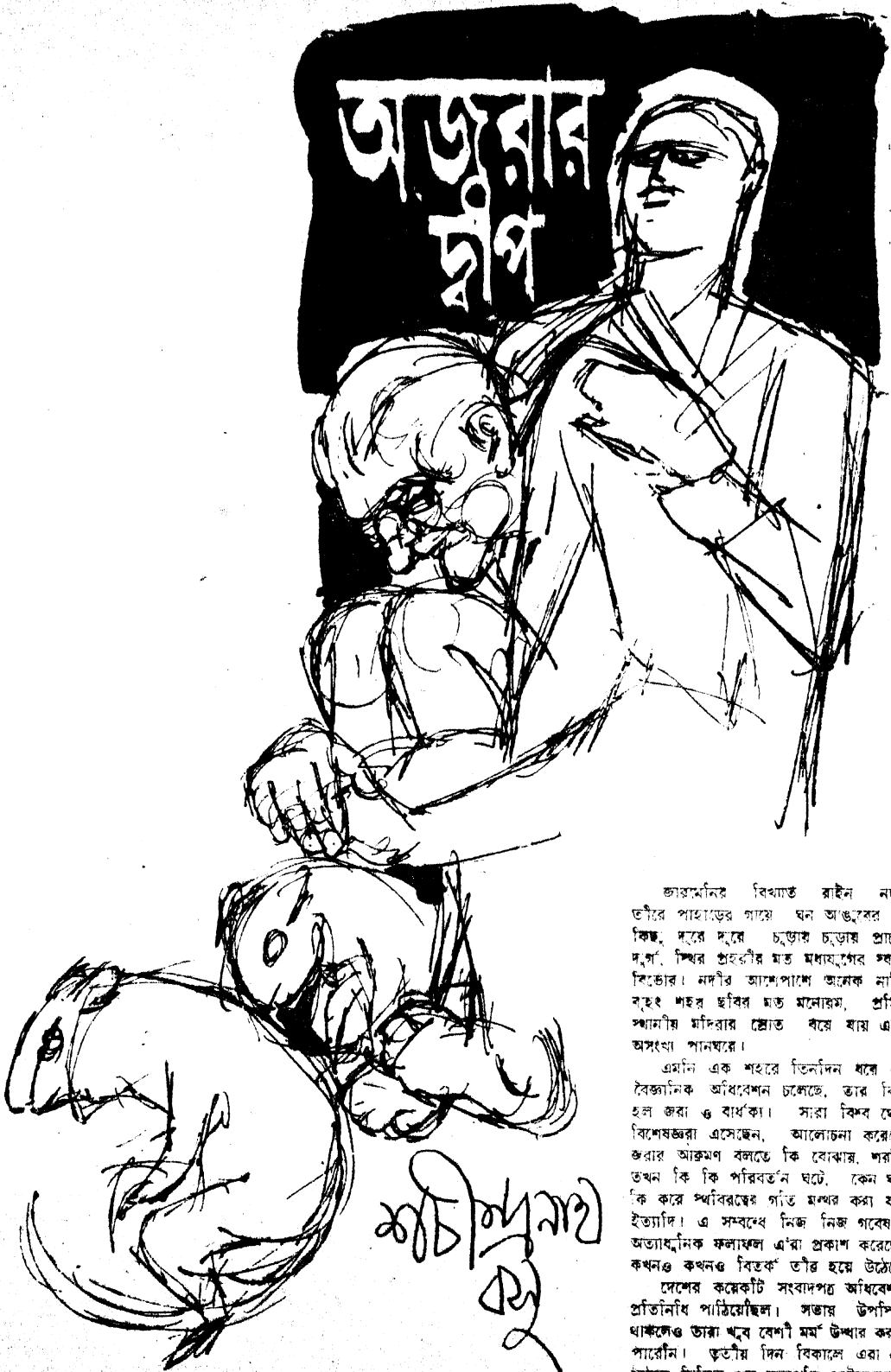
জারমেনির বিখ্যাত রাইন নদীর তীরে পাহাড়ের গায়ে ঘন আঙুরের বন, কিন্তু দূরে দূরে চূড়ায় চূড়ায় প্রাচীন দুর্গ, স্থির প্রহরীর মত মধ্যযুগের স্বপ্নে বিভোর। নদীর আশেপাশে অনেক নাতি-বৃহৎ শহর ছবির মত মনোরম, প্রসিদ্ধ স্থানীয় মদিরার স্রোত বয়ে যায় এদের অসংখ্য পানঘরে।

এমনি এক শহরে তিনদিন ধরে এক বৈজ্ঞানিক অধিবেশন চলেছে, তার বিষয় হল জরা ও বার্ধক্য। সারা বিশ্ব থেকে বিশেষজ্ঞরা এসেছেন, আলোচনা করেছেন জরার আক্রমণ বলতে কি বোঝায়, শরীরে তখন কি কি পরিবর্তন ঘটে, কেন ঘটে, কি করে স্থবিরত্বের গতি মন্থর করা যায়, ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে নিজ নিজ গবেষণার অত্যাধুনিক ফলাফল এ'রা প্রকাশ করেছেন, কখনও কখনও বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছে।

দেশের কয়েকটি সংবাদপত্র অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। সভায় উপস্থিত থাকলেও তারা খুব বেশী মর্ম উদ্ধার করতে পারেনি। তৃতীয় দিন বিকালে এরা এক বৈঠকে মিলিত হল সভাপতি হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হান্‌স ইয়েনির

সঙ্গে, সহজ প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়ে কিছু জানবার উদ্দেশ্যে।

এদের একজন বললে, 'কিছু দিন আগে প্রকাশ হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে এক বালিকা দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে ওঠে এবং মাত্র ন' বছর বয়সে ৮৫ বছরের অনুরূপ বৃদ্ধা হয়ে মারা যায়। তার ভাইও এগারো বছর বয়সে ৯০ বছরের মত বুড়ো হয়ে দেহত্যাগ করে। এর কারণ কি?'

অধ্যাপক ইয়েনি জবাব দিলেন, 'এ-রকম নজির আরও আছে, যদিও সংখ্যায় খুব কম। কেন এমন হয় আমরা জানি না। অনেকে বলেন অন্যান্য রোগের মত জরাও এক রোগ; তা যদি হয় তো এই রোগকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে হয়তো একদা মৃত্যু জয় করা সম্ভব হবে।'

প্রশ্ন : নানা দেশের পুরাণে বহু অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির উল্লেখ আছে। এ যুগে কি মানুষের আয়ু কমে গিয়েছে?

উত্তর : তা বলা কঠিন। চিকিৎসাবিদ্যায় অনেক কম বাঁচত। ধরুন ইলিয়াড কাব্যের নেস্টর, হোমারের বর্ণনা অনুসারে তিন পুরুষের সমান বয়স তার, শুনে মনে হয় কতই না জানি আয়ু। আসলে তখনকার দিনে সাধারণ আয়ু ছিল কুড়ি পঁচিশ বছর, সুতরাং নেস্টরের বয়স মাত্র সত্তর; একালে উন্নত দেশগুলির গড় আয়ুর কাছাকাছি।

প্রশ্ন : এই গড় আয়ু বাড়ল কি করে?

উত্তর : সংক্রামক রোগে এখন লোকে বড় একটা মরে না, তার নানা প্রতিষেধক বেরিয়েছে। তাছাড়া আছে ভাল খাদ্য, ভাল বাস ব্যবস্থা।

প্রশ্ন : এ যুগের মাপে তিন-পুরুষ আয়ু বাড়ানো কি সম্ভব হবে?

উত্তর : তা বলা কঠিন। চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা এসব সত্ত্বেও চরম আয়ু বেশী বাড়ে নি। হয়তো একটা সীমা আছে, ক্রমে বেশী লোক তার কাছাকাছি আসবে, কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাবে না বড় একটা কেউ।

প্রশ্ন : কিন্তু আমরা শুনেছি ইংলন্ডে টমাস কর্ন ২০৭ বছর বেঁচেছিল—তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘায়ু ব্যক্তি বলে দাবি করা হয়। রাশিয়ায় তেপসা আবজিভা নাকি ১৮০ বছর এবং হাংগেরীয় দম্পতি জন ও সারা রাভেল যথাক্রমে ১৭২ ও ১৬৪ পর্যন্ত বেঁচেছে।

উত্তর : এই সব দাবির পিছনে প্রমাণ কিছু নেই। আপনারা জানেন স্থবিরদের বয়স প্রায়ই তাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের কল্পনায় কেমন দেখতে দেখতে বাড়ে। জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে যাদের দলিল আছে এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু কুইবেকের মুচি পিয়ের জুবের, সে বেঁচেছিল ১১৩ বছর। ইংলন্ডে সরকারীভাবে জন্মের দলিল রাখা সুরু হয় ১৮৩৪ সালে, তখন থেকে দীর্ঘতম আয়ু ১০৯ বছর।

প্রশ্ন : রাশিয়ার ককেশাস প্রদেশগুলির থেকে প্রায়ই আমরা অতিজীবীদের খবর পাই। ঐ অঞ্চলের বিশেষত্ব কি?

উত্তর : রুশ সূত্র অনুসারে ঐসব প্রদেশে প্রায় ছ হাজার শতায়ু ব্যক্তি আছে। ১৯৫৯ সালের আদমসুমারে নাকি দেখা গিয়েছে যে পার্বত্য আজেরবাইজানে এদের অংশ লাখে ৮৪, জর্জিয়াতে লাখে ৫১, যেখানে সমগ্র রাশিয়াতে মাত্র দশ। ব্রিটেনে আছে লাখে মাত্র এক। আজেরবাইজানের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে; অধিবাসীরা দেহ খাটিয়ে খায়, পাহাড়ী পথে বাধ্য হয়ে প্রতিদিন অনেকখানি হাঁটাচলা করতে হয়; তারা সাধারণত দুধ, ফল ও সবজি দিয়ে পরিমিত আহার করে, ধূমপান বা মদ্য পানের অভ্যাস বড় একটা নেই; পরিষ্কার পাহাড়ী হাওয়ায় কাজ, বিশ্রাম ও সহজ আমোদ-প্রমোদ নিয়ে এদের নিয়মবাঁধা জীবন; প্রায় সকলেরই বিবাহ হয়েছে, সন্তান আছে; অনেকেই অশিক্ষিত, গভীর কিছু নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না; মনের ধাতটা প্রসন্ন, সৌহার্দ্যপূর্ণ। এইসব কারণে হয়তো তারা সাধারণত বেশী বাঁচে, এই তথ্যাবলীতে অনেক চিন্তার খোরাক আছে আধুনিক শহুরের সুসভ্য নাগরিকদের।

পরিশেষে অধ্যাপক ইয়েনি বললেন, 'আসলে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের ভাগ্য অনেক ভাল, সৃষ্টির নিয়মে সে মৃত্যুর থেকে অনেকটা দূরে। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব সাধারণত প্রায় একশ' কোটি হৃদস্পন্দনের পরে মরে, মানুষের হৃদঘড়ি বাজে এর প্রায় আড়াই গুণ। দেহের ওজনের সঙ্গেও আয়ুর মোটামুটি এক সম্পর্ক আছে, এখানেও নিয়মের তুলনায় আমরা প্রায় তিনগুণ বেশী বাঁচি। তবু মানুষ অমরত্ব খোঁজে ...

•

সেদিন সন্ধ্যার পরে এক পানঘরের কোণে আলাপে মগ্ন ডঃ নিল্‌স নিলসেন ও ডঃ তুশিমো কোবায়াশি, এদের সামনে স্নিগ্ধ সবুজ মোজেল মদিরা; মোজেল এক নদীর নাম, রাইনের শাখা।

নিলসেন ও কোবায়াশি এসেছেন জরা-বিজ্ঞান গবেষণার দুই প্রসিদ্ধ কেন্দ্র থেকে, যথাক্রমে কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয় ও টোকিওস্থিত জাতীয় জীববিজ্ঞান গবেষণাগার। এ যাবৎ যা যা নিবন্ধ বৈঠকে পড়া হয়েছে, এঁরা দু'জন এখন তারই আলোচনায় মশগুল। বিজ্ঞানীরা যেখানেই যাক, দু'জনে একত্র হলে দিনের যে কোনও সময়ে যে কোনও অবস্থায় তারা নিজ নিজ বিষয়ের আলোচনা করবে—সুরার পাত্র সামনে নিয়েও।

এঁরা একমত যে বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে মানুষের সব চাতুরি সব কৌশল এ পর্যন্ত মোটামুটি ব্যর্থ। জরা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমরা দু পাও এগোতে পারিনি. উন্নত দেশগুলিতে অধিকাংশ মানুষ আজ আগের চেয়ে বেশী দিন বাঁচে, কিন্তু উচ্চতম আয়ু প্রায় সমানই আছে। জীবনের অসংখ্য শোক-তাপ সত্ত্বেও মানুষ মাত্র সত্তর বছর বেঁচে তুষ্ট নয়, সে চায় অন্তত শতায়ু হতে, সেই লক্ষ্য এখনও সুদূরপরাহত—যদিও বেশ কয়েক বছর ধরে দেশে দেশে বিজ্ঞানীরা এই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছেন।

জরা যদি এক রোগ মাত্র হয়, তাহলে তা যে দেহের স্বাভাবিক বা অনিবার্য পরিণতি হতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। এই রোগের চিকিৎসা এখনও সম্ভব নয় বটে, কিন্তু রোগের স্বরূপ আমরা অনেকটা চিনেছি। আমরা জানি বয়সের সঙ্গে হাড় সহজে ভাঙে, পেশী শিথিল হয়, গিঁটগুলি আড়ষ্ট হয়ে যেতে চায়, শিরা-উপশিরার গায়ে কঠিন প্রলেপ পড়ে, দৈহিক প্রতিক্রিয়া দ্রুত সাড়া দেয় না, দৃষ্টি ও শ্রুতি দুর্বল হয়। হৃদ্‌পিন্ডের ও মস্তিষ্কের অনেক কোষ মরে যায়, সেখানে নতুন কোষ গজায় না।

দেহের মত মনও স্থাণু হয়ে পড়ে, মগজে রক্ত চলাচল কমার ফলে উপলব্ধিতে বেশী সময় নেয়, স্মৃতি দুর্বল হয়। স্থবিররা প্রায়ই অযৌক্তিক, নিজের স্বার্থের প্রতি অতিসচেতন, অন্যের সম্বন্ধে উদাসীন যারা কর্মজীবনে ছিল উদ্ধতস্বভাব, তারাই শেষ জীবনে হয়তো নিরীহ—করুণার ভিখারী।

সংক্ষেপে এই হল জরার চেহারা। এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম উদ্দেশ্য এই দুর্গতি এড়ানো, মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিন যেন সে সবল দেহে স্পষ্ট মনে জীবনের আনন্দ উপভোগ করে। দ্বিতীয় লক্ষ্য উচ্চতম আয়ু বাড়ানো।

নিলসেন ও কোবায়াশি আলোচনা করছিলেন যে এই সর্বাধুনিক বৈঠকেও দেখা গেল সমস্যার সমাধানে এখনও স্পষ্ট কোনও পথের ইঙ্গিত নেই। তা বলে নানা দেশ থেকে এখানে এসে জড়ো হওয়া তাদের অসার্থক নয়। কত যে বিভিন্ন উপায়ে জরার রহস্য ভেদের, তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চলেছে, তার সঙ্গে পরিচয়ও বিশেষ উদ্দীপনার বস্তু।

আরও অনেক বিশেষজ্ঞের মত নিলসেন নিজে বিশ্বাস করেন যে, বয়সের সঙ্গে দেহকোষের মধ্যে 'আবর্জনা' জমে, ক্রমে তারা কোষের প্রকৃত রাসায়নিক কাজে বাধা দেয় এবং কোষের মৃত্যু ঘটায়। অথবা যে প্রোটিন বস্তু আমাদের দেহের প্রধান উপাদান তার দীর্ঘ অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

কোবায়াশির ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তিনি মনে করেন, দীর্ঘায়ুর বীজ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে প্রাণীরা। কোনও কোনও পরিবারের লোকে অনেক দিন বাঁচে, আবার কোনও কোনও পরিবার স্বল্পায়ু। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করেছেন যে, কোনও শিশুর প্রপিতামহ ও প্রপিতামহী চারজনই যদি আশির উপর বাঁচে, তা হলে তারও সমবয়সীদের থেকে গড়ে চার বছর বেশী বাঁচার সম্ভাবনা। সুতরাং যারা সন্দেহ করে দীর্ঘায়ুর জিন বা বংশকণা আছে কোবায়াশি তাদের দলে। কোষস্থিত জিনের উপাদান নিউক্লিইক অ্যাসিড, তার অংশ বিগড়ে গিয়েও জরার সূচনা হতে পারে, যেমন সন্দেহ করেন মার্কিন জীববিদ হাওআর্ড কার্টিস ও আরও অনেকে।

নিলসেন তার সঙ্গীর গবেষণা সম্বন্ধে অবহিত। দু' জনের পাত্রে পানীয় ঢেলে তিনি বললেন, 'কিন্তু উত্তরাধিকার-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না, যতদিন না আপনারা এই জিন নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারছেন—এখন পর্যন্ত তা রয়েছে অনেকটা আশা ও কল্পনার ক্ষেত্রে। অবশ্য ইঁদুর নিয়ে আপনি অনেক দূরে এগিয়েছেন, আশা করি আপনার চেষ্টা সার্থক হবে।'

কোবায়াশি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, কিছুক্ষণ নীরব থেকে পূর্ণ পাত্রে চুমুক দিয়ে বললেন, 'জানি না সেটাই কাম্য কিনা। ধরা যাক বিজ্ঞান দীর্ঘায়ুর রহস্য ভেদ করল, মানুষ দেড়শ' অথবা পাঁচশ' বছর বাঁচতে আরম্ভ করল। সেটা যে সর্বাংশে ভালই হবে, এমন বিশ্বাস আমার নেই। তবু কাজ করে যাচ্ছি অন্তরের তাড়নায়।'

বক্তার বয়স চল্লিশেরও কম, তাঁর মুখে এমন কথা শুনে ইয়োরোপীয় সঙ্গী হেসে বললেন, 'আপনার উক্তিতে যেন এশিয়ার বা প্রাচ্য ধর্মবলম্বীর আত্মা প্রতিফলিত। জড়বাদী পশ্চিম বলবে, জীবন উপভোগের বস্তু, দেহ-মন সুস্থ থাকলে তাকে যত বাড়ানো যায়, ততই ভাল।'

এঁদের দু'জনের বিশ্বাস ছাড়া জরার কারণ সম্বন্ধে আরও অনেক তত্ত্ব আছে। জন বিয়র্কস্টেনস বলেন, তেল ফুরিয়ে গেলে মোটরগাড়ী যেমন থেমে যায়, তেমনি জীব-জন্তুর মৃত্যু আসে; আরম্ভে দেহ-কোষে কিছু একটা রসদ থাকে, যা ক্রমে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়। ক্যানাডার বিখ্যাত বিজ্ঞানী হানস সেলিয়ে বিশ্বাস করেন, আমরা জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়বার জন্য বিশেষ বিশেষ পরিমাণ শক্তি নিয়ে জন্মাই, প্রত্যেক লড়াইয়ের পর কিছুটা বুড়িয়ে পড়ি, শেষে ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়।

আবার কারও কারও ধারণা, বয়েসের সঙ্গে জীবাণু সহজে আক্রমণ করে, দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় বলে। আবার হয়তো এই স্বাভাবিক ক্ষমতা বহিরাগত প্রোটিন বলে ভুল করে দেহের প্রোটিনকেই আক্রমণ করে।

কিছুদিন আগে শিকাগোতে দুই বিজ্ঞানী ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, প্রতি তিন দিনে এক দিন উপবাস করলে তাদের আয়ু কুড়ি শতাংশ বেড়ে যায়, তা দেখে পরীক্ষকদের একজন নিজেই উপবাস সুরু করলেন। তেমনি নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম, মনের শান্তি ও স্বাভাবিক প্রসন্নতা ইত্যাদিতেও আয়ু বাড়ায় দেখা গিয়েছে।...

নিলসেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার আমাদের ওঠা দরকার, অধ্যাপক ইয়েনি অপেক্ষা করছেন।' তাঁর বাড়িতে আজ অভ্যাগতদের কয়েকজনের নিমন্ত্রণ।

দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়, কয়েকশ' বছর প্রাচীন পাথর-বাঁধানো ঢালু গলি, দু' পাশে ছোট ছোট সুসজ্জিত মনোরম দোকান, নানারকম আন্তর্জাতিক সখের বস্তু ঝুলছে সামনে। ঐটুকু রাস্তা পার হতে চার-পাঁচটা পানঘর চোখে পড়ল। গলি এসে পড়েছে নদীর ধারে। সেখানে স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে ছোট ছোট দলে নাগরিকরা গ্রীষ্ম উপভোগ করছে, নাচ-গানও চলছে। পরিষ্কার কোমল রাত্রি, নদীতে জাহাজ চলেছে ধীরগতি, ও পারে আঙুর বনের মাঝে মাঝে মিটিমিটি কুটিরের আলো।

কোবায়াশি বললেন, 'কি সুন্দর! এখন মনে হচ্ছে এমন জগতে জীবন যত দীর্ঘ হয়, ততই ভাল।'

●

পরদিন অভ্যাগতরা যে যার দেশের দিকে রওনা হলেন, কোবায়াশি ফিরে এলেন জাপানে, পৃথিবীর প্রায় অপর প্রান্তে। এর বছর দুই পরে আন্তর্জাতিক বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর ব্যবহারে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিস্মিত হল। যারা বিজ্ঞানের একই ক্ষেত্রে কাজ করে, তাদের মধ্যে প্রায়ই নিয়মিত পত্র বিনিময় চলে, কোবায়াশিরও এই অভ্যাস ছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি প্রায় নীরব হয়ে গেলেন। চিঠির জবাব বড় একটা দেন না, দিলেও তাতে কাজের কথা বিশেষ কিছু থাকে না, যেন ইচ্ছা করে এড়িয়ে যান সেই প্রসঙ্গ। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সভায়ও তিনি আসেন না। বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকায় তাঁর কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে অনেক দিন কোনও নিবন্ধও প্রকাশ পায়নি।

এমন সময়ে এক গুজব রটল যে, এক জাপানী বিজ্ঞানী দীর্ঘায়ুর রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন, সংবাদপত্রগুলি এ খবর প্রকাশ করল অনেকখানি রং চড়িয়ে, যেমন তারা করে। জাপানী সরকার বললে এ সম্বন্ধে তারা কিছু জানে না, কিন্তু বিজ্ঞান-জগতের সন্দেহ ঘুচল না। অধ্যাপক ইয়েনি এবং আরও অনেকে কোবায়াশিকে চিঠি লিখলেন, অনেকে এও জানালেন, এ কাজে সফল হয়ে থাকলে নোবেল পুরস্কার অনিবার্য, তাঁরা তাঁকে সমর্থন করে প্রস্তাব পাঠাতে রাজী আছেন, যদি কোবায়াশি তাঁর কাজের বিবরণ ছাপেন। জবাবে তিনি লিখলেন, তিনি বা জাপানে অন্য কেউ এমন আবিষ্কার করেন নি, সংবাদপত্ররা তিলকে তাল করে থাকে, বিজ্ঞানীদের সে-দিকে নজর না দেওয়াই ভাল। কর্মসূত্রে নিলসেন একবার পূর্ব এশিয়ায় এসে-ছিলেন, তখন টোকিওতে নেমে কোবায়াশির সঙ্গে দেখা করলেন, তিনিও এর বেশী জানতে পারলেন না, বরং কোবায়াশি তাঁকে জানালেন তিনি নিজের গবেষণার ক্ষেত্র পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন।

কিন্তু নিলসেন এবং অন্যান্যরা ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তাঁদের মনে সন্দেহ থাকল যে, কোবায়াশি বড় রকম একটা কিছু আবিষ্কার করেছেন। অনেকে ভাবলেন, একেবারে সাফল্যের শিখরে উঠে তিনি তথ্য প্রকাশ করবেন, যাতে প্রতিযোগী আর কেউ দেখা না দেয়; বৈজ্ঞানিক গবে-ষণায় অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ঈর্ষা ও প্রতি-দ্বন্দ্বিতা যে বিরল নয়, তা অনেকেই জানে। যারা অপেক্ষাকৃত সহৃদয়, তারা ভাবল কোবায়াশি হয়তো কাঁচা তথ্য প্রকাশ করতে চান না, নিজের কাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তবেই আর দশ জনের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের কাছে খুলে ধরবেন; অনু-সন্ধানে যদি কেঁচে যায়, তবে সেটা মস্ত দুর্নাম।

একমাত্র নিলসেনই প্রকৃত কারণ কিছুটা অনুমান করলেন। তাঁর মনে পড়ল বছর দুই আগে জারমেনির এক ক্ষুদ্র শহরে মদিরার পাত্র সামনে নিয়ে তাঁদের মধ্যে যে কথাগুলি হয়েছিল, মনে পড়ল কোবা-য়াশি নিজের কাজের মানবিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। অতিদীর্ঘ জীবন যে সর্বাংশে ভাল, সে সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধা ছিল। সেই কারণেই হয়তো তাঁর আবিষ্কার বিশ্বকে দান করতে ভয় পাচ্ছেন তিনি।

আসলে তখন পর্যন্ত কোবায়াশি যেটুকু সফল হয়েছেন, তা ভবিষ্যতের এক আশ্চর্য উদ্যোগের প্রথম ধাপ মাত্র। তিনি স্পষ্ট প্রমাণ পেলেন যে, ইঁদুরের মধ্যে দীর্ঘায়ুর জিন আছে, সেই জিনের গঠনও উদ্ঘাটন করলেন। এর অনেক আগেই অবশ্য বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে, জিনের উপাদান নিউক্লিইক অ্যাসিডের রাসায়নিক গড়ন

অনুসারে জিনের প্রকৃতি ভেদ। কোবায়াশি এমন নির্দেশও পেলেন যে, তাঁর এই নবাবিষ্কৃত জিন কয়েকটা এনসাইমের ছাঁচ হিসাবে কাজ করে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের মধ্যে কতগুলি ক্ষতিকর পদার্থ জমে, তাদের ধ্বংস করা এই এনসাইমগুলির কাজ। ধ্বংসের ফলে ইঁদুরের আয়ু বাড়ে। এর পরে দীর্ঘায়ুর উত্তরাধিকারতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ রইল না। কিন্তু বহির্জগতে নিজের কাজ তিনি প্রচার করলেন না, কারণ যথার্থ অনুমাণ করলেন তিনি যে, এই আবিষ্কারের পরিণতি অনেক দূর গড়াতে পারে, অতি সাংঘাতিক হতে পারে।

কাজের দ্বিতীয় ধাপ শেষ করতে আর ন' বছর কেটে গেল। আজ বিশ্বের নানা গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে জন্মলব্ধ জিন পরিবর্তন সম্বন্ধে কাজ চলছে, এর দ্বারা অনেক জন্মগত রোগের আরোগ্য সম্ভব হতে পারে, অথবা স্বাভাবিক সুস্থ জীবের আরও উন্নতি ঘটানো যেতে পারে এই আশায়। স্ত্রী ও পুরুষের এক একটি যৌনকোষ থেকে নতুন জীবের জন্ম, এই কোষগুলি পরীক্ষা করে কৃত্রিম প্রজননের আগে যদি দরকার মত জিন বদলে দেওয়া যায়, তাহলে প্রকৃতির উপর টেক্কা দেওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় উপায় হল, উপযুক্ত ভাইরাসের অনুপ্রবেশ; ভাইরাসও নিউক্লিইক অ্যাসিড দিয়ে তৈরী, কোষের মধ্যে জিনসমষ্টি বা ক্রোমোসোমের স্থান দখল করে তা নানারকম রোগের সৃষ্টি করে; কিন্তু পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত ভাইরাস যদি অনাকাঙ্ক্ষিত জিনের স্থান নেয়, তাহলে কার্যসিদ্ধি হতে পারে।

যে কোনও উপায়ে এখনও নানা সমস্যা, পরবর্তী ন' বছরে কোবায়াশি দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রয়োগে সফল হলেন। দীর্ঘায়ুর জিন-ভাইরাস ল্যাবরেটরিতে বানিয়ে তা ইঁদুরের দেহে স্থাপন করে তিনি দেখলেন, তাদের আয়ু তিন থেকে পাঁচ গুণ বেড়ে গেল। অধিকাংশ বিজ্ঞানী এই অবস্থায় এই আশ্চর্য আবিষ্কারের খবর অবিলম্বে পৃথিবীকে জানাতেন, কোবায়াশি তা করলেন না।

ইঁদুর স্তন্যপায়ী জীব, তা বলে তা মানুষ নয়। মানুষের মধ্যেও যে দীর্ঘায়ুর জিন কাজ করে, তা পৃথকভাবে দেখাতে হবে। অথচ মানুষ নিয়ে পরীক্ষায় অনেক বাধা। ইঁদুর অল্পদিন বাঁচে, সুতরাং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কোবায়াশির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। তাছাড়া মানুষের আছে মন ইচ্ছা অধিকার, তাদের খাঁচায় ভরে বিজ্ঞানীর খেয়ালের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

কোবায়াশি সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, সুতরাং জাপানী সরকার তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে অবহিত ছিল। এই সন্ধিক্ষণে প্রধানমন্ত্রী এক সভা ডাকলেন, তাতে এলেন নিজের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, কোবায়াশি এবং বাছা বাছা আরও বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী। প্রত্যেকেই শপথবদ্ধ বাইরে কোনও কথা প্রকাশ করবেন না। বিষয়টির সব দিক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। কেউ কেউ জনস্ফীতির আশঙ্কা জানালেন—জাপান অনেক চেষ্টায় এই স্ফীতির সংযম করেছে, তার জন্য ভ্রূণ ধ্বংসের নীতি পর্যন্ত গ্রহণ করেছে; এখন এই পরীক্ষার ফলে মানুষের স্বাভাবিক আয়ু যদি বাড়ে তো আবার একই সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু কোবায়াশি বললেন ফল আশানুরূপ হলেও সাধারণ জনতার মধ্যে যে তা প্রয়োগ করতে হবে এমন কোনও কথা নেই, এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে নিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে; বাইরের জগৎ যদি কিছু জানতে না পারে তো তারা দায়িত্বহীনভাবে কোনও উদ্যোগে হাত দিতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রী কোবায়াশিকে সমর্থন করে বললেন, 'মানুষ জাতির প্রতি যেমন আমাদের দায়িত্ব আছে, তেমনি মানুষের এত বড় প্রয়াস বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেও আমরা বাধা দিতে পারি না। অবশেষে ঠিক হল জাপানের এক ক্ষুদ্র দ্বীপে এই পরীক্ষা করা হবে।

বিশেষজ্ঞরা যে দ্বীপটি নির্ধারিত করলেন তার নাম কোজুশিমা, জনসংখ্যা মোটে কয়েক হাজার। অধিবাসীরা তাদের বাসভূমি ছেড়ে বাইরে বড় একটা যায় না, নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করে। পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স্কদের মধ্যে শ' পাঁচেক স্ত্রী পুরুষ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে রাজী হল, যদিও ফলে তাদের এই দ্বীপেই বাকি জীবন কাটাতে হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য এদের সম্পূর্ণ জানানো হল না, বহির্জগতে তা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে।

*

কোবায়াশির পরীক্ষা সার্থক হল আশানুরূপ, অবশ্য এর প্রমাণ পাবার অনেক আগেই তেষট্টি বছর বয়সে তিনি নিজে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের উত্তরাধিকারীরা কয়েক পুরুষ ধরে তথ্য সংগ্রহ করলেন। ২৮০০ সালে এ সম্বন্ধে শেষ রিপোর্ট তৈরি হল, তখন আর সন্দেহ রইল না যে যাদের মধ্যে ভাইরাস অনুপ্রবেশ করানো হয়েছিল তাদের বংশধরদের আয়ু অনেক বেড়েছে; এক শ'র আগে বড় কেউ একটা মরেনি, দেড়শ' কিছু অস্বাভাবিক নয়, সর্বোচ্চ সংখ্যা ২৬১। মৃত্যুর অল্প কয়েক বছর আগে জরার আক্রমণ ঘটে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গেল যে তখন দেহকোষে অনিষ্টকর বস্তু এমন জমা হয় যে এনসাইমু সব ধ্বংস করতে পারে না। অবশ্য কেউ কেউ দুর্ঘটনায় বা কঠিন রোগে আগেই প্রাণ হারিয়েছে, তাদের কথা আলাদা।

এই তো গেল নিছক বৈজ্ঞানিক সাফল্য। কিন্তু মানুষের মনের তখন কি অবস্থা, অধিবাসীরা কি সুখী? সমাজতাত্ত্বিকরা এ যাবৎ নিজেদের তথ্য সংগ্রহ করে এসেছে, তাদের দলিলে কোজুশিমা দ্বীপবাসীদের অন্য এক রূপ ধরা পড়ল। দেখা গেল দীর্ঘকাল অজরার সুখ ভোগ করেও বিরস নিরানন্দ এদের জীবন।

সমাজে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরীক্ষার আগে বাপের মৃত্যুর পর যথাকালে তার সম্পত্তি পেয়ে সন্তানদের অনেক সাহায্য হত নিজেদের পুত্র কন্যা মানুষ করতে। এখন যে ১৫০ বছর বাঁচছে তার নিচে আছে ১২০, ৯০, ৬০ ইত্যাদি বয়সের কয়েক পুরুষ, এরা দরকারের সময়ে পূর্বপুরুষের সম্পত্তি পায় না।

তাছাড়া তরুণদের উপর শুধু ঠাকুরদা ঠাকুরমা নয়, প্রপিতামহ এমন কি তস্য পিতামহ থাকাতে তাদের দেখাশুনো করতে হয়, মেজাজ সইতে হয়, হয়তো ভরণপোষণও দরকার হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পুরুষের মধ্যে কলহ ও বৈরভাব বেড়েছে।

বৃদ্ধদের প্রাধান্য হওয়াতে সমাজে কিছুটা কূপমণ্ডূকতা এসে গেল, এরা পরিবর্তনের বিরোধী, বহির্জগতের অনেক পিছনে পড়ে গেল দ্বীপসম্প্রদায়। জনসংখ্যার চাপও বর্ধিষ্ণু, ঘন বাসের ফলে বেড়েছে বদ মেজাজ, এমন কি মানসিক রোগ। শিশুরা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজের ক্ষুদ্র অংশ। পৃথিবীর অন্যত্র শিশুর হাসি খেলা ভালবাসায় মানবজীবন প্রফুল্ল ও সরস, এই দ্বীপে সর্বত্রই যেন প্রবীণদেরই চোখে পড়ে।

এরা দুঃখ তাপের ভারে নত। সুস্থ দেহে বেশী কাল বাঁচছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়ে উঠছে জীবনধারণের অনিবার্য শোকের বোঝা। আর বাড়ছে বিরক্তি—একই ঘরে বাস, একই পথে চলা এই সব সাধারণ বস্তুও অনেক সুস্থ সচেতন শতায়ুর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল।

জরা এক রোগ, তার আরোগ্য সম্ভব—এই মূলসূত্র থেকে বিশ শতাব্দে এই গবেষণার সূচনা; এখন মনে হচ্ছে জীবনধারণই এক রোগ, বিশেষ এক সীমার পরে।...

*

আবার টোকিওতে এক জরুরী সভা বসল। সিদ্ধান্ত হল যারা চায় তাদের স্বাভাবিক আয়ু ফিরিয়ে দেওয়া হবে একই পদ্ধতি অনুসারে, যারা জন্মলব্ধ আয়ুটুকু ক্ষয় করে যেতে চায় তাদের শুধু প্রজননের শক্তি বন্ধ করা হবে। অধিকাংশই প্রথম দলে ঢুকল, যাদের বয়স বেশী নতুন ভাইরাস অনুপ্রবেশের পর তারা দেখতে দেখতে পড়ল জরার কবলে। তবু অনেকেরই মুখে হাসি।

ততদিন অবশ্য এই আশ্চর্য পরীক্ষার খবর বহির্জগতে পৌঁছে গিয়েছে। এমন কি কয়েক শতাব্দী ধরে জাপানের অন্যত্র মাঝে মাঝে অতিজীবীর অভ্যুদয় দেখা গেল। বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করলেন যে সব সতর্কতা সত্ত্বেও দ্বীপ থেকে দু-চারজন বেরিয়ে গিয়েছে এবং বিবাহ করেছে, এই দীর্ঘায়ু তাদেরই বংশধর। এ কালে ছোঁয়াচে রোগ দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ যেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে তেমনি জাপান সরকার কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন যেন এদের এবং এদের বংশধরদের আর সন্তান না হয়। এইভাবে সমস্যার সমাধান হল।
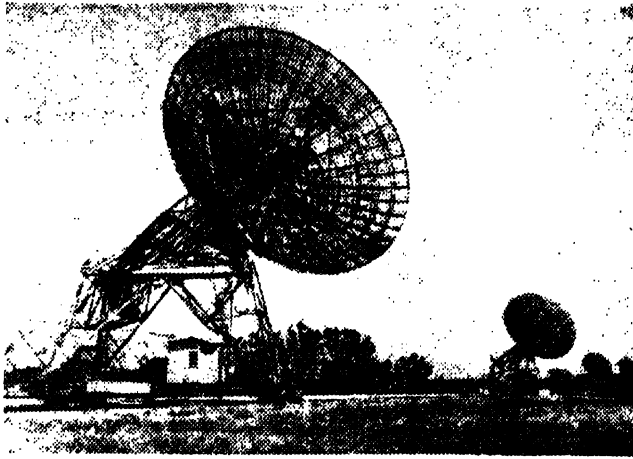
মহাবিশ্বে পালসারের অবস্থিতি নির্ধারণের জন্যে ব্যবহৃত কেম্ব্রিজের বৃহদাকার প্রতিফলক দূরবীণ

পালসার

মহাবিশ্বের বুকে এক ক্ষুদ্র বালুকণাসম আমাদের পৃথিবী গ্রহ আর পৃথিবীর বুকে এক ক্ষুদ্র জীব আমরা মানুষ। কিন্তু এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষই তার বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করে আসছে কোন্ সুদূর অতীত থেকে। তবু মহাবিশ্বের রহস্যের কতটুকু আজ আমরা জানি বা জানতে পেরেছি। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে গ্যালিলিও যেদিন তাঁর দূরবীণ তুলে প্রথম মহাকাশের দিকে তাকালেন, সেদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটু একটু করে গোপন দরজা আমাদের সামনে খুলতে শুরু করেছে। আর তারই ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে পেলুম অন্তহীন মহাবিশ্বের অসীম ব্যাপ্তিকে—আভাস পেলুম মহাকাশের নতুন থেকে নতুনতর রহস্যের। শত শত বৎসরের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে কিছু কিছু রহস্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি সত্য। কিন্তু মহাবিশ্বের রহস্যকে বা চরম সত্যকে আমরা কি কোনোদিন জানতে পারব? বোধ হয় কোনোকালেই পারব না।

তবু বিজ্ঞানীরা অজানাকে জানার চেষ্টা অবিরাম করে চলেছেন এবং করবেনও চিরকাল। বিজ্ঞানীদের এই নিরলস গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলেই আমরা সম্প্রতি 'কোয়াসার' রহস্যের সন্ধান পেয়েছি। আর মাত্র এক বছর আগে মহাবিশ্বের একটি নতুনতর রহস্যের সন্ধান পেয়েছি। যার নাম 'পালসার'। 'পালসার' কথাটির ব্যাখ্যা করলে দাঁড়াবে 'পালসেটিং রেডিও সোরসেস্' অর্থাৎ স্পন্দনশীল বেতার উৎস।

১৯৬৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী 'নেচার' পত্রিকায় পালসারের কথা প্রথম ঘোষণা করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুলার্ড বেতার-মান মন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ অ্যান্টনী হিউইশ। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে মুলার্ড বেতার-মানমন্দিরে একটি নতুন বেতার-দূরবীণ স্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম জটিল রহস্য কোয়াসার পর্যবেক্ষণ। এই কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় ডঃ হিউইশ এবং তাঁর সহকর্মীরা নতুন এক শ্রেণীর বেতার-উৎস আবিষ্কার করেন, যারা প্রায় এক সেকেন্ড সময় অন্তর অন্তর বেতাররশ্মি বিকিরণ করছে। এই বেতার-রশ্মির শক্তি এত ক্ষীণ যে এর আগে কেউ এই স্পন্দন লক্ষ্য করেন নি। বিকিরিত বেতার-রশ্মির এই স্পন্দনের জন্যেই এর উৎসকে বলা হয়েছে স্পন্দনশীল বেতার উৎস। এখন পর্যন্ত চারটি পালসারের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে তিনটি বেতার-রশ্মি বিকিরণ এক সেকেন্ডের সামান্য বেশি সময় অন্তর স্পন্দিত হয়। চতুর্থটির স্পন্দনকাল সেকেণ্ডের এক-চতুর্থাংশ।

প্রথম যখন পালসার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়, তখন কেউ কেউ কল্পনা করেছিলেন—সৌরজগতের বাইরে কোনো গ্রহ থেকে আমাদের চেয়ে উন্নততর কোনো মানবগোষ্ঠী এই বেতার-সংকেত পাঠাচ্ছে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই সম্ভাবনা মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমত, সৌরজগতের বাইরে কোনো নক্ষত্রের চারদিকে আবর্তনশীল কোনো গ্রহ থেকে যদি এই বেতার-সংকেতের উৎপত্তি হত, তাহলে ডপলার-এর সূত্র অনুযায়ী গ্রহের গতির সঙ্গে সঙ্গে বিকিরিত বেতার-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও পরিবর্তিত হত। কিন্তু কেম্ব্রিজের সূক্ষ্ম গবেষণাতেও পালসারের স্পন্দনকাল পরিবর্তনের তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, একটা বিষয়ে সব জ্যোতির্বিজ্ঞানীই একমত যে, অত কাছাকাছি চার চারটি উন্নত জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার গ্রীন ব্যাংক মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ কেনেথ কেলারম্যান এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে এখনও এমন কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে সৌরজগতের বাইরে কোনো গ্রহ থেকে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর দ্বারা

বেতার-সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায়।

অবশ্য বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই কল্পনা করছেন পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ব্রিটেনের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বার্নার্ড লোভেল বলেছেন, আমাদের ছায়াপথের মত আরও কোটি কোটি নক্ষত্র-মন্ডলী দিয়ে মহাবিশ্ব গঠিত। এদের মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের সূর্যের মতো লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আছে, যাদের চারদিকে গ্রহসমূহ আবর্তন করছে এবং কোনোটিতে জীবের অস্তিত্ব আছে নিশ্চয়। কাজেই সৌর-জগতের বাইরে কোথাও বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব কল্পনা করা অযৌক্তিক নয়।

এখন দেখা যাক, পালসারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি। অ্যান্টনী হিউইশ ও তাঁর সহযোগীরা বেতার-তরঙ্গের প্রকৃতি থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, পালসারের ব্যাস অবশ্যই ৫ হাজার কিলোমিটারের কম হবে। এদের দূরত্ব সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায়, আমাদের পৃথিবী থেকে ১০০ থেকে ৪০০ আলোকবর্ষের মধ্যে।

পালসারের সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হলো, এদের প্রত্যেকের স্পন্দন-কাল সঠিকভাবে অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ ঠিক একই সময় অন্তর অন্তর এদের বেতার-সংকেত আসে। পালসারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর বেতার-রশ্মি বিকিরণ সমতলে আবর্তিত হয় অর্থাৎ এই বিকিরণে বৈদ্যুতিক চৌম্বক কম্পন শুধু বিশেষ তলেই হতে পারে। আমরা জানি, সাধারণ বেতার-তরঙ্গে এই কম্পন তরঙ্গের গতিবেগের দিকের সঙ্গে লম্বভাবে সবদিকেই হয়ে থাকে। কিন্তু পালসারের বেতার-তরঙ্গে বৈদ্যুতিক কম্পন একটি বিশেষ দিকে এবং চৌম্বক কম্পন তার সঙ্গে লম্বভাবে হয় এবং এই দুটি দিকই আবার বেতার-রশ্মির গতিবেগের দিকের সঙ্গে ঠিক লম্বভাবে থাকে।

পালসারের স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত। কারো মতে এগুলি কোনো স্পন্দনশীল শ্বেতবামন নক্ষত্র, আবার কারো মতে এগুলি কোনো নিউট্রন-নক্ষত্র। আমরা জানি, মহাকাশের গ্যাস ও ধূলি-কণা সম্মিলিত হয়ে আপন মহাকর্ষের বলে জমাট বেঁধে নক্ষত্র সৃষ্টি করে। তারপর নক্ষত্রের ভেতর কেন্দ্রীনের সংযোজন প্রক্রিয়ায় প্রচন্ড শক্তি উৎপন্ন হয় এবং নক্ষত্রের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হতে থাকে। ফলে নক্ষত্রকে উজ্জ্বল দেখায়। এক সময় নক্ষত্রের হাইড্রোজেন জ্বালানী শেষ হয়ে আসে। নক্ষত্রটি তখন সংকুচিত হতে হতে শ্বেতবামনে পরিণত হয়। ছোট আকারের জন্যে এদের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা অতি প্রচন্ড, তাই এদের শাদা দেখায়।

আর এক রকম নক্ষত্র আছে, যারা হচ্ছে বিস্ফোরণশীল কোনো নক্ষত্রের অবশেষ। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের মতে যখন সূর্যের দশ গুণ ভরের কোনো বিরাট নক্ষত্র তার হাইড্রোজেন জ্বালানী নিঃশেষ করে ফেলে, তখন সেটা দ্রুত সংকুচিত হতে থাকে। ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এর কেন্দ্রভাগ বহির্ভাগ থেকে পৃথক হয়ে যায়। তখন কেন্দ্রভাগের ঘনত্ব এত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় যে, সেখানে ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে গিয়ে নিউট্রনের সৃষ্টি করে। এ থেকেই কেন্দ্রভাগ নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হয়।

পালসার-এর উৎপত্তি শ্বেতবামন নক্ষত্র, না নিউট্রন নক্ষত্র থেকে সে বিষয়ে নানাজনে নানা ব্যাখ্যা করেছেন। কেম্ব্রিজের তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণাগারের হয়েল এবং নারলিকার বলেছেন, পালসারের সেকেন্ডের এক-চতুর্থাংশের মতো স্পন্দনকাল শুধুমাত্র কম্পমান শ্বেতবামনের অনুমান থেকেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঘারবিজ এবং স্টিটম্যাটার বৃহস্পতি গ্রহের বেতার-সংকেতের সঙ্গে তুলনা করে অন্য একটি মতবাদ দিয়েছেন। বৃহস্পতি গ্রহের কোনো একটি উপগ্রহ (সর্বসমেত চারটি উপগ্রহ আছে) এবং গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্রের অক্ষ যখন বিশেষ দিকে থাকে, তখন বৃহস্পতি থেকে বেতার-সংকেত আসতে দেখা যায়। এই দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে পালসারও তেমনি একটি নিউট্রন নক্ষত্রের চারদিকে ঘূর্ণায়মান একটি গ্রহ। গ্রহটির আবর্তনকাল প্রায় এক সেকেন্ড।

ভারতের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর বিজ্ঞানী কুন্ডু এবং চিত্রে প্রস্তাব করেছেন, কোনো নক্ষত্রের চারদিকে তড়িৎ-আধানহীন গ্যাসের কম্পন থেকেই সম্ভবত পালসারের বেতার-সংকেতের উৎপত্তি। সৌরস্ফীতির মতো নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশে উত্তপ্ত গ্যাসের ফুল্কি থেকে উৎপন্ন কণিকার দ্বারা এই কম্পন সৃষ্টি হতে পারে।

পালসার আবিষ্কারের পর সাধারণ দূরবীণের সাহায্যে এদের সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়। বহু অনুসন্ধানের পর শুধু একটির ক্ষেত্রে দৃশ্য-বিকিরণের স্পন্দন লক্ষ্য করা গেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এই দৃশ্য-বিকিরণের স্পন্দনকাল বেতার-বিকিরণের স্পন্দনকালের অর্ধেক।

পালসারের রহস্য নিয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানীমহলে ব্যাপক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চলছে। পালসার গবেষণা থেকে অদূর-ভবিষ্যতে দুই মূল্যবান ফল পাওয়া যেতে পারে। একটি হচ্ছে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের নতুন পরীক্ষা। সূর্য যখন পৃথিবী ও পালসারের রেখার মধ্য দিয়ে যাবে, তখন সূর্যের বিরাট মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের দরুণ পালসারের বেতার সংকেতের স্পন্দনকাল পরিবর্তিত হবে। কতটা পরিবর্তিত হবে তা নির্ভর করবে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ওপর। আর একটি হচ্ছে —পালসারের দূরত্ব যদি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়, তা হলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বও নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যাবে।

বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে কোয়াসার এবং পালসার জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মহাবিশ্বের আরও কত বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কে জানে—পালসার রহস্যের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের অন্যত্র আমাদের সগোত্র কোনো জীবের সন্ধান একদিন হয়তো মিলবে!

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশী বাদ্য শিল্প

আশীষ বসু

দেশী বাদ্যযন্ত্রের কথা আজ আলোচিত হচ্ছে কেন না হঠাৎ বিদেশের, বিশেষ করে আমেরিকার বাজারে সেতার, সরোদ ইত্যাদির চাহিদা গেছে অসম্ভব রকম বেড়ে। আগে যা রপ্তানী ছিল সরকারী হিসাব মতো দেশী বাদ্যশিল্পের রপ্তানী বাণিজ্য এখন প্রায় দশগুণ কি তারও বেশী হয়েছে। ভালো সেতার বাজারে পাওয়া যায় না, যা'ও বা পাওয়া যায় তার দাম হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে।

দেশী বাদ্যশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত সেতার। সেতার সম্পর্কে ইতিহাস বলে যে ভারতবর্ষে সেতারের আমদানী করেন আলাউদ্দিন খিলজী। আমির খসরু সেতার আবিষ্কার করেন।

সেতার তৈরীর জন্য দরকার হয় একটি সাড়ে তিন ফুট সাইজের লাউ, সেগুন কাঠ, সম্বরের শিং, তুন কাঠ, সেলুলয়েড, পালিশের যন্ত্রপাতি ও জিনিষপত্র, স্টীল, ব্রোঞ্জ ও পেতলের তার ইত্যাদি। একই লোক সেতারের সব অংশটুকুর কাজ করেন না, প্রত্যেকটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা লোক আছে। তবু হিসেব করলে দেখা যায় যে একটি সেতার তৈরী করতে একজন কারিগরের প্রায় দশ রোজ লাগবে। একটি সাধারণ সেতার তৈরী করতে কারিগরের মজুরী ও জিনিপত্রের দাম নিয়ে প্রায় একশো টাকা লাগবে। এই সব সেতার একশো পঁচিশ-ত্রিশে বাজারে বিক্রি হয়। তবে উৎকৃষ্ট তরফদার সেতার যার গায়ে খোদাই কাজ ইত্যাদি করা থাকবে, এমন সেতারের দাম তিন-চারশো অবধি হতে পারে। একটি সেতারে মোটামুটি পাবেন এই ভাগগুলি—ঘাড়ি, গণ্ডি, পোর্টার, তবলি, আড়া বা সরস্বতী, ব্রিজ, মানকা; পম্বী বা লেঙ্গুট।

গুণীজনের মুখের কথা সবচেয়ে ভালো সেতার হয় কলকাতায়, কলকাতার তৈরী সরোদও সবচেয়ে ভালো। উৎকৃষ্ট ভালো তানপুরা তৈরী হয় মিরাজে (মহারাষ্ট্রে), ভালো দিলরুবা আসে বোম্বাই থেকে, বীণা তৈরী হয় পান্ডারপুরে দক্ষিণ ভারতে। লক্ষ্ণৌতে প্রায় সবরকম বাদ্যযন্ত্রই তৈরী হয় তবে সাধারণ স্তরের বাদ্যযন্ত্র, এও গুণী ব্যক্তিদের কাছেই জানা।

সেতারে সাত তারের ব্যবহার প্রথম করেন বিখ্যাত শিল্পী মজিদ খাঁ, তানসেন ঘরানার মানুষ। উনিশ শতকের শুরুতে লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ আলী রেজা খাঁ সেতারের অনেক উন্নতি করেন।

সেতারের পরেই আসে সরোদের কথা। সরোদের জন্ম পুরোনো রবাব থেকে। সরোদের বয়স বেশী নয়, উনিশ শতকের শুরুতেই তার অভ্যুদয়। সরোদের তারও সাতগাছা, এতেও তরফের তার লাগানো হয় ঠিক সেতারের মতোই। সরোদের অনেকগুলি ভাগ রয়েছে যেমন খুঁটি, কান, ফিংগার বোর্ড বা প্লেট, পম্বী, ব্রিজ, ঢোল, আড়া বা সরস্বতী, চিকারি গুণজি আর তার। তরফের জন্য স্টীলের তারই লাগবে, অন্য সাত তারের ভাগও সেতারের মতোই। সরোদ তৈরী করতে লাগে তুন কাঠ, সিসাম কাঠ, স্টীলের প্লেট, সম্বরের শিং, পালিশের যন্ত্র আর সাজ-সরঞ্জাম। একটি সাধারণ তরফদার সরোদের দাম পড়বে আড়াইশো, সাধারণ সাত তারের সরোদের জন্য পড়বে একশো পঞ্চাশ টাকার মতো দাম। উৎকৃষ্ট তরফদার নকশী সরোদের দাম সাড়ে ছ'শ, সাতশো টাকা অবধি হতে পারে। কলকাতার জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তার কারখানায় তৈরী সরোদ তিনি কলম্বো, মরিসাস, ডেনমার্ক, লস এঞ্জেলস, সানফ্রান্সিসকো ইত্যাদি বিদেশের নানাস্থানে পাঠাচ্ছেন।

সবচেয়ে পুরোনো বাদ্যযন্ত্র বীণা। এটিকে খাঁটি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র বলা যেতে পারে। অজন্তার গুহাগাত্রে, অমরাবতী, সাঁচীতে যে সব চিত্র রয়েছে তাতে সেতার, বেহালা কি রবাব জাতীয় যন্ত্রের ছবি দেখা যায়। সাঁচীতে একরকম বীণা দেখা যায় যার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় রোম সভ্যতার 'টি বি' ই নামে একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের। পারস্যের 'কুয়ানুন' যন্ত্রের মতো একপ্রকার যন্ত্রের ছবি পাওয়া যায় অমরাবতীর কাত্যায়নী বীণায়। মুর সভ্যতার 'রবেক' নামে যে যন্ত্রটির কথা পাওয়া যায় তার আকৃতি অনেকটা আমাদের রবাবের মতো। আবার অনেকের মতে রবাবের জন্ম আমাদের রুদ্র বীণা থেকে। ভারতবর্ষে, তিব্বতে এবং ইস্ট ইন্ডিজে এই যন্ত্রের বহুল প্রচার একসময় ছিল।

তন্ত্রে বীণার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। যামলতন্ত্র বীণা সম্পর্কে বলছে, চতুর্বিধানাং বীণানাং লক্ষণং তন্ত্রীলক্ষণম। কিন্নরস্বরযন্ত্রাদি লক্ষণং কেবললক্ষণং।। এখানে বারো রকমের বীণার লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ১৯শ সংখ্যক যামলাতন্ত্রটির নামই বীণাতন্ত্র। নারদীয় 'পঞ্চমকণ্ডিকা' শুরু হয়েছে 'দারবী' এবং 'গাত্রবীণা' দিয়ে। গাত্রবীণার ব্যবহার হোত সামগানে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যে দুটি বীণার কথা পাওয়া তার নাম 'চিত্রা' ও 'বিপঞ্চী'। চিত্রাবীণার সাত তার, বিপঞ্চীর নটি। 'সঙ্গীত মকরন্দ' নামক গ্রন্থে উনিশ রকম বীণার উল্লেখ রয়েছে। তাদের নামও অদ্ভুত কদুপী, কুব্জিকা, চিত্রা, বহন্তী, পরিবাদিনী, জয়া, ঘোষাবতী, জ্যেষ্ঠা, নকুলী, মহতী, বৈষ্ণবী ইত্যাদি। শার্ঙ্গদেব তার 'সঙ্গীত রত্নাকর' পুস্তকে একতন্ত্রী ত্রিতন্ত্রিকা, আলাপিনী, কিন্নরী ইত্যাদি এগারো রকমের বীণার কথা লিখেছেন।

সারস্বত বীণা বা উত্তর ভারতের বীণার সবচেয়ে বেশী খ্যাতি তানসেন ঘরানার। তানসেন কন্যা সরস্বতী দেবীর মারফৎ প্রাপ্ত ঘরানায় বিখ্যাত ছিলেন শাহ সদারঙ, নির্মল শাহ, ওয়াজির খান প্রভৃতি ওস্তাদেরা। সারস্বত বীণার সাত তার, বাইশ সারি বা ফ্রেট।

তানপুরা, কথিত আছে তম্বরু মুনির সৃষ্টি। মহাদেবের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম ছিল তম্বরু ঋষি। তম্বরু থেকেই তম্বুরা এবং তাই থেকেই 'তানপুরা' কথা এসেছে মনে হয়। তানপুরা তৈরিতে লাগে লাউ চার ফুট মতো সাইজের, সেগুন কাঠ, ডান্ডির জন্য তুন কাঠ, সেলুলয়েড, সম্বর শিঙ, তার পালিশের মালমশলা ইত্যাদি। আগেই বলেছি মিরাজের তানপুরা সবচেয়ে ভালো। মিরাজের বিখ্যাত ওস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল করিম খাঁ এবং বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকর। তানপুরার চারটি তার থাকে।

রবাবও তারের যন্ত্র, সঙ্গে একটি ড্রাম আছে। মনে হয় রবাবের জন্ম ভারতবর্ষেই। বিশেষজ্ঞদের মতে আরবীয়েরা ভারতবর্ষ থেকে রবাব যন্ত্রটি নিয়ে গিয়ে থাকবেন। মধ্যপ্রাচ্যের 'রুবেবা' নামক বাদ্যযন্ত্রটির সঙ্গে এর মিল দেখেও তাই মনে হয়।

সারেঙ্গীকে ভারতীয় ভায়োলিন বলা যেতে পারে। সারেঙ্গীর তিন বা চার তার থাকবে। চারটির মধ্যে একটি তার পিতলের। ছড়ি দিয়ে সারেঙ্গী বাজানো হয় ঠিক ভায়োলিনের মতো করে। সারেঙ্গীতে পেটের ওপর মাঝখানে ব্রিজ বসানো থাকে। অন্য বাজনার সঙ্গে বাজাতে সারেঙ্গীর জুড়ি নেই।

তবলার দুই ভাগ, ডাইনে আর বাঁয়া। ডাইনের তবলা তৈরী হয় শিসাম, বিজেশাল বা আমকাঠ দিয়ে। নিমকাঠেও তবলা হয়। ছাগলের চামড়া দিয়ে হয় চাদর। গরুর চামড়াও লাগে। কাঠের গুলি লাগে আটটা, টানা দেওয়া থাকে। লোহাচুর, ভাত, গাবের আটা দিয়ে মিকশ্চার করে তা বসানো হয় ওপরের চাদরে। বাঁয়া তবলায় এই মিকশ্চার-গোলক থাকে ধার ঘেঁষে, ডাইনা-তবলায় তা থাকে মধ্যে।

এর মধ্যে প্রায় সব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারই আছে বাঙলাদেশে, কম-বেশী এই যা।

সবশেষে বাংলাদেশের খোল, করতাল, একতারা-দোতারার এবং বাঁশীর কথাও বলতে হয়। পশ্চিমবাঙলার বাউল গান ও উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলের লোকগীতিগুলিতে দোতারা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র হিসাবে আজও ব্যবহৃত হয়।

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমো প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব। এমন সময় দুঃখী ঝিনুকের বাবা ভবতোষ এলেন। ভবতোষবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর দেখাশোনা নেই দীর্ঘ দু-মাস। অবনীমোহন বেশ কিছু জমি কিনবেন স্থির করলেন। ডাক পড়ল মজিদ মিঞার। চোখে তার খুশির রোশনাই। সামান্য দামেই জমির ব্যবস্থা করলো সে। হিরণ এল বহুদিন পরে। সুধার শিরায় শিরায় ভালোবাসার নেশা।

বিনু তখন একা। এল যুগল। জলা-বাঙলার প্রতীক। বলল : কাউঠা দ্যাখছেন ছুটোবাবু? অবাক হল বিনু। ছুটল। চোখের সামনেই জলজ-জীবটিকে টেটা দিয়ে গাঁথল যুগল। বাড়ি ফেরার পালা। পথে বেবাজিয়ার বহর। ঘুরে ঘুরে দেখল নৌকা-গুলো। বেদেদের জীবন দিল বিনুর চোখে বিস্ময়ের রঙ।]

বাগান-টাগান পেছনে ফেলে বার-বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী চিলের মতন সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কই গেলা সগলে—'

বেদেনীরা যে আসবে সে খবর বাড়ি ফিরে ওবেলাই দিয়ে রেখেছিল বিনু। আঞ্জুমানের গলা পেয়ে সুরমা সুধা, সুনীতি স্নেহলতা, বিনু কিংবা যুগল—কেউ আর ঘরে বসে থাকতে পারল না। এ-ঘর থেকে ও-ঘর থেকে দূরে দূরে করে সবাই বেরিয়ে এল।

মাথার থেকে সাপের ঝাঁপি মাটিতে নামাল আঞ্জুমান। তারপর স্নেহলতার দিকে ফিরে বলল, 'আইলাম গো বউদিদি—' বলে হাসল।

স্নেহলতাও হাসলেন, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'আইজই আমরা রাইজদিয়া আইছি।'

'শুনেছি।'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলতে লাগল, 'অন্য সগল বার এইখান থনে (থেকে) যাও-নের দিন আপনেগো বাড়িত আসি। এইবার কিলাম পরথম দিনই আইলাম।'

স্নেহলতা উত্তর দিলেন না; হাসিটুকু তাঁর ঠোঁটে স্নিগ্ধ আভার মতন লেগে রইল।

আঞ্জুমান আবার বলল, 'এইবার রাইজদিয়া আইসা আমি আটাশ (অবাক)।'

স্নেহলতা উৎসুক হলেন, 'কেন?'

'বিহান বেলায় আপনেগো যুগলার লগে এউক্কা সোন্দর ফুটফুইটা পোলা আমাগো বহরে গেছিল। শুনলাম পোলাগা (ছেলেটা) নিহি আপনের নাতি। শুইনা আমার ধন্দ লাইগা গেল।'

'কেন?'

'আমি তো জানতাম আপনেগো পোলা-মাইয়া নাই। নাই-ই যদি নাতিখান আইল কই থনে? শ্যাসে যুগলাই কইল, পোলাগা আপনের ভাগ্নীর ঘরের। কইলকাতা থনে আইছে।'

স্নেহলতা মাথা নাড়লেন 'হ্যাঁ।'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'বিহান বেলায় নাতি গিয়া কইল সাপের খেলা দেখব; আমাগো আইতেও কইল। বড় মুখ কইরা নাতি দাওয়াত কইরা আইছে; হেই লেইগা পরথম দিনই আইলাম।'

'ভালো করেছ।'

টিয়া পাখির মতন লাল টুকটুকে ঠোঁট নেড়ে আঞ্জুমান বলল, 'ম্যালা (অনেক) কথা তো হইল। এইবার ভাগনী ভাগনী-জামাই দেখান। নাতিরে দেখছি, নাতিন (নাতনী) দেখান।'

স্নেহলতা বললেন, 'ভাগনী-জামাই তো দেখাতে পারব না। ক'দিন হল সে কল-কাতায় গেছে। অন্য সবাই আছে, তাদের দেখাচ্ছি।'

সাজগোজা-সাজা এবং প্রাত্যহিক [illegible] আঞ্জুমানের আলাপ-টালাপ করিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

আঞ্জুমান বলল [illegible] আলাপ সালাপ হইল; ভাগনী জামাইরে খালি দেখলাম না। তা আমার অবাক!' [illegible] সকলের উপর স্থির হল, 'তা [illegible] বউদিদি—'

স্নেহলতা তক্ষুণি সাড়া দিলেন, 'কী বলছ?'

'ভাগনী আমাগো এমুন কাহিল ক্যান? শরীলখানে কিছু নাই; য্যান (যেন) ফু দিলে উড়ব।'

'হ্যাঁ; ও ভারি রোগা। শরীরটা একে-বারেই সারছে না। ওকে নিয়ে আমাদের বড্ড ভাবনা।'

একটু চুপ করে থেকে আঞ্জুমান বলল, 'বাতাস লাগছে মনে লয়।'

স্নেহলতা প্রায় হতাশার সুরেই বল-লেন, 'কী জানি; ক' বছর ধরেই তো এ রকম চলছে। ডাক্তার-কবিরাজ ওষুধ-বিষুধ বারোমাস লেগেই আছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।'

আঞ্জুমান বলল, 'যাওনের সময় এক-খান শিকড় দিয়া যামু; আমার তাবিজে ভইরা ভাগনীর কমরে (কোমরে) পরাইয়া দিয়েন। সাইরা যাইব।'

'আচ্ছা।'

এবার সুধা-সুনীতিকে ভাল করে লক্ষ করল আঞ্জুমান। বলল, 'কপালে সিন্দুর নাই; নাতিন দুগা অবিয়াত মনে লাগে—'

'হ্যাঁ।'

'নাতিনগো বিয়ার সময় দাওয়াত য্যান পাই।' বলেই সুধা-সুনীতির কাছে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটল,

আইবা নি ভাই, যাইবা নি—

নাতিন খাওয়াইব সাধের মেজবানি।'

বেদেনীর রকমসকম দেখে সুধা-সুনীতি খিল খিল করে হেসে উঠল।

স্নেহলতা বললেন, 'নেমন্তন্ন তো করব; তোমাকে পাব কোথায়? ঘরদুয়ার কি কিছু আছে তোমাদের? সারা বছর শুধু ভেসে ভেসেই বেড়াও—'

'কাক-পক্ষীর কাছে খবর দিয়া দিয়েন; ঠিক উড়াল দিয়া আইসা পড়ুম।' আঞ্জুমান হাসতে লাগল।

খানিক নীরবতা।

তারপর আঞ্জুমানই আবার শুরু করল, দগলের লগে দেখাশুনা হইল; হ্যাম-গোরেই খালি দেখি না। কোনে কই?'

স্নেহলতা বললেন, 'দুপুর বেলা আব-দুলপুর গেছে।'

'ফিরলে আমাগো কথা কইয়েন।'

'বলব।'

'পারলে আমাগো বহরে য্যান যায়।'

'আচ্ছা।'

আঞ্জুমান বলল, 'আলাপ-সালাপ হইয়া গেল। এইবার আমাগো পান-তামাক খাওয়ান গো বইনদিদি—'

তার মুখ থেকে কথা খসবার আগেই যুগল আর করিম ছুটে গিয়ে তামাকের ডিবে, পানের ডাবর আগুনের মালসা, হুঁকো-টুকো নিয়ে এল। তারপর তামাক সেজে হুঁকোর মাথায় কল্কে বসিয়ে আঞ্জু-মানেমানের হাতে দিল। আঞ্জুমান এবং তার দুই সহচরী পালা করে করে তামাক খেতে লাগল; আয়েশ করে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বেদেনী হলেও আঞ্জুমানরা মেয়েমানুষ। আগে আর কখনও মেয়েমানুষকে তামাক খেতে দ্যাখে নি বিনু। পায়ে পায়ে যুগলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'এই—'

যুগল মুখ ফেরাল, 'কী কন?'

ফিস ফিস গলায় বিনু বলল, 'ঐ দেখ, বেবাজিয়ানীরা তামাক খাচ্ছে।'

বিনু ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে যুগল তাকিয়ে থাকল।

খুব সহজ গলায় যুগল বলল, 'খাইব না ক্যান? নিশার (নেশার) জিনিস সগলেই খাইতে পারে। তার পুরুষ মানুষ মাইয়া মানুষ নাই। খালি কি এই বাইদানীরাই,—কামার পাড়ায়, কুমার পাড়ায়, যুগী পাড়ায় যাইয়া দ্যাখেন গিয়া; সগল বাড়ি-তেই দুগা চাউরগা (দু-চারটে) কইরা মাইয়া মানুষ হুক্কা খায়।'

যত সহজে যুগল কথাগুলো বলল ঠিক তত সহজে মেনে নিতে পারল না বিনু। আবার কী বলতে যাচ্ছিল সে, ঠিক সেইসময় সাপের ঝাঁপি খুলল বেদেনীরা। তিন ঝাঁপি থেকে তিনটে কালকেউটে বিদ্যুতের মতন সাঁ করে লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

এদিকে একটা বেদেনী তুবড়ি বাঁশি বার করে বাজাতে শুরু করেছে। বাঁশির তালে তালে সাপ তিনটে ফণা দোলাতে লাগল।

একজন বাঁশি বাজাচ্ছে। সাপের নাচের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্জুমান সরু গলায় সুর করে গান ধরল।

চান্দ রাজার দাপট গেল বাতাসে
মিশিয়া—

তৃতীয় বেদেনীটি গাইল।

হায় বিষহরির দোয়া!

আঞ্জুমান এক কলি করে গায়। তৃতীয় বেদেনীটি 'হায় বিষহরির দোয়া' বলে ধুয়া ধরে। এইভাবে গান চলতে লাগল।

বেউলা রাঁড়ী কান্দে গোম, আনন্দ হইয়া

হায় বিষহরির দোয়া!
কালনাগিনী খাইল আজি সোনার লখাইরে—
হায় বিষহরির দোয়া!
সোনার অঙ্গ ভাসাইল গাঙ্গুনীর নীরে—
হায় বিষহরির দোয়া!
তাহার দোয়ায় সূর্য্য ওঠে পূবের আকাশে—
হায় বিষহরির দোয়া!
পরান পাইয়া ভেলায় বইসা লখাই হাসে—
হায় বিষহরির দোয়া!

গান চলছে। তার মধ্যেই যুগল ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু—'

চোখকান ধ্যান-জ্ঞান বেদেনীদের দিকে রেখেই বিনু সাড়া দিল।

যুগল শুধলো, 'এইটা কী গান জানেন?'

'না।'

'ভাসানের গান। মা মনসা আছে না?'

'হ্যাঁ।'

মনসার গানেরে ভাসানের গান কয়। মনে কইরা রাইখেন।'

বিনু মাথা হেলিয়ে দিল; মুখে কিছু বলল না।

যুগল আবার বলল, 'অখন থেইকা (থেকে) আপনেরা তো এই দ্যাশে থাকবেন। শাওন (শ্রাবণ) মাসের শ্যাষে যখন মনসা পূজা হইব তখন ঘরে ঘরে ভাসানের গান শুনতে পাইবেন।'

'তাই নাকি?'

'হ।'

গান-টানের পর সাপ খেলা দেখিয়ে ক্ষীর-মুড়কির ফলার করল বেদেনীরা। আরেক প্রস্থ পান-তামাক খেল। তারপর বখশিস হিসেবে একডালা ধান, চার আনা পয়সা, কিছু আনাজপাতি আদায় করল।

পান চিবুতে চিবুতে আঞ্জুমান বলল, 'এইবার যাই গো বইনদিদি—'

স্নেহলতা বললেন, 'এখনই যাবে?'

'হ। চাঁকদারে (চৌকিদার) থাকতে তো দিব আড়াই দিন। এইর ভিতর রাইজদিয়ার সগল বাড়িতে যাইতে হইব। বাড়ি তো আর এউক্কা দুগা (একটা দুটো) না—'

বেবাজিয়ানীরা সাপের ঝাঁপি, ধানের ডালা-টালা মাথায় চাপিয়ে উঠে দাঁড়াল।

স্নেহলতা বললেন, 'আবার এসো।'

আঞ্জুমান বলল, 'এইবার আর আসা হইব না বইনদিদি; আইতে আইতে সেই ফিরা (আগামী) বচ্ছর।'

হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল স্নেহলতার। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'চলে তো যাচ্ছ, ভাগুনীকে শিকড় দিয়ে গেলে না?'

'আমার লগে তো নাই। নায়ে (নৌকায়) আছে। যুগলারে আমার লগে পাঠাইয়া দেন, দিয়া দিমু অনে।'

আঞ্জুমানদের সঙ্গে যুগলকে বেদে-বহরে পাঠিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

●

অবনীমোহন বলেছিলেন, দিন সাতেকের ভেতর কলকাতার সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসবেন। ফিরতে ফিরতে দু সপ্তাহ কেটে গেল।

সন্ধেবেলা পুবের ঘরের তক্তপোষে সুধা-সুনীতি-বিনু এবং ঝিনুক গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে পড়তে বসেছিল। তাদের সামনে দুটো ঝকঝকে হারিকেন।

হেমনাথও এই ঘরেই আছেন। তক্ত-পোষের ধার ঘেঁষে একটা ক্যাম্পখাট। তার

ওপর কাত হয়ে শুয়ে মূল বাল্মীকি রামায়ণ পড়ছেন।

আজ অঘ্রান মাসের ষোল তারিখ। নিয়ম অনুযায়ী পৌষ থেকে শীত শুরু। নিয়ম যা-ই থাক, এ বছর শীতের যেন আর তর সইছে না। তার বড় তাড়া। হেমন্ত থাকতে থাকতেই সে এসে দরজায় দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। ক'দিন ধরেই এলোমেলো উত্তুরে বাতাস ছেড়েছে। আজ যেন সেটা হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে। কাজেই বিনুরা চাদর বা কম্বল, যে যা পেয়েছে তাই জড়িয়ে পড়তে বসেছে।

সময়টা কৃষ্ণপক্ষ। বাইরে যতদূর চোখ যায়, চাপ চাপ অন্ধকার। চাঁদটা আজ নিরুদ্দেশ। আকাশ, পুকুর বা ধানখেত, কিছুই বোঝা যায় না। সব অদৃশ্য, নিরবয়ব। শুধু কাছাকাছি যে জোনাকিরা উড়ছিল তাদের দেখা যাচ্ছে। আলোর ছুঁচের মতন এই পোকাগুলো অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাইরের উঠোন থেকে অবনীমোহনের গলা ভেসে এল, 'বিনু, সুধা—কে আছিস রে, একটা আলো-টালো নিয়ে আয় —বড্ড অন্ধকার—'

বিনু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—'

সুধা-সুনীতি জ্বলন্ত হারিকেন দুটো নিয়ে বাইরে ছুটল। হেমনাথও রামায়ণ রেখে ব্যস্ত গলায় ডাকাডাকি শুরু করলেন, 'কোথায় গো, কোথায় গেলে সব! অবনী এসেছে—' বলতে বলতে বাইরে এলেন। তাঁর পিছু পিছু ঝিনুকও এল।

চেঁচামেচি শুনে রান্নাঘরের দিক থেকে স্নেহলতারাও ছুটে এলেন।

উঠোনের মাঝখানে অবনীমোহন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পেছনে তিন তিনটে কুলী। কুলীদের মাথায় গন্ধমাদন চাপানো।

হেমনাথ বললেন, 'বড্ড ঠাণ্ডা। এসো এসো—ঘরে এসো অবনী—'

আলো দেখিয়ে দেখিয়ে অবনীমোহনকে ঘরে আনা হল। কুলীরা বারান্দায় মালপত্র নামিয়ে ভাড়া-টাড়া নিয়ে চলে গেল।

এখন সবাই অবনীমোহনকে ঘিরে বসে আছে। স্নেহলতা বললেন, 'তুমি কেমন মানুষ বল তো অবনী। সাতদিনের নাম করে গিয়ে চোদ্দ দিন কাটিয়ে এলে। না একটা খবর, না একটা কিছু।'

অবনীমোহন অপ্রতিভের মতন হাসলেন, 'ঝামেলা মেটাতে মেটাতে দেরি হয়ে গেল। আমার একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল।'

'নিশ্চয়ই উচিত ছিল।'

হেমনাথ বললেন, 'আজ যে আসবে, আগে জানালে না কেন? লালমোহন কি ভবতোষের ফীটন নিয়ে স্টিমারঘাটায় যেতাম। স্টিমারঘাটা থেকে আমাদের বাড়ি তো একটুখানি পথ নয়। শুধু শুধু কষ্ট করতে গেলে।'

অবনীমোহন বললেন, 'ভেবেছিলাম, চিঠি লিখে জানাব, তারপর কেমন যেন আলস্য লেগে গেল। লিখি লিখি করে আর লেখা হল না।'

সুরমা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার মুখ বাঁকালেন, 'চিরদিন ঐ এক স্বভাব।'

অবনীমোহন হাসতে লাগলেন।

একটু নীরবতা। তারপর হেমনাথ বললেন, 'কলকাতার সব কাজ হয়ে গেছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর যাবার দরকার নেই?'

'আজ্ঞে না। সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকিয়েই এসেছি।'

খানিক ভেবে হেমনাথ এবার শুধোলেন, 'তারপর বল, কলকাতায় গিয়ে কী দেখলে। ওখানকার হালচাল কী?'

অবনীমোহন নড়েচড়ে বসলেন। ওঁকে রীতিমত উত্তেজিত দেখাল। বললেন, 'বাড়ি ফিরেই আপনাকে খবরটা দেব; তা নয়। কথায় কথায় একেবারে ভুলে গেছি।'

হেমনাথ উৎসুক হলেন, 'কী খবর?'

'আপনি যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে গেছে মামাবাবু।'

'কিরকম, কিরকম?'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ইওরোপের যুদ্ধ বাঙলাদেশের দিকে ছুটে আসছে। পরশুদিন রাত্তিরে কলকাতায় প্রথম ব্ল্যাক-আউটের মহড়া হয়ে গেল। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে খুঁড়ে শহরটার যা অবস্থা করেছে! পনের ষোল দিনের খবর-কাগজ নিয়ে এসেছি। পড়লেই বুঝতে পারবেন—'

উত্তেজনায় হেমনাথের গলা কাঁপতে লাগল, 'কোথায় খবর-কাগজ?'

'আমার সুটকেশে—'

অবনীমোহন উঠতে যাচ্ছিলেন; বাধা পড়ল। স্নেহলতা বললেন, 'উঁহু-উঁহু, এখন না। যুদ্ধ নিয়ে মাতলে রাত কাবার হয়ে যাবে। ট্রেনে-স্টিমারে দু-দিন কাটিয়ে এসেছে ছেলেটা; আগে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিক। তারপর ওসব হবে।'

হেমনাথ তক্ষুনি সায় দিলেন, 'সেই ভাল, সেই ভাল। যাও অবনী; তাড়াতাড়ি খাওয়া-টাওয়া সেরে নাও।' (ক্রমশঃ)
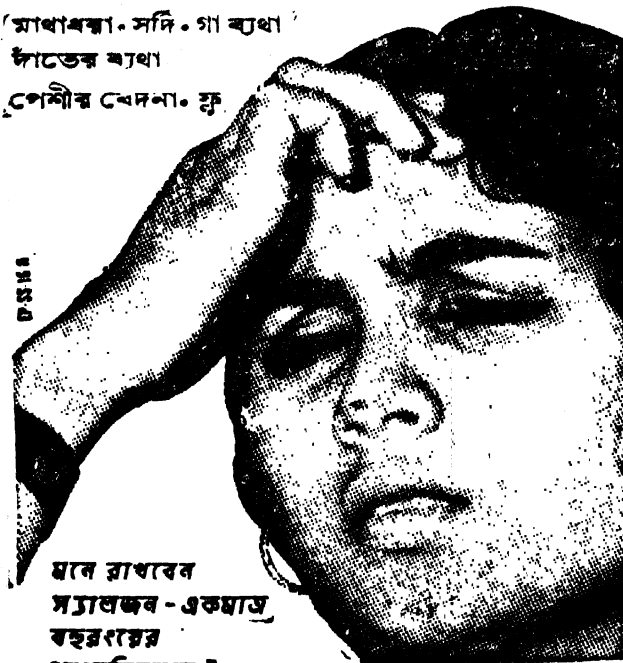
দাদা সাহেব ফালকে

কমল চৌধুরী

১৮৯৬ খৃঃ ৭ জুলাই। বোম্বাইয়ের ওয়াটসন থিয়েটারে ফরাসী লুমেরি ভাইয়েরা প্রথম ছবি দেখায়। তারপর নভেল্টি থিয়েটারে দেখান হয় ছবি। যাকে বলে ফিল্ম তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল ভারতবাসীর। মণি শেঠনা ১৯০৪ খৃঃ শুধুমাত্র ছবি দেখাবার জন্য একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন। সেখানে বিদেশী ছবি 'লাইফ অফ ক্রিস্ট' দেখান হয়। এই ছবি দেখে ফালকে অভিভূত হন। মনে বাসনা জাগে ছবি তোলবার। ১৯১৩ খৃঃ তিনি 'রাজা হরিশচন্দ্র' ছবি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের গোড়া পত্তন করেন।

এর আগে অবশ্য মহারাষ্ট্রে চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা চলছিল। কিন্তু ফালকেই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ করেন। ভারতে চলচ্চিত্র ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠার মূলে ফালকের অবদান নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

নাসিকের কাছে ত্র্যম্বকেশ্বর-এ ফালকের জন্ম ১৮৭০ খৃঃ ৩০ এপ্রিল। গরীব ব্রাহ্মণ পরিবার। ছেলেবেলা থেকেই ফটোগ্রাফির উপর বিশেষ আকর্ষণ। স্কুলের পড়া শেষ করে বিদেশে যান ফটোগ্রাফির উপর পড়াশুনা ও চর্চা করতে। ফিরে এসে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে ফটোগ্রাফারের কাজ নেন। বিদেশে ছাপা সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করেন। লাইফ অফ ক্রিস্ট ছবিটা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। প্রথমবার ছবি দেখেই তিনি মন্ত্রমুগ্ধ। ক্রিস্টকে যেভাবে ছবিতে দেখেছিলেন কৃষ্ণকে নিয়ে সেইভাবে কোন ছবি তোলা যায় কিনা, এই হোল ফালকের সব সময়ের চিন্তা। কৃষ্ণজন্ম চিত্রের জন্ম ঘটে এই চিন্তার মধ্য থেকে। ফালকে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। তা অবশ্য সহজসাধ্য ছিল না। ভারতে ব্যবসায়গতভাবে চলচ্চিত্র উৎপাদনের কথা তখন পর্যন্ত কেউ ভাবেনি। যন্ত্রপাতি ও কলাকুশলীর অভাব ছিল। কিন্তু ফালকে দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। যা একবার মাথায় আসে সহজে তাকে বিদায় দিতে পারেন না।

কৃষ্ণকে নিয়ে ছবি করবার আগে ফালকে এ বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন। হাতের কাছে সব বই পড়া শেষ। চোখের সামনে কৃষ্ণের মূর্তিকে জীবন্ত উপলব্ধি করতে চাইলেন। সেই সঙ্গে দরকার চলচ্চিত্র নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত যন্ত্রবিদ হওয়া। এমন সময় বোম্বাইয়ের একটি স্টল থেকে কিনলেন **দি এ বি সি অফ সিনেমাটোগ্রাফি।** অনেক কিছু জানবার ছিল এ বই থেকে। পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট ছিল না। হাতে-কলমে কাজ শেখবার জন্য বিদেশে যাওয়ার দরকার। সেই সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে। দুটো কাজের জন্য ইংল্যান্ড যাওয়া ঠিক করলেন। টাকা সংগ্রহের জন্য লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি মর্টগেজ দিয়ে ১৯১২ খৃঃ ২ ফেব্রুয়ারি লণ্ডন যাত্রা করেন। দুমাস পরে ফিরে এলেন দেশে। সঙ্গে একটি উইলিআমসন সিনে ক্যামেরা, ছাপার মেসিন এবং আরো কয়েকটি ছবি তোলবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি। ফালকে বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের মানুষের মনে অর্থকরী দিকটা ভালভাবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিতে পারলে ছবি তোলবার কাজে কেউ অর্থ বিনিয়োগ করবে না। তাই একটি শর্ট ফিল্ম তৈরি করা ঠিক করলেন। একটি পাত্রে কড়াইশুঁটি পুঁতে দিয়ে ছবি করলেন তাকে নিয়ে 'একটি চারাগাছের জন্ম'। কিভাবে সেই দানা থেকে দিনের পর দিন একটি গাছের জন্ম হোল—তারই রমণীয় চিত্ররূপ। অনেককে ছবি দেখালেন। তাদের মনে আস্থা জন্মাল। তারা ছবির কাজে অর্থ নিয়োগে রাজী হলেন। ফালকে নেমে পড়লেন ছবির জগতে।

প্রথম ছবির জন্য ফালকে পৌরাণিক চরিত্র রাজা হরিশচন্দ্র নির্বাচন করলেন। নতুন বাধা দেখা দিল। হরিশচন্দ্রের স্ত্রী তারামতীর ভূমিকাভিনয়ে কোন ভারতীয় নারী মিলল না। চলচ্চিত্র ও মঞ্চ সম্পর্কে নানা ধরনের কাহিনী প্রচলিত ছিল। এদিকে শিক্ষিত পরিবার থেকে কোন মেয়েই আসতে পারত না ছবির জগতে অভিনয়ের জন্য। অবশেষে এদের আশা ত্যাগ করলেন ফালকে। এগিয়ে গেলেন বোম্বাই-এর বেশ্যাপল্লীর দিকে। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ঘুরেছেন, কিন্তু মনোমত কাউকে পাননি। তাদের কাছেও চলচ্চিত্রের কোন সম্মান ছিল না সে সময়। অনেকেই জানাল 'এ পথে গেলে ওরা আমাদের সমাজ থেকে আমাকে দূর করে দেবে।' একজন বলল, 'আমার অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করুন।' আর একজন বলল 'আমার মেয়েকে বিয়ে কর, সে তোমার ছবিতে অভিনয় করবে।' এইভাবে ঘুরে ঘুরে ফালকে কোন নারীকেই তাঁর ছবির জন্য পেলেন না। বাধ্য হয়ে পুরুষকে দিয়ে নারীচরিত্রে অভিনয় করাবেন ঠিক করলেন।

কিন্তু তাতেও বিপদ কাটল না। নারীচরিত্রে অভিনয় করতে গেলে দাড়ি-গোঁপ বাদ দিতে হবে। ধর্মের ভয়ে কেউ তাতে রাজী হোল না। অনেক অনুনয়, অনুরোধ, প্রলোভনের পর বিপদ কাটল। অবশেষে ফালকে আসরে নামলেন। পরিচালক, ফটোগ্রাফার, সম্পাদক, শিল্পনির্দেশক, মেকআপম্যান ফালকে ছবি তৈরির জন্য মথুরা ভবনে স্টুডিও তৈরি করলেন। যে রাস্তায় তিনি স্টুডিও তৈরি করেছিলেন আজ সেই রাস্তাটি ফালকের নামেই

দাদাসাহেব ফালকে

পরিচিত। আট মাস লেগেছিল ছবির কাজ শেষ করতে। সমস্ত শুটিংই চলেছিল আউটডোরে দিনের আলোয়। প্রাসাদ, অরণ্য এবং অন্যান্য দৃশ্য মঞ্চের মতই পশ্চাৎ দৃশ্যে আঁকা হয়েছিল। ৩,৭০০ ফুট দৈর্ঘ্যের ছবিতে হরিশচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন দাবকে, তারামতী সালুনকে এবং রুহিদাস চরিত্রে ফালকের পুত্র বালচন্দ্র।

রাজা হরিশচন্দ্র ১৯১৩ খৃঃ ১৭ মে করোনেশন থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়। প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এই ছবি আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়েই ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম। আট সপ্তাহ করোনেশন থিয়েটারে ছবিটি চলে। শোনা যায় প্রতি শোতে কাহিনী বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রানিং কমেন্ট্রির ব্যবস্থা ছিল। ছবির আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। তখন মঞ্চই ছিল সব থেকে জনপ্রিয়। ছবিকে আনন্দের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য ফালকের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সৎ চিন্তাধারা ভীষণভাবে কাজে লাগে। অসম্ভব প্রতিকূলতার সঙ্গে তাঁকে লড়তে হয়েছিল। বোম্বাই-এ যদিও ছবিটি ভালই চলে, বোম্বাই-এর বাইরে প্রচারের জন্য ফালকেকে অসম্ভব পরিশ্রম ও চিন্তা করতে হয়েছিল। সুরাটের একটি মঞ্চে নাটক দেখান হোত। ফালকে অন্য একজনের সহযোগিতায় নিজের প্রোজেকটর মেসিন এবং স্ক্রীন বসিয়ে ছবি দেখান। প্রথম দিন তিন টাকা উপার্জনে অংশীদারের মন ভেঙে দিলেও ফালকে হতাশ হয়ে পড়লেন না।

সুরাটে রাজা হরিশচন্দ্রের ব্যর্থ হওয়ার অনেক কারণ ছিল। ওয়াকনার থিয়েটার গ্রুপ এই সময়ে সুরাটের মঞ্চে নাটক দেখিয়ে বাজার দখল করে ফেলেছিল। এই প্রতিযোগিতায় সমানে ছবির সাফল্য বিষয়ে ফালকে চিন্তিত হলেন। সমাধানের পথ খুঁজতে তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যে মঞ্চে তাঁর ছবিটি দেখান হয়েছিল তার মালিক একদিন ফালকেকে বললেন, 'দেখ সুরাটের অস্থিমজ্জায় ব্যবসা। এখানে প্রত্যেকেই ব্যবসা করে। দেখ, ওয়াকনারো

কি করছে। ছয় ঘণ্টা নাটক দেখিয়ে আনন্দ দানের জন্য তারা প্রবেশমূল্য নিত দু আনা। তার তুলনায় তোমার ছবি দেখার খরচ অনেক বেশী। তুমি এক ঘণ্টার আনন্দ দিতে দু আনা দাম নিচ্ছ। তুমি যদি পয়সা করতে চাও যা বলি শোন। প্রতি শো দু পয়সা হিসাবে ব্যবস্থা কর। যদি দু আনা কর তবে শো আরও বাড়িয়ে দাও। ফালকে শুনলেন না একথা। বরং এক অস্বাভাবিক বিজ্ঞাপন বাজারে ছাড়লেন। তাতে ছিল:

SEE FIFTY THOUSAND PICTURES IN TWO ANNAS! DON'T MISS YOUR CHANCE TO SEE THE WONDERFUL PICTURES TWO MILES BY THREE QUARTERS OF AN INCH IN SIZE!

কাজ হোল। রাজা হরিশ্চন্দ্র পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হোতে লাগল। প্রথম শোতে যেখানে তিন টাকা পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে প্রতি শোতে তিন শত টাকার বেশী উপার্জন হোয়েছিল।

বোম্বাইয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রই ফালকের তোলা একমাত্র ছবি। তিনি বোম্বাইকে ছবি তোলবার উপযুক্ত জায়গা মনে করলেন না। তিনি স্টুডিও উঠিয়ে নিয়ে গেলেন নাসিকে। নাসিকে তোলা প্রথম ছবি পৌরাণিক কাহিনী ভস্মাসুর মোহিনী। ছবিটা খুব বেশী বাজার পায়নি। ব্যর্থ হওয়ার পর ফালকে স্ত্রীর সমস্ত অলংকার বিক্রি করে তৃতীয় ছবি করলেন সত্যবান সাবিত্রী। এই দুটো ছবি করবার সময় ফালকে ডকুমেন্টারি ছবির দিকেও নজর রেখেছিলেন। তেলগাঁও-এর পয়সা ফান্ড গ্লাস ফ্যাক্টরী নিয়ে খুব ছোট একটা ছবি করেছিলেন। ফালকে সব পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবির সংগে ছোট ছবি দেখাবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভাবতেন কোন ছবি দৈর্ঘ্যে ৯,০০০ ফিটের কম হবে না। এর সংগে থাকবে তথ্য এবং শিক্ষামূলক শর্ট ফিল্ম। তাঁর এই ধরনের ছবির মধ্যে বিচিত্র শিল্প, পিঠাসে পাঞ্জ, ধুম্র পঞ্চ লীলা, লক্ষ্মীচা, গালিচা আগ কাদ্যাঞ্চি মৌজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সব ছবিই দশ মিনিটের। এগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। মূল কাহিনী-চিত্রের সংগে দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ফালকে।

সত্যবান সাবিত্রী মুক্তিলাভের পর ফালকে আবার ইংল্যান্ড যাওয়া ঠিক করলেন। সংগে নিয়ে গেলেন নিজের তিনটি কাহিনীচিত্র। সেখানে ছবিগুলি দেখান হলো। খুবই প্রশংসা পেল। বাইস্কোপ সিনেমাটোগ্রাফি উইকলি ফালকের কল্পনাশক্তি, টেকনিক্যাল জ্ঞান এবং সংলাপহীন চিত্রগ্রহণের অসামান্য ক্ষমতার প্রশংসা করলেন। একটি ব্রিটিশ কোম্পানী তাঁর সংগে অংশীদার হয়ে ইংলণ্ডে ভারতীয় ছবি নির্মাণের প্রস্তাব করে। কিন্তু ফালকে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি-উন্মুখ ছিলেন বলেই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন অতি সহজে। ওয়ারনার ব্রাদার্স ইউরোপ এবং আমেরিকায় ফালকের ছবি দেখাবার এক বিরাট পরিকল্পনা নেয়। ফালকের ছবির দু'শ প্রিন্ট অর্ডার দেয় তারা। সন্তুষ্ট মনে দেশে ফিরে এলেন ফালকে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় কাঁচা ফিল্ম আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য প্রায় বন্ধ। ফলে ফালকে ওয়ারনার ব্রাদার্সের অর্ডার অনুযায়ী কোন কাজ করতে পারলেন না।

সত্যবান সাবিত্রীর পর ফালকের পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি হোল লংকাদহন। বক্স অফিস রেকর্ড করল ছবিটা। বোম্বাইয়ের ম্যাজেস্টিক সিনেমায় সকাল সাতটায় শো আরম্ভ হয়ে রাত্রি তিনটেয় শেষ হোত। ছবি দেখে বেরিয়ে যায় একদল, আর একদল ঢোকে। বাইরে প্রতীক্ষারত জনতা পরবর্তী কোন শো-এর জন্য দাঁড়িয়ে। মাদ্রাজেও অসম্ভব সাফল্য লাভ করে ছবিটি। আমর্ড পুলিশ প্রহরায় প্রতিদিনের টিকিট বিক্রির টাকা নিয়ে যেতে হোত। ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে এই ছবিটি অন্যতম দিকচিহ্ন। লংকাদহনের সাফল্য অনেকের চোখ খুলে দিল। শিল্পপতিরা মনে করলেন ছবির থেকেও টাকা আসতে পারে। অনেকে স্বেচ্ছায় ফালকের অংশীদার হিসাবে কাজ করবার প্রস্তাব পাঠালেন।

ফালকে ফিল্ম কোম্পানীর শিরোনামে রাজা হরিশ্চন্দ্র থেকে লংকাদহন পর্যন্ত ছবি তুলেছিলেন ফালকে। নিজের স্বল্প পুঁজি নিয়ে বড় বড় ছবি করায় তাঁর খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। বোম্বাইয়ের কোহিনুর মিলের আপ্তে এবং আরো চারজন কোটিপতি মিলে ফালকের সংগে দি হিন্দুস্থান ফিল্ম কোম্পানী গঠন করলেন। এর ৪০ ভাগ অংশ ছিল ফালকের। বাকি ৬০ ভাগ ছিল অংশীদারদের। এদের স্টুডিও ছিল নাসিকের ওল্ড ভাগুর দরওয়াজায়। যে বাড়ীতে ফালকের নিজস্ব ফিল্ম কোম্পানী ছিল, সেখানেই নতুন সাইন বোর্ড উঠল 'দি হিন্দুস্থান ফিল্ম কোম্পানী অ্যান্ড ওয়র্কস'। এখন আর কোন স্টুডিওর চিহ্ন নেই এখানে। কেবল আছে একটি ব্রীজ। সেটি ফালকে কোন ছবির জন্যে হয়ত তৈরি করিয়েছিলেন।

হিন্দুস্থান ফিল্ম কোম্পানীর প্রথম ছবি ফালকের পরিচালনায় কৃষ্ণজন্ম, দি লাইফ অফ ক্রিস্ট দেখে মনে যে বাসনা জেগেছিল, তা পূর্ণ হোল। এতদিন তিনি এই ছবির কাজে হাত দেননি। অপেক্ষা করেছেন উপযুক্ত সময়ের। চলচ্চিত্র শিল্পের সব দিকে জ্ঞান অর্জন করেও ফালকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের অভাব থাকায় এই ছবির কাজে হাত দেননি। হিন্দুস্থান ফিল্ম কোম্পানীতে সেই সুযোগ পেয়েই ফালকে কৃষ্ণজন্ম ছবিটি তোলেন। অসম্ভব জনপ্রিয় হয়। এরপর কৃষ্ণজীবন অবলম্বনে আর একটি ছবি করেন কালীয়মদন। ফালকের মেয়ে মন্দাকিনী বালক কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে মন্দাকিনীই প্রথম নারী শিশুশিল্পী। দশ মিনিটের জন্যে ছবিতে এসেও দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেন অসামান্য অভিনয় গুণে। এই ছবিটিও অসম্ভব রকম জনসমাদর লাভ করে। একটানা দশ মাস প্রদর্শিত হয়।

কৃষ্ণজন্ম—এবং কালীয় মর্দনের পর অংশীদারদের সংগে ফালকের মতানৈক্য শুরু হয়। নিজের শেয়ার ছেড়ে দিয়ে মাসে এক হাজার টাকা মাইনেয় কাজ করতে থাকেন। তাতেও বিবাদ মেটে না। ফালকে বিরক্ত হয়ে ঠিক করলেন আর ছবি করবেন না। তিনি চলে গেলেন কাশীর এক মন্দিরে। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জে এফ ম্যাডান এই সময় ফালকেকে চলচ্চিত্রে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। তাঁকে ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠিয়ে দেন। ফালকে জানান চলচ্চিত্রের সংগে সব সম্পর্কই তিনি ত্যাগ করেছেন। আর নয়।

চলচ্চিত্রে অনুপস্থিতির সময় ফালকে 'মঞ্চ' নামে একটি নাটক লেখেন। মঞ্চের ওপারে একটি নাটক চলছে। তার পশ্চাৎ মঞ্চের ঘটনা নিয়ে বিদ্রূপাত্মক এই নাটক। সাত অংকের নাটক। এক সন্ধ্যায় দেখানোর পক্ষে বিরাট। তাই ফালকে দু'ভাগ করলেন নাটকটির। চার দৃশ্য দেখান হবে প্রথম সন্ধ্যায়, দ্বিতীয় সন্ধ্যায় দেখান হবে পরের তিনটি দৃশ্য। বোম্বাই পুণা এবং নাসিকে দেখান হয় নাটকটি। মারাঠী নাটকের ইতিহাসে এটিই বোধহয় সব থেকে বড় নাটক—সাতটি অংক এবং পর পর দু'দিন দেখান হয়।

অন্তর্ধানের পর ফালকে আবার ফিরে আসবেন, এ ছিল সকলের কল্পনার বাইরে। কিন্তু ১৯২৩ খৃঃ ফিরে এলেন। ফিরে আসবার ঘটনাটা বেশ আকর্ষণীয়। সে সময় অত্যন্ত বলবন্ত কোলাংকর ছিলেন বিখ্যাত মারাঠী সাংবাদিক। যখন ফালকে ছবির জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, তখন কোলাংকর তার পত্রিকা সন্দেশে একটি খোলা চিঠি লিখলেন, ফালকেকে আবার ফিরে আসবার অনুরোধ জানিয়ে। কাশীতে বসে কোলাংকরকে চিঠি লিখে জানালেন দাদাসাহেব ফালকে চিত্র পরিচালক মারা গেছেন। কোলাংকর সংগে সংগে চিঠিটা ছাপলেন তার কাগজে। হেড লাইন ছিল: 'দাদাসাহেব ফালকে পরলোকে'। সারা মহারাষ্ট্রে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হোল। শত শত অনুরাগী আবার ছবির জগতে ফিরে আসবার জন্য ফালকেকে চিঠি লিখলেন। ফিরে এলেন ফালকে। তারপর দুটি জনপ্রিয় ছবি করলেন 'সতী মহানন্দা' এবং 'সেতুবন্ধ'।

সেতুবন্ধই ফালকের শেষ সংলাপহীন ছবি। এর মধ্যে ছবিতে সংলাপ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। কোলাপুর সিনেটোনের পক্ষে ফালকে 'গংগাবতরণ' ছবিতে সংলাপ ব্যবহার করলেন। এটিই তাঁর প্রথম এবং শেষ সংলাপময় ছবি। বেশী বয়স হয়ে যাওয়ায় ফালকে এবার ছবির জগৎ থেকে সরে গেলেন। মোট ১৭৫টি ছবি করেছিলেন। এর মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল পৌরাণিক কাহিনীধর্মী। ভারতে ধর্ম, উৎসব এবং পাল-পার্বণের পৌরাণিক ব্যাখ্যা এই সব ছবিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন ফালকে। পোষাকবহুল জাঁকজমকপূর্ণ ছবি তুলেছিলেন 'বচন ভংগ'। এরকম ছবি সংখ্যায় অবশ্য খুবই কম।

রমেশ দত্তের
রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা নয়

চিত্রকল্পনা - প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে - চিত্রসেন

আপনি কতখানি শক্ত মানুষ?

বেশ খানিকটা দৃঢ়তা বোধ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই থাকা দরকার এই জগতের সংগ্রাম-জীবনে পথ করে এগিয়ে চলার জন্যে, নানারকম ঝঞ্ঝাট আর বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে। আবার এই দৃঢ়তাবোধ আমাদের মধ্যে এত বেশি সৃষ্টি করে ফেলতেও পারি, যার ফলে জাগতে পারে রূঢ়তার লক্ষণ এবং সহানুভূতির অভাব। তখন নিজেকে খুব শক্ত মানুষ বলে গর্ববোধ হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে অন্য মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হতে থাকবে।

নীচের টেস্ট দিয়ে নিজেকে যাচাই করে দেখতে পারেন, আপনি কতখানি শক্ত মানুষ—খুব বেশি, না, খুব কম! প্রত্যেকটি প্রশ্নে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে যান, এবং সবশেষে দেখুন কত পয়েন্ট পেলেন।

১। আপনার নিজের এবং অপরের কোনো ব্যর্থতা দেখলে আপনি কি ঘৃণা-বা-তাচ্ছিল্য বোধ করেন?

২। আপনি কি বলতে পারেন, কোনো প্রতিপত্তিসম্পন্ন, পয়সাওয়ালা, প্রতিষ্ঠাবান জাঁদরেল লোককেই আপনি সমীহ করেন না কখনো?

৩। আপনার অফিসের কর্তা এবং বড়বাবুদের সঙ্গে আপনি কথা বলতে পারেন ঘাবড়ে না গিয়ে?

৪। কড়া জঘন্য মন্তব্য শুনলে আপনি কি গ্রাহ্য না করে থাকতে পারেন এবং ও ধরণের কথায় অবিচলিত থাকতে পারেন?

৫। যদি, বিশ্বাস করেন আপনি যা করছেন ঠিকই করছেন, তাহলে কি জনপ্রিয়তা হারানোর সম্ভাবনাতেও আপনি অবিচল থাকেন?

৬। সমালোচনা-নিন্দে শুনলে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভরসা না হারিয়ে সমালোচনাগুলির ঠিকমতো যাচাই করতে পারেন?

৭। বেশির ভাগ লোক আপনার সম্পর্কে যা ভাবে, আপনি সে বিষয়ে মোটামুটি নির্বিকার?

৮। তর্ক-বিতর্কের সময়ে আপনি কি নিজের পক্ষ সমর্থন করে আপনার অভিমত বজায় রাখতে পারেন?

৯। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আপনি কি ঠিক আপনার কাজ হাসিল করেন?

১০। বাধা-বিপত্তি আপনার ওপর অবসাদ-বিষণ্ণতার বোঝা না চাপিয়ে টনিকের মতো উদ্দীপনা জাগায় কি?

১১। ছিনেজোঁকের মতো একটা কাজ নিয়ে বারেবারে চেষ্টা করে চলাই কি আপনার স্বভাব?

১২। যখন কাউকে দেখেন সে তার আপন মূল্য-মর্যাদা অনুযায়ী চলতে পারছে না, তখন আপনি কি এগিয়ে গিয়ে তাকে ঝাঁকিয়ে তোলেন?

১৩। আপনি কি মনে করেন, প্ল্যান খাটানো আর ভবিষ্যতের কথা ভাবার চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল জগতে কাজ করে চলারই পক্ষপাতী আপনি?

১৪। আপনার কি ধারণা, দিনের বেলায় কাজের মাঝে ভবিষ্যৎ-স্বপ্নের চর্চা করা মানে সময় নষ্ট করা, এবং সেইজন্য এই অভ্যাসটি নিজে বর্জন করেন এবং সকলকে বর্জন করতে বলেন?

১৫। বিয়ে করার জন্যে বা কোনো স্বাধীন ব্যবসা সুরু করার জন্যে, কিংবা ঐ ধরনের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে টাকা সঞ্চয় করবার প্রতিজ্ঞায় আপনি কি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করে চলতে পারেন?

১৬। ঠান্ডা লাগা, মাথা ধরা ইত্যাদি অসুস্থতা সত্ত্বেও কি আপনি কাজ চালিয়ে যান?

১৭। যত ঝঞ্ঝাটই আপনার ওপরে আসুক, আগে থেকে কারুর সঙ্গে কোনো কাজের বন্দোবস্ত হয়ে থাকলে, ঠিক সময় মতো সেটি সেরে রাখার জন্যে আপনি কি মানুষের সাধ্য সবকিছুই করবেন?

১৮। ভাগ্য খারাপ, স্বাস্থ্য খারাপ—এইসব নিয়ে যারা নালিশ করে, আপনি কি তাদের অসহ্য মনে করেন?

১৯। যারা মদ্যপান, যৌনতা, এবং নানারকম নীতিভ্রষ্টতার মধ্যে দিয়ে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়, আপনি কি তাদের ঘৃণা করেন?

২০। আপনি কি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্মসংযমের ওপর খুব উচ্চ মর্যাদাবোধ পোষণ করেন?

●

প্রত্যেকটি "হ্যাঁ" জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে হিসাব করুন। যদি ৭০ কিম্বা তারচেয়ে বেশি পয়েন্ট আপনি পেয়ে থাকেন এই টেস্টে, তাহলে বেশ ভাল করে লক্ষ্য রাখবেন, আপনার মধ্যে যে দৃঢ়তাবোধ সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে আপনার ব্যক্তিত্ব-আচরণের মধ্যে সহানুভূতি-বোধ কমতে থাকবে, রুক্ষ, রূঢ় আচরণ বাড়বে, এবং জনপ্রিয়তা হারাবেন।

আর, যদি ৫০-এর নীচে আপনার পয়েন্ট হয়ে থাকে, তাহলে খুব সম্ভব আপনি সহজেই পাঁচজন লোকের কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং ঘটনা-পরিস্থিতির চাপে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মনোকষ্ট ভোগ করেন।

৫০ থেকে ৭০-এর মধ্যে পয়েন্ট পেলে আপনার দৃঢ়তাবোধের সামঞ্জস্য আছে বলেই মানতে হবে। ৬০ পয়েন্ট যিনি পাবেন, তিনি কঠোরে-কোমলে আদর্শ মানুষ।

●

পৃথিবীতে যাঁরা সফলতার শীর্ষে উঠেছেন, তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই দৃঢ়তা এবং নমনীয়তার সামঞ্জস্য থাকে। একগুঁয়ে কঠোরতা ভালো নয়; প্রয়োজন হলে নমনীয় হতে হয়, তাতে লাভবান হওয়া যায়।

অনেক সময়ে হীনতাবোধের পরিপূরণ করতে গিয়ে মানুষে অত্যধিক সামঞ্জস্যহীন দৃঢ়তাবোধের পরিচয় দিয়ে ফেলে। যাকে মনোবিদরা বলেন 'কমপেনসেটরী রি-অ্যাকশন'। এ-ধরনের দৃঢ়তা হঠাৎ হুড়মুড় করে এসে পড়ে, আবার দারুণ ধাক্কা খেয়ে তেমনি হঠাৎই মুষড়ে পড়ে। আপনার মধ্যে যদি এমন আচরণ অস্বস্তির সৃষ্টি করতে থাকে তাহলে জোর করে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে যাবেন না। বরং দুর্বলতাগুলিকে ভালভাবে বুঝে নিয়ে সেগুলিকে সংশোধন করবার চেষ্টায় লাগুন। সব মানুষকেই যে দারুণ শক্ত মানুষ হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আপনার মধ্যে নমনীয়তা থাকলে তাকেই কাজে লাগান তাতেও জনপ্রিয় হওয়া যায়, সফলতা অর্জন করা যায়।

কালচারাল সেমিনার

জীবনের বালুচর
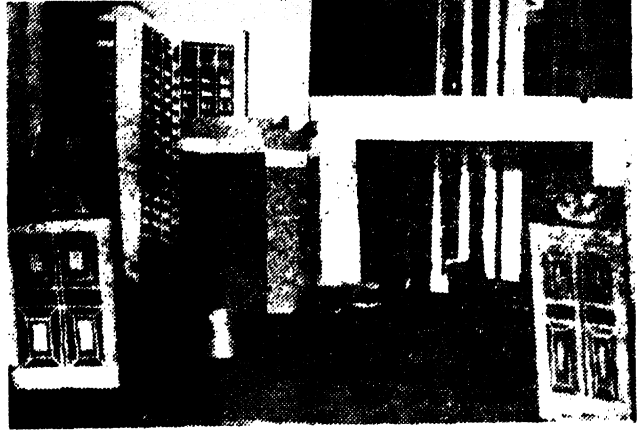
শিপ্রা। '...হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি ডাইনী, আমি নোংরা, আমি বাজারের মেয়ে, কিন্তু এর জন্য দায়ী কারা? তোমরা খারাপ জিনিসটাকে ঘেন্না করো, কিন্তু খারাপকে ভালো করতে পারো? এই তো এতজন রয়েছো কেউ আমাকে বোন বলে ডাকতে পারো? চুপ করে আছো কেন? এতগুলো পুরুষ রয়েছো, কেউ আমায় স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারো?.........'

বেঁচে থাকার প্রচণ্ড তাগিদে কোন কিছুর সন্ধান না পেয়ে অসৎ পথের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে শিপ্রা। প্রেম-প্রীতি স্নিগ্ধ জীবনের জন্য যে স্বপ্নটা একদিন উজ্জ্বল ছিল, আজ তা দারিদ্র্যের কষাঘাতে স্তিমিত হয়ে গেছে; কিন্তু রেশ আছে মনের অতলে। তাই সিঁদুরপরা একটি মেয়েকে দেখে নিজেকে সে ঠিক রাখতে পারে নি, রিভলবারের গুলী ছুঁড়েছে তার দিকে। এ ব্যাপারে তাকে অভিযুক্ত করা হোল, ক্ষুব্ধকণ্ঠে তখন কেঁদে পড়লো শিপ্রা। প্রশ্ন তুললো—কেন এমন হোল? এই প্রশ্নমথিত নাটকের নাম 'মৃতদেহ'—জীবনজিজ্ঞাসার এক প্রোজ্জ্বল রূপায়ণ। নাটকটির মহলা শুনছিলাম কিছুদিন আগে। মঞ্চস্থ করবার দায়িত্ব নিয়েছেন 'কালচারাল সেমিনার'। পঁচিশ বছর ধরে বাংলা নাট্যআন্দোলনে এই ধরনের যে জীবনধর্মী, বক্তব্যপ্রধান নাট্য-প্রযোজনার স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে, তাতে সেমিনারের দীর্ঘ পনেরো বছরের নিষ্ঠা জড়ানো প্রয়াস বহুদিন আগেই নাট্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এঁরা নাটক করতে শুরু করেছেন শুধু নাটক করার জন্য নয়, সমাজ-চেতনা ও পরিপূর্ণ শিল্পবোধের সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের জন্য। চোদ্দ পনেরো বছরের বর্ষা বসন্ত অতিক্রম করা নাট্যগোষ্ঠী বাংলাদেশে খুব বেশী নেই। তবু এঁরা আছেন। প্রতিবন্ধকতা এঁদের ক্লান্ত করেছে, কিন্তু উৎসাহে সমাপ্তির বিষণ্ণতা আনতে পারে নি।

প্রায় পনেরো ষোল বছর আগেকার কথা। কলকাতার 'কেশব একাডেমী' স্কুলের কয়েকজন নাটক-পাগল উৎসাহী ছেলে স্কুলের গণ্ডী থেকে পালিয়ে এসে বাড়ীর অভিভাবকের তিরস্কার হজম করে গড়ে তুলেছিল একটি সংস্থা—'নবনট সংঘ'। সংঘবদ্ধ থাকার জন্য অন্য একটি ক্লাব 'নবনটচক্র'কেও তারা টেনে নিয়েছিল দলে। তখন নাম হয়েছিল 'সংঘচক্র'। হাফ-প্যান্ট পরা ছোট্ট ছেলের দল। সীমাহীন উৎসাহ—নাটক করবো। লোকে আমাদের ভালো বলবে। নাটক করলো কয়েকটি। বয়স্কদের মনে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোল। এর মধ্যে 'মায়ের পুজো' নাটক প্রায় প্রত্যেক পুজামণ্ডপেই অভিনীত হোতে শুরু হোল। এরা পেলো প্রচুর উৎসাহ। ইতিমধ্যে বয়েস এদের বাড়তে লাগলো। বাড়লো মনের গতি। এবারের সংকল্প হোল আরো কঠিন নাটক করতে হবে। অভিনীত হোল 'কালরাত্রি' ও 'সৌরাষ্ট্রের পতন'। কিন্তু এর পরেই মতবিরোধিতা দেখা দিলো, শুরু হলো ভাঙনের পালা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাঙলো না। পূর্ণ উদ্যমে থেমে-যাওয়া গাড়ীকে টেনে নিয়ে চললেন পাঁচ-জন—জয়ন্ত দে, সমর মুখার্জি, সুশান্ত হাজরা, বিজন ভট্টাচার্য, সুকুমার দাস। এই 'পঞ্চপাণ্ডবে'র অক্লান্ত চেষ্টায় সংস্থায় নতুন চিন্তা আর পরিকল্পনার বন্যা এলো। নতুন করে আবার রং লাগানো হোল। ১৯৫৪তে ডাঃ কে হাজারীর বাড়ীতে গড়ে উঠলো আজকের 'কালচারাল সেমিনার'। 'সৌরাষ্ট্রের পতন' নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে আবার নতুন আবেগে চলা শুরু হোল।

এরপর থেকেই 'কালচারাল সেমিনারে'র কর্মমুখরতার ইতিহাস। 'সৌরাষ্ট্রের পতন' ও 'কালরাত্রি' নাটকের পর অভিনীত হোল 'মরণেরে'। রবীন্দ্রনাথের দুটি ছোটগল্প 'জীবিত ও মৃত' ও সম্পত্তি সমর্পণ'কে একসঙ্গে নিয়ে নাটকটি রচিত হয়েছে। এই একত্রীকরণে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণার কোন বিকৃতি ফুটে ওঠে নি। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই ধরনের প্রচেষ্টা বোধ হয় এঁরাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আর একটি গল্প 'ল্যাবরেটরী'র নাট্যরূপ এঁরা পরিবেশন করেছেন। মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্বের যে-কথা এই গল্পে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, নাট্যরূপদাতা সমর মুখোপাধ্যায় তাকে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। এই নাটকের প্রযোজনা নাট্যানুরাগী ও রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীদের বিমুগ্ধ করেছে। 'হে মোর পৃথিবী' নাটকই প্রথম দিকে 'কালচারাল সেমিনারে'র প্রয়াসকে সবার কাছে পরিচিত করায় এবং এই সূত্রে বিদগ্ধজনের প্রশংসা অর্জিত হয়। ১৯৪৬-এর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাকে প্রেক্ষাপটে রেখে জীবনের জয়গান করেছেন নাট্যকার এই নাটকে। এই সময়ে সমর মুখোপাধ্যায়ের 'আশার পুতুল' একাংক নাটক অভিনয় করে সেমিনার পশ্চিমবঙ্গ যুব-উৎসব আয়োজিত একাংক নাট্য প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানের সব পুরস্কারই অর্জন করেন।

এরপর থেকে বহু নাট্য-প্রযোজনার পালা। 'অবশেষে', 'পুনর্জন্ম', 'প্রহরী', 'খুন', 'উপহার', 'ওয়েটিং রুম', নাগিনী কন্যার কাহিনী, রঘুবীর, চুপ, শহুরে দাদা, 'জীবনের বালুচরে' 'বিষ', 'নেপথ্যে', 'মৃতদেহ' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়েছে। 'অবশেষে' নাটকটি হিন্দুকোড বিলকে বিদ্রূপ করে লেখা। এই স্যাটায়ারটি সেমিনারের প্রশংসিত নাটকের মধ্যে একটি।

বিষ নাটকের দৃশ্য

সমর মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনের বালুচরে' নাট্যপ্রযোজনা সেমিনারের এক বলিষ্ঠ অবদান। এই নাটকের অভিনয় করে 'কালচারাল সেমিনার' বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নাট্যগোষ্ঠীদের সারিতে এসেছেন। হাসি-কান্না, আশা-আনন্দ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ বা নরনারীর মিলনে মানবজীবনের বৈচিত্র্যের রূপটি এতে ফুটে উঠেছে। নিমন্ত্রণবাড়ীতে যারা পাতা কুড়িয়ে খায় তাদের নিয়ে নাট্য-সৃষ্টি এই প্রথম। এ নাটক যাঁরা দেখেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন নিশ্চই যে ভারতীয় জীবনদর্শন এই নাটক মিলে-মিশে এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'জীবনের বালুচরে' নাটকের মঞ্চরূপায়ণ নতুন চিন্তা-মূলক নাট্যপ্রয়াসের গভীরতাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, কেননা জীবনের স্বরূপ ও অর্থ খোঁজার এবং তার প্রয়োগ-পরিকল্পনার মৌলিক চেষ্টা আছে এই নাটকের অভিনয়ে। আজকের যুগে গ্রুপ এ্যাকটিং, বা মাস এ্যাকটিং-এর যে জোয়ার এসেছে, তারও নজীর মেলে ধরেছে এই নাটক। বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় এই নাটক অভিনয় করে কালচারাল সেমি-নার দলগত অভিনয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়া শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্র অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ টাইপ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কারও পান সেমিনারের শিল্পীরা। 'চুপ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেও বাংলাদেশের নাট্যসচেতন মানুষকে আন্দোলিত করেছে 'কালচারাল সেমিনার'। স্যাটায়ার নাটক পূর্বকালে আমাদের সম্পদ ছিলো, কিন্তু মাঝে প্রায় লুপ্ত হোতে বসেছিল। 'চুপ' নাটক সেই লুপ্ত ঐতিহ্যকে তো ফিরিয়ে এনেছে এবং স্যাটায়ারের মধ্য দিয়ে জীবনের চরমতম সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে। বিদগ্ধ কিছু সমালোচক স্বীকার করেছেন—'নাটকটি এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ার'। 'জীবনের বালুচরে', 'চুপ' নাটক সম্পর্কে সেমিনারের শিল্পীরা বলেন : 'গর্ব করেই বলছি উক্ত দুটি নাটক নিয়ে আমরা যে কোন বিদেশমুখী নাটুকে দলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি। প্রমাণ করতে পারি বাংলা ভাষায়ও যুগোপযোগী নাটক সৃষ্টি করা যায়।'

এখন 'কালচারাল সেমিনারে'র শিল্পীরা সমর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃতদেহ' ও দিলীপ ভট্টাচার্যের 'কালো দেয়াল' (একাংক) নাটক দুটি মঞ্চস্থ করার জন্য তৈরী হোচ্ছেন। বিশ্বরূপায় আগামী চার মাসের জন্য দিনও নির্ধারিত হয়ে গেছে। 'মৃতদেহ' নাটকটির অভিনয় এর আগে একবার হয়। এই প্রসঙ্গে সম্পা-দক জয়ন্ত দে ও নাট্যকার অমর মুখো-পাধ্যায় সংস্থার এক বিপর্যয়ের কথা জানালেন। 'মৃতদেহ' নাটকটি যখন মঞ্চস্থ হবার আয়োজন করা হোচ্ছে তখন বেশ কিছু সভ্য দল ছেড়ে চলে যান। কারণটা ছিল এঁরা রাজনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে নাটকে আনবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সংস্থা-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এবং আরো কয়েকজন সভ্য এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী হোলেন না। তাই স্বভাবতঃই ব্যবধান এলো। ও'রা চলে গেলেন। কিন্তু দল টিকে রইলো। নতুন ছেলে এলো। উৎসাহ বাড়লো আরো দ্বিগুণ বেগে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দলের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে এঁরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন। এঁরা বলেন, কালচারাল সেমিনার রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান নয়, সাংস্কৃতিক সংস্থা। কালচারাল সেমি-নারের সদস্যদের দৃঢ় প্রত্যয় সঙ্গীত, নাটক ঘরোয়া বৈঠকে মনোভাবের আদান-প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমেই মানুষের চরিত্রে সম্পূর্ণতা আসে।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জায়গায় 'কালচারাল সেমিনারে'র শিল্পীরা নাটক করে এসেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে সবার মাঝে পরিপূর্ণ নাট্যচেতনার বিকাশ সাধন করবার চেষ্টা করেছেন। অভিনয় ছাড়া প্রায় উচ্চা-রণ ও কণ্ঠে সমতা আনার জন্য আবৃত্তির অনুশীলন হয় ক্লাবঘরে, নাটক নিয়ে আলোচনা হয়, আলোচনা হয় কম্পোজিশন ও একসপ্রেশন নিয়ে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পী-দের চিন্তা একটা সামগ্রিক রূপ পায় এবং অভিনয়ের মাধ্যে সেটা মূর্ত হয়ে উঠলে চরিত্রচিত্রণ হয় প্রাণবন্ত। নাট্য এবং সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের পরি-কল্পনা এ'দের আছে।

গত পনেরো ষোল বছর ধরে বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রয়োগপরিকল্পনার যে পরিবর্তন হয়েছে, 'কালচারাল সেমি-নারে'র নাট্যপ্রযোজনার মধ্যে সেই রূপ পরিপূর্ণভাবে বিবৃত হয়েছে। এ সত্যকে হয়তো সবাই স্বীকার করে নেবেন। দীর্ঘ-দিনের পথ পরিক্রমায় কতো পরীক্ষার স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে সেমিনারের শিল্পী-দের। প্রতিটি পরীক্ষা এ'দের নতুন করে উদ্যম দিয়েছে। 'পরীক্ষা শুধু আজ থেকে নয়, শুরু থেকে। কতো অপমান, কতো লাঞ্ছনা, আর কতো চোখের জলে আমরা আজকের রূপ পেয়েছি।' এ অনুভূতি যাঁদের অন্তরের অতলে, বাংলাদেশের নাট্যা-নুরাগীরা তাঁদের কাছ থেকেই চান বিশ্বের আসরে পরিপূর্ণ শিল্প-সুষমায় বাংলা নাটকের সার্থক প্রতিষ্ঠা।

—দিলীপ মৌলিক

৩রা মে বেলা তিনটেয় নাটক শোনার জন্য রেডিও খুলে শুনতে পেলাম—'আকাশবাণী কলকাতা. আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বেলা ১১টা বেজে ২০ মিনিটের সময় পরলোকগমন করেছেন।'

শুনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। আরও শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম।

রেডিওয় তখন করুণ সুর বেজে চলেছে। একটানা করুণ সুর। সে-সুর মনটাকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে দিল। তারই মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল সেদিনের খবরের কাগজে ছাপা নাগা-ভূমির চুমুকেদিমায় উপজাতীয় নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে ডঃ জাকির হুসেনের একটি ছবি। তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গে লোকনৃত্যশিল্পীদের পোশাকের একটা অংশ।

সেই সঙ্গে ভেসে উঠল এক বছর আগে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধনে দেখা তাঁর শান্ত, সৌম্য মূর্তি। সেই তাঁর শেষ কলকাতায় আসা।

ডঃ হুসেন এত অকস্মাৎ চলে যাবেন, এ কারও কল্পনার মধ্যে ছিল না। কোনো আভাসই পাওয়া যায়নি। বেলা ১১টা ২০ মিনিটের সময় তাঁর মৃত্যু হয়েছে. চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁর শীতল দেহে প্রাণসঞ্চারের। শেষে বিফল হয়ে বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন।

রেডিওর শ্রোতাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে : ১১টা ৫৫ মিনিটে যখন তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ১২টা ৫০-য়ের খবরে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শোনা গেল না কেন (যেখানে রাত সাড়ে ৭টার খবরে বলা হল, তাঁর পরলোক-গমনের খবর মুহূর্তের মধ্যে রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ে)? দেড়টা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হয়নি। হয়েছে আরও পরে—যতদূর জানা গেছে, ১টা ৫০ নাগাদ। আমি ৩টের আগে শুনিনি, সুতরাং সর্বপ্রথম কখন ডঃ হুসেনের মৃত্যু-সংবাদ রেডিওয় ঘোষিত হয়েছে, সঠিক বলতে পারব না। আমি ১২টা ৫০য়ের খবরের পর রেডিও বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

সে যা-ই হোক, খবরের কাগজের অফিসে খবর আসার অনেক পরেই যে রেডিওয় রাষ্ট্রপতির মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। খবরের কাগজের অফিসে অনেক আগেই ইউ-এন-আই নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটি খবর পাঠায়। রেডিও অফিসেও নিশ্চয় খবরটা গিয়েছিল। কিন্তু রেডিও সরকারী প্রতিষ্ঠান। তার কিছু বিধিনিষেধ পালন করতে হয়। এই রকম একটা খবর টেলিপ্রিন্টারে বা টেলিফোনে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করা যায় না। তখন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কেউই রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। রেডিওয় ঘোষণার আগে খবরটা তাঁদের জানানো দরকার; জানানো দরকার সশস্ত্রবাহিনীত্রয়ের অধিনায়কদের, যে বাহিনী-ত্রয়ের সর্বাধিনায়ক ছিলেন রাষ্ট্রপতি। এবং আরও অনেক কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের দরকার। সমস্ত কর্ম সম্পাদনের পর সরকারের উচ্চস্তর থেকে ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত রেডিওয় এই রকম একটি খবর ঘোষিত হতে পারে না। কাজেই কিছু বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। এবং তার জন্য রেডিওকে দোষী করা চলে না।

রেডিওয় খবরটা প্রচারিত হবার পরই রেডিওর অনুষ্ঠানে কর্মতৎপরতা দেখা গেছে। কোনো রকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া তাঁরা অবস্থাটা সামলে নিয়েছেন। পূর্বনির্ধারিত সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে সময়োপযোগী অনুষ্ঠান প্রচার করতে শুরু করেছেন। রাষ্ট্রীয় শোকের সময় রেডিওর অনুষ্ঠান প্রচারে অনেক বিধিনিষেধ আছে। সমস্ত রকম সঙ্গীত প্রচার করা যায় না, সমস্ত রকম বাদ্যযন্ত্র বাজানো যায় না—কোনো অনুষ্ঠানে কোনো রকম লঘুতা প্রকাশ করা চলে না। হাসি না, আনন্দ না, কৌতুক না। কাজেই পূর্বনির্ধারিত সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করে এত অল্প সময়ের মধ্যে সময়োপযোগী অনুষ্ঠান প্রস্তুত করা খুব সহজ নয়।

এই অসহজ কাজে রেডিওর কর্মচারীরা যে তৎপরতা দেখিয়েছেন, তার জন্য তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

দিল্লীর বাংলা সংবাদ বিভাগের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা হয়েছে, বহুবার দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গাফিলতি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু তাঁদের সাড়া নেই। তাঁদের এই নিঃসাড়তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

গত ২১শে এপ্রিল রাত্রে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার দৌলতপুরের কাছে বিল-পাগলার জলাভূমিতে ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্সের একটি বিমান ভেঙে পড়েছিল। বিমানটি যে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সমস্ত খবরের কাগজে তা ছাপা হয়েছে। রেডিওর মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না, রেডিও থেকেও বিমানটিকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু ২৩শে এপ্রিল বেলা ১২টা ৫০য়ের খবরে পাঠিকা সেটিকে ভারতীয় বিমান-বাহিনীর বিমান বলে ঘোষণা করলেন। এতে তাঁর কী আনন্দ হ'ল বোঝা গেল না, এই ভুল প্রচারের জন্য তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছিল কিনা জানা যায় নি।

এইদিন বেলা ১টা ৫০ মিনিটে মহিলামহলে 'সংসারের কয়েকটি বাস্তব চিত্র অবলম্বনে' নীলা দেবী রচিত একটি রূপক প্রচারিত হ'ল। নীলা দেবী সংসারের অতি সাধারণ কয়েকটি খন্ডচিত্র বেছে নিয়ে তাঁর রূপকে স্থান দিয়েছেন। চিত্রগুলি প্রাণবন্ত, মধ্যবিত্ত সংসারে প্রত্যক্ষদৃষ্ট। তাই মধ্যবিত্ত সংসারের মানুষকে রূপকটি সহজেই স্পর্শ করতে পেরেছে। কিন্তু রূপকটি রূপায়িত করেছেন যাঁরা, তাঁদের আর একটু আন্তরিক হয়ে ভালোভাবে মহড়া দিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। সব জিনিস 'স্টেজে মারা' যায় না।

২৩শে এপ্রিল ছিল বড়ে গোলাম আলী খাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। বেতার জগতে এই উপলক্ষ্যে কোনো অনুষ্ঠানের উল্লেখ ছিল না। হয়তো দিনটির কথা কর্তৃপক্ষের মনে ছিল না। শেষ মুহূর্তে যখন মনে পড়ল তখন নির্ধারিত প্রচার সময়ের মধ্যে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের সুযোগ নেই। তাই নির্ধারিত প্রচার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর রাত ১১টায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। 'সবরং' নামে এই অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। অনুষ্ঠানে বড়ে গোলাম আলী খাঁর কণ্ঠসঙ্গীত ছাড়াও তাঁর জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রচার করা হয়েছে।

২৬শে এপ্রিল বেলা ৩টেয় প্রচারিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। বেতাররূপ ও প্রযোজনা শ্রীশ্রীধর ভট্টাচার্য।

শ্রীভট্টাচার্যের বড়ো কৃতিত্ব— নাটকের ওজুহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তিনি নিষ্ঠুর খড়্গ চালান নি। বঙ্কিমচন্দ্রকে অক্ষত রেখেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে রূপ দিয়েছেন, নাটকীয়তা সঞ্চার করেছেন। অভিনয়ের প্রতিও তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন ভ্রমরের ভূমিকায় শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। গোবিন্দলালের ভূমিকায় শ্রীনির্মল-কুমারকেও মানিয়েছিল সুন্দর। কৃষ্ণকান্তের চরিত্রটিতেও যথার্থ ব্যক্তিত্ব আরোপ করে-ছিলেন শ্রীগৌরীশঙ্কর চৌধুরী।

২৭শে এপ্রিল বেলা ১টায় রূপ ও রঙ্গের আসরে কৌতুক নকশাটির নাম ছিল 'সন্ধি'। রচনা শ্রীসরোজ ঘোষ।

এক উকিলের খুব গর্ব, তিনি কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির ফৌজদারী মামলা করেন না। তিনি জাত বনেদী, তাই দেওয়ানী মামলা করেন। কিন্তু জাত বনেদীর মক্কেল হয় না, রান্না চড়ে না। তাই নিয়ে পত্নীর সঙ্গে খিটিমিটি। পত্নী তাঁকে খোঁটা দেন, অকর্মণ্যতার অভিযোগ আনেন।

এমনি সময়ে দরজায় কড়া নাড়া শোনা গেল। নিশ্চয় মক্কেল। বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন। পত্নীকে তিনি ভিতরে পাঠিয়ে 'জয় মা দুর্গা' বলে দরজা খুলে দিলেন। —একজোড়া স্বামী-স্ত্রী এসেছে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করতে।

স্বামীর অভিযোগ, সারাদিন খাটা-খাটনির পর বাড়ি ফিরলে স্ত্রী আবার তাকে দিয়ে খাটায়। সপ্তাহে একটা দিন রবিবার, সেদিনও বিশ্রাম নেই—রাজ্যের ফরমাশ সেইদিনই। স্ত্রীর অভিযোগ, দাসীচাকর নেই, বিয়ের পর থেকে সংসারের খাটুনি খেটে খেটে হাড়মাস কালি হয়ে গেল। স্বামীর কাছ থেকে কোনো কাজে এতটুকু সাহায্য পাওয়া যায় না।—এমনি ছোটো-খাটো আরও কিছু অভিযোগ।

উকিলবাবু সব শুনে বললেন, এ ফিট কেস ফর ডিভোর্স। কিন্তু ডিভোর্সের আগে স্বামী-স্ত্রীকে তিন বছর আলাদা থাকতে হবে। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বাপের বাড়ি যাবার সঙ্কল্প প্রকাশ করল। স্বামী বলল, ওখানে বিছানাপাতির অভাব, ছোটো বোনের সঙ্গে একসঙ্গে শুতে হবে। ও যেন বিছানা-বালিশ নিয়ে যায়। স্ত্রী বলল, শীত আসছে, সোয়েটারটা বুনেই পাঠিয়ে দেবে। এর মধ্যে যেন ঠান্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধিয়ে না বসে।—এমনিভাবে স্বামী স্ত্রীর অসুবিধাগুলো উল্লেখ করে তাকে সাবধান করে দিতে লাগল, আর স্ত্রী স্বামীর অসু-বিধাগুলো দেখিয়ে তাকে সাবধান করে দিতে শুরু করল।

উকিল-গৃহিণী আড়াল থেকে সব শুনছিলেন। আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে এসে বললেন : আপনাদের চেয়ে বয়েসে আমি বড়ো। আমি বলছি, আপনাদের ডিভোর্সে কাজ নেই। আপনাদের মধ্যে মত না বিরোধ, তার চেয়ে বেশি ভালোবাসা। আপনারা ফিরে যান, দেখবেন সুখী হবেন। শুধু, একে অপরের অসুবিধেগুলো বুঝতে চেষ্টা করবেন।

স্বামী আর স্ত্রী উকিল-গৃহিণীর পরামর্শ মতো ফিরে গেলেন। মক্কেল ফসকে গেল দেখে উকিলবাবু গিন্নীর উপর খাপ্পা হলেন, ডিভোর্স করবেন বলে ঘোষণা করলেন। শেষে ঐ দম্পতির মতো তাঁদের মধ্যেও মিল হয়ে গেল। তাঁরাও একে অপরকে বুঝতে চাইলেন।

নকশাটা ভালো জমতে পারে নি। কৌতুকও খুব সূক্ষ্ম নয়। হাত খুব পাকা বলে মনে হয় না। কাহিনীটা স্বাভাবিক-ভাবে এগোয় নি। অনেক জায়গায় নকশাকার কাহিনীকে তার স্বাভাবিক গতিতে ছেড়ে না দিয়ে নিজের প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করেছেন, সাজিয়েছেন। কৌতুক সৃষ্টি করতে গেলেই যে স্বাভাবিকতা বিসর্জন দেওয়া যায় না, নকশাকার এ কথাটা বোধ-হয় বিস্মৃত হয়েছিলেন।

৩০শে এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৫টায় গল্পদাদুর আসরে 'বাপুজীর কথা' বললেন শ্রীঅমিতাভ সেন। বাপুজীর কথার চেয়ে শ্রোতাদের তিনি উপদেশই দিলেন বেশি। অনুষ্ঠানটা নিশ্চয় উপদেশের ছিল না!

• এইদিন রাত ৮টায় গান্ধীজীর স্মৃতি-চারণ করলেন শ্রীচারুচন্দ্র ভান্ডারী। এই স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের যেমন উল্লেখ করলেন তেমনি গান্ধীজীবনের কতক-গুলি স্বল্পপরিজ্ঞাত দিকের প্রতিও আলোকপাত করলেন। শ্রীভান্ডারীর বলার ভঙ্গী প্রাঞ্জল, সরস—সুন্দর।

১লা মে বিকেল সাড়ে ৫টায় শ্রীমতী চন্দনা রায়ের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গান শুনে বিশেষ খুশি হওয়া গেল না। আরও অনুশীলনের দরকার আছে বলে মনে হয়, আরও আন্তরিকতার।...সাড়ে ৬টার অনু-ষ্ঠানে শ্রীমতী অঞ্জলি মজুমদারের গাওয়া দুখানি লোকগীতিকে 'প্রাচীন লোকগীতি' বলে ঘোষণা করা হল। 'প্রাচীন আধুনিক' ঘোষণা করা হবে কবে? লোকগীতি যদি প্রাচীন হতে পারে তাহলে আধুনিকই বা প্রাচীন হবে না কেন? সম্প্রতিকালের লেখা না হলেই যদি প্রাচীন হয় তাহলে আজকের আধুনিক গানকে দশ, পনের বা বিশ বছর পরে 'প্রাচীন আধুনিক' বলে ঘোষণা করা উচিত। ইতিপূর্বে বিশদভাবে আলো-চনা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, লোক-গীতি কখনও প্রাচীন হয় না। কারণ, প্রয়োজনের তাগিদেই লোকগীতির সৃষ্টি, প্রয়োজন ফুরুলেই তার মৃত্যু ঘটে। লোক-গীতি তাই প্রাচীন হবার অবকাশ পায় না। ৬টা ৪০ মিনিটে 'পথ ও পথিক' নামে একটি রূপক শোনা গেল। প্রপাগান্ডা রূপক। কিন্তু তাই বলে গল্প বলতে গিয়ে একটা স্বাভাবিক, নিটোল গল্প বলা হবে না, এটা ঠিক নয়। রূপকটি যেন অনেক কথার একটা বান্ডিল। মোটেই জমে নি। অত্যন্ত মামুলী দায়সারা গোছের।

২রা মে রাত ১০টা ৫ মিনিটের খবরে পাঠক পড়লেন, 'আজ ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণ বার্ষিকী...।' সংবাদ বিভাগের যিনিই লিখে থাকুন, পাঠক যখন পড়েছেন তখন তাঁকেও দায়িত্ব নিতে হবে। পরিনির্বাণ শব্দের অর্থ কী? অভিধান বলে—ভববন্ধন থেকে মুক্তি। বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধ কি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন? কোথায় আছে এমন কথা?

সংবাদ বিভাগ একটা ভালো শব্দ পেয়ে ব্যবহার করার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি—কিন্তু তার অর্থটা যে জেনে নেওয়া উচিত, এ জ্ঞান হবে কবে?

—শ্রবণক

গালিব শতবার্ষিকী উৎসবে গজল পরিবেশন করছেন।
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়
আরতি মুখোপাধ্যায়

গ্রামোফোন কোম্পানীর ''গীতাঞ্জলি''

কবিগুরুর আবির্ভাব-লগ্নকে কেন্দ্র করে দেশবাসী যখন উৎসবে মেতে ওঠে ঠিক সেই মুহূর্তেই কবির গানের অজস্র সম্ভারে গানের ডালি ভরে দেন গ্রামোফোন কোম্পানী। এবারের বিশেষ অর্ঘ্য একখানি ই, পি-তে সাহানা দেবীর ৪ খানি এবং এল, পি-তে কণক দাস, মালতী ঘোষাল, সতী দেবী এবং রেণুকা দাসগুপ্তের গাওয়া ১২ খানি পুরোনোদিনের গান। রবীন্দ্র-সংগীতের জনমানসে পৌঁছানোর প্রথম অধ্যায় ভাস্বর হয়ে আছে এইসব শিল্পীদের অবদানে। এঁদের মধ্যে অনেকেরই সাক্ষাৎ কবির কাছে শিক্ষার সৌভাগ্যও হয়েছে। সুতরাং কবির মৌলিক গায়কীর ধারাটির সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়ে দেবার দায়িত্বও যেমন গ্রামোফোন কোম্পানী পালন করেছেন আমাদের এইসব সুদক্ষ শিল্পীকে অমর করে রাখার শিল্পকীর্তিও এঁদের প্রাপ্য। এই প্রসঙ্গে সাহানা দেবীর গানের সম্বন্ধে কবির মন্তব্য স্মরণীয়—"তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে।" "তুমি জানো তোমার মুখে আমার গানে আমি কি শুনি। আমি ভুলতে পারি না তোমার গান।" অতএব এইসব গানের ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। এঁদের গানে বৈদগ্ধ আছে, নিষ্ঠা আছে, শুদ্ধতা আছে তবু এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না এ যুগে বিশেষ এক সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের উচুমহলেই রবীন্দ্র-সংগীত সীমাবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত সত্যিকারের জনগণের গান হয়ে **জনপ্রিয়তা** অর্জন করেছিল চিত্রগীতির মাধ্যমে এবং এই প্রসঙ্গে **পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল** ও **কানন দেবীর** অবদান অনস্বীকার্য। তখনকার দিনে "দিনের শেষে" "কান পেতে রই"—"একটুকু ছোঁয়া লাগে", "আমি তোমায় যত", "আজ সবার রঙে" লোকের মুখে মুখে ফিরেছে।

দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারও পর চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের যুগ ও জনপ্রিয়তার পূর্ণ-যৌবন। তখন নানান ভাবের দোলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জোয়ার বয়েছে। প্রথম যুগের ছবি মেলে ধরার কাজ এবছর গ্রামোফোন কোম্পানী সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছেন। শেষের যুগ তো এখন প্রতি রবীন্দ্রোৎসবেই তরঙ্গিত। কিন্তু মাঝের যুগ যে যুগে সত্যিকারের **জনপ্রিয়তা**-য় প্রতিষ্ঠিত হয়ে কবির গানের ভাবমাধুর্যের সম্বন্ধে আমাদের মন সচেতন হয়েছে সেই যুগের একখানি পূর্ণাঙ্গ সংগীতালেখ্য তথা পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল ও কানন দেবীর লং প্লেয়িং না হলে এ ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই এবারে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এবারের অন্যতম আকর্ষণ হোল কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—তাঁদের আপনাপন বৈশিষ্ট্যের ৪ খানি গানেই রেখেছেন। ভাবময়ী কণিকার কণ্ঠে "নীলাঞ্জনছায়া" যেমন ঘন হয়ে উঠেছে তেমনই উচ্ছলিত "খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়ালে" বাউল ভাবের গান।

সুচিত্রা মিত্রের বলিষ্ঠ কণ্ঠে "হার মানালে" এবং "ঝরঝর বরিষে বারিধারা"—আপন ছন্দে প্রবাহিত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ" এবং "কাছে থেকে দূরে রচিল"—বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গানের 'হিরো'-রূপে বিখ্যাত হলেও এবারের ভক্তিগীতিতেও তিনি সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছেন। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কণ্ঠে কবির দুটি ভাবগীতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গান দুটি হোল—"এই বুঝি মোর ভোরের তারা" এবং "রাত্রি এসে যেথায় মেশে"।

সুমিত্রা সেনের ৪টি গানে তার ক্রম-পরিণত শিল্পীব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। সুচিত্রা-কণিকার পরই ইনি নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

শ্যামল মিত্র রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও আপন মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়ে সুনামে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। বিশেষ করে ভাল লাগে তার "আমি চঞ্চল হে"—। এবারে রবীন্দ্র-সংগীতের শ্রোতাদের গ্রামোফোন কোম্পানী চমকে দিয়েছেন মায়া সেন-এর ৪টি গান রেকর্ড করে। "ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী" "না চাহিলে যারে পাওয়া যায়" "শ্রাবণের গগনের গায়" এবং "... হোলো যাবার আয়োজন"—গানগুলি সুনির্বাচিত। এ ধরণের এক্সপেরিমেন্ট অভিনন্দনযোগ্য। অনেক সময় এতে অজানাদের মাঝ থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সার্থক শিল্পী বেরিয়ে আসেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের "আমার এ রিক্ত ডালি" এবং "দীপ নিভে গেছে" সুন্দর। আরতি মুখোপাধ্যায়ের দুটি গানই অপূর্ব তবু "কার চোখের চাওয়ায়" যেন ভোলা যায় না। ঋতু গুহর উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে কণিকার গায়কীর আদল আছে বলেই যেন এর আকর্ষণ বেড়ে গেছে। সাগর সেনের দুটি গান "স্বপনে দোঁহে" এবং "আধেক ঘুমে নয়ন চুমে"—সুনির্বাচিত এবং সংগীত। স্বপন গুপ্তের গান আগেই আলোচিত হয়েছে। সারা সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা শ্রোতার অভিমত শুনে আমাদের ধারণা আরো দৃঢ় হোল।

সুমিত্রা ঘোষ এবং সুশীল মল্লিকের বিস্তারিত বিশ্লেষণ আগের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন পূরবী মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, পূর্বা

সিংহী পার্কে রবিতীর্থের রবীন্দ্র জন্মোৎসব : সুচিত্রা মিত্র এবং অন্যান্য শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করছেন। ফটো : অমৃত

সিংহ, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়—এ'রা আপনা-পর মানে অবিচল। নমিতা ঘোষাল আর এক প্রতিশ্রুতিসম্পন্না শিল্পী।

বিদেশ যাত্রায় কল্যাণী রায়

প্রখ্যাতা সেতারবাদিকা শ্রীমতী কল্যাণী রায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াব্যাপী সাংস্কৃতিক সফরের প্রাক্কালে "সৌরভ" সংগীত প্রতিষ্ঠান পক্ষ থেকে এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন হয় বিড়লা আকাদমি হলে। প্রারম্ভিক ভাষণে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ শ্রীমতী রায়কে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, যে স্বল্প কয়েকজন বাঙ্গালী মহিলাশিল্পী যন্ত্রসংগীতের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন কল্যাণী তাঁদেরই একজন। ইনি প্রথিতযশা, নিষ্ঠায় অবিচল বাদনশৈলীর বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী। সংস্কৃতিক সফরে সরকার পক্ষ যোগ্য প্রতিনিধিকেই পাঠাচ্ছেন এটা সত্যিই আনন্দের। বীরেন্দ্রকিশোর বলেন, উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়াও কল্যাণী রায়ের ঠাকুর-পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমিকা আছে এবং 'ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু প্রাচীন বস্তু এ'র অধিগত।

অভ্যর্থনার জবাবে শ্রীমতী রায় অভ্যাগতদের সেতার বাজিয়ে শোনান। রাগ "জয়জয়ন্তী"। এখন ভারতবর্ষের উচ্চাঙ্গ-সংগীতের ক্ষেত্রে যন্ত্রসংগীতের স্বর্ণযুগ। বিভিন্ন ঘরাণার বহু প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাবে এইদিক পূর্ণ। যে কোনো ঘরাণার শিল্পীর পক্ষে আলাউদ্দিন ঘরাণার বাদনশৈলীর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। কল্যাণী রায় এই অবশ্যম্ভাবী প্রথার একমাত্র ব্যতিক্রম। ইনি বিলায়েত খাঁর শিষ্যা। কি বাজে, কি গতের বান্দাজ, কি বিস্তারে সেই পরিচয় সুস্পষ্টরূপেই পরিব্যাপ্ত। ডান হাতের এমন বাজ বাঁহাতের সাবলীল গতি সত্ত্বেও একটি স্ট্রোকে, স্বর-সমন্বয়ে অথবা বাদনশৈলীতে অন্য ঘরাণার ঐশ্বর্যযুক্ত করে বৈচিত্র সৃষ্টি করার প্রলোভন সংযত করে আপন ঘরাণার প্রতি যে আনুগত্য ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন তা অবশ্যই দুর্লভ। এনায়েত খাঁর ঘরাণার বিশুদ্ধ আঙ্গিকের উপযুক্ত প্রতিনিধিরূপে কল্যাণী রায় গুণীসমাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং বিদেশেও এই ঘরাণার নিদর্শন পেশ করবেন—শিল্পীজীবনে এটা কম সার্থকতা নয়। শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে উপযুক্ত তবলাসংগত করেছেন মাণিক দাস। বাজনা সমাপ্ত হয় শ্রীমতী রায়ের স্বরচিত একটি লোকসংগীত ভিত্তিক ধুনে দিয়ে। শিল্পীর মৌলিক সংগীতচিন্তার ছোঁয়া ছিল বলেই বোধহয় সহজেই এই অংশ সকল শ্রেণীর শ্রোতার চিত্ত স্পর্শ করতে পেরেছে।

বসন্ত

ঋতুরাজ 'বসন্ত' রঙের অফুরন্ত প্রবাহে দিগ্বিদিগ রাঙিয়ে দিয়ে নীল দিগন্তে ফুলের আগুনে জ্বালিয়ে আবির্ভূত হলেও অন্তরে তিনি মহাযোগী—তার হৃদয়ের একতারায় বৈরাগ্যের গান। বসন্তের তপোমুগ্ধ কবি তাই অন্তরের সংগীতলোক উজাড় করে দিয়েছেন ঋতুরাজের বন্দনায়। নানা রঙা ফুলের মত গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে উঠেছে নানা ভাবের গান "বসন্ত" (ই এ এল পি ১৩০৯) রেকর্ডটিতে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে চৈত্র-পবনে' এবং "দিয়ে গেনু বসন্তের এই গান" দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের "দিন শেষে" কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আজি দক্ষিণ পবনে"—কখনও চলে যাওয়ার ছন্দের উদাসী সুরে—গোধূলি লগ্নের বৈরাগ্যে রণিয়ে ওঠে মনের তারে, আবার দখিনা পবনের আবেগে কিসের অস্থিরতায় চিত্ত যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, অর্ঘ্য সেন, সুশীল মল্লিক, স্বপন গুপ্ত, পূরবী মুখোপাধ্যায়, ঋতু গুহ, সুমিত্রা সেন, বনানী ঘোষ, মেখলা পাল, সুমিত্রা ঘোষ, গোরা সর্বাধিকারী। শিল্পীরা সকলেই সুপরিচিত। এ'দের গাওয়া গান সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। নতুন একটি কণ্ঠ শুনলাম গোরা সর্বাধিকারী। রিহার্স্যালের সময়ই এ'র গান শুনেছিলাম—বড় সুরেলা। ইনি ভবিষ্যতের এক সম্ভাবনাদীপ্ত রবীন্দ্র-সংগীত-শিল্পী।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি সংগীতের স্রোতে বৈচিত্র্য-বিরতি এনেছে। ভাস্কর বসুর এই অমূল্য সংকলন সুপরিচালনার কৃতিত্ব সন্তোষ সেনগুপ্তের।

"ত্রিবেণী" পরিবেশিত "সুরের আকাশ"

কবিপক্ষে "ত্রিবেণী" পরিবেশিত "সুরের আকাশ" এক উজ্জ্বল নিবেদন। কোথাও এতটুকু আতিশয্যবর্জিত ঝরঝরে সুন্দর অনুষ্ঠান প্রথম থেকে শেষ অবধি দর্শক কৌতূহল জাগ্রত রেখেছে।

এই "গীতিনাট্য"র পূর্বমুহূর্তের আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থিত তিন শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একক সংগীত। সময়োপ-যোগী গানের দানে রসিকচিত্ত ভরে দিতে এ'রা কার্পণ্য করেননি। তারপরই "সুরের আকাশ" শুরু হয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠের সংস্কৃত স্তোত্র দিয়ে। "সুরের আকাশে" আমরা বিহার করেছি প্রাণভরে। কবির রাগাশ্রিত গানের পথরেখা এ'কে দিয়ে গেছেন প্রসূন ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এবং গ্রীষ্ম থেকে শুরু করে বসন্ত অবধি কবির গানের উৎস হোল বিশুদ্ধ রাগসংগীত। বিভিন্ন রাগ ভেঙে অথচ ভাবনার স্বাতন্ত্র্য রেখে কবির গান "আপন স্বরূপে আপনি ধন্য"—হয়ে উঠল কেমন করে তারই এক আশ্চর্য ইতিহাস সুরের আলপনায় নৃত্যের ছন্দে দর্শকচিত্তে উদ্ভাসিত হয়।

মীরা ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেন বিখ্যাত ভৈরো "জাগো মোহন

প্যারে” তারপরই ঐ রাগভিত্তিতে সমবেত-কণ্ঠে “জাগো মঙ্গললোকে” এক শুদ্ধ, গম্ভীর পরিবেশ রচনা করে। এমনিভাবে সারং “দারুণ লাগে সুরীয় কিরণ” থেকে এল “দারুণ অগ্নিবানে” মল্লার থেকে বিভিন্ন বর্ষার গান। হেমন্ত, শীতের পর বসন্তের রঙ-ভরা পুষ্পসমারোহের পালা। রাগসঙ্গীতের পটভূমিকা উপযুক্ত ভাব ও রসে সৃষ্টি করেছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গত করেছেন মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যে পরিচালিত করেছেন সুমিত্রা সেন—সাধারণ সঙ্গীত-পরিচালনা সুমিত্রা সেন ও পূর্ণেন্দু রায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। সুমিত্রা সেনের নির্দেশে আপনাপন দায়িত্ব যথাযোগ্য পালন করেছেন অর্ঘ্য সেন, সুমিত্রা সেন, সাগর সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, রমা পুরকায়স্থ, পূর্বা সিংহ, স্নিগ্ধা কোলে, দীপিকা কোলে, প্রশান্ত ঘোষ, নির্মল সেনগুপ্ত, অলক বোস, গোরা সর্বাধিকারী, পূর্ণেন্দু রায়, দিলীপ রা[illegible]। প্রভাত ভঞ্জ। রাগসংগীত প্রসূনবাবুর মধুর কণ্ঠে উপভোগ্য হলেও নৃত্যনাট্যের আসরে প্রলম্বিত বিস্তার ও তানের দীর্ঘস্থায়িত্বে অনেক সময় দর্শকবৃন্দকে চঞ্চল হতে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাগের মৌলিক রূপটি দেখিয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু হলে সকলরকম শ্রোতার চিত্তাকর্ষী হোত, অনেক সময় বিশেষ কিছু না বলেও অনেক কথা বলা যায়। এই ব্যঞ্জনাধর্মীতাই বড় শিল্পীর কাছে আমরা আশা করি। তবে ক্ল্যাসিক্যাল গানের শ্রোতারা সিনেমাস্কোপের দৃশ্যমান সৌন্দর্যের পটভূমিকায় রাগ বিশ্লেষণে নিঃসন্দেহে খুশী হয়ে উঠেছেন। প্রসূনবাবুর কণ্ঠে “কোথা যে উধাও” গানটিও ব্যাপ্তি ও বিস্তারে শ্রুতির মধুরতায় খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। সুমিত্রা সেনের কণ্ঠের “ঝর ঝর বরিষে” ও “শেষ গানেরই রেশে” ভোলা যায় না। “যোগিয়া” রূপাভাস সাগর সেনের “আজি শরত তপনে” সুখশ্রাব্য।

নৃত্যপরিকল্পনায়, উচ্চাঙ্গ-নৃত্যে, শিব-শঙ্করম্-এর নৃত্যে ‘ক্ল্যাসিক্যাল’ টাচ শিক্ষা ও মুন্সিয়ানা অনায়াসদক্ষতায় সকলের মন জয় করে নিয়েছে। কথকের আঙ্গিকে পরিবেশিত বন্দনা সেনের নৃত্যসঙ্গীতে—লয়ে দক্ষতায় এবং নির্ভুল পদক্ষেপের গতিবৈচিত্র্যে সকলের উচ্ছ্বসিত করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে। অনেক প্রতিশ্রুতির আভাস পাওয়া গেল ছোট্ট সুন্দর ইন্দ্রাণী সেনের নৃত্যে। জয়শ্রী লাহিড়ী তাঁর “বর্ষাবসন্তর” খ্যাতি বজায় রেখেছেন। পলি গুহ ও সাধন গুহ ত নৃত্যনাট্যে জনপ্রিয় শিল্পী। আর যাঁরা ছিলেন বনশ্রী ঘোষ, শিখা মুখোপাধ্যায়, চন্দনা বসু সকলে সমবেত নৃত্য সুন্দর করে তুলেছেন। “নৃত্যের তালে তালে”র শিল্পীদের মধ্যে সমবেত কথকনৃত্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভারতী, চম্পা, পদ্মা, ইন্দ্রা, ডলি, পদ্মা। প্রভাত

ত্রিবেণীর সুরের আকাশ পূর্ণেন্দু রায়, অর্ঘ্য সেন চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, পূর্বা সিংহ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, সুচিত্রা মিত্র, এবং নৃত্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পী : পলি গুহ, ইন্দ্রাণী সেন, বন্দনা সেন, জয়শ্রী লাহিড়ী, বনশ্রী ঘোষ, শিখা মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

ভঞ্জের সহায়তায় অনুষ্ঠানটির সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেন অনিল সেন। এ ছাড়া প্রদীপ ঘোষের ভাষ্যপাঠ, অনিল সাহার আলোকপাত, পরাশর রায়ের স্ক্রিপ্ট ত ছিলই। সজ্জাসৌন্দর্যের কৃতিত্ব “নীলা” ও ননী দাসগুপ্তের।

একটি সাহায্য রজনী অনুষ্ঠান

রবীন্দ্র সদনে ‘বিপ্লবী নিকেতন’-এর সাহায্যার্থে আয়োজিত সংগীত-সন্ধ্যায়, অনুভবঘন যে কয়েকটি মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, তা রসিকচিত্তে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গৌরবদীপ্ত বিদেশ সফরের পর, তাঁর অনুষ্ঠান এই প্রথম শুনলাম। ‘মেঘ’ রাগের আলাপ দিয়ে বাজনা সুরু হোলো। পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগের মন্দ্র ও অতিমন্দ্র স্থানের বিস্তারে রাগের শাস্ত্রীয় রূপটির কাঠামো ধীরে ধীরে রসকল্পনা,—ঘনীভূত হোলো রেখার-পঞ্চমের দীর্ঘস্থায়ী মীড়ের রেশে কৃন্তন জমজমার অতৃপ্ত পিপাসায় প্রতিটি স্বরস্পর্শনের শুদ্ধতায়, গাম্ভীর্যের পটভূমিকায়—মেঘের ক্রমসঞ্চার—কখনও সননসর-র মন্দ্র-ধ্বনিতে দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়ানো, আবার স র ম প ণ—প ণ সা তে অগম্বর হয়েই অবরোহনে ধৈবতের মৃদু স্পর্শলীলায় সুরে ফিরে আসা এবং নানান ছন্দে বর্ণবহুল মীড়ের পথ বেয়ে পঞ্চমে দাঁড়ানোর শিল্পমণ্ডিত প্রকাশ ব্যাকুলতা ভোলার নয়। জোড়ের সঙ্গে গমকের গাম্ভীর্যে মেঘমন্দ্রিত বজ্রগর্জন, অতুলনীয় সাপট-তানের বিদ্যুৎ রাগের পূর্ণ ছবিকে যেন এক নিমেষে মূর্ত করে তুলেছিলেন রসিকজনের চিত্তপটে। ‘মেঘ’ রাগের সঙ্গে ভাবসঙ্গতি রেখে ‘দেশ’ রাগের গতে বর্ষার পরিপূর্ণ রূপটি উদ্বেল হয়ে উঠল—বিরহী চিত্তের আর্তি নিয়ে। মেঘের বজ্রগর্ভ পৌরুষব্যঞ্জক রূপ বর্ষার সজল মেদুরতায় আলোতে, ছায়াতে, দৃপ্ততায় কোমলতায় যে মাধুর্য সৃষ্টি হয়েছিল তা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ভাবুক সৃজনশীল শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। অবরোহী অঙ্গের সাপটে রণধাপামপনসর-র পর রপমগর নিসা-র স্বর সমন্বয়ের সৌন্দর্যব্যঞ্জনা শ্রোতাদের অন্তরেও বিছিয়ে দেয় বর্ষার সজল কারুণ্য সে কোন চির পলাতকের জন্য চঞ্চল বেদনা যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে। উলটি-ঝালায় বর্ষার অশ্রান্ত গুঞ্জন-এর ছন্দে ছন্দে আমাদের মনও উধাও হয়ে গিয়েছিল চির-অধরা স্বপ্নলোকে। কানাই দত্তর সুন্দর সংগত শিল্পীর ধ্যানচিন্তার গতির সঙ্গে সংগতি রাখতে পেরেছে। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আবেগের এমন সমন্বয় নিখিলের আগের বাজনায় দেখিনি।

কন্ঠসঙ্গীতে শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ‘ইমন’ রাগ পরিচ্ছন্ন। বিস্তারের সঙ্গে শিল্পীর শান্ত মেজাজ প্রাণবন্ত তান ও সরগম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অগ্রগতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করেছে। বড়ে গোলাম আলির একটি ঠুংরির স্মৃতির আবেশে চিত্ত ভারাক্রান্ত করে। শ্যামল বোসের শান্ত মেজাজের সঙ্গত শিল্পীকে প্রফুল্ল রেখেছে।

অনুষ্ঠান সুরু হয় জয়শ্রী সেনের কথক-নৃত্য দিয়ে। শিল্পীরা বিনা দক্ষিণায় অংশ গ্রহণ করে শিল্পীজনোচিত উদার চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ বিপ্লবী গৃহের সাহায্যের অতিরিক্ত আনন্দ সম্পদ বিলোবার জন্য।

—চিত্রাঙ্গদা

পরিচালক : সত্যজিৎ রায়

চিত্র-সমালোচনা

ছেলেভুলানো রূপকথার সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ

সত্যজিৎ রায়ের পূজাপাদ পিতামহ স্বনামধন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত **'গুপী গাইন'** রূপকথাটি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সাল নাগাদ সেযুগের কিশোরদের প্রিয় মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ'-এ। সেই রূপকথাকে রূপকথারই বিশেষ মেজাজে চিত্রায়িত করেছেন সত্যজিৎ রায়। সারা ছবিটাই সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীর মাধ্যমে দেখবার পরে শেষ দু-তিন মিনিট স্থায়ী আনন্দোজ্জ্বল দৃশ্যটি রঙীন ফিল্মের মারফত পরিবেশিত হতে দেখে আমাদের বারংবার মনে হচ্ছে, সমস্ত ছবিটাই রঙীন হলে আরও কত না বেশী মনোলোভা হত। কল্পনাকে আর একটু প্রসারিত করে মনে জিজ্ঞাসা জাগছে, এই কাহিনীটি যদি ওয়াল্ট ডিজনের হাতে পড়ত তাহলে তিনি কি একে একটি সার্থক রঙীন কার্টুন চিত্রে পরিণত করতেন না?

কিন্তু আমরা সত্যজিৎ রায় কৃত 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'-এর কথায় ফিরে আসি। আমলকি রাজ্য থেকে বিতাড়িত গুপীর যখন বনমধ্যে হরতুকীরাজ্য হতে বিতাড়িত বাঘার সঙ্গে দেখা এবং বনমধ্যে অন্ধকার নেমে আসতেই যখন ওদের চোখের সামনে ভূতের দল কিম্ভূত নৃত্য শুরু করে, তখন থেকেই ছবিটি যথার্থ রূপকথার রূপান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই রূপান্তরিত চেহারাটি বজায় থাকে পাত্র-পাত্রীদের কথাবার্তা, সাজ-পোষাক, ঘটনাসংস্থান প্রভৃতির মাধ্যমে। কাহিনীর অলৌকিকত্বটিকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করবার জন্যে 'অপটিক প্রিন্টার'-এর সাহায্যে যে-সব চমকপ্রদ কৌশল দেখানো হয়েছে, তা যাদের জন্যে এই ছবি, সেই কিশোর-কিশোরীদের রীতিমত উল্লসিত করবে। শ্রীরায় লিখিত গানগুলি এবং তাঁর সৃষ্ট আবহ-সংগীত ছবিটিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দিতে অল্প সাহায্য করেনি। ছবির একেবারে শেষ দৃশ্যে শুণ্ডীরাজ ও হাল্লারাজের দুই কন্যারূপে দুটি মেয়ে আবির্ভূত হতে আমাদের মনে পড়ল যে, ওর আগে পর্যন্ত সারা ছবিটাতে কোনো নারীকে দেখা যায়নি (মাত্র শংকাটি শুণ্ডীর রাজবাড়ীর উচ্চতম অলিন্দে কে যেন শুণ্ডী রাজকন্যার বেশে দর্শকদৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করেছিল); অথচ ছবিটির উপভোগ্যতা তার জন্যে অনুমাত্রও কম হয়েছিল কি?

ছবিটিতে অভিনেতা আছেন প্রায় অর্ধ-শত এবং নবাগত তপেন চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তাঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন। ওঁদের মধ্যে হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (জাদুকর বরফি), রবি ঘোষ (বাঘা), জহর রায় (হাল্লার মন্ত্রী), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (আমলকির রাজা), প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ভূতের রাজা), সন্তোষ দত্ত (শুণ্ডীরাজ ও হাল্লারাজ) এবং গুপীবেশী নবাগত তপেন বিশেষ পারদর্শিতাও দেখিয়েছেন। কিন্তু এই ছবিতে সবচেয়ে বড়ো অভিনেতা ছিলেন নেপথ্যবিহারী সত্যজিৎ রায় নিজে প্রতিটি অভিনেতার সাজপোষাক, চলন-বলন ও নাচ-গানের অন্তরালে আমরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেছি। রূপকথার পরিস্থিতি অনু-

যায়ী গীত রচনাতেও তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'মোহারাজ, তোমারে সেলাম, 'ওরে বাঘারে', 'ভূতের রাজা দিল বর', 'ওরে বাবা দেখ চেয়ে' প্রভৃতি গান কিশোর-কর্ণকে খুশী না করে পারে না।

এই রূপকথার মধ্যে শ্রীরায় অতি সুকৌশলে বিশ্বশান্তির বাণী শুনিয়েছেন: 'রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল'। শুন্ডী ও হাল্লারাজের যে যুদ্ধ বাসনা তা পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিদের যুদ্ধ বাসনারই সমতুল্য।

নিখুঁত কলাকৌশলের সোনায় মোড়া এই রূপকথা চিত্র 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' বাংলার তথা বিশ্বের কিশোর-কিশোরীদের চিত্ত জয় করবে।

হিন্দী ছবিতে প্রেমের নতুন রূপ

পুরুষমানুষের নাম **সরস্বতীচন্দ্র**—কেমন যেন খাপছাড়া শোনায়। কিন্তু উপায় নেই; গুজরাটী সুলেখক গোবর্ধন-রাম ত্রিপাঠী তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের নায়-কের ঐ নামই দিয়েছেন। আবার উপন্যাসের একটি চরিত্রের নাম বিদ্যা চ্যাটার্জি ও একটি স্থানের নাম ভদ্রেশ্বর থাকায় সন্দেহ হচ্ছে তাঁর কল্পিত কাহিনীর ঘটনাস্থল বাঙলা দেশ নয়তো!

এই সরস্বতীচন্দ্র তার জীবন লোক-কল্যাণের জন্যে উৎসর্গীকৃত করতে চেয়ে-ছিল ব'লে তার বাবা যখন কুমুদ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন সে মেয়েটির বাবাকে চিঠি লিখে এই বিবাহ বন্ধ করতে চায়। কুমুদ এই চিঠির কথা জানতে পেরে নিজে সরস্বতীচন্দ্রকে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার নিজের মত প্রকাশ ক'রে একটি চিঠি লেখে। উভয়ের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান চলতে চলতে সরস্বতীচন্দ্র কুমুদকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয় এবং দর্শ-নের ফলে ক্রমে কুমুদকে যথার্থই ভালো-বেসে ফেলে এবং তাকে বিবাহ করবার অভি-প্রায়ে বহু অলঙ্কার কিনতে থাকে। তার বিমাতা অর্থের অপচয়ের আদৌ ভালো চোখে দেখতে পারে না এবং স্বামীকে সন্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তাকে পিতৃগৃহ ত্যাগে বাধ্য করে। নিজের দুর-বস্থার মধ্যে কুমুদকে টেনে আনা অন্যায় হবে বিবেচনা করে সরস্বতীচন্দ্র কুমুদের বিবাহ অন্যত্র দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখে। ফলে এক উচ্ছৃঙ্খল ধনী যুবকের সঙ্গে কুমুদের বিরোধ হয়। ঘুরতে ঘুরতে সরস্বতীচন্দ্র যখন নিজের অজ্ঞাতে কুমুদেরই শ্বশুরগৃহে এসে উপস্থিত হয়, তখন সে কুমুদের অসহায় অবস্থার কথা জানতে পেরে তার প্রতি স্বতঃই সহানু-ভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু কুমুদ তার প্রতি নিজের দুর্বলতার কথা স্মরণ করে তাকে চলে যেতে অনুরোধ করলে সে চলে যায়। পরে কুমুদও তার পূর্বঅনুরাগের দরুন স্বামী দ্বারা গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে জলে ঝাঁপ দেয় জীবনের সমাপ্তি ঘটাবার জন্যে। সরস্বতীচন্দ্র যে সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রয় লাভ করেছিল, সেই আশ্রমের সন্ন্যাসিনীরা জল থেকে উদ্ধার করে কুমুদকেও সেখানেই নিয়ে আসে। সরস্বতী সংবাদ পায়, কুমুদ বিধবা হয়েছে। তখন সে বিধবা কুমুদকে বিবাহ করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু কুমুদ তার বৈধব্যকে আঁকড়ে থাকতে চায়।

পত্রের আদান-প্রদানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ এবং ঘনায়মান প্রেম সত্ত্বেও সংযতভাবে মেলামেশা বর্তমানের সাধারণ হিন্দী ছবিতে দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এবং সবশেষে সরস্বতী-চন্দ্রের সনির্বন্ধ আকুতিকে উপেক্ষা করে বিধবা কুমুদের নিজের ছোট বোন কুসুমের সঙ্গে তার বিবাহ ব্যবস্থা করা হিন্দী চিত্রজগতে নিতান্তই অকল্পনীয়।

কাজেই সর্বোদয় পিকাচার্স নিবেদিত ও গোবিন্দ সরাইয়া পরিচালিত **'সরস্বতীচন্দ্র'** ছবিটিকে দর্শকরা যে বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে দেখবেন, তাতে আশ্চর্য কি? এবং নায়ক-নায়িকার অভিনয়েও এমন একটি সংযম প্রত্যক্ষ করা যায়, যা আধুনিক হিন্দী ছবিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ছবিটির চরিত্রোচিত সুমধুর সংলাপ এবং গানগুলির চিত্রধর্মি-তাও বহুলাংশে ছবিটিকে উপভোগ্য অভি-নবত্বপ্রদান করেছে।

নায়কের ভূমিকায় বাঙলার প্রথিতযশা মঞ্চাভিনেতা অসীমকুমারের মনীশ নামে আবির্ভূত হওয়া সার্থক হয়েছে তাঁর দরদী ও বাহুল্যবর্জিত অভিনয়গুণে। সাধারণ হিন্দী নায়কদের মতো নাচা-কোঁদা নেই, রকমারি মুখবিকৃতি ও অঙ্গভঙ্গী নেই। সহজ, সরল, স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে তিনি হিন্দী ছবির দর্শকদের চোখে ধাঁধা লাগিয়েছেন। এবং সম্ভবত তাঁরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নায়িকা কুমুদের ভূমিকায় নূতনও আশ্চর্য প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। কুমুদের ছোট বোন কুসুমের ভূমিকাটিও সুন্দরভাবে অভিনীত হয়েছে। অপরাপর ভূমিকা যথাযথ।

'সরস্বতীচন্দ্র' ছবিতে গানের রচনা ও সুরসংযোজনাতেও অভিনবত্ব লক্ষণীয়। 'চন্দন সা বদন চঞ্চল চিতবন' গানের দুটি রূপই বারংবার শোনবার মতো।

ছবিটি হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে একটি নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

পাঠকেরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, **পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি** মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে **'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'** ছবির মুক্তির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন বেশ কিছুদিন ধরে চালাচ্ছিলেন এবং ঐ-ছবি সম্পর্কে অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের তারিখ ৭ মে সকাল থেকে উক্ত তিনটি চিত্রগৃহের সামনে সমিতি সদস্যরা যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা ৮মে সকাল ৬টার সময়ে প্রত্যাহার করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, ৭ মে মেদিনীপুর যাবার প্রাক্কালে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সমিতির কাছে যে আবেদন জানান, বিশেষ করে তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে এবং ঐ রাত্রে তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যে আলোচনা হয়, তার ভিত্তিতে সংরক্ষণ সমিতি বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কোনো রকমে বিব্রত না করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সমিতি আশা করেন, তাঁদের বিভিন্ন দাবি সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যথাযথভাবে পালিত হবে।

মেঘ ও রৌদ্র/স্বরূপ দত্ত
পরিচালক অরুন্ধতী দেবী—ফটো : অমৃত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'হারানো সুর' অবলম্বনে গঠিত বি. কে. প্রোডাকসন্সের নবতম চিত্রার্ঘ **"শুকসারী"** আজ শুক্রবার, ১৬ মে তারিখে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। প্রবীণ পরিচালক সুশীল মজুমদার পরিচালিত ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা চক্রবর্তী, সাধনা রায়চৌধুরী প্রভৃতি যশস্বী শিল্পী। এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা, গীতরচনা ও সংগীতপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে পীযূষ বসু, মোহিনী চৌধুরী ও মুকুল দত্ত এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিটির পরিবেশক।

চিত্ররঙ্গ নিবেদিত 'চেনা অচেনা' শীঘ্রই মুক্তিলাভ করছে। ছবিখানা প্রযোজনা করেছেন বর্তমান চিত্রজগতের একমাত্র মহিলা প্রযোজক শ্রীমতী দুলালী চৌধুরী। ধনী দরিদ্রের চিরন্তন বৈষম্যের পটভূমিকায় আশাপূর্ণা দেবী রচিত সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাহিনী এ ছবির বিষয়বস্তু। পরিচালনা করেছেন হীরেন নাগ। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা সান্যাল, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, বিদ্যা রাও, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, অমর মল্লিক, খগেন পাঠক এবং অতিথি শিল্পী ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও অন্যান্য। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও সুরকার স্বয়ং। এ ছবির পরিবেশক চন্ডীমাতা ফিল্মস্।

সঞ্চয়িতা ফিল্মসের প্রথম ছবি 'বন-জ্যোৎস্না'র নিয়মিত চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন দীনেন গুপ্ত। 'নতুন পাতা' ছবির পর পরিচালক হিসেবে শ্রীগুপ্তের এটি দ্বিতীয় প্রয়াস। 'বনজ্যোৎস্না' কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন কাজল গুপ্ত, শমিত ভঞ্জ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন রায়, কামু মুখোপাধ্যায় এবং নায়িকারূপে শ্রীগুপ্তের নবতম আবিষ্কার মীনাক্ষী দত্ত। আলোচ্য ছবির সংগীত পরিচালনা করবেন প্রতিভাধর শিল্পী শ্রীনীহার রায়। পরিচালনা ছাড়াও আলোকচিত্র গ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন শ্রীগুপ্ত স্বয়ং। পিয়ালী ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে।

য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অভিনেত্রী সংঘ, সিনে টেকনিসিয়ান্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বি এম পি এ ইউনিয়ন, যুবক শ্রমিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির প্রতিনিধিদের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।—ফটো : অমৃত

ইংরাজ শাসনের অত্যাচার চরমে উঠল, দেশের লোক বিব্রত। নিজের দেশকে ভালবাসার অধিকার তাঁদের নেই। চরম মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী এলেন তাঁর অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে দেশবাসীর সামনে। আর চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরে একদল বাঙালী দীক্ষিত হল অগ্নিমন্ত্রে, যে কোন রকমে যে কোন মূল্যে দেশ থেকে বিদেশী ইংরাজদের তাড়াতেই হবে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দেশের যুবক-যুবতী আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগল—প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য। বীরেন রায় লিখিত 'খেয়ালী' উপন্যাস অবলম্বনে নিউ এরা পিকচার্সের পতাকাতলে ভূপেন রায়ের পরিচালনায় তোলা 'অগ্নিযুগের কাহিনী' নবযুগ চিত্রপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশনায় শীগগীর শহর ও শহরতলীতে মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুর দিয়েছেন—গোপেন মল্লিক। মাধবী মুখার্জি, বিকাশ রায়, অজিতেশ ব্যানার্জি, দিলীপ রায়, জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য, সুলতা চৌধুরী, গীতা দে প্রভৃতিকে ছবির মূল চরিত্রে দেখা যাবে। নেপথ্য কন্ঠসংগীতে আছেন—সন্ধ্যা মুখার্জি, মান্না দে, মঞ্জুশ্রী বসু ও অশোকতরু ব্যানার্জি।

কার্তিক বর্মন প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ ছবি শক্তিপদ রাজগুরু রচিত কাহিনী অবলম্বনে 'মুক্তিস্নান'-এর চিত্রগ্রহণ কাজ দ্রুত টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে চলেছে পরিচালক অজিত গাঙ্গুলীর পরিচালনাধীনে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—পরিচালক স্বয়ং। গীতরচনা করেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর দিচ্ছেন—রাজেন সরকার। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন—সাবিত্রী চ্যাটার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, কালী ব্যানার্জি, হরিধন, গঙ্গাপদ বসু, শ্যামল ঘোষাল, জহর রায়, সমরকুমার, মিন্টু, মৃণাল, অমর বিশ্বাস, ছায়া দেবী, শোভা সেন, গীতা দে প্রভৃতি।

মঞ্চাভিনয়

আজকের সমস্যাভারাক্রান্ত সমাজের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চরিত্রকে নিয়ে রচিত নাটক 'লবণাক্ত' সম্প্রতি স্টার রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করলেন স্টেট ব্যাঙ্ক, বড়বাজার শাখার কর্মীরা। নাট্য প্রযোজনায় কয়েকটি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রাণবন্ত অভিনয়ের জোরে নাটকটি শেষ পর্যন্ত রসোত্তীর্ণ হোতে পেরেছে। নাট্যনির্দেশনায় আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন ভোলা দত্ত। অভিনয়ে যাঁরা সর্বাগ্রে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা হোলেন—অমিত চক্রবর্তী, কমলেশ মুখোপাধ্যায়, ও দীপেন সাহা। অন্যান্য চরিত্রে

বি কে প্রোডাকসন্স/শকুন্তলা
পরিচালনা সুশীল মজুমদার—অঞ্জনা ভৌমিক

ঘোষ, কৃষ্ণকান্ত তেওয়ার, গণেশ পাল, সুরেন সিনহা, দিলীপ দাস, অজিত চক্রবর্তী।

সম্প্রতি 'আমরা সবাই' গোষ্ঠীর শিল্পীরা ডাঃ অরুণকুমার দে'র 'কার দোষ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন। নির্দেশনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন অবনী ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন মধুসূদন দে, নিমাই সেন, বিশ্বনাথ ঘোষ, সুশান্ত কর, স্বপনকুমার দে, সমীর সরকার, তরুণ দে, বরুণকুমার দে, স্বপন আচার্য, স্বপন দে।

সম্প্রতি কাসুন্দিয়া ইউনাইটেড ক্লাবের বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হোল। দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে 'ডাকঘর' ও 'লৌহকপাট' নাটক দুটি পরিবেশিত হোল। সুঅভিনয়ের জন্য দুটি নাটকের শিল্পীরাই প্রশংসা অর্জন করেছেন। নাটক দুটি পরিচালনা করেন বীরেন ভট্টাচার্য। দুটি নাটকের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হোলেনঃ সৌরেন রায়চৌধুরী, রাজকুমার ঘোষ, যুবরাজ হাজরা, ভদ্রেশ্বর দলুই, শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, প্রশান্ত দাস, সুপ্রভাত চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর রায়, শশাঙ্ক পাত্র, অমর পাত্র, দীপা সেন, আরতি চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পরেশ পাল, সুকুমার সরকার, চিত্তরঞ্জন কর্মকার, সমীর রাও, উমেশ রায়, কল্যাণী মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ দাস।

পূর্ব আসামের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা মার্গেরিটা ইন্ডিয়া ক্লাবের শিল্পীরা কিছুদিন আগে শচীন সেনগুপ্তের 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকটি ক্লাবের নিজস্ব মঞ্চে অভিনয় করেছেন। এই দুরূহ নাটকটির মঞ্চ রূপায়ণে যে নিষ্ঠা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন শিল্পীদের মধ্যে তার অভাব কখনো দেখা যায়নি। পঙ্কজ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনা সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয়ই বহন করে। দুটি মুখ্য চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় রূপ দেন—নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, নীতিন চট্টোপাধ্যায় পরমেশ শীল, শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা পাল, অলোকা গঙ্গোপাধ্যায়, নমিতা দত্ত। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত নাটকীয় গতি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে।

জিওলজিক্যাল সারভে রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা কিছুদিন আগে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে পিকলু নিয়োগীর হাসির নাটক 'ফাঁস' মঞ্চস্থ করেছেন। বর্তমান সমাজজীবনের নানা স্তরে যে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে এ নাটক। নাটকটির সামগ্রিক অভিনয়ে শিল্পীদের চরিত্র উপলব্ধির গভীরতা ও নিষ্ঠা ভাষা পেয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা রূপদান করেন তাঁরা হোলেনঃ জীতেন দত্ত (সোমনাথ), মাখন বিশ্বাস (সুভাষ), তারাপদ ভট্টাচার্য (বিমান), রুমা দাস (সোনালী), মঞ্জু ব্রহ্মচারী (তরলা), দীনেন চন্দ্র, দিলীপ

মুক্তিস্নান/সমরকুমার, শোভা সেন এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যা রাও। ফটো : অমৃত

প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন প্রতিমা তালুকদার ও নন্দু সান্যাল। নাটকের অন্যান্য ভূমিকায় অংশ নেন—রমেশ দাস, রাম নাহা, ডাঃ দেবব্রত ঘোষ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, শান্তি ভৌমিক, জ্যোতি গোল্ডস্মিথ, মিতা চক্রবর্তী, মুকুল রায়, অমল ভট্টাচার্য, সুনীল দাস।

সম্প্রতি ঝাঝার নবগঠিত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'জাগৃতি'র শিল্পীরা 'কাগজের নৌকা' নাটক মঞ্চস্থ করলেন স্টেশন ক্লাব মঞ্চে। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন লক্ষ্মীকান্ত যশ। কয়েকটি চরিত্রে সুঅভিনয় করেন শিশির চক্রবর্তী, লক্ষ্মীকান্ত যশ, উমা প্রামাণিক, রমা শ্রীবাস্তব। অচিন্ত ভট্টাচার্যের আলোকসম্পাত কয়েকটি বিশেষ নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা 'প্রতিবিম্ব' 'ঝিঁঝি' 'পোকার কান্না', 'নরক থেকে ফিরে' সফল অভিনয়ের পর বর্তমানে যে নাটকখানি প্রযোজনা করেছেন তার নাম—'কিন্তু নাটক নয়'। পরীক্ষামূলক মৌলিক নাটকটি রচনা করেছেন 'অগ্নিদূত'। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীপ্রকাশকুমার নন্দী, আলোকসম্পাতে শ্রীঅমিয় সেন। শব্দ ক্ষেপনে—দিলীপ ঘটক, শক্তিশালী গোষ্ঠী নিয়ে এ'রা ১১ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কুলটী, রূপনারায়ণপুর, চিত্তরঞ্জন, পাঞ্চেৎ এবং মাইথনে অভিনয় করছেন।

আসছে ১৯ মে সন্ধ্যায় মুক্ত অঙ্গনে গান্ধার সংস্থা চাণক্য সেনের বর্তমান বঙ্গ সংস্কৃতি নিয়ে কঠিন ব্যঙ্গ 'তারারা শোনে না' নাটকটি মঞ্চস্থ করছে। পরিচালনায় অসিত মুখার্জি, সংগীত পরিচালনায় ভাস্কর মিত্র, আলোয় পিন্টু বসু ও নৃত্য পরিকল্পনায় সুরেশ দত্ত।

প্যারিস স্পোর্টস এ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ১১ এপ্রিল বিশ্বরূপা মঞ্চে শ্রীবিমল মিত্র রচিত 'একক দশক শতক' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। প্রয়োগ ও অভিনয়ের দিক থেকে নিঃসন্দেহে এটি সুন্দর প্রযোজনা। বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় যাঁরা করেছেন তাঁরা হলেন রবীন মুখার্জী (সদাব্রত), শ্রীরমেন চ্যাটার্জী (কালিপদ), শ্রীমুরারী চ্যাটার্জী, এস বি রায়, কে এন ভট্টাচার্য, হারাধন ব্রহ্ম, শিবেন দাস, পবিত্র গাঙ্গুলি, সুপর্ণা চ্যাটার্জী, সুতপা ভট্টাচার্য, প্রতিমা দেবী, সবিতা মিত্র ও ডলি সরকার। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীসাধন বন্দোপাধ্যায়।

গত ২ মে চন্দ্রপুরো তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অপারেশন স্পোর্টস কমিটির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উক্ত কমিটির ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রে বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। দলগত নৈপুণ্যই নাটকটির সাফল্যের কারণ ছিল। নাটকটি প্রযোজনা করেন বিজন পাল এবং পরিচালনা করেন অরুণ চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন প্রদীপ ধর, উজ্জ্বল চক্রবর্তী, শান্তনু সেন, প্রণব সেনগুপ্ত, তপন পাল, গীতা গুপ্ত, কবিতা চৌধুরী।

গত ৭ এপ্রিল দক্ষিণ কলিকাতার নবগঠিত 'রঙ্গনট' শিল্পীগোষ্ঠী তাঁদের প্রথম অর্ঘ্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'বন্ধু' নিয়ে উপস্থিত হন অন্ধ এসোসিয়েশনের হলে। অভিনয় প্রসঙ্গে অশনির ভূমিকায় কল্যাণ ভট্টাচার্য ও প্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। অন্যান্য চরিত্রে মেঘসুন্দর জোয়ারদার, প্রশান্ত বসু, বিশ্বনাথ দত্ত, শ্যামল পুরকায়স্থ, মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল সরকার, বিভূতি

চিত্র-জগতের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সুপ্রিয়া দেবী, রাজকাপুর ও উত্তমকুমার। ফটো : অমৃত

দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অজিত দে, প্রমুখের অভিনয় সাধারণ। নির্দেশনায় ছিলেন হরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

অকটাভিয়াস স্টীল কোম্পানীর কর্মী সদস্যরা তাঁদের বার্ষিক উৎসবে অভিনয় করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নাটক। পরিবেশিত হয় স্টার রঙ্গমঞ্চে। সুঅভিনীত এ নাটকটির অভিনয়াংশে যাঁরা প্রশংসার যোগ্য তাঁরা হলেন সর্বশ্রী ফেলারাম মুখোপাধ্যায়, মুকুল বসু, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর দে, নিতাই সেনগুপ্ত, অমল রায়, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদি বসু, নমিতা বিশ্বাস, দীপিকা দাস, আরতি ঘোষ, ব্রতী দত্ত, মীরা বসু ও সেবা দাস। নাট্য নির্দেশনায় শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

একাডেমী অব আর্টস অ্যাণ্ড কালচারের প্রযোজনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **কালপুরুষ** গল্পটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে মঞ্চস্থ হতে চলেছে, আসছে ৪ঠা জুন সন্ধ্যায়। সেই আনুপূর্বিক মানুষের ইতিহাস-প্রতিকূল পরিবেশিকতার বিরুদ্ধে জয়যাত্রার ইতিহাস। মৃত্যুর শক্তিসমূহকে সবলে পরাহত করেছে তার দৃপ্ত পদচারনা। মানুষের এই জয়যাত্রার অভিযানে মানুষ অপরাজেয়। লেখকের এই বক্তব্যকে তুলে ধরেছে একটি অভিনব ফর্ম 'মিকসড ব্যালে'—যার মাধ্যমে যে কোন ভাষাভাষীর লোক একাত্মতায় অভিভূত হবেন, খুঁজে পাবেন নিজেরই বিমূর্ত প্রতিরূপ।

ফেডারেশন অফ টেকনিসিয়ানস ও আরও কয়েকটি সংস্থার মিলিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রসূন মুখোপাধ্যায়, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, পারিজাত বসু, রঞ্জন মজুমদার প্রমুখরা।

বিবিধ সংবাদ

গেল ৯ই মে, শুক্রবার সন্ধ্যায় **রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের** সপ্তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য **হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়** এবং চারুকলা বিভাগের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ **অহীন্দ্র চৌধুরী** মহোদয়কে সম্মানসূচক 'ডি-লিট' (ডক্টর অব লিটারেচার) উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়নৈপুণ্যে প্রায় তিন দশককাল ধরে বাঙালী দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করে রেখেছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জনবরেণ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পিত পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত-নাটক আকাদামী ও তার থেকে উদ্ভূত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থক রূপায়ণ। বিশেষ করে নাট্যকলা এবং অভিনয়কে যথাযথভাবে শিক্ষা দেবার জন্যে শাস্ত্রসম্মত নির্দিষ্ট পাঠক্রম রচনায় তাঁর দান অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়। এই প্রথম কোনো ভারতীয় নটকে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় 'ডি-লিট' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করলেন, এই কথা বলে শ্রীচৌধুরী সমবেত সুধিমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ১৮৯৫ সালে প্রখ্যাত নট হেনরি আর্ভিং সরকার কর্তৃক 'স্যর' উপাধি দ্বারা ভূষিত হলেও ইংলণ্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডি-লিট' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করতে এগিয়ে আসেননি, এই পণ্ডিতী (আকা-ডেমিক) সম্মানটি তাঁর কাছে এসেছিল একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

আমরা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত যে, প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অভিনেতা **ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** গেল ৮ মে, বৃহস্পতিবার, ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। অভিনয় তাঁর জীবনে পেশা ছিল না, এটা ছিল তাঁর নেশার মতো। যখন তিনি বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশনের একজন উচ্চপদস্থ চাকুরে, তখনও তাঁর অবসরবিনোদন হত অভিনয়ের মাধ্যমে। প্রায় তিরিশ বছর আগে তিনি সাজাহান নাটকটিকে নিজে ইংরাজীতে অনুবাদ করে গ্লোব থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয় ছাড়াও তিনি হোমিওপ্যাথির চর্চা করতেন এবং এই কারণেই তিনি 'ডাক্তার' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে দুজন—শুভেন এবং অমর অভিনেতা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

কিশোর কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে গত ২০ এপ্রিল পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটে মন্মথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পরিষদ-সভাপতি শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কিশোর ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, মূকাভিনয়, গীতি আলেখ্য এবং নাটিকা পরিবেশন করে। আবৃত্তিতে অংশ-গ্রহণ করে মৃদুল শীল; সঙ্গীতে মঞ্জু ভট্টাচার্য, কবিতা পাল, সন্ধ্যারাণী নায়েক, নীলারাণী খাঁ, রত্নাবলী বাগচী, তপতী বটব্যাল, কস্তুরী মৈত্র, প্রভাতী বাগচী; মূকাভিনয়ে সজল ভট্টাচার্য, প্রণব দাস এবং নৃত্যে অংশগ্রহণ করে অজন্তা মৈত্র ও কৃষ্ণকলি বাগচী। অনুষ্ঠানে গৌতম ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 'ঝালাপালা' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নাটকে অংশগ্রহণ করে গৌতম ভট্টাচার্য, স্বপন চট্টোপাধ্যায়, অরূপ দে, বিজন সরকার, দীনেন্দ্র সাহা, সীতানাথ ধর, বামাপদ মজুমদার, মনোরঞ্জন পাত্র, বাবলী পাল ও বরুণ খাঁ।

আগামী ১৬ থেকে ২২ মে জনতা প্রেক্ষাগৃহে সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার উদ্যোগে চেক্ জাতীয় দিবস উপলক্ষে এক চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে ছয়টি সমকালীন চেকো-শ্লোভাক চলচ্চিত্র 'ভ্যালী অফ দি বীজ', 'কিটেনস্ নট ক্যারেট', 'জনোসিক' (২টি ভাগ), 'ক্রাইম' ও 'ডিউটি স্যাক্স' প্রদর্শিত হবে।

প্রতি বছরের মত এ বছরেও শিব-রূপায় অনুষ্ঠিত চিল্ড্রেন লোবল থিয়েটার-এর নবম বার্ষিকী অনুষ্ঠান। এতে অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন নৃত্য ও নাট্য সংস্থা। দীপালি দেব চৌধুরীর পরিচালনায় "নূপুর" "ঝুমুর" নাচের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠান। মানসী দেব চৌধুরীর পরিচালিত নাগা ও বার্মিজ নৃত্যেও দর্শক-দের বিশেষ প্রশংসালাভ করে। পরবর্তী অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় হয় "চিল্ড্রেন লোবল থিয়েটার"-এর মুখোশ নাটক। বাংলার হরবোলা শিল্পী শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় নাটকটি প্রাণবন্ত করে তোলেন।

সঙ্গীত পরিষদের উদ্যোগে সম্প্রতি সিঁথিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। শান্তিনিকেতন সঙ্গীত-ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুম-দারের পরিচালনায় ছাত্রীরা দশখানি গান গেয়ে শোনান। অনুষ্ঠান শুরু হয় কৃষ্ণা সরকার ও মধুমাধবী ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। সম্মিলিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শিবানী সর্বাধিকারী, এষা রায়, অনীতা দে, কৃষ্ণ সরকার, গীতা বসু ও মধুমাধবী ভট্টাচার্য।

শ্রীশৈলজানন্দ মজুমদার তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে বলেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহুল প্রচারের দিনে আজকেই বিশেষ জরুরী যে তাঁর প্রদত্ত সুর ঢং ও গায়কী অনুসরণ করে যথাযথভাবে গানগুলি গাওয়া হোক। নইলে তাকে গুরুদেবের গান বলা অন্যায় হবে।

সুপ্রিয়া দেবী। ফটো : অমৃত

শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনির্মল দে গানের সঙ্গে যথাক্রমে তবলা ও এস্রাজে সহযোগিতা করেন। শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশৈলজারঞ্জনকে ধন্যবাদ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শ, শিক্ষকতা-নৈপুণ্য ও রবীন্দ্রসংগীতের প্রসারে নিরলস ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

সর্বোদয় পিকচার্স নিবেদিত অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদর্শ প্রেমের মাধুর্যমণ্ডিত হিন্দী ছবি "সরস্বতীচন্দ্র" বিঠলভাই (প্রাঃ) লিমিটেড দ্বারা পরিবেশিত হয়ে আজ শুক্রবার, ৯ মে থেকে জ্যোতি সিনেমা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হবে। বিখ্যাত গুজরাটী লেখক গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠী লিখিত একই নামের উপন্যাস থেকে গঠিত চিত্রটির প্রযোজক, পরিচালক ও সুরকার হচ্ছেন যথাক্রমে "বিবেক", গোবিন্দ সরাইয়া ও কল্যাণজী আনন্দজী। ছবিটির নায়ক-নায়িকারূপে অবতীর্ণ হয়েছেন মনীশ (বাঙলা মঞ্চখ্যাত অসীমকুমার) ও নূতন।

দুই যমজ মালিক আর তাদের দুই যমজ চাকর, এই চারটি প্রাণীকে নিয়ে কি ভীষণ হাসির হুল্লোড় সৃষ্টি হয়েছে তা বিমল রায় পিকচার্সের 'দো দুনি চার' ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন। শেক্সপিয়রের 'কমেডি অব এরার' ছবির মূলে কাহিনী। দেবু সেন ছবিখানি পরিচালনা করেছেন, হেমন্ত মুখার্জি ছবিতে সুর দিয়েছেন। কিশোরকুমার, অসিত সেন, তনুজা, সুধা শর্মা, সুরেখা পাণ্ডিত, বিনোদ শর্মা, বেবী সোনিয়া প্রভৃতিকে ছবির প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে।

সেভেনথ সীল

বার্গম্যানের সেভেনথ সীল—আধা-কাল্পনিক, আধা বাস্তব কাহিনী। বিষয় অত্যন্ত জটিল। একজন নাইট তথা মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা, প্লেগ-জর্জর গ্রামের পটভূমি, মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলা—প্রেমিক দম্পতি — নারীর ছলনা — কুসংস্কার—নাটকীয় মৃত্যু ইত্যাদি অনেক দৃশ্য অনেক দ্যোতনা, এত গভীর বিষয়কে চলচ্চিত্রের রূপ দিতে বার্গম্যানের মত পরিচালকই পারেন। কালো পোষাকে মিছিল, ক্যামেরার বিশেষ কোণ থেকে ধোঁয়া ওঠা ধূনিগুলোর ছন্দময় Oscillation অথবা পোড়াবার আগে মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে নায়কের ভগবানকে খোঁজার দৃশ্য দুর্ধর্ষ পরিচালকের প্রচণ্ড শক্তির আভাষ দেয়। সমুদ্র আর মেঘের পটভূমিতে মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলার দৃশ্য ছায়াচিত্রের জগতে অবিস্মরণীয়। মৃত্যুর চেহারায় কোনো ভয়াবহতা নেই, শুধু ভ্রূহীন মুখটাকে ঘিরে পুরোহিতদের মত কালো কাপড় আর ঈষৎ বাঁকা ঠোঁটে একটা ক্রুর হাসির আভাষ। জীবন-জিজ্ঞাসায় ভারাক্রান্ত নায়কের কপালে চিন্তার সিঁড়ি, চাপা ঠোঁটে মানসিক দৃঢ়তার ইঙ্গিত, হাঁটা চলা লাফানোয় বীরোচিত তারুণ্য। দুনিয়াকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য আত্মহত্যার অভিনয় করল যে অভিনেতা, বাঁচতে সে পারল না, মৃত্যু নিজে হাতে তাকে এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে অধিকার করল। পরিচালক এখানে যেন অবশ্যম্ভাবী নিয়তির একটা আভাস দিয়েছেন। এ ধরণের ইঙ্গিত অবশ্য আরো দু একবার আছে, যেমন মৃতের অলঙ্কার চুরি করা চোরটা প্লেগে মারা পড়ল। তবে ঐ চোরটার মৃত্যু দৃশ্যে তার ভয়াবহ চীৎকারে পরিচালক কতটা যন্ত্রণা বোঝাতে পেরেছেন জানি না, তবে অত চেঁচামেচি না থাকলেও চলত। মঞ্চের প্রয়োজনেই অভিনেতাদের আবেগ এবং অভিব্যক্তি খুব প্রখর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়, বার্গম্যান সেই মঞ্চের প্রভাব তাঁর জীবনে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 'সেভেনথ সীল'-এর মূল প্রশ্নগুলি প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রশ্ন। তবে আমরা অর্থাৎ ভারতীয়েরা যেন এগুলোকে একটু বেশী করে চিনি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় যে অবস্থা ছবিতে দেখান হয়েছে তাকে আজকের পচনশীল সমাজের রূপ হিসাবে অনায়াসে কল্পনা করা যায়। কয়েকটি দৃশ্য প্রচণ্ড সুন্দর, অর্থবহ — বাঁধিয়ে রাখার মত। নায়ক অ্যান্তোনিও ব্লক যখন ভবঘুরে অভিনেতা পরিবারের আতিথেয়তা গ্রহণ করল তখন দুধের বাটি হাতে করে তার বক্তৃতাকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা চলত, তেমনি স্বৈরিণী কাঠুরিয়া স্ত্রীর মিথ্যা ভাষণের মাধ্যমে নায়কের স্কোয়ারের মুখ দিয়ে যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন পরিচালক তা একেবারে যথাযথ।

বার্গম্যান তাঁর জীবন শুরু করেন মঞ্চ-পরিচালক হিসাবে। ১৯৪৩ সালে প্রথম চলচ্চিত্র জগতের সংস্পর্শে আসেন চিত্র-নাট্যকার হিসাবে। ১৯৪৬ খৃঃ প্রথম ছবি পরিচালনা করেন—'ক্রাইসিস'। তারপর ১৯৫৩-তে 'স-ডাস্ট অ্যান্ড টিনসেল', 'স্মাইলস অফ এ সামার নাইট' (১৯৫৫), 'দি সেভেনথ্ সীল' (১৯৫৬) 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীস' (১৯৫৭), 'দি ফেস' (১৯৫৮), 'দি ভার্জিন স্প্রি' (১৯৫৮)-এ, 'উইন্টার লাইট', এবং 'দি সাইলেন্স'—(১৯৬২) এবং 'পারসোনা'—(১৯৬৬)।

ঋত্বিকবাবু কোনো এক জায়গায় বার্গম্যান সম্বন্ধে দু একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন ও'র ছবিতে আছে অত্যন্ত নাটকীয়তা আর আন্তরিকতার অভাব। নাটকীয়তা যে আছে সে কথা আগেই বলা হয়ে গেছে। অবশ্য নাটকীয়তা ঋত্বিকবাবুর ছবিতেও আছে, তবে, সেকথা এখানে নয়। আর আন্তরিকতার অভাব এই কথাটাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না.—আন্তরিকতা বলতে এখানে ঠিক পরিচালকের আন্তরিকতার কথা নয় বরং চরিত্রগুলির আন্তরিকতার কথাই সম্ভবত ঋত্বিকবাবু বলেছেন। 'সেভেনথ্ সীল' ও অন্য দু-একটা ছবির চরিত্রগুলোকে যেন বড় বেশী কর্তব্যনিষ্ঠ মনে হয়েছে, তাদের সেটুকু এক্তিয়ার তা কতকগুলো ঘটনা বা কতকগুলো বিশেষ ভাব প্রকাশের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের ছবির 'চরিত্র' বলেই মনে হয়, তার থেকে বেশী কিছু বলে মনে হয় না। এর জন্য অবশ্য কিছুটা দায়ী ঘটনা এবং অভিনয়ের নাটকীয়তা আর কিছুটা দায়ী হচ্ছে বিষয়-বস্তুর জটিলতা এবং চমক সৃষ্টি। এটা একটা অনুভূতির ব্যাপার—লিখে প্রকাশ করা বেশ শক্ত, যাই হোক একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি—মৃতদেহের অলংকার চুরি করা চোরটা যখন প্রেমিক অভিনেতাকে ভালুকের অনুকরণে নাচতে বাধ্য করল সেই দৃশ্য—টেবিলের ওপর তালে তালে গেলাশ ঠোকার আওয়াজ, আগুন, বিভ্রান্ত লোকটার পাগলের মত নাচের ক্লোজ আপ, সরাইখানায় উপস্থিত সমস্ত লোকগুলোর পৈশাচিক উল্লাসের হাসির ক্লোজ আপ—কখনও বিশেষ বিশেষ কোণ থেকে—সমস্ত দৃশ্যটার অদ্ভুত তাৎপর্য এবং গভীরতা থাকা সত্ত্বেও ট্রিটমেন্টের দিক থেকে যেন বড় বেশী সাজানো।

এই সূত্রে অন্য একটা ছবির একটা দৃশ্য, আগেই বলে নেওয়া ভাল। এটা কোনো রকম তুলনা নয় শুধু বিষয়টাকে পরিষ্কার করার চেষ্টাতেই ঐ দৃশ্যের উল্লেখ করতে হচ্ছে, সাদৃশ্য যদি কিছু থাকে তবে তা ছবিগুলোর একান্ত নিজস্ব। যাই হোক—মাইকেল কাকুয়ানিজের 'জোরবা দা গ্রীক' ছবির একটা দৃশ্য—নায়কের আশ্বাস পেয়ে জোরবা (অ্যান্তনি কুইন) আনন্দে আত্মহারা, টেবিলে তাল দিতে দিতে তার প্রচন্ড নাচ—ছুটে বাইরে আসা, মুখের ডান পাশের ক্লোজ আপ—অন্ধকার আকাশের পটভূমি—অদ্ভুত ছন্দময় বাজনা—নাচ—নাচ—সমস্ত দৃশ্যটার উপস্থাপনা অত্যন্ত ছন্দময়, ভীষণ মর্মস্পর্শী। জানিনা ব্যাপারটা কতদূর প্রকাশ করা গেল।

জনৈক প্রখ্যাত সাহিত্যিক তাঁর একটা প্রবন্ধে তীব্রভাবে বিশেষ করে বার্গম্যান সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন। সম্ভবত তিনি বার্গম্যানের 'দি সেভেনথ্ সীল' দেখেন নি। দেখে থাকলে বার্গম্যান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কিছুটা পালটাত। কোন ছবিতে যৌন-আকর্ষণমূলক দৃশ্যকে ঠিক সাপোর্ট করা যায় না। ওসব ছাড়াও যে ভাল ছবি হয় তার সোচ্চার প্রমাণ সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে আজকে যে প্রচন্ড (বিকৃত) যৌন-চিন্তার ঢেউ চলেছে, যার স্পর্শ আমাদের দেশেও এসে লাগছে তার প্রভাব থেকে সাহিত্য, শিল্প, চলচ্চিত্রকে বাদ দিতে গেলে সত্যিকারের সমাজকেই বাদ দেওয়া হয় না কি? জেমস বন্ড, হিপি, যৌনচিন্তা—সমস্যা বইকি, সম্পূর্ণ পিউরিটান দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় কি? তাহলে পিকাসোর ছবিগুলো সম্বন্ধে আমরা কি বলব।

আর তাছাড়াও নগ্নতা এবং অশ্লীলতার ভেতর একটা পার্থক্য আছে।

বহু আলোচিত এবং বহু আলোড়িত মিলোস ফোরম্যানের 'ব্লন্দস লাভের' একটা দৃশ্য—মিলন ক্লান্ত দুটি নগ্ন তরুণ-তরুণীর আলাপের দৃশ্য—সেতারের একটা মৃদু সুরের মত ডেলিকেট দৃশ্য। ছবিটার ভালমন্দ বিচারের কথা বা ঐ দৃশ্যটার প্রয়োজনীয়তার কথা এখানে নিশ্চয়ই আসছে না। এর থেকে অনেক কম উপকরণে সামান্য অঙ্গভঙ্গী নাচ বা স্থির-চিত্রের (অ্যান ইভনিং ইন প্যারিসের পোস্টার দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে আমাদের দেশের পরিচালকেরা যা প্রকাশ করতে পারেন তাতে ঐ সমস্ত বিদেশী পরিচালকেরা তো এ'দের কাছে শিশু।

—তপনকুমার দাশ

মাঠ থেকে মঞ্চে

অজয় বসু

মাঠ থেকে মঞ্চে। মুক্তাঙ্গন ছেড়ে প্রমোদকক্ষের চারদেয়ালে আটকা পড়েছেন 'ফায়ারি' ফ্রেডি ট্রুম্যান। ছিলেন পেশাদার ক্রিকেটার। এখন হয়েছেন বেতনভুক কৌতুকাভিনেতা।

যখন ক্রিকেট খেলতেন তখন ইয়র্কশায়ারের সনাতন স্বভাবের প্রভাবে ট্রুম্যান ছিলেন রীতিমতো এক শক্ত ঘুঁটি। সজোরে বল করতেন, বাম্পার ঠুকতেন, ব্যাটসম্যানদের মনে করতেন ঘোর শত্রু। তখন অতি নির্দয় কঠিন মেজাজ। লড়াইয়ের মাঝপর্বে সতীর্থদের কেউ যদি হালকা চাল চালাবার চেষ্টা করতেন, ট্রুম্যান তাঁকেও ক্ষমা করতে চাইতেন না। তাঁর জোর বল আর বাম্পারের ধমককে যদি দর্শকেরাও ব্যঙ্গ করতো, তাহলে তাঁদের সঙ্গেও ট্রুম্যান আড়ি পাততে পেছপা হতেন না। এই নিয়ে একবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গ্যালারির মানুষগুলির সঙ্গে তাঁর হাতো-হাতি হয় আর কি!

দূর থেকে দেখে তখন মনে হোতো যে, ক্রিকেট সম্বন্ধে ক্রিকেটার ফ্রেডি ট্রুম্যানের ধারণাটাই বুঝি অন্যরকম। খেলা তাঁর কাছে নির্জলা লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়। খেলা চিত্তবিনোদনের এক আয়োজন, একথা বুঝি ট্রুম্যান মানতেই চাইতেন না। নিজের ধ্যান ধারণার কাছে অনুগত ছিলেন, ফাঁকি না দিয়ে মেহনতও করেছিলেন। তাই টেস্ট ক্রিকেটে তিন শতাধিক (৩০৭) উইকেট পাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। এ-কৃতিত্বের নাগালে আর কেউই পৌঁছতে পারে নি। ভবিষ্যতে পারবে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে!

ফুটন্ত যৌবনে ক্রিকেট লড়াইয়ে যিনি ছিলেন এমন সনিষ্ঠ, লোক হাসাতে তাঁর আজ মঞ্চারোহণের দৃষ্টান্তে অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছেন! কিন্তু ট্রুম্যান বলেন, 'এতে অবাক হবার কি আছে? আসলে আমরা হচ্ছি পাবলিক এনটারটেইনার। সাধারণকে আনন্দ বিতরণ করাই তো আমাদের কাজ। যখন মাঠে নামতাম তখন যে পেশা আজও তাই—হাসিতে খুশীতে দর্শকদের মন ভরিয়ে তোলা। সেই পেশাতে আজও আমি অবিচল। শুধু খেলসটাই যা বদলে গিয়েছে।' কথাটা ভাববার মতো বৈকি।

বল হাতে একদিন লড়াই করেছেন বটে। কিন্তু এক লড়িয়ে সৈনিকের অফুরন্ত প্রাণের প্রকাশে দর্শককুল কি আনন্দ পান নি? রগচটা ফ্রেডির 'ফায়ার'এর আঁচ পেয়ে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ তিরস্কার সোচ্চার হলেও ক্রিকেটার ট্রুম্যান কি এক লোকপ্রিয় চরিত্র নন?

আর তেমন খুঁটিয়ে দেখলে একথা বুঝতে অসুবিধেও হবে না যে খেলোয়াড় হিসেবে ট্রুম্যান দাঁতে দাঁত চেপে যতোই আক্রমণ শানান না কেন, তাঁর বাহ্যিক রুক্ষ খোলসের নীচে বরাবরই একটি আমুদে মেজাজ লুকিয়ে ছিল। সে মেজাজ হয়তো প্যাট্‌সি হেনড্রেন, কলিন কাউড্রে বা কেন ব্যারিংটনের মতো সর্বক্ষণই হাসির হিল্লোল জাগাতে চাইতো না। কিন্তু কোনো কোনো মুহূর্তে ভেতরের মানুষটি হালকা হাওয়ায় পাখা মেলতে ওপারের আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে কসুরও করেন নি নিশ্চয়ই।

এমনি দু-একটি মুহূর্ত খুঁজতে আজ একবার পেছনের দিকে তাকানো যাক।

ওয়েসলি হল সেবার সবপ্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে ইংলণ্ডে এসেছেন। হল ও ট্রুম্যানের প্রথম মোলাকাৎ শেফিল্ডে। দুজনেই ফাস্ট বোলার। কিন্তু ট্রুম্যান হলকে আউট করতে না পারলেও হল তাঁকে বাম্পারের ধাক্কায় পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিলেন। সবে ওঠার মুখ। ট্রুম্যান সেদিন হলের বেয়াদপিকে ক্ষমা করতে চান নি। সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটি কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন হলকে।

দিন ছয়েক পর এজবাস্টনে আবার দেখা দুজনের। হল তখনও ধড়াচূড়া ছাড়েন নি, ক্রিকেটের সাজ-পোশাক পরেনও নি। দেখে ট্রুম্যান অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন,—

কি হে, তুমি খেলছো না?

না।

সে কি? তাহলে বল করবে কে? আরে তুমিই দলের একমাত্র বোলার!

ছদিন আগে যাঁর ওপর ছিলেন রীতিমতো খাপ্পা, ট্রুম্যান আজ সশব্দে তাঁরই পিঠ চাপড়ে দিলেন পুরোপুরি দিলখোলা মেজাজে।

আর একদিন স্কারবারো মাঠে হলের বল ব্যাটের কানায় লাগিয়ে ট্রুম্যান বেশ কিছু রান করে ফেলতেই হল ধৈর্য হারিয়ে

মাটিতে হাঁটু গেড়ে যুক্তকরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বকছেন।

চেঁচিয়ে বলে বসলেন, এমন খেলা কোথায় শিখেছো?

দেরী হলো না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো, কেন তোমার কাছ থেকেই তো! সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছকিত হাসিও।

আরও মজা করেছিলেন লর্ডস মাঠে। ১৯৬৪ সালে এক উইকেটের প্রতিযোগিতা। এই লড়াইও ট্রুম্যান আর হলের মধ্যে। হলের ব্যাটিং শেষ হয়েছে। ট্রুম্যানের বলে তাঁরই মতো কানায় লাগিয়ে হল পঁয়তাল্লিশ রান করে আউট হন। তারপর ট্রুম্যানের ব্যাট করার পালা।

হল মন দিয়ে ফিল্ডিং সাজালেন। তারপর ফিরে চল্লেন বোলিং আরম্ভ করতে। দৌড় শুরু করে যেই না তিনি উইকেটের দিকে ফিরে তাকালেন অমনি দেখেন, ব্যাটসম্যান ট্রুম্যান মাটিতে হাঁটু গেড়ে যুক্তকরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বকছেন! যেন সভয়ে, প্রার্থনা জানাচ্ছেন, ঈশ্বর রক্ষে করুন! হল যেন রগ টিপ্ করা বাম্পার না ছেড়ে বসেন! অথচ ট্রুম্যান নিজে যে গন্ডায় গন্ডায় বাম্পার ঠুকে কতোজনের পিলে চমকে দিয়েছেন তার ঠিকঠিকানা কে রাখে!

নজর ফিরিয়ে এ মাঠ সে মাঠ ঘুরলে ট্রুম্যানের খেলোয়াড়-জীবনের হাস্যমুখর অনেক টুকরো ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাবে। বিড়বিড় করে বকাই ছিল তাঁর স্বভাব। সেই বকবকানি যাঁরাই শুনেছেন তাঁরাই হাসি চেপে রাখতে পারেন নি। সেগুলি কি শুধু কথাই? না টুকরো টুকরো কৌতুক-কণা?

খেলোয়াড়ের পোষাক ছেড়ে কমেডিয়ানের সাজে ট্রুম্যানকে সবাই কিন্তু স্বাগত জানাতে পারেন নি। বিখ্যাত বৃটিশ কৌতুকাভিনেতা ফ্র্যাংক হোমস্ বলেছেন, 'ফ্রেডির প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। তবু মনে হয়, নতুন পেশায় তিনি বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারবেন না।' হোম্সের আরও মন্তব্য : 'ভাবছি', এরপর আমরা কৌতুকাভিনেতারা দল বেঁধে ক্রিকেট মাঠে নেমে পড়বো।' শুধু বলেই খালাস নন, হোম্স খবরের কাগজে এক বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে জানিয়েছেন যে পেশাদার ক্রিকেটার রূপে তিনি খেলতে প্রস্তুত। ডাক পড়লে এবং পয়সা পেলেই তিনি মাঠে নামবেন।

তবে ফ্র্যাংক হোম্স ট্রুম্যানের নতুন ভূমিকার সাফল্য সম্পর্কে যতোই সন্দিহান হোন না কেন, ট্রুম্যান কিন্তু মঞ্চে আবির্ভাব ঘটিয়ে প্রথম রাউন্ডেই আসর মাৎ করে দিয়েছেন।

উইংসের ধারে একটি কাগজের পর্দায় দুরন্ত বেগে বল করছেন ট্রুম্যানের এমন একটি প্রতিকৃতি ঝুলছিল। ফ্রেডি সেই পর্দা ভেদ করে, ছিঁড়ে ফুঁড়ে মঞ্চে আবির্ভাব ঘটানো মাত্রই দর্শকেরা খিলখিলিয়ে ওঠেন। পরের প্রায় একটি ঘন্টা গল্প বলে, অংগ-ভংগী করে তিনি দর্শকদের খোশ মেজাজ ধরে রাখেন।

প্রথম সপ্তাহে ট্রুম্যান স্টেজের কাজ বাবদ পঁচিশ পাউন্ড পেয়েছেন। মন্দ কি! অভিজ্ঞতা বাড়লে, পারিশ্রমিকের অংকও ফুলতে পারে। তবে কোনো সমালোচক অভিযোগ করেছেন, ফ্রেডির কৌতুকাভিনয় মোটা দাগের কাজ, সময় সময় শ্লীলতার শাসনও তিনি মানেন নি।

শোনামাত্রই ট্রুম্যান মন্তব্য করেন, ওঁরা তো তাই বলবেনই। আমি যখন ক্রিকেট খেলতাম তখন ওঁরা বলতেন, ফ্রেডি তো বল করে না, শুধু বাম্পারই ছাড়ে। নিন্দুকের স্বভাবই ওই। কথায় বলে না, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা!

ফ্রেডি ট্রুম্যানের কমেডিয়ান হওয়াটা এক আকস্মিক ঘটনা হলেও, ঘটনার পেছনে ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। বছর দেড়েক আগে এক কমিক প্রতিযোগিতায় তিনি নাম দিয়েছিলেন। ডাক পড়তেই স্টেজে হাজির হয়ে মিনিট দশেক ধরে তিনি নানা কীর্তি করতে থাকেন। দেখে দর্শকেরাও খুব খুশী, ট্রুম্যানও পরীক্ষায় পাশ।

ওই দশ মিনিটের অভিজ্ঞতায় কেমন নেশা লেগে গেল। তাই দেড় বছরের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি একেবারে পেশাদারী দলে নাম লিখিয়ে ফেললেন।

শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে কমেডিয়ান ট্রুম্যানের খ্যাতি ক্রমশঃ বাড়ছে তো বাড়ছেই। এখন নাকি ইংলন্ড ছেড়ে ইউরোপের বাজারেও তাঁর চাহিদা খুব।

এবার কে বলবে যে মাঠ ছেড়ে মঞ্চে এসে ফ্রেডি ট্রুম্যান ভুল করেছেন? মাঠে যা দেবার ছিল তা তিনি দিয়েছেন, এখন অন্য জীবনে তিনি নবনায়ক।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

পশ্চিম জার্মানীর মিউনিকে আয়োজিত ৩০তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সাতটি খেতাব এই তিনটি দেশ এইভাবে ভাগ করে নিয়েছে—জাপান ৪টি, রাশিয়া ২টি এবং সুইডেন ১টি। জাপান জয়ী হয়েছে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলস খেতাব। গত দু' বছরের ইউরোপীয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান রাশিয়া পেয়েছে মহিলাদের দলগত পুরস্কার কোর্বিলোন কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে মহিলাদের ডাবলস খেতাব। সুইডেন ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয়ী হয়েছে। গতবারের প্রতিযোগিতায় (১৯৬৭) জাপান সাতটি বিভাগে অংশগ্রহণ করে ১৯৫৯ সালের মত ৬টি খেতাব জয়ী হয়েছিল। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে জাপান ছাড়া অপর কোন দেশের পক্ষে একই বছরে ৬টি খেতাব জয় সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস খেলায় জাপানের গত দু' বছরের বিরাট সাফল্য বিচার করে অনেকেই দৃঢ়তার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মিউনিকের ৩০তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান সাতটি খেতাবই জয় করে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করবে। শেষ পর্যন্ত জাপানের ৪টি খেতাব জয়ে তাঁরা খুবই হতাশ হয়েছেন। জাপানের টেবল টেনিস মহলও কম বিস্মিত হয়নি।

এবারের প্রতিযোগিতায় অপ্রত্যাশিত ঘটনার ছড়াছড়ি লক্ষ্য করে আন্তর্জাতিক টেনিস মহল হতবাক হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ফলাফল : পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার ৪র্থ রাউণ্ডে গতবারের বিজয়ী এবং এবারের এক নম্বর খেলোয়াড় নোবুহিকো হাসিগাওয়া (জাপান) ১৮—২১, ২১—৯, ১৭—২১, ২১—১২ ও ১৭—২১ পয়েন্টে যুগোশ্লাভিয়ার এনটো সিপোনকিকের কাছে পরাজিত হন। তৃতীয় রাউণ্ডে গতবারের রাণার-আপ এবং এবারের ২নং বাছাই খেলোয়াড় মিৎসুরু কোনো (জাপান) ২১—১৮, ১৫—২১, ১০—২১ ও ২০—২২ পয়েন্টে অবাছাই খেলোয়াড় এ্যানাটোলি এমেলিনের (রাশিয়ান ২নং) কাছে হেরে যান।

গতবারের (১৯৬৭) প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগে জাপান ৪টি খেতাব জয়ী হয়েছিল—পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস। জাপানের হাসিগাওয়া ২টি খেতাব (পুরুষদের সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলস), কুমারী সাচিকো মোরিসাওয়া ২টি খেতাব (সিঙ্গলস এবং ডাবলস) এবং কুমারী সাইকো হিরোতা ১টি খেতাব (ডাবলস) পেয়েছিলেন। এবারের প্রতিযোগিতায় হাসিগাওয়া দুটি বিভাগের ফাইনালে খেলে একটিতে (মিক্সড ডাবলস) জয়ী হয়েছেন। কুমারী সাচিকো মোরিসাওয়া কোন বিভাগের ফাইনালেই উঠতে পারেননি। সাইকো হিরোতা কেবল মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে উঠে শেষ পর্যন্ত স্বদেশের খেলোয়াড়দের কাছেই পরাজিত হন।

এবারেও জাপানের খেলোয়াড় মহিলা বিভাগের সিঙ্গলস ফাইনালে জয়ী হয়েছেন। ফলে জাপান উপর্যুপরি চারবার (১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯) মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। মিউনিকের আসরে জাপানের খেলোয়াড়রা চারটি ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে খেলে ৩টি খেতাব (পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস) জয়ী হয়েছেন। মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে জাপান ছাড়া অপর কোন দেশের খেলোয়াড় ছিলেন না। এইরকম নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের নজির এবারের ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে মাত্র একটিই ছিল।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা

ভারতবর্ষের সকল খেলোয়াড়ই—কল্যাণ জয়ন্ত, ফারুক খোদাজি এবং মীর কাশিম আলী প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই পরাজয় স্বীকার করেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : সিগিও ইতো (জাপান) ১৯—২১, ১৪—২১, ২১—১৯, ২১—১৫ ও ২১—৯ পয়েন্টে এবারহার্ড স্কোলারকে (পশ্চিম জার্মানী) পরাজিত করেন। এখানে উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১০ বছরে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে এই প্রথম ইউরোপের একজন খেলোয়াড়কে দেখা গেল।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কুমারী টোসিকো কোয়াদা (জাপান) ২০—২২, ২১—১৪, ২১—১৭ ও ২১—৮ পয়েন্টে গ্যাব্রিয়েল গিসলারকে (পশ্চিম জার্মানী) পরাজিত করলে জাপান উপর্যুপরি চারবার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করে।

পুরুষদের ডাবলস : ১নং বাছাই জুটি হ্যান্স আলসার এবং কেজেল জোহানসন (সুইডেন) ২১—১৯, ১৭—২১, ২১—৮ ও ২১—১২ পয়েন্টে ৩নং বাছাই জুটি নোবুহিকো হাসিগাওয়া এবং টোকিয়ো তাসাকাকে (জাপান) পরাজিত করে উপর্যুপরি ২ বার এই খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

মহিলাদের ডাবলস : জোয়া রুডনোভা এবং (রাশিয়া) গ্রিনবার্গ ১৭—২১, ২১—১৭, ২১—১৫, ১৬—২১ ও ২১—১৪ পয়েন্টে কুমারী মেরিয়া আলেকজেন্ড্রু এবং ইলেনোরা মিহালকাকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : নোবুহিকো হাসিগাওয়া এবং (জাপান) কোনো ২১—১৭, ২১—১৯ ও ২১—১৯ পয়েন্টে মিৎসুরু কোনো এবং সাইকো হিরোতাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার বিবিধ রেকর্ড

সোয়েথলিং কাপ বিজয়ী দেশ

১৯২৭-৩১ হাঙ্গেরী; ১৯৩২ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৩-৩৫ হাঙ্গেরী; ১৯৩৬ অস্ট্রিয়া; ১৯৩৭ আমেরিকা; ১৯৩৮ হাঙ্গেরী; ১৯৩৯ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪০-৪৬ যুদ্ধের কারণে খেলা বন্ধ ছিল; ১৯৪৭-৪৮ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪৯ হাঙ্গেরী; ১৯৫০-৫১ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৫২ হাঙ্গেরী; ১৯৫৩ ইংল্যাণ্ড; ১৯৫৪-৫৭ জাপান; ১৯৫৯ জাপান; ১৯৬১ প্রজাতন্ত্রী চীন; ১৯৬৩ প্রজাতন্ত্রী চীন; ১৯৬৫ প্রজাতন্ত্রী চীন; ১৯৬৭ জাপান; ১৯৬৯ জাপান।

সর্বাধিক দলগত জয়

সোয়েথলিং কাপ : ১১বার—হাঙ্গেরী

হাঙ্গেরীর শেষ কাপ জয় ১৯৫২ সালে

কোর্বিলোন কাপ : ৭ বার—জাপান

জাপানের শেষ কাপ জয় ১৯৬৭ সালে

উপর্যুপরি সর্বাধিক কাপ জয়

সোয়েথলিং কাপ : ৫ বার—হাঙ্গেরী (১৯২৭-৩১)

: ৫ বার—জাপান (১৯৫৪-৫৭ ও ১৯৫৯)

কোর্বিলোন কাপ : ৪ বার—জাপান (১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬১ ও ১৯৬৩)

একই বছরে সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ জয়

৪ বার—জাপান (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬৭)

১ বার—আমেরিকা (১৯৩৭)
১ বার—প্রজাতন্ত্রী চীন (১৯৬৫)

ব্যক্তিগত বিভাগের উল্লেখযোগ্য রেকর্ড সর্বাধিক জয়

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৫ বার—ভিক্টর বার্না (হাঙ্গেরী)—১৯৩০, ১৯৩২-৩৫ সাল

মহিলাদের সিঙ্গলস : ৬ বার—এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া)—১৯৫০-৫৫ সাল

পুরুষদের ডাবলস : ৮ বার—ভিক্টর বার্না (হাঙ্গেরী)। বিভিন্ন তিনজন জুটির সহযোগিতায় এই রেকর্ড স্থাপিত হয় (১৯২৯-৩৫ ও ১৯৩৯)

মহিলাদের ডাবলস : ৭ বার এম মেডনিয়ানস্‌জকি (হাঙ্গেরী)। তিনজন বিভিন্ন জুটির সহযোগিতায় এই রেকর্ড স্থাপিত হয় (১৯২৮ ১৯৩০-৩৫)

মিক্সড ডাবলস

পুরুষদের পক্ষে : ৪ বার—এফ সিডো (হাঙ্গেরী)—১৯৪৯-৫০, ১৯৫২-৫৩ সাল।

মহিলাদের পক্ষে : ৬ বার—এম মেডনিয়ানস্‌জকি (হাঙ্গেরী)—১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩১, ১৯৩৩-৩৪ সাল।

সর্বাধিক ব্যক্তিগত জয়

মহিলাদের পক্ষে : ১৮ বার—এম মেডনিয়ানস্‌জকি (হাঙ্গেরী)

পুরুষদের পক্ষে : ১৫ বার—ভিক্টর বার্না (হাঙ্গেরী)

উপর্যুপরি ব্যক্তিগত খেতাব জয়

মহিলাদের সিঙ্গলসে : ৬ বার—(১৯৫০-৫৫)—এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া)

পুরুষদের সিঙ্গলসে : ৪ বার (১৯৩২-৩৫) —ভিক্টর বার্না (হাঙ্গেরী)
৩ বার (১৯৬১, ১৯৬৩ ও ১৯৬৫) —চুয়াং সে-তুং (প্রজাতন্ত্রী চীন)

দ্রষ্টব্য : ১৯৫৭ সালের পর থেকে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর এক বছর অন্তর বসছে।

একই বছরে ৬টি খেতাব জয়

২ বার (১৯৫৯ ও ১৯৬৭)—জাপান।

১৯৫৯ সালে সোয়েথলিং এবং কোর্বিলোন কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের ডাবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব। ১৯৬৭ সালে সোয়েথলিং এবং কোর্বিলোন কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব।

সি এ বি ক্রিকেট লীগ

বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত কলকাতার প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬৬ রান বেশী সংগ্রহ করে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলকে পরাজিত করেছে। এই জয়লাভের ফলে মোহনবাগান একই বছরে 'ডাবল' খেতাব (নকআউট এবং লীগ) জয়ী হল ৫ বার (১৯৫৩-৫৪, ১৯৬০-৬১, ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৬৮-৬৯)। মোহনবাগান নকআউট ট্রফি জয়ী হয়েছে মোট ১০ বার এবং প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোট ৮ বার।

প্রথম দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। একশ্রেণীর দর্শকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের ৪৩ মিনিট আগে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম দিনের খেলায় মোহনবাগান ৬টা উইকেট খুইয়ে ১০২ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের কিছু আগে ২১২ রানের মাথায় মোহনবাগানের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। শেষ পর্যন্ত দলের অধিনায়ক শ্যামসুন্দর মিত্র ৮২ রান সংগ্রহ করে রানের চেহারা স্পষ্ট করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের

১৯৬৯ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় কোর্বিলোন কাপ বিজয়ী রাশিয়ার খেলোয়াড়বৃন্দ।

১৯৬৯ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় সোয়েথলিং কাপ বিজয়ী জাপানের খেলোয়াড়বৃন্দ।
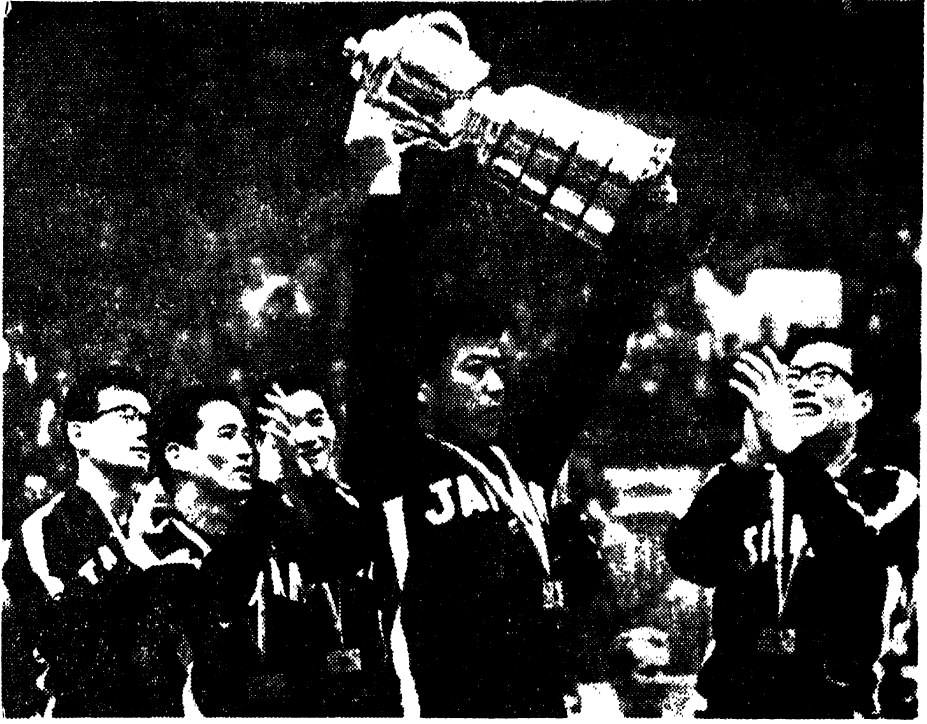
খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়নের ৩টে উইকেট পড়ে প্রথম ইনিংসে ৩৬ রান উঠেছিল।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় মাত্র ৭২ (৭ উইকেটে)। দলের এই চরম দুর্দশার সময়ে ৮ম উইকেটের জুটি সুব্রত গুহ এবং মুকুল মেহতাজি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের অতি মূল্যবান ৫৫ রান যোগ করেছিলেন। চা-পানের পর স্পোর্টিং ইউনিয়ন মাত্র ১৫ মিনিট ব্যাট করেছিল। স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রথম ইনিংসের খেলা ১৪৬ রানের মাথায় শেষ হয়।

উত্তর শহরতলী জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ পরিচালিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন আসর

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মোহনবাগান : ২১২ রান (শ্যামসুন্দর মিত্র ৮২ রান। সুব্রত গুহ ৭০ রানে ৫ এবং রথীন বসু ২৬ রানে ৩ উইকেট)।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ১৪৬ রান (মুকুল মেহতাজি ৩২ রান। এস সোম ৪২ রানে ৫ এবং রমেশ ভাটিয়া ৩৫ রানে ৪ উইকেট)।

এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

ব্যাংককে আয়োজিত একাদশ এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাইল্যান্ড বনাম ব্রহ্মদেশের ফাইনাল খেলাটি ২—২ গোলে ড্র গেছে। ফলে উভয় দেশকেই যুগ্মভাবে টুংকু আবদুল রহমন কাপ জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিয়ে ব্রহ্মদেশের কাপ জয় হল মোট ৬ বার এবং তাইল্যান্ডের মোট ২ বার।

ইরান ২—১ গোলে ইস্রায়েলকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রতি টানেই
আনন্দ উপভোগ
করুন !
অতি উত্তম
ভার্জিনিয়া
তামাক
আপনার
ধূমপানের
আনন্দের জন্য
বিশেষভাবে
মিশ্রিত
Esquire
Filter Tipped
CIGARETTES
MADE IN INDIA
এস্কোয়ার
ফিলটার টিপ্‌ড
GOLDEN TOBACCO COMPANY PRIVATE LTD.
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উত্তম
GT (E 10)-2 BEN
Greggs' Advtg.

৯ম বর্ষ ১ম খণ্ড — ৩য় সংখ্যা — মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 23rd May, 1969 শুক্রবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীশৈলেন সাহা

'রোজ মেরিজ বেবি' ছবি প্রসঙ্গে

শ্রীমতী মন্দিরা দাশগুপ্ত তাঁর চিঠিতে ঠিকই বলেছেন। ফিল্ম ক্লাবের অগণিত সদস্য ছবিটি দেখতে পাননি। তবে শ্রীসত্যজিৎ রায় এ ছবি সায়ান্স ফিকশ্যান সিনে ক্লাবে দেখানোর ব্যবস্থা করে রেখেছেন ছবির প্রিন্ট ভারতে আসার আগেই। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ক্লাব সদস্যরা ছবিটি দেখবেন। ভাল ছবি যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন শনি, রবি বাদে যে কোনোদিন সন্ধ্যায়। —অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদক, সায়ান্স-ফিকশ্যান সিনে ক্লাব, ৯৭।১ সার্পেন্টাইল লেন, কলকাতা-১৪।

নতুন ঠগী প্রসঙ্গে

আপনার সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এর পৃষ্ঠায় 'নতুন ঠগীর আবির্ভাব মুহূর্ত' থেকে আমি চমৎকৃত। শুধু চমৎকৃত বললে ভুল বলা হবে, বলতে পারি সাংঘাতিকভাবে উপকৃত। সত্যিই কতরকমের যে ঠক-জোচ্চোরের দল আমাদের নিত্য দিনের জীবন বৈঠকখানার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে সুস্থভাবে দিনাতিপাতই দুর্বহ হয়ে উঠছে। এর প্রতিকার করতে আমরা যে যার মতো সচেতন ত আছিই, উপরন্তু আপনার পত্রিকার 'সন্ধিৎসু' মশায় আমাদের আরও নতুন বিষয়ে আশ্চর্যভাবে সচেতন করলেন। এর জন্য তাঁকে আমি অজস্র ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। আমার এ চিঠির হয়ত কোন মূল্য আপনাদের কাছে থাকবে না, তবুও উপকারীর উপকার অস্বীকার করা সৌজন্য-হীনতারই পরিচায়ক। বলা বাহুল্য, ছদ্ম-নামের আড়াল হলেও 'সন্ধিৎসু' মশায়ের নামটি কিন্তু সার্থক।

কেন সন্ধিৎসু মশায় সম্বন্ধে আমি এত সোচ্চার তার একটা পরিচয় দিই। আমি একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় লেখা পাঠিয়ে আজও সে লেখার কূল-কিনারা পাইনি। যথারীতি ছাপানো কার্ডে প্রাপ্তি-স্বীকার করে লেখা প্রকাশের জন্যে পঁচিশ টাকা আমার কাছে চাওয়া হয়। আমি ছাত্র মাত্র। তাই টাকা পাঠাতে সাহস বা সংগতি রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু মাস তিনেক হল কোনও খবর নাই। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত অনুরূপ ধোঁকাবাজির কাহিনী পড়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি যে আমি টাকা না পাঠিয়ে ভুল করিনি। তবে একটা কথা, এভাবে না জেনে (জানা সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়) যারা লেখা পাঠান তাঁরা কি কোন প্রতিকার পেতে পারেন না? আমি বলি আপনাদের দপ্তরে এহেন বিজ্ঞাপন এলে একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে দেখলে তথাকথিত প্রতারিতেরা উপকৃত হবে। নমস্কার রইল।

রজতকুমার পাঞ্জা,
কলকাতা-১৯

সেকালের বাঙালী

'সেকালের বাঙালী' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে অনবধানতাবশতঃ দুটি ভুল রয়ে গেছে।

৯ই ফাল্গুন, ১৩৭৫-এ প্রকাশিত ৪১ সংখ্যায় শেষের দিকে আছে যদুনাথের দুই পুত্র ত্রিপুরারিচরণ ও সুশীলচন্দ্র আইনজীবী। তাঁরা কয়েকটি স্থানীয় বাঙালী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।—এরা উভয়েই জীবিত আছেন। ত্রিপুরারিবাবুর বয়স ৮০ এবং সুশীল-বাবুর বয়স ৭৬ বৎসর। এঁদের ছোট ভাই কানাই ডাক্তারী পাশ করে বিলাতেই স্থায়ী-ভাবে বসবাস করছেন।

১৯শে বৈশাখ, ১৩৭৬-এ প্রকাশিত ৫১ সংখ্যায় পাটনার কথায়ঃ (১) কান্তিচন্দ্র ঘোষের জায়গায় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ হবে। (২) ১৯৬১ সালের স্থানে ১৯১৬ হবে। —বিমানবিহারী বসু, পাটনা-৩।

কেয়াপাতার নৌকো

আমার আদি বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার পালং গ্রামে। আমার জন্ম কলকাতায়। পূর্ববঙ্গ দেখার সৌভাগ্য আমার আজ পর্যন্ত হয় নাই। অভিভাবক-দের কাছে পূর্ববঙ্গের কথা আজ শুনি। 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসটি পড়ে আমার মনে হয় পূর্ববঙ্গের লোকেরা কি রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দে দিনগুলি কাটিয়েছেন। অভিভাবকদের গল্পের সঙ্গে এই উপন্যাসের হুবহু মিল রয়েছে।

দরদী লেখক শ্রীপ্রফুল্ল রায় তাঁর উপন্যাসের মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রকৃত ঘটনা ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক যেভাবে হেমনাথ, অবনীমোহন, বিনু, লালমোর এবং যুগলের জীবনযাত্রার বর্ণনা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

তাই ধন্যবাদ জানাই লেখক শ্রীপ্রফুল্ল রায়কে এবং 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকে, যাঁরা এই রকম উপন্যাস প্রকাশ করে পাঠক-পাঠিকা-দের মন জয় করছেন। অতীন চট্টোপাধ্যায়, কালীঘাট, কলকাতা-২৬।

*

'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের লেখা উপন্যাস 'কেয়াপাতার নৌকো' পড়ে যারপর-নাই মুগ্ধ হয়েছি। উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যে, আমি যেন ভাষার সাবলীল স্বাচ্ছন্দের উপর ভর করে পূর্ব-বাংলা ভ্রমণ করছি। পূর্ববাংলার মানুষদের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছি। এই উপন্যাসটি সাম্প্রতিক কালে পঠিত উপন্যাসগুলির মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি। লেখক তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্যে 'বিষয়বস্তু' এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, উপন্যাসটি অধিকাংশ পাঠকেরই মনোরঞ্জনে সমর্থ। সব শেষে অনুরোধ জানাই এই উপন্যাসটি যেন আরও কিছুদিন চলে। সোমনাথ ভক্ত, কাঁথি, মেদিনীপুর।

'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' প্রসঙ্গে

পাঠকের রুচির দিকে নজর রেখে অমৃত-এর প্রকাশ সবসময়ই আমাদের মুগ্ধ করেছে। গল্প প্রবন্ধের বলিষ্ঠতা এবং বিচারের অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যের অনু-রাগী পাঠক তৈরির ব্যাপারে এই পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। যে কোন সংখ্যায় চোখ বোলালেই এই সত্য প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি একটি মহৎ উপন্যাসের ধারা-বাহিক চিত্ররূপ প্রকাশ আমাদের কাছে এই সত্য আরো গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এটা খুবই সুখের কথা যে, বাংলা সাহিত্যের ভলান্ম দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সব কিছু পড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাছাড়া সবাই এত ব্যস্ত-সমস্ত যে পড়ার সময়ও সংক্ষেপ। অথচ মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বাঞ্ছনীয়। এজন্য অনেককে আক্ষেপ করতেও শুনেছি। কিন্তু এই দৈন্য নিরসনে পথ নির্দেশের দায়িত্ব নিয়ে এযাবৎ কেউ এগিয়েও আসেন নি। সেদিক থেকে রমেশ-চন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাসের চিত্ররূপ প্রকাশ করে আপনারা পাঠক-মণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে অমৃত পথিকৃতের মর্যাদার দাবী করতে পারে। ছেলে ভুলানো গল্পের চিত্ররূপ প্রকাশ করার চেয়ে একাজ পাঠকের পক্ষে অনেক বেশি উপকারী। সেজন্য আপনাদের উপরি ধন্যবাদ পাওনা।

'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাসের সচিত্র বর্ণনা সকল পাঠককে সমানভাবে আকর্ষণ করে। চিত্রের সাহায্যে গল্প বর্ণনা যে কত সুন্দর হতে পারে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরিকল্পনা এবং শ্রীচিত্র সেনের সুদক্ষ রূপায়ণে সেকথাই বারবার মনে হয়।

আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় অভি-নন্দন জানাই। অমলেন্দু রায়, কলকাতা-১৬।

সম্পাদকীয়

জানবাজারের লালবাড়ি

লালদীঘির লালবাড়িতে শাসক বদলের পালার পর জানবাজারের লালবাড়িতেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচনে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষের যে-মেজাজ প্রতিফলিত হয়েছিল, কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে তারই প্রতিধ্বনি। কোনো নড়চড় হয়নি। এমনকি মেদিনীপুর লোকসভার উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত বহু-বিতর্কিত প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণ মেননের বিপুল জয়েও একই মনোভঙ্গির প্রকাশ। বাংলাদেশের মানুষ পরিবর্তন চায়। সে-পরিবর্তন অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ জড়ত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেসের দ্বারা আনা সম্ভব নয়। সুতরাং কংগ্রেস-বিরোধী বহু পার্টির সম্মিলিত সংস্থা যুক্তফ্রন্টকেই পরিবর্তনের মুখপাত্ররূপে বাংলাদেশের নির্বাচকরা গ্রহণ করেছে। এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই।

পঁয়তাল্লিশ বছর পর কলকাতা পৌরসভার কর্তৃত্ব থেকে কংগ্রেস বঞ্চিত হল। শুধু বঞ্চিত নয়, বলা চলে বিতাড়িত হল। কারণ, এতদিনের শাসক পার্টি এই নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবেও নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। সে-গৌরব অর্জন করেছে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বড় শরিক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। মোট একশোটি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট একাত্তরটি আসন পেয়েছে। কংগ্রেস ২২, জনসংঘ ২, নির্দল ৪ এবং ফ্রন্ট-বিরোধী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ১। জানবাজারের লালবাড়ি বলে খ্যাত কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় ভবন থেকে এতদিনের শাসক পার্টি হৃতজ্যোতি হতমান নক্ষত্রের মতো সরে এল। নির্বাচনে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল দুর্বল এবং সংগঠনের নিতান্ত অভাব। নির্বাচনের সময়েই বোঝা গিয়েছিল যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হবার মতো একাগ্রতা তাঁদের মধ্যে অনেকেরই নেই। অনেক কেন্দ্রে লোক ধরে ধরে প্রার্থী করা হয়েছিল শুধু কংগ্রেসের নাম রাখার জন্য। এভাবে যে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না তা ভোটাররা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

কলকাতা পৌরসভা সম্পর্কে নাগরিকরা গত দুই দশক ধরেই চরম বীতশ্রদ্ধ। বৃটিশ আমলে পৌরসংস্থাটি ছিল স্বায়ত্তশাসন প্রয়োগের একটি ক্ষেত্র। জনপ্রিয় নেতারা তখন নির্বাচিত হয়ে যেতেন পৌরসভায় জনসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ফজলুল হক, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো দেশবরেণ্য নেতারা কর্পোরেশনের মেয়র পদে বৃত হয়ে পৌরসংস্থার মুখোজ্জ্বল করে গেছেন। তখন রাজনৈতিক অধিকার থেকে দেশবাসী ছিল বঞ্চিত। তাই পৌরসভার সীমিত স্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রয়োগ করেই যতটা সম্ভব জনকল্যাণ সাধন ও রাজনৈতিক চেতনা প্রখর করে তোলার কাজ করতেন নেতারা এবং পৌরপিতারা।

দেশ স্বাধীন হবার পর কলকাতা শহরের চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে। তার জনবসতি বেড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য পৌরসভার দায়দায়িত্ব। কলকাতা সম্ভবত পৌরসংস্থা পরিচালনার দিক দিয়ে ভারতের নিকৃষ্টতম ও অবহেলিততম শহর। এত জনসংখ্যা অন্য কোনো শহরকে ঘিরে বাস করে না। অথচ এই শহরকেই পরিচ্ছন্ন রাখা যাচ্ছে না। তার পানীয় জলের সরবরাহ বহু অভাজনের তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিপাত তার শৌখিন এলাকার রাস্তাঘাটগুলোকেও ডুবিয়ে দিয়ে যায়। কলকাতার শিশুদের জন্য বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার যে-নীতি দেশগৌরব নেতারা কর্পোরেশনের নেতৃত্বে থাকবার সময়ে প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ অনুসৃত হয়নি। ছেলেদের জন্য উপযুক্ত খেলার মাঠ, উদ্যান ইত্যাদিও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তার ফলে পৌরসংস্থার নাম শুনলেই নাগরিকদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। পৌরসভার বৈঠকের যে-দৃশ্য দেখতে ও শুনতে নাগরিকরা অভ্যস্ত, তাতে জানবাজারের এই বিশাল লালবাড়ি সম্পর্কে নাগরিকদের বিমুগ্ধ হবার কোনো কারণ নেই।

এবারের নির্বাচনের ফলাফলে নাগরিকদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভই প্রতিফলিত হয়েছে। পুরনো অনেক পৌরপিতা তাঁদের পিতৃত্ব হারিয়েছেন। অনেক নতুন মুখ এসেছে এবার। লক্ষণীয় যে, নির্বাচিতদের মধ্যে অনেকেই তরুণ। ছাত্র-আন্দোলনে অংশীদার কয়েকজন যুবনেতাও এবার কাউন্সিলার হয়ে এলেন। এসবই খুব আশার কথা। পৌরসভা রাজনীতির জায়গা নয়। এখানে কাজ করবার ও কাজ দেখাবার অনেক সুযোগ আছে। এতদিন যাঁরা বিরোধী দলে ছিলেন, তাঁরা এবার সুযোগ পেলেন নিজেদের ইচ্ছামত পৌরসভার দায়দায়িত্ব পালনের। কলকাতা শহর নানাদিক দিয়ে আজ বিপন্ন। এই শহরের সঙ্গে বাংলার ও বাঙালীর ভাগ্য জড়িত। একে ছিমছাম, সর্বদিক দিয়ে নিখুঁত করে রাখতে পারলে শুধু নাগরিকদের জীবনযাত্রাই সহজ ও স্বচ্ছন্দ হবে না, দেশের সমৃদ্ধির পক্ষেও তা হবে সহায়ক। আমরা দেখতে চাই, নবনির্বাচিত যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধিরা কলকাতার বুকের ওপর থেকে জঞ্জাল সরিয়ে তাকে আধুনিক ভারতের অগ্রণী শহরে রূপান্তরিত করতে যেন একদিনও সময় নষ্ট না করেন। সরকারও তাঁদের হাতে। সুতরাং সরকারের সঙ্গে বিরোধের কোনো প্রশ্নই নেই। কলকাতাকে তাঁরা অপমান, অনাদর ও অবহেলা থেকে বাঁচান।

ঝড়ের কপাল নিয়ে আসার সুবিধা যেমন আছে, লোকসানও তেমনি কম নেই।

ঝড় হয়ে চক্ষের নিমেষে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে সাড়া তোলা যায় বটে তুমুল, কিন্তু বয়ে চলে যাবার পর একটা নাতিমধুর চমকের অগোছাল স্মৃতি ছাড়া আর কিছু বড় রেখে যাওয়া যায় না।

অন্য সব কিছুর মত সাহিত্যশিল্পে ঝড়ের বরাত নিয়ে দু' চারজনকে আসতে হয়। ঝড় হয়ে যারা আসে বেশীর ভাগই কিছুক্ষণের উত্তেজনা কোলাহলেই তাদের পালা শেষ।

কাজি নজরুল ইসলামের এই ধরনের নিয়তি তাঁর প্রথম আবির্ভাবের পর কেউ কেউ গণনা করে ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। কারণ নজরুল ইসলামের সাহিত্যজগতে প্রবেশ শুধু ঝড়ের মত বললে কম বলা হয়, একেবারে টাইফুন-এর প্রচণ্ড বেগ নিয়েই তিনি সাহিত্যের সিংহদ্বার ভেঙে ঢুকেছিলেন।

প্রায় পাঁচ দশক পূর্ণ হতে চলল তবু দুরন্ত উত্তেজনার ঢেউ তোলা তাঁর প্রথম কবিতার আকস্মিক অভিঘাতের কথা সে যুগের সাহিত্যানুরাগীরা কেউ নিশ্চয় ভোলেন নি।

কবিতাটির নাম যে 'বিদ্রোহী' তা বলাই বাহুল্য এবং এই বিদ্রোহী বেশে ঝড়ের বেগে দেখা দেবার দরুনই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেকালে কয়েকজন যদি একটু সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন তাহলে তাঁদের সবাইকেই ঈর্ষাকাতর ধরে নেওয়া বোধহয় ঠিক নয়।

'বিদ্রোহী'র মত কবিতায় রচয়িতার যথার্থ কবি প্রতিষ্ঠার স্বল্পায়ুযোগের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হয়ত থাকে। এ ধরনের কবিতা আকস্মিক উত্তেজনার যে উত্তাল ঢেউ তোলে তা কদিনের খ্যাতিকে আকাশে যেমন পৌঁছে দেয় অতলে ডোবায়ও তেমনি তাড়াতাড়ি।

নজরুল ইসলামের বেলা তা হয়নি। না হবার কারণ দুটি হতে পারে বলেই আমার মনে হয়।

সাময়িক আলোড়ন তোলবার উপাদান তার মধ্যে যত প্রধান-ই হোক 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে ধ্রুব দৃঢ় অক্ষয় কিছু আছে।

কিংবা 'বিদ্রোহী' কবিতাটিকেই শীল-মোহরের মত ব্যবহার করে কবি নজরুলকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বেগের প্রতীকমাত্র ভাবাই ভুল।

দুটি যুক্তিই আংশিকভাবে সত্য। দ্বিতীয়টি বিশ্বাস করবার ঝোঁক আমার নিজের অন্তত বেশী।

সাহিত্যে, শিল্পে ও জীবনে 'লেবেল' মারবার একটা প্রবণতা চিরকালই আছে। পাঠকমনের আলস্য থেকেই এ প্রবণতা আসে। লেবেল মারার সুবিধা অনেক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বেশী নাড়তে চাড়তে ভাবতে চিন্তোতে হয় না। লেবেলের ছাপ দিয়েই মোটামুটি কাজ চালানো যায়। তার বেশী সাধারণ সাহিত্যের কারবারে আর কি দরকার?

নজরুল ইসলামের বেলা এই বিদ্রোহী ছাপটা বেশ পাকাভাবেই তাই মারা হয়ে আছে। সভায় সমিতিতে বক্তারা বিদ্রোহী শব্দটা নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, পত্র-পত্রিকায় কবির নামের আগে সহজাত খেতাব হিসাবেই এ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়।

আপত্তির তাতে বেশী কিছু থাকত না যদি এই খেতাবে নজরুল ইসলামের কবি-সত্তার বেশ একটু খণ্ডিত ও কিছুটা অপ্রকৃত ধারণা প্রশ্রয় না পেত।

নজরুল ইসলামকে জীবনে ও কাব্যে বিদ্রোহী বললে একেবারে ভুল বলা হয় না কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর বিদ্রোহের স্বরূপটা সুস্পষ্টভাবে না বুঝলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়।

'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন
যত নিয়মকানুন শৃঙ্খল!
আমি মানিনাকো কোনো আইন
আমি ভরা তরী করি ভরাডুবি
আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন!'-এর

সঙ্গে আত্মবিরোধী ও বেসুর

'আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার
কাঁকন চুড়ির কন-কন্,
আমি চির-শিশু চির-কিশোর
আমি যৌবন ভীতু পল্লীবালার
আঁচর, কাঁচলি নিচোর।'—মিলিয়ে

যে বিদ্রোহ আস্ফালিত, তার উৎসমূল খুব গভীর কিনা সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবি-সত্তার যথার্থ রহস্য এ কবিতা থেকে উদ্ধার করাও কঠিন।

নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের মন্ত্র ত 'না' নয় 'হাঁ'। সর্বকালের সত্যকার সংস্কারক বিপ্লবীর মত তাঁর কণ্ঠের ভাঙবার ডাকটাই বেশী করে তাদের কানে বাজে কি সমাজে রাষ্ট্রে ও জীবনে জরা-জর্জর ভাঙাচোরার সঙ্গেই যারা আপোষ করে থাকে তাদের। মানুষের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধ্রুব ধারণার ভিত্তি বলিষ্ঠ বাহুতে প্রতিষ্ঠা করেছেন বলেই সেই উৎক্ষেপে তাঁর চারিধারে ভেঙে ধ্বসে পড়া কপটতা অন্ধতা ও মিথ্যার স্তূপ তাঁকে নিরর্থক ধ্বংসলোলুপতার চেহারা দিয়েছে।

তাঁর বিদ্রোহী কবি-সত্তার যথার্থ পরিচয়ের যে ইঙ্গিতটুকু মাত্র পাই—

'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত'-এর কটি ছত্রে,

তারই পূর্ণ প্রকাশ দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন-সুরের অনাস্ফালিত আর এক কবিতা-গুচ্ছে। সেগুলির মধ্যেই তাঁর ধ্রুব ধারণার ভিত্তির সন্ধানও মেলে।

'তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম
সকল যুগাবতার
তোমার হৃদয় বিশ্বদেউল
সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফেরো দেবতা ঠাকুর
মৃত পুঁথি কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার
নিভৃত অন্তরালে।

• • • •

বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে
সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই যে নীলাচল কাশী
মথুরা বৃন্দাবন,
বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ,
মদিনা কাবা-ভবন,
মসজিদ এই মন্দির এই,
গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল
সত্যের পরিচয়।'

কিংবা
'মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ বাইবেল
চুম্বিছে মরি মরি!'

আর
'তারই পদরজ অঞ্জলি করি
মাথায় লইব তুলি
সকলের সাথে পথে চলি যার
পায়ে লাগিয়াছে ধূলি!
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত
পীড়িতের মাখি' খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন
প্রভাতের নবারুণ'

খুব নতুন কিছু বলে নিশ্চয় মনে হবে না, কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য কিছু, প্রচণ্ড কিছু, বিশেষতঃ সেই যুগে, অসহযোগ আন্দোলন যখন তার উত্তাল আবেগ নিয়েও শ্বেতাঙ্গ বিতাড়নের চেয়ে বড় সংকল্প অধিকাংশের মনেই জাগাতে পারে নি।

নজরুল ইসলামের সমস্ত কবি-জীবনের সদাজাগ্রত সবচেয়ে দীপ্ত প্রেরণার উৎস হল শোষণহীন পীড়নহীন এক সমাজ আর সুস্থ বলিষ্ঠ মানবতা সম্বন্ধে গভীর এক প্রত্যাশা আর তার জন্যে ক্লান্তিহীন আপোষহীন সংগ্রামের সংকল্প।

এইখানেই তিনি সত্যকার বিদ্রোহী। সে বিদ্রোহের প্রকাশ তরল বাষ্পীয় উচ্ছ্বাসে নয়, মানুষের মূল্য ও মহিমা সম্বন্ধে অটল ধ্রুব অয়স্কঠিন বিশ্বাসের নির্ভীক স্বীকারোক্তিতে।

'সকল কালের সকল দেশের
সকল মানুষ আসি'
এক মোহানায় দাঁড়াইয়া শোনো
এক মিলনের বাঁশী।
একজনে দিলে ব্যথা—
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা
সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানব জাতির লজ্জা—
সকলের অপমান!'

কিংবা
'আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা
শুধিতে হইবে ঋণ,
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে
ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে
পড়িয়া যাদের হাড়,

• • •

তারাই মানুষ, তারাই দেবতা
গাহি তাহাদেরই গান,
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে
আসে নব উত্থান!'-এর

দৃঢ় গভীর প্রত্যয়ে না পৌঁছোলে বিদ্রোহী কবির প্রথম চমক জাগানো কবিতা—

'আমি উত্তর বায়ু মলয় অনিল
উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক কবির গভীর রাগিণী
বেণু বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা
আমি রৌদ্র রুদ্র রবি
আমি মরু নির্ঝর ঝর ঝর
আমি শ্যামলিমা ছায়াছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি
একি উন্মাদ আমি উন্মাদ'-এর

মত ছন্দের অসংলগ্ন ফাঁপা উচ্ছ্বাসের নমুনো হয়েই থাকত।

এতক্ষণের আলোচনায় নজরুল ইসলামের কবি-পরিচয়ে চারণের ভূমিকাটার ওপরই যদি একটু বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেটা একেবারে অনিচ্ছাকৃত নয়। নজরুল ইসলাম কবিতার নানা ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। কালগুণে রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর বহু অনবদ্য গীতিকবিতার কাব্যমূল্য আমাদের কাছে সুরের আড়ালে অস্পষ্ট হয়ে আছে, কিন্তু যেখানে বাংলা কাব্যজগতে তিনি অনন্য সেখানে তাঁর ভূমিকা নবযুগের চারণের।

সাহিত্যে সৃষ্টিপ্রতিভার কুলজি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা নজরুল ইসলামের কাব্যকীর্তির ধারাবাহিকতা খুঁজতে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ত বটেই তার আগে সত্যেন্দ্র দত্ত ও মোহিতলাল পর্যন্ত নিশ্চয় পৌঁছোবেন। পূর্বসূরী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা পরোক্ষে ও সত্যেন্দ্র দত্ত মোহিত-লাল প্রত্যক্ষভাবে যে কবি নজরুলকে প্রথম পাথেয় দিয়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম পাথেয় নিলেও নিজের পথ নজরুল ইসলাম নিজেই রচনা করেছেন। সে পথে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ।

বর্তমানের কবি আমি ভাই
ভবিষ্যতের নই 'নবি'
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে
মুখ বুজে তাই সই সবি।

• • •

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি
যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি
রয়েছে সোনার শত ছেলে
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস।
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায়
তাদের সর্বনাশ!

নজরুলের সময়েই উদাত্ত কণ্ঠে আমরা অনেক শুনেছি, মুগ্ধ হয়েছি ছন্দমিলের ভেল্কিতে, মুখের ভাষার অন্ত্যজ শব্দের নতুন বাক্যভঙ্গি প্রয়োগে উচ্ছল হতে দেখেছি বাংলা কাব্যলোক, কিন্তু নজরুল ইসলামের আগে যথার্থ মুক্তির প্রাণমাতা এমন অকুণ্ঠ স্বভাবকবিত্বের স্বাদ আর কোথাও পেয়েছি কি?

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নজরুলের অনেক হিতৈষী, অনেক বন্ধু, অনেক সমালোচক। তাঁর কবিতার, তাঁর গানের, তাঁর সবরকম লেখার চুলচেরা বিচার করে অনেকে অনেকগুলি বড় বড় কিতাব লিখেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে নজরুল সম্বন্ধে আজ আমি অন্য কথা লিখবো। যে-কথা কবি নজরুলের নয়, সে-কথা মানুষ নজরুলের। কারণ আমার কাছে কবি নজরুলের চেয়ে মানুষ নজরুল অনেক বড়। একই দেশে আমাদের বাড়ী, একই জল-হাওয়ায় আমরা মানুষ হয়েছি, নজরুল আমার সহপাঠী বাল্যবন্ধু। তাকে যখন আমি ভালবেসেছিলাম, অনেক বন্ধুর মাঝখান থেকে আমরা যখন একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তখন আমরা কেউ সাহিত্যের ধারও ধারতাম না।

আমি সেই নজরুলকে চিনি যে-নজরুল ইকড়া গ্রামের বাবুদের বাড়ী বাসন্তীপুজোর সময় ভাঙা প্রাচীরের ওপর বসে যাত্রাগান শুনছে, যে-নজরুল 'লেটো'র দলে বসে ঢোলক বাজাচ্ছে, যে-নজরুল সুর করে রামায়ণ-মহাভারত পড়ছে।

যেখানে সাধু-সন্ন্যাসী নাঙ্গা ফকির—সেইখানেই নজরুল!

শুনেছে সিয়াড়শোলের শিশুবাগানের কাছে একটা গাছের তলায় একজন ফকির বসে আছে। আমাকে ডাকতে এলো।—চল দেখে আসি!

গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই।

ওদিকে তখন পশ্চিম-আকাশটা কালো হয়ে এসেছে। কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠলো। দুজনে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছি। ওদিকটা ছিল তখন জনহীন বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। কাঁকর পাথরে হাঁটুর কাছে খানিকটা চামড়া ছড়ে গেল, খানিকটা রক্তও পড়লো। নজরুল তার নিজের কাপড় দিয়ে চেপে ধরলো জায়গাটা। তার কাপড়টা রক্তে ভিজে গেল। বললাম, এ কি করলে?

—ও কিছু না। সাবান দিলেই উঠে যাবে।

সেদিক দিয়ে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আমাকে তক্ষুনি সুস্থ করে তুলতে চায়।

বললে, হাঁটতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারবো। চল।

ঝড়ের বেগ থেমে এসেছে। আমাদের আর দৌড়াতে হচ্ছে না।

নজরুল বললে, আমি একবার গাছে উঠে আম পাড়তে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আর একবার—এই দ্যাখো। সাইকেল চড়া অভ্যেস করতে গিয়ে সাইকেলের চেনে কেটে গিয়েছিল অনেকখানি।

এ-সব কথার অবতারণা—আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝেছি।

রাণীগঞ্জে তখন ওষুধের দোকান বলে কিছু ছিল না। ডাক্তারের কাছেই ওষুধ পাওয়া যেতো। সাধনের দাদা সবে ডাক্তারী পাশ করে এসেছে। রাস্তার ধারেই সাধনদের বাড়ী। নজরুল দাঁড়ালো সেইখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি হবে?

সামনের ঘরেই বসেছিল সাধনের দাদা। সে তখন আমাদের দেখতে পেয়েছে।—এই যে মানিকজোড়! কি খবর? বাঃ, বেশ মানিয়েছে দুটিকে। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। আর-একটি কোথায়? সেই যে ক্রিশ্চেন ছেলেটি? শৈলেন?

নজরুলকে কথা বলবার অবসরই দিচ্ছে না। ডাক্তার ভেবেছিল আমরা সাধনকে খুঁজছি। বললে, সাধন বাজারে গেছে।

নজরুল বললে, একটু টিনচার আইডিন দেবে?

—কি হবে?

নজরুল আমার পা'টা দেখিয়ে দিলে।

ডাক্তার রসিকতা আরম্ভ করলে।—গাছে উঠেছিলে বুঝি? তা বেশ হয়েছে। হাত-পা ভেঙে গেলেই ভাল হতো। টিনচার আই-ডিন লাগাতে হবে না। রাস্তার ধুলো খানি-কটা ঘসে ঘসে ওইখানে লাগিয়ে দাও—ভাল হয়ে যাবে।

আমি তখন নজরুলের হাতে ধরে টানছি।

ডাক্তার বললে, না ভাই টিনচার আইডিন নেই আমার কাছে। এই তো সবে ডাক্তারী পাশ করলাম। ডাক্তার হয়ে বসি, তখন ওষুধ-পত্র সবই পাবে।

নজরুলকে রাস্তায় টেনে এনে বললাম, টিনচার আইডিন আছে আমাদের বাড়ীতে।

নজরুল বললে, গিয়েই লাগিয়ে নাওগে। আর একটা খুব ভাল ওষুধ আমি জানি। কাল দোবো।

—তাই দিও। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেরি হলে বকাবকি করবে। আমি পালাই।

দুজনে খুব কাছাকাছি থাকি। নজরুল গেল তার সিয়াড়শোল স্কুলের মোহমেডেন বোর্ডিং-এ। খড়ে-ছাওয়া মাটির একখানি ছোট ঘর। পাঁচজন মুসলমান ছাত্রের খাবার-থাকবার জায়গা। আর আমি গেলাম আমার আস্তানায়। রায়-সাহেবের প্রকাণ্ড লাল-কুঠির নীচের তলার একখানা ঘরে।

পায়ে টিনচার আইডিন লাগালে ভাল হতো। কিন্তু দোতলায় বাড়ীর গিন্নির কাছে গিয়ে চাইতে হবে। সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ উঠে গিয়েও নেমে এলাম। এই মেয়েটির ভয়ে আমাকে সব সময়েই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। এইটি আমার জীবনের সব-চেয়ে বড় অভিশাপ। টিনচার আইডিন কেন চাইছি বলতে হবে। হাঁটুর কাছে ছড়ে-যাওয়া জায়গাটা দেখাতে হবে। আছাড় খেয়েছি বললে সে বিশ্বাস করবে না। বিশ্রী একটা অপবাদ রটিয়ে সারা বাড়ীতে একটা হৈ-চৈ না বাধিয়ে ছাড়বে না। যার বন্ধু মুসলমান, আর একটা ক্রিশ্চেন, সে কখনও ভাল ছেলে হতে পারে না।

তার চেয়ে কাজ নেই টিনচার আইডিন লাগিয়ে।

একটা লণ্ঠন নিয়ে পড়তে বসলাম।

খানিক পরেই দেখি, নজরুল এসে দাঁড়ালো। তার দু-হাত ভর্তি অনেকগুলো নিমের পাতা। বললে, এইগুলো বেশ করে বেটে ওইখানে লাগিয়ে নাও। ব্যথা-বেদনা কিছু থাকবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, রাত্রে নিমপাতা কোথায় পেলে?

—নিম গাছ খুঁজতেই তো দেরি হয়ে গেল। শেষে মনে পড়লো ক্রিশ্চানদের কবর-খানার মুখে সেই বড় নিমগাছটার কথা।

দিনের বেলাও সে নির্জন জায়গাটার কেউ ত্রিসীমানা মাড়ায় না, ভয়ে গা ছম-ছম করে।

বললাম, এই অন্ধকারে তুমি ওই গাছ-টায় উঠতে গেলে কেন? গাছটায় ভূত আছে।

নজরুল বললে, তোমার মুণ্ডু আছে।

এই বলে সে হাসতে হাসতে চলে গেল। জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেল আমি আইডিন লাগিয়েছি কিনা।

ভালই হলো। আমিও বেঁচে গেলাম।

জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারতাম না।

আবার না ফিরে আসে, তাই দোরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

না, ফিরে সে এলো না। শুধু দেখলাম তার কাপড়ে আমার রক্তের দাগটা তখনও জ্বলজ্বল করছে।

এই নজরুল!

চওড়া বুকের ছাতি, বড় বড় চোখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর দেহ।

মাথার চুলগুলো কিছুতেই বাগ মানছে না— এই যা দুঃখ। আমার মাথার চুল খুব সুন্দর। কেমন করে সুন্দর হলো বুঝতে পারি না। লোকে ভাবে বুঝি মাথায় বড় বড় বাবরি চুল সখ করে রেখেছি। কিন্তু তা নয়। চুল কাটাবার পয়সা পাই না, এমনকি আঁচড়াবার একটা চিরুনি পর্যন্ত নেই।

নজরুল বলে, তোমার অমনি চুল কেমন করে হলো তাই বল।

আমরা তখন পনেরো ষোল বছরের কিশোর বালক। রাণীগঞ্জে থাকি। দুজন দুটো ইস্কুলে পড়ি, কিন্তু থাকি খুব কাছা-কাছি। এক পুকুরে স্নান করি, সাঁতার কাটি, আম, জাম, কামরাঙা গাছ থেকে পেড়ে নুন দিয়ে দিয়ে খাই, একসঙ্গে বেড়াতে যাই, সুখ-দুঃখের গল্প করি। অন্য বন্ধু আছে অনেক। তাদের ভেতর একমাত্র ক্রিশ্চান বন্ধু শৈলেন ছাড়া আর কেউ বড় একটা আমাদের সঙ্গে মেশে না। আমাদের জগৎ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

নজরুল ছোট ছোট গল্প লেখে, আমাকে শোনায়। আমি কবিতা লিখি—নজরুলকে শোনাই। আর-কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে

না। শোনালে বিশ্বাস করে না। বলে, ও আমাদের নিজের লেখা নয়। কোথাও থেকে চুরি করেছি।

একমাত্র শৈলেন শোনে মাঝে মাঝে। শোনে আর ফিক্‌ফিক্ করে হাসে। বলে, ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে দাও। কিছু হয়নি।

আমাকে রাগায়। বলে, ওইজন্যেই বুঝি চুল রেখেছো? চুল রাখলেই কবি হয় না।

নজরুলকে বলে, তুমি গদ্য লিখে কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র হবে না। এই আমি বলে রাখছি।

শৈলেনের কথায় আমরা রাগ করতাম না।

শৈলেন ছিল আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সে আজ আর ইহজগতে নেই।

কিন্তু যাবার আগে সে দেখে গেছে—আমরা আমাদের পেশা বদ্‌লে নিয়েছি। আমি লিখছি গল্প, নজরুল লিখছে কবিতা।

মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নজরুল ছিল করাচিতে।

শৈলেন আর আমি সেই ফাঁকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় এসেছি।

নজরুল এলো করাচি থেকে। হলো সৈনিক কবি।

তার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। গান লিখছে, গান গাইছে, সভায় সমিতিতে, বাড়ীর আড্ডায়, ছেলেদের হোস্টেলে নজরুলকে নিয়ে টানাটানি চলছে। তার মুহূর্তের অবসর নেই।

আমাদের দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে আসে।

সেখানে সদাপরিচিত স্তাবক আর অনুরাগীর দল। মার্জিত রুচি শিক্ষিত মানুষের মজলিস। সংখ্যায় অগণ্য।

আর এখানে আমরা নগণ্য মাত্র তিনজন। নজরুল, আমি আর শৈলেন।

আবার যেন আমরা সেই পুরোন দিনে ফিরে যাই। এখানে কবি বলে নজরুলের আলাদা কোন সম্মান নেই। সবই এখানে অবারিত, অনর্গল এবং নিরাভরণ। শান্তিপুরী পোষাকী ভাষায় মাতৃ-ভাষায় প্রাণ খুলে কথা বলে আর হো হো করে হাসে।

এমন সব কথা, এমন সব গল্প, যা ওখানে বলা চলে না, নজরুল এখানে তাই বলে। যে গানটি তার সবচেয়ে প্রিয় সেই গানটি শোনায়। যে কবিতাটি সবে লিখেছে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে।

শৈলেন বলে, যাক্, এতদিন পরে আমার কথাটা আমি withdraw করে নিলাম! তবে withdraw করবার দরকার হতো না যদি না তোমাদের লেখাদুটো তোমরা পালটা-পালটি করে নিতে। তুমি যদি গল্প লিখতে, আর শৈলজা যদি কবিতা লিখতো তাহলে তোমরা দুজনেই মরতে।

আমি বললাম, নজরুল এখনই-বা বেঁচে আছে কোথায়? সবাই হৈ হৈ করছে, টানাটানি করছে, বলছে—গান গাও, কবিতা শোনাও। বাহবা দিচ্ছে, প্রশংসা করছে। কিন্তু কি খেয়ে কেমন করে ও বেঁচে আছে সেদিকটা কেউ দেখছে না। একটা পয়সা আসছে না কোথাও থেকে। কি কষ্টে যে ওর দিন চলছে তা আমি জানি। যে গল্পগুলো ও লিখেছিল তার কপিরাইট বেচবার জন্যে বসে আছে। তাও তো আফজল বলছে একশ টাকার বেশি দেবে না।

এই কথাগুলো কেউ শোনে নজরুল তা পছন্দ করে না। হে হে করে হাসে আর অর্গ্যানের সুর তুলে আমার কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

আমি তিরস্কার করলাম নজরুলকে।—হে হে করে হাসছে দ্যাখো! যারা দু পেয়ালা চা খাইয়ে সারাদিন তোমাকে গাধার মত খাটিয়ে নেয় তাদের বলতে পার না?

নজরুল বলে, তাদের কি বলবো? আচ্ছা বোকা তো!

—তাদের বলবে তুমি যাবে না, তোমাকে লিখতে হবে। টাকার দরকার। দুটো কবিতা লিখলে কুড়িটা টাকা তো পাবে।

শৈলেন বললে, ও বলবে তবেই হয়েছে। টাকার কথা ও কখ্খনো কাউকে বলতে পারবে না। মাথার চুলের দুঃখু ছিল ওর চিরকাল। এখন চুলগুলো বাগিয়েছে কবি-কবি চেহারা হয়েছে, বাস, ওইতেই খুশী।

নজরুল চুলের প্রশংসায় ভারি খুশী। বললে, শৈলজার মত হয়েছে?

আমি বললাম, আমি এবার চুলগুলো কেটে ফেলবো কিন্তু।

নজরুলের খুব আপত্তি।—না না, কাটবে না।

শৈলেন বলেছিল, তা না হয় কাটবে না। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তোমার ওই চুলগুলোকে জটা করে ফেলতে হবে। তারপর সারা গায়ে ছাই মেখে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকবে। ত্রিশূল একটা আমি তৈরি করিয়ে দেবো। সত্যি বলছি দোহাই তোমার, মহাদেব হবার চেষ্টা কোরো না। সব ব্যাটা সমুদ্রমন্থন করে অমৃতটুকু লুটে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেবে বিষ। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থেকো না। আমরা সহ্য করতে পারবো না।

নজরুলকে নিয়ে এমনি রসিকতা করতো শৈলেন।

নজরুল হো হো করে হাসতো আর বলতো, আমি হব না হব না হব না তাপস যদি না পাই তপস্বিনী। মহাদেব হব কেমন করে? পার্বতী কোথায় পাব?

শৈলেন বলতো, বাবুদের অন্দরমহল থেকে যেরকম ঘন-ঘন ডাক আসছে তোমার—পার্বতী একটি জুটে যাবে ঠিক।

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

সে যে চায় না কিছুই। যে চায় না সে পায় না।

নজরুল চেয়েছিল শুধু আনন্দ। সে তার অন্তরের ভেতর থেকে স্বতঃ উৎসারিত পরমানন্দ। টাকা নয় পয়সা নয়, ক্ষুধার অন্ন নয়, পার্থিব কোনও সম্পদ নয়, সুর-সুন্দরের কাছ থেকে সে আনন্দ তার আপনিই আসে। সেই আনন্দে সে দিনরাত মশগুল হয়ে থাকে।

'আপন গন্ধে ফিরি মাতোয়ারা কস্তুরী-মৃগ সম!'

সেদিন তার খাবার সময় আমি তার আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলাম।

বাইরে কয়েকজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে তাকে কোথায় যেন নিয়ে যাবে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

খেতে বসবার আগে নজরুল আমাকে বললে, খাবে?

আমি বললাম, না।

কাছে গিয়ে দেখলাম কাঁচের একটি ডিসের ওপর কয়েক মুঠো ভাত আর একটি প্লেটের ওপর তিন টুকরো মাংস আর একটুখানি ঝোল।

যে দুটো ডেকচিতে রান্না হয়েছিল সে দুটো খালি পড়ে রয়েছে। তাতে আর অবশিষ্ট কিছু নেই।

বিশ-পঁচিশ বছরের যে ছোকরাটি রান্না করে, সে এক গ্লাস জল এনে নামিয়ে দিলে নজরুলের হাতের কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি খাবে না? নেই তো কিছু।

ছোকরাটি বললে, আমি হোটেলে খেয়ে নেবো।

নজরুলের কানে গিয়েছে কথাটা।—কেন, হোটেলে খাবে কেন?

লোকটি বললে, আপনি তখন আপনার বন্ধুকে খাইয়ে দিলেন যে!

এতক্ষণে মনে পড়লো নজরুলের। বললে, ধেৎ, সে আমার বন্ধু কেন হবে? সে এসেছিল আমার কাছে টাকা ধার করতে।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, আমার নাম-টাম শুনে লোকটা ভেবেছে আমার মেলা টাকা।

—তাই বুঝি খাইয়ে বিদায় করলে?

নজরুল বললে, না না দেখলাম বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। বললে, দু'দিন ভাত খাইনি।

বললাম, তাকেও তো পয়সা দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিতে পারতে!

নজরুল বললে, দশ টাকার একটি নোট ছাড়া আমার কাছে কিছু ছিল না যে! টাকা-পয়সাগুলো আমার কাছে আসতে চায় না, থাকতেও চায় না। তাদের সঙ্গে আমার কী শত্রুতা আছে কে জানে।

—সেই দশ টাকার নোটটি তাকে দিলে বুঝি?

নজরুল বললে, ভারি লজ্জা করছিল। চেয়েছিল একশ' টাকা, দিলাম মাত্র দশটি টাকা।

রাঁধুনী ছোকরাটি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। তাকে দেখিয়ে বললাম, এখন ওকে কি দেবে দাও।

নজরুল নিতান্ত অসহায়ের মত তাকালো আমার দিকে।

একটি টাকা সেই ছোকরাকে আমি দিতে গেলাম। সে নিলে না কিছুতেই। বললে, টাকা আছে আমার কাছে।

নজরুলের মুখে হাসি ফুটলো।

—এই দ্যাখ, সবাইকার কাছে টাকা থাকে, আমার কাছে থাকে না। পালায়।

ছোকরাটি বললে, হোটেলে আমাকে খেতে হতো না, যা রান্না করেছিলাম তাতেই কুলিয়ে যেতো, কিন্তু তিনজনের খাবার লোকটা একাই খেয়ে ফেললে।

নজরুল তাকে ধমক দিলে।—ধেৎ, ওরকম করে বলতে নেই। আমি ওর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম বেচারার খুব খিদে পেয়েছিল। খেয়েছে বেশ করেছে।

খাওয়া শেষ করে হাতকাটা ফতুয়ার ওপর বাসন্তীরঙের চাদরটি গায়ে দিয়ে চটি পরে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যাচ্ছিল নজরুল। আমাকে বললে, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

বললাম, খুব হয়েছে! তুমি যাবে পশ্চিমে, আমি যাব পুবে।

নজরুল বললে, গাড়ী এনেছে তো! মোটরকার।

মোটর যখন এনেছে তখন আর রক্ষা নেই।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে নজরুল—এই মোটরে চড়ার সখটা তার গেল না কিছুতেই। মোটরে চড়িয়ে কেউ যদি ওকে জাহান্নামে নিয়ে যায় তো ও তক্ষুনি যেতে রাজী হয়ে যাবে।

একদিন হয়েছে কি, বিকেলে শৈলেনদের বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে বসে বসে গল্প করছি শৈলেনের সঙ্গে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নজরুল ঢুকলো। আমাদের কাছে হাত পেতে বললে, চারটে টাকা দাও। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সির ভাড়া উঠেছে পাঁচটাকা। নজরুলের পকেটে ছিল মাত্র একটি টাকা। সেই টাকাটি ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে—টাকা আনছি, তুমি দাঁড়াও।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে শৈলেন বললে, এই টাকাটা তোমাকে আমি ধার দিলাম। ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো। যদি না দাও তো তোমার গলায় গামছা দিয়ে আমি আদায় করবো।

তার সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে নজরুল এসে বসলো তার নিজের জায়গায়। মানে অগ্যানের সামনে। বললে, তুমি তো ক্রিশ্চান ছিলে, জু হলে কবে?

শৈলেন বললে, হয়েছি তোমার জন্যে।

—তা বেশ করেছ। সেই রাণীগঞ্জ থেকে ধরলে অনেক টাকা তুমি পাবে আমার কাছ থেকে। হিসেব করে রেখো। আপাততঃ দু পেয়ালা চা দাও।

শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, দু-পেয়ালা কেন?

নজরুল বললে, লাখ পেয়ালা চা না খেলে চালাক হয় না। লাখ পেয়ালা হতে আমার এখনও দু' পেয়ালা বাকি আছে।

শৈলেন বলেছিল, লাখ পেয়ালা চা খেয়ে চালাক তুমি হবে কিনা জানি না, কিন্তু মদ্যপান যদি করতে পারো তো নির্ঘাৎ মাইকেল মধুসূদন হয়ে যাবে—সে কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

আমাদের দুর্ভাগ্য, শৈলেন অনেকদিন হলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। নজরুল আজ সতের বছরের বন্ধ। সারাজীবনে মদ্যপান দূরের কথা ধূমপান পর্যন্ত করলে না। কাজেই সে মাইকেল হলো কিনা শৈলেন দেখে যেতে পারলে না।

কিন্তু যা সে হয়েছে তাই-বা কজন হতে পারে?

যা সে পেয়েছে তাই-বা ক'জন পায়?

কবি এবং গীতিকার নজরুল সবজন-শ্রদ্ধেয়। তাই দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছে সে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর প্রণতি।

এদিকে জীবন-দেবতার কাছ থেকে পেয়েছে সে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ আর যন্ত্রণা।

কবি-নজরুলের চেয়ে মানুষ-নজরুল অনেক—অনেক বড়। শিশুর মত সরল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিরহঙ্কার, এমন অজাতশত্রু, হৃদয়বান এমন আনন্দময় পুরুষ—এ যুগে সচরাচর দেখা যায় না।

শৈলেন একদিন হাসিরহস্য করে বলেছিল 'তুমি মহাদেব সেজে ছাই মেখে বোম্ বোম্ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াও।'

আজ শৈলেনের সেই কথাটাই মনে পড়ছে। বলেছিল, সমুদ্রমন্থনের অমৃতটুকু নিজেরা নিয়ে বিষটুকু তুলে দেবে তোমার হাতে। সেই বিষ খেয়ে তুমি নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকবে।

তাই হয়েছে। আজ শৈলেন নেই, কিন্তু তার কথাটা সত্য হয়ে গেছে।

নজরুল নীলকণ্ঠ হয়ে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত বসে আছে।

তোমাকে আমি তুমি বলেই কথা বলব, কারণ তোমাকে দেখামাত্রই আমার মনে হোল যে তুমি আমার অনেকদিনের চেনা।

কাল তুমি যখন বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটছিলে তখন তোমার ওই একেবারে কিনার দিয়ে চলা দেখে আমিই ভয় পাচ্ছিলাম। তারপর তুমি যখন সিঁড়ির জায়গাটায় পৌঁছোলে তখন আমি ভাবছিলাম যে তুমি নিশ্চয়ই ওই ধাপগুলো দিয়েই নামবে। কিন্তু তা তুমি মোটেও করলে না, অতখানি ওপর থেকে বালির ওপর টুপ করে লাফিয়ে পড়লে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে তুমি যখন তোমার হাতের বালিগুলো ঝাড়ছিলে তখন আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম, তোমার হয়তো কোন তাড়া আছে, কারণ তখনই একটা ছুট দিয়ে তুমি নদীর কিনারার দিকে চলে গেলে। তোমার ওই দৌড়ে-যাওয়া দেখে আমার যেন মনে হচ্ছিল—আর যখনই তুমি বালির ওপর কাজ-নেই ভাবে শুয়ে পড়লে তখনই আমার যেমগুলো সব কোথায় মিলিয়ে গেল, আর একটা প্রত্যয় এলে আমার সামনে দাঁড়াল। দেখলাম, তুমি আমার খুবই চেনা। এমন অকারণ লাফিয়ে পড়া, বাঁধের কিনারায় এরকম ঝুঁকি নিয়ে চলা আর এমনি অনর্থক দৌড়-দেওয়া, এ শুধু একজনই করে। এগুলোয় কি এক অর্থহীন আনন্দও সে পায়।

—আপনি আমাকে চেনেন বলছেন? আমি কিন্তু আপনাকে একটুও চিনতে পারলাম না! তাই যদি দয়া করে আপনার পরিচয়টুকু দেন।

—পরিচয় নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু তার আগে একটু শুনে নাও। জানো, কাল তখনই আমি তোমাকে ডাকতাম, কিন্তু তখন আমার আর একটুও সময় ছিল না, অনেক কাজ পড়ে ছিল—আমার কাছে আবার কাজটাই সবচেয়ে বড়। তাই, কাল আমি একটুও আর দেরী করতে পারলাম না। কিন্তু তোমাকে আবার দেখবার জন্য তোমার সঙ্গে আর একবার কথা বলবার জন্য একটা বাসনা আমার মনে কতদিন তার রোদের মতই বেড়ে উঠেছে। তাই, আজ আমি ছুটি নিলাম, আর গুনে-গুনে সাতাশটা স্টেশন পার হয়ে তোমার কাছে এলাম।

—কিন্তু আপনি আমার খোঁজ পেলেন কি করে?

—তা তুমি নিশ্চয়ই জানতে পারবে। এখন শুধু এটুকুই বলে রাখি যে, তোমার খোঁজ করতে আমার কোন অসুবিধাই নেই, আমি যখন যেখানেই থাকি না কেন, স্টেশন গুনেই আমি তোমাকে খুঁজে নিতে পারি।

—ঠিক কিন্তু বোঝা গেল না। তবে সে যাই হোক আপনি স্বচ্ছন্দেই আমাকে তুমি বলতে পারেন। আপনি বয়সেও আমার বাবার বয়সী আর আপনাকে দেখতে—জানেন তাঁর সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে আপনার। এ ছাড়াও আপনি বা তুমি বলার মধ্যে আমি কোন ব্যাপারই দেখি না।

—বেশ শোনো, তোমার সঙ্গে আমার কিন্তু অনেক কথা আছে তাতে হয়তো তোমার অনেকটাই সময় আমি নিয়ে নেব—অবশ্য তোমার যদি বিশেষ অসুবিধা না থাকে—তোমার তো সময় খুবই কম, যদিও কাজও তেমন নেই।

—না, না আমার কোন অসুবিধা নেই। আর সময়ের জন্য তো আমি কোন পরোয়াই

করি না। নষ্ট সময়কে একটু দৌড়োলেই আমি ধরে নিতে পারি—একটু জোরে পা চালিয়ে চলাটা অবশ্য আমার আসেই না।

—তোমার সম্বন্ধে ওই রকমই আমার মনে পড়ছে যেন, তোমাকে তো একসময় আমি খুবই চিনতাম।

—কিন্তু এরকম দাঁড়িয়ে আমরা কতক্ষণ কথা বলব, আপনার তো নিশ্চয়ই বেশ অসুবিধা হবে, তাই ওই ঝাউগাছগুলোর মাঝে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে বসলে কি হয়।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, চলো বসেই কথা হবে সব।

—আপনি কি রুমালটা পেতে নেবেন, না শুকনো পাতার ওপরই বসবেন? এখানটা কিন্তু খুব পরিষ্কার।

—তা জানি, কিন্তু পরিষ্কার না হলেও আমি এমনিই বসতাম। জানো—কতোদিন আমি মাটির ওপর বসিনি। তোমার এই ঝাউতলাটায় আমার যে আজ কী ভালই লাগছে। এইসব পাতার ফাঁকে গলে আসা টুকরো টুকরো রোদ। মনে হচ্ছে বিকেলটাই যেন ভেঙে ভেঙে তার টুকরোগুলোকে এই মাটির ওপর বিছিয়ে দিয়েছে।

—আমারও এখানটা খুব ভাল লাগে। তাই আমিও প্রায়ই এখানে এসে বসি। যাক আপনি কী বলছিলেন বলুন।

—তার আগে তোমাকে বলে নিই, তুমিও কিন্তু আমাকে সমীহ করে কিছু এড়িয়ে যেও না। আজ কিছুক্ষণ তোমার ও আমার মাঝখানে বয়সের দীর্ঘ দেওয়ালটা ভেঙে দিয়েই আমরা কথা বলব, তাই তোমার বয়স যে মোটে আঠারো কিংবা উনিশ—

—এ তো ভাল কথা, আসলে কিছু আড়াল করে বলাটা আমার আসেই না। কিন্তু আমার বয়সটা আপনি জানলেন কি করে?

—তোমার হয়তো একটু হেঁয়ালী লাগবে শুনতে, তবু তোমাকে বলছি যে তোমার বয়সটা দিয়েই তো তোমাকে আমি চিনেছি। যদিও তোমাকে তোমার বয়সের থেকে অনেক বড় দেখায়, তবু তোমার বা সব মানুষেরই বয়স চেনবার অনেক লক্ষণ আছে—, সে-সব তোমাকে আমি বলতে পারতাম। কিন্তু সে প্রশ্ন তো এখানে উঠছে না। তাই ওসব কথা এখন থাক। তুমি ওই নদীর ধারের কথা বল, তুমি কি ওখানে সূর্যাস্ত দেখতে গিয়েছিলে?

—সূর্যাস্ত নিশ্চয়ই দেখেছি, দেখতেও গিয়েছিলাম—নইলে নদীর ধারেই বা অনীতার সঙ্গে দেখা হবার ঠিক করব কেন?

—কী বললে, নদীর ধারে তুমি অনীতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে? অনীতা—কোন্ অনীতা?

—কেন, অনীতাকে আপনি চেনেন নাকি?

—না, না এখন আর তাকে চিনি না। দেখলেও হয়তো পারব না, কিন্তু সে এক অনীতাকে আমি চিনতাম, কিম্বা বলতে পারো চিনি বলে আমি মনে করতাম।

—তিনি এখন কোথায় আছেন?

—সে কোথায় গিয়েছে তা আমি আর জানি না—জানো, সব মানুষকেই জীবন যে কোথায় নিয়ে চলে যায়!

—আমি কিন্তু বলব, জীবন মানুষকে শুধু কাছেই এনে দেয় যেমন ওকে আর আমাকে দিয়েছে।

—আমি বলছিলাম শেষের কথা, তুমি বলছ শুরুর কথা। জীবন যে অনীতাকে তোমার কাছে এনে দিয়েছে তা আমি মানছি। কিন্তু তারপর? ভেবেছো কি—তারপর আরও কিছু আছে? কতো তরঙ্গ আছে, ঘূর্ণি আছে, ঝড়-বাতাস আছে। ভবিতব্য তো আছেই।

—আমি ভবিতব্য মানি না, আমি জানি আমার শুধু দুটো হাত আছে। এই হাতজোড়া দিয়ে আমি পাহাড়ও উল্টে দিতে পারি। ঘূর্ণি তরঙ্গ ঝড় বাতাস ওসব এ হাতদুটোর কাছে কিছুই নয়। লোকে যাকে ভাগ্য বলে তাকেই তো আপনি ভবিতব্য বলছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস ভাগ্য হোল তাই যা আমরা তৈরী করি আমাদের নিজেদের হাতজোড়া দিয়েই।

—তোমার বিশ্বাস দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। ভালো লাগছে এ জন্যেই যে জীবন আরম্ভ করতে একটা বিশ্বাস দরকার। তুমি যে একটা বিশ্বাস নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছ সেটাই আশার কথা, নইলে তো একদিন তুমি বানের মুখে একটা কুটোর মতই কোথায় ভেসে যাবে—আমার মত এই এখানে বসে অবিশ্বাসের কথা বলতেও আর কোনদিন আসবে না।

—আপনার কথা শুনতে আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে না। জানেন, আমার বাবা আমাকে যেরকম উপদেশ দেন, কিম্বা অনীতার বাবাও যেভাবে ওকে বোঝান, তার থেকে আপনার বক্তব্য অনেক আলাদা। তাদের কথার আমি কোন জবাব দিই না, তবু আপনাকে আমি বলছি যে আপনি আর একদিন এখানে আসবেন। যেদিন ইচ্ছে এসে দেখে যাবেন আমাদের ওই নদীর ধারটায়। আমি শুয়ে আছি ওই বালির ওপর—আমার জামার বুকে কোন বোতাম নেই, দেখবেন ওর বিনুনী ও সামনের দিকে ঘুরিয়ে ফেলে রেখেছ, আমার সঙ্গে গল্প করছে আর মাঝে মাঝে আমার চুলে বালি ছিটিয়ে দিচ্ছে।

—বালি ছিটিয়ে দিচ্ছে? তাহলে তোমার অনীতা তো বেশ দুষ্টও দেখছি।

—হ্যাঁ, ও খুব দুষ্টু। আর সেজন্যই ওকে আমার আরও বেশি ভাল লাগে।

—বেশ, বুঝলাম। কিন্তু কী এত কথা তোমাদের? রোজই বিকেলে যে এত গল্প, এত কথা—তাতে সব ফুরিয়ে যাবে না?

—সে সব গল্পের কথা আপনি বুঝবেন না। আমাদের গল্পের বিষয় কি একটা? শুধু একটা চেনা হাতেই তো কতকাল কথা বলতে হয়। ও আর আমি যদি হাজার বছর ধরেও কথা বলি তাহলেও তা হয়তো শুধু শুরুর মধ্যেই থেকে যাবে। ওর শুধু হাতটা ধরে থাকলেই আমার—

—শুধু হাতটা ধরে থাকলে? শুধু হাত ধরে থাকলেই তোমার জীবন চলে যাবে? জীবনকে তুমি কতোটাই বা দেখেছ—কিই বা জানো জীবনের তুমি।

—জীবন আমি দেখতেই থাকি, তাকে আমি সুন্দর করে তৈরী করব,—অনীতাও আমার পাশে থাকবে। আমরা দুজনে জীবনকে আর জীবনের পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে নেব।

—আমি বলছি, জীবন কিছুতেই চিরদিন তোমাকে একটা অনীতার কাছে বসিয়ে রেখে দেবে না। শুধু হাতটা ধরে থাকলেও চিরকাল তার সবটাই চলে যাবে না। জীবনের বাসা দেহের মধ্যে, তাকে খুঁজতে সেখানে তোমাকে যেতেই হবে। তার দুর্বার স্রোত সব মানুষের মতই তোমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—ভাসতে ভাসতেই তুমি জীবনের কূল-উপকূল দেখবে, নোঙরের বন্দর খুঁজবে, তারপর একদিন নোঙর ফেলবে তোমার বন্দরে।

—আপনি যে জীবনের কথা বলছেন, সে তো দেহের জীবন। মনের জীবনের সন্ধান আপনি কখনও করেছেন? দেহ আর মন তো এক নয়—তাদের জীবনও নয়।

—দেহ আর মন যে কোথায় একাকার হয়ে যায় তা তো তোমার আজও জানবার কথা নয়। বধির দেওয়াল যেমন বন্যাকে চেনে না, তেমনি তুমিও আজ দেহকে জানো না। তুমি তো আমার সামনেই রয়েছ, তোমাকে আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি, তোমার সার্টের হাতার তলায় ওই জোরাল পেশী, তোমার বিশাল কাঁধের বাঁধনে উদ্দাম যৌবন, তবু তো শুধুই এক সুগঠিত বাঁধ, আর সব বাঁধেরই একদিন ভাঙন আছে, বন্যা আছে। তাই বলছি, দেহ কী তা হয়তো তুমি আজও জানো না।

—দেহ কী তা নিশ্চয়ই আমার জানতে বাকি নেই, আমার আমিদাগুলোকে আমি নিশ্চয়ই চিনি, কিন্তু তবু আমি জানি যে প্রেম আর বিশ্বাস অনেক বড়ো এই দেহের কামনার চেয়ে।

—প্রেম আর বিশ্বাস সৃষ্টির আবেগই শুধু—সৃষ্টি নয়, আর সৃষ্টিই হোল প্রকৃতির বেঁচে থাকবার প্রথম তাগিদ। তাই প্রকৃতি তার বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকেই সৃষ্টির স্পৃহার চেহারায় তার সমস্ত জীবের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছে—আমার এবং তোমার কাছেও দিয়েছে। আমাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা বিবেচনার তো কোন উপায় নেই।

—আপনার কথায় হয়তো যুক্তি আছে, তবু তাকে আমি মানতে পারলাম না।

আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না যে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমি—মানুষ। দেখুন আপনার সামনেই রাস্তার ওপারের ওই দু-সনী তেজী কুকুরটা, ওকে নিশ্চয় আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি কি বলছেন ওর এবং আমাদের মাঝখানে অন্তত সভ্যতার একটা দীর্ঘ পীচ-ঢালাই রাস্তাও চলে যায় নি? যে দেহের উত্তাপের আঁচে ও দিগ্বিদিকে হন্যে হয়ে ছোটে তার উত্তাপ কি আমার ভালবাসার রোদের চেয়েও বেশি?

—তোমার কথা দিয়েই তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব। তুমি যে রোদের কথা বললে, বলো তো রোদ্দুরের রঙ কী?

—আমি বিজ্ঞানেরই ছাত্র। রোদ্দুর এবং আলোর রঙ আমি জানি। রামধনু, স্পেকট্রাম, ভিবজিওর এ সবই আমার জানা।

—তাহলে তুমি তো জানো যে সব রঙেরই এক রঙ। ধরো, তুমি যদি তোমার অনীতার বেগুনী শাড়িটা সুনীলার নীল শাড়ি, শ্যামলীর সবুজ, কমলার কমলা রঙ আর এমনি এমনি মোট সাতটা রঙের শাড়ি একটা পিভট্-এ বেঁধে জোর-চরকীতে ঘুরিয়ে দাও তাহলে তুমি কী রঙ দেখবে? তুমি তো জানো—তুমি দেখবে শুধু আলোরই রঙ. যে আলো আসে সূর্যের থেকে, যে আলোই রোজ সকালবেলায় জানলা দিয়ে গলে তোমার ঘুম ভাঙায়, আর যে আলো-ডোবা বিকেল দেখতে তুমি অনীতারই সঙ্গে নদীর ধারে বসে থাকো। তুমি তো জানোই যে সূর্যের চেয়ে বেশি তেজ আর কিছুতেই নেই—তার শক্তিতেই আমাদের পৃথিবীটা বেঁচে আছে, আর সূর্যের আলোই হোল পৃথিবীর জীবনের স্পৃহার আদি উৎস। তুমি তো এই পৃথিবীরই মানুষ—তুমি কি সূর্যকেও অস্বীকার করতে পারো?

—না সূর্যকে আমি স্বীকার করি, কারণ ওর সঙ্গে আমার একটা আলাদা আঁতাত আছে। সেও আমাকে স্বীকার করবে। রোজ সকালে আমার ভালবাসার উত্তাপের গায়ে গা-সেঁকে নিয়েই সে তার যাত্রা শুরু করে। আমার কপালে আলোর তিলক সে নিজেই পরিয়ে দিয়ে যায়, আর আমিও সূর্যকে দিয়েছি আমারই ভালবাসার রঙ তার রামধনু তোলবার জন্যে, আর তাই নিয়ে পৃথিবীময় সমস্ত দেশে-দেশে কতো কবিতাই না লেখা হচ্ছে। কিন্তু ভালবাসাকে না জেনে, তারই উত্তাপ দিয়ে সূর্য তৈরী না করে শুধু রঙীন কাগজ কিম্বা সুন্দর কলমের প্যাঁজিতেই কী কবিতার সৃষ্টি হয়?

—তুমি কি কবিতাও লেখো নাকি?

—আমি লিখি কিছু ঠিকই, তবে তাকে আমি কবিতা বলতে রাজি নই। তবু কবিতা আমি লিখবই একদিন—একবারই লিখব।

—ঠিক বুঝলাম না।

—আমার কবিতা এখনো লেখা হয়নি। আসলে ভাষা খুঁজে পাই না। জানেন, একদিন আমি একটা মেছোঘেরীর বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়েছিলাম। সামনে হোগলা পাতার সবুজ-ভরা জলা আর জলা আর আকাশ আর দূরে। অতোখানি একটা হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে আমিই একমাত্র মানুষ। হঠাৎ আমি একটা গান গেয়ে উঠেছিলাম—একটাই লাইন তার আমি জানতাম—তবু গান তাতে থামেনি, সুরটাও ঠিক না জানায় কিছু আটকায়নি। ওখানেই অনেক সুর পড়ে ছিল—তারই কিছুটা কুড়িয়ে নিয়ে আমি আকাশের দিকে পাঠিয়ে দিলাম। সেই দূরের আকাশ আর সবুজের সুরের ভাষা আমি পাব।

আর একদিন আমি সমুদ্রের বালির পাড়ে ঢেউয়ের কিনার ঘেঁষে শুয়েছিলাম—ঢেউয়ের ডাক শুনছিলাম। আকাশের আলো-নেভা রাত্তিরে সমুদ্র ডাকছিল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কান্না আর বিক্ষোভ নিয়েই একটা প্রকাণ্ড মানুষ যেন তার পাগল তালে দুলছিল, আর কী বলছিল—আমি শুনছিলাম। শুনলাম সে বলছে, তুমিই আমি—তুমিও সমুদ্র। আমি তো সমুদ্রই তাই তার ভাষাটাও আমি পাব।

আরও একদিন ঘংসারদীর পাটক্ষেতের কিনারায় জলে আ-ডোবা একটা ভাঙা নৌকোয় বসে মেঘনা দেখছিলাম আর তার আধো-গলায় ভাষা শুনছিলাম। হঠাৎ কালো আকাশ, ঝোড়ো বাতাস, ওপারে সবুজ-দাগ গ্রামের রেখা। সামনে বৃষ্টির শাদা পর্দা। সবুজ মিলিয়ে গেল, মেঘনা দুলে উঠল, মেঘনার দোলনায় সমুদ্রই দুলে গেল, মেঘনাই সমুদ্র হয়ে গেল। মেঘনার গলায় তখন সমুদ্রের ডাক।

পাটক্ষেতের মাটি তখন জলের তলায়—ভাঙা নৌকায় তবু আমি গোটা মানুষ। আমি জানি মেঘনা আমাকে কিছু বলবে না, কারণ আমিও মেঘনা। মেঘনারই আধো-গলায় আমি অনীতার সঙ্গে কথা বলতে পারি। ঝোড়ো মেঘনার ডাকে আমিও ডেকে উঠতে পারি, আমিও সমুদ্র হতে পারি।

শেষে একদিন আনমনে পথ চলতে চলতে রিকসার ঠুংঠুং আওয়াজ শুনলাম। ফিরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখলাম, তারপর আমি যখন ওর দিনশেষের রামাহো-গানের সঙ্গে ওই খঞ্জনীর ঠুংঠুং বাজনার তাল মেলাচ্ছি তখনই একটা মিছিল আসছিল পথে। রিকসাটা নামিয়ে রেখে ও মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়ল, দূর-কাঁপানো একটা আওয়াজে ওর গলা মিলিয়ে দিল। তখন হঠাৎ শুনলাম সমুদ্রই ডাকছে!

এই সব ধ্বনি এক। তাদের আমি শুনেছি। তারা সব একদিন আমার ভাষার মধ্যে এসে যাবে—সবুজ আসবে, আকাশ আসবে, মেঘনা আসবে, সমুদ্র আসবে, রিকসার খঞ্জনী বাজবে, মিছিল ডাকবে। আমি আমার ভাষা পেয়ে যাব।

পৃথিবীর সব তল্লাকার একটা ভাষা আছে, জীবনের সব-শেষের একটা কাহিনী আছে—যার আর শেষ নেই। সেই অশেষ কাহিনীর মর্মেও আমি পৌঁছোব, কারণ জীবন আমার কাছে অজস্র পড়ে আছে, আমার সামনে পড়ে আছে, আর আছে আমার হাতের মুঠোয়। কোন পোকা-খাওয়া অভিধান থেকে আমার ভাষা আসবে না—তা আপনি দেখে নেবেন।

—শুনলাম। ভাল লাগল তোমার কথা শুনে। জানো, এমনি একটা ভাষা পাওয়ার আশা আমারও একদিন ছিল। ভেবেছিলাম সব সঞ্চয়কে তুলে রাখি, শেষে একদিন তার সবটুকু দিয়ে—কিন্তু সে-সব কথা থাক। তোমাকে শুধু এটুকুই বলছি যে সব কিছু তুলে রাখবার জন্যে রেখে দিও না, কারণ মানুষের মনের মধ্যে কোন সিন্দুক নেই। তাই একদিন তুমি হঠাৎ দেখবে যে তোমার সব কিছুই খোয়া গিয়েছে, আর তোমার অজ্ঞান্তে তোমার চোখের সামনে একটা খোলা চশমা ঝুলছে, আর তার ভেতর দিয়ে একটা ফ্যাকাশে পৃথিবীই শুধু চলছে।

—তা কখনও হতে পারে না। সজীব পৃথিবীতে আমি মানুষের সঙ্গে চলব। পৃথিবীতে ফুলে-ফুলে বারে-বারে কত রঙ। আমার মনের ছবিতেও রঙের ওপর কত নতুন রঙ এসে চড়বে, মানুষের জীবন আমাকে ক্যানভাসের পর ক্যানভাস এগিয়ে দেবে, আর সমুদ্র তো আছেই। সমুদ্র কি তার বিক্ষোভ ভুলে গেছে কোনদিন! না, যাবে কোনদিন!

—দেখো, একদিন সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে তুমি আতঙ্কেই অস্থির হবে। নদীর ধারে গিয়েও তুমি হারিয়ে যাওয়ার ভয় পাবে। সেদিন দেখবে, নদী তোমাকে কোন গান শোনাতে এখানে আসেনি, সে এসেছে শুধু সমুদ্রেই হারিয়ে যেতে, আর তুমিও এসেছ একটা অসীম সমুদ্রে হারিয়ে যেতে, যেখানে সব নদীর গানই চিরকাল মিলিয়ে গেছে। তাই বলছি, তোমার ভালই জন্যেই বলছি, যা লিখেছ তা প্রকাশ করে ফেল, যা লিখবার লিখে ফেল—যতটুকু পারো ততটাই যথেষ্ট, কারণ তোমার ধারণার অভিধানের বাইরের পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে কোন কথা নেই। মানুষের নিজের-নিজের কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়া, সেটাই আসল কথা।

—আপনার কথা মেনে নিতে পারলে হয়তো ভালই হোত। তাতে আমার গুরুজনেরা খুশি হতেন, আমার বন্ধুরা সব খুশি হোত, অনীতা তো হাততালিই দিয়ে উঠত। তাতে আমার তৃপ্তি রীতিমতো আমেজ পেত, আর আমার 'কি-একখানা-করলাম' ভেবে বুকটা বেশ ফুলেই উঠত। জানেন, সবাই আমাকে বলেছে, আপনার মতই বলেছে, একটা কিছু করে ফেলতে—সবাই আমার কাছে কি জানি কী আশাই করে, সবাই আমাকে বলে ভাল হতে—আপনার মতই বলে, কিন্তু আমি জানি ওরকম ভাল হতে আমি কোনদিনই পারব না। আমার ছোটবেলার একটা গল্প শুনুন, তাহলে হয়তো আমাকে কিছুটা বুঝবেন।

তখন আমার সেই বয়স যখন বর্ষাটের কাদাজলে গামছা ছেঁকে মাছ ধরতে গিয়ে ব্যাঙাচি পেলেও আমি খুব নিরাশ হই না। আমার মায়ের তো ভারি ভাবনা আমাকে নিয়ে। বিকেল হবার আগেই আমাকে তিনি ঠিক ধরে ফেলতেন, স্নান করিয়ে সুন্দর করে চুল আঁচড়ে একটু পাউডার মাখিয়ে তবে বাইরে বের হতে দিতেন। আমি মাঠের ধুলোয় দাপাদাপি করে কিম্বা রাস্তায় ছুটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে আবার স্নান করবার দরকার-করেই বাড়ি ফিরতাম। আর আমার চুলগুলো? আয়নায় আমি নিজে অবশ্য দেখতাম না—আমি শুধু শুনেছি। শেষে মা একদিন লোভ দেখালেন তাঁর-সাজানো সেজে যদি আমি বাড়ি ফিরে আসি তো আমাকে দু' আনা করে পয়সা দেবেন রোজ। তখন আমার পয়সার কোন লোভ ছিল না, দরকারই ছিল না—আজও নেই। তাই আমার বন্ধুরা যখন ফিট্-ফাট্ বেড়িয়ে বেড়াত, তখন আমি ফলসা গাছের মগডালে বসে দোল খেতাম, না কী করতাম।

তাই আপনাকে বলছি, ভালো হওয়ার উপদেশ আমার কোন কাজে লাগবে না, কারও হিসাবের খাতায় অঙ্ক মিলিয়ে আমি চলতে পারব না, আপনাদের ছন্দের ঘরেও ছন্দ আমি মেলাব না, তাতে চুলোর দোরেই যায় তো যাক কবিতা।

—কবিতার ওপরে আসলে তোমার কিছু রাগই দেখছি।

—তা হলেও হতে পারে।

—কেন, কবিতা বিশেষ কী দোষ করল?

—বলতে পারেন, একটা দোষ ভিড়ের। ভিড়টা যদি মানুষের হোত তাহলে না হয় ভাবা চলত যে একটা মিছিল চলবে এবার, আমি তখন একটা পতাকার খোঁজে ছুটতাম। কিন্তু এইসব পানসে কোনো সাহিত্য আর কবিতার ভিড়। জানেন, ওদের সব এক কথা—একটাই কথা, এক ছন্দ—একটাই ছন্দ, এক সুর—একটাই সুর। তবু কতো তার ইন্টি-পিন্টি। অথচ পৃথিবীতে কত কোটি কবিতাই না লেখা হয়ে গেল।

—তাতে ক্ষতি কী? যে পারে সে লেখে, যার খুশি সে ছাপে......আর দু' একটা কবিতা ছাড়া কোনো পত্রিকার যে প্রেস্টিজও নেই সেটা জানো কী?

—ওসব জানার আমার কোন দরকার নেই।

—তবু, কোটি যখন হয়েই গিয়েছে, তখন কোটি-এক কোটি-দুই কোটি-দশ-বিশে ক্ষতিই বা কী? তুমিও ওর মধ্যে ঢুকে যাও না, একেবারে হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে তাও অনেক ভালো।

—না, এই একটা বিষয়েই শুধু কোটির মধ্যে এক হওয়ার দলে আমি নেই। যদি একের মধ্যে আমি কোটিকে আনতে পারি, তবেই আমি আছি। আর আপনাকে বলছি, আপনি দেখে নেবেন যে আমি থাকবই। সেদিন কোন স্টেশানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে না—কোনো সিগন্যালও আপনার সামনে থাকবে না।

—তোমার বিশ্বাসটা আমার চমৎকার লাগছে, কিন্তু জানো, তোমার বয়সে আমারও অমনি মনে হোত। তখন ছিল। রোদের দিন, তারপর বার-বার কতো বৃষ্টি যে হোল। কতো জল যে গড়িয়ে গেল নদী দিয়ে, নালা দিয়ে। আমার বিশ্বাসগুলো সব কোথায় ধুয়ে চলে গেল। তবু আজও মাঝে মাঝে আমি লেখার চেষ্টা করি, কিন্তু দেখি ছন্দে কোন মিল নেই, ব্যাকরণ সব সন্দেহের ঘরে পোরা, আর বানানের বারোটা বাজিয়ে সময়ের কাঁটাগুলো ঠিক দাঁড়িয়েই আছে।

তাই এখন ভাবছি, আমার মেয়েটার কাছেই আবার বানান শিখব। কিন্তু দ্যাখো, আমার দুঃখটার কথা একবার ভেবে দ্যাখো, বানান শিখতে-শিখতেই আমি হয়তো একটা নদীর দিকে চলে যাব আর আমার সঙ্গীরা সব নামাবলীর লেখা-গুলোকে বানান থেকে বের করে, গর্জন করতে করতে আমার মনেই ভয় জাগিয়ে দিয়ে, খই ছিটিয়ে ছিটিয়ে আমাকে নিয়ে নদীর দিকে চলবে। যে নদীর ধারে গিয়ে একদিন আমি তোমারই মত কুলুধ্বনি শুনেছি, আর অনীতারাও যেখানে আমার চুলে বালি ছিটিয়েছে, সেখানেই কিছু ছাই ছিটিয়ে, একটা ভাঁড় ডুবিয়ে ওরা সব বাড়ী ফিরে আসবে।

—আপনার কথা শুনে আপনার জন্যে আমার বড়্‌ডো খারাপ লাগছে। আপনি যে খোলা চশমার কথা আমাকে বলছিলেন সেটা হয়তো আপনারই চোখে ঝুলেছে। যদিও আমি বয়সে আপনার চেয়ে অনেক ছোট এবং আপনাকে কোন উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না, তবু একথা আপনাকে বললাম। আমার মনে হচ্ছে, আজ আপনার মনটাই খারাপ।

—মনটা খারাপ কী ভাল তা জানি না। মন নিয়ে আজকাল বিশেষ মাথা ঘামাই না। মাথা ঘামানোর অনেক অন্য বিষয় থাকে, মনের কথা ভাবতে গেলে সব দিকেই লোকসান।

—যাক এসব কথা ছেড়ে একটা কাজ করি চলুন।

—কী কাজ?

—চলুন একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি, কী সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে. দেখেছেন ঝাউগাছের পাতাগুলো কি ঝির-ঝির কাঁপছে। নদীর পাড়ের কাছে হাওয়া অনেক বেশী—আপনার খুব ভালো লাগবে।

—ভালো লাগার কোন দরকার নেই, তোমার সঙ্গে কথা এখনও অনেক বাকি

সন্ধ্যাও এদিকে পার হয়ে গেল।

—তবে বরং একটা সিগারেট খেয়ে নিন।

—কেন তুমি খাবে নাকি? তুমি কী সিগারেট খাও?

—না, না আমি সিগারেট খাই না। আপনার জন্যেই বলছিলাম।

—তুমি কলেজে পড়ছ, সিগারেট খাও না, সে কী রকম!

—সিগারেট খাওয়া আর নোট পোড়ানো একই কথা নয় কি? যে দেশের অর্ধেক লোক দিনে একবেলাও খেতে পায় না সেখানে এটা কি একটা বিলাস নয়? আর তাছাড়া শরীরটাতো আমারই। তাকে খামোকা আমি কষ্ট দেব কেন?

—তবে আমাকে বলছ কেন?

—আপনি তো খানই। আর আপনার মনটাও আজ খারাপ—তাই বললাম।

—খারাপ ভালো দুটোরই বাইরে দিয়ে আমার মনটা আজকাল সাধারণত চলে—তুমি একথা ঠিক হয়তো বুঝবে না।

—কিছু হুইটম্যান পড়া আরম্ভ করুন আপনি—সেই যেখানটায় আছে—আই নাউ থার্টি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড ইন পারফেক্ট হেলথ্ বিগিন হোপিং টু সীজ নট টিল ডেথ!—ওখানটা ভালো করে পড়বেন, দেখবেন আপনারও মনে হবে, জীবন যে কোন বয়সে আরম্ভ করা যায়। হুইটম্যান সাঁইত্রিশ বছর বয়সে জীবন আরম্ভ করতে পেরেছিলেন। আপনি তার চেয়ে আর কতোটাই বা বড়ো?

—হুইটম্যান আমার পড়া আছে—ও লাইনগুলো আজও মুখস্ত, তবে ওতে আমার কাজ হবে না, আবেগের দুনিয়া আর সত্যের পৃথিবীর তফাৎ আমি মেপে দেখে নিয়েছে। আমি জীবনের পথ দিয়ে গিয়েছি, দেখতে দেখতে আর শিখতে শিখতে গিয়েছি—ওই পথ দিয়ে সবাইকে যেতে হবে, দেখতেও হবে। তার স্রোতের উজানে কখনও মনে হতে পারে—বাঃ বেশ তো রয়েছি! বেশতো চলেছি ভেসে। পালে অনেক হাওয়া, দাঁড়ে অনেক জোর। তারপর শুধু ঢেউ আর ঘূর্ণি—দাঁড় ভেঙে গেছে, পালে হাওয়া নেই।

—পালের হাওয়ার ভরসায় থাকলে দাঁড়ও ভেঙে যায়। ভরসা যদি দাঁড়েরই হয় শুধু,—আর দাঁড়টা যদি আদর্শের হয়, তবে কোনো ঘূর্ণিতে তার কিছু হবার নয়, সে দাঁড় ভাঙবার নয়।

—তোমাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?

—বলুন না, কথা বলবার জন্যেই আজ এখানে আসা আর এই ঝাউতলায় বসা।

—আদর্শ কাকে বলে তা কী তুমি জানো? আদর্শ নামক শব্দটাকে বড়োই অহরহ ব্যবহার করছে সবাই, তাই তোমাকে প্রশ্ন করলাম।

—এ একটা কী প্রশ্ন আপনি করলেন, যেটা আমার মনের মাঝে মনেরই উপলব্ধির বস্তু, যেটা আমার রক্তের কণায়-কণায় মিশে যাচ্ছে, তাকে কি আমি কোনো ডেফিনেশনে বোঝাতে পারব? ইতিহাসের পাতা জুড়ে দেখুন, জীবনের পর জীবন লুটিয়ে পড়ছে, তাদের সব সুখ-দুঃখ সব বাসনা-কামনার ডালি যার পায়ে সাজানো—যাকে পেতে হয় জীবন নিংড়ে, বাঁচাতে হয় বুক দিয়ে—তাকে শুধুই দু-চারটে কথায় আমি বোঝাতে পারব? না আপনিই পারেন?

—আমি তোমাকে শুধু এটুকু বলতে পারি যে, তুমি যাকে আদর্শ বলছ—তোমার আদর্শটা আমি ঠিকই অনুমান করতে পারছি, কারণ—যাক ওসব কারণ এখন থাক। যা বলছিলাম, তোমার আদর্শ হোল এক ধরনের, কিন্তু আদর্শ আবার অন্য রকমেরও আছে। জানো, মানুষ জীবটি বড়োই অসহায়। সে অনেক কিছুই করতে বাধ্য হয়, কিম্বা করে ফেলে। কিন্তু সে কখনও অন্যের সামনে হার স্বীকার করতে চায় না, কখনও সে বলে না, এই কাজটি আমি খারাপ করলাম। তাই সে তার সব কাজেরই একটা যুক্তি খুঁজে বার করে, আর তারই নাম দেয় আদর্শ। তাই আদর্শের অনেক রকমফের। তবে এটাও ঠিক যে যত রকমের আদর্শ আছে, তার মধ্যে তোমারটাই সবচেয়ে ভারি—এতই ভারি যে ওই বোঝা নিয়ে জীবনের পথে বেশী দূর হাঁটা যায় না। আজ তোমার নতুন জীবন, শক্তি অনেক, তাই বুঝতে পারছ না, কিন্তু একদিন এর ভারেই তোমার ঘাড় নুয়ে আসবে আর তখনই তুমি মাথার বোঝা নামিয়ে পথের পাশেই কোথাও তাকে একটু মাটি চাপা দিয়ে আড়াল করবে। আর সেই খালি ঝুড়ি মাথায় তুলে আবার চলবে তোমার জীবনের পথ। সেদিন তুমি বুঝবে আদর্শ আর প্রজ্ঞা এক নয়।

—এতো রীতিমতো নৈরাশ্যবাদ! প্রজ্ঞা আর নৈরাশ্যবাদ তো এক কথা নয়! আর আমার বিষয়ে যদি আপনার প্রজ্ঞাকে আপনি প্রয়োগ করতে চান তো এখন আমার আর কিছু জবাব নেই, ভবিষ্যৎই সব প্রমাণ দেবে, আপনি সেদিনই বরং দেখে যাবেন!

—আমি কিন্তু কল্পনার চোখে এখনই দেখতে পাচ্ছি।

—কী দেখতে পাচ্ছেন?

—একটু আগে যা বলছিলাম সেটাই অবশ্য আবার বলছি, সব মানুষের বেলায় যা ঘটে সেটাই দেখতে পাচ্ছি। আমি তো আমার জীবন দিয়েই দেখেছি, অন্য মানুষেরও জীবনে দেখেছি যে, দূরাদর্শের সঙ্গে কিছু রফা মানুষকে করতেই হয়। অবশ্য এমনও হয়তো হতে পারে যে, রফা করে যতটা বোঝা নামালে লোকে আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে ক্লীব বলে হাসবে, ততখানি রফা করা হোল না, কিন্তু কোন রফা না করলেও আবার জীবনের বাঁকে-বাঁকে সামনে-পিছনে সংঘাত আর সংঘর্ষ। তাতে প্রাণ যদি বা রক্ষাও পায় তবু অঙ্গ-হানি সুনিশ্চিত। তাই, কিছুটা আদর্শ ছাড়তেই হবে। আবার কিছুটা ছাড়ার চেয়ে সবটা ছাড়াই মঙ্গল—তাতে বোঝাও কমে, আর শান্তির ঘরে বিবেক এসে বারবার হানা দেয় না, জানো, তোমার আদর্শ এমনই বস্তু যে কিছুটা গেলেই তার সবটাই গেছে, তাই তখন তোমার আশ্রয় নেই, অনিদ্রা আছে। এ দুটোর মাঝখানে পড়ে থাকার গ্লানিটা যে কী তা তুমি বুঝবে না!

—তবে আপনি কি বলতে চাইছেন যে, আদর্শকে অটুট রেখে যৌবনের দিনগুলোর পারে কেউই যেতে পারেন নি?

—কেই বা পেরেছেন বলো?

—বাঃ আপনিই তো সব বলছেন, আপনিই বলুন। আপনি কি বলতে পারবেন যে, মহাপুরুষদের উত্তরজীবনও আদর্শ-চ্যুত?

—দ্যাখো, জীবনোত্তীর্ণ মানুষের কথা আমার বলা উচিত নয়, কারণ আমি সাধারণ মানুষ—তবু, আমার যা মনে হয় তাঁরাও সব খালি ঝুড়ি মাথায় করেই শেষ পথটা চলেছেন। অবশ্য হাঁক-ডাক কোন সময়ই কমতি ছিল না, কারণ, ভক্তগণ তো ছিলেনই আশে-পাশে। আমরা সবাই হয়তো প্রণামও অনেক করেছি মানুষ আসলে বড়োই প্রণাম-পরায়ণ, আর হাঁক-ডাক বেশী শুনলে কেই বা ঝুড়ি নামিয়ে যাচাই করবার সাহস রাখে বলো?

—দেখুন, অন্যের কথা তুলে আমার কথা বলতে যাওয়া হয়তো আমারই ভুল, কারণ, আমি আমিই। আমি কোনো বরেণ্যও নই, মহাপুরুষও নই, এবং ওসব হতে আমি চাইও না কোন দিন। তবু আমার যা বিশ্বাস আমার যা আদর্শ, তা আমি আমার জীবন দিয়ে বাঁচাব। আপনি হয়তো আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছেন না—আপনি তো আমার ছোটবেলাটা জানেন না, জটা-পাগলীকেও চেনেন না। জানেন, সেই জটা-পাগলীর ব্যাপারটা থেকেই এটা আমার সঙ্গে চলেছে।

—কোন্ জটা-পাগলী?

—যার চেয়ে জটা বোধহয় কখনও হয় নি,—সেই জটা-পাগলী। জানেন, ও কোন দিন পাগল ছিল না—পাড়ারই এক বাড়ির আত্মীয়া সে। বড়-ঘরেরই বৌ ছিল। একটা খুব সুন্দর ছেলে ছিল ওর। সেই ছেলে মরে যেতে ও পাগল হয়ে যায়, চুল বাঁধা বন্ধ হয়। সেই থেকে ওই প্রকাণ্ড জটার শুরু—জটাটা মাটিতে লুটিয়ে চলত। কিন্তু ও কোনো অন্যরকম পাগল ছিল না। নিজের মনেই ও বিড়বিড় করে ওর মরা ছেলের সঙ্গে কথা বলত আর হাতে টিনের কৌটো, ছেঁড়া কাগজ-ন্যাকড়া নিয়ে ও শুধু রাস্তার পর রাস্তা হাঁটত। আমার মনে হয়, ও ওর ছেলেকেই খুঁজে বেড়াত। কাউকেই ও কিছু বলত না। তবু, জানেন, আমার খেলার সঙ্গীরা ওকে দেখলেই ওর সঙ্গে লাগত, জটা টেনে দিত। কৌটো কেড়ে নিত, কিম্বা ঢিল ছুঁড়ত ওর দিকে।

একদিন তাদের সঙ্গে আমি যখন মাঠে ডাং-গুলি খেলছিলাম, তখনই হঠাৎ ওরা রাস্তায় জটা-পাগলীকে দেখে ফেলল। আর যায় কোথায়, খেলা ফেলে রেখে ওরা জটা-পাগলীর দিকে ছুট দিল। একজন গিয়ে

ডাং দিয়ে ওকে খোঁচা মারল, অন্যরা ঢিল ছ্‌ুড়তে লাগল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, কেন ওকে মারবে তোমরা? ও তোমাদের কী করেছে?

ওদের একজন বলল, কে তোকে দালালী করতে বলেছে রে! আর একজন বলল, জ্ঞান দিস্‌নি—জ্ঞানদা! বড়ো জ্ঞান দিস্‌ তুই!

আমি বললাম, কেউ তোমরা ওকে মারবে না কিন্তু; আমি মারতে দেব না!

কে তুই হরিদাস রে! ওরা সবাই একজোট হোল। জানেন, আমি তখন রোগা ছিলাম— ওদের দ্‌ুজনের সঙ্গে পারলাম না। ম্‌ুখে অনেক ফোলা দাগ আর জামায় কিছ্‌ু রক্ত নিয়ে বাড়ি এলাম। কিন্তু মনে রাখবেন, তখন আমি সাত! আর আজ আমি সতেররও অনেক বেশি! আজ আমার যা ন্যায় মনে হয় তা করতে, দ্‌ুনিয়ার অত্যাচার দ্‌ূর করতে, গোটা প্‌ৃথিবীর সঙ্গেও আমি একলাই লড়্‌তে রাজি কোথাও কোন রফা নয়! তব্‌ু আজ আমি আর একাও নই—ওরাও দল বে'ধে আমার সঙ্গে আসছে সব!

—কারা আসছে? কাদের কথা বলছ তুমি?

—আমি তাদের কথা বলছি, যাদের দল না বে'ধে আর উপায় নেই। তাদেরই কথা বলছি যারা রিকসা টানে, যারা মেশিন চালায়, মেশিনের চাকায় পিষে গেলে তাদের বো ছাড়া আর কেউ কাঁদবার নেই। তাদের কথা বলছি, যারা বর্ষা-বাদলায়

খুন্টি মাথায় মাঠের কাদায় ধান রুইতে যায়; আর ফসল উঠলে অন্যের উঠোনে মরাই বেঁধে দিয়ে খালি ঝুড়ি আর ভাঙা কুলো বয়ে চুপি চুপি বস্তী ফিরে আসে। তাদের কথা বলছি যারা চিরকাল আছে বুটের তলায়! যারা জটা-পাগলীর চেয়ে আরও আরও অসহায়— আমি তাদের কথাই বলছি!

—তোমাকে একটা কথা বলব—কিছু মনে করবে না তো?

—বলুন না, মনে করা-করির কী আছে?

—শোনো, তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না, তুমি কিন্তু বড্ডো উতলা হয়ে পড়েছ!

—এসব কথায় যদি উতলা হয়ে পড়ি তো তা বেশি কিছু হোল কী? এসব কথা ভাবতে আমি শুধু উতলাই নয়—আমি পাগল হয়ে যাই।

—শোনো, আবেগের মুখে তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, এর একটা অন্য দিকও আছে।

—না, এর কোনো অন্য দিক নেই, এই-সব জুলুমের কোনো জবাব নেই—কোনো সাফাই নেই। সাফাই কিছু আমি শুনতেও রাজী নই!

—শোনো, তুমি অযথাই আমার ওপর রাগ করছ। আমি তো বলছি না যে, জুলুম ভালো। আমি শুধু বলছি যে, পৃথিবীতে কিছু সত্যিকার হতভাগা ছাড়া বাকি সব মানুষই জীবনের হার-জিতের খেলা খেলতে নামে। যে হারে, তার চোখে জল দেখে আমাদের দুঃখ লাগে। তবু খেলার যে একটা ফলাফল আছেই, সেকথা মনে রাখলে শোক কমে। আর যে জেতে, সে তোমাকে তার ট্রফিগুলো কিছুতেই দেবে না, এবং তার আপন মানুষকে সেই ট্রফিগুলো, এমন কি উত্তরাধিকারেও দিয়ে যেতে চাইবে। পৃথিবীতে এ নিয়ে বারবার কতরকম পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কেউ ওসব কখনও ছাড়তে রাজী নয়—কোনো সমাজেই নয়। মানুষ জীবনে তার খেলা খেলতে আসে—খেলা সে খেলবেই। যে জিতবে সে মেশিন বানাবে, যে হারবে সে মেশিন চালাবে। সাম্যের বাগানে তাই অসাম্যের আগাছাই রোজ-রোজ বড় হচ্ছে।

—আর সে জন্যই আমার কাজ যে আরও কঠিন, তা আমি জানি। আর কঠিন বলেই আমাকে তো আরও বেশী টানছে। আমিও তো জীবনে আমার খেলা খেলতে নামছি—সে খেলা যত কঠিন, যত বড়, আমার জয়ের তৃপ্তিও ততটাই হবে। আমার খেলাটা হোল নতুন পৃথিবী গড়বার খেলা। তার বাজীর দানে আমার জীবনটাই ধরা, আর সেই পৃথিবী আমি গড়েও দিয়ে যাব দেখবেন, মানুষের চোখের জলের কোনো নদী আর বইবে না জীবন-জোড়া অন্ধকারে আর সে পথ হাতড়ে বেড়াবে না—আলোর পতাকা নিয়ে আমিই পথ দেখিয়ে দেব—আমিই চলব সামনে।

—এক অর্থে তোমার কথা আমি মেনে নেব, সেটা হচ্ছে তুমি ওদের সামনেই চলবে—অর্থাৎ, সামনে চলার বাসনা তোমার আছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে বোধ হয় চলতে তুমি পারবে না, কারণ তুমি এসেছ অন্য সমাজ থেকে, তোমার আজন্ম অভ্যাসগুলোই তোমার সামনে পথ আগলে দাঁড়াবে। ওদের সঙ্গে চলতে গেলে তোমাকে ওদের সঙ্গে বসতে হবে, ওদের সঙ্গে খেতে হবে। পারবে তুমি শালপাতায় পান্তাভাত খেতে? পারবে তুমি মশা-কিলবিল, মাছি-ভনভন নর্দমার একহাত দূরে উপুড় হয়ে বসে পরম সুখে খৈনী টিপতে? ওরা পারে, কারণ ওরা ওখানেই জন্মেছে, ভাগ্যকে ওরা স্বীকার করে নিয়েছে—অর্থাৎ ওদের দুর্ভাগ্যের জন্যে তোমার মত ওরা সচেতন নয়।

—আমি তবে আছি কিসের জন্য! রিকসার ঠুং-ঠাং খঞ্জনীর মধ্যে আমি তো শুনেছি সেই সমুদ্রের ডাক। আমি গিয়ে তাকে বলব, তোমার মধ্যেও সমুদ্র আছে, তা হয়তো তুমি জানো; সেই সমুদ্রকেই তুমি ডেকে নিয়ে এস, আমার সঙ্গে সমুদ্রের মতই এগিয়ে চল। ভাগ্য যেন ওরা আর চিরদিন বসে থাকবে না, ওদেরই কেড়ে নেওয়া দুমুঠো ধানের তৈরী মন্দির-মসজিদ-গীর্জার ঝুটো-মুঠো বয়ানে সমুদ্রকে আর ঠেকানো যাবে না।

—তুমি তো ভাগ্য মানো না, তুমি কি ঈশ্বরও মানো না?

—আমার ঈশ্বর মানুষ। ধর্ম—জীবন।

—আর, তার কাজ?

—কাজ অনেক আছে, তার মধ্যে প্রথম হোল একপাল পাগল-মাতালের হাত থেকে পৃথিবীর হাল কেড়ে নেওয়া।

—মাতাল-পাগল কোথায় দেখলে, তুমি কাদের কথা বলছ?

—কেন, আপনিও তো দেখেছেন, আপনি ডালহৌসিতে যান না? সেদিন আমি গিয়েছিলাম, দেখলাম একগাদা লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে চীৎকার করছে—হে রুপেয়া দশ! হে রুপেয়া দশ! আমি ভাবছিলাম ব্যাপারটা কী? আর, অবাক হয়ে ওই কাণ্ড দেখছিলাম। তখনই ওদের একজন পাগলের মত আকাশে হাত ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠল, হে রুপেয়া বাবা! হে বাবা! তখনি হঠাৎ একটা তুমুল সোরগোল পড়ে গেল আর সব লোকগুলোই হে বাবা! হে রুপেয়া বাবা! বলে নাচতে লাগল। আপনি কি বলছেন, ওরা সব উন্মাদ নয়? মাতাল নয়? শুনলাম, ওরাই নাকি মানুষের সুখ-দুঃখের নদীতে জোয়ার-ভাটার তুফান তোলে তেজী-মন্দার টানে, পৃথিবীর নৌকোর হাল ধরে ওরা ডাইনে-বাঁয়ে টাল-মাটালে চালায়।

—এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, তুমি শেয়ার মার্কেটের কথা বলছ। ওই লোক-গুলো হোল শেয়ার বাজারের দালাল, আর, কেউবা হয়তো শুধুই ফাটকা খেলতে এসেছে। ওরা সবই চুনো-পুঁটির দল। ওদের পেছনে অবশ্য কিছু রাঘব-বোয়ালও আছে, তারা মাঝে মাঝে আবার এদেরও খেয়ে নেয়। তবে ওই শেয়ারমার্কেট বন্ধ হয়ে গেলেও আবার অনেক গোলমাল। তাতে অর্থনীতির বাজারে সংকট আসবে, বেকারী বাড়বে আর অনেক মানুষই খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে।

—কষ্ট আর দুঃখ কী এমনিতেই কম আছে? আপনি তো অনেক দেখেছেন—আপনিই বলুন! যখনই একটা পড়ে থাকা কাজের কথা উঠবে, তখনই এই একটা কথা, তবে কী করে সব চলবে? তাতে আরও কত রকম যে অসুবিধা হয়ে যাবে!

—যাক, বলো আর কী কাজ?

—পরেরটাই আগের কাজ, আর এই এক কাজেই সব কাজ মিটে যাবে। আপনি তো এত দেখছেন, তাই আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, এই যাকে সভ্যতা নাম দেওয়া হয়েছে, তার গায়ে আজ কত ক্ষত—কত গ্লানির দাগ ওর জরাজীর্ণ শরীরে। আজ কতোকাল হয়ে গেল এর নাভিশ্বাস উঠেছে, কতোকাল ধরে এ শুধু ধুঁকছে আর ধুঁকছেই, তবু কিছুতেই ও আর একটু বাঁচার আশা আর একটু ভোগের লোভ ছাড়ছে না। নিওন আলোর ঝলমল অন্ধকারে কানাগলির মাথায় দাঁড়িয়ে শিফনের রঙীন চটকে মুখে-গালে রং মেখে এখনও ও যৌবনের ইশারা দেখিয়ে যাচ্ছে। তবু ও নিজেই জানে, যখন ও মাঝ-পথে মানুষের সঙ্গে কোন রফা করে নি—তখন থেকেই জানে, যে ওর নিজের কবরটা ও নিজেই খুঁড়ে রাখছে। তবু জীবন-যন্ত্রণা যুগযন্ত্রণা এইসব আলগা মাটি-ঘাসের চাপড়ায় ওর কবরের একটার পর একটা ক্রাইসিস্‌কে ও আড়াল করতে চাইছে। তাই, আজ ওর ভালর জন্যেই ওকে সেই কবরে নিয়ে যেতে হবে। আর, তাতে যদি ও সহজে রাজী না হয়, তবে সেই সমুদ্রকেই ডেকে আনতে হবে—পৃথিবী চলে যাবে তার জলের তলায়। তারপর সেই জল যখন সরে যাবে, তখন সেখানে নতুন পলি, আরেক সবুজ, নতুন পৃথিবী। তবে নিচে ও আবার একটা মহানজোদারো হয়ে গেছে।

জানেন, আমি আমার চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি যে, একদিন আবার একে মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে—আজকের এই স্কাইস্ক্রেপার রকেম-টাওয়ারগুলো দেখতে খুব ভিড় জমেছে মানুষের, পুরাতত্ত্বের জোর গবেষণা চলেছে, কিন্তু আজকের এই অদৈ হতাশা, আজকের এই অন্ধকার বেদনা এ শুধু আমরাই দেখে রাখছি।

—শোনো, সে সব তো হোল অনেক দূর-দিনের কথা! তার চেয়ে আরও কিছুটা পিছনের এই বর্তমানের কাছে এসে কথা বলো। এই সভ্যতা আর সমাজের যেসব গ্লানিগুলো দেখে তোমার মন আজ এত দুলে উঠেছে, সেগুলো সবই সেদিন মিলিয়ে যাবে কী? আমি জানি তোমার উদ্দেশ্য মহৎ—সেখানে কোনো ভেজাল নেই। তাতে

আমি কোনই অবিশ্বাস রাখছি না। তাই আমি ধরে নিচ্ছি তুমি সফলও হবে। তখন এক অধ্যায় শেষ হয়ে অন্য অধ্যায় শুরু। সেদিনের পৃথিবী কেমন হবে তা তুমি ভেবেছো কী?

—তারপর শুধু সুন্দরের দিন—নতুন পাতার ওপর সবুজ, পরিচ্ছন্ন নতুন পৃথিবী, নতুন পথ-ঘাট। তার সমতলে সমান মানুষ ঘাড় সোজা রেখে কাজ করে, হাসে আর সুখের ঘরে গান গায়, তার আর আকাশের মাঝখানে কোনো ছাদের আড়াল নেই। আমিও তাদের মধ্যে কাজ করি আর গলা মিলিয়ে গান গাই—কোথাও কারও চেয়ে আমি উঁচুও নই, নীচুও নই।

—তুমি হয়তো খুব দুঃখ পাবে শুনে, তা কিন্তু হয় না। পৃথিবীর যে কোন সমাজে যদি অনেকগুলো তলা না-ও থাকে, তবু দুটো তলা তার থাকবেই, আমরা এসব দেখেও নিয়েছি। জানো, এই পৃথিবীতে তোমারই মত আরও অনেক মানুষ এসেছিল, আলোর পতাকা তাদের হাতেও ছিল, কিন্তু তাতেই সব কাজ মিটে যায় নি। তাই তাদের মতই তোমারও দল চাই, সংগঠন চাই, নিয়মাবলী চাই, কর্মসূচী—ম্যানিফেস্টো চাই। তারপর শ্রেণ্ডের জীবন। সে জীবনও তোমার একদিন শেষ হবে। তখন ঘাম মুছে, রক্ত ধুয়ে উৎসবের দিনে তোমাকে মঞ্চের ওপর উঠতে হবে।

—মঞ্চে আমার কোনো প্রয়োজন নেই—সমান মানুষের মধ্যে সমান মাথা হয়েই আমি দাঁড়াতে চাই।

—তা হয়তো সত্যি, কিন্তু সমান মাথায় দাঁড়িয়ে তো সামনের তিনটে মানুষকেই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। তাই মঞ্চে তোমাকে উঠতেই হবে—আর, তুমি যদি তাতে দ্বিধা সংকোচ কিম্বা অনিচ্ছায় ইতস্ততঃ কর, তাহলে অনেকেই তোমাকে হাত ধরে মঞ্চে তুলে দাঁড় করিয়ে দেবে। সেখানে তখন বেড়া বাঁধা হয়েছে, ব্যাণ্ড বাজছে, মালা এসেছে, আরও এসেছে নিরাপত্তার সাদা-পোশাকের পকেটে পকেটে অনেক রিভলবার। তখন তুমি মঞ্চের ওপর থেকে কাছের মানুষ-দূরের মানুষ সবাইকে এক লহমায় চোখ বুলিয়ে দেখবে—তোমার একেবারে সব অন্যরকম লাগবে। তখন নিজের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার তুমি জনতার দিকে তাকাবে। জনতা রয়েছে তোমার অনেকটা নিচে, তাই সেদিকে দেখতে তুমি নিচু তির্যকে তাকাবে, তাদের দৃষ্টির পথ ধরে আমার নিজের দিকেই তুমি উঁচু-তির্যকে দেখবে। তখনই তোমার মাথা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠবে। তুমি দেখবে তোমার মাথা তখন আকাশকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তখন তোমাকে তোমার নিজেরই বেশ ভাল লাগবে। তোমার মালার গন্ধে তখন আকাশ আকুল, আকাশ-জোড়া ওই ফুলের গন্ধে তুমিও আকুল হয়ে উঠবে। তোমার মনে হবে—তোমার ঠিক মনে হবে, তোমার গলার মালায় ছাড়া ওই নিচু পৃথিবীতে আর কোন ফুল নেই। বনে নেই, মনে নেই, বাগানে নেই।

সেই উঁচুর থেকে যখন আবার তুমি নিচের দিকে তাকিয়ে জনতাকে দেখতে যাবে, তোমার শ্রেণ্ডের জীবনের সাথীদের খুঁজতে যাবে, তখন হঠাৎ দেখবে মানুষও সব কোথাও নেই। তার বদলে শুধু কিছু রেখা আর পরিধিই পড়ে আছে। অত উঁচুর থেকে পাখি-চোখ চাউনীতে শুধু কেন্দ্র, বৃত্ত, অন্তর্বৃত্ত, ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এই সবই দেখা যায়, আর ও সবই হচ্ছে দুই-মাত্রার ব্যাপার। অথচ একদিন তুমি মানুষকে তিন-ডাইমেনসনেই দেখেছো! এমনকি, হৃদয় প্রাণ আদর্শ এই সব আরও কতো মাত্রা তার মধ্যে তুমি খুঁজে পেয়েছ।

তখন তোমার কানে আর কোন বিপ্লবের খঞ্জনী বাজছে না, জনতার সমুদ্রের গুরু গুরু ডাকে তোমার বুকেও দুরু দুরু। তোমার তখন মনে হবে—তোমার নিরন্তর মনে হবে যে, ওই নিচের পৃথিবী থেকে অজস্র হাত তোমার গলার দিকেই উঁচুতে উঠে আসছে কোনো মালা পরাতে নয়, মালাটা খুলে নিতেই। অথবা, আরও কিছু কী মতলব আছে? সেই অথবারই কল্পনায় তুমি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে উঠবে, আর তোমার আলোর পতাকার কালো লাঠিটা টেনে নিয়ে ওই হাতগুলোকে ভেঙে ভেঙে তুমি মাটিতে ফেলতে থাকবে, আর আকাশের দূরে আরও দূরে কিনারায় সরে যেতে চাইবে। সেখান থেকে কোনদিন আর মানুষকে একটুও দেখা যায় না—একটুও চেনা যায় না।

তখন হয়তো আটচল্লিশ কিম্বা আটষট্টিটা ঘরের এক বিপুল প্রাসাদে তুমি তোমারই নিরাপত্তার হাতে বন্দী। আটজন আটচল্লিশ দেহরক্ষীর সজাগ পাহারা তার দরজায় দরজায়। তখন তোমার আর কোন অনীতা নেই, কোনো নদীর ধার নেই, তোমার চুলে বালি ছিটোবার মত মাথাও কারও খাড়ে নেই। আর সেদিন যদিই বা কোনো ভুলের খেয়ালে অনীতাই তোমাকে আবার খুঁজতে আসে, তাহলে ভিজিটিং কার্ডে সই করে তাকে আটচল্লিশ দিন বসে থাকতে হবে—আর তার মধ্যে কতো বিকেল গড়িয়ে যাবে নদীর ধার দিয়ে, কতো ঢেউ চলে যাবে তোমার পাড় দিয়ে, কত সকাল ফিরে যাবে তোমার বন্ধ জানালার গা দিয়ে।

তোমার আদর্শ তখন শুধু একটু মাটির আড়ালেই নেই, কোনো সেফডিপোজিট ভল্টেও নেই, পুরো দেওয়ালে পুরে তাকে তখন পাকা গাঁথুনি করে দেওয়া হয়েছে নিভাঁজ পলেস্তারার ওপর রঙ-মেলানো চুনকামে বেমালুম করে দেওয়া হয়েছে।

—শুনুন, একটা কথা বলব কিছু মনে করবেন না তো?

—না, মনে কী করব, কথা শোনবার জন্যেই তো এসেছি, আর আমার যে আজ ছুটি তা তো তোমাকে আগেই বলেছি।

—কিন্তু রাত যে অনেক হয়ে গেল, সেই কখন আমরা বসেছি মনে আছে? তখন সেই বিকেল সবে পড়োপড়ো—আকাশে একটু রোদও ছিল; আর এখন দেখুন চাঁদটাও মাঝ আকাশ পার হয়ে গেছে।

—ওঃ! তোমার তো আজ একটা লোকসানই করে দিলাম! আমার কিন্তু সত্যিই মনে ছিল না।

—লোকসান আবার কী?

—অনীতার সঙ্গে আজ তুমি দেখাই করতে পারলে না, তাই বলছি।

—না, না, ও কিছু একটা ব্যাপারই নয়, আর ও ছাড়া কালই ওকে বলে রেখেছিলাম আজ আমার একটা কাজ আছে।

—কী কাজ ছিল, বলোই না শুনি!

—না, বিশেষ কিছু বলবার মত নয়—আচ্ছা আপনার গাড়ী কটায়?

—গাড়ীর জন্য কিছু ভেবো না, গাড়ী অনেক আছে, কিন্তু তোমারই সত্যি বড্ডো দেরী হয়ে গেল। তোমাকে একটু আনমনাও দেখছি! আমি কি তোমার মন খারাপ করে দিলাম?

—না, মন আমার খারাপ হয় না, কিছুতেই হয় না, আমি শুধু আপনার কথাগুলোই ভাবছিলাম।

—কী ভাবছিলে—আমাকে তুমি ভুল বুঝলে না তো?

—না, আমি ভাবছিলাম সেই নতুন পৃথিবীটার কথা, ভাবছিলাম সেখানে আমার জায়গাটা কোথায় হবে। অবশ্য এটা খুবই সম্ভব যে আমি হয়তো সেই পৃথিবীতে আর আসবই না, হয়তো ট্রেঞ্চের সেই ভিজে মাটিতে কিম্বা মাঠের ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে তারা দেখতে দেখতে আমি তাদের দেশেই চলে যাব। কিন্তু যদি আমি আবার ফিরেই আসি, আর পৃথিবীর মানুষের মাঝে ঘর বেঁধে থাকতে যাই, তাহলে কোথায় আমি থাকব সেটাই ভাবছিলাম।

—তাই নাকি, কোথায় থাকবে ঠিক করলে?

—ভেবে দেখলাম, আমি কামারশালারই থাকব, কারণ আপনার কথা হয়তো ঠিকও হতে পারে যে মানুষের সুখের ঘরে দাবার ঘুঁটি বারবার চালা হয়েছে এবং আবার তা হতেও পারে। তাই, সেই নতুন সভ্যতাও যদি সেই খেলাই ফের খেলতে যায়, তাহলে তাকেও আবার কবর দিতে হবে, আর তার জন্যে অনেক ঝুড়ি-কোদাল চাই। তাই আমি কামারশালে বসে কোদালই তৈরি করে যাব। কিন্তু এসব তো হোল গিয়ে আমার কথা, আপনার কথাটা কিন্তু আমি একটুও বুঝছি না। দেখুন, সেই কতোক্ষণ যে আমরা বসে আছি—তখনও সূর্য ছিল বিকেলের গায়ে, তারপর চাঁদ উঠল, ঝাউবনের মাথা ডিঙিয়ে এতক্ষণে তা বাঁধের দিকে চলে গেল, শিশিরে আমাদের জামা কাপড় সব ভিজে নরম হয়ে এল—সেই কতোক্ষণ যে আমরা বসেছি আর কথা বলছি—আমি কতো কথা বললাম, আপনি কতো বললেন, কিন্তু এর মধ্যে তো একবারও আপনি আশার কথা কিছু শোনালেন না। আপনি নিজে আপনার সামনের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবছেন আর ভাবছেন, পিছনের দিকে ঘাড় ফিরিয়েও বার-বার তাকাচ্ছেন আর আপনার অতীতটাই আমাকে কতোবার দেখাচ্ছেন। আপনার কী ধারণা, তাতে আমার মঙ্গল হবে? আপনি তো বলেছেন আমার মঙ্গলই আপনি চান!

—আমি এখনও বলছি তোমার মঙ্গলই আমি চাই। এমন কি তোমার মঙ্গলকে আমি আমারই মঙ্গল বলে মনে করব, তবে তোমার সঙ্গে কেন যে আমি দেখা করতে এসেছি তা তোমাকে আমি পরে বলব।

—আমি কিন্তু বলে রাখছি যে আমার মঙ্গলের জন্য আমার বিশ্বাসকে আমি ছাড়তে পারব না।

—না, তা তোমাকে আমি বলছিও না। তোমাকে আমার শুধু এইটুকুই আছে বলবার যে, তুমি যেন তোমার জীবনের পথগুলো সব দেখে চলতে পারো—কিছু বিশ্বাসের আলো হাতে না থাকলে তুমি তা পারবেও না। জানো, বড়ো ঝড়-বাদল এই পৃথিবীতে, পথ বড়ো অন্ধকার। জীবনের বাঁকে-বাঁকে অনেক ক্ষয়, অনেক ক্ষতি। তাই আলো কিছু সঙ্গে চাই, তা যেমনই হোক না কেন।

—এবারে আপনাকে চিনতে আমার আরও কষ্ট হচ্ছে। আসলে আমি কিছু বুঝছিই না।

—আমিই তোমায় চিনিয়ে দেব এবং সব বুঝিয়েও দেব। তুমি তো জানো আমার বাড়ি সেই সাতাশটা স্টেশন দূরে।

—তা তো শুনেছি, কিন্তু তারপর?

—আগে আমার বয়সটা শোনো—আচ্ছা তুমিই বলো দেখি তোমার কী মনে হয়?

—আমার মনে হয় আপনি আমার বাবার বয়সীই হবেন।

—তা হয়তো হবো। আচ্ছা, আগে তোমাকে আমার ছেলেবেলার কথাটা বলি। আজ তুমি আমাকে যে রকম দেখছ, তখন কিন্তু আমি এরকম ছিলাম না। আমার যখন তোমার মত বয়স তখন আমারও জীবন ছিল খুশিতে ডগমগ, আমার পেশীতেও তখন মাগুর মাছের কিলবিল ঝাঁক, দুটো হাত দিয়ে পাহাড় উল্টে দেবার ভরসা আমারও ছিল। আদর্শ ছিল, ছিল বিশ্বাস। আমার আকাশে কোনো কালো মেঘ কখনও ভাসত না। একজন—হ্যাঁ তারও নাম অনীতা, সে আমার সঙ্গে নদীর ধারে বসে তার ইচ্ছের-খেলা খেলত।

আমাকে সবাই খুব ভালবাসত, তবে বাবা আমাকে সবচেয়ে ভালবাসতেন। যদিও আমার বিশ্বাস ও আদর্শকে তিনি ঠিক চিনতে চাইতেন না; কিম্বা এও হতে পারে যে তাঁরই বিশ্বাস ও আদর্শকে অনেক পিছনে ফেলে অসবার জন্য তিনি তাদের আর চিনতেই পারতেন না, তবু আমাকে তিনি অন্ধের মতই ভালবাসতেন। আমি তখন তোমার মতই ছোট, কাজেই আমার বাবার সামনে তখনও অনেকটা জীবন পড়ে ছিল। সেই জীবনের চেহারাটা কেমন ছিল তা আমার ঠিক জানা নেই, কিম্বা এও হতে পারে যে তখন তাকে আমি চিনতাম না বলেই আজ আমি তাকে ভুলেই গেছি—তবে বাবা যে তাকে খুব ভয় করতেন সেটুকু আমার আজও বেশ মনে আছে।

তারপর একদিন দেখলাম—বাবার চোখে জলের ধারা। তখন আমি জীবনের পথে নামলাম। তোমাকে তো আগেই বলেছি যে তখন আমার বিশ্বাস আদর্শ সবই ছিল। সেই সব সঙ্গে নিয়ে আমি জীবনের মধ্যে দিয়ে চললাম। কোন বেড়া তখন বেড়া নয়, কোনো পাহাড় আর পাহাড় নয়, আমার জীবনের পথ তার ওপর দিয়ে সহজে চলে যায়—একটা জীবন থেকে আর একটা জীবনের মধ্যে সহজে চলে যায়।

সেখানে ওরা আমার দিকে এগিয়ে এসেছে। কখন এসেছে তা আমি ঠিক জানি না—ওরা কোনো ব্যান্ড বাজিয়ে আসেনি, সামনা-সামনি আসেনি, চুপি চুপি কখন সব এসেছে আর একটু একটু করে মজা হয়েছে অন্ধকারের মধ্যে, কতক্ষণ কিম্বা কতোকাল ধরে ফন্দী এঁটেছে আর আমাকে একলা পাবার জন্যে বসে থেকেছে জানি না।

আমি কিন্তু একাই হাঁটতাম। রুটির জন্যে হাঁটতে গেলে একা চলতে হয় আর ক্ষিধের মধ্যে চলতে গেলে ঘাম মুছতে হয়। একটু একটু করে তাই আমার দেহে ঘাম ঝরতে লাগল। আমি ঘাম মুছলাম, সাহসের কাঁধে হাত রাখলাম। ক্লান্তিকে বললাম, তুমি সরে যাও! যদিও আমার পথের বাঁকে বাঁকে ক্ষুধা, তবুও তোমাকে আমি আমার কাছে ঘেঁষতে দেব না—আমার পথ ছেড়ে তুমি দূরে হয়ে যাও! কিন্তু ও এক নাছোড় বাবাজী পিছনে পিছনে ও চলছে তো চলেছেই। মাঝে মাঝে এগিয়ে এসে গায়ে ঠেকতে চায়।

তারপর কখন বৃষ্টি নেমেছিল টিপ-টিপ—ঝির ঝির। রাস্তা অন্ধকার, আকাশটা অন্ধকার; চাঁদ ওঠেনি, তারা ফোটেনি কোনো। সেই অন্ধকারের তলা দিয়ে গলে সেই নাছোড়-ক্লান্তি এসে কখন আমার গায়ে ঠেকে গেল। বুঝলাম আমার এবারে কিছু ঘুমের বড়ো দরকার, দুখানা রুটির বড়ো দরকার, এবারে একটু আশ্রয় পেলে ভাল হয়। আর তখনই ওরা বুঝল, এবার ওদের মওকা। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এসে ওরা সব আমাকে হঠাৎ ঘিরে ফেলল। সেই অন্ধকারে ওদের সব ভাল চেনা যাচ্ছিল না, তবু কয়েকজনকে চিনতে পারলাম। ওরা সবাই আমার ওপর একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর ওদের সঙ্গে কতক্ষণ যে যুঝলাম তা আমি জানি না। মনে হয় জীবনের অর্ধেক একটা রাত্তির জুড়ে ওই লড়াই চলল। এর মধ্যে আমার ক্লান্তি গিয়ে ওদের দলে যোগ দিল, আমার ক্ষুধাও গিয়ে ওদের সঙ্গে হাত মেলাল, আর একা অন্ধকার-নির্জনে শেষে একসময় আর আমি
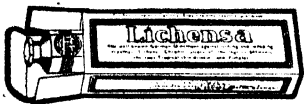
পারলাম না। ওরা আমার বিশ্বাসটা বের করে নিয়ে পথের মধ্যে আমার দেহটাকে ফেলে রেখে গেল।

তারপর কী করে জানি, আমার দেহটা আবার উঠেছে। আবার সে কাজ করতে গিয়েছে। খাবার সে অবশ্য খেয়েছে, কিন্তু তার রুটিনে আর কোন ছুটি নেই—আকাশ দেখবারও ছুটি নেই। আকাশ এখন আর দেখবার দরকারও নেই, ঝোড়ো মেঘনারও কোনো কারবার নেই তার কাজের খাতার কোনো কোনো ফর্দে কি ফাইলে। বিশ্বাস-হীন দেহের জোগানে শুধু রুটিরই দরকার।

তবু, কাল তোমাকে নদীর ধারে দেখে আমার সব মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল আমার—আমাকে। মনে প্রশ্ন এল, আমি কেন এসেছিলাম—কি জন্যে এসেছিলাম, কী করেছি আমি, কী করা হয়নি, কী চেয়েছি, কী পেয়েছি, আমি। তোমাকে দেখে আমার হঠাৎ মনে হোল আমার আজ যা আছে তা হয়তো তোমার কিছু কমই আছে, তবু তোমার যা আছে তা আমার একটুও নেই।

—দেখুন আপনার কথা যা শুনলাম আর আপনাকে যা দেখছি, তাতে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে একেবারে নিরাশ হবার মত কোন কারণ আপনার নেই।

—সেই কথাই আমি কাল থেকে ভাবছিলাম।

—তাহলে আপনি তা করছেন না কেন? আপনি যদি সামনে চলতেই চান আর আমাকে সঙ্গী পেলে আপনার যদি কোনো সুবিধা হয় তাহলে আমাকেই আপনার সঙ্গে নিন না, দেখবেন আমি আপনার অনেক কাজে লাগব। আমার চেনা-অচেনা অনেক লোকের আমি অনেক কাজ করে দিই, কারণ কাজ করতেই আমার খুব ভালো লাগে। অবশ্য আপনাকে যা বললাম, তা আমি কাউকে বলতাম না, আপনাকে বললাম এ জন্যেই যে আমার চেনা সব লোকের থেকেই আপনাকে আমার একেবারে অন্যরকম মনে হয়েছে।

—না, আমার সঙ্গে চলে তোমার কাজ নেই, তুমি বরং তোমার নিজের পথেই চলো। আমি জানি যে তোমার পথ কিছু সহজ নয়—অনেক হতাশা, অনেক দুর্ভাগ্য, অনেক ঠিক, অনেক ভুল ওখানে সারি দিয়ে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে। তবে তুমি নিজেই সেগুলোকে দেখতে পাবে, আর তোমার প্রাণের শক্তিতে তাদের সব সামাল দিতে পারবে। তোমার জন্য কোনো ভয়ও আমি করি না, কারণ তোমার বয়সটাই যে বারবার মোড় ঘুরিয়ে পৃথিবীকে পথ দেখিয়ে চলেছে।

—আমাকে যদি আপনার উৎসাহই দেবার থাকে তাহলে এতক্ষণ আমাকে এত সব হতাশার কথা শোনালেন কেন? আমাকে খুঁজে-খুঁজে এত দূরে এসে আমার সঙ্গে দেখাই বা কেন করলেন তাও তো আমাকে এখন বলেননি!

—হ্যাঁ, সেটা নিশ্চয় সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। সে প্রশ্নের জবাবও তোমাকে নিশ্চয় দেব। তোমাকে তো আগেই আমি বলেছি যে তুমি আমার খুবই চেনা, একদিন এমন কি তোমার নিশ্বাসটাকেও আমি চিনতাম, তোমার বিশ্বাস তোমার আদর্শ এ সবই আমার জানা ছিল তবু সেসব তো অনেক দিনকার কথা! আজ তার অনেকটাই আমি ভুলে গিয়েছি। তাই সেই-সব আবার জানবার জন্যে বারে-বারে আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি, আমার নিজের মত এবং তোমার বিরুদ্ধ মত সবই তোমাকে শুনিয়েছি। তোমার সব কথা জানবার আমার প্রয়োজনও ছিল, কারণ সব শেষেরই একটা শুরু চাই।

—এটা কি খুবই একটা হেঁয়ালী হোল না? আমার সঙ্গে এই তো আপনার আজই চেনা হোল, আমার মতামত এর আগে আপনি শুনলেন কোথায়? আমাকেই বা চিনলেন কবে?

—এ সব শুনেছি আমি সেই অনেকদিন আগে—তোমারই বয়সী একটি ছেলের কাছে তার কথাই তো তোমায় বলেছি—সেই তখন যে বললাম—তোমাকে দেখামাত্রই আমার মনে হোল—তুমি আমার অনেক দিনের চেনা।

হেঁয়ালী কিন্তু রয়েই গেল। যাক আমার সঙ্গে কী আপনার কাজ ছিল বলেছিলেন—

—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমি দেখা করেছি কিছু ধার নেবার জন্যেই—সেটা তোমাকে এতক্ষণ বলা হয়নি।

—ধার আমি কী দেব? আমার পকেটে তো কিছু পয়সা থাকে না—আর পয়সার আমার দরকারই বা কী? অনীতার জন্যেও তো আমার কোন খরচ নেই! জানেন, ও কোনো উপহারও নিতে চায় না, শুধু একবার আমার একটা রুমালই ও নিয়েছিল—সেটাও আবার নতুন নয়।

—না, না, ওসব ধার কিছু নয়—ওতো আমিই অনেককে দিয়ে থাকি।

—তবে আর কী আমার আছে বলুন, পারলে তা আমি নিশ্চয়ই দেব।

—শোনো, তোমাকে তো একটু আগে আমি বলেছি যে যেটুকু জীবন আমার পড়ে আছে তাতেই আমি আমার সাধ্যমতো চলব তা আমি কালই স্থির করেছি। তাই আমার যে পাথেয় দরকার—সেটাই আমি তোমার কাছে নিতে এসেছি—শুধু বিশ্বাস আর সাহসই আমার কিছুটা চাই, আর কিছু নয়। আমি জানি ওসব তোমার অনেক আছে—তার কিছুটা আমাকে দিলেও তোমার কিছু ক্ষতি হবে না।

—তা ঠিক, ওতে আমার কিছু ক্ষতি নেই! সমস্ত পৃথিবীকেই আমি অনেক সাহস ধার দিতে পারি। আর আপনাকে দিতে তো কোন কথাই নেই! আমার সব কিছুই আমি আপনাকে দিতে পারি—জানেন, আমার সঙ্গে এমন করে কেউ কোন দিন কথা বলেন নি, এমন কি আমার বাবাও না।

—শোনো, তোমাকে কিন্তু আমি বলেই রাখছি যে তোমার ধার ফেরৎ দিয়ে শোধ করতে আমি পারব কিনা তা অবশ্য এখনই বলতে পারছি না। তবে জেনো, যদি কোনই যোগ্যতা আমার থাকে—যদি আমার স্বপ্নের দিনগুলোর জন্যে একটুও কিছু করতে পারি তবেই তোমাকে তা শোধ দিতে পারব, আর আমি নিজে এসে ফেরৎ না দিলেও তুমি আপনিই তা পেয়ে যাবে।

—বেশ, আজ তাহলে ওঠা যাক, কি বলেন! রাতও তো অনেক হয়ে গেছে!!

—হ্যাঁ, চলো ওঠা যাক।

—আচ্ছা, আপনাকে তো অনেক দূরে যেতে হবে—সেই কটা—যেন স্টেশন দূরে আপনার বাড়ি তখন বললেন?

—হ্যাঁ সাতাশটা স্টেশন দূরে—কিন্তু অত দূরে তো আজ আমি ফিরব না! মাঝামাঝি কোন একটা স্টেশনে নেমে তোমারই অনেকটা কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় রাতটা কাটিয়ে নেব, কাল সকালে সেখান থেকে আবার চলার শুরু।

—পথটা তাহলে তো বেড়েই যাবে কিছু!

—তা বেড়ে যাক! যে পথ সুন্দর তাতে যতটা চলতে পারা যায় ততটাই ভাল।

কথা বলতে বলতে ওরা উঠে পড়ল। একজন বলল, এঃ আপনার মাথার চুল, কপাল সবই শিশিরে ভিজে গেছে,—দিন আমি মুছে দিই।

—না থাক, আমিই মুছে নিচ্ছি, তোমারটা মুছে নাও, রুমাল আছে তো?

একজন পুরোনো মানুষ পকেট থেকে রুমাল বের করে তার চুল কপাল সব মুছল। নরম শিশিরের রসে তার কপালের সব রেখা কেমন নরম হয়ে গেছে, তা বাঁ-ডান-চোখের কোল ঘেঁষে কয়েকটা মাকড়শার জালও মুছে গেল।

আর একজন নতুন মানুষ তার ভরাট কপালে হাত ঘষছিল—তার কপালে কয়েকটা আঙুলের রেখা পড়ে গেল।

ঝাউগাছের তলা থেকে উঠে তারা নদীর দিকে হাঁটতে লাগল। শিশিরে তাদের দুজনেরই জামা কাপড় সব ভিজে গেছে!

দুটো ছায়া—বাঁধের আড়াল থেকে ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে, দুটো নরম ছায়া পাশাপাশি চলতে লাগল।

ছায়ারা কায়া নয়—তারা কখনও ছোট, কখনও বড় হয়। কখনও সামনে কখনও পেছনে হাঁটে।

তাই দুটো ছায়া, কখনও সামনে কখনও পিছনে চলতে চলতে একবার তারা সমান হয়ে এক হয়ে গেল। একটা ছায়াই তখন ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে গেল, বালির পাড়ে একটাই দাগ ফেলে, বাঁধের শরীরে রেখা এঁকে এগিয়ে যেতে লাগল।

কোন দূর কিম্বা কাছের ইস্টিশনের কাউন্টারে সে টিকিট কাটতে চলেছে—কিংবা চলেওনি।

মানুষগড়ার ইতিকথা

এক-একটি ইস্কুল যেন জাতীয় জীবনে এক-একটি দীপশিখা। কতো ঘরে আলো জ্বেলেছে সে, কতো শিশুর কপালে এঁকেছে ভবিষ্যতে অমরতার অম্লান জ্যোতি। এক-একটি ইস্কুলকে অনুসরণ করলেই তাই জানতে পাই আমরা জাতীয় জীবনের অজানা ইতিহাস—নবজাগরণের ধারা-পরম্পরা। 'মানুষ গড়ার ইতিকথায়' সেই অধ্যায়কেই তুলে ধরা হবে প্রতি সপ্তাহে।
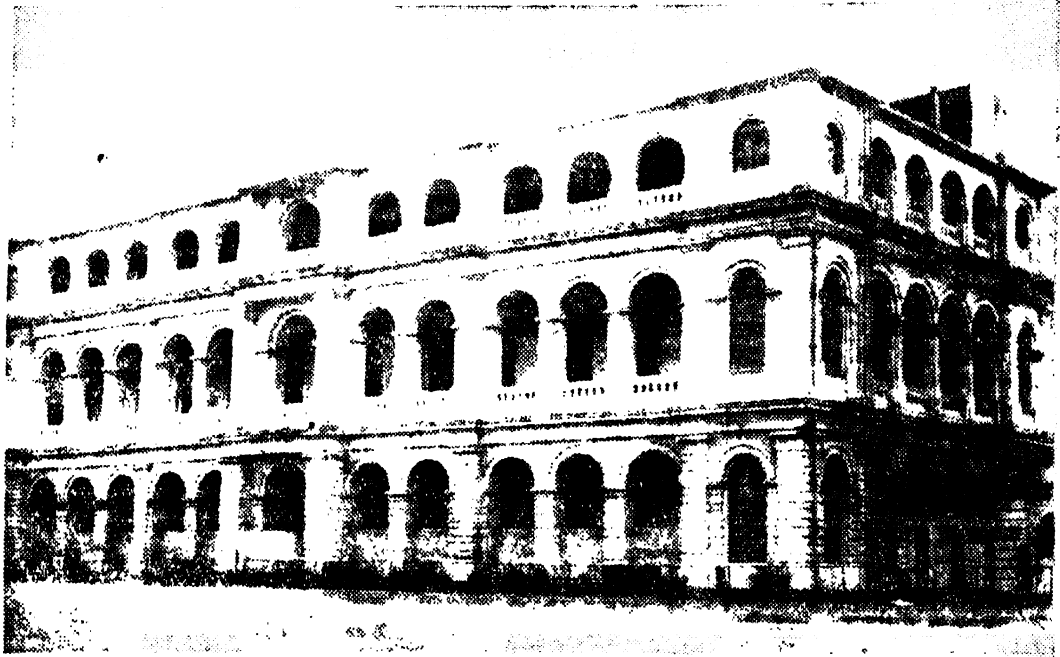
দিন কয়েক আগে হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে বসে স্কুলের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। হেডমাস্টার কেশববাবু ছাড়াও ঘরে আরো কয়েকজন প্রবীণ মাস্টার মশায় ছিলেন। একটু আগে বেয়ারা আমাদের চা দিয়ে গেছে। চা শেষ করে স্কুল সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন-তালিকাটা হেডমাস্টার মশায়ের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি ঠিক সে সময়ে ঝড়ের মত সুইং ডোর ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন ফুলপ্যান্ট সার্ট-পরা অল্পবয়েসী একজন টিচার।

: স্যার এই ছেলেটিকে আমি ক্লাসে বেঞ্চ ডাউন হতে বলেছি, কিন্তু আমার কথা শোনে নি।

দরজার দিকে পিঠ রেখে কেশববাবুর মুখোমুখি বসেছিলাম। মাস্টারমশায়ের প্রসারিত হাত অনুসরণ করে দরজার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি মাথা নীচু করে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মাস্টারমশায়ের অভিমানক্ষুব্ধ গলা কানে এল—

: এতদূর অসভ্য যে ক্লাসে বসে রুমাল নাচাচ্ছিল। বারণ করলাম শুনল না।

: না, স্যার। আমি—

মরিয়া হয়ে উঠেছে ছেলেটি। ঠক ঠক করে কাঁপছে। ঘরে বসে আছেন স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ও অন্যান্য প্রবীণ শিক্ষক। মাঝপথেই হারিয়ে গেল কথাগুলো। টেবিলের ওপাশ থেকে নির্দেশ এল শান্ত ঠান্ডা গলায়—

: তুমি বাইরে গিয়ে বেঞ্চ ডাউন হও।

আদালতে হাকিমের রায়ের উপরেও আপীল চলে। কিন্তু এ রায় নড়চড় হওয়ার কোন উপায় নেই। অমান্য করে কার সাধ্য। ছেলেটি আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। অভিমানক্ষুব্ধ মাস্টার মশায়-এর মুখে দেখলাম হৃত সম্মান ফিরে পাওয়ার সান্ত্বনা।

ব্যাপারটা চুকে-বুকে যেতেই আবার আমরা ছিঁড়ে-যাওয়া আলোচনার সুতোয় গেরো দিতে বসলাম। কিন্তু কেশববাবু যেন কিছুতেই আগের মত সহজভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না। একবার ইলেকট্রিক বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন, কিছু না বলেই তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—

: এখুনি আসছি।

ফুলপ্যান্ট সার্ট-পরা প্রৌঢ় ছোটখাট মানুষটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ভাবলাম বোধহয় কোন জরুরী বিষয় হঠাৎ মনে পড়েছে, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। কিন্তু দরজার ওপাশ থেকে পরিচিত ঈষৎ চাপা সহৃদয় গলাটি ভেসে আসতেই কান খাড়া হয়ে উঠল—

: ওঠ। ক্লাসে যাও। আর কখনো এরকম করো না।

পরমুহূর্তেই আবার হেডমাস্টার মশায় ঘরে ফিরে এলেন। চোখে মুখে কোথাও আর কোন অস্বস্তির ছাপ নেই। বসতে বসতে সহজভাবে বললেন—

: হ্যাঁ। তারপর। আপনি স্কুলের গোড়াপত্তন সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন।

হেয়ার স্কুল

আমি ততক্ষণে ইউনিভার্সিটির সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী বিল্ডিং, হিন্দু স্কুল, কফি হাউস, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বেকার ল্যাবরেটারী ঘেরা কলেজ স্ট্রীটের উপর হেয়ার স্কুলের তিনতলা বাড়ীর একতলার ডানহাতি ছোট ঘরটি ছেড়ে অনেক অনেক অতীতে চলে গেছি। যখন এই গোটা তল্লাটে আজকের অনেক কিছুই ছিল না। তখন সবে হিন্দু কলেজকে ভেঙে প্রেসিডেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু স্কুল বসত সংস্কৃত কলেজের লাগোয়া বর্ত-মান সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের বাড়ীতে। কফি হাউসের বাড়ীর চিহ্নমাত্র ছিল না। বেকার ল্যাবরেটারীর জায়গায় ছিল ধাঙড়-দের বস্তী। তখন হেয়ার স্কুলের নাম ছিল কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। স্কুল বসত বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের মেন বিল্ডিংয়ের পেছনে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটারীর জায়গায়। তখন স্কুলের হেডমাস্টার প্যারীচরণ সরকার—ফার্স্ট বুক রচয়িতার নাম জানে না এমন শিক্ষিত মানুষ নিশ্চয়ই এদেশে নেই।

প্যারীচরণ এক আশ্চর্য শিক্ষক। মাঝারী গড়নের এই শক্তসমর্থ মানুষটি কোনদিনও কাউকে ধমকে কথা বলেন নি। অথচ তাঁর নির্দেশ ছিল অমোঘ—না মেনে কোন উপায় ছিল না। আজ থেকে প্রায় একশ দশ-পনেরো বছর আগের কথা। স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় তখন কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের ছাত্র।

ক্লাসে পড়াতে পড়াতে ক্লাস-টিচার একটি ধেড়ে ছেলের ব্যবহারে খুব চটে গিয়ে আদেশ দিলেন—

: বেঞ্চির উপর দাঁড়াও।

ছেলেটি ক্লাসের অন্য ছেলেদের তুলনায় বয়সে একটু বড়। বেঞ্চিতে দাঁড়ালে বন্ধুদের কাছে মান যাবে, তাই সে বলল—

: স্যার, আমি সবার চেয়ে বয়সে বড়, আমাকে অন্য কোন শাস্তি দিন।

: না। তোমাকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হবে।

ছেলেটি দাঁড়াবে না, মাস্টার মশাইও ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত এটা একটা মান-ইজ্জতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কিছুতেই ছেলেটি কথা শুনতে রাজি হল না দেখে রেগে-মেগে মাস্টার মশাই ছুটলেন প্যারী-চরণের কাছে। হেডমাস্টার মশাইকে খবর দেওয়া হচ্ছে দেখে এবার ছেলেটি ভয় পেয়ে গেল। ব্যাপারটা এতদূরে গড়াবে সে ভাবতেই পারে নি। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—

: এবার সারল রে।

প্যারীচরণ মাস্টার মশায়কে নিয়ে ক্লাসে এলেন। সব শুনলেন। তারপর বললেন—

: মাস্টার মশায়ের আদেশ তোমায় পালন করতেই হবে। তুমি দাঁড়াও।

একটি কথাও না বলে ছেলেটি বেঞ্চির উপর দাঁড়াল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সারাটা ক্লাসকে চমকে দিয়ে প্যারীচরণ বললেন—

: তোমার মাস্টার মশায়ের আদেশ তুমি মেনেছ, এবার তিনি বসতে বললে, নিশ্চয়ই বসবে।

প্যারীচরণ ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মাস্টার মশায় ছেলেটিকে বসতে আদেশ দিলেন। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার। তাই বলে সম্পর্কের সুতো ধরে ক্রমাগত টান দিলে সুতো যে ছিঁড়ে যাবে একথা প্যারী-চরণ বিশ্বাস করতেন। প্যারীচরণের উত্তর-সাধক কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য সেই একই ট্র্যাডিশনে যে বিশ্বাসী একটি সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়েই তা বুঝতে পেরেছি সেদিন।

প্যারীচরণ যে ট্র্যাডিশন তাঁর উত্তর-পুরুষের জন্য রেখে গেছেন তার ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের আরো কয়েকটি বছর পেছিয়ে যেতে হবে। বিদ্যাসাগরের তখনো আগমন ঘটে নি। রাজা রামমোহন, রাজা রাধাকান্ত দেব, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখুজ্যেরা তখন গোটা দেশটাকে অন্ধ কুসংস্কার ও অশিক্ষার হাত থেকে উদ্ধার করবার ব্রতপালনে ব্যস্ত। কলকাতার এক ঘড়িব্যবসায়ী তাঁর ষোল বছরের পুরোনো দোকানটি এক বন্ধুকে বেচে দিয়ে নিজেকে নিযুক্ত করলেন ঐ ব্রতপালনে। কোনদিন কোন বিদেশী বোধহয় এত গভীরভাবে ভালবাসেন নি এদেশীয়দের। মানুষটি হলেন ডেভিড হেয়ার।

দেশে তখন ছিল কিছু পাঠশালা। এখনকার মত স্কুল-কলেজ বলতে কিছু ছিল না। পড়বার বা পড়ানোর মত বইও ছিল না সে যুগে। তখন পাঠশালার গন্ডীর বাইরে শিক্ষার প্রবাহকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রচুর স্কুল স্থাপনের ও স্কুলে পড়ানোর উপযোগী বই রচনা ও প্রকাশনের কাজে এগিয়ে এলেন ডেভিড হেয়ার। ১৮১৭ সালে যখন গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে 'হিন্দু কালেজ' শুরু হল, ঠিক সে বছরেই স্থাপিত হল স্কুল বুক সোসাইটি। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় বাদ দিয়ে ইংরেজী ও দিশী ভাষার মাধ্যমে সস্তা অথবা বিনামূল্যে বিতরণ উপযোগী বই লেখানো এবং ছাপানো।

বইয়ের ব্যবস্থা ত হল। কিন্তু কোথায় পড়ানো হবে এসব বই? পরের বছর এই স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতার গণ্যমান্য ইউরোপীয় ও দিশী ভদ্রলোকদের নিয়ে তৈরী হল স্কুল সোসাইটি। 'জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের জন্য, বিশেষ করে ফোর্ট উইলিয়মের শাসনাধীন প্রদেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে যুগোপ-যোগী শিক্ষার অধিকতর প্রসারের জন্য স্থায়ী স্কুলগুলির সাহায্য ও উন্নতি বিধান এবং নতুন নতুন স্কুল স্থাপনার' উদ্দেশ্যে সোসাইটি গঠিত হল।

দিশী লোকদের 'যুগোপযোগী শিক্ষা' বা ইউজফুল নলেজ দেওয়ার জন্য সোসাইটির উদ্যোগে ঠনঠনের কালীতলার উল্টোদিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ও বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের মোড়ে একটি পাঠশালা খোলা হল। জায়গার নামে এটি পরিচিত হল আরপুলি পাঠশালা বলে। ১৮১৮ সাল। হেয়ারের অনুরোধে সোসাইটি পাঠ-শালার পুরো দায় দায়িত্ব সাহেবের হাতেই ছেড়ে দিল। হেয়ার তাঁর পাঠশালায় বেছে বেছে শুধু সেইসব ছেলেদের ভর্তি করতেন, অভাবের জন্য যাদের হয়তো কোন-দিনই পড়াশুনা হত না।

পাঠশালায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। বছর পাঁচেকের মধ্যেই পাঠশালার গায়ে একটা ইংরেজী স্কুল গড়ে উঠল। এই স্কুলে পরে পাঠশালার সঙ্গে জুড়ে যায়। তখন পাঠশালার দুটো ডিপার্টমেণ্ট—একটি ইংরেজী, অপরটি বাংলা। বাংলার মাধ্যমে পড়াশুনোয় যে সব ছেলে ভাল ফল দেখাত হেয়ার তাদের ইংরেজী বিভাগে পড়বার সুযোগ দিতেন। এই সুযোগ যে এদেশের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে কত বড় জায়গা জুড়ে আছে তা পাঠশালার তৎকালীন ছাত্র তালিকা পড়লেই পরিষ্কার হয়ে যায়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজা দিগম্বর মিত্র, মধুসূদন গুপ্ত, রাজনারায়ণ বসু, সবাই এই পাঠ-শালাতেই তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে-ছিলেন।

সম্পূর্ণ অবৈতনিক এই পাঠশালার যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন হেয়ার। সেই সঙ্গে তাদের যোগাতেন বই, শ্লেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। স্কুল বসার বা ভাঙার সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন গেটের সামনে। ছেলেদের গায়ে ময়লা দেখলে, নিজে তাদের ধুইয়ে-মুছিয়ে বাড়ী পাঠাতেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে নিজের ছেলেকে পড়াতে পারলে সেদিন লোকে নিজেকে ধন্য মনে করত—বিশ্বাস করত ছেলে মানুষ হবে। তাই হেয়ার যখনই কোন কাজে বেরুতেন, তাঁর পাল্কীর পেছন পেছন ছুটত শয়ে-শয়ে ছেলে, মুখে তাদের এক বুলি—

me poor boy, have pity on me.
me take in your school.

আরপুলি পাঠশালার সমসময়ে সোসাইটি আর একটি স্কুল খুলেছিল পটলডাঙায়। সেটির নাম—ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটিজ প্রিপারেটরী ইংলিশ স্কুল। এটির দায়িত্বও হেয়ার সাহেব নিজের ঘাড়ে তুলে নেন। তাঁর পাঠশালার মেধাবী ছেলেরা এই প্রিপারেটরী স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত এবং এখানে ভাল ফল দেখালে তাদের পাঠানো হত হিন্দু কলেজে। ঠিক কবে থেকে জানা যায় না, তবে প্রায় গোড়াতেই এই স্কুল মাসে পাঁচশ টাকা সরকারী সাহায্য পেত। এর অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হত হেয়ারকে।

১৮৩৫ সালে মেকলে সাহেবের পরামর্শে যখন গভর্নর-জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিক এদেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী চালু করলেন ঠিক তার এক

বছর আগে আরপুলি পাঠশালা পটলডাঙার প্রিপারেটরী স্কুলের সঙ্গে মার্জ করে যায়। এই যুক্ত স্কুল বহুদিন পটলডাঙায় রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে বসেছে। কাগজপত্রে স্কুল সোসাইটিজ স্কুল বলা হলেও সাধারণ মানুষ বলত এটি হেয়ার সাহেবের স্কুল। চতুর্থ দশকের শুরুতে হেয়ারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তখন এ স্কুলে পড়ত ৪৩৮টি ছাত্র। মাসে খরচ হত পাঁচশো তিরিশ টাকা। ১৮৪১ সালে 'হিন্দু কালেজ'কে যে একুশটি জুনিয়র স্কলারশিপ দেওয়া হয় তার মধ্যে সাতটি হেয়ার সাহেবের স্কুলের পাশ করা ছেলেরা পেয়েছিল। মেরিট স্কলারশিপ লিস্টের সবচেয়ে উপরেই ছিল হেয়ারের স্কুলের একটি ছাত্রের নাম — প্যারীচরণ সরকার।

স্কুলের রেজাল্ট যাতে ভাল হয়, ছেলেরা যাতে ভাল করে ইংরেজী লিখতে পারে তাই সেই যুগে যখন অন্যসব স্কুলে বেশীরভাগ ইংরেজ শিক্ষক নিয়োগ করা হোত, তখন হেয়ারের স্কুলের প্রায় সব শিক্ষকই ছিলেন এদেশীয়। হেয়ার বিশ্বাস করতেন এদেশীয়দের মধ্যেই শিক্ষকতার সব গুণ আছে। বিনাদ্বিধায় নিজের প্রাক্তন ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্কুলের শিক্ষকতার ভার। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই স্কুলে পড়েছিলেন।

চতুর্থ দশকের সূচনায় স্কুলের ইতিহাসে প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটে গেল। ১৮৪২ সালের ১ জুন হেয়ার কলেরায় মারা যান। চিরকুমার হেয়ারের রোগের খবর পেয়ে তাঁর প্রিয় ছাত্র মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাসকরা ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্র ছুটে এলেন— মেডিক্যাল সায়েন্সে যতদূর সম্ভব সব চেষ্টাই করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখনকার ব্যবস্থা মত ডাক্তার কলেরা রোগীর সারা গায়ে ব্লিস্টার মাখাতেন- হেয়ারের সারা দেহে ব্লিস্টার লাগানো হল। বিকেলের দিকে হেয়ার তাঁর ছাত্রকে বললেন 'প্রসন্ন, আর ব্লিস্টার দিও না। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।' কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। হেয়ারের মৃত্যুর খবর পেয়ে সেদিন সারা কলকাতা ভেঙে পড়েছিল আজকের ডালহৌসী স্কোয়ারে। একজন বিদেশীর মৃত্যুতে বাঙালীদের আর কোনদিনও এভাবে কাঁদতে দেখা যায় নি। সেদিন মিছিলে রাজা রাধাকান্ত দেব থেকে স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত সব যোগ দিয়েছিলেন। হেয়ারকে ইউরোপীয় সমাজ কোনদিনই দেখতে পারত না—কারণ তাঁর 'নেটিভ-প্রীতি'। মৃত্যুতেও অকারণ শত্রুতার সমাপ্তি ঘটে নি। তাঁর মৃতদেহের জন্য এক টুকরো জমি সেদিন সিমেট্রিতে পাওয়া যায় নি। হেয়ারের মরদেহ স্থান পেল শেষ পর্যন্ত 'হিন্দু কালেজের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে'।

হেয়ারের মৃত্যু স্কুলের ভিত্তিমূলে নাড়িয়ে দিল। বারোটি ক্লাসে ছড়ানো প্রায় সাড়ে চারশো ছাত্রের এই স্কুল তখন সম্পূর্ণ অবৈতনিক। এতদিন হেয়ার সব দায়-দায়িত্ব বহন করে এসেছেন। এখন প্রশ্ন উঠল কে বহন করবেন এই স্কুলের দায়িত্ব? এগিয়ে এল 'হিন্দু কালেজে'র শিক্ষা পরিষদ। হেয়ারের মৃত্যুর পর বারো বছর পরিষদ এই দায়িত্ব বহন করেছে।

পরিচালক জুটল ত মাথার ছাদ টলমল করে উঠল। কুড়ি বছর ধরে যে স্কুল ফি মাসে বাড়ীভাড়া গুনে এসেছে, হেয়ারের মৃত্যুর পর বছর না ঘুরতেই বাড়ীওয়ালা নরসিংহচন্দ্র রায় তার উপর নোটিশ জারী করলেন— বাড়ী ছাড়। আমার প্রয়োজন জরুরী। পরিষদের অনুরোধে রাজাবাবুর মন সেদিন টলে নি। স্কুলকে বাড়ী ছাড়তে হল। কুড়ি বছরের পুরোনো বাড়ী ছেড়ে সাময়িকভাবে স্কুল উঠে এল 'হিন্দু কালেজে'র পুরোনো পাঠশালায়। ঠিক তখন থেকেই স্কুলে বৈতনিক ছাত্র নেওয়া শুরু হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে মাইনে দেওয়া ছেলের সংখ্যা ফ্রী স্টুডেন্টের সংখ্যা ছাপিয়ে গেল।

দু বছর পর স্কুলের নিজস্ব বাড়ী তৈরী হয়ে গেলে স্কুল উঠে এল ভবানীচরণ দত্ত লেনে, বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ওভারটুন হলের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায়। বাড়ী বদলের সঙ্গে সঙ্গে নামও বদলে গেল। স্কুল সোসাইটিজ স্কুল নাম পাল্টে হল ব্রাঞ্চ স্কুল বা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল।

১৮৫৪ সালে বারাসত স্কুল থেকে বদলী হয়ে ব্রাঞ্চ স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলেন, এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র প্যারীচরণ সরকার। প্যারীচরণের আসার তিন বছরের মাথায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া শুরু করল। প্রথম বছরে ব্রাঞ্চ স্কুলের সাতাশটি ছেলে পরীক্ষায় বসে। পাস করে কুড়িজন, নজন পেল ফার্স্ট ডিভিসন।

প্যারীচরণ যেন জাদু জানতেন। রাতারাতি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের নাম সারাটা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। সব গার্জেনেই চান তাঁর ছেলেকে ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়াতে—কিন্তু এত ছেলেকে কোথায় জায়গা দেবেন প্যারীচরণ। হেয়ার তাঁর স্কুলে ছাত্রভর্তি ঠেকানোর জন্য ছাত্রের প্রধান কোয়ালিফিকেশন ধার্য করেছিলেন—তার দারিদ্র্য। প্যারীচরণ ছাত্রভর্তি রেসট্রিক্ট করার জন্য বাড়িয়ে দিলেন টিউশন ফী। হেয়ারের মৃত্যুর সময় যে স্কুল ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক আঠার বছর পরে সেখানে টিউশন ফী হল মাসিক পাঁচ টাকা। ফলে যে স্কুল ৪২ বছর আগে শুধুমাত্র দরিদ্র ছাত্রদের বিনা পয়সায় পড়বার সুযোগ দেওয়ার জন্য শুরু হয়েছিল, পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই হয়ে দাঁড়াল কলকাতার অন্যতম ধনী স্কুল—যেখানে চড়া হারের ফী দেওয়ার ক্ষমতার জন্য শুধুমাত্র অভিজাত ঘরের ছেলেরাই পড়বার সুযোগ পেতে লাগল। এর ফল যে ভাল হয়নি পরবর্তী ইতিহাসই তার স্বাক্ষর। কিন্তু পরিবর্তনের ধাক্কা যেমন সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া যায় না, প্যারীচরণও তেমন টের পাননি। তাঁর সময়ে স্কুল উন্নতির কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করেছে। ১৮৬১-৬২ সালে কলকাতা শহরের জন্য নির্দিষ্ট চৌদ্দটি জুনিয়র স্কলারশিপের একটিও এই স্কুলের ছেলেরা অন্য কোন স্কুলের ছেলেদের পেতে দেয় নি। এর ছ' বছর পর প্যারীচরণ পাকাপাকিভাবে স্কুল ছেড়ে গেলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। যাওয়ার আগে প্রবীণ শিক্ষক একটি মাত্র অনুরোধ করেছিলেন কর্তৃপক্ষকে। স্বচ্ছন্দে সেই অনুরোধ সরকারী কর্তৃপক্ষ রক্ষা করলেন। সাধারণ মানুষ বহুদিন ধরে যে নামে ডেকে এসেছে এই স্কুলকে, প্যারীচরণের অনুরোধে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের নাম পাল্টে রাখা হল সেই নাম—হেয়ার স্কুল।

প্যারীচরণ গেলেন প্রেসিডেন্সীতে। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী গিরিশচন্দ্র দেব। তাঁর আমলেই হেয়ার স্কুল ভবানীচরণ দত্ত লেনের পাট চুকিয়ে বর্তমান ঠিকানায় উঠে আসে ১৮৭২ সালে। লাখ টাকা ব্যয়ে স্কুলের দোতলা বাড়ী বানানো হয়। এই টাকার অধিকাংশই এসেছে স্কুলের রিজার্ভ ফান্ড থেকে।

পনেরো বছর স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করে রিটায়ার করলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁর জায়গায় এলেন ভোলানাথ পাল। ১৮৯৪-তে রিটায়ার করেন ভোলানাথবাবু। প্যারীচরণের সময় থেকে ভোলানাথের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ চল্লিশ বছরে এই স্কুল অজস্র কৃতী ছাত্র দেশকে উপহার দিয়েছে। নামের লিস্টি সাজাতে গেলে জায়গা থাকবে না অন্য কিছু বলার। তবু একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা না দিলে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই এ সময়ের অসংখ্য নামী ছাত্রের মাঝ থেকে কয়েকটি নাম শুধু তুলে দিলাম—রমেশচন্দ্র মিত্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিশিরকুমার ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, সারদাচরণ মিত্র, বিহারীলাল গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, জগদীশচন্দ্র বোস, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বিনোদচন্দ্র মিত্র, অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি। আর সব নাম আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত, এঁদের সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। শুধু একজন, যাঁকে আমরা ভুলে গেছি, নতুন করে আজ আমাদের সঙ্গে পরিচিত হন। আমি নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর কথা বলছি। নামটি আই-এফ-শীল্ড টুর্নামেন্টের রানার্স আপ ট্রফির গায়ে খোদাই করা আছে। আজ থেকে প্রায় নব্বুই বছর আগে দশ বছরের নগেন্দ্রপ্রসাদ মার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়ার সময় ময়দানে গোরাদের ফুটবল খেলা দেখে মনে মনে স্থির করেছিলেন, তাঁর স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে এই খেলা খেলতে হবে। শিশুর কৌতূহল থেকে যার সূচনা তাই আজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে—হারিয়ে গেছে শুধু তাঁর নাম, যিনি আধুনিক ভারতীয় ফুটবলের জনক।

সোনার যুগের হীরের টুকরো ছেলেরা পাশ করে বেরিয়ে যেতে নেমে এল অন্ধকার স্কুলের মধ্যাহ্নে। ভোলানাথবাবু রিটায়ার করার পর থেকেই স্কুলের ফলাফল ক্রমশ নেমে যেতে থাকে। স্কুল পরিচালন ব্যবস্থা যে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠে তার প্রমাণ আমরা পাই একটিমাত্র সংখ্যাতত্ত্বে। ভোলানাথ পাল রিটায়ার করার পর ও রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ আসার আগে ন' বছরে স্কুলের হেডমাস্টারের পোস্ট সাতবার খালি হয়। এই স্কুলের চড়া হারের মাইনে দিয়ে পড়ার মত ছেলের সংখ্যা তখন খুবই কম। তাছাড়া সারা দেশে তখন অজস্র ভাল বেসরকারী স্কুল গড়ে উঠেছে যেখানে মাইনে অনেক কম। মেধার সঙ্গে ধনের সম্পর্ক কোনদিনই বিশেষ ভাল নয়। তাই দেখা গেল এ সময়ে অন্যান্য বেসরকারী স্কুলে যখন রেজাল্ট ভাল হচ্ছে, ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে, হেয়ার স্কুলে ঠিক তার উল্টো। ভাঙন ঠেকানোর জন্য একবার হেয়ার, হিন্দু দুটো স্কুলকেই একই হেডমাস্টার দিয়ে চালানোর চেষ্টা হয়েছিল। একসপেরিমেন্ট ধোপে টিকল না। কোনদিক দিয়েই যখন স্কুলের সুনাম ফিরিয়ে আনা যাচ্ছিল না, সে সময় বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে ঈশানচন্দ্র ঘোষ হেয়ার স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলেন।

ঈশানচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর প্যারীচরণ। প্রায় তেরো বছর শক্ত হাতে পরিচালনা করে স্কুলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার হৃত গৌরব। দেখতে দেখতে স্কুলের রেজাল্ট থার্মোমিটারের পারার মত হু হু করে বেড়ে চলল। প্রায় একযুগ পরে এই স্কুলের ছাত্র আবার এনট্রান্সে প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেল। সতীশচন্দ্র রায় ১৯০৬ সালে এনট্রান্সে ফার্স্ট হলেন। আট বছর পরে ম্যাট্রিকে আবার ঐ স্থানটি দখল করলেন এই স্কুলেরই ছেলে বিজয়গোপাল ঘোষ। রেজাল্টের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বদিকেই স্কুল তখন এগিয়ে চলেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে স্কুলের ম্যাগাজিন প্রথম প্রকাশিত হয়। ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতা ঈশানচন্দ্র রিটায়ার করার পরেও প্রায় কুড়ি বছর অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত হেয়ার স্কুলের ছাত্ররা একচেটিয়াভাবে ম্যাট্রিকে শুধু যে ভাল ফল দেখিয়েছেন তাই নয় স্কলারশিপ লিস্টেরও একটা বড় অংশ তাদেরই দখলে ছিল। স্কুলের শতবার্ষিকী উদযাপন সার্থক হয়ে ওঠে স্কুলের ছাত্রদের কৃতিত্বে। ১৯১৮ ও ১৯১৯ পর পর দুবারই এই স্কুলের ছেলে ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছেন। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে. পরবর্তী কুড়ি বছরের হিসাব-নিকাশ করতে গেলে শস্যশূন্য এক অনুর্বর প্রান্তরের ছবি ফুটে ওঠে চোখের সামনে। বিশ্বাসই হয় না যে একটা যুদ্ধ কিভাবে একটা স্কুলের উজ্জ্বল রেকর্ড ম্লান করে দিতে পারে। পাশ করা বা ডিভিসন পাওয়া হেয়ার স্কুলের পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা—আমরা এই স্কুলের কাছে আশা করি পজিশন। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা চালু হওয়ার মাঝের বারোটি বছরে স্কুলের কপালে মাত্র একটিবার স্কলারশিপ জুটেছিল—তাও সেকেন্ড গ্রেড।

মান পড়ে যাওয়ার কারণ কি?—একথা জিজ্ঞাসা করাতে কেশববাবু বললেন—মহাযুদ্ধ, দেশবিভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতার পর শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সব কিছুকেই এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে। তবু এরই মধ্যে ১৯৬০ সালে এই স্কুলের ছেলে স্কুল ফাইন্যালে প্রথম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম স্কুল ফাইন্যাল যুগে স্কুলের রেজাল্ট কি রকম? অঙ্কটা বোধহয় কষাই ছিল তাই মুহূর্তে উত্তর পেয়ে গেলাম—দশ বছরের গড় হিসাবে প্রতি বছর পাশ করেছে শতকরা বিরাশী জন।

পঞ্চম দশকের শেষাশেষি স্কুলে আপগ্রেডিংয়ের কাজ শুরু হয়। বাষট্টিতে প্রথম এই স্কুলের ছেলেরা সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ স্ট্রীমে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিয়েছে। আগামী বছর কমার্স স্ট্রীমের ছেলেরাও হায়ার সেকেন্ডারীতে বসবে। আপগ্রেডিংয়ের সময় সায়েন্স স্ট্রীমের প্রয়োজন মেটাতে পুরোনো দোতলা বাড়ীর মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হল আর একটি তল। গত সাত বছরে সায়েন্স স্ট্রীমে গড় পাশের হার শতকরা নব্বুই। হিউম্যানিটিজে পার্সেন্টেজ একটু কম—পঁচাশী। দেখা যাক কমার্সে কি হয়?

প্যারীচরণের যুগ থেকে স্কুলের টিউশন ফী প্রায় একইরকম থেকে গেছে, বললেন কেশববাবু। অথচ ঐ বেতনের জনাই সে যুগে হেয়ার স্কুলকে বলা হত ধনীর স্কুল। আর আজ স্কুলের আটশো ছেলের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ছেলে আসছে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। প্রাইমারী সেকেন্ডারী মিলিয়ে এই আটশো ছেলেকে পড়ানোর জন্য আছেন ছেচল্লিশজন শিক্ষক। ছাত্র-শিক্ষক রেশিও বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক স্কুলের তুলনায় নিশ্চয়ই আইডিয়াল।

আমার কাছে যা আইডিয়াল মনে হয়েছে, আইডিয়ালিস্ট কেশবচন্দ্রের কাছে তা শুধু অঙ্ক মাত্র, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। তিনি চিন্তিত, গভীরভাবে চিন্তিত, কেমন করে হেয়ার, প্যারীচরণের ট্র্যাডিশন বজায় রাখবেন। হায়ার সেকেন্ডারীর বিশাল কোর্স তেরো, চৌদ্দ, পনেরো বছরের কিশোরদের মাথায় ভারী বোঝার মত চেপে রয়েছে বলেই তাঁর ধারণা। এই বোঝা যদি হাল্কা না করা যায় তাহলে অতীতের মত জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রদের আর কোনদিনও স্কুল তৈরী করতে পারবে না। কিছু আই-এ এস, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা অধ্যাপক নিশ্চয়ই তৈরী হবে এই স্কুলে, কিন্তু অতীতের জায়ান্ট ইনটেকলেকচুয়ালদের শূন্যস্থান পূরণ করার মত ছাত্র ভবিষ্যতে কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কেশবচন্দ্রের মত তাঁর সহকর্মীরাও আর একটি বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। বারুদের স্তূপের মাঝে আটশো শিশুর জীবন গড়ার দায়িত্ব তাঁদের বহন করতে হচ্ছে। আজকের ছাত্ররাজনীতির ভূগোলে কলেজ স্ট্রীটের স্থান শেয়ার মার্কেটের জগতে ওয়াল স্ট্রীট বা দালাল স্ট্রীটের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছাত্ররাজনীতির এরেনার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে হেয়ার স্কুল। আশ্চর্য ঘটনা গত দুটি বছরে কত আন্দোলনের দুর্বার স্রোতে কলেজ স্ট্রীট বারবার ভেসে গেছে, অথচ হেয়ার স্কুলের লোহার গেট পেরিয়ে বেনোজল আজ পর্যন্ত ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। আজ পারেনি বলে যে কালও পারবে না এমন আশাবাদী নন কেশবচন্দ্র। তবু বিশ্বাস করেন হেয়ারের পুণ্যস্মৃতিজড়িত স্কুলের অপমান কোনদিনই তাঁর ছাত্ররা নিশ্চয়ই হতে দেবে না।

কথা বলতে বলতে কখন বেলা পড়ে এসেছে টের পাইনি। হঠাৎ হাতঘড়িতে চোখ পড়তে খেয়াল হল গ্রীষ্মের বিকেল শেষ হতে আর বাকী নেই বেশী। মাস্টার মশায়দের নমস্কার জানিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে পা বাড়ালাম। স্কুলের লম্বা করিডোর পায়ে পায়ে ফুরিয়ে গেল। সামনে মাঠে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলছে। কলেজ স্ট্রীট জুড়ে বয়ে চলেছে মানুষ, বাস, ট্যাক্সি, ট্রামের স্রোত। কলেজ স্ট্রীট থেকে আবার মাঠের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখদুটো আটকে গেল একটি মূর্তির গায়ে। পেছন থেকে দেখে মনে হল রোমান সেনেটরদের রোবের মত তাঁর চওড়া উঁচু কাঁধ বেয়ে নেমে এসে পোষাকের প্রান্ত বেদী ছুঁই ছুঁই করছে। তখন সামান্য দূরে পশ্চিমে প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিকী ভবনের আড়ালে সূর্য টুপ করে খসে পড়বার অপেক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে। মনে হল একটু পরে যখন এই মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসবে তখনো বুঝি পাষাণবেদীর উপর দাঁড়ান মূর্তির সর্বাঙ্গ ছেয়ে শেষ বিকেলের সূর্য স্থির হয়ে থাকবে। স্কুলের গেট পেরিয়ে পুরোনো বইয়ের রেলিং-দোকানের কয়েকটা থাক পার হয়ে মূর্তির পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। না—এখনো ডেভিড হেয়ারের মুখের প্রশান্তি এতটুকুও ম্লান হয় নি। ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে?

—[illegible]

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কবিতার ফসল

কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যের যে-বিভাগটি এতদিন জয়ধ্বনিতে নন্দিত হয়েছে ইদানীং সেই কথা-সাহিত্য বিভাগটি কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্য ঝিলিক দেখা যায় তবে তা নিছক ক্ষণিকের আলেয়া মাত্র। নিঃসংশয়ে বাংলা কাব্য-সাহিত্য এই গৌরবের আসনটি অধিকার করে চলেছে। বর্তমান দশকে উপনীত বাংলা কাব্য-সাহিত্য যথেষ্ট সাবালকত্ব অর্জন করেছে আর সে মুষ্টিমেয় পাঠকের পিঠ চাপড়ানির অপেক্ষায় বসে নেই। অনেক নতুন কবির মধ্যে আশ্চর্য দীপ্তির আভাস পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। একথা মনে করা হয়ত অন্যায় হবে না বাংলার আধুনিক কবিতা এতদিনে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে অনেক প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব ঘটেছে। নতুন আঙ্গিক, চিত্রকল্প এবং নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতিকে ভাবানুষঙ্গের নানাত্ব দান করে এ কালের কবিরা বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

সম্প্রতিকালে কয়েকখানি কাব্য-গ্রন্থ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। এই কবিরা সকলেই স্ব-প্রতিষ্ঠ। কেউ-ই প্রায় সমবয়সী নন, তবে তাঁরা আধুনিক যুগের প্রতিনিধি স্থানীয়। একালের মেজাজ এবং বক্তব্য এই সব কবিদের কবিতায় আশ্চর্যভাবে রূপায়িত।

হরপ্রসাদ মিত্রের কবিখ্যাতি দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুন কবিতার বই 'সাঁকো থেকে দেখা'। এই সংসারে যারা এসেছে আঙুল দিয়ে আঙুর দলতে, সেই তাদের কাজ, আঙুর ফুরালে সেও ফুরায়, যে গোলাপ ছিঁড়তে এসেছে তার কাজ খতম গোলাপের সমারোহ শেষ হলে। আবার এমন অনেক ত আছে যাদের আঙুর নেই, গোলাপ নেই, তারা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

মানব-সত্তার দৃশ্যপটে সব মানুষেরই জীবনের শীতের পর্ব অন্তে বসন্তের সমারোহ জাগে। হরপ্রসাদের গ্রন্থ নামাঙ্কিত কবিতাটির মধ্যে এই বক্তব্য ধ্বনিত। মানব-সত্ত্বার মধ্যে আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু—জীবনের প্রখর পৌষের রাত কাটে, আবার নতুন আশার আনন্দ জাগে।

এই আশার আশ্বাসটুকু আছে বলেই আমরাও আছি। শীতজর্জর রাত্রির অবসানে তাই আভাস পাওয়া যায় নবীন বসন্তের। দক্ষিণের সমীরণ ঘোষণা করে নব-জাগরণের নব-জীবনের। এই সংবাদটুকুই সব কিছু ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে—

দুর্দিনের অবসান ঘটছে। আসছে ফুলের মরশুম, আসছে বসন্ত। হরপ্রসাদ আশা ও আনন্দের কবি। তাই তিনি বলেন, 'নয় লাভ, নয় ক্ষতি নয় জয়-পরাজয় শুধু এক কেন্দ্র থেকে অসীম পরিধি খুঁজে ফেরা।' কিন্তু তথাপি আমরণ সফরের শেষে একথা বুঝতে হয় যে এ জীবন মায়া মাত্র, মরীচিকাই করে। ভবঘুরে ঘোড়সওয়ার আমরা আম জাম বাঁশের ছায়ার মায়া কাটিয়ে মগলে সরাই-এ পৌঁছে বুঝেছি নর্তকীর জন্য সমস্ত জীবনটাই নজরনা দিতে হবে। রাত্রের কুহকে ভবঘুরে ঘোড়সওয়ার বিভ্রান্ত।

হরপ্রসাদের এই জাতীয় কবিতাবলীর মধ্যে আছে যে দার্শনিক ইঙ্গিত, তা ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর প্রায় সব কবিতায়। 'ছাতা', 'সময় নামক সাপ' যার বিষে দেহ-মন বিষাক্ত হয়েছে তবু তার মধ্যে আছে আশ্বাস—আছে খুকুর নীল ফ্রকে রোদ।

হরপ্রসাদের কবিতায় আছে প্রচ্ছন্ন বিষাদ, কিন্তু তিনি বিষাদের ভারে ভারাক্রান্ত করতে চান না মনকে। তাই 'কে যায় খেয়াল নেই, কোনো পদচিহ্ন নয়, শুধু। স্রোতের নখের দাগে বিচিত্র খচিত করে আলো।''

হরপ্রসাদ নিজেরই কলমে মুক্তির গান রচনার প্রয়াস করেছেন। এই মুক্তি আসলে মোহমুক্তি।

হরপ্রসাদ তাঁর কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন সুনীল নন্দীকে। সুনীল নন্দী প্রায় হরপ্রসাদের সমকালীন, এই বছর তিনি 'উল্টোরথ' প্রদত্ত কবিতা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সুনীল নন্দীর 'ভগ্ন বৃক্ষ ছিন্ন ফুল' নামক কাব্যগ্রন্থটি অনেক আগে প্রকাশিত হয়ে প্রশংসিত হয়েছে, কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে তার নতুন কাব্যগ্রন্থ 'প্রকীর্ণ সবুজে নীলে'। সুনীল নন্দী প্রকৃতি-পূজারী, কিন্তু সেই প্রকৃতি শুধু শ্যামল বনানী কিংবা আলো-ছায়া ভরা প্রান্তর নয়। তাঁর গ্রাম যদিচ প্রকীর্ণ সবুজে নীলে তবু সেই আমন-আউসে মগ্ন থই-থই মাঠ কে যেন লুঠ করছে, অরণ্যানীও আজ আক্রান্ত, সূর্যাস্ত শেষ। চিমনি-ধোঁয়া-কলকব্জার ইস্পাতি চাপে আজ সব নীল সবুজের নাভিশ্বাস। বৃষ্টি পড়ে কবিতায় হাওয়ায় যেন গন্ধ ভেসে আসে, রাতের এলোচুল গন্ধ ঢালে, তবু প্রথম প্রহরে সে আসেনি। আগুন-ছোঁয়া নিঃস্ব ঘরের দহন-জ্বালা জুড়ানোর জন্য শীতল চোখের আবির্ভাব ঘটেনি। সুনীলকুমার এই জাতীয় কবিতায় প্রথানুগত্য থেকে মুক্ত হয়েছেন অথচ সহজে চিত্রকল্প সৃষ্টি করার এক বিচিত্র আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। অতি-কথন নেই, অথচ মিত-ভাষণে সামগ্রিক চিত্রটি ফুটিয়েছেন। এর মধ্যে আছে দেশ বিভাগের জ্বালা। করিম চাচার সঙ্গে দেখা হলে তাই কলজেখানায় মোচড় লাগে। এ কলজে যে দুভাগ করা হয়েছে। অতি সহজ অথচ

গভীর ভঙ্গীতে এক নিবিড় বেদনার ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায়।

অতি সহজেই যেখানটিতে আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা ছিল সেই পথ পরিহার করে অন্যত্র মুখ ফিরিয়েছেন, তাঁর কবিতায় অনুভূতি-পুঞ্জের যে ঐক্যবোধ আছে তা প্রশংসনীয়। ব্যক্তিগত এবং কালোচিত বহু অনুভূতিকে সুনীল নন্দী শিল্পসংগত আশ্রয় দিয়েছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবি ও কথা-সাহিত্যিক হিসাবে অল্পকালের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কৃত্তিবাস কবি-গোষ্ঠীর তিনি নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি। কবিতার বাঁধা ধরা আঙ্গিক, শিল্পচাতুর্য, রূপকল্প উপেক্ষা করে নতুন দৃষ্টিকোণে অনেক রূঢ় বাস্তব-ভিত্তিক ইমেজ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বক্তব্য বলিষ্ঠ এবং কোথাও অতিকথন নেই। 'বন্দী জেগে আছো' তাঁর নতুন কবিতার বই, এবং এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি কবিতা স্মরণযোগ্য। সুনীল-কুমার বাস্তববিশ্বাসী অথচ তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক। গহন অরণ্যে একা যেতে সাধ নেই, তবু এক অদৃশ্য আকর্ষণে বার বার ফিরে যেতে হয়। একই আয়নায় ধরা পড়ে কত মুখ। যে কোনো মানুষকে তাই হাত-ছানি দিয়ে ডেকে বলতে হয়, আমরা ত সেই ছোটবেলার খেলার সঙ্গী, অনাদিকালের সাথী, মনে নেই সেই ফেলে আসা অতীত। যে অতীতের মধ্যে আছে বাল্য ও কৈশোরের স্বপ্নভরা দিনগুলি। কবির মনে প্রশ্ন জাগে—একই আয়না, চিনতে পারো না?

কিশোর বয়সে কে সমুদ্রে থুতু ফেলেছিল কিংবা মেল ট্রেনের কাচের গায়ে এঁকেছিল রমণীর মুখ, অথবা প্রথম কৈশোরের আবেগে সরস্বতী-মূর্তিকে জড়িয়ে ধরেছিল, এখন তার অপরাধবোধ জাগ্রত হয়েছে, সে কি তাহলে পাপ করেছে? মনঃস্থির করতে পারে না, তবু সেই কিশোরের কানে আজো বাজে মেল ট্রেন বা সমুদ্রের অভিশাপ। 'দুটি অভিশাপ' নামক কবিতাটিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক অপরূপ অনুভূতির স্পন্দন সৃষ্টি করেছেন।

একটি ছোট্ট কবিতা 'ভালোবাসা', অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে একটি ম্যাজিক্যাল প্যাটার্ণ গড়ে উঠেছে। আবেগমুক্ত কয়েকটি কথায় এক সামগ্রিক অনুভূতিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। —'চরাচরে তীব্র নির্জনতা, এই তো সময় ভালোবাসার—ভালোবাসা মানে ঘুম, শরীর বিস্মৃত পাশাপাশি ঘুমোবার মত ভালোবাসা।

এর পরের কবিতাটি আর এক সুর। পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে মনে হয় পৃথিবী পদানত। তারপর যে ছবি এঁকেছেন তা সংক্ষিপ্ত হলেও স্পষ্ট—'কমলার কোয়া থেকে খসে পড়া বীজ ঢুকে পড়ে পাতাল গর্ভে। পোলকা ডট প্রজাপতি তাদের আপন-আপন কাজে ব্যস্ত। বাবলাগাছের শুকনো কাঁটাও দাবী করেছে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব। আমি জয়ী নই, আমি পরাজিত নই, আমি এমনই একজন মানুষ/পাহাড় চূড়ায় পৃথিবীকে পদতলে রেখে, আমার নাভিমূল থেকে উঠে আসে বিষণ্ণ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস। এই নির্জনতাই আমার ক্ষমাপ্রার্থী অশ্রুমোচনের মুহূর্ত।'

জয়ী নই, পরাজিত নই, অথচ একটা মুহূর্ত আসে যে যে মুহূর্ত অশ্রুমোচনের, ক্ষমাপ্রার্থীর অশ্রুতে সজল। বাড়ি ফেরা, প্রবাসের শেষে, কঙ্কাল ও সাদা বাকি প্রভৃতি কবিতাতেও কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন।

গণেশ বসু সবচেয়ে নবীন এই প্রবন্ধে আলোচিত কবিদের মধ্যে, কিন্তু তাঁর কবি-খ্যাতি সুদূর প্রসারী। ইতিমধ্যেই একাধিক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে গণেশ বসু সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন। 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' তাঁর নবতম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতায় আবেগ আছে, সে আবেগ যৌবনের আবেগ, কিন্তু তার মধ্যে যে দাহ সে দাহ—দেহকে অতিক্রম করে গেছে। তাঁর কবিতায় আছে বিদ্রোহের সুর, আছে বিপ্লবের পদধ্বনি। শিকড়গুলোকে উপড়ে ফেলে নতুন প্রাণের বীজ বপনের ইঙ্গিত তাঁর কবিতায় আছে। অভিশাপের ফাটল ধরা অন্ধ পাঁচিলের ভিতটাকে টেনে ফেলে বদলে দিতে হবে। এ সময় এসেছে বদলে ফেলার, জীর্ণতাকে চূর্ণ করার। বিধান-সভার কার্পেটে তাই তিনি কঙ্কালেরও ফিস-ফিসানি শুনতে পেয়েছেন। শিকড়-বিহীন মাঠের মানুষের আলোড়নে আজ অবিরাম অভিশাপ ঝরে পড়ছে। 'কেন যৌবনে' কবিতাটির মধ্যে আছে যুগযন্ত্রণার প্রতিধ্বনি—কবি লিখেছেন, 'দুঃখ কে চায় প্রেম পরিহাসে একা/অস্ত্রবিহীন খুঁজি রক্তের পাশে/বন্ধ্যাভূমির অবিরাম হাহাকারে/মহার্ঘ ভাতা তলানির সংসারে/ যতই পোড়ার বাজারের শূন্যতা/ তোমারি গলিতে কড়া-নাড়ি অভ্যাসে।'

'খড়গের মুখে' এবং 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' এই কাব্যগ্রন্থের অনুপম সম্পদ। এমন পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠতা কদাচিৎ চোখে পড়ে।

প্রতিটি গ্রন্থ সুমুদ্রিত ও সুন্দর প্রচ্ছদশোভিত।

—অভয়ঙ্কর

(১) **সাঁকো থেকে দেখা**— হরপ্রসাদ মিত্র। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা) লিমিটেড। কলিকাতা-১২।। তিন টাকা।

(২) **প্রকীর্ণ সবুজে নীলে**— সুনীল-কুমার নন্দী। সুরভি প্রকাশনী। ১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯।। তিন টাকা।

(৩) **বন্দী জেগে আছো**— সুনীল-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সিগনেট বুক সপ: কলিকাতা-১২।। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

(৪) **রক্তের ভিতরে রৌদ্র**— গণেশ বসু, প্রাপ্তিস্থান: মনীষা গ্রন্থালয়, কলিঃ-১২।। দু টাকা।

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

সম্প্রতি একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে 'ইণ্ডিয়া বুক হাউস'। ১১—১৪ বছর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। রচিত গল্পের শব্দসংখ্যা হবে ১৫০০—২০০০। নিজ হস্তাক্ষরে আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ইণ্ডিয়া বুক হাউস, পাবলিশিং ডিভিশন, ২৪৯ দাদাভাই নৌরজি, বোম্বে-১—এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে এই প্রতি-যোগিতা হচ্ছে। এতে প্রথম স্থানাধিকারীকে ৩০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে ২০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ১০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়াও ৮টি বিশেষ পুরস্কার আছে।

পশ্চিম জার্মানী থেকে প্রকাশিত 'ইন্দো-এশিয়া' দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার করে আসছে। বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর উপর। জার্মান ও ইংরেজিতে যাঁরা প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উইলহেলম ভিন পরমার রচিত প্রবন্ধটি খুবই উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন ভবানি

ই মাহ্‌বুলম্যান, মহম্মদ মুজীব, গিরিজাকুমার মুখার্জি প্রমুখ উল্লেখ্য।

'যশপাল' এখন হিন্দি সাহিত্যের একটি স্মরণীয় নাম। প্রেমচাঁদ সাহিত্যে যে সমাজ-বাস্তবতার প্রবর্তন করেন, যশপাল যেন ঠিক অন্যদিকে আর এক ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং এর জন্য দীর্ঘ কারাভোগ করেন। ১৯৩৮ সালে যখন তিনি মুক্তি পান, তখন সাহিত্যিক হিসেবে তেমন খ্যাতি ছিল না। এই অবস্থায় কেবল সাহিত্যকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি দুঃসাহসের পরিচয় দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন—"আমার সাহিত্য-চিন্তাকে রাজনৈতিক চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এরা একে অন্যের পরিপূরক। আমার জীবনচেতনার অঙ্গস্বরূপ। যখন আমি সক্রিয় বিপ্লবী ছিলাম, তখনও আমার লেখনী থামে নি। জেলখানায় বসে আমি তাই অনেক লিখে ফেললাম। কারণ, এটা ছিল আমার বিপ্লবী সাধনার অঙ্গ।" যশপাল প্রথম থেকেই সাহিত্যকে জীবন-চেতনার অঙ্গস্বরূপ মনে করেছিলেন বলেই, জেল থেকে মুক্তি পাবার পর সাহিত্যকেই জীবিকা হিসেবে বেছে নিলাম। ১৯৪১ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দাদা কমরেড' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি ১৯২৯-৩৩ সালের ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৪৩ সালে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস দেশদ্রোহী প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেও রাজনৈতিক পরিস্থিতিই প্রাধান্য বিস্তার করে। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দিব্যা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এরপর 'গীতা' এবং 'মনুষ্য কে রূপ' উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হল 'ঝুটা সাচ'। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮-৬০ সালে।

লন্ডন থেকে 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এতে বিবেকানন্দের কয়েকটি এবং প্রখ্যাত পণ্ডিতজনের কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে বিবেকানন্দের প্রতিভার বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। এই গ্রন্থের ৬টি প্রবন্ধই ৬ জন বিদেশীর। শ্রীই আর মারোজি লিখিত প্রবন্ধে স্বামীজীর জীবন-ইতিহাসের অনেক নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। অধ্যাপক নিনিয়ান স্মার্ট দর্শনের দিক থেকে স্বামীজীর প্রতিভার আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রী সি পি রামস্বামী আয়ার, শ্রী এম সি চাগলা ও শ্রীকেনেথ ওয়াকার।

গত ৮ মে হাওড়া কেন্দ্রীয় পাঠাগার ভবনে এক সাহিত্যসভার আয়োজন হয়। শ্রীকালিপদ দে ভৌমিকের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই সভায় 'আধুনিক কবির দৃষ্টিতে কবি রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন রাম বসু, তরুণ সান্যাল, গণেশ বসু, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীল দাস।

বিদেশী সাহিত্য

প্রকাশকদের কাছে সবচাইতে প্রিয় লেখক কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক বিদেশী সমালোচক বলেন, 'প্রখ্যাত রাজনীতিক, জনপ্রিয় চিত্রতারকা এবং যৌন-গ্রন্থের লেখক।' পশ্চিম জার্মানীর খবরে প্রকাশ, সেখানকার রাজনীতিকরা নাকি ক্রমশ জনপ্রিয় লেখকদের জায়গা দখল করে নিচ্ছেন। প্রকাশকরা তাঁদের লেখা পেলে একেবারে বর্তে যান। পশ্চিম জার্মানীর বেশীর ভাগ বাড়ীতেই এখন শোভা পাচ্ছে থিয়োডোর হয়েজের শৈশবস্মৃতি, আদেনাওয়ারের আত্মজীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ। প্রাক্তন চ্যান্সেলর লুডভিক এরহার্ট 'সকলের জন্য সমৃদ্ধি' নামে একটি বই লিখে পারিশ্রমিক পেয়েছেন তিন লক্ষ মার্ক। বর্তমান চ্যান্সেলার কুর্ট জর্জ কিসিংগারও নাকি শীঘ্রই একজন শক্তিশালী লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাছাড়া লেখক-রাজনীতিক হিসেবে যাঁদের নাম করা যায়, তাঁরা হচ্ছেন—ফেলিকস ফন (প্রাক্তন তথ্যসচিব), হ্যানস ক্রোল (মস্কোস্থ প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত), গেরহার্ট শ্রোয়েডের (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী) এবং রেনার বার্তজেল (সংসদীয় দলের প্রধান)। দেখেশুনে মনে হয়, কবিতা বা গল্প-উপন্যাস পড়ার চেয়ে পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের বই পড়ে কিছুকাল দেশের কল্যাণ, সামাজিক অগ্রগতি ও আর্থিক উন্নতির চিন্তায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতে পারবে।

চার্লস এ মুর সম্পাদিত 'দি জাপানীজ মাইন্ড' নামে একটি বই সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন হনোলুলুর হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। বইটির একটি সাব-টাইটেল আছে : 'এসেনসিয়েলস অব জাপানীজ ফিলোজফি অ্যান্ড কালচার'। প্রাচ্যের ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মুর বরাবরই বিশেষভাবে আগ্রহী। এর আগে তিনি আরো দুটো বই লিখেছিলেন 'দি চায়নীজ মাইন্ড' ও 'দি ইন্ডিয়ান মাইন্ড'। এ-সংকলনের মধ্যে আছেন বর্তমান জাপানের সবচেয়ে খ্যাতনামা প্রবন্ধকার ও সাহিত্যিকবৃন্দ। বইটির দুটো ভাগ—প্রথম ভাগে রয়েছে জাপানের ধর্ম, দর্শন ও সমাজ সম্পর্কে আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে জাপানের কাব্যসাহিত্য, শিল্প-সমাজ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা কিরূপ—তার বিশ্লেষণ। এ সংকলনের সবচাইতে আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন লেখক সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলেও সকলেই প্রায় একই রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

মার্কিন দেশের তরুণ মহিলাকবি মার্জ পিয়ার্সি'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ব্রেকিং ক্যাম্প' প্রকাশিত হয়েছে কয়েক মাস আগে। পিয়ার্সি সাধারণত চড়াসুরের কবিতা লিখে থাকেন। এ কাব্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। মৃত্যু, যৌনতা, প্রেম, ভালোবাসা এবং অন্যান্য সাময়িক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে কবিতাগুলি লেখা। তাঁর কবিতায় কাল্পনিকতার প্রভাবও অত্যন্ত প্রখর। অনেকে পিয়ার্সি'র কবিতায় তাঁর স্বামীর প্রভাব ও প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। তাঁর স্বামী আমেরিকার একজন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত।

সাহিত্যের বাজারে চমক সৃষ্টির ঝোঁকটা চিরকালই ছিল, আজও আছে। বৃটিশ তরুণ লেখক অ্যালস্টান স্টোরে নাকি সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে পাঠক-পাঠিকাদের রীতিমত অবাক করে দিয়েছেন। উপন্যাসটির নাম 'গ্রেসলেস গো আই'। তাতে নাকি আধুনিক জীবনযাত্রার সামাজিক রীতিনীতি এবং যৌনউত্তেজনা কিভাবে শেষ পর্যন্ত একজন মনস্তত্ত্ববিদকেও ঘায়েল করে ফেলে—তারই বৈপ্লবিক চমক দেওয়া হয়েছে। মনে হয় স্টোরে শীঘ্রই একজন জনপ্রিয় লেখক হিসেবে খ্যাতি পাবেন। এর মধ্যেই তিনি 'ইয়র্কশায়ারের ঔপন্যাসিক' বলে চিহ্নিত হতে শুরু করেছেন।

প্রাচীন যুগের চীনা কবি তু ফু-র পঁয়ত্রিশটি কবিতার একটি অনুবাদ সংকলন বেরিয়েছে সম্প্রতি 'এ লিটল প্রাইমার অব তু ফু' নামে। অনুবাদ করেছেন ডেভিড হকস। বেশ কিছুকাল আগে চীনাভাষায় তাঙ কবিতার একটি সংকলন বেরিয়েছিল 'থ্রি হানড্রেড তাঙ পোয়েমস্' নামে। অধ্যাপক হকস সে বইটি থেকেই তু ফু-র এই কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন। ধ্রুপদী চীনা কবিতার সংকলন হিসেবে বইটি ভালো লাগবে। কবিতাগুলি কালানুক্রমে সাজানো। চীনাভাষায় বিশেষজ্ঞদের মতে, বইটির অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক—(আলোচনা—অরুণ ভট্টাচার্য, লৌকিক ও রাগসংগীতের উৎস সন্ধানে (আলোচনা)—অনুবাদ কৃষ্ণা বসু। দাম পাঁচ টাকা। ভারতীয় সংগীত পরিষদ। কলকাতা।

'রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গানের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্ভারকে আঙ্গিকের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তথ্যমূল্যও কিছু কম নয়।

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর চিঠিপত্র শৈলজারঞ্জন মজুমদারের রবীন্দ্রসঙ্গীত—শিক্ষারপ্রসঙ্গ, অরুণ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরসংগতি ও সুরবৈচিত্র্য, প্রফুল্লকুমার দাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত—লিপি, রাজ্যেশ্বর মিত্রের রবীন্দ্রসংগীতচিন্তা, সুধীর চক্রবর্তীর রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক সংগীতকার, পূর্ণানন্দ, প্রসাদ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রনাথের সুরসংযোজিত বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র, কৃষ্ণা বসু-অনুদিত এ এ বাকের সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ—ইত্যাদি প্রত্যেকটি প্রবন্ধই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারাসূত্র-অন্বেষীকে খুশি করবার দাবী রাখে। বিশেষ করে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের 'রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাপ্রসঙ্গে' বিভিন্ন রাগ কেমন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আপন স্বরূপে আপনি ধন্য হয়ে উঠেছে তারই এক সরস চিত্র—শুধু মর্মগ্রাহীই নয় রবীন্দ্রসঙ্গীত-মানসের পথরেখা প্রদর্শনেও এর মূল্য অপরিসীম।

অরুণ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'কথা ও সুরের মিলনই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। একথা অসত্য নয়, কিন্তু যা ততোধিক সত্য এবং যে বিচারে রবীন্দ্রসঙ্গীত দেশকাল উত্তীর্ণ সংগীতের পর্যায়ে পড়ে বলে আমাদের বিশ্বাস, তা হচ্ছে কথার সামান্যকরণ থেকে সুরের অসামান্যতায় উত্তরণ।' মন্তব্যের মৌলিক চিন্তার ছায়া লক্ষ্য করবার মত। গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আকুল বেশে আসে' রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি ফটোপ্রিন্ট এবং এ এ বাকের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইংরাজী নোটেশনের ফটোপ্রিন্ট।

লোকগীতি নিয়ে গবেষণা হয়েছে যথেষ্ট এবং এ সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থেরও অভাব নেই। কিন্তু রাগসঙ্গীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের লোকসঙ্গীতের সু-বিস্তৃত ঐতিহ্যের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙালীর বিশিষ্ট অবদানের এক বিস্ময়কর চিত্র মেলে ধরেছে কৃষ্ণা বসু অনুদিত 'লৌকিক ও রাগসঙ্গীতের উৎসসন্ধানে' গ্রন্থখানি। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি সিংহল শাখার আমন্ত্রণে আহূত ডঃ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রত্নঝংকারের লৌকিক ও রাগসঙ্গীতের পারস্পারিক সম্পর্ক ও তাদের সম্ভাব্য উৎস-বিষয়ক প্রবন্ধ। যা উক্ত সোসাইটির জর্নালে প্রকাশিত হয়। অবলম্বনে অনুদিত এই গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যেও নানাভাবে রাগ-রাগিণীর ছায়ার অস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং আগমনী ও অন্যান্য ভক্তিমূলক সংগীতে দুর্গা, বাগেশ্রী, মালকোষ ইত্যাদি রাগ ওতপ্রোতভাবে মেশার ইতিহাস—সঙ্গীতের ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবান জ্ঞানসম্পদ যোগাবে। এই মহাপ্রয়াসের জন্য শ্রীমতী বসু ধন্যবাদার্হ।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার বার্ষিক সংখ্যা [১৩৭৬]—বিবেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাণা বসু সম্পাদিত।। ২৬।৮এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯।।

সুন্দর প্রচ্ছদ ও মুদ্রণবৈশিষ্ট্যে চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের এই বার্ষিক সংকলনটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই সংকলনে লিখেছেন মনীষ ঘটক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, রাণা বসু, দুর্গাদাস সরকার, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, গোপাল ভৌমিক, কাজল ঘোষ, তপতী রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শঙ্করবিজয় মিত্র, ইন্দিরা দেবী এবং আরো অনেকে। সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি লেখা মুদ্রিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে লিখেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য ও নারায়ণ চৌধুরী, মনোমোহন ঘোষ সম্পর্কে সমীরণ চক্রবর্তী, পুণ্যশ্লোক মহেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং দানীবাবু, লক্ষ্মীকান্ত বেজবড়ুয়া ও মীর্জা গালিব সম্পর্কে লিখেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রীতি রায় ও নির্মল সেনগুপ্ত। তাছাড়া দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সাহিত্যিকের পরলোকগমনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ বসু, বিশু মুখোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল দত্ত, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ পত্রিকা [১৯৬৭-৬৮]—সম্পাদক আদিত্য চৌধুরী ও শম্ভুনাথ পালিত।। কলকাতা

সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষের কাল হিসেবে ছাত্রজীবনকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সময় বলা যায়। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতও এ সময়টাতেই সবচাইতে লক্ষ্যণীয় তাৎপর্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ পত্রিকার এই সংকলনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন প্রিন্স ভঞ্জ, তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়, অবনীকান্ত চৌধুরী, তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মিহিরলাল মুখোপাধ্যায়। গল্প লিখেছেন সঞ্জীবকুমার ঘোষ, সুকুমার দাস, সমরকুমার বসু এবং আরো কয়েকজন। কবিতা লিখেছেন অমিতাভ চক্রবর্তী, স্বর্ণা ঘোষ, মনীষা চট্টোপাধ্যায়, কনক দেবনাথ, সুখেন ঘোষাল এবং আরো কয়েকজন কবি। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় স্মরণে দুজন অধ্যাপক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ইংরেজী বিভাগে লিখেছেন কিরণ চৌধুরী, সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতী বসু, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সংকলনটি প্রচ্ছদ-আঙ্গিকে সুরুচিসম্পন্ন।

কালি ও কলম (চৈত্র ১৩৭৫)—সম্পাদক: বিমল মিত্র। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ দাম পঁচাত্তর পয়সা।

সাহিত্য মাসিক কালি ও কলম মাত্র দু বছর যাবৎ প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যেই পত্রিকাটি সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে

সমাদৃত হয়েছে। ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন বিমল মিত্র। গল্প লিখেছেন অমর চট্টোপাধ্যায় এবং আরতি বসু। প্রবন্ধ লিখেছেন এবং আলোচনা করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য, যজ্ঞেশ্বর রায়, সুন্দরলাল ত্রিপাঠী, গৌর শাণ্ডিল্য এবং পুলিনবিহারী সেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি [মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫]—সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু।। ১০, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা ১।। দাম: এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গবেষণামূলক একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বহু আগেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ-সংখ্যায় দুর্গাদাস লাহিড়ীর জীবন ও সাহিত্যের ওপর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন হারাধন দত্ত। ত্রিভঙ্গ রায়ের লেখা "শিল্পের প্রাণ: অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে" নিবন্ধটিও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো। তাছাড়া কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখেছেন অশোকদেব চৌধুরী, তারকনাথ ঘোষ, সুধীরকুমার করণ, অক্ষয়কুমার কয়াল, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত ও সৌরেন্দ্রমোহন বসু। অন্যান্য রচনার তুলনায় পত্রিকাটির পুস্তক সমালোচনার মান কিছুটা নিম্নস্তরের। অবশ্য এ-সংখ্যায় প্রকাশিত অলোক রায়ের লেখা পুস্তক সমালোচনাটি আমাদের ভালো লেগেছে।

আজকাল (ঈদ সংখ্যা)—সম্পাদক: এম তবরেজ, এস. এম. এহিয়া ও জিয়াদ আলি। এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আজকাল নতুন পত্রিকা। উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: "তরুণ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে এখনো একপ্রাণতার নিদারুণ অভাব। আমরা অনেকেই ব্যক্তিগত ঈর্ষাপরায়ণতা ও স্বার্থান্ধতার দাসত্বে খেয়োখেয়ির আসর বানাই অনেকের অলক্ষ্যে।... এসব কি ভেদকে জড়ো করে আজকাল প্রকাশিত হলো।" এ সংখ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, কাজী আবদুল ওদুদ, মুজফফর আহমদ, বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিরাজ চৌধুরী, পাবলো নেরুদা, এম তবরেজ ও আরো কয়েকজন। তা ছাড়া গল্প, কবিতা, কাব্যনাটক লিখেছেন বশীর আলহেলাল, আবদুল জব্বার, মোপাসাঁ, চেকভ, এস এম এহিয়া, বিষ্ণু দে, সুনীল চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। কয়েকটি বিদেশী গল্প-কবিতার অনুবাদ আছে।

যুগ (প্রথম সংকলন ১৩৭৬)—সম্পাদক: অসীমকুমার মজুমদার। ১০বি টি রোড। বার্ণপুর। বর্ধমান। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

বার্ণপুর মূলত শিল্পাঞ্চল। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে এখান থেকে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। নতুন প্রকাশিত 'যুগ' পত্রিকার সঙ্গে তাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল ভাবধারায় পুষ্ট যুগের প্রথম সংখ্যায় তার পরিচয় স্পষ্ট। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ফিচার লিখেছেন আশুতোষ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ, উদয়ন ঘোষ, মণীন্দ্র চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন।

রহস্যোপন্যাসের আবেদন সর্বদাই আছে। হালে বোধহয় বেড়েছে। রহস্যোপন্যাসের প্রকাশনার সংখ্যা দেখে তাই মনে হয়। বাজারে এইসব বইয়ের কাটতিও ভালো। **ধীরু চট্টোপাধ্যায়ের** দুটো উপন্যাস দিনকয়েক হলো বেরিয়েছে। একটির নাম **'পঞ্চম তরঙ্গ'**, অপরটির নাম **'অবৈধ পাপ এবং প্রমীলা সংবাদ'**। 'পঞ্চম তরঙ্গে' লেখক প্রেম ও প্রতিহিংসার পরিণতি দেখিয়েছেন। প্রেম করে বেড়ানোই নায়কের কাজ। শেষে কিন্তু একটি নিশ্চিত আশ্রয় সে পেল। বহু সাধের সে-ঘর একদিন ভেঙে যেতেই প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল তার মনে। সে আগুনে অনিবার্যভাবেই আহুতি দিতে হলো দুজনকে। তাদের একজন তারই দয়িতা।

'অবৈধ পাপ এবং প্রমীলা সংবাদ'-এ রহস্যের কিনারা করতে হলে পেরুতে হয় কাহিনী-উপ-কাহিনীর বহু আঁকাবাঁকা এঁদো গলি। বিশ বছর বাদে একজন সাংবাদিকের কাছে জনৈক অসমীয়া ভদ্রলোক নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি দেন। কী এমন ঘটল যার জন্যে এই স্বীকারোক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ল? পড়তে পড়তে আরও অনেক প্রশ্নই পাঠকের মনে দেখা যাবে। সে সমাধানে পৌঁছতে বইটি শেষ করতে হয়।

রমণীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তব গঙ্গা বয়ে চলে'—রহস্যোপন্যাসটির কাহিনীও বেশ জমাটে। জনৈক পুলিশ অফিসারের তদন্তের পথ ধরে কাহিনীর শেষে পৌঁছলে স্তম্ভিত হতে হয় সমাজের তথাকথিত উঁচুতলার মানুষের নারকীয় কীর্তিকলাপের পরিচয় পেয়ে। নিজেদের প্রয়োজনে শিশু হত্যা, নারী হত্যা করতে তাদের হাত একটুও কাঁপে না।

চিরঞ্জীব সেনের 'টু-সীটার গাড়ির রহস্য' উপন্যাসের তিনটি দিক। একদিকে ঝুমরী তিলাইয়ার সঞ্জয়ের চোখে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন—অন্যদিকে সীতাভিলার দাম্ভিক মেয়ে চন্দনা আর শংকরের প্রেম। সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি কুমারী বলি। টু-সীটার গাড়ির মালিকের কাছে সতীত্ব হানি হচ্ছে কতো কুমারী মেয়ের। চন্দনাও বাদ রইল না। কে এই টু-সীটার গাড়ির মালিক? উপন্যাস শেষে হয়েছে সেই রহস্য উদ্ঘাটন।

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদিম লিপ্সা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পাঁচটি। সুমন, প্রণয়, মলি, আঁখি এবং ডাক্তার দত্ত। মলি আর আঁখিকে ঘিরে দুই বন্ধু সুমন ও প্রণয়ের অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্বের কাহিনী এই উপন্যাস। প্রণয়কে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন কে সেই রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন গোয়েন্দা বাসব। মলির খুনের রহস্যও শেষে অজানা রইল না পাঠকের কাছে। কিন্তু শাখা-প্রশাখায় কাহিনী জটিল থেকে ক্রমশ জটিলতর আবর্তে গিয়ে পড়েছে। গোয়েন্দা বাসব আশ্চর্য দক্ষতায় সেই রহস্যের জট খুলেছেন। রহস্য এত ঘন যে আগাগোড়া রুদ্ধশ্বাসে পড়ে যেতে হয়।

স্বীকার করতেই হবে যে, বই পাড়ায় যত বই বেরোয় তার বেশির ভাগই উপন্যাস। প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বড়ো কম। **'আমার কথা ও চলচ্চিত্র কথা'** বইটি সে অভাব খানিকটা দূর করেছে।

সিনেমা যে একটি শিল্পমাধ্যম সে-বিষয়ে আজকাল মতদ্বৈধতা নেই। সমাজজীবনে-ব্যক্তিজীবনে আজকাল সিনেমার প্রভাবও যথেষ্ট। 'চলচ্চিত্র কথা' গ্রন্থে সেই চলচ্চিত্রের বহু কথা জানা যায়। চলচ্চিত্র-অনুরাগীদের কাছে বইটির বিশেষ মূল্য হবে। বইটিতে পুরনো এবং এ-কালের দেশি-বিদেশি বহু চিত্রের ছবিও এতে রয়েছে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন চিত্র-পরিচালক **সত্যজিৎ রায়**। বইটি সম্পাদনা করেছেন অসীম সোম।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে **'আমার কথা'**। এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য গিরিশ-যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী **বিনোদিনী দাসীর আত্মকথা**। একালের রঙ্গালয় ও অভিনয় বিষয়ে বহু মূল্যবান এবং অজানা তথ্য জানা যায় এই বইয়ে। অনেক দুষ্প্রাপ্য চিত্রও এতেও রয়েছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বইটি বিশেষ আদৃত হবে।

বৈকুণ্ঠের খাতা নয়, বইকুণ্ঠের খাতা—কেননা বইয়ের বিষয়ে কুণ্ঠা আমাদের বহু দিনের। অথচ বই পড়েই আমরা মানুষ হই, জীবনযুদ্ধে শক্তি অর্জন করি। তারপরেই আসে বইয়ের বিষয়ে ঔদাসীন্য। কিন্তু তা যদি না হয়, যদি আমরা পুরনো অভ্যাস ছেড়ে বুঝতে পারি, বই আমাদের কত বড় বন্ধু, কত বড় শুশ্রূষাকারী, তাহলে একটি নতুন বইয়ের প্রকাশনা লগ্নকে আমরা অভ্যর্থনা জানাব মানুষের সংসারে একটি নবজাতকের মতোই। বইকুণ্ঠের খাতায় আমরা এ ধরণের নবজাতক বইয়ের দিকে সম্ভ্রমে ও মমতার দৃষ্টিতে তাকাব, বই আর তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে কৌতূহলী হব। আর তারই ভিতর দিয়ে পালন করব আমরা ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের দায়িত্ব।

হৃদয় যখন কাঁদে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই স্বল্পসংখ্যক লেখকদের মধ্যেও অন্যতম, যাঁর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে একটা আলোড়ন ওঠে। এর কারণ অনেক সময়ই ভাবতে চেষ্টা করেছি। মনে হয়েছে, যেন একটা মায়াবী স্পর্শ রয়েছে তাঁর রচনায়, যা সহজেই পাঠক মনকে কাছে টানতে পারে। মনে পড়ে তাঁর 'পঞ্চতপা' বইটি পড়ছিলাম। খুব আগ্রহ ছিল না। নিতান্তই সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু কয়েক পাতা পড়বার পরেই কেমন যেন তন্ময় হয়ে পড়লাম। এর পর থেকে তাঁর গ্রন্থ খুঁজে খুঁজে পড়তে আরম্ভ করলাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করলাম, নতুন কথাবস্তু, নতুন উপলব্ধি আর নতুন অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়াস।

সম্প্রতি তাঁর 'নতুন তুলির টান' উপন্যাসটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিও তাঁর প্রতিভার দিগন্তকে প্রসারিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাতরঙ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। তখন এই বইটির নাম ছিল 'যক্ষপুরী'। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে অনেক দিন বইটা পড়ে ছিল। উপন্যাসটি নিয়ে অনেক কাজ করার আছে ভেবে লেখক ফেলে রেখেছিলেন। তারপর কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে 'নতুন তুলির টান' নামে বইটি প্রকাশ করেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে লেখক জানালেন, সময়াভাবে যে পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবেন ভেবেছিলেন, তা সম্ভব হয় নি।

কথাটা শুনে একটা অদ্ভুত কৌতূহল জেগে উঠল মনে। জিজ্ঞেস করলাম, 'বইটা লেখার ব্যাপারে হঠাৎ কি প্রেরণা অনুভব করেছিলেন আপনি?' প্রশ্নটা শুনে একটু কি যেন ভেবে নিলেন তিনি তারপর বললেন —'না, এই বইটা লেখার ব্যাপারে হঠাৎ কোন প্রেরণা নেই। অনেক দিনের অনেক কিছু সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতি ও ইঙ্গিত—নানা পর্যায়ে মানুষের অবস্থার তারতম্যজনিত চালচলনের যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছিল,—তার অনেকগুলো ব্যাপার একত্রে এই বইয়ে এসে পড়েছে।'

বিষয়টাকে আরো বিস্তারিত করবার জন্য আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার উত্তর শুনে মনে হচ্ছে, আপনি এই বইটি লেখার আগে বেশ কিছুদিন কতকগুলো সামাজিক সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন। এই উপন্যাসে তার প্রতিফলন ঘটেছে। সে সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন—?' প্রশ্নটা শুনে চিন্তাগ্রস্ত হলেন লেখক। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, সারা ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন কিছুক্ষণ। আমি লক্ষ্য করলাম, যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিছুক্ষণ আগেও হাল্কা চালে কথা বলছিলেন, তিনিই ধ্যানগম্ভীর আশুতোষের মত হয়ে উঠেছেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা প্রশান্ত গভীরতার ছাপ। পায়চারি করতে করতেই তিনি বলে চললেন, 'সাধারণত আমি হৃদয়ের কারবারী। বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্ন অবস্থার মানুষকে টেনে এনে তাদের বুকের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিতে আমার ভাল লাগে। এই বইটা লেখার সময় শহর কলকাতার শ্রেণীচেতনা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল—অনেক সময় ধাক্কা মেরেছিল পর্যন্ত। আমার মনে হচ্ছিল, শ্রেণীচেতনার এই মোহ ঘুচিয়ে দিয়ে হৃদয়ের সত্যিকারের বিনিময় সম্ভব কিনা? বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব কিনা? আমার ভাবতে ভাল লাগত সম্ভব। আমি এই উপন্যাসে সেই সম্ভাবনার একটা নির্ভরযোগ্য জাল বুনতে চেষ্টা করেছি।'

মুহূর্তে আমার চোখের সামনে নারায়ণী আর বিপুলানন্দের প্রতিচ্ছবি দুটো ফুটে উঠল। এই উপন্যাসের নায়ক আর নায়িকা। নারায়ণী মানে পদ্মাপারের নারায়ণী চক্রবর্তী। ছোটবেলার অনেক কথাই তার মনে আছে। সে জেনেছিল, কলকাতা থেকে জাহাজে পদ্মা পেরিয়ে এসেছে এই নারায়ণগঞ্জে। তখন তার বয়স চার। 'সেই বছর বয়সের অনেক কিছুই তো তার মনে আছে। যেমন, মনে আছে এখানকার সব লোকেরাই কেমন টেনে কথা বলে দেখে সে হাঁ করে থাকত। অর্ধেকের বেশি বুঝত না। সেই টানা বিদঘুটে কথা শুনে ওর হাসি পেত।... বছর বারো বয়স হতে নারায়ণীর মনের তলায় তাদের বিগত সংসার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।... না, বাবার কথা নারায়ণীর মনে নেই। সকলেরই একজন বাবা থাকে, তারও ছিল এইটুকুই জানে। শুনেছে বাবা খুব সুপুরুষ ছিল।...নিজের এই বারো বছর বয়সের অনেক আগেই নারায়ণী বুঝতে শিখেছিল সে খুব সুন্দরী মেয়ে।' এই দরিদ্র ঘরের পিতৃহীন কন্যা নারায়ণীর সঙ্গে পরিচয় হলো একদিন মালটি মিলিওনেয়ার বিপুলানন্দ বাগচীর। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মামাবাবু। ক্রমে এই পরিচয়ে পরিণয়ে সমাপ্ত হলো। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই নারায়ণী বুঝতে আরম্ভ করলো, কেবল রূপের জোরেই সে এই ঘরে এসেছে। এ ছাড়া 'এ ছাড়া এই আভিজাত্যের অন্তঃপুরে ঢোকার মত তা[র] আর কোন গুণ নেই। নেই যে এটা সকলেই খুব ভদ্র দাক্ষিণ্যে মেনে নিয়েছে। এমন কি যে তাকে এনেছে সে-ও। মনে নিয়ে তাকে তার কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছে। ছাঁচ বদলে[র] কর্তব্য।' আর এই কর্তব্যের তাগিদেই পাঁ[চ] মিনিটের মধ্যে এতদিনের নারায়ণী বৌ[দি] বাগচীতে পরিণত হয়েছে। চতুর্দিক থে[কে] অর্থ আর আভিজাত্যের চাপে নারায়ণী[র] ভেতরের মানুষটা পিষ্ট হয়েছে। বিপুলা[ন]ন্দ আভিজাত্যের গর্বে দিশেহারা। কারণে অকারণে তার কারখানা থেকে ছাঁটা[ই] করছে। নারায়ণী প্রতিবাদ করতে পারে না কিন্তু তারও চেয়ে নারায়ণী বেশি চিন্তি[ত] তার একমাত্র পুত্র রাজার মধ্যেও পিতার ম[ত] গর্ব আর অহঙ্কার। একদিন কারখা[না] থেকে বরখাস্ত এক দল শ্রমিক এসে দরজ[ার] সামনে দাঁড়িয়ে চাকরী থেকে ছাঁটাই করার জন্য অনুরোধ করছিল। এমন স[ময়] বারান্দা থেকে দামী এয়ার গান থে[কে] জনতাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে দেখ[ল] রাজাকে। নারায়ণী বিস্ফারিত নেত্রে দেখ[ল] ওই ছোট্ট মুখখানা রাগে আর হিংসার তা[পে] গন-গন করছে। গেটের ওধার থেকে উঠল, খোকা নেমে এসো, খোকনবাবু নে[মে] এসো। আমাদের একেবারে শেষ করে দি[য়ে] যাও। নারায়ণী নেশায় নিজেকে ডুবি[য়ে] রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও সান্ত্বনা পেল না। এর পর একদিন স্বা[মীর] অগোচরে ছেলেকে নিয়ে গেল নন্দ আশ্রমে। এইবার বিপুলানন্দ অনুভব ক[রল] তার মত পুত্রশোক আর পাঁচজনের[illegible]

প্রচ্ছদ চিত্র

তার হৃদয়ের পরিবর্তন সূচিত হল। শিল্পপতির মুখোস ছিন্ন করে তার ভেতরের যথার্থ মানুষটিকে জাগিয়ে তুলল। কাহিনীর এরকম বিন্যাসের ভেতর দিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যকে নির্ভরযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। লেখক যে কতখানি সমাজ-সমস্যার বিষয়ে সজাগ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুখোপাধ্যায় এই উপন্যাস রচনার পেছনের একটি প্রচ্ছন্ন কাহিনী বলে ফেললেন। কাহিনীটি এই উপন্যাস রচনার অন্তরালে একটি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে বলে উল্লেখ না করে পারছি না। লেখক যেভাবে কাহিনীটি বলেছিলেন আমি সেভাবেই এখানে পরিবেশন করছি।—

'আমি একটি মহিলাকে জানি যিনি মোটামুটি বিদুষী। কিন্তু তার থেকে ঢের বেশী রূপসী। তিনি এই রূপের ছাড়পত্রের জোরে আমার পরিচিত ছোটখাট এক শিল্পপতির অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ পেয়েছিলেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে একদিন আমার বাড়ীতে এসেছিলেন বেড়াতে। আমার শোবার ঘরে আসর বসেছিল। আমার স্ত্রী আর ওই মহিলা খাটে বসেছিলেন। আমি, ভদ্রলোক এবং আরো দু-একজন তাঁদের সামনে চেয়ারে বসেছিলাম। কথায় কথায় ভারি একটা মজার গল্প নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা। নিজের চোখে দেখা এক পানাসক্ত ভদ্রলোকের প্রচণ্ড হাস্যকর প্রহসনের কথা বলছিলাম আমি। হাসতে হাসতে প্রচণ্ড রক্তবর্ণ হয়ে মহিলা ঝোঁক সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলেন। সে রকম আঘাত না লাগার ফলে মিলিত হাসির প্রহসন যখন মাত্রা ছাড়াবার উপক্রম—ঠিক তখন তাঁর স্বামী ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে আমার মনে হল, তার আভিজাত্যে যেন একটা ঘা পড়েছে। স্ত্রীর প্রতি চাউনিতে তিনি যেন এক নিমেষে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর ঘরণীর এই ধরনের আত্মবিস্মৃত উচ্ছ্বাস মানায় না। আমি আরো অবাক হয়ে দেখলাম, চোখে চোখ পড়ামাত্র স্ত্রীটিও যেন এক নিমেষে সেটুকু বুঝে নিলেন। এই থেকে আমি যেন এই দুই অসমান শ্রেণীচেতন নারী-পুরুষের সংসার জীবনের চিত্রটি অনেকখানি আঁচ পেয়েছি। 'নতুন তুলির টান' উপন্যাসের কাহিনীতে এই ঘটনাটি একটা বিরাট ছায়া ফেলেছে।

এবার আমি জানতে চাইলাম, 'যক্ষপুরী' নাম পাল্টে তিনি কেন গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'নতুন তুলির টান' নামকরণ করেছেন। এবারেও তিনি একটু কি যেন ভাবলেন। তারপর উল্টো জিজ্ঞেস করলেন, 'যক্ষপুরী' নামটা শুনলে কি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র কথা মনে পড়ে না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তাহলেই বুঝতে পারছেন, উপন্যাসে নামটা কেন পাল্টেছি।' আবার একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'তাছাড়া এই নামটা বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ। এই উপন্যাস লেখার সময়ে একজন শিল্পপতির বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেই বক্তৃতা শুনে আমার মনে হয়েছিল, এঁরা এক ভিন্ন জগৎ, ভিন্ন সমাজের মানুষ। বাঙলার এই সব ভাগ্যবান সন্তানরা যদি পৃথক হয়েই থাকেন, তাহলে হৃদয় নামে বস্তুটি উদ্ভাসিত হয়ে যদি সর্বসাধারণের সঙ্গে না মেশে, তবে হয়তো এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে মেলার স্বপ্নটা বাহুলতা মাত্র। এই উপন্যাসে আমি একজন সেরকম শিল্পপতিকে অবলম্বন করে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর লোহার বুকখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি। হৃদয় যখন কাঁদে, সে কান্নার জোরটা অতিসাধারণ পাঁচজনের কান্নার জোর থেকে তফাৎ নয়। এই উপন্যাসে বিপুলানন্দের হৃদয়ের ক্রন্দনের করুণ ধ্বনি অঙ্কন করে এক নতুন সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই কারণে 'নতুন তুলির টান' নামটির বেশি ব্যঞ্জনাময় বলে মনে হয়েছে।'

কথা বলতে বলতে অনেক বেলা হয়ে যায়। ইচ্ছে ছিল বসে আরো কিছু জিজ্ঞেস করি। কিন্তু হল না। ফিরে এসে আবার উপন্যাসটি পড়লাম। মনে হল, একালের একটা বিরাট প্রশ্নকে তিনি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শুধু কাহিনী নয়, চরিত্রনির্মাণেও তিনি সমান দক্ষ। একালের নারীসমাজের তথাকথিত আধুনিকতাকে তিনি যেভাবে বিদ্রূপ করেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয় নারায়ণী চরিত্রের মাধ্যমে তিনি শাশ্বত ভারতীয় নারীর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। সদ্য-বর্তমানের এই হৃদয়শূন্য বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে মুক্তির একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি এই উপন্যাসে দিয়েছেন। বইটি তাই আমাদের প্রতিদিনের বিবর্ণ পটভূমিতে সত্যিই একটি 'নতুন তুলির টান' হয়ে উঠেছে।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

অন্নদাশঙ্কর রায়

।।পাঁচ।।

গান্ধীনেতৃত্বের অস্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের পানে তাকাই। মনে পড়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার সেই বিখ্যাত দুটি পঙ্‌ক্তি।

'Bliss was it in that dawn
to be alive
But to be young was very
heaven!'

ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনে যেমন ফরাসী-বিপ্লব আমার জীবনে তেমনি অসহযোগ আন্দোলন। প্রায় অর্ধশত বৎসর পরেও তার উন্মাদনা আমি এখনো অনুভব করি। তেমন দিন জাতির জীবনে একবারমাত্র আসে, চিরদিন প্রভাব রেখে যায়।

ফরাসী বিপ্লবও তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। অথচ তার মতো সার্থক আর কোন্ ঘটনা! এখনো বিশ্বমানবের চিত্তে তার স্পন্দন জেগে আছে।

তেমনি অসহযোগের দিনগুলির স্পন্দন।

গান্ধীজী হঠাৎ কোনখান থেকে এসে একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করেন। তার কথা ইংরেজ রাজের চৈতন্য হতো না। এবার তাঁরা জানলেন যে সব হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত করলেও একটি হাতিয়ার থেকে যায়, সেটির নাম হাতিয়ার না থাকা। তার থেকে কোনো মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না।

ভারতের জনগণ সেই প্রথম ইতিহাসের মঞ্চে প্রবেশ করে। তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে আসেন এক অসাধারণ তেজস্বী নেতা। তাঁর হাতে একটিমাত্র অস্ত্র। তার নাম নিরস্ত্রতা। সেই অসামান্য অস্ত্রই তিনি জনগণের হাতে তুলে দেন।

আবেদন নিবেদন করে যেটুকু পাবার সেটুকু পাওয়া গেছে, তার বেশী পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ সে-পথে আসবে না। সুতরাং দেশবাসী তখন অন্য কোনো পথের সন্ধান করছিল। সে-পথ কি তবে সশস্ত্র বিদ্রোহের বা বিপ্লবের পথ! মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পথ সেইরূপ হলেও লক্ষ লক্ষ পথিকের জন্যে সে পথ নয়।

এদেশের সাধারণ লোকের হাতে রাইফেল রিভলবার ধরিয়ে দিলেও তারা সাহস করে ধরবে না। সে সাহসই তাদের নেই। ধরবে যারা তারা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত তরুণ ভদ্রঘরের সন্তান। তাদের জীবনদর্শন রোমান্টিক। সেই অসমসাহসিকদের উপর ছেড়ে দিলে তারাই দেশকে স্বাধীন করে দেবে এ বিশ্বাস খুব বেশী লোকের ছিল না। আর থাকলেও তারা চাচার মতো আপনা বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। অংশ নিচ্ছিল না। ইতিহাসের মঞ্চে তাদের টেনে আনা অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

তবে সে চেষ্টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী বর্জন বলে আরো একটা পথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। সে পথে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হওয়া গেছল। কিন্তু যে জিনিসটিকে বর্জন করবে সে জিনিসটি যদি অত্যাবশ্যক হয়ে থাকে তবে সেটির অভাব পূরণ করবে কী দিয়ে? দেশে কি সেটি তৈরি হয়? তৈরি না হলে তৈরি করে নিতে কি তোমরা তৈরি?

বর্জন যে সফল হলো না তার কারণ তার সঙ্গে গঠনের আয়োজন ছিল না। যারা গড়বে না, শুধু ভাঙবে, তাদের সঙ্গে জনগণ বেশীদূর যায় না। তাই বর্জন আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে গান্ধীজী এটা লক্ষ করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে প্রথমেই মনোযোগ দেন গঠনের উপর। দেশ যাতে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রথম থেকেই গঠনের উপর ঝোঁক তাঁকে ধাপে ধাপে নিয়ে যায় খাদির অভিমুখে, চরকার অভিমুখে। একমাত্র সেইভাবেই দেশের কোটি কোটি দীনহীন মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে। নয়তো যা হবে তা কয়েকটা শহরের কয়েকজন মিল মালিকের স্বাবলম্বন।

স্বাধীনতার সঙ্গে স্বাবলম্বনের সম্পর্ক সব দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। ওটা কিছু নতুন কথা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের তত্ত্বও ছিল দেশকে সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। কিন্তু ঝোঁকটা পড়েছিল বর্জনের উপরে। তা দেখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তখন থেকে তাঁর মনে যে বিরূপভাব সঞ্চিত হয়েছিল তা অমূলক ছিল না। তিনি যখন শুনলেন যে গান্ধীজীও বর্জন প্রচার করছেন তখন তিনি ধরে নিলেন যে গান্ধীজীও গঠন না করে বর্জনের পক্ষপাতী। বর্জন কথাটাই, রবীন্দ্রনাথের কানে জাতিবৈরসূচক অযথা একটা উৎপাত। কারণ তাঁর স্বদেশীযুগের অভিজ্ঞতা সেইরূপ ছিল।

কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, গান্ধীজী দেশকে দিয়ে বিপুল আকারে গঠনকর্ম করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ও বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল গঠনকর্মের দেশব্যাপী উদ্যোগ। রবীন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছা বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না করে গঠন কথাটিকে একমাত্র উচ্চার্য শব্দ করা। গান্ধীজীর মনের ইচ্ছা যে তার থেকে ভিন্ন তা নয়। কিন্তু বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না করলে বিদেশী প্রভুশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হয় না। আর সংগ্রাম না হলে স্বাধীনতা হয় না। তবে গান্ধীজীও স্বীকার করতেন যে, নিছক গঠনমূলক কর্মের দ্বারাও দেশ স্বাধীন হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বাণীও কি তাই নয়?

তারপর অসহযোগ কথাটিও রবীন্দ্রনাথের অসহ্য। তার পেছনে রয়েছে কেবল শাসকদের বা শোষকদের সঙ্গে নয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলার পাশ্চাত্ত্য তথা আধুনিক প্রবাহের সঙ্গে একপ্রকার অসহযোগী মনোভাব। সেটা তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। না করাই উচিত। বিদেশী কাপড় বর্জন করলে দেশে একদিন স্বদেশী কাপড় বোনা হবে, তা সে যতই মোটা হোক। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীপাবলী নিবিয়ে দিলে যা হবে তা অমাবস্যার অন্ধকার। মধ্যযুগ নেমে আসবে। শাসক ইংরেজ, শোষক ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চাও করো। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শ থাকবে না এটা সংস্কৃতির দিক থেকে অপহানি।

আমাদের সংস্কৃতি তিনটি স্রোতের ত্রিবেণীসংগম। প্রাচীন হিন্দু, মধ্যযুগীয় মুসলিম ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য। এর থেকে কোনো একটিকে বাদ দেওয়া যায় না। সরকারী বিদ্যালয়ের থেকে বিদ্যার্থীদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চাও, বেশ। কিন্তু যেখানে নিয়ে যাচ্ছ সেখানেও তাদের ত্রিবেণীসংগমে অবগাহন করাও। সাধারণত ওইসব জাতীয় বিদ্যালয় ছিল সরকারী বিদ্যালয়েরই পরিবর্তিত সংস্করণ। প্রাচীন বা মধ্যযুগের মতো নয়। নতুনের মধ্যে ছিল ইংরেজীর বদলে বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার মাধ্যম। পাঠ্যতালিকায় হয়তো ছিল এমন কোনো বই যা সরকারী বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না, কারণ রাজদ্রোহগন্ধী। বর্জন এক্ষেত্রে গঠনের মৌলিকতাবিহীন। তাই জাতীয় শিক্ষা অবশেষে চরকা খাদিকেই অবলম্বন করে গ্রামমুখীন হয়। সংস্কৃতির প্রবাহ সে খাতে বয় না।

আদালত বর্জনের উদ্দেশ্য ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে পঞ্চায়েৎ গঠন। সেখানেই দেশের লোক অন্যায়ের প্রতিকার খুঁজবে ও পাবে। আদালতে যারা সত্য কথা বলে না পঞ্চায়েতে বলতে বাধ্য হবে। গ্রামের লোক তাদের

সহজাত প্রতিভার দ্বারা বুঝতে পারবে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। কারাগারে না পাঠিয়েও দণ্ড দেওয়া যায় আর তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে। রাজদ্বারে যে দণ্ডদান হয় তা মনুষ্যত্ববিরোধী। আর ইংরেজের আদালতে তো দুর্নীতির বেসাতি। সেখানে ন্যায় বলতে কতটুকু মেলে! একরাশ উকিল মোক্তার কেরাণী ও টাউট পোষাই কি সভ্যতা? আর হাকিমদের চুলচেরা বিচার যতই মূল্যবান হোক ভারতের সাধারণ লোকের কাছে তার কতটুকু মূল্য?

বহু ইংরেজ অফিসার ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আদর্শের আইন আদালত প্রবর্তনের মহিমা বুঝতেন না। ভারতের লোকের জন্যে চাই কাজীর বিচার বা রাফ জাস্টিস। তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে হাইকোর্ট লোয়ার কোর্ট ইত্যাদি অনেক কিছুই গড়ে উঠত। আমরাও যে তার বদলে পঞ্চায়েৎ গড়ে তুলতুম তাও নয়। আমাদের সম্বল হতো মারাঠা ও মুঘল বিচারপতি। ব্রিটিশ রাজত্ব আমাদের রাষ্ট্রে একটি আধুনিক অংগ যোজনা করে। তার নাম জুডিসিয়ারি। তাকে ভেঙে ফেললেই যে তার বদলে নির্ভরযোগ্য আর-এক জুডিসিয়ারী খাড়া হবে তা নয়। যেটা হবে সেটা হয়তো মোটা ভাত মোটা কাপড়ের মতো মোটামুটি সুবিচার। কিন্তু দেখা গেল শিক্ষিত অশিক্ষিত কেউ সেটা চায় না। তারা চায় সূক্ষ্ম বিচার।

ব্যয়বহুল ও দুর্নীতিকলুষিত হলেও ব্রিটিশ আদর্শের জুডিসিয়ারি দেশের লোকের বহু শতাব্দীর অভাব পূরণ করেছিল। সেই জন্যে তারই উপর তাদের আস্থা বেশী। এসব বিষয়ে লোকে স্বদেশী-বিদেশীর বিতর্ক বোঝে না। বিদেশী পদ্ধতি যদি স্বদেশী পদ্ধতির চেয়ে উন্নত হয়ে থাকে তবে উন্নততর বলে বিদেশীকেই বরণ করে। বিদেশী কাপড় সম্বন্ধে যাদের আপত্তি বিদেশী বিচার সম্বন্ধে তাদের আপত্তি থাকলে অসহযোগ নিশ্চয়ই জোর পেত। কিন্তু দেখা গেল আদালত বর্জন করে সরকারের চেয়ে সাধারণেরই অসুবিধে হলো বেশী। পঞ্চায়েৎ দিয়ে বিচারের অভাব মিটল না।

ইংরেজ রাজত্বে যেমন আমাদের রাষ্ট্রে আধুনিক আদর্শের জুডিসিয়ারি সংযোজিত হয় তেমনি হয় লেজিসলেচার। এ জিনিস এর আগে এদেশে ছিল না। ব্রিটেন থেকেই আসে। এটা প্রবর্তন করতে ইংরেজদের যে বিশেষ ত্বরা ছিল তা নয়। তারা দীর্ঘসূত্রিতার চরম করেছে। কারণ তাদের দেশের ইতিহাসে পার্লামেন্ট ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়, রাজা ক্রমে ক্রমে হীনবল হন। ভারতের মাটিতে পার্লামেন্ট প্রবর্তন করলে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে। ভারতীয় লোকপ্রতিনিধিরা ক্ষমতাশালী হবেন, ইংরেজ শাসককুল সাক্ষীগোপাল হবেন। সাধে কি কেউ সাক্ষীগোপাল হয়?

তাছাড়া ইংরেজদের ধারণা ছিল যে তাদের পার্লামেন্টারি সিস্টেম তাদেরই বিশেষত্ব। ব্রিটেনের বাইরে প্রবর্তন করা নিষ্ফল। সে সীস্টেম চলে একজোড়া চাকার উপর গড়াতে গড়াতে। একটি সরকার পক্ষ। অপরটি বিরোধী পক্ষ। দুই পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে যে সাধারণ নির্বাচনে বেশীর ভাগ ভোট যার ভাগ্যে পড়বে সেই শাসনভার নেবে। অপর পক্ষ নেবে বিরোধিতার ভার। বিরোধিতার ভারও দায়িত্বপূর্ণ। কারণ বিরোধীরাও একদিন সরকার গঠন করার হকদার হবে। পার্লামেন্টারি কনভেনশন না মানলে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা অচল। তেমন কনভেনশন তো আইন করে প্রবর্তন করা যায় না। ভারতীয়রা হাজার যোগ্য হোক সেসব কনভেনশন পাবে কোথায়! নিজেদের ভিতর থেকে বিবর্তন করা কি এত সহজ! অতএব লেজিসলেচার প্রবর্তন করা বৃথা।

ঠিক ওই জিনিসটি দাবী করেই কংগ্রেসের সূচনা। কংগ্রেসের কাম্য ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ভারতীয় সংস্করণ। বিদেশী বলে তাতে তার অরুচি ছিল না। স্বদেশী বলতে যা ছিল তা পার্লামেন্টের বিকল্প নয়। তা লেজিসলেচারই নয়। যেদেশে যেটা নেই সেদেশে সেটা চাওয়া কি দেশীয়তাবিরুদ্ধ? অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে কোনো ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তেমন কথা ভাবেন নি। তাঁরা ইংরেজের কাছে ইংরেজের যা শ্রেষ্ঠ তাই বরং চেয়েছেন। পার্লামেন্টারি শাসন।

ইংরেজদের মধ্যে বরাবরই একদল সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁরা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে প্রতিশ্রুত। গায়ের জোরে নয়, বন্ধুতার ডোরে ভারত ও ব্রিটেন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত থাকবে এই ছিল তাঁদের আদর্শ। তাঁদেরই একজনের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে হিউম ছিলেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য আরো অনেক ইংরেজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, হাত না ধরে হাত ছাড়িয়ে নেওয়া দাদাভাই, সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজশা, গোখলে, মালবীয় প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাধ্যাতীত ছিল। গান্ধীজীও কি হাত ছাড়িয়ে নিতেন? নিতে হলো, না নিয়ে উপায় ছিল না।

সহযোগিতা সমানে সমানে হতে পারে, স্বাধীনে স্বাধীনে হতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ড যে এত বড়ো একটা মহাযুদ্ধের পরেও ভারতকে সমান ও স্বাধীন বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। মহাযুদ্ধে ভারত কি কম রক্ত, কম অশ্রু, কম অর্থ, কম উপকরণ দান করেছিল! তার সৈনিকরা প্রাণ না দিলে তুর্কদের হটানো যেত না। জার্মানদের হারানো আরো কঠিন হতো। অথচ কাজের বেলায় কাজী যারা কাজ ফুরোলেই পাজী তারা। তাদের উপর রাওলাট আইন চাপানো হলো। তাদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হলো না।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার সময়ও গান্ধীজী ব্রিটেনের সদিচ্ছায় বিশ্বাস করতেন। সে বিশ্বাস একটু একটু করে টলে। প্রথম ধাক্কা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। বুকে হাঁটার হুকুম। আনুষঙ্গিক বিবিধ প্রতিশোধ। কারণ কয়েকজন ইংরেজ পুরুষকে খুন করা হয়েছিল ও ইংরেজ নারীকে অপমান করা হয়েছিল। ইংরেজদের মনে আতঙ্ক জন্মেছিল যে সিপাহীবিদ্রোহ আবার বাধতে যাচ্ছে, তখন আর ইংরেজ পুরুষ বা নারী কেউ নিরাপদ নয়। কাজেই তাদের একজনের গায়ে হাত দিয়েছ কি সর্বনাশ করেছ। তারাও সর্বনাশ করবে।

দ্বিতীয় ধাক্কা মুসলমানদের মনে লাগে, ভাই হিসাবে গান্ধীজীরও মনে। যুদ্ধের পরে যে শান্তিবৈঠক বসে তাতে তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা খর্ব করা হয়, খালিফ হিসাবে তিনি দুনিয়ার মুসলমানদের ধর্মস্থানগুলির উপর কর্তৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ভারতীয় মুসলমান বন্ধুরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে তাঁর পরামর্শ চান। তখন তিনি তাঁদের বলেন যে, আবেদন নিবেদন করে যদি কোনো ফল না হয় তবে মুসলমানদের কর্তব্য হবে অসহযোগ। অসহযোগ কথাটি আচমকা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর তিনি সেটি ভুলে যান। পরে আবার মনে পড়ে যখন আবেদন নিবেদন সত্যি সত্যিই ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ট্র্যাজেডী নিয়ে দেশময় ঝড় উঠেছিল। প্রথম অসহযোগী আর কেউ নয়, নাইট উপাধিত্যাগী রবীন্দ্রনাথ।

আমরা যে সবাই মিলে এক নেশন তার প্রমাণ পাঞ্জাবীদের লাঞ্ছনায় সকলেরই লাঞ্ছনাবোধ আর মুসলমানদের মর্মবেদনায় সকলেরই সমবেদনা। তবে এ দুটির ভিতরে একটু তফাৎ ছিল। খেলাফৎ বহু দূরের ব্যাপার। খেলাফৎ নিয়ে মাথা পাওয়া তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক যারা তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সেটা অবাস্তব। তাই মুসলমান ভিন্ন আর কেউ সে ইস্যুতে অসহযোগ করতে এগিয়ে আসতেন না বড়ো। গান্ধীজীর কথাতেও না। তেমনি পাঞ্জাবের ইস্যুতেও আসমুদ্র হিমাচল এককথায় অসহযোগ করত না। এছাড়া আরো একটা ইস্যুর দরকার ছিল। তার নাম স্বরাজ।

মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবার মতো ছিল না। গান্ধীজীও গোড়ায় তার বিরুদ্ধতা করেন নি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর প্রত্যয় হয় যে, মহাযুদ্ধের দুঃখদুর্দশার ফলে দেশ যেমন আগুন হয়ে রয়েছে হিংসাপন্থীরাই তার সুযোগ নেবে ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিশোধ ডেকে আনবে। অহিংসাপন্থীরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে তবে কোনো দিনই সুযোগ পাবে না। মুসলমানরা যখন অসহযোগ করতে উৎসাহী, পাঞ্জাবীরাও প্রস্তুত, তখন আর-সবাইকে স্বরাজের নামে ডাক দিলে তারাও সাড়া দেবে। কেননা স্বরাজের জন্যে অভূতপূর্ব এক আকুলতা জেগেছিল। ধাপে ধাপে শাসনসংস্কার, কে জানে ক'পুরুষ বাদে স্বরাজ, এটা তারা মেনে নিতে নারাজ যাদের রক্ত গরম। সন্ত্রাসবাদী যাদের বলা হতো তারা অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে

বিশ্বময় জাল পেতেছিল। কোথায় কানাডা, কোথায় জার্মানী, কোথায় জাপান ও ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র তাদের কার্যকলাপ সম্প্রসারিত ছিল।

এক হাতে নরমপন্থীদের সরিয়ে আরেক হাতে সন্ত্রাসবাদীদের ঠেকিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। তাঁর পেছনে খেলাফতী মুসলমানদের জমায়েৎ। আর যাদের কথা কেউ কোনো দিন ভাবে নি সেই অভদ্র ইতর জনগণ। শূদ্রকে এতদিন শূদ্র বলেই অনুকম্পা ও অসম্মান করা হতো। এখন বোঝা গেল স্বরাজের জন্যে লড়তে হলে বিপুলসংখ্যকের যোগদান অত্যাবশ্যক। সুতরাং মুচি মেথর চামার কামার এরাও যোদ্ধা।

যুদ্ধের প্রয়োজন সব দেশেই শূদ্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। নারীরও। গান্ধী-পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের বেলাও তাই ঘটে। দেশ যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে সংগ্রামের প্রতীক্ষায় ছিল। অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে গান্ধীজী সেই সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। তার জন্যে একটা প্ল্যাটফর্মের দরকার ছিল। আশ্চর্যের বিষয় রাতারাতি ভোল ফিরিয়ে কংগ্রেস হয় সেই প্ল্যাটফর্ম। সংগ্রামের তীব্রতা তাকে ক্রমে ক্রমে একটা পার্টির চেহারা দেয়।

•

অসহযোগ আপাতত কার্যক্রম হলেও সিভিল ডিসওবিডিয়েনসই ছিল লক্ষ্য। লক্ষ লক্ষ লোক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারই আকর্ষণে ও মহাত্মার সম্মোহনে।

(২০) সাহানা কোথায় ?

ঘর নিস্তব্ধ।
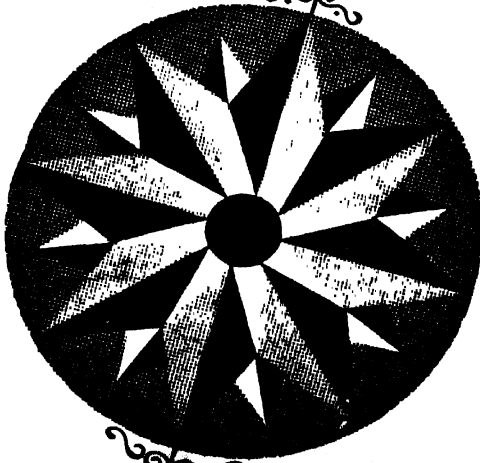
দেওয়াল থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল—ঠিক, ঠিক, ঠিক!

চিন্তাকুটিল ললাটে বলল ছদ্মবেশী গোয়েন্দা—'আপনি ঠিক দেখেছেন তো?'

'আলবৎ দেখেছি। বিকেলের দিকে বিশেষ কাজ ছিল না আমার। গেছিলাম প্ল্যাটফর্মে। পায়চারী করছি আর হাওয়া খাচ্ছি—এমন সময়ে ট্রেন এল। ভুঁইফোড় ছুঁচোর মত কোত্থেকে হাজির হল উপেন নন্দী। ট্রেন থেকে নামল লম্বামত একটি মেয়ে। চাউনি আর ঘাড় বেঁকানো দেখে মনে হল খানদানী ঘরের মেয়ে। ভীম দত্তর চৌকোণা চোয়ালের সঙ্গে মেয়েটার শক্ত চোয়ালের বেশ মিল আছে। তারপরেই শুনলাম উপেন নন্দী 'মিস দত্ত' বলে এগিয়ে গেল। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল—বাপি ভাল আছে?

উপেন নন্দী বলল—যেতে যেতে বলছি। ওঁর শরীর ভাল নয়। তাই আসতে পারলেন না। গাড়িতে উঠে বসল দুজনে। উপেন গাড়ি হাঁকিয়ে উধাও হল। তাই ভেবেছিলাম, সাহানা দেবী আপনার শুকনো মরু জীবনকে হয়তো কিছুটা ভিজোতে পেরেছেন।'

অখণ্ডনারায়ণ একটা বিঘৎখানেক লম্বা সিগারেট বার করে বলল—'ভাবি আশ্চর্য ব্যাপার তো। উপেন স্টেশন থেকে বেরিয়েছে বিকেলে। কিন্তু ভূতুড়ে বাংলোতে পৌঁছেছে

আগের ঘটনা

[চল্লিশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আজ প্রবীণ জহুরী খেমচাঁদ। আর সেদিনের প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা তারই দোকানে বেচতে এলেন অনন্ত স্মৃতিজড়ানো ব্রাজিল থেকে আনা বজ্রমণির কণ্ঠহার। কিনছেন একালের বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। নেকলেস বোম্বেতে ডেলিভারী দেবার কথা ছিল।...হঠাৎ ট্রাঙ্ক কল। রাজস্থানেই কণ্ঠহার ডেলিভারী দিতে হবে—নয়া ফরমান। আর তাতে পাওয়া গেল রহস্যের আমেজ, বোঝা গেল ফেউ লেগেছে। মুস্কিল আসানের ভার নিয়েই প্রাইভেট ডিকেটটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র কুঁজোর ছদ্মবেশে হাজির হলেন রাজস্থানে, ভীম দত্তের বাংলোয়। নাম তার এখন গুল মহম্মদ, জবরদস্ত খানসামা। অখন্ড আলাদাভাবেই এসেছে এই বাংলোয়। রহস্য ঘনীভূত। ভীম দত্তের পোষা হীরামন মারা গেছে ইতিমধ্যে। বাংলোর একটি দেয়ালে গুলির দাগ, মারা গেছে একটি মানুষ, উধাও হয়েছে ভীম দত্তের পুরনো পিস্তল। হারিয়ে যাওয়া বুলেট দুটোর খোঁজ পাওয়া গেল। সেঁকো বিষের খালি টিনও পাওয়া গেল খেঁকি উপেনের কাছ থেকে।কলকাতা থেকে ফিরল ভীম দত্তের প্রিয় খানসামা মেহের খান। কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢুকতে না ঢুকতে তাকেও কেন কে গুলি করে হত্যা করল। রহস্য গভীর থেকে গভীরতর। পুলিশ এল। ছদ্মবেশী ইন্দ্রনাথের উপর সন্দেহ সবচেয়ে বেশি। বড় কঠিন পরীক্ষা। উতরোতে পারবে তো গুল মহম্মদ?

এমন সময় এ বাড়িতে কয়েকদিনের জন্যে থাকতে এলেন ন্যাচারালিস্ট অঘোর মল্লিক। খবর পাওয়া গেল ভীম দত্তের কলজে-ছেঁড়া মেয়ে রূপসী সাহানা দেবীও আসছেন। স্টেশনে এসে নাকি পোঁছেওছেন, কিন্তু বাংলোয় তাঁর ছায়া পড়েনি। তাহলে কোথায় সে?]

রাত দশটায়। একলা। শুধু তাই নয়। আমাদের গোয়েন্দাদাদা মাইল মিটার দেখে আবিষ্কার করেছেন, গাড়ি বাষট্টি মাইল দৌড়েছে।'

ইন্দ্রনাথ বলল—'আরও আছে। অ্যাক-সিলেটরে খানিকটা লাল কাদামাটি লেগে ছিল। খুব সম্ভব উপেন সাহেবের শুকতলা থেকে উঠে এসেছে। আপনি এ তল্লাটের সব জানেন। বলতে পারেন লাল মাটি কোথায় আছে?'

'ঝট করে বলাটা ঠিক হবে না,' বলল দাশরথী। 'লাল মাটি কয়েক জায়গায় খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে মশায়। ওহো, ভুলেই গেছিলাম, অখন্ডবাবু, আপনার একটা চিঠি এসেছে।'

খামটা তুলে নিল অখন্ড। গোটা গোটা মেয়েলি ছাঁদে লেখা নাম ঠিকানা। লিখছে শর্মিষ্ঠা বর্মা। মিনতি জানিয়েছে, নেকলেস বিক্রি যেন কেঁচে না যায়। অবাক হয়েছে, ভীম দত্ত বাংলোয় হাজির থাকা সত্ত্বেও নেকলেস এখনো দেওয়া হল না কেন। দুঃখ করেছে, এ টাকা যদি ফসকায়, তাহলে পাওনাদাররা ছিঁড়ে খাবে বর্মা-পরিবারকে।

চিঠিটা পড়ে শোনাল অখন্ড। তারপর ছিঁড়ে ফেলল।

বলল—'এ দোটানা আর সইতে পারছি না। শর্মিষ্ঠা বর্মার মত মহিলা হাজারে একটা হয় না। তাঁর সঙ্গে এভাবে ক্যারেজ খেলতে আমার বিবেকে বাধছে। সত্যিই তো, ভীম দত্তর বাংলো ভূমিকম্পে যদি ধসেও যায়, আমাদের বয়ে গেল। শর্মিষ্ঠা বর্মার কাছে আমাদের একটা কর্তব্য—'

'তাঁর কাছে আমার কর্তব্যও বড় কম নয়,' বলল ইন্দ্রনাথ।

'তাহলে বলুন এখন কি করি।'

'শুধু দেখে যাও।'

'আর কত দেখব? দেখতে দেখতে তো চোখে ধোঁয়া দেখছি।'

'ধোঁয়ার উৎসটা তো দেখা দরকার।'

'সেটা দেখবে পুলিশ।'

'পুলিশ মানে ঐ মোটা মাথা রসিকলাল দারোগা? রক্ষে করো। যার অমন তেরাবেঁকা চেহারা—'

'তেরাবেঁকা চেহারার সঙ্গে নেকলেস দেওয়ার কি সম্পর্ক? আমাদের কাজ নেকলেস ডেলিভারী দেওয়া—আমরা তা করি। তার কাজ রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানো—সে ঘামাক। আমাদের কাজ আমরা না করে তার কাজ করতে যাই কেন?'

'রসিকলাল একটা অকর্মার ধাড়ি,' বলল ইন্দ্রনাথ।

'তাতে আমাদের কি?' অখন্ড অসহিষ্ণু।

'অস্থির পঞ্চম কষেছো?'

'অস্থির পঞ্চম আবার কী?'

'পাটিগণিতের কঠিন অংক। যা কষতে গিয়ে ভাবতে হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকতে হয়।'

'তার সঙ্গে নেকলেসের কি সম্পর্ক?'

'নেকলেস—মেহের নিধন একটা অস্থির পঞ্চম রহস্য। তোমার মত অস্থির পঞ্চাননের কর্ম নয়। দাশরথীবাবু কি বলেন?'

'আপনাকেই ডিটো মারছি। অখন্ডবাবু, ভাবনার ভারটা ইন্দ্রনাথবাবুর ওপরেই ছেড়ে দিন। ধৈর্য ধরুন।'

লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলল অখন্ড—'ধৈর্য! ধৈর্য! ধৈর্য! কিন্তু কিসের জন্য ধৈর্য ধরব বলতে পারেন?'

'ছেলেমানুষের মত কথা শুনুন,' সস্নেহ কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের। 'ভীম দত্ত কাল যোধপুর যাচ্ছেন তো?'

'যাচ্ছেনই তো।'

'সঙ্গে উপেন নন্দীও যাবে আশা করছি। বাংলো ফাঁকা হলে তোলপাড় করে দেখার একটা সুযোগ পাবো তো?'

'তা তো পাবো। কিন্তু—'

'বাস। আর কোনো কিন্তু নয়। তুমি জয়পুর ঘুরে এসো। এদিকে আমি সামলাবো। ট্রেন কখন?'

'সময় হল বলে।'

'তাহলে কেটে পড়ো। আর দেরি না।'

স্টেশনে অখন্ড একলাই গেল। গিয়েই দেখল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী। যেন কুচকুচে কালো পাথরে খোদাই খাজুরাহোর একটি জীবন্ত মূর্তি। পরনে ঘোড়ায় চড়ার পোশাক।

সোল্লাসে বলল অখন্ড—'একি! অমাবস্যার চাঁদ যে!'

ভুরু কুঁচকে বলল কৃষ্ণপ্রিয়া—'যাওয়া হচ্ছে কোন চুলোয়?'

'জয়পুর।'

'খুব দরকার?'

'বলাই বাহুল্য। দরকার না থাকলে আমার মত ব্রেনের তলব পড়ে?'

'অহংকারে মটমট করছেন দেখছি।'

জবাবটা জিভ থেকে খসবার আগেই হুড়মুড় দুড়মুড় করে স্টেশনে ঢুকল মান্ধাতার আমলের একটা ট্রেন। কাঠের বগী। একটা কামরায় লাফিয়ে উঠল ভ্রমর আর অখন্ড।

পাশাপাশি বসে ভ্রমর বলল—'পোড়া কপাল আমার।'

'সে কি কথা? চন্দন কুমকুমও যে কপালে ম্যাড় ম্যাড় করে, যে চারু ললাটের ওপর অলকা তিলকও লজ্জা পায়—'

'ইয়ার্কির সময় অসময় আছে।'

'যাচ্চলে। আপনি বললেন পোড়া কপাল—'

'সেটা আপনি জয়পুর যাচ্ছেন বলে। আমি চলেছি মরুভূমিতে। কটা স্টেশন পরেই নামব। একটা ঘোড়া ভাড়া করব। তারপর টিকোতে টিকোতে যাবো কসবা-গিরিতে।'

'কসবা? সে তো বালিগঞ্জের ওদিকে—'

'আপনি একটা ইয়ে...কসবা একটা আরবী শব্দ। মানে, শহর। মরুভূমির মাঝে একবার গিরি-শহরের প্ল্যান হয়েছিল। সেই থেকে পাহাড়টার নাম হয়েছে কসবা-গিরি। আমি সেইখানে যাবো। একলাই যাবো। আপনি সঙ্গে থাকলে সময়টা কোন রকমে কেটে যেত।'

'ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। কেন, সময়টা ভালোভাবে কেটে যেত বলতে কি হয়েছিল?'

মিটিমিটি হাসতে লাগল ভ্রমর। হাওয়ায় মাথার চুল আলপনার আকারে লেপটে রইল কপালে, গালে, চিবুকে।

অখণ্ড বলল—'কখন নামতে হবে আমাদের?'

'আমাদের মানে? আপনি তো বললেন জয়পুর যাচ্ছি?'

'গালের একটা তিলের জন্য সমরখন্দ যদি বিলিয়ে দেওয়া যায় তো আপনার মিষ্টি মুখের দুটো বচন শোনার জন্যে আমি জয়পুর যাওয়া বন্ধ করতে পারি না?'

আড়চোখে তাকিয়ে ভ্রমর বললে—'আপনি কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছেন। জয়পুর—'

'না গেলেও চলবে।'

●

কয়েকটা স্টেশন পরেই নেমে পড়ল দুজনে। দুটো ঘোড়া ভাড়া নিল ভ্রমর।

অখণ্ড বলল—'ঘোড়াটা আমাকে পিঠে চাপাবে তো? আমার ঘোড়সওয়ারের পোশাক নয়।'

'চাপাবে। পোশাক না থাকলেও চেহারাটা রাজপুত্রের মত তো।'

'বজ্রজ্বালা কথাটা শুনলে কষ্ট পাবে না তো?'

'আমার বজ্রজ্বালা আপনার মতো এক-চোখো নয়। সে জানে দ্রৌপদী তার একার নয়।'

'দ্রৌপদী! ও নাম আপনি কোত্থেকে শুনেছেন?'

'শুনেছি!' বলে চোখে গগলস পরল ভ্রমর। তাই কালো চোখের দামিনী-ঝলক দেখতে পেল না অখণ্ড।

পাশাপাশি দুটো ঘোড়া এগিয়ে চলল বালুকা-প্রান্তরের ওপর দিয়ে। নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যে শুধু খপ্ খপ্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বালির মধ্যে ঘোড়ার খুর পড়ছে আর উঠছে...পড়ছে আর উঠছে।

কিছুক্ষণ পর ভ্রমর বলল—'আপনার ভাল লাগছে?'

'কোনটা? আপনার সঙ্গ, না দৃশ্য?'

'দৃশ্য।'

'লাগছে।'

'লাগবে। প্রথম এলেন তো। আমার চোখে সব সয়ে গেছে। লোকেশন খুঁজতে খুঁজতে চোখ টাটিয়ে গেছে।'

'এটাও কি লোকেশন খোঁজার অভিযান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। নতুন চিত্রনাট্য পাঠিয়েছে বোম্বাই থেকে। নায়ক নায়িকার পেছনে তাড়া করবে মরুভূমির মাঝে, লুকোচুরি খেলবে পাহাড়ে, নদীতে। মরুভূমির সূর্যাস্ত দেখবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান গাইবে। তারপর আসবে বেদুইন দস্যু। খুন। জখম। নারী হরণ। বুঝছেন?'

'ফরমুলা কাহিনী। বুঝে ফেলেছি। কিন্তু সব জায়গাতেই যখন ছবি তোলা হয়ে যাবে, তখন আপনি যাবেন কোথায়?'

'মঙ্গলগ্রহে। অথবা চাঁদে। শেষ পর্যন্ত আপনার বজ্রজ্বালা তো আছেই। দাঁড়ান, দাঁড়ান। জায়গাটার কয়েকটা ছবি তুলে নিই।'

রেকাবে পা রেখেই ঘুরে বসল ভ্রমর। ক্যামেরার চোখ লাগিয়ে পর-পর তুলল কয়েকটা ছবি।

বলল—'সিনেমা জমবে ভাল। রোমাঞ্চ আর রোমান্স দুটোই আছে এখানে। টের পাচ্ছেন?'

'বিলক্ষণ। শেষেরটা বেশী করে।'

'কথার ছিরি-ছাঁদও নেই।'

আবার ঘোড়া চলল। আবার খপ-খপ-খপ শব্দ। খুরের তলায় বালি সরে সরে যাচ্ছে। অবরুদ্ধ বাতাস মুক্তি পাচ্ছে। যেন ফিস ফিস করে হা-হুতাশ করছে মরুর আত্মা।

পথে বিস্তর কাঁটাঝোপ, ফণীমনসা আর খেজুর গাছের দিকে আঙুল তুলে উদ্ভিদ জ্ঞান বিতরণ করল ভ্রমর। অখণ্ড চমকিত হল তার ক্যাকটাস-জ্ঞান দেখে। একটার পর একটার নাম শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠল।

বলল—'সবশুদ্ধ কটা আছে?'

'সতেরো হাজার।'

'অ্যাঃ! সতেরো হাজার রকমের ক্যাকটাস! এ তল্লাটে করকম আছে?'

'আসুন না চিনিয়ে দিচ্ছি।'

'থাক, থাক, থাক।' কসবা-গিরি কদ্দুর?'

'হাঁ করে আমার দিকে না তাকিয়ে সামনে তাকালেই দেখবেন। ঐ তো।'

ক্যাকটাস আর খেজুর গাছের জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলো পাহাড় দেখা গেল। বালির মাঝে ছায়াশীতল খানিকটা জায়গা। ঘোড়া দুটো পথ চিনে চিনে নিজেরাই পৌঁছলো একটা ঝরণা ধারার তীরে। বাতাস সেখানে আর্দ্র, তাই ঠাণ্ডা। ছায়াতে দেহ জুড়িয়ে যায়। মন হাল্কা হয়।

এই হল কসবা-গিরি। নামের মধ্যে লুকিয়ে প্রচণ্ড মিথ্যে। শহর কেন, গাঁয়ের পাত্তাও নেই ধারে-কাছে। ধু-ধু প্রান্তরের মাঝে শুধু কয়েকটা পাহাড়, কণ্টকাকীর্ণ; সূর্যদেবের রক্তচক্ষু সেখানে নিষ্প্রভ, তাপাঙ্ক পরাজিত। জনমানববর্জিত গিরির অঞ্চলে শুধু ওরা দুজনে—ভ্রমর আর অখণ্ড।

এ'কাবে'কা পথ পেরিয়ে, বিপজ্জনক খানাখন্দ টপকে একটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন সমতলে পৌঁছলো দুই ঘোড়সওয়ার। ভূমিতে অবতীর্ণ হল খিদের জ্বালায়। ভ্রমর বার করল কয়েকটা চিকেন স্যান্ডউইচ। পেট চুঁই-চুঁই করা সত্ত্বেও অখণ্ড বললে—'খিদে নেই। আপনি খান।'

ভ্রমর বলল—'ন্যাকামি করতে হবে না। সঙ্গে বেশী খাবার নিয়েই বেরুই। নিন।'

দ্বিরুক্তি না করে হাত পাতল অখণ্ড। 'ওয়েসিস কাফে'র স্যান্ডউইচ। খেতে খেতেই মালুম হল। খান-তিনেক পেটে চালান করার পর হাতজোড় করে বলল—'মাপ করবেন। আর না।'

'তবে দুধ খান।' ফ্লাস্ক থেকে দুধ ঢালল ভ্রমর।

'আমি কি দুগ্ধপোষ্য বালক যে—'

'আমার কাছে তাই। নিন, বেশী বকাবেন না।'

অতএব এক চুমুকে দুধটুকুও শেষ করল অখণ্ড। ভ্রমরের খাওয়া তার আগেই শেষ হয়েছিল।

অখণ্ড বললে—'আপনার খাবার যা নমুনা দেখলাম—'

'ভালোই তো। বজ্রজ্বালার রেশনের খরচ বাঁচবে।'

'দিলেন তো মাটি করে। দিব্যি মুড এসেছিল। বজ্রজ্বালাকে না আনলেই কি চলত না?'

ভ্রমর কিছু বলল না। মিটি মিটি হাসতে লাগল। অখণ্ড দেখল, হাসি রাঙা অধরে যত না, তার চাইতেও বেশী কালো চোখে। চোখের তারা দুটি দুষ্টু হাসিতে

অতীব মিষ্ট। মেয়েলী সজ্জার ধার দিয়েও যায় নি ভ্রমর। না আছে টিপ, দুল, হার, না আছে চুড়ি, বালা, কাঁকন। সেই প্রথম অখণ্ডর মনে হল, অলংকার রূপ বৃদ্ধি করে না, রূপ গোপন করে। তাই বুঝি ঝাঁ-ঝাঁ আকাশের তলায় নিরাভরণা মেয়েটির সর্বদেহে লাবণ্য, চোখে মাদকতা, সুঠাম গ্রীবা, নিটোল বুক আর গুরুনিতম্বে নিবিড় স্বাস্থ্য। যমপ্রেমী। উদ্দাম, নিষ্ঠেজাল, দুরন্ত।

কথায় কথায় সূর্য আরো একটু হেললো। অখণ্ড বলল—'এবার ওঠা যাক। নইলে ঘোড়া দুটো এ তল্লাটের সব ঘাস খেয়ে ফেলবে।'

'জায়গাটা ভাল', বলল ভ্রমর। 'প্রেমের ছবি উঠবে ভাল।'

'কার প্রেমের?'

'বজ্রজ্বালার।'

বলে, রেকাবে পা দিয়ে অভ্যস্ত কায়দায় অশ্বারূঢ় হল ভ্রমর। কদম চালে এগিয়ে গেল মরুভূমির দিকে।

অন্য পথে রেল লাইনের দিকে এগোল দুজনে। পথে যেতে যেতে অনেক ছবি তুলল ভ্রমর। স্টেশনের আর পাঁ দেখা গেল বেশ দূরে। এমন সময়ে টং করে কি যেন বেজে উঠল অখণ্ডর ঘোড়ার খুরে।

'গুপ্তধন নাকি?' রাশ টেনে বলল অখণ্ড।

'না, রেললাইন', বলল ভ্রমর।

'রেললাইন! মরুভূমির দিকে কেন?'

'কসবা-গিরিতে শহর পত্তনের প্ল্যান হয়েছিল তো। একটা প্রাইভেট কোম্পানী ছোট লাইন পেতেও ছিল খানিকটা। শুভ-দিনে ইঞ্জিনও চলেছিল। কিন্তু ঐ এক-দিনই। তারপর প্ল্যান ভেস্তে গেল। একটা ভাঙা কামরা এখনও পড়ে আছে। দেখবেন?'

'চলুন তো দেখি।'

লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ফেরাল ভ্রমর। কিছু দূরে গিয়ে একটা টিলা। টিলার আড়ালে একটা ধূসর কামরা। বালিতে চাকার অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে। দরজা জানলার অবস্থাও শোচনীয়। বালিতে ধুলোতে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে গোটা কামরাটা। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও রঙজ্বলা হরফগুলো দেখা যাচ্ছিল। হিন্দিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'কসবা প্যাসেঞ্জার।'

পৌরাণিক নামের মতই চোখের সামনে অনেক বিস্মৃত কাহিনীকে তুলে ধরার চেষ্টা করল ঐ কটি হরফ। দাম্ভিক মানুষ এসেছিল মরু-জয়ের অভিলাষ নিয়ে। মরুর বুক চিরে লাইন পেতেছিল, গাড়ি চালিয়ে-ছিল। কিন্তু স্বপ্ন চূর্ণ হয়েছে। জরাজীর্ণ কামরাটা তার সাক্ষী।

লাফিয়ে নামল অখণ্ড। বলল—'একটা ছবি তুলবেন না?'

'নিশ্চয়।' বলে, কৃষ্ণপ্রিয়াও নামল। ক্যামেরা বাগিয়ে ক্লিক করে শাটার টিপল। ক্যাকটাস আর বালির পটভূমিকায় ভাঙা কামরার সামনে মহা খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল অখণ্ড।

হাততালির শব্দ দূরে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার আগেই দেখা গেল লোকটাকে।

ভাঙা কামরার মধ্যে থেকে আচম্বিতে বেরিয়ে এল একটা বুড়ো। কুঁজো। এক মুখ দাড়ি। মাথার চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু সে অনুপাতে দাড়ির রঙ কুচকুচে কালো কয়লার মত।

দৃষ্টি বিনিময় করল অখণ্ড আর কৃষ্ণপ্রিয়া। ফিস ফিস করে শুধোলো অখণ্ড—'বুধবার রাতে ভীম দত্তর বাংলোর সামনে?'

ঘাড় হেলালো কৃষ্ণপ্রিয়া — 'সোনা সন্ধানী ভবঘুরে।

বুড়ো কোন কথা বলল না। কামরার পাদানিতে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সামনের দুই হতভম্ব মূর্তির দিকে।

•

ঠিক যেন দুটো পাথরের মূর্তি। একটা কষ্টি পাথরের; আর একটা মার্বেল পাথরের। কৃষ্ণপ্রিয়া আর অখণ্ডনারায়ণ। দুজনেই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত।

এ বুঝি আষাঢ়ে গল্পেই মানায়। নইলে ঈদের চাঁদ দুম করে দেখা দেবে কেন? যে ভবঘুরে সোনা সন্ধানীর জন্য গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্রেরও টনক টাটিয়েছে, আরব্য উপন্যাসের আজগুবি গল্পের কল্ক-প্রেতের মত হাততালির সঙ্গে সঙ্গে সে আবির্ভূত হবে কেন?

কণ্টেসন্টে পিঠের কুঁজ নিয়ে পাদানি থেকে বালিতে পা দিল বুড়ো।

কাষ্ঠ হাসি হাসল অখণ্ড। বলল—'ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নিশ্চয়?'

'ঘুম?' যেন মনের অভিধান হাতড়ে শব্দটাকে খুঁজে বার করল বুড়ো। 'না তো। এখন আমি ঘুমোই না।'

লোকটার গলার স্বর অদ্ভুত। কাঁপা-কাঁপা। এক সুরে বাঁধা নয়। কথা বললেই তিন-চারটে সুরের মধ্যে স্বর উঠতে নামতে থাকে। ফলে হাসি পায় বেসুরো স্বর শুনে।

কিন্তু সে হাসি মিলিয়ে যায় বুড়োর মুখ দেখলে। অনেক কৃচ্ছসাধনা, অনেক অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে মুখের পরতে পরতে। কপালে বলিরেখা, চোখের কোলে মহাদর্শনের রেখা। মুখের রঙ তামাটে, রোদেজ্বলা।

সবচেয়ে বড় কথা, লোকটা এদেশী নয়, বিদেশী। হোয়াইট ম্যান। গায়ের রঙ আর সাদা নেই, কিন্তু হাড়ের ককেশীয় গঠন পালটাবার নয়। তাই বোঝা যায়, যেদে-বুড়ো সাগরপারের মানুষ।

ভাষা ছত্রিশ জাতের। হিন্দি, বাংলা, ইংরেজীর খিচুড়ি। তাই তার সংলাপকে সরল করে দেওয়া হল পাঠক-পাঠিকার সহজে বোঝার জন্য।

•

অখণ্ড বলল—'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'কেউ তো আর যায় না এদিক দিয়ে', বলল বুড়ো। 'আমার নাম হ্যাগার্ড। উই-লিয়াম হ্যাগার্ড। বসুন না।'

বলে, কামরার দরজার কাছে রাখা একটা প্যাকিং কেস টেনে নামাল বুড়ো। অখণ্ড বসল না। বুড়ো তখন নিজেই জাঁকিয়ে বসল কাঠের বাক্সে।

'কি খাবেন বলুন?'

এ প্রস্তাবও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল অখণ্ড। বলল—'বেশ বাড়ি বানিয়ে বসেছেন দেখছি।'

'বাড়ি!' চোখ কপালে তুলে ফেলল ককেশীয় বৃদ্ধ। 'তিরিশ বছর হল আমি বাড়ি ছাড়া। এটাকে আপনি তাঁবু বলতে পারেন।'

'মন্দ তাঁবু নয়। কদিন আছেন এখানে?'

'দিন-তিন-চার হল এসেছি। গেঁটে-বাতের ঠেলায় একটু জিরোচ্ছি। কালই সরে পড়ব।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার...ঐ তো ঐখানে।'

'ঐখানে! কোনখানে?'

'যেখানে সবাই যায়। ঐ ঐখানে... অন্য কোনোখানে।'

'কি খুঁজছেন? পরশপাথর?'

'টাচস্টোন? নো ম্যান, নো। আমি খুঁজছি মাটির গুপ্তধন।'

'সেটা কি?'

'একবার পেয়েছিলাম। তামার খনি। বেটারা কেড়ে নিল। কুছ পরোয়া নেহি। আবার পাবো।'

'কদ্দিন ঘুরছেন মরুভূমিতে?'

'বছর পঁচিশ তো বটেই।'

'তার আগে?'

'অস্ট্রেলিয়ায় খনির কাজ করতাম। কিছু দিন জাহাজেও ডেক ধুয়েছি।'

'জন্ম কোথায়? অস্ট্রেলিয়া?'

'আমার? নো, ম্যান, নো। দক্ষিণ আফ্রিকায়। বাপ-মা ইংলণ্ড। বৃটিশ সেন্ট্রাল আফ্রিকা চষে ফেলেছে এই মিয়া।'

'অস্ট্রেলিয়া গেলেন কি করে?'

'যীশু নিয়ে গেলেন', শিশুর মত হেসে উঠল বুড়ো।

'দুনিয়ার অনেক কিছুই তাহলে দেখেছেন বলুন?'

'স—ব দেখেছি। ক্যালকাটার এক ডাক্তার বলেছিল, চশমা নাও হ্যাগার্ড। আমি বললাম, নিয়ে আর কি করব? দেখব কি? সব দেখা হয়ে গেছে। হা হা হা।'

হাসি থামল। সব চুপ। কথাটা কিভাবে পাড়বে, মনে মনে তাই ঠিক করে নিল অখণ্ড।

বলল—'আপনার এই ভাঙা তাঁবুতে দিন তিন-চার এসেছেন বললেন না?'

'ঐ রকম হবে।'

'গত বুধবার রাতে কোথায় ছিলেন মনে পড়ে?'

বুড়োর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল—'কেন?'

'মনে না পড়লে আমি মনে করিয়ে দিতে পারি। আপনি ভীম দত্তর বাংলোয় ছিলেন। বিকানীরে।'

বুড়ো চোখ নামাল। ধীরে-সুস্থে ছেঁড়া সার্টের পকেট থেকে একটা খড়কে কাঠি বার করল। দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলল বেপরোয়া গলায়—'তাতে কার কি?'

'কিছু না। কিন্তু সে রাতের ব্যাপার নিয়ে দুটো কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।'

চোখ ছোট ছোট করে বলল বুড়ো—'এ তল্লাটের সব দারোগাকেই আমি চিনি। আপনি কে মশায়?'

'তাই বলুন। বুধবার রাতে ভীম দত্তর বাংলোয় যা ঘটেছে, তা দারোগার এখতিয়ারে পড়ে?'

'আমি কিছুই বলি না।'

'বলতে আপনাকে হবেই। আপনি অনেক কিছু জানেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর রাখেন। আমি তা শুনতে চাই।'

'আমি বলব না।'

চাপ দিল না অখণ্ড। জেরার ধারা পালটালো।

বলল—'ভীম দত্তর বাংলোয় কি কাজে গেছিলেন?'

খড়কে কামড়ে বলল বুড়ো—'এমনি। ঘাটে-ঘাটে ঘুরে বেড়াই তো, তাই এদিকে এলেই ঢুঁ মেরে যাই। মেহের খান আমার পুরোনো দোস্ত। শরীফ আদমী। দু মুঠো খেতে দেয়, মাথা গুঁজতেও দেয়।'

'মেহের খানের মত মানুষ হয় না', বলল অখণ্ড।

'সাঁচাই হয় না।'

'মেহের খান আর বেঁচে নেই', টেনে-টেনে, থেমে-থেমে বলল অখণ্ড—'খুন হয়েছে।'

'কি হয়েছে?'

'খুন। গত রোববার রাতে। বাংলোর গেটের কাছে ছুরি মেরে পাঁজর ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

'কে?'

'জানি না। ধরা যায় নি।'

'বাসটার্ড!'

'ঠিক। আমি পুলিশের লোক নই, দারোগা নই। কিন্তু মেহের খান ছুরি খাওয়ার পর থেকেই আমার মনের অবস্থা আপনার মতই। ছুরি যে মেরেছে, তাকে আমি ধরব তবে ছাড়ব। বুধবার রাতে বাংলোয় আপনি যা দেখেছেন, তা যদি বলেন, তাহলে খুনীকে ধরা যেতে পারে। মিঃ হ্যাগার্ড, আপনার সাহায্য চাইছি আমি। দেবেন না?'

খড়কে কাঠিটা দাঁতের ফাঁক থেকে বার করে অনেকক্ষণ উল্টে-পাল্টে নিরীক্ষণ করল উইলিয়াম হ্যাগার্ড। রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রইল অখণ্ড।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো। শুকনো চোখ তুলে বলল—'বলব। যা জানি বলব। কিন্তু কিভাবে শুরু করি বলুন তো?'

সহর্ষে বলল অখণ্ড—'আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। গত বুধবার রাতে ভীম দত্তর বাংলোয় গিয়ে আপনি একটা চিৎকার শুনেছিলেন, চিৎকারটা এই রকম: 'বাঁচাও' বাঁচাও! খুন! পিস্তল ফেলে দাও! বাঁচাও!' নির্জন মরুভূমি কাঁপিয়ে বাস্তবিকই বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল অখণ্ড। যেভাবে জীবন হাহাকার করে-ছিল, অবিকল সেইভাবেই কঁকিয়ে উঠল।

চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে রইল বুড়ো হ্যাগার্ড। থেমে থেমে বলল—'মিথ্যে বলব না। লুকো-ছাপাও করব না। ঠিক এমনি চিৎকার শুনেছিলাম সে রাতে।'

অখণ্ডর হৃৎপিণ্ডটা ডিগবাজি খেয়ে ঠেকল গলার কাছে।

চোখ বড় বড় করে বলল—'তারপর... তারপর কি দেখলেন?' (ক্রমশ)

আগামী সংখ্যায় (আর্ত-চিৎকার রহস্য)
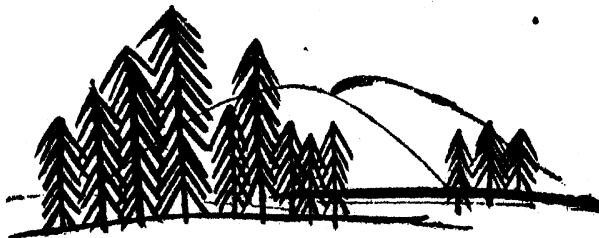
কেরলে সংকট

কেরলের অর্থমন্ত্রী শ্রী সি কে কুঞ্জু নিজে থেকে পদত্যাগ করে সেখানকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে একটা বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করেছেন; কেননা, তা না হলে মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করতেন। শ্রীকুঞ্জু পদত্যাগ করার আগে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথনকে সেকথা জানিয়ে এসেছিলেন।

এটাও ঠিক যে, কেরলে যুক্তফ্রন্টের ভিতরকার বিরোধে এখন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দল বিনিময়ে কিছুই না দিয়ে নিজেদের জেদ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীই স্থির করবেন তাঁর সহকর্মীদের কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে কিনা—শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ তাঁর এই দাবীতে অটল আছেন এবং তাঁর দলও তাঁকে এই বিষয়ে সমর্থন করে যাচ্ছে। শ্রীকুঞ্জু যে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, এতে বর্তমান বিরোধে কেরলের যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক দলেরই প্রাথমিক জয় সূচিত হল।

কিন্তু স্পষ্টতই, এই বিরোধে শেষ কথা এখনও বলা হয় নি। শ্রীকুঞ্জুর দল—ইণ্ডিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি — ইতিমধ্যে শ্রীকুঞ্জুর বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং শ্রীকুঞ্জুর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আচরণকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে অভিহিত করেছে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইণ্ডিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি দাবী করেছে যে, শুধু অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করলেই চলবে না, অন্য যেসব মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধানসভায় অভিযোগ এসেছে তাঁদের সম্পর্কেও অনুসন্ধানের কোন বিষয় আছে কিনা সেটা স্থির করার ভার মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হাতে না রেখে বিচার বিভাগীয় অফিসারদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। কেরল বিধানসভার গত বাজেট অধিবেশনে যেসব মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছিল তাঁদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী কুঞ্জু ছাড়াও রাজস্বমন্ত্রী শ্রীমতী গৌরী টমাস, সেচমন্ত্রী শ্রী এম এস কৃষ্ণাণ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীওয়েলিংটনও আছেন। প্রথমোক্ত দুজন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির আর শেষোক্তজন যুক্তফ্রন্টের ক্ষুদে শরিক কে টি পি'র (কার্যক তোড়িলালি পার্টির) প্রতিনিধি। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন, অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করে তিনি একমাত্র শ্রীকুঞ্জুর বিরুদ্ধে ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দেওয়ার মত উপকরণ পান নি। মুখ্যমন্ত্রীর এই 'একতরফা' সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সি পি আই ও আই এস পি রাজী নয়। যুক্তফ্রন্টের আর এক শরিক আর এস পি যদিও মুখ্যমন্ত্রীর অধিকার অস্বীকার করে না তাহলেও দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে সকল প্রকার সংশয় দূর করার উদ্দেশ্যে এই অধিকার খর্ব করার দরকার হতে পারে বলে মনে করে। মুসলিম লীগ এখন পর্যন্ত এই বিরোধে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে রয়েছে—যদিও প্রস্তাবিত মুশলিম-প্রধান মাল্লাপ্পুরম্ জেলা পুরোপুরি লীগের অভিপ্রায় অনুযায়ী হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই দলের মধ্যে সম্প্রতি কিছু কিছু অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রশ্নটি এখন কেরলের যুক্তফ্রন্টের সমন্বয় কমিটির কাছে গেছে। দীর্ঘ আলোচনা করেও সেখানে এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় নি। এখন প্রধানত সি পি আই ও আই এস পি'র উদ্যোগে চেষ্টা চলছে ফ্রন্টের ভিতরে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে একটি যুক্ত মোর্চা গড়ে তোলার। এই চেষ্টা যদি সফল হয় তাহলে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে কতকটা অসুবিধায় পড়তে হবে; কেননা, বিধানসভায় যুক্তফ্রন্ট দলের মধ্যে সি পি এমের যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে যুক্তফ্রন্ট সমন্বয় কমিটির মধ্যে তার সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। সি পি এম অবশ্যই বিধানসভায় তার সংখ্যাশক্তির উপর ভরসা করে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ অধিকারের উপর জোর দিতে পারে; কিন্তু যুক্তফ্রন্টের সমন্বয় কমিটির কাজ সম্পূর্ণ অচল না করে দিয়ে সে ঐ পথে যেতে পারবে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীর বিচারই যদি একমাত্র বিতর্কিত বিষয় হত তাহলে অবশ্য কেরলের নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের সংকটটা এত ঘোরালো হয়ে উঠত না। আসলে, এই মন্ত্রিসভায় দুই কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধটাই বড় অস্থিরতার কারণ হয়ে উঠেছে। কুঞ্জু প্রসঙ্গ উঠবার আগে থেকেই দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অযথা হস্তক্ষেপের অভিযোগ করছিল এবং ঐ পার্টির তরফের দুজন মন্ত্রী শ্রী এম এন গোবিন্দম্ নায়ার ও শ্রী টি ভি টমাসের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী মন্ত্রীরা নানা অভিযোগ আনছিলেন। কৃষিমন্ত্রী শ্রীনায়ার কেরলের চাষীদের ট্র্যাকটর ও কলের লাঙল দিয়ে সেখানকার কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলতে চান, মার্কসবাদীরা বাগড়া দিয়ে বলছেন, এতে বেকার সমস্যা বাড়বে। বিদ্যুৎমন্ত্রী হিসাবে শ্রীনায়ার ইডিক্কি পরিকল্পনা তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছেন; কিন্তু এই পরিকল্পনা নির্মাণের ঠিকাদার সংস্থা হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর সঙ্গে নির্মাণকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের সি পি এম প্রভাবিত ইউনিয়নের ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে। কেরলের কুট্টনাদ এলাকায় শ্রীনায়ার দ্বিতীয় একটি ধানের ফসল তোলার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সেখানকার জমির মালিকরা চাষ বন্ধ করে দিয়েছেন এই কারণ দেখিয়ে যে, মার্কসবাদীরা তাঁদের পার্টির চাঁদা দিতে বাধ্য করছেন। শ্রীনায়ার বলেছেন যে, মার্কসবাদী পার্টি কৃষির যান্ত্রিকীকরণের প্রস্তাবে বিরোধিতার নাম করে প্রত্যেকটি খামারকে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। কেরলের দুর্গত চাষীদের সাহায্য করার জন্য কেন্দ্র থেকে এক কোটি টাকা এসেছিল; সেই টাকা কেরল সরকার খরচ করতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার জন্য কৃষিমন্ত্রী নায়ার ও রাজস্বমন্ত্রী শ্রীমতী টমাস একজন আর একজনকে দোষ দিয়েছেন। শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি ভি টমাস অভিযোগ করেছেন যে, রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের জন্য তিনি যেসব চেষ্টা করছেন সেগুলি সবই মুখ্যমন্ত্রী বানচাল করে দিচ্ছেন। শ্রীটমাস ও শ্রীনায়ার দুজনেই মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদকে পৃথক পত্র দিয়ে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের দপ্তরের কাজে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এবং সি পি এমের প্রভাবাধীন সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না।

এই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই সি পি আই তেরো-দফা দাবী পেশ করেছে এবং দাবীগুলি মেটাবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে তিন মাস সময় দিয়েছে। আগামী জুলাইয়ে এই তিন মাসের মেয়াদ শেষ হবে। ইতিমধ্যে সি পি আই তার দাবীর ভিত্তিতে রাজ্যব্যাপী অভিযান আরম্ভ করেছে। বাহ্যত অবশ্য সি পি এম এখনও অবিচলিত। তাঁরা পাল্টা হুমকি দিয়েছেন যে, সি পি আই মন্ত্রিসভা ছেড়ে গেলে তাকে যুক্তফ্রন্টেও থাকতে দেওয়া হবে না।

এদিকে, লোকসভায় স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও ভারতীয় ক্রান্তি দলের সদস্যরা কয়েকজন নির্দলীয় সদস্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে দাবী
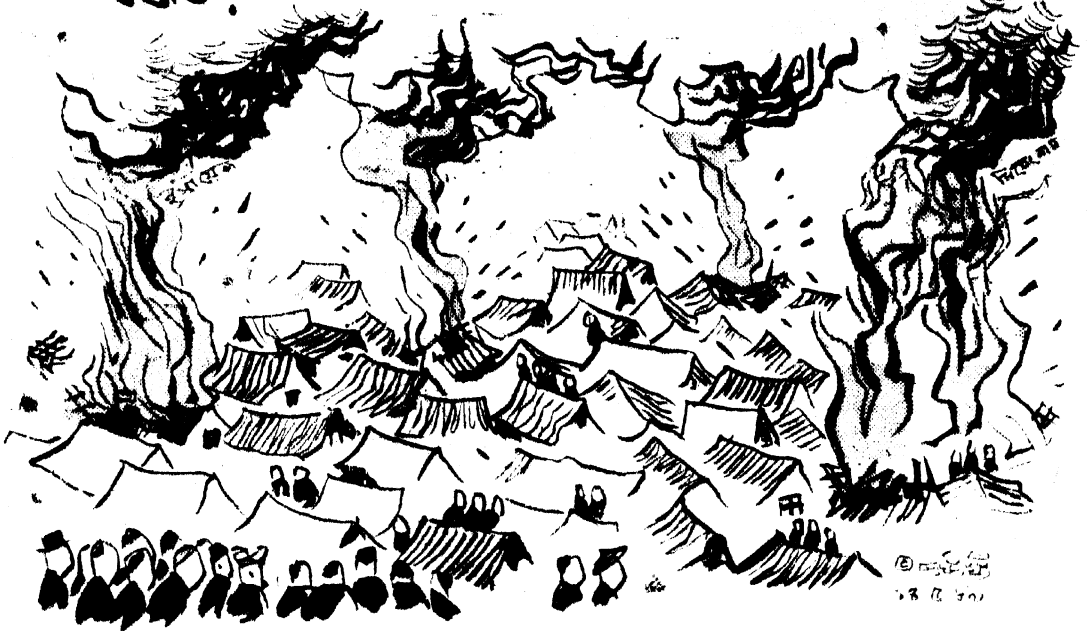
করেছেন যে, যেহেতু কেরলের মন্ত্রিসভায় যৌথ দায়িত্বের অস্তিত্ব নেই এবং মন্ত্রি-সভার সদস্যরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য গালিগালাজ করছেন সেহেতু কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ করে সেখানকার মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হোক। এই দাবীর উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন যে, ভিতরকার দলা-দলির দরুণ যদি মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও ভেঙে দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে, বর্তমান অবস্থায় কোয়ালিশন শাসনই একমাত্র সম্ভবপর শাসন. এই বাস্তব ঘটনা সকলকে মেনে নিতে হবে।

টুংকুর ডুবন্ত নৌকা

মালয়েশিয়ার টুংকু আবদুল রহমান গত দশ বৎসর যাবৎ অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করছিলেন। তাঁর অ্যালায়েন্স পার্টি'র প্রতীক হচ্ছে পালতোলা নৌকা। এই প্রতীক চিহ্নকে মালয়েশিয়ার মানুষ রাষ্ট্রতরণীর প্রতীকরূপে দেখতেই অভ্যস্ত হয়েছেন। সে দেশের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে সম্প্রতি যে নির্বাচন হয়ে গেল তাতে টুংকু দাঁড়িয়ে-ছিলেন এই বলে যে, এইবারই তিনি শেষ-বার ভোটদাতাদের কাছে ভোট ভিক্ষা করতে আসছেন। নির্বাচনে টুংকু জিতেছেন, তাঁর পার্টিও কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে এই সর্বপ্রথম মনে হচ্ছে, টুংকুর নৌকা বুঝি এবার ডোবে।

যেখানে মালয়েশিয়ার ১১টি রাজ্যের মধ্যে ১০টিতেই এতদিন অ্যালায়েন্স পার্টি'র প্রাধান্য ছিল সেখানে তিনটি রাজ্য ইতি-মধ্যে টুংকুর দলের হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেন্দ্রেও আগেকার মতো দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা দলের হাতছাড়া হয়ে গেল।

কিন্তু এই নির্বাচনের ফলাফল সবচেয়ে বড় যে বিপদ ডেকে আনল সেটা হল এই যে, টুংকুর মালয়েশিয়ার বহু-জাতিসমন্বিত রাষ্ট্র এতদিন যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে শাসিত হয়ে এসেছে সেই ভিত্তিটাই শিথিল হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। মালয়েশিয়ার তিনটি বৃহৎ সম্প্রদায় হল মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ধর্মে, ঐতিহ্যে ও ভাষায় এই তিন সম্প্রদায় একটি আর একটি থেকে পৃথক। মালয়ী ও চীনারা সংখ্যায় প্রায় সমান সমান, ভারতীয়রা অল্প পিছনে। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটামুটি একটা ভারসাম্যের ভিত্তিতে ছাড়া মালয়ে-শিয়ায় একটি সুস্থির গবর্নমেন্ট চলতে পারে না। টুংকু আবদুল রহমান এটা জানতেন। তাঁর অ্যালায়েন্স পার্টি আসলে তিন দলের কোয়ালিশন। এই তিনটি দল হচ্ছে ইউনাইটেড মালয়ান ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, মালয়ান চাইনিজ অ্যাসো-সিয়েশন, ও মালয় ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস। এই ত্রিদলীয় কোয়ালিশনের ভিতর দিয়েই এত-দিন সেদেশের তিনটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের স্বার্থের সামঞ্জস্য হয়ে এসেছে। মালয়েশিয়ার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার 'কনফ্রন্টেশন' যতদিন চলেছে ততদিন এই রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষা করা কঠিন হয় নি। কিন্তু এবারকার নির্বাচনের ফলাফলে প্রকাশ পেল যে, মালয়ী ও চীনা জনমত কোয়ালিশনের উপর আস্থা হারিয়ে নিজেদের পৃথক সংগঠনের দিকে ঝুঁকেছে।

মালয়েশিয়ায় ঐক্যের অন্তরালে জাতি-বিদ্বেষ কখনও বেশী দূরে যায় নি। ১৯৬৭ সালেও পেনাংয়ে সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়ে গেছে। এবারকার নির্বাচনের ফলাফল সেই জাতিবিদ্বেষের ইন্ধন যুগিয়েছে। পরিণামে কুয়ালালামপুরে যে দাঙ্গা হয়েছে তাতে সরকারী হিসাবে ৯৮ জন মারা গেছে। দেশে জরুরী অবস্থা বলবৎ করা হয়েছে, সামরিক রিজার্ভ লোকদের তলব করা হয়েছে। মালয়েশিয়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাও এই দাঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। তাঁদের কয়েকজন মারা গেছেন এবং তাঁদের কিছু কিছু সম্পত্তিও নষ্ট হয়েছ।

বত্রিশ দফা কর্মসূচীর এক দফা কার্যকর করার প্রস্তুতিপর্বেই যুক্তফ্রন্টের দফারফা হওয়ার উপক্রম হয়ে উঠেছে। অন্তর্দাহ শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের বিলুপ্তিকে কেন্দ্র করে। যদিও লোকসভা থেকে এখনও অনুমোদন আসে নি তবু এটা স্থিরনিশ্চয় যে, পরিষদের বিলোপ ঘটবে। বর্তমানে ফ্রন্ট শরিকদের অন্তর্দলীয় কোঁদল যেভাবে প্রকাশ্য রূপ নিচ্ছে তাতে মনে হয় কংগ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসভা কালক্ষেপণ না করেই পরিষদ বিলুপ্তি বিল অনুমোদন করে দেবে।

স্মরণ থাকতে পারে যে বিগত বিধান-সভার অধিবেশনে তাড়াহুড়ো করেই পরিষদ বিলোপের প্রস্তব পাশ করা হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণের পিছনেও একটু ইতিহাস আছে। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য শ্রীশৈলেন অধিকারী পরিষদ বিলোপের জন্যে এক বেসরকারী প্রস্তাব পেশ করে-ছিলেন। এস এস পি যাতে একা গর্বের অধিকারী না হতে পারে মনে হয় সেজন্যই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রদেশ কমিটি তৎক্ষণাৎ সরকারীভাবে পরিষদ বিলোপের প্রস্তাব তোলবার জন্যে নির্দেশ পাঠান। ফলত যুক্তফ্রন্টের সরকারী প্রস্তাব হিসাবে পরিষদের বিলুপ্তির জন্য কেন্দ্রীয় সর-কারকে আবেদন জানান হয়। এমন কি বিরোধী কংগ্রেস দলও ঐ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

প্রথম প্রথম 'একটা কিছু করা গেল' এই মনোভাব থেকে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন ফ্রন্টের অংশীদারগণ, অচিরেই সেই সুখস্বপ্ন দিনের অবসান ঘটল। অনেকেরই মন্ত্রিত্বের গদী টলমল করে ওঠার ফলে আদর্শ, নীতিকথা এমন কি 'কমের-ডার' পর্যন্ত সিকেয় উঠল। আর শুরু হল চিরাচরিত দ্বন্দ্ব। কংগ্রেস আমলে যা ঘটত, এখন ফ্রন্ট আমলেও তাই ঘটতে শুরু করল। অর্থাৎ সেই ট্র্যাডিসান সমানে চলছে। কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম নেই।

অকুতোভয়ে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস বিবৃত করার প্রয়োজন আছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ না পেলে মানুষের জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হয় না। অভিজ্ঞতাও সীমিত থাকে। কিন্তু সত্য পরিবেশনের বিপদও কম নয়। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের সম্বন্ধে সত্যি কথা বলে ফেললে মুস্কিলে পড়তে হয়। সে যাই হোক, এবার আসল কথায় আসা যাক।

বিশ্বাস করুন কোন দল থেকে কে মন্ত্রী হবেন এই বিষয় নিয়ে যুক্তফ্রন্টের সকল দলের মধ্যেই অল্প-বিস্তর কোঁদল প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রথমে ধরা যাক দুই কম্যুনিস্ট পার্টির কথা। সবচেয়ে বড় শরিক মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিতে গোলমাল ছিল একথা বললেই শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সাবধান বাণী উচ্চারণ করে উঠবেন। কারণ তাঁদের মনোলিথিক দল। কোন সদস্যের বাদানুবাদের জো নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে দলের বিধান-সভার সদস্যসংখ্যা ৮৩ জন সেই দলের কি কারণে বিধান পরিষদ থেকে দুজন মন্ত্রীকে গ্রহণ করতে হল? শ্রীদাশগুপ্ত বিধান পরিষদের বিলুপ্তি প্রসঙ্গে এই সেদিন বলছিলেন তাঁর দলকে আপাতত সেই প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে হবে না। কারণ, পরিষদ বিলোপ হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর দলের সদস্যেরা আরও ছয় মাসকাল মন্ত্রিত্বে আসীন থাকতে পারবেন। অর্থাৎ এই সপ্তাহেই লোকসভা যদি অনুমোদন করেন, তবুও নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর হাতে সময় থাকবে। এই উক্তি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, তাঁর দলের কোন সদস্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী ও যানবাহন-মন্ত্রীদ্বয়ের জন্য আসন খালি করে দেবেন না। মোদ্দা কথা দলকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে।

প্রথম যখন পরিষদ থেকে মন্ত্রী মনো-নয়ন করা হয় তখন তার যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শ্রীদাশগুপ্ত বলেছিলেন, যতদিন পরিষদ আছে তাকে আমরা ব্যবহার করব। অথচ একথা তিনি বলেন নি যে পরিষদকে আমরা তুলে দিতে চাই বলে সেখান থেকে কাউকে মন্ত্রিসভায় পাঠাবো না। শেষোক্ত বক্তব্য রাখলে মনে হয় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত একটি নীতিগত প্রশ্নের সমাধান আগেই করতেন।

অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরাও তাঁদের ত্রিশজন সদস্য থাকা সত্ত্বেও একজন বিধান পরিষদের সভ্য আর একজন কোন সভারই সভ্য নন এমন ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভায় পাঠালেন। কি যুক্তিতে এমন নির্বাচন করলেন তা অবশ্য দক্ষিণপন্থীরাই বলবেন। তবে অবশ্য একথা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, যিনি কোন সভারই সদস্য নন তাঁর জোর পার্টির ঊর্ধ্বতন মহলে খুব বেশী। কিন্তু এখন বিধান পরিষদ বাতিল হয়ে গেলে তাঁর কি হাল হবে সেটাই লক্ষ্যণীয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় অদ্যাবধি সুবিবেচনাবশতও তাঁর জন্য কেউ আসন খালি করে দিতে প্রস্তুত নন। তাঁদের সভা অতিগোপনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু এখনও পথের সন্ধান পাওয়া যায় নি। অন্যেরা ছাড়বেনই বা কেন? কম্যুনিস্ট হলেও তাঁরাও রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। অনুভূতি আছে, মান-সম্মানের জ্ঞান আছে, আর আছে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন। কত সংগ্রাম ত্যাগ করে তাঁরা একটু মর্যাদার আসনে উন্নীত হয়েছেন, আর সেই আসন থেকে নেমে গিয়ে তাঁরা কেন অন্যের জন্য পথ করে দেবেন? এহেন ব্যক্তিদের নিয়েই ত দল। এঁদের বাদ দিয়ে ত নয়। কাজেই কম্যুনিস্ট মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর ভাগ্যে কতদিন আর মন্ত্রিত্ব আছে তা বলা কঠিন। তাঁকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের প্রশ্নে দলের মধ্যে রীতিমত গুঞ্জন শুরু হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মমর্যাদার খাতিরে অনেকেই চুপ করে গিয়েছিলেন। পাছে কেউ গদীলোভী বলে ব্যঙ্গ করেন, এই ভয়েও অনেকে স্বাভাবিকভাবে নীরব হয়ে গিয়ে-ছিলেন। কিন্তু এবার আবার সুযোগ এসেছে। খিড়কি দিয়ে বিধান পরিষদে গিয়ে মন্ত্রী হওয়ার রাস্তা আর থাকবে না। অবশ্য, দলীয় অনুশাসনের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করা যায়। কিন্তু আখেরে তাতে সুফল ফলে না।

বাংলা কংগ্রেসে সে প্রশ্ন আসে নি। কারণ দল ভাঙাভাঙির পর বাংলা কংগ্রেসে যাঁরা আছেন সকলেই নেতৃত্বের প্রতি অদ্যাবধি আস্থাশীল ও অনুগত। আর এস পি'তে কোঁদলের সূত্রপাত হতে হতেই গোলমাল মিটে গেছে। কারণ দুটি মন্ত্রীপদ পাওয়ার ফলে দলের পক্ষে সমস্যা সমাধান খুবই সোজা হয়ে গিয়েছিল। একটি পদ পেলে কি হত তা এখন বলার আর প্রয়োজন নেই। ফরোয়ার্ড ব্লকেও কে মন্ত্রী হবেন সে প্রশ্ন জোরালো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কুশাগ্রবুদ্ধি শ্রীঅশোক ঘোষ গণতন্ত্রের কায়দায় অনেক হবু-মন্ত্রীকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন। উপরে উপরে মেনে নেওয়ার ভাব দেখালেও অনেকে যে এখনও সুবিধামত উষ্মা প্রকাশ করেন তা একটু সুড়সুড়ি দিলেই বুঝতে পারা যায়।

বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে এস এস পি'র মধ্যে। সমস্ত ঝগড়ার মূলে রয়েছে কে মন্ত্রিসভার আসন অলঙ্কৃত করবেন এই প্রশ্নের উপর। প্রকাশ্যে খুব বাদানুবাদ না হলেও কায়দা করে এক দলকে দলীয় আওতার বাইরে রেখে মন্ত্রিসভায় ঢোকার জন্য যে সদর রাস্তা তৈরী করা হচ্ছিল জব্বলপুর সম্মেলনে গিয়ে সে পথ বানচাল হয়ে গেল। যাঁরা কেন্দ্রীয়নেতৃত্ব দখল করেছেন তাঁদের সামনে আর কেরামতি করা চলবে বলে মনে হয় না। যা হোক অন্ততপক্ষে নিজের নাক কেটেও অপরের যাত্রাভঙ্গ করার যে মতলব চলছিল তা আখেরে হয়ত ব্যর্থ হয়ে গেল। আর যিনি এই নেপথ্য নাটকের নায়ক তিনিই তখন হয়ত নিজের রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যাঁদের সামনে রেখে গদা ঘোরাচ্ছিলেন তাঁদের পরিত্যাগ করতে পারেন। অবশ্য, এস এস পি'র এই অন্তর্দলীয় কোঁদল এখনও পর্যন্ত ফ্রন্টের উপর কোন অশুভ ছায়া ফেলে নি।

কিন্তু আর সি পি আইকে কেন্দ্র করে ফ্রন্টের উপর অশুভ ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে। ফ্রন্টের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীনকুমার কোন সভারই সদস্য নন। কিন্তু তাঁর পার্টি'র দুজন বিধানসভা সদস্য আছেন। এই দুজন সদস্য সর্বশ্রী অনাদি দাশ ও মকসেদ আলীর মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা ছিল না একথা বলা যায় না। বিশেষ করে প্রায়-প্রবীণ শ্রীদাশের ধারণা ছিল তিনিই যখন দলের নির্বাচিত দুজনের মধ্যে প্রবীণ অতএব মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান হবেই। কিন্তু শ্রীদাশ শ্রীসুধীনকুমারের বুদ্ধির কাছে সেদিন সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছিলেন। কায়দা করেই তাঁর দল থেকে তিনটি দপ্তর চাওয়া হয়েছিল। যথা—খাদ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও আর একটি। দলের মধ্যে কথা হয়েছিল যদি কুটিরশিল্প পাওয়া যায় তবে শ্রীদাশ মন্ত্রী হবেন। কেবলমাত্র খাদ্য দপ্তর পাওয়া গেলে শ্রীসুধীনকুমার মন্ত্রিসভায় যাবেন। শ্রীদাশ সেদিন ভেবেছিলেন তাঁদের ছোট দলকে খাদ্যের মত বড় দপ্তর কেউ ছাড়তে রাজী হবে না। অতএব, তাঁরই মন্ত্রী হওয়া একরকম পাকা। কিন্তু তলে তলে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রীসুধীনকুমারকে মন্ত্রিসভায় নিতে চান একথা শ্রীদাশ পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পারেন নি। মার্কসবাদীরা তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন এমন ব্যক্তিদেরই ছোট দলগুলি থেকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁরা জানেন কখনও যদি মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে ভোটাভুটি হয় তবে তাঁদের মতামতকে পাশ করাতে হলে তাঁদের অনুগামীর সংখ্যা বেশী হওয়ার প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে তাঁরা দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারেন না। এস ইউ সি, এস এস পি কি আর এস পিও হয়ত একটা স্বাধীন পথে চলতে পারেন। কাজেই সকল ছোট দলগুলির সদস্যদের তাঁদের দিকে রাখবার জন্যে ভাল ভাল দপ্তর নিজের হাতে বণ্টন করেছেন। কাজেই খাদ্যদপ্তর নিজের হাতে রেখে অবশেষে শ্রীসুধীনকুমারের উপর ন্যস্ত করে শ্রীঅনাদি দাশকে কূটনীতির খেলায় হারিয়ে দিলেন।

এখন যদি বিধান পরিষদ উঠে যায় তবে শ্রীসুধীনকুমারকে মন্ত্রিসভায় থাকতে গেলে কোন কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। তাঁর জন্য আসন ছেড়ে দিতে শ্রীদাশ বা মকসেদ আলী সাহেব কেউ প্রস্তুত নন। তাঁরা দুজনেই প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে অভিযোগ করেছেন যে, শ্রীকুমার জবরদস্তি করে তাঁদের মধ্যে যে কোন এক-জনকে আসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। অবশ্য শ্রীকুমার অসত্য বলে ঐ বিবৃতিকে নস্যাৎ করেছেন, এবং বলেছেন ভয়ে পড়েই তাঁরা আত্মরক্ষার্থ শ্রীকুমারের বিরুদ্ধে আজগুবী প্রচার চালাচ্ছেন। ঘটনার সত্যাসত্য বিচার না করেই একথা বলা চলে, যে-কোঁদল বর্তমানে যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে তার মুখ্য কারণ হচ্ছে লালদীঘির একটি বিশেষ কক্ষ। অন্য কিছু নয়।

শ্রীকুমার তাঁর দুই কমরেডের বিরুদ্ধে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ এবং যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অভিযোগ এনে তাঁদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করছেন। দলীয় ব্যাপারে অভিযুক্ত দুই কমরেডকে ইতিমধ্যেই চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। শাস্তিও তাঁরা পাবেন। কারণ আর সি পি আই-এর সদর দপ্তর শ্রীকুমারের বাড়ীতেই, এবং তিনিই পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযোগও শক্তিশালী রূপ নিয়েছে। কারণ, স্বয়ং শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত শ্রীকুমারের অভিযোগকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং বলেছেন ঐ দুই আর সি পি আই সদস্য সম্বন্ধে যুক্তফ্রন্টের খুব গভীর চিন্তা করা উচিত। কেননা যদি অচিরেই যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, শ্রীদাশ ও মোকসেদ আলীর রাজনীতিক জীবনে ঘোরঘনঘটা উপস্থিত। তাঁদের বক্তব্যকে শোনার জন্যে যাঁরা এখনও আগ্রহী, শেষ পর্যন্ত সেই আগ্রহ থাকলেও মার্কসিস্টদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তফ্রন্টে রাখার জন্য কেউ সচেষ্ট হবেন বলে মনে হয় না। অন্যদিকে যদি আর সি পি আই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় তবে ফ্রন্ট কাকে বাহুযুগলে আবদ্ধ করে রাখবে সেই সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে। কেউ কেউ নাকি বলেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আস্থা যাঁদের উপর থাকবে তাঁরাই যুক্তফ্রন্টে থাকতে পারবেন। এই নীতি যদি গ্রহণ করা হয় তবে শ্রীসুধীন কুমারের দলই যুক্তফ্রন্টে থাকবে একথা জোর করে বলা চলে। কিন্তু শ্রীকুমারের দল ফ্রন্টে থাকলেও শ্রীকুমার কোন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিসভায় আসবেন? ধরে নেওয়া যাক মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিই একটি আসন ছেড়ে দিয়ে শ্রীকুমারকে বিধানসভায় নির্বাচিত করে আনলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে শ্রীকুমার কি একজন সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের হয়ে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী থাকতে পারেন? যদি তাই ঘটে তবে শ্রীরাম চ্যাটার্জি মহাশয়ের কি পদোন্নতি ঘটানো প্রয়োজন হবে না? অবশ্য এসব প্রশ্নের অতি-সরল উত্তর পাওয়া গেছে একজন ক্ষমতাশীল বাংলা কংগ্রেস নেতার কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, সুবিধার্থে যে নীতি ফ্রন্ট গ্রহণ করবে সেটাই জনগণ মেনে নেবে। অতএব, চিন্তার কোন কারণ নেই। জনগণ মেনে নিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের ক্ষুদে নেতারা কিছু করবার আর ভরসা পাবে না। কেউ কেউ নাকি প্রশ্ন তুলেছেন কোনো দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মেনে নিলেই যদি সেই দলের কিছু সদস্যকে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে তবে কেরালার যুক্তফ্রন্ট এস এস পি'র দলছুটদের স্বীকৃতি দিল কি করে?

যা হোক ঘটনার পরিণতি দেখে মনে হয় এ লড়াই চলছে—চলবে। আখেরে আর সি পি আই দ্বিধাবিভক্ত হবে। ফ্রন্ট শরিকরাও এই কোঁদলকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত আছে।

আবার বলশেভিক পার্টিতেও কোঁদল লেগেছে। তাঁদের একটিও বিধানসভা কি পরিষদের সদস্য না থাকা সত্ত্বেও শ্রীবরদা মুকুটমণি একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন। কোন দল তাঁকে আসন ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। অতএব, তাঁর মন্ত্রিত্বপদ গেলেই দলের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা আছে তার আগে নয়।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, ৩২ দফার একটি দফা কার্যকরী করতেই ফ্রন্টের প্রায় দফারফা হওয়ার মত। যদি কোনক্রমে বিধান পরিষদ লোপের প্রস্তাব আপাতত স্থগিত থাকে এবং অবশেষে বানচাল হয়ে যায়, তবে পশ্চিম বাংলায় 'কমেরডারি' ফিরে আসবে। কেন্দ্রীয় চক্রান্তকে দায়ী করে ফ্রন্টের শরিকরা মনে মনে স্বর্গসুখ উপভোগ করতে পারবেন।

—সমদর্শী

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[শহুরে যুবক বিকাশ। ব্যাঙ্কের কর্মী। প্রমোশন নিয়ে এল পাড়াগাঁর আপিসে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্কবাবুর বাড়ি। চারদিকে জীর্ণতার গন্ধ; ধ্বসে পড়া বাড়ির মিছিল।

গ্রাম-বাঙলা সম্পর্কে ছিল তার রোমান্টিক আমেজ। কয়েক দিনেই চিড় ধরল তাতে। বদলে গেল চেহারা। দেখল শুধু বিবর্ণতার ম্লান আলো, তেতো স্বাদ। অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়ে দিল গ্রামের নানান চরিত্রের মানুষ। শশাঙ্ককাকাকে ঘিরেও রহস্যের জোনাকি।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। মনীষার দ্বিতীয় উপস্থিতি।

বিকাশ দেখল গোটা সমাজে ঘুনপোকা। চারদিকে ক্ষোভ আর ক্রোধের দাপাদাপি। মূল্যবোধ সব বিপর্যস্ত। এরই শিকার মনীষা, সোনালি আরো কত কে। খেটে মরছে মনীষা। সংসারের জন্যে ফুরিয়ে যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু করে। চোখের সামনে যেন আলো নেই। কেমন নিরুপায়।

সোনালির প্রতিও এক ধরনের মমতা। বিকাশের অস্তিত্বে আলোড়ন। শাঁখের করাত। মুখোমুখি দাঁড়াল নিজের।

দু'দিনের ছুটি নিয়ে এল কলকাতা। মনীষা আর বিকাশ। মাঝে অন্ধ পাঁচিল। ভাঙতে চাইল তা। বিকাশ মরীয়া। প্রস্তাব দিল বিয়ের। অন্ধগলিতে যেন কড়া নাড়ল। মনীষা ক্লান্ত, বিকাশও। ফিরে এল আবার নিয়োগীপাড়ায়। সেই ভিলেজ পলিটিক্স। একঘেয়ে করুণ সুর। বিরক্তি। আপিসেও তেমনি। ফিরছিল সেখান থেকেই। হঠাৎ দেখা স্থানীয় হেডমাস্টারের সঙ্গে। আবার সুনুর উপস্থিতি।]

।। ষোলো ।।

হেড মাস্টার মশাইয়ের বসবার ঘরটি যেমন হওয়া দরকার ঠিক সেই রকম। দেওয়ালে গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ। এক আলমারি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। টেবিলে খাতাপত্র, ফাইল। কয়েকটি চেয়ার। এক দিকের একটি শেলফে কিছু ইংরিজি ক্লাসিকস।

কুমুদবাবু বললেন, 'আসুন — বসুন, বসুন।'

বসতে বসতে বিকাশ একটু হাসল।

'একটা কথা ভুলে গেছেন। আমাকে তুমি বলবেন বলেছিলেন। আমি আপনার ছাত্রের বয়সী।'

'সব সময় খেয়াল থাকে না।' —হেড মাস্টারও হাসলেন : 'তা ছাড়া দিনকাল যা পড়েছে, তাতে নিজের ছাত্রকেও তুমি বলতে ভরসা হয় না আর। যা হোক, চেষ্টা করব।'

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'অথচ আমাদের সময় —'

বয়েস হয়ে গেলে নিজেদের অতীত সম্পর্কে যে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। যেসব দিন অনেক আলো-অন্ধকারে জড়িয়ে ছিল, তারা দূর থেকে যেভাবে শুধু সোনার আলোতেই রাঙিয়ে ওঠে। যেভাবে নতুন কালটাকে বিশ্রী, বিরস, দুর্বিনীত মনে হয়।

'এখন রাস্তায় দেখা হলে পুরোনো ছাত্র দূরে থেকে পাশ কাটায়—পাছে সামনা-সামনি হলে প্রণাম করে বসতে হয় একটা। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে এমনভাবে চলে যায় যেন দেখতেই পায় নি। আর আমরা —'

এই দীর্ঘশ্বাস সকলের। বিকাশের ছেলেবেলাটা কুমুদ সেনগুপ্তের চাইতে অনেক বাজে। তবু বিকাশেরও মনে হয়, তাদের কালটা অনেক ভদ্র, অনেক সজীব, অনেক উজ্জ্বল ছিল। এই-ই হয়। কিন্তু দিনের পর দিন যে অনিশ্চয়তা, যে আক্রোশ, যে যন্ত্রণা সমস্ত জাতটার হৃৎপিণ্ডে জ্বলছে—আজকের ছাত্ররাও সে দহনের শরিক হবে না—এমন আশাই বা কে করতে পারে?

বিকাশ জবাব দিল না, শুনে যেতে লাগল। বাইরে শীতের বেলা ডুবল, ছায়া ঘনিয়ে এল ঘরে। হেড মাস্টার মশাইয়ের চাকর একটা লন্ঠন জ্বেলে আনল।

'বুঝেছ, এই গ্রামের ছেলেরা আগে— মানে কিছুদিন আগেও একটু আলাদা ছিল, ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, প্রণাম করত একেবারে সাষ্টাঙ্গে। কিন্তু এখন সিনেমা-টিনেমা দেখে এরাও শহুরে ছেলেদের টেক্কা দিচ্ছে। একেবারে চাষাভুষোর গাঁয়ে চলে যাও, সেখানেও দেখবে কী বলে ওই চোঙ প্যান্ট আর ট্রানজিস্টার রেডিয়ো।'

আজ্ঞে হাওয়া যেদিকে বয়—'

'বিষের হাওয়া। দেশটা গেল। যেটুকু বাকী ছিল তাও যাবে ওই পলিটিকসে। এক লাইন ইংরিজি-বাংলা শুদ্ধ করে লিখতে পারে না, কিন্তু লেনিন আর মাও সে-তুংয়ের বাণী একেবারে গড়-গড় করে শুনিয়ে দেবে।'

বিকাশের বলতে ইচ্ছে করল, ক্ষতি কী। বাংলা দেশের ছেলেরা তো চিরকাল সপ্ত সমুদ্রের ডাক শোনবার জন্যে উৎকর্ণ। একদিন শহরের ছেলেরা বার্ক-শেরিডান-কার্লাইল থেকে সুরেন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ আউড়ে যেত, তারপর গান্ধীজী-অরবিন্দ-দেশবন্ধু এলেন, ক্রমে ক্রমে দিলেন মার্কস-লেনিন-স্তালিন, আজ যদি মাও সে তুং—হো চি মিন এসে থাকেন—তা হলে সেই সমুদ্র ধ্বনিকে ঠেকাবে কে! একদিন যা ছিল শহরের জিনিস—শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে

তা যদি গ্রামের যুবকের ভেতরেও গুমরে-গুমরে ওঠে—তা হলে সে তো ইতিহাসেরই নিশ্চয়তা। তার ফল—সেও ইতিহাস বিচার করবে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, কুমুদবাবুর কথায় তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইল।

'তোমাকে যে-জন্যে ডেকেছি। একজন টীচার জোগাড় করে দিতে পারো স্কুলের জন্যে?'

'কিসের টীচার?'

'ফিজিকসের। এম-এসসি।'

'টীচারের অভাব? এত বেকার!'

'না হে, অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছ না। এই থ্রী-ইয়ার ডিগ্রী কোর্স আর স্কুলগুলো সব আপগ্রেডিং হয়ে মহা-মুশকিলে পড়েছি। হিউম্যানিটিজের লোক একরকম পাওয়া যায়—কিন্তু সায়েন্সের টীচার জোগাড় করাই শক্ত। নতুন পাশ করে যদি বা এল, দু-এক মাস থেকেই কলেজে একটা কাজ জোগাড় করে নিয়ে চলে গেল, যেন স্কুল একটা স্টেপিং স্টোন। পুরোনো বি-এসসিদের দিয়েও তো আর চলে না—ওপরের ক্লাসগুলোতে কলেজ স্ট্যান্ডার্ডে পড়াতে হয়। কলকাতায় তোমার জানাশুনো আছে কেউ? জোগাড় করে দিতে পারো কাউকে? ম্যাক্সিমাম গ্রেড দেব আমরা।'

'ঠিক মনে পড়ছে না। খুঁজে দেখব।'

'হাঁ, একটু খুঁজে দেখো।'—বিরক্তভাবে হেড মাস্টার বললেন, 'সমস্ত এডুকেশনটাই নিয়েই যেন ছিনিমিনি চলছে। এ-সব আপ গ্রেডিং—থ্রী ইয়ার কোর্স—এসব করে যে কী লাভ হল কিছুই বুঝতে পারছি না। বিদ্যে বাড়ছে বলে তো মনে হচ্ছে না, বাড়ছে কেবল কনফিউশ্যন। তুমি কিন্তু আমার জন্যে একটু সিরিয়াসলি লোক দেখবে।'

'আজ্ঞে দেখব। খবর নেব কলকাতায় গেলে।'

'একটা কলেজ এখানে থাকলে—' স্বগতোক্তির মতো কুমুদবাবু বললেন, 'না হয় প্রোফেসারদের ডেকে এনে কয়েকটা ক্লাস করানো যেত। কিন্তু কবে যে কলেজ হবে, আর হলেও সায়ান্স আদৌ হবে কিনা ভগবানই জানেন। যা খেয়োখেয়ি। বীভৎস!'

বিকাশের সেই সভাটার কথা মনে পড়ে গেল। কলেজ হয়তো হবে, কিন্তু তার আগে কত টন থান ইঁটের বৃষ্টি হয়ে যাবে, সে খবর হয়তো শশাঙ্ককাকা আর কানাই পালই বলতে পারেন।

'কানাইবাবু চেষ্টা করলে একটা স্পনসর্ড কলেজ হতে পারত এখানে।' —হেড মাস্টার আবার স্বগতোক্তি করলেন : 'কিন্তু ওঁরও আর সেদিন নেই। ওপর মহলে যাঁদের সঙ্গে মাখামাখি ছিল, তাঁদের অবস্থাও এখন ভালো নয় — পলিটিকসের পাশার উল্টো দান পড়ছে।' —বিরক্তিতে একবার বিকৃত করলেন মুখটা : 'এই সব রাজনীতিই দেশকে ডোবালো, কেবল দল আর দল।'

বিকাশ ভাবছিল, কিছুক্ষণ ধরেই ভাবছিল। হেড মাস্টার মশাই তো টীচার খুঁজছেন। তিনি কি একটা কিছু করতে পারেন না মনীষার জন্যে? কলকাতা থেকে মনীষাকে যদি এখানে নিয়ে আসা যায়—যদি একটা স্কুলে সে কাজ পায়, তা হলে——মাইনে হয়ত কিছু কম পাবে, কিন্তু বিকাশ তো কিছুটা ক্ষতি-পূরণ করে দিতে পারে। তা হলে মনীষাদের সংসারটা একভাবে চলে যেতে পারে, মনীষা বেঁচে যেতে পারে তিল-তিল মৃত্যুর হাত থেকে, আর—আর কেশব হালদারের মতো বাড়ীর মালিকের ঘোমটা-টানা স্ত্রীর সামনে গিয়ে সে বুক ফুলিয়ে বলতে পারে : 'আমাকে নির্ভয়ে ঘর ভাড়া দিতে পারেন আপনি, এই দেখুন—একেবারে স্ত্রীকে সঙ্গে করে এনেছি।'

হেড মাস্টার বললেন, 'ভালো কথা—তুমি তো বোধহয় অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছ। নিশ্চয় কিছু খাওয়া হয় নি। আমি তোমার জন্যে একটু জলখাবার—'

'মাপ করবেন, আমার কিছু দরকার নেই—' বিকাশ তটস্থ হয়ে উঠল : 'ও-সব আপনি ভাববেন না। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ ছিল আপনার কাছে।'

'বলো—বলো।'

'এখানকার গার্লস স্কুলের সঙ্গে নিশ্চয় যোগ আছে আপনার।'

'আছে বইকি। আমি রয়েছি ওদের গভর্নিং বডিতে।'

ওখানে একটি মেয়ের চাকরি হয় না?'

হেড মাস্টারের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল উৎসাহে।

'সায়ান্স? নিশ্চয়, এখুনি—এখুনি।'

'না—সায়ান্স নয়। অর্ডিনারী আর্টস গ্র্যাজুয়েট।'

'আর্টস গ্র্যাজুয়েট? ও।' —হেড মাস্টারের চোখের আলো নিবে গেল : 'অনার্স ছিল না?'

'না।'

'তা হলে তো—' একটু ভেবে বললেন, 'বি-টি?'

'আজ্ঞে না, তাও নয়। অফিসে কাজ করে।'

'মুশকিল'—হেড মাস্টার মাথা নাড়লেন : 'অনার্স নেই, বি-টি নেই—এ অবস্থায় এখন আর কোনো স্কুলে কাউকে ঢোকানো—'

আর বললেন না, থেমে গেলেন। বলবার দরকার ছিল না। মনীষাকে তিনি চাকরি দিতে পারবেন না। মোহনলাল স্ট্রীট থেকে ডালহাউসির টানা ছকে দিনের পর দিন কাটবে মনীষার, কলকাতা আরো ক্লান্ত, আরো জীর্ণ হয়ে উঠবে, সেই কানা দেওয়ালটা সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে নিশ্চল হয়ে, বিকাশ কোনোদিন ঘর বাঁধতে পারবে না।

ম্লান গলায় বিকাশ বললে, 'বি-টি তো শুনেছি চাকরি করতে করতে পড়ে নেওয়া যায়।'

'তা যায়। কিন্তু অন্তত একটা অনার্স না হলে—' বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কিছু আন্দাজ করলেন কুমুদ সেন-গুপ্ত : 'মেয়েটি তোমার আত্মীয় হয় কেউ?'

কী বলা যায়? আমার ভাবী স্ত্রী? সে একটা চাকরি পেলে আমি তাকে বিয়ে করতে পারি, ঘর বাঁধতে পারি? কিন্তু এই কালটা সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হেড মাস্টার কিভাবে নেবেন সমস্ত জিনিশটাকে?

'হাঁ, আত্মীয়ই বলতে পারেন।'

হেড মাস্টার সহৃদয় মানুষ। বিকাশের নৈরাশ্যটা যেন বুঝতে পারলেন।

'বি-এতে কী সাবজেক্ট ছিল, জানেন?'

'ম্যাথমেটিকস ছিল। আর সংস্কৃতও ছিল বোধ হয়। ঠিক মনে নেই।'

'অঙ্ক ছিল?'—একটু যেন উৎসাহ বোধ করলেন কুমুদবাবু : 'তা হলে একবার বলে দেখতে পারি। শুনেছি অঙ্কের লোক ওদের দরকার হতে পারে।'

কুমুদবাবু একটু হাসলেন : 'দাঁড়াও—দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করে নিই। তারপরে আমিই জানাব তোমাকে। কিন্তু আমার ফিজিকসের টীচারের কথা মনে আছে?'

'আমি কালই কলকাতায় চিঠি লিখব দু-একজনকে।' —বিকাশ উঠে পড়ল : 'তা হলে আসি আজ।'

তখন হঠাৎ চোখে পড়ল। এনসাইক্লো-পিডিয়া ব্রিটানিকার গায়ে সোনার জলে লেখা সারি সারি নাম : মালিকের নাম। 'পি-কে নিয়োগী।'

পি-কে নিয়োগী! এই নামটা আগেও চোখে পড়েছে তার। মেজদার সেই অদ্ভুত লাইব্রেরিতে। মেজদার নাম—হাঁ, মনে পড়েছে, সুনু বলেছিল, প্রদ্যোৎকুমার নিয়োগী।

একবারের জন্যে বিকাশ শক্ত হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল না, তবু কথাটা বেরিয়ে পড়ল মুখ ফসকে।

'এই এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো—'

'ও—হ্যাঁ' — হেড মাস্টার একটু হাসলেন : 'ওগুলো সেই পাগলার বই। সব নষ্ট করে ফেলছিল। কয়েকটার পাতাও ছিঁড়েছে এখানে-ওখানে। শশাঙ্কবাবু

আমাকে বের করে এনে দিয়েছেন। দাম নিতে চান নি, তবু আমি যথাসাধ্য দিয়েছি। এমন ভ্যালুয়েবল বই তো আর বিনি-পয়সায় নেওয়া যায় না। একটু পুরোনো এডিশন, কিন্তু জানো তো—এসব বই একেবারে খাঁটি সোনা।'

'টাকাটা মেজদাকে দিলেন না কেন—' এ প্রশ্ন করা যেত। মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল মন, কথাটা একেবারে এগিয়ে এসেছিল জিভের ডগায়। কিন্তু বলা গেল না। এখন তাকে মনীষার চাকরির জন্যে তদ্বির করতে হচ্ছে মাস্টার মশাইয়ের কাছে, এখন তাঁকে চটানো চলে না।

ঠিক কথা—মেজদার সেই ধুলোয়-ভরা লাইব্রেরীতে দিনের পর দিন পচে জীর্ণ হয়ে গেলে, কিম্বা সেই পাগলটাকে খেয়াল-খুশি মতো এই সব দুর্মূল্য বইকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলে এ কারো কাজে লাগত না। জ্ঞান আলোতে আসবার জন্যেই—অন্ধকারে হারিয়ে যাবে বলে নয়। এ বইকে উদ্ধার করে এনে কেউ অন্যায় করেন নি—শশাঙ্ককাকা নন, হেড মাস্টারও না। কিন্তু টাকাটা যদি কাকা না নিতেন—

কিন্তু মেজদাকে তো তিনি খেতে দেন। পরতেও হয়তো। কিছু দিয়ে থাকেন, কিন্তু মেজদার বোধ হয় সেজন্যে বিশেষ কোনো দরকার পড়ে না।

বিকাশ একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আসি তা হলে।'

'আচ্ছা—এসো, এসো।'

না, এসব বই মেজদার কোনোদিন কাজে লাগবে না।

তবু চলতে চলতে বিকাশের খারাপ লাগছিল। একটা শিশুর হাত থেকে একজন জোয়ান লোক তার খেলনাটা কেড়ে নিচ্ছে, এইরকম একটা নিষ্ঠুরতা যেন অনুভব করছিল সে।

শশাঙ্ককাকা সম্পর্কে নতুন করে ভাববার কিছু নেই। কিন্তু যে শ্রদ্ধাটুকু নিয়ে সে হেড মাস্টার মশাইয়ের ঘরে ঢুকেছিল, সেটুকু সংগে করে বেরুতে পারলেই তার ভালো লাগত।

প্রভাকরের ওখানে যাব?

কী হবে? কোথাও যেতে ভালো লাগছে না। মনের ভেতরটাই এলোমেলো হয়ে গেছে, সমস্ত যেন বেসুরো বাজছে এখন। শুধু একটি মাত্র চিন্তাই ঘূরপাক খাচ্ছে মাথায়। আবার ধরতে হবে কুমুদবাবুকে, এনসাইক্লোপিডিয়াগুলোর দিকে তাকাতে অদ্ভুত খারাপ লাগলেও তাঁর কাছেই বলতে হবে মনীষার চাকরির কথা।

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনের একটা দোকানে রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত। 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে—'

এই সন্ধেবেলায় সকালের গান কেন? তবু ভালো লাগল গায়িকার গলা—উচ্চারণের ভঙ্গি। এই সব গান শুনলে একটা পবিত্র উজ্জ্বল বাংলা দেশকে মনে পড়ে, যে-দেশ হারিয়ে গেছে, যে-দেশ কখনো আর ফিরে আসবে না। সে দেশের আকাশ নম্র নীল, তার সোনালি ধানের ক্ষেতে জলভরা মেঘের ছায়া, সে দেশে অঞ্জনা নামে একটি ছোট নদীর এপারে-ওপারে দুটো হৃদয়ের সুরে বাঁধা। সেই দেশের মেয়েদের চোখে শান্তি আর বিশ্রামে ভরা—জীবনানন্দের নায়িকার মতো; সে দেশের মেয়েরা শিশির-জ্যোৎস্না-পাতার রঙ—আলোছায়া দিয়ে গড়া।

এই গান যাকে মনে আনে সে সোনালি।

হঠাৎ যেন একটা চাবুক খেলো বিকাশ।

এত তাড়া কেন তার মনীষার জন্যে? কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঘর বাঁধবার ভাবনায়? এখানে আসবার আগে এই সমস্যাটা কি এত বেশি জরুরি ছিল তার কাছে? মনীষার শরীর তো কেবল এই ক'দিনের মধ্যেই এমন করে ভেঙে পড়ে নি—মাত্র এই একটা মাসের ভেতরেই তো সে ডুবে যায় নি ছায়ার ভেতরে—ক্লান্তির এই শূন্যতায়? বিকাশ তো তা দেখেছে দিনের পর দিন, ভেবেছে কোনো উপায় নেই, তারপর একদিন অতল অবসাদের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এই সত্যকেই মেনে নিয়েছে যে, মনীষা কোনোদিন আসবে না—আসতে পারবে না—সে কেবল সমস্ত জীবন ধরে অপেক্ষা করবে, ধিক্কার দেবে নিজের পৌরুষকে।

মনের কাছে পরাভবের এই চুক্তিটাই তো পাকা হয়েছিল। আজ হঠাৎ—

সুনু—সোনালি? তার কৈশোর দিয়ে, তার প্রথম জানা রূপ আর সরল দুটি চোখ দিয়ে, শশাঙ্ককাকার বাড়ীতে তার মিরুপায় আর নিষ্ঠুর পরিণামের কথা ভেবে, সে কি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সুনুর দিকে? তার মনের ভেতর কি ঘনিয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের বাংলা দেশ, অঞ্জনার পারে সেই মেয়েটি—যে-সব স্বপ্ন এখন আর কেউ দেখে না, সেই স্বপ্নই কি তার চিন্তায় এখন গুন-গুন করে উঠছে?

মেজদা—মেজদা সেদিন কী বলেছিল?

'পালা—পালা—এখান থেকে!' উঁচুগলায় বলে দিয়ে যা মেয়েটাকে। তুই বাঁচবি, মেয়েটাও বেঁচে যাবে।'

বিকাশ জোরে পা চালালো।

না—বাড়ীই ফিরতে হবে। আজ, এই রাতেই একটা চিঠি লেখা দরকার মনীষাকে।

'আমি এখানে একটা মেয়েদের স্কুলে চাকরির খোঁজ করছি তোমার জন্যে। যদি হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ চলে আসবে। এখানে যা মাইনে পাবে, সবই পাঠাতে পারবে

বাড়ীর জন্যে। যা কম পড়বে, তা আমি পুষিয়ে দেব। তুমি তো জানো, আমার রোজগার খুব খারাপ নয় — আমাদের সংসারও সেজন্যে খুব অসুবিধেয় পড়বে না। তা ছাড়া তখন তো আমার টাকার ওপরে তোমারও একটা দাবী জন্মে যাবে, তুমি অন্যের কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নিচ্ছ, এ গ্লানি তোমাকেও—

নিয়োগীপাড়ার পথে শীতের অন্ধকার। শুকনো হাওয়ায় শুকনো পাতা ঝরছে—খস-খস করে যেন অশরীরী হাসি বাজছে চারদিকে। চলতে-চলতে অসতর্ক পায়ে হোঁচট লাগল এক টুকরো ইঁটের সঙ্গে—সেই বুড়ো আঙুলটাতেই লাগল — মাথার মধ্যে খানিকটা যন্ত্রণা ছুটে গেল ঝনঝন করে। একবারের জন্যে দাঁতে দাঁতে চাপল বিকাশ—যন্ত্রণাটা সইয়ে নেবার জন্যে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল একটু।

এই যন্ত্রণাটা সিম্বলিক। এবারে কলকাতা থেকে সঙ্গে এসেছে। স্টোন হয়েছে মনীষার—ডাক্তার বলেছেন। থেকে থেকে সেই যন্ত্রণা মনীষাকে কুরে কুরে খায়। এবার বিকাশ তার ভাগ নিয়ে এসেছে।

মনীষাকে তার উদ্ধার করে আনতে হবে। শুধু মনীষার জন্যে নয়, তার নিজের জন্যেও। মা—এইভাবে সুনুকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে যেতে দেওয়া যায় না। এ খারাপ লক্ষণ।

কিন্তু মনীষা যদি রাজী না হয়? যদি বলে, সে এতদিনের নিশ্চিন্ত চাকরিটা ছেড়ে স্কুল-মাস্টারির অনিশ্চয়ে নেমে পড়তে চায় না? যদি বলে, মাস্টারি তার ভালো লাগবে না—ওতে তার কোনো ন্যাক নেই? যদি বলে, স্ত্রী হিসেবে তোমার টাকা আমি না হয় নিতে পারি, কিন্তু আমার মা-বাপ-ভাই-বোন কেন হাত বাড়িয়ে নিতে যাবেন সেই অনুগ্রহের দান?

তা হলে?

আর একবার দাঁতে দাঁতে চেপে ধরল বিকাশ, একটা কিছুকে পিষে ফেলতে চাইল। ভাবনার কোনো শেষ নেই — ওতে মরে কেউ কোনোদিন কোনো জট খুলে ফেলতে পারে না। এবার শক্তি। জোর করে তুলে আনতে হবে মনীষাকে। বলতে হবে, পৃথিবীতে সবাই স্বার্থপর। সবাই নিজের ভাবনাই ভাবে। তুমি আমি উদার হয়ে, আত্মদান করে—কেবল দিনের পর দিন নিজেদের বঞ্চনাই করে যেতে পারি। এবার আমরাও স্বার্থপর হবো। মা-বাবা-সংসার? একটা কিছু হবেই, কারুর কোথাও আটকে থাকে না।

'বিকাশবাবু নাকি?'

বিকাশ চমকালো। গাছপালার ভেতর দিয়েও শীতের জ্যোৎস্নায় চেনা যায়। নিয়োগীপাড়ার আর এক ভদ্রলোক—কাকার বয়েসীই হবেন। ও বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসেন। ভালো একটা নাম নিশ্চয় আছে তাঁর, কিন্তু বাঁকাবাবু বলেই ডাকা হয় তাঁকে।

বাঁকাবাবু ফিরছিলেন বাজারের রাস্তায়। তাকে সামনে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

'আজ্ঞে হাঁ, আমি বিকাশ।'

'কোনো খবর-টবর পাচ্ছেন নাকি?'

'কিসের খবর?' বিকাশ আশ্চর্য হল।

'ম্যাকে তো নানারকম লোক আসে। কানাই পালের দল নাকি দারুণ ঘোঁট পাকাচ্ছে একটা। খুব চেঁচামেচি চলছে—জাত তুলে গালাগাল? আমরা দেখে নেব। কিছু শুনেছেন নাকি?'

আবার একরাশ বিস্বাদ বিরক্তি। মাথার মধ্যে জ্বালা করে উঠল বিকাশের।

'না, আমি কিছুই শুনিনি।'

'ছোটলোকের টাকা হলে আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না!'—কাকার কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল বাঁকাবাবুর মুখে: 'ঠিক আছে, দেখে নিতে আমরাও জানি।'

বাঁকাবাবু এগিয়ে গেলেন।

বিষাক্ত—সমস্ত বিষাক্ত। এখান থেকে ছুটে পালানো ছাড়া আর পরিত্রাণ নেই। মনীষাকে যেমন করে হোক আনতে হবে এখানে। আমরা নির্লজ্জভাবে স্বার্থপর হয়ে উঠব। আমাদের বাঁচা দরকার।

কেবল—কেবল সুনু যদি ওই বাড়ীটায় না থাকত।

কিন্তু শুধু শশাঙ্ককাকাই?

হতে পারে, মনীষার বাবা শিবদাস-বাবুর বয়েস হয়েছে; হতে পারে তিনি অসুস্থ, তাঁর সেবা দরকার, ওষুধপত্র দরকার। কিন্তু তিনি তো অশিক্ষিত নন। ইচ্ছে করলে বাড়ীতে বসেও তো দু-চারটে ছেলে পড়াতে পারেন, তাতেও তো সংসারে কিছু আসে। মনীষার যে ভাই কলেজে পড়ে সে-ও তো একটু টিউশন করতে পারে কোনো স্কুলের ছেলের। এমন কত ছাত্রই তো আছে যাদের দাঁড়াতে হয়েছে সম্পূর্ণ নিজের পায়ে—কত উঞ্ছবৃত্তি করে, টিউশন করে নিজেদের পড়ার খরচটা চালিয়ে নেয় তারা। কিন্তু কেউ কিছু করবে না। সব দায়িত্ব, সব ভার মনীষার ওপরে। বিন্দু বিন্দু করে ওই একটা মেয়ের রক্ত শুষে নিয়ে চমৎকার চলছে সংসারটা।

আজ যদি মনীষা হঠাৎ মারা যায়? তখন?

তখনো সব ঠিক চলবে। সবাই গুছিয়ে নেবে নিজের মতো। কারো জন্যে কোথাও আটকে থাকবে না।

সব সমান। সব স্বার্থপর কী হবে শশাঙ্ককাকার ওপরে রাগ করে?

এই সময়, পুকুরটার পাশ দিয়ে, নিয়োগী বাড়ীর বাইরের উঠোনে এসে পৌঁছেছিল বিকাশ। কিন্তু সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পা দুটো তার জমে গিয়েছিল মাটিতে।

বাড়ীর ভেতর থেকে কয়েকটা নিষ্ঠুর মারের শব্দ। একটা মেয়েলি চিৎকার হঠাৎ শীতের অন্ধকারকে চিরে দিয়েই ফোঁপানো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

নিশ্চিত — নিশ্চিতভাবেই কাকিমার গলা।

আর সেই কান্না ছাপিয়ে বিকট বীভৎস গলায় কাকার সিংহনাদ শোনা গেল: 'চুপ কর,—চুপ কর, হারামজাদী! বোনের শোক আবার নতুন করে উথলে উঠছে। আর এক-বার চেঁচিয়ে উঠবি তো একেবারে গলা টিপে খুন করে ফেলব!'

'কালী—কালী—নররক্ত খাব, নররক্ত!'

সমস্ত জঘন্য নাটকটাকে উদ্দাম বীভৎসতায় পৌঁছে দিয়ে সুপুরি গাছ-গুলোর আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল মেজদা — ছায়া-জ্যোৎস্না-কুয়াশাকে সম্পূর্ণ আবিল করে দিয়ে দু-হাত তুলে শুরু করল এক ভৌতিক তাণ্ডব, আর বিকাশের মনে হল, তার কপালের সব শিরাগুলো এই মুহূর্তেই ছিঁড়ে-ফেটে একাকার হয়ে যাবে!

(ক্রমশ)

ও'রা সেলস গার্ল

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়তেই কেন জানি না অনেকখানি আশা হয়েছিল। এবার হয়তো কোন সুরাহা হবে।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলার মুখে বেদনার কালো পর্দাটা সরে যায়। কিঞ্চিৎ উজ্জ্বলতা। অতটা বিষন্ন মনে হয় না।

সেই কবে থেকে চাকরির চেষ্টা করছি। সংসারের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়। স্বামী একা যা রোজগার করেন তা ঘরে আসতে না আসতেই শেষ হয়ে যায়। প্রায় বিয়ের পর থেকেই ভেবে আসছি কিছু রোজগার করতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু চাইলেই তো সবকিছু হয় না। তাছাড়া, চাকরির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় তেমন লেখাপড়া নেই। অথচ চিন্তায় এদিকে ঘুম চোখ ছাড়ার উপক্রম। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো, লেখাপড়ায় অসমাপ্ত পাঠটা মিটিয়ে ফেলি। সাধ আছে কিন্তু সাধ্যেরই যা টানাটানি। ভীষণ আটকে যাচ্ছিলাম।

সেদিনের হতাশায় ম্রিয়মাণ মুখচ্ছবি ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠে আবার আড়াল পড়ে যায়।

সেই সময়েই এই বিজ্ঞাপন। সেলস গার্লের চাকরি। অত কিছু খতিয়ে দেখার সময় এবং মনের অবস্থা কোনটাই ছিল না। এবার একটা হিল্লে হবে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত করে দিলাম। ইন্টারভ্যুও পেলাম। কথাবার্তায় কর্তৃপক্ষ খুশি। কাজের কথা তিনি বুঝিয়ে বললেন। কোম্পানীর প্রস্তুত প্রসাধন এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতে হবে। মাইনে অথবা কমিশন যে কোন সর্তে কোম্পানী রাজী। তবে ডিপোজিট মানি দরকার। কোম্পানীর যে মাল আমাদের কাছে থাকবে, সেজন্যেই এই টাকার দরকার।

শেষ কথাটা শুনে তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। এতো আশাভরসা সব ব্যর্থ হয়ে যাবার মুখে। টাকাই যদি থাকবে তাহলে এতো পরিশ্রম করতে রাজী হবো কেন!

আমি ছাড়া আরো কয়েকজন এসেছিলেন ইন্টারভ্যু দিতে। ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছে। সকলেরই দেখলাম একই সমস্যা। ডিপোজিট রাখার মতো টাকা কোথায়? সবাই একজোট হয়ে পরামর্শ করে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে বললাম। তিনি কিন্তু বুঝতে নারাজ। ঘন ঘন মাথা নাড়েন। অনেক কথা খরচ হওয়ার পর তিনি রাজী হলেন। একটু হেসে তিনি বললেন, কথায় চাতুর্যে তোমাদের প্রথম কিস্তি মাৎ হয়েছে। এবার শুরু হবে আসল কারিগরি।

আমাদের চাকরি হলো। তারপর বছর সাতেক কেটে গেছে। প্রথমে মাস মাইনেতে বহাল হয়েছিলাম। কিন্তু কাজে নেমে দেখলাম, জিনিস বিক্রি হচ্ছে বেশ ভালই। মোটামুটি লাইনটা রপ্ত করে নিয়ে মাস মাইনের বদলে কমিশনে কাজ করছি। এতে মাসে শ' দুয়েকের কাছাকাছি পাই। স্বামী-স্ত্রীর আয়ে সংসার একরকম চলে যায়।

- প্রশ্ন না করে ও'দের কথা শুনি। ও'রা তিনজন একই কোম্পানীর সেলস গার্ল। তিনজনই বিবাহিতা। প্রায় একই সঙ্গে চাকরিতে ঢুকেছেন। সমস্যা ও'দের একইরকম। তাই একজনের কথায়ই সকলের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য একজন আরেকজনের কথাই খেই ধরে এগিয়ে যান। আবার কোন কথা বাদ পড়লে তৃতীয়জন যোগান দেন। ও'দের কথায় প্রায় নিবিষ্ট হয়ে গেছি।

ডিউটি অবশ্য আমাদের বেয়াড়া ধরনের। সারাদিন ঘুরে বেড়াতে হয়। সাধারণত অফিস আওয়ার্স ধরেই আমরা চলি। একসঙ্গে এমনি জনাতিনেক কি চারজন। তারপর বিরাট বিরাট অফিসগুলির এক একটিতে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ি আমরা। এতে বিক্রির কোন অসুবিধা হয় না। বরং একসঙ্গে থাকায় বুকে বল ভরসা থাকে। কাজটা ঘোরাঘুরির বলেই দল বেঁধে বেরুই।

খদ্দের পেতে অসুবিধা হয় না। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বোঝাতে হয় অনেকক্ষণ ধরে। প্রতিটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা

এবং ব্যবহার পদ্ধতি না জেনে ক্রেতাই বা তা কিনবেন কেন? আর আমাদের এ লাইনে কথাই তো সবচেয়ে বড় মূলধন। অনেকেই জিনিসপত্র কেনেন। আবার কেউ কেউ গভীর মনোযোগ সহকারে আমাদের কথা শোনেন। কথা শেষ হলে গম্ভীর মুখে উঠে পড়েন অথবা পাশ ফিরে গল্প জুড়ে দেন। তাঁরা শোনার জন্যই শোনেন। কেনার দরকার তাঁদের নেই। মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু অভিযোগের পথ তো আমাদের বন্ধ। আজ যিনি কিনলেন না, কাল তো তিনি কিনতে পারেন। তাই কাউকে চটাতে সাহসে কুলোয় না। সকলের সংগেই আমরা যথসম্ভব ধীরস্থির মেজাজে কথাবার্তা বলি। কাউকে অসন্তুষ্ট হবার বা চটবার সুযোগটুকু পর্যন্ত দিই না।

সত্যি, ও'দের কথাবার্তার তারিফ করতে হয়। কথা বলে এবং শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। একজন জিনিস দেখাচ্ছিলেন আর দু'জন কথা বলছিলেন। ও'দের প্রতিটি কথা ক্রেতাকে জয় করার পক্ষে যথেষ্ট। ও'দের কথা শুনতে শুনতে মনে হলো, বাঙালী মেয়েদের তো অনেক অপবাদ। কিন্তু প্রচণ্ড পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করে বে'চে থাকা এদের দেখে সম্পূর্ণ ধারণাটাই বদলে যায়। সেলস গার্ল হিসেবে এ'দের পটুত্ব যে কারো সংগে পাল্লা দিতে পারে। অথচ এ'রা আমাদের কত ধারেকাছের।

আমাদের কাজ শুধু কলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ নয়। মাঝে মাঝে মফস্বলেও যেতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রোগ্রামও বেশ বড়ই হয়। তবে বিক্রিবাটা ভাল। গ্রামের লোক আমাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল। ও'রা আমাদের কথা শোনেন। সব শোনার পর জিনিসও কেনেন। খুব একটা নিরাশ হতে হয় না। তাই মফস্বল ট্যুরে আমাদের কমিশন বেশ ভালই থাকে।

ও'রা বর্ধমান লাইনে প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই ট্যুর করেছেন। এসব জায়গায় ও'দের জিনিসের কাটতি বেশি। আবার বাঙলার সীমানা ছাড়িয়ে প্রতিবেশী প্রদেশেও ও'রা পাড়ি জমান। ও'দের একজন তো ধানবাদ পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন। কৌতূহল হয়েছিল, ওখানে জিনিসপত্র কিরকম বিক্রি হয়েছে জানতে। আমার জিজ্ঞাসার আগেই ও'রা উত্তর দিলেন, সেখানে বিক্রি বেশ আশাপ্রদ।

তাছাড়া কলকাতায় একই লোকের কাছে ঘুরে ঘুরে কত আর বিক্রি করা যায়? তাই বাইরের প্রোগ্রামটার উপরই আমাদের জোর দিতে হয় বেশি। জোর দিয়ে লাভও হয়। তবে, খুব একটা দূরে গেলে ঘর ফেলে কয়েকদিন সেখানেই থাকতে হয়।

ও'র কথায় কিরকম একটু বেদনা। ঘরসংসার এবং সন্তান থেকে দু' একদিন দূরে থাকা মায়ের পক্ষে দুঃসহ। কিন্তু চাকরির তাড়নায় এবং অর্থের প্রয়োজনে মাকে এই বিরাট কষ্টটুকু মেনে নিতেই হবে। তবু কষ্ট সব সময় চেপে রাখা যায় না।

প্রাণধারণের প্রতিযোগিতায় ও'রা যে কারো সমকক্ষ। অন্তত, এই মুহূর্তে আমার তাই মনে হচ্ছিল। জীবিকার প্রয়োজনে যে কোন কষ্টকে ও'রা হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। পুরুষদের মতই সকল পরিশ্রমে ও'রা ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। শুধু পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বিরাট বিস্ময়ও ও'রা। ভাবতে অবাক লাগে, এরই মধ্যে আমাদের মেয়েরা কত এগিয়ে গেছে। আর্থনীতিক সমস্যার তীব্রতা যত বেড়েছে আমরা তত স্বাবলম্বী হতে শিখেছি। সত্যি কথা বলতে, জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে আজকের মেয়েদের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা এজন্যই। এই সেলস-গার্ল-ত্রয় হচ্ছেন তারই প্রতিনিধি।

কলকাতা শহরেও আমাদের অনেক গুণগ্রাহী আছেন। বিশেষ, ফিল্মস্টাররা তো আমাদের কাছ থেকে একসংগে অনেক জিনিস কেনেন। অবশ্য সকলেরই অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমরা পাই। ক্রেতা এবং কোম্পানী কর্তৃপক্ষ দু' তরফ থেকেই যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় আমরা পাই। সকলের সহানুভূতি নিয়েই আমাদের বে'চে থাকা।

আগেই বলেছি, আমাদের কাজটা একটু বেয়াড়া। শুধু ঘরে ঘরে বকবক করা। কিন্তু কাউকে এজন্য কোনদিন বিরক্ত হতে দেখিনি। বরং অনেকেই কেনেন। আবার কোম্পানীর তরফ থেকেও আমরা সব সময়ই ভাল ব্যবহার পেয়ে আসছি। সামান্যতম অভিযোগের কোন সুযোগও তাঁরা দেন না। ছ'দিন কাজ করি। রবিবার ছুটি পাই। অ্যাভারেজ মাইনেতে। এছাড়া ছুটিছাটা বড় একটা নেই। নেহাত অসুখবিসুখ করলে ছুটি নিতে বাধে। তবে পুরোপুরি মাইনে কাটা যায় না। এখানেও অ্যাভারেজ পে।

এবার এগিয়ে এলেন আর একজন।

জিনিস যত বিক্রি হবে তত বেশি লাভ। তাই খুব একটা ছুটিছাটা আমরা কেউ-ই নিই না। ছ'দিন কাজের পর একটা রবিবার ছুটি না নিলে চলে না। রবিবার বাদ দিলে আমাদের ছুটির তালিকা সবসময়ই হ্রস্ব।

ভাবতে ভাল লাগে, কি কঠোর শ্রমের বিনিময়ে এ'রা বে'চে আছেন। এ'দের প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্ব কিন্তু এখনো পালন করতে পারিনি। তাই সবশেষে ও'দের মৃদু অভিযোগও শোনা যায়।

অফিসপাড়া ছেড়ে মাঝে মাঝে আমাদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে হয়। অনেক বাড়িতে কড়া নেড়ে ভাল আপ্যায়ন পাই। আবার কোন কোন বাড়িতে আমাদের দেখেই একরাশ বিস্ময়-বিরক্তি। মুখের ওপরই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কোন কথা বলা দূরের কথা নিজের উপরই রাগ ধরে। কোন কোন বাড়িতে আবার কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে আমাদের ফিরে আসতে হয়। অভিজাত পল্লীতেই অবশ্য এধরনের ঘটনা ঘটে। তবে ওখানেও আমরা সমাদর পাই। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের প্রতি সহযোগিতার পাল্লাটাই ভারী।

তিনজনের মুখই এবার পরিতৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল।

—প্রমীল
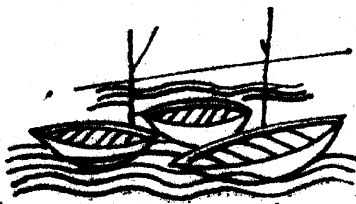
মস্কোর গবেষণাগারে
ভেষজ উদ্ভিদের সংগ্রহ পরীক্ষা

নতুন ভেষজ উদ্ভিদের সন্ধানে

প্রাচীনকাল থেকে মানুষের নানা রোগ-ব্যাধিতে ভেষজ-উদ্ভিদের ব্যবহার হয়ে আসছে। আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে ভেষজ-উদ্ভিদ বা বনৌষধি ব্যবহারের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এদেশে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রচলিত হবার পর ভেষজ-উদ্ভিদের প্রতি একটা ঔদাসীন্য দেখা যায়। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশজ মালমশলা থেকে ভেষজ প্রস্তুতের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় ভেষজ-উদ্ভিদের দিকে আবার দৃষ্টি পড়েছে। সম্প্রতি ভেষজ-উদ্ভিদ নিয়ে আমাদের দেশে নানা গবেষণা চলছে। এবং শুধু আমাদের দেশে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়ার মতো উন্নত দেশগুলিতেও বর্তমানে ভেষজ-উদ্ভিদ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। হৃদরোগ, স্নায়ুতন্ত্রসংক্রান্ত ব্যাধি, রক্তচাপ ইত্যাদি নানা ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিরাময়ে ভেষজের উপকরণ উদ্ভিদ থেকে খুঁজে পাবার চেষ্টা চলছে পৃথিবীর নানা দেশে। এ-প্রসঙ্গে ভারতের সর্পগন্ধার কথা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রক্তচাপজনিত ব্যাধিতে সর্পগন্ধার কার্যকারিতা আজ সুবিদিত।

ভারতের বাইরে যেসব দেশে ভেষজ-উদ্ভিদ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা চলছে তার মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মস্কোর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিসিনাল প্লান্টস-এ গত কুড়ি বছর ধরে ভেষজ-উদ্ভিদ নিয়ে নানা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চলছে। এখানে উদ্ভিদবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী ও রসায়নবিজ্ঞানীরা একযোগে নানা দিকে গবেষণা চালান। শত-শত উদ্ভিদ নিয়ে এখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তার মধ্যে কোনোটিতে যদি ভেষজের সক্রিয় উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়, তখন বিস্তীর্ণ এলাকায় সেই উদ্ভিদের চাষ করা হয়। সেই উদ্ভিদ থেকে যে ভেষজদ্রব্য পাওয়া যায় তা প্রাণীদের ওপর নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। একটি নতুন ভেষজ নিয়ে গড়পড়তায় ৫—৭ বছর এবং কখনও বা ১০ বছর পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এই ব্যাপক গবেষণার ফলে যখন ভেষজটির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় তখনই সেটি মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয়।

মস্কোর জাতীয় ভেষজ-উদ্ভিদ সংস্থার নিজস্ব উদ্যানে তিন হাজার ভেষজ-উদ্ভিদের সংগ্রহ আছে। এখানকার কর্মীরা অভিযান চালিয়ে নতুন নতুন ভেষজ-উদ্ভিদ সব সময় সংগ্রহ করেন এবং এখানকার গবেষণাগারে তাদের ভেষজগুণ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

এই সংস্থা বিশ্বের ৩৫০টি উদ্ভিদ-উদ্যানের সঙ্গে ভেষজ-উদ্ভিদের বীজ বিনিময় করে, তার মধ্যে ২০০টি হচ্ছে বিদেশী। ভারতের কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লখনৌ-এর উদ্ভিদ-উদ্যানের সঙ্গে তাঁরা নিয়মিত বীজ বিনিময় করে থাকেন। প্রতিদিন বিভিন্ন বীজের তিন হাজার নমুনা এখানে এসে পৌঁছয় এবং প্রায় সমসংখ্যক নমুনা এখান থেকে অন্যত্র পাঠানো হয়।

বর্তমানে এখানে ৩০টি নতুন ভেষজ-উদ্ভিদের সক্রিয় উপাদান নিয়ে রোগীদের ওপর পর্যবেক্ষণ চালানো হচ্ছে। হৃদ্, রক্তসংবহন, ক্যানসার, ভাইরাস ফ্লু ইত্যাদি ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্যে নতুন উপাদানের সন্ধানে এখানে রসায়ন-বিজ্ঞানী, জীব-বিজ্ঞানী এবং ভেষজবিদেরা গবেষণা করে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে কলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে ভেষজ-উদ্ভিদ সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা পরি-চালিত হচ্ছে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে যেখানে অধিকাংশ লোকের উচ্চমূল্যে ঔষধ কেনার ক্ষমতা নেই, সেখানে দেশীয় ভেষজ-উদ্ভিদ থেকে নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কারের গুরুত্ব যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়। তাই আমাদের দেশে ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি।

ডঃ স্টেলিং মহাকাশ অভিযানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন।
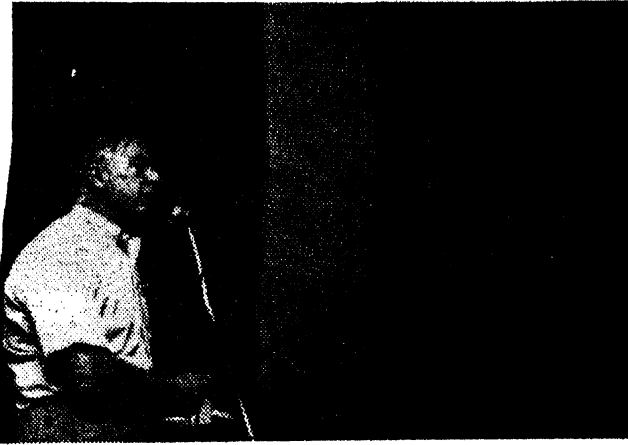
হীরার সোদর ‘কারবাইন’

একই মায়ের সব সন্তান রূপেগুণে সব সময় একরকম হয় না—কারো রঙ হয় ময়লা, কারো বা রঙ ফর্সা। তেমনি প্রকৃতিতে একই উৎপাদন নানারূপে দেখা যেতে পারে। কয়লা, হীরা, গ্র্যাফাইট বা কৃষ্ণসীসা আকৃতি প্রকৃতিতে কত বিভিন্ন, কিন্তু তারা সকলে একই উপাদান কার্বন বা অংগার থেকে উৎপন্ন।

প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়, যে হীরার ঔজ্জ্বল্য ও দাম এত বেশি তার সংগে কয়লা বা গ্র্যাফাইটের কোনো মূলগত সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু পদার্থের রাসায়নিক গঠনের গভীরে যদি আমরা প্রবেশ করি, তাহলে জানতে পারব কোনো পদার্থের প্রকৃতি বা ধর্ম কেবল তার মূল উপাদান পরমাণুর ওপর নির্ভর করে না, কিভাবে সে পরমাণুগুলি পদার্থের মধ্যে সাজানো থাকে তার ওপরও নির্ভর করে।

পদার্থের অভ্যন্তরে এই পরমাণু-বিন্যাসের যথাযথ পরিবর্তন ঘটাতে পারলে এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়, যেমন গ্র্যাফাইট থেকে হীরায় রূপান্তর। প্রকৃতিতে এই রূপান্তরের রহস্য বিজ্ঞানীরা আজ উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁরা বলেন, কখনো কখনো ভূ-আলোড়নে অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক উপায়ে ভূগর্ভস্থ অংগার অত্যধিক তাপ ও চাপের প্রভাবে হীরায় রূপান্তরিত হয়। তাঁরা এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে হীরা প্রস্তুতও করেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো—কয়লা, গ্র্যাফাইট ও হীরা ছাড়া অন্য কোনো রূপেও কি অংগারকে পাওয়া যেতে পারে? এই সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে চিন্তা করছেন। ১৯৬৪ সালে রুশ রসায়নবিজ্ঞানী স্লাদ-কফ অংগারের আর একটি রূপের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যুক্তি পেশ করেন। সম্প্রতি গবেষণাগারে পরীক্ষার দ্বারা তাঁর এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। মস্কোর অতিকায় অণু গবেষণাগারের মৌল জৈব যৌগিক পদার্থ বিভাগে রসায়ন-বিজ্ঞানী স্লাদকফ এবং কুদ্রিয়াৎসেফ কৃত্রিম উপায়ে অংগারের আর একটি রূপ প্রস্তুত করেছেন। অংগারের এই নতুন রূপটির নামকরণ হয়েছে ‘কারবাইন’। বলা বাহুল্য, আমাদের পৃথিবীতে প্রকৃতির মধ্যে কারবাইন পাওয়া যায় না। হয়তো বা অন্য গ্রহে এর অস্তিত্ব থাকতে পারে। কারবাইন দেখতে কালো সূক্ষ্ম গুঁড়োর মতো। কারবাইনের গুণ অনেক। গ্র্যাফাইটের সংগে কারবাইন মিশিয়ে, যদি কার্বন তন্তু প্রস্তুত করা হয়, সেই তন্তু দার্ঢ্যের দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ইস্পাতকেও হার মানাবে। এই সংমিশ্রণের আপেক্ষিক ভার খুব বেশি নয়। এ কারণ জিনিস তৈরীর উপকরণ হিসাবে এটির ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক। এছাড়া, যন্ত্রশিল্পে অর্ধ-পরিবহক (সেমি-কণ্ডাকটর) হিসাবে কারবাইন ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা আছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকে অংগারের এই নতুন রূপের আবিষ্কার অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার ভিত্তি রচনা করেছে, যে শাখাকে আমরা বলতে পারি কার্বন যৌগের বিন্যাসগত রসায়ন।

চন্দ্রের আরও কাছে আসার অভিযান

অ্যাপোলো-৮এর রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক অভিযানের পর গত মার্চ মাসের গোড়ার দিকে অ্যাপোলো-৯-এর অভিযানও সাফল্যের সংগে সম্পাদিত হয়েছে। অ্যাপোলো-৯ অভিযানে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমাকালে চন্দ্রে অবতরণের উপযোগী ‘লুনার মডিউল’ বা চন্দ্রযান নিয়ে প্রথম পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় মূল মহাকাশযানের সংগে চন্দ্রযানের সম্মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্যে এই পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। এবার ১৮ মে অ্যাপোলো-১০এর অভিযানে তিনজন মহাকাশচারী নিয়ে মাত্র ১০ মাইল বা ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে চন্দ্রকে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং সেই সংগে চন্দ্রের কক্ষপথে চন্দ্রযানের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হবে। এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলে আগামী জুলাই মাসে পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রের বুকে পদার্পণের জন্যে যাত্রা করবে।

অ্যাপোলো-১০এর অভিযান যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই অনুযায়ী ‘স্যাটার্ণ-৫’ রকেট অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযানকে নিয়ে ১৮ মে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে। মূল মহাকাশযানের পেটের ভেতরেই থাকবে চন্দ্রযান বা লুনার মডিউল। ক্যাঙ্গারুর পেটের থলির মধ্যে যেমন তার বাচ্চা থাকে, অথবা বড়ো জাহাজের পাটাতনের ওপর যেমন বন্দরে নামবার ছোট নৌকো থাকে, সেরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে এ ক্ষেত্রে।

অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযান প্রথমে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রায় দেড় ঘণ্টা পরিক্রমা করবে এবং তারপর ভূপৃষ্ঠস্থ কেন্দ্রের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে চন্দ্র অভিমুখে মহাকাশের বুকে পাড়ি দেবে।

চন্দ্রের কক্ষপথে পৌঁছে মহাকাশযানটি ১১২ কিলোমিটার উঁচুতে থেকে বার বার প্রদক্ষিণ করবে। প্রায় ২৪ ঘণ্টা এভাবে প্রদক্ষিণ করার পর দুজন মহাকাশচারী স্ট্যাফোর্ড এবং কারম্যান তাঁদের প্রকোষ্ঠ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গপথে চন্দ্রযানে প্রবেশ করবেন। সেই যানে গিয়ে তাঁরা একটি সুইচ টিপে মহাকাশযান থেকে চন্দ্রযানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন। তখন দুটি যানই একসংগে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

তারপর দুজন মহাকাশচারী চন্দ্রযানের নিজস্ব ইঞ্জিন চালু করে অন্য এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চলে যাবেন। চন্দ্র থেকে তখন সর্বোচ্চ দূরত্ব হবে ১১২ কিলোমিটার এবং সর্বনিম্ন দূরত্ব হবে মাত্র ১৫ কিলোমিটার। সবাপেক্ষা কম দূরত্ব থেকে তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সম্ভাব্য স্থানটি ‘শান্ত সাগর’ বা ‘অশ্রু সাগর’ দেখে নেবেন। বৈমানিক যেমন ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি এসে বিমানবন্দরের রানওয়ে দেখে নেন, তেমনি ভাবে তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের স্থানটি ভালোভাবে দেখে নেবেন। তাঁরা অবশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবেন না।

শেষকালে আবার একটি ইঞ্জিন চালু করে মহাকাশচারীরা চন্দ্রযানটিকে মূল-যানের কাছাকাছি নিয়ে আসবেন। দুটি যানকে সম্মিলিত করে তাঁরা আবার কয়েক-

একটি মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশের সংখ্যা ২০০ বা তারও কম, কিন্তু অ্যাপোলো মহাকাশ যানের কমান্ড মডিউল বা মূল যানটিতে প্রায় ২০ লক্ষ যন্ত্রাংশ আছে। এর কাঠামো তৈরিতে যে সব অংশ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে তারগুলি এতে ব্যবহার করা হয়েছে তা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি।
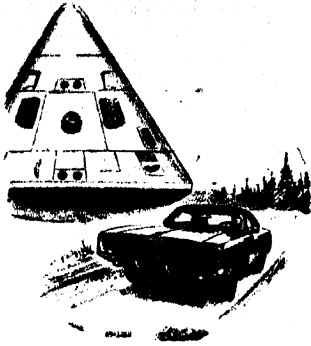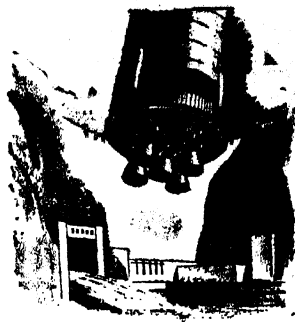
চন্দ্রাভিযানে যে স্যাটার্ণ-৫ রকেট ব্যবহার করা হচ্ছে তার দ্বিতীয় পর্যায়টিকে চালু করার জন্য যে পাঁচটি জে-২ ইঞ্জিন কাজ করবে তারা সম্মিলিতভাবে প্রায় ৯৫৪০ কোটি ওয়াটের সমান যা ৭২টি হুভার বাঁধের শক্তির সমান ধাক্কা সৃষ্টি করবে।

অ্যাপোলো মহাকাশযান সমেত স্যাটার্ণ ৫ রকেটের উচ্চতা ৩৬৩ ফুট। বেদী সমেত স্ট্যাচু অফ লিবার্টির চেয়েও এর উচ্চতা ৬০ ফুট বেশি। এর ওজন ৬০ লক্ষ পাউন্ডেরও বেশি—ঐ বিখ্যাত মূর্তিটির ওজনের ১৩ গুণ।

বার চন্দ্র প্রদক্ষিণ করবেন। তারপর আবার সুড়ঙ্গপথে ও মাগুড়ি দিয়ে মূল মহাকাশযানে ফিরে আসবেন। চন্দ্রযানটিকে তখন চন্দ্রের কক্ষপথে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সেটি বোধহয় অনন্তকাল ধরে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

এরপর তিনজন মহাকাশচারী চন্দ্রের অভিকর্ষ ছিন্ন করে আবার পৃথিবীর দিকে পাড়ি দেবেন এবং মহাকাশের বুক চিরে ভূপৃষ্ঠের পূর্বনির্ধারিত স্থানে অবতরণ করবেন।

অ্যাপোলো-১০র অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলে মহাকাশচারীদের প্রদত্ত বিবরণ বিচার করে আগামী মাসে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের উদ্দেশ্যে অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান যাত্রা করবে। প্রত্যাশিত সেই শুভদিনের জন্যে আমরা আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছি।

ভারতে প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ডঃ লিনেন

সম্প্রতি ভারতে ভেষজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্যে প্রখ্যাত জার্মান প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ ফিওডোর লিনেন ভারতে এসেছিলেন। ডঃ লিনেন ১৯৬৪ সালে শারীরতত্ত্ব ও ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

অধ্যাপক লিনেন জার্মানীর মিউনিক শহরে ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাণরসায়ন শাস্ত্রে তিনি দীক্ষিত হন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরিক ভীল্যান্ডের কাছে এবং তাঁরই অধীনে গবেষণা করে ১৯৩২ সালে ডকটরেট ডিগ্রী লাভ করেন। অধ্যাপক ভীল্যান্ডও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে ১৯২৭ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ডঃ লিনেন ১৯৪২ সালে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ সালে অধ্যাপকপদে উন্নীত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি মিউনিকের মাকস প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটের কোষ-রসায়ন বিভাগে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন।

অ্যাসেটিক অ্যাসিড বিপাক সম্পর্কিত সমস্যা বিষয়ে গবেষণার জন্যে ডঃ লিনেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। ডঃ ভীল্যান্ডের গবেষণাগারে কাজ করার সময়েই এই সমস্যাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আমরা জানি, সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর বিপাকক্রিয়ায় অ্যাসেটিক অ্যাসিড একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। দেহকোষে অগণিত পুষ্টিকর দ্রব্যের জৈবিক বিভাজনের মধ্যান্তরে এই অ্যাসিডটি উৎপন্ন হয় এবং তাদের অক্সিজেনসংযোগ ক্রিয়ার সূচনা করে দেয়। দেহের গুরুত্বপূর্ণ জটিল অণুর সৃষ্টিতে অন্যতম উপকরণ হিসাবে এই অ্যাসিডটি কাজ করে থাকে।

ডঃ লিনেন-এর গবেষণাকাজ প্রধানত জীবন্ত কোষে বিপাকক্রিয়ার রাসায়নিক দিক এবং বিপাকক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি সম্পর্কে। তিনি কো-এনজাইম-এ এবং সক্রিয় অ্যাসেটিক অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন নির্ধারণে সক্ষম হন। কো-এনজাইম-এর সঙ্গে অ্যাসেটিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে সক্রিয় অ্যাসেটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই সক্রিয় অ্যাসিড 'অ্যাসেটিল-কো-এ' নামে অভিহিত। এই অ্যাসিডটি জীবন্ত প্রাণীদেহে শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস।

ডঃ লিনেন-এর এই আবিষ্কারের ব্যবহারিক দিক কি, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা জানি, বর্তমানকালে মানুষের একটি মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে 'আরটিরিওস্ক্লেরোসিস' অর্থাৎ রক্তে অতিরিক্ত স্নেহজাতীয় পদার্থ বিশেষত কোলেস্টরল জমা হওয়ার ফলে যে রোগ হয়। অনেক চিকিৎসকের মতে, রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরিন জমা হওয়া থেকেই করোনারী থম্বোসিস ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এই মারাত্মক ব্যাধিগুলি প্রতিরোধে ডঃ লিনেন-এর গবেষণা অনেকখানি সহায়তা করতে পারে। এই প্রসঙ্গে ডঃ লিনেন নিজেই বলেছেন : 'যদি আমরা স্নেহজাতীয় পদার্থের উৎপাদন হ্রাস করার রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারে সমর্থ হই, তাহলে ভেষজের দ্বারা স্নেহজাতীয় অ্যাসিডের সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।'

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিভাষা ॥

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

জ্যোৎস্না, কথাটি খুব হৃদয়হরণ
যেই বলি, জ্যোৎস্নায় নদী—
শুনে লোকে জল দেয় উজ্জ্বল আঁখি।
এ-ও এক সরলীকরণ
দৃশ্যের আবেগে নিরবধি।

ফুলের উপমা পাই অতি অনায়াসে—
সৌরভশোভন স্মৃতিগুলি
খোলে বিবাহের মৃদু গোপন কণ্ঠুলি,
যেন হুহু লাল চৈত্র মাসে
কার পদশব্দ কাছে আসে।

রমণীর অঙ্গে রাখি দৃষ্টির সাহস,
নোনা ঢেউ, দোলায় চঞ্চল...
লাজুক উরসে উষ্ণ বাঁধভাঙা জল,
শৃঙ্গারের মানে না বয়স
শরীরে সহজ চলাচল।

একটি ঘোষণা ও আমি ॥

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ভালবাসার কোন ভবিষ্যৎ নেই—
বজ্রের মত এই ঘোষণা
মুদ্রিত অক্ষরগুলি থেকে লাফিয়ে পড়ল
আমার মাথায়
তারপর পুড়তে লাগল আমার চুল
চোখ কণ্ঠস্বর প্রাচীন হৃদয় ধ্রুবতারা।

তুমি কি নিয়তি
না কি সিদ্ধ অভিচারবিৎ
আমার বিনাশ চাও
সর্বনাশ?
ভালবাসা, সর্বনাশ
আমাকে গ্রহণ করো
সহমরণের জন্য আমিও প্রস্তুত।

কেয়াপাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলায় রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব। এমন সময় দুঃখী ঝিনুকের বাবা ভবতোষ এলেন। ভবতোষবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর দেখাশোনা নেই দীর্ঘ দু-মাস। অবনীমোহন বেশ কিছু জমি কিনবেন স্থির করলেন। ডাক পড়ল মজিদ মিঞার। চোখে তার খুশির রোশনাই। সামান্য দামেই জমির ব্যবস্থা করলো সে। হিরণ এল বহুদিন পরে। সুধার শিরায় শিরায় ভালোবাসার নেশা।

বিনু তখন একা। এল যুগল। জলা-বাঙলার প্রতীক। বলল : কাউঠা দ্যাখছেন ছুটোবাবু? অবাক হল বিনু। ছুটল। চোখের সামনেই জলজ-জীবটিকে টেটা দিয়ে গাঁথল যুগল। বাড়ি ফেরার পালা। পথে বেবাজিয়ার বহর। ঘুরে ঘুরে দেখল নৌকাগুলো। বেদেদের জীবন দিল বিনুর চোখেবিস্ময়ের রঙ। কলকাতা থেকে ফিরে এলেন অবনীমোহন। শোনালেন সেখানের হাল-চাল। ইউরোপের যুদ্ধ বাঙলা দেশের দিকে ছুটে আসছে। প্রথম ব্ল্যাক আউটের মহড়া হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে গোটা কলকাতা জুড়ে।]

(সাঁইত্রিশ)

সারা গায়ে দুদিনের ক্লান্তি মাখা। আর আছে ঘাম, ট্রেন-স্টিমারের ধুলো। অবনীমোহন একেবারে স্নানই সেরে নিলেন।

হেমনাথের ধৈর্য থাকছিল না। পুবের ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার চান হয়েছে অবনী?'

ওধারের কোন একটা ঘর থেকে অবনীমোহনের গলা ভেসে এল, 'হয়েছে।'

'তা হলে এখানে চলে এসো।'

'যাই মামাবাবু।'

অবনীমোহন যখন পুবের ঘরে এলেন তখন তাঁর গায়ে দুদিনের ধুলোবালি-ঘাম মাখা পোশাক নেই। তার বদলে পাট ভাঙা ধবধবে ধুতি আর হাফ সার্ট। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। গালে গলায় এবং ঘাড়ের কাছে এখনও ফোঁটা ফোঁটা জল। স্নানের পর ভাল করে মোছেন নি বোধহয়।

এবার হেমনাথ গলা তুলে স্ত্রীকে ডাকলেন, 'স্নেহ—স্নেহ—' এই বয়েসেও স্ত্রীকে তিনি নাম ধরে ডাকেন।

রান্নাঘরের দিক থেকে স্নেহলতা সাড়া দিলেন, 'কী বলছ?'

'অবনীর খাবার এ ঘরে দিয়ে যাও—'

'আচ্ছা।'

একটু পর স্নেহলতা এলেন। তাঁর এক হাতে কাঁসার থালা; তাতে ঘি-মাখানো চিঁড়ে ভাজা, নারকেল-কোরা আর দুটো চমচম সাজানো। আরেক হাতে চায়ের কাপ।

স্নেহলতা বললেন, 'এখন তোমাকে ভাত দিলাম না অবনী—'

অবনীমোহন বললেন, না-না, এখন ভাত খাব কি। সবে তো সন্ধ্যে। এখন চা-ই খাই।'

হেমনাথ অধীর হয়েই ছিলেন। বললেন, 'খেতে খেতে কলকাতার কথা বল। যুদ্ধের হালচাল কি রকম দেখে এলে, শোনাও—'

চায়ে চুমুক দিয়ে অবনীমোহন বললেন 'অবস্থা খুব খারাপ মামাবাবু। পরশুর আগের দিন রাত্তির থেকে কলকাতায় ব্ল্যাক আউট আর এয়ার-রেড প্রিকসানের মহড়া চলছে। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব।'

'এ কথা তো তুমি তখন বললে।'

'বলেছি নাকি?'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ ঘাড় কাত করলেন। সাগ্রহে শুধোলেন, তা মহড়াটা কি রকম হচ্ছে?

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'সন্ধ্যের পর কলকাতার সব আলো নিভিয়ে সাইরেন বাজানো হয়। শকুনের কান্নার মতন কেঁপে কেঁপে একটানা সুরে। তখন রাস্তায় কেউ থাকতে পারেন না। হয় কাছাকাছি কোন বাড়ি ভেতর ঢুকে যেতে হবে। নইলে পার্ক টার্কের ট্রেঞ্চে গিয়ে লুকোতে হবে। নইলে এ-আর-পি'র লোকেরা ধরে নিয়ে যাবে। এক ঘণ্টা কি দু ঘন্টা বাদে 'অল ক্লিয়ার' বাজলে আবার বাইরে বেরুনো চলবে।'

তক্তাপোষের একধারে বসে দম বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিল বিনু, চোখে পলক পড়ছিল না। রাত্রিবেলা সব আলো নিভে যাবার পর নির্জন রাস্তায় একটানা কান্নার মতন কোন সুর যদি বাজতে থাকে, কলকাতা শহর কতখানি ভীতিকর হয়ে উঠতে পারে? ভয়ের সে ছবিটা পুরোপুরি কল্পনা করতে পারল না বিনু, তবে তার গা ছম-ছম করতে লাগল।

হঠাৎ বিনু বলে উঠল, 'সাইরেন কী?'

অবনীমোহন তার দিকে ফিরে বললেন, 'শত্রুদের বিমান আক্রমণের আগে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে একরকম সুর বাজানো হয়, তাকে বলে সাইরেন।'

বিনুর কৌতূহল অসীম। সে আবার বলল, 'এ আর-পী কাকে বলে? ট্রেঞ্চ কী?'

অবনীমোহন বুঝিয়ে দিলেন।

একটু নীরবতা।

তারপর হেমনাথের দিকে আবার ঘুরে অবনীমোহন বললেন, 'আপনি শেষ করে কলকাতায় গিয়েছিলেন মামাবাবু?'

এক মুহূর্তও না ভেবে হেমনাথ বললেন, 'নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে—সেই যেবার দেশবন্ধু মারা গেলেন! উঃ কলকাতার সে শোকের দৃশ্য কোনদিন ভুলব না।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ হয়ে গেলেন হেমনাথ। তাঁর চোখের সামনে শোকাচ্ছন্ন বিহ্বল মহানগর যেন ছবির মতন ফুটে উঠেছে।

অবনীমোহন বললেন, 'সেই কলকাতাকে এখন চিনতেই পারবেন না। পার্ক আর ফাঁকা জায়গা যেখানে যতটুকু পেয়েছে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে খুঁড়ে সর্বনাশ করে রেখেছে। শুধু কি ট্রেঞ্চ, প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির সদরে ব্যাফল ওয়াল তোলা হয়েছে, তার সামনে বালির বস্তার স্তূপ। স্টেশনে, সিনেমা হাউসে, রাস্তায়-ঘাটে—যেখানে যাবেন শুধু গভর্ণমেন্টের পোস্টার।'

'কিসের পোস্টার?'

'নানা রকমের। যেমন 'গুজবে কান দেবেন না, গুজব রটাবেন না।' দলে দলে সেনাবাহিনীতে নাম লেখান।' 'দেশের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করলে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ইত্যাদি ইত্যাদি।'

হেমনাথকে বেশ চিন্তিত দেখাল। কপাল জুড়ে এলোমেলো গভীর রেখা ফুটতে লাগল তাঁর। ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার কী মনে হয় অবনী?'

'কী ব্যাপারে?' অবনীমোহন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'কলকাতায় বোমা-টোমা পড়তে পারে?'

'তার খুবই সম্ভাবনা।'

'কেমন করে বুঝলে?'

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'এই তো পরশুর আগের দিন এক সরকারী বড়কর্তা, মিস্টার সেমন্ড রেডিওতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ফার ইস্টে অবস্থা যেভাবে ঘোরালো হয়ে উঠছে, জাপান যেভাবে এগুচ্ছে তাতে কলকাতায় যে কোনদিন বিমান আক্রমণ ঘটতে পারে। নইলে—'

হেমনাথ শুধোলেন, 'নইলে কী?'

এত ব্ল্যাক-আউট, এত ট্রেঞ্চ-খোঁড়াখুঁড়ি আর এয়ার-রেড-প্রিকসানের ঘটা চলতে পারে!'

অন্যমনস্কের মতন হেমনাথ বললেন, 'তা তো বটেই।' একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে আবার বললেন, 'যুদ্ধ বাংলাদেশে এসে হাজির হলে সাংঘাতিক ব্যাপার। সব ছারখার হয়ে যাবে। ওয়ারের আফটার এফেক্ট যে কী, ভাবতেও শিউরে উঠছি।'

অবনীমোহন এবার আর কিছু বললেন না।

হেমনাথ বললেন, কলকাতায় আর কী দেখলে বল।'

'চারদিকে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে। যেখানে যাবেন সেখানেই মিলিটারি। রাস্তা-ঘাটে যত গাড়ি দেখবেন তার বেশির ভাগই মিলিটারির—হেভি ট্রাক আর জিপের জন্যে হাঁটাই মুশকিল। মনে হয়, সমস্ত শহরটা মিলিটারির হাতে চলে গেছে।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল অবনী-মোহনের। 'আরেকটা ব্যাপার চোখে পড়ল মামাবাবু—'

উৎসুক সুরে হেমনাথ জানতে চাইলেন, 'কী?'

'ব্যাঙের ছাতার মতন অলিতে-গলিতে ব্যাঙ্ক গজাচ্ছে। পুজোর আগে যখন এখানে এলাম তখনও এত ব্যাঙ্ক দেখিনি। আমার তো ধারনা, রোজ একটা করে ব্যাঙ্ক জন্মাচ্ছে।'

'যুদ্ধ বেধেছে ইনফ্লেসন আরম্ভ হয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক তো গজাবেই। দেখবে, টাকা এখন হাওয়ায় উড়তে থাকবে।'

'থাকবে কি, উড়তে শুরু করে দিয়েছে।'

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হেমনাথ তাড়া লাগালেন, 'এবার খবর-কাগজ বার কর অবনী—'

হিন্দুস্থানী কুলিরা বারান্দায় বাক্স-টাকস মালপত্তর নামিয়ে রেখে গিয়েছিল। অবনীমোহন বাইরে গিয়ে স্যুটকেশ খুলে মাসখানেকের খবর-কাগজ বার করলেন।

কাগজগুলো হাতে পাওয়া মাত্র হেমনাথ ঝুঁকে পড়লেন। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন, 'দোসরা নভেম্বর। গ্রীসে ইতালীর বাহিনীর অগ্রগতি।' বৃটেন কর্তৃক টিরানায় বোমাবর্ষণ। তুরস্ক বর্তমানে যুদ্ধ বর্জন করিয়া চলিবে—প্রেসিডেন্ট ইনেনুর ঘোষণা।'

'তেসরা নভেম্বর। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মস্থান কেনসিংটন প্রাসাদ বোমাবিধ্বস্ত। জার্মাণীর উপর প্রবল আক্রমণ—রাজকীয় বিমান বহরের দাবী। জাপান হইতে আমেরিকানদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। রাষ্ট্র-পতি আজাদ কর্তৃক কংগ্রেসের জরুরি অধিবেশন আহ্বান। ভারতরক্ষা আইনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গ্রেপ্তার, কারা প্রাচীরের অন্তরালে বিচার।'

'চৌঠা নভেম্বর। গ্রীসের সাহায্যার্থে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি। জাপান কর্তৃক শত্রুপক্ষের নৌবহর বাজেয়াপ্ত। জার্মাণ-অধিকৃত দেশগুলিতে পোলান্ড, ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া, হলান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি— নাৎসীদের নিদারুণ অত্যাচার।'

'পাঁচই নভেম্বর। দারদানেলেস সমস্যার সমাধান, জার্মাণীর মধ্যস্থতা। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ইটালীর সংঘর্ষের সম্ভাবনা তিরোহিত। ডানিয়ুব সম্মেলন। বৃটিশ নোটের উত্তরে সোভিয়েট বক্তব্য এইরূপ, 'আমরা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিব।' মলোটভের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্লিন পরিদর্শন। দীর্ঘ ছাপ্পান্ন দিন পর লন্ডনবাসীদের একটি বোমাবর্ষণহীন রাত্রি অতিবাহিত।'

'৬ই নভেম্বর। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্প্রসারণ; ভারতবর্ষের যুদ্ধকালীন পরি-কল্পনা। সমর-প্রস্তুতির প্রাথমিক ব্যয় তেত্রিশ কোটি টাকা। পরবর্তী প্রতি বছরে ব্যয় ষোল কোটি টাকা। অর্থের জন্য নতুন কর বসানো হইবে।'

৭ই নভেম্বর। রুজভেল্ট তৃতীয়বারের জন্য আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। পশ্চিমের মরু-রণাঙ্গনে বৃটিশ ট্যাঙ্কবাহিনী।'

'৮ই নভেম্বর। কালিনিনের সতর্কবাণী, রাশিয়া যুদ্ধ বর্জন করিয়া চলিবে। তবে কেহ তাহার সীমানা অতিক্রম করিতে চাহিলে চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে।'

৯ই নভেম্বর। আয়ারল্যান্ড নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলিবে—ডি ভ্যালেরার ঘোষণা। টাওয়ার অফ লন্ডন বোমাবিধ্বস্ত। সোভিয়েট বাহিনীর প্রস্তুতি; সারা দেশে আপৎকালীন অবস্থা। ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভা। রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃপালনী, গান্ধীজী, পন্থ, রাজা গোপালাচারি, প্রফুল্ল ঘোষ, শংকর রাও দেও ইত্যাদি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি।'

'১০ই নভেম্বর। ফুয়েরার কর্তৃক সর্ব-প্রকার সমর-সম্ভার দিয়া মুসোলিনিকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত। পরলোকে চেম্বারলেন। মিউনিক প্যাক্টের জনক, ইতিহাসে যাহাকে 'গৌরবময় ব্যর্থতা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তিনি আর নাই। নর্থের পর এমন দুর্বল প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ সাম্রাজ্যে আর কখনও দেখা যায় নাই।

১১ই নভেম্বর। আফ্রিকার মরু অঞ্চলে যুদ্ধ সম্প্রসারিত। গাবান রক্ষার্থে ফরাসী সিদ্ধান্ত। জেনারেল দা গলের দৃঢ়তা।'

১২ই নভেম্বর। হিটলার কর্তৃক বার্লিনে মলোটভের সম্বর্ধনা। রুদ্ধদ্বার কক্ষে দীর্ঘ আলোচনার সময় রিবেনট্রপের উপস্থিতি। ফুয়েরার কর্তৃক অক্ষশক্তির প্রতি সোভিয়েট সাহায্য প্রার্থনা। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি এ ব্যাপারে নীরব। লন্ডনে জল্পনা-কল্পনা। পূর্ব রণাঙ্গনে ভয়াবহ জাপানী আক্রমণ। হাইনান ও ফরমোসায় বিপুল সৈন্য সমাবেশ। সায়গন, ফরাসী, ইন্দোচীন ও কামরন উপসাগরে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা। সিঙ্গাপুরে চাঞ্চল্য।'

১৭ই নভেম্বর। দীর্ঘ বিরতির পর লন্ডনে প্রবলতম বোমাবর্ষণ, প্রচন্ড নৈশ আক্রমণ। লন্ডনবাসীদের ভূগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ।

'১৮ই নভেম্বর। সর্দার প্যাটেল কারা-রুদ্ধ। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা। ভুলাভাই দেশাই কর্তৃক সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত।'

হেমনাথ পড়ে যেতে লাগলেন।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল বিনু। কোথায় টিরানা, কোথায় আড্রিয়াটিক সাগর আর এজিয়ান সাগর, কোথায় দারদানেলেস আর ডানয়ুব, এবং ইন্দোচীন—ভূগোলের কোন প্রান্তে এই নামগুলো ছড়িয়ে আছে, কে বলবে। বিনুর কল্পনা অতদূর পৌঁছয় না। কালিনিন কি রিবেনট্রফ, ডি ভ্যালেরা কিংবা টিমোশেঙ্কো, গোয়েবলস অথবা ইনেনু—এই সব নাম যাঁদের, তাঁদের চেহারা-গুলো কতখানি ভয়াবহ তাই বা কে জানে।

কাগজ পড়া শেষ করে হেমনাথ মুখ তুললেন। অবনীমোহনের উদ্দেশে বললেন, 'অবস্থা তা হলে রীতিমত ঘোরালোই হয়ে উঠেছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন।

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় রাশিয়া, এই যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারবে?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

খানিক চিন্তা করে হেমনাথ বললেন, 'চারদিকে যে রকম বেড়া আগুন তাতে রাশিয়া কতদিন গা বাঁচিয়ে থাকতে পারবে, সেইটেই হচ্ছে কথা। টার্কি বা আয়ারল্যান্ড নিউট্রাল থাকুক বা যুদ্ধে নামুক, তার গুরুত্ব তেমন নয়। কিন্তু রাশিয়ার মতন এত বড় দেশ যদি যুদ্ধে নামে, ওয়ারের চেহারাই যাবে বদলে।'

সংশয়ের সুরে অবনীমোহন বললেন, 'এই তো সেদিন রাশিয়ার রেভোলিউশান হয়ে গেল, এর মধ্যে যুদ্ধ করার মতন শক্তি কি ওদের হয়েছে!'

'একটা ব্যাপার তুমি বোধহয় লক্ষ্য কর নি।'

'বৃটেন আর জার্মানি—দুই দেশই চাইছে, রাশিয়া নিউট্রাল থাক। এর অর্থ কী।'

অবনীমোহন উৎসুক চোখে তাকালেন।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'নিশ্চয়ই তার শক্তি আছে। যে পক্ষে রাশিয়া যাবে তার পাল্লা ভারী হবে। শত্রুর পাল্লা ভারী হোক, কে-ই বা তা চায়।' একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা কথা তোমার খেয়াল নেই অবনী—'

'কী?'

'রেভোলিউশনের পর রাশিয়ার খবর দুনিয়ার লোক বিশেষ কিছুই জানে না। চারিদিকে আয়রন কারটেন ফেলে ভেতরে ভেতরে ওরা কতদূর এগিয়ে গেছে, কে বলবে। আমার তো ধারনা, ওরা খুবই শক্তি-ধর হয়ে উঠেছে।'

তিরিশ
উনি
আনন্দের সঙ্গে
পার্লে বিস্কুট খাচ্ছেন
30 বছর ধরে...
...এখন অবশ্যি উনি নানা রকমারি বেছে নিতে পারেন—আর ওঁর পরিবারেও বিস্কুট খাবার লোক বেড়ে উঠেছে। উনি খান জেফস্, ওরলে, চীজলিংস্, স্পিন-এইচ—ভারতের প্রথম মজাদার স্বাদের বিস্কুট—আর বিশেষ ক'রে গ্লুকো ও মোনাকো-ভারতের সবচেয়ে বেশী কাটতির মিষ্টি ও নোন্তা বিস্কুট।
কিন্তু ওঁর মতটাকেই আপনি মেনে নেবেন না যেন—নিজেই সবগুলি যাচাই ক'রে দেখুন। দেখুন কোন্ পার্লে বিস্কুট আপনার সবচাইতে ভাল লাগে। এই সব বিস্কুটই চমৎকারভাবে তৈরী হয়েছে ভারতের অন্যতম অতি আধুনিক বিস্কুট ফ্যাক্টরীতে।
পার্লে
বিস্কুট
আজই এক প্যাকেট পার্লে কিনে নিন!
গ্লুকো
MONACO
মোনাকো
ওরলে
স্পিন-এইচ
জেফস্
CHEESLINGS
চীজলিংস্
everest/565 a/PP bn

অবনীমোহন কিছু বললেন না, ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। হেমনাথের কথাগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গত, তার বিপক্ষে বলবার মতো কিছুই নেই।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর হেমনাথই আবার শুরু করলেন, 'আচ্ছা, এই যুদ্ধে বৃটেনের অবস্থা তোমার কী মনে হয়?'

'খুব সঙ্গীন।'

'আমারও তাই মনে হয়। ব্যাটারা দারুণ ঠ্যাঙানি খাচ্ছে ; হিটলার ওদের হাড়গোড় একেবারে ভেঙে দিচ্ছে। রয়্যাল এয়ার ফোর্স বলছে আমরা টিরানায় বোমা ফেলেছি, বার্লিন উড়িয়ে দিয়ে এসেছি—সব মিথ্যে, সব বাজে, ধাপ্পা দিয়ে দুনিয়ার কাছে মুখ রাখতে চাইছে আর কি। কিন্তু লোকে যা বুঝবার ঠিকই বুঝছে।'

দেখা গেল, রাশিয়ার ব্যাপারে কিছু সংশয় থাকলেও বৃটেন সম্বন্ধে অবনীমোহন আর হেমনাথ সম্পূর্ণ একমত।

চিন্তিত গম্ভীর মুখে হেমনাথ বলতে লাগলেন, ওয়ার বেধেছে তা ঠেকাবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। তবে—'

'তবে কী?'

'ওয়ারটা যদি ইওরোপেই আটকে থাকত, মন্দের ভাল। নিজেরা কাটাকাটি করে মরত, আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতাম। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। আগুন একেবারে দরজার সামনে এসে পড়েছে। যেভাবে জাপানীরা এগুচ্ছে তাতে ইন্ডিয়ায় পৌঁছুতে খুব বেশিদিন লাগবে না।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এদেশে খুব দুর্দিন আসছে অবনী, খুবই দুর্দিন—' একই কথা দুবার করে উচ্চারণ করলেন হেমনাথ।

অবনীমোহন বললেন, 'তা বুঝতে পারছি। এদিকে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কংগ্রেস নেতাদের একে একে জেলে নিয়ে পুরছে, বিচারের নামে 'ফার্স' করছে। 'ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুল' একখানা করেছে বটে।'

'যা বলেছ।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ওয়ারের খরচ চালাবার জন্যে আবার ট্যাক্স বসাবে। হারামজাদারা ইন্ডিয়াকে এবার ঝাঁঝরা করে ছাড়বে। সাধারণ মানুষের কী দুরবস্থা হয়, এবার দেখো।'

অবনীমোহন এবং হেমনাথ আসন্ন দুর্দিনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন যেন।

বিনু প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবু রাশিয়া-জাপান-হিটলার, চার্চিল, স্টালিন এবং মহাযুদ্ধ—এই শব্দগুলির মধ্যে এমন তীব্র প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে যে অন্য দিকে চোখ ফেরাতে পারছিল না সে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে হেমনাথের আলোচনা শুনে যাচ্ছিল।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার চলছিল। হেমনাথের পড়া খবর কাগজগুলো নিয়ে সুধা-সুনীতি তক্তপোষের আরেক ধারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। বিনুর কানে এখন তাদের ফিসফিসানি ভেসে আসছে।

সুনীতি বলছে, 'দ্যাখ, দ্যাখ বিজলীতে 'পথ ভুলে' আরম্ভ হয়েছে। প্রতিমা, ডি-জি, পাম্না, রণজিৎ রায় অভিনয় করছে। ইস্, কলকাতায় থাকলে দেখতে পেতাম।'

সুধা বলল, 'উত্তরায় ন সপ্তাহ ধরে 'শাপমুক্তি' চলছে। আসবার সময় দেখে এলাম না। আর কোনদিন দেখাই হবে না।'

ধীরে ধীরে ঘুরে বসল বিনু। দেখল, দুই বোন সিনেমার পাতায় মুখ গুঁজে আছে। যুদ্ধ নিয়ে এত যে আলোচনা চলছে, সেদিকে তাদের এতটুকু লক্ষ্য নেই। তাদের দেখে মনেই হয় না, পৃথিবীতে আদৌ কোন সমস্যা আছে, দুই গোলার্ধ ঘিরে একখানা ভয়াবহ আগুনের চাকা ঘুরে চলেছে।

সুনীতি বলল, 'ভবানীপুরে আমাদের বাড়ির কাছে 'রূপালী' সিনেমা। সেখানে 'হাঞ্চব্যাক অফ নটরদাম' চলছে। নাম ভূমিকায় চার্লস লটন।'

সুধা বলল, 'চার্লস লটনের অ্যাক্টিং আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমারও।'

'দ্যাখ সুধা, কলকাতায় কত ছবি চলছে। প্যারাডাইসে 'বন্ধন', মধু বোস সাধনা বোসের 'রাজনর্তকী'। কিছুই দেখতে পারলাম না।'

কলকাতায় মোহময় চিত্রজগৎ দুই বোনকে যেন হাতছানি দিয়ে চলেছে। নতুন নতুন কত বিচিত্র মনোহর ছবির মেলা বসেছে সেখানে, অথচ কিছুই তাদের দেখা হল না। সুধা-সুনীতির কাছে এর চাইতে অপূরণীয় ক্ষতি আর কিছু নেই।

অবনীমোহন কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন। খবর পেয়েই মজিদ মিঞা কেতুগঞ্জ থেকে ছুটে এল। বলল, 'তাইলে আর দেরি করনের কাম নাই মিতা। আপনার জমিন বুইঝা লন। কবে রেজিস্টারি করবেন, কন?'

হেমনাথ কাছেই ছিলেন। হেসে ফেললেন 'জমিটা অবনীকে না দেওয়া পর্যন্ত তোর চোখে ঘুম আসছে না!'

'তা যা কইছেন।' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'কুনো ব্যাপার একবার মাথার ভিতরে ঢুকলে যতক্ষণ সেইটা না হইতে আছে, আমার সোয়াস্তি নাই। হে কথা যাউক। আর কয়দিনের মইধ্যে ধান কাটা আরম্ভ হইবো। তখন আর উয়াস নিশ্বাস ফালানের সময় পামু না। ধানকাটার আগেই আমি জমিন রেজিস্টারি করতে চাই।'

স্নেহলতাও এ আসরে আছেন। তিনি বললেন, 'সেই ভাল। ধানকাটা শেষ হতে হতে পৌষ মাস পড়ে যাবে। পৌষ মাসে শুভ কাজ করতে হবে না। কেনাকাটা যা করবার এই অঘ্রানেই একটা ভাল দিনটিন দেখে সেরে ফেলা উচিত।'

তখুনি একটা পঞ্জিকা এসে পড়ল। পাতা উল্টে উল্টে সপ্তাখানেক একটা শুভ-দিনও ঠিক করে ফেললেন হেমনাথ।

দিন তারিখ স্থির হবার পর মজিদ মিঞা বলল, 'এইর ভিতর একখান কথা আছে কিলাম মিতা—'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কী কথা?'

'যে জমিন আপনেরে দিমু হেয়াতে (তাতে) ধান আছে। এই সনের ধান কিন্তুক আপনে পাইবেন না, কারণটা হইল বর্গাদারের ঐ জমিন চাষ করতে দিছিলাম। আমি ছাইড়া দিলেও বর্গাদার তো ছাড়ব না। ধানউইঠা গেলে জমিনের দখল পাইবেন।'

অবনীমোহন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য, ও ধান আমি নেব কেন? যারা খেটেছে ও ফসল তাদেরই প্রাপ্য।'

'তাইলে কথা পাকা হইয়া গেল।'

জমি কেনার ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবার পর একদিন দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে সুধা-সুনীতি আর বিনু পুকুরঘাটে আঁচাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে উঁচু গলার ডাক ভেসে এল, 'হ্যামকত্তা আছেন, হ্যামকত্তা—'

বিনুরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু পর রাস্তার দিক থেকে বাগানের ভেতর যে এসে পড়ল তার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো। শরীরের কোথাও বিন্দুমাত্র মেদ নেই। ছোটখাট মানুষটি। চোখের দৃষ্টি কিছুটা অন্যমনস্ক, অনেকখানি উদাস। পোশাক-আশাক আর কাঁধের ঝোলাখানা দেখে টের পাওয়া গেল, সে ডাক-পিওন।

বিনুদের দেখে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনেরা?'

লোকটা কী জানতে চায়, বুঝতে পেরেছিল সুনীতি। নিজেদের পরিচয় দিল সে, হেমনাথের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী, তাও বলল।

লোকটার চোখ-মুখ আলো হয়ে উঠল, 'তিন মাস আমি এই বাড়িতে আসি নাই, তাই জানতে পারি নাই। আগে আইলে আপনাগো লগে চিনা পরিচয় হইত। আমার নামখান কইয়া রাখি—নিবারণ ভুঁইমালী। আমি ডাক-পিওন। হে যাউক, একখান কথা জিগাই—'

'কী?'

'আপনাগো ভিতর কেউ সুনীতিরাণী বসু আছে?'

সুনীতি যেন চমকে উঠল, 'কেন?'

নিবারণ বলল, 'একখান চিঠি আইছে—'

কাঁপা গলায় সুনীতি এবার বলল, 'দিন, আমার নাম সুনীতি—'

ঝোলার ভেতর থেকে একটা খাম বার করল নিবারণ। সুনীতির ডান হাত এঁটো, ভাত-টাত মাখানো রয়েছে। কাজেই বাঁ-হাতে খামটা নিল সুনীতি, খামের ওপরকার নাম-ঠিকানায় চোখ পড়তেই তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল।

বিনু পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুনীতির মুখের দ্রুত রং বদল দেখতে দেখতে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ভেবেই পেল না, সুনীতিকে কে চিঠি লিখতে পারে।

(ক্রমশ)

সাফল্য অর্জনে আপনার অধিকার কতটুকু ?

আমরা সকলেই তো বলি, সাফল্য অর্জন করবো, সফল হতে চাই—কিন্তু তার অধিকার সামর্থ্য আমাদের কতটুকু আছে, তা কি ভাল করে ভেবে দেখি ?

বোধহয় ওকথা ভাবি না বলেই যখনই বেকায়দায় পড়ি, নিজের দুর্ভাগ্যকে দোষ দিই, নয়তো সুযোগ-সুবিধার অভাবের অজুহাত খুঁজি—আসলে হয়তো দোষটা লুকিয়ে থাকে আমাদের নিজেদের মনোভঙ্গীর মধ্যে, আমাদের কাজের ধারা কিংবা লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার ধরন-ধারনের কোনো ত্রুটির মাঝে।

এ বিষয়ে যদি আপনি নিজেকে যাচাই করে দেখতে চান, তাহলে নীচের টেস্ট অনুযায়ী প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করুন। কেবল 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে যান প্রত্যেকটি প্রশ্নের। সব শেষে দেখবেন কতো পয়েন্ট পেলেন।

১। আপনি বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে কড়া সমালোচনা নির্দ্বেদ শুনতে পারেন, একটুও ক্ষেপে না গিয়ে ?

২। আপনি কি এমন বুদ্ধিমান যে, কখন মুখটি বুজে থাকতে হবে, কখন কোথায় ঠিক কোন্ কথাটি বলতে হবে, তা বোঝেন ?

৩। ঝোঁকের মাথায় যে কাজ করে বসলে বোকামির পরিচয় দেবে, সে-কাজে বিরত হওয়ার মতো আত্মনিয়ন্ত্রণ আপনার আছে বলে মনে করেন কি ?

৪। আপনি কি সহজে স্বচ্ছন্দে যে-কোনো পরিবেশে নিজেকে মিশিয়ে নিতে পারেন ?

৫। আপনি কি সব সময়ে মানুষের কোনো কাজে লাগবার জন্যে এবং ঝক্কি পোয়াবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকেন ?

৬। সময় ধরে কাজ-কর্ম করার ব্যাপারে আপনি কি খুব সচেতন, বেশ পাংচুয়াল ?

৭। আপনাকে কি এতোখানি বিশ্বাস-নির্ভর করে কোনো কাজের ভার দেওয়া চলে যে-কাজের কোনো তদারকি না করলেও আপনি ঠিকমতো করে রাখবেন ?

৮। আপনার কাজ-কর্ম যাই করেন, তাতে কি আপনি সত্যি সত্যি বেশ গর্ব অনুভব করেন ?

৯। সব জিনিস আপনি কি খুঁটিয়ে বিচার করে নেন এবং ঠিক আপনার যা দরকার, তা পেয়েছেন বা জেনেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নেন ?

১০। কোনো বিষয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হলে আপনি কি ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন এবং অন্য সকলে সব ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় নিলেও আপনি ধীর-স্থির হয়ে বোঝাতে পারেন ?

১১। কোনো নতুন অবস্থা-পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আপনি কি খুব তাড়াতাড়ি সেটি বুঝতে পারেন এবং সেই মতো নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন ?

১২। যে-কাজ বেশ শক্ত, একঘেয়ে, কিংবা অস্বস্তিকর, সে-কাজ স্থগিত রেখে দেবার মনোভাব জাগলে তা দমন করতে আপনি পারেন কি ?

১৩। কোনো বিষয়ে সব ভাল-মন্দ দিক আপনি যুক্তি দিয়ে সুন্দরভাবে যাচাই করে কাজের মতো একটা সিদ্ধান্ত বাতলাতে পারেন কি ?

১৪। কোনো নতুন সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য আপনি কি সদাজাগ্রত মন নিয়ে সব দিকে লক্ষ্য রাখেন, এবং ঠিক তেমনি সজীব মন নিয়েই সেই সব সুযোগকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাবার জন্যে লেগে থাকেন ?

১৫। দায়িত্ব কাঁধে নেবার জন্যে আপনি কি আগ্রহবোধ করেন এবং প্রস্তুত হয়ে আছেন ?

১৬। বলতে পারেন, আপনার নিজের ওপর এবং নিজের সামর্থ্যের ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখেন কি ?

১৭। লোকজনের সঙ্গে আপনি কি বেশ স্বচ্ছন্দে এবং মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে কথা বলতে পারেন ?

১৮। লোকের অপছন্দ, ঈর্ষা, প্রত্যাখ্যান—এসব যখন আপনি শোনেন, তখন বেশ বিচলিত বা মনমরা না হয়ে পড়ে, সহ্য করে থাকতে পারেন কি ?

১৯। আপনার সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার একটি লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেন কি ?

২০। যখন নানা বাধা-বিঘ্ন আপনার কাজের সামনে এসে পড়তে থাকে,, তখন কি আপনি উদ্যম ও সাহস বজায় রেখে চলতে পারেন ?

প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ' জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন। ৭০ পয়েন্ট পেলে খুব ভালো; ৬০ থেকে ৭০ হলে বেশ সন্তোষজনক এবং ৫০ থেকে ৬০ পেলে বলবো ভালোই। তবে ৪০ থেকে ৫০ যদি পান, নিতান্ত মন্দ নয়। ৪০ পয়েন্টের কম পেলে ভালো নয়।

এই মনোপ্রশ্নচর্চাটি হাতের কাছে রেখে দিন। ছ'মাস অন্তর একবার করে নিজেকে টেস্ট করে দেখবেন, সাফল্য অর্জনের অধিকার বাড়িয়ে তুলতে পেরেছেন কিনা।

হ্যাঁ, সাফল্য অর্জনের অধিকার-সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলা যায়। 'হায় কপাল' বলে গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে সাফল্য আসে না। দৈব মেনে চললে আপনা থেকে সফলতা লাভ করা যায় না। 'বশিষ্ঠ মহারামায়ণে' আছে, বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, দৈব কিছু নয়, পুরুষকারই সব। নিজের সামর্থ্যকে বিচারসহকারে কাজে লাগাতে পারলেই সফলতা আসে। সেটা যে পারে না, এবং কেন পারলো না, সেটা বুঝতে চেষ্টা করে না। সে-ই মনে করে অলৌকিক দৈববশেই বুঝি সফলতা এলো না।

আপনার সাফল্য যদি মনের মতো না হয়, তাহলে বিচারসহ নিজেকে শুদ্ধ করে তোলার পথ ওপরের মনোপ্রশ্নচর্চাটিতে পাবেন। অবশ্যই পাবেন।

রমেশ দত্তের
রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (দশ)
চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন

প্রদর্শনী পরিক্রমা

ভারত-চেক মৈত্রী সংঘের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে গত ২৬ এপ্রিল থেকে ৪ মে অবধি আধুনিক চেকোশ্লোভাক গ্রাফিকসের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হল।

চেক গ্রাফিকশিল্পের আধুনিক রূপ এনে দেবার মূলে আছেন প্রধানত তিনজন শিল্পী—মিকুলাস গালান্দা ১৮৯৭-১৯৩৪), লুডোভিট ফুল্লা (১৯০২) এবং কোলোমান সোকোল (১৯০২)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে শিল্প নিয়ে যতরকম পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে তার সঙ্গে চেক শিল্পের যোগসাধনের কাজে প্রধানত এঁদের এবং এঁদের শিষ্যবর্গের প্রচেষ্টা অনেকখানি। বাইরের প্রভাব ছাড়াও চেক লোকশিল্পের প্রভাব এই গ্রাফিক প্রদর্শনীতে অনেকখানি দেখা গেল। প্রায় ১৪০ খানি ছবির মধ্যে কাঠখোদাইয়ের সংখ্যাই বেশী এবং শুধু শাদা কালোর কাজের মধ্যে কিছুটা এক্সপ্রেশানিস্টিক প্রভাবই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। আধুনিক শিল্পকলার সব আন্দোলনের সংস্পর্শে এলেও চেক শিল্পপ্রদর্শনীতে বিমূর্ত শিল্পরীতির নিদর্শন চোখে পড়ল না। বরং ইলাস্ট্রেশন ঘেঁষা কাজের সংখ্যাই যেন বেশী মনে হল। তার মধ্যে আবার কয়েকটিতে এক ধরনের নাটকীয় আবেদন সৃষ্টি করা হয়েছে। অত্যন্ত জ্যামিতিক ঘেঁষা কম্পোজিশানেও এর অভাব নেই, যেমন ডুবের 'গেম' বা 'অনইয়ুজুয়েল নাইট' ছবিতে। অন্যান্য ছবির মধ্যে অ্যানড্রাসির 'উইন্টার ইন ব্রাটিশ্লাভা' নাজ-এর 'ক্রোড' বা মুসার 'জারালো পার্বত্য দৃশ্য'। জুলিয়াস জাবের 'উইপিং ফর পার্টিসানস' বা 'রেস্ট' ছবিতে সূক্ষ্ম শাদা রেখার প্রয়োগের মুন্সীয়ানায় দুখানি সুন্দর ইলাস্ট্রেশন তৈরী হয়েছে। রাপেনসবার গোরোভার এচিং 'শো ইন ব্ল্যাক' বা 'হ্যাজার্ডস প্লেয়ার্সের' মধ্যে সুররিয়ালিস্টিক রীতির প্রভাব অধিক থাকলেও কোথায় যেন একটা সামাজিক সমস্যার সমালোচনার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে হয়। জে হারিনার 'বিমপ্লকা ইন দি ইভনিং' রঙীন কাঠখোদাইয়ের একটি অতিসুন্দর নিদর্শন এবং বালাজ এর বৃহৎ প্যানেল 'রিটার্ন অব দি সান' লোকশিল্পের প্রভাবে প্রতীকধর্মী ছবির চমৎকার নমুনা। ফুল্লার রঙীন গ্রাফিকসের মধ্যে কালো জমির ওপর সাদা ও অন্যান্য বর্ণের রেখায় আঁকা কতকটা হাল্কা আনন্দের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ দেখা যায়। এছাড়া উর্বরিক, স্টুবনা এবং পেত্রাসের কয়েকটি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হল।

চেক গ্রাফিক শিল্প

২৮ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে অরুণ বোসের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অরুণ বোস বর্তমানে আমেরিকায় শিল্পচর্চায় নিযুক্ত আছেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে দুটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমান প্রদর্শনীর প্রায় ত্রিশখানির মত পেন্টিং ড্রয়িং এবং গ্রাফিকসের মধ্যে শেষোক্ত ছবির সংখ্যাই বেশী। ছবিগুলি সবই ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যেসব গ্রাফিকস পাঠানো হয়েছিল তারও কিছু কিছু নিদর্শন রাখা হয়েছে। কয়েকটি ডেকরেটিভ কাজ সুদৃশ্য হয়েছিল।

●

বারাণসীর শিল্পী হরিলাল বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দির, গীর্জা ও ইমামবাড়ার ছবি নিয়ে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে একটি প্রদর্শনী করলেন। জলরঙ, পেন্সিল ও পেন অ্যান্ড ইংকে আঁকা এই ষোলখানি বড় মাপের ছবি বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। জলরঙের ছবির মধ্যে দক্ষিণেশ্বর, হংসেশ্বরী, মায়াপুর, ব্যান্ডেল চার্চ, কৃষ্ণরায় জীউ প্রভৃতি মন্দিরগুলির ছবি পরিচ্ছন্ন রঙ ও তুলির টানে বেশ উজ্জ্বল চেহারা নিয়েছিল। হুগলীর ইমামবাড়ার পেন্সিল ড্রয়িংটি বেশ নিখুঁত কাজ।

●

মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পশিক্ষক রবার্ট বাসাবার্গার ফুলব্রাইট গ্রান্টে ভারতের লোকশিল্প নিয়ে গবেষণা করতে আসেন। ১৯৬১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কয়েকবার তিনি এদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং তাঁর অনুসন্ধানের ফল হিসেবে 'এভরি ডে আর্ট ইন ইন্ডিয়া' বইটি রসিকমহলে সমাদৃত হয়েছে। চিত্রবিদ্যা অনুশীলন ছাড়া অধ্যাপক বাসাবার্গার মৃৎশিল্প ও সেরামিকসে পারদর্শী এবং তাঁর গবেষণা ও শিল্পসৃষ্টি এইদিকেই অধিক পরিমাণে ফলপ্রসূ হয়েছে। তাঁর চিত্র ও সেরামিকসের একটি প্রদর্শনী গত ২ থেকে ৮ মে পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪০খানি ছবি ও সেরামিকসের নিদর্শনে সজ্জিত প্রদর্শনীটি কিছুটা

ফ্লাইট (সেরামিকস)
শিল্পী : রবার্ট বাসাবাগার

অনাবশ্যকরূপে ভারাক্রান্ত বলে মনে হয়। ছবিগুলি অধিকাংশই কতকটা যাকে বলে কনভেনশনাল। প্যাস্টেল, পেন্সিল, তেলরঙ, জলরঙ এবং অ্যাক্রাইলিকে আঁকা ছবিগুলির অধিকাংশই ভারতের বিভিন্ন স্থানের মানুষ, শহর ও নিসর্গ দৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে আঁকা। এরমধ্যে একটি স্টিল লাইফ ও কয়েকটি রাজস্থানের দৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ ছিল সেরামিকস ভাস্কর্য পাত্র ও চিত্রিত টালি। ভাস্কর্যগুলি বেশির ভাগই মাপে ছোট—কতকগুলি মিনিয়েচার পুতুলের মত এবং বেশ কয়েকটি কুমোরের চাকে ফেলে তৈরী। শিল্পীর কাজে বিভিন্ন দেশের আদিম শিল্পকলা এবং লোকশিল্পের প্রভাব অনেকখানি দেখা যায়। এর ভেতর প্রাচীন ক্রেটান, প্রি-কলাম্বিয়ান, টটেমিক এবং পুরোনো চীন জাপানের ভাস্কর্যের ছাপও অনুসন্ধান করলে মিলতে পারে। রঙের ব্যবহার সংযত এবং পোড়ামাটি রং, ধূসর, কৃষ্ণ ও নীলের স্বল্পতম ছোঁয়ায় কয়েকটি মূর্তি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা অদ্ভুত রস ও আদিম বলিষ্ঠভঙ্গীর প্রকাশও পাওয়া যায়, যেমন 'বার্ড', হ্যাট, ম্যান' (টটেমিক), 'গার্ডিয়ান উইথ ব্যানার' (হঠাৎ দেখলে বাকিংহাম প্যালেসের বীফ ইটার গার্ড-এর কথা মনে পড়ে), ম্যান ড্রাগন, পট, হর্স অ্যান্ড রাইডার (কিছুটা প্রাচীন চীনা পোর্সিলেন মূর্তি ঘেঁষা), ইত্যাদি কাজ। দেওয়ালের প্লাক হিসেবে একটি মেয়ের মুখ ভারী সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে গড়া হয়েছিল।

মৃৎপাত্রগুলির গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জীবজন্তুর আকারের সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য সংযোজনেও প্রি-কলাম্বিয়ান ছাপ দেখা যায়। বিভিন্ন আকারের বোল, ডিস এবং ট্রের মধ্যেও কিছুটা এই রীতির প্রকাশ ছিল। আবার কয়েকটি সাধারণ চিত্রিত প্লেট পরিচ্ছন্ন গঠনের গুণে বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল।

●

বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি বিড়লা কলামন্দিরে যে নাট্যোৎসব করেন তাতে চিত্রশিল্পীদেরও একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়। ৩ থেকে ৭মে কলামন্দিরের তিনটি তলার লবিতে প্রায় ত্রিশখানি বাছাই করা চিত্রভাস্কর্য এবং ইকেবানা প্রদর্শিত হয়। শিল্পীরা প্রায় সকলেই নতুন ছবি দিয়েছিলেন এবং সমগ্র প্রদর্শনীর ছবির মান কোথাও নেমে যায়নি। এটা কম কথা নয়। কিন্তু এত নিম্নমানের প্রদর্শন কৌশল দেখা যায়নি। অডিটোরিয়ামে প্রবেশপথের বাইরে অল্প-আলোতে কোনমতে খাড়াকরা ছবিগুলি দেখতে যথেষ্ট অসুবিধে হয়। শোনা যায় হলের কর্তৃপক্ষ কোনরকম আলোর ব্যবস্থা বা প্রদর্শনী সজ্জার জন্য কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন—কারণ সে ধরনের কোন আয়োজন করতে গেলে হলের দেওয়ালের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। খুবই ন্যায্য কথা। কিন্তু যারা ছবি দেখতে চায় তাদের স্বভাবতই মনে হতে পারে এভাবে এরকম জায়গায় তাহলে প্রদর্শনী করবার কি প্রয়োজন ছিল। কারণ যেভাবে ছবি রাখা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে একটি ভাল চিত্রপ্রদর্শনী প্রদর্শনকৌশলের অভাবে নষ্ট করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পের ও শিল্পীর মিলনক্ষেত্র হিসেবে নতুন নাট্যমন্দিরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর সেইজন্যেই এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে চিত্রশিল্পীরা এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু শুরুতেই চিত্রকলার যে অভ্যর্থনা দেখা গেল তাতে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর চিত্রশিল্পীরা হরিজনের মত অপাঙক্তেয় হয়ে থাকবেন না তো?

আধুনিক তরুণ শিল্পীদের মধ্যে খ্যাতনামা অনেকেই এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। রঘুনাথ সিংহের কাঠ ও সেরামিকসের তিনটি বিমূর্ত ভাস্কর্য তাঁর ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত একক প্রদর্শনীর মতই। মহিম রুদ্রের বহু বর্ণের তুলির ছোঁয়ায় 'গ্রীষ্ম' ছবিটির অ্যাবস্ট্রাক্ট প্যাটার্নের মধ্যে আনন্দময় ঔজ্জ্বল্যের ছাপ সুস্পষ্ট। সুহাস রায়ের 'চার্চ' সোনালি পটভূমিকায় সোনালি রঙে উজ্জ্বল এবং এতকটা যেন স্বর্ণকারের মতই সূক্ষ্মভাবে ফিনিশ করা। তপন ঘোষের 'হর্স উইথ এ ম্যান' আবছা সাদায় আঁকা জোরালো ছবি। শ্যামল দত্তরায়ের 'নাইট' সরল রংচঙে এবং শান্ত ফ্ল্যাট প্যাটার্নের কাজ। গণেশ পাইনের 'উইজার্ড অ্যান্ড দি বার্ড' তাঁর আগেকার কাজের মত। কার্তিক পাইনের 'ময়ূর' কতকটা ভারতীয় চিত্ররীতির কাজ কিন্তু বেশ গতিময় ছবি। সনৎ করের 'অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল' ক্যালিগ্রাফিক এবং রঙের সুসমঞ্জস প্রকাশ, অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর 'মিউজিক্যাল এনলাইটেনমেন্ট' এবং প্রকাশ কর্মকারের 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড'এ সুগঠিত প্যাটার্ন ও রঙের প্রয়োগ দেখা গেল। এছাড়া শৈলেন মিত্র, লালু শা, মনু পারেখ, অনিল সাহা ও বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবিগুলিও বিভিন্ন রসের পরিবেশন করেছে।

●

৪ থেকে ১০ মে ২ নম্বর দুর্গাচরণ চ্যাটার্জি লেনে 'চিত্রনিকেতন' শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ছোট ছেলেমেয়েদের শিল্প শিক্ষার এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে এতদিন ছিল না। উদ্বোধনের দিনে যে জনসমাবেশ ঘটে তা দেখে মনে হল এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় লোকে যথেষ্ট সচেতন।

৩ থেকে ১৪ বছর বয়সের জনাবিশেক ছেলেমেয়ের ১০০ খানির ওপর জল রং, প্যাস্টেল ও পেনসিলের ছবি এবং কতকগুলি মাটির মডেলিং দিয়ে প্রদর্শনীটি সাজান হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে দইওয়ালা, দাঁড়ানো ট্যাক্সি, বেড়াতে যাওয়া, উৎসবের রাত, ফুল চোর ইত্যাদি ছবি দেখতে ভালই লাগে। প্রতিষ্ঠানটি আশা করা যায় জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

●

গত জানুয়ারি মাসে ২২ পল্লী শারদোৎসবের রৌপ্যজয়ন্তী উপলক্ষে নর্দার্ন পার্কে শিশুদের ছবি আঁকার এক প্রতি-যোগিতার অনুষ্ঠান হয়। সেই প্রতি-যোগিতায় কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ ও ছবিগুলির প্রদর্শনীর উদ্বোধন কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে গত ৬ মে অনুষ্ঠিত হল।

টাইনি, জুনিয়র ও সিনিয়র এই তিন ভাগে ভাগ করে প্রতি বিভাগে তিনটি করে পুরস্কার ও সাতটি করে উৎসাহ দানের জন্যে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারগুলি দেওয়া হয় কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে। এঁদের মধ্যে আছেন অমৃত, অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর, জি, সি, লাহা প্রাইভেট লিমিটেড, কার্মালিন প্রাইভেট লিমিটেড, বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়্যারহাউস অ্যাসোসিয়েশন, অক্ষয়কুমার লাহা, হিন্দুস্থান পটারিজ, জে, এন, ঘোষ (মেণ ফেন), জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ এবং ক্যালকাটা এঞ্জিনীয়ারিং স্টোরস কোং। প্রায় পঁচাশীটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং টাইনি, জুনিয়র ও সিনিয়র গ্রুপের মধ্যে যথাক্রমে অলোকা গুপ্ত, এম শ্রীবঙ্গ-নাইকুলু ও সুযকুমার সাইগলকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়। এই তিনটি বিভাগকে তিনটি বিষয় আঁকতে দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র-তম বিভাগে দেওয়া হয় গাছের ডালে পাখি, জুনিয়র বিভাগ—একটি রাস্তার দৃশ্য এবং সিনিয়র বিভাগ আঁকে একটি উৎসবের দৃশ্য। এই তিন বিভাগের বাছাই করা প্রায় ২০০ ছবি ৮ মে পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি ছাড়াও অন্যান্য অনেকগুলি সুন্দর ছবি দেখা গেল। একই বিষয় কত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে ছেলেমেয়েরা আঁকতে পারে তার নিদর্শন হিসেবে প্রদর্শনীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হিসেবে শ্রীপশুপতিনাথ লাহার কৃতিত্ব অনেকখানি।

●

চৈতন্য কলাবিজ্ঞান কেন্দ্রের চতুর্থ বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী ৬ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত আকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সাতজন শিল্পীর ৩৬ খানি ছবি ও স্কেচের প্রদর্শনী গতবারের মতই লাগল। প্রত্যেকেই নিজের জায়গায় স্থির আছেন। কালীনাথ ঘোষের 'ইটার্নাল ট্র্যাঙ্গলের' দৈহিক আবেদন বড় ছেলেমানুষি মনে হয়, আরো ছেলেমানুষি তাঁর বোঝা হাতে পাহাড়ে ওঠা একটি মানুষকে 'স্ট্রাগল্ ফর একজিস্টেন্স্' বলে

হংসেশ্বরী মন্দির / শিল্পী : হরিদাস

দেখানো। দিলীপ মুখার্জির কয়েকটি অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইন ঘেঁষা জল রঙে করা ছোটছোট প্যাটার্নে পটুত্ব বা রস কিছুই দেখা যায় না। মুকুন্দলাল ভাদুড়ির ক্লিওপেট্রা, কালী প্রভৃতি রূপ মূলত ডেকরেটিভ। শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি ও নিসর্গদৃশ্যগুলি অত্যন্ত কাঁচা হাতের কাজ। সুপ্রিয় রাহার রঙের ছোপ থেকে ছবি খুঁজে বার করা দুষ্কর। এক শ্রীমতী হাঁপ মুখার্জির কাজ সেই সেকেলে ভারতীয় প্রথায় আঁকা ছবি হলেও একটা স্নিগ্ধতার ভাব এনে দিতে পারে। তাঁর 'বাতায়নবর্তিনী' বা 'গ্রামের দৃশ্য' অন্ততপক্ষে পরিচ্ছন্ন ছবি।

●

৩ থেকে ৯ মে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে পূর্ব ইউরোপের আরেকটি দেশের লোকশিল্পের প্রদর্শনী হয়ে গেল। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশনস ও রুমানিয়ান এম্ব্যাসির উদ্যোগে রুমানিয়ার লোক-শিল্পের শতাধিক নিদর্শন ও অনেকগুলি ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হল।

রুমানিয়ার লোকশিল্পে একদিকে যেমন তার প্রাচীন ডাসিয়ান ও রোমান ঐতিহ্যের চিহ্ন পাওয়া যায় অন্য দিকে তেমনি নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী শিল্পরীতির ছাপ প্রবল দেখা যায়। সে দিক দিয়ে বর্তমান প্রদর্শনীতে প্রাচ্য শিল্পের অলংকরণ এবং গঠনের দিক দিয়ে যেন প্রবল মনে হল। ওলটেনিয়া এবং ওয়ালাচিয়ার কার্পেটের লাল, সবুজ, হলদে জ্যামিতিক বা ফুল লতা-পাতার প্যাটার্নের সাযুজ্য হয়ত খুঁজলে মধ্য প্রাচ্য থেকে আসামের উপজাতিদের বোনা কাপড়ে পর্যন্ত পাওয়া যাবে। কয়েকটি চমৎকার লোকশিল্পের নিদর্শন দেখা গেল কাঠের তৈরী দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী হাতা, চামচ, কাঁটা ইত্যাদি বস্তুতে। এগুলির গড়ন এবং হাতলের কারুকার্য অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ। তেমনি সুন্দর শাদার ওপর শাদা নকসাকাটা রুমালে এবং বিভিন্ন জেলার পুরুষ ও নারীদের জমকালো পোষাক। এইসব পোষাকের ওপরকার ডিজাইন প্রাচ্যদেশ সুলভ এবং অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন সূক্ষ্ম কাজ।

মৃৎশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে যেসব জার ও অন্যান্য পাত্র রয়েছে সেগুলির গঠন এখনো প্রাচীন গ্রীকো-রোমান প্রভাবের পরিচয় দেয়। কয়েকটি লাল রঙের বাটির গায়ের শাদা আলপনা চিত্রণ বাংলা দেশের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সমগ্র প্রদর্শনীর ডেকরেটিভ গুণ এবং রঙের বাহার বিশেষ তৃপ্তিকর হয়েছিল। —চিত্ররসিক

অ্যামেচার ইউনিট

আলোর বৃত্তে

সময়টা ছিল ১৯৫৯। বাংলা নাটকের একটি স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে নাট্যকার ও শিল্পীর অন্তর সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে। নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত জীবনচর্চা ও জাতিগঠনের প্রয়োজনীয়তা সবার অনুভবে দিয়েছে দোলা। শুধু বিষয়বস্তু নয়, নাটকের আঙ্গিক পরিকল্পনায়ও এসেছে নানা রূপান্তর। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্র ধরে যে নাট্যানুশীলন, তারই মধ্যে সৎ নাট্যচেতনা গড়ে তোলার অন্তর নিষ্ঠা এক সুষ্ঠু রূপ পেয়েছে। নাটক যাঁরা ভালোবাসেন, নাটকের মধ্য দিয়ে দেশের শিল্প সংস্কৃতির মানোন্নয়ন যাঁরা করতে চান, তাঁরা এই নাট্যচর্চার অন্তর্নিহিত ও বাইরের ব্যাপ্তির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন পথচলার সীমাহীন উন্মাদনা।

অনেকের মতো কলকাতার মণীন্দ্রনাথ কলেজের দুটি তরুণের (অরুণ মোদক ও অমর ভট্টাচার্য) মনেও এ জোয়ার স্বপ্ন তুললো—নাটক করতে হবে, নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের শিল্প চেতনাকে ভাষা দিতে হবে। আলোচনা চললো কিভাবে কি করা যায়। নাটক নিয়েও চললো অনেক কথা। কিন্তু দুজন নিয়ে তো আর নাটক হয় না, আরো ছেলের প্রয়োজন। চেষ্টা চলতে লাগলো এবং একদিন সফল হোল চেষ্টা। একটি নাট্যগোষ্ঠী তৈরী করার মতো অবস্থার সৃষ্টি হোল। আহিরীটোলা স্ট্রীটে একটি দল গড়ে উঠলো। দলের নাম হোল 'অ্যামেচার ইউনিট'। বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের এক আন্তরিক শরিক হবার প্রতিশ্রুতি। এঁরা প্রথমেই লিখে দিলেন। ১৯৫৯ থেকে বহু আলো, বহু অন্ধকার, বহু স্মৃতি, বহু বিস্মৃতি মেখে 'অ্যামেচার ইউনিট' ১৯৬৯ এর দ্বন্দ্বমথিত সামাজিক পরিবেশে এসে নিজেদের নাট্য প্রযোজনার স্বাক্ষর অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।

কোন গ্রুপ থিয়েটারের পক্ষে দশ বছর নিজের অস্তিত্বকে সবার পরিচিতির আলোয় ভাস্বর করে রাখা যে কতোটা দুঃসাধ্য, তা যাঁরা এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরাই মনে মনে উপলব্ধি করতে পারেন। এই দশ বছর টিঁকে থাকার ব্যাপারে যে শক্তি নেপথ্যে কাজ করেছে তা হোল এই যে এঁরা প্রথম থেকেই জীবনরস সমৃদ্ধ নাটক অভিনয় করে প্রকৃত শিল্পের সাধনায় নিজেদের প্রয়াসকে নিয়োগ করেছেন। শুরুতেই এঁরা নাট্যানুরাগী দর্শকদের বলেছেন—'অতীতের সৌভাগ্য কিম্বা আন্তরিক অনুশীলনে, বর্তমানের প্রয়াসের ফলপ্রসূতায় যদি আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি, তবে উভয়তঃ আপনার এবং আমাদের রসপিপাসা পরিতৃপ্তির সম্ভাব্যতায় ভরে উঠবে।'

'অ্যামেচার ইউনিটের' প্রথম নাট্য প্রযোজনা হোল রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুর্দা'। নাটকটি অভিনীত হোল ১৯৬০-এর ১২ জুন আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে। প্রথম প্রযোজনা থেকেই স্পষ্ট হোল দলের শিল্পীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা। যাত্রা শুরুর সে এক অফুরন্ত আবেগ। দ্বিতীয় প্রযোজনা হোল ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্যঘন নাটক 'এক পেয়ালা কফি'। নাটকটি শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় পরিবেশিত হোল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। শিল্পীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা আরো ব্যাপ্তি পেলো। এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল নাট্যকার জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইউনিটের ছেলেদের পরিচয়। প্রথম পরিচিতি খুব অল্প দিনেই নিবিড় হয়ে উঠলো। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিলহারা ছন্দ' নাটকটি এই সূত্রে গিরিশ নাট্য (একাংক) প্রতিযোগিতায় অভিনয় করবার আয়োজন শুরু হোল। দেশ বিভাগের পর এক পণ্ডিতের বাইশ বছরের কুমারী মেয়ে অণিমা আর তাদের বাড়ীতে গতর খাটিয়ে খাওয়া বুড়ো চরণ কৈবর্তের ছাব্বিশ বছরের ছেলে জগাই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পালিয়ে আসছিল রাতের অন্ধকারে। আসার পথে দাঙ্গার মুখে পড়ে কে কোথায় ছিটকে পড়ে যায় কেউ জানে না। কিন্তু 'জগাই' আর 'অণিমা' বেঁচে রইলো, এখানে এসে শিক্ষকতা শুরু করলো অণিমা। মোটামুটি বেশ কাটছিল দিনগুলো, কিন্তু সমাজ বাদ সাধলো, সন্দেহ করতে লাগলো 'জগাই' আর অণিমার সম্পর্কের। সব সন্দেহের নিরসন করে অণিমা শেষ পর্যন্ত জগাইকেই বললো তার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে। এই অপূর্ব মানবিকতাবোধ সমৃদ্ধ নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হোল গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার বিচারকদের সামনে। পুরস্কারও মিললো। দলগত অভিনয়ে 'অ্যামেচার ইউনিট' পেলো দ্বিতীয় স্থান, এবং আরো তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কারও এলো এই সঙ্গে। 'মিলহারা ছন্দ' নাটকের অভাবনীয় সাফল্য গোষ্ঠীর পরিচিতিকে নিঃসন্দেহে বহুদূর প্রসারিত করলো। এই নাটকটি প্রায় পঞ্চাশ রাত্রি অভিনীত হয়েছে।

এই নাটকের আশাতীত সাফল্যের পর 'অ্যামেচার ইউনিটের' ঘর একেবারে জমজমাট। বহু নতুন ছেলে এসে দলের মুখরতায় ভাষা দিলো। একের পর এক নাটক তাই অভিনীত হয়ে চললো। ১৯৬৩-র ২১ অক্টোবর মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হোল ৭০ জন শিল্পী সমৃদ্ধ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আনক্লেমড বডি', ধীরেন মোদকের 'হে অতীত কথা কও' ও সঙ্গে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিলহারা ছন্দ'। 'হে অতীত কথা

কও' নাটকটি রঙ্গবাণী' আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় সব কটি বিভাগের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে। এরপর জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুটি প্রাণ, একটি মন' (একাংকিকা) ও 'দৃষ্টি' নাটক রঙমহলে অভিনীত হোল। (১৯৬৪) দুটি নাটকের বিষয়বস্তুই নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করলো। বিশেষ করে 'দৃষ্টি' নাটকের মধ্যে শিল্পসুষমা জড়ানো জীবনের এক গভীরতম দর্শন ভাষা পেয়েছে। শিল্পী-চেতনায় জড় পায় জীবনের স্পন্দন। অন্ধ কুমোর চরণের চোখের আকাশে শুধু গহীন অন্ধকার, তবু তার অন্তর মানসের প্রোজ্জ্বল দীপালোকে সে করে সুন্দরের আরতি, সম্ভব করে তোলে সে দেবীমূর্তির দৃষ্টিদান।

১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত আরো কতোগুলো সার্থক নাটক অ্যামেচার ইউনিট পরিবেশন করেছেন। এর মধ্যে আছে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গেটম্যান', 'সাগর সঙ্গমে', 'সতী', 'শিলালিপি', অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন যৌবন', সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায়', 'নীড়', শুভদা (নাট্যরূপ) রঞ্জিত রায়চৌধুরীর 'এই শতকের কান্না' ইত্যাদি। এই সব নাটকগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এই নাটকগুলোর মধ্যে কয়েকটি হোল 'শিলালিপি', 'এই শতকের কান্না', 'নীড়', 'আলোকের এই ঝর্ণাধারা' প্রভৃতি। 'শিলালিপি'তে একটি করুণ কাহিনীর অবগুন্ঠনে সমাজের ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটির আর একটি আকর্ষণ হোল যেমন বলিষ্ঠ সংলাপ তেমনি দৃশ্যবিন্যাস। 'এই শতকের কান্নায়' রয়েছে কয়েদখানার চার দেওয়ালের মধ্যে গুমরে ওঠা জীবনপিয়াসী মানুষের মুক্তির আর্তি।

'নীড়' নাটক সম্পর্কে 'অ্যামেচার ইউনিট' যেভাবে ভেবেছেন তাই তুলে ধরি—'দুটি কথা, একটি স্বপ্ন। কি অতীত, কি বর্তমান, কি ভবিষ্যৎ, মানুষের কাছে আবেদন তার চিরন্তন। তবু ঝড় ওঠে, বাজ পড়ে, এলোমেলো হয়ে যায় মানুষের বাঁধা ঠাসবুনুনি। এই সত্যি। কিন্তু আরো সত্যি পরিবেশের বিবর্তনে ভাঙ্গা ঘরে নতুন অঙ্কুর। স্বপ্ন তখন বাস্তব, সত্যি তখন সেটাই।' 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায়' যা ছিলো পাপের অন্ধকারের কালো, তাই দিয়েছে ভুবন ভরা আলোর সংকেত।

এই সময়ে আর একটি স্মরণীয় প্রযোজনা হোল জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুছেও যা মোছে না' নাটক। এই নাটকের মধ্যে নাট্যকার যে জীবন ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা নাটকের ইতিহাসে খুবই বিরল। এই নাটকে কুমারী মেয়ে কুন্দ মানবিকতার নামে বিচার চেয়েছে সমাজের কাছে। সমস্যাভারাক্রান্ত একটা পরিশ্রান্ত সংসারের অংশীদার হয়ে সে প্রশ্ন তুলেছে—কুমারী হয়েও কেন সে মা হোতে বাধ্য হয়েছে? তার দাবী 'সে বাঁচবে এবং বেঁচে প্রমাণ করে দেবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাজপথ আসলে উদার মানবিকতার অন্ধ কানাগলি।'

মা বললেন—'তুই ভেবে দ্যাখ কুন্দ।' কুন্দ বলে 'না'।

ললিত বলে—'আমি নেবো তোমাদের ভার'। এবারো কুন্দ বলে 'না'। ফিল্ম কোম্পানীতে কুন্দকে চান্স দিতে আসে নরহরি, কিন্তু আবার সেই 'না'।

ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় নয়, মাটির বুকে পা দিয়ে কুন্দ আগুনে পোড়া কুন্দ ফুলের নাটক অভিনয় করবে। আকাশ ভরা কণ্ঠে মহিম মাস্টার অস্ফুট সুরে বলে ওঠে—'পারবি, তুই নিশ্চয়ই পারবি।'

'মুছেও যা মোছেনা' নাট্যকার শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অপূর্ব সৃষ্টি এবং বিশ্বরূপায় আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় এটি শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে নির্বাচিত হয়। অ্যামেচার ইউনিট এই নাটক অভিনয় করে প্রযোজনায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সেই থেকে গোষ্ঠীর নাট্যানুশীলন সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই আশা পোষণ করতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা অবলম্বনে একটি নাটক এরপর (১৯৬৭-র, ১৮ সেপ্টেম্বর) এঁরা মঞ্চস্থ করেন। এঁরা এখন যে নাটকটি অভিনয় করছেন, তার নাম হোল 'ইস্তাহার'। জোতদার মজুতদারের শোষণের বিরুদ্ধে ভূমিহীন কৃষকদের যে সংগ্রাম তারই পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটি লিখেছেন জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়।

'অ্যামেচার ইউনিট' অনেক জায়গায় আমন্ত্রণ পেয়ে অভিনয় করেছেন। শরৎ সাহিত্য সম্মেলনে এঁরা পরিবেশন করেছেন 'শুভদা' নাটক, শ্রীরামপুরে 'আনন্দম' পরিচালিত নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ করেছেন 'মিলহারা ছন্দ' ও 'হে অতীত কথা কও' নাটক দুটি। এ ছাড়া 'নাট্য সম্মেলনে', 'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন' ও 'যুব উৎসবে' এঁদের নাটক অভিনীত হয়েছে। গোষ্ঠীর শিল্পীরা দার্জিলিঙে ও শিলিগুড়িতে নিজেদের চেষ্টায় নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে অভিনীত নাটকগুলো হোল 'পুরাতন ভৃত্য', 'মুছেও যা মোছে না', 'দুটি প্রাণ একটি মন', 'শপথ নিলাম'। দার্জিলিঙে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে অরুণ মোদক এবং জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'আমরা বুঝতে পেরেছি সেখানকার দর্শকও নাটক সম্পর্কে অতি সচেতন, বাংলার নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে এঁরা পূর্ণ মাত্রায় উৎসাহী।' এ ছাড়া দুর্গাপুর, বাউড়িয়া, উত্তরপাড়া, বালী প্রভৃতি জায়গায় এঁরা সার্থকতার সঙ্গে নাটক পরিবেশন করেছেন। গত বছরে এলাহাবাদে আয়োজিত অখিল ভারতীয় লঘু নাটক প্রতিযোগিতায় এঁরা 'মিলহারা ছন্দ' নাটক অভিনয় করেন। এঁদের থেকেই দুজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান অর্জন করেন।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরুণ মূকাভিনেতা স্বর্গত অরুণাভ মজুমদারের স্মৃতি রক্ষার্থে 'অ্যামেচার ইউনিট' মুক্ত অংগনে অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মিকভাবে জড়িয়ে ছিলেন শ্রীমজুমদার। এঁরা বলেন—'আমরা শোকার্ত। বাংলা নাট্যশিল্পের সবুজ সৈনিক অরুণাভ মজুমদারের মূকাভিনয় নৈঃশব্দের অন্তরালে আত্মগোপন করলো। সৎ শিল্পতীর্থের যাত্রা পথে এই আকস্মিক অকাল মৃত্যুর বেদনাভরা স্মৃতি সহযাত্রীর অন্তরঙ্গ সঙ্গী হোক। যেন বলতে পারি—'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, 'বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।' সত্যি যে শিল্পী এপারের নাটক শেষ করে আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছেন, তাঁর প্রতি এমন অনুরাগ মাখা ভালোবাসা জানানোর নজীর খুব বেশী আছে বলে মনে করি না।

খরা ক্লিষ্টদের সাহায্যের জন্যও এঁরা অভিনয় করেছেন। তা ছাড়া নাটকের উন্নতির চিন্তা নিয়ে যেখানে যে ধরনের আন্দোলন হয়েছে, অ্যামেচার ইউনিটের শিল্পীরা সেখানে গিয়ে যোগ দিয়েছেন।

কলকাতায় আরো দু-একটি 'মুক্ত অঙ্গন' তৈরি করা উচিত, এ সত্যে এঁরা শুধু আদর্শের দিক থেকে বিশ্বাসী হয়েই ক্ষান্ত নেই, এঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কি করে উত্তর কলকাতায়ও একটি মুক্ত অঙ্গন গড়ে তোলা যায়। প্রথম থেকেই সভ্যরা সবাই একই চিন্তায় মিলেছিলেন বলে দলে এখনো কোন ভাঙ্গন দেখা দেয়নি। বলেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্য প্রযোজনায় 'অ্যামেচার ইউনিটে'র বৈশিষ্ট্য এবং বাংলা থিয়েটারকে গৌরবে বিভূষিত করতে এঁদের প্রয়াস ইতিমধ্যেই নাট্যরসপিপাসু দর্শকদের উৎসাহ বাড়িয়েছে। আমরা আশা করবো 'জীবনের মিলহারা ছন্দে, ছন্দের যাদু' আনার কাজ এঁদের দ্বারা বেশ কিছুটা ত্বরান্বিত হোক। বাংলার নাট্যলোক সম্পর্কে এঁদের ভবিষ্যতের শপথ সফল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

—দিলীপ মৌলিক

রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরে ঘোষিত হল, তের দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হবে। অর্থাৎ ৩রা মে থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত ভারত সরকারের তরফ থেকে কোনো আনন্দানুষ্ঠান হবে না। পূর্বনির্ধারিত সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল, নতুন কোনো আয়োজন নয়।

রেডিও রাষ্ট্রপতির মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে শোকজ্ঞাপক অনুষ্ঠান প্রচার করতে আরম্ভ করেছিল। কোথাও আনন্দের সুর না, হৈ-হুল্লোড় না, চাপল্য না। সর্বত্র 'নাই নাই' সুর। মাঝে মাঝে সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত এবং আরও কয়েকজনের গান এই সুরকে আরও বিষণ্ণ করে তুলেছিল। আরও উদাস, আরও শূন্য। এঁদের গান মনটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেই অসীম শূন্যে—যেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। মনটাকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে শোকটাকে আরও গভীর করে তুলেছিল।

বিভিন্ন কথিকা, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান, সংবাদ বিচিত্রা প্রভৃতিতেও শোকের ছায়া। নাটকে, নকশায়, রূপকে, কথায় ও অন্য সবকিছুতে আনন্দের সুর বর্জিত, লঘুভাব নির্বাসিত। সর্বত্র সবক্ষণ সবকিছু ভারী, গম্ভীর।

কলকাতা ক ও খ কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় শোকের তের দিন এই অবস্থা বিরাজ করেছে। রাষ্ট্রীয় শোকের প্রথম তিন দিন কলকাতা গ অর্থাৎ বিবিধ ভারতী ওরফে হিন্দী ভারতীতেও এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। প্রথম তিন দিন ক, খ ও গ কেন্দ্র থেকে একই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ দিন অর্থাৎ ৬ই মে থেকে গ কেন্দ্র আলাদা হয়ে গিয়ে তার নিজস্ব মূর্তি ধারণ করেছে—তৃতীয় দিনে তার শোক সমাপন করে চতুর্থ দিন থেকে আবার সেই লঘুচপল আনন্দে, হৈ-হুল্লোড়ে মেতেছে। তার রাষ্ট্রীয় শোকপালন তৃতীয় দিনেই শেষ, তের দিন কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রয়োজন সে অনুভব করে নি।

রাষ্ট্রীয় শোককালে তবলা একটি নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু বিবিধ ভারতীতে প্রচণ্ড শব্দে তবলার সঙ্গে উত্তাল ভঙ্গিতে উন্মাদে হিন্দী ফিল্মী গান বেজেছে। মনে হয়েছে, হিন্দী ফিল্মের উন্মত্ত প্রেমদৃশ্য অভিনীত হচ্ছে।

ভারতে অবাক লাগে, হিন্দীকে 'রাষ্ট্রভাষা' করে হিন্দীর 'মহিমা' প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তারা যখন সমস্ত রকম লজ্জাশরমের বালাই বিসর্জন দিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছেন, বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীদের পর্যন্ত হিন্দীতে কাজকর্ম চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তখন রাষ্ট্রের এই মহাশোককালে সেই হিন্দীতেই রাষ্ট্রপতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হল। তের দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোকপালন তো দূরের কথা, পরলোকগত রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের সামান্য সৌজন্যবোধ-টুকুও দেখা গেল না। কিন্তু কেন?

কর্তৃপক্ষ হয়তো বলবেন, বিবিধ ভারতীর সঙ্গে বিজ্ঞাপন-প্রচার জড়িত, এবং বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য এটা না করে উপায় ছিল না। কিন্তু কেন ছিল না? বিজ্ঞাপনদাতারা কি চুক্তি করে নিয়েছেন, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়ভরা হিন্দী ফিল্মী গান বাজাতেই হবে? এমন কোনো চুক্তি হতে পারে না। কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠান এমন চুক্তি করতে পারেন না। তাহলে কেন কলকাতা ক ও খ কেন্দ্রের মতো গ কেন্দ্রেরও অনুষ্ঠান পরিবর্তন করা হল না? শুধু বিজ্ঞাপনের সঙ্গে হাল্কা, ছ্যাবলামি-ভরা হিন্দী গানের প্রচার বন্ধ রাখা হল না? এমার্জেন্সি বলে একটা কথা আছে, সেই এমার্জেন্সির জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকা দরকার। সেই এমার্জেন্সির কালে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, স্খলন-পতন হয়—কলকাতার অন্য দুটি কেন্দ্রেও হয়েছে। তার জন্য তাঁদের কৈফিয়ত তলব করা হয় নি। শুধু বিজ্ঞাপন আর গান বন্ধ রাখলে তাঁদেরও কেউ কোতল করত না।

রাষ্ট্রীয় শোককালে বিবিধ ভারতীর এই ধরনের আচরণের কৈফিয়ৎ পাওয়া যাবে কার কাছে?

রাষ্ট্রীয় শোককালের গোড়ার দিকে কলকাতা ক ও খ কেন্দ্রে গানের শিল্পীদের নাম বলা হত না। ৬ই মে সকাল পর্যন্ত হয় নি, হঠাৎ সন্ধ্যায় এই নীতির পরিবর্তন দেখা গেল—গায়ক-গায়িকাদের নাম ঘোষিত হতে লাগল। অকস্মাৎ এই নীতি পরি-বর্তনের কারণ বোঝা গেল না। একটা স্থির নীতিতে অটল থাকাই তো বাঞ্ছনীয়।

তাছাড়া কেবল গানের শিল্পীদের নাম ঘোষণা না করার নীতিও দুর্বোধ্য। কথিকা, শ্রদ্ধানিবেদন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে নাম ঘোষণায় যদি আপত্তি না থাকে তাহলে শুধু গানের বেলায় নাম ঘোষণায় আপত্তি থাকবে কেন? গানের শিল্পীদের প্রতি বৈষম্য-প্রদর্শনের হেতু কী? তাঁরা কোন্ দিক দিয়ে ন্যূন? সর্বত্র এক নীতিই তো অনুসৃত হওয়া উচিত।

৬ই মে থেকে অন্য সকলের নাম ঘোষণা শুরু হলেও কর্তৃপক্ষ স্টাফ আর্টিস্টদের নাম ঘোষণা না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে-ছিলেন। তাই আসর পরিচালক-পরিচালিকাদের নাম ঘোষণা করা হয় নি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী স্টাফ আর্টিস্টদেরও না।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তেও তাঁদের অটল দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে আসর পরিচালক-পরিচালিকার নাম শোনা গেছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদেরও। গোড়ার দিকে দ্রুততায়, বিভ্রান্তির মধ্যে এই রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি অসম্ভব নয়, কিন্তু শেষ দিকে অবস্থা শান্ত হলে, একটা স্থৈর্য এলে এর কোনো সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৬ই-য়ের উচ্চারণ ছউই বলে জানা ছিল এতকাল, কিন্তু ২রা মে রাত ১০টা মিনিটে কলকাতা থেকে প্রচারিত খবরে শোনা গেল ছোওই। উচ্চারণটা কি আমাদের 'শুদ্ধ' করে নেবার দরকার আছে?

চীনের প্রধানমন্ত্রীর নামের উচ্চারণ নিয়ে কিছু গোলমাল আছে—কেউ বলেন চৌ এন-লাই, কেউ চাও এন-লাই। রেডিও থেকে দুটোই বলা হয়, খবরের কাগজে প্রথমটা লেখা হয়। চীন-ভারত মৈত্রীকালে চীনা প্রধানমন্ত্রী যখন ভারতে এসে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন তখন সেখানে একদিন বেড়াতে বেড়াতে তিনি শুনেছিলেন, একটি বালক তার সঙ্গীকে বলছে, 'ঐ দেখ্, চৌ এন-লাই যাচ্ছে।' বালকটিকে ডেকে তিনি বলেছিলেন, 'চৌ এন-লাই বলছ কেন? আমার নাম চু এন-লাই।'

২রা মে রাত ১০টা ৫ মিনিটের খবরে চাও এন-লাই শুনে ঘটনাটি নতুন করে মনে পড়ে গেল।

বুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে কি বুধ? বুদ্ধা? ২রা মে রাত সওয়া ১০টার ইংরেজী নিউজ রীলে বাঙালী ন্যারেটার বুদ্ধকে ইংরেজী করে বললেন — বুধ জয়ন্তী, গোতম দি বুদ্ধা। তাই বলে তিনি তাঁর বাঙালীত্ব একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন নি, এই রীলেই অন্যত্র খাঁটি বাঙালী উচ্চারণে তিনি বলেছেন -- জগোদীশপুর, ভট্টাচার্যো।

যা-ই হোক, নিউজ রীলটি কিন্তু বেশ ভালো লেগেছিল। সুন্দর প্রযোজনা।

২রা মে-ই বেলা সাড়ে ১২টায় গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে গোড়ার দিকে একটি গানের একটি বর্ণও বোঝা যায় নি। রেকর্ডগুলো আর একটু যত্ন করে রাখা দরকার, আর প্রচারের আগে একবার বাজিয়ে দেখে নেওয়া উচিত সুস্থ আছে কিনা।...এইদিন বিকেল সাড়ে ৫টায় শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গানের অনুষ্ঠান ছিল। দ্বিতীয় গানটির আগে ঘোষক গানের আরম্ভ বললেন, 'আকাশে মেঘের খেলা...।' শিল্পী গাইলেন 'আকাশে মেঘের মেলা...।' খেলা মেলায় গিয়ে শেষ হল।

৪ঠা মে বিকেলে গল্পদাদুর আসরে শ্রীমতী লীলা মজুমদার খুব সুন্দর করে পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেন সম্বন্ধে বলেছেন গল্পদাদুর আসরের শ্রোতাদের উপযোগী করে।

৫ই মে দুপুরে মহিলামহলে ডঃ জাকির হুসেনের প্রতি ডঃ রমা চৌধুরীর শ্রদ্ধা নিবেদন হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল।...রাত্রে কলকাতা থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদের পর ১০টা ২০ মিনিটে যে গায়িকা (রাষ্ট্রীয় শোককালের গোড়ায় দিকে গায়ক-গায়িকাদের নাম ঘোষণা বন্ধ ছিল) রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন তাঁর আন্তরিকতায় অভিভূত হতে হয়েছে। তাঁর গান অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে স্পর্শ করেছে। তাঁর সুর যেন অসীমে গিয়ে মিশেছে।...এর পরে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে যে কীর্তন সম্প্রদায়টি সময়োপযোগী কীর্তন পরিবেশন করেছেন তাঁদেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা প্রাপ্য। তাঁদের কীর্তনও মর্মস্পর্শী, অন্তরের শোকের প্রকাশ।

ডঃ জাকির হুসেন সম্পর্কে এইদিনকার সংবাদ পরিক্রমাটি সুলিখিত, সুপঠিত। তাতে যেমন গাম্ভীর্য ছিল, তেমনি শোক-স্তব্ধতা ছিল।

৬ই মে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে প্রচারিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানটিও সময়োপযোগী, হৃদয়স্পর্শী। রাত সাড়ে ১০টায় শ্রীমতী পূর্বা সিংহের রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর ১০টা ৪৫ মিনিটে শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তর অতুলপ্রসাদের গানও সুন্দর, সুমধুর।

৮ই মে রাত ৯টায় শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে শ্রীক্ষিতীশ রায়ের একটি সাক্ষাৎকার পুনঃপ্রচারিত হল। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এখন পরলোকে। সাক্ষাৎকারটি রেকর্ড করা হয়েছিল ১৯৬০ সালে, শান্তিনিকেতনে। এই সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রবীন্দ্রনাথের গানের একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিচয়ের কথা অনেকেরই জানা আছে, তবু পরিচিত জিনিসকে নতুন করে জেনে ভালো লাগল। আর যাঁদের জানা নেই, এই পুনঃপ্রচারে তাঁদের পরম লাভ হল। ঐ বৃদ্ধ বয়েসে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ভাঙা কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কিছু কিছু অংশ শোনা, সেটাও কম লাভ নয়। বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান সম্পর্কে তিনি যে এত কথা স্মরণ রেখে গুছিয়ে বলতে পেরেছেন, সেটাও কম বিস্ময়ের কথা নয়।...কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে মাঝে মাঝে এসরাজ বাজিয়ে শোনানোর কী প্রয়োজন ছিল, বোঝা গেল না। কয়েক জায়গায় এই এসরাজ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

এই দিন রাত সওয়া ১০টায় 'রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ সংবাদ-বিচিত্রা'টি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার বিভিন্ন স্থানের রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অংশবিশেষ নিয়ে এটি রচিত। অংশনির্বাচন প্রশংসনীয়। রেকর্ডিং, সম্পাদনা ও গ্রন্থনাও ভালো। গ্রন্থনায় ছিলেন শ্রীমতী গৌরী ঘোষ।

—শ্রবণক

রবীন্দ্র-সদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সুরমন্দিরের শ্যামা নৃত্যনাট্যে সুমিতা গুইন এবং অরুন্ধতী গুইন ফটো : অমৃত.

বৈতানিকের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

প্রতিবারের মত এবারও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে ২৫ বৈশাখের অপরাহ্নে, বৈতানিক তাঁদের ১০৮তম রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সাফল্যের সংগে উদযাপন করেন। সভারম্ভের প্রায় এক ঘন্টা আগে থেকেই প্রচুর জনসমাগম হতে থাকে. ক্রমে ঠাকুরবাড়ীর ভিতরের ও বাহিরের প্রাঙ্গণে আর তিল ধারণের স্থান থাকে না। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই বৈতানিক আয়োজিত ৯ম বার্ষিক নন্দিতা সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিণী শিল্পীদের বৈতানিকের পক্ষ থেকে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরস্কৃত করেন। গুণানুসারে শ্রীসর্বাণী সেন, শ্রীউজ্জয়িনী সেন এবং শ্রীঅর্চনা বসু যথাক্রমে পাঁচশত, তিনশত ও দুইশত টাকা পুরস্কার পান। এরপর শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র-সংগীতে আনন্দতত্ত্ব আলোচনা করেন। সংগীতে অংশগ্রহণ করেন বৈতানিকের শিল্পীবৃন্দ। মানুষ জীবনের পথে নানা আঘাত-প্রত্যাঘাত নানা দুঃখ-দহন, নানা অনুকূল প্রতিকূল অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে চলতেও স্মরণ করতে চায় তার প্রথম জন্মদিনের শুচিসুন্দর লগ্নটিকে আকাশ-ভরা আলোর তলায় চোখ মেলে তাকাবার আনন্দঘন মুহূর্তটিকে। জীবনের উৎসমূলের ঐ আনন্দময় চির নতুনত্বটুকু জীবন-সংগীতে ধুয়োর মত ফিরে ফিরে আসে। উপনিষদ বলেন এই কথাই সত্য—আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই বাঁচা, আনন্দের অভিমুখে বিকশিত হওয়া এইটাই সত্য। বিশ্বপ্রকৃতির লীলা আর জীবনের লীলা একই সূত্রে বাঁধা, একই সুরে সাধা। ঋতুতে ঋতুতে কবি কত আনন্দের নব-নব মূর্তি দেখেছেন,—বর্ণ, গন্ধ, গানে ভরা বিশ্ব-প্রকৃতির আনন্দ কত ফুলে ফোটায়, কত ফল ফলায় দেখেছেন, আনন্দ দেখেছেন মানব জীবনের মিলন, বিরহ, ত্যাগ, দুঃখ মুক্তি উপলব্ধির পরিণামী প্রবাহে। এক আনন্দিত কবিচিত্তের বিভোর আনন্দে সুরে সাধনার নামই বুঝি গান। তাঁর যে কোনো ভাবের গানে, যে কোন রসের গানে 'আমি আনন্দিত" এ-কথাটি বুঝি শোনা যায়। তিনি জগতের আনন্দ-যজ্ঞে বাঁশী বাজাবার ভার পেয়ে ধন্য হয়েছেন—সেই আনন্দে জীবন-ভোর প্রাণের কান্না-হাসি গানে গানে গেঁথে বেড়িয়েছেন।

গানে ও আলোচনায় পরিবেশটিও আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। সংগীতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাধারাণী দেবীর 'তাই তোমার আনন্দ' গানটি শ্রোতাদের বারেবারেই মনে পড়বে। সুধীর চট্টোপাধ্যায় এবং সুবিদ ঠাকুরের সংগীত পরিবেশনও ভালো লাগল। খোকন মজুমদার ও স্মৃতি চট্টোপাধ্যায়ের গানও শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে। সমবেত সংগীতাংশ এবার বৈতানিকের পুরোকার খ্যাতি কিছুটা হারিয়েছে মনে হোল। এক কথায় সংগীতানুষ্ঠান শ্রোতাদের প্রত্যাশা ষোল আনা পূরণ করতে পারেনি বলেই মনে হয়। যন্ত্র-সংগীতে অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন নির্মল দে, হরিপদ মাশচটক নন্দন মুখার্জি, নিরঞ্জন দত্ত। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন—শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমতী লতা মুঙ্গেশকরের সঙ্গীত জীবনের রজতজয়ন্তী উৎসব

বোম্বের তাজমহল হোটেলে শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকারকে গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে যে রজত-জয়ন্তী সম্বর্ধনা দেওয়া হয়—টেপ-রেকর্ডে ধৃত সেই সভার উপস্থিত শিল্পী, পরিচালক ও প্রযোজকদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন বাণী সম্প্রতি এক আসরে কলকাতার সাংবাদিক মহলকে শোনানো হয়।

শ্রীমজুর সুলতানপুরী এক উর্দু কবিতায় শ্রীমতী মঙ্গেশকারকে অভিনন্দন জানানোর পর পৃথিরাজ কাপুর শ্রীমতী লতাকে "স্কাইলার্ক" বলে স্বাগত জানান। এরপর ওমপ্রকাশ, নৌশাদ এ ভি মাণিপ্পান

মুকেশের কাব্যময় ভাষায় প্রশস্তির পর কুমার শচীনদেব বর্মন বলেন—বালিকা লতার জুবিলীতে পিতার যেমন আনন্দ হয় আজ লতার সম্মানে আমিও তদ্রূপ আনন্দিত। লতার মত শিল্পীকে পেয়ে ভারতমাতা ধন্য। ভি শান্তারাম বলেন, "দি ডিগনিটি আওয়ার অ্যাক্নোলেজমেন্ট, কুইন অফ মেলডি' হ্যাজ গিভন টু ফিল্ম সং ইজ এভার গ্রেট।" ভাস্কর মেনন বলেন "লতাস মিউজিক ইজ এ স্যাটিসফাইং ফুড টু দি সোল।" পরিশেষে মিঃ সানফোর্ড (ভাইস প্রেসিডেন্ট হলিউড) এবং মিঃ ডান (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ই এম আই) প্রদত্ত সম্মান-ভূষিত হয়ে শ্রীমতী লতা সংক্ষিপ্ত এবং প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় বলেন, "ল্যাংগোয়েজ ফেলস্ টু এক্সপ্রেস মাই গ্র্যাটিচিয়ুট ফর দি ফুলেস্ট কো-অপারেশন এন্ড কাইন্ডেস্ট কনসিডারেশন অফ গ্রামোফোন কোম্পানী।"

"নৃত্যের তালে তালে"র বার্ষিক সঙ্গীতোৎসব

ত্যাগরাজ হলে পরিবেশিত "নৃত্যের তালে তালে"র চারদিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব সুধীবৃন্দের বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছে প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের উচ্চমানের নৃত্য-গীত ও অভিনয় দক্ষতায়।

প্রথম দিনে পদ্মভূষণ দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী এই সংস্থা আয়োজিত নিখিল ভারত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের চারু-কলা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। পর পর চারদিনে পরিবেশিত অনুষ্ঠানগুলি হোল যথাক্রমে—'তাসের দেশ', দ্বিতীয় দিনে বিশ্বপ্রেমানন্দ মহারাজের উপস্থিতিতে তাঁরই লিখিত 'বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ' নাটক, তৃতীয় দিন ডঃ রমা চৌধুরীর উপস্থিতিতে শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় রচিত 'গঙ্গা-ভারতী' নৃত্যনাট্য। চতুর্থ দিনে মহাদেবী বিড়লা বিদ্যা-বিহারের 'সাতভাই চম্পা' নৃত্যনাট্যের পর শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ও সুরারোপিত এক ভারতীয় রমণীর বিশ্ব পরিক্রমা অবলম্বনে লিখিত 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' নৃত্যনাট্য।

প্রতিটি নৃত্য অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করে দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন শ্রীমতী মীরা দাশগুপ্ত। প্রথম দিনের কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন সর্বশ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস, বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর ঘটক, কুমকুম বন্দ্যো-পাধ্যায়, অনুভা ঘোষ, ও সংস্থার ছাত্র-ছাত্রীরা। দ্বিতীয় দিনের অন্যতম আকর্ষণ নাটকের মধ্যে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে 'মন চল নিজ নিকেতনে'। এ ছাড়া সঙ্গীতাংশে ছিলেন পরিমল পাঠক ও কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন চম্পা মুখোপাধ্যায় ও ডলি ভট্টাচার্য।

সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়ের বিবাহে আশীর্বাদ করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয় দিন নৃত্য ছাড়াও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের, গ্রন্থনাসহ নির্মলা মিশ্র, প্রদীপ দাশগুপ্ত, অমর ঘটক, প্রদীপ বসুর গান, রতু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরি-চালনায় সুষ্ঠু সুন্দর রূপ নেয়। এই চার দিনের নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড়শত ছাত্র-ছাত্রী। যন্ত্র-সঙ্গীতে ছিলেন সর্বশ্রী দীনেশ চন্দ্র, রমেশ-চন্দ্র, বিপ্লব মণ্ডল, নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন দাস, অমর চন্দ্র, অরবিন্দ লাহা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানগুলির সামগ্রিক সাফল্য প্রশংসার দাবীদার।

ওস্তাদ 'ভগবান সেতারী স্মৃতি সংগীত সম্মেলন

সম্প্রতি 'সুর ও শ্রুতি'র উদ্যোগে দশম বার্ষিকী ওস্তাদ 'ভগবান সেতারী' স্মৃতি সংগীত সম্মেলন হয়ে গেল তিন দিন ধরে ওস্তাদ 'ভগবান সেতারী মেমোরিয়াল মিউজিক কলেজ প্রাঙ্গণে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় নলিনাক্ষ নন্দ মহাশয়, প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন এস সি ভুগার। শিল্পীদের এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভি বালসারা, জগন্নাথ মুখো-পাধ্যায়, শ্রীমতী রাণী দাশগুপ্তা, প্রতিমা ভট্টাচার্য, মীনা সাইগল, মঞ্জু চ্যাটার্জি, শিখা সরকার, মণিদীপা চ্যাটার্জি, প্রদোষ চৌধুরী, মাখনলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি। নৃত্যে স্মিতা কুণ্ডু, ছন্দা শীল, মঞ্জু শীল প্রভৃতি। দ্বিতীয় দিনে সারা রাত্রব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্মথ ঘোষ (পাথুরিয়াঘাটা), সহ-সভাপতি ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত শিল্পী সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল ও প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন ওস্তাদ মনোমোহন সেতারী ও শ্রদ্ধেয় প্রোঃ মণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়। সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয়ের দরবারী কানাড়া রাগে ধ্রুপদ সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শ্রীসান্যাল পর পর ছায়াকামোদ, চন্দ্রকোষ প্রভৃতি রাগে ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। সঙ্গে মৃদঙ্গে সহযোগিতা করেন বাংলার প্রখ্যাত মৃদঙ্গবাদক মৃদঙ্গাচার্য রাজীবলোচন দে মহাশয়। শিশুশিল্পী সৌরভ দত্ত, রুমা চৌধুরী ও শিখা সরকার, এরা মালকোষ ও জয়জয়ন্তী রাগে বিলম্বিত ও দ্রুতলয়ে খেয়াল পরিবেশন করে দর্শককে মুগ্ধ করে। দ্বৈত যন্ত্রসংগীতের আসরে প্রোঃ সুধীর দাস ও শ্রীমতী অপর্ণা মজুম-দার প্রথমে পুরিয়া কল্যাণ ও পর পর দুটি ধুন বাজিয়ে যথেষ্ট আনন্দ দেন। তরুণ শিল্পী কুমার বিমল রায়ের তবলা লহরাও প্রশংসার দাবী রাখে। শ্রীমতী শিবানী চ্যাটার্জির বসন্ত রাগে খেয়াল ও দুটি ঠুংরি আনন্দদায়ক হয়। বাকী শিল্পীদের মধ্যে প্রোঃ মণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের হেমশিখা খেয়াল ও অনিলকুমার সিংহ মহাশয়ের দরবারী কানাড়া রাগে বাঁশী সকলকে আনন্দ দেয়। অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী ছিলেন দেবু পাল ও সংগীতাচার্য নন্দলাল অধিকারী। অধিকারীর রাগপ্রধান ও ভজন শ্রুতিমধুর হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে মঞ্চ নির্দেশনায় ছিলেন অসিত রায়চৌধুরী ও সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শ্রীনন্দলাল অধিকারী।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মর্মবেদনার আলেখ্য

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে বর্তমানে অভিনীত 'ঘর' নাটকের প্রযোজক-পরিচালক-নাট্যরূপদাতা বলেছেন: সাধারণ মানুষ যখন তার দৈনন্দিন জীবনে সংকটের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়, তখন তারা আপনা থেকে জীবনের মূল্যবোধের পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা ভাবতে পারে না। তাদের ভাবতে শেখাতে হয়। এ কাজ হল... নাটকের।

আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। রঙ্গমঞ্চ হচ্ছে সমাজ-জীবনের দর্পণস্বরূপ। সমাজে যা ঘটছে, তাকেই নাট্যআবেগমণ্ডিত করে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করা রঙ্গমঞ্চের কাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অঙ্গীভূত ভারত-ব্যবচ্ছেদের পরে অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। সেই বিপর্যয়ের রূপ নানা দিক দিয়ে ফুটে উঠছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। সনাতন চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি—এক কথায় জীবন-দর্শন আজ পরিত্যক্ত; তার পরিবর্তে আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হচ্ছে নব মূল্যায়ন। আজকের কলকাতার সমাজজীবনে এই যে ভাঙাগড়া চলেছে, তারই একটি সুপরিসর চিত্র তুলে ধরেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'মেঘের উপর প্রাসাদ' উপন্যাসটির মাধ্যমে। এই উপন্যাস থেকেই 'ঘর' নাটকটি গড়ে উঠেছে এবং নাটকটিকে একমুখী করে বর্তমানের শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের ট্র্যাজিডিটিকে দর্শক সমক্ষে তুলে ধরবার জন্যে উপন্যাসের বহু ডালপালাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসে যা কিছু ঘটেছে, তা মূলত প্রভাত সরকারকে ঘিরে। আর 'ঘর' নাটকটিকে রাসবিহারী সরকার গড়ে তুলেছেন বর্তমান কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় গৌরাঙ্গ দের পরিবারকে কেন্দ্র করে। যদিও সুদীর্ঘ পঙ্কিল পথ ধরে তমিস্র রজনী পার হবার পরে ঐ পরিবারটির জীবনে সুখের প্রভাত সূর্যোদয়ের ইঙ্গিতে নাটকটি শেষ করার মধ্যে নাট্যরূপদাতা শ্রীসরকারের আশাবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তবু একথা মানতেই হবে যে, নাটকটি তার সীমিত পরিসরের মধ্যে বর্তমান শহুরে সমাজ-জীবনের বাস্তব নগ্ন রূপের ট্র্যাজিডিকে বহুলাংশে প্রকাশিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং এইখানেই নাটকটির সার্থকতা।

কুড়িটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এবং দুটি পর্বে বিভক্ত 'ঘর' নাটকটির মাধ্যমে গৌরাঙ্গ-পরিবারের কাহিনীটিকে বিবৃত করতে গিয়ে নাট্যরূপদাতা কোনো কোনো স্বল্প পরিসর দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, যা দর্শকের মনে মাত্র কোনো প্রশ্ন জাগানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ করেনি—যেমন প্রথম দৃশ্যটি। হয়ত এমন দৃশ্যও আছে, যেখানে দর্শকের মনে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে—যেমন পেট্রোল পাম্পের দৃশ্যটির পরে কয়েকটি দৃশ্য যাবার পর যখন কাশীর দৃশ্য আসে তখন

সঞ্চয়িতা ফিল্মস্-এর
বনজ্যোৎস্না/কাজল গুপ্ত
পরিচালনা দীনেন গুপ্ত/ফটো : অমৃত

চন্দন সিং ও চাচাজীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে অমিয় ও তৃপ্তি কেমন করে কাশীতে এল, তা দর্শকের বুঝতে অসুবিধে হয়। তবু বলব, বর্তমান কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশাপকে মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরে 'ঘর' নাটকটি একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করেছে এবং এর জন্যে এর প্রযোজক-পরিচালক-নাট্যরূপদাতা শ্রীসরকারকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই।

নাটকটিতে ছোট-বড় অনেকগুলি চরিত্র আছে এবং আনন্দের কথা এই যে, প্রতিটি

চরিত্রই সুঅভিনীত। গোবিন্দ গাঙ্গুলী (কর্তা গোরাঙ্গ), সর্বেন্দ্র (বড় ছেলে অভয়), অনুপকুমার (ছোট ছেলে অমিয়), স্বরূপ দত্ত (পরিবারের পেয়িং গেস্ট, মোটরচালক প্রভাত সরকার), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (বড় মেয়ে দীপ্তি), সুলেখা দে (ছোট মেয়ে তৃপ্তি), উমা পালচৌধুরী (মা), কণিকা মজুমদার (প্রজ্ঞা : সংস্কারের পক্ষে প্রতিযোগিনী ও মেটারনিটি হোমের প্রতিষ্ঠাত্রী, লক্ষ্মী নামক উপন্যাসের রাণী), কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ সৌমেন ঘটক-মেটারনিটি হোমের ডাক্তার), সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (কুঞ্জ বাড়ুজ্যে), কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃপ্তির পাণিপ্রার্থী কম্পাউণ্ডার করুণাময়), তপন গঙ্গোপাধ্যায় (পাড়ার মাস্তান অমল চৌধুরী), ইন্দ্রজিৎ সেন (অমিয়র বন্ধু চন্দন সিং), নির্মল ঘোষ (কাশীর মতলববাজ প্রতিবেশী নন্দলাল) প্রভৃতি প্রত্যেকটি শিল্পীই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর গৃহীত চরিত্রটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সীমিত স্থানে 'ঘর' নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের সমাবেশে রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যথাসম্ভব বাস্তব-ভাবে বিভিন্ন দৃশ্যের সমাবেশ করে শিল্প-নির্দেশক অমর ঘোষ এই দুঃসাধ্য ব্যাপারকেই সুসাধ্য করে তুলেছেন। বিভিন্ন দৃশ্য পরিবর্তনের মাঝে কোথাও যন্ত্রসঙ্গীত, কোথাও সমবেত কোলাহল বা শ্রুত-অশ্রুত কথাবার্তা, কোথাও বা আবহসৃষ্টিকারী শব্দযোজনা সুসংগত অভিনবত্বের পরিচায়ক।

বিশ্বরূপা নিবেদিত বর্তমান সমাজ-জীবনের প্রাত্যহিক আলেখ্য 'ঘর' নাটকখানি রীতিমত জনপ্রিয়তা দাবি করে। নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দ এর মঞ্চরূপ দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

যন্ত্রণাকাতর দু'টি মন

ভালোবাসার গাঙে জীবনটাকে ভাসিয়ে দেবার উদ্দেশ্য কিংবা সংকল্প নিয়েই বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়েছিল ভাস্কর ও সর্বাণী—নাটকীয় চরিত্র হিসেবে যাদের নাম বিকাশ ও বনানী। এবং সম্ভবত ভালো-বাসাকে দীর্ঘস্থায়ী করবার আশায় সর্বাণী নিজের দেহে অস্ত্রোপচার করিয়েছিল, যাতে কোনোদিন মা হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ তার দেহে ভাঙন না ধরে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত বন্ধ্যাত্বই সর্বাণী বা বনানীর জীবনে কাল হল। ওরা কেউ কাউকে যথার্থ ভালবাসতে পারল না—সদা সন্দেহে ওদের মন হয়ে উঠল বিষাক্ত। তার ওপর আবার যখন ওদের সংসারে অতিথি হয়ে-আসা ব্রতীন বনানীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেও বনানীর আন্তর বুভুক্ষাকে—যা আসলে হচ্ছে মাতৃত্বের বুভুক্ষা—মেটাতে পারল না, তখন বনানী করল তাকে গোপনে হত্যা এবং সেই হত্যার অপরাধ সে বিকাশের স্কন্ধে নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করল যথাসাধ্য।—নাটকের মধ্যে নাটক; সন্তোষ ঘোষ রচিত 'অজ্ঞাতক' নাটকে যারা আসলে হচ্ছে ভাস্কর ও সর্বাণী, নাটকের মধ্যে যে-নাট্যাভিনয় কল্পনা করা হয়েছে, সেই 'পাতা ঝরে গেল' নাটকে তারাই হয়েছে বিকাশ ও বনানী। 'পাতা ঝরে গেল' নাটকের নায়ক-নায়িকার মাঝে বিচ্ছেদের ব্যবধানকে দ্বিগুণতর করবার জন্যে যে দায়ী, সেই ব্রতীন চরিত্রটি উল্লেখ্যভাবে অনুপস্থিত এবং তার পরিবর্তে নাটকীয় পরিস্থিতিতে মোড় ঘোরাবার জন্যে আছে সীতেশদা নামধারী নাট্য-পরিচালক।

আসলে 'অজ্ঞাতক' হচ্ছে একটি 'কথোপকথন নাটক' (কনভারসেসন ড্রামা) এবং এর নায়ক-নায়িকা যাঁরা সেজেছেন, তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনেও স্বামী-স্ত্রী বলে কল্পনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত এবং নাটক-গত—দুই জীবনেই তারা আশাভঙ্গ, যন্ত্রণাকাতর, পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ ও দোষারোপকারী। জীবনে তারা ক্লান্ত, অবসন্ন, বিবেকের দংশনে মৃতকল্প।

সুন্দরভাবে পরিকল্পিত ও যথাযথভাবে আলোকনিয়ন্ত্রিত মঞ্চে এন বি এণ্টারপ্রাইজ নিবেদিত 'অজ্ঞাতক' নাটকে নায়ক, নায়িকা ও পরিচালকরূপে যথাক্রমে নিমু ভৌমিক, মমতা চট্টোপাধ্যায় এবং অশোক মিত্র তাঁদের নাট্যনৈপুণ্যের নিদর্শন দেখাতে সক্ষম হয়ে-ছিলেন। প্রযোজক ও নির্দেশকরূপে নিমু ভৌমিক এবং অশোক মিত্র সার্থক।

চিত্র-সমালোচনা

বহিপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তর্লোকের হয়ত কোথাও মিল আছে। ঝটিকা-তাড়িত হয়ে বৃক্ষশাখা যখন দ্রুত আন্দোলিত হতে থাকে, মানবহৃদয়ও হয়ত তখন বাত্যা-বিক্ষুব্ধ তরণীর মতো দোলায়মান হয়ে ওঠে। ঝঞ্ঝাঘাতে গৃহসংলগ্ন দরজা-জানালাকেও অর্গলচ্যুত হয়ে ইতস্তত আন্দোলিত হতে দেখা যায়; কিন্তু তারই সঙ্গে মানুষের মনোমন্দিরের প্রবেশপথও যে কীলকচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়, এ-সংবাদ অনেকেরই কাছে নতুন ঠেকবে। এল বি ফিল্মস নিবেদিত এবং অসিত সেন পরি-চালিত হিন্দী ছবি 'আনোখী রাত'-এর কাহিনীকার অনিল, আর ইদনানী একটি জলঝড়ের রাতে কয়েকটি চরিত্রকে একটি অট্টালিকায় সমবেত করে বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের মনের দরজাকে খুলে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আছে দুর্ধর্ষ ডাকাত বলদেব, যে একদিন অত্যন্ত সাদা-সিধা, পরোপকারী, প্রীতিপরায়ণ এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী খানসামা ছিল; কিন্তু বিবাহের পর প্রথম মিলন রজনীতেই যার প্রণয়িনী গোপা দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ায় যে সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে পৃথিবীর ওপর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। আরও আছে অনাথ আশ্রমে পালিতা প্রেমা, আশ্রম-পরিচালিকা যাকে মোটা অংকের চাঁদার বিনিময়ে এক বৃদ্ধ রায় বাহাদুরের কাছে বিবাহের নামে বিক্রয় করেন। আছে অজয় নামে একটি কবি-চিত্রকর, যার জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় প্রেমা এবং ঐ অট্টালিকার প্রৌঢ় মালিকের আদরের নাতনী রমা, যে তার দাদুকে সর্বস্বান্ত হওয়া থেকে বাঁচাবার জন্যে তার দাদুর পাওনাদার, এক মধ্যবয়সী বিপত্নীকের স্ত্রী হতে সম্মত হয়ে আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত।

ঝড়ের রাতে বিপরীতমুখী চরিত্রগুলির মনে ঝড় তুলে তাদের মনের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে যে-সব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন চিত্রনাট্যকার-সংলাপলেখক পণ্ডিত আনন্দকুমার তার অধিকাংশই যথেষ্ট স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি। ঝড়-জলের রাতটি নিশ্চয়ই একটি 'অনোখী রাত' বা অলৌকিক রাত, কারণ ঐ রাতে অট্টালিকার মালিক, তাঁর নাতনী ও প্রভুভক্ত ভৃত্য রামদাস ছাড়া পাওনাদার মদন ও তাঁর উকীলের উপস্থিতিতে আশ্রয়লাভের জন্য যুবতী স্ত্রীসহ বৃদ্ধ রায়সাহেব ও কবি-চিত্রকর অজয়ের আগমনের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা না থাকলেও তাদের আচরণ ও কথাবার্তা আদৌ আশ্রয়প্রার্থীদের অনু-রূপ নয়। এবং হুলিয়া-বেরুনো ডাকাত বলদেবের সঙ্গীবেশী মুকরী যে কৌতুকের সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে বাস্তব পরিবেশের নামগন্ধ নেই। সমস্ত কাহিনীটিকেই যেন রূপকথার কাহিনী বলে ভ্রম হয় যা কোথাও গতিহীনভাবে মন্থর ও কোথাও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে।

অভিনয়ে প্রথমে সাদাসিধা ও পরে ডাকাত বলদেও বেশী সঞ্জীবকুমার চরিত্রো-চিত নাট্যনৈপুণ্য দ্বারা দর্শকদের দৃষ্টি

বিশ্বরূপার **ঘর নাটকে** সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়/স্বরূপ দত্ত। ফটো : অমৃত

আকর্ষণ করেছেন। অজয়বেশী অজয় সাহনী এখনও কতকটা আড়ষ্টভাব ত্যাগ করতে পারেননি। রমার চরিত্রে জাহিদা ও প্রেমার চরিত্রে অরুণা ইরাণী চরিত্রোচিত ভাবপ্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। পাওনাদার মদন রূপে তরুণ বসু সার্থক অভিনয় করেছেন। মুকরী আগাগোড়া হাসাবার চেষ্টা করেছেন। অপরাপর ভূমিকাভিনয় যথাযথ।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রশংসনীয় হচ্ছে কমল বসুর সাদা-কালো ফোটোগ্রাফী এবং অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী উপযোগী শিল্পনির্দেশনা। এই দুটি বিভাগের উচ্চাঙ্গের কাজ 'অনোখী রাত'-এর প্রধান আকর্ষণ। রোশনকৃত সুর-সংযোজিত ছবির পাঁচখানি গানের মধ্যে 'মিলে ন ফুল তো কাঁটা সে দোস্তি করলি' ও 'দুলহন সে তুমহারা মিলন হোগা' গান দুখানি সুগীত।

এল বি লছমন প্রযোজিত এবং অসিত সেন পরিচালিত এল বি ফিল্মস-এর 'আনোখী রাত' অসাধারণ রাতের পরিচয় দিতে গিয়ে একটি সাধারণ ছবিতেই পর্যবসিত হয়েছে।

স্টুডিও থেকে

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয় নেমে সোজা নাক বরাবর হেঁটে গেলে রেসের মাঠের শেষ সীমা ছাড়িয়ে ডানদিকে যে ভাঙা পাঁচিল-ঘেরা জায়গাটা—আপাতত ওটাই টেকনিসিয়ান স্টুডিও। ঢুকেই বাঁদিকে হাঁটুসমান আগাছার জঙ্গলে দেখা যাবে ভাঙা সাউন্ড ট্রাক একখানা পড়ে আছে। বাঁদিক তকতকে পরিষ্কার, ছড়ানো-ছেটানো কামিনী ফুলের গাছ গোটাকয়। পা পা করে এগোলে ডাইনে চুনখসা হাড়-জিরজিরে ঘরগুলোর দরজায় বিভিন্ন প্রোডাকসনের নাম লটকানো কাঠ আর বাঁয়ে গাছেরই কন্টিনিউএশন। ঘেরা বাগানের মত ঘাসের কার্পেট ছড়ানো কিছুটা জায়গা জুড়ে। বাগানের ওপাশে অফিস। তারই পাশে রেকর্ডিং রুম।

বেশ ক'দিন পরে গিয়েছি ওই স্টুডিওয়। তাই নতুন নতুন ছোঁয়া লাগছিল চোখে। কেয়ারী-করা ফুলের বাগানটা কেন জানি না বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। চোখের সোজা যে ফ্লোর সেদিকে তাকিয়ে শূন্য। লাল রংয়ের গেঞ্জি হাফপ্যান্ট-পরা কয়েকজন বিরাট বিরাট স্ক্রীন নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। বুঝলাম নতুন ছবির সেট তৈরী হচ্ছে। এ-স্টুডিও কর্মহীন, ক্লান্ত। বিশ্রাম নিচ্ছে বুঝি। কাজ হচ্ছে না জেনেও এগিয়ে গেলাম ফ্লোরের দিকে।

অত বড় প্রকাণ্ড ঘরের তুলনায় একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে চালের সেই চুড়োয়। আধো আলো আধো অন্ধকার। বাঁদিক ঘেঁষে সেট পড়ছে। সম্পূর্ণ হয়নি এখনো। আধখানা দেখেই বুঝলাম কোটি টাকার 'মালকিন' নায়িকার ড্রইংরুম। চারদিকে ডিসটেম্পার দেয়াল। নীচু নীচু চেয়ার টেবিল। দেয়ালে সিঁড়ি-ভাঙা তাকে বাঁকুড়ার ঘোড়া, শান্তিনিকেতনের কাজ, কৃষ্ণনগরের গোটাকয় পুতুল ছড়ানো। কিন্তু মাঝখানে মোটা দড়ি দিয়ে ঝোলানো হয়েছে ঝাড়লণ্ঠন। কোন ছাদ নেই। দেয়ালের ওপর আলো রাখার জন্য চওড়া তক্তা পাতা। বড় বদখৎ।

মিস্ত্রী ঠুক ঠুক করে এখানে-সেখানে এটা-সেটা লাগাচ্ছে। আর সেই লাল গেঞ্জী প্যান্টওলা লোকগুলো মাঝে মাঝে যাচ্ছে আসছে। এই ফ্লোর সিনেমার কারখানা। মেকি হাসি-কান্নার ডিপো যেন এগুলো। রং মেখে সং সেজে মুখস্থ বলে যায় সংলাপ অভিনেতারা। পরিচালকের খুশীর মাপকাঠিতে হাসে এরা, চোখে জল আনে গ্লিসারিন দিয়ে। মুখোশের তলায় মুখ ঢেকে নতুন মানুষ সাজে সবাই। দুদিনের ফকির হয় কেউ, কেউ হয় প্রেমিক, নোংরা ফ্লোরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম—সত্যিই এ আজব জায়গা। মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ হয় এখানে। এর আগে বহুবার এসেছি এ-ফ্লোরে। কত কুশলী শিল্পীর চোখের জল মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে দেখলাম। হাজার হাজার ওয়াটের লাইটগুলো যখন বাঘের চোখের মত জ্বলে ওঠে, ক্যামেরা যখন শামুকের গতিতে তার শিকার ধরতে এগিয়ে যায় পরিচালকের লাগাম মুখে নিয়ে, তখন কিন্তু একটিবারের জন্য এসব কথা ভাবিনি। পরিচালক নায়ক-নায়িকার সঙ্গে গল্প করেছি, সময় গুজরান করেছি সময়কে মারার জন্য, তখন মনে আসেনি এ-অন্ধকার গুহার মধ্যে এত কথা এত গল্প লুকোনো আছে।

দিলীপ রায়/মাধবী মুখোপাধ্যায়
অগ্নিযুগের কাহিনী

আজ একা। শূন্য ফ্লোরের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেকে তো নতুন করে দেখছিলামই, ফ্লোরটাও যেন নতুনরূপে আমার কাছে ধরা দিচ্ছিল। কিছুদিন আগেও কাজ চলছিল দেখেছি। তখন গমগম করেছে সেট। পরিচালকের হুঙ্কার অন্যান্য সবাই-এর টুকরো টুকরো কথায় এক হাট বসেছিল এই ক'দিন আগে। এখন যেন সব প্রাণহীন। ছন্দ সুর সব কেটে গেছে। বড় বিষণ্ণ যেন।

এদিকে ডালহৌসীর রাজনীতি টালিগঞ্জে টেনে এনে নতুন এক উৎসবের মহড়া চলছে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলার সামনে। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সুসংরক্ষিত করার তোড়জোড় চলছে দু' পক্ষ থেকেই। বিবাদী বিবদমান সবাই-ই আগ্রহী চিত্রশিল্পকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু স্টুডিওর অবস্থা দেখে মনে হয়, অবস্থা দিনের পর দিন অবনতির দিকেই। ইঁটের দেয়াল ভাঙা টিনের চালা মাথায় নিয়ে জানে না রাজনীতির আবর্তে কি জল ঘোলাই না হচ্ছে তাদের প্রাণটুকু নিয়ে। ভাগ্য অনিশ্চিত। তবু এখনও দাঁড়িয়ে আছে অনেক আশা নিয়ে। পুজো না-হওয়া প্রতিমার মত প্রাণহীন যেন। ষোড়শ উপাচারে নৈবেদ্য তৈরী, পুরুত আসতে বাকি শুধু, পুরুত এখন এসপ্ল্যানেডের পরিবেশকের বাতানুকূল ঘরে মন্ত্র মুখস্থ করতে ব্যস্ত। এদিকে মূর্তি পুজো না পেয়ে ক্লান্ত।

বেরিয়ে এলাম ফ্লোর থেকে। ডানদিকের বাঁধান চাতালটায় বসতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। ফ্লোরটা অন্ধকারে তাই ডুবে যাচ্ছে যেন।

মনে হল, আলো চাই, প্রাণ চাই, একে বাঁচাতে হলে এক্ষুনিই চাই। নইলে হয়ত আর...। কাজ চাই, নতুন কাজ শুরু হোক। প্রাণ যদি না থাকল তাহলে শুধু মরা দেহটা টানাহ্যাঁচড়া করে কি লাভ?

•

মাভৌর ইন্দ্রপুরীর কাণ্ডকারখানা দেখবার জন্য সংখ্যার পর সেদিন ঢুকেছিলাম ইন্দ্রপুরীতে। কোন পরিবর্তন নেই—শুধুমাত্র একপোঁচ রঙ পড়েছে এই যা। ভেতরের লোহার গেট পেরিয়ে ফ্লোরে ঢুকতেই দেখি যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা কেউই পরিচিত নন খুব একটা—না ক্যামেরাম্যান, না পরিচালক, না অভিনেতা! একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপরিচিতদের কাজ লক্ষ্য করছিলাম। স্যুটিং জোনের চারপাশে প্রকাণ্ড চারটে পাখা ঘন ঘন অ-অ-ন্ করে ঘুরে চলেছে। কথাবার্তা খুব একটা কানে আসছিল না। তবে লক্ষ্য করলাম, যিনি সেটের শিল্পী, তিনিই সবকিছু সবাইকে বলছেন। বুঝলাম পরিচালকই ইনি। এগিয়ে গেলাম ডানদিকের অন্ধকারে বসে থাকা ভদ্রলোকের দিকে। নিজের পরিচয় দিলাম বাংলায়। উনি বুঝলেন না বুঝি কিছু। বাধ্য হয়ে সাগরপারের ভাষার শরণাপন্ন হতে হল। এবার মুখ খুললেন ভদ্রলোক। ওনার কাছ থেকেই জানলাম—ও'রা এসেছেন আসাম থেকে স্যুটিং করতে, ভালো স্টুডিও ও'দের গৌহাটিতে নেই- তাই। ছবির নাম 'ওপর মহলা'। পরিচালক ও নায়ক হচ্ছেন আমার অনুমান-করা সেই ভদ্রলোক। নাম জিতেন্দ্র শর্মা। পরিচয় হল—আসামের চলচ্চিত্রের দুর্গতির কথা জানালেন অনেক। ভূপেন হাজারিকার প্রশংসা শুনলাম খুউব এ'র মুখে। শ্রীশর্মার কাছেই জানলাম শ্রীহাজারিকার নতুন ছবি 'ঝিকিমিকি বিজুলি'র কাজ শেষ হয়ে গেছে, মুক্তি পাবে শীগ্‌গির। এ'দের কাজ দেখে কিন্তু একটিবারও মনে হয়নি অসমীয়া আর বাঙালীদের মধ্যে ফারাক কিছু আছে বলে—বিশেষ করে ছবি তৈরীর কায়দায়।

গত শুক্রবার ২ মে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এম বি প্রোডাকসন্সের প্রথম প্রয়াস নোঙর ছবির শুভ মহরৎ উদ্‌যাপিত হয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ স্মিথ-এর সভাপতিত্বে। রঞ্জিৎ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মোহন বিশ্বাস। মহরৎ-শিল্পী নিরঞ্জন রায় ও নবাগতা মণিকা দত্তকে নিয়ে ক্যামেরার সুইচ অন করেন চিত্রশিল্পী বিভূতি চক্রবর্তী। ছবির সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন তরুণ সুরকার অজয় দাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ছবির সম্ভাবনাময়ী নবাগতা নায়িকা মণিকার বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় থাকছেন একজন সর্বভারতীয় নায়ক। ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে।

পরিচালক হিরন্ময় সেন 'বালক গদাধরের' চিত্রগ্রহণের কাজ সমাপ্ত করে বর্তমানে সম্পাদনায় ব্যস্ত রয়েছেন। 'বালক গদাধর'-এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক হিরন্ময় সেন নিজেই। সংগীতগ্রহণ করেছেন অতীন ঘোষ, চিত্রগ্রহণে বিভূতি চক্রবর্তী এবং সম্পাদনায় শিব ভট্টাচার্য। শ্রেঃ মাঃ সৌমিত্র, কুমারী চুমকী, ছায়া দেবী, গীতা দে, স্বপনকুমার, নৃপতি চ্যাটার্জি, বঙ্কিম চৌধুরী, অমরেশ দাস, বীরেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি।

শুভরূপে প্রযোজিত বনফুলের শিককাবাব নাটকে পীযূষ দাশগুপ্ত ও দিলীপ ভট্টাচার্য।

গত মাসের শেষ থেকে এক সপ্তাহের চিত্রগ্রহণ করেছেন শ্রীরঞ্জিৎমল কাংকারিয়ার প্রযোজনায় পরিচালক বীরেশ্বর বসু এবং উৎপল দত্তকে (কাপালিক) নিয়ে রীতিমত চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ করেছেন। দুখানি চিত্রই পরিবেশনায় আছেন শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স।

মঞ্চাভিনয়

বাংলার নাট্যানুরাগীদের কাছে 'শুভরূপ' একটি নতুন নাম। এই নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই খুব সংগত কারণে আমরা ভেবেছিলাম যে এর শিল্পীরা চলতি নাট্যানুশীলন পদ্ধতিতে একটা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের নিষ্ঠাজড়ানো প্রয়াস নিয়োজিত করবেন এবং প্রথম প্রযোজনাতেই সে স্বাক্ষর চিহ্নিত হবে। কিন্তু অপ্রিয় হোলেও একথা বলছি, নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে 'শুভরূপে'র প্রথম পদক্ষেপ আমাদের অনুভবকে প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার সীমায় পৌঁছে দিতে পারেনি। যদিও শুরুতেই সামগ্রিক সার্থকতার পরিমাপ বিচার করা যায় না, কিন্তু উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আভাস তো বর্তমানের বিক্ষিপ্ততায় কিছুটা স্ফুটতর হয়ে ওঠে। শুধু সংঘবদ্ধ অভিনয়ের শৈথিল্যের জন্য নয়, নাটক তিনটি (যযাতি, শিককাবাব, গুপ্তবিদ্যা) নির্বাচনেও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও নতুন কিছু করার উদ্যম ছায়া পায়নি। 'রঙমহলে' পরিবেশিত এই তিনটি একাংকিকার সাম্প্রতিক প্রযোজনা বোধহয় তাই কোন সম্ভাবনাই তুলে ধরতে পারলো না।

প্রথম নাটকের নাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'যযাতি'। বলতে দ্বিধা নেই নাটকটির বিষয়বস্তুর মধ্যে যে মহত্ত্ব ছিল নাট্যসংঘাতে তা এতটুকুও ফুটে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া একজন বিলেতফেরত ব্যারিস্টার কি করে বলতে পারেন যে তিনি তাঁর স্ত্রী ও ছেলের অমানুষিক তিরস্কার মুখ বুজে সহ্য করে যান। ব্যাপারটা আমাদের বোধের বাইরে থেকে গেছে। আর তারপর চাকরীর খোঁজে আসা মেয়েটির কাছে তিনি যে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন তাও বোধহয় মানসিক সংঘাতের একটা পরিণত মুহূর্তে আসতে পারেনি। নাটকে ব্যবহৃত সংলাপ ও (বিশেষ করে ব্যারিস্টারের ছেলের) মাঝে মাঝে আমাদের রুচিবোধকে আহত করে। অভিনয়ের দিক থেকেও 'ব্যারিস্টার' ও মেয়েটির চরিত্রে বিমল ব্যানার্জী ও সন্ধ্যা মজুমদার এতটুকু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

দ্বিতীয় নাটক বনফুলের 'শিককাবাব'। নাটকটির মধ্যে যে হাসির এক উচ্ছলতা আছে, শিল্পীদের অভিনয়ে তা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বলা যেতে পারে এই নাটকে কিছুটা প্রাণবন্ত অভিনয়ের নজীর আছে। জ্যোতিপ্রকাশের 'জীবনধন' একটি স্মরণীয় চরিত্র-চিত্রণ। আগের নাটকের ব্যারিস্টাররূপী বিমল ব্যানার্জী এখানে পান্নালালের ভূমিকায় বিজন সান্যালকে মাঝে মাঝে আড়ষ্ট মনে হয়েছে।

শেষ নাটক দুলেন্দ্র ভৌমিকের 'গুপ্তবিদ্যা' সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখম'-এর একটি গল্প অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। এই নাটকের কোন স্বকীয় গতি লক্ষ্য করতে পারিনি তাই সামগ্রিক অভিনয়ও একঘেয়েমির দোষে দুষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন: জ্যোতিপ্রকাশ, নির্মল রায়, পরিতোষ দে, পীযূষ দাশগুপ্ত, দিলীপ ভট্টাচার্য, সুজিত কর, বিজন সান্যাল, গোবিন্দ ভৌমিক, দিলীপ দত্ত।

নির্দেশক হিসেবে জ্যোতিপ্রকাশ নিষ্ঠার পরিচয় দিতে বহুভাবে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নাটক তো সংঘবদ্ধ সৃষ্টি। অন্যান্য শিল্পীরা নির্দেশকের চিন্তার সঙ্গে না চললে, নাটক কি করে রসোত্তীর্ণ হোতে পারে।

বাংলা নাটকের আসরে 'শুভরূপ'কে অভিনন্দন না জানানোর কোন কারণ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর শিল্পীদের এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে 'আজকের সিরিয়াস থিয়েটারের যুগে কোনরকমে মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বললেই চলবে না, প্রতিষ্ঠার উৎস সেখানে নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

'চতুর্মুখ' নাট্যসংস্থা তাঁদের বহু প্রশংসিত নাটক 'জনৈকের মৃত্যু'র একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন আগামী ২৮ মে, শনিবার বেলা আড়াইটায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে।

আর্থার মিলারের 'ডেথ অফ এ সেলসম্যান' অবলম্বনে সাধন সেন নাটকটি রচনা করেছেন। নির্দেশনার দায়িত্ব অসীম চক্রবর্তীর ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন অজিত মিত্র ও অশোক দে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চিত্রা মণ্ডল, ছবি তালুকদার, সুলেখা দে, লোকনাথ চন্দ্র, বারীন মুখোপাধ্যায়, দুলাল মিত্র, অশোক রায়, অলোক দে, সুশীল গাঙ্গুলী, সুধীন কর্মকার, অনুপম মজুমদার, কল্যাণ সেন, দেবু কর ও অসীম চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'চতুর্মুখে'র আগামী প্রযোজনা হোল অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পোস্টমাস্টারের বৌ' ও সাধন সেনের জন অসবোর্ণের একটি নাটকের বাংলা অ্যাডাপটেশন।

বালী চৈতলপাড়া কিশোর নাট্যসংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নীরেন সেনের 'সূর্যাচল' ও নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর 'বিপ্লব' নাটক দুটি সম্প্রতি মঞ্চস্থ হোল। নাট্যনির্দেশনায় প্রহ্লাদ গাঙ্গুলী তাঁর পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন: শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত, পার্থ চ্যাটার্জী, অশোক গাঙ্গুলী, সৌমেন্দু চ্যাটার্জী, সুভাষ দাস, সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল ব্যানার্জী, প্রদীপ গাঙ্গুলী, শিবনাথ সেনগুপ্ত, জয়ন্তী সেনগুপ্ত, ভোলানাথ চক্রবর্তী, হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়, তপন গাঙ্গুলী।

সম্প্রতি 'রূপতরঙ্গ' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দ শ্রীঅংশুমান প্রামাণিকের 'নিহত গোলাপ' নাটকটি অভিনয় করেন।

নির্দেশনায় নাট্যকার স্বয়ং আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় রাখেন। সেদিনকার অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হোলেন লক্ষ্মীনারায়ণ শীল, পুষ্পরাণী দাস, বেলারাণী শীল, মঞ্জুরাণী বসু ও অংশুমান প্রামাণিক।

ম্যাকসিম গর্কীর জীবনের প্রথম প্রকাশিত গল্প মাকার চুদ্রা অনুপ্রাণিত পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং নির্দেশিত সূর্য-চেতনা ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় গত ১২ মে সন্ধ্যায় মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হল। অভিনয়ে ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের বলিষ্ঠ শিল্পী-দল শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় বাংলা দেশের প্রথম সারির নাট্যসংস্থার সমকক্ষ শক্তির এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে বলতে দ্বিধা নেই। নাটকের বিভিন্ন বিভাগ মঞ্চ পরিকল্পনা, আলো, সংগীত, রূপসজ্জা এবং শব্দপ্রক্ষেপন বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। সামগ্রিকভাবে সফল প্রযোজনা 'সূর্য-চেতনা' একটি অবশ্যদ্রষ্টব্য নাটক বললে বেশী বলা হবে না।

গত ২৬ এপ্রিল শনিবার এ-ভি-বি ক্লাবের (দুর্গাপুর) যোজনে স্থানীয় বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা কল্লোল থিয়েটার গ্রুপ শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত নাটক 'শেষ থেকে শুরু' ক্লাব প্রাঙ্গণে (মুক্ত অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে) মঞ্চস্থ করেন। এবং দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে সমর্থ হন। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসমীর সেনগুপ্ত। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন সর্বশ্রী ধীরা রায়, নির্মলকুমার নন্দী, বিজয় চ্যাটার্জী, সরোজ মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন চৌধুরী, শান্তি ঘোষ দস্তিদার, বিপ্লব দত্ত, দ্বিজেন ঘোষ, অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়, জহরলাল কুণ্ডু, বিধান মুখোপাধ্যায়, মাঃ মন্টু ঘোষাল ও পরিচালকদ্বয়।

বিবিধ সংবাদ

শহরের দিকে দিকে যে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল তার মধ্যে উত্তরপাড়ার রূপকল্প সংস্থা যে বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তা একদিকে যেমন সত্যিই বিচিত্র অন্যদিকে তেমনি আকর্ষণীয়। ভোর ছ'টায় উত্তরপাড়া থেকে যাত্রা শুরু। জোড়াসাঁকো, গিরিশ পার্ক, মহাজাতি সদন, চৌরঙ্গী প্রভৃতির রাস্তা ধরে আবার ফিরে আসে উত্তরপাড়ায়। পথে শুধু আবৃত্তি সংগীত আর নাটকের টুকরো টুকরো চরিত্রের টুকরো সংলাপ। এই বিচিত্র অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন সুমন্ত, পার্থ, তিমির, দিলীপ, পরিমল, বাবুল, মিতা, সুজাতা, প্রকৃতি, অমল, রণেশ, মুকুল, প্রণতি, কুমকুম, কৃষ্ণা, কল্পনা, সুশোভন, বিদ্যুৎ ও আরও অনেকে।

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা গিরিশ-নাট্য সংসদ-এর ব্যবস্থাপনায় গত ২৯ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গিরিশ ভবনে আয়োজিত গিরিশ স্মারক আলোচনা সভার তৃতীয় অর্ঘ্য প্রয়োগশিল্পী গিরিশচন্দ্র বিষয়ে ভাষণ দেন নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পৌরপ্রধান শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে। মহাকবির প্রয়োগ-কৌশল প্রসঙ্গে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীগুপ্ত বলেন যে, বাংলা মঞ্চের অবস্থা যখন কিছুই আশাপ্রদ ছিল না সে যুগে গিরিশচন্দ্র নাটকের সার্থক অভিনয় ও কলা-কৌশলের মধ্যে চমৎকারিত্ব আনতে সচেষ্ট ছিলেন। সার্থক প্রয়োগশিল্পী হিসাবে তাই গিরিশচন্দ্রের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শ্রীদে মহাশয় সংসদের উদ্যোগে এই স্মারক আলোচনানুষ্ঠানের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, পূর্বসূরীদের স্মরণ করা ও শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যেই ভবিষ্যতের সার্থক পথ চিহ্নিত। সংসদের পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত জানান এবং এই স্মারক আলোচনার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন।

মোমিনপুরে শহরের বিশিষ্ট সংগীত-সংস্থা খিদিরপুর 'সুরবিতান' এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মাধ্যমে এঁদের সমাবর্তন উৎসব উদযাপন করেন। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীরবীন বসুর প্রযোজনায় এক রবীন্দ্রগীতিবিচিত্রা পরিবেশিত হয়। সংস্থার প্রধান শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক সভায় ভাষণ দেন এবং সংস্কৃত সংগীত পরিবেশন করেন।

কলকাতার প্রাক্তন শেরীফ্ শ্রীসুরেশ-চন্দ্র রায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রসঙ্গে সুরবিতানের সাংস্কৃতিক কৃষ্টির প্রশংসা করেন।

শ্রীমতী প্রতিমা রায় পারিতোষিক বিতরণ করেন।

আগামী ৩রা জুন সন্ধ্যা ৬।। ঘটিকায় মহাজাতি সদনে তরুণ অপেরা কর্তৃক হিটলার অভিনীত হবে। হিটলারের নাট্যরূপ শ্রীশম্ভু বাগ এবং পরিচালক শ্রীঅমর ঘোষ। এই নাটক যাত্রাজগতে বিশেষ আলোড়ন

গৈরিক সংঘের পঁচিশ বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ।

সৃষ্টি করেছে। হিটলারের অভিনয় সাফল্য তরুণ অপেরার টিমওয়ার্ক বিশেষ উপভোগ্য।

গত ১ বৈশাখ দমদম আঞ্চলিক ব্রতচারী নায়কমণ্ডলীর পরিচালনায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নববর্ষ উৎসব দমদম ক্লাইভ হাউস ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন শ্রীঅসীমাভ আইচ (এন. এফ. সি. শিক্ষামন্ত্রক)। অনুষ্ঠানে ব্রতচারী-ভাই-বোনদের সমবেত ব্যায়াম ও নৃত্য প্রদর্শন বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ব্রতচারী ব্যায়াম পরিচালনা করেন শ্রীদিলীপ মজুমদার।

১০ মে শনিবার বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনস্থ গৈরিক সংঘের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, গৈরিক সংঘের সঙ্গে তাঁর বহুকালের ঘনিষ্ঠতা—কারণ তিনি একদা এই পল্লীর বাসিন্দা ছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যজীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা এইখানেই সৃষ্ট হয়। প্রধান অতিথি শ্রীঘোষ গৈরিক সংঘের ঐতিহ্যময় আদর্শের কথা উল্লেখ করেন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে সর্বশ্রী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুবীর সেন, নির্মলেন্দু চৌধুরী, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেন, পূরবী মুখোপাধ্যায়, মন্টু ভট্টাচার্য ও ভি বালসারা।

মলয় গীত-বীথির বার্ষিক উৎসব ও পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠিত হলো বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে। উদ্বোধক, প্রধান অতিথির ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ, ডঃ রমা চৌধুরী ও ওস্তাদ দাবীর খাঁ। সকলেই সংক্ষিপ্ত ভাষণ অতি সুন্দরভাবে পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। প্রতি ছাত্রীকে মেডেলের পরিবর্তে ভাল ভাল বই উপহার দেওয়া হয়। 'বোবা বউ' নাটকের অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। বোবা বউয়ে অংশ গ্রহণ করে শ্রীমতী কল্পশ্রী মিত্র তার সুন্দর অভিনয় সকলে মুগ্ধ হয়। রথিন হালদার নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব নেন—সকলেই খুব ভালো অভিনয় করেন। পরের দিন এই প্রতিষ্ঠানের শিশু ছাত্রীরা স্বার্থপর দৈত্য অপূর্ব নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে দর্শকদের অভিভূত করে। সমবেত ধ্রুপদ গান অশোক রায়ের পরিচালনায় হয়। প্রথম দিন নিখিলেশ সেনের পরিচালনায় অতুলপ্রসাদ নজরুল সংগীত খুবই সুন্দরভাবে পরিবেশ করে ছাত্রছাত্রীরা। কালুশঙ্করের পরিচালনায় উড়ে ও উড়োন নৃত্যে, শ্রীমতী সুস্মিতা মিত্রের পরিচালনায় কথকনৃত্য পিয়া ভট্টাচার্য, ভারতনাট্যম, শ্রীমতী মধুমিতা গোস্বামীর শিক্ষার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। পরে সংগীতপরিচালক ও চিত্র-পরিচালক হীরেন বসুর 'ফাগুয়া' নৃত্যনাট্য রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর নৃত্যপরিচালনার সার্থক হয়ে ওঠে। গ্রন্থনায় অভিভূত করে তাময় চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শেলী সান্যাল।

সম্প্রতি কলিকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদের ২৪ পরগণার নলকুড়ায় একটি শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এই শাখার সদস্যগণ গত ১৭ই মে নলকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যানে মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত টিপু সুলতান নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলেও প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এই অভিনয়কে সার্থক বলা যায়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন অখিল বিপ্রদাস, শান্তু পাল, বাসুদেব দিলীপ কালীকৃষ্ণ রঘুনাথ বাসুদেব প্রতুল, অসিত, প্রণব, সমর, স্বপন, নিতাই, সন্ধ্যা, স্বপ্না, বুলা প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ। নাট্যনির্দেশনায় মুলকেন্দ্রের সম্পাদক শ্রীধীরেন চক্রবর্তী ছিলেন। ব্যবস্থাপনায় শ্রীসুশীল বসু, শ্রীসুনীত বন্দ্যোপাধ্যায়, আবহসংগীত পরিচালনায় শ্রীশশাঙ্ক মুখোপাধ্যায় ও শ্রী নিমাইচাঁদ স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। এই শাখার সম্পাদক শ্রীশিশির বন্দ্যোপাধ্যায় ও কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় সহস্রাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে অভিনয়ানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠে।

আঙ্গুরবালা দেবী লোকান্তরিত

বিশিষ্ট নিয়মিত মঞ্চশিল্পী এবং মহিলা শিল্পীমহলের অন্যতম সভ্যা শ্রীমতী অঙ্গুরবালা দেবী গত শুক্রবার রাত ৮-৩০টায় ভান্দুর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত একমাস যাবৎ মহিলা শিল্পীমহলের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে ছিলেন তিনি। শেষসময়ে কানন দেবী, মলিনা দেবী, সরযূ দেবী, নীলিমা দাস, তপতী ঘোষ, সাধনা রায়চৌধুরী এবং মহিলা-শিল্পীমহলের আরো অনেক সভ্যা তাঁর কাছে থেকে আত্মীয়ের অভাব পূর্ণ করেছেন।

যাঁদের ভোলা যায় না

শংকরবিজয় মিত্র

অনেক রেকর্ডের ভাঙা-গড়ায় ও অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনায় ভরা মেক্সিকো ওলিম্পিকে খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদদের অন্যতম অল অর্টার যেমন ডিসকাসে পর পর চারটে স্বর্ণপদক জয় করে এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড করেছেন তেমনি রেকর্ড করেছেন বব বীমন দীর্ঘ লম্ফনে ২৯ ফুট ২২ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে। আবার শত মিটার দৌড়ে দশ সেকেণ্ডের গণ্ডী ভেঙে (৯'৯ সেঃ) জিম হাইন্স মেয়েদের মধ্যে পরপর দুটো ওলিম্পিকে শত মিটার দৌড়ে উইলিয়াম টিয়াসা স্বর্ণপদক জয় করে নতুন নজির স্থাপন করেছেন। এঁদের কথা যেমন সহজে ভোলবার নয়, তেমনি ১৮৯৬ সালের ওলিম্পিক থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ওলিম্পিকের জয়-পরাজয়ে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের কথা বলছি এখানে।

ঊনিশ শতকের শেষাশেষি নব পর্যায়ে বিশ্ব ওলিম্পিক আরম্ভ হয়ে বিশ শতকের শেষার্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনেক নতুন ক্রীড়া এতে সংযোজিত হয়েছে, বৈচিত্র্যে ও পরিকল্পনায় যা অভিনব। কিন্তু ম্যারাথন দৌড়ের আকর্ষণ ও আভিজাত্য আজও অম্লান। ম্যারাথন মেক্সিকো ওলিম্পিকেও সকলের সেরা আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল। খৃস্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে গ্রীসের ম্যারাথন গ্রামে পারস্য বাহিনীর পরাজয়-বার্তা বহন করে গ্রীক সৈনিক ফিডিপাইডিস ৪০ কিলোমিটার পথ একদৌড়ে অতিক্রম করে রাজধানী এথেন্সে বয়ে নিয়ে যান এবং সেই অসাধারণ শৌর্যের স্মরণে ১৮৯৬ সালে নবপর্যায়ে ওলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড় প্রবর্তন করা হয়। এই প্রথম ওলিম্পিকে গ্রীসের জন্য একমাত্র স্বর্ণপদক জয় করেন স্পিরিডন লুই সেই ম্যারাথন দৌড়েই। দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর সঙ্গে তাঁর সময়ের ব্যবধান ছিল সাত মিনিটেরও বেশী। ওলিম্পিকের ইতিহাসে এই ব্যবধান রেকর্ড সময় হয়ে আছে। বিজয়ী লুই ছিলেন একজন মেষপালক। কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি ডাকহরকরা ছিলেন। সে যাই হোক, ম্যারাথন দৌড়ের শেষে স্টেডিয়ামের মধ্যে জনতা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়।

গ্রীক সরকার তাঁকে এক কৃষি ফার্ম উপহার দেন। দৌড়বীর লুইকে বিপুল জনসমাবেশে সর্বশেষে দেখা যায় ১৯৩৬ সালে বার্লিন ওলিম্পিকে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে তিনি বার্লিন ওলিম্পিকে এসেছিলেন। ওলিম্পিকের প্রথম বিজেতা হিসেবে এবং সময়ের ব্যবধানের রেকর্ড করার জন্য লুই আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ম্যারাথন দৌড়বীরদের মধ্যে আর একজন এক অনন্যসাধারণ সম্মানের অধিকারী। ইনি হচ্ছেন ইতালীর ডোরাণ্ডে পিয়েত্রি। মূল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েও তিনি পরে বীরের সম্মান লাভ করে কীর্তিমান হন। ১৯০৮ সালে লণ্ডনে হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে যে বিশ্ব ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাতে পিয়েত্রি সর্বপ্রথম ম্যারাথনের শেষ সীমারেখা অতিক্রম করেও প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল হন—পথের মাঝে তিনি ডাক্তার ও কর্মকর্তাদের সাহায্য নিয়েছিলেন বলে। পিয়েত্রি প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় দৌড় সমাপ্ত করেছিলেন। তাঁর থেকে ৩২ সেকেন্ড পরে দৌড় সমাপ্ত করে আমেরিকার জন হেইস (দু ঘন্টা ৫৫ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড) স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হন। ওলিম্পিকের রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যে অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়, সাহস ও সংকল্প নিয়ে ইতালীর দৌড়বীর এই ম্যারাথনে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন কর্মকর্তা ও ক্রীড়ানুরাগী মহলকে তা মুগ্ধ ও বিচলিত করে। তাই পরবর্তী কালে তাঁরা তাঁকেই বিজয়ীর সম্মান দিতে উদ্যোগী হন। আনুষ্ঠানিকভাবে হেইসকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলেও পিয়েত্রিকে তাঁরা অভিনব উপায়ে এই সম্মান বর্ষণ করলেন। ওলিম্পিক পুরস্কারের অনুরূপ আর একখানা পুরস্কার তৈরী করে তাঁরা পিয়েত্রিকে দিলেন।

ওলিম্পিকের ইতিহাসে আর একজন ক্রীড়াবিদ সাফল্যের স্বীকৃতি পেয়েও পরবর্তীকালে বঞ্চিত হয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইনি হলেন আমেরিকার ওকলাহোমার জিম থর্প। ওলিম্পিকের কঠিনতম প্রতিযোগিতা ডেকাথেলনে ১৯১২ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বিবেচিত হন এবং যথারীতি স্বর্ণপদকও প্রাপ্ত হন। ওলিম্পিক অনুষ্ঠান চুকে যাবার পর খবরের কাগজে সংবাদ বেরোয় জিম থর্প ওলিম্পিকের তিন বছর আগে (১৯০৯ সালে) পেশাদার হিসেবে বেস বলে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মাসিক ৬০ থেকে ১০০ ডলার মাইনে নিয়েছেন। এই ঘটনা প্রকাশিত হবার পর ওলিম্পিক কর্তৃপক্ষ ডেকাথেলন প্রতিযোগিতার বিজেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ডেকাথেলন স্বর্ণপদক প্রাপ্তির প্রায় ছ-সাত মাস পরে তাঁর ঐ বিজয়ীর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করেন। ১৯১২ সালের ডেকাথেলন প্রতিযোগিতায় জিম অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তার রেকর্ড ছিল এইরূপ—১০০ মিটার দৌড় ১১'২ সেকেণ্ডে, বাইশ ফুট সোয়া তিন ইঞ্চি অতিক্রম করেছিলেন দীর্ঘ লম্ফনে, ছ ফুট পোনে দু ইঞ্চি লাফিয়েছিলেন উচ্চ লম্ফনে এবং হার্ডল রেসে (১১০ মিটার) বিজয়ী হয়েছিলেন ১৫'৬ সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। শুধু তাই নয় হার্ডল রেসে দৌড়ানোর কিছুক্ষণ পরেই তিনি ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান ফ্রেড কেলিকে পরাজিত করেন। সাধারণ হার্ডল রেসের প্রতিযোগিতায় ১৫ সেকেণ্ডে এই দৌড় শেষ করে বেসরকারী বিশ্ব রেকর্ডের সম্মানাধিকারী হন। ডেকাথেলনে তিনি মোট ৬,৯৭৬ পয়েন্ট অর্জন করেন।

পনেরো বছরের মধ্যে আর কেউ তাঁর এই রেকর্ড স্পর্শ করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও তাঁর ওলিম্পিক মর্যাদা ও মেডেল কেড়ে নেওয়া হয়। পরে সুইডেনের হিউগো উইসল্যাণ্ডারকে সরকারীভাবে চ্যাম্পিয়ান বলে ঘোষণা করা হয়।

পোলভল্ট ক্রীড়া কৃতিত্বে আমেরিকা এমন এক নজীর সৃষ্টি করেছে যে, এর স্বর্ণতিলক একমাত্র মার্কিণ ললাটেই শোভা পাচ্ছে। পোলভল্ট বলতে আমেরিকারই সম্পত্তি বোঝায়। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে স্বর্ণপদক আর কোন দেশ নিতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে ষোলটি ওলিম্পিকে সতেরোটি স্বর্ণপদক করায়ত্ত করেছে আমেরিকা। এর কারণ ১৯০৮ সালের ওলিম্পিকে আমেরিকার দুজন পোলভল্ট প্রতিযোগী—আলফ্রেড গিলবার্ট ও এডোয়ার্ড কক বার ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতা লম্ফন করলে

দুজনকেই বিজয়ীর স্বীকৃতি হিসাবে যুগ্মভাবে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯২০ সালে এ্যান্টোয়ার্পে যে ওলিম্পিক অনুষ্ঠান হয় তাতেও আমেরিকা তার পূর্ব গৌরব বজায় রাখে। আমেরিকার খ্যাতিমান পোলভল্টার ফ্র্যাংক ফস ১৩ ফুট ৫ ইঞ্চি অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ডের সৃষ্টি করেন। ফসই একমাত্র পোলভল্টার যাঁর ওলিম্পিক রেকর্ড বিশ্ব রেকর্ডকে হার মানায়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ফ্র্যাংক ফস পোলভল্টে এক অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। শুধু তাই নয় তিনি পনেরো ইঞ্চিরও ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে আর এক অনতিক্রম্য নজির স্থাপন করেছেন। ওলিম্পিকে আমেরিকার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও বিশ্ব রেকর্ডের ক্ষেত্রে পোলভল্টে কয়েকজন বে-মার্কিণী প্রতিযোগীরও আবির্ভাব ঘটেছে। ১৯২২ সালে নরওয়ের চার্লস হফ মার্কিণ পোলভল্টার ফ্র্যাংক ফসের বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রম করেন। ১৯২৭ সালে আমেরিকা আবার এই সম্মান ফিরিয়ে আনে এবং সেই থেকে এ পর্যন্ত (অল্প সময় ব্যতিরেকে) আমেরিকাই এতে শীর্ষাসন দখল করে এসেছে। ১৯৬২-৬৩ সালে ফিনল্যান্ডের পেন্টি নিকুলা মাত্র স্বল্প সময়ের জন্য চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। আমেরিকা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় সে সম্মান ছিনিয়ে নেয়। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো ওলিম্পিকেও ইউরোপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেও বব সিগ্রীন আমেরিকার এই প্রাধান্য বজায় রাখতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পশ্চিম জার্মাণীর শিপ্রোওস্কির চেয়ে মাত্র আধ ইঞ্চির ব্যবধানে তিনি জয়ী হন।

ওলিম্পিকে আমেরিকার দৌড়বীরদের সর্বকালে প্রাধান্য দেখা গেলেও ১৯২৮ সালে আমস্টারডামের ওলিম্পিকে আমেরিকার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার দিক থেকে এক রেকর্ড। এই ওলিম্পিকে আমেরিকার দৌড়বীরেরা ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে বিশ্ব রেকর্ড (৪১ সেকেন্ড) স্থাপন করলেও এই দেশের কোন দৌড়বীয়া ১০০ মিটার বা ২০০ মিটার দৌড়ে কোন পদক জয় করতে পারে নি। এই ওলিম্পিকে কানাডার পার্সি উইলিয়ামস ১০-৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে শত মিটার দৌড়ে এবং ২১-৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে দুশো মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করেন। বর্ষণসিক্ত মাঠে তাঁর এই সাফল্য অসাধারণ কৃতিত্ব বহন করে। এই দু বিষয়েই বৃটেন দ্বিতীয় স্থান দখল করে। শত মিটারে রৌপ্যপদক পান জ্যাক লন্ডন এবং দুশো মিটার দৌড়ে রৌপ্যপদক পান ওয়াল্টার র‍্যাঙ্গেলি। ক্যানাডীয় দৌড়বীর পার্সি উইলিয়ামস ১৯৩০ সালে ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হন ১০-৩ সেকেন্ডে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। এম্পায়ার গেমসে ঐ বছর তিনি শত গজ দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান হন।

১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ওলিম্পিক গেমস মিলড্রেড 'বেব' জাহারিয়াস নাম্নী অষ্টাদশী তরুণীর অসাধারণ সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে যুগের সেরা নারী এ্যাথলিটরূপে 'বেব' বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ঐ ওলিম্পিকে তিনি দুটি সোনা ও একটি রূপোর মেডেল লাভ করেন এবং মেডেল জয়ের সঙ্গে তিনটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। ৮০ মিটার হার্ডল রেসের প্রাথমিক পর্যায়ে (হিটে) ১১-৮ সেকেন্ডে দৌড়িয়ে যে রেকর্ড করেন ফাইনালে আবার নিজেই তাঁর সেই রেকর্ড অপেক্ষা এক সেকেন্ড কম সময়ে দৌড়িয়ে আবার নয়া নজিরের (১১-৭ সেঃ) সৃষ্টি করেন। উচ্চ লম্ফনে তিনি রৌপ্যপদক পেলেও স্বর্ণপদক বিজয়িনী জীন শার্লির সমান উচ্চতা লঙ্ঘন করেন। এই উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৫¼ ইঞ্চি। মিলড্রেড এই ওলিম্পিকে বর্শা নিক্ষেপে (জেভেলিন থ্রো) ১৪৩ ফুট ৪ ইঞ্চি অতিক্রম করে চ্যাম্পিয়ান হন। ওলিম্পিকের পর তিনি ডিসকাস ছোঁড়ায় লস এঞ্জেলসের স্বর্ণপদক বিজয়ের দূরত্বকেও ছাপিয়ে যান। পরবর্তী কালে মহিলাদের গলফ খেলায় তিনি অনন্যসাধারণ খেলোয়াড় বলে পরিগণিত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি আমেরিকার এ্যামেচার চ্যাম্পিয়ান এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে আমেরিকার গলফের চ্যাম্পিয়ান হন। মাঝখানে ১৯৪৭ সালে তিনি ব্রিটিশ গলফে এ্যামেচার চ্যাম্পিয়ানসিপ অর্জন করেন। এ্যামেচার অবস্থায় খেলাকালীন তিনি মোট ৬৩৪টি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাত্র দুটি খেলায় পরাজিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের উত্তরকালে ১৯৪৮ সালে লন্ডনে যে বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসে তাতে সমগ্র ক্রীড়া জগতের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন হল্যান্ডের গৃহবধূ ত্রিংশ বর্ষীয়া ফ্রান্সিনা ব্ল্যাঙ্কার্স (ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন নামে সমধিক পরিচিত) চার-চারটি স্বর্ণপদক জয় করেন। তাঁর এ্যাথলিট জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যবর্তী সময়ে না পড়লে তিনি আরও অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারিণী হতে পারতেন। তবুও ১৯৫২ সালের পূর্ববর্তী চোদ্দ বছরে তিনি সাতটি বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে এগারটি বিশ্ব রেকর্ডের সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ওলিম্পিকে তিনি ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৮০ মিটার হার্ডলস ও ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে স্বর্ণপদক লাভ করেন। শত মিটারে তাঁর ১১'৫ সেকেন্ড, ১১ সেকেন্ডে ৮০ মিটার হার্ডল রেস, হাইজাম্পে ৫ ফুট ৭-৩/৮ ইঞ্চি, দীর্ঘ লম্ফনে ২০ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং পেন্টাথোলনে ৪৬৯২ পয়েন্ট এখনও মহিলা এ্যাথলিটদের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু হয়ে রয়েছে।

একবার হারলে আর সহজে জেতা যায় না, ক্রীড়া জগতের এই প্রবচনটির অসারতা প্রমাণ হয়েছিল ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ওলিম্পিকের ক্রীড়ার মেলায়। ফরাসী দূরপাল্লার দৌড়বীয়া ৩৫ বছর বয়স্ক এ্যালেন সিমুন দু ঘণ্টা ২৫ মিনিটে ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করে এর আগের পাঁচ পাঁচ দফা পরাজয়ের গ্লানি মোচন করেন। ক্রীড়াজগতে তখন এমিল জ্যাটোপেকের যুগ। সমস্ত দূরপাল্লার দৌড়ে এমিল জ্যাটোপেক যেন তাঁর প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৫০ ও ১৯৫২ সালে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ানসিপ ও ওলিম্পিকের প্রতিযোগিতায় পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে, ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ওলিম্পিকের দশ হাজার মিটার দৌড়ে এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতায় সিমুন কিছুতেই অনন্যসাধারণ দৌড়বীর এমিল জ্যাটোপেকের নাগাল ধরতে পারেন নি, এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় কোনক্রমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেই তাঁকে পরিতুষ্ট হতে হয়েছে। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে সিমুন প্রথমে ম্যারাথন দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত এই ম্যারাথনই তাঁকে ওলিম্পিকের স্বর্ণসাফল্য এনে দেয়। এই দৌড়ে তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী খ্যাতিমান এ্যাথলিট এমিল জ্যাটোপেক কোন পদকই নিতে পারেন নি। প্রতিযোগিতায় জ্যাটোপেকের স্থান ছিল ষষ্ঠ পর্যায়ে। এ্যালেন সিমুনের অনন্য কৃতিত্ব এই যে, প্রথম চেষ্টাতেই তিনি ম্যারাথন দৌড়ে চ্যাম্পিয়ানসিপ অর্জন করেন।

সিমুন এখনও সক্রিয় ও সগৌরবে ক্রীড়াক্ষেত্রে রয়েছেন। ওলিম্পিক সম্মানের দশ বছর পরেও তাঁকে ম্যারাথন দৌড়ে যোগ দিতে দেখা গিয়েছে। সাতচল্লিশ বছর বয়সে তিনি জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হন এবং ওলিম্পিকের রেকর্ডের তুলনায় তাঁর মাত্র চল্লিশ মিনিট বেশী সময় লেগেছে।

এক-একটা ওলিম্পিকের আসরে এক-একজন মহিলা প্রতিযোগীকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে। ১৯৫০ সালের রোম ওলিম্পিকে আমেরিকার নিগ্রো মেয়ে উইলমা রুডলফ তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁকে রোম ওলিম্পিকের রাণী বলে অভিহিত করা হয়। ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে তিনি অনেকখানি দূরত্বের ব্যবধান নিয়ে জয়ী হন। তাঁর দুরন্ত গতি, সহজ ভঙ্গি ও প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় সময়ের ব্যবধান তাঁকে এই খ্যাতি এনে দেয়। তখন তাঁর বয়স কুড়ি এবং তখন তিনি ছিলেন স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রী। ১০০ মিটার দৌড়ের প্রতিস্বন্দ্বিতার সেমিফাইনাল তিনি অতিক্রম করেছিলেন ১১'৩ সেকেন্ডে। বাতাসের আনুকুল্যে ১১ সেকেন্ডেই তিনি পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হন। সেমিফাইনালে তিনি বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন। ২০০ মিটারের প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় তিনি ওলিম্পিক নজীরের গণ্ডিকে ছাপিয়ে যান ২৩'২ সেকেন্ডে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। প্রতিকূল বাতাসের জন্যে ফাইনালে এই পথ অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছিল চব্বিশ সেকেন্ড। তাঁর তীব্র গতিবেগের জন্যেই আমেরিকার পক্ষে মহিলাদের রিলে রেস জয়লাভ করা সম্ভবপর হয়।

১৯৬৯ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান বনাম কোর অব সিগন্যালস দলের ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য। খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়।

দর্শক

ডেভিস কাপ

পুনার ডেকান জিমখানা কোর্টে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩—০ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপের খেলায় জাপানের বিপক্ষে ভারতবর্ষ এই নিয়ে উপর্যুপরি ৯বার জয়ী হল।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম দিনের সিঙ্গলস খেলায় রমানাথন কৃষ্ণন (ভারতবর্ষ) ৬—২, ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে ইচিজো কোনিসিকে (জাপান) এবং প্রেমজিৎলাল ৬—২, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে কোজি ওয়াতানাবেকে (জাপান) পরাজিত করলে ভারতবর্ষ ২—০ খেলায় এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলসের খেলায় জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল ৬—৩, ১৩—১১, ৭—৯ ও ৬—৪ গেমে কোজি ওয়াতানাবে এবং জুনেজো কাওয়ামোরিকে (জাপান) পরাজিত করেন। ফলে ভারতবর্ষ ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

তৃতীয় দিনে প্রেমজিৎলাল (ভারতবর্ষ) ৬—৩, ৬—১ ও ৬—১ গেমে ইচিজো কোনিসিকে (জাপান) এবং অধিনায়ক কৃষ্ণানের অনুপস্থিতির ফলে এস পি মিশ্র (ভারতবর্ষ) ৬—৩, ৬—৩, ৫—৭ ও ৬—২ গেমে কোজি ওয়াতানাবেকে (জাপান) পরাজিত করেন।

ভারতবর্ষের পরবর্তী খেলা পড়েছে ইউরোপীয়ান জোনের 'বি' গ্রুপ বিজয়ী দলের সঙ্গে।

বেটন কাপ

মোহনবাগান বনাম কোর অব সিগন্যালস দলের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র গেছে। নির্ধারিত সময়ে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না-হওয়াতে অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। তবে এই অমীমাংসিত খেলাটি খেলোয়াড়দের দক্ষতায় এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। প্রথমার্ধের খেলায় জলন্ধরের কোর অব সিগন্যালস এবং দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় মোহনবাগান প্রাধান্য বিস্তার করে খেলেছিল। এরকম উন্নত পর্যায়ের খেলায় খেলাপক্ষেরই সামনে যে গোল করার অত সহজ সুযোগ এলো না—তাই নিয়ে দর্শকদের আক্ষেপ কম নয়।

কোয়ার্টার ফাইনালে যে আটটি দল খেলেছিল তাদের মধ্যে কলকাতারই এই ৫টি দল ছিল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন। অপরদিকে বাংলার বাইরের এই তিনটি দল ছিল কোর অব সিগন্যালস, লক্ষ্ণৌ একাদশ এবং দিল্লী একাদশ। সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ৩—০ গোলে লক্ষ্ণৌ একাদশ দলকে এবং জলন্ধরের কোর অব সিগন্যালস ২—১ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

এবছরের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল বনাম ভারতীয় বিমানবাহিনী দলের চতুর্থ রাউণ্ডের খেলাটির নিষ্পত্তি হতে মোট ৩৫৫ মিনিট সময় লাগে। এই দুই দলের পাঁচ দিনের খেলার ফলাফল এই রকম ছিল : ১ম দিনে ০—০ গোল, ২য় দিনে বৃষ্টির জন্যে খেলা পরিত্যক্ত (ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল), ৩য় দিনে ১—১ গোল, ৪র্থ দিনে ১—১ গোল এবং ৫ম দিনে ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে জয়ী। এই খেলার মীমাংসায় কর্মকর্তারাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

৩০তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ডাবলস খেতাব বিজয়িনী রাশিয়ার দুই খেলোয়াড়—জোয়া রুডনোভা এবং গ্রীনবার্গ।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

কোয়ার্টার ফাইনাল

মোহনবাগান ৫ : ইস্টার্ন আর এস সি ১
কোর অব সিগন্যালস ২ : মহমেডান স্পোর্টিং ০
ইস্টবেঙ্গল ১ : ইস্টার্ন আর এ এ ০
লক্ষ্মৌ একাদশ ১ : দিল্লী একাদশ ০

সেমি-ফাইনাল

মোহনবাগান ৩ : লক্ষ্মৌ একাদশ ০
কোর অব সিগন্যালস ২ : ইস্টবেঙ্গল ১

গোল্ড কাপ হকি ফাইনাল

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। ফলে জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। টাটা স্পোর্টস দলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা। প্রতিযোগিতার নতুন নিয়মে তিনদিন ফাইনাল খেলা হয়েছিল। ফাইনাল খেলার প্রথম পর্যায়ে টাটা স্পোর্টস ক্লাব অপ্রত্যাশিতভাবে ১—০ গোলে বর্ডার সিকিউরিটি দলকে পরাজিত করে অগ্রগামী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ১—০ গোলে টাটা স্পোর্টস দলকে পরাজিত করলে খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। ফাইনাল খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য উভয় দলকে তৃতীয় পর্যায়ে খেলতে হয়। এই তৃতীয় পর্যায়ের খেলায় ১২০ মিনিট খেলেও কোন পক্ষ গোল দিতে পারেনি—গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র যায়। এইভাবে দীর্ঘ ১২০ মিনিট খেলা দেখার পর এক শ্রেণীর দর্শক ধৈর্যচ্যুত হয়ে ইট-পাটকেল এবং চেয়ার নিক্ষেপ করে কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের দঃ আফ্রিকা সফর

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির কারণে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের আগামী দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল করার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার একটি ট্রেড ইউনিয়ন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের কাছে আবেদন জানিয়েছে। ইউনিয়নের সেক্রেটারী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, যেখানে ইংল্যান্ড এই কারণেই তাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল করেছিল, সেখানে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করা উচিত নয়।

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের ইউরোপ সফর

ইউরোপের উন্নত আসরে টেনিস খেলা অনুশীলনের জন্য ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন চারজন ভারতীয় জুনিয়র টেনিস খেলোয়াড়কে মনোনীত করেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন টেনিস টুর্ণামেন্টে এই চারজন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করে স্থানীয় জলবায়ু, টেনিস খেলার মান ও পরিবেশ সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন।

এই দলে মনোনীত হয়েছেন বর্ণজিৎ সিং (দিল্লী), গৌরব মিশ্র (মহারাষ্ট্র), আনন্দ অমৃতরাজ (মাদ্রাজ) এবং শশী মেনন (পুনা)।

ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ভারত সফরে পাওনাগণ্ডা নিয়ে যে দর কষাকষি চলছিল, তা শেষ হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সংশোধিত প্রস্তাবে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড সম্মতি দিয়েছেন। ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলকে মোট ১০৩,৫০০ ডলারের (অস্ট্রেলিয়ান) গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে—প্রতি টেস্ট খেলায় ১৬,৭০০ ডলার এবং প্রতি আঞ্চলিক খেলায় ৪০০০ ডলার। সফরের তালিকায় আছে ৫টি টেস্ট এবং ৫টি আঞ্চলিক খেলা। এছাড়া ভারতবর্ষে অবস্থানকালে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের বাসস্থান, খাওয়া এবং যাতায়াত খরচ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকেই বহন করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ভারত সফর আরম্ভ হবে ১৯৬৯ সালের ২৮শে অকটোবর এবং শেষ হবে ১৯৭০ সালের ২রা জানুয়ারী।

১৮।৫।৬৯

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৪র্থ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 30th May, 1969 শুক্রবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ 40 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীআর কিশোর যাদব

চিঠিপত্র

গুপী গাইন বাঘা বাইন

অমৃতের ২য় সংখ্যায় নান্দীকরের লেখা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির আলোচনা পড়লাম। অতি সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় তিনি অনেক কথা বলেছেন। আরো অনেক কথা তিনি বলতে পারতেন। উপেন্দ্রকিশোরের এই বইটির চিত্রায়ণ দুর্লভ ক্ষমতার পক্ষেই সম্ভব। যা শ্রীসত্যজিৎ রায়ের হাতেই সার্থক রূপ পেয়েছে। নান্দীকর বলেছেন '.. কিশোর-কিশোরীদের রীতিমত উল্লসিত করবে।' ছবিটি কি শুধুমাত্র কিশোর-কিশোরীদের উপভোগ্য? বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে তৈরি এই আশ্চর্য ছবি কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গেও কি বয়স্কদের বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত করে না? সত্যজিৎ রায়ের আগের ছবিগুলোর সঙ্গে বিষয় ও আঙ্গিক বা কলাকৌশলের দিক থেকে এর কোন মিল নেই। এই ছবির পিছনে যে একটি মানবিক আবেদন রয়েছে তা কি নান্দীকর মহাশয়ের চোখে ধরা পড়ল না? তিনি বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা গলায় বলেছেন, 'শ্রীরায় অতি সুকৌশলে বিশ্বশান্তির বাণী শুনিয়েছেন।' পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির জঙ্গী মনোভাব এমন সুন্দর এবং প্রচ্ছন্নভাবে শিল্পরূপ দেওয়া নিঃসন্দেহে প্রকৃত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। শুধু নিখুঁত কলাকৌশল নয়, আরও অনেক কিছু আছে এই ছবির পেছনে। কাহিনীটির আবেদন চিরকালীন এবং দেশকালাতীত। শ্রীরায়ের অনন্য চিত্রনাট্য যা নান্দীকর মশায় একবার উল্লেখই করেন নি, তাকে কি সত্যজিৎবাবুর বহুমুখী প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা যেত না?

অনুপকুমার বসু
কলকাতা-৩৪

(২)

আপনার চলচ্চিত্র বিভাগে প্রকাশিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছায়াছবির আলোচনা পড়লাম।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' শিশুচিত্র অথচ সর্বজনীন ছবি। বাংলা চিত্রবাণীর জগতে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে। নীতিশিক্ষাবর্জিত হয়ে বা আদর্শ জীবনের উজ্জ্বল চিত্র তুলে না ধরেও যে কল্পনাবিলাসী, কৌতূহলী, কোমলমতি শিশুদের মনের খাদ্য যোগাবার জন্য ছায়াছবি তৈরি করা যায়, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই ছবি। 'আবোলতাবোল' বই পড়ে যে-ধরনের মনোভাব জাগে আমাদের মনে, ঠিক তেমনই স্বাভাবিকভাবে হাসি-কান্না, বীভৎসতা-সুন্দরতা, কোমলতা-কঠোরতা, সংকীর্ণতা-উদারতা ইত্যাদি এখানে পাওয়া যায়। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি—শিক্ষার ভার নেই, নীতির কশাঘাত নেই, শুধু উচ্চ-সূক্ষ্ম-কোমল কল্পনার ডানায় ভর করে 'তিন ভুবন' উড়ে চলা।

আবার যদি অতিসূক্ষ্ম চিন্তার অনুবীক্ষণে ছবিটির অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজতে যাই, ছবির পশ্চাতে পরিচালকের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করতে যাই, তবে হয়তো Irony, satire & humour- এর মধ্যে দিয়ে গভীরতর, মহত্তর, উচ্চতর কিছু আমরা পাই। ভূতের নাচ বা আকাশ থেকে মিষ্টিঝরা শুধুই অর্থহীন খেয়ালিপনা?

যাই হোক, ছবিটি অসামান্য। গুপী যখন বাঁশবনে ঢুকে ওপর থেকে বাঘার ঢাকের ওপর টপ্-টপ্ করে জলপড়া দেখতে পেলো, তখন থেকেই 'Super-natural atmosphere -এর শুরু। তারপর বাঘের যাওয়া-আসা, ভূতের নাচ, ভূতের বর, শুণ্ডীরাজার দেশ, হাল্লারাজার দেশ, যুদ্ধ-সজ্জা, যাদুকরের ইন্দ্রজাল, রাজকন্যালাভ ইত্যাদি এদের মানসকল্পনাসৃষ্ট 'Land of Lotus'- -এর কাণ্ডকারখানা ছাড়া আর কিছু নয়!

'প্রজাপতির রঙিন আলপনার' মধ্য দিয়েই এ-ছায়াছবির সমাপ্তি। ছবিটি যে শিশুদের সূক্ষ্ম-কোমল কল্পনার স্বর্গলোকেই সীমাবদ্ধ থাকবে, বাস্তব-রুক্ষ কঠোর জীবনের রূঢ় আঘাতে 'চূর্ণীকৃত তাজমহলে' পরিণত হবে না—এ-উদ্দেশ্য পরিচালকের ছিল। সে-উদ্দেশ্য সফল।

ছবিটি সগৌরবে, সদর্পে, সানন্দে দেশ-বিদেশে দেখিয়ে আনার মতো। বিশ্ববন্দিত অনন্য এই ভারতীয় চলচ্চিত্রস্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তরুণকান্তি লাহিড়ী,
বেহালা, কলিকাতা-৩৪।

(৩)

সত্যজিৎ রায় সিনেমাজগতে একটি গৌরবময় নাম। শুধু নাম নয়, ইতিহাস। তাঁকে নিয়েই শুরু হয়েছে বাংলা ছায়াছবির বিজয় অভিযান। যৌবনের স্পর্ধিত প্রকাশ যেন।

পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার, পরশপাথর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, চারুলতা, কাপুরুষ-মহাপুরুষ সব যেন এক-একটি উজ্জ্বল দিগন্ত। শ্রীসত্যজিৎ রায় তাই ইতিহাস। বিস্ময়ের, বিজয়ের।

সম্প্রতি প্রদর্শিত হচ্ছে তাঁর গুপী গাইন বাঘা বাইন। এটি নিছক একটি সুন্দর ছবি নয়, স্বপ্নপ্রবণ মানুষের অব্যক্ত মহাকাব্য। গুপী গাইন বাঘা বাইন শিশুমনের আশ্চর্য খোরাক, বয়স্কের অভিজ্ঞতা।

এ-ছবি বর্তমান সংস্কৃতিজগতের দেউলেপনার প্রতিবাদে দীপ্ত। নৈরাজ্য আর নীতিভ্রষ্টতার অপূর্ব চ্যালেঞ্জ। শান্তির স্বপক্ষে, মানবিক মূল্যবোধের এক অনিন্দ্য আলেখ্য।

এ-ছবি শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়েও গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত।

তাই পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রণ্টের কাছে আবেদন জানাই, বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'কে প্রমোদকরমুক্ত করুন। আবালবৃদ্ধবনিতাকে করবিহীন অবস্থায় ছবিটি দেখবার ব্যবস্থা করে জাতীয় কর্তব্য পালন করুন। বাংলা শিশু-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মহৎ সৃষ্টির আশ্চর্য চিত্ররূপের আবেদনকে ব্যাপক ও গভীর করতে কল্যাণকামী সরকারের কাছে এই প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না।

রাবেয়া খাতুন
কলকাতা-১৭

(৪)

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' দেখলাম।

'সৃষ্টি' শব্দটির যদি কোনো ব্যাপক অর্থ থাকে 'পুনর্নির্মাণ' ও 'পুনর্বায়ণ' শব্দদুটির যদি বিশেষ কোনো তাৎপর্যে প্রয়োগ সম্ভব হয়, আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া হলো তার চেয়েও দূরপ্রসারী। সমস্ত ভাবাবেগকে সংহত করেও আমি উল্লাস বোধ না করে পারছি না।

বাংলাদেশে রূপোলি পর্দার জন্যে ছবি তোলা হচ্ছে কম নয়। তার মধ্যে শিশু-চলচ্চিত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম। যদ্দুর মনে পড়ছে, ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছিল এ-ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

সত্যজিৎ রায় আমার সব প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ফ্যানটাস্টিক কাহিনী যে এমন চমকপ্রদ চিত্ররূপ পাবে—তা যেন কখনো কল্পনাও করিনি। ফটোগ্রাফি, নির্দেশনা এবং ঘটনার বৈচিত্র্যে ছবিটি কেবল ছোটদের উপযোগী নয়, আমার মতো বয়স্ক দর্শককে রীতিমতো আনন্দিত করে তুলছে।

বাংলাদেশে ইতিপূর্বে দেশাত্মবোধক এবং শিক্ষামূলক কোনো কোনো ছবি প্রমোদকরমুক্ত হয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। আমার ধারণা, গুপী গাইন বাঘা বাইন করমুক্ত হলে ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বশ্রেণীর সাধারণ মানুষ ছবিটি দেখার অধিকতর সুযোগ পাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি ছবিটিকে কর-মুক্ত ঘোষণা করেন, তাহলে অনেকেই খুশি হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

—গৌরাঙ্গ ভৌমিক,
কলকাতা—৪

যুক্তফ্রন্টের দুশ্চিন্তা

এদিকে-ওদিকে নানা জায়গায় যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে মতান্তর, মনান্তর ও সংঘর্ষের সংবাদে সকলেই উদ্বিগ্ন বোধ করবেন। যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিধানসভায় এসেছে। পুরো পাঁচ বৎসর তারাই এ রাজ্যের শাসনকার্য চালাবে। কিন্তু এভাবে যদি নিজেদের মধ্যে কলহ শুরু হয় তাহলে নির্বিবাদে রাজ্য চালানোই তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা হয়। অবশ্য যুক্তফ্রন্টের শরিকগুলোর মধ্যে সব সময়েই যে সদ্ভাব ছিল তা নয়। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে এবং মতাদর্শগত প্রশ্নে এক না হতে পেরে ইউ এল এফ এবং পি ইউ এল এফ-এই দুইটি ফ্রন্টে বিভক্ত হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। মধ্যবর্তী নির্বাচনে এরা এক হয়ে লড়াই করে কংগ্রেসকে পরাজিত করে।

দলগুলোর উঁচুতলায় অর্থাৎ নেতৃত্বের স্তরে ভদ্রলোকের চুক্তি একটা হয়েছে। বত্রিশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকারের কার্য পরিচালনার দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নিচুতলায় অর্থাৎ জেলায় জেলায় সংগঠনের স্তরে সমঝোতা তো হয়ই নি বরং একের ঘাঁটিতে অপর দলের প্রভাব বিস্তার বা অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে। এ থেকেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে আর এস পি ও সি পি এম-এর মধ্যে সংঘর্ষের শোকাবহ পরিণতির পরও যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা বিশেষ হয় নি।

বিরোধের একটি কারণ বোধ হয় শরিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সংশয়। বৃহৎ দল ক্ষুদ্রতর দলগুলোর আনুগত্য চায়। ক্ষুদ্র দল বৃহত্তর দলের অভিভাবকত্বকে দুঃসহ মনে করে। তা থেকেই রেষারেষি ও আড়াআড়ির সূত্রপাত। যুক্তফ্রন্ট যেহেতু একটি কোয়ালিশন সরকার সেহেতু শরিক সব দলের সহযোগিতা ছাড়া এই সরকারের কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক দলকেই এসম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজেদের চেষ্টায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ইমেজ বা ভাবমূর্তিকে জনসাধারণের সামনে যথাযথ রাখার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তা হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। দুই রাজ্যেই ফ্রন্টের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। দলত্যাগ বা অন্য কোনো উপায়ে এই দুই রাজ্যের সরকারের পতন ঘটাবার কোনো আশঙ্কা নেই। অথচ নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য দেখা দিয়েছে কেরলে গভীর সঙ্কট। পশ্চিমবঙ্গে তেমন কোনো সংকট দেখা না দিলেও ভুল বোঝাবুঝি চলছেই।

যুক্তফ্রন্টের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীনকুমারকে কেন্দ্র করে একটি রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে যা যুক্তফ্রন্টের নেতাদের পক্ষে অস্বস্তিকর। মন্দিরের প্রশ্নে শ্রীকুমারের মতো যুক্তফ্রন্টের একজন নেতার পক্ষে এধরনের বিতর্কে জড়িয়ে পড়া অবাঞ্ছিত। এথেকে যুক্তফ্রন্টকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বনের শিক্ষা নিতে হবে। বিধান পরিষদ বিলোপের প্রশ্নেও এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বিলটি তাড়াহুড়ো করে যুক্তফ্রন্ট সরকার পাশ করলেন এবং যাতে সংসদেও তা পাশ হয় তার জন্য চলল জোর তদ্বির। কেন্দ্রীয় সরকার কালবিলম্ব না করে লোকসভায় বিলটি অনুমোদন করে দিলেন। কিন্তু রাজ্যসভায় বর্তমান অধিবেশনে বিলটি এল না। শোনা যায় এর জন্যও নাকি কয়েকজন বামপন্থী এম. পিই সরকার পক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন। তার ফলে আপাতত বিধান পরিষদ থেকে আসা যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা যেমন হাতে পরমায়ু পেলেন তেমনি কোনো সভারই সদস্য নন এমন মন্ত্রীদের পক্ষে বিধান পরিষদের বুড়ি ছুঁয়ে ছ' মাস কাল মন্ত্রী থাকার সুযোগও পেয়ে গেলেন। কিন্তু এতে যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা কেউ করবেন না। কারণ নিজেদের প্রতিশ্রুতি নিজেরাই বেকায়দায় পড়ে খেলাপ করছেন তাঁরা প্রকারান্তরে। সুতরাং দেখা গেল যে, বিরোধী দলে থাকবার সময় বহু বিষয়ে যত উচ্চকণ্ঠে চেঁচামেচি করা যায় সরকারের দায়িত্ব নিলে তা এত সহজে করা যায় না।

যুক্তফ্রন্টের ভিতরকার এই বিরোধ মিটবে কি না বলা যায় না। হয়তো বিরোধও চলবে, মন্ত্রিত্বও চলবে। এক মন্ত্রী অন্য মন্ত্রীর সমালোচনা করবেন, সরকারী প্রেসনোটের প্রতিবাদ করবেন অন্য মন্ত্রী এবং সবাই মিলে বলবেন, আমরা যুক্তফ্রন্টে আছি আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করছে কায়েমী স্বার্থের লোকেরা! পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বিরাট ও বিচিত্র। তার সমাধান না হলে এই রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি কখনোই আসতে পারে না। যুক্তফ্রন্টকে সেই দায়িত্বের কথা মনে রেখে শরিক দলগুলোর মধ্যে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে হবে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতি যেমন নিরঙ্কুশ সমর্থন জানিয়েছিল এই রাজ্যের অধিবাসীরা, ১৯৬৯র মধ্যবর্তী নির্বাচনে অনুরূপ সমর্থন লাভ করেছে যুক্তফ্রন্ট বিধানসভায় এবং কলকাতা কর্পোরেশনে। সুতরাং অবাধে তাঁরা কাজ করুন এবং কাজের দ্বারা প্রমাণ করুন যে, জনসাধারণের আস্থা অনাস্থা ন্যস্ত হয় নি। যুক্তফ্রন্ট বহু দল নিয়ে গঠিত হলেও কর্মসূচীর ভিত্তিতে তারা এক হয়ে কাজ করবে, পশ্চিম বাংলায় মানুষ তাই দেখতে চায়। কিন্তু শরিকী ঝগড়া তা হতে দেবে কি? না দিলেই দুশ্চিন্তার কথা।

রাহুল বর্মন
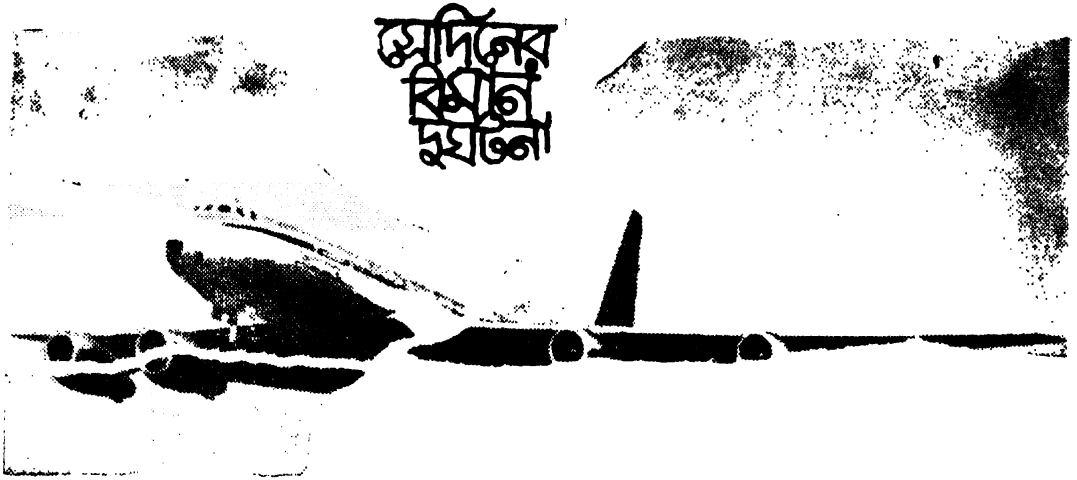
সোমবার। একুশে এপ্রিল। সকাল থেকেই যেন আবহাওয়াটা কেমন কেমন। ঘন কালো মেঘের আনাগোনা আকাশে। সাঁই-সাঁই শব্দে উদ্দাম মাতাল বাতাস ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে শুরু হচ্ছে ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টির ঝাপটা। রাস্তাঘাটে লোকজনের চলাচল কম।

পাহাড়ের কোলে ছোট্ট শহর আগরতলা। শহর থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে সিঙ্গারবিল বিমান বন্দর। হাওয়াই বন্দরের এক পাশ দিয়ে পূর্ব-পাকিস্থান সীমান্ত চলে গেছে আলপনার মতন এঁকে-বেঁকে।

অন্যদিনের চেয়ে আজ যেন কেমন ঝিমোনর ভাব সর্বত্র। কর্মব্যস্ততার অভাব সুস্পষ্ট। অল্প কয়েকজন যাত্রী বসে আছেন এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে। এঁদের মধ্যে কলকাতাগামী যাত্রীর সংখ্যাই বেশী।

দুটি ডাকোটা বিমান দাঁড়িয়ে আছে রাণওয়ের পাশে টারম্যাকে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে এঁদেরকে নিয়ে উড়া বিপজ্জনক। এয়ারপোর্ট অফিসার এঁদের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিচ্ছেন না। ঐ দুটি বিমানের পাইলট, রেডিও অফিসার আর এয়ার হোস্টেসরা গল্প গুজবে মাতিয়ে তুলেছেন এয়ারপোর্ট-ক্যান্টিন।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ে। সেই সঙ্গে যেন আবহাওয়াও পরিষ্কার হতে থাকে, বাতাসের বেগও কমে আসে।

বেলা বারোটার কিছু পর আগরতলা কন্ট্রোল টাওয়ারে খবর এলো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সমগ্র পূর্ববঙ্গে চলা সত্ত্বেও আগরতলা-কলকাতা রুটে একটা সংকীর্ণ পকেট পেয়ে ক্যাপ্টেন রবীন ঘোষের নেতৃত্বে ফ্লাইট নাম্বার টু ফাইভ নাইন ফকার ফ্রেন্ডশিপ 'বিয়াস' এফ-২৭ দমদমের মাটি ছেড়ে উঠে পড়েছে আকাশে।

আগরতলা বিমান বন্দরে অসহিষ্ণু ভাব দেখা গেল। ঘড়ির কাটা যেন আর সরতে চায় না। কিন্তু সমস্ত উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে বেলা দেড়টার কিছু পর অদূরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ওপাশে দিকচক্রবালে ভেসে উঠলো ফকারের অবয়ব। কিছুক্ষণ পর আগরতলার মাটি স্পর্শ করল বিপাশা। যাত্রীদের গুঞ্জন আর মালপত্র টানাটানিতে আবার সরব হয়ে উঠলো বিশ্রামকক্ষ।

আগরতলায় আধ ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার আকাশে উঠলো বিপাশা। এবারের গন্তব্যস্থল শিলচর।

বেলা চারটা। আবার ঘন কালো মেঘে ভরে গেল আকাশ। শুরু হয়ে গেল বাতাসের সাঁই-সাঁই শব্দ। চিন্তিত হয়ে উঠলেন এয়ারপোর্ট অফিসার। যাত্রীরাও। কারণ, কলকাতা থেকে আর কোন বিমান আসার সম্ভাবনা নেই। কেউ কেউ বাড়ী ফিরে যেতে চাইলেন, কেউ ভাবলেন দেখা যাক না একটা শেষ চেষ্টা করে। মহারাজগঞ্জ বাজারের বিড়ির ব্যবসায়ী নিতাই সাহা টিকিট বাতিল করে ফিরে এলেন বাড়ীতে। আর রয়ে গেলেন বৌবাজারের চিকিৎসক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, আগরতলা কলেজের অধ্যাপক সুধীর দত্ত এবং আরো তেরজন।

সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিকট শব্দ করে বাজ পড়ছে। আর সেই সঙ্গে চোখ ধাঁধানি বিদ্যুতের চমক। বৃষ্টির বড় বড় ফোটাগুলি গায়ে এসে বিঁধছে গোলাপের কাঁটার মতন। দূরে রাণওয়ের উত্তরে উড়ছে বাতাসের গতি-নির্দেশক নিশানা।

আবার নিঝুম হয়ে গেছে যাত্রীদের বিশ্রামকক্ষ। ঘরে বাতি জেবলে দেওয়া হল। কারণ সন্ধ্যা হবার আগেই নেমে এসেছে রাত্রির কালো অন্ধকার। অবস্থার পরিবেশ এমনই যে, অতি সাহসীরও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বেলা পাঁচটা। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে তখন। এরই মাঝে শোনা গেল আকাশে বিমানের গর্জন। একটু পর বৃষ্টি ভেজা রাণওয়েতে নেমে এলো শিলচর থেকে যাত্রী বোঝাই হয়ে বিপাশা।

কিন্তু ঝড় আর থামতে চাইছে না। উত্তরোত্তর ঝড়ের বেগ বেড়ে চলে। দুশ্চিন্তায় সমস্ত মুখ ছেয়ে গেছে এরোড্রোম অফিসারের। বাইরে এসে যাত্রীদের লাউঞ্জের বারান্দায় দাঁড়ালেন। ক্যাপ্টেন রবীন ঘোষ, ক্যাপ্টেন এম এম সিং আর এয়ার হোস্টেস পুষ্পা ওমান। তাঁরা ভাবছিলেন কি করে এই দুর্যোগের মাঝে কলকাতা ফিরে যাওয়া যাবে?

বাইরের আকাশটা তখন ভেঙে পড়তে চাইছে। মনে হয় যেন একটা আহত দানব যন্ত্রণায় হুংকার দিয়ে উঠছে। বারবার মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো আলো আর বাজ পড়ার কড়-কড় শব্দ কানে তালা ধরে যাবার জোগাড়। তবু রবীন আর এম এম সিং ধৈর্য ধরে বসে রইলেন।

বাইরে একটানা ঝোড়ো বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ আর যাত্রী-কক্ষে কবরখানার মতো নিস্তব্ধতা। ঝিমুচ্ছিলেন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা তাঁর জীবনে দ্বিতীয় বিমান-ভ্রমণ। রোগী দেখতে আগরতলা এসেছিলেন। ফিরছেন আজ। ঘরে ছেলেমেয়েরা বসে আছে উৎকণ্ঠা নিয়ে কখন বাবা ফিরবে বলে।

বসে আছেন ডঃ সুধীর দত্ত। পাশে তাঁর স্ত্রী শ্রীলা। কোলে চার বছরের ছেলে শান্তনু। বাবা দিল্লী যাচ্ছেন ইন্টারভিউ দিতে, তাই শান্তনুর কত মজা, বাবা কত খেলনা আনবে তার জন্য দিল্লী থেকে।

একটু দূরে বসে বিশ বছরের সুন্দরী তরুণী পুষ্পা ওমান ভাবছিল তাঁর বাড়ীর কথা। মা-বাপ হারা পাঁচটি ভাই-বোন। সাদার্ণ ফ্ল্যাটের বাড়ীতে ও'রা অপেক্ষা করে আছে দিদির জন্য।

অভিজ্ঞ পাইলট রবীন ঘোষ আর তাঁর সহযোগী এম এম সিং ভাবছিলেন অন্য কথা। অনেকক্ষণ চিন্তার পর তাঁরা স্থির

করলেন যেহেতু ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান প্রেশারাইজড কেবিন সম্বলিত সেজন্যে ওটা যদি ৮,০০০ ফুটের বদলে ১৬,০০০ হাজার ফুট ওপর দিয়ে চলে তবে বিপদের সম্ভাবনা কম। কেবিন প্রেশারাইজড আর এয়ার কন্ডিশণ্ড থাকাতে যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারবে। আর যেহেতু কাল-বৈশাখীর ঝড় সমস্ত পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক জুড়ে বইছে সুতরাং ওটাকে ভয় পেয়ে কোন লাভ নেই। শুধু কলকাতা থেকে ১১৬ মাইল দূরে যে 'এয়ার পকেট' পড়বে তা এড়িয়ে একটু ঘুরে গেলেই চলবে। বিমানে রেডার থাকায় যে কোন অনাগত বিপদের সম্ভাবনা আগেই জানা যাবে। বাইরে তখন ঝড়ের বেগ কমে এসেছে। অভিজ্ঞ পাইলট রবীন ঘোষ উড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পূবের আকাশ ফাঁকা। দু-একটা তারা যেন চোখে পড়ে। পশ্চিমের আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। যাত্রীরা একে একে উঠে বসলেন বিমানে। শান্তনু মার কোলে বসে বলল, 'টা-টা।'......।

এরোড্রোম অফিসার হাতের আঙুল তুলে সংকেত দিলেন। প্রথমে গর্জে উঠলো ডানদিকের ইঞ্জিন, তারপর বাঁদিকের। কিছুক্ষণের মধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠলো দুটি 'টার্বো প্রপ' জেট ইঞ্জিন। হাত নাড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন জানালেন এয়ারপোর্ট অফিসার। নড়ে ওঠে ফকার ফ্রেন্ডশিপ। মূলে রাণওয়ের দিকে এগোতে থাকে। সামনের দুটি হেড লাইটে বহুদূর সব কিছু দেখা যায়।

রাণওয়ের শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো বিমানটি। তারপর স্পীড নিতে থাকে ওটা। পাইলটদের কেবিন থেকে চোখে পড়ে দূরে-বহুদূরে...চলে...গেছে সোজা সমান্তরাল রাণওয়ে। বৃষ্টিতে ভেজা সিক্ত রাণওয়ের দুপাশে আলোর মালা অন্ধকার রাতে জোনাকীর মতন ঝিক-ঝিক করছে। বৃষ্টির ঝাপটা এসে পড়ছে সামনের উইন্ডশিল্ডের ওপর। দুটি কাঁটা ঘুরে ঘুরে মুছে দিচ্ছে জলের দাগ কাচের ওপর দিয়ে।

কাঁপছে 'বিপাশা।' ইঞ্জিনের সব শক্তি প্রয়োগ করলেন ক্যাপ্টেন রবীন ঘোষ। সিডলী হকার ইঞ্জিন দুটি যেন ব্যথায় ককিয়ে উঠে। মাথায় হেড ফোন লাগিয়ে হাতে মাউথ পিস তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন ঘোষ। রেডিও ডিক্টেটেড ম্যাগনেটিক কম্পাস আর রেডিও অল্টিমিটারের দিকে চোখ রাখলেন ক্যাপ্টেন এম এম সিং। বেতারে সংকেত পাঠানো সুরু হয়ে গেল বিমান আর বিভিন্ন হাওয়াই বন্দরের মধ্যে।

বাইরে ইঞ্জিনের একটানা তীক্ষ্ম শব্দ আর ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এয়ার হোস্টেস পুষ্পা ওমানের গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর—'নমস্কার! ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুশো উনষাট নম্বরের উড়ো জাহাজ আকাশে উঠবে কম্যান্ডার পাইলট রবীন ঘোষের নেতৃত্বে। তাঁকে সহযোগিতা করবেন ক্যাপ্টেন এম এম সিং ফার্স্ট অফিসার হিসেবে। উড়বো ষোল হাজার একশো পচাত্তর ফুট ওপর দিয়ে—কারণ, আমাদের রেডারে ধরা পড়েছে যে, ৬০০০ থেকে ৯২০০০ ফুটের মধ্যে ভয়ংকর ঝড় বইছে। এই বিমান-যাত্রা স্থায়ী হবে মাত্র একঘণ্টা পঁচিশ মিনিট। আমাদের কলকাতা পৌঁছবার নির্দিষ্ট সময় হল রাত, ৮-৪০ মিঃ।

মাথার উপর জ্বলে উঠলো লাল বাতি। 'ফাসন ইয়োর বেল্ট' ঘোষণা হয়ে গেল।

ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগ নিয়ে মুখ গুঁজে এগিয়ে চললো 'বিপাশা'। ঠিক সাতটা সতের মিনিটে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়লো। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চোখের পলকে চাকা দুটি ঢুকে পড়ে ডানার ভেতর। ঝোড়ো হাওয়াতে ঘুড়ির মতন বিমানটি উড়িয়ে নিলেন ৩৬ বছরের অভিজ্ঞ পাইলট ক্যাপ্টেন রবীন ঘোষ। প্রথম ধাপেই ত্রিশ ফুট। তারপর আরো...আরো... দুঃসাহসী কয়েকজন দেখলেন, ঐ দূরে দক্ষিণে ঘন কালো মেঘের পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে বিপাশা। সুউচ্চ লেজের মাথায় লাগানো প্রকান্ড লাল বাতিটা জ্বলছে আর নিবছে।

ভয়ঙ্কর আকাশ বাতাস কাঁপানো শব্দ হতে থাকে। সমস্ত আগরতলা শহর কাঁপতে থাকে। বোঝা গেল ফকার ফ্রেন্ডশিপ চলে যাচ্ছে কলকাতার দিকে। মুহূর্তে মধ্যে দূরে মিলিয়ে গেল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ক্যাম্পগুলি। বাঁ-পাশে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্থানের আখাউড়া স্টেশনের লাল বাতি। আরো দূরে চোখে পড়ে তিস্তা নদীর তীর ঘেঁষে চলা স্টিমারগুলির হেড লাইটের ঝিকমিকি। বাঁদিকে দেখা যায় আলোর মালায় সেজেছে রাতের রূপসী আগরতলা নগরী। এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারের লাল বাতিটাও আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। কিছু দেখা অসম্ভব। চারদিকে শুধু চাপ চাপ কালো অন্ধকার। শুধু তারারা অভিনন্দন জানায় ওদের দুঃসাহসিক অভিযানকে।

সামনে প্লেনের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। বাইরে শুধু কালো অন্ধকার। চার হাজার ফুট নীচে ঝোড়ো মেঘগুলিকে রেখে ভয়ঙ্কর বেগে এগিয়ে যাচ্ছে বিপাশা। কাচগুলি ঝাপসা। চারদিকে মেঘের পাহাড়। দূরে...আরো দূরে...ওরা ছড়িয়ে পড়েছে প্রাচীর তুলে।

যাত্রীরা নৈশ আহারে ব্যস্ত। কেউ কেউ সিগারেট ফুঁকছেন। কেউবা মনোনিবেশ করেছেন পত্র-পত্রিকায়।

নির্দিষ্ট রুট দিয়ে সোজা ৭০ মাইল দক্ষিণে এগিয়ে এলো 'বিপাশা'। পেছনে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে ঢাকা ত্রিপুরা। ডাইনে থাকলো নারায়ণগঞ্জ আর ঢাকা। কুমিল্লা জেলার ময়নামতীর ওপরে এসে ২৭৯ ডিগ্রীতে বাঁক নিল সে। একটা মোচড় দিয়ে এক পাশে হেলে আবার বকের মতন ডানা ছড়িয়ে উড়তে থাকে বিপাশা।

৭-৪০ মিঃ। বিপাশা ক্রুইসিং লেভেলে তখন। এসে পড়েছে পদ্মার সেই ভয়ঙ্কর দিগন্ত বিস্তৃত চর। নীচে কিছু চোখে পড়ে না। অসীম অতুল কালো অন্ধকার। গোঁ...গোঁ...একটানা শব্দ। ইঞ্জিনের গতিবেগ বাড়তে থাকে। থর-থর করে কেঁপে ও রেডিও অল্টিমিটারের কাঁটা। তীব্র গতিতে নিয়ে ১৬ হাজার ফুট ওপর দিয়ে পদ্মা সোজাসুজি অতিক্রম করতে থাকে বিপাশা।

সামনের ড্যাশবোর্ডের নীল ডায়ালে লাল সংকেত বাতিটা জ্বলছে আর নিবছে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্টিয়ারিং হুইল ধরে ব আছেন ক্যাপ্টেন ঘোষ একাগ্র চিত্তে। নে গেটরের ভূমিকা পালন করছেন এম এ সিং। মাঝে মাঝে মাউথপিস তুলে দমদম জিজ্ঞেস করছেন ওরা আর বহুদূরে আস কলকাতা থেকে—হেডফোনে ভেসে আস দমদমের উত্তর।

সামনে কাচের ওধারে কালো অন্ধকা রবীনের চোখ দুটি নিবদ্ধ। তিনি ভাবছে তাঁর স্ত্রী ডায়নার কথা। ৭৯ বছরের ব বিধবা মার অনুরোধে বিয়ে করেছিল তাঁকে বেচারী ডায়না! কত উদ্বেগ নিয়ে আছে মনোহরপুকুর রোডে ওঁদের ফ্ল্যা রবীনকে নিয়ে তাঁর উদ্বেগের অন্ত নেই রবীনের ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। ওদে বিয়ে হয়েছে মাত্র চার মাস। কিন্তু বিধা বোধহয় সবার অলক্ষ্যে হেসেছিলেন।

ক্যাপ্টেন এম এম সিং-এর চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এক মাস আগে ছু মঞ্জুর হয়েছে। মিসেসকে নিয়ে কাশ্মী বেড়াতে যাবার কথা। এটাই তাঁর শে ফ্লাইট।

এয়ার হোস্টেস পুষ্পা ওমান যাত্রীদে খাবার দিচ্ছিল আর ভাবছিল ছোট ভাইটা কথা। মা-হারা শিশু। জেগে বসে থা কখন দিদি ফিরবে এই আশায়। দিদির বুকে ঘুমিয়ে তবে তার শান্তি। ছোট ভাইটি কথা ভেবে পুষ্পার বুকে একটা ব্য মোচড় দিয়ে ওঠে বার বার।

যাত্রার সময় ফুরিয়ে এলো। দুর্যোগে রাতের বুঝিবা হল অবসান। কলকাতা অ মাত্র ১১৫ কিলোমিটার। ২০ মিনিট প দমদমের মাটি স্পর্শ করবে বিপাশা। যাত্রী দের মাথার ওপর লাগানো মাইকে ভে এলো ফার্স্ট অফিসার এম এম সিং-এ গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'ইয়োর অ্যাটেনশ প্লীজ, থোরী দের মে সতরা মিনিট ব ক্যাপ্টেন রবীন ঘোষকা নেতৃত্ব মে মে হাওয়াই জাহাজ কলকাতা হাওয়াই বন্দ পঁহুচ যায় গা।' হঠাৎ গর্জে ওঠে বিমানের স্পীড কমে এলো। তারপর এক টানা নিরবচ্ছিন্ন হাল্কা শব্দ। বিপাশা নোজল ইজেক্টার খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। মু নীচু হয়ে আসে। হেলে-দুলে নামতে থাকে মেঘের স্তর ভেদ করে। আর সাত মিনি পরই ডানার ভেতরে গোটানো চাকা দু স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বন্ধ কপা খুলে খাড়া হয়ে ঝুলে পড়বে।

কিন্তু একি! রেডারে ধরা পড়লো এক ভয়ঙ্কর ঝড় যশোহর-খুলনার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। রবীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তবে কি তীরে এসে তরী ডুবলো! বিমানের তেল প্রায় শেষ। এখুনি খাড়া ত্রিশ হাজার ফুট উঠার ক্ষমতা ইঞ্জিনের নেই। তবু ৩৬ বছরের অভিজ্ঞ পাইলট ক্যাপ্টেন রবীন ঘোষ আর তাঁর সুযোগ্য

ক্যাপ্টেন এন এম সিং (ফার্স্ট অফিসার) প্রাণপণে যুঝতে থাকেন। আকাশে তখন বিদ্যুতের ঝিলিকে ঝিলিকে মেঘমণ্ডল চমকাচ্ছে আর পড়ছে চোখ ধাঁধাঁন বাজ। ঘন কালো মেঘে আকাশ ভার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ভয়ংকর ঝড়ো বতাস।

মুহূর্তে মধ্যে যোগাযোগ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। হতভাগ্য বিমানটি তার যাত্রী আর চালকদের নিয়ে কালবৈশাখীর দাপটে আকাশের বুকেই খেতে থাকলো আছাড়ের পর আছাড়। বাতাস বিপাশাকে একবার টেনে নিয়ে গেল ঝড়ের কেন্দ্রে। আবার পরক্ষণেই ছুঁড়ে দিলো এয়ার পকেটের গহ্বরে। মরণের নাগরদোলায় দোলানী খেতে থাকে বিপাশা। কেবিনের ভেতরে বাতি প্রায় নিবু-নিবু। প্লেনের দেহ হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত। সেই চরম সময়ে যাত্রীদের আর্ত চিৎকার আর কান্নার বর্ণনা দেওয়া মুশকিল।

কিন্তু জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বীরের মতন ক্যাপ্টেন ঘোষ আর সিং চেষ্টা করতে লাগলেন বিপাশাকে ২৫ হাজার ফুট ওপরে তোলার জন্য। ইঞ্জিনের শক্তি নিঃশেষ। ওপরে উঠার ক্ষমতা নেই। রেডিও ডিরেক্টেড ম্যাগনেটিক কম্পাস ব্যর্থ হল। ব্যর্থ হল রেডিও অলিটিমিটারও। এরই মধ্যে ৮-৩০ মিঃ বাগডোগরা থেকে আগত একটি বিমানের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হল শেষবারের মত।

আবার আকাশ ভরে গেল আলোয়। আগুন ধরেছে বিপাশায়। লেজের দিক থেকে আগুনের হলকায় বার বার পুড়ে যেতে লাগলো কেবিন। ভেতরে পোড়া গন্ধ আর যাত্রীদের গোঙানী। সেকি আর্ত চিৎকার। প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন ঘোষ। বিমানটি তখনও তাঁর আয়ত্তে। ঐ দেখা যায় খুলনার পাশে দৌলতপুর শহর। দুটি-একটি আলো। তারপর কালো অন্ধকার। প্রায় দু' হাজার ফুট ওপরে ঘটল এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ। বোমার মতন শব্দ হল দুবার। এর কিছু পরই গোত্তা খেতে খেতে জ্বলন্ত বিমানটি দামুরিয়ার কাছে এক জনমানবহীন জলাভূমিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

বিমান দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আস্তে আস্তে বছর গড়িয়ে যাবে। পৃথিবীর সবাই ভুলে যাবে ক্যাপ্টেন রবীন ঘোষ, এম এন সিং আর সেবিকা পুষ্পা ওমনের কথা। বর্ষা যাবে, আসবে হেমন্ত আর বসন্ত। শীতের মধ্যাহ্নে কাঁচা রোদ্দুরে উড়বে 'শতদ্রু', 'গোদাবরী', 'কাবেরী', কৃষ্ণা', আর 'মহানদী'। 'বিপাশা'র কথা ভুলে যাবে সবাই। ধীরে ধীরে কুয়াশার মাঝে আবার মিলিয়ে যাবে কলকাতা নগরী। উতলা হাওয়ায় ওদের ব্যথাভরা আত্মার অকথিত কাহিনীর রেশ বয়ে বেড়াবে নদী জপমালা-ধৃত পূর্ববাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে। শরতের সকালে কাঁচা সোনা গলানো রোদ্দুরে খুলনার সীমাহীন ধানের প্রান্তরে ঢেউ তুলে বেড়াবে দক্ষিণা হাওয়া ওদের কথা মনে করে। দুটি-একটি কাশ ফুল আপনিই ঝরে পড়বে ওদেরই আত্মার উদ্দেশ্যে। ধরিত্রী মাতা থাকবেন তার একমাত্র সাক্ষী। পৃথিবীতে যা অতীত তা চিরদিনই অতীত।

।। দুই ।।

এই ১৯৬৯ সালের একুশে এপ্রিল ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ইতিহাসে এক চরম কলংকময় অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয়। বিমানটি ঝড়ে কিংবা বাজ পড়ে ভেঙে পড়ল কিনা তা জানা এখন অসম্ভব। কারণ, যাত্রীরা এখন পৃথিবীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। দুর্ঘটনার কারণ না জানা গেলেও আকস্মিক ঝড়ের মোকাবিলা করতে সক্ষম এই দুর্ভেদ্য বিমানটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

ফকার ফ্রেণ্ডশিপ শব্দটির উৎপত্তিস্থল নেদারল্যাণ্ড। ইয়োরোপের এই ছোট্ট দেশ নেদারল্যাণ্ড হচ্ছে ফকার বিমানের নির্মাতা। ফকার কোম্পানী প্রথম বিমান তৈরী করেছিলেন ১৯২৫ সালে। বিমানের নাম দেওয়া হয়েছিল ফ্রেণ্ডশিপ। গত ৪০ বছরে বিমানের আকৃতির বহু অদল-বদল করা হয়েছে, কিন্তু নামটি রয়ে গেছে এখনও অপরিবর্তিত। ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমানের প্রথম প্রচলন হয় রাজকীয় ওলন্দাজ কে-এল-এম বিমান বহরে। তারপর থেকে পৃথিবীর বহু দেশের বিমান বহরে যাত্রী বা মাল বহনের কাজে এই বিমনের প্রচলন ঘটে।

বর্তমানে আমরা আগরতলা যেতে কিংবা কলকাতা আসতে যে বিমানে চড়ে আকাশে উড়ি সেটার প্রচলন ঘটেছিল ১৯৫৫ সালে। কারণ, ১৯২৫ সাল থেকে '৪০ সাল পর্যন্ত ইয়োরোপের বাজারগুলিতে ফকার বিমানের কদর ছিল খুবই বেশী। কিন্তু মহাযুদ্ধের অনতিবিলম্ব পর পাশচাত্য দেশগুলি নানা ধরনের উন্নত শ্রেণীর বিমান তৈরি করতে থাকায় ফকারের গুরুত্ব কমে আসে। ফলে উন্নত ধরনের ফকার বিমান তৈরি করার প্রয়োজনিয়তা দেখা দেয়। নতুন বিমানের কাঠামো গড়ার কাজে উদ্যোগী হলেন নেদারল্যাণ্ডের বোর্ড ফর এয়ারক্রাফট ডেভলাপমেন্ট (এন আই ভি)। এর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ফকারের আবিষ্কারক এইচ সি ভন মার্তিন। ১৯৫৫ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর আকাশে উঠলো চারটি প্রটোটাইপ ফকার।

ফকার বিমান সর্বত্র এম কে ১০০ ফ্রেণ্ডশিপ বলে পরিচিত। এটা ছিল ফ্রেণ্ডশিপ বিমানের প্রথমাবস্থা। বিমানটি ছিল ডবল-স্লটেড ফ্লাপস যুক্ত দুটি রলস রয়েস ডর্ট আর ডি এ-৩ এম কে -৫০৭ ইঞ্জিন সম্বলিত। একুশে এপ্রিল দুর্ঘটনায় পতিত হতভাগ্য বিমানটি ছিল ১,৬৭০ ই পি এইচ ডর্ট আর ডি এ ৬ এম কে ৫১১ ইঞ্জিনযুক্ত।

ফ্রেণ্ডশিপ এম কে৩০০ বিমান প্রায় পঞ্চাশজন যাত্রী বহনে সক্ষম। যাত্রীদের সিটগুলিকে গুটিয়ে যে কোন সময় বিমানটিকে 'কার্গোসিপ' বা মালবাহী উড়ো জাহাজে পরিণত করা সম্ভব। সময় লাগে মাত্র ১৯ মিনিট।

ফকার বিমানের ইঞ্জিন আগে চলতো পিস্টন ব্যবস্থায়। এখন চলে টার্বো-প্রপ জেট শক্তিতে। জেট ইঞ্জিনে প্রপেলারযুক্ত থাকায় মাঝারী ধরনের উচ্চতায় এই বিমানে ভ্রমণ খুবই সুখপ্রদ। বিমানের কার্যক্ষমতা ৮০০ থেকে ১৬০০ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এইল এরন ব্যববস্থায় আর গ্রাউণ্ড স্টিয়ারিং-এ এ বিমানের জুড়ি মেলা দায়। তবে একটা অসুবিধা আছে, তা হল যদি ফকার বিমান উড়ন্ত অবস্থায় মাটি থেকে ২৫০ ফুটের মধ্যে এসে পড়ে তাহলে তাকে খাল বিল বা মাঠে, যেখানে হোক নেমে পড়তে হবে। কিন্তু ডাকোটা হলে সে অসুবিধায় পড়তে হবে না। কারণ, ডাকোটা নামতে পারে ৬০-৫০ ফুট পর্যন্ত।

ফ্রেণ্ডশিপ বিমানের তেলের খরচ খুবই কম। আগরতলা থেকে কলকাতা আসতে লায় হয় মাত্র দেড় থেকে দু লিটার তেল।

বিমানটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ফলে আকাশে চলাকালীন সময়ে ধূমপান করা যায়। তাছাড়া বিমানে আছে প্রেসার ইজেশান সিস্টেম। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় ১১ হাজার ফুট ওপরে বিমানটি পৌঁছুলে। হাওয়াই বন্দর ছেড়ে এই উচ্চতায় পৌঁছুতে বিমানের সময় লাগে মাত্র ৮ মিনিট। জানা কথা মানুষ স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চালাতে পারে ৭,০০০ ফুট পর্যন্ত। কিন্তু বিমানটি যদি ৮০০০ ফুট ওপরে ওঠে পড়ে তখন স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে শ্বাসকষ্ট। অজ্ঞান হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে হয়তো, তাই ডাকোটা বিমান সাধারণতঃ উড়ে চলে ৭,৫০০ থেকে ৭০০০ ফুটের মধ্য দিয়ে। কিন্তু পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক অবস্থার দরুণ এ অঞ্চল সাধারণত থাকে ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে। ফলে ডাকোটা বিমানগুলির পক্ষে ঐ ঘন মেঘ কেটে বেরিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধাজনক। তা বিপজ্জনকও বটে! কারণ, ডাকোটা ইঞ্জিনের শক্তি কম এবং তা চলে পিস্টন ব্যবস্থায়। এছাড়া আছে অটো ফিদার্ড বা প্রপেলার জমে যাবার সম্ভাবনা। মেঘের ঠাণ্ডায় যদি প্রপেলার জমে যায়, তাহলে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে মাঝ আকাশ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মৃত্যু অনিবার্য। অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল গত ফেব্রুয়ারী মাসে। গৌহাটি-গামী একটি ভাইকাউন্ট বিমান ছাড়ে দমদম থেকে বেলা ১-৫০ নাগাদ। এক ঘণ্টা পর তাঁরা যখন মাঝপথে এবং পাকিস্তানের আকাশে ভাসছেন, তখন হঠাৎ পাইলট ক্যাপ্টেন লক্ষ্য করলেন, চারটি ইঞ্জিনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তখন বিমানটি ক্রুইশিং লেভেলে। তাঁরা ঢাকা পার হয়েছেন অল্প সময় আগে। এদিকে বিমানটি হু-হু করে নেমে আসছে পূর্ববঙ্গের ধানের ক্ষেতগুলির দিকে। পাইলট ক্যাপ্টেন পড়লেন মহা ভাবনায়। ঢাকায় ফেরার পথও বন্ধ। ক্রমেই গাছ-পালা বড় বড় হয়ে আসছে। হঠাৎ দৈবক্রমে ইঞ্জিনগুলি চালু হল। পাইলট আর দেরী না করে বিমানটিকে দমদমে ফিরিয়ে আনলেন।

ফকার ফ্রেন্ডশীপ বিমানে উক্ত অসুবিধা দূর করা হয়েছে। ঠান্ডায় যাতে টার্বো-প্রপ্ ইঞ্জিনগুলি জমে না পড়ে সেজন্য লাগানো হয়েছে 'থার্মোস্ট্যাট'। ফলে ইঞ্জিনগুলিতে সব সময় সাধারণ তাপমাত্রা বজায় থাকবে। তাপমাত্রা ০—১ ডিগ্রি থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ০—৭ ডিগ্রি।

বিমানে প্রেসারাইজেশন পদ্ধতি থাকায় বিমানটি ৮০০০ ফুটের আরো উপরে অর্থাৎ ১৪—১৫ হাজার ফুট ওপরে উঠলেও যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে শ্বাস নিতে পারবেন। তাদের মনে হবে তাঁরা যেন মাটিতে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিচ্ছেন। এই ব্যবস্থায় ভেতর আর বাইরের চাপ অসমান করে দেওয়া সম্ভব। দীর্ঘ উচ্চতায় বাইরে শ্বাস নেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভেতরের কেবিনে তখন এনে দেওয়া হবে ঘরের বা পৃথিবীর চাপ।

ফ্রেন্ডশীপ বিমান প্রচুর মাল বইতে সক্ষম। এয়ার ক্র্যাফট্ কন্ট্রোল কম্যান্ড বা ককপিটের পেছনেই রয়েছে মাল রাখবার ব্যবস্থা। একুশে এপ্রিল যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়, তাতে ছিল পনের হাজার চিঠিপত্র, দুশো মণি-অর্ডার, ২৫০টি রেজিস্টার্ড চিঠি আর চারশো গ্রাম ওজনের কাগজ। তাছাড়া ছিল যাত্রীদের প্রচুর মালপত্র।

অভিজ্ঞ বৈমানিকদের মতে এ বিমান প্রায় দুর্ভেদ্য। এর ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই। বিমানের মুখে লাগানো আছে রেডার। রেডারের কার্যক্ষমতা পরিব্যাপ্ত ৬০০ মাইল পর্যন্ত। রেডার থাকায় বিমানটি যে কোন আকস্মিক ঝড়ের মোকা-বিলা করতে পারে। কোন মেঘে বিদ্যুৎ আছে, কোন মেঘে নেই তা রেডারে ধরা পড়ে। বৈমানিক তা দেখতে পাবেন ককপিট থেকেই। টার্বো-প্রপ্ জেট শক্তি-চালিত ইঞ্জিন থাকায় অকস্মাৎ ঝড়ের সামনে পড়লে ঝড়কে পাশ কাটিয়ে খাড়া ২৮ হাজার ফুট ওঠার ক্ষমতা ফকার রাখে। ফকার ফ্রেন্ডশীপের দুটি ইঞ্জিন একনাগাড়ে চলতে পারে ৫০০০ মাইল। তারপর সেটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়। ফকার বিশেষজ্ঞদের মতে এর আগে ইঞ্জিন গোলযোগ দেখা দেওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া স্ক্রুর মতন হাওয়া কেটে কেটে বেশী পরিমাণে হাওয়া ডানার নীচে ঢোকানোর ক্ষমতা ইঞ্জিন-গুলির থাকায় ফকার ফ্রেন্ডশীপ বিমান উড়ন্ত অবস্থায় কোন সময়ই কাঁপে না। শুধু মাত্র ঝোড়ো হাওয়া বা ঘন মেঘে ঢুকে পড়লে বিমানটি কাঁপতে থাকে।

ফকার ফ্রেন্ডশীপ বিমান নানা কারণে একটি উল্লেখযোগ্য বিমান। প্রথমত বিমানটি বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বলিত। 'টেক অফ্' করার সময় রাণওয়ে থেকে প্রথম ধাপেই বিমানটি উঠতে পারে ত্রিশ ফুট। মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার চার সেকেন্ডের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুদিকের দুটি চাকার ক্র্যাংক শ্যাফট নিজেই গুটিয়ে বাঁকা হয়ে ঢুকে পড়ে ডানার ভেতর। মুহূর্তে মধ্যে দুটি প্লেট বা ঢাকনা এসে ঢেকে দেয় চাকা দুটিকে। এই দুর্লভ দৃশ্য দেখার সুযোগ বহুবার আমি পেয়েছি চাকার পাশে বসা আসন থেকে জানালার ভেতর দিয়ে। তা ছাড়া বিমানে আছে উচ্চতা নিরূপক রেডিও অল্টিমিটার। এর সাহায্যে কত উচ্চতায় বিমান উড়ছে বা কত উচ্চতা থেকে ইঞ্জিনের স্পীড কমিয়ে নোজল ইঞ্জেক্টার নামিয়ে ল্যান্ড করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে তা জানা সম্ভব। যখন দমদমের কাছে বিমানটি চলে আসে তখন আবার চাকা দুটি প্লেট খুলে বেরিয়ে আসে স্বয়ংক্রিয় ভাবে। তারপর ঝুলন্ত অবস্থায় খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। ফকার রেডিও ডিরেক্টেড ম্যাগনেটিক কম্পাস যুক্ত। রাতের আঁধারে বা ঝোড়ো হাওয়ায় ঢুকে পড়লে বা ঘন মেঘে ঢুকে দিকদর্শন করতে ব্যর্থ হলে দমদম বা আগরতলা থেকে বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করে রেডিওর সাহায্যে বিমানটিকে সঠিক পথে চালিয়ে আনা যায়। এই ধরনের ম্যাগনেটিক কম্পাস নিয়ন্ত্রিত হয় বেতার দ্বারা। উড়ন্ত অবস্থায় কেবিনের ভেতর তাপমাত্রা বজায় থাকে ১৫-২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

আগরতলা থেকে কলকাতার দূরত্ব প্রায় তিনশো মাইল। ফকারের গতিবেগ ঘন্টায় চারশো মাইলের মতন। যদি সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে এ-পথ অতিক্রম করা সম্ভব মাত্র ৪৫ মিনিটেই। কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব নয়। কারণ, এ-পথে ভোরবেলা থেকে ১০টা ১১টা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে বয়ে চলে এক বাতাসের তরঙ্গ। একে পাইলটরা বলেন 'স্ট্রেইলিং উইন্ড'। আবার এই স্ট্রেইলিং উইন্ড' দেখা দেয় বিকেল বেলায়। অবশ্য তখন এর গতিবেগ থাকে উল্টো দিকে। ফলে কলকাতা থেকে সকাল বেলায় আগর-তলার দিকে যাত্রা করলে হাওয়াই বন্দরে পৌঁছুতে দেরী হবে প্রায় বিশ মিনিট বেশী। সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে কলকাতা রওয়ানা হলেও অনুরূপ সময় দেরী হবে। তা ছাড়া আছে আরেক অসুবিধা। আগে বিমানগুলি উড়ে আসতো ঢাকার পাশ দিয়ে। নতুন ব্যবস্থায় ভারতীয় বিমান-গুলিকে আগরতলা হাওয়াই বন্দর ছেড়ে সোজা দক্ষিণে চলে আসতে হয় কুমিল্লা জেলার ওপর দিয়ে। ডাইনে থাকে ঢাকা আর নারায়ণগঞ্জ। প্রায় সত্তর মাইল আসার পর ঠিক ময়নামতীর ওপরে এসে বিমানটি বাঁক নেয় ডাইনে। ইতিমধ্যে বিমানটি মোটামুটি ভাবে ক্রুইশিং লেভেলের কাছে পৌঁছে যায়। তার পরই এসে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত নদী পদ্মা আর তার দিগন্ত বিস্তীর্ণ চর। প্রায় ১৪ হাজার ফুট ওপর থেকে নদীটিকে মনে হয় এক বিরাট খালের মতন। ফকার বিমান পদ্মার দিগন্ত বিস্তীর্ণ চর অতিক্রম করে আড়াআড়ি ভাবে। তারপর বহুক্ষণ চলার পর বাঁদিকে বাঁক নিয়ে খুলনার ওপর দিয়ে কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে উড়ে এসে দমদমে নামে। তবে এ রুটের আর একটি ভয়ঙ্কর বিপদ হল একটি তিন মাইল ব্যাসের 'এয়ার পকেট'। এটি বৈমানিকরা এড়িয়ে চলেন সযত্নে। কারণ এয়ার পকেটে যে হাওয়ার তরঙ্গ বইতে থাকে, তা বিমান চলার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। অভিজ্ঞ বৈমানিকরা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যান অনেক সময়। কারণ তা না হলে যে কোন সময় ফকার বিমানের চলার রুট থেকে প্রায় ৬০০-৭০০ ফুট একটানে নেমে যাবার সম্ভাবনা থাকে কিংবা এয়ার পকেটের গায়ে ধাক্কা লেগে বিমানটি উল্টে পাল্টে যেতে পারে। হয়তো একুশে এপ্রিলের হতভাগ্য ফকার ফ্রেন্ডশীপ (এফ-২৭) বিমানের ভাগ্যে তাই ঘটে।

ফকার বিমানের আরেক বিপদের সম্ভাবনা থাকে প্রেশারাইজেশন পদ্ধতির গণ্ডগোল থেকে। বিমানের দু-দিকের গায়ে থাকে দুটি যন্ত্র। এদের কাজ হল একটি নলচে দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া 'প্রেশারাইজড এয়ার কন্ডিশন্ড' কেবিনে ঢুকিয়ে আর একটি নলচে দিয়ে ভেতরের গরম বাতাস অথবা সিগারেটের ধোঁয়া বের করে দেওয়া। প্রথম নলচে সামনে, আর দ্বিতীয় নলচে থাকে পেছনে। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে
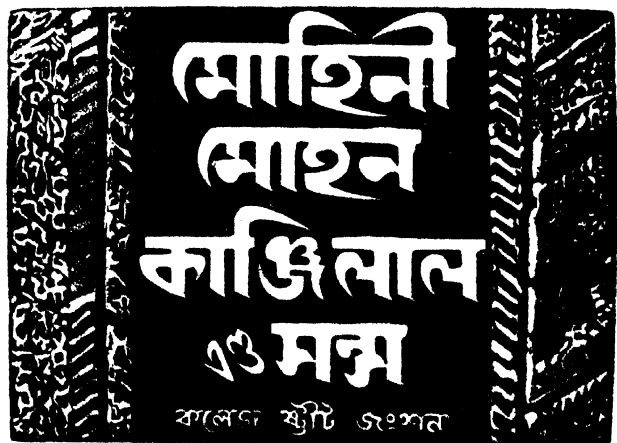
বদ্নাং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখন যদি প্রেশারাইজেশন পদ্ধতিতে সামান্য গোল-যোগ হয় কিংবা কোন ছিদ্র দেখা দেয় তবে আর রক্ষা নেই। বিমানের দেহ উত্তপ্ত হতে হতে অকস্মাৎ পেছন থেকে আগুনে কে. প্লাস্টিককে আগুনে ধরলে যেরূপ হয়, ঠিক সেরূপ অবস্থা হয়ে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিন্নভিন্ন অংশ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, দুর্ভাগা ফকার বিমানটিতে প্রথম আগুন লেগেছিল লেজের দিক থেকে. তা যদি সত্যি হয় তবে বিমানের প্রেশারাইজেশন পদ্ধতিতে যে গোলযোগ হয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। ফকার ফ্রেন্ডশীপ এফ—২৭ বিমানে সবরকম বিপদ মোকাবিলা করার প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন সেটি দামুরিয়ার কাছে ভেঙে পড়লো, তার কারণ জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। বিমানে তেল দেওয়া হয়েছিল মাত্র দেড় ঘন্টার উপযোগী। এবং যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন বিপাশায় তেল ছিল নামমাত্র। দমদমে নামার মাত্র ১৭ মিনিট আগে এই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রবন্ধকার তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারেন তাহলে বিমানটি ছিল খুলনা থেকে কিছু পূর্ব-দক্ষিণে দৌলতপুরের শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি (এখানেও একটি বড়ো নদী বিমানের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে; নদীটি তিন ভাগে বিভক্ত)। এ জায়গা অতিক্রম করার পরই বিমানের মুখ নেমে যেতে এবং ইঞ্জিনের গর্জন ক্রমেই কমে আসতে থাকে। তখন সুরু হয় গ্লাইডিং। এ সময় সাধারণ আবহাওয়াতে ফকার বিমান উড়ে থাকে মাত্র ৮০০০ ফুট উচ্চতায়। এখন লক্ষ্য করার বিষয় তখন যদি কোন জোরালো হাওয়া বিমানটিকে একবার ঝড়ের মধ্যে ছুঁড়ে তারপরই আবার ধাক্কা দেয় এয়ার পকেটের গায়ে এবং সেই সঙ্গে যদি প্রেশারাইজেশন সিস্টেমে ছিদ্র থাকে তবে মুহূর্তে মধ্যে উলট-পালট খেয়ে ফকারে আগুন ধরা স্বাভাবিক। প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, কেন বিপাশা ঝড়কে পাশ কাটিয়ে ৮ হাজার ফুট ওপরে উঠতে ব্যর্থ হলো? তাহলে বলতে হয় বিমানটি তখন নামার পথে এবং দীর্ঘক্ষণ চলার পর ইঞ্জিনের শক্তি প্রায় নিঃশেষ। তেলও ফুরিয়ে এসে-ছিল তখন। সুতরাং অকস্মাৎ মৃদু গতিবেগ থেকে ফুল স্পীড তোলাও অসুবিধাজনক। এটাও জানা ভাল যে, আকস্মিক ঝড়ের মোকাবিলা করতে ফকার ফ্রেন্ডশীপ সময় নেয় অন্তত ছয় মিনিট। হয়তো হতভাগ্য বিমান চালক পাইলট ক্যাপ্টেন রবীন ঘোষ তাও পাননি। বিপাশার রেডার ছিল মজবুত[illegible]রণের। বিমান চালকদ্বয় জানতেন ঝড়ো হাওয়ার কথা। ঢাকা আর কলকাতা হাওয়াই বন্দর থেকে তাঁদের একথা জানানো হয় এবং ঢাকা বিমানবন্দর থেকে তিন নং বিপদ সংকেত দিয়ে বলা হয়েছিল ঘন কালো মেঘে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত রুটটি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। তাতে কোন বিমান ঢুকে পড়লে বের হওয়া মুস্কিল হবে। তাছাড়া গোহাটি থেকে কলকাতাগামী একটি বিমানের কম্যান্ডার রেডারে উক্ত বিপদের আভাষ পেয়ে তা জানিয়েছিলেন বিপাশাকে। কিন্তু রবীন ভেবেছিল অন্যান্য বারের মতন এবারও ঘন কাল মেঘ কেটে বেরুবে সে। তাঁর আর বেরুনো হল না। দামুরিয়ার কাছে বিল পাগলায় বিপাশাকে নিয়ে ভেঙে পড়লো রবীন।

বিমানে মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়া যে কী মনের জোরের প্রয়োজন তা জেনেছি আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। গত ১৮ জুলাই সরযূ নামে একটি ফকার বিমানে আমি কলকাতার দিকে উড়ি। ফকারটি যখন এয়ারপোর্টে ছিল তখনই ঘোষণা করা হয় বিমানটির ইঞ্জিন খারাপ এবং প্রেসারাই-জেশন সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। ৪০ জনের বদলে আমরা উড়লাম মাত্র ৮ জন। ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার আশ্বাস দেওয়াতেই আমরা উঠলাম। দিল্লীতে আসার তাড়া থাকায় আমার না এসে উপায় ছিল না। ক্যাপ্টেন মালহোত্রার নেতৃত্বে ঝড়ের বেগে সিঙ্গারবিল বিমান বন্দরের রাণওয়ে থেকে 'টেক অফ' করল সরযূ। তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন লেঃ সোহেলী ফার্স্ট অফিসার হিসেবে। কিন্তু আমাদের 'টেক অফ' ভাল হল না। কারণ, বিমানটি তখন কাঁপছিল। আর পড়ে যাচ্ছিল দু-তিন ফুট। যেমন, একটানা শ্বাস নিলে হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে পড়ে দু-এক সেকেণ্ডের জন্য ঠিক সে রকম হচ্ছিল। সেই শ্বাস-রোধকারী মুহূর্তে বিমানটি পড়ে যাচ্ছিল একটু একটু করে। তাছাড়া বুঝতে পার-ছিলুম বিমানের প্রেসারাইজেশন পদ্ধতি গোলযোগপূর্ণ। কারণ শব্দটা একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। কারণ, ফকারে কোন দিন এরকম শব্দ হবার সম্ভাবনা কম। যদি পিস্টন ইঞ্জিনের মতো 'ঘর...ঘর'...শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে প্রেসারাইজেশন এবং ইঞ্জিন-এ গোলযোগ আছে। কারণ, ফকারের শব্দ হয় সাধারণত তীক্ষ্ম, টার্বো-প্রপ জেট বলে। অভিজ্ঞ পাইলটরা এ শব্দ দ্বারাই বুঝতে পারেন প্রেসারাইজেশন সিস্টেমে-এ গণ্ডগোল আছে কিনা। এদিকে বিমানটি ১১ হাজার ফুটের ওপরে ওঠে যেতেই তার দেহ হয়ে উঠলো উত্তপ্ত। শ্বাস নিতে পারছিলুম না। কারুর কথা শোনা যাচ্ছিল না। দেখা দিল আরেক বিপদ। যে কারণে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল, ঠিক সে কারণে আর একটা শব্দ সুরু হয়ে গেল। কংক্রিটের রাস্তার উপর দিয়ে ইস্পাতের পাত টেনে নিলে যে শব্দ হয় সেটা হচ্ছিল বিমানে। ফকার ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ক' মিনিট আগে ওই শব্দের উৎপত্তি হয়। ক্যাপ্টেন মাল-হোত্রা তাড়াতাড়ি বিমানটি ৮ হাজারে নামিয়ে আনলেন। এদিকে ৬০০০ থেকে ৯০০০ ফুট ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। ককপিটের দরজা খুলে দেওয়া হল। সামনে মেঘের পাহাড়। প্লাসকল্ট চলছে। দৃষ্টি ঝাপসা। কিছুক্ষণ নাগর-দোলায় চক্কোর খেয়ে আবার সেই ফেটে যাবার শব্দ! আবার নেমে এলো। কোনবার ফকারের মতন কোনবার ডাকোটার মতন হয়ে উড়তে লাগলুম আমরা। ভয়ে আমার কপাল থেকে টপ-টপ করে ঘাম ঝরতে লাগলো। কিন্তু দেখতে পেলাম ক্যাপ্টেন মালহোত্রা, লেঃ সোহেলী আর সেই মাদ্রাজী ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার নিজ নিজ কর্তব্যে অবিচল। ফ্লাইট ইঞ্জিনীয়ার ককপিটের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিলেন আর আমাদের অভয় দিচ্ছিলেন। ময়নামতীর ওপরে এসে যখন ডাইনে মোচড় দিয়ে বাঁক নিয়ে অকস্মাৎ একপাশে হেলে পড়লো সরযূ, তখন আমি উত্তেজনায় হেলে পড়লুম সিটের ওপরই। ভাবলুম, মা-বাবাকে জীবনে আর দেখা হল না। যা হোক, অসংখ্যবার উলট-পালট খেতে খেতে দু ঘন্টারও বেশী সময় পর দমদমের আশে-পাশে লাল রঙের টালির ঘরগুলি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। দেখতে পেলাম যাত্রী বোঝাই ট্রেন থেকে ঝুলন্ত যাত্রীরা তাকাচ্ছে ওপরের দিকে। দেখলুম, এক ভদ্রলোক পুকুরে স্নান করছেন বালতি দিয়ে জল ঢেলে ঢেলে। সুনিপুণভাবে সরযূকে নামিয়ে নিলেন ক্যাপ্টেন মালহোত্রা রাণওয়ের উপর। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম আমরা। বিমানটি গিয়ে থামলো হ্যাঙ্গারে, মেরামতের জন্য। পৃথিবীর বুকে ফিরে এলুম আবার।

ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান অনেক কারণে অন্যান্য বিমানের চেয়ে আলাদা। প্রথমত অন্যান্য বিমানের ককপিটে ডাইনে বসেন পাইলট ক্যাপ্টেন এবং বাঁয়ে থাকেন ফার্স্ট অফিসার। কিন্তু ফকারে তার ব্যবস্থা উল্টো। এখানে বাঁয়ে থাকেন উড়ো জাহাজের কম্যাণ্ডার আর ডাইনে থাকেন নেভিগেটর। দ্বিতীয়ত অন্যান্য বিমানে ঘন মেঘের দরুণ 'ভিজিবিলিটি জিরো' বলতে যা বোঝায় তা হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ফকার বিমানে তা ঘটে না। এ জন্যেই ঝড়ো হাওয়ার ভেতর দিয়ে ফুলঝুরির মতন মেঘগুলোকে ছাড়িয়ে ফকার এগোতে পারে।

ফ্রেন্ডশিপ বিমানের ডানা দুটি ছড়ানো থাকে ঘাড়ের উপর দিয়ে। ফলে যাত্রীদের পক্ষে জানালা থেকে নানান ধরনের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা সম্ভব। বিমানের দেহ নানা ধরনের ধাতুর মিশ্রণে গঠিত। এর মধ্যে আছে প্লাস্টিকের উপাদান। তাই বিমানটি খুবই হালকা হয়।

মাঝারি ধরনের বিমানক্ষেত্রই ফকারের উপযোগী। মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে ফকারের প্রয়োজন হয় মাত্র দেড় থেকে দু' হাজার ফুট দৈর্ঘ্যসম্পন্ন রাণওয়ে। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, অনেক সময় টারম্যাক থেকে চলতে সুরু করে মাঝ রাণওয়েতে পড়ে গিয়েই টেক অফ করে ফকার। একটুও দম না নিয়ে।

সন্ধেবেলায় ডাক্তারখানায় আমাদের আড্ডা।

সামনের পথ খোঁড়া হচ্ছে। সেখান দিয়ে ইলেকট্রিকের নতুন তার যাবে। তার ওপাশে একটা সিনেমা। সেখানে সারি-সারি লোক বসেছে তেলেভাজা ভাজতে। ডাক্তারখানার রকে. কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলের দল গুলতানি করছে। উত্তর থেকে হাওয়া বইছে। ফুটপাথের দেবদারু গাছ থেকে ঝরে পড়ছে অজস্র পাতা। আমার গরম চাদরেও একটা পড়লো। সেটা ফেলে ডাক্তার-খানায় ঢুকে দেখি ডাক্তার খুব ব্যস্ত।

কোণের একটা চেয়ারে বসলাম। যিনি পেশেন্ট তিনি মহিলা। তাঁর গায়ের যেটা জামা সেটা জামার নামান্তর। একবার চাইলেই মাথা হেঁট হয়ে আসে। তাই পথ খোঁড়া আর সিনেমার সামনে তেলেভাজা ভাজা দেখতে লাগলাম।

পেশেন্ট বললেন, "আজকেও ওজন নিলাম. ডাঃ রায়। আরো দু' পাউন্ড বেড়েছে—"

ডাক্তার হেসে বললেন, "সকাল সন্ধেয় যে হাঁটবার কথা বলেছিলাম সেটা করছেন?"

"সকালে সময় কোথায় বলুন? বাবলিকে মিউজিক ক্লাসে নিয়ে যাওয়া। তারপর সেই— আপনি তো জানেন—সেই কিন্ডারগার্টেন স্কুল। তারপর আবার বাবলিকে নিয়ে আসা। তারপর তো স্বামী। তাঁর সঙ্গে ক্লাবে যেতেই হয়।" —এইটুকু বলে বুঝলাম তিনি হাসলেন।

ডাক্তারও হাসলেন।

বললেন. "সময় একটু করতেই হবে. মিসেস সেন। একটু হাঁটা-চলা করা খুব দরকার।—তিনটে পুরিয়া দিলাম। পরশু আসবেন—"

বুঝলাম এই পুরিয়া দেবার দরকার ছিলো না।

"থ্যাংক ইউ", বলে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যেতেই ডাক্তার বললেন, "বাব্বা! —একটা বিড়ি-টিড়ি দে।"

একটা সিগারেট দিয়ে বললাম, "তোর তো দেখছি জম-জমাট প্র্যাকটিস। মহিলাকে এমন একটা ওষুধ দিলি না কেন যাতে গায়ের জামাটামা একটু বড় হয়?"

সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার বললেন, "আমি এমন একটা ওষুধের কথা ভাবছি যেটা দিলে পেসেন্ট ফি দেয়।"

এমন সময় একটি পাহাড়ি লোক হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তারখানায় এসে জোড় হাত করে দাঁড়ালো।

ডাক্তার তাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেট বাইরে ছুঁড়ে ফেললেন। বললেন, "লেড়কা ক্যায়সা হ্যায়?"

পাহাড়ি লোকটির নাম বাহাদুর। তার চুল রুক্ষ। ক্ষুদে-ক্ষুদে চোখদুটো লাল। সমস্ত মুখে একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। সব পাহাড়িদের নাম কেন বাহাদুর হয়? অন্তত এর কেন হলো? দেখে মনে হয় সমস্ত বাহাদুরি সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু নাম চুলোয় যাক।

সে বললো, 'ডাকটর সাব. সমঝতা নেই। শ্বাস মে বহুৎ তকলিফ। আঁখ উলটু যাতা হ্যায়।"

ডাক্তার আমাকে বললেন, "কাল দেখেছি ছেলেটার দুটো লাংগু-ই অ্যাফেকটেড। কে জানে কেমন আছে।" ডাক্তারি ব্যাগটা তুলে নিয়ে তিনি বেরুলেন। বাহাদুর আর আমি পিছু নিলাম। পাশের ডাক্তারখানা থেকে তিনি কোরামিনের একটা অ্যামপিউল কিনলেন।

হোমিওপ্যাথি করলেও দরকার পড়লে তিনি ইনজেকশন দিয়ে থাকেন।

বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা ছোটো একটা রাস্তায় পড়লাম। ছোটো রাস্তা ছেড়ে আমরা ঢুকলাম সরু একটা গলিতে। এঁকে-বেঁকে গলিটা চলেছে। দেয়ালের গায়ে ঘুঁটে, নীচে আবর্জনা। একটা বাঁকের মুখে দিশি মদের দোকান। বমি-উঠে-আসা গন্ধ। হৈ-চৈ ঝগড়ার শব্দ। তারপর একসারি ভাঙা রিক্সা মুখ থুবড়ে পড়ে। একটা মরা বেড়াল-ছানার ওপর মাছি ভন-ভন করছে। তারপর মাটির দেয়ালের একটা বাড়ি। করগেট টিনের ছাত। বাড়িটার ছাল-চামড়া কে যেন ছাড়িয়ে নিয়েছে।

মাথা নীচু করে ঢুকতে হোলো। দরজাটা ভারি ছোটো। ঢুকেই মনে হোলো হঠাৎ যেন রাত হয়ে গেছে। সেঁতসেঁতে একটা শীত সমস্ত শরীরে যেন সেঁধিয়ে গেলো।

কোণের কুলুঙিগতে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। আলোর চেয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বেশি। তার পাশে একটি খাটিয়ায় পাহাড়ি একটি মেয়ে। বয়েস ঠাহর করা দায়। নাকে নথ। ব্লাউজের বোতাম খোলা। কোলে কয়েক বছরের একটি ছেলে। অনাবৃত স্তন ছেলের মুখে চেপে একটানা বলে চলেছে, "পি লে বেটা, পি লে বেটা—"

ডাক্তার স্টেথিসকোপ বার করে চটপট বুক পিঠের শব্দ শুনলেন। চটপট সিরিঞ্জ বার করে অ্যামপিউল ভেঙে ছেলেটার বুকে ইনজেকশন দিলেন।

বুঝলাম ইনজেকশন দেবারও দরকার ছিলো না।

এখানকার অল্প আলোয় চোখ এতোক্ষণে সহে এসেছে। দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের কয়েকটা ছবি। গন্ধমাদন মাথায় নিয়ে শ্রীহনুমান আকাশে উড়ে সমুদ্র পার হচ্ছেন; একটি তরুণী চটুল চোখে তাকিয়ে চুল বাঁধছে—পেট-বুক-হাতকাটা ব্লাউজ ভেদ করে উদ্ধত স্তনযুগলকে "অনাঘ্রাত পুজোর ফুল-দুটি" বলে মনে হচ্ছে না; দশমুণ্ড রাবণ গদা হাতে দশ মুখে দাঁত কিড়মিড় করছে; ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি দশ-এগার বছরের মেয়ে তার ন্যাকড়ার ছেঁড়া পুতুলটা ভাইয়ের হাতে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো "লে লে ভাইয়া।"

পাহাড়ি মেয়েটি অসঙ্কোচে তার অনাবৃত স্তন সন্তানের মুখে চেপে এক-টানা যেন ঘুমপাড়ানি গানের সুরে বলে চললো, "পি লে বেটা, পি লে বেটা—"

ডাক্তার আমার দিকে তাকালেন, বাহাদুর আমাদের দিকে তাকালো। তারপর আমরা তিনজনে বেরিয়ে এলাম।

তারপর আবার সরু গলি, আবার ছোটো রাস্তা, আবার বড় রাস্তা, আবার উত্তুরে বাতাসের ঝরা-পাতা, আবার ডাক্তারখানা।

ডাক্তার সার্টিফিকেট লিখে বাহাদুরকে দিলেন। বাহাদুর কী যেন বলতে গিয়ে বলতে পারলো না। চলে গেলো।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার ডাক্তারখানার আড্ডায়।

উত্তরের বাতাসে আজ আরো বেশী পাতা ঝরছে। রকে বসে ছেলের দল গুলে-ভুনি করছে। সিনেমার সামনে তেলেভজা ভাজা হচ্ছে। মিসেস সেন বলছেন, "সকাল থেকে রেবা কিছু খাচ্ছে না। আজ ওষুধ নিয়ে যাই। কাল আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে—"

হোমিওপ্যাথিতে মানুষ কুকুর সবারই অসুখ সারে। ডাক্তার ওষুধের পুরিয়া দিলেন। মধুর হেসে মিসেস সেন চলে গেলেন। তাঁর গায়ের জামাটা যেন আরো ছোটো হয়ে গেছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললেন, "আজ নিয়ে টোটাল দাঁড়ালো ছাপান্ন টাকা—"

আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে দরজার মধ্যে দিয়ে বাইরের সিনেমা-হলের দিকে তাকালাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না। কারণ বাহাদুর সেখানে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে।

ডাক্তার বললেন, "কী খবর বাহাদুর?"

বাহাদুর ভিতরে এসে টেবিলের ওপর চারটে ময়লা একটাকার নোট রাখলো। তারপর ভীতু-ভীতু গলায় বললো, "ডাক্টর সাব, আপকো ফি—"

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সৃজনশীল সংশয়বাদ

অধ্যাপিকা মার্গারেট উইলে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী ও মার্কিণ সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। তাঁর বিশ্বাস অতীতের ও বর্তমানের সাহিত্য বিচারে সৃজনশীল সংশয়বাদের পটভূমি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচিতি বিশেষ উপযোগী। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা স্পষ্ট করে বলেছেন যে এই সংশয়বাদ বা scepticism -কে অবিশ্বাসের দর্শন বলে ধরে নিলে ত্রুটি হবে। যে সংশয়বাদ অবিশ্বাসসূচক তা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের উত্তরাধিকার। রেনেসাঁস পর্বে ইংলন্ডে এবং কন্টিনেন্টে ভাবনা চিন্তাভঙ্গীতে সরলীকরণের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল সংশয়বাদকে অবিশ্বাসের দর্শন হিসাবে অংশত তারাই চালিয়েছিল। তার পিছনে আছে সুদীর্ঘ ইতিহাস।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক পাইরোর অভ্যুদয় ঘটে, এই পাইরো হলেন সৃজনশীল সংশয়বাদের জনক। তাঁর এই মনোভঙ্গীর পিছনে আছে এক সম্ভাব্য ইতিহাস। আলেকজান্দার যখন ভারত আক্রমণে এসেছিলেন তাঁর সৈন্যদলের অন্যতম হয়ে এসেছিলেন এই পাইরো। তাঁর সহচর ছিলেন ডেমোক্রিটাসের একজন শিষ্য এনাকসার চুষ। পাইরোর দর্শনের অনেক সূত্র এবং ভাবধারার সঙ্গে ভারতে দীর্ঘকাল প্রচলিত অনেক তত্ত্ব ও মতের আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়।

সত্যের সন্ধানে তিনটি মুখ্য শব্দের প্রতি পাইরো বিশেষ গুরুত্বদান করেন, আইসোসোথেনিয়া, ইপোক এবং আতারা-কসিয়া। আইসোসোথেনিয়া বলতে পাইরো বুঝেছিলেন যে প্রতিটি উক্তির ভারসাম্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য তার বিরুদ্ধ উক্তিকেও পাশাপাশি রাখতে হবে, তবেই সত্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন আইসোসেলস ত্রিভুজে দুটি সমান অংশ থাকে, সত্যের আকৃতিকে অবিকৃতভাবে পেতে হলে দুটি বিভিন্ন মতামত একত্রে রেখে সমতা বজায় রাখতে হবে।

ইপোক—কথাটির অর্থ মতামতকে স্থগিত রাখা এবং আতারাকসিয়ার অর্থ মানসিক শান্তি অর্থাৎ দুটি বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করে তৃতীয়টিকে (শান্তি) লাভ করতে হবে। সংশয়বাদীরা স্টোইক এবং এপিকিউরিয়ানদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে যে বস্তুটির সন্ধান করেছেন তারই নাম শান্তি।

বর্তমান কালে 'আতারকসিকস' এই অভিধাটুকু বেঁচে আছে শান্তিদায়িনী সর্বরোগহর মহৌষধ হিসাবে এবং প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সর্পগন্ধা (রওলফা সার্পেন্টিনা) তার অন্যতম।

পাইরোর পর এই আন্দোলনের উত্থান-পতন ঘটেছে। সাচ্চা পাইরোবাদীদের দল কট্টরপন্থীদের এড়িয়ে চলেছেন, তাঁদের সেই কট্টর মতবাদের প্রস্তরশিলায় আছড়ে পড়ে মাথা গুঁড়ো করতে চান নি। সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে রোমান দার্শনিক সেকসটাস এমপায়ারিকস খাঁটি পাইরো পন্থী খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই পাইরো মতের প্রতি পুনরায় জোর দিয়ে উভয় পন্থাকেই অবলম্বন করে সত্যের সন্ধান করতে হবে। এই জাতীয় সংশয়বাদ, যাকে নাস্তিবাচক না বলে বরং অস্তিবাচক এবং সৃজনশীল বলা যায় তার প্রকাশ পেয়েছিল কুসার নিকোলাস ও আবেলারের মত চিন্তা নায়কের বক্তব্যে। নিকোলাসের বক্তব্যে অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতার কথা ছিল, আবেলার তার 'হ্যাঁ এবং না' নামক তত্ত্বগ্রন্থে লিখেছিলেন যুক্তিবাদীদের সংশয় নিরসনে এবং এইভাবেই তাঁরা পাইরো-ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন। লেখিকা বলেছেন একালে সম্ভবত ফরাসী দেশের, জার্মাণীর এবং আমেরিকায় অস্তিত্ববাদীর দল আছেন যাঁদের চিন্তা-ধারার প্রতিধ্বনি মেলে প্রাচ্য ভূখণ্ডে, বিশেষত ভারতে। আর এই ভারতবর্ষ থেকেই (লেখিকার ধারণানুসারে) পাইরো তাঁর দার্শনিক সূত্রের ভিত্তি রচনা করেছিলেন।

সংশয়বাদ সম্পর্কে মঁতে যে সংজ্ঞা দান করেছেন তা লক্ষ করা প্রয়োজন। তিনি পাইরোপন্থী সংশয়বাদীদের প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "the profession of the Phyrrhonians is ever to waver to doubt and to enquire never to be assured of anything ..."

এই ঋজু এবং অনমনীয় বিচারবুদ্ধির ফলেই সব কিছুই তাঁরা বিচার করে গ্রহণ করেন। ফলে তাঁরা একটা নিশ্চিন্ত, শান্ত এবং স্থির জীবনের অধিকারী। উদ্বেগ-উত্তেজনা থেকে মুক্ত এই মানুষগুলি নানা-বিধ ত্রুটি থেকে এবং হিংসা ও দ্বেষ থেকে মুক্ত বলে একটা ব্যক্তিগত নিয়মানুবর্তিতার বাঁধনে নিজেদের বাঁধতে পেরেছেন, তাঁরা প্রতিশোধের বা প্রতিবাদের ভয়ে শঙ্কিত নন।

মঁতে তাঁর মতবাদ যথাসম্ভব গোঁড়ামি-মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর নীতি সংক্ষেপে—আমি আর কি জানি? তাঁর নিজস্ব প্রতীক ছিল একটি মানদণ্ডের। ঈশ উপনিষদে এই জাতীয় প্রজ্ঞাদীপ্ত-বিনয়নম্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ বিদ্যায়াং রতাঃ।।

অর্থাৎ যাঁরা কেবল অবিদ্যাকে উপাসনা করেন, তাঁরা অতি গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করেন, আবার যাঁরা কেবল বিদ্যাকে (অর্থাৎ জ্ঞানকেই) উপাসনা করেন তাঁরা তার থেকেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন।

মতে' বলেছিলেন যে, পাইরো মতবাদী-দের জন্য একটি নতুন ভাষার প্রয়োজন যে ভাষার মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব। সকল প্রকার প্রচলিত ভাষার মত নয়, এই ভাষায় গোঁড়া মতবাদের জন্যও স্থান থাকবে। প্রাচ্য দেশের চিন্তানায়করা প্যারাডক্সের অপরিহরণীয় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, ভাষার মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি করার শক্তি তাঁদের ছিল। কেন উপনিষদে আছে—

'যস্যামতং তস্য মতং, মতং যশ্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজনতাম।।

অর্থাৎ যিনি মনে করেন—আমি ব্রহ্ম জানতে পারিনি, তিনি তাঁকে জেনেছেন, আর যিনি মনে ভাবেন, আমিই তাঁকে জেনেছি, তিনি তার কিছুই জানেন না। তিনি সম্যগদর্শী বিজ্ঞদের কাছে অবিজ্ঞাত এবং অসম্যাগদর্শী অবিজ্ঞগণের নিকট বিজ্ঞাত।

লেখিকা বলছেন যে উপনিষদের এই ভাষা এক অপূর্ব ভাষা, তার মধ্য দিয়ে যে সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে তা অন্যভাবে সম্ভব ছিল না। তিনি লিখছেন—

> "Here with a glance towards basic nescience and a distrust of logical statement. is set forth obliquely a truth which could not be stated directly. Just as in the Bhagavad Gita the paradox of killing and not killing is expanded into an insight transcending either position, although not directly suitable"

প্রাচ্য দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লেখিকা বিশেষ করে ভারতের অধ্যাত্ম সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে সংশয়বাদ এবং আস্তিক্যবাদের সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন।

১৯৫৭-৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে অধ্যয়ন করার কালে লেখিকার সুযোগ হয় অধ্যাপক এস সি চ্যাটার্জীর সহযোগে ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানলাভের। এছাড়া লেখিকার স্বামী শ্রীযুক্ত রোডরিক মার্শালের সঙ্গে তিনি প্রায় বারোটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরেছেন মার্কিণ সাহিত্য-অধ্যাপনা সূত্রে। কলিকাতার বাইরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন সাহিত্য পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সূত্রে ভারতীয় দর্শনে যে সংশয়বাদের পরিচয় আছে সেই তত্ত্ব তিনি অনুসন্ধানের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন ভারতীয় দর্শনের এই ধারা পাশ্চাত্য দর্শনের পরি-পূরক এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রেরণাসূত্র হওয়ায় ভারতীয় চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মধ্যে সংযোগ-সেতুর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইমার্সন, হুইটম্যান, থোরো প্রভৃতি তাঁদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরাজ লেখকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে কাজ করে গেছেন তার ফলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন সাহিত্য পঠন-পাঠনের এক বিস্ময়কর সুযোগ ঘটে গেছে।

এই গ্রন্থে এডওয়ার্ড স্পেনসার, ফ্রান্সিস বেকন, মিলটন, কেম্ব্রিজের প্লেটো-পন্থীরা, জোনাথান এডয়ার্ডস এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সারল্য, কোলরিজের ধর্মীয় চিন্তায় ভারতীয় আকৃতি, মেলভিল এবং বৃত্ত-বৃত্তান্ত, হেনরী জেমস, হেনরী এডামস, আস্তিক্যবাদ—ভারতীয় চিন্তায় সংযোগ সেতু—এই প্রবন্ধগুলি সংযোজিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলির কয়েকটি বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক (ইংরাজী সংস্করণ) পত্রে প্রকাশিত হয়, কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে রচিত।

সংশয়বাদ অতিশয় দুরূহ তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্ব উত্তরকালে আস্তিক্যবাদের অভ্যন্তরে কিভাবে আশ্রয় নিয়েছে তা দর্শন শাস্ত্রের আগ্রহী পাঠকের কাছে অজ্ঞাত নয়। শ্রীমতী মার্গারেট উইলের প্রবন্ধাবলীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ গুণ যে সেইগুলি সরলভাবে পরিবেশিত। শিক্ষার্থী এবং উৎসাহী পাঠক উভয়ের কাছেই 'ক্রিয়েটিভ স্কেপটিকস' এক মূল্যবান গ্রন্থ।

গ্রন্থটির ছাপার প্রশংসা না করে এই আলোচনা শেষ করা অনুচিত হবে, এমন সুন্দর ছাপা কদাচিৎ দেখা যায়।

—অভয়ঙ্কর

CREATIVE SCEPTICS : By Prof. Margaret L. Wiley. Published by SCIENTIFIC BOOK AGENCY : Raja Woodmunt Street: Calcutta : Price Rs. 7-50 only.

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

কয়েকদিন আগে দিল্লীতে ছোট পত্রিকা এবং সাময়িকপত্র সম্পাদকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন 'আভেশ' নামক একটি পত্রিকা। এই সম্মেলন উপলক্ষে এই পত্রিকার একটি বিশেষ কংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। এতে ভারতের বিভিন্ন তরুণ লেখকের গল্প-কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যাঁদের লেখা অনূদিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন, অশোক বাজপেয়ী, অশোক সাহানী, চন্দ্রকান্ত দেওতালে, চেরাবান্দা রাজু, হরনম, ইন্দু শারগিল, রঘুবীর সহায়, রাজকমল চৌধুরী, বলরাজ সমর, বিষ্ণু খারে, শ্রীকান্ত বার্মা প্রমুখ। অনুবাদগুলি কেমন হয়েছে, সে আলোচনা বাদ দিয়েও বলা যায়, উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। ছোট পত্র-পত্রিকার ভূমিকার উপর জন এল কুপার এবং মহেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠর একটি প্রবন্ধ এই সংখ্যাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

ভারতীয় সাহিত্য প্রচার এবং প্রসারের দিক থেকে এই ধরনের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। আর অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তারও চেয়ে বেশি। অথচ দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে আমাদের ভারতীয় সাহিত্যিকদের খুব একটা উৎসাহ নেই। নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছু করে যাচ্ছেন। ভারতে এই ধরনের অনুবাদ প্রকাশ করে থাকেন 'থট', 'লিটারেরি হাফ-ইয়ারলি', 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' প্রভৃতি কিছু পত্রিকা। কিন্তু এই পত্রিকাগুলি মূলত ব্যব-সায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত বলে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রচনা বিশেষ প্রকাশিত হয় না। এ ব্যাপারে 'পোয়েট্রি ইন্ডিয়া' এবং 'বেঙ্গলি লিটারেচার' পত্রিকা দুটির উদ্যম প্রশংসনীয়। তবে নিসিম ইজিকিয়েল সম্পাদিত 'পোয়েট্রি ইন্ডিয়া' পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। 'ইন্ডিয়ান রাইটিং টু ডে' পত্রিকায় ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের উপর আলোচনা প্রকাশিত হয়। পি লাল সম্পাদিত 'মিসেলিনি', মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত এবং এম গোবিন্দন সম্পাদিত 'সমীক্ষা', স্বদেশ ভারতী সম্পাদিত 'রূপাম্বরা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসারের ব্যবস্থা আরো সঙ্গীন। ফোরিয়ান বা চাইনিজ সাহিত্যের যত অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তার এক দশমাংশও ভারতীয় সাহিত্যের হয় না। যে কয়টি পত্রিকা নিয়মিত ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশ করে থাকেন, তার মধ্যে সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত 'পোয়েট্রি সিঙ্গাপুর', জাপান থেকে প্রকাশিত 'ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট রিভিউ', হংকং থেকে প্রকাশিত 'ইস্টার্ণ মান্থলির' নাম উল্লেখ-যোগ্য। প্রতীচ্যেও কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। পোলান্ড থেকে প্রকাশিত 'রাডার' পত্রিকাটির অবদান এদিক থেকে খুবই উল্লেখ্য। ইংলণ্ডের পত্রিকা 'ব্রেক থ্রু' এবং চিকাগো থেকে 'মহ্সিল' পত্রিকা দুটি বহু ভারতীয় লেখকের রচনা অনুবাদ করেছেন। এ দুটি পত্রিকাই সাইক্লোস্টাইলে ছাপা। 'আর্জেণ্টিনা' থেকে 'ইঞ্জির', প্যারিস থেকে 'লা আরবার', কানাডা থেকে 'ফার পয়েন্ট' প্রভৃতি পত্রিকাও নিয়মিত ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশ করে থাকেন।

বিদেশী সাহিত্য

সম্প্রতি আইসল্যাণ্ডের লেখক হ্যালডর ল্যাকসনেকস সোনীং পুরস্কার পেয়েছেন ডেনমার্ক থেকে। য়ুরোপীয় সংস্কৃতিতে মূল্যবান অবদানের জন্যই এ পুরস্কার। ভারতীয় মুদ্রায় তার নগদ মূল্য এক লক্ষ আশি হাজার টাকা। এর আগে উইনস্টন চার্চিল, বার্টাণ্ড রাসেল, অ্যালবার্ট সোয়াইৎজার, লরেন্স অলিভিয়ের প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিরা সোনীং পুরস্কার পেয়েছেন। ল্যাকসনেকসকে এ খবর জানানো হলে, তিনি বলেন, 'আমি তো এ পুরস্কার চাইনি। তবে টাকাটার সদ্ব্যবহার করতে পারবো ঠিকই। চার্চিলের মতো লোক যে কেন এ পুরস্কার নিয়েছিলেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। ওঁর টাকার অভাব ছিল না!' ল্যাকসনেকস বরাবরই একটু খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। কিছুকাল আগে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে। তারপর একদিন ছেড়ে দিয়েছেন ভালো লাগেনি বলে। 'রুপোলি চাঁদ' নামে তাঁর একটি নাটক এককালে রাশিয়ায় বহুবার অভিনীত হয়েছে। অসাধারণ সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন বেশ কিছুকাল আগে।

প্রকাশকদের কাছে মাথা বিকোন না এমন পণ্ডিত কিংবা সাহিত্যিক সারা পৃথিবীতে কমই আছেন। নামে বেনামে নানারকম লেখা লিখে থাকেন তাঁরা অর্থের বিনিময়ে। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্যতিক্রমের সংবাদ যে পাওয়া যায় না—তা নয়। অনেক মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যিক ব্যবসায়ী প্রলোভনকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তার একটি চমকপ্রদ খবর জানা গেছে সম্প্রতি। মার্শাল ক্যাভেন্ডিস কোম্পানী একটা এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করার জন্য সুমের অভিযানের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করেন জনৈক তরুণ সাহিত্যিককে। তার জন্যে তিরিশ গিনি পারিশ্রমিক পাবেন লেখক। বিনিময়ে অবশ্য তাকে প্রবন্ধের সর্বস্বত্ব ত্যাগ করতে হবে।

এমন অদ্ভুত অমর্যাদাকর প্রস্তাবে ক্ষেপে যান তরুণ গবেষক। এনসাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদক জানালেন, 'খ্যাতিমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা এই সর্তে লিখেছেন।' ভাবটা এই, 'আপনি তো কোন ছার!'

উত্তরে তরুণ গবেষক ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ। লিখলেন, 'অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিতই আসলে বোকা। আমি খ্যাতিমান নই, নির্বোধও নই। আপনারা অন্য কোথাও খোঁজ করতে পারেন। আরো বেশী খ্যাতিমান এবং আরো বেশী নির্বোধ নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।'

খোঁজা হ'ল, তাতে এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রকাশ বন্ধ থাকছে না। ঐ তিরিশ গিনি মূল্যের বিনিময়ে লিখে দেবার মতো পণ্ডিত এবং খ্যাতিমান প্রবন্ধকার তারা যথাসময়ে পেয়ে গেছেন।

হ্যারল্ড ক্রুসের লেখা একটি আলোচনার বই বেরিয়েছে সম্প্রতি 'রেবেলিয়ন অর রেভোলিউশন' নামে। আমেরিকার নিগ্রো-সমাজের প্রকৃত অবস্থাটা কি—সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য।

ক্রুস বলেন, 'আমেরিকান নিগ্রোদের পক্ষে রাজনীতিক বা অর্থনীতিক বিপ্লব করার চেয়ে সর্বাধিক জরুরী প্রয়োজন হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা।' কেননা, সমাজ, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে নিগ্রোরা নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে, অন্যান্য দিকের সাফল্য আসবে সহজেই।

তিনি লক্ষ্য করেছেন সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারে নিগ্রোরা মার্কিনীদের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন।

পুরোণ ভারত

এক সময়ে ভারতীয় বণিকদের ক্যারাভান কাস্পিয়ানের তীরে তীরে আজারবাইজানে পাড়ি জমাত। সে আজকের কথা নয়, বহু শতাব্দী আগের কথা। বাকু, দারবেন্ত, শেমাখে—আজারবাইজানের এইসব প্রসিদ্ধ বাজারে দোকানঘর ভাড়া করে ব্যবসা করত ভারতীয় সওদাগরেরা। ভারতের বস্ত্র, অলংকার আর মশলা ছিল আজারবাইজানের বাজারে মনোমুগ্ধকর পণ্য। 'জ্বালানি তেল' নামে একরকম তেল সেদিন আজারবাইজান থেকে আসত ভারতে আমদানি হয়ে। সওদা নিয়ে ভারতীয় বণিকদের আজারবাইজানে প্রায়ই একনাগাড়ে অনেকদিন কাটাতে হত। বাকুর কাছে সুরেখানিতে আজও দেখতে পাবেন সপ্তদশ শতকের ভারতীয় সূর্য উপাসকদের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। সেই ভাঙা মন্দিরের দেওয়ালে আজও সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি চোখে পড়বে।—ধীরে ধীরে কথা-গুলি বলছিলেন বিখ্যাত সোভিয়েত ঐতিহাসিক আলিওভসাৎ গুলিয়েভ সেদিন এ পি এন সাংবাদিকদের কাছে।

চার শতাব্দ পূর্বে আজারবাইজানের বিখ্যাত কবি ফিজুলির কবিতা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তেমনি ভারতের তৎকালীন লেখকদেরও রচনার অনুবাদ আজারবাইজানের ভাষায় পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতকে আজারবাইজানের খ্যাতনামা ভৌগোলিক গাজি আবেদিন শিরভানি ভারতে এসেছিলেন। ভারতের প্রাকৃতিক জীবন ও ভারতীয় জনগণের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর রচনা রয়েছে। ঊনিশ শতকের বিখ্যাত আজারবাইজানি পণ্ডিত মির্জা ফাতালি আখুনদোভের রচনায় ব্যাপকভাবে রয়েছে ভারতের আলোচনা। "সেই ঐতিহ্য শতাব্দের পর শতাব্দ পার হয়ে আজও অনির্বাণ"—অধ্যাপক গুলিয়েভ প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীনকাল থেকে একেবারে আধুনিক যুগের কথায় চলে আসেন।

আজকে আজারবাইজানি ভাষায় অনূদিত ভারতীয় গ্রন্থের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ থেকে, খাজা আহমদ আব্বাস ও আলি সর্দার জাফরির মত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকদের রচনা আজারবাইজানি ভাষায় ইতিমধ্যেই অনূদিত হয়েছে। অন্যদিকে ভারত সম্পর্কে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন আজারবাইজানের কবি সামেদ ভুর্গুন। আজারবাইজানের একালের বিখ্যাত লেখক মির্জা ইব্রাগিমোভের 'চন্দরের বিদ্রোহ' ভারতেরই পট-ভূমিকায় লেখা উপন্যাস।

ভারত ও আজারবাইজানের প্রাচীন সম্পর্কের উপর অধ্যাপক গুলিয়েভ অনেক-গুলি নিবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯৫৬ সালে বাকুতে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে অধ্যাপক গুলিয়েভের সাক্ষাৎকার এই অধ্যাপককে গবেষণায় বিশেষ উৎসাহিত করেছিল। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে সেই গভীর আলোচনা অধ্যাপক গুলিয়েভ আজও স্মরণ করেন। অধ্যাপক গুলিয়েভ ভারতেও এসেছিলেন। তাঁর লেখা ভারত সম্পর্কে গ্রন্থ ভারতীয় ঐতিহাসিক-দের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। "আমার ভারত ভ্রমণ আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। কারণ যে দেশের সঙ্গে প্রাচীনকালের মৈত্রীর সম্পর্ক নিয়ে আমি গবেষণা করছিলাম সেই দেশে এসে দেখলাম সেই সম্পর্ক আধুনিক যুগে এসে আরও ব্যাপক ও গভীর রূপ পরিগ্রহ করেছে"—অধ্যাপক গুলিয়েভ সাংবাদিকদের বলেন।

A HISTORY OF INDIAN JOURNALISM: By Mohit Moitra. National Book Agency Private Ltd., 12, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12. Price Rs. Ten.

পলাশীর প্রান্তরে ভারতবাসীর জীবন-ধারায় যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল, সেদিন তা উপলব্ধি করবার কোন পথ ছিল না। কোন সংবাদপত্র ছিল না, কোন বইও প্রকাশিত হোত না। চারণকবি কৃষক নরনারীর কণ্ঠে জীবন্ত হয়ে থাকত কেবল বীরত্ব-গাথা। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে কিভাবে তার খবর তুলে ধরবার মত কোন উপায় ছিল না তখন। অথচ যে কোন জাতির সংগ্রামী ইতিহাস জানবার পক্ষে সংবাদপত্রই হোল প্রধান অবলম্বন। পলাশী যুদ্ধেরও তেইশ বছর পরে ১৭৮০ খৃঃ ২৯ জানুয়ারী একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে কলকাতায়। জেমস অগাস্টাস হিকির বেংগল গেজেট প্রকাশিত হল। হিকি fought an uncompromising and ceaseless fight for the liberty of the Press.

হিকির পর সংবাদপত্রের অগ্রগতি ছিল মন্থর। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে সংবাদ এবং সাময়িকপত্রের প্রকাশ বেড়ে যায়। বিদেশীরা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তারা প্রথমে না হলেও, পরে কোম্পানীর অনাচার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরে কঠোর শাস্তি পেয়েছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অত্যাচার এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি বিদ্রোহ ঘটে। কিন্তু—

> Indian newspapers, except on two or three occasions did in spite of their role of opposition, neither sympathise with the fighting peasants and toiling masses nor did they boldly advocate the abolition of permanent settlement and unjust exploitation. The bourgeois influence on them was responsible for this, for they were the products of the new regime.

তারপর থেকে সমাজ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এগিয়ে আসেন সংবাদপত্র প্রকাশে। এ ক্ষেত্রে রামমোহন রায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। ধর্মীয় বিসংবাদেরও ঊর্ধে তাঁর অতুলনীয় মণীষা বিশ্ববোধের ধারণায় যে কতখানি মূর্ত হয়ে উঠেছিল তার নিদর্শন রয়েছে রামমোহন-সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে। সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশ অধিকাংশ সময়েই নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। যারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করতে গিয়েছিলেন তাঁরা নানাভাবে অত্যাচারিত হন। এমনকি জাতীয়তার উন্মেষের সময় নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন আর এর জন্য তাদের প্রবল সংগ্রামও করতে হয়েছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অবশ্য প্রথম দিকে জাতীয় সংবাদপত্র সমাজ ও ধর্ম সংস্কার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতারাই প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে উচ্চ-কণ্ঠ হওয়াই ছিল তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাছাড়া জনমতের প্রবাহে যে নতুন ভাবনার বিকাশ ঘটেছিল তাকেও তারা রূপ দিয়েছিলেন। সেকারণে দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকরা এদেশে সবসময় এক প্রতিকূল পরিবেশের সংগে সংগ্রাম করে কলমকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কঠোর বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে তাঁদের চলতে হয়েছে। কখনও স্বীকার করে নিতে হয়েছে সরকারী নির্দেশ।

পরলোকগত বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহিত মৈত্রের 'এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘকাল তিনি সংবাদপত্রের সংগে জড়িত ছিলেন। দুখণ্ডে সংবাদপত্রের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। প্রথম খণ্ড হোল বর্তমান বইটি। দ্বিতীয় খণ্ডের কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি জানিয়েছেন প্রকাশক।

বর্তমান বই-এ ভারতীয় সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশের বিরাট প্রেক্ষাপটকে তথ্য ও যুক্তির সংগে তুলে ধরা হয়েছে। ১৭৮০-১৮৩৫ খৃঃ পর্যন্ত যে জটিল অবস্থায় সংবাদপত্রকে চলতে হয়েছে এবং নবউদ্ভূত ধনিক সমাজের সাহচর্যে সভ্যতার গতিধারা ও চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে কিভাবে তারই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য বিবরণ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার। এই বই যে সংবাদপত্রের ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্বকে জানা যাবে মাত্র, কিন্তু তার দামও কোন অংশে কম নয়। সংবাদপত্রের ইতিহাসের সংগে স্বাভাবিকভাবে এসেছে নবজাগরণ, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার আন্দোলন, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, রাজদ্রোহ আইনের কথা। সংবাদপত্রের ইতিহাসের যে আলেখ্য রচনা করেছেন স্বর্গত মৈত্র মহাশয় তা কেবলমাত্র তাঁর মত অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট সাংবাদিকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সংবাদপত্রসেবী এবং সাধারণ পাঠক সকলেই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন।

থাণ্ডারবল (গোয়েন্দা কাহিনী)। ইয়ান ফ্লেমিং। অনুবাদ : পরমভট্টারক লাহিড়ী। রু-বেল পাবলিশার্স। ১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। কলকাতা-২৬। দাম সাড়ে ছয় টাকা।

জেমস বণ্ড ইয়ান ফ্লেমিং-এর সৃষ্ট এক বিস্ময়কর চরিত্র। জেমস বণ্ড আধুনিক জগতের মানুষ। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি আর রাজনীতি অর্থনীতির টানাপোড়েনের জগতে বিচরণ করে অনায়াসে। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ চিন্তার খেলায় দুর্ধর্ষ অভিযানে তার বিস্ময়কর সাফল্য সহজেই পাঠকের মনকে টেনে নেয়। ইংরেজি জানা পাঠকের কাছে জেমস বণ্ড কাহিনীগুলি সুপরিচিত। সম্প্রতি 'থাণ্ডারবলে'র বাংলা অনুবাদ বেরিয়েছে। আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক দুটি অ্যাটম বোমা অপহরণ করে বিরাট অংকের সোনা দাবী করে এর বিনিময়ে। আটলান্টিকের আকাশ থেকে বিস্ময়করভাবে এই বোমাদুটির অপহরণ দুই বৃহৎ শক্তিকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। সোনা না পেলে বোমাদুটো ফাটানো হবে পশ্চিম গোলার্ধের দুটি শ্রেষ্ঠ শহরে। অদ্বিতীয় গুপ্তচর জেমস বণ্ড নামলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। সন্ত্রাসবাদী গুপ্তচর সংস্থা প্রেতাত্মা সংঘের দলনেতাকে খুঁজে পেলেন আশ্চর্য ঘটনার মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে গোপন প্রেমের খেলা। দলনেতার সঙ্গিনী ডোমিনী এসে বাঁচাল বণ্ডকে সমুদ্রের নীচে তীব্র সংগ্রামের শেষে। এক রোমাঞ্চকর কাহিনী, বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে কাহিনীর গতি বেগময়। গোয়েন্দা কাহিনীতে আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় যে কত গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তার সাক্ষাৎ মেলে ইয়ান ফ্লেমিং-এর কাহিনীতে। অনুবাদ আরো ঝরঝরে হওয়া উচিত।

●

অনিন্দিতা (উপন্যাস) — জিতি বসু। ভারত প্রকাশ ভবন, ২৪বি যুগীপাড়া ওস্তাগার লেন, কলকাতা—৯। দাম : দু টাকা।

এ উপন্যাসের নায়িকা সুনন্দা স্বামীর ঘর করতে এসেছিল অকপট বিশ্বাস ও সংসারের প্রতি সুগভীর আনুগত্য নিয়ে। কিন্তু স্বামী অনিমেষ তার সেই সাধে বাদ সাধলো। বিলেতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রইল অনিমেষ। সুনন্দা উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে বিলেত থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে

আনলো নিজের ঘরে। অবশ্য তার এই সাফল্য সহজে আসে নি। পুরনো গণ্ডীর বেড়া ভাঙতে বহু বিপর্যয় ও সংশয়ের সংগে লড়াই করতে হয়েছে তাকে। প্রচ্ছদ নিকৃষ্ট মানের। উপন্যাসটি পড়তে ভালো লাগবে।

সংশোধন

গত সপ্তাহে সমালোচিত 'বন্দী জেগে আছে' কাব্যগ্রন্থের কবির নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। মুদ্রণ প্রমাদবশত সুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ছাপা হয়েছে। 'রক্তের ভীতরে রৌদ্র' কাব্যগ্রন্থের কবির নাম পড়তে হবে গণেশ বসু।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

প্রবাহ (সারস্বত সংকলন) **:** যশোদাজীবন ভট্টাচার্য ও পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় মনাইট্যান্ড, ধানবাদ থেকে প্রকাশিত। দাম **:** এক টাকা।

কলকাতাকে ঘিরেই বাঙলা সাহিত্যের সব আন্দোলন। এর বেশ বাইরে বড়-একটা পৌঁছায় না। বিভিন্ন জায়গা থেকে পত্র-পত্রিকার স্বল্প প্রকাশেই সেকথার প্রমাণ মেলে। সম্প্রতি ধানবাদ থেকে প্রকাশিত 'প্রবাহ' পত্রিকা অবশ্য এই প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম। ত্রৈমাসিক হিসেবে এই সংখ্যাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানভূমের ইতিহাস এবং বীরভূমের প্রবাদ-সংগ্রহ প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর লেখকদ্বয় হলেন যথাক্রমে গোলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তি শর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ মুন্সীর প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য। গল্প লিখেছেন শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, রামশঙ্কর চৌধুরী অতনু চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতা লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মণীশ ঘটক, গণেশ বসু, আবদুস সাত্তার, প্রণতি চক্রবর্তী, শ্যামল দাশ এবং আরো অনেকে।

●

বঙ্গবাসী মর্ণিং কলেজ পত্রিকা। চতুর্থ সংখ্যা। ১৯৬৮। সাহিত্য সম্পাদক— অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত।

বাংলা দেশের কলেজ পত্রিকা সম্পাদনার ইতিহাসে বঙ্গবাসী মর্ণিং কলেজ পত্রিকার নাম স্বীকৃত। পত্রিকাটিকে রচনায় ও পরিচ্ছন্নতায় সুদৃশ্য এবং সুখপাঠ্য করে ছাত্রদের হাতে দেওয়ার ব্যাপারে বর্তমান সংখ্যাটি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। বাংলা, ইংরাজি, হিন্দী—তিনটি শাখাকেই সমান মর্যাদায় পরিবেশন করেছেন সম্পাদক। বাংলা বিভাগে কবিতা লিখেছেন ডঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুপ্রকাশ ঘোষ, প্রবীর বসু, শোভন কর, প্রবীর দাস, রত্নেশ্বর দাশগুপ্ত, গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন—অধ্যাপক মিলন দত্ত, অধ্যাপক আশিস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রভঞ্জন সামন্ত এবং ছাত্রদের মধ্যে রণেন মোদক, সুবোধ বর্ধন, শ্যামাপ্রসাদ দত্ত, প্রবীর চৌধুরী প্রমুখ, ইংরাজী ও হিন্দী বিভাগেও অধ্যাপক ও ছাত্রদের রচনা পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। পত্রিকার প্রচ্ছদ স্কেচ ও আলোকচিত্রগুলি সুন্দর। ছাত্রদের নান্দনিক চেতনা তৃপ্ত হবে বলে মনে হয়।

●

কণ্ঠস্বর (শীত সংখ্যা, ১৩৭৫)—**সম্পাদক** সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ৪৯এল-৭ নারকেলডাঙ্গা রোড, কলকাতা—১১। **দাম :** পঁচিশ পয়সা।

কবি, কবিতা ও কাব্যালোচনার মাসিক পত্রিকা কণ্ঠস্বরের এ সংখ্যায় লিখেছেন গণেশ সেন, সত্যব্রত রায়, অমরেন্দ্র সান্যাল, দিলীপ চৌধুরী, আশিস সান্যাল, শান্তি লাহিড়ী, সরবি সেন, চন্ডী লাহিড়ী এবং আরো কয়েকজন।

●

একক (কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫)—**শুদ্ধসত্ত্ব** বসু সম্পাদিত। **২১ কালী টেম্পল** রোড। **কলকাতা—২৬। দাম এক** টাকা।

এই সংখ্যায় লিখেছেন **শুদ্ধসত্ত্ব বসু,** গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনীলকুমার গুপ্ত, দুলাল মিত্র, সুশীলকুমার ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রকাশিত এই কবিতা পত্রিকাটি তরুণ এবং প্রবীণ কবিদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে থাকে।

এটা খুবই আনন্দের কথা যে এবার সত্তর বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সরকারীভাবে কবি নজরুল ইসলামের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে। নানান মহলেই আবার নজরুল-প্রসঙ্গ উঠতে সুরু করেছে। এ সময় স্বভাবতই একটা কথা মনে হচ্ছে, সরকারী উদ্যোগে নজরুলের সমস্ত রচনা সংগ্রহ ক'রে সুলভে কি পাঠকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় না? জানি, আইনগত অসুবিধা আছে। কিন্তু সারা বাঙলার অধিবাসীদের দাবির চাইতেও কি আইনগত ত্রুটি বড়ো হলো। আজকের দিনে সরকারকে এই বিষয়ে উদ্যোগী হতে বলব।

নজরুলের বহু চিঠিপত্র, একখানি নাটক কিছু গান এখনো অপ্রকাশিত আছে বলেই জানি। নজরুলের পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ এবং কাজী সব্যসাচীর সহযোগিতায় একজন ভদ্রলোক সে সব উদ্ধার করবারও চেষ্টা করছেন। কয়েকটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন লোকের কাছে। এগুলো উদ্ধার করে প্রকাশ করা হবে এক মহৎ কাজ। বই পাড়ার একটি বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা নজরুলের সেই সব অপ্রকাশিত রচনা, চিঠিপত্র সাগ্রহে ছাপতে রাজী হয়েছেন। আমরা সাগ্রহে সেই মূল্যবান বইখানির প্রতীক্ষায় রইলাম।

এবছর নজরুল জন্ম-তিথিতে নজরুল সম্পর্কে যে দুটি বই বেরিয়েছে তার একটি হলো **'নজরুল-পরিক্রমা'**। এবং অপরটি হোল **'নজরুল রচনা-সম্ভারের'** তৃতীয় খন্ড।

এ-প্রসঙ্গে পাঠকদের আর একটি খবর দিচ্ছি। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের লেখা অগ্নিযুগের কাহিনীর 'সবার অলক্ষ্যে' বইটির প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ চলছে। বইটিতে বিপ্লবী নজরুল সম্পর্কে নানান ঘটনা এবং অজানা অনেক তথ্যসহ একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। নজরুল সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী এই আলোচনা কবির সম্পর্কে তাঁদের অনেক কৌতূহল মেটাবে।

সমরেশ বসুর একটি নতুন বই বেরুল দুই-তিন দিন আগে। উপন্যাসটির নাম **'মিছিমিছি'**। এক ভাঙাচোরা মোটরের ড্রাইভার ফকির চাটুজ্যে। নিজের গাড়ি। গাঁয়ের পথে হাজার রকম শব্দ করতে করতে পথচারীদের সচকিত করে পথ চলে তার গাড়ি। সামান্য মান-অপমানের বাদানুবাদ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'লো। একমাত্র ছেলে ফড়িং বাপের কাছেই থাকে, মাঝে মাঝে দেখতে যায় মাকে। ফকির চাটুজ্যের সঙ্গে দীর্ঘ বহু বছর বাদে স্ত্রীর সাক্ষাৎ হলো কিন্তু তখন তার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। ফকির চাটুজ্যের বুকভরা জ্বালার কাহিনী এই উপন্যাস।

সুভাষ সমাজদারের **'ছায়েজের নায়িকা'** বেরিয়েছে। ছায়েজের নায়িকা আবুল ফজল নামে লেখক একটি মাসিকের পুজো সংখ্যায় লিখেছিলেন প্রথমে। পরে বাড়িয়েছেন অনেকটা। নতুন নতুন কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। কাহিনীগুলো শুধু কল্পনা নয়, বাস্তব ভিত্তিও আছে। তবে স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে কল্পনার মিশেল আছে।

বৈকুণ্ঠের খাতা নয়, বইকুণ্ঠের খাতা—কেননা বইয়ের বিষয়ে কুণ্ঠা আমাদের বহু দিনের। অথচ বই পড়েই আমরা মানুষ হই, জীবনযুদ্ধে শক্তি অর্জন করি। বইকুণ্ঠের খাতায় আমরা নবজাতক বইয়ের দিকে সম্ভ্রমে ও মমতার দৃষ্টিতে তাকাব, বই আর তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে কৌতূহলী হব।

"মৃত্যুর আগে প্রাণভরে সত্যি কথাগুলো বলতে পেরেছি এতেই আমার গভীর আনন্দ"

'নিশিকুটুম্ব' যখন অকাদেমি পুরস্কার পেল অনেকেই এসেছিলেন মনোজ বসুকে অভিনন্দন জানাতে। আমিও ছিলাম। মনোজবাবু বন্ধুবান্ধব আর কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিককে নিয়ে আসর জমিয়ে তুলেছেন: একটার পর একটা কৌতুককর ঘটনা বলে চলেছেন। কথাপ্রসঙ্গে এক সময় বললেন, 'জানো, নিশিকুটুম্ব যখন ধারাবাহিক বেরয় তখন একজন পাঠক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখেছিলেন, লেখক আগে নিশ্চয়ই ঘড়েল চোর ছিল, না হলে চোরেদের এতো ঘাঁতঘোঁত জানবে কোত্থেকে?' হাসতে হাসতে সকলকে উদ্দেশ ক'রে তারপর বলেছিলেন, 'তোমাদের কী মনে হয় আমাকে?'

'নিশিকুটুম্ব'-এ চৌর্যবৃত্তির এতো সব নিখুঁত বর্ণনা আছে যে স্বাভাবিকভাবেই পাঠক ভেবেছেন লেখক নিশ্চয়ই চোরেদের হাঁড়ির খবর রাখেন। কারণ প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার থেকেই তো লেখক তাঁর লেখার মালমশলা জোগাড় করেন। কিন্তু লেখার মধ্যে লেখকের মনের নাগাল পেতে গেলে আরও সতর্ক হতে হবে। সাধারণত আমরা চোরকে ঘৃণা করি। কিন্তু 'নিশিকুটুম্ব' পড়তে পড়তে সাহেব চোরের প্রতি কখন যে সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি জানতেও পারি নে। কারণ কী? সাহেব চোরের মধ্যে আমরা এমন কতোগুলি মানবিক গুণের বিকাশ দেখি যা আমাদের তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। ওইখানেই যে লেখক তাঁর মানব-দরদী মনের পরিচয় রেখে গেছেন সতর্ক পাঠকের তা দৃষ্টি এড়াবে না।

ভুলি নাই, আগস্ট ১৯৪২, ছবি আর ছবি, মানুষ গড়ার কারিগর প্রভৃতি উপন্যাসেও মনোজ বসুর ব্যক্তিমানসের পরিচয় পাই বটে, তবে তা খন্ড খন্ড। এ যাবৎ লেখা তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'পথ কে রুখবে'তে মনোজ বসুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ চিত্র ধরা পড়েছে। উপন্যাসটি ধারাবাহিক যখন বেরুচ্ছিল তখন মনোজদার নিজেই বন্ধুদের মনে পড়ে সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়কে বলছিলেন, 'উপন্যাস তো অনেকই লিখেছি, এবার মন খুলে প্রাণের কথাটি বলছি।'

ধারাবাহিক লেখা আমি পড়তে পারি না। মধ্যমগ্রামে আমার এক বন্ধু থাকেন, সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক তিনি। তাঁর কাছেই উপন্যাসটির প্রশংসা শুনেছিলাম প্রায়শই। সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম কবে বই হয়ে বেরুবে। পত্রিকায় লেখাটা সুরু হয় ১৯৬৮ সালে ১৮ এপ্রিল, শেষ হয় ৬৯ সালের ৬ মার্চ। আর বই আকারে বেরুল এপ্রিলের শেষে। বইটি খুলে প্রথম দুটি পাতা উল্টেই আশাতিরিক্ত একটি জিনিস পেয়ে গেলাম। ধারাবাহিক লেখাটি পড়লে বইটি হয়তো হাতেই তুলতাম না। বঞ্চিত থাকতাম মনোজ বসুর মনের নিগূঢ় স্পর্শ থেকে। বইটি উৎসর্গ করেছেন পূর্ব বাংলার আমির হোসেন চৌধুরী, জিন্নত আলী মাস্টার আর পশ্চিমবঙ্গের শচীন মিত্র ও স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁরা হিন্দু নন, মুসলমান নন। তাঁরা যথার্থ মানুষ। চারজন সত্যিকারের মানুষকেই লেখক তাঁর বইটি উৎসর্গ করেছেন। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গার সময় হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে আমির হোসেন চৌধুরী, জিন্নত আলী মাস্টার প্রাণ দিয়েছেন, আর মুসলমানদের বাঁচাতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রাণ দিয়েছেন শচীন মিত্র ও স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান-বৌদ্ধ নয়, সবার উপরে মানুষ সত্য। এটাই মনোজ বসুর জীবন-সত্য। তাই যাঁরা এক ভারতকে কেটে দুভাগ করেছে, এক বাঙলাকে করেছেন দুই বাঙলা, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়েছেন পৈশাচিক আনন্দে, তাঁদের উদ্দেশে তীব্র শ্লেষের চাবুক হেনেছেন তিনি। 'পথ কে রুখবে' বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন: সভ্যতার মাইল-স্টোন পিছনে ফেলে এসে প্রগতির বিস্তর বাণী কপচে এমন জায়গায় এসে পৌঁছলাম, ধর্ম-বিবেচনায় দেশের ঘাড়ে কোপ ঝাড়া ছাড়া মহামান্য নেতারা উপায় খুঁজে পান না।

আর এক জায়গায় ডাক্তার খলিলুরের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন: 'কে হিন্দু, কে মুসলমান—বাচ্চাদের মধ্যেও সেঁধিয়ে যাচ্ছে। যে সর্বনাশ আমাদের হবার হলো। কিন্তু এমনি চললে ভবিষ্যত বলেও তো কিছু আর থাকবে না। ...ইতিহাস আমাদের কোন্ চোখে দেখবে?'

পাঁচ ছয় বছরের দুইটি বাচ্চা—টাটু আর হাসনার কথোপকথনটা একবার শুনুন: হাসনা টাটুকে জিজ্ঞাসা করে: হিন্দু কেমন রে? দেখেছিস টাটু, দেখলেই নাকি কেটে ফেলে?

টাটুর জবাব: দেখব কি করে? দেখলেই তো কেটে ফেলত।'

টাটু জানাল—দাদা কাকাদের কাছেও শুনেছে মারে হিন্দুতে নয়, মুসলমানে। হিন্দু-মুসলমান কোনটাই দেখেনি দুজনের কেউ।

সভয়ে হাসনা বলে, 'দেখে কাজ নেই রে টাটু! তোদের বাড়িতে আর আমাদের বাড়িতে খেলব। বাইরে কোথাও যাচ্ছি নে আর।'

লেখকের জ্বালাভরা বুকের তীব্র বেদনা ঝরে পড়েছে ছত্রে ছত্রে।

হিন্দু আর মুসলমানের বিভেদ ঘোচাতে তাইতো তিনি লীলার মুখ দিয়ে প্রস্তাব করেছেন 'কত বাঙালি মেয়ের নাম বীথি ডলি করবী তা হলে লায়লা জোছনা নাজমা মিনিট মিলি নামগুলোই বা কী দোষ করেছে? নামে নামে মিলেমিশে যাক—কে হিন্দু কে মুসলমান নামের ভিতর দিয়ে বড়রা উঁচিয়ে না থাকে।'

তাই বসিরহাটে পুলিশের গুলীতে স্কুলের ছাত্র নুরুল ইসলামের মৃত্যুতে মনোজ বসুর মানবাত্মা কেঁদে উঠেছিল, প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন 'পথ কে রুখবে' লিখবার।

সাক্ষাৎকারের সময় মনোজবাবু বলছিলেন, 'এক ভারতবর্ষ এবং এক বাংলা কলমের খোঁচায় দুটো দেশ হয়ে গেল—অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম লিখব সেই তাজ্জব কাহিনী, লিখব পূর্ব বাঙলায় এবং ভারতের শিলচরে বাংলা ভাষার জন্য বাঙালীদের শহীদ হওয়ার কথা, লিখব সেই কথা ভ্রান্ত ভন্ড লোভী নেতৃত্ব বাঙলাদেশকে সর্বনাশের কোন প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে, লিখব বিপ্লবীদের অতুলনীয় আত্মত্যাগের কথা।' একটু থেমে আবার বললেন, 'নুরুল ইসলাম ভাত চাইতে গিয়ে

ছিল, পুলিশ বুলেট দিয়েছে। ওর মৃত্যুটাই আমার প্রত্যক্ষ প্রেরণা। আর দেরি নয়, মৃত্যুর আগে প্রাণ মন খুলে বলে যাব সত্যি কথা। কারু কাছে আমার কিছু প্রত্যাশা নেই, সত্যি কথা বলতে ডরাই নে। তাই 'পথ কে রুখবে'-এর ছত্রে ছত্রে লিখে গেছি দীর্ঘদিনের বেদনা আর জ্বালার কথা। লিখেছি বীরেন দে-নুরুল ইসলামের উপাখ্যান।' বলতে বলতে দেখলাম তাঁর দুই চোখ দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

আগেও অনেকবার দেখেছি, পূর্ব বাঙলায় কাছাড়ে যাঁরা বাংলাভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাঁদের কথা বলতে বলতে, দুই বাঙলায় আত্মিক মিলনের কথা বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ জ্বলে উঠেছে। মনোজবাবু হিন্দু না মুসলমান, বামপন্থী না ডানপন্থী এই সব বাদানুবাদ মুলতুবী রেখে আমি নিশ্চিতরূপে একটা কথা বলতে পারি মনোজ বসু পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাঙালি। তাঁর জপমন্ত্র : বাঙালি বাঙলাদেশ এবং বাংলাভাষা।

তাই 'পথ কে রুখবে' চব্বিশ অধ্যায়ে শ্লেষ ভরা কণ্ঠে বলেছেন 'মেঘনা, পদ্মা, আড়িয়ল-খাঁ, বুড়িগঙ্গার জলে বঙ্গের বড়ো হিস্যার বিসর্জন হয়েছে। (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ হয়েছে পূর্ব পাকিস্থান।)

ছোটো হিস্যারও সদ্গতি হতে যাচ্ছিল—পূর্ব বাংলা গেছে, পশ্চিম বাঙলাই বা কেন আর? দাও ওটুকু বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে—বিহারবঙ্গ মজাৎব হয়ে যাক। দেশভাগ যাঁদের কীর্তি, এ আয়োজনও তাঁদের। ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিচ্ছিলেন - বঙ্গ নাম থাকত না ভূগোলের পাতায়। উঁহু, ভুল বললাম—থাকত বঙ্গোপসাগরে, জাত ধরে বাঙালি ডুবে মরবার জন্য।'

বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। জানি, একটু বাদে রাস্তাঘাট ছয়লাব হয়ে যাবে, বাড়ি ফিরতে ভোগান্তির এক শেষ হবে। সেই সময় মন থেকে সেই সব দুশ্চিন্তা উবে গেছে। আমি একজন একালের বাঙালির কাছে বাঙলার কথা। শুনতে শুনতে অন্য জগতে চলে গিয়েছিলাম। মন ঘুরে ঘুরে ফিরছিল সূর্য সেন, গোপীনাথ সাহার ফাঁসির মঞ্চে, বরকত-সালামের শহীদ মিনারে, নুরুল ইসলামের কবরে, বীরেন দের চিতায়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, বইটি লেখবার আগে কি আপনি একটা প্লট ভেবে নিয়েছিলেন, বা চরিত্রের কথা ভেবেছিলেন?'

মনোজবাবু বললেন, 'গোড়ায় কোনো প্লট বা চরিত্রের কথা না ভেবেই লেখা শুরু করেছিলাম। খণ্ড খণ্ড চিত্রে মনের অনেক দিনের জমানো কথা বলছিলাম। তারপর আমার কথাগুলো বলবার প্রয়োজনেই নানান চরিত্র আনলাম। সত্যিকারের প্লট বলতে এতে কিছু নেই।'

প্রশ্ন : বইটা শেষ করে আপনার কী মনে হয়েছে?

উত্তর : সাহিত্য হলো কিনা গোড়া থেকেই সেটা আমি গ্রাহ্য করিনি। আমি

আমার প্রাণের কথা বলতে চেয়েছি এই বইয়ে। মৃত্যুর আগে জ্বলন্ত সত্য কথাগুলো বলতে পেরে মন আমার খুশিতে ভরে উঠেছে। আমি তৃপ্ত। লেখক হিসাবে, মানুষ হিসাবে আমার যা কর্তব্য আমি করে গেলাম।

প্রশ্ন : বইটি সম্পর্কে পাঠকদের কাছ থেকে কোনো চিঠি পেয়েছেন?

উত্তর : পত্রিকার সম্পাদকের কাছে অনেক এসেছে—ও'রা বলছিলেন, আমি দেখিনি। আমি আজই একটি পেয়েছি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কাছ থেকে।

ফোলিও ব্যাগ থেকে বের করে দিলেন সেই চিঠিটা। চিঠির শেষাংশটুকু আমি এখানে তুলে দিচ্ছি :

রাজনীতির কুটিল চক্রে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ফলে বিশ বৎসর যাবৎ যে তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়েছে আপনি গদ্য মহাকাব্যে তার যে রূপায়ণ করেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা হয়তো তা একটি কাল্পনিক দুঃস্বপ্ন মনে করবে। কিন্তু এই নিদারুণ মর্মন্তুদ সত্য কেবল ইতিহাসের পাতায় না থেকে যাতে সাহিত্যের মাধ্যমে চিরজীবি হয়ে থাকে আপনি তার ব্যবস্থা করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার
৩।৫।৬৯

এরপরে আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমি বইটি সম্পর্কে পাঠকদের একটি খবর জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। খবরটা আমি মনোজবাবুর কাছ থেকে শুনিনি, শুনেছি বইটির প্রকাশনা সংস্থার একাউনটেনটের কাছ থেকে। বইটির স্বত্ব দিয়ে দিয়েছেন সোনারপুরে সদ্য নির্মিত বিপ্লবী নিকেতনে। লেখকের প্রাপ্য রয়্যালটি বিপ্লবী নিকেতন পাবেন।

—বিশেষ প্রতিনিধি

বলল—'দেখুন বাবা, এই বুড়োহাড় অনেক দেখেছে। সাতঘাটের জল খেয়েছে। এ দুনিয়া বড় মজার জায়গা। মরুভূমিতে সোনাদানা খোঁজা আমার নেশা। খুন-জখম আমার ভাল লাগে না। কোর্ট-কাছারি তো নয়ই। বুড়ো বাঁদরটাকে থানায় যেতে হবে না তো?

'না, হবে না। আমি কথা দিচ্ছি। শুধু বলুন আপনি কি দেখেছেন?'

'তাহলে শুনুন। বুধবার রাত্রে ভীম দত্তর বাংলোয় গেলাম দু-মুঠো খাবার আশায়। গিয়ে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে। উঠানে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম মালিক ভীম দত্ত এসেছে। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেহের আলি বাইরে বেরুলেই ডাক দেব। ভীম দত্তকে না জানিয়ে খেতে দিতে হবে তো। নইলে মেহের ফাঁপরে পড়বে।

'তাই খোলা গ্যারেজে আমার পুঁটলি রাখলাম। কিছুক্ষণ হা-পিত্যেশ করার পর ভাবলাম যাই রান্নাঘরে গিয়ে জানান দিয়ে আসি। পা টিপেটিপে গেলাম। মেহেরকে দেখলাম না। ফিরে আসছি, এমন সময়ে বাড়ির মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। বেটাছেলের গলা। জোর চীৎকার। তাই স্পষ্ট শোনা গেল। কে আছো বাঁচাও। পিস্তল

(২১) আর্ত চীৎকার রহস্য

বুড়ো বলল—'মাই বয়, অনেক কিছুই দেখেছি আমি। খুনে বাংলোয় মেহের একা খুন হয়নি। আরো একটা হয়েছে। আমার নিজের চোখে দেখা।'

অখন্ডনারায়ণের বুকে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে ইচ্ছে হল ডুগ-ডুগি বাজিয়ে ডিগবাজি খায়। চোখদুটো গুঁড়ির মত ঠেলে বার করে বলল রুদ্ধশ্বাসে—'দেখেছেন? কি দেখেছেন?'

খড়কে কাঠিটা আবার হলুদ দাঁতের ফাঁকে চালান করল বেদে-বুড়ো।

ভ[illegible]গের ঘটনা

[চল্লিশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আজ প্রবীণ জহুরী খেমচাঁদ। আর সেদিনের প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা তারই দোকানে বেচতে এলেন অনন্ত স্মৃতিজড়ানো ব্রাজিল থেকে আনা বজ্রমণির কণ্ঠহার। কিনছেন একালের বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। নেকলেশ বোম্বেতে ডেলিভারী দেবার কথা ছিল।...হঠাৎ ট্রাংক কল। রাজস্থানেই কণ্ঠহার ডেলিভারী দিতে হবে—নয়া ফরমান। আর তাতে পাওয়া গেল রহস্যের আমেজ, বোঝা গেল ফেউ লেগেছে। মুস্কিল আসানের ভার নিয়েই প্রাইভেট ডিকেটটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র কুঁজোর ছদ্মবেশে হাজির হলেন রাজস্থানে, ভীম দত্তের বাংলোয়। নাম তার এখন গুল মহম্মদ, জবরদস্ত খানসামা। অখন্ড আলাদাভাবেই এসেছে এই বাংলোয়। রহস্য ঘনীভূত। ভীম দত্তের পোষা হীরামন মারা গেছে ইতিমধ্যে। বাংলোর একটি দেয়ালে গুলির দাগ, মারা গেছে একটি মানুষ, উধাও হয়েছে ভীম দত্তের পুরনো পিস্তল। হারিয়ে যাওয়া বুলেট দুটোর খোঁজ পাওয়া গেল। সেঁকো বিষের খালি টিনও পাওয়া গেল খোঁকি উপেনের কাছ থেকে। কলকাতা থেকে ফিরল ভীম দত্তের প্রিয় খানসামা মেহের খান। কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢুকতে না ঢুকতে তাকেও যেন কে গুলি করে হত্যা করল। রহস্য গভীর থেকে গভীরতর। পুলিশ এল। ছদ্মবেশী ইন্দ্রনাথের উপর সন্দেহ সবচেয়ে বেশি। বড় কঠিন পরীক্ষা। উতরোতে পারবে তো গুল মহম্মদ? ইতিমধ্যে সাহানা দেবীরও বাংলোয় আসবার কথা ছিলো। কিন্তু এসে পেঁছতে পারেন নি। তাহলে সে কোথায়?

ঘটনা আরো এগোতে বাংলোর শোনা সেই 'বাঁচাও। বাঁচাও! খুন!'-এর আর্ত চিৎকার রহস্য উন্মোচিত হবারও সম্ভবনা দেখা গেল ধীরে ধীরে।]

ফেলে দাও। তোমার চালাকি আমি ধরে ফেলেছি। বাঁচাও! বাঁচাও! খুন!!

'মাই বয়, আপনি যেভাবে চেঁচালেন, অনেকটা ঐভাবে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। আমার হল শাঁখের করাত। না পারি এগোতে, না পারি পেছোতে। কি করি ভাবছি, এমন সময়ে আবার একটা চীৎকার শুনলাম। কথা একই। কিন্তু গলাটা গোলাম হোসেনের। মানে, পোষা কাকাতুয়ার। বিদ-গিচ্ছিরি গলায় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল গোলাম হোসেন। ঠিক যেন ভুতুড়ে কান্না—'বাঁচাও! বাঁচাও! খুন! পিস্তল ফেলে দাও! বাঁচাও!' তারপরেই দুম করে একটা আওয়াজ হল। পিস্তল ছোঁড়ার আওয়াজ। গোলমালটা সামনের ঘর থেকে আসছিল। আলো জ্বলছিল ঘরে। জানলা খোলা ছিল। আমি গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা দুম করে আওয়াজ হল। 'আঁ' করে কে যেন ক'কিয়ে উঠল। বুঝলাম, গুলি লেগেছে। আমি তিন লাফে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম।'

দম ফুরিয়ে গেছিল হ্যাগার্ডের। থামতেই অখন্ডনারায়ণ ঝুঁকে পড়ে তাড়া লাগাল—'তারপর? তারপর?'

আবার দাঁতে কাঠি দিয়ে বলল বুড়ো—'দেখলাম, ঘরটা শোবার ঘর। গুলি যে ছুঁড়েছে, পিস্তল হাতে সে তখনও দাঁড়িয়ে। চোখ-মুখের চেহারা ভীষণ। অথচ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপছে ঠকঠক করে। মেঝের ওপর পড়ে গুলি খাওয়া লোকটা। বিছনার ওদিকে। তাই জুতো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। পিস্তল হাতে লোকটা জানলার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই—'

'কে? কে সে? পিস্তল কার হাতে ছিল? উপেন নন্দী?' উত্তেজনায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল অখন্ডনারায়ণ।

'উপেন নন্দী? কুত্তা সেক্রেটারী? নো, ম্যান, নো। আমি যাকে দেখেছি সে—'

'সে কে?'

'মালিক। ভীম দত্ত নিজে।'

সব চুপ। সহসা মরুভূমির বাতাস পর্যন্ত বুঝি থমকে দাঁড়াল। আকাশ উন্মুখ হল। প্রতিটি বালিকণা উদগ্রীব হয়ে রইল।

আর, অখন্ডনারায়ণের মগজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তীব্র বেগে ঘুরপাক খেতে লাগল শুধু দুটি শব্দ ...ভীম দত্ত! ভীম দত্ত! ভীম দত্ত!

●

অনেকক্ষণ পর কৃষ্ণাপ্রিয়া কাঁধে হাত রাখতেই সম্বিৎ ফিরল অখন্ডর।

ফিস ফিস করে বলল—'কি বলছেন কি? ভীম দত্ত খুনী? আপনি ঠিক দেখেছেন তো?'

'মাই বয়, তিন বছর আগে এই ভীম দত্ত আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল বাংলো থেকে। তাই ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। বিগম্যান। লালমুখ। চোখ তো নয়, যেন বাঘের চাউনি। পিস্তল উঁচিয়ে জানলার দিকে তাকাতেই সেই চোখ দেখলাম...দেখেই সাঁৎ করে সরে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কুত্তা সেক্রেটারীর গলা শুনলাম। দৌড়ে ঘরে ঢুকল দ্যাট ডার্টি ডগ...বলল—'করেছেন কি?' 'খুন করেছি,' বলল ভীম দত্ত। 'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি হবে কবে?' বলল উপেন নন্দী। 'খুন করার কোনো দরকার ছিল না।' ধাঁই করে পিস্তলটা ফেলে দিয়ে ভীম দত্ত বলল—'আলবৎ দরকার ছিল। ওকে নিয়েই আমার যত ভয়।' 'ওকে তো আপনি চিরকালই যমের মত দেখেন। আপনার মত বুদ্ধির ঢেঁকি আমি দুটো দেখিনি। সেবার কলকাতায়—' 'চোপরাও।' গনগনে চোখে তাকিয়ে গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল ভীম দত্ত। 'আমি খুন করেছি বেশ করেছি। যাকে নিয়ে এত ভয়, তাকে সাবাড় করাই ভাল। এখন কি করা যায়, তাই ভাবো। বাজে কথা বলো না।'

বেদেবুড়োর বিদঘুটে গলা ক্ষীণ হয়ে এল দমের অভাবে। তাই থামল। পিট-পিট করে বিস্ফারিত-চক্ষু দুই মূর্তিমানের দিকে তাকিয়ে বলল—'মিস্টার, মিস, ঐ পর্যন্ত শুনেই আমি চম্পট দিলাম। আর তো কিছু করার ছিল না। যে মরেছে, সে মরেছে, আমি বেঁড়ে ওস্তাদি করতে গিয়ে মরি আর কি। বুকে বাঁশ ডলা আমার সয় না। তাই চুপি-সাড়ে গ্যারেজে এলাম, পুঁটলি কাঁধে তুললাম। ফটকের বাইরে পা দিয়েছি, এমন সময়ে সাঁ করে একটা মোটরগাড়ি উঠোনে ঢুকল। আমি পড়ি কি মরি করে অন্ধকারে গাঢাকা দিলাম। মাই বয়, এই হল আমার কাহিনী। আমি ভেরান্ডা ভাজি, হরিমটর খাই আর হট্টমন্দিরে শুই। ভোগান্তি আমার সয় না। তাই পালিয়েছিলাম। কিন্তু কি করে যে আমার টিকি ধরে ফেললেন, এ এক রহস্য।'

গোঁফে তা দেওয়ার মতই জুলপি ধরে টানাটানি করল অখন্ড। অস্থির পায়ে বালির ওপর একটু পায়চারি করল। অবশেষে বলল—'ব্যাপারটা গুরুতর। পালিয়ে বাঁচা যাবে কি?'

'তাই নাকি?' বুড়ো হ্যাগার্ড শংকিত।

'তাই নাকি মানে? খুন করেছেন কে? না, ভীম দত্ত। ভীম দত্ত কে? না, ইণ্ডিয়ার পয়লা সারির শিল্পপতি—'

'তাতে কার কি? টাকার জোরে ভীম দত্ত ঠিক পিছলে যাবে—'

'মগের মুল্লুক নাকি? মিঃ হ্যাগার্ড, আপনাকে বিকানীর আসতে হবে। এখুনি। আপনাকে সাক্ষী পেলে ভীম দত্তর মানের গুড়ে বালি দিতে আমার দু মিনিটও লাগবে না।'

কাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল বেদে-বুড়ো—'নো, ম্যান, নো। আগেই বলেছি আমি হাড়হাবাতে মানুষ। কোর্ট-কাছারি পোষায় না। বিকানীর আমি যাবো না।'

'শুনুন—'

'আপনি আগে শুনুন। শুধু আমি বললে ভীম দত্ত নির্ঘাৎ হাঁকিয়ে দেবে। খুন যে হয়েছে, সে কে? বিছানার পাশে যে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, তার লাশ পাওয়া গেছে?'

'পেতে কতক্ষণ?'

'হাটে হাঁড়ি ভাঙার আগে, ভীম দত্তকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে লাশ বার করুন। নইলে ভরাডুবি হবে।'

মাথা চুলকে অখন্ড বলল—'কথাটা মন্দ বলেন নি।'

'মাই বয়, আমার হাড় অমনি পাকে নি। হাঁড়ি ভাঙার আগে আটঘাট আগে বাঁধুন। আমিও তো তাই চাই। সেইজন্যেই মুখের সেলাই খুললাম আপনার কাছে। আর জড়াবেন না আমাকে।'

'কিন্তু আপনাকেই তো দরকার।'

'আমার কথায় যদি কাজ গুছোতে পারেন, তাহলে না হয় আসব। দিন সাতেক পরে ফালোদিতে পৌঁছোবো। সর্দার সিং

এর অফিসে রাত কাটাবো। সর্দার সিং ল্যান্ড এজেন্ট। ফালোদির সবাই চেনে। ঠিক আছে? মিস কি বলেন?'

কমলালেবুর কোয়ার মত গোলাপী ঠোঁটে মিষ্টি হেসে কৃষ্ণাপ্রিয়া বলল—'ফাইন।'

অখন্ড খুঁতখুঁত করতে লাগল—'ফাইন না কচু। দাশরথী ঠিক বকাবকি করবেন। মিঃ হ্যাগার্ড সঙ্গে থাকলে কোমরের জোর বাড়তো। যাক গে, আমিই না হয় ম্যাও সামলাবো, দরকার হলে দৌড়োবো ফালোদিতে।'

আর বেশি কথা হল না। কুঁজো ভরথুরের কাছে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চাপল দুজনে। রাজপুতানার ঘোড়া। সওয়ার বুঝে ছোটে। তাই লাগামে টান পড়তেই চৈতকের মতই দুলকি চালে ঘাড় বেঁকিয়ে বালি ছিটিয়ে এগোলো স্টেশনের দিকে। পেছন ফিরে কৃষ্ণাপ্রিয়া দেখল, পরিত্যক্ত কামরার সামনে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ। হাওয়ায় উড়ছে দাড়ি। বাকি দেহ নিবাত নিষ্কম্প।

•

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। থপ থপ থপ শব্দে বালি মাড়িয়ে পাশাপাশি এগিয়ে চলল দুটি ঘোড়া।

তারপর অখন্ড বলল—'মাই ডিয়ার লেডি, অনেক কিছুই শুনে ফেললেন।'

টুথপেস্ট হাসি হেসে বলল কৃষ্ণাপ্রিয়া—'অগত্যা।'

'শেষেরটা যখন শুনলেন, তখন গোড়াটাও শোনা দরকার। নিজের অজান্তেই আপনি একটা রহস্য-নাটকে পার্ট নিয়ে ফেলেছেন। হিচককের সাসপেন্সও এ তুলনায় নেহাত জলো।'

'বেশ, আমি উৎকর্ণ হলাম।'

'আমি আপনাদের এই ডাকাতে মরুভূমিতে এসেছিলাম ব্যবসাসূত্রে। ভীম দত্তর সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে। প্রথম রাতে বাংলোতে ঢোকার পর—'বলে, একে-একে সব বলল অখন্ড। হিমেল রাতে নিশাচরের কান্নার মত কাকাতুয়ার আর্ত চীৎকারের পর থেকে রহস্যাবৃত ঘটনাবলী বিবৃত করল সংক্ষেপে। সবশেষে বলল—'এখন বুঝছেন তো, বাংলোয় মেহের আলির আগে আরও একজনকে খুন করা হয়েছে। কে খুন হয়েছে, আর কে খুন করেছে—এইটাই ছিল হেঁয়ালি। হেঁয়ালির খানিকটা এখুনি পরিষ্কার হল।'

'অসম্ভব।'

'কি বললেন?'

'বলছি, অসম্ভব। ভীম দত্ত খুনী হতেই পারেন না।'

'উইলিয়াম হ্যাগার্ডের গল্প তাহলে মিথ্যে?'

'গল্প তো মিথ্যেই হয়। বিশেষ করে এদের গল্প। মাঠে-ঘাটে ঘোরে তো, মাথার ঠিক থাকে না। চোখদুটো দেখে বুঝলেন না হেডঅফিসে গোলমাল হয়েছে?'

'আমি মনোবিদ নই।'

'সেটা তো আগেই বুঝেছি।'

আড়চোখে তাকাল অখন্ড—'কথাটার অন্য মানে আছে মনে হচ্ছে?'

'আছে নাকি?' মিটি-মিটি হাসল কৃষ্ণপ্রিয়া। 'থাকতে পারে। নাও পারে।'

'মানেটা মগজ দিয়ে বুঝতে হবে, না, হৃদয় দিয়ে ধরতে হবে?'

'সেটা আমার মত শ্যাওড়া গাছের পেত্নীকে জিজ্ঞেস করে লাভ কি? আপনার সঙ্গে বজ্রজ্বালার তফাৎ এইখানেই।'

'গেল মাটি হয়ে। উফ্, আপনি একটা প্রকান্ড বেরসিক!'

'সে কথা থাকুক। মেহের আলির জল্লাদ তাহলে কে? সেটা আমরা বার করবোই।'

'ষাঁড়ের গোঁ দেখছি। কিন্তু 'আমরা' মানে?'

'আপনিও আজ থেকে আমাদের দলে। মেয়ে গোয়েন্দা অনেক কাজের হয়। শেয়াকুল কাঁটা তো।'

'শেয়াকুল কাঁটা মানে?' সন্দিগ্ধ কন্ঠ কৃষ্ণাপ্রিয়ার।

'মানে যে শক্ত করে ধরে। একদিকে ছাড়লে আর একদিকে জড়ায়,' নিরীহ কন্ঠ অখন্ডর।

'ইচ্ছে যাচ্ছে আপনাকে কীচকবধ করি,' ততোধিক নিরীহ কন্ঠ কৃষ্ণাপ্রিয়ার।

অট্টহাস্য করে উঠল অখন্ডনারায়ণ।

•

ট্রেনে চাপবার আগেই স্টেশনে ছাইভস্ম যা পাওয়া গেল, তাই দিয়েই রাতের খাওয়া সেরে নিল দুজনে। যত না খেল, তার চাইতে বেশি হাসল আর বকবক করল। কেননা, দুজনেরই মনে তখন পিকনিকের আমেজ।

রাত্রে বিকানীর পৌঁছে দেখল স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাশরথী আর কুঁজো গুল মহম্মদ।

দাশরথী বলল সোল্লাসে —'এই যে, বলি যাওয়া হয়েছিল কোথায়? এদিকে ভীম দত্ত ছটফট করছেন। গুল মহম্মদকে পাঠিয়েছেন গাড়ি দিয়ে।'

'তাই নাকি?' অখন্ড ভুরু তুলল। 'আগে চলুন আপনার ডেরায়। একটা বম্বশেল নিউজ আছে।'

'স্রেফ ঢক্কানিনাদ মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে না, শুনলে থ হয়ে যাবেন।'

'তবে চলুন।'

সদলবলে খবরের কাগজের অফিসে ঢুকল ওরা। কৃষ্ণাপ্রিয়া 'বনি অ্যান্ড ক্লাইড' ছায়াছবির নারী-গুন্ডা ওয়ারেন বেটির মত এক লাফে গিয়ে বসল টাইপরাইটারের টেবিলে। দরজার সামনে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছদ্মবেশী গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

দুষ্টুমিভরা চোখে সেদিকে তাকাল অখন্ডনারায়ণ। তারপর আচম্বিতে তর্জনী নির্দেশ করে বলল নাটকীয় ভঙ্গিতে—'আসুন, এ-যুগের এক বিখ্যাত প্রতিভার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। অলীক শার্লক হোমসকে যিনি নিজ কীর্তি দিয়ে ম্লান করেছেন, জেমস বন্ডকে যিনি দুঃসাহসের পরীক্ষায় হারিয়েছেন, লন চ্যানীকে যিনি ছদ্মবেশ ধারণের আর্টে টেক্কা দিয়েছেন—ভারতবিখ্যাত সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র আজ আপনাদেরই সামনে—তবে কুঁজো গুল মহম্মদের ছদ্মবেশে।'

তড়াক করে টেবিল থেকে ভূতলে অবতীর্ণ হল ব্রীচেসপরা ভ্রমর। তিন লাফে গেল ছদ্মবেশীর সামনে। খপ করে করমর্দন করে বলল—'অভিনন্দন নিন!'

হকচকিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। রুষ্ট চোখে তাকাল অখন্ডর দিকে। আর, অখন্ড হাসতে হাসতে বললে—'দাদা, খামোকা চটবেন না। কৃষ্ণাপ্রিয়া সিংহ এই মুহূর্তে আপনার চাইতে অনেক বেশি খবর রাখেন। কাকাতুয়া রাত্রে কেন অমন বিকট চেঁচায়, তা আমরা দুজনেই জানি। শুনবেন?'

ইন্দ্রনাথ রুদ্রর ভাঙা চশমার আড়ালে দু'চোখে সেই নিমগ্নভাব দেখা গেল। কিছু বলল না।

অখন্ড বলল—'তার আগে একটা কথা বলি। বলিহারি যাই আপনার হর্সসেন্সকে। ভীম দত্তর বাংলোবাড়ি যে একটা রহস্যের কারখানা, খুনের আড়ৎ, তা ঠিকই ধরেছিলেন। রিয়ালি, আপনি একটা জলজ্যান্ত ভুশুন্ডির কাক।'

ইন্দ্রনাথ তখনও নীরব।

অখন্ড বলল—'মেহের আলির আগে ও-বাড়িতে আর একটা খুন হয়েছিল। আমরা খুনীর নাম জেনেছি।'

'ফ্যানচাটা উপেন?' দাশরথীর প্রশ্ন।

'মোটেই না। ও প্যাল্তাখেঁচার কর্ম নয়। বুড়ো হনুমানের কীর্তি। ওঃ, বিড়ালতপস্বীর কত ভিটাকিলামিই দেখলাম! তলায় তলায় এত কান্ড!'

'কার কথা বলছেন?' দাশরথীর চোখে হীরের দ্যুতি।

'কার আবার? ভীম দত্তর।'

'ভীম দত্ত!'

'বিশ্বাস হল না? হবে না তো। কারোরই হবে না। কিন্তু শুনে রাখুন, ভীম দত্ত খুনী। ভুঁড়োশেয়াল খুনী।'

'বেড়িয়ে এসে কি তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?' এই প্রথম কথা বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

'তাতো বলবেনই। কিন্তু—' বলে ঝালেঝোলেঅম্বলে বেশ রসালো কাহিনী বিবৃত করল অখন্ড।

কাহিনী ফুরোতেই ইন্দ্রনাথ বলল—'উইলিয়াম কি ধোয়া তুলসীপাতা?'

'ভগবান জানেন। তবে মাই ফেয়ার লেডি মানে কৃষ্ণাপ্রিয়া সিংহর ধারণা পাগলছাগল লোকেরা নাকি অমনি অনেক কথাই বলে।'

'হ্যাগার্ড এখন কোথায়?'

চুপসে গেল অখন্ড—'ঐ একটা ভুল আমি করেছি। লোকটাকে ল্যাজে বেঁধে আনতে পারলাম না।'

'লম্বা দিয়েছে?'

'ঠিক তা নয়। ফালোদিতে দিনসাতেক পরেই পৌঁছোবে বলেছে। ঝঞ্ঝাটে থাকতে চায় না বলেই সঙ্গে এল না।'

'ও। কিন্তু ভীম দত্ত খুনী! আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল ইন্দ্রনাথ।

'আশ্চর্য আবার কি? কালোবাজারীদের

পক্ষে সব সম্ভব। রসিকলালকে খবর দিন দাশরথীবাবু।'

'না', কঠিন স্বর ইন্দ্রনাথের।

'কেন ?'

'হকিস্টিকের মত যার মেরুদন্ড বেঁকা, তার বুদ্ধিও বেঁকা। সব ভন্ডুল হয়ে যাবে ও এলে। তাছাড়া টাকার মোরব্বা সবাই ভালবাসে তো। রসিকলাল সেই জাতের।'

'তাহলে ?'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও। দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও।'

আর বেশি কথা হল না। বাইরে এল সবাই। ভ্রমরকে বলল অখন্ড—'একটা কথা ছিল।'

'ব্যাঙের মাথা নাকি ?'

'দিনটা কাটল ভাল। শুধু একটি খোঁচা ছাড়া।'

'যথা ?'

'বজ্রজ্বালা। ও-নামটা আর সইতে পারছি না।'

'বেচারী শাল্পিশেল। কেন যে ওকে দেখতে পারেন না। আচ্ছা, নমস্কার। সাবধানে থাকবেন।'

'কেন ?'

'ভীম দত্তর বাড়ি আর নিরাপদ নয়।'

'বুঝলাম।'

•

ফেরবার পথে একটি কথাও বলল না ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বাংলোয় ফিরে বসবার ঘরে ঢুকল অখন্ড। রেডিওর সামনে বসেছিলেন দীর্ঘদেহী ভীম দত্ত। অখন্ডকে দেখেই লাফিয়ে উঠে বললেন—'বলো।'

'কি বলব ?' জয়পুর যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল অখন্ড।

'এক্স-রে'র সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

'ওহো!' চমকে উঠল অখন্ড। মনে পড়ল যাত্রার উদ্দেশ্য। ছলাকলার কি আর শেষ নেই ? 'আগামীকাল ব্যাংকের সামনে। যোধপুরে। কাঁটায় কাঁটায় দুপুর বারোটায়।'

'দ্যাটস্ গুড। কাল ভোররাতেই বেরিয়ে যাব। পরে দেখা হবে। ক্লান্ত ?'

'খুব।'

'তাহলে গুডনাইট', মার্জার-চরণে বেরিয়ে গেলেন ভীম দত্ত। পলকহীন চোখে বিশাল বপুর দিকে তাকিয়ে রইল অখন্ড-নারায়ণ।

দুর্জয় সাহস যাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে, সুকঠোর ব্যক্তিত্ব যাঁর বজ্রকঠিন স্বরে, অপরিমেয় শক্তি যাঁর রক্তরাঙা পিঙ্গল চোখে, তিনি কিনা মানুষ খুন করেন ভয়ের চোটে ?

আশ্চর্য !

•

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই ভীম-উপাখ্যান ভিড় করে এল অখন্ডর মগজে।

ভীম দত্ত! যিনি কিনা মধ্যম-পান্ডবের মতই বৃষস্কন্ধ, যাঁর পাহাড়প্রমাণ ব্যক্তিত্বের সামনে হেন লোক নেই যার বুক কাঁপে না, যাঁর সারাজীবন মানুষকে ভয় দেখিয়েই কেটেছে, তিনি কিনা ভয় পেয়ে মানুষ খুন করে বসলেন ?

মুখ-হাত ধুয়ে বসবার ঘরে ঢুকল অখন্ড। একগাল হেসে কুর্ণিশ করল গুলে মহম্মদ। বলল—'ছোট হাজারী তৈয়ার হুজুর।'

'আজকের দিনটা দাদা ছুটি নিন। উফ, উত্তমকুমারকেও হার মানালেন। বাড়ি তো খালি ? অঘোর মল্লিক এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি ?'

'উঁহু। অঘোর মল্লিকও গেছে।'

'সেকী ?'

'ভোররাতে চোখ ডলতে ডলতে উপেনকে নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন ভীম দত্ত, এমন সময় অঘোর মল্লিক মুখে পাইপ দিয়ে ফিটফাট সেজে বেরিয়ে এল। চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। দাঁত বার করে বলল, যোধপুরে তাকেও যেতে হবে। ইঁদুর, না ব্যাঙ কি যেন দেখবে।'

'ভীম দত্ত যেতে দিলেন ?'

'সেইটাই আশ্চর্য। দুর্বাসার মত একবার শুধু কটমট করে তাকালেন। সেকাল হলে অঘোর নির্ঘাত ছাই হয়ে যেত।'

'হৃতদর্প দুর্বাসা। চোখ আছে, আগুন আর নেই।'

'বাড়ি খালি। সার্চ শুরু করা যাক। ওকি, আবার কার গাড়ি এল ?'

হুমহাম করে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা ঐতিহাসিক ফোর্ড গাড়ি ঢুকল উঠোনে। ইঞ্জিন বন্ধ করে সহাস্যে নেমে এল দাশরথী উকিল।

মিনিট-দুয়েক পরে আবার টেবিলে জমায়েত হল তিনজনে।

দাশরথী বলল—'আমি প্রেসের লোক হতে পারি। কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতেও কম যাই না। তাই তৈরি হয়ে এসেছি।'

'কিরকম ?'

বিরাট একগোছা চাবি তুলে দাশরথী বলল—'সবখোল চাবিও হার মানবে এর কাছে। ভীম দত্তর যাবতীয় বাক্সপ্যাটিরা খুলে আমাকে দেখতে হবে লোকটার মতিচ্ছন্ন হল কেন।'

'উইলিয়াম হ্যাগার্ডের গুলপট্টি তাহলে বিশ্বাস করেছেন বলুন ?' বলল অখন্ড।

'অবিশ্বাসের খুব সম্ভাবনা দেখছি না। কেননা, আমরা ইতিমধ্যে যা জেনেছি, তার কিছু কিছু মিলে যাচ্ছে। যেমন গোলাম হোসেনের কান্নাকাটি, তারপর স্বর্গারোহণ। তাই আমাকে আজ হ্যাগার্ডে পেয়েছে। বজ্রমণির কণ্ঠহার, ঢোঁড়াবাসুকির নৃত্যাম, মেহের আলির হত্যা, ভীম দৈত্যের আদরিণী কন্যার অন্তর্ধান এই মুহূর্তে আমার মাথায় নেই। রয়েছে শুধু হ্যাগার্ডের গল্প। সে-গল্পের আর একটা চাক্ষুস প্রমাণ, গাজীনগরের নবাবী পিস্তল। কোল্ট ফরটি-

ফাইভের দুটো চেম্বার খালি কেন? গুলি-দুটো গেল কোথায়? একটা তো দেওয়ালে, আর একটা কোথায়?'

'তিন নম্বরের বুকে', গম্ভীর গলায় বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

'তিন' নম্বরটি আবার কে? অখন্ডর প্রশ্ন।

'বুধবার রাতে যে-নাটক জমেছিল, তাতে ছিল তিনজন। ভীম দত্ত, উপেন নন্দী, আর একজন। সেই তৃতীয়জনটি কে? মৃত্যু সামনে দেখে সে চেঁচিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে তার জুতো দেখা গেছে বিছানার পাশে, কিন্তু মুখ দেখা যায়নি। কোত্থেকে এসেছিল সে? কেন এসেছিল? কখন এসেছিল? ভীম দত্ত তাকে ভয় করত কেন? এই প্রশ্নকটার জবাব আগে চাই। তাই না দাশরথীবাবু?'

'এগজ্যাক্‌টলি', সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল দাশরথী। চাবির গোছা তুলে বলল—'সেইজন্যেই তো তৈরি হয়ে এলাম। চলুন ভীম দত্তর দেরাজ, আলমারী, ড্রয়ার হাঁটকাই।'

তাই হল। সব তোলপাড় করা হল। দাশরথী উকিলের সবখোল চাবির কাছে সবকিছুই চিচিংফাঁক হল। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল কি? সন্দেহজনক চিঠি? দলিল? যে-কারণ ভীম দত্তর মত নির্ভীক মানুষকেও ভয় পাওয়ায় এবং মানুষ খুন করায়—তার হদিশ?

না। কিছু না। নিরীহ কাগজপত্র, ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠিপত্র। আর কিছু না। কোনো কিছুই পাওয়া গেল না।

এমনকি পিস্তলটাও না। সাবেকি আমলের গাজীনগরের সেই পিস্তলটাও নেই উপেন নন্দীর আলমারীতে। দুদিন আগেও যা ছিল, তারও আগে যার উদরনিক্ষিপ্ত তপ্তবুলেটে একজন মানুষ নিহত এবং একটি দেওয়াল জখম হয়েছে, নেই সেই রিভলবারটাও।

এই একটিমাত্র চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার ছাড়া জিনিসপত্র তোলপাড় করাই সার হল।

উপেন নন্দী কি তাহলে পিস্তল নিয়ে যোধপুর গেল? কিন্তু কেন? (ক্রমশঃ)

আগামী সংখ্যায় 'গ্ল্যাডস্টোনব্যাগের রহস্য'।

এক-একটি ইস্কুল যেন জাতীয় জীবনে এক-একটি দীপশিখা। কতো যত্নে আলো জেলেছে সে, কতো শিশুর কপালে এ'কেছে ভবিষ্যত অমরতার অম্লান জ্যোতি। এক-একটি ইস্কুলকে অনুসরণ করলেই তাই জানতে পাই আমরা জাতীয় জীবনের অজানা ইতিহাস—নবজাগরণের ধারা-পরম্পরা। 'মানুষ গড়ার ইতিকথায়' সেই অধ্যায়কেই তুলে ধরা হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে।

মানুষগড়ার ইতিকথা

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়নি তখনো। রবীন্দ্রনাথ সবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ঠিক সেই সময়ে চিৎপুরের ঠাকুরবাড়ি থেকে রশি কয়েক দূরে আপার চিৎপুর রোড ও বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীটের মোড়ের খুব কাছাকাছি একটা পুরোনো বাড়ি ভেঙে ফেলার জন্য এক ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর লোকজন উঠেপড়ে লেগেছে। পুরোনো বাড়িটা ভেঙে ঐ জায়গায় একটা নতুন বাড়ি তোলা হবে। বাড়িটা বড় পুরোনো,—চুন-বালি ঝরে-ঝরে করে খসে পড়ে। খসে পড়বে নাই বা কেন। বয়স তো কম হল না, একশ বছর কবে পেরিয়ে গেছে।

বাড়িটা ভেঙে ফেলার খবর নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন। খবরটি শুনে জীবনস্মৃতির ধূসর হয়ে যাওয়া পাতায় অস্পষ্ট কয়েকটি ছবি হয়তো ফুটে উঠে-ছিল। হয়তো মনে পড়ে গিয়েছিল ছেলে-বেলায় একদিন ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ঐ বাড়িটিতে গিয়েছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমি-নারীতে ভর্তি হবেন বলে। আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগের ঘটনা এসব। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন এই স্কুলে পড়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স বড়জোর পাঁচ কি ছয়।

ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের জন্য সে যুগে কলকাতার সেরা স্কুলগুলোর দরজা থাকত খোলা। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী সে সময়ে কলকাতার অন্যতম সেরা স্কুল বলেই পরিচিত ছিল। এ পরিচিতি যে শুধু এদেশের শিক্ষাব্রতীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না তার প্রমাণ ১৮৫৪ সালের এডুকেশন ডেসপ্যাচ ঘাঁটলেই জানতে পারা যায়। কলকাতায় ইউনিভার্সিটি খুললে ছাত্র জুটবে কিনা সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে ঐ রিপোর্টে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে ছাত্ররা আসবে বিভিন্ন এফিলিয়েটেড কলেজগুলো থেকে, যাদের মধ্যে অন্যতম ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। সাদা চামড়ার সাহেবদের চোখে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী তখন নেটিভদের শিক্ষাপ্রীতির জ্বলন্ত উদাহরণ।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারী

এ সুনাম একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে একটি মানুষের আত্মবলিদানের ইতিহাস। 'আত্মবলিদান' শব্দটি খট করে কানে বাজতে পারে। মনে হতে পারে উচ্ছ্বাসের বান ডেকেছে আমার কলমে। কিন্তু যে যুগে ধনীরা বেড়ালের বিয়েতে বা লক্ষ্ণৌর বাঈজীর নাচে লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিতেন, বারোয়ারী পুজো উপলক্ষে বাবুদের বাড়িতে আতস বাজি পুড়ত হাজার হাজার টাকার বা খালি মদের বোতলগুলো পর পর সাজালে টালা থেকে টালিগঞ্জ 'বোতল সরণি' রাতারাতি বানিয়ে ফেলা অসম্ভব ছিল না যে সময়ে, সে যুগে একটা লোক তাঁর স্কুলের জন্য ভাল শিক্ষক খুঁজতে গিয়ে ঝড়-তুফানে গংগায় ডুবে মারা গিয়েছিলেন, সেটাকে তাহলে কি বলব? মার্টার এই মানুষটির নাম গৌরমোহন আঢ্য।

গৌরমোহন ছেলেবেলায় পড়াশুনা বেশী করতে পারেন নি। তাই বোধহয় শিক্ষার ওপর তাঁর ছিল অপরিসীম ঝোঁক। গৌরমোহনের ছেলেবেলায় এদেশে কোন স্কুল-টুল ছিল না। ছিল কিছু পাঠশালা যেখানে পড়াশোনাটাই ছিল গৌণ—বেতের শাসনে শাস্ত্রের অমোঘ বিধানগুলো শিশুদের কণ্ঠস্থ করানো ছিল মুখ্য ব্যাপার। জীবনোপযোগী শিক্ষার কোন আয়োজনই ছিল না সেদিন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এদেশে এক আন্দোলনের সূচনা হয়, যার পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পাঠশালা শিক্ষাপদ্ধতিকে আধুনিক ও সর্বজনীন করে তোলার জন্য তাঁরা মন দিয়েছিলেন বিলেতী শিক্ষাব্যবস্থাকে এদেশের মাটিতে চারিয়ে দিতে। সেই চেষ্টার ফসল হিসেবে গড়ে উঠল 'হিন্দু কালেজ', 'স্কুল সোসাইটিজ স্কুল' ইত্যাদি। 'হিন্দু কালেজ' ছিল সেকালের কলকাতার সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সন্তানদের পড়াশুনার একমাত্র জায়গা। কিন্তু 'কালেজ' প্রতিষ্ঠার পর একটি যুগও পার হল না, তার আগেই কথা উঠল 'হিন্দু কালেজে'র অধ্যাপক ডিরোজিওর প্রভাবে হিন্দু ছেলেরা দলে দলে হয় নাস্তিক না হয় ম্লেচ্ছ হয়ে উঠছে। ছাত্রদের হিন্দুয়ানীতে প্রচন্ড ঘৃণা, বিশ্বাস শুধু খৃস্টানীতে। সারা শহর তখন আতঙ্কিত। 'হিন্দু কালেজে' হিন্দুদের জাত মারা যাচ্ছে, অথচ অন্য এমন কোন স্কুল নেই যেখানে হিন্দুরা তাঁদের ছেলেদের পাঠাতে পারেন পড়াতে। ছেলেদের ত আর পড়াশোনা না করিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না। ঠিক সে সময়ে মুস্কিল আসানের চিরাগ নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে প্রবেশ করলেন গৌরমোহন। তাঁর বয়স তখন মোটে চব্বিশ।

কলকাতার তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালিকৃষ্ণ দেব, নড়াইলের রামরতন রায়, মালিবাগানের কাশীনাথ ঘোষ, বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও হাটখোলার দত্তদের উৎসাহে গৌরমোহন এগিয়ে এলেন 'হিন্দু কালেজে'র বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে। ১৮২৯ সালের ১ মার্চ মানিক বসু ঘাটের কাছে বোশোহাটায় প্রতিষ্ঠিত হল ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। কিছুদিনের মধ্যেই বোশোহাটা থেকে আপার চিৎপুর রোডে খোড়াবাজারে, সেখান থেকে বটতলা হয়ে গরানহাটায় গোবাচাঁদ বসাকের বাড়িতে স্কুল উঠে এল। সেই বাড়িটার কথাই বলছিলাম। বাড়িটা ভেঙে নতুন একটা তিনতলা বাড়ি গড়ে তোলার জন্য লোকজন এসেছিল।

একটি আশ্চর্য ঐতিহ্যের স্মারক ঐ বাড়িটি। এই বাড়িতেই 'হিন্দু কালেজ' প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাফ সাহেবের স্কুলও কিছুদিন এই বাড়িতে বসেছে। ডাফ সাহেবের স্কুল এখান থেকে উঠে যেতে গৌরমোহনের স্কুল স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল ঐ বাড়িতে। সাত বছরে চারবার বাড়ি পাল্টে গৌরমোহন শেষ পর্যন্ত গৌর বসাকের বাড়িতেই তাঁর স্কুল স্থায়ীভাবে বসালেন।

সাত বছরে স্কুল শুধু স্থায়ী হয় নি, যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। সেই সুনামের মূলে ছিল গৌরমোহনের আন্তরিক চেষ্টা। একদিকে তাঁর কড়া নজর ছিল 'হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহারের প্রতি ছাত্রদের ভক্তিমূল যাহাতে শিথিল না হইয়া যায়, অপরদিকে যুগোপযোগী সংস্কারমুক্ত শিক্ষা প্রদানেও গৌরমোহন পশ্চাদপদ ছিলেন না।' ফলে মাত্র কয়েকটি ছাত্র নিয়ে যে স্কুল শুরু হয়েছিল এক দশক শেষ হওয়ার আগেই তার ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াল প্রায় চারশো। তখন স্কুলে পড়ানো হত পাটিগণিত, অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি, দর্শন, রসায়ন, মরাল ফিলজফি, ভূগোল, পলিটিক্যাল ইকনমি, বুক-কিপিং, ইতিহাস, কাবিত্ত্বা, ব্যাকরণ এবং সরকারী নিয়মকানুন। এত সব বিষয় পড়ানোর জন্য গৌরমোহন খুঁজে পেতে উপযুক্ত শিক্ষক যোগাড় করতেন। স্কুলে পড়ানোর মাধ্যম ইংরেজী ছিল বলে, বিশেষ করে যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী এমন শিক্ষকদেরই তিনি স্কুলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেন। গোড়ার দিকে টার্ণবুল, মার্জিন্স, শ্রেনটেল, ল্যাভলিমোর, গ্রীনার; ম্যাকলীন; ডে সুজা, সেন্ডেন, পার্কিনস, মন্টেগু, হারমন জেফ্রোয়া এই স্কুলে পড়িয়েছেন।

মানুষ চিনতে যে কখনো ভুল করেন নি গৌরমোহন, তার সেরা উদাহরণ হারমন জেফ্রোয়া। জাতে ফরাসী, পেশায় ব্যারিস্টার জেফ্রোয়া এসেছিলেন কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস করবেন বলে। পসার জমল না। বরং যা কিছু জমা ছিল সব মদের পেছনে উড়িয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে গেলেন। এই নিঃস্ব রীফলেল ব্যারিস্টারের মাঝেই গৌরমোহন আবিষ্কার করেছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে। একশ টাকা মাস মাইনে ও স্কুলবাড়িতে বিনে ভাড়ায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গৌরমোহন তাঁকে নিয়ে এলেন। কিন্তু চুক্তিমত খরচে জেফ্রোয়ার কাছে তখন একশ টাকা কিছুই না। সবই মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতেন। তাই মানুষটা যাতে অর্থের অভাবে কষ্ট না পান, গৌরমোহন মাঝে মাঝে মাইনের টাকাটা সাহেবের হাতে না দিয়ে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন। প্রায় এক যুগ সাহেব ঐ স্কুলবাড়িতে তাঁর নিত্যসংগী কুকুরটিকে নিয়ে বাস করেছেন।

মদে মাতাল মানুষটির কিন্তু [illegible] ঠিক ছিল। পড়ানোর সময় তিনি যেন [illegible] এক মানুষ। ছ-সাতটা ভাষা জানতেন তিনি। তাঁর চেষ্টায় স্কুলের সুনাম সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতার বহু বনেদী ঘর থেকেই ছেলেরা আসত ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পড়তে। গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত তৃতীয় দশকে এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন।

জেফ্রোয়া ছিলেন এক আশ্চর্য শিক্ষক। শেক্সপীয়র পড়াতে পড়াতে মাথায় ঢুকল ছাত্রদের যদি অভিনয় করে দেখানো যায় তাহলেই নাটকের আসল রূপমাধুরী ফুটে উঠবে। একজন ফরাসী অভিনেতাকে ডেকে জুলিয়াস সীজারের মহড়া শুরু করে দিলেন। ঠিক হল সেমিনারীতে এই নাটক মঞ্চস্থ হবে। জেফ্রোয়ার সাধ কিন্তু মেটেনি। গোটা ব্যাপারটার জন্য দরকার পনেরো শ টাকা। গৌরমোহনের হাতে তখন টাকা নেই। অনেক কষ্টে গৌরমোহন পাঁচশো টাকা যোগাড় করেছিলেন—তাতে কুলোল না। এ সময়ে জেফ্রোয়ার ছাত্র ছিলেন পরবর্তী যুগের বাংলাদেশের 'গ্যারিক' কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী। এসব স্কুলের প্রথম যুগের কাহিনী।

এই তৃতীয় দশকেই স্কুলের ইতিহাসে এল অনেক পরিবর্তন। গৌরীমোহন শুধু ভাল একটি স্কুল গড়ে তুলতে চান নি, চেয়েছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার আশ্রম বানাতে। তাঁর স্কুলের পঠন-পাঠন সবই হত ইংরেজীতে। কিন্তু যে সব ছেলে এই স্কুলে ভর্তি হতে আসত তাদের পড়াশুনোর হাতেখড়ি হত পাঠশালায়। পাঠশালা থেকে সেমিনারীর ইংরেজী আবহাওয়ায় এসে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ত। এই অসুবিধে দূর করার জন্য গৌরমোহনের ইচ্ছায় ডবলিউ এইচ পার্কিনস স্কুলবাড়িতে একটি 'শিশু বিদ্যালয়' খুলেছেন। তিন থেকে ছ বছরের শিশুদের ইংরাজী ও বাংলা পড়ানো হত। পদ্ধতি একেবারে মডার্ণ। ছবি, গান, খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে শিশুরা প্রথম পাঠের সঙ্গে হত পরিচিত।

প্রায় ষোল বছর আগে গৌরমোহন যখন নার্সারী স্কুল খুলেছিলেন তখন কি তিনি জানতেন যে আধুনিক ভারতের শিশু-শিক্ষার বুনিয়াদ রচনায় তিনিই প্রথম পুরুষ। আমি কলকাতার অনেক নামী নার্সারী বা কে জি স্কুলে গেছি, সব জায়গাতেই দেখেছি শিক্ষক-শিক্ষিকা বা প্রতিষ্ঠাতাদের মনের দেয়াল জুড়ে রয়েছেন বিদেশী মন্টেসরীরা, দিশী গৌরমোহনের কোন স্থান নেই সেখানে। আমরা সকলে অজ্ঞান্ত, তাই নিজেদের তৈরী জিনিসেও বিলিতি স্ট্যাম্প না মেরে তৃপ্তি পাই না।

স্কুল হল, নার্সারী হল—সব জায়গাতেই ইংরেজী প্রধান। মাতৃভাষায় দখল না থাকলে বিদেশী শিক্ষার ধারা একসময় শুকিয়ে যাবে সে বিষয়ে গৌরমোহন ছিলেন সজাগ। তাই নার্সারীর পাশাপাশি বাংলা পাঠ-

শালাও তিনি খুলে দিলেন, সংস্কৃত ও বাংলা ভালভাবে পড়ানোর জন্য।

তিনটি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্কুলের নার্সারী বিভাগ ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। আজকের দিনে যে কথা গার্জেনদের সুদূর কল্পনারও বাইরে। এখন ব্যাপারটা পিওরলি বাণিজ্যিক। গৌরমোহন কিন্তু ব্যবসা করতে চান নি, চেয়েছিলেন স্কুল গড়তে। স্কুল গড়বার জন্য কখনো তিনি সরকারের দ্বারস্থ হন নি। সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় শুরু হয়েও প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই সে যুগের অন্যতম সেরা দুটি ইনস্টিটিউশন 'হিন্দু কালেজ' 'স্কুল সোসাইটিজ স্কুল' সরকারী সাহায্য পেতে থাকে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী কখনো কোনদিন তার বেসরকারী স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে নি। সাহায্যের আড়ালে হস্তক্ষেপের লুকোনো হাত হয়তো তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। স্কুল চলত ছাত্রদের ফীজের টাকায়, প্রয়োজনে, গৌরমোহন নিজের থলি উজাড় করে দিতেন। স্কুল ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র প্যাশন।

এই প্যাশনের টানেই তিনি গিয়েছিলেন শ্রীরামপুর—ভাল শিক্ষকের সন্ধানে। ফেরবার পথে গঙ্গায় নৌকাডুবি হল। গৌরমোহন আর ফিরে আসেন নি। গৌরমোহনের অবর্তমানে স্কুলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গিয়ে পড়ল তাঁর ছোট ভাই, এই স্কুলেরই শিক্ষক হরেকৃষ্ণ আঢ্যের উপর। যে দেশে একপুরুষে গড়ে, অন্যপুরুষে তাই
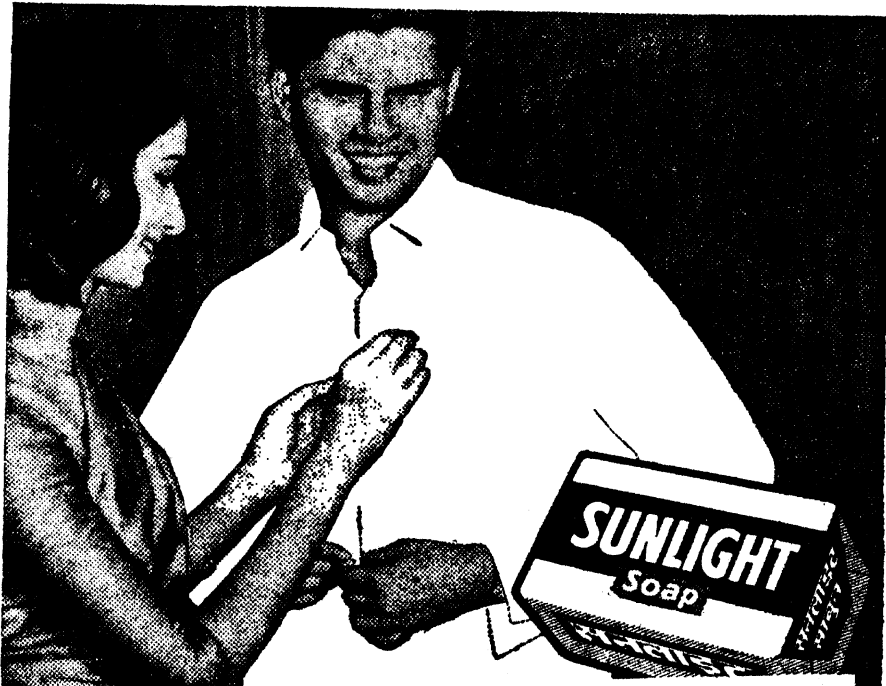
ভেঙে যাওয়া নিয়ম, সেই নিয়মের মূর্তিমান ব্যতিক্রম হরেকৃষ্ণ। ষোল বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে দাদা যা গড়েছিলেন, তারই সূত্র ধরে তিনি এগিয়ে চললেন। প্রায় চব্বিশ বছর হরেকৃষ্ণ একলা এই দায়িত্ব বয়েছেন। সময়ের স্রোতে বহু পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেছে এই পুরোনো স্কুলের উপর দিয়ে।

গৌরমোহনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে সে যুগের নামকরা ইনস্টিটিউশন মেট্রোপলিটান একাডেমী দেনার দায়ে উঠে যাচ্ছিল। হরেকৃষ্ণ একাডেমী কিনে নিয়ে নিজের স্কুলের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। এই মার্জারের ফলে একাডেমীর বিখ্যাত অধ্যাপক, হিন্দু কালেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসন সেমিনারীতে পড়াতে আসেন। তিনি প্রায় তিন বছর এই স্কুলে পড়িয়েছেন। রিচার্ডসনের সময়ে ও পরে সে যুগের অনেক নামকরা শিক্ষক এই স্কুলে পড়িয়েছেন — লক্ষ্ণৌ মার্টিনিয়ারের এল ক্লিন্ট, রেভারেন্ড জে ন্যাশ, ই পি মুর, ডি সুজা, রেভারেন্ড জে এল স্পেন্সার, রবার্টসন ম্যাকেঞ্জি, জে ডি লেশ প্রভৃতি।

ই পি মুর যখন সেমিনারীর প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসেন ঠিক সে বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রথমবার এই পরীক্ষায় বসে এ স্কুলের ছাত্র রাধানাথ বসাক ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসে সেমিনারীর পঠন-পাঠনে অনেক পরিবর্তন এল। আগে হিন্দু কালেজের মত সেমিনারীতেও পাঠশালা থেকে এম-এ পর্যন্ত সবকিছু পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। ১৮৬২ থেকে সেমিনারী কলেজ অংশ ছেঁটে দিয়ে একটি স্কুলে পরিণত হল।

মেট্রোপলিটান একাডেমী কিনে নেওয়ার পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডারে শুধুমাত্র একটি স্কুলে পরিণত হওয়ার মধ্যে সেমিনারীকে একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন হরেকৃষ্ণ। তখন ভবানীপুর, বেলঘরিয়া ও বটতলাতে সেমিনারীর তিন-তিনটে ব্রাঞ্চ। এক বটতলা ব্রাঞ্চেই ১৮৫৪ সালে পড়ত ১৩০টি ছাত্র। সেমিনারীর এই গৌরবময় যুগেই এখানে পড়েছেন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল, সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও রসরাজ অমৃতলাল বসু।

জেক্রোয়ার অপূর্ণ সাধ তাঁর পরবর্তী যুগের ছাত্ররা পূর্ণ করেছিলেন। ১৮৫৩ সালে স্কুলের ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্ররা চাঁদা তুলে স্কুলের মধ্যেই গড়ে তোলেন শেকসপীয়র রঙ্গমঞ্চ। স্কুলের নামে নাম হল এই মঞ্চের—ওরিয়েন্টাল থিয়েটার। এই স্টেজে ওথেলো, মার্চেন্ট অব ভেনিস, নাটকগুলো একে একে অভিনীত হয়। একদিকে রিচার্ডসনের উদাত্ত আবৃত্তি আর একদিকে মঞ্চে সেই আবৃত্তির জীবন্ত ট্রানস্লেশন—বাংলা নাটকের বীজ লুকিয়ে-ছিল ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে। এই বীজ পরবর্তীকালে মহীরুহে পরিণত হয় বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রাণপুরুষ গিরিশচন্দ্র ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী অমৃতলালের অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময়, পঞ্চম দশক সেমিনারীর ইতিহাসের পাতায় একটা প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে। এই ইতিহাস পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ প্রাক্তন ছাত্রদের জীবনআলেখ্যে শুধু ছড়িয়ে নেই, ছড়িয়ে আছে তৎকালীন হিন্দু সমাজের ধর্মীয় আন্দোলনের ভাঙা-গড়ার স্রোতের গভীরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু সমাজের একটি প্রধান ঘটনার স্মৃতি বহন করছে সেমিনারী। ১৮৫১ সালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর বাড়িতে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে হিন্দুদের একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাঁরা খৃস্টান বা অন্য ধর্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য 'শুদ্ধির' প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

এত ঘটনা যখন সেমিনারীর জীবনে ঘটে চলেছে তখন আড়াল থেকে হরেকৃষ্ণ নীরবে সব দায় ও দায়িত্ব বহন করেছেন। কিন্তু একলা একটা মানুষ আর কত পারে। তাই যখন ষষ্ঠ দশকের শেষে তাঁরই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা এগিয়ে এলেন স্কুলের দায়িত্ব বহন করতে স্বেচ্ছায় তাঁদের হাতে সব ভার তুলে দিলেন হরেকৃষ্ণ। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেচারাম চাটার্জি ও অন্যান্য কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে গঠিত একটি ম্যানেজিং কমিটির উপর স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ল ১৮৬৯ সালে। ঠিক একশ বছর আগে।

তখন স্কুলের দুঃসময়। ব্রাঞ্চগুলো উঠে গেছে, মূল সেমিনারীর ছাত্রসংখ্যা কমতে কমতে একশয় এসে ঠেকেছে। এই দুর্দিনে কমিটি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে স্কুল পরিচালনা করেছেন। মাত্র দশ বছরের মধ্যে স্কুলের চেহারা পাল্টে গেল। ধার-দেনা শোধ হয়ে স্কুলের তখন স্বাচ্ছল্য ফিরে এসেছে। ঠিক সেই সময়ে কলকাতার কয়েকজন শিক্ষোৎসাহীর সাহায্যে কমিটি হাটখোলার দত্তদের কাছ থেকে স্কুলের এতদিনের পুরোনো ভিটে কিনে নিলেন। স্কুলের সেক্রেটারী তখন বেচারাম চ্যাটার্জি।

চাটুজ্যে মশাই পঁচিশ বছর একটানা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবার দুর্দিন ঘনিয়ে আসে স্কুলের ইতিহাসে। একটা আশ্চর্য ঘটনা বার বার সেমিনারীর ইতিহাসে দেখা গেছে যে যখনই দুঃসময় ঘনিয়ে এসেছে তখনই হাল ধরার উপযুক্ত মাঝিও এসেছে স্কুলের জীবনে। চাটুজ্যেমশায়ের মৃত্যুর পর বছর খানেক টাল-মাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে স্কুলের দিন কেটেছে। শতাব্দী শেষ হওয়ার বছর পাঁচেক আগে গৌরমোহন, হরেকৃষ্ণ ও বেচারামের যোগ্য উত্তরসাধক অপূর্বকৃষ্ণ স্কুলের সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

ষোল বছর অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আমলে স্কুল সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্টার্ড হয়। রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে, অপূর্বকৃষ্ণ চিন্তিত হয়ে উঠলেন বাড়ি নিয়ে। প্রায় একশো বছরের পুরোনো বাড়িতে আর জায়গা হয় না। চুন-বালি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে চারদিক থেকে। স্থির হল পুরোনো বাড়ি ভেঙে ফেলে সে জায়গায় নতুন বাড়ি তোলা হবে। সে জন্যই ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর লোকেরা এসেছে। খবরটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কানেও পৌঁছেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলের তিনতলা বাড়ি তৈরী হয়ে গেছে। বাড়ি তৈরী করেই ক্ষান্ত হন নি ঘোষমশাই। তাঁর স্কুলের ছেলেরা খেলবে কোথায়? দেহে-মনে সুস্থ নাগরিক গড়ে উঠবে তাঁর স্কুলে, এই একমাত্র ব্রত। চিৎপুরের মত ভিড়াক্রান্ত এলাকায় বছর খানেকের চেষ্টায় স্কুলের পাশেই তিনি যোগাড় করলেন দেড় বিঘে জমি। সরকারী সাহায্যে স্কুল ঐ জমি কিনে নিল। ঐ মাঠে ১৯১৬ সালে প্রথম সেমিনারীর বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। স্বপ্ন সত্য হয়ে ওঠার পর আর বেশীদিন বাঁচেন নি ঘোষমশাই। ঐ বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘোষমশায়ের মৃত্যুর তেরো বছর পরে স্কুলের শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করতে এসে বাংলা দেশের গভর্নর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন বললেন — 'নট আউট থেকে সেঞ্চুরী করার জন্য সেমিনারীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। কামনা করি স্কুলের গতিময় সাফল্য ও সমৃদ্ধিময় ভবিষ্যৎ।'

স্ট্যানলী জ্যাকসনের শুভেচ্ছা যে অসার্থক হয় নি তারই প্রমাণ আজকের ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে সেমিনারীর ক্রম-পরিবর্তনশীল জীবনে নতুন নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। স্কুলের পরিচালকরা কখনো যে বস্তাপচা ঘুনধরা আদর্শে আস্থাবান ছিলেন না তারই প্রমাণ পাই যুগে যুগে। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যুগোপযোগী প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখানে একটি টাইপ স্কুল খোলা হয়। প্রায় এক যুগ চলার পর টাইপ স্কুলটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে উঠে যায়। টাইপ স্কুল উঠে গেছে, কিন্তু তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্থানীয় অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের একটি অভাব মেটানোর জন্য যে গার্লস স্কুল খোলা হয়েছিল গত পঁয়ত্রিশ বছরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা আজ এ এলাকার একটি অন্যতম নামী স্কুলে পরিণত হয়েছে। এ সব তথ্য আমায় জুগিয়েছেন স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীরাসবিহারী রায়। ১৯৩৩ সাল থেকে রায়মশায় এই স্কুলে পড়িয়ে আসছেন। ভুল বললাম, এই স্কুলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছেন বলাটাই ঠিক। পড়ান অনেকেই, কিন্তু এভাবে নিজের স্কুলকে

ভালবাসতে পারেন কজন। ভালবাসতে না পারলে একটা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন ইতিহাস কি করে একটি মানুষের সমস্ত সত্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

অতীতের ইতিবৃত্ত শেষ হলে জানতে চাইলাম রাসবিহারীবাবুর কাছে বর্তমানের কাহিনী। মৃদু হেসে বললেন, কি জানতে চান বলুন। বললাম — সব জানতে চাই। অপূর্বকৃষ্ণের আমলে বাড়ি ছিল তিনতলা, কিন্তু বর্তমান বাড়ি পাঁচতলা। এই পরিবর্তন কবে কিভাবে হল, সব।

পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ মাস্টারমশায়ের মুখে ফুটে উঠল হাসির মৃদু রেখা। প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানের সহকর্মী নিতাইচাঁদ শীলকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—এঁকে আমাদের বিল্ডিংগুলো ভাল করে দেখিয়ে আনো।

নিতাইবাবুকে অনুসরণ করে মূল বাড়ির লাগোয়া ডানহাতি তিনতলা বাড়িতে গেলাম। এটা আমাদের সায়েন্স ব্লক, বললেন নিতাইবাবু। আগে এটা ছিল হোস্টেল। ১৯৫৯ সালে আপগ্রেডিংয়ের সময় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের প্রয়োজনে পুরোনো হোস্টেলবাড়ি ভেঙে ফেলে তোলা হয়েছে নতুন তিনতলা বিল্ডিং। সায়েন্স ব্লকের দোতলায় দেখলাম পাশাপাশি দুটো ঘরে ফিজিক্স ল্যাবরেটরী। তিনতলায় জিওগ্রাফি, মেকানিক্স ও বায়োলজির ল্যাবরেটরী। প্রতিটি ঘর ঠাসা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে। সায়েন্স ব্লক থেকে এলাম মূল বিল্ডিংয়ে। নিতাইবাবুর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে এক প্রাচীন শিক্ষায়তনের ধূসর পাণ্ডুলিপির বিবর্ণ মলিন পাতাগুলি আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল যেন গাইডের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কোন মন্দির দর্শনে চলেছি। লম্বা লম্বা করিডোরের দুপাশে সারি সারি ঘর। কোন ঘরের দরজা নেই। প্রায় একবুক পুরু দেয়ালের মাঝে পুরোনো দিনের ভারী ভারী লো বেঞ্চ, হাই বেঞ্চ, হাতল ভাঙা চেয়ার, নড়বড়ে পায়া টেবিল প্রতি ঘরে। একই প্যাটার্ন একতলা, দোতলা ও তিনতলায়। কিন্তু চারতলায় করিডোরে পা দিয়েই যেন চমকে উঠলাম। একটা সিঁড়ির মাঝে যেন পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান। চারতলার প্রতিটি ঘর আলোয় ঝলমল করছে—সদ্য-কেনা চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চিতে ক্লাসরুমগুলো ঝকঝক করছে। আমার বিস্ময়টুকু অনুভব করেই যেন নিতাইবাবু বললেন—আপগ্রেডিংয়ের সময় উঠেছিল সায়েন্স ব্লক, তাতে সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজন মিটেছে। বছর চারেক আগে হিউম্যানিটিজের প্রয়োজন মেটাতে এই চারতলা তোলা হয়। শুরুতে আমাদের দুটো স্ট্রীম ছিল। সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ। সাতষট্টি থেকে কমার্স চালু হয়েছে। এটা হয়েছে লোক্যাল ছাত্রদের ডিম্যান্ড মেটানোর জন্য।

তীর্থ পরিক্রমা শেষে মন্দিরের চত্বরে ফিরে এসে দেখি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন হেডমাস্টারমশাই। কি, দেখা হল?

আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু? বুঝেছি কিছু প্রশ্ন করবেন ত, তার আগে চলুন আমার ঘরে।

মাস্টারমশাইয়ের ঘরে ঢুকে দেখি ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা মাথায় টুপি, এক সৌম্য ভদ্রলোক বসে আছেন। দেখে কেন জানি মনে হল এই চেহারায় লোক কোন কলেজের অধ্যাপক হলে বেশ মানায়। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে ভদ্রলোক প্রশস্ত চোখদুটো মেলে তাকালেন আমার দিকে। রাসবিহারীবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন—আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী, অশোককুমার ঘোষ। বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসর। পরিচয়-মুহূর্তে মুখ থেকে বেরিয়ে এল—আপনিই তাহলে গৌরমোহন, হরেকৃষ্ণ. বেচারাম অপূর্বকৃষ্ণের উত্তরসাধক। চাপা হাসিতে ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল মাঝবয়েসী অধ্যাপক-এর—সাধক কিনা জানি না, তবে উত্তরসূরী যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাক সে কথা, বিকেলে স্কুলে এসে শুনলাম আপনি আমাদের স্কুলের বিষয়ে লিখবেন বলে তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছেন। সবিনয়ে জবাব দিলাম—অনেক তথ্য হেডমাস্টারমশাই দয়া করে আমায় দিয়েছেন। দু-একটা প্রশ্ন এখনো বাকি। উনি বললেন, বলুন—কি জানতে চান?

শুনলাম স্থানীয় ছাত্রদের ডিম্যাণ্ড মেটানোর জন্য কমার্স সেকসন আপনাদের খুলতে হয়েছে বছর দুয়েক আগে। আপনার স্কুলের স্থানীয় ছাত্র কারা? কোথা থেকে তারা বেশী করে আসছে? মোট কত ছাত্র পড়ে এই স্কুলে? লাইব্রেরীতে কত বই আছে? সবশেষে স্কুলের রেজাল্ট. এসব জানতে চাই।

কি যেন ভাবলেন সম্পাদকমশাই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখুন বর্তমানে প্রাইমারী সেকেণ্ডারী মিলিয়ে প্রায় উনিশ শো ছেলে আমাদের স্কুলে পড়ে। এর প্রায় শতকরা নব্বুই ভাগ আসছে আহিরীটোলা, বেনিয়াটোলা, নিমতলা, পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, শোভাবাজার, রামবাগান, নতুন বাজার, দর্জিপাড়া, এসব জায়গা থেকে। কিছু কিছু আসে বরানগর, পাতিপুকুর, হাতিবাগান, ভি আই পি রোডের ধারে কেষ্টনগর থেকে। প্রসঙ্গত জানাই, এখনো এ অঞ্চলের পুরোনো ফ্যামিলীর ছেলেরা এ স্কুলে পড়তে আসে। যেমন হাটখোলার দত্ত, আহিরীটোলার মুখুজ্যে বা এ অঞ্চলের শীল, শেঠ, বসাক ও সাহা পরিবারের ছেলেরা জেনারেশন আফটার জেনারেশন এই স্কুলেই পড়েছেন, এখনো পড়ছেন।

রেজাল্টের কথা জানতে চেয়েছেন—সাতষট্টিতে সায়েন্সে পাশ করেছে শতকরা ৬১ জন, হিউম্যানিটিজে শতকরা ৪০। পাশ-ফেলের শতকরা হিসাবের পাশাপাশি আরো একটা কথা বলা দরকার, গত শতাব্দীর কৃষ্ণদাস পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বা স্বামী অভেদানন্দের মত কৃতী ছাত্র বর্তমান শতাব্দীতেও স্কুল তৈরী করেছে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক জে এল ভাদুড়ী, ধানবাদ মাইনিং স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এস কে বোস আমাদের স্কুলেরই ছাত্র। আজকাল-রেজাল্ট যে ভাল হচ্ছে না মনে হয় তার কারণ ছাত্রদের আর্থিক সঙ্গতির অভাব। আগে এই স্কুলে ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাই পড়ত। এখন শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ছাত্র আসছে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। যদি পেটভরে ছেলেরা খেতেই না পায়, পড়বার বই যদি তাদের না থাকে তাহলে শুধু স্কুলের চেষ্টায় রেজাল্ট কখনো কি ভাল হতে পারে?

একটু থামলেন অশোকবাবু। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—চলুন আপনাকে আমাদের লাইব্রেরীটা দেখিয়ে আনি। একতলার সিঁড়ির মুখে একটা বড় ঘরের চারদেয়াল জুড়ে শুধু আলমারী ভর্তি বই। খান পনেরো বড় বড় আলমারীতেও কুলোয় নি বলে দেয়ালে তাক করে বই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম বছরে কত টাকার বই কেনেন? জবাব মুখে না দিয়ে স্কুল-ম্যাগাজিনের একটা কপি এগিয়ে দিয়ে বললেন—দেখুন। বিজ্ঞান, ধর্ম, জীবনী, কবিতা, প্রবন্ধ, অ্যাডভেঞ্চার, ইতিহাস, ভূগোল, গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে প্রায় দুশো বই গত বছর স্কুলের পাঁচ হাজার বইয়ের লাইব্রেরীতে যোগ হয়েছে। স্কুলের ছেলেরা নিয়মিত বই পায় লাইব্রেরী থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে একটি সম্পূর্ণ বেসরকারী স্কুল যা পারে, কেন সরকারী অনেক স্কুল তা পারে না? এক পয়সাও সরকারী সাহায্য না পেয়ে নিজেদের সঞ্চিত অর্থে এঁরা বছর বছর হাজার হাজার টাকার বই কিনছেন ছেলেদের জন্য। আর গত বছর হিন্দু স্কুল বই কেনার জন্য মাত্র সোয়াশ টাকা সরকারী অনুদান পেয়েছে। সোয়াশ টাকায় কটা বই-ই বা মেলে?

লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিতে, কোথায় দূরে কোন কারখানার ঘণ্টা কানে এল—পাঁচটা বাজে। সময় হয়েছে বিদায় নেওয়ার। প্রায় দু হাজার ছাত্রের এই বিশাল স্কুলের দুই নবীন ও প্রবীণ পরিচালকের কাছে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরুতে গিয়ে দেখি জনাকীর্ণ চিৎপুরে পিচেমোড়া রাস্তার ধারে মাধবীলতায় ফুল ধরেছে। তখন আকাশে কালবৈশাখীর খ্যাপা মেঘ হু হু করে ছুটে আসছে। ঝড়ের দোলায় স্কুলগেটের মাথায় মাধবীলতার লাল-সাদা ফুলগুলো সবুজ পাতার আড়াল থেকে সগর্বে মাথা দুলিয়ে নাচছে। কেন জানি অকারণে মনে পড়ে গেল চল্লিশ বছর আগে স্কুলের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বাংলার ক্রিকেটার গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসনের স্মরণীয় উক্তিটি—

> I congratulate the seminary on its attainment of a century not out. I wish it continued success and full confidence in its future prosperity.

—সন্ধিৎসু

* আগামী সংখ্যায়
স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল

চাঁদে অভিযান

দিলীপ বসু
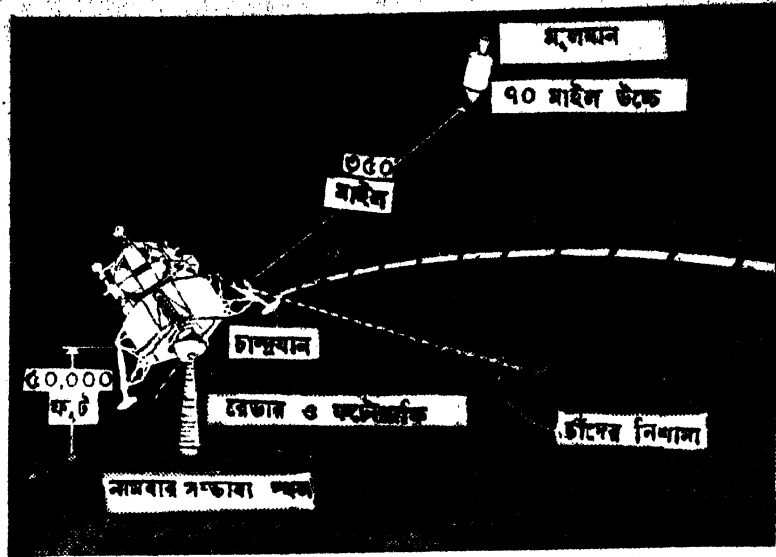
মানুষের জিজ্ঞাসার কোনো শেষ নেই। সামনে যদি উত্তুঙ্গ পর্বত থাকে তো আরোহণ করে দেখতে হবে তার ওপারে কি আছে। যদি বিস্তৃত থাকে দুস্তর সাগর তো পাড়ি জমাতে হবে। মানুষের এই অদম্য কৌতূহল না থাকলে হয়তো সভ্যতার জয়রথ থেমেই যেতো। অবশ্যই কৌতূহল নিবৃত্তির তাড়নায় যেমন আমরা অবিরত অস্থির, তেমনি আবার অজানাকে জানার চেষ্টার ফলেই মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তৃততর দিগন্তে নিরন্তই প্রসারিত।

আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা আজ নিশ্চিত চাঁদের পথে পা বাড়িয়েছেন। পরিকল্পনা-মাফিক ১৯ জুলাই, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭-১৯ মিনিটে তাঁদের মহাকাশচারীরা প্রথম চাঁদে পদার্পণ করবেন। চন্দ্র জয়ের এই প্রস্তুতি বহুদিন ধরে চললেও গত বছর খৃষ্টমাসের সময়ে এপোলো—৮, তারপর এপোলো—৯, ১০ ও ১১-তে চাঁদে পৌঁছনোর কাজ সুসম্পন্ন হবে। লেখার সময়ে (২২শে মে) এপোলো—১০ চাঁদের লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এপোলো—১০-এর প্রোগ্রামে অবশ্য চাঁদে অবতরণ করা ব্যবস্থা করা হয়নি, তবে চাঁদের জমি থেকে মাত্র ১০ মাইল উচ্চে অবধি যাওয়ার কথা। আগেই বলেছি, এপোলো—১১-এর আরোহীরা প্রথম চাঁদে অবতরণ করবেন।

চাঁদে অভিযানের সমগ্র বিষয়টি আমরা সাধারণভাবে এর পূর্বে পূজা সংখ্যার 'চাঁদের দেশে' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। এখানে তার সামান্য অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও আমরা বিশেষভাবে আমেরিকার পরিকল্পনাটি বিশদভাবে আলোচনা করবো।

বাঁকা গমন পথ

পৃথিবী ও চাঁদ, আসলে এরা গ্রহ-উপগ্রহ নয়, যেন যুগ্ম গ্রহ, যার মধ্যে পৃথিবী অবশ্যই বড়ো। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮,০০০ মাইল, যেখানে চাঁদের ব্যাস মাত্র ২,১৬০ মাইল। ভর চাঁদের তুলনায় ৮১ গুণ বেশী। স্বভাবতই পৃথিবীর মহাকর্ষের জোর বেশী।

পৃথিবী-চাঁদের মধ্যেকার দূরত্ব ২,৪০,০০০ মাইল। সামান্য অঙ্কের হিসাবে আমরা দেখছি (বিপরীত বর্গফলের নিয়মানুসারে) এই ২,৪০,০০০ মাইল দূরত্বের মধ্যে পৃথিবী থেকে ২,১৬,০০০ মাইল অবধি দূরত্বে থাকবে পৃথিবীর মহাকর্ষের আধিপত্য, শেষ ২৪,০০০ মাইলে চাঁদের। আর তাহলে ২,১৬,০০০ মাইল দূরত্বে থাকবে সামান্য একটি পয়েন্ট যেখানে পৃথিবী-চাঁদের পারস্পরিক মহাকর্ষের টানাটানি যেন নাকচ হয়ে যাচ্ছে।

একটা কথা বলে রাখা ভালো, আমরা এখানে গড়পড়তা হিসাবে গোটা অঙ্কের মাপজোক দিচ্ছি, আসল হিসাবটা নিশ্চয়ই বেশ আর একটু সূক্ষ্মতর। দ্বিতীয়ত, ২,১৬,০০০ মাইল দূরে যে শূন্য-মহাকর্ষের অঞ্চল বললুম, যেটাকে কেউ কেউ যেন ত্রিশঙ্কুর রাজত্ব বলে বর্ণনা করেছেন, আসলে সেই পয়েন্টটিও কেবলমাত্র অঙ্কের হিসাবেই ধরা পড়ে। বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথিবী ও চাঁদের প্রতিমুহূর্তেই স্থান পরিবর্তন হচ্ছে বলে এই পয়েন্টটিও ক্রমাগতই সরে যাচ্ছে। যাই হোক, জটিলতা বাদ দিয়ে মূল ব্যাপারটি এবারে অনুধাবন করা যাক।

পৃথিবী থেকে চাঁদে যাবার পথটি ঠিক কি রকমের? সরলরেখা? নিশ্চয়ই নয়। কারণ, মহাকাশে সবই বক্ররেখা (curve) ধরে চলে। বৈজ্ঞানিক কেপলার ষোড়শ শতাব্দীতেই প্রমাণ করে দিয়েছেন, গ্রহাদি সূর্যের চতুর্দিকে উপবৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করছে। তাহলে মহাকাশে যে-কোনো বস্তুরই (তা সে প্রকৃতির হাতে-গড়া গ্রহ-উপগ্রহই হোক, বা আজকের মানুষের হাতে-গড়া কৃত্রিম উপগ্রহ বা গ্রহই হোক) গমনপথ হবে উপবৃত্তের বাঁকা রেখার অংশবিশেষ।

চড়াই-উৎরাই

আমরা আগেই বলেছি, পৃথিবী থেকে ২,১৬,০০০ মাইল দূরে পৃথিবী চাঁদের পারস্পরিক টানাটানি (মহাকর্ষ) নাকচ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথম ২,১৬,০০০ মাইল যাত্রা যেন উঁচু খাড়া (vertical পাহাড়ী পথ বেয়ে ঊর্ধ্বে আরোহণ করা। পাহাড়ে চড়তে গেলে যেমন আমাদের গতিবেগ ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসে (চূড়ায় পৌঁছবার পূর্বেই যদি সমস্ত গতিবেগ নষ্ট

করে তারপর আড়োয় টানে যদি উঠে যাওয়া যায়, যেটা রকেট ইনজিনের বেলায় করা হয়ে থাকে)। সোজাসুজি ঝোঁকাতেই ঘন্টায় ২৫ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে চন্দ্রগামী ব্যোমযান যাত্রা শুরু করলো।

২,১৬,০০০ মাইল দূরে খাড়া পাহাড়ী পথ বেয়ে শীর্ষদেশে আরোহণ করে এবারে চাঁদের দিকে শেষ ২৪,০০০ মাইল ঢাল অবতরণ শুরু হলো। অর্থাৎ চাঁদের মহাকর্ষে এবার যেন গা-ভাসিয়ে নেমে যাওয়া। আজকের (২২শে মে) সকালের কাগজে সেই খবরটিই আমরা পড়েছি।

আচ্ছা, এখন এপোলো-১০ ব্যোমযানের গতিবেগ নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বিনা বাধায় এপোলো-১০ চাঁদের জমি অবধি নেমে গেলে চাঁদের জমি ছোঁবার মুহূর্তে তার গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে ঘন্টায় ৫,২৫০ মাইল। বলা বাহুল্য, পৃথিবী-চাঁদের চড়াই-উৎরাই পথের শীর্ষদেশ পার হবার সময় যেটুকু গতিবেগ ব্যোমযানে অবশিষ্ট থাকবে, সেটুকুও ঘন্টায় ৫,২৫০ মাইল গতিবেগের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

ডিঙি নৌকা

ঘন্টায় ৫,২৫০ মাইলেরও বেশী গতিবেগ নিয়ে চাঁদের জমি ছুঁলে নিশ্চয়ই এপোলো-১০ ভেঙে চুরমার হবে। অবশ্যই সেটা করতে দেওয়া যেতে পারে না।

এপোলো-১০-এর প্রোগ্রাম এপোলো-৮ থেকে একটু আলাদা। এপোলো-৮কে গত বছর খৃস্টমাসের সময় চাঁদের জমি থেকে ৯০ মাইল উঁচে থাকার সময় চাঁদের জমির একটা সমান্তরাল গতিবেগ দেওয়া হয়। হিসাবটা খানিকটা জটিল, যেটা এখানে উত্থাপন করা গেল না। এই নতুন গতি নিয়ে এপোলো-৮ চাঁদের জমির মাত্র ৬০ মাইল উঁচে প্রায় একটি গোলাকার চক্রপথে চন্দ্র-প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। অর্থাৎ এপোলো-৮ যেন চাঁদেরই একটি কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে দাঁড়ালো।

এপোলো-১০কেও চাঁদের নিকটে নিয়ে গিয়ে তাকে চাঁদের জমির সমান্তরাল গতিবেগ দিয়ে চাঁদের কৃত্রিম উপগ্রহ করা হবে। চাঁদের কৃত্রিম উপগ্রহরূপে চন্দ্র-পরিক্রমা করতে করতে মূল ব্যোমযান থেকে আর একটি ছোট ব্যোমযান বেরিয়ে আসবে। এপোলো-১০-এর তিনজন আরোহীর মধ্যে দুজন ঐ ছোট ব্যোমযানে চেপে চাঁদের জমির দিকে নেমে যাবেন।

জুলাই মাসে এপোলো-১১ ব্যোমযান-এর মূল যান থেকে ছোট আর একটি ব্যোমযানে দুজন আরোহী সরাসরি চাঁদের বুকে নেমে, সেখানে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে আবার মূল ব্যোমযানে ফিরে আসবেন।

বড়ো জাহাজ যেমন মাঝ-দরিয়ায় নোঙর করে এবং তারপর সেখান থেকে ছোট ডিঙিতে করে ঘাটে পৌঁছান যায়, এ যেন সেই রকম আর কি।

প্রধান বিপদ কি কি

চাঁদের দেশে যাওয়া-আসায় বিপদ একাধিক, যেগুলি এক এক করে আমরা কাটিয়ে উঠবার জন্য এপোলো সিরিজের অষ্টম, নবম, দশম ও শেষ অবধি একাদশে চাঁদে পদার্পণ করব।

এপোলো-৮ ব্যোমযান প্রথম তিনজন মানুষকে সশরীরে চাঁদের দেশে পৌঁছে দিয়ে আবার নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলো। অনেকগুলি বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল একসঙ্গে।

প্রথম, পৃথিবীকে ঘিরে ২০০০ মাইল দূরে, তারপর ৮০০০—১২,০০০ মাইল, তারপর ২০ হাজার মাইল দূরে পর পর তিনটি তেজস্ক্রিয় বলয় যেন সাজান রয়েছে। এদের ভেদ করে এই প্রথম তিনজন মানুষ চাঁদের দেশে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয়, চাঁদের মহাকর্ষে ভাসতে ভাসতে চাঁদের জমির দিকে অবতরণের একটি বিশেষ মুহূর্তে রকেট ইনজিনকে পুনরায় ঠিক ততোটুকু জোরে চালাতে হবে, যার প্রতিধাক্কায় সমগ্র ব্যোমযানের গতিবেগ ঠিক ততোখানিই বদলাবে এবং গতিমুখ চাঁদের জমির সমান্তরাল হয়ে দাঁড়াবে, যাতে সমগ্র ব্যোমযানটি চাঁদের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য পূর্বেও বার দুয়েক স্বয়ংক্রিয় মনুষ্যবিহীন ব্যোমযানকে চাঁদের দেশে পাঠিয়ে তাকে চাঁদের কৃত্রিম উপগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।

তৃতীয়, প্রত্যাবর্তনের পথে বিপদের ঝুঁকি ছিল সর্বাধিক। কারণ এপোলো-৮কে চাঁদের চতুর্দিকে ৬০ মাইল উঁচে বার দশেক পরিক্রমা করিয়ে, আবার রকেট ইনজিনকে চালু করে, এবারে চাঁদের দিকের ২৪,০০০ মাইল খাড়া পাহাড়ী পথ বেয়ে শীর্ষদেশে পৌঁছানো গেল। সেখান থেকে ২,১৬০০০ মাইল ধরে দীর্ঘ ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে পৃথিবীর দিকে অবতরণ। মুশকিল হচ্ছে, পৃথিবীকে ঘিরে ২০০/২৫০ মাইল গভীর যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তাকে ভেদ করে নীচে নামতে গেলে বায়ুর ঘর্ষণে ব্যোমযান উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তপ্ত হতে হতে শেষ অবধি ব্যোমযানের তাপমাত্রা (হিসাব অনুসারে) প্রায় ১০,০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড হয়ে দাঁড়াবে। এতো উচ্চ তাপমাত্রা থেকে ব্যোমযানের অভ্যন্তরের মানুষদের রক্ষা করা যাবে না, সব কিছু জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা।

এই ভীষণ বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য ব্যোমযানকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে একটা বিশেষ কোণে (angle) ছুঁতে হবে। উল্টো দিকে যদি আবার একেবারে তেরচাভাবে (tangentially) সামান্য মাত্র ছোঁয়া যায়, তাহলে ব্যোমযানটি আবার ছিটকে মহাকাশে (অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের বাইরে) বেরিয়ে গিয়ে আর কখনও পৃথিবীতে ফিরে আসবে না, সূর্যের একটি কৃত্রিম গ্রহ হয়ে দাঁড়াবে।

এই উভয়বিধ বিপদ থেকে এপোলো-৮ ব্যোমযানকে বাঁচিয়ে বায়ুমণ্ডলে এমন একটি বিশেষ কোণে, এমন একটি গতিবেগে প্রবেশ করানো হয়েছিল, যাতে তাপমাত্রা ৬,০০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেডের অধিক হয় নি। ৬,০০০ ডিগ্রি তাপমাত্রা অবশ্য যথেষ্ট বেশী, সূর্যের ছটামণ্ডলের তাপমাত্রার সমান, তথাপি তা থেকে বাঁচবার উপযুক্ত প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী পদার্থের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। সেই প্লাস্টিকের আবরণে ব্যোমযান-আরোহীরা জ্বলন্ত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছিলেন।

এপোলো-১০-এর এই বিপদগুলি ছাড়াও অন্যান্য নতুন কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, মূল ব্যোমযান থেকে ছোট আর একটি ব্যোমযানে দুজন আরোহীকে চালান করতে হবে। এটা অবশ্য এর পূর্বে পৃথিবী-প্রদক্ষিণের কক্ষপথে কয়েকবার করা সম্ভব হয়েছে। এবারে সেটা করতে হবে চন্দ্রপ্রদক্ষিণের কক্ষপথে, যখন পৃথিবী থেকে এপোলো-১০ ব্যোমযানের দূরত্ব থাকবে প্রায় ২,২০,০০০ মাইলের মতন। অবশ্যই বায়ুবিহীন মহাকাশে, পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটে বা দূরে হলেও প্রযুক্তিবিদ্যার কৌশলের দিক থেকে নতুন কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু তার পরে ছোট ব্যোমযানটি যখন দুজন আরোহীকে নিয়ে চাঁদের জমির মাত্র দশ মাইল কাছ বরাবর নেমে যাবে, (এবং পরে আবার ফিরে আসবে), তখন রকেট ইনজিনকে একেবারে পূর্বনির্ধারিত হিসাব অনুসারে ঠিক সময় মতো মাত্র চালাতে হবে। মনে রাখা দরকার শুধু কয়েকটি সেকেন্ড বেশি চালু থাকলেও ছোট ব্যোমযানটি হয়তো দুজন আরোহী সমেত চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়বে।

তৃতীয়ত, ছোট ব্যোমযান থেকে আবার মূল এপোলো-১০ ব্যোমযানে ঐ দুজন আরোহীকে চালান দিয়ে তারপর শুরু হবে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পালা।

এই লেখা যখন পাঠকের হাতে পৌঁছবে, তখন মানুষের ইতিহাসের সর্বাধিক দুঃসাহসিক এই অভিযানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। জয়ী তাঁরা হবেনই, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

'জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।'

সমাজতন্ত্রের শিবিরে অনৈক্য

নদীর এককূলে ভাঙ্গন আর এককূলে নতুন মাটি জাগা যেমন চলতেই থাকে ভারতীয় সমাজতন্ত্রের শিবিরে তেমনি দীর্ঘকাল ধরে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা পাশা-পাশি চলেছে। এক সময় 'সোস্যালিস্ট পার্টি'র আগে কংগ্রেসের নাম জোড়া ছিল। এখন সোস্যালিস্ট পার্টির নামের আগে 'প্রজা', 'সংযুক্ত', 'ভারতীয়' প্রভৃতি বিশেষণ ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ-বিয়োগের অধ্যায়গুলিকে চিহ্নিত করে রেখেছে।

সুতরাং, আশ্চর্য নয় যে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ঐক্যের কথাটা আবার উঠছে। এবং কথাটা উঠছে এমন এক সময়ে যখন সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি ও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির নিজের নিজের ঘরের ভিতরেই ঐক্যের বাড়বাড়ন্ত নেই।

ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া যেদিন চোখ বুজেছেন সেদিন থেকেই সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিতে টানাপোড়েন চলেছে। সম্প্রতি জব্বলপুরে পার্টির যে অধিবেশন হয়ে গেল সেখানে দলের ভিতরকার বিরোধগুলি ভালভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই অধিবেশনের প্রাক্কালে শ্রী এস এম যোশী পার্টি চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। চেয়ারম্যানের কার্যকলাপের সমালোচনা করে দলের কোন কোন নেতা প্রকাশ্যে যেসব বিবৃতি দিয়ে-ছিলেন সেগুলির প্রতিবাদেই তিনি পদত্যাগ করেন। জব্বলপুর সম্মেলনে শ্রীযোশী প্রস্তাব আনলেন সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি ও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে নিঃসর্ত সংযুক্তি হোক। তাঁর প্রস্তাব ৩১৩—১৬১ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেল। এর পর তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি ও তাঁর অনু-গামীরা দলের মধ্যে একটি পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে সমাজতান্ত্রিক একতার জন্য কাজ করে যাবেন।

নিয়ম অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টি সম্মেলন আহ্বান না করে পাঁচ মাস পরে এই সম্মেলন ডাকার জন্য শ্রীযোশীকে সম্মেলনে সমালোচনা শুনতে হয়। অথচ সম্মেলনেই আবার স্থির করা হয় যে, পার্টির পরবর্তী সম্মেলন হবে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অর্থাৎ ২০ মাস পরে।

এবার সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সম্মেলনে পার্টী নেতৃত্বকে সাধারণ সদস্যদের যে কঠোর সমালোচনা শুনতে হয়েছে সেটা লক্ষ্য করার মত। সদস্যরা অভিযোগ করেন যে, নেতারা দলকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারছেন না এবং নিজেদের অনৈক্যের দ্বারা দলের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন।

জব্বলপুর সম্মেলনে পার্টির নূতন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ৪৭৯—৩৬ ভোটে হারিয়ে দিয়ে শ্রীঠাকুর ও পদে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু এই নির্বাচনের ফলে পার্টির মধ্যে আবার নূতন সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

শ্রীকর্পূরী ঠাকুর রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে শ্রী এস এম যোশীর অনুগামী। এস-এস-পি—পি-এস-পি সংযুক্তির প্রস্তাব-এর তিনি একজন সমর্থক। সম্মেলন ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে শ্রীঠাকুরকে সভাপতি নির্বাচিত করায় দলের মধ্যে একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দলের সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন শ্রীজর্জ ফার্ণান্ডেজ। তাঁর সংগে ও নূতন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের সংগে শ্রীঠাকুরের মতের মিল নেই। সুতরাং এই অবস্থায় শ্রীঠাকুর পার্টির সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিনা সেবিষয়ে প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। পার্টির নূতন জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম সভাতেই তিনি যখন অনুপস্থিত হলেন তখন জনরব রটতে থাকল।

যদিও এস-এস-পি'র নেতারা প্রথম প্রথম এইসব জনরব খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন তাহলেও এখন জানা যাচ্ছে যে, জনরব ঠিক। অর্থাৎ শ্রীকর্পূরী ঠাকুর সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দিয়েছেন। পাটনাতে দলের জাতীয় কমিটির সভায় শ্রীঠাকুরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করাবার চেষ্টা করা হবে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। যদি এই চেষ্টা সফল না হয় তাহলে এস-এস-পি'র ভিতরকার সঙ্কট জটিল হবে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে, শ্রীযোশী, শ্রীঠাকুর প্রভৃতি প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিতে ফিরে যেতে পারেন। যদি তাই হয় তাহলে এস-এস-পি'র যে অংশ ডাঃ লোহিয়ার পুরনো সোস্যালিস্ট পার্টি থেকে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে পি-এস-পি থেকে আগত অংশের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে এস-এস-পি'র ভিতরকার বিরোধ ও অনৈক্য নানা দিক দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। কেরলে যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগ-দানের প্রশ্নে পার্টি দু ভাগ হয়ে গেছে এবং যে অংশ ফ্রন্ট সরকারের সংগে রয়েছেন তাঁরা ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল নাম দিয়ে আলাদা দল গঠন করেছেন। পশ্চিমবংগে পার্টি চেয়ারম্যানের এক দল, সেক্রেটারির ভিন্ন দল হয়ে গেছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় দলের দুটি করে পাল্টা কমিটি হয়ে গেছে। উত্তরপ্রদেশেও পাল্টা কমিটি গঠনের তোড়জোড় চলছে। পশ্চিম-বংগে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির এক অংশ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্য করে যুক্তফ্রন্টের সংগে হাত মিলিয়েছেন। তার ফলে এই অংশ মূল পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

দুটি সোস্যালিস্ট পার্টির ভিতরকার অবস্থা যখন এই ঠিক তখনই কিন্তু দুই দলের নেতাদের কিছু কিছু অংশ দুই পার্টির মিলনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মহীশূরে পি-এস-পি ও জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতির আসন্ন অধিবেশনে প্রসঙ্গটি আবার উঠবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পি-এস-পি'র দিক থেকে এই প্রয়াসের একজন প্রধান উদ্যোক্তা হলেন শ্রীপিটার আলভারেস। শ্রীআলভারেস ও তাঁর সহমতাবলম্বীরা লক্ষ্য করেছেন যে, যদিও এস এস পি'র জব্বলপুর সম্মেলনে দুই সোস্যালিস্ট পার্টির মিলনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেছে তাহলেও ঐ প্রস্তাবের পক্ষে নেহাৎ কম ভোট পড়ে নি। এস-এস-পি'র ভিতর সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের সমর্থক-দের সংখ্যাশক্তির উপর ভরসা করেই এখন প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে যে, দুই পার্টির মিলনের প্রস্তাব সম্পর্কে উভয় দলের সদস্যদের মত নেওয়া হোক। বিকল্প আর একটি প্রস্তাব হচ্ছে উভয় দলের একতা-পন্থী নেতারা মিলিত হয়ে একটি কমিটি গঠন করুন এবং যাঁরা ঐক্যের বিরোধিতা করছেন তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলুন।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ঐক্য আসবে কিনা সেটা নিতান্তই অনিশ্চিত: আপাতত যেটুকু স্পষ্ট তাহল এই যে, দুই পার্টির ভিতরেই যে টানাপোড়েন চলছে তাতে সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের প্রশ্নটি নূতন ইন্ধন যোগাবে।

মার্কিন ক্যাম্পাসে বিদ্রোহ

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র বিদ্রোহ যেদিকে যাচ্ছে তাতে সেদেশের নেতারা রীতিমত উদ্বিগ্ন। প্রায় তিনটি [illegible]

অধ্যাপক ও কর্মকর্তাদের ঘেরাও, পুলিশী হস্তক্ষেপ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনা ঘটে গেছে।

আমেরিকার অভিভাবকরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য দস্তুরমত ত্যাগস্বীকার করেন। সেদেশে উচ্চশিক্ষার খরচ অত্যন্ত বেশী, নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবুও মার্কিন পিতা-মাতারা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান এই আশায় যে, উচ্চশিক্ষা নূতন নূতন সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করবে ও মোটা বেতনের কাজ পেতে সাহায্য করবে। সাফল্য, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, তীব্র প্রতি-যোগিতা, এইগুলি এতদিন যে সমাজের মূলমন্ত্র ছিল সেই সমাজের নতুন প্রজন্মের কতকগুলি মানুষ আত্মবঞ্চনার পথে যাচ্ছে, এতে সেদেশের অভিভাবকরা উৎকণ্ঠিত। তাঁরা বিদ্রোহী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী তুলছেন। তাঁরা বলছেন, ছাত্রদের মাত্র দু শতাংশ আন্দাজ এই সব হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িত। তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হোক, অন্যান্য সমস্যা কেড়ে নেওয়া হোক। ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢুকিয়ে দেওয়া হোক। তারাই তাড়াতাড়ি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে। কলেজে যারা ঢুকতে চায় তাদের বাছাই করে যারা হাঙ্গামা করতে পারে তাদের আটকানো হোক।'

কিন্তু শিক্ষাবিদরা বলছেন, এতে করে ছাত্র বিদ্রোহ দমন করা যাবে না, বরং এতে বিদ্রোহ আরও উস্কানি পাবে। তার চেয়ে বরং বিশ্ববিদ্যাগুলির হাতে ছাত্র বিদ্রোহের মোকাবেলা করার ভার দেওয়া হোক, কলেজ পরিচালনায় ছাত্রদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হোক।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ছাত্র বিদ্রোহের কারণ কি এবিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, এই বিদ্রোহ কোন একটা সঙ্ঘবদ্ধ চক্রান্তের পরিণাম নয়। এক এক জায়গায় বিদ্রোহের আশু কারণ এক এক রকম। তবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, একদিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে মনোভাব, অন্যদিকে নিগ্রো সম্প্রদায়ের স্বাধিকারের সংগ্রাম এই ছাত্র বিদ্রোহের রসদ যুগিয়েছে। আমেরিকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও আকারে-প্রকারে বৃহৎ ব্যবসায়ের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের যোগ সহস্র বন্ধনের দ্বারা তৈরী। এক সময়ে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যাকে আমেরিকার 'সমরযন্ত্র ও শিল্পের চক্র' (মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স) বলে অভিহিত করেছিলেন বহু বিশ্ব-বিদ্যালয় সেই চক্রের ভিতরে পড়ে গেছে। আমেরিকার ছাত্ররা এটা বুঝতে পারছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। ছাত্ররা চাইছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন সরকারী প্রতিরক্ষা বিভাগ ও গোয়েন্দা সংগঠনের কর্মচারী সংগ্রহের ক্ষেত্র না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনায় যেন ছাত্রদের স্থান দেওয়া হয়, উপযুক্ত শিক্ষকদের হাতে যেন ছাত্রদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়, অনগ্রসর ছাত্রদের জন্য যেন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় ইত্যাদি।

ঘূর্ণিবাত্যা ও বর্ষণের ফলে অন্ধ্র-প্রদেশের গুন্টুর জেলার নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে। অথচ পানীয় জলেরও অভাব রয়েছে। সেদিন গুন্টুর শহরে দেখা গেল, নারী-পুরুষ প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন পানীয় জলের জন্যে।

পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সংকটে পড়েছে। অবশ্য ইতিপূর্বে বহু সমস্যা ফ্রন্টকে বিব্রত করেছে। কিন্তু ঘায়েল করতে পারেনি। এবারের সংকটের গতি, প্রকৃতি ও গভীরতা দেখে মনে হয় ঐক্যে যে ফাটল ধরতে সুরু করেছে তা সাময়িকভাবে সংকুচিত হলেও সময়ের ব্যবধানে পুনরায় বিস্তৃতি লাভ করতে থাকবে। অবশ্য, তিক্ততা চরমে উঠলেও মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে না। কারণ বর্তমানে কোন শরিকই একথা ভাবতে প্রস্তুত নয়। কেউ কেউ মন্ত্রিসভা ছাড়বার প্রশ্ন বিবেচনা করলেও সরকারের অংশীদার হয়ে থাকতে প্রস্তুত। অর্থাৎ ফ্রন্টে থাকবেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ এনে কোন শরিক অদ্যাবধি বিবৃতিও প্রকাশ করেন নি। যে বিষয় নিয়ে বিরোধ চরমে উঠছে তাকে মুখ্যত দুভাগে ভাগ করা যায়—এবং তা হচ্ছে—(১) পুলিশের ভূমিকা ও আনুগত্য, (২) ফ্রন্ট শরিকদের রাজনৈতিক সংগঠন বিস্তারের জন্যে নিজের নিজের দলীয় কৌশল।

উপরিউক্ত দুই বিষয়ের উপর আলোকপাত করলেই ফ্রন্টের বর্তমান সংকটের কিনারা করা যাবে। ধীরে সুস্থে বিচার করলে দেখা যাবে এই কোঁদল মোটেই কোন নীতিগত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়, কিম্বা জনসাধারণের মঙ্গলদায়ক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও এর তেমন যোগাযোগ নেই। ঐক্যের চলার পথে অন্তরায় হচ্ছে বিশেষ করে দলীয় প্রভাব বিস্তারের অনন্ত লিপ্সা।

অনেকেরই প্রথম প্রথম ধারণা হয়েছিল যে নয় মাস কাল ঘর করার পর যুক্তফ্রন্টের শরিকরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে হয়ত এবার বেশ কিছুদিন তাঁরা আত্মকলহে বিরত থাকতে পারবেন, এবং কর্মসূচীর উপর জোর দিয়ে এগিয়ে গেলে দলীয় মনোভাব তাড়াতাড়ি প্রকট হয়ে উঠতে পারবে না। ঐক্যের প্রশ্নই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য লাভ করবে। ফলে, হতাশাময় মানুষ নতুন আশার আলো দেখতে পাবে এবং কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই ফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হানাহানিকে মূলধন করে প্রচারের সুযোগ পাবে না। সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব—যাই বলা হোক না কেন, তা সফলকাম করার পথে একটি বিশিষ্ট স্তরে গিয়ে পেঁৗছুতে পারবে।

এই আশা নিয়ে যাঁরা বুক বেঁধেছিলেন তাঁদের মনে সংশয় এখন বাসা বাঁধতে সুরু করেছে। কারণ তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই সেই পুরোনো নাটক জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রতিনিয়তই শরিকে শরিকে হানাহানির খবরে খবরে দৈনিকের পৃষ্ঠা ভরপুর হয়ে উঠছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যকে জোতদারের দালাল, প্রতিক্রিয়াশীলদের এজেন্ট ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করে বিবৃতি ও প্রতিবিবৃতি প্রকাশ করছেন। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা কিম্বা পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধেও অভিযোগের অন্ত নেই। তাই মনে প্রশ্ন জাগে—যুক্তফ্রন্ট কোন পথে?

কেউ যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে ইতিহাসের পাতা পর্যালোচনা করেন তবে দেখতে পাবেন সুদীর্ঘ কংগ্রেস রাজত্বকালে বামপন্থী দলগুলির নিজেদের মধ্যে এত খুনোখুনি হয় নি। আরও খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে পর্যালোচনার ফল দাঁড়ায়, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি জন্মলাভ করার পর থেকে বিশেষ করে কংগ্রেস আমলে অন্যান্য বামপন্থী দলের বিরুদ্ধে কোনদিনই এত সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টি যখন অবিভক্ত ছিল তখনও অন্য বামপন্থী দলগুলিকে এত হেনস্তা করার সাহস ছিল না।

তবে কেন যুক্তফ্রন্ট গদীতে বসবার পর তিন মাসকাল অতিক্রান্ত হতে না হতেই মার্কসবাদীরা এত সাংঘাতিক রকমের তৎপর হয়ে উঠলেন? এক কথায় উত্তর হচ্ছে পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। এ অভিযোগ সমদর্শীর নয়। ফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি দল, যথা আর-এস-পি, এস-ইউ-সি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কম্যুনিস্ট পার্টি (আদি), এস এস পি ইস্তক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জির একান্ত সচিব পর্যন্ত সকলেই সমস্বরে একই অভিযোগ করেছেন।

কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো পুলিশ তখন একান্তভাবে কংগ্রেসেরই অনুগত ছিল। পুলিশ প্রভুভক্ত জাতি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা দলের প্রতি আনুগত্য পুলিশজাতির মর্মবাণী। কংগ্রেস দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা কালেও এই রাজ্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে যে যিনি পুলিশমন্ত্রী হতেন তাঁকে সেলাম ঠোকার সময় বুটের গোড়ালির মিতালির সময় এমন শব্দ আওয়াজ হতো যে মহাকরণের অলিন্দে তার প্রতিধ্বনি গমগম করত। অন্যান্য কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সেলাম পেতেন না এমন নয়, তবে তাতে এমন সরব আওয়াজ হতো না। আজকেও মহাকরণের সাংবাদিক গুমটিতে বসে লক্ষ্য করলে দেখবেন সেলামী বুটের আওয়াজ পুলিশমন্ত্রীর সময় যেমনটি হয় এমন কি মুখ্যমন্ত্রীকে অভিবাদনকালেও তেমনটি হয় না। এক কথায় বলতে গেলে সেই 'ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।'

তখন অর্থাৎ কংগ্রেস আমলে একটি দলের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকার ফলে পুলিশজাতির এই বৈশিষ্ট্য এত দৃষ্টিকটু লাগত না। আর বামপন্থী বনাম কংগ্রেসের লড়াইয়ে পুলিশ তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করত বলে অভিযোগ সেদিনও মুখর ছিল। কিন্তু বর্তমানে চৌদ্দ শরিকের ফ্রন্টের এক শরিকের ভাগে পুলিশজাতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়েছে। কাজেই পুলিশ তার ঐতিহ্য রক্ষা করছে বলেই অন্যান্য অংশীদাররা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে জাগে যে কি প্রকারে পুলিশ তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে সমাজের বুকে বেঁচে থাকবে? তাঁরা ত আর সেবাশ্রম সংঘের সভ্য নন যে প্রত্যেকের তরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে আখেরে মোক্ষলাভের সাধনায় ব্রতী হবেন।

আরও একটা অভিযোগ উঠেছে যে সমাজবিরোধীরা ফ্রন্টের অংশীদার কয়েকটি দলের মধ্যে এখন আশ্রয় নিয়েছে। রেখে ঢেকে বললেও একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে সমাজবিরোধীরা এখন মার্কসবাদীদের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছে। মার্কসবাদ লেনিনবাদের মর্মকথায় হঠাৎ বিগলিত হয়ে তারা মুক্তিমার্গে বিচরণ করতে সুরু করেনি। আসল কথা হচ্ছে পুলিশজাতির আনুগত্য যেদিকে থাকবে সমাজবিরোধীরাও সেদিকে যাবে। এটাই হচ্ছে নিয়ম। এর ব্যত্যয় অতীতে ঘটেনি, বর্তমানেও ঘটতে পারে না। কাজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটি দলই যদি বিশেষভাবে কমরেডপুষ্ট হতে থাকেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

যুক্তফ্রন্ট যখন গঠিত হয়েছিল তখন ত এমন কোন এগ্রিমেন্ট হয় নি যে প্রত্যেক দলই স্বীয় ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের কর্মসূচী থেকে বিরত থাকবেন। বরঞ্চ একথা স্বীকৃত যে ফ্রন্টের মধ্যে সার্বিক মঙ্গলের জন্য একত্রীভূত হলেও দলীয় প্রভাববৃদ্ধির জন্য তাঁদের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে কী উপায়ে এই প্রভাব বৃদ্ধির কাজে প্রত্যেক দল ব্যাপৃত থাকবে তার কোন রূপরেখা টানা হয়নি।

যুক্তফ্রন্ট অর্থে কিছু কিছু দল মনে করেন জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের পথে যে বাধা আছে তাকে দূর করার জন্য একটি সংযুক্ত প্রচেষ্টা বা মোর্চা। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে ফ্রন্টের সংজ্ঞা বলতে তা বোঝায় বইকি। কিন্তু কম্যুনিস্ট দর্শনে এর ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। তা হচ্ছে বৃহৎ শত্রুকে বধ করবার জন্য অন্যদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হওয়া। তারপর অন্যদের ঘায়েল করে নিজেকে পুষ্ট করা। এ বক্তব্য সমদর্শীর নয়। ফ্রন্টের সূত্র-উদগাতা স্বয়ং ডিমিট্রিভ সাহেবের।

অতএব নির্বাচনে কংগ্রেস পর্যুদস্ত হওয়ার পর এবং তার প্রত্যাঘাতের শক্তিরহিত হওয়ার ফলে দুর্বল ফ্রন্ট শরিকদের উপর চরম আঘাত আসতে বাধ্য। এ অঙ্কে ভুল হওয়ার যো নেই। এ একেবারে ছকে বাঁধা।

এই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য অনেক শরিকই ইতিমধ্যে আচরণবিধি প্রণয়নের ও প্রয়োগের উপর জোর দিতে সুরু করেছেন। আচরণবিধি কার্যকর হয় তখনই যখন শক্তির সমতা থাকে। কাজেই শক্তির বৈষম্য থাকলে সেখানে আচরণবিধি অচল। দুর্বলকে সবলের অনুকম্পায় বেঁচে থাকতে হয়। এবং সেই অবস্থায় দুর্বলকে অধীনতামূলক মিত্রতার মাধ্যমে আত্মরক্ষা রক্ষা হয়। নান্যঃ পন্থাঃ। অতএব, আচরণবিধি, রাজনৈতিক সমাধান ইত্যাদি কথা বলে কোন লাভ নেই। এর ফলে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘটতে পারে মাত্র। দীর্ঘস্থায়ী সন্ধি চলে না।

কংগ্রেস আমলে বামপন্থীদের মধ্যে বড় দলগুলি এমনিতর কার্যকলাপে সাহসী হত না। কারণ তখন কংগ্রেসী পুলিশ ডান্ডা উঁচিয়ে শায়েস্তা করতে আসত। অতএব ভয় ছিল। কিন্তু এখন পুলিশ কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই অকুতোভয়ে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে রক্ষা করবে কে? তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব ত নেই। কোন হানাহানির ঘটনা ঘটলে আর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এলে তখন অনেকেই বোবাকালার ভূমিকা গ্রহণ করেন। কংগ্রেস রাজত্বকালে কোন ঘটনার পুলিশ রিপোর্ট বামপন্থীরা সত্য বলে গণ্য করতেন না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পুলিশ রিপোর্ট না এলে বিচার-বিবেচনার জন্য অনেক বামপন্থীই উৎসাহ দেখান না। সেক্ষেত্রে সত্যযোদ্ধাদের চেয়েও পুলিশ বেশী নির্ভরশীল দেখা যায়। এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যবহারও পাল্টায়, ইদানীংকালের ঘটনায় তার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ফ্রন্টের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সচেষ্ট না হয়ে যদি দলীয় শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির কাজে যুক্তফ্রন্টের শরিকরা মত্ত হয়ে থাকেন তবে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে যে প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে নাকি? কর্মসূচী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে যদি কেউ গণতান্ত্রিক উপায়ে দলবৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করতেন তবে কারও কিছু বলার থাকত না। কিন্তু প্রায় কিছু না করেই যদি নিজেরা হানাহানি শুরু করেন তবে অবস্থা কি দাঁড়াবে?

যুক্তফ্রন্ট স্বীকার করুন আর নাই করুন, নির্বাচনী সমীক্ষায় দেখা যাবে জনতার ঝোঁক বামপন্থীদের প্রতি খুব বাড়েনি। বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে এত বেশি সংখ্যায় তাঁরা বিধানসভার আসন দখল করতে পেরেছেন। একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু নিজেরা হানাহানি করে আবার যদি পৃথকগমনের পথ প্রশস্ত করে ফেলেন তবে লাভ হবে কার? একথা ত সত্যি নয় যে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ বামপন্থী হয়ে গেছেন। একথা আরও সত্য নয় যে সকল মানুষ মার্কসবাদী হয়ে পড়েছেন। অতএব, এই পটভূমিকায় কোন দল যদি মনে করে যে অন্যকে উৎখাত করে একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার সময় সমাগত তবে সে দল ইচ্ছাকৃতভাবেই ঐতিহাসিক ভুল করছেন। এবং পরে ভুলের মার্জনা ভিক্ষা করে আশীর্বাদ লাভ করবার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হতে বাধ্য হবেন। এটা নিষ্ঠুর সত্য, এর ব্যতিক্রম হবে না।

ছোট হোক কিম্বা বড় হোক, প্রত্যেক দলেরই একটি ঐতিহ্য আছে। অনেক দলেরই বোমা, বন্দুক পিস্তলের অভিজ্ঞতাও আছে। বর্তমানে ঘটনার যেভাবে ক্রমাবনতি ঘটছে তা দেখে মনে হয় নরহত্যার রাজনীতি চলতে থাকলে সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু হবে। ফলত গণতন্ত্রের সমাধি ঘটবে। কারণ বর্তমান যুগে পড়ে পড়ে দুর্বলও মরতে প্রস্তুত নয়। মরণ কামড় দেওয়ার জন্য সীমিত শক্তি নিয়ে সেও কোমর বেঁধে দাঁড়াতে পারে। আর ঐ অঘটন যদি ঘটে তবে ত আর কথাই নেই। বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল তার চাকা উল্টো দিকে চলতে সুরু করবে। আর তার চক্রাপিষ্ট হয়ে যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব বিলোপ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। কাজেই সময় থাকতে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে আদর্শ ও পথের পার্থক্য আছে বলেই সর্বনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে। কেউ কোনদিন এ আশা পোষণ করেন নি যে একত্রে ফ্রন্ট গঠন করেছেন বলেই চৌদ্দ শরিকে মত ও পথ ভুলে গিয়ে একেবারে ভাবগদগদ হয়ে আত্মবিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবেন। পশ্চিম বাংলার মানুষও সেই ভরসায় করেছিল যে অন্তত একটা সীমিত সময় পর্যন্ত ঐক্যভাব বজায় রেখে জনকল্যাণমূলক কাজে যুক্তফ্রন্ট এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফ্রন্টের কর্মসূচী রূপায়ণের দাবী নিয়ে কোন শরিক মিছিল করে না। কংগ্রেসী আমলে বামপন্থীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এখনও তাঁদের শ্রেণী-সংগঠনগুলি সেই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মনে হয় মন্ত্রীমহোদয়রা লালদীঘির কক্ষে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই যেন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আলাদা মানুষে পরিণত হয়েছেন। কাজেই তাঁদের সম্বিত ফিরিয়ে আনবার জন্য দল ব্যগ্রচিত্তে মিছিল সংগঠিত করে চলেছে।

যুক্তফ্রন্টকে যদি বাঁচাতে হয় তবে সমস্ত দলকে এই সমস্ত হানাহানি অহেতুক মিছিল ইত্যাদির উপর অন্ততপক্ষে ছয়মাস কি এক বৎসরের জন্য 'মরিটোরিয়াম' ঘোষণা করতে হবে। দলীয় নেতৃবৃন্দকে কর্মীদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিতে হবে যে অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফ্রন্টের বত্রিশ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের রচনাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অন্যথা চলবে না। তবেই বোঝা যাবে যে যুক্তফ্রন্ট একটি সীরিয়াস মোর্চা। এদের কথায় ও কাজে সঙ্গতি আছে। নয়তো একে অন্যের বিরুদ্ধে, কি শ্রমিক সংগঠনে বা কিষাণ সংগঠনে লড়তে ব্যস্ত থাকলে যুক্তফ্রন্ট ভাঙবে। যতই কড়া কড়া বামপন্থী বুলি উচ্চারণ করে বুর্জোয়া চক্রান্তের কথা বলা হোক না কেন তাতে কোন ফল হবে না। কারণ, বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়?

গদীতে আসীন হওয়ার পর থেকেই ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কোন বুনিয়াদী কাজের দিকে এখনও পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি। দৈনন্দিন হানাহানি ও সংঘর্ষের ব্যাপারেই অধিকাংশ মন্ত্রীমহোদয়কে বিব্রত থাকতে হয়েছে। ফলত কর্মসূচী রূপায়ণের প্রশ্নে জোর দেওয়া সম্ভব হয় নি। কাজেই অবিলম্বে এদিকে নজর দেওয়া উচিত, এবং 'মরিটোরিয়াম' ঘোষণা করে একাগ্রচিত্তে বত্রিশ দফা রূপায়ণের কাজে মনোনিবেশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে· নয়তো গণমনে হতাশার সৃষ্টি হবে। আর ফ্যাসিবাদ হতাশারই পরিণাম মাত্র।

—সমদর্শী

(ছয়)

অহিংসার সর্বশক্তিমত্তার উপর গান্ধীজীর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল পর্বতের মতো অটল। কিন্তু তাঁর অনুসরকারীদের সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। তারা আশা করেছিল হাতে হাতে ফল। ফল যখন ফলল না তখন তারা নিরাশ হলো।

গান্ধীকথিত এক বছর তো ফুরিয়ে গেল। কোথায় স্বরাজ! তখনো বাকী ছিল মাস্ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স। যার বাংলা করা হয় গণসত্যাগ্রহ। সকলের আশা গণসত্যাগ্রহ যদি একবার আরম্ভ করে দেওয়া হয় তাহলে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে ও দমকলের দ্বারা দমনের অতীত হবে। সেই তো স্বরাজ। তাই সকলেরই দৃষ্টি বারদোলির উপর। গুজরাতের সেই তহশিল হবে পথপ্রদর্শক।

এমন সময় ঘটে গেল চৌরিচৌরায় আকস্মিক এক ঘটনা। পুলিশের গুলী-বর্ষণের প্রতিবাদে উন্মত্ত জনতা থানায় আগুন দিল। পুড়ে মরল বাইশজন কনস্টেবল। মাহাত্মার চোখে ভয়ংকর এক অশুভ লক্ষণ। এত বড়ো দেশে চৌরিচৌরার মতো ঘটনা যে আর কোথাও ঘটবে না সে নিশ্চয়তা কে দেবে? অহিংস সত্যাগ্রহ সহিংস হত্যাগ্রহ হতে কতক্ষণ? সরকার কি ছেড়ে কথা কইবে? সরকারও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আগুন নেবাবে।

বৃটিশ সরকার যে দরকার হলে তার মখমলের দস্তানা খুলে লোহার হাত বার করতে পারে এবিষয়ে গান্ধীকে কিছু বলার আবশ্যক ছিল না। তা হলেও তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সতর্ক করে দেন যে, ইংরেজরাও তাদের সৈনা-সামন্ত নিয়ে প্রস্তুত। গণ-সত্যাগ্রহ তারা অঙ্কুরে বিনাশ করবে।

এমনি এক বন্ধুর নাম মহম্মদ আলী ঝীণাভাই খোজানী। পরবর্তী বয়সে 'ভাই' ও 'খোজানী' বাদ দিয়ে মহম্মদ আলী ঝীণা। ইংরেজীতে জিন্না। ইনি একদিন রাত্রিবেলা বারদোলিতে উপস্থিত। এঁর মতে গণসত্যাগ্রহ কিছুতেই করা উচিত নয়, করলে শুরুতেই গুলী চলবে। ইংরেজরা বেপরোয়া হয়ে রয়েছে। তারচেয়ে ভালো বড়লাট লর্ড রেডিং-এর সঙ্গে বৈঠক। ঝীণা ও মালবীয় সেই চেষ্টায় আছেন।

গান্ধীজীও জানতেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজরা সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত, অতএব সশস্ত্র। একগুণ হিংসার উত্তর ওরা দশগুণ হিংসায় দেবে। তারপরে হয়তো কিছু শাসন সংস্কার বা চাকরি-বাকরি দিয়ে নিহত ও আহতদের স্বদেশ-বাসীকে কৃতার্থ করে দেবে। সুতরাং একগুণ হিংসা যাতে আদৌ না হয় সেইটেই শ্রেয়। তার মানে কি সব আন্দোলন স্তব্ধ? না, তা কদাচ নয়। অহিংসা সেকথা বলে না। অহিংসা বলে আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করো.

অন্নদাশঙ্কর রায়

তারপরে গণসত্যাগ্রহ করো। ক্ষেত্র যে প্রস্তুত হয়নি চৌরিচৌরা তার সংকেত। ওই লাল সিগনাল অগ্রাহ্য করলে সিপাহী-বিদ্রোহের মতো পরিণাম হবে।

একজন সত্যাগ্রহী সব অবস্থায় অহিংস হতে পারে, কিন্তু এক কোটি সত্যাগ্রহী সব অবস্থায় অহিংস হতে পারে কি? যেখানে জীবনমরণ সংগ্রাম চলেছে সেখানে এটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রশ্ন। নেতা যিনি তাঁকে এর সম্যক উত্তর দিতে হবে। বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। গণসত্যাগ্রহের সময় বয়ে যাচ্ছে। এখন যদি না হয় তবে আর কখন হবে কেউ বলতে পারে না। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। অথচ যে সংগ্রাম অহিংস তার অহিংস চরিত্র না থাকলে তার নেতৃত্ব করা কি গান্ধীজীর উপযুক্ত কাজ?

গণসত্যাগ্রহের তখনকার দিনের পরি-কল্পনা ছিল বারদোলির অনুসরণে এক এক করে ভারতের অগণ্য তহশিল সরকারী কর্মচারীদের শাসনমুক্ত হবে। সরকারী কর্মচারীরা সেখানে গেলে সহযোগিতা পাবেন না। তাঁদের বর্জন করা হবে। তখন হয় তাঁরা তহশিলবাসীদের পক্ষে যোগ দেবেন নয় তাঁরা এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। এমনি করে ভারতের তহশিলে তহশিলে স্বাধীনতা আসবে। সরকারকে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হবে।

তত্ত্বের দিক থেকে ভুল নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা হতো তা ওই বারদোলির মতো দুটি-একটি তহশিলের আত্মশাসন। তারাও কিছুদিন বাদে হাল ছেড়ে দিত। পরম্পরাবিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ বেশীদিন চালাতে পারে না। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীরা কি কেবল অপকারই করেন? আপদে-বিপদে উপকার করেন না? তাঁরাও যদি অসহযোগ করেন, যদি তহশিলে না যান, তবে তহশিলবাসীরাই কি তাঁদের কাছে গিয়ে সাহায্যপ্রার্থী হবেন না? বাংলাদেশে আমি বহু অঞ্চল দেখেছি যেখানে সরকারী কর্মচারীরা পারতপক্ষে পা দেন না। এতই দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন। সাধারণের স্বার্থে তাঁদের জোর করে পাঠাতে হয়েছে। অঞ্চলবাসী যদি তাঁদের সহ্য করতে না পারে তাহলে তাদের উপর চাপ দেওয়া বৃথা। তাঁরা যদি না যান অঞ্চলই অবহেলিত থাকবে।

থিওরির সঙ্গে প্র্যাকটিস যদি না মেলে তবে চমৎকার একটা আইডিয়াও মাঠে মারা যায়। ব্যর্থতাই ছিল তখনকার পরিকল্পনার কপালে। গান্ধীজী যদি চৌরিচৌরার ইঙ্গিতে গণসত্যাগ্রহ স্থগিত না রাখতেন। ফলে তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হলো। অনেক গালমন্দ শুনতে হতো, যদি না সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে তাঁকে কারারুদ্ধ করতেন। ওটা শাপে বর। জেলে গিয়ে তিনি সব সমালোচনা এড়ালেন।

গণসত্যাগ্রহ যখন শিকের তোলা রইল তখন কর্মীদের একদল ধুয়ো ধরলেন যে বিকল্প হচ্ছে কাউন্সিল বর্জন তুলে নেওয়া। কাউন্সিলে গিয়েও তো সরকারের সঙ্গে একহাত লড়তে পারা যায়। অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরকার পক্ষকে হারিয়ে দিতে পারা যায়। তা যায়। কিন্তু সরকার তা বলে দেশের কাঁধ থেকে নামে না। আইনসভার হার-জিতের উপর সরকারের হারজিত নির্ভর করে না। তবে প্রাদেশিক সরকারের কয়েকটা বিভাগ নির্বাচিত মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত। সেই সব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে

অন্যাপথা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারলে তাঁদের পতন ধ্রুব। কাউন্সিলগামী স্বরাজীদের সাধ্যের সীমা সেই পর্যন্ত। সেভাবে কি স্বরাজ হতে পারে? কংগ্রেস ওই প্রশ্নে দ্বিমত। পরে স্বরাজীদের কাউন্সিলে যাবার জন্যে নির্বাচনে নামতে দেওয়া হয়।

এমনি করে অসহযোগ নীতিতে উজান বইতে শুরু করে। বিদ্যার্থীরা ফিরে যায় স্কুল-কলেজে। উকিলেরা আদালতের পসারে। কোথায় সেই সব জাতীয় বিদ্যাপীঠ, কোথায়ই বা গ্রামপঞ্চায়েৎ' চরকা ও খাদি টিম টিম করে জ্বলতে থাকে। গঠনকর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে শিবরাত্রির সলতে জ্বালিয়ে রাখেন।

অহিংসার দৌড় দেখে হিংসাপন্থীরা আবার হিংসাত্মক কাণ্ডকারখানায় উৎসাহ ফিরে পান। কংগ্রেসের এক অংশ তাঁদের নৈতিক সমর্থন জোগান। পেণ্ডুলাম ধীরে ধীরে অহিংসার থেকে হিংসার অভিমুখে দোলায়িত হয়। আর সে হিংসা যে কেবল রাজনৈতিক হিংসা হয়েই ক্ষান্ত থাকে তা নয়। বহুস্থলে সাম্প্রদায়িক হিংসার আকার ধারণ করে। দোষ অবশ্য দেওয়া হয় তৃতীয়পক্ষের 'ভাগ করো আর শাসন করো' নীতিকে। দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধের হেতু তা বলে হাওয়া হয়ে যায় না।

খেলাফতের স্তম্ভ ছিলেন তুরস্কের খালিফ। কামাল পাশা তাঁকে বিতাড়ন করে নিরাশ্রয় করেন। তখন খেলাফতের ভারতীয় স্তম্ভধারীরা স্তম্ভীভূত হন। খেলাফতের ইস্যুতে যাঁরা হাতে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁদের হাতের জোড় খুলে যায়। তারপরে হাতাহাতি বাধতে কতক্ষণ!

নির্বাচনে জিতে কংগ্রেসপ্রার্থীরা অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটির কর্ণধার হয়েছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে মুসলমানদের আরো কয়েকটা চাকরি দিতে পারতেন। কিন্তু দিলে হয়তো হিন্দু ভোট হারাতেন। ফল যা হলো তা সাম্প্রদায়িক গাত্রদাহ। মুসলমানরা অনেকেই কংগ্রেসের উপর ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়। কংগ্রেস রাজা হলে মুসলমানের কি এমন সুবিধে! ও তো হিন্দুরাজ। পরের জন্যে লড়তে যাবে ও জান দেবে কোন্ আহাম্মক!

তা সত্ত্বেও বিস্তর মুসলমান কংগ্রেসে রয়ে যান, জাতীয় সংগ্রামের দায়িত্ব অস্বীকার করেন না, হিন্দুর দোষে ভারতকে দণ্ড দিয়ে নিজেরা খালাস হন না। দেশের জন্যে নৈতিক বাধ্যবাধকতা তাঁদের সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষের ঊর্ধ্বে রাখে।

গান্ধীজী যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসেন তখন দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়ে এমন হয়েছে যে, গণসত্যাগ্রহের লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই। অসহযোগও মৃতপ্রায়। বেঁচে আছে কেবল চরকা ও খাদি। ওদের বাঁচিয়ে রাখাই হয় তাঁর পিতৃকৃত্য। সে কাজে তিনি তাঁর সকল শক্তি ঢেলে দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জোয়ার আবার একদিন আসবে। যেদিন আসবে সেদিনকার জন্যে আপনাকে প্রস্তুত রাখাই তাঁর কর্তব্য। সেদিন যাঁরা তাঁর সঙ্গে চলবেন তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হলে গঠনকর্ম নিয়েই জনসংযোগ রক্ষা করতে হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে কাউন্সিলযাত্রা হচ্ছে লক্ষ্যভ্রংশ। আর হিংসা তো রীতিমতো বিপথ।

কলেজে গিয়ে আমি নানা বিদেশী গ্রন্থ পাঠ করি ও নানা মুনির নানা মতের সঙ্গে পরিচিত হই। গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সুযোগ পাই। মানবের ইতিহাসে গান্ধীই আদি বা অন্ত নন। গান্ধীবাদীদের গোঁড়ামি দেখলে আমিও সমালোচনা করি। কিন্তু আমার সমালোচনা বাইরের লোকের নয়, ঘরের লোকের। আর সমালোচনাই কি শুধু করি, সমর্থন কি করিনে? আমার সমর্থন আমার সাজে-পোশাকে। টিকি আর টুপী ছাড়া আর সবই তো আমি নিয়েছি। টিকি যে আমি নিই নি এর কারণ আমি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় রেনেসাঁসের সন্তান। গান্ধীজীর সঙ্গে এই ক্ষেত্রে আমার মিল নেই। টিকি দেখলেই আমার হাত নিসপিস করে। কাঁচি আমার অস্ত্র। আমি তার বেলা হিংসাপন্থী। আর টুপী না পরাই আমাদের প্রাদেশিক ঐতিহ্য। আমরা টুপী পরিনে, মাথা খালি রাখি। পরলে আর বাঙালী থাকিনে, সাহেব বনে যাই।

একদিনে নয় দিনে দিনে আমার এ ধারণা দৃঢ় হয় যে অহিংসাই প্রকৃষ্ট উপায়, যেমন সততাই প্রকৃষ্ট পলিসি। ভারতের যা অবস্থা তাতে অহিংসা ভিন্ন আর কোনো উপায় জনগণের কাছে খোলা নয়। যাঁদের কাছে খোলা তাঁদের দলে জনগণ নেই। বিপ্লবীদের দলেও না, কাউন্সিলগামীদের দলেও না। তাঁরা যদি জনগণকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা উপার্জন করতে ও পরে সংরক্ষণ করতে পারেন তো আমি সাধুবাদ দিতে রাজী আছি। কিন্তু জনগণকে বাদ দিয়ে ভাবা মহাত্মার আবির্ভাবের পর আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গান্ধীজী এসে জনগণকে এমনভাবে জাগিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কিছুদিনের মতো অসাড় থাকলেও আর কখনো অসাড় হবে না। তখন জনগণের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন কোন্ বিপ্লববাদী বা কোন্ কাউন্সিলগামী? করলে কিভাবে করবেন? তাদের হাতে হাতিয়ার দিয়ে না ভোটপত্র দিয়ে? হাতিয়ার দিলে গৃহযুদ্ধ। ভোটপত্র দিলে তিন বছর বা পাঁচ বছর অন্তর একবার ঘুম ভাঙা। বাকী সময়টা নিদ্রা। কুম্ভকর্ণের মতো। আমার কাছে গান্ধী, অহিংসা ও জনগণ তিনে এক, একে তিন। হিন্দুদের ত্রিমূর্তি, খৃস্টানদের ট্রিনিটি, বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন যেমন।

তারপর আধুনিক যুগের অপরাপর মতবাদের মধ্যে ন্যায়ের অন্তঃসার যথেষ্ট থাকলেও প্রায় প্রত্যেকটির আড়ালে রয়েছে উদ্দেশ্যই আসল, উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে যে-কোনো উপায় অবলম্বনীয়, উদ্দেশ্য মহৎ হলে উপায়ের সাত খুন মাফ। এণ্ড জাস্টিফায়েস মীন্স। টলস্টয় অনুপ্রাণিত গান্ধী মতবাদই বলতে গেলে একমাত্র মতবাদ যে বলে উপায়ই আসল, উপায় অশুদ্ধ হলে উদ্দেশ্যও মাটি হয়, উপায় শুদ্ধ হলে উদ্দেশ্যও হয় তদনুরূপ। এর কণ্ঠস্বর অতিক্ষীণ। এর হাতে না আছে ঢাল না আছে তলোয়ার। তবু এ বলবে, উদ্দেশ্য মহৎ হলে কি হবে, উপায় যদি নীচ হয় তবে তেমন সিদ্ধি কাম্য নয়। ন্যায়ের জগৎ অন্যায়ের রক্ত আর কর্দমপিচ্ছিল পথ দিয়ে আসতে পারে না।

মার্সের পুজো করব না, ম্যামনেরও না, একথা বলতে পারতেন একমাত্র গান্ধীজী। সেই জন্যেই জাতীয়তাবাদের মতো একটা সংকীর্ণ মতবাদও তাঁর নেতৃত্বের মহিমায় মহীয়ান হয়ে ওঠে। নেশনের পুজারীরা মানবসত্যেরও পুজারী হন। ভারতের জাতীয়তাবাদ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। তা হলেও তার তলায় বিদ্বেষের বিষক্রিয়া ছিল। অহিংসার সঙ্গে তা সংগতিহীন।

অহিংসাকে তা ভিতরে ভিতরে লঙ্ঘন করে চলেছিল। বীরের প্রকাশ্য হিংসাও তার চেয়ে ভালো। প্রকাশ্য হিংসার সাহস যাদের ছিল না গান্ধী নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় মুখ ঢেকে তারা অহিংসার গৌরব বৃদ্ধি করত না। করত কেবল সংখ্যা বৃদ্ধি। সংগ্রামের দিন সেটারও দরকার ছিল। বস্তুত সর্ব-সাধারণের কাছে আন্দোলনের বা প্রতিষ্ঠান-এর দুয়ার খোলা রাখলে বাছ-বিচারের কড়াকড়ি থাকে না। যারা ঢোকে তারা যদি অহিংসার জল ঘোলা করে বা জাতীয়তার সঙ্গে বিজাতিবিদ্বেষ মেশায় তা হলে মহাত্মারও সাধ্য নেই যে ঠেকান। তাঁর ধারণা চরকা কাটার বিধান দিলে কেবল সাধু-সজ্জনরাই টিঁকে থাকবে, আর সবাই কেটে পড়বে। বিদেশীর আইন ভঙ্গ করতে যারা এগিয়ে এসেছে মহাত্মার আইনভঙ্গ করার থেকে তারা পেছিয়ে যাবার পাত্র নয়।

উপায় নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মতভেদ ছিল না। আমিও মানতুম যে, অহিংসা অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ ছিল। ইংরেজ সরকার যাক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিও কি যাবে, যেহেতু তার বাহন পাশ্চাত্য বা ইংরেজী? সত্য আর অহিংসা আর মৈত্রী প্রভৃতি শাশ্বত মূল্যগুলি আসুক, সে তো অতি উত্তম কথা, কিন্তু রেনেসাঁসের পর থেকে যেসব মূল্য চলিত হয়েছে—যুক্তি আর তথ্য আর সংস্কারমুক্তি আর বন্ধনহীনতা—সে সবের প্রস্থান ঘটবে না তো? জনগণ অহিংস হোক, আমিও চাই। কিন্তু অজ্ঞ হলেই কি ভালো হবে? রেনেসাঁসকে জন-জীবনের খাতে বইয়ে দেওয়াই কি কাম্য নয়?

একটিমাত্র কোকিল দিয়ে যেমন একটা বসন্ত হয় না তেমনি একজনমাত্র গান্ধী দিয়ে একটা ভাববিপ্লব। ধীরে ধীরে আমার প্রত্যয় হলো যে রেনেসাঁস তাঁর উপর বিশেষ কোনো প্রভাবপাত করে নি, অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট তাঁকে স্পর্শ করে থাকলে সামান্যই করেছে, আধুনিক যুগ বলতে তিনি বোঝেন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম ও মিলিটারিজম। তাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হতে পারবে, জনগণও প্রতিরোধশক্তি লাভ করবে, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীও সম্ভবপর, কিন্তু আর একটা ফরাসী বিপ্লব কেমন করে সম্ভব? তার প্রস্তুতি কোথায়? কোথায় ভলতেয়ার? কোথায় রুশো? দিদেরো ও তাঁর বিশ্বকোষরচয়িতা বন্ধুগণই বা কোথায়?

আমরা কি তা হলে মধ্যযুগে ফিরে যাব। ইংরেজ বিদায় মানে কি ইংরেজপূর্ব যুগের প্রত্যাবর্তন। মধ্যযুগ তো তবু হিন্দু-মুসলমান উভয়ের। মুসলমানকে বাদ দিয়ে আরো অতীতে ফিরে যাবার চিন্তাও অনেকের মনে ছিল। তাঁদের বলা হতো হিন্দু রিভাইভালিস্ট। তেমনি একদল মুসলিম রিভাইভালিস্টও ছিলেন। আমরা কি তা হলে রিভাইভালিস্টদের সংঘর্ষের দৃশ্য দেখব? মানুষ যেমন দেশ-বিশেষের সন্তান তেমনি যুগবিশেষেরও সন্তান। আমরা কোন্ যুগের সন্তান? যদি আধুনিক যুগের সন্তান হয়ে থাকি তবে সে যুগের সঙ্গে আমাদের কি ভালো-বাসার সম্পর্ক না বিদ্বেষের সম্পর্ক?

মিলিটারিজম ও ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম যে আমাদের যুগকে ফোঁপরা করে তুলছে আমি তা ভালো করেই জানতুম। স্বাধীন ভারত বলতে যদি বোঝায় আর একটা ইটালী বা জাপান তা হলে সে ভারত গান্ধীজীর তো কাম্য নয়ই। কাম্য নয় আমারও। গান্ধীজীর সঙ্গে আমি এক্ষেত্রে একমত। কোনো একটা যুগের সব কিছুই গ্রহণীয় নয়। তাই যদি হতো তবে গত শতাব্দীর দাসপ্রথাও গ্রহণীয়ের তালিকায় পড়ত। আমাদের যুগ ওটাকে অতিক্রম করে এসেছে। তেমনি মিলিটারিজম তথা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজমকেও করবে। এই ছিল আমার বিশ্বাস। তাই স্বাধীন ভারত বলতে আমি আর-একটা ইটালী বা জাপান বুঝতে চাইতুম না।

কিন্তু ওটা তো হলো নেতিবাদ। কি চাইনে তা বলা হলো। কি চাই তা তো বলা হলো না। গান্ধীজীর দিকে তাকাই। মন মেনে নিতে পারে না যে, হাজার হাজার বছর ধরে গ্রামে বাস করা মানুষ চিরকাল গ্রামে বাস করলেই নতুন এক সমাজব্যবস্থার পত্তন হবে, নতুন এক সভ্যতার উদয় হবে। উচ্চ-নীচ ভেদ তুলে দিলেই জাতিভেদ আরো পাঁচ হাজার বছর সহনীয় বা স্পৃহনীয় হবে। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করলেই নরনারী সম্পর্ক মধুময় হবে ও নরনারীর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ধনিক-শ্রমিক, খাতক-মহাজন, জমিদার-রায়ত সকলেরই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেও শ্রেণীসাম্য সম্ভব। সনাতন শাস্ত্রশাসিত মন একতিলও বদলাবে না, একটুও বিদ্রোহ করবে না, অথচ বিংশ-শতাব্দীর গতিশীল মন হবে। তাই গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হতে পারিনে।

অব্যাহত জয়যাত্রা

ভারতীয় দুহিতা বরাবর অতিমাত্রায় আত্মসচেতন। নিজেদের উপর কোন ভার তাঁরা কোনদিন মেনে নিতে চাননি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন। তাতে যদি ফল না হয় তবে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছেন। এমনিভাবে হয়তো নিজেদের অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তবু পরাধীনতা বা শৃংখলতা হয়ে রাজ-ভোগে দিন কাটাতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। রাণী ভবানী, অহল্যাবাই, চাঁদ সুলতানা সেই বীরত্বেরই ধারক ছিলেন। কোন অবস্থাতেই এবং এমনকি নিশ্চিত ধ্বংস জেনেও তাঁরা অপরের কর্তৃত্ব মেনে চলতে রাজী হননি। শুধু কর্তৃত্বের প্রশ্ন নয়, সঙ্গে সঙ্গে শাসনকার্যেও তাঁরা অপূর্ব দক্ষতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এঁদেরই পথ ধরে এগিয়ে এসেছেন মহারাণী ঝান্সী। প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সামান্য সামর্থ্য নিয়ে এই বীরাঙ্গনা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সেদিন ইতিহাস বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। পরাধীনতাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই আত্মসম্মান রক্ষায় প্রকাশ্যে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। পরিণামে তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যান: কিন্তু ইতিহাসে ভারতীয় রমণীর বীরত্বের এক রক্তরাঙা অধ্যায় সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই বীরত্ব আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। রাণী লক্ষ্মীবাঈ লড়াই করেছিলেন বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। এবার রংগমঞ্চে অভিনীত হলো সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অধিকার বা মর্যাদাবোধ এখন আর প্রশ্ন নয়, সকলকে তুলে ধরার জাতীয় কর্তব্যবোধ সবাই উদ্বুদ্ধ। যদিও মহারাণী ঝান্সীর অবদান এই বিরাট বোধে উদ্বুদ্ধ করতে সবাইকে প্রেরণা জুগিয়েছে।

এবার পরাধীনতার শিকড় উপড়ে ফেলতে এগিয়ে এলেন নতুন বীরাঙ্গনার দল। নতুন অধ্যায় রচিত হলো। মিছিলের আগে আগে চলেছেন মেদিনীপুরের বীর দুহিতা মাতঙ্গিনী হাজরা। হাতে তেরঙা ঝান্ডা—স্বাধীনতার প্রতীক। শুরু হলো পুলিশী অত্যাচার। চললো গুলী। হিমশীতল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মাতঙ্গিনী। হাতে ধরা স্বাধীনতার প্রতীক তখনো ঊর্ধ্বে। রচিত হলো নয়া ইতিহাস। মাতঙ্গিনীর পথ ধরে এগিয়ে এলেন আরো শতশত মহিলা। আত্মত্যাগ এবং নিষ্ঠায় তাঁরা সকলেই একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়।

তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে। নারী-সমাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত প্রগতির পথে। সর্বক্ষেত্রে তাঁদের বিজয়ধ্বজা উড়ছে। জলেস্থলে নভোতলে তাঁদের জয়যাত্রা সমান। যেকোন ব্যাপারে যেকোন ডাকে তাঁরা অকুতোভয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এবং ভারত-পাক অঘোষিত লড়াইয়ের কথা। চীন-ভারত সংঘর্ষে সুদূর হিমালয়ে দেশের স্বাধীনতা তথা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত জোয়ানদের প্রতি কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে থাকেন নি। গরম জামাকাপড় থেকে খাদ্যদ্রব্য সবই তাঁরা তৈরি করে পাঠিয়েছেন ওঁদের। দেশে সে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা। সবাই যুদ্ধে গিয়েছিলেন এই মুহূর্তে জওয়ানদের পাশে দাঁড়ান তাঁদের জাতীয় কর্তব্য। এমনকি উৎসবের আমেজও তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন জওয়ানদের। আবার এলো ভারত-পাক অঘোষিত যুদ্ধ। সেদিন পাঞ্জাবের রমণীরা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে নিয়মিত নিজেরাই জওয়ানদের পৌঁছে দিয়েছেন। একজন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা এভাবে জওয়ানদের কাছে যেতে তোমাদের ভয় করে না? সেই রমণী একবার তাকিয়েছিলেন প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। পরক্ষণেই জ্বলে উঠেছিলেন, ভয় কিসের? বোন ভাইয়ের কাছে যাবে তাতে আবার ভয় কেন? এরপর ভদ্রলোকের মুখে নিশ্চয়ই আর কোন কথা জোগায়নি। তাঁর কৌতূহলও এখানেই চরিতার্থ হয়েছিল নিশ্চয়।

এতো গেল একদিক। কিন্তু ভুল করলে চলবে না এই একটি দিক থেকেই ভারতীয় ললনার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। যে কোন দিকে এবং প্রয়োজনে আজ তাঁরা পুরুষদের মতোই অপরিহার্য। আর কৃতিত্ব তাঁরা অর্জন করেছেন যুগান্তব্যাপী সাধনায়। তাই যেদিন তাকাই, দেখতে পাই নারীসমাজের বিজয়কেতন সেখানে উড়ছে। এটা তবুও সূচনামাত্র। কারণ বিভিন্ন আজও আমাদের নিদারুণ সংখ্যাল্পতা। ইওরোপ এবং পশ্চিমের দেশে মেয়েদের কি ভীষণ অগ্রগতি। অফিস, কলকারখানায় তাঁদের অবাধ গতি। হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার হিসেবে তাঁদের একাধিপত্য। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় পুরুষের সংখ্যাকে তাঁরা হার মানান। বৈমানিক হিসেবে তাঁরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমন কোন পেশা নেই যা তাঁদের অনধিগম্য।

আমরাও এগিয়েছি। আমাদের আছে বৈমানিক শ্রীমতী দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়। একমেবাদ্বিতীয়ম। আর কোন মহিলা এখনো পর্যন্ত এ পেশায় উৎসাহী হননি। সেজন্য দুঃখ করার কিছু নেই। আমরা আশা করবো, অচিরেই এক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটবে। এবার আছে আরো একটা জোর খবর।

আর্মি মেডিক্যাল কোরের ক্যাপ্টেন শ্রীমতী জয়ন্তী মুখার্জি তৃতীয় মহিলা প্যারাট্রুপার সম্মান অর্জন করেছেন। সাফল্যের শেষ ধাপে তিনি দেড় হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া একটি বিমান থেকে ঝাঁপ দেন। জলপাইসবুজ একটি প্যারাসুট তাঁকে নিয়ে নিরাপদে অবতরণ ক্ষেত্রে নেমে আসে। চরম এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মিস মুখার্জি। ইতিপূর্বে আরো চারবার তাঁকে এরকম পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এবার তিনি ধারণ করবেন বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্যারা-উইংস ব্যাজ।

শ্রীমতী জয়ন্তীর পূর্বে আরো দুজন প্যারা-ট্রুপার হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা হলেন ফ্লাইট লেফটন্যাণ্ট গীতা চন্দ এবং ক্যাপ্টেন ফরিদা রেহানা। তাঁরা তিনজনেই মেডিক্যাল কোরের সঙ্গে যুক্ত। দুজন থেকে বেড়ে সংখ্যা এবার দাঁড়ালো তিন। আমাদের আশা, এই সংখ্যা আরো বাড়বে দিনে দিনে।

১৯৪২এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ক্যাপ্টেন জয়ন্তীর মা শ্রীমতী উমারাণী মুখার্জি কারারুদ্ধ হন। এ সময় তিনি ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন। এখানেই জয়ন্তীর জন্ম। আবার একই সঙ্গে হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন জয়ন্তীর বাবা ডঃ এল মুখার্জি। অপরাধ অবশ্যই স্বাধীনতাসংগ্রাম। কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শ্রীমতী উমারাণী মুখার্জি মাত্র এক মাসের জন্য প্যারোলে মুক্তি পান। এক মাস শেষ হতেই তাঁকে আবার জেলে আটক করা হয়। তাই জয়ন্তীর শিশুবয়সের বেশ কিছু সময় জেলেই কাটে। জেলখানাকেই সে তার ঘরবাড়ী বলে চিনেছিল। তাই জেল থেকে মুক্তি পাবার পরও জয়ন্তী মাঝে মাঝে মাকে জিজ্ঞাসা করতো, মা আমরা কবে বাড়ি যাবো?

জয়ন্তী পড়াশোনা করেন মোতিহারিতে এবং দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজে। ১৯৬৫ সালে তিনি এখান থেকে ডাক্তারী পাশ করে আর্মি মেডিক্যাল কোরে যোগদান করেন। তারপর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই সম্মান লাভ করেন। শৈশব থেকেই জেলে মায়ের বন্দী-

জীবন এবং পরাধীনতার বেদনা তাঁকে বিদ্ধ করেছে। স্বাধীন দেশে আজ তাঁর এই গৌরবময় আত্মপ্রকাশ অনেকখানি সেদিনের বেদনাসঞ্জাত।

বৈমানিক দুর্বা, প্যারাট্রুপার গীতা, ফরিদা, জয়ন্তী ভারতীয় নারীসমাজের গর্ব। অতীত ঐতিহ্যকে নতুন মহিমায় রূপায়িত করার মহৎ প্রচেষ্টায় তাঁরা অক্লান্ত এবং সফল যোদ্ধা। এবার আমাদের সকলের দায়িত্ব এই কৃতিত্বকে আরো মহীয়ান করা। দু'জন বা চারজনের মধ্যে সীমিত কৃতিত্বে আমাদের অগ্রগতির রথ থেমে থাকবে না জীবনের সকলের ক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার বিরাট অঙ্গীকার নিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো। আমরা প্রতিষ্ঠিত হবো। সেদিন আর ভিনদেশী নজীর টেনে আমাদের সাফল্যের মূল্যায়ন করতে হবে না, কারণ শীর্ষে থাকবো আমরাই।

সম্প্রতি কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ছাত্রছাত্রীদের তৈরী মডেল প্রতিযোগিতায় অন্যতম পুরস্কার লাভ করেন সারদা-কন্যা বিদ্যাপীঠের শ্রীঅঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ

সম্প্রতি মোহনবাগান-ক্যালকাটা মাঠে মহিলাদের ২৩তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।

লীগ তথা নক-আউট প্রথায় আয়োজিত এই হকি প্রতিযোগিতা আরম্ভের পূর্বাহ্নে পশ্চিমবঙ্গ মোট এগারটি প্রতিযোগী দল মার্চপাস্টে অংশ নেন। শ্রীবসু মার্চপাস্টে অংশগ্রহণকারীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। বাঙলা দলের অধিনায়ক শ্রীমতী পি লাডের নেতৃত্বে অন্যান্য দলের অধিনায়করা শপথ বাক্য পাঠ করেন।

প্রথমদিনের একমাত্র খেলায় রেলওয়ে জীত সহজেই গোয়ালিয়রকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে।

সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নার্সদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং সরকারের কাছে নার্সদের অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবী জানানো হয়।

ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা হকি খেলোয়াড় শ্রীমতী লিরা ডি'সুজা সম্প্রতি বোম্বাইয়ে পরলোকগমন করেন। ইনি সিংহলের বিপক্ষে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং জাতীয় হকিতে বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া তিনি ফুটবল, বাস্কেটবল, সাঁতার প্রভৃতিও অনুশীলন করতেন।

ইন্দিরা আহুজা যেদিন ভারত থেকে ওদেসায় এসে পৌঁছল তখন সে প্রায় দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, অক্ষিগোলকের আবরণ ক্রমশঃ মোচাকৃতি হয়ে যাওয়ার ফলে আলোর প্রবেশ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং দ্রুত অন্ধ হয়ে যাবে। একমাত্র আকাদেমিশিয়ান ফিলাতোভের পদ্ধতিতে অক্ষিগোলকের আবরণটির বদলে নূতন একটি আবরণ বসিয়েই রোগীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। ভারতে এই ধরনের অপারেশন হয়েছে, দুঃখের বিষয় তার একটিও সফল হয় নি। রোগীর অবস্থার কোনরূপ উন্নতি লক্ষ্য না করে তার স্বামী "বিশ্বসুধা" জাহাজের ক্যাপ্টেন শ্রীআহুজার ওদেসার কথা মনে পড়ল। সেখানে তিনি কয়েকবারই গেছেন এবং এই চক্ষুরোগ চিকিৎসাকেন্দ্রটি সম্পর্কেও অনেক কথা শুনেছিলেন। তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে ওদেসায় নিয়ে আসেন তখন সে শুধুমাত্র ডান চোখ দিয়ে (যা ভারতে কাটা হয়েছে) সাধারণ দৃষ্টিশক্তির মাত্র এক-দশমাংশ দেখতে পেতো এবং বাঁ চোখে মোটেও দেখতে পেতো না।

প্রায় দু'মাস আগে ছিল এই অবস্থা। আর আজকে ফিলাতোভ ইনস্টিট্যুটের বিশেষজ্ঞদের কৃপায় ইন্দিরা আহুজা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। বাঁ চোখটির অপারেশন করেছেন অক্ষিগোলক আবরণ পরিবর্তনের সব থেকে অভিজ্ঞ সার্জন প্রফেসার ডেভিড বুসমিক্ এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন ডাঃ ইয়াদ্ভিগা গালাবস্কা। ডান চোখটিরও ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ উন্নতি হয়েছে ও আরও হচ্ছে। ইন্দিরা আহুজা এখন দেশে ফিরে আসছে, সারা বিশ্বের রূপ ও রং এখন চোখ দিয়ে উপভোগ করছে।

—প্রমীলা

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[শহুরে যুবক বিকাশ। ব্যাঙ্কের কর্মী। প্রয়োজন নিয়ে এল পাড়াগাঁর আপিসে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্কবাবুর বাড়ি। চারদিকে জীর্ণতার গন্ধ; ধ্বসে পড়া বাড়ির মিছিল।

গ্রাম-বাঙলা সম্পর্কে ছিল তার রোমান্টিক আমেজ। কয়েক দিনেই চিড় ধরল তাতে। বদলে গেল চেহারা। দেখল শুধু বিবর্ণতার ম্লান আলো, তেতো স্বাদ। অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়ে দিল গ্রামের নানান চরিত্রের মানুষ। শশাঙ্ককাকাকে ঘিরেও রহস্যের জোনাকি।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। মনীষার দ্বিতীয় উপস্থিতি।

বিকাশ দেখল গোটা সমাজে ঘুনপোকা। চারদিকে ক্ষোভ আর ক্রোধের দাপাদাপি। মূল্যবোধ সব বিপর্যস্ত। এরই শিকার মনীষা, সোনালি আরো কত কে। খেটে মরছে মনীষা। সংসারের জন্যে ফুরিয়ে যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু করে। চোখের সামনে যেন আলো নেই। কেমন নিরুপায়।

সোনালির প্রতিও এক ধরনের মমতা। বিকাশের অস্তিত্বে আলোড়ন। শাঁখের করাত। মুখোমুখি দাঁড়াল নিজের।

দু'দিনের ছুটি নিয়ে এল কলকাতা। মনীষা আর বিকাশ। মাঝে অন্ধ পাঁচিল। ভাঙতে চাইল তা। বিকাশ মরীয়া। প্রস্তাব দিল বিয়ের। অন্ধগলিতে যেন কড়া নাড়ল। মনীষা ক্লান্ত, বিকাশও। ফিরে এল আবার নিয়োগীপাড়ায়। সেই ভিলেজ পলিটিক্স। একঘেয়ে করুণ সুর। বিরক্তি। আপিসেও তেমনি। ফিরছিল সেখান থেকেই। স্থানীয় হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে স্কুলে মনীষার একটি চাকরির জন্যে। রাতে ফিরলো বাড়িতে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকবার আগেই কেমন যেন সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। বীভৎসতার ছোঁয়া।

।। সতেরো ।।

'লাগ্ ভেল্কি লাগ্—' বিকাশের একেবারে মুখের সামনে এগিয়ে এসে মেজদা তার ভৌতিক তাণ্ডব নাচতে লাগল : 'নরবলি হচ্ছে—বাজনা শুনতে পাচ্ছিস না?'

বাড়ীর ভেতর থেকে মেয়েলী আর্তনাদের আর একটা ঢেউ উঠেই অদ্ভুত আওয়াজ তুলে থমকে গেল, ঠিক মনে হল কেউ যেন গলাটা টিপে ধরেছে। এক ধাক্কায় পাগলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিকাশ বাড়ীর দিকে ছুটে গেল।

'কোথায় পালাবি? এবারে তোর পালা—তোর পালা—' পেছন থেকে আবার জয়ধ্বনি করল মেজদা।

বাড়ীর মধ্যে এই মুহূর্তে একটা খুন হয়ে যাচ্ছে—এইরকম ভাবনায় বিকাশের মাথায় যেন রক্ত ছুটছিল। ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল ভেতরে, সরু ফালি পথটার নোনাধরা দেওয়ালে ধাক্কা খেলো একটা, তারপর একসঙ্গে একেবারে দুটো করে ধাপ পেরিয়ে পৌঁছুল দোতলার বারান্দায়।

কিন্তু ঠিক ওপরে পৌঁছুবার আগেই কোথাও ধড়াস করে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ এল। আর দোতলায় উঠে এসে—চারদিকে তাকিয়ে তার মনে হল, হয় সবটাই ম্যাজিক—নইলে যা কিছু সে শুনছিল সব স্বপ্ন। সারা বাড়ী মাঝরাতের ঘুমের মতো নিথর। মেজদার পোড়ো মহল থেকে পায়রার পাখা-ঝাপটানি। আর ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোথাও আর এতটুকুও শব্দ নেই, বারান্দার এক কোণে মিটমিটে লণ্ঠনটা না থাকলে মনে হত এ-বাড়ীতে কোনো লোক থাকে না—কোনোদিন ছিল না।

শুধু দূরে থেকে আবার মেজদার বিকৃত গলায় চিৎকার ভেসে এল : 'কালী—কালী—কালী—'

কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিকাশ। নিজের উত্তেজিত হৃৎপিণ্ড ধক্-ধক্ করে আওয়াজ তুলছে দুই কানে, নিশ্বাস পড়ছে ঝড়ের মতো। কপালের একদিকের [illegible] দিলে একটা—সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ধাক্কা লেগেছিল।

এক বোন সামনের বন্ধ ঘরটায় গলায় দড়ি দিয়েছিল; আর এক বোনকে কি গলা টিপে খুন করা হয়ে গেল এইবার?

হঠাৎ শশাঙ্ককাকার ঘরের দরজাটা খুলে গেল, একটু শব্দ হল, এক ঝলক জোরালো আলো আছড়ে পড়ল বাইরে। নিদারুণভাবে চমকে উঠল বিকাশ। বাইরের সমস্ত শীত একটা সরীসৃপ স্পর্শের মতো জমাট হয়ে কিলবিল করে খেলে গেল সারা শরীরে। এই মুহূর্তে—ওই ঘরের দিকে তাকালেই একটা বিকট হত্যাকাণ্ড দেখতে হবে তাকে!

কিন্তু কিছুই ঘটল না। প্রশান্ত মুখে, দরজায় আলোর পিঠ রেখে এসে দাঁড়ালেন শশাঙ্ককাকা।

'এই যে বিকাশ, কখন এলে?'

অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ স্বর। কল্পনা করা যায় না—মাত্র তিন-চার মিনিট আগেও এই লোকটা চিৎকার করছিল : 'খুন করে ফেলব হারামজাদী, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব তোকে।'

একটি পরিপূর্ণ নির্বোধের দৃষ্টি নিয়ে বিকাশ চেয়ে রইল শশাঙ্ক নিয়োগীর দিকে। একটি শব্দ বেরুল না মুখ দিয়ে।

শশাঙ্ক অত্যন্ত অমায়িকভাবে হাসলেন।

'রাস্তা থেকে চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলে—না?'—তেমনি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে চললেন, 'ও কিছু নয় বাবাজী। তোমার কাকিমার এক ছোট বোন ছিল, ভারী ভালো মেয়েটি—গত বছর হঠাৎ মারা যায়। সেই মেয়েটির কথা [illegible]

তোমার কাকিমার কেমন হিস্টিরিয়ার মতো হয়, একটু-আধটু চেঁচিয়েও ওঠেন কখনো কখনো। তারপরেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ও-সব কিছু না—কিছু না।'

বিকাশ তেমনি দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। শশাঙ্কের দিকে চোখ তুলে তাকানোই অসম্ভব এখন।

আরো সহজ আর অন্তরঙ্গ হয়ে শশাঙ্ক বললেন, 'এত দেরী হল যে আজ ফিরতে? কোথাও গিয়েছিলে নাকি?'

'না—তেমন বিশেষ কোথাও নয়—' কোনোমতে একটা জবাব দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল বিকাশ। কোটটা ছুড়ে ফেলে দিলে বিছানার ওপর—তারপর চেয়ারটায় বসে রইল কাঠ হয়ে। তখনো বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডের শব্দ—তখনো দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে তার, কপালে দপ্‌দপ্‌ করছে যন্ত্রণা।

অভিনয়?

অসাধারণ অভিনয়। কলকাতার কোনো পেশাদার স্টেজেও এমন আশ্চর্য নিপুণতা কল্পনা করা যায় না।

কে বলেছিল কথাটা? প্রভাকর, না কানাই পাল? স্ত্রীটি এত ভালো, এত শান্ত—অথচ শশাঙ্ক নিয়োগী তারও গায়ে হাত তোলেন।

সে তো পরিষ্কার দেখাই গেল আজকে। কিন্তু তাতে চমক লাগেনি, শশাঙ্ককাকার কাছ থেকে কিছুই আর অপ্রত্যাশিত নয়। তার চাইতেও বড়ো বিস্ময় সমস্ত নাটকটা সাজিয়ে তোলবার ভেতর। হিংস্র ক্রোধে একটা দানবের মতো চিৎকার করার সময়েও সবদিকে লক্ষ্য ছিল ভদ্রলোকের, ছুটন্ত বিকাশের পায়ের শব্দ বাইরে থেকেও শুনতে পেয়েছেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে থামিয়ে ফেলেছেন নাটকটা বিচক্ষণ পরিচালকের মতো চোখের পলকে যবনিকা ফেলে দিয়েছেন।

নিজের ভেতরকার উদ্যত জানোয়ারটাকে এক মিনিটে এমন করে লুকিয়ে ফেলতে পারে কেউ? অলৌকিক কোনো ক্ষমতা না থাকলে? এ যেন একটা পিশাচ-তান্ত্রিকের জগৎ, যে-কোনো বর্বরতম কাণ্ড এখানে ঘটতে পারে যে-কোনো সময়, পরক্ষণেই সব আবার মিলিয়ে যেতে পারে বাতাসে।

এ ক'দিন ভুলে গিয়েছিল, আজ আবার নতুন করে জীর্ণ বাড়ীটার পুরোনো চুন-বালি, দেওয়ালের নোনা আর চারদিকের মৃত আবর্জনার স্তূপ একটা দুঃসহ গন্ধের বৃত্ত তৈরী করে বিকাশের শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আনতে চাইল। বদ্ধ ঘরে যেন ছুরিতে শান দিতে লাগল মশার ঝাঁক। এই নরকে আর সে কতদিন কাটাবে, কেন কাটাবে?

পায়ের শব্দ। সুনু।

বিকাশ একবার চেয়ে দেখল মেয়েটার দিকে। ভালো লাগল না, মন খুশি হল না, অন্যদিনের মতো একটা মমতার ঢেউ দুলে উঠল না কোথাও। তার বদলে একটা কুটিল চিন্তা পেয়ে বসল তাকে। এই মেয়েটার একটা কোমল কৈশোর, সরল চোখ, সারা চেহারায় জড়ানো মমতা—এরা সব কোনো একটা অলক্ষ্য চক্রান্তের অংশ—বিকাশকেও এই নরকের মধ্যে ডুবিয়ে নেবার একটি মনোরম প্রলোভন!

সুনু আস্তে আস্তে বললে, 'চা খাবেন বিকাশদা?'

'না। দরকার নেই।'

তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুনু।

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বিকাশ বললে, 'আমার কিছু দরকার নেই সুনু, একলা একটু চুপ করে থাকতে দাও।'

স্বরটা যেমন শক্ত, তেমনি ঠাণ্ডা। সুনু যেন পিছিয়ে গেল একটু। তারপর একটাও কথা না বলে—যেমন ছায়ার মতো এসেছিল, তেমনি ছায়ার মতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

টেবিলের ওপরে লণ্ঠনটা তুলে এনে, আলো বাড়িয়ে দিয়ে সে চিঠি লিখতে বসল মনীষাকে।

এখন মনীষাই তার মুক্তি—তার একমাত্র পরিত্রাণের পথ। এই নরক থেকে—সুনুর নিশ্চিত মোহ থেকে মনীষাই তাকে বাঁচাতে পারে।

চুরি-করা এনসাইক্লোপিডিয়াগুলোর দিকে তাকিয়ে যত খারাপই লাগুক, কুমুদ সেনগুপ্তকে কিছুতেই তার ছাড়া চলবে না।

প্রিয়গোপাল রাগ করবেন?

বুর্জোয়া কানাই পাল সম্পর্কে যত বিদ্বেষই তাঁর থাকুক, একটা বাসা তো জোটাতে পারলেন না এখনো। তাঁর দলের ছেলেরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে কানাই পালের প্রজাদের উসকে দিক, সামনের যে বাই-ইলেকশনে কানাই পাল দাঁড়াবার কথা ভাবছেন—তাতে তারা যত খুশি 'মুর্দাবাদ' বলে চ্যাঁচাক—তাতে তার কী আসে যায়? কোন্ যোগেন পালকে তিনি সর্বস্বান্ত করেছেন, কত মানুষকে ঠকিয়েছেন, তাঁর জবরদখলি বে-আইনী মাছের ভেড়ির জলে কত চাষীর চোখের জল মিশেছে—এসব তথ্য দিয়েই বা সে কী করবে? তার একটা বাসা দরকার।

আর সে-বাসা তাকে এখনি দিতে পারেন কানাই পাল।

শশাঙ্ক নিয়োগীর চাইতেও কানাই পাল খারাপ? হতে পারে। কিন্তু কানাই পালের বাসায় অন্তত একটা জীর্ণ সন্ধ্যার গন্ধ তার বুকের ওপর চেপে বসবে না, একটা অপমৃত্যু আর এক রাশ অত্যাচারের অপচ্ছায়া ঘিরে থাকবে না কোথাও—যে-কোনো একটা বীভৎস পারিবারিক নাটকের মাঝখানে এসে পড়ে এমন করে তার মাথায় রক্ত ছুটে যাবে না, সুনু একটা সোনালী জাল দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরবে না তাকে। কানাই পালের সঙ্গে তারও উদ্দেশে 'মুর্দাবাদ' আউড়ে চলুন প্রিয়গোপাল, তৈরী করুন কথায় আর মার্কসবাদের সিন্‌থিসিস, বিকাশের কিছু দেখবার নেই, ভাববারও না।

কানাই পালের বাড়ীটা সে চেনে, কেই-বা না চেনে এখানে? অফিসে বসে ভাবছিল—যা থাকে কপালে, ছুটির পরে একবার যাওয়াই যাক তাঁর ওখানে, এমন সময় কয়েকটা চেক নিয়ে কানাইবাবুর একজন কর্মচারী এল ব্যাঙ্কে।

'কখন গেলে কানাইবাবুর সঙ্গে দেখা হতে পারে, জানেন?'

কিছু দূরের চেয়ারে একবার নড়ে বসলেন প্রিয়গোপাল।

'বাবু? বাবু তো এখন নেই এখানে। একটা জরুরি কাজে কাল রওনা হয়ে গেছেন কলকাতায়। সেখান থেকে প্লেনে দিল্লী যাবেন। ফিরতে আরো দিন-পাঁচেক।'

'আচ্ছা।'

প্রিয়গোপাল আরো বেশি করে নুয়ে পড়লেন একটা মোটা লেজারের ওপর।

তাহলে আরো পাঁচদিন কিছু করবার নেই। বসে থাকা, অপেক্ষা করা। এর মধ্যে হয়তো মনীষার চিঠিও এসে পড়বে। তাছাড়া কানাই পালের দিকে ভাবনাটা একটু এগিয়ে যেতেই আরো একটা কথা মনে এল। মনীষার চাকরির জন্যে তদ্বির যদি করতেই হয়, তাহলে কুমুদবাবুরই বা শ্বরণস্থ হওয়া কেন? কানাই পাল তো এখানে মুকুটহীন সম্রাট—নিয়োগীপাড়ার সমস্ত অক্ষম ঈর্ষা সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছাই এখানে শেষ কথা। তিনি বললে এখানকার মেয়েদের স্কুলে চাকরি থাক আর নাই থাক, চাকরি তৈরী হয়ে যেতেও সময় লাগবে না।

প্রিয়গোপাল তাঁর আদর্শবাদ নিয়ে ক্ষেপে যাবেন। সে শত্রুর দলে যোগ দিয়েছে বলে শশাঙ্ককাকা তার আর মুখদর্শন করবেন না। চুলোয় যাক সব। তার বাঁচা দরকার—মনীষাকে তার বাঁচানো দরকার।

অফিস থেকে বেরুবার পর আজ আর প্রিয়গোপাল তার সঙ্গ নিলেন না, কুঁজো হয়ে, চিরন্তণী ছাতাটায় ভর দিয়ে অন্য-

মনস্কভাবে এগিয়ে গেলেন। এর মধ্যেই চটতে শুরু করেছেন তার ওপর। বিকাশের একবার হিংস্রভাবে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল : 'এতই যদি বিশ্বের ক্যাপিটালিস্টদের ওপরে, তাহলে তাদের ব্যাঙ্কেই বা কেন চাকরি করেন আপনি?'
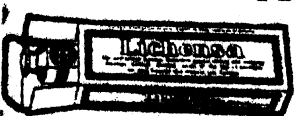
কিন্তু প্রিয়গোপাল এমন জরুরি ব্যক্তি নন। তাঁকে সিরিয়াসলি না নিলেও চলে।

চলতে চলতে একবার স্কুলের কাছে এসে, হেডমাস্টারের বাসার দিকে চেয়ে দেখল সে। বসবার ঘরে আলো, লোকজন। কোনো একটা জরুরি আলোচনা চলছে মনে হয়। হয়তো স্কুল-সংক্রান্ত কিছু হবে। এত লোকের ভেতরে আর ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে মনীষার জন্যে উমেদারী করা চলে না।

তার চেয়ে—

তার চেয়ে—হাঁ, ডাক্তার প্রভাকর। অনেকদিন দেখা হয় না তার সঙ্গে।

শীতের ধার কমে আসছে। এলোমেলো হাওয়ায় বসন্তের ছোঁয়াচ লাগছে মধ্যে মধ্যে। কথাই চোখে পড়েছিল। নিয়োগীপাড়ার এখানে-ওখানে আমের মুকুল। শশাঙ্ক-কাকার বাগানে সজনে ফুল দেখা দিয়েছে। দেখতে দেখতে প্রায় একটা মাস কেটে গেল এখানে?

প্রভাকর বারান্দায় বসেছিল হাত-পা মেলে। লাফিয়ে উঠল।

'আরে বিকাশ যে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'পাত্তা নেই কেন এতদিন ?'

'পাত্তা তোমারই নেওয়া উচিত ছিল'—বলতে বলতে বিকাশ বললে, 'আমি তো তোদের অতিথি।'

'এতদিন আর অতিথি নেই, বাসিন্দা হয়ে গেছিস।'—প্রভাকর বিমর্ষ হল একটু : 'তা ছাড়া জানিস তো তুই যেখানে আছিস সেটা আমার কার্ফিউ এরিয়া, ইচ্ছে থাকলেও যাওয়ার উপায় নেই।'

'এবারে ছাড়ব ও বাড়ী।' — শুকনো গলায় বিকাশ বললে, 'ডিসাইড করে ফেলেছি।'

'রিয়্যালি ?' প্রভাকর উৎসাহিত হল : 'খুব ভালো কথা। কালই বাকস-বিছানা নিয়ে স্ট্রেট চলে আয় আমার এখানে। ডাল-ভাত যা জোটে খাবি।'

'ডাল-ভাতের জন্য ভাবছি না। কিন্তু তোমার এই হাসপাতালের ভিসিনিটিতে থাকা আমার পোষাবে না ব্রাদার। ক্রমাগত ওখান থেকে ওষুধের গন্ধ আসবে, দিন-রাত তুমি ছুটবে রোগী দেখতে আর অপারেশন করতে, আর আমার মনে হবে আমি তোমার পেশেন্ট—একটা ক্রনিক অসুখে ভুগছি। ও চলবে না।'

প্রভাকর হাসল : 'বাসা পেয়েছিস ?'

'কানাইবাবু—মানে মিস্টার পাল একটা দেবেন বলেছেন।'

'ও—কানাই পাল ?'—প্রভাকর যেন নিবে গেল।

বিরক্তিতে বিকাশের মুখের স্বাদ তেতো হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'তোদের এখানকার লোকের সাইকোলজী আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ভদ্রলোক সামনে এলেই সবাই হাতজোড় করে বসে থাকে, আর আড়ালে রাত-দিন নিন্দা করা চাই! তাঁর কাছ থেকে একটা বাসা ভাড়া নিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি ?'

প্রভাকর সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, নামিয়ে রাখল। একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালো বিকাশের দিকে।

'তুই খুব উত্তেজিত হয়ে আছিস মনে হচ্ছে। আমি তো সে-ভাবে কিছু বলি নি। একটু দাঁড়া-চা-টা খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নে, তারপরে কথা হবে।'

খরখরে গলায় বিকাশ বললে, 'চায়ের দরকার নেই, ধন্যবাদ। যদি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারিস তা হলেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।'

'আমি ডাক্তার।'—প্রভাকর হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে শক্ত থাবাটা রাখল বিকাশের কাঁধের ওপর, বললে, 'কথা শুনলেই বুঝতে পারি কে সম্পূর্ণ সুস্থ, কে একটু অ্যাবনর্মাল। তুই ক্লান্ত, অ্যাজি-টেটেড। একটু ঠাণ্ডা হ — কিছু খা তারপরে আলোচনা করা যাবে।'

'কিন্তু—'

'চুপ। অমলা—অমলা—'

সাড়া দিয়ে অমলা এসে হাজির হল।

'বিকাশবাবু যে! নমস্কার — নমস্কার। এতদিন পরে মনে পড়ল ?'

'নমস্কার। সময় পাই নি।'

'সময় পাবে কী করে—বিজি ব্যাঙ্কার!' প্রভাকর বললে, 'বোধ হয় কারো সঙ্গে চটাচটি করে এসেছে, মেজাজ খারাপ। তুমি আগে এর জন্যে চা আর খাবারের ব্যবস্থা করো।'

'আমার খাবারের দরকার নেই। একটু চা হলেই—'

'ওর কথায় কান দিয়ো না অমলা, তুমি যাও।'

প্রভাকর সিগারেট ধরিয়ে কিছু ভাবতে লাগল, বিকাশ বসে রইল বিরস মুখ নিয়ে। কোথাও শান্তি নেই, কোথাও সুর মিলছে না। প্রভাকরের এখানে এসেও তার ভালো লাগছে না।

একটু পরে প্রভাকর বললে, 'একটা কথা বলব বিকাশ ?'

'বল।'

'বিয়ে কর তুই।'

বিকাশ আস্তে আস্তে চোখ তুলল : 'বিয়ে করব না সে তো বলি নি।'

'গুড। চমৎকার কথা। তা হলে ঠিক করে দিচ্ছি।'

'কী ঠিক করবি ?'

'বিয়ে। অমলার একটি মামাতো বোন আছে—আই মীন, আমার একটি মামাতো শালী। দিব্যি দেখতে রে—এম-এ পাশ করেছে গত বছর। তা ছাড়া এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন—মানে তুই যা পছন্দ করিস, খুব ভালো গান—'

বিকাশের ধৈর্যচ্যুতি হল।

'থাম প্রভাকর। তোর রূপবতী গুণবতী শালীর জন্যে বিস্তর সুপাত্র জুটবে—আর আমার জন্যেও তোর ঘটকালির দরকার নেই। বিয়ে যদি করি, পাত্রী আমার ঠিকই আছে।'

'দ্যাট সেটলস!'—প্রভাকর বললে 'তবে তো কথাই নেই, বিয়েটা করে ফেল।'

'সেই জন্যেই তো এত করে বাসা খুঁজছি।'

'ও!' — একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে তার মধ্য দিয়ে বিকাশের দিকে চেয়ে রইল প্রভাকর। চেয়ে রইল একটু অদ্ভুতভাবেই।

চাকরের হাতে চা আর খাবার নিয়ে অমলা এল।

'আবার এত খাবার ? সেই রাজসূয় যজ্ঞ ?'

প্রভাকর ধমক দিয়ে বললে 'বকিস নি—যা পারিস খা।'

'তোর প্র্যাকটিস খুব ভালো চলছে মনে হয়। যদি হাসপাতাল আর ওষুধের গন্ধ না থাকত, তা হলে হয়তো তোর এখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেতুম।'

'খবর্দার, এ-সব বলিস নি। আমার চাকরি নন-প্র্যাকটিসিং। তোর কথাটা কানে গেলে আমার একটা লম্বা রিপোর্ট চলে যাবে আমার নামে।'

খাওয়া, টুকরো টুকরো কথা। বিকাশের মাথাটা অল্প অল্প করে শান্ত হয়ে আসছিল। তারপর এক সময় সমস্ত পৃথিবীর ওপর যে বিরূপতাটা তার জমে উঠেছিল, সেটা ফিকে হয়ে এল। তখন মনে হল, এখানে একমাত্র প্রভাকরের ওপরেই সে নির্ভর করতে পারে, সমস্যাটা একমাত্র তাকেই বলা চলে।

ক্লান্ত গলায় বললে, 'একটা পার্সোনাল আলোচনা ছিল তোর সঙ্গে।'

প্রভাকর চোখের কোনা দিয়ে একবার তাকালো অমলার দিকে। অমলা নিঃশব্দে সরে গেল বাড়ীর ভেতরে।

'তুই তো ডাক্তার। একটা মেয়ের মনের জট খুলে দিতে পারিস?'

'ওটা সাইকিয়াট্রিস্টের কাজ।' প্রভাকর হাসল : 'তবু বলে যা। শুনি।'

শীতের হাওয়ার সঙ্গে বসন্তের ছোঁয়া মিশছিল, হেনার গন্ধ আসছিল, সামনের মাঠে জ্যোৎস্না জ্বলছিল। বাড়ীর ভেতর চলে গিয়ে অমলা রেডিয়ো খুলে দিয়েছিল, চাপা একটা সুরের নেপথ্য-সঙ্গীত চলে আসছিল বাইরে। এতদিন ধরে যা বিকাশ আর মনীষার ভেতরে একান্ত হয়েছিল, আজ ক্লান্তি আর বিরক্তির পথ ধরে তা বেরিয়ে এল তৃতীয় আর একজনের কাছে।

চুপ করে শুনল প্রভাকর, পর পর সিগারেট পুড়ল গোটা তিনেক। এর মধ্যে বাড়ীর চাকরটা কখন চা এনে দিয়ে গেল দু-বার।

প্রভাকর বললে, 'রাগ করবি না?'
'না।'

'তোর একটা ঘর বাঁধা নিশ্চয় দরকার। মনীষার চাকরি—তারও দরকার আছে। কিন্তু সবচেয়ে আগে যেটা দরকার সেটা ভদ্রমহিলাকে ভালো করে ডাক্তার দেখানো। দিনের পর দিন শুকিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।'

'স্টোনের কথা বলছিস?'

'সেটা পেনফুল বটে, কিন্তু এমন কিছু নয়, অপারেশন করলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু শরীর শুকিয়ে যাওয়াটাই কাজের কথা নয়।'

'ম্যাল-নিউট্রিশন?'

'হতে পারে। কিন্তু সেজন্যে জ্বর হবে কেন মধ্যে মধ্যে?'

হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় বিকাশ শিউরে উঠল : 'তুই কি টি-বি বলে সন্দেহ করিস?'

'এত দূর থেকে কী আন্দাজ করব, বল?'—বিকাশের দিকে তাকিয়ে প্রভাকরের যেন সম্বিৎ ফিরে এল : 'হয়তো কিছুই নয়—হয়তো উইকনেসের জন্যে জ্বর হয়। একটু শরীরের ওপর যত্ন নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু সত্যিই যদি টি-বি হয়?'
প্রভাকর শব্দ করে হেসে উঠল।

'এই রে, মাথায় একটা ভাবনা ঢুকল তো? ডাক্তারদের সবরকম স্পেকুলেশনই করে রাখতে হয়, তার জন্যে তুই এত তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন? ধর—যদি ওয়ার্স্টটাই ভাবা যায়, টি-বিই হল, তাতেই বা কী? আজকাল টি-বি সেরে যাওয়াটা কিছুই নয়।'

দাঁতে দাঁত চাপল বিকাশ।
'সব ওই সংসারের জন্যে। ওদের স্বার্থপর ওই ফ্যামিলিটাই ওকে খুন করল।'

প্রভাকর বললে, 'পাগলামি রাখ। শোন —দিন সাতেক বাদে আমি একবার কলকাতায় যাচ্ছি। ভদ্রমহিলার কথা শুনে যেটুকু বুঝতে পারছি, তাতে সিরিয়াসলি ডাক্তার উনি কিছুতেই দেখাবেন না। তুই পারিস তো আমার সঙ্গে চল। আমাদের প্রোফেসার ডাক্তার চৌধুরীকে দিয়ে একবার দেখিয়ে দিই। তার পরে ও'র চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা যেমন হয় করিস।'

একটু চুপ করে হতাশভাবে বিকাশ বললে, 'দেখি। তাই করতে হবে মনে হচ্ছে।'

হাসপাতালের পেটা ঘড়িতে ন'টা বাজল। বিকাশ বললে, 'আজ উঠি তা হলে।'

আবার অনেকখানি পথ। নিয়োগী-পাড়ার ভুতুড়ে রাস্তা। শশাঙ্ক নিয়োগীর প্রেতপুরী।

রঙ্গমঞ্চ তেমনি সাজানো। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। কাকার সদালাপে নয়, কাকিমার মুখে নয়, এমন কি সুনুর চোখের তারাতেও নয়। সবাই নিপুণ অভিনেতা। কতদিন ধরে মহলা দিয়ে দিয়ে এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওরাই জানে।

অসীম বিতৃষ্ণায় কিছুই খাওয়া গেল না—প্রভাকরের ওখানে খেয়ে এসে খিদেও ছিল না। কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে বিকাশ এসে সোজা শুয়ে পড়ল বিছানায়। আজও মশারি ফেলতে সে ভুলে গেল, লেপটাকে একটা বিসদৃশ চাপের মতো মনে হতে লাগল বুকের ওপর, মশার গুঞ্জনে কান ছিঁড়ে যেতে লাগল, তারপর নিজের মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে কখন তার ঝিমুনি।

'বিকাশদা!'

একটা মিষ্টি ডাকের ছোট্ট ঢেউ ভেঙে পড়ল কানের কাছে। সুনু।

'আবার মশারি ফেলতে ভুলে গেছেন তো?'

কমানো লণ্ঠনের আলোয় ছায়া-ছায়া এক টুকরো মুখ। এক খণ্ড স্বপ্নের মতো।

বিকাশ আচ্ছন্নভাবে বললে, 'রোজই তুমি এসে দেখে যাও বুঝি?'

'যাই-ই তো। আপনার মতো মানুষকে বিশ্বাস করতে আছে?'—সুনু মশারি ফেলে গুঁজে দিতে লাগল। তারপর এক সময় বিকাশের মুখের কাছে মাথাটা নুয়ে এল তার, চুলের গন্ধ এল, নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগল গালে।

সুনু প্রায় বাতাসের সঙ্গে গলা মিশিয়ে বললে, 'এখান থেকে চলেই যান বিকাশদা—একেবারে ভুলে যান আমাদের।'

এক সেকেণ্ড — দু সেকেণ্ড চুপ করে রইল বিকাশ। তারপর—অসুস্থ মনীষার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, একান্ত কৃতজ্ঞের মতো আবিষ্ট ঝাপসা স্বরে বললে, 'তোমাকে ভুলব না সুনু, তোমাকে ভোলা যায় না।'

(ক্রমশ)

গ্রহান্তর অভিযানে একটি অভিনব সাফল্য

সৌর পরিবারে আমাদের আবাসভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আছে যে গ্রহটি এবং কবি যাকে বলেছেন 'সূর্য-বন্দনার প্রদক্ষিণপথে, তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,' আমাদের অতি পরিচিত সেই প্রভাতের 'শুকতারা,' সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যাতারা' বা শুক্রগ্রহের বুকে গত ১৬ ও ১৭ মে ধীরে ধীরে অবতরণ করেছে চার মাস আগে ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত সোভিয়েত রাশিয়ার ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬ মহাকাশযান। পৃথিবী থেকে প্রায় পনের কোটি মাইল বা ২৪ কোটি কিলোমিটার দূরবর্তী শুক্রগ্রহে মানুষের হাতে তৈরী মহাকাশ-যানের অক্ষতভাবে অবতরণ এই প্রথম। অবশ্য এর আগে কয়েকটি মহাকাশযান শুক্রের দিকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, আবার কেউ বা শুক্রের মাটি স্পর্শ করে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেরিনার-৫কে শুক্র অভিমুখে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেটি যে কিভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মহাকাশের কোন্ দিকে চলে গেছে তার কোনো হদিশ বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত দিতে পারেন নি। ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়া আর একটি মহাকাশযান শুক্রের বুকে নামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেটি কোনো বেতার-সংকেত পাঠাতে পারে নি।

মহাকাশ অভিযানে ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬এর এই সাফল্য এক বিস্ময়কর অবদান বলে পরিগণিত হবে। মাসের পর মাস মহাকাশের মধ্য দিয়ে ছুটে যাবার সময় এই দুটি যান নানা বার্তা পাঠিয়েছে। চার মাসে ভেনাস-৫এর সঙ্গে ৭৩ বার এবং ভেনাস-৬এর সঙ্গে ৬৩ বার বেতারে বার্তার আদানপ্রদান চলেছিল। একবারও কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে নি।

এতদিন শুক্রগ্রহ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। কিন্তু ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬ শুক্রের বাষ্পমণ্ডলের মধ্য দিয়ে নামবার কালে এক ঘণ্টা ধরে তার রাসায়নিক গঠন, বাষ্পের চাপ ও ঘনত্ব সম্পর্কে বার্তা পাঠিয়েছে। এসব বার্তা থেকে জানা গেছে, তার বাষ্পমণ্ডলের তাপমাত্রা ২৫০ ডিগ্রী থেকে ৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। গাঢ় বাষ্প-পুঞ্জ এই গ্রহকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে সূর্যের আলোও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। আর সেজন্যেই শুক্রের টেলিভিশন ছবি তোলার সম্ভাবনাও নেই।

ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬ প্রেরিত বার্তা থেকে একথাও জানা গেছে, পৃথিবীতে জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, শুক্রে তা থাকতে পারে না। কিন্তু সিলিকনভিত্তিক জীবন থাকতেও পারে বলে কোনো কোনো বিজ্ঞানী অনুমান করছেন। অবশ্য এটা তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরও জানা গেছে, শুক্রের বাষ্পমণ্ডলের চাপ হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ২০ গুণ। পৃথিবীর চতুর্দিকে যে বিকিরণ বলয় রয়েছে, শুক্রে তেমন কিছু নেই। পৃথিবীর মতো তার কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রও নেই।

ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬এর বিস্ময়কর সাফল্যে স্বভাবতই মনে হতে পারে, শুক্র-গ্রহের বুকে কোনোদিন হয়তো মানুষ পদার্পণ করবে। কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬ প্রেরিত তথ্য বিশ্লেষণ করে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—আমরা, আমাদের পুত্র, পৌত্ররা, এমনকি ভাবীকালের কোনো মানবগোষ্ঠীই কোনোদিন শুক্রের বুকে পা ফেলতে পারবে না।

বিজ্ঞান মেলা

দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা গড়ে না উঠলে আজকের যুগে কোনো দেশের পক্ষেই প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। একারণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের কথা প্রচার ও প্রসারের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের উদ্যোগে ১০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ২ মে কলকাতা শহরে এই উদ্দেশ্যে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি আকর্ষণীয় বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। গত ২ মে বিড়লা সংগ্রহশালার প্রাঙ্গণে এই বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার ৫৯টি স্কুলের (দুটি হবি সেন্টার সমেত) ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান মেলায় তাদের নিজের হাতে তৈরী বৈজ্ঞানিক মডেল প্রদর্শন করে। বাংলা, এমনকি বিহারের সুদূর গ্রামাঞ্চলের ৩৭টি স্কুল মেলায় যোগদান করে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কে ৪০০টি মডেল প্রদর্শিত হয়। এইসব মডেলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পুরুলিয়ার ছাত্রদের তৈরী সাঁওতালডিহি কয়লা পরিশোধনাগারের মডেল, তমলুকের ছাত্রদের হলদিয়া বন্দরের মডেল, রায়গঞ্জ ছাত্রদের ফারাক্কা প্রকল্পের মডেল, বাঁকুড়ার ছাত্রদের কংসাবতী প্রকল্পের মডেল, কাটোয়ার ছাত্রদের মেরিনার-৪এর মডেল এবং ভাগলপুরের ছাত্রদের তৈরী অ্যাপোলো-৮এর মহাকাশচারীদের পোশাকের মডেল।

ছাত্রদের তৈরী এই মডেল প্রদর্শনীর সঙ্গে সংগ্রহশালার তিনটি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে ছিল। এই ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীগুলি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রদর্শন করা হয়। বিশেষভাবে নির্মিত তিনটি বাসে এই প্রদর্শনীগুলি সাজানো হয়েছে। তিনটি বাসের মধ্যে একটিতে ছিল 'কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি' সম্পর্কে ২৪টি চালু মডেলের প্রদর্শনী, আর একটিতে ছিল 'আমাদের পরিচিত বিদ্যুৎ' সম্পর্কে চালু মডেলের প্রদর্শনী এবং তৃতীয়টিতে ছিল 'আলো ও দৃষ্টি' সম্পর্কে চালু মডেলের প্রদর্শনী। এই ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে শুনলাম, বিভিন্ন জেলায় এই ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীগুলি নিয়ে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

এই বিজ্ঞান মেলার একাংশে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ বিভাগও ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার সহযোগিতায় এটি আয়োজিত হয়। এছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ক চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন দিনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণ করেন ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ [illegible] রায়, শ্রী[illegible]

রায়, শ্রীরতনলাল ব্রহ্মচারী, ডঃ রাধাকান্ত মণ্ডল এবং শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী।

পক্ষকালব্যাপী এই বিজ্ঞান মেলা দেখতে বহু ছাত্রছাত্রী এবং সমাজের সর্বস্তরের লোক এসেছিলেন। এতবড় বিজ্ঞান মেলা এর আগে কলকাতায় আয়োজিত হয় নি এবং গ্রামাঞ্চলের এত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মডেল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নি। অবশ্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান এবং 'সায়েন্স ফর চিলড্রেন' সংস্থা এর আগে এই ধরনের মডেল প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছেন।

গত ১৫ মে বিজ্ঞান মেলার শেষদিনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মডেল প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়। প্রথম পুরস্কার লাভ করে বাঁকুড়া জেলার অমরকানন দেশবন্ধু উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান কল্যাণব্রত সিকদার এবং জেলাভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পুরস্কারও লাভ করে বাঁকুড়া জেলা।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যে বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায় এই বিজ্ঞান মেলা আয়োজন সত্যই প্রশংসনীয়। আমরা এই মেলা দেখে পরম আনন্দিত হয়েছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ, শুধু শহরাঞ্চলে নয় গ্রামাঞ্চলেও তাঁরা এই ধরনের বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞানচেতনা জাগিয়ে তুলুন। দেশের প্রগতি ও সমৃদ্ধি তাতে ত্বরান্বিত হবে নিঃসন্দেহে।

মহাকাশ গবেষণা ও সাধারণ মানুষ

অ্যাপোলো-৮এর অভূতপূর্ব সাফল্যে সকলে বিমুগ্ধ হলেও নানা মহল থেকে আজ প্রশ্ন উঠেছে—সাধারণ মানুষের কাছে এই বিরাট ব্যয়বহুল অভিযানের তাৎপর্য কতটুকু। প্রশ্ন উঠেছে—আজ যখন পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে জর্জরিত, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করছে তখন পৃথিবীর সমস্যায় অর্থ ব্যয় না করে গ্রহান্তর অভিযানের জন্যে এত বিরাট অর্থ ব্যয় করার সার্থকতা কোথায়? সম্প্রতি কলকাতায় আগত বিশিষ্ট মার্কিন মহাকাশ-বিজ্ঞানী ডঃ কার্ট আর স্টেলিং-এর কাছে এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া গেল। ডঃ স্টেলিং কলকাতায় এসে সাহা ইনস্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ এবং রামকৃষ্ণ ইনস্টিট্যুট অফ কালচার-এ 'মহাকাশ অভিযানের ব্যবহারিক প্রয়োগ' এবং 'মানুষের কাছে মহাকাশ গবেষণার তাৎপর্য' সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তাঁর এই আলোচনা শুনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জানতে পেরেছি।

মহাকাশ অভিযানে জীবনধারণের জন্যে মহাকাশচারীরা যে খাদ্য গ্রহণ করেন তা বিশেষ ধরনের। কারণ পৃথিবীতে আমরা

শ্রীকল্যাণব্রত সিকদার বিজ্ঞান মেলার মডেল প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার বিজয়ী।
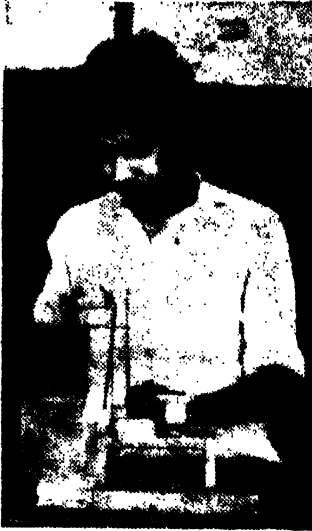
যেসব খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত সেসব খাদ্য মহাকাশযানে প্রস্তুত করা সম্ভব নয় এবং তার উপকরণও লভ্য নয়। মহাকাশ অভিযানে যেসব বিকল্প খাদ্য গ্রহণ করা হয় তা বিশেষ বিশেষ উপকরণে প্রস্তুত অথচ তার খাদ্যমূল্য আমাদের স্বাভাবিক খাদ্যের মতোই। আজ পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতে যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে তা অনেকাংশে পূরণ করা যেতে পারে এই ধরনের বিকল্প খাদ্যের দ্বারা। মহাকাশ গবেষণার অনুষঙ্গ হিসাবে এই বিষয়টি আজ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এই সব বিকল্প খাদ্য যেদিন সাধারণ মানুষের কাছে সুলভে এসে পৌঁছবে, তখন পৃথিবীর মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তার অনেকাংশ কীটপতঙ্গের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায় এবং অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রত্যাশিত পরিমাণ ফসলও অনেক সময় পাওয়া যায় না। মহাকাশ অভিযানে ব্যবহৃত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান হতে পারে। সম্প্রতি অ্যাপোলো-৯ মহাকাশ অভিযানে এই উদ্দেশ্যে সমীক্ষা চালানো হয়। এর ফলে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর ক্ষেত-খামার ও শস্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ভবিষ্যতে এমন সব উপগ্রহ তৈরী হবে যার সাহায্যে পৃথিবীর সম্পদের পরিমাপ করা যাবে। এসব উপগ্রহের সাহায্যে অনাবৃষ্টি, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, শস্যের অবস্থা আগে থেকেই জানা যাবে।

ডঃ স্টেলিং আরও বলেন, পৃথিবী প্রদক্ষিণরত যন্ত্রপাতি সম্বলিত উপগ্রহসমূহ সমুদ্রতলে লুক্কায়িত খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ এবং ভূতলস্থ ধাতব পদার্থ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান দিচ্ছে। পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, নদী-মোহনা, শস্যসমৃদ্ধ ভূমির নিখুঁত পরিচয় কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্রের মাধ্যমে পাওয়া গেছে।

এছাড়া, আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী উপগ্রহসমূহ যেসব তথ্যের সন্ধান দিয়েছে তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ঝড়-জল, বন্যা সম্পর্কে বহু আগে থেকেই জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব হবে। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলে বেতার যোগাযোগ ও টেলিভিশনসূচী প্রচার করা সম্ভব হবে।

মহাকাশ পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ভেষজ ও জীব এবং আবহ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। সাধারণ মানুষের কল্যাণকর আরও নানা সম্ভাবনার চাবিকাঠি মহাকাশ গবেষণার ভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে সে সব সম্ভাবনার কথা আমরা হয়তো শুনতে ও জানতে পারব।

রোগ প্রতিরোধক অণু গামা গ্লোবিউলিন

দেহকোষের যেসব অণু রোগ প্রতিরোধ করে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ইমিউনো গ্লোবিউলিন বা গামা গ্লোবিউলিন। সম্প্রতি রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জেরাল্ড এম ইডেলম্যান এই অণুটি সম্পর্কে বহু নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং এদের সম্পূর্ণ গঠনপ্রণালী নিরূপণ করেছেন।

দেহ যখন কোনো ভাইরাস বা রোগ-বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন দেহে ইমিউনো গ্লোবিউলিন নামে প্রোটিন উৎপন্ন হয় এবং ঐ সমস্ত বহিরাগত আক্রমণকারীদের ধ্বংস করে ফেলে। আজ পর্যন্ত যত প্রোটিন অণুকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে ইমিউনো গ্লোবিউলিন। এতে আছে ১৯ হাজার ৯৯৬টি পরমাণু।

ভবিষ্যতে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান, দেহের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলায় ডাঃ ইডেলম্যানের গবেষণা খুবই সহায়ক হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এমন কি, অনেকে বলেছেন ক্যানসার রোগ নিয়ন্ত্রণেও এই গবেষণা সহায়ক হতে পারে।

দেহের কোনো অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া এবং তা সরিয়ে অন্য দেহ থেকে সেই অঙ্গটির সুষ্ঠু সংযোজন সম্পর্কে ডাঃ ইডেলম্যানের এই নতুন আবিষ্কার বিশেষ আলোকপাত করবে এবং তার ফলে সমগ্র মানবজাতি লাভবান হতে পারবে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া মিছিল

বীরু চট্টোপাধ্যায়

আচ্ছা, এ পৃথিবীতে সংঘটিত হওয়া বিরাট বিরাট এবং ভয়ংকর ঘটনাসমূহ কি ঐ একবারের মত মূর্ত হয়ে কালের গর্ভে চিরকালের মত বিলীন হয়ে যায়? অর্থাৎ ঐতিহাসিক রোম নগরীর প্রখ্যাত অগ্নি-কান্ড, বা সানফ্রানসিসকোর প্রচন্ডতম ভূমি-কম্প, বা স্পেনীয় আর্মাডা বিজয়, কিংবা সাম্প্রতিক নাগাশাকি-হিরোশিমার বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমা বর্ষণ অথবা মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়া রকেটসহ কৃত্রিম উপগ্রহগুলির যাত্রা প্রভৃতি অদ্ভুত ক্রিয়াকান্ড এ সবই কি ঐ একটিবার মাত্র সংঘটিত হয়ে অবশেষে কালের করালগর্ভে চিরবিলীন হয়ে যায়; না কি, প্রকৃতির কোথাও, মানুষের জ্ঞান-সীমার বাইরে, বা বায়ুমন্ডলের কোন অজ্ঞাত স্তরে, কিংবা শব্দ-তরঙ্গের কোন রহস্যময় অভ্যান্তরে ঐ সব অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত বা সুপ্ত থেকে যায় অনন্ত কাল? অতঃপর নানা সময়ে অকস্মাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে উক্ত রোমহর্ষক ও জমকালো ঘটনাসমূহ পুনরায় দৃশ্যমান হয়ে, মূর্ত হয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলে?

এ প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে দুটি কারণে। প্রথমটি হল: প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন তাঁর শেষ জীবনে এমন একটি গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী থেকে অতীতে এমন কী শতাব্দীকাল অতীতে পাঠানো শব্দাবলীকে বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটো-স্ফিয়ার শব্দ তরঙ্গ থেকে পুনরায় ধরে আনা যায় কিনা তা দেখতে।

দ্বিতীয় ঘটনা হল: ইংলন্ডে বিগত তিন শতাব্দী পূর্বে শত শত মানুষ এমন কতগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যেগুলোকে যদি অলৌকিক ঘটনা বলে সরিয়ে না রাখি তো তাকে সংঘটিত ঘটনার পুনরাবর্তন বলেই মানতে হয়।

অদ্ভুত ব্যাপারটি ঘটেছিল ১৬৪২ খৃঃ শেষাশেষি ইংলন্ডের ওয়ারউইকশায়রের অন্তর্গত কিনেটন নামক ছোট্ট শহরে।

সে বছরের ক্রিসমাস অতি ঝামেলায় গিয়েছে। কারুর মনে সুখ শান্তি ছিল না। ইংল্যান্ড তখন সিভিল-ওয়ারে পর্যুদস্ত। দু মাস আগে এই কিনেটন-এর পাশেই এজহিল উপত্যকায় রয়েলিস্ট সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আর্ল অব এসেক্সের সমর্থকদের তুমুল লড়াই হয়ে গেছে, নৃশংস বন্য লড়াই।

ফলে উক্ত শহর কামানের গোলা এবং বন্দুকের গুলীতে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুদ্ধের সময় যা হোক শহরের অধিবাসীরা দরজা-জানালা বন্ধ করে সে ঝামেলা সহ্য করেছে। কিন্তু প্রকৃত ভয়ঙ্কর ঝামেলা এবং উৎপাত শুরু হল পরবর্তী সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে।

ভীত সন্ত্রস্ত শহরের অধিবাসীদের মনে হল 'সময়' বুঝি একেবারে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে উক্ত বিবদমান দুটি সৈন্যদলের কাছে।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি অক্সফোর্ডে রাজা প্রথম চার্লস-এর কোর্টে এ সংবাদ পৌঁছল যে "ওয়ারউইকশায়ারে মানুষজনের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্কের সাংঘাতিক প্রাদুর্ভাব হয়েছে।" বিশেষ করে কিনেটন এবং তারই আশেপাশে ভয়াবহ গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে যুদ্ধের পরে যুদ্ধ সক্রান্ত অদ্ভুত ঘটনা একই ধাঁচে ঘটে চলেছে। রহস্যময় অবিশ্বাস্য ঘটনা।

রাজা চার্লস দেখলেন যে, এতে করে অসামরিক জনসাধারণের মনোবল সাংঘাতিক-ভাবে ভেঙে পড়ছে। এই গৃহযুদ্ধের ঝামেলার সময় সাধারণ মানুষকে অবশ্যই 'নিরপেক্ষ' রাখতে হবে, অন্ততঃ শারীরিক দিক থেকে। রাজার অভিমত হল যদি সাধারণ মানুষকে তার নিজস্ব কাজ কারবার দিয়ে সুখী সংসারী ও তৃপ্ত করে রাখা যায়, তাহলেই তারা সর্বতোভাবে রাজার বাধ্য প্রজা হয়ে, রাজাকেই তাদের ধনজনমান ও আইন-এর রক্ষক হিসেবে ভেবে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে। এবং তারা তখন ঐ আর্ল অব এসেক্সকে শান্তিভঙ্গকারী ভেবে ঘৃণা করতে শুরু করবে, অতএব........

রাজা তাঁর বিশ্বস্ত দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ডেকে অবিলম্বে কিনেটন গিয়ে এ বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত করতে আদেশ দিলেন। ঐখানে ঐ যারা গুজব রটাচ্ছে, তাদের ধরে ধরে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, অগ্নিচক্ষু নৃপতি কড়া আদেশ দিলেন, আর, যে কোন উপায়েই হোক ঐ অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতেই হবে।........

১৬৪৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসের প্রথম শনিবার দিন কর্ণেল লুইস কার্ক এবং ক্যাপ্টেন ডাডলি ওয়ারউইকশায়ারের সীমান্ত পেরিয়ে সন্ধ্যার পর গিয়ে উপস্থিত হলেন কিনেটন শহরে। শহরের রাস্তাঘাট সন্ধ্যা-রাত্রেই জনমানবহীন, ওরা দুজন অশ্বারোহণে খটখটাখট শব্দে শহরের রাস্তা দিয়ে ঘুরতে লাগলেন।

দরজা আঁটা, জানালা বন্ধ, অনেক বাড়ি আবার মনে হল জনমানবহীন পরিত্যক্ত। দেয়ালে দরজায় খড়ি দিয়ে ধর্মীয় চিহ্নাদি এবং বাইবেলের বিভিন্ন লাইন লিখে রাখা হয়েছে। চতুর্দিকেই তাঁরা দেখলেন ভয় আতঙ্কের থরথর চেহারা।

এজহিল উপত্যকার নিকটে শহরের এক প্রান্তের একটি সরাইখানায় ওঁরা রাত্রি বাস করবেন স্থির করলেন। সরাইখানায় আর কোন অতিথি ছিল না। তাই মালিক রিচার্ড নোয়েকস এবং তার স্ত্রী ওঁদের পেয়ে প্রকৃতই খুশী হল, স্বস্তি পেল।

নৈশ আহারের পর সহসা জোরে জোরে বাতাস বইতে শুরু হল। প্রবল বাতাস। সে শোঁ শোঁ বাতাস রাস্তা দিয়ে বয়ে যাবার মুখে দরজা জানালা কাঁপিয়ে খটাখট শব্দে চিমনিসমূহের মধ্য দিয়ে গোঁ গোঁ ধ্বনি করে বয়ে যেতে লাগলো। আর কোন খদ্দের সরাইখানায় এল না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল যে নোয়েকস দম্পতি যেন প্রতি মুহূর্তেই আরো বেশী নার্ভাস হয়ে যেতে থাকল।

—কি ব্যাপার বলুন তো মালিকমশায়? কর্ণেল জিগ্যেস করেন, ঐ জঘন্য গুজবের জন্যেই বুঝি আপনারা ঘাবড়ে যাচ্ছেন?

মালিক এগিয়ে এল কাছে, বললে, না না ওসব মোটেই গুজব নয় স্যার। নির্ভেজাল সত্যি কথা। এ শহরে আমি চল্লিশ বছর সুখে শান্তিতে বাস করছি, কিন্তু আজ কদিন ধরে আমাদের দিন রাত্রে ... বন্ধু নেই, মনে শান্তি নেই।

মালিকের স্ত্রীও ঘরের অপর কোণ থেকে ওঁদের কাছে এগিয়ে এল, হাত ঊর্ধ্বে তুলে বললে, এদেশে ঐ শয়তানীর লড়াইর জন্যে ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নিতে ছেয়ে গেছে এ অঞ্চল। এ গাঁর্জাণ্ডল অভিশপ্ত।

অফিসারদ্বয় ওদের কাছ থেকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানতে চাইলেন, কিন্তু এই দম্পতি ঐ 'ভুতুড়ে' ব্যাপারে এতই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল যে তাদের মুখ থেকে টানা কোন কাহিনী পাওয়া গেল না। শুধু তারা ছাড়া-ছাড়া বললে, "ভয়ঙ্কর শব্দ", "জলাভূমি, উপত্যকার উপর দিয়ে মৃত মানুষেরা মার্চ করে যায়"...........এই ধরনের খাপছাড়া সব কথা।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ ধপ করে সেই শোঁ শোঁ বাতাস একেবারে থেমে গেল। ব্যাপারটা বড়ই অস্বাভাবিক মনে হল। এক মুহূর্তে চারিদিক যেন মৃতের মত নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

—এবারে আরম্ভ হবে, ভীত সন্ত্রস্ত
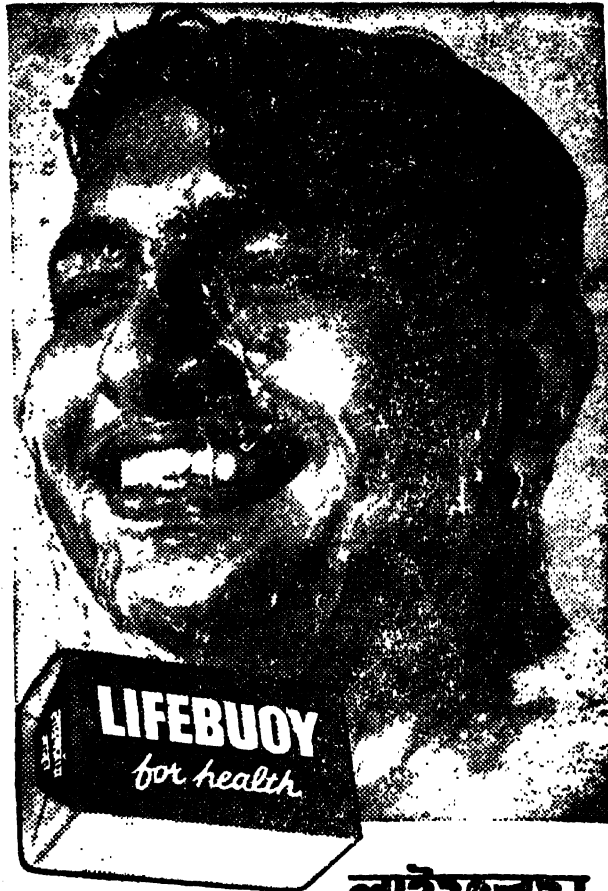
ফিসফিসে কণ্ঠে নোয়েক্স দম্পতি বলে ওঠে, এবারে ওরা আসছে!

কর্ণেল উঠে গটগট করে জানালার কাছে গিয়ে একদিকের খড়খড়ি তুলে দিল। বাইরে রাস্তায় বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে এদিক ওদিক। চতুর্দিকে একটা অলৌকিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

বেশ কয়েক মিনিট সবাইকে অপেক্ষা করতে হল। তার পর রাত্রির সেই অসহনীয় নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে মৃদু, প্রচ্ছন্ন নির্ভুল একটা চেনা আওয়াজ দূরে থেকে ভেসে আসতে লাগলো।

কর্ণেলএর সারা শরীর শক্ত হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। দাঁতে দাঁত চেপে কর্ণেল বলে ওঠে আরে! গ্রেট মি! এযে........এযে স্পষ্ট বিউগোলএর আওয়াজ। ডার্লিং, শুনতে পাচ্ছ?

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ধীর পায়ে উপরওয়ালা অফিসারের কাছে এগিয়ে যায়।

আবার সেই ধ্বনি শোনা গেল। নোয়েক্স দম্পতি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

মালিক বললে, ঐ, ঐ রাজার সৈন্যরা আসছে, আর্তকণ্ঠ কেঁপে কেঁপে ওঠে তার. রাজার সৈন্যরা রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

—সেকি! না না এ অসম্ভব কথা, ক্যাপ্টেন প্রতিবাদ করে ওঠে, এখানকার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেও কোন সৈন্য-বাহিনী নেই।

সরাই মালিক যেন নিজ মনেই বলে যায়, আজ নিয়ে চারদিন চারদিন ধরে একই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

পর পর অনেক বিউগলধ্বনি হতে লাগলো, প্রতিটি ধ্বনি যেন ক্রমশই নিকটবর্তী হচ্ছে। এরপর যে শব্দটি শোনা গেল সেটা যেন আরও বিস্ময়কর। অশ্বের হ্রেসাধ্বনি ......ড্রামের বাজনা .....খটখটাখট মার্চকালীন বুটের আওয়াজ!........

—এক রকম, রোজই হুবহু একরকম শব্দ পর পর, নোয়াকস অস্ফুটে বলে ওঠে, ঠিক যুদ্ধের প্রথম দিনে যেভাবে শোনা গিয়েছিল শব্দগুলি.....ঠিক তেমনি পর পর একই আওয়াজ হয়ে চলেছে রাতের পর রাত। প্রথমে বিউগল......পরে ঘোড়ার চিৎকার...ড্রাম ..শেষে মার্চ...

অফিসারদ্বয় কোমরে তরোয়ালের বাকল্‌স পরে নিয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁরা যখন ঘোড়ার ওপরে উঠছেন তখন কানে এল শহরতলী থেকে বজ্রধ্বনির মত আওয়াজ।

ক্যাপ্টেন বিরক্তি ভরে আকাশ পানে তাকালেন।

আশ্চর্য...অদ্ভুত! মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই বজ্রধ্বনি......।

—উঁহু ক্যাপ্টেন! পেছনে নারীকণ্ঠ শুনে ও'রা তাকিয়ে দেখলেন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মিসেস নোয়াকস। তার দৃষ্টি শহরতলীর পানে। গুরু গুরু ধ্বনি বেড়ে গেছে, কিন্তু মহিলাটির মধ্যে বেশ প্রশান্তভাবই লক্ষ্য করা গেল।

—ওটা বজ্রের আওয়াজ নয়, মিসেস ভয়ে বসা গলায় বলে ওঠে ওটা কামানের গোলার শব্দ......রাজার কামান .....!

দুজনে মহিলার পানে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। অজ্ঞাতে ক্যাপ্টেনের সর্ব অঙ্গ দিয়ে একটা মৃদু কম্পন বয়ে গেল।

কর্ণেল সহসা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, অল রাইট! কানে যা শুনেছি, সেটা চোখে আমরা দেখতে চাই।

বলে সেই অন্ধকারে দুজন অশ্বারোহী অফিসার খটাখট ধ্বনিসহকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এজহিল-এ অনুষ্ঠিত লড়াই-এর পাক্কা বাহাত্তর দিন বাদে......যখন আশে-পাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন রাজকীয় সৈন্য-দল নেই... ..সে সময় রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উঠছে কামানের গুরু গুরু ধ্বনি। স্থানীয় লোকেরা সভয়ে জানাচ্ছে— আজ নিয়ে চারদিন ধরে এরকম ঘটনা ঘটে চলেছে......... ..

তিন শতাব্দী পেছনে তাকিয়ে আমরা এই মানুষগুলির ভয়ের কারণ প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পারি। সময় বুঝি থেমে গিয়েছিল। লাইন কাটা ভাঙা রেকর্ডের মত একই ঘটনা বার বার যেন ঘটে যাচ্ছিল।

কর্ণেল আর ক্যাপ্টেন ও'রা দুজন কট্টর সৈনিক। দেহ মন লৌহ দিয়ে গড়া। এ সব সস্তা কুসংস্কার ও'দের অন্তরের কাছাকাছি ঘেঁষতে সাহস পায় না। ওরা কোন ভয়েই ভীত হন না। সে রাতে ও'রা এ সব ব্যাপারের একটা ফয়সলা করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়েই প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হলেন। চন্দ্রালোকে দুজন মাইলখানেক দূরের উক্ত রণাঙ্গনের অভিমুখে যেতে লাগলেন। সরাই-খানায় বসে যে সব বিচিত্র ও অদ্ভুত ধ্বনি শুনেছেন তার রহস্য অবশ্যই উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন।

এ রণপ্রান্তর ও'দের দুজনেরই অতি পরিচিত স্থান। কেননা ও'রা দুজনেই বিগত যুদ্ধে এখানে এসে লড়ে গেছেন। ও'রা ভাবলো হয়ত বা কোন গোপন বিদ্রোহী দল এখনো এ অঞ্চলে রয়ে গেছে কিংবা এগুলো হয়ত স্থানীয় দুষ্টপ্রকৃতির কিছু রাজ-সমর্থক চাষীদের অপকৌশল।

ভেবে দেখুন তাদের মানসিক অবস্থা, যখন তাঁরা সেই ফাঁকা ফ্যাকাজ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরে গিয়ে স্বকর্ণে শুনতে লাগলেন ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলির আওয়াজ। এর চেয়ে ভয়াবহ বিস্ময়কর ব্যাপার কিছু পরেই হল। যুদ্ধের জন্যে নিখুঁতভাবে অনুশীলিত তাঁদের ঘোড়াগুলো সহসা নিদারুণ ভয় পেয়ে, সাংঘাতিক ভড়কে গেল। বিকট চিৎকার করে আচমকা ঘোড়াটা এমনভাবে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো দুপায়ে যে ক্যাপ্টেন ডাডলে ছিটকে পড়ে গেলেন মাটিতে। অপর-দিকে শাসন না মেনে কর্ণেলএর ঘোড়াটা চোঁচাঁ দৌড় দিল জলাভূমির ওপর দিয়ে পড়িমড়ি করে।

এইভাবে অফিসার দুজন সেই প্রান্তরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। সাময়িকভাবে ও'দের ওখানেই রেখে আমরা আবার সরাই-খানায় ফিরে যাই........

সরাইখানার দরজা-জানালা বন্ধ করে মালিক নোয়াকস ও তার স্ত্রী ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে ফায়ার প্লেসের উত্তাপের কাছে চুপচাপ বসেছিল। কানে আসছিল সেই বিচিত্র রণধ্বনি অতীতের কবর থেকে উঠে আসা সেই অলৌকিক আওয়াজ।

মধ্যরাত্রি যত এগিয়ে আসতে লাগলো, ভয়ংকর কানফাটা সোরগোল যেন শীর্ষ-সীমায় পৌঁছল। এতাবৎ শোনা ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হল আহত মানুষের করুণ আর্তনাদ, কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করা অফিসারদের আদেশ নির্দেশ, অশ্বারোহী সেনাদের সশব্দ আক্রমণ, আর বর্মপরা সৈন্যদের হাতাহাতি লড়াইয়ে ঠুংঠাং লৌহ-আওয়াজ। প্রকৃত যুদ্ধের দিনে যেমন হয়েছিল, তেমনি ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ একবার এগোচ্ছিল একবার দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

এরপর এক সময় সমস্ত রকম আওয়াজ কমে আসতে লাগলো। শহর থেকে যেন সে শব্দলহরী দূরে চলে যাচ্ছে। এক সময় সব কিছু দূরে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার শুরু হল........

রাত একটার সময় সরাইখানার দম্পতির কানে এল জনৈক অশ্বারোহী যেন খটখটিয়ে এসে তাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে থেমে পড়ল। জানালার খড়খড়ি তুলে উঁকি দিয়ে দেখবার মত সাহসও তখন দুজনের দেহে অবশিষ্ট নেই। অথর্বের মত নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওরা অপেক্ষা করতে লাগলো।

উঠোনের পাথরে অস্ফুট পদক্ষেপ সম্বেগে এগিয়ে এল দরজার কাছে, তারপর দরজায় প্রবল করাঘাতের শব্দ......শুধু এই ভীত সন্ত্রস্ত দম্পতি বসার আসন ছেড়ে নড়ল না। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দরজার পানে তাকিয়ে রইল।

—সোয়াকস! সোয়াকস! শুনতে পাচ্ছ না, কানের মাথা খেয়েছ নাকি! শিগ্গির দরজা খোল।

কর্ণেলের নির্ভুল কণ্ঠস্বর! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো ওদের। স্বস্তি এল মনে। সরাই মালিক এবার উঠে গিয়ে হুড়কো নামিয়ে দরজা খুলে দিলে।

হুড়মুড় করে কর্ণেল এসে ঘরে ঢুকে পড়লেন উদ্ভ্রান্তের মত...বিকটভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে তাঁর, দৃষ্টি কাঁচের মত ফ্যাকাসে, অর্থহীন।

—ক্যাপ্টেন ডাডলে কোথায়...?

—তিনি তো ফিরে আসেননি স্যার...।

অফিসার সামনের চেয়ারে বসে পড়ে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। বহুক্ষণ তাঁর মুখে কোন কথা ফুটলো না। অতঃপর যেন স্বগতোক্তি করছেন এমনিভাবে বলে গেলেন কাহিনীটা, কিভাবে তিনি প্রান্তরে গেলেন এবং কিভাবে দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।

সোয়াকস ধীর পদে এগিয়ে এল কাছে এবং কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, আপনি...... আপনি দেখেছেন? ওদের আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন কি?

কর্ণেল মাথা তুললেন, তারপর ফায়ার প্লেস-এর আগুনের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পুনরায় যেন স্বগতোক্তি করলেন।

—অনুভব করেছি......দেখার বাড়া তা, শুনেছি সব।

তিনি বলে গেলেন, আমার চারদিকে ওরা ঘুরেছে ফিরেছে, যেন লড়াই করেছে...... এবং আসল দিন আমি যেভাবে আক্রমণ পুনরাক্রমণ করেছিলাম ঠিক তার পুনরাভিনয় যেন হতে দেখলাম। শত্রুদের হটিয়ে দিতে দিতে যে যে অর্ডার আমি দিয়েছিলাম, হুবহু সেই সব শুনলাম.........

বলতে বলতে বারেক সর্বাঙ্গীন কেঁপে উঠলেন কর্ণেল, হাত অজ্ঞাতসারে চলে গেল তরোয়ালএর হ্যান্ডেল-এ।

—চাঁদ যখন ভালভাবে মাথার উপর উঠল, সেই জ্যোৎস্নায় আমি যেন ওদের লাইনবন্দী অবস্থায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ছায়ামূর্তিরা, ছায়া মিছিল করে চলেছে... বন্দুক ঝলসাচ্ছে......রাজকীয় পোষাক ভূষিত সৈন্যবাহিনী............

বলে সহসা কর্ণেল লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। টেবিলে প্রচন্ড একটি ঘুঁষি চালিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, না না এ হতে পারে না, এগুলো সব কল্পনা। মায়া প্রপঞ্চ। হতেই হবে। অবশ্যই হতে হবে। উঃ এটা ভাবা যাচ্ছে না, ওখানে গিয়ে কিনা......উঃ স্মৃতি যে কত চালাকিই খেলতে পারে মানুষের মনে......এ স্রেফ স্বপ্ন......... বাজে খোয়াব.........

সরাই-মালিকের স্ত্রী সাহসে এগিয়ে এসে বললে, আপনি বলছেন কি? এই সব বিচিত্র শব্দ, কামানের শব্দ এ সবই কি বলছেন নিছক কল্পনা? কি করে হতে পারে? ঐ শব্দ আপনি এখানে শুনে গিয়েছেন যাবার আগে এবং এখনো দূরে ক্ষীণভাবে আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? বলুন......বলুন স্যার?

এরপর তারা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্তব্ধ হয়ে। কানে আসতে লাগলো দূরাগত নানা বিচিত্র রণ-ধ্বনি......

সরাই মালিক নিজ মনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যেন প্রলাপ বকতে লাগলো, এটা ঈশ্বরের মর্জিতে হচ্ছে। বাপের বিরুদ্ধে ছেলে লড়ছে, ভাইএর বিরুদ্ধে ভাই......এই সব পাপের শাস্তি চলছে এই অঞ্চলে...হায়... হায়.........।

কর্ণেল গলা খাঁকারি দিলেন বিকৃত মুখে কিন্তু কোন কথা বললেন না।

অকস্মাৎ দরজায় পড়ল প্রবল করাঘাত। কর্ণেল এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

ক্যাপ্টেন ডাডলে যেন লাফিয়ে পড়লেন ঘরে। কি চেহারা হয়েছে। পোষাক ছিন্ন-ভিন্ন, এলোমেলো কাদামাখা বিপর্যস্ত।

ওরা তাকে ধরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে কিছু মদ্য পান করালেন।

আমি আমার ঘোড়াটিকে হারিয়েছি, হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যাপ্টেন বলে ওঠেন, বাধ্য হয়েছি হারাতে...সমস্ত পথটা ওদের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসতে হয়েছে, হ্যাঁ ওদের মধ্য দিয়ে।...

যুবক ক্যাপ্টেনের মুখাবয়ব এবং কম্পিত দেহ দেখে কর্ণেল তাঁকে শান্ত করবার মানসে বলে উঠলেন, ডাডলে, শোন বৎস, তোমার ডবল বয়েস আমার। আমি বলছি, শোন এটা স্রেফ কল্পনা, দৃষ্টিভ্রম, মতিভ্রম, এই দুষ্ট স্মৃতিই তোমাকে এবং আমাকে জ্বালাচ্ছে।

—না, না। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে ওঠেন, আমি, আমি ওদের মুখ দেখেছি...রাজকীয় সৈন্যদল...এমন কি শত্রুবাহিনীদেরও দেখেছি...।

কর্ণেল কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন, কক্ষনো না। তুমি কাউকে দেখোনি, স্রেফ কল্পনা করছ যে দেখেছো।

—আমি শপথ করে বলতে পারি আমি দেখেছি, ক্যাপ্টেন সজোরে মাথা নেড়ে বলেন, তাদের মধ্যে একজনকে তো খুবই স্পষ্টভাবে দেখেছি, যেমন এখন দেখছি আপনাকে, তেমনি।

কর্ণেল সহসা নীরব হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি এখনো স্বকর্ণে দূরাগত রণ-হুঙ্কারাদিসহ বিচিত্র গোলাগুলির ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। তবু মুখে প্রতিবাদ করে বললেন, এটা একটা অতি জঘন্য চক্রান্ত কামুর। আর্ল অব এসেক্সের মুখ খাওয়া কতগুলো বিশ্বাসঘাতক কল-মায়েস চাষীর কর্ম এগুলো। মৃতদের দেহ থেকে খুলে নেওয়া রাজকীয় ইউনিফর্ম পরে বেটারা......

—না, কর্ণেল, বাধা দিয়ে ক্যাপ্টেন বলে ওঠেন, ওরা কক্ষনো চাষীরা নয়। বলে ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়িয়ে কর্ণেলের একটা বাহু সজোরে চেপে ধরে ফের বলে ওঠেন, আমি একজন পুরনো বন্ধুকে দেখেছি। কে জানেন? সে হল স্যার এডমান্ড ভার্নি।

—ভার্নি...!

—হ্যাঁ কর্ণেল সে-ই। আপনার স্মরণ আছে নিশ্চয়ই যখন সে নিহত হয় আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলাম। দু-চোখের মাঝখানে গুলি খেয়ে সে মারা যায় সূর্যাস্তের সময়।...আমি স্বহস্তে তাকে সমাধি দিয়েছিলাম।...

এই হল কাহিনী। শুধু চার রাত নয় আরও তিন রাত এই ধরনের পুনরাভিনয় হয়েছে যুদ্ধের।

শুধু মাত্র এই দুজন সরকারী সৈনিকই নয়, বহু ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী, পাদ্রী, যাজক প্রভৃতি আরও বহু বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

এদের প্রত্যেকের স্বাক্ষরিত একটি রিপোর্ট প্রথম চার্লস সকাশে পেশ করা হল। অতঃপর বিষয় সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে রাজা শেষপর্যন্ত আর কাউকে শাস্তি-দানের ফর্মান দেননি।

রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। অনুদ্ঘাটিত অলৌকিক রহস্য।

সন্ধ্যার সূর্যেও ॥

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

৩

অবাধ উড়াল পাখা মেলে দাও তোমরা আকাশে,
তোমরা কোন পাখি?
আমি তৃষ্ণার্ত, উন্মুখ
দেখেছি উৎসের মুখ
শিলায় আবৃত।
কোনোখানে আলো নেই; বোবা কান্না

গান হয় না;
হাওয়া স্তব্ধ; আমি আঁধারের বাহুতে বিলগ্ন;
বুকে তোলপাড়;
দেখি ভোরের সূর্যের নগ্ন
আলোতে ঝলমলো একটি মুখ;
সেই মুখ সন্ধ্যার সূর্যেও।
বুকের নির্জনে মন্ত্র পড়ি: রক্তের বুদ্বুদে
আজো অবিরাম ধ্বনি, প্রতিধ্বনি।

সংঘর্ষে রক্তাক্ত আমি, ভয় পাইনি, ভয়
ঘৃণা, হিংসা, প্রেম
বড়ো কাছাকাছি; কানামাছি খেলেছি আজীবন;
কে তোমরা উড়াল পাখায়
দৃশ্য থেকে অদৃশ্য আঁধারে চলে যাও!
তোমরা কোন পাখি?
তোমরা কি পাখি?
আমি তৃষ্ণার্ত, উন্মুখ
দেখেছি উৎসের মুখ
শিলায় আবৃত।
কোনোখানে আলো নেই; বোবা কান্না

গান হয় না। রক্তের বুদ্বুদে
আজো অবিরাম ধ্বনি, প্রতিধ্বনি।

জননী ॥ শান্তনু দাস

যা লিখি তোমার নামে:

প্রহরে, প্রহর, দুঃস্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে...
ঘন্টা বাজে; শিরায় শিরায় ধ্বনি, লাভাস্রোত অন্তর্গত
কোষের ভেতরে...
জ্বলন্ত চুল্লীর মতো জ্বলে।
উরু থেকে নাভিকুণ্ড অগ্নির প্রবাহে
হৃদয় আঙরা হয়ে ওঠে।
তবুও তোমার নামে দু' হাতে জ্যোৎস্না মাখি বুকে
রক্তজবা কুসুমসংকাশ
অন্ধকার গর্ভ থেকে জন্ম নেয় আরেক সকাল

স্মৃতিগুলি শব্দহীন নুলিয়ার মতো, ডোবে আর ওঠে।
কখনো সাগর
হামাগুড়ি দিয়ে আসে, দূরে সরে যায়
পাটাতনে চিৎ হয়ে একা আমি একান্ত নাবিক
শাণিত ফলার মতো রোদ্রে মাথা রাখি,
হাজার বছর ধরে পদধ্বনি কানে ভেসে আসে

তবুও যখন শুনি প্রহরে প্রহর
দুঃস্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ঘন্টা বাজে...
অন্ধকার গর্ভ থেকে জন্ম নেয় আরেক সকাল।

ভয়ের কথা

দুর্লভ চক্রবর্তী

সংসারে সব থেকে ভয়ের কথা এই যে, ভয় পেতে আমরা ভালোবাসি। এমনিতে মনে হয় বটে, ভয় থেকে আমরা দূরে থাকি, ভয়কে আমরা অপছন্দ করি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, সে ধারণায় মধ্যে খাদ আছে। ভয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আমাদের যতোটা, আকর্ষণও তার চেয়ে কম নয়।

সত্যি বলতে কি, ভয় আমাদের জীবন-যাত্রায় একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। একটু স্থিরচিত্তে তালিকা তৈরি করতে বসলেই দেখা যাবে ফর্দের কাগজ কতো তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে ওঠে। আমাদের এই মানবজীবন শুরু হয় বাবা-মাকে ভয় করে। আমি নেমকহারাম নই, আলবৎ স্বীকার করব বাবা-মা'র ভালোবাসা ছাড়া এক লহমাও আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না। কিন্তু সত্যের খাতিরে এটাও আমাকে কবুল করতে হবে যে, সেই ভালোবাসা ছিল যাকে বলে 'টেকেন ফর গ্র্যান্টেড', মানে একেবারে ধরে নেওয়া জিনিস। ঠিক যেমন মাছেরা ধরে নেয় জলের অস্তিত্ব। অর্থাৎ তার মধ্যেই জন্ম, তার মধ্যেই জীবনধারণ। কাজেই পিতৃস্নেহ বা মাতৃস্নেহকে বিশেষ একটা ব্যাপার বলে বুঝতে শিখি নি বাল্যকালে। কিন্তু ভয়? সে একেবারে বাস্তব অস্তিত্ব। মিথ্যা কথা বলা, কি রোদ্দুরে বেড়ানো, অথবা পাশের বাড়ির ছেলেটাকে ঢিল ছোঁড়া, এসব করলেই বুকের মধ্যে ধুকপুকানি অনিবার্য। কেননা কানমলাই হোক বা বকুনিই হোক, শাস্তি একটা বাবা-মা'র দিক থেকে আসবেই। তারপর বাড়ি ছেড়ে যেই ইস্কুলে ঢুকলাম, কি, ভয়ের হাত থেকে রেহাই পেলাম ভাবছেন? সে গুড়ে বালি। দুজনের জায়গায় দেখা দিলেন কম করে অন্তত কুড়িজন— কেননা মাস্টারমশাইরা প্রত্যেকেই এবার গ্রহণ করলেন ভীতিপ্রদ হবার ভূমিকা। তারপর কর্মজীবনে মনিব আর বিবাহিত জীবনে স্ত্রী যে সত্যিই বেশ একটু ভয়ের ব্যাপার তা আর আশা করি কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। আর বয়স বাড়লে ছেলেমেয়ে, হ্যাঁ, তাদেরও একটু ভয় করে চলতে হয় বইকি!

কিন্তু এ তো গেল নেহাত পারিবারিক দিকের কথা। ব্যক্তিগত দিক থেকেও ভয়ের তালিকা বৈচিত্র্যহীন নয় মোটেই। ভূতের ভয় অবিশ্যি শহুরে জীবনে এখন লোপ পেয়ে যাচ্ছে ক্রমশই। এর পয়লা কারণ বোধ করি ইলেকট্রিসিটি। বিদ্যুতের চড়া আলোয় ভূত টেঁকে না। মাছের জন্যে যেমন জলের দরকার, ভূতের জন্যেও দরকার তেমনি অন্ধকার। এককালে গ্রামে এ বস্তুটি অঢেলভাবে পাওয়া যেত বলে ভূতও দেখা যেত হাজারে হাজারে। এখন জঙ্গলগুলো ক্রমে লোপাট হয়ে যাওয়ায় এবং লাখে লাখে উদ্বাস্তু সমাগমে ভূতেরাও ভিটেমাটি ছাড়া হচ্ছে। তদুপরি যে সব গাঁয়ে বিজলিবাতি দেখা দিয়েছে সেখানে তো ভূতগুলোর ভিসা পর্যন্ত বাতিল।

তবে এক যায় তো আর আসে। ভূত নেই তো অসুখের ভয় আছে। বাস্তবিক, রোগভীতি এখন এমন আকারে বেড়েছে যা নিজেই হয়ে উঠেছে একটা নতুন অসুখ। কিন্তু সে যাই হোক, ভয়টা তবু থেকেই যাচ্ছে। সকলেই কোনো না কোনো অসুখের ভয়ে তটস্থ। নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন, ওষুধ খাচ্ছেন। কিম্বা, খেতে হয়তো খুব একটা উৎসাহিত হচ্ছেন না, হয়তো আর্থিক অসুবিধেই সে নিরুৎসাহের প্রধান কারণ, কিন্তু ওষুধপত্রের খবর নিচ্ছেন, আলোচনা করছেন। এবং সুযোগ পেলেই অর্জিত জ্ঞান অন্যের ওপর প্রয়োগও করছেন। রামের সুমতি গল্পে আমরা 'খানিকটা পাশকরা ডাক্তারে'র কথা শুনেছি, একালের এই আমরা প্রায় সকলেই হয়ে উঠেছি বেশ খানিকটা পাশ-না-করা ডাক্তার।

অপিচ চোরের ভয়। জানি এ ভয়টা এত বাস্তব যে এ নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে না। কিন্তু আমার বক্তব্য তো সত্যাসত্য যাচাই করা নয়, আমার মোদ্দা কথা হল, ভয়গুলো যে আছে সেই দিকে নজর ফেরানো। চোরের ভয়, অ্যাকসিডেন্টের ভয়, পুলিশের ভয়— কোন ভয়টা নেই আমাদের? তারপর আগুনের ভয়, জলের ভয়, সাপের ভয়।

হ্যাঁ সাপের ভয় বলতে পুরনো দিনের একটা গল্প মনে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। অনুরাগীদের মধ্যে একজন ছিলেন, ধরা যাক তাঁর নাম 'হ'বাবু। তিনি কলকাতার লোক, কিন্তু মাঝে মাঝেই শান্তিনিকেতন যেতেন। এই রকম এক সময়ে একদিনের সান্ধ্য জমায়েতে রবীন্দ্রনাথ 'হ'বাবুকে না দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন 'হ'বাবুর এক বন্ধু জানালেন, হ'র বড্ড সাপের ভয়, তাই সন্ধ্যে-বেলায় বেরোয় নি ঘর থেকে। রবীন্দ্রনাথ এর জবাবে জানালেন—'হ'কে বলো, শান্তি-নিকেতনের ইতিহাসে সাপে কাটার ঘটনা নেই। যাই হোক, পরদিন সকালে 'হ'বাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে এলেন, এবং কথা আবার রিপিট করলেন আগের সন্ধ্যার সেই উক্তি। বললেন, তোর এত ভয় কীসের? জানিস, শান্তিনিকেতনের গোটা ইতিহাসে একটিও সাপে কাটার ঘটনা নেই! 'হ'বাবু একথা শুনে লজ্জিতভাবে হাসলেন। তারপর মাটির দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, কিন্তু গুরুদেব, ইতিহাসটা তো আমাকে দিয়েও শুরু হতে পারে!

রবীন্দ্রনাথ একথার কী জবাব দিয়ে-ছিলেন তা আমার জানা নেই। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি সেখানে হাজির ছিলাম না। এ ঘটনা আমি শুনেছি একটা প্রচলিত গল্প হিসেবে। আর সংসারের বেশির ভাগ ভালো গল্পের মতোই এ গল্পও ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতেই আশ্চর্য রকম নীরব।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম। ভয় পাওয়া আমাদের মজ্জাগত। সমাজ-বিজ্ঞানীরা এর একটা ব্যাখ্যাও দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যা বলেছেন তার নিগলিতার্থ হল এই যে—সমাজে আমরা অনেক লোক বাস করি। কিন্তু এতগুলো লোক যে একসঙ্গে বাস করতে পারছি তার মূলে রহস্য হল, মেনে চলার প্রবৃত্তি। বহুস্তরে বিন্যস্ত এই সমাজব্যবস্থার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত হুকুম দেওয়া আর হুকুম মেনে চলার একটা নিঃশব্দ পরম্পরা বয়ে চলেছে। ক'র হুকুম খ মানে, খ'র হুকুম গ মানে, গ'র হুকুম ঘ মানে—এই-রকম। একে ঐ বিজ্ঞানীরা বলেছেন 'পেকিং অর্ডার'—অর্থাৎ ঠোকরানের ক্রমিক বিন্যাস। কথাটা এসেছে মুরগীর দলের ব্যবহার লক্ষ্য করে। দলের মধ্যে একটা মুরগী আরেকটা মুরগীকে ঠোকরায়, কিন্তু এই দ্বিতীয়টা উল্টে প্রথমটাকে ঠোকরায় না, সে ঠোকরায় তৃতীয়টাকে। এইভাবে চলে ক্রমিক পর্যায়, আর তারই ফলে থাকে মুরগীর পালে নিয়মশৃঙ্খলা। ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে মানুষের সমাজে। তাই বিরুদ্ধতা বা বিদ্রোহ যতো সোচ্চারই হোক, শেষ পর্যন্ত সব দেশেই শৃঙ্খলা আসে, আর সমাজ ফিরে পায় তার ভারসাম্য।

অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু গোড়ার ব্যাপার কী ঘটল তা লক্ষ্য করেছেন? গোড়ার ব্যাপার হল ভয় পাওয়া। দ্বিতীয় মুরগীটা যে প্রথমটাকে ঠোকরালো না তার কারণ হল প্লেন অ্যান্ড সিম্পল, ভয় পায় সে। আমাদেরও ঠিক সেই দশা। আমরাও সমাজ-সংসারের মধ্যে সুস্থিতসুখ অনুভব করতে পারছি, ভয় পাওয়াটাকে টিকিয়ে রাখছি বলেই!

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে ঝিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব। এমন সময় দুঃখী ঝিনুকের বাবা ভবতোষ এলেন। ভবতোষবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর দেখাশোনা নেই দীর্ঘ দু-মাস। অবনীমোহন বেশ কিছু জমি কিনবেন স্থির করলেন। ডাক পড়ল মজিদ মিঞার। চোখে তার খুশির রোশনাই। সামান্য দামেই জমির ব্যবস্থা করলো সে। হিরণ এল বহুদিন পরে। সুধার শিরায় শিরায় ভালোবাসার নেশা।

বিনু তখন একা। এল যুগল। জলা-বাঙলার প্রতীক। বলল : কাউঠা দ্যাখছেন ছুটোবাবু? অবাক হল বিনু। ছুটল। চোখের সামনেই জলজ-জীবটিকে টেটা দিয়ে গাঁথল যুগল। বাড়ি ফেরার পালা। পথে বেবাজিয়ার বহর। ঘুরে ঘুরে দেখল নৌকা-গুলো। বেদেদের জীবন দিল বিনুর চোখে বিস্ময়ের রঙ। কলকাতা থেকে ফিরে এলেন অবনীমোহন। শোনালেন সেখানের হাল-চাল। ইউরোপের যুদ্ধ বাঙলা দেশের দিকে ছুটে আসছে। প্রথম ব্ল্যাক আউটের মহড়া হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে গোটা কলকাতা জুড়ে। যুদ্ধ দ্রুতবেগে ছুটে আসছে।

সুধা সুনীতি সব তখন পুকুর ঘাটে। এল পিয়ন। সুনীতিকে দিলো একটি চিঠি। দেখতে দেখতে সে অবাক হয়ে হয়ে যাচ্ছিল। ভেবেই পেল না তাকে কে চিঠি লিখতে পারে।]

।। আটত্রিশ ।।

নিবারণ একসময় বলে উঠল, 'হ্যামকত্তায় বাড়িত্ আছে?'

সুনীতি বুঝিবা শুনতে পেল না। হাতের খামটার দিকে পলকহীন তাকিয়েই ছিল, তার মুখে নানা রঙের খেলা চলতে লাগল।

ওধার থেকে সুধা উত্তর দিল, 'দাদু নেই। সকালবেলা উঠে বেরিয়ে গেছেন, সন্ধ্যের আগে ফিরবেন না।'

নিবারণ এবার শুধলো, 'বৌ-ঠাইন (বৌ-ঠাকরুণ) আছে তো?'

নিবারণ যে স্নেহলতার কথা বলছে, সুধা বুঝতে পারল। বলল, 'আছেন।'

'যাই, বৌ-ঠাইনের লগে দেখা করি গা। ঘরের দুয়ারে অ্যাইসা তেনার লগে দেখা না করলে রক্ষা নাই। নিয্যাস (নিশ্চয়ই) আমার গর্দান যাইব।' নিবারণ বড় বড় পা ফেলে ভেতর-বাড়ির দিকে চলে গেল।

একটু নীরবতা।

তারপর সুনীতির দিকে ঝুঁকে সুধা বলল, 'কার চিঠি রে দিদি?' তার মুখ-চোখ থেকে কৌতূহল যেন উপচে পড়ছিল।

সুনীতি চকিত হয়ে বলল, 'কারো না।' বলে শাড়ির ভেতর খামটা লুকোতে যাবে তার আগেই ডিঙি মেরে দেখে নিল সুধা।

কিন্তুও খুব ইচ্ছে করছিল, সুধার মতন [illegible] মুখের আড়ালে ভর দিয়ে দেখে নেয়। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে চিঠিটা অদৃশ্য হয়েছে।

এদিকে সুধার চোখ কৌতুক এবং দুষ্টুমিতে ঝকমকিয়ে উঠেছে। ঠোঁট ছুঁচলো করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুব রগড়ের গলায় সে বলল, 'ফ্রম আনন্দ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ চন্দ্র তা হলে কথা রাখলে! চিঠি দেবে বলেছিল, ঠিক দিয়েছে।'

শিউরে ওঠার মতন করে চারদিক একবার দেখে নিল সুনীতি। তারপর বিরতমুখে বলল, 'এ্যাই সুধা, এ্যাই—চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? কেউ শুনতে পাবে।'

'শুনবে না। আমরা ছাড়া এখানে কেউ নেই।'

'না থাক। তুই মোটে চ্যাঁচাবি না।'

'এক শর্তে চ্যাঁচানো থামাতে পারি।'

সংশয়ের গলায় সুনীতি শুধলো, 'কী?'

সুধা বলল, 'আমাকে চিঠিটা পড়াবি। আনন্দ মহাপ্রভু কেমন করে তোর ভজনা করেছে, দেখতে হবে।'

জোরে জোর প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সুনীতি বলল, 'ওমা, না-না—'

'তা হলে কিন্তু আমি সব্বাইকে বলে দেব।'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হাত শুকিয়ে কড়-কড়ি হয়ে গেল। চল আঁচিয়ে আসি।'

সুধা বলল, 'আঁচাবার পর কিন্তু পড়াবি। না পড়ালে ছাড়ছি না।'

পুকুরঘাটের দিকে যেতে যেতে সুনীতি ফিস-ফিস করল, 'কী অসভ্য লোক ভাই—'

'কার কথা বলছিস?'

'আহা, কার কথা যেন বুঝতে পারছে না।'

সুধা বলল, 'আনন্দদার কথা?'

আস্তে করে ঘাড় কাত করল সুনীতি।

সুধা আবার বলল, 'অসভ্যের কী হল?'

'এমন করে চিঠি কেউ লেখে!'

'ঢঙ করিস না দিদি।'

'ঢঙের কী হল?'

'আনন্দদার চিঠির জন্যে তো হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলি।'

'তোকে বলেছে!'

'বলিস নি। তবে—'

'তবে কী?'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুধা বলল, 'যেরকম উদাস-উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতিস আর ফোঁত ফোঁত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতিস তাতে মনে হচ্ছিল আনন্দদার চিঠি না এলে বুঝি আত্মহত্যাই করে বসবি।'

'তবে রে বাঁদর মেয়ে—' সুনীতি করল কি, এঁটো হাতেই সুধার পিঠে দুম করে কীল বসিয়ে দিল।

পিঠ বাঁকিয়ে নাকিসুরে উঁ-উঁ করতে করতে সুধা বলল, 'পেটে খিদে মুখে লাজ। সত্যি কথা বললেই দোষ।'

'সত্যি কথা তোকে বলছি। আর—'

দ্বিতীয় কীলটি পড়বার আগেই ছুটে দূরে সরে গেল সুধা।

পুকুরঘাটে আঁচাতে আঁচাতে সুনীতি বলল, 'ভাগ্যিস পিওনটার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। বাবা কি দাদু-টাদুর হাতে চিঠিটা পড়লে কী হত বল দেখি!'

এক মুখ জল নিয়ে পিচকিরির মতন ছুঁড়ে দিল সুধা। তারপর বলল, 'খুব ভাল হত। ওঁরা বুঝতে পারতেন কী পাকাটাই না তুই পেকেছিস!'

'আমাকে নিয়ে বেশি মজা কোরো না, নিজের কথাটা একটু ভেবে দেখো।'

'আমার আবার কী কথা?' সুধার চোখ কুঁচকে গেল।

সুনীতি বলল, 'শ্রীমান হিরণকুমার ঢাকায় বসে আছেন। তিনিও এইরকম চিঠি ছাড়তে পারেন। আর তা দাদু কি বাবার হাতে পড়তে পারে।'

চমকে ওঠার মতন করে সুধা বলল, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না—'

'না নয়, হ্যাঁ।'

সুধাকে এবার চিন্তিত দেখাল, 'তাই তো রে দিদি, কী করা যায় বল দেখি—'

নারকেল-গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাটে দুই বোন পাশাপাশি বসল। বিনু তাদের সঙ্গেই ছিল, হাত নেড়ে নেড়ে হেমন্তের স্থির জলে ঢেউ তুলতে লাগল। কান দুটো কিন্তু তার সুধা-সুনীতির দিকেই ফেরানো।

সুনীতি বলল, 'আজই কলকাতায় চিঠি লিখে জানিয়ে দেব, আমাকে যেন আর চিঠি-টিঠি না লেখে—'

সুধা বলল, 'তোর কথা শুনবার জন্যে বসে আছে আনন্দদা!'

'তা হলে হিরণকুমারও তা-ই।'

'যা বলেছিস। বারণ করলে ওরা আরো বেশি করে করে চিঠি লিখবে।'

একটু ভেবে সুনীতি হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'একটা ফন্দি মাথায় এসেছে রে সুধা—'

সুধা উৎসুক চোখে তাকাল, 'কী?'

উত্তর না দিয়ে সুনীতি বিনুকে ডাকল। বিনু তাকাতেই বলল, 'পোস্ট অফিসটা কোথায়, জানিস?'

বিনু ঘাড় কাত করল, অর্থাৎ জানে।

'দুদিন পর পর একবার করে পোস্ট অফিসে যাবি ভাই?'

'কেন?'

'সুধার কি আমার চিঠি থাকলে নিয়ে আসবি।'

চোখ কুঁচকে একটু তাকাল বিনু। তারপর বলল, 'যেতে পারি। কিন্তু—'

সুনীতি উঠে এসে বিনুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল, 'কিন্তু কী?'

'আমাকে কী দিবি?'

'কী আবার দেব? যাবি তো বাবা এখান থেকে এখানে—'

'এখান থেকে এখানে! সেই স্টিমারঘাটা বরফকল ছাড়িয়ে তবে পোস্ট অফিস। পাক্কা দেড় দু মাইল রাস্তা। এমনি-এমনি অতখানি পথ আমি যেতে পারব না।'

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আচ্ছা আচ্ছা, কী নিবি বল—'

বিনু বলল, 'যেদিন পোস্ট অফিসে যাব সেদিন দু আনা পয়সা দিবি।'

'দু আনা!' সুর টেনে টেনে সুনীতি বলল, 'তুই কি ডাকাত রে—'

'তা হলে যেতে পারব না।'
'আচ্ছা আচ্ছা, দু আনাই দেব।'
ওদিক থেকে সুধা ডাকল, 'দিদি—'

সুনীতি আবার সুধার কাছে ফিরে গেল, 'কী বলছিস?'

'পোস্ট অফিসের ব্যাপারটা তো মিটল। এবার আনন্দদার চিঠি বার কর।'
'না-না—'

'না বললে শুনছি না। বার কর—' সুনীতির আঁচল ধরে টানাটানি করতে লাগল সুধা।

'এ্যাই সুধা, এ্যাই—' বিব্রত বিপন্ন সুনীতি শাড়ি সামলাতে চেঁচামেচি জুড়ে দিল।

সুধার এক কথা, 'বার কর, বার কর—'

আত্মরক্ষার জন্য সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ছাড়-ছাড়, কী ছেলেমানুষি করছিস! বিনু রয়েছে না?'

'বিনু গেলে চিঠি দেখাবি?'
'সে দেখা যাবে।'
সুধা এবার বিনুর উদ্দেশে বলল, 'তুই এখন যা তো বিনু—'

বিনুর যাবার ইচ্ছে নেই। আনন্দ সুনীতিকে কী লিখেছে, জানবার ভারি কৌতূহল হচ্ছিল। সে বলল, 'না, যাব না।'

'যাবি—'
'না।'

একটা ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তার বদলে অগ্নিদৃষ্টিতে একবার বিনুকে দেখে নিয়ে সুধা বলল, 'চল দিদি আমরা ওদিকে যাই। হনুমান ছেলে এখানে বসে থাক।' সুনীতিকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের উত্তর দিকে ঘন রোয়াইল আর সিনজুরি ঝোপের ভেতর চলে গেল সুধা।

●

একা-একা [illegible] [illegible] [illegible] পুকুর-ঘাটে বসে থাকল বিনু। [illegible] [illegible] [illegible] উঠে পড়ে পাখির মতন অস্থির পায়ে বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক-বার ইচ্ছে হল রোয়াইল আর সিনজুরি বনে ঘন ছায়ার ভেতর সুধা-সুনীতি যেখানে বসে আছে সেখানে চলে যায়। পরক্ষণেই ভাবল, ওরা যখন তাকে ফেলে চলেই গেছে তখন আর হ্যাংলার মতন যাবে না।

অনেকক্ষণ পর বাড়ির ভেতর চলে এল বিনু। এসেই অবাক।

রান্নাঘরের দাওয়ায় নিবারণ পিওন একটা মোটে গামছা পরে প্রায় খালি গায়ে তেল মাখছিল। কোথায়ই বা তার ইউনিফর্ম, কোথায়ই বা তার চিঠি-পত্তরের ঝোলা। তার মুখে অনবরত খই ফোটার মতন কথা ফুটছিল।

স্নেহলতা-সুরমা-শিবানী-অবনীমোহন, বাড়ির প্রায় সবাই নিবারণের সামনে দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে বিনুও গিয়ে সেখানে দাঁড়াল। তার মনে হল, এত যখন তেল মাখার ঘটা, নিবারণ এখানে খাবেও।

যাই হোক, নিবারণ বলছিল, 'চিঠি লইয়া এই বাড়িত্ যেদিনই আসি সেইদিনই ছান-খাওয়া (স্নান-খাওয়া) সাইরা যাই। সেইদিন খাওন আমার বান্ধা। না খাইয়া গেলে হ্যামকত্তা আর বৌ-ঠাইনে আস্তা রাখব না।'

কথাগুলো অবনীমোহনের উদ্দেশে বলা। অবনীমোহন উত্তর দিলেন না, নিঃশব্দে হাসলেন শুধু।

নিবারণ বলতে লাগল, 'রাইজদিয়ায় হ্যামকত্তার বাড়ি, বাজিতপুরে অভয় কবি-রাজের বাড়ি, সুনামগঞ্জে ইসমাইল মেরধার (মৃধা) বাড়ি, গিরিগঞ্জে ছোত্তান (সোক্তান) আলি মোলবীর বাড়ি, হাসাড়ায় মল্লিকগো বাড়ি—এই কয় বাড়িতে চিঠি লইয়া গেলে খাইতে হইবই।'

অবনীমোহন এবার ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'আপনি তো অনেকগুলো গ্রামের নাম করলেন—'

'হ।'

'এত এত গ্রামে আপনাকে ঘুরতে হয়?'
'মোটে তো চাইরখান গেরামের নাম কইলাম। আমারে বিশখান গেরামে ঘুরতে হয় জামাইকত্তা—'

অবনীমোহন হেমনাথের ভাগনী-জামাই। সেই সুবাদে এরই ভেতর 'জামাই-কত্তা' ডাকতে শুরু করেছে নিবারণ।

অবনীমোহন বললেন, 'বিশখানা গ্রামে একদিনে যান কী করে!'

'একদিনে কে যায়?'
'তবে?'

নিবারণ এবার যা উত্তর দিল, সংক্ষেপে এইরকম। রাজদিয়া এবং আসে-পাশের কুড়ি-খানা গ্রাম নিয়ে একটা মস্ত পোস্ট অফিস আর ডাক-পিওন বলতে একা নিবারণ। মস্ত

মেলার চিঠিপত্র বোঝাই করে প্রতি সোমবার সে বেরিয়ে পড়ে। পথে নদী-খাল বিল পড়লে নৌকোর মাঝিদের ডেকে ডেকে পাড়ি জমায়, কখনও বা 'গয়নার নৌকো' ধরে নেয়। যেখানেই যাক, এই জলের দেশে মানুষ বড় ভাল, বড় দয়ালু। দু মুঠো না খাইয়ে কেউ ছাড়তে চায় না। রাত্রিবেলা কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় জুটে যায়ই।

সোম থেকে শনি, একটানা ছ'দিন চিঠি বিলির পর রাজদিয়ায় ফিরে আসে নিবারণ। মাঝখানে রবিবারটা বিশ্রাম। তারপর আবার সোমবারে দূরের গ্রাম-গঞ্জ- জনপদে বেরিয়ে পড়া· পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে এইরকমই চলছে।

সব শুনে অবনীমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'বকবকানি থামিয়ে এখন চান করতে যা নিবারণ। তোকে খেতে দেবার পর আমরা খাব।'

'এই যাই—' ব্যস্তভাবে নিবারণ পুকুর-ঘাটের দিকে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে যখন খেতে বসল তখনও তার কথার শেষ নেই। খেতে খেতে গল্প করতে লাগল সে।

একধারে দাঁড়িয়ে বিনুর মনে হল, লোকটা যেন বকবক করার কল। দম দেওয়াই আছে, সবসময় গল গল করে কথা বেরিয়ে আসছেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিবারণ বিনুকে নিয়ে পড়ল, 'তোমার লগে ভাল কইরা আলাপই হইল না নাতিবাবু। লও যাই, এট্টু গপ-সপ (গল্প-সল্প) করি।' বিনুকে সঙ্গে নিয়ে যুগলের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। বোঝা গেল এ বাড়ির সব অন্ধি-সন্ধিই তার চেনা। টের পাওয়া গেল, এতক্ষণ বক-বক করেও তার সাধ মেটেনি, আরো কিছুক্ষণ সে গল্প করতে চায়।

লোকটাকে খুব খারাপ লাগছিল না বিনুর। যুগলের নীচু তক্তাপোষে নিবারণের পাশাপাশি বসে উন্মুখ হয়ে থাকল সে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিবারণ বলল, 'তোমরা তো কইলকাত্তার পোলা।'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ—'

'কইলকাত্তা দ্যাশখান কেমুন কইবা—'

কলকাতা কী, কথায় কথায় তার মোটা-মুটি ছবি এঁকে নিবারণের চোখের সামনে যেন এঁটে দিল বিনু।

শুনে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকল নিবারণ। তারপর বলল, 'আলিসান ব্যাপার, না?'

'হ্যাঁ'

কইলকাত্তার কথা তো শুনলাম, এইবার আমাগো জলের দ্যাশের গপ (গল্প) শোন।'

'বলুন—'

দেখা গেল নিবারণ লোকটা সত্যি-সত্যি গল্পের খনি। বিপুল অভিজ্ঞতা তার জীবনের। কবে কার্তিক মাসের ঝড়ে বড় গাঙে 'গয়নার নৌকো' উল্টে গিয়ে মরতে বসেছিল, তারপর দু'খানা মোটে হাতের ভরসায় দু মাইল উথল-পাথল নদী পাড়ি দিয়েছিল, কবে চরের মুসলমানদের সঙ্গে শুধু লাঠি পেটা করে একটা প্রকাণ্ড কুমীর মেরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছ থেকে দশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিল, কবে কোথায় সাক্ষাৎ যমের মতন ডানাওলা উড়ন্ত সাপ দেখেছিল, কোথায় দুশ বছরের এক ন্যাড়া ফকিরের অলৌকিক মন্ত্রবলে বিশাল দীঘির সব জল দুধ হয়ে গিয়েছিল—হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে কত বিচিত্র বিস্ময়কর গল্প যে নিবারণ বলে গেল হিসেব নেই।

গল্প বলতে জানে বটে লোকটা। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিল বিনু, তার চোখে পলক পড়ছিল না।

গল্পে গল্পে বিনুকে জয় করে বিকেলের খানিক আগে নিবারণ চলে গেল। এখান থেকে কারো নৌকো ধরে সোজা সুজনগঞ্জ যাবে সে।

নিবারণ চলে যাবার কিছুক্ষণ পর হেমন্তের ছায়া যখন আরো দীর্ঘ এবং ঘন হল সেই সময় সিনজুড়ি বন থেকে বেরিয়ে সুধা-সুনীতি বাড়ি চলে এল।

পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে সুরমা চুল বাঁধছিলেন। বিনু তাঁর কাছেই ছিল। মেয়ে-দের দেখে সুরমা বললেন, 'কোথায় ছিলি রে তোরা এতক্ষণ?'

সুনীতি বলল, 'বাগানে—'

'কী করছিলি?'

'গল্প।'

'কলকাতা থেকে নাকি চিঠি এসেছে?'

সুনীতি চমকে উঠল। আধফোটা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

সুরমা শুধোলেন, 'কার চিঠি?'

'আমার—'

'তোকে আবার কে চিঠি দিলে?'

'আমার কলেজের এক বন্ধু—সেই যে বেলা বলে মেয়েটা, কলকাতায় আমাদের বাড়ি আসত—'

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

বিনু লক্ষ্য করল, সুধা-সুনীতি চোরা চাহনিতে পরস্পরকে দেখতে দেখতে ঠোঁট টিপে হাসছে। বিনুর একবার ইচ্ছে হল, চিঠির আসল রহস্যটা ফাঁস করে দেয়। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকল, কিছু বলল না।

●

অঘ্রাণের শেষ সপ্তাহে বিনুদের জমি কেনা হয়ে গেল।

রেজিস্ট্রি হবার পর অবনীমোহন, মজিদ মিঞা, হেমনাথ, বিনু আর সুরমা রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। সুরমাকেও এতদূর আসতে হয়েছে, কেননা জমি তাঁর নামেই কিনেছেন অবনীমোহন।

হঠাৎ একটা লোক—মাথায় চুলে জট বাঁধা, মুখময় দাড়ি-গোঁফ, ভাঙা-ভাঙা নখ, পায়ে হাজা, লালচে উদভ্রান্ত চোখ, সব মিলিয়ে পাগলাটে চেহারা—অবনীমোহনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'সালাম বাবু। আমার নাম তাহেইরা (তাহের)। আপনে বুঝি জমিন রেজিস্টারি করলেন?'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কেন?'

'আপনের লগে একখান কথা।'

(ক্রমশ)

রমেশ দত্তের রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১১)

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন

আপনার সৌজন্যবোধ মেপে দেখবেন?

লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার সময়ে আপনি কতোখানি সৌজন্যবোধ এবং বিনয়-নম্রতার পরিচয় দিতে পারেন তা থেকে আপনার মনের প্রকৃতি বেশ বোঝা যায়। এথেকে বুঝতে পারা যায় সামাজিক ব্যাপারে এবং আপনার আবেগ-প্রক্ষোভের ব্যাপারে আপনি কতোখানি মানিয়ে চলতে পারেন, আর তা থেকেই আন্দাজ করা যায় আপনার আচরণ-বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য আছে কিনা।

নীচের মনোপ্রশ্ন-চর্চায় যোগ দিতে পারেন সৌজন্যবোধ যাচাই করতে ইচ্ছা থাকলে। প্রশ্নগুলিতে "হ্যাঁ" কিংবা "না" জবাব দিন। যদি ঠিক জবাব দিতে দ্বিধা বোধ হয়, কিংবা ঠিক জানেন না মনে হয়, তাহলে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন বসিয়ে দিন।

১। মেজাজ খারাপ না করে আপনি সমালোচনা সইতে পারেন কি?

২। আপনি মেয়ে-পুরুষদের যথাযথ সামাজিক মর্যাদা জানাবার আদব-কায়দাগুলি মেনে চলেন তো—দরজা খুলে ধরা, অভ্যর্থনা জানিয়ে উঠে দাঁড়ানো ইত্যাদি?

৩। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে আপনি কি জানিয়ে দেন কবে কখন যাচ্ছেন?

৪। লোকজনের মাঝখানেই কারুর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছা থেকে নিজেকে নিরস্ত করতে পারেন কি?

৫। নতুন পরিচিত লোকের সঙ্গে নম্র আচরণ যেমন করেন, তেমন কি বাড়ীর লোকজন কিংবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গেও করেন?

৬। আপনি কি দেখেছেন, আপনি বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবে চলতে ফিরতে পারেন এবং বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলতে পারেন?

৭। যখন মনে মনে আপনি আহত হয়েছেন ভাবেন, তখন কি বিদ্বেষ পোষণ করার মনোভাবকে দমন করতে পারেন?

৮। বাড়ীতে কিংবা অফিসে অন্য লোকের চিঠিপত্র খোলা বা পড়ার ইচ্ছা আপনি দমন করতে পারেন কি?

৯। পাড়া-প্রতিবেশীর উপকার করবার জন্যে আপনি কি নিজের কাজকর্ম রেখেও এগিয়ে যান?

১০। অন্যের জন্য আপনি ভাবেন, কিছু করেন বলে কি কখনো প্রশংসা পেয়েছেন?

১১। কোনোরকম বিরক্তি বা রুক্ষভাব প্রকাশ না করে আপনি কোনো দোকান-দারের জিনিস না কিনে চলে আসতে পারেন কি?

১২। যাদের আপনি পছন্দ করেন না, তাদেরও সৌজন্য দেখাতে পারেন কি?

১৩। আপনি চিঠিপত্র পেলে তাড়াতাড়ি প্রাপ্তি-স্বীকার করেন কি?

১৪। আপনি কি স্বচ্ছন্দে একজনের সঙ্গে অন্যজনের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন?

১৫। বন্ধুদের সমালোচনায় তৎপর হয়ে পক্ষ সমর্থন করার জন্যে আপনি কি সর্বদা তৈরী থাকেন?

১৬। বিনয়-নম্রতা এবং রসিকতার সঙ্গে আপনি কি ভুলভ্রান্তি মেনে নিতে পারেন?

১৭। গলা না চড়িয়ে, কোনোরকম উগ্রতা প্রকাশ না করে আপনি কি কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন?

১৮। আপনার পাড়ায় কোনো নতুন প্রতিবেশী এলে, কিংবা ক্লাবে কোনো নতুন মেম্বার এলে, আপনি তাঁকে কোনো ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে নিজের কাজ ফেলে এগিয়ে যেতে পারেন কি?

১৯। যখন আপনি বিরক্তিবোধ করেন, তখন আপনি সেই মনোভাব বেশ সহজেই চেপে রাখতে পারেন কি?

২০। আপনি বাইরে যেমন ভদ্র ব্যবহার আদব-কায়দা মেনে চলেন, বাড়ীতেও কি তেমন করেন—যেমন, খাওয়া শেষ করে ওঠার আগে সকলকে বলে ওঠা, খাবার বাঁটোয়ারার সময়ে নিজে সব শেষে নেওয়া, ইত্যাদি?

❀

এবারে আপনার সৌজন্যবোধ বিশ্লেষণ করবেন কিভাবে, তা দেখুন। প্রত্যেকটি "হ্যাঁ" জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন। আর অনিশ্চিত উত্তর কিংবা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিলে পাবেন ২½ নম্বর।

যদি ৮৫ কিংবা তারও বেশি পয়েন্ট পান, তাহলে বুঝতে হবে আপনি চিন্তা-শীল নম্র-বিনয়ী মানুষ, বন্ধুরা আপনাকে ভালবাসেন এবং আপনি সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে বেশ চমৎকার মেলামেশা করে মানিয়ে চলতে পারেন।

মোটামুটি ৭০ থেকে ৭৫ পয়েন্ট পেলে এই কথাই বোঝাবে যে, আপনার মিষ্টি আচরণ এবং সৌজন্যবোধ প্রশংসার যোগ্য হলেও, কখনো কখনো বিশেষ ক্ষেত্রে সেটাও আপনার আচরণে বেয়াড়া ঠেকে।

৬৫ পয়েন্টের নীচে পেলেই অনেক কথা ভাবতে হয়। যত কম পয়েন্ট পাবেন, ততই বুঝতে হবে, আপনি খুব সম্ভব নিজের অজান্তেই অনেক সৎ লোক এবং প্রকৃত বন্ধুর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন—হয়তো তাঁদের কথা শুনলে আপনার ভালোই হতো, কিন্তু তার সুযোগ আপনি নিতে পারেন না। কম পয়েন্ট পেলে আরও একটা জিনিস বুঝতে হবে যে, মনের মধ্যে কোনো লুকানো অসন্তোষ এবং অশান্তির ফলে জীবনের প্রতি সমস্ত মনোভাব তিক্ত হয়ে উঠছে এবং তার প্রতি-কার করার জন্যে কিছু একটা পরীক্ষা করানো দরকার। যাতে শৈশব থেকে গড়ে ওঠা ঐ বিষাদ-বিদ্রোহভাবটিকে কাটিয়ে ওঠা যায়।

সব ব্যাপারে রুক্ষতা রূঢ়তা এবং অধীর-ভাব প্রকাশ পেলে অত্যধিক অহম্‌ভাবের পরিচয় ধরা পড়ে এবং সেটার জন্যেই এই মনোপ্রশ্নচর্চাটিতে কম পয়েন্ট পাওয়া যাবে। এখুনি যদি এর চিকিৎসা সুরু করতে হয়, তাহলে আর-পাঁচজন লোকের কথা চিন্তা করার চর্চায় বেশি করে মন দিতে হবে। আর, এই মনোব্যাধিটির পাকা চিকিৎসা করাতে হলে অবচেতন মনের বিশ্লেষণের জন্যে মূলগত গলদটা কোথায় তা ঠিক-মতো বুঝে নিয়ে তার উদ্‌গমন করা সম্ভব হয়।

সৌজন্যবোধের বিষয়টিকে অবহেলা করবেন না। আজকের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক জগতে সাফল্যের পথে মহামূল্য পাথেয় এই জিনিসটি। বিশ্বাস করছি, আপনি খুবই আন্তরিকভাবে সকলের কল্যাণ কামনাই করেন, তবু কতকগুলি সামাজিক আদবকায়দার ফর্ম্যালিটি আপনি মেনে চললে আপনার সেই আন্তরিক ভব্যতার একটি মনোরম সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটবে, যার ফলে লোকে আপনাকে কম ভুল বুঝবে। সকলে তো আপনার মন বুঝতে পারে না—সে আপনি যতই আন্তরিক হোন না কেন,—তাই সৌজন্যবোধের কতকগুলি সামাজিক অভিব্যক্তির চর্চা করলে ভালো করবেন।

দু চাকায় সারা বাংলা

শ্যামল দত্ত, রাজকুমার পাল

অনেক লোক, অনেক উৎসাহ আর অনেক সহানুভূতির চৌহদ্দি পেরিয়ে এলাম দু-চাকার বাহনকে নিয়ে বাংলায় মুখ দেখে আসতে। সেদিন ১০ এপ্রিল, সমস্ত রাস্তাঘাটকে যেন কোন অদৃশ্য হাত শো-পয়জন করে রেখেছে। প্রধান যে রাস্তাটার ওপর দিয়ে আমরা যাব বলে ঠিক করেছিলাম সেটা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক—কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি একটানা দৌড়ে গেছে। বেলা দশটার কিছু আগে কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়ে এলাম, বারাসাত পর্যন্ত কয়েকজন বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিল। সাহস অ্যাডভেঞ্চারের নেশা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল হুহু করে, তবুও মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা ভয়ও লাগছিল। সত্যি কথা বলতে কি এত লম্বা সফর সাইকেলে কোনদিনও করিনি আর করবো বলে ভাবিওনি।

বেলা চারটে প্রায় বাজে—রাণাঘাট এসে পৌঁছে দুজনে ঠিক করলাম, আজ এই পর্যন্তই থাক। রাণাঘাট কলকাতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মত। অবশ্য আমরা সব কাগজেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, প্রতিদিন একশ থেকে একশ পঁচিশ মাইলের মত পাড়ি দেব। কিন্তু প্রথম দিনেই অতটা সাহস করলাম না। এখানে 'ভারতী সংঘের' ছেলেরা আমাদের খুব আদরযত্ন করেছিল। প্রথম দিনই ভাল লোকের দেখা পেয়ে মনটা বেশ খুশি। তারপর দিনই রাণাঘাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হোল কৃষ্ণনগরের দিকে। এপর্যন্ত প্রচণ্ড রোদে চালানোর মর্মটা ঠিক বুঝিনি। এবার বুঝতে শুরু করেছি হাড়েহাড়ে। আগে কয়েকজন বলেছিলেন, এই রোদের মধ্যে না বেরোতে, তারপর এক একজন এমন সব হিট স্ট্রোক, সান স্ট্রোক, হিট ফিভার প্রভৃতির কথা বলছিলেন যে শুরুতেই বসে পড়ার যোগাড়। তবুও ডোণ্ট কেয়ার করে বেরিয়েছিলাম। যেদিকে তাকাই গরমের জ্বালায় পিচ গলে কাদা হয়ে রয়েছে, ওর মধ্যে চাকা একেবারে আঠার মত ধরে যাচ্ছে. তার ফলে উপকার আমাদের বেশ হয়েছিল. স্পীড তোলার বারটা তো বেজে গেলই. প্যাডেল ঘোরাতেই ভীষণ পরিশ্রম হচ্ছিল. দুজনের সাইকেলের পেছনেই লেখা ছিল 'রাউন্ড দি স্টেট ইন টোয়েণ্টি ডেজ'; খালি মনে হচ্ছিল ওটাকে আশি দিন করে দিই। কৃষ্ণনগর ছাড়িয়ে সেদিন চলে এলাম মুর্শিদাবাদ আসার পথে পড়ে পলাশী [illegible] পলাশীর সেই যুদ্ধক্ষেত্র দেখলাম, অবশ্য এখন তা গোচারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, চেনাই যায় না। ওখানে একটা মনুমেণ্ট আছে, তার ধারেই সুগার মিল। স্থানীয় লোকের কাছে শুনলাম, ওটাই নাকি এখন বাংলাদেশের চালু চিনি কল। সেদিন বেশ রাত্রি হয়ে যাওয়ায় মুর্শিদাবাদ আর দেখা হল না, তাই তার পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হোল।

'বাচ্চাওয়ালী তোপ'। কেন যে এই অদ্ভুত নামটা হোল জিজ্ঞেস করা আর হয়নি। পুরো চত্বরটায় কেমন একটা পুরোনো শ্যাওলাধরা কান্নার গোঙানি। হাজারদুয়ারির সে চাকচিকাময় রাজকীয়তা আর নেই, অতীতের নবাবী প্রতাপ আজ বিচিত্র নাট্যশালার ধারে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের মতন মুখ কালো করে মহাকালের কপোলতলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজের হাতছানি পেছনে ফেলে রেখে চলে এলাম সেদিন জঙ্গীপুর হয়ে ফারাক্কা। মাঝে মাঝে একটু আত্মসুখের মোহে পড়ে যাই যখন ভাবি যে, এতটা রাস্তা আমরা সাইকেলেই চলে এসেছি। অবশ্য কলকাতা থেকে যে উৎসাহ নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তা এখন বেশ কিছুটা স্যাঁৎস্যাতে হয়ে গেছে। সারা রাস্তা জুড়ে লোকেরা জানতে চেয়েছে, কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব, কি নাম। অত্যুৎসাহী কয়েকজন তো অটোগ্রাফই চেয়ে বসেছে। আত্মপ্রসাদে হাবুডুবু খেতে খেতে তাও দিয়েছি। এখন এতটা রাস্তা এসেছি, তাই ওসব ভীষণ একঘেয়ে লাগে। কোথাও হয়ত রোদে রোষ্ট হয়ে রেষ্ট নেবার জন্য গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছি, তখন যদি বাংলাদেশের একটা স্ট্যাটিসটিকস উপহার দিতে হয় লোকেদের, কি অবস্থা হয় ভেবে দেখুন। কিন্তু এটাও ভেবে দেখেছি, আমাদের বিরক্ত হওয়া কিছুটা অযৌক্তিক।

কোন কোন জায়গায় হাইওয়ে ছেড়ে দিয়ে গ্রামের রাঙামাটির পথ ধরে এগিয়েছিলাম জীবনানন্দের 'ধানসিঁড়ির নদীটির' খোঁজে। কিন্তু কবির চোখের অভাব আমাদের ছিল, তাই 'সোনালী ডানার চিলের' বিষন্ন সঙ্গীত কানে এসে বাজেনি। গণ্ডগ্রামের মধ্যে আমাদের লাল টকটকে রেসিং সাইকেল আর আমাদের স্পোর্টস ড্রেস দেখে লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো। কোথাও সাইকেলটা রেখে একটু দেখার জন্য আসতেই ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরত। একটু বিস্ময়, একটু ভয়, একটু শ্রদ্ধা মেশানো একটিখানি প্রশ্ন তারা করেছিল 'তোমরা কে গো'? গ্রামের লোকেরা আমাদের অনেক আদরযত্ন করত।

ফরাক্কা সম্বন্ধে কাগজে অনেক কথাই পড়েছি, দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু খুদা যব দেতা ছপ্পর ফাড়কে দেতা। রাস্তা খুলে গেলো সাইকেল টায়ারের দৌলতে। পৌঁছে গেছি ফরাক্কার টাউনশীপে। সন্ধ্যে তখন সাতটা। ওখানে কাজ করেন এমন কিছু ভদ্রলোক আমাদের দেখে একরকম জোর করেই নিয়ে গেলেন তাদের মেসে, সেখানে হৈ হুল্লোড় লাগিয়ে দিলেন আমাদের পেয়ে। বেশ গোছানো ওখানকার কোয়ার্টারগুলো। সুন্দর সুন্দর বাগান, এবং রিক্রিয়েশন ক্লাব রয়েছে। তবে বাজারে খুব একটা ভাল জিনিষ পাওয়া যায় না যার জন্য প্রত্যেক কর্মীকে প্রজেক্ট অ্যালাউন্স দেওয়া হয়। যা হোক পরের দিন জেনারেল ম্যানেজারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমরা অর্ধ নির্মিত ব্রীজের উপর দিয়ে রওনা দিলাম রায়গঞ্জ—পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সাব ডিভিসন। অন্যান্য জেলার থেকে পশ্চিম দিনাজপুর রুক্ষ জায়গা, প্রচুর ধানক্ষেত দেখলাম অনাবাদী জমি পড়ে আছে। তবে রোদের তাপটা এদিকে একটু কম, বোধ হয় দার্জিলিংএর প্রভাব। দেখার মতন এই জেলায় তেমন কিছু নেই। তাই ওখানে সময় নষ্ট না করে পরের দিনই শিলিগুড়ি রওনা দিলাম।

আমাদের প্ল্যান ছিল পুরো বাংলাদেশটার ২০০০ মাইলেরও কিছু বেশী রাস্তা কুড়ি দিনে ঘুরে আসা মানে সব জেলার ওপর দিয়েই সফর করা। এর পরিপ্রেক্ষিতে খুব ভাল দেখার জায়গা ছাড়া আমরা দিন নষ্ট করতাম না। আচ্ছা, এমনকি হোতো না যে ভরদুপুর বেলা এমন জায়গায় গিয়ে পড়লাম যেখানে ভাল শহর নেই, খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা নেই? এ প্রশ্ন আমাদের ফিরে আসার পর অনেকে করেছেন। সত্যি সত্যিই আমরা এধরনের অসুবিধায় বেশ কয়েকবার পড়েছি। অনেক দিন চান করা হতো না অথচ রোদে গা, হাত, পা পুড়ে কালো হয়ে থাকত। যদিও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের খুব একটা ভুগতে হয়নি, সাইকেলে বয়ে নেয়া তিনটে ব্যাগের মধ্যে একটাতে টিনে প্যাক করা ফলের রস নাট, কাজুবাদাম, চীজ পাউরুটি প্রভৃতি জিনিষ ভর্তি করে রেখেছিলাম সময়-অসময়ের জন্য। অবশ্য এমনিতেও আমাদের কপালে দিনের বেলা ভাত জুটত না, কারণ

ভাত খেলেই এই ঘুমঘুম ভাবটা আসত বলে একেবারেই খেতাম না।

শিলিগুড়ি পৌঁছলাম সন্ধ্যেবেলায়। পৌঁছেই সোজা চলে গেলাম ডেপুটি কমিশনারের কাছে, তাঁকে আমাদের নামে লেখা মন্ত্রীদের সার্টিফিকেটগুলো দেখাতেই তিনি ওখানে কোর্টের কাছে ডি আই বাংলোতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। বেশ ঠান্ডা। আটটা নাগাদ শহরটা দেখতে বেরিয়েছিলাম, শহরের মধ্যে সোজা রাস্তাটার একটা মাথা চলে গেছে দার্জিলিং, পাহাড়টা দেখা যায় পরিষ্কার। সারারাত আনন্দে ঘুম হচ্ছে না, কখন ভোর হবে। খুব সকালে দারোয়ানের হাতে ঘরের চাবি জমা দিয়ে চললাম দার্জিলিং। বাপরে বাপ, কি ভয়ংকর পাহাড়ী আপ!! এখানে সাইকেল চালাবো কি দশবার প্যাডেল ঘোরালেই বুকে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। কলকাতার ছেলে আমরা—ওরকম উঁচু রাস্তার সঙ্গে পরিচয় একেবারেই নেই, খাবি খাওয়ার যোগাড়। এঁকে বেঁকে পথ উঠে গেছে। অপূর্ব লাগছিল লুপ লাইনের গাড়ী-গুলোকে, বাচ্চাদের খেলনা গাড়ীর মত আচার ব্যবহার। রাস্তার একধারে প্রচণ্ড গভীর খাদ, প্রায় ৫০০০ ফুট। আরেক ধারে খাড়াই পাহাড়। কিছুদূরে গিয়ে ভ্রমণকারীদের বিশ্রামের জন্য পাহাড়ের গায় বাগানের মত করা রয়েছে। যদিও পরিশ্রম অমানুষিক হচ্ছে তবুও দার্জিলিং যাচ্ছি এরকম একটা ভাব টেনে তুলছিল। কিন্তু এদিকে বিকেল হয়ে এল। তাও পৌঁছাতে পারলাম না। হাঁপাতে হাঁপাতে 'ঘুম' পেরিয়ে যখন দার্জিলিং পৌঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। খিদের চোটে নাড়ী হজম হয়ে যাচ্ছে, পা আর চলে না, সোজা রাস্তা হলে যে পঞ্চাশ মাইল রাস্তা আমরা পাঁচ ঘণ্টায় যেতে পারি, সেই দূরত্বই পাহাড়ী রাস্তায় আমরা চোদ্দ ঘণ্টায় এলাম কাঁদতে কাঁদতে। এবার ভাবুন কৃচ্ছ্র-সাধনের কথাটা। থাকার ব্যবস্থা অফিসার্স বাংলোতে করে নিয়ে তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে খেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম, যা হাড়কাঁপান শীত। পরের দিন দার্জিলিং কিছুটা দেখে নিয়ে নেমে আসছি। রাস্তার প্রচণ্ড কুয়াশা। কিছু দেখা যায় না। খুব আস্তে আস্তে সাইকেল চালাচ্ছি, কারণ একে নামার সময় ভীষণ ডাউন রাস্তা, তারপর এই সময় যদি চাকা ফসকায় ব্যস তাহলেই চিত্তির। চার পাঁচ হাজার ফুট নিচে পড়ে গিয়ে শ্যামল রাজকুমারদের সাই-কেলযোগে পরলোকগমন করা ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকবে না। আস্তে আস্তে যখন কার্সিয়াং ছাড়িয়ে তিনধারিয়ার কাছা-কাছি এসেছি, এমন সময়ে ভগবান বাঁচালেন প্রচণ্ড সাইক্লোনের হাত থেকে এবং যাঁরা আমাদের বাঁচালেন, তাঁরা হলেন 'আগিনা মাহাতো' সুটিং ইউনিটের অভিনেতৃবর্গ। আমরা যখন ভেতরে বিরাট বাংলোয় নিরাপদ তখন বাইরে ঝড়ের ভয়ংকর উন্মত্ততা। ঠিক বেলা তিনটের সময় ঝড় থামল। আমরাও নেমে এলাম তাঁদের প্রচুর সহানুভূতি ও আদরযত্নের স্মৃতি নিয়ে। সেদিনই শিলি-গুড়ি হয়ে চলে এলাম জলপাইগুড়ি। এখানে এসে উঠলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামিজীর আমন্ত্রণে। একদিন ছিলাম জল-পাইগুড়িতে। ওখানে বিগত বন্যার তান্ডব, রিলিফের কাজকর্ম এবং আরো অনেক কথা শুনলাম।

কুচবিহার ঘোরা শেষ করে একদিন পর ফেরার পথ করলাম একই রাস্তা ধরে সেই পুরোনো পথের বন্ধুদের সাহায্য আর স্নেহ নিয়ে জঙ্গীপুর পর্যন্ত।

এখান থেকে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়ে আমরা ছোটোখাটো পথ ধরলাম। বীরভূম জেলায়, সিউড়ি, রামপুর হাট, মুরারই প্রভৃতি জায়গা হয়ে এলাম শান্তিনিকেতনে সেই মানুষটির স্মৃতির ছায়ায়, যিনি বলেছিলেন,

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক"।

অপূর্ব লেগেছিল, কবিগুরুর প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা। শান্তিনিকেতনে আমরা ট্যুরিস্ট লজে ছিলাম। ভাল করে কবিগুরুর সব দেখে নিয়ে পরের দিন চলে এলাম দুর্গাপুর হয়ে পুরুলিয়া। ভীষণ গরম, গা-হাত পুড়ে যাচ্ছে। মাইলের পর মাইলের মধ্যে কোন বাড়ীঘর দেখা যায় না, একেবারে নো ম্যানস ল্যান্ড। গরমের ঠ্যালায় দার্জিলিংএর এয়ারকন্ডিশনড সুখ-স্মৃতি একেবারে টোল খাওয়া ঘটির মত তুবড়ে গেল। বাপ বাপ বলে রাত্রি হয়ে গেলেও সেদিনই পালিয়ে গেলাম বাঁকুড়ায়, ওখান থেকে প্রায় একচল্লিশ মাইলের মত দূরে।

পরদিন সকালে গেলাম বিষ্ণুপুরে দেখতে। এখানকার ইতিহাস খুব বেশি পুরনো। তাই একটু গা ছমছম করে। সেই পুরোনো রাসমঞ্চ, জোড়ামন্দির, রাধা-মাধবের মন্দির, সিরাজের সমাধি, মুর্শিদ-কুলি খাঁর সমাধি, এখানে এলে মনে হয় এই বিশাল ইতিহাসের মেলায় আমি কত ক্ষুদ্র, আমার কিছুই দেওয়ার নেই, আমি শুধু পারি ঝটপটিয়ে উড়ে যাওয়া চামচিকে-গুলোকে অবাক হয়ে দেখতে, জাফরি ইঁটে অপূর্ব কারুকার্যের গায় কান পেতে বুক ফাটা 'হায় হায়' শুনতে। বিষ্ণুপুরে একদিন ছিলাম, পরদিন রওনা দিলাম খড়গপুর। এখানে পুলিশ চীফ শ্রীখান আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন পুলিশ ইন্সপেকসন বাংলোয়। অপূর্ব ভদ্রলোক শ্রীখান। আমাদের নিয়ে বেরোলেন তার নিজের গাড়ীতে বসিয়ে ওখানে রেলওয়ে ওয়ার্কসপ দেখাতে। তার-পর আমরা খড়গপুরে টাউনটা ঘুরে দেখলাম। এত অদ্ভুত রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর, যে অবাক হয়ে যেতে হয়, সব দেখে-শুনে বেশ রাতে ফিরলাম। পরের দিন আমাদের যাবার সময় পুলিশের এতবড় অফিসার ভদ্রলোক খুব মনমরা হয়ে গেছিলেন, কিন্তু যেতে যে আমাদের হবেই। তাই বিদায় নিয়ে চললাম। এবার কলেজে ফেরার পালা। খাবার দাবার যা ছিল ফুরিয়ে গেছে, সঙ্গের টাকাও কমে এসেছে। যত বাড়ী কাছে আসছে তত মন টানছে। আর মনের কোণায় গাদাগাদা কথা জমে উঠছে বাড়ী পৌঁছেই হুড়হুড় করে বলার জন্য। সেদিনকার মত আমরা বেলুড় গেলাম, সেখানে মঠে রাত্রে থেকে পরের দিন এগারটার সময় কলেজে ফিরে এলাম। হয়ে গেল বাংলাদেশ ঘোরা, কিন্তু যে নেশা মনে লেগেছে তাকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ব কোনোদিন সুযোগ পেলেই, হয়ত ভারত ভ্রমণে হয়ত বিশ্ব-ভ্রমণে।

আলোর বৃত্তে

অভ্যুদয়

নাট্যচর্চা যে দেশে আছে সেখানে প্রায় প্রতিদিনই বলিষ্ঠ পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন ধরণের নাট্যগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়ে থাকে। সুরুতে থাকে প্রচন্ড উদ্যম, আর সীমাহীন স্বপ্নের বিহ্বলতা। কিন্তু সামনের পথে পদক্ষেপ চিহ্নিত করার সময় দেখা দেয় অনেক ঝড়, অনেক অন্ধকার। এই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেশীর ভাগ গোষ্ঠীই নিজেদের অস্তিত্বকে পূর্ব প্রতিশ্রুতির প্রদীপ্ত আলোয় প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে পারে না; স্বাভাবিক ভাবেই নাট্যানুশীলনের আবেগ স্তিমিত হয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় বিস্মৃতির বিষন্নতায়। এই সত্যটি বাংলা দেশের নাট্যানুরাগীদের কাছে ধরা পড়েছে বহুবার। কিন্তু এই মুছে যাওয়া যেমন সত্য, তেমনই বিরুদ্ধ শক্তির রূঢ়তা মুছে দিয়ে স্বকীয়তার দীপ্তি অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা তার চেয়ে আরো গভীরতর অর্থের দ্যোতনা আনে এবং এর মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা হয়ে ওঠে উদ্বেল। বাংলাদেশে যে সব নাট্যসংস্থার প্রয়াস আর নিরীক্ষার মধ্যে এই সত্যের এক সুষ্ঠু রূপ বিধৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে অভ্যুদয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ আঠারো বছরের কতো ক্লান্ত দিন আর রাত অতিক্রম করে আজকে 'অভ্যুদয়' আমাদের চোখের আলোয় আর অনুভবের গভীরতায় জেগে আছে।

সময়টা ছিল ১৯৫০। ক'লকাতায় তখন নতুন ধরনের নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। বহুরূপী, গণনাট্য-সংঘ, নাট্যচক্র, উত্তরসারথী প্রভৃতি দল নতুনতর চিন্তায় বাংলা নাটককে অর্থময় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। পেশাদার মঞ্চের গতানুগতিক নাট্যাভিনয়ের রীতিকে ভেঙে নতুন আঙ্গিকে নাটককে মঞ্চে পরিবেশন করার প্রয়াস চলেছে উদ্দাম বেগে। কিন্তু বরাহনগরে তখনো নাট্যানুশীলনের এই ঢেউ এসে দোলা জাগায়নি, তখনো সেখানে পরিচিত রীতিতেই নাট্যাভিনয়ের রেওয়াজ। ঠিক এই সময়ে 'অনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, গোবিন্দ মৈত্র, শৈলেন ঘোষ, কিরণ মৈত্র প্রভৃতি কয়েকজন নাটক-পাগল লোক মনে করলেন বাংলাদেশের চারদিকে ব্যাপ্ত নাট্যযোজনার নতুন ঢেউকে বরাহনগরে নিয়ে আসতে হবে, সেখানকার জনসাধারণকে জীবন সমৃদ্ধ নাটকের অভিনয় দেখতে উৎসাহিত করতে হবে। কিছুদিন পর এই মনে হওয়া ব্যাপারটা আরো কয়েকজন উৎসাহী লোকের সহমর্মিতায় একটা বাস্তব রূপ নিলো। প্রতিষ্ঠিত হোল 'অভ্যুদয়' (১৯৫১)।

দল তো তৈরী হোল। কিন্তু নাটক হবে কি? প্রশ্নটা সভ্যদের খুব বেশী করে ভাবালো না, কারণ কিরণ মৈত্র একটি নাটক লিখলেন। নাটকের নাম 'নাটক নয়'। আলমবাজার বাগচীবাটী মঞ্চে এই নাটকটি মাত্র ত্রিশ টাকা ব্যয়ে অভিনীত হোল। এর পর থেকে অনেক জায়গা থেকে এই নাটকটি অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ আসতে থাকলো। নাটক ভালোভাবে তৈরী করতে গেলে একটি নির্দিষ্ট মহলা কক্ষের দরকার। কিন্তু মহলা দেবার জায়গা নেই। কখনো হয়তো বা জায়গা জুটলো, কিন্তু আলো নেই। এইসব অসুবিধার কাছে সভ্যেরা কিছুতেই পরাভব স্বীকার করলেন না। এখানে সেখানে মহলা দিয়ে নাট্যচর্চার আবেগ আর উদ্দীপনাকে সতেজ করে রাখলেন। 'থিয়েটার সেন্টারে' তখন একাংক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। 'অভ্যুদয়ের' শিল্পীরা স্থির করলেন ক'লকাতার বিভিন্ন প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হোতে হোলে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে।

প্রতিযোগিতায় একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেলো। কিরণ মৈত্রের 'আয়না' নাটক অভিনয় কোরে তৃতীয় স্থান পেলো 'অভ্যুদয়'। সময়টা ছিল ১৯৫৬। পরের বছর ১৯৫৭ সালে শ্রীমৈত্রের 'বুদ্বুদ' নাটক মঞ্চস্থ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো অভ্যুদয়। সেই সূত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-সংস্থা হিসেবে গোষ্ঠী পরিচিত হোল। এই পরিচিতি আরো গভীরতরভাবে প্রসারিত হোল। গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতায় এঁরা যোগ দিলেন। কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা' নাটক অভিনয় এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো 'অভ্যুদয়'। নাটকটির বলিষ্ঠ বক্তব্য ও প্রয়োগ-পরিকল্পনার অভিনবত্ব সাধারণ মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। এই সময়েই পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদানের জন্য এই গোষ্ঠীর কয়েকজন শিল্পীর কাছে আহ্বান এলো। আর্থিক কারণে তাঁরা গেলেন সেখানে অভিনয় করতে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এঁরা নানা অজুহাতে গোষ্ঠীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছেন। এই ব্যাপারে দলের অন্যান্যরা একটু ব্যথিত হোলেও

নাম নেই আর একটি দৃশ্য

ভেঙে পড়লেন না, মানসিক যন্ত্রণার প্রহর অতিক্রম করে গোষ্ঠীকে আরো শক্তিশালী করে তোলার কাজে লেগে গেলেন। এর পরে 'অভ্যুদয়' সোসাইটি রেজেষ্ট্রীকৃত হয়েছে ও নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত আকাদামীর অনুমোদন পেয়েছে।

এরপর থেকে সুপরিকল্পিতভাবে 'অভ্যুদয়ের' শিল্পীরা অভিনয় করে চললেন। একের পর এক নাটক অভিনীত হোতে লাগলো। মঞ্চে এলো কিরণ মৈত্রের 'চোরাবালি', 'অন্ধকারায়', 'কোথায় গেলো', 'অমোঘ', 'নাম নেই', 'মায়ের ডাক', 'সংকেত', 'বিশ পঞ্চাশ', 'তৃষ্ণা'; রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'নিষ্কৃতি', 'আশ্রমপীড়া' 'সংক্ষিপ্ত বিচার', 'গুরুবাক্য'; মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম'; বনফুলের 'শিককাবাব'; পরিমল দত্তের 'ব্যান্ডমাস্টার' ও রমেন লাহিড়ীর 'মনের বনে ফাল্গুনে'।

এইসব নাট্যপ্রযোজনার মধ্যে যে-কটি নাট্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হোল 'অন্ধকারায়', 'কোথায় গেলো', 'বিশ-পঞ্চাশ', 'মায়ের ডাক', 'নাম নেই', 'তৃষ্ণা', 'মীরকাশিম', 'শিককাবাব' ও 'মনের বনে ফাল্গুনে'। কয়েকটি নির্যাতিত অন্ধমানুষের ক্লান্ত জীবনের কথা বিধৃত হয়েছে 'অন্ধকারায়' নাটকে। অন্ধকার ঘরে দারিদ্র্যের শত লাঞ্ছনা সহ্য করেও মানুষ আশা করে—কেউ আসুক, আলোর উজ্জ্বলতায় অন্ধকারের কাঠিন্য মুছে যাক। মানবজীবনের এই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার কথাও নাট্যকার ধ্বনিত করেছেন এই নাটকে। 'কোথায় গেলো' একাংকে দুটি নিঃসহায় যুবকের বেদনাকে কেন্দ্র করে একটি সুস্থ চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। একশ' বছর পরে দেশ ও মানুষের মনে সামাজিক অবস্থাটি কেমন দাঁড়াবে তাকে আশ্রয় করে এক কল্পিত কাহিনী প্রহসনের আধারে পরিবেশিত হয়েছে 'বিশ-পঞ্চাশে'। 'অভ্যুদয়ে'র একটি দেশাত্মবোধক নাট্যপ্রয়াস হোল 'মায়ের ডাক'। দেশের সংকটকালে দেশাত্মবোধক নাটকাভিনয়ে এ'রা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। সেদিনকার সবাই স্বীকার করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে যে-কটি সংস্থা দেশাত্মবোধক নাটক প্রযোজনায় অবতীর্ণ হয়েছেন, 'অভ্যুদয়' তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

'নাম নেই' নাটকে প্রযোজনা অভ্যুদয়ের একটি স্মরণীয় প্রয়াস। এই নাটকে চিরাচরিত প্রথায় নাটকের যে আঙ্গিক, তাকে ভাঙবার চেষ্টা রয়েছে এ-নাটকে। মঞ্চের বিভিন্ন কোণ ও প্রেক্ষাগৃহ থেকে চরিত্রগুলো প্রবেশ করেছে রঙ্গভূমিতে। মঞ্চায়নে ফ্রীজ রীতি ও বর্তমানের সঙ্গে অতীতের টেলিস্কোপিং পদ্ধতি ব্যবহার করে আঙ্গিকে নতুনত্বের নির্দেশ দিয়েছেন 'অভ্যুদয়ে'র নির্দেশক। এই নাটকে ধারাবাহিকভাবে কোন ঘটনা নেই। 'একটি মানুষের অবচেতন সত্তার গভীরে সদাজাগ্রত অপরাধবোধ থেকেই নিয়ন্ত্রিত বা প্রতিফলিত কিছু ঘটনা, কয়েকটি চরিত্র ও ব্যঞ্জনাময় কিছু সংলাপের সাহায্যে গল্প গেঁথে তোলা হয়েছে।' 'তৃষ্ণা' নাটকে মাতৃত্বের কামনায় উদ্বেল একটি নারীর হৃদয়বেদনাকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। একজন নিরক্ষর অসহায়া নারীকে ঘিরে কয়েকজন মানুষের উপভোগকামিতা এবং শেষে আত্মহত্যার মধ্যে হতভাগিনীর জীবনাবসানের কাহিনীকেই তুলে ধরা হয়েছে 'শিককাবাব' নাটকে।

আধুনিক মননশীলতার এক সফল নাট্যপ্রয়াস হোল 'মনের বনে ফাল্গুনে'। আজকের যুগযন্ত্রণা আর নিষ্ঠুর জীবনযাত্রার আবর্তের মধ্যে দুটি যৌবন পরস্পরের সঙ্গে মিলতে চেয়েছিল, এ'দের আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণাই নাটকের মূল সুর। 'অভ্যুদয়ে'র আগামী নাটক কিরণ মৈত্রের 'অন্য ছায়া'। যেসব ছেলেরা রকে বসে দিন কাটায়, তাদের নিয়ে লেখা এই নাটক। 'অভ্যুদয়ে'র শিল্পীরা 'বোম্বে', 'ঘাটশীলা', 'ধানবাদ', 'বর্ধমান' প্রভৃতি জায়গায় অভিনয় করে এসেছেন।

নাটক অভিনয় করা ছাড়া এ'রা নাট্যোন্নয়নমূলক বিভিন্ন ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। নাট্যশিল্পের সার্থক রূপের সঙ্গে পরিচিতি লাভের জন্য এ'রা একটি নাটক পাঠাগারের ব্যবস্থা করেছেন। নাট্য-বিষয়ক অনেক আলোচনারও ব্যবস্থা আছে। 'অভ্যুদয়ে'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে (১) বরাহনগর-কাশীপুর অঞ্চলে একটি স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করা, (২) নাটক সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশ, (৩) নাট্য-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, (৪) নাটকের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করা। এ'রা বলেন "নিছক নাটকই 'অভ্যুদয়ে'র পেশা নয়, নেশাও নয়। অভ্যুদয় চাইছে সমাজের সংস্কার। তাই যা-কিছু পুরাতন, জরাজীর্ণ, তাকে পরিত্যাগ করে সমাজকে নতুন পথে চালিত করতে অভ্যুদয় সচেষ্ট।"

নাটক নির্বাচন ব্যাপারে শ্রীকিরণ মৈত্র বলেছেন, অভ্যুদয় সব সময়েই সমাজ-সচেতন ও জীবন-সচেতন নাটক করেছে।

নাট্য-প্রযোজনা প্রসঙ্গে শ্রীমৈত্র বলেছেন, 'প্রোডাকশন-এর ক্ষেত্রে প্রথম যেটার দিকে আমি বেশী নজর রাখতে চাই, সেটা হোল ঠিক চরিত্রে ঠিক শিল্পী নির্বাচন। আমি মনে করি, এ-কাজটা যদি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে করা যায়, তাহোলে 'বিদেশী নাটক অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী', বলেছেন শ্রীমৈত্র।

যেসব অসুবিধার মধ্যে 'অভ্যুদয়'কে চলতে হয়, সে সম্পর্কে শ্রীমৈত্রের বক্তব্য হোল : 'নাট্যসংস্থা চালাতে গিয়ে যার অভাব আমরা প্রচণ্ড অনুভব করি, সেটা হোল মঞ্চের। আজ মুক্ত অঙ্গনের মতো ছোট ছোট মঞ্চ কলকাতা শহরে অন্ততপক্ষে চারটি দরকার। বেশি ভাড়ায় বড় মঞ্চে নাটক পরিবেশন করার মতো আর্থিক সামর্থ সাধারণ সংস্থাগুলোর নেই অথচ এ'দেরই হাতে নাট্য-আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে 'অভ্যুদয়' আঠারো বছর অতিক্রম করে এসেছে। মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়েছেন শিল্পীরা, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। নতুন উদ্যমে আবার এগিয়েছেন, নাটকের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগই দিয়েছে এ-উদ্যম।

—দিলীপ মৌলিক

রেডিওতে প্রধানত দুই শ্রেণীর কর্মচারী আছেন। এক শ্রেণীর কর্মচারী খাস সরকারী কর্মচারী, আর এক শ্রেণীর কর্মচারী চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী—তাঁদের বলা হয় স্টাফ আর্টিস্ট। প্রোগ্র্যামের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁরা স্টাফ আর্টিস্ট। এই স্টাফ আর্টিস্টদের আবার বিভাগ আছে। এক ভাগ নেপথ্যে থেকে প্রোগ্র্যাম প্রোডাকশনে সাহায্য করেন, আর এক ভাগ একেবারে শ্রোতাদের সামনে এসে হাজির হন, তাঁদের নিয়েই প্রোডাকশন—তাঁরা গান গান, বাজনা বাজান, অভিনয় করেন, আলোচনা করেন, কথিকা পড়েন, ঘোষণা করেন, আসর-মহল পরিচালনা করেন, নাটক-নকশা প্রযোজনা করেন...।

এই শ্রেণীভুক্তদের স্টাফ আর্টিস্টদের অডিশন দিয়ে পাস করে তারপর চাকরিতে বহাল হতে হয়। শুধু গানের জন্য স্টাফ আর্টিস্ট কলকাতা বেতারকেন্দ্রে একজনও নেই। যাঁরা অন্য কাজ করেন অথচ গান জানেন তাঁরাই শখ করে এখানে গান গেয়ে থাকেন, এবং তার জন্য তাঁদের অডিশন দিয়ে পাস করে নিতে হয়। শুধু অভিনয়ের জন্য স্টাফ আর্টিস্ট কলকাতা বেতারকেন্দ্রে আছেন। ঠেকা-বেঠেকায় তাঁরা নাটকে-নকশায়-রূপকে অভিনয় করার জন্য তৈরি থাকেন। বাইরের কোনো আর্টিস্ট হঠাৎ কোনো কারণে হয়তো আসতে পারলেন না, তাঁর একার জন্য রেকর্ডিং তো আর বন্ধ থাকবে না, অন্য আর্টিস্ট 'বুক' করারও হয়তো সময় নেই তখন এই স্টাফ আর্টিস্টরাই ঠেকা কাজ চালিয়ে দেন, এবং তার জন্য তাঁদের অডিশন দিয়ে পাস করে চাকরিতে ঢুকতে হয়। আবার যাঁরা ঘোষক, কথক, আলোচক তাঁদেরও অডিশনে পাস করাটা আবশ্যিক। অর্থাৎ রেডিওর স্টাফের যাঁরই কণ্ঠস্বর প্রচারিত হবে—তা সে যেভাবেই হোক—তাঁকে আগে অডিশনে পাস করে নিতে হবে। এখানে অডিশন মানে পরীক্ষা—কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা। এই কণ্ঠস্বরের পরীক্ষায় পাস না করে মাইক্রোফোনে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারবেন না—এই হচ্ছে নিয়ম। এই নিয়মটা খুবই দরকারী, কারণ সকলের কণ্ঠস্বর মাইক্রোফোনের উপযুক্ত নয়। মাইক্রোফোনের অনুপযুক্ত কণ্ঠস্বর কখনও কখনও বীভৎস আকার ধারণ করতে পারে। অনেকের কণ্ঠস্বর এমনিতে ভালো, কিন্তু মাইক্রোফোনে বিকট। সুতরাং মাইক্রোফোনে পরীক্ষা না দিয়ে কারও কণ্ঠস্বর প্রচার না করার নিয়মটা যে ভালো তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নিয়মটা কেবল স্টাফ আর্টিস্টদের বেলায় প্রযোজ্য হবে কেন? খাস সরকারী কর্মচারী যাঁরা, যাঁরা প্রোগ্র্যাম প্রোডাকশনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন, যাঁদের কাজ শুধু কাগজ-কলম নিয়ে—তাঁরা যদি রেডিওয় অভিনয় করতে চান, কথা বলতে চান, কিছু পড়তে চান তাহলে তাঁদের অডিশন দিতে হবে না কেন? বিনা পরীক্ষায় তাঁদের কণ্ঠস্বর মাইক্রোফোনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে কিসের জোরে?

যতদূর জানা যায়, এই শ্রেণীর কর্মচারীদের কণ্ঠস্বর প্রচারের নিয়ম নেই। যদি কেউ শখ করে মাঝে-মধ্যে প্রচার করতে চান তাহলে অবশ্যই তাঁকে অডিশনে পাস করে নিতে হবে। কিন্তু এমনটা বড়ো কেউ করেন না। তাঁরা নামের মোহে, মাইক্রোফোনে বলার লোভে নিয়ম লঙ্ঘন করেন।

যেসব স্টাফ আর্টিস্টের কণ্ঠস্বর প্রচারের কথা নয়, যাঁদের কাজ শুধু কাগজে-কলমে, তাঁরাও লোভ সম্বরণ করতে না পেরে বিনা অডিশনে কণ্ঠস্বর প্রচার করে নিয়ম লঙ্ঘন করেন এমন দৃষ্টান্তও আছে।

বেশ কিছুকাল আগে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেকটার (এখন তিনি অন্যত্র আছেন) নাটক প্রযোজনা করতেন। নামেই তিনি প্রযোজনা করতেন, কাজে তাঁর সঙ্গে নাট্য বিভাগের প্রায় পুরো বাহিনীই থাকত। এ দৃশ্য প্রবন্ধকের স্বচক্ষে দেখা। অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টরের নাটক প্রযোজনা করার কথা নয়, এমনভাবে [illegible] তিনি করতেন—নিছক শিল্পপ্রেরণায় নয় [illegible]।

[illegible] সুরারোপ করতেন অল্প কিছু-দিন আগে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর (এখন তিনি কলকাতা থেকে [illegible]। তাঁর নাম শ্রী পি সি চক্রবর্তী)। ভদ্রলোক, যতদূর জানা যায়, প্রকৃত অর্থে শিল্পী ছিলেন। তিনি অবাঙালী অথচ বাংলার শিল্পকলায় তাঁর অসীম আগ্রহ। বাংলাদেশের শিল্পকলাকে তিনি ভালোবাসেন। সুতরাং তিনি যদি শ্রোতৃসমক্ষে উপস্থিত হন তাহলে তাতে খুশি হবারই কথা।

কিন্তু যাঁদের মধ্যে শিল্পপ্রেরণা বড়ো নয়, বড়ো নামের মোহ, তাঁরা যখন মাইক্রোফোনের সামনে হাজির হন তখন সেটা খুব সুখের মতো হয় না—তা তিনি স্টাফ আর্টিস্টই হোন আর খাস সরকারী কর্মচারীই হোন।

ইতিপূর্বে একজন মহিলা স্টাফ আর্টিস্ট—যাঁর কণ্ঠস্বর প্রচারের কথা নয়—এক রহস্যজনক কারণে প্রায় প্রতি-দিনই কিছু না কিছু প্রচার করে তাঁর নামটা শ্রোতাদের শোনাতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর মোটেই শ্রুতিমধুর ছিল না, তিনি কখনও অডিশন দিয়েছিলেন বলেও শোনা যায় নি। দিলে নিরপেক্ষ বিচারে পাস করতেন না, একথা হলপ করে বলা যায়। তবু কী করে তিনি দিনের পর দিন রেডিওয় কণ্ঠস্বর প্রচার করে শ্রোতাদের উত্যক্ত করতে পেরেছেন, অনেকের কাছেই তা গবেষণার বিষয়।

সম্প্রতি একজন মহিলা এগ্‌জিকিউটিভ অর্থাৎ খাস সরকারী কর্মচারিণী বিনা অডিশনে অবিরাম স্বীয় কণ্ঠস্বর প্রচার করে চলেছেন। ইনি শিশুমহলে আছেন, মহিলামহলে আছেন, গল্পদাদুর আসরে আছেন (৭ই মে গল্পদাদুর আসরে এক-নাগাড়ে ১৮ মিনিট তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর প্রচার করেছেন) এবং আরও অনেক কিছুতে আছেন। অবশ্য একথা সত্যি যে, তাঁর কণ্ঠস্বর মাইক্রোফোনের খুব অনুপযুক্ত নয়। কিন্তু তিনি এগ্‌জিকিউটিভ বলে বিনা অডিশনে নিয়মিত প্রোগ্র্যাম করবেন, স্টাফ আর্টিস্টদের কাজে হাত দেবেন, মানে যে কাজ যাঁদের করার কথা তাঁদের তা করতে না দিয়ে নিজে করবেন—এটা বোধ হয় ঠিক নয়। এবিষয়ে একটা সুস্পষ্ট নীতি থাকা দরকার।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৬ই মে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছোটোদের আসরে এক্স-রে সম্পর্কে বললেন শ্রীরমাপ্রসাদ সরকার। ভাষা সহজ, সরল—বলার ভঙ্গিটিও ভালো। তার চেয়েও বড়ো কথা, একটি কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয়কে তিনি ছোটোদের কাছে আকর্ষণীয় করে বলেছেন। এক্স-রে কীভাবে আবিষ্কৃত হল, কোন্ কোন্ কাজে তার ব্যবহার—তার মোটামুটি একটা ধারণা তাঁর কথিকা থেকে ছোটোদের এবং বিজ্ঞান না জানা বড়োদেরও হয়েছে বলে আশা করা যেতে পারে। এই রশ্মিকে বাংলায় কেন রঞ্জন রশ্মি বলে তা-ও তিনি সুন্দর করে বলেছেন। রোয়েন্টগেনের রঞ্জন হওয়া বেশ কৌতূহলপ্রদ বৈকি!

ছোটোদের আসরের পরে পল্লী বেতার গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানের স্থলে (রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় শোকের জন্য এদিন পল্লী বেতার গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিৎ উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের একটি ভাষণ প্রচারিত হল—'শিক্ষাব্রতী ডঃ জাকির হুসেন'। একজন শিক্ষাবিতের কাছে আর একজন মহান্ শিক্ষাব্রতী সম্পর্কে যে রকম ভাষণ আশা করা যায় ঠিক সেই রকম ভাষণই দিয়েছেন ডঃ সেন। ডঃ হুসেনের শিক্ষাব্রতের দিকটাকে তিনি শ্রোতৃসমক্ষে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, তাঁর বিদ্যাবত্তার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। এই রকম একটি ভাষণের আয়োজন করার জন্য বেতার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদার্হ।

১০ই মে সকাল ৮টায় শ্রীঅমর পালের শ্যামাসংগীতের অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান আরম্ভের পূর্বে সেই 'মহামান্যা' ঘোষিকা অনুষ্ঠানটিকে লোকগীতির (তিনি বোধ হয় লোকোগীতি বলতে পারেন না, তাই সর্বদা লোক্‌গীতি বলেন) অনুষ্ঠান বলে ঘোষণা করলেন। গান শুরু হবার পর বোধ হয় তিনি শ্যামাসংগীত আর লোকগীতির পার্থক্যটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই অনুষ্ঠানের শেষে শ্যামাসংগীত বললেন—অবশ্য পূর্বের ত্রুটির জন্য কোনো রকম দুঃখ প্রকাশ করলেন না, এমন কি ত্রুটিটা স্বীকার পর্যন্ত না।

১০ই মে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র প্রাণ-মন ঢেলে রবীন্দ্রসংগীত গাইছিলেন, তাঁর সুরে মনটা উদাস হয়ে গিয়েছিল। 'মহামান্যা' ঘোষিকার সেটা বোধ হয় ভালো লাগল না, তিনি শেষ গানখানি শেষ হবার আগেই কেটে দিলেন। তাঁর এই নিষ্ঠুর আনন্দের কী জবাব, জানা নেই।

এই 'মহামান্যা' ঘোষিকাই আবার ১৩ই মে বেলা সাড়ে ১২টায় গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে কেবল শ্রীপর্ণা ঘোষ আর পঙ্কজকুমার মল্লিকের রেকর্ড বাজিয়ে শেষের ঘোষণায় কী কারণে বলা মুশকিল হঠাৎ সুমিত্রা সেনের নামটাও যোগ করে দিলেন। এসব দেখার কি নেই রেডিও স্টেশনে? যাঁর যা খুশি করে যেতে পারেন এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে? জমিদারি সেরেস্তাতেও কোনো সাধারণ কর্মচারী এই রকম করতে পেরেছেন বলে জানা নেই।

১১ই মে বেলা ১টায় রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকটি শোনা গেল। নিবেদন করলেন 'রূপকার' গোষ্ঠী, নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। নাটকটি এমনিতে জমেছিল ভালো, অভিনয় সুন্দর—কিন্তু গানের অংশ আশানুরূপ নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের একটা মস্ত ভূমিকা থাকে, সেই ভূমিকা দুর্বল হলে নাটকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তার আকর্ষণ কমে যায়। এই নাটকে কতকটা তাই হয়েছিল।

১২ই মে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে শ্রীমতী ঋতু গুহর রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটি ভালো হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল, বলার উপায় নেই। কারণ, তাঁর গান দুখানি স্বাভাবিকভাবে বাজে নি — থেমে থেমে, কষ্ট করে করে বেজেছে। অস্পষ্টতাও ছিল প্রচুর। এটাকে রেকর্ডিংয়ের দোষ বলা ঠিক হবে, না প্রচারকালে যন্ত্রের বিরোধিতা?

এই দিন বেলা ৩টেয় শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানটি ভালো লাগল। বেশ দরদ দিয়ে গেয়েছেন তিনি।

১৪ই মে রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কীর্তন গানের শেষটা শোনা যায় নি, ১১টা বেজে যায় দেখে বোধ হয় কেটে দেওয়া হয়েছিল। না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবার সেই মহামান্যা ঘোষিকা নন—এবার আসরে ছিলেন এক ঘোষক।

১৫ই মে বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে একজন মহিলা জানালেন, পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্তি নির্মিত হয় একটি নিমগাছ থেকে। নিমগাছটির বয়েস দু শ বছর, এবং তার গায়ে 'শঙ্খচক্রগদাপদ্ম' আঁকা রয়েছে।—ভদ্রমহিলা কি বাঙালী? কিন্তু বাঙালীরা তো পদ্মকে কখনও পদ্‌ম বলে না!

অনেকদিন আগে বোম্বাইয়ে তৈরি একটা বাংলা ছবি দেখেছিলাম। তাতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন একজন নামকরা হিন্দী চলচ্চিত্রাভিনেতা। তিনি বাঙালী, এবং তাঁর পূর্বপুরুষরাও বাঙালী ছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক দীর্ঘকাল বোম্বাইয়ে থেকে এবং অসংখ্য হিন্দী ছবিতে অভিনয় করে বাংলা উচ্চারণ ভুলে গেছেন। ছবিতে তাঁর বাংলা উচ্চারণ শুনে তাই মনে হয়েছিল—তিনি বাস্ উচ্চারণ করেছিলেন বস্। বাঙালীরা বলে, 'এই বাসটা কোথায় যাবে?' আর হিন্দীভাষীরা বলে, 'ইয়ে বস্ কাহাঁ জায়গী?'

কথাটা মনে পড়ল পদ্মর উচ্চারণ পদ্‌ম শুনে। বাঙালীরা পদ্মকে পদ্দ বলে, হিন্দীভাষীরা বলে পদ্‌ম।—এই ভদ্রমহিলা দীর্ঘকাল রাজধানীতে থেকে হিন্দী বলে বলে 'রাজভাষা' হিন্দীর অনুসরণেই কি পদ্মকে পদ্‌ম বলেছেন; নাকি রাজধানীর কর্তাদের নির্দেশে বাংলার মধ্যে হিন্দী চালিয়ে হিন্দী প্রচার করছেন? রাজধানীর কর্তারা তো বিদেশেও হিন্দী প্রচারে মেতে উঠেছেন, হিন্দীকে একমাত্র ভারতীয় ভাষা হিসাবে জাহির করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীদের হিন্দীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে আদেশ দিয়েছেন।

কিলোমিটারে আর মাইলে পার্থক্য আছে কিছু? যাঁরা জানেন-শোনেন তাঁরা বলেন, আছে। কিন্তু দিল্লীর সংবাদ বিভাগ-এর জানা-শোনা আলাদা, তাই ১৫ই মে'র পূর্বোক্ত খবরে ঐ ভদ্রমহিলা ১১০ কিলোমিটার আর ১১০ মাইল সমান করে দেখালেন। পুরী থেকে জগন্নাথদেবের মূর্তি নির্মাণের ঐ নিমগাছটার গ্রামের দূরত্ব প্রথমে বললেন ১১০ কিলোমিটার, পরে ১১০ মাইল।

এই ভদ্রমহিলাই ১৭ই মে সকাল সাড়ে ৭টার খবরে পশ্চিমবঙ্গের আর-সি-পি-আই থেকে বহিষ্কৃত একজন সদস্যের নাম বললেন শ্রীআনন্দি দাস। খবরের কাগজের পাঠকরা ভদ্রলোককে অনাদি দাস বলেই জানেন। অনাদিকে আনন্দি করে ভদ্রমহিলা কতখানি আনন্দিত হয়েছেন তিনিই জানেন, কিন্তু ভদ্রলোক যে আনন্দিত হন নি একথা হলপ করে বলা যায়।...ভদ্রমহিলা এই খবরেই উড়িষ্যার বালেশ্বরকে বালাসোর বলে ঘোষণা করলেন। খবরের কাগজ যাঁরা পড়েন না তাঁরাও জানেন, বালাসোর ইংরেজীতে বলা হয়, জায়গাটার সঠিক নাম বালেশ্বর।

সুরসঞ্চয়নের "বর্ষাবসন্ত"

সম্প্রতি দেবব্রত বিশ্বাসের ভাবনার ধারানুযায়ী রবীন্দ্রসংগীত নির্বাচন এবং নৃত্যনাট্যে তার রূপায়ণ রবীন্দ্র সদনের এক রসঘন সন্ধ্যা অনুষ্ঠান যার জন্য 'সুর-সঞ্চয়ন' অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। এই গীতিনাট্য নিবেদকের মতে 'রবীন্দ্রসংগীত অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথের গানে অনুভূতির অসংখ্য পাখী সীমাহীন সুরের দিগন্ত আকাশে ডানা মেলেছে—গানে শোনা যায় তার কাকলী আর নৃত্যে ধরা দেয় তার ছন্দ।' বর্ষার পুঞ্জীভূত মেঘে সে কোন চিরবিরহীর অন্তহীন বিষণ্ণতার ছায়া দোলে সেই দোলা ব্যাপ্ত হয়ে যায় মানুষের মনে—বর্ষার অশ্রান্ত বারি-গুঞ্জনে অন্তরগহনের স্পন্দনী যেন কার ভাষা শোনে—যার সঙ্গে বহু যুগের পরিচয় অথচ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে তার দেখা মেলে না। যে সবচেয়ে আপনার হয়েও সবচেয়ে দূরের।

হেমন্ত, শীতের ধূসর দিনের রুক্ষতার পথচেয়ে আসে বসন্ত। তখন চঞ্চল ছন্দে হৃদয়বীণা বেজে ওঠে। আত্মবিস্মৃত বিরহ-বেদনার অবসানের লগ্নে ফাগুনের আগুন লাগায় উচ্ছ্বাসের উত্তাপ। ঋতুর পালা বদলের ছন্দে নৃত্য-গীতের রূপবদল এক অভিনব রঙ ও রসের মাধুর্যে মন ভরে দিয়েছে। এ অনুষ্ঠানের সেরা আকর্ষণ প্রথম থেকে শেষ অবধি দেবব্রত বিশ্বাসের গান। শ্রীবিশ্বাস কবির গানের যথাযথ সুর ও বিস্তার অনাহত রেখেও আপন ভাবকল্পনার গায়নশৈলীর কৌশলে বিচিত্র অনুভবের আলোছায়ায় যেন সপ্ত রঙের রামধনু এঁকে দেন শ্রোতাদের মনে। রবীন্দ্র-ধারানুসারী হয়েও গতানুগতিকতা বর্জিত তাঁর আত্মনির্বিষ্ট অন্বেষণের আলোয় যেন কবির গানের এক নব-দিগন্ত দুলে ওঠে রসিকের দৃষ্টিপাটে। এ তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি এবং এইখানেই তিনি অনন্য। তাঁর সেদিনের গাওয়া 'দ্বারে কেন দিলে নাড়া', 'হাটের ধুলোয় সয় না'—সারা প্রেক্ষাগৃহে যে ভাবের আকাশ মেলে ধরেছিল তা বিরল বলেই বুঝি এমন মধুর। তাঁর সুযোগ্যা শিষ্যা পদ্মিনী দাশগুপ্তের গানও সুখশ্রাব্য হয়ে উঠেছিল শিক্ষা ও আতিশয্য বর্জিত পরিবেশনার গুণে।

শান্তি বসুর নৃত্য পরিকল্পনা গানের ভাববস্তুকে যথাযথ প্রকাশ করতে পেরেছে। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জয়শ্রী লাহিড়ী। শুধুমাত্র সুদর্শনা বলেই নয়, এঁর গতিছন্দের সুষমা ভাবব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি, স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ ও হস্ত সঞ্চালনের পেলব মাধুর্য সংগীতের মর্ম-ভাবকে নয়নাভিরাম রূপ দিয়েছে। 'কোথা যে উধাও' নৃত্যের ভাবরূপ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আরতি গুপ্ত, ঝর্ণা দত্ত, শ্রীমতী দত্ত, সুনন্দা সেন-গুপ্ত, বিশাখা গুপ্তরায়, তপতী ঘোষাল, ভারতী দাস, পলি গুপ্ত, চম্পা, ধূর্জটি সেন, শান্তি বসু। সমবেত নৃত্যে মোটামুটি। আরতি গুপ্তের নৃত্যে ছন্দ আছে। কিন্তু নৃত্যের উপযুক্ত দেহ যাতে থাকে সেদিকে নজর না রাখলে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। শান্তি বসুর নৃত্যপরিকল্পনার সাফল্যের বিষয় প্রথমেই উল্লেখ করেছি। তাঁর একক নৃত্যগুলিও অনুশীলনের স্বাক্ষরযুক্ত। তবে পুরুষ ভূমিকায় তিনিই একা। তাই অবশ্যম্ভাবী একঘেঁয়েমো এড়াতে পারেননি। সম্ভবত এই কারণেই ধূর্জটি সেনের সাধারণ একটি নৃত্যও দর্শকদের অভিনন্দন-লাভ করেছে। কারণ মানুষের মন বৈচিত্র্য-সন্ধানী। নৃত্যরচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'হাটের ধুলায় সয়না', 'মোর বীণায়', 'তুমি কোন পথে যে 'এলে পথিক'—গানগুলি সমন্বয়ে ভাবের ক্রমপর্যায় অংকনে—সংগীত পরি-চালক নৃত্য পরিচালক উভয়েরই সমান কৃতিত্ব। যন্ত্র সংগীতে সুযোগ্য সম্পদের প্রশংসা পাবেন ওয়াই. এস মুলকী, দীনেশ চন্দ্র, নির্মল বিশ্বাস, চানুবাবু, রঞ্জিত বসু, বিপ্লব মন্ডল, কেশব মুখোপাধ্যায়।

পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়ের সজ্জা-পরিকল্পনায় বর্ণ-বিন্যাসের শিল্পশ্রী আমা-দের দৃষ্টি এড়ায়নি। কনিষ্ক সেনের আলোক-সম্পাত সুন্দর। ব্যবস্থাপনায় বাবুল বন্দ্যো-পাধ্যায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

আসাম হাউসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

আসাম হাউস রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে ১৭ মে আসাম হাউসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠান-সভাপতি শ্রীঅজিত বড়ুয়া। রবীন্দ্র-সংগীতে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী কৃষ্ণা বড়ুয়া, মায়া বরদলৈ, প্রদীপ দাশগুপ্ত, জয়ন্ত সেনগুপ্ত, দিলীপ দাস, সুধীর ঘোষ। আবৃত্তিতে ছিলেন সর্বশ্রী রমা দাশগুপ্ত, দর্পহারী পাল, প্রিয়লাল দাস, সুধাংশু সেনগুপ্ত ও দীপক গুপ্ত। দ্বৈত কণ্ঠসংগীতে শ্রীমতী মায়া বরদলৈ ও দিলীপ দাস প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুষ্ঠু সুন্দর রূপ আলোচনায় মেলে ধরলেন রণজিত মিত্র। যন্ত্র-সংগীতে রবীন্দ্র-সংগীত বাজিয়ে শোনান শ্রীনুলু বরদলৈ ও সম্প্রদায়। সর্বশেষ এবং প্রধান অনুষ্ঠান হোলো ববী ধরচৌধুরীর পরিচালনায় কবিগুরুর কাব্য-নাট্য "নরকবাসে"র চরিত্র-চিত্রণে ছিলেন মঞ্জু বসু, গীতালি মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি দত্ত ও সমরজিৎ গুপ্ত।

নজরুল জয়ন্তীর রেকর্ডগুচ্ছ

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু—প্রতিদিনের অন্তহীন দুঃখ-দৈন্যের হাহাকার সকাল-বেলার কাগজ খুললেই চোখে পড়ে। কিন্তু এই কোলাহলেরও অতলে কান পাতলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত—যে এ.কুণ্ঠ আকুতি শোনা যায়—তারই পল্লবিত বিস্তার বাংলা দেশের যুগজয়ী কবির কাব্যে। তপঃসিদ্ধ সাধকের মত বাইরের সকল সংঘাতকে জয় করে এঁরা চির-সুন্দরের অভিসারী। বার মাসে তের পার্বনের মত বিভিন্ন কবির গানের ডালি সাজিয়ে চলেছেন গ্রামোফোন কোম্পানী মানুষের অন্তরের চিরন্তন চাওয়াকে স্মরণ করে। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পর এল অনুজ কবি নজরুলের গীতিগুচ্ছ।

আটখানি রেকর্ডে রোমান্টিক গীতি-কাব্যের আবেগ-রঙিন ছবি বাংলার প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদের কণ্ঠে কবির স্পর্শকাতর মনটিকে তুলে ধরেছে।

প্রথমেই যে গানদুটির জন্য গ্রামোফোন কোম্পানী বিপুল অভিনন্দন পাবেন সে দুটি হোলো প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "পথহারা পাখী কেঁদে ফেরে একা" এবং "রুমঝুম রুমঝুম"। গানটি শুনে কানে বাজে মহাকবির দুটি চরণ 'পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে'—কারণ আজকের আবেগহীন, অনুভবকৃপণ জগতে যে হৃদয়োচ্ছ্বাসের কোনো দাম নেই অথচ যার গহণসঞ্চারী দাবী—মনকে উতলা করে তোলে শতকর্মেরও মাঝে সেই উচ্ছ্বাস-মুখর মূল্যবান কয়েকটি মুহূর্ত যেন কারুণ্যে মাধুর্যে শিল্পীর অতুলনীয় মধুর কণ্ঠে উচ্ছল হয়ে উঠে ধূসর মনকে সরস করে তোলে। প্রতিমার সুমার্জিত, শিক্ষিত কণ্ঠ ছাড়াও অনুভূতিপ্রবণ মনের ছোঁয়া লেগেছে। "পথহারা পাখী" শুনে মনে হোলো কথা ও সুরের সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সংগীতটি শিল্পী অন্তকরণ দিয়ে শুনেছেন বলেই কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে মেলাতে চাননি। তাই এমন গভীর অন্তর্মুখী রাগটি আপন স্বরূপে ফুটে উঠতে পেরেছে। গভীর বেদনা ঘনিয়ে আনার পর "রুমঝুম ঝুমঝুম" গানের ছন্দের দোলায় আরব্য-উপন্যাসের জগতে মনকে হাজির করে দেয়। "ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে তনুর তরোয়াল সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে পাথরকুচির হার।" কবির নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে অপরূপ নয় কি? সত্যিকারের শিল্পীর

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী-সরকার

কণ্ঠ-কৌশলটাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানীকে আবারো ধন্যবাদ।

ইলা বসুর "চেয়ো না সুনয়না" গানটির সম্ভবতঃ আগে ইন্দুবালার রেকর্ড ছিল। প্রবীণা শিল্পীর গাইবার ঢং পুরোপুরি বজায় রেখেও শ্রীমতী বসু নিজের ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। এতেও আছে "ভ্রমরের ধনু ফুল অতনু"—হয়ত ভ্রমর ধনু—নজরুলের প্রিয় উপমা—গান শোনার সঙ্গে কবির গীতিকাব্য অধ্যয়নের কাজও চলে তার দামই বা কম কি? অপর গান "সখী বোলো বঁধুয়ারে"—গানটিতে পিলুর সুন্দর রূপাভাস ফুটে উঠেছে।

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের "এই রাঙামাটির পথে লো"—"কে সেই সুন্দর আমি যার নূপুরের ছন্দ" শিল্পীর সতেজ-মধুর কণ্ঠে সুশ্রাব্য। প্রথম গানটি বহুদিন পরে "উত্তরায়ণ" চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সাঁওতাল রমনীর প্রাণোচ্ছ্বাস লোকগীতির ছন্দে—তার মধ্যে একটি চরণ "তার গলার মালার কুসুম ছিঁড়ে করব কানের ফুল"—কৌতুক-মধুরতা রীতিমত উপভোগের বস্তু।

ধীরেন বসুর কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনেছি, নজরুলগীতিও তরুণ গায়কের কণ্ঠে ভালই উতরেছে। গানদুটি হোলো 'খেলিছে জলদেবী' এবং 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন'। নজরুলপক্ষের বিশেষ রেকর্ড মানব মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে চারখানি গান "দাঁড়ালে না দুয়ারে মোর" "অরুণকান্তি কে গো যোগী" "কেন কাঁদে পরান" এবং "মুসাফির মোছ রে আঁখিজল"—মানবভক্তদের অবশ্যই আনন্দ দেবে।

ইলেকট্রিক গীটারে কাজী অনিরুদ্ধের বাজানো দুটি নজরুল-গীতির সুর এবং কাজী সব্যসাচীর উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি শোনবার মত।

আর একটি উপরি পাওনা হোলো স্বয়ং কবিকণ্ঠের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি।

একটি মহৎ কাজে উৎসগীত অনুষ্ঠান

সম্প্রতি কলকাতার বিভিন্ন অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠানের বালক-বালিকাদের আনন্দ দেবার জন্য এবং প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের মুক্ত অঙ্গনে এক মনোরম নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন শ্রীপ্রকাশ মালহোত্রা।

শ্রীমালহোত্রার পরীর মত ছোট সুন্দর তিন কন্যা সোনু, গীতা এবং মীরা মালহোত্রা ছিলেন সেদিনের শিল্পী।

অনুষ্ঠান শুরু হয় গীতা ও মীরার শাস্ত্রীয় সংগীত দিয়ে। শ্রীএ কাননের ছাত্রীদ্বয় স্বল্প পরিসরেও তাঁদের গানে সুশিক্ষার স্বাক্ষর রেখেছেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠান মারু থাপা পিল্লাই-এর ছাত্রী শ্রীমতী সোনু মালহোত্রার 'ভারত নাট্যম' নৃত্যানুষ্ঠান। তার নট্ট রাগ এবং মিশ্রম তালের আলারিপু এবং বসন্ত রাগ ও ত্রিস্রম তালের 'জাতিস্বরম' অবাধ দেখে আসতে পেরেছি। দুটি অংশেই শিল্পীর লয় দক্ষতা ও স্বচ্ছন্দ গতিশীলতা আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

●

নিউইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি নৃত্যের অধ্যাপিকা হয়ে যোগ দিয়েছেন শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীর শিক্ষণ বিষয়ের নাম 'নৃত্যের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন'। ভারতবর্ষে নৃত্যের জন্ম থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতীয় নৃত্যের একটি বিশদ আলোচনা ও মূল্য নির্ধারণ এই বিষয়টির উদ্দেশ্য। তাছাড়া ভারতীয় নৃত্যে ছন্দ, মুদ্রা ও অভিনয়ের ব্যবহারিক শিক্ষাদানও শুরু হয়েছে। মণিপুরী ও ভারতনাট্যম নৃত্যের অঙ্গসঞ্চালন এবং সাধারণভাবে তার ব্যবহার শেখানো হচ্ছে সেখানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গান্ধী শতবার্ষিকী উৎসবে গত ২৬ এপ্রিল শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে একটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানের পটভূমিকা ছিল দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরে চিত্রাবলী। রাবীন্দ্রিক নৃত্যানুষ্ঠানে ছিল গভীর স্পর্শকাতর কণ্ঠে সূত্রধরের আবৃত্তি। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী নিউইয়র্কে প্র্যাট ইনস্টি-টিউটে বক্তৃতা দিয়েছেন ও অনুষ্ঠান করেছেন। নিউইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীর লেখা "কথক নৃত্যের ইতিহাস ও আঙ্গিক" পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হচ্ছে। জানা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীর নৃত্যের উপর দুটি ভিডিও টেপ করা হয়েছে। দুটি চিত্রের নাম 'রেমিনিসেন্স অফ অ্যানসেন্ট ইণ্ডিয়া ইন ডান্সেস' ও 'ডান্সেস অন টেগোর্স সঙ্গ'। প্রথমটিতে উড়িষ্যা ও তাঞ্জোরের মন্দিরভাস্কর্যের পটভূমিকায় ওড়িষী ও ভারতনাট্যম নৃত্য ও দ্বিতীয়টিতে রবীন্দ্রনাথের নটরাজবন্দনা দিয়ে ঋতুচক্রের নৃত্যানুষ্ঠান ও তৎসহ প্রাচীন রাগরাগিণীর চিত্রকলার পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ঋতুবদলের সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ নৃত্যভঙ্গিমায় দেখান হয়েছে।

সংগীত আসর

সম্প্রতি 'সংগীত আসরের' উদ্যোগে কাশিমবাজার বিদ্যালয়ে সারা রাত্রিব্যাপী এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আসরের অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাড-ভোকেট সুহৃদগোপাল দত্ত।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পূরিয়া ও ধানেশ্রী রাগে খেয়াল ও ঠুংরী গেয়ে শোনান স্নিগ্ধা কুণ্ডু। ঐদিন অনুষ্ঠানে ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করেন সঙ্গীতা-চার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল, বন্দনা চক্রবর্তী, বাগেশ্রী রাগে খেয়াল ও ঠুংরি এবং পরে ভজন গেয়ে শোনান, দ্বৈত কণ্ঠে প্রথমে মালকোষ ও পরে ভাটিয়ার রাগে খেয়াল ও ঠুংরি গেয়ে শোনান রবীন চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ সুর।

যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠানে নন্দকোষ রাগে সেতার বাজিয়ে শোনান রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শচীন পাল হেমন্ত রাগে সরোদ বাজিয়ে শোনান, সেতারে নটভায়রো ও পরে ভৈরবী ঠুংরী বাজিয়ে শোনান অমলেন্দু চৌধুরী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দেবু চট্টোপাধ্যায় ও জগন্নাথ দাস।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রমোদকর রহিত করুন······

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের খ্যাতি পৃথিবী জুড়ে। ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বিশ্বের দরবারে বিশিষ্ট স্থান করে দিতে তাঁর ভূমিকা শুধু অবিস্মরণীয় নয়, ঐতিহাসিকও বটে। তাঁর প্রতিভার আর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমানে প্রদর্শিত ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। শিশু-সাহিত্যের গৌরব উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর জন্মশতবর্ষেই তাঁর অসামান্য সৃষ্টি 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর চিত্ররূপ দেবার পরিকল্পনা করেন তাঁরই পৌত্র শ্রীসত্যজিৎ রায়। এবং তা চিত্রভাত করে শ্রীসত্যজিৎ রায় উপেন্দ্রকিশোরের প্রতি জাতির শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করেন।

গুপী গাইন বাঘা বাইন শিশুমনের অপরূপ কল্পনার ছবি হিসেবে ইতিহাস তৈরি করল। বয়স্কদের কাছেও এর আবেদন বয়স আর দেশকালের গণ্ডি পেরিয়ে। এমন আশ্চর্য ছবির জন্যে আমরা সত্যজিৎ রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তাই এই ছবিটিকে প্রমোদকরের বাঁধন থেকে মুক্ত করবার আবেদন জানাই পশ্চিমবাংলার সরকারের কাছে।

ছড়াটি বলেছিল রাঙা বৌদি গান-বাজনার ওস্তাদ ননীকে যে হচ্ছে বি কে প্রোডাকসন্স নিবেদিত ও সুশীল মজুমদার পরিচালিত **"শুক-সারী"** ছবির নায়ক। ননী ঠাকুর গড়ে; সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের বাঁশিও গড়ে। বাঁশি গড়ে, আর বাজায়: বাজায় আর গান গায়। জমি জারাত বিষয় আশয়ের দিকে তার তাকাবার প্রবৃত্তি নেই, সময়টা যাত্রা করে, যাত্রার মহলা দিয়ে কাটে ভালো। গিরির কথা তার মনেই ছিল না। কোন্ ছেলেবেলায় বিয়ের রাতেই কি একটা গণ্ডগোলের ফলে নতুন বৌকে ফেলে রেখেই ওর বাপ ওকে নিয়ে চলে এসেছিল: সেই থেকে গিরি বাপের বাড়ীতেই পড়ে আছে। কথাটি মনে পড়িয়ে দিল লোটনদার বৌ; রাঙাবৌদি ছড়া কেটে বললে: বাপের বাড়ী থাকে বৌ, স্বামীর মনে সাগরের ঢেউ। সেজেগুজে ননী গেল বৌকে নিয়ে আসতে। নিজের বৌকে চিনে নিতে তার দেরী হল না। পুকুরঘাটে তাকে দেখে সে গেয়ে উঠল: কাদের কুলের কন্যে তুমি? কোন্ গোকুলের ললনা? আনন্দে দুজনেই আত্মহারা হয়ে উঠল। গিরি চলে এল ননীর সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে। বৌকে সঙ্গে করে মেলা থেকে ননী শাড়ী ধুতি থেকে শুরু করে হাঁড়ি, কুলো ধামা—সবই কেনে। খুশীতে দুজনেরই মন ভরপুর। কিন্তু এই খুশী বেশীদিন রইল না। শিগগিরই গিরি আবিষ্কার করল সংসারে ননীর মন

বাপের বাড়ী থাকে বৌ
সোয়ামীর মনে সাগরের ঢেউ

নেই, এমন কি তার দিকেও; সে শুধু বাঁশি আর গান আর যাত্রা নিয়েই মত্ত। বাঁধিয়ে দিল ঝগড়া—দিল উনুনের মধ্যে চালিয়ে ননীর বাঁশির গোছা। ননী একেবারে থ'। সে মনে মনে ঠিক করল গিরি যা চায়, তাই হবে। ছেড়ে দিল সে বাঁশি বাজানো, ছেড়ে দিল গান গাওয়া; শুরু করল বিষয়-সম্পত্তি দেখা, হল ঘোরসংসারী। কিন্তু আনন্দ বিদায় নিল, শুকিয়ে গেল দুজনেরই মন। দুঃখের সাগর পেরিয়ে আবার দুটি মন কোন্ সোনার কাঠির পরশে জেগে উঠল, তাই নিয়েই ছবির শেষের দৃশ্যগুলি রচিত।

এই কাহিনী অবলম্বনে পীযূষ বসু কৃত চিত্রনাট্যটিকে সেলুলয়েডে রূপান্তরিত করেছেন পরিচালক সুশীল মজুমদার। ছবির প্রথমাংশটি ব্যয়িত হয়েছে নায়ক ননীর চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যাপারে। সে যে তার বিষয়সম্পত্তির প্রতি নজর না দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে, গান গেয়ে এবং যাত্রা করে দিন কাটায়, এই তথ্য প্রতিষ্ঠান করতে গিয়ে যাত্রার মহলা উপলক্ষ্যে পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ প্রভৃতি কিছু কিছু অবান্তর বিষয়ের অবতারণার ফলে মূল কাহিনীটি দানা বাঁধতে অযথা বিলম্ব ঘটেছে। যখন ননী বৌকে নিয়ে যাবার জন্যে শ্বশুরবাড়ীতে হাজির হয়েছে এবং গিরিকে চিনতে পারার পরে গান ধরেছে, তখন থেকেই ছবিটি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে এবং নায়ক-নায়িকার মনের আনন্দ দর্শকদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। কিন্তু যেখান থেকে বিরোধের শুরু, গান-বাঁশি পাগল ননীর সংসার-বিমুখতা যেখানে গিরিকে ননীর প্রতি বিমুখ করে তোলে, ঐ বিরোধের অংশটির তীব্রতা আরও সুপরিস্ফুট, আরও মর্মভেদী হওয়ার অবকাশ ছিল। স্বামী-সঙ্গকামী গিরির সামনে যাত্রাদলের নতুন কেষ্ট শ্রীমান কড়ির আবির্ভাব এবং তার প্রতি গিরির ক্ষণিক মোহ ও পরে মোহ-ভঙ্গের দৃশ্যগুলি প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে দ্রুতলয়ে এসেছে। এখানে ঐ দৃশ্যগুলির মাঝে মাঝে গিরির আকুতি সত্ত্বেও ননীর নিস্পৃহতাকে চিত্রায়িত করলে কড়ির প্রলোভনে গিরির আত্মবিস্মৃতির ট্র্যাজেডি ঢের বেশী তীব্রতর হয়ে উঠত এবং ফলে ননী ও গিরির মানসিক পুনর্মিলনও দ্বিগুণভাবে উপভোগ্য হতে পারত।

নায়ক-নায়িকারূপে উত্তমকুমার এবং অঞ্জনা ভৌমিক তাঁদের সাবলীল অভিনয় দ্বারা অনায়াসেই দর্শকচিত্ত জয় করতে পেরেছেন। এঁরা ছাড়া আর যাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁরা হচ্ছেন সুব্রতা চট্টো-পাধ্যায় (রাঙাবৌদি), রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(লোটনদা), স্বপনকুমার (কড়ি), সুখেন দাস, শেখর চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এতে গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টি; এ-ব্যাপারে শিল্প-নির্দেশক সুনীল সরকার অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটিতে ছোটবড়ো অন্তত আঠারোখানি গানের সমাবেশ ঘটেছে। এর মধ্যে মাত্র দুখানি মুকুল দত্তের এবং বাকী ষোলোটি মোহিনী চৌধুরীর রচনা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কৃত সুরসৃষ্টি। ছবিটির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছুটা লিরিক্যাল মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। চিত্রনাট্যটি যদি আরও সুসংহত-ভাবে ছন্দোবন্ধ হত, তাহলে এই লিরিক্যাল মেজাজ "শুকসারী" ছবিটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলত।

ভোলানাথের প্রেম

অদৃষ্টের কি পরিহাস! যে মুখ্যু, জংলী লোকটার ছিপের বঁড়শী মাথায় বাঁধা রুমালে আটকে যাওয়ার জন্যে আধুনিকা সুন্দরী বিন্দু তাকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল, সেই বোকা ভোলানাথ-টাই কিনা এসে জুটেছে তাদের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীটিতে! আর এসেই কিনা শ্রীমান ভোলানাথ বিন্দু প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছে! ধরে চড় কসিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও লোকটির লজ্জা নেই। কিন্তু হঠাৎ বিন্দুর মাথাটা ঘুরে গেল: সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল লোকটির গান গাইবার ক্ষমতা অদ্ভুত। সে অনায়াসে তার দক্ষিণী মাস্টারজীকে গান গেয়ে কুপোকাৎ করে দিল! শ্রীমান ভোলনাথের গান গাইবার শক্তি বিন্দুকে করল অভিভূত। বিন্দু স্থির করে ফেলল: বিয়ে করতে হয়ত ভোলানাথের মতো ছেলেকেই। কিন্তু বিন্দু প্রচণ্ড ধাক্কা খেল, যখন সে তার এক বান্ধবীর সহায়তায় জানতে পারল ভোলানাথ আদৌ গান জানে না: সে শুধু ঠোঁট নাড়ে, আর তার পিছন থেকে তার 'গুরু' গান গায়। ছি-ছি, এইভাবে লোকঠকানো! এইরকম জুয়োচুরি!

পড়োসান/সায়রাবানু, মেহমুদ

বিন্দু মরীয়া হয়ে উঠল। যে দক্ষিণী মাস্টারজীর প্রেমনিবেদন তাকে একদিন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সেই নিকষ কালো মাস্টারজীকেই সে বিয়ে করবে বলে ঘোষণা করল। বিয়ের রাতে মাস্টারজী যখন ঘোড়ায় চেপে বিয়ে করতে হাজির, সেই সময়ে পাশের বাড়ীতে উঠল মড়াকান্না। বিন্দু কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভোলানাথ দিয়েছে গলায় দাড়ি। রইল বিয়ে পড়ে। বিন্দু গিয়ে আছড়ে পড়ল ভোলানাথের বুকে—তাকে ভালোবেসে ভোলানাথের এই পরিণাম! —না, ভোলানাথ মরেনি; অতএব ভোলানাথ ও বিন্দুর হল মিলন।

সেই বহুদিন আগে-দেখা সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "পাশের বাড়ী"র ইস্টম্যান কলার রঞ্জিত হিন্দী সংস্করণ, মেহমুদ প্রোডাকসন্স নিবেদিত ও জ্যোতি-স্বরূপ পরিচালিত "পড়োসান" ছবিটির কাহিনীর এই হচ্ছে সারমর্ম।

সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনের যা-কিছু প্রয়োজন, নয়নানন্দকর দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা, কর্ণকুহর পরিতৃপ্তিকর গীতাবলী, প্রধান চরিত্রগুলির স্বচ্ছন্দ সুঅভিনয়, সুষ্ঠু আবহসংগীত—কিছুরই অভাব নেই "পড়োসান" ছবিটিতে।

নায়ক ভোলানাথ ও নায়িকা বিন্দুবেশে সুনীল দত্ত ও সয়রা বানু অত্যন্ত সাবলীলভাবে তাঁদের গৃহীত চরিত্র দুটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। ভোলানাথের উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী গুরুর ভূমিকায় কিশোরকুমারের আশ্চর্য প্রাণবন্ত অভিনয় ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ। দক্ষিণী

মাস্টারজীরূপে মেহমুদ বাচনে, বেশভূষায়, গীতে ও ভঙ্গীতে একটি অভিনব এবং নিদারুণ উপভোগ্য চরিত্রসৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া ওম প্রকাশ (ভোলার বিবাহ-পাগল মামা), সুন্দর (ঘটক), মুকরী (পঞ্চরত্ন দলের অন্যতম), কেষ্টো (ঐ) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চপ্রশংসারযোগ্য। ছবির সাতখানি গানই রচনা ও সুরসৃষ্টির দিক দিয়ে অভিনবভাবে উপভোগ্য। মাস্টারজী ও ভোলানাথের গানের লড়াইয়ের দৃশ্য ভোলবার নয়। এ ছাড়া 'মেরে সামনে বালী খিড়কীমে এক চাঁদকা টুকরো রহতা হৈ' গানখানি বারংবার শোনবার মতো। হিন্দী গানে কীর্তনের মজাদার ব্যবহার চমৎকার আনন্দ পরিবেশন করেছে। মাস্টারজীর মুখে কর্ণাটকী ঢঙের প্রয়োগও অল্প উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেনি।

মেহমুদ প্রোডাকসন্স-এর রঙীন ছবি "পড়োসান" দর্শকদের আনন্দ দেবে।

বাঙলার পুতুল ও বন

বাঙালীর বহু ঐতিহ্যের মধ্যে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল অন্যতম। বিদেশী সরকারের আমলে এই পুতুল এবং এর কারিগরেরা একরকম অবহেলিত অবস্থাতেই দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের এই সুকুমার শিল্পটির দিকে নজর পড়েছে এবং তাঁরা এর রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে যত্নবান হয়েছেন।

জলঙ্গী (খোড়ে) নদীতীরস্থ কৃষ্ণনগরের এই মৃৎশিল্প ও এর শিল্পীদের জীবনকে অবলম্বন করে আশিস মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি ইস্টম্যান কলারে একটি সুন্দর তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। নদীবক্ষে নৌকা করে যেতে যেতে নদীতীরে ছোট ছোট ছেলেদের কাদার তাল নিয়ে খেলা থেকে শুরু করে সেই কাদার তাল দিয়ে মূর্তি গড়া দেখানো এবং ক্রমে কারিগরদের জীবনধারা, তাদের এই বিশেষ শিল্পটির প্রতি দরদ এবং একাগ্রতা, তাদের জীবন-দর্শনের বিশেষত্ব, বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির মূর্তি গড়ায় তাদের দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়কে সুবিন্যস্তভাবে চিত্রিত করেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। উপযুক্ত নেপথ্যভাষণ এবং ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ সৃষ্ট আবহসংগীত ছবিটির আকর্ষণ বর্ধিত করেছে।

বাঙলাদেশের সুন্দরবনের খ্যাতি 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-এর দৌলতে জগৎজোড়া। কিন্তু ওর বেশীর ভাগই আজ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের ভাগে যেটুকু সুন্দরবন আছে, তারই একটি আলো-আঁধারি রূপে দেখতে পাওয়া যায় আশিস মুখোপাধ্যায়কৃত রঙীন ছবি "সুন্দরবন"-এ। নদীবক্ষ থেকে সুন্দরবনের প্রহেলিকাঢাকা রূপ, দুঃসাহসী কাঠুরিয়া ও মধু সংগ্রহকারীদের অভিযান, জলে

রাধারাণী পিকচার্স-এর
মুক্তিস্নান/অনিল চট্টোপাধ্যায়
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

কুমীর, ডাঙ্গায় সাপ প্রভৃতিকে বিদেশী পর্যটকদের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে। এই ছবিটিতেও ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সংগীতরচনা পরিবেশকে উপযুক্তরূপে প্রকাশ করেছে।

স্টুডিও থেকে

'দেহ পট সনে নট সকলি হারায়'—কথাটা আর কারুর বেলা যতটা সত্য হোক না কেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর বেলায় এটা প্রামাণ্য অসত্য বললে আপত্তি নেই। নটসূর্য এখনও সূর্যের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। শরীর জীর্ণ বটে কিন্তু, প্রাণ—তা এখনও সবুজ। শরীর অবশ বটে কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যের ছাপ এখনও সারা চোখ মুখ জুড়ে।

বহুদিন বাদে নটসূর্যকে আবার দেখলাম স্টুডিও পাড়ায়। স্যুটিং করতে নয়, অভিনন্দন গ্রহণ করতে। অভিনেত্রী সঙ্ঘ এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে সম্বর্ধনা জানালেন তাঁর ডি-লিট উপাধিপ্রাপ্তিতে। শ্রীচৌধুরী ওই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। ওখানেই দেখা আবার।

একটানা তিনটে দশক ধরে তিনি মঞ্চ-জগতে যে অভিনয়কলার নিদর্শন রেখে গেছেন তা ভোলার নয়, শুধু মঞ্চজগত বলি কেন চিত্রজগতেও তাঁর অভিনয়প্রতিভা স্মরণে রাখার মত। ক্ষমতার মধ্যগগনে থাকতে থাকতেই তিনি যখন বিদায় নিলেন কলাদেবীর আরাধনা থেকে তখন মনে

হয়েছিল এ হারানো বুঝি প্রিয়জন হারানো। কিন্তু লোকচোখের আড়ালে থেকে তিনি যে কলাদেবীর আরাধনা কিছুমাত্র না থামিয়ে পূর্ণমাত্রায় চালিয়ে গেছেন তা অনেকেরই অজানা। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটকের যে পাঠক্রম তার ভিত্তি রচনা শ্রীচৌধুরীর হাতেই তৈরী।

কিন্তু বড় মজার ব্যাপার সেই রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নটসূর্যকে ডি-লিট উপাধি দিতে গড়িমসি করেছিলেন। একুশে মের সম্বর্ধনা সন্ধ্যায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য শ্রীচৌধুরীর 'ডি-লিট' পাওয়ার পেছনের সেই কাহিনী বললেন। ঐ দিনের সভায় আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী বি এন সরকার, দেবকী বসু, দেবনারায়ণ গুপ্ত, তপন সিংহ, অর্ধেন্দুনারায়ণ রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মল্লিনা দেবী, সরযূবালা ও আরও অনেকে। সবার শেষে নটসূর্য দু'চার কথা বলতে গিয়ে জানান—'আমি আর কি বলব, আমার আর কিই বা আছে। দেবার তো ভাই আমার কিছু নেই। নতুনরা আসছে, তাদেরও এভাবে সম্মানিত করা হবে—এই আমার কামনা।'

পান্না সেনের বাংলার মাঝিভাই তথ্যচিত্রের একটি দৃশ্য

একথা সত্যিই নটসূর্যের আজ আর নতুন করে বলার কি আছে। তাঁর জীবনীই বাণী। ইতিমধ্যে আত্মচরিত্রের প্রথম খণ্ড 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' বেরিয়ে গেছে। সেদিন মঞ্চে শ্রীচৌধুরীকে শান্ত অথচ গভীর চাউনি নিয়ে বসে থাকতে দেখে সেই 'কর্ণার্জুন'-এর অর্জুন, 'শেষ উত্তর'-এর জমিদার, 'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রবাবুর কথা মনে এসেছিল। মনে পড়ছিল শেষের সেদিন তাঁর মঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার কথা। মনে আসছিল সেই উনিশশো তেইশ চব্বিশের 'ঋষির প্রেম', 'প্রহ্লাদ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষ্ণুমায়া' প্রভৃতি ছবির অহীন্দ্র চৌধুরীকে।

তাঁর যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশশো বাইশে, আজ নয় বেশ কয়েক বছর আগেই তাঁর সে পথ শেষ হয়ে গেছে। জয়যাত্রার জয়রথ আজ থেমে গেছে, এবার তাঁকে নতুন করে বরণ করার পালা। অনুষ্ঠানে তপনবাবুর ভাষণের পুনরাবৃত্তি করে বলি—'আজকের চিত্রজগতের চারদিকে যেভাবে নৈরাজ্য নৈরাশ্য নেমে আসছে তাতে ভবিষ্যতের কোন আলো তো চোখেই পড়ছে না, বর্তমানও অন্ধকার। এখন শুধু অতীত ঐতিহ্যের, ফেলে আসা সুখ-স্মৃতির জাবর কাটা ছাড়া আর কি আছে?'

স্টুডিওগুলো আপাতত প্রায় বন্ধ। খুচরো কাজ চলছে এদিক ওদিক। কলকাতার খাঁ খাঁ দুপুরের মত স্টুডিওপাড়া ঝিম মেরে পড়ে আছে। মনে হয় নিজের অবস্থা বুঝে যেন আজ চিন্তিত সে। দু' নম্বরে দীনেন গুপ্ত দিন কয় কাজ করলেন নতুন ছবি 'বনজ্যোৎস্না'র। তাঁর আগের ছবি 'নতুন পাতা' এ বছরের এক স্মরণীয় ছবি নিঃসন্দেহে। ও ছবিতে যে কেউ ছবিরই পাচিমশেলী রূপ দেখে থাকুন না কেন পরিচালকের প্রয়োগশিল্পের নিপুণতা স্বীকার করতেই হবে। তার ওপর নতুন মেয়ে আরতি গাঙ্গুলীকে দিয়ে কত সুন্দর কাজ করা।

নতুন ছবিতেও উনি আবার একটা নতুন মুখ এনেছেন। নাম মিনাক্ষী দত্ত। বাংলাদেশে আজ নায়িকার অভাব একথা বোঝা যাচ্ছে বেশ। গত বছরে যেকটা নতুন মুখ দেখা গিয়েছিল তাদের অনেকের

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে ডি-ফিল উপাধিতে ভূষিত করায় অভিনেতৃ সংঘ থেকে তাঁকে নিউথিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে এক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানান হয়। চিত্রে নিভাননী দেবী, রাধামোহন ভট্টাচার্য এবং শ্রীচৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে। ফটো : অমৃত
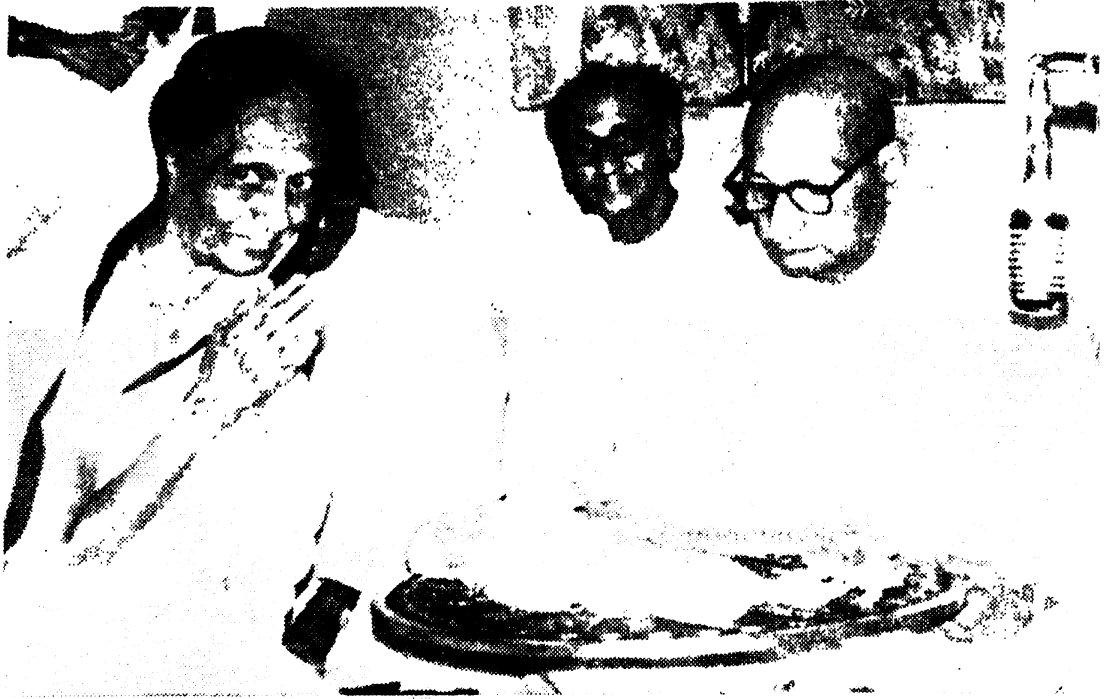
আশার নীড়ও ভেঙে গেছে ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে। টনি মারা গেছে অকস্মাৎ।

তারপর বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে সে যখন সুইজারল্যাণ্ডে গেছে তখন সত্যিই সে বেঁচেছে। সাদা বরফে ঘেরা পাহাড়, শান্ত সুন্দর প্রকৃতি তাকে কাছে টেনে নিয়েছে, কাহিনী থেকে এটা স্পষ্ট যে এ গল্প নতুন নয় ইউরোপের ছবিতে। কিন্তু পরিচালক মস্কালিকের সুন্দর সীমিত প্রয়োগনৈপুণ্য ছবিটাকে মনোহারী করেছে। নাটক নেই এ ছবিতে আছে জীবন। একটুকরো প্রাণ আশা ও আশাভঙ্গের মাঝেই জীবনের যে মূল্য তাকেও উপস্থাপিত করেছেন পরিচালক। ভিটা এখানে তাই অনেকাংশে প্রতীক চরিত্র।

অন্য দুটো ছবি 'কিটনস নট ক্যারেড' ও 'ক্রাইম'এ ইয়াঙ্কি কালচারের ছাপ বড় বেশী। চেক কিশোরসমাজের চিত্র যদি এই হয় তাহলে ওদেশের অবস্থা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তার প্রয়োজন। তবে একটা ব্যাপারে পরিচালক ভ্যামিল প্রশংসা পাবেন—তা হল কিশোরজীবনের কিছু টুকরো কাজ। সেদিক থেকে ভ্যাসিল নিখুঁত। সব মিলিয়ে এ উৎসব 'উৎসব' হয়ে না উঠলেও মাত্র ঐ একখানা (ভিটা ম্যাক্রোভা) ছবিই আশার কিছু বেশীই দিয়েছে।

মঞ্চাভিনয়

বাঁশদ্রোণী আঞ্চলিক যুব সংঘের প্রকাশ্য সম্মেলন উপলক্ষে গত ১০ মে বাঁশদ্রোণী কালীবাড়ীতে শ্রীসরোজ রায়ের 'এক্সরে' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনের পট-ভূমিকায় রচিত নীতিগত সংকট ও তার এক বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছিল নাটকে। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে যাঁরা সেদিন নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষ মজুমদার, রণজিত গঙ্গোপাধ্যায়, গার্গী রায়, সুষমা দাস, ডায়মণ্ড ও অন্যান্যরা।

শনিবার, ৩১ মে, দুপুরে কল্পতরুর ভিন্নধর্মী দুটি নাটক 'পরমপুরুষ' ও 'পরাজিত পৃথিবী'র পুনরভিনয় হচ্ছে বিশ্বরূপায়। নাট্যকার বসন্ত ভট্টাচার্য রচিত ও নির্দেশিত দুটি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করছেন সুকুমার মিত্র, নীতিশ সান্যাল, শম্ভু দাঁ, রাজকুমার বসু, বিশ্বনাথ বসাক, পুলক সেন, কাজল বর্ধন, সাধন দত্ত, পরাশর হালদার, সুশীল নন্দন, বসন্ত ভট্টাচার্য ও নমিতা দাস।

অ্যাবসার্ড নাটকের আপাত দুরূহতার অতলে যে চূড়ান্ত বাস্তব সত্য প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে, তাকে পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরেছেন 'নক্ষত্রে'র শিল্পীরা—এস আজ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি নাট্য রসিকের কাছে স্পষ্ট। বাংলার নাট্যপ্রযোজন আসরে এই বিশেষ ধরনের নাট্যচর্চায় এক সূক্ষ্ম শিল্পসম্মত বৈশিষ্ট্য আরোপ ক এবং তার মধ্যে গভীরতর অর্থে দ্যো জীবনের স্পন্দনকে আবিষ্কার করা, দুটো দিকেই এঁদের অনুভব ও প্র প্রসারিত হয়েছে। আমাদের দেশে যাঁ নাটক নিয়ে ভাবেন, বাংলা নাটকের ভবি যাঁদের চিন্তার সীমায় আলোর বৃত্ত মে ধরে, তাঁদের কাছে 'নক্ষত্রে'র নাট্যানুশীলন এই ধারা বাংলা নাটকের আগামী দিনগু সম্পর্কে এক নতুনতর আশায় ভ বিশ্বাসের ছবি এঁকেছে। 'নক্ষত্রে'র শিল্পী ক্রমশ রহস্যময় জটিলতার মধ্য থে জীবনের গান সংগ্রহ করে আনছেন: ত 'মৃত্যুসংবাদ', যে বাস্তবতা, 'চন্দ্রলো অগ্নিকাণ্ডে' তাই আরো স্পষ্টতর হয়ে আর এঁদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'বৃ বৃষ্টি'তে বোধহয় মানুষের ক্ষমতার প্র এক সীমাহীন বিশ্বাস বিঘোষিত। রিচা ন্যাসের একটি নাটক অবলম্বনে এটি র করেছেন অসিত দে। 'মৃত্যুসংবাদ', 'চ লোকে অগ্নিকাণ্ড', 'বৃষ্টি বৃষ্টি' না তিনটির মধ্যে অর্থগত একটা সহমর্মি রয়েছে। যে-চিন্তা দিয়ে মনে আন্দো তোলা হোল, সেই চিন্তার একটি স্পষ্ট রূপ বাস্তব জীবন সত্যের পরিচ্ছন্ন

ন ধরার ব্যাপারে 'নক্ষত্রে'র সুচিন্তিত ক্ষেপ বাংলার নাট্যানুরাগীদের কাছে সন্দেহে একটা বিস্ময়ের বস্তু।

চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে খরার ন। মাটি, জল আর আকাশ যেন রে গুমরে কাঁদছে। সূর্যের প্রচন্ড তেজ বশ্রান্ত করেছে একটি জনপদের কয়েকটি জ স্বপ্নের মানুষকে। এ'দের নিয়েই ষ্টি বৃষ্টি' নাটক। তপ্ততায় অবসন্ন হয়ে রা যখন অন্তর থেকে চাইছে, 'বৃষ্টি সুক', যখন অশান্ত জলধারায় হৃদয়ের লোকে শান্ত করার প্রত্যাশায় আকুল, নেই যেন যাদুকরের দণ্ড হাতে স্বপ্নে নারিত দৃষ্টি নিয়ে একটি অদ্ভুত মানুষে স দাঁড়ালো এ'দের মাঝে সে বল'লো, ড়া মাটির রিক্ততা আর রুক্ষতাকে বৃষ্টি- ল সজীব করে দিতে পারে। আত্ম- শ্বাসের প্রবল জোয়ারে সে অলৌকিক- রে বৃষ্টি আনার গল্প বললো। তাতে দীপ্ত হোল পরিবারের ছোট ছেলে সমু, মালিনী মীতি, কিন্তু বড় ছেলে রমেন র মেয়ে মায়া কিন্তু এই অলৌকিকতাকে বাস করে নিতে পারলো না। পরিবারের বা অভয়বাবু বিশ্বাস করলেন এমনিভাবে ষ্টি আনা যেতে পারে। এই সূত্রে নতুন র আবার জটিলতা দেখা দিলো সংসারে। হোক শেষপর্যন্ত বৃষ্টির নূপুর-নিক্কণ যপর্যন্ত শোনা গেলো। সবার সন্দেহের ত্রা নিরসন হোল। 'মায়া'র মনের কাশে সুশান্তকে নিয়ে ভালোবাসার পার নিয়ে যে কালো মেঘ জমেছিল, ষ্টি নেমে তাও হোল স্বচ্ছতায় সুন্দর।

'বৃষ্টি বৃষ্টি' নক্ষত্রের আর একটি শংসাচিহ্নিত নাট্যপ্রযোজনা। মঞ্চ, আলোক র শব্দসংযোজন এই নাটকের গভীরতর ভবের অন্তরঙ্গ রূপটিকে পরিস্ফুট করে তে নির্দেশক শ্যামল ঘোষ সূক্ষ্ম প্রয়োগের পরিচয় দিয়েছেন। মঞ্চস্থাপত্যে ন্দু সেনের কল্পনাশক্তি প্রশংসার দাবী । প্রায় প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রোপযোগী নয় করে সমগ্র প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত তুলতে পেরেছেন। সেই অদ্ভুত লৌকিক মানুষটির (বরুণ) চরিত্রে শ্যামল র অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। রায়চৌধুরীর 'মীতি' একটি সুন্দর, ভাবিক চরিত্র-চিত্রণ। 'মায়া' চরিত্রের সংহত শর্মিষ্ঠা ঘোষের অভিনয়ে মূর্ত উঠেছে। অন্য কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় ছেন : তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় (সুশান্ত), দে (রমেন), অমল চক্রবর্তী (মথুর), স মুখোপাধ্যায় (অভয়), কৃষ্ণা দাস খী), শান্তি চক্রবর্তী (রেবতী), তপন গোপাধ্যায় (সমু), দিলীপ ঘোষ পরেশ), স্বপন গঙ্গোপাধ্যায় (মুখার্জি)।

চন্দননগরের 'নাট্যরঙ্গ দল' সম্প্রতি মুখোপাধ্যায়ের 'হে মোর পৃথিবী' অভিনয় করেছেন 'নৃত্যগোপাল তমন্দির' মঞ্চে। সুশীল ব্যানার্জি নাট্যনির্দেশনা প্রত্যাশিত শিল্পবোধ ভাষা পেয়েছে। কয়েকটি ভূমিকায় সার্থকভাবে রূপ দেন—রমেন চক্রবর্তী, সুব্রত পাল, শ্রীমান বাবলু, কমলা সুর, গঙ্গাধর ব্যানার্জি, পূর্ণ সরকার, দিলীপ ব্যানার্জি, রাঘবেন্দ্র পাল, দিব্যেন্দু সুর, অরুণ ব্যানার্জি প্রভৃতি।

'রঙ্গমে'র শিল্পিবৃন্দ তারু ব্যানার্জি ও দেবু মুখার্জি'র 'ইঙ্গিত' নাটককটি আগামী ৯ই জুন সন্ধ্যায় সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে পরিবেশন করবেন। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছে তারক ব্যানার্জি।

উত্তর কলকাতার অন্যতম নাট্যসংস্থা 'কেন্দ্রী' আগামী ৩রা জুন 'বিশ্বরূপা'য় শক্তিপদ রাজগুরুর 'প্রজাপতি' নাটক মঞ্চস্থ করবেন। হাসি-কান্নার আলপনা আঁকা এই নাটকটি পরিচালনা করবেন সুশীল হালদার।

'প্রতিনিধি' নাট্যসংস্থার প্রথম নাট্যোপ- হার 'এক দিন এক রাত' ইতিমধ্যেই কল- কাতার দর্শকমহলে আলোড়ন আনতে সফলকাম হয়েছে। এই সংস্থা আবার অবতীর্ণ হচ্ছেন 'মিনার্ভা' মঞ্চে আগামী ৩ জুন '৬৯ তাঁদের নতুন নাটক 'মুখর অভিযান' নিয়ে। ১৮৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। পরি- চালনার দায়িত্বও তাঁর। অভিনব মঞ্চ-পরি- কল্পনায় সংস্থার প্রায় ৫০ জন শিল্পী সমন্বয়ে নাটকটি পরিবেশিত হবে।

নান্দনিক সম্প্রদায় আগামী ১৫ জুন পাটনা আই এম হলে 'রজনীগন্ধা' নাটকটি অভিনয় করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। নাট্যানুষ্ঠানটির আয়োজন করেছেন বিহার আর্ট থিয়েটার। পরিচালনায় এবং একটি বিশেষ ভূমিকায় আছেন সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, অন্যান্য ভূমিকায় আছেন অমর ভট্টাচার্য, পার্থ ভট্টাচার্য ও শিপ্রা সাহা।

নিশিপদ্ম ছবির নায়ক
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়/ফটো : অমৃত

বিবিধ সংবাদ

নতুন চিত্রগৃহ 'জেম'-এর উদ্বোধন হল গেল ২৯ মে, বুধবার। সুবিস্তৃত প্রেক্ষাগৃহটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এর আভ্যন্তরীণ সজ্জা আধুনিক রীতি অনুযায়ী অনাড়ম্বর, অথচ মনোরম। বিরাট প্রোসেনিয়াম। তার সামনে আগেকার কালের নিউ এম্পায়ারের মতো ঢেউখেলানো পর্দা। অন্তরালবর্তী আলো প্রেক্ষাগৃহকে উজ্জ্বল রাখে। সামনের লবিও বেশপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত। মেহমুদ প্রোডাকসন্স-এর রঙীন হিন্দী ছবি "পড়োসান" নিয়ে "জেম"-এর যাত্রা শুরু হল। আমরা ছবিঘরটির দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

সম্প্রতি বোম্বাই শহরে ৬ থেকে ৯ মে বিড়লা থিয়েটার 'চতুরঙ্গ' আয়োজিত বাঙলা ও মারাঠি নাট্যোৎসব অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে শেষ হোল। সর্বভারত ক্ষেত্রে এ ধরনের নাট্যোৎসব বোধহয় প্রথম। চারদিনব্যাপী এই নাট্যোৎস প্রথমদিনে মহারাষ্ট্রের বর্তমানকালের প্র নাট্যবিদ পি, এল, দেশপান্ডে "ভারৈভারচী বরাত" নাটকটি পরিবে করেন এবং বাকী তিনদিন চতুরং যথাক্রমে 'ডাউন ট্রেন', "আবর্ত" ও ব বরুণ দাশগুপ্তের নির্দেশনায় অভিন হয়। 'আবর্ত' দর্শকদের বিস্ময়ে বিমো করে। মারাঠি গুজরাটি শিক্ষা সংস্ক জগতের বহু গণ্যমান্য গুণী ব্যক্তির সমা ঘটেছিল অনুষ্ঠানগুলোতে। তাঁরা বা থিয়েটার দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় প্রী অভিনয় শেষে শিল্পীদের গাঢ় অভিন জানান। বিশেষ করে শিল্পীদের অসাধ অভিনয় ক্ষমতার তাঁরা সোচ্চার প্রশ করেন। উৎসব শেষে ১০ মে বোম্বাই ম সাহিত্য সংঘ চতুরঙ্গ শিল্পীদের জন্য এ সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সেখা বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশে বা থিয়েটারের শ্রেষ্ঠত্বর কথা আলোচিত হ

শ্রীসুজাতা মুভীজ নিবেদিত পৌরা চিত্র "সাবিত্রী সত্যবান"-এর বা সংস্করণের নির্দেশনায় আছেন দি ভাওয়াল; সংলাপ ও গীতরচনা কর যথাক্রমে অরুণ রায় এবং শ্যামল গুপ্ত শ্যামল ঘোষ; নেপথ্য কন্ঠসংগীতে অ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখোপাধ প্রদীপ দাশগুপ্ত, গীতা দাস এবং নি মিত্র। ছবিটির প্রযোজনা ও সংগী পরিচালনা করেছেন রমেশ নাইডু।

ছ' মাস কঠোর পরিশ্রম করে প্রা দুর্লভ দৃশ্যগুলি বাংলার নদী-খাল থেকে উদ্ধার করে ফিল্মের মালায় উপহার দিয়েছেন প্রখ্যাত প্রেস ফটোগ্রা শ্রীপান্না সেন। তাঁর তথ্যচিত্র 'বাংলার মা ভাই' বাংলার ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ের অ নৈরাশ্যের জীবনালেখ্য। নদীর বুকে শীতের কুয়াসা, ঘূর্ণী, জোয়ারের উন্মত্ত নৌকাডুবি, চাঁদের আলোয় ভেসে নৌকার শট ও কম্পোজিসনে যে সৌ সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্যিই স্মরণীয় শিক্ষণীয়। যাত্রীপারাপার, পণ্যের আদ প্রদান, জালবোনা, সুতোকাটা, মাঝি সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না—সবকিছুই আছে দু' রীলের তথ্যচিত্রটিতে। ভাটিয়ালী গ গুলিও বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংযোগ বিভাগ এই ছবির প্রযোজ কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা, সুরসংযোজনা গ্রহণ ও পরিচালনার দায়িত্ব একা পালন করেছেন শ্রীপান্না সেন।

গত ১৭ তারিখে কোতুলপুরে সাধন পাঠাগার কর্তৃক রবীন্দ্রউৎসব সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে

দেখুন ওঁর সামনে
কত রকমারি রয়েছে-
পার্লে থেকে: নানা
রকমারি অপূর্ব
মজাদার
স্বাদের বিস্কুট
প্রথম
তৈরী হয়েছে!

বিস্কুট

আজই এক প্যাকেট পার্লে কিনে নিন!

আপনি খুশীমত বেছে নিন!
তবে চাইতে ভালো, যদি সবগুলিই খেয়ে দেখেন। **জেফস্, ওরলে, স্পিন-এইচ, চীজলিংস্।** সবই তৈরী হয়েছে ভারতের এক অতি আধুনিক বিস্কুট ফ্যাক্টরীতে এবং সবার পেছনে রয়েছে ৩০ বছরের বিশেষ জ্ঞান। ভারতের সবচেয়ে বেশী কাটতির মিষ্টি ও নোন্তা বিস্কুট **গ্লুকো** ও **মোনেকো** প্রস্তুতকারক পার্লে ছাড়া আর কেই বা এমন সুস্বাদু খাবার এনে দিত আপনাদের কাছে!

গ্লুকো

মোনাকো

ওরলে

স্পিন-এইচ

জেফস্

চীজলিংস্

everest/566a/PP bn
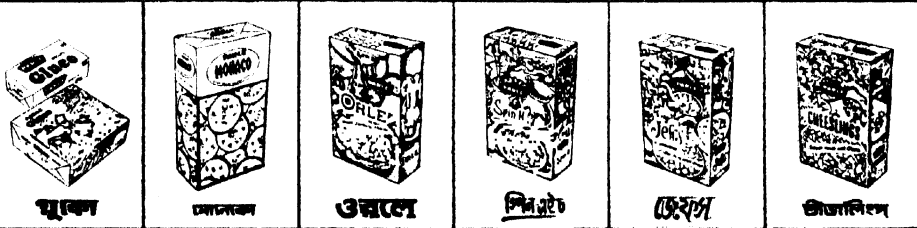
বিশ্বাস/অপর্ণা সেন এবং জীতেন্দ্র
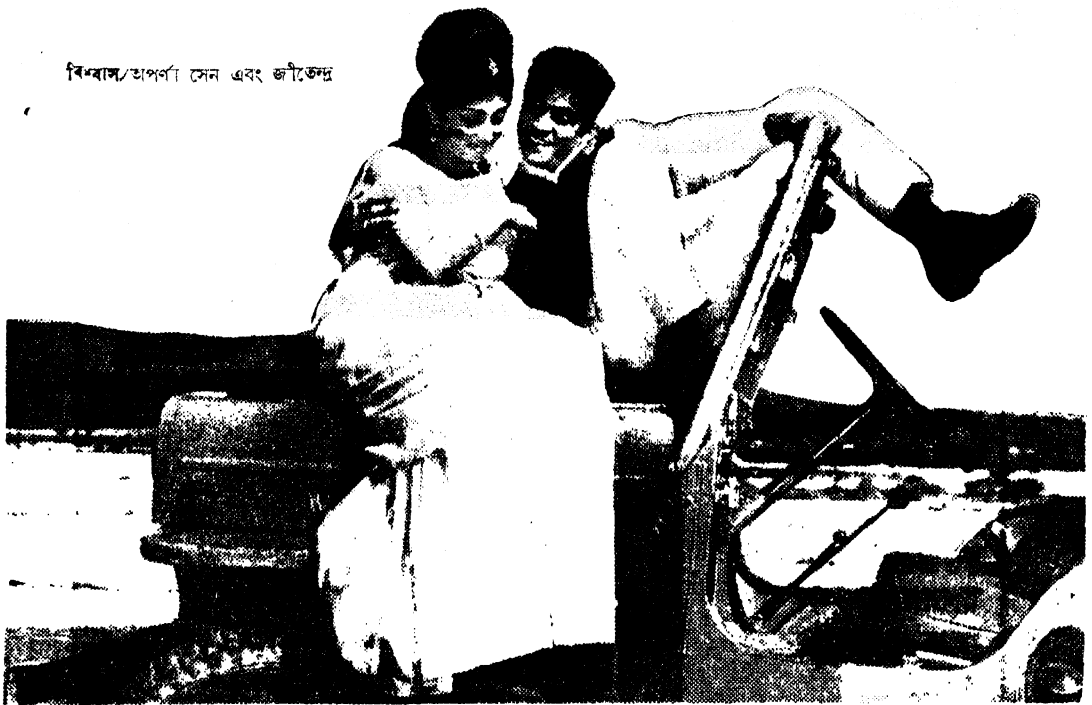
অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তারাপদ মণ্ডল ও পাঠাগারের সম্পাদক ডাঃ নিরঞ্জন ভদ্র, এম-এল-এ পৌরোহিত্য করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেনা দেব ও মীরা দেব। উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্থানীয় বাংলা কংগ্রেস নেতা মন্মথ মল্লিক। মণ্ডল কবিগুরুর ব্যক্তিসত্তা ও কবির প্রতিভা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এবং কবির জীবনের ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেন ডাঃ ভদ্র। পরিশেষে পাঠাগারের কর্মীরাও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তব্য রাখেন।

চাকপোতার (হাওড়া) প্রখ্যাত সংস্থা 'সাংস্কৃতি' গত ২১ মে এক আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশের মাঝে সংস্থার ১৯ বার্ষিকী পূর্তি উৎসব উদযাপন করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন দীপান্বিতা মান্না, তপন চক্রবর্তী (রেকর্ড) কল্পনা দাস, বীণা চক্রবর্তী, নিমাই মান্না, পরমেশ্বর ঘটক, অমল বটব্যাল, তারাপদ দে (মিঠুদা), হারাধন গাঙ্গুলি, হেমন্ত সামন্ত, দীপক সাহা, দীনবন্ধু হালদার, কাশিনাথ মণ্ডল, হারাধন খাঁ, সনৎ ঘোষ, বিমল পাল (ফিল্ম), গোবিন্দ সাঁতরা, দিলীপ কাঁড়ার (ফিল্ম), গোপাল দাস, অসীম চট্টোপাধ্যায়, পিন্টু সাঁতরা, বিশ্বনাথ মাড্ডা, কমলেশ কুণ্ডু ও অন্যান্য। দিলীপ বক্সীর 'বাংলার লোকগীতি' এই পর্যায়ের অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। এই উপলক্ষে সংস্থার সদস্য-সদস্যারা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ-সফল নাটক 'শেষ থেকে সুরু' কবি-সমালোচক নিমাই মান্নার নির্দেশনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে নবীন মান্না (নীলমণি), মোহন সেনাপতি (ভোলা), দিলীপ মান্না (বিশ্বম্ভর), কৃষ্ণ কোলে (বোকা), অপূর্ব দলুই (নেপালবাবু), অমিত পাত্র (রাণী) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নিমাই মান্না বিশিষ্টজনের শুভেচ্ছা-বাণী পাঠ করেন।

গত ২১ মে ২৪ পরগণার পাত্রাক্ষয়ার রায় কুটীর প্রাঙ্গণে পল্লী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালিত হয়। সভার প্রারম্ভে সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। তারপর কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী মানসী রায়, ইরা মিত্র, ভাস্কর রায়, দীপেন রায়, তুষার মিত্র, রবি রায়, সবিতা রায়, মানসকুমার রায়, শংকর বিশ্বাস; নরেন্দ্রচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রজীবনী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায় ও অশ্বিনীকুমার মণ্ডল মহাশয়।

১৯ এপ্রিল দমদম ইয়ংস ক্লাবের উদ্যোগে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মনোজ্ঞ শিল্পকর্মের সঙ্গে বিষয় সকল দর্শককে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে তা হল মূকাভিনয়। পরিবেশন করেছেন জনপ্রিয় মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী। এদিন দীর্ঘসময় ধরে পরিবেশিত শ্রীচক্রবর্তীর ফিচারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফিচার হল বাসযাত্রী ও প্রসাধনে আধুনিকা' এ ছাড়া প্রতিটি ফিচারেই শিল্পীর উচ্চ-কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

গত ২৫ বৈশাখ বাণীনিকেতন হলে দক্ষিণ হাওড়া রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সম্মেলন ও বাণীনিকেতন ইনস্টিটিউটের যুগ্ম উদ্যোগে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন কৃষ্ণা মিত্র, দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখর বসু, স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন তপনকান্তি দে। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন রেখা দে হাজরা। আবৃত্তি করেন অসীমানন্দ মৌর ও বীথি ভট্টাচার্য। সভাপতির ভাষণে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র রবীন্দ্রপ্রতিভার বহুমুখী দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কবি-সংগীতের প্রথম যুগের যে-সব শিল্পীর গানের লং-প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে গত রবিবার ডাঃ নীহার মুন্সীর গৃহে এক ঘরোয়া পরিবেশে সেইসব শিল্পীদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁদের হাতে লং-প্লেয়িং রেকর্ড তুলে দিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ হতে সন্তোষ সেনগুপ্ত। এ-ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর এ সি সেন, টি পি রায়চৌধুরী, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী সাহানা দেবীর (তিনি এখন পণ্ডিচেরীতে) প্রতিনিধিরূপে ই পি রেকর্ড গ্রহণ করলেন তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী মঞ্জু গুপ্তা।

ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সমীক্ষা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা এবং উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার অবদানই সবথেকে বেশী। ক্রিকেট শুধু ইংল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা নয়। ইংরেজ জাতির ধ্যান-ধারণায় এবং সমাজ-জীবনে ক্রিকেট অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। ইংরেজ চরিত্রের মহান প্রতীক এই ক্রিকেট। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ একটি বিশেষ পুণ্যদিন। এই দিন মেলবোর্ণ মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে টেস্ট সুরু হয়, তাই পৃথিবীর মাটিতে প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার আকর্ষণ শুধু এই দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে সারা পৃথিবীর জনমানসে অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং উত্তেজনার জোয়ার বয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া ইংল্যাণ্ড তার সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানকে দোসর করে নিয়েছে। এই সাতটি দেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিবার গড়ে উঠেছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯২৮ সালের ২৩শে জুন ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে। এই ১৯২৮ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ড ৩—০ খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে 'রাবার' জয়ী হয়। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম জয় ২৮৯ রানে—১৯৩০ সালে জর্জ টাউনের ৩য় টেস্টে। ১৯৩৪-৩৫ সালের ৪র্থ টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ স্বদেশের মাটিতে ২-১ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে—সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম রাবার জয়ের নজির। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম 'রাবার' জয়ী হয় ১৯৫০ সালে ৩—১ খেলায়। এই ১৯৫০ সালের টেস্ট সিরিজটি ছিল উভয় দেশের ৭ম সিরিজ, অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ৪র্থ সিরিজ।

ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাস ১৯৫০ এবং ১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজ ঘটনা-বৈচিত্র্যে অমর হয়ে আছে। ১৯৫০ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩-১ খেলায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করার সূত্রে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথম 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই 'রাবার' জয়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এই দুই বোলার—আলফ ভ্যালেনটাইন এবং অখ্যাত খেলোয়াড় সনি রামাধীন। স্পিন বোলার রামাধীন তাঁর বল দেওয়ার কসরতে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে দিতেন—সে এক দুর্ভেদ্য মায়াজাল। তাঁর বল খেলতে গিয়ে বলির পাঁঠার মত অসহায় অবস্থায় ব্যাটসম্যানরা শরণাগত হতেন। রামাধীন রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান।

১৯৬৩ সালে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩-১ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়—ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় 'রাবার' জয় এবং প্রথম নিগ্রো খেলোয়াড়ের নেতৃত্বে প্রথম জয়। এই জয়ের সূত্রেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সূচনা। লর্ডস মাঠে ১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও তার জন্যে কারও বিন্দুমাত্র অভিযোগ বা মনস্তাপ নেই। রুদ্ধ নিশ্বাস এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টের শেষ ওভারের খেলা দর্শকদের দেখতে হয়েছিল। সমস্ত মাঠ শিহরণ, উত্তেজনা এবং উদ্বেগে সন্তপ্ত ছিল। ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের জন্যে ২৩৪ রানের দরকার—খেলার এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। হল এবং গ্রিফিথ রুদ্র মূর্তি নিয়ে বল করতে থাকেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের মনোবল অনেক বেশী—তারা ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে প্রথম টেস্ট খেলায় ১০ উইকেটে জয়ী হয়ে লর্ডস মাঠে এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমেছেন। মাত্র ৩১ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের ৩য় উইকেট পড়ে যায়। দলের সঙ্গীন অবস্থা। খেলার এক সময়ে ইংল্যাণ্ডের মাথায় সারা আকাশ ভেঙ্গে পড়ল—হলের দুর্দান্ত বাম্পারে কলিন কাউড্রে আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। বলের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর হাতের কব্জি ভেঙ্গে গেল। কাউড্রের পক্ষে আর খেলা সম্ভব নয়; তিনি তাঁর মাত্র ১৯ রানের সম্বল নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। এক সময় দেখা গেল শেষ ওভারের তিনটি বল দিতে বাকি। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের রান উঠেছে ২২৮। ইংল্যাণ্ডকে এই খেলায় জয়লাভ করতে হলে এই তিনটি বল খেলে ৬ রান সংগ্রহ করতে হবে। উইকেটে তখন খেলছেন ৯ম উইকেট জুটি স্যাকলটন এবং ডেভিড এ্যালেন। এছাড়া ইংল্যাণ্ডের হাতে জমা আছে আর মাত্র একজন খেলোয়াড়—তিনি কলিন কাউড্রে। বিশেষ প্রয়োজন হলে তবে তিনি নামবেন। ভাঙ্গা হাতে প্লাস্টার জড়িয়ে তিনি প্যাভিলিয়নে প্রস্তুত হয়ে আছেন। ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের ২২৮ রানের মাথায় ৯ম উইকেট পড়ে গেল। হলের বল খেলে স্যাকলটন রান নিতে বিপরীত দিকের উইকেট লক্ষ্য করে ছুটলেন; কিন্তু নির্দিষ্ট দাগে পৌঁছবার আগেই তাঁর উইকেট ভেঙ্গে গেল। স্যাকলটন রান আউট হয়ে বিদায় নিলেন। তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করলেন কলিন কাউড্রে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে মন্দের ভাল যে, কাউড্রেকে ভাঙ্গা হাতে হলের বলের সামনে দাঁড়াতে হল না। হলের বল খেলবেন এ্যালেন। খেলায় জয়লাভের জন্যে ইংল্যাণ্ডের আর ৬ রান দরকার। পুঁজি মাত্র ২টি বল। সেই বল দুটি দিবেন আর কেউ নয়—ব্রিসবেনের ঐতিহাসিক 'টাই' ম্যাচের নায়ক ওয়েসলি হল। সুতরাং ডেভিড এ্যালেন ভক্তিভরে ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন—ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ইজ্জত আজ তাঁর খেলার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। প্রাণপণ দৃঢ়তায় হলের শেষ দুটি বল খেললেন ডেভিড এ্যালেন। বিপর্যয় কিছু ঘটলো না। খেলা অমীমাংসিত থেকে গেল। এ্যালেনকে উদ্দেশ্য করে সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হল—তুমি বাঁচালে! আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এরকম উত্তেজনাপূর্ণ অমীমাংসিত খেলার নজির দ্বিতীয় নেই।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একদল ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে শেষ পর্যন্ত খেলায় পরাজয় বরণ করেছে—এমন নজির সারা টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে মাত্র এই চারটি আছে: ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরাজয় ২বার (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৩৫ ও ১৯৬৮ সালে), ইংল্যাণ্ডের পরাজয় ১ বার (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পরাজয় ১বার (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে)। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই নজির প্রথম সৃষ্টি হয় ১৯৩৫ সালের ১০ই জানুয়ারী ব্রিজটাউনে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পরাজয়ের সূত্রে।

উইসডেন ট্রফি

ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৩টি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হয়েছে। প্রথম ১০টি টেস্ট সিরিজের বিজয়ী দলকে কোন ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে 'রাবার' বিজয়ী। ১৯৬৩ সাল অর্থাৎ এই দুই দেশের একাদশ টেস্ট সিরিজ থেকে 'রাবার' বিজয়ী দেশকে 'উইসডেন ট্রফি' দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। এপর্যন্ত এই উইসডেন ট্রফি পেয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২বার (১৯৬৩ ও ১৯৬৬) এবং ইংল্যাণ্ড একবার (১৯৬৭-৬৮)।

ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলায় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন :

ইংল্যাণ্ড : ব্যাটিংয়ে—কলিন কাউড্রে, লেন হাটন, টম গ্রেভনী, কেন ব্যারিংটন, ই হেণ্ড্রেন, পিটার মে, জিওফ বয়কট, ডেনিস কম্পটন, এ্যান্ডি স্যান্ডহাম প্রভৃতি। বোলিংয়ে—ফ্রেডী ট্রুম্যান, জে সি লেকার, জে বি স্ট্যাথম প্রভৃতি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ব্যাটিংয়ে—গ্যারী সোবার্স ঐতিহাসিক 'থ্রি ডবলিউ'—স্যার ফ্র্যাংক ওরেল, ক্লাইড ওয়ালকট এবং এভার্টন উইকস, রোহন কানহাই, জর্জ হেডলে, বেসিল বুচার, সেমুর নার্স, কনরাড হান্ট, স্যার লিয়ারী কনস্টানটাইন প্রভৃতি। বোলিংয়ে—সনি রামাধীন, গ্যারী সোবার্স, এল আর গিবস, ওয়েসলি হল, সি সি গ্রিফিথ, স্যার লিয়ারী কনস্টানটাইন, আলফ ভ্যালেনটাইন প্রভৃতি।

অল-রাউণ্ডার হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্যারী সোবার্স—২৬টি টেস্টে মোট রান ২৬৫৮ (গড় ৬৮·১৫), এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৬ সেঞ্চুরী ৯টি এবং ক্যাচ ৩০টি। উইকেট পেয়েছেন ২৪১৮ রানে ৭১টি (গড় ৩৪·০৫)।

এক নজরে ফলাফল

	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	খেলা ড্র
ইংল্যাণ্ডে	১২	৯	৭
ওয়েস্ট ইণ্ডিজে	৬	৭	১৪
মোট :	১৮	১৬	২১

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যাণ্ড : ৮৪৯ রান, কিংস্টন, ১৯২৯-৩০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৮১ রান (৮ উইঃ ডিক্লে), ত্রিনিদাদ ১৯৫৩-৫৪

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান
(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ইংল্যাণ্ড : ১০৩ রান, কিংস্টন, ১৯৩৪-৩৫
১০৩ রান, ওভাল, ১৯৫০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৮৬ রান, ওভাল, ১৯৫৭

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যাণ্ড : ৩২৫ রান — এ্যাণ্ডি স্যাণ্ডহাম, কিংস্টন, ১৯২৯-৩০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৭০ নটআউট — —জর্জ হেডলে, কিংস্টন ১৯৩৪-৩৫

টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২ বার — জর্জ হেডলে ১১৪ ও ১১২, জর্জ-টাউন ১৯২৯-৩০; ১০৬ ও ১০৭, লর্ডস ১৯৩৯

ইংল্যাণ্ড : কোন নজির নেই

সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫৫ ।। ইংল্যাণ্ড ৫৪

ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বছর	স্থান	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	খেলা ড্র	রাবার জয়ী
১৯২৮	ইংল্যাণ্ড	৩	০	০	ইংল্যাণ্ড
১৯২৯-৩০	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১	১	২	ড্র
১৯৩৩	ইংল্যাণ্ড	২	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৪-৩৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১	২	১	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৩৯	ইংল্যাণ্ড	১	০	২	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৭-৪৮	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	০	২	২	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৫০	ইংল্যাণ্ড	১	৩	০	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৫৩-৫৪	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২	২	১	ড্র
১৯৫৭	ইংল্যাণ্ড	৩	০	২	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৯-৬০	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১	০	৪	ইংল্যান্ড
১৯৬৩	ইংল্যাণ্ড	১	৩	১	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	১	৩	১	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৬৭-৬৮	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১	০	৪	ইংল্যাণ্ড
	মোট :	১৮	১৬	২১	

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৪৮৯ (গড় ৯৭·৮০)—পিটার মে, ১৯৫৭

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৬৯৩ (গড় ১১৫·৫০)—ই হেণ্ড্রেন ১৯২৯-৩০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৭২২ (গড় ১০৩·১৪)—গ্যারী সোবার্স ১৯৬৬

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৭০৯ (গড় ১০১·২৮)—গ্যারী সোবার্স, ১৯৫৯-৬০

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৩৪টি (গড় ১৭·৪৭)—ফ্রেডী ট্রুম্যান, ১৯৬৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২৭টি (গড় ১৮·৬৬)—জন স্নো, ১৯৬৭-৬৮

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ইংল্যাণ্ডে : ৩৩টি (গড় ২০·৪২)—এ এল ভ্যালেনটাইন, ১৯৫০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২৩টি (গড় ২৪·৬৫)—ড বলিউ ফার্গুসন, ১৯৪৭-৪৮
: ২৩টি (গড় ২৪·৩০)—এস রামাধীন ১৯৫৩-৫৪

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যাণ্ড : ১২টি (১১৯ রানে)—ফ্রেডী ট্রুম্যান, বার্মিংহাম, ১৯৬৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১১টি (১৫২ রানে)—এস রামাধীন, লর্ডস, ১৯৫০, ১১টি (১৫৭ রানে)—এল আর গিবস, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৬৩, ১১টি (২০৪ রানে)—এ ভ্যালেনটাইন, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫০, ১১টি (২২৯ রানে) — ডবলিউ ফার্গুসন, ত্রিনিদাদ, ১৯৪৭-৪৮

এক ইনিংসে দলগত ৫০০ রান

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

৮৪৯		কিংস্টন	১৯২৯-৩০
৬১৯-৬	ডিক্লেঃ	নটিংহাম	১৯৫৭
৫৮৩-৪	ডিক্লে	বার্মিংহাম	১৯৫৭
৫৬৮		ত্রিনিদাদ	১৯৬৭-৬৮
৫৩৭		ত্রিনিদাদ	১৯৫৩-৫৪
৫২৭		ওভাল	১৯৬৬

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

৬৮১-৮	ডিক্লে	ত্রিনিদাদ	১৯৫৩-৫৪
৫৬৩-৮	ডিক্লে	ব্রিজটাউন	১৯৫৯-৬০
৫৫৮		নটিংহাম	১৯৫০
৫৩৫-৭	ডিক্লেঃ	কিংস্টন	১৯৩৪-৩৫
৫২৬-৭	ডিক্লেঃ	ত্রিনিদাদ	১৯৬৭-৬৮
৫০৩		ওভাল	১৯৫০
৫০১-৬	ডিক্লেঃ	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৬৩
৫০০-৯	ডিক্লেঃ	লিডস	১৯৬৬

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী
(দুই দলের সমষ্টি)

১৪টি : ইংল্যাণ্ড ৯ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫, ১৯৫৯-৬০

১৩টি : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ এবং ইংল্যাণ্ড ৬, ১৯৬৭-৬৮

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী
(এক দলের পক্ষে)

ইংল্যাণ্ড : ৯টি, ১৯৫৯-৬০
৮টি, ১৯৫৭

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৮টি, ১৯৬৬
৭টি, ১৯৬৭-৬৮

সেঞ্চুরীশূন্য টেস্ট সিরিজ

১৯২৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ড টেস্ট সিরিজে সেঞ্চুরী করতে পারেনি।

সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৬৫৮ রান — গ্যারী সোবার্স (খেলা ২৬, ইনিংস ৪৫, নট আউট ৬ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৬, সেঞ্চুরী ৯ এবং গড় ৬৮·১৫)

ইংল্যাণ্ড : ১৭৫১ রান — কলিন কাউড্রে (খেলা ২১, ইনিংস ৩৬, নট আউট ২ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫৪, সেঞ্চুরী ৬ এবং গড় ৫১·৫০)

সর্বাধিক উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৮০টি — সনি রামাধীন (বল ৭১৮৪, মেডেন ৯৬৪, রান ২১৯৫ এবং গড় ২৭·৪৩)

ইংল্যাণ্ড : ৮৮টি — ফ্রেডী ট্রুম্যান (বল ৪৭০৪, মেডেন ১৮২, রান ২০২৫ এবং গড় ২৩·১)

সর্বাধিক সেঞ্চুরী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৯টি — গ্যারী সোবার্স
ইংল্যাণ্ড : ৬টি — কলিন কাউড্রে

সর্বাধিক ক্যাচ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩০টি — গ্যারী সোবার্স
ইংল্যাণ্ড : ২০টি — টম গ্রেভনী

সর্বাধিক ডিসমিস্যাল

ইংল্যাণ্ড : ৩৭টি (ক্যাচ ২৮ ও স্টাম্পড ৯) — টি জি ইভান্স

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩১টি (ক্যাচ ২৩ ও স্টাম্পড ৮) — ক্লাইড ওয়ালকট

দ্রষ্টব্য : ইভান্স ১৬টি এবং ওয়ালকট ২০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন।

মোট ১০০০ রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৯ জন এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ৪ জন খেলোয়াড় মোট ১০০০ বা তার বেশী রান সংগ্রহ করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্বাধিক ২৬৫৮ রান সংগ্রহ করেছেন গারফিল্ড সোবার্স এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক ১৭৫১ রান করেছেন কলিন কাউড্রে।

৫০টি উইকেট

ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মোট ৫৫টি টেস্ট খেলায় মোট ৫০ বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৬জন এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ২জন। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ৮৮টি উইকেট পেয়েছেন ইংল্যাণ্ডের ফ্রেডী ট্রুম্যান এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্বাধিক ৮০টি উইকেট পেয়েছেন সনি রামাধীন।

একটি খেলায় সর্বাধিক **ওভার : ১২৯ ওভার** (৭৭৪ বল)—সনি রামাধীন, বার্মিংহাম, ১৯৫৭ (বিশ্বরেকর্ড)

এক ইনিংসে সর্বাধিক ওভার : ৯৮ ওভার (৫৮৮ বল)—সনি রামাধীন, বার্মিংহাম, ১৯৫৭ (বিশ্বরেকর্ড)

হ্যাটট্রিক : পি জে লোডার (ইংল্যাণ্ড), লিডস ১৯৫৭

এক ইনিংসে পাঁচটি উইকেট
(সর্বাধিক বার)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬ বার — ল্যান্স গিবস
ইংল্যাণ্ড : ৬ বার — ফ্রেডী ট্রুম্যান

উইসডেন ট্রফি হাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল। ১৯৬৩ সালে উইসডেন ট্রফির উদ্বোধনী বছরেই ফ্রাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩—১ খেলায় (ড্র-১) ইংলণ্ডকে পরাজিত করে এই ট্রফি জয়ী হয়।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় উল্লেখযোগ্য নজির :

৩২৫ রান : এণ্ডি স্যাণ্ডহাম (ইংল্যাণ্ড), কিংস্টনের ৪র্থ টেস্ট, এপ্রিল ১৯৩০ — আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার এক ইনিংসে 'ট্রিপল' সেঞ্চুরীর প্রথম নজির এবং সেই সূত্রে টেস্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব রেকর্ড। এখানে উল্লেখ্য, সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এক ইনিংসে এপর্যন্ত ৯ জন খেলোয়াড় ১০টি 'ট্রিপল' সেঞ্চুরী করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান করেছেন ২টি। টেস্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড : ৩৬৫ নট আউট—গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮।

৮৪৯ রান : ইংল্যাণ্ড, কিংস্টনের ৪র্থ টেস্ট, এপ্রিল ১৯৩০—আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার এক ইনিংসে সর্বাধিক দলগত রানের রেকর্ড (সেই সূত্রে বিশ্ব রেকর্ড)। ইংল্যাণ্ডই ১৯৩৮ সালে ওভাল মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৯০৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) তুলে যে বিশ্ব রেকর্ড করে, তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

২০৬ ও ১০৭ রান : জর্জ হেডলে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), লর্ডস মাঠের ২য় টেস্ট, জুন ১৯৩৯ — একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে লর্ডস মাঠের সরকারী টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার একমাত্র নজির।

এক সিরিজে ৭০৩ রান : জর্জ হেডলে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ১৯২৯-৩০ সালের টেস্ট সিরিজে (৪টি টেস্ট ম্যাচ) এই ৭০৩ রান সংগ্রহ করার সূত্রে ইংল্যাণ্ড—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন একটি টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান করার রেকর্ড করেন। ১৯৫৯-৬০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই গারফিল্ড সোবার্স ৫টি টেস্ট খেলায় মোট ৭০৯ রান সংগ্রহ করে জর্জ হেডলের রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

অসাধারণ পরাজয় : ১৯৩৫ সালের (১০ই জানুয়ারী) ব্রিজটাউনের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪ উইকেটে পরাজয় আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি অসাধারণ নজির। এই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের ৫১ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং ইংল্যাণ্ড তাদের ২য় ইনিংসের খেলায় ৬ উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৭৩ রান তুলে দেয়। আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একদল তাদের ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে শেষপর্যন্ত খেলায় পরাজয় বরণ করেছে এমন নজির আর মাত্র তিনটি আছে।

বেটন কাপ ফাইনাল

১৯৬৯ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলাটিও গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। এই দিন দু'বার অতিরিক্ত সময় খেলানো হয়। মোট খেলার সময় দাঁড়ায় ৯০ মিনিট। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান এবং কোর অব সিগন্যালস দলকে বেটন কাপের যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিয়ে মোহনবাগান ৮বার ফাইনালে খেলে ৭বার বেটন কাপ জয়ী হল। তবে এর মধ্যে ৩বার যুগ্মভাবে জয়ী হয়েছে—১৯৬৪ সালে ইস্টবেঙ্গল, ১৯৬৫ সালে কাস্টমস এবং ১৯৬৯ সালে কোর অব সিগন্যালস দলের সঙ্গে। মোহনবাগানের অন্যান্য বছরের বেটন কাপ জয়—১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬০ ও ১৯৬৮ সালে। ১৯৬৯ সালে বেটন কাপ জয়ের ফলে মোহনবাগান একই বছরে প্রথম বিভাগের হকি লীগ এবং বেটন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করলো। মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী কোর অব সিগন্যালস দলের এই প্রথম বেটন কাপ জয়। ইতিপূর্বে তারা একবার রানার্স-আপ হয়েছিল—১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব পুলিশ দলের সঙ্গে ফাইনাল খেলে।

এখানে উল্লেখ্য, একই বছরে প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং বেটন কাপ জয়ী হয়েছে এই ৫টি দল: ক্যালকাটা কাস্টমস ৮বার, রেঞ্জার্স ৩বার, মোহনবাগান ৩বার, পোর্টকমিশনার্স ২বার এবং সি ই কলেজ, শিবপুর ১বার (১৯০৯)। ক্যালকাটা কাস্টমস উপর্যুপরি ৩ বছর (১৯৩০-৩২) হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং বেটন কাপ জয়ী হয়ে যে রেকর্ড করেছে তা আজও অক্ষুন্ন আছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল

১৯৬৯ সালের ইংল্যান্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছে না তার প্রধান কারণ বৃষ্টি। সফরের বিগত খেলার হিসাব নিলে দেখা যাবে, যেখানে তাদের ১২ দিন খেলার কথা ছিল, সেখানে ৭ দিনের খেলা বৃষ্টির জন্যে বাতিল হয়েছে। ইংল্যান্ড সফরের তালিকা অনুযায়ী তারা এপর্যন্ত ৬টি ম্যাচ খেলেছে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ড্র৫ (সবগুলিই বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত) এবং পরাজয় ১—নর্দামটনশায়ার কাউন্টি দলের কাছে ৬৫ রানে। ইংল্যান্ড সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে ইতিমধ্যেই যে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তাতেই দলের কর্মকর্তাদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে। ক্ষতির পরিমাণ কত ভয়বহ তা এই একটা খেলার হিসাবেই যথেষ্ট হবে। ১৯৬৬ সালের সফরে কেন্ট কাউন্টি দলের সঙ্গে খেলে

দর্শক

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যেখানে ৪,৫০০ স্টার্লিং পাউন্ডের লভ্যাংশ পেয়েছিল সেখানে বর্তমান সফরে পেয়েছে মাত্র ৩০০ স্টার্লিং পাউন্ড।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্ষতি শুধু টাকার দিক থেকেই নয়। বর্তমান সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে এমন ৮জন খেলোয়াড় আছেন যাঁদের ইংল্যান্ড সফর এই প্রথম। ইংল্যান্ডের জলবায়ু, খেলার মাঠের পরিবেশ এবং খেলার রীতিনীতি সম্পর্কে তাঁরা সম্যক ওয়াকিফহাল নন। একনাগাড়ে বৃষ্টির ফলে তাঁদের অনুশীলনে যথেষ্ট বাধা পড়ছে। দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স নিঃসন্দেহে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অল-রাউন্ডার। কিন্তু তিনি একা কতদিক সামলাবেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেছে। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে উপর্যুপরি পাঁচটি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'রাবার' জয়ী হয়—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২বার, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২বার এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১বার। এর পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট খেলায় ভাটা পড়ে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৯৬৭-৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড ১-০ খেলায় (ড্র ৪) এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৩-১ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত করে। এরপর ১৯৬৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম নিউজিল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ ১-১ খেলায় (ড্র ১) ড্র যায়। এর ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ উপর্যুপরি পাঁচটি 'রাবার' জয়ের সূত্রে বে-সরকারী ভাবে যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান খেতাব পেয়েছিল তা হাতছাড়া করেছে। দলও ভেঙ্গে গেছে। বর্তমান ইংল্যান্ড সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলে অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় নির্বাচিত হননি। যেমন হল, গ্রিফিথ, নার্স, হলফোর্ড এবং কানহাই। সুতরাং অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের কাঁধে বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ইংল্যান্ড সফরের শেষ খেলা আরম্ভ হবে ১৯শে জুলাই। সফরের খেলার তালিকায় আছে পাঁচদিন ব্যাপী তিনটি টেস্ট ম্যাচ।

টেস্ট খেলার তারিখ এবং মাঠ

১ম টেস্ট, ওল্ড ট্রাফোর্ড : আরম্ভ জুন ১২
২য় টেস্ট, লর্ডস : আরম্ভ জুন ২৬
৩য় টেস্ট, লিডস : আরম্ভ জুলাই ১০

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত ৯ই মে থেকে কলকাতার মাঠে ১৯৬৯ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাবে সুরু হয়েছে। দিনটা কিন্তু মোটেই শুভ হয়নি। বৃষ্টির ফলে নির্ধারিত দুটি খেলাই পরিত্যক্ত হয়। গত বছরও ঝড়-জলে লীগের উদ্বোধনী খেলা বাতিল হয়েছিল এবং প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি।

কলকাতার নামকরা তিনটি দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং লীগের খেলা সুরু হওয়ার অনেকদিন পরে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামে। ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং তাদের প্রথম ম্যাচ খেলে ১৯শে মে এবং মোহনবাগান ২০শে মে। এপর্যন্ত এই তিনটি দলই তিনটে করে ম্যাচ খেলেছে। মোহনবাগান তার তিনটে খেলায় ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। ইস্টবেঙ্গল করেছে ৫ পয়েন্ট এবং ১৯৬৮ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং ৪ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গল গোলশূন্য অবস্থায় বি এন আর দলের সঙ্গে খেলা ড্র রেখে এক পয়েন্ট নষ্ট করেছে। অপরদিকে মহমেডান স্পোর্টিং ০-০ গোলে বালী প্রতিভা এবং ১-১ গোলে কালীঘাটের সঙ্গে খেলা ড্র করে দুই পয়েন্ট নষ্ট করেছে।

বছরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আয়ান চ্যাপেল

অস্ট্রেলিয়ার গত ক্রিকেট মরসুমে আয়ান চ্যাপেল ব্যাটিংয়ে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন তারই স্বীকৃতিতে তাঁকে বছরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সম্মান দেওয়া হয়েছে। গত মরসুমের প্রথম শ্রেণীর খেলায় তিনি ১,৫০০ রান সংগ্রহ করেন। ১৯২৮-২৯ সালের মরসুমে প্রথম শ্রেণীর খেলায় স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান ১৭০০ রান সংগ্রহ করে অস্ট্রেলিয়ান রেকর্ড করেছিলেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৮-৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে চ্যাপেল ৫টি টেস্টের ৮ ইনিংসে মোট ৫৪৮ রান (গড় ৬৮.৫০) সংগ্রহ করেছিলেন। উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় তিনি ৩য় স্থান পান। সেঞ্চুরী করেছিলেন দুটো—১১৭ রান (১ম টেস্ট, ব্রিসবেন) এবং ১৬৫ রান (২য় টেস্ট, মেলবোর্ণ)। চ্যাপেলের বয়স ২৫ বছর।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

বিচিত্র রচনা ॥ বিচিত্র লেখক

অবধূতের দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা

উদ্ধারণপুরের ঘাট (১৪শ মুঃ) ৫, **মরুতীর্থহিংলাজ** (২৪শ মুঃ) ৬,

কাশ্মীর বেদান্তবাগীশের
[ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী সম্পাদিত]
বেদান্ত সংজ্ঞাবলী ৮,

কালীপদ ঘটকের
বিখ্যাত বই
অরণ্য কুহেলী ৫, **মৃদঙ্গার** ৪॥

কালিকারঞ্জন কানুনগোর
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
রাজস্থান কাহিনী ৮॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
এক খন্ডে সম্পূর্ণ
পৃথিবীর ইতিহাস ৪॥

তরুণকুমার ভাদুড়ীর
সন্ধ্যাদীপের শিখা ৪॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
তুচ্ছ ৪॥ **জলকল্লোল** ৫॥

প্রমথনাথ বিশীর
মাইকেল মধুসূদন ৪॥

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ (১ম) ৮, (২য়) ৮,

অদৃষ্ট রহস্য ৩॥

বাংলাসাহিত্যিকের বিখ্যাত লেখকদের
স্ব-নির্বাচিত প্রিয় গল্প
আমার প্রিয় গল্প ৭্

বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিকের
শুভ বিবাহের বিচিত্র কাহিনী
নবজীবনের প্রান্তে ৩্

শচীন্দ্রলাল রায় অনূদিত
বাবরের আত্মকথা ৫্

লীলা মজুমদারের
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
আর কোনোখানে ৫,
(তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত)

অপূর্বমণি দত্তের
সম্রাট বাহাদুরশার বিচার ৩.

সৈয়দ মুজতবা আলীর
নবতম রম্যরচনা
রাজা উজীর ৮্

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নবতম জীবনকথা
গৌরাঙ্গ পরিজন ১০্

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
আমি কান পেতে রই ১৪্

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস
স্বয়ম্বৃতা ৬্

জরাসন্ধের
॥ মাত্র দুই মাসে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত ॥ **জায়গা আছে** ৪

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সর্বশেষ উপন্যাস
ক্ষুধা ৭,

প্রবোধকুমার সান্যালের
এক চামচ গঙ্গা ৪,

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত
ভারতের তাবৎ প্রবীণ নেতা ও চিন্তানায়কদের রচনা-সংকলন
গান্ধী পরিক্রমা
গান্ধীশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষভাবে লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা — ১২

১ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৫ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 6th June, 1969. শুক্রবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীআর কিশোর যাদব

চিঠিপত্র

নববর্ষ সংখ্যা

অমৃত-এর নববর্ষ সংখ্যাটি (১৩৭৬) প্রতিটি সাহিত্যানুরাগীর কাছে একটি মূল্যবান উপহার হিসাবে আদৃত হবে। এতে সুনির্বাচিত গল্প ছাড়াও খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সচিত্র পরিচিতি একটি বিশেষ আকর্ষণ। প্রতিটি পরিচিতিতে লেখক সম্পর্কে আলোচনা না দিয়ে 'লেখা' সম্বন্ধে আলোচনা থাকায় বেশ নতুনত্ব মনে হয়েছে। তবে আরও কয়েকজন জনপ্রিয় সাহিত্যিকের রচনা সংযোজিত হলে আরও খুশী হতাম। এইরূপ একটি মূল্যবান সংকলন ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখবার মত।

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
রাঁচি—৪

মানুষগড়ার ইতিকথা

'অমৃত' (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬) একটি সদ্‌প্রসঙ্গের সূচনা করে, দেশ ও জাতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। "মানুষ গড়ার ইতিকথার" সূচনায় সন্ধিৎসু মহৎ কাজ আরম্ভ করেছেন,—এ কাজ সুকঠিন ও পরিশ্রমসাধ্য। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ইতিহাসের মর্যাদা রেখে, প্রসঙ্গটি সমাপ্ত হলেই সন্ধিৎসু সুগভীর শ্রদ্ধায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আজকের দিনের তরুণ সমাজের কাছে এইসব ইতিহাস তুলে ধরার সার্থকতা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি—তরুণেরা এমন ইতিহাস জানতে চান,—জানাবার লোকেরই অভাব।

প্রবন্ধটিতে কিছু তথ্যগত ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল, সবিনয়ে নিবেদন করি। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের নাম—(১) আনসেলম নহেন,— D'Anselme. (ডি অনসেলম)। (২) ইউরোপীয় সম্পাদক ছিলেন—("আর্ভিন" নহেন) লেঃ ফ্রান্সিস আরভিন। (৩) প্রখ্যাত অধ্যাপক (পরে অধ্যক্ষ) রিচার্ডসন সাহেব বেথুন সাহেবের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় পদত্যাগ করেন বা চাকুরী ছেড়ে চলে যান,—এর ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। ১৮৬১ সালে, ৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা টাউন হলে, তাঁর প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রগণ ডি, এল, রিচার্ডসনের কর্মজীবনের অবসর গ্রহণ ও বিলাত যাত্রা উপলক্ষে সম্বর্ধনার বিপুল আয়োজন করেন, —চারি সহস্র মুদ্রার তোড়া পাথেয়স্বরূপ ও অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয় ("সোমপ্রকাশ" পত্রিকা ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১ সম্পাদকীয় এবং বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের "The Hindoo College and its Founder — 1862" —গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। (৪) হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্রদের নামের তালিকায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মধুসূদন, ভূদেব, ভোলানাথ এঁদের সহাধ্যায়ী ছিলেন। রেভাঃ লালবিহারী দে সম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগাজিনে" কিশোরীচাঁদের প্রখ্যাত প্রবন্ধ "The Presidency College"—1873. ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। ১৮৫৭ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা—The Mutiny, the Government and the People" — By a Hindoo ছদ্মনামে "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রবন্ধ লেখার জন্য কোলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ পদচ্যুত হন (হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত সম্পাদকীয় — "হিন্দু পেট্রিয়ট' — ১১ই নভেম্বর, ১৮৫৮)। ভোলানাথ চন্দ্রের স্মৃতিচরণ এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

গোরাচাঁদ মিত্র,
টেকচাঁদ ঠাকুর ভবন,
কলকাতা—৬।

চিঠির জবাব

'হিন্দু স্কুল' সম্পর্কে আমার লেখায় কয়েকটি ভুল (?) আবিষ্কার করে চিঠি লিখেছেন শ্রীগোরাচাঁদ মিত্র। লেখাটি খুঁটিয়ে পড়েছেন বলে গোড়াতেই ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে আমার জবাব এখানে পেশ করছি।

শ্রীমিত্র দাবী করেছেন যে, হিন্দু স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষকের নামের বানান হওয়া উচিত ডি' অনসেলম। আমি লিখেছি ডি' আনসেলম। হিন্দু স্কুলের 'দেড়শত বর্ষ পূর্তি' স্মারক পত্রিকায় 'হিন্দু স্কুলের আদিপর্ব" প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল যে বানান দিয়েছেন, আমি তাই অনুসরণ করেছি। ইংরেজীতে নামটির বানান—D'Anselme. এর সঠিক বাংলা উচ্চারণ ও বানান আমার ত' মনে হয় যোগেশবাবুই বাতলে দিয়েছেন। শ্রীমিত্রের দ্বিতীয় দাবী হিন্দু স্কুলের প্রথম ইউরোপীয় সম্পাদকের নামের বানানে আমি ভুল করেছি। তাঁর মতে Lt. Francis Irvine বাংলায় হবে লে, ফ্রান্সিস আরভিন। পান্ডুলিপিতে আরভিনই ছিল, ছাপার সময়ে ভুল হয়েছে সেজন্য দুঃখিত। প্রসঙ্গত বানান ও উচ্চারণ প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলা দরকার। শ্রীমিত্র তাঁর চিঠিতে এক জায়গায় Europe বানান লিখেছেন ইউরোপ। মাইকেল মধুসূদন লিখতেন "উরোপ", রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "য়ুরোপ", অনেকেই লেখেন 'য়োরোপ' এবং আমি শ্রীমিত্রের মত লিখে থাকি 'ইউরোপ'। দয়া করে শ্রীমিত্র জানাবেন কি Europe শব্দটির থাঁটি বাংলা বানান ও উচ্চারণ কি হবে?

শ্রীমিত্রের তৃতীয় দাবী 'বেথুন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে রিচার্ডসন চাকরী ছেড়ে দেন' এটা নিছক গালগল্প। জানিনা কোন ইতিহাস পড়ে শ্রীমিত্র আমার তথ্যটিকে অনৈতিহাসিক বলে দাবী করেছেন, তবে নিজের স্বপক্ষে আমি দাবী করতে পারি যে "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" বইয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী যা লিখেছেন, আমি তাই অনুসরণ করেছি। চিঠি বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করে দেখাতে বিরত থাকছি। তবে অনুরোধ জানাই ঐ বইয়ের (নিউ এজ দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৮৩ পৃষ্ঠায় একবার চোখ বোলাতে। তাছাড়া 'হিন্দু স্কুলের আদিপর্ব' প্রবন্ধেও যোগেশচন্দ্র বাগল একই মত পোষণ করেছেন। শ্রীমিত্রের তৃতীয় দাবীটি একটু বিস্ময়করও বটে। উনি আমার ঐ লাইনটি থেকে কল্পনার সাহায্য অনুমান করে নিয়েছেন যে ঐ ঘটনার পরে রিচার্ডসন দেশে ফিরে যান। তাই ছায়ার সঙ্গে লড়াই চালাবার জন্য তাঁর চিঠিতে রিচার্ডসনের বিদায় সম্বর্ধনার উল্লেখ দেখি। আমার ঐ লাইনটির এ ধরনের অদ্ভুত ব্যাখ্যায় আমি নিজেই চমকে গেছি। হিন্দু কলেজ ছাড়ার পর রিচার্ডসন মেট্রোপলিটান একাডেমী, মেট্রোপলিটান কলেজ ওরিয়েন্টাল সেমি-নারীতে বহু বছর পড়িয়েছেন এ তথ্য প্রায় সকলেরই জানা। তাই ১৮৪৯-এ বেথুনের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি দেশে ফিরে যাবেন কি করে?

সবশেষে শ্রীমিত্র একটি প্রচ্ছন্ন অভিযোগ এনেছেন—কেন হিন্দু স্কুলের প্রখ্যাত ছাত্র-তালিকায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের নাম উল্লিখিত হয় নি? তার জন্য আমি দুঃখিত। তবে একটা কথা বলা দরকার, আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নামী ছাত্রদের ক্যাটালগ তৈরী করা নয়। উদ্দেশ্য গত দেড়শো বছরে বাংলার সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে স্কুলের অসামান্য অবদান ফুটিয়ে তোলা। অনেক নামই ত' বাদ গেছে। বাদ গেছে কিশোরীচাঁদের সহাধ্যায়ী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়ের ছেলে রমাপ্রসাদ রায় বা পূর্ববর্তী যুগের প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র ঠাকুর ও পরবর্তী যুগের খ্যাতনামা ডজন ডজন ছাত্রের নাম। তাঁদের হয়েও দাবী জানান নি শ্রীমিত্র? তাই যখন দেখি কিশোরীচাঁদ মিত্রের খ্যাতনামা দাদা প্যারী-চাঁদ মিত্রের ছদ্মনামে নামাঙ্কিত 'টেকচাঁদ ঠাকুর ভবন' থেকে গোরাচাঁদ মিত্র অভিযোগ আনেন ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকার সম্পাদকের নাম কেন আমার রচনায় স্থান পায় নি, তখন আমার তরফে দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিই বা করার থাকে। ইতি—

—[illegible]।

সম্পাদকীয়

মার্কসবাদীদের নতুন চিন্তা

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনের মাধ্যমে দুইটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পর তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এটা নিশ্চয়ই অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে কথায় না হলেও কাজে এক হবার মতো অবস্থা তাঁরা তৈরি করছেন। এই হৃদয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সাম্প্রতিক দিল্লী আগমনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। তবে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির খোঁজ যাঁরা রাখেন, তাঁদের কাছে এই কমিউনিস্ট পার্টির সাম্প্রতিক সমঝোতার প্রচেষ্টা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হবে।

১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দু' ভাগ হয়ে যায়। এই ভাঙনের মূলে ছিল সোভিয়েট নেতৃত্ব সম্পর্কে চীনা পার্টির অভিযোগ। শোধনবাদী কথাটা সেই সময়েই সোভিয়েট নেতৃত্ব সম্পর্কে চীনা পার্টি প্রয়োগ করে ১৯৬৩ সালের জুন মাসের এক দলিলে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে-অংশ শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের অনুগত, তাঁরা চীনা পার্টির এই দলিলকে নিতান্ত কুৎসা বলে বরবাদ করেন। তখন সুন্দরায়া, বাসবপুন্নায়া, রণদিভে, প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘু সদস্যরা চীনা পার্টির দলিল সমর্থন করে পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পার্টি গড়েন—যার নাম হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। পরে দেখা গেল যে, সারা ভারতে না হলেও কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে মার্কসবাদীরাই প্রধান কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়েছে। দুই পার্টির মধ্যে প্রচণ্ড গালাগাল ও কুৎসা রটনা চলতে থাকে পরস্পরের বিরুদ্ধে। এখনো তা থামেনি। কিন্তু ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার পর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে তাঁদের মত, পথ ও কৌশল নিয়ে আবার নতুন চিন্তা শুরু হয়। একটি সংখ্যালঘু অংশ যাঁরা মার্কসবাদীদের পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসা পছন্দ করেন না, তাঁরা সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়ে তরাই অঞ্চলে আন্দোলন গড়ে তোলেন। বলা বাহুল্য এই আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে তাঁরা খুব আশাবাদী ছিলেন না। কিন্তু এর দ্বারা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে খুবই বিব্রত করা সম্ভব হয়েছিল। কেননা, তাঁরা তখন সরকার গঠন করেছেন। মার্কসবাদী পার্টির ভিতরে বিরোধের তখনই সূত্রপাত।

সম্প্রতি সেই বিরোধ তীব্রতর হয়েছে। মার্কসবাদী পার্টি থেকে একটি সংখ্যালঘু অংশ বেরিয়ে গিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছে। এই পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রবক্তা হিসেবে চীনা পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর নেতৃত্ব স্বীকার করেন। চীনা পার্টিও ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি বলতে এদেরই বোঝায়। আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, নতুন পার্টি গঠনের তিন সপ্তাহের মধ্যেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো এক প্রস্তাবে মাও সে তুং-এর নেতৃত্ব ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বগত লাইনকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করে বরবাদ করেছেন। এতদিন যে-কাজটি 'শোধনবাদী' ডাঙ্গে পার্টির একচেটিয়া ছিল এখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকেও তা করতে হবে। তবে ফারাক একটু আছে। মার্কসবাদীরা চীনা পার্টির বর্তমান নেতৃত্বকে যেমন নিন্দা করেছেন তেমনি সোভিয়েট নেতৃত্বকেও বলেছেন শোধনবাদী। অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে চীনা পার্টির দলিলের সঙ্গে তাঁরা এখনও একমত। ব্যতিক্রম শুধু তাঁদের পরবর্তী ও বর্তমান কার্যক্রম নিয়ে। তবে মাও সে তুং-এর প্রতি আনুগত্য, ব্যক্তিপূজা ইত্যাদি বিষয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বলেছেন যে, চীনা পার্টিকে এখন চালানো হচ্ছে বিশ্বাস দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে নয়। এই কঠোর সমালোচনার পর স্বভাবতই চীন আরও রুষ্ট হবে এবং সাচ্চা কমিউনিস্টদের দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের জন্য তৎপর হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে ভারতের কমিউনিস্টরা এখন হয়তো পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারবেন। পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল ও সমাজের মৌলিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী হয়ে এঁরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। জনসাধারণের সমর্থনে দু'টি রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকারও গঠিত হয়েছে যার মধ্যে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব আছে। সুতরাং তাঁদের এই পরীক্ষা সার্থক করতে হলে হঠকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সম্প্রতি দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে সমঝোতা আলোচনা হয়ে গেছে। যুক্তফ্রণ্টের শরিকদলগুলোর মধ্যে যে-ধরনের ঝগড়া শুরু হয়েছে এবং মারামারি চলছে তাতে এই ধরনের সমঝোতা না হলে কাজ করাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এখন ফারাক তো শুধু নেতৃত্বের। আদর্শগত ও কৌশলগত পার্থক্য যখন কমে এসেছে তখন হয়তো দেখা যাবে এঁদের জ্ঞাতি-শত্রুতা দূর হবার দিন আর বেশি দূরে নয়। সুস্থ ও দায়িত্বশীল রাজনীতির পক্ষে তার প্রয়োজন তো অস্বীকার করা যায় না।

(সাত)

গান্ধী, অহিংসা ও জনগণ এই ত্রয়ীতে আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তিনের যোগফলে ভারতের কী ভাবরূপ হবে তা আমাকে ভাবিয়ে তুলত। যদি হয় বর্ণাশ্রমী ভারত তাহলে তো তার সঙ্গে আমার মূলগত অমিল। কারণ আমি চাই গতিশীল জীবন, স্থিতিশীল জীবন নয়। আর আমি চাই নূতন শৃঙ্খলা, পুরাতন শৃঙ্খল নয়।

গান্ধীজীর দিকে আমি তাকিয়ে থাকি, প্রতি সপ্তাহে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পড়ি। ইতিপূর্বেই পড়া হয়েছিল 'হিন্দ স্বরাজ'। এরপরে পড়া গেল 'সত্যের পরীক্ষা' বা আত্মজীবনী। এ জগতে যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেন ইনি হলেন তেমনি একজন পুরুষ। এঁকে যীশু বুদ্ধের মতো মহাপুরুষও বলতে পারা যায়। আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা এঁর বাণী সতৃষ্ণ আগ্রহে পান করে। ইনি যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আমিও যে সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এ কি আমার চরম সৌভাগ্য নয়! ভাবীকালের মানুষ আমাকে এই জন্যে ঈর্ষা করবে। আমার সাধ ছিল যাতে একদিন বলতে পারি, "হাঁ, গান্ধীজীকে আমি দেখেছি।"

সুযোগ জুটে যায় তাঁর জেল থেকে বেরোবার বছর দেড়েক পরে পাটনায়। যেবার স্বরাজীদের হাতে কংগ্রেসকে সঁপে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিখিলভারত কাটুনী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ধার করা এক ক্যামেরা ঝুলিয়ে আমিও ঢুকে পড়ি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায়। মহাত্মার কাছ থেকে অদূরেই আমার আসন। ফোটো তুলিনি, তবে সমস্তক্ষণ তাঁর উপর দৃষ্টি রেখেছি সূর্যমুখীর মতো। মানুষটার সীক্রেট কী? কিসের জোরে উনি নতুন এক সৌরমন্ডলীর সূর্য? কেন ওইসব সর্বজনমান্য জ্যোতিষ্ক তাঁর চারদিকে ঘুরছেন? হাঁ, সেই সভায় ভারতের তাবৎ বড়ো বড়ো নেতাকেও প্রত্যক্ষ করি। নেত্রীকেও।

কেমন করে বুঝব কী তাঁর সীক্রেট? ডেস্ক সামনে রেখে মেজের উপর পা মুড়ে বসেছিলেন ও একমনে শুনছিলেন নেতাদের বক্তব্য। অখন্ড ধৈর্য। মাঝে মাঝে দুটি একটি উক্তি করছিলেন, একান্ত বিনয়ে ও নিম্নস্বরে। তখন ঠিক মালুম হয়নি যে স্বরাজীদের কাছে তিনি হেরে গেছেন, ওটা তাঁর পরাজয়-সভা। এই মর্মে সন্ধি হয়েছে যে, ওঁরা তাঁর খদ্দরনীতি মেনে নেবেন আর তিনি ওঁদের পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম মেনে নেবেন। বুদ্ধের মতো অবিচলিত বিগ্রহ। কিন্তু বুদ্ধের মতো প্রশান্ত নন। ভিতরে ভিতের অশান্ত। কী যেন করতে এসেছিলেন, করতে পারেন নি, করতে পারছেন না। তবু স্থিতপ্রজ্ঞ। স্বীয় মতবাদে অটল। বজ্র দিয়ে গড়া।

কিন্তু ততদিনে আমি তাঁর মতবাদের থেকে অনেকদূরে সরে গেছি। যদিও সংযোগ রেখেছি। কে পার্লামেন্টে যাবে, কে চরকা নিয়ে থাকবে এসব আমার গণনা নয়। ইতিমধ্যে মার্কসবাদীরা সক্রিয় হয়েছেন, আমার সতীর্থরা এম এন রায়ের 'ভ্যানগার্ড' পড়ছেন। কেউ কেউ আবার মুসোলিনির ভক্ত ও ফাসিস্ট মতবাদের অনুরক্ত। মুসলমান বন্ধুদের মনেও সংশয় দেখা দিয়েছিল। খেলাফতের ইস্যুতেই

অন্নদাশঙ্কর রায়

তাঁরা সংগ্রামে নেমেছিলেন, নইলে শুধুমাত্র স্বরাজের জন্যে তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ বাধাতেন না। তাঁরা বরং কমিউনিস্ট বনবেন, তবু ন্যাশনালিস্ট হতে তাঁদের অন্তরের বাধা। তাঁরা যে একটি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃসঙ্ঘ। তাঁদের খলিফ না থাকলেও তীর্থ আছে, মক্কার সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর টান। আমাদের চোখে তুর্করা আরবরা ইরানীরা এলিয়েন। কিন্তু তাঁদের চোখে এলিয়েন নন।

ইংলন্ডের ইতিহাসে একদা ক্যাথলিকরা তাঁদের আন্তর্জাতিক ধর্মগুরু পোপ ও আন্তর্জাতিক তীর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে প্রোটেস্টানদের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ছন্দ রাখতে অক্ষম হয়েছিলেন। এই নিয়ে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দেশের চার্চ থেকে তো বটেই, রাষ্ট্র থেকেও ক্যাথলিকদের নিষ্কাশন করা হয়। এখানে ওখানে এক আধজন ক্যাথলিক রাজকর্মচারী থাকলেও থাকতে পারেন, কিন্তু রাজা থেকে আরম্ভ করে রাজত্বের উচ্চতর স্তরে তাঁরা অনধিকারী বলে গণ্য হন। তাঁদের সুদিন ফিরে আসতে প্রায় তিন শতাব্দী লাগে।

সুতরাং কারা এলিয়েন, কারা নয়, এটা একটা গুরুতর সমস্যা। হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক যে কেবল ধর্মভেদের দরুণ কন্টকিত তাই নয়, রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের দরুন দ্বিধাজড়িত। খেলাফতের মতো একটা বাইরের ইস্যু নিয়ে যারা দেশশুদ্ধ লোককে সংগ্রামে নামাতে চায় স্বরাজের মতো সর্বভারতীয় ইস্যু সম্বন্ধে তাদের ক'জনের সত্যিকার মাথাব্যথা? তার বেলা কেবল দরাদরি। হিন্দুরা কী দেবে? কত দেবে? ইংরেজরা যদি তার চেয়ে বেশী দেয় তাহলে কী হবে? গান্ধীজী ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম নৈব নৈব চ। হাত মেলাতে হবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে। অর্থাৎ যাঁদের আনুগত্যে দোটানা নেই। তাঁদের হিন্দু হতে কেউ বলছে না, তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে কেউ হস্তক্ষেপ করছে না, কিন্তু তাঁরা আর সকলের মতো ভারতীয় সুতরাং ভারতের জাতীয় ঐক্যের শরিক।

ন্যাশনালিজম নিয়ে যেমন দোটানা তেমনি ডেমোক্রাসী নিয়েও দোভাগা। চাকরিবাকরির বেলা তো বটেই, নির্বাচন-কেন্দ্রের বেলা নির্বাচিত প্রতিনিধির বেলা ও দায়িত্বশীল মন্ত্রীর বেলাও দুটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভাগ। মুসলমান দায়ী শুধু মুসলমানের কাছেই। বাদ বাকী দায়ী শুধু বাদবাকীর কাছেই। না ভেবেচিন্তে গান্ধীও এককালে এতে সায় দিয়েছিলেন। মনটা তো পার্লামেন্টারি নয়, বুঝবেন কী করে কী পরিণাম এর? অসহযোগ স্থগিত রাখার পর স্বরাজীদের উপরোধে পার্লামেন্টারি ঢেঁকি গেলার পর গলায় বাধল যখন তখন বুঝলেন।

গান্ধীজী কোনোরূপ চুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। চুক্তি তো সংগ্রামের জন্যে নয়, পার্লামেন্টারি কর্মপন্থার জন্যে। তেমনতর কর্মপন্থার জন্যে ভারত ইতিহাসে গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটে নি। তাঁর তাতে

বিশ্বাসও নেই। সেইজন্যে লখনউ চুক্তির অনুরূপ চুক্তি দ্বিতীয়বার সম্ভব হলো না। ঝীণাও সে আশা ছেড়ে দিলেন। এরপরে আসে ঝীণার চোদ্দ দফা দাবী। কংগ্রেস ওসব শুনতে চায় না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ পলিসিই সফল হয়। যেসব মুসলমান একদিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীজীর পেছনে ভিড় করেছিলেন তাঁদের অনেকেই পিছু হটতে হটতে অদৃশ্য হয়ে যান। আর তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে তাঁরা স্বরাজের ইস্যুতে লড়তে চান নি। চেয়েছিলেন খেলাফতের ইস্যুতেই। দুই ইস্যু জুড়ে না দিলে লড়াই হতো না বলে তাঁরা স্বরাজের জন্যেও লড়েন।

এই গোঁজামিলের জন্যে বহু সমালোচক গান্ধীজীকে দুষেছেন। কিন্তু করতেনই বা তিনি কী, যখন খেলাফতীরা অগ্রণী হয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ও খেলাফতের জন্যে সংগ্রামের সেনাপতি হতে অনুরোধ করেন? তাঁর শর্ত হলো অহিংসা। সে শর্তে যখন তাঁরা রাজী তখন তিনি কি রাজী না হয়ে পারেন? তা ছাড়া নিছক স্বরাজের জন্যে সংগ্রাম জোর পেত কী করে, যদি মুসলমানরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপ না দিতেন? দু'চারটি মুসলমানকে নিয়ে তো জাতীয় সংগ্রাম হয় না। হলে যা হয় তা এত বিরাট নয়।

আমার এক মুসলিম বন্ধু বহুদিন পরে আমাকে বলেছিলেন, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান একজোট হয়ে লড়েছিল। তার ফল হলো কী? মুসলমানেরই জান গেল, জমিন গেল। হিন্দুরা সেসব জমিন নীলামে কিনে নিয়ে ধনবান হলো। সেই থেকে মুসলমানরা আর হিন্দুদের সঙ্গে একজোট হয়ে লড়তে চায় না। তাতে তাদের লাভ তো কিছু হবেই না। লোকসানই হবে।

সিপাহীবিদ্রোহ যে ইংরেজকে আর মুসলমানদের একশ্রেণীকে বরাবরের জন্যে প্রভাবিত করে গেছে এটা মনে রাখলে অনেক ব্যাপারের অর্থ ভেদ করা যায়। ইংরেজের মনে আতঙ্ক হিন্দু-মুসলমান একজোট হলে আবার সেইসব বিভীষিকা ফিরে আসবে। কানপুরে আর দিল্লীতে আর লখনউতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল। মুসলমানদের একশ্রেণীর প্রাণে ত্রাস ইংরেজরা তাদের মেরে ঠান্ডা করে দেবে আর হিন্দুরাই তাদের সম্পত্তি ভোগ করবে। আগে যেমন করেছিল।

জেল থেকে ফেরার চার-পাঁচ বছর বাদে হাওয়া আবার গান্ধীনেতৃত্বের অনুকূলে যায়। স্বরাজীদের দৌড় দেখে দেশের লোক নারাজীদের দিকে ঝোঁকে। বারদোলিতে একটা ছোটমাপের সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। তার সর্দার হন বল্লভভাই প্যাটেল। বারদোলির এবারকার সত্যাগ্রহ একটা স্থানীয় ইস্যুতে। খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে। এতে বল্লভভাইয়ের উচ্চতা বেড়ে যায়। গান্ধীজীই তাঁকে সেই সুযোগ দেন।

সামনের সারিতে আসার সুযোগ এতদিন প্রো-চেঞ্জাররা পেয়ে আসছিলেন। এবার থেকে নো-চেঞ্জাররা পেলেন। কংগ্রেস সভাপতির পদে দ্বিতীয়বার বৃত হবার প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে গান্ধীজী সে মণিহার জবাহরলালের কণ্ঠে পরিয়ে দেন। তখন থেকে জবাহরও প্রথম সারির নেতা। বলা বাহুল্য তিনিও ছিলেন নো-চেঞ্জার। পরে তিনি সোসিয়ালিস্ট চিন্তাধারা আবাহন করে নিয়ে আসেন। অন্যান্য নো-চেঞ্জারদের ছাড়িয়ে যান। যুবকের দল তাঁর দিকে আর সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকান। তবে সবাই জানতেন যে গান্ধীজী যা করবেন তাই হবে। কারণ স্যাংকশন তো সেই একজনের হাতে।

স্যাংকশন অর্থাৎ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স একমাত্র গান্ধীজীরই ইচ্ছানির্ভর। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তিনি যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন তো আর সকলেও অগত্যা নিষ্কর্মা। লম্ফ-ঝম্ফ যতই করুন। আর গান্ধীজী যে নিষ্ক্রিয় সেটা ঠিক নয়। গঠনের কাজে প্রাণ-মন ঢেলে দেওয়াই সত্যাগ্রহের জন্যে দেশকে প্রস্তুত করে তোলা। সত্যাগ্রহ কেবল তাকেই মানায় গঠনের কাজে যার এক মুহূর্ত বিরাম বা বৈরাগ্য নেই। যুদ্ধের যেমন প্যারেড সত্যাগ্রহের তেমনি গঠনকর্ম। গঠনের কাজে অনাগ্রহ থাকলে সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

গঠনের মর্মকথা কায়িক শ্রম। গঠনকর্ম হচ্ছে শ্রমাগ্রহ। শ্রমই সমাজের প্রধান শক্তি। অধিকাংশ মানুষই শ্রমজীবী। দেশে-দেশে শ্রমজীবীদের হাতেই ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে তাদেরি মতো কায়িক শ্রমে রুচি হওয়া চাই। যাদের একান্তই অরুচি তারা দেশের মূলস্রোতের বাইরে থাকতে পারে। কিন্তু মূলস্রোতের সামিল হবে যারা তাদের কাছে কায়িকশ্রমে যোগদান এমন কিছু অন্যায় প্রত্যাশা নয়। দিনে আধ ঘণ্টা চরকা কাটা তো

ন্যূনতম আশা। তাতেও যারা নারাজ তারা কি কোনো দিন দেশের লোকের মন পাবে? ভোটের জোরে দেশ শাসন করতে পারে, কিন্তু তাদের সেই নৈতিক শক্তি কোথায় যে জনগণ তাদের নির্দেশ মান্য করবে?

স্যাংকশন বলতে বোঝায় সেই নৈতিক শক্তি যা বিদেশী শাসকদের গায়ের জোরকে হটাতে পারে ও তার জায়গায় স্বদেশী লোকপ্রতিনিধিদের হুকুম দেবার ক্ষমতাকে বসাতে পারে। গান্ধীজীর ব্রত তেমন স্যাংকশন তৈরি করা। কবে একদিন জোয়ার আসবে, তার জন্যে কান পেতে থেকে তিনি অহরহ গঠনের কাজ চালিয়ে যান। দেখতে দেখতে খাদিশিল্প গড়ে ওঠে। বলতে গেলে বিনা মূলধনে। বিনা রাজানুকূল্যে।

গান্ধীজী সরাসরি জনগণের সান্নিধ্যে কতটুকু আসতে পারেন? তাঁর বাণী বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে শত-সহস্র সহকর্মী চাই। তাঁরাই ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে পড়বেন ও জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করবেন। তাঁরা যেমন জনগণের সেবা করবেন তেমনি জনগণও তাঁদের সাংসারিক অভাব মোচন করবেন। সে অভাব যদি গ্রামবাসীর সাধ্যের অতীত না হয়। অধিকাংশ কর্মীই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। চিরাচরিত স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ না করে তাঁরা গ্রামবাসী জনগণের সেবা করতে পারেন না। নয়তো তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের পিঠের বোঝা বাড়িয়েই দেবেন। ফলে তাঁদের সঙ্গেই গ্রামের লোকের ঠোকাঠুকি বাধবে।

সৌভাগ্যক্রমে সত্যিকার ত্যাগী কর্মী দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন ও নিরলস সাধনার দ্বারা জনগণের চিত্তজয় করেছিলেন। কিন্তু যার জন্যে তাঁরা এতকিছু ছেড়েছিলেন ও এত দুঃখ বরণ করেছিলেন তার নাম স্বরাজ। অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিল দেশপ্রেম। দেশকে না ভালোবাসলে তাঁরা জনগণের জন্যে আবেগ বোধ করতেন না। তাঁদের ভালোবাসা দেশকেন্দ্রিক, জনকেন্দ্রিক নয়।

কিন্তু গান্ধীজীর ভালোবাসা দেশের মানুষকে ভালোবাসা। বিশেষ করে যারা দীন হীন, যারা দুর্বল, যারা বিপন্ন, যারা আতুর, যারা অনাথ সেইসব মানুষকে ভালোবাসা। তাঁর ভালোবাসা অহেতুক। তার বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না, দেশের স্বাধীনতাও না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি লড়বেন, সেটা তাঁর প্যাশন, কিন্তু স্বাধীনতার পরে যখন লড়বার প্রয়োজন থাকবে না তখন কি তাঁর দেশের জনগণকে কম ভালোবাসবেন বা কম সেবা দেবেন? জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নৈমিত্তিক নয়, নিত্য। দেশ পরাধীন থাকতেও যা, দেশ স্বাধীন হলেও তাই। তিনি জনগণের লোক। তারা ও তিনি অভিন্ন। তেমনি তিনি অহিংসার পূজারী। অহিংসা ও তিনি অভিন্ন।

তাঁর সহকর্মীদের সকলের মধ্যেই জ্বলন্ত দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু জনপ্রেম ছিল অতি বিরলসংখ্যক অনুগামীর মধ্যে। এঁরাই ধরিত্রীর লবণ। এঁরা না থাকলে গান্ধীজীর বাক্যগুলো হয়তো জনগণের কানে পৌঁছত, কিন্তু গান্ধীজীর বাণীর জীবন্ত রূপ তাঁদের চোখে ভাসত না। জনগণকে এঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে ব্যবহার করতে চাননি, দেশের স্বাধীনতাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছেন জনগণের জন্যে। নিজেদের জন্যে এঁদের পরোয়া ছিল না। অতি অল্পেই এঁদের অভাব মিটত। এঁরা ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। জাতীয়তাবাদী এঁরা নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা এঁরা গান্ধীবাদী। স্বাধীনতার পরেও এঁরা গান্ধীবাদী থাকবেন, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের ত্যাগস্পৃহা ফুরোবে না। এরকম নিষ্ঠাবান কর্মীদের কারো কারো সংস্পর্শে আমি এসেছি। জানি এঁরা কী ধাতুতে গড়া।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরবার সময় গান্ধীজী দুই হাতে দুটি দান নিয়ে আসেন, দুই চোখে দুটি ধ্যান। একটি তো সত্যাগ্রহ, অপরটি সর্বোদয়। স্বরাজ কথাটি তাঁর সৃষ্টি নয়। যাঁর সৃষ্টি তিনি যতদূর জানি টিলক। কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন দাদাভাই নৌরোজী। গান্ধীজী অবশ্য পরে ওটিকে আপনার করে নেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই 'হিন্দ স্বরাজ' লিখে স্বরাজের একটা সংজ্ঞা দেন বা ছবি আঁকেন। তাঁর স্বপ্নের স্বরাজ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের কল্পনার স্বরাজ নয়। কেমন করে হবে? তাঁরা তো সত্যাগ্রহ বা সর্বোদয় কোনোটার দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। গান্ধীজীর স্বরাজের একটি অপরিহার্য অংশ ছিল সত্যাগ্রহ, আরেকটি অপরিমেয় অংশ সর্বোদয়।

স্বরাজের ইস্যুতে না হোক যে-কোনো উপযুক্ত ইস্যুতে সত্যাগ্রহ তিনি করতেনই। জনগণকে নিয়ে না হোক একজনকে নিয়েই তাঁর সত্যাগ্রহ চলত। সত্যাগ্রহেরই অপর নাম অহিংসা। গান্ধী আর অহিংসা অভিন্ন। জগৎকে সত্যাগ্রহের বাণী শোনাবার জন্যেই তাঁর জন্ম। তেমনি সর্বোদয় হচ্ছে তাঁর জীবনদর্শনের লক্ষ্য। কতজনের কতরকম ইউটোপিয়া, গান্ধীজীর ইউটোপিয়া হচ্ছে সর্বোদয়। স্বরাজেই থেমে যাবে না তাঁর চলা। তাঁর অনুগামীদের চলা। সর্বোদয় যদি স্বরাজের অঙ্গ হয়ে থাকে, তবে স্বরাজও ইংরেজ বিদায় নামক একদিনের একটা ঘটনা নয়। বহুকাল ধরে গড়ে তোলার মতো একটি সাধনা।

স্বরাজ কথাটি তিনি এক এক পটভূমিকায় এক এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে স্বরাজ এক বছরেই হতে পারে সে স্বরাজ 'হিন্দ স্বরাজ' নয়। এক বছরে হতে পারে ক্ষমতার হস্তান্তর। রাজপ্রতিনিধিদের হাত থেকে লোকপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা আসা। তারপরে যদি ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না হয় তবে তো ভারতের স্বাধীনতা হবে ইটালীর স্বাধীনতার মতো একটা বড়লোকী ব্যাপার। যাতে তেমন না হয়, সেইজন্যেই তো 'হিন্দ স্বরাজ' লেখা। ইটালীর স্বাধীনতা দূরের কথা, ব্রিটেনের পার্লামেণ্টারী সিস্টেমও গান্ধীজীর চোখে লাগে না। এমন কি গোটা পশ্চিম ভূখণ্ডের আধুনিক সভ্যতাও তাঁর মতে একটা ব্যাধি, যা ব্রিটেনকে দিয়ে ভারতে সংক্রামিত হয়েছে। এককথায় তিনি চান নীতির জগৎ, যেমন সেকালের সাধুসন্তেরা চাইতেন ধর্মের জগৎ। নৈতিককে উপেক্ষা করে বৈষয়িক উন্নতি তাঁর কাছে তুচ্ছ।

তিনি তাঁর সত্যাগ্রহের দ্বারা অনৈতিকের সংক্রমণ হতে স্বদেশকে রক্ষা করবেন, তাঁর সর্বোদয় দ্বারা স্বদেশের জনগণকে প্রকৃত সভ্যতার অধিকারী করবেন। দীর্ঘ পথ, তার একটা মধ্যবর্তী স্টেশনের নাম স্বরাজ। টিলকের স্বরাজ, দাদাভাইয়ের স্বরাজ। রাজনৈতিক স্বরাজ। পার্লামেণ্টারি সীস্টেমকেও তিনি আর তাচ্ছিল্য করেন না। যদিও পঞ্চায়তী ব্যবস্থাই তাঁর অভিষ্ট।

সিঁড়ির ধাপে ধাপে জুতোর শব্দ দোতলার বারান্দায় এসে থেমে গেল। নীলু বড় ঘর ঝাঁট দিয়ে ছোট ঘরের মেঝেয় বসেছিল। ঝাঁটাটা সামনেই পড়ে আছে। অনামনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল। জুতোর শব্দে ঘড়ির দিকে তাকাল। ছ'টা বাজতে যায়। মিলুর এই ফেরার সময় হল! নীলু মনে মনে বিরক্ত হল। কোন দিকে না তাকিয়ে মেঝেয় উবু হয়ে বসে চেপে চেপে ঝাঁট দিতে লাগল।

মিলু বারান্দার ওকোণে সন্তর্পণে জুতো খুলেছে। বড় ঘরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, মা ঠাকুরঘরে সন্ধ্যার আহ্নিকে বসেছে। ওঘরে নীলুর ঝাঁট দেওয়ার শব্দ।

'মা কোথায় রে?' গলা চাপা। মিলু ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

নীলু কোন উত্তর দিল না। একভাবে ঝাঁট দিয়ে চলেছে।

'বুঝেছি, রাগ হয়েছে।' মিলুর কণ্ঠস্বরে চাপা খুশি। হাসি মুখে তাকিয়ে রইল নীলুর দিকে। হাতের বই-খাতা, ভ্যানিটি ব্যাগ রাখতে ভুলে গেছে। 'এই, সত্যি বল না, মা কোথায় রে?'

নীলু বিরক্ত হল। 'আমি কি করে বলব।'

'মা কিছু বলছিল?' মিলু গলা নামাল।

'যাও না ওঘরে. কি বলছিল বুঝতে পারবে।'

মিলু নীলুর কথায় তেমন আমল দিল না। নিজের খুশিতেই বড় ঘরে এলো। বই-খাতা-ব্যাগ গুছিয়ে রাখল। আলমারীর বড় আর্শিটার সামনে একবার দাঁড়াল। একটু পরেই কলেজে যাওয়ার কাপড়-জামা ছেড়ে ফেলতে হবে। তবু একবার পোশাকটাকে শরীরের ওপর গুছিয়ে নিয়ে নিজেকে দেখল। পাশ ফিরে চকিতে বুক দেখল। মাথার অগোছালো বেণীটাকে বুকের ওপর আনল। নিজের বড় বড় চোখের দিকে তাকাল। অকারণ মুখ টিপে হাসছে। এক সময়ে মুখভঙ্গি করে নিজেকেই ভেংচি কাটল। ঠাকুরঘর থেকে মায়ের বেরুবার শব্দ পেতেই দ্রুত আর্শির সামনে থেকে সরে গেল।

'হ্যাঁরে নীলু, মিলু ফিরেছে।'

'ফিরবে না তো যাবে কোথায়।' নীলুর গলার স্বর শুনেই বোঝা গেল চাপা রাগে ফেটে পড়বে এখুনি। একটুতেই রেগে যায় নীলু। পরে আবার সহজ হয়ে ওঠে। ভুলে যায় ওর রাগের কথা। এটা ওর স্বভাব। এখনকার গলার স্বরে চাপা রাগ। হঠাৎ হাতের ঝাঁটাটা দালানের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'আমি আর পারব না ঝাঁট দিতে। সব কাজ আমাকে দিয়ে করাবে। ও কিছু করবে না।'

'সন্ধ্যে হয়ে এল। এটুকু ঝাঁট দিয়ে দে মা।' মা এগিয়ে এলেন। 'ও এই কলেজ থেকে ফিরল।'

'কলেজ থেকে ফিরল তো কি হয়েছে? এত বেলা পর্যন্ত কি কলেজ হয়? বল, আড্ডা থেকে ফিরল।' নীলু এঘরে চলে এল। 'এই তো একটু আগে চেঁচাচ্ছিলে ফেরে নি বলে। না-ও এবার খাবার ধর মুখের সামনে। কিছু তো বলতে পার না। আদরের ছোট মেয়ে তোমার!'

মা বড় ঘরের সামনে এলেন। কোন কথা না বলে নীলুর দিকে একবার তাকালেন। নীলু এঘরের মেঝেয় এঁটো কাপ-ডিসগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে বসেছে। পরে মিলুর ওপর চোখ রাখলেন।

মিলু ইতিমধ্যে কলেজের কাপড় বদলে ফেলেছে। গা ধুতে যাবার কাপড় জড়িয়েছে। মাকে সামনে দেখে তাকাল।

'এত দেরী কেন রে তোর?' মা ঘরে ঢুকলেন।

মিলু কোন উত্তর দিল না। দুপুরে ঘুমোনোর জন্যে বিছানা অগোছালো হয়ে যায়। সে বিছানা মিলু পরিষ্কার করে কলেজ থেকে ফিরে। খাটে উঠে বিছানা ঝাড়তে বসল।

'কি রে, কথা বলছিস না কেন?' মা একটু থামলেন। একভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। 'কলেজে ঢুকে যেন কি একটা হয়ে গেছিস, নাকি? উত্তরই দিচ্ছিস না।'

'কি বলব!'

'কি বলব মানে? তোর কলেজ হয় সাড়ে চারটে পর্যন্ত। এই তো এখানে আসতে মিনিট পাঁচেক লাগে। এখন কটা বেজেছে দেখেছিস?'

'এমনি বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলাম।'

'তা-ও ছটা পর্যন্ত। ক্রমশ দেরী করে ফিরতে আরম্ভ করেছিস।' মেয়েকে একবার সম্পূর্ণ করে দেখলেন মা।

বড় মেয়ে নীলুকে সকালের মেয়েদের কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন মা। বাড়ী থেকে দূরের কলেজ ছিল সেটা। তবু ভয় ছিল না। নীলু খুব ঠাণ্ডা। ছোট মেয়ে মিলু যেন এ বাড়ী ছাড়া, একটু বেশী চটপটে। বেশী স্নেহ করেন বলে এবং দূরের কলেজে পাঠাতে চান না বলে বাড়ীর সামনের কলেজে ভর্তি করে দিয়েছেন। ছেলে-মেয়েদের এক সঙ্গে পড়ার কলেজ। বাবা থেকে বাড়ীর ও আত্মীয়-স্বজনের সকলের আপত্তি সত্ত্বেও মা মেয়েকে বেশী বিশ্বাস করেন বলেই এরকম কলেজে ভর্তি করেছেন। বিশ্বাস হারাবার মত কিছু ঘটে নি যদিও তবু ভিতরে চাপা ভয় আছে ওঁর। যা দিনকাল পড়েছে!

মিলু নিজের খেয়ালে বালিশ গুছোচ্ছে মায়ের দিকে পিছন করে। একভাবে সেদিকে তাকিয়ে থেকে মা আবার বললেন, 'কলেজ থেকে কোথাও গিয়েছিলি বুঝি?' কণ্ঠস্বর চাপা কঠিন শাসন।

মিলু মায়ের এই কণ্ঠস্বর চেনে, ভয় করে। এখনি কি উত্তর দেবে মিলু? নিজের কাছে অসহায় বোধ করল। মা উত্তর না নিয়ে যাবে না, বুঝতে পারল। অথচ যে জন্যে দেরী হল আজ, কিছুতেই বলা যাবে না ত হলে! মিথ্যে কথা বলবে? আজ পর্যন্ত মাকে ও কোনদিন মিথ্যে কথা বলে নি।

'নিশ্চয়ই কোথাও গিয়েছিলি। কোথায়?' মায়ের গলা কৃত্রিম সন্দেহ জড়ানো।

'কোথাও না।' মিলু গলা গম্ভীর করে সহজ হবার চেষ্টা করল। 'স্যার আজ অনেকক্ষণ ক্লাস নিয়েছেন।' হঠাৎ একটা মিথ্যে বানিয়ে নিল মিলু। বুকের মধ্যে ভয়ের শব্দ।

'কেন অনেকক্ষণ নেবেন?'

'বাঃ, তুমি তার কি বুঝবে? অনার্স ক্লাশ শেষের দিকে থাকলে অনেক সময় আর একটা পিরিয়ড় বেশী ক্লাশ নেন স্যাররা।'

'যাঃ, মিথ্যে বলিস না।' নীলু এঁটো চায়ের কাপ-ডিস গোছাতে গোছাতে উঠে দাঁড়াল। 'মাকে বোঝালেই হল। কলেজ যেন আমি করিনি!' গোছানো কাপ-ডিসগুলো ঘরের এক কোণে সরিয়ে রাখল নীলু।

'তোদের সকালের কলেজ ছিল। এসবের ঝামেলা ছিল না।' নীলু বড় হলেও মিলু ওকে 'তুই' বলে। কাছাকাছি বয়সের দুটি বোন।

'বাজে বকিস না। মনে করছিস কি, আমি বুঝি না কেন তুই দেরী করে আসিস!'

'কেন!' মিলু ভিতরে একটু ভয় পেল। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নীলুর দিকে। মা ঘরে ঢুকে ধূপ জ্বালাচ্ছিলেন, একবার নীলুর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

'পাছে কাজ করতে হয়! তুই জানিস, একটু দেরীতে এলে আমিই সব কাজ করে রাখব।'

মিলু ভয়ে-চাপা-নিঃশ্বাস ফেলল।

মা এগিয়ে এলেন। 'নীলু, আবার ঝগড়া করতে আরম্ভ করলি।'

'না, বলবে না। তুমি কেবল ছোট মেয়েকেই আদর দাও। আমিই বা ওর কাজগুলো করব কেন? ও কি আমার কিছু করে?'

'সেই সন্ধ্যেবেলায় ঝগড়া আরম্ভ করলি!' মিলুর দিকে ফিরলেন, 'তুই-ই বা দেরী করলি কেন? দিনের কলেজে পড়ে বুঝি বুদ্ধি পাকছে তোর? দাঁড়াও অফিস থেকে আসুক, বলব এবার। কলেজ ছাড়িয়ে দিক।'

'ও বাজে কথা বলছে কেন মা? আমি কি ওর কাজ কোনদিন করিনি?' মিলু ভিতরে রেগে গেছে। কলেজ থেকে যে মেজাজ নিয়ে ফিরেছিল, তার সুর যেন কেটে যাচ্ছে। ভাল লাগছে না কিছু বলতে। তবু মিলু জানে, চুপ করে থাকলে মা যদি সন্দেহ করে? বলল, 'এই সেদিন যে আমি—'

'চুপ কর।' মা থামিয়ে দিলেন। 'তোদের ঝগড়া আর শুনতে ভাল লাগে না। মেয়ে দুটোর বিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।'

নীলু আবার আগের কথার সূত্রেই গজ-গজ করল। 'কেন দেরীতে ফিরিস, তা কি বুঝি না?'

'দেখ মা কি যা-তা বলছে। আমি কিন্তু এবার যা-তা বলব।'

'বলবিই তো। ছেলেদের কলেজে পড়ছিস। ছেলে বন্ধু জুটলে আর তাড়া-তাড়ি ফেরা হয় না।'

'দেখলে তো?' মিলুর ফর্সা মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। ভিতরে উত্তেজিত। এই মুহূর্তে কোন কথা না বলে অসহায়ের মত নীলুর দিকে তাকিয়ে রইল।

'কি যা-তা বলছিল নীলু।' মায়ের গলা নীচু। 'এমন সব কথা বলে ঝগড়া করিস, পাশের বাড়ীর লোকের কানে গেলে তাতে তো তারা সন্দেহ করবে?'

'ঐ যে ও কলেজে পড়তে পায় না, তাই হিংসে। আমি কি তা বুঝি না?'

'মিলু!' মা সত্যিই চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তুই থামবি কিনা!' জোরে ধমক দিলেন। 'তোদের দুজনকে সামলাতে গিয়ে আমি দেখছি পাগল হয়ে যাব।'

মিলুর দু চোখ ছলছল করে উঠল। অভিমানে নাক ফুলছে মাঝে মাঝে। খাট থেকে নেমে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রতিদিনের মতই ওর জন্য নীলু চা-জলখাবার চাপা দিয় রেখেছে টেবিলে, দেখলই না। নীলু মাথা নীচু করে খাটের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মা দাঁড়িয়ে থেকে কি ভাবলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজের কাজে ব্যস্ত হলেন।

বছর দুয়েকের তফাতে দুই বোন। নীলুর বয়স চব্বিশ, মিলু এই বাইশে পড়ল। ছোটখাট চেহারা দুজনের। দেখলে মনে হবে না দুজনেই কুড়ি পেরিয়েছে। দুই বোনই দেখতে সুশ্রী। মুখে, চোখে স্বভাবে এক অদ্ভুত নিষ্পাপ সারল্য আছে দুজনের। কম-বেশী ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, তীক্ষ্ন নাক, পাতলা সোনার পাতের মতন ঠোঁট দুজনের। যে কোন লোক এদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেই বুঝতে পারবে এরা আপন বোন। দুজনেই গান জানে। ছোট বোন মিলু অল্প বয়সে নাচ শিখত। এখন বড় হয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নীলুর চেহারা পাতলা রোগা। মিলুর স্বাস্থ্য ভাল, আঁট-সাঁট গড়ন। স্বভাবে বেশ সপ্রতিভ, ঝকঝকে। সহজেই সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারে কথায় ব্যবহারে।

সকালের কলেজে পড়তে পড়তে নীলুর ভারী অসুখ হয়। তার পরেই কলেজ যাওয়া বন্ধ করেছে। বাড়ীতে বসে বি-এ পার্ট-ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছিল। এখন প্রাইভেটে পার্ট-টু পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করছে। মিলু এ বছর ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পার্ট ওয়ান দেবে।

মিলু একটু অলস, সুখী, সৌখিন। সব সময়েই বাড়ীর কাজে ফাঁকি দিয়ে সময়ে-অসময়ে পড়ার বই ছাড়াও গল্পের বই মুখে বসে থাকতে ভালবাসে। নীলু বড় বোন বলেই সংসারের কিছু বেশী কাজ নিজে থেকেই করে; বরং করতে ভালবাসে। সকালে বাবা দাদার অফিস বেরুবার ব্যবস্থা করা, টুকিটাকি কাজে মাকে সাহায্য করা, ছোট ভাইটিকে স্কুলে পাঠানো—সব একা করে নীলু। তাই মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বিরক্ত হয়। মিলুর ওপর কেন যেন হঠাৎ-হঠাৎ রেগে যায়।

দু'বোনের ঝগড়া হবে বলেই মা ওদের দিনের কাজ ভাগ করে দিয়েছেন। সকালে নীলুর কাজ চা করা, চায়ের বাসন ধোয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে আরো কিছু ছোট-খাট কাজ। মিলু একটু বেলায় ওঠে। বিছানা ঝাড়া, মাছ বাছা, আনাজ কোটার দায়িত্ব মিলুর। বাড়ীর ছোট মেয়ে বলে মিলুর কাজও কিছু কম। এইভাবে নানা কাজ ভাগ করে নিয়ে সমানভাবে করে দু বোনে।

মা-বাবার ভাবনা দুজনকে নিয়েই। দুজনের যেমন ঝগড়া, তেমনি ভাব। মা বেশী দূর পড়াতে চান না মেয়েদের। বিয়ের কথা ভাবেন। যত বয়স ওদের বাড়ছে, মা-বাবার চিন্তাও তত স্থির হচ্ছে ক্রমশ।

আজ মিলু কলেজ থেকে ফিরছে দেরীতে। ওর অনেক কাজ করতে হয়েছে নীলুকে। তাই ওর বিরক্তি ও রাগ। ঝগড়ার সূত্রপাত এইখানেই। মা কথাগুলি শুনবেন রান্নাঘরে বসে বসে। মিলুটাও যেন দুপুরের কলেজ ঢুকে কেমন হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ক্লাসের ও কলেজের অন্যান্য ছেলেমেয়ের গল্প করে। মায়ের কেমন ভয় হয়। ভাবেন, ভুল হয়েছে বুঝি ছেলে-মেয়ে মেশানো কলেজে ভর্তি করিয়ে।

রান্না করতে করতে উঠে এলেন মা বড় ঘরে। টেবিলের ওপর মিলুর চা ও খাবার ঢাকা দেখে মনে পড়ে গেল, মিলু কলেজ থেকে ফিরে কিছু খায়নি এখনো। দুজনে কি নীচে পড়তে গেল? মা ছোট ঘরে এলেন। না কেউই যায় নি। এক জানালায় বসে আছে নীলু দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। মিলু আর এক জানালার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। আকাশে আজ পূর্ণিমার চাঁদ।

'মিলু, তুই এখনো কিছু খাসনি!' মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন।

'কিছু খাবো না মা, একটুও খিধে নেই।'

'কেন, বাইরে খেয়ে এসেছিস বুঝি?'

মিলু চুপ।

মা নীলুকে দেখলেন। নীলুর জন্যে দুঃখ হয় মায়ের। মিলু তবু বাইরে গিয়ে গল্প করে সহজ হবার অবকাশ পায়, নীলু তা পায় না। সব সময় বাড়ি বসে। মায়ের কি যেন মনে হল। বললেন, 'মিলু, যা না নীলুকে সঙ্গে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আয় বাইরে।' পার্কের দিকে যা না। অনেক চেনাজানা দেখতে পাবি।' নীলুর দিকে তাকালেন, 'ওঠ নীলু, দু' বোনে কি যে ঝগড়া করিস। যা বেড়িয়ে আয়। ও আসার আগে ফিরে আসিস। এসে পড়তে বসবি।' রান্নাঘরে তরকারি চাপানো আছে বলে চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

মিলু একটু আগেই ভাবছিল, নীলুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুবে মাকে বলে। আজ নীলুর কথায় একটুও রাগ হয়নি ওর। তা ছাড়া নীলুকে ওর কতো কথা বলার আছে। সব গুছিয়ে বলতে হবে। এতক্ষণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে।

মিলু এগিয়ে এসে দাঁড়াল নীলুর কাছে, 'এই নীলু, চল যাবি।'

নীলু কোন উত্তর দিল না।

মিলু ওর সামনে উবু হয়ে বলল, 'তুই এখনো রেগে আছিস?' কোন কথার উত্তর দিচ্ছে না দেখে মিলু বলল, 'তুই ওভাবে কথা বললি কেন, ঐ জন্যেই তো আমার রাগ হয়ে গেল। মায়ের সামনে ছেলেবন্ধুদের কথা বললি। মা যদি সন্দেহ করে সত্যি ভেবে, তখন? এমন বোকামি করিস রাগের মাথায়!' বলতে বলতে মিলু নীলুর পিঠের ওপর বিনুনীটা নাড়তে আরম্ভ করল। একবার অকারণ কানের লতিতে হাত দিয়ে পুরনো দুলটা দেখল।

নীলু কোন কথা না বলে সোজা হয়ে বসল।

'বাবা এসে যাবেন। তখন আর যেতে দেবেন না। চল্ না বেড়িয়ে আসি। আজ অনেক কথা আছে বলব। খুব গোপন কথা, কোনদিন কাউকে বলবি না।' ফিসফিস করে বলল মিলু।

নীলু এবার মিলুর দিকে তাকাল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। মিলু জানে, এইবার নীলুর যাবার মত আছে।

চারপাশ সন্ধ্যের অন্ধকারে ঢাকা। সারাদিন গুমোট গরম ছিল। সন্ধ্যের দিকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস ভাল লাগছে। নীলু মিলু মাকে বলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় লোকজন ভর্তি। ওরা দুজন ভিড় কাটিয়ে একটু ফাঁকা রাস্তায় চলে এল।

'রাস্তায় যা ভিড়, কোথায় যাওয়া যায় বলতো?' মিলু বলল।

'গঙ্গার দিকে চল্।'

'নাহ্, যত চ্যাংড়া ছেলেগুলো ওখানে আড্ডা জমায়। আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া ওখানেও ভিড়, কথা বলা যাবে না।'

'তা হলে পার্কে যেতে হয়।'

'সেই ভালো। যে কোন একটা অন্ধকার জায়গা দেখে বসে গল্প করি চল। আজ তো বৃষ্টি হয়নি। বেঞ্চ না পেলে মাটিতেই বসা যাবে।'

'চল্ তবে।' আজ যেন মিলুর কি হয়েছে। একেবারে অন্য রকম! মিলুর মুখ-চোখ-চেহারায় চোখ বুলিয়ে নীলু কয়েক পা এগিয়ে গেল। ভিড়ে মিলু থমকে দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তার মধ্যে। মিলু কাছে এলে ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। নীলু বলল, 'জানিস, আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়ত অর্চনা—ওর বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে রেজিস্ট্রি করেছে। আর সুস্মিতাকে তুই তো চিনিস। তার পরশু বিয়ে, নেমন্তন্ন করে গেছে। বাড়ি থেকেই বিয়ে দিচ্ছে; পছন্দ করা ছেলেকে পারল না।'

মিলু নীলুকে দেখছিল। বলল, 'ও, সেই জন্যে তোর মন খারাপ বুঝি? সকলের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বলে?'

'যাঃ ফাজলামি করিস না।' নীলু হাসল। কয়েকটা লোকের ভিড় পিছনে রেখে ওরা এগিয়ে গেল। নীলু এবার জিজ্ঞেস করল, 'কই তোর কি কথা বললি না?'

মিলু কি ভেবে হাসছিল নিজের মনে। নীলুর দিকে তাকাল। 'তুই কাউকে বলবি না কিন্তু। বাড়িতে কেউ যেন জানতে না পারে।'

'আগে বল, তারপর ভাবা যাবে।' নীলু হাসতে হাসতে মিলুকে দেখল। মিলু ইতস্তত করল। একটু যেন অন্যমনস্ক হ'ল। বলল, 'কলেজের একটা ছেলে আমাকে বড় বিরক্ত করছে।' একটু থামল। 'আজ ছেলেটা আমার সঙ্গে আলাপ করেছে। অনেক কথা বলেছে।'

'যাঃ সত্যি!' নীলু বেশী হেসে ফেলল।

'সত্যি,' মিলু চুপ করল। আবার কি ভাবছে। 'আমার কি রকম বোকা বোকা লাগছে ব্যাপারটা। ছেলেগুলো এরকম হয় বুঝি?' মিলু শেষের কথাটা যেন স্বগতোক্তির মত বলল।

'কেন কি বলেছে? আজে-বাজে সব কথা?'

'না, না, আজে-বাজে নয়। তবে এমন সব কথা, যা আমি কোন দিন আর ভাবিনি।'

নীলু সোজা মিলুর দিকে তাকাল। 'ছেলেটার নাম কি রে? কোন্ ইয়ারে পড়ে?'

'আশীষ মিত্র। এবার পার্ট টু দেবে, কেমিস্ট্রি অনার্স। খুব ভাল ছাত্র। পার্ট ওয়ানে ভাল রেজাল্ট করেছে।'

'দেখতে কেমন!'

'ফর্সা, লম্বা, বেশ দেখতে। ধুতি, পাজামা, প্যান্ট সবই পরে। কেমন নিরীহ-নিরীহ চেহারা, কিন্তু মাঝে মাঝে কথা বলে খুব ভাল। ওদের বাড়িতে গানের চর্চা আছে।'

নীলু হেসে ফেলল। 'তোর বেশ পছন্দ হয়েছে মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার!'
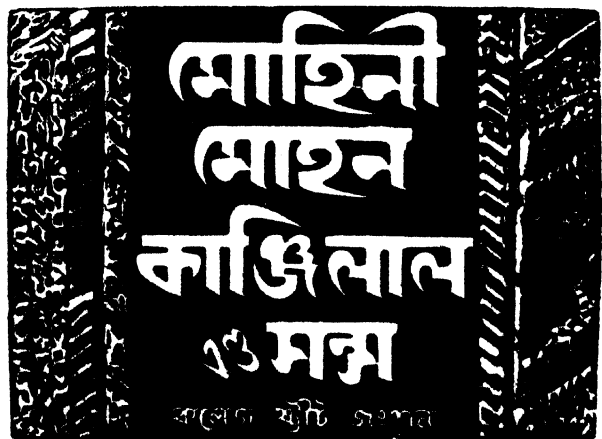
মিলু মুখ টিপে হাসল। ওরা পার্কের গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকছিল। মিলু বলল, 'চল, ওখানটায় বসে কথা বলি।'

দুজনে বসল অন্ধকার একটা গাছের নীচে, ঘাসের ওপর। এপাশটা নির্জন। অন্ধকার ঘন হয়ে পার্কের বুক ঢেকেছে। আকাশে সমস্ত নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। ঝির ঝির করে বাতাস বইল। মিলু দূরে একটা নক্ষত্র দেখল।

নীলু বসেই বলল, 'তুই আর্টস ও সায়েন্স, আলাপ হ'ল কি করে?'

'ফ্রেসার্শ ওয়েলকাম জানানো হবে তার জন্যে গানের রিহার্সাল হচ্ছে। ও ওর এক বন্ধুর সঙ্গে বসেছিল। আমি গান গাইছি। খবরদার মাকে বলবি না কিছু।'

নীলুর খুব মজা লাগছিল। ভয়ও। বাড়িতে যদি একবারও কেউ জানতে পারে, ভীষণ কাণ্ড হবে। মিলুকে সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে দেবে। তার ওপর ছেলেটা কায়স্থ। মিলুর সাহসও কম নয়। নীলু মিলুকে একবার দেখল। মিলু কেমন অন্যমনস্ক।

'কি সব বলেছে গুছিয়ে বল, শুনি।' অভিজ্ঞের কণ্ঠে বলল নীলু।

'কি সব বোকা-বোকা কথা!' বলে মিলু ঘাসের মধ্যে আঙ্গুল নেড়ে যেন হিজিবিজি কাটতে লাগল। 'আমাকে বলে কি, অনেক দিন থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। ভয়ে আসতে পারেনি।' খুক খুক করে হেসে ফেলল মিলু। 'কদিন ধরে নাকি আমাকে শুধু দেখছে, আমার গান শুনেছে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমার কথা ভেবে গান গেয়েছে।'

'সত্যি বলেছে?' নীলুর চোখ বড়, বিস্মিত।

'সত্যি! তারপরে দল থেকে আমাকে চালাকি করে সরিয়ে এনে রেস্টুরেন্টে বসিয়েছে। অনেক খাওয়ালো। ঐ জন্যেই তো ফিরতে দেরী হ'ল। ছেলেটা ছাড়তেই চায় না।' আশীষের কি একটা কথা মনে পড়তেই মিলু এমনি হেসে ফেলল।

'আর কিছু বলেনি?' নীলু যেন আরও শুনতে চায়।

'বলেছে, কিন্তু বলতে আমার লজ্জা করছে।'

'কি?' নীলু একটু অবাক হ'ল।

মিলু ইতস্তত করল। নীলুর চোখের দিকে তাকাল। 'তুই সত্যি কাউকে বলবি না কিন্তু। আমি অবশ্য ঠাট্টার মতনই নিয়েছি ওর কথাটা।'

নীলু তাকিয়ে রইল ওরদিকে।

'বলছে, আমরা দুজনে তো বিয়েও করতে পারি। ওর বাড়িতে মা-বাবা ছাড়া কেউ নেই। ও একমাত্র ছেলে। খুব মজা হবে তা হ'লে।' মিলুর গলার স্বর চাপা ঔৎসুক্যে ভর্তি।

নীলু মাটির দিকে তাকাল। কি ভাবল, একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার কিন্তু ব্যাপারটা একটুও ভাল লাগছে না। সামান্য কদিনের শুধু দেখায় আলাপে যে বিয়ের কথা বলে, আমার তাকে ভাল লাগছে না। কেমন সন্দেহ হয় ছেলেটোকে।'

'না রে, ছেলেটা কিন্তু খুব ভাল।' মিলু যেন আহত হয়েই বলল। 'আসলে বোকা তো। কি করে কথা বলতে হয় জানে না।' মিলু চুপ করল। 'আবার বলে কি, ওর বাবা-মা ভীষণ কড়া। এসব একটুও পছন্দ করে না।'

'তা হলেও কলেজের ছেলেদের আমার ভাল লাগে না।'

মিলু একটু দমে গেল। সামনে দিয়ে বাদামওলা যাচ্ছিল। ডাকল। 'বাদাম খাবি?'

নীলু হাসল। 'ঘুষ দিচ্ছিস?'

মিলুও হেসে উঠল। 'নে খা।' বাদাম কিনল মিলু। একটা বাদাম ভাঙতে ভাঙতে মিলু বলল, 'যাই বলিস ছেলেটা দেখতে বেশ ভাল। লম্বা-চওড়া চেহারা দেখে তো মনে হয় অবস্থা খারাপ নয়। দমদমে রেল লাইন থেকে একটু দূরে নিজেদের বাড়ি।'

'ভালই তো!' নীলু মিলুর চোখ-মুখ লক্ষ্য করছিল। চাপা খুশিতে মিলু কেমন ঝকমকে।

নীলুকে গম্ভীর হ'তে দেখে মিলু হেসে ফেলল। 'তুই এরই মধ্যে অনেক কিছু ভেবে ফেললি বুঝি? দূর পাগল। এমনি বললাম। আমার মজা লাগছে কিসে জানিস তো? ছেলেটা কতদূর এগোয় দেখা যাক না। বেশ মজা হবে।'

নীলু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। 'চল রে, সাতটা বেজে গেছে। বাবা এবার এসে যাবে।' উঠে দাঁড়াল নীলু। মিলুও। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

ফেরার পথে নীলুর পাশে মিলু নিজের খুশিতে হাঁটছিল। হাতের বাদাম ফুরিয়ে যেতে নিজের মনে হাসতে হাসতে এগোতে লাগল।

নীলু একটু গম্ভীর। একটা অস্বস্তি যেন গলায় কিছু আটকে যাওয়ার মত ভিতরে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে। মিলু একটা ছেলেকে পেয়েছে, পছন্দ করেছে, সাহস ওর কম নয়! বাড়ির কেউ কোনমতেই মানবে না। অথচ ছেলেটা সম্পর্কে অনেক ভেবেছে মিলু। মিলুর সঙ্গে বিয়ে হলে কেমন হয়! বাড়ির অমতে করুক না। বেশ মজার হবে। যা বাড়িতে কেউ কোনদিন করেনি, করতে সাহস পায়নি, মিলু যদি সে রকম কিছু একটা করে, নীলুই তাতে সাহায্য করবে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে নীলু মিলুকে এক একবার আড়চোখে দেখতে লাগল।

বাড়ি ফিরেই দুই বোন বইপত্তর নিয়ে নীচের ঘরে চলে এল। বাইরের লোকজনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে নীচের একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে বাবা। ওরা দু'টি বোন এখানেই সন্ধ্যায় পড়তে বসে। ছোট ভাই স্কুলে পড়ে এখন। মা দেখিয়ে দেয়। তাই নীচে আসে না এসময়ে।

মিলু বুক-চাপা বইপত্তর শব্দ করে টেবিলের ওপর ফেলল। ঘরের সব জানালা-গুলো এক এক করে খুলে দিল। একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইল। নীলু বড় টেবিলের এক কোণে চেয়ারে বসে বইগুলো রাখল যত্ন করে। কাপড়-জামা ঠিক করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। মিলুর দিকে তাকাল। অন্যমনস্ক হয়ে মিলু কি যেন ভাবছে।

'এই মিলু পড়বি না!'

'আজ পড়তে ভাল লাগছে না রে।'

নীলু হাসল। মিলু পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। নীলুর মুখ দেখল না। এক সময়ে মিলু কি একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে টেবিলের সামনে এগিয়ে এল। দেখল, নীলুর মুখ গম্ভীর। বই-এর দিকে চোখ।

মিলু শব্দ করে চেয়ার টেনে বসল। 'তুই রাগ করেছিস?'

'কেন?' নীলু বই থেকে চোখ তুলল।

'আমি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলি বলে? ছেলেটার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে।'

নীলু কান উত্তর না দিয়ে বই-এর দিকে চোখ রাখল। মিলুর খারাপ লাগল। হঠাৎ ভয় পেল। কি ভেবে হেসে উঠল। নীলু ওর দিকে তাকাতেই বলল, 'তুই বুঝি সব বিশ্বাস করেছিস? সব বানানো। আসলে আমার এক বান্ধবী, তুই চিনিস কল্পনা রে,—তারই ব্যাপারটা। মজা করার জন্যে আমার সঙ্গে, জড়িয়ে বললাম। আজকেই সে গল্পটা করল তো!'

নীলু একটু অবাক হ'য়ে ভুরু কোঁচ-কালো। 'আমাকে বলে তুই খারাপ করে-ছিস ভাবছিস তো? ভয় নেই। আমি তোর কোন ক্ষতি করব না রে।'

মিলু নীলুর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল।

নীলু আবার পড়ায় মন দিল। কিন্তু কিছুতেই মন বসতে পারছে না। মিলুর জন্যেই বোধহয়। সামনেই মিলুটা কেমন এক চাপা অস্বস্তিতে ছটফট করছে। বই খুলে রেখে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। লেখার নাম করে কি সব যেন হিজিবিজি লিখছে খাতায়, আবার কাটছে। আজ একটুও পড়ায় মন নেই মিলুর। আবার উঠে জানালার সামনে গেল। শীতল সোনালী জ্যোৎস্না মাখল বাইরে হাত বাড়িয়ে, গরাদে মুখ-বুক চেপে। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। মিলুর কপালের ওপরকার খোলামেলা চুল কাঁপছে। মিলুকে কি রকম যেন লাগছে!

বই-এর দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল নীলু। এই ঘরে এরকম সময়ে নীলুই তো একদিন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে-ছিল! অকারণে বুক দুর দুর করে কেঁপেছিল। কেউ জানে সে কথা। না, কেউ না। সম্ভবত ত্রিদিবদাও না। দাদার এক বন্ধু। পড়াতো ওদের দুটি বোনকে। বছর তিনেক আগে যেন! বাবা-মা সেবার ছোট ভাই আর মিলুকে নিয়ে দিল্লী চলে গেছে বেড়াতে। দাদার অস্থায়ী চাকরীর অফিস আর নীলুরও স্কুলের কি পরীক্ষা থাকায় যাওয়া হয়নি। নীচে একা পড়ত নীলু। ত্রিদিবদা আসতেন নিয়মিত। অনেকক্ষণ পড়াতেন।

পড়াতে পড়াতে লেখার একটা জায়গায় 'ভালবাসা' শব্দটা এসে গিয়েছিল। নীলু কেন যেন হেসে উঠেছিল। কোন শব্দ করেনি। ত্রিদিবদা মুখ নীচু করে বোঝাচ্ছিলেন। কি
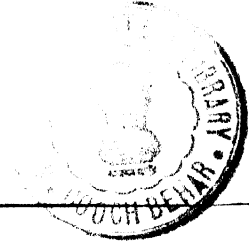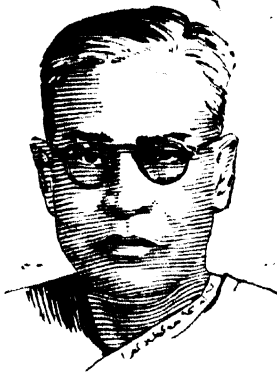
করে টের পেলেন ও হেসেছে। মুখ তুলে তাকালেন। 'হাসছ কেন?'

নীলু ভয় পেয়েছিল। কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে বসেছিল আড়ষ্ট হয়ে।

'জানি তুমি কেন হাসছ। 'ভালবাসা' শব্দটা শুনে তো?'

নীলুর বুকে ঢিপ ঢিপ করছিল।

'শব্দটা এমন আর কি? অত্যন্ত পবিত্র শব্দ!'

নীলু কোন শব্দ করল না।

'কি তাই না?' ত্রিদিবদা থামলেন। কি যেন ভাবলেন। 'জান তো, এরকম শব্দ আমি একজনকেই বলতে পারি; এত পবিত্র, এত গোপন শব্দটা।'

নীলুর কথাগুলো কেমন যেন লাগছিল। একভাবে মাথা নীচু করে।

'কাকে জান?' গলা নামাল। 'তোমাকে,' শব্দ করে হেসে হঠাৎ চুপ করে গেল।

নীলু কাঠ। একটু আগে থেকেই ত্রিদিবদার কণ্ঠস্বরে কেমন মনে হচ্ছিল নীলুর। শেষ কথাটা শুনে বিস্ময়ে ভয়ে টেবিলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে নীলুর যেন মনে হচ্ছিল, ত্রিদিবদা এখনি এখান থেকে উঠে যাক, বা নীলু কোন গোপন অন্ধকার জায়গায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলুক।

সেদিন অনেকক্ষণ কোন কথা হয়নি। ত্রিদিবদা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। চুপ করে নীলুর খাতায় হিজিবিজি কাটতে কাটতে কি সব ভাবছিলেন। মনে পড়ে, জোরে বাতাস বইছিল সেদিন। ঘরের দেয়াল, আলো আসবাবপত্তর যেন ভাসিয়ে ফেলছিল। দেয়ালঘড়ির টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছিল না ওদের। এক সময়ে মনে হয়েছিল নীলুর, ঘরের অদৃশ্য বাতাস আর আলোর আবরণ থেকে একধরনের নীরবতা নীলুর বুকের মধ্যে জমছিল। ভয় দেখাচ্ছিল নীলুকে। নীলু ত্রিদিবদার মুখোমুখি বসে। ওদের দুজনেরই নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। হাত-পা ঘামছিল। একভাবে বসে থাকতে থাকতে মেরুদাঁড়া, বুক, পিঠ কনকন করলেও কে যেন এক যাদুদণ্ড বুলিয়ে ওকে এখানে বসিয়ে রেখেছিল।

ত্রিদিবদাই সে অবস্থা থেকে সেদিন বাঁচিয়েছিলেন। 'আচ্ছা উঠি, আজ আর কিছু ভাল লাগছে না।' চাপা গলা ত্রিদিবদার। বলেই জুতোর শব্দ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

নীলু দরজার আড়াল হবার আগে একবার দেখেছিল ত্রিদিবদাকে। তারপর কিছু ভাবতে পারেনি। টেবিলের ওপর ফেলে রাখা ওর খাতাটা চোখে পড়তেই টেনে নিয়েছিল সামনে। ত্রিদিবদা কি সব লিখছিল সাদা পাতা ভর্তি করে। সব লেখা কালো করে কেটে দিয়েছে। চার অক্ষর ছ'অক্ষরের কি সব শব্দ সারা পাতা ভর্তি কিন্তু কোন শব্দ বুঝতে পারেনি নীলু। অনেক চেষ্টা করেও একটিকেও চিনতে পারেনি। পাগলের মত শব্দগুলো খুঁজেছিল। কাটা জায়গাগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়েছিল, যদি স্পর্শ করে বুঝতে পারে। না কিছু পায়নি। শেষে বোকার মতন পেন্সিলের দাগ দিয়ে ঢাকা অংশগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই পাতাটা নীলু আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছে ওর সুটকেশে। মিলু জানে না। দেখলেও কিছু বুঝতে পারবে না।

'তুই বোস, আমি একবার ওপর থেকে আসি।' নীলুর কিছু বলার আগেই মিলু বেরিয়ে গেল।

নীলু যেন এক ঘোরের মধ্যে ঘুরছে এখন। ত্রিদিবদাকে মনে পড়ছে। মিলুর আশীষের মতন ফর্সা, লম্বা-চওড়া নয়। ময়লা রং, মুখটা বেশ মিষ্টি। ভীষণ লাজুক ছিলেন। নীলুর সঙ্গেই যখন কথা বলতেন, মনে হ'ত যেন নীলুকে ভীষণ ভয় করেন। সুন্দর হাসতে পারতেন; মাঝে মাঝে মজার কথা বলতেন। নীলুর স্বজাতি ছিল না। তাই ত্রিদিবদা কেন যেন আড়ষ্ট হয়ে কথা বলতেন নীলুকে। মিলু পাশে বসে থাকত। বুঝতে পারত না।

আর মিলুটা! কেমন সাহস করে এগোচ্ছে আশীষের দিকে। নীলু নিজের মধ্যেই ভয় পেল। কেমন এক অসহায়তার মধ্যে বাইরে তাকিয়ে রইল। মিলু এখন আর নীচে নামবে না, বুঝতে পারছে। ওপরে মিলু এখন রেডিও খুলে গান শুনতে বসেছে। নীলু নিজের মনে হাসল।

একটু আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তায় জল জমার মত নয় যদিও, তবু পাতলা ঠান্ডায় ঢেকে গেছে চারপাশ। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যা গুমোট গরম ছিল। নীলু ভাবল কথাটা। বৃষ্টি থামলে নীচে নেমে এসেছে নীলু বই-পত্তর নিয়ে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল নীলু। বইটা সামনে খুলে রাখল। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারল না। গত কদিন ধরে কোনমতেই পড়াশুনা করতে পারছে না। মিলু বাড়ি থাকলে কলেজের গল্প, আশীষের গল্প করে। ও দুপুরে কলেজ বেরিয়ে গেলে নীলুর কত আবোল-তাবোল কথা মনে পড়ে। ত্রিদিবদা সারাদিন ওকে ঘিরে থাকে। মিলু ত্রিদিবদার কথা জানে না। জানবেও না কোন দিন। নীলু বলতে ভালবাসে না। মিলুর মতন না ও। নীলুর মনে হয়, নিজের একান্ত গোপন কথা কাউকে বলে দিলেই তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়, কেমন প্রকাশ্য বিশ্রী হয়ে পড়ে।

কথাটা মনে হতেই নীলু নিজের মনে হাসল। ত্রিদিবদা এই কথাটা পড়াবার সময় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা সুরে বলত। নীলু ত্রিদিবদাকে মনে করার চেষ্টা করল।

মিলু জানেই না ত্রিদিবদার সঙ্গে ওর একদিন দেখা হয়েছে এর মধ্যে। বলেনি নীলু। তা ছাড়া ত্রিদিবদার কথা নিজে থেকে বলবেই বা কেন? কবে ওদের পড়ানো ছেড়ে দিয়েছে। এখন বললে যদি মিলু কিছু মনে করে? মিলু কলেজে ঢুকে অনেক চালাক হয়েছে আজকাল!

নীলু ওর বান্ধবী গীতার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ির দিকে আসছিল। পাঁচমাথার মোড়ে ত্রিদিবদা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলেন, ভাবতেই পারেনি? আচমকা নাম ধরে ডাক শুনল, 'নীলা, শোন!'

নিজের নাম শুনে সত্যি চমকে গিয়েছিল ও। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। একদল ছেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ত্রিদিবদা। হাসছেন। নীলু হঠাৎ ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

গীতা ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোকে চেনেন বুঝি?'

নীলু কোন উত্তর দেয় নি। এই মুহূর্তে কি করবে ঠিক করতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে ছিল ত্রিদিবদার দিকে।

'এই শোন, কথা আছে।' হাসছেন ত্রিদিবদা। প্যান্ট বুশ সার্টে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেই লাজুক ভাবটা কেটে গেছে মুখ থেকে। 'ভয় নেই। এদিকে এসো।'

হঠাৎ রেগে গেল নীলু। ভয়ের কি আছে। বোকার মত কথা বলেন। ওর কথায় বন্ধুরা হেসে উঠল শব্দ করে। বুক কেঁপে উঠল নীলুর। 'কি দরকার, বলুন!'

নীলু যেন সাহস দেখাবার জন্যেই গীতাকে পিছনে রেখে এগিয়ে এল।

'তুমি একটু আগে একা একা যাচ্ছিলে না? কোথায়? বন্ধুর বাড়ি?

'সে খোঁজে আপনার দরকার কি?

'এমনি বলছি।' ত্রিদিবদা যেন ভয় পেলেন 'এখন কি বাড়ি যাচ্ছ?'

'জানি না!' বলেই নীলু সরে এসেছিল সামনে থেকে। গীতাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল বাড়ির দিকে।

ত্রিদিবদা দল ছেড়ে এগিয়ে এসেছিলেন। 'বাবা মা ভাল আছেন?' পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন।

'গিয়েই দেখে আসতে পারেন।'

'তুমি এখন কলেজে পড়ছ না? একদিন তোমার কলেজের সামনে দিয়ে আসছিলাম'।

'না।'

'তোমাদের বাড়ি একদিন যাব। তুমি থাকবে তো?'

নীলু কোন উত্তর দেয় নি। লজ্জা করছিল। গীতা পাশে থাকায় কেমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একটু দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরেছিল তখন নীলু।

ত্রিদিবদা যেন কি? কথা বলার আর জায়গা পেলো না? এতগুলো বন্ধুর মধ্যে! ত্রিদিবদার কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তারপর কদিন কেবল ত্রিদিবদার চেহারা মনে পড়েছে। মিলুর আশীষের থেকে পোষাকে-চলাফেরায় অনেক ভদ্র চেহারা।

নীলু চেয়ারের ওপর একটু নড়ে বসল। ওদের কলেজের সোস্যালে মিলু নিয়ে গিয়েছিল নীলুকে—আশীষকে দেখানোর জন্যে। আশীষকেও বলে রেখেছিল আলাপ করিয়ে দেবে বলে। ভিড়ে আর সম্ভব হয় নি। আশীষ দেখতে ভাল, কিন্তু চেহারা আর পোষাকে একটুও

ভাল লাগে নি ওকে। পরণে চুস প্যান্ট আর সার্ট। ছুঁচোলো বুট পায়ে। মাথার সামনের চুল উঁচু থাক করে সাজানো। পিছনের চুল কোঁকড়ানো, কেমন কচি কচি মত। নীলুর একটুও পছন্দ হয় নি। তার চেয়ে ত্রিদিবদার অনেক ভাল।

কি ভেবে নীলু হেসে ফেলল। সেদিন সোস্যালে আশীষ গান গেয়েছিল। মিলু বুঝি ওর গানের ইন্‌স্পিরেশান। নিজে নিজেই খুক খুক করে হাসল। মিলু ওর বান্ধবী স্বপ্নাকে নিয়ে ওর পাশে বসেছিল। মাইকে আশীষের নাম ঘোষণা-মাত্রই হঠাৎ স্বপ্নাকে নিয়ে সংগে সংগে স্টেজে চলে গিয়েছিল। নীলুর চোখ এড়ায় নি। উইংসের আড়ালে মিলু গিয়ে দাঁড়াল। আশীষ কয়েকবার ওকে দেখে গান আরম্ভ করল। বাড়াবাড়ি। নীলু বিড় বিড় করল। তা-ও তো ঐ গানের ছিরি। ছেলেদের হাততালির তোড়ে পালাতে পথ পায় না।

মিলুকে বলবে ভেবেছিল। বলতে পারে নি। ক'দিন লক্ষ্য করেছে নীলু, আশীষের কিছু নিন্দে করলেই মিলু দুঃখ পায়, রেগে যায়। সত্যিই তো। 'ত্রিদিবদাকে কেউ যদি খারাপ বলে : তুমি সহ্য করতে পারবে নীলু?'

নীলু অস্বস্তি বোধ করল। ঘড়ির টিক টিক শব্দ কানে আসতেই তাকাল ওদিকে। মিলু এখনো ফেরেনি। মাকে অবশ্য বলে গেছে কলেজ থেকে এক বান্ধবীর বাড়ি যাবে নোট করতে। সত্যি গেছে তো? নীলু মনে মনে হাসল। যা মিথ্যে কথা শিখেছে আজকাল মিলু। কেমন চালাকি করে নীলুকে নিয়ে বেরুল সেদিন সন্ধ্যায় ওর বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে বলে। নীলুকে পাঠিয়ে দিয়েছিল গীতার বাড়ি। অপেক্ষা করতে বলেছিল রাত নটা পর্যন্ত। মিলু চলে গিয়েছিল বরানগরে ওদের ফাংশনে। আগে নীলুকে বলে নি। ওকে নিয়েও যেতে চায় নি। ফিরে বসে গল্প করেছিল গীতার বাড়ি থেকে এক সংগে বাড়ি ফেরার পথে।

'কেমন ফাংশন হল রে?'

'দূর্, ফাংশন শুনেছি নাকি।'

'তবে? ওখানেই যাস নি!' নীলুর দু চোখে বিস্ময়।

'গান হচ্ছিল, আমরা বাইরে চমৎকার একটা অন্ধকার গাছের নীচে বসে গল্প করছিলাম।'

'আমরা কারা?' মুখ টিপে হাসল নীলু।

'আমি, আশীষ, প্রভাতী।'

'প্রভাতী আবার কে?'

'ও আশীষদের ক্লাশের একটি মেয়ে।'

'তুই একা এলি!'

'না, আশীষ পৌঁছে দিয়ে গেল। ট্যাক্সি করে আসবে বলছিল। আসিনি। ভয় করে।' মিলু থামল। 'আজ অনেক কথা বলেছে।' মিলুর কন্ঠস্বর কেমন অশান্ত শোনাল।

নীলু চুপ করে রইল।

'কি করা যায় বল তো? ভীষণ ভাবনায় পড়েছি।' মিলুকে একটু চিন্তিত মনে হল।

'কেন!'

'ওর বাড়ি একদিন যেতে বলেছিল।' একটু থামল। 'আমাদের বাড়ির সব কথা বলেছি। বাড়ি জানলে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, তাও শুনিয়ে দিয়েছিল। আমাদের বাড়িতেও আসতে বারণ করেছি।'

'ও কি বলল।'

'ও তো বলল, ওরও বাড়ি নাকি তাই।'

'তোদের মিলেছে বেশ।'

মিলু হেসে নীলুর দিকে তাকাল। 'আশীষ খুব ভাল রে। আমার দাদা টেম্পোয়ারী চাকরী করছে শুনে বলল, ওর কে আত্মীয় কাশীপুরের ফ্যাক্টরীতে অফিসার আছেন, সেখানে ভাল একটা স্থায়ী চাকরী করে দেবে এক সপ্তাহের মধ্যে।' যেন এক নিঃশ্বাসে বলে গেল কথাগুলো মিলু।

নিলু মিলুর দিকে তাকাল। মিলু আশীষের কথায় যে মনে মনে চমৎকার এক গোপন অংক কষায় ডুবে আছে, বুঝে হাসল। ত্রিদিবদার সংগে এসব কোন কথাই হয় নি। অথচ ত্রিদিবদাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না নীলু। কেন?

বাইরে জুতোর শব্দ হল। নীলুর অন্যমনস্কতা সরে গেল। দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, মিলু আসছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিলু হাতঘড়ি দেখল। 'একটু দেরী হয়ে গেল রে। মা কিছু বলছিল না তো?'

'মা নেই, মামার বাড়ি গেছে। ফিরতে দেরী হবে।'

'উঃ, বাঁচা গেল।' বলেই ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা রাখল। নাক টানল। বৃষ্টির জন্যে বেশ ঠান্ডা লেগে গেছে রে।' চেন টেনে ব্যাগ খুলতে খুলতে গুন গুন করে গান ধরল, 'ভালবেসে যদি সুখ নাহি, তবে কেন মিছে ভালবাসা'। নিজের খেয়ালে গেয়ে যাচ্ছে।

নীলু মিলুকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মিলু সত্যিই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। গানটা মন দিয়ে শুনতে লাগল। আজকাল অনেক গান গায় মিলু যা আশীষই ওকে শিখিয়েছে।

'কিরে, এটা কি নতুন শেখাচ্ছে?'

মিলু কোন কথা না বলে বড় বড় চোখে নীলুকে দেখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ঠিক করল।

'দেখি কত নোট করে এলি।' নীলু হাসতে হাসতে মিলুর ব্যাগের দিকে হাত বাড়ালেন।

'থাক, তোকে আর পুলিশী করতে হবে না। মায়ের হয়ে প্রক্সি দিচ্ছিস?' এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল। গুন গুন গানের সুর হঠাৎ বন্ধ করে কেমন অন্যমনস্কের মত বলল, 'আজ আশীষের বাড়ি গিয়েছিলাম কলেজ থেকে।'

'একা!'

'বেশ, তাতে আপত্তি কিসের?' মাঝে মাঝে নাক ফুলিয়ে কথা বলে মিলু। 'মনে হচ্ছে তুই ভীষণ ভয় পাচ্ছিস?'

'না, বলেছিলি যে, ওর বাড়িতে মা-বাপ ছাড়া কেউ নেই।

'সেই জন্যেই তো যাব।'

নীলু একটু গম্ভীর হয়ে গেল। 'বেশী বাড়াবাড়ি করিস না মিলু।'

'বাঃ, গেলে কি হয়েছে?' একটু থামল। 'যাই ঘটুক ভালই তো।' মিলু বুকের কাপড় ঠিক করল।

নীলু বিরক্ত হল মিলুর কথায়। অন্য দিকে মুখ ঘোরালো। মিলুকে নীলু খুব ভালবাসে। তাই ওর কথা না শোনায় অভিমানে লাগতেই চুপ করে গেল।

মিলু নীলুর অভিমান লক্ষ্য করল। হেসে উঠল। 'তুই পাগল হলি। আমি একা যাব কি করে? বাড়ি চিনি নাকি? আর হঠাৎ একা যাবই বা কেন?'

নীলু সহজ হল। 'আর কে গিয়েছিল।'

'প্রভাতীটা।' মিলু থামল। 'আজ একটা মজার ব্যাপার আবিষ্কার করেছি।'

'কি রে।' নীলু অবাক হল।

'প্রভাতীটা আশীষকে ভীষণ লাইক করে। কি শয়তান। এতদিন একটুও আমাকে বুঝতে দেয় নি। আজ ধরেছি। আজ আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই তো ও জোর করে ওর বাড়ি নিয়ে গেল।'

'আশীষ কি বলে?'

'কি আবার? ওকে আমলই দেয় না। ওই তো হ্যাংলার মতন ছোটে।' মিলুর মুখে-চোখে কন্ঠস্বরে কেমন বিজয়িনীর তৃপ্তি। মিলু হাসছে। 'তবে একটা কি ব্যাপার জানিস, আমার সংগে যদি কিছু না হয়, তবু প্রভাতীকেও এগোতে দেব না। তার জন্যে যা করতে হয়, রাজি।'

'ইস্, এত ভালবেসে ফেলেছিস আশীষকে! সাবধান!'

মিলু অন্যমনস্ক হল একটুকাল। কি ভাবল যেন। নীলুর দিকে বড় বড় উৎসুক চোখে তাকিয়ে বলল, 'ভাবছি, এবার একবার আশীষকে জিজ্ঞেস করব, বাড়ির অমতে খুব তো এগোচ্ছেন, বাড়ি থেকে যদি তাড়িয়ে দেয়?' থামল। 'আমার ভীষণ লজ্জা করে! বল তো, বললে কি উত্তর দেবে!'

নীলু হেসে ফেলল, 'কি আবার বলবে। তোমার জন্যে সব কিছু ছাড়তে পারি!'

নীলু এমন চটপট জবাব দেবে ভাবতে পারেনি মিলু। শব্দ করে হেসে উঠল। নীলুর কথাটা খুব ভাল লাগল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে বুঝি। মিলু জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। আজ আর চাঁদ দেখা যাচ্ছে না।

মিলুকে দেখতে দেখতে নীলু জিজ্ঞেস করল, 'আশীষদের বাড়ি কিরকম বললি না?'

'খুব ভাল।' বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেই মিলু জবাব দিল।' দোতলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি। সামনে একটা নরম ঘাসে ঢাকা পাড়-ঘেরা পুকুর আছে। আর একটু দূরে থেকে মাঝে মাঝে ট্রেন যাওয়ার শব্দ কানে আসে। কয়েকটা গাছের ছায়ায় ওদের বাড়িটাকে বড় ভাল দেখায়।' মিলু যেন মুগ্ধের মতন কণ্ঠে বলে যাচ্ছিল। নীলুর দিকে ফিরল। 'জানিস তো ওর বাবাও খুব ভাল গান জানেন।'

নীলুর কি মনে হল বলল, 'তোর ব্যাপারটা প্রভাতী বুঝতে পেরেছে?'

'কবে!' এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল। 'আর প্রভাতীই বোধ হয় বলেছে অনেককে সকলে জেনে গেছে। আজ তো আমার ক্লাশের সুশান্ত পার্থরা কি ঠাট্টা করছিল। ক্লাশে পিছনে বসে কেবল দুজনে বলছে কি জানিস, সুশান্ত বলছে, মিলি নামটা আমি লিখব, পার্থ বলে আমার ছাড়া কারোর লেখার অধিকারই নেই। এমন ফাজলামি করে। আর সমানে দেবুদা গান গেয়ে চলেছে, 'বাঁধি ডাগর আঁখি যদি দিয়ে-ছিল সে কি আমার পানে ফিরিবে না।' আচ্ছা তুই বল্, ক্লাশে স্যার পড়াচ্ছেন, এরকম গান গাইলে কার না হাসি পায়, রাগও হয়।'

'তোর ক্যান্ডিডেট অনেক তা হলে!'

'আগেও এরা ছিল। আমার একটুও পছন্দ না। আশীষের ব্যাপারটা জেনেই তো উৎপাত লাগিয়েছে বেশি। হেরে গেছে তো সব।' মিলুর গলার স্বরে চাপা খুশি।

নীলু হঠাৎ কেমন অস্বস্তি বোধ করল। মিলু যেন গর্ববোধ করছে সব ব্যাপারটায়। নীলুর অক্ষমতায় আঘাত করছে না তো! মিলুর দিকে তাকাল। মিলু আবার উঠে জানালার সামনে চলে গেল। কিসে যেন মিলুকে আজ স্থির থাকতে দিচ্ছে না। নীলুর ভিতরে একটা চাপা কষ্ট হল। মিলু সত্যিই জিতে যাবে। না বোধহয়। এর আগেও তো মিলুকে দেখেছে নীলু অমিয়র জন্যে পাগল হতে। অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল সে। সোনারপুরে বাড়ি। একবার এক সপ্তাহের জন্যে ছিল ওরা দুজনে। অমিয়র সঙ্গে সে কি বন্ধুত্ব। অমিয় নাকি ওকে ডার্লিং বলেছিল। কত গোপন ব্যাপার ছিল তার সঙ্গে। এখন কোথায় সে! আশীষের ব্যাপারটা সে রকমই হবে বোধহয়। মিলুর সাহস অনেক কম।

নীলু, তোমারই বা কি সাহস? তোমার ত্রিদিবদাকেই তুমি চিরকালের জন্যে পাবে! পেতে চেষ্টা করেছ? মিলু তো তবু অনেক কাছে আসতে পেরেছে। নীলুর ভিতরে কেমন কষ্ট হল! চাপা শ্বাসকষ্ট পেতেই সহজভাবে মিলুর দিকে তাকাল।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে সামান্য জোরে। মিলু হাত বাড়িয়ে দিল বাইরে বৃষ্টির মধ্যে। মনে পড়ল, আজ আশীষদের বাড়ি প্রভাতী যখন রান্নাঘরে আশীষের মায়ের সঙ্গে গল্প করছিল, আশীষ ছিল ওর পাশে। ডান হাত ওর হাতের মধ্যে নিয়ে-ছিল হঠাৎ। কনুই থেকে ওর হাতের মুঠি পর্যন্ত আশীষ অকারণ হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। মিলু বুঝতে পারছিল, আশীষের হাত কাঁপছে। মিলুরও কি কাঁপছিল না? শুধু হাত নয়, হাতের শিরা-উপশিরার মধ্যে রক্ত-কণিকাগুলি কাঁপছিল। আর কম্পিত রক্তকণিকাগুলি হৃদয়ের মধ্য দিয়ে এসে মুহূর্তে স্তূপীকৃত হয়ে জমতে জমতে যেন মৃদু ভূকম্পন তুলেছিল। ঘর অন্ধকার ছিল তখন। বৃষ্টি থেমে গিয়ে ঠান্ডা বাতাস বইছিল। আশীষ ভীরু গলায় শুধু বলেছিল, 'আমরা দুজন এত কাছে চিরদিনের সত্য হয়ে থাকতে পারি না।' মিলু পারে নি কোন উত্তর দিতে। উত্তর দেওয়ার আগেই প্রভাতীর পদশব্দে ওরা সরে গিয়েছিল।

উত্তর কি মিলু দিতে পারত? বৃষ্টির দিকে তাকাল মিলু। ডান হাত ভরে যেখানে আশীষের স্পর্শ ছিল, সেখানে মুক্তোর মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সাজিয়ে নিল। দূরের লাইটপোস্টের আলোয় হাতের ওপর ফোঁটা-গুলি জ্বলছে। মিলু সেদিকে তাকিয়ে রইল। ঠান্ডা, বৃষ্টির গুঁড়ো মেশানো বাতাস এসে মুখ-চোখ ভরিয়ে দিল ওর। মিলু লোহার গরাদে বুক চেপে দাঁড়াল। মনে হল, এখনি ও বাইরে বৃষ্টির মধ্যে স্নান করতে পারে। চারপাশে বেলফুলের কুঁড়ি দিয়ে গাঁথা লম্বা ঝোলানো মালার মত বৃষ্টির ঝালর নিয়ে মিলু এখন ঝর্নার মত আকাশের নীচে দাঁড়াতে পারে।

আহ্, এখনি তো তুমি আসবে! তুমি এইভাবেই তো এসেছো। তুমি! তুমি! তুমি! যখন তুমি এলে আমি জেগেছিলাম। যখন তুমি গান গাইলে আমি শুনেছি, গেয়েছি তোমার সুরে সুর মিলিয়ে। তুমি শুনেছ কি, আমার বুকে ঘাসে ঢাকা ভিজে মাটির গন্ধ আছে, আকাশের নীলিমা আছে, বৃষ্টির শব্দ আছে। রক্তকণিকার নৃত্য আছে, সারা পৃথিবীর জমানো আলোর ঢেউ আছে। তুমি নিশ্চয়ই জেনেছ। না জানলে যখন তুমি বৃষ্টি হয়ে এলে আমি মন করে তোমায় জানলাম, কি করে? বল কি করে?

বুকে চাপা শ্বাসকষ্ট হতেই মিলু সচেতন হল। কখন সে এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে খেয়াল নেই ওর। জানালার দুটো রডের ওপর গোপনতম চিন্তার ভারে বুক চেপে বসে গিয়েছিল। বৃষ্টির ঝাপটায় সামনেটা সব ভিজে গেছে। মিলু লজ্জা পেল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, নীলু অন্যমনস্ক হয়ে বই-এর পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে। পাছে নীলু বুঝতে পারে। মিলু সন্তর্পণে পায়ে এগিয়ে এল টেবিলের সামনে। ব্যাগটা নিয়ে নীলুর দিক থেকে সামনেটা আড়াল করে একসময় বাইরে বেরিয়ে এল। ওপরে যাবার সিঁড়ি ধরল।

নীলু বই-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বাইরে বৃষ্টির বিজবিজ শব্দের সঙ্গে কখন যেন ওর ছোট ছোট ভাবনাগুলি মিশিয়ে ফেলেছিল। অন্যমনস্কতার মধ্যে নিঃশ্বাস শান্ত, সন্তর্পিত। নীলু সারা ঘরে একা। ঘরে যেন কোন আসবাব-পত্তরও নেই। পাখা আলো নেই। শুধু চারপাশে শাদা দেয়াল পাতলা ছায়া-বোলানো। কয়েকটা জানালা হাট করে খোলা। বৃষ্টির গুঁড়োর চুল-ঢাকা মাথা নাড়তে নাড়তে হালকা বাতাস যেন ঘরে ঢুকে খেলা সুরু করেছে। নীলুর কেমন শীত করল।

ত্রিদিবদা একদিন আসবেন বলেছেন। কই এলো না তো! এবার এলে 'আপনি' বলবে না, 'তুমি' বলবে। অনেকদিন আগে ত্রিদিবদা একদিন বলতে বলেছিলেন ঠাট্টা করে। নীলু কিছুতেই বলতে পারেনি। এখন যদি আসেন, বলবে। 'ত্রিদিব তুমি, তুমি, তুমি। তিন-সত্যি কাটলাম। হয়েছে তো! বাব্বা, কি জেদ তোমার?'

নিজের মনেই খিলখিল করে হেসে উঠল নীলু। 'যখন তুমি আসবে, প্রথমেই ঝগড়া করব, সেদিন রাস্তায় অমন করে ডেকেছিলে কেন? ভদ্রতা জান না?'

'বা রে! অভদ্রতার কি করেছি! তোমার জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, তুমি তো জান না?'

'জানব কি করে? দাঁড়াবে আগে বলেছ নাকি?'

'এসব কি বলে দিতে হয়?'

'শয়তান তো!' হেসে উঠল নীলু। 'তুমি একটা বোকা। বাড়িতে আসতে পার না?'

'এই তো এসেছি!'

'এমন বৃষ্টিতে ভিজেছ কেন?'

'তোমার জন্যে।'

'থাক। কত দরদ বোঝা গেছে!' কতদিন ধরে বসে আছি জান? ভাবছি কখন তুমি আসবে।'

'আমিও তো কথাটা বলতে পারি!'

'খুব চালাক হয়েছ আজকাল। যখন পড়াতে আসতে তখন কি বোকা ছিলে! মুখে কথাটি ফুটত না।'

'আর তোমার! ওহ্! একটা শব্দ বলেছিলাম, তাতেই মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলে! কেন তা কি জানি না?'

'ত্রিদিব! তোমার সেদিনের সেই যে পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কালো করে কাটা কাগজটা, রেখে দিয়েছি যত্ন করে। বলবে, কি লিখেছিলে?'

'না, ওসব খুব কনফিডেনসিয়াল।'

'আমি জানি তুমি কি লিখেছিলে! তখন তো বুঝিনি, এখন বুঝি!'

'যাক, তবু চালাক হয়েছ, সাহস পেলাম।' ত্রিদিবের চোখ সারা ঘরে ঘুরল। 'তোমার সেই ছোট বোনটি কোথায়—মিলু না কি নাম যেন!'

'মিলু একেবারে নিজের মত একটা বন্ধু পেয়েছে।' হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল। নীলু ত্রিদিবের চোখ-মুখ দেখল। প্রভাতীও আশীষকে চায়, মিলু বলেছিল। জানে মিলুর তাতে ভীষণ ভয়, কষ্ট, জ্বালা, সারাক্ষণ অস্থিরতা। নীলু ভয় পেল: 'তোমাকে আর কেউ চায় নাকি ত্রিদিব। এমন আর কেউ যে আমার থেকে সুন্দর। সত্যি করে বলি, আমার তাতে খুব কষ্ট হবে।'

'কেউ না। চাইলে পাবে নাকি! আমি একজনকে ভালবাসি, একজনেরই ভালবাসা পেতে চাই। কাউকে পাত্তাই দিই না।'

নীলু ভীষণ খুশী হ'ল। এই একটা জায়গায় মিলুকে সে হারিয়ে দিয়েছে। আশীষ তো প্রভাতীকেও আসতে বলেছে ওর বাড়ি মিলুকে সঙ্গে নিয়ে। ত্রিদিব তা নয়। নীলুর মুখ বিজয়িনীর মত। 'আচ্ছা ত্রিদিব, তুমি তোমার বন্ধুদের সব বলেছ নাকি? আমার কথা।'

'মোটেই না। আমি এসব ভালবাসি না। আমাদের ভালবাসার কথা কারোর জানার অধিকার নেই। তা হলে ভালবাসা নোংরা হয়ে যায়!'

নীলু খুশী হ'ল। মিলু বলছিল, আশীষ নাকি ওর কথা সারা কলেজময় বলে বেড়িয়েছে। ত্রিদিব আশীষের থেকে অনেক ভাল। আশীষের মত বোকা নয়।

'আর কিছু বলবে?' ত্রিদিব চোখ বুলোলো ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। নীলু চিবুক তুলে মনোরম একটা ভঙ্গি করে ত্রিদিবকে দেখতে লাগল।

'মা আমার বিয়ের সম্বন্ধ দেখছে। তুমি কিছু বলবে না?'

'না।'

'কি না?

'বিয়ে হবে না।'

'কোনদিনই না!'

'তুমি আমাকে তোমার বিয়ের কথা কোনদিন বলবে না।' ত্রিদিব যেন চলে যাবার ভঙ্গি করল।

'ইস্, সাহস নেই তা হলে! পালাচ্ছ কেন?'

'শুনতে ভাল লাগছে না।' ত্রিদিব দরজার দিকে চলে যাচ্ছে।

'এই শোন। লক্ষ্মীটি।' নীলু ত্রিদিবকে দেখছিল। ওর হাতের মুঠি ধরার ইচ্ছে হল। চওড়া কাঁধ। সুন্দর চেহারা। মাথায় একরাশি চুল। কেমন ছেলেমানুষ। 'তুমি এসো, আমি অপেক্ষা করব। শোনো, যখন তুমি আসবে—' ত্রিদিব যেন হঠাৎ দরজার আড়াল হয়ে গেল। নীলু খিলখিল করে হেসে উঠল। 'ভীতু কোথাকার!'

চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল নীলু। সামলে নিল। কি সব যা-তা ভাবছিল সে! নীলু নিজের কাছেই লজ্জা পেল। ঘরের চারপাশে চোখ বুলোল। মিলু নেই। বৃষ্টি থেমে গেছে। নীলু দরজার দিকে তাকাল। এখানে ওখানে টপটপ করে বৃষ্টি পড়ার শব্দ। নীলুর নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হ'ল। টেবিলের ওপর মাথা রাখল।

ক'দিন ধরে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। আজও সারাদিন গুমোট। নীলুর একটুও ভাল লাগছে না এখন। মুখ গম্ভীর করে বসে আছে পড়ার টেবিলের সামনে। মুখে-চোখে কেমন এক অসহায় হতাশ ভাব। মিলু এখনো ফেরেনি। সন্ধ্যে সাতটা হতে চলল। আজ কিছু না বলেই এত দেরী করছে। নীলু বিরক্ত হ'ল। আজ কিছু ভাবতে পারছে না ও, ভাবতে চাইছেও না।

পা টিপে টিপে মিলু ঘরে ঢুকল। সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে সারা মুখখানি কালি। 'এই, মা বাড়িতে নেই তো?'

'হ্যাঁ আছে।'

'কেন, আজ তো কোথায় যাবে বলেছিল বিকেলে? অনেক রাত্রে ফেরার কথা?'

'যায়নি।' নীলু গম্ভীরভাবে বলল। 'তুই এত দেরী করলি কেন?'

মিলু নীলুর গাম্ভীর্য গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। সারা শরীরে ক্লান্তি থাকলেও মুখ-চোখ অন্যদিনের থেকে বরং বেশী উৎসুক। নীলুর ওকে দেখে কেমন কষ্ট হল।

মিলু এগিয়ে এসে শব্দ করে চেয়ারে বসে পড়ল। 'আজ যা মজা হয়েছে না! বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে লরি করে কত ঘুরেছি। সেই বড়বাজার পর্যন্ত।'

'বাড়িতে বলে গেলে পারতিস।'

'দূর, সময় দিল নাকি? একজন প্রফেসারই তো জোর করে নিয়ে গেলেন। না হ'লে আমি যেতাম নাকি?'

'বাজে বলিস না। নিজের যাওয়া না-যাওয়ার ওপর প্রফেসারদের কোন হাত নেই।'

'তুই রাগ করছিস?' নীলু ঘনিষ্ঠ হ'ল। নিজের চাপা খুশিতে মিলু এখনো ভাসছে। 'আজ লরিতে আশীষের বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যা করছিল না। ইস্, কি

মজা হয়েছে। তুই যদি থাকতিস, দেখতে পেতিস।'

'ভাল করেনি।'

'কেন?' নীলুকে এবার সত্যি গম্ভীর দেখাল। 'তবে কি জানিস, আমারই খারাপ লাগে। আশীষটা এমন, সকলকে বলে বেড়িয়েছে, তারা তো লাগবেই। আসলে এমন কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি। তবে—'

'বাড়িতে মা সব জেনে গেছে।'

'কি?' মিলু বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল নীলুর দিকে। হঠাৎ বুকের মধ্যে দ্রুত কয়েকটা শব্দ হ'ল।

'তোর সমস্ত ব্যাপার মা শুনেছে। শোনার পর মা যেখানে যাবার কথা ছিল, যায়নি। বাড়িতে গুম হয়ে বসে আছে।'

'যাঃ, ঠাট্টা করিস না।' মিলু উড়িয়ে দিতে চাইল কথাটা।

'বিশ্বাস কর। তুই লুকিয়ে বরানগরের ফাংশানে গেছিস, আশীষ তোকে পৌঁছে দিয়ে গেছে, সোসাইলে আমাকে দেখাতে নিয়ে গেছিস, আশীষের বাড়ি গেছিস, কোনদিন ওর সঙ্গে একা একা বাসে করে শিয়ালদা পর্যন্ত বেড়িয়েছিস। সব মা জানতে পেরেছে।'

'কি করে?' মিলুর বুকের শব্দ দপ্-দপ্ করছে। মাথার সঙ্গে যেন আগুনের স্রোত।

'কি জানি! কে যে বলল বুঝতে পারছি না। মা একবার বিকেলে বাইরে বেরিয়েছিল। কে বলেছে বলতে চাইছে না।'

'তোকে কিছু বলেছে?'

'আমাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে আশীষকে চিনি কিনা। কি করে লুকোব বল? আমার বলার আগেই মা সব জানে। বলার আগে মা-ই আমাকে শুনিয়ে দিল।'

মিলু চুপ। মাথা নিচু করে রইল কিছুক্ষণ। এখন মনে হচ্ছে, কেউ বুঝি একঝলক আগুন গায়ে ছুঁইয়ে ওকে নিষ্প্রাণ নিস্তেজ করে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ বাদে নীলু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। 'আমার একটুও ভাল লাগছে না। যে বলেছে তার ওপর এমন রাগ হচ্ছে না!'

'আমি যদি বলি সব মিথ্যে!'

'মা বিশ্বাসই করবে না। বাবাকে বলে দেবে বলেছে।' একটু থামল। 'তুই যে কলেজ থেকে আজ দুপুরে লরি করে ছেলেদের সঙ্গে গেছিস, মা জানে। কতবার তোকে বলেছি মিলু, বাড়ির সামনে কলেজ, এসব করিস না। করলেও সাবধান হবি।'

মিলুর নিজেকে বড় অসহায় মনে হল।

'মা বলেছে, কাল থেকেই কলেজ ছাড়িয়ে দেবে।'

হুঁঃ, ছাড়লে তো?'

'তুই এত দেরী করে ফিরিস। মা বলছিল এবার ছুটির সময় কলেজে যাবে। নিজেই মাঝে মাঝে খোঁজ নেবে।'

'পারবে নাকি?' মিলুর চাপা রাগ হল। একধরনের অভিমানও। নাক ফুলছে। 'কলেজ থেকে বেরুবোই না অফ্ পিরিয়ডে। কোথায় গল্প করব, বুঝতেই পারবে না।'

নীলু বিষণ্ন চোখে মিলুকে দেখতে লাগল। সারা দিনরাত ওর কাটত ভাল। মিলুর কাছ থেকে নতুন কথা শুনতো। কত মজার কথা। সে সব চিন্তা দিয়ে দিনরাত ভরিয়ে তুলত নীলু। এখন সব ফাঁকা, বড় বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। মায়ের সন্দেহ এখন প্রতি ব্যাপারেই। আর বোধহয় বাইরে একা একা বা মিলুর সঙ্গেও বেরুতে দেবে না। ত্রিদিবদার সঙ্গে কোনদিন আর দেখা হবে না!

মিলু পাথরের মত স্থির হয়ে বসে রইল। মায়ের ভয়ে যে ওপরে যাচ্ছে না তা নয়, কে যেন তার সব কিছু একটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে! মিলুর বান্ধবী স্বপ্নাকে আশীষ আজই বলেছে, 'হঠাৎ আমাদের সম্পর্ক চলে গেলে আমার আর কি? কষ্ট সবই তো মিলুর।' আশীষ জানে না, আজ এই মুহূর্তে থেকে আমি কি অসহায় হয়ে পড়েছি। যখন শুনবে, তখন শুধু কি আমারই কষ্ট হবে? ওর না? আর কি কলেজে বা কলেজের বাইরে কথা বলতে পারবে না ওর সঙ্গে? আজই ওরা সব মিলে একটা নাটক অভিনয় করবে ঠিক করছিল। মিলুকে বইটা খোঁজ নিতে বলেছে। মিলু থাকবে তাতে। তার কি হবে? মিলু ভীষণ এক অস্বস্তি অনুভব করল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। হোক না বিচ্ছেদ। আশীষ তো সায়েন্স কলেজে পড়বে এম. এস-সি। মিলু কি আর এম-এ পড়তে যাবে না? তখন! তখন দেখা হবেই। মা বিয়ে দিয়ে দেবে! বিয়ের পরও দেখা করতে পারব। তুমি তখন কথা বলবে তো?'

ওপর থেকে মা ডাকলেন, 'নীলু, মিলু ফিরেছে?'

নীলু মিলুর দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ।'

'দুজনে ওপরে আয়।' মায়ের গলা কঠিন, গম্ভীর।

ওপরে বাবা এখনো অফিস থেকে ফেরেনি। দাদা ফিরে আড্ডায় বেরিয়েছে। ছোটভাই মেঝেয় বসে পড়ছে। মা নীলু-মিলুদের নিয়ে ছোট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

মিলু দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। মাথা নিচু। ভিতরে কাঁপছে বুঝি। নীলু একটু দূরে জানালার ধারে বসল। গুমোট গরম। বিশ্রী হাওয়া বইছে।

'আশীষ মিত্র কে মিলু?'

মিলু চুপ।

'চুপ করে থেকো না, বলো।' পাথরের মত কঠিন, নিষ্প্রাণ শীতল গলা মায়ের।

'আমাদের কলেজের বন্ধু।'

'কলেজে ভর্তি হবার সময়, তার পরেও অনেক কথা তোমায় বলেছিলাম, মনে আছে? তুমি আমার এতদিনের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙেছ। এবার?'

মিলুর মনে হল বলে, 'আমি কিছু অন্যায় করি নি মা!' কিন্তু ভয়ে আড়ষ্টতায় কিছু বলতে পারল না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আঘাতটা এমন অতর্কিতভাবে এসেছে যে মিলু নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছে না। আর মিলু এ বাড়ির নীরব শাসন জানে। বাবা-মাকে চেনে। কি ভয়ংকর সে শাসন, তা ভাবা যায় না।

'কাল থেকে কলেজ যাবে কি না, ভেবে দেখ। গেলেও আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। ছুটি হলেই আমাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই কি চাও? মনে রেখো, আমি সমস্ত জানি। আশা করি কাল থেকে এমন কোন কাজ করবে না, যাতে তোমার বাবাকে কথাটা জানাতে বাধ্য হই।' মা উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন। 'এসব নিয়ে বাইরে কোন কথা বলবে না। সম্মানটুকু নিয়ে আমাদের বাকি জীবনটুকু বাঁচতে দাও। বিশ্বাসের মূল্য এমনভাবে নষ্ট করবে, কোনদিন ভাবিনি।' মা হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। কি ভেবে ঘরে আর থাকলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

মিলু নীলু একভাবে বসে রইল কিছুক্ষণ। নিস্পন্দ, মূর্তির মত স্থির নির্বাক দুজনে।

মা একবার রান্নাঘর থেকে ডাকলেন নীলুকে। 'নীলু বিকেলের কাপ ডিস-গুলো ধুয়ে দে।'

নীলু উঠে এ ঘরে এলো। 'কেন?' মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকাল। মা গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে।

'কেন আবার কি? বিকেল থেকে ধোয়া হয়নি।'

'আমি ধুতে পারব না।'

'কে ধোবে তা হলে?' মায়ের কণ্ঠস্বরে চাপা বিরক্তি।

'মিলুকে বলো। প্রত্যেকদিন আমি ওর কাজ করে দি। আমার আজ কিচ্ছু ভালো লাগছে না। ও করুক না।' চড়া গলায় কথা বলে নীলু সরে গেল মায়ের সামনে থেকে।

সত্যি মিলুর অনেক করে দিয়েছে নীলু গত এক মাসের ওপর। মিলুর কথা শুনতে শুনতে নীলুও নিজের কত সব কথায় সারাক্ষণ ভরিয়ে রাখত। আজ যেন একটুও ভাল লাগছে না। সারা শরীরে মনে বিরক্তি। কেন যেন মনে হচ্ছে, মিলুকে দুটো কঠিন কথা শুনিয়ে দেয় আজ।

ভাবতে ভাবতে নীলু ছোট ঘরে এলো। মিলু কখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। মেঝেয় বসে ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়েছে। দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে মিলু বুঝি কাঁদছে। পিঠ কাঁপছে তির তির করে। নীলু জানালায় গিয়ে বসল। মিলুর চাপা কান্নার শব্দ বুঝি বা নীলুর বুকের শব্দে জড়িয়ে গেল। নীলুর দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল। ও বুঝতে পারছে, ওর দুটি চোখ ভীষণ লাল। নীলু দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজল।

ঘরের ছায়া-ছায়া অন্ধকার কখন যেন ওদের কান্নার মধ্যে জমতে জমতে কঠিন কালো পাথর হয়ে গেল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শয়তানের জন্ম

'রোজমেরীস বেবি' নামক একটি ছায়াছবি রূপালী পর্দায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যে-উপন্যাসটি অবলম্বনে এই ছায়াচিত্র তোলা হয়েছে তার আলোচনা এদেশে তেমন বেশী হয় নি। ইরা লেভিন কৃত 'রোজমেরীস বেবি' উপন্যাসটি একালের বিস্ময়, এই উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "This is truly one of the most human and fascinating novels published in recent times".

'রোজমেরীস বেবি'র গল্পাংশ একটু বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করার চেষ্টা করব, 'অমৃত'-র যেসব পাঠক-পাঠিকার মূল গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ হয় নি তাঁদের জন্য।

এই শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকার ব্রামফোর্ড অঞ্চলটিতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা সহজে পদার্পণ করত না। আজ অবশ্য ম্যানহাটানের এই পল্লীতে অজস্র ফ্ল্যাট বাড়ির ভীড়, আর সেই কারণেই তার খ্যাতি। রোজমেরী এবং তার স্বামী গয় উডহাউস যখন এই অঞ্চলে বাসা নেওয়া স্থির করল তখন তাদের পারিবারিক বন্ধু এডওয়ার্ড হাচিনস্ নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল। ব্রামফোর্ড অঞ্চলটি কুহকবিদ্যা, হত্যালীলা এবং নরখাদকদের জন্য কুখ্যাত। এই অখ্যাতি তার দীর্ঘদিনের। রোজমেরী আর তার স্বামী এইসব কুসংস্কার আমল দিতে চান না। গয় উচ্চাভিলাষী মঞ্চ ও টি ভি'র অভিনেতা, আর রোজমেরী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্যাথলিক মতবিশ্বাসী তরুণী। হাচিনসের সতর্কবাণী হেসে উড়িয়ে দিয়ে তারা ব্রামফোর্ডের বাসভবনে চলে এল।

পল্লীটা মন্দ নয়। এখানে এসে পরিচয় হল পরিণত বয়সী প্রতিবেশী কাসটে-ভেটাসদের সঙ্গে। এঁরা নিঃসঙ্গভাবে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁদের কাছে একটি মেয়ে প্রতিপালিত হত। এই মেয়েটিকে তাঁরা পথ থেকে তুলে নিয়েছিলেন। সে সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছে।

একদিন সন্ধ্যায় রোমান এবং মিনি কাসটেভেট তাঁদের বিশাল অথচ বিষণ্ণ বাসভবনে রোজমেরী ও গয়কে নৈশ ভোজনে আমন্ত্রণ করলেন।

রোজমেরী এবং মিনি যখন রান্নাঘরে ব্যস্ত তখন বৃদ্ধ রোমান গয়কে প্রাচীনকালের সব নট-নটীদের সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক কাহিনী শোনালেন।

এই ঘটনাটির পর অনেক সময় একা-একা কাসটেভেটদের বাড়ি বেড়াতে যেত, আর সেই সময়েই মিনি কাসটেভেট রোজমেরীর কাছে এসে নানারকম গল্প করতেন। একবার সঙ্গে করে একজন বান্ধবীকে নিয়ে এলেন। তাঁর নাম লরা লুইসী ম্যাক বারনী। মিনি রোজমেরীকে আবার একটা কবচ ধারণ করতে দিয়েছিল। রূপোর জালিকাটা পদক, তার ভিতর কি এক পদার্থ। মিনি বলেছিলেন এ হল টানিস গাছের শিকড়, এ পাওয়া যায় না, ওঁর বাড়িতে টবে বসানো আছে, সেখান থেকে এই সর্বদোষ ও রোগহর অমূল্য পদার্থটি সংগৃহীত। এর গন্ধটা বড় বিশ্রী। রোজমেরী তাই পরে এ তাবিজ খুলে ফেলেছিল, স্বামীর শত অনুরোধেও আর পরেনি।

কাসটেভেটেরা কিন্তু অতি আশ্চর্য ধরনের সামাজিক প্রাণী। এক রাত্রে, সেদিন ছিল শনিবার, রোজমেরীকে জেগে থাকতে হল। পাশাপাশি বাড়ি, পাশের বাড়ির কলরবের ঢেউ এসে এই বাড়িতে ধাক্কা দেয়। দুটি বাড়ির মাঝে পাতলা পার্টিশন। এই কলরবটা কি রকম যেন একঘেয়ে একটানা গানের সুর—সঙ্গে আছে বাঁশীর আওয়াজ। এই গানের ঢঙটা ধর্মীয় গানের মতো। যেমন নাম-সংকীর্তনে হয়ে থাকে।

দুদিন পরের ঘটনা। গয় সারাদিন বাড়িতেই ছিল, টেলিফোনটা বাজতেই সে তাড়াতাড়ি ধরল। এ টেলিফোন করেছেন একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন প্রযোজক। তিনি ব্রডওয়ের রঙ্গমঞ্চে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গয়কে দিতে চান। ডোনাল্ড বমগারট বিখ্যাত নট। তিনিই এই ভূমিকাটির জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন, কোনো কারণ সন্ধান পাওয়া যাবে না। থিয়েটারে গয়ের পক্ষে এ এক সুবর্ণ সুযোগ।

রোজমেরী আর গয় দুজনে স্থির করেছিল যে যতদিন না ওরা একটু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে ততদিন অন্তত সন্তানাদির কথা মাথায় আনবে না। এই সংবাদ পাওয়ার পর গয় প্রস্তাব করল এইবার তাহলে সময় সমাগত, আমাদের সন্তান জন্মে আর কোন বাধা নেই। সামনের সোমবার কিংবা মঙ্গলবার, ভালো দিনে সন্তান ধারণ করা কর্তব্য।

রোজমেরীও আনন্দিত হল। সোমবার অনেক রাত হল বাড়ি ফিরতে। গয় ফিরে এসে বলল, পোপের আগমনে নিউইয়র্কের পথঘাট ভীষণ জ্যাম হয়েছিল, যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

মিনি কাসটেভেট ঠিক খেতে বসার সময়টিতে এসে দুজনের জন্য দু' কাপ চকোলেটের সরবত রেখে গেল। জিনিসটা খেতে মোটেই ভালো না, কেমন যেন খড়ি গোলা জলের মত, তবু গয়ের চাপে রোজমেরী বেশ খানিকটা খেয়ে ফেলল। এর একটু পরেই কেমন মাথাটা ঘুরতে থাকে। তার মনে হল মদ্যপানের মাত্রাটা বোধহয় একটু বেশী হয়ে গেছে। গয় যখন তার কাপড়-চোপড় ছাড়ার ব্যাপারে সাহায্য করছিল, রোজমেরীর মনে হল সেই সময় বিবাহের আংটিটাও যেন খুলে নিল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে রোজমেরী যেন শূন্যে ভাসমান। অন্তত তার এই বোধটুকু ছিল। তাকে যেন কে জামাকাপড়ের ফালি ঘরটার ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ও পাশেই কাসটেভেটদের ফ্ল্যাট।

গয় যেন বলল—তুমি ভারী কড়া আরক দিয়েছ, সবটা বেশ সহজ হয়ে গেছে।

রোজমেরী স্বপ্ন দেখল, সে যেন একটা বিরাট বলরুমের মধ্যে বিছানায় শুয়ে আছে। তার এক পাশে একটা গির্জা যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। ওর চারপাশে নগ্ন নর-নারীর দল। তারা সবাই ওকে ঘিরে আছে। রোমানও রয়েছে, ওর অঙ্গে একটা কালো সিল্কের পোশাক, মাথায় যাজক-কিরীট। স্বামী গয়ের অঙ্গে একটা চামড়ার বর্মজাতীয় পোশাক, সেই পোশাকটা গায়ে দিয়েই রোজমেরীর সঙ্গে সে দৈহিক সংসর্গে মাতল। তার হাত দুটি গরম, নখ অতি তীক্ষ্ম, চোখ দুটি আগুন-রাঙা, আর তার নিঃশ্বাসে গন্ধক এবং টানিসের শিকড়ের উৎকট গন্ধ। ওছাড়া আরো অনেক দর্শকের নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। পরদিন প্রাতে গয় কথা প্রসঙ্গে বলল, যদিও রোজমেরী অতিশয় শীতল ছিল তথাপি 'সন্তানের রাত্রি'টা ব্যর্থ হতে দেয় নি গয়।

এর পরবর্তী কয়েকটি সপ্তাহ গয় তার নতুন পার্ট তৈরীর ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত রইল। রোজমেরীর সন্দেহ হল সে সন্তানবতী হয়েছে। ডাক্তার হিল তার সন্দেহকে যখন সমর্থন করলো তখন তার খুব আনন্দ হল। একদিন কাসটেভেটদের সঙ্গে এই উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করা গেল। কাসটেভেট-দম্পতি বললেন, ওঁদের বন্ধু—ডাক্তার সাপিরষ্টাইনের সঙ্গে যোগা-যোগ করতে। তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

সেই রাতে শোবার ঠিক আগে রোজ-মেরী সেই মন্ত্রপূত কবচ গলায় পরে নেয়। টানিশের শিকড়ের উৎকট-গন্ধ আর তেমন উগ্র মনে হচ্ছে না। বিছানায় খুশী মনে শুয়ে পড়ে রোজমেরী। তার দুটি হাত পেটের ওপর, যে ভ্রূণ পেটের অভ্যন্তরে রয়েছে তাকে সে সকল অশুভ স্পর্শ থেকে রক্ষা করবে।

ডাঃ সাপিরষ্টাইন লোকটি অদ্ভুত। তাঁর কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট। তিনি বললেন, কোনো বই-টই পড়তে যাবেন না। বই-তে যা সব লেখা থাকে তার সঙ্গে কোনো কেস-ই মেলে না। কোনো বন্ধু-বান্ধবের কথায় কান দেবেন না। তারা সবাই বলবে তাদের গর্ভাবস্থা ছিল স্বাভাবিক আর আপনারটাই অস্বাভাবিক। কোনো ভিটা-মিন ট্যাবলেট বা পিল খাওয়ার দরকার নেই। ডাক্তার হিলের কথা শোনার জন্য ব্যস্ত হবেন না, মিনি কাসটেভাট যেসব জড়ি-বুটি দেবে শুধু তাই খেলেই হবে। সেই হল সবচেয়ে নিরাপদ। যা কিছু দরকার হবে, দিনে হোক রাতে হোক, আমাকে ডাকবে। তোমার মাকে বা ফ্যানী-মাসীকেও কিছু বলবে না।

মিনি একদিন পেস্তার সরবৎ এনে দিল, তার সামনেই সবটা যেতে হল রোজমেরীকে। এর কদিন পরেই শুরু হল পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। ডাঃ সাপিরষ্টাইন বললেন—ও কিছু নয়, একটা এসপিরিন খেলেই কমবে।

বেদনা কিন্তু গেল না, ক্রমশই বাড়তে থাকে।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে গয় গিয়েছে একটা সৌখীন দলে অভিনয় করতে এমন সময় এডওয়ার্ড হাচিনসন ফোন করল—শুক্রবার রাতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে। রোজমেরী বলে, আমার শরীরটা তেমন ভালো নয়। তখন হাচিনসন বললেন, আমি যাব? রোজমেরী বলল, নিশ্চয়ই, এলে ভারী খুশী হব। টেলি-ফোনটা রেখে তাড়াতাড়ি একটু সাজ-পোশাক করল, ঠোঁটে রঙ দিল। হাচ আসতেই বলল, আমাকে কি বিশ্রী দেখাচ্ছে!

হাচ বলল, বিশ্রী! তোমাকে ভয়ংকর দেখতে হয়েছে। ব্যাপার কি! কত পাউন্ড ওজন কমেছে? চোখের নীচে যে কালো দাগ তা শাদা ভালুককেও লজ্জা দেয়।

রোজমেরী হেসে বলে, আমি সন্তানবতী, তিন মাস চলছে।

হাচ বলল, ভালো, নারী অন্তঃসত্ত্বা হলে তার ওজন বাড়ে, দেখতে ভালো হয়, এমনটা তো হয় না।

রোজমেরী বলল, বোধহয় আমার হাড় একটু শক্ত হয়েছে তাই কোমরে বেদনা বোধ করি। তবে তেমন কিছু নয়, সেরে যাবে দু-একদিনেই!

হাচ প্রশ্ন করে, তোমার ডাক্তারের নাম কি? রোজমেরী জানালো ডাক্তার সাপিরষ্টাইনের কথা। হাচ বললেন, আমি জানি—আমার দুটি মেয়ে তাঁর হাতে প্রসব হয়েছে।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

রোমান কাসটেভেটের হাসিমাখা মুখ দেখা গেল দোরগোড়ায়।

(আগামী সংখ্যায় পরবর্তী ঘটনা)

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

মনে পড়ছে, অন্নদাশঙ্কর রায় একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

ভাগ হয়ে গেছে
সবই বিলকুল
ভাগ হয়নিকো
শুধু নজরুল।

এবার নজরুলের জন্মদিনে এ কথাটাই যেন বার-বার মনে পড়ছিল। পশ্চিম বাংলা আর পূর্ব বাংলার অগণিত মানুষ সমান-ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবিকে। শহরে ও গ্রামে, নানা অনুষ্ঠানে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন গুণমুগ্ধ পাঠকেরা।

এবারের নজরুল-জয়ন্তীর মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানটি। এই সর্ব-প্রথম সরকারী উদ্যোগে নজরুল-জন্মদিবস পালিত হল। ঐদিন সকালে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠানটি হয়। মঞ্চের উপরে বসেছিলেন কবি। নির্বাক। সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি আর নতুন ধুতি পরিহিত কবি তাকিয়েছিলেন বিশাল জনসমুদ্রের দিকে। কি ভাবছিলেন তিনি, কে জানে? পায়ের কাছে ছড়ানো অজস্র রক্তগোলাপ আর গলায় রজনীগন্ধার মালা। মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন—"সকলপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে কবির কন্ঠ ছিল সোচ্চার। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বজ্রবহ্নি।" অনুষ্ঠানের সভাপতি মুজাফফর আহ্মেদ বলেন—"১৯৪২ সালের ৯ জুলাই থেকে কবি তাঁর বর্তমান দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। কিন্তু এর আগেই তিনি তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের স্বত্ব বিক্রয় করে ফেলেন। 'অগ্নিবীণা'র স্বত্ব বিক্রয় করেন ১৯৩১ সালে। ক্রমশ তাঁর অনেক লেখার বিকৃতিও ঘটেছে। তাই এখন রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে তাঁর বিশুদ্ধ সংরক্ষণ ও প্রকাশনার জন্য।" পবিত্র গঙ্গো-পাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিচার-পতি মাসুদ প্রমুখ কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন। শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মান-পত্রটি পাঠ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, সরকার অবিলম্বে কবির বিস্তৃততর বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। কবির চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর রচনা সংগ্রহও সরকার প্রকাশ করবেন বলে ঘোষণা করেন তিনি। কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী কবির দুটি কবিতা অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন।

ক্রিস্টোফার রোডে কবির বাসভবনের সামনে সকাল ৯টায় আরেকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কলকাতা পৌরসভা। কবির দুই পুত্রবধূ কবিকে নিয়ে মঞ্চের উপরে আসেন। মেয়র গোবিন্দচন্দ্র দে অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন। তিনি কবিকে একটি গরদের জোড়, মানপত্র এবং একগুচ্ছ লাল গোলাপ উপহার দেন। কালিদাস রায় কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কবিতা

রচনা করে পাঠান। পৌরসচিব কবিতাটি পাঠ করে শোনান।

পাক-ভারত মৈত্রী সংসদ, রাষ্ট্রীয় নজরুল জন্ম-জয়ন্তী উৎসব সমিতি এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ঢাকায় বাংলা আকাদমি ও নজরুল আকাদমির উদ্যোগে দুটি পৃথক অনুষ্ঠান হয়েছে। এই দুটি অনুষ্ঠানেই কবির কবিতা ও গান পরিবেশন করা হয়। এ-ছাড়াও বিভিন্ন বক্তা নজরুলের সাহিত্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। চট্টগ্রাম এবং লাহোরেও নজরুল-জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। নজরুল জন্মদিবস উপলক্ষে বিভিন্ন পত্রিকা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে।

বিদেশী সাহিত্য

ওয়াল্ট হুইটম্যানের নাম জানেন না এমন শিক্ষিত কোন বাঙালী খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। প্রেমেন্দ্র মিত্র এককালে তাঁর কবিতার কিছু অনুবাদ করেছিলেন। সেগুলি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে 'হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ নাকি হুইটম্যানের কবিতা পড়েই প্রথম গদ্য-কবিতা লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

এখন তাঁর সার্ধ-শতবার্ষিকী জন্ম-জয়ন্তী পালিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র।

হুইটম্যান ছিলেন তাঁর যুগের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল এবং সাহসী। কেবল ছন্দ মেপে নয়, ছন্দ ভেঙে দিয়ে, গদ্যের সাবলীলতায়ও যে কবিতা লেখা সম্ভব—এ সত্য তিনিই প্রমাণ করেছিলেন 'লীভস অব গ্রাস' নামে একটি কবিতার বই লিখে। স্মরণ থাকতে পারে, সে বইয়ের প্রচ্ছদে কিংবা টাইটেল পৃষ্ঠায় কবির নাম ছিল না। কাব্যগ্রন্থের মাঝামাঝি একটি কবিতায় ছিল ওয়াল্ট হুইটম্যানের নাম।

গত বাইশে মে কলকাতায় "হুইট-ম্যানের জগৎ" শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান হয়। ডঃ চার্লস টি ডোভিস 'বিশ্বকবি হুইটম্যান' সম্পর্কে আলোচনা করেন। ডঃ অমলেন্দু বসু অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তাছাড়া টেপ ও স্লাইডের সাহায্যে হুইটম্যানের কবিতা পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা হয়। তাঁর সমসাময়িক শিল্পী উইনস্লো হোমারের ওপর নির্মিত একটি রঙিন চলচ্চিত্রও দেখানো হয়।

মাস কয়েক আগের কথা। ইতালীর তরুণ কবি নেল্লো ভেজের্তাস লিখলেন একটি কবিতার বই। যথারীতি প্রকাশিত হলো। তার নাম 'ফ্রম প্রোটেস্ট টু এরোটিক অ্যাসেটিকস'। কিছুটা পাগলামির ছোঁয়া আছে কবিতাগুলিতে। নামকরণে সেটা স্পষ্ট। ইতালীর সরকার দিলেন বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

কিন্তু কবির উৎসাহ কমল না এতটুকু। তিনি দমবার পাত্র নন। নানারকমে তিনি বিক্ষোভের ঝড় তুললেন এখানে ওখানে। কয়েকদিন আগে ইতালীর পিয়াসেঞ্জা শহরের একটি থিয়েটার হলে পটকা ফাটিয়ে তিনি ভয়ংকর রকমের প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। তখন থিয়েটারে হচ্ছিল 'আই লিভ ইট টু দি গার্লস' নামে একটি নতুন ধরনের নাটকের অভিনয়।

বৃটিশ মহিলা উপন্যাসিকদের মধ্যে সবচাইতে অল্প বয়স্কা লেখিকা কে?—অ্যান কুইন নামে একজন তরুণী সাহিত্যিক। তাঁর একটি উপন্যাস বেরিয়েছে কয়েক মাস আগে। বইটির নাম 'প্যাসেজ'। দামও কম নয়, পঁচিশ শিলিং। সমালোচকেরা রীতি-মতো সন্ত্রস্ত। পাঠকেরা তুলেছেন সোর-গোল। অ্যান কুইন লিখেছেন আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস। সকলের ধারণা, শুধু বয়সের দিক দিয়ে নয়, লেখার দিক থেকেও তিনি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে পাঠকের হৃদয় হরণ করবেন।

আজকাল সাহিত্যিকেরা অনেক বেশি যুক্তিবাদী হয়ে উঠছেন। অলৌকিক কল্পনা আর ভূতের গল্প লেখার সময় চলে গেছে। সায়েন্স ফিকশনের চলেছে জয়যাত্রা। কিছু-কাল আগে লন্ডনের র‍্যানডল্প হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো "গ্যালাকটিক ফেয়ার ১৯৬৯"। বৃটিশ সায়েন্স ফিকসন এসো-সিয়েশনের উদ্যোগে এ সম্মেলন আয়োজিত হয়।

আধুনিক পাঠক-পাঠিকারা যে অনেক সচেতন, সংবাদপত্রের দৌলতে বিজ্ঞানের অনেক খুঁটিনাটি খবরই যে তাঁদের জানা—সে সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তির আলোচনায়। স্ট্র্যাটক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আই এফ ক্লার্ক বলেন, "সাহিত্যের পাঠকরা আজকাল কল্পনাবিলাসী নন, আধুনিক বিজ্ঞান জগতের অনেক খবরাখবরই তাদের জানা। সাম্প্রতিক মহাকাশ গবেষণার ফলশ্রুতি তাঁদের কাছে সায়েন্স ফিকশনের চেয়েও আকর্ষণীয়। সেজন্য লেখকদের পুরোনো কৌশল, কায়দাকানুন ত্যাগ করে নতুন ভাবে চিন্তা করতে হবে।"

সম্প্রতি হংকং বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশ করেছেন চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ওপর প্রিপ-মোলারের লেখা একটা গবেষণা-মূলক বই। তার নাম 'চায়নীজ বুদ্ধিস্ট মোনাস্টারিজঃ দেয়ার প্ল্যান অ্যান্ড ইটস ফাংশন অ্যাজ এ সেটিং ফর বুদ্ধিস্ট মোনাস্টিক লাইফ'। অবশ্য রচনাকালের বিচারে বইটিকে সম্পূর্ণ নতুন গ্রন্থ বলা যায় না। ১৯৩৭ সালে প্রিপ-মোলারের এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ডেনমার্ক থেকে। তারপর, নানা কারণে এটি বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। চীন-জাপান যুদ্ধের আগে ১৯২৯ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে লেখক চীন ভ্রমণ করেন বইটির উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি বিভিন্ন চীনা বৌদ্ধ মঠে যান এবং তাঁদের জীবনযাত্রা ধর্মীয় রীতিনীতি, আচারঅনুষ্ঠান, সাধন-পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে বহু অজ্ঞাতপ্রায় তথ্য সংগ্রহ করেন। বইটিতে আছে ২০৯টি ফটোগ্রাফ এবং ১২৬টি স্কেচ।

আমেরিকায় এখন বেশ হৈচৈ পড়ে গেছে ঔপন্যাসিক নরম্যান মেইলারকে নিয়ে। তাঁর বই বিক্রী হচ্ছে হাজার হাজার কপি। কেবল সাহিত্য করা তাঁর শখ নয়, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি হলো তাঁর প্রধান পেশা। রাজনীতির ওপর বই লিখে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন পশ্চিমী দুনিয়ায়।

এবার তিনি শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন একটি বই লিখে। গত বছর নিউইয়র্কে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, তার সুন্দর, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নাকি লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থের ভেতর।

এবার তিনি নিউইয়র্কের মেয়র পদ-প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন বলে খবরে প্রকাশ।

বাংলা-সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমাবকাশ (আলোচনা)— সতী ঘোষ। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬, বিধান সরণি। কলকাতা—৬। দাম— পাঁচ টাকা।

বাঙলা ভাষায় অমর সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলী। সাহিত্যসৃষ্টির প্রারম্ভে বৈষ্ণব-ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব এবং ভাবসম্পদ কবি এবং সাহিত্যকারদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। প্রাকৃত থেকে বাঙলায় উত্তরণ-কালে সৃষ্ট প্রথম সাহিত্যসম্ভার হোল শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ-কাল। কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। যুগ-সংকট যুগান্তরের মধ্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে নতুন চিন্তা ও ধারণার উন্মেষ ঘটেছে। তবুও বৈষ্ণব তত্ত্ব বাঙালীকে ত্যাগ করেনি। কাব্যক্ষেত্র থেকে সরে এসে কথা-শিল্পে তার রূপ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্নভাবে।

ডঃ সতী ঘোষ এই পটভূমিকায় রচনা করেছেন 'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ'। ডঃ ঘোষ 'বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলীর রচনাকাল, অন্তর্নিহিত ভাবমাধুর্য ও দার্শনিক তত্ত্ব, ভিন্ন ভিন্ন যুগে রচিত পদাবলীর তুলনা-মূলক সমালোচনা, পরিশেষে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছেন বর্তমান বই-এ তার পটভূমিকা সুবিস্তৃত হলেও বিশ্লেষণ অতি সংযত ও সংক্ষিপ্ত। উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তিকে তিনি প্রামাণিক করেছেন। পূর্বসূরীদের মন্তব্য নিয়ে বিচার করেছেন এবং নিজের যুক্তির স্বপক্ষে তার সত্যতা কতটুকু তাও দেখিয়েছেন। এই ছোট্ট একশ তের পাতার বই থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বরূপ এবং সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে তার প্রভাব কতখানি যে কোন পাঠক তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। বৈষ্ণব পদাবলীর রচনার কাল এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমি বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন স্তর বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব উনিশ ও বর্তমান শতকের বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব ডঃ ঘোষের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বইটি সমাদর পাবে।

●

ইবলিশের আত্মদর্শন : (কবিতা) পবিত্র মুখোপাধ্যায়। দাম দু টাকা। কবি-পত্র প্রকাশনী। কলকাতা-২৬।

আন্দোলন মাত্রই বিতর্কিত। এমন একটি আন্দোলনের শরিক স্বয়ং পবিত্র মুখোপাধ্যায়। আর তাঁর সর্বাধুনিক কাব্য-গ্রন্থটি সেই আন্দোলনেরই প্রথম ফসল যা ইতিমধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। কবি স্বয়ং স্রষ্টা এবং তিনি কোন আপ্তবাক্যের দ্বারা চালিত নন। মানব জীবনের নির্বি-চার বিশ্বাসের কাপুরুষতা বর্জন করে যুক্তির চেয়ে বোধের মানদণ্ডে বিচার করে মানুষের অস্তিত্ব কোন শূন্যমার্গে ত্রিশঙ্কুর মত লম্বমান এবং নতুনবোধে পৌঁছবার প্রাক্কমুহূর্তে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে বোধের আগুনে ঝলসে নিতে চান বলে শিল্পী-মানুষ ও সামাজিক মানুষ এই দু সত্ত্বার টানাপোড়েনে কবিচিত্ত বিক্ষুব্ধ। একদিকে সভ্যতার নামে পীড়ন, অপর দিকে শিল্পের মুখোস পরে সমকালীন কোনো কোনো কবির শিল্পসত্ত্বা বিসর্জন, অর্থাৎ সময়ের পুরো-পুরি লক্ষণগুলোকে কেন্দ্র করে 'ইবলিশের আত্মদর্শন'। ইবলিশ এখানে প্রতীক। যে তার প্রাপ্তমূল্য থেকে বঞ্চিত শুধু নয়, নিজ অস্তিত্ব থেকে পর্যন্ত বিতাড়িত।

নিরাপত্তাবোধের এই দোদুল্যমান অবস্থা থেকে পবিত্রবাবুর যাত্রা। আট সর্গে বিভক্ত দীর্ঘ এই কবিতাটির মধ্যে আসক্ত কবি কোন মূল্যবোধের বা বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান নি। যদিও তিনি ইতিহাস ঘেঁটেছেন তবু ইতিহাসের অমোঘ শিক্ষাকে কোথাও স্বীকার করেন নি। শিল্পী যে কোন আপ্ত-বাক্যের দ্বারা চালিত নন এই সত্য অবিচল-ভাবে সমর্থন করেন। পবিত্র নিজেই বলে-ছেন—"এ অভিযান আত্মিক তাড়নায়, সামা-জিক তাড়নায় নয়।' কি যে চাই জানি না তা/কেউই না জেনেছে এই মানবেতিহাস?/একবার জেনেছিল বুদ্ধ এই জীবনের শূন্যের পরিধি/আর জেনেছিল বুঝি নচিকেতা জ্ঞানালোক মথিত হৃদয়ে/জেনে-ছিল যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র শেষ হলে :/বিজয়ীর দেহে এত অবসাদ কেন?/হৃদয়ে শূন্যের প্রতিধ্বনির তরঙ্গ বেজে চলে/মহাপ্রস্থানের পথে জেনেছিল ধর্মপুত্র/জেনেছিল চণ্ডাশোক রক্তপান করে/কি যে চাই জানি না তা/।" উপলব্ধির সত্যতাই কবির জীবনসত্য যদি হয় তাহলে পবিত্র মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সার্থক একজন কবি।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতার নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। এবং তা আরও ব্যাপকতরভাবে ধরা পড়েছে ইব-লিশের আত্মদর্শনে। কোরান পুরাণ লোক-শ্রুতি থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বত্র সতত সঞ্চরণশীল এক কবিব্যক্তিত্বের উপস্থিতি। 'পাথর ছুঁড়তে গিয়ে ছুঁড়ে মারি পরমাণু বোমা।" এসব বিবর্তনধারার যুক্তিযুক্ত পটভূমির মধ্যে বিধৃত রয়েছে কবির অস্তিত্ব। শব্দচয়নে উপমার উপস্থাপনে গ্রন্থিবন্ধ করেছেন সময়কে চেতনা-প্রবাহের দ্বারা। কবির প্রস্থানভূমিতে যদিও সংলগ্ন রয়েছে জীবন কিন্তু তার লক্ষ্য শিল্পের প্রতি, তাই কবি যতখানি না জীবনশহীদ তার চেয়ে বেশী তিনি শিল্পশহীদ একথা গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রের তালিকায় বোদলেয়র, রিলকে, র‍্যাঁবো বা জীবনানন্দকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সুস্পষ্ট হয়েছে।

●

ইটু-পাটুর কাহিনী (কিশোর উপন্যাস)— মনোজিৎ বসু। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। এ১৩২।১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা—১২। দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাঙলা কিশোর সাহিত্যে একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন ইটু-পাটুর কাহিনী। দুই ভাই ইটু আর পাটু। মা-বাবা নেই। ভাগ্যা-ন্বেষণে বেরিয়ে ভদ্রমুখোশধারীদের পাল্লায় পড়ে তাদের হাল হোল মর্মান্তিক। হারিয়ে গেল দুজনে। কিন্তু একদিন আশ্চর্যভাবে আবার তারা মিলিত হোল। ধরা পড়ে গেল প্রবঞ্চকদের ষড়যন্ত্র। শ্রীমনোজিৎ বসুর এই সুন্দর কাহিনীটি কিশোরদের কাছে সমাদৃত হবে। মানানসই ছাপা এবং সুন্দর ছবিতে কাহিনী যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

●

অসতী (উপন্যাস)— নাথানিয়েল হথর্ন। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমি-টেড। কলকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

মার্কিনী সাহিত্যিক নাথানিয়েল হথর্নের 'দি স্কারলেট লেটার' উল্লেখযোগ্য সম্পদ বিশেষ। সম্প্রতি 'অসতী' নামে বইটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন শ্রীঅজিত-কৃষ্ণ বসু। হথর্নের পিউরিটান মন এবং চরিত্রের সম্যক উপলব্ধির পরিচয় বর্তমান বইখানি। রচনাশৈলীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে এবং হথর্নের জীবন-দর্শন এই আকর্ষণীয় কাহিনীর মধ্যে মার্কিনী চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে স্পষ্ট করে তুলেছে। অনুবাদ স্বচ্ছ এবং সাবলীল।

●

পশ্চিমের প্রজাপতি (উপন্যাস)—চিত্ত-রঞ্জন সেনগুপ্ত। অগ্রণী প্রকাশনী। ২, দারিয়াতুল্লা লেন। কলিকাতা—৬। দাম চার টাকা।

বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টারের বিদেশী স্ত্রীকে ঘিরে দাম্পত্য-জীবনের অন্তর্লোক তুলে ধরেছেন গ্রন্থকার। একটি আকর্ষণীয় উপ-কাহিনী সমগ্র কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছে। বইখানি পড়তে বেশ ভাল লাগে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অনামিক [প্রথম সংকলন বৈশাখ ১৩৭৬]—সম্পাদক আশিস সান্যাল, শিশির ভট্টাচার্য, অমল ভৌমিক। ৫৩, বিধান পল্লী, যাদবপুর, কলকাতা ৩২। দাম : এক টাকা।

আজকাল কবিতা কিংবা সাহিত্যের কোনো নতুন পত্র-পত্রিকা বেরোলেই দেখা যায় একটি সম্পাদকীয় ঘোষণা কিংবা কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে প্রথা ভাঙবার দুরন্ত আবেদন। অনামিক নতুন কাগজ হলেও সে রকম কোনো আহ্বান জানাননি সম্পাদকত্রয়। চমৎকার ছাপা, সুন্দর প্রচ্ছদ, সুরুচি-সম্পন্ন এই কাগজটি প্রধানত তরুণ কবিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রচনা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। এ সংখ্যায় কয়েকজন কবির কয়েকগুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কবিকে বোঝার ব্যাপারে তাতে পাঠকের বিশেষ সুবিধা হয়। কবিতা লিখেছেন গণেশ বসু, সোরীন ভৌমিক, আশিস সান্যাল, সমীর দাশগুপ্ত, হিমাদ্রি-শেখর বসু, শংকর দাশগুপ্ত, অমল ভৌমিক, শিশির ভট্টাচার্য, রাণা চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মজুমদার, পলাশ মিত্র, অশোক দত্ত-চৌধুরী, কালীকৃষ্ণ গুহ, পরেশ মল্ল-বড়ুয়া, রথীন্দ্র মজুমদার, প্রদীপ নাগ, সুকোমল রায়চৌধুরী এবং শান্তিরাম ভৌমিক। দুটি বইয়ের ওপর আলোচনা লিখেছেন আলোক সরকার এবং অমল ভৌমিক। সমকালীন কবিদের ওপরে লেখা আশিস সান্যালের প্রবন্ধটি বিতর্কিত হলেও ভালো।

●

শালবনী (দ্বিতীয় সংকলন)—সম্পাদক নিখিল বসু ও পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত। হাট কোয়ার্টার্স, ধূপগুড়ি, জলপাই-গুড়ি। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত এই কবিতা-প্রধান সাহিত্যের কাগজটিতে নানারকম চমৎকার ঘোষণা থাকে। প্রচ্ছদে রয়েছে শালের বনে কয়েকটি হরিণের ছবি। এ সংখ্যায় লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন সরকার, রত্নেশ্বর হাজরা, পুণ্য-শ্লোক দাশগুপ্ত, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল এবং আরো কয়েকজন।

●

সুরেন্দ্র চক্রবর্তী ইনস্টিটিউশান। সাময়িক পত্রিকা। একবিংশ সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৭৬। সম্পাদক কালীপদ চক্রবর্তী।

বাংলাদেশে কলেজের পত্রিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে সহজেই, কিন্তু স্কুলের পত্রিকার মুদ্রিত রূপ সাধারণভাবে সহজসাধ্য হয় না। এরই মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইনস্টিটিউশান-এর সাময়িক পত্রিকাটি যেভাবে বেরিয়েছে তা উল্লেখের দাবি রাখে। রচনাগুলি সুপাঠ্য। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে আছেন মলয় মজুমদার, অজয় সাহা, দিগন্ত মিত্র, বিভাস দাস, স্বপনকুমার দেব, সমরেশ মজুমদার, গোপাল সাঁ ইত্যাদি। কিছু স্কেচ এবং পত্রিকার প্রচ্ছদ চিত্রীর রসজ্ঞানের পরিচায়ক।

গত সপ্তাহে সরকারী উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সমস্ত বই প্রকাশ ও সুলভে প্রচার করার কথা বলেছিলাম। সুখের বিষয়, যুক্তফ্রন্ট সরকার এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। চুরুলিয়ায় কবির বসতবাটিতে ২৬ মে অনুষ্ঠিত নজরুল-জয়ন্তী উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের পরিষদীয় মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুল ইস-লামের সমস্ত বই প্রকাশের ব্যবস্থা করে-ছেন। আইনে আটকালে সরকার এ-ব্যাপারে অর্ডিন্যান্স জারী করবেন।

গত সংখ্যায় নজরুল এবং তাঁর রচনা সম্পর্কে দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থের উল্লেখ করে-ছিলাম। এবারে আর-একটি বইয়ের কথা বলছি। বইটির নাম **'জ্যৈষ্ঠের ঝড়'**। লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বাস্তবিকই নজ-রুল জ্যৈষ্ঠের ঝড়। অসি আর মসি—দুই অস্ত্রে নজরুল পরাধীন বাঙলায় আগুনের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনীতে বাঙলায় দামাল ছেলেদের ঘর-ছাড়ার ডাক দিয়েছিলেন। উদাত্তকণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে দিকে দিকে জ্বালিয়েছিলেন দেশপ্রেমের মশাল।

এর বাইরেও নজরুলের আর একটি পরিচয় আছে। সেখানে নজরুল আত্ম-ভোলা, প্রেমিক, বন্ধুবৎসল, আমুদে-রসিক। ইলেকশানে দাঁড়িয়ে যে নিজের জামানত নিজেই জব্দ করায়, গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান খুলে ব্যবসায় ফেল-মারার রেকর্ড করে। কপিরাইটের আইনের কবলে যে স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়ে, সর্বস্ব খুইয়ে এসেও যার মনে খেদ নেই সেই নজরুল। দুই নজ-রুলেরই পরিচয় লেখক চমৎকার করে তুলে ধরেছেন। নজরুল জন্মদিনে বইটি বেরিয়েছে।

ভারতের প্রায় পঞ্চাশজন শ্রেষ্ঠ চিন্তা-বিদের রচনার একটি অমূল্য সম্ভার 'গান্ধী পরিক্রমা'। মহাত্মা গান্ধীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লেখা বিভিন্ন রচনার সংকলন এই গ্রন্থ। এইসব রচনায় মহাত্মা গান্ধী তাঁর কর্ম, তাঁর আদর্শের নানাদিকের পরি-চয় পাওয়া যাবে। লেখকদের তালিকায় রয়েছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, জাকির হোসেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য বিনোবা ভাবে, রাজাগোপালাচারী, আচার্য কৃপা-লনী, জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, অন্নদাশংকর রায়, নন্দলালকুমার মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রমুখ আরো অনেকের রচনা। গান্ধী-গবেষণায় বইটির প্রয়োজনীয়তা অন-স্বীকার্য।

জীবনানন্দ দাশের 'মহা পৃথিবী'র নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে। 'মহা পৃথিবী'র আদি সংস্করণ থেকে 'বনলতা সেন' গ্রন্থে অনেক কবিতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে এ-সংস্করণে। সমসময়ে রচিত কিন্তু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা এই নতুন সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। সেদিক দিয়ে এ-বই অনেকাংশেই নতুন। জীবনানন্দ দাশের কাব্য-পিপাসুদের এই নতুন কবিতাগুলি আনন্দই দেবে আশা করি।

ইন্দ্রজিৎ সেনের **'ফেড ইন ফেড আউট'** ছবির প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, একস্ট্রা, কলাকুশলী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক—স্টুডিও-জীবনের নানান চরিত্র আর সেইসব চরিত্রের অসংখ্য চমকপ্রদ নেপথ্যকাহিনী এই বইয়ের প্রধান উপজীব্য। গত সপ্তাহে বইটি বেরিয়েছে।

এপারের বাঙলার মানুষ আজ আর ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহের নামের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত নয়। অথচ বাঙলা ভাষায় এই নামটি অবিস্মরণীয়। কয়েক মাস আগে সংবাদপত্রে তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পড়ে-ছিলাম। অথচ শেষ খবর কিছুই জানা যায় নি। এই বাঙলায় ডঃ শহীদুল্লাহের ছাত্র-সংখ্যা কম নয়। তাঁরা উদ্যোগী হোলে খবর নিশ্চয়ই জানা যেত। বাঙলা সাহিত্যে শহী-দুল্লাহের দানের কথা স্মরণ করে আজাহার-উদ্দীন খান একখানি বই লিখেছেন। বইটি প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত প্রকাশক জিজ্ঞাসা। ডঃ শহীদুল্লাহের জীবন ও সাহিত্যসাধনার পরিচয়লাভে বইখানি পরম নির্ভরযোগ্য। তিনি একবার বলেছিলেন, "বাঙলা আমার মাতৃভাষা, সকল সেবকই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। পশ্চিমবঙ্গের সহিত আমাদের রাজনীতিগত পার্থক্য আছে। কিন্তু ভাষা-গত শত্রুতা তো নাই। যে বাংলা ভাষা আমরা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহা কাহারও কথায় আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।"

সাহিত্যিক

সান্ধ্য মজলিস

ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

কেউ কেউ বলেন 'পত্র-পত্রিকার পুরস্কার বিতরণী সভা'। আমাদের এই জাতীয় একটা ম্লান শিরোনাম ভাল লাগে না, তাই লিখলাম—'সাহিত্যিক সান্ধ্য মজলিস'। যদিও সভাগৃহ এবং চেয়ার-টেবিল কণ্টকিত দর্শকদের আসন, তথাপি পত্র-পত্রিকা আয়োজিত এই সভার অন্য একটা চরিত্র আছে। ইদানীংকালে এই জাতীয় নির্ভেজাল সাহিত্যিক সমাবেশ আর কোথাও হয় কিনা আমাদের জানা নেই।

সভাগৃহে প্রথম দিকে থমথমে ভাব। সুরু হল রবীন্দ্রসংগীত। সুমিত্রা সেন একে একে অনেকগুলি গান পরিবেশন করলেন। ফুল দিয়ে সাজানো মঞ্চে বসে আছেন যাঁরা এবছর পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই। এক মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয়েছে শ্যামাপদ চক্রবর্তীকে, তাঁর পক্ষে হাজির ছিলেন তাঁর পুত্র। অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও অমৃত গোষ্ঠী থেকে প্রদত্ত শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার এই বছর দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে প্রবীণ সাহিত্য সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর 'পূর্বপার্বতী' লেখক সম্প্রতি অমৃতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'কেয়াপাতার নৌকো'র লেখক শ্রীপ্রফুল্ল রায়কে। আনন্দবাজার পত্রিকা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ গোষ্ঠীর তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে প্রফুল্লকুমার পুরস্কার ও সুরেশচন্দ্র পুরস্কার—এই পুরস্কারদুটি পেয়েছেন যথাক্রমে স্বর্গত শ্যামাপদ চক্রবর্তী এবং 'চৌরঙ্গী' 'কত অজানারে' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর)-কে। কবিতার জন্য দেওয়া হল উল্টোরথ পুরস্কার। কবি সুনীল নন্দীকে এবং ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনার স্বীকৃতি হিসাবে মৌচাক পত্রিকার সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পেলেন প্রবীণ শিশু-সাহিত্যসেবী খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন (ওপরে) শ্রীপ্রফুল্ল রায় এবং (নীচে) শ্রীমণিশংকর মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন তাঁর ভাষণে বললেন: 'সভা অনেক করতে হয়, কিন্তু এমন সভায়

কদাচিৎ উপস্থিত হতে পারি। এতগুলি বিশিষ্ট সাহিত্যিক একত্রে সমাগত হয়েছেন আর এতগুলি কৃতী সাহিত্যরথীকে পুরস্কারে সম্মানিত করা হচ্ছে এ এক অভিনব আয়োজন। সমস্ত উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা দূর করে সাহিত্য, সাহিত্যিকরা তাই আমার নমস্য। সাহিত্য আছে তাই আছি আমরা। বর্তমানের ভাবনার' ভার, মনের ক্লান্তি দূর করে সাহিত্য। সাহিত্য সেই একমাত্র বস্তু মনকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যার আছে।" আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন আরো বললেন, "কিছুদিন আগে তাকে বেশ কিছুক্ষণ 'ঘেরাও' অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। ছাত্রদের কাছে চিরদিন, সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে মনে হয়েছে এই ত পাওয়া। কিন্তু সম্প্রতি যখন বিপরীত অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে তখন মনে ক্লেশ জেগেছে, দুঃখ হয়েছে, যা অপ্রত্যাশিত তার সামনে পড়ে চমকিত হয়েছি। তাই ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে একটা গ্রন্থ খুলে বসেছিলাম, সেই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের। তিনিই শান্তি দিলেন। তাই বলি সাহিত্যিকরা আমার কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

সর্বপ্রথম শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সমাগত সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এই পুরস্কার দানের কথা বললেন। তাঁর সরস বক্তব্যে সকলেই বিশেষ আনন্দ বোধ করেন। সভান্তে ধন্যবাদ দিলেন শ্রীঅশোককুমার সরকার।

একে একে পুরস্কার বিতরণ করা হল, প্রথমেই পুরস্কার গ্রহণ করলেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাতে পুরস্কারটি তুলে দিয়ে পদধূলি নিলেন উপাচার্য ডঃ সেন। পুরস্কার বিতরণ শেষ হওয়ার পর শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের কিঞ্চিৎ ভাষণ দানের জন্য অনুরোধ করলেন। এই রীতি গত বছর থেকে প্রচলিত হয়েছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলতে চাইলেন না, তাঁর শরীর বেশ অসুস্থ। প্রথমে বললেন 'শংকর', তিনি মঞ্চে দাঁড়াতেই চতুর্দিক থেকে প্রেস ফটোগ্রাফাররা ক্যামেরা উঁচিয়ে ধরলেন। শংকর বললেন—কিছু বলতে হবে জানা থাকলে, হয়ত আসতাম না, তেমন বলতে আমি পারি না। পুরস্কার পেয়ে মনে হচ্ছে দুটি দিক আছে। একটি হল দেবার, সেটি সাহিত্যিকদের তরফে। আরেকটি হল পাবার। বাংলা দেশে ইদানীং এই পাওয়ার দিকটা বেশী হয়েছে, অন্য প্রান্তের লোকজন বলে তোমরা বেশ আছো। শ্রদ্ধেয় বারওয়েল সাহেবকে স্মরণ করে আমি সাহিত্যে প্রবেশ করি। তিনি আমাকে বলতেন, আগামী জন্মে আমি বাংলা দেশের জামাই হয়ে জন্মাব। আমি বললাম, কেন? তিনি জবাবে বললেন, তোমাদের একটা প্রথা আছে জামাই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে একটাকা দিয়ে প্রণাম করলে সে দুটাকা ফেরৎ পায়। আমি অনেক টাকা দিয়ে প্রণাম করে তার দ্বিগুণ আদায় করব। আমি আজ ভাবি, কেন মাত্র এক টাকা দিয়ে সাহিত্য সংসারে প্রবেশ করেছি। কেন বেশী প্রণামী দিইনি।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় এবং শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রফুল্ল রায় বললেন, পুরস্কার পাওয়ার অর্থ আমাদের দায়িত্ব আরো বৃদ্ধি পেল, এইবার আরও লিখতে হবে এবং আরো ভালো করে।

প্রবীণ শিশু-সাহিত্য সেবক খগেন্দ্রনাথ মিত্র আক্ষেপ প্রকাশ করে বললেন, আজকাল শিশু-সাহিত্য বিভাগ অবহেলিত। এই বিভাগের সেবায় গাড়ি-বাড়ি-ইনাম নেই, তার বদলে সিনেমার কাহিনী লিখলে মোক্ষ হয়। এখন আর এ্যাডভেঞ্চার বা ভূতের গল্প চাই না, ছেলেরাও একটু স্কুল রসের গল্প চাইছে।

সভা শেষ হল আনুষ্ঠানিক ভাবে! আর তারপরই সুরু হল পরস্পর আলাপাচার এবং তৎসহ প্রচুর জলযোগ। যাঁরা সভায় ছিলেন তাঁদের নাম আজকাল সংবাদপত্রে থাকে না, আগে থাকত বিস্তারিতভাবে। তার ফলে সুবিধা হত অনুপস্থিত পাঠকের, তিনি বাড়ি বসে সভার চেহারাটা আঁচ করতে পারতেন। সকলের নাম ত' দেওয়া সম্ভব নয় তবু যাঁদের চোখে পড়েছে তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, দেবকী বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, মনোজ বসু, চারু রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, সুজাতা সানগময় ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ রায়, প্রাণতোষ ঘটক, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মিহির আচার্য, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল সরকার, প্রিয় গুহ, অক্ষয় বসু, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, আশিস সান্যাল, কুমারেশ ঘোষ, বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার দে, গিরীন্দ্র সিংহ, মায়া বসু, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রভৃতি।

উদ্যোক্তাদের তরফে শ্রীসুপ্রিয় সরকার ও তাঁর সহধর্মিণী অতিথিদের আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি রাখেননি।

গ্রীষ্মতপ্ত সন্ধ্যার এই মনোরম মজলিসের মধুর আকর্ষণ ত্যাগ করে উঠে আসতেও অনেকের যেন মন উঠছিল না। এমন সমাবেশ মাত্র বছরে একবারই হয়, এই তাঁদের ক্ষোভ।

বৈকুণ্ঠের খাতা নয়, বইকুণ্ঠের খাতা—কেননা বইয়ের বিষয়ে কুণ্ঠা আমাদের বহু দিনের। অথচ বই পড়েই আমরা মানুষ হই, জীবনযুদ্ধে শক্তি অর্জন করি। বইকুণ্ঠের খাতায় আমরা নবজাতক বইয়ের দিকে সম্ভ্রমে ও মমতার দৃষ্টিতে তাকাব, বই আর তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে কৌতূহলী হব।

জীবনী সাহিত্যে পরম বিস্ময় :
নতুন দিক, নতুন দিগন্ত

কবে কোন প্রথম কৈশোরে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা পড়েছি, আজ তা মনে করাও কঠিন। কিন্তু যখন শুনেছি, তিনি একজন বিচারকও, তখন অবাক না হয়ে পারিনি। কেননা, তাঁর গল্প উপন্যাস পড়ে তিনি যে বিচারক তা কখনো মনে হতো না আমার।

মনে হতো, তাঁর পেশা যেন একটা বাইরের পোশাক। "সারেঙ"-এর মতো অসাধারণ গল্প যিনি লেখেন—তিনি কি এতোটা দূরের মানুষ হতে পারেন? তিনিই তো লিখেছেন 'কালোরক্ত' 'ধন্বন্তরি' 'দুই রাজা' 'হরেন্দ্র' 'জমি' 'আরোগ্য' 'বিন্দু' এবং 'মৃত্যুদণ্ড'-এর মতো গল্পে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী—তাদের আনন্দবিষাদ ও জীবনযৌবনের কথা।

দিন কয়েক আগে পড়ছিলাম তাঁর লেখা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'। আমার কাছে ছিল বছর কয়েক আগে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড এবং সদ্য-প্রকাশিত তৃতীয় খণ্ডটি। এমন সরস সতেজ ভঙ্গিতে লেখা আর কোনো জীবনীগ্রন্থ আমি পড়িনি। বাংলাভাষায় অন্তত তাঁর জুড়ি নেই। নানা কারণে প্রথম খণ্ডটি আমার পড়া হয়নি। এখন ছাপা নেই। আপশোস হচ্ছে না-পড়ার জন্যে। ভারত-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিকালের উত্তাল তরঙ্গময় কাহিনীই শুধু আমার কাছে উদ্ঘাটিত হচ্ছে না, একজন বীর্যবান মহাপুরুষের সাধনা এবং ঐতিহ্যের উত্তর-পুরুষ হিসেবে নিজেকেও যেন অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে।

স্বামীজি বলতেন, "ধর্মকমব করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পুজো চাই, পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। খালি পেটে ধর্ম হয় না, বলতেন না গুরুদেব? ঐ যে গরুগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে, আমরা আজ চার যুগ ধরে ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর দু পা দিয়ে দলেছি। এরা না উঠলে দেশ জাগবে না। একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গগুলি সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ হয় না। তোরা সব কি করলি বল দেখি? পরার্থে একটা জন্ম দিয়ে দিতে পারলি না? আর জন্মে এসে বেদান্ত ফেদান্ত পড়িস—এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা।"

অচিন্ত্যবাবুর ভাষায়, "বিবেকানন্দের ডাক তাই পরম বিস্তারের ডাক। বিবেকানন্দের গৌরব সত্যের গৌরব, প্রেমের গৌরব, মঙ্গলের গৌরব, কঠিনবীর্য নির্ভীক আত্মোৎসর্গের গৌরব।" (ভূমিকা : দ্বিতীয় খণ্ড)।

গল্পকার ও ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমারকে এ আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার। এতদিন তাঁকে যেমনটি ভেবে এসেছি এ যেন ঠিক তেমনটি নয়। তাঁর কণ্ঠস্বর আলাদা, উচ্চারণ আলাদা, ভঙ্গি আলাদা। এমন অসাধারণ গদ্যই বা কজন লিখতে পেরেছেন? তাঁর 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' বিক্রী হয়েছে হাজার হাজার। সিগনেট প্রেস বইটি বের করেছিলেন ১৯৫১ সালে। মাত্র একদিনেই বিক্রী হয়েছিল দু' হাজার কপি।

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' এতটা ব্যবসা-সফল না হলেও পাঠককে অভিভূত করার মতো অসাধারণ গ্রন্থ। ফুলের একেকটা পাপড়ি খুলতে খুলতে যেমন করে এক সময়ে সম্পূর্ণ ফুলটি ফুটে ওঠে, তেমনি-ভাবে অচিন্ত্যবাবু ফুটিয়ে তুলেছেন বিবেকানন্দের জীবনসাধনার এক-একটি দিক।

প্রথম খণ্ডে তিনি লিখেছেন, স্বামীজির জন্ম থেকে আমেরিকায় রওনা হওয়া পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে আমেরিকা জয় করে ইংলণ্ডে পাড়ি দেওয়া পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন লণ্ডন থেকে পুনরায় আমেরিকায় যাওয়া এবং ইংলণ্ডে ফিরে আসা, য়ুরোপ ভ্রমণ, ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড ইতালী জার্মানী হল্যাণ্ড ঘুরে কলম্বোতে অবতরণ এবং মাদ্রাজ হয়ে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে কলকাতায় ফিরে আসা পর্যন্ত অজস্র ঘটনা।

স্বামীজি বলতেন, "ধর্মকর্ম করছে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"
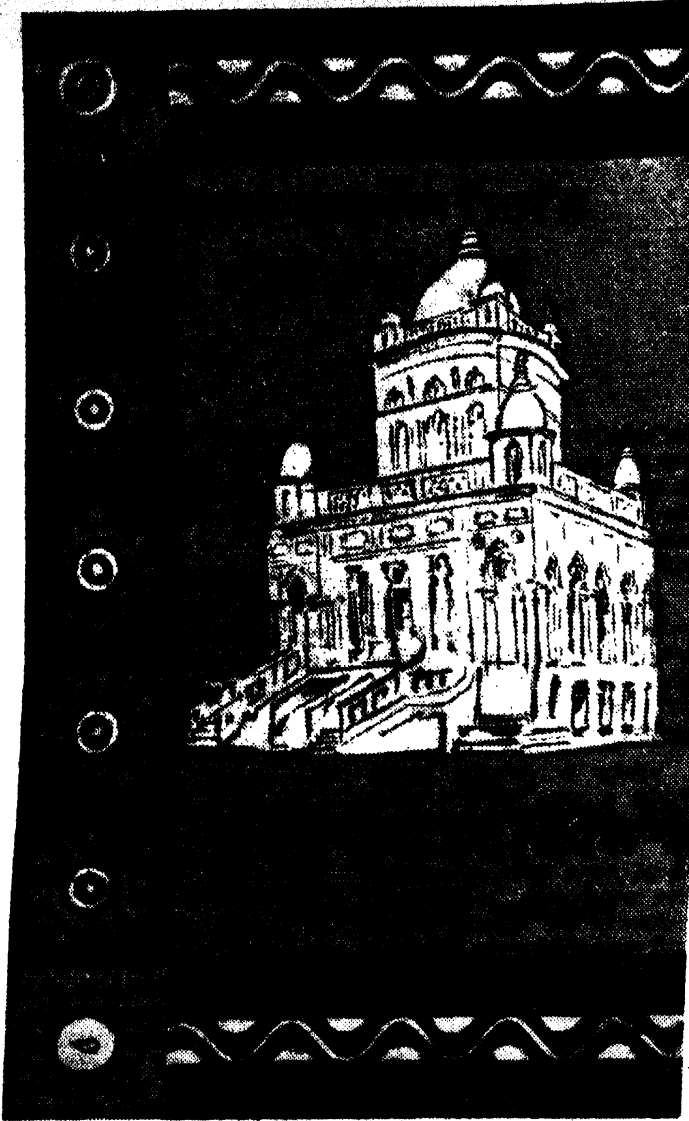
অচিন্ত্যবাবু কখনো গদ্যচ্ছলে, কখনো নিজস্ব বিশ্লেষণে ফুটিয়ে তুলেছেন কর্মী ও বীর্যবান বিবেকানন্দকে, তাঁর স্বদেশ-প্রাণতা এবং বিশ্বপ্রাণতাকে, তাঁর ধ্যান ও স্বপ্নের জগৎকে, যুক্তি ও অধ্যাত্মবাদী বিবেকানন্দকে। যিনি একই সঙ্গে আহ্বান করেছিলেন, সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে এবং পরার্থে জীবন দান করতে। যিনি চেয়েছিলেন নিপীড়িত মানুষের জাগরণ এবং আধ্যাত্মিক সমুন্নতি। এই শক্তির জোরেই তিনি বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ভারতের মর্যাদা। তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড, বিদুষী বৈজ্ঞানী সিস্টার টেসলা, হেনরিয়েট মুলার, গুড উইন, আলাসিঙ্গা, নোর্ডি—এমনি আরো কতো নরনারী।

নিউইয়র্ক হেরাল্ড-এর রিপোর্টার লিখেছিলেন, "স্বামীজির বেদান্ত ক্লাসে গিয়ে দেখলাম সুসজ্জিত ভদ্রলোকেরা বসে আছেন। ডাক্তার, উকিল, চাকুরে—সব বুদ্ধিজীবীর দল, আর কয়েকজন অভিজাত মহিলা। মাঝখানে, পরণে গেরুয়া, বিবেকানন্দ বসে আছেন; শ্রোতা বা ছাত্র-ছাত্রীর দল তাঁর দুদিকে ভাগ করা।...... বলবার বিষয় কর্মযোগ।"

একেকটা অধ্যায় পড়ছিলাম, আর মনে হচ্ছিল, পাহাড় এবং সমতলের নানা পথ অতিক্রম করে আমি যেন ক্রমশ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যেমন করে নদী এগিয়ে যায় মহাসাগরের দিকে।

একদিন গেলাম অচিন্ত্যবাবুর কাছে। বুকের ভেতরে ঢিপ ঢিপ করছিল। কি জানি কেমনভাবে তিনি আমাকে নেবেন। বিচারকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। নিজেকে আসামীর মতো মনে হচ্ছিল। তখন সকালবেলা। সময় আটটার কাছাকাছি। তখনো ওপর থেকে নামেন নি তিনি। নামবেন ঘণ্টাখানেক পরে। অর্থাৎ নটায়।

তবু খবর পাঠালাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

খানিক পরে নেমে এলেন তিনি। শ্যামলা রঙ, বড় বড় চুল, আয়ত চোখ। বিচারকের মতোই মনে হচ্ছিল আমার। সেই গাম্ভীর্য, অথচ একান্ত পরিচিতের মতো আহ্বান, 'আসুন।'—গেলাম তাঁর পিছু পিছু। আলমারি ভর্তি বই। বেশির ভাগই নিজের লেখা। টেবিলের ওপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিল অনেকগুলি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধনিবন্ধ ও কবিতার বই। খালি লেখবার জায়গাটুকু ফাঁকা।

বললাম, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। আমি জানতে চাই তার ইতিহাস, তার ভেতরের খবরাখবর।

ছিঁড়ে গেলো তাঁর বাইরের আবরণ। মুহূর্তে আলাদা মানুষ হয়ে গেলেন অচিন্ত্যবাবু। যেন অনেক দূর থেকে তিনি চলে এলেন আমার কাছাকাছি। একান্ত আপন জনের মতো শোনালেন বীরেশ্বর বিবেকানন্দের পূর্ব-ইতিহাস।

'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রকাশের পর সিগনেটের দিলীপ গুপ্ত অনুরোধ করেন, ছোটদের উপযোগী বিবেকানন্দের একটি জীবনী লেখার জন্য। মনে মনে ভাবনা চলতে লাগলো। মৌচাকে লিখতে শুরু করলাম 'বিলে' নামে বিবেকানন্দের বাল্য-জীবনী। অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই লেখা। কেউ সন্তুষ্ট, কেউ রুষ্ট।

শনিবারের চিঠিতে স্বর্গত সজনীকান্ত দাশ আক্রমণ করলেন অচিন্ত্যবাবুকে। স্বামীজির ডাক-নামে বইয়ের নামকরণ পছন্দ হয়নি তাঁর। লিখলেন, তা হলে তো রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনীর নাম হবে 'রবে', শ্রীরামকৃষ্ণের 'রামু'।

অচিন্ত্যবাবু বললেন, তাতে আমি উপকৃত হয়েছি। সেজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। লেখার ভঙ্গি পাল্টালাম। বিষয়ও। নতুন করে লিখলাম, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। তাঁর মা বিবেকানন্দকে পেয়েছিলেন শিব-পুজো করে। সেদিক থেকেও নামকরণ ঠিক। আবার তিনি ছিলেন কর্মবীর, বীরশ্রেষ্ঠ।

বলতে বলতে এক সময়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আমি বসে আছি টেবিলের উল্টোদিকে। পুরোনো স্মৃতির কথা বলছিলেন অচিন্ত্যবাবু। অনেকটা স্বপ্নোত্থিতের মতো।

জিজ্ঞেস করলাম, অনেকের ধারণা আপনি জীবনী লেখেন না—লেখেন জীবনোপন্যাস?

—আজকের পাঠকের উপযোগী করে আমি জীবনী লিখতে চাই। এবং তাই লিখেছি। লেখার সময় 'হোল্ ক্যানভাস'টা থাকে আমার চোখের সামনে। পুরো মানুষটা। আমি তো তথ্য সন্ধান করি না, রসের সন্ধান করি।

তাতে আপনার সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে না? গল্প-উপন্যাস লেখার ব্যাপারে?

—জীবনী রচনাও তো সাহিত্যসৃষ্টিই। আমি যেভাবে বলি, যেভাবে লিখি, তাও তো সাহিত্যেরই বিষয়। আমার লেখায় যমকের ব্যবহার অবশ্য একটু বেশী। তাতে পড়তে ভালো লাগার কথা, রসসৃষ্টি হয়। আপনি তো অমৃতে লেখেন, মায়ের কাছে পুত্র সাজেন, স্ত্রীর কাছে প্রেমিক সাজেন,—তাতে কি আপনার কোনো অসুবিধে হয়?—সবই তো করে যাচ্ছেন ঠিক মতো।

অনেকে অভিযোগ করেন, আপনি ক্রমশ যৌবনচ্যুত হয়ে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছেন? কল্লোল যুগে তো আপনারা ধর্মটর্ম মানতেন না, ঈশ্বরকেও উড়িয়ে দিতেন?

—আজকে একরকমভাবে ধর্মের কথা ভাবছি, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করছি। কল্লোল যুগে ঐ না-মানার মধ্যেই ধর্ম ছিল। তখন আমার কাছে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ছিলেন না। ছিলেন অন্য নামে। যেমন কম্যুনিস্টরা মানবতার নামে ঈশ্বরকে মেনে চলে।

আপনার বিচারক সত্তা কি এসব বিশ্লেষণের ব্যাপারে কাজ করে?

—করে। তবে মায়ের ভালোবাসায় কি সব সময় বিচার চলে?

লেখার ব্যাপারে আপনি কখনো ক্লান্তি বোধ করেন না? লেখেন কখন?

—না। কখনো ক্লান্তি আসে না। লেখনী সুখের খনি। দুপুরে ঘুমোই না। রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত লিখি। আগে চাকরী ছিল। এখন লেখাই আমার চাকরী। চব্বিশ ঘন্টার চাকরী।

জীবনী লেখায় কি আপনি ঘটনার নির্বাচনে পক্ষপাতী?

—সিলেকশন তো আছেই। অনেক সময় তুচ্ছ ঘটনাও আমার কাছে অসামান্য মনে হয়। সেসব ঘটনাকেও আমি আমার লেখায় বিশেষ মূল্য দিয়েছি।

জীবনী লেখায় সাধারণত যে তবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়, আপনি তো তার ব্যতিক্রম। এ ব্যাপারে আপনার কি কোনো পক্ষপাতিত্ব বা আসক্তি আছে?

—আসক্তি তো আছেই। সে আসক্তি অন্যরকম। কাঁদতে কাঁদতে যেমন শোক হয়, ভাবতে ভাবতে আসে তেমনি অনুরাগ বা আসক্তি। বিবেকানন্দ কবি ছিলেন। তিনি গান গাইতেন। ঠাকুরের যা করার তিনিই তো করেছেন।

ধর্ম এবং দর্শন অচিন্ত্যবাবুর প্রিয় বিষয় হলেও বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন। তিনি মূলত শিল্পী এবং সাহিত্যিক। যা কিছু করেন—সবই সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি আজকের মানুষের বিজ্ঞান-চেতনা, চাঁদে যাওয়া, নতুন নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে আমাকে বুঝিয়ে বলছিলেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর অনন্ত নক্ষত্রলোকের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব কতটুকু? চাঁদ থেকে ফিরে এসেও মানুষ প্রাণের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। বেতার আবিষ্কারের আগে মানুষ কি এই ধরণের বায়বীয় যোগাযোগকে অলৌকিক ভাবতো না? বিজ্ঞান যখন ব্যর্থ হয়, মানুষের তখন আর কোন্ অবলম্বন অবশিষ্ট থাকে?

ক্রমশ বেলা বাড়ছিল। বললাম, এখন আর কি লিখছেন?

—রবীন্দ্রনাথ ও যীশুখৃষ্টের জীবনী। বন্যাকন্যা নামে একটি উপন্যাস। নজরুলের জীবনী লিখেছি। বেরোবে দু'একদিনের মধ্যেই।

অচিন্ত্যবাবু তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আলমারি থেকে একটি-দুটি করে বই খুলে দেখাচ্ছিলেন। গল্প-উপন্যাস-কবিতা ও জীবনীর বই। নানা অচিন্ত্যকুমারের সে এক বিচিত্র প্রদর্শনী।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবার ফিরতে হবে। বললেন, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলাম, নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে। আমার নিজে সময়ে একটু দেরী হয়। বয়স হয়েছে। নানারকম অসুখ-বিসুখে ভুগছি। সকালবেলা উঠে শরীরটাকে পালিশটালিশ করে কিছুটা ঠিক করে নিতে হয়।

লজ্জিত হয়ে বললাম, না কোনো অসুবিধে হয়নি। বরং আপনাকে কষ্ট দিয়েছি এতক্ষণ।

আসলে, আমি ভাবছিলাম অচিন্ত্যবাবুর কথা, তাঁর অনন্যসাধারণ শিল্প-কৌশল ও সৃজনশীলতার কথা। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ আমি পড়েছি একবার নয়, দুবার নয়, তিন-তিনবার। তাঁর লেখার শক্তিতে আমি মন্ত্রমুগ্ধ। আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে বিবেকানন্দের জীবন বিশ্লেষণ। একেকটি স্মরণীয় ঘটনাকে বেছে নিয়েছেন অচিন্ত্যবাবু। তারপর করেছেন সেই সময়কার মানসিকতার উন্মোচন, অনেকটা ধ্যানী সাধকের মতো, যেন আত্মস্থ হয়ে কথা বলেছেন তিনি। কিছুই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে নিজের কথা জুড়ে দিয়েছেন — সাহিত্যের প্রয়োজনে—শিল্পের। জীবনী সাহিত্যের অনন্য নিদর্শন বলেই মনে হয় আমার কাছে এ গ্রন্থটিকে। এর সমান্তরাল রচনা বাংলা সাহিত্যে একটিও নেই—তথ্যের নিরিখে নয়, সৃজন-কৌশলে। বাংলা সাহিত্যের এ এক পরম বিস্ময়—নতুন দিক, নতুন দিগন্ত।

—বিশেষ প্রতিনিধি

(২২) গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগের রহস্য

গুম হয়ে বসে রইল তিনজন। ইন্দ্রনাথ, দাশরথী, আর অখন্ড।

কিছুক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ বলল—'ভেবেছিলাম, অন্তত লাশটা পাওয়া যাবে। ভীম দত্ত গুলি ছোঁড়বার পর উপেনকে বলেছিল, 'এখন কি করা যায়, তাই ভাবো। বাজে কথা বলো না।' সুতরাং উপেন নিশ্চয় লাশটাকে ধারেকাছে কোথাও পুঁতেছে। কিন্তু বাড়ির আশপাশ আগেই দেখেছি, ভেতরেও দেখলাম। লাশটা কি হাওয়ায় মিশে গেল?'

'পুড়িয়ে ফেলেছে হয়তো', বলল অখন্ড।

'মড়া কখনো পোড়াওনি মনে হচ্ছে। শবদাহ অনেক ঝামেলার ব্যাপার হে। কাঠ চাই, প্যাঁকাটি চাই। তার ওপর ধোঁয়া তো আছেই। লোকজানাজানি হতে কতক্ষণ।'

আবার সব চুপ।

অখন্ড বলল—ডিটেকটিভ বইতে লেখে, এসব ক্ষেত্রে মাটির তলায় পাতালঘর থাকে।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। ধীরে ধীরে চোখে আলো দেখা দিল।

বলল—ব্র্যাভো। পাতালে না হোক, স্বর্গেও ঘর থাকতে পারে তো।' বলে ওপরে তাকাল।

দাশরথী বলল—'হেঁয়ালি ছাড়ুন।'

ইন্দ্রনাথ বলল—'মাথার ওপর ঘর থাকতে পারে। সাদা বাংলায় যাকে বলি মাচা-ঘর। পাতালে নেই। কেননা, মেঝে তন্নতন্ন করে দেখেছি।'

হীরামনের হাহাকার

অদ্রীশ বর্ধন

বলেই লাফিয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ। বক্রপৃষ্ঠে নিয়ে সাঁৎ করে ঢুকল পাশের প্রায়ান্ধকার ছোট্ট ঘরটিতে। সে ঘরে হাবিজাবি জিনিস থাকে। মাকড়শা থাকে। টিকটিকি থাকে; আরশুলো থাকে।

তাদের রাজত্বে হুড়মুড় করে ঢুকল কুঁজো গোয়েন্দা। পেছনে সম্পাদক আর জহুরী-তনয়। তিনজনেই তাকাল ওপরে। টর্চের আলো গিয়ে পড়ল কড়িকাঠে।

দেখা গেল, মাচা-ঘরের পাল্লা।

'হুররে' বলে ব্যাঙ-তড়কা লাফ মারল অখণ্ড। নিমেষে গেল গ্যারেজঘরে। মই-ঘাড়ে ফিরে এল চকিতে। তিন লাফে উঠল মাচা-ঘরে। অদৃশ্য হল ভেতরে।

নিচে উর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সম্পাদক আর গোয়েন্দা।

ঘরের কোণে কোণে মাকড়শাবাহিনী রুষ্টচোখে নিরীক্ষণ করতে লাগল হানাদারদের।

মাকড়শা জাল অখণ্ডর নাকে-মুখেও জড়ালো মাচা-ঘরের মধ্যে। পিঠ খেঁকিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কোনমতে টর্চের আলো ফেলল সব কটা কোণে। কিছুই দেখতে পেল না। শুধু একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ ছাড়া।

ব্যাগটা নামিয়ে দিল জহুরী-নন্দন। নিজেও নেমে এল তরতর করে। বসবার ঘরে তিন মাথা এক হল ব্যাগের ওপর। দাশরথীর সবখোল চাবির মহিমায় খুলল ব্যাগের তালা।

ভেতর থেকে বেরুলো একটা সস্তা প্রসাধনী বাক্স। বাক্সের মধ্যে চিরুনি, চুল আঁচড়ানোর বুরুশ, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, টুথপেস্ট।

বেরুলো কয়েকটা সার্ট, মোজা, রুমাল। ধোপার চিহ্ন দেখল ইন্দ্রনাথ। বলল—'ডি-তিন পাঁচ ছয় সাত দুই শূন্য'।

'কোনো মানেই হয় না', বলল দাশরথী।

ব্যাগের তলা থেকে বাদামী রঙের একটা সুট বার করল ইন্দ্রনাথ। লেবেলের লেখা দেখে বলল—'কলকাতার দরজি বানিয়েছে।' পাশের পকেট থেকে বার করল এক বাক্স দেশলাই আর একটা সিগারেটের প্যাকেট। সস্তার সিগারেট। অর্ধেক খালি।

কোট উল্টে ভেতরের পকেট নিয়ে ব্যস্ত হল ইন্দ্রনাথ। ডানদিকের নিচের পকেট থেকে বার করল একটা সেকেলে পকেট-ঘড়ি। রুপোর চেন। অনেকদিন দম না দেওয়ার ফলে নীরব ও অচল। পেছনের ডালাটা খটাস করে খুলে কি যেন দেখল। তারপর খোলা ডালাটা হাতে দিয়ে বলল—'দেখুন!'

অখণ্ডও দেখল এবং পড়ল। ডালার ভেতরে খোদাই করা :

'প্রাণের বন্ধু দনু ঘোষকে—মনু রায়ের স্মৃতিচিহ্ন।

২৬শে অগাস্ট, ১৯৩৬।'

'দনু ঘোষ! প্রায় নেচে উঠল জহুরী-পুত্র অখণ্ডনারায়ণ। ইয়া আল্লা, বিসমিল্লা! [illegible] নাম তাহলে দনু ঘোষ!'

আগের ঘটনা

[চল্লিশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আজ প্রবীণ জহুরী খেমচাঁদ। আর সেদিনের প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা তারই দোকানে বেচতে এলেন অমূল্য স্মৃতিজড়ানো ব্রাজিল থেকে আনা বজ্রমণির কণ্ঠহার। কিনছেন একালের বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। নেকলেশ বোম্বেতে ডেলিভারী দেবার কথা ছিল।...হঠাৎ ট্রাঙ্ক কল। রাজস্থানেই কণ্ঠহার ডেলিভারী দিতে হবে—নয়া ফরমান। আর তাতে পাওয়া গেল রহস্যের আমেজ, বোঝা গেল ফেউ লেগেছে। মুস্কিল আসানের ভার নিয়েই প্রাইভেট ডিকেটটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র কুঁজোর ছদ্মবেশে হাজির হলেন রাজস্থানে, ভীম দত্তের বাংলোয়। নাম তার এখন গুলে মহম্মদ, জবরদস্ত খানসামা। অখণ্ড আলাদাভাবেই এসেছে এই বাংলোয়। রহস্য ঘনীভূত। ভীম দত্তের পোষা হীরামন মারা গেছে ইতিমধ্যে। বাংলোর একটি দেয়ালে গুলির দাগ, মারা গেছে একটি মানুষ, উধাও হয়েছে ভীম দত্তের পুরনো পিস্তল। হারিয়ে যাওয়া বুলেট দুটোর খোঁজ পাওয়া গেল। সেঁকো বিষের খালি টিনও পাওয়া গেল খেঁকি উপেনের কাছ থেকে। কলকাতা থেকে ফিরল ভীম দত্তের প্রিয় খানসামা মেহের খান। কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢুকতে না ঢুকতে তাকেও যেন কে গুলি করে হত্যা করল রহস্য গভীর থেকে গভীরতর। পুলিশ এল। ছদ্মবেশী ইন্দ্রনাথের উপর সন্দেহ সবচেয়ে বেশি। বড় কঠিন পরীক্ষা। উতরোতে পারবে তো গুলে মহম্মদ? ইতিমধ্যে সাহানা দেবীরও বাংলোয় আসবার কথা ছিলো। কিন্তু এসে পৌঁছতে পারেন নি। তাহলে সে কোথায়?

ঘটনা আরো এগোতে বাংলোর শোনা সেই 'বাঁচাও। বাঁচাও। খুন!'-এর আর্ত চিৎকার রহস্য উন্মোচিত হবারও সম্ভনা দেখা গেল ধীরে ধীরে। রহস্য এবার তুঙ্গে।]

'আহ্লাদে আটখানা হলে দেখছি', বলল ইন্দ্রনাথ।

'দনু ঘোষই যে তিন নম্বর, সে প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি।

গ্ল্যাডস্টোন-খুপরি থেকে এবার বেরুলো একটা ট্রেনের টিকিট। দিল্লি থেকে বিকানীর। এক্সপ্রেসের টিকিট। তারিখ আটই ফেব্রুয়ারী।

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল অখণ্ড। বলল উল্লাসে—'ইউরেকা! আটই ফেব্রুয়ারী দিল্লি থেকে সকালে রওনা হয়েছে দনু ঘোষ। বিকানীর পৌঁছেছে বুধবার আটটা পাঁচে। বুধবার রাতেই ভীম দত্তর বাংলোয় খুন হয়েছে ভদ্রলোক! মার দিয়া কেল্লা!

ইন্দ্রনাথ তখনও হেঁট হয়ে কোটের অন্যান্য পকেট দেখছিল। এবার বার করল একতাড়া চাবি আর একটা খবরের কাগজের কাটিং। ব্লেড দিয়ে কাটা খবরটা অখণ্ডর হাতে দিয়ে বলল—'জোরে পড়ো।'

জোরেই পড়ল অখণ্ড :

'নাট্যামোদীরা শুনে খুশী হবেন, আগামী সোমবার নয়াদিল্লীর পদ্মিনী রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হচ্ছেন রোশনারা খাতুন। কলকাতার মঞ্চ-সফল নাটক 'আরব্য উপন্যাসের একটি রাত' নয়াদিল্লীর মঞ্চে এই প্রথম সঙ্গীত ও কৌতুকে ভরা দৃশ্যাবলী তুলে ধরবে। রোশনারা খাতুনকে একটি বিশেষ ভূমিকায় দেখা যাবে ঐ নাটকে। রোশনারা খাতুন তাঁর শিল্পী-জীবন শুরু করেন অল্পবয়সে। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে তিনি নাট্যামোদীদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন তাঁর ধ্রুপদী নৃত্য, সুললিত কণ্ঠ এবং সুনিপুণ অভিনয় দিয়ে। 'কাশ্মীরের ফুল' তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি সোম, বুধ ও শনিবারে 'আরব্য উপন্যাসের একটি রাত' অভিনীত হবে পদ্মিনী রঙ্গমঞ্চে।'

●

কাটিং টেবিলে রেখে অখণ্ড বলল—'দনু ঘোষের একটা সুরুচির পরিচয় পাওয়া গেল। লোকটা নাচ, গান, নাটক ভালবাসত।'

দাশরথী জুল-জুল করে স্তূপীকৃত জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল—'বেচারা দনু ঘোষ। কি কুক্ষণে এসেছিল এই পোড়ো বাড়িতে। এই চিরুনি, এই ঘড়ি এই ব্লেড, আর তার ভোগে লাগবে না।'

বলতে বলতে ঘড়িটা আবার তালুতে রাখল দাশরথী। ঘড়ির মিস্ত্রীর মত চোখ পাকিয়ে খোলা ডালার ভেতরে উৎকীর্ণ লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল। আপন মনে বলল—'মনু রায়। নামটা যেন চেনা মনে হচ্ছে।'

ইন্দ্রনাথ রুদ্র ততক্ষণে প্যান্টের পকেট নিয়ে পড়েছে। পকেট উল্টে ফেলেও যখন কিছু পাওয়া গেল না, তখন বলল—'তদন্ত শেষ। যা পাওয়া গিয়েছে, এবার তা রেখে দেওয়া যাক।'

সোৎসাহে অখণ্ড বলল—যাই বলুন দাদা, এক রাউণ্ডেই কম লাভ হল না। কাল শুনলাম ভীম দত্ত খুন করেছেন, আজ শুনলাম দনু ঘোষ খুন হয়েছে।'

ইন্দ্রনাথ রুদ্র বলল—'সব কটা পয়েন্ট আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ভীম দত্ত দনু ঘোষকে ভয় করতেন। তাই গুলি করে খতম করেছেন। দনু ঘোষ কে? জামা-কাপড়ের নমুনা দেখে মনে হয়, অবস্থা খুব ভাল নয়। দরজির নাম কোটেই রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর। সিগারেট সস্তা দামের। মনু রায় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই একটা ঘড়ি উপহার দিয়েছিল দনু ঘোষকে। দনু ঘোষ রোশনারা খাতুনের নাচ-গান অভিনয় ভালবাসত। হপ্তাখানেক আগে দিল্লী থেকে সে বিকানীর আসে। আর কিছু?']

'নো, স্যার,' একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল অখণ্ড।

'নো ম্যান, আরো আছে। দনু ঘোষের কোটের ভেতরের এই পকেটটা দেখেছো? ভাল করে দেখো। কি দেখছো?'

অখণ্ড ঝুঁকে পড়ল কোটের ওপর। কিন্তু পকেট ছাড়া আর কিছুই দেখল না। দাশরথীও বিফল হল। দুজনেই হতভম্ব চোখে তাকাল গোয়েন্দার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে।

'দেখতে পেলে না?' নিঃশব্দে হাসতে লাগল ইন্দ্রনাথ। 'পকেটের ভেতরে হাত দাও। কি বুঝছো?'

'চামড়ার লাইনিং রয়েছে।' অখণ্ড হতবুদ্ধি।

'অর্থাৎ ঘড়ির পকেট, তাই তো?'

'তা বটে।'

'ঘড়ির পকেট তো কোটের বাঁ দিকেই থাকা উচিত?'

'তা উচিত', বোকার মত তাকাল অখণ্ড। 'এ পকেটটা অবশ্য ডান দিকে রয়েছে।'

'কেন রয়েছে? না, দনু ঘোষের সুবিধের জন্য। দনু ঘোষ আর সবার মত ডান হাত দিয়ে বাঁ পকেট থেকে ঘড়ি বার করে না। বাঁ হাত দিয়ে ডান পকেট থেকে ঘড়ি বার করে। তাই দরজিকে বলে বন্ধুর দেওয়া ঘড়ির জন্য বিশেষ একটা পকেট তৈরি করিয়েছে কোটের ডান দিকে। দনু ঘোষের গতিবিধির এবার কিছু হদিস পাওয়া যেতে পারে। লোকটা ন্যাটা।'

●

দাশরথীর আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখদুটো সহসা হীরের মত ঝক-ঝক করে উঠল। সেকেলে ঘড়িটা খপ করে আবার তুলল। ডালায় উৎকীর্ণ কথা ক'টির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। যেন স্মৃতির একটা অতীত অধ্যায় খুলে গেল চোখের সামনে।

বলল, অবরুদ্ধ কণ্ঠে—'মাই গুডনেস! মনু রায়কে আমি চিনি।'

'চেনেন?' ইন্দ্রনাথ সচকিত।

'অনেকদিন আগে আলাপ হয়েছিল। প্রথম যে রাতে অখণ্ডবাবুকে এখানে আনি, উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ভীম দত্তকে আগে দেখেছি কিনা। বলেছিলাম, হ্যাঁ, দেখেছি। বারো বছর আগে চৌরঙ্গীর নাইট-ক্লাব 'চিটি চিটি-ব্যাং-ব্যাং' ক্লাবে। জুয়া খেলছিলেন ভীম দত্ত। রাজা-উজীরের মত টাকা ওড়াচ্ছিলেন। ভীম দত্ত নিজেরও মনে আছে সে রাতের ঘটনা।'

'মনু রায়?'...

'চিটি-চিটি-ব্যাং-ব্যাং ক্লাবের মালিকের নাম। জুয়ার আড্ডার মালিক মনু রায়। দনু ঘোষের প্রাণের বন্ধু তিনি। বন্ধুগণ, যোগাযোগটা ইন্টারেস্টিং। গ্রেট ভীম দত্তর রঙচঙে জীবনে আবার ফিরে এল চিটি-চিটি ব্যাং-ব্যাং ক্লাবের বন্ধুরা।'

●

গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ আবার ঠাসা হল, তালা দেওয়া হল। অখণ্ড আবার মই বেয়ে উঠল মাকড়শাদের ঘাঁটি মাচা-ঘরে। ব্যাগ রেখে, পাল্লা বন্ধ করে, মই পাচার করল গ্যারেজে। তারপর আনন্দ-জ্বলজ্বলে চোখে তিন সত্যান্বেষী দাঁড়াল মুখোমুখি।

দাশরথী বলল—'বারোটা বাজে। এবার চলি।'

'খেয়ে গেলে হয় না?' ইন্দ্রনাথ বলল।

'না। আজ আপনার হোটেলে লক-আউট। বিকেলে আবার আসছি। তার আগে শহরে খোঁজ-খবর নেব, দনু ঘোষকে কেউ দেখেছে কিনা।'

'হুঁশিয়ার থাকবেন। আপনার মাথার দাম কিন্তু মাত্র একটি বুলেট।'

'জানি।'

গোঙাতে গোঙাতে সম্পাদকের জরাজীর্ণ চক্রযান উধাও হতেই রান্নাঘরে স্যাণ্ডউইচ আর কফি খেল অখণ্ড আর ইন্দ্রনাথ। তারপর আস্তিন গুটিয়ে আবার লাগল তল্লাসিতে। বিকেল চারটে নাগাদ দাশরথী ফিরল। সঙ্গে এক কাকতাড়ুয়া মূর্তি। সিনেমার চার্লি চ্যাপলিনের মত চেহারা: ঢলঢলে প্যাণ্ট আর শার্ট। বদখত জুতো। আর দোমড়ানো সোলার টুপী। সব মিলিয়ে অবিকল সার্কাসের ক্লাউন।

এক নজরেই চিনেছিল অখণ্ড। মরুভূমির সেই ছিনে জোঁক জমির দালাল। ডেজার্ট-সিটির স্বপ্ন যার কোটর-প্রবিষ্ট চোখে।

দাশরথী নাম বলল, মহম্মদ ইয়াসিন।

হেসে বলল জহুরী-নন্দন—'আলাপ আগেই হয়েছে। গুড সেলসম্যান। কথা দিয়েছি, পরে জমি নেব।'

'নিতে আপনাকে হবেই স্যার।' দাঁড়কাক-কাকলী করল মহম্মদ ইয়াসিন।

দাশরথী বলল—'ইয়াসিনকে আনলাম ওর মুখেই গল্পটা শোনানোর জন্যে। বুধবার রাতের কেচ্ছা ও কিছুটা জানে।'

অখণ্ড বলল—'বিষয়টা কিন্তু গোপনীয়। কাক-পক্ষীও যদি জানতে পারে—'

ইয়াসিন বলল—'ঘাবড়াইয়ে মাৎ। ভীম দত্ত আমার দোস্ত নয়। সেদিন আমাকে জুতোপেটা করতে শুধু বাকি রেখেছিল।'

'বুধবার রাতে?'

'না। বুধবার রাতে আমি আর একজনকে দেখেছি। যদিও শনি-রবিবারে জমির দালালি করি, সেদিন হঠাৎ এসেছিলাম যদি কোনো খদ্দের পাওয়া যায় এই আশায়। সন্ধ্যে হল। অথচ কেউ এল না। তাই পাততাড়ি গুটোচ্ছি, এমন সময়ে একটা মস্ত গাড়ি ব্রেক কষল সামনে। গাড়ি চালাচ্ছিল একটা ছোটখাট লোক। পেছনে বসেছিল আর একজন। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল—'ভীম দত্তর বাংলো কি এই দিকে?' আমি বললাম—'নাকের সিধে যান।' পেছনের লোকটা বলল—'কদ্দুর?' ড্রাইভার বলল—দনু, তুমি চুপ করো তো। ওটা আমার মাথাব্যথা।' বলে গাড়িতে গীয়ার দিল। দিয়ে আমাকে বলল—'চল হে, বেতাল।' বলুন তো খামোকা বেতাল বলার মানেটা কি?'

হাসল অখণ্ড। বলল—'লোকটার চেহারা মনে আছে?'

'অন্ধকারে অত দেখিনি। তাছাড়া বেতাল বলায় আমার মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল।'

'ভীম দত্তর সঙ্গে দেখা হল কবে?'

'বলছি। বাড়ি গিয়ে ভাবলাম, ভীম দত্ত যখন বাংলোয় আছেন, তখন কোমর বেঁধে দেখা করা যাক। কারবার মন্দা যাচ্ছে। জমি কেউ কিনতে চাইছে না। ভীম দত্তকে যদি কবজায় আনতে পারি, মোটা দাঁও পেটা যাবে। গোঁ চাপলে রাতারাতি 'ডেজার্ট সিটি' বানিয়েও দিতে পারেন তিনি। তাই বেস্পতিবার ভোর হতেই রওনা হলাম।'

'বাংলোয় পৌঁছোলেন কখন?'

'আটটা নাগাদ। সদর দরজার কড়া নাড়লাম। কেউ সাড়া দিল না। ঠেলা মারলাম। দেখলাম চাবি দেওয়া। বাড়ির পেছনে গেলাম। দেখলাম কেউ নেই। খাঁ-খাঁ করছে মরুভূমির মতই।

'সে-কি!' অখণ্ড অবাক।

'মুর্গি ছাড়া জ্যান্ত জন্তু কেউ ছিল না। মানুষ তো দূরের কথা। ও-হ্যাঁ, সেই কাকাতুয়াটা দাঁড়ে দোল খাচ্ছিল। আমি বললাম—'গোলাম হোসেন সেলাম।' ও জবাব দিল—'যেটা পকেটকাটা ছুঁচো বেল্লিক।' দেখুন স্যার, আমি জমির দালাল, জোচ্চর নেই। শেষকালে কিনা একটা কাকাতুয়াও আমাকে পকেটকাটা বলল? লাগে না আমার?'

'খুব লাগে।' হাসল অখণ্ড। 'ভারি অন্যায় কাকাতুয়ার। কিন্তু ভীম দে—'

'ঠিক তখনি গাড়ি হাঁকিয়ে উঠোনে ঢুকলেন ভীম দত্ত। সঙ্গে পেঁচি সেক্রেটারিটা। খবরের কাগজে অনেক ছবি দেখেছি। তাই ভীমবাবুকে চিনলাম। দাড়ি না-কামাবার ফলে বিচ্ছিরি লাগছিল দেখতে। খুব ক্লান্ত চেহারা। আমাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠলেন—'কি চাই?' আমি বললাম—'কিছু চাই না। আপনি চান কিনা জানতে এসেছি।' বলেই 'ডেজার্ট সিটি'র কথামালা আরম্ভ করে দিলাম। জমি যে কত সস্তা এখানে, তা সবে বোঝাতে শুরু করেছি, এমন সময়ে ভদ্রলোক তেড়ে এলেন: যা বললেন, তা আর নাই বা শুনলেন। আমি খেটে খাই। কিন্তু এরকম গালাগাল কখনো খাইনি। দেখলাম, অতবড় কারবারী মানুষ জমির কারবারের কিছু বোঝেন না। তাই মনের দুঃখে চলে এলাম।'

'তারপর?'

'আর ওমুখো হইনি।'

অখণ্ড বলল—'মুষড়ে পড়বেন না।' 'আমি আপনার জমি কিনব।'

'কিনবেন? কত বিঘে?' ইয়াসিনের ইঁদারা চোখ চকচক করল।

'পরে বলব। আপাতত মরুভূমি আমাকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছে। কাটতে চাই।'

দাশরথী বলল—'ইয়াসিন, তুমি একটু বাইরে বসো। পরে ডাকব।'

'বুঝেছি। আমি বরং এগোই। ফোয়ারাটা কাজ করছে কিনা দেখি। যাবার সময়ে তুলে নিয়ে যাবেন।'

বেরিয়ে গেল চার্লি চ্যাপলিনের দ্বিতীয় সংস্করণ। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় আড়াল

থেকে কাঠবেড়ালের মত ঘরে ঢুকল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

'শুনলেন?' বলল অখণ্ড।

'ইন্টারেস্টিং', বলল ইন্দ্রনাথ।

দাশরথী বলল—'তাহলে দেখা যাচ্ছে, মন্মু ঘোষ বুধবার সন্ধ্যের পর বাংলোয় পৌঁছেছে। একা আসেনি। এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে চতুর্থ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। লোকটা কে বলুন তো? অঘোর মল্লিক নয় তো?'

'অঘোর মল্লিকই', জোর দিয়ে বলল অখণ্ড।' কথায় কথায় বেতাল বলার অভ্যেস আছে ভদ্রলোকের।

দাশরথী বলল—'ফাইন। তাহলে রহস্য-নাটকে চার নম্বর আসামী হল ন্যাচারালিস্ট অঘোর মল্লিক। আর একটা গোল আছে। রোববার রাতে ডক্টর লাখোটিয়ার আরোগ্য-নিকেতনে একটা লোক গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, ঢোঁড়া বাসুকিকে নিয়ে হাওয়া হয়েছিল। লোকটা কে? অঘোর মল্লিক কি?'

'খুব সম্ভব,' বলল ইন্দ্রনাথ। 'মেহের খানের আগমন-বৃত্তান্ত অঘোর মল্লিক জানত।'

'জয় গুরু', লাফিয়ে উঠল জহুরী-তনয়।

'মেহের খানের সঙ্গে ধুর্জটিলাল কাকেতে দেখা হওয়ার সময় কিন্তু অঘোর মল্লিকও ছিল সেখানে।'

হাসল দাশরথী—'ঘাটে ঘাটে বেশ মিলে যাচ্ছে তো। কে জানে অঘোর মল্লিক চোখ দিচ্ছিল কিনা। মেহেরকে দেখেই টনক

নড়ে। ঢোঁড়া বাসুকিকে নিয়ে আগেভাগেই গাড়ি হাঁকিয়ে আসে বাংলোর ফটকে। উদ্দেশ্য তো বোঝাই যাচ্ছে।'

'কিন্তু উপেনের কোট ছিঁড়ল কেন?'

'ভুল করেছিলাম। উপেন খুন করেনি। ইয়াসিনের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে দনু ঘোষকে চুলোর দোরে পাঠিয়ে উপেন আর ভীম দত্ত দুজনেই সারারাত টোঁটোঁ করেছেন। কোথায়?'

'মরুভূমির দুর্গম অঞ্চলে।' বলল ইন্দ্রনাথ। 'দনু ঘোষের লাশ বালিতে কবর দিয়ে ফিরে এসেছেন ভোরে।'

দাশরথী বলল—'সম্ভব। রাজপুতানার মরুভূমিতে পাহাড়-পর্বত কম নেই। এই বিরাট অঞ্চল থেকে লাশ উদ্ধার করা চাট্টিখানি কথা নয়।'

ভীম দত্তর টেবিলে বসে আনমনে কাগজ হাটকাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। হঠাৎ তাড়িতাহতের মত চমকে উঠল। চোখ উজ্জ্বল হল। সন্তর্পণে ব্লটিং পেপারগুলো আলাদা আলাদা করে রাখতে লাগল পাশে।

বলল—'এটা কী?'

সবাই দেখল। ছদ্মবেশী গোয়েন্দার হাতে এক তা কাগজ। তাতে কি যেন লেখা। পড়ল ইন্দ্রনাথ। পড়ে কাগজটা অখণ্ডর হাতে দিল। বলল—'পড়ো।'

অখণ্ড বলল—'বুধবার রাতে লেখা দেখছি।'

'হ্যাঁ। কি লেখা?'

'কল্যাণীয়া সাহানা, ইদানীং বাংলোয় যা-যা ঘটছে, তা তোকে জানিয়ে রাখা দরকার। আগেই বলেছি, উপেন নন্দীর সঙ্গে বছরখানেক ধরে আমার বনছে না। আজ বিকেলে আমার ধৈর্য ফুরিয়েছিল। তাই তাকে বরখাস্ত করেছি। কাল সকালে যোধপুর যাবো উপেনকে নিয়ে। ওখান থেকেই ওকে বিদেয় দেব—এ-জীবনে আর মুখদর্শন করব না। আমার হাঁড়ির খবর জানে বলেই এতদিন সয়েছিলাম। নইলে এক বছর আগেই ওকে তাড়াতাম। ভয় সেইজন্যেই। গোলমাল বাঁধাতে পারে। দিল্লি গিয়ে তোকে ফ্যাসাদেও ফেলতে পারে। তাই হুঁশিয়ার করে দিলাম। এ-চিঠি নিয়ে আমি এখুনি টাউনে গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলব। কারণ তো বুঝতেই পারছিস। উপেনকে জানাতে চাই না—'

দাশরথী বলল—'থামলেন কেন?'

'আর নেই বলে।'

'বটে। বাপ মেয়েকে চিঠি লিখতে লিখতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোলেন না। অদ্ভুত। গত বুধবার রাতের নাটকটা আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। টেবিলে বসে আছেন দুঁদে ভীম দত্ত। চিঠি লিখছেন মেয়েকে। দরজা খুলল। ঘরে ঢুকল—কে? ধরে নেওয়া যাক, দনু ঘোষ। যাকে বছরের পর বছর ভয় পেয়েছেন। দুম করে তাকে ঘরে দেখে তাড়াতাড়ি চিঠিটা দুটো ব্লটারের ফাঁকে লুকোলেন ভীম দত্ত। উঠে দাঁড়ালেন। শুরু হল কথা-কাটাকাটি। কথার লড়াই ফুরোলো উপেনের ঘরে। শোনা গেল পিস্তলের আওয়াজ। মাটিতে চিৎপাত হল দনু ঘোষ। সমস্যা হল লাশ নিয়ে। ভোর পর্যন্ত কোনো কিনারা হল না। ভোরবেলা দেহে-মনে অবসন্ন ভীম দত্ত ফিরলেন বাংলোয়। হাড়ে হাড়ে বুঝলেন, এ অবস্থায় উপেনকে আর তাড়ানো যায় না। রফা করে থাকতেই হবে। রুস্তমশাই, নাটক ঠিক আছে?'

'যুক্তিগুলো ভালো।' বলল ইন্দ্রনাথ।

'থ্যাঙ্ক ইউ। এ ব্যাপারে আমি আরো ভেবেছি। যদি ধৈর্য ধরেন তো বলি।'

'বলুন।'

'ভীম দত্ত যমের মত ভয় পান দনু ঘোষকে। কেন? বড়লোক গরীবকে কখন ভয় পায়? যখন গরীব বড়লোকের গোপন কলঙ্ক জেনে ফেলে। ভীম দত্তর জীবনেও গুপ্ত অধ্যায় আছে। সম্ভবত 'চিটি-চিটি-ব্যাং-ব্যাং' ক্লাবে তার সূত্রপাত। দনু ঘোষ তা জানে। তাই চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে। অর্থাৎ দনু ঘোষ ব্ল্যাকমেলার। উপেন নন্দীও নিশ্চয় দনুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাই উপেনের সঙ্গে বনি-বনা নেই ভীম দত্তর। এ-হেন পরিস্থিতিতে দামি হীরের নেকলেস কিনলেন উনি। কিনে ফাঁপরে পড়লেন। খবরটা উপেনের মারফৎ চলে গিয়েছিল দনু ঘোষ আর তার দলবলের কাছে। ফলে ঢোঁড়া বাসুকি শিয়ালদায় হানা দিল। ভীম দত্ত দেখলেন, লোকালয় থেকে অনেক দূরে মরুভূমির বাংলোয় ঘাপটি মেরে বসে থাকা যাক। সে গুড়েও বালি পড়ল। ঢোঁড়া বাসুকি ফন্দি করে বুড়ো মেহেরকে সরালো বাংলো থেকে। রাস্তা পরিষ্কার। দনু ঘোষ হাজির হল বুধবার রাত্রে। চাইল নেকলেস, সেই সঙ্গে টাকা। ভীম দত্তর মাথায় খুন চাপল। ব্ল্যাকমেলার দনু ঘোষকে কুকুরের মত গুলি করলেন। ঠিক হ্যায়?'

'ও ইয়েস।' সায় দিল অখণ্ডনারায়ণ।

'পাক-চক্র শুরু হল এরপর থেকেই। ভীম দত্ত ভেবেছিলেন, দনু ঘোষ একা এসেছে। খুন করার পর দেখলেন, দনুর পুরো দলটাই তাঁকে ছেঁকে ধরেছে। গোপন খবর তারাও জানে। সেই সঙ্গে জেনেছে, ভীম দত্ত খুনী। এবার আর নিস্তার নেই। পুরো গ্যাংটার মুখবন্ধ না করলেই নয়। তারা নেকলেস চায়, টাকাও চায়। তাদেরই চাপে ট্রাঙ্ক-কল করলেন ভীম দত্ত। বললেন বজ্রমণির কণ্ঠহার যেন অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মরুভূমির বাংলোয়। তারিখটা মনে আছে অখণ্ডবাবু?'

'গত বৃহস্পতিবার সকালে।'

'মিলছে তো? বুধবার রাত্রে খুন, সমস্ত রাত ধরে লাশ পাচার, বৃহস্পতিবার সকালে ছিনে জোঁক ব্ল্যাকমেলারদের অত্যাচার। তাই নেকলেস গাছিয়ে তিনি চটপট অকুস্থান থেকে চম্পট দিতে চেয়েছিলেন।

ইন্দ্রনাথবাবু, মুখ বুজে রইলেন কেন?

'কি বলব?'

'আমার ভাবনা ভুল?'

'কিছু কিছু।'

'যেমন?'

'ভীম দত্ত হেঁজিপেঁজি লোক নন। ব্ল্যাকমেলারকে খুন করেছেন বললে, তিনি রেহাই পেতেন।'

'পেতেন, যদি সেক্রেটারী সহায় হত। কিন্তু সে তো বেঁকে বসেছে। ভীমদাকে ফাঁসানোর জন্যে বানানো গল্প শোনাতেও তৈরি হয়েছে। তাছাড়া মনে রাখবেন, খুন ছাড়াও ব্ল্যাকমেলাররা ভীম দত্তর আরো একটা পাপের কেচ্ছা জানে।'

'যুক্তি সন্তোষজনক।'

'তাহলে আমার থিওরী নির্ভুল?'

'একটি পয়েন্ট ছাড়া।'

'আবার কি?'

'খুনের অন্যতম সাক্ষী কাকাতুয়া খুন হয়ে যাবার পর মেহের এল বাংলোয়। তখন তাকে খুন করার কারণ কি?'

'ধরেছেন ঠিক। শুধু এই পয়েন্টেই আমার কোনো যুক্তি নেই। তবে অনুমানে বলতে পারি। মেহের খাস ভীম দত্তর পুরোনো লোক। সে কাছে থাকলে ভীম দত্ত মনে জোর পেতে পারেন। তাই তাকে সরিয়ে ভীম দত্তকে অসহায় করে রাখা হয়েছে।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ইন্দ্রনাথ বলল—'আমার মন সায় দিচ্ছে না। অভিজ্ঞতা বলে, থিওরী আঁকড়ে তদন্ত করতে নেই। পস্তাতে হয়। তাই আমি চাই চোখ কান খোলা রেখে চলতে।'

'আপনার চোখে কানে কি এখনো কিছু ধরা পড়েনি?'

'বিলকুল না। আমার মন এখন অমাবস্যার অন্ধকারে, চিন্তা তাই দিশেহারা।'

'আমারও', বলল অখণ্ড।

'দ্রৌপদীর জন্যে বুঝি?' গোবেচারা মুখ ইন্দ্রনাথের।

'কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দেবেন না, দাদা,' কাতর কণ্ঠ অখণ্ডর। 'যোধপুর থেকে ভীম দত্তর ফেরবার সময় হল। এসেই তো আমার পিণ্ডি চটকাবেন।'

'ডিটেকটিভ এক্স-রে'কে যোধপুরে না দেখতে পেয়ে?'

'তাছাড়া আর কি?'

'এত ঘাবড়াবার কি আছে? ভীম দত্ত এক্স-রে'কে চেনেন না। এক্স-রেও ভীম দত্তকে চেনে না। সুতরাং কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। ও-রকম হামেশাই হচ্ছে।'

মুখ গোমড়া করে অখণ্ড বলল—'দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি আমার হাল। ভীম দত্ত গাজীপুরে নবাবী পিস্তল বার করেছেন। গরম সীসের পিঠে খেয়ে আমি চিৎপটাং হয়েছি খাটের পাশে। জানলা থেকে আমার শুধু পা জোড়া দেখা যাচ্ছে। আপনারা মড়ার মুণ্ডপাত করছেন, জুতোর বাণ্ডিলে আমার মুখ দেখাতে পাচ্ছেন না বলে। পাবেন কি করে? জুতোয় তো সাতদিন কালি পড়েনি!'

[ক্রমশঃ]

আগামী সংখ্যায় 'দনু ঘোষের রহস্য'

কলকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে মহাবিপ্লবী বিনয়, বাদল, দীনেশ স্মরণে একটি স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করা হয়। মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে স্মারক স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন।

পোলারাইজেশন নতুন যুক্তফ্রণ্ট

যদিও বৈঠক শেষে মুখপাত্রদের উক্তিতে ততোখানি নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হয়নি, তবু একীকরণের প্রশ্ন নিয়ে জনসংঘ স্বতন্ত্র ও ভারতীয় ক্রান্তি দলের মধ্যে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তার সাফল্যের পরিধি সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট সংশয় রয়ে গেছে। বাহ্যত এই সংশয়ের কারণ যুগিয়েছে আলোচনায় জনসংঘ সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ীর অনুপস্থিতি, যদিও স্বতন্ত্র ও বি কে ডি'র পক্ষে রঙ্গা, মাসানী, চরণ সিং প্রভৃতি শীর্ষ-নেতারা হাজির ছিলেন। হুবলীর উপ-নির্বাচনে স্বদলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচার-কার্যে ব্যস্ত থাকার দরুনই বাজপেয়ী দ্বিতীয় দিনেও বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি, এই যুক্তি স্বভাবতই সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি এবং স্বতন্ত্র ও বি কে ডি'র প্রতিনিধিরা এই ব্যাপারে তাঁদের বিস্ময় ও নৈরাশ্যও গোপন করতে পারেন নি। সংঘের সভাপতির অনুপস্থিতি যে তাঁদের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একথা তাঁরা খোলাখুলিভাবেই বলেছেন। তবু ত্রিপক্ষীয় যুক্তবিবৃতিতে আলোচনার কিঞ্চিৎ সাফল্য হিসেবে বলা হয়েছে যে এর ফলে যেমন নিজেদের মধ্যে মতের ঐক্য কোথায় এবং কতোখানি তার সন্ধান পাওয়া গেছে তেমনি অনৈক্যের ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া এই সূত্র ধরেই ভবিষ্যতে তিন দলের মধ্যে আবার আলোচনা হবে যখন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, কম্যুনিস্ট বিপদ, প্রতিরক্ষা সমস্যা, পরমাণু অস্ত্র, কাশ্মীর, পাকিস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক, সংখ্যালঘু প্রশ্ন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে মতামত বিনিময়ের সুযোগ পাওয়া যাবে।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখনীয় যে তিন দলের এই ঐক্য আলোচনায় নানা প্রশ্ন উঠলেও, 'জাতীয়তা-বিরোধী' দলগুলোর মোকাবেলার চেষ্টাই যে এদের মূল প্রেরণা জুগিয়েছে তা অনস্বীকার্য। কংগ্রেসের শক্তি ক্ষীয়মাণ এবং আগামী '৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব থাকবে কিনা সে বিষয়ে অনেকেই গুরুতর-রূপে সন্দিহান। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল এই সন্দেহের ভিত্তি আরো দৃঢ় করেছে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখন দ্বিতীয় চিন্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই দ্বিতীয় চিন্তা এই যে ৭২-এর নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলোর জোট বাঁধার প্রশ্ন আর মুখ্য নয়, ডান ও বামের যে ভিন্নমার্গিতা আজ দেশের রাজনীতিকে
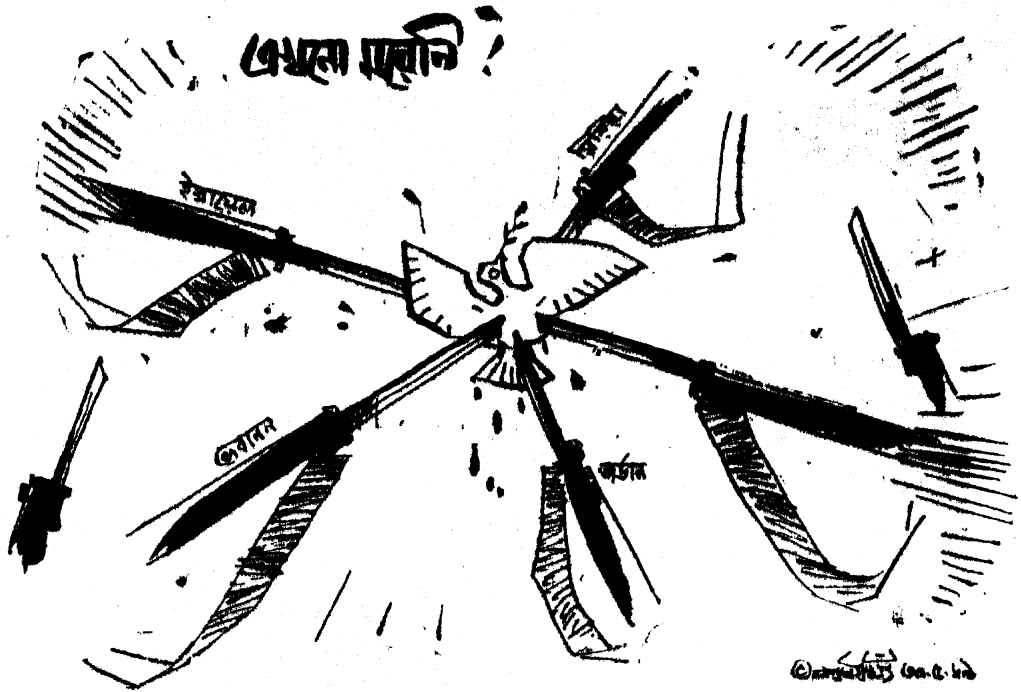
বিপরীত দুই মেরুবর্তী করতে চলেছে তারই পটভূমিকায় সমপন্থীদের নতুন করে জোট বাঁধতে হবে।

'৬৭ নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলোর একমাত্র স্লোগান ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট। কংগ্রেসের মধ্যে গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের সাফল্যের যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পরে বিভিন্ন রাজ্যে যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয় তাতে বহু ক্ষেত্রেই বাম ডান উভয় দলই এসে শক্তি যোগায়। কিন্তু সেই সুযোগসন্ধানী সমঝোতা কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলোর শক্তিকে জোরদার করার পরিবর্তে পরবর্তীকালে উভয়ের চিন্তা ও পথের অনৈক্যকেই আরো পরিস্ফুট করে তোলে। এই সময় থেকেই কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সমপন্থীদের নিয়ে জোট বাঁধার ঝোঁক দেখা দেয়। অনেকেরই ধারণা যে আগামী সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নিছক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সীমাবদ্ধ না থেকে বরং প্রতিটি দলকে ডানে-বামে বিভক্ত করে ফেলে সমপন্থীদের জোট বাঁধার অপর কথায় পোলারাইজেশনের পথেই তাদের চালিত করবে। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি তাদের এই ধারণাকে আরো জোরদার করেছে। স্বতন্ত্র, জনসংঘ ও বিকেডির আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিলো এই। তিনটি দলই প্রধানত দক্ষিণমার্গী এবং কম্যুনিস্ট-বিরোধী। এই কম্যুনিস্ট-বিরোধিতার দরুনও একদিক থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের চিন্তার ঐক্য রয়ে গেছে যার ফলে স্বতন্ত্র দল পার্লামেন্টে বহুক্ষেত্রে বিশেষত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার কালে কংগ্রেসের সমর্থনে দাঁড়িয়েছে এবং বিহারেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে সমর্থন যুগিয়েছে। তবুও তিনদলের আলোচনা শেষে দেখা গেছে যে, জনসংঘ সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির পক্ষে নয়, পার্লামেন্ট ও আইনসভাগুলোতে বিকেডি ও স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করা পর্যন্তই সে এগুতে পারে। অপরপক্ষে বিকেডি ও স্বতন্ত্র দল চায় সম্পূর্ণ একীকরণ। এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ মনস্থির করতে না পারাই হয়তো রাজগোপালাচারীর অনুপস্থিতির মূল কারণ।

দক্ষিণপন্থীদের এই জোট বাঁধার চেষ্টার পটভূমিকায় সম্প্রতি কম্যুনিস্ট পার্টির দু'দলের মধ্যে যৌথ কর্মপন্থা অনুসরণের সম্ভাব্যতা নিয়ে যে আলোচনা হয়ে গেলো তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও আলোচনাশেষের যুক্তবিবৃতিতে উভয় দলের আদর্শগত পার্থক্য পূর্বের মতোই রয়ে গেছে বলে স্বীকার করা হয়েছে, তবু কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের শক্তিবৃদ্ধির জন্য উভয় দলই যে বিশেষ সচেষ্ট হবে তা দ্বিধাহীন ভাষায়ই প্রকাশ করা হয়েছে। উভয় দলের আদর্শগত বিরোধ পূর্বের মতোই থাকবে না সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা ভবিষ্যতের কথা হলেও একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো এবার প্রকাশ্যভাবে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে গৃহীত নিয়মতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেছে এমনকি চীনা পার্টির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে একথা বলতেও কুণ্ঠিত হয়নি। চীন কর্তৃক দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের নিন্দা এবং নকশালপন্থীদের উৎসাহ যুগিয়ে পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরো তীব্র করার চেষ্টা স্বভাবতই সি পি এম'কে চীনের ওপর অনেকটা বীতশ্রদ্ধ করে ফেলেছে। সমালোচনার তীব্রতার এও হয়তো একটা সম্ভাব্য কারণ।

চীনের প্রতি সি পি এম-এর এই শ্রদ্ধাহানি উভয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আনার সহায়ক হবে কিনা একথা আজ বলা না গেলেও ভারতীয় রাজনীতিতে এই ঘটনা যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সেকথা বলার দরকার করে না।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির আত্ম-দর্শন সুরু হয়েছে। জাতীয় এবং আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে যে গুরুগিরির ভূমিকায় মার্কসবাদীরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন চীনের সঙ্গে তত্ত্বগত পার্থক্যের রূপরেখা টেনে সেদিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কথায় বলে, ইংলিশ চ্যানেলের এদিকে এলেই ফ্রান্স। সেইরকমই মনে হচ্ছে, মার্কসবাদীরা চীন থেকে দূরে সরে গিয়ে এবার রাশিয়ার উপকূলেই তরী ভিড়াচ্ছেন। সংশোধনবাদের প্রতি তাঁদের যে কঠোর মনোভাব ছিল তা ক্রমেই পেলব হতে হতে তরল হয়ে যাচ্ছে, নয়তো সংশোধনবাদের একমাত্র প্রতিভূ আদি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত বৈঠকে মিলিত হয়ে পথের সন্ধান করবার চেষ্টা করতেন না। যুক্ত বিবৃতিতে মত-পার্থক্যের কথা যত দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করা হোক না কেন, ভবিষ্যতে নিকটতর হওয়ার উপযোগী পটভূমিকা তৈরী হয়েছে বলে মনে হয়। খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্বের হাত বাড়ালে পার্টী কর্মীরা বিগড়ে যেতে পারেন—তাই তাঁরা কৌশলের সঙ্গে এগোবার চেষ্টা করছেন। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দুই দলের মধ্যে আদর্শগত মত-দ্বৈধতার চেয়ে "temperamental" পার্থক্যটাই বেশী।

মার্কসবাদীরা তাঁদের বিগত বর্ধমান প্লেনামে চীনের সঙ্গে দু'একটা বিষয়ে সহমত নন বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন সোভিয়েট রাশিয়াকে সাম্রাজ্য-বাদী বলতে তাঁদের দ্বিধা আছে এবং ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে হো চি মিনের হাতকে সুদৃঢ় করার জন্য চীনের এগিয়ে গিয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে কাঁধ মেলানো উচিত। তাছাড়া ভারতীয় মার্কসবাদীদের নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে স্বাধিকার থাকা উচিত, কেননা মার্কস-বাদীরাই এখানকার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, চীনা নেতারা নন। স্মরণ থাকতে পারে যে চীনা নেতৃবৃন্দ ভারতীয় মার্কসবাদীদের কম্যুনিস্ট সুলভ বিশেষণে আখ্যাত করে আদ্যশ্রাদ্ধ করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও মার্কসবাদীরা চীনা পার্টির সঙ্গে একটি সার্বিক মতপার্থক্যের কথা সেদিন বলেন নি। কারণ, ১৯৬৩ সালের ১৪ই জুন চীনা নেতৃবৃন্দ তাঁদের "General line" বলে যে তত্ত্বগত বক্তব্য হাজির করেছিলেন তার সঙ্গে মার্কসবাদীরা একমত ছিলেন। এবং সেই বক্তব্যে সংশোধন-বাদ সম্পর্কে চীনা পার্টির সমালোচনার সঙ্গেও মার্কসবাদীরা সহমত ছিলেন। এখনও সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐক্যমত আছে বলে মার্কসবাদীদের পলিটব্যুরো ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা থেকেই প্রমাণিত হয় যে সোভিয়েট অনুসরণকারী কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে কেন মার্কসবাদীরা বের হয়ে এসে নতুন দল গঠন করলেন ১৯৬৪ সালে। এবং একথা সুস্পষ্টই প্রমাণিত হল যে ১৯৬৯ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা সত্ত্বেও মার্কসবাদীরা চীনের সঙ্গে একই তরীতে পাল তুলে দিয়ে অকারণে ভেসেই যাচ্ছিলেন।

চীনা পার্টির নবম কংগ্রেসের ডকুমেন্ট পাওয়ার পরই মার্কসবাদীরা বুঝতে পারছেন যে, চৈনিক কমরেডরা ভক্তিবাদী হয়ে উঠেছেন। মার্কস-লেনিনের বৈজ্ঞানিক দর্শনের প্রতি তাঁদের আস্থা নেই। পলিট-ব্যুরো নয়া চৈনিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেছেন,

> "It is a question of serious rupture with the Marxist-Leninist analysis of the contemporary world and its developments."

চীনে প্রকৃতপক্ষে তেমন বৈষয়িক উন্নতি হয় নি বলে এতদিন যাঁরা সমালোচনা করতেন তাঁদের C.I.A. agent বলে ব্যঙ্গ করা হত। কিন্তু মার্কসবাদীরা স্বয়ং সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ না করলেও চীনা কংগ্রেসের প্রতিবেদনে বৈষয়িক উন্নতি বা অবনতির কথা লিপিবদ্ধ না থাকায় সখেদে বলেছেন যে ১২ বছর পরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক রচনার কাজে চীনে কি করা হয়েছে তার কোন ইংগিত নেই। নতুনভাবে পারিপার্শ্বিকতার বিশ্লেষণ করে যে সংগ্রাম ও কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়েছে তার ফলে চীনা অর্থনীতির উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং চীনা জনগণের রাজ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কি প্রভাব পড়েছে কিম্বা নয়ানীতির দৌলতে কৃত-কার্যতা বা অকৃতকার্যতার পরিমাণই বা কতটুকু—তার কোন হদিশ দেওয়া হয়নি।

একথা সত্যি, যদি কিছু "আহা মরি" রকমের উন্নতি হত তবে চীনা নেতারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তার প্রচার চালাতে কসুর করতেন না। ডকুমেন্ট আসবার আগে অর্থাৎ ভারতবর্ষে যখন খাদ্যের অবস্থা চরমে উঠেছিল তখন প্রায়শ শুনতে পাওয়া যেত চীনে চাষের এমন উন্নতি হয়েছে যে প্রতি একরে সেখানে ১২০০ মণ ধান ফলছে। শুধু কি তাই? জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে চীনবাসীরা এমন এগিয়ে যাচ্ছিলেন যে হঠাৎ ঐ উন্নতির প্রভাবে কয়েকজন চীনা হিমালয়ের অপর পার থেকে এক লহমায় এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গে উঠে একেবারে দম না ফেলেই নীচে নেমে এসেছিলেন। পশ্চিম দুনিয়া যখন আজগুবি বলত তখন গালমন্দের অভাব হত না। কিন্তু পশ্চিমীরা যখন প্রথমে বলল চীনারা অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়েছে, তখন সকলেই বিশ্বাস করে ফেললেন। কেউ সাম্রাজ্যবাদী প্রচার অবিশ্বাস করলেন না। কারণ কিছু লোকের মনে এমন ধারণা হয়েছিল যে চীনারা কখনও অকৃতকার্য হতে পারে না। আবার ভারতের সঙ্গে সীমানা-বিরোধে অনেকেই বলেছেন চীনা বক্তব্য ঠিক। অর্থাৎ চীনারা বাজে বক্তব্য সাধারণত বলেন না। অতএব, যেখানে বৈষয়িক উন্নতি হয়নি, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে হানা-হানি চলছে, সেখানে উন্নতি হয়েছে বলে মিথ্যা কথা বলা চীনা কমরেডরা পছন্দ করেন নি। সেই জন্য এই সম্পর্কে কোন উল্লেখ করা হয়নি বলে মনে হয়।

অথচ চৈনিক পার্টির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে এবং বিভিন্ন স্তরে এমনকি প্রশাসনিক যন্ত্রের মধ্যে ধনবাদী ও নয়া সংশোধনবাদী দৃষ্টি-ভংগীর মানুষ ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয় মার্কসবাদীরা আক্ষেপের সঙ্গে বলছেন কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী বিচ্যুতির ঝোঁক দেখা দিয়েছে কিম্বা কমরেড মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে কিভাবে চৈনিক পার্টি এই অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করছে তার কোন ইঙ্গিত নেই।

এই বিষয়েও কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। কারণ মার্কসবাদীদের যাঁরা বর্তমানে সংশোধনবাদী বলে আখ্যাত করছিলেন, তাঁদের যেভাবে দল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে চীনেও ঠিক সেইভাবেই বিতাড়ন পর্ব চলছে। বরঞ্চ রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে থাকার ফলে হয়ত কঠোর পন্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে কিভাবে বিদায় দেওয়া হয় সেটা তখন প্রতিবেদনে প্রকাশ করা বাতুলতা মাত্র। কম্যুনিস্ট ইতিহাসে যুগে যুগে তার নিয়মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। সেই সুবর্ণ পন্থা চীনেও অনুসৃত হচ্ছে। তবে কোন নতুন পন্থা যদি আবিষ্কৃত হত, চীনা কমরেডরা সেটা ভিনদেশী কমরেডদের অবগতির জন্য প্রকাশ করতেন। মনে হয়

একটি নতুনপন্থা চীন এই সম্পর্কে আবিষ্কার করেছে। তা হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। তবে পুরোপুরি কার্যকর হয়নি বলে এখনও তাকে দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করে অন্যদের ওয়াকিবহাল করার সময় আসে নি।

চীনা পার্টি ১৪ই জুনের সনদ থেকে কিভাবে সরে যাচ্ছেন তাঁর আলোচনা মার্কসবাদীরা করেছেন। এবং এই সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছেন বর্তমান পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতার মূল্যায়ন এবং শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণের উপর, অর্থাৎ সমকালীন পৃথিবীতে বুনিয়াদি কন্ট্রাডিকশান কোথায় —এই তথ্য নির্ধারণের উপর।

মার্কসবাদীরা বলতে চান, যাঁরা প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাঁরা সর্বদাই চারটি অবস্থার উপর নিয়মিতভাবে জোর দিয়ে থাকেন। যথা (১) সমাজবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের কন্ট্রাডিকশান; (২) ধনবাদী দেশে বুর্জোয়া ও সর্বহারার মধ্যে কন্ট্রাডিকশান; (৩) নির্যাতিত জাতি ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কন্ট্রাডিকশান এবং (৪) সাম্রাজ্যবাদী ও একচেটিয়া পুঁজির ধারকদের মধ্যে কন্ট্রাডিকশান। এগুলিই আখেরে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে তুলে।

কিন্তু চীনা পার্টির ২নং নেতা কমরেড লিন-পিয়াও তাঁর প্রতিবেদনে এই মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট সূত্র গ্রহণ করলেও আরও কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে চারটি প্রধান কন্ট্রাডিকশান থাকার ফলে বিপ্লব আসতে বাধ্য। তবে এই চারটির মধ্যে তিনি "Social imperialism" এবং "revisionist countries" এর কন্ট্রাডিকশানের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নামোল্লেখ না করে তিনি সোভিয়েটকে "Soviet imperialist" দেশ বলে আখ্যাত করেছেন এবং আর সমস্ত সংশোধনবাদী দেশগুলির কন্ট্রাডিকশান-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

মার্কসবাদ - লেনিনবাদের পীঠস্থান সোভিয়েট দেশ। কাজেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত যে চারটি প্রধান কন্ট্রাডিকশানের কথা একটু আগে উল্লেখ করা হল তা থেকে বোঝা যায়, সোভিয়েট ব্যবস্থা একদিকে আর গোটা দুনিয়া অন্যদিকে। এবার কমরেড লিন পিয়াও তাঁর নয়া ফরমুলেশানে চীনকে একদিকে রেখেছেন আর গোটা দুনিয়া অন্যদিকে। অর্থাৎ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এখন চীন দেশ। এই দেশেরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কে প্রোলিটারিয়েট কে ধনবাদী, কে সাম্রাজ্যবাদী তা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ কমরেড মাও সে তুং বর্তমান পারিপার্শ্বিকের মূল্যায়ণ করে, অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে, যে নতুন সূত্রের ও তথ্যের উদ্ভাবন করেছেন—চলমান পৃথিবীর বর্তমানে বিপ্লব সাধিত করতে হলে কমরেড মাও-এর সেই চিন্তাধারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে সংযোজন করতে হবে; এবং তবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মত হতে পারবে আর তার সৃজনশীলতাও বজায় থাকবে, নয়তো নয়।

কিন্তু ভারতীয় মার্কসবাদীরা এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজী নন। কারণ, তাঁরা সোভিয়েটকে "Soviet imperialist" বলতে কিম্বা সংশোধনবাদের ছোতা দেশগুলিকে শ্রেণী-বিশ্লেষণের সময় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সামিল বলে চিহ্নিত করতে রাজী নন। বক্তব্য হিসাবে তাঁরা বলতে চাইছেন যে শ্রেণী-বিশ্লেষণের কাজে উৎপাদনের উপায়গুলিতে কার অধিকার বেশী তা পরিষ্কারভাবে বিচার করে দেখতে হবে। সোভিয়েট উৎপাদনের উপায় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত। মার্কসবাদীরা দুঃখ করে বলছেন যে বর্তমানে কোন রাজ্যের সামাজিক ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক আদর্শের বিচ্যুতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার ঝোঁক দেখা দিয়েছে। চীনা পার্টি সোভিয়েটের সমালোচনায় এই পন্থা অবলম্বন করেছে। মার্কসবাদীরা আরও ক্ষোভ করেছেন যে, এমন কি আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্বকেও সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বরূপে পরিবেশন করা হয়েছে। এইভাবে ব্যাখ্যা করলে—ভারতবর্ষের মার্কসবাদীরা মনে করেন বিশ্বে এখন সমাজতন্ত্রী শিবির বলে আর কিছুই থাকবে না।

ভারতীয় মার্কসবাদীরা বলতে চান, চীনাদের এই ধরণের ব্যাখ্যা ১৯৫৭ সালের মস্কো ঘোষণার পরিপন্থী, এমনকি চীনা পার্টি ১৯৬৩র ১৪ই জুন যে "General line" ঘোষণা করেছিলেন এই নতুন শ্রেণীবিন্যাস তার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং তার বিচ্যুতিমাত্র। অতএব, কমরেড লিন পিয়াও একেবারে নয়া থিসিস উপস্থাপিত করেছেন বলে ভারতীয় মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন—তাই চীনা পার্টির এই সমালোচনা। অবশ্য ভ্রান্তভাবে এই সমালোচনা করেছেন কিনা পলিটব্যুরো তার উল্লেখ করেন নি। শুধু বলেছেন, চীন দেশের অবস্থা বুঝে চীনেও নেতারা যা করেছেন তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত নয়। ঠিক চীনাদলও নকসালবাড়ী আন্দোলনের সময় ভারতীয় মার্কসবাদীদের একই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে গালমন্দ দিতেও কসুর করেন নি। ভারতীয়রা তাঁদের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী কটুবাক্য ব্যবহার করেন নি। তফাৎ এইটুকু।

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি চেকোশ্লোভাকিয়ানদের সমর্থন জানিয়েছেন সোভিয়েট সংশোধনবাদী ও "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইয়ে। ভারতীয় মার্কসবাদীরা এটা সহ্য করতে পারেন নি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরে কেউ প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা করলে সেখানে বৃহৎ সমাজবাদী শক্তির হস্তক্ষেপের পুরোপুরি অধিকার আছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, সংশোধনবাদী অপচেষ্টা প্রতিবিপ্লবী কর্মকান্ড নয় কি? কিম্বা চীনের এই যে নয়া সিদ্ধান্ত তা কি কম্যুনিস্ট শিবিরকে আর প্রতিবিপ্লবের সম্মুখীন করছেন না। অতএব, এই অজুহাতে রাশিয়া যদি চীন আক্রমণ করে বা চীন রাশিয়া আক্রমণ করে তখন ভারতীয় মার্কসবাদীদের কি বক্তব্য হবে তা শোনার জন্য মানুষ আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। সাধারণ একখন্ড জমির জন্য সেদিন উশুরী নদীর ধারে কমরেডদের রক্ত পড়েছে—আর এই রকম অমার্কসীয় অ-লেনিনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চীনাদের শায়েস্তা যদি না করা হয় তবে বোঝা যাবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন বা বিশ্ববিপ্লবের প্রতি কারও আস্থা নেই।

ভারতীয় কম্যুনিস্টরা (মার্কসবাদীরা) মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে কমরেড মাও-এর চিন্তাধারার সংযুক্তি করার ঘোরতর বিরোধী। তাঁরা বলছেন, মার্কসবাদকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে কমরেড লেনিন একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করেছেন। অতএব, মাও-এর চিন্তাধারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরই নামান্তর বলে চালানো ঠিক হচ্ছে না। মনে হয়, চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি স্ট্যালিন যে ভুল করে গেছেন, তা পুনরায় ঘটতে দিতে চান না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ব্যাখ্যা করে স্টালিনও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু রদবদল করেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত পৃথিবীর অবস্থা বিশ্লেষণ করে কমরেড মাও ত এক-ধাপ এগিয়েও চিন্তা করতে পারেন? রক্ষণশীল মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁকে বিচার করে লাভ কি? যখন তাঁর ১৪ই জুনের "General line" -এর সঙ্গে একমত হতে পারা গিয়েছিল, ভবিষ্যতে তাঁর নতুন মতের সঙ্গে মিলতে পারা যাবে না এমন কথা আসে কি করে?

তারপর লিন পিয়াও-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে চীনা পার্টি ভালই করেছেন। কারণ, স্টালিনের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদী ক্রুশেচভ যে গোপাকু নাচ নেচেছেন, মাও-এর মৃত্যুর পর চীনেও তাই ঘটতে পারে। কাজেই দৃষ্টান্ত যেখানে রয়েছে সেখানে এমনিতর অন্যায় হতে দেওয়া কি উচিত? মার্কসবাদীরা কি বলেন? স্টালিন যদি তাঁর উত্তরাধিকারীকে বসিয়ে যেতেন তবে সামূহিক একনায়কত্বে ফাটল ধরিয়ে ক্রুশেচভ সাহেব 'গণতন্ত্রের' কথা বলে সংশোধনবাদ হাজির করে শ্রেণী-সংগ্রামের কাজকে ব্যাহত করতে পারতেন কি? না, মার্কসবাদীদের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার সুযোগ হত? কাজেই কমরেড মাও যে লড়াই শুরু করেছেন, তার ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্যই পাকাপাকি ব্যবস্থা করে গেলেন। এতে উষ্মা করলে চলবে কেন? উত্তরাধিকারী নিয়ে সোভিয়েটে লেনিনের মৃত্যুর পর কি নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা নিশ্চয় সকলেরই জানা আছে। অতএব, সেই সমস্যাও সমাধান করে কমরেড মাও মনে হচ্ছে আরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বলতে পারেন এটা গণতন্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু তা যে হতেই হবে তার কী মানে আছে?

—সমদর্শী

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

গ্রাম চেনবার নেশা ছিল বিকাশের। শহুরে যুবক প্রয়োজন মিরেই এল তাই পাড়াগাঁর ব্যাংকে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্ককাকার বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। বিস্ময়ের আশ্রয়। মনীষার সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত মনীষার, দ্বিতীয় উপস্থিতি।

চারদিকে টানাপোড়েন। চোরাবালি। ক্ষোভে-ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছে সবাই। মূল্যবোধও বিপর্যস্ত। ঘুণেপোকা।

বিকাশের সামনেও কানাগলি। মনীষার প্রতি হৃদয়ের রঙ। সোনালির প্রতিও একধরনের আকর্ষণ। স্বপ্ন ;

মুক্তি চায় বিকাশ। নোংরা গ্রাম্য রাজনীতির আওতা থেকে, শশাঙ্ক নিয়োগীর বিবর থেকে। আশ্রয় চায় সে মনীষার।

আনতে হবে তাকে। বাঁধতে হবে ঘর। মনীষার চাকরির জন্যে চলে তাই উমেদারি।

মাঝে সোনালি। আরেক অধ্যায়।

রাত। বিবর্ণতার আলো। শুয়েছে বিকাশ। ঘরে ঢুকল সুনু—সোনালি। স্বপ্নের আমেজ।

বিকাশের কণ্ঠ, 'তোমাকে ভুলব না সুনু, তোমাকে ভোলা যায় না।'

॥ আঠারো ॥

রাতের বেলা, সুনু চলে যাওয়ার পরে—আরো অনেকক্ষণ জেগে রইল বিকাশ। নেশা ঝিম-ঝিম করতে লাগল রক্তের ভেতর, বুকের মধ্যে একটার পর একটা ঢেউ উঠতে লাগল। সুনু কি বুঝেছে সে কী বলতে চেয়েছিল? সুনুর মন কি এতখানি জেগে উঠেছে এর ভেতরে?

তারপরে নেশাটা কেটে এল আস্তে আস্তে। তখন মশারির বাইরে মশাদের ক্রুদ্ধ গর্জন। ঘর ভরে সেই অস্বাস্থ্যকর জীর্ণ গন্ধটা। বাইরের বাগানে বাদুড়ের শব্দ—ঝিঁঝির ডাক। সেখান থেকে কলকাতা। মনীষা।

মনীষা। একটু একটু করে অন্ধকারে ডুবছে। তাকে তুলে নেবার জন্যে—দু হাত বাড়িয়ে রক্ষা করবার জন্যে প্রতিশ্রুতি ছিল তার। অথচ—

একটা যন্ত্রণা। ছুটে আসবার সময় দেওয়ালে কপাল ঠুকে গিয়েছিল, সেখানে? অথবা পায়ের সেই বুড়ো আঙুলটা থেকে—শীতের ব্যথা সহজে যেতে চায় না? যন্ত্রণাটা কোন্‌খান থেকে উঠে আসছে বিকাশ বুঝতে পারল না, কিন্তু ধীরে ধীরে সেইটেই এসে তার মাথার মধ্যে ঘন হতে লাগল।

না—আমি মনীষাকে ঠকাইনি। আমার জীবনে সে ছাড়া আর কোনো মেয়ে আসবে না—কোনোদিন নয়। সুনুকে আমার ভালো লাগে। এই মৃত্যু আর কুশ্রীতা দিয়ে ঘেরা বাড়ীটার এই মেয়েটি আলোর দিকে ফুটে উঠতে চাইছে। সেই চাওয়াটা তার দুটি চোখের তারায় তার নতুন মনে, তার নতুন শরীরে। আমার এই মেয়েটিকে ভালো লাগে। ভালো লাগা মানেই ভালোবাসা নয়। মনে করা যাক একজন সুখী বিবাহিত পুরুষের একটা বিশেষ ফুলকে ভালো লাগে, কোনো গায়িকার গান ভালো লাগে, ছবির কোনো নায়িকাকে ভালো লাগে। তার অর্থ এই নয় যে, দাম্পত্য-জীবনে সেই মানুষটা অবিশ্বাসী।

এই ভালো লাগাটা ইম্‌পার্সোন্যাল। ঈসথেটিক। নিজের ভেতরে যে অস্বস্তিটা খচ-খচ করছিল, তাকে ধমক দিয়ে বিকাশ বললে, তর্ক কোরো না। অত নীতিবাগীশ হলে পৃথিবীতে একেবারে চোখ-কান বুজে প্যাঁচার মতো বসে থাকতে হয়। সুনু মেয়েটি বেশ। ভারী ছেলেমানুষ। আমার মায়া হয় ওকে দেখলে। ওর জন্যে আমি কিছু করতে চাই। চারদিকের এই অসুস্থতা আর বিকারের মধ্যে আমি ওর জন্যে মুক্তির পথ খুঁজে দিতে চাই একটা। ওকে আমি সেতার শিখিয়ে দেব। সুরের মতো এমন মুক্তি আর কোথায় আছে—আর কে পারে এমন করে জীবনকে আলোর দিকে মেলে দিতে? কিন্তু—

'তোমাকে ছেড়ে আমি কখনো যাব না।' কী মানে হয় এই কথাটার?

বিরক্ত হয়ে বিকাশ আবার ধমক দিয়ে উঠল : তর্ক কোরো না। ছেলেমানুষকে সান্ত্বনা দিয়েছি একটা। তবু রাতটা ভালো কাটল না। থেকে থেকে মনীষা এসে দাঁড়াতে লাগল সামনে। সেই সিনেমা দেখবার প্রহসন। মনীষার ক্লান্ত চোখ, শ্রান্ত শরীরে এতটুকু সাড়া ছিল না কোথাও। তার কাঁধের ঝোলায় সংসারের খুঁটিনাটি ছিল, বাপের জন্যে ওষুধ ছিল। কিন্তু তার নিজের জন্যে?

রাতটা ভালো কাটল না—ঘুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগল বার বার। মশার ডাক, ঝিঁঝির শব্দ। চুন-বালির গন্ধ—বাইরের বাগানে হাওয়া। বিরক্ত হয়ে বিকাশ উঠে বসল বিছানার মধ্যে।

ভোরের হালকা ঘুমে—একটা মিশ্রিত স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে, অনেক দূর থেকে বেহালার সুর শুনতে পাচ্ছিল সুনু। সেই সুরটা শুনতে শুনতে—স্বপ্নের ভেতরেও একটা কান্না কাঁপছিল তার পাতলা ঠোঁটে। কান্না কেন আসছিল সুনু জানত না, জানত না—জীবনের গভীর কান্নার পালা এই প্রথম শুরু হল তার।

আর একটা ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে—শশাঙ্ক নিয়োগীর বাড়ীর অন্ধকার সিঁড়িটার নীচে বসে থাকতে থাকতে আর বিকৃত মুখে মশা মারতে মারতে হঠাৎ উৎকর্ণ হল মেজদা। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট বেহালার সুর তারও কানে গিয়ে পৌঁছেছে।

মেজদা হিংস্রভাবে একবার দাঁতে দাঁতে ঘষল।

'পাগানিনির বেহালা! যে মেয়েরা তাকে ভালোবাসে, তাদেরই খুন করে সে। তারপর তাদের বুকের শিরা ছিঁড়ে নিয়ে তৈরী করে বেহালার তার।'

সেই সময়, শশাঙ্কর স্ত্রী সুধাময়ী আলগা একটা ধাক্কা দিলেন মেয়েকে।

'এই, কী হয়েছে তোর? ঘুমের মধ্যে কাঁদছিস কেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে?'

সুনু চমকে জেগে উঠল।

তখনো ঠোঁটে তার কান্না কাঁপছিল। সেই কান্না—যা জীবনের সবচেয়ে গভীর থেকে আসে, যা এই প্রথম দুলে উঠল তার ভেতরে।

বিকাশ সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। বিকাশ তাকে অনেক বেশি ছেলেমানুষ ভেবেছিল।

তবু তিন চারটে দিন কেটে গেল নিছক বর্ণহীনভাবে। মনীষাকে চাকরির কথা লিখে চিঠি দেওয়া হয়েছে, জবাব আসেনি। কেমন আছে, কে জানে। তা ছাড়া ইচ্ছে করলেই মনীষা এতদিনের চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারে না—তাকে সব দিক ভেবে দেখতে হবে। আর চাকরিও তো চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাচ্ছে না।

কুমুদবাবুর সঙ্গে একদিন পথে দেখা হয়েছিল। নিজে থেকেই বললেন তিনি।

'তোমার সেই মেয়েটির চাকরির জন্যে খোঁজ করছি হে।'

'কোনো আশা আছে এখানে?'

'হেড মিসট্রেস্ বললেন, একজন টীচার শিগগীরই যাচ্ছেন লীভ-ভেকান্সিতে। বোধ হয় বিয়ে হবে মেয়েটির। তার মানে এখন লীভ-ভেকান্সি হলেও পরে পার্মা-নেণ্ট্ হওয়ার সম্ভাবনা। বিয়ের পরে মেয়েটি খুব সম্ভব তার স্বামীর সঙ্গে আসামে চলে যাবে।'

'কবে সে মহিলা যাচ্ছেন বিয়ে করতে?'

'এখনো বলতে পারি না। বিয়ে এ মাসে হতে পারে, সামনের মাসেও হতে পারে।'

'আচ্ছা—' বিকাশ নিশ্বাস ফেলল।

হেড মাস্টার একটু হাসলেন।

'এত ব্যস্ত হলে কি চলে হে—যা দিন-কাল! দলে দলে এম-এ পাশ মেয়ে চাকরির জন্যে পাড়াগাঁয়ের স্কুলে ধর্না দিচ্ছে। যাই হোক, একটু অপেক্ষা করো—ব্যবস্থা একটা করে দেব। ভালো কথা, আমার জন্যে সায়ান্স-টীচার কী হল? খোঁজ নিয়েছ?'

'আজ্ঞে সাত আট দিনের মধ্যেই আমায় আর একবার কলকাতা যেতে হবে, তখন—'

'দেখো, দেখো—একটু ভালো করে দেখো। বোলো, আমরা ম্যাক্সিমাম পে দেব এখানে। তা ছাড়া সায়ান্সের লোক এখানে টিউশনও পাবে অনেক। তুমি আমার জন্যে চেষ্টা করো, আমিও তোমার জন্যে দেখছি।'

তার মানে, একটা চুক্তি। আমার স্কুলের টীচার জুটিয়ে দাও, আমি মনীষাকে চাকরি জোগাড় করে দেব।

সবাই একটি শর্তই বোঝে। গিভ্ অ্যাণ্ড্ টেক। কিন্তু কুমুদবাবুর জন্যে টীচার খুঁজলেও কি সে পাবে? তার জানা-শুনো কোন্ এম-এস্-সি পাড়াগাঁয়ের স্কুলে চাকরি করবার জন্যে বসে আছে? কল-কাতায় গিয়ে দু-দিন ঘুরলেই কি সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে?

বিস্বাদ মন নিয়ে বিকাশ ভাবল, কানাই-বাবুকেই ধরতে হবে। শশাঙ্ক তাঁর যত বড়ো শত্রুই হোন, প্রিয়গোপালেরা যতই শ্লোগান তুলুন তাঁর নামে, তিনিই এ অঞ্চলের ভাগ্যবিধাতা। হয় সোজাসুজি, নয় ঘুরে-ফিরে সকলকেই হাত পাততে হয় তাঁরই কাছে গিয়ে। শুধু এখানে নয়—এখনো তো সমস্ত সমাজের এই একটাই চেহারা। মধ্যবিত্তের—নিম্নবিত্তের—শ্রমিকের—কৃষকের—সকলের স্বার্থই কখনো সরল-রেখায়, কখনো বা অর্থনীতির জটিল চক্রান্তে কানাই পালদের মতো মানুষের মুঠোর ভেতর। আমরা তারস্বরে এই লোক-গুলোকে ধিক্কার দিয়ে নরকে পাঠাতে পারি, কিন্তু বেঁচে থাকবার অত্যন্ত মোটা দাবিতেও শেষ পর্যন্ত এদের কাছেই আমা-দের দু-হাত মেলে দাঁড়াতে হয়।

প্রিয়গোপালেরা যে বিপ্লবের কথা ভাবেন, তা যদি সত্যি সত্যিই কখনো আসে, তা হলে সেদিন ইতিহাস আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ-জীবন-অর্থনীতির রূপ না বদলাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কানাই পালদের অচ্ছুত ভেবে মুখ ঘুরিয়ে থাকা উপবাস আর আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই দেবে না।

অতএব আসুন কানাই পাল। তাঁকেই ধরতে হবে। চাকরি যদি না থাকে, চাকরি তৈরি করে দিতে তাঁর সময় লাগবে না।

কিন্তু কানাই এখনো ফেরেন নি।

ব্যাঙ্ক-ফেরৎ বাসায় ফেরার সময় সে ভদ্রলোক আসছিলেন উল্‌টো দিক থেকে। একবার অস্বস্তিভরে চারদিকে চেয়ে দেখল বিকাশ। না—প্রিয়গোপাল সঙ্গে নেই। তাঁর আজকে বেরুতে দেরী হবে, কিছু বকেয়া কাজের ঝঞ্ঝাট নিয়ে পড়েছেন। বিকাশের আর এক জ্বালা হয়েছে এই প্রিয়গোপালকে নিয়ে। প্রথম প্রথম বেশ লেগেছিল লোকটিকে। জেল-খাটা বিপ্লবী বলে—মানুষটির কাছাকাছি এসে, বেশ শ্রদ্ধাও হয়েছিল একটু; এমনকি একথাও মনে হয়েছিল, বাস্ত ডাক্তার প্রভাকরের ওখানে গিয়ে ঘন ঘন আড্ডা দিয়ে তো তাকে বিব্রত করা যাবে না, বরং মাঝে মাঝে এসে বসা যাবে প্রিয়গোপালের কাছে, আলাপ-আলোচনা করা যাবে, গান-বাজনাও চলবে একটু-আধটু। কিন্তু বাসা—মনীষার চাকরি, তার এবং মনীষার বাঁচবার প্রয়োজন—এই সব দাবিগুলো মেটাতে গেলে এখানে কানাই পালকে বাদ দিয়ে চলবে না। এবং তাঁদের ব্যাংকের এই ব্র্যাঞ্চের যিনি সবচাইতে বড়ো পেট্রন তাঁর বিরোধিতা করলে হেড-অফিসেও—

অথচ, প্রিয়গোপাল যেন মূর্তিমান বিবেক। সেই কোন এক বাড়িওলা কেশব হালদারের ঘোমটা-টানা স্ত্রীর কাছে গিয়ে সে জোড়হস্তে নিজের সচ্চরিত্রতা ঘোষণা করেনি বলে এবং কানাই পালের কাছে বাসার খবর নিচ্ছে বলে সেই যে তাঁর ভুরু কুঁচকেছে, তা এখনো সোজা হল না।

চুলোয় যাক। বিরক্ত হয়ে বিকাশ ক'বারই মনে মনে বলেছে, চুলোয় যাক। এক বুড়ো ব্যাচেলারের আদর্শবাদী বেসুরে চেপেই যদি আকাশে পাড়ি দেওয়া যেত, তা-হলে আর ভাবনা ছিল না।

তবু সামনে কানাইবাবুর সরকারকে দেখে, সেই অবাঞ্ছিত বিবেকের তাড়নাতেই বিকাশ তাকিয়ে নিলে চারদিকে। না—আশপাশে কোথাও নেই ছাতাধারী প্রিয়-গোপাল। ঘাড় গুঁজে এখনো তিনি ব্যাঙ্কের খাতা নাড়া-চাড়া করছেন।

বিকাশ বললে, 'এই যে—নমস্কার।'

সরকার বললে, 'এজ্ঞে নমস্কার—নমস্কার।'

'মিস্টার পাল ফিরেছেন নাকি দিল্লী থেকে?'

'না ফেরেননি এখনো। তবে চিঠি যখন কিছু দেননি, তখন দু-একদিনের মধ্যেই আসবেন।'—একটু উৎসুক ভাবে সরকার তাকালো : 'জরুরি দরকার আছে কিছু?'

'এমন কিছু নয়। উনি এলে একবার দেখা করব।'

'আমি খবর দেব আপনাকে।'

'আচ্ছা।—নমস্কার।'

'এজ্ঞে নমস্কার—নমস্কার।'

কোথায় যেন সব অনিশ্চয়তায় ঝুলছে। একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না। মনীষার ব্যবস্থা হচ্ছে না—ওই বীভৎস নিয়োগীবাড়ীটা, সেই সন্ধ্যার পর যেটা আরো বিকট হয়ে উঠেছে, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে না—সুনুর মনে সুর ধরিয়ে দিয়ে অন্তত একটি মুক্তির আকাশ তাকে এনে দেওয়া হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। শুধু পর পর ক্ষত-গুলো বর্ণহীন বিরস দিন কেটে যাচ্ছে তার।

সে-রাতের পর সুনু কী বুঝেছে সেই জানে। চা কিংবা খাবার নিয়ে আসে, কিংবা কিছু বলবার জন্যে ঘরে পা দেয়—কিন্তু আর কখনো ভালো করে তাকাতে পারে না তার দিকে। চোখ নামিয়ে রাখে মাটিতে, গালে রঙ পড়ে, শাড়ীর আঁচল জড়াতে থাকে আঙুলে। হঠাৎ নিজের কাছে কেমন অপরাধী মনে হয় বিকাশের। বেশ তো ছিল এই পাড়াগেঁয়ে মেয়েটি।—বিকাশ কি তাকে—

'তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব

না।'—এই কথাটা ও-ভাবে না বললে কি কোনো ক্ষতি ছিল? অথবা—সেই রাত্রে—সেই ঘুম-জড়ানো বিহ্বলতার ভেতরে, সুনন্দর অতি-সান্নিধ্যে, তার দুটো চোখের ছায়ায়, তার শরীরের একটা মৃদু সুগন্ধের ভেতর—কথাটা বলবার ওপর কি তার নিজের সম্পূর্ণ হাত ছিল?

তবু বিকাশ সাধ্যমতো সহজ করে নিতে চাইল।

'পড়াশোনা কেমন চলছে?'

চোখ একবারের জন্যে উঠেই আবার নেমে গেল মাটিতে।

'ভালো।'

'বুড়ো আর কালি ঢালেনি বই-খাতায়?'

একটুকরো হাসি দেখা দিল ঠোঁটের কোণায় : 'না।'

'পড়াশোনায় দরকার হলে আমি সাহায্য করতে পারি।'

'আপনাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না।'

'এত ভদ্রতা কেন? হঠাৎ আমি পর হয়ে গেছি নাকি?'

কোনো জবাব এল না। মুখের রঙটা যেন নিবিড় হল একটু। তারপর :

'সেদিন ভোরবেলা আপনি বেহালা বাজাচ্ছিলেন, না?'

'তুমি জেগে ছিলে নাকি তখন?'

'না, ঠিক জেগে ছিলুম না। ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলুম। খুব অদ্ভুত লাগছিল।'

'তুমি সুর ভালোবাসো?'

'খুব!'—সুনুর চোখ এবার কিশোরীর সরলতায় স্বচ্ছ হয়ে উঠল : 'আরো আপনার বাজনা শুনলে আমার ভীষণ ভালো লাগে।'

'আমি তো ভালো বাজিয়ে নই। সামান্য শিখেছিলুম কেবল। নিজের আনন্দে যা হোক বাজিয়ে যাই। তবে তোমার মতো সমঝদার পেলে আমার মতো বাজিয়েরও বশ হওয়া শক্ত নয়।'

'জানি না।'—একটু চুপ করে থেকে সুনু বললে, 'জানেন, মা কতবার বাবাকে আমায় গান শেখার কথা বলেছেন। বাবা শুনলেই চটে যেতেন। বলতেন, হাঁ, গান শিখুক, তারপর ছোট মাসীর মতো—' বলতে বলতে থমকে থেমে গেল সুনু, সারা মুখে ছায়া নামল তার।

তৎক্ষণাৎ উৎকর্ণ হল বিকাশ।

'ছোট মাসীর মতো কী?'

ভয়ে আবছায়া হয়ে গেল সুনুর স্বর।

'সে থাক, পরে বলব।'

একটু চুপ। এই বাড়ীর সেই অপছায়াটা। একটা আত্মহত্যা ঘটে গেছে এখানে, তার স্মৃতিটা সুদূর নয়। সন্ধ্যার পর সেই বন্ধ ঘরটার পাশ দিয়ে যেতে সুনু ভয় পায়। কানাই পাল না প্রভাকর—কে বলেছিল? দুই বোনের সম্পত্তি সবটাই একা আত্মসাৎ করবেন বলে শশাঙ্ককাকা—

শুকনো গলায় বিকাশ বললে, 'এখন তো তোমাকে বাজনা শেখাবার জন্যে কাকার খুব উৎসাহ দেখছি।'

'আপনি আসবার পরে মত বদলেছে।'

কেন? একটা কুট প্রশ্ন ঝলকে গেল বিকাশের মনে। কী কারণে হঠাৎ এই সদিচ্ছাটা জেগে উঠল কাকার? কোনো উদ্দেশ্য নেই কি কোথাও? হিসেবী মানুষ শশাঙ্ক নিয়োগী কি উদ্দেশ্য ছাড়া একটি পা-ও ফেলেন কোনোদিন?

কিন্তু সব সন্দেহ মুছে যায় সুনুর দিকে তাকালে। সুনু—সুবর্ণা। আসবার পরেই কী ভেবে সে নাম দিয়েছিল সোনালি। শীতের আড়ষ্টতায় জড়ানো এই বাড়ীতে এক ঝলক সোনার আলোর মতো মেয়েটি। এখানে অনেক ফাঁকি থাকতে পারে কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে কোথাও নেই। আর নেই কাকিমার মধ্যেও—সংসারের আড়ালে একান্তে হারিয়ে-যাওয়া তাঁকে যতটুকু সে দেখেছে, তা থেকে এটুকু অন্তত বুঝেছে সে।

বিকাশ বললে, 'তোমার সেতার আসছে। আমি ক'দিন বাদে কলকাতায় যাচ্ছি, নিয়ে আসব।'

সুনুর চোখ আলো হয়ে উঠল।

'আমি বাজাতে পারব?'

'নিশ্চয়। কেন পারবে না?'

'যদি ঠিক মতো না পারি—' সুনু কথাটা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল : 'আপনি তো রাগ করে বলবেন না—যাও, তোমাকে আমি শেখাব না?'

'না—কোনোদিন বলব না। আমার যেটুকু বিদ্যে আছে, তোমাকে আমি সাধ্যমতো দিয়ে দেব।'

হঠাৎ এগিয়ে এল সুনু। প্রণাম করল বিকাশের পায়ে হাত ঠেকিয়ে।

আশ্চর্য হয়ে বিকাশ বললে, 'কী হল? প্রণাম কেন হঠাৎ?'

আচমকা—কী করে যে হল সুনু জানে না, সেই গভীর কান্নাটা আবার কেঁপে উঠল সুনুর ঠোঁটে। ধরা গলায় বললে, 'এমনি'—তারপরেই পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

একান্ত বিরস হয়ে ব্যাঙ্কে বসেছিল বিকাশ। একটা কাজে মন দিতে পারছে না। দু-তিন জায়গায় ভুল সই করবার পর, ক্ষিপ্তভাবে নীচের চায়ের দোকান থেকে চা আনালো এক গ্লাস। চা-টা মনে হল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি বিস্বাদ। গ্লাসটা সরিয়ে দিয়ে বসে রইল গুম হয়ে।

পকেটে মনীষার চিঠি। আজ এসেছে।

'চাকরি খুঁজছ, ভালো কথা। কিন্তু টাকাই তো একমাত্র প্রবলেম নয়। আসলে বাড়ীর সব যে আমাকেই দেখতে হয়। আমি এখানে না থাকলে—'

তুমি ওখানে না থাকলে! বিকাশের এমন একটা দানবিক চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল যেটা এই একশো মাইল দূর থেকেও কলকাতায় পৌঁছে যায়। তুমি ওখানে না থাকলে পৃথিবী অচল হয়ে যাবে, চন্দ্র-সূর্য উঠবে না। তুমি যদি আদৌ না জন্মাতে, তাহলে বিশ্ব-সংসারে তোমার মা-বাপ ভাই-বোনের কোনো অস্তিত্ব থাকত না। আজ যদি তুমি হঠাৎ মরে যাও, তাহলে তোমাদের সারা সংসার একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। তুমি ওখানে না থাকলে সংসারে সব থেমে যাবে, কারণ তোমার কলেজে-পড়া ভাইটাও পুরুষ-মানুষ নয়!

চিঠিতে আরো আছে।

'আমার সেই পেটের যন্ত্রণাটা এখন আর নেই। তবে মধ্যে মধ্যে স্লাইট টেম্পারেচার হয়। ও কিছু না, মনে হয় ঠাণ্ডা-ফাণ্ডার জন্যে—'

ঠাণ্ডা-ফাণ্ডার জন্যে! অবলীলাক্রমে সব মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন ডাক্তারী-বিদ্যা একেবারে সহজাত প্রতিভা মনীষার। বিকাশ দাঁতে দাঁতে চেপে ধরল। এর পরে একটি মাত্র কাজই করবার আছে। একেবারে কলকাতায় গিয়ে ডাকাতের মতো লুট করে আনা মনীষাকে। আর কিছু করবার নেই, কিছু না।

'এই যে ব্যাঙ্কার!'

উদ্ভাসিত সম্ভাষণে মুখ ফেরালো বিকাশ। সামনে প্রভাকর।

'বোস!'—জোর করেও চেহারায় প্রসন্নতা আনা গেল না : 'হঠাৎ কী মনে করে?'

'তোদের ব্যাঙ্কে আমারও যে ছোট্ট একটা অ্যাকাউণ্ট আছে হে। উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তবে তাই থেকেই কিছু তুলে নিয়ে যেতে হবে আজকে। কিন্তু ব্যাপার কী? এমন একটা আনপ্লেজেণ্ট চেহারা করে বসে আছিস কেন? কেউ চেক জাল করে টাকা নিয়ে সরে পড়েছে নাকি?'

'তোর চেক দে, পরে বলছি।'

প্রভাকরের চেকটা নিয়ে, ক্যাশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে বিকাশ পকেট থেকে বের করল মনীষার চিঠিটা।

'পড় এটা।'

'সেই—সেই তাঁর চিঠি নাকি?'

'হাঁ। মনীষারই চিঠি।'

'আমি? আমি পড়ব?'—কিন্তু-কিন্তু করতে লাগল প্রভাকর।

'স্বচ্ছন্দে পড়তে পারিস। ওটা প্রেমপত্র নয়। আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।'

'প্রেমপত্রের বয়েস তোর পার হয়ে গেল সাতাশ বছরেই?'—প্রভাকর হাসতে চেষ্টা করল : 'এ-যুগে তো ষাট বছরেও মানুষের যৌবন যায় না রে!'

'ইয়ার্কি ভালো লাগছে না প্রভাকর। পড়্।'

প্রভাকর পড়ল। হাসল না। চিঠিটা বিকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চুপ করে রইল।

'কী করতে বলিস?'

'একবার কলকাতায় গিয়ে ওঁকে ভালো করে মেডিক্যাল চেক-আপ করা। মনে হচ্ছে রেস্ট দরকার—নিউট্রিশন দরকার। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করে ফেল—নিয়ে আয় এখানে। বাসা না পাস, আমার কোয়ার্টারে বাড়তি ঘর তো রয়েইছে। তারপর আছি আমি আর আমার ডিসপেনসারী। কতদিন অসুস্থ হয়ে থাকতে পারেন আমি দেখে নেব।'

'তুই তো নিজেই যাবি বলেছিলি কলকাতায়।'

'হাঁ, কথা একটা ছিল। কিন্তু আপাতত বোধহয় যাওয়া হবে না, কতগুলো অসুবিধে রয়েছে। কিন্তু একটা চিঠি দিয়ে দেব আমাদের প্রোফেসারকে। তুই দেখাস তাঁকে। ফীজ—'

'সেজন্যে আটকাবে না।'

প্রভাকর হাসল : 'তা বলছি না। আমার কাছ থেকে গেলে ফীজ নেবেন না।'

'আমি ডাক্তারকে ফাঁকি দিতে চাই না।'

'আচ্ছা, তুই অফার করিস।'—আবার হাসল প্রভাকর : 'কিন্তু তুই যাচ্ছিস কবে? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আর বেশি দেরী করা উচিত নয়।'

এই সময় এসে দেখা দিলেন কানাই পালের সরকার।

'নমস্কার। এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো তো?'

প্রভাকর বললে, 'ভালোই। কী খবর?'

'খবর এই ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। বাবু এসেছেন আজ দিল্লী থেকে। বলে পাঠিয়েছেন, আজ অফিসের পরে ম্যানেজারবাবু যদি ও'র সঙ্গে চা খান, বাবু খুব খুশি হবেন।'

একটা চকিত বিস্ময় ফুটল প্রভাকরের মুখে। ওদিকের কাউন্টার থেকে কাশির আওয়াজ এল প্রিয়গোপালের। সেই কাশিটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্পষ্ট গলায় বিকাশ বললে, 'হাঁ নিশ্চয় যাব। কানাইবাবুকে বলবেন আপনি।'

(ক্রমশঃ)

মানুষগড়ার ইতিকথা

'তারপর?' ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হল।

'খবর এল দলে দলে ছেলে আসছে। স্কটিশের ছেলেরা স্ট্রাইক না করে ক্লাস করছে—এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। খবর আরও পেলাম যাঁরা আসছেন তাঁরা নিরস্ত্র নন। রীতিমত সহিংস পদ্ধতিতে তাঁরা গোটা ব্যাপারটা ট্যাকল করতে চান। হাতে সময় বেশী ছিল না যে টিচার্সদের ডেকে মিটিং করে কোন ডিসিশন নেব। সামান্য সময়ের হেরফেরে হয়তো রাস্তার দুধের গুমটি কি বাস বা ট্রামের মত আমার স্কুলের বিল্ডিং আমার চোখের সামনে পুড়বে। হয়তো দু-একটি নিরীহ ছেলে জখম হবে। উত্তেজনার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে হেনসম্যান সাহেবের নিজের হাতে গড়া সায়েন্স ল্যাবরেটরী।' একটু থামলেন হেডমাস্টারমশাই। বছর দুয়েক আগের একটি ছাত্র-আন্দোলনের ঢেউ থেকে নিজের স্কুল ও ছাত্রদের কি-ভাবে বাঁচিয়েছিলেন সে কথা বলতে বলতে বোধহয় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন এমিরেল রণজিত রায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলটা সামান্য ঘুরে গিয়ে ঘরের কোণে সযত্নে রাখা একটা মেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'এই মেশিনে ইচ্ছা করলে সব ক্লাসে আমি খবর পাঠাতে পারি। তবে আমার কথাই ঘরে ঘরে শোনা যাবে, অন্যদের কথা আমি শুনতে পাব না। তক্ষুনি স্কুল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমে নির্দেশ পাঠালাম প্রত্যেক ক্লাস-টীচারের কাছে—ক্লাস বন্ধ করে দিন। ছেলেদের বাড়ি চলে যেতে বলুন। এ-ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। দেখতেই তো পাচ্ছেন, রাস্তার উল্টোদিকে মেন বিল্ডিং।' জিজ্ঞাসা করলাম—'তারপর কি হল?' 'ব্যস কয়েক মিনিটেই স্কুল ফাঁকা। আন্দোলনকারীরা এসে দেখল স্কুলে কেউ নেই। আমার মুণ্ডপাত করতে করতে ফিরে গেল।'

মানুষ গড়ার ইতিকথায় স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল সম্বন্ধে লিখব বলে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম স্কুলে। বাঁয়ে বেথুন, ডাইনে স্কটিশ চার্চ কলেজ রেখে হেদুয়া পেরিয়ে একটা স্টপ যেতেই নেমে পড়লুম বাস থেকে। মুহূর্তে বেল বাজিয়ে ডবলডেকার উধাও হ'তে চোখের সামনে জেগে উঠল পুরোনো সিটি অফ প্যালেসেসের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, অথবা বিধান সরণি ও ঈশ্বর মিল লেনের মোড়ে দেয়ালঘেরা তিনতলা বাড়ি। যে আমলে এই বাড়ি তৈরী হয়েছে সে সময়ে মানুষগুলো বোধহয় বুকচাপা ঘরে থাকতে অভ্যস্ত ছিল না। আজকের দিন হলে ঐ তিনতলা বাড়ির মাল-মশলায় একটা চমৎকার ছ'তলা দেশলাই বাক্স বানিয়ে ফেলা যেত। থাক সে কথা, কি হলে কি হত, তা

"স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল"

দিয়ে কি হবে। এখন ঢুকব কোন পথে এ বাড়িতে। বড় রাস্তায় ফটক বন্ধ। বন্ধ দরজা দেখে ফিরে যাব? তাহলে কি ভুল ঠিকানায় এসেছি? এটা কি স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল নয়? তাহলে আলেকজান্ডার ডাফ সাহেবের স্কুল কোথায়?

ডাফ সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—ডাফ সাহেবের স্কুল এখানে কোথায়? সে ত চিৎপুরে। ফিরে চললাম পুরোনো কলকাতার আজ থেকে একশো উনচল্লিশ বছর আগে। কলকাতা তখন কোম্পানীর রাজ্যের রাজধানী। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গভর্ণর-জেনারেল। দেশ জুড়ে চলেছে তুমুল আন্দোলন। বয়ে চলেছে ধর্ম ও শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলনের যুগপ্লাবী স্রোত। 'হিন্দু কালেজ' ও স্কুল সোসাইটিজ স্কুলে পড়াশুনা চলছে ইংরেজীর মাধ্যমে। কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে পড়ানোর মাধ্যম আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত। প্রাচীনপন্থীরা চাইছেন শিক্ষার মাধ্যম হোক প্রাচ্যভাষা, রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীদের দাবী—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাগীরথী ইংরেজী হোক এদেশের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন। রামমোহন তখন গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ভীষণ অন-পপুলার তাঁর বৈদান্তিক মতবাদের জন্য। তাঁদের চোখে রামমোহন আর বিদেশী মিশনারীরা এক। ঝগড়া যখন চরমে উঠেছে, তখন নতুন এক ঝামেলা দেখা দিল। হিন্দু কালেজে'র ডিরোজিও সাহেবের শিষ্যরা ঘোষণা করলেন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ। দেশজোড়া এই তুমুল হট্টগোলের মধ্যে একজন স্কটিশ মিশনারী কলকাতায় এসে পৌঁছলেন—২৭ মে, ১৮৩০। নাম আলেকজান্ডার ডাফ, বয়স তেইশ। স্কট-ল্যান্ডের প্রাচীনতম চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ 'সেন্ট এন্ড্রুজ' থেকে তিনি এম-এ পাশ করেছেন। ইউনিভার্সিটিতে সাত বছরেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ডাফ নৈতিক পরিবেশের অভাবে। বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছায় আশ্রয় নেন 'জেনারেল অ্যাসেমব্লি অফ দি চার্চ অফ স্কটল্যান্ডে'। মিশন তাঁকে পাঠাল ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য।

ধর্ম প্রচার করবেন কি ডাফ, এদেশের মানুষ তখন খেপে গেছে মিশনারীদের উপর। হালে পানি না পেয়ে ডাফ স্থির করলেন স্কুল গড়বেন—স্কুল হবে তাঁর ধর্মপ্রচারের মাধ্যম। অল্পবয়েসী হিন্দু ছাত্রদের মনে খৃশ্চানিটির বীজ বুনবেন। কিন্তু 'হিন্দু কালেজে'র ছাত্রদের কাণ্ড-কারখানা দেখে শহর কলকাতার রইস আদমীদের তখন আক্কেল গুড়ুম হওয়ার জোগাড়। ইংরেজী শেখাতে চায় সবাই তার সন্তানকে, কিন্তু ভরসা হয় না পাদ্রীর হাতে ছেলে তুলে দিতে, যদি জাত মেরে দেয়। হতাশ হয়ে ডাফ শরণ নিলেন রাজা রামমোহনের। রামমোহন নিজে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে লড়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইংরেজী শেখা সবচেয়ে জরুরী। জরুরী বাইবেল পড়ে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। বিনাদ্বিধায় এই তরুণ মিশনারীর সাহায্যে এগিয়ে এলেন রাম-মোহন। চিৎপুরের ফিরিঙ্গি কমল বসুর যে বাড়িতে তাঁর ব্রহ্মসভার অধিবেশন বসত সেই বাড়ি ঠিক করে দিলেন ডাফ সাহেবের স্কুলের জন্য।

কলকাতায় পৌঁছানোর আটচল্লিশ দিন পরে ১৮৩০ সালের ১৩ই জুলাই ডাফ তাঁর স্কুল খুললেন। ছাত্র ছিল পাঁচটি। অবৈতনিক এই স্কুলের উদ্বোধন দিনে রামমোহন উপস্থিত থেকে ছাত্র ও গার্জেনদের উদ্দেশ্যে বললেন—'বাইবেল পাঠকে অযথা উপেক্ষা বা ভয় করিলে চলিবে না। ইহাতে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। খৃষ্টানেরা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ বা মুসলমানের কোরান পাঠে রত আছেন।...কিন্তু তাহাতে তো তাঁহাদের জাতি নষ্ট হয় নাই। বাইবেল পাঠেই বা কেন হিন্দুদের জাতি যাইবে?'

চার্চের নামে স্কুলের নাম হল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন। ইনস্টিটিউ-শনের নাম রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল শহরে। স্কুলের সুনামের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলল ছাত্রসংখ্যা। জায়গার অভাবে স্কুল-বাড়ি পাল্টে উঠে এল চিৎপুরে গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে, যেখানে প্রথম 'হিন্দু কালেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছাত্র-দের ভালভাবে পড়াবেন বলে ডাফ বাংলা শিখেছিলেন। ইংরেজী গ্রামার, ভূগোল, অঙ্ক, বাংলা শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে ডাফ খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। গত শতাব্দীর তিরিশের যুগে মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাফ খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেন।

পড়ানো ও ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যস্ত এই পণ্ডিত-মানুষটি অল্পদিনের মধ্যেই কল-কাতার শিক্ষা ও ধর্মীয় আন্দোলনের মূল-স্রোতে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। তাঁর পরামর্শেই লর্ড বেন্টিঙ্ক মেডিকেল কলেজে ইংরেজীর মাধ্যমে পঠন-পাঠনের নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাক-শন হিসেবে ইংরেজী চালু হওয়ার বছর-খানেক আগেই মেডিকেল কলেজে ইংরেজীর মাধ্যমে পড়ানো শুরু হয়। মেডিকেল কলেজের আদি যুগে ছাত্ররা আসত প্রধানত হিন্দু কলেজ, হেয়ার সাহেবের স্কুল সোসাইটিজ স্কুল ও ডাফ সাহেবের জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে।

চার বছরের হাড়ভাঙা খাটুনিতে ডাফের শরীর ভেঙে পড়েছিল। তাই কিছু-দিন বিশ্রাম নেবেন বলে দেশে ফিরে গেলেন। স্কুল চালানোর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন সুযোগ্য সহকর্মীদের হাতে। ১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হেদুয়ার পূর্বদিকে নিজস্ব বাড়ি তৈরী হয়ে গেলে স্কুল গরানহাটার পাট চুকিয়ে উঠে এল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে।

স্কুলের বাড়ি তৈরি হওয়ার দু' বছর বাদে চার্চের নির্দেশে ডাফ ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। এদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে যে-বীজ তিনি বুনে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখলেন তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই সেদিন তাঁর ছাত্রের দোকানের তাঁর নজর এড়ায়নি—"রামলোচন সেন অ্যান্ড বিজ্ঞাপন তাঁর নজর এড়ায়নি—"রামলোচন সেন অ্যান্ড কোম্পানী, সার্জন অ্যান্ড ড্রাগিস্ট।" কৃষ্ণমোহন তখন রেভারেন্ড কে এম ব্যানার্জি। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের লাগোয়া চার্চে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন তখন খৃষ্টের জীবনী ও বাণী বিতরণে ব্যস্ত।

সার্থকতায় উদ্দীপ্ত ডাফ ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তাঁর ছেড়ে-যাওয়া কাজ নতুন করে শুরু করার জন্যে। কিন্তু ডাফের গোটা কর্মজীবন জুড়ে ছড়ানো অসংখ্য বাধা। তাই এদেশে ফিরে আসার পর চার বছরও পার হয়নি, সাগরপার থেকে খবর এল, সরকারী হস্তক্ষেপ মানতে অস্বীকার করে ডাফের ইউনিভার্সিটি জীবনের মাস্টারমশাই ডঃ চামার্সের নেতৃত্বে পাঁচশো সদস্য জেনারেল অ্যাসেমব্লি অফ দি চার্চ অফ স্কটল্যান্ড ছেড়ে বেরিয়ে এসে গড়ে তুলেছেন অ্যাসেমব্লি অফ দি চার্চ অফ স্কটল্যান্ড ফ্রী। পুরোনো ও নতুন চার্চ দু-তরফই ডাফের সহযোগিতা প্রার্থনা করল। উদারমতাবলম্বী ডাফ তাঁর পুরনো মাস্টারমশায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে যোগ দিলেন ফ্রী চার্চে। ধর্মবিশ্বাস তাঁকে যখনই যে-কাজে নিযুক্ত করেছে, তখনি তিনি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাই এতদিনের পুরোনো আশ্রয় ছেড়ে আসার সময় এক-বারও তিনি একথা ভেবে বিচলিত হননি যে যদি নতুন সংস্থা তাঁকে নিয়মিত টাকাকড়ি পাঠাতে না পারে, তাহলে তাঁর সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পুরোনো সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলার জন্য হেদুয়ার বাড়ি তাঁকে ছেড়ে দিতে হল। কুছপরোয়া নেই, আবার গড়ব। নিজের হাতে গড়া স্কুল ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন নিমতলাঘাট স্ট্রীটে। গড়ে তুললেন এক নতুন কলেজ—ফ্রী চার্চ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন। লোকে বলত ডাফ কলেজ। তাঁর নতুন দুর্গটিকে স্বাগত জানাল কলকাতা। কাজল

ডাফ নিজেই একটি ইনস্টিটিউশন। লোকে ছুটত ডাফ সাহেবের কাছে যেমন অতীতে হেয়ার সাহেবের কাছে যেত ছেলেকে তাঁর স্কুলে ভর্তি করানের জন্য।

সে-যুগে স্কুল-কলেজ আলাদা আলাদা-ভাবে গড়ে ওঠেনি। স্কুলেই কলেজের কোর্স পড়ানো হোত ছেলেদের। তাই ইনস্টিটিউশনের নাম কলেজ হলেও স্কুলের পড়া তার বার আনা জুড়ে ছিল। নতুন কলেজ একটু দাঁড়াবার পর ফ্রী চার্চের ডাকে ডাফ আবার স্কটল্যাণ্ডে গেলেন। সিপাহী যুদ্ধের মুখে মুখে ফিরে এসে স্কুলের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিলেন। সেই সঙ্গে সরকারী অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধান প্রণয়ন কমিশনের সদস্যপদ তাঁকে গ্রহণ করতে হল। যুদ্ধ মিটে গেলে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হল। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সরকার ডাফ সাহেবকে অনুরোধ জানিয়েছিল—শরীরে কুলোয়নি বলে অক্লান্ত পরিশ্রমী ডাফ সেদিন সে-অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে-আন্দোলন রাজা রামমোহন, ডেভিড হেয়ার শুরু করেছিলেন, ডাফ সেই আন্দোলন-যজ্ঞের উত্তর-ঋত্বিক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন জেনারেল অ্যাসেমব্লি, মেডিকেল কলেজ, ডাফ কলেজ ও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে। ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাত বছর পরে ডাফ এদেশ ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর নিজের দেশে। আর কখনো ফিরে আসেননি। চলে গেলেন বটে এদেশের মায়া কাটাতে পারেননি কোনদিনও ডাফ সাহেব। সত্তর বছরের বুড়ো মানুষ নিজের হাতে-গড়া ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কৃষ্ণমোহনকে অনারারী এল এল ডি উপাধিতে ভূষিত করেছে জানতে পেরে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। প্রিয় ধর্মশিষ্য ডঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমস্ত মন-প্রাণ উজাড় করে অভিনন্দন জানিয়ে সেদিন চিঠি লিখেছিলেন ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ। এর দু' বছর পরে বাহাত্তর বছর বয়সে ডাফ মারা যান।

স্টকল্যাণ্ডে চার্চের অন্তর্বিরোধের ফলে এদেশে জেনারেল অ্যাসেমব্লি ছেড়ে ডাফ সাহেব যে কলেজ গড়ে তুলেছিলেন, তার মৃত্যুর তিরিশ বছর পরে নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে সেই কলেজ আবার অ্যাসেম্ব্লির সঙ্গে জুড়ে যায়। যুক্ত হওয়ার আগে পঁয়ষট্টি বছর এই দুটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে আসছিল। এই দীর্ঘ সময়ে জেনারেল অ্যাসেমব্লির পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন ওগিলভি হেস্টি, স্মিথ, মরিসন ও ওয়ান এবং ডাফ কলেজে আলেকজাণ্ডার ডাফ ছাড়া ফাইফ, রবার্টসন, হেক্টর প্রভৃতি স্কটিশ মিশনারীরা। অসংখ্য কৃতী ছাত্র এই দুটি শিক্ষায়তনে সে যুগে পড়েছেন। 'লোক টেলস অফ বেঙ্গল' এবং 'বেঙ্গল পেজান্ট লাইফ'-এর রচয়িতা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ডাক্তার দ্বারকানাথ বসু ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব গত শতাব্দীতে জেনারেল অ্যাসেমব্লির ছাত্র ছিলেন।

নতুন শতাব্দীর সূচনায় চার্চ দুটির পুরোনো ঝগড়া অনেকটা মিটে যাওয়ায় প্রমাণ পাওয়া গেল একটি সিদ্ধান্তে—অন্তত শিক্ষাবিষয়ে তারা একযোগে ভারতবর্ষে কাজ করবে। ফলে ১৯০৮ সালে জেনারেল অ্যাসেমব্লি ও ডাফ কলেজ জুড়ে গিয়ে নাম হল 'স্কটিশ চার্চেস কলেজ অ্যাণ্ড কলেজিয়েট স্কুল'। চিৎপুরের পাট গেল চুকে। নতুন করে পুরোনো পট উঠল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে।

ফিরে এলাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে। না ঠিকানায় কোন ভুল হয়নি, তবে সামান্য হেরফের ঘটে গেছে। পুরোনো বাড়িতে জায়গা হয়নি বলে কলেজিয়েট স্কুলের জন্য রায়বাগানে ঈশ্বর মিল লেন আর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ে উঠেছে তিনতলা বাড়ি সেই ১৯০৮ সালে। কলেজ থেকে দূরে সরে এলেও স্কুলপরিচালনার দায়িত্ব ছিল একই পরিচালনা সমিতির হাতে। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

নতুন বাড়িতে স্কুল যখন উঠে এল তখন হেডমাস্টার ছিলেন এম এম বোস। সাত বছর এই দায়িত্ব বোস-মশাই পালন করেছেন। স্কটিশের হেড-মাস্টার ঠিক অন্যান্য স্কুলের হেড-মাস্টারের মত সমান অধিকার সে যুগে ভোগ করতেন না। হেড-মাস্টার পোস্টের উপরে স্কুলের সম্পূর্ণ তদারকীর জন্য থাকতেন সুপারিনটেনডেন্ট। এই পোস্ট স্কটিশ মিশনারী ছাড়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হত না। বোস-মশায়ের সময়ে তিন-তিনজন মিশনারী সুপারেনটেনডেন্ট হিসাবে পর পর কাজ করেছেন—জন ল্যাম্ব, আলেকজাণ্ডার মবালিন, অ্যালান ক্যামেরন।

প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে স্কুলের অ্যাসিসটান্ট হেড-মাস্টার হয়ে এলেন সে যুগের খ্যাতনামা শিক্ষক রায়-সাহেব বি এম বোস। এম এম বোসের পর হেড-মাস্টার পোস্টে দীর্ঘদিন কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি। তখন স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট রেভারেণ্ড ডব্লিউ আলেকজাণ্ডার। রায়সাহেবের ইতিহাস ও ভূগোলের নোটের খ্যাতি সে যুগে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর আমলেই প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্কুলে টেলিগ্রাফী শেখানোর জন্য একটি কোর্স চালু হয়েছিল। প্রায় একযুগ চলবার পর কোর্সটি উঠে যায়। টেলিগ্রাফী কোর্সটি উঠে গেলেও প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যে বয়েজ স্কাউট বিভাগ খোলা হয়েছিল এ বছর তার বয়স হল পুরো পঞ্চাশ। ভারতীয় স্কাউটিংয়ের ইতিহাসের যে কোন মনস্ক পাঠকেরই জানা আছে এস এন ভোসের নাম। মিঃ ভোস ছিলেন স্কটিশের গ্রুপ মাস্টার। স্কুলের সে এক একসপানশনের যুগ। স্কুল তখন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে অনেক, সুনামও প্রচুর। এই সময়ে যখন মোটে দুটি বছর আর বাকী স্কুলের শত-বর্ষপূর্তির, সবাইকে ফাঁকি দিয়ে রায়-সাহেব চলে গেলেন সেই দেশে, যেখান থেকে কেউ কোনদিনও ফেরেনি।

রায়সাহেবের পরিত্যক্ত চেয়ারে এসে বসলেন তাঁরই দীর্ঘদিনের সহকর্মী পি সি কর। করমশায়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলেত থেকে এলেন জে সি হেনসম্যান স্কুলের সুপারেনটেনডেন্ট হয়ে। জাতে ইংরেজ হেনসম্যান এদেশে আসার আগে ইংলণ্ডে পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। কেমিস্ট্রির টিচার ছিলেন স্ট্যামফোর্ডের পাবলিক স্কুলে। হেনসম্যানের আগে কখনো মিশনারী ছাড়া আর কেউ স্কুলের এই পোস্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাননি। হেনসম্যান প্রথম।

হেনসম্যান প্রায় তিরিশ বছর স্কটিশে ছিলেন। এই তিরিশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে স্কুলের। তাঁর আমলের প্রায় মুখে মুখে স্কটল্যাণ্ডে বহু পুরোনো

একটা ঝগড়া একেবারে মিটে যায়—পুরোনো ও নতুন চার্চ ডাফের মৃত্যুর বহুকাল পরে সব ঝগড়া ভুলে মিলেমিশে গেল। স্কটল্যাণ্ডে পরিবর্তনের ঢেউ কলকাতায় এসে পেঁাছতে সময় লাগে নি আদৌ। স্কটিশ চার্চেস কলেজিয়েট স্কুলের নাম পালটে হল স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল। দেখতে দেখতে স্কুলের বয়স পেরিয়ে গেল একশ'র কোঠা।

শতবর্ষপূর্তি উৎসবের ছ বছর পরেই স্কুলের পরিচালনব্যবস্থায় এল এক দারুণ পরিবর্তন। এত বছর একই পরিচালন সংস্থা চালিয়ে এসেছে স্কুল ও কলেজ। ১৯৩৬ সালে দুটি স্বতন্ত্র পরিচালন সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হল এই দায়িত্ব। কলেজের পরিচালন সংস্থার নাম সেনেটাস, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি। দুটির উপরে সুপার কেবিনেটের মত রইল কাউন্সিল অফ দি স্কটিশ চার্চ কলেজ অ্যাণ্ড কলেজিয়েট স্কুল।

মাথার উপরে ম্যানেজিং কমিটি থাকলেও আদতে স্কুল চালিয়েছেন হেনসম্যান ও পি সি কর। অর্গানাইজার হিসাবে অ্যাডমিনিসট্রেটর হিসাবে হেনসম্যান এক অতুলনীয় মানুষ। তাঁর আমলেই রায়বাগানের বাড়ি উঠেছে। তখন এ বাড়ির নাম ছিল রায়বাগান বিল্ডিং। বিল্ডিংয়ের একতলায় ছিল ঢাকা খেলার মাঠ। দোতলায় শুধু একটি ঘর। ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে অনুমোদন আদায় করে ঐ বাড়িতেই হেনসম্যান খুললেন তাঁর স্কুলের সায়েন্স ল্যাবরেটরী। এসব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের ঘটনা।

হেনসম্যান যখন স্কুলের অ্যাডমিনিসট্রেশন ও একসপানশনের কাজে ব্যস্ত, তখন পঠন-পাঠনের সব ভার ছিল কর-মশায়ের উপর। হেনসম্যান নিশ্চিন্ত ছিলেন যোগ্য-লোক সর্বদাই তাঁর পাশে রয়েছেন। কিন্তু একযুগও পার হল না, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক একটি বছর আগেই একুশ বছর একটানা স্কুলের সেবা করে কর-মশাই মারা গেলেন। কর-মশায়ের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে কুচবিহার থেকে এলেন সুইডিস মিশন ইনসটিটিউশনের হেড-মাস্টার এমিয়েল রনজিত্ রায়।

গত একত্রিশ বছর ধরে রায়মশাই স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে মিশে আছেন। খেলোয়াড়ী কাঠামোর এই মানুষটি চশমার আড়ালে দু-চোখ জুড়ে শুধু স্বপ্ন। এই স্কুল তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনা। স্কুল নয় যেন ল্যাবরেটরী। জীবন গড়ার ল্যাবরেটরীতে আজীবন পরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন রায়মশাই। জীবনের প্রান্তে পেঁাছেও, বিদায় নেওয়ার সময়েও তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন গবেষণার নবতর দিগন্ত উন্মোচনে। সময়ের ঢেউ তাঁর কপালে এঁকে গেছে অসংখ্য অভিজ্ঞতার রাজটিকা। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনবার জন্যই ইতিহাস অনুসরণ করে এই ঘরে এসেছি। স্কুলের মেন-বিল্ডিংয়ের পেছনেই হেনসম্যান ব্লক। তারই দোতলায় হেডমাস্টারমশায়ের ঘর। এই ঘরে বসে তাঁর মুখ থেকে শুনেছিলাম স্কুলের সেকাল ও একালের কথা। স্কুলের শতবর্ষের ইতিহাস বর্ণনায়, পূর্বসূরীদের প্রশংসায় যে মানুষ এতক্ষণ মুখর ছিলেন, আত্ম-পরিচয় পর্বে এসে কেমন চুপ মেরে গেলেন। সেকাল ও একালের মাঝে দাঁড়িয়ে তখন নিজেই কেমন অধীর হয়ে উঠেছি, জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এলেন কুচবিহার থেকে। তখন ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও এসে গেছে। তারপর কি হল?

আবার শুরু হল। বলে চললেন রায়মশাই। দেখতে দেখতে যুদ্ধ এসে গেল। হেনসম্যান যুদ্ধে জয়েন করলেন। তখন গোটা স্কুলের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। স্কুলের পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী সুপারিনটেনডেন্ট বা হেডমাস্টারের অবর্তমানে কলেজের কোন ইউরোপীয় শিক্ষকের সাময়িকভাবে ঐ পদে বহাল হওয়ার কথা। রায়মশাই কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক আর্থার মোয়াটকে রিকোয়েস্ট করলেন—আপনি এই দায়িত্ব নিন! মোয়াট গোড়ায় রাজী হননি। উল্টো বললেন—আমি স্কুলের বিষয়ে কি জানি? তুমি সব জান, তুমিই চালাও। শেষ পর্যন্ত রনজিতবাবুর অনুরোধ মোয়াট সাহেব ঠেলতে পারেন নি। যুদ্ধশেষে হেনসম্যান ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি স্কুলের টাইটুলার হেড হয়ে ছিলেন—করতেন কর্মাতেন সবই রায়মশাই। ১৯৫৮ সালে হেনসম্যান দেশে ফিরে গেলেন। হেনসম্যানের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন রনজিত রায়। তিনিই স্কটিশের প্রথম ভারতীয় হেডমাস্টার যার উপরে কোন ইউরোপীয় মিশনারী সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে আসেন নি। মিশন ঐ পোস্টটা তুলে দিয়েছেন। যুগ পাল্টেছে, হাওয়াও বদলে গেছে।

'কত অজানারে'-এর বারওয়েল সাহেবকে মনে আছে আপনার? রায়মশাই প্রশ্নটা এমন আচমকা ছুঁড়ে দিলেন যে গোড়ায় ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। বললাম বারওয়েলকে নিশ্চয়ই মনে আছে, কিন্তু কেন? জবাব এল—১৯৪১-এ ব্যারিস্টার বারওয়েল ছিলেন ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সভাপতি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইংলিশের প্রফেসর সুহাস রায় আর আমি দুজনে গিয়ে বারওয়েলকে ধরে পড়লাম, সুইমিং এসোসিয়েশনের আন্ডারে যে স্কোয়ারগুলো আছে, সেগুলোতে সেফটি জোন খুলতে হবে। স্কুলের ছেলেরা যাতে সাঁতার শিখতে পায়। বারওয়েল আমাদের অনুরোধ রেখেছিলেন। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে তিনি যে কোন ভুল করেন নি, তারই জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের স্কুলের ছাত্র বিমল চন্দ্র, অরুণ সাহা, রাজীব সাহা। অরুণ অর্জুন পুরস্কার পেয়েছে সেকথা ত জানেন। বললাম—জানি। কিন্তু ছেলেদের সাঁতার শেখানোর জন্য আপনার যখন এত ইচ্ছা তখন আপনি নিশ্চয়ই অতীতে একজন চ্যাম্পিয়ন সুইমার ছিলেন? হো হো করে হেসে উঠলেন রনজিতবাবু। হাসি থামিয়ে চুপি চুপি বললেন—আমি সাঁতারই জানি না। সাঁতার আমি জানি না, কিন্তু আমার স্কুলের ছেলেরা সব ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়ন।

শুধু কি সাঁতারে? খেলাধুলোর কোন বিভাগে স্কটিশের ছেলেরা যুগে যুগে সুনাম অর্জন করেনি? এই স্কুলেরই ছাত্র বলাই চ্যাটার্জি, সুশীল বোস, প্রেমাংশু চ্যাটার্জি, জ্যোতিষ মিত্র, কল্যাণ মিত্র, প্রশান্ত ভট্টাচার্য। মাঝমাঠ থেকে বল টেনে এনে গোলের মুখে কিভাবে চুনী গোস্বামী পাস দিলেন অরুময়কে—খেলার মাঠের সেই অদ্বিতীয় ভাষ্যকার অজয় বসু স্কটিশেরই ছাত্র।

স্কুল থেকে মাইলখানেক দূরে মানিকতলা খালের পুব ধারে দু-দুটো মাঠ স্কুলের। একটা ছোট, আর একটা বড়

সাইজ। এই মাঠের সদ্ব্যবহার ছেলেরা ভাল-ভাবেই করেছে। তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি ও অ্যাথলেটিকসের রেকর্ড বইয়ে। গত পনেরো বছর ধরে অ্যাথলেটিকসে উত্তর কলকাতা জেলা স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই স্কুলের ছেলেরা একচেটিয়াভাবে কাপ-মেডেলগুলো দখল করে আসছে।

খেলাধুলোর পাশাপাশি ডিবেটে, গানে এই স্কুলের ছাত্রদের সুনাম চিরদিনই বজায় থেকেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যাঁরা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন, তাঁদের হয়তো মনে আছে চামেলীকুমার চ্যাটার্জিকে, সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ডিবেটার। গানে নচিকেতা ঘোষ আজ একটি নাম। হেনসম্যান সাহেব যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাঁর বিদায় সভায় নচিকেতা গান গেয়েছিলেন—আজও সে কথা রনজিতবাবুর মনে আছে।

মনে আছে রণজিতবাবুর আরো অনেক কথা। প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রভাতকিরণ বসুকে স্কুল আজো মনে রেখেছে। মানুষ গড়ার কারিগর ফিরিস্তি দিয়ে চললেন তাঁর স্কুলের নামী ছাত্রদের, যাঁরা পরবর্তী সময়ে জাতীয় জীবনে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারী এম এম বোস, রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্কটিশেরই ছাত্র। পশ্চিম বাংলার আজকের তথ্যমন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য ও প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সহায়রাম বসুর ছেলে বৈজ্ঞানিক দেবকুমার বসু এই স্কুলেরই ছাত্র। রায়-মশাই বললেন জ্যোতি ভট্টাচার্য ও দেবকুমার বসু একই ক্লাসে প'ড়ত। পড়াশুনোর বিষয়ে ওদের মধ্যে ছিল দারুণ কম্পিটিশন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বর্তমান কন-ট্রোলার অফ এগজামিনেশন ডঃ এ এন দাঁ ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন স্কটিশ থেকে। সুদূর অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই স্কুলের ছেলেরা বহুবার এনট্রান্স ও ম্যাট্রিকে প্লেস পেয়েছে। স্কুল-ফাইন্যালের প্রথম বছরে ফার্স্ট হয়েছিল এই স্কুলেরই ছাত্র।

হেনসম্যান সাহেবের রিটায়েরমেন্টের বছরেই স্কুল আপ-গ্রেডেড হল। আপ-গ্রেডিংয়ের সময় সায়েন্স স্ট্রীমের প্রয়োজনে রায়বাগান বিল্ডিংয়ের দোতলায় আর একটি তলা উঠল। স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের জন্মদাতার প্রতি স্কুল তার কৃতজ্ঞতা ভোলে নি। রায়বাগান বিল্ডিংয়ের গায়ে আজ বড় বড় হরফে লেখা আছে হেনসম্যান ব্লক।

হায়ার সেকেন্ডারী শুরু হল স্কুলে শুধু সায়েন্স আর হিউম্যানিটিজ স্ট্রীম নিয়ে। বছর ছয়েক আগে চালু হয়েছে কমার্স স্ট্রীম। জিজ্ঞাসা করলাম—হায়ার সেকেন্ডারী চালু হওয়ার পর আপনার স্কুলের রেজাল্ট কি রকম হচ্ছে? প্রশ্নটা যে করব বোধহয় আগেই তা অনুমান করে-ছিলেন রায়মশাই। গড় গড় করে বলে গেলেন গত আট বছরের রেজাল্ট। সায়েন্সে এই স্কুলের পাশের হার গড়ে বিরানব্বই পারসেন্ট। হিউম্যানিটিজে ঐ হার চুরাশী পারসেন্ট। কমার্সে গত তিন বছরের গড় প্রায় আশী পারসেন্ট। সায়েন্সে দুটি জিনিস এ স্কুলের ছেলেরা বাঁধা করে নিয়েছে—ফার্স্ট ডিভিশন আর অঙ্কে লেটার। চৌষট্টি থেকে সাতষট্টি পর পর চার বছর এই স্কুলের ছেলেরা অঙ্কে ফার্স্ট হয়েছে।

সায়েন্সের বিশেষ করে অঙ্কের রেজাল্ট এত ভাল হচ্ছে কি করে জিজ্ঞাসা করাতে রায়মশাই বললেন, কারণ একটাই—খাঁটি শিক্ষক। এই স্কুল গর্ব করতে পারে তার অঙ্কের টিচারদের ট্র্যাডিশন সম্পর্কে। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর গোড়ায় ননীলাল মল্লিক থেকে শুরু করে আজকের শ্যামাদাস মুখার্জি পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে দিকপাল অঙ্কের মাস্টারমশাইরা পড়িয়ে আসছেন। ননীবাবুর পরে পরেই গত শতাব্দীর বিখ্যাত অঙ্কবিদ গৌরীশংকর দের ছেলে বিজয়চন্ডী দে এই স্কুলে অঙ্ক পড়িয়েছেন। আত্মভোলা বিজয়বাবু রাস্তা পার হ'তে হতে অঙ্কের প্রবলেম ভাবতেন। ক্লাসে ছেলেরা হাঁপিয়ে উঠত শক্ত অঙ্কের ঠেলায়। এত কঠিন অঙ্ক কোথায় পেলেন স্যার—ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করলে মাস্টার-মশায়ের প্রশান্ত মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। বাড়ি থেকে স্কুলে আসতে তিনটে রাস্তার মোড় পেরুতে হত। মোড়ে মোড়ে নতুন নতুন অঙ্ক প্রবীণ শিক্ষকের মাথায় আসত, সেকথা ছাত্ররা জানবে কি করে। বিজয়বাবুর পরে সেই ট্র্যাডিশন সমান গৌরবে বজায় রেখেছেন বিষ্ণুহরি দত্ত। যেমন বিষ্ণুবাবুর উত্তরসূরী শ্যামাদাস মুখার্জি এ যুগেও সেই ট্র্যাডিশন রেখেছেন বজায়।

শুধু কি অঙ্কে? অন্য বিষয়েও স্কুলের ভাগ্য চিরকালই সুপ্রসন্ন। ইংরেজীর অথরিটি ছিলেন মনোরথ রায়। সহকর্মীরা প্রয়োজনে ডিকসনারী বা নেসফিল্ডের বদলে মনোরথ রায়কে উল্টে-পাল্টে দেখতেন। যেমন সংস্কৃতের বাঘা শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত ভূতনাথ বিদ্যারত্ন। এ পি রায়ের মত শিক্ষক যে কোন স্কুলেরই গৌরব। স্কুল তার কৌস্তুভমণিকে বুকে আজও ধারণ করে আছে। রিটায়ার করার পরও এ পি রায় এমেরিটাস টিচার হিসাবে স্কুলের সঙ্গে জড়িত আছেন। যুগে যুগে এঁদের মত শিক্ষকরাই স্কুলের গৌরব বাড়িয়েছেন।

গৌরব শব্দটি যে আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল রায়মশায়ের মুখে সে আলোর দীপ্তি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। কোন প্রশ্ন করার দরকার হয়নি। নিজে থেকেই বললেন—হেনসম্যান সাহেব যে বছর রিটায়ার করলেন সে বছর প্রাইমারী সেকেন্ডারী মিলিয়ে এ স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল এগারো শ'। আজ ডবল হয়ে গেছে স্টুডেন্টস স্ট্রেংথ। প্রাইমারী সেকেন্ডারী, পার্টটাইম মিলিয়ে সত্তরজন শিক্ষক পড়াচ্ছেন। স্কুলের তিন তিনটে বাড়ি। মেন বিল্ডিং ও হেনসম্যান ব্লক সেকেন্ডারী সেকশনের জন্য। প্রাইমারী সেকশন বসে ৩২।৮ বিডন স্ট্রীটের তিনতলা বাড়িতে। এত বড় স্কুল। হাজার হাজার অ্যাপ্লি-কেশন প্রতি বছর পাই ভর্তির সময়। কত অনুরোধ আসে—কতটুকু তার রাখতে পারি। পারি না তার কারণ সুনামটুকু রাখতে চাই। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সুনাম থাকবে কিনা বলা শক্ত।

কেন? হেডমাস্টারমশায়ের হতাশা আমাকে আশঙ্কিত করে তুলল। ডাফ সাহেবের স্কুল একশ চল্লিশ বছর পরে রায়-মশায়ের সময়ে এসে কি দম হারিয়ে ফেলেছে? কেন এত চিন্তিত রায়মশাই? যাঁর স্কুলের রেজাল্ট এত ভাল, তাঁর ভাবনা কিসে? তবে কি তিনি ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য চিন্তিত? কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে যখন ছাত্র-বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও স্কটিশের স্কুলে সেই আগুন ত এসে পৌঁছায়নি। বরং অন্য স্কুল-কলেজে যখন স্ট্রাইক চলছে, চলছে ঘেরাও তখনো স্কটিশে ক্লাশ হয়েছে। কখনোসখনো নিরুপায় হলে হেডমাস্টারমশাই দিয়েছেন সাময়িকভাবে স্কুল বন্ধ করে। তাহলে?

বোধহয় বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। হেসে উঠলেন মাস্টারমশাই। বললেন ভয় আমার স্কুল নিয়ে শুধু নয়—গোটা দেশটার কথা ভেবেই আমি ভয় পাই। এগারো ক্লাস শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের ছেলেদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে হিমালয় পর্বত। এই বোঝা ছেলেরা বইতে পারবে কিনা সেকথা কর্তৃ-পক্ষ চিন্তা করেননি। বলতে বলতে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রায়মশাই—বলুন ত' ক্লাস এইটের একটা বারো তেরো বছরের ছেলের এমন কি ম্যাচুরিটি গ্রো করে যে একটা ক্লাস ওপরে উঠতে না উঠতে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় স্পেশালাইজেশনের দিকে। সামান্য চয়েসের ভুলে একটা ছেলের ভবিষ্যৎ চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যেতে পারে সে কথা কি অথরিটি কখনো ভেবেছেন? এদেশে কি সেইভাবে বাছাই করে নেওয়ার মত, নাইন, টেন, ইলেভেনে পড়ানোর মত উপযুক্ত শিক্ষক গণ্ডায় গণ্ডায় আছে? না, নেই। উপযুক্ত শিক্ষক নেই, বিশাল কোর্স, এর ফল যে কি হবে তা আপনারা দেখতেই পাবেন। আমার দিন ত শেষ হয়ে এল। আগামী বছর রিটায়ার করব। কিন্তু শিক্ষার কি হবে?'

ফেরার পথে সে কথাই ভাবছিলাম—শিক্ষার কি হবে? স্কটিশের রণজিতবাবু, ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর রাসবিহারীবাবু এঁরা ত আজ বাদে কাল রিটায়ার করে যাবেন। এঁরা থাকবেন না, তাহলে স্কুল থাকবে, ছাত্র থাকবে, থাকবেন শিক্ষকরা, থাকবে আজকের হায়ার সেকেন্ডারী শিক্ষা [illegible] কি শুনেছি [illegible] বাংলো-[illegible] হয়ে উঠবে। কিন্তু এঁরা চলে গেলে [illegible] অভাবে সলতে নিভে যাবে না ত'?

—সাপ্তাহেন্দু

প্রিয়নাথ দারোগার দপ্তর

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আদি কলকাতার স্বনামধন্য গোয়েন্দা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর দারোগার দপ্তরে বহু সত্য ঘটনার কেস-হিস্ট্রি লিখে গেছেন। যে কাহিনীটি এখানে আধুনিক বিন্যাসে পরিবেশন করা হল তার সঙ্গে প্রিয়নাথের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। পুলিশের চাপা-দেওয়া রেকর্ড থেকে তিনি ঘটনাটি জানতে পারেন। মূল কাহিনীটি বলবার আগে এ সম্পর্কে প্রিয়নাথবাবুর মুখবন্ধটি হুবহু উদ্ধৃত করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তাতে পাঠকদের পক্ষে তখনকার দিনের পুলিশী ব্যবস্থা জানবার সুবিধা হবে।

প্রিয়নাথবাবুর ভাষায় : "ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশীয় পুলিশ বিভাগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোন থানার অন্তর্গত কোন স্থানে কোন ঘটনা ঘটিলে, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সেই ঘটনা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্গত যে কোন থানার এলাকায় গমন করিয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন; কিন্তু অপর থানার এলাকায় অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবার পূর্বে প্রথমত তাঁহাকে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এক স্থানের পুলিশ অপর স্থানের পুলিশের নিকট সরকারী কার্য উপলক্ষে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সেই স্থানের পুলিশের নিকট তিনি পরিচিত না হইলেও, সাহায্য পাইয়া থাকেন। সমস্ত পুলিশ কর্মচারিই যে পরস্পরের পরিচিত তাহা নহে, তাঁহারা পরস্পরের পরিহিত পোষাক দেখিয়াই পরস্পরকে প্রকৃত পুলিশ কর্মচারী বলিয়া স্থির করিয়া লন ও পরস্পরকে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই একরূপ নিয়মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।"

বাংলা ১৩০৫ সালের ঘটনা।

একদিন ছ'জন লোক শ্যামপুকুর থানায় উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে একজন পুলিশের ইন্সপেক্টার, অপর দুজন কনস্টেবল। অন্য দুজনের হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি। বোঝা যায়, তারা চুরি বা অন্য কোন ফৌজদারী মামলার আসামী বা [illegible]

দেখে গ্রামের আধা-ভদ্র কোন মানুষ বলে মনে হয়।

শ্যামপুকুর থানার অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে দেখা করে আগন্তুক পুলিশ কর্মচারীটি বললেন—'আমি ক্যানিং থানার অফিসার, আমার নাম জগদীশ পান্ডে। আমার এলাকায় দিন পনেরো আগে এক ভয়ানক ডাকাতি হয়ে গেছে। বিশ পঁচিশজন ডাকাত ওখানকার ধনী ব্যাপারি রামনারায়ণ তরফদারের বাড়ি ডাকাতি করে বহু টাকার গয়নাগাটি নিয়ে গেছে। আমি সে সময় ক্যানিং-এ ছিলাম না, একটা খুনী-মোকর্দমার তদন্তে হাওড়া অঞ্চলে গিয়েছিলাম। দুদিন পরে আমি ফিরে আসতেই ওই এলাকার বড় সাহেব আমায় ডেকে এই কেসের ভার দেন। আমি কয়েকদিন তদন্ত করে কিছু সূত্র পাই এবং ক্রমে দশজনকে গ্রেপ্তার করি। তাদের মধ্যে চারজন তাদের দোষ স্বীকার করে এবং ভিতরকার কথা আমায় জানায়। দুজন ডাকাত তাদের ভাগে যে সমস্ত গহনা পেয়েছিল সেগুলি উদ্ধার করেছি। গহনাগুলো তারা পাটনায় নিয়ে গিয়ে এক পোদ্দারের কাছে বিক্রি করে এসেছিল। অপর দুজন ডাকাত বলছে, আপনার এলাকার অন্তর্গত দুজন পোদ্দারের কাছে তাদের অংশ বিক্রি করেছে। যে দুজন আসামী এই কথা স্বীকার করেছে তারা আমার সঙ্গেই এসেছে, বাইরে দুজন কনস্টেবলের হেপাজতে আছে। তাদের জিজ্ঞেস করলেই আপনি সমস্ত কথা জানতে পারবেন। এখন, যাতে ঐ দুজন পোদ্দারের কাছ থেকে চোরাই মাল উদ্ধার করতে পারি আপনাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আপনি স্থানীয় অফিসার। আপনি একটু কষ্ট স্বীকার করলেই অনায়াসে কার্য সিদ্ধ হতে পারে। আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে আমি তো আপনার এলাকায় তদন্ত চালাতে পারি না।"

ক্যানিং থানার অফিসারের কথা শুনে শ্যামপুকুরের অফিসার রাজেন সরকার বললেন—এ আর বেশি কথা কি! আপনিও সরকারের চাকর, আমিও সরকারের চাকর। সরকারি কাজে আপনি আমার কাছে এসেছেন। আপনাকে সব রকমে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য। অবশ্যই আমরা এখনি সেই পোদ্দার দুজনের খোঁজ করব। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে এই যে, যদি খানাতল্লাসী করে গয়না বেরোয় তাহলে সেগুলো যে সত্যিই চোরাই মাল তা সনাক্ত করবে কে? সনাক্ত না করলে তো সেসব জিনিষ আমরা আটক করতে পারব না।"

রাজেনবাবুর কথা শুনে জগদীশ পান্ডে বললেন—"সে বিষয়ে আমি আগেই ভেবে রেখেছি। আপনার কোন চিন্তা নেই। অলংকার সনাক্ত করতে পারবে এমন একজন লোক সঙ্গে করে এনেছি।"

এই কথার পর আর কালবিলম্ব না করে শ্যামপুকুর আর ক্যানিং-এর অফিসার দুজন দলবল নিয়ে বেরুলেন। চোর দুজনকে বলা হল, যে পোদ্দারদের দোকানে তারা গয়না বেচেছে সোজা সেই দোকানে চলুক।

শ্যামপুকুর থানার এলাকার কম্বুলিয়াটোলা। পুরনো পল্লী। সেখানে পাশাপাশি দুটি বড় পোদ্দারি দোকান। দুই মালিক, কিশোরীনন্দন আর বেহারী নন্দন। (দোকান দুটি এখনো আছে) চোর দু'জন সেই দুই দোকানের সামনে গিয়ে বললে যে তারা এই দুই দোকানে গহনা বিক্রি করেছে।

দুই ইন্সপেক্টার লোকজন সমেত দোকানে ঢুকলেন। পাশাপাশি দরজা, দুই ঘরের মাঝখানেও দরজা, একটা দোকানে ঢুকলেই দুটো দোকানের সঙ্গে কথা বলা যায়।

ইন্সপেক্টার আর চোর দু'জনের কথা শুনে দোকানদার দু'জন মহা কলরব তুলে বললে যে চোরদের কথা মোটেই সত্যি নয়, তাদের কাছ থেকে পোদ্দাররা কোন চোরাই গহনা কেনে নি।

ক্যানিং থানার অফিসার বললেন—"বেশ, কার কথা সত্যি তাতো জানা দরকার। আমরা আপনাদের দোকান সার্চ করব।"

পোদ্দার দু'জন বললে—করুন সার্চ। কোন আপত্তি নেই। আমরা এদের কাছ থেকে চোরাই মাল কেনা তো দূরের কথা, এদের আমরা জীবনে কোনদিন দেখিনি এর আগে।'

চোর দুজনও এদিকে তেমনি সমান জোরের সঙ্গে বলতে লাগল—"আমরা তোমাদের কাছেই গয়না বেচেছি আর তোমরা বলছ, আমাদের এর আগে দেখই নি। মিছে কথা বললেই হল।"

দুই ইন্সপেকটর পরামর্শ করে দোকান তল্লাস করাই সাব্যস্ত করলেন। পোদ্দারদের কাছ থেকে লোহার সিন্দুক, আলমারি, বাক্স প্রভৃতির চাবী নিয়ে সব খুলে দেখা হল। দেখতে দেখতে তাদের ভিতর থেকে নানা ধরনের অনেকগুলি নতুন ও পুরানো গহনা বেরুলো। চোর দু'জন বলে উঠল—"এই তো আমাদের চুরিকরা সব গয়না। দেখুন আপনারা পোদ্দার দু'জন কিরকম মিথ্যেবাদী।"

ক্যানিং থানার জগদীশ পান্ডে এবার তাঁর সঙ্গী ষষ্ঠ ব্যক্তিটিকে বললেন—"আপনি দেখুন সরকার মশাই। চিনতে পারেন গয়নাগুলো?"

সেই লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বললে—"চিনতে পারছি বৈকি!"

শ্যামপুকুরের ও-সি রাজেনবাবু লোকটির দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন—"কেমন করে চিনতে পারলেন? আপনি কে? আপনার পরিচয়ই বা কি?"

উত্তরে লোকটি বললে—"আমার নাম বৈদ্যনাথ হাজরা। আমি রামনারায়ণ তরফদারের সরকার। তিরিশ বছর তাঁর কাছে আছি। তাই আমি নিশ্চয় করে বলতে পারছি, এই সমস্ত গয়না আমার মনিবের।"

রাজেনবাবু বললেন—"এসব তো স্ত্রীলোকের অলংকার। আপনি চিনলেন কেমন করে?"

বৈদ্যনাথ জবাব দিল—"আমার হাত দিয়েই এইসব গয়না তৈরী হয়েছিল। আমার মনিবের বাড়ির যা কিছু কেনাকাটা সব আমার মারফৎ হয়ে থাকে। তাই খালি গয়নাগুলো দেখেই চিনতে পেরেছি। এর মধ্যে যেগুলো নতুন গয়না সেগুলো বন্ধকী।"

—"কার কাছে বন্ধক ছিল?"

বৈদ্যনাথ বললে—"কার কাছে আবার। আমার মনিবের কাছে। আমার মনিবের কাছ থেকে টাকা নেবার সময় অনেকেই ওইভাবে গয়না বাঁধা রেখে যায়। গয়নাগুলো জমা করা, হিসাব রাখা এবং তাদের সিন্দুকে তুলে রাখা—এসব কাজ আমিই করি। যে ঘরে সিন্দুক থাকে, রাত্রে আমি সেই ঘরেই শুই। ডাকাতরা সেদিন রাত্রে সেই ঘরে ঢুকে আমার সামনেই লোহার সিন্দুক খুলে গয়নাগুলো বার করে নেয়।"

ক্যানিং থানার জগদীশ পান্ডে এবার প্রশ্ন করলেন—"কার কাছ থেকে নতুন গয়নাগুলো আপনারা বন্ধক রেখেছিলেন?"

বৈদ্যনাথ বললে—"আমাদের গ্রামে এবং আশেপাশের গ্রামেও কয়েকঘর স্যাকরা আছে। তাদের যখন হঠাৎ হঠাৎ টাকার দরকার হয় তখন তারা তাদের দোকানের নতুন গয়না আমাদের কাছে বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে যায়। এগুলো সেই বন্ধকি গয়না।'

পোদ্দারদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলে উঠল—"একদম মিছে কথা বলছে সার! এসব গয়না আমাদের। কতক নতুন তৈরী করা, কতক বন্ধকি। খাতাপত্রে সব লেখা আর জমাখরচ করা আছে। আপনারা পরীক্ষা করে দেখুন।"

কিন্তু পোদ্দারদের কোন ওজর-আপত্তিই টিকল না। সনাক্তকারী বৈদ্যনাথ হাজরা যেসব গহনা সনাক্ত করল, ক্যানিং-এর ও-সি সেগুলো আলাদা করে রাখলেন। শ্যামপুকুরের অফিসার রাজেন সরকার যখন বুঝলেন যে, এই সমস্ত গহনাই দোকান থেকে স্থানান্তরিত করা হবে, তখন তিনি গহনাগুলির একটি তালিকা তৈরী করলেন এবং তালিকার নীচে নিজে সই করে তারিখ বসিয়ে দিলেন। ক্যানিং পুলিশের জগদীশ পাণ্ডে এবং রামনারায়ণের সরকার বৈদ্যনাথ হাজরাও সেই তালিকায় সই করলেন। এইভাবে লেখাপড়া শেষ হলে জগদীশ পাণ্ডে সেই সব অলংকার একত্র করে একটা বড় রুমালে বেঁধে নিলেন।

রাজেন সরকার জগদীশ পাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"এবার কি করণীয় ?"

জগদীশ বললেন— "এখানে আপাতত আর কিছু করণীয় নেই। তবু একবার আসামীদের জিজ্ঞেস করে দেখি।" এই বলে তিনি চোর দুজনকে প্রশ্ন করলেন—"তোমাদের ভাগে যে জিনিসগুলো পড়েছিল তার সমস্তই কি তোমরা এই দুই দোকানে বিক্রি করেছিলে, না, অন্য কোথাও অন্য কোন দোকানেও কিছু বিক্রি করেছো ?"

চোর দুজন বললে—"আজ্ঞে, আমরা যা পেয়েছিলাম, সমস্তই এদের কাছে বিক্রি করেছি, অন্য কোথাও যাই নি।"

অতঃপর দুই ইন্সপেকটার রাস্তায় এসে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। জগদীশ পাণ্ডে বললেন, তিনি এখনি পোদ্দার দুজনকে চালান দিতে চান না, তবে তাদের দুজনের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে যাতে না পালায়, এ-বিষয়ে তিনি ওপরওয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করে যা সিদ্ধান্ত হয় বা করে মামলার শুনানীর তারিখ পড়ে তা দু-একদিনের মধ্যেই শ্যামপুকুরকে জানাবেন আরও কিছু তদন্ত বাকি আছে, তাই হয়ত শ্যামপুকুরে খবর আসতে এক-আধদিন বিলম্ব হতে পারে।

আলোচনার পর দুজনে আবার দোকানে ঢুকলেন। জগদীশ পাণ্ডে চোরাই গহনাগুলির পুঁটলিটা নিয়ে কনস্টেবল দুজনকে বললেন—'চল, এবার যাওয়া যাক।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ছজনে একটা ঠিকা গাড়ী চেপে শিয়ালদহ স্টেশন অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

তারপর দু-তিন দিন ছেড়ে এক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু ক্যানিং থানা থেকে কোন খবর এলো না। পোদ্দার দুজন রোজই থানায় এসে খবর নিচ্ছিল—অবশেষে একদিন তারা থানায় এসে ইন্সপেক্টার রাজেন সরকারকে বললে—'মশায়, দেখলেন তো, তখনই বলেছিলাম ওসব জিনিস আমাদের, চোরাই মাল নয়, আপনারা আমাদের কোন কথাই শুনলেন না। এখন বুঝুন ব্যাপার। জোচ্চোরের দল আপনার চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে গেল।'

রাজেন সরকারের মনেও সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু তিনি এও ভাবলেন যে, হয়ত তদন্ত এখনো শেষ হয় নি, তাই মামলার তারিখ এখনো পড়ে নি এবং সেই কারণেই পোদ্দারদের নামে এখনো কোন সমন বা সফিনা আসে নি। তিনি বললেন—'একজন পুলিশ অফিসর সই করে আপনাদের জিনিস নিয়ে গেছেন, এর মধ্যে কোন জুয়াচুরি আছে বলে আমার মনে হয় না। যাই হোক, যখন আপনাদের মনে সন্দেহ জেগেছে তখন আপনারা ক্যানিং থানায় গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসতে পারেন। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তাতে আপনাদের খোঁজ নেবার সুবিধা হবে।'

পোদ্দার দুজন সেই পরামর্শ অনুসারে রাজেন সরকারের চিঠি নিয়ে সেই দিনই ক্যানিং রওনা হয়ে গেল।

পরদিনই তারা ফিরে এলো এবং সোজা শ্যামপুকুর থানায় গিয়ে হাজির হল।

তাদের দেখে রাজেন সরকার বললেন—'এই যে আপনারা এসে গেছেন ? খবর কি বলুন।'

পোদ্দার দুজন খেদোক্তি করতে করতে কপাল চাপড়াতে লাগল। একজন বললে—'আর খবর! জোচ্চোরে আমাদের সর্বনাশ করেছে। তারা পুলিশ নয় মোটেই। সব কজনেই জাল, জোচ্চোর। আপনি যদি তাদের সঙ্গে না থাকতেন তাহলে কখনই আমরা গয়না হাতছাড়া করতাম না। আমরা তাদের চিনি না, আপনার কথায় দিয়েছি। এখন আমাদের গয়নার জন্যে আপনাকেই দায়ী হতে হবে।'

পোদ্দারদের কথা শুনে রাজেন সরকারের চোখ কপালে উঠল। বললেন—'কি ব্যাপার, খুলে বলুন। সেখানকার ইন্সপেক্টারের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয় নি ?'

পোদ্দারটি বললে—'হবে না কেন ? তাঁর নাম জগদীশ পাণ্ডে। তিনি বললেন, তাঁর এলাকায় গত ছ' মাসের মধ্যে কোন বড় চুরি বা ডাকাতি হয় নি এবং তিনি কোন তদন্ত করতে কাউকেই এখানে পাঠান নি। আমাদের সব কথা শুনে বললেন, এ একটা সাংঘাতিক জুয়াচুরি আর অসাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে এই কর্ম করা হয়েছে।'

পোদ্দারের কাহিনী শুনে রাজেন সরকার যেমন বিমূঢ় তেমনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বললেন—'এ তো দেখছি ভীষণ ব্যাপার! আমি জুয়াচোরদের সাহায্য করে আপনাদের দোকান থেকে গহনাগুলো তাদের হাতে তুলে দিয়েছি সুতরাং আমিও এই জুয়াচুরির একজন প্রধান মদতদার আর সেজন্যে ঘোরতর অপরাধী। আমার চাকরি তো যাবেই, জেলে যেতে না হয়। আচ্ছা, আপনারা এখন যান। আমি চললাম ডি-সি'র কাছে। দেখি, তিনি কি বলেন।'

রাজেন সরকারের মুখে সব কথা শুনে ডেপুটি কমিশনার তাঁকে খুব খানিকটা গালমন্দ করলেন, তারপর তিন-চারজন ইন্সপেক্টারকে এই ব্যাপার তদন্ত করার নির্দেশ দিলেন।

অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল, যে-লোকটা ইন্সপেক্টারের পোশাক পরে এসেছিল সে পুলিশের কর্মচারী, কনস্টেবল দুজনও জাল, যারা চোর সেজে এসেছিল তারা আসলে আসামী নয় এবং যে-লোকটা গহনাগুলো সনাক্ত করেছিল সেও ক্যানিং-এর রামনারায়ণ তরফদারের সরকার নয়। স্পষ্টই বোঝা গেল, দল বেঁধে প্ল্যান করে তারা এক অসমসাহসিক জুয়াচুরির দ্বারা পুলিশ কর্মচারীর চোখে ধুলো দিয়ে, তাঁকে সামনে রেখে, দুই নিরীহ পোদ্দারের পাঁচ হাজার টাকা দামের অলঙ্কার নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। ছ' মাস ধরে গোপনে গোপনে অনেক তদন্ত হয়েছিল কিন্তু অপরাধীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।
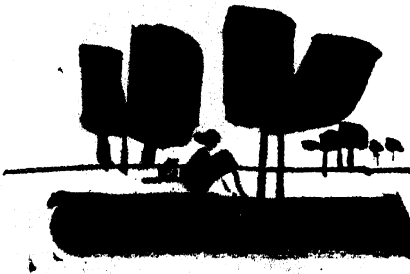
অঙ্গনা

বান্ধনি শিল্প
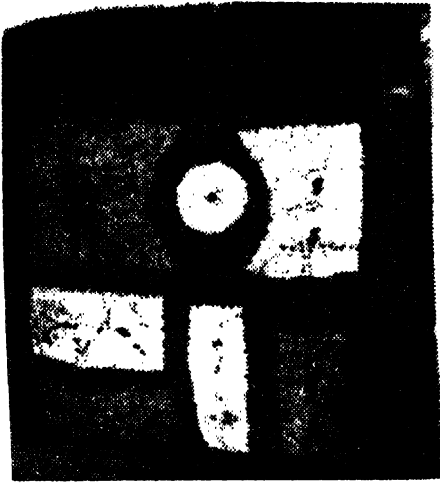
আমরা স্বভাবশিল্পী। কথা বলতে বলতে চুপ। কিছুক্ষণ ভাবি। আবার মুখ খুলি। একেবারে নতুন। শিল্পের দেশের লোক আমরা, তাই শিল্প আমাদের কথাবার্তায়, আচার-আচরণে, হাসি-উচ্ছলতায়। ব্যস,এই পর্যন্ত। তারপর আর ধৈর্য থাকে না। চর্চার ধার ধারি না। কষ্ট করতে আর কজনই বা রাজি। তাই হাতে-কলমে কাজ এগোয় না। যাকিছু সব হালকা কারিগরীতে। অথচ সময়ের খুব একটা অপ্রাচুর্য এমন নয়। সবাই নানা কাজে ব্যস্ত। এরই মধ্যে সময় করে নিয়ে এমন কিছুর চর্চা করা যায়, যা হবির মতো। বিশেষ, যারা স্কুলে-কলেজে পড়ে। তাদের হাতে সময় তো বেশ। দুটো লম্বা ছুটি। তারপর খুচরো ছুটির কমতি নেই। তাই সময়ের জন্য তাদের খুব একটা ছুটোছুটি করতে হয় না। এই ফাঁকে তারা যদি কোন শিল্পচর্চা করে। কিন্তু সচরাচর এমনটা হয় না। সবাই করে না, কেউ কেউ রে। তারা বিষন্ন হয়ে চিন্তা করে। আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। হাত্ত লাগায়। মাথা খেলায়। শিল্পরূপ ভাস্বর হয়ে ওঠে।

শিল্পের চিন্তা সব সময় হয়ে ওঠে না। সেরকম সুযোগ-সুবিধা সকলের নেই। এ-কথা খুবই সত্যি। তাই কেউ কেউ ভাবলেও অধিকাংশ উপযুক্ত গাইডেন্সের অভাবে একদম এগুতে পারে না। অবশ্য যার শিল্পীসত্তা এমনিতেই মুখর, তার কথা স্বতন্ত্র। একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সে নিজেই টেনে নিতে পারে। উৎসাহের গনগনে আঁচে সে নিজেকে অনেকখানি টেনে নিয়ে যায়। তারপর যখন পরিচালকের প্রয়োজন হয়, তখনকার কথা আলাদা। অন্ততঃ নিজের চেষ্টায় অনেকে যদি এইটুকু এগিয়ে থাকতে পারে সেটাই বা মন্দ কি! কিন্তু তাতো হচ্ছে না। সবাই এভাবে ভাবে না। শিল্পের দেশ আমাদের। অথচ আমরা শিল্পের কথা ভাববো না। অনেক শিল্পই তো এভাবে অমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে। আজ যার চর্চা সুদূর গ্রামে সীমাবদ্ধ, সেখান থেকে যদি আমরা তা উদ্ধার করে না নিয়ে আসি, তবে তো সেখানেই লুপ্ত হয়ে যাবে। আগামী ভবিষ্যতে আমরা তার আর কোন হদিশ করতে পারবো না।

আগেই বলেছি, এ-কথা অনেকে ভাবে না কিন্তু কেউ কেউ ভাবে। শ্রীমতী অঞ্জু মাথুর এমনি একজন। কলেজে পড়তো। আর সময় পেলেই ভাবতো, কি এমন করা যায়। হৈ-হল্লা নিয়ে বেশি সময় মত্ত থাকতে তার ভালো লাগতো না। অঞ্জুর বাবা শিল্পী। মেয়ের এই হাবভাব এবং চিন্তাপ্রবণ মুখমন্ডল দেখে তিনিও কিছু আঁচ করে নিলেন। তিনিই অঞ্জুকে ডেকে পরামর্শ দিলেন বান্ধনি শিল্প চর্চার। কথাটা তার মনে ধরলো। যেন এরকম একটা কিছুর জনাই সে অপেক্ষা করছিল।

বাবার উৎসাহ এবং পরামর্শে অঞ্জু কাজ শুরু করে দিল। বান্ধনি শিল্পের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। সে-কথা মনে রেখেই প্রতি পদে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সে এগুতে লাগলো। শিল্প চর্চার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এই ফাঁকে আমরা বান্ধনি শিল্পের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

বান্ধনি শিল্প মূলত রাজস্থানী শিল্প। পুরনো ঐতিহ্য এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রায় চোদ্দশ' বছর আগে বান্ধনির উদ্ভব। মূলে হয়তো ছিল কোন গ্রাম্য ললনা। কারণ, বান্ধনির বহুল প্রচার আজও গ্রামেই আবদ্ধ। কিন্তু সেই কালে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পও প্রসারলাভ করে। তাই জাপান, চীন, নাইজিরিয়া এবং প্রাচ্যের আরো অনেক দেশে এই শিল্পের প্রচলন দেখা যায়।

বান্ধনি সম্পূর্ণ হাতের কাজ। মেসিন এখানে অচল। গ্রামের মেয়েরা অবসর মুহূর্তে বসে কল্পনার জাল বোনে। [illegible]

কাপড়চোপড় এক জায়গায় জড়ো করা হয়। কাপড় মোটামুটি সূক্ষ্ম হওয়া চাই। তারপর সেগুলো সুতো দিয়ে বাঁধা হয়। এবার রঙের টবে কাপড়গুলো চুবিয়ে দেওয়া হয়। রঙে কাপড় মাখামাখি হয়ে যায়। কিন্তু সারা কাপড়ে রঙ ধরে না। তার বাহার হয়। বিভিন্ন জায়গা জুড়ে রঙের ছোপ পড়ে। ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে সাদা। সুতোয় বাঁধা জায়গাগুলি খুলে দিলেই শিল্পরূপ তখন আমাদের সকলকে মাতায়।

বান্ধিনি কথাটার সঙ্গে সঙ্গে একরকম ছোট ছোট বিন্দুর কথা আমাদের মনে পড়ে। ঐতিহ্যগত দিক থেকে বান্ধিনির এটাই বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের আঙ্গিকে পরিবর্তন হয়েছে। তাই ক্ষুদ্র বিন্দু আয়তনে বেড়ে গোলাকৃতি হয়েছে। সেই সঙ্গে চৌকো এবং নানারকম স্ট্রাইপেরও আমদানী হয়েছে। তবে একটা কথা অনস্বীকার্য, ফর্ম এবং সেপের ক্ষেত্রে বান্ধিনি বেশ রক্ষণশীল। চট করে কোন পরিবর্তন সে মেনে নিতে রাজী নয়। এ-কথা তার হাবেভাবে বেশ স্পষ্ট।

বস্ত্রে বন্ধন থেকেই বান্ধিনির উদ্ভব। কাপড়ে শিল্প-চাতুর্যই এর লক্ষ্য। শ্রীমতী অঞ্জুও তা জানে। কিন্তু সে নিজেকে কোনরকম সংস্কারে বদ্ধ রাখতে রাজী নয়। তাই নানারকম সেপ ও স্কোয়ার সে কাপড়ে তোলে। এছাড়া ফুল, পাখি প্রভৃতিও তার দক্ষতায় সুন্দর হয়ে ধরা পড়ে। এই শিল্পে নতুন যে কোনকিছু চোখে চট করে ধরা পড়ে।

এরই মধ্যে অঞ্জুর কৃতিত্ব কিন্তু অন্যখানে। এতদিন পর্যন্ত মসলিন বা ভয়েলই ছিল বান্ধিনির একমাত্র উপজীব্য। অঞ্জু কাপড়ের কৌলিন্যে শিল্পকে আটকে রাখতে প্রস্তুত নয়। তাই মোটা কাপড়েও সে বান্ধিনিকে জীবন্ত করে। একটি কম্বলের উপর সে কাজও করেছে। মোটা এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রের তফাৎ বেশ বুঝতে পারা যায়।

কলেজে পড়তে পড়তেই অঞ্জুর এসম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ পায়। দর্শনে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করার পরই সে শিল্পে মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। নতুন নতুন আইডিয়ার সার্থক প্রয়োগ শুরু হয়। ভয়েল থেকে র‍্যাগ সব বস্ত্রই সে শিল্পের আওতায় নিয়ে আসে। রঙের বাহারে মনমাতানো প্যাটার্ণ তৈরির দিকে অঞ্জুর নজর খুব। আবার অঞ্জু পোর্ট্রেট এবং ফিগারেও বেশ সাফল্য অর্জন করেছে।

বান্ধিনির চর্চার মধ্যে শ্রীমতী অঞ্জুর কৃতিত্ব অনেকের নজর কাড়ে। বিশেষ করে উৎসাহী হন তার বাবা। তিনি হয়তো মেয়ের এতটা সাফল্য আশা করেননি। নেহাতই অবসরবিনোদন হিসাবে অঞ্জু বান্ধিনি চর্চা করবে, তিনি হয়তো তাই ভেবেছিলেন। কয়েকজন প্রতিবেশীও এসম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেন। কথায় কথায় অঞ্জুর কিছুটা প্রচার হয়। দু'-একজন জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে আগ্রহও প্রকাশ করেন। তখন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আকাদেমী অব ফাইন আর্টসে বান্ধিনি শিল্পকর্ম নিয়ে অঞ্জু প্রদর্শনীতে হাজির হয়। প্রদর্শনী দেখে সবাই খুশি। সকলের মুখেই প্রশংসা। দর্শক, রিপোর্টার, সমালোচক সবই বান্ধিনির এই রূপান্তরকে অকুণ্ঠ স্বাগত জানালেন।

বান্ধিনিতে টেবিল ক্লথ, বেডকভার, কুশন-কভার, ল্যাম্প-শেড এবং রুমাল সবই নানা রঙে এবং কাপড়ে হয়। প্রদর্শনীর অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ ছিল পেন্টিং। বান্ধিনি শিল্পে পেন্টিংয়ের কথা অনেকেরই অজানা ছিল। শ্রীমতী অঞ্জু এই অসাধ্যকে সাধন করেছে। বান্ধিনিতে অঞ্জু ভবিষ্যতে বিশেষ দিকচিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হবে।

অঞ্জু কাজে ভয় পায় না। অসাধারণ পরিশ্রমী। কলেজে পড়তেই এই শিল্পকে সে গ্রহণ করেছে। আজ সে এগিয়েছে

অনেকখানি। একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে চলে। এটাই তার বড় আনন্দ। ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে অঞ্জু এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বদ্ধ হয়ে নেই। শিল্পে আধুনিক চিন্তাধারার সংযোজনাই তার লক্ষ্য। এযাবৎ এক্ষেত্রে তিনি সফলও হয়েছেন। বৃহত্তর সাফল্য এখনো অপেক্ষা করে আছে। সেদিন বান্ধিনির পুনর্নবীকরণে অঞ্জুর নাম উচ্চারিত হবে পরম শ্রদ্ধায়।

সুন্দরী, শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা এবং স্বাস্থ্যবতী

রবিবারের কাগজ। পর পর একাশিটি বিজ্ঞাপন। তার মধ্যে ছিয়াত্তরটি বিজ্ঞাপন একই ছাঁদে লেখা। বিদেশী ডিগ্রীধারী উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক, গ্রামের স্কুলের এম-এ, বি-টি, প্রধান শিক্ষক, গ্রাজুয়েট ইউ, ডি ক্লার্ক, বিপত্নীক ডাক্তার, স্কুল ফাইনাল পাশ বে-সরকারী অফিসের টাইপিস্ট, স্বল্পশিক্ষিত ব্যবসায়ী সবরকম পাত্রের চাহিদা একই অর্থাৎ সুন্দরী শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা এবং স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। বাকী পাঁচটির মধ্যে তিনটি বিজ্ঞাপন আরো একটু চটকদার। শুধু সুন্দরী, শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা এবং স্বাস্থ্যবতীতে তারা খুশি নন; তার উপর চাই লাবণ্যময়ী, সঙ্গীতজ্ঞা, দীর্ঘাঙ্গী, রুচিসম্পন্না, সুশ্রী

মুখশ্রীযুক্তা, এবং আধুনিকা। মাত্র দুটি বিজ্ঞাপনে রূপের উল্লেখ নেই। একটি বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে লেখা—চাকুরিরতা অগ্রগণ্য। এবং অন্যটিতে লেখা—'গুণবতী এবং উচ্চমনা পাত্রীই বিবেচ্য।'

মানুষ মাত্রই সুন্দরের পূজারী। কিন্তু তাই বলে ছিয়াত্তরটি অনন্যাকে খুঁজে বার করা কি সহজ কথা? সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর সুরুচি সুন্দরী রমণীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কার না কামনার বস্তু? তার উপর সেই রমণী যদি আলাপের ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের দুচার কলি গান কিংবা কীটসের দুচার ছত্র আওড়াতে পারে তবে ত সোনায় সোহাগা।

পাত্রীপক্ষও কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হোয়ে বসে নেই। যে মেয়ে ছাত্রীদের বাইনোমিয়াল থিওরিমের জটিল তত্ত্ব বোঝায় কপাল কুঁচকে তাকেই আবার পাত্রপক্ষের তুষ্টির জন্য মেয়ে দেখার আসরে মোলায়েম ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ কিংবা অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে পাশ মার্ক জোগাড় করতে হয়; যে মেয়ে আইন পাশ করে হাইকোর্টে যাতায়াত করছে তাকেও শুক্তোয় কোন সময় আদা দিতে হয় সে প্রশ্নের জবাব তৈরি রাখতে হয় এবং যে মেয়ে চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রীধারী তাকেও সূচীশিল্পের দু' চারটে নমুনা রাখতে হয়। তার উপর আছে মাঝারি চেহারার মেয়েদের প্রসাধনচাতুর্যে সুন্দরী হবার আপ্রাণ চেষ্টা এবং কৃষ্ণাঙ্গীদের কাঁচা হলুদ ও মসুর ডাল বাটা মাখিয়ে 'উজ্জ্বল শ্যাম' পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য মাসী-পিসির অক্লান্ত উদ্যম। মেয়েরা এই ব্যাপারে কত যে নিরুপায় তা বোঝান কঠিন। দু'চারজন মেয়ে যে এই মেয়ে দেখার আসরে বিদঘুটে প্রশ্নের পাল্টা জবাব দেননি এমন নয় কিন্তু তাতে বিশেষ ফল ফলেছে বলে শোনা যায়নি। ক্ষেত্রবিশেষ অর্থাৎ প্রেমঘটিত ব্যাপার, ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধি, মোটা অঙ্কের যৌতুকের লোভ কিংবা বিয়ে পাগল পুরুষ ছাড়া কোন ব্যক্তি যে স্বেচ্ছায় রূপগুণদক্ষতায় অতি সাধারণ পর্যায়ের মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করতে রাজী হয়েছে এমন ঘটনা বড় একটা শোনা যায় না। 'কুঁচবরণ রাজকন্যা তার মেঘবরণ কেশ' এমনি এক অপরূপা অদেখা মানসীর স্বপ্ন প্রাক-বিবাহকালে প্রায় সবার চোখেই থাকে।

নারীকে শুধু নারীত্বের সীমায় বন্দী দেখতে পুরুষ চায় না। তাকে হতে হবে নানা বর্ণসম্ভারে উদ্ভাসিত রামধনুর মত—নানা সুরে বাঁধা কয়েকটি তারের ঝংকারে মিলিত একটি রাগিণীর মত। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছিলেন আমার প্রিয়া সীতা হলেন কর্তব্য পালনে আমার মন্ত্রী, আমার ব্যক্তিগত সেবায় দাসী, ধর্মকাজে আমার সহধর্মিণী, ক্ষমায় পৃথিবী, স্নেহে মাতা, শয্যায় আনন্দদায়িনী রমণী, কথাবার্তায় আলাপে আমার সখী।' অতএব সব যুগেই নারী কেবল নারী হয়ে পুরুষকে সুখী করতে পারে না। যে রাঁধবে সে চুলও বাঁধবে, যে গভীর রাত অবধি পার্টিতে বলনৃত্য নাচবে সে বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পাঁচালীও পড়বে। এমন মেয়ে দু-চারজন চোখে পড়ে না এমন নয়।

অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত' বিশেষণ থাকলেই তাদের হাতে বাসরঘরের চাবি-কাঠি এসে যায়। কয়েকটি বিজ্ঞাপনে রুজিরোজগার উল্লেখ করা থাকে—ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, পদস্থ অফিসার—' পাত্র চাই। ব্যস ঐ পর্যন্ত। মেয়ের পিতা পাত্রের অন্যান্য গুণের ঘাটতিগুলির সঙ্গে কম্প্রোমাইস করতে প্রস্তুত। জানি না এই পক্ষপাতিত্বের জন্য দায়ী কে?

শুধু সুন্দরীতে আজ-কালকার পুরুষের রুচি নেই। তাঁরা বলবেন 'বিদ্যা না থাক অন্তত কালচার ত থাকা চাই।' অতএব সে পাত্রী নাকচ। শুধু শিক্ষিতাতেও তাঁদের মন ওঠে না—কোথায় থাকে খচখচানি ভাব; দিদিমা ঠাকুমার পছন্দমত 'গৃহকর্মে-নিপুণা' মেয়ে শুনলে বলবে ঘর-সংসারের তদারকী করার জন্য পয়সা দিলে ঝিও মেলে।' অতএব চাই 'সুন্দরী, শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা এবং স্বাস্থ্যবতী।'......

এমন পাত্রী যদি জীবনে না জোটে তবে তা নেহাৎই প্রজাপতি-নিবন্ধ।

সংবাদ

পশ্চিমবাংলার স্বর্গত রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর স্ত্রী শ্রীমতী বঙ্গবালা দেবী বার্ধক্য ও অসুস্থতাজনিত অবস্থার মধ্যে নিঃসঙ্গ। তাঁর দেখাশোনার ব্যাপারে সরকার ও নাগরিকদের পক্ষ থেকে কি করণীয় তা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

× × ×

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি-মিউজিক পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে প্রতি বছর যাঁরা দাশগুপ্ত স্বর্ণ পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। ১৯৬৯ সালের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এই পদক দেওয়া শুরু হচ্ছে। স্মরণ থাকতে পারে, সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী দাশগুপ্ত গত ২৫ জানুয়ারী পরলোকগমন করেন।

প্রথম বার্ষিক নন্দিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী শর্বাণী সেন, শ্রীমতী উজ্জয়িনী সেন এবং শ্রীমতী অর্চনা সেন যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

২৫ বৈশাখ 'মহর্ষি ভবনে' বৈতানিক আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবের প্রারম্ভে পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ও বাইরে থেকে প্রায় দুশো প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

× × ×

আগামী ১৯ মে থেকে ইডেনের ক্রিকেট মাঠে উইমেন্স হকি এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের উদ্যোগে তেইশ বার্ষিক জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসবে। প্রায় পনেরো দিনব্যাপী এই হকি প্রতিযোগিতায় মোট একুশটি দল যোগদান করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারতে মেয়েদের হকি খেলার প্রচলন ও প্রসারে উইমেন্স হকি এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের অবদান বিশিষ্ট।
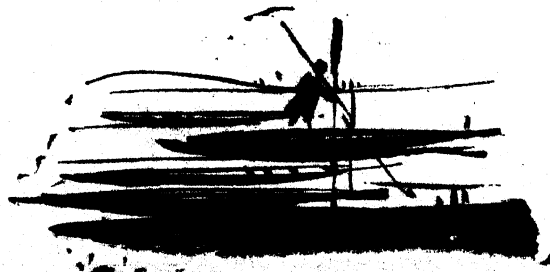
সেই ব্যর্থ লোকটার গল্প ।।

রাম বসু

রোপনের বেলা বুঝলাম আমি দুঃস্বপ্ন।

অথচ আমি একদিন পাখির সদ্য শাবকের মতো স্বপ্ন ছিলাম
আমার ভিতরে সেই স্বপ্ন শিকড় চালিয়ে দিয়েছিল
বোধের দিকে
আমরা সময়কে বন্দী করেছিলাম
একটা ভাবনায় অথবা ভাবনাই ছিল সময়
যে মেয়েটি ময়ূরকণ্ঠি আকাশের নিচে আমাকে ভালবেসেছিল
সে আমাকে বলতো দেব-তরু
সমাধির ধারে, মৃত্যুখচিত মুখে,
আমি যাকে কুসুমিত করেছিলাম
সে আমাকে বলতো শ্মশান-চাঁপা
আমরা কথা বলতাম কখনো রূপকথায়, রূপকে, কখনও নীরবতায়
আমরা জানতাম আমাদের চারপাশে দিব্য জাদুর ইথার
বেশ মনে আছে আমরা সেদিন ছিলাম পল্লবিত স্পর্ধা।

রোপনের বেলা বুঝলাম আমি দুঃস্বপ্ন
আমি সব কিছু ধিকৃত করতে পারি—জন্ম মৃত্যু ফুল ও পল্লব
আমি থুতু ছিটিয়ে, লাথি মেরে, সব কিছু তছনছ করতে পারি
অবলীলাক্রমে ছুরি বসিয়ে আমি
রাস্তার কল থেকে ধুয়ে নিতে পারি রক্ত
পৃথিবীর কুঁজের ওপর দাঁড়িয়ে বোমা ছুঁড়ে দিতে পারি
প্রেমের মন্দিরে।

ওরা সকলেই রায় দিয়েছে আমি পণ্য বাজে মাল, একান্ত অচল
দেখেছি সম্ভ্রান্ত ফড়েরা আমাকে ভুলেও ছোঁয় না
আমি হো হো করে হাসি, কিছুতেই কিছু আসে যায় না আর
আমি জানি আমরা একদিন শক্তিশালী রেডারের চেয়েও
অব্যর্থ ছিলাম

কোটি কোটি আলোক-বর্ষ দূরের নিঃসঙ্গতম নক্ষত্রটিও ছিল
সখি
আমি যে মেয়েটিকে ভাল বাসতাম
যে মেয়েটি আমাকে ভালবাসতো উজ্জ্বল বৈশাখে
(সে বৈশাখে এসেছিল বলে আমি তার নাম রেখেছিলাম বৈশাখী)
সেই বৈশাখে, পলাশে কৃষ্ণচূড়ায়, আমরা হয়েছিলাম
অরণ্যের উচ্চারণ, শান্ত জলধারা।

আজ সেই ঘা এখনও দগদগ করছে
হাসতে হাসতে সে যখন আমাকে ফেলে গেল ছেঁড়া ঘুড়ির মতো
আদিতম নিষ্ঠুরতার সহোদরার মতো হাসতে হাসতে চলে গেল
কুসুমের দিকে
স্বর্ণ-সাধক সময় যখন কানাকড়ির মূল্য না দিয়ে গেল বেশ্যালয়ে
আমি সেই ঘায়ের ওপর ঝুঁকে পড়লাম,
কৃপণ যেমন গুপ্তধনের ওপর ঝুঁকে পড়ে
আর স্মৃতি, প্রভুভক্ত বিশ্বাসী স্মৃতি, নিপুণ সার্জেনের মতো
সেই ঘায়ে গজ পুরে দিতে থাকলো।

আমি ঝড়ো হাওয়ার মতো ভিতে টান মারি
অরণ্যকে কাঁধে করে আনি শহরে
সেই সময় এক বুড়ি হাসতে হাসতে বললে, 'শোন্,
দেওয়ালে দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে যেতে হয়
এইভাবেই সকলে যায়, তুইও যা।
সকলের যা হবে, তোরও তাই হবে।'

তার গলায় কি ছিল জানি না
পৃথিবীকে কাঁধে তুলে আমি সেইভাবেই যাচ্ছি
আজ আমার চোখে স্বপ্ন নেই, দুঃস্বপ্ন নেই,
আছে বিষন্ন কোমলতা।

শুধু ওঠে স্মৃতি ।।

তরুণ সেন

বুকের ভিতর ক্রমাগত
করাঘাত—পুরনো শৈশব, স্মৃতি
পায়ে পায়ে দাঁড়ায় প্রত্যহ
স্বপ্নময় আশ্চর্য সময়
জানালায়

আমার মুখের ছায়া কেঁপে ক্রমে বিরাট, অদ্ভুত
অন্ধকার থেকে মহীরুহ
এখনো হাতছানি নিত্য
এখনো সূর্যের মুখোমুখি
পাখি সুখে নাচে এক দীঘি—
ছলক্ষ তুলতুলে হাত দোলায় সবুজ ইশারায়

আমি রাতভর
বুকের গভীরে এক জলাশয়
দুহাতে খুঁড়েছি ক্রমাগত—
যতই গভীরে যাই—শুধু ওঠে মুঠোভর স্মৃতি!

পৃথিবী থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার মাইল দূরে মহাকাশে অবস্থানকালে অ্যাপোলো-১০ এর মহাকাশচারীরা পৃথিবীকে যেভাবে দেখেছেন। মাদ্রিদের নিকটবর্তী ফ্রেসনেড ডিলাকে অবস্থিত অ্যাপোলোর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার কেন্দ্রে এই ফটো নেওয়া হয়েছে।

দিন আগত ঐ

দিন অর্থাৎ চন্দ্রের বুকে পৃথিবীর মানুষের প্রথম পদচিহ্ন রাখার দিন আগত-প্রায়। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে স্বপনসাধ পোষণ করে এসেছিল, তার বাস্তব রূপায়ণ আগামী একমাস বা দুমাসের মধ্যেই ঘটবে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা যারা পৃথিবীতে বাস করছি তাদের জীবন নানা সমস্যায় জর্জরিত, কিন্তু একদিক থেকে আমরা মহা ভাগ্যবান। আমাদের জীবনকালেই বিজ্ঞানের দুটি যুগান্তকর ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করলুম। একটি হচ্ছে পরমাণু শক্তির বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি হলো মর্তের সীমানা ছেড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণ। বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার ইতিহাসে এই দুটি ঘটনা চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বর্তমান শতাব্দীতে মানুষের সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক অভিযানের সর্বশেষ প্রস্তুতি হিসাবে গত ১৮ মে অ্যাপোলো—১০ মহাকাশযানযোগে পৃথিবীর তিনজন মানুষ স্ট্যাফোর্ড, সারনান এবং ইয়ং চন্দ্র অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে কাজ করে পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধন ছিঁড়ে চন্দ্রের অভিকর্ষের এলাকায় তিনজন মহাকাশচারীকে পৌঁছে দেয়।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, অ্যাপোলো—১০-এর অভিযান চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের জন্যে পরিকল্পিত হয়নি ১০ মাইল বা ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ ও অবতরণের সম্ভাব্য স্থান পর্যবেক্ষণ করাই ছিল এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ছিল, মূল মহাকাশযান (কমান্ড মডিউল) থেকে চন্দ্রযান (লুনার মডিউল) বিচ্ছিন্ন করা ও তাদের সম্মিলন। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে ২২ মে, যখন অভিযানের অধিনায়ক স্ট্যাফোর্ড ও সারনান মূল মহাকাশযান থেকে ভারশূন্য অবস্থায় সুড়ঙ্গ পথে চন্দ্রযানে প্রবেশ করেন এবং মূলযানে থাকেন ইয়ং। চন্দ্রপৃষ্ঠের ১১২ কিলোমিটার উঁচুতে থেকে মূলযানটি চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। অ্যাপোলোর ওজন ৩০০ টন, কিন্তু চন্দ্রযানের ওজন মাত্র ৩৩ টন। অ্যাপোলোকে বড় জাহাজের সঙ্গে তুলনা করলে চন্দ্রযানকে বলতে হয় একটি ক্ষুদে ভেলা।

মূল যান থেকে চন্দ্রযানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রায় শেষ মুহূর্তে মহাকাশচারীদের একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তখন ভূপৃষ্ঠের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে জানানো হয়, চন্দ্রযানটি তিন ডিগ্রী কাত হয়ে পড়েছে। আর বেশি কাত হলে কোনোক্রমেই চন্দ্রযানকে মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হত না। এই অবস্থায় সারনান একটু বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু অধিনায়ক স্ট্যাফোর্ড ধীর অচঞ্চল থেকে ত্রুটি সংশোধন করে ফেলেন। এরপর ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্দেশ পেয়ে স্ট্যাফোর্ড ও সারনান তাঁদের ভেলাকে মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন করে চন্দ্রের কাছাকাছি নামতে লাগলেন। ইয়ং তখন বিরাট বপু অ্যাপোলোকে নিয়ে একাই চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে চলেছেন। চন্দ্রযানের নিম্নাবতরণ রকেট চালু করে তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠের ১০ মাইল বা ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে চলে এলেন। এর আগে পৃথিবীর কোনো মানুষ চন্দ্রের এত কাছাকাছি কখনও আসে নি।

এই দূরত্ব থেকে চন্দ্র প্রদক্ষিণের সময় স্ট্যাফোর্ড ও সারনান চন্দ্রের বিষুব রেখা বরাবর অবতরণের সম্ভাব্য পাঁচটি স্থান পর্যবেক্ষণ করেন। ভেলায় সারনানকে পাশে নিয়ে স্ট্যাফোর্ড কক্ষপথ পরিবর্তন করেন এবং ভেলার মুখ ঘুরিয়ে দেন চন্দ্রের বিষুবরেখা বরাবর নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এলাকার দিকে। এই রেখা বরাবর আর চারটি স্থানও তাঁরা দেখে নেন। সাতবার এইভাবে

ভেনাস—৫ এবং ৬ স্বয়ংক্রিয় অন্তর্গ্রহচারী যানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার স্টেশন।
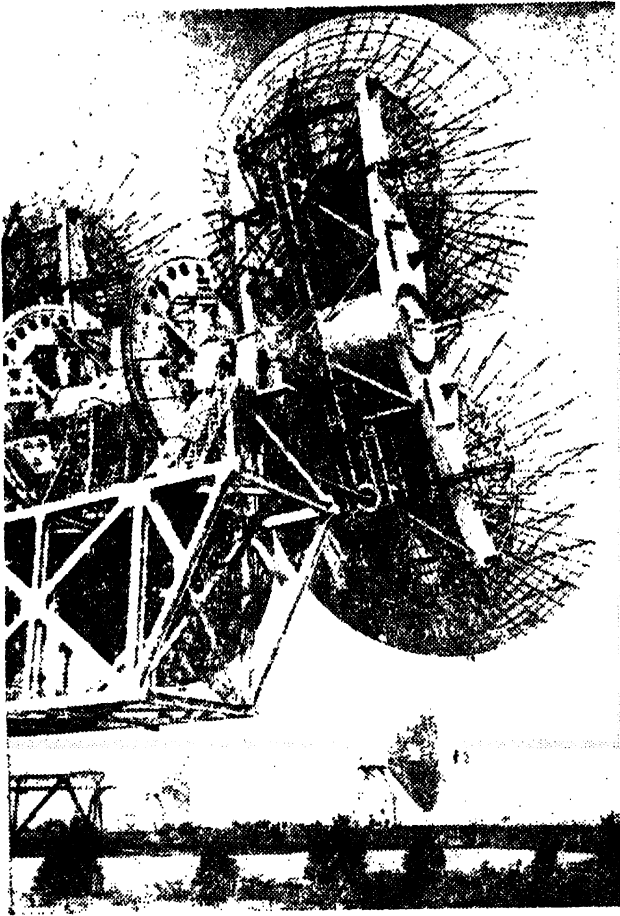
চন্দ্র প্রদক্ষিণ করার পর তাঁরা চন্দ্রযানের নিজস্ব রকেট চালু করে মূল যানের কাছা-কাছি সেটিকে নিয়ে আসেন। এই পর্যায়টিও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রযানকে মূল-যানের সঙ্গে সংযুক্ত করে স্ট্যাফোর্ড ও সার্নান সুড়ঙ্গ পথে আবার মূল মহাকাশ-যানে প্রবেশ করেন। তখন চন্দ্রযানকে সূর্যের কক্ষপথ পরিক্রমার পথে মহাকাশের বুকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মূল মহাকাশযানটি তারপর কয়েকবার চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর বুকে প্রত্যা-বর্তনের জন্য নিজস্ব রকেট চালু করে গতিবেগ বাড়িয়ে নেয়। চন্দ্রের অভিকর্ষ বন্ধন ছিন্ন করে মহাকাশযানটি পৃথিবীর দিকে ছুটে চলে। পৃথিবীর অভিকর্ষ এলাকায় প্রবেশ করার পর তার গতিবেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঘণ্টায় প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার আগে অ্যাপোলো—১০ মহাকাশযানটির মূল ইঞ্জিনসহ সার্ভিস মডিউলটি পৃথক করা হয়। তখন কেবল কমান্ড ক্যাপ-সুলটিই দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর বিরাটকার প্যারাসুটের সাহায্যে ক্যাপসুলটি প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে অবতরণ করে। গত ১৮ মে কেপ কেনেডি থেকে যাত্রা শুরু করার ঠিক ১৯২ ঘণ্টা ৩ মিনিট পরে উদ্ধারকারী রণতরী প্রিন্সটনের ৫ কিলোমিটার দূরে ঘণ্টাকৃতি কমান্ড ক্যাপ-সুলটি জলে নেমে আসে। মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসার পর প্রাথমিক ডাক্তারী পরীক্ষায় বলা হয়েছে, তাঁরা বেশ সুস্থ সবল আছেন।

প্রায় ৯ দিনব্যাপী অ্যাপোলো—১০ অভিযানে মহাকাশযানের সব যন্ত্রপাতি বিস্ময়করভাবে নিখুঁত কাজ করেছে। শুধু চন্দ্রের কাছাকাছি এসে ফটো তোলার সময় ক্যামেরায় কিছু ত্রুটি দেখা দেয় এবং চন্দ্রযানটি একবার তিন ডিগ্রী কাত হয়ে গিয়েছিল। অ্যাপোলো—১০ অভিযানের সব কিছু কর্মসূচীই নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এই অভিযানের বিস্ময়কর সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, একাদশ অ্যাপোলোর অভিযান অর্থাৎ চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণের অভিযানও অনুরূপভাবে সাফল্যমণ্ডিত হবে। এবং প্রত্যাশিত সেই শুভদিনটি আগতপ্রায়।

শুক্রগ্রহ প্রসঙ্গে

সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়া প্রেরিত স্বয়ংক্রিয় আন্তগ্রহচারী স্টেশন ভেনাস—৫ এবং ভেনাস—৬-এর শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণের সাফল্যে আমাদের পৃথিবীর নিকটতম এই গ্রহটি সম্পর্কে স্বভাবতই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই শুক্রগ্রহ প্রসঙ্গে রুশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ভাসিলি মোরেজ এবং অধ্যাপক ভলাডিমির প্রকোফিয়েফ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা আমরা এখানে আলোচনা করছি।

অধ্যাপক মোরোজ বলেছেন : বছর পনেরো আগে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও শুক্র-গ্রহকে যমজ গ্রহ বলে মনে করতেন। এদের আয়তন ও ভর প্রায় সমান। পৃথিবীর মতোই শুক্রের এক উন্নত ধরনের আবহ-মন্ডল রয়েছে।

পৃথিবীর চেয়ে শুক্র সূর্যের কাছে কিন্তু সূর্যের আলো তার আবহমন্ডল থেকে বেশি পরিমাণ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় বলে তার জমির উপরে পৃথিবীর প্রায় সমপরিমাণ তাপ গিয়ে পৌঁছয়। শুক্রের আবহমন্ডলে কার্বন ডাই অকসাইডের পরিমাণ খুব বেশি। এর কারণ হিসাবে কেউ কেউ মনে করেন, শুক্রের পুরো জমি জুড়ে রয়েছে সমুদ্রের বিস্তার এবং তার শিলার মধ্যে কার্বন ডাই-অকসাইডকে ঘনীভূত হতে বাধা দেয় এই সমুদ্র। শুক্রগ্রহের আবহমন্ডলের এই ঘন আবরণ মানুষের পক্ষে তার আবহমন্ডল ভালোভাবে অনুশীলন করার পথে বাধা-স্বরূপ। স্বয়ংক্রিয় অন্তর্গ্রহচারী ভেনাস-৫ এবং ভেনাস-৬-এর সাহায্যে শুক্রের আবহ-মন্ডল সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আমরা জানতে পারব নিঃসন্দেহে।

অধ্যাপক প্রকোফিয়েফ বলেছেন : রেডারের মাপজোকের সাহায্যে দেখা গেছে, শুক্রগ্রহ তার অক্ষপথে খুব ধীরে ধীরে আবর্তন করে। একবার পুরো আবর্তনের সময় আমাদের পৃথিবীর ২৫০টি দিনের সমান। কিন্তু শুক্রের মেঘাবরণের বর্ণালী বিশ্লেষণ সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, ওই মেঘাবরণের একপাক ঘুরে আসতে সময় লাগে পৃথিবীর প্রায় ৩।৪ দিনের সমান সময়। এই অবস্থায় শুক্রের আবহমন্ডলের মেঘের স্তরে হাওয়া বয়ে যায় এক প্রচন্ড ঝড়ের গতিতে। শুক্রগ্রহের আবহমন্ডলের ভিতরকার ভৌতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই রহস্য স্বয়ংক্রিয় অন্ত-র্গ্রহচারী স্টেশনের সাহায্যে উন্মোচিত হতে পারে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব। এমন সময় দুঃখী ঝিনুকের বাবা ভবতোষ এলেন। ভবতোষবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর দেখাশোনা নেই দীর্ঘ দু-মাস। অবনীমোহন বেশ কিছু জমি কিনবেন স্থির করলেন। ডাক পড়ল মজিদ মিঞার। চোখে তার খুশির রোশনাই। সামান্য দামেই জমির ব্যবস্থা করলো সে। হিরণ এল বহুদিন পরে। সুধার শিরায় শিরায় ভালোবাসার নেশা।

বিনু তখন একা। এল যুগল। জলা-বাঙলার প্রতীক। বলল : কাউঠা দ্যাখছেন ছুটোবাবু? অবাক হল বিনু। ছুটল। চোখের সামনেই জলজ-জীবটিকে টেটা দিয়ে গাঁথল যুগল। বাড়ি ফেরার পালা। পথে বেবাজিয়ার বহর। ঘুরে ঘুরে দেখল নৌকা-গুলো। বেদেদের জীবন দিল বিনুর চোখে বিস্ময়ের রঙ। কলকাতা থেকে ফিরে এলেন অবনীমোহন। শোনালেন সেখানের হাল-চাল। ইউরোপের যুদ্ধ বাঙলা দেশের দিকে ছুটে আসছে। প্রথম ব্ল্যাক আউটের মহড়া হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে গোটা কলকাতা জুড়ে। যুদ্ধ দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। রাজদিয়ার মাটিতে ভালোবাসা। ঘর বানানোর আকর্ষণ। অবনীমোহন কিনল তাই জমি, রাজদিয়ার মাটি।]

।।ঊনচল্লিশ।।

অবনীমোহন বললেন, 'কী কথা?'

হলদে হলদে অসমান দাঁত বার করে লোকটা বলল, 'কার জমিন কিনলেন?'

'মজিদ মিঞার।'

চোখের ওপর হাত রেখে ভুরু কুঁচকে লোকটা ভাবতে চেষ্টা করল যেন। বলল, 'কোন মজিদ মেয়া কন দেখি? বাড়ি কোন্‌খানে?'

অবনীমোহন বললেন, 'কেতুগঞ্জের।'

'কেতুগঞ্জের মজিদ মেয়া বড় ভাল মানুষ!' লোকটার চোখমুখ আলো হয়ে উঠল, 'মেয়াভাইর কোন জমিন কিনলেন?'

'উত্তরের দিকের মাঠের।'

'উত্তরের চকের জমিন! বড় বাহারের জমিন। হেই ধারে সুনামগঞ্জের হাট, আর এইধারে ধলেশ্বরী গাঙ—এইর ভিতর এমুন ভাল জমিন আর নাই।'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, 'তুমি এখানকার সব চেন নাকি?'

'চিনি আবার না! সগ্‌গল চিনি। মেয়া-ভাইর যেই জমিন আপনে কিনলেন হেয়াতে ধান দ্যান, পাট দ্যান, মুঙ (মুগ)-মুসৈর-কলই—যা ইচ্ছা দ্যান, ফলন যা হইব না! চোমৎকার—চোমৎকার—'

একটু চুপ।

তারপর লোকটা আবার বলল, 'আপনের সগে এত কথা কইলাম, কিন্তু আপনে কে, হেয়াই জানলাম না।'

অবনীমোহন নিজের পরিচয়-টরিচয় দিলেন।

অপার বিস্ময়ে লোকটা খানিকক্ষণ হাঁ করে থাকল। তারপর বলল, 'আপনে হ্যামকর্তার জামাই!'

অবনীমোহন আস্তে করে মাথা নাড়লেন। হেমনাথের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাটাই যেন এখানে পরমাশ্চর্য ঘটনা। এ লোকটার চোখেমুখে যে বিস্ময় তা রাজদিয়া-বাসী প্রতিটি মানুষের চোখেই আগে দেখেছেন অবনীমোহন!

লোকটা বলল, 'আপনি নিশ্চয় কইলকাত্তায় থাকতেন?'

'হ্যাঁ। তোমায় কে বললে?'

'কে কইছিল মনে নাই। তয় শুনছিলাম, কইলকাত্তার থনে হ্যামকত্তার কেটা (কেউ) যেন আইছে। ভাবছিলাম আপনেরে দেখতে যামু—'

'যাও নি তো—'

'না।'

'গেলেই পারতে।'

একটু ভেবে লোকটা বলল, 'যাওনের সময় কই? চকে চকে মাঠে-ঘাটে ঘুইরা দিন কাইটা যায়। কোনখানে যাওনের ফুরসুত নাই।'

বিনু একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ভেবেই পেল না, মাঠে-ঘাটে এত কী কাজ লোকটার। ইচ্ছে হল, একবার জিজ্ঞেস করে। কী ভেবে আর করল না।

অবনীমোহন বললেন, 'তোমার নামটা কী ভাই?'

'তালেব—তালেব মেয়া—'

'তুমি এই রাজদিয়াতেই থাকো?'

'না।'

'তবে?'

তালেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর উদাস গলায় অন্যমনস্কের মতন বলল, 'বাড়ি আমার এই দ্যাশে না।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কোথায়?'

'হেই ম্যাঘনার পারে। তয়—'

'কী?'

'দ্যাশে কিচ্ছু কইতে কিচ্ছু নাই। ম্যাঘনায় ঘরবাড়ি খাইছে; ভাসতে ভাসতে এইখানে চইলা আইলাম। দশ-বিশ বছর ধইরা এইখানেই আছি।'

'তোমার কে কে আছে?'

'কেউ না। এক্কেরে ঝাড়া হাত-পা।'

অবনীমোহন হয়তো কৌতূহল বোধ করছিলেন। বললেন, 'এখানে কোথায় থাকো তুমি?'

তালেব বলল, 'থাকনের ঠিক-ঠিকানা নাই। যখন যেইখানে পারি সেইখানে পইড়া থাকি। তয় মাঠে-ঘাটেই থাকি বেশি।'

'পাথ্থরেও!'

'হ।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না অবনীমোহন।

তালেব আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় মজিদ মিঞাকে নিয়ে হেমনাথ এসে পড়লেন। এতক্ষণ রেজিস্ট্রি অফিসের ভেতরে মুহুরি আর উকিলের সঙ্গে কথা-বার্তা বলছিলেন তাঁরা।

হেমনাথকে দেখে অনেকখানি ঝুঁকে সম্ভ্রমের গলায় তালেব বলল, 'ছালাম (সেলাম) বড়কত্তা; শরীল-গতিক ভালা তো?'

হেমনাথ বললেন, 'ভাল। তুই কেমন আছিস তালেব?'

'আপনেরা যেমুন রাখছেন।'

'আমরা রাখবার কে?' আকাশের দিক দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'ভালমন্দ যা রাখবার ঐ ওপরওলাই রাখেন।'

তালেব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'লাখ কথার এক কথা। খোদাতাল্লা ছাড়া কে আর রাখতে পারে।'

ওপাশ থেকে মজিদ মিঞা বলে উঠল 'জমিন রেজিস্টারির খবর বুঝি পাইয়া গেছস?'

সোংরা জট-পাকানো দাড়ি-গোঁফের ভেতর জগতের সরলতম হাসিটি ফুটিয়ে তালেব মাথা হেলিয়ে দিল।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'গন্ধ পাইয়াই বুঝি লৌড়াইয়া (দৌড়ে) আইছস?'

'হ।'

হেমনাথ এই সময় তাড়া দিলেন, 'এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বেলা হেলতে চলল, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

মজিদ মিঞা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'হ-হ; শুদাশুদি খাড়াইয়া থাকনের কোন কাম? লন (চলুন) যাই।'

সুরমার নামে জমি রেজিস্ট্রি হয়েছে। কাজেই সবার সঙ্গে তাঁকেও আসতে হয়েছিল। রাজদিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, এতখানি রাস্তা তাঁর মতন দুর্বল রোগা মানুষের পক্ষে একবার এসে আবার ফিরে যাওয়া অসম্ভব। শরীরে তা হলে আর কিছুই থাকবে না। তাই সকাল বেলাতেই লারমোরের ফীটনখানা আনিয়ে রেখেছিলেন হেমনাথ। গাড়িতে করেই সবাই রেজিস্ট্রি অফিসে এসেছেন।

সামনের দিকে একটা ডালপালা-ওলা বিশাল জামরুল গাছের তলায় লারমোরের ফীটনটা দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স্ক রুগ্ন ঘোড়াটা আর কোচোয়ান কেরামুদ্দি; যে যার জায়গায় ঝিমুচ্ছিল। হেমনাথরা সোজা সেখানে চলে এলেন।

মজিদ মিঞা গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কেরামুদ্দি—'

অতি কষ্টে চোখের পাতা দুটো ওপর-দিকে টেনে তুলল কেরামুদ্দি। ঘুমন্ত গলায় সাড়া দিল, 'অ'—'

'ঘুমাস নিকি?'

'না।' বলতে বলতেই আবার তার চোখ বুজে এল।

'ঘুমাস না তো চোখ বুইজা আছে ক্যান?' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'নে, চোখ টান কর। তর ঘোড়ারে জাগা। আমাগো কাজ হইয়া গেছে। এইবার বাড়িত্ যামু।'

একে একে সবাই ফীটনে উঠল।

হেমনাথদের সঙ্গে জামরুলতলায় তালেবও এসেছিল। সবাইকে গাড়িতে উঠতে দেখে সে উৎকণ্ঠিত হল। ফীটন ছাড়বার মুখে তাড়াতাড়ি অবনীমোহনকে ডাকল, 'জামাইকত্তা—'

অবনীমোহন তাকালেন, 'কী বলছ?'

'আমার সেই কথাটা কিলাম কওয়া হয় নাই।'

অবনীমোহনের মনে পড়ে গেল। সাগ্রহে বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বল—'

তালেব বলল, 'জমিন কিনলেন; ধান রুইবেন তো?'

'সেইরকমই ইচ্ছে।' অবনীমোহন হাসলেন।

'অঘ্রান পোষ মাসে ধান কাটার পর—' তালেব বলতে লাগল, ' আপনের জমিনে যা দুই-চাইর দানা পইড়া থাকব, হেগুলা (সেগুলো) কিলাম আমার। ইন্দুরের গাদে (ইঁদুরের গর্তে) যা ধান থাকব তা-ও আমার।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'মাটির সঙ্গে যে ধান মিশে থাকবে তা তুলবে কী করে?'

'হে (তা) আমি যেমনে পারি। আপনে খালি কথা দ্যান, ঐ ধান আমারে দিবেন।'

সংশয়ের গলায় অবনীমোহন বললেন, 'তুমি যদি তুলে নিতে পার, আমার আপত্তি নেই।'

তালেবের চোখ-মুখ থেকে আনন্দ যেন উপচে পড়তে লাগল। এত বড় জয় যেন আর কখনও হয়নি তার। উৎফুল্ল সুরে মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে সে বলতে লাগল, 'কথা দিলেন কিলাম, পাকা কথা—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাকা কথা বৈকি—'

এক সময় ফীটন চলতে শুরু করল। অবনীমোহনের বিস্ময় আর কাটছিল না। বললেন, 'অদ্ভুত লোক—'

হেমনাথ বললেন,—'হ্যাঁ,' অদ্ভুতই। রোজ এই রেজিস্ট্রি অফিসে এসে বসে থাকে। আর যে জমি কেনে, তাকে গিয়ে ধরে; যাতে ধান ওঠার পর ঝড়তি-পড়তি ফসল ও কুড়িয়ে নিতে পারে।'

'আর কিছু করে না?'

'না। করতে তো অনেকেই বলে। আমি বলেছি, মজিদ বলেছে, রামকেশব বলেছে, গয়াখোলার রহিম মিয়া বলেছে। কামলার তো সবারই দরকার; আমরা ওকে বাড়িতে এসে থাকতে বলেছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে!'

'ধান কুড়িয়ে দিন চলে?'

'ভগবান জানে।'

সারা রাস্তা তালেবের কথাই হল। কথায় কথায় একসময় বরফকল, স্টিমারঘাটা, সারি সারি মিঠাইর দোকান পেরিয়ে ফীটন হেমনাথের বাড়ি এসে থামল।

পুজোর আগে আগে সেই যে ঝিনুক এ বাড়ি এসেছিল, এখনও যায়নি। ভবতোষ অবশ্য মাঝে-মধ্যে এসে মেয়েকে দেখে গেছেন। ঠিক হয়েছে এখানে থেকেই পড়াশোনা করবে ঝিনুক। ইংরেজি নতুন বছর পড়লে স্কুলে ভর্তি হবে।

এখনও মাছের বড় টুকরোটা নিয়ে, দাদুর কাছে শোওয়া নিয়ে, স্নেহলতার ভাগ নিয়ে বিনুর সঙ্গে সমানে হিংসে করে যাচ্ছে ঝিনুক। তবে, পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে ঝুমারা আসার পর ঝিনুক যেমন হয়ে উঠেছিল, এখন আর তেমনটি নেই। তখন সব সময় বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকত সে। বিনু কী করে, কোথায় যায়—সব তীক্ষ্ন ধারাল চোখে লক্ষ্য করত।

ঝুমার সঙ্গে বিনু খেলা করলে, কথা বললে, কিংবা বেড়াতে গেলে রাগে আক্রোশে বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে যেত ঝিনুক। আজকাল সে ভাবটা আর নেই তার।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ্য করেছে; লেখাপড়া, খেলাধুলো কিংবা তার সঙ্গে হিংসের ফাঁকে ফাঁকে কখনও পুবের ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে ঝিনুক; উদাস চোখে হেমন্তের অনুজ্জ্বল ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। যে ঝিনুক হিংসে করে, যে ঝিনুক দাদু-দিদার ভাগ নিয়ে গাল ফুলিয়ে দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে থাকে, তাকে তবু চেনা যায়। কিন্তু উদাসিনী এই মেয়েটা বড় অচেনা; তাকে বড় দূরের মনে হয় তখন।

এমনিতে ঝিনুককে বিশেষ পছন্দ করে না বিনু; আবার অপছন্দও করে না। কিন্তু নির্বাক বিষন্ন প্রতিমার মতন এই সুদূর অচেনা মেয়েটা তাকে যেন অসীম আকর্ষণে টানতে থাকে।

একেক সময় বিনু তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'এখানে বসে কী করছ?'

প্রথমটা হয়তো শুনতেই পায় না ঝিনুক। দু-চারবার ডাকাডাকির পর সে চমকে তাকায়। বিনু আগের প্রশ্নটাই আবার করে, 'এখানে কী করছ?'

গাঢ় বিষাদের গলায় ঝিনুক বলে, 'মার কথা ভাবছি।'

দুঃখী মেয়েটা নিমেষে যেন বিনুকে অভিভূত করে ফেলে। তার অনেকখানি কাছে গিয়ে অপার সহানুভূতির সুরে সে শুধোয়, 'মা'র জন্যে মন কেমন করছে?'

আস্তে আস্তে কোঁকড়ানো চুলে-ভরা মাথাটা নেড়ে আধফোটা গলায় ঝিনুক বলে, 'হুঁ—' কালো টিপ পরানো রূপোর কাজললতার মতন বড় বড় চোখদুটো প্রথমে জলে ভরে যায় তারপর ফোঁটায় ফোঁটায় টপ-টপ পড়তে থাকে।

এই সময়টা একেবারে দিশেহারা হয়ে যায় বিনু। কিভাবে ঝিনুককে সান্ত্বনা দেবে, কেমন করে কোন সমবেদনার কথা বললে মেয়েটা শান্ত হবে, সে ভেবেই পায় না। বিমূঢ়ের মতন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গভীর ভারী গলায় বিনু বলে, 'কেঁদো না, কেঁদো না।'

কান্না থামে না। ঝিনুক ফুলে ফুলে ফোঁপাতেই থাকে আর ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে, 'মাকে আমি আর কখ্খনো দেখতে পাব না।'

গলার কাছটা, বুকের ভেতরটা কেমন ভারী হয়ে আসে। কান্নার মতন কিছু একটা উথলে উথলে বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু পথ পায় না। ফিসফিস করে বিনু কী বলে, ঝিনুক তো নয়ই, নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে না।

অঘ্রানের শেষাশেষি একদিন হেমনাথ বললেন, 'মাঠের ধান তো পেকে এল। আর ক'দিন পর কাটা শুরু হবে। তার আগে একটা কাজ করা দরকার।'

স্নেহলতা অবনীমোহন-সুধা-সুনীতি-বিনু, এমনকি যুগলও কাছাকাছিই ছিল। সবাই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী?'

'ধানকাটার পরই তো যুগলের বিয়ে। তার আগে একখানা ঘর তুলতে হবে। নইলে—'

স্নেহলতা বললেন, 'নইলে কী?'

হেমনাথ বললেন, 'নতুন বৌ এসে থাকবে কোথায়?'

'সে তো ঠিকই।' স্নেহলতা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'তা ঘর উঠবে কোথায়?'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ যুগলের দিকে তাকালেন। কৌতুকের গলায় বললেন, 'কি রে, কোথায় ঘর তুলবি?'

যুগল ঘাড় গুঁজে একমনে নখ খুঁটে যাচ্ছিল। আরো ঝুঁকে পড়ল সে; জবাব দিল না।

হেমনাথ বললেন, 'লজ্জায় তো একেবারে গেলি!' বল-বল্, তাড়াতাড়ি বল্। কাল থেকে কামলা লাগাব।'

যুগল আর বসে থাকতে পারল না; উঠে বার-বাড়ির দিকে ছুট লাগাল।

হেমনাথ হেসে উঠলেন, দেখাদেখি অন্য সবাইও হাসল।

যাই হোক, সেদিনই ঘুরে ঘুরে যুগলের ঘরের জন্য জায়গা ঠিক করে ফেললেন হেমনাথ। দক্ষিণের ঘরের গা ঘেঁষে ঢেঁকি-ঘর। তার পেছন দিকে কইওকড়া আর চোখ-উদানে গাছের ঝুপসি জঙ্গল। স্থির হল এই জায়গাটা সাফ-টাফ করে কাল থেকে ঘর তোলা হবে। পাঁচশের বন্দের ঘর।

হেমনাথ যা বলেছিলেন তাই করলেন। পরের দিনই মজুর লাগিয়ে দিলেন।

দেখতে দেখতে পৌষ মাস পড়ে গেল।

আশ্বিনের শুরুতে মাঠময় শুধু ছিল জল। অথৈ অপার সমুদ্র হয়ে শরতের মাঠ দিগদিগন্ত জুড়ে দুলতে থাকত। তার ওপর আমন ধানের চারাগুলো মাথা তুলে ছিল। তখন যেদিকে চোখ যেত, সবুজ আর সবুজ।

কার্তিকের গোড়াতেই জলে টান ধরেছিল। পৌষ মাস পড়তে না পড়তেই মাঠ একেবারে শুকনো; এক ফোঁটাও জল নেই। অবশ্য মাটি এখনও নরম, কোথাও কোথাও অবশ্য কাদা জমে আছে।

তবে সব চাইতে বিস্ময়কর যা, তা হল ধানগাছগুলো। কোন এক যাদুকরের ছোঁয়ায় সেগুলো এখন সোনা হয়ে গেছে। মাঠের খাঁপি ফসলের লাবণ্যে ভরে উঠেছে।

হেমনাথ একদিন বললেন, 'আর দেরি করা যাবে না। কালই ধানকাটা শুরু করতে হবে।'

(ক্রমশঃ)

নিজেকে সৎ বলে মনে করেন

কথাটা পড়ে রাগে ফেটে পড়বার আগে, দয়া করে নীচের প্রশ্নগুলিতে আন্তরিক-ভাবে জবাব দেবার একটু চেষ্টা করুন, তাহলে নিজের সম্পর্কে নিজেই বেশ বুঝতে পারবেন।

আপনার নিজের পছন্দ মতোই (ক) কিংবা (খ)-তে টিকচিহ্ন দিন এবং সবশেষে পয়েন্ট দেবার পদ্ধতি অনুসারে নিজেই হিসেব করে দেখুন কত পেলেন।

১। (ক) আপনি যদি রাস্তার ওপর পড়ে-থাকা একটা মানিব্যাগ পান, যাতে টাকা ঠাসা, তাহলে কি আপনি তৎক্ষণাৎ সেটি কাছাকাছি কোনও থানায় জমা দিয়ে দেবেন?

(খ) কিংবা, আপনি মনে করবেন যে-লোক এতো টাকা এমন করে ফেলে যেতে পারে, তার টাকা হারালে কিছু ক্ষতি হবে না, এবং তাই ভেবে টাকাগুলো নিজের কাছেই রেখে দেবেন?

২।(ক) যখন দোকানদার আপনাকে চেঞ্জ ফেরৎ দিতে গিয়ে অনেক বেশি পয়সা দিয়ে ফেললো, তখন কি আপনি সেগুলো নিজের পকেটে ঢুকিয়ে দেবেন এই ভেবে যে, ওরা তো সব জোচ্চোর, আর এইবার তো তাদের বাগে পেয়েছেন শোধ নেবার?

(খ) না কি, তার ভুলটা ধরিয়ে দেবেন?

৩।(ক) মনে করুন, একটা বড় দোকানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে এবং ছেলেটি কোনো একটি কাউন্টার থেকে আপনার অজ্ঞাতে কিছু একটা তুলে নিয়েছে—আপনি কি ফিরে এসে সেটির দাম দিয়ে দেবেন?

(খ) না কি, চলেই যাবেন?

৪।(ক) যদি কখনো আপনাকে কোনো ইনসিওরেন্সের ক্লেম জানাতে হয়, তাহলে কি লাভের আশায় টাকার অংক বাড়িয়ে বলা দরকার মনে করেন?

(খ) কিংবা, প্রকৃত হিসাবমতো সঠিক টাকার অংকটাই ক্লেম করেন?

৫।(ক) মনে করুন, আপনার রোজ-গারের একটা দিক ইনকাম ট্যাক্সের হিসাবে আপনি না দেখালে ইনকাম ট্যাকস অফিসার কোনোদিন ধরতেই পারবে না—আপনি কি সেই রোজগারের কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবেন?

(খ) না কি, ঐ রোজগারের কথা উল্লেখ করবেন না, ভাববেন, 'ওরা তো আমাদের কাছ থেকে এমনিতেই কতো টাকা কামাচ্ছে'?

৬।(ক) ট্রামে বাসে চলার সময়ে কনডাকটর যদি আপনার কাছ থেকে ভাড়া চাইতে খেয়ালই না করে, তাহলে কি আপনি পয়সা পকেটেই রেখে দেবেন?

(খ) না কি, ঠিক ভাড়াটুকু দিয়েই দেবেন?

৭।(ক) মনে করুন, রেস্টুরেন্টে প্লেটের নীচে বয়দের বখশিসের কিছু পয়সা পড়ে রয়েছে দেখতে পেলেন, আপনি কি তাদের ডেকে দেখিয়ে দেবেন?

(খ) না কি, আপনার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চেপে রাখবেন, তারপরে যেন আপনিই ঐ বখশিশ রেখে যাচ্ছেন এমন ভান করে উঠে যাবেন?

৮।(ক) যদি আপনার কাছে এমন একখানি চিঠি আসে যার ওপরে লাগানো ডাকটিকিটে কোনো ছাপের দাগ পড়েনি, তাহলে কি লোভ সামলে রেখে সেটিকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবেন?

(খ) না কি, সযত্নে ডাকটিকিটখানা খুলে নিয়ে আবার ব্যবহার করবেন?

৯।(ক) যদি আপনার কোনো ধনী আত্মীয় আপনার জন্যে প্রচুর টাকা রেখে যান, এই সর্তে যে, আপনি মদ খাবেন না, ধূমপান করবেন না, সিনেমায় যাবেন না ইত্যাদি, তাহলে কি আপনি টাকাটা নেবেন এবং তারপরেও মদ খাওয়া, ইত্যাদি চালিয়ে যাবেন এই মনে করে যে, আপনার ঐ ধনী আত্মীয়টি ছিলেন একটা পাগল?

(খ) না কি, আপনি তাঁর ইচ্ছার প্রতিটি অক্ষর অনুসারে জীবন কাটাবেন?

১০।(ক) যদি কোনো সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠান থেকে আপনাকে প্রায় বিনা দামেই কিছু 'তাজা মাল' দিতে চায়, এবং ধরা পড়বার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও যদি না থাকে, তাহলে কি আপনি তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেবেন?

(খ) না কি, তাদের সংগে কারবার করবেন?

প্রত্যেক সঠিক জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন।

সঠিক জবাবগুলি এই:—১(ক), ২(খ) ৩(ক), ৪(খ), ৫(ক), ৬(খ), ৭(ক), ৮(ক), ৯(খ), ১০(ক)।

মোট সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে ৫০।

আপনি যদি আন্তরিকভাবে জবাব দিয়ে ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে পয়েন্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনি সদাচরণের মূর্ত প্রতীক এবং আমাদের সকলের কাছে আপনি সততার উজ্জ্বল আদর্শ।

২৫ থেকে ৩৫ পয়েন্ট পেলে বোঝাবে আপনি ভারী চমৎকার মানুষটি, তবে নিখুঁত হতে অনেক বাকী আছে,—বলতে গেলে, আপনি সাধারণ মানুষ।

২০ পয়েন্ট কিংবা তারও কম পেলে বুঝতে হবে, আইন-শৃংখলার ব্যাপারে খুব জটিল ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার দিকে আপনি এগিয়ে চলেছেন!

কেউই নিজেকে অসৎ বলে না, ভাবে না। প্রত্যেকের নিজের রুচিবোধ নীতিবোধ অনুসারেই কাজ করে চলে। কিন্তু সমাজে যে নীতিবোধ সর্বজনগ্রাহ্য, তারই মাপ-কাঠিতে আমাদের আচরণের যাচাই করা হয়ে থাকে।

এই কারণেই সমাজের অধিকাংশ মানুষের চোখে সৎ হয়ে থাকতে হলে কতকগুলি সাধারণ সততার নীতি মেনে চলতেই হয়।

সততা রক্ষা করে চলে কি লাভ হয় আজকের দিনে—এমন প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে। তাঁরা মনে করেন, সকল ক্ষেত্রেই যখন দুর্নীতি চলেছে, তখন এক-আধজন সৎ হয়ে থেকে তো ঠকতেই থাকবে।

বস্তুগত লাভ-ক্ষতির দিক বিবেচনা করেই তাঁরা এমন কথা ভাবেন। কিন্তু বস্তুগত লাভ মানুষকে পরিপূর্ণ মনোগত তৃপ্তি দিতে পারে না। বিশেষ করে, কোনো কিছু লাভ করার পদ্ধতির পেছনে যদি লুকোচুরি থাকে, নীতিগত আত্ম-সমর্থনের অভাব থাকে, তাহলে সেই লাভের অনেক-খানি আনন্দই নষ্ট হয়ে যায়। বিষণ্ণতা জাগে। কেউ জেনে ফেলবে এই ভয়ে, উৎকণ্ঠা জাগে, আর তার ফলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়তে থাকে।

এর মধ্যে জটিল দর্শনের কোনো কথা নেই—নিতান্ত সাদাসিধে কথা। আপনার নিজের দৈনন্দিন জীবনেই এর পরখ করে দেখতে পারেন—যা আপনি সৎ পথে বুক ফুলিয়ে অর্জন করবেন, তার জন্যে অহরহ আপনি এক অতুলনীয় প্রফুল্লতায় সজীবতা উপলব্ধি করবেন; আর যা আপনি অসৎ উপায়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে অর্জন করবেন, তার জন্যে দিনে-রাতে ভোগ করতে থাকবেন একটা বিশ্রী অপরাধমনতার বুকচাপা বিষাদভরা মনোভাব, যাকে টাকা দেওয়ার জন্যে মানুষ সবরকমের ভালো-মন্দ হৈ-হুল্লোড় আমোদ-ফূর্তির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেও নিস্তার পায় না কী? সত্যি কিনা ভেবে দেখুন!

রমেশ দত্তের
রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১২)

চিত্রকল্পনা- প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে- চিত্রসেন

অথ চূত কথা

সুশীলাংশু দাশ

আমেরিকা বা ইউরোপে যেমন আপেল আমাদের দেশে তেমনি আম। স্বাদে গন্ধে কিংবা চেহারাতেই শুধু নয়, খাদ্যমূল্যের দিক দিয়েও আম পৃথিবীর বাজারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

একথা নিরাপদে বলা চলে যে ভারতীয় সভ্যতা যত বছরের আমের চাষও এখানে তত বছরের। চরক সংহিতায় এ গাছের উল্লেখ রয়েছে। শোনা যায় সম্রাট আলেক-জেন্ডার (৩২৭ খৃঃ পূঃ) সিন্ধু উপত্যকায় একটি আম বাগান দেখে প্রথমে মুগ্ধ হন। তাঁর কৌতূহলও নাকি বেড়ে যায়। সম্ভবত এই প্রথম একজন বিদেশী এই গাছ দেখেন। পরে হুয়েন-ৎ-সাঙ (৬৩২-৫৪ খৃঃ) এবং ইবান হানকাল (৯০২-৬৮ খৃঃ) ভারতে এসে তাঁদের বিবরণীতে এই ফলের উল্লেখ করেন। হুয়েন-ৎ-সাঙই বোধকরি প্রথম লেখক যিনি ভারতের বাইরে মানুষের নজরে এই ফলের কথা নিয়ে আসেন।

বর্তমানে যদিও পৃথিবীর বহু দেশেই বাণিজ্যিক কারণে আমের চাষ হচ্ছে তবু এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের স্থান নিঃসন্দেহে তুঙ্গে। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যা-কুমারিকা ও পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত সর্বত্র আম হয়ে থাকে। আম গাছের প্রকৃতি খুব শক্ত ধরণের, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও কম অথচ ফলন প্রচুর ; তাই আমকে বলা হয় গরীবের ফল। এদিক থেকে আমের একটা বিরাট আবেদন রয়েছে সাধারণ মানুষের উপর।

ভারতের অতি প্রাচীন ফল হিসেবে আম হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনীতে আম গাছকে ধরা হয়েছে প্রজাপতির (সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার) রূপান্তর হিসেবে। আম্র-মুকুল ও ফলের প্রশংসায় সংস্কৃত কবিতা উচ্ছ্বসিত। শকুন্তলা নাটকে আম ফুলকে কামদেবের পঞ্চশরের এক শর বলা হয়েছে। এখনও পঞ্চপল্লব বা আমসরা হিন্দুদের বহুপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞান ও সূক্ষ্ম চারুশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর উপাসনায় মাঘ মাসে আম্রমুকুল অপরিহার্য। তার এক মাস পরে ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে হিন্দুর ত্রিমূর্তির এক মূর্তি শিব পূজায় ব্রতে আম্রমুকুল না হলে চলে না।

হিন্দুর প্রায় সব উৎসব অনুষ্ঠানেই আম পাতার ফেস্টুন দেখা যায়। যাগ-যজ্ঞে হোমে পবিত্র অগ্নি-প্রজ্জ্বলনে আম কাঠের ব্যবহার সুবিদিত। ভগবান বুদ্ধকে একটি আম্রকুঞ্জ দান করা হয়েছিল তার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে ধ্যান করবার জন্য। এখনও এই গাছ আমাদের কাছে পরম সমাদরের।

প্রাচীন ভারতে মানুষের কৃষ্টির সঙ্গে আম এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল যে সংস্কৃতে এর প্রতিশব্দগুলি (আম্র চূত, সহকার ও রসাল) অন্যান্য বহু জিনিসের গুণাগুণ বোঝাতে প্রায়শই ব্যবহৃত হতো। যেমন, আমের গন্ধ যেসব গাছপালায় পাওয়া যায়, তাদের বলা হয় আম্র-গন্ধক। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ও অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁদের নামের সঙ্গে আমের নাম যুক্ত করে গেছেন। বৈশালীর আম্রপলীর নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। ভগবান বুদ্ধকে যে রমণী আম্র-কুঞ্জ দান করেছিলেন তিনি আম্রদারিকা নামে খ্যাত ছিলেন। কালিদাস তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি মেঘদূতে আম্রকূট নামে এক পাহাড়ের উল্লেখ করেছেন। বাল্মীকি তাঁর অমর মহাকাব্য রামায়ণের বহু স্থানে আম বাগিচা ও আম বনের কথা উল্লেখ করেছেন। আমের নামানুসারে কোন কোন ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ও সঙ্গীতের রাগের নাম হয়েছে ; যেমন যথাক্রমে আম্র তাকেশ্বর ও আম্রপঞ্চম। অজন্তা, ইলোরা এবং অন্যান্য বহু স্থানে যেখানে ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায় সেই সমস্ত চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্যে আম গাছ তার পাতা, ফুল ও ফলের সমস্ত সৌন্দর্য সম্ভার নিয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

প্রাচীন ভারতে হিন্দুরা যে কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতা বা ধর্মানুরাগবশতই আমের মূল্যবোধ সম্বন্ধে এতটা সজাগ ছিলেন তা নয়, তাঁরা সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আমের প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আমের ব্যবহার বহুবিধ। এই মূল্যবান গাছের আগা থেকে গোড়া অবধি প্রত্যেকটি অংশ মানুষের কোন না কোন কাজে লাগে। ফল যখন বেড়ে উঠছে তখনও 'বাঁড়া' পর্যায়ে তার ব্যবহার মানুষ করে থাকে। পাকার আগে কাঁচা ফল দিয়ে নানারকম চাটনী, টক, ঠান্ডা পানীয়, আচার, আমস ইত্যাদি তৈরী করা হয়। পাকা ফল তো পৃথিবীর সর্বত্র পরম আস্বাদের বস্তু। উদ্বৃত্ত আম দিয়ে স্কোয়াশ, সীরাপ, জ্যাম জেলী, জারক আম ও মোরব্বা প্রভৃতি তৈরী করা হয়ে থাকে। আমের আঁটি বিবেচনা করে পুঁতলে পরে তা গাছ হয়ে পথচারী, কৃষক ও শ্রমিকদের শীতল ছায়া ও বিশ্রামের সুযোগ করে দিয়ে প্রখর সূর্যকিরণ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে

আবার ওদিকে আম গাছ মাটি আঁকড়ে ধরে ভূমিক্ষয়ও রোধ করতে পারে। কোন কোন প্রকারের আমের আঁঠি দিয়ে ব্রুশ তৈরী হয়। আমের আঁঠি আবার শূকরের খাদ্যও বটে। আম যেমন ভিটামিন 'এ' ও 'সি'-য়ে ভরা আমের আঁটির ভেতরের শাঁসটাও তেমনি কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম ও ফ্যাটে ভরা। সুতরাং খাদ্য হিসেবেও আঁঠির শাঁসের ব্যবহার চলে। শাঁসটা শুকিয়ে, পিষে ময়দা করে বিহার ও উত্তর-প্রদেশে খাবার চলন আছে।

ঘাসের অভাবের সময় ছাগ ও গবাদি পশু আম পাতা খেয়ে কাটায়। আর মরা ডালগুলি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খুব ভারী আসবাবপত্র বা দরজা জানালা তৈরী করার ব্যাপারে আম কাঠের প্রচলন আমাদের দেশে খুবই বেশী। আম গাছের ছালের উপর যে আঠা লেগে থাকে তা দিয়ে আমাদের গাঁদের কাজ হয়।

আম গাছ যে বড় অলংকারপূর্ণ এতে কোন সন্দেহ নেই। পুরোপুরি বর্ধিত আম গাছ চির সবুজ। ভালো মাটিতে জন্মালে বিরাট আকার গ্রহণ করে অর চেহারাটাও হয় বেশ দর্শনীয়। ফলে পার্ক করতে গেলে এ-গাছে খুব সুবিধা। এদের মধ্যেই আবার যেসব বীজে গাছের কাণ্ড খুব দীর্ঘ হয়, এবং গাছের স্বাভাবিক ঝোঁক উপরে বাড়বার দিকে সে সব বীজের গাছ বড় বড় রাস্তার ধারে লাগালে পর বেশ মনোহর এভেন্যু রচনা করা যায় এবং এতে ব্যবহারকারীর রুচিবোধও বৃদ্ধি পায়।

আমের এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও এর স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে অতীতে মতানৈক্য যেমন দেখা গেছে, তেমনি মজার ঘটনাও নেহাৎ কম ঘটেনি। একবার জনৈক বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষ ঘুরে স্বদেশে ফিরে গিয়ে আত্মীয় স্বজনের কাছে আম সম্বন্ধে বলেছেন—ওটা একটা বলের মত, তাপিণ তেল ও ঝোলা-গুড়ে ভেজানো; ওটা খেতে হলে তোমায় বাথ্ টাবে বসে খেতে হবে। এ-ধরণের কথা পর্যটকদের মুখে শোনা গেছে তার কারণ বোধহয় তাঁরা ভারতের যত্র-তত্র যে-সব আঁশযুক্ত সাধারণ পর্যায়ের আম জন্মায় সেগুলিরই আস্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।

এবার বিভিন্ন প্রকারের আম নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বিভিন্ন প্রকারে আমের নাম নিয়ে যদিও কোন সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নীতি নেই। একইপ্রকারের আম দেশ ভেদে এমন কি প্রদেশ ভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। তবুও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের আমের নাম হওয়া উচিত। বিভিন্ন প্রকারের আমের নামের ভিত্তিও অবশ্য আলাদা আলাদা।

উৎপত্তি স্থান ভিত্তিক আমের নামের কিছু নমুনা এখানে দেওয়া গেল—রত্নৌল, বেনারসের ল্যাংড়া, বোম্বাই, কলকাতার আমিন, বাংলার গোলা, মালদা, চুপোখালি, দশহরি, সিঙ্গাপুরী ইত্যাদি।

রাজা মহারাজা অথবা এমনি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামানুসারে বিভিন্ন-প্রকারের আমের নাম হয়েছে, যেমন? হিমায়ুদ্দিন, জাহাঙ্গীর, নিসার পসন্দ, রহমত খাস, আসফ-পসন্দ, ইনায়েৎ-পসন্দ ইত্যাদি।

রোমান্টিক ভাব থেকেও আমের নাম হয়েছে। দিলপসন্দ, হুসেনারা নাজুক-বদন, পরী, সমর বাহিস্ত (এই উর্দু নামের অর্থ স্বর্গের ফল), কৃষ্ণভোগ, গোপালভোগ, ইত্যাদি তার প্রমাণ।

আমের বিরাট সাইজ থেকে যেমন হাতীঝুল, পানসেরী ইত্যাদি নামের উদ্ভব তেমনি এসেছে আমের আকৃতি হিসেবে—তোতাপুরী, করলা, নাগিন, লাড্ডু, চাপটা গোলা, খরবুজা, নাসপাতি প্রভৃতি।

আমের রঙ দেখে নাম রাখা হয়েছে—সিঁদুরিয়া, জাফ্রান, কালা, কালাপাহাড়, স্বর্ণরেখা, জরদা ইত্যাদি।

আমের নামেতে স্বাদ ব'লে দেয় তেমন আমও রয়েছে অনেক। যেমন—মিঠুয়া, সন্দেশা, শরবতী, রসগোল্লা, মিশ্রী, মালাই, দুধিয়া মুলগোয়া, কাঁচামিঠা ইত্যাদি।

আবার নামেতে গন্ধও বলে। নমুনা-স্বরূপ, গুলাবখাস, গুলাবজামন, শরিফা'র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বছরে ক'বার ফলন হয় বোঝা যাবে বারমাসী, দোফসলা ইত্যাদি নাম দেখে।

আবার বছরের কোন্ মাসে আম পাকে তাও নাম দেখে ব'লে দেওয়া যয়; যেমন—বৈশাখিয়া, শাবনি, ভাদরিয়া, কার্তিক ইত্যাদি।

যদিও খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে সেই সংহিতার যুগেই ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ ফল হিসেবে আমের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল তবু ভারতের আম সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খলাসম্মত প্রামাণ্য লিপি পাওয়া যায় 'আইন-ই-আকবরী'তে (১৫৯০ খৃষ্টাব্দে)।

বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বিভিন্নপ্রকারের আমের বর্ণনার প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে, যখন এ ব্যাপারে প্রায় পাঁচশত রকমের আম সংগ্রহ করা হয়েছিল ব'লে জানা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে সবচাইতে বেশী আমের চাষ হয়ে থাকে। তারপরে মাদ্রাজ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশে এপর্যন্ত ৭২ রকমের আমের বর্ণনা পাওয়া গেছে। এখানে তার কিছু উল্লেখ করা হ'ল—অনুপম, বেগম-পসন্দ ভবানী চৌরস, দুদিয়া, ফজলী, হিমসাগর, জগন্নাথ ভোগ জাহানারা, কালা-পাহাড়, খিরসাপাতি, কহিনুর, কহিতুর, লক্ষ্ণৌ বক্স, মালদহ, মোহনঠাকুর, মোহন-ভোগ নাজুকবদন, নাম্রাং পসন্দ, পাপ্পা-পসন্দ, রাধিকাভোগ, রাণী পসন্দ, শাহদৌল্লা, শাহপসন্দ, সুলতান পসন্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক উপায়ে বর্ণসংকর হয়ে হ'য়েই এত বিভিন্ন-প্রকারের আমের উৎপত্তি হয়। উদাহরণ স্বরূপ মুর্শিদাবাদের আমের কথা ধরা যাক্। বলা হ'য়ে থাকে যে মুর্শিদাবাদে মূলত দুইপ্রকারের আম ছিল, মালদহ ও চুণাখালি। ক্রমে দেখা যায় মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ বিখ্যাত আমই উক্ত দুইপ্রকার আমের 'cross-pollination' -এর ফলে জন্মেছে।
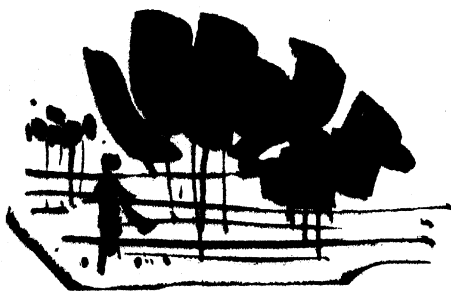
প্রায় বছর-দেড়েক আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচারে বর্তমান যুগের মানুষের পরস্পরের কাছে সংবাদ ও বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার যতরকম মাধ্যম আছে এবং এই মানুষে মানুষে যোগাযোগ স্থাপনের যতরকম সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে-বিষয় নিয়ে একটি সেমিনার হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই এর ওপর একটি প্রদর্শনী আয়োজনের পরিকল্পনা হয়। নানা কারণে এই প্রদর্শনীর আয়োজন পেছিয়ে গিয়েছিল। গত ১৭ই মে পার্ক-সার্কাস ময়দানে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা যেভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন বলে মনস্থ করেন, সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাবে সেইরকমভাবে তা করা সম্ভব হয়নি। তাহলেও সামগ্রিকভাবে প্রদর্শনীটি মন্দ হয়নি। আধুনিক যোগাযোগ স্থাপনের অনেকগুলি ব্যবস্থাই এঁরা প্রদর্শন করেছেন। বই, পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমগুলি দেখানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার স্টলে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা, ভ্রমণের সুযোগ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে মডেল চার্ট ও ফটোগ্রাফে সুসজ্জিত কতকগুলি স্টল সুন্দর হয়েছে।

প্রদর্শনীর আরেকটি আকর্ষণ একটি ছোট স্টলে ভারতের ব্যঙ্গচিত্রের ইতিহাসের একটি চমৎকার প্রদর্শনী। ১৮৫০ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত শতাধিক কার্টুনের প্রতিলিপি দিয়ে সাজানো এই প্রদর্শনীটি প্রবীণ কার্টুনিস্ট পি সি এল ১৯শে মে উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ শিল্পী ও কার্টুনিস্ট চারু রায়। প্রদর্শনীর আয়োজন করেন নবীন কার্টুনিস্ট কমল সরকার। দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বাংলাদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রকাশিত প্রাচীন পত্র-পত্রিকা থেকে কার্টুনগুলি সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখযোগ্য কার্টুনের মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর প্রথম ডাকটিকিট প্রচলন, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, সিপাহী-বিদ্রোহের কালে তাঁতিয়া টোপিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা, আফগান যুদ্ধ, বঙ্গভঙ্গ, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন যেগুলি গান্ধীজীর কোন জীবনীতেই বোধহয় উল্লেখ পাওয়া যায় না) প্রভৃতি রাজনৈতিক কার্টুন ছাড়াও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক কার্টুন রয়েছে। এর মধ্যে থুইয়ার সাহেব কর্তৃক রাধানাথ শিকদারের প্রবন্ধ চুরি এবং সপ্তম এডোয়ার্ড যখন প্রিন্স অব ওয়েলস, তখন কলকাতায় অবস্থানকালে জগদানন্দ মুখুজ্যের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণের ফলে যে-সামাজিক ঝড় উঠেছিল, তার ওপর কার্টুনগুলি উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে গগনেন্দ্রনাথের সামাজিক ও রাজনৈতিক কয়েকটি কার্টুন ও চারু রায়ের অসহযোগ আন্দোলনের কার্টুন ও লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে পি সি এল-এর একটি কার্টুন প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকাই প্রথম কার্টুন ছাপানো শুরু করেন। ভারতীয় কার্টুনের একটা ধারাবাহিক রূপ এইভাবে দেবার চেষ্টা বোধহয় এই প্রথম এবং সেজন্যে উদ্যোক্তারা আশা করি তাঁদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি পাবেন। প্রদর্শনী ১৬ই জুন অবধি খোলা থাকবে।

রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পী রণজিৎ দে ২৮মে থেকে ৩ জুন অবধি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। ইতিপূর্বে ১৯৬৪ সালে একবার তিনি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে প্রদর্শনী করেন।

বর্তমান প্রদর্শনীতে তাঁর প্রায় খান-চল্লিশ জল রং টেম্পারা ও তেল রঙের ছবি এবং অনেকগুলি ছোট স্কেচ দেখানো হয়। গতবারের প্রদর্শনীর চাইতে এবারকার কাজগুলি আরো পরিণত মনে হল। প্রদর্শনীতে তেল রঙের চাইতে জল রঙের কাজেরই সংখ্যাধিক্য এবং এরই মাধ্যমে তাঁর দক্ষতাও বেশী বলে মনে হল এবং ফিগারের চাইতে নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যেই তাঁর সাবলীলতা বোধহয় বেশী প্রকাশ পেয়েছে। দু-একটি ছবি গোপাল ঘোষের শিল্পরীতি মনে পাড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে ৯ নম্বর ছবির নীল পাহাড় ও মেঘের মধ্যে কমলা রঙের সূর্যের টিপ কতকটা অ্যাবস্ট্রাক্টধর্মী সুদৃশ্য কাজ। তেল রঙের তালবীথির ছবিটি ধূসর-ঘেঁষা কতকটা শান্তিনিকেতনের ঢং-এর স্টাইলাইজড্ কাজ। তবে কয়েকটি শ্রমিকের কর্মরত মূর্তির মধ্যে মূলত চতুষ্কোণ ও গোলাকার রূপের সাহায্যে একটি জোরালো কম্পোজিসন তৈরি হয়েছে। ভারতীয় রীতির থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে শাদা ষাঁড় ও তার সঙ্গী মানুষের ছবিটির জোরালো রঙের প্রয়োগ বেশ সুদৃশ্য একখানি ছবির সৃষ্টি করেছে। কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিক-রমণীর মূর্তিগুলি কতকটা বৈশিষ্ট্যহীন নব্য ভারতীয় রীতির কাজ—যদিও রেখাপাত বেশ জোরালো। বড় মাপের টেম্পারায় করা কয়েকটি নারী-মূর্তির

শিল্পী : বারিদ গোস্বামী

রুশ শিল্পী এফ জিয়ারচেঙ্কোর অলঙ্কৃত অ্যালমুনিয়ামের মুখোস

মধ্যেও নিছক ডেকরেটিভ ভাবটুকুই প্রধান হয়ে চোখে পড়ল। তবে 'লাভার্স' সিরিজের ছবিগুলির মধ্যে ডিজাইনের বাহার দুটি দেহাকৃতির রেখার ছন্দ এবং কম্পোজিশনের বাহাদুরী লক্ষ্য করার মত। এখানে আধুনিক রীতি ও নব্যভারতীয় প্রথার একটা সুষম সংযোগ হয়েছে বলে মনে হয়। কৃষ্ণলীলা ছবিটির রং ও রেখার ডেকরেশন উল্লেখযোগ্য।

●

অ্যাকাডেমিতে সাতজন শিল্পীর যে স্কেচ-এর প্রদর্শনী ১০ থেকে ১৬ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তাতে অসাধারণ বৈচিত্র্য বা মৌলিকতা না থাকলেও একটা সতেজ ভাব কারো কারো কাজে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। শিল্পীরা জলরং কালি-কলম, ব্রাশ ড্রয়িং ও অন্যান্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে যে ক'টি ছবি উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে বারিদ গোস্বামী, শঙ্কর ঘোষ ও অমিতাভ ব্যানার্জির কাজগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। প্রথমোক্ত শিল্পীর ষাঁড়, মোরগ ও ছাগলের ড্রয়িংগুলির গ্রাফিক গুণ সুস্পষ্ট। কাগজের ওপর বিষয়বস্তুর স্থাপনাও সুরুচিসম্পন্ন। দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজে কখনো বা অতি সরলীকৃত ভাস্করসুলভ দৃষ্টিভংগী— যেমন 'রেস্ট' বা কালি ও রঙের হাল্কা ছাপে তৈরী আনন্দোজ্জ্বল দৃশ্য "দ ব্রাইট লেন', দক্ষতা ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ এনে দেয়। তৃতীয়জন ভিজে কাগজে কাগুঁর রেখা ও ছোপ-এ দুটি (বিড়ালে) এবং কেবল মাত্র রঙের ছাপে প্রায় অ্যাবস্ট্রাক্ট ঘেঁষা 'মিউজিসিয়ান' ও একটি প্রায় জাপানী কম্পোজিশন ঘেঁষা জলরং-এর ল্যান্ডস্কেপ উপস্থিত করেছেন।

সন্তোষ রোহাতগীর জল-রং ও কালির গ্রুপ কম্পোজিশনগুলিতে ক্ষিপ্রতার ভাবটাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্যামল বোসের ছোট ছোট একরঙা স্কেচ এবং মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর এক রঙে তুলি চালনায় তৈরী সিল্যুয়েৎ ঘেঁষা ফিগারগুলির মধ্যে কোথায় একটা সাবলীলতার অভাব আছে। বেণু লাহিড়ীর জলরঙের ওয়াশে করা ফিগারেটিভ স্টাডিগুলি মন্দ হয়নি।

●

শিশু-শিল্পী অনমিত্র চক্রবর্তীর বয়স এখন এগারো। বছর দুই আগে তার প্রথম প্রদর্শনীতেই কলকাতার রসিক মহলে সে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ন'বছরের ছেলের হাত থেকে এত পরিণত ছবি সকলকেই অবাক করেছিল। ইতিমধ্যে তিনটি প্রদর্শনীতে তার সুনাম সে অক্ষুন্ন রেখেছে। বর্তমানে অ্যাকাডেমিতে তার চতুর্থ প্রদর্শনীও (২০ থেকে ২৬ মার্চ) দর্শকদের নিরাশ করবে না।

নববর্ষ সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা শ্রীশ্রীপতি বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত

আশীটির অধিক জল রঙ ও তেল রঙে এবারেও তার নিসর্গ দৃশ্যের প্রতি একান্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেল। তার আগের বারের ছবির ধরনে কয়েকটি নৌকা, চক্র বা রাজহংসের ছবি ছাড়া এবারের বেশীর ভাগ ছবিই কাশ্মীর আর পুরীর দৃশ্য নিয়ে আঁকা, রঙের প্যাটার্ণ তার খুব বেশী বদলায় নি তবে কয়েকটি তেল রঙের কাজে অসাধারণ জোর এবং দুঃসাহসিক কম্পোজিসান দেখা গেল। ৭৫ নম্বরের গাছের ছবিতে সমস্ত গাছটির একটি ছাতার মত বিস্তৃত রূপ তার অনুভূতিসম্পন্ন মনের পরিচয়। ৬৪ নম্বরের কাশ্মীরের দৃশ্যতেও এই ধরনের সাহায্যের সংগে খোলা মাঠের সামনে একটিমাত্র বড় গাছ সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে। পুরীর কয়েকটি সমুদ্রের দৃশ্যে একটি নীল রঙের বিভিন্ন টোনে যে বিস্তার সৃষ্টি হয়েছে তা বিস্ময়কর। কোন কোন ছবিতে স্পেস এবং ডেকরেশন উভয়ের সুন্দর মিলন হয়েছে যেমন ৯ নম্বরে শান্তিনিকেতনের দৃশ্য। সরু একফালি নীল আকাশ, লালচে মাটি কালো গাছ আর লাল ফুল নিয়ে ছবিটি উজ্জ্বল। কাশ্মীরের পার্বত্য দৃশ্যে শুধু বিভিন্ন রঙে একটা বিস্তৃত জায়গার আভাস পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বরফ ঢাকা পাহড়ের চূড়া আর গাছের সারির মধ্যে কালো রঙের আঁকা-বাঁকা

শিল্পী : রণজিৎ দে

রেখায় যাত্রাপথের ইঙ্গিত আশ্চর্য লাগে। এ ছাড়া কয়েকটি ছবিতে শুধুই বিভিন্ন রঙের প্যাটার্ণে কতকগুলি নিছক আবস্ট্রাক্ট ডিজাইন সৃষ্টি করা হয়েছে। গত চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই এই ছবিগুলি আঁকা হয়েছে। সময়ের তুলনায় এদের বৈচিত্র্য এবং কতকগুলি ছবির বলিষ্ঠতা আশ্চর্যজনক বললে অত্যুক্তি হবে না।

●

হ্যদেশ গাই আসবাবপত্রের মধ্যে ভারতীয় ডিজাইন প্রয়োগের অনেকগুলি নিদর্শন নিয়ে আকাডেমি অব ফাইন আর্টসে একটি প্রদর্শনী করেন। নীচু গদি আঁটা চেয়ার— তার পেছনের হেলান দেবার জায়গাটির দু-পাশে দুটি মিনারের মত গঠন তুলে ও মধ্যে কিছু নকশা লাগিয়ে নানা উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করে এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট আয়না বসিয়ে কারো নাম শাহানশা, কারো বা নাম নুরজাহান, আবার কারো পদ্মিনী ইত্যাদি নাম দিয়ে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এর সংগে রঙীন দড়ির ছোট ছোট চারপাই, নকশাদার পায়াওয়ালা কাচের টেবিল, বিভিন্ন ধরনের মোড়া ইত্যাদি এবং অনুরূপ নকশার টেবিলল্যাম্প প্রভৃতি দিয়ে এক-একটি সেট কার্পেটের ওপর সাজান হয়। সবশুদ্ধ মিলিয়ে হলিউডে একদা আরব্যোপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে যে সব ছবি তোলা হত তার প্রাচ্যদেশের সুলতানের ঘরের সেটএর মত বেশ রঙদার চেহারা হয়েছিল। একদা অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র প্রমুখ শিল্পীরা স্বদেশী আসবাবপত্র তৈরীর পরীক্ষা করেছিলেন। তা সাময়িকভাবে সাফল্যও লাভ করেছিল। তার পেছনে একটা শিল্পের আদর্শ ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রদর্শনীতে শিল্পের আদর্শের চাইতে ব্যবসা-বুদ্ধিটাই প্রবল মনে হল। কারণ এ সবের সংগে আচার ও চাটনীর বোতলও সুসজ্জিত রাখা হয়।

—চিত্ররসিক

কল্পতরুর সারি সারি পরিচয়

কল্পতরু

আলোর বৃত্তে

শীতের একটি সুন্দর সকাল। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প পড়তে পড়তে বাড়ীর ছাদে ঘুমিয়ে পড়েছিল একটি স্কুলের ছেলে। ঘুম থেকে জেগে উঠে তার মনে হোল গল্পের চরিত্রগুলো যেন নিজ নিজ ভংগিমায় কোন এক স্বপ্নের নাটকে কথা বলেছে এতোক্ষণ। বেশ ভালো লেগেছে এই চরিত্রগুলোর অস্ফুট চলাফেরার সংগে নিজের বাস্তববিস্মৃত মনটাকে মিশিয়ে দিয়ে। বেলা গড়িয়ে গেলে একার স্বপ্ন-দেখার আনন্দবিহ্বলতা আর কিছু অনুভবে হিল্লোল তুললো। স্বপ্নে দেখা নাটকের মঞ্চ তাই এবার বাইরের আকাশের নীচে চোখে দেখা আলোর নতুন করে বিকশিত হোতে চাইলো। এ ভি স্কুলের নবম, দশম শ্রেণীর কয়েকটি ছেলের উৎসাহ এই আকুলতা ঘিরেই চাইলো প্রকাশের পথ। নাটকের গোষ্ঠী তৈরী করতে হবে, যেখানে বিভিন্ন চরিত্রের সংগে নিজেদের মিশিয়ে এক অদ্ভুত পরিচিতির কথা মঞ্চে তুলে ধরা যাবে। অপরিণত বয়সের এই কটি ছেলের মনে তখন শুধু এক চিন্তা—কবে, কখন, কোথায় নাটকের দল তৈরী করা যাবে। আলোচনা চললো বাড়ীর বারান্দায় আর পার্কের মুখরতায়। কয়েকদিন পর উৎসাহ সফলতার ভাষা পেলো। প্রতিষ্ঠিত হোল একটি নাট্যদল। নাম হোল 'কল্পতরু সংঘ'। সময়ের হিসেব নিলে সেটা ছিল ১৯৫৪-র আগস্ট মাস।

যে বইয়ের মর্মকথা প্রথম এই সব কিশোরদের মনে আলোড়ন তুলেছিল, যাকে ঘিরে একটি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলার কামনা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তাই দিয়েই 'কল্পতরু সংঘের' যাত্রা শুরু। 'মহেশ' গল্পের নাট্যরূপ দিলেন বসন্ত ভট্টাচার্য যাঁর প্রথম ভালোলাগা গোষ্ঠী তৈরীর নেপথ্যে উদ্দীপনা [illegible]। নাটক তো ঠিক হোল [illegible]। অনেক চেষ্টা করেও একটা নির্দিষ্ট ঘর জোটানো গেলো না। কিন্তু তার জন্য মহলা বন্ধ রইলো না। লুকিয়ে চুরিয়ে এর বাড়ীর বারান্দায় বা ওর বাড়ীর চিলে-কোঠায় কোনরকমে মহলা চলতে লাগলো। তারপর সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিন এলো। ১৯৫৪তে শারদীয়া পূজার আগের দিন এ ভি স্কুলের 'অমৃতলাল হলে' 'মহেশ' নাটক মঞ্চস্থ হোল। দর্শকের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেলো ছোট ছোট শিল্পীরা। অভিনয় অনুষ্ঠানে সেদিন প্রধান অতিথি ছিলেন সুসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আর সভাপতি হয়েছিলেন ছাত্র-দরদী এ ভি স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ'দের অকুণ্ঠ প্রশংসা, উৎসাহ, উপদেশ আর সহমর্মিতার স্পর্শে সংস্থা তার দীর্ঘ আয়ুষ্কাল পেয়েছে।

এর পরের নাটক শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই।' প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হোল 'রঙমহল' মঞ্চে। এই নাট্যপ্রযোজনার সময় বিখ্যাত নট অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে সংস্থার শিল্পীদের পরিচয় হোল। এই পরিচিতিকে শ্রদ্ধার সংগে সংস্থার শিল্পীরা মনে গেঁথে রেখেছেন। এ সম্পর্কে বসন্ত ভট্টাচার্য বলেছেন, 'আমরা যখনই অজিত-দা'র কাছে নাটকের কোন ব্যাপারে গিয়েছি, তখনই তিনি আদর করে আমাদের কাছে টেনে নিয়েছেন। নাটকের পাণ্ডুলিপি দেখে দেওয়া থেকে শুরু করে নাট্যপ্রযোজনার যাবতীয় কাজে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। অ্যামেচার ক্লাবের প্রতি এই দরদ ও ভালোবাসা তাঁর মতো অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিনি। আজো তিনি আমাদের অতি কাছের।' অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়েরই পরিচালনায় ১৯৫৭তে মঞ্চস্থ হোল তারাশঙ্করের 'সন্দীপন পাঠশালার' নাট্যরূপ।

শরৎ সাহিত্য সম্মেলনে পরে আবার 'পণ্ডিতমশাই'এর নাট্যরূপ অভিনীত হয়। ১৯৫৯ সালে 'রঙমহলে' অবৈতনিক বিদ্যালয় 'শৈলশ্রী' বিদ্যাপীঠের সাহায্যকল্পে বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে নাটকটি পুনরভিনীত হয়। স্ত্রীচরিত্রে অংশ নেন অপর্ণা দেবী (বৃন্দাবনের মা), নিভাননী (কুলুর শাশুড়ী), গীতশ্রী (কুলুর পত্নী), গীতা দে (কুসুম)। 'পণ্ডিতমশাই' নাটকের আরো কয়েকটি জায়গায় অভিনয় 'কল্পতরু সংঘের' প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করে তোলার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

প্রায় সব সংস্থাতেই কোন না কোন সময়ে একটা দলভাঙার পালা আসে। কিন্তু দলের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা যদি এ বিষয়ে সচেতন থাকেন, তাহলে 'ভাঙন' খুব গভীরতর হতে পারে না। নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার ছোঁয়ায় দলে আবার সংহতিশীলতার নতুন জোয়ার আসে। 'কল্পতরু সংঘ'র বেলায়ও এই সত্যের ব্যতিক্রম হয়নি। কিছু ছেলে দল ছেড়ে চলে যাওয়াতে প্রাথমিকভাবে একটা হতাশা আক্রমণ করেছিল প্রতিষ্ঠাতাদের মনকে। কিন্তু এ আঘাত সাময়িক। আবার তাঁরা নতুন ছেলে জোগাড় করে নতুন নাট্য-প্রযোজনায় ডুব দেন।

[illegible] ... শতবার্ষিকী উৎসব। সংস্থার শিল্পীরা বিশ্ববরেণ্য কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

জানালেন 'ঠাকুরদা' গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করে। এই নাটকটিও পরিচালনা করেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬১-তে প্রথম মৌলিক নাট্যপ্রযোজনা হল। বসন্ত ভট্টাচার্যের 'ধুলো বালির মাটি' দিয়ে এ পর্যায়ের যাত্রা শুরু হল। এই নাটকের মধ্যে আছে আজীবন আদর্শবাদী শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয়-এর পুত্রস্নেহের কাছে পরাজয়, নিয়তি নির্ধারিত ভাগ্যকে স্বীকার করে নেবার ছলে কঠোর বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়া এবং সর্বোপরি মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের এই শতাব্দীর কয়েকটি দশকের এক নিটোল ছবি। নাটকটি প্রথম হাওড়ায় টাউন হলে বিদ্যার্থী সমাজ আয়োজিত একাংক নাট্য-প্রতিযোগিতায় মঞ্চস্থ হল। প্রতিযোগিতায় এই নাটক বেশ কিছু প্রশংসাপত্র পেলো। এই নাটক পরে নাট্য-সম্মেলন ও উত্তর কলকাতা যুব উৎসব আয়োজিত অনুষ্ঠানে অভিনীত হয়।

'কল্পতরু সংঘে'র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হল 'সারি সারি পাঁচিল' নাটক। এই নাট্যপ্রযোজনা সংস্থার খ্যাতি এবং পরিচিতিকে বৃহত্তরে পরিব্যাপ্ত করে। নাটকের শেষে শিল্পী শংকর যখন আবেগ-উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলে ওঠে...'টুয়েন্টিথ্ সেঞ্চুরি---তুমি তাকিয়ে দেখো, আমি আজো বেঁচে আছি। আমার সনৎ আজ মস্তবড় ইঞ্জিনীয়ার। তোমরা তাকে খাতির করবে, মান সম্মান প্রতিপত্তি সব কিছু দেবে আমি তাই দেখবো, সমস্ত জীবনভোর দেখবো।...কিন্তু আমায় যে বাঁচতে হবে... হ্যাঁ-হ্যাঁ বাঁচতে হবে...' তখন বুঝতে পারি নাটকটি জীবনের কোন অতল গভীরের সংঘাতকে মঞ্চে মূর্ত করে তুলতে চাইছে। নাটকটির প্রযোজনায় প্রয়োগপরিকল্পনার অভিনবত্ব বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। নাটকটি গিরিশ স্মৃতি পুরস্কার লাভ করে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বহু বিষয়ে পুরস্কার আনে। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে নাটকটির অভিনয় একাধিকবার প্রচারিত হয়।

এরপর থেকে 'কল্পতরু সংঘের' নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কে বাংলাদেশের নাট্যানুরাগীদের প্রত্যাশা বাড়তে থাকে। স্বাভাবিকভাবে সংস্থার শিল্পীদের উৎসাহ দ্বিগুণবেগে এগিয়ে চলতে থাকে। একের পর এক নাটক অভিনীত হতে থাকে। এই আসরে আসে 'বনো পাখীর গান' 'ডিস্মিস্', 'পরমপুরুষ', 'নায়িকা বিদায়' প্রভৃতি নাটক। 'বনো পাখীর গানে' রাস্তায় যারা কাগজ কুড়োয় তাদের জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি কলকাতা ছাড়াও বাইরে বহু জায়গায় পরিবেশিত হয়। 'ডিস্মিস্' 'পরমপুরুষ', 'নায়িকা বিদায়' হাসির নাটক। ক্ষুরধার সংলাপ আর ব্যংগকৌতুক মুহূর্তে জমজমাট নাটক ডিস্মিস। কলকাতার নাট্যানুরাগীরা এই নাটকটিকে বহুবার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। 'পরমপুরুষ' দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত একটি ব্যংগাত্মক নাটক।

১৯৬৫-তে একটি ঘটনা ঘটলো। সংস্থা রেজিস্টার্ড হল। নাম হল 'কল্পতরু'। আজ এই নামেই বাংলাদেশে সুপরিচিত।

'পরাজিত পৃথিবী' 'কল্পতরু' সংস্থার আর একটি স্মরণীয় প্রযোজনা। আণবিক যুদ্ধ, বিশ্বশান্তি তথা মানবতার জয়গান---এরই প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে নাটক। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় বিশ্বরূপায় (১৯৬৮)। শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে একাধিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে।

এ'দের আগামী নাটক 'কেউটে'। একটা নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে এ নাটকের সংঘাত গড়ে উঠেছে। মুখোশ মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতার মুহূর্তে প্রকাশ ও আজীবন তার দংশন। নরনারীর মিলিত জীবনে ক্ষণেকের পদস্খলনের চিরকালীন ব্যবধান যা যে কোন মানুষের জীবনেই ঘটছে অথচ তার গোপনতা রক্ষায় আজীবন মিথ্যার অভিনয় করে একদিকে আপাত স্বস্তি অপরদিকে দংশন। সে দংশন বিবেকের, মনুষ্যত্বের অথবা 'কেউটে'র। নাটকটির দু'একটি সংলাপ তুলে ধরছি :---

কল্পতরুর 'ডিস্মিস্'

রঞ্জন।। বনানীকে একটা জন্তু ছোবল মেরেছিল। সে জন্তুটা মরে গিয়ে আবার আজ বেঁচে উঠেছে। আমার শিরায় শিরায় তার তপ্ত নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগছে। তুমি, তুমি এবারে বনানী হও। তোমার চোখের তারা দুটো আমার ছোবলে নীল হয়ে যাক্।

শুভা।। না, মরতে আমি পারবো না। তিল তিল করে মৃত্যুর চাইতে সব কিছুকে অস্বীকার করেও আমি বাঁচতে চাই।

'কল্পতরু' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে নাট্যানুশীলনে বিভোর আছেন। প্রথম থেকেই এ'রা নাটকের মধ্য দিয়ে জীবনের কথাকেই মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন। তাই এ'রা নাটকে রাজনীতি প্রচারে বিশ্বাসী নন।

বাংলাদেশে নাটক নিয়ে যেখানে যতো আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে সেখানেই 'কল্পতরু'র শিল্পীরা যোগ দিয়েছেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। বাংলাদেশের নাট্য ঐতিহ্যকে একটা গভীরতর ব্যাপ্তি ও চিরকালীন মর্যাদা দেবার প্রয়াসে এ'দের এতটুকু ফাঁক ছিল না বলেই দীর্ঘ পনেরো বছরের অজস্র প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে আজকের কর্মচাঞ্চল্যে এরা মুখর।

—দিলীপ মৌলিক

ভারতের সংবিধানে ১৪টি ভাষা স্বীকৃত হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, ভারতে ঐ ১৪টি ভাষাই মাত্র আছে। ভারতে ভাষা বা উপভাষার মোট সংখ্যা ৮৪৫। এর মধ্যে ভারতীয় ভাষা ছাড়া অভারতীয় ভাষাও আছে। অভারতীয় ভাষার সংখ্যা ৬৩। একটি পুরনো হিসাবে প্রকাশ, ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে ৭২০টি ভাষার প্রতিটি ভাষা এক লক্ষেরও কম লোক ব্যবহার করে থাকে, আর মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৯১ ভাগ সংবিধান স্বীকৃত ১৪টি ভাষার একটা না একটা ভাষা ব্যবহার করে।

যেসব ভাষা ছোটো, অর্থাৎ খুব অল্প লোকে ব্যবহার করে সেইসব ভাষাকে উপভাষা বলা হয়। উপভাষা ছোটো হলেও তার মূল্য কম নয়। সে মূল্য ভাষাতত্ত্বের ছাত্রদের কাছেই শুধু নয়, জাতীয় জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হলে উপভাষা জানা দরকার। কিন্তু জাতীয় জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার লোক সমস্ত দেশেই কম। তাই সমস্ত দেশেই উপভাষা কমবেশি অবহেলিত।

ভারতেও এর অন্যথা হয়নি। ভারতের বেতারকেন্দ্রগুলিতে প্রধান প্রধান ভাষাই "সিংহভাগ" অধিকার করে আছে। অর্থাৎ প্রধান প্রধান ভাষাতেই অধিকাংশ অনুষ্ঠান প্রচার হয়, অপ্রধান ভাষাগুলি ছিটেফোঁটা পায়। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো যায় না, কারণ সংখ্যাধিক্যেরই জোর বেশি। যে ভাষাভাষীর সংখ্যা বেশি সেই ভাষাতেই অধিক অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকটাই হয়ে আসছে সমস্ত বেতারকেন্দ্রে।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি অনুষ্ঠান প্রচার হয় বাংলা ভাষায়, তারপর ইংরেজীতে, তারপর হিন্দীতে। বাংলা এই রাজ্যের ভাষা, ইংরেজী সর্বভারতীয় ভাষা, হিন্দী "রাষ্ট্রভাষা", এবং এই তিন ভাষাভাষীর লোকই এই রাজ্যে বেশি। সুতরাং এই তিন ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই তিন ভাষা ভারতের প্রধান তিন ভাষা। ভিন্ন রাজ্যের অন্য প্রধান প্রধান ভাষাভাষীরাও এই রাজ্যে আছে। তাদের জন্যও কলকাতা কেন্দ্র থেকে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। সেইসব ভাষা প্রধান ভাষা বলে অধিক স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।

কিন্তু এই রাজ্যের অপ্রধান উপভাষাগুলি ততখানি স্বীকৃতি না পেলেও তার কোনো কোনোটাতে সাপ্তাহিক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এইরকম একটি উপভাষা সাঁওতালী।

পশ্চিম বঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা কম নয়। পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় জীবনে সাঁওতালদের স্থান নগণ্য নয়। বাংলা সাহিত্যে ও শিল্পে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয়ভাবেই তারা আমাদের মনে স্থান করে নিয়েছে। অন্যান্য উপজাতীয়দের চেয়ে তাদের আমরা কাছের মানুষ বলে মনে করি। দূরের মানুষ বলে তাদের সরিয়ে রাখার উপায় আমাদের নেই। প্রখ্যাত সাহিত্যিকরা তাদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, প্রখ্যাত চিত্রকররা তাদের নিয়ে চিত্র অঙ্কন করেছেন, প্রখ্যাত গীতিকাররা তাদের নিয়ে গীত রচনা করেছেন। তাদের আমরা চিনি, খুব কাছে থেকে চিনি। তাদের শিল্প-সংস্কৃতি, আচার-আচরণের প্রতি আমাদের আগ্রহ আছে।

কিন্তু আমাদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সাপ্তাহিক সাঁওতালী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, একথা মনে করার কারণ নেই। দক্ষিণ ভারতীয়দের জন্য যেমন সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, ত্রিপুরাবাসীদের জন্য যেমন প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়—এ-ও তেমনি। অর্থাৎ সাঁওতালদের জন্যই সাঁওতালী অনুষ্ঠান।

কিন্তু সাঁওতালদের জীবনধারার যে মান তাতে তাদের ক'জনের ঘরে রেডিও-সেট আছে বলে মনে করা যেতে পারে? তাদের যে পেশা, যে আয় তাতে তাদের ক'জনের রেডিও-সেট কেনার সামর্থ্য আছে বলে ভাবা যেতে পারে? সরকার থেকে কি তাদের জন্য কমিউনিটি সেট দেওয়া হয়েছে? তাহলে এই সাঁওতালী অনুষ্ঠান প্রচারের সার্থকতা কোথায়? যদি ধরেও নেওয়া যায় তাদের অনেকেরই রেডিও-সেট কেনার সামর্থ্য আছে তাহলে সপ্তাহে মাত্র পনের মিনিটের একটা অনুষ্ঠান শোনার জন্য তাদের ক'জন রেডিও-সেট কেনার আগ্রহ বোধ করবে? এত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান প্রচার করে তাদের কোন্ চাহিদা মেটানো সম্ভব? বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী অনুষ্ঠান তারা ভালোভাবে উপলব্ধি ও উপভোগ করতে পারে, এ কথা নিশ্চয় ভাবা যায় না! বাংলাদেশে অবস্থিত দক্ষিণ ভারতীয়দের যাদের বাড়িতে রেডিও-সেট আছে তারা অধিকাংশই শিক্ষিত। তাদের সঙ্গে সাঁওতালদের তুলনা চলে না। তারা সারা সপ্তাহে অন্যান্য ভাষায় অনুষ্ঠান শুনে মাত্র একটা দিন মিনিট কুড়ি তাদের নিজস্ব ভাষায় গান শুনে তৃপ্ত হতে পারে, কিন্তু সাঁওতালরা তা পারে না, পারার কথা নয়—কারণ, অন্যান্য ভাষায় রসগ্রহণের অধিকার তাদের তেমন নেই।

সরকার থেকে যদি কমিউনিটি সেট দেওয়া হয়েও থাকে তাহলে সে কি সপ্তাহে মাত্র পনের মিনিটের অনুষ্ঠান শোনার জন্য? সপ্তাহে মাত্র পনের মিনিটের অনুষ্ঠান শোনার জন্য ক'জন সাঁওতাল অন্ধকারে পথ ভেঙে কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে সমবেত হয়?

তাছাড়া অনুষ্ঠানটা প্রচারিত হয় খ কেন্দ্রে। খ কেন্দ্রের দুর্বলতা কারও অবিদিত নয়। দূরাঞ্চলের শ্রোতাদের কাছে খ কেন্দ্র একটা মর্মবেদনা। পশ্চিম বঙ্গের সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এই অনুষ্ঠান শোনা যায় কিনা সন্দেহ আছে।

অতএব কোন্ উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়, বোঝা কঠিন। উদ্দেশ্যটা যদি একটু ব্যাপক করা হয় তাহলে এর সার্থকতা কিছুটা উপলব্ধ হবে বলে বিশ্বাস। অনুষ্ঠানটা কেবল সাঁওতালদের জন্য প্রচার না করে সাঁওতালদের বিষয়ে আগ্রহী শ্রোতাদের জন্যও প্রচার করা হোক। কিন্তু সাঁওতালদের বিষয়ে আগ্রহী হলে সাঁওতালী ভাষা জানতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাই এই অনুষ্ঠানে সাঁওতালী কথিকার চেয়ে সাঁওতালী গানই বেশি করে প্রচার করতে হবে। গানের সুর সর্বজনীন, তাই রুশ ভাষা না জানা বাঙালীও রুশদেশের লোকগীতির রস গ্রহণ করতে পারে, আনন্দানুভব করতে পারে। সাঁওতালী অনুষ্ঠানে সাঁওতালী কথিকাও থাক—যদি কোনো সাঁওতালী কোনো ভাবে তা থেকে উপকৃত হয়, হোক—কিন্তু সেই সঙ্গে সাঁওতালদের বিষয়ে বাংলা কথিকাও কিছু প্রচারিত হোক। বেশি করে প্রচারিত হোক সাঁওতালী গান, সাঁওতালী বাজনা। আর অনুষ্ঠানটির প্রচার সংখ্যা ও সময় একটু বাড়ানো যায় কিনা, চিন্তা করে দেখা হোক।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৮ই মে বেলা ১টার নাটক "মৃত্যুর স্বাদ"। একটি বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

নাটকে দেখা যাচ্ছে, এক বিত্তশালী ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যা বলতে কেউ নেই—সংসারে তিনি একা। তাঁর দুই ভাগ্নী আছে, তাদের স্বামীরা দুই ভাই। অর্থাৎ দুই বোন দুই ভাইকে বিয়ে করেছে—বোন হয়েছে জা, শ্যালিকা হয়েছে

ভ্রাতৃবধূ। সম্পর্কটা খুব জটিল না হলেও খুব সাধারণ নয়। তা না হোক, তা নিয়ে নাটক নয়। নাটকে তা নিয়ে জটিলতা-সরলতা কিছুই সৃষ্টি হয়নি। নাটকে তার কোনো দরকারও নেই।

নাটকটা হচ্ছে, সেই বিত্তশালী ভদ্রলোকের মৃত্যু আর প্রধানত তাঁর ভাগ্নীদের বিত্তলোলুপতা নিয়ে। নাটকের আরম্ভেই দেখা যাচ্ছে, ভদ্রলোক মারা গেছেন। উপরের ঘরে তাঁর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, আর নিচের ঘরে তাঁর পরম আদরের ভাগ্নীরা তাঁর ধনসম্পদ আর জিনিসপত্র ভাগাভাগি শুরু করে দিয়েছে। শুধু ভাগাভাগিই নয়, তা নিয়ে সংকীর্ণতা আর হৃদয়হীনতাও।

তাদের হৃদয়হীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শববাহকদের হৃদয়হীনতা, শ্মশানযাত্রী নামসংকীর্তনীয়াদের হৃদয়হীনতা, মৃত্যুর খবর পেয়ে শকুনির মতো ছুটে আসা শ্রাদ্ধকারক পুরোহিতের হৃদয়হীনতা, ভদ্রলোকের ঘরটি ভাড়া নেবার উদ্দেশ্যে আগত পরিবার পরিকল্পনার খবর না রাখা বহু সন্তানের জনক জনৈক প্রতিবেশীর হৃদয়হীনতা।

এত হৃদয়হীনতার মধ্যেও কিয়ৎকাল পরে দেখা গেল ভদ্রলোক যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে বেঁচে উঠেছেন। উপরের ঘরে তাঁর মৃতদেহের প্রহরায় ছিল যে ভৃত্যটি, সে তাঁকে নড়ে উঠতে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে এসে নিচের ঘরে যখন বার্তাটি দিল তখন সেখানে প্রচণ্ড সোরগোল পড়ে গেল। তাঁকে সত্যি সত্যিই বেঁচে উঠতে দেখে সবচেয়ে মর্মাহত হল তাঁর আদরের ভাগ্নীরা। কিন্তু তারা ছদ্মবেশে সেই মর্মাঘাতকে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করল। আবার শুরু হল তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসার অভিনয়। দুই ভাগ্নীই তাঁকে নিজেদের কাছে রাখার জন্য কলহ শুরু করে দিল। আজ তিনি মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন, কিন্তু একদিন তো তাঁকে সত্যি সত্যিই মরতে হবে এবং তাঁর আত্মজ বলে যখন কেউ নেই তখন তারাই তো তাঁর বিত্তের অধিকারী! তাই...

কিন্তু সে অধিকারে ভদ্রলোক বাধ সাধলেন। তিনি তাদেরই দিয়ে খবরের কাগজে বয়স্কা পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন লেখালেন। ...তারা চরম হতাশায় ভেঙে পড়ল।

নাটকটার বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। কিন্তু যা স্পষ্ট তা-ই হৃদয়স্পর্শী নয়। নাটকটা মোটেই হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি, মনটাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। সম্পূর্ণ নাটকটাই সাজানো, অবাস্তব, রুক্ষ, নীরস। অভিনয় অত্যন্ত জলো---অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেন কোনো হালকা রসের নাটকে অভিনয় করেছেন। তাঁরা যে একটা গুরুতর বিষয় চিত্রিত করছেন তা মনেই হয়নি। কারও অভিনয়ই মনে রেখাপাত করেনি। কোন উদ্দেশ্যে এই ধরনের নাটক প্রচারিত হয়, বোঝা কঠিন। না এ সমাজের কোনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে, না আর্টের দিক দিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দেয়।

১৮ই মে রাত ১০টায় সংবাদ পরিক্রমায় "জুরীরা" বলে একটা কথা শোনা গেল। কথাটা ভুল। "জুরা" যেমন ভুল তেমনি "জুরীরা"ও ভুল। "জুরু" এবং "জুরী" সমষ্টিবাচক শব্দ। সেইজন্য ইংরেজীতে বলা হয়, "মেম্বার্স অভ দি জুরু", "মেম্বার্স অভ দি জুরী"। সংবাদ পরিক্রমায় ওখানে বলা উচিত ছিল, "জুররর্রা" অথবা শুধু "জুরী"।

১৯শে মে বেলা সাড়ে ১২টায় ট্রান্সমিশন আরম্ভ হবার পূর্বে যথারীতি সিগনেচার টিউন বাজল, টাইম সিগন্যালও শোনা গেল। তারপর গভীর নিস্তব্ধতা। সাড়ে ১২টা বেজে ঘড়ির কাঁটা অনেকখানি ঘুরে গেল, তবু ঘোষকের দেখা নেই। ঘোষক কি নিরুদ্দেশ? ঘোষক কি তখনও স্টুডিওয় এসে পৌঁছন নি? না কি যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেছে? এমনি নানা চিন্তার জট যখন পাকাতে শুরু করেছে তখন হঠাৎ ত্রস্ত কণ্ঠে শোনা গেল, "আকাশবাণী কলকাতা......।" হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল।

২২শে মে সকাল সাড়ে ৯টায় সংবাদ বিচিত্রাটি অত্যন্ত মামুলী লাগল, যেন কোনোরকমে দায় সারা। প্রশ্নগুলি বড়ো ছেলেমানুষি—অথচ ছেলেমানুষদের জন্য ছিল না অনুষ্ঠানটি।

২৩শে মে রাত সওয়া ১০টায় ইংরেজী নিউজ রীলটি শুনে খুশি হওয়া গেল। বেশ প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান, ন্যারেশন সজীব, সাবলীল। এডিটিং সুন্দর।

২৫শে মে বেলা সাড়ে ১২টায় আধুনিক গান শোনালেন শ্রীবরুণদেব মুখোপাধ্যায়। ঘোষণায় গান বলা হল, কিন্তু শুনে মনে হল ঈষৎ সুর করে পড়া পদ্য। আধুনিক গান নিয়ে আধুনিককালে যে পরীক্ষানিরীক্ষা (?) শুরু হয়েছে, এই অনুষ্ঠান বোধহয় তারই অন্তর্গত একটা কিছু। কিন্তু পরীক্ষক-নিরীক্ষকরা শ্রোতাদের দিকটা বিবেচনা করে তাঁদের পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি যদি একান্তে সম্পাদন করেন তাহলে ভালো হয়। বিজ্ঞানীরা একান্তে গবেষণাগারেই তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করে থাকেন। যদি কখনও কোনো অঘটন ঘটে, বাইরের লোককে তা বড়ো একটা স্পর্শ করতে পারে না।

এইদিন বেলা ১টায় রূপ ও রঙ্গের আসরে প্রচারিত হল শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় রচিত রঙ্গনাট্য "বুদ্ধি ব্যাঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড"।

মানি ব্যাঙ্ক থেকে যেমন টাকা দেওয়া হয়, চক্ষু ব্যাঙ্ক থেকে যেমন চোখ (ঠিক চোখ নয়, চোখের একটা অংশ) দেওয়া হয়, ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে যেমন রক্ত (ঠিক রক্ত নয়, রক্তের ভিন্ন রূপ) দেওয়া হয়, তেমনি বুদ্ধি দেবার জন্য ডঃ শান্তশীল বক্সী খুলেছেন বুদ্ধি ব্যাঙ্ক—ইংরেজীতে ইনটেলিজেন্স ব্যাঙ্ক। কিন্তু পাছে লোকে ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ বলে ভুল করে, তাই তিনি বাংলা নামের উপরই জোর দিয়েছেন —বুদ্ধি ব্যাঙ্ক। এটা প্রাইভেট লিমিটেড— তিনিই এর মালিক, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এই ব্যাঙ্ক থেকে তিনি বুদ্ধিপ্রার্থী বিপন্ন লোকদের বুদ্ধি বিক্রি করেন। পটাশগড়ের মহারাজা তাঁর ছোটো রাণীকে একটু অধিক স্নেহ করেন আর বড়ো রাণীকে কিঞ্চিৎ ভয়। ছোটো রাণীকে তিনি একটি হীরের নেকলেস দিতে চান, কিন্তু বড়ো রানীর ভয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বুদ্ধি ব্যাঙ্ক থেকে বুদ্ধি নিয়ে তাঁর সমস্যার সমাধান করে ফেললেন।

আগরওয়ালা সারা জীবন অর্থোপার্জন করেছেন, এখন একটু দেশ-সেবার বাসনা জেগেছে তাঁর মনে, অর্থাৎ তিনি ইলেকশনে দাঁড়াতে চান। এজন্য তাঁর কন্সটিটিউয়েন্সিতে দান-খয়রাতও করেছেন প্রচুর। কিন্তু তাঁর বিজনেস পার্টনার এবং দোস্তও এই কন্সটিটিউয়েন্সিতেই দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে তিনি চটাতে চান না অথচ ইলেকশন থেকে সরে আসার কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। তিনি বুদ্ধি ব্যাঙ্ক থেকে এমন বুদ্ধি চান যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। ডঃ বক্সী তেমন বুদ্ধি দিলেন।

বাচ্চু নামে এক যুবক লিলি নামে এক যুবতীর প্রেমাসক্ত। কিন্তু লিলি সম্প্রতি বাচ্চুকে পরিত্যাগ করে দুর্যোধন নামে এক এঞ্জিনীয়ারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বাচ্চু তার গভীর সমস্যা সমাধানের জন্য বুদ্ধি ব্যাঙ্কে বুদ্ধি কিনতে এল। ডঃ বক্সী শিভালরির বুদ্ধি দিলেন। তিনি বুদ্ধি দিলেন, দুর্যোধন আর লিলি যখন ময়দানে প্রেমলীলায় মগ্ন থাকবে তখন তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট রাইচরণ দস্যু সেজে সেখানে গিয়ে হানা দেবে। বাচ্চু দূরে অবস্থান করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং যথাসময়ে হাজির হয়ে 'দস্যুকে' বাহুবলে পরাভূত করে লিলিকে উদ্ধার করবে। লিলি বাচ্চুর বীরত্বে অভিভূত হয়ে দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করে তারই গলায় বরমালা দেবে।

সবই পরিকল্পনা মতো চলছিল, কিন্তু শেষকালে বাচ্চু একটু ভুল করে বসল-- রাইচরণকে তার ঘুষি মারার কথা ঠিক, কিন্তু মেরে বসল লাথি। রাইচরণ এই কথার খেলাপে ক্রুদ্ধ বাচ্চুর ঘাড়ে "রদ্দা" কষিয়ে দিল। বাচ্চু ছিটকে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বাচ্চুর বীরত্বও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে লিলি প্রাপ্তির আশাও।

বাচ্চু কাঁদো কাঁদো হয়ে নতুন বুদ্ধির জন্য এল বুদ্ধি ব্যাঙ্কে। ডঃ বক্সী বললেন, তিনি আন্তর্জাতিক বুদ্ধি কংগ্রেসে যোগ দিতে বাইরে যাচ্ছেন, ফিরে এসে সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

আন্তর্জাতিক বুদ্ধি কংগ্রেস থেকে তাঁকে আগেই ফিরতে হ'ল, কারণ তাঁর কন্যা গুণবতী রাইচরণকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে বসেছে। পরে জানা গেল, গুণবতীই লিলি।

এই হচ্ছে মোটামুটি গল্প। গল্পের বুনট খুব ঘন নয়, নাটকটা তাই দানা বাঁধতে পারেনি। নাটকের বড়ো জিনিস যা, সেই কৌতূহলও এতে বিশেষ জাগ্রত হয়নি। রঙ্গনাট্যে আসল জিনিস যা, সেই কৌতুকও এতে গভীর হয়নি। অভিনয় চলনসই। —শ্রবণক

ভারতনাট্যম নৃত্যে সোনু মালহোত্রা

গালিব শতবার্ষিকী

কয়েক সপ্তাহ আগে দার্শনিক কবি গালিবের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পালিত শতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে গেল রঞ্জি স্টেডিয়ামে। উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কবির জন্মোৎসবের ক'দিন জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিশ্বজ্জন, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীসমাবেশে এক মর্যাদাগম্ভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকল শিল্পীর অনুষ্ঠানই উপভোগ্য হয়েছে। আশ্চর্য লেগেছে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নিখুঁত ঢঙে গজল।

শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায় দুটি গালিবের গজল 'কোঁহি উমিদ্ বর নেহি আতিসো' 'ইনসে তেরী নিগহে' ছাড়াও কমলজীর 'মায় হরণ যো গম সরপা' এবং সাকিন বদাস্তিনীর 'গারিমত্র হজরতে' গানগুলি গেয়ে শোনালেন। কণ্ঠমাধুর্য ছাড়াও তাঁর গাইবার আন্তরিকতা, গজলের বিশেষ শৈলীর অনুশীলন এবং প্রতিটি অঙ্গের যথাযথ সন্নিবেশ অ-বাঙালী শ্রোতাদেরও মুগ্ধ করেছে এবং সকলের বিশেষ অনুরোধে আরও চারখানি গজল গেয়ে তিনি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় কানপুরের শ্যাম নিগম বলেন, 'সতীনাথবাবু সু-গায়ক এ-খবর আপনাদের জানা আছে—তাঁর আর একটি পরিচয় আমি জানাচ্ছি। সেটি হচ্ছে এই যে, বাংলা ছাড়াও তাঁর আর একটি মাতৃভাষা আছে এবং সেটি হোলো উর্দু। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আমি তাঁকে পশ্চিম ভারতের মানুষ বলেই ভেবেছিলাম—এত স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর উর্দুভাষা। মাত্র কিছুক্ষণ আগে জানলাম ইনিই জনপ্রিয় গায়ক সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।'

এরপর শিল্পী অনেক গান গেয়ে অগণিত শ্রোতার মধ্যে হর্ষপ্রবাহ সৃষ্টি করেন। সবগুলিই গালিবের গজল। তার মধ্যে দুটি হোলো 'দিলাহিত হ্যায়' এবং 'ফির মুঝে জিদ্‌সে ঔর' উচ্চারণ শুদ্ধতা, বিশুদ্ধ আঙ্গিক এবং 'শের'-এর আবেগরঞ্জিত কাব্যসৌন্দর্যে যেন বাসরাই গোলাপের গন্ধ ও রূপ ছড়িয়ে গেল রসিক শ্রোতৃচিত্তে। মীড়ের সূক্ষ্ম কাজ, সাপট তানের ফুলঝুরি আবার স্মরণ করিয়ে দিল আধুনিক গানের শিল্পী হলেও, উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অনুশীলনে কায়েমী গলায় যে-কোনো পর্দাই শুদ্ধ স্বরশ্রুতিতে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যেন কথা বলে ওঠে।

মনে ভেসে উঠল—বহুদিন আগে গভর্নমেণ্ট হাউস-এ এক উৎসবে আহির ভৈরো রাগাভিত্তিতে রচিত সতীনাথবাবু নিজের সুর দেওয়া বিখ্যাত গান 'না যেও না' শুনে 'বড়ে গোলাম আলি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তুম্ সতীনাথ নেহি, শিউনাথ্ হ্যায়।' এই সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা ধন্যবাদার্হ।

তাসের দেশ

দি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় 'নৃত্যের তালে তালে' সম্প্রদায়ের 'তাসের দেশ' গোলপার্ক, বিবেকানন্দ হলে এক উপভোগ্য সন্ধ্যা রচনা করে। কিছুদিন আগে ত্যাগরাজ হলে নৃত্যশ্রী মীরা দাশগুপ্ত পরিচালিত 'বিবেকানন্দ' নাটক দেখে মুগ্ধ হয়েছিল'ম শিশু-শিল্পীদের দিয়ে এক রসোত্তীর্ণ বস্তু সৃষ্টি করবার দক্ষতা দেখে। কিন্তু 'তাসের দেশ' শ্রীমতী দাশগুপ্তের সুন্দরতর শিল্পকৃতি যা প্রথম থেকে শেষ অবধি অভিনয় ও নৃত্যকুশলতায় মনকে আবিষ্ট রাখে। ভারতী পুরকায়স্থ চম্পা মুখোপাধ্যায়, সংগীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা সেন, ইন্দ্রা সেন, পূরবী শীল, তপতী চট্টোপাধ্যায়, বিদিশা দাশগুপ্ত, পদ্মা মুখোপাধ্যায়, রমা পাঠক, ডলি ভট্ট, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, কণা মুখোপাধ্যায়ের সম্মিলিত এবং সামগ্রিক সার্থকতার কৃতিত্ব মীরা দাশগুপ্তের প্রাপ্য।

কণ্ঠসংগীতে ছিলেন সর্বশ্রী অরুণ বসু, অমর ঘটক, কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, বাসন্তী, জয়ন্তী, স্বপ্না, কৃষ্ণা, নবনীতা ও রীতা।—তবে নৃত্যের তুলনায় সংগীতাংশ দুর্বল। উপযুক্ত আবহসংগীতে পটভূমিকার ভাষা রচনা করেছেন সর্বশ্রী নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব মণ্ডল

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পিন্টু মণ্ডল, শৈলেন দাস ও উৎপল দে। সাজসজ্জা ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন রেণু চৌধুরী, বীণা চক্রবর্তী ও আরতি দাশগুপ্ত।

কলকাতার সুপরিচিত [illegible] শিক্ষায়তন সুর-বাহারের শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলবরে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শোনান—বিমলকুমার মিত্র, কৃষ্ণা সমাদ্দার, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, নন্দা মুখোপাধ্যায় শ্যামশ্রী বিশ্বাস, বাণী সমাদ্দার, সুগতা মৈত্র, জয়শ্রী ঘোষ, ঊর্মিলা দত্ত, প্রতিমা সরকার, আরতি রায়, ডলি ভট্টাচার্য, স্বপ্না চক্রবর্তী, শ্রীলা রায়, সন্ধ্যা সাহা, কল্পনা রায়চৌধুরী, শাশ্বতী সাহা, সুপর্ণা দত্ত, ব্রততীছায়া চৌধুরী, বাসনা ঘোষ, তৃপ্তি মজুমদার, অতসী ভট্টাচার্য, ললিতা চট্টোপাধ্যায় ও অলকানন্দা মৌলিক। সমবেতভাবে গীটারে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজান—শেখর সাহা, লীলা দাশগুপ্তা, অনিতা সেন, নমিতা সেন, ডলি চক্রবর্তী, সুশীল রায়, জ্যোৎস্না কর্মকার ও স্বপন দত্ত। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শ্রীসুনীল সাহা।

সম্প্রতি সংগীত আসরের (বাগবাজার) উদ্যোগে মহারাজা কাশিমবাজার বিদ্যালয়ে সারারাত্রিব্যাপী এক উচ্চাঙ্গ সংগীত আসরের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এ্যাডভোকেট সুহৃদগোপাল দত্ত। সংস্থার পক্ষ থেকে শংকু দাস প্রধান অতিথি এবং সভাপতিকে বরণ করেন।

সংগীতানুষ্ঠানের প্রথমে ধানেশ্রী রাগে খেয়াল ও ঠুংরী গেয়ে শোনান স্নিগ্ধা কুণ্ডু। তবলায় ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন যথাক্রমে তারক সাহা ও তারানাথ ঠাকুর। তারপর ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করেন সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল। পাখোয়াজে সহযোগিতা করেন রাজীবলোচন দে ও হারমোনিয়ামে রণেন দাস। তবলায় তারক সাহা ও হারমোনিয়মে তারানাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় বাগেশ্রী রাগে খেয়াল ও ঠুংরী এবং পরে ভজন গেয়ে শোনান বন্দনা চক্রবর্তী। দ্বৈতকণ্ঠে সংগীতানুষ্ঠানে মালকোষ ও পরে ভাটিয়ার রাগে খেয়াল ও ঠুংরী গেয়ে শোনান রবিন চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ সুর। সংগতে সহযোগিতা করেন মানিক সাধুখাঁ। যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠানে চন্দ্রকোষ রাগে সেতার বাজিয়ে শোনান রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, তবলায় সহযোগিতা করেন নিমাই চ্যাটার্জি। হেমন্ত রাগে সরোদ বাজিয়ে শোনান শচীন পাল, সংগতে থাকেন অপূর্ব বসু। সেতারে প্রথমে নট-ভায়রো ও পরে ভৈরবী ঠুংরী বাজিয়ে শোনান অমলেন্দু চৌধুরী। তবলায় থাকেন নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দেবু চট্টোপাধ্যায় ও ভোলানাথ দাস।

কচ ও দেবযানী / নরেশকুমার ও পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়

কচ ও দেবযানী

রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' কবিতা অবলম্বনে সুরসপ্তয়নের 'কচ ও দেবযানী' নৃত্য ও গীতের বিচিত্র সমারোহে রবীন্দ্র-সদনে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ দর্শক আকর্ষণ করতে পেরেছিল। কচ ও দেবযানীর প্রণয় ও বিচ্ছেদকে অন্যান্য রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য সংগৃহীত গানের সুরে বিস্তার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শিল্পীর কণ্ঠবৈভব ও গায়ন-শৈলীতে। উপরি পাওনা হিসাবে শুনতে পাওয়া গেল প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের অপূর্ব রবীন্দ্রসংগীত 'এখন আমার সময় হোলো' এবং 'বিদায় নেবার সময় এবার হোলো প্রসন্ন মুখ তোল'—পরিশীলিত কণ্ঠের শুদ্ধ স্বর প্রয়োগ এবং গাইবার আবেগে সরস-মধুর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রসংগীতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা গোরা সর্বাধিকারীর কণ্ঠে 'তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে' অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী। এছাড়া ছিলেন অমর রায়, পূর্বা সিংহ, বনানী ঘোষ, সুপর্ণা লাহিড়ী, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত আপনাপন সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

নৃত্যাংশে নাম-ভূমিকায় নরেশকুমার ও পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় অভিনয়, নৃত্য ও ব্যঞ্জনায় নাটকের বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করেছেন। কচের সাধন নিষ্ঠা, অস্ফুট অথচ উচ্ছ্বসিত প্রণয়-বিহ্বলতা যেমন নরেশকুমার মর্মগোচর করেছেন—পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়ের নৃত্যে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে দেবযানীর উচ্ছলতা প্রণয়-বিভোর কাতর-অনুনয় মানসিক উদ্বেলতা। বিশেষ করে শেষের দৃশ্যে ব্যাকুল কারুণ্যের নিষ্ফল রোদনের তিনি বাস্তব চিত্র তুলে উঠতে পেরেছেন। নৃত্যরচনায় চিন্তা ও নিষ্ঠার ছাপ রেখেছেন অসিত চট্টোপাধ্যায়। মূলভাবে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের কাঠামো বজায় রেখে বাউল অন্যের গানে লোকনৃত্য এবং সমবেত নৃত্যে বিদেশী ব্যালের সামগ্রিক সাম্যের সমন্বয়ে ভাববৈচিত্র্য পরিস্ফুট করে তোলার প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। অন্যান্য নৃত্যশিল্পীরা তাঁদের ভূমিকাকে যথাযথ-ভাবেই প্রকাশ করেছেন।

কনিষ্ক সেনের আলোকপাত বিষয়ানুগ। সজ্জা-পরিকল্পনায় পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় রুচির পরিচয় দিয়েছেন। আবৃত্তিতে পার্থ ঘোষ (কচ) এবং গৌরী ঘোষ (দেবযানী) রাবীন্দ্রিক-ধারার বিশ্বস্ত [illegible]।

—চিত্রাঙ্গদা

শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন তপন সিংহ এবং হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়
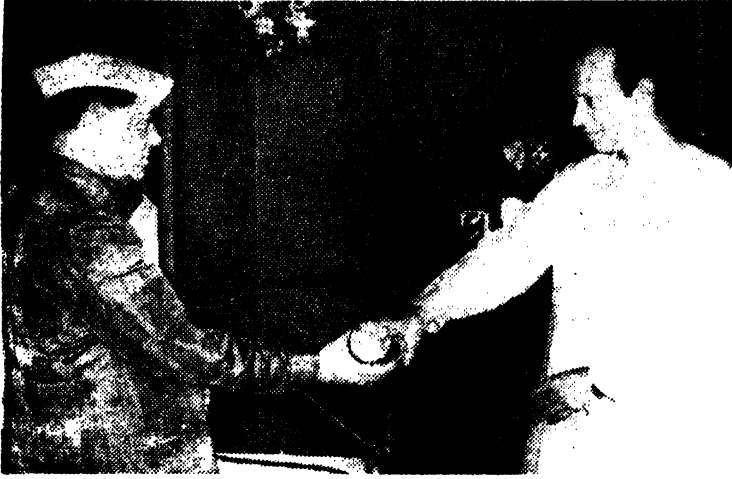
প্রেক্ষাগৃহ

বি-এফ-জে-এ
৩২তম বার্ষিক শংসাপত্র
বিতরণী উৎসব

মাত্র এক ঘন্টার অনুষ্ঠান! অথচ এইটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্ভব করে তোলবার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন পর্বে কি খাটা-খাটুনি, কি টানাপোড়েন, কি উৎকণ্ঠা, কত না উত্তেজনা! বি এফ জে-এর (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর) বহুদিন আচরিত প্রথামত শংসাপত্র বিতরণী উৎসবটির উদ্বোধন করে থাকেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী। এবারেও যাতে তার ব্যতিক্রম না ঘটে, এর জন্যে কত যে চিঠি লেখালেখি-টেলিগ্রাম,-ট্রাংককল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এবং অনেক টাল-বাহানার পরে শেষ অবধি শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করতে সম্মত হলেন সাম্প্রতিক পার্লামেন্ট অধিবেশন সমাপ্তির পরে বেশ কিছুদিন ব্যবধান রেখে ২৮ মে তারিখে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বি-এফ-জে-এ সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বি এফ জে-এর প্রাক্তন সভাপতি শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীসিংহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার একটি ফিল্ম কাউন্সিল গঠনের কথা চিন্তা করছেন; এই কাউন্সিলটিই কালে আমাদের দেশে চলচ্চিত্র বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট সংস্থায় পরিণত হবে।' শ্রীসিংহ আশা করেন যে, এই কাউন্সিলকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প ও চিত্র-সাংবাদিকরা উপযুক্ত-ভাবে সাহায্য করবেন। তিনি আরও বলেন, আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ছবিগুলিকে অন্যান্য রাজ্যে চালু করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে 'সাবটাইটেল' প্রথা গ্রহণ করেছেন, তার ফলে বাংলা ছবি আরও বিস্তৃততর অঞ্চলে আদৃত হবার সুযোগ পাবে।

সমবেত সুধিবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বি এফ জে-এ সভাপতি বাংলা চলচ্চিত্রজগতে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীতুষারকান্তি ঘো[illegible] প্রায় তিরিশ বছর ধরে বি-এফ-জে-এ[illegible] সভাপতিরূপে জড়িত থাকার কথা উল্লে[illegible] করে বলেন, জন্মকাল ও বয়ঃসন্ধির সময়ে[illegible] তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে দেখেছেন; কাজে[illegible] বর্তমানে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় একে দেখ[illegible] পেয়ে তাঁর আনন্দই হচ্ছে। বি এফ জে[illegible] প্রতি বৎসর প্রশংসাপত্র বিতরণের মাধ্য[illegible] চলচ্চিত্রশিল্পকে উত্তরোত্তর অধিক[illegible] উৎকৃষ্ট ছবি নির্মাণ করতে বন্ধুসুল[illegible] উৎসাহ দিয়ে থাকে বলে তাঁর অভিমত প্রক[illegible]

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
সুপ্রিয়া দেবী

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বিমল মুখোপাধ্যায়, সুবোধ রায় এবং শমিত ভঞ্জ। —ফটো : অমৃত

করেন। তিনি আরও বলেন, বি এফ জে-এ বরাবরই, বিশেষ করে বর্তমানের বিভ্রান্তিপূর্ণ ও বেদনাদায়ক সময়ে, চলচ্চিত্রশিল্পের বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতা ও মঙ্গলকামী হিসেবে কাজ করে যাবে।

শ্রীসিংহের হাত থেকে ১৯৬৮ সালে শ্রেষ্ঠত্বের শংসাপত্র গ্রহণের জন্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেনঃ (১) তপন সিংহ (বাংলা ছবির পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার), (২) হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (হিন্দী ছবির পরিচালক), (৩) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (বাংলা ছবির অভিনেতা), (৪) সুপ্রিয়া দেবী (বাংলা ছবির অভিনেত্রী), (৫) শমিত ভঞ্জ (বাংলা ছবির সহ-অভিনেতা), (৬) নবেন্দু ঘোষ (হিন্দী ছবির চিত্রনাট্যকার (৭) পবিত্র চট্টোপাধ্যায় (বাংলা ছবির সুরকার) (৮) প্রশান্ত দেব (বাংলা ছবির সংলাপলেখক), (৯) বিমল মুখোপাধ্যায় (বাংলা ছবির চিত্রশিল্পী), (১০) প্রসাদ মিত্র (বাংলা ছবির শিল্পনির্দেশক), (১১) অতুল চট্টোপাধ্যায় ও অনিল তালুকদার (বাংলা ছবির শব্দযন্ত্রী), (১২) পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা ছবির গীতিকার), (১৩) সুবোধ রায় (বাংলা ছবির সম্পাদক), (১৪) প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা ছবির নেপথ্য-গায়িকা) এবং (১৫) শ্রীমান প্রসেনজিৎ (সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বিশেষ কৃতী অভিনেতা)।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা প্রদত্ত 'বড়ুয়া স্মৃতিফলকটি বাংলার শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে তপন সিংহ লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্যে প্রসাদ সিংহ স্মৃতিপদক দুটি লাভ করেন তপন সিংহ (বাংলা) ও নবেন্দু ঘোষ (হিন্দী)। এ ছাড়া 'আপনজন' ছবির নির্মাতা কে এল কাপুর প্রোডাকসন্স প্রদত্ত ৫০১ টাকা অর্থ-পুরস্কারটি লাভ করেন প্রসাদ মিত্র (শিল্পনির্দেশক)।

এবারে বোম্বাইয়ের শিল্পী এবং অধিকাংশ কলাকুশলীদের অনুপস্থিতি বিশেষ করে চোখে পড়ে। অনুসন্ধানে জানা যায়, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের মসীলিপ্ত ঘটনা তাঁদের এই অনুপস্থিতির কারণ। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতিভুক্ত বহু প্রযোজক, পরিবেশক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীকেও কোনো অজ্ঞাতকারণে এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

চিত্র-সমালোচনা

বাঁচবার জন্যে

স্রেফ বেঁচে থাকার ও নির্ভরশীল স্বজনদের বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদে আজ মানুষকে কত রকমই না ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিতে হয়। বন্ধুর সুপারিশে মোহন যখন ধনী কমল রায়ের সেক্রেটারীগিরির চাকরিটা করায়ত্ত করল, তখন মনিবের মন বুঝেই বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মোহনকে বলতে হল, সে অকৃতদার এবং তার তিনকুলে কেউ নেই। এই মিথ্যা ঘোষণার ফলে যেদিন ধনকুবের কমল রায় মোহনকে তাঁর একমাত্র কন্যা রাধার পাণিগ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তাব করলেন সেইদিনই মোহনকে থমকে দাঁড়াতে হল। সে কি করবে? কমল রায় প্রদত্ত উপঢৌকন—দু'লক্ষ টাকা মা, স্ত্রী, অনূঢ়া ভগ্নী এবং ছোট ছোট দুই ভাই ও এক ভগ্নীর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে গ্রহণ করে পরিবর্তে রাধাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করবে, কিংবা ঐ আর্থিক প্রলোভনকে উপেক্ষা করে নিজে সপরিবারে অনাহারে শুকিয়ে মরবে? দ্বিতীয় চিন্তা তার কাছে ভয়াবহ বোধ হওয়ায় সে প্রথম পন্থা অনুসরণ করে দারিদ্র্যের কাছে বিবেককে বলি দিতে উদ্যত হল। কিন্তু বাধা এল মায়ের কাছ থেকে, অনূঢ়া ভগ্নীর কাছ থেকে; তারা একবাক্যে রায় দিল, ন্যায় বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। ন্যায়কে বজায় রেখে বাঁচবার পথ কৈ? এ সমস্যার সমাধান করতে চাইল মোহনের আদরিণী স্ত্রী শোভা আত্মহত্যা করে। কিন্তু শোভা ও রাধা—দুজনেই মোহনকে ভুল বুঝেছিল। মোহন যেমন একদিনও রাধাকে ভালোবাসেনি, তেমনই সে স্বপ্নেও স্ত্রী শোভার কাছে বিশ্বাসঘাতক হতে চায়নি। সে কমল রায়ের কাছে মিথ্যাচার করেছিল স্রেফ বাঁচবার ও বাঁচাবার তাগিদে।

এই অতি-বাস্তব কাহিনীটিকে ইস্টম্যান কলার রঞ্জিত 'জীনে কী রাহ' ছবির মাধ্যমে রূপ দিতে গিয়ে প্রযোজক-পরিচালক এল ভী প্রসাদ এমন কতকগুলি পরিস্থিতির আমদানী করেছেন, যেগুলি প্রত্যয়গ্রাহ্য নয়।

ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্যে বিধবা মায়ের পক্ষে ভদ্রাসন বন্ধক দেওয়া তেমন অস্বাভাবিক নয়, যতটা অবাস্তব ঠেকে তাঁর নিজের মিল-শ্রমিক হওয়া এবং তাঁর শিশু-সন্তানদের দিনমজুরে হতে দেওয়া। সন্তানের খোঁজে বিরাট এক শহরে এসে পোস্টাপিসের দ্বারে তার সন্ধান পাবার আশা এবং অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকার দাদার খোঁজে দাদারই গাওয়া গান গেয়ে পথে পথে ঘোরা বেশ কিছুটা কষ্টকল্পনার পরিচায়ক।

অভিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রাধা ও দুর্গার চরিত্রে যথাক্রমে তনুজা ও বেলা বসু। তনুজার অভিনয়ে আছে আশ্চর্য আন্তরিকতা এবং বেলা বসু তাঁর নাটনৈপুণ্য দ্বারা তাঁর গৃহীত চরিত্রটিকে করেছেন জীবন্ত। মোহনের কর্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রী শোভার চরিত্রটি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করেছেন অঞ্জলি। নায়ক মোহন বেশে জিতেন্দ্র চলনসই। অপরাপর ভূমিকায় দুর্গা খোটে (মোহনের মা), মনোমোহন কৃষ্ণ (ধনী কমল রায়), জগদীশ (কুন্দন), রূপেশকুমার (ডঃ মনোহর), সুধীরকুমার (বোবা নরেন্দ্র), মীনা (সুধা), রামমোহন (দুর্গার স্বামী রামদাস) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। পণ্ডিত মুখরাম শর্মা রচিত সংলাপ এবং আনন্দ বক্সী লিখিত গীত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল কৃত

জীনে কী রাহ/ তনুজা এবং অঞ্জলী

সুরবিশিষ্ট গানগুলি সাধারণভাবে উপভোগ্য, ওরই মধ্যে লতা মুঙ্গেশকার গীত 'অপ মুঝে অচ্ছে লগনে লগে' - গানটির জনপ্রিয় হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা।

প্রসাদ প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'জীনে কী রাহ' হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শককে আনন্দ দেবে।

চিরঞ্জীবী চরিত্র

ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে রাজা অষ্টম হেনরীর সঙ্গে যে চিরঞ্জীবী চরিত্রের নাম অবিস্মরণীভাবে জড়িয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন সার টমাস মুর। আদর্শপ্রেমী মুর তদানীন্তন চ্যান্সেলর হিসেবে রাজা হেনরীর বিবাহ-বিচ্ছেদকে সমর্থন করেননি প্রচুর চাপ সত্ত্বেও। রাজার সঙ্গে মুরের এই বিবাদকে কেন্দ্র করে রবার্ট বোল্ট 'ম্যান ফর অল সিজনস' নাম দিয়ে যে নাটকটি রচনা করেছেন, সেটিকে অনাড়ম্বরভাবে আমরা অভিনীত হতে দেখেছি নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 'শেক্সপীয়রানা' কোম্পানী দ্বারা। রবার্ট বোল্ট নিজেই তাঁর নাটকখানি থেকে যে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, তাকে অবলম্বন করে একটি অসামান্য ছবি নির্মাণ করেছেন প্রযোজক-পরিচালক ফ্রেড জীনেম্যান। কলম্বিয়া পরিবেশিত ও হাইল্যাণ্ড ফিল্মস প্রযোজিত 'ম্যান ফর অল সিজনস' ছবিখানি ১৯৬৬ সালে ছটি অস্কার দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেঃ (১) শ্রেষ্ঠ ছবি, (২) শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, (৩) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (পল সোফিল্ড), (৪) শ্রেষ্ঠ রঙীন ফটোগ্রাফী, (৫) অন্য শিল্পমাধ্যম থেকে রচিত শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য ও (৬) শ্রেষ্ঠ রঙীন পোশাক পরিকল্পনা। ছবিটি অবশ্যদর্শনীয়।

ওয়েট আনটিল ডার্ক

ফ্রম রাশিয়া উইথ লভ, থাণ্ডার বল ব ডঃ নো কোনো ছবিরই টেরেন্স ইয়ংকে খুঁজে পাওয়া যায় না তাঁর নতুন ছবি 'ওয়েট আনটিল ডার্কে'। সম্প্রতি ছবিটা মুক্তি পেয়েছে নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে। ইয়ং এর অন্যান্য ছবির মত ঘটনার ঘনঘটা এ ছবিতে নেই বিশেষ, কিন্তু রহস্য উপাদা আছে যথেষ্ট। এক অন্ধ তরুণীর ফটোগ্রাফার স্বামী ঘটনাচক্রে একটি পুতুল পান যার ওপর তিনটে লোকের নজর আছে। তারা যখন জানতে প্যারল পুতুলটার সন্ধ তখন নানাভাবে তরুণীকে ব্যতিব্যস্ত ক তুলল। পুতুলটা হাতাবার জন্য নানাদিক থেকে তার ওপর পীড়ন চলল বিভি ভাবে। কিন্তু সেই অন্ধ তরুণী প্রায় এক (গ্লোরিয়া নামে এক প্রতিবেশী কিশো সাহায্য কিছু করেছে অবশ্য) কিভা তিনজন কুচক্রীর চক্রান্তজাল ছিঁড়ে পুতুলটার 'প্রাণ' রক্ষা করল ছবির চিত্রনা হীত সেখানিই। নিউয়র্কের মঞ্চে এ না

নাকি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ছবির পর্দায় তা কিন্তু কম আকর্ষণীয় হয় নি। পরিচালনার কাজে ইয়ং আগেই বলেছি নতুনত্বের নজির রেখেছেন। তবে চিত্রনাট্যের অসংবদ্ধতা মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটিয়েছে। সব আলো নিবিয়ে দিয়ে তখন স্থাণুর মত অন্ধ তরুণী বসে আছে সে দৃশ্য ইয়ং-এর পরিমিতি বোধেরই পরিচয় দেয়। ছবির সবচাইতে আকর্ষণীয় যা হল সেটি অন্ধ তরুণীর ভূমিকায় শ্রীমতী অড্রে হেপবার্ণের অভিনয়। তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভয় সবকিছুই অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শুধুমাত্র মুখের অভিব্যক্তিতে। অন্যান্য চরিত্রে অ্যালান আর্কিণ, রিচার্ড ক্রেনা, জুনিয়র জিমব্র্যাস্ট প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন।

মঞ্চাভিনয়

গত মাসে লোকায়ণের দ্বীপের রাজা অভিনীত হল মুক্তাঙ্গন মঞ্চে। সংবাদপত্রের একটি ঘটনা রূপকের মাধ্যমে এই নাটকে প্রকাশ করা হয়েছে। আলোচ্য নাটকটি যুদ্ধবিরোধী চেতনার পটভূমিতে রচিত। নিরবচ্ছিন্ন এক শান্তির দ্বীপে কোথা থেকে অশান্তির প্রতীক কয়েকটা গোলা দ্বীপের মাটি স্পর্শ করলো। গোলাগুলি ফাটে নি কিন্তু চিড়-খাওয়ায় তেজস্ক্রিয়তায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সেইরকম একটি চিড়-খাওয়া গোলায় প্রথম লাথি মারে সাগর। সেই তো সে দ্বীপের রাজা। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার ও তার স্ত্রী রঙনের মধ্যে। এরই ফলে শান্তিকামী দ্বীপবাসীদের জীবনে নেমে আসে রণের ছায়া। অবশেষে তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় সেই দ্বীপ।

ধ্বংসের আবরণের নীচে দাঁড়িয়ে আজকের মানুষের যে উৎকণ্ঠা, ভয় আর নাশ; এবং এরই পাশাপাশি সুন্দর পৃথিবীতে সুস্থ বেঁচে থাকার যে অঙ্গীকার—সে তো গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই কথা। দ্বীপের রাজা নাটকে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এই কথাই নাটকীয় ধাঁচে ও কাব্যিক রূপায়ণে প্রকাশ করেছেন।

নাটকটি দু-একটি জায়গায় পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। শেষ দৃশ্যটার কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। একই ধরনের সংলাপ ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে বার বার বলার কি এমন মহৎ কারণ ছিল? নাটকটির সম্পাদনার দিকে আর একটু নজর দিলে আরো ভালোই পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। প্রযোজনার ক্ষেত্রে লোকায়ণের প্রথম প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। দ্বীপের পরিবেশ রচনায় সুজেন তরফদারের মঞ্চসজ্জা সুন্দর। ভূপেন হাজারিকার আবহ-সঙ্গীত নাটকের বক্তব্য প্রস্ফুটনে সহায়ক হয়েছে। নির্দেশনায় অরুণ রায় সফল। অভিনয়ের দিকে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সাগরের ভূমিকায় অরুণ রায়ের নাম। তাঁর অভিনয় বলিষ্ঠ এবং সুছন্দ। কিন্তু মাঝে মাঝে যেন একটু বেশী অভিনয় হয়ে গেছে। তাঁর পরই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন ঝুমকো ও রঙনের ভূমিকায় যথাক্রমে মায়া দাস এবং সীমা ঘোষ। আর পুরুষদের মধ্যে চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন নাবিকবুড়ো ও মোড়লের ভূমিকায় যথাক্রমে চরণ রায়-চৌধুরী আর দীপক চক্রবর্তী। অন্যান্য ভূমিকার রূপায়ণ চলনসই। আঙ্গিকগত দু-একটি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বিষয়বস্তু কবিত্ব এবং দলগত অভিনয়ের ফলে 'দ্বীপের রাজা' নাটকটি যে মোটামুটি সার্থক তা স্বীকার করতেই হবে।

স্টেট ব্যাঙ্কের বালিগঞ্জ শাখার কর্মিগণের উদ্যোগে আগামী ১৬ই জুন সন্ধ্যায় স্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীশম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। নাটকটি পরিচালনা করছেন শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালনার 'চতুরঙ্গের' পরিচালনায় গত ১৮ মে রাজবাটী প্রাঙ্গণে শৈলেশ গুহ-নিয়োগী রচিত 'বিদিশ' একাঙ্কিকাটি অভিনীত হয়। চরিত্রাভিনয়ে গোবিন্দ রায়, আশিষ ব্যানার্জি, সাধন চ্যাটার্জি, আশুতোষ ব্যানার্জি, শ্যামল চক্রবর্তী, অরবিন্দ পাল ও প্রশান্ত মৈত্র সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। নাট্য নির্দেশনায় শম্ভুনাথ লাহা উল্লেখ্য। তারপর 'সংগীতার' শিল্পীবৃন্দ পরিবেশন করে 'ঋতুরঙ্গ' গীতিনাট্য।
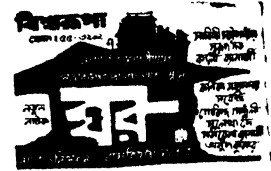
চোখ মেললে দেখা যাবে, এক অসামাজিক ব্যাধি আজ প্রতিটি সামাজিক মানুষকে প্রতিমুহূর্তে গ্রাস করতে চলেছে। আদর্শ, নিষ্ঠা, শিক্ষা, সভ্যতা সবকিছুই যেন আজ এক চরম অর্থহীনতার ম্লান। মানুষ আজ তাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত; সেই ব্যাধির হাত থেকে শান্তি আর স্বস্তির জীবনকে সে কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারছে না। সাম্প্রতিক সমাজের এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে ভবেশ চক্রবর্তীর 'মারীগুটিকা' নাটক। সম্প্রতি 'পাঞ্চজন্য' সংস্থার সভ্যরা 'বিশ্বরূপা' মঞ্চে এই নাটকের সার্থক অভিনয় পরিবেশন করলেন। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন নাট্যকার স্বয়ং।

'মারীগুটিকা' নাটকে পরিব্যাপ্ত অ-সামাজিক ব্যাধির কথা সোচ্চারে বলা হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি আদর্শবান চরিত্রের উপস্থাপনা নাট্যকার করেছেন যে, ব্যভিচারের পঙ্কিল আবর্ত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে নিজের ছেলেকে মুক্ত করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি। নাট্যকার বোধহয় একটি প্রশ্নই তুলতে চেষ্টা করেছেন—সমাজে ব্যাধিগ্রস্ত চরিত্রের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি?

নাটকটির মঞ্চরূপায়ণে প্রতিটি শিল্পীই স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ অভিনয়-রীতির স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই সামগ্রিক অভিনয়ে গতি ছিল দুর্বার। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেনঃ ভগবান বসু, সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, নিত্য পাল, এনায়েৎ পীর, সোমেন সেন, দীনেন দত্ত, সলিল সেনগুপ্ত, অজিত মুখোপাধ্যায়, ভবানন্দ সরকার, সুনীল বসু, অজয় সিংহ ঘোষ, শেলী পাল, বিপাশা গোস্বামী, মন্দিরা দাস ও রানী বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি কালীবাড়ি বেঙ্গলী ক্লাবের প্রযোজনায় দিল্লীর আইফ্যাক্স হলে সিরাজ চৌধুরীর 'সূর্য ওঠার সময়' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকের কাহিনী বিন্যাসে মাঝে মাঝে শৈথিল্য থাকায় নাট্যমুহূর্তগুলো সব সময়ে মঞ্চে মুখর হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু শিল্পীদের অভিনয় নাটকের কাহিনীগত ত্রুটিকে ঢেকে দিতে পেরেছে। নাট্যনির্দেশক প্রভাস মুখোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা এ-ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন সুধাংশু চক্রবর্তী, স্মরজিৎ রায়, ধ্রুবেন রায়, সত্যেন বসু, সমীর রায়চৌধুরী, সুজিৎ চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন চক্রবর্তী, দীপক ঘোষ, হিমাংশু চক্রবর্তী, রবি রায়চৌধুরী, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস মুখোপাধ্যায়, গোপা দে ও আরতি দত্ত। অজয় ভট্টাচার্যের আলোকসম্পাত ও নারায়ণ ভট্টাচার্যের শব্দযোজনা নাটকের সংঘাতকে আরো গভীরতর করে তুলতে পেরেছে মনে হয়।

বিবিধ সংবাদ

৮ ও ১৫ জুন সকাল সাড়ে নটায় ছায়া সিনেমায় যথাক্রমে 'জেনেসিস', 'দি ক্রাইম' এবং ১০ জুন ও ১১ জুন সন্ধ্যায়/রাত্রে প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে যথাক্রমে 'ভিটাল্যাক্স' ও 'দি ভ্যালী অফ দি বীজ' চেক্ ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে।

সম্প্রতি রাসবিহারী এভিনিউর নিউ হ্যাপী হোমের ছাত্রছাত্রীরা তরুণ জাদুকর রাজকুমারকে এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি অভিজ্ঞানপত্রও অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীরাজকুমার কয়েকটি সুন্দর ম্যাজিক দেখান। যাদুকর রাজকুমার ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই শুধু নয় ভারতের বাইরেও জাদু প্রদর্শন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

গত ২৪শে মে 'কৃষ্টিতীর্থে'র আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল দত্তবাগানে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শ্রীগৌরীপদ মজুমদার ও নৃত্যাংশে ছিলেন শেফালী দাস, প্রতিমা ভট্টাচার্য, সুব্রতা কুণ্ডু, অশোকা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা ভট্টাচার্য, মালা গোস্বামী, সন্ধ্যা দাস ও মঞ্জু মণ্ডল। এর পর শ্রীমতী বিজলী দাশগুপ্তার পরিচালনায় কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ নেয় অন্নপূর্ণা দত্ত, দ্বীপেন দত্ত, পরাগ দত্ত, দীপু চ্যাটার্জি ও বিজলী দাশগুপ্তা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনবগোপাল চক্রবর্তী।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শ্রীমতী বিজলী দাশগুপ্তা, দ্বীপেন দত্ত ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দত্ত।

সম্প্রতি 'জোনাকি'র তৃতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে। অনুষ্ঠানে ছোট ভাইবোনেরা নৃত্য, গীত, পুতুল নাচ ও নাটকাভিনয় করল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশু সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ মল্লিক। শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ ও শ্রীমতী পিলু ঘোষের পরিচালনায় কবিগুরুর বর্ষা সংগীত পরিবেশন করেছিল সত্যভামা দাশগুপ্তা, বিশ্বনাথ সেন, রুমা দত্ত, শ্রাবণী গাঙ্গুলী, স্বপ্না চৌধুরী এবং নৃত্য পরিবেশন করল মেঘবর্ণা মুখার্জি, শর্মিষ্ঠা গুহ, মিত্রা চক্রবর্তী, সংযুক্তা গুহ, অর্পিতা বসু, শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলী ও ইলা মুখার্জি। শ্রীকনক মুখার্জির গল্প ও সুরে শ্রীঅলোক দত্তের পরিচালনায় ও নন্দিতা বসুর সংগীতে 'নাকাল রাজার ছক্কা ভোকার' মঞ্চস্থ করেছিল মন্দিরা বসু, সুস্মিতা বসু, মীনাক্ষী দাস, তাপস মুখার্জি, অমিত ব্যানার্জি, শ্যামলী গাঙ্গুলী, অঞ্জনা শ্রীবাস্তব, পুষ্কর দাসগুপ্তা, মনীষা, নিতাই দাস, দেবযানী মল্লিক, টিংকু ঘোষ, গৌতম ঘোষ, গৌতম শ্রীবাস্তব, সীমা সিং, সীমা গুপ্তা, অদিতি সান্যাল, অর্পণ সান্যাল, পিউ দত্ত ও রাজা মল্লিক। স্বর্গত সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' শ্রীমতী ভারতী গুহর পরিচালনায় রূপায়িত করল শকুন্তলা রায়, শর্মিষ্ঠা গুহ, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুস্মিতা বসু, প্রভাত সরকার, পৃথা সেন, সংযুক্তা গুহ, তপতী মুখার্জি, মেঘবর্ণা মুখার্জি, কৃষ্ণা দাসগুপ্ত, কেকা মিত্র, দেবযানী মল্লিক ও বিজয় ভট্টাচার্য।

শ্রীঅলোক দত্ত, সর্বশ্রী সোমনাথ ভট্টাচার্য, শঙ্কর মাকাল, বাবলু দে, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও (হরবোলার) কৃষ্ণপদ গায়েনের সহযোগিতায় দুটি পুতুল নাচ 'খেলার সাথী' ও 'দুই বানর' পরিবেশন করেন। রূপসজ্জায় ছিলেন চিত্ত মজুমদার, বেলা দাস ও রুবী দাস। অনুষ্ঠানে আলোকসম্পাত করেন শ্রীপরেশ দত্ত। আবহসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপরেশ আচার্য ও শ্রীস্বপন নন্দী।

'কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প' ও 'সুন্দরবন' তথ্যচিত্র দুটি সম্পর্কে অনবধানতাবশত একটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল। ছবি দুটির সঙ্গীতপরিচালনা করেছেন শুভ গুহঠাকুরতা।

ওরলে
দেখুন, কি পরম পরিতৃপ্তি
ওঁর মুখে...
ওঁর মতন লক্ষ লক্ষ লোকই
গ্লুকো আর মোনাকো-কে
ভারতের সবচেয়ে বেশী কাটতির
বিস্কুট ক'রে তুলেছেন।
পার্লে
বিস্কুট
আজই এক প্যাকেট পার্লে কিনে নিন।
everest/567a/PPbn

অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ২—১ খেলায় এগিয়ে যায়। তৃতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় অস্ট্রেলিয়ার রে রাফেলস জয়ী হলে পুনরায় খেলার ফলাফল সমান ২—২ দাঁড়ায়, ফলে অস্ট্রেলিয়ার ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে। তখন জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় শেষ সিঙ্গলস খেলায়। মেকসিকোর রাফেল ওসুনা ৬—২, ৩—৬, ৮—৬ এবং ৬—৩ গেমে বিল বাউরেকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করে স্বদেশকে জয়যুক্ত করেন। মেকসিকোর ১৬ বছর বয়সের লাইন-জাজ গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় সেটে অস্ট্রেলিয়ার বিল বাউরের যে ৫টা 'ফুট ফল্ট' ধরেন তাতেই বাউরের মনোবল সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে যায়। এই 'ফুট ফল্ট' রায় সম্পর্কে মতবিরোধ ছিল। আবার বাউরের সার্ভিস করার সময় মেকসিকোর ওসুনা তাঁর বেস-লাইনে স্থিরভাবে না দাঁড়িয়ে নাচানাচি করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুত কোচ হ্যারী হপম্যান এ সম্পর্কে আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোন সুবিচার তো পান নি, বরং আম্পায়ার ক্ষুব্ধ হয়ে মাইকের সাহায্যে স্থানীয় ভাষায় ওসুনাকে এই বলে উৎসাহিত করেন, 'ওসুনা, তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পার।' এ-এক তাজ্জব ব্যাপার! কোন অভিযোগ বা আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য করার অধিকার আম্পায়ারের নিশ্চয় আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আম্পায়ার অগ্রাহ্য করার যে রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন তা কোন সভ্য দেশে বা ডেভিস কাপের আইনে আছে কি? আর একটা জিজ্ঞাসা আছে। ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতা শুধু আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানই নয়। ডেভিস কাপ জয়ের গুরুত্ব লন টেনিস খেলায় বেসরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব জয়। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে লাইন জাজের আসনে ১৬ বছর বয়সের বালককে যেমন মেকসিকোতে হয়েছে, বসতে দেওয়া সমীচীন কি? এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার আসে একুশ বছর বয়সে। এ ব্যাপারে বয়সটাই একমাত্র মাপকাঠি—সামাজিক পদমর্যাদা, শিক্ষাদীক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ে দক্ষতা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। আবার আইনের চোখে সাবালক হওয়ার বয়স ১৯ বছর। সুতরাং আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় নাবালকের পক্ষে বিচারকের আসনে বসবার অধিকার কোথায়?

স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান

ওয়াল্টার হ্যামণ্ড

টেস্ট সিরিজে ১০০০ রাণ

টেস্ট ক্রিকেটে হাজার রকমের রেকর্ড আছে। কিন্তু একটি সিরিজের খেলায় ব্যক্তিগত হাজার রান সংগ্রহের কোন নজির নেই। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুত ডন ব্র্যাডম্যান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালের টেস্ট সিরিজে এই দুর্লভ ১০০০ রানের অতি নিকট দূরত্বে গিয়েছিলেন। সামান্য ২৬ রানের জন্যে তিনি বুড়ি ছুঁতে পারেন নি! তাঁকে ৯৭৪ রান করার পর থেমে যেতে হয়েছিল। এর জন্য দায়ী খেলার পরিস্থিতি। কারণ ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস খেলার সুযোগই আসে নি, এমনই খেলার পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল।

ওভালের ৫ম টেস্টে ব্র্যাডম্যান প্রথম ইনিংসে ২৩২ রান করেন। সিরিজে তখন তাঁর মোট রান দাঁড়ায় ৯৭৪ (গড় ১৩৯-১৪)। এই সিরিজে ১০০০ রান পূর্ণ করতে হলে তাঁকে আরও ২৬ রান সংগ্রহ করতে হবে। হাতে জমা ৫ম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। কিন্তু খেলার পরিস্থিতি তাঁর লক্ষ্যের পথে দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। ইংল্যান্ড তাদের পুরো ২য় ইনিংস খেলেও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৬৯৫ রান ছুঁতে পারলো না—৩৯ রান কম হল। ফলে অস্ট্রেলিয়াকে আর ২য় ইনিংস খেলতেই হল না। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং ৩৯ রানে জয়ী হল বটে কিন্তু ব্র্যাডম্যানের আর হাজার রান পূর্ণ হল না। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

একটি টেস্ট সিরিজে ৯০০ রান পূর্ণ করার আর মাত্র একটি নজির আছে—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯২৯ সালে ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের ৯০৫ রান (গড় ১১৩-১২)।

ফেডারেশন কাপ

মহিলাদের আন্তর্জাতিক দলগত লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমেরিকা ২—১ খেলায় গতবছরের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ১৯৬৯ সালের ফেডারেশন কাপ জয়ী হয়েছে। তিনটি খেলার মধ্যে আমেরিকা একটি সিঙ্গলস এবং একটি ডাবলস খেলায় জয়ী হয়। বাকি সিঙ্গলস খেলাতে জয়ী হয় অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দিনের খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। প্রথম সিঙ্গলস খেলায় আমেরিকার ন্যান্সি রীচে জয়লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় জয়লাভ করে খেলার ফলাফল সমান করেন। ডাবলসের খেলায় কুমারী ন্যান্সি রীচে এবং পিচেশ বার্টকোভিজ ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে প্রখ্যাতা খেলোয়াড় শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট এবং জুডি টেগার্টকে পরাজিত করে স্বদেশকে জয়যুক্ত করেন।

ডেভিস কাপ যেমন পুরুষদের দলগত আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা তেমনি ফেডারেশন কাপ মেয়েদের। তবে ঐতিহ্যের দিক থেকে ডেভিস কাপের নামডাক অনেক বেশী। ১৯০০ সালে ডেভিস কাপ এবং ১৯৬৩ সালে ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন।

এ পর্যন্ত মাত্র এই দুটি দেশ ফেডারেশন কাপ জয়ী হয়েছে—আমেরিকা ৪বার এবং অস্ট্রেলিয়া ৩বার। আমেরিকা এই কাপ পেয়েছে ১৯৬৩, ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার কাপ জয় ১৯৬৪, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৮ সালে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ১ম খণ্ড

৬ষ্ঠ সংখ্যা
মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 13th June, 1969 শুক্রবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ **40 Paise**

প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

বইকুণ্ঠের খাতা

২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের "অমৃতে" "বিশেষ প্রতিনিধি"র লেখাতে দেখলাম, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর নূতন বইয়ের নাম ব্যাখ্যা করে বলছেন, পেরু অঞ্চলের "আদিবাসীরা বিশ্বাস করতো সূর্য কাঁদলে নাকি সোনা ঝরে পড়ে, সোনার সৃষ্টি হয়।" কিন্তু John Gunther এর "Inside South America" বইয়ের পেরুর উপরের অধ্যায়ে দেখছি ঃ

"By legend, gold is called 'Sweat of the sun' in Peru; silver is 'tears of the moon'."

Siegfried. S. Sitwell প্রভৃতির লেখা হাতের কাছে নেই, সুতরাং এতদতিরিক্ত কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য মত কি? John Gunther ই তো দেখি, অনেক লেখার আকর-গ্রন্থ; সুতরাং সন্দেহ-নিরসনের প্রয়োজন আছে।

মল্লিকা মৈত্র
কলকাতা-৩৩

(২)

অমৃত পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। নববর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে আপনারা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নামে যে নতুন ফিচারটি শুরু করেছেন, তা বাংলা পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে সত্যই অভিনব। বিদেশে কোন নতুন বই প্রকাশিত হলে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে যায়। আমাদের দেশে লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের কোন পরিচয় নেই। সাহিত্য-সমালোচনা যা হয়, সে সম্পর্কেও মানুষের শ্রদ্ধা এখন কমে যাচ্ছে। আপনাদের ফিচারটি বই লেখার ব্যাপারে লেখকের যে সব রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতা ঘটে তার সঙ্গে পাঠকের একটা গভীর সম্পর্ক স্থাপন করছে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন বই 'সূর্য কাঁদলে সোনা'র বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে ফিচারটি শুরু করায় আমি বিশেষভাবে খুশি হয়েছি। প্রেমেনবাবুর লেখার আমিও একজন অনুরক্ত পাঠক। অমৃতে প্রকাশের সময় আমি উপন্যাসটি পড়েছি। প্রথমদিকটা একটু মনে টেনাস মনে হয়েছিল। আপনাদের বিশেষ প্রতিনিধি তার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে আমার কৌতূহল বহুগুণে বেড়ে গেছে। ইচ্ছে করছে, আরেকবার উপন্যাসটি পড়ে দেখি। বিশেষ প্রতিনিধিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবেন। কোনো বই বা লেখক সম্বন্ধে আমি এত সুন্দর আলোচনা এর আগে আর কোন কমার্শিয়াল কাগজে পড়িনি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখাও আমাকে আকর্ষণ করে। তাঁর বহু বই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে অন্যতম খ্যাতিমান পুরুষ। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা সম্পর্কে আপনাদের বিশেষ প্রতিনিধি যে রকম দক্ষতার সঙ্গে ভিতরের খবর দিতে পেরেছেন, আশুবাবুর উপন্যাস সম্বন্ধে ততটা দেওয়া সম্ভব হয় নি।

তবু, আমি এই ফিচারটির প্রতি কৌতূহলী। নতুন বই সম্পর্কে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের এই প্রয়াস শুধু একটা সাময়িক ঘটনা নয়, বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী উদ্যম হিসাবেও স্বীকৃতি পাবার মতো যোগ্য বিষয়।

দিলীপ দত্ত
কলকাতা-৫

লেখকের উত্তর

শ্রীমতী মল্লিকা মৈত্রের চিঠিটি পড়লাম। এ রকম উৎসাহী ও উৎসুক পাঠক-পাঠিকার চিঠি পেলে সাহিত্যিক মাত্রেই নিশ্চয় খুশি হন।

শ্রীমতী মৈত্র যেটির উল্লেখ করেছেন John Gunther-এর সেই "Inside Peru" লেখাটি আমারও চোখে পড়েছে এবং তা পড়ে বেশ একটু বিস্মিত হয়েছি। Gunther এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"Gold, the legendary 'sweat of the sun', brought the Conquistadores to Lima..."

'সোনা সূর্যের ঘাম',—সোনা সম্বন্ধে পেরুর প্রবচনটি Gunther এ ভাবে কোথায় পেয়েছেন জানি না। কথাটি কিন্তু সূর্য কাঁদলে সোনা বলেই স্প্যানিশ বিজয়ের সময় থেকে স্বীকৃত।

পেরুর নিজস্ব 'কুইচুয়া' ভাষার কোনো লিখিত রূপ ছিল না। সে দেশের রীতিনীতি শাস্ত্র পুরাণ ইতিকথা প্রভৃতি সবকিছুই শুধু 'কিপু' নামে এক ধরনের রঙিন সুতুলির গোছার সাহায্যে শ্রুতি-স্মৃতি হিসেবেই মুখে মুখে প্রচলিত থাকত। ও দেশ জয় করবার পর স্পেনের অনেক সৈনিক ও খৃষ্টান পুরোহিত-লেখক যতদূর সাধ্য ওই সব মৌখিক শ্রুতি-স্মৃতি স্প্যানিশ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক গবেষকরা এই সব পাণ্ডুলিপি থেকে পেরুর অতীত পরিচয় উদ্ধারে প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন।

পেরুর স্মরণীয় আদি ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রধান হলেন উইলিয়ম হিকলিং প্রেসকট। একশ' বাইশ বছর আগে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর Conquest of Peru বইটি শেষ করেন। তাতে সোনা সম্বন্ধে পেরুবাসীর প্রবচনটির এই উল্লেখ আছে—

"Gold in the figurative language of the people was 'the tears wept by the Sun'"

এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে প্রেসকট যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রাচীন একটি স্প্যানিশ পাণ্ডুলিপি থেকেই তা সংগৃহীত। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটির নাম Conquista i Poblacion de' Piru, MS আর উদ্ধৃতিটি হল—

"I al oro, asimismo decian que era lagrimas que el Sol llorava."

সোনাকে 'সূর্যের ঘাম' বলা ছাড়া Lima সম্বন্ধেও Gunther যা লিখেছেন ইতিহাসের দিক দিয়ে তা ভুল বলতে বাধ্য হচ্ছি। সোনার লোভেই Conquistadores মানে স্প্যানিশ বিজেতারা পেরুতে গেছেন ঠিকই কিন্তু Conquistadores যখন পেরুতে পদার্পণ করে তখন সে দেশে 'লিমা' বলে কোনো শহরই ছিল না। স্প্যানিশ সেনাদলের নেতা ফ্রান্সিসকো পিজারো চরম বিশ্বাসঘাতকতার পৈশাচিক চাতুরীতে পেরুর সম্রাট ইংকা আতাহুয়ালপাকে ১৫৩২-এর ১৬ই নভেম্বর বন্দী করে। আতাহুয়ালপাকে শ্বাসরোধ করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় ২৯শে আগস্ট ১৫৩৩। আর পেরু জিতে নেবার পর পিজারোই নতুন রাজধানী হিসেবে 'লিমা' শহরের প্রথম পত্তন করে ১৮ই জানুয়ারী ১৫৩৫-এ।

John Gunther বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক হলেও একেবারে অভ্রান্ত নন বলেই তো মনে হচ্ছে।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র
কলিকাতা ঃ ২৬

মেওয়ালালের কর্মশালা

'খেলার কথা' সংকেতে 'মেওয়ালালের কর্মশালা' প্রবন্ধে কমল ভট্টাচার্য ফুটবল খেলার দর্শক হিসেবে আমার মনে পুরোনো দিনের বহু স্মৃতিকেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সালটা মনে নেই স্বচ্ছন্দচারী সেন্টার ফরওয়ার্ড মেওয়ালালকে আমি প্রথম দেখি প্রথম ডিভিশন লীগের খেলায় **'রবার্ট হাডসন'** দলের হয়ে খেলতে। অতর্কিতে এগিয়ে গিয়ে দলের অন্য খেলোয়াড়ের সট-করা চলতি বলে টুক করে—বলা যায়, আলতোভাবে—পা'টি ঠেকিয়ে দিয়ে বলের গতিপথ (ডিরেকশন) হঠাৎ পরিবর্তিত করে গোল দেওয়ায় তাঁর জুড়ি আমি সাতচল্লিশ বছরের ফুটবল দর্শকের জীবনে আজও খুঁজে পাইনি।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা ঃ ১৩

সম্পাদকীয়

অপচিত যৌবনের ক্ষোভ

গত সপ্তাহে কলকাতায় মহাকরণের সামনে এক বিশাল যুব সমাবেশ কতকগুলো দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। কলকাতায় এবং বাংলা দেশে বিক্ষোভ আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অনেকটা গা-সহা হয়ে গেছে এই ধরনের গণ-বিক্ষোভ। সামান্য কারণে এদেশে মারামারি হয়, রক্তপাত ঘটে, মানুষের প্রাণ যায়। আমরা তার বিবরণ পড়ে দুঃখিত হই। তার বেশি কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু দেশের সরকারকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে। কেন এই বিক্ষোভ, কেন এই অহেতুক রক্তপাত তার কারণ খুঁজে বের করে প্রতিবিধানের জন্য অগ্রসর হতে হবে।

আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে বাস করছি যার একদিকে প্রত্যাশা অন্যদিকে হতাশা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে আছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতা লাভ করলেন তখন দেশের মানুষের মনে প্রত্যাশা জেগেছিল। হয়তো বা তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মানুষের মনে এই প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল যে, সরকার বদল হলেই দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে রাতারাতি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শতদিন পার হয়ে গেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের পক্ষে বিশেষ কিছু করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত এই কারণে আশাবাদীদের মনে দেখা দিয়েছে নিরাশা। সাম্প্রতিক যুব বিক্ষোভ সেই নিরাশারই একটি প্রকাশ মাত্র।

ছাত্র ও যুবকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, হয় আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো নতুবা বেকার ভাতা দাও। যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীর একটিতে বলা হয়েছিল যে, ক্ষমতা পেলে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেকার ভাতা প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করবেন। তাঁদের এই সদিচ্ছাকে যুবকরা এখন কার্যে রূপায়িত করার দাবি জানাচ্ছেন। যুবকদের এই দাবি তাঁদের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষত পশ্চিম বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষিত যুবকদের কর্ম সংস্থান অত্যন্ত জরুরি সামাজিক প্রয়োজন। ভারতবর্ষের সর্বত্রই তীব্র বেকার সমস্যা। পশ্চিম বাংলায় তা তীব্রতর। এখানে শিল্প প্রসারের পরিবর্তে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে শিল্পের সংকোচনই আমরা লক্ষ্য করি। বহু কলকারখানা ধর্মঘট, লক-আউটের দৌলতে অচল। উপযুক্ত অর্ডার ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অভাবে অনেক কারখানা কারবার গুটিয়ে ফেলেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানায় লোকসানের পরিমাণ এত বেড়েছে যে, সেখানেও নতুন কর্মসংস্থান আপাতত সম্ভব নয়। তাছাড়া, এও সত্য যে, বহু ব্যবসায়ে স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থানের পরিবর্তে বহিরাগতদের আনা হচ্ছে। এই সমস্ত কারণে পশ্চিম বাংলার কর্মপ্রার্থীদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের আশা প্রায় দুরাশাই বলা যেতে পারে।

কিন্তু এভাবে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে কোনো সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হতে পারে না। এই হতাশা ও অসন্তোষের সুযোগ নেবার জন্য ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলের অভাব নেই। রাজনীতির কথা বাদ দিলেও কর্মহীন ক্ষুধার্ত যুবকের পক্ষে উৎপাত ও উপদ্রব সৃষ্টি করা অস্বাভাবিক বলা যায় না। সরকারকে এ সমস্ত বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। প্রায় বারো লক্ষ শিক্ষিত বেকার আছে এখন পশ্চিমবঙ্গে। প্রতি বৎসর তার সংখ্যা বাড়তে থাকবে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারের কতটুকু ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে? বেকার ভাতা একা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই বিষয়টি আলোচনার যোগ্য। যুক্তফ্রন্ট সরকার তার জন্য চেষ্টা করবেন বলেছেন। এটা একটা সান্ত্বনা মাত্র। বলা বাহুল্য, যুবকরা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। তারা হতাশ হয়েই সেদিন ফিরে এসেছে মহাকরণের সামনে থেকে।

কর্মপ্রার্থী যুবকদের বিভ্রান্ত না করে এটা বলে দেওয়াই উচিত যে, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বেকার ভাতা চালু হবার কোনো আশা নেই। কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে পরিকল্পিত অর্থনীতির ভিত্তিতে রাজ্য ও কেন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুর্দশা দূর করার জন্য শিল্প প্রসারের দিকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সুস্থির সামাজিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বেসরকারী শিল্প কারখানায় শান্তি স্থাপন। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক বিক্ষোভ বেশি। ঘেরাও-এর সর্বনাশা নীতি সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সরকার পক্ষের অনেক দলও এবিষয়ে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল হচ্ছে না। এভাবে বিশৃঙ্খলা চললে এবং শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করলে এ রাজ্যে উৎপাদন তো ব্যাহত হবেই, শিল্প প্রসারের সম্ভাবনাও যাবে শূন্যে মিলিয়ে।

এই বাস্তব সত্য আজ সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। দলীয় রাজনীতি নয়, গোটা দেশের স্বার্থে আজ সরকারকে তার শিল্পনীতি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করতে হবে। শিল্প প্রসারের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ইতিমধ্যেই সরকার শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারের জন্য সরকার পক্ষের করণীয় যা আছে তা কার্যে পরিণত করার আশ্বাস দিয়েছেন। ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্যও সরকার এক শিল্পে একটি ইউনিয়ন গঠনের সুপারিশ করে বিল আনবেন বলে জানা গেছে। এ সমস্ত ব্যবস্থা করতে সময়ের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জনসাধারণের ধৈর্য ও সহযোগিতা। তা যদি না পাওয়া যায় এবং ক্রমাগত বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ লেগে থাকে তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ হবে অনিশ্চিত। সরকার তাঁদের আন্তরিকতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে হতাশ যুবশ্রেণীর মধ্যে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনুন।

অন্নদাশঙ্কর রায়

।। আট ।।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী যখন স্বদেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। তার থেকে প্রায় পঁচিশ বছরই কেটেছে বিদেশে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে যদি ইউরোপীয়দের একটি দেশ বলে ধরা হয় তবে পশ্চিমে আর কোনো ভারতীয় মনীষী বা নেতা তাঁর মতো এতকাল ইউরোপে বা ইউরোপীয় উপনিবেশে অতিবাহিত করেন নি।

পশ্চিমে প্রায় বিশ বছর ধরে বাস করে তাঁর যা প্রত্যয় হয় তারই উপর নির্ভর করে তিনি লেখেন 'হিন্দ স্বরাজ'। তখনো তিনি জানতেন না যে সত্যাগ্রহ দক্ষিণ আফ্রিকায় সফল হবে, সেইসূত্রে ভারতবর্ষে তাঁর নাম হবে, সেখানে পাঁচ বছর বাদে তিনি ফিরবেন, ফেরার চার বছর বাদে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে নামবেন। তার এক বছর বাদে ভারতের স্বরাজের ইস্যুতে অসহযোগ পরিচালনা করবেন।

বলতে গেলে 'হিন্দ স্বরাজ'ই তাঁর ম্যানিফেস্টো। মার্কসের যেমন 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। এই ইস্তাহারের সারাংশ দিয়ে তাঁর এক স্বদেশবাসী বন্ধুকে তিনি একখানি চিঠি লেখেন। চিঠিতে ছিল—

'এক। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কোনো অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই।

দুই। পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় সভ্যতা বলে কোন পদার্থই নেই। আছে এক আধুনিক সভ্যতা। সেটা পুরোপুরি বস্তুভিত্তিক।

তিন। আধুনিক সভ্যতার ছোঁওয়া লাগার আগে ইউরোপের লোকের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল ছিল পূর্বমহাদেশের লোকের। অন্তত ভারতবর্ষের লোকের। আজকের দিনেও যেসব ইউরোপীয়দের গায়ে আধুনিক সভ্যতার ছোঁওয়া লাগেনি তারা ভারতীয়দের সঙ্গে আরো ভালোভাবে মিশতে পারে আধুনিক সভ্যতার সন্তানদের চেয়ে।

চার। ভারতবর্ষ শাসন করছে ব্রিটিশ জাতি নয়, আধুনিক সভ্যতা। তার বাহন হচ্ছে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি সভ্যতার জয় বলে কথিত যাবতীয় উদ্ভাবন।

পাঁচ। বম্বে, কলকতা ও অন্যান্য প্রধান ভারতীয় শহরগুলোই হচ্ছে আসল মহামারীক্ষেত্র।

ছয়। কালকেই যদি ব্রিটিশ শাসনের জায়গা নেয় আধুনিক পদ্ধতির উপর নির্ভর ভারতীয় শাসন তা হলে ভারতের অবস্থা এরচেয়ে ভালো হবে না। তবে যে টাকাটা ইংলন্ডে টেনে নেওয়া হচ্ছে তার কিছুটা ভারতে থেকে যাবে। কিন্তু ভারত তখন হবে ইউরোপ অথবা আমেরিকার দ্বিতীয় বা পঞ্চম নেশন।

সাত। পূর্ব আর পশ্চিম তখনি সত্যি মিলতে পারবে যখন পশ্চিম ওই আধুনিক সভ্যতাকে প্রায় পুরোপুরি বিসর্জন দেবে। তারা অন্যভাবেও দৃশ্যত মিলতে পারবে, যদি পূর্বমহাদেশও আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করে। কিন্তু সেপ্রকার মিলন হবে সশস্ত্র যুদ্ধবিরতির মতো। যেমন ধরুন ইংলন্ডের সঙ্গে জার্মানীর। উভয় নেশনই মরণশালায় প্রাণধারণ করছে, যাতে এক অপরকে ভক্ষণ না করে।

আট। একজন বা একদল মানুষের পক্ষে সারা দুনিয়ার সংস্কার শুরু করা বা ধ্যান করা নিতান্তই ধৃষ্টতা। অত্যন্ত কৃত্রিম ও বেগবান যানবাহনের দ্বারা অমন কিছু করার চেষ্টাও অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা।

নয়। বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দ্বারা নৈতিক বিকাশ হয় না, এটা সাধারণভাবে জাহির করা যেতে পারে।

দশ। চিকিৎসাবিজ্ঞান হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘনীভূত সারাৎসার। উঁচুদরের ডাক্তারি বলে যা চলে তারচেয়ে হাতুড়েগিরি অশেষগুণে শ্রেয়।

এগারো। শয়তান তার রাজত্ব রক্ষা করার জন্যে যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করছে হাসপাতালগুলো হচ্ছে তাই। পাপ, দুর্গতি অধঃপতন ও প্রকৃত দাসত্বকে চিরন্তন করে তারা। আমি যখন ডাক্তারিতে তালিম হতে চেয়েছিলুম তখন আমি সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট হয়েছিলুম। হাসপাতালে যেসব অনাসৃষ্টি ব্যাপার হয় তাতে কোনোপ্রকার অংশ গ্রহণ করা আমার পক্ষে পাপকর্ম। যৌনব্যাধির জন্যে, এমন কি ক্ষয়রোগের জন্যেও, যদি হাসপাতাল না থাকত তাহলে আমাদের মধ্যে কম ক্ষয় রোগ ও কম যৌনব্যাধি থাকত।

বারো। বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারত যা শিখেছে তাকে না-শেখাতেই তার পরিত্রাণ। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, উকিল, ডাক্তার ও সেইরূপ সমস্তকেই যেতে হবে। কৃষকের সরল জীবনই হচ্ছে এমনতর জীবন যাতে সত্যিকার সুখ, একথা জেনে তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীদের সচেতনভাবে ধর্মোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে কৃতসংকল্প হয়ে বাঁচতে শিখতে হবে।

তেরো। ভারতের পক্ষে কলে তৈরি কাপড় পরা অনুচিত, তা সে ইউরোপীয় মিলেরই হোক আর ভারতীয় মিলেরই হোক।

চোদ্দ। ইংল্যান্ড ভারতকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। তা হলেই ভারতের উপর তার অধিকার অনুমোদনযোগ্য হবে। ইংলন্ডে আজকাল অনেকে এই মর্মে ভাবেন।

পনেরো। জনগণের বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যের একটা সীমা বেঁধে দিয়ে সমাজের নিয়ন্ত্রণ করা ছিল প্রাচীন ঋষিদের বিজ্ঞতা। প্রায় পাঁচ হাজার বছরের রুক্ষ লাঙল আজকেও চাষীদের লাঙল। তার মধ্যেই পরিত্রাণ। এই ধরনের অবস্থাতেই মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচে। বাঁচে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে। তেমনধারা শান্তি ইউরোপ উপভোগ করেনি আধুনিক কার্যকলাপ অবলম্বন করার পর থেকে।......"

উপরোক্ত চিন্তাধারা যে ভারতীয় নয়, তা এক আঁচড়ে চেনা যায়। রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ গোখলে বা টিলক কেউ সভ্যতার সামনে 'আধুনিক' বলে একটি বিশেষণ বসিয়ে দিয়ে তাকে এককথায় খারিজ করেন নি। পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন বা বিপরীত সভ্যতার কথাই তাঁরা ভেবেছেন। কেউ বা চেয়েছেন সমন্বয়, কেউ বা আত্মরক্ষার খাতিরে পাশ্চাত্যকে রোধ করতে বলেছেন।

আসলে ওই চিন্তাধারা ইউরোপেরই ভিন্নমুখী চিন্তাধারা। সবাই যে আধুনিকের পক্ষে তা নয়। বিপক্ষেও বহু লোক। এমন কি সভ্যতা কথাটারও স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু ব্যক্তি। প্রকৃতিসম্মত জীবনেই সুখ, প্রকৃতির যে যত কাছে সে তত সুখী, এ তত্ত্ব ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকেই

মানতেন। শিল্পবিপ্লবকে ও যন্ত্রপাতিকে ইউরোপের মনীষার একভাগ বরাবর বাধা দিয়েছে। কিছুতেই যখন ঠেকানো গেল না তখন পথ ছেড়ে দিতে হলো।

রাশিয়াতে অপেক্ষাকৃত নতুন বলে টলস্টয় নতুন করে বিরোধিতা করেন। তাঁদের আরো স্পষ্ট হয়েছে যে ক্যাপিটালিজম ফলিত বিজ্ঞানকে লাগিয়েছে আপনার কাজে, সমাজের কাজে নয়। আর ক্যাপিটালিজম নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের রূপ। আর তার দোসর হয়েছে মিলিটারিজম। এমনি করে দেশে দেশে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সংঘাত ধূমায়িত হচ্ছে টলস্টয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তার অনিবার্য পরিণাম একদিকে যুদ্ধ ও অপরদিকে বিপ্লব। সময় থাকতে তিনি প্রতিকারচিন্তা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিরোধ করতে উদ্যোগী হননি। সে ভারটা পড়ল গান্ধীজীর ওপর।

টলস্টয় একা নন, আরো অনেকের চিন্তাধারা যুদ্ধবিরোধী তথা বিপ্লববিরোধী ছিল। সেইজন্যে আধুনিক সভ্যতাবিরোধী, এমন কি সভ্যতা জিনিসটারই বিরোধী ছিল। কিন্তু চিন্তার উপযোগী কর্মের সন্ধান জানতেন না অনেকেই, যাঁরা জানতেন তাঁদের কর্মক্ষমতা ছিল না। তাঁদের পিছু ফেলে এগিয়ে আসেন গান্ধীজী। তাঁর হাতে সত্যাগ্রহ বলে উপযুক্ত একটি অস্ত্র। আর তাঁর পেছনে অল্পসংখ্যক হলেও একদল সৈনিক।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ শুরু হবার দুবছর পরে ও শেষ হবার পাঁচ বছর আগে লেখা 'হিন্দ স্বরাজ' পড়ে টলস্টয় আশীর্বাদ করেছিলেন, কিন্তু গোখলে খুশি হন নি। তৎকালীন ভারত সরকার ও বই নিষিদ্ধ করে দেন। গান্ধীজী ভারতে ফিরে নেতৃত্ব নিলে পরে ও বইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয়।

গত শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সময় এক সেট নতুন মূল্য এসে আমাদের পুরাতন মূল্যগুলিতে ঘা দিয়েছিল। সেটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আরেক প্রস্থ মূল্য এসে আবার ঘা দিল। এবার নতুন শেখা মূল্যগুলিতে। মহাত্মার দাবী হলো যা শিখেছি তাকে না শিখতে হবে। স্লেটের লিখন মুছে ফেলতে হবে।

এবারকার অভিযান আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে। তার অপরাধ সে বস্তুভিত্তিক। তাতে কেবল বস্তুগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু নৈতিক বিকাশ হবার নয়। আর মানুষ তো কেবল রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে না। অন্নের সঙ্গে চাই অমৃত। যাতে তাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে সে কী করবে। মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসা বহুযুগ পরে পরে ঘুরে ফিরে এল।

যীশুর জিজ্ঞাসাও বলতে পারি। তাতে তোমার লাভ কী হবে, যদি তুমি সারা দুনিয়াটা পাও, কিন্তু আপন আত্মাকে হারাও?

আমাদের যুগেও এ জিজ্ঞাসা বিভিন্ন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। গান্ধীজী স্বয়ং বলেছেন যে 'হিন্দ স্বরাজে' প্রকাশিত মতামতগুলি যদিও তাঁর নিজের তবু তিনি বিনম্রভাবে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন টলস্টয়, রাস্কিন, থোরো, এমার্সন প্রভৃতি লেখকদের, তা ছাড়া ভারতীয় দার্শনাচার্যদের। বিশেষ করে টলস্টয় বেশ কিছুকাল থেকে তাঁর অন্যতম গুরু।

গান্ধীজীর জিজ্ঞাসাকে মৈত্রেয়ীর বা যীশুর জিজ্ঞাসার মতো একটি বাক্যে সংহত করলে এইরকম দাঁড়ায়—বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে তুমি করবে কী, যদি তোমার হৃদয় অসাড় হয়, বিবেক নিষ্ক্রিয় হয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে যন্ত্রের মতো যান্ত্রিক?

গান্ধীজীর চেয়ে টলস্টয় আরো ভালো করে চিনতেন ইউরোপের আধুনিক সভ্যতাকে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, এত যে বড়াই করছ তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতার, কিন্তু কোথায় থাকে তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতা, যখন যুদ্ধের জন্য

তোমাকে ধরে নিয়ে যায়, যখন কনস্‌ক্রিপ্ট হয়ে মানুষ মারো?

'হিন্দ স্বরাজ' রচনার পাঁচ বছর যেতে না যেতেই মহাযুদ্ধ বেধে যায়। রাশিয়া, জার্মানী ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ গোড়া থেকেই কনসক্রিপশন চালায়। ইংলন্ড যতদিন সম্ভব এড়ায়, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও তাই করতে হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। গেল তো এমনি করে একটি যুগ। এমনি করে আরো কয়েকটি গেল রাশিয়ার দুই বিপ্লবে। তারপর ফাশিস্ট ইটালীতে। তারপরে স্টালিনের রাশিয়ায়। তারপরে হিটলারের জার্মানীতে। তারপরে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন আমেরিকায়।

আমার জীবনে গান্ধীজী ও টলস্টয় বলতে গেলে একই সময়ে আসেন। মনে মনে আমি বিষয়বৈরাগী নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠি। জনগণের মধ্যেই দেশের ও নিজের সার্থকতা দেখতে পাই। জীবনের গভীরে তলিয়ে যেতে হলে গ্রামেই যেতে হবে, নগরে নয়। নগরের জীবন বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু অগভীর। কারুশিল্প ও কৃষি যা দিতে পারে কলকারখানা কি কখনো পারে? বিত্তের দিক থেকে যা কম পড়বে চিত্তের দিক থেকে পুষিয়ে যাবে।

কোনটা সার কোনটা অসার বেছে নিতে হলে নাগরিক সভ্যতার মায়া কাটাতে হয়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বলতে কি নাগরিক সভ্যতাই বোঝায়? তার চেয়ে আরো বড় কিছু নয়? আধুনিক সভ্যতার সংজ্ঞা কি রেল স্টীমার আদালত হাসপাতাল কলকারখানা শহর? তা যদি হয় তবে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন চারুশিল্প এরা কোথায় দাঁড়ায়?

বিজ্ঞান যে এতোবড়ো আসন জুড়ে বসেছে সে কি শুধু বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণিত করার জন্য? না সত্যের সন্ধানে অতন্দ্র থেকে নিত্য নতুন তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কারের জন্যে? সাহিত্যিকদের চোখে ঘুম নেই। তাঁরাও সজাগ। কিসের জন্যে? সৌন্দর্যের তথা সত্যের অন্বেষণে নয় কি? না কেবল ধনীদের মনোরঞ্জনের জন্যে? চারুকলার সাধকরা যে নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত তা কি কামিনীর নগ্নতার বিনিময়ে কাঞ্চনের আশায়?

সন্দেহ নেই যে এসব ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবসাদারী চলেছে। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে বুজরুকি। কিন্তু গত পাঁচশো বছরের খতিয়ান করলে দেখা যাবে যে মানুষ যদি মধ্যযুগের নিরাপদ বন্দর ছেড়ে অকূলে তরী ভাসিয়ে থাকে তবে তা বস্তুগত সওদাগিরির জন্যেই শুধু নয়, অবস্তুগত অচেনা অজানা সত্য ও সৌন্দর্যের অভিনব বন্দরে নতুন করে আশ্রয় নেবার প্রয়োজনেও। আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে গতিশীল সভ্যতা। তার বাইরের যানবাহনের গতি হচ্ছে ভিতরের চিন্তাস্রোতের গতি। চেতনাস্রোতের গতি।

গত পাঁচশো বছরের ইতিহাসে অন্ধকারের ভাগ হয়তো বেশী, কিন্তু আলোর ভাগ কি নেহাৎ কম? কী করে আমি আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে কেবল অন্ধকারটাকেই দেখি? আর আলোর মূল্য অস্বীকার করলে কি অন্ধকারের মূল্য বেড়ে যায় না?

অন্তহীন ভাবনার পর যেখানে এসে আমি পৌঁছলাম সেখানে আমি জনগণের পক্ষে, অহিংসার পক্ষে, গান্ধীজীর পক্ষে, সেই সঙ্গে আধুনিক সভ্যতারও পক্ষে, তার গতিশীলতারও পক্ষে। নিত্য নতুন আইডিয়া, নিত্য নতুন আবিষ্কার, নিত্য নতুন সৃষ্টি না হলে আমি বাঁচব না। ভুলভ্রান্তি করবার যে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা আমার চাই। আধুনিক সভ্যতা এ স্বাধীনতা দিয়েছে। মধ্যযুগের সভ্যতা এ স্বাধীনতা দেয় নি। ধর্মের নামে নীতির নামে কেড়ে নিয়েছে।

ওছাড়া আর কোনো মীমাংসা আমার পক্ষে—আমার মতো তরুণদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে যে মূল্য-পরিবর্তন ঘটেছিল আমরা তার উত্তরাধিকারী। হিসাব করলে আমরা তার চতুর্থ পুরুষ। আমরা আর উজিয়ে যেতে পারতুম না। ইংরেজী স্কুল ছেড়ে দিলেও আমাদের সেই উত্তরাধিকার আমাদের সঙ্গ নিত। জাতীয় বিদ্যালয়েও সে আমাদের সঙ্গে অনুপ্রবেশ করত।

আমাদের সেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আধুনিক যুগের তথা পূর্ব-পশ্চিমের মহামানবের প্রবর্তিত মূল্য-রাজি আমরা কারো কথায় বিসর্জন দিতে পারিনে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে ঐতিহ্যে আমরা লালিত হয়েছি তার প্রবাহ কারো কথায় শুকিয়ে যাবার নয়। এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়ে আমরা গান্ধীজীর প্রবর্তিত আরেক প্রস্থ মূল্য মাথা পেতে নিই। মানুষে মানুষে বিরোধ যদি দেখা দেয় তবে সে বিরোধ অহিংস-ভাবেই মেটাতে হবে। মেটাতে না পারলে যেটা অনিবার্য হবে সেটা সহিংস সংগ্রাম নয়, অহিংস সংগ্রাম। অহিংসার পেছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের ভারতীয় তথা খৃস্টীয় ঐতিহ্য। প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে প্রাণীর প্রতি অহিংসা। সত্যও তেমনি মহামূল্যবান।

সত্যের পেছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের বিশ্বজনীন ঐতিহ্য। মহাত্মার মধ্যে তারই পরিপূর্ণতা। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য অসত্য অবলম্বন করবেন না। তাঁর কার্যকলাপ সকলের সামনে খোলা। সরকারের কাছেও তাঁর গোপনীয় কিছু নেই।

তেমনি জনগণের বঞ্চনার অবসান আমাদেরও কাম্য। স্মরণাতীত কাল থেকে যাদের পায়ের তলায় রাখা হয়েছে তাদের হাত ধরে তুলতে হবে, তুলে পাশে বসাতে হবে, সমান সুযোগ দিতে হবে। সম্ভব হলে সমানের চেয়েও বেশী দিতে হবে, যাতে অতীতের সঞ্চিত অসাম্য দূর হতে পারে। এরজন্যে যদি ভাগ্যবান শ্রেণীকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তো সেটা করতে হবে স্বেচ্ছায় ও আনন্দে। অন্যায় সুবিধা যে যা পেয়েছে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত নয়। বিপ্লবের দিকে অর্ধেক পথ এগিয়ে যাওয়াই বিপ্লব পরিহারের প্রকৃষ্ট পন্থা। গান্ধীজীর উদ্দেশ্যও তাই। জনগণকে নিয়ে চললে বিপ্লবের দরকার হবে না, কারণ বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের কাটাকুটির পর যেটুকু শেষপর্যন্ত বাঁচে গান্ধী নেতৃত্ব তার চেয়ে বেশী এনে দেবে।

গান্ধীবাদী রাষ্ট্র যদি নৈরাজ্যের দিকে অর্ধেক পথ যায় তাহলে তো আমাদের কোনো খেদই থাকে না। টলস্টয়ের মতো আমিও ছিলুম রাষ্ট্রমাত্রেরই উপর বিরূপ। স্বাধীনতায় লাভ কী হবে যদি রাষ্ট্র তেমনি থেকে যায়? গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মনের মিল অহিংসার জন্যে ততটা নয়, নৈরাজ্যের জন্যে যতটা।

বৃত্ত

কল্যাণ সেন

ঘরে ঢুকে অবাক হল নমিতা। আর একটু হলেই তার হাতের ওপর গরম চা ছলকে পড়তো, কোনোরকমে সামলে নিল সে। তাড়াতাড়ি হাতের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বিছানার কাছে এগিয়ে এলো নমিতা। আশ্চর্য! একটা চাদরে শরীরটাকে বিশ্রীভাবে পেঁচিয়ে, বালিশগুলো নানাভাবে ছড়িয়ে, এখনো শুয়ে আছে বিমলেন্দু। নমিতার চোখে পড়লো জানালা দিয়ে রোদ এসে টেবিলের গায়ে, দেয়ালে, মশারির ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। জানালার বাইরেই একটা নিমগাছ। হাত বাড়ালেই পাতা ধরা যায়, তার পাতাগুলোও সকালের রোদে ঝলমল করছে। ঘরের ভেতর চারপাশে তাকালো একবার, টেবিলের ওপর জলের গ্লাস, বিমলেন্দুর ঘড়ি, ট্রামের 'মান্থলি টিকিট', তার নিজের পাউডার আর সিঁদুরের কৌটো, সমস্তই ঠিক অন্যদিনের মতো সাজানো আছে। ঘড়ি দেখলো একবার নমিতা। সাতটা দশ, আরও অবাক হলো সে, কী হলো বিমলেন্দুর ? অন্যদিন এত-ক্ষণে বিমলেন্দুর চা-খাওয়া, দাড়ি কামানো, সব শেষ হয়ে যায়! তারপর কোনোরকমে খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো দেখেই তাকে তাড়া লাগায়—জামাকাপড় সব রেডি করে রাখো—আমি বাথরুমে যাচ্ছি। ঠিক আটটায় বিমলেন্দু স্নান করতে যায়। সবার আগেই ওকে বেরোতে হয়, তারপর ওর বড়দা নিখিলেন্দু বেরোন ঠিক সাড়ে ন'টায়। ছোটো ভাই অনিলেন্দুর ভাগ্য ভালো, তার দশটা পাঁচটা নেই, সবে ডাক্তারি পাশ করেছে, কাজকর্মের কিছু ঠিক হয়নি, শুধু দুই বৌদির অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে আর বাড়িতে কারো মাথা ঘুরলে বা গলা ব্যথা হলে বড় বড় প্রেসক্রিপশান দিয়েই তার সময় কাটছে।

বিছানার কাছে এগিয়ে এসে মশারির একটা দিক তুলে ফেলে নমিতা ডাকলো—এই, উঠবে না? প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। কোনো উত্তর না পেয়ে নমিতা ভাবলো, কী জানি, প্রথম রাত্তে হয়তো ভালো ঘুম হয়নি, গরম পড়ে গেছে; তাই শেষরাতের দিকে
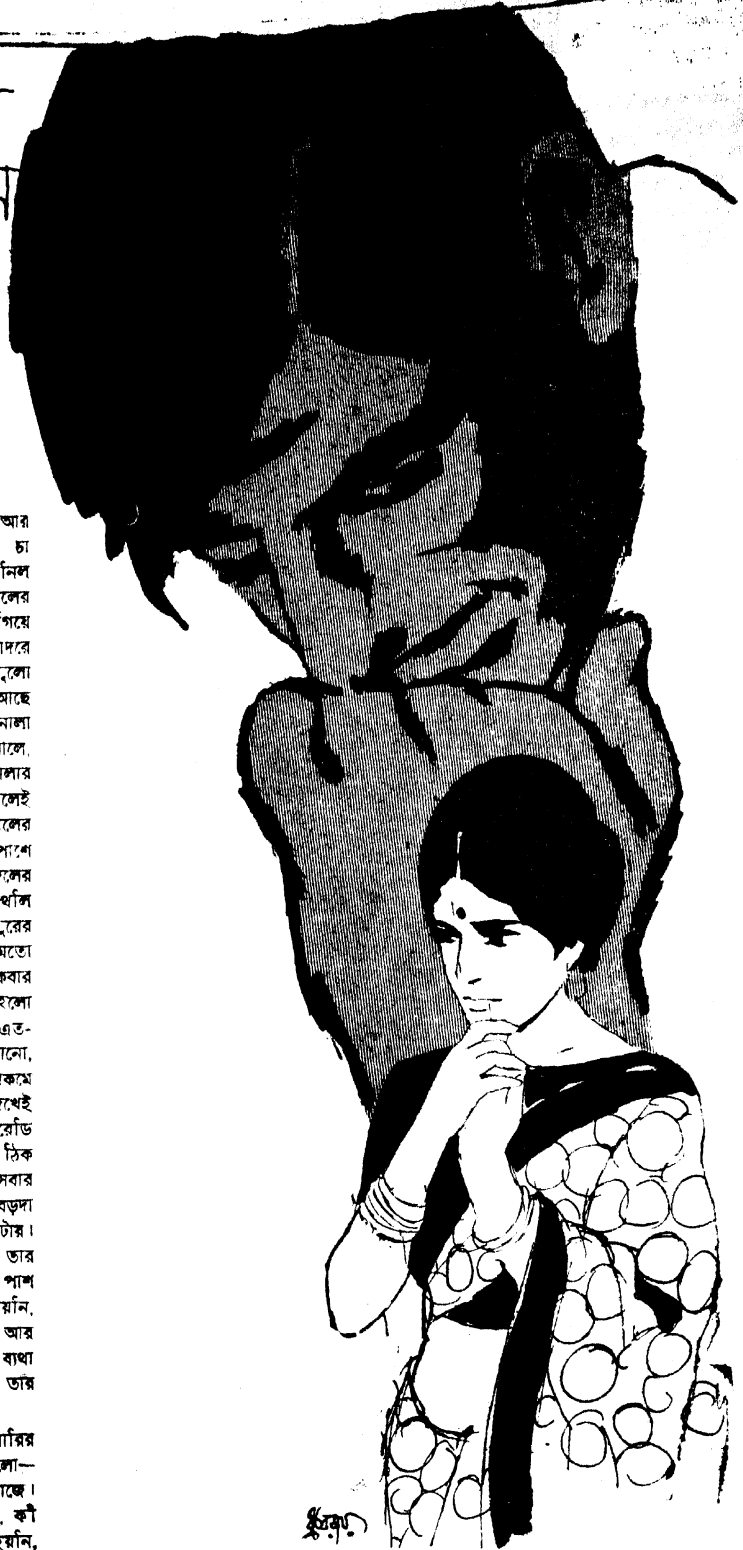
হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কেমন যেন মায়া হলো তার, কিন্তু জেগে উঠেই হয়তো আবার চেঁচামেচি শুরু করবে—বাড়িতে কী একটা মানুষ নেই? অফিসে যে আজ নির্ঘাৎ লেট...। নমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, ঠিক বুঝতে পারলো না কিছু। আজ প্রায় দু'বছর তার বিয়ে হয়েছে, অথচ সে মনে করতে পারে না বিমলেন্দু কোনোদিন অফিস কামাই করেছে। প্রথম প্রথম বিরক্ত হতো, অভিমান হতো তার, কতদিন বলেছে—চল না, ছোড়দির ওখানে ঘুরে আসি একবার। বিমলেন্দু উত্তর দিয়েছে—বাঃ অফিস নেই? .....নমিতা চুপ করে গেছে। আবার হয়তো শ্রাবণ মাসের কোনোদিনে সকাল থেকে মেঘ করেছে, খুব হাওয়া দিয়েছে, নমিতা হয়তো 'রেকর্ড প্লেয়ারে'—'মন মোর মেঘের সঙ্গী'... গানটা চাপিয়ে দিয়ে বিমলেন্দুকে বলেছে 'এই, আজকে তুমি অফিসে যেয়ো না লক্ষ্মীটি!' পায়ে মোজা পরতে পরতে বিমলেন্দু জবাব দিয়েছে—'পাগল! ...তোছাড়া আজ থেকে আমার ইন্সপেক্‌শান এখন অফিসে না গেলে চলে?' ক্রমশ নমিতারও সব ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে, আর কখনো এসব নিয়ে বিমলেন্দুকে বিরক্ত করেনি। বরং দেখেছে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বারো মাস ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বিমলেন্দু চা খেয়েছে, দাড়ি কেটেছে, স্নান করেছে, তারপর ঠিকসময় খেয়েদেয়ে অফিসে চলে গেছে। কোনো হেরফের ঘটেনি। এতটুকু অনিয়মও নয়।

ওদিকের ঘর থেকে শুনতে পেল, রেডিওর শব্দ 'সর্বভারতীয় বাঙলা সংবাদ, পড়ছি'... তার মানে সাড়ে সাতটা। এইবার নমিতা বিমলেন্দুর পিঠের ওপর চাপ দিয়ে ডাকলো, কী হলো তোমার? অফিসটফিস যেতে হবে না আজ? কটা বাজে খেয়াল আছে?...সামান্য একটু নড়ে উঠলো বিমলেন্দুর শরীর। তারপর চাদরে শরীরটাকে আরও পেঁচিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলো একদিকে কাত হয়ে। নমিতা এতক্ষণে বুঝলো ও তাহলে ঘুমিয়ে নেই, এমনি শুয়ে আছে। বালিশের তলা থেকে টেনে একটা বই বার করলো, কী একটা 'জেমস বন্ড' মার্কা খুনে গল্পের বই। একটু বিরক্ত হয়েই নমিতা বললো—সারাদিন শুয়ে থাকলেই চলবে?... ওদিকে বেরোতে দেরী হলে তো আমার মাথা খাবে। বিমলেন্দুর গায়ে একটা ধাক্কা মারলো সে। এ পাশ থেকে ও পাশ ফিরলো বিমলেন্দু—কোনো কথা বললো না। একটু দুষ্টুমি করবার ইচ্ছে হলো নমিতার। হাত বাড়িয়ে ওর গলার নীচে সুড়সুড়ি দিল কয়েকবার, আর হঠাৎ বালিশের ওপর সামান্য মাথা তুলে যেমনভাবে ভাইপো টুবলুকে ধমক দেয় মাঝে মাঝে, তেমনিভাবে চেঁচিয়ে উঠলো—আঃ! কী ইয়ারকি হচ্ছে তখন থেকে?...চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে নমিতা শুধু একবার বললো, তুমি আজ অফিসে যাবে না? প্রায় আর্তনাদের মতোই আর একবার চেঁচিয়ে উঠলো বিমলেন্দু—না, কোথাও যাবো না। কথা ভালো করে শেষ না করেই আবার বালিশে মাথা গুঁজে চাদরটা টেনে নিল সে। এবার কেমন যেন একটু ভয় করলো নমিতার, কী হলো তোমার? গায়ে হাত দিয়ে দেখলো—জ্বরটর কিছু হয়নি। তাহলে? মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো—শরীর খারাপ লাগছে? কোনো উত্তর দিল না বিমলেন্দু। চাদরটা টেনে নিয়ে ভালো করে ঝুঁকে দেখতে গেল নমিতা। মাঝে মাঝে ওর গায়ে অ্যালার্জির মতো কীসব বেরোয়, সে সব না তো? আর তখনই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বিমলেন্দু ধমকে উঠলো—এ ঘর থেকে যাবে? কেন জ্বালাতন করছো আমায়? কোনো কথা বলতে পারলো না নমিতা। তার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। বিমলেন্দু তার সঙ্গে কোনোদিন এরকম ব্যবহার করেনি, এভাবে তাকে অপমান করেনি। আর কথাটা মনে হতেই তার দুর্ভাবনা আরও বেড়ে গেল। সত্যিই কী ওর কিছু হয়েছে। কিছু ভেবে পাচ্ছিল না সে।

—পেনের কালিটা একটু দাও তো বৌদি, আমার কালি ফুরিয়ে গেছে; বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো বিমলেন্দুর ছোটো বোন সুজাতা, যাকে বাড়ির সবাই ঝুমু বলে ডাকে। আর খাটের পাশে নমিতাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে মেজবৌদি? মেজদা এখনো শুয়ে যে?...এতক্ষণ পরে কথা বলতে পেরে যেন অনেকটা সাহস ফিরে পেলো নমিতা। চাপা গলায় বললো—দ্যাখো না, তোমার মেজদার কী হয়েছে, সকাল থেকে বিছানাতেই পড়ে আছেন, চা পর্যন্ত খাননি, আমি ডাকতে গেলাম, আমায় তেড়ে এলেন একেবারে। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ভাই, এরকম তো কোনোদিন

তুমি সরো তো, আমি দেখছি, বলে হাসলো ঝুমু। তারপর বিমলেন্দুর খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই ওর চুলের মধ্যে হাত দিয়ে ডাকলো—কী হচ্ছে কী, মেজদা! ক'টা বাজে জানিস?

কোনো উত্তর দিল না বিমলেন্দু, চাদরে শরীর পেঁচিয়ে যেরকম শুয়ে ছিল, তেমনিই শুয়ে রইলো।

—ফের বৌদির পেছনে লেগেছিস?...... বলেই বিমলেন্দুর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলো সে, আর বিমলেন্দু উঠে বসে ঠাস্ করে ঝুমুর গালে এক চড় বসিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—দাদার সঙ্গে ফাজলামি করছিস? কথাটা বলেই আবার একটা বালিশ টেনে নিয়ে বাঁদিকে ঘুরে শুয়ে পড়লো। নমিতা আর ঝুমু দুজনেই দুজনার মুখের দিকে বোকার মতো একবার তাকালো। নমিতার ভয় নয়, দুঃখ নয়, রাগ নয়, অথচ কেমন যেন গলার কাছে একটা ব্যথা ঠেলে উঠতে চাইলো।—কেন এখানে দাঁড়িয়ে শুধু অপমানিত হচ্ছো, বলে হাত দিয়ে ঝুমুকে সরিয়ে দিল সে। ঝুমু একবার বৌদির মুখের দিকে, আর একবার খাটের দিকে তাকালো, কিছু বুঝতে পারছিল না সে। কী হলো মেজদার, এই সকাল থেকে? মেজদা তাকে সবচেয়ে ভালোবাসে, কোনোদিন তাকে শাসন করেনি, কিছু বলেনি, তার সব আব্দার এই মেজদার কাছে; ছুটিতে মধুপুর কী পুরী বেড়াতে যাওয়া, কলেজের পিকনিকের চাঁদা, সিনেমার খরচ, রেকর্ড কেনবার শখ, সবকিছুর জন্য এই মেজদা। মনে আছে, মেজদা যখন কলেজে পড়ে, তখন একবার টাইফয়েড হয়েছিলো ওর, সে দিনরাত মেজদার বিছানার পাশে, ঘুমোতে পারেনি, ভালো করে খেতে পারেনি, আর সুস্থ হয়ে বিমলেন্দু জিজ্ঞেস করেছিলো—ঝুমু, আমি মরে গেলে তুই কী করতিস?

—ধোৎ মরবি কেন? বলে হেসে ফেলেছিলো সে।

এখন সেই মেজদা তাকে শুধু ধমকালো না, বৌদির সামনেই তাকে বিশ্রী অপমান করলো, তার গায়ে হাত তুললো। কান্নার চেয়েও হঠাৎ মেজদার জন্য তার কীরকম কষ্ট হলো। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ক্রমশ কথাটা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো। নীচের ঘরে সুধাকান্তবাবু কাগজ পড়ছিলেন। ঝুমু গিয়ে প্রায় কেঁদে পড়লো বাবার কাছে—বাবা শিগ্‌গির ওপরে মেজদার ঘরে এসো, মেজদা যেন কীরকম করছে! চোখের সামনে এই সকালবেলায় ঝুমুকে এরকম হাঁপাতে দেখে বেশ অবাক হলেন সুধাকান্তবাবু। কী হয়েছে ঝন্টুর? এখনো অফিসে বেরোয় নি?

—আগে তুমি ওপরে এসো, সব বলছি। কিছু বুঝতে না পেরে, কাগজ হাতেই ওপরে উঠে এলেন তিনি।

একে একে সবাই শুনলো। সবাই এলো বিমলেন্দুর ঘরে। বিমলেন্দুর দাদা, নিখিলেন্দুর স্নান হয়ে গিয়েছিলো, খেতে যাচ্ছিলেন, শুনতে পেয়ে এলেন এই ঘরে। নমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঝুমু বলছিলো, কী হয়েছে ঝন্টুর?...

—কিছু তো বলছেন না, বুঝতেও পারছি না কিছু; কোনোরকমে জবাব দিল নমিতা। নিখিলেন্দু বিছানার কাছে এগিয়ে এলো, চাদরটায় একটা টান মেরে জিজ্ঞেস করলো—কী হয়েছে তোর? এতবেলা পর্যন্ত শুয়ে আছিস কেন?

—এমনি, খুব ঠান্ডা গলায় উত্তর দিল বিমলেন্দু।

—এমনি মানে? অফিস যাবি না?

—না, তোমরা যাও এঘর থেকে।

—কেন, অফিস যাবি না কেন? শরীর খারাপ হয়েছে?

—বলছি কিছু হয়নি, কেন ভীড় করছো এই ঘরে?...বিমলেন্দু কঠিন গলায় কথা বললো।

—এভাবে শুয়ে আছিস, অসুখবিসুখ কিছু হয়নি বলছিস, তবে কী হয়েছে তোর?

—আঃ! তোমরা গোলমাল থামাবে? বড়দার ওপর প্রায় খিঁচিয়ে উঠলো সে।

সমস্ত ঘরে একটা বিশ্রী আবহাওয়া যেন থম্‌থম্ করছে। ফেব্রুয়ারীর রোদে ঘর ভরে গেছে। নিমগাছের ডালে দুটো কাক একটানা ডেকে যাচ্ছে।

এক সময় নিখিলেন্দু বললো—নান্টু কোথায়? একবার এ ঘরে আসতে বলো নান্টুকে।

অনিলেন্দু ঘরে ছিল না, বাইরে বেরিয়েছিলো, বোধহয় সিগারেট খেতে। কারণ, বাড়িতে এক মেজোবৌদি ছাড়া আর কারো সামনেই সিগারেট খাওয়া চলে না খবর পেয়েই ছুটে এলো দোতলায়. ঘরে ঢুকে একসঙ্গে সকলকেই প্রশ্ন করলো—কী হয়েছে মেজদার?...

ঝুমুই উত্তর দিল—দ্যাখ্‌না ছোড়দা, সকাল থেকেই মেজদা কীরকম যেন করছে!

—হ্যাঁ, তুই একবার দ্যাখ তো নান্টু, নিখিলেন্দু বললো। সুধাকান্তবাবু একবার জিজ্ঞেস করলেন নমিতাকে—কাল কখন বাড়ি ফিরেছিলো ঋন্টু?...

—আটটার সময়। অফিসে কীসব ক্যারম না টেবলটেনিস খেলা ছিল, তাই ফিরতে একটু রাত হয়েছিলো, আস্তে আস্তে কথার উত্তর দিল নমিতা। নমিতাকে একপাশে ডেকে, নিখিলেন্দুর স্ত্রী শোভনা জিজ্ঞেস করলো—তোমার সঙ্গে রাতে কোনোরকম ঝগড়াটগড়া কিছু হয়নি তো?...

—না, ও তো খেয়েদেয়ে একটা বই পড়ছিল।

অনিলেন্দু বিছানার ওপর বসে বিমলেন্দুর বুক দেখলো, পিঠ দেখলো, আর আশ্চর্য! কোনো প্রতিবাদ করলো না বিমলেন্দু, চেঁচিয়ে উঠলো না. কেমন নির্জীবের মতো পড়ে রইলো। প্রেসার দেখার পর অনিলেন্দু বললো—সব তো দেখলাম, কোথাও কোনো কমপ্লেন নেই, প্রেসারও

তো নর্মাল, টেম্পারেচারও তো নেই দেখছি।

—তোর তাহলে কী মনে হয়? নিখিলেন্দু জানতে চাইলো।

—কিছু তো ঠিক বুঝতে পারছি না, শুধু চোখ দুটো একটু ঘোলাটে, তাছাড়া—একটু থেমে অনিলেন্দু বললো—একবার বড়মামাকে খবর দিলে ভালো হয়, এসে দেখে যাক একবার।

শোভনা নিখিলেন্দুকে বললো—তোমার তাহলে আজ আর অফিসে গিয়ে কাজ নেই, মামাবাবুকে একটা ফোন করে দাও, একবার দেখে যাওয়া ভালো।

নিখিলেন্দু ফোন করবার জন্য চলে গেল তার ঘরে। আর বেরিয়ে যাবার সময় চোখে পড়লো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মা চোখ মুছছেন, নিখিলেন্দুকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মন্টু, কী হয়েছে ঝন্টুর?

—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নান্টু তো দেখলো, দেখি বড়মামাকে একবার ফোন করে, সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি মিছেমিছি কান্নাকাটি করো না।

—আমার কাছে বিশ্বনাথের প্রসাদী ফুল আছে, তাই একবার ওর কপালে ছোঁয়াবো?...

—এখন থাক, বলে নিখিলেন্দু তার ঘরে চলে গেল।

সুধাকান্তবাবু বললেন শোভনাকে—একবার আমাদের হরিশ কবিরাজকে খবর দিলে হয় না? কোনো মালিশটালিশ যদি—শোভনা হ্যাঁ-না কোনো উত্তরই দিতে পারল না।

আর নমিতার মনে হচ্ছিল, সে যেন ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। আর সেই স্বপ্নের মধ্যে একজন তার হাত-পা বেঁধে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিচ্ছে নীচের অন্ধকার খাদে, আর চোখ মেলতেই দেখতে পেলো—আর কেউ নয়, বিমলেন্দুই পাগলের মতো হাসতে হাসতে তাকে নীচের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। মাথা ঘুরে উঠলো, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তার।

—পাখার স্পিডটা আর একটু বাড়িয়ে দে তো ঝুমু, আর এখানে ভীড় করে কাজ নেই, কিছুক্ষণ একলা বিশ্রাম করা দরকার মেজদার, কথা শেষ করে অনিলেন্দু হাতে সরঞ্জাম তুলে নিয়ে বাইরে চলে এলো। নমিতা ছাড়া সবাই অনিলেন্দুর কথামতো ঘর ছেড়ে চলে এলো।

আধ ঘন্টার মধ্যেই নীচে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। ঝুমু বললো, বড়মামা এসে গেছেন। ঘরের মধ্যে আবার ভীড় জমে উঠলো, শুধু বড়মামাই নয়, খবর পেয়ে ঢাকুরিয়া থেকে ছোটোমাসি এসেছেন, কবীর রোড থেকে পিসীমা, পিসেমশাই।

বড়মামা এসে বিমলেন্দুর পালসটা শুধু একবার দেখলেন, তারপর অনিলেন্দুকে প্রশ্ন করলেন—তুমি তো সব দেখেছো?

—হ্যাঁ, হার্ট, লাঙস্, প্রেসার সব, অনিলেন্দু জবাব দিল।

—এনি অ্যাবনরম্যালিটি?...

—কিছু তো তেমন দেখছি না, আপনি বরং একবার—

—কিছু দরকার নেই, তারপর বিমলেন্দুকেই প্রশ্ন করলেন—কী কষ্ট হচ্ছে তোমার? কোনোরকম যন্ত্রণা?

—না, বিমলেন্দু আগের মতই উত্তর দিল।

—ভয়টয় করছে?

—কিছু না, বিমলেন্দুর শুকনো জবাব। তারপর আবার সে পাশ ফিরলো।

বড়মামা নমিতাকে কাছে ডাকলেন। কাল রাত থেকে কোনোরকম কিছু অস্বাভাবিক লক্ষ্য করেছো ঝন্টুর মধ্যে?

—কিছু না তো, কাল বাড়িতে এসে ইংরেজী খবর শুনে, খেয়েদেয়ে একটা বই নিয়ে পড়ছিল, নমিতা টেবিল থেকে বইটা তুলে দেখালো।

—খেয়েছিল ঠিকমতো?

—হ্যাঁ, অন্যদিনের মতই, এবার কথার জবাব দিল শোভনা।

—বেশি কথাটথা বলেছে?

—কথা তো ঝন্টু এমনিতেই একটু বেশি বলে, নিখিলেন্দু বড়মামার কথার উত্তর দেয়।

—রাত্তিরে ভালো ঘুমটুম হয়েছিলো?

—মনে তো হয়, নমিতা বললো, শুধু মাঝরাত্তিরে টের পেয়েছিলাম, একবার উঠে জল খেয়েছিলো আর আমাকে বলেছিলো—বেশ গরম লাগছে, পাখাটা খুলে দাও।

আর কোনো প্রশ্ন করলেন না তিনি। বাইরে এসে বললেন—ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে যতদূর মনে হয়, নার্ভ-টেনশান, একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, দেখা যাক কী হয়।

মাসীমা বললেন—একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, মানে মাথায় যদি...

—এখন কিছু দরকার নেই, ওসব পরে দেখা যাবে।

—কী খেতে দেবো? শোভনা জানতে চাইলো।

—যা খেতে চাইবে সব। আর ওর ওপর এখন কেউ যেন কোনো জোর না করে। স্নান যদি না করতে চায়, কিছু দরকার নেই, আর দেখবে, বইটই যেন একদম না পড়ে। তারপর নমিতাকে বললেন—যদি দ্যাখো, তোমাকে দেখে বেশি একসাইটেড হচ্ছে, তাহলে খুব একটা কাছেটাছে যেও না, যদি সময় করতে পারি, তবে বিকেলের দিকে একবার আসবো।

ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে যাবার পর বিমলেন্দু চোখ খুললো। চারপাশে তাকালো। সব চোখে পড়ছে, পরিষ্কার দেয়াল, দেয়ালের ওপর র‍্যাকেট হাতে তার নিজের ফোটো। আর একদিকে একটা ক্যালেন্ডার, ক্যালেন্ডারের ছবিতে একটি সাঁওতাল যুবতী কোলে ছেলে নিয়ে হাসছে। আবার ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। সকলের মুখের দিকে এবার সোজা তাকালো বিমলেন্দু। হঠাৎ তার খুব হাসি পেলো। বুঝতে পারলো সবাই খুব ভয় পেয়েছে, সে যেন একটা দারুণ মজার নাটক দেখছে। সকলের চোখের দৃষ্টি কী করুণ! যেন আসন্ন সর্বনাশের দুশ্চিন্তায় সবাই ভেঙে পড়েছে। নমিতা যেন তার দিকে তাকাতে পারছে না। কী ছেলেমানুষ নমিতা! একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে টুবলু তাকে দেখছে, কোনোরকমে হাসি চেপে রাখলো বিমলেন্দু, একবার ইচ্ছে হলো ঝুমুকে জিজ্ঞেস করে—রেডিও খুলেছিস? ইন্ডিয়ার কটা উইকেট পড়লো?...কিন্তু কিছু না বলে আবার চোখ বুজলো সে।

ঘর ফাঁকা হতে দরজার পর্দাটা ভালো করে টেনে দিয়ে নমিতা বিছানার ওপর এসে বসলো। বিমলেন্দুর বুকের ওপর হাত রেখে একবার শেষ চেষ্টা করলো নমিতা।

—তোমার কী হয়েছে, বলবে না?... নমিতার গলা যেন ভিজে উঠেছে।

—কিছু হয়নি আমার, শান্ত গলায় উত্তর দিল বিমলেন্দু।

—অফিসে কোন গোলমাল হয়েছে?

—না, বিমলেন্দুর ছোটো উত্তর।

—কেউ তোমাকে অপমান করেছে?

—না...

—সেই মীরা দত্ত বলে মেয়েটা আবার জ্বালাতন শুরু করেছে?......

—সেসব কিছু নয়, বলে বিমলেন্দু হাসলো।

—তাহলে এরকম করছো কেন? নমিতা ঠোঁট চেপে ধরলো।

আর হঠাৎ নমিতাকে অবাক করে দিয়ে বিমলেন্দু বিছানায় উঠে বসলো, খুব স্বাভাবিক গলায় বললো—আচ্ছা, তোমরা সকাল থেকে কী আরম্ভ করেছো বলো তো? এমনি মানুষ শুয়ে থাকে না? তারপর নমিতার একটা হাত তুলে নিয়ে বললো—আজ কোথাও বেড়াতে যাবে নমিতা?...

নমিতা বোকার মতো একবার বিমলেন্দুর মুখের দিকে তাকালো; তারপর থেমে থেমে বললো—তুমি শুয়ে পড়, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, আমি আসছি। উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল নমিতা।

আর নমিতা চলে যেতেই বিমলেন্দু বিছানা থেকে নেমে এলো। টেবিল থেকে তুলে ঘড়িটা দেখলো একবার, প্রায়

এগারোটা। একবার শিস্ দিয়ে উঠলো সে। ফেব্রুয়ারীর সামান্য উত্তপ্ত হাওয়া এখন তার খুব ভালো লাগছিলো। বিমলেন্দু টের পেল—এখন তার কিছু একটা করা দরকার। যেন তার রক্তের মধ্যে একটা দুরন্ত ইচ্ছে অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে এখন। ইচ্ছে হলো—খাটটাকে ঠেলে দেয়, ঘুষি মেরে ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা ভেঙে ফেলে, টুবলুকে ডেকে এনে ওর বল নিয়ে অনেকক্ষণ লোফালুফি করে। তার মানে এখন আমার যা খুশী করতে পারি; হাসতে পারি, চীৎকার করে গান করতে পারি, আমার সময় আমি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারি।

—আঃ বলে একটা শব্দ করলো বিমলেন্দু।

আজ দাড়ি কামানো নেই, ঠিক আটটায় স্নান করতে যাওয়া নেই, অফিস নেই, ফাইল নেই, বাজে সময় নষ্ট না করে রিপোর্টটা আজই শেষ করে দিন, বলে জুনিয়ারদের ধমকানো নেই, ওপরওয়ালা দেখলে কেসে সিগারেট বাড়িয়ে দেওয়া নেই, আর সন্ধ্যার পর ফিরে এলে পুজোর ঘর থেকে মার ঘণ্টার শব্দ, অন্ধকারে ইজি-চেয়ারে বাবার শুয়ে থাকা, টুবলুর পড়ার শব্দ, বড়দার কাগজপড়া, ঝুমুর রেকর্ড-বাজানো, নমিতার সাংসারিক চেহারা—এসব কিছু নেই, কিছু নেই। যেন এই মুহূর্ত থেকে অন্যরকম একটা কিছু শুরু হচ্ছে: তার ভেতরে। তার বাইরে। ছোটবেলার কোনো পুরনো বন্ধুর নাম ধরে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করলো বিমলেন্দুর। আর তখনই সে ঠিক করে নিল এবার তাকে বেরোতে হবে।

আজ অনেকক্ষণ ধরে সে একা পথ হাঁটবে, গাড়ির শব্দ শুনবে, ট্রাম-বাসের ক্লান্ত মুখগুলি দেখবে। কেউ পয়সা চাইলে তাকে ধমকাবে না, তারপর মধ্য ফেব্রুয়ারীর দুপুরে, যখন কার্জন পার্কে শুকনো পাতা ঝরছে, চারদিকে অসংখ্য ফুল এমন ইচ্ছে করলো একটা পাথরের বেদীতে শুয়ে থাকবে। তারপর হয়তো কোনো পুরনো বন্ধুকে খুঁজে বার করে জড়িয়ে ধরে বলবে—এতদিন আমাকে না দেখে তুই বেঁচে আছিস কী করে?

ভাবনাটা আবার ঘুরপাক খেয়ে গেল।

ভাবল সে, আজ ইচ্ছে করলে নান্টুর সঙ্গে মার্বেল নিয়ে ঝগড়া করতে পারি, মার সঙ্গে বসে ভাত খেতে পারি। তার মানে, আমি সব পারি। যা খুশি... যা ইচ্ছে...।

রমেন এখন কোথায় আছে? জামশেদপুরে?

—অশোক তো মারা গেছে।

আর পাড়ার সেই রোগাটে মেয়েটা? যে তাকে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় চিঠি দিয়েছিলো—'তোমাকে না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিব।'

ইয়া! বলে হাততালি দিয়ে ঘরের মধ্যে একটা ঘুরপাক খেয়ে নিল বিমলেন্দু।

আর সেই সময় আবার সবাই ফিরে এলো ঘরে। সে কিছু বোঝবার আগেই বড়দা একরকম জোর করে আবার তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। দেখতে পেলো—নমিতা কাঁদছে। আর বৌদি, মা, বাবা, ঝুমু সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কোনো কথা বলতে পারলো না, কোনো প্রতিবাদ করতে পারলো না সে।

—ওষুধটা খেয়ে নাও ঠাকুরপো; বৌদি এগিয়ে এলো তার কাছে।

আর সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারলো—সে কিছু করতে পারে না, তার হাত নেই, পা নেই, তার কোনো ক্ষমতা নেই। কোনো ইচ্ছে নেই। শুধু জলের মতো ঢালু জমিতে গড়িয়ে যাওয়া ছাড়া তার কোনো উপায় নেই।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো—টেবিলের কাছ থেকে একটা রোদের বৃত্ত ক্রমশ বিছানার ওপর উঠে আসছে, যেন ওই বৃত্তটা ক্রমশ তাকে জড়িয়ে ফেলছে, আর সে কিছুতেই বাইরের পথটা খুঁজে পাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজে ফেললো বিমলেন্দু।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখের কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যাবেলায় নয়াদিল্লীতে একটি পার্টিতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা হল তখনকার দিনের গণ-পরিষদের সেক্রেটারি শ্রীএইচ ভি আর আয়েঙ্গারের। প্রধানমন্ত্রী নেহরু শ্রীআয়েঙ্গারকে এক পাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে রাজী আছেন কিনা। শ্রীআয়েঙ্গার জবাব দিলেন, তিনি এই পদ গ্রহণে নিজেকে সম্মানিত বোধ করবেন; কিন্তু যেহেতু তিনি গণ-পরিষদের সেক্রেটারি হিসাবে পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অধীন সেহেতু এই বিষয়ে সভাপতির অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'সেটা আপনার ও তাঁর মধ্যকার ব্যাপার।' প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শ্রীআয়েঙ্গার পরের দিন ভোরবেলাতেই দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবে সফর করতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে। পরে শ্রীআয়েঙ্গার যখন গণ-পরিষদের সভাপতির অনুমতি চাইতে যান তখন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে বলেন, 'আমার দিক থেকে আপনি এখনও গণ-পরিষদের সেক্রেটারি আছেন।'

আর একটি ঘটনার কথা লিখেছেন শ্রীআয়েঙ্গার। তিনি তখন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁকে নির্দেশ দিলেন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর অভিষেকের উপলক্ষে কি ধরনের অনুষ্ঠান চান তা জেনে আসার জন্য।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত ব্যবধানের সৃষ্টি করেছিল সেটা বোঝাবার জন্য শ্রীআয়েঙ্গার 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে উপরের ঐ দুটি ঘটনা বিবৃত করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে ঐ দুটি ভিন্নপ্রকৃতির মানুষ আমাদের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের সূচনালগ্নে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কে যে নজীর রেখে গেছেন সেটা রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর হয় নি। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধি কতদূর বিস্তৃত, রাষ্ট্রপতি কি সব অবস্থাতে সব সময়েই মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য, অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা তাঁর আছে, এসব প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবশ্য তাঁর কার্যকালের মধ্যে একবার এই প্রশ্নগুলি তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারত সরকার যখন হিন্দু কোড বিল রচনা করছিলেন তখন তিনি সেই বিলের বিরোধিতা করে নিজের ক্ষমতা যাচাই করার চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শও করেছিলেন। কিন্তু বিতর্কটি যে কোন কারণেই হোক, আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নি।

প্রধানমন্ত্রী বনাম রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার এক্তিয়ারের প্রশ্নটি আবার নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে দেখা দিয়েছে। ডাঃ জাকির হোসেনের স্থলে নতুন একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। ঐ পদে কে যাবেন তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যিনিই যান না কেন, তাঁর সামনে গুরু দায়িত্ব রয়েছে। এই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কাজ করতে হবে। তার মধ্যে পার্লামেন্টের নির্বাচন হয়ে যাবে। এবার লোকসভার নির্বাচনে যদি কোন একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করতে পারে (যার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রয়েছে) তাহলে নতুন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার এক্তিয়ার নির্দিষ্ট করা না থাকলে অথবা নিজের অধিকার প্রয়োগ করার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ রাষ্ট্রপতির আসনে না থাকলে সেই সময়ে অসুবিধা হতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের ৫৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি সরাসরি অথবা তাঁর অধস্তন পদাধিকারীদের মারফৎ সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ৭৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কর্তব্য পালনে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রিমন্ডলী থাকবে—যার প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী। ৭৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির যতদিন অভিরুচি ততদিন—মন্ত্রিসভা বহাল থাকবেন। ৬১ নম্বর অনুচ্ছেদের দ্বারা সংবিধান ভঙ্গের দায়ে পার্লামেন্টে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ব্যবস্থা আছে এবং ৮৬ নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্টে বাণী পাঠাবার বিধান রয়েছে। তাছাড়া, রাষ্ট্রপতি হলেন পদাধিকার বলে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক, পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করার ও বন্ধ করার ক্ষমতা তাঁর। লোকসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর।

এইগুলি হচ্ছে সংবিধানের লিখিত বিধি-নিয়ম। কিন্তু পৃথিবীর কোন সংবিধানেই সমস্ত শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের শেষ কথা লেখা থাকে না। সংবিধানের লিখিত নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা থেকেই গড়ে ওঠে রেওয়াজ এবং কালক্রমে রেওয়াজগুলি মূলে সংবিধানের ব্যবস্থাসমূহের প্রায় সমান মর্যাদা পায়। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে এ যাবৎ যে রেওয়াজ গড়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রপতি নিছক একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান মাত্র। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে ঢেঁড়া সই দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ নেই। কংগ্রেস এখনও সেই রেওয়াজ বজায় রাখতে চায়। ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীপনমপিল্লি গোবিন্দ মেনন এই সেদিন বেতারে একটি আলোচনায় বলেছেন যে, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করার কোন অবসরই নেই। কংগ্রেসের দিক থেকে এই নীতি গ্রহণ করার একটি বাস্তববুদ্ধিসম্মত কারণ আছে। রাষ্ট্রপতিকে যদি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য করা যায় তাহলে ১৯৭২ সালে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে কংগ্রেসের ক্ষমতা বজায় রাখার সুযোগ পাওয়া যাবে। ঐ একই কারণে দিল্লীর কংগ্রেস মহলের একাংশ চাইছেন, রাষ্ট্রপতির পদে দলেরই একজন কাউকে বসান হোক।

আর ঠিক এরই বিপরীত কারণে কোন কোন বিরোধী দল চাইছেন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার এক্তিয়ার ঠিক করে দেওয়া হোক। যেমন, শ্রীমধু লিমায়ে প্রস্তাব করেছেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগেই লোকসভা ও রাজ্যসভার একটি যুক্ত প্রস্তাবের দ্বারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কর্তব্যের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক। শ্রীলিমায়ে বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে দুটি ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করতে হতে পারে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কোন একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করতে পারলে রাষ্ট্রপতি কাকে সরকার গঠন করতে আমন্ত্রণ জানাবেন? দ্বিতীয়ত, লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার উপক্রম দেখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যদি রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দেন তাহলে রাষ্ট্রপতি কি সেই পরামর্শ মেনে নেবেন?

এই সব প্রশ্ন এখন ভারতবর্ষের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কাজটিকে জটিল করে তুলেছে।

একটি বইয়ের জন্য

'টোকিও হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কদর্য ও সবচেয়ে বিশৃঙ্খল রাজধানী শহরগুলির অন্যতম।'

'পিগমি আর হটেনটটদের বাদ দিলে জাপানীরাই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত মানুষ।'

'(জাপানের) উপর মহলে স্পষ্টই নেতৃত্বের অভাব রয়েছে, জাতির স্বার্থে কোনটা সবচেয়ে ভাল তার কোন উপলব্ধি

কথা কও! কথা কও!
কেন শুধু চেয়ে রও?

© ৬.৬.৬৯
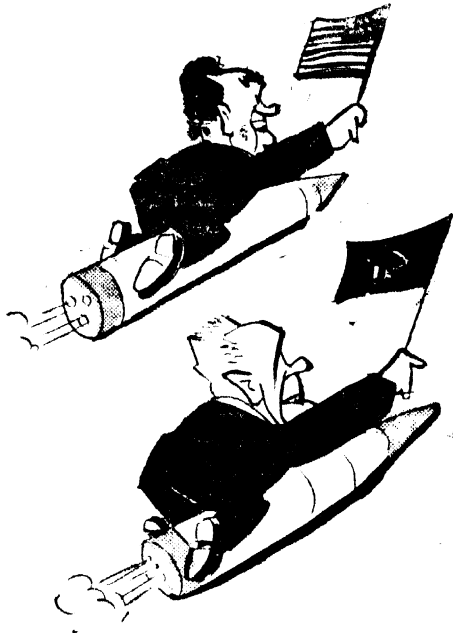
নেই, নৈতিক সাহস ও শৃঙ্খলার ঘাটতি রয়েছে।'

এশিয়ার সবচেয়ে অগ্রসর, সবচেয়ে উন্নতিশীল পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোরও ঈর্ষার পাত্র জাপান সম্পর্কে এই সব কটূক্তি মন্তব্য যিনি করেছেন তিনি নিজে একজন জাপানী। এবং তাও যে সে ব্যক্তি নন, সে দেশের একজন রাষ্ট্রদূত। নাম ইচিরো কাওয়াসাকি। বয়স ৫৯ বছর— যার মধ্যে ৩৭ বছরই কেটেছে বিদেশে জাপানের প্রতিনিধিত্ব করে।

ইচিরো কাওয়াসাকি অবশ্য এখন আর রাষ্ট্রদূত নেই। চাকরীটি তিনি খুইয়েছেন— এবং খুইয়েছেন একটি বই লেখার দরুন। বইয়ের নাম 'জাপান আনমাসকড' অর্থাৎ 'মুখোশ-খোলা জাপান।' উপরে যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলি ঐ বই থেকেই নেওয়া।

কাওয়াসাকির এই বই যখন বেরোয় তখন তিনি আর্জেন্টিনায় তাঁর দেশের রাষ্ট্রদূত। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিচি আইচির কাছে এই বই পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গেই কাওয়াসাকির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। কাওয়াসাকি অবশ্য তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'আমি একথা যোগ করতে চাই যে, এই বইয়ে যেসব মত প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলি শুধু গ্রন্থকারেরই মত, পররাষ্ট্রবিভাগের অভিমত অথবা আমি যে সরকারে আছি তাঁদের অভিমত কোনভাবেই এই প্রতিফলিত হয় নি।' কিন্তু এই কৈফিয়ং দিয়েও তিনি রক্ষা পান নি।

এই প্রথম কর্মরত একজন জাপানী রাষ্ট্রদূতকে বরখাস্ত করা হল। একজন রাষ্ট্রদূতকে বই লিখে চাকরি খোয়াতে হল, আন্তর্জাতিক কূটনীতির ইতিহাসে এও এক অভিনব ঘটনা।

এর আগে ১৯৫৫ সালে ইচিরো কাওয়াসাকির আর একখানি এই ধরনেরই বই বেরিয়েছিল। সেই বইয়ের নাম ছিল 'দি জাপানীজ আর লাইক দ্যাট' অর্থাৎ 'জাপানীরা এই রকমেরই মানুষ'। সেবার কিন্তু পররাষ্ট্র বিভাগের নেকনজর তার উপর পড়ে নি। জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, বছরখানেক ধরে ঐ দপ্তরের বিরুদ্ধে সমালোচনা চলছিল এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূর করে দপ্তর পুনর্গঠন করার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়েই এই বই প্রকাশিত হওয়ায় পররাষ্ট্র দপ্তর বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন।

ইচিরো কাওয়াসাকি তাঁর বইয়ে রেখে-ঢেকে কথা বলেন নি। তিনি জাপানীদের ভাবলেশহীন মুখ ও ছোট ছোট পা থেকে আরম্ভ করে জাপানী রাজনৈতিক দলগুলির পরগাছাবৃত্তির কথা লিখেছেন।

কথাগুলি যদি বা সত্যিই হয় রাষ্ট্রদূত কাওয়াসাকি এমন অপ্রিয় সত্য বলতে গেলেন কেন? গত ২১ মে বুয়েনস আয়ার্স থেকে টোকিওতে ফিরে এসে কাওয়াসাকি সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, বহু বিদেশীর জাপান সম্পর্কে ধারণা একপেশে বলেই তিনি তাঁর বইয়ে জাপানীদের সম্পর্কে একটি সঠিক চিত্র দিতে চেয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা করা হয়েছে ভুল ধারণার উপর এবং তাঁর বইয়ের কতকগুলি তুচ্ছ খুঁটিনাটির উপর ভিত্তি করে। তিনি মনে করেন যে, আজকের দিনের উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থার মধ্যে সারা পৃথিবীতে শুধুমাত্র জাপানের গুণকীর্তন করা অসঙ্গত।

যাঁদের ধারণা, রাষ্ট্রদূতকে পয়সা দিয়ে পোষা হয় নিজের দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে কায়দা করে মিথ্যা কথা বলার জন্য তাঁদের ধারণা অনুযায়ী কাওয়াসাকি নিশ্চয়ই আদর্শ কূটনীতিবিদ নন। কিন্তু সারা পৃথিবীতেই কূটনীতি ও কূটনীতি-বিদদের চেহারা পালটাচ্ছে। রাষ্ট্রদূত ইচিরো কাওয়াসাকির দৃষ্টান্ত যদি সংক্রামিত হয় তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আমরা আরও চমকপ্রদ আত্মসমালোচনা শুনতে পাব।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের জনপ্রিয়তাও নেই, আর্থিক সম্পত্তিও বাড়ন্ত। সখেদে এই মন্তব্য করেছেন রাজ্য কংগ্রেসের এক বিশিষ্ট নেতা। প্রসঙ্গ—চৌরঙ্গী থেকে কংগ্রেস দপ্তর স্থানান্তর। আলোঝলমল চৌরঙ্গী থেকে ঝমকালো কংগ্রেস কার্যালয় কোন সাধারণ গৃহে প্রতিষ্ঠিত হলে অনেকেরই ধারণা দল পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার খানিকটা সুরাহা হবে, আর জনমনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হবে। বর্তমান কংগ্রেস অফিস ভাড়া দিলে যে বিপুল অর্থ আসার সম্ভাবনা আছে—তাতে কয়েকজন সর্বক্ষণ-কর্মীর ভাতার ব্যবস্থাও করা যাবে। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটি দপ্তরকে ভাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তাবও নাকি উঠেছে।

চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে প্রায় ৪০ জন কর্মচারী আছেন। তাঁদের অনেককে 'ছাঁটাই' করার কথাও উঠেছে। কংগ্রেসের ২০খানা গাড়ীর মধ্যে মাত্র দুটি চালু রাখা হয়েছে। বাকীগুলো গ্যারেজজাত। আর 'বাদশাহী' কায়দায় অফিস চালানোর ফলে রাহাখরচ নাকি এত বেড়ে গিয়েছে যা 'কোন জনগণের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে' তা বহন করা একান্তভাবে অসম্ভব। আয়ের দিক থেকে চিন্তা করলে কংগ্রেস বন্ধুদের দান ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে উৎসাহব্যঞ্জক আয় হয় না। কংগ্রেসের সদস্য-ফি বাবদ যে অর্থ আসে তাও ব্যয়ের তুলনায় নিতান্ত সামান্য, আর কংগ্রেসী আইন সভার সদস্যদের উপর কিভাবে লেভি ধার্য হয়, কিম্বা ধার্য হলেও তা নিয়মিত কংগ্রেস ভান্ডারে জমা পড়ে কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে। যাহোক, রাজ্য কংগ্রেস যে আর্থিক দিক থেকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে এটা সত্য। ক্ষমতাহীন হওয়ার ফলে দাতা বন্ধুর সংখ্যাও যে অনেক কমে গেছে সেকথা বর্তমান রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বও স্বীকার করছেন।

অন্যদিকে কংগ্রেস ভবন ভাড়া দেওয়া যাবে কিনা সেই সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবন একটা ট্রাস্ট সম্পত্তি। সেই ট্রাস্টের অছিরা যদি সম্মত না হন তবে বর্তমান প্রাদেশিক নেতৃত্বের কংগ্রেস ভবন ভাড়া দেওয়ার কোন অধিকার থাকবে না। আর এই অছিগণ হচ্ছেন, 'জনসেবক' নামক দৈনিক খবরের কাগজের ট্রাস্টি। কাজেই কংগ্রেস ভবন সেই জনসেবক ট্রাস্টের সম্পত্তি। দেখা যাচ্ছে, যাঁরা জনসেবকের মালিক তাঁরাই আবার কংগ্রেস ভবনের মালিক। অছিগণের নাম যতদূর অদ্যাবধি আলোকে এসেছে—সর্বশ্রী অতুল্য ঘোষ, বিজয়ানন্দ চ্যাটার্জি, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, নির্মলেন্দু দে (বদুবাবু) এবং বিজয় সিংহ নাহার। একমাত্র শ্রীনাহার ছাড়া আর অন্য সকলেরই—কংগ্রেসীরা বলেন—"এক মত এক পথ।" শ্রীনাহার 'তরুণ তুর্কীদের' একজন। তিনি কংগ্রেসের 'গোষ্ঠীচক্র' পর্যুদস্ত করার ব্যাপারে একজন অগ্রণী সেনানী বলে পরিচিত। কাজেই খুব সহজে প্রশ্নটা সমাধান হবে বলে অনেকেই মনে করেন না। আবার কিছু সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী মনে করেন কংগ্রেস ভবন ছেড়ে দিলেই মুস্কিল আসান হবে এমন চিন্তা করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাতে জনপ্রিয়তাও বাড়বে না, বিরাট রকমের আর্থিক সংকুলানও হবে না। এটা, সস্তায় কিস্তিমাৎ করার একটা অপচেষ্টা মাত্র। আবার তাঁরা হুল ফুটিয়ে বলেন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ পরিহার করার মত এও একটা কৃচ্ছ্রসাধন মাত্র। আখেরে এতে খরচ করা জনপ্রিয়তা বাড়ার সম্ভাবনা দূরে অস্তু।

এই আর্থিক প্রসঙ্গের প্রশ্ন উঠেছে কংগ্রেসে পুনঃ প্রাণসঞ্চারের প্রেরণা থেকে। নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে রাজ্য কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের বহু পূর্ব থেকে এক শ্রেণীর কংগ্রেস কর্মী দলের অভ্যন্তরে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। বস্তুতপক্ষে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু কার্যকর ব্যবস্থা সেদিন অবধি কিছুই করা যায় নি। অবশেষে যা হল তাকেও কিছু বৈপ্লবিক সাংগঠনিক পরিবর্তন বলা চলে না। 'মন্দের ভাল' বলে অনেকেই বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে জনতার মধ্যে আবার কিছু কিছু কাজ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ঘটনার পরিণতি দেখে মনে হয়, যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব কংগ্রেসকে ক্রমশঃই দুর্বল করে তুলেছে তা অদ্যাবধি পুরোমাত্রায় বজায় আছে। নতুন নেতৃত্ব সেই ঘুণেধরা সংগঠনের উপর একটু চুনকাম মাত্র।

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাই তাঁরা ডঃ জি এস মালকোটের নেতৃত্বে একটি তিনজন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি নিয়োগ করে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। কোলকাতায় দুদিনের সফরে এসে ডঃ মালকোট বলেছেন, তিনি শুধু কারণ নির্ণয় করে ক্ষান্ত থাকবেন না। সংগঠনের উন্নতির জন্যে কিছু কিছু পরামর্শও তাঁর প্রতিবেদনে সংযোজিত করবেন। আর এই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা তাঁকে নির্দেশও দিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই ডঃ মালকোট ৩০০ চিঠি পেয়েছেন। এই সমস্ত লিপি নাকি পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কংগ্রেস কর্মী ও দলের শুভানুধ্যায়ীরা লিখেছেন, আর তাতে রয়েছে—বিপর্যয়ের কারণ, নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আর ভবিষ্যতের কর্মপন্থার রূপরেখা কি করে কংগ্রেসকে গণমনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তার কথা।

অনুসন্ধানের প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলো শেষ করে কোলকাতা ছাড়ার আগে ডঃ মালকোট সাংবাদিকদের বলেছেন—তিনি শুধু কংগ্রেস কর্মীদের সাক্ষী নেবেন এমন নয়, যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এমন কোন ব্যক্তি বা সংগঠন যদি এগিয়ে এসে বক্তব্য রাখেন তাও সাদরে লিপিবদ্ধ করা হবে। যাহোক, ডঃ মালকোটের বক্তব্যের পূর্বাভাষ থেকে বোঝা যায়, ক্ষমতা পুনর্দখলের জন্য কংগ্রেস সংগঠনকে কিভাবে সুসংবদ্ধ করা যায় তাও তাঁর প্রতিবেদনে বিশেষভাবে স্থান পাবে।

কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, আরও একটি রাজ্যে এমনই একটি কমিশন পাঠিয়েছেন, এবং প্রায় সকল রাজ্যেই, যেখানে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, সেখানেই সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে অনেক পরিকল্পনা করছেন। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যে অসম চিন্তার আবির্ভাব হয়েছে তার দিকে কে নজর দেবে

সেই চিন্তা কেউ করছেন বলে মনে হয় না। অধিকন্তু এই বৈপরীত্যের ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও দুর্বল হচ্ছে, আর ক্ষমতা স্বাধিকারে রাখবার জন্য যে নেপথ্য লড়াই চলছে তার সমাধানের সূত্রও এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। তাই, প্রায়ই অমুক মাসের অত তারিখের মধ্যেই ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায়। অথচ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কারও মুখ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদধ্বনি উচ্চারিত হয় না। ফলত, এ ধারণা জন্মায় যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। কাজেই স্ব স্ব ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য নেতারা ব্যস্ত ও বিব্রত। অতএব, সামগ্রিকভাবে সংগঠনের কি ক্ষতি হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করার ফুরসৎ কারও নেই।

কাজেই সমগ্র দেশে কংগ্রেস সংগঠন যখন এমন বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়েছে সেখানে একটি বা দুটি রাজ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণ নির্ণয় করে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। আর পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পরাজয়ের কারণ উল্লেখ করে যে সমস্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে তাতে জানা যায় বেশীর ভাগ পত্রকার নেতৃত্বকেই দায়ী করেছেন। অবশ্য রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে এই অভিযোগ দিল্লীকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

ভোটের সংখ্যাতথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কংগ্রেস ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় যে অবস্থায় ছিল বর্তমানেও ঠিক প্রায় সেই অবস্থায় রয়েছে। শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভোটের সংখ্যা কিছু বেড়েছে মাত্র। পরিষ্কার করে বললে কথাটা এই দাঁড়ায় যে এই উপমহাদেশে সাধারণ নির্বাচন যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই কংগ্রেস সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোট পেয়ে রাজ্য শাসন করছিল। বিরুদ্ধবাদীরা এর আগে নির্বাচনে একজোট না হতে পারার ফলেই কংগ্রেস গদীতে আসীন হতে পেরেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে বিরোধীপক্ষ জোট বেঁধেছে তখনি কংগ্রেসের আসল রূপ ধরা পড়েছে। এই রূপ জানবার জন্যে বিশেষ কোন সমীক্ষারই দরকার করে না। যে জন্যে সমীক্ষার দরকার সেটা হচ্ছে ১৯৫২ সাল থেকে কংগ্রেসের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও আরও জনতাকে কংগ্রেসে আনবার জন্য দলীয় ও সরকারী নেতৃত্ব কি করেছেন? করলেও তার ভুলত্রুটি কোথায়? সেই সম্পর্কেই চুলচেরা হিসাবনিকাশ করার দিন এসেছে। এককথায় বলতে গেলে কংগ্রেসের আদর্শের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। বাস্তব অবস্থার, তা কি অর্থনৈতিক কি সমাজনৈতিক জীবনের, মূল্যায়ণ করে যদি মানবজীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে কংগ্রেস অনুসৃত আদর্শের নিবিড় যোগসূত্র না স্থাপন করা যায় তবে হাজার মহাত্মাজী স্বর্গ থেকে নেমে এলেও কংগ্রেসকে বাঁচানো যাবে না। ইতিহাসের ছকবাঁধা পথেই কংগ্রেস কবরের দিকে এগিয়ে যাবে। এর ব্যতিক্রম ঘটবার যো নেই।

কংগ্রেস নেতারা মাঝেমাঝেই বলেছেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁদের আদর্শের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক একটা নির্বাচনের মুখেই এক একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছে। তারপর পাঁচ বছর কংগ্রেস রাজত্ব চলেছে সেই পরিকল্পনাকে রূপায়ণের মাধ্যমে। কিন্তু কোন বারেই ভোটের বিশেষ ব্যবধান ঘটেনি। অর্থাৎ পরিকল্পনা কার্যকর করার পরও গণমন বিপুলভাবে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হয়নি। জনতার আস্থার মাত্রা কংগ্রেসের উপর বাড়েনি। এই নির্মম সত্যকে উপলব্ধি না করে কৌশলে গদীতে থাকার চেষ্টা কংগ্রেসীরা এতদিন করেছিলেন, তার মাশুল এখন তাঁরা দিতে শুরু করেছেন।

অবশ্য কংগ্রেসীরা যে অবস্থাটা ভালো করে উপলব্ধি করতেন না এমন নয়, তাই তাঁরা কখনও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়বার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, এবং পরে আরও প্রগতিশীলতার ঝোঁক দেখিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের শ্লোগান দিয়েছেন। কিন্তু আদর্শ ও তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত, আর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে ভিন্নমুখী ছিল, এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, একথা কেউ ভাববারও চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না।

সুদীর্ঘ বিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কংগ্রেস সংগঠন ও সরকার একাকার হয়ে গিয়েছিল। সরকার ও সংগঠনের যে আলাদা ভূমিকা আছে কোন কংগ্রেসীই; তিনি কর্মী হন আর নেতাই হন, সেটা ভেবে দেখবার অবকাশ পর্যন্ত পাননি। অন্যদিকে ইংরেজসৃষ্ট ব্যুরোক্রেসির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে সমস্ত সংগঠন পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। ব্যুরোক্রেসিকে এত বিশ্বাস যা কংগ্রেস মন্ত্রী ও কর্মীরা এই দীর্ঘ বিশ বৎসর করে এসেছেন তা বোধহয় ইংরেজরাও করেনি। ফলে যেটুকু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বা প্রগতিশীল আইন কংগ্রেসীরা প্রণয়ন করেছিলেন তার শতাংশের একাংশও কার্যকর হয়নি। আর সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস দলের সতর্ক প্রহরীরূপে যে ভূমিকা ছিল দলের ভিন্ন অস্তিত্ব না থাকার ফলে তাও সম্ভব হয়নি। কাজেই আজকের ব্যুরোক্রেসির ভূমিকা দেখে উষ্মা করলে চলবে কেন? ইতিহাসে এই রকমই ঘটেছে। ইতিহাসের শিক্ষা না লাভ করে অতীতে যেমনটি অনেকেরই ঘটেছে কংগ্রেসের কপালেও তার অনুলেখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কংগ্রেস কর্মীদের এখন প্রায়ই বলতে শোনা যায় তাঁরা জনগণের সঙ্গে মিলে গিয়ে নতুন কায়দায় সংগঠন করার জন্য আত্মবলি দিতেও কুন্ঠিত হবেন না। ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস 'কৃষক কংগ্রেস' সংগঠন করে জমির আন্দোলন ইত্যাদি করার সংকল্পও ঘোষণা করেছেন। আবার শ্রীগুলজারীলাল নন্দকে সভাপতি করে শ্রমিক সংস্থার মধ্যে তাঁরা আরও প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করছেন। আর ছাত্র সংগঠন "ছাত্র পরিষদ" ইতিমধ্যে বামপন্থী স্টাইলে ময়দানে নেমে পড়েছেন। কংগ্রেসীরা স্বীকার করুন আর নাই করুন—এরই নাম শ্রেণী সংগঠন, আর এই সমস্ত সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন করার নাম শ্রেণীসংঘর্ষ। অবশ্য সংঘর্ষের রূপরেখা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেই সম্পর্কেই কংগ্রেসীরা কিছু বলছেন না—বা বলতে কুন্ঠাবোধ করছেন। কিন্তু তাঁদের জানা উচিত আন্দোলনের গভীরতা যত বাড়বে সংঘর্ষের স্তরে ও কৌশলেও ততো পরিবর্তন আসবে। সেখানে তখন পিছপা হওয়া যায় না। ঘটনার গতিবেগ নেতৃত্বকে জোর করেই এগিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করে পরিকল্পনা রচনায় এবং তা কার্যকর করার জন্য ব্যস্ত থাকলে তলাকার কংগ্রেসীরা যতই চেষ্টা করুন, সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। গণমনের চাহিদার সঙ্গে আদর্শের সরবরাহের মিল থাকবে না। ঘাটতি হবে। এবং সেখানেই আছে ফাঁক—আর তা থাকবেও। ফলে, সংগঠন ভেঙ্গে যাবে, আর কংগ্রেস কর্মীদের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসতে হবে। কাজেই কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আদর্শ ও তত্ত্বগত বস্তুর উপর। ডঃ মালকোটের সমীক্ষার উপর নয়। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাধারার অভাব যেখানেই ঘটবে সেইখানেই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হতে বাধ্য। সব দলেই অল্পবিস্তর এই ঘটনা ঘটছে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ছে। এই সমস্ত দলের হাতে ক্ষমতা ছিল না বলেই বেদনা গভীরতর হয়নি। কংগ্রেস ক্ষমতা হারাচ্ছে বলেই দুঃখের পসরা ভারী হয়ে উঠছে। আর তাই এলোপাথাড়ি চিন্তার ঝড় উঠেছে।

—সমদর্শী

(২৩) মন্দ ঘোষের রহস্য

সূর্য ডুবল। বারান্দায় ঝোলানো থার্মোমিটারের পারা নামতে লাগল। হাওয়া বইছে। গরম কমছে।

দাশরথী বিদায় নিয়েছে। বসবার ঘরে একা বসেছিল অখণ্ডনারায়ণ। পর পর কয়েকটা কিং-সাইজের ফিলটার টিপ ছাই করার পর রেডিও খুলল। প্রথমে হল যন্ত্রসংগীত। তারপর ঘোষকের গলা। এবার গান গাইছেন রোশনারা খাতুন। 'আরব্য উপন্যাসের একটি রাত' নাটকের মঞ্চ তারকা। শুনেই চিৎকার করে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে ডাক দিল অখণ্ড। কিন্তু গান শোনাই সার হল। মন্দ ঘোষের সঙ্গে রোশনারা খাতুনের কোনো সম্পর্ক আবিষ্কার করা গেল না।

গান শেষ হলে অখণ্ড বলল—'মেয়েটির গলা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মত।'

ইন্দ্রনাথ বলল—'মেয়েলি গলা শুনলেই তোমার এই গদগদ ভাবটা ভাল লক্ষণ নয় অখণ্ড।' বলে, গেল রান্নাঘরে।

'ধুত্তোর', বলে বসে আবার পা নাচাতে লাগল অখণ্ড। হঠাৎ টেলিফোন বাজল। আবার মেয়ে মানুষের গলা। এবার জমরের।

'বলি, কি করা হচ্ছে?'

'তামাক খাচ্ছি আর শিবনেত্র হয়ে রহস্যের অংক কষছি।'

'সাক্ষাৎ শার্লক হোমস রে!'

'আপনি কি দেবীচৌধুরাণী?'

জলতরঙ্গ হাসি ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে—'চলে আসুন। বিকানীর হোটেলে আছি।'

'কেন বলুন তো?'

'ফিল্ম স্টাররা এসে গেছে। কাল থেকে শুটিং।'

'তাই নাকি? আমি আসছি।'

●

বিকানীর হোটেল।

নিচের হলঘরে গুলতানি চলছে সিনেমা তারকাদের। কেউ বাজাচ্ছে স্যাক্সোফোন। কেউ গীটার। কেউ পিয়ানো নিয়ে

আগের ঘটনা

[চাল্লশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আজ প্রবীণ জহুরী খেমচাঁদ। আর সেদিনের প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা তারই দোকানে বেচতে এলেন অনন্ত স্মৃতিজড়ানো ব্রাজিল থেকে আনা বজ্রমণির কন্ঠহার। কিনছেন একালের বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। নেকলেশ বোম্বেতে ডেলিভারী দেবার কথা ছিল।...হঠাৎ ট্রাংক কল। রাজস্থানেই কন্ঠহার ডেলিভারী দিতে হবে—নয়া ফরমান। আর তাতে পাওয়া গেল রহস্যের আমেজ, বোঝা গেল ফেউ লেগেছে। মণিকল আসানের ভার নিয়েই প্রাইভেট ডিকেটটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র কুঁজোর ছদ্মবেশে হাজির হলেন রাজস্থানে, ভীম দত্তের বাংলোয়। নাম তার এখন গুল মহম্মদ, জবরদস্ত খানসামা। অখন্ড আলাদাভাবেই এসেছে এই বাংলোয়। রহস্য ঘনীভূত। ভীম দত্তের পোষা হীরামন মারা গেছে ইতিমধ্যে। বাংলোর একটি দেয়ালে গুলির দাগ, মারা গেছে একটি মানুষ, উধাও হয়েছে ভীম দত্তের পুরনো পিস্তল। হারিয়ে যাওয়া বুলেট দুটোর খোঁজ পাওয়া গেল। সেঁকো বিষের থালি টিনও পাওয়া গেল খোঁক উপেনের কাছ থেকে। কলকাতা থেকে ফিরল ভীম দত্তের 'প্রিয় খানসামা' ম্লেচ্ছের খান। কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢুকতে না ঢুকতে তাকেও যেন কে গুলি করে হত্যা করল। আরো একটি খুন হল। কে-এক দনু ঘোষ এবার শিকার হল ভীম দত্তের। রহস্য তুঙ্গে।]

গুমগাম আওয়াজ করছে। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে টুইস্ট নাচ করছে। সে এক কান্ড!

হাসি, হুল্লোড়, গান আর নাচের মধ্যে অখন্ডকে নিয়ে এল ভ্রমর। রঙ্গ-পরিহাসের মধ্যে আলাপ হল সবার সঙ্গে। আলাপ হল হাসির বোমা আদম লাহার সঙ্গে। নামকরা কমেডিয়ান। মাথার চুল পাকা। ঠোঁটে হাসি। চোখে কৌতুক। দেখতে দেখতে কটি ঘন্টা কোথায় হারিয়ে গেল।

যৌবনের উদ্দামতা যখন চরমে উঠল, নাচ-গান-বাজনায় যখন ঘর ঝমঝম করতে লাগল, তখন আচম্বিতে ঢোকাঠে এসে দাঁড়াল এক প্রৌঢ়। ডিরেক্টর।

হেঁকে বললে—'রাত দশটা। কাল ভোরে উঠতে হবে খেয়াল আছে? সকাল আটটার মধ্যেই বেরোতে হবে।'

নিমেষে ঝমঝমানি থেমে গেল। গাঁঙিয়ে উঠল একাধিক কন্ঠ। আদম লাহা বললে—'আটটার মধ্যে?'

'আটটার মধ্যে। বাস, আর কোনো কথা নয়। এবার ঘুম।'

আসর ভেঙে গেল। একে-একে গেল যে-যার ঘরে। অখন্ডকে নিয়ে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল ভ্রমর।

অখন্ড বলল,—'চাঁদটা দেখেছেন? ঠিক যেন মধুতে ডোবানো পাতিলেবুর ফালি।'

'খেতে খুব ভালবাসেন, না? ঝমপাখীর ঠ্যাংয়ের সঙ্গে আপনার কুস্তির দৃশ্য কোনোদিন ভুলব না।'

'ভুললে তো চলবে না। ঐ কুস্তি থেকেই আমাদের আলাপ।'

'আলাপ না হলেই বা ক্ষতি কি ছিল?'

'দিনগুলো আর কাটত না', কিছুক্ষণ নীরবতা। অখন্ড বলল—'বলে রাখি, রূপসী-বাংলোর রহস্য ফুরিয়ে আসছে। আমার যাবার সময়ও ঘনিয়ে আসছে—'

'ভালই তো। আবার স্বাধীন জীবন-যাপন করবেন।'

'বুকের পাঁজরগুলো মড়-মড় করে গুঁড়িয়ে গেল কথাটা শুনে। উফ। বন্ধু-রূপেও কি আমরা থাকতে পারি না?'

'বন্ধু তো সবারই দরকার।'

'চিঠিপত্তর লিখবেন। শান্তিশেলের কুশল জানাবেন।'

'শান্তিশেল বারো মাসই কুশলে থাকবে। রাত হল। এবার চলি, কেমন?'

'চাঁদটা দেখলেন না? ঠিক পাতিলেবুর মত—'

'চাঁদ নয়, আপনি। অন্দরমে-উত্তুঙ্গ—'

ঠিক এই সময়ে বিকানীর হোটেলের বুড়ো বেরিয়ে এল। ভ্রমরকে বলল—'আপনি এখনো বাইরে? আমি তো ফটক বন্ধ করে দিচ্ছিলাম।'

'যাচ্ছি। অখন্ডবাবু, কাল বাংলোয় দেখা হবে, কেমন?'

'ও কে মাই ফেয়ার লেডি।'

সশব্দে ফটক বন্ধ হল মুখের ওপর। গাড়ি নিয়ে মরুভূমির পথে ফিরল অখন্ড। ভেবেছিল বাংলো গিয়ে আবার এক প্রস্থ লড়তে হবে ভীম দত্তর সঙ্গে। ডিটেকটিভ একবারও আসেনি যোধপুরে। অতএব অখন্ডের মাথা চিবোলেন যক্ষপতি।

কিন্তু কপাল ভাল। বাংলোয় গিয়ে দেখল অধিকাংশ ঘরের আলো নেভানো। নাজপৃষ্ঠ ছদ্মবেশী গোয়েন্দা ফিসফিস করে জানাল, কুকুর-ক্লান্ত হয়ে ফিসফিস তিনজনেঃ ভীম দত্ত, উপেন নন্দী, আর অঘোর মল্লিক। ফিরেই নাকে-মুখে গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অখন্ড।

●

বৃহস্পতিবার সকাল।

প্রাতরাশ খেতে টেবিলে জমায়েত হল সকালে। অখন্ড জিজ্ঞেস করল—'যোধপুরের কাজ মিটে গেছে তো?'

সপ্রশ্ন চোখে তাকাল উপেন আর অঘোর। ভীম দত্ত সাত তাড়াতাড়ি বললেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিটে গেছে।' বলেই বিষম খেলেন। কটমটে চাউনি দিয়ে নীরবে ধমকালেন—'মুখে চাবি দিয়ে থাকো।'

তাই রইল অখন্ড। খাওয়া শেষ হলে উঠোনে গিয়ে ভীম দত্ত হুকুম দিলেন—'একুমরের ব্যাপারটা যেন আর কেউ জানতে না পারে।'

'দেখা হয়েছে?'

'না।'

'সেকি? কেউ কাউকে চেনেন না বলেই কি—'

'তোমার বর্ণনা মত মানুষ তো দূরের কথা, বেড়ালকেও দেখিনি।'

'কিন্তু ওকে যে আমি থাকতে বলেছিলাম।'

'ফোন করেনি?'

'না।'

ফটকের কাছে সোরগোল শোনা গেল। গাড়ি বোঝাই ফিল্ম-স্টাররা এসে গেছে। সেই সঙ্গে শুটিং সরঞ্জাম। বিদঘুটে পোশাকপরা চিত্র-তারকাদের দেখে ভীম দত্তর পিঙ্গল চোখ কঠিন হল। হুংকার দিলেন—'এ সব কি?'

'আজ বেস্পতিবার। ভুলে গেছেন?'

'ও হ্যাঁ। উপেন! উপেন কই?'

হন্তদন্ত হয়ে উপেন বেরিয়ে এল—'কি হল?'

'তোমার মুন্ডু! এতদূরে এসেও কিন্তু শান্তি নেই? দেখা-শুনার ভার তোমার। আমাকে জ্বালিও না,' গমগম করতে করতে ভেতরে গেলেন যক্ষপতি।

●

শুটিং।

ডিরেক্টরের চিৎকার— 'আরে, আরে ও কি হচ্ছে? নগ্নজিৎ তোমার হল কি বলো তো? প্রেয়সীকে বিদায় জানাচ্ছো তুমি। যে প্রেয়সীর জন্য তোমার প্রেম অসীম, অনন্ত, অব্যয়। সেই প্রেয়সীকে তুমি বিদায় জানাচ্ছো, এ জীবনে হয় তো আর দেখা হবে না।'

'না হলে ছবি এখানেই শেষ', বলল নায়ক নগ্নজিৎ।

'আরে গেল যা! মাঠেঘাটে বনে-বাদাড়ে গিয়ে শুটিং-এর পর যত খুশী দেখা করো। কিন্তু নাটকে তোমাদের আর মিল হবে না। বুঝেছো? নায়িকার বাবা তোমাকে গাট্টা মেরে বার করে দিয়েছে। তোমার বুক ভেঙে গেছে। বুক ভাঙলে কেউ দাঁত বার করে হাসে না, নগ্নজিৎ।'

'জানি, এসো মদালসা। শেষ বিদায় জানাই তোমায়। তোমার উজবুক বাপ আমাকে গাট্টা মেরে তাড়িয়েছে, আমার বুক ভেঙে গেছে। মাই গড, এ স্ক্রিপ্ট কার লেখা?'

●

ঠিক সেই সময়ে বাংলোর পেছনে।

মুর্গিঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ভীম দত্ত। দৃষ্টি দিগন্তবিস্তৃত। ললাটে ভ্রূকুটি। পায়ে পায়ে পাশে এসে দাঁড়াল কমেডিয়ান আদম লাহা। মোটাসোটা চুরুটটা দাঁত থেকে নামিয়ে বলল—'ভীম দত্তকে দেখলেই দনু ঘোষকে মনে পড়ে।'

চমকে উঠলেন ভীম দত্ত—'সে কে?'

'দনু ঘোষ। পাকা লোক। ভীম দত্তর কি মনে পড়ে দনু ঘোষকে?'

আদম লাহার নাম করে সরু-মোটা গলায় অনেকে চেঁচিয়ে উঠল বাংলোর সামনে থেকে। চুরুট ফেলে দৌড়োলো কমেডিয়ান। আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল অখন্ড আর গুল মহম্মদ!

●

দুপুরের খাবার সময় হল। শুটিং শেষ করে জমায়েত হল পুরো দলটা। হঠাৎ হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন ভীম দত্ত। সবার সংগে যেচে আলাপ করলেন। হাসি-ঠাট্টা করলেন। নায়িকা মদালসার পেছনে একটু বেশি সময় ব্যয় করলেন।

আদম লাহার সামনে পৌঁছোতেই কমেডিয়ান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'গ্লাড টু মীট ইউ, মিঃ দত্ত। আমার নাম আদম লাহা।'

চোখে চোখ রেখে হাসলেন ভীম দত্ত।

স্মিত মুখে আদম লাহা শুধোলো—'আপনার এক পুরোনো বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। লোকটার নাম দনু ঘোষ।'

বন্দুকের নলচের মত সংকীর্ণ হয়ে এল ভীম দত্তর চোখ, তির-তির করে কেঁপে উঠল গালের আঁচিল—'দনু ঘোষ?'

'কলকাতার দনু ঘোষ। ক্লাবে হামেসাই আসতো।'

'খেয়াল করতে পারছি না', পা বাড়ালেন ভীম দত্ত। 'আলাপ তো অনেকের সংগেই হয়।'

'জানি। কিন্তু একে মনে পড়ার একটা কারণ আছে। দনু ঘোষ একটা কুকাজ করেছিল। আপনার জন্যেই।'

চকিতে এদিক-ওদিক তাকালেন ভীম দত্ত। নিম্নকণ্ঠে বললেন—'দনু ঘোষ সম্বন্ধে আর কি কি জানেন?'

'অনেক' খাদে নেমে এল আদম লাহার স্বর, 'দনু ঘোষের নাড়ি-নক্ষত্র আমি জানি, মিঃ দত্ত।'

দুজনেই নির্নিমেষ। কয়েক সেকেন্ডের শ্বাসরোধী নীরবতা। যেন বন্দুকের নলচে আর রাইফেলের ব্যারেলের লক্ষ্য স্থির—শুধু ট্রিগার টিপতে বাকি।

ফিসফিস করে ভীম দত্ত বললেন—'বাইরে আসুন।' দুজনে বেরিয়ে গেল বারান্দায়।

সিগারেটের ট্রে নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনল কুঁজো গুল মহম্মদ।

●

গুল মহম্মদের বিচিত্র মূর্তি দেখে আনন্দে আটখানা হল ডিরেক্টর—'পেয়েছি। লোক পেয়েছি। কি নাম তোমার?'

'গুল মহম্মদ।'

'ফিল্মে নামবে?'

'কি যে বলেন!' দাঁত বার করে ফেলল গুল মহম্মদ।

'ভাল টাকা পাবে। নাম হবে। তোমার মতই একজনকে দরকার। রাজী?'

'ঠাট্টা করছেন?'

'ঠাট্টা নয়। ভেবে দ্যাখো। রাজী থাকলে দেখা করবে। এই নাও আমার কার্ড। টাউনে দেখা করো। ঠিক হ্যায়?'

'ইয়েস স্যর।'

●

অখন্ডর ঘর।

মুখোমুখি চেয়ারে বসে অখন্ড আর ভ্রমর। অখন্ড উত্তেজিত। ভ্রমর শান্ত। এহেন মুহূর্তে কুঁজো পিঠ উঁচিয়ে খাঁকারি দিয়ে বলল—'কথা আছে।'

'কি?' অখন্ডর প্রশ্ন।

আদম লাহার সংগে ভীম দত্তর কথা-বার্তা বিবৃত করল গুল মহম্মদ। বলল—আদম লাহা লোকটা কি রকম?'

'সুবিধের নয়। আমার তো ভাল লাগে না,' বলল ভ্রমর।

'কায়দা করে দনু ঘোষের কথাটা পাড়ুন। দনু ঘোষ সম্বন্ধে কি কি জানে জেনে নিন। সন্দেহ না করে। পারবেন?' গুল মহম্মদ বলল।

'চেষ্টা করব। আদম লাহা মহা ধূর্ত, আমি নই।'

'আপনি বুদ্ধিমতী। ধূর্ত একটা নিচু বিশেষণ। চলি।'

●

হলঘর।

ডিরেক্টর উঠে দাঁড়াল। বলল—'এবার ফেরা যাক। সবাই তৈরি? আদম কোথায়? আদম?'

পাশের ঘর থেকে সাড়া এল —'যাই।' পরক্ষণেই গজেন্দ্রগমনে ঘরে ঢুকল আদম লাহা। মুখ নির্বিকার। যেন একটা মাটির মুখোস। ভ্রমরকে নাকানি চোবানি খাওয়াবে এ লোক, মনে মনে বলল অখন্ড।

ঘন্টাখানেক পরে ফিল্ম-স্টারদের দল ফিরে গেল শহরে।

পেছন পেছন গেল কৃষ্ণপ্রিয়ার স্কন্দে আরোহিয়া [illegible]

●

গেল আরও একটি ঘন্টা। ঝনঝন করে বাজল টেলিফোন। অখন্ডর কপাল ভাল। ঘরে কেউ ছিল না। তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল ভ্রমরের গুনগুনে কণ্ঠ।

'কেল্লা ফতে?' নিম্নকণ্ঠে অখন্ডর।

'না। শহরে ফিরতে না ফিরতেই জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করে দিয়েছিল আদম। আমি যখন পাকড়াও করলাম তখন ও দৌড়োচ্ছে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে। বললাম, দাঁড়ান কথা আছে। ও দাঁড়াল না। ছুটতে ছুটতে বলল, যোধপুর যাচ্ছি পরে কথা বলব।'

অখন্ড গুম হয়ে রইল সেকেন্ড কয়েক। তারপর বলল—'আদম তাহলে দলছাড়া হল?'

'তাইতো দেখছি। যোধপুরে গোটা ইউনিটটাই যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বেরোবো গাড়ি নিয়ে। পরের শুটিং ওখানেই। অথচ আদম আগে চলে গেল।'

'বক দেখিয়ে গেল।'

'ফিরে এসে আপনাকে দেখতে পাবো তো?'

'আমাকে? পাবেন। পরিস্থিতি যা দেখছি, অনন্তকাল পাবেন।'

'কী ভয়ানক।'

'এটা কী জাতীয় উক্তি হল?'

'আপনার জন্যে দুঃখপ্রকাশ হল।'

'তাই নাকি? কি সৌভাগ্য। আবার দেখা হবে। ছাড়ি।' রিসিভার রাখল অখন্ড। উঠোনে গেল। দেখল রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি চুমড়োচ্ছে গুল মহম্মদ।

'কি হল?' শুধোলো কুঁজো গোয়েন্দা।

'বকান্ড প্রত্যাশা।'

'তার মানে?'

'পাখী উড়েছে। আদাম লাহা পালিয়েছে,' সব খুলে বলল অখন্ড।

'তুমি যোধপুরে যাও,' ইন্দ্রনাথ বলল।

'গিয়ে?"

'গোয়েন্দাগিরি করবে। এ বাড়িতে যা পাবার পেয়েছি। এখন দেখা যাচ্ছে, নতুন

রহস্য জমা হচ্ছে যোধপুরে। আমাদের তদন্তকেন্দ্রও সরানো হোক যোধপুরে।'

'তথাস্তু। এখুনি যদি বেরুতে পারি, ভ্রমরের গাড়ি ধরতে পারবো। আপনি দাঁড়ান, ভীম দৈত্যকে বলে আসি।'

ভীম দত্ত শয়নকক্ষে ছিলেন। খোলা দরজা দিয়ে অখন্ড দেখল, কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোচ্ছেন ভদ্রলোক। দৈত্যের মত বিরাট বপু, নাকডাকার তালে তালে হাপরের মত ফুলছে আর চুপসাচ্ছে। দরজায় জোরে গাট্টা মারল অখন্ড।

সঙ্গে সঙ্গে তিড়িং করে লাফ মারলেন দৈত্যমশায়। সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন শয্যার পাশে। বিস্ফারিত চোখে তাকালেন অখন্ডের দিকে।

করুণা হল অখন্ডর। বেচারী! এত পয়সা নিয়েও অসুখী। ঘুমিয়েও অশান্তি। ষড়যন্ত্রের চক্রাবর্তে দিশেহারা। কিন্তু ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না।

'সরি টু ডিসটার্ব ইউ স্যার', বলল অখন্ড। এখুনি যোধপুরে যাবো ভাবছিলাম। এক্স-রে নিশ্চয় এখনো আছে ওখানে—'

'চুপ।' ঠোঁটে আঙুল চাপা দিলেন ভীম দত্ত। দরজা ভেজিয়ে দিলেন। 'এক্স-রে'র ব্যাপারটা তুমি আমি ছাড়া আর কেউ জানুক আমি চাই না। কারণ আছে। অঘোর মল্লিকের চালচলন আমার ভাল ঠেকছে না—'

'ইয়েস স্যার', উসকে দেওয়ার চেষ্টা করল অখন্ড।

কিন্তু ভীম দত্ত বিলক্ষণ হুঁসিয়ার। বললেন—'এর বেশি কিছু বলব না। তুমি যোধপুরে যাও। এক্স-রে'কে নিয়ে এসো বিকানীরে। হোটেলে উঠুক। আমি না দেখা করা পর্যন্ত যেন রাস্তায় না বেরোয়। বুঝেছো?'

'পরিষ্কার। গুলে মহম্মদকে নিয়ে যাচ্ছি টাউন পর্যন্ত।'

'ঠিক আছে।'

ঘরে ফিরে ক্ষিপ্র হাতে টুকিটাকি জিনিস সুটকেশে ভরল অখন্ড। উঠোনে ছুটে বেরোতেই পাশের দরজা দিয়ে আবির্ভূত হল অঘোর মল্লিক। এঁটো হেসে বলল —'চললেন নাকি?'

'গেলে তো বাঁচতাম। কিন্তু আবার আসছি কাল-পরশু। বলতে বলতেই সামনে এসে দাঁড়াল গুলে মহম্মদ চালিত চক্রযান। লাফ দিয়ে ভেতরে বসল অখন্ড।

মরুভূমির হলুদ বুকে মাড়িয়ে গাড়ি দৌড়োলো। অখন্ড বললে—'গোয়েন্দাগিরিতে হাতেখড়ি হচ্ছে আমার। কিন্তু বড়ো মার্ভেলাস লাগছে।'

'মাভৈঃ আমি আছি।'

'আপনি তো এখানে। যোধপুর গেলেই তো তবলার চাঁটি পড়বে আমার মাথায়।'

'যে মারবে আমি তাকে পায়জার-পেটা করব। আমিও যাচ্ছি।'

'আপনি? কোয়াবাৎ! ভীম দৈত্যের কোপ্তাকাবাব কে রাঁধবে শুনি?'

"সে ভাবনা আমার নয়। আমি ছুটি নেব। দেশের লোককে দেখতে যাব। কাল ভোরেই লম্বা দেব। তোমার দৈত্যমশায় চটলেন তো ভারি বয়েই গেল। যোধপুর স্টেশনে দেখা করবে ঠিক বারোটার সময়ে।'

●

বিকানীর হোটেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ভ্রমরের পাঁচপেয়ে অ্যাংগালিয়া। যাত্রার জন্যে তৈরি। অখন্ড নেমে দাঁড়াল গাড়ির পাশে। এমন সময়ে দাশরথী উকিলকে আসতে দেখা গেল। দৌড়ে গেল অখন্ড। দাশরথী বলল—'আহ্লাদে ফাটিফাটা যে, বলি ব্যাপারটা কি?'

ব্যাপারটা সাকস্তারে বলল জহুরীনন্দন। যোধপুরে হানা দেওয়ার প্ল্যান শুনে দাশরথী বলল—"গুড আইডিয়া। যোধপুরে আমার চেনাজানা একজন আছে।'

কে?'

"রামদাস শর্মা। ভীম দত্তর বাড়ীর কেয়ারটেকার।'

যোধপুরেও ও'র বাড়ি আছে?'

'কোথায় নেই? যাক, এই কার্ড রামদাসকে দেখাবেন। সাহায্য পাবেন,' বলে একটা আইভরি কার্ডের পেছনে এক লাইন লিখে দিল দাশরথী।

হোটেল থেকে বেরোলো ভ্রমর। —'কি ব্যাপার? সদলবলে কেন?'

'সুখবর আছে,' বলল অখন্ড। 'যোধপুরে যাচ্ছি আমি।'

'উঠে পড়ুন।' অ্যাংগালিয়া চলল।

●

কিছুক্ষণ পর অখন্ড সিগারেট ধরাল। ভ্রমরকে দিল। বলল—'বিরক্ত করলাম না তো?

'ননসেন্স। আমি খুশী হয়েছি।'

'মন যোগাচ্ছেন?'

'শক্তিশেলের মন যুগিয়ে লাভ আছে। আপনার মন যোগাবো কেন?'

'দিলেন মাটি করে।'

'খোঁচা মারলেই খোঁচা খাবেন। আপনাকে নেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে আপনার ওজন।'

'আমার ওজন?'

'গায়ে গতরে বেশ ভারি তো। গাড়ি চলবে ভালো।'

'উফ কি হৃদয়বিদারক অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স!

●

রাত্রে অ্যাংগালিয়া ধুঁকতে ধুঁকতে পৌঁছাল যোধপুর হোটেলের সামনে।

অখন্ড বলল—'রাত কাটাচ্ছেন কোথায়?'

'আপনার হোটেলে নিশ্চয় নয়। ফিল্ম কোম্পানী জায়গা রেখেছে অন্য হোটেলে।'

'জন্মাবধি আপনার মুখে মধু পড়েনি দেখছি। কাল দেখা হচ্ছে?'

'হচ্ছে', বলে ঠিকানা দিল ভ্রমর।

অ্যাংগালিয়া উধাও হতেই অখন্ড পা দিল হোটেলের চত্বরে। মিষ্টি স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটাল রাত।

পরের দিন ভোরে উঠেই কাফ ডিমসেদ্ধ খেয়ে দৌড়োলো পুরোনো এক বন্ধুর কাছে। কলেজ ফ্রেন্ড। এখন শেয়ার মার্কেট নিয়ে ব্যস্ত। দিব্ব অফিস গুছিয়ে বসেছে। অফিসের ওপরেই নিজের আস্তানা। অখন্ডকে দেখেই বিকট উল্লাসে জড়িয়ে ধরল। হাঁপাতে হাঁপাতে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে প্রথমেই কাজের কথা পাড়ল অখন্ড। বলল—'ভীম দত্তকে চিনিস?'

'কি যে বলিস। দুদিন আগেই ভদ্রলোকের একটা কাজ করে দিয়েছি।'

'যথা?'

'বুধবার সকালে এলেন তিন লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ নিয়ে। দুপুরের মধ্যেই সব বেচে দিলাম। নগদ পাইয়ে দিলাম।'

'স্যাপ্লেন্ডিড। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড এই রকম খবরই খুঁজছি আমি। আর একটা খবর দরকার। ভীম দত্তর ব্যাঙ্কের কোনো চোমরাচামরার সঙ্গে বার্তাচিত করিয়ে দিতে পারিস?'

'কে তুই? ব্যোমকেশ বক্সী?'

'আপাতত পুলিশের স্পাই। ভীম দত্তকে নিশ্চয় ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে। ও'র বাংলোয় আমি উঠেছি বলেই এ সন্দেহ আমার হচ্ছে। কথাটা যেন পাঁচ কান না হয়।"

'হবে না। কিন্তু মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী হচ্ছে না? ভীম দত্তর চেয়ে তোর টনক বেশি নড়েছে? কেন?

'আমার বাবার স্বার্থ আছে বলে। ড্যাডিকে চিটিংবাজ চাকু মেরে যাবে, আমি বসে বসে দেখবো? আর জানাসনি, ভীম দত্ত কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন?'

'চিতোর ব্যাঙ্ক। ম্যানেজারটি চাইবুড়ো। তবে খাতির করে।'

'তবে চ'।'

●

চিতোর ব্যাঙ্ক।

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বসবার ঘরে পৌঁছোলো অখণ্ড। বন্ধুটি গেল ম্যানেজারের কাছে। অনেকক্ষণ গুলতানি হল। তারপর ডাক পড়ল অখণ্ডর।

ম্যানেজার বলল — 'আপনার বন্ধুর অনুরোধ সৃষ্টিছাড়া। অন্য কেউ এ অনুরোধ নিয়ে এলে আমরা রাখতাম না। বলুন কি জানতে চান।'

'ভীম দত্ত বুধবার এখানে এসেছিলেন! কেন?'

'দু বছর পরে এলেন উনি। এসেই সেফ ডিপোজিট ভল্টে গেলেন। নিজের বক্স নিয়ে অনেকক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন।'

'একা?'

'না। সেক্রেটারী উপেন নন্দী সঙ্গে ছিল। আর একজন ছিল সঙ্গে। মাঝবয়সী, ছোটখাট চেহারা।'

'বুঝেছি। সেফ ডিপোজিট বক্স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন ভীম দত্ত। আর কিছু করেন নি?'

ইতস্তত করল ম্যানেজার। বলল—'উনি বোম্বাই অফিসে টেলিগ্রাম পাঠালেন যেন একটা মোটা টাকা আমাদের ক্রেডিটে ফেডারাল ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়। এর বেশি কিছু বলা বোধহয় সমীচীন হবে না।'

'টাকাটা ওঁকে আপনারা দিয়েছেন?'

'আর কিছু বলব না। যা বলেছি, তাই কি যথেষ্ট নয়?'

'যথেষ্ট। থ্যাংকিউ, স্যার।'

বন্ধুকে নিয়ে মর্মর সোপান বেয়ে রাস্তায় নামল অখণ্ড। বলল—'তোকে এখানে ফেলে আমি এখন কাটব।'

'তা তো কাটবিই। ছাই ফেলার পর ভাঙা কুলো কেউ সঙ্গে রাখে না। খেয়ে যাবি না?'

'আর একদিন। চললাম।' বায়ুবেগে উধাও হল অখণ্ড। বারোটা বাজার কয়েক মিনিট আগে পৌঁছোলো যোধপুরে স্টেশনে। গিয়ে দেখল ছদ্মবেশী ইন্দ্রনাথ রুদ্র গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে।

অখণ্ডকে দেখেই চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বলল—'পালিয়ে এলাম। ঘুম থেকে উঠেই ভীম দত্ত দেখবেন দরজার তলায় একটা চিরকুট। তাতে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে লেখা ছুটির দরখাস্ত। উনি ভাববেন বুঝি একেবারেই কেটে পড়লাম। কিন্তু দু দিন বাদে আবার দেখলে খুশীই হবেন।'

'এলেন কিভাবে?'

'ট্যাক্সিতে, বাসে, প্রাইভেট কারে। দরকার মত ডিটেকটিভরা রকেট-গাড়িতে যাতায়াত করে জানো না? যাক, খবর কি বলো।'

খবর বলল অখণ্ড। চিতোর ব্যাংকে মোটা টাকার ব্যাপার আর শেয়ার মার্কেট-এর বন্ধুর কাছে তিন লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ বিক্রির কাহিনী শুনিয়ে বলল—'আমাদের অনুমান অভ্রান্ত। ভীম দত্তকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে।'

'দুটো কারণে। দনু ঘোষ একটা কুকীর্তি জানত। দু নম্বর কুকীর্তি হল দনু ঘোষ নিধন। এই ট্যাক্সি। ট্যাক্সি। চল উঠে পড়ো।'

'কোথায়?'

'ভীম দত্তর বাড়ি। কেয়ারটেকার রামদাস শর্মার সঙ্গে তুমি দেখা করবে। দাশরথী উকিলের কার্ড দেখিয়ে পেটের কথা বার করবে। আমি থাকব বাইরে।'

●

ভীম দত্তর যোধপুর-ভবন।

রামদাস শর্মা লোকটি প্রৌঢ়। সৌম্য মূর্তি। দাশরথী উকিলের নামাঙ্কিত কার্ড দেখে মহাসমারোহে অখণ্ডকে নিয়ে গিয়ে বসালো ভেতরে।

বলল — 'দাশরথী আমার পুরোনো বন্ধু। সুতরাং আপনিও আমার বন্ধু।' বলে, শিশুর মত সরল হাসি হাসল।

অখণ্ড বলল—'ধন্যবাদ। আমি এসেছি একটা বিশেষ ব্যাপারে। কথা দিন একথা কাউকে বলবেন না। এমন কি ভীম দত্তকেও না।'

'বটে! কি ব্যাপার?'

'ভীম দত্ত বিপদে পড়েছেন। কেউ বা কারা ওঁকে ব্ল্যাকমেল করছেন।'

'কী সর্বনাশ!'

'ভীম দত্তর স্বার্থের সঙ্গে আমার স্বার্থ জড়িয়ে আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি, বুধবার উনি এসেছিলেন?'

'হাঁ। সন্ধ্যের দিকে এলেন। সঙ্গে ছিল উপেন নন্দী আর একজন অচেনা লোক। গাড়ী থেকে নামলেন না। কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, পরে মেয়েকে নিয়ে কয়েকদিন থেকে যাবেন।'

'ভীম দত্তর কথাবার্তা কি রকম মনে হল?'

সোজা তাকাল রামদাস শর্মা। বলল—'আপনার প্রশ্নটা অদ্ভুত। তাহলেও বলছি, মিঃ দত্তর নার্ভ পাথরের মত শক্ত। কিন্তু সেদিন মনে হল যেন উনি নার্ভাস হয়েছেন। গাড়ির জানলায় জানলায় পর্দা টানা ছিল। অন্ধকারে ঘুপসির মধ্যে এককোণে বসেছিলেন।'

'ওঁর নার্ভাসনেসের কোনো কারণ আপনি জানেন?' ●

'বলা মুশকিল।'

'ভীম দত্ত কাউকে ভয় পান কি? ধরুন তার নাম দনু ঘোষ?'

প্রশ্নর সঙ্গে সঙ্গে রামদাস শর্মার চোখে-মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল— 'কি নাম বললেন?'

'দনু ঘোষ। চেনেন?'

'নামটা চিনি। লোকটাকে নয়।'

'নাম চেনেন? কোথায় শুনেছেন?' গলা কেঁপে গেল অখণ্ডর।

'ভীম দত্তর মুখে। অনেকদিন আগেকার কথা। যোধপুর-ভবন ঢেলে সাজাচ্ছিলেন মিঃ দত্ত। দরজা জানলায় বার্গলার-অ্যালার্ম বসাচ্ছিলেন। হলঘরে দাঁড়িয়ে নিজে তদারক করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন—এবার থেকে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাবে। তাই না রামদাস? আমি বললাম, এত আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে, আপনার শত্রু অনেক। উনি হাসলেন। বললেন—দুনিয়ায় শুধু একজনকেই আমি ভয় পাই রামদাস। আমি বললাম—মোটে শুধু একজনের জন্য এত কাণ্ড? কে সে?' উনি বললেন—দনু ঘোষ। নামটা মনে রেখো, রামদাস। দরকার লাগতে পারে। আমি বললাম দনু ঘোষকে এত ভয় কিসের স্যার? প্রশ্নটা শুনে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে আবার জিজ্ঞেস করলাম। উনি তখন চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিলেন।'

'কি জবাব দিলেন?' জহুরী-তনয় উদগ্রীব।

'প্রথমে স্থিরচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, দনু ঘোষ বড় কারবারী। কিন্তু ওর কারবারটা বড় বিদঘুটে। বলেই বেরিয়ে গেলেন। আমিও সব বুঝলাম।'

আগামী সংখ্যায় 'রোশনারার রহস্য'

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শয়তানের জন্ম (২)

গত সংখ্যায় এই আলোচনায় 'রোজ-মেরীস বেবি' কাহিনীটির সারাংশ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। গ্রন্থটির আয়তন সুবৃহৎ এবং কাহিনীঅংশে এমন সূক্ষ্ম ঘটনার বিবরণাদি আছে যা পরিবেশনে সংক্ষিপ্তকরণ সম্ভব নয়। সেই কারণে কাহিনী অংশের অতি সামান্যই দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করে মূল গ্রন্থটির বক্তব্য এবং গুরুত্ব বিষয়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করা হল।

'রোজমেরীস্ বেবি'কে কেউ কেউ সায়ান্স-ফিকস্যান নামে অভিহিত করছেন। কিন্তু 'রোজমেরীস্ বেবি'কে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনী বলে উল্লেখ করা সমীচীন হবে না, কারণ, এই উপন্যাসে কুহকবিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ম্যান-হ্যাটানের ব্রামফোর্ডে যখন গয় ও রোজমেরী বাসা বাঁধতে যায় তখন তাদের সতর্ক করেছিল হ্যাচ বা এডওয়ার্ড হাচিনসন। তিনি বলেছিলেন এই পল্লীটার অখ্যাতি আছে। ওখানে ডাকিনীতন্ত্রের প্রচলন ছিল। নরমাংস আহার এবং নরহত্যা ঐ অঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি কুহকবিদ্যার কয়েকটি ঘটনাও বলেছিলেন।

গয় উডহাউস তাঁর কথা উপেক্ষা করে এই ব্রামফোর্ডে বাসা বেঁধেছিল, কারণ গয় ছিল সংস্কারমুক্ত আর রোজমেরী ভক্তি-মতী ক্যাথলিক। এই ব্রামফোর্ডে এসেই তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে কাসটেভেট দম্পতির সঙ্গে। কাস্টেভেটরা বয়সে প্রবীণ, এবং বিশেষভাবে ঘরকন্নার কাজকর্ম, বাজারহাট ইত্যাদি করে দেওয়া, খোঁজখবর নেওয়া প্রভৃতির দ্বারা ওদের পরিবারে 'পেরেন্ট ফিগার' বা অভিভাবকসদৃশ হয়ে উঠেছিলেন। গয় উচ্চাভিলাষী অভিনেতা, সে যে কোনো প্রকারে নিজের উন্নতি চায়, নট হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা চায়। রোমান কাসটেভেট গয়ের এই দুর্বলতা বুঝে নিয়েছিল এবং অতি সহজেই তাকে হাত করে ফেলে। রোমান একজন বহুদর্শী এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ। সে একজন ওস্তাদ গুণীন এবং তার স্ত্রী মিনিও তার উপযুক্ত সহকর্মী। এরা দুজনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এই নবীন দম্পতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। রোজ-মেরীর গর্ভস্থ সন্তানটিই তাদের লক্ষ্য। সেই কারণে, রোজমেরীকে ভিটামিনের পরিবর্তে জড়িবুটির মাদুলি আর লতা-পাতার আরক পান করতে দেওয়া হয়। ডাক্তারটিও ওদেরই নির্বাচিত। ডাঃ সাপির-স্টাইনও একজন কুহকবিদ্যায় বিশ্বাসী মানুষ। রোজমেরীর আসন্ন সন্তানকে নিয়ে নাটক যখন জমে উঠেছে সেই মুহূর্তে আবির্ভাব হ'ল হ্যাচের। হ্যাচ্ রোজ-মেরীকে দেখে চমকে উঠলেন।

রোজমেরীর এই সন্তান জন্মের কালে কোনও আত্মীয় বন্ধুর দেখা নেই, তাই হ্যাচ্‌কে ভালো লাগে। একটি বই-এর আলমারির পাশে দাঁড়িয়ে হ্যাচ বলে, ভারী সুন্দর তোমার ঘর-দোর। তোমরা বেশ আছো।

রোজমেরী বলল, ভালই ত' ছিলাম। তবে এই যে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা শুরু হয়, এটাই আমাকে কাবু করেছে। জানো রোমানের কানে ছেঁদা আছে, আজই এইমাত্র দেখলাম।

—শুধু ছেঁদা করা কান নয়, ওর দৃষ্টিও অন্তর্ভেদী। লোকটার পূর্ব-বৃত্তান্ত কিছু জানো?

—মানে, সবজান্তা গোছের আর কি, পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরেছে।

—যত সব বাজে কথা, কেউ-ই তা পারেনি। লোকটা এখন এল কেন?

—ও বাইরে যাচ্ছে। দেখতে এল আমাদের জন্য কিছু আনতে টানতে হবে কিনা। ওরা আমাদের সঙ্গে ভারী ঘনিষ্ঠ, বললে বাসনপত্র পরিষ্কার করেও দেবে। গয় অবশ্য একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। ওরা একরকম আমাদের পাতানো বাপ-মার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—আর তোমার কি মনে হয়! হ্যাচ প্রশ্ন করে।

—আমার কথা বলা শক্ত। মাঝে মাঝে ভালোই লাগে। কখনও মনে হয় বড্ড গায়ে-পড়া, নেটি-পেটি। দেখলে ত' যেই ইলেক-ট্রিক বন্ধ হয়ে গেল মিনি বাতি হাতে এসে হাজির হল।

—ঐ কালো বাতি-দুটো নাকি? বাতি-গুলি সবই কালো?

—হ্যাঁ, কেন? তাতে কি হয়েছে?

—না, এমনই। আমাকে এক পাত্র কফি দাও। আচ্ছা কাস্টেভেটরা কোথায় এইসব জড়িবুটির গাছগাছড়াগুলো বসিয়েছে, টবে নাকি?

কথাবার্তা চলছে এমন সময় গয় এসে ঘরে ঢুকল, তার মুখে রঙমাখা। সে হ্যাচ্‌কে দেখে অবাক। রোজমেরী বলে, অবাক ত তুমিই করেছ। কি হল তোমার বলো। গয় বলে—মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। নতুন করে লিখতে হবে। কাল সকালে আবার রিহার্সেল। তোমরা বসো আমি হাত মুখ ধুয়ে রঙ উঠিয়ে আসি।

গয় ফিরে এল। কফির পাত্র হাতে নিয়ে আলাপ চলে। হ্যাচ্ বলে একদিন একত্রে ডিনার খাওয়া যাক। তারপর—হ্যাচ উঠে পড়ে। বলে—ডাক্তারকে বলবে তার ওজন করার যন্ত্রটা দেখে নিতে। ওটা বোধহয় ঠিক নেই। রোজমেরী হেসে ওঠে, বলে, দূর তা কখনও হয়।

হ্যাচ কোটটি গায়ে চড়িয়ে পকেট হাতড়ায়, এক পাটি দস্তানা পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিক খোঁজা হল। তারপর বলো হয়ত অন্য কোথাও ফেলে এসেছি। ডিনারের কথাটা কিন্তু মনে রেখ। গয় বলল—নিশ্চয়ই সামনের সপ্তাহে।

হ্যাচ্ চলে যেতে রোজমেরী বলে, জানো, ও কি বলছিল? বলছিল যে আমাকে নাকি ভারী বিশ্রী দেখতে হয়েছে। গয় বলল—যত সব বাজে কথা। লোকটার ওই বড়ো দোষ। আমরা যখন এই বাড়িটা নিই তখন কি ভয়টাই না দেখিয়েছিল মনে আছে?

রাত সাড়ে দশটায় টেলিফোন বেজে উঠল। গয় ধরেছিল, তারপর রোজমেরীর হাতে দিয়ে বলল, হ্যাচ্ ফোন করছে। হ্যাচ বলল, ভারী জরুরী একটা কথা আছে। আগামীকাল সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ যদি দেখা কর ত' ভালো হয়। একত্রে খা হয় খেয়ে নেওয়া যাবে।

গয় প্রশ্ন করল, কি বলে হ্যাচ? তারপর রোজমেরীর মুখ থেকে সব শুনে হঠাৎ বলে, তোমার বাচ্চা হবে আর আমার এদিকে আইস-ক্রিম খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার জন্য একটা আনব। আমি এখনই ফিরব।

গয় চলে গেল। রোজমেরীর বেদনা বাড়ে। সে ভাবে হ্যাচ কি বলতে চায়। সেই বেদনামিশ্রিত অর্ধচেতন অবস্থায় মনে হয় কাসটেভেটদের বাড়ির কলিংবেল বাজছে।

পরদিন প্রাতে অনেকক্ষণ যথাস্থানে দাঁড়িয়েও দেখা হল না হ্যাচের সঙ্গে। যখন পৌনে বারোটা তখন রোজমেরী ফোন-বুথ থেকে একটা ফোন বুক করল। টেলিফোনে জবাব দিল গ্রেস কারডিফ, সে ওদের বাড়ির কাজকর্ম দেখে। বলল যে, হ্যাচ গতরাত্র থেকে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তারে ঠিক বুঝতে পারছে না। হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সে এখন অচেতন। গ্রেস জানালো, হ্যাচের মেয়েদের খবর দেওয়া হয়েছে।

পথে হঠাৎ মিনি কাসটেভেটের সঙ্গে দেখা। বলল, বড়দিনের বাজার করতে বেরিয়েছে। তারপর প্রায় অসুস্থ রোজমেরীকে নিয়ে মিনি ট্যাকসীতে উঠল, আর বাড়ি পৌঁছে সেই তিক্ত কষাই শীতল ওষুধ একপাত্র খাইয়ে দিল।

রোজমেরীর খাওয়া-দাওয়ায় রুচি হ্রাস পেয়েছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী মাঝে মাঝে মিনি ও রোমান কাসটেভেটদের বাড়ি যায়। সেখানে আরো অনেকে আসে। ফন্টস্টেন, গিলমোর এবং উইক-দম্পতি। মিসেস সাবাটিনি নামে এক বিধবা আসেন, তাঁর পোষা বিড়াল নিয়ে। অবসরপ্রাপ্ত ডেন্টিস্ট ডাঃ স্যানড। এরা সবাই বয়সে প্রবীণ এবং সকলেই রোজমেরীকে বেশ সহৃদয় ভঙ্গীতে দেখেন। হয়ত তার শরীরটা ঠিক নেই বলেই এই করুণা। লরা-লুইসীও থাকে আর মাঝে মাঝে আসেন ডাঃ সাপিরস্টাইন। রোমান গৃহস্বামী হিসাবে ভারী উৎসাহী। কেবল মদের গ্লাস ভরছেন আর মজার মজার কাহিনী শোনাচ্ছেন। নববর্ষের সূচনায় ১৯৬৬-কে অভিনন্দন জানানো হল, সেই সঙ্গে প্রথম বৎসরটিকেও—। কিসের প্রথম বছর কে জানে তবে মনে হল সবাই এর অর্থ জানে। হয়ত কোনো রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক অর্থ আছে এর ভেতর কে জানে! ওর কি অর এসে যায় না জানা থাকলে। গয় আর রোজমেরী একটু আগে-ভাগে চলে আসে, গয় ওকে বিছানায় শুইয়ে আবার চলে যায়। যেসব মেয়েরা আসেন সবাই রোজমেরীকে ভালোবাসেন, ওর কথায় হাসেন।

এদিকে হ্যাচ তেমনই অচেতন। রোজমেরী সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালে দুদিন গিয়ে দেখে এসেছিল। একদিন হ্যাচের মেয়ে ডোরিসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলল, ডাঃ সাপিরস্টাইন ত' আমাকে মাসে একবার দেখতেন, তোমাকে প্রতি সপ্তাহে দেখেন। আশ্চর্য! রোজমেরীর মনে সন্দেহ জাগে সে নিশ্চয়ই অসুস্থ। সবাই বলছে। পার্টিতে যারা এসেছিল তারাও বলল, অন্য ডাক্তার দেখাও। শুধু গয় আর সাপিরস্টাইনই অন্য কথা বলে।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল শয়তানী-চক্রান্তে অনেক অংশীদার। হ্যাচ যে কথা রোজমেরীকে বলতে চেয়েছিল তা বলতে পারে নি, হ্যাচের সঙ্গে রোজমেরীর যে টেলিফোনযোগে কথাবার্তা হয়, আইসক্রিম কিনতে যাই বলে গয় তখনই সে কথা কাসটেভেটদের বলে এসেছিল। হ্যাচ সেই রাত্রেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার একজোড়া দস্তানা খুঁজে পাওয়া যায় নি। যে ডোনালড্ বমগার্ট সহসা অন্ধ হয়ে গেল এবং আর অভিনয় করতে পারল না অর একটি টাই গয় বদলে নিয়েছিল। যে বান্ধবীরা রোজমেরীর পার্টিতে এসেছিলেন তাঁরা তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন অন্য ডাক্তার দেখাতে, কিন্তু গয় এই প্রস্তাবে বিরক্ত হয়। হ্যাচ মারা যাওয়ার পরে তাঁর পরিচারিকা যে গ্রন্থটি রোজমেরীকে দিয়েছিল তার নাম "All of them Witches" —এই গ্রন্থটি ভালো করে পড়ে রোজমেরী। গয় শান্তগলায় বলেছিল, প্রিয়ে! এটা ১৯৬৬—এখন এসব কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই বই প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৩-এ। রোজমেরীর সন্দেহ যায় না। ডাঃ সাপিরস্টাইনও রোজমেরীকে ভোলানোর চেষ্টা করেছেন—এসব বাজে কথা বলে। মিনি বুঝতে পেরেছিল। সে একদিন রোজমেরীকে বলে, তুমি জানতে পেরেছ রোমানের পিতৃপরিচয়? কিন্তু কোনো কথা বোলো না, এতে ওঁর মাথার গোলমাল হবে। আর সেই দিন থেকে হ্যাচের বইখানা খুঁজে পাওয়া গেল না। গয় বললে, আমি ফেলে দিয়েছি। ওসব রাবিশ না পড়াই ভালো। সে বইখানি ফেলে দিয়েছে গয় তাতে একটা জায়গায় ছিল যে, 'ডাকিনী চক্রে' দীক্ষিত হলে একটি ক্ষতচিহ্ন অঙ্গে থাকে। গয়ের কাঁধেও ছিল ঐ রকম একটা দাগ। প্রশ্ন করতে সে বলেছিল, কিছু নয় ফুসকুড়ি। তাহলে গয়ও কি এই দলে যোগ দিয়েছে? রোজমেরী বুঝল এরা সবাই, গয়, ডাঃ সাপিরস্টাইন, মিনি, রোমান, সবাই এর কুহকবিশারদ। এরা চায় রোজমেরী তাদের জন্য একটি সন্তান দিক। রোজমেরী ভাবে ছেলেই হোক আর মেয়ে হোক তাকে আমি হত্যা করব, তোমাদের ছুঁতে দেব না।

সন্তান প্রসব হওয়ার পর ওকে সবাই জানালো যে, মৃত সন্তান প্রসব করেছে। কিন্তু একদিন রোজমেরী যেন ছোট ছেলের কান্না শুনতে পায়—মিনি ও রোমানদের ফ্ল্যাটে শিশুর কান্না। এই সন্তান ওর—এই সেই এ্যান্ডি। এর চোখ এমন কেন। রোমান বলে এ বাপের মত চোখ পেয়েছে। রোজমেরী বলে—এ চোখ ত' ওর বাপের নয়, গয়ের চোখ বাদামী। রোমান বলে—শয়তানের পুত্র এ্যান্ডি—ওর চোখ শয়তানের মত। শয়তান নরক থেকে উঠে এসে মর্তের মানবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছেন—জয় শয়তানের জয়।

রোজমেরী চীৎকার করে পিছু হটে—না—না—

কাহিনী এইখানেই শেষ। কাহিনী বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, এ কাহিনী এক প্রতীকি কাহিনী, এ যুগে দেবতার জন্ম সম্ভব নয়, শয়তানের জন্মোৎসব করার জন্য বহুজন ব্যাকুল। —অভয়ঙ্কর

ROSEMARY'S BABY : By IRA LEVIN : Published by : Random House! INC NEW YORK: Price $ 10 only :

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

সেদিন একটা সাহিত্য অনুষ্ঠানে খগেন্দ্রনাথ মিত্র দুঃখ করে বলছিলেন যে, এদেশে শিশু সাহিত্যিকরা অবহেলিত। ছোটদের জন্যে তেমন উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকারও যথেষ্ট অভাব আছে। কথাটা যে একেবারে অমূলক নয়, তা সাহিত্যরসিক-মাত্রেই স্বীকার করবেন। যাঁরা বড়দের সাহিত্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের তবু কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু কেবল শিশু সাহিত্য রচনা নিয়েই যাঁরা থাকেন তাঁরা তেমন কোন সম্মান এদেশে পান না। এই অবস্থায় যাঁরা শিশু সাহিত্যের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে হয়। শিশু সাহিত্য পরিষদ কয়েকদিন আগে এরকম একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে নিখিল বঙ্গ শিশু সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল অবন মহলে। এই উপলক্ষে ১৩৭৪ সালের ভুবনেশ্বরী পদক অখিল নিয়োগীকে এবং ১৩৭৪—৭৫ সালের ফটিকস্মৃতি পদক সুবোধকুমার চক্রবর্তীকে দেওয়া হয়। এছাড়াও শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়ায় ননীগোপাল চক্রবর্তীকে এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার। পরিষদ সভাপতি নরেন্দ্র দেব শিশু সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানের অপর একটি আকর্ষণ হল পূর্ব ভারতে শিশু সাহিত্যের ধারা বিষয়ক আলোচনাটি। এতে অংশ গ্রহণ করেন বাংলার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, হিন্দীর ডঃ প্রতিভা আগরওয়াল, অসমীয়ার বিনোদ শর্মা এবং ওড়িয়ার অবকাশ জেনা। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এই অনুষ্ঠানের পর ছড়াপাঠের আসর বসে। সমর চ্যাটার্জি'র সভাপতিত্বে ছড়া পাঠ করে শোনান উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, অজিতকৃষ্ণ বসু, রবিরঞ্জন চ্যাটার্জি, শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীকান্ত রায়, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি, ধীরেন্দ্র করগুপ্ত, সুচেতা ভট্টাচার্য, মায়া ঘোষ দস্তিদার। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা, সুনীলা চ্যাটার্জি ও সীমা সেন।

গত শনিবার ৩১শে মে পৌরসংস্থার উদ্যোগে কলকাতার বাগবাজার গিরিশ-ভবনে সভাপতি গিরিশচন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে। এই উপলক্ষে পৌরসংস্থার উদ্যোগে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় তাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন—"গিরিশচন্দ্র বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জনক। তিনি একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রাণস্পর্শী রচনার জন্য জনসাধারণ তাঁকে মহাকবিরূপে আখ্যাত করেন।" অনুষ্ঠানে গিরিশনাট্য সংসদের পক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুজাতা পাঠক গিরিশচন্দ্রের জনা নাটক থেকে পাঠ করে শোনান। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দেন প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র শ্রীমোহিতলাল গঙ্গোপাধ্যায়। কাউন্সিলার পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জানান। রাসবিহারী সরকার, মিহির ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গিরিশনাট্যানুরাগীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গিরিশ-প্রতিমূর্তিটি নির্মাণ করেন প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রীসুনীল পাল।

স্বাধীনতার পরবর্তী মালয়ালম কবিতার অগ্রগতির ইতিহাস সত্যই উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে ভারতে এবং বিদেশে যিনি সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি কবি বল্লাথোল। লোকনাট্যের পুনরুজ্জীবনের ইনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা; কথাকলি নৃত্যের উপরে তাঁর বহু বই আছে। ১৯৫৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এর পরে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কে এম পানিক্কর, নালাপত এবং কুট্টিপুরম। এঁদের তিনজনেরই অকালমৃত্যু হয়। ফলে সাহিত্যের ধারা প্রচলিত পথে বাহিত হল এবং নতুন পথে চলতে লাগল। এই পরিবর্তন স্পষ্টতররূপে লক্ষ্য করা গেল শঙ্কর কুরুপের কবিতায়। সম্প্রতিকালের মালয়ালম সাহিত্যের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন বৈলোপিল্লাই, বালামণি-আম্মা, কাপরায়ণ নাইয়ার এবং ও এন ভি কুরুপ।

বিদেশী সাহিত্য

ক্যালিফোর্নিয়ার রেডউড শহরে রোলফ হামফ্রিজ সম্প্রতি মারা গেছেন চুয়াত্তর বছর বয়সে। অনুবাদক হিসেবে তিনি সারা পৃথিবীতে পরিচিত। ভার্জিলের 'ঈনিড' ও ওভিডের 'দি আর্ট অব লাভ' অনুবাদ করে তিনি প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন।

এককালে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা লিখেছিলেন তিনি। আমরা স্মরণ করছি তাঁর 'নো এনিমি' কবিতার কয়েকটি পংক্তি। তিনি লিখেছেন—

এই শীতের কাছে প্রশংসা কর
তার বন্দীনিবাসের জন্য।
গ্রীষ্মের প্রতিভূ সূর্য আর নির্বিঘ্ন
আলোর ওপর
যখন চাঁদটায়
কামনার ছকে আঁকাবাঁকা খণ্ডগুলি
কাটতে থাকে—
এখন শোনো,
নীল গোলাপদানাজ্বালানীর কঠোর পদধ্বনি।

কবি হিসেবে হামফ্রিজ একজন উপেক্ষিত মানুষ। সমালোচকরা তাঁকে মর্যাদা দিয়েছেন অনুবাদের জন্য। তাঁর অনুবাদে পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুণের স্বাক্ষর, দুর্লভ শিল্পজ্ঞান, চমৎকার কৌতুকের মিশ্রণ ও ভাষার জাদুকরী সম্মোহন।

আমাদের দেশে গোয়েন্দাকাহিনীর একটা বাজার চাহিদা থাকলেও বিদ্বানের কদর নেই। লেখকলেখিকারাও এ নিয়ে কোনরকম মর্যাদা দাবী করেন না। বাজারে বই চললেই হলো। টাকা নিয়ে হলো কথা। তার সঙ্গে আবার শিল্পসাহিত্যের সম্পর্ক কি?

যুরোপ-আমেরিকা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কিন্তু এরকম হেলাফেলার মনোভাব নেই। রীতিমতো সিরিয়াসলি গোয়েন্দাকাহিনী লেখার কথা তাঁরা ভাবছেন। সাম্প্রতিককালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, পাশ্চাত্য উপন্যাসের পাঠকপাঠিকাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আধি রহস্য রোমাঞ্চ কিংবা গোয়েন্দা-কাহিনীর অনুরাগী।

অন্যান্য বিদেশী [illegible]

অনেকের অনুমান। শোনা যায়, কবি টি. এস এলিয়ট নাকি কবিতা লেখার ফাঁকে ফাঁকে গোয়েন্দাকাহিনী পড়তেন আগ্রহের সঙ্গে। তিনি নাকি গোয়েন্দা গল্প লিখেও ছিলেন।

পরলোকগত মার্কিনী প্রেসিডেন্ট কেনেডি নাকি নিয়মিত গোয়েন্দাকাহিনী পড়তেন। বিশেষ করে জেমস বন্ডের কাহিনী ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

বয়স্ক লেখকরা আজকাল তরুণদের লেখা পড়েন না। খোঁজখবর রাখেন না তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে। এজন্য পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে দিনের পর দিন। তরুণেরা স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্যে অস্বীকার করেন বড়দের, আর বয়স্করা আত্মমগ্ন থাকেন নিজেদের রচনার মধ্যে।

সম্প্রতি আমেরিকার প্রখ্যাত কবি লুইস জুকভস্কিকে জিজ্ঞেস করা হয়, "নতুন লেখকদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?"

ভদ্রলোক কোনরকম সঙ্কোচ না করেই জবাব দিলেন, 'এ বিষয়ে আমার পরিষ্কার ধারণা থাকা সম্ভব নয়। মনে রাখবেন আমার মতো বয়স্করা অন্যের লেখা সম্পর্কে উদাসীন। নিজেদের লেখা নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত। যৌবনে অন্যের লেখা পড়ে দেখার উৎসাহ থাকে। তখন জানতে ইচ্ছে করে, সাহিত্য-আন্দোলনের খবরাখবর। তখন বন্ধুবান্ধবদের লেখার উচ্ছ্বসিত নিন্দা বা প্রশংসা করতাম। এখন নিজের লেখা নিয়ে আমি চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত থাকি।'

জুকভস্কি কয়েকদিন আগে লন্ডনে এসেছিলেন আমন্ত্রিত হয়ে। ১৯২৭ সালে থেকে তিনি 'এ' নামে ২৪ সর্গে বিভক্ত একটি এপিক লেখায় ব্যাপৃত। এখনো তার তিনটি সর্গ বাকি। তিনি বলেন— 'আমার মনে হয়, আগের মতো এখনকার লেখাতেও একটি বড় দোষ আছে। তা হলো—পান্ডিত্যাভিমান এবং প্রাণপণে তাকে প্রমাণ করার চেষ্টা।'

সম্প্রতি 'ব্ল্যাক ফায়ার' নামে নিগ্রো-সাহিত্যের একটি সংকলন সম্পাদনা করেছেন লিরয় জোনস এবং ল্যারী নীল যুগ্মভাবে। সমালোচকের ভাষায়, 'আত্ম-সচেতন, স্বজাতিপ্রেমিক, নিজস্ব সংস্কৃতির আস্থাবান লেখকদের রচনা হিসেবে ব্ল্যাক-ফায়ার অনন্য।'

বিভিন্ন সময়ে শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবীতে নিগ্রো লেখকরা যে সব গল্পকবিতা লিখছিলেন—তারই নির্বাচিত সংকলন বলা যায় এ গ্রন্থটিকে। দু বয়েস-এর মতে, 'নিগ্রোদের দ্বৈত সচেতনতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এই সংকলনে।'

নিগ্রোরা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, স্বাধিকার আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়েছেন তার মর্মস্পর্শী বিবরণে এর প্রতিটি লেখা করুণ।

এই সংকলনে ইউসুফ রহমানের একটি অসাধারণ কবিতা আছে। কবিতাটির নাম 'ট্রানসেনডেন্টাল ব্লুজ'। অনেকে এ কবিতাটিকে চার্লি পার্কারের সমকক্ষ রচনাশক্তির নিদর্শন বলে মনে করেন।

বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (জীবনী)—আজাহারউদ্দীন খান। জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো। কলকাতা-১। দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে কখনও চোখে দেখিনি। ছবি দেখেছি। তাঁর বহু প্রবন্ধ পড়েছি। গোটা মানুষটার পরিচয় শোনা কথা আর টুকরো স্মৃতির মধ্যে জানতে পেরেছিলাম যা কিছু। সম্প্রতি আজাহারউদ্দীন খানের 'বাঙলা সাহিত্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' বইখানি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এই নিরলস গবেষক রাজনৈতিক বেড়াজালে ওপারের বাঙলায় আবদ্ধ হয়ে ছটফট করেছেন মাতৃভূমি দেখবার প্রেরণায়। কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি। শতবর্ষের কাছে পেণছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তারপর তাঁর আর কোন খবর জানা যায়নি।

আজাহারউদ্দীন খান তাঁর বইয়ে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল প্রতীক শহীদুল্লাহ সাহেবের চরিত্র-চিত্রণ করেছেন। ব্যক্তিত্ব ও পান্ডিত্যের, দেশহিতৈষিতা এবং উন্নত জীবনাদর্শের অনুকরণীয় মহৎ প্রাণ মানুষ তিনি। ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে শহীদুল্লাহ সাহেবের জীবন ও সাহিত্যচর্চার মধ্যে বাঙলা সংস্কৃতি, ঐস্লামিক ঐতিহ্য ও আধুনিক মানবিকতাবোধের অবিস্মরণীয় প্রকাশ ঘটেছে। তিনি সেই বাঙলার মানুষ যে বাংলা অবিভক্ত। যে বাঙলায় বাস করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। যাঁদের প্রতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

শ্রদ্ধায় অবনত শহীদুল্লাহ। এই মানুষকে কোন বাঙালী ভুলে থাকতে পারে না। এপারের বাংলায় তিনি প্রায় বিস্মৃত। অথচ এই বাঙলায় তাঁর শিক্ষাজীবন এবং কর্মজীবনের এক বিরাট অংশ জড়িয়ে আছে। অসংখ্য ছাত্র ছড়িয়ে আছে বাঙলাদেশের নানা প্রান্তে। পান্ডিত্যে এই দুর্লভতম প্রতিভা ওপারের বাংলায় অতি সম্মানিত পুরুষ। তাঁর কর্মজীবনে নেই কোন চটকদার ঘটনার প্রবাহ। প্রত্যেকেই তাঁর কাছে মানুষ হিসাবে সম্মানিত। আচার্য সুনীতিকুমার বর্তমান বইয়ের ভূমিকায় শহীদুল্লাহ সাহেবের চরিত্র এক কথায় যেন স্পষ্ট করে দিয়েছেন: 'তিনি একজন সংস্কার মুক্ত চিত্তের মানুষ এবং এইরূপ মানুষই full man —'পূর্ণ মানব' অথবা 'ইনসান-অল-কামিল' পদবীতে পহুঁছিবার পথে জয়যাত্রা করিবার যোগ্য।' ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতে গিয়ে সেবা করেছেন দেশের। ভালবেসেছিলেন প্রতিটি মানুষকে।

বাংলা ভাষার মধ্যে বিচরণ করতে তিনি ভালবাসেন। কারণ এ তাঁর মাতৃভাষা। শহীদুল্লাহ বলেছিলেন: 'বাঙলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষার সকল সেবকই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। পশ্চিমবঙ্গের সহিত আমাদের রাজনীতিগত পার্থক্য আছে, কিন্তু ভাষাগত তো শত্রুতা নাই। যে বাংলাভাষা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহা কাহারও কথায় আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।' মুক্তিবাদী মন আর [illegible] প্রতিভা

বাংলাভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পাণ্ডিত্য কোথাও অহমিকা নয় সরল অথচ জ্ঞানগম্ভীর প্রাঞ্জল অথচ প্রগাঢ়। বহুভাষাবিদ শহীদুল্লাহ নানান ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন অজস্র। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও শিশুসাহিত্যের জন্যও কলম ধরেছিলেন তিনি। গল্প ও কবিতা লিখেছেন। কতকগুলি সাহিত্য পত্রিকা ও ধর্মবিষয়ক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব পত্রিকা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। বাংলা সংস্কৃতি ইসলামী ঐতিহ্য এবং রবীন্দ্র তথা আধুনিক ঐতিহ্য এই তিন ধারায় বিভক্ত তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি, দুই বাংলার নয়, এক বাংলারই সম্পদ।

শহীদুল্লাহ কলকাতায় অধ্যাপনা-জীবন শুরু করেন। সেই থেকে লিখে আসছেন। প্রাচীন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে সে সময়ে ও পরবর্তীকালে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। সেসব প্রবন্ধের বেশির ভাগই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। মোট বিয়াল্লিশখানা বই বেরিয়েছে। এর মধ্যে আছে ভাষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম, শিশুসাহিত্য সম্পর্কে বই। কতকগুলি পুরোন পুঁথি সম্পাদনাও করেছেন। লোকগাথা, লৌকিক ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, পুঁথি সংগ্রহ, প্রাচীন সাহিত্যের বিতর্কিত বিষয়ে আলোকপাত, উর্দু অভিধান সম্পাদনা, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা, আঞ্চলিক বাঙলা ভাষার অভিধান সম্পাদনা শহীদুল্লাহের অন্যতম কীর্তি। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে অসংখ্য সভাসমিতিতে ভাষণ দিয়েছেন। নিজেকে ঠাট্টা করে বলতেন 'জ্ঞানানন্দ স্বামী'।' জ্ঞানের চর্চা জড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর অস্থিমজ্জার সঙ্গে। 'জ্ঞান যেন তাঁর অস্তিত্বে আকাশ এবং কবিতা। দিগন্তের ইচ্ছার মতো যেন তা বিপুল প্রশান্তির জয়ের অনিবার্যতা।'

আজাহারউদ্দীন খান অত্যন্ত সমীহ ও শ্রদ্ধার সংগে শহীদুল্লাহ সাহেবের এই জীবনচিত্র রচনা করে এপারের বাঙালীর ঋণভার অনেকখানি মুক্ত করলেন। অপ্রিয় সত্য এই যে বাঙলা দেশের মানুষ প্রবন্ধ বা জীবনীর ভক্ত নয়। কিন্তু আজাহারউদ্দীন খানের লেখায় এমন একটা ধার আছে, যা মনকে সহজেই টেনে রাখে। জীবনী লেখা শক্ত। বাঙলা ভাষায় রমণীয় জীবনালেখ্যের একান্তই অভাব। বর্তমান বইখানি সেই অভাব অনেকটা পূরণ করবে। তাছাড়া অতি প্রচলিত রীতি অবলম্বনেও জীবনী উপাদানের বিশ্লেষণ করান হয়নি এটা এই বইখানির আন্তর বৈশিষ্ট্য। বাঙালী যাঁরা মনেপ্রাণে তাঁদের কাছে শুধুমাত্র নয়, জ্ঞানী এবং বিদ্বান সমাজেও শহীদুল্লাহ সাহেবের এই আলেখ্য নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে। প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই বইখানি প্রকাশের জন্যে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কালি ও কলম (বৈশাখ ১৩৭৬) সম্পাদক: বিমল মিত্র। ১৫, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম: ১·০০

মননশীল পাঠকমহলে কালি ও কলম ইতিমধ্যেই স্বতন্ত্র পরিচয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। পত্রিকাটি যথার্থ সাহিত্যরস পরিবেশন করে চলেছে।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 'ওটেন সুভাষচন্দ্র' একটি বিতর্কিত ঘটনার নতুন আলোকপাত। ডঃ মজুমদার নানা তথ্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে ভাবে এই ঘটনাটিকে তুলে ধরেছেন তা ইতিহাসের দিক থেকেই শুধু নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের পুরোনো ধারণা আরো স্বচ্ছ করে তোলে। এ ধরনের একটি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করে 'কালি ও কলম' পত্রিকা এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলেন। প্রথম পাটনা পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাট্য সম্মিলনীতে প্রধান অতিথি শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকারের ভাষণ 'নাটক ও বর্তমান বাঙালী জীবন' পাঠকদের কাছে এক বিশেষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবিচ্ছায়া', পুলিনবিহারী সেনের 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী' এবং দেবনারায়ণ গুপ্তের 'নায়িকা ও নাট্যমঞ্চ' পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করবে। এছাড়া লিখেছেন গোপাল ভৌমিক, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার সেনগুপ্ত, বর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন গুপ্ত, পরিমল

গোস্বামী এবং আরো অনেকে। আলবার কামুর একটি গল্প অনুবাদ করেছেন শম্ভু রক্ষিত।

●

[illegible] [মার্চ ১৯৬৯]—সম্পাদক ঃ নির্মল-কুমার দাস ও বরুণকুমার দাস। ১৪, [illegible] লেন, বালিগঞ্জ, কলকাতা—১৯ এবং ২, গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলকাতা ৬। দাম ঃ পঞ্চাশ পয়সা।

সাহিত্যের নতুন ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটির প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পারিপাট্যে সুন্দর। সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ "আসুন, আমরা কিছুটা এগিয়ে যাই বলয়ে বাঁধা ঘন্টার শব্দ করতে করতে। কবিতায় গল্পে উপন্যাসে তার প্রতিধ্বনি উঠুক। নিতান্ত শিথিল, নিষ্প্রাণ, আত্মকাম সাহিত্যের বিলাস ছেড়ে সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াই। আমাদের ছায়া তাদের চোখে-মুখে প্রতিফলিত হোক—তাদের নিঃশ্বাসে আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি।" এ সংখ্যায় লিখেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তকুমার, শৈবালকৃষ্ণ বসু, অশোক মজুমদার, বিজয় গঙ্গোপাধ্যায় (সদ্য পরলোকগত তরুণ কবি), শামা পাল চৌধুরী, মিলনকুমার দাস, বরুণকুমার দাস ও ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

●

অভিনয় দর্পণ (প্রথম বর্ষ ঃ বর্ষপূর্তি সংখ্যা)—প্রধান সম্পাদক ঃ ঋত্বিক ঘটক। ১৩২, হরিশ মুখার্জি রোড। কলকাতা—২৬। দাম ঃ তিন টাকা।

অভিনয় দর্পণের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করেছিলাম। এক বছর পূর্ণ হওয়ায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরাও আনন্দিত। প্রধান সম্পাদক লিখেছেন 'এইসব পত্রিকাকে সাধারণতঃ আগাছা বা ব্যাঙের ছাতা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। আমরা আমাদের এক বৎসরের জীবন দ্বারা প্রমাণ করিলাম যে, ইহা সত্য নহে।" এর সঙ্গে আমরাও একমত। আধুনিক নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভিনয় দর্পণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে আশা করি। এক বৎসরে এঁরা সাতটি পূর্ণাঙ্গ ও একুশটি একাঙ্ক নাটক প্রকাশ করেছেন। সব নাটকই একালের প্রতিষ্ঠিত ও তরুণ নাট্যকারদের রচনা। সুবৃহৎ বর্ষপূর্তি সংখ্যায় বিভিন্ন স্বাদের বারটি একাংক নাটক ছাপা হয়েছে। লিখেছেন নীলাব্জ দে, উৎপল ঘোষ, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, নিবেদিতা দাস, কিরণ মৈত্র, রঞ্জনকুমার ঘোষ, অমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় সেনগুপ্ত, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যে আছে বিদেশী নাটকের রূপান্তর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে একটি নাটক। আরো কয়েকটি আলোচনা এবং সংবাদ আছে। আশা করি অভিনয় দর্পণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যেতে পারবেন।

●

বৈতানিক (বৈশাখ ১৩৭৬)—সম্পাদক ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা) লিমিটেড—১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম এক টাকা মাত্র।

বৈতানিক সাহিত্যপত্রের নবম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি যথারীতি প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও নাটকে সমৃদ্ধ। এই সংখ্যায় 'গান্ধীবাদ ও দ্বান্দ্বিক আদর্শবাদ' লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটক প্রসঙ্গে ও ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন 'সাহিত্যতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের কৈশোর চিন্তা'। নাট্যকার সিনজ এবং গ্রীক নাট্যকার ইসকাইলাস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী। দেবপ্রসাদ সিংহ রচিত 'ধূর্জটিপ্রসাদ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক রচিত 'সংগ্রামী আধুনিক' প্রবন্ধটিতে স্টিফেন স্পেনডারের "দি স্ট্রাগল অব দি মডার্ন" নামক গ্রন্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের দুটি নাটক আছে। এছাড়া গলসওয়ার্দির একটি নাটক অনুবাদ করেছেন বিজন ঘোষ। এই সংখ্যায় একটি মাত্র মৌলিক কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কয়েকটি বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেছেন—গোপাল ভৌমিক, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি। সমীর রক্ষিত, তৃপ্তি বসু ও নির্মলেন্দু গৌতমের নতুন রীতির তিনটি গল্পও সুখপাঠ্য।

●

আন্তর্জাতিক আঙ্গিক (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)—সম্পাদক ঃ রাণী সরকার। ১৯০, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। কলকাতা—২৬। দাম ঃ এক টাকা।

চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। বিশ শতকের শিশুশিল্প অতি অল্পদিনে

নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বাঙলা ভাষায় অনেকগুলি চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'আন্তর্জাতিক আঙ্গিক' তার মধ্যে ব্যতিক্রম বিশেষ। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রবন্ধ এবং আলোচনায় পত্রিকাটির দাম বেড়ে গেছে। বর্তমান সংখ্যায় ফেদেরিকো ফেলিনি এবং আন্তোনিওনি-গোদার সাক্ষাৎকার দুটি মূল্যবান। জাঁ লুক গোদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বব কাচিং, সুনীত সেনগুপ্ত, দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও আলোচনা চলচ্চিত্র-উৎসাহীদের চাহিদা মেটাবে।

●

একাল [১ম-৩য় সংখ্যা]—প্রকাশক : ভরতকুমার সিংহ।। ২৪ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা-৩৭।। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

ছোটগল্পের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'একাল' আকারে-প্রকারেও ছোট। সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয়েছে : "সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে চ্যাংড়ামো শুরু হয়েছে। একাল চিরদিনই তার বিপক্ষে।" এ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ ও তিনটি গল্প লিখেছেন সুবন্ধু ভট্টাচার্য, সুধাংশুকুমার চৌধুরী, ভরত সিং, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ও নকুল মৈত্র। প্রায় ছাপান্ন বছর আগেকার লেখা একজন অ-নামা লেখকের একটি গল্প পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

●

সাম্প্রতিক [একাদশ সংকলন]—সম্পাদক কাননকুমার ভৌমিক। ৩৬ডি এইচ সি স্ট্রীট, কলকাতা ২৬। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

ধ্বংসকালীন আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে নাকি 'সাম্প্রতিক' প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমরা জানি না, তাঁরা কি ধ্বংস করতে চান, কেন ধ্বংস করতে চান। এ সংখ্যায় লিখেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কাননকুমার ভৌমিক, দীপেন রায়, অঞ্জন কর, শিশির সামন্ত, তুষার চৌধুরী, মৃণাল দত্ত, সুকোমল রায়চৌধুরী, অমিতাভ দাস, সত্যানন্দ মণ্ডল, প্রভাত চৌধুরী, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ এবং উদয়ন ভৌমিক।

মুক্ত মেঘ (২য় বর্ষ ৪র্থ সংকলন)—সম্পাদক তুহিনকান্তি দাশ, সিঙ্গাতলা লেন, মালদা।। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

কবি ও কবিতা-বিষয়ক এই ক্ষুদে আকারের পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে। কলকাতার উত্তাপ-উত্তেজনাকে দূরে রেখেও সম্পাদক আধুনিক মেজাজের কবিতা নির্বাচনে সতর্ক থেকেছেন। এ সংখ্যায় লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, নীরদ রায়, অমিতাভ দাস, তুহিন দাশ এবং আরো কয়েকজন। পত্রিকাটির মুদ্রণে ও প্রচ্ছদে বেশ মফস্বলী গন্ধ বরাবরের মতোই রয়ে গেছে।

●

তরুণের অভিযান (রবীন্দ্র সংখ্যা ১৯৬৯) —সম্পাদক : পিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়। ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড কলকাতা—২০। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

তরুণ কবিদের মৌলিক রচনা এবং অনুবাদ কবিতায় বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

সেদিন বইপাড়ায় একটি প্রখ্যাত প্রকাশন সংস্থার দফতরে দেখলাম সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন খোসগল্পে মেতে রয়েছেন। বিভূতিবাবুর সব সময়কার সঙ্গী ফোলিও ব্যাগটা কোলের ওপরেই রয়েছে। বিভূতিবাবুকে দেখেই একটা গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটা শুনেছিলাম মনোজ বসুর কাছে।

কাশী ছাড়িয়ে কোথায় এক সাহিত্যানুষ্ঠানে গিয়েছিলেন দুজনে। একই সঙ্গে ফিরছেন ট্রেনে একই কামরায়। ভীষণ খিদে পেয়েছে দুজনেরই। মনোজবাবু বিভূতিবাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, বিভূতিদা গাড়ি কখন হাওড়া পৌঁছবে ঠিক নেই। বুফে থেকে সুন্দর রান্নার গন্ধ আসছে, খেয়েনি।

কথা শুনে বিভূতিবাবু একেবারে হাঁহা করে উঠলেন, 'না না ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে বুড়ো বয়সে বাইরের রান্না খেয়ে জাত খোয়াতে পারব না।'

সেদিন ইচ্ছে করছিল বিভূতিবাবুকে শুধোই সে-কথা। তাঁর নিজের মুখে শুনি সেদিনের সেই ঘটনা।

বিভূতিবাবুর বিখ্যাত গ্রন্থ 'নীলাঙ্গুরীয়' নতুন মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

গত সপ্তাহে আশাপূর্ণা দেবীর দুটো উপন্যাস বেরিয়েছে। একটির নাম 'বিরহী বিহঙ্গ' অপরটির নাম 'দর্পণকের ভূমিকায়'। 'বিরহী বিহঙ্গ' দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখ ভালোবাসার কাহিনী। স্বামী ইঞ্জিনীয়ার অশোক মুখার্জি এবং তার স্ত্রী সুস্মিতা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে। দুজনেই চায় তাদের একটা ছেলেকে ঘিরে তাদের সংসার সুখের হয়ে উঠুক। কিন্তু কোথায় যেন সূক্ষ্ম চিড় দুজনেরই অজান্তে ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠে দুজনকে দুজনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, একই খাটে দুজনে শুয়ে আছে অথচ মাঝে অনেকটা ব্যবধান। মনে হচ্ছে দুজনে যেন স্বামী-স্ত্রী নয়, একই ট্রেনের যাত্রী।

লেখক বা লেখিকা জীবনে অনেক চরিত্র দেখে—দেখে তাদের সুখ-দুঃখ ভরা জীবন। মনে মনে তাদের কথা লেখবার প্রেরণা জন্ম নেয়। ইচ্ছে করে মহৎ কিছু লেখেন। কিন্তু হয়ে ওঠে না। কলম নিয়ে বসলেই সেইসব চরিত্রগুলো একের পর এক মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। জন্ম-যন্ত্রণায় কাতর লেখকসত্তার চমৎকার কাহিনী 'দর্পণকের ভূমিকায়' উপন্যাস।

'অভিশপ্ত সুন্দরবন' নামে রোমাঞ্চকর একটি বই বেরিয়েছে। লেখক বিশ্বনাথ বসু। কথায় বলে, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ এই হলো সুন্দরবন। জীবিকাসন্ধানী দরিদ্র মানুষের দল সুন্দরবনে যায়—মধু আনতে, কাঠ কাটতে। কেউ-বা ফিরে আসে। কেউ-বা আসে না। যায় নরখাদক ব্যাঘ্রের মুখে। হামেশাই পত্র-পত্রিকায় আমরা সে-খবর পাই। সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য, ব্যাঘ্র, হরিণ, পাখি, কুমির আর অসহায় মানুষদের লেখক এই গ্রন্থে জীবন্ত করে তুলেছেন। একটি সত্যি কাহিনীর সুন্দর আলেখ্য এই গ্রন্থ।

শক্তিপদ রাজগুরুর সর্ব নতুন উপন্যাস 'পরবাস'। মধ্যবিত্ত সমাজে যে কতো সমস্যা। অন্নের সমস্যা তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে ভালো হতে যাওয়ার পথে অজস্র বাধা। বিধবা পারুলও সংপথে থেকে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। সমাজ তাকে তার কর্তব্য করতে দেয়নি। সংসারে তার একমাত্র স্নেহের আশ্রয় ছিল তার শ্বশুর ভুবনবাবু। শেষে ভুবনবাবুই তাকে পথের নির্দেশ দিলেন। এক সময় যাকে পারুল ভালোবেসেছিল, যে আজও পারুলকে গ্রহণ করতে চায় সেই সুশান্তর হাতেই পুত্রবধূ এবং কন্যাপ্রতিম পারুলকে তুলে দিলেন। একটি জীবনের অপচয় রোধ করলেন ভুবনবাবু। সমাজের জটিল সমস্যার এক অনবদ্য আলেখ্য উপন্যাসটি।

যে কর্তা, সেই মানুষ, সেই ভগবান: এই উপলব্ধির মহৎ কাহিনী

যেতে দেরী হলো। তাই দ্বিধা ছিল, হয়ত আজ আর দেখা হবে না। কিন্তু কেন জানি না, তবু গিয়ে কড়া নাড়লাম তাঁর ঢাকুরিয়ার বেণী ব্যানার্জি এভিনিউ-এর বাড়িতে। নাম শুনে ভৃত্য উঠে গেল উপরে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে জানাল—বসতে বলেছেন, এখুনি আসবেন।

বাইরের ঘরের সোফায় বসে আমি লক্ষ্য করছিলাম আলমারিতে সাজান বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ। মালী ফুলদানিতে সদ্যতোলা ফুল সাজিয়ে রেখে গেল। ওই সাজানো ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মনে হতে লাগল আমার। আজকাল অধিকাংশ বাড়িতেই দেখি, ফুলদানিতে কৃত্রিম ফুলের বাহার। কিন্তু এখানে দেখ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। এই ব্যতিক্রম শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাহিত্যেও বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে। কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক দিকগুলোই তিনি তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলতে উৎসুক। কেবল মস্তিষ্কের নীরস চর্বণ নয়—হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রচিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যের ত্রিবেণী-তীর্থ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁকে দেখামাত্র মনের সংকোচভাবটা কেটে গেল। মুখের সেই স্মিত হাসির ভাবটা যেন মুহূর্তেই আপন করে নিল আমাকে। তিনিই প্রথম জিজ্ঞেস করলেন—

'কি জানতে চান, বলুন?'

আমি আমার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বললাম—'আপনার সম্প্রতি প্রকাশিত 'আমি কান পেতে রই' সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল আছে। সে সম্বন্ধেই কিছু জিজ্ঞেস করবো।'

'বলুন।' ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসিটি জড়িয়েই বললেন।

'এই বইটি রচনার পেছনে কি কোন বিশেষ প্রেরণা আছে?'

'প্রেরণা বিশেষ কিছু নেই। চিন্তাটা অনেক দিনের। প্রেসিডেন্ট কেনেডি যখন মারা যান, তখন আমি ছিলুম হরিদ্বারে। সেখানেই বইটির কল্পনা রচিত হয়।'

আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন—'অনেক দিন কাটতে পেরো বছর পনেরো ধরে চিন্তাটা ছিল মনে। একদিন একটা পুরানো ডায়েরীর মধ্যে এই বইয়ের নায়িকার কেবল নামটি খুঁজে পেলাম। তখন আমি চৈতন্য মহাপ্রভুর উপর একটি উপন্যাস রচনা করবো বলে হরিদ্বারে বসে পড়াশোনা করছিলাম। ডায়েরীতে নামটা পাবার পর মনটা চলে গেল সেদিকে।'

'আপনার এই বইটির রচনাভঙ্গিতে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। বইটির প্রারম্ভে আছে 'রচনা-ইতিবৃত্ত' আর শেষাংশে আছে 'পুনশ্চ ইতিকথা'। উত্তমপুরুষে রচিত। এর কাহিনীটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।' তিনি জানালেন। 'আরম্ভের অংশটায় কিছুটা কল্পনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু শেষাংশ একেবারে সত্যি। তখন আমার সংগে ছিলেন ভবানী মুখোপাধ্যায় ও সুমথনাথ ঘোষ।'

পাঠকের সুবিধার্থে প্রথমে 'রচনা-ইতিবৃত্ত' ও পরে 'পুনশ্চ-ইতিকথার' সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা যাচ্ছে। বছরটা ১৯২৬; সময়টাও—জুন মাসের মাঝামাঝি। গরমের ছুটি শেষ হয়ে আসছে, আর কটা দিন পরেই স্কুল খোলার কথা। ঠিক সেই সময় বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন লেখক মাত্র একশটি টাকা সম্বল করে। অবশ্য পালাবার তেমন কারণ ছিল না। যাই হোক, পালিয়ে প্রথমে গিয়ে উঠলেন দিল্লিতে। কয়েক দিনের মধ্যেই টাকায় টান পড়লো। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে উঠলেন গিয়ে বৃন্দাবনে। সেখানেই একদিন ঘটনাচক্রে পরিচয় হলো সুরোদি, কিরণবাবু আর তাঁদের সংগে। এঁদের কাহিনীই মূল উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

প্রশ্ন হতে পারে, কাহিনীটি এমন কি, যা লেখককে এত অভিভূত করেছিল? সাধারণ দৃষ্টিতে হয়ত তেমন কিছুই নয়, কিন্তু লেখকের সহৃদয় দৃষ্টিতে তার অন্তর্নিহিত রূপটি ধরা পড়েছে। একটি অতি দরিদ্র বৈষ্ণব দম্পতি ঘোষপাড়ায় সতীমার মেলায় গিয়ে কুড়িয়ে পায় একটি মেয়ে। তার পালক পিতা-মাতার একান্ত বাসনা সত্ত্বেও তার জীবনস্রোত সাধারণ ধরা-বাঁধা খাতে বইল না, তার বিচিত্র জীবন তাকে টেনে নিয়ে গেল সংগীতজগতে। অবশেষে বাজনদার পেশাদার কীর্তনীয়া হয়ে উঠল সে। কৃষ্ণপ্রেমের গান গাইতে গাইতেই সেই প্রেমের আস্বাদ পেল নিজের জীবনে, নিজের ভাগ্যে। এই কীর্তনীয়ার জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যর্থতা সাফল্য, প্রেম-বিরহ-বেদনার কথা বলেছেন লেখক এক আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে।' এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান—'উনিশ শতকের শেষ ভাগের নাগরিক জীবন সম্বন্ধে একটা আগ্রহ ছিল আমার অনেক দিনের। তখন কীর্তন দেওয়ার প্রথা ছিল আমাদের সমাজে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে কীর্তন দেওয়ার রেওয়াজটাই ছিল বেশি। সেই সময়ের একজন বিখ্যাত কীর্তনীয়া হলেন পান্না কীর্তনওয়ালী। এই সব কীর্তনীয়া দলে প্রায়শঃ দেখা যেত, হয়ত একজন বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে একজন পঁয়তাল্লিশ বছরের মানুষকে ভালবাসছে। তখনকার দিনে লোকেরা পঁয়তাল্লিশ বছরেই বুড়ো হয়ে যেত। এখনও অনেক চংং থাকে। আর হ্যাঁ, এই ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। এরকম একটি সত্যি কাহিনীকেই এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছি। কাহিনীটি অর্ধেক কল্পনা এবং অর্ধেক সত্যি। নায়িকা সুরোদির নামটা পাল্টে নিয়েছি। তবে তার আসল নামটাও কিন্তু বইয়ের মধ্যে আছে।'

সুরোদি অর্থাৎ সুরোবালার চরিত্রটি সত্যই বৈচিত্র্যে ভরা। উনিশ শতকের শেষ ভাগের সমাজজীবনের এমন একটি নিখুঁত চিত্র আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। উপন্যাসটির শেষের দিকে লেখক এই চরিত্রটির একটি মৌলিক বিশ্লেষণ করেছেন। এঁকেছেন সুরোবালার পরিবর্তনের ছবিটি। দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে সুরোবালার পরিবর্তন ঘটেছে। সে পরিবর্তনের দৈনন্দিন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন না থাকলেও, অনেক দিন পরপর নিজের দিকে চেয়ে, নিজের মনের চেহারাটা দেখতে পেয়ে, নিজের কথায়-বার্তায় আচরণে চমকে উঠেছে বৈকি। সবটা না হলেও সে পরিবর্তনের খানিকটা স্বীকারও করে নিয়েছে। রূপ-যৌবনের সংগে সংগে মনের সেই দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, লোভহীনতা আদর্শবাদ কোথায় মিলিয়ে গেছে। যে অর্থ সে দু'পায়ে ঠেলে চলে এসেছিল একদিন সেই অর্থ সম্বন্ধেই আজ ওর লোলুপতার শেষ নেই। আজ যেন জীবনকে সে নতুন

করে আঁকড়ে ধরতে চায়, চায় সে জীবন থেকে যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আদায় করে নিতে, সুখ ও বিলাস সম্ভোগ করতে। ক্রমশঃ সে উপলব্ধি করেছে, মানুষের মধ্যেই রয়েছে ভগবান। নিজের এই পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত সুরবালার কথার মধ্যেই পাওয়া যায়। সে বলেছে—"মুখে যতই বলি ভগবান ভরসা, বলার সময়ই কিন্তু মনে মনে একটা মানুষকে উপলক্ষ ঠিক করে রাখি। মানুষের মধ্যেই ভগবান—আমাদের শাস্ত্রও তাই বলে, সেই জন্যই ভগবান লীলা করতে মানুষের রূপ ধরে—আমাদেরও গুরু ধরতে হয়।...মানুষ মানে গুরু, মানুষ মানে ভগবান। চন্ডী- [illegible] উপরে মানুষ সত্য...সে ঐ মানুষই, ও'রা বলেন কর্তা। যে কর্তা সেই মানুষ, সে-ই ভগবান।...তাই আমিও এই মানুষটাকে ছাড়তে পারিনি, শুধু ভগবানের ভরসায়।"

উপন্যাসের মূল বক্তব্যও এই উক্তিটির মধ্যে জড়িয়ে আছে। লেখকও যেন এই উপন্যাসের মাধ্যমে এই কথাই বলতে চেয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইলে শ্রীমিত্র বললেন—

"হ্যাঁ, কর্তাভজা দলের সাধনতত্ত্ব এরকমই। এই গ্রন্থের আরম্ভে কর্তাভজা দল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। চন্ডীদাসও ছিলেন এ শ্রেণীর সাধক। এ'দের সাধনা মানুষ। আমার এই উপন্যাসে এই সাধনতত্ত্বই [illegible]"

এবার প্রসঙ্গান্তরে যেতে চেষ্টা করলাম। এর মধ্যে চা এসে গেছে। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলাম—"এই উপন্যাসটি যখন 'অমৃতে' ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছিল, তখন ঐ পত্রিকাতেই পাঠকের অনেক চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে দেখেছি। সেইসব চিঠিপত্র পড়ে কি আপনি প্রভাবিত হয়েছেন?"

এবার তিনি একটু কি যেন ভাবলেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাঁচটা মুছে আবার পরলেন। তারপর একটু মৃদু হেসে বলতে লাগলেন—

"এই বইটা লেখার সময় আমি খুব অ্যাবসর্বড হয়ে গিয়েছিলাম। তাই ইচ্ছে করেই তখন যেসব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তা পড়িনি। আসলে কি জানেন, তখন আমি সুরবালার প্রেমে মজে গিয়েছিলাম।"

"সুরবালার চরিত্রটি যে আপনাকে মুগ্ধ করেছিল, তার প্রমাণ বইয়ের মধ্যেই আছে।" আমি বলে চললাম—"বইয়ের শেষে আপনি লিখেছেন—বলতে গেলে তাঁর জীবনদর্শন, আমি এ উপন্যাসের কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারি নি। পারতুম, যদি এ বই আরও টানা যেত। এর থেকে মনে হয়, আপনি এ বিষয়ে আরো লিখবেন।"

আমার প্রত্যাশা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন—"না, এই বিষয় নিয়ে আর লিখবার ইচ্ছে নেই। লেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায়। এক বিষয় নিয়ে বেশি লিখতে গেলে তেমনি আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়।"

"এখন কি বিষয় নিয়ে লিখবেন বলে ভাবছেন?"

"একটা পৌরাণিক আর একটা অর্ধ-পৌরাণিক—এই দুই বিষয়ে গ্রন্থ লিখবো বলে ভাবছি। এ দুটো গ্রন্থই হবে খুব দীর্ঘ।"

"আচ্ছা, একই সঙ্গে খুব ছোট গল্প এবং দীর্ঘ উপন্যাস কিভাবে লেখেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না, এক সঙ্গে লিখিনি। প্রথম দিকে অজস্র ছোটগল্প লিখেছি। খুব আয়তন কখনও কখনও এক পাতা থেকে দু'পাতার মত। তখন বড় উপন্যাস লিখতে গেলেও হত না। আমার প্রথম বড় রচনা 'রাত্রির তপস্যা'। এরপর বড় লিখতে লিখতে এমন হয়েছে যে, ছোট লিখতে চেষ্টা করেও ছোট করা যায় না।

অনেক বেলা হয়ে গেল। তাই ইচ্ছে থাকলেও আর বসতে পারলাম না। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম। যে দ্বিধাজড়িত মনোভাব নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, লক্ষ্য করলাম, তার [illegible]মাত্রও এখন আর নেই।

—বিশেষ প্রতিনিধি

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[গ্রাম চেনবার নেশা ছিল বিকাশের। শহুরে যুবক প্রমোশন নিয়েই এল তাই পাড়াগাঁর ব্যাঙ্কে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্ককাকার বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। বিস্ময়ের আশ্রয়। মনীষা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত মনীষার, দ্বিতীয় উপস্থিতি।

চারদিকে টানাপোড়েন। চোরাবালি। ক্ষোভে ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছে সবাই। মূল্যবোধও বিপর্যস্ত। ঘুনপোকা।

বিকাশের সামনেও কানাগলি। মনীষার প্রতি হৃদয়ের রঙ। সোনালির প্রতিও একধরনের আকর্ষণ। স্বপ্ন।

মুক্তি চায় বিকাশ। নোংরা গ্রাম্য রাজনীতির আওতা থেকে, শশাঙ্ক নিয়োগীর বিবর থেকে। আশ্রয় চায় সে মনীষার।

আনতে হবে তাকে। বাঁধতে হবে ঘর। মনীষার চাকরির জন্যে চলে তাই উমেদারি।

মাঝে সোনালি। আরেক অধ্যায়।

রাত। বিবর্ণতার আলো। শুয়েছে বিকাশ। ঘরে চঞ্চল সুন্দু—সোনালি। স্বপ্নের আমেজ।

বিকাশের কণ্ঠে 'তোমাকে ভুলব না সুনু, তোমাকে ভোলা যায় না।'

সোনালির গালে এখন রঙ পড়ে। চোখে কেমন নির্ভরতার আলো। মায়াকন্যা। বিকাশের গভীরে দোলাচল। শাঁখের করাত। মনীষা আর সোনালি। এবার পালাতে চাইল নিয়োগী বাড়ি থেকে। কিন্তু যাবে কোথায় বিকাশ? ব্যাচেলরকে ঘর-ভাড়া দেবে কে? শেষ পর্যন্ত শরণ নিতে হল জাঁদরেল ব্যবসায়ী কানাই পালের।]

।। উনিশ ।।

বিরক্ত হয়ে টেলিফোনটা পাশে নামিয়ে রাখলেন কানাইবাবু।

'যেমন এক্সচেঞ্জ — তেমনি তার টেলিফোনের ব্যবস্থা! কোনো মানে হয় না একরাশ পয়সা দিয়ে এইসব টেলিফোন রাখবার।' তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু: 'অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি না?'

'না, বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচেক।'

'একটু বিশ্রাম নেই মশাই, কাজ আর ছাড়ে না!'—বলতে বলতে হঠাৎ উদাস হলেন কানাইবাবু: 'কখনো কখনো মনে হয় মশাই, এর চাইতে সেই গরীবের ছেলে হয়ে থাকলেই ভালো হত। সেই মূর্তি গড়া, সেই জাত-ব্যবসা। টাকা থাকত না হয় তো, সুখ থাকত।'

বিকাশ একটু কৌতুক বোধ করল। ভাগ্যবান লোকদের এই সব রোম্যান্টিক স্বগতোক্তি শুনতে মন্দ লাগে না। পোলাও খেয়ে অরুচি ধরে গেলে পান্তাভাত আর কাঁচা লঙ্কার স্বপ্ন। তাদের ব্যাঙ্কের এক কর্তা-ব্যক্তিকে মনে পড়ল। কথায় কথায় বলেছিলেন, 'ডু ইয়ু নো—আই স্টার্টেড মাই লাইফ অ্যাজ এ স্কুল-টীচার। তখন বাইরে ছিলুম দরিদ্র, কিন্তু হৃদয়ে? আই ওজ রিচার দ্যান এম্পেরার! কিন্তু এখন? ওহো—মাই সোল—আই হিয়ার ইট্স স্টার্ভড ক্রাই এভরি ডে!'

এই বলে, হৃদয়ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাত দেড়েক লম্বা একটি চুরুট ধরিয়ে— প্রকাণ্ড আমেরিকান মোটর গাড়ীতে চড়ে চলে গেলেন।

'ভূতের বোঝা মশাই, ভূতের বোঝা!'— কানাইবাবু আবার উদাস হয়ে অফিস-ঘরের দিকে চোখ বোলালেন: 'ভালো লাগে না—এত ক্লান্তি বোধ করি মধ্যে মধ্যে!'— তারপর বললেন, 'সে যাক—চলুন, চা-টা খাওয়া যাক।'

বাগানবাড়ী নয়, বসতবাড়ী। নতুন করা হয়েছে কয়েক বছর আগে। মোজেইক-করা চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বিকাশের মনে হল এ বাড়ীটা এখানে না হয়ে কলকাতার কোনো কুলীন পাড়ার হলেই মানাত ভালো।

দোতলায় উঠে সামনে মস্ত দক্ষিণের বারান্দা। দুটো সোফাসেট—চামড়া-বাঁধানো ছোট ছোট বসবার আসন। কালো কালো মেহগনি স্ট্যান্ডে ইতস্তত দু-তিনটি পাথরের মূর্তি।

'এখানেই বসা যাক—কী বলেন?'— কানাইবাবু বললেন, 'আজ তো ঠাণ্ডা নেই বললেই চলে, দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নাকি ঘরে বসবেন?'

'এখানেই ভালো।'

কানাইবাবু বসলেন, বিকাশ বসল। সামনে অনেকখানি ফাঁকা পেরিয়ে জ্যোৎস্না-মাখানো গাছের সার। হাওয়ায় আমের মুকুলের গন্ধ। একটা উজ্জ্বল নীলচে আলোয় ভরে আছে বারান্দাটা।

কানাইবাবু বললেন, 'বাড়ীতে আপনাকে চা খেতে বলেছি বটে, কিন্তু আমার গোটা ফ্যামিলিই এখন কলকাতায়। কারুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেওয়া গেল না।'

'সে পরে হবে অন্য সময়।'

'হ্যাঁ, পরেই হবে।' — কানাইবাবু হাসলেন: 'কিন্তু আপনাকে আসতে বলতেও আমার একটা ডেলিকেসি বোধ হয়। আপনার কাকা—'

আবার সেই বিরক্তিকর প্রসঙ্গটা।

বিকাশ বিরস মুখে বললে, 'উনি আমার আপন কাকা নন। ওখানে বরাবর থাকা আমার চলবে না। আপনি আমাকে একটা বাসা দেবেন বলেছিলেন, সেই জন্যেই—'

'ওঃ বাসা? তার জন্যে সঙ্কোচ করছেন কেন? আমি তো ভাড়া দেবই। আমার সরকারকে বললেই পারতেন, সেই ঠিক করে দিত।'

একটু চুপ করে থেকে বিকাশ বললে, 'শুধু তাই নয়। আর একটা অনুরোধ ছিল আপনার কাছে।'

দুজন চাকরের হাতে ট্রে-তে করে এল খাবার, টি-পট।

'আর একটা অনুরোধ?'—ভ্রূদুটো এক-বারের জন্যে জুড়ে এল কানাইবাবুর : 'আচ্ছা সে পরে হবে, এখন একটু চা খান।'

কেক আর সন্দেশগুলো কলকাতা থেকে কানাইবাবুর সঙ্গে এসেছে মনে হল। সন্দেশে ফ্রীজের শীতলতা।

'আরো দু-চারটে নিন মশাই। এই বয়েসে এত কম খেলে চলে?'

'মাপ করবেন, এর বেশি চলবে না।' চা শেষ করে সিগারেট ধরালেন কানাই-বাবু।

'কী অনুরোধ বলছিলেন?'

একবারের জন্যে প্রিয়গোপালের মুখটা মনে এল বিকাশের, অস্বস্তি বোধ হল একটু। ওরা বুর্জোয়া স্যার—ক্যাপিটালিস্ট। কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না—অ্যাভয়েড করবেন যতটা পারেন।

ননসেন্স। কোনো মানে হয় না।

তবু একটু চুপ করে রইল বিকাশ। মনীষার জন্যে চাকরির কথাটা কিছুতেই বলা যাচ্ছে না সহজভাবে।

কানাইবাবুর ভ্রূদুটো আবার জুড়ে এল এক মুহূর্তের জন্যে।

'কী অনুরোধ বলুন তো?'

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বিকাশ বললে, 'চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন একটা?'

'চাকরি?'—কানাইবাবু আশ্চর্য হলেন : 'কেন, ব্যাঙ্কের চাকরিতে অসুবিধে হচ্ছে নাকি আপনার?'

'আমার নিজের জন্যে নয়।'—বিকাশ একটু-একটু করে আত্মবিশ্বাস জমিয়ে তুলতে লাগল : 'একটি মেয়েকে—এখানে বা কাছাকাছি কোনো স্কুলে—' একবার থেমে বিকাশ কথাটা শেষ করল : 'মেয়েটি গ্র্যাজুয়েট, বি-এতে ম্যাথমেটিকস ছিল। এখানকার মেয়েদের স্কুলে একটা ভেকান্সি হতে পারে শুনেছি।'

কানাইবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন : 'আপনার রিলেটিভ?'

স্পষ্টগলায় বিকাশ বললে, 'না, আমার স্ত্রী।'

'আপনার স্ত্রী? আরো আশ্চর্য হলেন কানাইবাবু : 'বিয়ে করেছেন নাকি? আমি তো জানতুম, আপনি এখনো ব্যাচেলর।'

'আমার বোধ হয় বলতে একটু ভুল হল—' একটু কুণ্ঠিত হয়ে বিকাশ বললে, 'আমার ভাবী স্ত্রী। মানে, এখানে একটা চাকরির ওপরে বিয়েটা নির্ভর করে আছে।'

প্রয়োজনের কথাটা যখন বলতে আসাই হয়েছে, তখন নিজেকে নগ্ন করে দেওয়াই ভালো। কানাইবাবুর কাছে কোনো আড়াল রাখা যাবে না—রেখে কোনো লাভ নেই।

মিনিট খানেক পর্যবেক্ষকের তীক্ষ্ণ চোখে বিকাশের দিকে চেয়ে থাকলেন কানাইবাবু।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। যতদূর জানি, ব্যাঙ্কে তো আপনারা ভালো মাইনেই পান। আর এ-সব পাড়াগাঁয়ে তো মোটামুটি খরচ-খরচাও কম। এখানে এনেও মেয়েটাকে জুড়ে দেবেন কাজের জোয়ালে?'—কানাই-বাবুর স্বরে অপ্রসন্নতার ছায়া পড়ল : 'এ আপনাদের এক অদ্ভুত ক্যালকাটা-কালচার মশাই। ঘরের সুখ-শান্তি বলে আপনারা আর কিছু রাখলেন না—ঘরের মেয়েদের তাড়া দিয়ে অফিসে না পাঠালে স্বস্তি নেই আপনাদের।'

এই বাঁকা কথাটার এখুনি ধারালো জবাব দেওয়া যেত একটা। বলা যেতে পারত, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা চাকরি করতে বেরোয় ক্যালকাটা-কালচার হিসেবে নয়, পেটের দায়ে, বাঁচবার তাড়ায়। ঘরটাকে প্রাণপণে টিঁকিয়ে রাখবার জন্যেই হাজার-হাজার মনীষাকে তিলে তিলে ফুরিয়ে যেতে হয়। ট্রামে-বাসে যারা দু-বেলা অফিসে যাতায়াত করে, তাদের ক্ষুধিত-পীড়িত মুখের দিকে চেয়ে দেখবার সুযোগ কখনো কানাইবাবুরা পান না—বিকেল পাঁচটা-ছটা-সাড়ে ছটায় যে মেয়েরা গঙ্গার হাওয়ায় ক্লান্ত মাথা ভিজিয়ে অসাড় পা টানতে টানতে হাওড়া ব্রীজের ওপর দিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারীর ট্রেন ধরতে যায়—তাদের কানাইবাবুরা কখনো দেখেন নি।

কিন্তু চাকরির তদ্বির করতে এসে দুর্বিনীত হওয়া যায় না। ম্লান গলায় বিকাশ বললে, 'ঠিক ক্যালকাটা-কালচার নয়। চাকরিটা ওর দরকার।'

বিরূপভাবে একটু চুপ করে রইলেন কানাইবাবু।

'আপনাদের বিয়ের সঙ্গে চাকরিটার সম্পর্ক আছে কিছু?'

'আছে একটু। আপনি যা ভাবছেন তা নয়। চাকরিটার সঙ্গে আর একটা ফ্যামিলিও জড়িয়ে রয়েছে।' — কথাগুলো বলতে বিকাশ একটা তিক্ততা বোধ করছিল মুখের ভেতর : 'সব হয়তো এখন আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারছি না। কিন্তু যদি একটু হেল্প করেন—'

কানাইবাবু কী বুঝলেন তিনিই জানেন। সিগারেট শেষ করে গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রের ভেতরে।

বিকাশ আবার বলল, 'আমি হেড-মাস্টার কুমুদবাবুর সঙ্গেও কথা বলে-ছিলুম।'

'তিনি কী বললেন?'

'বললেন, শিগগীরই একটা পোস্ট খালি হতে পারে গার্লস স্কুলে।'

'আচ্ছা, দেখছি।'—কানাই পাল অফি-শিয়্যাল হয়ে উঠলেন : 'আপনার কাছে অ্যাপ্লিকেশন আছে?'

'একটা আশা যদি পাই—' বিকাশ শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বোলালো : 'তা হলে—দু-তিন দিন পরেই তো আমি কলকাতা যাচ্ছি, দরখাস্তটা নিয়ে আসতে পারি।'

'আনুন। করা যাবে একটা ব্যবস্থা।'

একটা ধন্যবাদ দেবে কিম্বা উচ্ছ্বসিত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবে, বিকাশ ঠিক বুঝতে পারল না। বরং নিজের এই দৈন্যের জন্যে একটা গ্লানি এসে ধীরে ধীরে তাকে ছেয়ে ফেলছিল।

কানাইবাবু একটু হাসলেন।

'আমি আপনার পজিশনটা ঠিক জানি না বটে, কিন্তু একটা চাকরির জন্যে যদি আপনার বিয়েটা আটকে থাকে, তা হলে সে ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে।'

প্রবৃত্তি ছিল না, তবু একটা বিশ্রী চাটুকারিতা বিকাশের মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল।

'আপনি ইচ্ছে করলে সব হতে পারে এখানে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতরটা আরো তেতো হয়ে গেল। কিন্তু নিজের জন্যে, মনীষার জন্যে এখন আর তার ফিরে যাওয়ার পথ নেই।

'সব হতে পারে?'—কানাইবাবু আবার মৃদু রেখায় হাসলেন : 'না—সব হতে পারে না। তবু একটু চেষ্টা করতে পারি—এই মা।' —হাসিটা ঠোঁটের দু-ধারে আর একটু ছড়ালো : 'যদিও আমি এখানে বিখ্যাত 'মিস্টার ব্যাডম্যান'—তবু আমাকে যতটা ভিলেন বলে শুনেছেন—হয়তো আমি তা নই।'

কে বলেছে আপনি মিস্টার ব্যাডম্যান? এইটেই এ অবস্থায় স্বাভাবিক বক্তব্য ছিল বিকাশের। কিন্তু এত বড়ো মিথ্যেটা কিছুতেই বলা গেল না। সেই যে মোক্তার পাল; সেই মাছের ভেড়ী—এগুলো সবই মায়া বলে ধরে ভাবা শক্ত।

'ক্ষমতা থাকলেই শত্রু থাকে—কী করবেন বলুন?' —কানাইবাবু যেন বিকাশকেই সান্ত্বনা দিলেন : 'সে যাক, যেতে দিন ওসব। দিন কয়েকের মধ্যে একটা দরখাস্ত এনে দেবেন আমার কাছে। তারপর দেখব আমি কী করতে পারি।'

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো। কৃতজ্ঞতা জানানোর জরুরতটা মনে এল এবার।

'আপনাকে কী বলে যে—'

এত
তৃপ্তিদায়ক

যেভাবেই
বলুন না কেন
ওতে বোঝায়
এস্‌কোয়ার

আজই
এক প্যাকেট
কিনে দেখুন

এস্‌কোয়ার
ফিলটার-টিপ্‌ড সিগারেট

গোল্ডেন টোবাকো কোং. প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই—৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

Greens' Advtg

'ধন্যবাদ জানাবেন? ওটা পরে। আগে চাকরিটা হয়ে যাক—এখুনি বাজে খরচ করবেন কেন?' কানাইবাবু প্রগল্ভ ভঙ্গিতে বললেন, 'চাকরির সঙ্গে সঙ্গে নীড়ও বাঁধবেন তো?'

'তাই তো ইচ্ছে।' —মাথা নামিয়ে বিকাশ জবাব দিলে।

'তা হলে বাসার ব্যবস্থা করে রাখব?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সামনের মাসে থেকেই। কিন্তু ভাড়া-টাড়া—'

'হবে, হবে, সব হবে। ওসব সরকার-মশাই করে দেবেন।'

'আপনাকে বিরক্ত করলুম—কোনো অপরাধ—'.

'খুব হয়েছে, আর ভদ্রতার দরকার নেই।'

'আজ চলি তা হলে—নমস্কার...'

কানাইবাবু উঠে এলেন। বললেন, 'চলুন, আপনাকে বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

'কোনো দরকার নেই, আমি যেতে পারব। আপনি বসুন।'

'চলুন মশাই—'

নিঃশব্দে সিঁড়ি পেরিয়ে, সদর দরজার সামনে এসে কানাইবাবু বললেন, 'একটা কথা বলব আপনাকে?'

'বলুন।'

'আপনার স্ত্রীর চাকরিটা কত দরকার, সে আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আপনার বিয়েটা যে একটু তাড়াতাড়িই করা দরকার—সেটা আমি বুঝতে পারছি।'

নমস্কার করবার জন্যে হাত জড়ো করছিল বিকাশ, চমকে হাত দুটো খুলে পড়ল। কানাইবাবুর গলার স্বরটা একটু অন্যরকম মনে হল।

'একথা কেন বলছেন আপনি?'

দরজার আলোয় একটা রহস্যময় হাসি দেখা গেল কানাইবাবুর মুখে।

'এমনি। হয়তো কোনো কারণ নেই! হয়ত ইনটুইশনও বলতে পারেন। আজ যদি না শুনতুম যে আপনার ভাবী স্ত্রী একজন রয়েছেন আপনার, তা হলে এই কথাটা হয়তো বলবার দরকারও হত না আপনাকে।'

সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ গলায় বিকাশ বললে, 'আপনি কিছু একটা বলতে চাইছেন মনে হচ্ছে।'

'কিছু না—কিছু না।'—এবার কানাই-বাবু বেশ উচ্চগলায় হেসে উঠলেন : 'পাড়াগাঁয়ের মানুষ মশাই, এত বয়সে পর্যন্ত আইবুড়ো রয়েছেন, ভাবতেই খারাপ লাগে। তাই উপদেশ দিচ্ছিলুম। যত তাড়া-তাড়ি পারেন, বিয়েটা করে ফেলুন। আমাদের একেবারে ফাঁকি দেবেন না, দু-একটা মিষ্টি-টিষ্টি যেন পাই। আচ্ছা—নমস্কার।'

আলোচনা থামিয়ে দিয়ে দু হাত জুড়ে নমস্কার করলেন, তারপরই চলে গেলেন বাড়ীর ভেতরে।

বিকাশ চলা শুরু করল বাড়ীর দিকে। চাঁদটা উঠেছে পেছনে। বিকাশের ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছিল সামনের দিকে। সে ছায়াটার সঙ্গে আরো একটা ছায়া এগিয়ে আসছে—এই কথাটাই ক্রমাগত মনে হল তার।

পঞ্চনদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে, দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে—' বিকট চিৎকারের আবৃত্তি থেমে গেল। তার-পরই শোনা গেল সমালোচকের বিদগ্ধ ভাষ্য : 'বাঃ বাবা, গুরু ফুকতে হবে না। শেষকালে মোগল সৈন্য বেণী ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবে আর কচাকচ সাবাড় করে দেবে। চাই—কালী। কালী, কালী মহাকালী—কালিকে কালরাত্রিকে—'

মেজদা। শশাঙ্ক নিয়োগীর বাড়ীর সামনে উঠোনে জোৎস্নার ভেতরে দাঁড়িয়ে। জটায়, দাড়িতে, দুটো বড়ো বড়ো চোখে চাঁদের আলো জ্বলছে—যেন শ্মশান-ভৈরবের মূর্তি।

একবারের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল বিকাশ। মেজদার দৃষ্টি পড়ল তার দিকে।

'তোর নাম বিকাশ না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' —লোকটাকে দেখে এখন আর ভয় করে না, বরং কৌতূহল আর সমবেদনা বোধ হতে থাকে। তার নিজের নামটা সম্পর্কে মেজদার এই প্রশ্ন ক'বার শুনতে হয়েছে—বিকাশ ভাবতে চেষ্টা করল।

'তুই বেহালা বাজাস?'

'বাজাই মধ্যে মধ্যে।'

হঠাৎ মেজদা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে এগিয়ে এল তার। একরাশ চিমশে দুর্গন্ধ ছেয়ে ফেলল বিকাশকে। বিকাশ সরে যেতে চাইল, পারল না। তার একটা হাত কড়া-পড়া কটা শক্ত আঙুলে চেপে ধরে মেজদা বললেন, 'খুন করতে পারবি?'

'সেকি।'

'না হলে বড়ো বাজিয়ে হবি কী করে?' —হঠাৎ মেজদা পাশবিকভাবে চেঁচিয়ে উঠল : 'সুনুকে খুন করবি নাকি রাস্কেল—ওর বুক ছিঁড়ে নাড়ী বের করে নিবি? তা হলে রাস্কেল—' আচমকা মেজদার থাবার মতো একটা হাত কতগুলো লোহার মত নখ নিয়ে বিকাশের গলার দিকে এগিয়ে এল; 'তা হলে—তা হলে তোর গলা টিপে আমি মেরে ফেলব।'

বাঘ কিংবা ভালুকের পাল্লায় পড়লে মানুষের কী অনুভূতি হতে পারে বিকাশের জানা ছিল না। কিন্তু ওই জান্তব দুর্গন্ধ, ওই থাবা, মুখের ওপর ওই কুৎসিত নিশ্বাস—ভয়ে বাকরোধ হয়ে গেল তার।

কী ঘটত বলা মুশকিল, এমন সময় বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়লেন শশাঙ্ক নিয়োগী। বাজের মতো চিৎকার ছাড়লেন একটা : 'মেজদা!'

মেজদার মুঠি খুলে গেল, থাবা নেমে এল। একটা ম্যাজিক ঘটে গেল যেন মুহূর্তের ভেতরে।

বিকাশকে ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিন পা পিছিয়ে গেল মেজদা।

শশাঙ্ক বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে এলেন : 'আবার বড় বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে তোমার—না? হতভাগা গাঁজাখোর কোথাকার। খাটে বেঁধে আচ্ছা করে না চাবকালে তুমি শায়েস্তা হবে না মনে হচ্ছে।'

'ওরে বাবারে, মেরে ফেললে রে। এবার আমার ধরে নিয়ে গিয়ে ঠিক বলি দেবে—' মেজদা ডুকরে কেঁদে উঠল, তারস্বরে। তারপরেই বাগানের ভেতরে টেনে দৌড়।

'এবারে হাত-পা বেঁধে এই নুইসেন্সটাকে রাঁচী কিংবা বহরমপুরে পাঠিয়ে দেব—সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে এলেন শশাঙ্ক : 'ওই গেঁজেলটা গায়ে হাত দিয়েছে নাকি তোমার?'

হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করছে তখনো। তবু বিকাশের মনে হল, মেজদা যে তার গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল এই কথাটা অন্তত শশাঙ্কের কাছে গোপন করা ভালো। না হলে চাবুকের চোটে মেজদার পিঠ আর আস্তো থাকবে না।

কাঁপা গলায় বিকাশ বললে, 'না—এমনি ভয় দেখাচ্ছিলেন।'

'নিশ্চয় আজ কোথা থেকে গাঁজা জুটিয়ে টেনেছে এক কলকে। নইলে, আমি বাড়ী থাকলে এত বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায় না। তোমার কাকিমার আবার নরম শরীর—সেইজন্যে এইরকম একটা পাবলিক নুইসান্সকে আমাকে বাড়ীতে পুষতে হচ্ছে মইলে—' শশাঙ্ককাকা একটু থামলেন : 'তুমি কিছু ভেবো না বাবাজী, আমি ওকে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে দেব। পালাবে কোথায়—খাবার সময় তো আসতেই হবে বাড়ীতে।'

'না-না, কিছু বলবেন না ও'কে—' বিকাশের মনে পড়ল মেজো জ্যাঠার কথায় কিভাবে সুনুর স্বর মমতায় ভরে ওঠে : 'উনি আমার কোনো ক্ষতি করেন নি।'

'সে দেখা যাবে।' —বিকট একটা মুখ-ভঙ্গি করে শশাঙ্ক বললেন, 'এই যে বনে-বাদাড়ে গিয়ে ঢুকল— সাপে-খোপে কেটে দিলেও বাঁচতুম। কিন্তু পাগলকে সাপেও কামড়ায় না—আশ্চর্য!'

সাপের এই অবিবেচনায় শশাঙ্ক-কাকাকে বেশ করুণ করুণ মনে হল।

বললেন, 'যেতে দাও ও-সব। এসো ভেতরে। আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম এতক্ষণ। একটা দরকার আছে তোমার সঙ্গে।'

'বলুন।'

'এসো, বসছি।'

বাইরের সেই ঘরটায় চৌকিতে খাতাপত্র রেখে কি সব হিসেবপত্র বোধহয় লিখছিলেন শশাঙ্ক। দেওয়ালের ছবিগুলো লণ্ঠনের আলোয় আবছায়া। কোনায় ছাতাগুলো কতগুলো জটলা বাঁধা মানুষের মতো। ভাঙা আলমারিটার পাশে ছায়া। নতুন চুনকাম থেকেও দেওয়ালে কোনো গন্ধ। শীতের আভা মেশানো দক্ষিণের হাওয়ায় সুধাময়ী দেবীর সন্ন্যাসী প্রদত্ত মাদুলীর খাম দুই বিজ্ঞাপন ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

শশাঙ্ককাকা বললেন, 'বোসো। একটু কথা আছে।'

একটু আগেই গিয়েছিল কানাই পালের কাছে মনীষার চাকরির জন্যে তাগিদ করতে। অর্থাৎ এই মাত্র সে ফিরে আসছে শশাঙ্কের শত্রুশিবির থেকে। তা ছাড়া যে সন্ধ্যায় শশাঙ্ক কাকিমার গায়ে হাত তুলেছিলেন, সেই রাত থেকে এই লোকটার মুখের দিকে সে চাইতে পারে না, তার গায়ে কিলবিল করে যেন একটা বিশ্রী পোকা উঠে আসছে এইরকম মনে হয়। কী বলবেন শশাঙ্ককাকা? মেজদার হাতে সেই ভয়ের চমকটা কেটে গেছে—কিন্তু অনিশ্চিত অস্বস্তিবোধ হচ্ছে এখন।

বিকাশ চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। শশাঙ্ককাকা লণ্ঠনের পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তুমি কলকাতায় যাবে নাকি শিগগীরই?'

'হাঁ দু-তিন দিন পরেই একবার যাব। তিন-চার দিনের ছুটি নিয়ে।'

'তবে তো ভালোই হল। তোমাকে একটা অনুরোধ করব বাবাজী। একটু উপকার করতে হবে।'

'বলুন না।'

'তোমার ওপর একটু উপদ্রব হবে হয়তো— 'চৌকিতে পড়ে থাকা একটা পায়রার পালক কুড়িয়ে নিয়ে, মুখটা একটু বেঁকিয়ে একটা কান কিছুক্ষণ চুলকে নিলেন শশাঙ্ক: 'মানে—যদি খুব অসুবিধে বোধ না করো, তা হলে সুনুকে এই ক'দিনের জন্যে তোমার সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব।'

সুনুকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। বুকের ভেতরে খানিকটা রক্ত চলকে পড়ল বিকাশের।

'বেড়াতে?'

'না বাবাজী, বেড়াতে নয়। গরীব গেরস্ত—পয়সা খরচ করে কলকাতায় মেয়েকে বেড়াতে পাঠাব, এমন সখ আমার নেই। তুমি যদি সময় করে একজন ডাক্তারকে দিয়ে মেয়েটার চোখটা একটু দেখিয়ে দাও, বড্ডো ভালো হয় তা হলে।'

'কী হয়েছে চোখে?'

'মাত্রে পড়াশুনো করতে পারে না। প্রায়ই জল পড়ে চোখ দিয়ে। মাথা ধরে।'

'চোখ খারাপ হয়েছে বোধ হয়।'

'খুব সম্ভব।' —এবার ব্যাজার মুখটাকে আবার বাঁকিয়ে নিয়ে পায়রার পালক দিয়ে আর একটা কান চুলকোতে লাগলেন শশাঙ্ক: 'কিন্তু কী মেয়ো মশো দোষ। এখন চশমা দাও—ঝ্যাসো করো, ঝ্যাসো করো। মেয়ে তো চশমা চোখে দিয়ে ফ্যাশন করে বেড়াবেন, এদিকে আমার খরচান্ত।'

'ফ্যাশন বলছেন কেন। চোখ খারাপ হলে চশমা তো নিতেই হবে—' বিকাশ হাসল: 'কিন্তু এখানে কোনো চোখের ডাক্তার নেই কি? তাঁদেরও তো দেখাতে পারেন।'

'আরে ডাক্তার থাকবে না কেন? কিন্তু সেগুলো আবার ডাক্তার নাকি? কিছু মনে কোরো না বাবাজী, প্রভাকর তোমার বন্ধু—কিন্তু এখানকার সব ডাক্তারেরা ওর দলের—মানে ভেটিরিনারী সার্জন, গরু-ঘোড়ার চিকিচ্ছে করতে পারে, মানুষের নয়।'

বিকাশ চুপ করে রইল। শশাঙ্ক আবার বললেন, 'এখানকার ডাক্তার—হুঁ! চোখ দেখাতে নিয়ে যান অ্যাসিড-ফ্যাসিড ঢেলে দেবে চিরকালের মতো কানা করে। শেষকালে একটা অন্ধ মেয়ে গলায় বেঁধে আমি সাগরে ডুবে মরি কি!'

'আজ্ঞে তা কি সম্ভব?'—বিকাশ আপত্তি করল: 'তাঁরা ডাক্তার, পাগল নয় তো।'

'পাগল নয় হে, ভিলিয়ান-ভিলিয়ান। ('ভিলেনকে ভিলিয়ান বলা হল খুব সম্ভব) তুমি এ সব পাড়াগেঁয়ে লোককে জানো না— একেবারে ডেঞ্জারাস। তুমি যাওয়ার সময় মেয়েটাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যাও, বড়ো উপকার হয় আমার। আর থাকবে তোমাদের বাড়ীতে—তোমার মায়ের কাছে, সে তো আমাদের নিজের বাড়ী হে। তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক যে ছিল সে তো আর তুমি জানো না।'

'আপনিও সঙ্গে চলুন না, কাকা।'

'আমি। আমার সময় কোথায় হে! একা মানুষকে যে কতদিক সামলাতে হয় সে তুমি কী বুঝবে বাবাজী! একটা বড়ো ছেলে যদি থাকত তা হলেও কথা ছিল, কিন্তু লাইন দিয়ে জন্মালো এক দঙ্গল মেয়ে—পর পর তিনটে। কিছু ভেবো না হে, তুমি আমাদের ঘরের ছেলে, তোমার সঙ্গে যাওয়া যা, আমার সঙ্গেও তাই। যদি একটু অসুবিধে হয়ও—মেয়েটাকে একটু কষ্ট করে সঙ্গে নিয়ে যাও বাবাজী।'

সুনু—সুনু তার সঙ্গে কলকাতায় যাবে। একটা ট্রেনের কামরা, একটি রাত—কলকাতায় তিনটে দিন। ছেলেমানুষ সুনু কলকাতা চেনে না, তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা-ওটা দেখাতে হবে। বিকাশের ভাবনার ওপর একটা মিষ্টি স্বপ্নের জাল ছড়িয়ে যেতে লাগল। আর—এই স্বপ্নের মধ্যে তার একবারও মনে পড়ল না যে আসলে কলকাতায় চলেছে মনীষাকে ডাক্তার দেখাতে, এখানকার স্কুলমাস্টারির জন্যে তাকে রাজী করাতে, তার কাছ থেকে একটা দরখাস্ত লিখিয়ে আনতে, আর—আর কানাইবাবুর কাছ থেকে একটা ছোট বাসা ভাড়া নিয়ে সেখানে নীড় বাঁধতে।

মাথা নামিয়ে, মৃদু গলায় বিকাশ বললে, 'আচ্ছা—নিয়ে যাব।'

(ক্রমশ)

মানুষগড়ার ইতিকথা

সোসাইটি অফ জেসাসের সদস্যদের সংক্ষেপে বলা হয় জেসুইট। ষোড়শ শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক এই সংস্থাটি স্থাপন করেছিলেন স্পেনের সেন্ট ইগনা-সিয়াস অফ লায়োলা। প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধর্মদূত প্রেরিত হল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। সেই উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন ফাদার ফ্রানসিস জেভিয়ার। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে। জাতে ফরাসী জেভিয়ার হলেন ভারতে প্রথম জেসুইট মিশনারী। গোয়াকে হেড কোয়ার্টার করে প্রায় দশ বছর পশ্চিম ভারতে ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন ফাদার। এই ব্যস্ততার মধ্যেই দূর প্রাচ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁকে রওনা হতে হয় উপর মহলের নির্দেশে। পরবর্তীকালে এই মহান ধর্ম-প্রচারক ক্যাথলিক ধর্মের একজন সেন্টের পর্যায়ে উন্নীত হন।

জেভিয়ারের নির্দেশে গোয়া থেকে জেসুইট মিশনারীরা ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন পর্তুগীজ। কিন্তু ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মিশনারীরা আসতে থাকেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। দেখতে দেখতে ইংরেজ, আইরীশ, ফরাসী বেলজিয়ান মিশনারীতে এ দেশ গেল ছেয়ে। তাঁদের চোখে ইন্ডিয়া, বিশেষ করে বেঙ্গল তখন 'এলডোরাডো।' ধর্মপ্রচারের সোনার সুযোগ ছড়িয়ে আছে এদেশের পথেঘাটে। শুধু সুযোগ বুঝে মানুষগুলোর কানে তুলে দাও স্বর্গীপুত্রের বাণী। এই উদ্দেশ্যেই উনিশ শতকে এসেছিলেন উইলিয়াম কেরী, আলেকজান্ডার ডাফ।

গত শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাসে এক আশ্চর্য যুগ। তখন ধর্মীয় ও শিক্ষা আন্দোলনের তীব্র জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস মানুষের মন থেকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমন্ত বাঙালীর চোখ থেকে ঘুম গেছে উবে। গোটা দেশটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌ-ভাণ্ডার সঞ্চয়নে। কলকাতায় তখন প্রায় প্রতিদিনই একটি করে নতুন স্কুল গড়ে উঠছে। এদেশে শিক্ষার প্রসারে বিদেশী মিশনারী, বিশেষ করে প্রোটেস্টান্টদের ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

ক্যাথলিকরাও পিছিয়ে ছিলেন না। গোটা ভারতে তখন কোন ক্যাথলিক স্কুল বা কলেজ ছিল না। ১৮৩৩ সালে কলকাতার ক্যাথলিক বাসিন্দারা পোপের কাছে আবেদন পাঠালেন—কলকাতায় ক্যাথলিকদের সন্তানদের পড়ানোর জন্য একটা স্কুল খোলা হোক এবং তার জন্য পাঠানো হোক ইংরেজ বা আইরীশ মিশনারীদের। পোপ অনুরোধ রাখলেন।

১৮৩৪ সালের অক্টোবরে ডকটর রবার্ট সেন্ট লেজার একদল ইংরেজ জেসুইট নিয়ে কলকাতায় এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সিস চ্যাডুইন ও রিচার্ড সামনার।

লোকজন এসে যেতেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। কলকাতায় ক্যাথলিকদের জন্য স্কুল খোলা হবে। নাম না জানা দুজন ক্যাথলিক ব্যবসায়ীর দানে সেদিন স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। একজন স্কুলের জন্য তাঁর পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে দিলেন। অন্যজন এগিয়ে এলেন তাঁর সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার নিয়ে স্কুল পরিচালনার ব্যয়নির্বাহের জন্য। ১৮৩৫ সালের ১ জুন স্কুল শুরু হল। ভারতে আগত প্রথম জেসুইট মিশনারীর নামে নামকরণ হল ভারতের প্রথম ক্যাথলিক স্কুলের—সেন্ট জেভিয়ারস কলেজ। স্কুলের প্রথম রেক্টর নিযুক্ত হলেন ফ্রান্সিস চ্যাডুইক।

ক্যাথলিক ছাত্রদের স্বধর্মের শিক্ষা-গুরুর কাছ থেকে চরিত্রগঠনোপযোগী ধর্মীয় ও উদার শিক্ষা লাভ করাই ছিল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। ক্যাথলিক ছাত্রদের পাশাপাশি অন্য ধর্মের ছাত্রদের কাছেও খোলা ছিল স্কুলের দরজা। গত একশ চৌত্রিশ বছর ধরে সেন্ট জেভিয়ারস কলেজ ও স্কুল এই উদ্দেশ্য নিষ্ঠাভরে পালন করে এসেছে।

উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য গোড়া থেকেই কর্তৃপক্ষের কড়া নজর ছিল শিক্ষা-পদ্ধতির উপর। বারোজন ইউরোপীয়

সেন্ট জেভিয়ারস কলেজিয়েট স্কুল

ডিরেক্টর দিয়ে গড়া একটি মিশনারী সংস্থার উপর ছিল স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব। ডিরেক্টররা সর্বদাই স্কুলে থাকতেন। ছাত্রদের রাখা হত চোখে চোখে। সে যুগে ছাত্রদের একটা বড় অংশ ছিল আবাসিক। কখনো কোন ছেলে বেড়াতে বেরুলে সংগে যেতেন একজন করে ফাদার সুপিরিয়র। কারুর বাড়িতে যেতে দেওয়া হোত না ছাত্রদের। এমন কি আগে থেকে গার্জেনের লিখিত অনুরোধ ছাড়া অন্য কেউ স্কুলে এসে ছাত্রদের সংগে দেখা করতে পারত না। নির্দিষ্ট মাসিক ছুটির দিন ছাড়া ছাত্রদের বাড়ি যাওয়ার উপায় ছিল না। ছুটির দিনে বাড়ি যেতে দেওয়া হোলেও রাত কাটানোর অনুমতি দেওয়া হোত না। ভোরে জলখাবার খেয়ে তারা বেরিয়ে পড়ত, সন্ধ্যে হওয়ার আগেই ফিরে আসতে হোত স্কুলে। স্কুল থেকে বাড়ি ও বাড়ি থেকে স্কুল আসার সময় তাদের সংগে সংগে যেতেন একজন ফাদার।

সাত বছরের কমবয়েসী ছেলেদের নেওয়া হোত না স্কুলে। বোর্ডার ছাত্রপিছু মাস মাইনে ছিল পঁচিশ টাকা। এ ছাড়া, স্কুলের বইপত্র, জামাকাপড়, কাচাকাচি, ওষুধপত্রের ফি আলাদা। ছবি আঁকা বা গান শিখতে গেলে আলাদা ফি দিতে হত। আবাসিক ছাত্রদের বাড়ি থেকে আনতে হোত একপ্রস্থ গরম পোশাক, দেড় ডজন হাল্কা পোশাক, সার্ট ও মোজা; এক ডজন তোয়ালে ও রুমাল, দু জোড়া জুতো। একটা খাট, দু'খানা বেডসিট, ও একটি বিছানার চাদর। নিয়ম বড় কড়া, কোন আইটেম কম পড়লে গার্জেনকে জরিমানা দিতে হত।

এত কড়াকড়ির মধ্যেও বছর বছর ছাত্র বেড়ে চলল স্কুলের। পুরোনো বাসায় আর কুলোয় না। তাছাড়া মুরগীহাটার পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। তাই তিন বছর পরে স্কুল উঠে এল তিন নম্বর পার্ক স্ট্রীটে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এখানেও জায়গায় টান ধরল—ছাত্র বেড়ে গেছে প্রচুর। তাই ১৮৪১ সালে স্কুল বাইশ নম্বর চৌরংগীর বাড়ি কিনে উঠে এল। এই বাড়ির জায়গায় আজ দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় যাদুঘর।

ছ' বছরে তিনবার বাড়ি পাল্টেছে স্কুল। অনেক ছাত্র বেড়েছে। এর কারণ স্কুলের সুনাম। তখন স্কুলে পড়ানো হোত গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজী, ইতিহাস ও অংক। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পুজোর ছুটির আগে অ্যানুয়াল এগজা-মিনেশনের সময় কলকাতার ভাবৎ জ্ঞানী-গুণী উপস্থিত হতেন স্কুলে। পড়ানোর মাধ্যম ছিল ইংরেজী। সে যুগের ইংলিশ-ম্যান পত্রিকায় বছর বছর স্কুলের পড়ানো ও পরীক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরুত।

এত সুনাম সত্ত্বেও স্কুল কিন্তু বেশী দিন চলল না। প্রতিষ্ঠার পর দু যুগও পেরোয়নি, স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থা টলমল করে উঠল। তখন কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হয়ে এসেছে। সিপাহী বিদ্রোহ মিটে গেছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন ভারত সাম্রাজ্যের ভার। ঠিক সেই সময়ে কলকাতার একটি নামকরা থিয়েটার বাড়ি নীলামে বিক্রি হয়ে গেল। সাঁ সুশি থিয়েটার সে যুগের ধনী ইউরোপীয়দের আমোদপ্রমোদের কেন্দ্র। মিসেস লীচের অভিনয় ও নাচ দেখার জন্য গোটা ইউরোপীয় কলকাতা তখন ভেঙে পড়ত পার্ক স্ট্রীটে। হঠাৎ একদিন পাদপ্রদীপের আলোয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল কলকাতার রঙীন প্রজাপতি মিসেস লীচ। সেই সংগে চিরদিনের মত যবনিকা নেমে এল সাঁ সুশি থিয়েটারে। খুব সামান্য টাকায় নীলামে থিয়েটার বাড়ি ডেকে নিলেন সে যুগের কলকাতার আইরীশ ক্যাথলিকদের নেতা পাদ্রী কেরু। ইচ্ছা ছিল ক্যাথলিক ছাত্রদের জন্য একটা স্কুল খুলবেন। নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেল স্কুলের সেন্ট জনস কলেজ। আটজন পাদ্রী নিয়ে স্কুল চালানো হবে বলে ঠিক হয়ে গেল। সে সময় চৌরঙ্গীর সেন্ট জেভিয়ারস কলেজের প্রায় উঠে যাওয়ার যোগাড়। ইংরেজ মিশনারীরা তখন দেশে ফিরে যাচ্ছেন।

ইংরেজ আইরীশ ঝগড়া যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তাই একই সম্প্রদায়ের লোক হয়েও প্রায়-উঠে-যাওয়া কলেজের সাহায্যে না এগিয়ে কেরু স্থির করলেন কলেজ খুলবেনই। কিন্তু কেরুর মনোবাসনা পূর্ণ হয় নি। কাজ শুরু হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। তখন চৌরঙ্গীর কলেজও বন্ধ হয়ে গেছে, পার্ক স্ট্রীটের সাঁ সুশি থিয়েটারে সেন্ট জনস কলেজ শুরু হয় নি।

কলকাতার ক্যাথলিক সম্প্রদায় তখন নিরুপায় হয়ে আবার আপীল পাঠালেন রোমে, পোপ ষোড়শ গ্রেগরীর কাছে—জেসুইটদের পাঠাও, স্কুল বাঁচাও। সোসাইটি অফ জেসাসের তখন জেনারেল ছিলেন একজন বেলজিয়ান। তাঁরই নির্দেশে একদল বেলজিয়ান জেসুইট কলকাতায় এলেন ভাঙা স্কুল গড়ে তোলার জন্য।

বেলজিয়ানদের চেষ্টায় ইংরেজদের হাতে গড়া স্কুল আইরীশ পাদ্রীর নীলামে কেনা থিয়েটার আবার চালু হল—১৬ জানুয়ারী, ১৮৬০। প্রথম বছরে চল্লিশটি ছেলে পড়ত এই স্কুলে। থিয়েটার হলটাকে সামান্য মেরামত করে স্কুলের উপযোগী করা হল। স্কুলের রেক্টর তখন ফাদার এইচ, ডেপেলচিন। এগারোবছর রেক্টর হিসাবে কাজ করে ডেপেলচিন কলেজ ও স্কুলের সুদৃঢ় বনিয়াদ গড়ে তোলেন। এগারো বছরে এগারোটি দিনও বোধহয় বিশ্রাম পান নি ফাদার ডেপেলচিন। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেও ছাত্রসংখ্যা বিশেষ বাড়াতে পারলেন না দেখে একটা নতুন উপায় ঠাওরালেন রেক্টর। সে সময় প্যাসেঞ্জারের অভাবে একটা ব্রিটিশ কোম্পানীর বাসের ব্যবসা লাটে ওঠে। ডেপেলচিন কোম্পানীর কাছ থেকে মাত্র চারশো টাকায় তিনখানা ঘোড়ার টানা বাস কিনে নিলেন। বাস-গুলোর গায়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হল। সকাল সন্ধ্যা কলকাতার রাস্তায় চলন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে ফিরতে লাগল কলেজের বাস। ফলও পাওয়া গেল হাতে হাতে। কলেজ দ্বিতীয়-বার খোলার তৃতীয় বছরে যেখানে ছাত্র ছিল মোটে নব্বই পাবলিসিটির দৌলতে দু' বছর যেতে না যেতে ঐ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল একশো নব্বইয়ে। ছাত্রসংখ্যা বাড়ল, সেই সংগে ১৮৬২ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানোর অনুমতি পেয়ে স্কুলের প্রেসটিজও বেড়ে গেল অনেক।

ডেপেলচিনের আমলে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি সারা শহরে স্কুলের সুনামও ছড়িয়ে গেছে। ১৮৬৬ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হন এই স্কুলেরই ছাত্র আর, ডীফহোল্টস।

এগারো বছর সুনামের সংগে দায়িত্ব পালন করে ডেপেলচিন যার হাতে স্কুল তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন তাঁকে আমরা চিনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জনক বলে। ফাদার ইউজীন লাফো ছিলেন বর্ন টিচার—ফিজিক্স তাঁর সাবজেক্ট। একটানা আট বছর তিনি রেকটর হিসাবে কাজ করেছেন সেন্ট জেভিয়ার্সে। সাঁ সুশি থিয়েটারে জায়গায় কুলোত না বলে পাশের এগারো নম্বর পার্ক স্ট্রীটের জমি কিনে সেখানে একটা পেল্লায় কমপাউন্ডওয়ালা দোতলা বাড়ি বানানো হল। এই স্কুল ও কলেজ ছিল লাফোর প্রাণ। কলেজে মান-মন্দির বসানোর জন্য নিজের সঞ্চয় থেকে একুশ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন লাফো। কলেজের গবেষণাগার তাঁর নিজের হাতে তৈরী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রেই তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান কালটিভেশন ফর সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সংগে। এই বন্ধুত্ব ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক কোণ-শিলা।

টার্ম শেষ হয়ে গেলে রিটায়ার করলেন লাফো। তখন শুধু স্কুলের ছাত্রসংখ্যাই প্রায় সাড়ে চারশো। তাঁর সময়ে, তেয়াত্তর ও চুয়াত্তর সালে এনট্রান্সে আবার সেন্ট জেভিয়ার্সের ছেলে ফার্স্ট হল—এস, ক্যারেল ও সি, সান্ডার। ঠিক এই সময়ে চীৎপুরের ঠাকুরবাড়ি থেকে একটি ছেলে এসেছিল সেন্ট জেভিয়ার্সের স্কুল ডিপার্টমেন্টে পড়তে। স্কুলের পুরোনো ক্যালেন্ডার ঘাটলে আজও সেই ছেলেটির নাম খুঁজে পাওয়া যায়। ছেলেটি পড়ত ফিফথ ইয়ার ক্লাসে। নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। খুব অল্প-দিনই স্কুলে পড়েছেন। কিন্তু এই অল্প সময়েই যে মানুষটি কিশোর কবির মনে দাগ কেটেছেন তাঁর কথা কবি কখনো বিস্মৃত হননি। ইংরেজী উচ্চারণ ভাল ছিল না বলে ফাদার এ, ডি' পেনেরান্ডাকে ক্লাসের অন্য ছেলেরা আমলই দিত না। ছেলেদের শত অপরাধেও এই বিদেশী মিশনারীটি কোনদিনও বিচলিত হন নি। শিক্ষকের শান্ত, ধীর মুখ জুড়ে যে প্রশান্তি ছড়ানো ছিল, সে ছবি পরিণত বয়সেও কবি ভুলতে পারেন নি। জীবন-স্মৃতির পাতায় অমর করে গেছেন কবি তাঁর পুরোনো শিক্ষকের স্মৃতিটুকু।

এই স্মৃতিই তাঁকে আবার ফিরিয়ে এনেছিল স্কুলের ফেলে আসা দিনের বন্ধুদের মাঝে। ১৯২৭ সাল। প্রাক্তন ছাত্র

সংস্থা উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে পড়েছে ঝিমিয়ে। সকলের অনুরোধে বিশ্বকবি রাজী হলেন সংস্থার সভাপতি হতে। নিজের সাইনড ফটোগ্রাফ সংস্থার সেক্রেটারীর হাতে তুলে দিতে গিয়ে কবির বিশাল আয়ত চক্ষু দুটি ছলছল করে ওঠে। হয়তো তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল প্রায় সত্তর বছর আগে হারিয়ে যাওয়া কোন এক আনন্দঘন স্মৃতি। সে স্মৃতির সরনী জুড়ে দাঁড়িয়ে একটি আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক—ফাদার এ. ডি' পেনেরাণ্ডা।

লাঁফো নিজে কি ভুলতে পেরেছিলেন তাঁর রক্তে গড়া স্কুল ও কলেজের কথা। গত শতাব্দীর এক বিষণ্ণ অপরাহ্নে যে দায়িত্বভার উত্তরসূরীর হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন, নতুন শতাব্দীর শুরুতে দীর্ঘ তেইশ বছর পরে জীবনের অপরাহ্নে সেই দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ফিরে এলেন পুরোনো থিয়েটার বাড়িতে। এই থিয়েটারে তাঁর জীবননাট্যের প্রধান অঙ্কটি অভিনীত হয়েছে—শেষ অঙ্ক অভিনয়ের পালাও অনুষ্ঠিত হল এখানেই। ততদিনে স্কুলের চেহারা গেছে অনেক পাল্টে।

মাঝে ১৮৮৫ সালে স্কুলের রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মজার ব্যাপার সোসাইটি অফ জেসাস এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ মিশনারীদের ঐতিহ্য বেলজিয়াম মিশনারীরা কোনদিনই স্বীকার করেন নি। স্বীকার করলে রজতজয়ন্তী উৎসবের পরিবর্তে সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হত। যাক সে কথা।

স্কুলের পঁচিশ বর্ষ পূর্তি উৎসবের আগেই জায়গার অভাবে সাময়িকভাবে বাড়ি পাল্টাতে হয়েছিল। স্কুল কলেজ মিলিয়ে আটশো ছাত্রের জায়গা হয় না থিয়েটার বাড়িতে। তাই কলেজ ও স্কুলের একটা বড় অংশ উঠে গিয়েছিল ২৮৮ বৌবাজার স্ট্রীটে। স্থান পরিবর্তনে কলেজ লাভবান হলেও, স্কুলের কোন উপকার হয় নি। জায়গার অভাবেই তখন কথা উঠেছিল কলেজ ডিপার্টমেন্টের জন্য জানবাজারে আজ যেখানে ওয়েভারলি ম্যানসন দাঁড়িয়ে আছে ঐখানে একটা নতুন বাড়ি তোলা হবে। দিনক্ষণ সব স্থির হয়ে গেল—৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৫, বৃহস্পতিবার, সকাল আটটা। ঐ পর্যন্ত। পরিকল্পনার ব্লু প্রিন্ট সূর্যের আলো দেখেনি। উল্টে বছর দুয়েক বাদে এগারো নম্বর পার্ক স্ট্রীটের দোতলা বাড়ির মাথায় আর একটি তলা চাপিয়ে জায়গা সমস্যার সমাধান করা হল। আর কখনো স্থান পরিবর্তনের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাথায় আসে নি।

শুধু যে স্কুল বিল্ডিংয়ের চেহারা পাল্টেছে তাই নয়, এন্ট্রান্সের পাশাপাশি গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এই স্কুলের ছেলেরা হাইস্কুল পরীক্ষায় বসতে শুরু করে। পরিবর্তনের পালা শেষ হওয়ার আগেই লাঁফো ফিরে এলেন। দ্বিতীয়বার তিনি তিন বছর রেকটর হিসাবে কাজ করেছেন।

বাবরের হাতে গড়া সাম্রাজ্যকে স্থায়ী রূপ দিয়েছিলেন আকবর। লাঁফোর দ্বিতীয় টার্ম শেষ হওয়ার মুখে মুখে রেকটর হয়ে এলেন ফাদার ই. ওনীল। ওনীলের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেণ্ট জেভিয়ার্স হয়ে ওঠে বাংলা দেশের অন্যতম সেরা স্কুল ও কলেজ। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো এনট্রান্স পরীক্ষা বাতিল হয়ে চালু হল ম্যাট্রিকুলেশন। সেণ্ট জেভিয়ারের ছাত্ররা কিন্তু আর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসেনি। কর্তৃপক্ষ বদলে বেছে নিয়েছিলেন সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা। ওনীল যে ব্যবস্থা চালু করে গিয়েছিলেন, তা আজও চলছে। চালু রয়েছে আরো অনেকগুলো ব্যবস্থা যার উদ্ভবকর্তা স্বয়ং ওনীল। কলেজ ও স্কুলের ম্যাগাজিন 'দি জেভেরিয়ান' তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। প্রথম অ্যানুয়েল স্পোর্টস তাঁর সময়েই শুরু হয়। প্রাক্তন ছাত্র সংস্থা গড়ে তোলার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। খেলা-ধুলোয় আজ সেণ্ট জেভিয়ার্সের নাম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বছর জুনিয়র বাংলা হকি টীমে এই স্কুলের তিনটি ছেলে চান্স পেয়েছে। একটি ছেলে ইণ্ডিয়া-সিলোন হকি টেস্টে খেলবার জন্য সিলেকটেড হয়েছিল। এসব সম্ভব হয়েছে শুধু একটি লোকের দূরদৃষ্টির ফলে। ফাদার ওনীলের অজস্র দান ও অক্লান্ত পরিশ্রমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন তাঁর স্কুলেরই আধুনিকতম কর্ণধার—ফাদার টি, ভেটিকাড। বাড়ি মহীশূরে। বাবা মা দুজনেই আশীর কোটা পেরিয়ে গেছেন। এগারোটি ভাইবোনের সংসারে সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছেন ভেটিকাড। শিক্ষক হিসাবে কুড়ি বছরেরও বেশী সময় তিনি কাটিয়েছেন বাংলাদেশে। অতীতের জায়াণ্ট পূর্বসূরীদের স্মৃতি-চারণে শ্রদ্ধায় বার বার নবীন পরিচালকের মাথা নত হয়ে আসছিল।

একটা সাইক্লোস্টাইল্ড পত্রিকা হাতে তুলে দিয়ে ফাদার বললেন—আমার ছেলেরাই এই পত্রিকা বার করে। পত্রিকাটিতে চোখ বুলোতে গিয়ে মলাটেই চোখ আটকে গেল। ইংরেজীতে বড় বড় ইটালিকসে দুটি শব্দ ছাপানো রয়েছে—নিহিল আলট্রা। জিজ্ঞাসা করলাম এর মানে কি? এরকম নামই বা কেন দেওয়া হয়েছে?

আমাদের স্কুলের মোটো ঐ শব্দ দুটি। মানে হল, সাধ্যের অতীত নয় কিছুই। এই মন্ত্রও আমরা পেয়েছি ফাদার ওনীলের কাছ থেকে। বললেন ফাদার ভেটিকাড। সেই মুহূর্তে মনে হল এই শব্দ দুটি আসলে এই বিশাল প্রাচীন শিক্ষায়তনটির সমস্ত ঐতিহ্যের সারাৎসার। যাঁরা একে গড়ে তুলেছেন তাঁদের অন্তরে যুগ যুগ ধরে শক্তি জুগিয়ে এসেছে এই বাণী। সেই বাণীকে বুকে ধারণ করে সার্থক হয়ে উঠেছে এই স্কুল, তার বিশাল ছাত্রগোষ্ঠী, ও অসামান্য শিক্ষক সম্প্রদায়।

ওনীল থাকতে থাকতে স্কুলের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবে যোগদান করতে এসে তিজায় সভার প্রধান অতিথি লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার এডোয়ার্ড নর্মান বেকার আশা প্রকাশ করেছিলেন : ১৯৬০ সালে যখন স্কুলের শতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ভুভ-দিনে আজ যে সুমহান ঐতিহ্যের স্মরণে আমরা মিলিত হয়েছি, তাও ম্লান বলে মনে হবে ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর সাফল্যের তুলনায়।

স্যার বেকারের আশা যে ব্যর্থ হয় নি তারই প্রমাণ আজকের সেণ্ট জেভিয়ার্স। ওনীলের পর প্রথম মহাযুদ্ধের বছরগুলি এই স্কুলের রেক্টর ছিলেন রেভারেণ্ড এফ এক্স কোরহান। তাঁর সময়েই এক লাখ ছ' হাজার টাকা খরচ করে আর একটি নতুন বিল্ডিং তোলা হল—কোরহান বিল্ডিং। কোরহানের বিদায় বছরে স্কুলে পড়ত প্রায় সোয়া পাঁচশ ছাত্র। এর মধ্যে মাত্র একশো দুজন ছিল আবাসিক। পঁচাশী বছর আগে পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীটে যখন স্কুল প্রথম শুরু হয় তখন অধিকাংশ ছাত্রই ছিল আবাসিক। কোরহানের পর ফাদার ফাঁলো যখন স্কুলের রেক্টর হয়ে এলেন তখন থেকে আবাসিক ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়।

স্কুলের ভেতরের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের রূপেও পাল্টেছে অনবরত। সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব পুরোনো থিয়েটার বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পঁচাত্তরে পৌঁছনোর আগেই স্কুলের চেহারা গেল আমূলে পাল্টে। এই পরিবর্তিত রূপের রূপকার ফাদার এম ভেরমিয়ের। ভেরমিয়ের যখন রেক্টর তখন পুরোনো থিয়েটারের অবশেষটুকুও ভেঙে ফেলা হোল। পোর্টিকোর জায়গায় উঠল নতুন হল। ইতিহাস লরী বোঝাই ইঁট, বালি, চুন, সুরকীর রাবিশ হিসাবে চিরকালের জন্য বিদায় হয়ে গেল সেণ্ট জেভিয়ার্স থেকে।

তবু জায়গার অভাব মেটে না। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্কুলের প্রাইমারী সেকশনের জন্য. সর্ট স্ট্রীটে কেনা হল জয়গা। ফাদার রিশির যে উদ্দেশ্যে এই জায়গা কিনেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁরই উত্তরসূরীর আমলে। তখন টি পিকাসী স্কুলের রেক্টর। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে, শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী। সর্ট স্ট্রীটে প্রাইমারী বিভাগের জন্য উঠল চারতলা বিল্ডিং।

তিরিশ নম্বর পার্ক স্ট্রীটে স্কুলের চারতলা মেন বিল্ডিং, সর্ট স্ট্রীটে বসে প্রাইমারী সেকশন। জিজ্ঞাসা করলাম, কত ছাত্র পড়ে আপনার স্কুলে? উত্তর এল, সেকেন্ডারী, প্রাইমারী মিলিয়ে সতেরোশ। সতেরোশ ছাত্রের জন্য আছেন তেয়াত্তরজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা। এত বড় স্কুল, পৌনে একশর কাছাকাছি টিচিং স্ট্রেংথ। এর খরচ আসছে কোথা থেকে? আমার প্রশ্নের জবাবে ফাদার ভেটিকাড বললেন—আমাকে ধরে ছজন জেসুইট শিক্ষকের খরচ-খরচ বহন করে মিশন। আর সব খরচ উঠে আসে টিউশন ফির টাকায়।

ঠোঁটের ওপর এসে গেল—টিউশন ফির রেট কত? জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেলেন ফাদার ভোটিকাড। বন্ধ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন ফুল প্যান্ট, হাওয়াই সার্ট-পরা অল্পবয়েসী এক টিচার। আজই রাত্রের ফ্লাইটে এক দল ছাত্রকে নিয়ে ইউরোপ ট্যুরে যাচ্ছেন, তাই যাওয়ার আগে বিদায় নিতে এসেছেন হেডমাস্টার মশায়ের কাছে। বিদায় নিয়ে চলে গেলে ফাদার ভোটিকাডকে জিজ্ঞাসা করলাম—ছাত্রদের ইউরোপ ট্যুর? ব্যাপারটা কি?

সহজ সুরে জবাব এল! এটা একটা পুরোনো প্রথা। দেশভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ। আগে প্রতি বছরই গরমের ছুটির সময় স্কুলের ছেলেদের একটা করে ব্যাচ বিদেশে যেত এডুকেশন্যাল ট্যুরে। মাঝখানে ফরেন এক্সচেঞ্জের কড়াকড়ির ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ বছর গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করাতে সম্ভব হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশটি ছেলে অ্যাপ্লাই করেছিল, তার মধ্যে থেকে পনেরোটি ছেলেকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ছত্রিশ দিনের এই ট্যুরে ছাত্রপিছু গড়ে খরচ পড়বে মাত্র দশ হাজার টাকা।

খুবই সামান্য ব্যাপার। কিন্তু এর পর আর পুরোনো প্রশ্নটা তুলতে পারলাম না—টিউশন ফির রেট কত? রেটটা অবিশ্যি জেনে গেছি স্কুলের বর্তমান বছরের ক্যালেন্ডার থেকে। ক্লাস ওয়ান টু, ইলেভেন ফ্ল্যাট রেটে পঁয়ত্রিশ টাকা। উপরের ক্লাশে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ক্র্যাফট, বায়োলজি, মেকানিকস ইত্যাদি সাবজেক্ট-পিছু টাকা তিনেক অতিরিক্ত দিতে হয়। যে সব ছেলে দিনের বেলায় লাঞ্চটা স্কুলেই সেরে নেয় তাদের মাসে অতিরিক্ত উনত্রিশ টাকা দিতে হয়। লাঞ্চ ছাড়া টী ও স্টাডি এই টাকাতেই হয়ে যায়। প্রায় চারশো ছেলে স্কুলেই লাঞ্চ সারে। বিশাল খেলার মাঠের এক ধারে দেখলাম ছেলেদের খাওয়ার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা। জিমন্যাসিয়ামও রয়েছে স্কুলের। মানুষ গড়ার প্রতিটি প্রয়োজনীয় উপাদানই রয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্সে। পুরোনো আমলেই এ সমস্ত গড়ে উঠেছে।

অতীতের একটি সিসটেম কিন্তু আজ পাল্টে গেছে। আজ মানে বছর নয়েক আগে পাল্টেছে ঐ সিসটেম। শতবর্ষ ধরে স্কুল ও কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন রেক্টররা। শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালনের সময়ে নিয়মটা গেল পাল্টে। স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হোল। সেই থেকে স্কুলের সর্বময় কর্তা হেডমাস্টার মশাই। রেক্টর রয়েছেন স্কুল ও কলেজের ধর্মীয় দিকের প্রধান হয়ে।

নতুন ব্যবস্থার কর্ণধার ফাদার ভোটিকাড তাঁর স্কুলের আধুনিক যুগের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন—ফাদার ওনীলের সময়ে শেষবার এই স্কুলের ছেলেরা এনট্রেন্স পরীক্ষা দিয়েছিল। তার পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ইউনিভার্সিটি বা মধ্যশিক্ষার পর্ষদ বোর্ডের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না স্কুলের। হায়ার সেকেন্ডারী চালু হতে স্কুল বোর্ডের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক পাতিয়েছি। গত দশ বছর ধরে এই স্কুলের ছেলেরা সায়েন্স ও কমার্স স্ট্রীমে হায়ার সেকেন্ডারী ও সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম—হায়ার সেকেন্ডারীতে গত ক' বছরে আপনার স্কুলের ছেলেরা প্লেস পেয়েছে? হাসতে হাসতে জবাব দিলেন ফাদার—প্লেস নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না, ডিভিশন যাতে বাড়ে তাই আমাদের একমাত্র চিন্তা। বলে সামনে মেলে ধরলেন গত পাঁচ বছরের রেজাল্টের রেকর্ড।

রেজাল্ট দেখে চমকে গেছি। সারি সারি ফার্স্ট ডিভিশন। মাঝে মধ্যে দু-একটি সেকেন্ড ডিভিশন। কিন্তু আমি যা খুঁজেছি তা কোথায়? তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলাম। গত পাঁচ বছরে মাত্র একবার এই স্কুলের একটিমাত্র ছাত্র থার্ড ডিভিশন পেয়েছে। গত বছর কমার্স স্ট্রীমে এই বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভব হয়েছে।

রেকর্ড বই থেকে চোখ তুলে যখন তাকালাম হেডমাস্টার মশাইয়ের দিকে, দেখি প্রশান্ত মুখে ঈষৎ হাসির ছোঁয়া। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখে গর্বের মৃদু আভাষ কেন জানি মনে হল—অনায়াসই। এটুকু গর্ব প্রকাশ না পেলে মনে হত এক টুকরো পাথর, যাতে ফুল ফোটে না, ফল ধরে না। কিন্তু পাথর নয়, মহীশূরের নরম কৃষ্ণ মৃত্তিকা বাংলা দেশের সজল আবহাওয়ায় নতুন সৃষ্টির ধ্যানে আজ মগ্ন। কৌতূহল হোল জানতে এই চমৎকার রেজাল্টের বীজ-মন্ত্রটি কি?

ফাদার ভোটিকাড বললেন—আমার স্কুলের প্রতিটি শিক্ষকের মনের গভীরে রয়েছে এই বীজমন্ত্র, নিহিত আলো। সাধ্যের অতীত কিছুই নয়। অধীরভাবে বললাম, এ তো সব স্কুলের সব শিক্ষকেরই মনের কথা হতে পারে। শান্তভাবে সন্ন্যাসী বললেন—হতে পারে, তবে হচ্ছে না কেন। একটু থামলেন ফাদার ভোটিকাড। বোধহয় ভাবলেন কিছু। চেয়ার ঘুরিয়ে পেছনের দেওয়াল-র‍্যাক থেকে একটা ফাইল তুলে এনে টেবিলের ওপর রেখে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—দেহকে উপোসী রেখে মানুষ গড়ার ব্রত পালন করা কি সম্ভব? শিক্ষকও মানুষ। তাঁর দেহ রক্ত-মাংসেই গড়া। তাঁর জীবনেও আছে সুখ-দুঃখ। সমাজ তাঁকে দেবে না কিছুই অথচ সর্বদাই দাবী জানাবে মানুষ গড়, তা কি করে সম্ভব? কোন তুলনায় না গিয়ে গুটি-কয়েক স্ট্যাটিসটিকস আপনাকে দিচ্ছি, এর থেকেই বুঝতে পারবেন সেন্ট জেভিয়ার্সে কেন রেজাল্ট ভাল হয়।

ফাদার ভোটিকাড যে স্ট্যাটিসটিকস আমায় জানিয়েছেন, তা হুবহু এখানে পেশ করলাম। তবে তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা সেদিন যে আমার ছিল না, তা অকপটেই স্বীকার করব।

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে প্রাইমারী থেকে সেকেন্ডারী সব স্তরের টিচারের পে স্কেল এক। তিনশো থেকে সাড়ে পাঁচশো। মূল ডি-এ সত্তর টাকা। এ ছাড়া আছে সরকারী মহার্ঘ ভাতা। ম্যারেড শিক্ষকরা ব্যাচিলারদের থেকে কুড়ি টাকা বেশী পান। তিনটি সন্তান পর্যন্ত, সন্তান পিছু অতিরিক্ত দশ টাকা পাবেন শিক্ষক। অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট ছাড়া আছে এফি-সিয়েন্সি বোনাস। বোনাসের নিয়ম—পনেরো বছর কাজের পর পঁচিশ টাকা, কুড়ি বছরের পর পঞ্চাশ টাকা, পঁচিশ বছরের পর পঁচাত্তর টাকা ও তিরিশ বছরের পর একশ টাকা করে একসঙ্গে ইনক্রিমেন্ট। এ ছাড়া আছে শতকরা আট ভাগ কনট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফান্ড ও রিটায়ারমেন্টের পর যত বছর চাকরী তত মাসের মাইনে হিসাবে গ্র্যাচুইটি। শুধু কি তাই? প্রচলিত ছুটি ছাড়াও একজন শিক্ষক যত বছর চাকরী করবেন তত মাসের হাফ পে লীভ তাঁর পাওনা হবে। জানি না বাংলা দেশের কটি স্কুলে শিক্ষকরা এসব সুবিধা পান। তবে ফাদার ভোটিকাডের একটি কথা এখনো কানে বাজছে—গত পঞ্চাশ বছরে কখনো কোন শিক্ষক এই স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে কাজের করেন নি।

অর্থচিন্তা চমৎকার হয়ে দেখা দেয় নি বলেই বোধহয় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে ডেডিকেশনের অভাব ঘটে নি কখনো। প্রতিষ্ঠাতাদের মিশনারী স্পিরিট আজ ছড়িয়ে গেছে অধিকাংশ শিক্ষকদের মধ্যে। একথা জানা আছে বলেই শহরের প্রতিটি প্রান্ত থেকে পেরেন্টরা ছুটে আসেন তাঁদের ছেলেকে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াবেন বলে। যত অ্যাপ্লিকেশন পড়ে, তার শতকরা দশ ভাগও এনটারটেইন করা সম্ভব হয় না। জায়গা কোথায়? বিল্ডিং বাড়িয়ে বেশী ছাত্রকে ঠাঁই দিতে গেলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধুর রেশটুকু যদি হারিয়ে যায় তাহলে যে ব্যর্থ হয়ে যাবে প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য—'ক্যাথলিক ও অন্য ধর্মের ছাত্রদের মধ্যে চরিত্র গঠনোপযোগী ধর্মীয় ও উদার শিক্ষার বীজ বপন করা।' অবিশ্যি গত একশ চৌত্রিশ বছরে স্কুল তার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য থেকে অনেক সরে এসেছে। অতীতে ক্যাথলিক ছাত্ররাই ছিল সংখ্যা-গরিষ্ঠ। তাদের সে জায়গা আজ দখল করে নিয়েছে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা। বলতে দ্বিধা নেই — পরিবর্তনটুকু আমাদের পক্ষে মঙ্গলই হয়েছে।

—সন্দীপন

পরবর্তী সংখ্যায়

বেথুন কলেজিয়েট স্কুল

এই প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ফাদার এলায়েন্স। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতা

জাতীয় মহিলা হকির আসর। তেইশতম প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানস্থল কলকাতা। উদ্বোধন হয় কলকাতা—মোহনবাগান মাঠে। বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে। অংশগ্রহণ করার কথা ছিল একুশটি দলের। শেষপর্যন্ত প্রতিযোগীর সংখ্যা দাঁড়াল উনিশ। রাজস্থান ও হিমাচল আসতে পারেনি। কিন্তু উদ্বোধনের দিন হাজির ছিল মাত্র ১১টি দল বাদবাকিরা তখনো এসে পৌঁছায়নি।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। তিনি এলে শাঁখ বাজিয়ে অতিথি বরণ করা হয়। তারপর তাঁকে অভিবাদনমঞ্চে নিয়ে যান বাংলা মহিলা হকি দলের সভানেত্রী শ্রীমতী সোনিয়া জন। বাংলা দলের পতাকা উত্তোলন করার পর মার্চ পাস্ট শুরু হয়। মার্চ পাস্টের পরিচালনা করেন বাংলার অধিনায়ক শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া লর্ড। তাঁর হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। পেছনে অন্য একজনের হাতে ছিল অল ইন্ডিয়া উওমেন্স হকি অ্যাসোসিয়েশনের পতাকা। তারপর শ্রীমতী লর্ডের নেতৃত্বে অন্যান্য দলের অধিনায়করা শপথবাক্য পাঠ করেন। ৪০টি সাদা পায়রা এবং অসংখ্য বেলুন আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। সারা মাঠে তখন উৎসবের আমেজ। এর মধ্যে শুরু হলো তেইশতম জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী খেলায় রেলওয়ে সহজেই গোয়ালিয়রকে ৪ গোলে হারিয়ে দেয়। দর্শকদের উপস্থিতি সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক গ্যালারী প্রায় সবই ফাঁকা পড়ে থাকে।

জাতীয় মহিলা হকির কলকাতা আসরের ফাঁকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক অতীতের পৃষ্ঠায়। গত বছর এই প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল চন্ডীগড়ে। ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্র সেবার এঁটে উঠতে পারেনি। বিজয়ীর হাসিতে পাঞ্জাব মেতিমা উজ্জ্বল হয়েছিল। তারও আগের বছর ত্রিবান্দ্রামে বসে জাতীয় মহিলা হকির আসর। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয় মহীশুর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, জাতীয় হকিতে চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা বোধহয় মহীশুরই সর্বাধিকবার অর্জন করেছে। সবমোট সাত বার। এতবড় সম্মান আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। সেই মহীশুরও এবার এসেছিল।

হকিতে এই সেদিনও আমরা বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মানের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলাম। বলতে গেলে, হকিতে আমরা পদ্ধতিতে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলাম। সেখান থেকে আজ আমরা সরে আসতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু হকির ভূমিকায় এখনো খুব একটা নগণ্য নয়। মহিলা হকিতে সে তুলনায় আমরা খুব একটা এগুতে পারিনি। হকিতে মহিলাদের জাতীয় প্রতিযোগিতাই একমাত্র

টুর্নামেন্ট। অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা কিন্তু সর্বত্র সমান নয়। পুরুষদের হকি এবং ফুটবলে টুর্নামেন্টের ছড়াছড়ি। ইদানীং ক্রিকেটেও হয়েছে। সে জোক দুঃখ নেই। খেলার প্রতিযোগিতার সংখ্যা যত বাড়ে ততই মঙ্গল। এবং পুরুষদের দাবী সেখানে অগ্রাধিকার পাবেও। তবু মেয়েদের জন্য আর একটু সুব্যবস্থার আশা খুব একটা অন্যায় হবে না। বিশেষ, জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতার বয়েস যেখানে তেইশ।

এ প্রসঙ্গ আপাতত বাদ দিয়ে খেলার কথায় আসা যাক। একটি খেলায় হেরেই যাতে কোন দলকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে না হয় সেজন্য লীগ ও নকআউট প্রথায় খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। তিনটি গ্রুপে বারটি দলকে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই বারটি দলকে চণ্ডীগড়, ভুপাল, মাদ্রাজ ও কেরালা; গোয়ালিয়র, হিমাচল, রেল ও গোয়া; উত্তরপ্রদেশ, নাগপুর, গুজরাট ও হরিয়ানা; এভাবে ভাগ করা হয়েছিল। এদের লীগ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপরা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্য। এছাড়া বোম্বাই, পেপসু, বাংলা, মহাকোশল, মহীশূর ও দিল্লীকে লীগে খেলতে হয় নি। এরা সরাসরি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সৌভাগ্য লাভ করে। আর গত প্রতিযোগিতার বিজয়ী পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলা শুরু করে।

খেলার চার্ট থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, হকিতে মহিলাদের সর্বত্র প্রসারলাভ এখনো হয়নি। কয়েকটি প্রদেশে তো এ সম্পর্কে উৎসাহের একান্ত অভাব। তারা জাতীয় আসরেও অনুপস্থিত। জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতা কমিটি এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবে সঠিক কিছু জানা যায়নি। তবে একথা ঠিক যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেকদিন পরেও মহিলাদের খেলাধুলো সম্পর্কে সর্বত্র সমান উৎসাহ সঞ্চারিত হয়নি। একমাত্র উত্তর ভারতেই খেলাধুলোয় মহিলাদের আগ্রহ উৎসাহব্যঞ্জক। বাদবাকি অংশ এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। তাই আশা ছিল, তেইশতম হকির আসর থেকেই সারা দেশে মহিলাদের মধ্যে হকিকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেবার কথা ঘোষিত হবে। কিন্তু তা হয়নি।

এবারকার জাতীয় হকিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নক-আউট প্রথায় খেলা শুরু হয়েছিল। লীগ থেকেই ছাঁটকাট শুরু হতে থাকে। নকআউট আরম্ভ হওয়ার পর তো কথাই নেই। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত টিঁকে থাকে পেপসু, বোম্বাই, বাংলা, মহাকোশল, মহীশূর এবং দিল্লী। মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাব তো কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই খেলা শুরু করে। কোয়ার্টার ফাইনালের একটি খেলা নিয়ে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এ খেলায় পাঞ্জাবের কাছে বোম্বাই ১ গোলে পরাজিত হয়। বোম্বাই পাঞ্জাবের একজন খেলোয়াড়ের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে। এর ফলে খেলায় একটু বিঘ্ন দেখা দেয়। তবে জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতার টেকনিক্যাল কমিটি বোম্বাইয়ের প্রতিবাদ নাকচ করে দেন। জাতীয় হকির আসরে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের এই খেলাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। দু'দলই প্রশংসনীয় ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। গুটিকয় দর্শক যাঁরা মাঠে নিয়মিত হাজির হয়েছেন তাঁরা এই খেলাটি দেখে বেশ আনন্দ পেয়েছেন।

কোয়ার্টার ফাইনালের বেড়া ডিঙিয়ে আর এক ধাপ এগিয়ে সেমিফাইনালে খেলার অধিকার করে নেয় মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, পেপসু এবং মহীশূর। সেমি-ফাইনালের খেলায় প্রতিটি দলের খেলোয়াড়রাই এক মহৎ দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নামেন। রাজ্যের সুনাম রক্ষা এবং ফাইনাল খেলার সৌভাগ্য। তাই এই খেলাগুলি বেশ জমে যায়। তবে গোলের ব্যবধান খুব স্পষ্ট। মহারাষ্ট্র ৭-০ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে আর পাঞ্জাব পরাজিত করে পেপসুকে। গোলের ব্যবধান ৪-১। সেমিফাইনাল পর্যায়ে পাঞ্জাব ও পেপসুর খেলায় দর্শকদের কেউ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেননি। সবাই জোটাজুটি দু'পক্ষের খেলায়ই উৎসাহ জোগাচ্ছিলেন। আসলে, পাঞ্জাব এবং পেপসু প্রায় অভিন্ন। তাই কাকে ছেড়ে কাকে রাখার প্রশ্নটাই এখানে বড় হয়ে দেখা দেয়। যা হোক উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্যে পাঞ্জাব বিজয়ী হয়

মার্চ পাস্ট

এবং জোট পাঁচবার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। অপরদিকে এই নিয়ে মহারাষ্ট্র দু'বার ফাইনাল খেলে।

হকির আসরেও অন্যান্য অনেক চিন্তা এসে ভিড় জমাচ্ছিল। খেলাধুলোয় সার্বিক কৃতিত্ব মহিলাদের কতটা? সত্যি, নানা দেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এজন্য খুব একটা চেষ্টাও নেই; তাছাড়া মেয়েদের খেলাধুলোয় সকলেরই উৎসাহের অভাব। সরকারী উদ্যোগে যে কিছু ব্যবস্থা না হচ্ছে তা নয়। এই তো, সম্প্রতি পাঞ্জাবের লুধিয়ানা সরকারী কলেজের মধ্যে মেয়েদের স্পোর্টসের জন্য একটি শাখা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বি-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা এখানে স্পোর্টসের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। এভাবে সর্বত্র কিন্তু প্রেরণা দেওয়া হয় না। আমরা কিছুই হলো না বলে আকাশবাতাস কাঁপাচ্ছি কিন্তু খেলাধুলোর উন্নতির জন্য কতখানি কি করতে পেরেছি, সে কথাও ভেবে দেখা দরকার।

খেলাধুলোয় বাংলা সর্বভারতীয় মানদণ্ডে অনেকখানি পিছিয়ে। তবু হকিতে আমাদের তেমন নিন্দনীয় নয়। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলার যোগ্যতা ছিল বাংলা দলের। এ খেলায় পেপসুর কাছে বাংলা পরাজিত হয়। পেপসুকে এজন্য রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে। উপর্যুপরি তিনদিন খেলা ড্র থাকে। তারপর অতিরিক্ত সময়ে ন্যূনতম ব্যবধানে খেলার ফয়সালা। জাতীয় হকিতে বাংলার স্থান হয়েছে পঞ্চম। কোয়ার্টার ফাইনাল বিজিতদের খেলায় বাংলা ২-১ গোলে মহাকোশলকে পরাজিত করে এই স্থান লাভ করে।

জাতীয় হকিতে যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁদের অধিকাংশই স্কুল-কলেজের পড়ুয়া। চাকুরিজীবীর সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন দলে অবশ্য এ'রা সংখ্যায় ভারী। কিন্তু পাল্লার ভারটা আমাদিকেই বেশি। অনেক কমবয়সী খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে এবার। ভূপালের নিরুপমা চ্যাটার্জি হলো সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। বয়েস মাত্র তের। আর একটা ব্যাপারেও সাঁমান উল্লেখ-যোগ্য, বাইরের দলগুলিতে কয়েকজন বাঙালীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এমনকি কোচও। অথচ বাংলাদেশে মহিলাদের উৎসাহ কত কম দলের দিকে তাকালেই সেকথা বুঝতে পারা যায়।

ফাইনালে খেলছে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জয়লক্ষ্মী কার ভাগ্যে বোঝা যাচ্ছে না। পাঞ্জাব গতবারের অর্জিত বিজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে তুখোড় খেলছিল। অপরদিকে মহারাষ্ট্রও কসুর করছিল না। গতবারের পরাজয়ের শোধ চাই। অবশেষে মহারাষ্ট্র ১-০ গোলে পাঞ্জাবকে হারিয়ে দেয়। বিজয়ীর সম্মান লেডি রতন টাটা ট্রফি লাভ করে তাঁরা হাসি-আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

শেষদিনে দর্শক হয়েছিল প্রচুর। পুলিশ ব্যান্ডও বেজেছিল, যা প্রথমদিন হয়নি। অন্তত মার্চ পাস্টে ব্যান্ড না বাজানোয় অনেকেই বেজেছিল। দর্শক এবং ব্যান্ডে সেটা অনেকখানি লাঘব হয়েছে।

—প্রমীলা

নারী ও ফ্যাশান প্যারেড

আধুনিক যুগে ফ্যাশান প্যারেডের রীতি প্রচলিত হয়েছে। নানা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এই রীতির পরিচালনা করে থাকেন। এটা এক ধরনের বিজ্ঞাপনও বলা যায়। এই ফ্যাশান প্যারেড মোটেই কিন্তু আধুনিকতা-প্রসূত নয়। বহু যুগ আগেও এর প্রচলন ছিলো একথা আমরা ইতিহাসের পাতা খুলে দেখতে পাই। সে যুগে আবার শ্রেষ্ঠ সুন্দর ও শ্রেষ্ঠা সুন্দরী শেষ পর্যন্ত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হতেন।

যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা রক্ষণশীল তাঁরা মোটেই পছন্দ করেন না এই ফ্যাশান প্যারেড। পাঁচজনের সামনে নিজের সৌন্দর্য ও দেহসুষমাকে প্রকটিত করে তোলার ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ আপত্তি আছে। কিন্তু এটা হলো প্রকাশের, প্রচারের ও প্রতি-দ্বন্দ্বিতার যুগ। সবাই শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করতে চায় রূপ, গুণ ও যোগ্যতা দিয়ে। এই শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করতে হলে প্রয়োজন কিছু অনুশীলনের, কিছু নির্বাচনের, কিছু রুচির এবং সবার উপরে কিছু ব্যক্তিত্বের। এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যে শুধুমাত্র ফ্যাশান প্যারেডের জন্য অপরিহার্য তা নয়। জীবনের সর্বত্রই এইগুলির মূল্য কিছু না কিছু আছে। ধরুন, কোথাও যদি ইন্টারভিউ দিতে হয়, তবে এগুলিকে কি আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো?

প্রগতিশীল দেশ মাত্রই আশা রাখে সকল বিষয়ে, সকল দিকে তার উন্নতি। আমরা জানি উড্ডীয়মান পক্ষীর দুটি ডানারই সমান প্রয়োজন। নারী আর পুরুষ হলো সমাজের দুটি ডানা। পুরুষের সঙ্গে নারীকে এগিয়ে চলতে হবে। স্ত্রীজাতি যদি পিছিয়ে থাকে তবে সমূহ উন্নতি সম্ভব নয়। অতএব, যে কোন বিষয়ে পুরুষ আর নারীতে ভেদাভেদ না রাখাই ভালো। প্রগতিকে হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাতে সবার আগে প্রয়োজন দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রসারতা।

নারীদের ফ্যাশান প্যারেডে যোগ দেওয়ায় অনেকেরই বিশেষ আপত্তি আছে। শুধু যে প্রাচীনারা আপত্তি করেন তা নয়, অনেক নবীনারাও সে দলে যোগ দিয়েছেন। নারী নিজেকে সাজাতে ভালবাসেন। যদি কোন প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হয় তবে তাঁরা নিজেদের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলায় বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবেন স্বভাব কারণেই। কারণ, শ্রেষ্ঠ আসনটি যে সকলকেই সমানভাবে প্রলুব্ধ করে। তাই চেষ্টাও চলবে অবিরাম। সফলতা হয়তো সর্বক্ষেত্রে আসবে না, কিন্তু অনুশীলনের একটা উপকারিতা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পাবে চেহারায়। রুচিবোধও জাগবে, সৃজনী-শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর সামঞ্জস্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। যাঁরা সাজতে জানেন না, বা যাঁরা শুধু অনুকরণ করে থাকেন তাঁরা এই ফ্যাশান প্যারেডের মাধ্যমে অনেক রকম সাজসজ্জা ও বেশবিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হবেন। জানতে পারবেন যুগের হাওয়া কোন নতুন স্টাইল এনেছে, কোন ফ্যাশানের সমাদর করছে।

একটু নজর রাখলেই আমরা দেখতে পাই ফ্যাশানটা সাধারণত সাইক্লিক অর্ডারে ঘুরছে। পুরানো জিনিসই ফিরে আসছে কিছুটা অন্যরূপে। আবরণের ও আভরণের রকমফের কিন্তু ভালোই। কারণ তা বৈচিত্র্য আনে। আর বৈচিত্র্য আমরা সকলেই ভালবাসি।

নারীদের ফ্যাশান প্যারেডে যোগদানের প্রসঙ্গ এলেই দুটি দল গড়ে উঠবে। একদল সমর্থক, অপর দলটি ঘোর বিরোধী। আমরা যদি সামান্য কয়েক বছর পিছনে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখবো, আমাদের দেশে নারীর অগ্রগতির সর্ববিষয়ে এসেছে প্রচুর বাধা। যেদিন নারীশিক্ষার পত্তন হয়, সেদিন কত বাধা এসেছিল। আজ যখন বইখাতা হাতে মেয়েরা স্কুলে যায় ভাবতেও পারা যায় না যে, এককালে মায়েরা ভয় পেতেন মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে।

শিক্ষার প্রসারের ফলে যখন সহশিক্ষার যুগ এলো তখন বিরোধী দলের চেষ্টায় ত্রুটি হয়নি। কত নারীই ইচ্ছা থাকলেও বি-এ পাশের পর বই খাতার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করতে বাধ্য হয়েছে।

নারী যেদিন পাঠশালে যেতে নিজে চাইলো চাকুরীজীবন সেদিনও এলো বিরোধিতার ঝড়। কিন্তু আজ তা সর্বজনগ্রাহ্য। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই বোধহয় এর জন্য দায়ী।

নারীদের ফ্যাশান প্যারেডে যোগদান শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে, তাই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী যাঁদের তাঁরা সুনজরে হয়তো দেখেন না এ রীতিকে। কিন্তু যদি কোন জিনিসের পিছনে কোন অশুভ ইংগিত না থাকে তাহলে তার প্রচলনকে কেউ আটকাতে পারবে না। যেমন পারেনি বিগত যুগের উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনাকে। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বাধ্য করেছে—রক্ষণশীলদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে। অতএব আজ যা সমালোচনায় বস্তু আঁচলেই তা হয়তো হবে একটা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার।

—[illegible]

সাগর পারের খবর

দিলীপ মালাকার

রোমান ক্যাথলিক সমাজের কেন্দ্রীয় অফিস 'ভ্যাটিকান' এক নির্দেশনামায় ক্যাথলিক গির্জায় উপস্থিত কয়েকজন পরিচিত 'সেন্টস' বা দেবতার পদাবনতি ঘটিয়েছে। আগে জানতাম সরকারী অফিসে পদস্থ কর্মচারিদের পদোন্নতি ও পদাবনতি হয়ে থাকে। দেবতাদের বেলায় বোধ হয় এই প্রথম। ক্যাথলিক দেবতাদের উন্নতি অবনতি বিধান দেন ভ্যাটিকানের জ্যান্ত মানুষ পুরোহিতেরা। দেবতারা নয়।

সম্প্রতি ভ্যাটিক্যানের উচ্চপর্যায়ের পুরোহিতেরা এক সম্মেলনে বসে বহু সেন্টস বা দেবতাদের আত্মত্যাগ, দর্শন ইত্যাদির বিচার করে কয়েকজনের পুজো দেওয়া বন্ধ করেছেন। এর মধ্যে এক ডজন সেন্টকে দেবতাস্থান চ্যুত করা হয়েছে। যেমন সেন্ট ক্রিস্টোফার ও সেন্ট বারবারাকে আর সেন্ট বলে ডাকা হবে না বা তাঁদের পুজোও দেওয়া চলবে না। ফলে ল্যাতিন আমেরিকার কিছু সেন্ট ক্রিস্টোফার ও সেন্ট বারবারা ভক্তদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

আরও মজার খবর হল এই ইংলন্ডের ক্যাথলিক গির্জার সবচেয়ে বড় দেবতা সেন্ট জর্জেরও পদাবনতি করা হয়েছে। যারা এতকাল ধরে সেন্ট জর্জের পুজো-উপসনা করে আসছিল তাদের এখন থেকে আর কোনো পুজো দেওয়া চলবে না। সেন্ট জর্জ শুধু ইংলন্ডের মান্য দেবতা নন তিনি পর্তুগাল ও স্পেনেরও। এখন এই তিন দেশে সেন্ট জর্জ তাঁর মান-সম্মান খোয়ালেন।

ল্যাতিন আমেরিকায় সেন্ট ক্রিস্টোফারের প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা ছিল একটি কারণে। আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কর্তা ক্রিস্টোফার কলম্বাসের প্রথম নাম সেন্ট ক্রিস্টোফার থেকে নেওয়া বলে ল্যাতিন আমেরিকার বহু অধিবাসী সেন্ট ক্রিস্টোফারকে বিশেষ ধরনের পুজো দিত। এবার থেকে তাদের প্রিয় সেন্টের পুজোও বন্ধ হল। তাই তাদের বিক্ষোভ।

ক্যাথলিক গির্জার সেন্ট বা দেবতাদের তালিকা বেশ লম্বা। তার মধ্যে চল্লিশজনকে দেবতার পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ভ্যাটিকানের বড় বড় পুরোহিত ও বিধানদাতারা নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে অনেক খোঁড়া কুসংস্কার তুলে দিয়েছেন। তাঁরা ক্যাথলিক গির্জা ও সমাজকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টায় রয়েছেন। তাই এবার তাঁরা বাদ-বিচারে বসেছেন যেসব সেন্টকে অনাবশ্যকভাবে পুজো দেওয়া হয় বা তাঁদের নামে উৎসব পালন করা হয় সেগুলো কমান হচ্ছে। এঁরা বিচার করছেন বিভিন্ন সেন্টদের কতখানি আত্মত্যাগ ছিল, কতখানিই বা তার সত্যতা রয়েছে। সব মিলিয়ে দেখে তাঁরা রায় দিয়েছেন। এই রায়ের ফলে ক্যাথলিক সমাজে আরও দুটো জনপ্রিয় সেন্টের মর্যাদাহানি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রিয় সেন্ট ভ্যালেন্টিন, যিনি প্রেমের দেবতা বলে পরিচিত, এবং খৃস্টমাসে ছেলে-মেয়েরা যে সেন্ট ক্লাউসকে নিয়ে এত আমোদ করে সেই সেন্ট ক্লাউসকেও টেনে নিচে নামান হয়েছে। এবার থেকে শিশুদের প্রিয় সান্টা ক্লাউস যিনি চিমনির ভেতর দিয়ে জুতোর ভেতর কত উপহার পাঠান তাঁকে। এই দুই সেন্টের পদচ্যুতিতে শিশুদের মতন প্রেমিকরাও মর্মাহত হবে।

ইউরোপীয় সমাজে নানান সেন্টকে নিয়ে অনেক সময়ে, হাসি-ঠাট্টা করা হয়। সব 'সেন্ট' তো আর গোমরামুখো নয়। অনেক সেন্ট বেশ রসিক। তাঁদের অনেককেও এবার নির্বাসন দেওয়া হয়েছে যেমন, সেন্ট সিপ্রিয়ান, সেন্ট যুস্টিন ইত্যাদি। কারুর পদাবনতি, কারুর বা একেবারে পদচ্যুতি ঘটেছে। সব মিলিয়ে তাঁদের সংখ্যা হবে দুশো জন।

ফ্রান্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল একটি ঐতিহাসিক ও বৈচিত্র্যময় চরিত্র। দ্যগল সম্বন্ধে কৌতূহল প্রায় সব দেশের জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান। কেউ শ্রদ্ধায় মাথা নত করে, কেউ কটুবাক্য ব্যবহার করে। তা সত্ত্বেও বলব, সবারই সমান কৌতূহল রয়েছে এই ব্যক্তিটির প্রতি।

জেনারেল দ্যগল ফ্রান্সের সরকার থেকে বিদায় নিয়েছেন। সম্ভবত স্বল্প সময়ের জন্য তিনি ফরাসী রাজনীতি নিয়ে বেশী মাথাও ঘামাবেন না। কিন্তু বহু অনুগ্রাহী দ্যগল সংবাদে সচেতন। এই বছরে দ্যগল তাঁর রাজত্বের এগার বছর পূর্ণ করেছেন। সেই উপলক্ষে প্যারিসের রাষ্ট্রপতি ভবন পাড়ায় একটি আর্ট গ্যালারি দ্যগল প্রতিকৃতির তৈল-চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। ইরিশ ক্ল্যার আর্ট গ্যালারির উদ্দেশ্য ছিল দ্যগল রাজত্বের একাদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বহুসংখ্যক দ্যগল প্রতিকৃতি নিয়ে প্রদর্শনী। দ্যগলের বহু ছবি নিয়ে চিত্রকরদের আঁকা ছবিতে গ্যালারি ভর্তি হয়ে যায়। বেশ কিছু দর্শকেরও সমাগম হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনার মতন গণভোটের রায় বেরোয় তার তিন দিন পর। গণভোটের রায় ছিল দ্যগলের বিরুদ্ধে। দ্যগল তাঁর প্রতিজ্ঞা মতন বিদায় নেন। ইরিশ ক্ল্যার আর্ট গ্যালারির দ্যগল চিত্র প্রদর্শনী মোড় নেয় তখন অন্যদিকে। এমন অঘটন ঘটবে তা জানত না আর্ট গ্যালারির মালিক। দর্শকের ভীড় বাড়তে সুরু করে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে আর যারা দ্যগল-বিরোধী তারা যায় কৌতূহলের বশে। যাই হোক আর্ট গ্যালারির মালিকের লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। রাজনৈতিক অঘটনে তার প্রদর্শনী থেকে বেশ কিছু ছবি বিক্রি হয়েছে।

দ্যগল আলোচনায় যখন আসা গেছে তখন আরও জানা গেল দ্যগল নাকি এখন থেকে তাঁর অবসর সময়ে স্মৃতিকথা লিখবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিয়ে দ্যগল চার খণ্ডে অনেক লিখেছেন। এবার তিনি লেখা শুরু করবেন ১৯৪৬ সালের পরের ঘটনা থেকে।

ইতিমধ্যে একটি মার্কিন প্রকাশভবন দ্যগলকে জানিয়েছে যে তাঁর লেখা শেষ হলে এবং সেই লেখার শুধু মাত্র ইংরেজী অনু-বাদের জন্য তারা দশ লাখ টাকা দিতে রাজী।

একটি বৃহৎ ফরাসী প্রকাশক দ্যগলের সঙ্গে দেখা করে তাঁর স্মৃতিগ্রন্থের বায়না দিয়ে এসেছেন। প্রকাশক চাইছেন যে দ্যগল যেন তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে লেখেন ইদানিংকালের ফরাসী ইতিহাস। কেমন করে তিনি ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় এলেন, কি করে তিনি আলজেরিয়ার যুদ্ধ মেটালেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল, গত বছরে কেন ছাত্র বিপ্লব ঘটল এবং এ বছরেই বা তিনি কেন গণভোটে হারলেন। এই ধরনের বহু ঐতিহাসিক অথচ কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা থাকবে তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে।

জনতাম আমাদের সমাজবিজ্ঞান ক্লাশে একমাত্র পুরুষ ছিল জন। সুতরাং ও মেয়েদের হংসমধ্যে বক যথা হয়ে বসে থাকত। অবশ্য চেহারাটা ওর বকের মত ছিল না, ছিল আবলুস কাঠের মত। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। কিন্তু ওর দৈর্ঘ্যটা বেমানান ছিল না। খুব ফিটফাট থাকত ও। কোটের তলায় যেটুকু শার্ট দেখা যায়, ধবধবে স্টারচড। তার উপরে মানান কালো পুরু নিগ্রো ঠোঁট— চমৎকার কনট্রাস্ট! অত বিশাল চেহারা হলে কি হবে, ওর চোখ দুটো ছিল আশ্চর্য নরম।

ওর সঙ্গে আমার প্রথম ভাব করে আলাপ হয় একটা সেমিনারে। ডঃ স্টারলিং প্রফেসর। আমি আমার প্রবন্ধ প্রকাশ্য লেখা পড়ছি। বুকটা কাঁপছিল। কাঁপছিল আরো বেশী করে কারণ খুব ফাঁকি দিয়ে লিখেছি। নতুন বয়ফ্রেন্ড হয়েছে। লাইব্রেরীতে যাবার সময় থাকলেও পড়ার মনসায় মন যেন ফড়িঙের মত সবুজ ঘাসে নেচে বেড়াচ্ছে। আমার পাশে বসেছিল জন। জন বলল, ভয় করছে?

হুঁ।

মিস রায়, ডঃ স্টারলিং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার কি আমরা আরম্ভ করব?

পড়া শেষ করলাম। কোনরকমে। শুরু হলো মন্তব্য আলোচনা। ডঃ স্টারলিং সব শেষে বললেন, ঠিক ইংরেজদের মত করেই, কন্ঠোর ভঙ্গায় শুধু প্রশংসে।

—সত্যি মিস রায়, আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি তোমার চয়ন করার ক্ষমতায়। কোন চিন্তা নেই, কোন মতামত নেই, কোন বিশ্লেষণ নেই শুধু বিবরণ। অপূর্ব! আমরা আজকে ভীষণ উপকৃত হলাম।

আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

উনি বলে চললেন, উইচ-ক্রাফট যে এত বোরিং হতে পারে আমি তা জানতামই না। তোমার পার্শ্ববর্তী মিঃ টমাসের সঙ্গে বরং একটু আলোচনা করে দেখ। তোমার চিন্তা করার ক্ষমতা হয়ত বা বাড়বে। ধন্যবাদ এই সারগর্ভ প্রবন্ধের জন্য।—ডঃ স্টারলিং প্রস্থান করলেন।

আমি কারুর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। জন আস্তে আস্তে বলল, চল কফি খেয়ে আসি।

চল। আমি চট করে রাজী হয়ে গেলাম। তাহলে আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে হবে না।

বার-এ গিয়ে বসলাম। জন বলল, তোমার জন্য কি আনব বল।

ব্র্যাক।

জন দু'কাপ কফি নিয়ে এসে বসল। বলল, দূর, মন খারাপ করে না। মিসেস স্টারলিং আমাকে নিজে বলেছে, তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল পেপার তৈরী কর।

হ্যাঁ, আমি তিক্তভাবে বললাম, সে তো আজ শুনতেই পেলে।

দূর, সব দিন কি আর সমান হয়। আমার তো কোন সময়েই পড়ায় মন বসে না।

কেন ?

কি জানি, জন ওর কাল হাত কুচকুচে কালো গালে বুলোতে বুলোতে বলল, এ-দেশের সব যেন কিরকম। ছাড়াছাড়া। আমি যেন কিম্ভুৎকিমাকার কি একটা।

চোখে পড়ল ওর দুটো জুতোশুদ্ধ পা নীচু কফি টেবিলের তল দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

তুমি কোথা থেকে এসেছ ?

আফ্রিকা।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি রূঢ়-ভাবে বললাম।

জন কিন্তু হো-হো করে হাসল। বার-এ বসা অনেকগুলো চোখ আমাদের দিকে পড়ল। জন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, এখনও উইচ তোমাকে তাড়া করছে বুঝি।

সত্যি ওদের যেমন গমগমে গলার স্বর, তেমন ওদের হাসি। কেঁপে উঠতে হয়।

তাই হবে। আমি লজ্জিত হয়ে বললাম।

আমার দেশ সিয়েরা লিওনে।

সিয়েরা লিওন। মনে মনে উচ্চারণ করলাম। ভূগোলের বিদ্যা ম্যাট্রিকে শেষ হয়েছে। মনে করতে পারলাম না কোথায়। নামটা বেশ! সিয়েরা লিওনে।

হঠাৎ চোখে পড়ল ডঃ স্টারলিং বার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওয়াইন-এর অর্ডার দিচ্ছেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই হেসে বললেন, এনজয়িং ?

হ্যাঁ স্যার, আমি মুখ হাঁড়ি করে বললাম, উইচ-হান্টিং সম্বন্ধে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়াচ্ছি!

ডঃ স্টারলিং হো হো করে হেসে বোতল হাতে চলে গেলেন।

জন আমার দিকে ফিরে বলল, একদিন এস আমার ফ্ল্যাটে। তোমাকে দেখাব কোথায় সিয়েরা লিওন। আমি জানি তুমি জান না কোথায়।

জানিই না তো।

কবে আসবে ?

কোথায় ?

আমার ফ্ল্যাটে ?

যাক্‌খন একদিন।

কয়েক মাস চলে গেছে। জনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কিছু বাড়ে নি। আর পাঁচজন পরিচিতের মধ্যে ও ছিল একজন। তবে বেশীর ভাগ সময়েই ও আমার পাশে এসে বসত। আমার চৈনিক বান্ধবী মিঙ দু-একবার এ নিয়ে ঠাট্টাও করেছে। আমি গায়ে তুলি নি। বলেছি, আমার ওকে দেখলে এমনিতেই ভয় ভয় করে। বয়ফ্রেন্ড তো পরের কথা।

মিসেস স্টারলীং-এর কাছে আমার আর মিঙ-এর টিউটোরিয়েল ছিল। শেষ করে উঠতে যাব, মিসেস স্টারলীং বলে উঠলেন, বাই দ্য ওয়ে, তোমরা যদি মাঝে মাঝে জন-এর সঙ্গে কথাবার্তা বল, আমি খুব খুশী হব।

আমরা কথা বলি তো।—আমি বললাম।

ও বড় একা বোধ করছে এখানে। নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের কাছাকাছি গেছে। তোমাদের বন্ধুত্ব হয়তো ওকে টেনে তুলতে সাহায্য করবে।

চেষ্টা করব মিসেস স্টারলীং! আমিই আবার বললাম। মিসেস স্টারলিং-এর আমি একনিষ্ঠ ভক্ত। আমরা অনেকেই তাই ছিলাম। ডঃ স্টারলীংকে যেমন ছেলেমানুষ দেখায়, ওঁর স্ত্রীকে তেমনি বয়সে বড় দেখায়। অথচ দুজনেই অক্সফোর্ডে একসঙ্গে পড়েছেন।

মিঙ বেরিয়ে এসে বলল, চল জনকে খুঁজি। শ ওয়ালেসের থেকে শুরু করে থ্রী টামস বার কোথাও ওকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরের দিন ডঃ লিপসির ক্লাশ। জেনারেল ক্লাশ। সব বিষয়ের ছাত্রছাত্রীই এই ক্লাশে আসতে পারে। আমি কেন, বেশীর ভাগ ছাত্র বিশেষ করে ছাত্রীরা গ্যালারীর প্রথম সারিতে বসার চেষ্টা করে। আমি ক্লাশ বসবার বেশ কিছু আগে গিয়ে জায়গা দখল করলাম। ডঃ লিপসি শুধু হ্যান্ডসাম ইয়ংই ছিলেন না, পড়াতেনও অদ্ভুত। অর্থ-নীতি যে এত ইন্টারেস্টিং তা জানতাম না। অবশ্য লেখাপড়া যে ইন্টারেস্টিং হতে পারে তা এদেশে না এলে অজানাই থেকে যেত। জন আমার পাশে এসে বসল। আমি উইস করলাম, জনও করল। ক্লাশ শেষে বললাম, জন তুমি না তোমাদের ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে যাবে বলেছিলে ?

যাবে তুমি, সত্যি ? জন উজ্জ্বল হয়ে বলল।

যাব।

কালকে এস তবে। মিসেস জোনসকে বলে রাখব। আমরা একসঙ্গে রাত্রে খাব। ঠিক ত ?

ঠিক।

বেশ, ছ'টার সময়ে ঘড়ির নীচে দাঁড়িও।

আচ্ছা।

আমি অন্য বন্ধুদের সঙ্গে প্রস্থান করলাম।

হলোয়েতে জনদের বাড়ী। কুখ্যাত হলোয়ে কারনারের কাছেই ওদের আস্তানা। লন্ডনের এও একটি দিক—কদাকার, বিষণ্ণ অন্ধকার। ভাঙা সরু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। জন ওর ঘর খুলে বলল, ভেতরে এস।

মিসেস জোনস কোথায় ? আমি চারি-দিকে তাকিয়ে বললাম।

ওরা নীচে থাকে। আমি পেয়িং গেস্ট।

ওঃ।

বস।

ঘরে একটাই চেয়ার। বসলাম আমি। ভারী কোটটা পরেই বসলাম। শীত করছিল। জানালাগুলো ঠিকমত বন্ধ নেই। বন্ধ হয় না বোধহয়। হাওয়া ঢুকছিল, ভারী পর্দা ভেদ করেও। দেয়ালগুলো ভিজে ভিজে মত। ভ্যাপসা একটা কি গন্ধ ঘরের বুকে চেপে বসে আছে। জন স্লটে পেনী ফেলে গ্যাসের আগুন জ্বালাল। আমি চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে বসলাম। হাতের গ্লাভস খুলে আগুনের কাছে হাতদুটো সেঁকে নিচ্ছিলাম। জন খাটের উপরে বসল। বসে হাত দুটো মেলে দিল আগুনের দিকে।

জন বলল, আমার ঘরটা বড় 'চিয়ারলেস'। কোটটা খুলবে ?

না। আমি বললাম। আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। নির্জন ঘরে—স্ব পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নেই, নারী-

রিকভাবে ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছেও নেই। তার মুখোমুখি বসে আমার একটু ভয় ভয়ও করছিল। রাগও হচ্ছিল নিজের ওপর, সব তাতেই আমার বাড়াবাড়ি। কার না কার নার্ভাস ব্রেকডাউন হচ্ছে, তার জন্য আমার প্রাণ একেবারে আকুল হয়ে উঠল। কী বোকামি!

তুমি কথা বলছ না কেন গৌরী?

তুমি বরং তোমার দেশের কথা বল জন!

দেশ? জন আগুনের দিকেই তাকিয়ে বলল, আমার দেশ বড় সুন্দর। মানুষদের মনে কত মমতা, ভালবাসা। ইংলন্ডের মত নয়। এদের সব কিছুই ঠান্ডা। এত ঠান্ডা যে আমার ভয় করে আমি বুঝি মমি হয়ে যাচ্ছি।

তুমি কেন সকলের সংগে মেশ না?

আমি কেন জানি না, নিজে থেকে মিশতে পারি না। তুমিই একমাত্র বন্ধু যে আমার ঘরে এল। তুমি কোথায় থাক?

হস্টেলে।

আমি সেখানে যেতে পারি না, না?

না। মিথ্যে কথা বলে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

জান, আমাদের দেশে অনেক হীরে আছে। আসবে তুমি আমাদের দেশে।

আমার তো সব দেশই দেখতে ইচ্ছে করে।

আফ্রিকাও?

হ্যাঁ, কিন্তু, হেসে বললাম, হীরের জন্য নয়।

তুমি এস আমাদের দেশে। আমার ইচ্ছে করে তোমাকে হীরের নেকলেস পরিয়ে দিই।

আমি ঢোক গিললাম।

তোমাদের দেশে কেমন করে বিয়ে হয়?

মা-বাবারা বিয়ে দিয়ে দেয়।

তুমি কি করবে?

আমি কি আর আলাদা কিছু করব? তাড়াতাড়ি বললাম আগুনের থেকে চোখ না সরিয়ে। গরম লাগছে, কোটটা তাও খুললাম না। পিঠ আবার ঠান্ডায় শির-শির করছে।

ঘরের আলোটা দপ্ করে নিবে গেল। আমি তড়াক করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম। বলে উঠলাম—আলো নিবল কেন?

বস বস ভয়ের কিছু নেই। পুরোন বাড়ী কিনা। মাঝে মাঝে লাইনগুলো বিগড়ে যায়। বস না। ওর গলার স্বরে অন্ধকার ঘর ছমছম করে উঠল।

আমি জড়োসড়ো হয়ে বসলাম।

তোমার ভয় করছে আমাকে? ওর শাদা বড় বড় দাঁতগুলো আগুনের আঁচে আরো শাদা মনে হল।

না তো! জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললাম। কিন্তু বাঙালী মেয়ের মতই ভয় করছিল। তখন তো ডানপিটে হই নি। মনে হল আফ্রিকার কালো জংগলে ছোট্ট আগুনে গরম হবার চেষ্টা করছি। বাঘ কোথা থেকে হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বে কে বলতে পারে।

গৌরী, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

আমরা যে, আমি বাঘের ভয়ে কাতর হয়ে ন্যাকা সাজলাম, নিজেরা বিয়ে করি না। আমার তখন কান্না পাচ্ছিল ভয়ে। ওর বিশাল কৃষ্ণ চোখের শাদাটা কেবল চকচক করছিল। জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল আমরা নীচে যাই। মিসেস জোনস হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

জন একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সিঁড়ির কাছে এনে বলল, এস, আমার হাত ধর। সিঁড়িটা বড় বিশ্রী।

আমার হাত ওর মস্ত মুঠোয় হারিয়ে গেল। আমরা নীচে নেমে এলাম।

লন্ডনে আমার ছাত্রজীবনের দ্বিতীয় বছর। এখন হালচাল জানা হয়ে গেছে। কোনো মেয়ে কোনো ছেলের ঘরে একা যাওয়ার অর্থ যে একটাই হয়, তাও জেনেছি। জনকে তাই আমি বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। আমি যথারীতি বার-এ বসে ড্রাফ সাইডার নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সংগে নড়ক-গুলজার করছি, জন আমার সামনে এসে বলল, গৌরী একটা কথা শুনবে?

এখানেই বস না। দল বাড়াও।

না, আমার একটু তাড়া আছে। এক মিনিট শুধু।

আমার পাশে বসা রবার্ট হেসে বলল, এক মিনিটই কিন্তু।

আমি উঠে দাঁড়ালাম একটু বিরক্ত হয়েই। বার কাউন্টারে কনুই রেখে জন বলল, আমি চলে যাচ্ছি।

কোথায়? আমি সচকিত হয়ে বললাম।

দেশে ফিরে যাচ্ছি

সে কি, কোর্স কমপ্লিট না করেই?

হ্যাঁ। আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে তোমার কাছে।

বল। মনে মনে বললাম, আর যাচ্ছি না বাপু তোমার ঘরে।

আমার খুব সাধ, তুমি আমার সংগে একটা ছবি তুলবে।

এই? বেশ তো। যেদিন বলবে।

এখন তো যাবে না। স্টুডিওতে—

কেন, চল না। কাছেই তো স্টুডিও। রবার্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেরিয়ে এলাম।

স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলা হল। পরের দিন ক্লাশফেরৎ যথারীতি বারের দিকে যাচ্ছি গলা ভেজাবার জন্য। বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। জন আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি, তুমি নিলে আমি খুব তৃপ্তি পাব।

হীরের নেকলেস নয় আশা করি। আমি হেসে বললাম।

না, না, সেসব কিছু নয়। জন আমার হাতে এগিয়ে দিল বড় এক বাকস চকোলেট। রঙীন ফিতেয় বাঁধা।

আমি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, ধন্যবাদ! আমার কেন জানি চোখে জল এসে গেল। বললাম, কেন তুমি ফিরে যাচ্ছ জন?

বই হাতে, খালি হাতে ছেলেমেয়েরা উপরে উঠে যাচ্ছে, নেমে আসছে। আমরা দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়ালাম। জন দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল, আমি এখান থেকে বিশেষ কিছুই নিতে পারলাম না যে। কিন্তু দেশে আমার অনেক দেবার আছে। জন একটু চুপ করে থাকল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে বলল, এখানে এসে ভুল করেছি আমি। কিন্তু এখানে না এলে আমার ভুলটাও ভাঙত না। সেজন্য আর আফশোষ নেই। শুধু একটা আফশোষ রয়ে গেল, জন হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি হীরের নেকলেস নিতে আমার সংগী হলে না।

আফশোষ কি, আমিও সমানে হেসে হাত বাড়িয়ে বললাম, আমারই কম হবে সারা জীবন! হিরের নেকলেসটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

জন আবার দাঁড়িয়ে পড়ে দুই হাতে আমার হাত মুঠো করে ধরল। আমি বাথায় একটু চমকে উঠলাম। ও মুঠো আলগা করে আমার হাতে ঠোঁট ছুঁয়ে বলল, নিজের দেশকে কোন দিন ভুল না গৌরী।

জন তরতর করে নীচে নেমে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু দেখলাম চকোলেটের বাকস হাতে করে। বাকসের প্রথম রঙীন মোড়ক খুলতেই দেখলাম উপরে সাজানো রয়েছে আমাদের দুজনকার ছবি। আফ্রিকা আর ভারতবর্ষ! নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বললাম, না, ভুলব না জন!

ঘাট কোথা আজ ।। শান্তিকুমার ঘোষ

কাক উড়ে গেলে উনিশ মাইল, বড়ো জোর হবে বিশ
ঘাট কোথা আজ...চিড় খানে স্রোত পাগলা ঝোরার
ধসের উপর ধস, পথ নেই আর, ধারালো বাঁকের
সম্মুখে পিছে দুই দিকে ধস্
মাঝখানে ক্ষীণ পথের অংশে আবদ্ধ যেন অনাদ্যন্ত কাল

ঢাকে দিকপট পাহাড় ভয়াল, নীচে মৃত্যুর খদ
কল্পাতে এমন বর্ষার ধারা...ধারা অবিরাম প্রহর-প্রহর
আশ্বিন শেষে বজ্রের ডাক—ক্রমাগত ডেপথ্-চার্জ
পাহাড়ে-পাহাড়ে টানা গম্ভীর প্রতিধ্বনি

সাথে সাথে উঁচু মনাস্টারিতে নাচ শুরু
ঘুরে ঘুরে করে মরণ-নৃত্য মুখোশধারী
লম্বুজার নাচ যায় দূরে যায় পার হয়ে দুধকোশী

পিছনে সরছে ঝুলন্ত সেতু—নীচে প্রগতির ধারা
পিছিয়ে পড়ছি আমি কি তবে সাঁকোর উপরে—
আগে যায় নদী ভীমা
নিয়ে চলে ধুয়ে চত্বর জোড়া পদাতি বাহিনী,
সাঁকোটা শক্ত তার

জল শোষে নাকো—বেগে নামে জল
স্নাত শিথিল পর্বতশিলা...ভেঙে পড়ে মাটি,
খসে মহীরুহ পাহাড় খণ্ড
ফাটল ধরেছে এখানে-ওখানে অন্ধকার
চালের উপর বিপজ্জনক
নিজ হাতে গড়া কাঠের কুটির
আসবে না ছেড়ে গরীব পাহাড়ী
মরে তো মরবে আপন ঘরের ভিটায়

শহরগুলি সব ডুবেছে নিভৃত পাতালে
নর্তক দল ঘুমায় জলধি অতলে

শিখর প্রান্তে রেখেছি শরীর—বেঁচেও তো নেই, মরিও নি
আমি প্লাবনের ঘন হুঁশিয়ারি বাজাবো কি দেশময়?
শিয়রে মিলেছে পুরুষ-প্রকৃতি জোড়া হাত খেলা করে
পদতলে শোভা...যত দূর চাই ফেরোজা-হরিৎ সমতল ধরে শোভা
শাখা-উপশাখা রুপালি রেখায় নেমে গেছে নদীমালা

কাক উড়ে গেলে উনিশ মাইল, বড়ো জোর হবে বিশ

নিদ্রার কাঞ্চনা ছিঁড়ে দুধবরণ-হারানো জাগে বৈজয়ন্তী চূড়া ।।

স্রেফ নিরাপত্তার অভাবে ।।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

স্রেফ নিরাপত্তার অভাবে
আমার ভালোবাসাগুলি দ্রুত উচ্ছন্নে চলে গেল
স্রেফ যত্ন-আত্তির অনটনের জন্যই
আমার ভালোবাসাগুলি বখাটে ছেলের মতো বয়ে গেল
ভালোবাসা যেন ঝোপঝাড়-আগাছা জঙ্গল
একটা যেমনতেমন মাটি পেলেই
পৃথিবী কামড়ে পড়ে থাকল!
শব্জীর বাগানের মতোই ভালোবাসা দারুণ সন্ত্রস্ত
শস্যক্ষেতের মতোই তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল
অতএব ভালোবাসার জন্য যথাবিহিত নিরাপত্তা চাই,
চাই মায়ের কোলের মতো প্রাণান্ত আড়াল, সেবা ও শুশ্রূষা
স্রেফ নিরাপত্তার অভাবে
আমার ভালোবাসাগুলি দ্রুত উচ্ছন্নে চলে গেল।

আজকাল বাইরে বেরোলে বুক টিপটিপ করে
মরার খুলি আঁকা পোস্টার দাপাদাপিয়ে ওঠে চারপাশে
রাস্তাঘাটে যখনতখন ষাঁড়ের মতো গুন্ডার আস্তিন
বিনা নোটিশে পরোয়ানা এসে সামনে দাঁড়ায়
আজকাল বাইরে বেরোলে খাপ থেকে বেরোতে পারি না
ভয়ে কাঠ মেরে সিঁটিয়ে থাকি সারাক্ষণ
অথচ কে না জানে——ভালোবাসার অভাবে,
স্রেফ ভালোবাসার অভাবে আমাদের সম্পন্ন ঘরগেরস্থালী
তাসের ঘরের মতো এক ফুঁয়ে উড়ে যেতে পারে।

স্রেফ ভালোবাসার অভাবে
আমার ভালোবাসাগুলি দ্রুত উচ্ছন্নে চলে গেল।

কী এবং কেন (১)

বিজ্ঞানের যুগে যা সবারই জানা দরকার। নতুন বিভাগ। লক্ষ্য রাখুন।

কম্প্যুটার

বর্তমানে বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে আমরা যে অভাবনীয় উন্নতি দেখতে পাচ্ছি তার মূলে রয়েছে কম্প্যুটার, ইলেকট্রনিক্স, মেসার লেসার, প্লাস্টিক প্রভৃতি কয়েকটি জিনিসের বিরাট অবদান। এই জিনিসগুলি আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়েছে। তাই এই জিনিসগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহল প্রচণ্ড। তাঁদের অনুসন্ধিৎসা পূরণের জন্যে আমরা এই জিনিসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে উদ্যোগী হয়েছি।

আজ মহাকাশ অভিযানে আমরা যে বিস্ময়কর সাফল্য দেখতে পাচ্ছি তার মূলে যে জিনিসটির অবদান সবচেয়ে বেশি সেটি হচ্ছে কম্প্যুটার। এই হাতিয়ারটি বিজ্ঞানীদের হাতে না থাকলে মহাকাশ অভিযানের এই সাফল্য কিছুতেই সম্ভব হত না, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

কম্প্যুটার বলতে আমরা বুঝি সূক্ষ্ম গণক-যন্ত্র, যার কাজ হচ্ছে গণিতের জটিল সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করা। দুভাবে এই কাজ হতে পারে। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট রাশিগুলিকে বিচ্ছিন্ন সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা। যেমন, একটি পাত্রে কিছুটা দুধ ঢেলে তারপর আরও খানকটা দুধ ঢাললে সেটি কত হলো? আগে যে দুধ ঢালা হয়েছিল ও পরে যা ঢালা হলো তাদের সংখ্যায় (অর্থাৎ এত পোয়া, এত সের, এত লিটার ইত্যাদি) প্রকাশ করে উত্তরটি সংখ্যার মাধ্যমে জানতে পারা যায়। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট রাশিগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে অন্য কোনো উপযোগী অবিচ্ছিন্ন রাশির মাধ্যমে তাদের প্রকাশ করা। যেমন, কোনো জমির সীমানাকে তাদের আনুপাতিক দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে জমির পরিমাপ ঠিক করা যায়। এই দুটি পদ্ধতি অনুযায়ী কম্প্যুটারের দুটি শ্রেণী আছে। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে যারা গণনা করে তাদের বলা হয় ডিজিটাল বা সংখ্যাত্মক কম্প্যুটার। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যারা করে তাদের বলা হয় অ্যানালগ বা সাদৃশ্যাত্মক কম্প্যুটার।

এখন দেখা যাক, কম্প্যুটার কিভাবে কাজ করে। কম্প্যুটার সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হলো, তার অসাধারণ কর্মক্ষমতা। যে গাণিতিক হিসাব করতে আমাদের কয়েক ঘণ্টা মাথা ঘামাতে হয়, কম্প্যুটার তা নিমেষের মধ্যে সমাধান করে দেয়। প্রত্যেক কম্প্যুটারের থাকে পাঁচটি অংশ: (১) প্রবেশ, (২) স্মৃতিভান্ডার, (৩) নিয়ন্ত্রক (৪) গণিত, (৫) প্রস্থান। কম্প্যুটারকে যে সমস্যার সমাধান করতে হবে সেই সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যগুলি প্রবেশের মাধ্যমে প্রথমে স্মৃতি-ভান্ডারে গিয়ে সঞ্চিত হয়। তারপর গাণিতিক প্রক্রিয়ার যথাযথ ধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রক অংশ স্মৃতিভান্ডার থেকে তথ্যাদি পাঠিয়ে দেয় গণিত অংশে। সেখানে প্রয়োজনীয় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। গাণিতিক ফলাফলগুলি নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে আবার স্মৃতিভান্ডারে এসে সঞ্চিত হয়। সব শেষে নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে সমস্যার উত্তর স্মৃতিভান্ডার থেকে প্রস্থান অংশের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, কম্প্যুটারের ভাষা একটু বিশেষ ধরনের। সে ভাষা হচ্ছে দ্বি-সংখ্যক ভাষা, অর্থাৎ দুটি ভাষার মাধ্যমে কম্প্যুটার সব কিছু প্রকাশ করে থাকে। ঐ দুটি সংখ্যা হচ্ছে ০ এবং ১। যে কোনো সংখ্যার এক-একটি ডিজিট বা অঙ্ক হচ্ছে ঐ দুটির মধ্যে একটি, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় একটি বাইনারি ডিজিট, সংক্ষেপে 'বিট'। বিট-এর দ্বারা শুধু যে সংখ্যাকে এবং যোগ বা বিয়োগ চিহ্নকে প্রকাশ করা হয় তা নয়, কম্প্যুটারের যুক্তি-শক্তির ভিত্তিও হচ্ছে এই বিট। হাঁ, নির্ভুল বা সত্য বোঝাতে ১, আর না, ভুল বা মিথ্যা বোঝাতে ০ ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক সার্কিটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগের মূল বক্তব্য হচ্ছে: কোনো সুইচ বন্ধ থাকলে তা দিয়ে বোঝানো হয় ১ এবং খোলা থাকলে ০।

বিনা জ্বালানিতে তাপ উৎপাদন

জ্বালানী ছাড়া তাপ উৎপাদন, কথাটা অনেকের কাছে 'অবিশ্বাস্য' বলেই মনে হবে। কারণ আমরা এতদিন জেনে এসেছি, তাপ উৎপাদন করতে হলে কোনো না কোনো প্রকার জ্বালানী একান্ত প্রয়োজন—তা সে কয়লার মতো কঠিন জ্বালানী, জল বা কেরোসিনের মতো তরল জ্বালানী, অথবা কোন গ্যাসের মতো গ্যাসীয় জ্বালানী যাই হোক না কেন। এমন কি, আমাদের দেহে তাপ উৎপাদনের জন্যেও খাদ্যরূপ জ্বালানীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি আজ বহু 'অসম্ভব'-কে সম্ভব করে তুলেছে। ১০-১৫ বছর আগে আমাদের অনেকের কাছে চন্দ্র-পৃষ্ঠে মানুষের পদার্পণ একরকম প্রায় অসম্ভব বলে মনে হত। কিন্তু আজ আমরা দেখছি, এই 'অসম্ভব' ঘটনাই আর এক বা দু মাস পরে সত্য-সত্যই ঘটবে। সেইভাবেই বিজ্ঞানীরা আজ বিনা জ্বালানীতে তাপ উৎপাদনের এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছেন। সেই অভিনব পন্থাটি কি তা এখন আলোচনা করা যাক।

আমরা জানি, সারাদিনে একজন মানুষের দেহ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ তাপ বিকিরিত হয়ে থাকে। এই তাপের সবটুকুই বৃথা অপচয় হয়, অর্থাৎ সেই তাপকে কোনো কাজে লাগানো হয় না। বিজ্ঞানীদের মাথায় তাই চিন্তা জাগলো—মানুষের দেহের এই অপচয়িত তাপকে কি কোনো কাজে লাগানো যায় না? যেমন চিন্তা তেমনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হলো। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ ওয়ারেন কাস্টার মানবদেহের এই তাপকে কাজে লাগাবার এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছেন।

এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে মিঃ কাস্টার বলেছেন: যে গৃহে বহুলোক রয়েছে তাদের দেহের তাপ বায়ুতে সঞ্চারিত হচ্ছে। সেই তাপ ঐ গৃহের ছাদের ওপর দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মাধ্যমে সংগৃহীত হয় এবং ঐ তাপকে প্রবাহিত করানো হয় ঠাণ্ডা জল-ভর্তি বহু নলের মধ্যে। এই সব নলের সাহায্যে এই তাপ এসে সঞ্চিত হয় একটি কেন্দ্রীয় ভান্ডারে এবং সংনমনের সাহায্যে তার তাপমাত্রা বাড়ানো হয়। তারপর তাপ-কেন্দ্রিক পাম্পের সাহায্যে গরম জলবাহী নলের মাধ্যমে সেই তাপকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরবরাহ করা হয়। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যের জনস টাউনের পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের দেহের তাপকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁদের দেহের এই তাপ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দশটি ভবনের শীতলতা দূর করার ও তপ্ত রাখার কাজে লাগানো হয়েছে। এই ব্যবস্থায় কেবলমাত্র মানব-

বিনা জ্বালানীতে তাপ উৎপাদন : বিনা জ্বালানীতে তাপ উৎপাদন কার্যপ্রণালীর রেখাচিত্র : (ক) শীতলীকরণের যন্ত্রাংশ (খ) দেহের উত্তাপ ও বাতির তাপ শোষণ, (গ) সঞ্চয়াধার, (ঘ) শয়নাগার।
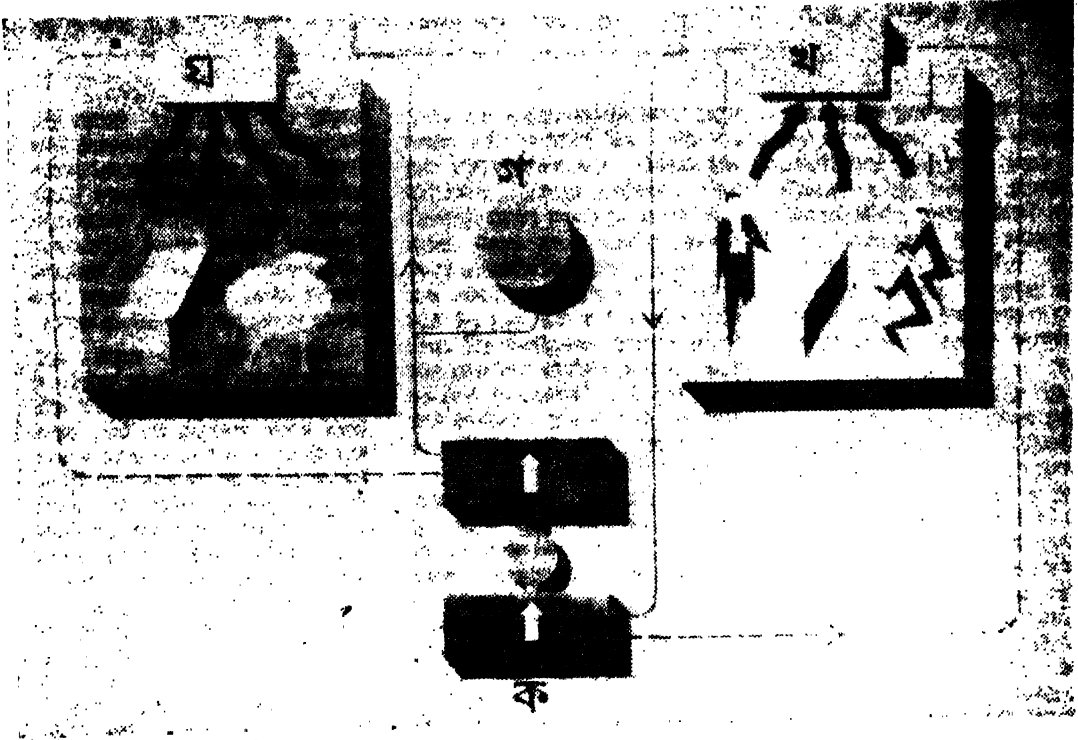
দেহের তাপই নয়, ঘরের বৈদ্যুতিক বাতির, রন্ধনাধারের তাপ এবং জানালার মধ্য দিয়ে ঘরে যে সূর্যের আলো আসে সেই সূর্যকিরণের তাপকেও কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

এই তাপ প্রথমে একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে এসে সঞ্চিত হয় এবং তারপর সেই তাপ ভাণ্ডার থেকে ভূগর্ভস্থ নলের সাহায্যে তা বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। শুধু গ্রীষ্মকালে নয়, প্রচণ্ড শীতেও মানুষের দেহ থেকে সংগৃহীত তাপকে ঘর গরম রাখার কাজে সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। সঞ্চিত তাপের যাতে অপচয় না ঘটে, তার জন্যে প্রয়োজনমাফিক তাপটুকু কাজে লাগাবার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা ইনসুলেটেড হট ওয়াটার ট্যাঙ্ক বা অপরিবাহী উষ্ণ জল ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখা হয়। এই উষ্ণ জলভাণ্ডারের তাপ বিকিরিত হয় না। সপ্তাহান্তে, ছুটির দিনে বা রাত্রিতে যখন এই প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে তাপ সংগ্রহ সম্ভব হয় না, তখন এই সঞ্চিত ভাণ্ডারের তাপকে কাজে লাগানো হয়। তবে বিশেষ জরুরী অবস্থা দেখা দিলে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যেও ঐ সকল নলের জলকে উত্তপ্ত করা যেতে পারে এবং চাহিদা মেটানো যেতে পারে।

বিনা জ্বালানীতে তাপ উৎপাদনের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'হিট রিক্লেম' বা তাপ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা। এই পরিকল্পনার মূলে আছে জল ঠাণ্ডা করার একটি সেন্ট্রিফুগাল বা তাপকেন্দ্রক যন্ত্র। ঐ যন্ত্রটি সকল নলের জল থেকে তাপ সংগ্রহ করে এবং একটি কন্ডেন্সারে বা ঘনীভবন-আধারে গিয়ে সেই তাপ জমা হয়। ফলে ঐ নলের মধ্যে প্রবাহিত জল ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে এবং সেই ঠাণ্ডা জলে আবার নতুন করে তাপ সঞ্চিত হয়।

তাপ-উদ্ধারের এই প্রক্রিয়া আমাদের কাছে অভিনব মনে হলেও তা কিন্তু একেবারে নতুন নয়। একশো বছরেরও আগে ১৮৫২ সালে পাম্পের সাহায্যে যে তাপ সংগ্রহ করা সম্ভব তা তাত্ত্বিক দিক থেকে বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছিলেন। আর ১৯৩২ সালে এই ধারণা বাস্তবে রূপায়িত হয় 'হিট পাম্প' উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে।

কয়েক বছর আগে পর্যন্তও সবরকম হিট পাম্প বাইরের বাতাস, জল, এমন কি মাটি থেকে তাপ সংগ্রহ করত। কিন্তু ১৯৫৮ সালে যন্ত্রবিদেরা বড় ঘর-বাড়ির জন্য আরও নির্ভরযোগ্য ও সস্তা তাপ-উৎস উদ্ভাবন করেন।

আগে শৈত্যাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সংগৃহীত তাপ বাতাসে বা জলে ছেড়ে দিয়ে অপচয় করা হত। আমরা জানি, শৈত্যাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোনো ঘরের অভ্যন্তরস্থ তাপ সংগ্রহ করে তা বার করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার উদ্ভাবকেরা দেখলেন, তাপ নিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্কার করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং এক স্থানের তাপ সংগ্রহ করে অন্য স্থানে অর্থাৎ যে শীতল অঞ্চলকে গরম করার প্রয়োজন সেখানে প্রেরণ করা যায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে ঘর-বাড়ি তৈরী হয় সেখানকার ভেতরে দিকের ঘর সব ঋতুতেই ঠাণ্ডা রাখার প্রয়োজন হয়, কারণ ঘরের ভেতরে মানুষের দেহ বাতি ও যন্ত্র থেকে উৎপন্ন তাপ বাইরে বিকিরিত হতে পারে না। আবার বাইরের দিকের ঘর শীতকালে ঠাণ্ডা প্রতিরোধের জন্য গরম রাখার প্রয়োজন হয়।

এর আগে পর্যন্ত শৈত্যাতপ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য তাপ-উদ্ধার ব্যবস্থা একটি মাত্র বড় বাড়িতে প্রযুক্ত হত। কিন্তু জনস টাউন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে তা দশটি বড় বাড়িকে গরম রাখার কাজে লাগানো হয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রাথমিক খরচ শৈত্যাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রায় সমান, কিন্তু এই ব্যবস্থা চালু রাখার খরচ প্রচলিত তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে ছাত্র বা ছাত্রী যত বেশি পড়াশোনা করে তার দেহ থেকে তত বেশী তাপ বিকিরিত হয়।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলায় রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমো প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

কিছুদিন বাদেই গেলেন কলকাতা এলেনও ফিরে। শোনালেন সেখানের হাল-চাল। ইউরোপের যুদ্ধ বাঙলা দেশের দিকে ছুটে আসছে। প্রথম ব্ল্যাক আউটের মহড়া হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে গোটা কলকাতা জুড়ে। যুদ্ধ দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। রাজদিয়ার মাটিতে ভালোবাসা। ঘর বানানোর আকর্ষণ। অবনীমোহন কিনল তাই জমি, রাজদিয়ার মাটি। ইতিমধ্যে যুগলের বিয়ের তারিখও এসে গেল। নতুন ঘর উঠেছে। ধান কাটাও শুরু।

।। চল্লিশ ।।

হেমনাথের জমি প্রায় একশ' কানির মতন। আর বারো মাসের লোক বলতে মোটে দুজন—করিম এবং যুগল। দুটি লোকের পক্ষে এত জমির ধান কেটে ঘরে এনে তোলা অসম্ভব। তাই জনপঁচিশেক অস্থায়ী কৃষাণ লাগিয়েছে হেমনাথ।

লোক যোগাড় করতে হিল্লী-দিল্লী ছুটতে হয় নি; ঘরে বসেই পাওয়া গেছে। অঘ্রানের শেষাশেষি ধলেশ্বরীর চরগুলো থেকে এবং সুদূর ভাটির দেশ থেকে দলে দলে ভূমিহীন নিরন্ন কৃষাণ রাজদিয়ার দুয়ারে দুয়ারে এসে হানা দিয়েছিল। প্রতি বছরই নাকি এই সময়টা ওরা এখানে আসে। শুধু অঘ্রানেই না, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে—এই ধান-পাট রোয়ার দিনগুলোতেও আসে। দরকার মতন ধানী গৃহস্থেরা তাদের কাজে লাগায়; সাময়িক প্রয়োজন ফুরোলে তারা আবার দল বেঁধে ফিরে যায়।.

অবনীমোহনরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই বিশাল দেশে যেখানে এত প্রাচুর্য, জিনিসপত্র এত অকল্পনীয় রকমের সস্তা, সেখানেও মানুষের দু-মুঠো ভাত জোটে না? পূর্ব বাঙলায় দিকদিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ ছড়ানো। অথচ এ দেশের বেশির ভাগ মানুষই নাকি ভূমিহীন! ভাগ্যবান গৃহস্থের বাড়িতে বছরে মোটে চার মাসের মতন তারা কাজ পায়।

অবনীমোহন শুধিয়েছিলেন, 'বাকি আট মাস ওদের কিভাবে কাটে?'

'অনুমান কর না—' হেমনাথ হেসেছিলেন।

'বুঝতে পারছি না।'

হেমনাথ এবার বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। চার মাস লোকের জমিতে ধানপাট বুনে এবং কেটে ওদের কাটে। সারা বছরে এই সময়টাই যা একটু সুখের মুখ ওরা দেখতে পায়। একমাস কাজ করে পানের 'বরজে'। মাসদুয়েকের মতন মুত্তা আর বাঁশ দিয়ে ধামা-কুলো-পাটি, এইসব বুনে হাটে হাটে বেচে। তা ছাড়া খালে-বিলে-নদীতে মাছ মারা তো আছেই। জীবনধারণের জন্য তাদের নির্দিষ্ট সম্মানজনক কোন জীবিকা নেই; হাজার রকমের উঞ্ছবৃত্তি শুধু।

হেমনাথ বলে যাচ্ছিলেন, 'দু চারটে মাস বাদ দিলে দুর্ভিক্ষ ওদের নিত্য সঙ্গী। কত কষ্টে যে ওরা দিন কাটায় ভাবতে পারবে না।'

একটু ভেবে অবনীমোহন বলেছিলেন, 'আমার ধারণা ছিল, এ দেশের সব মানুষ খুব সুখে আছে।'

'ধারণাটা ঠিক না।'

'তাই তো দেখছি।'

একটু নীরবতা। তারপর অবনীমোহনই আবার শুরু করেছিলেন, 'এত প্রচুর ফসল এদেশে, এত সস্তাগণ্ডা, তবু লোকে খেতে পায় না! আশ্চর্য ব্যাপার।'

হেমনাথ আস্তে করে মাথা নেড়েছিলেন। আবছা গলায় বলেছিলেন, 'সত্যিই আশ্চর্য।'

'আচ্ছা মামাবাবু—'

'বল—'

'এভাবে এত কষ্টের ভেতর কতদিন মানুষ বাঁচতে পারে?'

'বংশ-পরম্পরায় ওরা বেঁচে আছে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাই এইরকম। কি আর করা যাবে।'

অবনীমোহন উত্তর দ্যান নি।

একধারে চুপচাপ বসে দাদু আর বাবার কথাগুলো শুনছিল বিনু। সব বোঝে নি সে। তবু গরীব নিরন্ন ঐ মানুষগুলোর জন্য অসীম দুঃখে তার বুক ভারী হয়ে গিয়েছিল।

পঁচিশজন লোক রেখেছেন হেমনাথ; তারা সবাই ধলেশ্বরী চরের মুসলমান। উদয়াস্ত খাটলেও একশ' কানি জমির ধান কাটতে, সেই ধান ঝেড়ে শুকিয়ে গোলায় তুলতে কম করেও মাস দুই লাগবে। নতুন লোকগুলো ততদিন এখানেই থাকবে।

অর্থাৎ যেতে যেতে তাদের সেই ফাল্গুন মাস।

যতদিন ধানকাটা চলবে ততদিন খোরাকি পাবে লোকগুলো। মজুরি হিসেবে টাকা-পয়সা অবশ্য দেবেন না হেমনাথ; দু' মাস পর দেশে ফেরার সময় প্রত্যেককে তিন মণ করে ধান, দুখানা করে নতুন লুঙ্গি আর গামছা দেবেন।

উত্তর আর দক্ষিণের দুখানা ঘর লোকগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের। অবশ্য চাল-ডাল-তেল-মশলা স্নেহলতা পাঠিয়ে দেন। রান্নাবান্না ওরা করে নেয়।

লোকগুলো কাজে লাগবার পর থেকেই ছায়ার মতন বিনু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। ভোরবেলা উঠেই কাঠকুটো জ্বেলে ওরা রান্না চড়িয়ে দেয়। তারপর উনুনের চারধারে গোল হয়ে বসে হাত-পা সেঁকতে থাকে। তখনও কুয়াশা আর হিমে চারদিক ঝাপসা; সূর্যের তো দেখাই পাওয়া যায় না। তার বদলে আকাশের দূরপ্রান্তে প্রভাতির তারাটা জ্বলজ্বল করতে থাকে।

ওদের গলার আওয়াজ পেলেই আজকাল ঘুম ভেঙে যায় বিনুর। ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। প্রতিদিনই উঠে সে দ্যাখে, হেমনাথ বসে আছেন। এমনিতেই হেমনাথ তাড়াতাড়ি ওঠেন। ইদানীং ধানকাটা শুরু হবার পর তাঁর চোখ থেকে ঘুম গেছে। সারারাত বোধহয় জেগেই থাকেন।

তাড়াতাড়ি দাদুর সঙ্গে সূর্যবন্দনা সেরে সকালবেলার খাবার খেতে খেতে রোদ উঠে যায়; শীতের নিরুত্তাপ স্তিমিত রোদ।

এদিকে অবনীমোহনও উঠে পড়েন; ওদিকে লোকগুলোর খাওয়াও হয়ে যায়। সকালবেলায় অবশ্য ওরা ভরপেট খায় না। নাকে মুখে দু-চার গরাস কোনরকমে গুঁজে বাকি ভাত-তরকারি আর নুন-লঙ্কা-পেঁয়াজ মেটে পাতিলে ভরে গামছায় বেঁধে নেয়।

যাই হোক, সকালে খাওয়া হলে আর একদণ্ডও বসে থাকে না লোকগুলো। ধানকাটা কাঁচি, ভাতের পাতিল আর তামাকের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। হেমনাথ, অবনীমোহন আর বিনুও রোজ তাদের সঙ্গে চকে যায়। ধানকাটা শুরু হতেই লেখাপড়া একরকম বন্ধ করে দিয়েছে বিনু।

এমনিতে কোন রাস্তা নেই। জমির আলের ওপর দিয়ে পথ। আলপথের ঘাস শিশিরে ভিজে থাকে। পোষ মাসের সকালে তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পা শিরশির করতে থাকে বিনুর। অঘ্রানের মাঝামাঝি থেকেই উত্তুরে হাওয়া ছাড়তে শুরু করেছিল। পোষ মাসে তার যেন দাঁত বেরিয়েছে। শরীরের যে জায়গাগুলো খোলা বাতাস যেন সেখানে কেটে কেটে বসছে।

যতখানি সম্ভব বিনুরা দামী গরম জামা-কাপড়ে গা মুড়ে এসেছে। কিন্তু ধানকাটা এই লোকগুলোর বড় কষ্ট। আচ্ছাদন বলতে লুঙ্গি আর মার্কিন কাপড়ের ফতুয়ার ওপর জ্যালজেলে পাতলা চাদর; অনেকে আবার চাদরটাও জোটাতে পারে নি। পোষ মাসের শীতল প্রভাতে খোলা আকাশের তলায় হু-হু উত্তুরে বাতাসের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে লোকগুলো হি-হি করে কাঁপছে। রোদ থেকে যে ভরসা পাবে তারও উপায় নেই। এই শীতে সূর্যালোক বড় কৃপণ, বড় কুণ্ঠিত, বড় নিস্তেজ।

যেতে যেতে লোকগুলো বলাবলি করে, 'এই বছর বেজায় শীত—'

'হ।'

'হাত-পাও কালাইয়া যায়।'

'হ।'

'সুনামগঞ্জের হাট থন একখান চাদর যদি কিনতে পারতাম?'

'চাদরের যা দাম!'

'কত?'

'আড়াই ট্যাহা, তিন ট্যাহা—'

'হায় আল্লা, অত ট্যাহা কই পামু?'

একটু চুপচাপ।

তারপর কে একজন ডেকে ওঠে, 'বছির ভাই—'

বছির নামে লোকটি তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'কী কও তাহের ভাই—'

তাহের বলে, 'ধান কাটতে বাইর হওনের সময় ছোট মাইয়াটার ধুম জ্বর দেইখা আইছিলাম—'

'হ—'

'অহন কেমুন আছে, কেডা জানে?'

'মনখান খারাপ লাগে?'

'হ।'

'মাইয়ার ব্যারাম; তোমার বাইরন (বার হওয়া) ঠিক হয় নাই।'

বিষণ্ণ গলায় তাহের বলে, 'তুমি তো কইলা বাইরন ঠিক হয় নাই; কইয়াই খালাস। কিন্তুক—'

'কী?' জিজ্ঞাসু সুরে বছির শুধোয়।

তাহের বলে, 'ধানকাটা হইয়া গেলে তিন মণ ধান পামু; লুঙ্গি গামছা পামু দুইখান কইরা। মাইয়া লইয়া আর বইসা থাকলে কে আমারে এই সগল দিব? এই ধানটা পাইলে দুই মাসের লেইগা নিশ্চিন্তি—'

'তয় আড়বুইঝার (অবুঝের) লাখান কথা কইতে আছিলি যে বড়। মাইয়া বাচুক-মরুক, এইটা কি আমাগো ঘরে বইসা থাকনের সময়?'

'না।'

'বাইচা থাকলে মাইয়া লইয়া পরে সুহাগ করন যাইব।'

'হ।'

একটু চুপ করে থেকে বছির বলে, 'তোমার মাইয়ার কথায় আমার একখান কথা মনে পড়ল তাহের ভাই—'

তাহের বলে, 'কী?'

'আহনের সময় বউর হাতে তিনখান ট্যাহা দিয়া আইছিলাম; ঘরে আছিল স্যার (সের) পানের চাউল; দুই স্যার তিল আর এক আগইল (ধামা) কাঐনের (কাউনের) চাউল। দুইটা মাস চাইরটা পোলা মাইয়া লইয়া কেমনে যে চলাইব!'

তাহের উত্তর দ্যায় না।

বছির আবার বলে, 'ঘরে এক টুকরা সোনাদানা নাই যে বেইচা কি বান্ধা দিয়া দুইটা পয়সা পাইব! কী যে করব বউটা?'

তাহের এবার বলে, 'ভাইবো না মেঞাভাই—'

বছির উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'ভাবুম না, কও কী?'

'ভাইবা কী করবা? পথ আছে কোন? শুদাশুদি মন খারাপ। তার থিকা যা করতে আছ, কর।'

ধানকাটা লোকগুলোর টুকরো টুকরো ঘর-সংসারের কথা শুনতে শুনতে একসময় বিনুরা জমিতে এসে পড়ে।

ধানখেতে এসে প্রথমে লোকগুলো একছিলিম করে তামাক খেয়ে গা গরম

করে নেয়। তারপর জামাটি খুলে সযত্নে গাছের ডালে ঝুলিয়ে লুঙ্গিতে মালকোঁচা মারে; তারও পর খাঁজকাটা বাঁকানো ধারাল কাস্তেটি হাতে নিয়ে খেতে নামে। শুরু হয়ে যায় ধানকাটা; সমস্ত মাঠ জুড়ে শব্দ ওঠে খসর্‌-র্‌—খস্‌। গোড়া থেকে খড়-সমেত ধানের গোছা কেটে এক-এক জন এক-এক জায়গায় স্তূপাকার করতে থাকে।

হেমনাথের বসবার সময় নেই। মাঠময় ঘুরে ঘুরে তিনি ধানকাটা তদারক করতে থাকেন। অবনীমোহন আর বিনুও বসে না। হেমনাথের পিছু পিছু ঘুরতে থাকে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধান কাটার পর নতুন লোকগুলোর ভেতর থেকে কেউ হয়তো বলে বলে ওঠে, 'মুখ বুইজা কাম করণ যায় না। এই ছ্যামরারা (ছেলেরা) একখান ধর—'

সঙ্গে সঙ্গে তালমাত্রাহীন বেসুরো গলায় গান শুরু হয়ে যায়।

দোহাই আল্লা মাথা খাও,
তামাক ফেলা কই বা যাও,
বিদ্যাশ গ্যালে এবার তুমার
সঙ্গ ছাড়ুম না—আ-আ-আ—
বাপো নাই মোর মাও নাই,
একলা ঘরে কাল কাটাই,
গোসা করলে আর তো
আমি সামুন বান্ধুম না—আ-আ-আ—
নয়া শীতের জারাতে,
যাইবা যখন ধান দাইতে,
তুমার কাঁচি বে'থা, হুকা তামুক
দিমু না আ-আ-আ—
যখন আমি তুমার
সঙ্গ ছাড়ুম না—আ-আ-আ—
নিদয় হইলে মানুষ পাইবা
পিরীত পাইবা না—আ-আ-আ—

রোজই অবশ্য গান হয় না। কোন কোন দিন অল্পবয়সী ছোকরারা দলের সব চাইতে বর্ষীয়ান কৃষাণটিকে ডেকে বলে, 'একখান পরস্তাব (গল্প) কও খলিল চাচা—'

খলিল বলে, 'কী পরস্তাব শুনবি?'

'হেই 'গুলেবাখালি' রাজকন্যার—'

'রাজকন্যার পরস্তাবে বড় রস, না?'

ছোকরারা কিছু বলে না; শব্দ করে হাসতে থাকে শুধু।

বুড়ো খলিল ধবধবে দাড়ি আর শীর্ণ হাত নেড়ে গল্প জুড়ে দেয়, 'এক আছিল রাজকন্যা। তার চিকন চিকন চুল, চাম্পা ফুলের লাখান রঙ, মুক্তার লাখান দাঁত। হ্যায় হাসলে হাজারখান চান্দ (চাঁদ) যেমন ঝলমলাইয়া ওঠে—'

কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান কিংবা গল্প। গানে গানে, গল্পে গল্পে বেলা দুপুর হয়ে যায়। শীতের সূর্য খাড়া মাথার ওপর এসে ওঠে। এই সময়টা ধানকাটা বন্ধ রেখে লোকগুলো পাশের একটা খাল থেকে হাত-পা ধুয়ে ভাতের পাতিল খুলে আলের ওপর সারি সারি খেতে বসে যায়।

দুপুরবেলায় হেমনাথ মাঠে থাকেন না। অবনীমোহন আর বিনুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। জিরোবার সময় নেই। কোনরকমে চান-খাওয়া সেরেই আবার ধানখেতে ছোটেন। এ বেলাও অবনীমোহন এবং বিনু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যায়।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে খানিক নেমে গেলেই ধান কাটা বন্ধ করে দেয় লোকগুলো। এবার ফেরার পালা। সকাল থেকে একটানা পরিশ্রমে যে শস্য কেটে কেটে স্তূপাকার করা হয়েছিল, কৃষাণেরা এবার তা মাথায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। একবারে তো এত ফসল নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই বার বার তাদের মাঠে আসতে হয়।

সমস্ত শস্য বাড়ি নিয়ে তুলতে সন্ধ্যা নেমে যায়। তারপর পুকুর থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে লোকগুলো উত্তর আর দক্ষিণের ঘরে বসে বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়।

সারাদিন তো কাছে কাছেই থাকে; বাড়ি ফিরেও তাদের সঙ্গ ছাড়ে না বিনু। উত্তর কি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ওদের কথা শোনে।

লোকগুলোকে সারাদিন দেখেও বিনুর বিস্ময় কাটে না। কোথায় কতদূরে তাদের দেশ, কে জানে। ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে ফেলে শুধু দু মুঠো ভাতের জন্য তারা এখানে পড়ে আছে। কতদিন ওরা বাড়ি নেই; বাবাকে না দেখে ওদের ছেলেমেয়েদের মন খারাপ হয়ে যায় না? বিনু ভাবতে চেষ্টা করে।

যাই হোক, সমস্ত দিন তো কথা বলার ফুরসত নেই। সন্ধেবেলা মাঠ থেকে ফেরার পর লোকগুলো বিনুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

বছির বলে, 'অ বাবুগো পোলা—'

বিনু তক্ষুনি সাড়া দ্যায়, 'কী বলছ?'

'আপনের নাম কী?'

'বিনু—বিনয়কুমার বসু।'

'বড় বাহারের নাম।' বছির বলতে থাকে, 'কিষাণগো কাম আপনের ভালা লাগে?'

বিনু ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

'আমাগো লগে ধান কাটবেন?'

বিনু উত্তর দেবার আগেই ওধার থেকে বুড়ো খলিল বলে ওঠে, 'কী যে কস

বছিরা, বাবুগো পোলায় ধান কাটব কোন দুঃখে। লেখাপড়া শিখা দারোগা হইব, ম্যাজিস্টর হইব।'

বছির বলে, 'আমি তামসা করলাম দাদা—'

এমনি টুকরো টুকরো কথা। কথায় কথায় শীতের রাত ঘন হতে থাকে। উত্তুরে বাতাস বাগানের গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে শনশনিয়ে ছুটতে থাকে। কোথায় যেন কালাবাদুড় ডানা ঝাপটায়; রাতজাগা পাখিরা গাঢ় গলায় খুনসুটি করে। ভারী কুয়াশা জমে জমে চারদিক ঝাপসা হয়ে যায়।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হতে ব্যস্তভাবে কেউ বলে ওঠে, 'রাইত মেলা হইল; আর কত গপ করবি? ভাত বসাইতে হইব না?'

সবাই চকিত হয়ে উঠে পড়ে।

ওদিকে ভেতর-বাড়ি থেকে স্নেহলতার গলা ভেসে আসে, 'বিনু—বিনু, খাবি আয়—'

লাফ দিয়ে উত্তর কি দক্ষিণের ঘর থেকে বেরিয়ে বিনু ছুট লাগায়।

●

শুধু হেমনাথের জমিতেই না, চকের পর চক জুড়ে এখন ধানকাটা চলেছে। শীতের নিস্তেজ রোদেও কৃষাণদের হাতের কাস্তেগুলো ঝকমক করতে থাকে।

হেমনাথের জমির পশ্চিমে রামকেশবের জমি, উত্তরে লারমোরের। ধানকাটা তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে লারমোর আর রামকেশব গল্প করতে আসেন।

রামকেশব বলেন, 'এইবার ফলন বেশ ভাল।'

হেমনাথ আর লারমোর মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ—'

'আমার পঞ্চাশ কানি জমিতে কম করে এবার পাঁচ শ মণ ধান উঠবে।'

হেমনাথ বলেন, 'অত ধান দিয়ে কী করবি?'

রামকেশব বলেন, 'বছরের খোরাকি রেখে বাকিটা বেচে দেব।'

'আমারও তাই ইচ্ছে। তা দরটর কেমন শুনেছিস?'

'দর বেশ তেজী। সেদিন নিত্য দাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বলল।'

'বাজার তেজী থাকলে ভালই। দুটো পয়সা হাতে আসবে।' হেমনাথ বলতে থাকেন, 'তবে একটা কথা?'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রামকেশব।

'আমাদের তো সুবিধেই। কিন্তু যাদের জমিজমা নেই, শরীরের খাটুনিই ভরসা, তারা খুব মুশকিলে পড়ে যাবে।'

'তা ঠিক।' রামকেশব আর লারমোর চিন্তিত মুখে মাথা নাড়েন।

একটু নীরবতা।

এক সময় হেমনাথ বলেন, 'যা হবার তা হবে। তারপর লালমোহন—'

'বল—' লারমোর মুখ তুলে তাকাল।

'খুব তো ধানখেতে এসে বসে আছ; তোমার রুগীরা ছাড়লে! হাটে-টাটে যাচ্ছ না আজকাল?'

হেমনাথের কোন নেশা নেই। চা-পান-বিড়ি-সিগারেট কিছুই খান না। রামকেশবও তা-ই। লারমোরের কিন্তু নেশার জিনিসটি হাতে পেলে ছাড়াছাড়ি নেই। পেলেন তো দিনে দশবার চা-ই খেলেন; বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি শেষ করলেন। না পেলেন তো বছরখানেক কিছুই খেলেন না।

আলে কৃষাণদের হুঁকো-কল্কি-তামাক, সব কিছু মজুদ থাকে। পরিপাটি করে এক ছিলিম তামাক সেজে আয়েস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লারমোর বলেন, 'ধানকাটার কদিন রুগীদের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছি। বলেছি, তেমন জরুরি কেস থাকলে গীর্জায় নিয়ে আসে যেন। বুঝতেই তো পারছ, এই সময়টা ধান-টানগুলো ঠিকমতো তুলতে না পারলে সারা বছর না খেয়ে থাকতে হবে।'

হেমনাথ হাসেন, 'ত্যাগীব্রতী হলে কি হবে, আসল ব্যাপারে টনটনে—'

লারমোর জোরে জোরে মাঠ কাঁপিয়ে হাসতে থাকেন, 'যা বলেছ!'

●

ধানকাটার মধ্যেই একদিন সময় করে নিলেন হেমনাথ। বললেন, 'আজ বিনুদাদা আর আমি মাঠে যাব না; কৃষাণদের নিয়ে অবনী একলা যাবে।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'আপনার কোন কাজ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'আজ বিনুদাদাকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাব।'

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেছে; এমনভাবে অবনীমোহন বললেন, 'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

হেমনাথ বললেন, 'তুমি একা অতগুলো লোককে সামলাতে পারবে তো?'

'পারব।'

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর হেমনাথের সঙ্গে স্কুলে রওনা হল বিনু। স্টিমারঘাটা, বরফ কল, মাছের আড়ত পেরিয়ে ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসের গায়ে স্কুলবাড়িটা। নাম রাজদিয়া হাই স্কুল।

স্কুলবাড়িটাকে ঘিরে কোন দেয়াল নেই। টিনের চাল আর কাঁচা বাঁশের বেড়া লাগানো অসংখ্য ঘর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। সামনের দিকে প্রকাণ্ড মাঠ; সবুজ সতেজ ঘাসে ছেয়ে আছে। মাঠটায় দুধারে বাঁশের গোলপোস্ট।

রাজদিয়ার এ প্রান্তে কতবার এসেছে বিনু; যাতায়াতের পথে দূর থেকে স্কুলবাড়িটাকে দেখেছে। ভেতরে অবশ্য যায় নি।

আজ হেমনাথের সঙ্গে সামনের মাঠখানা পেরিয়ে স্কুলের দিকে যেতে যেতে বুকের মধ্যেটা কেন যেন দুরু দুরু করতে লাগল বিনুর। হঠাৎ সে ডেকে উঠল, 'দাদু—'

'কি রে—' হেমনাথ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

'ভর্তি হতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে?'

'নিশ্চয়ই দিতে হবে।'

বিনু কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার চোখমুখ দেখে কিছু অনুমান করলেন হেমনাথ। বললেন, 'আমায় কিছু বলবি?'

'হুঁ—'

'কী?'

খানিক ইতস্তত করে বিনু বলল, 'হেডমাস্টার মশায়কে তুমি চেন?'

হেমনাথ বললেন, 'চিনব না কেন?'

'তুমি তাঁকে একটু বলবে—'

'কী বলব?'

'আমার পরীক্ষা যেন না নেন—'

পূর্ণ দৃষ্টিতে হেমনাথ বিনুকে দেখালেন। তারপর খুব গম্ভীর গলায় বললেন, 'না; তা বলতে পারব না। ভর্তি হতে হলে পরীক্ষা দিতেই হবে।'

বিনু চমকে উঠল। আশ্বিনের শুরুতে রাজদিয়া এসেছে তারা; এখন পৌষ মাস। হেমনাথের এমন কণ্ঠস্বর আগে আর কখনও শোনে নি সে।

(ক্রমশ)

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১৩)

চিত্রকল্পনা- প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে - চিত্রসেন

তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ?

খুব তাড়াতাড়ি অথচ দৃঢ় মন নিয়ে সিদ্ধান্ত করে ফেলার ক্ষমতা আমাদের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব-সম্পদ। ইতস্তত দ্বিধা করে আপনি বহু সময় এবং কর্মশক্তির অপচয় ঘটাতে পারেন।

নীচে যে টেস্ট দেওয়া হলো, তার প্রত্যেকটি প্রশ্নে আন্তরিকভাবে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' জবাব দিয়ে যান। তারপর সবশেষে পয়েন্ট দেবার নির্দেশ দেখে বুঝে নিন আপনি কত পেয়েছেন, অর্থাৎ দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য আপনার কতখানি।

১। আপনার কাজকর্মে আপনি খুব চট্‌পটে, এরকম সুনাম কি আপনার আছে?

২। অযাচিত কাজে দেরী না করে জোর করে নিজেকে লাগিয়ে দিতে পারেন কি?

৩। কোনো কাজে যখন আপনি মনস্থির করে ফেলেন, তারপরে কোনোরকম দুঃখদ্বিধা না করে এগিয়ে চলেন কি?

৪। দোকানে গিয়ে কেনাকাটা কি আপনি খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেন?

৫। আপনি কি কখনো দশজনের জন্যে কোনো ক্লাব, বা সমিতি, বা কোনো কিছু অনুষ্ঠান সংগঠন করেছেন?

৬। আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আপনার মনে সুস্পষ্ট ধারণা আছে কি?

৭। কাউকে পরিষ্কার সহজ ভাষায় নির্দেশ দেওয়া আপনার পক্ষে কি সহজ স্বচ্ছন্দ বলে মনে হয়?

৮। অসংখ্যবার 'আঁ' 'য়োঁ' অকারণ শব্দ না করে আপনি পাঁচজনের সামনে কথা বলতে পারেন কি?

৯। যখন কোনো ব্যাপারে আঘাত পান, তখন কি আপনি খুব তাড়াতাড়ি নতুন প্ল্যান নিয়ে সাধারণত কাজে নেমে পড়তে পারেন।

১০। রাজনীতি এবং ধর্মনীতি সম্পর্কে আপনার কি একটা পরিষ্কার ধারণা এবং নিজস্ব বিশ্বাস আছে?

১১। যখন আপনার কোনো নেমন্তন্ন আসে, তখন আপনি সেটা ঠিক গ্রহণ করবেন কিনা বলবার আগে খুব ইতস্তত করার ভাব দেখান কি?

১২। হঠাৎ জরুরী কোনো অবস্থায় পড়লে আপনি কি সাধারণত খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পড়েন?

১৩। দায়িত্ব এড়িয়ে চলার দিকেই কি আপনার ঝোঁক বেশি?

১৪। আপনি কি সহজেই লোকের কথা শুনে সেইমতো কাজ করে বসেন?

১৫। আলাপ-আলোচনা করার সময়ে আপনি কি মাঝে মাঝে কোনো কোনো কথা অসম্পূর্ণ রেখে দিয়ে পরিষ্কার করে না বুঝিয়ে ছেড়ে রাখতে পছন্দ করেন?

১৬। ভুল করে বসবেন এই ভয়ে আপনি কি বাস্তব জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চান?

১৭। পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ না করে আপনি খুব কম ব্যাপারেই কাজে নামেন কি?

১৮। আপনার অবসর সময়ের বেশির ভাগটাই কি আপনি আজেবাজেভাবে কাটিয়ে দেন?

১৯। আপনি কি কখনো কোনো উপলক্ষে পোশাক পরা হয়ে যাবার পর, মন বদলে ফেলেন এবং অন্য পোশাক পরতে ইচ্ছে করেন।

২০। আপনি কি অনেক বছর কোনো কাজে লেগে থাকা সত্ত্বেও উপলব্ধি করেছেন যে, সে-কাজ আপনার ভালো লাগে না?

*

প্রথম দশটি প্রশ্নে 'হ্যাঁ' জবাব দিলে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন এবং ১১নং থেকে ২০নং প্রশ্নে 'না' জবাব দিলে ৫ পয়েন্ট করে পাবেন।

৮০-র বেশি পয়েন্ট বড়-একটা কেউ পান না। যদি কেউ পান, বুঝতে হবে, তিনি কাজের মানুষ, তিনি জানেন তিনি কি চান এবং যা কিছু প্ল্যান করেন বা যে-কোনো কাজেই নামেন, তার প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি সুনিশ্চিত হয়ে নামেন।

৭০ থেকে ৮০ পয়েন্ট বেশ ভালো; ৫০ থেকে ৬৫ মন্দ নয়।

৪০ পয়েন্টের কম পেলে জীবনের প্রতি আর অনেক আস্তিক মন অর্থাৎ পজিটিভ মনোভঙ্গী জাগাতে হবে। ছোটখাটো ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস চর্চা থেকে শুরু করলে অনেক ক্ষেত্রেই উপকার পাওয়া যায় এবং তারপর ধীরে ধীরে আরও বড় বড় কাজে আরো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মনোভাব গড়ে তোলার সাধনা করা সহজ হবে।

*

ভেবেচিন্তে কাজ করা তো ভালোই। কিন্তু বেশি ভাবতে বসা নিশ্চয়ই ভালো নয়। অনেকে বলবেন, 'বুঝি তো সবই, কিন্তু না ভেবে পারি না,' অর্থাৎ, তাঁদের মন ভাবপ্রবণ। হোক ভাবপ্রবণ, তবু মনে রাখতে হবে, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তৎপর হয়ে যা করবার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারাটাই কৃতিত্বের লক্ষণ। আর তৎপর হতে হলে প্রথম চিন্তাতেই যা ভালো মনে হবে শান্তভাবে তা করতে শুরু করে দেওয়া উচিত। আপনার চিন্তাও এগুবে, কাজও এগুবে। প্রথম চিন্তাটি যে সবসময়ে কাঁচা হয়, তা নয়। কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবেই, এইরকম একটা দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ভাবতে শুরু করলে দেখবেন, চিন্তাধারাটিও কেমন তৎপর হয়ে উঠে আপনাকে সঠিক কর্মপন্থা বাতলে দেবে।

তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবার চর্চা করতে হলে আর-একটি জিনিসের দিকে সযত্ন হতে হবে, সেটি হলো পজিটিভ অর্থাৎ আস্তিক মনোভঙ্গী। সবকিছুর উজ্জ্বল শুভ দিকটা নিয়ে ভাববেন, দেখবেন, চিন্তা কতো সজীব হয়ে ওঠে। অশুভ দিকটা আপনিই মনে আসবে, কিন্তু সেটাকে প্রাধান্য দেবেন না; শুভদিকটার সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দেবেন, যুক্তিসহকারে মনে মনে বিচার করবেন। সবকিছুর মধ্যেই শুভ সম্ভাবনা থাকে। সেই শুভ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মতো আশাবাদী সদর্থক মনোভঙ্গী থাকলে আপাতদৃষ্টিতে যাকে অশুভ ঝঞ্ঝাট বলে মনে হয়, তার মধ্যে থেকেও শুভ ফল সৃষ্টি করে নেওয়া যায়।

কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে, এমন যাঁরা মনে করেন, তাঁরা নঞর্থক (নেগেটিভ) মনোভঙ্গীর মানুষ। তাঁদের জীবনে সফলতা আসে দেরীতে।

অবশ্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে হঠকারিতার পথে পা বাড়ানোর পরামর্শও দেওয়া চলে না। তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কাজে নেমে পড়ে যদি দেখেন অনবরত অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে সিদ্ধান্ত একটু-আধটু বদলে নেবার মতো মনটাও তৈরী রাখবেন।

বাঙ্গালোরের একটি শিল্প নিদর্শন

প্রদর্শনী পরিক্রমা

কথা হচ্ছিল দেশজোড়া লোকশিল্পের ভেদ নিয়ে। বলছিলেন লোকশিল্পে বিশেষজ্ঞ জনৈক ভদ্রলোক। আলোচনার প্রসঙ্গ। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের বিভাগীয় ডিজাইন সেন্টারে। এঁরা ২ থেকে ৮ জুন একটি লোকশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন; এই প্রদর্শনীতে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও বাঙ্গালোরের সেন্টারে গত বছর যেসব ডিজাইন অনুযায়ী লোকশিল্পীরা বিভিন্ন জিনিস তৈরী করেছেন তার একটি নাতি-বৃহৎ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। উদ্দেশ্য, এই সব শিল্পীদের কাজের সঙ্গে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের যোগাযোগ সাধন। এই ডিজাইন সেন্টারগুলিতে চিরাচরিত লোকশিল্পের ডিজাইন নিয়ে অনুসন্ধান করা হয় এবং প্রয়োজনমত বা আধুনিক চাহিদামত সামান্য কিছু পরিবর্তন করে লোকশিল্পীদের দিয়ে নানারকম গৃহসামগ্রী তৈরী করানো হয়। তাছাড়া স্বদেশ ও বিদেশের বাজারের চাহিদা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের সুবিধার জন্য।

ভারতে লোকশিল্পের বৈচিত্র্য এবং বৈভব নিয়ে এখনো কোন পূর্ণাঙ্গ কাজ হয়েছে কিনা জানা নেই। তবু ভদ্রলোক যা বললেন তাতে এক রূপ এবং সমস্যা সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা গেল। দিল্লী অঞ্চলের ফারিদাবাদে তৈরি কতকগুলি চমৎকার দাবার সেট এবং সূক্ষ্ম জাফরি কাটা কতকগুলি কাঠের ট্রে দেখিয়ে বললেন, ভারী চমৎকার কাজ কিন্তু এর মধ্যে একটা দরবারী আমেজ আছে। বাংলার লোক শিল্পের মধ্যে যে নির্ভেজাল এবং বলিষ্ঠ একটা লোকায়ত ঐতিহ্য রয়েছে তার পাশে কেন জানি না এসব কাজ দুর্বল মনে হয়। বাস্তবিক বাংলার ঢোকরা কাসারদের দুর্গামূর্তি, রাবণ বা ত্রিপুরা অঞ্চলে কাঠ আর সরু বেতের তৈরী পাত্র কিম্বা পাতলা বাঁশের ট্রে অথবা বারুইপুরের নতুন প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছোট ছোট শোলার পুতুল তাদের রেখা বা গড়নের মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য এনে দেয় যেটা বোধহয় এক উড়িষ্যা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। দুর্গামূর্তি সম্পর্কে ভদ্রলোক বললেন যে, প্রথম যখন এটা তৈরি করিয়ে দিল্লী নিয়ে যাই তখন এর বিক্রির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ ছিল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হবার পর সেখানকার কেন্দ্রের এক মহিলা এটাকে বিক্রয়কেন্দ্র সাজাবার একটা বিশেষ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা স্থির করেন। কিন্তু পরে এক বিদেশী ট্যুরিস্ট এটি দেখে

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট বোর্ডের প্রদর্শনী —দিল্লীর একটি শিল্প নিদর্শন
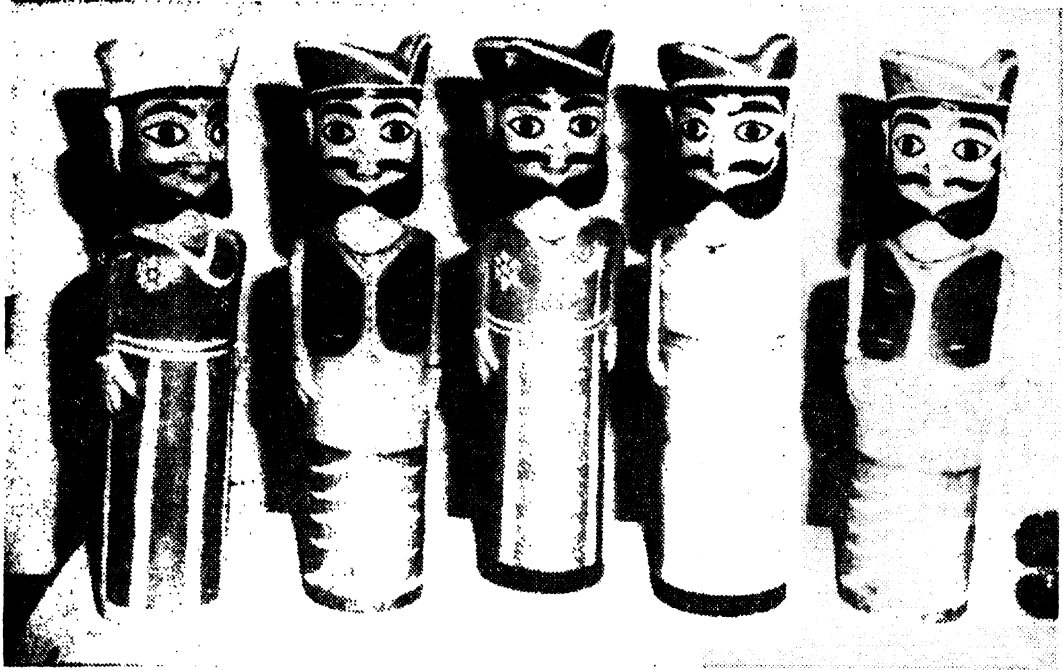
কেনবার জন্যে দোকানে প্রায় হত্যা দিয়ে পড়লেন। ভদ্রলোকের সেইদিন ফিরে যাওয়ার কথা, কিন্তু মূর্তিটি আদায় করবার জন্যে তিনি তাঁর ফ্লাইট ক্যানসেল করে বসে রইলেন এবং শেষ পর্যন্ত ধার্যমূল্যের প্রায় দশগুণ দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক নানা দেশ ঘুরেছেন এবং বিভিন্ন দেশের লোকশিল্পের সঙ্গে তাঁরও যথেষ্ট পরিচয় আছে। তিনি বলে গিয়েছিলেন এ ধরনের বলিষ্ঠ এবং সভ্যতার নিবীর্যকরণের ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত মূর্তিশিল্প তিনি বেশী দেখেন নি।

আমি বললাম, তাহলে ত এ ধরনের কাজের বাইরে রপ্তানির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

তিনি বললেন, তাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় না। কারণ সেটা শিল্পীদের বিচিত্র মনোবৃত্তি। একশ দেড়শ টাকার কাজ পেলে এরা নানাধরনের শিল্পবস্তু তৈরি করে দেয়। কিন্তু মোটা টাকার অর্ডার পেলেই কাজের মান ক্রমশ নামতে থাকে এবং কাজ ডেলিভারি পেতে যে কি কষ্ট করতে হয় তা বলা যায় না।

এই দেখুন গত বছর দিল্লী অঞ্চলের কারিগরেরা এই সব ছোট ছোট কাগজের পুতুল ক্রিসমাস ডেকরেশন হিসেবে প্রচুর বিক্রি করেছে। প্রায় ৩৮০০০ টাকার মত। কিন্তু আমাদের এই শোলার পুতুলগুলো তার চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। এর মোটা টাকার অর্ডার আছে। কিন্তু কারিগরদের কাজ ডেলিভারি দেবার কোন উৎসাহই নেই। অথচ বলবে খেতে পাই না। আরো একটা ভাববার কথা এই যে উত্তর ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে হিন্দুদের চাইতে মুসলমান কারিগর অনেক বেশী নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। এক উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতেই আপনি সেইরকম নিষ্ঠাবান হিন্দু কারিগর ও শিল্পী পাবেন। তাই মনে হয় আমাদের দেশের লোকশিল্পীদের মানসিক গঠন সম্বন্ধেও বোধহয় একটা অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ভারতের সব অঞ্চলের কাজের মধ্যেই রঙের জেল্লাটা সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে। তারপর আসে গঠনবৈচিত্র্য। মাদ্রাজ অঞ্চলের শিল্প মন্দির-কেন্দ্রিক। পাথরের ও কাঠের দেব-দেবীমূর্তির বাহুল্য এবং দুঃখের বিষয় সেখানকার কেন্দ্রের ভাল ডিজাইনারের অভাবে কিছুটা স্থূল। তবে বিভিন্ন ধাতু বসিয়ে কয়েকটি সূক্ষ্ম কারুকার্যময় সেট অপূর্ব লাগল। ভদ্রলোক জানান যে এ ধরনের কাজ কিন্তু আর কোথাও পাওয়া যায় না। বোম্বাইয়ের কাপড় ও পোপগার মেশের মুখোস ও পুতুলের বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মত।

সব দেখার পর মনে হল যে আমাদের দেশে তো লোকশিল্পের কত বিচিত্র সম্ভার। এর কোন একটা ভাল সংগ্রহশালা নেই। অথচ এখনই সেটা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন মনে হয়। আর্টিস্ট্রি হাউসের তরফ থেকে একটা সংগ্রহশালা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে সেটিও পার্ক হোটেলের ওপরতলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে একরকম গুদামজাত হয়ে পড়ে আছে বলেই মনে হয়। এখানে ওখানে ছোটখাট সংগ্রহ কিছু কিছু আছে। কিন্তু কোনটাই সকলের অধিগম্য নয়। লোকশিল্প জনগণের শিল্প লোকচক্ষুর অন্তরালে তার সংগ্রহ কয়েকটি মাত্র বিশেষজ্ঞের অধিগম্য হয়ে থাকাটা বাঞ্ছনীয়ও নয়—লক্ষণ হিসেবে সুস্থও নয়। একে সকলের আয়ত্তের মধ্যে আনা দরকার। শহরের কেন্দ্রীয় কোন জায়গায় এর একটা স্থায়ী ও সর্বাঙ্গসুন্দর সংগ্রহশালা স্থাপন করা দরকার। স্বদেশ ও বিদেশের লোকের এ সম্বন্ধে রুচি আগ্রহ ও চাহিদা বাড়াবার পক্ষে এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

—চিত্ররসিক

উপনিষদে সঙ্গীতের উপাদান

রামচন্দ্র পাল

ভারতীয় উচ্চ সংগীতের উপাদান, আমরা প্রধানত তিনটি উপনিষদে পেয়ে থাকি। 'ছান্দোগ্যে', 'বৃহদারণ্যক' ও 'তৈত্তরীয়'। প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে ঐতরেয় ও কৌষীতকি ঋগ্বেদের অন্তর্গত, কেন ও ছান্দোগ্য সামবেদের অন্তর্গত, ঈশ, তৈত্তরীয় ও বৃহদারণ্যক যজুর্বেদের অন্তর্গত প্রশ্ন ও মুণ্ডক উপনিষদ অথর্ববেদের অন্তর্গত। এই আরণ্যক বা অরণ্য-সাহিত্যগুলির সৃষ্টি কোন যুগে। কোনও কোনও মতে এই সাহিত্যগুলি ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ যুগের মধ্যকালে সৃষ্ট হয়েছিল। ব্রাহ্মণ সাহিত্য গৃহবাসীদের জন্য। ব্রাহ্মণ সাহিত্য গৃহবাসীদের ধর্ম তথা যাগযজ্ঞের উপদেশ দিয়েছে। আরণ্যক বলেছে—বানপ্রস্থীদের অরণ্যবাসী হবার জন্য। সেই জন্য আরণ্যক হোল ব্রাহ্মণের কর্ম ও উপনিষদের অধ্যাত্মতত্ত্ব বিচারের মাঝামাঝি যোগসূত্র। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা বৈদিক যুগেও ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ও বিচিত্র রীতিসম্পন্ন লোক পেয়েছি, বেদের শাখাগুলিই তার প্রমাণ। বিচিত্র শাখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণ ও শিক্ষাশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। ব্যাকরণগুলির মোটামুটি বা এক কথায় নাম প্রাতিশাখ্য। বেদের প্রতি শাখার ছিল ব্যাকরণ, একজনাই তাদের নাম **প্রাতিশাখ্য**। বেদের **মন্ত্র ব্রাহ্মণ** ও **উপনিষৎ** এই তিনটি প্রধান অংশ। ব্রাহ্মণগুলিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মমীমাংসাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অন্ত্য তথা শেষভাগই উপনিষৎ ও আরণ্যক। উপনিষদে চিন্তার চরম পরিণতির আভাস পাওয়া যায়, এই জন্যই উপনিষদকে বুদ্ধি ও বোধির ফলস্বরূপে বলা যায়।

উপনিষদগুলি রচিত হয়েছিল কোন সময়ে এ নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন· প্রাচীন উপনিষদগুলি খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ শতকে রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক "কাকাস ও কাকুরা" বলেছেন উপনিষদগুলি অন্তত খৃষ্টপূর্ব ২০০০—৭০০ শতকের মধ্যে লেখা হয়েছিল। উপরোক্ত তিনখানি উপনিষদের মধ্যে **ছান্দোগ্যের** প্রাচীনতাই প্রায়শই বা বেশীর ভাগ মনীষীরা স্বীকার করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমেই ওঁকারকে **উদগীথরূপে** উপাসনা করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যথা—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত" এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে ওঁকারকে কেন **'উদগীথ'** বলা হয় তার উত্তরে বলা হয়েছে; যে জন্য **"ওম্"** এই পবিত্র অক্ষরটি প্রথমে উচ্চারণ করে উদগান। অর্থাৎ উদাত্তকণ্ঠে বা উচ্চৈঃস্বরে গান করে সেইজন্য ওঁকার "উদ্গীথ"। আমরা এখানেই "ওঁকারের" প্রসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গানের বা সংগীতের পরিচয় পেলাম। উচ্চৈঃস্বরে অর্থাৎ **তারস্থান** থেকে উচ্চারণ করা, মন্দ্র বা মধ্যস্থান থেকে নয়। তৃতীয় মন্ত্রে উদগীথকে সামবেদের রস বা সারাংশ বলা হয়েছে—যথা **"সাম্ন উদ্গীথো রসঃ"**।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, **উদ্গীথের** উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে' ছান্দোগ্যে **বাক ও সামের** মিলনে **উদগীথের** সৃষ্টি বলা হয়েছে। বাক্‌কে অর্ক বা সূর্য (তাপ) এবং **সামকে** প্রাণ বা প্রাণবায়ুরূপে কল্পনা করা হয়েছে **"বাগেবর্ক, প্রাণঃ সাম"**, তা ছাড়াও বলা হয়েছে "তদবা এতন্মিথুনাং যদবাক চ প্রাণশ্চর্ক চ সাম চ" অর্থাৎ বাক্ ও প্রাণের, ঋক ও সামের মিথুনে (সংযোগে) থেকে উদগীথ তথা উদ্গানের সৃষ্টি। সংগীতে কারণস্বর নাদের ও অন্যান্য বাক্যের উৎপত্তির জন্যও উল্লেখ করা হয়েছে।

"নকারং প্রাণনামানং দকারং মনলাং বিদুঃ
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন
নাদোঽভিধীয়তে"।

প্রাণ বা প্রাণবায়ু ও অনল অথবা তাপের সংমিশ্রণেই কারণশব্দের অর্থাৎ নাদের উৎপত্তি। তৎকালীন প্রখ্যাত টীকাকার "সিংহভূপাল" ১২১৩ খৃঃ তাঁর টীকায় লিখেছেন :—

"অন্তঃকরণমাজ্ঞাপ্রেরিতং সদেহস্থ
মুদয়মগ্নিমাহন্তি
তাড়য়তি। স বহ্নিমারুতং বায়ুং প্রেরয়তি।
স পূর্ব ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতেন বহ্নিনা
প্রেরিতঃ সমূর্ধমাগে
গচ্ছনাঘাতেন নাভিহৃদয়কণ্ঠ মুখেষু
ধ্বনিং প্রকটয়তি"

সংস্কৃত শ্লোকে **উদ্ধৃত করার অর্থ** এই যে, ভারতে **পুরাকাল অর্থাৎ প্রাচীন** কাল থেকে **সঙ্গীত ও নাদের উৎপত্তির** গবেষণা **করেছে, যখন ভারত ভিন্ন অন্য কোনও** দেশ **করেনি। উৎগীরথেরও উৎপত্তি** বাকরূপী **অর্ক** তথা তাপ, এবং সাম-রূপী প্রাণবায়ুর সংমিশ্রণে, অতএব উদ্গীথই **ওঁকার তথা নাদ** এবং নাদই সংগীতের **অধিষ্ঠান ও আশ্রয়। ছান্দোগ্য** উপনিষদের **এই** প্রাচীন ধারণা ও সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে যোগ, **তন্ত্র** এবং শব্দশাস্ত্রকারেরা **গ্রহণ করেছিলেন** এবং মেনে নিয়েছিলেন, এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে **বলা হয়েছে, প্রাণ** ও সূর্য সমান গুণসম্পন্ন, **প্রাণও উষ্ণ, সূর্যও** উষ্ণ, তাপ উভয়েই আছে। মুনি **ঋষিরা** প্রাণকে **স্বর** অর্থাৎ মৃত্যুকালে দেহ থেকে বহির্গমনশীল বলেন। সূর্যও তাই, সূর্যকেও স্বর অর্থাৎ **অস্তাচলে** বা দিনান্তে দৃষ্টির পারে গমনকারী এবং **প্রত্যাস্বরঃ** প্রত্যহ **প্রত্যাগমনশীল** অথবা দিনারম্ভে বা রাত্রের শেষে **উদীয়মান** বলা হয়। সমানগুণ এবং স্বভাব বিশিষ্ট এইজন্য প্রাণ ও সূর্যকে উদগীথরূপে উপাসনা করা বিধেয়।

উদগীথকে বিশ্লেষণ করে তার কি সার্থকতা, তা দেখানো হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে : "উদ্+গী+থ ইতিং প্রাণ এবোং প্রাণেনহ্যুত্তিষ্ঠতি, বাগগীঃ বাচোহি গির ইত্যা চক্ষতে, অন্নং থম, অন্নেহীদং সর্বস্থিতম"।

গী অর্থে বাক। 'থ' অর্থে **অন্ন** কেন না সমগ্র জগৎ অন্নে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং

উদগীথ =	উৎ +	গী +	**থ**
	প্রাণ	বাক	অন্ন
	দ্যৌ	অন্তরীক্ষ	পৃথিবী
	আদিত্য	বায়ু	অগ্নি
	সামবেদ	যজুর্বেদ	ঋগ্বেদ

এই তিন জাতীয় উদগীথই বিশ্বসৃষ্টির কারণ; এই জন্যই স্বর, সুর বা **সংগীত** সকলের কারণ বলা হয়েছে। আবার **একথারও** ছান্দোগ্য উপনিষদে **উল্লেখ আছে** "ইয়মেবর্গাগ্নি সাম' ইত্যাদি অর্থাৎ পৃথিবীই ঋগ্বেদস্বরূপিণী, আর অগ্নিই সামবেদ। সাম ঋক মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য সামগ অথবা সামগানকারী বা গায়ক সামকে ঋকমন্ত্রে অধিষ্ঠিত ক'রে গান করেন। বিচারে দেখা যায় এবং প্রকৃতপক্ষে সামগান ঋক্‌ছন্দের উপর বা ভিত্তি করে বিভিন্ন স্বরের ও সাঙ্গীতিক উপাদানের সমাবেশ মাত্র।

ঋকছন্দ=কথা ও সুর=সামগান। অর্থাৎ ঋক্ ও সামের সম্বন্ধ যেন পুরুষ ও প্রকৃতি—পুরুষ ও স্ত্রী। বৈদিক সামগানের তথা সঙ্গীতের সৃষ্টি এই পুরুষ ও প্রকৃতির মিথুন হতে। সামগানে যেমন ছন্দ ও স্বর দুইই থাকে, তেমনি সর্বপ্রকার সঙ্গীতেই অর্থাৎ কি উচ্চাঙ্গের মার্গ বা ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক ও দেশজ সকল সঙ্গীতেই সুর ও কথার একত্র সমাবেশ থাকেই থাকে। ভাষা রূপ মাধ্যমের অনিবার্য উপযোগিতা আছেই আছে। ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা অবশ্যম্ভাবী এবং অতীব প্রয়োজনীয়। বৈদিক সামগমও তাই ঋক্মন্ত্র বা ঋকের মাধ্যমকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টরূপে গান, বাদ্য এবং নৃত্যের উল্লেখ আছে যজ্ঞের সময় বিচিত্র ছন্দে স্তব পাঠ করা হোত, আর তাতে থাকত ছন্দ (তাল) ও সুর। যে সব স্তোম পনেরটি অথবা একুশটি সাম নিয়ে গঠিত হোত, সেই সকল স্তোমকে সুরযোগে পাঠ আবৃত্তি অথবা গান করার সময় তার নাম, গোত্র, বর্ণ ও অধিদেবতাদের চিন্তা করা হোত। তাই উপনিষদ বলছে "যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাৎ তচ্ছন্দ উপধাবেৎ, যেন স্তোমেন স্তোষ্যমানঃ স্যাৎ তাং স্তোমমুপধাবেৎ"। সুতরাং বৈদিক যজ্ঞকুন্ডগুলিকে কেন্দ্র করেই ভারতের দেবদেবী, দর্শন, সাহিত্য, ললিতকলা, শিল্প, কাব্যসৌন্দর্য প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। কর্মকান্ডকে অবলম্বন করে জ্ঞানকান্ডেরও সহস্র ধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

ঐ যুগে স্বরগুলির নামকরণ করা হোত নানাভাবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে। যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করার সময় পরস্পর সংলগ্ন হয়ে যজ্ঞবেদী পরিক্রমণ করতেন আর "বহিষ্পবমান" নামক স্তবিশেষের সঙ্গে উদ্গাতারা স্তুতি করতেন। এর উদাহরণ এবং উপমার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্তোত্র উল্লেখের সঙ্গে, অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন হয়ে যে স্তোত্র গাইতেন তার সঙ্গে নৃত্যেরও সম্পর্ক ছিল একথা এই শ্লোক হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

ভাষ্যকার আচার্য "শঙ্কর" বলেছেন ঃ "স্তোষ্যমাণা উদ্গাতৃপুরুষাঃ সংলগ্নাঃ অন্যোন্যমের সর্পন্তি।" গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্যের এটি একটি নিদর্শন।

সঙ্গীতে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত স্বরের ব্যবহার ছিল এই তিনটি স্বর প্রয়োগ করার, মাত্রা ও লয়ের জ্ঞান থাকা অতি প্রয়োজন, কারণ হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত এই তিনটি মাত্রারই পরিচায়ক। ছান্দোগ্য উপনিষদের মন্ত্রগানে অথবা মন্ত্র পাঠে যে মাত্রা ব্যবহৃত হোত উদাহরণ স্বরূপ তার কিছুটা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করে, এখানে উদ্ধৃত করলাম। "ওম্ ৩, অদাম. ৩, ওম্ ৩, পিবাম্ ৩, ওম ৩, দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা ২ হন্নামিহা ২ হরদন্নপতে ৩, হন্নামিহা ২, হরা ২ হরো ৩ মিতি" এই মন্ত্রের মাঝে মাঝে যে ৩ এবং ২ অঙ্কগুলি আছে এদের অর্থ হোল—৩ অঙ্ক চিহ্নিত বাক্যগুলিকে প্লুত স্বরে ও ২ অঙ্ক চিহ্নিত শব্দগুলিকে দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ করতে হয়। উপরোক্ত নিয়মানুসারে বেদের মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করলে তবেই ফলপ্রদ হয়। অতএব দেখা যায় যে মন্ত্রগানেও স্বর উচ্চারণের পদ্ধতি এবং নিয়মাবলী ছিল। ইচ্ছানুসারে বা মনগড়া মন্ত্রগানের স্বরকে কেহ গ্রহণ করতেন না। মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের উপর যখন নিয়মানুবর্তিতার নজর পড়েছিল তখনও যেমন, তার অনেক আগে বৈদিক যুগে যখন গ্রামগেয় ও অরণ্যে গেয় গানের প্রচলন ছিল সে সময়ও তেমনি ছিল। সুতরাং ঐরূপ নিয়ম কানুনগুলি বৈদিক যুগ থেকে আজও অবাধ বর্তমান।

উপনিষদে অনেক বহু নিয়মাবলীর উল্লেখ আছে, সেগুলি সব উল্লেখ করতে গেলে এই লেখাটি অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। প্রধানতঃ কিছু নিয়মের উল্লেখ করলাম মাত্র এবং সঙ্গীত যে পবিত্র ও উপাসনার বস্তু তা বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগ থেকেই ভারতীয় মনীষীরা শিক্ষা দিয়েছেন। উপনিষদে সঙ্গীতের উপাদান কি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ সাম সঙ্গীতে যে বাইশটি অক্ষরের স্থান আছে বা স্পষ্ট রূপে বলা বা দেখানো হয়েছে। এই বাইশটি স্বরের উপনিষদে উদাহরণসহ নানারূপ বর্ণনা আছে। সামের বাইশটি অক্ষর থেকেই পরবর্তীকালে মার্গ-সঙ্গীতে বাইশটি শ্রুতি কল্পিত হয়েছিল এইরূপে ধারণা করা হয়। সামকে পশুরূপে চিন্তার কথা ("ভবতি হাস্য পশবঃ") ('পশুমান ভবতি') উল্লেখ করা হয়েছে। মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের ষড়্জাদি স্বরকেও পশু-প্রাণীদের স্বরের সঙ্গে তুলনা করে ঐক্য ভাবা হয়েছে, যেমন—ষড়্জের সঙ্গে ময়ূরের শব্দের, ঋষভের সঙ্গে বৃষের ধ্বনির, গান্ধারের সঙ্গে অজ বা ছাগলের ডাকের, মধ্যমের সঙ্গে সারসের শব্দের, পঞ্চমের সঙ্গে কোকিলের ধ্বনির, ধৈবতের সঙ্গে অশ্বের শব্দের ও নিষাদের সঙ্গে হস্তীর ডাকের ঐক্য চিন্তা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্গানে ব্যবহৃত আরো সাতটি স্বরের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলির নাম—বিনর্দি, অনিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বান্তঃ।

১) বিনর্দি—বৃষভধ্বনির মতন স্বর, পশুদের কল্যাণকর, অগ্নি এই স্বরের অধিদেবতা।

২) অনিরুক্ত—অনভিব্যক্ত স্বর প্রজাপতি এর অধিদেবতা।

৩) নিরুক্ত— স্পষ্টতর স্বর, সোম বা চন্দ্র অধিদেবতা।

৪) মৃদু—কোমল ও অল্পচেষ্টাতে উচ্চারিত স্বর, বায়ু অধিদেবতা।

৫) শ্লক্ষ্ণ। শিথিল ও অল্প আয়াসেই নির্গত স্বর, ইন্দ্র অধিদেবতা।

৬) ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চপক্ষীর মত স্বর, বৃহস্পতি অধিদেবতা।

৭) অপধ্বান্ত—ভগ্ন কাংস্যপাত্রে আঘাত করলে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় সে রকম স্বর, বরুণ এর অধিদেবতা।

উপনিষদে সঙ্গীতের যে কত উপাদান আছে, তার নানা উদাহরণ এবং প্রমাণ আছে। সব লেখা সম্ভবপর নয়। যতটুকু লেখা হোল এর দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়, যে উপনিষদে কেবল সঙ্গীতের উপাদান আছে, তা নয় উপনিষদগুলি সঙ্গীতের আধার স্বরূপ।

বর্তিকা

সময়ের বিচারে কোন নাট্যগোষ্ঠী কতো বছরের সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত অতিক্রম করে গেলো, কতো রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি খেলায় বয়ে যাওয়া দিনগুলোর হিসেব রাখলো; শুধু তারই ওপর ভিত্তি করে গোষ্ঠীর প্রকৃত স্থায়িত্ব কিন্তু নাট্যানুরাগী-দের মনে কোন গৌরবদীপ্ত ছবি তুলে ধরতে পারে না। বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত স্থায়িত্ব আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রচনার নেপথ্যে রয়েছে নাট্যশিল্পের প্রতি গোষ্ঠীর শিল্পী-দের ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর জীবনের গভীর-তম উপলব্ধির আলোয় তাকে পরিস্ফুট করে তুলে দেশীয় নাট্য-ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ-তর করে তোলা। এই চিরন্তন সত্যের মর্মকথা যাঁদের অনুভবে, প্রকাশের চাঞ্চল্য যাঁদের প্রয়াসে ভাষা পায়; তাঁরাই এগিয়ে যাওয়া সময়ের সঙ্গে সমান গতিতে চলে প্রতিটি পদক্ষেপকে নতুনতর সুরে মুখর করে তুলতে পারেন। বাংলাদেশের দীর্ঘ পঁচিশ বছরের নাট্য-আন্দোলনের জোয়ারে বহু গোষ্ঠী এসেছে, আবার বহু বিস্মৃতিতে মিলিয়েছে। এই মিলিয়ে যাওয়াটা যেমন সত্য, তেমনই অনেকে বিপুল গৌরব নিয়ে জেগে আছে, উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে অনেকে নতুন করে জাগবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, এটাও সত্য। হয়তো এ সত্যের দ্যুতি আরো গভীরতর। জীবনের সঙ্গে সেতু-বন্ধনে জড়ানো নাট্যশিল্পের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস থাকলেই তবে প্রকৃত অর্থে বাঁচা যায়, এই সত্যকে মর্যাদা দিয়ে যেমন অন্যান্য গোষ্ঠী বাংলাদেশের নাট্যানুশীলনের ক্ষেত্রে নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে পেরেছে, 'বর্তিকা'ও সেই আলোয় নাট্যানুরাগীদের প্রত্যাশাকে দিয়েছে আরো ব্যাপ্তি।

বাংলাদেশের প্রথম সারিতে যে-সব নাট্যসংস্থা রয়েছে, 'বর্তিকা' হয়তো সেখানে আজো স্থান করে নিতে পারেনি। কিন্তু তার প্রয়াসের মধ্যে চলমানতার লক্ষণ সুস্পষ্ট বলেই আমাদের কৌতূহল ছায়ায় আলোয় তার এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলো ও মঞ্চের প্রেক্ষাপটে শিল্পচর্চার ধারাকে ঘিরে জেগে ওঠে। 'বর্তিকা'র চলা শুরু হয়েছে ১৯৬০ থেকে। সেই সময়ে বাংলা-দেশের মানুষ জীবনধর্মী নাটকের মঞ্চ-রূপায়ণের দিকে পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি ফিরিয়েছে; নতুন আঙ্গিকে জীবনের নাটক

কাবুলিওয়ালা নাটকের দৃশ্য

পরিবেশিত হচ্ছে। অতীতের গতানু-গতিকতা থেকে সরে এসে বাংলা নাটক তার একটা বিশিষ্ট পথ বেছে নিয়েছে। এই আলোড়িত পরিবেশে কলকাতার হেদো-পাড়া লেনের কয়েকটি উৎসাহী তরুণের স্বপ্ন উদ্বেল হয়ে উঠলো। যেভাবেই হোক, একটা নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে; এই হোল তাঁদের পরিকল্পনা। এঁদের ভাবনায় এলো, আজ চারদিকে যে নাট্যচর্চার প্রবাহ তাতে আমরাও নিজেদের কেন মিলিয়ে দেব না। এমনি প্রশ্ন আর চিন্তা অনেক দিন ধরে চললো। তারপর একদিন রূপ নিলো মনের কামনা। প্রতিষ্ঠিত হোল 'বর্তিকা'। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্রশিল্পী শ্রীগঙ্গাপদ বসুর নাম বিশেষভাবে স্মরণ-যোগ্য। তাঁর অপরিসীম উৎসাহ আর মূল্য-বান উপদেশ 'বর্তিকা'র আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছে।

সবেমাত্র গড়ে ওঠা সংস্থা 'বর্তিকা'র সভ্যদের তখন প্রচুর উৎসাহ। সবাই তখন অভিনয় করাতে শুরু করলেন, এখন নাটক করবো কি ভাবে, আর কোন নাটকই বা করবো। যাই হোক, চিন্তার এই গুরুভার থেকে এঁদের মুক্তি দিলেন শ্রীবসু। প্রথম কয়েকটি বছরের জন্য তিনি নিজেই নাট্য-শিক্ষার দায়িত্ব নিলেন। প্রথম নাটক ধরলেন তাঁরই লেখা 'কালান্তর' (পরে 'জীবনায়ন' নামে প্রকাশিত)। সমাজজীবনের পরিচিত এক কাহিনী এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। বেশ কিছুদিন মহড়ার পর এই নাটক পরিবেশিত হোল মঞ্চে এবং দর্শকদের কাছ থেকেও মিললো প্রাথমিক পর্যায়ের স্বীকৃতি। উৎসাহিত হোলেন গোষ্ঠীর শিল্পীরা। যাত্রা শুরুর এই বিমুগ্ধ লগ্নেই এঁরা ঠিক করে নিলেন কি ধরনের নাটক এঁরা করবেন। যে নাটক শুধু বাস্তবধর্মী নয়, যে নাটক সমাজের পঙ্কিলতা দূর করে সুস্থ সমাজের পথনির্দেশ করে, আশ্বাস নিয়ে আসে, এমন এক সত্যের যা মানুষকে প্রভাবিত করে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে

ঘূর্ণী নাটকের দৃশ্য

তুলতে, সেই নাটকের মঞ্চরূপায়ণেই এঁরা এঁদের প্রয়াসকে নিবদ্ধ রাখতে চাইলেন।

নাটক সম্পর্কে এই সংকল্পকে মনে রেখে 'বর্তিকা'র শিল্পীরা এবার দীনবন্ধু মিত্রের অমর নাটক 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করবার আয়োজন করলেন। নিরীহ, সরল নীল-চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের নির্মম অত্যাচার এই নাটকে রূপ পেয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে সর্বহারা মানুষদের পক্ষ থেকে পুঞ্জীভূত অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর। এই জ্বালাময়ী নাটক যে চিরকালের, সেই সত্যটুকুকে 'বর্তিকা'র শিল্পীরা ধরতে পেরেছেন বলেই একশ বছর আগের এই নাটক অভিনয় করতে এঁদের দ্বিধা জাগেনি। এই নাটকের প্রযোজনা করতে গিয়ে এঁরা বলেছেন, আজকের জনজাগরণের যুগে সমাজকে জানতে হবে সামাজিক নাটকে, বিদ্রোহকে চিনতে হবে বৈপ্লবিক নাটকে।...'নীলদর্পণ' অত্যাচারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে,...এ নাটক শাশ্বত। এ নাটক আমাদের একতার, সখ্যতার অনুপ্রেরণা দেয় যখনই মনে হয় হিন্দু নবীন মাধবের মৃত্যুতে মুসলমান চাষী তোরাপের গগনভেদী আহ্বান সে জানায় সব অত্যাচার ধুয়ে মুছে উড়ে সাফ হয়ে যাবে দেশের সমস্ত মানুষ যদি এক কাঠ্‌ঠা হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় থেকেই 'বর্তিকা'র জনপ্রিয়তার ইতিহাস সূচিত হোল। বহুবার পরে এ নাটক অভিনীত হয়েছে। এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে 'বর্তিকা'। নাট্যপ্রযোজনার পথ তখন আরো সহজ হয়ে যায়। 'নীলদর্পণে'র পরে অভিনীত হোল তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নাটক। নবনাট্য আন্দোলনের মর্মকথা এ নাটকে বিঘোষিত। 'পথিকে'র পর আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত নাট্যকার বাদল সরকারের হাসির নাটক 'রাম শ্যাম যদু' অভিনীত হোল। এই নাটকের অভিনয় 'বর্তিকা'র খ্যাতিকে আরো বিস্তৃততর করে। নাটকটি মঞ্চে তুলে ধরতে গিয়ে এঁরা বলেছেন, 'সমস্যা জর্জরিত এই ভারতবর্ষ। ততোধিক সমস্যায় ভরা এই বাংলাদেশ। কিন্তু আমাদের কি সংসার নেই? সমাজ নেই? নেই কি হাসি? আছে, কিন্তু শুধু থাকতে হয় তাই। আরও আছে নাচ, গান আছে নাটক। নাট্যকার রচনা করেন নাটক, শিল্পীরা করেন অভিনয়। একটি পরিবারের সামনে হাজার সমস্যা—নেমে আসে অন্ধকার। কিন্তু সে সমস্যার সমাধানও হয়—অন্ধকার ভেদ করে আসে আলোর নিশানা। কে আনে? কে করে সমাধান? করি আমি, আপনি অর্থাৎ রাম, শ্যাম, যদু। এরকম একটা সমস্যার হোল সমাধান, একটা কূট পাপচক্রের বিনাশ হোল—হোল হাসির মাধ্যমে। নিছক হাসি নয়, শুধু পরিস্থিতিটাই হাস্যকর। আপনারাও হাসুন—দেখুন।'

'বর্তিকা'র শিল্পীরা এছাড়া অভিনয় করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' ও অনিল ঘোষের 'বিয়োগ দিয়ে যোগ'। এঁদের আর একটি স্মরণীয় প্রযোজনা হোল শম্ভু মিত্রের 'ঘূর্ণী'। জীবনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধে পরাভূত, পরিশ্রান্ত এক পিতার স্বেচ্ছাচারী ছেলেমেয়েদের আপাতঃতৃপ্তির সন্ধানে বিপথ পরিক্রমা এবং সব শেষে তাদের পতনের নিঃসীম করুণ কাহিনী এই নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সামাজিক সমস্যাসঙ্কুল এই নাটকের সার্থক রূপায়ণে 'বর্তিকা' যথার্থ কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। 'ঘূর্ণী' তাই অভিনীত হয়েছে বহুবার।

বর্তিকার আগামী নাটক দীপক সেনের 'নীড়ে ফেরা'। এ নাটক মানবপ্রেমের বহুমুখী ধারার বিশ্লেষণ করেছে। প্রেম তার গতিপথ বদলাতে পারে কিনা এ নিয়ে বাজী হোল বিলেত ফেরৎ অশোক, শুভেন্দুর স্ত্রী তপতী ও শিল্পী ইন্দ্রজিৎ রায়ের মধ্যে। বাজীর শুরু আর শেষের মাঝখানে আছে আরো একটি প্রেম, ভালোবাসা আর সাময়িক মোহের গল্প।

'বর্তিকা'র শিল্পীরা কলকাতা ছাড়া দুর্গাপুরে, বার্ণপুর, শ্রীরামপুরে, ব্যারাকপুর (পলতা) ও পাহাড়পুরে তাঁদের মঞ্চসফল নাটকগুলোর অভিনয় করেছেন। এঁরা পুরস্কার পেয়েছেন বহু নাট্য-প্রতিযোগিতায়। 'রাম শ্যাম যদু' নাটক অভিনয়ে 'বর্তিকা'র বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার। 'বিয়োগ দিয়ে যোগ' নাটকের জন্য অনিল ঘোষ পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার আর তরুণ-তপন মিত্র পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান। 'বর্তিকা'র বিশেষ কয়েকটি অভিনয়ে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, নিভাননী দেবী প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ।

অভিনয় ছাড়া নাটক সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনা-চক্রের আয়োজন হয় 'বর্তিকা'র মহলাকক্ষে। সংস্থার সভ্যরা নিজ নিজ দৃষ্টি-কোণ থেকে বর্তমান নাট্য-আন্দোলনের ওপর আলোকসম্পাত করেন। সব শেষে সবার চিন্তা মিলে যায় একটা পূর্ণ সংঘবদ্ধ অনুভবে। এখানে সভ্যদের মৌলিক নাটক রচনা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন সংস্থার অন্যতম সভ্য অনিল ঘোষ লিখেছেন 'বিয়োগ দিয়ে যোগ' নাটক।

নাটক নির্বাচন প্রসঙ্গে সংস্থার অন্যতম

সভ্য ও নির্দেশক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বর্তিকা'র লক্ষ্য হোল এমন নাটক করা যা সমাজের মঙ্গলসাধন করবে। এ ব্যাপারে 'ঘূর্ণী' নাটক একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ। এই নাটকে সমাজের দুর্নীতি, সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। দর্শকদের শুভবুদ্ধি এর মধ্য থেকে বক্তব্য খুঁজে নেবে।'

'বর্তিকা'র লক্ষ্য হোল শিল্পসংস্কৃতি প্রচার ও প্রসার, সমস্ত নাট্যসংস্থা ও নাট্যামোদীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ও শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ়করণ।

ন'বছরের পথ-পরিক্রমায় 'বর্তিকা' খুব বেশী নাটক হয়তো মঞ্চস্থ করতে পারেনি, কিন্তু যেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে, তা হোল নাট্যশিল্পের প্রতি সীমাহীন নিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের নাট্যআন্দোলনকে একটা সার্থক ব্যাপ্তিদানে আন্তরিক প্রয়াস। এ'রা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, আমরা চাই নাট্যশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, কেবলমাত্র অর্থের প্রাচুর্যে এ শিল্পকে যেন বিকৃত করা না হয়। কালহরণ ও বিলাসিতার ভিত্তির উপর যেন এ শিল্পের প্রতিষ্ঠা না হয়, নাট্যশিল্প দিনে দিনে সমৃদ্ধি লাভ করুক এটাই কাম্য। মেকি চাঁদিতে নয়, আসল শিল্পসোনায় গড়ে উঠুক শিল্পস্তম্ভ। আর সে স্তম্ভচূড়া থেকে বাজুক সভ্যতার অভয় শঙ্খ।

—দিলীপ মৌলিক
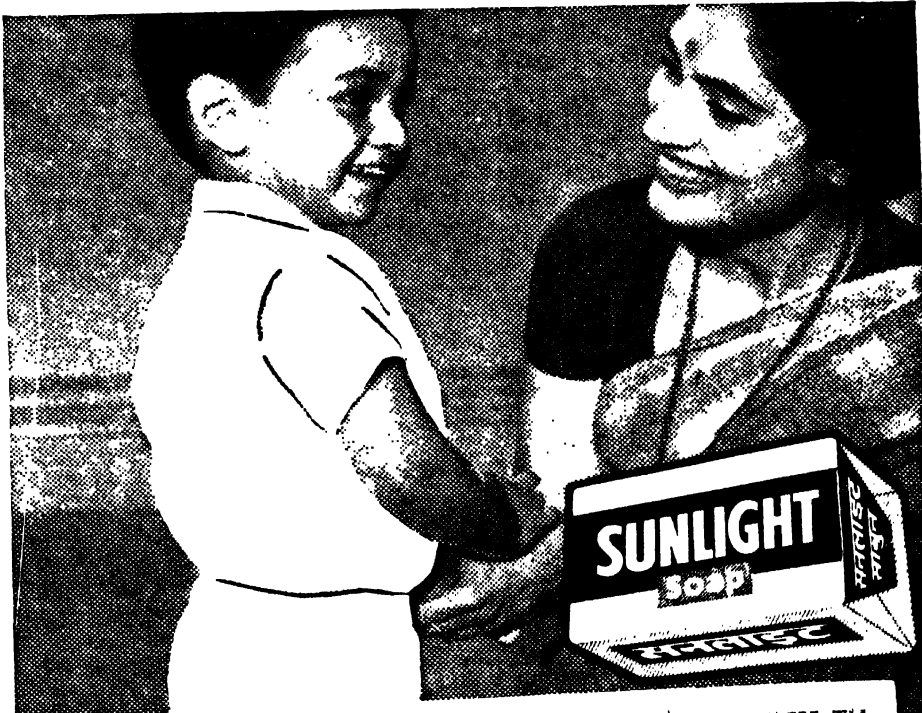
আমি এমন একজনকে জানি যাঁর অন্তরের গভীর বাসনা, মহালয়ার দিন প্রভাতী অনুষ্ঠান মহিষাসুর-মর্দিনীতে চণ্ডী পাঠ করেন। তিনি আমাকে বহুবার তাঁর বাসনার কথা জানিয়েছেন এবং বলেছেন, "আমি বহুকাল ধরে চণ্ডীপাঠ অভ্যাস করেছি, বহু বিদগ্ধজনের আসরে চণ্ডীপাঠ করেছি, পণ্ডিতেরা আমার চণ্ডীপাঠের অজস্র প্রশংসা করেছেন, আমি রেডিওর চণ্ডীপাঠে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্থলাভিষিক্ত হতে চাই।"

আমি তাঁকে গভীর সহানুভূতিসহকারে বলেছি "আপনি রেডিওর চিঠি লিখুন না!"

তিনি বলেছেন, 'লিখেছিলাম, তাঁরা আগ্রহ দেখান নি।'

আমি সোৎসাহে বলেছি, "আপনি দিল্লীতে লিখুন।"

তিনি বলেছেন, "দিল্লীতেও লিখেছিলাম, উত্তর পাইনি।"

এর পর আমার বিমর্ষ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বিমর্ষভাবে আমি বলেছি, "তাহলে আর কী করবেন, বলুন। অপেক্ষা করুন, আপনার নবীন বয়েস, অপেক্ষার সময় আছে। বীরেনবাবু তো একদিন রিটায়ার করবেনই, তখন আপনার চান্স আসতে পারে।"

ভদ্রলোক আমার চেয়েও বিমর্ষ ভাবে বলেছেন, "ওঁরা প্রোগ্রামটা রেকর্ড করে রেখেছেন, বীরেনবাবু রিটায়ার করলেও সেটা বাজাবেন, আমার চান্স নেই।"

আমি তাঁর চেয়েও বিমর্ষভাবে বলেছি, "তাহলে আমি কী করতে পারি, বলুন?"

ভদ্রলোক হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, একটু উৎসাহিত। দু চোখে উৎসাহ ভরে বলেছেন, "আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।"

আমি বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করেছি, "কী করে?"

ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে উঠেছেন, চোখেমুখে প্রত্যাশা ফুটিয়ে বলেছেন, "আপনি আমার সম্বন্ধে একটু লিখুন।"

এবার আমার চমকিত হবার পালা। আমি চমকিত হয়ে বলেছি, "আমি কী লিখব? আমার পক্ষে এরকম কিছু লেখা তো সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি আপনার চণ্ডীপাঠ শুনি নি কখনও।"

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শুরু করে দিয়েছেন। আশপাশে ঘরে তখন আর কেউ ছিল না।

ভদ্রলোকের এত কাণ্ডের পরেও আমি আমার অক্ষমতা জানাতে বাধ্য হয়েছি। ভদ্রলোক নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন।

না, সম্পূর্ণ নিরাশ হন নি। এরপর আবারও এসেছেন আমার কাছে......আবারও......আবারও। প্রতিবারই আমি আমার অক্ষমতার কথা জানিয়েছি।

হঠাৎ একদিন এক শ্রোতার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। তাতে ভদ্রলোকের অজস্র প্রশংসা, বাইরের কোন এক আসরে তাঁর চণ্ডীপাঠ শুনে মুগ্ধ সেই শ্রোতা, মহিষাসুর-মর্দিনীতে তাঁর চণ্ডীপাঠ শুনতে অভিলাষী তিনি, তাঁর অভিলাষ পূরণে লেখার জন্য আমাকে অনুরোধ। ......চিঠিখানা আমি যত্ন করে রেখে দিলাম।

এরপর আর একজন শ্রোতার কাছ থেকে আর একখানা চিঠি এল। তারপর আর একখানা...আর একখানা...আর একখানা। এমনি করে অনেক চিঠি জমে উঠল আমার দেরাজে। একদিন সেই চিঠিগুলো নিয়ে গবেষণায় বসলাম। দেখলাম, সমস্ত চিঠির বক্তব্যই এক, এমন কি অনেকগুলোর হাতের লেখা পর্যন্ত এক শুধু বিভিন্ন নামে কলকাতা ও তার আশপাশ থেকে লেখা। ...চিঠিগুলো আবার বন্ধ করে রেখে দিলাম।

ঘটনাটা বললাম, কারণ শ্রোতাদের তরফ থেকে অনুরোধের আসর সম্বন্ধে কতকগুলো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। প্রধান অভিযোগ, শ্রোতাদের অনুরোধ করা অনেক গান বাজানো হয় না, বাজানো গানগুলির মধ্যে যদি বা কখনও শ্রোতাদের অনুরোধ করা গান থাকে, নামের তালিকায় তাঁদের নাম স্থান পায় না। অনেক শ্রোতা বেতার দপ্তরে অনুরোধ জানিয়ে রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়েছেন (কেউ কেউ আমাকে রেজিস্ট্রেশনের রসিদও পাঠিয়েছেন), আকনলেজমেণ্ট রিসিট ফিরে এসেছে, তাঁদের সেই সব গান বাজানোও হয়েছে—তবু অনুরোধকারীদের নামের ঘোষণায় তাঁদের নাম বলা হয় নি। তাঁদের বিশ্বাস শ্রোতাদের অনুরোধের চিঠি পড়েই দেখা হয় না, অনুরোধের আসরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁর খুশিমতো গান নির্বাচন করে মনগড়া নামের তালিকা পেশ করেন।

তাঁদের এ বিশ্বাস একেবারে অমূলক বোধ হয় নয়। কারণ, বহু শ্রোতার একই অভিযোগ, এবং কয়েকদিন অভিনিবেশসহকারে অনুরোধকারীদের নামের তালিকা লক্ষ্য করলে এ বিশ্বাস সত্যি বলেই মনে হবে।

অনুরোধের আসর একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, অনুরোধ-কারীদের নাম ঘোষণা প্রবর্তনের পর আরও জনপ্রিয় হয়েছে—কারণ, রেডিওয় নিজের নাম শোনার বাসনা অনেকেরই আছে। দশ পয়সার একখানা পোস্টকার্ড ছেড়ে রেডিওয় যদি নিজের নামটা শোনা যায়, দশজনকে শোনানো যায় তাহলে লোকে সে সুযোগ ছাড়বে কেন? তাই অনুরোধের চিঠির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এত চিঠি পড়ার সময় কই বেতার দপ্তরের? তাছাড়া পড়ার দরকারই বা কী? কতকগুলো গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজালেই তো হল, মনগড়া কতকগুলো নাম বললেই তো হল। কে আর ভেরিফাই করতে যাচ্ছে! এতে সময় বাঁচে, পরিশ্রম বাঁচে, লেখালেখির হাঙ্গামাও মেটে।

কিন্তু এইখানেই কি শেষ? বোধ হয় না। এর পরেও আছে। এইখানেই আমার সেই আগের গল্প। দিন কয়েক খেয়াল করে অনুরোধের আসর শুনলে বোঝা যাবে, জনকয়েক গায়ক-গায়িকা আছেন, তাঁদের গানই বেশি বাজে। অনেক নামকরা গায়ক-গায়িকার ভালো ভালো গানের চেয়ে অনেক নাম না-করা গায়ক-গায়িকার সস্তা, বস্তাপচা গানই বেশি অনুরোধ হয়। শ্রোতারা ভালো ভালো গান ছেড়ে "রাবিশ" শোনার জন্য কেন ঘন ঘন অনুরোধ জানাবেন, বোঝা কঠিন।

না, খুব কঠিন নয়—আমার আগের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে খুব কঠিন বলে মনে হবে না। রেডিওর প্রোগ্রাম করার মতো গ্রামোফোনে গান রেকর্ড করারও সম্ভবত কিছু বাঁকা পথ

আছে। এই অপ্রিয় সত্যটা আজ অনেকে অনুমান করে ফেলেছেন। তাই শ'য়ে শ'য়ে বাসী-পচা গান রেকর্ড হলেও বিক্রি বিশেষ নেই। শুধু গান রেকর্ড করাটাই তো বড়ো কথা নয়, রেকর্ড বিক্রিও তো চাই, শিল্পীর প্রচারও তো চাই। তাই ঐ শিল্পীরাই যে নিজেরা নামে-বেনামে বেতার দপ্তরে তাঁদের গান বাজাবার অনুরোধ করে চিঠি লিখছেন, না, বাড়ির বাচ্চা-কাচ্চা আর বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছেন না, তারই বা ঠিক কী?

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২০শে মে রাত সাড়ে ১০টায় পদাবলী কীর্তন শোনালেন শ্রীমতী গৌরী মিত্র ও তাঁর সহশিল্পিবৃন্দ। সুন্দর লাগল। সত্যিকারের কীর্তনরসপিপাসু যাঁরা নিশ্চয় তাঁরা খুশি হয়েছেন, তৃপ্তি পেয়েছেন—এবং অকুণ্ঠ চিত্তে প্রশস্তি করেছেন।

বহুরূপীর অন্যতম সার্থক সৃষ্টি তুলসী লাহিড়ী বিরচিত 'ছেঁড়া তার'। একদা মঞ্চে বহুরূপীর এই নাটকের অভিনয় দর্শকমহলে প্রভূত সাড়া জাগিয়েছিল, বহুরূপীর খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু **২৩শে** মে রেডিওয় তাঁদের এই নাটকের অভিনয় কী কারণে যেন চিত্তে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। একথা সত্যি যে, 'ছেঁড়া তার' যতখানি মঞ্চের নাটক ততখানি রেডিওর নয়, মঞ্চের আবেদন রেডিওয় সৃষ্টি করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু বহুরূপীর কাছে প্রত্যাশা অনেক। বহুরূপীর কাছে বিনীত অনুরোধ, এই সমস্যা নিয়ে তাঁরা যদি একটু চিন্তা করেন!

২৫শে মে বিকেল সাড়ে ৫টায় গল্পদাদুর আসরে গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুলের কণ্ঠে তাঁর একটি কবিতা পাঠ শোনা গেল—রবীন্দ্রনাথের উপর কবিতা। যে কবি দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে নীরব, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল, ব্যথাও বাজল। মনে হল, এই যে গল্পদাদুর আসরের শ্রোতারা, এরা কতখানি বঞ্চিত—যাঁকে এরা দেখছে, যাঁর সম্বন্ধে এত কথা শুনছে, পড়ছে তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও আর এরা কোনো দিন শুনতে পাবে না। বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহটা দেখবে শুধু তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়—তাঁকে দেখবে শান্ত, নিস্তব্ধ।

এই আসরে পরে 'অমর জ্যোতি' নামে জওহরলাল বিষয়ে বললেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের লেখার ভাষাতেই কেবল সাহিত্য ফুটে ওঠে না, তাঁর মুখের ভাষাতেও সাহিত্য প্রাণ পেয়ে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। সাহিত্যিক ভাষায় জওহরলালের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-নিবেদন সাগ্রহে শোনার মতো।...... জওহরলালের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, তাঁর এই কথিকায় জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।

২৬শে মে বিকেল ৬টা ১০ মিনিটে মজদুরমণ্ডলীর আসরে "আজকের কথা" শীর্ষক অনুষ্ঠানে পরিচালক খুব অল্প কথায় অত্যন্ত সহজভাবে তারাপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্বন্ধে বললেন। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অল্প কথায় বলার বিষয় নয়, এ নিয়ে মোটামুটি ভাবে একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে গেলেও সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রয়োজন। কিন্তু সে প্রয়োজনটা মজদুরমণ্ডলীর আসরের শ্রোতাদের জন্য নয়। তাই পরিচালক সে চেষ্টা করেন নি। তিনি শুধু বলেছেন তারাপুরে কী, সেখানে কী হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের কী লাভ হচ্ছে ইত্যাদি। এবং এই বলাটুকু সুন্দর হয়েছে, তাঁর আসরের শ্রোতাদের কাছে অনেকটা বোধ্য হয়েছে।

২৮শে মে বেলা **১টা** ৫০ মিনিটে মহিলামহলে একটি গৃহিণীসভা বসেছিল। তাতে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। আলোচনা করেছিলেন শ্রীমতী শৈলবালা বসু, শ্রীমতী রাধা অধিকারী ও শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায়। আলোচনার মধ্যে বেশ একটা ঘরোয়া ভাব ছিল, তাঁরা যে স্ক্রিপ্ট পড়ছেন মনেই হয় নি। ঐ ভাষাটা থাকার জন্য, ঐ মনে না হওয়ার জন্য আলোচনা খুব প্রাণবন্ত হয়েছিল। আলোচনাকারিণীরা নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার পরিকল্পনার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সরাসরি উপদেশ দেবার চেষ্টা করেন নি। ফলে আলোচনার উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এইদিন রাত **৮টায়** যুবগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন অনুষ্ঠান স্মরণকালের মধ্যে রেডিওয় শোনা যায় নি। এই অনুষ্ঠানে কলকাতা প্রবাসী ভারতের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাষাভাষী তরুণ-তরুণীর বাংলায় গান্ধীজী সম্পর্কে নিজেদের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের কারও মাতৃভাষা গুজরাটী, কারও তামিল, কারও তেলুগু, কারও হিন্দী, কারও ওড়িয়া, কারও পঞ্জাবী। কিন্তু তাঁরা চমৎকার বাংলা বলেছেন, তাঁদের বাংলা অনেক বাঙালীর বাংলাকেও হার মানাবে। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে না শিখলে এমন বাংলা আয়ত্ত করা যায় না। তাঁদের বাংলা চলিত বাংলা হলেও একেবারে কথ্য বাংলা নয়, সাহিত্যিক বাংলা --যে বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এই আলোচনা থেকে বোঝা গেছে, বাংলা ভাষা ভারতের ভিন্নভাষাভাষীদের মনে কী গভীর ভালোবাসার স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

এখানে শ্রবণকের এক ইয়োরোপীয় অধ্যাপকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক—বাংলা ভাষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে, বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-রচনা পড়ার আগ্রহে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বংলা শিখেছেন, বাংলায় এম-এ পাস করেছেন। তিনি চমৎকার বাংলা বলেন, বাংলায় প্রবন্ধ লেখেন—বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর বাংলা রচনা ছাপা হয়। রেডিওয় তিনি বাংলা কথিকা পড়েন। শ্রবণক তাঁর মুখে মিষ্টি বাংলা শোনার জন্য এখনও তাঁর সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলেন।

সত্যিই, "আ মরি বাংলা ভাষা"! আজকের এই হিন্দীর আধিপত্যের যুগে বাংলার এমন স্থান, বাঙালী মাত্রেরই গর্বের বিষয়। হিন্দীকবলিত রেডিও অবাঙালীদের দিয়ে বাংলায় এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন।

কেবল ভাষার জন্যই আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য নয়, আলোচনার বিষয়বস্তুও ছিল চিন্তনীয়। ঐ তরুণ-তরুণীরা গান্ধীজী সম্বন্ধে যতখানি চিন্তা করেছেন, বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তা খুব সুলভ নয়। তাঁদের চিন্তায় বেশ গভীরতা লক্ষিত হয়েছে, স্পষ্টতা দৃষ্ট হয়েছে।

৩০শে মে সকাল সওয়া **৭টায়** ভজন গানের অনুষ্ঠানটির প্রতি আবার বোধ হয় সেই মহামান্যা ঘোষিকার কোপদৃষ্টি পড়েছিল—অনুষ্ঠানটি শেষ হবার আগেই তিনি কেটে দিয়েছিলেন।

—শ্রবণক

পরলোকে জহর গাঙ্গুলী

পুরাতনের সঙ্গে আর একটি যোগসূত্র ছিন্ন হল। গেল ৭ জুন, শনিবার, বেলা সাড়ে দশটায় ছেষট্টি বছর বয়সে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত নট জহর (সুলাল) গাঙ্গুলী পরলোক গমন করেছেন। অলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে (বর্তমানে গ্রেস সিনেমা) ১৯২৬ সালে 'শ্রীদুর্গা' নাটকে আত্মপ্রকাশ করে এই সেদিন পর্যন্ত কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে নান্দিক সম্প্রদায়ের 'নটী বিনোদিনী'তে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একাদিক্রমে চুয়াল্লিশ বছর অভিনয়ের রেকর্ড রাখার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাক ও সবাক মিলিয়ে অন্তত তিনশোখানি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সুরসিক এবং অমায়িক। তাঁর শোকসন্তপ্ত সহধর্মিণী এবং একমাত্র পুত্রকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

আসছে সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হবে।

প্রেক্ষাগৃহ

অথ চিরন্তনী প্রেমকথা

প্রকৃতির কোন খেয়ালের ফলে, কেমন করে, কোথা থেকে কোন্ সুদূর অতীতে পৃথিবীর প্রথম মানব দম্পতির জন্ম সম্ভব হয়েছিল, এ প্রশ্নের সর্বসম্মত সদুত্তর আজও মেলে নি। আবার ঠিক তেমনই বলা যায়, আদিম যুগের মানব-মানবী প্রথম লজ্জা অনুভব করে দেহের অংশবিশেষকে আবৃত করবার কথা চিন্তা করল, খাদ্যোৎপাদনের জন্যে ভূমি কর্ষণে প্রবৃত্ত হল, আগুন জ্বালাতে শিখল এবং নিজেদের মনোভাব প্রকাশের জন্যে অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করতে শুরু করল অর্থাৎ এককথায় সভ্যতার পথে কবে প্রথম পদক্ষেপ করল, সে-সম্পর্কে সঠিক সাল-তারিখ আজও নির্ণীত হয় নি। সিন্ধু সভ্যতার বয়স কেউ বলেন মাত্র পাঁচ হাজার, আর কারও মতে বিশ হাজারের নীচে নয়। মিশরীয় সভ্যতাকে প্রাচীনতম ধরলে তাও কতো হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নন। কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা সকলেই একমত যে, সভ্যতাগর্বী সামাজিক মানুষ নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করবার জন্যে বাইবেলের 'দশ অনুশাসন' রূপ বিধিনিষেধের মত রকম নিগড়ই রচনা করুক না কেন, নরনারীর প্রেমের জয়পতাকাকে সে উড্ডীন না করে পারে নি। কাব্যে পুরাণে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় সেই অতীত যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ প্রেমের জয়গানে শতমুখ। 'পিরিতী বলিয়া এ তিন আখর সৃজিল ভুবনে কে?' রাধাকৃষ্ণ প্রেম থেকে শুরু করে চণ্ডিদাস-রামী প্রেম পর্যন্ত বক্ষে ধারণ করে গোটা বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যই গড়ে উঠেছে। লয়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি প্রেমোপাখ্যান পৃথিবীর সাহিত্যকে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করেছে।

আর একটি অবিনশ্বর প্রেমকথা হচ্ছে রোমিও জুলিয়েট। যদিও অমর কবি-নাট্যকার শেকসপীয়র এই কাহিনীটিকে অবিনশ্বরতা দান করে গেছেন, তবু আসলে এটা ছড়া বা গাথার আকারে মধ্যযুগীয় চারণ কবিদের মুখে মুখে ইতালী ও মধ্য ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকমুখে কীর্তিত এই কাহিনীটিকে প্রথম গাথার আকারে মুদ্রিত করেন লুইজি-ডা-পোর্তো অনুমান ১৫৩০ খৃস্টাব্দে। ম্যাটিও ব্যান্ডেলো ১৫৫৪ সালে আর একটি রূপে একে প্রকাশিত করেন। এই রূপটিই ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে ইংলণ্ডে উপনীত হয়। ব্যান্ডেলোর এই ফরাসী অনুবাদ থেকেই ১৫৬২ সালে জন্মগ্রহণ করে আর্থার ব্রুক রচিত কবিতা 'রোমাস ও জুলিয়েটের বিয়োগান্ত ইতিহাস' (দি ট্র্যাজিক্যাল হিস্ট্রী অব রোমাস অ্যান্ড জুলিয়েট)। শেকসপীয়রের 'রোমিও-জুলিয়েট' নাটকের উপাদান অবিসংবাদীভাবে আর্থার ব্রুকের এই কবিতাটি থেকে সংগৃহীত।

শেকসপীয়রের নাটকটি প্রথম অভিনয় করেন গ্লোব থিয়েটার কোম্পানী ১৫৯৭ সালে। এর পর গেল তিনশো সত্তর বছরের মধ্যে ইংলণ্ডের অভিনয়জগতে এমন কোনো বড়ো নাম নেই যিনি এই 'রোমিও-জুলিয়েট' অভিনয় করেন নি। ডেভিড গ্যারিক, সারা

সিডন্স, মিসেস প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল, সার হেনরী আর্ভিং, এলেন টেরী, ওটিস স্কিনার, অ্যাডিলেড মুর, সার লরেন্স অলিভার ভিভিয়ান লে, জন গিলগুড, ক্লেয়ার ব্লুম প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

চলচ্চিত্রে 'রোমিও-জুলিয়েট' রূপান্তরিত হয়েছে অতীতে দুবার। ১৯৩৫ সালে মেট্রো-গোল্ডউইন-মায়ার দ্বারা প্রযোজিত এবং জর্জ কুকার পরিচালিত ছবিটির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন লেসলী হাওয়ার্ড ও নর্মা শিয়ারার। ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ডে জে আর্থার র‍্যাঙ্ক-এর প্রযোজনায় দ্বিতীয়বার যে-ছবি তোলা হয় রেনাটো ক্যাস্টেলানির পরিচালনাধীনে তাতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন যথাক্রমে লরেন্স হার্ভে ও সুসান শেণ্টাল।

তৃতীয়বার একটি বৃটিশ-ইটালিয়ান কো-প্রোডাকসন এই অমর ট্র্যাজিক কাহিনীটিকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করেছেন ফ্রাংকো জেফিরেলির পরিচালনাধীনে। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, কাহিনীর চাহিদানুযায়ী পরিচালক জেফিরেলি রোমিও এবং জুলিয়েটের ভূমিকা দুটি অভিনয় করিয়েছেন সতেরো বছর বয়স্ক নায়ক লিওনার্ড হোয়াইটিং এবং পনেরো বছর বয়স্কা নায়িকা অলিভিয়া হাসি দ্বারা। তাঁর এই অসমসাহসিকতার ফল কি হয়েছে, তা দেখবার জন্যে আমরা সকলেই উদগ্রীব।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন দুরবস্থার কথা কল্পনা করে সম্প্রতি এক মন্ত্রণা সমিতি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন চলচ্চিত্র মহলে। সাতই জুনের মধ্যে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সমস্ত রেজিস্টার্ড সংস্থাকে প্রতিনিধি হিসাবে দুটি করে নাম পাঠাতে অনুরোধ করেছেন।

এ ব্যাপারে যথাবিহিত ইম্পার (ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশন) কাছেও অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু আত্মস্বার্থে আঘাত লাগতে পারে এই আশংকায় তাঁরা নাম পাঠাতে রাজী নন। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প যখন মুমূর্ষপ্রায় তখন সরকারের এই হস্তক্ষেপ ইম্পার পক্ষে অসহনীয়। একথাই গত মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন অভিনেতৃ সংঘের পক্ষ থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সি টি ডবলিউ ইউর পক্ষ থেকে নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায় আর বি এম পি ই ইউ'র পক্ষ থেকে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা এ অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে বিশেষের একখানা সার্কুলারের কথা উল্লেখ করেন। ইম্পা ঐ সার্কুলারে সমস্ত সদস্যদের জানিয়েছে যে সংস্থার অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো সদস্য সরকারী কোন কমিটিতে যেন যোগদান না করে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ইম্পার বৈঠক বসছে আসছে বিশে জুন। কাজেই সাত তারিখের মধ্যে তারা প্রতিনিধির নাম পাঠাচ্ছে না। অথচ সবারই জানা ইম্পা বাংলা চিত্রশিল্পের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কোন সরকারী সমিতিতে এর অনুপস্থিতির অর্থ অসহযোগিতামূলক আচরণ। ঐ সম্মেলনে উপরোক্ত তিনজনই ইম্পার এই কাজের সমালোচনা করে জানান যাতে ইম্পা তাদের প্রতিনিধি পাঠায় তার জন্য তাঁরা যথা সম্ভব চেষ্টা করবেন। তারই প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে শুক্রবার দিন ঐ তিনটি সংস্থার সভ্যরা এক মিছিল নিয়ে গিয়েছিলেন ইম্পার অফিসে, বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাঁরা (এ পর্যন্ত কোন মীমাংসায় আসেন নি) বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে ইম্পার একত্বের কথা স্মরণ করেই শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই জানান ইম্পারী এই অসহযোগী মনোভাব সরকারের কল্যাণকর চিন্তার পরিপন্থী।

এজন্য তাঁরা নতুনভাবে আন্দোলন শুরু করার পক্ষপাতী। এ মাসের মাঝামাঝি তাই ধর্মঘটের ডাক দেবেন চলচ্চিত্র মহলে উপরোক্ত তিনটে সংস্থা। তাঁদের এই আন্দোলনে শুধুমাত্র ইম্পার যোগ দেওয়ার ব্যাপারই নয়, কর্মী শিল্পীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ব্যাপারেও তাঁদের এ আন্দোলন। বিভিন্ন কনভেনশন করে তাঁরা জনমত তৈরি করবেন, শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হবেন।

●

এ ব্যাপারে ইম্পা অবশ্য আবার অন্য কথা জানিয়েছে। তাঁরা বলেছেন সরকারী মন্ত্রণা সমিতিতে যোগ দিতে তাঁরা রাজী কিন্তু প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যাপারে তাঁরা সরকারের সঙ্গে একমত নন। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা থেকে আরও বেশী প্রতিনিধি পাঠাতে তাঁরা ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে সরকার পক্ষ থেকে কোন জবাব এখনও মেলেনি।

●

নতুন সংগ্রামী চেতনা নিয়ে সিনো-গ্রাফিকের উদ্যোগে 'হরবোলা'র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। গত ২৬শে মে পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদারের নির্দেশে এবং আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীদেওজীভাই-এর চিত্র গ্রহণের মাধ্যমে ছবির 'শুভ মহরৎ' অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

মুখ্য দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাগত জয়দীপ ঘোষ। অন্যান্য চরিত্রে শমিত, নন্দিতা, জ্ঞানেশ, নিভাননী, বঙ্কিম, চিন্ময় ও শুভেন্দু প্রভৃতি। সম্পাদনা, আলোকচিত্র, শিল্প-নির্দেশনা এবং সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতি মিত্র এবং প্রবীর মজুমদার। শ্রীসুবোধ ঘোষের 'পুষ্পকীট' কাহিনীর ভিত্তিতে 'হরবোলা'র চিত্রনাট্যকার পরিচালক শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইকাল্প ফিল্মস নিবেদিত ইন্দর সেন পরিচালিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে 'প্রথম কদম ফুল'-এর সংগীতগ্রহণ সুরকার সুধীন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে গৃহীত হয়েছে গত সপ্তাহে বোম্বেতে। নেপথ্যে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন মান্না দে ও আশা ভোঁশলে।

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা সমর্থ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ছায়া দেবী ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।

সীমা ফিল্মস পরিবেশিত এই ছবিটির কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

●

দীনেশ দে প্রযোজিত দীনেশ চিত্রম্ নিবেদিত ও পরিবেশিত 'পান্না হীরে চুনী' ছবিটি গড়ে উঠেছে ভাগ্যবিড়ম্বিত এক তরুণ সংগীতসাধকের জীবননাট্যকে কেন্দ্র ক'রে। ছবিখানি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষায়। দেবনারায়ণ গুপ্তের চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করেছেন—অমল দত্ত। সুরারোপ করেছেন তরুণ প্রতিভাধর সুরকার অজয় দাস।

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—অনুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, দিলীপ রায়, নিরঞ্জন রায়, বাণী গাঙ্গুলী, শিশির বটব্যাল, স্বপনকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বেবী গুপ্তা, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল ও সুখেন দাস।

বোম্বাই থেকে

উত্তর-ভারত সফরে বেরিয়েছিলাম, তাই গত কয়েক সপ্তাহ 'বোম্বাই চিঠি' লেখা হয়নি। অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে মে-মাসের দ্বিতীয় সপ্তায় কুলু কাটরাইন গ্রামে এসে পোঁছলাম আমরা। বিপাশা নদীর তীরে এই ছোট গ্রামে মে-জুন মাসে টুরিস্টদের মেলা বসে যেন। ডাক-বাংলো, টুরিস্ট বাংলো ও সুইস কটেজগুলো (মোনে সোজা কথায় যাকে বলে তাঁবু) যাত্রীতে ভরে ওঠে। মৌনমুখর পাইনবন ঘেরা উপত্যকা কুলু। তারই ভেতর দিয়ে হিমালয়-কন্যা স্রোতস্বিনী বিপাশা ফেনিল আবর্ত তোলে মৃদু গর্জন করে ছুটে চলেছে রাত্রদিন। রাতে যেন বিপাশার গর্জন আরো বেড়ে যায়।

নদীর পারেই আমাদের ডাকবাংলো। ওখানকার হর্টিকালচারিস্ট ডক্টর জগপাল সিং মশাই, নদীর অপর পারে পাহাড়ের দিকে ইসারা করে বললেন, ঐ যে সামনে ছবির মত বাংলো দেখছেন, ওখানে থাকেন শ্রীমতী দেবিকারাণী, গত যুগের ভারতীয় রূপালি পর্দার প্রথম মহিলা। কাটরাইনে এসে দেবিকারাণীর সংগে দেখা না করে চলে যাবেন? বললাম, নিশ্চয়ই না।

নদীর অপর পারে হলেও, জায়গাটা বেশ দূরে। দেবিকারাণী যেখানে থাকেন সেই গ্রামের নাম নগর। কাটরাইন থেকে দু মাইল চড়াই পথ। দেবিকারাণী মাত্র ক'দিন আগে ব্যাঙ্গালোর থেকে এখানে এসেছেন। আমাদের সংগে সংগে ডক্টর সিংএর পাঁচ বছরের ছেলে বিকি বায়না ধরল, দেবতারাণীকে সে-ও দেখতে যাবে। দেবিকারাণী কথাটা সে বলতে পারে না, বলে দেবতারাণী।

সেদিনই ডক্টর সিং, শ্রীমতী দেবিকারাণীর নিকট লোক পাঠিয়ে আমাদের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেন।

বোম্বে টকিজের কর্ণধার হিমাংশু রায়ের অকাল মৃত্যুর পর পত্নী ও তারকা শ্রীমতী দেবিকারাণী বোম্বে টকিজে নিজের শেয়ার বিক্রী করে, সিনেমা লাইন থেকে চিরকালের জন্য অবসর গ্রহণ করেন ১৯৪৫ সালে। ঐ বছরই তিনি বিখ্যাত শিল্পী রোয়েরিক সাহেবের সংগে দ্বিতীয়বার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং বোম্বাই থেকে বাসস্থান উঠিয়ে দিয়ে কুলুবাসিনী হন। সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

এই ত মাত্র ক'মাস আগে বিখ্যাত ফিল্ম-সোসাইটি 'ফিল্ম-ফোরামের' উদ্যোগে বোম্বে টকিজের প্রথম যুগের ছবিগুলো শহরের তারাবাঈ হলে দেখান হয়। দেবিকারাণী ও অশোককুমার অভিনীত 'জীবন-নাইয়া', 'অচ্ছ্যুতকন্যা' প্রভৃতি ছবিগুলো

অন্য মাটি অন্য রঙ-এর শিল্পী শিবানী বসু। ফটো : অমৃত

... সমানভাবে দর্শকদের আকর্ষণ করত। অবাক হয়ে আমরা বলাবলি করেছিলাম, সাড়ে তিন দশক আগে এ-ধরনের উন্নতমান ছবি নির্মাণ করা সম্ভব ছিল। অথচ আজ, চিত্র নির্মাণের কলা-কৌশলের অত উন্নতি সত্ত্বেও হিন্দি ছবির এই হাল কেন?

তুললাম কথাটা দেবিকারাণীকে জিজ্ঞাসা করলাম আজ। এটা ত খুবই সত্যিকথা, দেবিকারাণীর মত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি অভিনেত্রী হিন্দী ছবিতে সে-যুগেও কেউ ছিল না, আজো কেউ নেই। খুব একটা কৌতূহল নিয়ে, নির্দিষ্ট সময়ে আমরা সদলবলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করেই নজরে পড়ল, নীচের তলাকার একটা ঘরের সামনে সাইনবোর্ড। রোয়েরিক আর্ট গ্যালারী। উঁকি মেরে দেখি গ্যালারিতে বেশ ভীড়। কিছু বিট্‌ল্ ও হিপিও রয়েছে এদের ভেতর। এরা নাকি কুলু বেড়াতে এসেছে।

একটু বাদে রিসেপ্‌সনিস্ট মেয়েটি আমাদের ওপরে ডেকে নিয়ে গেলেন। দেবিকারাণী ও তাঁর স্বামী হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে ভেতরের বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। মিস্টার রোয়েরিক তাঁর ছবি সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। এখানকার আর্ট গ্যালারীতে সাম্প্রতিক পেন্টিং কিছুই নেই যদি আমার ছবি দেখতে চান, আসুন না একবার ব্যাঙ্গালোরে। মিস্টার রোয়েরিক ভারত সরকারের তরফ থেকে আসছে বছর মস্কো যাচ্ছেন—ইন্টারন্যাশনাল আর্ট এগজিবিশনে যোগ দিতে। সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বিশেষ করে আঁকা পঞ্চাশখানি ক্যানভাস্। ঐ ছবিগুলোতে নাকি ভারতের আত্মাকে খুঁজে পাবেন।

শ্রীমতী দেবিকারাণীও মধুর আলাপে সবাইকে আপ্যায়িত করলেন। আমি বাঙালী জেনে আমার সঙ্গে বাংলায় কিছু কথা বললেন। ওঁর হাস্য পরিহাসবহুল কথোপকথন ও বাচনভঙ্গী আমাকে মনে করিয়ে দিল পঁচিশ বছর আগেকার দেবিকারাণীকে। আগে তাঁকে যেমনটি দেখেছিলাম, আজো তাই আছেন। যদিও দেবিকার বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি, বয়স তাকে মানসিকভাবে স্থবির করতে পারে নি।

দুর্গা খোটে দেবিকারাণীর সমসাময়িক হিন্দী ছবির অন্যতম নায়িকা, দুর্গা খোটের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, দুর্গা খোটে এখন ডকুমেন্টারী ছবি করে জীবিকা-নির্বাহ করেন। দেবিকারাণী বললেন, কিন্তু লক্ষ্য করেছেন কী সুন্দর স্বাস্থ্য ওঁর। গেল বছর আমার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে দেখা হয়েছিল। অথচ আমার শরীরটা প্রায় ভেঙেই গেছে। অবশ্য বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না—

বললাম, কি অসুখ?

অসুখ কি একটা? তবে সবচেয়ে কষ্ট পাই পিঠের ব্যথায়। জানেন, প্রথম যৌবনে স্যুটিং-এর সময় দুর্ঘটনায় পড়ে পিঠে খুব আঘাত লেগেছিল। তখন কিছু বুঝতে পারিনি। আজকাল তার জের টানছি। গেল বছরে বোম্বে গিয়ে সব বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি। কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত নিজের চিকিৎসা নিজেই করছি বায়োকেমিক বই পড়ে। জানেন, 'ক্যালিফস্' খেলে সাময়িক উপকার পাই।

জানা গেল, হোমিওপ্যাথি ছাড়াও জ্যোতিষ ও হস্তরেখা বিদ্যা শ্রীমতী দেবিকারাণীর নখাগ্রে। এসব নিয়েই আজকাল সময় কাটে। বললেন তিনি।

বললাম, হিন্দী ছবি দেখেন না আজকাল?

দেবিকা—দেখি বইকি মাঝে মাঝে।

প্রশ্ন—ইদানীং কি ছবি দেখলেন?

দেবিকা—নামটাম মনে নেই। দিলীপ-

ত্রিশ
উনি
আনন্দের সঙ্গে
পার্লে বিস্কুট খাচ্ছেন
৩০ বছর ধরে ...
...এখন অবধি উনি নানা রকমারি বেছে নিতে পারেন—আর ওঁর পরিবারেও বিস্কুট খাবার লোক বেড়ে উঠেছে। উনি খান জেফস্, ওরলে, চীজলিংস্, গ্লিন-এইচ—ভারতের প্রথম মজাদার স্বাদের বিস্কুট—আর বিশেষ ক'রে গ্লুকো ও মোনাকো-ভারতের সবচেয়ে বেশী কাটতির মিষ্টি ও নোন্তা বিস্কুট।
কিন্তু ওঁর মতটাকেই আপনি মেনে নেবেন না যেন—নিজেই সবগুলি যাচাই ক'রে দেখুন। দেখুন কোন্ পার্লে বিস্কুট আপনার সবচাইতে ভাল লাগে। এই সব বিস্কুটই চমৎকারভাবে তৈরী হয়েছে ভারতের অন্যতম অতি আধুনিক বিস্কুট ফ্যাক্টরীতে।
পার্লে
বিস্কুট
আজই এক প্যাকেট পার্লে কিনে নিন!
গ্লুকো
মোনাকো
ওরলে
গ্লিন-এইচ
জেফস্
চীজলিংস্
everest/565 a/PP bs

কুমার ও সায়রা বানু অভিনীত কোন ছবি বোধহয়।

বললাম—কিন্তু যতদূর জানি, দিলীপ-কুমার ও সায়রা বানু আজ পর্যন্ত কোন হিন্দী ছবিতে একত্রে নায়ক-নায়িকার পার্ট করেননি।

দেবিকা—তাহলে বোধহয়, দিলীপ ও বৈজয়ন্তীমালা।

প্রশ্ন—আজকালকার সাধারণ হিন্দী ছবি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

দেবিকা—মন্দ কি। তবে সত্যি বলতে কি, ওসব কথা নিয়ে ভাবি না।

প্রশ্ন—আপনার স্বামী হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর যে ক'বছর আপনি বোম্বে টকিজের কর্ণধার ছিলেন, 'বসন্ত', 'কিসমৎ' প্রভৃতি বহু হিট পিকচার তৈরী হয়েছিল তখন। আপনার কি কখনো ইচ্ছে করে না আবার একখানি হিন্দী ছবি-টবি করেন?

না। ইতিমধ্যে ভৃত্য চা-বিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে এল। কার কত চিনি চাই, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে দেবিকা নিজে চা পরিবেশন করলেন।

মিস্টার রোয়েরিক বিকির জন্য নিয়ে এলেন মিল্ক-চকোলেট। দেবিকারাণী বিকিকে আদর করতে করতে বললেন, জানেন আমি যখন বোম্বে টকিজে অভিনয় করতাম, আমাদের আর্টিস্ট মমতাজ আলি তাঁর একটা পাঁচ বছরের ছেলেকে প্রায়ই সেটে নিয়ে আসত। মমতাজ আলির অনেক ছেলেমেয়ে। লক্ষ্য করে দেখলাম ছেলেটি আমার কাছে এসে বসতে চায়। তখন আমি তাকে কাছে এনে বসালাম। বললাম, তুমি কি চাও? ছেলেটি বললে, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। বড় হলে তোমাকে সাদি করব। বললাম সাদি ত করবে, কিন্তু আমাকে খাওয়াবে কি?

ছেলেটা বললে, কেন আমি টাঙ্গা চালাব না? রোজগার করব না? তখন কি করব জান? তুমি লাল পোষাক পরবে, আমি সবুজ পোষাক পড়ব। আর দুজনে রোজ বিকালবেলা টাঙ্গায় চড়ে খালি ঘুরব, ঘুরব আর ঘুরব।

আমরা হাসতে লাগলাম। একটু থেমে দেবিকা বললেন, মমতাজ আলির সেই ছেলেটা আজকাল অভিনেতা হিসাবে খুব নাম-টাম করেছে। ভাবলাম, তবে মাহমুদের কথা বলছেন দেবিকারাণী?

বললাম—আচ্ছা আপনি কি বাংলা ছবি দেখেন? মানে সত্যজিৎ রায়ের ছবির কথা বলছি।

দেবিকা—হ্যাঁ সত্যজিতের পথের পাঁচালি দেখেছি। খুব ভাল লেগেছে।

দেবিকারাণী ও তাঁর স্বামী আজকাল বছরের অধিকাংশ সময় ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। শুধু মে ও জুন মাসে কুলু আসেন নিজেদের বাড়ীতে। একটু বাদেই দেবিকা-রাণী ও তাঁর স্বামী আমাদের নিয়ে নীচে নেমে এলেন, বাগান-টাগানগুলো দেখাবেন বলে। ও'র হাতে লাঠি। লজ্জিতভাবে বললেন, পাথরে জুতো ফসকায় তাই।—

বিরাট গোলাপবাগ। কত রঙের কত জাতের গোলাপ দেখলাম ও'দের বাগানে। গাছগুলো কিন্তু বেশ বড় বড়। কখনো ছাঁটা হয় না। দেবিকা হেসে বললেন, আমার স্বামী এখানকার গাছ-লতা কিছুই কাট-ছাঁট করতে নারাজ। মিস্টার রোয়েরিক হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

পেছন দিকে ফলের বাগান। আপেল, নাশপাতি, চেরি গাছ ইত্যাদির ছড়াছড়ি। মিস্টার রোয়েরিক বললেন, বাজারে ফল বিক্রী করে যা আয় হয়, বাংলোর চাকর-বাকরদের মাইনে-পত্র তাতে মিটে যায়।

এক জায়গায় দেখলাম, বাড়ী তৈরীর বিস্তর মাল-মশলা। দেবিকারাণী জানালেন, এদিয়ে ন্যাশনাল মিউজিয়মের বাড়ী হবে। এই মিউজিয়ামে আমার শ্বশুর নিকোলাস রোয়েরিক ও স্বামীর বিখ্যাত পেন্টিংগুলো গচ্ছিত রাখা হবে। তাছাড়া আরো অনেক দুর্মূল্য আর্ট এগজিবিট থাকবে এখানে। শেষ পর্যন্ত এটা হিমাচল সরকারকে আমরা দান করব।

অবশেষে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে এক সমাধির সামনে এসে থামলাম আমরা। নীচে উপত্যকা। ওপাশে বরফে ঢাকা লাহুল ও স্পিতি পাহাড়। দেবিকারাণী বললেন, এটা আমার শ্বশুর নিকোলাস রোয়েরিকের সমাধি। সামনের এই দুটো স্নো-মাউন্টেন আমার শ্বশুরের খুব প্রিয় ছিল। তাই এখানে এমন জায়গায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, যেখান থেকে সব সময় তিনি ঐ পাহাড় দুটো দেখতে পান।

পাহাড়ের নীচে বড় রাস্তায় যেখানে আমাদের জীপ দাঁড়িয়েছিল, রোয়েরিক দম্পতি আমাদের সেখানটায় পৌঁছে দিয়ে বললেন, আবার আসবেন।

গাড়ীতে ওঠবার আগে আমি বললাম, আপনার একখানি ছবি ত দিলেন না।

ছবি? ছবি ত নেই। বেশ ত' ক্যামেরা নিয়ে আসুন একদিন।

বললাম, কিন্তু আমি যে আপনার আগেকার ছবি চাই।

এক মুহূর্ত কি ভেবে দেবিকারাণী বললেন, বুঝেছি। কিন্তু কেন আপনারা বোঝেন না, পুরানো দিনের পুরানো জীবন থেকে আমি বহুকাল বিদায় নিয়েছি। অভিনেত্রী দেবিকারাণীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

গাড়ীতে বসে ভাবলাম, সত্যিই ত। অভিনেত্রী দেবিকারাণী আজ তিন দশক ধরে সম্মানিতা গৃহস্বামিনী মিসেস দেবিকারাণী রোয়েরিক।

শ্রীমতী বিভা

মঞ্চাভিনয়

কলকাতা ট্রামওয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পী সদস্যরা সম্প্রতি রমেশ গোস্বামীর ঐতিহাসিক নাটক 'কেদার রায়' মঞ্চস্থ করেছেন। সংস্থার সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করেন প্রকাশকুমার। দৃশ্যগঠন, মঞ্চ-ব্যবস্থার ও বিভিন্ন নাটামুহূর্ত সৃষ্টিতে তাঁর নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতিটি শিল্পীই স্ব স্ব চরিত্রে প্রাণ আরোপ করতে পেরেছিলেন বলেই সামগ্রিক অভিনয় ধারায় কখনই শৈথিল্য আসেনি। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন : নীলমণি

পরিচালক এন্ডারসন নির্দেশ দিচ্ছেন

স্থিরতা অস্থির। যুবসমাজ বিভ্রান্ত বিকেন্দ্রীক হয়ে পড়ছে। কিশোরদের কাছে কোন কংক্রীট আদর্শ আজ ধরে রাখা যাচ্ছে না। পুরাতনী শিক্ষা ব্যবস্থা পড়ছে ভেঙে।

'ইফ' এ বিষয়কে সামনে রেখেই তোলা। এন্ডারসন গ্লচেস্টারশায়ারের এক পুরোনো স্কুলকে পটভূমিকা করে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ ও মাস্টারমশাই সবাই-ই ছাত্রদের সনাতনী পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে চান। কিন্তু তা অনেক ছাত্রই মেনে নিতে চায় না, বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে অনেকেই। ছাত্রদের মধ্যে প্রকাশ্যে কখনো বা গোপনে ষড়যন্ত্রের নক্সা তৈরি হতে থাকে স্কুলের বিরুদ্ধে। দলের নেতা মাইক দুজন সঙ্গী ওয়ালেস আর জনিকে নিয়ে বিদ্রোহের পথে এগিয়ে যায়।

দিকে দিকে আজ ছাত্রসমাজ উদ্দাম অস্থির হয়ে উঠছে। বন্ধ সোনার খাঁচায় থেকে তারা আজ আর শেখানো বুলি আওড়াতে রাজী নয়। নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের ক্ষমতা, স্বাধীনতা সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সজাগ। নিজেদের প্রতি এই ভুয়ো বিশ্বাস তাদের মধ্যে বহু অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যার ফলে তারা আজ দিশেহারা। রাজনীতি নিয়ে তারা আজ যত উৎসাহী, যৌনতার ব্যাপারে তার চাইতে হয়ত বেশী। এন্ডারসনের স্কুলের ছেলেরাও তার ব্যতিক্রম নয়। ছাত্ররা তাদের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে পুরাতনী ব্যবস্থাকে ভেঙে-চুরে ফেলতে চেয়েছে। উৎসবের দিনে স্কুলে আগুন জ্বলেছে তাই, সেই বখাটে ছেলেরা ছেলে খেলার মত গুলি চালিয়েছে ওপর থেকে। হেডমাস্টারমশাই ছাত্রদের বৃথাই শান্ত হতে অনুরোধ করেছেন। এখান থেকে ওখানে ছুটে ছুটে চিৎকার করে বলেছেন 'বিশ্বাস কর, শান্ত হও তোমরা।'

কিন্তু শান্ত তারা হবার নয়, হয়ও নি।

মাস্টারমশাইয়ের কপালে বুলেট লেগেছে অকস্মাৎ। গলা তার অতর্কিতে বন্ধ হয়ে গেছে। (এ দৃশ্যে এন্ডারসন এক অপূর্ব চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন। মাস্টারমশাই বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় কাৎ হয়ে পড়ছেন—দৃশ্যটি স্তব্ধ হয়ে গেছে—মুহূর্ত পরেই তিনি মাটিতে পড়ে গেছেন)। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলেছে তখন চারদিকে।

ও'র 'দিস স্পোর্টি লাইফ'-এ যে হাস্য-রসের অবতারণা লক্ষ্য করা গিয়েছিল এ ছবিতেও তার ছোঁয়া আছে। জ্যাক ক্লেটনের 'রুম অ্যাট দি টপ' দিয়ে ইংল্যান্ডে যে 'নিউ সিনেমা'র শুরু হয়েছিল, যুদ্ধোত্তর চলচ্চিত্রে যে নতুন দিগন্ত এল—কার্ল রেইজের 'স্যাটার্ডে নাইট সানডে মর্ণিং'-এ তার পূর্ণতা এল ঠিকই তবে সমাজের বিশ্লেষণ তখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। 'রুম অ্যাট দি টপ'-এর কেরাণী নায়ক, তার অর্থ লিপ্সা, যৌনক্ষুধা বা 'স্যাটার্ডে নাইট'-এর তরুণ নায়ক, তার মনের আপাত স্ববিরোধিতা ইত্যাদির মধ্যে রিয়ালিজমের স্পর্শ ছিল ঠিকই তবে তা অনেকটা ওপর দিকের—সমস্যার গভীরে রেইজ বা ক্লেটন যেতে চেষ্টা করেছেন ঠিকই কিন্তু কেন্দ্র বিন্দুতে পৌঁছতে পারেন নি।

এন্ডারসনের 'ইফ' সেই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে না পারলেও অনেক কাছাকাছি গেছেন। চরিত্র আর সমাজকে অনুবীক্ষণের লেন্সের নীচে রেখে বিশ্লেষণ করেছেন। কাজেই সেদিক থেকে 'ইফ' কোন 'যদি'র অবকাশ না রেখে আজকের ছবি, আজকের অ্যাংগ্রী ছাত্র সমাজেরই ছবি।

নির্মল ধর
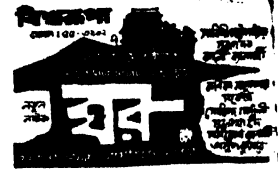
কানপুরের গ্রীন পার্কে

অজয় বসু

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল আবার ভারত সফরে আসছে। এদেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে খবরটি এক সুসংবাদ বিশেষ। কারণ, বছর দুয়েকের ওপর দেশের মাটিতে টেস্ট খেলার আসর বসে নি। তার ওপর বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরের প্রশ্নে এক সময় অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তাবিত সফর ঘিরে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অস্ট্রেলিয়া দলের পূর্ণাঙ্গ সফরই অনুমোদন করেছে।

কাজেই আশা করা যায়, আগামী ক্রিকেট মরশুমে আমাদের দেশের ক্রীড়ানুরাগীদের উৎসাহের মরা গাঙে আবার জোয়ারের জল ঢুকে পড়বে। বিশেষত অস্ট্রেলিয়া যখন বর্তমানে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল। স্বদেশের মাঠে তারা জবরদস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। তাই তাদের সফর ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে যদি বাড়তি কোনো প্রত্যাশা জেগে ওঠে তাহলে বর্ধিত উৎসাহের লক্ষণটিকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া চলে।

তবে অস্ট্রেলিয়া যতোই শক্তিমান এবং ভারতীয় দলের সামর্থ্য যতোই মামুলী হোক না কেন, ভারত কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বেশ কবার সম্মুখ সমরে মেরুদণ্ড সোজা রেখেই দাঁড়াবার যোগ্যতা দেখিয়েছে।

১৯৪৭-৪৮ মরশুমে অবশ্য ব্যতিক্রম। তখন রান 'তোলার যন্ত্র' স্যার ডন ব্র্যাডম্যান স্বয়ং সশরীরে মাঠে হাজির। তিনি থাকতে কারুরই রেহাই নেই। রেহাই ভারতেরও মেলে নি। কিন্তু স্যার ব্র্যাডম্যানের অনুপস্থিতিতে ভারত যে কবার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছে সে কবারই অন্তত বিক্ষিপ্ত লগ্নে ভারতীয় দল এমন মুহূর্ত গড়েছে যা জোর গলায় বলার মতো।

ইংলন্ড এবং অবশ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগে খেলায় ভারত যা করতে পেরেছে তার অনুপাতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় ভূমিকা অপেক্ষকৃত উজ্জ্বল। দেশের মাঠে ইংলন্ডকে হারালেও ভারত ইংলণ্ডের মাঠে নেমে হেরেছে তো বটেই সেই সঙ্গে নাস্তানাবুদও হয়েছে বহুবার। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েও ভারত হেরেছে, তবু অন্তত সর্বশেষ সফরে বারকয়েক রুখে দাঁড়াতেও পেরেছে। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলায়, কি দেশে কি বিদেশে কোথায়ও ভারত জিততে পারে নি। মাথা [illegible] একটা নয়।

কাজেই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট খেলার সুযোগে ভারত যে ঐতিহ্য গড়তে পেরেছে তা একেবারে নস্যাৎ করে দেবার মতো নয়।

স্যার ডন ব্র্যাডম্যান সরে দাঁড়াবার পর অস্ট্রেলিয়া ভারতে আসে ১৯৫৬ সালে আয়ান জনসনের নেতৃত্বে। অস্ট্রেলীয় দলের আনুষ্ঠানিক ভারত সফর সেই প্রথম। দলে তখন অনেক দিকপাল খেলোয়াড়—নিল হার্ভে, রে লিণ্ডওয়াল, রিচি বেনো, এলান ডেভিডসন এবং বিশ্বের প্রথম সারির আরও কজন। এই দলের সঙ্গে ভারতের এঁটে ওঠার কথা ছিল না। এঁটে উঠতে পারেও নি। তবু সেবার কলকাতার ইডেনে ভারত শক্তিমান অস্ট্রেলিয়ার মনে পরাজয়ের আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল।

চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্নে অস্ট্রেলীয় শিবিরে সেদিন সত্যিই গেল গেল রব উঠে-

যশু প্যাটেল

ছিল। ভারতের হাতে আটটি উইকেট, ব্যবধান মাত্র ১৫৬। মনে পড়ছে আমার, মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়রা যখন প্যাভিলিয়নে ফিরছে তখন কিথ মিলার (তিনি অবশ্য ওই ম্যাচে খেলেন নি) দলপতি আয়ান জনসনকে জোর করে এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে চড়া গলায় উপদেশ দিলেন 'কি করছো আয়ান? জিমকে কাজে লাগাও। দেখছ না, উইকেট স্পিন নিচ্ছে!'

পিচের চরিত্র বোঝার মতো টনটনে জ্ঞান ছিল কিথ মিলারের। আয়ান জনসন তা জানতেন। তাই মিলারের পরামর্শ মেনে মধ্যাহ্নের পর তিনি জিম বার্কের হাতে বল তুলে দিতেই খেলার মোড় ঘুরে গেল! বাকী ভারতীয়দের সামর্থ্যে কুলালো না জিম বার্কের পাক ধরানো অফ ব্রেককে সামাল দিয়ে ইডেনের পিচ থেকে বাকী ১৫৭টি রাণ কুড়িয়ে নেবার। মজার কথা এই যে, জিম বার্ক বড় একটা বল করতেন না। অথচ তেমন তেমন উইকেট পেলে তাঁর কব্জী বাঁকানো ও আঙুলে পাক ধরানো বল যে কি রকম ছোবল বসাতে পারতো তারই সাক্ষী হয়ে আছে ১৯৫৬ সালের সেই টেস্ট ম্যাচটি।

১৯৫৬ সালে ইডেনে বসে থাকতে আমরা কতোবার আফশোষে হাত কামড়েছি। ইস, এমন করেও জয়লক্ষ্মী হাত ফসকে পালিয়ে যেতে পারে! চতুর্থ দিন মধ্যাহ্নে উমরিগড়, মঞ্জরেকার অপরাজিত। তাঁদের পরে ব্যাট ধরতে রয়েছেন ভিনু মানকাদ, রামচাঁদ, কৃপাল সিংয়েরা। তবু শেষরক্ষে করা গেল না!

কিন্তু ১৯৫৬তে যা সম্ভব হয় নি, ১৯৫৯-৬০ মরশুমে কানপুরে তা সাধ্যায়ত্ত হল। এবং পরের বার অর্থাৎ ১৯৬৪তে ব্র্যাবোর্ণেও কানপুর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল।

ভারত দেশের মাটিতে টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে। কিন্তু হার-জিতের যথার্থ মূল্যায়নে কানপুরের এবং অন্যবার ব্র্যাবোর্ণে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোই বোধহয় আরও কৃতিত্বের পরিচায়ক। কারণ, অস্ট্রেলিয়া তার সমস্ত শক্তি সম্বল করেই সেই দুবার ভারতে এসেছিল এবং ভারতের কাছে হারের কৈফিয়ৎ দাখিলে জল-ঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অজুহাত তোলার ফুরসৎ পর্যন্ত পায় নি। অস্ট্রেলিয়ার চক্ষুলজ্জা ছিল। তাই ইংলণ্ডের অনুকরণে তারা বলতে চায় নি যে, ওই সফরে তারা তাদের সমস্ত শক্তি জড়ো করতে পারে নি। তাছাড়া সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলকে বার বার হারতে হলেও শেষের কটি টেস্টে ভারত যে জয়ের আশাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে নি তাও নয়। বলা যায়, ক্ষেত্রবিশেষে যেন জিততে জিততে হেরেছে। তাই বলছিলাম, অস্ট্রেলিয়ার বিরোধীতায় ১৯৪৭-৪৮ ছাড়া ভারত প্রতিবারই এমন কিছু না কিছু করেছে যা মনে রাখার মতো।

মনের অতল হাতড়ালে আজ নিশ্চয়ই কানপুরের গ্রীন পার্ক এবং বোম্বাইয়ের ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামের কথা মনে পড়বে। সেখানকার ঘাসে ঘাসে পদচারণ করলে ক্রিকেটে ভারতীয় কীর্তির উষ্ণতায় অভিভূত যিনি হবেন না, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি তাঁর কোনো দরদই নেই। কানপুরে ভারত ইতিহাস লিখেছে, ব্র্যাবোর্ণে সেই ইতিহাসের ধারা ধরে রেখে ভারতীয় ক্রিকেটের ঝলমলে প্রতিচ্ছায়া এঁকেছে। কানপুর ও ব্র্যাবোর্ণের স্মৃতি তাই আমাদের মনের মুকুরে দীর্ঘ ছায়ায় প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত। দীর্ঘকালের ব্যবধানেও সে ছায়া প্রত্যাশা পূরণের সান্ত্বনায় পরম তৃপ্তিদায়ক।

বড় লোভ হচ্ছে আজ ১৯৫৯ সালের কানপুরের গ্রীন পার্কে ফিরে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের স্বর্ণ সাফল্যের স্বাদটিকে আবার নতুন করে পেতে। চলুন, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে গ্রীন পার্কে টহল দিয়ে আসা যাক।

কানপুরের প্রথম অধ্যায়টি ডিঙিয়ে দ্বিতীয় পর্বে এলেই ক্রিকেটের সনাতন চরিত্র, তার গৌরবময় অনিশ্চয়তার সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রথম অধ্যায়ে ভারতই কোণ-ঠাসা, সর্বসাকুল্যে রাণ তুলল ১৫২। অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যুত্তর ২১৯। যাসু প্যাটেল একার কৃতিত্বে নজন ব্যাটসম্যানকে তাঁবুতে ফিরিয়ে দিয়েও অস্ট্রেলিয়ার রানকে দেড়শোর সীমায় বেঁধে রাখতে পারলেন না। কি আফশোষ, পঙ্কজ রায়, নরি কন্ট্রাক্টর, পলি উমরিগড়, আব্বাস আলি বেগ, চান্দু বোরদে, রামচাঁদ, আর জি কেনি, বাপু নাদকার্ণি কোথায় হারিয়ে গেলেন! কেউ ত্রিশ রানও করতে পারলেন না!

তবে আত্মাবিলুপ্তি বোধহয় ক্ষণিকের। দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হতে প্রথম ইনিংসের লজ্জা ঢাকতে তাঁদের অনেকেই কোমর কষে এগিয়ে এলেন। মনে এলো সাহস, কব্জীতে জোর। কন্ট্রাক্টর, বোরদে, কেনি, নাদকার্ণি, আব্বাস আলি বেগেরা রুখে দাঁড়াতেই রান পৌঁছালো তিনশোর কাছাকাছি—২৯১।

তবুও দু পক্ষে ব্যবধান তেমন নয়—বড়জোর ২২৪। নিল হার্ভে, নর্মান ও'নিল, ডেভিডসন, কেন ম্যাকায়রা থাকতে আশঙ্কাই বা কিসের?

কিন্তু অলক্ষ্যে বুঝি ভাগ্যলক্ষ্মী হাসছিলেন। আর আস্তিনে ঢাকা ডান হাতের গুলি ফোলাচ্ছিলেন যাসু প্যাটেল আর পলি উমরিগড়। দুজনেই অফ স্পিনার। পাক-ধরানো বলের ঝড়ে তাঁরা প্রলয় কান্ড বাধিয়ে তুললেন, আঙুলের টানে স্পিনে স্পিনে বলের বিষ বেড়েই চললো। সাধ্য কি ওপক্ষের সেই জ্বালা ধরানো বিষটুকু গলায় ঢেলে নীলকন্ঠ সাজার? দেখতে দেখতে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ফুরিয়ে গেল মাত্র ১০৫ রানে, ভারত জিতলো ১১৯ রানে।

প্রথম ইনিংসে নটি, দ্বিতীয় দফায় আরও পাঁচটি, সব মিলিয়ে একটি ম্যাচে চোদ্দটি উইকেট নিয়ে যাসু প্যাটেল তাঁর নামটি ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে খোদাই করে দিলেন।

অথচ কানপুর টেস্ট শুরু হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত যাসু প্যাটেল পরিচিত ছিলেন ম্যাটিং উইকেটে একজন ভাল বোলার হিসেবে। তৃণাচ্ছাদিত উইকেটে খেলার ব্যবস্থা হলে তাঁর ডাকই পড়ত না। কদিন আগে ব্র্যাবোর্ণে প্রথম টেস্ট খেলার জন্যে তিনি আমন্ত্রণই পান নি। আরও মজার কথা, লালা অমরনাথ না থাকলে যাসু প্যাটেল কানপুর টেস্টে খেলার সুযোগই পেতেন না।

লালা তখন নির্বাচকমন্ডলীর চেয়ারম্যান। কানপুরে পৌঁছুতে তাঁর একদিন দেরী হয়ে যায়। তার আগে নির্বাচকমন্ডলীর অন্য সদস্যরা নেটে যাসুকে দেখে স্থির করেন যে, কানপুরের সবুজের সমারোহে যাসুর অফ স্পিন ফসল ফলাতে পারবে না, অতএব চৌকশ কৃপালই খেলুন।

পরের দিন লালা অমরনাথ এসেই সব ওলট-পালট করে দিলেন। পিচের নাড়ী টিপে বুঝলেন, নতুন পিচের মাটি এক সময় আলগা হয়ে যেতে পারে। যদি যায় তখন যাসুই হবেন ভারতের সবচেয়ে ধারাল অস্ত্র। হলোও তাই। অমরনাথের চেষ্টায় যাসু প্যাটেল দলে ঢুকেই বাজীমাৎ করে দিলেন।

সাধারণ দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে কানপুরে সেবার আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল।

ভারতের ব্যাটিংয়ের সময় ন্যাটা পেস বোলার ডেভিডসনের পদাঘাতে লেংথের কাছাকাছি যে ক্ষতচিহ্ন ফুটে উঠেছিল তা যাসুর নজর এড়ায় নি। প্রথম কিছুক্ষণ অন্য প্রান্তে হাত ঘোরাবার পর যাসু অধিনায়ক রামচাঁদকে তাঁকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ জানান। রামচাঁদ প্রথমে আমতা আমতা করলেও শেষপর্যন্ত যাসুর মতেই সায় দেন এবং যাসু অন্য প্রান্তে আসামাত্রই অস্ট্রেলীয় প্রতিরোধ জলের তোড়ের মুখে খড়-কুটোর মতো ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ভাগ্যিস, সেবার লালা অমরনাথ যাসুর নৈপুণ্যে এবং দলপতি রামচাঁদ যাসুর বিচক্ষণতায় আস্থা রাখতে পেরেছিলেন!

কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে যাসু প্যাটেলের নটি উইকেট পাওয়ার নজীর ভারতীয় ক্রিকেটে এক রেকর্ড বিশেষ। একমাত্র সুভাষ গুপ্তে ছাড়া আর কোনো ভারতীয় টেস্ট ম্যাচের এক ইনিংসে নজনকে বধ করতে পারেন নি। তবে যাসুর (৬৯ রানে) মতো সুভাষ গুপ্তেকে নটি উইকেট পেতে আরও বেশী রান (১০২) দিতে হয়েছিল। এবং গুপ্তেও এক ইনিংসে নটি উইকেট পান কানপুরেই, ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।
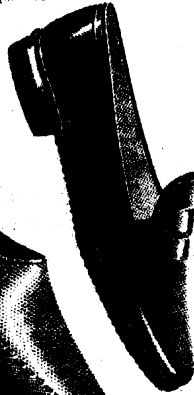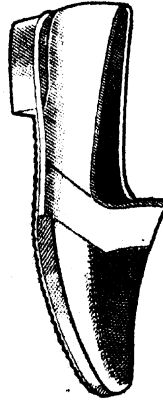
ভালকান
ক্যাজুয়াল ৮.৫০
ভালকান
পয়েণ্টেড ক্যাজুয়াল ৯.৫০
ভালকান
নিউকাট ৬.৭৫
ভালকান
স্কোয়ার ক্যাজুয়াল
১০.২৫
ভালকান
গোর ক্যাজুয়াল
১০.২৫
ভালকান
লেসিং ৮.৫০
জলে, কাদায়, দুর্যোগে
নিশ্চিন্ত সহায়
বাটা ভালকান
বৃষ্টি-বাদলের দিনে অথবা দুর্যোগে, নিশ্চিন্তে
পথ চলার সহায় বাটা ভালকান। অসামান্য জুতো
এই ভালকান, নকশায়-উপাদানে একেবারে নতুন।
বাছাই রবারের মজবুত ছিমছাম আপার, সব ধকলই
সামলাতে পারে; কাউণ্টার সংযোজনে সুদৃঢ়,
ফলে অটুট জুতোর গড়ন; আর পি ভি সি
শুকতলি যখন ইচ্ছে ধোয়া যায়।
যেমন সুঠাম গড়ন, তেমনি নমনীয়—পায়ের
আরাম ষোল আনা। তাছাড়া শোভাযাত্রায়
আশ্চর্য উজ্জ্বল, জলে ভিজুক, কাদা লাগুক—
সাফ করতে ঝামেলা নেই।
ভেজা কাপড়ে মুছে নিলেই নিমেষে নতুন।
হরেকমারি রঙে আর মনোহর নকশায়, বাটা ভালকান
জুতো বরষার পথে নিশ্চিন্ত ভরসা।
বাটা ভালকান চকচকে, ঝকঝকে, ছিমছাম।
Bata
VULCAN
Bata
VULCAN
দুর্যোগের দিনে
মুশকিল আসান
বাটা ভালকান
Bata
VULCAN

রাফেল ওসুনা

করেছিল। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মেক্সিকোর এই জয়লাভ নিঃসন্দেহে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। যে ওসুনা মাত্র কয়েক-দিন আগেও স্বদেশের জন্যে মরণ পণ করে খেলছেন তাঁর এই মর্মান্তিক অকাল মৃত্যু মেক্সিকোর বুকে দীর্ঘদিন ধরে এক দুঃসহ বজ্রশেল হয়ে থাকবে।

আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার মানচিত্রে মেক্সিকোর নাম চিহ্নিত করেছেন ওসুনা। বিশ্ববিশ্রুত ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতি-যোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে মেক্সিকো মাত্র একবার খেলে রানার্স-আপ হয়েছে—১৯৬২ সালে দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। মেক্সিকোর এ সাফল্যের মূলে ছিলেন দুজন—ওসুনা এবং প্যালাফক্স।

মাত্র ১০ বছর বয়সে ওসুনা টেনিস খেলায় হাতে খড়ি নিয়েছিলেন। তবে টেনিসের থেকে ফুটবল খেলায় তাঁর আগ্রহ বেশী ছিল। দেখা যায়, তিনি তাঁর তের থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত আন্তরিক-ভাবে ফুটবল খেলেছেন। দক্ষিণ কালি-ফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় টেনিস খেলার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের টেনিস দলে যোগদান করেন। এই সময় তাঁর টেনিস খেলার গুরু ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোচ জর্জ টলি। পরবর্তীকালে আমেরিকার দুই প্রখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় পাঞ্চো গঞ্জালেস এবং পাঞ্চো সেগুরার সান্নিধ্যে এসে ওসুনা তাঁর খেলার মান যথেষ্ট উন্নত করেন।

আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় ওসুনার উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ১৯৬০ সালে আমেরিকার ডেভিস রলস্টনের সহযোগিতায় এবং ১৯৬৩ সালে স্বদেশবাসী এ্যান্টোনিয়ো প্যালাফক্সের সহযোগিতায় ডাবলস খেতাব জয়।

তাঁর জীবনের বড় সাধ ছিল এই প্রতি-যোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব জয়। কিন্তু তিনি কখনও সেমি-ফাইনাল পর্যায়েও উঠতে পারেননি। দুবার কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন (১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে)।

আমেরিকার জাতীয় লন টেনিস প্রতি-যোগিতায় তিনি ১৯৬৩ সালে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন। মেক্সিকোর খেলোয়াড়দের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম সিঙ্গলস খেতাব জয়ের নজির তিনিই গড়েছিলেন। আগের বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় স্বদেশের খেলোয়াড় প্যালাফক্সের সহযোগিতায় ওসুনা ডবলস খেতাব পেয়েছিলেন।

চাকুরীর গুরু-দায়িত্ব এবং সংসার জীবনের চাপ থাকায় গত কয়েক বছর একমাত্র ডেভিস কাপ ছাড়া অন্য কোন আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় ওসুনার পক্ষে যোগদান সম্ভব হয়নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩০ বছর।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৯ম বর্ষ　১ম খণ্ড

৭ম সংখ্যা　মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 20th June, 1969　শুক্রবার, ৫ই আষাঢ়, ১৩৭৬　40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী

চিঠিপত্র

গান্ধী প্রসঙ্গে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় দ্বারা লিখিত 'গান্ধী' চমৎকার লাগছে।

এই প্রসঙ্গে মহম্মদ আলী জিন্না সম্বন্ধে কিছু কথা স্মরণ এলো। মহাত্মা গান্ধীর গণ সত্যাগ্রহের স্বপক্ষে তিনি ছিলেন না, কিন্তু আজ তিনি পাকিস্তানের জনক বলে চিহ্নিত হবার দরুন দেশের অধিকাংশ জনতা ভুলে গেছেন যে, গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বে জিন্না অসাধারণ দেশভক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি ছিলেন স্যার ফিরোজ শাহ মেহতার সুযোগ্য শিষ্য ও উত্তরসূরী এবং সেদিন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁকে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের রাজদূত (Ambassador of Hindu-Muslim Unity) বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। ১৯১৮ সনে বোম্বাই শহরে, গান্ধীজীর পূর্বে, প্রথম সত্যাগ্রহ করেন জিন্না সাহেব। সেটা ঘটেছিল লর্ড ওয়েলিংটনকে সম্মান জানাবার বিরুদ্ধে। তার ফলে উল্লসিত বোম্বাই'র জনতা চাঁদা তুলে তাঁর সম্মানার্থে তৈরী করে বিরাট 'জিন্না হল', যেটি এখনো এই নামেই বর্তমান আছে, কংগ্রেসের অফিস হিসাবে।

ভারতে আসার পর কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী প্রথম যে বক্তৃতাটি দেন সেটিকে সমর্থন করেন (Seconded) জিন্না সাহেব। পরে গান্ধীজীর মতামতের সঙ্গে তাঁর বিরোধ আরম্ভ হয়। তবু ১৯৩০।৩১ সন পর্যন্ত জিন্না, জয়াকর ও সপ্রু এই তিনটি নাম লাল, বাল, পালের মতই প্রসিদ্ধ এবং বহুজনের সমাদৃত ছিল। ১৯২৮ সনে জিন্না সাহেবের 14 points বা চোদ্দ দফা সূচী উপেক্ষণীয় ছিল না। আজ মনে হয় সেটি গৃহীত হলে হয়তো দেশবিভাগ না করেই ভারত স্বাধীন হতে পারতো। গান্ধীজীর সঙ্গে মতভেদের ফলে বিক্ষুব্ধ জিন্না সাহেব বিলেতে চলে যান। ১৯৩১ সনে যখন চৌধুরী রহমৎ আলি পাকিস্তান শব্দটি প্রস্তুত করেন তখন জিন্না সাহেব সেটিকে chimera দিবাস্বপ্ন বলে হেসে উড়িয়ে দেন। ১৯৩৬ সনে লাহোরের প্রসিদ্ধ শহীদগঞ্জের মামলায় জিন্না সাহেব অনুরোধ করা সত্ত্বেও মুসলমানদের তরফে মামলার করতে অস্বীকার করে ইন্দোরে একটি হিন্দুমানদের তরফে মামলার তদবির করতে হাতে নেন।

অবশেষে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ এত চরমে দাঁড়ায় যে, তিনি পাকিস্তানের স্বপক্ষে হয়ে সুযোগ্য ব্যারিস্টারের মতই সেই মামলায় জয়ী হন।

ভারতের দুর্ভাগ্য যে, গান্ধীজীর সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, এনি বেসান্ট, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলি-ভ্রাতা, সুভাষ বসু প্রভৃতি বহুজনেরই পরে মতভেদ হয়। ১৯৩৭ সনে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশে কোয়ালিশন বা পাঞ্জাবে সিকান্দার হায়াত খানের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে কংগ্রেস যদি দ্বিধা না করতো তা হলেও হয়তো ভারতের ইতিহাস আজ অন্য প্রকার হত।

গান্ধীজী নিঃসন্দেহে ভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনো স্বপ্নই ফলপ্রসূ হয়নি, বরং অনেক সিদ্ধান্ত আজ বিপরীত ফলই প্রসব করছে। যেমন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ রচনা, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা ইত্যাদি। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে গান্ধীজীর কর্মীজীবনের ফলাফল বিচার করবার উপযুক্ত সময় এখনো আসে নি। আসবে আরো একশ বছর পরে।

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
আমেদাবাদ—১

রাজপুত জীবনসন্ধ্যা প্রসঙ্গে

আমি অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। দীর্ঘ নবৎসর ধরে আমি অমৃত পড়ছি। আধুনিক উপন্যাস, কবিতা এবং ছোটগল্প ইত্যাদি প্রকাশে অমৃত আমার খুবই প্রিয়। পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হোক এই প্রার্থনা করি। এর প্রতিটি সংখ্যার জন্যে আমি উৎসুকভাবে প্রতীক্ষায় থাকি।

সম্প্রতি আপনারা রমেশ দত্তের 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' প্রকাশ করছেন, তাতে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ঐতিহাসিক ঘটনা যে কত সুন্দর ও জীবন্ত হতে পারে তা আমাদের প্রিয় শ্রীমিত্র ও শ্রীচিত্রসেন প্রমাণ করছেন। সেজন্য উভয়কে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। তবে আমি প্রস্তাব করি যে, আমাদের অতিপ্রিয়, সর্বজনশ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসখানি যদি আপনারা শ্রীমিত্র ও শ্রীচিত্রসেন মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে অনুরূপভাবে প্রকাশ করেন তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আমার বিশ্বাস এ-বিষয়ে আপনারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

সুভাষ মজুমদার
অফিস অফ দি ডি ই টি মাইক্রওয়েভ
ইনস্টলেসান
গৌহাটি-৩

সমীকরণ প্রসঙ্গে

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের সমৃদ্ধতম ধারা বোধ করি ছোটগল্প। ছোটগল্পের রীতি, প্রকৃতি, অনুধ্যান, বক্তব্য এবং ভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। খ্যাতনামাদের মধ্যে তো বটেই, এমন কি বহু নামহীন গোত্রহীন লেখকদের মধ্যেও পরীক্ষার সুফল আশাতীতভাবেই পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে লেখকের নামেই গল্পের পরিচয় নয় গুণেই তার পরিচয়। ৯ই জৈষ্ঠ সংখ্যার অমৃতে শ্রীগোপাল সামন্তর সমীকরণ নামক গল্পটির প্রসঙ্গেই কথাগুলি মনে এলো। লেখক বাংলাসাহিত্যে বোধ করি সম্পূর্ণ নবাগত। কিন্তু লেখার ভঙ্গি: বিশেষতঃ ভাষার আমেজে ও বক্তব্যের গভীরতায় যেন বহু প্রাজ্ঞ লেখনীর উত্তরসূরী। 'সমীকরণ' মূলতঃ প্রারম্ভ যৌবন ও উত্তরযৌবনের সমীকরণ। উভয়ের চিন্তায়, ভাবনায়, আদর্শে অমিল নেই। প্রারম্ভ যৌবন বিশ্বাসে হঠকারী আর উত্তরযৌবন বিশ্বাসের অভাবে শক্তিহীন কিন্তু অভিজ্ঞতায় সান্দ্র। লেখকের লেখনী এই উভয়ের সাক্ষাৎকার এক অভাবনীয় পরিস্থিতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারপর দেখা যায় দুটি ছায়া এক হয়ে মিশে গেল। মূলতঃ উভয় অংশই একই জীবনের প্রকাশ। প্রাক্ বর্তমান হঠকারী অতীতের দ্বারে শক্তির ভিখারী। জীবনের কালাতিক্রমী এই গূঢ় সত্য লেখকের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। লেখক সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। সম্পাদকের আবিষ্কারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইতি করছি।

শ্রীসঞ্জয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
কল্যাণপুর
দেওঘর

নববর্ষ সংখ্যা প্রসঙ্গে

নববর্ষ সংখ্যাটির জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। সংখ্যাটি প্রতীক্ষার সার্থক খোরাক জুগিয়েছে। খুব খুশী হয়েছি। কি ভাল কাজ যে করেছেন—তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু এ পত্রের অবতারণা শুধু প্রশস্তির জন্য নয়, একটি ঘটনা শোনাব। যা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আমার এক বন্ধু গল্প-উপন্যাস পড়া দু চোখে দেখতে পারেন না। কিন্তু আমার কাছে সেদিন 'অমৃতের' নববর্ষ সংখ্যাটির পাতা ওল্টাচ্ছিল, দু-এক লাইনে চোখ বোলাচ্ছিল, হঠাৎ আমাকে বললঃ এটা একটু নিয়ে গেলাম—সে আমার জবাবের অপেক্ষা না করে পত্রিকাটি নিয়ে গেল। সকালে পত্রিকাটি ফেরত দিতে এসে সে যা বলল তাতে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলুম। সে বললঃ না, আমার ধারণাটাই পাল্টে গেল, এতদিন ভাবতাম সাহিত্য মানেই কাঁড়ি কাঁড়ি কথার ফুলঝুড়ি, টাকা রোজগারের একটা উপায়। কিন্তু এই কাগজটা (অমৃত) আমাকে যেন সাহিত্যামৃত পান করিয়ে দিল। সত্যি জীবনকে খুব গভীর করে না দেখলে তার মাধুর্য অনুভব করা যায় না, বিশ্বাসেই জীবনের ভিত্তি মনুষ্যত্ব অপূর্ব চমৎকার।

সে চলে গেল, আমি দাঁড়িয়ে দেখলুম একটি জীবন্ত গল্প। ধন্যবাদান্তে— রবি হক, চিচুড়িয়া, নদীয়া।

পশ্চিমবাংলার চাল চিন্তা

চালের জন্য পশ্চিম বাংলা সরকারের আবার চিন্তা সুরু হয়েছে। হবারই কথা। সবে আষাঢ় মাস এল, সামনে বর্ষা। ইতিমধ্যেই পশ্চিম বাংলার নানা জায়গায় চালের দাম বাড়তির দিকে। রাজ্য সরকারের খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, এখন পর্যন্ত চার লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ বছরের জন্য দেড় লক্ষ টন চাল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন যে, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে চালের চোরাচালান ও কালোবাজারী বন্ধ করার জন্য। চালের জন্য দুর্দশা পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে নূতন নয়। সরকারী আশ্বাসের উপরও তাই তাঁরা খুব একটা ভরসা রাখেন না। গত সপ্তাহের খবরে দেখা গিয়েছিল যে কয়েকটি জেলায় খোলা বাজারে চাল পাওয়া দুষ্কর। কোথাও কোথাও দু' টাকা কিলো চাল বিক্রীর খবরও এসেছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, সরকার এই দরবৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত। রাজ্য সরকার ওড়িষ্যা, নেপাল ও আসাম থেকে চাল আনার ব্যবস্থা করছেন। এবারের দুর্ভাবনার একটি কারণ হল, ফলন ভাল হওয়া সত্ত্বেও চালের দাম বাড়ছে। উদ্বৃত্ত জেলার মজুতদারদের কাছ থেকে চাল বের করা যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। এদিকে জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতাও গ্রামাঞ্চলে খুব কম। দিনমজুরী যাঁরা করেন তাঁদের হাতে কোনো কাজ নেই। এক টাকা আশী কিংবা দু' টাকা কিলো দরে চাল কেনার ক্ষমতা তাঁদের নেই। দুর্দশা বাড়ছে সে কারণেই। অর্থনৈতিক মন্দার সঙ্গে সঙ্গে রোজকার খাদ্য চালের দাম যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তাহলে জনসাধারণের মনে হতাশা সৃষ্টি হবেই। সরকার অবশ্য বলছেন, গত বছর এই সময়ে চালের দাম যতটা বেড়েছিল এবারে তা বাড়েনি। কিন্তু এতে আত্মসন্তুষ্ট থাকার কোনো কারণ নেই। কারণ, গত যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে মজুতদারদের কারসাজিতে বাংলাদেশে চাল নিয়ে যে কান্ড ঘটেছিল তা এত সহজে সরকারের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, সরকার এই খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। কলকাতার মানুষকে বিধিবদ্ধ রেশনিং-এ সরকার চাল ও গম সরবরাহ করছেন। যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতা লাভের পর কলকাতায় মাথাপিছু চাল ও গমের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁরা মাথাপিছু সাড়ে ন'শো গ্রাম চাল এবং সাড়ে ষোল শো গ্রাম গম পাচ্ছেন। গমজাতীয় খাদ্যের প্রতি অনীহা না থাকলে এতে কুলিয়ে যাবার কথা। কিন্তু বাঙালী ভাত খেতে অভ্যস্ত। অন্তত একবেলা ভাত তাকে খেতে না দিলে স্বভাবতই তার মনে হবে যে সে বঞ্চিত হচ্ছে। তবু একথা মনে রাখতে হবে যে, শহরবাসীর ক্রয়-ক্ষমতা বেশী। তাকে খোলাবাজারে চাল কিনতে দিলে গ্রামের মানুষ উপবাসী থাকবে। সুতরাং রেশনবহির্ভূত এলাকা থেকে শহরে চাল আসা বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারকে নিতেই হয়। খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, কলকাতার বাইরে কয়েকটি শিল্পাঞ্চলে পাঁচ লক্ষ লোককে বিধিবদ্ধ রেশনিং-এর আওতায় আনা হয়েছে। আরও প্রায় তিন কোটি লোককে কোনো না কোন আংশিক রেশন দেওয়ার ব্যবস্থাও সরকার করেছেন। অর্থাৎ রাজ্যের সকল লোককেই কোনো না কোনো প্রকার রেশন দেবার ব্যবস্থা সরকার নিচ্ছেন। খাদ্যের ঘাটতি দূর করা এবং খাদ্য নিয়ে চোরাকারবারী ও মুনাফাবাজী বন্ধ করার জন্যই সরকারকে এই পথ অনুসরণ করতে হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-ঘাটতি পূরণে কেন্দ্রীয় সরকারকেও সাহায্য করতে হবে। বন্যায় ও খরায় এই রাজ্যের ক্ষতি হয়েছে। এখনও মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গতবারের বন্যার জের কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া নদীয়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার খাদ্য-ঘাটতি পূরণের জন্যও উদ্বৃত্ত এলাকার সহযোগিতা কাম্য। অন্য কোনো দেশেই জনসাধারণের খাদ্য নিয়ে এ ধরনের মুনাফাবাজি চলে না। উন্নত দেশগুলিতে সবচেয়ে শস্তা হল খাদ্যদ্রব্য। অথচ আমাদের দরিদ্র দেশেই মানুষের আয়ের প্রায় সবটাই চলে যায় খাদ্য সংগ্রহে। সমাজচিন্তার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে এই অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো না।

খাদ্য দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থাকাই কাম্য। এই খাদ্য নিয়ে বহু রাজনীতি হয়েছে। যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে পূর্বতন সরকারের অক্ষমতা তাঁদের ইচ্ছাকৃত ছিল না। খাদ্যের উৎপাদন বাড়াবার দিকে নজর না দিলে সকল লোককে দুবেলা খেতে দেবার মতো চাল এই রাজ্যে নেই। সুতরাং কৃষি-উৎপাদন বাড়াবার জন্য চাই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে যাতে অসাধু মুনাফাখোররা জনসাধারণের খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে তার জন্য চাই কঠোর ব্যবস্থা। এই দুটি ব্যবস্থা যুগপৎ করতে পারলে হয়তো খাদ্য-সংকট থেকে আমরা উদ্ধার পাব। নতুবা অসন্তোষ, হাহাকার এবং পরিণামে বিক্ষোভ হবে পশ্চিম বাংলার মানুষের ভাগ্যলিপি। সরকার সময় থাকতে অবহিত হোন এই আমাদের আবেদন।

অন্নদাশংকর রায়

।। নয় ।।

অথচ এমনি আমার নিয়তি যে আমাকে **কিনা জড়িয়ে** পড়তে হলো রাষ্ট্রের **সঙ্গে**। যে-আমি টলস্টয় গান্ধীর প্রভাবে **অহিংস নৈরাজ্যবাদী**। নিয়তি বোধহয় **আমাকে হাতে** কলমে শেখাতে চেয়েছিল যে **স্বরাজ্য** ও **নৈরাজ্য** একই মুদ্রার **এপিঠ ওপিঠ** নয়, **স্বরাজ্য** হচ্ছে **স্বরাষ্ট্র**, আর **স্বরাষ্ট্র** যদিও সর্বোদয়ের অভি-মুখী তবু তা রাষ্ট্রশূন্যতা নয়।

ইতিমধ্যে আমার শিক্ষানবীশী আমাকে **ইংলণ্ডে** নিয়ে যায়। সেখানে দুবছর থাকি **ও ছুটি** পেলেই ইউরোপের অন্যদেশ **ঘুরে আসি**। টলস্টয়, রাসকিন প্রভৃতির কথা **আমার** মনে ছিল। দুঃখের সঙ্গে **লক্ষ করি** যে ইতিহাস তাঁদের শিক্ষা উপেক্ষা **করেছে**, সমুদ্র যেমন উপেক্ষা করেছিল রাজা **ক্যানিউটের** অনুজ্ঞা। **প্রথম** মহাযুদ্ধের পূর্বে যেমন তাঁদের অনুবর্তীর সংখ্যা **অগণ্য ছিল** যুদ্ধের দশ বছর পরে **তেমন নয়**। **যুদ্ধ** যেন **সর্বপ্রকার** আদর্শ-**বাদকে** অবাস্তব বলে কোণঠাসা করেছে। **করেনি কেবল কমিউনিজমকে**। কিন্তু **কমিউনিজম** তো আদর্শবাদ বলে আপনার **পরিচয়** দেয় না। কমিউনিজম বলে সে **বস্তুবাদ**, সে এমন একপ্রকার **বস্তুবাদ** যা পূর্বনির্ধারিত ঘট-নার মতো ইতিহাসে একদিন **সম্ভব হবেই**।

যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবাত্মার প্রতিবাদ **তখনো** সাহিত্যের বিষয় ছিল। মানুষ তো **একেবারে যন্ত্রদাস** বনে যেতে পারে না। **যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত** থেকে যন্ত্র বনতেও **তার অনিচ্ছা**। সে হবে যন্ত্রী। কিন্তু **তেমন সৌভাগ্য** আর কজনের হয়! ওদিকে **আলাদীনের** দৈত্যের মতো একালের যন্ত্র **চাইবামাত্র** যা এনে দিচ্ছে তা কি **সেকালের তাঁত চরকার** কর্ম! তাছাড়া এমন **সব দশকর্মী** কাজও তো করে দিচ্ছে **যা কিনা** যন্ত্রে হবার নয়।

প্রাচীনদের জীবনে যেমন তাঁত চরকা **তেমনি** হাতুড়ি আধুনিকদের জীবনে **তেমনি বাষ্প** বিদ্যুৎ পেট্রল চালিত যন্ত্র। **এর** হাত থেকে পরিত্রাণের কথা হয়তো **একদা বাস্তব** ছিল, কিন্তু এখন অবা-**স্তব। তাই যন্ত্রের** বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অন্তর থেকে উত্থিত হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকলেই যন্ত্রমুখাপেক্ষী। এমন কি অটোমেটিকের যথেষ্ট প্রচলন। তাতে শ্রমিকের দানাপানি বিপন্ন, তবু শ্রমিকরা তা ব্যবহার করছে। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট বা চকোলেট পাচ্ছে। যন্ত্র ভারতের মাটিতে অপেক্ষাকৃত নতুন ও তার সঙ্গে বিদেশী শাসন শোষণ সংযুক্ত বলে গান্ধীজী তাঁর স্বদেশবাসীর মনে যতটা দাগ কাটতে পেরেছেন টলস্টয় তাঁর স্বদেশ-বাসীর মনে ততটা নয়। থোরো ত নয়ই। কী ক্যাপিটালিস্ট কী কমিউনিস্ট কী অ্যানার্কিস্ট সবাই এখন যন্ত্রের পক্ষে। যদিও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও শোনা যায়। ওটা যেন বিশ বছর ঘরসংসার করে সন্তানাদি হওয়ার পর বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অথচ কলকারখানার পেছনে কলের মতো খেটে ও অবসর সময়ে কলের গান শুনে বা কলের অভিনয় দেখে মানুষের চিত্তবৃত্তি বিকল। একটা যুদ্ধবিগ্রহ পেলে সে যেন বর্তে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কি কলের মতো লড়তে হয় না? মানুষের জীবনযাত্রা গত দুই শতাব্দীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাধারণত ধনতন্ত্রের আওতায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের আওতায় হলেও মোটামুটি এমনি হতো। সমাজতন্ত্রও নিছক কাস্তে হাতুড়ির ব্যাপার হতো না।

দেখলুম পুরাতন নীতিবোধ আর কাজ দিচ্ছে না। নীতির ক্ষেত্রে এসেছে বিশৃঙ্খলা। তেমনি পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে সংশয়। সংশয় থেকেও বিশৃঙ্খলা আসে। ইউরোপের সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তার জন্যে শিল্পায়ন যথার্থই দায়ী। কৃষি ও কারু-শিল্পভিত্তিক সমাজ যদি ধীরে সুস্থে শিল্পায়িত হতো তা হলে হয়তো ভাঙনও হতো ধীর মন্থর। কিন্তু পুঁজিওয়ালাদের লাভের জন্য বা এক নেশনের সঙ্গে আরেক নেশন পাল্লা দিতে গিয়ে শিল্পায়নের গতি এত দ্রুত হয়েছে যে কৃষি ও কারু-শিল্পভিত্তিক সভ্যতার ভিত্তিমূলে আঘাত লেগে তার ভাঙন ত্বরান্বিত হয়েছে। ইংলণ্ডের যেখানে দুই শতক লেগেছে জার্মানী সেখানে দুই শতকের পথ অর্ধ শতকে অতিক্রম করতে গিয়ে অনর্থ ডেকে এনেছে। মহাযুদ্ধের পরেও কি তার শিক্ষা হয়েছে! কারোরই না।

শিল্পায়নের ঘাড়ে কিন্তু সবটা দায়িত্ব চাপানো যায় না। তার পূর্বেই সমাজ-বিপ্লবের আইডিয়া ফ্রান্সে ও জার্মানীতে বাসা বেঁধেছিল। অর্ধশতকের পূর্বের অর্ধশতক মনোজগতের ঘাতপ্রতিঘাতে মুখর। আরো অর্ধশতক পেছিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ফরাসী বিপ্লব। তার আদিতে ছিল অবিমিশ্র রাষ্ট্রবিপ্লবের সংকল্প। ধাপে ধাপে এল সমাজ বিপ্লবের চিন্তা। সেটা যদিও তখনকার মত ব্যর্থ হলো তবু তার বীজ বুনে রেখে গেল ভাবীকালের জন্যে।

বিংশ শতাব্দীর গাছপালার মূল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এমন কি ফরাসী বিপ্লবের আগে। ইংলণ্ডেরও দান কম নয়। রাজার মুণ্ডু তো ওরাই প্রথম কাটে। ফরাসীরা তার দেড় শতক বাদে। রুশেরা আরো দেড় শতক পরে। রাজাই হলেন ফিউডাল সমাজের মাথা। তাঁর মাথা নেওয়া মানে ফিউডাল সমাজেরই মাথা নেওয়া। সে সমাজ তারপরে বাঁচে কী করে? অভিজাতদের প্রাধান্য যায়। বুর্জোয়াদের প্রাধান্য আসে। রুশদেশে তো বুর্জোয়া-দেরও প্রাধান্য যায়।

আমি যে সময় ইউরোপে ছিলাম সেটা বাইরের দিক থেকে শান্ত হলেও ভিতরে ভিতরে অশান্ত। নতুন শৃঙ্খলার জন্যে মানুষ উতলা হয়ে উঠেছিল। নতুন শৃঙ্খলা বলতে মধ্যযুগের খৃস্টীয় শৃঙ্খলার পুনরা-বর্তন বোঝায় না। নতুন বলতে যা বোঝায় তা পুরানোর রকমফের নয়। সত্যিকার নতুন শৃঙ্খলায় থাকবে রেনেসাঁসের মানসিকতা, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, শ্রমবিপ্লবের শিল্পায়ন, রুশ বিপ্লবের সামাজিক ন্যায়, ইংলণ্ডের গণ-তন্ত্র ও আইনের শাসন, আমেরিকার সেকুলারিজম।

কিন্তু মার্স ও ম্যামনের আরাধনা যদি **সমানে চলতে** থাকে তা হলে আর **নতুন শৃঙ্খলা কী হলো! দুদিন আগে**

হোক, পরে হোক, মানুষ মোহমুক্ত হয়ে আবার তেমনি প্রশ্ন করবে, বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে আমরা করব কী, যদি আমাদের হৃদয় হয় অসাড়, বিবেক হয় নিষ্ক্রিয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে যন্ত্রের মতো যান্ত্রিক। কী করতে এ জগতে আসা, কেনই বা অপঘাতে মরা, অমরত্ব কি নিশ্চিত, না এইখানেই সব শেষ? ঈশ্বর কি আছে, না শয়তান আমাদের রাজত্ব দিয়ে ভোলাচ্ছে, যেমন ভোলাতে চেয়েছিল যীশুকে? প্রগতি যাকে বলছি তা কি গতিতেই নিবদ্ধ, না তার আছে একটা অন্তিম লক্ষ্য? অন্তহীন প্রগতি কি একটা মীনস, না একটা এন্ড?

টলস্টয় তাঁর জীবনে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে দেখেন সব অন্তঃসারশূন্য, সব ঝুটা। খৃস্টের জীবনই তাঁকে বাঁচার প্রেরণা জোগায়, নইলে আত্মহত্যা করতেন। সেই সঙ্গে বুদ্ধের শিক্ষা। অহিংসা ও প্রেমই তাঁকে শান্তি দেয়। জীবনযাত্রাকে সরল করে এনেই তিনি জীবনের তাৎপর্য পান। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি গান্ধীজীকে যে শেষ চিঠি লেখেন সে চিঠি যেন তাঁর শেষ টেস্টামেন্ট। ওইভাবে গান্ধীকেই যেন তিনি দিয়ে যান তাঁর জীবনের ব্রত, তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। তাতে ছিল—

"The longer I live, and especially now, when I vividly feel the nearness of death I want to tell others what I feel so particularly clearly and what to my mind is of great importance, namely, that which is called 'passive resistance', but which is in reality nothing else than the teaching of love uncorrupted by false interpretations. That love, which is the striving for the union of human souls and the activity derived from it, is the highest and only law of human life; and in the depth of his soul every human being as we most clearly see in children—feels and know this; he knows this until he is entangled by the false teachings of the world. This law was proclaimed by all—by the Indian as by the Chinese, Hebrew, Greek and Roman sages of the world. I think this law was most clearly expressed by Christ, who plainly said, 'In love alone is all the law and the prophets'..........

"He knew, as every sensible man must know, that the use of force is incompatible with love as the fundamental law of life, that as soon as violence is permitted, in whichever case it may be, the insufficiency of the law of love is acknowledged, and by this the very law of love is denied. The whole Christian civilization, so brilliant outwardly, grew up on this self-evident and strange misunderstanding and contradiction, sometimes conscious but mostly unconscious".

টলস্টয়ের আশী বছরের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার শেষ পরিণতি সেই চিঠিতে ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী।—

"In acknowledging Christianity even in that corrupt form in which it is professed among the Christian nations, and at the same time in acknowledging the necessity of armies and armament for killing on the greatest scale in wars, there is such a clear clamouring contradiction that it must sooner or later, possibly very soon, inevitably reveal itself and annihilate either the professing of the Christian religion, which is indispensable in keeping up these forces, or the existence of armies and the violence kept up by them, which is not less necessary for power...."

টলস্টয়ের নিজের দেশ তাঁর মৃত্যুর সাতবছর বাদে এই দোটানার অবসান ঘটায় খৃস্টধর্মকে —ধর্ম জিনিসটাকে জনগণের মাদক বলে বিসর্জন দিয়ে। সেইসঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসকেও। সোভিয়েট রাশিয়া সোজাসুজি নাস্তিক বনে যায়। সে আর প্রেমের নিয়মে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে হিংসার নিয়মে। ফলে একদিক থেকে সে ভারমুক্ত হয়েছে। বিবেকভারমুক্ত। হৃদয়ভারমুক্ত। তাকে আর ঈশ্বরের কাছে বা প্রেমাবতারের কাছে জবাবদিহি

করতে হয় না। কেউ বলতে পারে না যে তার কথায় ও কাজে অসংগতি আছে বা সে ভন্ড। সমস্তক্ষণ একটা দোটানায় পড়ে তার মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে না। সে দেহে মনে সুস্থ।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এরা না পারে খৃস্টে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাতে, না পারে মার্স বা ম্যামনের আরাধনায় বিরত হতে। কিন্তু ইতিমধ্যে এদের বিস্তর লোক কায়মনে পেগান হয়ে গেছে। যেমন ইটালীর ফ্যাসিস্টরা জার্মানীর নাৎসীরা। তারা এখন রোমান বা টিউটন পূর্বপুরুষদের মতো প্রাকখৃস্টান ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। খৃস্টের কাছে বা ঈশ্বরের কাছে তাদের কোনো জবাবদিহি নেই। তারা নির্বিবেকে নরহত্যা করতে পারে। রক্তেই তাদের উল্লাস। টলস্টয় বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে দোটানার এটাও একটা সমাধান। আর এ সমাধান কমিউনিজমেরই প্রতিক্রিয়া। ইউরোপের এক প্রান্তের খৃস্টান যদি কমিউনিস্ট হয় অপর প্রান্তের খৃস্টান ফ্যাসিস্ট বা নাৎসী হবে। অমনি করে খৃস্টের তথা ঈশ্বরের টান কাটাবে। তখন একমাত্র টান হিংসার।

এদের বাদ দিলে যারা থাকে তারা এখনো এরকম কোনো সমাধানে সম্মত নয়। তারা শ্যামও রাখবে, কুলও রাখবে। তাই তারা জীবনদর্শনে অতৃপ্ত, জীবনযাত্রায় অসুখী, জীবনের আভ্যন্তরিক স্ববিরোধে ও অর্থহীনতায় অসুস্থ। এমন অবস্থার অন্য নাম malaise বা জীবনজোড়া অস্বস্তি। বুদ্ধি কাজ করছে, বুদ্ধি কাজ করছে, কিন্তু সত্তায় অবসাদ।

টলস্টয়ের সেই চিঠিতে আরো এক-প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। যদিও অতটা স্পষ্ট নয়। গান্ধীই বুঝতে পেরেছিলেন তার মর্ম। লিখেছিলেন ঋষি—

"Therefore, your activity in the Transvaal as it seems to us at this end of the world, is the most essential work, the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but of all the world, will unavoidably take part."

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ তখনো বেশী দূর এগোয়নি। তার সিদ্ধি তখনো সুদূর ও অনিশ্চিত। তথাপি টলস্টয়ের শোনদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে গান্ধীজীর কাজই পৃথিবীর সবচেয়ে সারবান, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে একদিন খৃস্টান নেশানগুলি কেবল নয়, সারা পৃথিবীর নেশনসমূহ অপরিহার্যরূপে অংশ নেবে।

ইউরোপে সেদিন আমি তেমন কোনো লক্ষণ দেখিনি। তবে অনেকের সংগে আলাপ করে বুঝেছি তাঁরা হিংসা প্রতিহিংসায় ক্লান্ত। তাঁরা চান চিরতরে শান্তি। কিন্তু শান্তি চাইলেই তো আর অমনি মেলে না। তার জন্যে জীবনযাত্রাকে ঢেলে সাজতে হয়। ধনদেবের উপাসনা করলে রণদেবও আপনি উপস্থিত হন। তিনিও উপাসনা দাবী করেন। ধনতন্ত্রকে অক্ষুন্ন রেখে যুদ্ধ এড়ানো যায় কি?

আধুনিক সভ্যতা না বলে আধুনিক ধনতন্ত্র বললে গান্ধীজীর নিদাননির্ণয় আরো যথার্থ হতো। ব্রিটেনকে যে ব্যাধিতে ধরেছে, যে ব্যাধি সে ভারতে সংক্রামিত করেছে তার নাম আধুনিক ধনতন্ত্রবাদ। মাঝে মাঝে ব্যাধিগ্রস্তের সাংঘাতিক অবস্থা হয়। তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক মন্দা। ও জিনিস যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে কম দুঃসহ নয়। মন্দার আক্রান্ত দেশ বরং যুদ্ধকেই কম মন্দ বলে বরণ করবে, তবু অর্থনীতিকে ঢেলে সাজবে না। রেখে দাও তোমার রাসকিন ও তাঁর 'আনটু দিস লাস্ট'। যার গুজরাতী তর্জমার নাম 'সর্বোদয়।' যুদ্ধপ্রস্তুতি যতদিন চলে ততদিন মন্দার প্রকোপ থাকে না। তাই ধনতন্ত্রের সংকটে রণতন্ত্রই ভরসা। তার উপর যদি একটা যুদ্ধ বেধে যায় তো কোথায় মন্দা। ধনতন্ত্র আর রণতন্ত্র তখন দক্ষিণ হস্ত আর বাম হস্তের মতো পরস্পরকে সাহায্য করে।

এই যে জুটি এ জুটি ভাঙবে কে? মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন, এ জুটি ভাঙবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। তার নাম সমাজবিপ্লব। তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী রাশিয়ার মতো এক সামরিকবাদী দেশে ফলে যায়। তার থেকে ধারণা জন্মায় যে সর্বত্র ফলবে। তার দেখাদেখি আরো কয়েকটি দেশে বিপ্লবের চেষ্টা হয়। ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু ধারণাটা কায়েমী হয়। তাই ইউরোপের বহু দেশে প্রতিবিপ্লবী ধারণাও শক্তি সঞ্চয় করে।

তবে ইংলন্ডের মতো যেদেশে পার্লামেন্টারী ঐতিহ্য অতি গভীর সেদেশে বিপ্লব বা তার বিরোধী শক্তি কোনোটাই পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে বল কষাকষি করার ছল পায় না। পার্লামেন্টই তাদের ভিতরে ডেকে এনে বল পরীক্ষার সুযোগ দেয়। আমার দেশে ফিরে আসার মাসকয়েক আগে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি ইংলন্ডের সাধারণ নির্বাচনের সময়। আমাকে অবাক করে দিয়ে লেবার পার্টি জয়লাভ করে। আরো অবাক হই যখন দেখি যে বুর্জোয়ারা তাতে সুখী না হলেও খেলোয়াড়ের মতো পরাজয় মেনে নিয়েছে। শ্রমিক মন্ত্রীদের মনে সন্দেহ ছিল সিভিল সার্ভিস সহযোগিতা করবে কি না। সন্দেহ অচিরে দূর হলো।

দেশে যখন ফিরি তখন ইংলন্ড আর পার্লামেন্টারী ঐতিহ্য আর তার সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নিয়েই ফিরি। ভারতে কি ওসব ভদ্রভাবে প্রবর্তন করা যায় না? সংগ্রাম বিনা কি গতি নেই? দুই শতাব্দী ধরে পরিচয় কি দুই পক্ষকে সন্ধির জন্যে প্রস্তুত করেনি? পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বা সত্যাগ্রহ একটা না একটা কিছু না করলেই নয়?

দেশের নেতারাও ইংলন্ডকে পরীক্ষা করে দেখতে চান। তার আগে কিছু করবেন না। তাঁরা সাইমন কমিশনের সংগে সম্মানের সংগে সহযোগিতার পথ না পেয়ে অসহযোগ করেছেন। তারপরে নিজেরাই মিলেমিশে নিজেদের দেশের জন্যে একটা পার্লামেন্টারী সংবিধান রচনা করেছেন। তাতে ইংলন্ডের মুখ চেয়ে ডোমিনিয়ন স্টেটাস অংগীভূত করেছেন। কিন্তু তার জন্যে মেয়াদ নির্দেশ করেছেন একটি বছর। এক বছর পূর্ণ হতে আর মাস তিনেক দেরি। এর মধ্যে যদি মোতিলাল নেহরু রিপোর্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গ্রহণ করে তো ভারত হবে একটি স্বশাসিত ডোমিনিয়ন। আর নয়তো পরের বছর থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হবে।

কিন্তু লক্ষণ তেমন সুবিধের নয়। আর-সব দল একমত হলেও মুসলমানদের একটি প্রভাবশালী দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি মুসলমানরা কিছুতেই ছাড়বে না. তারা নাছোড়বান্দা। আর তারা চায় ফেডারেশন, সর্বময় কর্তৃত্ব যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না পড়ে, হিন্দুপ্রধান কেন্দ্র যাতে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলোর উপর একচ্ছত্র না হয়। এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কার কথা শুনবে? মুসলমানদের সম্মতি না নিয়ে কি নতুন সংবিধান প্রবর্তন করা যায়?

বড়লাট লর্ড আরউইন ব্রিটিশ সরকারের মন জেনে এসে ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক প্রগতির চরম লক্ষ্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস। সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বসবে। ভারতের নেতাদের নিমন্ত্রণ করা হবে। বড়লাট কিন্তু ঠিক করে বলতে পারলেন না কবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস ভূমিষ্ঠ হবে। কতকাল পরে।

বর্ষশেষ ও নববর্ষের মধ্যবর্তী মধ্যরাত্রে লাহোর কংগ্রেস ডোমেনিয়ান স্টেটাসকে রাভী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করে ও সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় গান্ধীজীকে।

ঘটমান বর্তমান

অজিত চট্টোপাধ্যায়

গাড়িটা ব্রিজের উপর উঠতেই শুভময় সেনের ঘুম ভেঙে গেল। আর একটা মাত্র স্টেশন,—তারপরই বাঁকুড়া। স্টেশনে ঢুকবার আগেই একটা নদী। দ্বারকেশ্বর না কি যেন নাম। নদী পেরোলেই স্টেশনের আলো, ঘর-বাড়ি সব চোখে পড়বে।

প্রথম শ্রেণীর কামরাটা এখন খালি। খড়গপুরে এক দম্পতি নেমে যাবার পর থেকে শুভময় সেন একাই ভোগদখল করে এল কামরাটা। ইচ্ছে থাকলেও দু চোখের পাতা এক করে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনি শুভময়। শেষ রাতে গাড়িটার বাঁকুড়ায় পৌঁছবার কথা। ঘুমিয়ে পড়লে কখন ঘোমঘুমে রাত কাবার হয়ে যাবে। সকালে উঠে দেখবে গাড়ি পুরুলিয়া কিংবা অন্য কোন অচেনা পাহাড়ী জায়গায় এসে হাজির হয়েছে।

শুভময় জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল। নদী পিছনে পড়ে। গাড়ীর গতি এখন শ্লথ। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই স্টেশনে এসে দাঁড়াবে।

হাতঘড়িতে সময় দেখল শুভময়। তিনটের মত। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। শেষ রাতের ঘুমন্ত পৃথিবীতে জ্যোৎস্না

যে এমন অপরূপ মায়াময় হয় শুভময় তা যেন আজ নতুন করে জানল। চেয়ে চেয়ে শুভময় দেখছিল। গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় প্রসারিত মাঠে ধানের চারা হিল হিল করে বাতাসে দুলছে।

মমতার ইচ্ছে ছিল সঙ্গে আসবার। একফাঁকে অমনি একটু বেড়িয়ে আসে। কিন্তু শুভময় আপত্তি করেছে। ইদানীং ট্যুরে বড় একটা বেরোয় না শুভময়। কেমন যেন একটা ক্লান্তি এসেছে তার। বয়সও কম হ'ল না শুভময়ের। চল্লিশের বুড়ি ছুঁতে আর বছর চার দেরি। অথচ চাকুরির প্রথম জীবনে অফিস ছেড়ে বেরোতে পেলে যেন মুক্তির আনন্দ পেত শুভময়।

গাড়িটা স্টেশনে ঢুকে পড়ছে দেখে শুভময় ব্যস্ত হয়ে উঠল। জিনিসপত্র বলতে কি আর এমন? কটাই বা জিনিস এনেছে শুভময়? ছোট মতন একটা বিছানা আর বিশ ইঞ্চির সুটকেশে তার জামা-কাপড় আর অফিসের কিছু কাগজ-পত্তর। সাকুল্যে এই হল তার লগেজ।

দরজা খুলে শুভময় সোজা হয়ে দাঁড়াল। নির্দেশমত অফিসের লোকের স্টেশনে এসে তাকে রিসিভ করবার কথা। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আসবে স্টেশনে। শুভময় অবশ্য কাউকেই চেনে না। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে শুভময়কে ঠিক ওরা খুঁজে বের করবে।

বড়সায়েব আসবার সময় বার বার বলে দিয়েছেন শুভময়কে। 'প্রহ্লাদ চক্কোত্তি সাংঘাতিক লোক মশায়। ও ঠিক পাঁকাল মাছের জাত। পাঁকের মধ্যে থেকেও ছিটে ফোঁটা গন্ধটি ওর গায়ে লাগে না। আপনার মত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে বেকায়দায় ফেলে দেওয়া ওর পক্ষে বিন্দুমাত্র অসম্ভব নয়। খুব সাবধান হবেন।'

প্রহ্লাদ চক্কোত্তিকে চোখে দেখেনি শুভময়। তা আলাপ-সালাপ আর কেমন করে হবে? কিছুদিন হল ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই তার কানে এসেছে। লোকটা নাকি কাজকর্ম জানে। সব কিছু ওর নখ-দর্পণে। কিন্তু কাজের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে বড্ড বেশী অকাজও করছে প্রহ্লাদ। তিন চার বছরে নাকি মোটা টাকা কামিয়েছে সে। মোটা টাকা বলতে কত তার অবশ্য কোন হদিশ নেই। তবে তা দু চার হাজার কিংবা দশ বিশ হাজার যা হোক কিছু হতে পারে।

হেড অফিসে একরাশ উড়ো চিঠি এসেছে প্রহ্লাদের নামে। নানা ধরনের অভিযোগ। লোকটা যে দিন দিন টাকার কুমীর হয়ে উঠছে। বড়সায়েব কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন? নিদেন-পক্ষে বদলী কিংবা তার চেয়ে বড় কিছু শাস্তি তাকে দেওয়া হোক। নইলে এই কু দৃষ্টান্ত থেকে আরো অনেক বেশী ক্ষতি হবে দেশের। আরো দশটা লোক এমনি হলে যে সরকারের বারোটা বাজবে। উড়ো চিঠি দু চারখানা সঙ্গে এনেছে শুভময়। তেমন কিছু অবশ্য হদিশ নেই ওতে। তবু যদি কোন কাজে লাগে, এই ভেবে শুভময় ফাইলে নিয়েছে সেগুলি। তদন্তের ব্যাপারটাই ভারী এলোমেলো। কোথা থেকে কখন যে কি ঘটে যায়। অতি তুচ্ছ কোন ব্যাপার থেকেই হয়ত সব ফাঁস হয়ে যাবে।

স্টেশনে এসে গাড়ীটা থামল। জংশন স্টেশন। অন্তত দশ বারো মিনিট দাঁড়াবে গাড়ি। ইঞ্জিন জল নেবে। স্টেশনে চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। যাত্রীদের ওঠানামা। তাড়া-তাড়ি উঠে জায়গা দখল করবার জন্য অনেকেই ব্যস্ত। দুজন লোক ফার্স্ট ক্লাশ কামরাটার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে শুভময় নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চাইল। চোখেমুখে ছদ্ম গাম্ভীর্য প্রকাশ করে দাঁড়াল।

—'আপনি কি স্যার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শুভময় সেন?'

শুভময় ইষৎ হেসে বলল—'আপনারা?'

—'আমি প্রহ্লাদ চক্কোত্তি স্যার। আর এ হল অফিসের চাপরাশী পরেশ বাউড়ী।'

শুভময় নমস্কার করে বলল—'আপনি নিতে এসেছেন কষ্ট করে। এ ভারী অন্যায় প্রহ্লাদবাবু। রাতদুপুরে ঘুম থেকে উঠে স্টেশনে ছুটে আসা—।'

প্রহ্লাদ চক্কোত্তি বিনয়ে গদগদ হয়ে উঠল। 'কি যে বলেন সার। আপনি হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। এতদূরে এসেছেন কষ্ট করে। আর আমি একটু ঘুম থেকে উঠে রিসিভ করতে আসতে পারব না?'

পরেশ বাউড়ী বিছানা বগলদাবা করে এগিয়ে চলল। সুটকেশটা ওর হাতে। প্রহ্লাদ চক্কোত্তি সামনে। শুভময় কখনও ওর পাশে, কখনও ওর পেছনে হাঁটছিলেন। ওভারব্রিজটা পার হতেই সারি সারি রিকসা। যাত্রী পাবার জন্যে সকলেই ব্যাকুল। নানা রকম চীৎকারে প্রত্যেকেই যাত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে।

রিকসায় বসে শুভময় বলল—'সার্কিট হাউসটা কতদূর?'

প্রহ্লাদ চক্কোত্তি একগাল হাসল। 'সার্কিট হাউসে জায়গা পেলাম না স্যার। চেষ্টার কসুর করিনি। কিন্তু সব কটা ঘরই ভর্তি। একজন ডেপুটি মিনিস্টার এসে-ছেন, সঙ্গে তাঁর ডিপার্টমেন্টের তিনজন অফিসার। আর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তো স্থায়ীভাবে সার্কিট হাউস দখল করে রয়েছেন।'

অবাক হয়ে শুভময় বলল—'তাহলে কোথায় যাচ্ছি আমরা? কোনো হোটেল-টোটেলে ঘর ঠিক করেছেন নিশ্চয়?'

লোকটার ঠোঁট দুটি পুরু। চোখের তারায় চাপা কৌতুক। প্রহ্লাদ চক্কোত্তি জিভ কেটে একটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল। 'কি যে বলেন স্যার। আপনাকে কি কোনো হোটেলে তুলতে পারি? আর হোটেলে বলতে এখানে যে সব জিনিস রয়েছে তা কি আপনাদের মত লোকের উপযুক্ত হবে? বাজে জায়গা স্যার।—'

শুভময়কে চিন্তিত মনে হল। অস্ফুটে সে বলল,—'তাহলে!'

প্রহ্লাদ চক্কোত্তি আবার হাসল। 'আমার ওখানে পাঁচ ছখানা ঘর স্যার। দু তিনটে ঘর খালিই পড়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রী মানুষ। দু একখানা ঘরেই বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকি। বাকীগুলো একরকম ফালতুই। গরীবের ঘরেই আপনাকে অতিথি করে রাখব ভেবেছি। অবশ্য আপনি যদি অনিচ্ছে করেন, তাহলে—'

ভ্রূ কুঁচকে অল্প একটুক্ষণ চিন্তা করল শুভময়। কোনো গোপন তদন্তের ব্যাপারে সে এসেছে একথা প্রহ্লাদ জানে না। ও ভেবেছে সাদামাটা কোনো রুটিন ইন্সপেকশনে এসেছেন ওপরওয়ালা। বৎসরে এক আধবার তো এমনিই ইন্সপেকশন হবার কথা। আর সার্কিট হাউসে জায়গা না পাওয়ার জন্য প্রহ্লাদ চক্কোত্তিকে দায়ী করা যায় না। একরকম হুট করেই চলে এসেছে শুভময়। প্রহ্লাদকে খবর পাঠানো হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়। সাতটার পর ট্রাংক-কলে খবর পেয়ে এর চেয়ে কি ভাল ব্যবস্থা সে নিজে করতে পারত?

শুভময়ের ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। ঘড়িতে তখন সাতটার কাছাকাছি। স্টেশন থেকে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল শুভময়। শোবার পরই কখন এক চটকা ঘুম এসেছে, তা শুভময় নিজেও জানে না।

ঘুম ভাঙলে শুভময় ঘরখানা দেখল ভালো করে। দোতলার উপর এই ঘরখানা বেশ সুন্দর। ছোট একটা পালঙ্কের উপর সে শুয়ে আছে। তার নিজের বিছানাটা তেমনি হোল্ডলে বাঁধা। ঘরের এক কোণে রাখা। দেওয়ালে দু একটা ছবি। টেবিলে এক গ্লাস জল, কলম ইত্যাদি রাখবার একটা পেনস্ট্যান্ড। দিনের তারিখ। ছোট্ট একটি পাত্রে সামান্য কটি ফুল।

রাত্রে ভালো করে দেখা হয়নি জায়গাটা। শুভময় বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। নীচে লাল মাটির পথ। বাড়ীটা শহরের একেবারে প্রান্তে। রাস্তার ওপারের কয়েকটা ঘর-বাড়ির পিছনেই সবুজ ধানের ক্ষেত। খানিকটা জলা মতন জায়গা, ঝোপঝাড়। নীল আকাশের বুকে শরতের উজ্জ্বল রোদের লুটোপাটি।

চায়ের টেবিলে এসে বসল শুভময়। শুধু চা নয়, ব্রেকফাস্টও তৈরি। গরম গরম ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা, একটা চীনে মাটির পাত্রে রাখা খানিকটা ওমলেটও শুভময়ের চোখে পড়ল।

প্রহ্লাদ চক্কোত্তি বলল—'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই সার। ইনি আমার স্ত্রী বিনীতা,—বিনীতা চক্রবর্তী। আর ইনি শ্রীশুভময় সেন—আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।'

শুভময় খেয়াল করেনি, সে চেয়ারে বসবার পর কখন ভদ্রমহিলা এসে একপাশে দাঁড়িয়েছেন। শুভময় হাত তুলে আড়ষ্টভাবে নমস্কার করল। কি যেন বলতে গিয়েও চোখের ইশারায় চুপ করে গেল শুভময়। চেষ্টা করেও মুখে হাসি ফোটাতে পারল না।

প্রহ্লাদ চক্রবর্তী বলল—'আপনি চা-টা খেয়ে নিন স্যার। আমি চট করে একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি। একটু বেলা হলে আবার ভালো মাছটাছ সব হাওয়া হয়ে যাবে। দুর্গাপুর হবার পর থেকেই এখানে সাপ্লাইটা দিন দিন কমে যাচ্ছে। অথচ ডিমান্ড বাড়ছে—'

শুভময় বলল,—'আপনার নিজের কেন মিছিমিছি কষ্ট করে বাজারে যাও...? চাকর-বাকর কাউকে পাঠালেই হত—'উত্তরে প্রহ্লাদ চক্রবর্তী শুধু একগাল হাসল।

প্রহ্লাদ চলে গেলে শুভময় চেয়ারে আলগা হয়ে বসল। বর্ষাকালের ভরা নদীতে হঠাৎ একটা শাদা পাল তোলা সুন্দর নৌকো দেখলে মনে যেমন বিস্ময়ের ভাব হয়, শুভময়ের অবস্থা অনেকটা তাই। শুভময় ভাবছিল এতদিন পরে কেমন করে বিনীতার সঙ্গে কথা শুরু করবে। কথা অবশ্য বিনীতাই আগে বলল—'আমাকে এখানে দেখবে বলে নিশ্চয়ই আশা করনি?'

শুভময় উত্তর না দিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসল।

—'লুচিগুলো ঠান্ডা হয়ে গেলে খেতে ভাল লাগবে না। বরং খেতে খেতে গল্প করো।' বিনীতা অনুরোধ করল।

শুভময় বলল,—'সত্যি, খুব অবাক হয়ে গেছি বিনীতা। সকালে উঠে ভাবতেও পারিনি যে দশ বছর পরে এই বাড়িতেই

চায়ের টেবিলে তোমার সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে যাবে; প্রহ্লাদবাবুকে আমার কথা বলেছ নাকি?'

ঠোঁটে আঙুলে ঠেকিয়ে বিনীতা একটা নিষেধের ভঙ্গি করল। —'অমন কাজ ক'র না যেন। ও ভারী সন্দেহবাতিক। তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল জানলে আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে মারবে।' বিনীতা প্রায় ফিসফিস করল।

শুভময় বলল—'আমাকে তুমি কখন দেখলে?'

বিনীতার চোখ দুটি উজ্জ্বলে দেখাল। কিছু বলবার আগে ঠোঁট টিপে হাসল বিনীতা। —'কাল রাত্তির দশটার সময় কোথা থেকে ফিরে এসে ও বলল রাস্তার ধারের ঘরখানা এখুনি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। শেষ রাতের ট্রেনে কলকাতা থেকে এক ওপরওয়ালা আসবেন। অফিসের কাজ কর্ম দেখতে। তখন কি ছাই জানি যে ওপর-ওয়ালা আর কেউ নয়,—তুমি।'

শুভময় বলল,—'ওপরওয়ালা সেই লোকটা যে আমি তা কখন জানলে?'

'কখন আবার? তুমি যখন রিকসা থেকে নামলে, তখনই তো চিনতে পারলাম। এখন অবশ্য অনেকখানি বদলে গিয়েছ। বেশ মোটাসোটা দেখাচ্ছে। আগে অনেক পাতলা ছিলে। খুব স্মার্ট দেখাত তোমাকে।' পুরনো দিনের কোন একটা ঘটনার কথা মনে করে বিনীতা যেন একটু আরক্ত হল।

সত্যি দশ বছর যেন অনেকখানি সময়। অনেকগুলি দিন আর মাসের সমন্বয়। এই দীর্ঘ সময়ে মানুষ তো বদলাবেই। বিনীতার দিকে অপাঙ্গে চাইল শুভময়। দশ বছরে বিনীতাও কম বদলেছে নাকি? এখন কত বয়স হবে বিনীতার? শুভময় মনে মনে আন্দাজ করল। একত্রিশ? কিংবা ওরই ধারেপাশে। বিনীতাকে দেখলে অবশ্য আরো দু'-চার বছর কমই মনে হবে। ছেলেপুলে হয়নি বলে চেহারার বাঁধন আছে বিনীতার। আগের চেয়ে অনেক ভালো স্বাস্থ্য ওর। গায়ের রং আরো উজ্জ্বল। চোখদুটি কালো, আয়ত। সরু কোমর। নিতম্ব বেশ ভারী।...শুভময় ওর দেহের উপর চোখদুটো দ্রুত বুলিয়ে নিল।

বিনীতার সঙ্গে সমস্ত বাড়িটা একবার ঘুরে এল শুভময়। বেশ সাজানো-গোছানো বাড়ি। ঐশ্বর্যের এবং সাফল্যের ছাব সর্বত্র। না প্রহ্লাদ চক্রবর্তি বিনীতাকে মোটামুটি সুখেই রেখেছে। এই সাত-সকালেই বিনীতার অংগে যা গয়নাগাটি দেখেছে শুভময়, তা ওর আর্থিক অবস্থা আন্দাজ করবার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরে বড় সাইজের ফ্রিজ রয়েছে। শোবার ঘরে দামী বার্মা সেগুনের নানা আসবাব। বিলিতি গ্লাসের ড্রেসিং টেবিল। বিনীতার সুন্দর আটপৌরে শাড়িটাড়িগুলো তো রীতিমত দামি।

বাজার সেরে প্রহ্লাদ চক্রবর্তি ফিরল। বিনীতার সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলছে ও। সম্ভবত রান্নাবান্না সংক্রান্তই আলোচনা। শুভময় বিছানার উপর আর একবার গড়িয়ে পড়ল। অফিসের এখনও অনেক দেরি। শুয়ে শুয়ে বিনীতার কথা ভাবছিল শুভময়। আচ্ছা, ও কি শুভময়ের আগমনের গূঢ় কারণটা আন্দাজ করতে পেরেছে? শুভময় যে ওর স্বামীর বিরুদ্ধে একটা গোপন তদন্তে এসেছে, এ-কথা কি জানে বিনীতা? খুব সম্ভব নয়। কারণ, ব্যাপারটা রাখা হয়েছে অতি সংগোপনে। ধড়িবাজ অফিসার প্রহ্লাদ চক্রবর্তি যেন এটা কিছুতেই না আন্দাজ করতে পারে। প্রহ্লাদ জানে এটা বছরের রুটিন ইন্সপেকশন। আর বিনীতা? অফিসার-গিন্নির কানে গোপন তদন্তের কথা তার স্বামী ভিন্ন অন্য কে পেঁছে দেবে?

শুভময় চোখ বুজে দশ বছর আগের দিনগুলি কল্পনা করতে চেষ্টা করল। পুকুরে চান করতে নেমে ছেলেরা যেমন পানকৌড়ীর মত ডুব দেয়, ডুবসাঁতার দিয়ে অনেকদূরে গিয়ে ভেসে ওঠে, শুভময় তেমনিভাবে অতীতটাকে ছুঁতে চাইল। আচ্ছা দশ বছর আগে শুভময়ের কত বয়স ছিল? বিনীতা বলছিল শুভময়কে তখন দারুণ স্মার্ট দেখাত। বিনীতা কি তাকে আজও তেমনি পছন্দ করে? আগের মতই—।

কথা ছিল বিনীতা মুখার্জি শুভময় সেনের কাছেই ধরা পড়বে শেষপর্যন্ত। বহরমপুর শহরের অনেক ছেলেমেয়েই সে-কথা জানত। শুভময় যখন বি-এ ক্লাশে বিনীতা তখন আই-এ পড়ছে। আর শুভময় যখন এম-এ পরীক্ষা দেবে, বিনীতা তখন বি-এ দিয়েছে। কলকাতায় পড়তে এসে বিনীতাকে কি কম চিঠি দিয়েছিল শুভময়? বিনীতাও উত্তর দিত। ততদিনে শুভময়ের বাপ বহরমপুর থেকে বদলী হয়ে গেছেন কোচবিহারে। শুভময় কিন্তু কোচবিহার যাবার পথে বহরমপুরে এসে নামত। কলেজের হস্টেলে এসে উঠত। গোপনে দেখা করত বিনীতার সঙ্গে। গল্প করত, দুজনে মিলে নানা ছবি আঁকত। সাতরঙা রামধনুর মত বিচিত্র রঙীন ছবি।

পুজোর পরই বিনীতার একখানা চিঠি পেল শুভময়। তার এম-এ পরীক্ষার তখন মাস-দেড়েক দেরি। বিনীতা লিখেছে,—'বাবা আমার বিয়ের ঠিক করে ফেলেছেন। আর দিন-পনের দেরি। তোমার কথা মাকে বলেছিলাম। মা বলেছেন, ও-ধরনের বিয়ে হলে আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা কেউ মেনে নেবে না। সুতরাং তা অসম্ভব। আর বাবা বলেন যে, এই প্রেম-ভালবাসাগুলো জলের দাগের মত। জীবনের বেলা একটু বাড়লেই সব শুকিয়ে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যা হোক একটা ব্যবস্থা কর। আমি তোমাকেই বিশ্বাস করে আছি।'

চিঠি পেয়ে শুভময় যেন ক্ষেপে উঠল। মনে হল পাখির মত ডানা মেলে বহরমপুরে গিয়ে হাজির হয়। বিনীতাকে নিয়ে পালিয়ে যায় কোথাও। কিংবা রূপকথার রাজ-কুমারের মত তলোয়ার উঁচিয়ে বিনীতার সেই পাণিপ্রার্থীকে টুকরো করে ফেলে।

অনেক ভেবেচিন্তে চিঠি লিখল শুভময়। কলকাতায় চলে আসুক বিনীতা। শিয়ালদা স্টেশনে শুভময় ওর জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। দুটো-তিনটে দিন উল্লেখ করে দিল শুভময়। বিনীতা শুধু কলকাতায় চলে আসুক, তারপরের দায়িত্ব শুভময়ের। চির-কালের দায়িত্ব। আর বিনীতা নিশ্চয়ই তাকে বিশ্বাস করে।

তিন-চারদিন স্টেশনে গেল শুভময়। প্ল্যাটফর্মে অগণিত মানুষের ভিড়ে বিনীতার হাসি মুখখানা আতিপাতি করে খুঁজল। কিন্তু বিনীতা কই? হতাশ হয়ে শুভময় ওর মেসে ফিরল। দিন-পনের পরেই বহরমপুরের এক বন্ধু চিঠি দিল। সিঁদুর পরে বিনীতা স্বামীর সংসারে গিয়েছে।

অফিসে ঘণ্টা-তিনের মত কাজ করল শুভময়। আসল তদন্ত গোটা-তিনেক ফাইল নিয়ে। কিন্তু সরাসরি সেই তিনটে ফাইল চাইলে প্রহ্লাদ চক্রবর্তি তদন্তের ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলবে। তাই ফাইল তিনটে চাইবার আগে আরো ক'টা ফাইল দেখল শুভময়। কয়েকটা রেজিস্টারে মনোযোগী হল। কিছু কিছু অংশ অকারণেই নোট করল। আসল তিনটে ফাইলের দুটো ফাইল দেখেই উঠে পড়ল শুভময়। তৃতীয়টি বরং পরের দিন দেখবে।

রিকসা এসে থামল বাড়ির দরজার কাছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল শুভময়কে। কড়া নেড়ে বেশ কিছুক্ষণ সাড়া পেল না সে। দরজা খুলতেই শুভময় অবাক হয়ে চাইল। অন্য কেউ নয়। বিনীতা নিজেই এসে দরজা খুলেছে। সম্ভবত বাড়িতে আর কেউ নেই। এই ভরদুপুরে বিনীতা হয়ত দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। অসময়ে ওকে বিরক্ত করছে ভেবে শুভময় নিজেকে অপরাধী মনে করল।

ওর দিকে চেয়ে বিনীতা হাসল, 'কি কাজকর্ম হয়ে গেল তোমার? কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছ?'

চোখদুটি সামান্য ফোলা। পানের রসে ঠোঁট হয়েছে টুকটুকে লাল। শাদামাটা এক-খানা ডুরে শাড়িতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে বিনীতাকে।

শুভময় বলল—'কাজের অর্ধেকের মত শেষ। বাকী অর্ধেকটা কাল করব। কিন্তু তুমি বোধহয় ঘুমোচ্ছিলে। অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম না তো?'

ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে খবরের কাগজটা টেনে নিল শুভময়। কাগজটা হাতে নিয়ে একটু বিছানায় গড়াবে। ঘুম এলে খানিকক্ষণ ঘুমোতে পারে। নইলে চুপ করে পড়ে থাকবে।

কাগজ খুলে পড়তে চেষ্টা করল শুভময়। কিন্তু মন বসল না। মনের মধ্যে প্রহ্লাদ চক্রবর্তির মুখখানা ভাসছিল। অফিসে ফাইল দেওয়ার ব্যাপারে সর্বতো-ভাবে সহযোগিতা করেছে সে। ফাইলের কাগজপত্র সব ঠিকঠাক। ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যন্ত চাপা দেবার কোন চেষ্টা করেনি। লোকটা সেদিকে ভালো। ওপর-ওয়ালার হুকুম তামিল করতে যেন এক পা

বাড়িয়ে আছে। শুধু একটা জিনিস মনের কোণে কাঁটার মত খচখচ করে। ওর পুরু দুটি ঠোঁটের আড়ালে একটা চাপা কৌতুকের হাসি। শুভময়ের একবার মনে হয়েছিল যেন তদন্তের ব্যাপারটা পূর্বাহ্নেই আঁচ করেছে প্রহ্লাদ। কিন্তু আঁচ করলেও প্রহ্লাদ চক্কোত্তির ধরনধারণই উলটো। তদন্তে বাগড়া দেবার কোন স্পৃহাই যেন ওর নেই। আর কিছু না হোক, ইচ্ছে করলে দু একখানা ফাইল সাময়িকভাবে এদিকে-সেদিকে নিখোঁজ করে দিতে পারত প্রহ্লাদ। তাহলে তদন্তের প্রথম পর্বেই বেশ সুন্দর একটা দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হত।

ঘরের মধ্যে কার পায়ের শব্দ শুনে শুভময় তাকাল। বিনীতা এসেছে ঘরে।

—'তুমি ঘুমোবে নাকি? তাহলে বরং যাই।' বিনীতা হাসল।

বাধা দিয়ে শুভময় বলল,—'পাগল হয়েছ! গল্প করবার লোক পেলে দুপুর-বেলায় কেউ ঘুমোয়? বস ওই চেয়ারটায়।'

বাধ্য মেয়ের মত বিনীতা বসল।

শুভময় বলল—'তোমার ঘর-সংসার দেখে গেলাম বিনীতা। বেশ আছ। ঈশ্বর তোমাকে সুখী করেছেন।'

বিনীতা চোখ তুলে তাকাল। 'তোমাকে দেখেও তো অসুখী মনে হয় না শুভময়। আর সুখী-অসুখী কি মুখ দেখে অত সহজে বোঝা যায়?...' এক মুহূর্ত থেমে যেন ঢোক গিলল বিনীতা। বলল,—'ওসব কথা থাক। আমাকে কিন্তু নিজের কথা কিছুই বললে না তুমি। এবার বল বৌদি কেমন হয়েছেন? ক'টি ছেলেপুলে তোমার?'......

শুভময় হাসল। 'তোমার বৌদি বয়সে তোমার চেয়ে খানিকটা বড়ই হবেন বিনীতা। আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট। এই বয়সে তার রূপের কথা কি আর শুনবে?...'

—'বেশ তো, রূপ বাদ দিয়ে গুণের কথাই বল।—'

শুভময় হঠাৎ গম্ভীর হল। বলল,—'তৃতীয়জনের কথা বাদ দিয়ে বরং তোমার আমার কথা বল বিনীতা।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করল শুভময়—'এতদিন পরে জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে করো না। আমার শেষ চিঠিটা তুমি পেয়েছিলে?'

চোখ বড় বড় করে বিনীতা বলল—'কোন্ চিঠি? যেটাতে তুমি কলকাতায় পালিয়ে যেতে বলেছিলে।'

মাথা নিচু করে নখ খুঁটতে লাগল বিনীতা। বলল,—'চিঠিটা কেমন করে জানি না মার হাতে পড়ে গিয়েছিল। মার কাছে থেকে বাবা জেনেছিলেন। আমাকে কড়া পাহারায় রেখেছিল সবাই। পালাবার কোন উপায় ছিল না। তুমি বিশ্বাস কর—'

একটুক্ষণ ভাবল শুভময়। বলল—'কিন্তু এর আগেও তো কত চিঠি দিয়েছি তোমাকে। সেগুলো তো গুরুজনদের হস্তগত হয়নি।'

বিনীতা ম্লান হাসল। 'আগে তো কেউ সন্দেহ করত না। কিন্তু যেদিন তোমার কথা মাকে বললাম, সেদিন থেকেই মায়ের চোখ রইল আমার উপর। চিঠিটা আসতেই মা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন।'

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত গড়াল।

বিনীতাই আবার শুরু করল—'তোমার অন্য চিঠিগুলো আজও আমার কাছে রয়েছে। ইচ্ছে করলে তুমি ফেরৎ নিয়ে যেতে পার।'

চিঠি প্রসঙ্গ যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল শুভময়। বলল,—'বিনীতা, প্রহ্লাদ-বাবুকে বিয়ে করে তুমি সুখী হয়েছ তো?'

উত্তর না দিয়ে বিনীতা জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিটা আকাশের দিকে মেলে ধরল।

শুভময় হাসল। 'আমি জানি তুমি লজ্জা পাচ্ছ বলতে। অবশ্য লজ্জা পাওয়া স্বাভাবিক। আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলাটা তোমরা কেমন করে কাটাও এখানে?'

বিনীতা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'তোমরা কেন বলছ? উনি তো রোজ সন্ধ্যে হলেই ক্লাবে চলে যান। আমি গল্পের বইটই পড়ি কিংবা খাটে শুয়ে এক ঘুম দিয়ে নিই। ইচ্ছে করলে বাজারে গিয়ে এটা-ওটা কিনে আনি।'

—'প্রহ্লাদবাবু কি রোজই ক্লাবে যান? ফিরতে রাত হয়?' শুভময়কে কৌতূহলী দেখাল।

—'রাত মানে?' বিনীতার হাসিতে বেশ কিছুটা বিষাদ ঝরে পড়ল। সে বলল,—'সাড়ে দশটার আগে উনি কোনোদিন ফেরেন না। এক-একদিন তো রীতিমত বেহুঁশ হয়ে আসেন। পা টলে। আমাকে ধরে কোনোমতে উপরে ওঠেন।'

শুভময়কে চিন্তিত দেখাল। ধীরে ধীরে সে বলল—'এত সব কথা তো জানতাম না বিনীতা।'

—'জানবার আরো আছে শুভময়। বিনীতা শাড়ির আড়াল সরিয়ে অনাবৃত বাহুমূলের খানিকটা তুলে দেখাল। একটা কালশিটের দাগ। বিনীতা হেসে বলল—'শিউরে উঠো না। এরকম আরো আছে দেহে। দেখলে তোমার মন খারাপ হবে শুভময়।'

বিছানা ছেড়ে উঠে শুভময় জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—'একটা কথা তোমাকে বলব ভাবছি।' এদিক-ওদিক চেয়ে বিনীতা যেন নিশ্চিন্ত হতে চাইল। 'লোকটা দারুণ চালাক। তুমি একটু সাবধানে কথা বলো আমার সঙ্গে। মুখের দিকে চেয়ে ও মনের কথা বুঝতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসা ছিল জানলে ও সর্বনাশ করে ছাড়বে। দুজনের কাউকে রেহাই দেবে না।'

বিনীতা চলে গেল চা করে আনতে।

শুভময় গম্ভীরমুখে বসে রইল। কি অমানুষ এই লোকটা। মদ্যপ, স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান এবং তাকে মারধোর করে। বিনীতার জন্য কষ্ট হল শুভময়ের। টুকরো টুকরো মিষ্টি হাসি, ভালো শাড়ি ও দামি গয়না দিয়ে জীবনের একটা গভীর ক্ষতকে সযত্নে আড়াল করতে চাইছে।

বিনীতার হাত থেকে চা নেবার সময় প্রহ্লাদ চক্কোত্তি প্রায় হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল। 'অফিস থেকে বেরিয়েই সোজা চলে এলাম স্যার। আপনাকে ঠিক সময়ে চা জলখাবার দেওয়া হল কিনা ভাবতে ভাবতে এসেছি।...'

শুভময় খুশী হয়ে বলল,—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সবদিকে আপনার স্ত্রীর সজাগ দৃষ্টি আছে।'

প্রহ্লাদ চক্কোত্তি ওর পুরু দুটি ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। বলল, —'নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম স্যার। নইলে ও ভারী লাজুক। এখানে অফিসাররা কেউ কেউ বেড়াতে আসেন। কিন্তু তাদের সামনে বেরুতেই চায় না। অথচ ভদ্রলোকেরা মিসেসের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যস্ত।—' রসিকতা করেছে ভেবে প্রহ্লাদ চক্কোত্তি হি-হি করে হাসতে লাগল।

কি যেন একটা অস্বস্তিকর ইঙ্গিত রয়েছে প্রহ্লাদের কথায়। কিন্তু অনেক ইঙ্গিতই নিঃশব্দে হজম করাই বুদ্ধিমানের কাজ। শুভময়ও তাই করল।

সন্ধ্যের একটু আগে জামাকাপড় বদলে শুভময় বেরোল। প্রহ্লাদ চক্কোত্তি ঘরেই ছিল। ব্যস্ত হয়ে এসে বলল,—'একা একা কোন্‌দিকে যাবেন স্যার? আমি কি আপনার সঙ্গে বেরুব?...'

—'না না। আপনাকে মিথ্যে কষ্ট দেব না। একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে এখনই ফিরে আসব।'

প্রহ্লাদ চক্কোত্তি একগাল হাসল। 'সন্ধ্যের পর একটু ক্লাবে যাই স্যার। ফিরতে কোনো কোনো দিন এক-আধটু রাত হয়ে যায়। তাস, আড্ডা, গল্পগুজব। আর তো কোন রিক্রিয়েশন নেই এখানে।...চক্কোত্তির কুতকুতে ছোট দুটি চোখে কৌতুকের ঝিলিক। বলল—'আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চেষ্টা করব স্যার। তবু যদি ইচ্ছে হয়, বিনীতা রইল স্যার, খাওয়াদাওয়া শেষ করে নেবেন। সমস্ত দিন একটা ধকল গেছে আপনার। কাল রাতেও তো ভাল করে ঘুম হয়নি। আজ একটা সুনিদ্রা দিন।—'

বেড়িয়ে এসে বিনীতাকে ডাকল শুভময়। সম্ভবত রান্নাঘরে কাজের কোন নির্দেশ দিচ্ছিল বিনীতা। শুভময় চেয়ে দেখল। একটু আগেই গা-টা ধুয়ে সাজ-গোজ সমাপ্ত করেছে বিনীতা। ওর অঙ্গ থেকে প্রসাধনের মৃদু সৌরভ ভেসে আসছে। বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে ওকে। গোলাপী রঙের একখানা শাড়িতে গায়ের রঙ যেন আরো উজ্জ্বল হয়েছে বিনীতার।

—'চা খাবে এখন?' বিনীতা প্রশ্ন করল।

—'তা এক কাপ দিতে পার। কিন্তু প্রহ্লাদবাবু তোমার বিরুদ্ধে রীতিমত অভিযোগ এনেছেন বিনীতা। অফিসার-টফিসাররা এলে তুমি নাকি তাদের সামনে বেরোও না—'

তির্যক হেসে বিনীতা বলল,—'ওপর-ওয়ালার কাছে বুঝি স্ত্রীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ চলে?'

শুভময় হাসল। 'প্রহ্লাদবাবু নিশ্চয়ই ক্লাবে গিয়েছেন। এস না দুজনে বসে গল্প করি। রান্নাঘরে কি এত কাজ তোমার?'

—'তুমি বস। আমি চা করে নিয়ে আর্।—'

শুভময় বলল—'আমার সেই চিঠিগুলো তুমি ট্রেনও রেখে দিয়েছ বিনীতা। ভাবলেও আঁতে লাগে। তোমার উত্তরগুলো কিন্তু আমার কাছে আর নেই। কবে নষ্ট করে ফেলেছি—'

বিনীতা হেসে জবাব দিল—'নষ্ট করে ফেলেছ তো কি হয়েছে? হাজার হলেও তোমরা পুরুষমানুষ। কবে কে চিঠি দিয়েছিল তা কি চিরদিন বয়ে বেড়াতে পার?—'

হেসে বললেও কথাটা অভিমানের। শুভময় বুঝতে পারল। উত্তর এল না শুভময়ের ঠোঁটে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শুভময় ভাবছিল। রান্নাঘরে চা করে আনতে গিয়েছে বিনীতা। অন্ধকারে মফস্বল শহরটা অস্পষ্ট আবছা দেখায়। এখানে-সেখানে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু সে-আলো তেমন জোরালো নয়।—

দরজার কাছে কার একটা ছায়া পড়েছে যেন। শুভময় দ্রুত পিছন ফিরে চাইল। ছায়াটা সাঁৎ করে সরে গেল। শুভময় অবাক হল। কে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল তবে? বিনীতা? কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ চা করতে নীচে নেমে গিয়েছে।

ছায়ার মত কালো একটা পাতলা মেঘ শুভময়ের মনের এক কোণ থেকে অন্য কোণে চকিতে সরে গেল। তবে কি প্রহ্লাদ চক্কোত্তি ফিরেছে? অন্য ঘরে বসে তার এবং বিনীতার কথোপকথন শুনেছে?

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল শুভময়ের। দরজাটা হাট করে খোলা। জ্যোৎস্নার আলোয় ভরে উঠেছে ঘর। কপালের উপর কার নরম হাতের স্পর্শ। কথা বলবার চেষ্টা করতেই বিনীতা ঠোঁটের উপর একটা আঙুল এনে রাখল।

ফিসফিস করে শুভময় বলল,—'প্রহ্লাদবাবু কোথায়? এত রাতে তুমি?'

—'ও ঘুমে বেহুঁশ। কাল সকাল সাতটার আগে আর উঠছে না।—'

—'তুমি শোও গিয়ে। জেগে উঠলে একটা বিশ্রী কেলেংকারী হবে।' শুভময়ের কণ্ঠে কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে সুর।

বিনীতা শান্তকণ্ঠে বলল—'একটা কথা বলতে এসেছি তোমাকে।'

—'কি কথা?' শুভময় জানতে চাইল।

—'আমাদের সন্দেহ করেছে ও। ওর মনে হয়েছে আমাদের পূর্বপরিচয় ছিল। আজ সকাল করে ক্লাব থেকে ফিরে আমাকে একরাশ প্রশ্ন করেছে।' বিনীতা যেন দম নিল।

শুভময় ভয় পেয়ে বলল—''তুমি স্বীকার করেছ নাকি? পরিচয়ের কথা ও জানবে কেমন করে?''

—'কি জানি। হয়ত কাল কিছু শুনে থাকবে আড়াল থেকে। ভয় হয় যে তুমি চলে গেলেই আমার বাক্স-প্যাঁটরা ও ওলট-পালট করে ছাড়বে। ওর সন্দেহ হয়েছে যে, তোমার লেখা চিঠিপত্তর এখনও আমার কাছে রয়েছে।' একটুক্ষণ থেমে বিনীতা বলল—'মুখ দেখলেই ও সব কিছু বুঝতে পারে। ভীষণ ধূর্ত।—' দাঁতে দাঁত চেপে কথা শেষ করল বিনীতা।

ওকে দেখে শুভময়ের মনে একটা কামনার ঢেউ জেগেছিল। এই নির্জন রাত, জ্যোৎস্নার মরা আলো, বিনীতার আলুথালু বেশ। শুভময়ের মনে হয়েছিল মশারির এই ঘেরাটোপের মধ্যে বিনীতাকে কাছে টেনে নেয়। বহরমপুরে থাকতে বিনীতার ঠোঁটের স্বাদ একবার পেয়েছিল শুভময়। কিন্তু তখন বিনীতা ভারী লাজুক। কাণ্ডটা হবার পর এমন দ্রুত অদৃশ্য হয়েছিল যে, শুভময় চিন্তিত না হয়ে পারে নি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে নিজেকে কেমন শীতল মনে হল শুভময়ের। মনের তপ্ত কামনা-বাসনাগুলি তাড়া-খাওয়া পশুর মত লেজ গুটিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ যেন অধস্তন প্রহ্লাদ চক্কোত্তিকে ভয় করতে শুরু করেছে শুভময়।...প্রহ্লাদের পুরু ঠোঁটের আড়ালে কৌতুকের হাসি কেন? ওর মুখের দিকে চেয়ে বিনীতা বলল—'তোমার চিঠিগুলো ফেরৎ নিয়ে যেও। জানতে পারলে দুজনের কাউকে ও রেহাই দেবে না।'

বিনীতা চলে গেলে শুভময় ঝড়ে ওপড়ানো গাছের মত টান হয়ে শুয়ে রইল। প্রহ্লাদ চক্কোত্তি তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। সন্দেহের দানা একবার যখন মাথায় ঢোকে, তখন তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। সুতরাং সাবধান হওয়া ভাল। ওর চিঠিগুলি যদি ফেরৎ দেয় বিনীতা, তাহলে শুভময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। সত্যি, বিশ্বাস নেই লোকটাকে। ওপর-ওয়ালার সংগে নিজের স্ত্রীর নাম জড়িয়ে হয়ত এক রসালো কেচ্ছা-কাহিনী বাজারে চালু করবে। বউ বলে বিনীতাকে রেয়াৎ করবে না।

পরদিন সকালে উঠে শুভময় পুরোপুরি কাজে মন দিল। ইচ্ছে করেই বিনীতার সংগে কোন কথা বলল না। অফিসে গিয়ে ফাইল-পত্তর দেখল। রিপোর্ট তৈরি করবার জন্য যে সমস্ত তথ্য নেওয়া প্রয়োজন তা নোট করল। তদন্তের ব্যাপারে স্থানীয় দুজন লোকের সংগে দেখা করবার দরকার ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের সংগে দেখা করবে এই অছিলায় বেরিয়ে তাদের জবানবন্দীও নিয়ে এল শুভময়। সন্ধ্যের পর শুভময় যখন ফিরল তখন কাজকর্ম শেষ হয়েছে। তদন্ত সম্পূর্ণ।

প্রহ্লাদ চক্কোত্তি বাড়ীতেই ছিল। বিনীতা এসেছিল চা দিতে। শুভময় ফিস ফিস করে বলল—'সেই চিঠিগুলো ফেরৎ দেবে বলেছিলে।—'

এদিক-ওদিক চেয়ে বিনীতা বলল,—'এখন নয়। ট্রেন তো শেষ রাত্রে। তার আগে এক সময় এসে আমি দিয়ে যাব।'

—'সে কেমন করে হবে?'

—'কেন হবে না? তোমার বাক্সের চাবি কোথায় থাকে বল না? সকলে ঘুমিয়ে পড়লে আমি বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়ে যাব। লক্ষ্মীটি কলকাতায় পৌঁছেই ওগুলো নষ্ট করে ফেলো।—' বিনীতা প্রায় মিনতি করল।

খুশী হয়ে শুভময় বলল — 'জামার ভিতরের পকেটে খোঁজ করো, ঠিক পাবে—'

শেষ রাত্রে স্টেশনে এল শুভময়। প্রহ্লাদ চক্কোত্তি ওকে ট্রেনে তুলে দিল। বলল,—'ঠিকমত খাতির-যত্ন করতে পারি নি স্যর। ক্ষমা করবেন।' বাধা দিয়ে শুভময় উত্তর দিল 'না, না। সে কি কথা! আপনার স্ত্রী যথেষ্ট যত্ন করেছেন। ওকথা বলবেন না—' জ্যোৎস্নার আলোয় প্রহ্লাদকে দেখল শুভময়। ওর পুরু ঠোঁটের আড়ালে সেই কৌতুক। চোখ দুটিতে রহস্যের হাসি। নিজের সুটকেশটার দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হল শুভময়। লোকটাকে বিশ্বাস নেই। বিনীতা ওকে ঠিক চিনেছে।

রাত্রে খুব ঘুমিয়েছে শুভময়। পর পর দু রাত প্রায় জাগরণে কেটেছে। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙেছে প্রহ্লাদ চক্কোত্তির ডাকাডাকিতে। বিনীতার সংগে আসবার সময় আর নিভৃতে দেখা হয় নি। রাত্রে কখন ও ঘরে এসেছিল কে জানে!

ট্যাক্সিতে উঠে শুভময়ের কথাটা মনে হল। বিনীতার চিঠিপত্রগুলো এবার সরিয়ে ফেলা দরকার। বাড়িতে গেলেই মমতা সুটকেশ খুলবে। চিঠি দেখলেই কেলেংকারী। ট্রেনে চার-পাঁচজন সহযাত্রী ছিল বলে শুভময় আর সুটকেশ খোলে নি। পুরোনো চিঠির গন্ধে সহযাত্রীরা না আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সুটকেশ হাতড়ে আতিপাতি খুঁজল শুভময়। কোথায় সেই চিঠিগুলো? তবে কি বিনীতা ঘরে আসবার সুযোগ পায় নি? জামা-কাপড় সরিয়ে শুভময় ওর অফিস ফাইলটা নিয়ে বসল। ওমা! সেই কাগজগুলো কোথায়? রিপোর্ট লিখবার জন্য শুভময় যেসব গোপন তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে। সেই উড়ো চিঠি দুটো। মায় শহরের দুজন লোকের জবানবন্দী পর্যন্ত।

ট্যাক্সির মধ্যেই মাথায় হাত দিয়ে বসল শুভময়। সমস্ত টুরটা মাটি। কেমন করে এখন রিপোর্ট দেবে সে? কোন মুখে বড় সায়েবের সামনে দাঁড়াবে?

চট করে বিনীতার মুখটা ভেসে এল মনে। ওর অনাবৃত বাহুমূলের সেই কালসিটের দাগ, স্বামীর মনে গোপন সন্দেহের কাহিনী, দামী দামী আটপৌরে শাড়ি, গয়না-গাঁটি, আসবাবপত্র, স্বাচ্ছন্দ্যময় সংসার—।

কোনটা অবিশ্বাস করতে পারত শুভময়? কোনটা?

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অতুলনীয় নাসরউদ্দীন

মধ্যযুগীয় লোক-কাহিনীর নায়ক হলেন মুল্লা নাসরউদ্দীন। নাসরউদ্দীনের গল্প আমাদের বাংলা দেশের গোপাল ভাঁড়ের গল্প বা অতি সাম্প্রতিককালের দা ঠাকুরের কাহিনীর সমগোত্রীয়। দীর্ঘকাল ধরে প্রাচ্য দেশে এবং পূর্ব ইউরোপের অনেকাংশে তাঁর কাহিনী প্রচলিত আছে। এর পিছনে আছে কয়েক শতাব্দীর অধ্যবসায়। লোক-কাহিনীর এই নায়ককে কেন্দ্র করে সোভিয়েট রাশিয়ায় কয়েকটি ছায়াছবি তোলা হয়েছে। তুরস্কে কিছু ভ্রমণগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

ইদরিশ শাহ মুল্লা নাসরউদ্দিনের কিছু কাহিনী সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ইদরিশ শাহ ১৯২৪-এ জন্মেছেন ভারতবর্ষে। ইদরিশ শাহের পরিবারবর্গ আফগানিস্থান থেকে ভারতে এসেছিলেন। শৈশবে পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি আরবী ও ফারসী সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন এবং সুফী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন। পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, ও য়ুরোপের অনেক অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং পাশ্চাত্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। ইদরিশ শাহ দার্শনিকতত্ত্ব-প্রসঙ্গে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁর "The Sufis" সুফীবাদ সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাঁর এই গ্রন্থে মুল্লা নাসরউদ্দীনের সুফীবাদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে আলোচনা আছে।

মধ্য-প্রাচ্যে সাধু-সভাসদ, চিকিৎসক, ভাঁড় এবং বিচারক হিসাবে মুল্লা নাসরউদ্দীনের প্রচন্ড খ্যাতি। তাঁর কয়েকটি রসাল কাহিনীর সংকলন করে ইদরিশ শাহ তাঁর পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস করেছেন।

গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি বলেছেন—অনেক দেশ-ই দাবী করে মুল্লা নাসরউদ্দীনের জন্মভূমি বলে। এমন কি তুরস্কে তাঁর একটি কবরও কিছু লোক আবিষ্কার করেছেন এবং সেইখানে প্রতি বছর নাসরউদ্দীনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেই মেলায় অনেকে নাসরউদ্দীনের কাহিনীর উপযোগী পোষাক পরিধান করে তাঁর কাহিনীকে নাট্য রূপায়িত করে পরিবেশন করেন।

গ্রীকরা নাসরউদ্দীনের কিছু কাহিনী তুর্কীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে তাঁদের স্বদেশীয় লোক-কথা হিসেব প্রচার করেন। মধ্যযুগে নাসরউদ্দীনের কাহিনীর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে তিনি জনগণের নায়ক। একটি ছায়াচিত্রে দেখানো হয়েছে নাসরউদ্দীন তাঁর বুদ্ধি প্রভাবে হীন চরিত্রের পুঁজিবাদী শাসকচক্রের মানুষদের বারবার হিমসিম খাওয়াচ্ছেন।

নাসরউদ্দীনের সিসিলিতে রূপান্তর ঘটেছে আরব দেশীয় জ্ঞানীপুরুষ জোহা নামে। সেই দেশের লোক-কথায় নাসরউদ্দীনের কাহিনী সেইভাবে প্রচলিত হয়ে থাকে। মধ্য-এশিয়ার যেসব কাহিনী নাসরউদ্দীনের নামে প্রচলিত সেইগুলি রুশ দেশে বলদাকিয়েভের কাহিনী হিসাবে খ্যাত। ডন কুইকসোটেতেও তাই, এমন কি মেরী দ্য ফ্রান্সের 'ফেবলস' নামক প্রাচীনতম গ্রন্থেও তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ আছে।

মুল্লা অতিশয় নির্বোধ অথচ চতুর ব্যক্তি, এ ছাড়া অলৌকিক শক্তির তিনি অধিকারী। দরবেশরা মুল্লার কাহিনী প্রয়োগ করে তাঁদের ধর্মীয় উপদেশ প্রচার করে থাকেন। চল্লিশ বছর আগে তুর্কী গণতন্ত্রে দরবেশ-তন্ত্র নিষিদ্ধ করা হলেও মুল্লা নাসরউদ্দীনের কাহিনী ভ্রমণকারিদের জন্য মুদ্রিত পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়ে ভ্রমণকারিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়।

পন্ডিতরা নাসরউদ্দীনকে নিয়ে অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। নাসরউদ্দীন নিজে অবশ্য বলেছেন আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে "আমি একজন উলটা মানুষ, আমার মাথা নীচের দিকে পা-টা উপরে।"

সুফীদের বিশ্বাস যে সুগভীর অন্তর্নিহিত জ্ঞান-প্রভাবেই মানুষ শিক্ষামূলক কথা এভাবে বলতে পারে। তাঁরা এইসব কাহিনী যথেচ্ছ ব্যবহার করে থাকেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষ এই সব কাহিনী শুনে আনন্দ পেয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। তাই ইদরিশ শাহ মুল্লা নাসরউদ্দীনের কাহিনীর সংকলন করেছেন।

আমরা কয়েকটি কাহিনী এই সঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রকাশ করছি—

আমার সত্য—তোমার সত্য—নাসরউদ্দীন শাহানশাকে বললেন—আইনের দ্বারা মানুষের চরিত্রকে উন্নত করা যায় না। অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে তাদের অনেক কিছু প্রক্রিয়া করতে হবে। সত্য যাকে আমরা বলি, তা বাহ্যত সত্য, আংশিক সত্য মাত্র।

শাহানশা স্থির করলেন যে তিনি তাঁর প্রজা সাধারণকে সত্য ভাষণে সত্য পালনে দক্ষ করতে পারবেন। তারা সবাই সত্য কথাই বলবে। সত্য পথে চলবে।

শাহানশার রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে সেতু পার হয়ে আসতে হয়। সেই সেতুর মুখে একটি ফাঁসি কাঠ টাঙানো হল। পরদিন যেই সেতু উন্মুক্ত হল, দেখা গেল একজন সেনাপতি কয়েকটি সৈন্য নিয়ে প্রবেশকারিদের পরীক্ষা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। যারা আসবে তাঁদের সকলের পরীক্ষা হবে।

ঘোষণা করা হল—সবাইকে প্রশ্ন করা হবে। যে সত্য কথা বলবে তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। যদি মিথ্যা বলে তার ফাঁসি হবে।

নাসরউদ্দীন প্রথমেই এগিয়ে এলেন।

প্রশ্ন হল—যাচ্ছ কোথায়?

ধীর গলায় নাসরউদ্দীন বলেন—ফাঁসিকাঠে চড়তে যাচ্ছি।

—আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

—বেশত, যদি মিথ্যাই বলে থাকি তাহলে ফাঁসিতে চড়াও।

বারে, আমরা যদি তোমাকে মিথ্যাবলার দায়ে ফাঁসি দিই তাহলে ত তুমি যা বলেছ তাই সত্যি হবে।

তা হবে। এখন দেখছ ত', সত্য কাকে বলে। সত্য দু প্রকার। আমার সত্য আর তোমার সত্য।'

পোষাক নিয়ে একটি মজার গল্প আছে নাসরউদ্দীনের। এই পোষাক গল্পটির মধ্যে যেমন লঘু রস আছে তেমনই আবার কিঞ্চিৎ নীতিও আছে।

আচকান : নাসরউদ্দীনের পুরোতন বন্ধু জালাল একদিন এসে হাজির। মুল্লা তাকে দেখে পরমানন্দে বললেন—আরে এসো এসো, কতদিন পরে দেখা। আমি অবশ্য বেরোচ্ছিলাম। কয়েকটি জায়গায় যেতে হবে। তা তুমিও আমার সঙ্গে এসো, পথে যেতে যেতে কথা হবে।

জালাল বলল —তাহলে ভাই তোমার একটি ভালো পোষাক আমাকে দাও। কারণ, দেখছ তো আমার এই পোষাকটা পরে কোনো জায়গায় যাওয়া চলে না। নাসরউদ্দীন বন্ধুকে একটি চমৎকার আচকান দিলেন।

প্রথম যে বাড়িতে গেলেন নাসরউদ্দীন সেখানে বন্ধুর পরিচয় প্রসঙ্গে বললেন : —এ আমার বাল্যবন্ধু জালাল, তবে ওর গায়ের আচকানটা আমারই।

পরবর্তী গ্রামে যাওয়ার পথে জালাল বলল—তুমি ভাই নির্বোধের মত কি সব বললে। "আচকানটা আমার" এ কথাটা বলা নির্বোধের কাজ হয়েছে। ও কথা আর বোলো না। নাসরউদ্দীন কথাটা মেনে নিলেন।

নাসরউদ্দীন নতুন জায়গায় গিয়ে বেশ আরাম করে বসে বললেন—এই হল জালাল, আমার বাল্যবন্ধু। আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। তবে ঐ আচকানটা—ওটা ওরই।

এ বাড়ি থেকে পথে বেরিয়ে জালাল অতিশয় বিরক্তিভরে বলল—এ আবার কি ধরনের কথা? তুমি ও কি সব বললে? এ-রকম কেউ বলে নাকি। মাথা খারাপ?

নাসরউদ্দীন বললেন—আমি ভ্রম সংশোধন করেছি মাত্র। আচ্ছা ঠিক আছে, আর হবে না।

জালাল বলল, কিছু মনে কোরো না ভাই। এ নিয়ে কথাই তুলো না। নাসরউদ্দীন এ কথা মেনে নিলেন।

তৃতীয় স্থানে পৌঁছে নাসরউদ্দীন বললেন— এই আমার প্রিয় বন্ধু জালাল। আর ঐ আচকান, যে আচকানটা পরে আছেন উনি—যাকগে ও বিষয়ে মানে আচকান নিয়ে কোনো কথা না বলাই ভালো, কি বলো ভাই জালাল, বলা উচিত কি?

এরপর আরেকটি মাত্র গল্প উদ্ধৃত করার মত স্থান আছে, কিন্তু অজস্র মজাদার কাহিনীর মধ্য থেকে সংকলিত এই কাহিনীগুলিই সব নয়।

জীবনদাতা প্রাণী—নাসরউদ্দীন ভারতে বেড়াতে এসেছেন। একটি অদ্ভুত ধরণের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন একটি সাধু বসে আছেন। বেশ শান্ত, সমাহিত ভঙ্গী। নাসরউদ্দীনের বাসনা হল তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। তিনি বললেন—আপনার মত এমন সন্ত পুরুষের সঙ্গে আলাপ করার মত অনেক বস্তু আছে যা উভয়ের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়।

সাধু বললেন—আমি একজন যোগী। আমি মাছ এবং পাখিদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি।

মুল্লা বললেন—তবে ত আমার সঙ্গে আপনার অনেক মিল, আমি আগেই বুঝেছি। মাছ একবার আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল।

যোগী বললেন—কি আশ্চর্য। বলেন কি, আপনার মত মহান পুরুষ আর দেখিনি। এতদিন প্রাণীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি, কিন্তু মাছ কারোর প্রাণ বাঁচিয়েছে, এমন কথা কখনও শুনিনি, জীবনে ঘটেওনি কখনও। তাহলে আমার মতই দেখছি ঠিক, সকল প্রাণীজগতের মধ্যে একটা পারস্পরিক সংযোগ আছে।

কয়েক সপ্তাহ কাটল। একদিন যোগী বললেন—এখন ত আমরা পরস্পর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছি। আপনিও সুস্থ হয়েছেন। বাধা না থাকলে অনুগ্রহ করে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলে যদি আমাদের সম্মানিত করেন।

মুল্লা বললেন—এখন ত আপনার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। জানি না আপনার কি রকম লাগবে। বলা কি ঠিক হবে?

যোগী—প্রভু আমাকে ছলনা করবেন না। বলে ঘাসে মুখ রগড়ে কাঁদতে থাকেন।

তখন নাসরউদ্দীন বললেন—শুনবেনই যখন তখন বলি। আমার উপলব্ধির সঙ্গে আপনার মিল হবে কিনা জানি না। মাছ আমার প্রাণরক্ষা করেছে। আমি অনাহারে মারা যাচ্ছিলাম, কদিন অভুক্ত থাকার পর একটি মাছ ধরেছিলাম এবং সেটি এত বড় ছিল যে আমার তিনদিনের খোরাক জুগিয়েছে। বলুন প্রাণীরা প্রাণ বাঁচায় কিনা।

গ্রন্থটি চমকপ্রদ এ কথা বলা যায়।

—অভয়ংকর

THE EXPLOITS OF MULLA NASRUDIN: Collected by IDRIES SHAH. Published by JOHNATHAN CAPE LTD. (London)—Price 25 shillings.

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

ভারতীয় সাহিত্যরসিকরা শুনে আনন্দিত হবেন যে, এবার 'পেঙ্গুইন' এগিয়ে এসেছে ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশে। ১৯৪৭ থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ভারতীয় গল্প, কবিতা ও সমালোচনার একটা প্রামাণ্য সংকলন প্রকাশের জন্য এঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। সংকলটি সম্পাদনা করছেন এ বি রাধওয়াল।

ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে 'পথের পাঁচালী'। মূল বাংলা থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ বোধ করি এই প্রথম। অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি ও ঔপন্যাসিক লোকনাথ ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী শ্রীমতী ফ্রান্স ভট্টাচার্য।

উপন্যাসটির ফরাসী নাম La Complainte du Sentier। অনুবাদের সময় অনুবাদিকা যতদূর সম্ভব মূলানুগ হতে চেষ্টা করেছেন। এমন কি দেশীয় গাছগাছালির নাম প্রথমে লার্টিনে এবং পরে তা থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করেছেন। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের এই উদ্যোগকে যে সকলে অভিনন্দন জানাবেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি এখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' অনুবাদ করবেন বলে স্থির করেছেন। একটি কথা আজ বিশেষভাবে মনে হয়, যদি বাংলা সাহিত্যের যথার্থ অনুবাদ হত, তাহলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালেরও অনেক লেখক বিশ্বসম্মান লাভ করতেন।

কিন্তু অনুবাদের অভাবে বাঙালী কবি সাহিত্যিকের নাম বাইরের জগতে, এমন কি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও অপরিচিত। এই

অবস্থায়, যাঁরা ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের জন্য আমাদের শুধু অভিনন্দন নয়, আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও প্রকাশিত হবে সন্দেহ নেই।

নজরুল আকাদমীর উদ্যোগে গত ৭ জুন কলকাতার মহাজাতি সদনে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদীয় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। শ্রীচক্রবর্তী তাঁর ভাষণে নজরুল ভবন ও নজরুল সাহিত্যসম্ভার প্রকাশে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। সভায় শ্রীমুজফ্‌ফর আহমেদও উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে 'নিরঞ্জন স্মৃতি-সভা' অনুষ্ঠিত হয়। কবির সদ্য প্রকাশিত 'এখন রাজা' থেকে কবিতা পাঠ করে শোনান নীলাদ্রিশেখর বসু, ফিরোজ চৌধুরী, অজিত মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। কবির উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা পড়েন অমিতাভ চক্রবর্তী, মঞ্জু মিত্র ও প্রভাতকুমার দাস।

বিদেশী সাহিত্য

ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন মানব-ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমাজবিকাশের ধারা, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মানুষের সংগ্রাম ও সফল্য, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও অগ্রগতির চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন তিনি তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থে।

এখন টয়েনবির বয়স আশি বছর।

সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর একটি নতুন বই 'এক্সপেরিয়েন্সেস' নামে। নিজের জীবনের কথাই লিখেছেন তিনি, বর্তমান সময়ের কথা। এখানেও তিনি ভ্রাম্যমাণ। লিখেছেন চলমান জীবনের খবরাখবর, আধুনিক মানবসমাজের গতিপ্রকৃতি। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা নয়, উপলব্ধির আলোকে দেখা। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ। সমালোচকের ভাষায়, 'টয়েনবি ড্রজ আপ এ ব্যালান্স-শীট অব হিউম্যান অ্যাফেয়ার্স ডিউরিং হিজ লাইফ-টাইম, অ্যান্ড শোজ হিমসেলফ ইন এ নিউ রোলঃ অ্যাজ এ পোয়েট ইন গ্রীক অ্যান্ড ল্যাটিন।'

ঘটনাক্রমে একেকজন মানুষের জীবন হয়ে ওঠে উপন্যাসের চেয়েও চমকপ্রদ। বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না, এক জীবনেই এতো বিচিত্র ঘটনা ঘটে যায় কিভাবে! সেই আশ্চর্য সত্যি ঘটনার কাহিনী লিখেছেন সম্প্রতি অ্যানি মোডি।

অ্যানির বয়স এখন উনত্রিশ। কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী। অশিক্ষিত গ্রাম্য পরিবেশে তার জন্ম হয়। ১৯৩৯ সালে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে তাঁর বাল্যজীবন। কিন্তু দুঃখজয়ের অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন তিনি। এখনো সেই ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েনি। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তিনি শেষ করলেন স্কুল-কলেজের পড়াশোনা। যোগ দিলেন নিগ্রো স্বাধিকার আন্দোলনে। অল্প-দিনেই লাভ করলেন নেতৃত্বের মর্যাদা।

অ্যানি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়েছেন 'কামিং এজ ইন মিসিসিপি' গ্রন্থে। আমেরিকান নিগ্রো আন্দোলনের আংশিক দলিল বলা যায় এ বইটিকে। অনেকে বলেন, 'এটা একটা সময়ের দর্পণ।'

এডওয়ার্ড লিয়ারের নাম ভুলে গেছে এ কালের পাঠক-পাঠিকারা। এককালে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিলো য়ুরোপীয় কবিমহলে। ভিক্টোরিয়া আমলে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন ভূরি ভূরি। এখনকার সমাজব্যবস্থা, রাজ-নীতি, ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের ওপর লেখা তাঁর লিমেরিকগুলি সাহিত্যমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন অন্য মানুষ। জীবনে সুখ পাননি বেশী। ছোটদের জন্যে যে সব 'ননসেন্স রাইম' লিখে-ছিলেন, তার মধ্যে অফুরন্ত আনন্দের খোরাক থাকলেও আসলে সেগুলি ছিল একজন 'প্রকৃত নির্যাতিতের' বইয়ের মুখোশ।

কয়েকদিন আগে ভিভিয়ান নোয়াকস লিখেছেন তাঁর অসুখী জীবনের কাহিনী। মধ্য ভিক্টোরিয়ান যুগের সমাজ-বিকাশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। সমা-লোচকের ভাষায়, 'নোয়াকস লিখেছেন এমন একজন পর্যটকের জীবনকাহিনী, যিনি বহু মানুষের মধ্যে বাস করেও ব্যক্তিজীবনে ছিলেন ভয়ংকর নির্জন, নিঃসঙ্গ এবং যন্ত্রণা-কাতর।'

আমি যাঁদের দেখেছি —পরিমল গোস্বামী, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

সব মানুষই বিশিষ্ট নন। কেউ কেউ বিশিষ্ট। এঁরা মনীষী। সম্মানীয় এবং শ্রদ্ধেয়। খুব কমই দেখা যায় এই ধরনের মানুষ। জল্পনা-কল্পনা আলোচনা গবেষণার অন্ত থাকে না এঁদের নিয়ে। বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ কবিতা স্মৃতিকথা রচিত হয়ে থাকে। সেগুলির অসাধারণ জনসমাদর ঐ সমস্ত ব্যক্তির জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক। সে হোল দৃশ্যমান জগতের সব সময়ের দেখা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। কিন্তু এই জগতেরও অন্তরালে এঁদের জীবনের খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনার আকর্ষণও কম নয়। তাছাড়া ইতিহাসের দিক থেকে এই সমস্ত উপাদানের যথেষ্ট দামও রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র-নাথ, শরৎচন্দ্র এবং আরো অনেকের এই ধরনের জীবনচিত্র পাওয়া যায়। বহুজনকে দেখা একজন মানুষের অন্তরঙ্গ স্মৃতি-চিত্রমূলক বই মাত্র কয়েকখানি বেরিয়েছে বাংলায়। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবীণ সাহিত্য-সেবী শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'আমি যাঁদের দেখেছি' সেই রকমই একখানি বই। বইটি হাতে নিয়ে সকল শ্রেণীর পাঠকই মুগ্ধ হবেন।

এই বই-এ একুশজন মনীষীর অন্তরঙ্গ জীবনের কথা আছে। গ্রন্থকার প্রথমেই বলেছেন, 'এই পুস্তকে যাঁদের কথা লিখেছি, তাঁরা আমার চোখে কেমন, সেই কথাই বলতে চেষ্টা করেছি।...এঁদের সবাইকে ভালবেসেছি বলেই লেখার প্রেরণা। এবং আমার ভাল লাগাকে আমি জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে কোনো বাধা অনুভব করিনি।'

এই ভাললাগা কাছেদেখা একুশজন মানুষ হলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিহারীলাল গোস্বামী, রাজশেখর বসু, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নলিনীকান্ত সরকার, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়ী দেবী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, কাজি নজরুল ইসলাম এবং সজনীকান্ত দাস। এঁরা সকলেই একই কর্ম-গোত্রের মানুষ নন। লেখক বিভিন্ন সময়ে এঁদের সাহচর্যে এসেছেন। মিশেছেন এঁদের সঙ্গে। দেখেছেন চোখ খুলে। অল্পবয়সে, যৌবনে এবং কর্মজীবনে নানাভাবে এঁদের সঙ্গে মিশেছেন। দুর্লভ একটি মুহূর্তে কোন ঘরোয়া আসরে, অথবা কোন সভায় যাঁদের যেভাবে দেখেছেন তাঁদের জীবনের সেই মুহূর্তটিকে চিত্রিত করেছেন। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে দেখা আর দূরের থেকে দেখার মধ্যে যে কত ফারাক তা নানান ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক নতুন কথা নতুন ছবির রঙীন প্রক্ষেপণ অতি রমণীয় এবং সহজেই মনকে টেনে নেয়। গ্রন্থকার রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ 'মনেরও একটি চোখ আছে, তা মনেই থাকে এবং আমরা সবাই সেই চোখ বয়ে বেড়াই মনের মধ্যে, সেই বিলট-ইন চোখ। এবং চোখের দেখা ও

মনের দেখা এই দুই দেখা একত্র মিললে তবে-দেখা বেশি সার্থক হয় বলে আমার বিশ্বাস।' লেখকের দেখাও সার্থক। সবগুলি আলোকচিত্র তথ্যভারাক্রান্ত জীবন-স্মৃতি না হয়ে, দিয়েছে মনীষী চরিত্রচিত্রের অভিনব আস্বাদ। আহার-আচরণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, চেনা মানুষকে যেন তা আরও নতুন করে তোলে। জীবনের অনেক খুঁটিনাটি তুচ্ছ ঘটনা, যার মধ্যে চরিত্রের বিশিষ্ট দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা অনিবার্যভাবেই শ্রীযুক্ত গোস্বামীর চোখে ধরা পড়েছে। আর সবশেষে যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, তা হল লেখকের অননুকরণীয় ভাষা। এই সরল স্বচ্ছন্দ ভাষার জন্যে বইটি প্রত্যেক পাঠকেরই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তেইশখানি অসাধারণ আলোকচিত্রের অধিকাংশই লেখকের নিজের তোলা। তিনি একজন প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী। তাঁর সৌন্দর্যবোধের এই অসামান্য দিকটি প্রতিটি ছবিতে সুস্পষ্ট।

রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা (কাব্যগ্রন্থ) **—তরুণ সান্যাল ।। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা ৬।। দাম : তিন টাকা।**

তরুণ সান্যাল সচেতন কবি। সর্বপ্রকার দায়িত্বহীন শব্দোচ্চারণে তিনি বীতস্পৃহ। কাব্যিক ভাবনায় নিয়ত পরিবর্তনশীল। সৃজন ক্ষমতায় স্বপ্রতিষ্ঠ। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরণ আছে, পতন নেই। দীর্ঘ দুদশক ধরে তরুণবাবু কবিতা লিখে আসছেন, পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন শৈল্পিক বিচারবোধে। তাঁর সমকালীন অনেকের চাইতে এদিক থেকে তিনি সার্থক এবং ক্লান্তিহীন।

যদিও শেষ কবিতার নামে এ কাব্যগ্রন্থের নামকরণ, তবু সহজেই উপলব্ধি করা যায় —লেখকের মৌলপ্রত্যয় ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন কবিতার মধ্যে। কবির দ্বন্দ্বময় রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রায় প্রতিটি কবিতায়। তিনি আবর্তিত—তীব্র স্রোত এবং গতির ভেতরে সঞ্চরমান। এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'টিকিট'—প্রবাসের নয়, ওজন মাপার—নিজের, সময়ের এবং সমাজের ওজন মাপার টিকিট। এখানে 'অসীম কালের যাতায়াতে' তিনি পর্যবেক্ষণরত—ভ্রাম্যমান—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং অতীতের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে তৎপর।

বাংলাদেশ কবিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে তার আধা শহুরে আধা গ্রামীণ সভ্যতা। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে তাঁর লেখা 'তোমার জন্যেই বাংলাদেশ' নামে কবিতাপুস্তিকার কথা। মনে হয়, এই গ্রন্থ তারই সম্পূরক কিংবা যেন তারই পূর্ণতর দ্বিতীয় সংস্করণ। বহু দেশীবিদেশী শব্দের যোগ্য ব্যবহারে তরুণ সান্যাল তাৎপর্যপূর্ণ। যুগ সঙ্কটের আগত এবং অনাগত চেহারাটাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন নিজের মধ্যে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন শহুরে সোফিস্টি-কেশনের সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে হাইটেনসন ইলেকট্রিকের তার ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে দ্রুতগামী রেলের গাড়ি, অন্যদিকে গাঁয়ের পথে গরুর গাড়ির চাকার শব্দ, মাঠেঘাটে আস্তীর্ণ হয়ে আছে সাবেকী আমলের বিচিত্র স্বাক্ষর।

এই সময়চেতনার দেশীয়তাকে মেনে নিলেও, আন্তর্জাতিক অভিঘাতকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি তিনি। একেকটি বিশিষ্ট ভাবনাকে তরুণ সান্যাল এ কাব্যগ্রন্থে সামান্যীকরণ বা জেনারেলাইজেশন করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। দীর্ঘ কবিতা লেখায় জন্যে যে বিরাট পটভূমি দরকার হয়, সেই পটভূমিতে বসে তিনি কবিতা লিখছেন ইদানীং। এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে 'রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা' দূরপ্রসারী, ইঙ্গিতময় এবং মহত্তর কাব্যভাবনায় প্রতিভূ।

বহু বিপর্যয় এবং ঝড়ের মধ্যে তিনি অন্তর্নিহিত আশাবাদকে কখনো বিসর্জন দেননি। বরং বিদ্রূপ করেছেন পথভ্রষ্ট কবি এবং শিল্পরসিকদের। 'ঝড়বৃষ্টি'র মধ্যেও নাট্যমঞ্চের সাক্ষী দর্শক। কয়েকটি দীর্ঘ কবিতাও স্থান পেয়েছে এ সংকলনে। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন : 'এত হাওয়া হাতে মেখে / কে এলে হে / ঘুমোতে পারি না।' অথচ তার পূর্বের পংক্তিতেই আর্তকণ্ঠ শোনা গেছে '......হায় বুক শিলাজতু নিঃসাড় বিপুল জেলখানা/আর আমি।'

এই বন্দীত্বের হাত থেকে তিনি মুক্তি চান। মুক্তি চান সংশয় আর অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিঘাত থেকে। সমস্ত যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বুঝি সোনালি সূর্যের আচ্ছাদন হবে—পূর্ণতর বিশ্রাম এবং আত্মমুক্তির।

বাংলা কবিতার পাঠক এই বইটি হাতে পেয়ে খুশী হবেন অবশ্যই।

ছবি ছড়ার দেশে : (সংকলন) শৈলশেখর মিত্র সম্পাদিত। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। এ১৩২।১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২। দাম : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ছড়ার সংকলন 'ছবি ছড়ার দেশে'র এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। সম্পাদক বলেছেন, 'কোনো সাহিত্য সংকলনই সব দিক থেকে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। তাই জানি ছবি ছড়ার দেশেতেও বাকি থেকে যাবার অনেক কিছু থেকে গেছে।' বিনয়ের সঙ্গে একথা স্বীকার করে সম্পাদক সমালোচনার একটি দিককে বন্ধ করেছেন। এই সুন্দর সংকলনটিতে রবীন্দ্রনাথ থেকে অতি সাম্প্রতিক কবিদের রচনা এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকজন কবির রচনা সংকলিত হয়েছে। যাঁদের লেখা আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, এবং আরো অনেকে। অতি সুদৃশ্য এবং সুন্দর ছাপা। এই বইয়ের ছবি আঁকা শিল্পীরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, রথীন্দ্র মৈত্র, সূর্য রায়, শৈল চক্রবর্তী, মনীন্দ্র মিত্র, রেবতীভূষণ ঘোষ, সুব্রত ত্রিপাঠী, নিতাই ঘোষ এবং আরো কয়েকজন। এবারের প্রচ্ছদটি আগের থেকেও আকর্ষণীয়।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ক্রান্তি। বাংলা ত্রৈমাসিক। দ্বিতীয় বর্ষ। ১ম ও ২য় যুগ্ম-সংখ্যা। জানুয়ারী-জুন, ১৯৬৯। সম্পাদক, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দাম এক টাকা।

পত্রিকাটি একটি পুরনো রাজনৈতিক দলের মুখপত্র। এটি বহু পরিণত এবং বহুল প্রচারিত। আলোচ্য সংখ্যাটিও পূর্বধারার মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখেছে। 'ভিয়েতনাম যুদ্ধ: যৌবনের মনস্বীর প্রতিবাদ' শীর্ষক রচনাটি একটি মূল্যবান অংশ এবং সময়োচিত বিষয়। পুস্তক পরিচয় অংশে শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর আলোচনা গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। এছাড়া সর্বশ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্র কৌশিক ও সত্যেন সাহার রচনাগুলি সহৃদয় পাঠকের কাছে যথাযথ ভাবনা ও বিতর্কের অবকাশ দেয়। দেবব্রত ঘোষ অনূদিত রবার্ট লাংস্টনের রচনাটি সাবলীল ও সহজবোধ্য।

বর্তিকা [ত্রয়োদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা]—সম্পাদক মনীশ ঘটক। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। দাম : ষাট পয়সা।

মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত এই সাহিত্য পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন মনীশ ঘটক, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্র মজুমদার এবং আরো কয়েকজন। কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ, দুটো গল্প, এবং একটি নাটিকা ছাপা হয়েছে। সম্পাদকীয় প্রশংসনীয়।

কিশলয় (সুরেন্দ্র চক্রবর্তী ইনস্টিটিউশন—প্রাতঃকালীন বিভাগের সাময়িক পত্রিকা) ১৩৭৬। সম্পাদিকা—রীতা চক্রবর্তী।

প্রাতঃকালীন বিভাগের এই পত্রিকাটি কালো, লাল, সবুজ রং-এ ছাপা, নানান ছবি ও রচনায় উল্লেখ্য শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী পত্রিকাটির ভূমিকায় বলেছেন, পত্রিকাটি হল, 'অপরিণত বালকের অব্যক্ত ভাবনার নিঃসংকোচ প্রকাশ।' বাস্তবিকই তাই। লেখাগুলি প্রত্যেকটি শিশুমনকেই নাড়া দেবে। তাদের সারল্য, কৌতূহল, বিস্ময়, হাসি, আনন্দ সবকিছুকেই ধরে রাখে এই পত্রিকাটি। পত্রিকাটির আলপনা আঁকা সুন্দর, সুরুচিসম্পন্ন প্রচ্ছদটি নিঃসন্দেহে সম্পাদিকা ও প্রতিষ্ঠানের সম্মান বৃদ্ধির সহায়ক।

উৎস-অভিযাত্রীর অবিস্মরনীয় রচনা

শিয়ালদা থেকে নব ব্যারাকপুরে। কতটুকুই বা পথ। রেলগাড়িতে বিশ-পঁচিশ মিনিট। তার চেয়ে বেশি সময় লাগে শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ যেতে। তবু কত দূরে মনে হয় আমাদের কাছে। শহর ছাড়িয়ে যেতে হয় উপ-শহরের দিকে। উত্তেজনা থেকে স্থিরতায়।

আমরা যারা কফি হাউসে আড্ডা দিই, সাহিত্যের আলোচনা করি চরম উত্তেজনায়—তাদের কাছে এ দূরত্ব কম নয়। তার চেয়ে দিল্লী-বোম্বাই আমাদের অনেক কাছাকাছি। এমন কি প্যারিস লণ্ডনও। মনে-প্রাণে সফিস্টিকেটেড হয়ে গেছি আমরা। সাম্প্রতিকের আলোচনায় মশগুল। তুলকালাম কাণ্ড করি কবিতা নিয়ে, গল্প-উপন্যাসের বিতর্কে ঝড় তুলি, রম্য রচনা লিখি সংবাদ-পত্রে, ইতিহাসের নামে চমকপ্রদ ঘটনা উপহার দিই।

অথচ ভেবেও দেখি না, এই পরিমণ্ডলের বাইরেই অপেক্ষা করে আছে সাহিত্যের আরেকটা জগৎ, চোখ মেলে তাকাবার চিরন্তন গবাক্ষ। সেখানে দৃষ্টির আসনে বসে আছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ। উত্তেজনাহীন এবং নিরাসক্ত। সকল অসংগতি থেকে সংগতির সূত্র আবিষ্কার করেন তাঁরাই।

আমাদের সে অন্তর্দৃষ্টি কই?

এ প্রশ্নের উত্তর জানতেই গিয়েছিলাম নব ব্যারাকপুরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের কাছে। পূর্বব্যবস্থামতো জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন। যোগেশবাবু চোখে দেখতে পান না। সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছেন। অসুখে ভুগে না, বই পড়ে পড়ে—পুরোনো দিনের কাগজপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে, অস্পষ্টতার মধ্যে স্পষ্টতার আলো খুঁজতে খুঁজতে।

পুরোনো দিনের দুজন কবির নাম মনে পড়লো আমার। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন শেষবয়সে। মিল্টন 'প্যারাডাইস লস্ট' লিখেছিলেন অন্ধ অবস্থায়। বাইরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়েছিলেন ভেতরের দিকে। ঐশ্বর্যময় স্মৃতির জগতে। যোগেশবাবুও অন্ধ হয়ে যেন দ্বিতীয় দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী সম্পাদনা করেছেন চোখের দৃষ্টি হারিয়ে। নিজের হাতে লিখতে পারেন না। মুখে মুখে বলে যান। লিখে দেয় অন্য লোক।

তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। শরীর ছুঁয়ে দেখলেন। আমার হাত ছোঁয়ালেন তাঁর কপালে। একালের সঙ্গে নিকট-অতীতের দৃষ্টি বিনিময় হলো এভাবেই। আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমার নাম, কোথায় থাকি, কি করি—ইত্যাদি প্রশ্ন। এবং আমাকে বিস্মিত করে বললেন, আমি যা জানি না, আমার সেই জন্মস্থানের বিবরণ, ওখানকার বৈশিষ্ট্য, লোকজন এবং পুরোনো ঐতিহ্যের কথা।

হরিহর শেঠ এককালে পুরোনো কলকাতার ইতিহাস লিখেছিলেন। কলকাতার আভিজাত্য, মর্যাদা এবং পরিবর্তনশীলতার কথা জেনেছিলাম তাঁর লেখা থেকেই। যোগেশবাবুর চোখে দেখেছি উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের তরঙ্গবিক্ষেপ। বাংলাদেশের গ্রাম এবং সংস্কৃতির পরিচয়। সদা অতীতের রহস্যময় সংবাদ।

তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন।

বললেন, আপনার কি প্রশ্ন আছে বলুন। কথা তো একদিনে ফুরোবার নয়। সে অনেক ব্যাপার। মাঝে মাঝে আসবেন, বলা যাবে।

বললাম, 'বইকুণ্ঠের খাতা' নামে একটি নতুন ফিচার করেছি আমরা অমৃতে। বইপড়া সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হলো তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে লেখকের মানসিকতা, তাঁর যন্ত্রণা ও উদ্বেগ, বই লেখার ভেতরের খবরাখবর জানাতে চাই পাঠকসমাজকে। হয়তো, এর ফলে নতুন বই এবং লেখক সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ অনেক বেশি সতর্ক ও কৌতূহলী হয়ে উঠবে।

যোগেশবাবুর মুখ সহসা একটু উজ্জ্বল মনে হলো। বললেন, বই কেনা আসলে একটা অভ্যাস। প্রবাসী থেকে মাইনে পেতাম মাসে চল্লিশ টাকা। ২০ টাকার বই কিনতাম, ২০ টাকা পাঠাতাম বাড়িতে। মেসে ছিলাম দশ বছর। অন্যের বাড়িতে রেসিডেন্সিয়াল টিউটার হিসেবে কাটিয়েছি দীর্ঘকাল। তাতে খাওয়া থাকার সমস্যাটা মিটে যেত। প্রেসিডেন্সির রেলিং থেকে বই কিনেছি। মূল্যবান বই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, শেকসপীয়ার, বায়রনের রচনাবলী। শুনেছি, হাজার টাকার ওপরে যাঁরা মাইনে পান, তাঁদের ওপর শ্রীসত্যপ্রিয় রায় শিক্ষাকর বসাচ্ছেন। বেশ হচ্ছে। দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দরকার।

এমন সময় একটা ট্রেন এল শিয়ালদা থেকে। বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছিল। গাঁয়ের মানুষ গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে। জিলিপি আর মুড়ি নিয়ে এলেন যোগেশবাবুর ছেলে।

জিজ্ঞেস করলেন, কত বয়েস? চল্লিশের কাছাকাছি হলে কিছু খাঁটি জিনিস খেয়েছেন।

আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, তাঁর এই জিজ্ঞাসা। শহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ নন। কিন্তু খাঁটি জিনিসের জন্যে উৎসুক। মানুষের প্রতি আস্থাশীল। শহরে থেকেও চিরকালীন বাংলাদেশের মানুষ। আস্তিক্যবাদী।

সম্প্রতি তাঁর একটি বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হয়েছে—'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত'। প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। তখন ওর নাম ছিল 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত'। যোগেশবাবু পুরোনো নামটার ওপর একটু জোর দিতে চান। স্বাদেশিকতার সূত্রপাত তো ওখান থেকেই। কথায় কথায় বললেন, 'উই অয়ার চিলড্রেন অব গান্ধীজম'। ছাত্রজীবনে পড়েছি 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'প্রবাসী' 'সবুজপত্র' প্রভৃতি কাগজ। বিশেষ করে প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' আমার খুব ভাল লাগতো। অমৃতবাজার পড়তাম। অমৃতবাজার তো ছিল জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র।

মনে পড়ল, কয়েক বছর আগে অমৃতে ওঁর একটা লেখা পড়েছিলাম, 'বাংলার মেলা'। তার আগে পড়েছিলাম, প্রবাসীর পাতায় অনেকগুলি প্রবন্ধ। বেশির ভাগ উনিশ শতকের সমাজ-জীবন সম্পর্কে লেখা।

ওঁকে বললাম সেকথা।

তিনি বললেন, হ্যাঁ অমৃতে আমার ঐ লেখাটি বেরিয়েছিল।

—আপনি উনিশ শতকের ইতিহাস বেছে নিলেন কেন? দূরঅতীতের কথাও তো লিখতে পারতেন? মোগল যুগ, কিংবা নবাবী আমলের ইতিহাস?

যোগেশবাবু বললেন, এ ব্যাপারে আমার গুরু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অধীনে কাজ করতাম। মাসে পাঁচ টাকা পেতাম যাতায়াত খরচ। বিনা পয়সায় তিনি কাউকে খাটাতেন না। তখন পুরোনো কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করতে হত। ব্রজেনবাবুর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, সংবাদপত্রে সেকালের

কথা, সাময়িক পত্রের ইতিহাস প্রভৃতি বই লেখার সময় উপাদান সংগ্রহের জন্য প্রচুর ছোটাছুটি করতে হত। জোগাড় করেছিলাম প্রচুর তথ্য, চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ। ব্রজেনবাবুও সেসব ছেপেছেন তাঁর বইতে। তখনই আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় উনিশ শতকের দিকে। ব্রজেনবাবু বেছে নিয়েছিলেন একটি দিক, আমি বেছে নিলাম আরেকটি। উনিশ শতকের 'পার্সোন্যালিটি'কে তুলে ধরতে চেয়েছি আমি।

—'হিন্দুমেলা' লিখতে শুরু করেন কখন? আর কোনো বইয়ের সাহায্য পেয়েছিলেন কি? কোত্থেকে আপনি তার উপাদান সংগ্রহ করলেন?

—১৯৩১-৩২ অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে যেতাম। প্রচুর খবরাখবর পেয়েছিলাম তখন। রাধাকান্ত দেবের ফ্যামিলি লাইব্রেরীতে গিয়েছি বহুবার। যেতাম মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণের (দাদাবাবু) কাছে। হিন্দুমেলার ওপর অনেক লেখা বেরিয়েছিল পত্রপত্রিকায়। কোনো বই ছিল না। এখনো নেই। আমিই একমাত্র হিন্দুমেলার ইতিহাস লিখেছি। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ সম্পর্কে আমি খুব উৎসাহী। লিখেছি আমি তাঁর সম্পর্কে। জাতীয় আন্দোলনের তিনিও ছিলেন অন্যতম পুরুষ। তা ছাড়া সাহায্য পেয়েছি 'সোমপ্রকাশ' নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপার' অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' কালীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইন্টালিজেন্সার' গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকা থেকে। সব নাম মনে করতে পারছি না। নবীন সেনের 'আমার জীবন' রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', শিবনাথ শাস্ত্রীর, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও সাহায্য পেয়েছি।

—'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' কি কোথাও ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল?

—বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ আগে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় হিন্দুমেলা সম্পর্কে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেগুলিই পরে 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' নামে গ্রন্থবন্ধ হয়। নতুন সংস্করণে সেসব লেখার কোনো কোনো অংশ বাড়ানো হয়েছে।

হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে। সে আজ একশ বছরেরও বেশিকাল আগের কথা। যোগেশবাবু পঁচাত্তর বছর পরে লিখলেন তার ইতিহাস। প্রকাশক বইটির পুনর্মুদ্রণ করেছেন তার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বালাকথা'য় লিখেছেন, 'আমি বোম্বাইয়ে কার্যারম্ভ করার কিছুকাল পরে কলকাতায় এক স্বদেশী মেলা প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন।... কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে তিন-চারি দিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সংগীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা হত।'

হিন্দুমেলার প্রথম সম্পাদক • ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র।

যোগেশবাবু অত্যন্ত নিষ্ঠায় সংগে সেই উত্তাপ-উত্তেজনার কথা লিখেছেন। প্রতিটি অধিবেশনের ধারাবাহিক বিবরণ, সংবাদপত্রের মন্তব্য, দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের আগ্রহ-উৎসাহ, সাময়িক পত্রের মতামত, সবই তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক সততায়। তিনি লিখছেন, 'ছন্দে ও সুরে দেশমাতার বন্দনা প্রশস্তি জাতীয় মেলা হইতেই আরম্ভ হয়।'

কথাটি ঠিক। দেশের দুর্দশা ও বিদেশী শাসনের অপমান যেন কবিতায় ফুটে উঠতে থাকে এ সময় থেকেই। অবশ্য তখনো ভয় ছিল। রাজার ভয়। একটি গানে সেই সংকট ও আকাঙ্ক্ষার কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। তার দুটি পংক্তি—

গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এককালে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। ১৮৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় কবিতাটি ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা হিন্দুমেলায় পঠিত
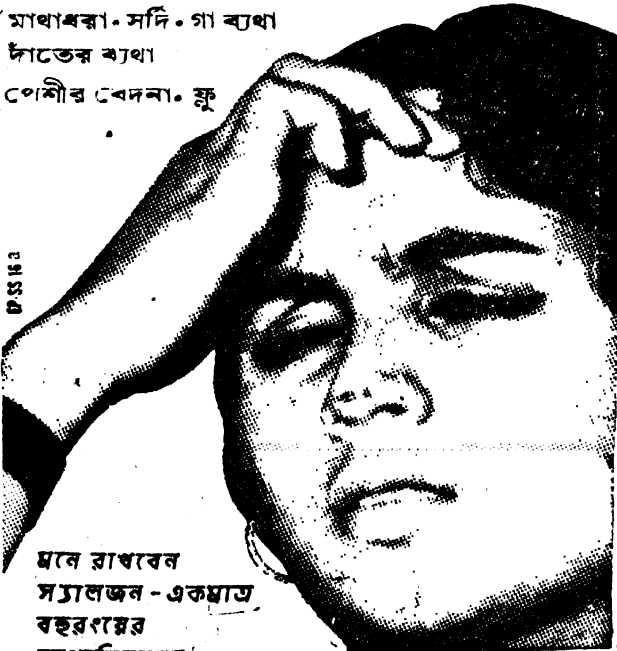
দ্বিতীয় কবিতা হলো 'দিল্লীর দরবার'। তার শেষ কয়েকটি পংক্তি—

বৃটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা
যে কজন আছি
আমরা ধরিব আরেক তান।

গত চল্লিশ বছর ধরে যোগেশবাবু প্রধানত 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় পত্রিকায় উনিশ শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী লিখে এসেছেন। লিখেছেন যুগান্তর, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, দেশ, আনন্দবাজার, আর্থিক প্রসঙ্গ, জয়শ্রী, বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্গশ্রী, বন্ধু, বসুন্ধরা, বাংলার শিক্ষক, ভারতবর্ষ, মন্দিরা, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি কাগজে নানারকম গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ। এতটুকু ফাঁকি দেননি তিনি। তথ্যসংগ্রহের জন্য তিনি গিয়েছেন নানা জায়গায়। অনুমানের ওপর নির্ভর করেননি। রাধানাথ শিকদার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁকে ছুটে যেতে হয়েছিল আহিরীটোলায়। ওখানে থাকতেন রাধানাথের আশি বছর বয়স্ক ভাইপো।

বললেন, ইচ্ছে থাকলে সবই হয়। চাই জানার আগ্রহ। পথ আপনা থেকেই বেরিয়ে আসবে। একবার রাধানাথ শিকদারের একটা ছবির দরকার হলো প্রবাসীর জন্য। খোঁজ নিয়ে জানলাম, চিত্ত বসুর কাছে পাওয়া যেতে পারে। ঠিকানা জানি না। আমহার্স্ট স্ট্রীটে থাকেন এইটুকুই শুনেছি। খোঁজ করতে করতে গেলাম। ভয়ে ভয়ে কড়া নাড়লাম একটি বাড়ির নেমপ্লেট দেখে। ভুল করিনি। তারই পেছন দিকে ছিল একটি ছাপাখানা। নাম 'একটি প্রেস'। ওদের কাছ থেকেই ছবি পেলাম। ছবির ব্লকও। আজকের দিনের ছেলেদের সে নিষ্ঠা নেই। আমি তো বলি, দশ পাতা পড়ে এক পাতা লেখো। আমরা একশ পাতা পড়ে এক পাতা লিখতাম।

জিজ্ঞেস করলাম, হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত লিখলেন কেন? এর মধ্য দিয়ে কি আপনার কোনো বিশেষ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়?

—আমি 'মুক্তিসংগ্রামে ভারত' লিখেছিলাম ছ'-সাত মাসে। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম আমাকে নাড়া দিয়েছিল। 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' একই মানসিকতা থেকে লেখা। বিশেষ করে লক্ষ্য রাখবেন 'হিন্দু' শব্দটা। তখন তো হিন্দুদেরই একাধিপত্য। মুসলমানরা ছিল ব্যাকগ্রাউন্ডে। হিন্দুরাই চাকরী করত ইংরেজ সরকারের। তারাই প্রতিবাদ করত। এখন আমাদের রাষ্ট্রে হিন্দু নামটা অচল। এখনকার অবস্থায় বিচার করলে চলবে না। তখনকার পরিবেশে চিন্তা করতে হবে।

আপনাদের সময়ে সাহিত্য নিয়ে পলিটিক্স হতো না? দলাদলি?

—হত। আমি সেসবে যেতাম না। বুঝতেও পারতাম কম। আমি ছিলাম ঘরকুনো মানুষ। একটা কথা আছে, সারগ্রাহ্যমোপাস্য খলু। আমিও ছিলাম অনেকটা তাই। ১৯৩০ থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যাতায়াত করি। ওখানকার সদস্য আছি বহুদিন। কার্যকরী সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কয়েকবার সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছি পরিষদের নির্বাচনে। ব্রজেনবাবু বলতেন, ব্যাপারটা কি? তোমাকে দেখছি, আমাদের পক্ষের লোকও ভোট দেয়, বিপক্ষের লোকও ভোট দেয়।

তখন তো সাহিত্যের বেশ ভালো ভালো আড্ডা ছিল। যেতেন না কোথাও?

—যেতাম শনিবারের চিঠির আড্ডায়। প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছি। কয়েক বছর দেশ পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলাম। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত প্রবাসীতে সহ-সম্পাদকতা করেছি। তারপর তো চোখ খারাপ হয়ে যায়।

কোন্ কোন্ সাহিত্যিকের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল?

—নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অধীনে কাজ করেছি। ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (শিল্পী), সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল কম নয়। কবি কৃষ্ণধন দে আমার খুবই পরিচিত।

হাসি চেপে রাখলাম একটি ঘটনায়।

যোগেশবাবু বললেন, বিভূতি বাড়ুজ্জে বিড়ি খেতেন। এক নম্বরের কঞ্জুষ। নিজের পয়সায় সিগ্রেট কিনতেন না কখনো। কেউ দিলে খেতেন। না হলে বিড়ি ভরসা।

হো হো করে হাসা যায় না। বুঝলাম, চোখ গেলেও কৌতুক যায়নি। ভেতরে ভেতরে বেশ রসিক মানুষ তিনি। সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর।

একটু থেমে বললেন, খুব ভালো লিখতেন বিভূতিবাবু। ভারি চমৎকার। লেখার দিকে এমন সুন্দর হাত আর কয়টি আছে?

খোঁচা দেবার জন্যে বললাম, ইতিহাসের ব্যাপারে আপনি তো বিশ্লেষণের পক্ষপাতী নন? আপনার লেখা অ্যানালিটিক্যাল নয়। আপনি হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে এগারোটি অধিবেশনের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। তা দিয়ে তো সেকালের পুরো অবস্থাটা বোঝা যায় না। এক-একটি অধিবেশনের পর দেশব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ কই? হিন্দুমেলার গুরুত্বই বা পাঠক বুঝবেন কি করে? পটভূমি ও পরিবেশ বিশ্লেষণের কি প্রয়োজন ছিল না?

—আমি তো ব্যাখ্যাতা নই। ফ্যাক্টস তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। আপনারা বুঝে নেবার চেষ্টা করবেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অন্যেরা করবে। সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আমি চুন-সুরকি দিয়েছি। কোথাও ভেজাল দিইনি। ইমারত তৈরি করবেন আপনারা। যারা আমার 'মুক্তিসংগ্রামে ভারত' পড়েছেন তাঁদের কাছে 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' বুঝতে সহজ হবে। আমি তো বলি, আমার মতো দু-চারজন অন্ধ হয়ে যাও। গো টু দি সোর্স। আই হ্যাভ গন টু দি সোর্স।

সত্যিই তাই। এদিকটা তো ভাবিনি। চমকে উঠলাম যোগেশবাবুর কথা শুনে। নিজের অন্তসারশূন্যতায়, আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। কার কাছে কি প্রশ্ন করেছি? উৎসের দিকে যাওয়া! যোগেশবাবু ঘটনার উৎস দেখেছেন। জ্ঞানের জগতে এ আরেক অভিযান। তিনি গিয়েছেন উৎসস্থলে। আর আমরা?

আমি ভাবতে ভাবতে উঠে এলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা কাটিয়েছি তাঁর সঙ্গে। তিনি বস্তুকে দেখেছেন ভেতরের দিক থেকে। অন্তরের আলোকে। চোখ হারিয়েও দৃষ্টি হারাননি তিনি। এখনো আমার কানে বাজছে তাঁর সেই অমোঘ উচ্চারণ : "গো টু দি সোর্স। আই হ্যাভ গন টু দি সোর্স"।

—বিশেষ প্রতিনিধি

(২৪৫) [illegible] রহস্য .
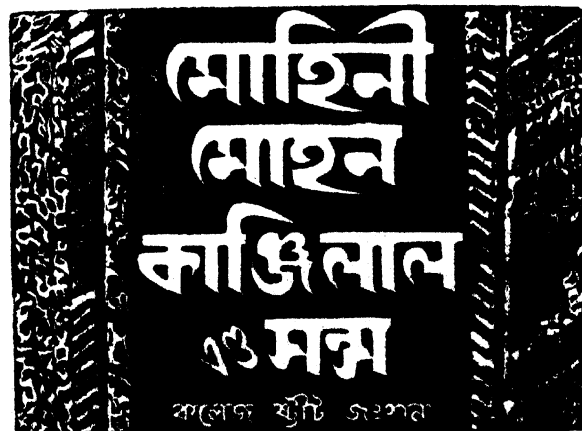
রামদাস [illegible]'। রইল পেছনে, ট্যাক্সি ছুটল ভ্রমরের হোটেলের দিকে।

যেতে যেতে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে সব বলল অখণ্ড। শোনবার পর ইন্দ্রনাথ বলল—'অনেকগুলো খবর জানা গেল। ভীম দত্ত বুধবার এসেছিলেন, নিজের প্রাসাদে গেছিলেন, কিন্তু গাড়ি থেকে নামেন নি, মেয়ের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তাকে পরে নিয়ে আসবেন। লোহার ভীম ভয়ে কাঁপছিলেন গাড়িতে বসেও। কেন? উত্তরটা আমরা জানি। দনু ঘোষের জন্য।'

'বিদঘুটে কারবারে ঝানু কারবারী দনু ঘোষ। কিন্তু কারবারটা কি?'

'হেঁয়ালি তো সেইটাই।'

●

কপাল ভাল, ভ্রমর হোটেলে ছিল। খাবার আয়োজন করছিল। দুই মূর্তিমানকে দেখে আরো দুটো খাবার অর্ডার দিল। খেতে খেতেই বলল আদম ন্যাহার ব্যাপার। পাখী এখানেও উড়েছে। সকালের দিকে একটা 'টেক' হওয়ার পর আউটডোর শুটিংয়ে আদমের কাজ ফুরোয়। সঙ্গে সঙ্গে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে ট্যাকসি নিয়ে সে রওনা হয়েছে জয়পুরের দিকে। সেখান থেকে দিল্লী হয়ে কলকাতা যাবে।

ভুরু কুঁচকোলো ইন্দ্রনাথ—'এত তাড়াহুড়োর কারণ বলে যায় নি?...'

'বলেছে। কলকাতায় অনেকদিন যাওয়া হয় নি, তাই যাচ্ছে। আদমের এক ফ্রেণ্ড বলল, আদম বোধহয় হঠাৎ অনেক টাকা পেয়েছে।'

'ভীম দত্তর টাকা। মুখ বন্ধ করার ঘুস। আদম যে দনু ঘোষের নাড়ি-নক্ষত্র জানে!'

একথা সেকথার পর ভ্রমর বলল—'এখানকার শুটিং আজকেই শেষ। কাল ফিরছি বিকানীর। ফিরেই ছুটবো কপার মাইনে।'

'কপার মাইন! সে আবার কি?' অখণ্ডর প্রশ্ন।

'বিকানীর থেকে মাইল সতেরো দূরে। এক সময়ে তামার খনি পাওয়া গিয়েছিল। হাজার তিনেক কুলির বসতিও ছিল। তারপর খনির তামা ফুরিয়েছে। খনি-নগরী ফেলে ফিরে গেছে যে যার ঘরে।'

'বুঝলাম। কিন্তু পোড়ো শহরে হঠাৎ যাওয়া কেন?'

'নতুন স্ক্রিপ্ট হাতে এসেছে। একটা ভুতুড়ে শহর দরকার। গোটা ছবিটাই উঠবে প্রেত-নগরীতে। কপার মাইন তাই নতুন করে দেখা দরকার।'

আগের ঘটনা

[চল্লিশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আজ প্রবীণ জহুরী প্রেমচাঁদ। আর সেদিনের প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা তারই দোকানে বেচতে এলেন অনন্ত স্মৃতিজড়ানো ব্রাজিল থেকে আনা বজ্রমণির কণ্ঠহার। কিনছেন একালের বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। নেকলেশ বোম্বেতে ডেলিভারী দেবার কথা ছিল।...হঠাৎ ট্রাংক কল। রাজস্থানেই কণ্ঠহার ডেলিভারী দিতে হবে—নয়া ফরমান। আর তাতে পাওয়া গেল রহস্যের আমেজ, বোঝা গেল ফেউ লেগেছে। মুস্কিল আসানের ভার নিয়েই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র কুঁজোর ছদ্মবেশে হাজির হলেন রাজস্থানে, ভীম দত্তের বাংলোয়। নাম তার এখন গুল মহম্মদ জবরদস্ত খানসামা। অখণ্ড আলাদাভাবেই এসেছে এই বাংলোয়। রহস্য ঘনীভূত। ভীম দত্তের পোষা হীরামন মারা গেছে ইতিমধ্যে। বাংলোর একটি দেয়ালে গুলির দাগ, মারা গেছে একটি মানুষ, উধাও হয়েছে ভীম দত্তের পুরনো পিস্তল। হারিয়ে যাওয়া বুলেট দুটোর খোঁজ পাওয়া গেল। সেঁকো বিষের খালি টিনও পাওয়া গেল খেঁকি উপেনের কাছ থেকে। কলকাতা থেকে ফিরল ভীম দত্তের প্রিয় খানসামা মেহের খান। কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢুকতে না ঢুকতে তাকেও কেন কে গুলি করে হত্যা করল। আরো একটি খুন হল। কে-এক দনু ঘোষ এবার শিকার হল ভীম দত্তর। রেডিয়োয় রোশনারা খাতুনের কণ্ঠ। কমেডিয়ান আদম শাহ্‌ দনু ঘোষ সম্পর্কে আরো তথ্য নিয়ে হাজির। ঘটনাস্রোত দ্রুত বইতে থাকে।]

'ভাল চাকরি জুটিয়েছেন,' বলল ইন্দ্রনাথ। 'সেই সূত্রে দুনিয়ার লোকের সঙ্গে জমিয়েও ফেলেছেন। বলুন দিকি, রোশনারা খাতুন আপনার বান্ধবীদের মধ্যে পড়ে কিনা ?'

'না। রোশনারা স্টেজের মেয়ে, আমি ফিল্মের। তবে এবার আলাপ হবে।'

'কেন ?'

'ভুতুড়ে শহরে একটা ভৌতিক নাচ আছে। শ্যাওড়াগাছের নাচ নয়, এক অশরীরী বাঈজীর প্রেমকাহিনী। রোশনারাকে তাই আনা হয়েছে যোধপুরে প্রাথমিক কথাবার্তার জন্যে।'

লাফিয়ে উঠল অখণ্ড—'রোশনারা এখন যোধপুরে ?'

'আপনার প্রশ্ন-বাণগুলো অবিকল লোহার কার্তিকের মত। কেন বলুন তো ?' ডাগর চোখে কৌতুক বিছিয়ে বলল ভ্রমর।

প্রশ্নের জবাব দিল না অখণ্ড। ইন্দ্রনাথকে বলল—'দাদা, এই হল সুবর্ণ সুযোগ।'

'রোশনারাকে জেরা ?' বলল ইন্দ্রনাথ।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দনু ঘোষের সঙ্গে ওর কতটা দহরম-মহরম, সে রিপোর্ট ওর কাছেই শোনা যাক।'

'কে যাবে ?'

'আপনার সুযোগ্য শিষ্য, এই শর্মা', বলে বুক চিতোলো জহুরী-নন্দন।

●

ঠিকানা ভ্রমরের কাছেই পাওয়া গেল।

যোধপুরের আর একটি হোটেলের সামনে টাঙা এসে দাঁড়াল। গুল মহম্মদরূপী ইন্দ্রনাথ নামল না। অখণ্ড একাই বুক ঠুকে হানা দিল ভেতরে। কার্ড পাঠাল। একটু পরেই ডাক পড়ল দোতলার একটি সুসজ্জিত ঘরে।

সোফায় বসেছিল রোশনারা। কাশ্মীরী চোখ নেচে উঠল অখণ্ডর গ্রীক-মূর্তি দেখে। আরবী ঠোঁটে মিষ্টি হেসে বলল—'আসুন। বসুন। বলুন কি করতে পারি ?'

মহিলা মহলে অসাধারণ স্মার্ট অখণ্ড-নারায়ণের আসল 'ফর্ম' ফিরে এল। আসন গ্রহণ করে বলল সপ্রতিভ স্বরে—'এলাম আপনাকে দেখতে। সেদিন রেডিওতে গান শুনে বড় ভালো লাগল।'

সুদর্শন তরুণের মুখে তারিফ শুনে রোশনারার ত্রিশ বছরের যৌবন নিশ্চয় পুলকিত হল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ পেল না। শুধু ফুলধনুর মত দুই ভুরু বেঁকিয়ে বলল—'আচ্ছা ?'

'স্টেজে আপনি অনেক বছর আছেন বলুন ?'

'অনেক বছর। আপনিও কি আমাদের লাইনে ?'

'আজ্ঞে না। আমার লাইন আলাদা।'

'কিন্তু আপনার যা চেহারা, এ লাইনে এলে নাম করতেন।'

'তাই নাকি ?' এবার ভুরু তোলবার পালা অখণ্ডর। 'আপনি ফিল্মে নামছেন না কেন, মিস খাতুন ?'

'আশা আছে নামবো', মদির হাসল রোশনারা। গোলাপী ওড়নার ফাঁক দিয়ে কানের হীরে ঝিলমিল করে উঠল।

'মিস খাতুন, আপনি তো কলকাতার বাসিন্দা ?'

'তাতো বটেই। আদি বাস লক্ষ্ণৌতে।'

'আমার এক পুরোনো বন্ধুকে চেনেন ?'

'কে ?'

'দনু ঘোষ।'

'দনু !' কপাল কুঁচকোলো রোশনারা। 'খবর আছে ?'

'না। তবে দনুকে আমি খুঁজছি পাগলের মত। আপনি জানেন ওর ঠিকানা ?'

হুঁশিয়ার হল রোশনারা—'দনু আপনার পুরোনো বন্ধু ?'

'অনেকদিনের। চিটি চিটি ব্যাং [illegible]ব্যাং ক্লাবেই আমাদের আলাপ।'

ভুরু সরল হল রোশনারার—'তাই [illegible]ন। দনুর কাছ থেকে একটা চিঠি [illegible] হপ্তা দুয়েক আগে। ধোঁয়াটে চি[illegible] লিখেছিল ব্যাঙ্গালোর থেকে। বলেছিল, শীগগিরই এই অঞ্চলে দেখা হবে আমাদের।'

'কি কাজ নিয়ে এদিকে আসছে, তা বলেনি ?'

'কাজ ! কি কাজ ?'

'আহো ! তাও জানেন না। দনু মুখ প্যালটাচ্ছিল।'

'বটে ? ভালই করছিল। ক্লাবে ওর টেঁকাই দায় হয়ে উঠেছিল ইদানীং।'

'ক্লাবে অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম ছিল দনুর। বিশেষ কারোর নাম আপনাকে বলেনি ?'

'ও নিয়ে কোনো কথাই বলত না। কেন ?'

'ভীম দত্তর নাম বলেনি আপনাকে ?'

'ভীম দত্ত ! সে কে ?'

'ইন্ডিয়ার ক্লাস ওয়ান শিল্পপতি। কাগজেও নাম দেখেন নি ?'

'কাগজ পড়ার সময় কোথা ?'

'তা তো বটেই। কিন্তু দনুকে কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো ? বড় চিন্তায় পড়েছি ওকে নিয়ে।'

'চিন্তা ? কেন ?'

'দনুর কারবারে ঝুঁকি অনেক তো।'

'ঝুঁকি তো থাকবেই। তাতে চিন্তা কিসের ?'

'তা ঠিক। তবে বুধবার বিকানীরে পৌঁছোনোর পর থেকেই দনু কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল, আর টিকি দেখা যাচ্ছে না।'

এই প্রথম চমকে উঠতে দেখা গেল রোশনারাকে—'বিপদে পড়েনি তো ?'

'ভাবনা তো সেই জন্যেই। ডানপিটের মরণ গাছের আগায় হয় তো।'

... বলেছেন। বাটিকুল চেহারায় এত দাস্যি... আছে।'

'বাটিকুল ...লেই দনু এত ডাকাবুকো। পাঁকাল মাছের মত পিছলে যায়—'

উঠে দাঁড়াল রোশনারা—'দনু আপনার অনেকদিনের বন্ধু বললেন না?'

'হ্যাঁ। সেই 'চিটি চিটি ব্যাং ব্যাং ক্লাব থেকে—'

'অথচ দনু ঘোষ যে কস্মিনকালেও বাঁট-কুল নয়, তা জানেন না', রোশনারার চোখে ছুরির ঝলক, কণ্ঠে বিষ। 'স্পাই! এমন সুন্দর চেহারার স্পাই! কালে কালে হলো কি? কার্তিকদের ধরে ধরে টিকটিক বানানো হচ্ছে।'

'এসব কি বলছেন?'

'নিজের চরকায় তেল দিন। দনু ঘোষ আমার বন্ধু। সে বিপদে পড়লে আমি দেখব। ঠিকানা আপনাকে বলব না।'

'আপনি যা ভাবছেন, আমি তা নই।'

'আমি যা ভেবেছি, আপনি ঠিক তাই। জীবনে এই প্রথম এমন নব-কার্তিক ডিটেকটিভ দেখলাম। এবার কেটে পড়ুন, দনুর ঠিকানা আমি জানি না। জানলেও বলব না।'

উঠে দাঁড়াল অখণ্ড। হেসে বলল—'থ্যাংকিউ। আপনার গানের গলাটা কিন্তু বড় মিঠে।'

'সাহস তো কম নয়! এখনও মুখে খই ফুটছে? রেডিও আছে, খুলে গান শুনুন। গেট আউট।'

তাড়া খেয়ে রাস্তায় নেমে এল জহুরী-নন্দন। টাঙায় চেপে যেতে যেতে ইন্দ্রনাথকে সব বলল। শুনে একচোট হেসে নিল ছদ্মবেশী গোয়েন্দা। বলল—'অত মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? গোয়েন্দাগিরির হাতে-খড়িতে এমনি আরও কত কুকুর-তাড়া খেতে হবে।'

'তা খেতে আপত্তি নেই। কিন্তু ফিচেল মেয়েটা কথার প্যাঁচে কুপোকাৎ করল, এইটা বড় লাগছে।'

'পৌরুষে?' বলে হাসল ইন্দ্রনাথ। পরক্ষণেই হাসি মিলিয়ে গেল।

অখণ্ডও দেখল। সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে বিকানীরের সেই হকিস্টিক মার্কা দারোগা। রসিকলাল। দুই চোখে স্ফুলিঙ্গ। দৃষ্টি নিবদ্ধ গুল মহম্মদের ওপর।

মোড় ঘুরল টাঙা। আড়ালে হারিয়ে গেল রসিকলালের গনগনে চাউনি।

বিড় বিড় করে বলল গুল মহম্মদ—'হয়ে গেল। এবার নির্ঘাত জেল। অপরাধ—মেহের খান নিধন!'

●

সেই রাতেই বিকানীর পৌঁছোলো দুজনে।

ইন্দ্রনাথ বললে—'ওহে অখণ্ড, আমরা দুটিতে শ্যামদেশের যমজ ভাইয়ের মত এক-সঙ্গে বাংলোয় ঢুকলে সন্দেহ হবে, রাগের মাথায় দত্তমশায় দুজনকেই একসঙ্গে গুলি করতে পারেন। কাজেই আমি আজ রাত্রেই ফিরছি। তুমি হোটেলে রাত্রিবাস করো। কাল সকালে রোদ উঠলে তবে যেও। কেমন?'

'রাজী, কিন্তু একটা সর্তে।'

'কি?'

'লুকোচুরি আর ভাল লাগছে না। গুল-পট্টির একটা সীমা আছে। তাই কালকেই এর হেস্তনেস্ত হবে।'

'যথা?'

'নেকলেস ভীম দত্তর করকমলে অর্পণ করব।'

'সাধু, সাধু। জিরো আওয়ারে পৌঁছেছি, আর একটু ধৈর্য ধরলে হত না?'

'আর পারছি না। তার ওপর ঐ বেটা রসিকলাল আপনার পিণ্ডি চটকানোর প্ল্যান আঁটছে। ঘাটে এসে নৌকো ডোববার আগেই নেকলেস দিয়ে হাত ধুয়ে হরি, হরি বলে দেশে ফিরতে চাই। আর অমত করবেন না।'

'বেশ, তোমার যখন এতই ইচ্ছে।'

'তাহলে কাল রাত আটটা পর্যন্ত আমরা দেখব। এর মধ্যে দনু ঘোষের মিসট্রি যদি জানা যায়, ভাল। নইলে হীরের হার দিয়ে বাড়ি পালাব। সকালে গিয়েই ভীম দৈত্যকে শুধু একটা কথাই বলব—'আজ রাত আটটায় নেকলেস বাংলোয় পৌঁছোবে।' বাস, আর কিছু নয়। ও কে?'

'ও কে!'

●

পরের দিন বেলায় উঠেই আগে দাশরথী উকিলকে খুঁজে বার করল অখণ্ড। সব বলল। রসিকলালের বিষদৃষ্টি আবার গুল মহম্মদের ওপর পড়েছে শুনে চিন্তিত হল। বলল—'পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। ইন্দ্র-নাথবাবুকে ভোগাবে রসিকলাল।'

'নেকলেস দিয়ে দিলেই সব ফাঁস হবে। তখন পালাবার পথ পাবে না। কিন্তু যোধ-পুরে যে সব খবর পেলাম, তা আপনার ব্ল্যাকমেলিং থিওরীকে জোরদার করছে।'

'করতেই হবে। ভীম দৈত্যকে ডেড়েমুষে নেওয়া হয়েছে, তার আরও প্রমাণ আছে।'

'কি রকম?'

'কালকের খবর। ভীম দত্তর বোম্বাই অফিস এখানকার ব্যাঙ্কে আরও এক লাখ টাকা পাঠাচ্ছে। ম্যানেজারের সঙ্গে কালকেই কথা হচ্ছিল। বলছিলেন, পুরো টাকাটা পেমেন্ট করতে গেলে আরও একটা দিন লাগবে। তার মানে, ভীম দত্তকে আরও একদিন সবুর করতে হচ্ছে।'

'নেকলেস আমি আজকেই দেব।'

'অগত্যা। ইন্দ্রনাথবাবুর কিন্তু ইচ্ছে সাত তাড়াতাড়ি নেকলেস না দেওয়া।'

'জানি শর্মিষ্ঠা বর্মা টাকা চান। ভীম দত্ত মানুষ খুন করেও যদি টাকা বার করে দেন, উনি তা নেবেন। মিস সিনহা আজকেই ফিরবেন বলছিলেন।'

'ফিরে এসেছে। সকালে ওয়েসিস কাফেতে দেখা হল। ও আজ কপার মাইনে যাবে। ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে নিয়ে যাবো বাংলোয়।'

'না, না।'

'দূর মশাই। খবরের কাগজের কাজ আরম্ভ হয় বিকেলে। এখন আমার ছুটি। চলুন।'

●

ভীম দত্তর বাংলো।

দাশরথী উকিলের গাড়ি ফটকে পৌঁছোতেই গুল মহম্মদ ছুটে এল। গেট খুলে দিয়ে ফিসফিস করে বলল—'কাল সারা-দিন গাড়ি নিয়ে টো-টো করেছেন ভীম দত্ত।' বলেই উধাও হল। দাশরথীও গাড়ি নিয়ে ফিরে গেল।

অখণ্ড বসবার ঘরে ঢুকল। দেখলে সোফায় কাত হয়ে শুয়ে ভীম দত্ত দি গ্রেট।

অখণ্ডকে দেখেই উঠে বসে বললেন—'এসেছো? এক্স-রের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কেউ নেই এখানে। বলো, দেখা হয়েছে?'

ধপ করে আসন গ্রহণ করল অখণ্ড। বলল—'ব্যবস্থা করে এসেছি। আজ রাত আটটায় বজ্রমণির কণ্ঠহার পাবেন।'

'কোথায়?'

'এই ঘরে।'

'বিকানীরে পেলেই ভালো হত। এক্স-রে নিয়ে আসছে?'

'না। রাত আটটায় নেকলেস আমার হাতে আসবে। এলেই আপনাকে দেব। যদি কাউকে না জানাতে চান, তাহলে আপনার শোবার ঘরে গিয়ে দেব।'

'অল রাইট। নেকলেস এখন কোথায়? পকেটে?'

'না রাত আটটায় পাব।'

'তবে এতদিন ধরে নবডঙ্কা দেখিয়ে এলে কেন? এত ধামালীর কি দরকার ছিল?'

'নবডঙ্কা? ধামালী? বলছেন কি?'

'দ্যাখো ছোকরা, আমি ভেড়াকান্ত নই। নেকলেস নিয়ে গোড়া থেকেই তুমি ল্যাজে খেলছো। ঠিক কিনা?'

দ্রুত ভাবল অখণ্ড। সময় এসেছে। এখন খোলামেলা হওয়াই ভাল। বলল—'হ্যাঁ ঠিক।'

'কেন?'

'এখানকার হাওয়া সুবিধের মনে হয় নি, তাই।'

'কেন মনে হয় নি?'

'হঠাৎ মত পালটালেন কেন? কলকাতায় বসে নেকলেস চাইলেন বোম্বাইতে। কলকাতা ছেড়েই নেকলেস চাইলেন রাজস্থানে। কেন?'

'মেয়ের আসার কথা ছিল এখানে, তাই। নেকলেস আমার জিম্মায় থাকতো, ওর ভোগে লাগত। কলকাতায় যখন ছিলাম, তখন ওর প্ল্যান অন্য ছিল।'

'আপনার মেয়ে, মানে, সাহানা দত্ত? চার্মিং লেডি।'

সোজা তাকালেন ভীম দত্ত—'আলাপ আছে নাকি?'

'না। এখানেই আলাপ হবে'খন। কবে আসছেন?'

পলকহীন চোখে অখণ্ডকে নিরীক্ষণ করলেন ভীম দত্ত। বললেন—'এখন আসবে না।'

'তাই নাকি? উনি এখন কোথায়? অবশ্য আমার কৌতূহল যদি অন্যায় মনে করেন তো—'
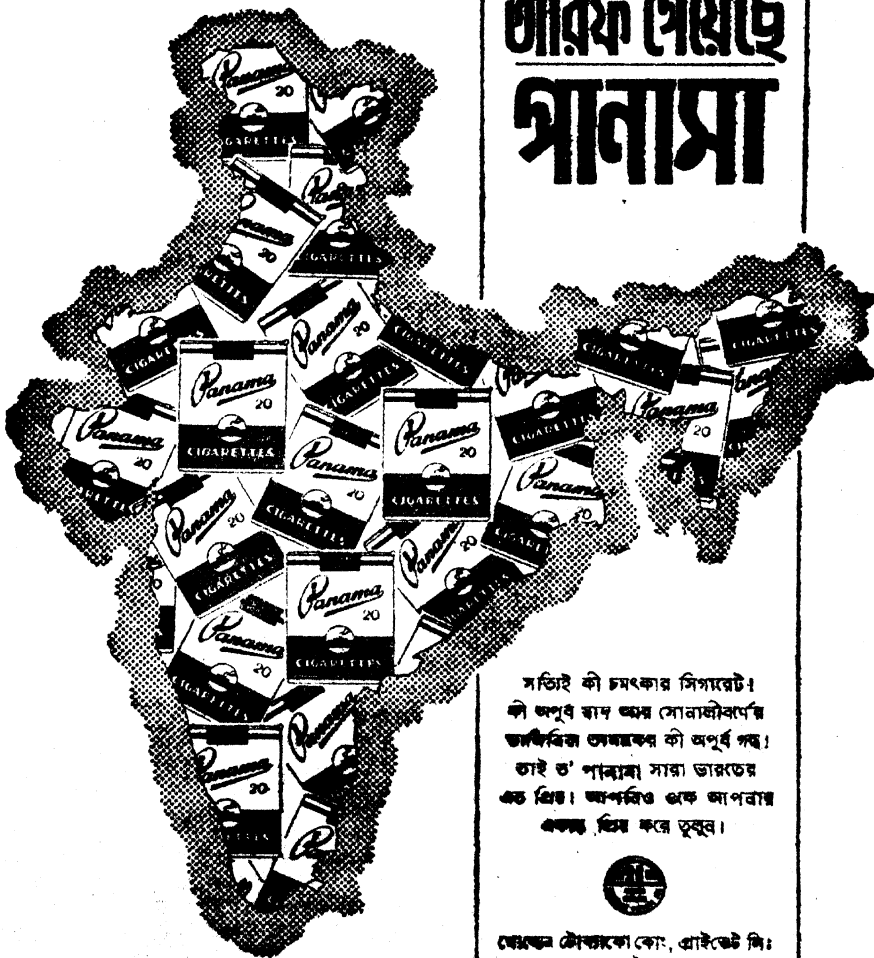
...তনগড়ে।'

...টা এত আকস্মিক যে, অখণ্ডর হৃদযন্ত্র ...বুজি খেয়ে গলায় এসে ঠেকল—'সে কি? ক...আছেন ওখানে?'

'গত মঙ্গলবার থেকে। টেলিগ্রাম পেলাম, সাহানা আসছে। অনেক কারণে ওর এখানে থাকা সমীচীন মনে করলাম না। তাই উপেনকে গাড়ি দিয়ে পাঠালাম। স্টেশন থেকে ওকে নিয়ে যেন পৌঁছে দিয়ে আসে রতনগড়ে সাহানার বান্ধবীর কাছে।'

অখণ্ডর মন তখন তুফান-বেগে ছুটছে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র সে রাত্রে মাইল মিটারে দেখেছিল, বহু মাইল ঘুরে এসেছে গাড়ি। বিকানীর থেকে রতনগড়ে কত মাইল? অ্যাক্সিলেটরে লাল কাদা-মাটি দেখেছিল। সে কি রতনগড়ের?

মুখে বলল—'রতনগড়ে আছেন? ভাল আছেন তো?'

'নিশ্চয়। বুধবার আমি গিয়ে দেখে এসেছি। তোমার সব প্রশ্নের জবাব দিলাম। এবার তোমার পালা। বলো, এখানকার হাওয়া কেন সুবিধের মনে হয় নি।'

'ঢোঁড়া বাসুকির কি হল?' আচমকা জিজ্ঞেস করল অখণ্ড।

'কে?'

'ঢোঁড়া বাসুকি ব্রহ্ম। অঘোর কুণ্ডু নাম নিয়ে এখানে যে তাসের জুয়ো খেলে গেল। আমার উনপঞ্চাশ টাকা ট্যাঁকে গুজে গেল।'

'বলো কি? অঘোর কুণ্ডুর আসল নাম—ইয়ে—কি যেন বললে?'

ঢোঁড়া বাসুকি ব্রহ্ম।'

'অদ্ভুত নাম তো! তুমি ঠিক জানো?' ভীম দত্তর চোখে কৌতূহল।

'জানার দুর্ভাগ্য হয়েছিল কলকাতায়।'

'কি রকম?'

'ঢোঁড়া বাসুকি পেছনে লেগেছিল। উদ্দেশ্য, বজ্রমণির কন্ঠহার গস্ত করা।'

ভীম দত্তর গালের আঁচিল তিড়-তিড় করে কেঁপে উঠল। চঞ্চল হল পিঙ্গল চোখের রক্ত কণিকা—'কি ব্যাপার বলো তো।'

সব বলল জহুরী-নন্দন। শুধু বাদ দিল মেহের খানের প্রসঙ্গ।

'আগে বলোনি কেন?'

'ভেবেছিলাম আপনি জানেন। আমার এখনও বিশ্বাস, আপনি জানেন, চোখের পাতা না কাঁপিয়ে সটান তাকাল অখণ্ড।

ভীম দত্ত শুধু বললেন—'ছেলেমানুষ!'

'যা বলেন। পুরোনো কাসুন্দি ঘাটতেও চাই না। কিন্তু ওকে এখানে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। নিশ্চয় এই আঁচ করেই আপনি নেকলেস বোম্বাইতে ডেলিভারী নিতে চান নি।'

'সে অনেক কথা। পরে শুনবেখন।'

'গজ-কচ্ছপের লড়াইটা কি নিয়ে, তাও বলবেন না?'

'লড়াই আবার কিসের? নাকাল হচ্ছি ছোটখাট দু-একটা ব্যাপার নিয়ে। ব্যক্তিগত ব্যাপার। দুদিনেই মিটিয়ে নেব।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমি অন্ধ নই। আপনি বিষম বিপদে পড়েছেন।'

মুখ ফিরিয়ে নিলেন ভীম দত্ত। অবসন্ন উদভ্রান্ত চোখ-মুখ ধরিয়ে দিল, অখণ্ড মিথ্যে বলেনি। তাই আর কথা বাড়ালেন না। বললেন—'ও কিছু নয়। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুধু দেখো রাত আটটার মধ্যে যেন নেকলেস পৌঁছোয়।'' বলেই, বেরিয়ে গেলেন।

কপাল কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইল অখণ্ড। ভীম দত্তকে কবজায় এনেও আনা গেল না। কিন্তু বেশি বলে ফেলা হয় নি তো? সাহানা কি সত্যিই রতনগড়ে? রতনগড় কদ্দুর?

ভাবতে ভাবতে মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। ঘরে গিয়ে পরিপাটি দিবানিদ্রা দিল। ঘুম যখন ভাঙল, গোধূলি আকাশ রাঙিয়েছে। পাশের কলতলায় প্রচণ্ড ধুম-ধাড়াক্কা করে স্নান করছে অঘোর মল্লিক।

অঘোর মল্লিক! লোকটা কে? বাংলোয় তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে কেন?

বারান্দায় আসতেই দেখা হল কুঁজো গুল মহম্মদের সঙ্গে। ফিসফিস করে সাহানা-সমাচার শুনিয়ে দিল অখণ্ড। গুল মহম্মদ জানাল, গাড়ির মাইল মিটার আবার পরখ করা হয়েছে। আগের বারের মতই বেশ কয়েক মাইল ঘুরে এসেছেন ভীম দত্ত উপেনকে নিয়ে। গাড়ির মধ্যেও লাল কাদা-মাটির গুঁড়ো পাওয়া গেছে।

কিন্তু কোথায় সেই লাল মাটির কেন্দ্র যেখানে বার বার গোপন অভিযানে যাচ্ছেন ভীম দত্ত দি গ্রেট?

●

খাবার টেবিল।

অঘোর মল্লিক একাই আসর জমাবার চেষ্টা করল। অখণ্ডকে বলল—'ফিরে এলেন? গুড। কাজ হল তো?'

'হল। আপনার?'

থতমত খেল অঘোর। পরক্ষণেই সামলে নিল। বলল—'মোটামুটি। একটা গিরগিটি পাওয়া গেছে। যেমনটি খুঁজছিলাম।'

'ফাইন'। আর কোনো কথা হল না। নিঃশব্দে শেষ হল রাতের খাওয়া। ম্যাগাজিন নিয়ে উপেন নন্দী, অঘোর মল্লিক আর অখণ্ডনারায়ণ বসল ঘরের তিনদিকে। এককোণে ইজিচেয়ারে বসে কড়িকাঠ গুণতে লাগলেন ভীম দত্ত। ঘরে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। অসহ্য। শ্বাসরোধী।

ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো ঘড়িতে। গমগমে ঘণ্টাধ্বনির রেশ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ঘরে ঢুকল কুঁজো গুল মহম্মদ। ঘাড় হেঁট করে টেবিল সাফ করতে লাগল।

নৈঃশব্দ আর সহ্য হল না অখণ্ডর। উঠে গিয়ে খটাস করে রেডিও চালাল। প্রথমে যন্ত্রসংগীত। তারপরেই ঘোষকের গলা। 'আরব্য উপন্যাসের একটি রাত' নাটকের নায়িকা রোশনারা খাতুন মঞ্চে অভিনয় সম্পর্কে কিছু বলবেন।

ঝুঁকে বসলেন ভীম দত্ত। টোকা মেরে সিগারের ছাই ফেললেন ছাইদানীতে। অঘোর মল্লিক আর উপেন্দ্র তাকাল এর ওর মুখের দিকে। মুখে কথা না বললেও যেন চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই রেডিওর মধ্যে দিয়ে ভেসে এল নারীকন্ঠ। সেই কন্ঠ যা আগের দিন প্রথমে খাতির করেছে তরুণ জহুরী-তনয়কে, পরে দূর-দূর করে তাড়িয়েছে।

'যাঁরা চিঠি দিয়ে তারিফ করেছেন আমার অভিনয়ের, তাঁদের সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে যাঁরা মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা শোনার জন্যে রেডিও খুলে বসেছেন, তাঁদেরকেও নমস্কার জানাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয় বলে ক্ষমা চাইছি। দু-একটি চিঠির জবাব এখানেই দিচ্ছি। অম্বিকা মালহোত্র, আপনার চিঠিতে যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তা নিয়ে বিশ্বের থিয়েটার বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করেছেন।

দনু ঘোষের চিঠির জন্য ধন্যবাদ—'

আচম্বিতে বুঝি অখণ্ডর হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেল। ভীম দত্ত চুরুটে টান দিতে ভুলে গেছেন। উপেন নন্দীর পাথরের চোখটা নিশ্চল রইল, বিস্ফারিত হল রক্ত-মাংসের চোখ। অঘোর মল্লিকের দুই চোখ সূচাগ্র বিন্দুতে পরিণত হল। আর, দাড়ি নেড়ে নেড়ে একমনে টেবিল মুছতে লাগল গুল মহম্মদ।

রোশনারা-কন্ঠ বলল—'দনু ঘোষকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছিলাম। উনি বেঁচে আছেন জেনে আমি নিশ্চিন্ত। চিঠির ঝাঁপি এখানেই বন্ধ করলাম। সময় কম। আধঘন্টা পরেই থিয়েটারে ডিউটি। আপনারা যাঁরা শুনছেন, আশাকরি তাঁদের অনেককেই দেখবো পদ্মিনী রঙ্গমঞ্চে। আমার মঞ্চ অভিজ্ঞতার শুরু—'

'রেডিওটা বন্ধ করবে?' সিংহনাদ ছাড়লেন ভীম দত্ত। 'যত না প্রোগ্রাম, তার অর্ধেক জয়ঢাক পেটা। রাবিশ!'

অতএব, রোশনারা খাতুনের কন্ঠরোধ করে দিল অখণ্ডনারায়ণ। নীরবে তাকাল গুল মহম্মদের দিকে। চশমার আড়ালে মহম্মদী-দৃষ্টি অতিশয় শীতল। পাহাড় ডিঙিয়ে জনপদ পেরিয়ে, মরুভূমি টপকে আকাশ-পথে এইমাত্র ভেসে এল এক নটী-কন্ঠ। জানাল এক প্রত্যাশিত সংবাদ।

দনু ঘোষ মরেনি। সে বেঁচে আছে।

ফলে, নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল যত কিছু পূর্ব-কল্পনা।

ভীম দত্ত খুনী। কিন্তু দনু ঘোষকে তিনি খুন করেন নি। তাই যদি হয়, তাহলে সেই নিশুতি রাতে হত্যার হাহাকারে যে হতভাগা নিথর মরুভূমির আকাশ-বাতাসকে শিহরিত করেছিল, সে কে? কার অন্তিম চীৎকার শুনে রোমাঞ্চিত হীরামন বহু রজনীকে চমকিত করেছিল বিকট বিকৃত প্রতিধ্বনি শুনিয়ে?

সে কে? সে কে? সে কে?

(ক্রমশ)

(আগামী সংখ্যায় 'ভুতুড়ে শহরের রহস্য')

প্রতিবেশীর মিত্রতা

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সেই সোনা-মাখানো দিনগুলি আর নেই যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এদেশের একটা নৈতিক নেতৃত্বের গৌরব ছিল। শক্তিশালী বলে নয় অথবা সফল রাষ্ট্র বলে নয়, কথার দাম ছিল বলেই ভারতবর্ষকে এককালে সমীহ করত বৃহৎ শক্তিবর্গ। কিন্তু আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে, এদেশের বন্ধু বলে আর বড় বেশী অবশিষ্ট নেই। আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন যখন পাকিস্থানের ঘাটে এসে এক সঙ্গে জল খাচ্ছে তখন ভারতবর্ষের ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। পৃথিবীর রাজনীতিতে মুরুব্বিয়ানা করার যে ঝোঁক একদা ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রকট হয়েছিল সেটা এখন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। অনিবার্যভাবেই আমরা এখন তাকাচ্ছি আমাদের ঘরের কাছের দেশগুলিতে। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমল থেকেই এই মোড় ফেরা শুরু হয়েছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও সেই নীতি বজায় আছে।

ভারতবর্ষের দুই বৃহত্তম প্রতিবেশী পাকিস্থান ও চীন। দুয়ের সঙ্গেই, দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের সম্পর্ক ভাল নয়। অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের মধ্যে আছে বর্মা, সিংহল, নেপাল, আফগানিস্থান প্রভৃতি। এই সব দেশের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন অটুট রাখার উপর ভারত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এই সব দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা প্রায়শই যে পারস্পারিক শুভেচ্ছা সফর করে থাকেন তার মধ্য দিয়েও তাঁদের এই মৈত্রীবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই কিছুকাল আগে বর্মায় সফর করে এসেছেন। সম্প্রতি তিনি পাঁচ দিনের জন্য আফগানিস্থান সফর করে ফিরে এসেছেন। প্রায় একই সময়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংহ গিয়েছিলেন নেপাল।

ভারত-আফগানিস্থান ও ভারত নেপাল সম্পর্কের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য রয়েছে। দুটিই ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী। (ভারত-আফগান সীমান্ত কাশ্মীরের যে অংশের উপর দিয়ে গেছে সেটি অবশ্য এখন পাকিস্থানের দ্বারা অধিকৃত।) দুই দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নেপাল বুদ্ধের জন্মভূমি হিসাবে বৌদ্ধদের তীর্থস্থান এবং পশুপতিনাথের অধিষ্ঠানরূপে হিন্দুদের পুণ্যভূমি। 'গান্ধার দেশ' এই নাম পরিচয়ে আজকের আফগানিস্থানের স্থান রয়ে গেছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে। আফগানিস্থানের বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ সেই যোগসূত্রের সাক্ষ্য দেয়। বিখ্যাত সংস্কৃতি বৈয়াকরণের জন্মভূমি আজকের আফগানিস্থানের অংশ। আধুনিককালেও নেপাল ও আফগানিস্থানের মানুষের সঙ্গে ভারতবাসীর সমধিক পরিচয় আছে। ভারতবর্ষের এমন কোন শহর বোধহয় নেই যেখানে কিছু না কিছু নেপালী ও 'কাবুলীর' দেখা পাওয়া যাবে। নেপাল ও আফগানিস্থান দুইই স্থলবেষ্টিত দেশ। সমুদ্রপথ না থাকার ফলে এই দুই দেশের বাণিজ্যের কতকগুলি অসুবিধা আছে। ভৌগোলিক কারণে ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের প্রশ্নটি ভারত-নেপাল ও ভারত-আফগানিস্থান সম্পর্কের প্রশ্নের সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়েছে। নেপাল-পাকিস্থান বাণিজ্য ভারতের স্থলপথের উপর নির্ভরশীল এবং আফগানিস্থান-ভারত বাণিজ্য নির্ভর করছে পাকিস্থানের উপর। ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্যিক সম্পর্ক যতদিন না স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন স্থলবেষ্টিত আফগানিস্থান ও নেপালের বহির্বাণিজ্যে অসুবিধা হবেই।

ভারত-নেপাল সম্পর্ক ও ভারত-আফগানিস্থান সম্পর্কের মধ্যে আর একটি সাদৃশ্য এই যে, ভারত তার এই দুই প্রতিবেশী দেশকেই যথেষ্ট পরিমাণ কারিগরী সাহায্য দিয়েছে। আফগান-ভারত সম্পর্ক যতটা ভাল নেপাল-ভারত সম্পর্ক অবশ্য ততটা নয়। প্রকৃতপক্ষে, আফগানিস্থান ও ভারতের মধ্যে কোন সমস্যাই নেই, কিন্তু নেপাল সম্পর্কে তা বলা চলে না।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আফগানিস্থান সফরের প্রধান সুফল এই হয়েছে যে, দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রসার সম্পর্কে বোঝাপড়া হয়েছে। আফগানিস্থানের সৌভাগ্য এই যে, তাকে বৈষয়িক সাহায্য দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছে। ভারতের পক্ষে অবশ্য এই প্রতিযোগিতায় নামা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর আফগানিস্থান সফরের পর দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরে যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে কারিগরী সহযোগিতার অবকাশ রয়েছে। স্থির হয়েছে যে, আফগানিস্থানকে সাহায্য করার জন্য ভারত থেকে ২৩ জন বিশেষজ্ঞ সেদেশে পাঠান হবে। এঁদের মধ্যে দশজন হবেন কৃষিবিশেষজ্ঞ, দশজন সেচবিশেষজ্ঞ আর তিনজন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ। তাছাড়া আরও তিনজন আয়কর বিশেষজ্ঞ এবং কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঁচজন অধ্যাপক ও একজন রেজিস্ট্রার ভারত থেকে পাঠান হবে। আফগানিস্থানের রাজা জহীর শাহ্ ও প্রধানমন্ত্রী নুর মহম্মদ এতিমাদির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর আলোচনার পর আরও স্থির হয়েছে যে, দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প পরীক্ষা ও রচনা করার জন্য মন্ত্রী পর্যায়ে একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হবে। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আফগানিস্থানে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি বাবদ ভারত আফগানিস্থানকে ২৫ লক্ষ টাকা দিতেও সম্মত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর আফগানিস্থান সফরের ঠিক প্রাক্কালে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন সেদেশ ঘুরে গেছেন। সেখানে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারত, পাকিস্থান ও আফগানিস্থান মিলে একটা আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তুলবে। পাকিস্থানের সঙ্গে ভারত ও আফগানিস্থান, দুই দেশের বিরোধ আছে। সোভিয়েট রাশিয়ার অজানা নয় যে, প্রত্যাশিত আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার পথে একটি বড় বাধা হচ্ছে এই বিরোধ। পাকিস্থান তার মাটির উপর দিয়ে সরাসরি পথে ভারত-আফগানিস্থান বাণিজ্য চালাতে দেয় না, এই বাণিজ্যের সমস্ত পণ্য করাচী দিয়ে পাঠাতে বাধ্য করে। এতে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে বাণিজ্য যতটা প্রসার পাওয়া সম্ভব ততটা পাচ্ছে না। সোভিয়েট রাশিয়া বলছে, সে ভারত-পাকিস্থান বিরোধ ও পাক-আফগান বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। অন্য কারণ ছেড়ে দিলেও, বাণিজ্যিক স্বার্থে এই অঞ্চলে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় রাশিয়ার আগ্রহ আছে। মালং টানেল নামে হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গপথটি সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে ও অক্সাস নদীর উপর তেরমেজ-এ যে নতুন বন্দর তৈরী হয়েছে তাতে মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র-

গুলির সঙ্গে আফগানিস্থানের স্থল-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ভারত-আফগান পণ্য চলাচলের বর্তমান বাধা দূর হয়ে গেলে স্থলপথে সরাসরি সোভিয়েট-ভারত বাণিজ্যের একটি নূতন রাস্তা খুলে যেতে পারে।
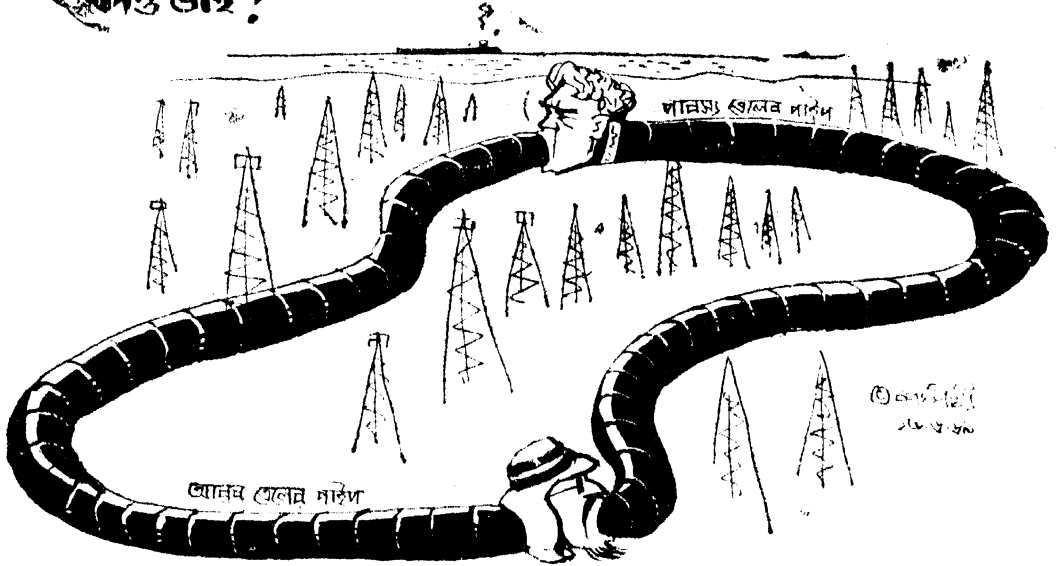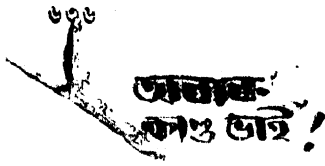
শ্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক আফগানিস্থান সফরের সময় দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনায় যে কোসিগিনের প্রস্তাবিত আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নটিও বিবেচিত হয়েছিল তার ইঙ্গিত যৌথ বিবৃতিতে আছে। বিবৃতিতে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'এই অঞ্চলের দেশগুলির জনসাধারণের কল্যাণার্থে ঐ দেশগুলির মধ্যে যথাসম্ভব অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে সেজন্য এই অঞ্চলে স্থলপথে বাণিজ্য চলাচলের বর্তমান বাধাগুলি শীঘ্র দূর হবে।

ভারত-নেপাল সম্পর্ক ভারত-আফগানিস্থান সম্পর্কের মতো সমস্যামুক্ত নয়। নয়াদিল্লীর সঙ্গে কাঠমান্ডুর সম্পর্কের মধ্যে ইদানীংকালে যেসব সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছে সেগুলি হল :—নেপালে চীনের উপস্থিতি, নেপাল থেকে চোরাচালানের পথে ভারতে বিদেশী পণ্যের আমদানী, ভারতের মধ্য দিয়ে স্থলপথে নেপাল-পাকিস্থান বাণিজ্য এবং কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের মধ্য দিয়ে সমুদ্রপথে নেপালের বহির্বাণিজ্য পরিচালনা, নেপাল-ভারত সীমান্ত ইত্যাদি। এই সব সমস্যার কোনটিই খুব বড় না হলেও সেগুলির সঙ্গে নানা জটিল প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংহের তিনদিনের কাঠমান্ডু সফরেই এই সব সমস্যার নিরসন হয়ে যাবে, এটা আশা করা যায় না। এই সফরের শেষে যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে তাতেও এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে, এই সব সমস্যা সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। সম্ভবত এরই উপর ভিত্তি করে জনরব প্রচারিত হয়েছে যে, শ্রীদীনেশ সিংহের নেপাল সফর 'ব্যর্থ হয়েছে'। শ্রীসিংহ তাঁর সফরের শেষে নয়াদিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে কাঠমান্ডুতে সাংবাদিকরা তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নেপালে আসেন নি, সাধারণভাবে দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ বৃদ্ধি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

শ্রীদীনেশ সিংহ ও নেপালী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগেহেন্দ্রবাহাদুর রাজভান্ডারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, সুনির্দিষ্ট সমাধানের সুপারিশ করার জন্য ও দুই দেশের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করার উদ্দেশ্যে দুই দেশের সরকারী অফিসাররা মিলিত হয়ে ভারত-নেপাল সম্পর্কের সমস্যাগুলি গভীরভাবে আলোচনা করবেন।

বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও নেপাল যেখানে এসে এক সীমারেখায় মিলিত হয়েছে সেখানে ভারত-নেপাল সীমান্তের অচিহ্নিত অংশটি সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে স্থির হয়েছে যে, দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা মিলিত হয়ে এই সীমান্ত চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করবেন। গন্ডক নদী বরাবর মাত্র মাইলখানেক দীর্ঘ এই সুদ্ধা সীমান্ত সম্প্রতি দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিরোধের একটি হেতু হয়ে উঠেছে।

যৌথ বিবৃতিতে ভারত ও নেপালের মধ্যে যে 'বিশেষ সম্পর্ক'-এর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে নেপাল এযাবৎ ভারতের কাছ থেকে একতরফা সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেওয়ারই চেষ্টা করেছে। তার ফল হয়েছে এই যে, বিদেশ থেকে যেসব বিলাসপণ্য আমদানী করে নেপাল ভারতের মাটির উপর দিয়ে নিয়ে গেছে তার একটা অংশ অরক্ষিত নেপাল-ভারত সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এ দেশ ছেয়ে ফেলেছে, নেপালী পণ্যের নাম করে টেরিলিন, নাইলন জাতীয় কৃত্রিম কাপড় ও ষ্টেনলেস ষ্টীলের জিনিস ভারতীয় শুল্ক ছাড় পাচ্ছে এবং এই সব আমদানী পণ্যের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প মার খাচ্ছে। অথচ, এই 'বিশেষ সম্পর্কের' বলেই ভারত নেপাল-তিব্বত সীমান্তে যেসব 'চেকপোষ্ট' রাখছে ও কাঠমান্ডুতে যে সামরিক মিশন রেখেছে সেগুলি তুলে নেওয়ার জন্য নেপাল সরকার দাবী জানাচ্ছেন। সংবাদে প্রকাশ যে, এবার ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর নেপাল সফরের সময় কাঠমান্ডুর সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ভারত-নেপাল বিশেষ সম্পর্কটা শুধু নেপালের একতরফা সুবিধাভোগের জন্য তৈরী নয়, এই সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এই প্রতিবেশী রাজ্যটিরও কিছু করণীয় আছে। পর্যবেক্ষকদের অনুমান এই যে, যৌথ ইস্তাহারে ভারত-নেপাল 'বিশেষ সম্পর্কের' উল্লেখের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে নেপালের ঐ দায়িত্বের দিকটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘেরাও সমস্যাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অশান্তির প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া ঘেরাও সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণের উপর জোর দিচ্ছেন। অবশ্য, ইতিমধ্যেই তিনি এক দফা অনশন করে ঘেরাও-এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এবং শুধু তাই নয়, যুক্তফ্রণ্টের নিকট তাঁর দল বাংলা কংগ্রেসের তরফ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘেরাওকে চিরতরে বন্ধ করবার জন্য দাবীও জানিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেসের এই দাবী আরও জোরদার হয়েছে সেদিন যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রণ্টের সভায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে কেউ যদি তাঁকে ঘেরাও করার চেষ্টা করেন,—সে নক্সালপন্থীই হোন আর ফ্রণ্টের কোন শরীকই হউন—তবে তিনি তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবেন। হতচকিত ফ্রণ্ট-শরিকরা নতমস্তকে ফ্রণ্ট-নায়কের নির্দেশনামা মেনে নিয়ে সমস্ত পার্টি ইউনিটকে ঘেরাও থেকে বিরত থাকবার জন্য সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে—মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় শতদিনের রাজত্বকালের মধ্যে এই প্রথম তাঁর শক্তি প্রয়োগ করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ফলও পেয়েছেন।

এই সমস্যা নিয়ে ফ্রণ্টের মধ্যে আলোচনার জন্য দু' একটা দিনও ইতিমধ্যে ধার্য হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি অদ্যাবধি আলোচিত হতে পারে নি। কারণ, আরও জরুরী বিষয়ের দিকে ফ্রণ্টের নজর দিতে হয়েছে। ফলে সময় সঙ্কুলান হয়নি। কিন্তু ফ্রণ্টের বিভিন্ন শরিক তাঁদের দলগত বক্তব্য কি হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করে ফেলেছেন। একমাত্র বাংলা কংগ্রেস ছাড়া আর সমস্ত দলই শুধু নীতিগত দিক থেকে নয়—শ্রমিক আন্দোলনের একটি অস্ত্র ও কৌশল হিসাবে ঘেরাওর প্রতি সীমিত সমর্থন জানিয়েছেন। যদিও বা ধর্মঘটকে অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্র বলে তাঁরা মনে করেন, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘেরাও যে চলবে একথা বলতেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন নি। বাংলা কংগ্রেস ঘেরাও বন্ধ করতে হবে এ দাবী উঠিয়েছেন।

ঘেরাও সম্পর্কে মতামতের পটভূমিকায় বিচার করলে যুক্তফ্রণ্টে বাংলা কংগ্রেসের চিন্তাধারার প্রভাব আদৌ নেই। কিন্তু তা হলে কি হবে, তুরুপের তাস কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের হাতে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যদি ঘেরাও বন্ধ করবার উপর জোর দিতে থাকেন, তবে দলে ভারী হলেও অন্য শরিকদের নিঃসন্দেহে কিছু কনসেশান দিতেই হবে। নয়তো রাজ্য রাজনীতিতে এক নয়া পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

যা হোক প্রশ্ন হচ্ছে, ঘেরাও হচ্ছে কেন? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঘেরাও-এর আশু প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে? কথায় কথায় ঘেরাও করা কি উচিত? এরকম ঘেরাও চলতে থাকলে যুক্তফ্রণ্ট সরকার বেকায়দায় পড়বেন না ত? এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করলেই ঘেরাও সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকারেরও শীঘ্রই ঘেরাও-এর উপর সুচিন্তিত অভিমত পেশ করা উচিত। কারণে বা অকারণে, ঘেরাও সম্পর্কে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে যুক্তফ্রণ্টকে জনকল্যাণে কোন মৌল পরিবর্তনের কথা না ভেবেও কিছু কিছু কাজ করতে হবে। এবং সেজন্যই শিল্পে উন্নয়ন না আনতে পারলেও নিদেন পক্ষে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। নয়তো ক্রমবর্ধমান বেকারীর সংখ্যার সঙ্গে কাজ-হারানো বেকারের সংখ্যা যুক্ত হতে থাকবে। সমস্যা আরও জটিলতর হয়ে উঠবে।

শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া বলেছেন, ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট যখন নয় মাসকাল ক্ষমতায় ছিল তখন বিভিন্ন শিল্পে মন্দার ভাব ছিল। কাজেই ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন হয়ে শ্রমিকদের ঘেরাও করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শ্রীধাড়া বলেছেন, বর্তমানে সে অবস্থা নেই। শিল্পে চাহিদা আছে। এবং তেমন ছাঁটাইয়ের প্রশ্নও নেই। কাজেই বর্তমানে ঘেরাও-এর ফলে মন্দার ভাব কাটিয়ে শিল্পসংস্থাসমূহ যখন তেজীভাবের দিকে এগুচ্ছে সে সময় ঘেরাও করে আতঙ্কের সৃষ্টি করলে মূলধন কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করবে। স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়ে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়বে। অর্থনীতি ভেঙে যাবে।

বর্তমান পারিপার্শ্বিককে বিচার করলে শ্রীধাড়ার বক্তব্যকে কিছুতেই নস্যাৎ করা যায় না। আর এই সমস্ত ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে সফল আন্দোলন করা যাবে বলেও মনে হয় না। কাজেই শ্রীধাড়ার বক্তব্যকে গ্রহণ করলে পুরোপুরি দক্ষিণপন্থী হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। বৃহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কোন কৌশল যুক্তফ্রণ্ট গ্রহণ করতে পারে। কারণ "End will justify the means."

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যত ঘেরাও হচ্ছে, তার শতকরা নিরেনব্বুইটা যুক্তফ্রণ্টের শরিকরাই করছেন। বাকী একাংশ ইতস্তত নকসালবাদীরা করছেন। কংগ্রেস পরিচালিত কোন শ্রমিক সংস্থা এখনও ঘেরাও করেছেন বলে রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। যদিও বা দু'একটা হয়ে থাকে ত তা এখনও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। কাজেই, ফ্রণ্টের শরিকদল যদি তাঁদের শ্রেণী-অস্ত্র প্রয়োগে কিছু ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেন, তবে সমস্যা হয়ত এত জটিল হয়ে উঠত না।

মনে হয়—দু বিশেষ কারণে ঘেরাও-এর সংখ্যা প্রবল হয়ে উঠছে। (১) এক দল অপর দল অপেক্ষা ভীষণতর সংগ্রামী এটা প্রতিপন্ন করে দলীয় প্রভাব বৃদ্ধি করা, আর (২) সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে শ্রেণী-অস্ত্র প্রয়োগ করে সংগঠনকে মজবুত রাখা এবং শ্রমিক-শ্রেণীর ন্যায্য পাওনা-গণ্ডার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশু সমাধানের পথ খোঁজা।

ফ্রণ্টের এক দল অপর দলকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন থেকে যে উৎখাতের চেষ্টায় 'ঘেরাও' মার-পিট ইত্যাদির আশ্রয় নিয়েছেন একথা ফ্রণ্টের 'শক্তিমান পঞ্চবাম' অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে পথের নিশানা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এহেন উদ্দেশ্যে ঘেরাও একটি অমোঘ অস্ত্র। কারণ, কোন একটি শ্রমিক সংগঠনকে ভেঙে আর একটি তৈরী করতে গেলে ঘেরাও সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। কেননা শ্রমিক সংগঠনের আইন অনুযায়ী যে কোন শিল্প সংস্থার ৭ জন শ্রমিক একতাবদ্ধ হলেই একটি ইউনিয়ন রেজেস্ট্রীভুক্ত করতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আইনগত অধিকার জন্মায়। জন্মাবার পক্ষকাল মধ্যেই দাবী সনদ তৈরী করে কোম্পানীর কাছে পেশ করেই দাবী আদায়ের জন্য ঘেরাও সুরু করে দিতে পারেন। কারণ নবজাতকের স্ট্রাইক করবার ক্ষমতা তখনও হয় নি। অথচ কোম্পানীকে দেখাতে হবে নবজাতক শক্তিশালী। আর অন্যদিকে যে ইউনিয়ন আছে সেটাও বেকায়দায় পড়বে। বলা নেই কওয়া নেই, ধর্মঘটের ঝুঁকি নেওয়াও সম্ভব নয় আর

[illegible]ান [illegible]ী-দাওয়ার প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা [illegible] এমন অবস্থায় ঘেরাও করাও সম্ভব ন[illegible] নবজাতক ইউনিয়নটি এই সুবর্ণ পথ [illegible] এগিয়ে গিয়ে পুরনো সংস্থাকে দালাল প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। আর নিজেদের সংগঠন বাড়াবার কাজে ব্রতী হয়। পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে যে ঘেরাও হচ্ছে তার বেশীর ভাগের ইতিহাস এই। এই ঘেরাও থেকে আসছে মার-পিট, আর লক-আউট।

পরিস্থিতির এই অবনতিতে ভাবিত হয়ে পঞ্চবাম বলেছে, একটি শিল্প সংস্থায় যাতে একটি মাত্র শ্রমিক প্রতিষ্ঠান থাকে সেইভাবে আইন প্রণয়নের জন্য ফ্রন্ট শ্রমমন্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হবে। এদিকে শ্রমমন্ত্রী বলেছেন, শিল্প সংস্থায় ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকৃতি পাবে। কথাটা শুনলেই মনে হবে প্রস্তাবটি আপাদমস্তক গণতান্ত্রিক। কিন্তু আসলে তা নয়। এমন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে সমস্ত শ্রমিকই কোন না কোন সংস্থার সভ্য। সমীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে শ্রমিকদের সংখ্যার হয়ত অর্ধেকও কোন ইউনিয়নের সদস্য নয়। অবশ্য, অনেকে বলবেন, তবে ধর্মঘট হয় কি করে? যাঁরা কোনদিন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরাই নিঃসঙ্কচিত্তে বলবেন—'ভয়ে'। অতএব, যাঁরা কোন ইউনিয়নের সভ্য নয়, নীতিগতভাবে কোন ইউনিয়নের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত—সে প্রশ্নে ভোট দেওয়ার অধিকার তাদের থাকা উচিত কি? শ্রমমন্ত্রী এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশা করা যেতে পারে।

যে সমস্ত শিল্প সংস্থায় একাধিক ইউনিয়ন আছে, সেখানেও ইউনিয়নসমূহের যুক্তফ্রন্ট গঠন করলে হয়ত ঘেরাও-এর সংখ্যা কমে যাবে। কারণ, যুক্তশক্তিবলে দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট করা মোটেই অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য, এ হেন ফ্রন্টকে কার্যকর করার জন্য আচরণবিধির প্রয়োজন হবে। এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যে শিল্প সংস্থায় যে সমস্ত ইউনিয়ন আছে তাদেরই যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে হবে। পরে কেউ সংস্থা বানাবার চেষ্টা করলেও তা গ্রাহ্য করা উচিত হবে না। এই সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের যুক্তফ্রন্ট কোন সমস্যার সমাধান করতে না পারলে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি সেখানে হস্তক্ষেপ করে তা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এ পদ্ধতি যদি গ্রহণ করা যায় তবে মনে হয় ঘেরাওএর সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

আবার সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে ঘেরাওএর প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। যুক্তফ্রন্টের সরকার যদি জনগণের সরকার হয়ে থাকে, এবং বাম-পন্থীদের সরকার হয়ে থাকে, তবে অন্তত সরকারী উদ্যোগগুলির কিম্বা সরকারী কাজে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বদলানো দরকার। কারণ যুক্তফ্রন্ট তার ৩২-দফা কর্মসূচীতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং একথাও দৃপ্তকণ্ঠে স্বীকার করেছে যে, ফ্রন্ট সরকার মেহনতি মানুষেরই সরকার। অতএব, কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা ফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিতে না এনে কিম্বা তাঁদের হস্তক্ষেপের সুযোগ না দিয়ে যদি ঘেরাওএর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়—তবে সমস্যা শুধু জটিল হয় না—অধিকন্তু ফ্রন্ট সরকারের প্রতি শ্রমিক শ্রেণীর অনাস্থাও প্রকাশ পায়। ফ্রন্টের প্রত্যেক অংশীদারের একথা ভালো করে উপলব্ধি করা উচিত। অবশ্য একথা বলা হচ্ছে না যে, প্রত্যেক শ্রেণী সংগঠনকেই সরকারকে সুযোগ দেওয়ার জন্য অকেজো করে ফেলা হোক। কিন্তু অন্ততপক্ষে সরকারী উদ্যোগে এই অস্ত্র প্রয়োগের ব্যাপারে সংযত হওয়া যে উচিত সেকথা সকলেই স্বীকার করবেন।

বে-সরকারী সংস্থায় শ্রমিকদের উপর অনেক চাপ হয়ত পড়ে। কিম্বা অনেক ন্যায্য পাওনা থেকেও শ্রমিকরা হয়ত বঞ্চিত থাকেন। এই দাবী আদায়ের জন্য রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তর আছে। অবশ্য শ্রমদপ্তরের দীর্ঘসূত্রতা শ্রমিকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি অনাস্থার ভাব এনে দিয়েছে। স্বয়ং শ্রমমন্ত্রী একথা স্বীকার করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শ্রম-বিরোধ নিষ্পত্তির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সমস্ত শ্রম-বিরোধকেই একই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে চলবে না। এমন অনেক সমস্যা আছে যা কিছু দেরীতে সমাধান হলেও শ্রমিকদের কল্যাণের ইতরবিশেষ হয় না। অতএব, শ্রমদপ্তর সমস্যাকে ভাগ করে সেইভাবে সমাধানের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

বেসরকারী উদ্যোগেও 'এখনি সমাধান চাই' এমন শ্লোগানের ভিত্তিতে ঘেরাও হওয়া উচিত নয়। কোন কোম্পানীর তরফ থেকে কাউকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে ছাটাই করলে কিম্বা কোন শ্রমিককে মারধর করা হলে কেবলমাত্র সেই সমস্ত জরুরী সমস্যা সমাধানের জন্য ঘেরাও চলতে পারে। নতুবা, অন্য সমস্ত দাবী-দাওয়ার জন্য নিয়মমাফিক নোটিশ দিয়ে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ কাজ ছেড়ে এসে ঘেরাও করছেন শ্রমিকবন্ধুরা। বেশী টাকা পেতে হ'লে বেশী কাজ করতে হবে। একথা স্মরণে রেখে তবে ধীরে-সুস্থে অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত। সরকার যখন তাঁদের পাশে আছেন, তখন তাঁদের উচিত সরকারকে অহেতুক নাজেহাল না করা। কারণ তাঁরা কাজে থেকে আরও জীবনমান উন্নয়নের জন্য লড়াই করছেন। আর যাঁরা কাজে নেই তাঁদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সরকারের। অতএব, পারিপার্শ্বিক বিচার করে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি না মেনে চললে আখেরে তাঁদের সরকারকেই অপদস্থ হতে হবে—শ্রমিকবন্ধুদের একথা স্মরণ রাখা একান্ত কর্তব্য।

রাজনীতি-সচেতন শ্রমিক শ্রেণীকে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শুধু ঘেরাও করে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। কিছু আপাতলাভের আশায় শক্তির অপপ্রয়োগ ঘটলে সত্যিকারের প্রয়োজনের সময় তার পুরোমাত্রায় অভাব ঘটবে, আর যাঁরা তাঁদের নায়ক তাঁদেরও এই শ্রেণী শক্তিকে কাজে লাগাবার আগে সমস্ত দিক বিবেচনা করে চলতে হবে। অবশ্য শুধু সরকারী যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল থেকে কোন সমস্যার সমাধান হবে না একথাও ঠিক। কাজেই ন্যায্য দাবীর লড়াই-এর জন্য আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তাই বলে বিরোধী সরকারের সঙ্গে লড়াই-এর মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে গেলে বিপদ অত্যাসন্ন হয়ে উঠবে। কারণ, শুধু পশ্চিম বাংলায় এমন কোন মৌল নীতি চালু করা যাবে না, যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সরকাররা এখনও চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেন নি। যা কিছু পরিবর্তন আনতে হবে তা অতীব ধীরে, যাতে অন্যান্যদের মনের উপর ক্রমেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নয়তো বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মুকুল অকালেই ঝরে পড়বে, ফলবান হওয়ার সুযোগ পাবে না।

অতএব, যুক্তফ্রন্টকে অচিরেই 'ঘেরাও'-এর প্রশ্ন মীমাংসা করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর উপর তাঁদের যে নেতৃত্ব আছে তাকে আরও সুসংবদ্ধ, সংযত ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে হবে। সাধারণ দেনা-পাওনার জন্য ঘেরাও করে শক্তির অপচয় করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

—সমদর্শী

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[গ্রাম চেনবার নেশা ছিল বিকাশের। শহুরে যুবক প্রমোশন নিয়েই এল তাই পাড়াগাঁর ব্যাঙ্কে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্ককাকার বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমাণ শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। বিস্ময়ের আশ্রয়। মনীষা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত মনীষার, দ্বিতীয় উপস্থিতি।

চারদিকে টানাপোড়েন। চোরাবালি। ক্ষোভে-ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছে সবাই। মূল্যবোধও বিপর্যস্ত। ঘুনেপোকা।

বিকাশের সামনেও কানাগলি। মনীষার প্রতি হৃদয়ের রঙ। সোনালির প্রতিও একধরনের আকর্ষণ। স্বপ্ন।

মুক্তি চায় বিকাশ। নোংরা গ্রাম্য রাজনীতির আওতা থেকে, শশাঙ্ক নিয়োগীর বিবর থেকে। আশ্রয় চায় সে মনীষার।

আনতে হবে তাকে। বাঁধতে হবে ঘর। মনীষার চাকরির জন্যে চলে তাই উমেদারি।

মাঝে সোনালি। আরেক অধ্যায়।

রাত। বিবর্ণতায় আলো। শুয়েছে বিকাশ। ঘরে ঢুকল সুনু—সোনালি। স্বপ্নের আমেজ।

বিকাশের কণ্ঠ 'তোমাকে ভুলব না সুনু, তোমাকে ভোলা যায় না।'

সোনালির গালে এখন রঙ পড়ে। চোখে কেমন নির্ভরতার আলো। মাদকতা। বিকাশের গভীরে দোলাচল। শাঁখের করাত। মনীষা আর সোনালি। এবার পালাতে চাইল নিয়োগীবাড়ি থেকে। কিন্তু যাবে কোথায় বিকাশ? ব্যাচেলরকে ঘর-ভাড়া দেবে কে? শেষ পর্যন্ত শরণ নিতে হল জাঁদরেল ব্যবসায়ী কানাই পালের। আশ্বাস মিলল। ঘরের। মনীষার চাকরির।

কলকাতার পথে এবার বিকাশ। সঙ্গে সোনালি। ট্রেন চলছে।

।। কুড়ি ।।

পকেটে প্রভাকরের লেখা একটা চিঠি, তার প্রোফেসার ডাক্তার চৌধুরীর কাছে। মনীষাকে একাবার ভালো করে দেখবেন তিনি — অ্যাডভাইস দেবেন। এই চিঠিটার দরকার হবে কাল, কলকাতায় পৌঁছুলে। আপাতত সামনের সীটেই একটুখানি জায়গায় ছোট্ট শরীরটাকে আরো ছোট করে নিয়ে সুনু ঘুমন্ত। কখনো কখনো এ-রকম অঘটনও ঘটে যায় অর্থাৎ ট্রেনের এই সেকেন্ড ক্লাস কামরাটিতে আজ ভীড় নেই, বাকী জন-চারেক যাত্রীও এর মধ্যে শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। সুনুর বেঞ্চিতে আর একটি মাঝবয়েসী মহিলা ঘুমের ভেতরেও থেকে থেকে ছটফট করছেন, গায়ের পায়ের কম্বল গুছিয়ে নিচ্ছেন বার বার, কখনো চোখ দুটো সম্পূর্ণ মেলে তাকিয়ে থাকছেন ওপরের লালচে আলোটার দিকে। বিকাশ জানে, মহিলাটি আজ সারা রাত ঘুমুতে পারবেন না, সঙ্গী দেবরের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা থেকে আগেই জানা গেছে — বিবাহিতা মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে তাকে কলকাতায় দেখতে যাচ্ছেন তিনি।

কিন্তু সুনু ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্তে, একান্ত নির্ভরতায়। বিকাশ — অভ্যাসমতো সীটের কোণায় যেখানে বসে আছে, সেখানে একটুখানি হাত-পা মেলে যে ঘুমিয়ে নিতে পারত না তা নয়, বাঙ্কেও জায়গা ছিল। কিন্তু একে তো ট্রেনে তার কখনো ঘুম আসে না, রিজার্ভেশন থাকলেও না, তার ওপর—তার ওপর, আজ রাতটাই আলাদা। দেড় মাস আগেও যে সুবর্ণা তার জীবনে কোথাও ছিল না—দেখতে দেখতে সে কখন সোনালি হয়ে গেছে, কখন সে বিকাশের মনের মমতা অনেকখানি দখল করে নিয়েছে, কখন তার এক-একটা অবসরকে আলোয় ভরে দিয়েছে, এ-কথা ভাবতেই তার আশ্চর্য লাগছিল। তারও চেয়ে আশ্চর্য, শশাঙ্ককাকা অত্যন্ত সহজে—এবং নিজেই উৎসাহ করে সুনুকে তার সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুনু ঘুমুচ্ছে। গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। কয়েকটা ঝুরো চুল উড়ে পড়ছে মুখে, একটা কানে চিকচিক করছে সোনার রিং। ট্রেন চলেছে রাত ছিঁড়ে ছিঁড়ে—কাঁচের জানলার বাইরে মরা শীতের জ্যোৎস্নায় পৃথিবীটা আকারহীন অর্থহীন ভুতুড়ে দেশের রূপ নিয়েছে একটা। মনে হচ্ছে এই অবাস্তব ভৌতিক জগতের মধ্য দিয়ে এই যে গাড়ীটা লোহা-লক্কড়ের ঝাঁঝর বাজিয়ে খ্যাপার মতো ছুটছে—এ কোথাও পৌঁছুবে না, কোনোদিন না—কেবল এমনি করে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এই মরা জ্যোৎস্নার ভেতরে হারিয়ে যাবে। সুনুর জাগাও এমনি একটা ট্রেন, কোথায়—কিভাবে—

নিজের ভাবনার গতিতে বিরক্ত হ[...] বিকাশ মুখ ফিরিয়ে নিলে সুনুর দি[...] থেকে, চোখ বুজে বসে রইল। আজ রাত্রে এই চলন্ত ট্রেনে সুনু অন্তত নিশ্চিন্ত শশাঙ্ক তাকে অসঙ্কোচে পাঠিয়ে দিয়েছে বিকাশের সঙ্গে, বিকাশ তার সব ভাবন[া] সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছে।

কিন্তু অস্বস্তি কাটছে না। কোথায় য[...] যেন একটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হয়[তো] রাজী না হলেই ভালো হত। 'তোমাকে ভু[লব] না—তোমাকে ভোলা যায় না—' এই কথা সে-রাত্রে বলবার পর থেকেই নিজের কা[ছে] অদ্ভুত রকম কুণ্ঠিত হয়ে আছে সে। সু[নু] কী ভেবেছে কে জানে, হয়তো কিছু ভাবে নি, ভাববার মতো বয়েসই হয়

[illegible]। [illegible] বিকাশ জানে, এই কথাটা—এমন করে, [illegible] ছাড়া আর কাউকে বলা যায় না, কাউকে [illegible] উচিত নয়।

আর মেজদা?

পাগল, বদ্ধ পাগল। কিন্তু বার বার কেন টেনে আনে সুনুকে? কেন জড়িয়ে দিতে চায় তার সঙ্গে? কেন বলে—

ননসেনস। কোন মানে হয় না।

কিন্তু একটা মানে হয়। সেই গল্পটা। সেই পাগানিনি।

পাগানিনি বলে কেউ কস্মিন কালে ছিল কিনা, সে জানে না। তবে ভাগনার সম্বন্ধে কবে যেন কিছুকিছু পড়েছিল সে। সেই লোকটাও মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। তাদের যন্ত্রণা নিয়েই কি সুর বাঁধত ভাগনার—জন্মে উঠত তার কম্পোজিশন? পাগনিনি কি ভাগনারের রূপক?

চুলোয় যাক এ-সব তত্ত্ব। মাথা খারাপ না হলে এ-সব নিয়ে দুশ্চিন্তা করে না কেউ। কিন্তু বার বার ওই পাগানিনির গল্প শোনায় কেন লোকটা? বিকাশ বেহালা বাজায় বলে? মেজদা কি বলতে চায়—ওই বেহালার সুরে বিকাশের একটা ফাঁদ—ওই ফাঁদে একটা পাখির মতো ধরা পড়বে সুনু, তারপর বিকাশ যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে একটু একটু করে হত্যা করবে তাকে, আর সেই যন্ত্রণা সুর হয়ে বাজতে থাকবে তার বেহালায়?

পাগল! পাগল ছাড়া এ-রকম ভাবতে পারে কেউ?

এ থেকে আর একটা সিদ্ধান্ত এসে যায়। তার মানে—সোজা বাংলা ভাষায় যা দাঁড়ায়—সুনু তাকে ভালোবাসবে, এবং— এবং মরবে!

ভালোবাসবে তাকে! বিকাশ চমকে চোখ মেলল। সুনু পাশ ফিরেছে। একটি শীর্ণ শাদা হাত বেরিয়ে এসেছে কম্বলের আড়াল থেকে। কী অদ্ভুত কোমল আর ছোট ছোট আঙুলগুলো, একটা চাপও সইবে না, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে একতাল মাখনের মতো গলে যাবে। এই চলন্ত ট্রেনে, এই ঘুমের ভেতর, মেয়েটাকে কী করুণ আর বিষণ্ণ লাগল।

'তুমি তা হলে কলকাতায় যাচ্ছ আমার সঙ্গে।'

বিকাশের মনে পড়ল, পরদিন সকালে তাকে চা দিতে এসে কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল সুনু।

'কেন?'

বিকাশ একটু আশ্চর্য হল : 'কেন, কাকা তোমাকে কিছু বলেন নি?'

'না তো।'

'তা হলে পরে বলবেন। তাক লাগিয়ে দেবেন তোমায়।'

বড়ো বড়ো চোখ মেলে সরল বিস্ময়ে সুনু তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

'হঠাৎ আমি কেন কলকাতায় যাব বিকাশদা? কিছু বুঝতে পারছি না তো।'

'তোমার চোখ তো ট্রাবল দিচ্ছে কিছু-দিন ধরে।'

'তা দিচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় পড়তে পারি না, মাথা ধরে, চোখ দিয়ে জল পড়ে মধ্যে মধ্যে। কিন্তু কলকাতার যাওয়ার কথা কেন বিকাশদা?'

বিকাশ হাসল।

'কেন, কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে না তোমার?'

'করে, খুব করে।' — সুনুর মুখে আলো পড়ল : 'খুব ছোট্ট বেলায় কেবল একবার গিয়েছিলুম, একটা দো-তলা বাসে চেপেছিলুম, তা ছাড়া আর কিছু মনে নেই আমার।'

'কী দেখলে কলকাতায় গিয়ে?'

তৎক্ষণাৎ, এক সেকেন্ড দেরী না করে সুনু বললে, 'চিড়িয়াখানা।'

'চিড়িয়াখানা?' — বিকাশ স্নিগ্ধ চোখে তাকালো : 'সে তো বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দেখতে পায়। তুমি তো বড়ো হয়ে গেছ, এখন ও-সব বাঘ-সিঙ্গি-হাতি-গন্ডার দেখতে তোমার ভালো লাগবে?'

সুনু ফিক করে হাসল। তারপর ঘাড় নেড়ে জানালো, তার ভালো লাগবে।

'আর সিনেমা?'

একটু রাঙা হল সুনুর মুখ। আর একবার ঘাড় নড়ল তার। তার মানে, সিনেমা দেখতেও ভালো লাগবে তার।

'আর?'

'প্ল্যানেটোরিয়াম। আমাদের ক্লাসের মীরা দেখে এসেছে। বলেছে, একটা ঘরের ভেতর আকাশ—সেখানে চন্দ্র-সূর্য-তারা সব দেখা যায়।'

'আর কিছু দেখবার নেই?'

'কেন? কালীঘাটে যাব, দক্ষিণেশ্বরে।'

'আবার কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর কেন? ও-সব তো বুড়ো-বুড়ীদের জায়গা।'

সুনু আর হাসল না, আবার বড়ো বড়ো চোখ দুটো ভরে উঠল সরল বিস্ময়ে।

'বা-রে, ও তো মা-র মন্দির। বুড়ো-বুড়ীদের জায়গা কেন হবে? মা-র মন্দির দেখে আসব না?' — সুনু দুহাত তুলে নমস্কার করল উদ্দেশ্যে, তারপর বয়স্ক মানুষের মত ভারিক্কি গলায় বললে, 'ছি বিকাশদা, মা-কে নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই, ওতে পাপ হয়।'

এই সুনু।

ট্রেন থামল। স্টেশন। ঘুম-জড়ানো গলায় কে যেন স্টেশনের নাম ডাকছে। কয়েকটি মানুষের ব্যস্তব্যস্ত ওঠা-নামা। ঘন্টি। হুইসেল। ট্রেনের চলা। লাইনের জোড়—একটু দোল খাওয়া, ঘটাং ঘটাং করে গোটা দুই শব্দ। তারপর আবার বাইরের মরা জ্যোৎস্নায়—আকারহীন একটা ভুতুড়ে পৃথিবীর মধ্য দিয়ে ছুটে-চলা।

সেই মহিলাটি নড়ে উঠলেন। একবার চেয়ে দেখলেন বিকাশের দিকে। নিশ্বাস ফেললেন একটা, আবার চোখ বুজলেন। সন্দেহ নেই, ঘুমুতে পারছেন না।

কাঁচের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না, জোলো-কালিতে আঁকা গাছের সার, ধোঁয়াটে মাঠ, বিবর্ণ গরদের মতো আকাশের খণ্ড, এক-আধটা মরা তারা দেখা যায়, দেখা যায় না।

ঘড়ির কাঁটায় রাত একটা চল্লিশ। ট্রেনটা কলকাতায় যাচ্ছে, অথবা কোথাও যাচ্ছে না। কিন্তু সুনুর কোনো ভাবনা নেই, সে ঘুমুচ্ছে।

চিড়িয়াখানা — সিনেমা — প্ল্যানে-টোরিয়াম — দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। আরো অনেক বিস্ময়, অনেক রোমাঞ্চ, অনেক আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করলে কলকাতা। তবু কলকাতা আসার ব্যাপারে কোথাও একটা খটকা ছিল সুনুর মনে।

'চোখ দেখাবার জন্যে কলকাতা কেন? এখানেই তো শচীনকাকা রয়েছেন।'

'শচীনকাকা কে?'

'চোখের ডাক্তার। সকলকে তো তিনিই চশমা দেন, লোকের দাঁত-টাঁতও বাঁধিয়ে দেন।'

'কিন্তু কাকা এখানকার কাউকে বিশ্বাস করেন না। তিনি বললেন, ও'রা ভালো ডাক্তার নন।' — কাকার বাকী মন্তব্যটুকু চেপে যাওয়া ভালো বলেই মনে হল বিকাশের। এখানকার ডাক্তারেরা চোখ পরীক্ষা করতে গিয়ে মানুষকে অন্ধ করে দিতে পারেন, এই তত্ত্বটুকু সুনুর না জানলেও চলবে।

সুনু চুপ করে রইল। বিকাশের মনে হল, কলকাতায় বেড়াতে আসবার আনন্দ যাই হোক, সুনু যেন জিনিসটাকে খুব সহজভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না।

আশ্চর্য শশাঙ্ককাকার ভাগ্য — বিকাশ ভাবল। এই ছোট্ট মেয়েটা পর্যন্ত অবিশ্বাস করে তাঁকে, সন্দেহ করে। শশাঙ্ককাকা যে উদার হতে পারেন, নিজের সন্তানের জন্যে ভাবতে পারেন, মেয়েকে গান-বাজনা শেখবার জন্যে একটা সেতার কিনে দিতে পারেন, তাঁর এই সততাটুকুও কারো কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না!

এবং খেতে বসবার সময়—

কাকিমা বরাবর কম কথা বলেন, প্রায় চোখেই পড়ে না তাঁকে, ছায়ায় ভরা এই বাড়ীটায় ছায়ার মতো মিলিয়ে থাকেন সব সময়। তবু আজ ক্লান্ত চোখে বিকাশের দিকে তাকালেন।

'মেয়েটা ভারী সাদাসিদে, বাবা। ওকে কোথাও পাঠাতে আমার ভয় করে।'

'কোনো ভাবনা নেই কাকিমা, আমি তো আছি।'

'হ্যাঁ বাবা, তুমি আছো। সেইটেই আমার ভরসা। একটু ভালো করে দেখো। রাস্তায় যেন একা না বেরোয়, চারদিকে গাড়ী-ঘোড়া—'

'কিছু চিন্তা করবেন না কাকিমা, আমি কলকাতায় নিয়ে গিয়েই মা-র কাছে জিম্মা করে দেব।'

আবার নিঃশ্বাস পড়ল কাকিমার।

'দু-তিন দিন বেড়িয়ে আসবে কলকাতা থেকে, সে তো ভালোই। কিন্তু এখানকার শচীনবাবু তো নামকরা চোখের ডাক্তার, সবাই তো তাঁর কাছেই—

শশাঙ্ককাকার চটির আওয়াজ পাওয়া গেল, বাড়ীর ভেতরে আসছেন। কাকিমা চুপ করে গেলেন।

মানুষ কী সুখে সংসার করে? ভাতের থালায় আঙুল শক্ত হয়ে গেল বিকাশের। না—কোনো সন্দেহ নেই, কাকিমাও শশাঙ্ক-কাকাকে বিশ্বাস করেন না।

সেই একটা আচমকা চিৎকার — সেই গর্জন। 'আর একবার চেঁচাবি তো গলা টিপে'—

না—সুনুকে কলকাতায় না নিয়ে এলেই বোধ হয় ভালো হত।

তবু আসবার সময় রিক্সায় চেপে সুনুর খুশিটুকু। ট্রেনে ওঠবার আনন্দ। অনেক রাত পর্যন্ত জানলায়—কাচে মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা। ছেলে-মানুষি উত্তেজনায় জ্বলজ্বলে চোখ।

সুনু নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। এই ট্রেনটা—তার ভাগ্যের মতো এই রাত্রের গাড়ীটা যদি শেষ পর্যন্ত কোথাও গিয়ে না পৌঁছোয়, তাতেই বা কী আসে-যায়। সুনুর কোনো ভাবনা নেই।

না—ট্রেনটা পৌঁছোক। ভোরের আলোয়, প্রথম-জাগা কলকাতায়। চিড়িয়াখানা-সিনেমা - প্ল্যানেটোরিয়াম — দক্ষিণেশ্বর। সুনুর চোখ-মুখ আলোয় ভরে উঠুক। আলোর জন্যেই ও জন্মেছে, সেই আলো এসে পড়ুক ওর প্রথম-ফোটা শরীরের পাপড়িতে পাপড়িতে। সুনু সুখী হোক।

ক্লান্ত চোখ দুটো বন্ধ করল বিকাশ।

'মা—মাগো—'

সেই মহিলা। ঘুমুতে পারছেন না। কিন্তু সুনু ঘুমোক—নিশ্চিন্তে ঘুমোক।

মা চিঠি আগেই পেয়েছিলেন। ভারী খুশি হলেন সুনুকে দেখে।

'শশাঙ্কঠাকুরপোর মেয়ে? বাঃ দিব্যি মেয়েটি তো। 'এসো মা, এসো।'

আপাতত বিকাশের দায়মুক্তি। সুনু এখন মা-র চার্জে, অন্তত একটা দিন সুনুর সম্পর্কে তার করণীয় কিছু নেই। তার চেনা অপটিশিয়ান ডাক্তার সান্যাল—যিনি তাকে আর তার ছোট ভাই বিনয়কে চশমা দিয়েছেন, তিনি রবিবারে চেম্বারে বসেন না। অতএব কাল সকালে যেতে হবে তাঁর ওখানে।

সুতরাং—সুতরাং মনীষা।

চা খেতে খেতে হঠাৎ বিকাশ চমকে উঠল। সবচেয়ে দরকারী কথাগুলোই যেন কখন তার কাছে গৌণ হয়ে গেছে, প্রভাকরের চিঠি, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে মনীষাকে ডাক্তার চৌধুরীর কাছে নিয়ে যাওয়া, তার কাছ থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখিয়ে আনা—এগুলো এতক্ষণ সব চিন্তার এক পাশে চাপা পড়ে ছিল। অথচ এরই জন্যে সে ছুটি নিয়েছে, কলকাতায় এসেছে। আশ্চর্য!

না, ঠিক হচ্ছে না। সন্দিগ্ধভাবে বিকাশ নিজেকে প্রশ্ন করল : তা হলে তুমি যে ভদ্রতা করছ তাই কি ঠিক? মনীষাকে ঠকাচ্ছ, সরে আসছ তার কাছ থেকে, এই সরল শান্ত মেয়েটা — অচেনা বনের ভেতরে হরিণের মতো যে এখনো পৃথিবীর কিছুই চেনে না, যে তোমাকে সহজভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে, যার মা তোমার কাছে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন, তাদের সবাইকে ঠকাচ্ছ তুমি? তুমি জানো—মনীষা ছাড়া কাউকে তুমি বিয়ে করতে পারো না, কোনো অধিকারই নেই তোমার—অথচ এই মেয়েটাকে তুমি ধীরে ধীরে টেনে আনছ নিজের দিকে, বাঁধতে চাইছ যন্ত্রণার ফাঁদে, তারপর এক-দিন—

আধ-খাওয়া চায়ের পেয়ালা রেখে বিকাশ উঠে দাঁড়ালো।

মা বললেন, 'কী হল রে?'

'একটা জরুরী কাজ পড়ে [illegible]। এখুনি বেরুতে হবে।'

সুনু তখন দোতলার [illegible]দায় তারের খাঁচার ভেতরে নিবিষ্ট [illegible] এক ঝাঁক লাল-মুনিয়ার নাচানাচি দেখছিল। বিকাশকে দেখে শিশুর মতো কলধ্বনি তুলল।

'কী সুন্দর পাখিগুলো বিকাশদা!'

'হুঁ।'

'কোথায় বেরুচ্ছেন? আমাকেও নিয়ে

চল[illegible]!' উৎসাহিত হয়ে সে বিকাশের দিকে এ[illegible] এল।

'এখন নয়[illegible]' সিঁড়ি দিয়ে ঠক ঠক করে নীচে নেমে যেতে যেতে শীতল স্বরে বিকাশ বললে, 'এখন নয়।'

রেলিঙে ভর দিয়ে অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে রইল সুনন্দ।

থাকুক দাঁড়িয়ে। এখন সোজা মোহন-লাল স্ট্রীট।

কিন্তু বাড়ী পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হল না আর। কয়েক পা এগোতেই দেখা গেল, মনীষা আসছে। আজ আর কাঁধে ঝোলা নেই, কিন্তু সেই ক্লান্ত পা, সেই শুকনো মুখ, চুলগুলো রুক্ষ। একটা সাদা-মাটা শাড়ীতে আরো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে মনীষাকে। বিকাশ থমকে গেল। মনে হল, এই দিন-পনেরোর মধ্যে যেন আরো শীর্ণ, আরো নিঃশেষিত হয়ে গেছে মনীষা।

মনীষা দাঁড়িয়ে পড়ল : 'তুমি!'

বিকাশ শুকনো স্বরে বললে, 'তুমি তো জানতে আজ আমি কলকাতায় আসব। আমার চিঠি পেয়েছ নিশ্চয়।'

'পেয়েছি।' মনীষা বললে, 'কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, বিকেলে তুমি আসবে।'

'সকালেই আসতে হল। অনেকগুলো জরুরি কাজ আছে তোমার সঙ্গে।'

মনীষা হাসল : 'হবে সে-সব। কিন্তু তার আগে বলো, শরীর কেমন আছে।'

'আমার শরীর খারাপ থাকবার কোনো কারণ নেই। তোমার কাছ থেকেই ও-খবরটা জানা দরকার।'

'তোমার পায়ের ব্যথাটা?'

বিকাশ ধৈর্যচ্যুত হল : 'বুড়ো আঙুলের একটা চোট অনন্তকাল থাকে না। কিন্তু তোমার চেহারা এ-রকম কেন?

'আমি তো এই রকমই।'

'মণি আজ আর পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। এবার আমি কলকাতায় বেড়াতে আসি নি, এসেছি সব কথা ঠিক করে নিতে। কিন্তু এ-ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা হবে না। বাড়ীতে হোক, মোড়ের কফির দোকানে হোক—আমার সঙ্গে এখন ঘণ্টাখানেক বসতে হবে তোমায়।'

বিব্রত হয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো মনীষা।

'কিন্তু কথাগুলো বিকেলে হলে হয় না? আমার টিউশন আছে।'

'অধঃপাতে যাক টিউশন।'

'অধঃপাতে গেলে তো হবে না'—ক্লান্ত-ভাবে হাসল মনীষা : 'আর ক'দিন বাদেই মেয়েটার পরীক্ষা।'

'একদিন না পড়লে যদি ফেল করে তো করুক। তুমি চলো আমার সঙ্গে।'

'আমাকে তো মাইনে নিয়ে পড়াতে হয়—' মনীষার মুখে ছায়া পড়ল : 'নিজের একটা দায়িত্বও তো আছে। লক্ষ্মীটি, এখন পাগলামি কোরো না। এত জরুরি না হলে জ্বর গায়ে নিয়ে আমি বেরুতুম না।'

'জ্বর নিয়ে বেরিয়েছ!'—এটা যে সদর রাস্তা সে-কথা ভুলে গিয়েই বিকাশ মনীষার হাত চেপে ধরল। রোগা হাতটায় জ্বরের স্পষ্ট উত্তাপ, বুড়ো আঙুলের নীচে দপ-দপ করছে একটা দুর্বল নাড়ী।

মনীষা হাতটা টেনে নিলে তৎক্ষণাৎ।

'কী পাগলামি হচ্ছে রাস্তার ভেতরে!'

'বাড়ী ফিরে যাও মণি।'

'না।'

'এই জ্বর নিয়েই তুমি যাবে?'

'মাঝে মাঝেই আমায় যেতে হয় এ-ভাবে। ও জ্বরে আমার কিছু হয় না। অভ্যেস হয়ে গেছে।'

বিকাশ হিংস্রভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরল নিজের।

'একটা কথার জবাব দেবে মণি?'

অস্বস্তিভরে হাত ঘড়িটার দিকে চোখ নামালো মনীষা : 'কী বলবে বলো।'

'তুমি আত্মহত্যা করতে চাও—না? সেই জন্যেই বেশ নির্বিকার একটা পথ বেছে নিয়েছ?'

মনীষা একটু চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'বিকেলে এসো, তখন কথা হবে।'

'তা হোক।' তার আগে দুটো জিনিস তোমাকে বলে রাখি। আজই আমি বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব—কাল সকাল-বিকেল যখন হোক, দেখাতে যেতে হবে তোমাকে। আর তোমাকে এখানকার চাকরি ছাড়তে হবে, আমি সামনের মাসেই নিয়ে যাব তোমাকে।'

মনীষা বিকাশের দিকে চেয়ে রইল। ম্লান চোখ দুটো একটু একটু করে নিবে এল, তারপর ঘষা কাঁচের মতো ঝাপসা হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আবছা গলায় মনীষা বললে, 'বিকাশ, দরকার নেই, কিছুই দরকার নেই।'

'মানে?' — সদর রাস্তা না হলে বিকাশ প্রায় গলা ফাটিয়েই চিৎকার করে উঠত।

মনীষা তেমনি ঝাপসা গলায় বললে, 'বললুম তো বিকেলে এসো, তখন সব কথা হবে।'

একটা দানবিক শক্তিতে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল বিকাশ।

'ঠিক আছে, বিকেলেই আসব। কিন্তু মণি, এবার আমি সব মিটিয়ে দিতে এসেছি। আমি তোমাকে নিয়ে এবার ঘর বাঁধব। তা ছাড়া উপায় নেই আমার।'

মনীষার চোখ দুটো আস্তে আস্তে নিবে গেল একেবারে। যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এল সেখানে।

'আমি তো তোমাকে কতবার বলেছি, তুমি অন্য কোনো মেয়েকে—'

'মণি!'

'আচ্ছা—আচ্ছা—' জোর করে হাসতে চেষ্টা করল মনীষা : 'রাস্তায় এখন আর ঝগড়া নয়। বিকেলে তুমি তো আসছই। সব হিসেব-নিকেশ হবে তখন।'

'কিন্তু এখন এই অসুস্থ শরীর নিয়ে, জ্বর নিয়ে তুমি পড়াতে যাবেই?'

'আমাকে যেতেই হবে লক্ষ্মীটি। জ্বরের জন্যে ভেবো না—ওটা একটু টেম্পারেচার মাত্র, ডাক্তার বলেছেন ওতে ভয়ের কিছু নেই।'

'কোন্ ডাক্তার বলেছে? কোন্ রাস্কেল? সে কি লেখাপড়া শিখেছে কোনোদিন? তাকিয়ে দেখেছে তোমার মুখের দিকে? তাকে পেলে আমি—

'কী মুশকিল, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল তো। তুমি কি ডাক্তারের সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাবে নাকি এখন? শোনো —রাস্তায় দাঁড়িয়ে খ্যাপামি করতে হবে না। সব বিকেলে হবে।'

'এখন এ-ভাবে তুমি পড়াতে যাবেই?'

মনীষা চোখ নীচু করে রইল, জবাব দিল না।

'আমার কথা শুনবে না?'

'মাপ করো আমাকে।'

বিকাশ তৎক্ষণাৎ উল্টো দিকে ফিরে হাঁটতে শুরু করল। রাস্তার মোড়ে এসে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, একটা ল্যাম্প-পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনীষা, তার সামনে যে ছায়াটা পড়েছে, যেন তারই মধ্যে মিশে গেছে সে।

এখনি—এই মুহূর্তে ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা দরকার। মনীষা তার আত্মহত্যার ইচ্ছেটা পূর্ণ করবার আগেই।

কিন্তু দরকার সত্যিই ছিল না। মিথ্যেই ডাক্তার চৌধুরী বেলা সাড়ে আটটায় সময় দিয়েছিলেন। মিথ্যেই বলেছিলেন, 'প্রভাকর পাঠিয়েছে? নিশ্চয়-নিশ্চয়, ভালো করে দেখে দেব, কিছু ভাববেন না।'

কারণ, বিকেল পাঁচটায় আবার মোহন-লাল স্ট্রীটের বাড়ীতে এসে কড়া নাড়তে দোর খুলে দিলে মনীষার ছোট ভাই।

'বিকাশদা, কবে এলেন?'

'আজই। তোমার দিদি কোথায়?'

'দিদি?' — বিস্ময়ের ছায়া ফুটল ছেলেটির কপালে : 'আপনি জানেন না?'

'না তো!'

'দিদি তো হঠাৎ কী কাজে দুপুরবেলা চলে গেল বর্ধমানে। বলে গেল, অফিসের কী ব্যাপারে পাঠাচ্ছে, ফিরতে তিন দিন দেরী হবে।'

'ঠিকানা জানো বর্ধমানের?'

'না—দিয়ে যায় নি।'—ভাইটির গলায় দুশ্চিন্তা ফুটল : 'দিদি কখনো এ-ভাবে যায় না। তার ওপর গায়ে জ্বর নিয়ে—'

'আচ্ছা—'

বিকাশ চলতে শুরু করল।

'বসবেন না বিকাশদা?'

'না।'

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে সে প্রভাকরের চিঠিটা বের করল পকেট থেকে। তারপর সেটাকে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিতে লাগল শীত-মেশানো দক্ষিণের হাওয়ায়।

এই সহজ সত্যটা তার বুঝতে বাকী ছিল না যে মনীষা তার হাত এড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে!

(ক্রমশঃ)

মানুষগড়ার ইতিকথা

একটু পরেই বিকেল শেষ হয়ে যাবে। পশ্চিমে চার্চের ছায়া রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে পূর্বে আজাদ হিন্দ বাগের রেলিংয়ে। হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম বাসের জন্য। প্রায় পাঁচ মিনিট হয়ে গেল ট্রাম বা বাসের কোন পাত্তা নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল চার্চের লাগোয়া বাড়িটার দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা বাস। সতর্কভাবে বার-কয়েক হর্ন বাজিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলল দক্ষিণে। বাসভর্তি বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের মেয়ে। ওরা যাচ্ছে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে।

একটু আগে যখন বেথুনের হেড মিস্ট্রেসের ঘরে বসেছিলাম তখনই শুনেছি অমিয়া দেবী ড্রাইভারকে ডেকে ওদের পৌঁছে দিয়ে আসতে বললেন। এটা আজ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বেথুনের মেয়েরা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দল বেঁধে কোথাও না কোথাও যাচ্ছে—হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম নয় প্ল্যানেটোরিয়াম, যাদুঘর বা বোটানিকসে। আজকাল আমরা কেউ খেয়ালই করি না। এরকম কত বাসভর্তি স্কুল-কলেজের মেয়ে দু বেলা যাচ্ছে-আসছে। শুধু যে শহরের মধ্যেই ওদের যাওয়া-আসা সীমাবদ্ধ থাকে, তা নয়। বছরে একবার করে গোটা বেথুন স্কুল বেরিয়ে পড়ে পিকনিকে। সে সময় আউট্রাম ঘাট থেকে স্টিমার 'ব্রহ্মপুত্র' করে বজবজ পর্যন্ত ওরা বেড়িয়ে আসে। কোন বছর গোটা একটা ট্রেন রিজার্ভ করে চলে যায় পিয়ালী উপনগর। কোনবার খান-কয়েক বাস বোঝাই হয়ে বেথুন স্কুল চলে যায় শ্রীরামপুর, ওয়াটার ওয়ার্কস দেখতে। বছরের ঐ দিনটির আনন্দের কোন তুলনা নেই। স্কুলের সেকেন্ডারী সেকশনের পাঁচশো ছাত্রী, প্রায় চল্লিশজন শিক্ষিকা, প্রাক্তন শিক্ষিকারা ও অন্যান্য স্টাফ সবাই যোগ দেয় এই আনন্দযজ্ঞে।

এই আনন্দযজ্ঞে ভাগ নিতে আজ গোটা কলকাতা উৎসুক। কোথা থেকে না মেয়েরা আসে এই স্কুলে পড়তে। কোথায় বরানগর আর কোথায় বেহালা। পাইকপাড়া, দত্তবাগান, শ্যামবাজার, লেকটাউন, ভি আই পি রোড, বেলেঘাটা, শোভাবাজার, বৌবাজার, নিমতলা, জানবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুর—শহরের প্রায় সব পাড়া থেকেই মেয়েরা আসে। সবাই চান তাঁদের মেয়েকে এই স্কুলে দিতে। কিন্তু এত মেয়ের জায়গা হবে কোথায়? তাই প্রতি বছর হেডমিস্ট্রেস অমিয়া হালদারকে বহু অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট করতে হয়। সে কথাই বলছিলেন অমিয়া দেবী—ক্লাস ফাইভে প্রতি বছর ছ-সাতটা সীটের জন্য কমপক্ষে দেড়শো অ্যাপ্লিকেশন পড়ে। সিক্সের সাত-আটটার জন্য ক্যান্ডিডেট কমপক্ষে দুশ থেকে আড়াইশ। নাইনের গোটা-দশেক সীটের জন্য প্রায় তিনশ সাড়ে তিনশ অ্যাপ্লিকেশন পড়ে। ফলে বুঝতেই পারছেন কত মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে হয়। গার্জেনরা দুঃখিত হন, কিন্তু আমরা নিরুপায়।

এসব কথা যদি বেথুন সাহেব জানতে পারতেন, তাহলে লাইব্রেরীর ঐ পাষাণ স্ট্যাচুর মুখ কি আনন্দে ভরে উঠত না?

বেথুন কলেজিয়েট স্কুল

র্দির কথা উঠবে কেন? বেথুন সাহেব নিশ্চয়ই সব দেখেন, সব শুনতে পান। যাতে তিনি দেখতে-শুনতে পান, তাঁর স্কুল কিভাবে চলছে, তাই ত তিনি আসন নিয়েছেন স্কুলের মাঝে। মানুষ ত নন, উনি দেবতা। আর কেউ না মানুক, স্কুলের এক ঝাড়ুদারনী একথা মানে। মানে বলেই স্বামীর কঠিন অসুখ হতে সে গিয়েছিল অমিয়া দেবীর কাছে আর্জি পেশ করতে—অনুমতি পেলে বেথুনের মূর্তিকে পুজো দেবে। ওর বিশ্বাস বেথুন ওর স্বামীকে ভাল করে দেবেন। অমিয়া দেবী সেদিন আর না বলতে পারেন নি। আশ্চর্য ঘটনা পুজো দেওয়ার কিছুদিন বাদেই ওর স্বামী সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যিই কি আশ্চর্য হওয়ার মত কোন ঘটনা? এর চেয়েও অনেক বড় ম্যাজিক ত বেথুন জীবিত অবস্থায় আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখিয়ে গেছেন। যে যুগে ঘরের বাইরে পা দিলে পুরুষ-প্রধান সমাজে মেয়েদের মাথায় উঠত কলঙ্কের ডালি, সেদিন এই বিদেশী মানুষটি এগিয়ে এসেছিলেন এদেশের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মূঢ় মূক মুখে ভাষা জোগাতে। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনা যে ব্যর্থ হয় নি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ আজকের বেথুন কলেজিয়েট স্কুল।

সোয়াশ বছর আগে। তখন দেশ জুড়ে গড়ে উঠছে অসংখ্য স্কুল ও কলেজ যেখানে ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে গেছে হাজার হাজার ছাত্রের কাছে। হিন্দু কলেজ, হেয়ার স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ—একের পর এক স্কুল শহরের বুকে গড়ে উঠছে। দলে দলে ছাত্ররা যাচ্ছে সেখানে পড়তে। কিন্তু মেয়েদের কোন সুযোগ ছিল কি সে যুগে ছেলেদের পাশাপাশি স্কুলে বা কলেজে পড়বার? এক কথায় উত্তর দেওয়া চলে—না।

অত পেছনেই বা যাওয়ার দরকার কি? ষাট বছর আগে এই শহরে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখার ব্যাপারে অনেক গণ্যমান্য শহরবাসীর কি ধারণা ছিল সে সব কথা আজও নিশ্চয়ই আমাদের দিদিমা ঠাকুমাদের মনে আছে। গল্পটা শুনেছি দক্ষিণবঙ্গের এক নামকরা জমিদার ফ্যামিলীর মহিলার কাছে। খুব ছেলেবেলায় কোন রকম লেখা-পড়া না শিখিয়েই নিজের মেয়েকে তাঁর দাদামশায় বিয়ে দিয়েছিলেন জমিদার-বাড়ীতে। প্রথম ভারতীয় হাইকোর্ট জজের নামে নামাঙ্কিত রাস্তায় ঐ জমিদার ফ্যামিলির পেল্লায় বিল্ডিং আজও দাঁড়িয়ে আছে। নিজে লেখাপড়া শিখতে না পারলেও মায়ের ইচ্ছা ছিল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবেন। তাই শ্বশুরকে গিয়ে ধরে পড়লেন—

: বাবা অনুমতি দিন পানু মনুকে স্কুলে ভর্তি করে দিই।

বৌমার মনের কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন ডাকসাইটে জমিদার। ঘোলাটে লাল চোখ দুটো অনেক কষ্টে তুলে প্রশ্নের ভ্রূকুটি ছুঁড়ে মারলেন বৌমার দিকে—

: কেন? লেখাপড়া শিখবে? লেখাপড়া শিখে কোন ছোঁড়াকে চিঠি লিখবে?

: ছি ছি! এ আপনি কি বলছেন বাবা? লেখাপড়া না জানলে প্রয়োজনে আমার কাছেই বা মনের কথা লিখে জানাবে কি করে?

: কেন সুখে থাকলে সাদা কাগজে লাল কালির টিপ দিয়ে চিঠি পাঠাবে। দুঃখ হলে কালো কালির টিপ। এর জন্য লেখাপড়া জানার কি দরকার।

ষাট বছর আগেই যখন দেশে মেয়েদের পড়াশুনা সম্পর্কে শিক্ষিত লোকদের এই মনোভাব ছিল তখন আরো অতীতের ব্যাপারটা অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। গত শতাব্দীতে হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র ও লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর আধ্যাত্মিকা বইটির ভূমিকায় লিখেছিলেন—আমি জন্মেছি ১৮১৪ সালে (১২ জুলাই) বাংলা ১২২১ (৮ শ্রাবণ)। পাঠশালায় পড়বার সময় দেখেছি আমার ঠাকুমা, মা ও খুড়ীমারা বাড়িতে বাংলা বই পড়তেন। তাঁরা বাংলা লিখতে ও হিসাব রাখতে পারতেন। তখন দেশে কোন মেয়েদের স্কুল ছিল না।

স্কুল ছিল না। বাইরে স্বাধীনভাবে বেরুবার অধিকার ছিল না। হাজার না না'র মধ্যে থেকেও সে যুগে কিছু মহিলা কিভাবে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা ভাবতে গেলে গায়ে কাঁটা দেয়। কাশীবাসী বাঙালী মহিলা হোতি বিদ্যালঙ্কার বা ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার শ্যামমোহিনী দেবীর নাম সে যুগে পণ্ডিত মহলে অজানা ছিল না। ব্যস ঐ পর্যন্ত। শত শতাব্দীর অবরোধ তাঁদের যে অন্ধকূপে ঠেলে দিয়েছিল, সেখান থেকে আলোয় তুলে আনতে হলে যে পরিমাণ শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, তা সে যুগে বাঙালী সমাজে নিতান্ত সহজলভ্য ছিল না। তবু কিছু কাজ শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে। এই কাজের সূচনায় কিছু ইউরোপীয় মহিলা আগ্রহভরে এগিয়ে এসেছিলেন।

ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের উৎসাহে দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে দি লেডিজ সোসাইটি, দি লেডিজ এসোসিয়েশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শহরের দিশী মহিলাদের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গত কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ডের শ্রীরামপুর মিশন এদেশে নারী শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় স্থান দখল করে আছে।

বিদেশী ও খৃশ্চান মিশনারীদের পাশাপাশি সে যুগের উন্নতমনা বাঙালীরাও এগিয়ে এসেছিলেন মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে। রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, প্রাচীন কলকাতার রথসচাইল্ড মতিলাল শীল-এর নাম এ বিষয়ে সবার আগে মনে পড়ে। ডিরোজিওর ছাত্র ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতা রামগোপাল ঘোষ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর প্রবন্ধ রচনার জন্য দুটি মেডেল দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। কম্পিটিশন সীমাবদ্ধ ছিল হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে। সোনার মেডেলটি পেয়েছিলেন মধুসূদন, তাঁর সহপাঠী ভূদেব পেয়েছিলেন রুপোর মেডেল। মেডেল ঘোষণা করেই রামগোপাল নিরস্ত হন নি। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল বৃটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটির মাধ্যমে সরকারী শিক্ষা পরিষদের কাছে আর্জি পেশ করলেন—সরকার মেয়েদের জন্য স্কুল খুলুন। উত্তর-পাড়ার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখুজ্যেরা উঠে-পড়ে লেগেছিলেন রামগোপালের পরিকল্পনাটিকে সার্থক করে তুলতে। কিন্তু চার বছর ধরে গড়িমসি করে শিক্ষা পরিষদ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। কলকাতায় তখন এ বিষয়ে একটি আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে (দয়া করে ভুল বুঝবেন না—আন্দোলন মানে মিছিল নয়)। সে সময় ১৮৪৭ সালে বারাসতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলা হল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ নবীনকৃষ্ণ মিত্র, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও হিন্দু কলেজের স্বনামধন্য ছাত্র এবং বারাসত গভর্নমেন্ট স্কুলের হেড মাস্টার প্যারীচরণ সরকার।

ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থা পরিষদের আইনসচিব হয়ে বিলেত থেকে এলেন জন ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার বেথুন আইন পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লেখায় হাত পাকিয়েছিলেন। মাতৃভক্ত বেথুন বিশ্বাস করতেন মেয়েদের উন্নতির একমাত্র উপায় শিক্ষার প্রসার। আইনসচিব হিসাবে তিনি শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হলেন। শিক্ষা পরিষদের বৈঠকেই মনের দোসর খুঁজে পেলেন রামগোপালের মাঝে। বেথুনের বড় সাধ এদেশের মেয়েদের জন্য একটা স্কুল খুলবেন। জানতে পেরে রামগোপাল বেজায় খুশী। তখুনি বন্ধু-বান্ধবদের ধরে এনে সাহেবের কাছে হাজির করলেন। শুরু হল শলাপরামর্শ। সবাই কথা দিলেন সব রকমে বেথুনকে সাহায্য

করবেন—এমন কি ঘরের মেয়েদেরও পাঠাবেন তাঁর স্কুলে।

'এমন কি' শব্দ দুটির পেছনে কেমন একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার গন্ধ লুকিয়ে আছে। এখন যেমন ভারতের বাইরে মোটা মাইনের চাকরী পেলেও অনেক বেকার ছেলে ভয় পায় যেতে—তেমনি সে যুগেও গোঁড়া-পন্থীদের ভয়ে মানুষ সাহস পেত না স্কুল-কলেজে মেয়েদের পাঠাতে কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলরা ছিলেন সত্যিকারের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সামাজিক সব রকম উৎপীড়নই তাঁদের গা-সহা। সহপাঠী রামগোপালের মুখে স্কুল খোলার খবর পেয়ে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন তাঁর সাহায্যের ঝুলি নিয়ে। স্কুলের জন্য বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন ৫৬ সুকিয়া স্ট্রীটের বৈঠকখানা বাড়ি। পাঁচ হাজার টাকা দামের মূল্যবান লাইব্রেরীটিও দিলেন স্কুলকে। তাছাড়া স্কুলের নিজস্ব বাড়ির জন্য মির্জাপুরের সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি দান করলেন। তখনকার দিনে এ জমির দাম ছিল প্রায় বারো হাজার টাকা। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর দানের প্রস্তাব চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন বেথুনকে।

এর মাঝে বেথুন একদিন বারাসতে গিয়ে নবীনকৃষ্ণ-প্যারীচরণের অবৈতনিক স্কুলটি দেখে এসেছেন। প্রাথমিক কাজকর্ম মিটে যেতে দক্ষিণারঞ্জনের বৈঠকখানা বাড়িতে বেথুন তাঁর স্কুল খুললেন—৭ মে, ১৮৪৯। একুশটি মেয়ে নিয়ে স্কুল চালু হল। উদ্বোধনী ভাষণে বেথুন বললেন কেন তিনি এই স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারী সাহায্য নিতে চান নি। লালফিতের কল্যাণে তাঁর পরিকল্পনার রূপায়ণ পিছিয়ে যেতে পারে এ ভয় তাঁর ছিল (রামগোপালের আর্জির করুণ ইতিহাস তাঁর জানা ছিল)। ভয় শুধু লালফিতার নয়। ভয় ছিল তাঁর শহরের নেতৃস্থানীয় বাঙালীদের সম্পর্কেও। সে কারণে তিনি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজা রাধাকান্ত, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব বা প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানান নি। পাছে তাঁর পরিকল্পনা ও'দের অনুমোদন না পায় বা ও'দের মতামতের ফলে কোন পরিবর্তন করতে হয়। ইউরোপীয়দেরও তিনি ডাকেন নি—ব্যাপারটা একটা সরকারী অনুষ্ঠানে পরিণত হোক, এ ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

বেথুনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে বেশী সময় লাগে নি। গোঁড়ারা খেপে গেলেন। হাঙ্গামার ভয়ে অনেকেই স্কুলে মেয়েদের পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা তিন ভাগের এক ভাগে এসে ঠেকল। সারা শহরে তখন তুমুল উত্তেজনা। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' মহানির্বাণ তন্ত্রের বাণী লেখা স্কুলের ঘোড়ার গাড়ি যখন রাস্তায় বেরুত তখন ছোট ছোট মেয়েদের লক্ষ্য করে লোকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করত। সাধারণ লোকের মুখে তখন শুধু এক বুলি — 'এইবার কলির বাকী যা ছিল হয়ে গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকী থাকবে না।' বাবুদের মজলিসে রসিকতা করে নাটুকে রামনারায়ণ বললেন—'বাপ্‌রে বাপ্‌ মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক 'আন্' শিখাইয়াই রক্ষা নাই। চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।' নতুন স্কুলকে স্বাগত জানিয়েও সংবাদ প্রভাকরের পাতায় ঈশ্বর গুপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—

'যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
এ বি শিখে, বিবী সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে;
আর কিছু দিন থাকরে ভাই!
পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।'

গুপ্তমশাই ইংরেজী শেখার ব্যাপারে টিটকারী করলেও, তাঁর রসিকতার গোড়ায় একটা গলদ ছিল। কারণ 'এ বি' শেখানোর জন্য স্কুল হয় নি। স্কুলে তিন 'আর'-এর বাইরে শেখানো হত ভূগোল ও বাংলা দেশের ইতিহাস। এ ছাড়া সেলাই-ফোড়াই শেখানো হত। স্কুলের পরিচালনা ও সেলাই শেখানোর দায়িত্ব ছিল হেডমিস্ট্রেস রিডসডেলের ওপর। পড়ানোর মাধ্যম কিন্তু ইংরেজী ছিল না—ছিল বাংলা। হেড মিস্ট্রেস ছাড়া আরো দুজন শিক্ষিকা ও দুজন পণ্ডিত সে সময় মেয়েদের পড়াতেন।

প্রথম যুগে বিদ্যাসাগরের সহকর্মী, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেশ কিছুদিন বিনে মাইনেয় এই স্কুলে পড়িয়েছেন। স্কুলের একুশজন ছাত্রীর মধ্যে তর্কালঙ্কারের দুটি মেয়েও ছিলেন—ভুবনমালা ও কুন্দমালা। স্কুলের মেয়েদের পড়াতে গিয়েই রচিত হল তাঁর বিখ্যাত বাংলা বর্ণমালা।

সে যুগে যখন শহরের কেউ এই স্কুলে ঘরের মেয়েদের পাঠাতে সাহস পেতেন না, তখন বেথুনকে অনেক ফন্দী-ফিকির করে মেয়েদের স্কুলে আনতে হত। সেই ফন্দী-ফিকিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের দিদি ও প্রখ্যাত লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯০৫ সালে বেথুন স্মৃতিসভায় বলেছিলেন যে, আইনসচিবের পদাধিকারবলে বেথুন সে যুগের অনেক ভদ্রলোককে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা মুনসেফগিরির পদ অফার করে তাঁদের ঘরের মেয়েদের স্কুলে আনতেন।

বেথুনের ইচ্ছা ছিল তাঁর স্কুলের নাম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হোক। কিন্তু কোম্পানীর বিলিতি পরিচালকরা রাজী হতে পারেন নি। তাই প্রতিষ্ঠার সময়ে বেথুনের ভাষণে উল্লিখিত 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' নামটি প্রায় এক যুগ ধরে স্কুলের নথিপত্রে দেখতে পাওয়া যায়।

স্কুল স্থাপন করেই বেথুনের চিন্তা হল—স্কুলের নিজস্ব বাড়ি চাই। দক্ষিণারঞ্জন মির্জাপুরে যে জমি দিয়েছিলেন তার পাশেই বেথুন প্রায় দশ হাজার টাকায় আরো পাঁচ বিঘা জমি কেনেন। তখন মির্জাপুরকে ধরা হোত কলকাতার উপকণ্ঠ বলে। তাই বেথুনের অনুরোধে মির্জাপুরের ঐ দু টুকরো জমির বদলে কোম্পানী কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের পশ্চিম ধারে এক টুকরো জমি দিলেন। বাড়ী উঠবে। ১৮৫০ সালের ৬ নভেম্বর বাংলা দেশের ছোটলাট স্যার জন হান্টার লিটলার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বেথুনের অনুরোধে লেডী লিটলার স্কুলের বাগানের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় একটি অশোক গাছ রোপন করেন। অশোক গাছ পোঁতার সিম্বলটুকু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেদিন বেথুন বলেছিলেন—'কারুর উপদেশ না নিয়ে বা অর্থহীনভাবে এই গাছ রোপনের কথা আমার মাথায় আসে নি। আমি শুনেছি যে, বাঙালীদের কাছে এটি একটি আনন্দতরু।...আমি প্রস্তাব করছি যে, ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হোক অশোক তরুকে। শুধু এখানে নয়, এদেশের যেখানে যত মেয়েদের স্কুল আছে বা ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে সবখানে এই গাছ রোপিত হোক।'

স্কুলের বাড়ি তৈরীর ব্যয়ের সিংহভাগ বেথুন নিজেই বহন করেন। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ জন্য দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু বেথুন নিজে এই বাড়ি দেখে যেতে পারেন নি। বাড়ি তৈরী হওয়ার এক মাস আগে বেথুন এদেশের মাটিতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জুলিয়াস সীজার তার উইলে সমস্ত সম্পত্তি রোমানদের দিয়ে গিয়েছিলেন। বেথুন এদেশে তাঁর নিজস্ব বলে যা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ছিল সব দিয়ে গেলেন তাঁর স্কুলকে। ১২ আগস্ট, ১৮৫১ স্কুল দক্ষিণারঞ্জনের বৈঠকখানা বাড়ি থেকে উঠে এল নিজ বাড়িতে।

বেথুন চলে গেলেন। তাঁর সাধের স্কুলের সব দায়-দায়িত্ব যে মানুষটি এর পর প্রায় সতেরো বছর ধরে বহন করেছেন তাঁর নামই বহন করছে তাঁর পরিচয়—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বেথুন যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন নিজেই এই স্কুলের সব খরচ-খরচা জুগিয়েছেন। মাসে প্রায় সাত-আটশো টাকা। বেথুনের ইচ্ছা ছিল সরকার স্বয়ং স্কুলের দায়িত্ব বহন করুন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে ভারত সরকার বেথুনের ইচ্ছাটুকু স্বীকার করে নিলেন। সরকার পক্ষে সেক্রেটারী স্যার সিসিল বীডনের উপর এ ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পড়ল। স্কুলের সুপরিচালনার জন্য বীডন একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠন করলেন। কমিটির দশজন সদস্যের মধ্যে ছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি।

সভাপতি হলেন স্বয়ং স্যার সিসিল বীডন। সেক্রেটারী বিদ্যাসাগর। বীডন ও বিদ্যাসাগরের যুক্ত স্বাক্ষরিত একটি নোটিশে বেথুন-নির্দেশিত বিদ্যালয়ের আদর্শ ও পাঠ্য বিষয়াদি প্রকাশিত হল। হিন্দু ভদ্রঘরের মেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই ছিল বেথুনের উদ্দেশ্য। বেথুনের উদ্দেশ্য স্ফটিকের মত স্বচ্ছ মনে হয়েছিল সে যুগের কলকাতার অনেক নেতৃস্থানীয় বাঙালীর কাছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের মেয়ে সৌদামিনী দেবীকে পাঠিয়েছিলেন এই স্কুলে পড়তে। রামগোপাল ঘোষের বাড়ির মেয়েরাও পড়েছেন এই স্কুলে।

ঠিক কবে কিভাবে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'-এর নাম পাল্টে প্রতিষ্ঠাতার নাম স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা জানা যায় না। তবে ১৮৬২-৬৩ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে স্কুলের নাম সর্বপ্রথম 'বেথুন স্কুল' বলে উল্লিখিত হয়। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তখন কলকাতা ও আশপাশে বেথুন স্কুলের দেখাদেখি অনেক নতুন মেয়েদের স্কুল গড়ে উঠেছে। এসব স্কুলের জন্য সরকারের খরচ বলতে কিছুই ছিল না। কলকাতার বেথুন স্কুলই তখন একমাত্র অবৈতনিক সরকারী স্কুল। ছাত্রী সংখ্যা বিরানব্বই। বছরে ছাত্রীপিছু গড়ে দশটি টাকা গভর্নমেন্টকে ব্যয় করতে হত। কিন্তু এই সামান্য কটা টাকা ব্যয় করতেও তখন গভর্নমেন্টের গায়ে ফোস্কা পড়ত। তাই হঠাৎ ধুয়া উঠল, এত খরচ করা সরকারের পোষাচ্ছে না, বিশেষ করে অধিকাংশ ছাত্রীই যখন প্রাইমারীর গণ্ডী পেরুনোর আগেই বিয়ে হয়ে যাওয়ায় স্কুল ছেড়ে দিচ্ছে। এক টাকা করে ফী ধার্য হল। বিদ্যাসাগর বাধা দিয়েছিলেন। সেই মানুষটি বুঝেছিলেন যে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষার তখন শৈশব। এ অবস্থায় উৎসাহের অভাবে বেথুনের অশোক তরু শুকিয়ে যাবে। কিন্তু সরকার শুনলেন না। যেমন সরকার বিদ্যাসাগরের আপত্তি সত্ত্বেও শিক্ষয়িত্রী তৈরীর জন্য বেথুন স্কুলে একটি নর্মাল স্কুল খোলার পারমিশন দিয়েছিলেন মিস মেরী কার্পেন্টারকে।

বিদ্যাসাগরের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল—যে দেশে ছেলেবেলাতেই মেয়েদের স্কুলে পড়তে পাঠানো হয় না, সেখানে নর্মাল স্কুলের জন্য বয়স্কা মেয়ে জুটবে কোত্থেকে? গভর্নমেন্ট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরও ইস্তফা দিলেন সেক্রেটারী পদে। গভর্নমেন্ট বেথুন ও নর্মাল স্কুল দুটোকে খাস সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু তিন বছরও গেল না। মেয়ের অভাবে নর্মাল স্কুল উঠে গেল। সরকার বুঝতে পারল ভুল। এর পর বছরখানেক সরকারী তত্ত্বাবধানে থাকার পর স্কুল তুলে দেওয়া হল একটি বেসরকারী ম্যানেজিং কমিটির হাতে।

পাঁচজন সদস্যের কমিটি। বৌবাজারের ফিয়ার্স লেন যার নামে পরিচিত কলকাতা হাইকোর্টের সেই বিচারপতি জন বাড ফিয়ার হলেন সভাপতি। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, প্যারীচরণ সরকার, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় — সদস্য। সেক্রেটারী হলেন ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ। চব্বিশ বছর মনোমোহন এই দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সময়ে সামান্য একটি প্রাথমিক স্কুল থেকে ভারতের প্রথম মহিলা কলেজে পরিণত হয় বেথুন স্কুল।

কমিটি দায়িত্ব পেয়ে প্রথমেই টিউশন ফী বাড়িয়ে দিল—এক টাকার জায়গায় হল দু' টাকা। ফী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীসংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াল বাহাত্তরে। ছাত্রীসংখ্যা কমলেও স্কুলের পড়ানোর মান যথেষ্ট বাড়ল। তবু গভর্নমেন্টের গোঁসা যায় না। একটা সামান্য প্রাইমারী স্কুলের জন্য এত খরচ!

সরকারী গোঁসা কমানোর একটা উপায় ঠাওরালেন মনোমোহন। ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন 'ভারত আশ্রম' স্থাপন করে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুল খোলেন। ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাই ছিলেন এই স্কুলের ছাত্রী। এ-সময়ে কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দু টুকরো হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র নারী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন মেয়েদের আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন না যে, মেয়েদের হায়ার ম্যাথেমেটিকস, জিওমেট্রি বা লজিক পড়ার কোন দরকার আছে। শিক্ষার ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মাঝে ভেদ থাকা দরকার বলেই তাঁর ধারণা ছিল। কিন্তু মেয়েদের উচ্চশিক্ষা সমর্থকরা এতে চটে গিয়ে বালীগঞ্জে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি বোর্ডিং স্কুল খুললেন। স্কুলের সব ব্যয় বহন করতেন দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ও আনন্দমোহন বসু। এ-সময় বিলেত থেকে মিস এক্রয়েড কলকাতায় এসে মনোমোহনের বাড়ীতে উঠেছিলেন। মিস এক্রয়েডের হাতে স্কুলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। বছর কয়েক পরে স্কুলের আদ্যাক্ষরটি বাতিল হয়ে গিয়ে স্কুলের নাম হল—বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। এই স্কুলটি তখন বাংলাদেশে মেয়েদের ইউনিভার্সিটি স্ট্যাণ্ডার্ডের পড়াশুনার

একমাত্র জায়গা বলে গণ্য হোত। মনোমোহনের চেষ্টায় এবং বেথুন ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের পরিচালকদের ইচ্ছায় স্কুলদুটো মার্জ করে গেল ১৮৭৮ সালে। ফলে প্রাইমারী স্তর থেকে সেকেন্ডারী স্তরে উঠে এল বেথুন স্কুল। সরকারের গোঁসা একটু কমল।

এই মার্জার বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে একটি প্রধান ল্যাণ্ড-মার্ক হিসাবে পরিচিত। এই মার্জারের ফলেই, কতকগুলো নিয়মকানুন পালটাতে ইউনিভার্সিটি বাধ্য হল। বেথুনের কাদম্বিনী বসুকে এনট্রান্স পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার জন্য নিয়ম হল যে, এবার থেকে মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারবে—১৮৭৮ সাল। মাত্র এক নম্বরের জন্য কাদম্বিনী ফার্স্ট ডিভিসন পাননি। কিন্তু বেথুন যা চেয়েছিলেন, তাই সার্থক হয়ে উঠল কাদম্বিনীর এনট্রান্স পাস করার মধ্য দিয়ে —সমান সুযোগ পেলে মেয়েরাও ছেলেদের সমান ফল দেখাতে পারে।

সরকারী ও বে-সরকারী বিভিন্ন জায়গা থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি পুরস্কার সেদিন কাদম্বিনী পেয়েছিলেন। সরকারী পনেরো টাকা বৃত্তির সঙ্গে একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়—কাদম্বিনীকে ফার্স্ট আর্টস পড়তে হবে, নইলে স্কলারশিপ বাতিল হয়ে যাবে। কাদম্বিনী চান পড়তে, কিন্তু সুযোগ কোথায়? কাদম্বিনীর ইচ্ছাটুকু সফল করে তোলার জন্য গভর্নমেন্ট অধ্যাপক শশিভূষণ দত্তের তত্ত্বাবধানে বেথুনে এফ-এ ক্লাস খুলে দিলেন পরের বছর। ঠিক এর দু' বছর আগে দেরাদুনের ভুবনমোহন বসুর মেয়ে চন্দ্রমুখী বসু ইউনিভার্সিটির স্পেশাল পারমিশনে অনুষ্ঠিত একটি পরীক্ষায় পাস করে এনট্রান্স পাস করেছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পান। চন্দ্রমুখী তখন কলকাতায় এসে ফ্রী চার্চ নর্মাল স্কুলে এফ-এ পড়ছিলেন। কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী দুজনেই এফ-এ পাস করলেন। তখন গভর্নমেন্ট এদের আরো পড়াশুনার সুযোগ দেওয়ার জন্য বেথুনে বি-এ ক্লাস খুলে দেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দু' বছর আগে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী দুজনেই বি-এ পাস করেন।

কাদম্বিনী পড়তে চেয়েছিলেন তাই বেথুন স্কুল কলেজে পরিণত হয়েছিল। চন্দ্রমুখী এম-এ পড়লেন বলেই বেথুনে মেয়েদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস খোলা হয়েছিল। কাদম্বিনী ডাক্তারী পড়তে চেয়েছিলেন বলে, মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষের সমস্ত ওজর-আপত্তি নস্যাৎ করে ছোটলাট স্যার রিভার্স অগাস্টাস টমসন আদেশ জারী করেছিলেন—ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের দরজা মেয়েদের জন্যও খুলে দেওয়া হোক। মাত্র তিরিশ বছরে কি বিশাল পরিবর্তন। যদি বেথুন সেদিন থাকতেন। তাঁর স্বপ্নের অশোক তখন ডালপালা ছড়িয়ে কত বড় হয়ে উঠেছে। কিছুই দেখে যেতে পারেননি। প্রাইমারী স্কুল হয়ে উঠেছে একটি কলেজ —ভারতের প্রথম মহিলা কলেজ।

কলেজ বিভাগ খোলা হলেও সরকারী স্বীকৃতি আসতে আসতে প্রায় দশটি বছর কেটে গেছে। ১৮৮৮ সালে কলেজ ডিপার্টমেন্টটি নিয়ে গঠিত হল বেথুন কলেজ। স্কুলের নাম পাল্টে হল বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। এ-সময়ে স্কুলের ছাত্রী-সংখ্যা শতের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে।

এম-এ পাস করে চন্দ্রমুখী বসু হলেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও স্কুলের হেড-মিসট্রেস হয়ে এলেন উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ বাঙালী শিক্ষক রামতনু লাহিড়ীর ভাইঝি রাধারাণী লাহিড়ী। গত শতাব্দীর আশীর যুগে যেসব স্বনামধন্য মহিলারা এই স্কুলে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি নাম আজও আমাদের সকলের পরিচিত—কামিনী রায়। কবি কামিনী রায় এনট্রান্স পাস করেছিলেন কামিনী সেন নামে। কুমুদিনী খাস্তগীর (পরে দাস) এ-সময়ে বেথুন স্কুল থেকেই পাস করেছেন। পাস করেছেন দুর্গামোহন দাসের মেয়ে, পরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী, অবলা দাস। এ-সময়েরই অন্যতম ছাত্রী সরলাবালা ঘোষাল।

প্রাইমারী স্কুল থেকে সেকেন্ডারী—তারপর কলেজ। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে বেথুন স্কুলের সুনাম। বেথুন-বিদ্যাসাগরের স্কুল দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে চালিয়ে এসে, সুনামের শিখরে মনোমোহন মারা গেলেন। তখনও শতাব্দী পূর্তির বাকি চারটি বছর।

মনোমোহনের মৃত্যুর পর ও ইউনিভার্সিটির নিউ রেগুলেশন চালু হওয়ার আগে বেথুন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হিসাবে সাত বছর কাজ করেন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী জানকীনাথ ঘোষাল।

নতুন শতাব্দীর সূচনায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল স্কুলের ইতিহাসে। ইউনিভার্সিটির নিউ রেগুলেশনে পুরোনো পরিচালন সমিতি ভেঙে স্কুল ও কলেজের জন্য আলাদা আলাদা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠিত হল। নতুন ব্যবস্থায় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট হলেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও সম্পাদক নিযুক্ত হলেন হেড মিসট্রেস। পরিচালন সমিতি আলাদা হলেও স্কুল ও কলেজ বসত একই বাড়ীতে। কিন্তু ছাত্রী বাড়ায় ফলে জায়গার অভাব ভীষণভাবে দেখা দিল। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে গভর্নমেন্ট স্কুল ও কলেজের জন্য পশ্চিমধারের শিমলা বাজার দখল করে নিলেন। যে-কারণে বাড়তি জায়গা নেওয়া হল, সেই বাড়ি তৈরির কোন ব্যবস্থাই সরকার করেননি। নতুন শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকে এ-যুগের কৃতী বাঙালী মহিলাদের অনেকেই বেথুন স্কুলে পড়েছেন। সীতা দেবী, শান্তা দেবী, বেথুন কলেজের নামকরা প্রিন্সিপ্যাল তটিনী গুপ্ত (পরে দাস), সুজাতা বসু (পরে রায়) এ-সময় বেথুন থেকেই ম্যাট্রিক পাস করেন।

স্কুল থেকেই কলেজের উৎপত্তি। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষা স্কুলের সভাপতি হওয়ায় পরবর্তী সময়ে স্কুলের ব্যাপারে কিছু কিছু বৈষম্য চোখে পড়ে। ১৯১৮ থেকে ২৮ প্রায় দশ বছর মিস জি এম রাইট ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। মিস রাইট কলেজের জন্য একতলা মেন বিল্ডিংটি নিয়ে স্কুলের জন্য পাশের জমিতে কতকগুলো টিনের শেড তুলে দেন। আমরা ঐ টিনশেডেই পড়াশুনা করেছি—আগুন দিয়ে

দেখালেন হেডমিসট্রেস অমিয়া হালদার। বিশের যুগে তিনি বেথুন স্কুলেরই ছাত্রী ছিলেন। অমিয়া দেবী বললেন—আমাদের সময়ে হেডমিসট্রেস ছিলেন হিরন্ময়ীদি (হিরন্ময়ী সেন)। আমরা তখন অনেকেই স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকতাম। আগে ঐ বোর্ডিংয়ে স্কুল-কলেজ দুটো ডিপার্টমেন্টের মেয়েরাই থাকত। এখন থাকে শুধু স্কুলের মেয়েরা। ঐ যে দেখছেন ঢুকতেই গেটের ডান হাতে দোতলা বাড়ি, ঐখানে ছিল আমাদের বোর্ডিংয়ের খেলার মাঠ। সাতান্ন-আটান্ন সালে আপগ্রেডিংয়ের সময় ঐখানে সায়েন্স ব্লক তৈরি হয়েছে। একটু থামলেন অমিয়া দেবী।

ঘুরে ঘুরে স্কুল দেখাচ্ছিলেন আমাকে। মেন বিল্ডিং এখন স্কুলের। ওখানে উঁচু ক্লাসের মেয়েদের ক্লাস ছাড়াও রয়েছে হেড-মিসট্রেসের বসবার ঘর, অফিস ও লাইব্রেরী-কাম-হল। তখন ঘরে ঘরে ক্লাস চলছে। হঠাৎ বড়দিদিমণির সঙ্গে আমাকে দেখে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ ক্লাসরুমের বাইরে ঘুরে এল। এ আবার কে? ঐ একই কৌতূহলী দৃষ্টি অনুসরণ করে মেন বিল্ডিংয়ের পশ্চিমে গিয়ে দেখলাম ড্রিল শেড—এখানে ড্রিল ছাড়াও মেয়েদের প্রার্থনার আসর বসে। মাঝখানে পুরোনো আমলের স্টেবল বিল্ডিং। বেথুন সাহেবের সময় মেয়েদের আনা-নেওয়ার জন্য ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াগুলো রাখা হত এখানে। এখন কলেজের ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ড্রিল শেড ও স্টেবল বিল্ডিংয়ের উত্তরে টিন শেড। এন সি সি-র অফিস ছাড়াও নীচু ক্লাসের মেয়েদের ক্লাসরুম হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী এল অক্ষরের মত শেড দুটি ঘিরে রয়েছে এক-ফালি ছোট্ট মাঠকে। মেয়েরা ওখানে খেল-ছিল। ওদের দেখেই বোধহয় মনে পড়ে গেল অমিয়া দেবীর প্রায় চল্লিশ বছর আগে ফেলে-আসা দিনগুলির কথা। জানেন, এক সময় এই মাঠে আমরা কত খেলেছি। টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, ক্রোকে, কাবাডি সব। তখন অ্যানুয়াল স্পোর্টস হত এই মাঠে—আজও হয়।

মাঠ ছেড়ে স্টেবল বিল্ডিং পেছনে ফেলে আবার আমরা মেন বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে ছোট্ট এক-টুকরো ফুলের বাগান। আস্তে আস্তে মনের গভীরে যত্নে তুলে রাখা ভ্রমর-কৌটো খুলে স্মৃতির ফুল একটি একটি করে তুলে এনে বললেন অমিয়া দেবী—জানেন, আমাদের সময়ে এখানে ছিল টেনিস কোর্ট। আজ আর কিছুই নেই। যেন আজও চোখের সামনে ছোট একটি কিশোরীকে দেখতে পাচ্ছেন টেনিস র‍্যাকেট হাতে খেলুড়েদের সঙ্গে মাঠময় ছুটে বেড়াতে। জিজ্ঞাসা করলাম, এত সব পাল্টাল কখন, কেমন করে? কবে আবার স্কুল কলেজের কাছ থেকে মেন বিল্ডিং ফিরে পেল? উত্তর এল—পাল্টেছে গত চল্লিশ বছরে। আস্তে আস্তে। একদিন এই স্কুলে পড়েছি, আজ এখানেই আমি হেডমিসট্রেস—মাঝে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। বয়ে গেছে হাজার পরিবর্তনের ঢেউ স্কুলের উপর দিয়ে।

হিরন্ময়ী সেন প্রায় কুড়ি বছর এই স্কুলে হেডমিসট্রেস হিসাবে কাজ করেছেন—১৯১৯ থেকে ৩৮। তাঁর আমলের শুরুতে কলেজ মেন বিল্ডিং দখল করে-ছিল। কিন্তু ত্রিশের যুগের সূচনায় এক আন্দোলনের ফলে স্কুল তার হারানো বাড়ি ফিরে পায়। তখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল চন্দ্রমুখী বসুর বোন রাজকুমারী দাস। বেথুন তাঁর উইলে বাড়ীটি স্কুলকে দিয়ে গিয়েছিলেন। মিস রাইট স্কুলের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ আবার স্কুলকে স্ব-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে উইলের আর একটি বিষয়ের ওপর সবার চোখ পড়ল। শুধু হিন্দু মেয়েদেরই এই স্কুলে পড়বার অধিকার আছে। এতদিন সবাই ভুলে গিয়ে-ছিলেন ব্যাপারটা। অতীতে হিন্দু ছাড়াও অজস্র খৃশ্চান ছাত্রী এই স্কুলে পড়েছে। উইল ঘাঁটতে গিয়ে অন্য ধর্মের মেয়েদের কাছে স্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটি কথা—বেথুনের সময় আর আজকের দিনে অনেক তফাৎ। বেথুন যখন উইল করেছিলেন, তখন শিক্ষার ঢেউ সবেমাত্র হিন্দু সমাজের তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। আজ শিক্ষার বীজ এদেশের প্রতিটি ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই মনে হয় বেথুনের উইলের স্পিরিটের প্রতি পুরো মর্যাদা দেখাতে হলে স্কুলের দরজা জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সবার জন্যই উন্মুক্ত হওয়া দরকার। এ-কাজ একমাত্র সরকারই করতে পারেন।

হিরন্ময়ী সেনের আমলেই ত্রিশের যুগের মাঝামাঝি স্কুলের ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে শুরু করে। এর প্রায় দু' যুগ আগে কলেজের ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখে মুখে হিরন্ময়ী সেন রিটায়ার করেন।

পরবর্তী দশটি বছর যেন স্কুলের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গভর্নমেণ্ট এ আর পি-র জন্য স্কুল ও কলেজ-বাড়ি দখল করেন। সে-সময় একটি বছর বন্ধ থাকার পর সাময়িকভাবে সায়েন্স কলেজের উল্টোদিকে বিদ্যাসাগর বাণীভবনে স্কুল বসেছে তিন বছর। যুদ্ধের শেষে আবার স্কুল তার পুরোনো আস্তানায় ফিরে এল। প্রত্যাবর্তনের মধ্যেই বেজে উঠল শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসবের বিজয়-শঙ্খ—১৯৪৯ সাল। আধুনিক ভারতের প্রথম মহিলা বিদ্যায়তনের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে সভাপতিত্ব করতে এসেছিলেন বরোদা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীমতী হংসরাজ মেটা, 'ভারতের প্রথম মহিলা উপাচার্য'। তখন স্কুলের হেড-মিসট্রেস সুপ্রভা সেন।

হিরন্ময়ী সেন থেকে সুপ্রভা সেন। এই চল্লিশ বছরে প্রায় ছ'শ মেয়ে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার্থী-দের শতকরা পঞ্চাশজন পাস করেছে ফার্স্ট ডিভিসনে। পঁয়ত্রিশটি স্কলারশিপ এই চল্লিশ বছরে স্কুলের মেয়েরা পেয়েছে। আজকাল মেয়েরা পরীক্ষায় ভাল ফল দেখালে বড়জোর বৃত্তিস্বরূপ কিছু টাকা পায়। কিন্তু এই শতাব্দীর একেবারে শুরুতে বেথুন কলেজের পুরস্কার-বিতরণী উৎসবে যোগদান করতে এসে ছোট-লাট স্যার জন উডবার্ণের স্ত্রী লেডী উড-বার্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কলেজের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রীকে প্রতি বছর একটি করে সিল্কের শাড়ি পুরস্কার দেবেন। মেয়েরাই ভাল বলতে পারবেন টাকা, না শাড়ি কোনটা প্রাইজ হিসাবে তাদের মনের মত।

তবে একটি দিনের কিছু সময়ের আলোচনা থেকে বুঝেছি, হায়ার সেকেণ্ডারী শিক্ষা-ব্যবস্থা অমিয়া দেবীর মনের মত নয়। তিনটে স্ট্রীমে—হিউম্যানি-টিজ, সায়েন্স ও হোম সায়েন্স—আজ প্রায় পাঁচশো ছাত্রী বেথুনের সেকেণ্ডারী সেক্সনে পড়ছে। প্রাইমারী ছাত্রী-সংখ্যা প্রায় সোয়া দু'শ। অতীতের মত আজও স্কুল-রেজাল্টের ট্র্যাডিশন বজায় রেখে চলেছে। তবু অমিয়া দেবী সুখী নন। তিনি মনে করেন, নতুন ব্যবস্থায় মেয়েদের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অতীতের তুলনায় আজকের ছাত্রীদের ডেপ্থ অনেক কম। কারণ জিজ্ঞাসা আর করিনি। যে-স্কুলে যখনই গেছি, দেখেছি একই হতাশার ছাপ শিক্ষকদের মুখে। সত্যিই কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকস! যাঁরা নতুন যুগের মানুষ গড়বেন, তাঁদের বাদ দিয়েই নতুন কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভিন-দেশী শিক্ষা-পদ্ধতি এ-দেশের জলবায়ুর উপযোগী কিনা, সে-কথা বিবেচনা করার সময় ছিল না কর্তৃপক্ষের। যা হোক একটা নতুন কিছু কর—এই নতুন করার উত্তেজনায় তাঁরা সব ভুলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ভোলেননি অমিয়া দেবী। ইণ্টারভিউ শেষে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম একটা প্রশ্ন শুনে। মেন বিল্ডিংয়ের হাতায় সদ্য বেড়ে-ওঠা কচি কচি পাতায় ছাওয়া একটা গাছ দেখিয়ে বললেন—বলতে পারেন কি গাছ এটা? বোটানীর ছাত্র নই, গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা নেহাৎই কম। নিরুপায় হয়ে বললাম—চিনি না। হাসি ঝলমল জবাব এল—অশোক গাছ। লেডী মিন্টো যে চারাগাছ পুঁতেছিলেন, সময়ের স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের সময় নতুন করে অশোকের চারা পোঁতা হয়েছিল। ঐ চারাগাছটিরই বয়স আজ কুড়ি। শতকুড়ি যৌবন যুগে যুগে ফিরে পাক অশোক তরু। ওর মাঝেই বেথুনে অমর হয়ে থাকবেন।

ভাবতে ভাবতে সামনে চেয়ে দেখি বাস আসছে। এবার বাড়ি ফেরার পালা।

—সন্ধিৎসু

পরের সংখ্যায় : কৈলাস বিদ্যামন্দির

ভিনদেশী বিচিত্রা

জার্মাণীর কোন একটি মধ্যে সাপ্তাহিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের তিন বছর পূর্ণ হওয়ায় 'একজন মহিলা এবং ৫০ কোটি মানুষ' শিরোনামে রচিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে প্রধান মন্ত্রিত্বের পদে আরোহণ করার তিন বছর পর আজ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলতে গেলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দীর্ঘদিন স্বামীহারা ৫১ বছর বয়স্কা শ্রীমতী গান্ধী প্রাথমিক প্রমাণ দিয়েছেন যে, একজন পুরুষের মতোই এত বড় এক রাষ্ট্রের পরিচালনা একজন মহিলা দক্ষতার সঙ্গেই করতে পারেন। তুলনামূলক উদাহরণের জন্য আমরা ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করি অর্থাৎ সেই অতীতে যেখানে ইউরোপীয় সর্বেশ্বরবাদ এবং একেবারে মারিয়া থেরেসা ও ক্যাথারিন দি গ্রেটের কাল। এই তুলনা অবশ্য সঠিক হবে না। কারণ, এ'দের সঙ্গে তুলনায় শ্রীমতী গান্ধীর সবই আছে একমাত্র সর্বেশ্বর হওয়ার ইচ্ছা ছাড়া। এই রকম একটা সংজ্ঞা বরঞ্চ তাঁর পিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু তাঁর তুলনায় শ্রীমতী গান্ধীকে নিজের পার্টির মধ্যে অনবরত নানা বিরোধিতা এবং প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়।

শাস্ত্রীজীর পরলোকগমনে সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ইচ্ছায়ই প্রধানত ইন্দিরাজী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। অবশ্য তখন তাঁর দল কংগ্রেসের প্রাধান্য ছিল অপ্রতিহত এবং সব রাজ্যেই কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতাসীন ছিল। কংগ্রেসের সেই প্রভাব এখন অনেকখানি সংকুচিত হয়েছে আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সকলে কংগ্রেসীও নন। শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এবং বহুভাষী ভারতে আঞ্চলিকতার জন্যেও কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়েছে।

তাঁর পিতার মত ইন্দিরাজীর সেই আকর্ষণ-বিমোহন ক্ষমতা নেই। ইন্দিরাজী হচ্ছেন রাজনীতিকদের মধ্যে রাজনীতিক। নিজের দলের প্রধানদের সঙ্গে এবং রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে ব্যবহারে তিনি কৌশলী বিবেচনার উপর নির্ভর করে চলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কিছুটা গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলেন। যে বিশেষ গুণ তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তা হলো তাঁর নির্ভীকতা। অনাপেক্ষিক সাহস, যা তাঁর দেশের পুরুষদের মধ্যেও বিরল।

নানা বিচ্যুতির মধ্যে ও বিশ্বের ফুটন্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁকে উল্লেখযোগ্যই বলতে হয়। যা থেকে ভারত মুক্ত নয়—সেই আঞ্চলিক এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মোটামুটি একটা আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে। ১২টি ভাষা এবং ব্যাপক রীতি-নীতির বৈচিত্র্যমণ্ডিত গতিপ্রকৃতির আবেগকে আগে যেমন সহজেই অতিক্রম করা গিয়েছিল এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না। এখন যেকোন মুহূর্তে বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। সেইসঙ্গে ১৯৬২ সালে চীন এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্থানের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষ জড়িয়েও কোন দূর-প্রসারী ক্ষতি কিছু হয়নি।

অবশেষে বলা যায়, শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের উপর যে দায়িত্ব এবং দুর্ভাবনার গুরুভার রয়েছে পশ্চিম জার্মাণীতেও তার গুরুত্ব দেওয়া হয়। আসল কথা, এশিয়ার ভবিষ্যৎ রূপকল্প ভারতের স্থায়িত্বের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

●

শতায়ু স্ত্রীলোকের সংখ্যায় সবদেশই আজ কম-বেশি গৌরবান্বিত। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিই বোধহয় অন্য সবাইকে টেক্কা দিয়ে চলেছে। সম্প্রতি পাওয়া এক খবরে জানা গেছে বুলগেরিয়ায় ২৫৯ জন স্ত্রীলোক আছেন যাঁদের বয়স একশো অতিক্রম করে ক্রমেই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ'দের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠা হলেন কাইউসটেণ্ডিল শহরের ঠাকুমা ডি গোরোভা। এই ভদ্রমহিলার বয়স ১২০ বছর।

সমস্ত শতায়ু মহিলাকে সেরোনটলাজ ও সেরিয়াটিকসের অধীনে এবং পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। এই খবরটি সেখান থেকেই পাওয়া।

এই শতায়ুরা বেশিরভাগই আসছেন সেই সব পরিবার থেকে যেখানে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের পিতা-মাতার সন্তান সংখ্যা ৪ থেকে ৯ জনের মধ্যে। তাঁদের বিয়েও হয়েছে অল্পবয়সে। সাধারণত ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যেই এ'রা বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলেছেন। এবং শারীরিক দিক থেকে যতদিন সম্ভব ততদিন তাঁদের সন্তান হয়েছে। এ'রা প্রায় সকলেই অনেকদিন সম্পূর্ণ কর্মক্ষম ছিলেন। মোটামুটিভাবে, সবাই ৭০ থেকে ৯০ বছর সুস্থ এবং সক্ষম দেহে কাজ-কর্ম চালিয়ে গেছেন। জীবিকা বা চাকরি থেকে এরা অবসর নিলেও কর্মক্ষমতায় আজও এ'রা অটুট। ঘর-গেরস্থালির কাজকর্ম কেউ কেউ এখনো করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত এখান থেকে তাঁরা অবসরও নেবেন না।

এই প্রচণ্ড প্রাণশক্তি এবং জীবৎশক্তির উৎস কি? এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতামত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ'রা কাজ করেছেন খোলা আলো-বাতাসে এবং ক্ষেত-খামারে আর বাড়িতে। এই বিশুদ্ধ আলো-হাওয়া তাঁদের জীবনীশক্তির পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে। খাদ্যের দিক থেকেও তাঁরা এ ব্যাপারে অনেকটা সাহায্য পেয়েছেন। তাঁদের প্রধানতম খাদ্য হচ্ছে, রাই ও অপরিশ্রুত গমের রুটি, ফল, সব্জি, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য।

আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অধিকাংশ শতায়ু মহিলা তাঁদের জীবৎকালের মধ্যে গুরুতর পীড়ায় ভোগেননি।

●

ইউরোপের বড় বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ, হাসপাতাল ও কল-কারখানার ক্যান্টিনে একটি অবাক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। রান্নাঘরে উনুন নেই, ঘুঁটে নেই, কয়লা নেই, কেরোসিন বা গ্যাস স্টোভ নেই অথচ রান্না হচ্ছে। এবং তা হচ্ছে বলতে গেলে পলকে। একেবারে তাজ্জব ব্যাপার।

রান্নার কোন সরঞ্জাম নেই অথচ রান্না হচ্ছে। মনে তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, রান্না হচ্ছে কিসে? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায়, রান্নাবাড়ার এই সহজতম উপায়টি হলো মাইক্রো ওয়েভ। এতে সম্পূর্ণ কৌতূহল চরিতার্থ হলো না। বিশদভাবে বলতে হয়, মাইক্রো ওয়েভ হচ্ছে বেতার তরঙ্গের মতো একরকম তরঙ্গ। রান্নাঘরে স্টোভ রয়েছে কিন্তু তা থেকে আগুন বেরুচ্ছে না, বেরুচ্ছে মাইক্রো ওয়েভ এবং তা দিয়ে আট মিনিটে রান্না হচ্ছে চার পাউণ্ডের রোস্ট, পনেরো মিনিটে ভেড়ার গোটা গর্দান, ঠাণ্ডায় জমানো মুরগির মাংস

কিংবা শাকসব্জি দ্রুত সিদ্ধ, মিনিটে আর সৌকুমার্যোর জন্য কাঁচা খাবার এক থেকে দু মিনিটে পরিবেশনের জন্য তৈরি। আমাদের অনেক মেয়েদের রান্নার অভিজ্ঞতায় এরকম বিদেশ কল্পনাই করা যায় না।

ইতিমধ্যে মাইক্রো ওয়েভের ব্যবহার চালু হয়েছে। তবে গিন্নীদের হাতের আওতায় এসে পৌঁছুতে বেশ কিছু সময় এখনো দেরি। কারণ এর দাম সাধারণের নাগালের বাইরে। একটা মাইক্রো ওয়েভ স্টোভের দাম ৭ থেকে ১০ হাজার টাকার মতো। তাই এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এখন দেখা যাক, মাইক্রো ওয়েভ কিভাবে কাজ করে। কাচ, পোর্সেলিন প্ল্যাস্টিক, কার্ডবোর্ড ও কাগজ ফুঁড়ে চলে যায় মাইক্রো ওয়েভ। অথচ সেগুলো পোড়ায় না বা তাতায় না। কিন্তু খাদ্যবস্তু মাইক্রো ওয়েভ শুষে নেয় এবং আণবিক স্তরের জন্য খুব চট করে সেগুলো তেতে ওঠে। ফলে ভেতর থেকে সবটা সমানভাবে রান্না হয়ে যায়।

সবাই আশা করছেন, ভবিষ্যতে মাইক্রো ওয়েভ স্টোভের দাম কমবে। আর তখন গেরস্থের ঘরেও এই স্টোভ অনেক খাটুনি ও পরিশ্রম বাঁচাবে। আপাতত এই ভেবে রান্নাঘরের উত্তাপ সহ্য করাটাও কম আনন্দের নয়।

—প্রমীলা

অর্থনৈতিক জীবনে দাম্পত্য শান্তি

এ যুগের দাম্পত্য জীবনে দৈনন্দিন জটিলতা ও অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে সমাজের এক অংশে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য চিন্তা করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আগেকার দিনে স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত জীবনে যে সহজ সরল সুরটি ছিল এখনকার দাম্পত্য জীবনে সে সুরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেকালে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর নিজ এলাকায় থেকে নিজ নিজ কর্তব্য করে যেতেন। স্বামী স্ত্রী ও সংসারের ভরণ-পোষণ-রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতেন এবং স্ত্রী ঘর-গৃহস্থালির একচ্ছত্র কর্ত্রী হিসাবে ঘরকন্না করতেন। এতে সামান্য খুঁটি-নাটি বিষয়ে অশান্তি থাকলেও বড় রকমের কোন ঝঞ্ঝাট আসার সুযোগ ছিল না। এর মূলে ছিল মানুষের আত্মকেন্দ্রিক অভাববোধ এবং অর্থনৈতিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য। রুজি-রোজগারের দায়িত্বটা একলা পুরুষের ওপরই ন্যস্ত থাকায় নারী-পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার তিক্ততা সমাজে প্রবেশ করতে পারেনি।

এখনকার সমাজে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে হাত মেলাতে হচ্ছে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটাই আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে; এই ব্যয়বহুল বিলাস-ব্যসনের যুগে মানুষের ক্রমবর্ধমান অভাববোধ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, এবং নিজ নিজ মর্যাদাবোধের খাতিরে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও অর্থকরী পথ নির্বাচন করে নিতে হচ্ছে। এখন স্ত্রী স্বামীর ভারস্বরূপ হয়ে থাকতে চায় না, স্বামী যেমন স্ত্রীকে তার অর্থকরী সাহায্যকারী হিসাবে কামনা করে, স্ত্রীও এখন শুধু স্বামীর ঘরের দায়িত্ব নিয়ে থাকতে রাজী নয়, স্ত্রী স্বামীর বাইরের কর্মজীবন ও অর্থকরী জীবনের দায়িত্বও নিতে অগ্রণী হয়েছে। স্বভাবতঃই এখন স্ত্রী আগেকার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে স্বামীর বাইজীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। যুগের দাবীতে তাকে স্বামীর সহধর্মিনী থেকে সহকর্মিনী হতে হয়েছে। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা গেছে, তার এই ব্যাপক কর্মবিস্তৃতির দাম্পত্যজীবনে শান্তির ব্যাঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অশান্তির মূলে রয়েছে স্ত্রীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, সংসার ও সন্তান পালনে অক্ষমতা, এবং স্বামীর ব্যক্তি-সত্তা ও চিরন্তন সংস্কারগত আদর্শের সঙ্গে বিরোধিতা। স্বামীর পক্ষে দাবী থাকে, স্ত্রী সংসারের সব কিছু দায়িত্ব পালন করে স্বামীর অর্থনৈতিক জীবনে সাহায্যকারী হিসাবে যোগ দেবে; অপর পক্ষে কর্মরত স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর এতগুলি আশা পূরণ করাও সম্ভব হয় না, তার স্বাধীন সত্তার জাগিয়ে সে স্বামীর কর্মজীবনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করতে প্রয়াসী হয়, তখন সংঘর্ষ হয়ে ওঠে অনিবার্য।

স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ক্রমবর্ধমান সাংসারিক অভাব-অভিযোগ এবং কঠোর জীবন-সংগ্রামে স্নায়বিক দুর্বল চিত্তের অসহনীয়তা আজকের দাম্পত্য জীবনে ক্রমশঃ জটিল কাঠামোর সৃষ্টি করছে যার পরিণাম পরস্পরের বিচ্ছেদ পর্যন্ত এগোয়। আধুনিক সমাজে এগুলি চরম সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এখন স্বামীর প্রভাব স্ত্রীর ওপর খানিকটা প্রতিহত হয়েছে পক্ষান্তরে স্ত্রী স্বামীর অর্থোপার্জন-ক্ষেত্রের সঙ্গী হওয়ায় স্বামীর অর্থনৈতিক জীবনে খানিকটা প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে। এখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি না থাকলে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী।

এখন দেখতে হবে এই পারস্পরিক বোঝাপড়াটা কিভাবে এবং কতদূর হওয়া সম্ভব। বলা বাহুল্য এতে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়েরই সমান দায়িত্ব রয়েছে। মূলত যখন স্ত্রী স্বামী ও সংসারের সাহায্যকারী হিসাবে রোজগারের পথ নির্বাচন করে, তখন পর্যন্ত সংসার ও স্বামীর কাছে তার কল্যাণময়ী মূর্তির প্রকাশ ঘটে, স্বামী ও সংসারের সঙ্গে তার সুসংহত ঐক্য বজায় থাকে। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতার উগ্র চেতনা এবং অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উন্মাদনার জোয়ারে ভেসে গেলে অনেক স্ত্রীকে স্বামী ও সংসারের কল্যাণকামী ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হতে দেখা যায়। স্ত্রীর পক্ষে এটি যেমন কাম্য নয়, তেমনি স্বামীর পক্ষেও অনেকগুলি ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনভিপ্রেত আচরণ করা দাম্পত্য শান্তির পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। চাকুরিরত স্ত্রীর কাছে আগেকার গৃহসর্বস্ব গৃহিণীর রূপ খুঁজে পাওয়া শক্ত, এ বিষয়ে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। উদার ও সংস্কারমুক্ত মন দিয়ে স্বামীর পক্ষে উপার্জনকারী স্ত্রীর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দেওয়া উচিত।

এ যুগে স্বামীর অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্ত্রীকে সঙ্গী হতে হচ্ছে বলে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুসন্ধিৎসা এবং সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেকালে স্বামীর রোজগারের বিষয়ে স্ত্রী কোনরকমেই দায়িত্ব নিত না। এখন যখন স্ত্রীকেও স্বামীর সঙ্গে সমানভাবে রোজগারের দায়িত্ব নিতে হয়েছে, তখন স্বামীর রোজগার বিষয়ে ও তার উপযুক্ত খরচ বিষয়ে স্ত্রীর সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বহু ক্ষেত্রে এই অজ্ঞতা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির কারণ হিসাবে দেখা যায়। স্বামী সৎ বা অসদুপায়ে যে করে হোক টাকা রোজগার করে নিজের জীবন কিংবা নৈতিক চরিত্রের ক্ষতি করে তথা বৃহত্তর সমাজের যে ক্ষতিসাধন করছে, এতে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্ত্রীর দায়িত্ব বড় কম নয়। সংসারের দৈনন্দিন দাবী, স্ত্রীর শাড়ি, গহনা, সামাজিক ফ্যাশান বৈচিত্র্যের দাবী, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ব্যয়, সামাজিক মান-মর্যাদার খেসারৎ ইত্যাদি দিতে গিয়ে স্বামীর সব সময়ে সৎ-অসৎ পথ চিন্তা করবার অবকাশ থাকে না। স্ত্রীই একমাত্র

সংযম ও বিচক্ষণতার সঙ্গে স্বামীকে এই অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে পারে। স্ত্রীর সহানুভূতিহীন ব্যবহারে স্বামীকে যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগার করতে হয় এবং ক্রমেই স্ত্রীর সঙ্গে গভীর ব্যবধান রচনা হয়। এতে যে শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই বিষময় হয় তা নয়, এর প্রভাব সংসারের উত্তরপুরুষের ওপর বিষমভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাবা মার দাম্পত্য কলহ, বাবার অর্থনৈতিক জীবনের দুর্নীতি, ক্ষেত্র-বিশেষে মায়ের এই দুর্নীতির প্রতি নীরব সমর্থন ছেলেমেয়েদের জীবনে যথেষ্ট কু-প্রভাব বিস্তার করে। ভাবী নাগরিক জীবনের সুরুতেই পচন সৃষ্টি হতে থাকে।

কাজেই যখন দেখা যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী অনিবার্যভাবেই অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছে, তখন দাম্পত্য জীবন শান্তিময় করতে হলে এবং তার চেয়ে বড় কথা উত্তরপুরুষ তথা জাতির ভবিষ্যৎকে দুর্নীতি-মুক্ত ও আদর্শপরায়ণ করে তুলতে গেলে স্বামীর ও স্ত্রীর উভয়েরই অর্থোপার্জন ক্ষেত্রে উভয়ের স্ব স্ব নীতিযুক্ত মর্যাদা সহকারে প্রভাব থাকা কর্তব্য। অর্থোপার্জন-কারী স্ত্রীর পক্ষেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উগ্রতায় যেমন স্বামীকে অগ্রাহ্য করে চলা উচিত হয় না, তেমনি স্বামীর পক্ষেও উচিত হয় না তার আর্থিক ব্যাপারে স্ত্রীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে সরিয়ে রাখা। যুগোপ-যোগীভাবে স্ত্রীকে স্বামীর অর্থকরী জীবনে সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী করে নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উভয়ের মিলিত অভিজ্ঞ পরামর্শে ও সামঞ্জস্য-বিধানে পরস্পর পরস্পরের সংকটমোচনে সাহায্য করতে পারে, অপরদিকে দাম্পত্য শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে একটি আদর্শ, সুখী পরিবার গড়ে তুলতে পারে। ক্রম-বর্ধমান দাম্পত্য বিরোধ ও বিচ্ছেদের যুগে এই রকমের আদর্শ সংসার ব্যক্তি-জীবনের পক্ষে তথা বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত কামনার বস্তু। দাম্পত্য জীবনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়ত বোঝাপড়ার মধ্যে সমগ্র সমাজের কল্যাণের বীজ নিহিত রয়েছে।

—গীতা রায়

সংবাদ

এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে শ্রীমতী পার্বতী গাঙ্গুলি এবং শ্রীমতী দীপালি দাস। বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন শ্রীমতী দীপালি এবং দ্বিতীয় হয়েছিলেন শ্রীমতী পার্বতী।

●

সংবাদে প্রকাশ, মহিলাদের নতুন কয়েকটি ট্র্যাকের প্রতিযোগিতা আগামী অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হয়েছে। ১৫০০ মিটার দৌড়, ৪×৪০০ মিটার রিলে ও ১০০ মিটার হার্ডলস হলো এই নতুন ট্র্যাক। ৮০ মিটারের পরিবর্তে ১০০ মিটার হার্ডলসকে গ্রহণ করা হয় এবং ২০০ মিটার হার্ডলসের প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি।

প্রতিবেশী রূপসী

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

দেখতে দেখতে পশুপতিনাথের খাস-মহলে এসে পড়ি। পৌঁছুই কাঠমাণ্ডু।

কাঠমাণ্ডু পৌঁছে মনে হয়, রূপকথার রাজপুত্তুর আমি। গহন গিরি-কন্দর পেরিয়ে এই আমি রাজধানীতে এলাম। রাজধানী আলো-ঝলমল। কী যেন একটা কাঠি সোনার না রুপোর ছোঁয়া পেয়েছে সে। পেয়ে অতিথি-সমাগমের সমারোহে মেতেছে।

অতিথি অনেক আসে এ-সময়ে। এই সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে মার্চের শুরু অবধি অনেকেই এখানে এসে ভাবে, আমি রূপ-কথার রাজপুত্তুর।

রূপকথার আর দোষ কী! দোষ কী রাজপুত্তুরের! বিরাট বিপুল একটা দেশ হঠাৎ যদি এই এত্তটুকু হয়ে উঠে সাঁঝের আলোয় নিজেকে মেলে ধরে তো কী উপায়!

কাঠমাণ্ডুতে পা দিয়ে মনে হল, তাই তো! কী উপায়! রহস্যপুরী নেপাল এখানে যে এত্তটুকু হয়ে উঠেছে। এখানে সে বড়ো নিজেকে ছোট করে মেলে ধরে বলছে, দ্যাখ আমাকে।

দেখবো, কাঠমাণ্ডুর বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবি সেদিন। ভাবি, দেখবো না কেন? রহস্যের এমন বাহারী রঙমহলের একবার যখন হদিস পেয়েছি, তখন কেন দেখবো না? আর কেনই বা রঙমহলকে একবার একটু ছুঁয়ে নিয়েই বলবো, যাই তবে?

রঙমহল যে জমজমাট ওদিকে; দূরাগত অতিথিদের ভিড়ে যে ভরো ভরো।

অতিথির আবার রকমফের আছে। আছে ক্যাটিগরী বা শ্রেণীবিভাগ। পয়লা নম্বর শ্রেণীতে যাঁরা পড়লেন,, তাঁরা হলেন রাজ-অতিথি বা 'স্টেট-গেস্ট'। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে 'ডি-লুকস হোটেল' আগে থাকতেই 'বুক' করা থাকে। আর যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর, তাঁরা এতসব বুক-টুকের ধার ধারেন না; তাঁরা হাতের কাছে সস্তা দরের যে-হোটেলটা পান, অথবা যে-ধর্মশালা বা আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি, তাতেই ওঠেন।

কাঠমাণ্ডুর অতিথি-তালিকায় আমি এই শেষোক্ত শ্রেণীর সর্বশেষ পংক্তিটাতে পড়ি। অর্থাৎ, পড়ি সেই দলে, যাঁরা হোটেলে না গিয়ে ধর্মশালায় যান এবং শেষপর্যন্ত ধর্মশালায়ও সুবিধে করতে না পেরে আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়েন।

কড়া আমিও নাড়লাম। এক সন্ধ্যায় কাঠমাণ্ডুতে বন্ধু শ্রীপ্রদীপ চৌধুরীর বাড়ির কড়াটা প্রাণপণে চেপে ধরলাম আমি।

বন্ধু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে এলেন এবং অভ্যর্থনার ভেলকী দেখালেন অচিরেই।

অতএব অচিরেই তৃতীয় শ্রেণীর সর্ব-শেষ পংক্তির অতিথি হওয়া সত্ত্বেও আমি আবার নিজেকে রূপকথার রাজপুত্তুর বলে ভাবতে পারলাম।

ভাবতে কেন পারবো না? সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জায়গায় ততোধিক অপরিচিত একটা গলি ছত্রপটিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে যদি বিনা আয়াসেই বের করে ফেলতে পারি এবং যদি সেই গলিতে বস-বাসকারী বন্ধুর বাড়িও বের করতে পারি নম্বর ছাড়াই, তবে কেন নিজেকে রূপকথার নায়ক ভাবতে পারবো না?

রূপকথার নায়ক কি আমাদের চেয়ে বেশি দুরাভিসারী? একেবারে নতুন একটা জায়গায় আলো-ঝলমল রাজপথ পেরিয়ে হঠাৎ গা-ছমছমে গলিপথের অন্ধকারে ঢুকে পড়তে সে কি একবারও বিচলিত হয় না? একবারের জন্যেও কি মনে হয় না, পংখী-রাজের মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করি এবার?

জানি নে, এ-হেন সংকটের মুহূর্তে এমনিতরো সব ভাবনা তার মনে আদৌ আসে কিনা। তবে এটুকু বেশ জানি যে, আমরা ভাবিনি এসব। জেব্রার গায়ের মতো ডোরাকাটা ট্যাক্সী নামক আমাদের পক্ষী-রাজটি যখন হায়েনার দৃষ্টি মেলে গলির ভিতর ঘোরাঘুরি শুরু করল, তখন আমরা অবকাশই পাইনি ভাববার যে, কোনটা ভালো,—পশ্চাদপসরণ? না ওই হায়েনার দৃষ্টিকে অনুসরণ?

আজ ভাবি, হায়েনাই বটে, পাহাড়-পুরীর আঁধারে সব গাড়ির আলোই হায়েনার চোখ।

আর ভাবি, কাঠমাণ্ডুর রাজপথে ভাড়াটে সব গাড়িই জেব্রা—ঠিক জেব্রারই মতো ডোরা ডোরা, কাটা কাটা।

কিন্তু তবু থাকগে, মরুক গে ডোরা-কাটা জেব্রা। ওদের চেপে তো আর কাঠ-মাণ্ডুর রাজপথে চক্কর মারিনি, মেরেছি পায়ে হেঁটে। রাজধানীর বারো আনারও বেশি আমরা দেখেছি হাঁটা-পথে। অতএব আমাদের কাছে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর গল্প মানে, পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর গল্প, দেখে দেখে চেখে-বেড়ানোর গল্প।

বেড়ানোর শুরু কাঠমাণ্ডু পৌঁছুবার পরদিন থেকেই। পরদিনই খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়লাম।

আমাদের 'হোস্ট' প্রদীপ চৌধুরী পরামর্শ দিলেন, কাঠমাণ্ডু এসেছেন; পশু-পতিনাথকে দর্শন করুন আগে।

বললাম, বেশ! তাই করবো। চলুন পশুপতির দিকেই।

চললাম। ছত্রপটির কাঁচা ও এবড়ো-খেবড়ো গলিটাকে পিছনে ফেলে দ্রুত এগোলাম আমরা।

আমরা এগোলাম। কিন্তু কাঠমাণ্ডু কোথায়! রাজধানীর বহু লোকেরই যে ঘুম ভাঙেনি এখনও। এখনও যে ঘরবাড়িগুলোর অধিকাংশকেই তালা-আটকানো সিন্দুকের মতো দেখাচ্ছে।

প্রদীপবাবুর কাছ থেকে শুনেছিলাম, সিন্দুক আরও কিছুক্ষণ নাকি এইরকম দেখাবে; এবং তারপর খুলবে সব। তারপর ভার কাঁধে নিয়ে বাজারের দিকে যাবে কেউ, আবার কেউ যাবে তরকারি নিয়ে বা ঝুড়ি-ভর্তি মাংস নিয়ে।

মোষের মাংস খুব নাকি চলে এদিকে এবং নেপালীদের অনেকেই নাকি মাংসের সঙ্গে চিড়ে খেতে পেলে অন্য কিছু চায় না।

চায় না নেপালীরা আরও অনেক কিছুই, সেদিন বার বার মনে হল আমার; মনে হল, ওরা ভোরে উঠতে চায় না, রাস্তা পরিষ্কার রাখতে চায় না এবং চায় না ঠিক আমাদের মতোই কুসংস্কারকে ছেড়ে থাকতে।

কুসংস্কারের একটি গর্তে সেদিন আর একটু হলেই আমার পা ভাঙত; প্রদীপবাবু যদি আর এক মুহূর্ত পরে স্মরণ করিয়ে

দিতেন গর্তটির কথা, তবে নির্ঘাত ভাঙত আমার পা।

মনে পড়ে, সেদিন পথ চলতে চলতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিলেন তিনি, অ্যাই! দেখবেন!

—কী দেখবো? পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়ালাম।

—দেখবেন, সামনেই আছে গর্ত।

কয়েক পা এগিয়েই দেখি,—ঠিক। প্রদীপবাবু ঠিক বলেছেন। গর্ত একটা আছে বটে।

—কিন্তু গর্ত কেন? ওকে শুধালাম একবার, রাস্তার এই মাঝখানে কেন মরণ-ফাঁদ?

প্রদীপবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, আরে ছিঃ ছিঃ! বলেন কী! বলেন কী! অমন কথা আর মুখে আনবেন না।

—মুখে আনবো না? কিন্তু কেন?

—আনলে পাপ হবে। ঠাকুর শাপ দেবে।

সহযাত্রীর কথা শুনে আমি থ। বললাম,—শাপ, পাপ—কী বলছেন এসব?

—ঠিকই বলছি, প্রদীপবাবু বুঝিয়ে দিলেন,—এই যে দেখছেন গর্তটা, নেপালীরা নিয়মিত এর পুজো করে।

গর্তটার দিকে ভালভাবে তাকালাম এইবার; এবং তাকাতেই চোখে পড়ল পুজোর চিহ্ন। দেখলাম, কিছু ফুল রয়েছে ওর মধ্যে। আর রয়েছে কিছু চাল ও সিঁদুর।

প্রদীপবাবু বললেন, দেখছেন তো! এই হল ভেড়া সিং।

নাম শুনে স্তম্ভিত হলাম রীতিমত। শুধালাম, কী বললেন? ভেড়া সিং?

প্রদীপবাবু বললেন, হ্যাঁ। সত্যি ভেড়ার একটা মাথা আছে ওখানে।

—কিন্তু কোথায় মাথা?

—ভাল করে তাকান, ঠিক দেখবেন।

শেষ অবধি দেখলাম ঠিক। সান-বাঁধানো ওই গর্তের মধ্যে পাথরে-গড়া একটা ভেড়ার মাথা ঠিক আবিষ্কার করলাম। গর্তটা ফুট দুয়েক গভীর হবে। দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থেও হবে ঐরকম।

—এই ভেড়া সিং-এর দৌলতে পা ভাঙে না কারও?—প্রদীপবাবুকে শুধালাম একবার—

না, ভাঙে না বড় একটা—প্রদীপবাবু বুঝিয়ে দিলেন,—তবে নেহাৎই যদি কারো ভাঙে তো ভাবনা কী! সামনেই আছে কিল-টোল। ওখানে গিয়ে বিধিমত কাজ করলে ভাঙা জোড়া লাগে, ব্যথাও সারে।

বললাম, কিল-টোল? সে আবার কী জিনিস?

প্রদীপবাবু জানালেন, সে জিনিসটি এই ভেড়া সিং-এর মতোই পবিত্র।

—ভেড়া সিং আরও অনেক আছে বুঝি?

—তা আছে; এবং কাঠমাণ্ডুতে আমি যখন প্রথম আসি, তখন এই ভেড়া সিং-এর ভয়ে খুব সাবধানে পথ চলতে হত আমায়।

—সাবধানে আমাকেও চলতে হবে দেখছি।

চললাম আবার; খুব সাবধানেই চললাম। ভেড়া সিং সম্পর্কে একটা আতঙ্ক অনুক্ষণ ঘিরে রইল আমায়।

ওদিকে খানিকদূর এগোতেই দেখি পথের এক পাশে দেওয়ালে লাগানো এক বোলতার চাক।

প্রদীপবাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, চাক নয় মশাই। ওই হল কিল-টোল। গাছের একটা গুঁড়িতে পেরেক মেরে মেরে ওইরকম করা হয়েছে।

কিন্তু গুঁড়ি কোথায়। এগিয়ে গিয়ে দেখি, গুঁড়ি অদৃশ্য; দৃশ্য শুধু পেরেক আর অসংখ্য লোহার টুকরো।

প্রদীপবাবু বললেন, লোহার টুকরো আর পেরেকের আড্ডা বলেই এর নাম কিল-টোল। স্থানীয়দের কী ধারণা জানেন? ধারণা, এই কিলটোলে এসে একটি কিল বা পেরেক ফোটাতে পারলেই দেহের সব রকম ব্যথা-বেদনা সেরে যায়।

শুধালাম, সারে নাকি সত্যি?

প্রদীপবাবু বললেন, আরে দূর মশাই! আমার বাড়িতে কাজ করে যে কাঙ্গীটা, সেই যে সেই গঙ্গারাণী, ওকেই তো কতবার দেখলাম কিল-টোলে যেতে। কিন্তু কোন-দিন ওর কোন ব্যথা সেরেছে বলে তো শুনি নি।

—তবে হ্যাঁ, একটু থেমে আবার শুরু করলেন প্রদীপবাবু, একবার ও এক কাণ্ড বাধিয়েছিল বটে। কিল-টোলে গিয়ে কিল বসাবার সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বেচারী...অজ্ঞান কেন হবে না মশাই? কারও পিলে যদি এভারেস্ট-এর মতো ডাগর-ডোগর হয় এবং তারপর আবার যদি সেই পিলে পেকে ওঠে তো এতটা পথ হেঁটে এসে কিল-টোলে কিল বসাবার সময় কেন সে অজ্ঞান হবে না?

বললাম, অজ্ঞান হয়ে পথেই বুঝি পড়ে গিয়েছিল গঙ্গারাণী?

প্রদীপবাবু জানালেন,—হ্যাঁ, গিয়েছিল। কিন্তু তখন আমাদের রাণীটিকে পায় কে! দেবতার ভর হয়েছে ভেবে সবাই তখন ওকে পুজো করতে ব্যস্ত।

শুধালাম, পুজো আপনি দেখেছিলেন?

—দেখেছিলাম বৈকি! প্রদীপবাবুর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা, অফিস যাবার সময় সেই পুজো নিজের চোখে আমি দেখেছিলাম।

—কী দেখলেন আপনি?

—দেখলাম, ওর মাথা কিল-টোলে ঠেকানো; আর পা ঠেকানো ভক্তদের মাথায়। আর দেখলাম, ও অজ্ঞান এবং ভক্তরা সজ্ঞানে ওকে মেরে ফেলবার আয়োজন করছে।

—ভক্তদের হাত থেকে ওকে বাঁচালেন কী করে?

—সে অনেক কথা মশাই, অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে এটুকু শুধু বলতে পারি যে, ভক্তদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে আমার যে পরিশ্রম এবং অর্থদণ্ড হয়েছে, পিলের হাত থেকে বাঁচাতে তার অর্ধেকও হয় নি।

বললাম, হবে কী করে! পিলের ওষুধ ডাক্তার, আর ভক্তের ওষুধ ডাকিনী যে! এবং ডাকিনীর 'ভিজিটিং ফি' যে ডাক্তারের 'ফি'র চেয়ে চিরকালই বেশি।

প্রদীপবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন; বেশি। এবং সেদিন কিল-টোলে রীতিমত একটি পুজো দিয়ে ভক্তদের হাত থেকে আমি রেহাই পেয়েছিলাম।

—ভক্তরা চিরকালই এখানে উচ্ছ্বসিত। পথে-ঘাটে পুজো এখানে লেগেই আছে, কিল-টোল ছাড়িয়ে যেতে যেতে বললেন প্রদীপবাবু।

আমার মনে হল, ঠিকই বলেছেন উনি। পুজোর আসর পথে-ঘাটে অজস্রই তো দেখছি। দেখছি, ছোট-বড়-মাঝারি মন্দির—কাঠমাণ্ডুর রাজপথে কত যে মন্দির চোখে পড়ল, চোখে পড়ল কত যে বিচিত্র দেব-দেউল, তার ফিরিস্তি দিতে গেলে আমি তো কোন্ ছার, কয়েক ডজন ইতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের মিলিত উদ্যোগও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শুনেছি, পুরু লেন্স নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক আসেন কাঠমাণ্ডুতে। আসেন স্মিত-প্রাজ্ঞ পক্বকেশ সব ঐতিহাসিক। কিন্তু কাঠমাণ্ডুর মন্দির-রহস্যকে ভেদ করতে পারেন কি ও'রা?

কী করে পারবেন? কেমন করে পারবেন? এই যে আশান-চক অঞ্চল দিয়ে এখন আমরা চলেছি এবং আমাদের ঠিক সামনেই এখন চোখে পড়ছে জরাজীর্ণ, শ্যাওলাঢাকা, প্যাগোডার ঢং-এ গড়া এক মন্দির, কে ওটা গড়েছে, কেন গড়েছে এবং কবে গড়েছে, তা জানা কি এতই সহজ?

ভাবলাম, সহজ যদি হত তো রহস্যকে ভেদ করতে গিয়ে নতুন এক রাজধানীকে কবেই আবিষ্কার করতাম আমরা। তবে তো কবেই আমরা নেপালের ইতিহাসকে নতুন করে লিখে বলতাম, এই অমূল্য বস্তুটির পূর্ববর্তী সব সংস্করণে অমার্জনীয় কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে বলে লজ্জার অবধি নেই আমাদের।

কিন্তু ওদিকে পূব-আকাশ যে লজ্জিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সলজ্জ বধূটির মতো রাঙিয়ে উঠল সে। বধূটির চোখের আলো কোমল-মধুর; তাই পূব-পাহাড়ের চূড়ায় মিঠে রোদের হাতছানি।

—ওই পাহাড়গুলো খুব কাছে এখান থেকে, তাই না? প্রদীপবাবুকে শুধালাম একবার।

প্রদীপবাবু জবাব দিলেন, কাছে মানে দশ-বিশ মাইল দূরে।

—কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই নাগাল পাবো ওদের।

—নাগাল ঠিক পাবেন। কিন্তু হাতটা তার আগে স্বয়ম্ভুর কাছ থেকে ধার করে নিতে হবে।

শুধালাম, স্বয়ম্ভু আবার কে?

প্রদীপবাবু বললেন, এখানকার সৃষ্টি-কর্তা। আবার রক্ষাকর্তাও বটে।

বললাম, তার মানে?

—মানে-ফানে আমার জানা নেই, প্রদীপবাবু অকপটে স্বীকার করলেন,—তবে ইতিহাস ঘাঁটলে মানে জানা যাবে হয়তো।

খড়্গপাণি মঞ্জুশ্রী

জানা যাবে? সত্যি যাবে জানা?—ভাবলাম একদিন এবং কাঠমাণ্ডুর ইতিকথা লিখতে বসে সত্যি একদিন ইতিহাস-রাজপুরীর সদর দরজায় হত্যে দিলাম। দিয়ে দেখি, রাস্তটা হয়েছে অপরিমেয় এবং প্রদীপবাবু যেখানে শেষ করেছেন, ঠিক সেইখান থেকেই শুরু হয়েছে ইতিহাস।

সে-ইতিহাসে পাই বিস্ময়কর সব কিংবদন্তী আর উপকথা। পাই, এক সময়ে কাঠমাণ্ডু উপত্যকা ছিল জলভরা একটি হ্রদ। সেই হ্রদে বিচিত্র সব প্রাণী ঘুরে বেড়াত। কিন্তু কোন পদ্মফুল ফুটত না সেখানে। মানুষেরও সেখানে কোন চিহ্ন ছিল না।

চিহ্ন কী করে থাকবে? কী করেই বা মানুষ আসবে ওই হাজার-দু-হাজার ফুট গভীর জলপুরীতে? কিন্তু অবশেষে অবস্থার একদিন পরিবর্তন হল। দেবতার আশীর্বাদে ধন্য হয়ে উঠল ওই জলপুরী। একদিন ভগবান বিপাস্য বুদ্ধ এলেন ওখানে এবং এসেই একটি পদ্মের কুঁড়ির ওপর মন্ত্র উচ্চারণ করে সেটিকে ছুঁড়ে দিলেন হ্রদের জলে। ভগবান ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, এই কুঁড়ি থেকে যখন পদ্ম ফুটবে, তখন জ্যোতির্ময় স্বয়ম্ভু আবির্ভূত হবেন এখানে। একটি শিখার আকারে তখন তিনি এখানেই প্রবর্ত্ত হবেন।

এই ঘটনার দীর্ঘদিন পর একদিন শিখি-বুদ্ধকে বলতে শোনা গেল,—হ্যাঁ, এখানেই; এই পুণ্যপুরীতেই একদিন তাঁর আশীর্বাদ আলোক ছড়াবে। সেদিন কত লোক আসবে এখানে, আসবে কত তীর্থযাত্রী ও পর্যটক। এ জায়গাটা সেদিন রমণীয় হবে বলেই আসবে ওরা।

তৃতীয় বুদ্ধ বিশ্বভু ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, আসবে তো বটেই; ঠিক আসবে। ধনে-জনে এ অঞ্চল ঠিক একদিন ভরে উঠবে। কিন্তু তার আগে একজন বোধি-সত্ত্বের আবির্ভাব হওয়া চাই। এ-হ্রদের তলায় আছে যে মাটি, তার গায়ে সূর্যকিরণ লাগা চাই।

ইতিহাস বলে, বহুবাঞ্ছিত ওই সূর্য-কিরণ একদিন নাকি লাগল। জল সরে গিয়ে মাটি দেখা দিল ওখানে। কিন্তু কী করে দিল? সব কিংবদন্তী এই একই জিজ্ঞাসায় এসে থমকে দাঁড়ায়। এবং নানা মুনি এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে থাকেন নানাভাবে।

একদিকে সনাতনপন্থীরা বলেন, কাঠ-মাণ্ডু উপত্যকার মুক্তির মূলে আছে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ; আর অপরদিকে বৌদ্ধদের মত হল, মঞ্জুশ্রী মুক্তি দিয়েছেন একে। বিশ্ব-কর্মার মূর্তি ধরে এখানকার হ্রদটিকে তিনিই প্রদক্ষিণ করেছেন।

মঞ্জুশ্রী দেখলেন, হ্রদের জলকে ইচ্ছে করলেই সরিয়ে দেয়া যায়। ইচ্ছে করলেই নতুন একটা স্থলভাগ উপহার দেয়া যায় বিশ্বলোককে। খড়্গপানি তিনি। সেই খড়্গ দিয়ে পাহাড়ের খানিকটা জায়গা তিনি যদি কেটে দেন, তবে হ্রদের সব জল স্বচ্ছন্দেই বেরিয়ে যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কাটলেন তিনি পাহাড়। বাগমতী নদী বরাবর হ্রদের সব জলকে দিলেন বের করে। আর দেখতে দেখতে সূর্যকিরণ এসে লাগল হ্রদের তলাকার মাটিতে। কাঠ-মাণ্ডু-উপত্যকার জন্ম হল।

তখন মঞ্জুশ্রীর শিষ্যরা বললেন, পদ্ম-ফুল এতদিনে ফুটেছে। স্বয়ম্ভু আবির্ভূত হয়েছেন এতদিনে। অতএব গড়ো স্তূপ। পদ্মফুল যেখানে ফুটেছে, ঠিক সেখানেই স্বয়ম্ভুনাথের পুণ্যতীর্থ গড়ে তোল।

শোনা যায়, তীর্থ গড়ে উঠল অচিরেই। কাঠমাণ্ডু শহরের ঠিক পাশেই গড়ে উঠল স্বয়ম্ভুনাথের বিরাট স্তূপ।

পশুপতিনাথ যাবার সময় দূরে থেকে সেই স্তূপ চোখে পড়ল আমাদের। স্তূপ রয়েছে পশ্চিমে, আর আমরা এগোচ্ছি পূবে। কাঠমাণ্ডুর চৌরঙ্গী ত্রিভুবন রাজপথ পেরিয়ে, রত্না পার্ক ছাড়িয়ে দ্রুত এগোচ্ছি আমরা।

এতক্ষণে সূর্য উঠেছে। লোক-চলাচল বেড়েছে রাজধানীর পথে পথে; আর গাড়ি-ঘোড়াও চলতে শুরু করেছে। কিন্তু আমরা কতক্ষণ আর চলবো! দেখতে দেখতে প্রাসাদ-আকীর্ণ কাঠমাণ্ডুকে যে পিছনে ফেলে এলাম। নিঃসঙ্গ ও নিঃস্তব্ধ একটি পথ ধরলাম যে এবার।

পথটা এক পাহাড়ীয়া নদীকে ডিঙিয়ে পশুপতিনাথের মহল্লা বরাবর চলে গেছে।

মহল্লাই বটে,—আজ ভাবি, সত্যি বটে মহল্লা। মন্দির তো আসলে উপলক্ষ্য; লক্ষ্য মানুষ। এবং এই মানুষের কত দুঃখ-সুখের ইতিকথা প্রকীর্ণ এখানে।

এখানেই একদিন দক্ষিণ ভারত থেকে ছুটে এসেছিলেন প্রবল-পরাক্রান্ত ধর্মদত্ত। কাঞ্জিভরমের সম্রাট তিনি। তাঁর নির্দেশে লক্ষ সৈন্যের হাতে তরবারি ঝলসে ওঠে।

একদিন সৈন্যদের বড় কঠিন নির্দেশ দিলেন তিনি। বললেন, হিমালয়ের এক সুখী উপত্যকায় চলো। বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ো গিয়ে ওখানে।

সৈন্যরা সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য করল। রণদামামা বাজিয়ে কাঠমাণ্ডু-উপত্যকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল একদিন।

সম্রাট বললেন, সুন্দর! বড় সুন্দর এ উপত্যকা। এর বাগমতী নদীর তীরে একটি মন্দির গড়ালে কেমন হয়?

সৈন্যরা বলল, খুব ভালো হয় সম্রাট। ব্রাহ্মণরা তবে মন্দিরের আশে-পাশে যাগযজ্ঞ নিয়ে থাকতে পারে।

—তাই থাকুক, সম্রাট হুকুম দিলেন,—মন্দির ঠিক আমি গড়ে তুলবো।

গড়লেন তিনি মন্দির, পশুপতিনাথের মন্দির। আর ব্রাহ্মণরাও গড়ল মহল্লা, পশপতি-মহল্লা।

কালক্রমে সেই মহল্লায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্ররাও এল। এল এমনকি রাজকন্যে।

হ্যাঁ, একদিন অশোক-দুহিতা চারুমতী এল এখানে। তার স্বামী দেবপালের সঙ্গে রাজনন্দিনী এখানেই এসে ঘর বাঁধল।

এ-সব অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। খৃস্টের জন্মেরও ২৫০ বছর আগেকার কথা। আজ পশুপতিনাথ মন্দিরের

পথ ধরে যেতে যেতে হাজার বার কথা খ্ুঁজলেও এ-সব কথার সত্যমিথ্যে যাচাই করার উপায় নেই। এরা নেহাৎই কিংবদন্তী আজ। নেহাৎ প্রবাদ-প্রবচনের মতোই এরা আজ লোকের মুখে মুখে ফেরে।

কিন্তু কোথায় লোক! সামনের মাঠ-ময়দান যে খাঁ খাঁ করছে। দু পাশের ঢেউ-খেলানো প্রান্তরে শুধুই যে চলছে সবুজের অভিসার।

শুনলাম, এই অভিসার নাকি ফেব্রুয়ারী অবধি চলবে; এবং তারপর শিবরাত্রি আসবে যখন, তখন ভক্তদের তাঁবু ছেয়ে ফেলবে এই মাঠ-ময়দান।

শিবরাত্রির সময় ভক্ত অনেক আসে এখানে। ভারতবর্ষ থেকেও আসে হাজার-হাজার। বুড়ো আসে, বুড়ী আসে, কিশোরী আসে, যুবতী আসে, আসে ছেলে-বুড়ো, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে অগণিত লোক। নেপাল সরকার তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন তখন।

কিন্তু করলে কী হবে! যাত্রীদের বাসনা পূরণ করবে কে।

প্রদীপবাবুর কাছ থেকে শুনেছিলাম, শিবরাত্রির সময় একবার এখানে এক জরা-জীর্ণের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। শিব-চতুর্দশী উপলক্ষ্যে তিনি এসেছিলেন শিবের কাছে প্রার্থনা জানাতে। প্রার্থনা তাঁর সন্তান। শুধু একটি সন্তান লাভ করে শূন্য ঘরকে পূর্ণ করতে চান তিনি।

আর একবার এক সিনেমা-অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ হয় প্রদীপবাবুর। তিনি এসেছিলেন পূর্ণ ঘরকে শূন্য করতে; প্রথম পক্ষের স্বামী এবং ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দ্বিতীয় পক্ষকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে।

—দ্বিতীয় পক্ষটি আপনি দেখেছিলেন? প্রদীপবাবুকে শুধালাম একবার।

—দেখেছি বৈকি! প্রদীপবাবু জবাব দিলেন, তিনি ভারতবর্ষের একজন নামকরা অভিনেতা। এই সেদিনও ইনকাম-ট্যাকস ফাঁকি দেবার জন্যে খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ওঁর নাম বেরিয়েছিল।

—আর অভিনেত্রীটি নামকরা নয় বুঝি?

—তিনি একটি পতনশীল তারকা; ছাই হবার মুখে একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন।

—কিন্তু যে তারকা পতনশীল, আঁকড়ে ধরা কি তার পক্ষে সম্ভব?

—মোটেও সম্ভব নয়, বললেন প্রদীপবাবু, বরং যাকে সে আঁকড়ে ধরবে, তাকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া সম্ভব।

বললাম, সেই দ্বিতীয় পক্ষটি এতদিন তাহলে ছাই হয়ে গেছে?

প্রদীপবাবু বললেন, জানি নে।

জানি নে,—ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল আমারও; মনে হল, সেই শূন্য মাঠ-ময়দানও যেন একই কথা বলছে।

বলছে, জানি নে। জানি নে। জানি নে। তীর্থযাত্রী যারা এখানে এসেছিল, তাদের কার কী হয়েছে, জানি নে। জানি বোধ করি এই যে, এ-অঞ্চলটা আসলে তীর্থ-যাত্রীদের নয়, বানরের রাজ্য। তারা বছর ভরে বানররা এখানে সুখে বসবাস করে এবং ফেব্রুয়ারী-মার্চে শিবরাত্রির সময় ভক্তরা এসে এখানে অনধিকার-প্রবেশ করে তাদের রাজ্যে।

ভাবলাম, হ্যাঁ; রাজ্যটা বানরেরই বটে। রাশি রাশি বানর এখানে হুটোপুটি দাপাদাপি করছে। প্রদীপবাবুর কাছ থেকে শুনেছিলাম, বানরদের কেউ নাকি কিছু বলে না। সবাই ধরে নিয়েছে, বাবা পশুপতি-নাথের চ্যালা ওরা। ওদের কিছু বললে বাবাকেই নাকি বলা হয়।

কিন্তু কোথায় বাবা? খানিকটা দূরেই মন্দিরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন যে দেবতা, তিনি? তাঁর কানে সাড়া কি কিছু পৌঁছয়? বানরের চেয়ে আরও এক ধাপ উন্নত মানুষ নামক তাঁর যে চ্যালারা সারা পৃথিবী জুড়ে মার খাচ্ছে, সে খবর কি কোনকালে পৌঁছয় তাঁর কানে?

জানি নে পৌঁছয় কিনা। তবে প্রদীপবাবু দেখলাম, পশুপতিনাথের সদাজাগ্রত কর্ণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত।

—সব জানেন তিনি; তিনি সব শোনেন, বললেন প্রদীপবাবু।

ঠিকই বললেন বোধ করি। কারণ, পরে মিলিয়ে দেখি, আশ্চর্য! ইতিহাসেও ঠিক একই কথা বলে,—সব জানেন তিনি। তিনি সব শোনেন। তাই তাঁর নাম স্মরণ করে রাজ্য চলে যখন প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি তখন হিমালয়কে স্পর্শ করে। দেশে তখন স্বর্ণ-যুগ আসে।

একবার স্বর্ণযুগ এসেছিল লিচ্ছবি রাজবংশের আমলে, যখন বাবা পশুপতি-নাথকে স্মরণ করে সারা নেপাল চলত, যখন এমন কি বিভিন্ন মুদ্রায়ও পশুপতির প্রতীক থাকত। আর সত্যি বলতে কি, লিচ্ছবি আমলে রাজা একজনই ছিলেন নেপালে, এবং সে রাজা হলেন বাবা পশুপতিনাথ।

বাবার আশীর্বাদে রাজ্য তখন সুখে-সম্পদে ভরো-ভরো, শিক্ষায়-দীক্ষায় মহিম-ময়। তখন এমন কি সাধারণ লোকও সংস্কৃতের চর্চা করত, দূর-দূরান্তরে ব্যবসা করতে যেত, মন্দির গড়ত প্যাগোডার ধরণে। সপ্তম শতাব্দীতে নেপালের মন্দির-স্থাপত্য যে খুব উন্নত ছিল, চৈনিক পরি-ব্রাজকরা সেকথা বার বার বলে গেছেন। আর ওরা না বললেই বা কী! চীন যে প্যাগোডার ধরনে মন্দির গড়তে শিখেছে নেপালের কাছ থেকে, একথা আজ কে না জানে।

আসলে মন্দিরের কথা জানে সবাই। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর নেপালকে জানে না কেউ। কেউ আজ খবরও রাখে না যে, আসলে নেপালের প্রতিটি বাড়িই ছিল প্যাগোডা, প্রতিটি গ্রামেই ছিল পঞ্চায়েৎ এবং প্রতিটি লোকের হাতেই ছিল বাবা পশুপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা।

হ্যাঁ, পশুপতিরই নাম-গান করতে করতে নেপাল তখন বিজ্ঞানে, সাহিত্যে এবং শিল্পকলায় উন্নতির সোপান বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। চক্রপাণি আবির্ভূত হলেন এই সময়, সুশ্রুত-সংহিতার [illegible] রচনা [illegible] কবিতা। [illegible] অনেক [illegible] ছিলেন নিঃসন্দেহ। তাঁর প্রমাণ? ওদের অনেকেই চাইল পাথর কেটে মূর্তি-গড়ায় কালে নিয়ে যেতে, চাইল দেব-ভূমিকে সাক্ষী রেখে দেবমূর্তি গড়তে।

ওদিকে দেবভূমি পশুপতিনাথে এতক্ষণে এসে পৌঁছি আমরা। আর আমাদের ঠিক সামনেই মহাকালের চাকাটা সপ্তম শতাব্দী থেকে ঘুরতে ঘুরতে একবারে ১৯৬৮-তে এসে ঠেকেছে।

হ্যাঁ, ১৯৬৮-তেই পশুপতিনাথকে দেখছি আমরা। দেখছি, তার প্রবেশ-পথের এক পাশে সারি সারি দোকান; দোকানগুলো যেখানে গিয়ে শেষ হল, মন্দির-চত্বর শুরু হল সেখানেই। সেখানেই চলেছে অগণিত ভক্ত। পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে চলেছে কেউ, কেউ চলেছে ভোগ নিয়ে; দেবতার জয়গান করতে করতে চলেছে কেউ, কেউ চলেছে ক্যাথান-প্যারেডের ঝিলিক দিয়ে; ক্যামেরা-হাতে চুরুট-মুখে চলেছে কেউ, আবার কেউ চলেছে ট্রানজিস্টার ঝুলিয়ে। চলেছে সবাই। সবাই যেন আভাসে-ইঙ্গিতে একই কথা বলছে,—পশুপতিনাথ, প্রসীদ! হে রাজ-রাজেশ্বর মহাদেব, প্রসন্ন হও! সুপ্রসন্ন, তোমার লীলা-নিকেতন দেখে চোখ জুড়োই। সুমহিম, তোমার করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হই। সুপ্রাচীন, তোমার আনন্দরসসাগরে নিমগ্ন হই।

ভাবলাম, নিমগ্ন তো হয়েই আছি। ভক্তিরসে না হই রূপরসে তো হয়েই আছি নিমগ্ন। তা না হলে, সাত-সকালে উঠে ছত্রপাটি থেকে পশুপতি অবধি এই দীর্ঘ পাঁচ মাইল পথ পায়ে-হেঁটে আসবো কেন! আর কেনই বা পশুপতিনাথের মন্দির-চত্বরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাববো, অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয় এক দেব-দেউলকে দেখছি!

পশুপতি-মন্দির অতুলনীয় ও অবি-স্মরণীয়ই বটে। সে অতুলনীয় তার পারিপার্শ্বিকের জন্যে; একদিকে নদী বাগমতীর এবং অপরদিকে বনাচ্ছাদিত পাহাড়ভূমির দাক্ষিণ্যের জন্যে। আর সে অবিস্মরণীয় তার অবয়বের জন্যে; প্রতি-বেশী স্তূপ, মন্দির ও বিগ্রহদের সাক্ষী করে তার মন-ভোলানো প্রকৃতির জন্যে। যথার্থই মন-ভোলানো মূর্তিমান এক রহস্য-ময় পশুপতি-মন্দির। তার প্রাঙ্গণে সকাল বেলায় দুই ছাদওলা তার শীর্ষদেশটির দিকে তাকালে মনে হয়, হিমালয়ের রূপের খনি থেকে এই বুঝি হঠাৎ করে জন্ম নিল সে, বুঝি এইমাত্র তার শুভজন্মকে উপলক্ষ্য করে আকাশ-আলো মুখরিত হয়ে উঠল। আর ঠিক এই মুহূর্তে পশুপতি-মন্দিরের ছাদে নগাধিরাজ তার সোনার ভাণ্ডারকে উপুড় করে দিল বুঝি।

সোনা কত আছে ওই মন্দিরে?

জানি নে। তবে ওই সোনা যখন প্রভাত-আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে, তখন তা' যে সাত রাজার ধন মানিককেও হার মানায়, তা' জানি।

ওই মানিকরাজ চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সেদিন। মন্দিরের সোনা-সোহাগ কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সেদিন আমায় অভিভূত করেছিল।

কিন্তু সোহাগ কি শুধু সোনারই? রুপোর নেই? রুপোয় মোড়ানো পশুপতি-মন্দিরের দরজাগুলো কি কম সুন্দর?

ভাবলাম, কে বলে কম সুন্দর। পশুপতি-মন্দিরের সবকিছুই সুন্দর।

মন্দিরের ঠিক সামনেই আছে যে-বৃষটি, যে শিবের বাহন নন্দী, সৌন্দর্য তার মধ্য থেকেও ঠিকরে বেরোচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, অতন্দ্র এক প্রহরী, পাথরের এক বেদীর ওপর অধিষ্ঠিত সোনালী এক অপরূপ শিল্পকীর্তি অনুক্ষণ যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—যা গৃধ্নু! লোভ করো না। সুন্দরকে দূরে দাঁড়িয়ে তারিফ করো। স্বর্ণখচিত এই শিবতীর্থকে মুমুক্ষুর মন নিয়ে দ্যাখ।

কিন্তু হায় রে মানুষের মন! তার ত্যাগের সোনার কৌটোতে যে ভোগের ভোমরা লুকিয়ে আছে। বললেই কি মুমুক্ষু হওয়া সাজে তার? যদি সাজত, তবে কি আর পশুপতির রত্নশালায় হাত পড়ত কারও? তবে কি রাজা জয়প্রকাশ বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত রাজাধিরাজের ঐশ্বর্যের ওপর?

অথচ ইতিহাস বলে, ঝাঁপিয়ে সে পড়েছিল। বাবা পশুপতিনাথের রত্নভাণ্ডার সে লুঠ করেছিল।...তখন কাঠমাণ্ডুর রাজা ছিল জয়প্রকাশ; আর পশুপতি ছিল কাঠমাণ্ডুর বাইরে।...জয়প্রকাশ বললে, পশুপতি বাইরে থাকলে আপত্তি নেই, আপত্তি শুধু তার রত্নভাণ্ডারকে নিয়ে। বললে, ওই ভাণ্ডারটিকে আমার চাই।

—ভাণ্ডার চাই? বলে কি লোকটা?—মাথায় হাত দিয়ে বসল কাঠমাণ্ডুর জনসাধারণ। বার বার ওরা বলাবলি করল, জয়প্রকাশের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

জয়প্রকাশের কানে গেল এসব কথা; এবং যেতেই রেগে আগুন হল সে। বলল, ভাণ্ডার কার? আমার? না, পশুপতির?

মোসাহেবরা বলল, আপনার জাঁহাপনা।

—তবে? জয়প্রকাশ চিৎকার করে উঠল, তবে ভাণ্ডার জবরদখল করছি বলে কানাঘুষো কেন?

শোনা যায়, কানাঘুষো বন্ধ হয়নি শেষ অবধি। তবে জয়প্রকাশ পশুপতির রত্নভাণ্ডার ঠিক জবরদখল করেছিল। ঠিক হাজার বছর ধরে সঞ্চিত পশুপতির রাশি রাশি রত্ন হাতে নিয়ে অষ্টাদশ শতকের এক সন্ধ্যায় সে বলে উঠেছিল,—ভাণ্ডার কার? আমার? না, পশুপতির?

এবার কিন্তু মোসাহেবরাও স্তব্ধ। লজ্জায় ঘৃণায় এবার ওরাও কোনো জবাব দিতে পারেনি।

জবাব দিয়েছিল কাঠমাণ্ডু উপত্যকার জনসাধারণ। বলেছিল, নাম করো না ওই পাপিষ্ঠের; ওর নাম মুখে আনলেও অকল্যাণ হয়।

—হ্যাঁ, অকল্যাণ হয়: বলেছিল গ্রামের মোড়লরা,—নিজের অকল্যাণ নিজেই ডেকে আনল ও। নিজের চিতায় ও নিজেই আগুন দিল। তিলে তিলে দগ্ধ হল পাপিষ্ঠ।

ইতিহাসে পাই, দগ্ধ সত্যি সে হয়েছিল। সত্যি পৃথ্বীনারায়ণ শা'র কাছে একের পর এক যুদ্ধে হেরে শেষপর্যন্ত সে আশ্রয় নিয়েছিল পশুপতিনাথেই।

পশুপতির মন্দির-সমীপে বাগমতী-তীরে আর্যঘাট। সেখানেই শেষ আশ্রয় নিয়েছিল জয়প্রকাশ। তার দেহ তখন জীর্ণ-শীর্ণ, পায়ে দারুণ ক্ষত।

সে পা ভেঙেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে।

শত্রু পৃথ্বীনারায়ণ শা' কিন্তু করুণা-সাগর। জয়প্রকাশকে জীবনের শেষ কটা দিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, এবারে বিশ্রাম নাও বন্ধু; ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা কর।

কিন্তু কোথায় বিশ্রাম নেবে জয়প্রকাশ! রাজ্যের প্রতিটি লোকই যে তার শত্রু!

অবশেষে অনেক ভেবে বিশ্রামের উপযুক্ত একটা স্থান সে খুঁজে বের করল। পৃথ্বীনারায়ণকে একদিন সে বললো, পশুপতিনাথে রেখে এসো আমাকে। ওই হোক আমার শেষ আশ্রয়।

পৃথ্বীনারায়ণ কথা রেখেছিলেন। জয়প্রকাশকে রেখে এসেছিলেন পশুপতিনাথে।

কিন্তু সেই বাজপাখি জয়প্রকাশ তখন কোথায়! পাখির ডানা তখন ভেঙে গেছে। আর ক্ষতস্থানে প্রলেপ বুলোতে গিয়ে সে তখন ভাবছে, বড় ভুল হয়ে গেছে। পশুপতির রত্নভাণ্ডারে হাত দেয়া ঠিক হয়নি।

—ঠিক হয়নি, ভুল হয়ে গেছে:—আর্যঘাটে মৃত্যুর সময়েও নাকি বলেছিল জয়প্রকাশ। স্বর্ণশীর্ষ পশুপতি-মন্দিরের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, না না; ভাণ্ডার আমার নয়, পশুপতির।

কিন্তু কেন এখানে এই পশুপতি-মন্দির গড়ে উঠল? রত্নভাণ্ডার গড়তেই বা কে বলেছিল মানুষকে?

জানি নে। তবে মন্দির নিয়ে নানা কিংবদন্তী আছে। শোনা যায়, একবার দুই দেবতায় লড়াই বাধল। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুতে শুরু হল তুমুল ঝগড়া।

ঝগড়া কেন?—না বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলছেন, আমি তোমার চেয়ে বড়।

লড়াই কেন?—না ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলছেন, বড় হলেম গিয়ে আমি।

এই যখন দেবলোকের সমস্যা, তখন দেবাধিপতি মহাদেবের কানে গেল সব। তিনি মরলোক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সব সমস্যার সমাধান করলেন।

মহাদেব এসে দাঁড়ালেন এই পশুপতি-নাথেই; দাঁড়িয়ে জ্যোতি ছড়িয়ে দিলেন ত্রিলোক জুড়ে—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল জয়ে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবাধিপতির এই জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখে স্তম্ভিত। বাদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে দু'জনেই মেনে নিলেন তখন, বড় আমরা কেউ নই। বড় দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব।

মহাদেবকে নিয়ে আরও অনেক কিংবদন্তী আছে এখানে। অনেকেরই ধারণা, দেবাধিপতির হাত, পা এবং মাথা ছাড়া সবটুকু অঙ্গই এখানে বিরাজিত। মর্ত্য-অমর্ত্যের রাজ-রাজেশ্বর সত্যি এখানে প্রত্যক্ষ। আর তিনি প্রত্যক্ষ বদ্রীনাথে। সেখানে তাঁর মাথা আছে। তাই লোকে বলে, বদ্রী আর পশুপতি দর্শন করা মানে, ত্রিলোকাধিপতি রাজরাজেশ্বরকে পূর্ণ-দর্শন করা।

পরে শুনেছি, পূর্ণ-দর্শনের মাহাত্ম্য কাঠমাণ্ডু-রাজদের অনেককেই নাকি ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই রাজাদের কেউ কেউ এগিয়ে এসেছিলেন পশুপতিনাথের মন্দির-সংস্কারে।

সকলের আগে এসেছিলেন জয়সিং রামদেব। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে পশুপতি-মন্দিরকে নতুন করে গড়েছিলেন তিনি; এবং আজকের যে-মন্দির আমরা দেখি, তা' জয়সিং রামদেবেরই পরিকল্পিত।

পরিকল্পনায় অভিনবত্ব দেখালেন নেপালাধীশ অভয়মল্লও। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পশুপতি-মন্দিরে লক্ষহোম ও মহাস্নান চালু করলেন তিনি।

কিন্তু কেন চালু করলেন? হঠাৎ এমন একটা ব্যয়বহুল প্রথা চালু করার জন্যে কী তার দায় পড়েছিল?

এসব প্রশ্নের জবাব ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন।—লক্ষহোম ও মহাস্নান,—ও'রা বলেছেন, নিরুপায় হয়ে চালু করেছিলেন অভয়মল্ল। কারণ, একবার দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পে তাঁর রাজ্য টলমল করে উঠল। প্রজারা ধ্বংস হতে লাগল দেখতে দেখতে।

অভয়মল্ল সেই বিরাট ধ্বংসপুরীতে দাঁড়িয়ে কপালে করাঘাত করলেন। বললেন, সর্বনাশ হল: রাজ্য রসাতলে গেল: আর উপায় নেই বাঁচবার।

পারিষদরা বললেন, উপায় আছে সম্রাট। পশুপতিনাথকে খুশি করুন। দেখবেন উপায় আছে।

—কিন্তু খুশি কেমন করে করবো তাঁকে?—অভয়মল্লের কণ্ঠস্বরে এবার ব্যাকুলতা।

ওদিকে পারিষদরাও ব্যাকুল। রাজ্য-জোড়া হাহাকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও'রা পরামর্শ দিলেন, ও'কে খুশি করবেন লক্ষ-হোম আর মহাস্নান দিয়ে।

—বেশ! তাই করবো।—নিরুপায় অভয়মল্ল সম্মতি জানালেন শেষ অবধি।

সম্মতি শেষ অবধি জানালেন পরবর্তী অনেক মল্লরাজাও। বিদ্যোৎসাহী ও সংগীতজ্ঞ রাজা প্রতাপমল্লকেও একদিন বলতে শোনা গেল, বেশ! তাই করবো।

করলেন তিনি অনেক। আগের চেয়েও অনেক কিছু বেশি করলেন। পশুপতি-মন্দিরের গঠনে বৈচিত্র্য আনলেন তিনি। মন্দির-গাত্রে কারুকার্যের মধ্যে আনলেন অনির্বচনীয়ত্ব।

কিন্তু এত কিছু করেও মন ভরল না তাঁর। তিনি বললেন,—দেবতার প্রসাধন হল, আর মানুষের হবে না?

পারিষদরা প্রতিধ্বনি তুললেন,—তাই তো! মানুষের হবে না?

—হবে, বললেন প্রতাপ মল্ল।—ভুবনেশ্বরী

হবে এই পশুপতি-মন্দির প্রাঙ্গণে। তুলাদণ্ডের এক পাশে থাকবো আমি, আর অপর পাশে থাকবে সোনা। সোনা দিয়ে ওজন হবে আমার।

—কিন্তু এত সোনা দুনিয়ায় কি আছে সম্রাট? পারিষদরা চিন্তিত।

—হ্যাঁ, আছে; সম্রাট নিশ্চিন্ত করলেন ওদের। বললেন, আমার রাজকোষেই আছে অনেক সোনা। প্রতিবেশী রাজ্য হিন্দুস্থানের সঙ্গে বাণিজ্য করে এ আমি সংগ্রহ করেছি।

—কিন্তু সেই সংগ্রহে হাত দেয়া কি ঠিক হবে সম্রাট?—পারিষদদের কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত।

—হ্যাঁ, ঠিক হবে;—দ্বিধাহীন প্রতাপমল্ল জবাব দেন, সংগ্রহ করা সোনা ব্রাহ্মণ দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়াই ঠিক হবে।

শোনা যায়, বিলোন হয়েছিল শেষ অবধি। ভাল ভাল সোনা এসেছিল পশুপতির মন্দির-প্রাঙ্গণে, আর রাজা সেই সোনা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের হাতে উঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন,—এই নাও, ধরো। তোমাদের ঐশ্বর্য তোমরাই গ্রহণ করো।

শোনা যায়, গ্রহণ নাকি অনেকেই করেছিল। সপ্তদশ শতকের নেপালে রাজা প্রতাপমল্লের দেয়া সোনা অনেক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের ঘরেই নাকি ঝলমল করে উঠেছিল।

প্রতাপমল্লের পুত্র নৃপেন্দ্রমল্ল সোনা ছড়ালেন অন্যভাবে। পশুপতি-মন্দিরের বৃষকে সোনায় মণ্ডিত করলেন তিনি। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এই মন্দিরের ঠিক সামনেই তাঁকে একদিন বলতে শোনা গেল, রাজরাজেশ্বরের বাহন যে, তার কি গুরুত্ব কম? অতএব, তাকে ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করি কেন!

সুযোগ্য সেনাপতি ভীমসেন থাপাও প্রায় একই কথা বললেন। ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে পশুপতি-মন্দিরের দরজাগুলো সোনা এবং রুপো দিয়ে মুড়ে দিয়ে তিনি একদিন বললেন, এদেরই কি গুরুত্ব কম! অতএব ঐশ্বর্য থেকে এদেরই বা বঞ্চিত করি কেন! কেনই বা রাজরাজেশ্বরের পুণ্যদর্শন মাহাত্ম্যের অংশীদার যে-মন্দির, তার দরজাগুলোকে ঐশ্বর্য থেকে অপূর্ণ রাখি।

ঠিক কথা, কেন রাখা হবে অপূর্ণ। রাখা যদি হত, তবে তো আজকের পশুপতি মন্দিরকে দেখে পূর্ণতার আস্বাদ আমরা পেতাম না।

সত্যি, পূর্ণতা মন্দিরটির সর্বত্র। তার দেওয়ালে, দরজায়, প্রাঙ্গণে, প্রকোষ্ঠে সর্বত্র পূর্ণতার ছাপ।

প্রকোষ্ঠটির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, ভিড় ঠেলে তার ভিতরে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, যখন দেখলাম শিবলিঙ্গটিকে, তখন আশ্চর্য এক অনুভূতি ঘিরে ধরেছিল আমায়। তখন বার বার আমার মনে হচ্ছিল, সঙ্গ পাচ্ছি। যুগ-যুগান্তকাল ধরে এইখানে ছুটে-আসা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভক্তের সঙ্গ পাচ্ছি। গায়ের গন্ধ পাচ্ছি ওদের। ওদের প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছি,—পশুপতিনাথ, প্রসীদ!

পশুপতিনাথ, প্রসীদ!—ওইখানে দাঁড়িয়ে একবার আমিও বললাম বুঝি। কিন্তু কা'কে বললাম? পাষাণে গড়া নিষ্প্রাণ শিবলিঙ্গকে? না করুণায় ভরা জাগ্রত শিবশম্ভুকে? কারুকার্যে ভরা নির্বাক শিবগেহকে? না মমতায় ভরা সর্বপাপহর শিবসুন্দরকে? কাকে বললাম?

মনে নেই, কাকে বললাম। কিন্তু সব বলা সেদিন যেন আরও নানা জনের নানা বলার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেল। সব যেন হারিয়ে যাওয়া শতাব্দীগুলোর পথ ধরে অভিসার করে লক্ষ জনের বলার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে গেল।

লক্ষ কাহিনী, কোটি দীর্ঘশ্বাস এখানে। কোটি কোটি মানুষের এখানে এসে একই প্রার্থনা,—পশুপতিনাথ প্রসীদ। কিন্তু প্রার্থনা কি হারিয়ে যায়? দীর্ঘশ্বাস নিঃশেষিত হয়ে যায় বায়ুভূতে? যারা এখানে একদিন এসেছিল, তাদের সবকিছুই কি আজ নিশ্চিহ্ন?
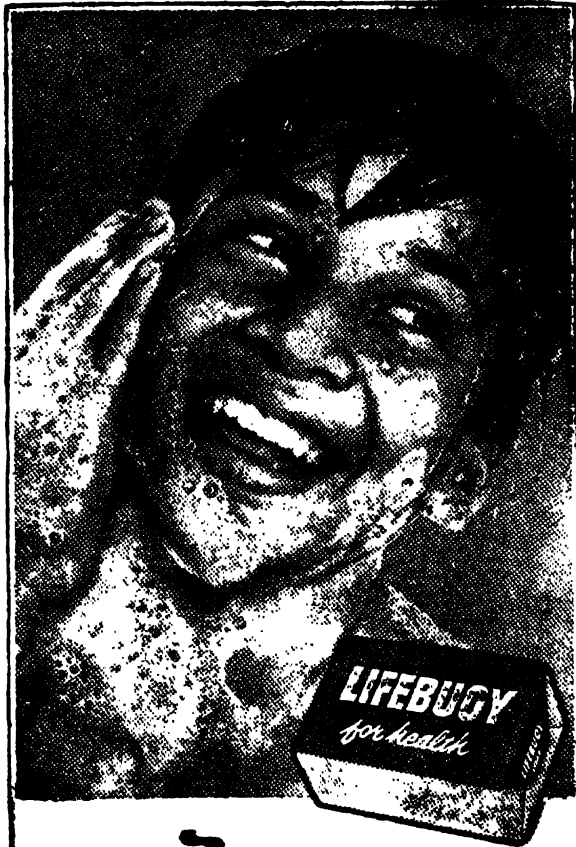
মনে হল, কে বলে নিশ্চিহ্ন! ওদের সঙ্গ পাচ্ছি যে। প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছি ওদের,—পশুপতিনাথ, প্রসীদ!

ওরা এসেছে দূর-দূরান্তর থেকে, দূরের ওই পাহাড়গুলোর ওপার থেকে। ওপারের অরণ্য পেরিয়ে আছে যে-জনপদ, সেই জনপদ থেকে। ওরা বিচিত্র, অদ্ভুত ও রহস্যময়। পথের দুঃখ ওদের সুখ, প্রকৃতির অভিশাপ ওদের আশীর্বাদ, সকলের মন্দ ওদের ভালো। ওরা পর্বতের শাসন মানে না, নদীর নিষেধ শোনে না, অরণ্যের অত্যাচার বোঝে না। ওরা বোঝে শুধু পশুপতিনাথকে, শোনে শুধু পশুপতিনাথকে। মানেও শুধু পশুপতিনাথকে। সকল শাসন, সকল নিষেধ ও সকল অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়েও ওরা বলে, পশুপতিনাথ, প্রসীদ!

মনে পড়ে, সেদিন পশুপতি-মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম যখন, তখনও যেন ওদের এই ঐকতান কানে আসছিল। তখনও মনে হচ্ছিল। অতীতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা বিরাট এক মিছিলের স্মৃতি একটুক্ষণ আগে দেখা স্বপ্নের মতো আমাকে ঘিরে রেখেছে। মহাকালের মহা-রাজপথ থেকে ভেসে আসা অস্ফুট এক কল-কোলাহল বহুদূর হতে শোনা শব্দের মতো আমাকে আচ্ছন্ন করেছে, শতাব্দীর ওপার হতে ছুটে আসা আশ্চর্য সব অনুভূতি বহুদিন আগে পাওয়া সুবাসের মতো আমাকে উতলা করেছে।

কিন্তু আমি কী? পর্যটক? না, তীর্থযাত্রী? রূপালিপ্সু, না ভক্তিপ্রাণ? মানুষ ও প্রকৃতির রসপিয়াসী? না ঈশ্বরের করুণাভিলাষী? কী আমি?

সেদিন পশুপতি-মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল,—জানি নে, আমি কী। আমি স্রোতের টানে ভেসে-চলা তৃণখণ্ড? না ঘূর্ণি-হাওয়ায় উড়ে-বেড়ানো পত্রখণ্ড? আমি রূপের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া পতঙ্গ? না রসের সাগরে তরী ভাসিয়ে-চলা নিরুদ্দেশ-যাত্রী? জানি নে, আমি কী। তবে আমি যে প্রতিবেশীর উঠোনে পা দিয়ে তার তুলসীতলার রত্নবেদীটিকে দেখছি, তা বেশ জানি।

হ্যাঁ, রত্নবেদী। নেপাল যদি হয় প্রতিবেশী, পশুপতিনাথ তবে তার তুলসীতলার রত্নবেদী। আমরা তুলসীতলায় প্রণাম করে যেমন প্রতিবেশীর ঘরে যাই, পশুপতিনাথকে প্রণাম করে ঠিক তেমনি নেপাল দেখি। আবার তুলসীতলায় যেমন প্রদীপ জ্বলে এই পশুপতি-মন্দিরকে পরিবেষ্টন করেও ঠিক তেমনি জ্বলে সারি সারি প্রদীপ। তবে এ-প্রদীপ আর সে-প্রদীপে ফারাক আছে। সেখানে একটিমাত্র শিখা কাঁপতে কাঁপতে, ধুকতে ধুকতে আলো ছড়ায়; আর এখানে অনেক শিখা ঊর্ধ্ববাহু অনেক ভক্তের মতো মূর্তিমান শ্রদ্ধা হয়ে জ্বলতে থাকে।

সেই জ্বলা আমি দেখিনি; তবে শিখার আধার প্রদীপগুলোকে দেখেছি। দেখেছি, পশুপতি-মন্দিরকে ঘিরে আছে ওরা, দেওয়ালী-উৎসবের দিনে তুলসীমঞ্চটিকে যেমন বহু প্রদীপ ঘিরে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে ঘিরে আছে।

পশুপতিনাথ প্রতি রাত্রেই দেওয়ালী, প্রতিদিনই উৎসব। পশুপতি-মন্দিরের বারান্দায় এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন, —এখন আমি সেই উৎসবেরই শরিক।

কিন্তু হায়! আমার শরিকানা ক্ষণ-ক্ষণের! আমি এই মুহূর্তে আছি এখানে, কিন্তু একটু পরেই তো এই উৎসবপুরী থেকে বিদায় নেব! একটু পরেই তো এই তুলসীমঞ্চ আমার কাছে সুদূরের বস্তু হয়ে যাবে!

মনে হল, সুদূর অদূর হয় না? নিত্যশরিক কেউ হয় না উৎসবপুরী পশুপতির?

—হয়, —পশ্চিমদিককার পশুপতি-প্রাঙ্গণের দিকে তাকাতেই মনে হল, নিত্যশরিকও হয়।...ঐ তো! সামনেই তো দেখছি একজনকে প্রায় পনের-বিশ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভের ওপর করজোড়ে বসে থাকতে।...

কে উনি? আজকের নেপাল-অধিপতি রাজা মহেন্দ্র না? সোনালী ধাতুতে গড়া রাজা মহেন্দ্রেরই একটি মূর্তি ওখানে শোভা পাচ্ছে না?

এগিয়ে গিয়ে দেখি,—হ্যাঁ, রাজাই বটে। রাজাই হাঁটু গেড়ে বসে পশুপতিনাথের উদ্দেশ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। এবং রাজার ঠিক পাশেই রয়েছে আর একটি স্তম্ভ। সেখানে রাজরানী রত্না দেবতার কাছে অঞ্জলি প্রদানে উদ্যতা।

রত্নার মূর্তিটিও সোনালী। রাজা মহেন্দ্রের মতো তাঁর মূর্তিটিও জীবন্ত।

ভাবলাম, জীবন্ত তো হতেই হবে। জীবন্ত না হলে রাজা-রাণী উৎসবপুরী পশুপতিনাথের নিত্যশরিক হবেন কী করে? আর কী করেই বা ওঁদের প্রণাম দেবতার চরণে গিয়ে পৌঁছবে!

দেবতার চরণে আরও অনেকে প্রণাম জানাচ্ছেন দেখলাম। ওই পশুপতি-প্রাঙ্গণেই দেখলাম রাজা ত্রিভুবন এবং আরও কয়েকজন ভূতপূর্ব রাজা-রানীকে। তবে ভূতপূর্বরা বর্তমানটির তুলনায় অনেক ছোট। বর্তমান রাজা মহেন্দ্রের মতো বিরাটকায় কোনো ছত্র নেই ওঁদের মাথার ওপর; এবং এছাড়া মহেন্দ্রের মতো ঐশ্বর্য-দীপ্ত কোনো স্তম্ভের ওপরেও নেই ওঁরা। ওঁদের অবস্থান একটু যেন অনাড়ম্বর ও অজ্ঞাত পরিবেশে। একটু যেন দূরে দাঁড়িয়ে, বর্তমানের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পশুপতি-বন্দনা করছেন ওঁরা।

ভাবলাম, এমনই হয়। বর্তমান অতীতকে ঠিক এমন করেই আড়াল করে। একদিন বর্তমান রাজা মহেন্দ্রও হয়তো ঠিক আড়ালে চলে যাবেন এবং যে-স্তম্ভটির ওপর বিরাট-বিপুল মহিমা নিয়ে তাঁর সোনালী মূর্তি আজ শোভা পাচ্ছে, সেখানে সেদিন শোভা পাবে নতুন কোনো রাজার কোনো নতুন মূর্তি।

শোভা তো পাবেই!—ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল আমার। মনে হল, রাজার আসা-যাওয়া আর রাজ্যের হাতবদল তো চলবেই। রাজা সকলের ওপরে তার দণ্ডটি হাতে নিয়ে বসে আছেন বলেই কি মহাকাল তাঁর দিকে ফিরে তাকাবে না?

তাকাবে ঠিক। মহাকালের শ্যেনদৃষ্টি রাজাকেও ঠিক নামিয়ে আনবে সেই পথে, যে-পথে অসীম অনন্ত যুগ ধরে অগণিত প্রজাদের মরণাভিসার।

পশুপতি-মন্দিরের পার্শ্ববর্তী কালভৈরব মন্দিরটি বিচিত্র সেই অভিসার-পথেরই নীরব সাক্ষী যেন। কালভৈরব যেন অনন্তপথযাত্রী বিদায়ী সব মানুষেরই অতি বিশ্বস্ত দ্রষ্টা। রুদ্রচক্ষু মেলে, ভৈরব-ভীষণ আকৃতি নিয়ে উপস্থিত তিনি। আর তাঁর মন্দিরে উপস্থিত বিদায়ী রাজাদের কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন;— কিছু ছবি।

ওই ছবিগুলোও একদিন শেষ হয়ে যাবে,—কালভৈরব মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ভাবলাম একবার, কিন্তু রুদ্রচক্ষু ভৈরব সেদিনও হয়তো থাকবেন অতন্দ্র। হয়তো সেদিনও তাঁর অতিকায় লিঙ্গটি বিশ্বাসীদের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আর অবিশ্বাসীদের মনে বিদ্বেষ ও বিরক্তি উৎপাদন করবে।

কিন্তু কোটিলিঙ্গ কী উৎপাদন করবে সেদিন? শ্রদ্ধা, না বিদ্বেষ? ভক্তি, না বিরক্তি?—ভৈরব-মন্দির থেকে বেরিয়ে প্রতাপমল্লের গড়া শিবলিঙ্গগুলো প্রদক্ষিণ করতে করতে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেদিন।

তবে সেদিন কোনো জবাব পাইনি জিজ্ঞাসার। এবং পাইনি বলে যন্ত্রচালিতের মতো রাশি রাশি শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করার সময় কোনো বেদনাও বোধ করিনি সেদিন।

বেদনা বোধ করছি আজ। আজ মনে হচ্ছে, উন্মুক্ত আকাশতলে সারি সারি সাজানো ওই শিবলিঙ্গগুলোর অদ্ভুত একটা মহিমা আছে। এবং আজ যদি ওদের আবার দেখবার সুযোগ পেতাম তো বলতাম বিরক্তি নয়, শ্রদ্ধাই উৎপাদন করে ওরা। সান-বাঁধানো বেদীর ওপর স্থাপিত ওদের শতাধিক শিলামূর্তি ভক্তিরই উদ্রেক করে।

ভক্তিরস পশুপতি-সংলগ্ন আরও অনেক মন্দির থেকে উচ্ছ্বসিত। রামচন্দ্র মন্দির, লব-কুশ মন্দির সবই যেন নদী বাগমতীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অ-দৃষ্ট অথচ অবশ্যম্ভাবী আর একটি স্রোতস্বিনীকে সঞ্জীবিত করছে এবং সে স্রোতস্বিনীতে ছড়িয়ে আছে যে রস, ভক্তের মর্মমূল থেকে ক্ষরিত না হলে তার আবির্ভাব সম্ভব নয়।

ভক্ত ছিলেন বটে জয়স্থিতি মল্ল।

বিদ্যার ভক্ত, রাজকার্যের ভক্ত, দেবতার ভক্ত—ভক্ত ছিলেন তিনি অনেক কিছুরই।

অবিশ্যি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন রাজা হলেন, তখন তাঁর ভক্তমানসের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিচয় প্রজারা পায়নি। সে পরিচয় পেতে সময় লাগল প্রায় ৪০ বছর। ১৩৮৯ খৃস্টাব্দে প্রজারা দেখল, বাগমতীর তীরে পশুপতির খুব কাছেই তিনি গড়ে তুলেছেন অপরূপ তিনটি মন্দির এবং সেই তিনটির একটি রামচন্দ্র মন্দিরকে তিনি গড়েছেন তাঁর রাণী রত্নাল্লা দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে।

জয়স্থিতি মল্লের গড়া অপর দু'টি মন্দির লব ও কুশ তাঁর দুই যমজ পুত্রের স্মৃতিকে বহন করছে। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন করেন অনেকেই। বলেন, পুত্র বা পত্নীর নামে মন্দিরের নামকরণ না করে রাজা রামায়ণের দ্বারস্থ হলেন কেন? কেন বাল্মীকির কাব্য থেকে নাম অহরণ করলেন?

এ প্রশ্নের জবাব নেপালের ইতিহাস দিচ্ছে। সেখানে পাই, রামায়ণ খুবই প্রিয় ছিল এই রাজার। তাঁর রাজত্বকালে রাজা যেমন, রাজগৃহও তেমনি অনুক্ষণ রামায়ণ-গানে মুখরিত হ'ত।

কিন্তু রাণীর মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন সব গান বন্ধ হয়ে গেল।

রাজা বললেন, রাণীর স্মৃতির উদ্দেশে মন্দির গড়ো পশুপতিনাথে, আর সে মন্দিরের নাম দাও শ্রীরামচন্দ্র মন্দির। গান সেখানেই হবে।

হল গান। রামায়ণগানে বাগমতীর তীরে-গড়া শ্রীরামচন্দ্র মন্দির একদিন মুখরিত হল।

কিন্তু গান যদি বন্ধ হয়ে যায় কোনোদিন। জয়স্থিতি মল্লের ভাবনা ধরল একবার, কোনদিন যদি রামায়ণ-গান ওখানে থেমে যায়!

পারিষদরা রাজার এ সংশয়ের কোনো সুরাহা করতে পারলেন না। উল্টে ও'রাও মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তাই তো! যদি থেমে যায়।

অবশেষে একদিন রাজাই করলেন সংশয়ের সুরাহা। বললেন,—না না, থামবে না গান। পথ পেয়েছি। লব-কুশের মন্দির গড়তে হবে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এবং গান গাইবে লব-কুশ।

মন্দির গড়া হল অচিরেই। রাজার দুই যমজ পুত্রের স্মৃতির উদ্দেশে গড়ে উঠল আরও দু'টি মন্দির। প্রজাদের অনেকেই তখন নাকি বলাবলি করেছিল, এ আর বুঝলে না! রামচন্দ্র হতে চান জয়স্থিতি মল্ল স্বয়ং; লব-কুশের কাছ থেকে রামায়ণ গান তিনি নিজেই শুনতে চান। তাই না মন্দির নিয়ে এত তাঁর ভাবনা।

কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, জয়স্থিতি মল্লের ভাবনা সফল হয়েছিল কি? রামায়ণ-গান শুনেছিলেন কি তিনি শেষ অবধি? শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরে তিনি কি শেষনিশ্বাস ফেলেছিলেন?

এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখি, ঐতিহাসিকরা নিরুত্তর; কিন্তু কিংবদন্তী সহস্রমুখ। ওই কিংবদন্তীগুলোরই একটিতে পাই,—হ্যাঁ, রামায়ণগান শুনতে পান জয়স্থিতি মল্ল। কারণ, শেষ-নিঃশ্বাস ফেলবার সময় দেহ তাঁর যেখানেই থাক না কেন, মন থেকেছিল শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরে।——তাই শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরেই 'বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' শেষ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন। আর লব-কুশও খুঁজে পেয়েছিল ওদের আপনজনকে। তাই গান ওরা ঠিক গেয়েছিল।

কিংবদন্তী বলে, সেই গান আজও নাকি শোনা যায়। আজও রাত গভীরে পশুপতি-মহল্লা যখন থমথমে হয়ে ওঠে, যখন নদী বাগমতী মূর্তিময়ী একটা প্রহেলিকার মতো শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে যায়, যখন দূরের বন থেকে ভেসে-আসা ঝিঁঝির চীৎকার শতাব্দী-প্রাচীন মন্দিরগুলোর গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, তখন গান নাকি শোনা যায়। তখন রামায়ণের সেই হারিয়ে যাওয়া আরণ্যক পরিবেশটা পশুপতি-মহল্লায় হঠাৎ করে ফিরে আসে নাকি। তখন হঠাৎ নাকি মনে হয়, শ্রীরামচন্দ্র-মন্দিরে কিসের যেন একটা গুঞ্জরণ সুরু হয়েছে। যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের পর শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় সমাগত ব্রাহ্মণদের গুঞ্জরণের মতো কিছু একটা সুরু হয়েছে। এবং তার ঠিক পরেই সুরু হয়েছে বীণা-বাদ্য। দু'টি বীণা বাজছে যেন, এবং সেই বীণাবাদনের সঙ্গে সঙ্গে দু'টি বালকের অদ্ভুত মিষ্টি গান শোনা যাচ্ছে। সেই গান দেখতে দেখতে বিশ্বভুবনকে মুগ্ধ করে দিল, মর্ত্যে-অমর্ত্যের কথা ছড়িয়ে দিল, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষকে স্তম্ভিত করে দিল, আকাশ-বাতাসকে ভারী বিষণ্ণ ও মর্মস্পর্শী করে দিল।

কিংবদন্তী এইরকম আরও কত কথা বলে। কত অবিশ্বাস্য, অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য ঘটনার মায়াজাল রচনা করে। দিনকে রাত্রি আর রাত্রিকে দিন করে।

করে তো বটেই!—আজ ভাবি, তা না হলে দিনের পশুপতি-মহল্লার কথা লিখতে বসে হঠাৎ রাত্রির কুহক নিয়ে মাথা ঘামাবো কেন? আর কেনই বা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ষোল আনা অবাস্তব একটা স্বপ্ন-জগতের কথা তুলবো! স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয়?

—না, স্বপ্ন সত্যি হয় না; পশুপতি-মহল্লার কথা লিখতে বসে বারবার মনে হচ্ছে, তবে সত্যি কখনও কখনও স্বপ্ন হয়ে ওঠে। পশুপতি-মহল্লা আমার কাছে স্বপ্ন হয়ে উঠেছে আজ। ওখানকার বিশ্বনাথ-মন্দির, পঞ্চদেউল ও গোর্খনাথ-মন্দির কিছুদিন আগে দেখা স্বপ্নের মতো আমার স্মৃতিতে আজ ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

ঝাপসা হয়নি শুধু গুহ্যেশ্বরী মন্দির ও আর্যঘাট। দেখে-আসা অবধি বারবার ওদের স্বপ্ন দেখেছি বলেই হয়তো হয়নি। আর্যঘাটকে আজও দেখতে পাই যেন। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, পশুপতি-মন্দিরকে সাক্ষী করে নদী বাগমতীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহাশ্মশান। সেখানে নদীর ঠিক ওপরেই চিতাশয্যা রচিত হয়েছে। চিতায় আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। আর সেই আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে স্বজনহারা কিছু মানুষ জীবনের অনিত্যতা নিয়ে হাহাকার করছে।

কিন্তু জীবন তো অনিত্যই। আর্যঘাট যেন বলছে, অনিত্যতাই তো জীবন। বলছে, পশুপতি-মন্দির-মহলকে দেখবার পরেও এ নিয়ে যদি কারও সংশয় থাকে তো এখানে একটু দাঁড়াও। একটুক্ষণ চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে ভাবো, তোমার শেষ আশ্রয় কোথায়। ভাবো, রাজায় এবং প্রজায় আসলে তফাৎ কতটুকু।

রাজারও তো শেষ আশ্রয় এখানেই। জয়প্রকাশ আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে: আবার এখানেই এই সেদিনের রাজা ত্রিভুবনেরও আশ্রয়।

ত্রিভুবনকে বাঁচাবার জন্যে কত উদ্যোগ কত আয়োজন হল সেদিন। রাজার চিকিৎসার ব্যবস্থা হল জুরিখ-এর হাসপাতালে। কিন্তু রাজা বাঁচলেন না। রাজ্য থেকে অনেক দূরে সুইজারল্যান্ড-এর এক পাহাড়-ভূমিতে শেষনিশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর বিশেষ এক বিমানে করে তার মরদেহ কাঠমাণ্ডু নিয়ে আসা হল। রাজধানী তখন শোকাচ্ছন্ন। আর্যঘাটে তখন তিলধারণের জায়গা নেই। কী ব্যাপার? না রাজাকে ওখানে দাহ করা হবে।

দাহ করা হল শেষ অবধি। আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিরা দেখলেন, রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ বাহাদুর বাগমতী-তীরে আর্য-ঘাটে দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেলেন।

তারপর ছাই ভাসল বাগমতীর জলে। প্রজাদের ছাই যেমন করে ভাসে, ঠিক তেমন করেই ভাসল। রাজায়-প্রজায় এক হয়ে গেল আর্যঘাটে।

আর্যঘাট সেই এক হয়ে যাওয়ার কথাই বলছে আজও। তার ঠিক সামনেই বাগমতীর জলে ভেসে যাওয়া ছাই বলছে, সব সমান। রাজা যা', প্রজাও তা'। তুমি যা', ত্রিভুবনও তাই।

তুমি যা, ত্রিভুবনও তাই—সেদিন আর্যঘাট থেকে একটু দূরে বাগমতীর ওপর গড়ে তোলা সেতুটি, পেরোবার সময় বারবার মনে হল আমার। অনতিদূরে চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সব সমান। রাজা যা', প্রজাও তা'। পশুপতিনাথ যেমন সামনের ওই গুহ্যেশ্বরী মন্দিরও তেমন, রাজা-প্রজা সবাইকে এক সূত্রে ধারণ করে আছে।

অপেক্ষমাণ ॥

শংকর চট্টোপাধ্যায়

যাওয়া আসা বন্ধ। পায়ে পড়েছি শিকল
দু'হাত ভরে ঝুলিয়েছি চাবির গোছা
তাই সারাদিন ধরে পথটাই গজরাচ্ছে পথে পথে
গভীরতা ছাড়াই বেশ কিন্তু বেঁচে-বর্তে আছি হে?

ফুল ছাড়াই বাগান উঠেছে ফুটে
ভেতর জমিনে আবাদ চলেছে ভারী
এখন নিবিড় ছুটি আমার
কাঙাল জুটিয়ে দান-খয়রাতি চলেছে মন্দ নয়।

তুমি দূরে থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলেছ,
যেন গাছ নাড়া দিলেই, প্রবল পাতারা দিগ্বিদিক হারিয়ে
উড়ে যাবে
এমন মূঢ়তা তোমার
লুটতরাজ ছাড়া পা পড়বে না হে রাস্তায়?

স্বয়ংশাসিত বলেই, লোকসমাজে আমাকে নিয়ে যত নিন্দে মন্দ
যাওয়া আসার রাস্তাটায় তুলেছি মস্ত দেওয়াল
পাড়ানির কড়ি হাতে তাই বসে আছি, চুপ করে।

পুনরায় ফিরে ডাকা ॥

কাজল ঘোষ

যতদিনে যতদিনে পার
পুনরায় ফিরে এসো
মুঠিতলে।
স্বর্ণাক্ষরে মৃত নাম
অহেতুক চোখের কৌতুকে
তুমিই ভুলিয়ে ছিলে,
সহজেই রপ্ত হয় সুখ
'সব গেলে কি থাকে আমার'
এ-বোধ শরীরে মেখে
সুস্নিগ্ধ গৈরিক জলে
স্নান করে নাও।

ও পাশেই বাঁধা ঘাট
ব্যাঙ-ডাকা ছায়া সুশীতল
সাপের খোলস দেখে
শিউরে ওঠা জৈবিক এ সুখ,
তাই বলি

যত দিনে যত দিনে পার
পুনরায় ফিরে এসো
মুঠিতলে,
ইন্দ্রনীল আকাশ পিছনে।

নীরবতা

শান্তি পাল

ট্রেনের গতির সঙ্গে শব্দের তরঙ্গগুলো ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যেতে জায়গাটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে জ্বলা আলোর খানিকটা আভা বাইরে ছোট ঘেরা উঠোনে পড়াতে ছোট ছোট ঝোপের মত গাছগুলির আবছা অস্তিত্ব প্রায় অশরীরী কিছু মনে হচ্ছে। যদিও রাত বিশেষ না, তবু চারিপাশের শব্দহীনতা একটানা ঝিঁঝির ডাক এবং হাওয়ায় অস্পষ্ট পাতার মর্মর প্রভৃতি মিলে কেমন একটা গুরুগম্ভীর থমথমে ভাব যেন সময়ের গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। নিঃশেষিত চায়ের কাপে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে শব্দ করে দুবার কাশল বরেন, তারপর হিমাংশুকে উদ্দেশ করে বলল, —বারো মাস এখানে থাকতে ভাল লাগে আপনাদের?

উত্তরে সামান্য হাসল হিমাংশু। স্বভাবসিদ্ধ ঠান্ডা গলায় বলল,—মন্দ কি। আমার ধারণা এখানে অনেক কম ঝামেলায় [illegible]

—তাই। মুখ ফিরিয়ে হিমাংশুর বক্তব্যে প্রতিবাদ জানাল নীলিমা, আসলে এটা নিরুপায় হয়ে ভাল লাগিয়ে নেওয়া।

—তবে তাই। হিমাংশু আরো শান্তভাবে বলল।

—আমারো। বরেন নিজের কথায় এল এবার, ঠিক বিপরীত ব্যাপারটা। সারা বছর ধরে আজ এখানে কাল সেখানে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেলাম প্রায়। এখন মনে হয় কোথাও একটু স্থিতু হয়ে বসতে পারলে ভাল হত। এই তোমাদের মতন। বরেন নীলিমার দিকে চেয়ে কথাগুলি বলছিল।

—আসলে যে কোন ধরণের জীবনই দীর্ঘদিন হয়ে গেলে একঘেয়ে লাগে।

নীলিমা ঘরের ভেতর স্টোভ জ্বালিয়ে লুচি ভাজছিল বলে আর কোনদিকেই তেমন তাকাতে পারছিল না। সেজন্য হিমাংশুর পক্ষে বরেন ও নীলিমাকে লক্ষ্য করা সহজ হচ্ছিল। হিমাংশুর মনে হল বরেনের উক্তিগুলি সম্ভবত সবটা সত্য নয়। এখন বরেন নীলিমাদের ঘরে বসে ওর ভাবনা চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যেই এ ধরণের কথা বলছে। আসলে ওর নিজের জীবনযাপন ওর পক্ষে খারাপ লাগার কথা নয়। কেন না বরেন সংসারে প্রায় একলা মানুষ, সমর্থ স্বাস্থ্যবান এবং মর্যাদাসম্পন্ন বৃত্তির অধিকারী। এই বৃত্তির কারণে বরেনকে যদি নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়, স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দভাবে তাহলে তো তার রীতিমত সুখী থাকার কথা। অন্তত হিমাংশু হলে তাই ভাবত নিজেকে। নীচু খাটের ওপর ঢালা বিছানায় এবার আয়েস করে হেলান দিয়ে প্রায় গড়িয়ে পড়ল হিমাংশু। তার পাশেই বরেন। কোলের ওপর রাখা নরম বালিশে কনুই ডুবিয়ে বেশ গল্প করার মেজাজে বসে আছে। বাতাসে স্টোভ নিভে যাবার ভয়ে ঘরের দরজা ছাড়া জানলাগুলি সব বন্ধ। বাইরের অন্ধকার থেকে পাতার সরসরানি শব্দ ও কদাচিত দূরাগত শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে।

ঘরের চারিপাশে তাকাতে গিয়ে দেয়াল ঘড়ি লক্ষ্য করল হিমাংশু। রাত নটা বেজে গেছে। অন্য দিন এ সময় হিমাংশুরা চারজন খেয়ে-দেয়ে শোয়ার উদ্যোগ করে। পারিপার্শ্বিকের মূক জড় নির্জনতার সঙ্গে অস্তিত্ব মিশিয়ে দেয়। আজ তবু একজন লোক আছে কাছে, গল্প করবার, অবাস্তব কিছু আলোচনায় সময় ভরিয়ে রাখবার। ছেলেমেয়ে দুটোরও চোখে ঘুম নেই এখনো তাই। চুপচাপ বসে গল্প শুনছে। সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে এসে একটু বাদেই চলে যাচ্ছিল বরেন। হিমাংশুরা ছাড়েনি। রাত্রে খেয়ে যেতে হবে বলে বসিয়ে রেখেছে।

—শুধু শুধু আমার জন্যে কত কষ্ট করছ বল ত। বরেন ঈষৎ সংকোচের গলায় বলল নীলিমাকে।

—শুধু শুধু কষ্ট করার মধ্যে আনন্দ থাকে অনেক সময়, উত্তরটা হিমাংশুই দিল, বিশেষ করে যখন কোন কাজই থাকে না হাতের কাছে।

নীলিমার রান্না শেষ হয়েছিল, এদের দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে বসল এবার।—বরেনদা, তোমার পিসতুতো বোন অনামীর খবর কি?

—দারুণ, বরেন উৎসাহে চোখ নাচাল। তিন বছর আগে বিয়ে করল। এখন স্বামী সহ ফরেনে। কানাডায় ভাল চাকরী পেয়ে গেছে ওর হাজব্যান্ড। একটি বাচ্চাও হয়েছে।

—ভীষণ বন্ধুত্ব ছিল ওর সঙ্গে আমার, নীলিমা দরজার বাইরে চোখ রেখে স্মৃতি রোমন্থন করল, ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে কাটিয়ে দিতুম, ক্যারাম খেলে। এক ক্লাসে পড়তুম কিনা দুজনে।

হিমাংশু দেখছিল নীলিমার হাতে-পায়ে আজ সন্ধ্যে থেকে একটা অগতানুগতিক ছন্দ। পুরনো দিনের প্রসঙ্গে ওর চিন্তা ও মুখ উদ্দীপিত।

বরেন নীলিমার কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হয়ত ও স্মরণ খুঁজে নীলিমার সেই পূর্বতন রূপটি আবার আবিষ্কার করতে চাইছে, হিমাংশু মনে মনে চিন্তা করল। যতদূর সম্ভব মনে হয় এই পিসতুতো বোনের মাধ্যমেই বরেনের সঙ্গে নীলিমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল।

—সময় এত তাড়াতাড়ি চলে যে সব-কিছু মনে হয় সেদিনের কথা। বরেন সামান্য উদাস ভঙ্গি করে আচমকা দার্শনিক মন্তব্য করল।

হিমাংশু কপালে অলক্ষ্য কৌতুকের ভাঁজ ফেলে বরেনের দিকে সম্পূর্ণ মুখ ঘুরিয়ে দেখল। ওর যেন কেমন মজার লাগছিল ব্যাপারটা, নিজেকে একজন নিরুত্তাপ দর্শক মনে হচ্ছিল, কোন এক সিনেমার পর্দায় ছবি দেখার মত।

নীলিমাকে অন্যদিনের তুলনায় আজকে একটু বেশী প্রফুল্ল লাগলেও সে খুব স্বাভাবিকভাবে প্রায় অভ্যাসমতই ঘরের সব কাজকর্ম গুছিয়ে করে যাচ্ছিল। বরেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে বাচ্চা দুটিকে জায়গামত শোয়াল এবং ওরা অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল। ছেলের পড়ার ছড়ান ছিটোন বইগুলিকে তুলে বিশৃঙ্খল টেবিলটাকে গুছোল নীলিমা। বাসনপত্র সরিয়ে রেখে এসে ঘরের মেঝে ঝাট দিল, সুন্দর-হাতে বোনা আসন বিছিয়ে দিল। বরেন চেয়ে চেয়ে খানিকক্ষণ কর্মরতা নীলিমাকে ও তার পরিপাটী ঘর-সংসার দেখল।

—একটা কথা, এখানে রেখে আপনি বাচ্চাদের মানুষ করতে পারবেন না। ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে দুটিকে একনজর তাকিয়ে দেখে হিমাংশুর দিকে ফিরে মন্তব্য করল বরেন।

—জানি। নীলিমাই সোৎসাহে জবাব দিল কথার। যেন বরেনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হিমাংশুর অলস অনড়তাকে পরোক্ষে খোঁচা দেবার চেষ্টা করল, ওরা এই বড় হবার মুখে মনের কোন খোরাকই পাচ্ছে না, এরকম জংলী ভূতের জায়গায়। স্কুল আছে একটা, ভর্তি করা হয়েছে, প্রয়োজনমত বই কিনে দেওয়া হয়েছে, ব্যস।

—সত্যি, ভাল অ্যাসোসিয়েশন না হলে বাচ্চারা—আক্ষেপের গলায় বলছিল বরেন, নীলিমার কথার ঝোঁকে থেমে গেল।

—উপায় নেই যখন, ওসব ভবিষ্যৎ চিন্তা আর করি না বরেনদা, ইচ্ছে থাকলেই কিছু আর ছেলেমেয়েদের মনের মতন করে গড়ে তোলা যায় না। কথার শেষ দিকটা চাপা নিঃশ্বাসে গাঢ় শোনাল।

নীলিমার উক্তি শুনে বরেন চুপ করে থাকল। ওর হয়ত ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না, হিমাংশু ভাবল, যে ওর সামনেই নীলিমা তার স্বামীকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ ধরনের চার্জ করুক। বরেন একজন বাস্তবসম্মত মানুষ হয়ে এটা নিশ্চিত বুঝেছে যে হিমাংশুর অবস্থানুযায়ী বাচ্চাদের জন্য এর চেয়ে উন্নততর কোন ব্যবস্থা করা আর সম্ভব নয়। এসব ভেবে নীলিমার বরেনের সঙ্গে জোট বেঁধে আক্রমণের প্রচেষ্টাকে মনে মনে ব্যঙ্গ করল হিমাংশু এবং বরেনকে নিঃসন্দেহে একজন সহমর্মী ভেবে স্বস্তি পেল।

—বরেনবাবু এখানে আর কদ্দিন আছেন? হিংমাশু খুব স্বচ্ছন্দ গলায় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করল।

—এই অঞ্চলটায় আর দিন তিনেক। ইনস্পেকশন শেষ হলেই চলে যেতে হবে এখানকার হেড কোয়ার্টারে। বরেন পদ-মর্যাদার গাম্ভীর্য আনল স্বরে।

—ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায় তাই, না হলে জানতেও পারতাম না। হিমাংশু কণ্ঠে খুব সৌজন্যের সুর আনল।

—হ্যাঁ, আমিও জানতাম না তো। দেখা না হলে এমন একটা আদরযত্ন আর ভোজ থেকে ফাঁকি পড়ে যেতাম। কথাটা বলে শব্দ করে হাসল বরেন, নীলিমার দিকে তাকাল।

—ভারী তো আদরযত্ন, খুশী খুশী ভাব করে ঠোঁট ওলটাল নীলিমা। ছোট-বেলায় তোমাদের বাড়ী গিয়ে কত খেয়ে এসেছি। আচারের লোভে তোমার মায়ের কাছে যেতাম মাঝে মাঝে ছলছুতো করে।

কিসের লোভে ছলছুতো খুঁজত কে জানে, কড়িকাঠের গায়ে সন্তর্পণে এগোতে থাকা টিকটিকিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ভাবল হিমাংশু, আচার অথবা বরেনের সঙ্গে দেখা হওয়া, সঠিক জানা না থাকলেও আন্দাজে মনে মনে তৎকালীন ঘটনাবলীকে বিন্যস্ত করে দেখতে চাইল হিমাংশু। বরেন তখন পড়ুয়া ছেলে, নিম্নবিত্ত পরিবারের উচ্চাশাপরায়ণ বাবামায়ের সযত্ন ও তীক্ষ্ন দৃষ্টির আলোয় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ব্যস্ত। তবু তারই মধ্যে কখন একটুখানি এলো-মেলো চৈত্র হাওয়ার ফাঁকি অজ্ঞাতে তাকে বিপর্যস্ত করেছিল, কদাচিত্ত নীলিমার গোপন সাহচর্যলাভ ক্রমশ তার একমাত্র ধ্যানের বস্তু হয়ে উঠেছিল।

আমি কি হঠাৎ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে যাচ্ছি? মনে মনে তলিয়ে দেখল হিমাংশু। সমাদর করে ডেকে আনা কোন অতিথিকে ঈর্ষা করা উচিত কিনা ভাবল। তারপর আপনমনেই হাসল। ওর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক হাসির অর্থ খুঁজতে বরেন নীলিমা দুজনেই ফিরে তাকাল ওর দিকে।

—কি হল? জিজ্ঞেস না করে পারল না নীলিমা।

—জানেন বরেনবাবু, বরেনের দিকে ফিরে উত্তরটা দিল হিমাংশু, নীলু সব বিচিত্র রকমের স্বাদগন্ধযুক্ত রান্না করতে ভালবাসে, কিন্তু খাওয়াবার লোক খুঁজে পায় না। আমি আবার ও রসে বঞ্চিত কিনা। সাধারণ সাদামাঠা খাদাই আমার পছন্দ। হিমাংশু ইচ্ছে করেই এখন নীলু বলল নীলিমার বদলে।

—ওর সব পছন্দই সাদামাঠা, বরেনদা। নীলিমাও বরেনকে মাধ্যম করে ওর মন্তব্যের উত্তর দিল।

বরেন চোখ ঘুরিয়ে মাঝারি ঘরখানার কড়িকাঠ দেয়াল লক্ষ্য করছিল। দেয়ালে ঘড়ি, কখানা ছবি। বাঁ পাশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। তাকসমেত মাঝারি আয়না। বাকি তিনদিকে দুটি বাচ্চার এবং হিমাংশু-নীলিমার বিয়ের সময়কার এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ। নীচু দিকে সাদা চুনকামের ওপর বাচ্চা দুটিরই কারো হাতের আঁকা শিল্প-কৃতি। আন্দাজমত বানানে নিজেদের ও বাবা মার নাম লেখা। ঘরে আসবাবপত্র প্রয়োজনীয় ও স্বল্প। তবু সব কিছুর ওপরেই একটা যত্নের পরিচ্ছন্ন ছাপ। সমীক্ষা করলে যেন এই ঘর এই সীমিত বস্তুপুঞ্জের আড়ালে অনেক না-মেটা শখ, অনেক অকথিত ও অতৃপ্ত বাসনার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। অন্তত হিমাংশুর ধারণা হল যে এসব লক্ষ্য করে সম্ভবত বরেনের বুকে ছোট একটু নিঃশ্বাস জমা হয়ে উঠেছে নীলিমার জন্য।

—একদিন সকালের দিকে সময় পেলে তোমাদের সব ফটো তুলতাম। মুখ হাত ধুতে ধুতে বরেন বলল।

—ক্যামেরা আছে নাকি? খুশীতে চকচকিয়ে উঠল নীলিমার মুখ। নীলিমা আজো এইসব ছেলেমানুষী, নানারকম করে ছবি তোলার বিলাস ভালবাসে।

—আমি যেখানেই যাই, ক্যামেরা থাকে সঙ্গে। পরিতৃপ্ত আহারের ঢেকুর তুলে বলল বরেন। ধপধপে দামী রুমালে ওর হাত মোছার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরে সেন্টের উগ্র মধুর গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছিল। বাইরে ঘুরে

দূরে এটা আমার নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। বরেন সুপারির টুকরো দাঁতে চেপে বলল।

—খুব ছবি তোলো বুঝি?

—হ্যাঁ, যখন যেখানে পারি। কম খরচ হয় এর পেছনে নাকি! বরেন দুহাত তুলে আলস্য ছাড়াল শরীরের। হিমাংশু দেখল বরেনের চেহারা আগে ছিপছিপে ছিল, এখন কিছুটা স্থূলতার দিকে। জামার নীচে উদরের স্ফীতি লক্ষণীয়।

—একলা মানুষ যা ইচ্ছে করে বেড়াও। বরেনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বলছিল নীলিমা। ওর স্বরে কিছুটা ভাল লাগা ও প্রশ্রয়জনিত মমতা খেলা করছিল।

—এস না এর মধ্যে একবার আমার ডেরায়। কাল পরশু যখন হোক। বরেন খুব খাতির করে বলল, কিছু ছবি সঙ্গেই আছে, নানান জায়গার সব, তোমাদেরও ফটো নেব সেই সঙ্গে কয়েকটা। আসবেন? বরেন শেষের প্রশ্নটা হিমাংশুর দিকে চেয়ে নম্র গলায় উচ্চারণ করল।

—দেখি। হেসে বলল হিমাংশু।

হিমাংশুর এ ধরনের ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া সৌজন্য নীলিমার পছন্দ হচ্ছিল না। নিজেকে চেষ্টা করে দমন করে রাখলেও ভেতরে ভেতরে ও যে বেশ অস্থির ও আলোড়িত তা হিমাংশু বুঝতে পারছিল।

—কালকেই আসতে পারেন কিংবা পরশু। এ দুদিন আর আমার কাজের তেমন ঝামেলা নেই। ফ্রী থাকব। হিমাংশুকে বলে বরেন নীলিমার দিকে ফিরল, দুপুরের খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেবে তোমরা। রান্না কিন্তু তোমাকেই করতে হবে, ফাঁকি দিয়ে আর একবার ভালমন্দ খেয়ে নেব তোমার হাতে, কেমন? নিজেই নিজের রসিকতায় হেসে উঠল বরেন।

বেশ ত। বলল নীলিমা ছোট করে, হাসল।

—বেশ রাত হল কিন্তু, কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল বরেন। হিমাংশুকে বলল, এবার বিদায় হওয়াই সঙ্গত, কি বলেন?

আপনার নিজের জন্যেই অবশ্য, হিমাংশু খুব মোলায়েম করে বলল, এতটা পথ ফিরতে হবে তো।

এখান থেকে চলে গেলে আবার কবে দেখা হবে তোমার সঙ্গে কে জানে। খানিকটা উদাস স্বরে বলল নীলিমা।

চিনে গেলাম তো তোমাদের নিবাস, কাছাকাছি এলেই উঁকি দিয়ে যাব। মাঝে মধ্যে চিঠিতেও অবশ্য যোগাযোগ রাখা যায়।

বরেন কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে এল। সঙ্গে হিমাংশু। নীলিমা পিছনে, দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল। খোলামেলা আকাশে আধ-খানারও কিছু বেশী চাঁদ। কোথাও মেঘ না থাকায় চারিদিকে বেশ উজ্জ্বল সাদা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। দুধে ধোয়া নক্ষত্র গাঢ় নীলের যবনিকায়। উঠানের ছোট ছোট পাচমিশেলি গাছগুলি আচমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে উঠছে। কেমন একটা অচেনা ফুলের গন্ধ নিশ্বাসে জড়িয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে।

—চলি তাহলে, এ্যাঁ? দুজনের উদ্দেশ্যেই বলল বরেন।

—চলুন খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি। হিমাংশু খাতির রাখল স্বরে।

কিছুটা দূরেই রেল লাইন, বাড়ীটার সামনে দিয়ে প্রায় পরিক্রমণ করে গেছে। এখন সম্ভবত একটা মালগাড়ী চলেছে। রাত বলে একটানা গম্ভীর ধাতব শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চারিদিকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। শব্দটা যতক্ষণ প্রচণ্ড নির্ঘোষে কানের কাছে বাজল, তিনজনই দাঁড়িয়ে রইল কি এক অজানা কারণে নির্বাক, তার-পর আবার নৈঃশব্দ এলে উঠোন পেরিয়ে সদর খুলে বেরিয়ে গেল হিমাংশু আর বরেন।

—যতই জংলী জায়গা হোক, এই সব মুহূর্তে কিন্তু বেশ লাগে। গলায় আমেজের সুর ফুটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মন্তব্য করল বরেন।

হিমাংশু ওর সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। বস্তুত এরকম রাতের বেলা আহারাদির পর আস্তে আস্তে বাইরের ফাঁকা হাওয়ায় হাঁটতে হিমাংশুরও মন্দ লাগছিল না। রাস্তার দুপাশে খোলা জমি, গাছপালা, ইতস্তত কিছু বাড়ী, বেশীর ভাগই ঘুমে নিঃশব্দ। ঠাণ্ডা ছোট ছোট সব পুকুরের জল হাওয়ায় থিরথির করছে, এক আকাশ পরিষ্কার উপছে পড়া জ্যোৎস্নায় চারিদিক কেমন ভিজে ভিজে শিথিল অপার্থিব মনে হচ্ছিল। পরিপার্শ্বের সমস্ত নৈঃশব্দ্যকে ঘিরে একটানা ঝিঁঝির ডাক বাতাসে কাঁপ-ছিল। এতক্ষণ চুপচাপ চলছিল হিমাংশু, বরেনের কথায় ছোট করে হাসল এবার। হাতের টর্চ ঘুরিয়ে রাস্তার দু পাশে আলো ফেলল।

—অত ধারে ঘাসের ওপর দিয়ে যাবেন না।

—সাপের উপদ্রব আছে নাকি? হিমাংশুর কাছ ঘেঁসে এসে বরেন বলল।

—উপদ্রব না থাকলেও অস্তিত্ব আছে তো নিশ্চিত।

বরেন এ নিয়ে আর গল্প ফাঁদল না, সম্ভবত এসব স্থূল ধরণের কথা আলোচনা করতে তার ভাল লাগছিল না।

—এখানকার বাসিন্দারা কেমন যেন সামাজিক নয়, কথা বলতে হয় তাই বলল হিমাংশু, দু তিন বছর এসেছি এখানে, এখনো তেমন কোন সম্পর্কই হল না কারো সঙ্গে। আমি না হয় কাজেকর্মে থাকি, নীলিমার কষ্ট হয়। অথচ স্কুলমাস্টার কেরাণী সবই আছে, সকলেই পরিবার নিয়ে থাকে, সবাই কিছু আর গেঁয়ো ভূত নয়।

—অথবা আপনারাই হয়তো মানিয়ে নিতে পারেন না। হাসল বরেন, খাস শহুরে লোকদের কিছু স্নবারি তো থাকেই, ঠিক না?

—হয়তো বা, কে জানে।

—ছুটির দিনে বা লীজার পিরিয়ডে কি করেন?

—ঘুমোই। বসে বসে বই পড়ি, আর কি? জলের খাবাপ লাগে, বেড়াতে যাবার জন্যে জেদ করে। কখনো কখনো ওদের [illegible] পাঠিয়ে দি। কাছাকাছি একটা নদী আছে। একটা আশ্রম মতনও আছে, বেশ সুন্দর বেড়াবার জায়গা। আমার আর ইচ্ছে করে না।

—মানুষ কত সহজে এক জীবন থেকে আর এক জীবনে পরিবর্তিত হয়। বরেন উর্ধ্বমুখে চেয়ে বলল।

হিমাংশু ভিতরে সামান্য নাড়া খেয়ে আড়চোখে তাকাল ওর দিকে, যা সে এতক্ষণ আন্দাজ করছিল, নীলিমার প্রসঙ্গ, বরেন নিশ্চয়ই তুলবে এবার, হিমাংশু ভাবল। বরেন যে মনে মনে নীলিমায় চিন্তায় কিছুটা আলোড়িত সে বিষয়ে হিমাংশু নিঃসন্দেহ ছিল।

—আপনার কথা বলছি, বরেন নরম সুরে বলল হিমাংশুকে, ক বছর আগে যেমন দেখেছি, একজন উৎসাহী পুরুষ। দেশের কাজ বা আর যাই করে বেড়ান, খুব স্ফূর্তিবাজ ছিলেন, সর্বদা লোকজন বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত। আর এখন? ঘরের কোণে গুহাবাসী।

বরেন পরিহাস করে হাসল। হিমাংশুও হাসল সঙ্গে সঙ্গে।

—আমি যেমন ছিলাম, আত্মকেন্দ্রিক, বরেন নিজের তুলনা দিল, পড়ার ঘরে চেয়ার টেবিলে পিঠ বাঁকিয়ে রাতদিন কেবল নোট মুখস্থ, লেখালেখি, আর সীমিত বন্ধু-বান্ধব। নিজের ছোট পরিবারটুকুর মধ্যে আবদ্ধ। এখন তেমনি হয়েছে বিপরীত। সব ছেড়েছুড়ে নিত্য এদিক সেদিক ছোটা-ছুটি, নিত্য নতুন মানুষের সঙ্গে চেনাজানা।

বুকের মধ্যে ছোট একটু আলগা নিঃশ্বাস আটকে রাখল হিমাংশু। বরেনের অবলীলায় বলা কথাগুলি ওর ভেতরে চিরকালের অতৃপ্ত অনুচ্চারিত আশায় ছোট ছোট বুদ্বুদ ফোটাচ্ছিল।

—আসলে জীবিকা মানুষকে আমূল বদলে দেয়।

—জীবিকা এবং সময়। খুব মৃদু, প্রায় অস্ফুট করে উত্তর দিল হিমাংশু, সময়ে সব কিছু সয়ে যায়, সব মুছে যায়।

—একি আপনি যে প্রায় সমস্ত পথটাই চলে এলেন। বরেন সচকিত করলে ওকে।

—না কি? হিমাংশু পিছন ফিরে তাকাল একবার, তাই তো, অন্যমনস্ক হয়ে যে হেঁটেই চলেছি।

—শুধু শুধু কষ্ট হল আপনার। বরেন আফসোস জানাল।

—এতে কষ্টের কি। ভালই লাগল। আগে এরকম রাতে খাওয়ার পর বন্ধুদের
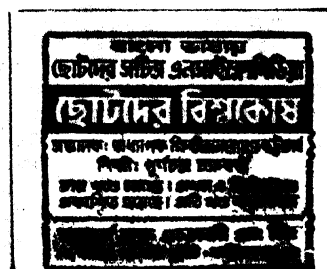
সঙ্গে গল্পের ঝোঁকে হাঁটতাম। কলকাতার শহরে এ সময়ও অবশ্য লোকজন বাস-ট্রাম মোটর প্রচুর থাকে। এমন নিঝুম না।

—যে দু-তিনদিন আছি, একদিন আসছেন তো সবাই? বরেন গলায় মিনতি রাখল, এই তো, আর একটু এগুলেই বাঁহাতি আমার ডেরা। যাকে বলবেন গভর্ণমেন্টের বাংলো, দেখিয়ে দেবে।

—আমার তো ঠিক নেই, বেরোতে হবে, হিমাংশু ঈষৎ চিন্তিত সুরে বলল, তেমন তেমন কাজ থাকলে ছুটি পাওয়া মুস্কিল।

—খুব আশা করেছিলাম একদিন হৈচৈ করব সবাই মিলে, জিভের আগায় ক্ষোভের শব্দ করল বরেন, স্ফূর্তি-আনন্দ করার সময় সুযোগ সর্বদা কিন্তু আর পাওয়া যায় না তো।

—কি আছে, নীলু যাবেখন বাচ্চাদের নিয়ে। ওই বরং আহ্লাদ-আনন্দ করতে ভালবাসে। পারে না, বেচারী।

—আর আপনি বুঝি বুড়িয়ে গেছেন একেবারে, এ্যাঁ? চোখ ছোট করে ভ্রূ কুঁচকে হাসল বরেন। আরে আসুন না মশাই, জমিয়ে আড্ডা দেবার একটা সুযোগ পেলে হেলায় হারাতে নেই।

—আচ্ছা দেখব। হিমাংশু বিনয়ে বলল।

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে এতক্ষণ কথা বলছিল ওরা, এবার বরেন বিদায় নিয়ে চলে যেতে হিমাংশু পিছন ফিরল। এত সময়ে চারিধার আরো নির্জন ও ঝিঁঝির ডাক আরো প্রখর হয়ে এসেছে। মৃদু অথচ অবিরাম হাওয়ায় গাছপালাতে আন্দোলন-জনিত মর্মর। পাতলা আবছা চাদরের মত ছড়িয়ে পড়া ঝিমঝিমে জোৎস্না মাখা। পথ মাড়িয়ে চলতে চলতে আপন মনেই হাসছিল হিমাংশু। বরেনের কথা, পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। বরেন, হিমাংশুর থেকে বয়সে কিছু ছোট, একদা তার ছিপছিপে শরীর দুর্বল অস্তিত্ব নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, পুরু চশমার ওধার থেকে হিমাংশুর দিকে স্থির তাকিয়ে বলেছিল :

—নীলুর আশা আপনাকে ছাড়তে হবে।

—কারণ? খুব স্টাইলের মাথায় সিগারেট মুখে চেপে হাতের বইটার দিকে অধিকতর মনযোগ সহকারে তাকিয়ে ভারী গলায় প্রশ্ন করেছিল সে।

—কারণ আমি নীলুকে ভালবাসি। বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গিয়েছিল বরেনের।

—তাতে কি। এমনভাবে ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল হিমাংশু যে বরেন যেন খুব অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের উপস্থাপনা করেছে।

—নীলুও ভালবাসে আমাকে।

—তা আমি কি করতে পারি।

—আপনি জেনেশুনেও আমাদের মধ্যে বাধা হচ্ছেন, ওদের বাড়ীতে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। এসব ঠিক না।

—নয় কেন, আমিও নীলিমাকে ভালবাসি।

—বিশ্বাস করি না, বরেন প্রায় ছেলে-মানুষের মত কিছুটা অভিমানী কিছুটা সংশয়িত গলায় বলে উঠেছিল, এ আপনার জেদ। এসব কিন্তু আমরা সহ্য করব না, জেনে রাখবেন। নীলু আমি দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক, কোন বাধাই আমাদের কাছে বাধা নয়।

—আচ্ছা, বরেনকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে অত্যন্ত স্থির শান্ত কঠিন স্বরে বলল হিমাংশু, এ বিষয়ে নীলিমার সঙ্গে কথা বলব আমি, কি হবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারছি না। আপনি আসুন এখন।

এই সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়ে এরপর বন্ধু-মহলে হাসির তুফান তুলেছিল হিমাংশু। সে সময় ওর বুক আত্মবিশ্বাসে প্রবল ছিল। নীলিমাকে বিয়ে করতে চাওয়ায় আমার শুধু জেদটুকুই প্রধান ছিল না। চলতে চলতে আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল হিমাংশু, প্রেম না থাকলে এ ধরণের জেদ কি আসতে পারে? আর নীলিমার বিষয়েও তার কেমন একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় ছিল। সে যেন জানত, বরেনের সম্বন্ধে তার যত দুর্বলতাই থাক, হিমাংশু সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সেই ম্লান ছায়াটুকু ঢেকে যেতে বেশী সময় লাগবে না। বস্তুত ব্যাপারটা ঘটেছিলও তাই শেষ পর্যন্ত। আর নীলিমার পরিবারের লোকেরা বিয়ের মত প্রতি-যোগিতার বাজারে বরেনের চেয়ে হিমাংশুকেই অধিকতর কাম্য মনে করেছিল তখন।

তাদের বিয়ের আগের এই ছোট্ট নেপথ্য ঘটনাটুকু পরে পরিহাসছলে নীলিমার কাছে গল্প করেছিল একদিন। তারপর আর কখনও বরেনের ব্যাপারে নীলিমার মনোভাব জানতে চায়নি। আসলে এ বিষয়ে বরেনের ভূমিকাকে এত তুচ্ছ মনে করত হিমাংশু যে কোনদিন নীলিমার সঙ্গে বরেন সম্বন্ধে আলোচনা করতেও তার প্রবৃত্তি হয়নি।

গাছগাছালির ঝোপে দুটো রাতচরা পাখী কালো ডানায় ঝটপটানি তুলতেই চমক ভাঙলো হিমাংশুর। অনতিদূরে কোথায় শেয়াল ডাকল হুক্কাহুয়া। বেশ কিছু সময় হিমাংশু বাড়ী থেকে বেরিয়েছে। নিরালা নিঃশব্দ ঘরে একা-একা নীলিমা নিশ্চয়ই শঙ্কিত বা চিন্তান্বিত হচ্ছে। আচ্ছা, নিজের মনেই প্রশ্ন জাগল হিমাংশুর, নীলিমা এখন কার কথা ভাববে, বরেন অথবা হিমাংশু। সম্ভবত বরেনের কথাই প্রকট করে মনে জাগছে নীলিমার, কারণ অনেক অনেকদিন পরে আজ পুরনো পরিচিত লোকটিকে দেখল নীলিমা, তার সঙ্গে গল্প করল। স্মৃতি যেমনই হোক আনন্দ বা বেদনায়, ছোটবেলার হারানো দিন মানুষের কাছে আদরের হয়। বর্তমানের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক দূরে সে বিস্তৃত হয়, সেখানে হিমাংশুকে এখন স্থান দেবে কি করে নীলিমা। আপন মনে আবার হেসে ফেলল হিমাংশু। আনাচকানাচে কোথাও ঈর্ষা ছায়া ফেলছে কিনা সমীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে হল। কে জানে, অবচেতনে কোথাও এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হচ্ছে কিনা। ভাল করে ভাববার আগেই নিজের বাড়ীর দরজায় পেঁছে গেল হিমাংশু।

—তুমি যে কেমন মানুষ। ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতায় জুতোর শব্দ পেয়ে দরজা খুলল নীলিমা।

—কেন ভয় করছিল?

—না। গলায় একরাশ বিরক্তি ও অভি-যোগ নিয়ে ঘরে চলে গেল নীলিমা। পিছনে হিমাংশু এল। গায়ের জামা খুলে আলনায় টাঙ্গাল। দু হাত টান-টান করে ক্লান্তি ছড়াল শরীরের। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। হিমাংশু বরেনের সঙ্গেই খেয়েছিল, নীলিমাও খাওয়া সেরে নিয়েছিল ইতিমধ্যে, কিন্তু এখনি শোয়ার উদ্যোগ করল না সে। আলোর নীচে চেয়ার টেনে কি একটা সেলাই নিয়ে বসল। আলোর বাল্ব ঘিরে কিছু পোকামাকড় উড়ছিল ক্রমাগত। তাদের পাখার অস্ফুট গুঞ্জন আর দেয়াল ঘড়ির টিকটিক মিলে নিশ্চুপ ঘর-খানায় কেমন একটা অস্বস্তিকর শব্দের সৃষ্টি হচ্ছিল। হিমাংশু বিরক্ত বোধ করলেও কিছু বলল না। চোখে আড়াআড়ি হাত চেপে আলো আড়াল করে রাখল। রাতের নৈঃশব্দ চিরে চিরে আবার একটা মালগাড়ীর আওয়াজ বাতাসে মিলিয়ে গেল। একটু নড়েচড়ে বসে নীলিমাই কথা বলল এবার।

—অন্যদিনের মত আজ ঘুম পাচ্ছে না একটুও।

—ধরাবাঁধা অভ্যাসে হঠাৎ একদিন বদল হলে এরকম হয়।

স্থির একভাবে শুয়ে খুব নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দিল হিমাংশু। ওর কথার অন্য কোন অর্থ আছে কিনা সম্ভবত ভেবে পেল না নীলিমা। সেলাই রেখে উঠে প্রায় অকারণেই ঘরের টুকিটাকি জিনিষ নাড়া-চাড়া করল ক মিনিট।

—বরেনবাবু যেতে বলেছিলেন অনেক করে। হিমাংশু বলল।

—হ্যাঁ।

খুব স্বাভাবিক এবং ছোট্ট করে বললেও হিমাংশু নীলিমার স্বরে চাপা আগ্রহ ও উত্তেজনার আঁচ বুঝতে কান পাতল।

—যেও একদিন, বেড়িয়ে এস। হিমাংশু হাই তুলল।

—তুমি? জিজ্ঞাসু হল নীলিমা।

—আমি পারব না। সময় পাব না। ওকে বলেই দিয়েছি সে কথা।

—কি বলেছ? ঈষৎ ব্যগ্রের ছোঁয়া লাগল নীলিমার স্বরে।

—কি আবার, বলেছি তুমি একাই যাবে। [illegible] নিয়ে।

—তোমার সময়ের একান্তই অভাব বুঝি? বিদ্রূপটাকে আর চাপা দিয়ে রাখতে পারল না নীলিমা।

—না তো কি?

—আসলে ইচ্ছের অভাব। একটা বিদ্বেষের ভাব যেন ফুটল এবার নীলিমার গলায়।

—যাই বল। সামান্য অতিষ্ঠ হয়ে বলল হিমাংশু। ওপাশে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুলে। ঘুমন্ত মেয়ের এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলোল ক'বার। মেয়েটা ওর ভীষণ প্রিয়।

—পরশুই যাব তাহলে। নীলিমা যেন হিমাংশুর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে কিছুটা জোর দিল কথাটায়, ওদের স্কুল ছুটি আছে সেদিন।

—একটু সকাল সকাল যেও, বরেনবাবু তো আবার উদ্যোগ আয়োজন করবেন। খুব সহজ শান্ত গলায় বলল হিমাংশু। ওর স্বরে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে এই মুহূর্তে ওর মনে কোথাও কোন আঁচড় নেই।

একটু যেন দমে গেল নীলিমা। সম্ভবত হিমাংশুর এই নিরুত্তেজিত উদাসীন ভাব ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত করছিল ওকে। এর চেয়ে হিমাংশু যদি শাসনে কঠিন, বিদ্রূপে ক্ষুরধার হত—ওর পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হত তাহলে।

সদর বন্ধ ছিল বলে ঘরের দরজাটা এখনো খুলেই রেখেছিল নীলিমা। বাইরের উঠোন থেকে ফাঁকা হাওয়ায় ছোট ছোট গাছপালার মাতামাতির শব্দ আসছিল। অচেনা ফুলের গন্ধটা ভারী হয়ে এসে ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। নীলিমা আলোটা নিভিয়ে দিতে দরজার বাইরে থেকে তেরছা হয়ে পরিষ্কার চাঁদের আলো এসে পড়ল ঘরের ভেতর খানিকটা অংশে। খাটের ওপর হিমাংশুর পায়ের দিকটায় এসে বসল নীলিমা, হিমাংশু অনুভবে বুঝল। চোখ খুলে দরজার কাছে ছিটিয়ে থাকা জ্যোৎস্না দেখল।

—বরেনদা যদি সঙ্গে যায় ওদিকে নদীর ধারে কোথায় মেলা বসে এসময়, বেড়িয়ে আসব। হাই তুলে একটু ছেলেমানুষী গলায় বলল নীলিমা।

—বেশ তো, যেও না। ওদিকটা তোমার দেখা হয়নি তো কোনদিন, হিমাংশু কথায় দরদ ফোটাল।

—জীবনে প্রায় সব দিকটাই তো না দেখাই রয়ে গেল। সামান্য শব্দ করে হাসল নীলিমা, চেষ্টাকৃতভাবে বড় করে শ্বাস ফেলল।

হিমাংশু নীলিমার সব আচরণই বুঝছিল মনে মনে। ও আজ ইচ্ছে করে এমন করছে কেন, ভাবল হিমাংশু, শুধু শুধু আমাকে উত্তপ্ত করতে চেষ্টা করছে। চিন্তা করতে গিয়ে আপন মনেই হাসি এল হিমাংশুর। হয়ত নীলিমা চাইছে হিমাংশু বরেনকে ঈর্ষা করুক। নিজের মধ্যেই জ্বলুক খানিকটা। আসলে হয়ত নীলিমা চাইছে নিজের প্রতি হিমাংশুর পুরনো আগ্রহটা ফিরিয়ে আনতে অথবা ঝালাই করে নিতে।

—বরেনদার মত স্ফূর্তিবাজ খোলামেলা লোকের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েও আনন্দ হয়। নিশ্চুপে নীলিমার মন্তব্য শুনল হিমাংশু। অন্ধকারে চোখ খুলে ওর উপবিষ্ট মূর্তি দেখল।

আচ্ছা, নিজেকে এবার প্রশ্ন করল হিমাংশু, আমিই বা এত নিরাসক্ত শীতল হয়ে আছি কি করে? যে কোন লোক, সামাজিক ভদ্রলোক, এসব ব্যাপারে চাপা উত্তেজিত হয়ে উঠবে, এটাই তো স্বাভাবিক ঘটনা। নিজের মনে হাতড়ে কুল-কিনারা পাচ্ছিল না হিমাংশু। হিমাংশু জানে, এককালে বরেন ও নীলিমার মধ্যে দুর্বলতার সম্পর্ক ছিল। তৎকালীন কিছু বাধা-নিষেধে আর হিমাংশুর ব্যক্তিত্বের চাপে নীলিমা পথভ্রষ্ট হয়েছিল বটে, তখন কি এমন বয়স ছিল তার, তবু সেই সব প্রথম দিনের ভাল লাগার জলছবি জীবন থেকে একেবারে তো মুছে যায় না, একথা হিমাংশু সত্যিই স্বীকার করতে বাধ্য। আজ তাই দীর্ঘকাল পরে বরেনের সান্নিধ্যে নীলিমার সর্বাঙ্গে সলজ্জ খুশীর ছায়া হিমাংশুর নজর এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু তাতে কি এসে গেছে হিমাংশুর। সে তো সত্যিই কিছু আর ভদ্রতা সৌজন্য বা সভ্যতাবোধে আক্রান্ত হয়ে নিজের ভেতরের আক্রোশকে দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে না। বরং এই যে তার সৃষ্টিছাড়া নির্লিপ্ত, সব কিছু থেকে আলগা হয়ে শূন্যতার মধ্যে ঝুলে থাকা, নিজের গভীরে তারই কারণ খুঁজতে প্রয়াসী, হল হিমাংশু। তবে কি আমি নীলিমার প্রতি বীতস্পৃহ? নিজেকে প্রশ্ন করল সে। ওকে আর ভালবাসি না, কিছু না, শুধু একটা দীর্ঘদিনের অভ্যাস প্রয়োজন ও সামাজিকতার দায়ে দুজনে দিনযাপন করে চলেছি? কে জানে। স্বচ্ছ হয়ে থাকা অন্ধকারে চোখ পেতে নীলিমার অস্তিত্বের দিকে, আবছা শরীরের রেখার দিকে স্থির চেয়ে থাকল হিমাংশু। অথচ এই নীলিমার জন্যে একদা হিমাংশু বুকের ভেতর অসম্ভব ভালবাসা বোধ করেছিল। ওর সঙ্গে বরেনের সম্পর্কের কাহিনী জেনেও ভেবেছিল নীলিমাকে ছাড়া তার জীবন ব্যর্থ। ভেবেছিল অন্যান্য যে কোন আকর্ষণ থেকে নীলিমাকে বিচ্ছিন্ন করে সে আনবেই।

—ভদ্রলোকের লাক ভাল। কথা বলতে হয় তাই বলল হিমাংশু, চাকরীটা খুব ভালই পেয়ে গেছে।

—তুমি একবার বললে না কেন ওকে, নিজের জন্যে?

কথাটার মধ্যে খোঁচা দেবার চেষ্টা আছে কিনা গ্রাহ্য করল না হিমাংশু।

—ভাবছিলাম। বলল হিমাংশু, তবে আমার সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠতা নেই তেমন। তুমিও তো একবার জিজ্ঞেস করতে পার এ বিষয়ে।

—বলবখন। আশ্বস্ত করার মত করে বলল নীলিমা।

—করে দিতে পারে, চেষ্টা করলে। আলাপী লোক, দু-পাঁচজনের সঙ্গে চেনাজানাও তো আছে। ওর মত না হোক, ভাল একটা চাকরী-বাকরী পেলে এ কাজটা ছেড়েই দেব।

—আমি বললে বরেনদা নিশ্চয় চেষ্টা করবে।

খানিকটা গর্বিত ও উদ্ধত শোনাল নীলিমার গলা। কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল দুজনেই। হিমাংশুর ঘুম আসছিল, ক্লান্তির গলায় বলল, ঘরের দরজাটা বন্ধ কর এবার। এত রাত্রে এরকম ফাঁকা জায়গায় দরজা খুলে রাখা ঠিক না।

রাত ঘন হয়ে আসা পরিবেশে প্রায়ান্ধকার ঘরে তন্দ্রার ঘোরে খানিকটা সময় গুনল হিমাংশু নীরবে। তারপর নীলিমার দিক থেকে সাড়াশব্দ না পেয়ে চোখ খুলে দেখল। খোলা দরজায় হেলান দিয়ে চৌকাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নীলিমা। ওর ভঙ্গিটা কেমন শিথিল ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। নির্জন রাতের দুধ সাদা জ্যোৎস্না দাওয়ায় বিছানো। এলোমেলো হাওয়ায় ওর উড়ন্ত আঁচল এবং চুলের রেখা দেখতে পাচ্ছিল হিমাংশু। ও যেন হঠাৎ দমে গেছে, হিমাংশু ভাবল, ওর ভেতরের সংগ্রাম করবার শক্তি নিঃশেষিত এতক্ষণে। ওর দাঁড়ানোয় এমন একটা হতাশা ও করুণতা মেশামেশি করে ছিল যে হিমাংশু দুঃখবোধ না করে পারল না। হিমাংশুর ওর প্রতি এই আসক্তিহীনতা, এই নিরুত্তেজ রাশছাড়া ভাব, এ সবই ওকে নির্মম আঘাত হেনেছে। ওর সমস্ত সূক্ষ্ম চাওয়া-পাওয়াকে চরম গ্লানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। বেচারা। অথচ হিমাংশুরও তো আর কিছু করার নেই। অথবা, হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে ভিন্ন একটা চিন্তা মাথায় এল চকিতে। নীলিমা হয়ত এখন আদৌ অন্য বিষয় ভাবছে। বরেন সম্বন্ধে ওর যে এই সমস্তক্ষণব্যাপী অহমিকা আর অধিকারবোধ, এসবই যে কতদূর অর্থহীন তা অবশ্যই নীলিমা উপলব্ধি করতে বাধ্য। যতদূর স্মরণ করা যায়, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বরেনের আচরণের মধ্যে এমন কিছু চাঞ্চল্য বা অবদমিত উষ্ণতার আভাষ দেখা যায়নি যা থেকে মনে হতে পারে, দীর্ঘদিন পর নীলিমার সান্নিধ্যে এসে সে অনৈসর্গিক কোন কিছুর আস্বাদ লাভ করছে। আশ্চর্য নয়, বরেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত কৃতি পুরুষ, জীবনের নানাক্ষেত্রে ওর ভিন্নতর আকর্ষণের অভাব নেই। একথা নীলিমা আজ বোঝে না তা নয়। তবু বরেনকে অবলম্বন করে হিমাংশুর সামনে নিজের মূল্যবোধ জাহির করেছে, আর হিমাংশুর কঠিন ঠান্ডা আচ্ছাদনের কাছে বারবার ব্যর্থ প্রতিহত হয়েছে। দুকূল হারানো একটা নদীর মতন তাই নিজের অভ্যন্তরেই অভিমান আক্ষেপ হতাশ্বাস অথবা কান্নায় থৈ-থৈ করছে এখন নীলিমা। একদৃষ্টে নীলিমার স্থির দাঁড়ানো প্রতিমূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল হিমাংশু। কখন যে দরজা বন্ধ করল নীলিমা, তা জানতেও পারল না।

কী এবং কেন

বিজ্ঞানের যুগে যা সবারই জানা দরকার।
নতুন বিভাগ। লক্ষ্য রাখুন।

কম্প্যুটার (২)

একটি আধুনিক কম্প্যুটারের একাংশ।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে কম্প্যুটারের কর্মধারা সম্পাদিত হয় পাঁচটি অংশের মাধ্যমে। এই পাঁচটি অংশ কিভাবে কাজ করে তা এবার দেখা যাক।

মানুষকে তার সমস্যা অনুযায়ী কম্প্যুটারের জন্যে প্রথমে একটি কর্মসূচী বা 'প্রোগ্রাম' স্থির করে দিতে হবে। এই প্রোগ্রামিং বা কর্মসূচী নির্ধারণে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। প্রছিদ্রিত (পাঞ্চড্) কার্ড, কাগজের ফিতা বা চৌম্বক ফিতায় ঐ কর্মসূচী দ্বিসংখ্যক ভাষায় লিখে প্রথমে কম্প্যুটারের প্রবেশ-অংশে উপস্থিত করা হয়। ঐ অংশ তখন তাকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে স্মৃতি-ভাণ্ডারে পাঠিয়ে দেয়।

স্মরণ রাখবার যেসব উপকরণ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় চৌম্বক ফিতা। টেপ-রেকর্ডারে এই ধরনের ফিতার ব্যবহার আমরা দেখে থাকি। এই ফিতায় 'ফেরাইট' নামে একজাতীয় দ্রব্যের ছোট ছোট উপাদান থাকে। যেসব দ্বিসংখ্যক অংক বা বিটকে স্মরণ করে রাখতে হবে, তাদের সমধর্মী বৈদ্যুতিক সংকেতের সাহায্যে ঐ সব উপাদানের এক একটি চৌম্বক অবস্থা এক-একটি বিট অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং ঐ সব উপাদানের চৌম্বক অবস্থার মধ্যে বিটগুলির খবর জমা থাকে। কোনো বিটকে স্মরণ করবার অর্থ হচ্ছে চৌম্বক ফিতার যে উপাদানে ঐ বিটের খবরটি জমা আছে, বিটটির মধ্যে সেই উপাদানকে খুঁজে বার করা এবং উপাদানটির চৌম্বক অবস্থা অনুযায়ী একটি কার্যকর বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করা। কোনো কোনো কম্প্যুটারের স্মৃতি-ভাণ্ডারে ১০০ কোটি পর্যন্ত বিট সঞ্চিত থাকতে পারে।

নিয়ন্ত্রক অংশকে কম্প্যুটারের হৃদ্‌পিণ্ড বলা যেতে পারে। কম্প্যুটারের মধ্যে যে বিপুল সংখ্যক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একটি সুশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি করবার দায়িত্ব হচ্ছে নিয়ন্ত্রক অংশের। 'কাজ শুরু করো', 'যোগ করো', 'অমুক নম্বর বিটকে স্মরণ করো', 'কাজ বন্ধ করো' ইত্যাদি যেসব নির্দেশ কর্মসূচীতে দেওয়া হয় সেগুলি এই অংশ বুঝতে পারে এবং বুঝে সমস্ত সুইচকে যথাসময়ে খোলার বা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। দ্রুত স্পন্দনশীল বৈদ্যুতিক দোলক বা ঘড়ি এবং রিলে, ডিলে ইত্যাদি নানারকম বৈদ্যুতিক উপকরণ ব্যবহার করে এই অংশে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

গণিত-অংশের কাজ হচ্ছে ইলেকট্রনিক সুইচের সাহায্যে যত কিছু আংকিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। এই সব সুইচ আলোর প্রায় সমান গতিতে (সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) খোলে বা বন্ধ হয়। কোনো কোনো কম্প্যুটারে সুইচ খুলতে বা বন্ধ হতে সময় লাগে এক সেকেন্ডের ১০০ কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই সব ইলেকট্রনিক সুইচের কাজ করত ইলেকট্রনিক ভালব। আজকাল সব কম্প্যুটারে ভালবের স্থান গ্রহণ করেছে ট্রানজিস্টর ও সেমি-কন্ডাক্টর ডায়োড।

আগেই বলা হয়েছে, কম্প্যুটারে সম্পাদিত সমস্ত গাণিতিক প্রক্রিয়ার ফলাফল স্মৃতি-অংশে জমা হয়ে থাকে। নিয়ন্ত্রক অংশের নির্দেশে সেই সব ফলাফল অনুযায়ী বৈদ্যুতিক সংকেত প্রস্থান-অংশে চলে যায় এবং সেখানে তারা রূপান্তরিত হয়ে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে যাতে মানুষ তা বুঝতে পারে। সাধারণত এই আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রছিদ্রিত কার্ড বা কাগজের ফিতায় মুদ্রিত দ্বিসংখ্যক ভাষায় যা থেকে সহজেই মানুষের প্রচলিত যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করা যায়। কোনো কোনো কম্প্যুটারে প্রস্থান অংশ থেকে ফলাফলগুলি কাগজের ওপর মানুষের প্রচলিত ভাষাতেই মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে কম্প্যুটারের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। মানুষের মতোই কম্প্যুটার অংক কষতে পারে, ফলাফল স্মরণ করে রাখতে পারে এবং যুক্তির আশ্রয় নিতে পারে। অবশ্য মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে কম্প্যুটারের পার্থক্যও আছে অনেক। যে সমস্যার সমাধান করতে একজন মানুষের কয়েক বছর কেটে যাবে, কম্প্যুটার তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে করে দিতে পারে। তবে কম্প্যুটারের স্মরণশক্তির তুলনায় মানুষের স্মরণশক্তি অনেক বেশি বিপুল। কম্প্যুটারের সুইচের সংখ্যা যেখানে ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ, সেখানে মানুষের মস্তিষ্কে সমধর্মী নিউরনের সংখ্যা ১০০০ কোটি।

এখন দেখা যাক, কম্প্যুটার মানুষকে আজ কতভাবে সাহায্য করছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত যেসব সমস্যার সমাধান এক-রকম প্রায় অসাধ্য বলে মনে হত, আজ কম্প্যুটারের সাহায্যে তাদের অনেকগুলির সমাধান সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার আজ সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রয়োগ আমরা দেখছি মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে কম্প্যুটার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। গতি-শীল মহাকাশযানের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যাদি বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে কম্প্যুটারের কাছে এলে কম্প্যুটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিসাব-নিকাশ করে জানিয়ে দেয়, যানটি পূর্ব নির্দিষ্ট পথে চলছে কিনা। যদি কিছু বিচ্যুতি ঘটে, তার পরিমাপও কম্প্যুটার জানিয়ে দেয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার ক্ষেত্রেও কম্প্যুটার আজ মানুষকে অনেকখানি সাহায্য করছে।

বিশ্বের অন্যতম কম্প্যুটার : এর স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রায় চার হাজার আঙ্কিক শব্দ জমা থাকে।
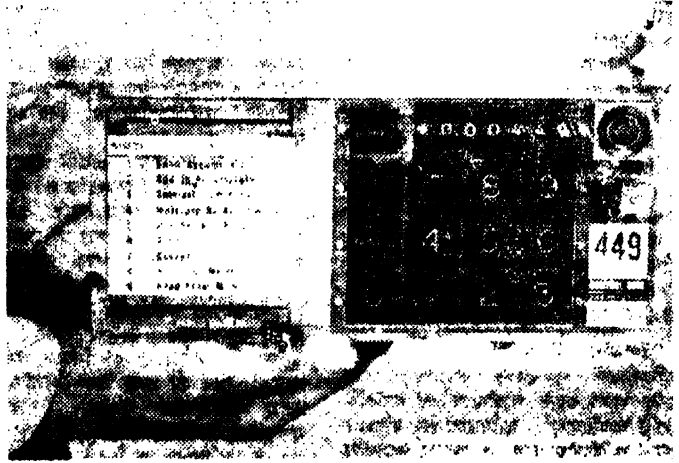
যেমন কোনো সেতু তৈরী বা সুড়ঙ্গ কাটতে যেসব গণনার প্রয়োজন তা কম্প্যুটার অতি অল্প সময়েই করে দেয়। শুধু ইঞ্জিনীয়ারদের নয়, চিকিৎসকদের কাজেও কম্প্যুটার আজ সাহায্য করছে।

রোগের উপসর্গগুলি কম্প্যুটারের কাছে তুলে ধরলে কম্প্যুটার সহজেই রোগ নির্ণয় করে দিতে পারে। তা ছাড়া, মানুষের মস্তিষ্কের কর্মধারার অনেকখানি সাদৃশ্য থাকায় কম্প্যুটারের সাহায্যে আজ মানুষের মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডের জটিল রহস্য উদ-ঘাটনের চেষ্টা চলছে, নানারকম স্নায়ু-রোগ চিকিৎসার উপায়ও উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এর ওপর ভিত্তি করে যে নতুন বিজ্ঞানবস্তু গড়ে উঠেছে তার, নাম দেওয়া হয়েছে 'বায়োনিকস' অর্থাৎ বায়োলজি ও ইলেকট্রনিকস-এর সমন্বয়। অদূর ভবিষ্যতে কম্প্যুটার আরও কতভাবে যে মানুষকে সাহায্য করবে তা বলে শেষ করা যায় না।

মুর্শিদাবাদে অভিনব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একদল ছাত্র ও অধ্যাপক মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাদিডাঙ্গায় খনন-কালে দুটি অভিনব টেরাকোটা নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। এ দুটি নিদর্শনের একটিতে রোমান লিপি এবং অপরটিতে দক্ষিণ ভারতের পল্লভ লিপি দেখা গেছে। খনন স্থানের কাছে প্রাচীন বাংলার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল। এই দুটি মুদ্রা ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যা এখানে পাওয়া গেছে তা থেকে কর্ণসুবর্ণের গৌরবোজ্জল দিনের পরিচয় পাওয়া যায়।

রোমান মুদ্রাটি ত্রিভুজাকার এবং তাতে 'ওয়াবোরা' কথাটি খোদিত আছে। এটি সম্ভবত কোনো ব্যক্তির নাম। এই মুদ্রাটি দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের বলে বিশষজ্ঞরা মনে করেন। এর আগে এই স্থানে আর একটি রোমান মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। তাতে গ্রীক দেবতা ঋতুরাজ হোর-এর দেখা যায়। পল্লভ লিপি খোদিত মুদ্রাটি সপ্তম-অষ্টম খৃস্টাব্দের বলে অনুদিত হয়। এতে 'হাস্নোহিদিনো' (সম্ভবত সবর্ণ শ্রী) নাম লেখা আছে। এই দুটি লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন লিপি-বিশেষজ্ঞ ডঃ বি এন মুখার্জি।

এই খননকার্যের পরিচালক কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ আর দাসের মতে আবিষ্কৃত লিপির ভিত্তিতে বলা যায়, রাজবাদিডাঙ্গা হচ্ছে সুপ্রসিদ্ধ রক্তমৃত্তিকা বিহারের স্থান। সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ এই বিহারটি পরিদর্শন করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখে গেছেন, দক্ষিণ ভারতের জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণের সম্মানে দেশের রাজা বিহারটি নির্মাণ করেন। এই বৌদ্ধ শ্রমণ এক প্রকাশ্য সভায় দক্ষিণ ভারতের অপর এক দাম্ভিক পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব দল দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। চারটি বিশিষ্ট গঠনশৈলীর নিদর্শন অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। চারটি নিদর্শনের মধ্যে একটিতে চন্দ্রাকার মণ্ড-প্রবেশ-রীতি লক্ষ্য করা যায়।

এই রীতি এতদিন বাংলাদেশে দেখা যায় নি। আর একটিতে পঞ্চায়তন মন্দিরের রীতি পরিলক্ষিত হয়। এই রীতিতে চার কোণে চারটি বর্গাকার ছোট মন্দির এবং কেন্দ্র-স্থলে পঞ্চম মন্দিরটি দেখা যায়।

এ বছরের ফেব্রুয়ারী-মে মাসে এই খননকার্য চালানো হয়। এই খননকার্যে আর একটি বৃহদাকার মন্দির—রীতির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। এই মন্দিরটি রীতিতে সীমানা-প্রাচীর, বহির্ভাগে মণ্ড এবং অন্তর্ভাগ 'শর্ক' নির্মিত প্রাঙ্গণ দেখা যায়। একাধিক তলাবিশিষ্ট গৃহের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গেছে। এই গৃহের গঠনরীতি দেখে বলা যায়, এগুলি প্রাচীন বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহারেরই স্মৃতিচিহ্ন।

আবহতত্ত্ববিদের নতুন হাতিয়ার "লীডার"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাডার আবিষ্কারের পর থেকে আবহতত্ত্ববিদদের কাছে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ নির্ধারণে এটি একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। বিমান ও জাহাজ চালনার ক্ষেত্রেও রাডারের উপযোগিতা অপরিসীম।

রাডারের মূল কার্যপ্রণালী অতি সরল। কয়েক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ বিশেষভাবে নির্মিত অ্যানটিনা থেকে ক্ষুদ্র স্পন্দনের রশ্মিরূপে প্রেরিত হয়। এই স্পন্দনগুলি বায়ুবাহিত বারিকণা বা তুষার অথবা কখন কখন অন্যান্য বস্তু (যেমন শত্রু-পক্ষের বিমান) থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার অ্যানটিনায় ফিরে আসে। রশ্মি ফিরে আসার সময় থেকে যে বস্তুর দ্বারা তা প্রতিফলিত হচ্ছে তার দূরত্ব নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু রাডারের বহুমুখী কার্যকারিতা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গের দরুন বারিকণা বা তুষারকণার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বস্তু এর দ্বারা সনাক্ত করা যায় না। এ কারণে রাডারের দ্বারা ধূলিকণা বা বাতাসে ভাসমান ধোঁয়ার অস্তিত্ব ধরা যায় না।

সম্প্রতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রুবি বা পদ্ম-রাগমণি লেসারের ওপর ভিত্তি করে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের একটি নতুন ও অভিনব হাতিয়ার উদ্ভাবিত হয়েছে। এই হাতিয়ারটির নাম 'লীডার' অর্থাৎ লাইট ডিটেকশান অ্যান্ড রেঞ্জিং। মাইক্রো ওয়েভ বা হ্রস্বতরঙ্গের পরিবর্তে আলোক-তরঙ্গ ব্যবহার করে কণার আকারের দিক থেকে বিচারে সনাক্তীকরণের সীমা বহুগুণ বির্বাধত হয়েছে। লীডার-এর সাহায্যে কোনো বিস্ফোরণজাত ক্ষুদ্র ধূলিকণা বা মাঠের ওপর স্প্রে-করা কীটঘ্ন দ্রব্যের অস্তিত্ব ধরা যায়।

যখন কোনো কীটঘ্ন দ্রব্য মাঠের ওপর স্প্রে-করা হয়, তখন বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতিবেগের ওপর নির্ভরশীল ছিটানো কীটঘ্ন দ্রব্যের ধোঁয়া নামবার সময় গাছের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। বিমানবাহিত লীডার ব্যবহার করে অদৃশ্য কীটঘ্ন দ্রব্যের মেঘের চলাচল অনুসরণ করা যেতে পারে এবং লীডার পর্যবেক্ষণে তার 'এলাকা' সনাক্ত করে ছিটানো দ্রব্যের পরিমাণও নির্ধারণ করা যায়।

লীডার-এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতা হচ্ছে বিস্ফোরণজাত ভস্মাব-শেষের মেঘপুঞ্জ সনাক্ত করা। এইভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার অস্তিত্ব লীডারের সাহায্যে সনাক্ত করা যেতে পারে।

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে লীডারের ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিক। কাজেই এই নতুন হাতিয়ারটি ভবিষ্যতে এই বিষয়ে কতখানি সাহায্য করবে তা আজ ঠিক উপলব্ধি করা সহজ নয়। তবে রাডার, ইলেকট্রনিক কম্পুটার, রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ আব-হাওয়া পর্যবেক্ষণে যে বিরাট অগ্রগতি এনে দিয়েছে, তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় লীডার এ বিষয়ে আরও অগ্রগতি এনে দেবে।

একটি অনন্যসাধারণ জীবাণু

গ্রহান্তর অভিযানে মানুষের একের পর এক বিরাট সাফল্যে একটি প্রশ্ন আজ বিশেষভাবে জেগে উঠছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে গ্রহান্তরে জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে। পৃথিবীতে যে জীবনের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেরকম না হলেও অন্য রকম জীবন কি সেখানে সম্ভব নয়?

পৃথিবীতে বাতাস ও অক্সিজেন ছাড়া আমরা জীবন ধারণ করতে পারি না। কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতেই মাটির মধ্যে এক রকম জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে যারা বাতাস ও অক্সিজেন ছাড়াই বাঁচে ও বেড়ে ওঠে। এদের বলা হয় 'অ্যানিরোবিক জীবাণু'। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে মাটি থেকে নানা ধরনের 'মাইক্রোব' বা আনুবীক্ষণিক জীবাণু পৃথক করেছেন। প্রতি বছরই মাটির মধ্যে থেকে 'ছেঁকে তোলা' নতুন নতুন জীবাণুর কথা আমরা জানতে পারছি।

কিন্তু মৃত্তিকাবাসী জীবাণু জগতের যে বাসিন্দা সম্বন্ধে আমরা সবচেয়ে কম জানি তারা হলো অ্যানিরোব জীবাণু। একশো বছর আগে জীবাণু গবেষণার পৃথি-কৃৎ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এই জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, এই অ্যানিরোব জীবাণুর জৈবিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে মোটেই অক্সিজেন প্রয়োজন নেই, বরং এদের পক্ষে অক্সিজেন মারাত্মক। পাস্তুরের আগে পর্যন্ত জীবন-দায়িনী গ্যাস অক্সিজেন ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব বলে মনে করা হত। এমনকি, পাস্তুরের এই আবিষ্কারের পরেও অনেকদিন পর্যন্ত অ্যানিরোব জীবাণুদের বিরল এবং অদ্ভুত একধরনের জিনিস বলে মনে করা হত।

কিন্তু আজ পৃথিবীর নানা আনাচকানাচে 'বিনা অক্সিজেনে জীবনের অস্তিত্ব'র পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে মাটির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে এধরনের বহু জীবাণু। এসব জীবাণু সম্বন্ধে আমরা এখন পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি তা থেকে মাটির মধ্যে যেসব প্রক্রিয়া চলছে সেই প্রক্রিয়াগুলির পক্ষে এদের বিরাট গুরুত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। অনন্য-সাধারণ এই অ্যানিরোবিক জীবাণু সম্বন্ধে অনুশীলন করে ইতিমধ্যেই জীবাণুদের জীবন সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য জানা গেছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু জানা যাবে। তাই এর পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা আজ দৃঢ় ধারণা পোষণ করছেন, পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহে অন্য ধরনের জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়।

অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর সংবর্ধিত

গত ২৮ মে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে এক প্রীতিপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীরকে তাঁর ৭০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু ও অনুরাগীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু এবং জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষ এস বি দত্ত সকলকে স্বাগত জানান। সংবর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক অধ্যাপক সত্যসুন্দর দেব প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত মানপত্র পাঠ করেন। সর্বশ্রী এন জি রায় সরকার, জে বসু, জে রায়, এন কে পাল, এন সি রায় এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব শ্রীজয়ন্ত বসু অধ্যাপক খাস্তগীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক খাস্তগীর তাঁর প্রতি প্রীতি-ভালবাসার জন্যে সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
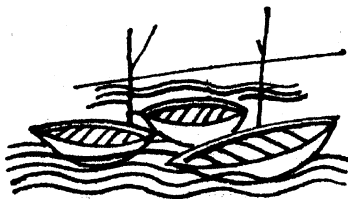
রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১৪)

চিত্রকল্পনা- প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে- চিত্রসেন

তেজসিংহ চলে যাবার পরও ভীল মেয়েটি কিন্তু একলা নির্জনে বসে রইল। গাঁথা মালাটি সে তখন ফেলে দিয়েছে।

রাজপুত বীরত্ব তুলনাহীন, কিন্তু মানসিংহের অধীন মোগলবাহিনী সংখ্যায় অগণন। রসদ ও যুদ্ধোপকরণ তাদের অফুরন্ত। হলদীঘাটার পর অরণ্য পর্বতচারী, ছিন্নবেশ, অর্ধ-উপবাসী রাণাপ্রতাপের সঙ্গে তাঁর অসামান্য রাজপুতবাহিনী প্রাণ দিয়ে যুঝেও সে মোগল-বন্যা রোধ করতে পারল না। শত্রু একের পর এক দুর্গ অধিকার করে চলল।

ধূমমহল দুর্গও একদিন আক্রান্ত হল।

সে দুর্গে তেজসিংহও তখন উপস্থিত।

আপনার মানসিক উৎকণ্ঠা মেপে দেখুন!

মানসিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা কোনোদিন কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। বরং উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ফলেই আমাদের মধ্যে অবসাদ এসে পড়ে এবং সব কাজ আরো জট পাকিয়ে যায়, ভুল করে কাজের পরিমাণ বেড়ে যায়, এবং দুশ্চিন্তা বাড়ে। যথাসময়ে এর প্রতিকারের চেষ্টা না করলে এটা একটা বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, অর্থাৎ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার তীব্রতা বাড়তে থাকে, অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে হয়।

কখন ঠিক কোন্ দিকে মন দিতে হয় এবং কোন্ জিনিসটার খোঁজ করে কাজে লাগাতে হয়, তা যদি আমরা শিখতে বুঝতে পারি, তাহলে উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে দমন করতে পারি, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করতে পারি।

এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারে নীচের টেস্টটি। নীচে দশটি ঘটনা-পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি ঐ সব পরিস্থিতিতে কি ধরনের আচরণ করবেন বলে মনে করেন, সেকথা ভেবে নিয়ে (ক) কিংবা (খ)-তে দাগ দিন। তারপরে সবশেষে পয়েন্ট হিসাবের যে-নির্দেশ দেওয়া আছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। আপনি ইনটারভিউ দিতে গেছেন। আপনাকে বসতে বলা হলো।

• (ক) আপনি চেয়ারের ধারে দেহ হেলিয়ে ঝুলে বসলেন, হাত জড়ো করে রাখলেন কিংবা চেয়ারের হাতলের উপর রাখলেন। বেশ বুঝতে পারছেন, আপনার দেহটা ভেতরে-বাইরে কাঠের মতো খুব আড়ষ্ট হয়ে আছে।

(খ) আপনি চেয়ারে আরাম করে বসলেন সমস্ত দেহের ভর দিয়ে। বেশ সচেতনভাবেই আপনার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল করে দিলেন। সামনে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কথাই এতো বেশি করে ভাবতে লাগলেন যে, নিজের কথা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করলেন।

২। কোনো নতুন লোক বা অল্প-পরিচিত লোকের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে।

• (ক) লোকটি যখন কথা বলছেন, তখন তাঁর কথা কিছু শুনছেন, কিছু শুনছেন না, কারণ আপনি তখন ভাবছেন, উনি থামলে আপনি কি বলবেন।

(খ) লোকটির প্রতি আপনি এতো আগ্রহবোধ করলেন যে, নিজের কথা ভুলেই গেলেন। আলাপ আলোচনার মধ্যে, একটা কথার সূত্রে পরের কথাটি আপনা থেকেই চলে আসতে লাগলো।

৩। কোনো দর্শকমণ্ডলীর সামনে আপনাকে কিছু করতে হবে—হয়তো কিছু বলতে হবে, কিংবা অভিনয় করতে হবে।

(ক) অতো লোকের সামনে যদি বেকায়দায় পড়ে যান, সেকথা ভাবতে ভাবতে আপনি এতো ভয় পেয়ে গেলেন যে, সবার সামনে দাঁড়াবার সময় আসবার অনেক আগেই আপনি দারুণ বেসামাল হয়ে পড়লেন।

• (খ) আপনাকে একটা বিশেষ কিছু বিস্ময়কর করে ফেলতে হবে, এমন কথা আপনি ভাবেন না। আপনার মনোভাবটা এইরকম : "আমার যথাসাধ্য ভালো কিছু করবো। যদি উল্টোপাল্টা কিছু করেই ফেলি, তবে সেটাও যা হয় একটা কিছু হবে।"

৪। আপনাকে কোথাও বাইরে পাঠানো হয়েছে, কিংবা কোনো কাজ করতে বলা হয়েছে।

(ক) সবকিছুই আপনাকে খুব চেষ্টাচরিত্র করেই করতে হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের আনন্দে কোনো কাজই আপনি করতে পারেন না, কারণ আপনি ঠিক কাজটা নিয়ে হৈ হৈ করে নিজের মূল্য সম্পর্কে নিজেকে এবং পাঁচজনকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেনই।

• (খ) সত্যি সত্যিই আপনি নানা জায়গায় যেতে এবং কাজ করতে বেশ ভালোবাসেন। আপনি যদি স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে আগ্রহভরে কাজ করেন, তাহলে কেউ আপনার কাজের জন্য বারবার খোঁচাবে না।

৫। আপনার ওপর কোনো কিছুর দায়িত্বভার দিয়ে যাওয়া হয়েছে।

(ক) কোনোকিছুর যেন ভুল না হয়। আপনি হৈ চৈ চেঁচামেচি করে, উদ্বিগ্ন হয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আপনার হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

• (খ) নিজের দৈনন্দিন কাজের ধারার মধ্যেই ঐ কাজটিকে মিশিয়ে নিলেন এবং কোনো হৈ চৈ না করে, কর্তাগিরি না ফলিয়ে যথাসাধ্য কাজ করে যেতে লাগলেন।

৬। কিছু জিনিস কাউকে ধার দিয়েছেন।

(ক) সঙ্গে সঙ্গে আফশোষ শুরু করে দিলেন ধার দিয়েছেন বলে এবং দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন, যদি জিনিসটা হারিয়ে যায়, ভেঙে যায়, কিংবা ক্ষতি হয়ে যায়।

(খ) জিনিসটি নাড়াচাড়ার ফলে খানিকটা পুরনো তো হয়ে যাবেই, তা আপনি জেনেই নিয়েছেন। যদি টাকা ধার দিয়ে থাকেন তাহলে ঠিক সেই পরিমাণ টাকাই আপনি দিয়েছেন নিশ্চয়ই, যা মারা গেলে আপনি সইতে পারবেন।

৭। কোনো বিষয়ে মতভেদ বা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

(ক) আপনি ঠিকই করেছেন সেকথা বোঝাবার জন্যে আপনি বদ্ধপরিকর—এমনকি যিনি সেকথা শুনতে চান না তাঁকেও। ঐ নিয়ে চিন্তা করা, কথা বলা থেকে আপনি কিছুতেই নিজেকে নিরস্ত করতে পারছেন না।

• (খ) আপনি সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেললেন কিংবা মতভেদটাই মেনে নিলেন। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে অপ্রীতিকর ব্যাপারটিকে মন থেকে একেবারে সরিয়ে দেন এবং বাকী জীবনটা সহজভাবে কাটিয়ে দিতে চান।

৮। আপনি অসুস্থ।

(ক) আপনি খিটখিটে বদমেজাজী রুগী, কারণ আপনি আশা করছেন, সকলে এসে আপনার অসুখ নিয়ে হৈ চৈ করবে, আর তা না করলে আপনি মনোকষ্ট পাবেন, নয়তো বিরক্ত হবেন। আপনার চিকিৎসা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন, এবং আপনাকে না হলে আপনার অফিসের কাজের নিশ্চয়ই অনেক ক্ষতি হবে, সেকথাই ভাববেন।

• (খ) আপনি যথাসম্ভব এ নিয়ে হালকা মনে থাকতে চেষ্টা করবেন এবং যথাসম্ভব কম ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করবেন। আপনার অফিসের কর্তা নিশ্চয়ই আপনাকে ছাড়াই কাজকর্ম চালিয়ে নিতে পারবেন। ভগবান না করুন আপনি যদি মারাই যেতেন, তাহলে কাজ চালিয়ে নিতেই হতো।

৯। আপনার বাড়ীতে বা ফ্যামিলির কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিংবা অসুবিধায় পড়েছে।

(ক) দারুণ একটা খারাপ কিছু ঘটে যাবে, আপনি সেই ভয় করছেন এবং আপনার চোখে মুখে হাবে-ভাবে সেই ভয় প্রকাশ পাচ্ছে।

• (খ) যদি উৎসাহ দেবার মতো কোনো কথা বলতে না পারেন, তাহলে যথাসম্ভব কম কথা বলবেন। আপনি নম্রভাবে, সহানুভূতিভরে, প্রশান্ত থেকে সবাইকে সাহায্য করবেন।

১০। সেই চিরন্তন অর্থ-সংকটের সমস্যা।

(ক) আপনি উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত হয়ে বাড়ীর সকলকে কেবলই খিঁচোচ্ছেন।

• (খ) আপনি নিজের খরচপত্র কমানোর দিকে মন দেওয়া শুরু করলেন। আপনি ফ্যামিলির সকলকে নিয়ে বসলেন এবং খরচ কমানোর ব্যাপারে এমন একটা প্ল্যান শুরু করলেন যাতে সবাই কিছু না কিছু করতে পারে। যে-জিনিসগুলির ওপর জোর দিলেন, তা হলো সাহস, প্রফুল্লতা এবং সহযোগিতা।

প্রত্যেক (খ) জবাবের জন্যে দশ পয়েন্ট পাবেন। যদি ইচ্ছা করেন, পুরো দশ পয়েন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে ভাগও দিতে পারেন। ৬০ পয়েন্ট সন্তোষজনক, এবং ৮০ ভালো। ৬০-এর নীচে সুবিধের নয়।

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

কিছুদিন বাদেই গেলেন কলকাতা এলেনও ফিরে। শোনালেন সেখানের হাল-চাল। ইউরোপের যুদ্ধ বাঙলা দেশের দিকে ছুটে আসছে। প্রথম ব্ল্যাক আউটের মহড়া হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে গোটা কলকাতা জুড়ে। যুদ্ধ দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। রাজদিয়ার মাটিতে ভালোবাসা। ঘর বানানোর আকর্ষণ। অবনীমোহন কিনলেন তাই জমি, রাজদিয়ার মাটি। ইতিমধ্যে যুগলের বিয়ের তারিখও এসে গেল। নতুন ঘর উঠছে। ধান কাটাও শুরু। স্কুলে ভর্তির পালা এবার বিনুর। চলল সে দাদু হেমনাথের সঙ্গে স্কুলে।]

।। একচল্লিশ ।।

সামনের মাঠখানা পার হয়ে স্কুলবাড়ির বারান্দায় উঠলেন হেমনাথরা। লম্বা মাটির বারান্দা, তার শেষ প্রান্তে হেডমাস্টারের ঘর। সেখানে উঁচু টুলের ওপর দপ্তরী জাতীয় একটা লোক বসে আছে।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি এই সময়টায় স্কুল বন্ধ; ক্লাসঘরগুলোতে তালা লাগানো হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে যাবার কথা। খুব সম্ভব রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। ইংরেজি নতুন বছর না পড়লে নতুন করে ক্লাস শুরু হবে না। সারা বছর একটানা খাটুনির পর ক্লান্ত স্কুলবাড়িটার গায়ে এখন ছুটি আর আলস্যের আমেজ লেগেছে।

দূর থেকেই হেমনাথ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'এই উপেন—'

টুলের ওপর থেকে দপ্তরীটা চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আইজ্ঞা—'

'হেডমাস্টার আছে রে?'

সেই লোকটা অর্থাৎ উপেন বলল, 'আছেন—'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে এসেছিলেন হেমনাথ। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে পর্দা ঠেলে হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকলেন।

ঘরখানা প্রকাণ্ড। চারদিকে সারি সারি কাচের আলমারি, তার ভেতর শুধু বই আর বই। আলমারিগুলোর মাথায় গ্লোব, ডাস্টার, ঝাড়ন, চকের বাক্স এবং আরো অসংখ্য জিনিস সাজানো। দেয়ালে দেয়ালে মহাপুরুষদের ছবি—গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক, বিদ্যাসাগর—এমনি অসংখ্য। তাঁদের কারোকে কারোকে চেনে বিনু, অনেকেই অচেনা।

রবীন্দ্রনাথের ছবিটার তলায় একটা গোলাকার বড় ঘড়ি। তার তলায় মস্ত একখানা টেবিল। টেবিলটার এধারে অনেকগুলো কাঠের চেয়ার। ওধারে একটি মাত্র চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়েস ষাটের কাছাকাছি। পরনে মোটা খদ্দরের ধবধবে পাজামা এবং পাঞ্জাবি। চোখে পুরু লেন্সের গোল চশমা।

ভদ্রলোকের গায়ের রঙ টকটকে, ধারাল নাক, তীক্ষ্ণ চিবুক। দীর্ঘ চোখ দুটি অত্যন্ত সজীব আর দূরভেদী। মুখময় কাঁচা-পাকা দাড়ি। মাথাটা কিন্তু একেবারেই সাদা, একটি কালো চুলও সেখানে খুঁজে বার করা যাবে কিনা সন্দেহ। এই বয়েসেও মেরুদণ্ড আশ্চর্য ঋজু, চামড়ায় তেমন ভাঁজ পড়ে নি।

ঘরে আর কেউ ছিল না। বিনু বুঝতে পারল, ইনিই হেডমাস্টার। তার বুক ঢিবঢিব করতে লাগল।

হেমনাথদের দেখে হেডমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। একটু অবাক হয়ে বললেন, 'হেমদাদা যে—'

হেমনাথ হাসলেন, হ্যাঁ, 'আমিই—'

বিস্ময়ের রেশ তখনও কাটে নি। হেডমাস্টার বললেন, 'আপনি স্কুলে!'

'সাধে কি আর এলাম রে, দরকারে আসতে হল। তারপর কেমন আছিস মোতাহার!'

'ঐ একরকম। আপনি?'

'খুব ভাল। কখনও আমি খারাপ থাকি?'

'তা বটে।' হেডমাস্টার অর্থাৎ মোতাহার সাহেব হাসলেন, 'কতকাল আপনাকে দেখছি। খারাপ আছেন, এমন কথা কখনো শুনি নি।' বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এ কি হেমদাদা, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন—বসুন—'

হেমনাথ বসলে মোতাহার সাহেব বসলেন। বিনুও নিঃশব্দে দাদুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'ব্যাপার কী রে! স্কুল ছুটি, তুই একা একা এখানে কী করছিলি?'

'নতুন বছরের বুক লিস্টটা এখনও তৈরি হয় নি, তাই করছিলাম।'

'স্কুল কতদিন বন্ধ থাকবে?'

'জানুয়ারির দু তারিখ পর্যন্ত।'

'তারপর অন্য সব খবর-টবর কী?'

'কোন খবর জানতে চান, বলুন—'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'তোর খবর তো মোটে দুটো। এক কংগ্রেস আর এই স্কুল।'

মোতাহার সাহেব কিছু বললেন না, চশমার কাচ মুছে গভীর দৃষ্টিতে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

হেমনাথ থামেন নি, 'বিয়ে করলি না, সাদি করলি না, বউ নেই, সংসার নেই চিরটা কাল স্কুল আর কংগ্রেস নিয়েই থাকলি।'

মৃদু গলায় মোতাহার সাহেব বললেন, 'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো! সত্যি বলছি হেমদাদা, স্কুল আর কংগ্রেস ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতেই পারি না।' বলে মৃদু হাসলেন।

হেমনাথ বললেন, 'অনেকদিন তোর কাছে আসা হয় নি, তা স্কুল কেমন চলছে?'

'ভালই। তবে—'

'কী?'

'আমার বড় ইচ্ছা, স্কুলবাড়িটা পাকা হোক—'

মোতাহার সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'এক শ' বার হওয়া উচিত। দু-এক বছর পর পর বর্ষায় কাঁচা বাঁশের বেড়া নষ্ট হয়ে যায়, মাটির ভিত যায় ধসে। সব কতবার তো পাল্টালি। বার বার কামলা লাগিয়ে খরচও তো কম হয় না।'

'খরচ বলে খরচ! স্কুলের কত আর আয় বলুন। বেশির ভাগ ছেলেই তো ফ্রী, হাফ-ফ্রী-তে পড়ছে—'

হেমনাথ বললেন, 'একবার একটু কষ্ট করে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে পারলে সব দিক থেকেই ভাল।'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'কিন্তু টাকা পাব কোথায়? আপনি তো জানেন, গভর্ণমেন্ট থেকে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না।'

'কেন যাবে শুনি! সারা গায়ে কংগ্রেসের গন্ধ মাখিয়ে রেখেছিস, ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিস। আর ওরা দেবে টাকা!'

হাসতে হাসতে মোতাহার সাহেব বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, দু-একদিনের ভেতর আপনার কাছে যাব।'

পাকা ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'আমার কাছে কেন?'

'আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে যাব।'

'আমি বুঝি তোর স্কুলের জন্যে টাকার থলে নিয়ে বসে আছি?'

'তা জানি না।'

'তবে কী জানো শুনি?'

মোতাহার সাহেব গভীর গলায় বললেন, 'একটা কথাই জানি। তা হল, রাজদিয়ার হেমনাথ মিত্রের কাছে কোন শুভকাজের আর্জি নিয়ে গেলে কেউ কখনো বিমুখ হয়ে ফেরে না।'

হেমনাথ বললেন, 'আমাকে তোরা কল্পতরু পেয়েছিস নাকি?'

'পেয়েছিই তো।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে মোতাহার সাহেব বললেন, 'কী?'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'স্কুল-বিল্ডিং করে দেবার মতন অত টাকা তো আমার নেই। অবশ্য একটা কাজ করা যেতে পারে—'

'কী কাজ?'

'সবার কাছ থেকে টাকা তোলা। যার যেমন সাধ্য সে তেমন দেবে। মোট কথা একটা ফান্ড খোলা দরকার।'

'সে আপনি যা ভাল বোঝেন—'

'তুই কবে আমার বাড়ি যাচ্ছিস?'

'কবে যেতে বলেন?'

'যেদিন তোর খুশি—'

'পরশু সকালে যাব।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরবতা।

তারপর মোতাহার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'যাক আমার দুর্ভাবনা কাটল। স্কুলবাড়ি এবার হয়ে যাবেই।'

হেমনাথ হাসলেন, 'স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমার ভালই লাভ হল, দেখছি। তারপর তোর কংগ্রেসের খবর কী?'

নিমেষে হাসি থেমে গেল। কপালে অসংখ্য রেখা ফুটল মোতাহার সাহেবের। গম্ভীর গলায় বললেন, 'খুবই সাঙ্ঘাতিক। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে ছোট-বড় সব নেতাই অ্যারেস্টেড, সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেছে।'

'দেখেছি। তোর কী মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয়, ভেতরে ভেতরে ইংরেজরা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভেতরে যত কাবু হচ্ছে, বাইরে অত্যাচার ততই বেড়ে চলেছে।'

'তুই তো এখানকার কংগ্রেসের সেক্রেটারি। তোকে কি অ্যারেস্ট করবে?'

'বুঝতে পারছি না। তবে—'

'কী?'

'গেল সপ্তাহে দু-তিন বার পুলিশ এসেছিল।'

হেমনাথ বললেন, 'এখানে কি সত্যাগ্রহ শুরু করবি?'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'এখনও কিছু ঠিক করিনি। আরো কয়েকদিন দেখি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমনাথ এবার শুধোলেন, 'যুদ্ধের হালচাল কেমন বুঝছিস মোতাহার?'

'খুব খারাপ। মিত্রশক্তি চারদিকেই মার খাচ্ছে। ইওরোপ আফ্রিকার কথা থাক, ইস্টার্ণ ওয়ার্ল্ডে জাপান তো ওদের একরকম নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। আমার ধারণা কলকাতায় যে কোনদিন বোমা পড়তে পারে। কলকাতায় বোমা পড়া মানে সারা বাংলাদেশ তোলপাড় হওয়া। কী যে হবে!'

'সেদিন কাগজে পড়লাম, কলকাতায় ব্ল্যাক-আউটের মহড়া চলছে। এয়ার রেডের সব রকম প্রিকশানও নেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মোতাহার সাহেব।

হেমনাথ বললেন, 'তোর কী ধারণা, এ যুদ্ধে ইংরেজরা হারবে?'

'বলা মুশকিল। হারুক জিতুক, আমি একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।'

'কী?'

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা খুব বেশি দূরে নেই।'

'হঠাৎ তোর এ ধারণা কেন?'

মোতাহার সাহেব থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'হিটলারের বোমা খেয়ে খেয়ে ইংল্যান্ডের আর কিছু নেই। যতই ওরা গলা ফাটাক 'আমাদের কিছু হয় নি' লোক তা বিশ্বাস করে না। আমরা তো আর ঘাস খাই না, আসল ব্যাপারখানা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি। যুদ্ধ থেমে গেলে ইংল্যান্ডকে রিকনস্ট্রাকশনের প্রশ্ন দেখা দেবে। এখন নতুন করে পোড়া ঘর তুলবে, না এতদূরে ইন্ডিয়ায় কলোনি সামলাবে? অবশ্য—'

'কী?'

'এই হচ্ছে সব চাইতে বড় সুযোগ; আমাদের হাতছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়। একবার যদি একে আমাদের হাতের বাইরে চলে যেতে দিই, পরে আপসোস করেও কুলকিনারা পাব না।'

হেমনাথ বললেন, 'সুযোগ বলতে?'

মোতাহার সাহেব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। ইংরেজ এখন যুদ্ধ নিয়ে অস্থির হয়ে আছে। ইওরোপ-এশিয়ায়-আফ্রিকায় যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু বারুদের গন্ধ। এ সময় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যদি একটা আন্দোলন করা যেত?

হেমনাথ বললেন, 'তোর কি ধারণা, শিগগিরই কোন মুভমেন্ট শুরু হবে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। এ সময় যদি মুভমেন্ট না করা যায় তবে আর কবে হবে? দেখা যাক, নেতারা কী করতে বলেন—'

হেমনাথ এবার আর কিছু বললেন না। তাঁর পাশে বসে দাদু আর মোতাহার সাহেবের কথা শুনছিল বিনু। অল্প-স্বল্প

বুঝতে পারছিল সে, তবে বেশির ভাগই অবোধ্য।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মৃদু হেসে মোতাহার সাহেব বললেন, 'দেশের কথা, কংগ্রেসের কথা এখন থাক। তখন কী একটা দরকারের কথা বলছিলেন যেন'—বলতে বলতে হঠাৎ বিনুর দিকে লক্ষ্য পড়ল, 'ছেলেটি কে হেমদাদা—'

'আমার নাতি।'

'কি রকম নাতি?'

কি রকম, হেমনাথ বুঝিয়ে দিলেন।

মোতাহার সাহেব বললেন, 'শুনেছিলাম বটে, কলকাতা থেকে আপনার কে সব আত্মীয়-স্বজন এসেছে। এরাই তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'এবার বলুন দরকারটা কী?'

বিনুকে দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'দরকারটা এর জন্যেই। ওকে তোর স্কুলে ভর্তি করতে এনেছি।'

মোতাহার সাহেব ঈষৎ অবাক হলেন, 'ভর্তি করতে এনেছেন মানে! ওরা কি এখানে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতা ছেড়ে এই গ্রামে থাকতে ভাল লাগবে!'

'ওর বাবার খেয়াল। কলকাতায় ব্যবসা-ট্যবসা ছিল। সব তুলে দিয়ে এখানে জমি-জমা কিনেছে। ইস্টবেঙ্গল নাকি ওর খুব ভাল লেগেছে।'

'খুব ইন্টারেস্টিং তো।' মোতাহার সাহেব কৌতূহলের গলায় বললেন, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আলাপ-টালাপ করতে হয়।'

হেমনাথ বললেন, 'পরশু দিন আমাদের বাড়ি যাচ্ছিস তো, তখন আলাপ করিয়ে দেব'খন।'

'আচ্ছা। কিন্তু হেমদাদা—'

'কী বলছিস?'

'সামান্য একটা ভর্তির জন্যে আপনি আবার কষ্ট করে নিয়ে এসেছেন কেন? এখন তো স্কুল বন্ধ। জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে কারোকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন, ভর্তি করে নেব।'

'উঁহু—' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে লাগলেন হেমনাথ, 'আমার খাতিরে এমনি এমনি ভর্তি করলে চলবে না। যে ক্লাসে ভর্তি হবে তার যোগ্য কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে।'

স্থির চোখে হেমনাথকে দেখলেন মোতাহার সাহেব। তারপর অসীম সম্ভ্রমের সুরে বললেন, 'পরীক্ষা করে নেবার কথা কোন অভিভাবকই বলে না। আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা দশগুণ বেড়ে গেল হেমদাদা। আপনি যখন চাইছেন, পরীক্ষা আমি নেব।'

'আজ যখন এসে পড়েছি, আজই নিয়ে নে। পরে না হয় মাইনে-পত্তর দিয়ে ফী-বুক, বুকলিস্ট নিয়ে যাবে।'

মোতাহার সাহেব অদ্ভুত হাসলেন।

হেমনাথ শুধোলেন, 'হাসলি যে।'

'আমাকে বুঝি আপনার বিশ্বাস নেই। পাছে অন্য কারো সঙ্গে পাঠালে পরীক্ষা না নিই তাই এখনই নিতে বলছেন।'

বিব্রতভাবে হেমনাথ বললেন, 'না, ঠিক তা নয়।'

হাসতে হাসতেই মোতাহার সাহেব বললেন, 'বেশ বেশ, আপনার যখন এতই অবিশ্বাস তখন পরীক্ষাটা এখনই নিয়ে নিচ্ছি।'

দাদুর ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল বিনুর। হেডমাস্টারমশাই যেখানে এমনিতেই ভর্তি করে নিতে চাইছেন সেখানে দাদু 'পরীক্ষা পরীক্ষা' করে অস্থির হয়ে উঠেছেন। শুধু রাগই না, তার সঙ্গে অভিমান মিশল।

চোখে প্রায় জলই এসে যাচ্ছিল বিনুর, সেই সময় মোতাহার গলা শোনা গেল, 'তোমার নাম কী?'

বিনু চমকে উঠল। বুকের ভেতরটা ভয়ানক দুলতে লাগল তার। কাঁপা গলায় বলল, 'বিনয়কুমার বসু—'

'বাবার নাম?'

'অবনীমোহন বসু—'

চোখ কুঁচকে মোতাহার সাহেব বলেন, 'শুধু অবনীমোহন বসু? বাবার নামের আগে একটা শ্রীযুক্ত বসাতে হয় তাও জানো না?'

মুখ নীচু করে বসে রইল বিনু।

'কলকাতার কোন স্কুলে পড়তে?'

'সাউথ সাবারবনে—'

'কোন ক্লাস ছিল?'

'সেভেন।'

'তার মানে এইটে ভর্তি হবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ঐ ছবিটা কার বল তো?

চোখ তুলতেই বিনু দেখতে পেল, মোতাহার সাহেব ডানদিকের দেয়ালে একটি ছবির দিকে আঙুল নির্দেশ করেছেন।

ছবির মানুষটিকে বিনু চিনত। বলল, 'উনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'

'গুড—' বলেই আরেকটা ছবি দেখালেন মোতাহার সাহেব, 'উনি?'

'লালা লাজপত রায়।'

'আচ্ছা বলতে পার, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কবে হয়েছিল?'

ভাগ্য ভাল, উত্তরটা জানা ছিল বিনুর। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ১৯০৫-এ—'

'ভেরি গুড—'

নিঃশব্দে বসে ছিলেন হেমনাথ। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এ সব কী পরীক্ষা রে মোতাহার?'

'এগুলোই তো আসল পরীক্ষা দাদা—' মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'দেশের ছেলে দেশের সত্যিকার খবর রাখে কিনা সেটা জানা দরকার।'

'একটু পড়াশোনার কথাও জিজ্ঞেস কর—'

'নিশ্চয়ই করব।'

গোটা পাঁচেক ট্রানশ্লেসন ধরলেন মোতাহার সাহেব, বিনু তিনটে পারল। আলজেব্রার ফরমুলাগুলো ঠিক ঠিক বলল। বাংলা ব্যাকরণের উত্তরগুলোও নির্ভুল হল।

পরীক্ষা হয়ে যাবার পর মোতাহার সাহেব বললেন, 'বিনয়বাবু আমাদের বেশ ভাল ছেলে। স্কুল খুললে রোজ ক্লাস করবে বুঝলে? একদিনও ফাঁকি দেবে না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' বিনু আধফোটা গলায় বলল। তারপর মাথা হেলাল।

হেমনাথ বললেন, 'ক্লাস এইটে ও পারবে তো?'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবে। দেখবেন, স্ট্যান্ড করবে।'

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর হেমনাথ বললেন, 'এবার তা হলে উঠি—'

'এখনই উঠবেন?'

'হ্যাঁ, ধান কাটা চলছে। একবার মাঠে যাওয়া দরকার।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন হেমনাথ। তারপর হঠাৎই যেন কথাটা মনে পড়ে গেল। বিনুর দিকে ফিরে বললেন, 'মাস্টারমশাইকে প্রণাম কর।'

মোতাহার সাহেবকে প্রণাম করে বিনু যখন উঠে দাঁড়াল, হেমনাথ আবার বললেন, 'এঁকে আজ প্রথম দেখলে, ভবিষ্যতে অনেকবার দেখবে। জীবনে এই মানুষটির মতন হবার চেষ্টা কোরো।'

(ক্রমশ)

১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করার পর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস। নানা রকম পন্থা-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল। তার মধ্যে একটি হল রেডিওর দেশবন্দনা, আর একটি রেডিও ও সিনেমার শেষে জাতীয় সংগীত।

চীনা হামলার পর সেই যে সকালে দশ মিনিট করে দেশবন্দনার গান শোনানোর অভ্যাস হয়ে গেছে, সে অভ্যাস এখনও ছাড়ে নি। এখনও সেই গুটি-কয়েক গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজানো হয়। এক-একটা গান এতবার বাজানো হয়েছে যে, তার আর গোনা-গুনতি নেই। দেশবন্দনার প্রতিটি গানের প্রতিটি শব্দ এমন কি কমা সেমিকোলন দাঁড়ি পর্যন্ত শ্রোতাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে একবার লেখা হয়েছিল, খাঁচার পাখিরা পর্যন্ত দেশবন্দনার গানগুলি নির্ভুলভাবে গাইতে শুরু করেছে এবং এখন দেখা যাচ্ছে, যারা নতুন গান শিখছে তারা একটা করে এই গাইয়ে পাখি কিনছে। অসমর্থিত খবরে প্রকাশ, এই গাইয়ে পাখিদের জন্য গ্রামোফোন রেকর্ডের বিক্রি পর্যন্ত কমে গেছে। সুতরাং একই গান রেডিওর দেশবন্দনার অনুষ্ঠানে অসংখ্যবার বাজিয়ে পাখিদের শিখিয়ে রেকর্ড বিক্রি কমিয়ে দেবার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানী-গুলির উচিত তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করা। আজকাল এই রকম প্রতিবাদে অনেক সময় কাজ হয়। তাই তাঁদের প্রতিবাদ শুনে রেডিও কর্তৃপক্ষ যদি দেশবন্দনায় নতুন গানের আমদানি করেন তাহলে গ্রামোফোন কোম্পানীগুলির যেমন সুরাহা হবে তেমনি শ্রোতাদেরও উপকার হবে। শ্রোতারা তাঁদের দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

ভেবে বিস্মিত হতে হয়, আধুনিক রাগপ্রধান শ্যামাসংগীত লোকগীতি প্রভৃতি গানের রচয়িতার অভাব নেই, অভাব শুধু দেশাত্মবোধক গানের রচয়িতার! না কি কর্তৃপক্ষ এই দেশবন্দনা অনুষ্ঠানটিকে একটি দায়সারা ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছেন? তা যদি না হবে তাহলে কেন বহু সমালোচনা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এই অনুষ্ঠানটির প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন না? কেন নতুন নতুন গান বাজাচ্ছেন না? তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় দেশবন্দনার গান লেখার লোকের অভাব তাহলে রেডিওর সংগীত বিভাগীয় কর্তাদের মধ্যে যাঁরা গান লেখেন, তাঁরা কেন দেশবন্দনার গান লিখছেন না? রেডিওর সংগীত বিভাগে এবং অন্য বিভাগে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা আধুনিক লোকগীতি রাগপ্রধান প্রভৃতি নানা ধরনের গান লিখে থাকেন। তাঁদের হাতে দেশাত্মবোধক গান উতরায় না, এটা কি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? যতদূর জানা গেছে, হয় নি। আসলে এই গানের প্রতি রেডিওরই কেমন যেন একটা অন্যমনস্কতা আছে। তাই যদি হয় তাহলে তাঁরা এই অনুষ্ঠানটি তুলে দিলেই তো পারেন। না কি দিল্লীর নির্দেশ আছে? দিল্লীকে তেমন করে বোঝাতে পারলে নির্দেশ প্রত্যাহারে আপত্তি হবে বলে মনে হয় না। দিল্লী তো কেবল হিন্দীর বেলায় অনমনীয়; বাংলা জাহান্নামে যাক, তাতে তাঁদের কিছু যায়-আসে না। দেশবন্দনা বাংলা গানের অনুষ্ঠান, সুতরাং এই অনুষ্ঠানটি তুলে দেবার জন্য দরবার করলে সে দরবার ব্যর্থ না হবারই সম্ভাবনা অধিক।

আবার রেডিওর শেষ অধিবেশনের শেষে যখন জাতীয় সংগীত বাজিয়ে শোনানো হয় তখন কেউ উঠে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, এমনটা দেখা বা শোনা যায় নি। অধিকাংশ রেডিও-সেটই অধিবেশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং জাতীয় সংগীত বাজার আগে বন্ধ হয়ে যায়।

রেডিওয় এমনি করে জাতীয় সংগীত বাজবার প্রয়োজন কী তা বলা মুশকিল।

বিলেত থেকে আমরা অনেক জিনিস নিয়েছি। ভালো জিনিস নিতেই হবে—তাতে সংস্কার থাকলে চলবে না, গোঁড়ামি থাকলে চলবে না। তাতে আমাদের ক্ষতিই হবে। কিন্তু যে ভালো জিনিসে আমাদের দরকার নেই তা দিয়ে কী হবে? বিলেতে যা করে, আমাদেরও তা করতেই হবে এমন কী কথা আছে? বিলেতে 'গড সেভ দি কিং' (এখন 'কুইন') বাজানো হয়—আমাদের কিংও নেই, কুইনও নেই, তাই তাঁদের সেভ করার জন্য গডের কাছে প্রার্থনা জানাবার প্রশ্ন ওঠে না বলে জাতীয় সংগীত বাজিয়ে বিলেতী প্রথার অনুকরণ করতেই হবে, এটা ঠিক নয়।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

পাপু একটি ছেলের নাম। ছেলেটি আপন মনে ছবি আঁকত আর লিখত। শিল্প আর সাহিত্য ক্ষেত্রে তার প্রবেশ ছিল অনায়াস। অনায়াসেই সে আঁকত, অনায়াসেই লিখত।...কিন্তু সে ছিল ক্ষণজন্মা, তাই মাত্র সাড়ে আট বছর বয়েসেই তাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল — একেবারে অকস্মাৎ, কোনো রকম জানান না দিয়েই। তাই আমাদের দুঃখ। তার মা-বাবার দুঃখ আরও বেশি। তাই তাঁরা পাপুহীন পাপুর জন্মদিনে পাপুর আঁকা আর লেখা সংকলন করে একটি বই প্রকাশ করলেন — 'পাপুর বই'। পাপুকে যারা ভালোবাসত তাদের উপহার দিলেন সেই বই। বইটি বড়োদেরও হাতে এসে পৌঁছুল। বড়োরা বুঝলেন, পাপুর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। সেই অসাধারণ প্রতিভাধর পাপুর বইয়ের জন্য পাপুর মা-বাবার কাছে অনুরোধের পর

অনুরোধ আসতে লাগল। তারই ফলে 'পাপুর বই'য়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

এই 'পাপুর বই' নিয়ে ২৮শে মে বিকেল সাড়ে ৫টায় গল্পদাদুর আসরে আলোচনা করলেন শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আলোচনাটা মনোগ্রাহী—আনন্দের সংগে বেদনা মিশ্রিত।

'পাপুর বই' নিয়ে গল্পদাদুর আসরে আলোচনার ব্যবস্থা করার জন্য বেতার কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

এই আসরে উদয়ন মুখোপাধ্যায় তার ডায়েরি থেকে পড়ে শোনাল—গান্ধীজীর বিষয়ে লেখা ডায়েরি থেকে। গান্ধীজী সম্বন্ধে সে যা শুনেছে, যা পড়েছে, যা ভেবেছে তা-ই। বেশ সুন্দর লেখা, কিন্তু পড়াটাও সুন্দর হলে ভালো হ'ত।

৩০শে মে রাত ৭টা ৫০ মিনিটে স্থানীয় সংবাদে পাঠক নারিকেল নারকেল নারকোল সবই বললেন। সবই হয়, কিন্তু একজনের মুখে সব হওয়ানোটা ভালো শোনায় না। যে কোনো একটাই ভালো—শেষে দুটোর একটা।

৩১শে মে বেলা ৩টেয় নাটক 'নীলাম'। রচনা অগ্নিমিত্র।

এক ভাগ্যহত দরিদ্র মুসলমানের কাহিনী নিয়ে রচিত এই নাটক। দরিদ্র চিরকালই ধনীর শিকার—এই নাটকে তা-ই একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। এই দরিদ্র মুসলমানটি একজন ধনী মুসলমানের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়ে অবস্থা বিপাকে হঠাৎ ক্রোধান্ধ হয়ে তার পত্নীকেই তালাক দিয়ে বসল। তারপর সম্বিৎ যখন ফিরল তখন আক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছু উপায় রইল না। তালাক-দেওয়া বিবিকে সে ঘরে নেবে কী করে? নিতে পারে যদি কেউ তাকে নিকাহ করে আবার তালাক দেয় এবং সে আবার তাকে বিবাহ করে। ধনী মুসলমান আর একবার তার উপর অত্যাচারের সুযোগ পেল। তার বিবিকে সে নিকাহ করল এই আশ্বাস দিয়ে যে, যথাসময়ে সে আবার তাকে তালাক দেবে। কিন্তু যথাসময় পেরিয়ে গেলেও তালাক দেবার আর আগ্রহ নেই সেই বৃদ্ধের।

এদিকে তার প্রথমা বিবি তার কাছে খবর এনে দিল, নতুন বিবি অন্তঃসত্ত্বা, এবং আভাস দিল, তার জন্য তার সম্পর্কে ভাই রেজাক মিঞাই দায়ী। রেজাক সময়ে-অসময়ে অন্দরমহলে যাতায়াত করে।

এর পর অবস্থা আরও ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল, এবং বৃদ্ধ তার নবীন ভার্যাকে গলা টিপে হত্যা করে মৃতদেহ ঝুলিয়ে দিয়ে খবর ছড়াল, সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

দরিদ্র মুসলমানটি তার তালাক-দেওয়া বিবিকে উদ্ধার করার সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এবং স্বীয় অপরাধে অন্তরে অন্তরে মরে ছিল, এখন এই খবরে সে ছুটে গেল তার তালাক-দেওয়া 'আত্মহত' বিবিকে দেখতে। সেখানে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। চিৎকার করে কেঁদে বলতে লাগল, এ আত্মহত্যা নয়, এ হত্যা—ঐ শঠ বৃদ্ধ তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু দরিদ্রের কান্না কে শোনে!

রেডিওয় মাঝে মাঝে 'জমি' নামে একটি নাটক প্রচারিত হয়, সেই নাটকটির সংগে এই নাটকটির অংশত মিল থাকলেও এই নাটকটিতে মুন্সিয়ানার পরিচয় বেশি। দরিদ্রের কান্নাটাও এতে ফুটেছে বেশি।

অভিনয়ের দিক দিয়েও এই নাটকটি সমৃদ্ধ।

১লা জুন বেলা ১টার নাটক শ্রীশক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে শ্রীঅনিল ভৌমিক রচিত 'কখন অন্য মনে'।

এই নাটকে দেখানো হয়েছে কী করে এক অসহায় অন্তঃসত্ত্বা নারীকে তার অপদার্থ স্বামী আর স্বার্থপর শ্বশুর তার নিষ্কলংক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে পদাঘাতে বাড়ি থেকে বার করে দিল, তারপর কী করে সেই নারী নানা ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে এক সময় স্থৈর্য লাভ করল, ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবনপণ করল—এবং শেষে কী করে একদিন তার সেই অপদার্থ স্বামী অনুতপ্ত হৃদয়ে তার কাছে এসে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মৃত্যুবরণ করল।

এই নাটকে কিছু চিন্তার খোরাক আছে। কিছু অতি-অভিনয় আছে। অতি-অভিনয়টুকু বাদ দিয়ে নাটকটি ভালো লেগেছে।

২রা জুন রাত ৮টায় 'পরিশেষের কবি রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে একটি কথিকা পাঠ করে শোনানো হল। কথিকাটি লিখেছেন শ্রীমোহিত রায়।...বেশ তথ্যসমৃদ্ধ কথিকা, মনে রেখাপাত করার মতো।

এইদিন রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে শ্রীমতী কমলা বসুর রবীন্দ্রসংগীত ও ৯টা ৪৫ মিনিটে শ্রীমতী মায়া রায়ের রাগপ্রধান প্রশংসা দাবি করতে পারে।

আচ্ছা, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী কি শ্রীপরিমল ঘোষ? ৪ঠা জুন রাত ৭টা ৫০ মিনিটে স্থানীয় সংবাদে যে তা-ই বলা হ'ল। ডঃ রামসুভগ সিং গেলেন কোথায়?

—শ্রবণক

আমার দেখা জহর গাঙ্গুলী
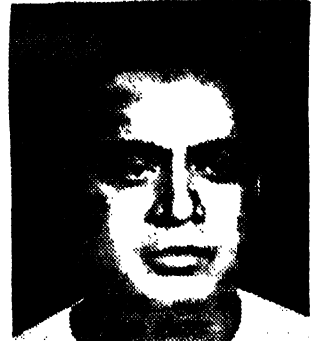
কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পশ্চিমে মহাত্মা গান্ধী রোডের (পূর্ববর্তী নাম হ্যারিসন রোড) উপর **গ্রেস সিনেমা** নামে যে-চিত্রগৃহটি বর্তমানে চালু রয়েছে, সেটির আদি নাম ছিল কার্জন থিয়েটার। পরে যখন মিঃ কে পি খাটাউ তাঁর পার্শী আলফ্রেড থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী নিয়ে থিয়েটারটি অধিকার করেন, তখন থেকে এর নাম হয় আলফ্রেড থিয়েটার। প্রায় ১৯২২ সাল পর্যন্ত আলফ্রেডে হিন্দী এবং উর্দু নাটক অভিনয় করবার পরে কোম্পানীটি বন্ধ হয়ে যায় ও থিয়েটারবাড়ীটি কিছুকাল খালিই প'ড়ে থাকে। এখানে প্রথম বাংলা থিয়েটারের আসর বসান বিখ্যাত সৌখীন সম্প্রদায় 'আনন্দ পরিষদ'-এর দু'জন উৎসাহী সভ্য—লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ও রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 'মডার্ণ থিয়েটার্স' (প্রথমে পোস্টার পড়ে 'দি গ্রীণসে' নামে) নাম দিয়ে এবং অভিনয় করেন নবীন সেনের 'রৈবতক'-এর নাট্যরূপ। এই আলফ্রেডে মিত্র থিয়েটার যখন ১৯২৬ এর ২ এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'শ্রীদুর্গা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন, তখন নাম-ভূমিকায় তারাসুন্দরী, মহিষাসুর বেশে নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও হাসির চরিত্র কুট্টুস রূপে ধীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে সঙ্গে দেখি সম্ভবত নারায়ণের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীকে। এই হচ্ছে তাঁর সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম মঞ্চাবতরণ। বাগবাজারের বৃন্দাবন পাল বাই লেনে বাড়ী এবং পাড়ার আড্ডায় 'নাটুকে' হিসেবে খ্যাতি থাকায় সৌখীন যাত্রা ও মঞ্চাভিনয়ে অবশ্য এর আগেই বারকয়েক তাঁকে নামতে হয়েছিল। অবশ্য এ তথ্য আমি পরে অবগত হয়েছিলাম। আলফ্রেডের পরে আমি তাঁকে দেখি আর্ট থিয়েটার্স পরিচালিত স্টার রঙ্গমঞ্চে রবীন মৈত্র রচিত কৌতুক-নাটিকা 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এ মানস মাস্টার-এর ভূমিকায়। এবং এই ভূমিকাভিনয়ই তাঁকে এনে দেয় রাতারাতি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। কৌতুকমিশ্রিত স্বাভাবিক অভিনয়ের নিদর্শন তিনি আগেই রেখেছিলেন অনুরূপা দেবী লিখিত 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসের অপরেশচন্দ্র প্রদত্ত নাট্যরূপে ফটিকচাঁদ-এর ভূমিকায়।

এই সময়ে জহর গাঙ্গুলী রূপায়িত আরও একটি ভূমিকা নাট্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হচ্ছে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত 'বড়বৌ' নাটকের নায়ক সত্যেন্দ্র, যাকে তার স্ত্রী নারায়ণী (নায়িকা বড়বৌ) আদর করে ডাকত হাবু-বাবু বলে। বোকা, বোবা ন্যালাখেপা—এই চরিত্রটিকে তিনি মঞ্চের ওপর জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন। আর্ট থিয়েটার্স থেকে তিনি গিয়েছিলেন রঙমহলে এবং সেখান থেকে নাট্যনিকেতনে বছর খানেকের জন্যে (১৯৩৫-৩৬)। আবার ফিরে এসেছিলেন রঙমহলে এবং পরে ১৯৩৯ থেকে আলফ্রেড বোর্ডে স্থাপিত নাট্য-ভারতীতে। এইখানে 'দুই পুরুষ' নাটকে সুশোভন-এর চরিত্রটি তাঁর অনুপম সৃষ্টি; বেহালা-হাতে সুশোভনকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বলবেন, এ-চরিত্রকে ভোলা যায় না। এ-যুগে তাঁর আর একটি স্মরণীয় চরিত্র-চিত্রণ হচ্ছে 'পথের দাবী'তে শশী কবি। নাট্য-ভারতী বন্ধ হবার পরে জহর গঙ্গোপাধ্যায় আসেন মিনার্ভাতে এবং সেখান থেকে

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

আবার রঙমহলে। এখানে দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত 'রামের সুমতি'র নাট্যরূপে তিনি 'শ্যামলাল'-এর ভূমিকায় চমকপ্রদ অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে এই রঙমহলে তিনি আর একটি শরৎ-চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তোলেন; সেটি হচ্ছে : 'নিষ্কৃতি'তে 'গিরীশ'। মধ্যে তিনি ছিলেন সলিল মিত্র পরিচালিত বর্তমান স্টার-এ। এখানে তাঁর স্মরণীয় অভিনয় হচ্ছে 'শ্রীকান্ত'তে অভয়ার স্বামী। স্বাস্থ্যের জন্যে কিছুকাল রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে থাকবার পরে তিনি 'বিশ্বরূপা'তে যোগদান করেন এবং তারপরে আসেন নান্দিক সম্প্রদায় অধিকৃত 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ'-এ। এখানে 'আন্টনী কবিয়াল' নাটকে 'ভোলা ময়রা' বেশে নেচে-গেয়ে অভিনয় ক'রে তিনি নাট্যরসিক সুধিবৃন্দকে বিস্ময়াভিভূত করেন। তাঁর শেষ মঞ্চাভিনয় হচ্ছে ঐ নান্দিক সম্প্রদায় প্রযোজিত 'নটী বিনোদিনী'তে গিরিশচন্দ্র-এর চরিত্রে। ১৯২৬ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রায় আমৃত্যু পুরো তেতাল্লিশ বছর তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত থেকে নাট্য-ভারতীর সেরা ক'রে গেছেন। আমাদের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল মধুর। শতবার্ষিকীর সময়ে 'অমৃতস্যপুত্রা' : নাটকে তিনি সানন্দে 'হেমন্তকুমার'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

মঞ্চে যোগদানের প্রায় বছর পাঁচেক পরেই কুমার মিত্র ও পরিচালক-অভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তীর সহায়তায় তিনি চলচ্চিত্ররাজ্যে প্রবেশ করেন। রাধা ফিল্মস্-এর প্রযোজনায় ও তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় যে-নির্বাক ছবিতে তিনি প্রথম অভিনয় করেন, সেই 'গীতা' নামক চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৩১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। এর পরেই তিনি নিউ থিয়েটার্স-এর প্রথম সবাক চিত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত 'দেনাপাওনা'তে সম্ভবত শিরোমণির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৩৪ সালে তিনি শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'চাঁদ-সদাগর' ও শুভগ্রহ-স্পর্শ' এবং কালী ফিল্মস্-এর 'তুলসীদাস' ছবিতে অবতীর্ণ হবার পরে প্রথম যে-ছবিতে নায়ক রূপে চিত্রপ্রিয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সেটি হচ্ছে তাঁরই মঞ্চসাফল্যমণ্ডিত 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর চিত্ররূপ। তাঁর বিপরীতে নায়িকা নীহারিকার ভূমিকায় ছিলেন কানন দেবী, সে-যুগে যিনি কাননবালা নামেই লোকের মুখে মুখে ঘুরতেন জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন স্বরূপে। মন্ত্রশক্তি, কণ্ঠহার, বিষবৃক্ষ, মহানিশা, পথের শেষে, যোগাযোগ প্রভৃতি বহু ছবিতেই তিনি রোমান্টিক নায়ক রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্য সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'যোগাযোগ'-এ নায়ক রূপে প্রথমে অভিনয় করছিলেন সুদর্শন নট জ্যোতিপ্রকাশ। কিন্তু ছবি কিছু দূর অগ্রসর হবার পর তিনি আত্মঘাতী হওয়ায় গাঙ্গুলীকে নায়ক রূপে গ্রহণ করা হয়। শ্রীগাঙ্গুলীর নাটনৈপুণ্য অবশ্য সবচেয়ে বেশী স্ফুরিত হয় প্রধানত সিরিও-কমিক ও টাইপ চরিত্রে এবং এর প্রমাণ প্রথম নিউ থিয়েটার্স চিত্র, হেমচন্দ্র পরিচালিত 'প্রতিশ্রুতি'তে। বাঁলস, পিসেমশাই যুদ্ধে

গেছে'—তাঁর মুখের এই সংলাপ কোনো-দিনই ভোলবার নয়। শৈলজানন্দ পরিচালিত 'নন্দিনী', 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে,, 'মানে না মানা'—প্রতিটি ছবিতে এক একটি টাইপ চরিত্রে তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়। প্রিয় বান্ধবী, মেজদিদি, শ্যামলী, বাবলা, ডাক-হরকরা প্রভৃতি প্রতিটি ছবিতেই তিনি প্রতিটি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনূন্য প্রায় তিনশত কাহিনীচিত্রে তিনি অবতরণ করেছেন। অধুনাতম ছবিগুলির মধ্যে তাঁকে আমরা এই সেদিনও দেখেছি অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'পিতাপুত্র' ছবিটিতে।

এ পর্যন্ত যা বললাম, সে হ'ল আরও দশজনের মতো জহর গাঙ্গুলীকে দূরে থেকে দর্শক হিসেবে দেখবার কথা। কিন্তু এছাড়াও কথা আছে। রঙ্গজগতের প্রতি আমার আসক্তি বাল্যকাল থেকে । রঙ্গজগৎ সম্পর্কিত সে-যুগের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'নাচঘর'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে থাকবার ফলে ১৯২৭ এর মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অন্দর মহলে আমার নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে নামকরবার মতো প্রতিটি অভিনেতারই সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। অবশ্য এরও আগে বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর শেষবয়সের কলমচিরূপে এবং পরে ১৯২৩ সাল থেকে অধুনালুপ্ত 'অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার'-এর একজন কর্মী হিসেবে থিয়েটার মহলের সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর যোগাযোগ ঘটে। এই যাতায়াতের ফাঁকেই কবে যে জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হই, তা আজ আর বিশেষ করে মনে করতে পারছি না। তবে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী প্রথম পরিচয়ের ধরণটা নিশ্চয়ই ছিল এইরকম : 'নমস্কার—নমস্কার' থেকে আরম্ভ হয়ে 'এই যে মশাই, নমস্কার' -এর পর্ব পেরিয়ে একটু ঘনিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'আরে মশাই, মশাই, নমস্কার—তারপর কেমন আছেন বলুন' পর্যন্ত। এবং এরই মধ্যে কবে থেকে যে তাঁকে 'সুলালদা' বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম, তাও আজ মনে পড়বার কথা নয়। আগেই বলেছি, সুলালদা ছিলেন বাগবাজারের ছেলে; আমিও থাকতাম ঐ বাগবাজারেরই লাগোয়া কম্বুলিয়াটোলায়। ও'র বৃন্দাবন পাল বাই লেনের বাড়ীর সামনে দিয়ে আমাকে হামেশাই যাতায়াত করতে হত এবং এই যাতায়াতের পথে যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা, তখনই রঙ্গজগৎ সম্বন্ধে দু'পাঁচ মিনিট গল্প চলতই। পরে তিনি যখন বালিগঞ্জ ডোভার লেনে বাড়ী করে উঠে এলেন, আমি তার আগে থেকেই পণ্ডিতিয়া রোড অঞ্চলের বাসিন্দা এবং চলচ্চিত্র-পরিচালকরূপে কর্মব্যস্ত। টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় তো দেখা হতই; তা ছাড়া কখনও-সখনও তাঁর বাড়ীতে যেতুম গল্পগুজব করতে। আর একটি জায়গায় তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যেত; সেটি হচ্ছে মোহনবাগানের খেলার মাঠ—মেম্বারদের আসনে। বাল্যকাল থেকেই আমি ফুটবলভক্ত এবং মোহনবাগানের উগ্র সমর্থক। সুলালদাও তাই এবং হয়ত আমার থেকে একটু বেশী। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিন বছর ধরে তিনি ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের হকি সেক্রেটারী। তাঁরই আমলে মোহনবাগান প্রথম হকি-লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় এবং প্রথম বাইটন কাপ জেতে। আবার ঠিক এই সময়েই ১৯৫৩ সালে তিনি আমার পরিচালনায় "নিষ্কৃতি" ছবিতে গিরীশ-এর ভূমিকায় কাজ করছিলেন। আমি রঙ্গমঞ্চে "নিষ্কৃতি"র অভিনয় আজও পর্যন্ত দেখিনি। অবশ্য শুনেছিলাম, রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের অভিনয়ে সিদ্ধেশ্বরীর ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা ও গিরীশবেশে সুলালদা দর্শকদের একেবারে মাতিয়ে তুলতেন। রঙ্গমঞ্চে সুলালদা কি রূপ ফোটাতেন, তা আমি জানি না; কিন্তু ছবিতে আমি চেয়েছিলুম, তাঁকে যেন দেখতে হয় অনেকটা রাসবিহারী ঘোষের মতো। অবশ্য রাসবিহারী ঘোষের বেশ ভালো ফোটো যোগাড় করতে না পারায় আমার ইচ্ছা ঠিকভাবে পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। তবে গিরীশ যে তার ওকালতী নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত এবং সেই কারণে আত্মভোলা ও সংসার সম্বন্ধে উদাসীন, অথচ আসলে একটি সদাশয় লোক,—এই চারিত্রিক রূপটি সুলালদা বেশ ভালো করেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সুলালদা স্বভাবত একটু তড়বড় করে কথা বলতেন এবং এই কথার পুনরাবৃত্তি করাও তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল। 'কেন? কেন? হবে না কেন?', কিংবা 'আহা, হোলো, ওই হোলো' গোছের কথা বলা গিরীশ চরিত্রের সঙ্গে বহু জায়গায় খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেখানেই পরিস্থিতি ও সংলাপে কিছু আবেগ সৃষ্টির প্রয়োজন, সেখানেই সুলালদার কণ্ঠ হয়ে পড়ত একটু সুরেলা, একটু কাঁপানো। অবশ্য এর সঙ্গত কারণও ছিল। ভুললে চলবে না যে, সুলালদার প্রথম প্রেম ছিল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে; আগে তিনি মঞ্চাভিনেতা, পরে তিনি চিত্রাভিনেতা। তিনি বলতেন, 'অভিনয় শিখতে চাও, তো স্টেজে যোগ দাও।' কাজেই যেখানেই একটু আবেগপ্রবণতা, একটু দীর্ঘসংলাপ, সেখানেই সুলালদার অভিনয় কিছুটা মঞ্চঘেঁষা, চলচ্চিত্রজগতে যাকে ভুল করে বলা হয় মেলোড্রামাটিক, কিন্তু আসলে থিয়েট্রিক্যাল। সুলালদা আমার পরিচালনাধীনে আরও তিনখানি ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং প্রতিটিতে অভিনেতা হিসেবে তিনি আমাকে খুশীই করেছিলেন। সদালাপী, পরিহাসপ্রিয় মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ও সহযোগী মনোবৃত্তিসম্পন্ন। কোনো পরিচালককে কোনোদিন তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরকম অভিযোগ করতে শুনিনি। যারই সঙ্গে তিনি মিশেছিলেন, তাকেই আপনার করে নিতে একটুও দেরি হয়নি। তাঁর জীবনের মধ্যে ছিল সৎ খেলোয়াড়ের মনোভাব, যাকে বলে স্পোর্টিং স্পিরিট। তিনি যখন অভিনেতৃ-সংঘের সম্পাদক ছিলেন, তখন শরৎচন্দ্রের নাটকাভিনয় নিয়ে তাঁর ওয়ারিসনের সঙ্গে সংঘের মনোমালিন্য ও বিরোধ হয়। এই সময়ে সুলালদার আগ্রহে এবং আমার মধ্যস্থতায় সেই বিরোধের সমাপ্তি ঘটে।

মানুষ অবিনশ্বর নয়: 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে, কোথা, কবে?' তবু সেই গিলে-করা, ঢিলে-হাতা ধবধবে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী-পরা, হাতে কোঁচানো-কোঁচা-ধরা, পায়ে চকচকে কালো নিউ-কাট-পরা সাদা অন্তঃকরণের সেই চিরযুবা পুরুষটিকে আর দেখতে পাব না, তাঁর স্মৃতিকে ঘিরে বহুদিন ধরে একটি শূন্যতা বিরাজ করবে, এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই।

পরিণীতা/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের মানসীকন্যার দ্বিতীয় রূপ

শরৎচন্দ্রের ললিতার বয়স ছিল তেরো: কিন্তু আচারে আচরণে সে ছিল পুরোপুরি গিন্নিবান্নি। নতুন অ্যাটর্নি শেখরনাথের কাছে সে আট বছর বয়েস থেকে লেখাপড়া শিখছে এবং শেখরকে ডাকেও শেখরদা বলে। বদলে সে শেখরের জামা-কাপড় থেকে শুরু করে ঘরের যাবতীয় জিনিস-পত্তর সব গুছিয়ে রাখে, ঝাড়-পোঁচ করে এবং মনে মনে এ-কথা জানে, শেখরের বিনা হুকুমে সে কোথাও যেতে পারে না। স্বাভাবিক, সহজ বুদ্ধি দিয়েই জানে, সে স্বাধীন নয়, তার মামা-মামীর অনুমতিই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাকে চূড়ান্ত অনুমতি দেবার মালিক হচ্ছে শেখর।

আয়া সাওন ঝুমকে/আশা পারেখ ধর্মেন্দ্র

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র সমালোচনা

সহকারকে আশ্রয় করে লতা যেমন বড়ো হয়, ঠিক তেমনই করেই ললিতা বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে উঠেছিল শেখরকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করে। হঠাৎ যেদিন সে শেখরের মুখ থেকে শুনল, ভালোমন্দ বোঝবার তার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, সেইদিন সে প্রথম চমকিত হয়ে নিজের দিকে তাকাল এবং তার তেরো বছর বয়েসে প্রথম উপলব্ধি করল, তার ব্রাহ্ম বন্ধু চারুবালার মামা গিরীনবাবু তাকে একটু বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন। 'পুরুষের প্রীতির চোখ যে এত বড়ো লজ্জার বস্তু', এ-খবর সে এই প্রথম জেনে মরমে মরে গেল।

তবুও বিবাহ-লগ্নে ললিতা যখন শেখরের গলায় গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল, তখন সে না ভেবেচিন্তেই কাজটা করেছিল। কিন্তু শেখর যখন তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সেই মালা তার গলায় ফিরিয়ে পরিয়ে দেয় এবং তার

রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট/লিওনার্ড হোয়াইটিং এবং অলিভিয়া হাস্‌সি

তরের প্রেমের স্বাক্ষরস্বরূপ তার অধরে জের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে, তখন থেকে সে প্রাণে নিজেকে শেখরের ধর্মপত্নী বলে ন। —বহু ভুল বোঝাবুঝির পরে কেমন র এই গোপন বিবাহোৎসব প্রকাশ্য াজিক বিবাহকে সম্ভব করে তুলল, নিয়েই শরৎকাহিনীর বাকী পাঁচটি রচ্ছেদ রচিত।

শেখর-ললিতা যার নায়ক-নায়িকা, সেই বদ্য প্রেম-কাহিনী "পরিণীতা" বাঙলা াকচিত্রে প্রথম রূপান্তরিত হয়েছিল আজ ক প্রায় সাতাশ বছর আগে ১৯৪২ ল। সেই ছবিতে প্রথম নায়িকারূপে তীর্ণ হয়ে সন্ধ্যারাণী দর্শকসমাজে যে-ত্রপূর্ব আলোড়ন জাগান, তার কথা ও আমাদের স্পষ্ট মনে আছে।

দ্বিতীয়বার সেই 'পরিণীতা'র চিত্ররূপ লন নবগঠিত চিত্রলিপি ফিল্মস। ঠিক চ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ ধরে মূল হনীটির চিত্রনাট্য রচনা করতে করতে ুচরণ ও নবীন রায়ের মৃত্যু দুটিকে তনাটকীয়' করতে গিয়ে চিত্রনাট্যকার প্রীতম চৌধুরী কাহিনীর ভিতর দুটি ন্ত বেসুরো আওয়াজ তুলেছেন। ছাড়া এই অনবদ্য প্রেম-কাহিনীটির যে টি কারামেজাজ ও ছন্দ আছে, তাও চিত্রনাট্যটিতে ধরা পড়েনি। মাত্র শেখর-তার মাল্যবিনিময় দৃশ্যের সঙ্গে াকালীর পুতুলের বিবাহোৎসবের ঙ্গিক বাদাগীত "লাজে রাঙা হোলো লো বৌ"-সহ দৃশ্যটি মিলিতভাবে টি উপভোগ্য চমৎকারিত্বের সৃষ্টি ছে।

এই দ্বিতীয় চিত্ররূপে নায়িকা ললিতার কায় অবতীর্ণ হয়েছেন 'বালিকাবধূ'-র মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। সহজাত নাট-ণ্য দ্বারা তিনি ললিতা চরিত্রটির প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। রের ভূমিকার মর্মটিকে নিখুঁতভাবে য়িত করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ভাবকে অতি সুন্দরভাবে তিনি শিত করেছেন তাঁর চক্ষু দ্বারা। িনরূপে শমিত ভঞ্জ অভিনয়ের তেমন গ পাননি বলেই মনে হয়। অপরাপর রে কমল মিত্র (নবীন রায়), বিকাশ রায় ুচরণ), ছায়া দেবী (ভুবনেশ্বরী), মালিয়া (আন্নাকালী), অনুভা গুপ্তা মা), রমি চৌধুরী (চারুবালা), শৈলেন পাধ্যায় (অবিনাশ), গীতা দে ুচরণের স্ত্রী) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় ছেন।

চিত্রলিপি প্রযোজিত 'পরিণীতা'র পারিপাট্য এবং অলঙ্করণ অত্যন্ত পসম্মত। কিন্তু চিত্রগ্রহণে আলোছায়ার ার অভাব পরিলক্ষিত হল। ছবির টি গানের মধ্যে "চাঁদে বুঝি লাগল " এবং "লাজে রাঙা হোলো কনেবৌ —গান দু'খানি সুরে, গাওয়ায় ও প্রয়োগ অনুযায়ী সংস্থাপনে উপ-গের সৃষ্টি করেছে।

শরৎ-কাহিনীর আবেদন যে আজও অসামান্য, তার সাক্ষ্যবহন করে চিত্রলিপি প্রযোজিত এবং অজয় কর পরিচালিত "পরিণীতা"র জনপ্রিয়তা।

শেক্সপীয়ারের অমর প্রেমগাথার নব চিত্রায়ণ

ধন্য সাহস পরিচালক ফ্র্যান্কো জেফিরেলির! ধন্য সাহস যুগ্ম-প্রযোজক অ্যান্থনি হ্যাভেলক-অ্যালান ও জন ব্র্যাবোর্ণ-এর! শেক্সপীয়রের ধ্রুপদী নাটক অবলম্বনে নতুন ক'রে "রোমিও-জুলিয়েট" ছবি তুলতে গিয়ে তাতে তারুণ্যের উত্তাপ ও সমকালীনতা আরোপ করবার জন্যে তাঁরা যে-স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, তাতে শেক্সপীয়ার-ভক্তরা নিদারুণ ভাবে রুষ্ট হবেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত চিত্ররসিকরা ছবিটির মধ্যে দেখতে পাবেন অসাধারণ চিত্রধর্মিতা। বিবদমান মন্টেগু ও ক্যাপুলেটদের অধিকাংশই শুধু তরুণই রাখা হয়নি, পথে তাদের ঝগড়া-মারামারি দ্বন্দ্বকেও বর্তমানের 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'র মত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকদলের রূপ দেওয়া হয়েছে। আচারে-আচরণে এবং সুপরিকল্পিত পোশাকে একদল কিছুটা উন্নাসিক ও সভ্য, অপর দল কিছুটা সংযত এবং ঐ উন্নাসিক দলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

সবচেয়ে বেশী সাহসের পরিচয় দিয়েছেন জেফিরেলি নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় যথার্থ দুই 'টীন-এজার'কে—তরুণ-তরুণীকে নির্বাচন ক'রে। শেক্সপীয়রের নাটক বলে : জুলিয়েটের বয়েস প্রায় চৌদ্দ। ছবির জুলিয়েট অলিভিয়া হাস্‌সির বয়েস হচ্ছে পনেরো এবং রোমিও বেশী লিওনার্ড হোয়াইটিং হচ্ছেন সতেরো বছর বয়স্ক যুবক। বোধহয় আমি ভুল বলব না, যদি বলি, পৃথিবীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এত কমবয়সী রোমান্টিক জুটী এই প্রথম দেখা গেল। মিস হাস্‌সি যথার্থই সৌন্দর্যময়ী এবং তাঁর মুখে-চোখে কৈশোরের সারল্য। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল : বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি? তখন তাঁর সেই সারল্যে ভরা দীপ্তি-ময়ী উত্তর : ওঃ, এত একটি সম্মানের

মাধবী/সঞ্জয় এবং দীপা

কথা !—আমাদের চমৎকৃত না ক'রে পারেনি। রোমিও যখন সংগোপনে তাঁর অঙ্গুলিধারণ করল, তখন তাঁর অস্ফুট শিহরণজাত মুখধ্বনি এবং অজ্ঞাতনামা যুবকের প্রতি অনুরাগী মন নিয়ে তার অতর্কিত মৃদু চুম্বনে নূতনতর অনুভূতির প্রকাশকে আমরা অভিনন্দিত না ক'রে পারি না। তারপর জুলিয়েটের সমস্ত দেহমনে প্রেমের অশান্ত বন্যাকে—যাকে শেক্সপীয়ারের জুলিয়েট বলেছে—

> My bounty is as boundless as the sea.
> My love as deep; the more I give to thee
> The more I have for both are infinite.

—তাকে যে ভাবে চলচ্চিত্রের ভাষা দেওয়া হয়েছে, তাতে জেফিরেলির কল্পনাশক্তিকে অজস্র প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। রোমিও যে কাব্যধর্মী ও শান্তিপ্রিয়, একথা পরিচালক জেফিরেলি একবারও ভোলেন নি। বন্ধু মার্কুসিওর হত্যার পর সে ঠিক উন্মাদ হয়ে উঠে সেই হত্যার প্রতিশোধ নিল টিব্যাল্টকে হত্যা করে; কিন্তু পরক্ষণেই সে অনুশোচনায় ভরে উঠেছে। ছবিতে রোমিও চরিত্র অতি নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে জেফিরেলির পরিচালনাধীনে লিওনার্ড হোয়াইটিং দ্বারা। এ'দের সঙ্গে তাল রেখে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন প্যাট হেউড (নার্স), মিলো ও'শিয়া (ধর্মযাজক লরেন্স), মাইকেল ইয়র্ক (টিব্যাল্ট) ও জন ম্যাকএনেরী (মার্কুসিও)।

শেক্সপীয়ারের ভাষাকে যথাসম্ভব বজায় রেখে সংলাপ রচনা এবং কাহিনী উপযোগী বহিদৃশ্য নির্বাচন ও দৃশ্যপট সংস্থাপন এই ছবিটির অতিরিক্ত আকর্ষণ।

মঞ্চাভিনয়

সম্প্রতি উত্তর কলকাতার প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী 'ঋতায়নে'র শিল্পীরা 'নেকড়ে' নাটকের অভিনয় করলেন মুক্তঅঙ্গনে। নাটকীয় ঘটনার মধ্যে খুব বেশী নতুনত্ব না থাকলেও, পরিবেশনার গুণে 'নেকড়ে' একটি রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি হোতে পেরেছে। কাহিনীর অব্যাহত ধারায় নাট্যকার মনোজ মিত্র প্রায় সব সময়েই রহস্যেভরা এক অদম্য কৌতূহল বজায় রাখতে পেরেছেন। কংসারী ঠাকুর আর তাঁর দুই সঙ্গী 'আক্রাম' আর গোঁসাই এসে উপস্থিত হয়েছেন শহর থেকে দূরের কোন এক দ্বীপে। আক্রাম, গোঁসাইয়ের শক্তি, বুদ্ধি আর কৌশলে কংসারী ঠাকুর একের পর এক ঐসব সরল দ্বীপবাসীর জমিজমা গ্রাস করতে থাকেন এবং শেষে একদিন দেখা যায় তিনিই হয়েছেন সমগ্র দ্বীপের মালিক। সঙ্গে সঙ্গে যৌনতৃষ্ণা মেটাতে তিনি ব্যবহার করতে থাকেন ওদের মেয়েদের। তাদেরই একজনের গর্ভে জন্ম নেয় এক বীভৎস সন্তান। গোঁসাই তাকে না মেরে ফেলে দিয়ে আসে দক্ষিণের জঙ্গলে। মাঝে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। এরপর প্রতিহিংসাপরায়ণ এক নেকড়ের কথা ঘোষিত হয় রহস্যময় আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে। সীমাহীন ভীতি জাগে সবার মনে, শংকিত হয়ে ওঠে সবাই। 'আক্রাম' প্রাণ হারায়, সবার অন্তরে নেমে আসে মৃত্যুর করাল ছায়া। নাটকের সমাপ্তিতে দেখা যায় কংসারি ঠাকুর আর সাথীরা আত্মসমর্পণ করছেন শোষিত সেই দ্বীপবাসীদের কাছে।

মোটামুটি নাটকের কাহিনী হোল এই। রহস্যময় পরিবেশে বীভৎস 'নেকড়ে'র আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন নির্দেশক মনোজ মিত্র। পার্থপ্রতীম চৌধুরীর আবহসংগীত ও আলোকসম্পাত নাটকটির রহস্য জমাট বাধার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে বলে মনে হয়। মঞ্চসজ্জায় অজয় দত্তগুপ্ত সুগভীর শিল্পবোধের পরিচয় দিতে পেরেছেন। শেষ মুহূর্তের কম্পোজিশনে নির্দেশকের অসাধারণ বোধের পরিচিতি চিহ্নিত হয়েছে। দু' একটি বাদ দিয়ে সব চরিত্রই মোটামুটি সুঅভিনীত। অধিপ বিশ্বাস কংসারি ঠাকুরের ভূমিকায় খুব সংযত অভিনয়রীতির নজীর রেখেছেন। দুলাল ঘোষ 'শশাংক' চরিত্রে একেবারেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। প্রশান্ত বর্মণেরও 'আক্রাম' আমাদের নিরাশ করেছে। চিত্রিতা মণ্ডলের 'নেহারি' মোটামুটি একটি সার্থক চরিত্রচিত্রণ। সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন 'ছক্কা' আর 'সুখী' চরিত্রে মনোজ মিত্র ও মমতা চট্টোপাধ্যায়। দুজনেরই স্বচ্ছ ও প্রাণোচ্ছল অভিনয় দর্শকদের বিমুগ্ধ করেছে। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন মানব চন্দ্র, অশোক চক্রবর্তী, তপন দাস, ফণীন্দ্র ভট্টাচার্য।

জীবনটাকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখার না শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তের কোন বধান না মেনে যাঁরা ডেইলী প্যাসেঞ্জারী রে চলেছেন দিনের পর দিন, বছরের পর র তাঁদের প্রতিটি মুহূর্তের সুখদুঃখ, হাসি, ব্যথাবেদনা একটি নাটকের ধ্যাতে রূপলাভ করেছে। নাটকটির নাম ্যান্ডেল লোকাল'। ডাঃ বিভূতি মুখো- ধ্যায় রচিত এই নাটকটি মোটামুটি র্থকভাবে সম্প্রতি মুক্তঅঙ্গনে পরিবেশন রলেন 'শুভময়' সংস্থার শিল্পীরা। টকটির নির্দেশনায় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় র্বত্র শিল্পবোধের পরিচয় না দিতে রলেও, কয়েকটি মুহূর্তে সৃষ্টিতে তাঁর ণ্ঠা ধরা পড়েছে। প্রতিটি শিল্পীই প্রায় রিত্রপযোগী অভিনয় করেছেন। শিল্পী- লিকায় আছেন : ইন্দুমাধব দে, দেবনাথ ট্টোপাধ্যায়, শৈলেশ দাস, সমীর রক্ষিত, নন্দম, পঙ্কজ চক্রবর্তী, সুধীর দাস, ভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মল্লিক, রণজিৎ ন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব ভট্টাচার্য, অলোক ধিকারী, প্রবীর রাহা, শচীন মুখোপাধ্যায়, নীত বসু, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। একটি কাল ট্রেনের কামরার দৃশ্য সুপরি- ল্পিতভাবে মঞ্চে বিন্যাস লাভ করেছে। লোকসম্পাতে স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ন্তাশীলতার পরিচয় রেখেছেন। শব্দ- যোজনায় মাঝে মাঝে শৈথিল্য স্পষ্ট হয়ে ঠেছে।

ধর্মীয় মুখোশের আড়ালে মানুষ নেক সময় তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে মন করে, কিন্তু সেই অবদমিত প্রবৃত্তির কস্মাৎ প্রকাশ যে কি ভয়ংকর হোতে পারে, তার প্রমাণ মিললো সম্প্রতি বিশ্বরূপা' মঞ্চে 'নাটকীয়' সংস্থা পরি- বেশিত 'অঙ্ক ফলে শূন্য' নাটকে। বক্তব্য- মৃদ্ধ এ নাটকটির প্রয়োগপরিকল্পনা প্রশংসার দাবী রাখে। অভিনয় ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন চরিত্রহীন যুবক মলনের ভূমিকায় নাট্যনির্দেশক সুদীপ্ত ক্রবর্তী ও তাঁর হোস্টেলের বন্ধু বিনয়ের ভূমিকায় শিবাজী গুপ্ত। 'ফাদার' অবিনাশ', 'লাবণ্য'র ভূমিকায় শিল্পীদের অভিনয় ত্রুটিমুক্ত হোতে পারেনি। শুভেন্দু বিশ্বাস (ফাদার) স্পষ্ট করে সংলাপ বলতে পারেননি বলে, তাঁর চরিত্রচিত্রণ অনেকাংশে দুর্বোধ্য থেকেছে। চন্ডীদাস মুখোপাধ্যায় (অবিনাশ) ও মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (লাবণ্য) নিজেদের চরিত্রে প্রত্যাশিত আবেগ আরোপ করতে পারেননি। অন্য দুটি ভূমিকায় মোটামুটি স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন অমিতাভ চক্রবর্তী, অলোক দাস। আলোকসম্পাতের ত্রুটি একটি নাটকের গতিকে মাঝে মাঝে ব্যহত করেছে।

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'পথিক'-এর শিল্পী সদস্যরা তাঁদের আগামী প্রযোজনা ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' নিয়মিত অভিনয়ের এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছেন। 'মা' উপন্যাসের মূল বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে বাংলা রূপান্তরণের দুরূহ কর্মটি সম্পাদন করেছেন শ্রীবিষ্ণু চক্রবর্তী। প্রথম পর্যায়ে দুটি অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে ৪ জুলাই ও ৮ আগস্ট বিশ্বরূপা মঞ্চে। তারপর এঁরা ১৪ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুরে, ৫ অক্টোবর ডায়মন্ডহারবার ও ২ নভেম্বর পুরুলিয়ায় উক্ত নাটকটি মঞ্চস্থ করছেন বিভিন্ন সংস্থার আমন্ত্রণে। বাংলা এবং বাংলার বাইরে নিয়মিত অভিনয়ের জন্যেও জোর প্রস্তুতি চলছে। রূপারোপে থাকছেন সর্বশ্রী ফণী গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্র মিত্র, জয়ন্ত মতিলাল, ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গোপাল দে, শিবনাথ ব্যানার্জি, মণি শ্রীমানী, রবীন ব্যানার্জি, কান্তিময় রায়চৌধুরী, প্রণব বল, শোভেন মুখার্জি, অনুপম বাগচী, কল্যাণ কর্মকার, কামাখ্যা ঘোষ, কমল রায়চৌধুরী, রামরাম চ্যাটার্জি, জয়দেব চক্রবর্তী, সুনীল সুর, সনৎ বসু, সুপর্ণা চ্যাটার্জি, দীপা হালদার ও শেফালী দে। আলোকসম্পাতে থাকছেন বিমান ব্যানার্জি। নাট্যনির্দেশনায় থাকছেন জ্যোতিপ্রকাশ।

সম্প্রতি সুভাষ ইনঃ হলে শ্রীশৈলেশ গুহ নিয়োগীর "ফাঁস" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়। তরুণ পরিচালক শ্রীসরোজ রায় পরিচালনা, সংগীত পরিচালনা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্বে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ভূমিকায় সর্বশ্রী সন্তোষ দাস, গুণেন সাহা, দিলীপ দাস, দ্বিজেন চন্দ, গণেশ পাল, ডঃ তেওয়ারী ও রমা দাসের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। দি সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ৭ম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে এই নাটকটি অভিনীত হয়।

গত ৬ জুন মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে থিয়েটার ওয়ার্কশপ তাঁদের নতুন প্রযোজনার নাম প্রথম ঘোষণা করলেন এবং সেই সন্ধ্যায় নাটকটির একটি গোপন অভিনয় অনুষ্ঠিত হল সংস্থার শুভানুধ্যায়ী ও অনুগ্রাহকদের সামনে। নাটকটির নাম 'হাড়ি ফাটিবে'। উৎপল দত্ত রচিত এই রসঘন রহস্যঘন নাটকের প্রযোজনায় এক পরীক্ষামূলক নব্য- রীতির প্রয়োগ করেছেন থিয়েটার ওঅর্কশপ। নির্দেশনায় রয়েছেন চিন্ময় রায় ও বিভাস চক্রবর্তী এবং অন্যান্য বিভাগে ও অভিনয়ে : সত্যেন মিত্র, দীপক মিত্র, শান্তি দে, দীপঙ্কর ধর, চিত্ত মিত্র, রতন মিত্র, অশোক মুখোপাধ্যায়, সুকুমার বসু, মানিক রায়চৌধুরী, গৌরাঙ্গ গুহ- ঠাকুরতা, তাপসী গুহ, মায়া ঘোষ ও চিন্ময় রায়। গোপন অভিনয়ের অভাবনীয় সাফল্যের পর থিয়েটার ওঅর্কশপের এই তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনার প্রথম প্রকাশ্য অভিনয়ে হবে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে আগামী ১১ জুলাই সংস্থার তৃতীয় বর্ষপূর্তি দিবসে।

গত ৬ জুন, এন্ডারসন হাউসএ ডি- ভি-সি রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭১তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডি-ভি-সির এডিশন্যাল কমার্শিয়াল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপি আর রায়চৌধুরী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডি-ভি-সির চেয়ারম্যান শ্রীএন ই এস রাঘবাচারী ও জেনারেল ম্যানেজার শ্রীএন কে প্রসাদ। খ্যাতনামা শিল্পীদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সফল ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আবৃত্তিতে কবিপুত্র

পাতিপুকুর গভঃ হাউসিং এস্টেটের মহিলাবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **কালের যাত্রা** অভিনয়ে মঞ্জুশ্রী, তনুশ্রী এবং মান্তা।

কাজী সব্যসাচী, শ্রীমান পার্থিবকুমার গুহঠাকুরতা ও শ্রীকল্যাণ মৈত্র, সঙ্গীতে শ্রীঅনুপ ঘোষাল, শ্রীমতী নমিতা ঘোষাল, শ্রীশচীন ব্যানার্জি শ্রীপ্রণব ঘোষ ও শ্রীমতী কবিতা মুখার্জী এবং যন্ত্রসঙ্গীতে শ্রীসুনীল গাঙ্গুলী ও শ্রীঅমর কুন্ডু ও সম্প্রদায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। ক্লাবের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীদেবনাথ চক্রবর্তীর কবির বাণী ও জীবন দর্শনের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

ইউ বি আই এর শিয়ালদহ শাখার কর্মচারী সমিতি সম্প্রতি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে 'আজকাল' নাটকটি শ্রীশিশির চক্রবর্তীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও সর্বোপরি দলগত নৈপুণ্যে নাটকটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। অভিনয়াংশে কৃতিত্বের নজীর রাখেন সর্বশ্রী সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ সর্বজ্ঞ, তুষার চক্রবর্তী, সমীর চক্রবর্তী, প্রভাত ভট্টাচার্য, শর্বরী মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি ভট্টাচার্য ও ছন্দা চট্টোপাধ্যায়।

জব্বলপুরে আমারিয়ার এ্যাকাউন্টেন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসব গত ২৪ মে অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় প্রবাসী বংগীয় সংসদ প্রাঙ্গণে। এই উপলক্ষে ক্লাবের সভ্যবৃন্দ জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টি' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং দর্শকবৃন্দের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন অজিত দাশগুপ্ত, অনন্ত দে, শৈলেন মন্ডল, অনিল সরকার, রমেশ রায়, শ্যামল রায়, পরিমল দাস, পান্নালাল সরকার, দীপক খান, রবিশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, সোমনাথ ও সুশীল সাহা। স্ত্রী চরিত্রে অচ্যুত চক্রবর্তী ও কমলা পাল দর্শকবৃন্দের অকুন্ঠ প্রশংসা পান। নাটকটির আবহসংগীতে সহযোগিতা করেন সর্বশ্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ অশোক বটব্যাল এবং অজিত সামন্ত। নাটকটি পরিচালনা করেন সুশীল সাহা।

কোচবিহারে উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ বাণীরূপা নামে একটি সংস্থা গঠন করেছেন বেশ ক' বছর হল। সম্প্রতি সংস্থার সভ্যরা সুনীতি এ্যাকাডেমি হলে কবিগুরুর 'চিরকুমার সভা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। মহিলাদের দ্বারা এ অভিনব নাটকের সার্থক রূপায়ণ প্রশংসার দাবী রাখে। নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনা, অভিনয়ে ও নির্দেশনার গুণে নাটকের বক্তব্য ও রস দর্শকদের অন্তর তৃপ্ত করেছে। প্রতিটি শিল্পীর অভিনয় প্রশংসনীয়। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অংশ নিয়েছেন তাঁরা হলেন : শ্রীমতী আরতি গুহ, বাণী সেন, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, কনক দত্ত, মীনাথ, বন্যা ঘোষ, সোনা গুপ্ত, গৌরী দা[illegible], সুমিতা গুপ্ত, প্রতিমা দেবী, শান্তি মজুমদার, উমা ঘোষ, রীতা ঘোষ, কৃষ্ণা ঘো[illegible] প্রভৃতি। নাট্য নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেন শ্রীমতী আরতি গুহ।

বিবিধ সংবাদ

গেল ৫ জুন, বৃহস্পতিবার বাগবাজার গিরিশ ভবনের প্রাঙ্গণে গিরিশ নাট্য সংসদ এর ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল দীপনারায়ণ সিংহের পৌরোহিত্যে এক গিরিশ স্মারক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সদা-প্রতিষ্ঠিত গিরিশচন্দ্রের মৃন্ময়-মূর্তির পাদদেশে রাজ্যপাল মহোদয় পুষ্পবলয় স্থাপন করবার পরে অধ্যাপিকা ডক্টর উমা রায় গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সংস্কৃত আলংকারিক পরিত্যক্ত এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের আলংকারিকগণ দ্বারা শ্রেষ্ঠ রস [illegible] স্বীকৃত ভক্তিরসকে আশ্রয় করেই গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম রচনা—তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, পাশ্চাত্য নাটক ও সংস্কৃত নাট্য দুই বিপরীতমুখী ভাবাদর্শের মধ্যে গিরিশ নাটক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল [illegible] মহামান্য রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে ব[illegible] পরমহংস দেবের প্রতি গিরিশচন্দ্রের [illegible] হীন একান্ত নির্ভরতা গিরিশ চরি[illegible]

ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের সূর্য-চেতনা নাটকের একটি দৃশ্যে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সতীকান্ত ঘোষ, দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত ভট্টাচার্য, কল্যাণ মিত্র, দীপক ধর ও সাধন সেনগুপ্ত।

তাঁর কাছে সমুত্থান করে তুলেছে—এমনভাবে কেউ যে নিজেকে গুরুদেবের চরণে বিলিয়ে দিতে পারে, তা ভাবতেই পারা যায় না। গিরিশভক্ত নাট্যোৎসাহিগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থকতা লাভ করেছিল।

আসচে রবিবার, ২২ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় মহাজাতি সদনে **নটলীলার** প্রযোজনায় শরৎচন্দ্রের **বিন্দুর ছেলে** আবার অভিনীত হবে। চিত্ত বসুর নির্দেশনায় এতে অংশ গ্রহণ করবেন সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মী-জনার্দন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী নিভাননী, মণি শ্রীমানি প্রভৃতি শিল্পী।

বোম্বে সিনে আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি **জগদীশ শেঠী** ১৩ জুন বোম্বাই শহরে ছেষট্টি বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ভারতের প্রথম সবাক ছবি "আলম-আরা"তে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। পাঁচ বছর ধ'রে কলকাতার নিউ থিয়েটার্সে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবার পরে তিনি বোম্বাই যান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছবিতে অবতীর্ণ হন। তাঁর শেষ ছবি "মেরে সায়া"। কে এস পিকচার্স-এর হয়ে তিনি 'রাত-কী-রাণী' ও 'পেনসনার' ছবি দুখানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। তিনি আই-এম-পি-পি-এর কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

শর্মিলা নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব ও অহীন্দ্র চৌধুরী সম্বর্ধনা

আগামী ২৮ জুন শনিবার সন্ধ্যে ছটায় স্টার থিয়েটারে শর্মিলা নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব এবং উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অভিনেতা নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর ডি-লিট উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হবে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং শ্রীপ্রবোধ সান্যাল যথাক্রমে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। এই উপলক্ষে শ্রীসলিলকুমার মিত্র নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পী ও মঞ্চের কলাকুশলীদের পুরস্কৃত করবেন।

গত ১৪ জুন উল্টাডাঙ্গার তেলেঙ্গাবাগানের নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত কাউন্সিলার শ্রীঅনন্তকুমার ভারতীকে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠান শুরু হয় চৈতালী সুরাই-এর রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। সঙ্গীতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তারা মুখোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়, অশ্রুকণা মুখোপাধ্যায়, রমেন ঘোষ, রবি বর্ধন, সেবা সেন, সুধীর কর, পরিমল ভট্টাচার্য, আরও সুবীর কর, পরিমল ভট্টাচার্য, অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন রথীন চক্রবর্তী, অনল পাল ও সারদা বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীপ্রমোদরঞ্জন কুণ্ডু।

সম্প্রতি পাতিপুকুর গভঃ হাউসিং এস্টেটে একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এই এস্টেটের মহিলারা, গত দুবছর এই ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কুমারী মঞ্জুশ্রী বসু ও জয়শ্রী বসুর যুগ্ম-পরিচালনায় এবার অনুষ্ঠান সবদিক দিয়েই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কণ্ঠ-সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, যন্ত্র-সংগীত ও নাট্যাভিনয় প্রভৃতির সমাবেশে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। হিমগ্ন রায়-চৌধুরীর রবীন্দ্রসংগীত, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেহালা এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের তবলা সংগত সবার প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত 'অবাক জলপান' ও 'কালের যাত্রা' নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেয়—শিখা চক্রবর্তী, নূপুর সেনগুপ্তা, অরুন্ধতী ঘোষ, মনমোহন বসু, মঞ্জুশ্রী বসু, জয়শ্রী বসু, তনুজা সেন, মিতালী চ্যাটার্জি, মাম্পা নন্দী, মহুয়া রায়, সোমা দাস, রিতা চক্রবর্তী, দীপশ্রী ব্যানার্জি, পুতুল দত্ত, কণিকা চ্যাটার্জি, পিনাক সরকার, শুভ্রা কুণ্ডু। বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন আই-ই-এন-এস-এর সভাপতি মিহিরলাল গাঙ্গুলী ও প্রবীণ সাংবাদিক রাখাল ভট্টাচার্য, ডঃ দিলীপ মালাকার, শ্রীঅনিলকান্তি ঘোষ, ডিরেক্টর অমৃত, শ্রীপ্রভাতকান্তি ঘোষ এবং শ্রীঅসিতকান্তি ঘোষ।

গত ৩ জুন গোপালনগর হরিপদ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে স্থানীয় ছাত্র-যুবকেরা ৭০তম নজরুল জয়ন্তী উদযাপিত করে। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে স্বদেশী আন্দোলনের গণচেতনার উন্মেষের পটভূমিকায় নজরুলের অভ্যুদয়কে বিবৃত করেন। কবি তরুণ সান্যাল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদের তীব্র বিরোধিতা করে নজরুল কিভাবে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী কবি হয়ে উঠলেন এবং কিভাবে তিনি আজও দুই বাংলার অবিভাজ্য কবি, তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

রণব্রতী রণ ক্লার্ক

শঙ্করবিজয় মিত্র

যদি গুণগত উৎকর্ষ ও রেকর্ড করার কৃতিত্বের ভিত্তিতে স্বর্ণপদক দানের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে অস্ট্রেলিয়ার রণ ক্লার্ক সর্বাগ্রে সেই পদকের জন্য মনোনীত হতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগে দূর পাল্লার দৌড়ে সুইডেনের পাভো নুরমী যে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, বর্তমান যুগে সেই অসামান্য কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন রণ ক্লার্ক। দূর পাল্লার দৌড়ে তিনি রেকর্ডের পর রেকর্ড করে চলেছিলেন এবং ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো ওলিম্পিকের প্রাক্কালে ক্রীড়ারসিক মহল ঠিক করেই রেখেছিলেন যে দশ হাজার মিটার ও পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক রণ ক্লার্কের বক্ষেই শোভা পাবে। ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিকের পরবর্তী চার বছরে রণ ক্লার্কের নাম সকলের মুখে মুখে ফিরেছে। দূর পাল্লার দৌড় হলেই রণ ক্লার্কের নাম উঠেছে এবং অবলীলাক্রমে তিনি সেগুলি জয় ত করেছেনই, অবিশ্বাস্য-ভাবে নূতন নূতন রেকর্ড স্থাপন করে ক্রীড়ামোদীদের প্রশংসা পেয়েছেন। ক্রীড়া-রসিকরা তাঁকে চ্যাম্পিয়ানেরও চ্যাম্পিয়ান আখ্যা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অক্লান্ত সাধনা আর অসংখ্য প্রতিযোগিতায় যোগ-দানের ফলে ক্লার্ক সম্পর্কে সাধারণেরও একটা প্রচন্ড আস্থার ভাব এসেছিল এবং মেক্সিকোর সোনার মুকুটগুলো তাঁরা মনে মনে তাঁরই মাথায় তুলে দিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, মেক্সিকো ওলিম্পিকে তাঁর অবিশ্বাস্য ব্যর্থতার পরও রণ ক্লার্কের জনপ্রিয়তা এতটুকু হ্রাস পায়নি। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটেনে ক্রীড়ানু-রাগীদের ভোটেও মেক্সিকো ওলিম্পিকের পরাজিত চ্যাম্পিয়ান রন ক্লার্ক বিশ্বের দশজন সেরা এ্যাথলিটদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। এই সেরা দশজনের তালিকায় একমাত্র তিনিই পরাজিত হয়েও স্থান পেয়েছেন। এতেই প্রমাণিত হয় তাঁর ক্রীড়াকৃতি সম্পর্ক বিশ্বের ক্রীড়ানুরাগীরা কতখানি আস্থা রাখেন। এই দশজনের তালিকাতে শীর্ষস্থান পেয়েছেন অল অর্টার যিনি ডিসকাস ছোড়ায় পরপর চারটি বিশ্ব ওলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয় করেছেন। বত্রিশ বছর বয়সে অর্টার যে-সাফল্য অর্জন করেছেন বিশ্বের ক্রীড়াকৃতির ইতিহাসে তার আর অন্য কোন নজির নেই। ক্রীড়া-সাফল্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী নির্বাচিত হয়েছেন ভেরা কাসলাভাস্কা। চেকোশ্লোভাকিয়ার অপরূপ দেহসৌন্দর্যের অধিকারিণী এই তরুণী জিমনাস্টিকে চারটি বিষয়ে স্বর্ণপদক জয় করে অনন্যসাধারণ সাফল্যের অধিকারিণী হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন আমেরিকার বব বীমন অনায়াসে দীর্ঘ লম্ফনে ২৯ ফুট ৫½ ইঞ্চি উত্তীর্ণ হয়ে। অনেকের বিশ্বাস তাঁর এই নতুন রেকর্ড অতিক্রম করা বিংশ শতাব্দীতে সম্ভব হবে না। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান পেয়েছেন যথাক্রমে বৃটেনের ডেভিড হেমেরি ও আমেরিকার তরুণী সাঁতারু ডেবি মায়ার। ডেভিড হেমেরি চারশো মিটার হার্ডল রেসে নূতন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করে সকলকে চমৎকৃত করেছেন। তাঁর নূতন সময় ৪৮·১ সেকেন্ড পূর্বেকার রেকর্ড থেকে ·৭ সেকেন্ড কম। এইসব কৃতী এ্যাথলিটদের পাশে ষষ্ঠস্থান পেয়েছেন রণ ক্লার্ক। এই পরাজিত চ্যাম্পিয়ান জনমানসে এতখানি আস্থা ও মর্যাদার আসন পেয়েছেন তাঁর নিরলস সাধনা ও ক্রীড়াবিদের মহান আদর্শের প্রতি নিরঙ্কুশ বিশ্বাসের জন্য। ওলিম্পিক গৌরব অর্জনের জন্য তিনি যে একাগ্রতার ও অদমনীয় উৎসাহের পরিচয় রেখেছেন তাতে প্রকৃত এ্যাথলিট হিসেবে তাঁর মর্যাদা লোকচক্ষে অনেক উঁচু স্থান পেয়েছে। মেক্সিকোর পরাজয় তাই তাঁকে দমিত করতে পারেনি। তিনি নবীন উৎসাহে নবতর রেকর্ড স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন।

নিজের সম্পর্কে রণ ক্লার্ক উচ্চ ধারণাই পোষণ করেন এবং জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ওলিম্পিকের স্বর্ণ সাফল্যের জন্য কম চেষ্টাও করেননি। মেক্সিকো নগরীর উচ্চতা নিয়ে গত বছর বহু জল্পনা-কল্পনা চলেছিল এবং বিভিন্ন দেশ তৎসম্পর্কে নানা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। রণ ক্লার্কও সে-সতর্কতা নিতে ভোলেননি। তিনি কীরনিজ পাহাড়ের উচ্চ অধিত্যকায় তাই দীর্ঘদিন অনুশীলন করে মেক্সিকো ওলিম্পিকে গিয়েছিলেন।

দৃপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গিতে দূর পাল্লার দৌড়ে তিনি যেভাবে ক্ষিপ্র ও সুঠাম পদক্ষেপ করেন তাতে তাঁকে বিশ্বের অন্যতম স্টাইলিশ দৌড়বীর বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ার গর্ব বত্রিশ বছর বয়স্ক এই এ্যাথলীটটি অনেকগুলি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। দশ হাজার মিটার দৌড়ে তার বিশ্ব রেকর্ড ২৭ মিনিট ৩৯·৪ সেকেণ্ড আজও কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। ১৯৬৫ সালে কৃত এই রেকর্ড তাই অম্লান রয়েছে। পাঁচ হাজার মিটার দৌড়েও বিশ্ব রেকর্ড রণ ক্লার্কের। ১৯৬৬ সালে ১৩ মিনিট ১৬·৬ সেকেন্ডে তিনি এই দীর্ঘ পথ অতি-ক্রম করেছেন। দূর পাল্লার দু' মাইল, তিন মাইল, ছ' মাইল ও দশ মাইল দৌড়েও ক্লার্ক বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। এ'র সময় রেখা-গুলি হল : দু' মাইল ৮ মিনিট ২২·৬ সেকেণ্ডে, তিন মাইল ১২ মিনিট ৫০·৪ সেকেণ্ডে, ছ' মাইল ২৬ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ডে এবং দশ মাইল ৪৭ মিনিট ১২·৮ সেকেণ্ডে। এছাড়া বর্তমানে তিনি এক মাইল দৌড়েও অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ান। এক মাইল দৌড়ে তাঁর সময় লেগেছে ৪ মিনিট ·০০২ সেকেন্ড। মেক্সিকো ওলিম্পিকের পূর্বে-কার এই বিরাট সাফল্যের অধিকারী হয়ে রণ ক্লার্ক যখন মেক্সিকোতে গিয়েছিলেন, তখন অনেক অনেক ক্রীড়া-সমালোচকই মনে করেছিলেন এবার মেক্সিকোতে দূর পাল্লার বিজয়-গৌরব ক্লার্কেরই করায়ত্ত হবে। নিউজউইকের ক্রীড়া-সমালোচক বলে-ছিলেন, ওলিম্পিকের প্রথম দিনে দশ হাজার মিটার দৌড়ের স্বর্ণপদক বুকে ঝুলিয়ে রণ ক্লার্ক পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ের জন্য প্রস্তুত হবেন এবং আশা হয় তাতেও তিনি স্বর্ণপদক জয় করতে পারবেন। তবে কেনিয়ার কিপচো কিনো ও নাফতালি তেমু খুব সহজে যে ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী রণ ক্লার্কের প্রতি মোটেই সুপ্রসন্ন ছিলেন না। দশ হাজার মিটার দৌড়ে অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকা সাফল্যের যে-আলো জ্বালিয়ে অগ্রসর হলো, তাতে সবাই বিস্মিত হয়েছিল। প্রথম হলেন কেনিয়ার নাফতালি তেমু, দ্বিতীয় ইথিওপিয়ার মহম্মদ ওলদে, তৃতীয় টিউনিসিয়ার মহম্মদ গামোদি। আর যাঁর প্রতি ক্রীড়ামোদীদের এত প্রত্যাশা গড়ে উঠেছিল, সেই রণ ক্লার্ক হলেন ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী। তেমুর সময় ছিল ২৯ মিনিট ২৭·৪ সেকেন্ড এবং ক্লার্কের সময় ছিল ২৯ মিনিট ৪৪·৮ সেকেন্ড। বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ক্লার্ক কোন পদকই পেলেন না।

মেক্সিকোর উচ্চতা ও হাল্কা হাওয়া এই অসাফল্যের অন্যতম কারণ হলেও তার জন্যে বিলাপ করে কোন লাভ নেই। তাই ক্লার্ক হতাশ না হয়ে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গেল আফ্রিকার নিচ্ছিদ্র প্রাধান্য। প্রথম হলেন গামোদি, দ্বিতীয় কনো ও তৃতীয় তেমু। ক্লার্ক পেলেন পঞ্চম স্থান। গামোদির সময় ছিল ১৪ মিনিট ·০৫ সেকেন্ড এবং ক্লার্কের সময় ছিল ১৪ মিনিট ১২·৪ সেকেন্ড। ওলিম্পিকে স্বর্ণ সঞ্চয়ের আশায় ছাই পড়লো—দীর্ঘকালের প্রত্যাশা ব্যর্থ হলো ক্লার্কের। স্পোর্টসম্যানের মতই এই অসাফল্যকে বরণ করে নিলেন, এতটুকুও দমলেন না। একমাত্র প্রশ্ন পরবর্তী ওলিম্পিকের সময় তাঁর বয়স হবে প্রায় ছত্রিশ, তখনও এই দ্রুততা ও দক্ষতা কি অক্ষুণ্ণ থাকবে?

ওলিম্পিকে যাঁদের কাছে তিনি পরাজিত হলেন মেক্সিকো ক্রীড়ানুষ্ঠানের আগের বছরে ইউরোপে ভ্রমণকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি তাঁদের পরাজিত করেছেন। এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় কিপচো কিনো, নাফতালি তেমু কিংবা বেলজিয়ামের রোয়েলেন্টস প্রভৃতি বিখ্যাত দৌড়বিদকে তাঁর কাছে হার মানতে হয়েছে। তবে দশ হাজার মিটার দৌড়ের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান তেমু প্রায় তিন বছর কাল বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ক্লার্কের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং অবশেষে ওলিম্পিকেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করে সমস্ত পরাজয়ের গ্লানি পরিশোধ করে দিয়েছেন।

মেক্সিকো ক্রীড়ানুষ্ঠানের পরও রণ ক্লার্ক রণে ক্ষান্ত দেন নি। কালিফোর্ণিয়ার ওকল্যাণ্ডের ক্রীড়ানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি তাঁর ক্রীড়াপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে এসেছেন। ইন্ডোর অনুষ্ঠানে তিন মাইল দৌড়ে তের মিনিট ১২·৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে পূর্বেকার রেকর্ডের উন্নতি সাধন করেছেন।

এবার তিনি তাঁর দশ হাজার মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডের সময় নিয়ে রণে অবতীর্ণ হবেন। এই দৌড়ে তাঁর যে সময়ের রেকর্ড আছে তা কমিয়ে আনতে হবে অর্থাৎ ২৭ মিনিট ৩৯·৪ সেকেন্ডেরও কম সময়ে তিনি দশ হাজার মিটার দৌড়াবার চেষ্টা করবেন। এই দৌড়ের সুযোগ এসে যাচ্ছে আগামী ২২শে জুন বৃটেনে আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে। ক্রাইস্টাল প্যালেস স্টেডিয়ামে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা করছেন এবং যাতে খ্যাতনামা অ্যাথলিটরা অংশ গ্রহণ করেন তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রণ ক্লার্ক উদ্যোক্তাদের কাছে যে পত্র দিয়েছেন তাতে বলেছেন, 'আমি এবার বৃটেনের ক্রীড়ানুরাগীদের সামনে এমন একটা দৌড় দেখাতে চাই যা তাঁরা মনে রাখতে আনন্দ পাবেন।

উদ্যোক্তারাও ক্লার্কের এই উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হচ্ছেন। বড় বড় দৌড়বীররা যাতে ক্লার্কের সঙ্গে পাল্লা দেন তারই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইংলণ্ডের দুজন প্রখ্যাত ম্যারাথন দৌড়বীর এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছেন—এ'রা হলেন বিল এ্যাডকক ও জিম এ্যান্ডলাব। এ্যাডকক গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের ফুকোওকাতে আয়োজিত এক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ম্যারাথন রেসে বিজয়ী হন এবং তিনি সময় নিয়েছিলেন দু ঘন্টা ১০ মিঃ ৪৭·৮ সেকেন্ডে। ম্যারাথনের দ্রুততম সময়ের দিক থেকে এর হিসাব-নিকাশ করলে এই সময়কে তৃতীয় স্থান দিতে হবে। এই প্রতিযোগিতায় বৃটেনের আন্তঃকাউন্টি ও ক্রস কান্ট্রি প্রতিযোগিতার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান ট্রেভার রাইটও যোগ দেবেন। আর একজন তরুণ এ্যাথলিট ঊনবিংশ বর্ষীয় শারীর-শিক্ষা বিভাগের ছাত্র ডেভিড বেডফোর্ডও এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সম্প্রতি এই তরুণ ২৮ মিনিট ২৪·৪ সেকেন্ডে দশ হাজার মিটার দৌড়ে যুক্তরাজ্যে রেকর্ড করেছেন। এতো গেল বৃটেনের নামকরা এ্যাথলিটদের তালিকা। তাছাড়া, বিভিন্ন স্থানের প্রতিযোগীরাও এতে যোগ দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

রণ ক্লার্ক প্রায় দশ বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ক্রীড়ানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। দৌড় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমসেকম সতেরটি বিশ্ব রেকর্ডের তিনি অধিকারী। কিন্তু আজও ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক তাঁর কাছে স্বপ্নই রয়ে গেল। ভাগ্যলক্ষ্মীর এই পরিহাসকে তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। আরও একবার হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা তাঁর বুকে বাজছে এবং তারই প্রস্তুতি হিসেবে দেশে দেশে ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণে তিনি সোৎসাহে সাড়া দিচ্ছেন।

মেক্সিকো ওলিম্পিকে ব্যর্থতার পরও বিশ্বের ক্রীড়াভিজ্ঞ মহল রণ ক্লার্কের শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে উচ্চাশা কমিয়ে ফেলতে পারেন নি। বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ রবার্টো কুর্সেটনি বিশ্বের সেরা এ্যাথলীটদের বিভিন্ন বিভাগে যে ক্রমপর্যায় তালিকার ছক করেছেন, তাতে দশ হাজার ও পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে রণ ক্লার্ককেই শীর্ষস্থান দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ হাজার মিটারের ক্রমপর্যায় তালিকার পর্যালোচনা করে তিনি বলেছেন, রণ ক্লার্ক ইউরোপ পর্যটনকাল যেভাবে সাফল্যলাভ করেছেন, তাতে তাঁকেই শীর্ষস্থান দিতে হবে। অবশ্য মেক্সিকোতে তিনি ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছেন। সেকালে শীর্ষস্থানীয় ইউরোপীয় এ্যাথলিটদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে। তিনি এ-কথাও বলেছেন, আফ্রিকার পদক-বিজেতারা (গামুদি, কিনো, তেমু) যে-কোন অবস্থাতেই প্রতিযোগিতা করতে পারেন এবং গামুদি নিজেকে সমতলভূমির লোক বলেই পরিচয় দিতে চান। এ-তালিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থান দিয়েছেন হাঙ্গেরীর এল মেকসারকে, তৃতীয় স্থান ফ্রান্সের ওয়ার্ডোকে, চতুর্থ স্থান গামুদিকে, দশম স্থান কিনোকে এবং দ্বাদশ স্থান তেমুকে। অবশ্য তালিকা প্রণয়নে তিনি সময়ের বিচার অনুযায়ী ক্রমপর্যায় ধার্য করেছেন।

দশ হাজার মিটার দৌড়ে ক্রমপর্যায় তালিকার পর্যালোচনায় রবার্টো বলেছেন, এই দৌড় প্রতিযোগিতাতেও ক্লার্ক বিশ্বের সেরা সেরা দৌড়বীরদের তেমু, কিনো, রোয়েলেটস প্রভৃতি) ইউরোপের মাটিতে পরাস্ত করেছেন। কিন্তু মেক্সিকোতে তিনি পরাজিত হলেন। গত তিন বছর ধরে এই দশ হাজার মিটারের দৌড়ে তাঁর সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা চালিয়ে গেছেন তেমু এবং তিনিই ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক জয় করেছেন। ইউরোপের নতুন রেকর্ডের অধিকারী পূর্ব জার্মানীর দৌড়বীর হাসেও ওলিম্পিকেই জীবনের প্রথম পরাজয় বরণ করেন।

দশ হাজার মিটারের ক্রমপর্যায় তালিকা রচনা করেছেন তিনি এইভাবে : (১) রণ ক্লার্ক, (২) জে হাসে (পূর্ব জার্মানী), (৩) কিপচো কিনো। নাফতালি তেমু এই তালিকায় দশম স্থানে আছেন। অবশ্য সময়ের ক্রমিক পর্যায় অনুসারে এ-তালিকাটিও রচিত হয়েছে।

এমনি নানা পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, মেক্সিকো ওলিম্পিকে শোচনীয় ব্যর্থতার পরেও রণ ক্লার্ককে অপচিত শক্তি বলে গণ্য করা হচ্ছে না। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ক্লার্কের এখনও রণে ক্ষান্ত হবার সময় হয়নি। মিউনিক ওলিম্পিকে তাঁকে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখলেও বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। কে জানে এই অদম্য উৎসাহ ও সাধনা তাঁকে স্বর্ণশিখরে বসাবে না?

মহিলাদের ১৯৬৯ সালের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়িনী নোনা গ্যাপ্রিন্ডাশভিলি (রাশিয়া)। এই নিয়ে ইনি মোট ৩ বার বিশ্ব খেতাব পেলেন!
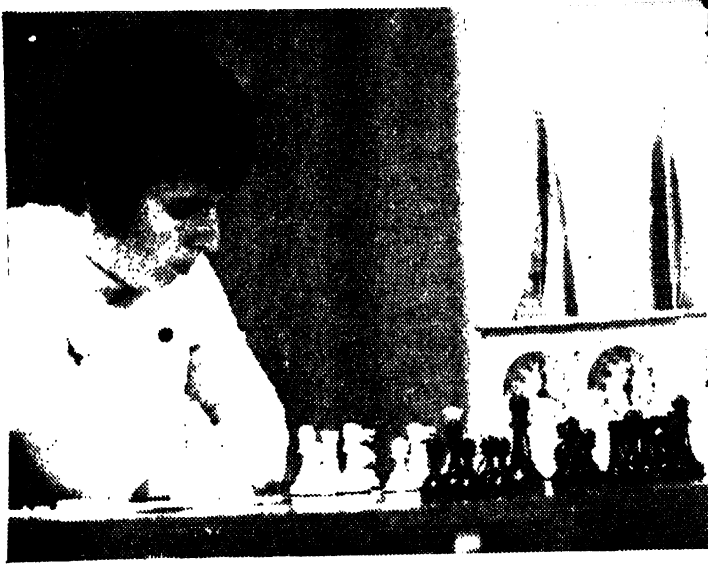
দর্শক

উবের কাপ ফাইনাল

টোকিওতে আয়োজিত মহিলাদের দলগত পঞ্চম বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে জাপান ৬—১ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৬ ও ১৯৬৯) উবের কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট ৭টি খেলার মধ্যে (সিঙ্গলস ৩ এবং ডাবলস ৪) ইন্দোনেশিয়া মাত্র একটি সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়েছে।

১৯৬৬ সালের চতুর্থ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে জাপান ৫—২ খেলায় উপর্যুপরি তিনবারের উবের কাপ বিজয়ী শক্তিশালী আমেরিকাকে পরাজিত করে বিজয়ী দলের তালিকায় এশিয়া মহাদেশের নাম প্রথম উৎকীর্ণ করেছিল।

জাপানের কুমারী নোরিকো তাকাগী সবথেকে খুশি—তাঁরই অধিনায়কত্বে জাপান উপর্যুপরি দুবার উবের কাপ পেয়েছে।

উবের কাপ হাতে জাপানের ক্যাপটেন কুমারী নোরিকো তাকাগি (ডানদিকে) এবং কুমারী হিরো আমানো। ১৯৬৯ সালের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে জাপান ৬—১ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার উবের কাপ জয়ী হয়েছে।

উবের কাপ বিজয়ী দেশ

বছর	বিজয়ী দেশ	স্কোর
১৯৫৭	আমেরিকা	৬—১
১৯৬০	আমেরিকা	৫—২
১৯৬৩	আমেরিকা	৪—৩
১৯৬৬	জাপান	৫—২
১৯৬৯	জাপান	৬—১

ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল

ভারতবর্ষের ক্রিকেট অনুরাগী মহলে মস্ত সুখবর যে, আগামী ক্রিকেট মরসুমে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসছে। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ভারত সফরে মোট ১০টি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে—পাঁচটি টেস্ট এবং পাঁচটি তিনদিনব্যাপী আঞ্চলিক খেলা। ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের প্রথম খেলা শুরু হবে পশ্চিমাঞ্চল দলের বিপক্ষে ৩১শে অক্টোবর এবং শেষ খেলা ২৬শে ডিসেম্বর—ভারতবর্ষের বিপক্ষে পঞ্চম টেস্ট।

নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট দলটি ভারত সফরে পাঁচটি ম্যাচ খেলবে—তিনটি টেস্ট এবং দুটি তিনদিনব্যাপী খেলা। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল ভারত সফরের উদ্বোধন করবে ১৯শে সেপ্টেম্বর এবং সফরের শেষ ম্যাচ (তৃতীয় টেস্ট) খেলতে নামবে ১৫ই অক্টোবর।

টেস্ট খেলার স্থান ও তারিখ

বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া

১ম টেস্ট, বোম্বাই : নভেম্বর ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯

২য় টেস্ট, কানপুর : নভেম্বর ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০

৩য় টেস্ট, দিল্লী : নভেম্বর ২৮, ২৯, ৩০ ও ডিসেম্বর ২ ও ৩

৪র্থ টেস্ট, কলকাতা : ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭

৫ম টেস্ট, মাদ্রাজ : ডিসেম্বর ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১

বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড

১ম টেস্ট, আমেদাবাদ : সেপ্টেম্বর ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ ও ২৯

২য় টেস্ট, নাগপুর : অক্টোবর ৭, ৮, ১০, ১১ ও ১২

৩য় টেস্ট, হায়দ্রাবাদ : অক্টোবর ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০

দুটি দুর্ঘটনা

ইংল্যান্ডের তরুণ টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কলিন মিলবার্ণ এক মোটর দুর্ঘটনায় সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর বাঁ চোখটি চিরকালের মত হারিয়েছেন। বিপরীত দিক থেকে এক চলন্ত লরীর সঙ্গে তাঁর গাড়ির প্রচন্ড সংঘর্ষ বেধেছিল। মিলবার্ণ নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর গাড়ির অপর এক আরোহী—নর্দাম্পটনশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় ডেনিস ব্রেকওয়েল এই সংঘর্ষের হাত থেকে রেহাই পান নি, তিনিও জোর চোট খেয়েছেন। তবে কোন অঙ্গহানি হয় নি। মিলবার্ণের আহত বাঁ চোখটি চিকিৎসকের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি, অস্ত্রোপচারে তা তুলে ফেলতে হয়েছে। একটা চোখ চিরতরে নষ্ট হওয়ার ফলে মিলবার্ণের খেলোয়াড়-জীবন কি এইখানেই শেষ হল—এই প্রশ্নে আজ তাঁর অনুরাগী মহল খুবই চিন্তিত। মিলবার্ণ

কলিন মিলবার্ণ

কিন্তু তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ খেলা সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। একাধিক ক্রিকেট খেলোয়াড় তাঁদের এক চোখ হারিয়েও যে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন এমন নজির আছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক পতৌদির নবাব এখানে বড় দৃষ্টান্ত। আট বছর আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনিও এক মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর আহত ডান চোখটি তুলে ফেলতে হয়েছিল। আজকে তাঁর যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি তার সবই এসেছে তাঁর বাঁ চোখ অবলম্বন করে।

আগামী ২৩শে অক্টোবর তারিখে মিলবার্ণের ২৮ বছর বয়স পূর্ণ হবে। তাঁর দেহের ওজন ২৫০ পাউণ্ড। এই দিক থেকে তিনি একজন স্থূলাঙ্গ খেলোয়াড়। তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তিনি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন মাত্র একটি, ১৯৬৭ সালে।

ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট খেলায় মনে হয় শনির কুদৃষ্টি পড়েছে। কলিন মিলবার্ণ মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে বাঁ চোখটা জন্মের মত হারালেন আর তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক প্রখ্যাত কলিন কাউড্রে গ্লামর্গান দলের বিপক্ষে খেলায় এমন আহত হলেন যে, তাঁর পক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে আগামী কোন টেস্ট খেলাতেই যোগদান সম্ভব হবে না। কি কুক্ষণেই না তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ৩৯ রানের মাথায় **রান নিতে গিয়েছিলেন। মোটর দুর্ঘটনায় কলিন মিলবার্ণ তাঁর বাঁ চোখ হারিয়েছেন আর কলিন কাউড্রে খেলতে গিয়ে তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে দারুণ চোট খেয়েছেন।**

ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৬৯ সালের ফ্রেঞ্চ ওপন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার গত বছরের বিজয়ী স্বদেশবাসী কেন রোজওয়ালকে পরাজিত করে গত বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন। দুজনেই পেশাদার খেলোয়াড়। মহিলাদের ডাবলস খেতাব পেয়েছেন গত বছরের বিজয়ী জুটি শ্রীমতী এ্যান জোন্স এবং ফ্রাঁসোয়াজ ডুর।

প্রতিযোগিতায় দুটি খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (কুমারী জীবনে মার্গারেট স্মিথ)। পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার ৭০০০ হাজার আমেরিকান ডলার পুরস্কার পেয়েছেন। ফাইনালে পরাজিত কেন রোজ-ওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) পেয়েছেন ৩,৫০০ আমেরিকান ডলার। লেভার শেষ সিংগলস খেতাব পেয়েছিলেন ১৯৬২ সালে অপেশাদার অবস্থায়। মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয় করে অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট ১৫০০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই অপর সকল দেশের খেলোয়াড়দের উপর টেক্কা দিয়েছেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস: রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে কেন রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: শ্রীমতী এ্যান জোন্স (বৃটেন) এবং ফ্রাঁসোয়াজ ডুর (ফ্রান্স) ৬-০, ৪-৬ ও ৭-৫ গেমে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং নান্সি রিচেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

রড লেভার

মহিলাদের সিংগলস: শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৪-৬ ও ৬-৩ গেমে শ্রীমতী এ্যান জোন্সকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: জন নিউকম্ব এবং টনি রোচে (অস্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ৬-১, ৩-৬ ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে রয় এমার্সন এবং রড লেভারকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং মার্টি রিসেন

ফ্রাঁসোয়াজ ডুর

মার্গারেট কোর্ট
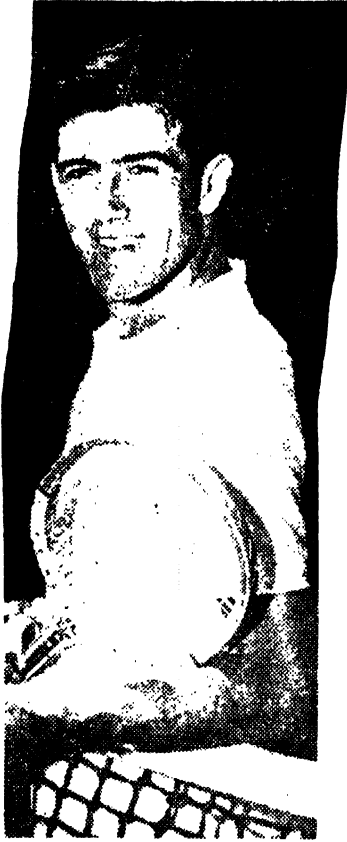
কেন রোজওয়াল

(আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-২ গেমে ফ্রাঁসোয়াজ দুর এবং জিনেরুড বার্কলেকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ৯—১৪) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যে ১৫টি খেলা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১১টি এবং খেলা ড্র ৪টি।

আলোচ্য সপ্তাহে মোহনবাগান দুটো ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল দুটো ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট এবং মহমেডান স্পোর্টিং দুটো ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। ইস্টবেঙ্গল ৪—০ গোলে বাটা স্পোর্টস দলকে পরাজিত করে রাজস্থানের বিপক্ষে তাদের পরবর্তী খেলাটি ২—২ গোলে ড্র রাখে। বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে—৯টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গল দলের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান আলোচ্য সপ্তাহে ৪—০ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে পরাজিত করে মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিপক্ষে এ-বছরের লীগের প্রথম প্রদর্শনী খেলাটি ১—১ গোলে ড্র করে। বর্তমানে লীগ তালিকায় মোহনবাগানের স্থান দ্বিতীয়—৯টা খেলায় ১৫ পয়েন্ট। তারা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছেই এ মরসুমের প্রথম গোল খেয়েছে। ১৯৬৭ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলায় বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না। মোহনবাগানের বিপক্ষে খেলা ড্র করাই (১—১ গোলে) তাদের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য। লীগ তালিকার মাঝামাঝি স্থানে তারা আছে—৭টা খেলায় মাত্র ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

মোহনবাগান ক্লাবের শোক

এক সপ্তাহের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের তিনজন বিশিষ্ট সদস্য পরলোকগমন করেছেন—শ্রীএস এম বসু, শ্রীজহর গাঙ্গুলী এবং প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় জনাব ফজলুর রহমান।

খ্যাতনামা সলিসিটর শ্রী এস এম বসু গত ৯ই জুন (সোমবার) মধ্যরাত্রিতে তাঁর ৭৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। কলকাতার ক্রীড়ামহলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি গত ১৭ বছর ধরে মোহনবাগান ক্লাবের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং দু'বার আই এফ এ-র সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর আত্মার সম্মানার্থে আই এফ এ অফিস এবং ময়দানের বিভিন্ন ক্লাবের তাঁবুতে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছিল এবং মঙ্গলবারের সমস্ত লীগ ফুটবল খেলায় উপস্থিত খেলোয়াড় এবং দর্শকবৃন্দ এক মিনিট মৌনতা পালন করেছিলেন।

মোহনবাগান ক্লাবের আর একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা পরলোকগমন করেছেন—তিনি প্রখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পী শ্রীজহর গাঙ্গুলী। ক্লাবের হকি সম্পাদক হিসাবে তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তা ক্লাবের সদস্য এবং সমর্থকরা আজীবন মনে রাখবেন। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় মোহনবাগান দু'বার প্রথম বিভাগের হকি লীগ চাম্পিয়ানশিপ পায় এবং একই বছরে (১৯৫২ সালে) প্রথম বিভাগের হকি লীগ কাপ এবং বেটন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে।

অতীতের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় ফজলুর রহমান তাঁর ৬৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। কুমারটুলী, এরিয়ান্স এবং মোহনবাগান—এই তিনটি ক্লাবের পক্ষে ফুটবল খেলে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এরিয়ান্স ক্লাবের সদস্য থাকার সময়েই তিনি প্রথম বিভাগের ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানে মাত্র এক বছর খেলে ১৯২১ সালে মোহনবাগান ক্লাবে চলে যান। ১৯২৬ সালে মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড় হিসাবেই
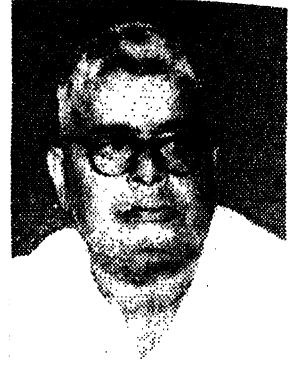
শ্রীএস এম বসু

ফুটবল খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ফজলুর রহমান প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ, আই এফ এ শীল্ড এবং বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন। তাছাড়া ইউরোপীয়ন একাদশ দলের বিপক্ষে বাৎসরিক প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় তিনি ভারতীয় একাদশ দলের পক্ষে একাধিকবার খেলেছেন এবং বাংলার ফুটবল দলে নির্বাচিত হয়ে ১৯২৩ সালে জাভা এবং ১৯২৬ সালে দূরপ্রাচ্য সফর করেছিলেন। ১৯২৩ সালে আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল এবং রোভার্স কাপ ফাইনাল খেলায় তিনি মোহনবাগান দলে খেলেছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলার ফুটবল মহলে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেন্টার ফরোয়ার্ড।

ডেভিস কাপ

আমেরিকান জোন

১৯৬৯ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় সাউথ আমেরিকান জোনের ফাইনালে ব্রেজিল ৩—২ খেলায় চিলিকে পরাজিত করে আমেরিকান জোন ফাইনালে নর্থ আমেরিকান জোন বিজয়ী মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, নর্থ আমেরিকান জোন ফাইনালে মেক্সিকো অপ্রত্যাশিতভাবে ৩—২ খেলায় শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে জোন ফাইনালে উঠেছে।

রেণে ফ্র্যাঙ্ক হকি ট্রফি

১৯৬৯ সালের রেনে ফ্র্যাঙ্ক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে কোর অব সিগন্যালস (জলন্ধর) ২—১ গোলে ওয়েস্টার্ণ রেল দলকে পরাজিত করে রেনে ফ্র্যাঙ্ক ট্রফি জয়ী হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতাটিকে খুদে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা বলা চলে। কারণ, ভারতের নামকরা হকি দলগুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ
১ম খণ্ড

৮ম সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 27th June, 1669. শুক্রবার ১২ই আষাঢ়, ১৩৭৬ **40 Paise**

প্রচ্ছদ : শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী

চিঠিপত্র

মানুষগড়ার ইতিকথা

রিচার্ডসন ও বেথুনসাহেবের বিবাদ প্রসঙ্গে আমি যে প্রাচীন তথ্য পেয়েছিলাম,—সেটুকু জানাই। ১৮৬২ সালে লেখা কিশোরীচাঁদ মিত্রের "হিন্দু কলেজের ইতিহাস" (ইংরাজী) এবং ১৮৭৩ সালের অক্টোবর সংখ্যা—"বেংগল ম্যাগাজিনে" প্রকাশিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের মরণোত্তর প্রবন্ধে "প্রেসিডেন্সী কলেজ" —দুটি সম্ভবত "জাতীয় গ্রন্থাগারে" প্রাপ্তব্য, ('বেঙ্গল ম্যাগাজিনের'—অক্টোবর, ১৮৭৩—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা সম্ভব—সম্প্রতি তাঁদের নিকট 'বেংগল ম্যাগাজিনের মূল্যবান প্রাচীন সংখ্যাসমূহ হস্তান্তরিত হয়েছে)। এই দুই গ্রন্থের তথ্যানুসারে ঃ—

রিচার্ডসনের সম্বন্ধে বেথুনসাহেব কিছু অভিযোগ পান। বেথুন সেগুলি সম্পর্কে অধ্যক্ষকে "গোপন পত্রে" গোপনে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন। রিচার্ডসন স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ এ আর ইয়ংএর নিকট কথাটি জানতে পারেন ও পদত্যাগপত্র পেশ করেন। পত্রটি কমিটি বিবেচনার জন্য দীর্ঘকাল রাখেন -- প্রকৃতপক্ষে কোন সিদ্ধান্তই নেওয়া হোল না। ১৮৪৯ সালের এই ঘটনার পরে মেজর রিচার্ডসন ১৮৫৭ পর্যন্ত কোলকাতার বিভিন্ন স্কুলে যুক্ত ছিলেন—পারিশ্রমিক নিতেন না। ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহে সেনাবাহিনীতে যুক্ত তাঁর অনুজ ভ্রাতা কানপুরে নিহত হন। রিচার্ডসন ১৮৫৭ সালে ইংলণ্ডে ফিরে যান। ১৮৫৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের মাধ্যমে মেজর রিচার্ডসনকে ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোর জন্য এদেশে আসার অনুরোধ করেন। ১৮৬০ সালের জানুয়ারীতে রিচার্ডসন কলেজে পুনরায় যোগ দেন। লেঃ গভর্ণর সার পিটার গ্রান্ট, ইংলণ্ডে ভারতসচিব (সেক্রেটারী অব স্টেট, ইণ্ডিয়া)কে এই নিয়োগটি অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানালে, ভারতসচিব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন,—দুটি কারণে—(১) সৈনাবাহিনীর মেজর হিসেবে রিচার্ডসন যেহেতু ভাতা (অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী) পেতেন, সেইহেতু বিনা অনুমতিতে ভারতবর্ষ কলেজে শিক্ষকরূপে যোগদান আইনসম্মত নয়; (২) হিন্দু কলেজের উত্তরসূরী প্রেসিডেন্সী কলেজ (রূপান্তর) —যেহেতু ১৮৪৯ সালে রিচার্ডসন পদত্যাগপত্র গৃহীত না হতেই কলেজ পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁকে সেইহেতু পুনরায় নিয়োগ করা সমীচীন হবে না—অতএব ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারী, রিচার্ডসন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন,—১৮৬৫ সালে লণ্ডনে তাঁর লোকান্তর হয়। ১৮৬১, ৫ই ফেব্রুয়ারী টাউনহলে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্ররা তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানান। 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'সোমপ্রকাশ' (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১ প্রভৃতিতে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

গোরাচাঁদ মিত্র
কলকাতা।

॥২॥

অমৃত পত্রিকার ২রা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'মানুষ গড়ার ইতিকথা' পর্যায়ে হিন্দু স্কুলের বিবরণ পড়লাম। এক স্থলে লেখা হয়েছে '১৮৭৮ থেকে ১৮৮২ এই পাঁচ বছরে এই স্কুলের ছেলেরা পর পর পাঁচবার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করে। এ রেকর্ড বাংলাদেশের কোনও স্কুলের নেই।

আমি এ প্রসঙ্গে বাংলা দেশেরই আর একটা স্কুলের কথা উল্লেখ করতে পারি। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল; এ স্কুলের ইতিহাস কেউ লিখেছেন কিনা জানি না ; মফস্বলের স্কুল বলে হয়তো এই স্কুলের কথা বেশী লোকে জানে না। আমি এই স্কুলে পড়তে যাই ১৮৯৯ সালে, ১৯০৬ সালে এন্ট্রান্স পাস করে বার হই। সেই সময়ে আমরা দেখেছি স্কুলের দেওয়ালে একটি প্রস্তরফলকে লেখা ছিল—

> "In memory of the very meritorious services of Babu Ratna Mani Gupta ..... During his headmastership (1888-1896) the Dacca Collegiate School stood first for eight years out of nine in the Entrance Examination of the Calcutta University"

আমাদের সময়ে হেডমাস্টার ছিলেন ভুবনমোহন সেন। তখনও আমাদের স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শ্রেষ্ঠ স্কুল ছিল।

শ্রীসত্যভূষণ সেন,
গৌহাটী-১১, আসাম।

বঙ্গ সংস্কৃতি সাহিত্য ও জব্বলপুর

(লেখকের বক্তব্য)

গত ২৫শে এপ্রিলের অমৃতের 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে শ্রীমতী শোভনা বিশ্বাস মহাশয়া ৪ঠা এপ্রিলে অমৃতে প্রকাশিত আমার 'বঙ্গসংস্কৃতি সাহিত্য ও জব্বলপুর' প্রবন্ধে তথ্যগত অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ করেছেন। বিচিত্রা বাসর প্রসঙ্গে শ্রীমতী হেনা হালদারের অবদানের উল্লেখ না থাকার জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দেখে বিস্মিত হয়েছি। এটা অনস্বীকার্য যে শ্রীমতী হেনা হালদারের উদ্যোগে বিচিত্রা সাহিত্য বাসর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের বর্তমান প্রতিষ্ঠাত্রী সভানেত্রী। সম্প্রতি ২৩শে এপ্রিলে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত আমার 'জব্বলপুরে বাঙালীর সাহিত্যচর্চা' প্রবন্ধে একথা উল্লেখ আছে। অমৃতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটি 'বিচিত্রা বাসর' বিষয়ে লিখিত হয়নি বলে শ্রীমতী হেনা হালদারের বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচিত হয়নি। শ্রীমতী হালদার বহুদিন আগে আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন 'বিচিত্রা বাসর' ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীমতী বিশ্বাস তাঁর পত্রে 'বিচিত্রা বাসরের' জন্মলগ্ন চিহ্নিত করেছেন ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে। তিনি এই তথ্য কোথায় আবিষ্কার করলেন আমাদের জানা নেই। পত্রখানি পড়ে মনে হয় শ্রীমতী শোভনা বিশ্বাস মহাশয়া বিচিত্রা বাসরের একজন অনুরক্ত সদস্যা। কিন্তু শোভনা বিশ্বাস নামে বিচিত্রা বাসরের কোন সদস্যা আছেন বলে প্রবন্ধ লেখকের জানা নেই।

বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের নবপর্যায়ে যাত্রা শুরু হয় গত ২১শে এপ্রিল ১৯৬৮ সোমবার। শ্রীমতী হেনা হালদারের বাসভবনে অনুষ্ঠিত প্রথম সাহিত্যসভা থেকে। এরপর সদস্যরা অগ্রণী হয়ে এক এক মাসে এক একজনের বাসভবনে সাহিত্যসভার আয়োজন করে, আতিথ্য দিয়ে বিচিত্রা সাহিত্যবাসরকে সাফল্যময় গৌরবের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। 'সিটি বেঙ্গলী ক্লাব' হলে প্রায় 'পাঁচশ' নরনারীর এক বর্ণাঢ্য সমাবেশে গত ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় বঙ্গসংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারক ও বাহক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের প্রথম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে বিচিত্রা বাসরকে আরো গৌরবান্বিত করেন। বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের এই গৌরবময় পরিণতির কৃতিত্ব যেমন শ্রীমতী হেনা হালদারের, অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল সদস্যদেরও। সকল সদস্যের সমবেত অবদানের ফলে 'বিচিত্রা সাহিত্য বাসর' বহির্বঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নাম।

কুসুমবিহারী চৌধুরী
সম্পাদক
বিচিত্রা সাহিত্য বাসর
জব্বলপুর।

সম্পাদকীয়

কলকাতার পৌর সমস্যা

কলকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব এখন যুক্তফ্রন্টের হাতে। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর একটানা কংগ্রেস দলের কর্তৃত্ব বদলের পর জনসাধারণ আশা করে আছেন যে, নতুন মেয়র এবং নতুন কাউন্সিলাররা নতুন উৎসাহে কর্পোরেশনের ভিতরকার জঞ্জাল সাফ করতে উদ্যোগী হবেন।

কলকাতা মহানগরীর যেমন একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তেমনি এই মহানগরীর পৌরসভার পরিচালনাও সারাদেশের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। এত জনাকীর্ণ শহর ভারতবর্ষে আর নেই। এত সমস্যাও নেই। বৃটিশ আমলে স্বায়ত্তশাসিত পৌরসভা ছিল জাতীয়তাবাদীদের সংগঠনমূলক কাজ করবার একটি প্রধান কেন্দ্র। তখনকার দিনে বিদেশী সরকার প্রতি পদে পৌরসভার কাজে বাধা দিত। স্বাধীনতার পর সেই বাধা অপসারিত হয়েছে। কিন্তু পৌরসভার কাজের কোনো উন্নতি হয়নি। রাজনৈতিক বিরোধ পৌরসভার আলোচনা ব্যাহত করেছে এবং অন্যদিকে বহুদিনের শৈথিল্য ও অবসাদ কর্পোরেশনের বৃহৎ রক্তবর্ণ প্রাসাদের কোটরে কোটরে চরম বিশৃংখলা এনে দিয়েছিল। আজ কলকাতা শহরের দিকে তাকানো যায় না। এককালে এই শহর ছিল ভারতের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এখন শুধুমাত্র জীবিকার তাগিদে এবং মুনাফার লোভে এই শহরের দিকে মানুষে আকৃষ্ট। বিদেশী টুরিস্টরা ভুলেও এই শহরে পা দেয় না। আন্তর্জাতিক বিমান-সার্ভিসগুলো ক্রমে ক্রমে এই শহরের বিমানঘাঁটি এড়িয়ে চলার পরিকল্পনা নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক অফিস স্থানান্তরিত। অনেক অফিস যাবার মুখে। অথচ বাঁচার তাগিদে এবং অর্থোপার্জনের আশায় বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ এই শহরে ভিড় করে আছে। দেশ-বিভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের ভিড়ও বেড়েছে। অনন্যোপায় হয়ে তারা শহরের ফুটপাথে পণ্যের পসরা নিয়ে বসে দুবেলা অন্ন জোটাবার আশায়। বেকারী যত বাড়ছে, শহরের ভিড়ও বাড়ছে।

এমন একটি জনবহুল শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা, তার রাস্তাঘাট চলাফেরার উপযোগী রাখা, তার পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সহজ কাজ নয়। পৌরসভার নতুন কর্তৃপক্ষকে এই দুরূহ কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। প্রথমেই তাঁদের যে-কাজটি করতে হবে তা হল পৌরসভা থেকে দুর্নীতি দূর করে কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ফিরিয়ে আনা। কে না জানে যে, কলকাতা পৌরসভায় বহু ভূতুড়ে কর্মী আছে যাদের কোনো অস্তিত্ব নেই অথচ তাদের নামে মাসে মাসে মাইনের বিল হয়। কে না জানে, কলকাতা পৌরসভাকে ফাঁকি দিয়ে বহু বাড়িওয়ালা দিব্যি আছেন, কোনো কর দেন না এবং দিলেও তা বাড়ির মূল্যের অনুপাতে খুবই কম। এসব হয়েছে পৌরসভার কর্মীদের দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা এবং শৈথিল্যের জন্য।

নতুন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর দায়িত্ব নিয়েই পৌরসভাকে কাজে তৎপর হবার নির্দেশ দিয়েছেন। কর্পোরেশনের সাউথ গ্যারেজে আকস্মিকভাবে হানা দিয়ে তিনি নিজেই দেখেছেন কিভাবে কর্পোরেশনকে কাজে এবং অর্থে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেশনের টাকা নেই। অথচ চার কোটি টাকা বাড়ীর কর অনাদায়ী পড়ে আছে। আরও চার কোটি টাকা অনাদায়ী কর আর আদায় করাই যাবে না। এসব হয় কেন? পৌর-কর্মীদের সঙ্গে ফাঁকিবাজ বাড়িওয়ালাদের যোগসাজস না থাকলে কি এই ধরনের কাণ্ড ঘটতে পারে? এই সমস্ত অনাচার দীর্ঘদিন ধরে চলছে। একদিনে তা দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু আগামী চার বছরে যদি কিছুটা কাজ এঁরা করতে পারেন, তাহলে পৌরসভার মধ্যে পরিবর্তনের একটা আবহাওয়া আসবে।

বস্তিবাড়ীর সংস্কার, জনস্বাস্থ্যমূলক কর্মসূচীও অবিলম্বে করা দরকার। এখনও এই কলকাতা শহরে খোলা নর্দমা এবং খাটা পায়খানা আছে। একটি আধুনিক শহরে কী করে তা থাকা সম্ভব, তা নতুন মেয়র একটু চিন্তা করে দেখুন। কলকাতার রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ জমে থাকে। শহরে নিঃস্ব লোকের ভিড় হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক ফুটপাথে শোয়। তাদের স্নানাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। প্রতিদিন কয়েক লক্ষ লোক নিত্যযাত্রী হিসেবে এসে এই শহর ব্যবহার করে যান। সুতরাং শহরের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান খুবই দুরূহকর্ম। তার জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মসূচী এবং সৎ প্রশাসন।

কলকাতা রুগ্ন, একথা আমরা শুনেই আসছি। রোগনির্ণয়ের জন্য বহু বৈদ্যের সমাবেশ ঘটেছে। এদিকে শহর তো প্রায় যায়-যায়। প্রতি বৎসর লোকসংখ্যা বাড়ছে। পৌরসভার দায়িত্বও বাড়ছে ক্রমবর্ধমান নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের। এ কোনো দলীয় রাজনীতির সমস্যা নয়। সকলে মিলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কলকাতার উন্নতি এবং অস্তিত্বের উপর পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক সমৃদ্ধি কম নির্ভরশীল নয়। সুতরাং তার পৌর-সমস্যা সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব সহায়তা করা উচিত নতুন পৌর-কর্তৃপক্ষকে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমেই আকাশছোঁওয়া হয়ে উঠছে। ফলে আজ জনতার দৈনন্দিন বাজেটে ঘাটতির অংক বেড়ে চলেছে। বছর বছর রুটিনমাফিক এই সময়ে জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে সুরু করে। আমন কাটার মরশুমে এলেই একটু কমতে থাকে। কিন্তু যে হারে দাম বাড়ে সেই হারে দাম কমে না। অর্থাৎ কি বছরই দ্রব্যসম্ভারের দাম কিছু না কিছু বেড়েই থাকে। দীর্ঘদিন ধরে এ খেলা চলছে। এবং এই বাড়তি দাম অনেকটা মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। ট্রামে, বাসে, পথে ঘাটে—দাম বাড়ার কথা নিয়ে তত্ত্ব ও তথ্যগত আলোচনা হয়। আবার দৈনন্দিন বাজারের চাপে ব্যস্ত মানুষ সব ভুলে থাকার চেষ্টা করে। দুঃখী মানুষ সংসার-রথ টেনে চলে।

এবারেও দর বাড়ছে। ইতিমধ্যে খোলা বাজারে চালের দাম ২-৩০ কিলোয় উঠেছে। অবশ্য, কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে মানুষকে খাওয়াবার দায়িত্ব সরকার নিজেই বহন করছে। এখানকার মানুষের চাল ব্ল্যাক মারকেট থেকে কেনার কথা নয়। কিন্তু তবুও তাঁরা কেনেন। ঝান্ডাবহনকারী নির্বিশেষে সকলেই প্রায় কিছু কিছু কেনেন। অবশ্য, গ্রামাঞ্চলেও দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। আয়ের সঙ্গে জিনিসপত্রের দামের সংগতি ইতিমধ্যেই অবলুপ্ত। কংগ্রেস আমলে যা শুরু হয়েছিল এখনও তা অব্যাহত গতিতে চলছে, কোন ইতর-বিশেষ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমন হচ্ছে? মাছের দর যখন ২ টাকা তিন টাকা থেকে বাড়তির দিকে যাচ্ছিল, কলকাতা তখন আন্দোলন মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই দাম এখন ৮ টাকা কিলোয় গিয়ে অনড়ভাবে আটকে আছে। মানুষ মেনে নিয়েছে, উচ্চ-বাচ্য করে না। জানে, করে লাভ নেই। অপুষ্টিজনিত ক্ষীয়মান দেহের আরও ক্ষয় সাধনে সাহায্য করা ছাড়া চেঁচামেচি করে আর কোন কাজই এতে হবে না।

এই যে জনতার নিস্পৃহ ভাব এটা সমাজ-দেহে ক্ষতের সৃষ্টি করছে। এ ব্যাধি যতই ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকবে সমাজ ততই পঙ্গু হয়ে পড়বে। প্রতিবাদের ক্ষমতা হারিয়ে অত্যাচারের বোঝা বইতে সুরু করবে। কিন্তু এহেন অবস্থাতেই রাজনৈতিক দলগুলির কর্তব্য অতীব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই পঙ্গু মানুষের প্রাণে আশার আলো সঞ্চার করাই তাদের প্রাথমিক কর্তব্য। তাই, সাধ্যমত মাঝে মাঝে আন্দোলন হয়েছে, প্রতি[illegible] বিক্ষোভে মানুষ ফেটে পড়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি প্রতিকার হয়নি। রাজত্ব বদলিয়েছে—কিন্তু ব্যবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং। এতটুকু বিবর্তন বা পরিবর্তন এখনও হয়নি। মানুষ এখনও আশায় বুক বেঁধে আছে, রৌদ্র করোজ্জ্বল প্রভাতের প্রত্যাশায়। সেই প্রত্যাশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে আসবে অনন্ত হতাশা। অর্থাৎ সমাজ সেদিন মরবে, বাঁচাবার পথ থাকবে না।

কিন্তু শুধু রাজনৈতিক দলই এই অসহনীয় অবস্থার অবসানকল্পে কাজ করে যাবে তা হতে পারে না। সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। দলের কর্তব্য দৃষ্টি আকর্ষণ, আর সরকারের কর্তব্য সমস্যার সমাধান। কি কংগ্রেস, কি যুক্তফ্রন্ট সকল সরকারই এই দামবৃদ্ধি ঠেকানোর জন্যে সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রেসক্রিপসানের কথা বলে থাকেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় সকল বক্তব্য প্রতিজ্ঞাস্তরেই থেকে যায়। কার্যকর আর হয় না। দামের গতি ঊর্ধ্বমুখী হতেই থাকে,—চীৎকার, হৈ চৈ হয়, আবার সকলে মেনে নিয়ে সেই সংসার-রথ টেনে চলে।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার এখন দাম বাড়ার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। ফ্রন্টের অংশীদাররা দাম বৃদ্ধি প্রতিরোধে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। খবরে প্রকাশ, মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি নাকি ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে একটি ব্লু প্রিন্টও তৈয়ার করে ফেলেছেন। বক্তব্যটা বোধ এই যে, সরকারের হাত শক্ত করার জন্য শরিকদের আন্দোলনে নামা উচিত। তবে এই আন্দোলনের রূপরেখা কি হওয়া উচিত কোন শরিকই অদ্যাবধি তা বিবৃত করেননি। কিম্বা কোন স্তরে গিয়ে আন্দোলনের পরি-সমাপ্তি ঘটবে তাও এখনো জানা যায় নি। শুধু এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, এই আন্দোলন সরকারের কার্যপ্রণালীর পরিপূরক হবে।

যা হোক, সরকারের পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধিকে কিভাবে প্রতিরোধ করা হবে তার কোন সার্বিক ঘোষণা এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি। শুধু খাদ্যদপ্তর থেকে বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় মাথাপিছু ১০০ গ্রাম চাল বাড়িয়ে মানুষ যাতে চোরাবাজার থেকে চাল না কেনেন তার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। এই ১০০ গ্রাম চাল বাড়ানোর আগে খাদ্য-মন্ত্রী বলেছেন রেশনিংয়ে যে গমের বরাদ্দ আছে কলকাতার লোক তার অর্ধেকও নিচ্ছেন না। অর্থাৎ সাপ্তাহিক প্রায় ৬০ হাজার টন গমের মধ্যে বিধিবদ্ধ এলাকার মানুষ প্রায় ৩০ হাজার টন গম নিতেন। বিগত মে মাস পর্যন্ত অন্তত এই ছিল হিসেব। খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন এই গমের বদলে মানুষ চোরাবাজার থেকে চাল কিনে খেয়েছেন, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকার লোকদের যে পরিমাণ চাল খাওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশী চাল খেয়ে তাঁরা সংকটসৃষ্টির কাজে সাহায্য করছেন। খাদ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ সত্য। তবে কংগ্রেস আমলে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন একথা বললে বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী গণদেবতাকে আহ্বান জানাতেন। পশ্চিম বাংলার আজ জনতা স্বীকার করুন আর নাই করুন একথা সত্য যে শত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করিয়েছেন। বাঙালী রুটি খেতে শিখেছে, শ্রীপ্রফুল্ল সেনের খাদ্যনীতির সারাংশটুকু গ্রহণ করেই বর্তমান যুক্তফ্রন্টের খাদ্যনীতি চলছে। এবং বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী মনে করেন রেশনে মাথাপিছু যে বরাদ্দ আছে তাতে অকুলান হওয়ার কোন কারণ নেই। আর কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের গণদেবতারা যদি চোরাবাজার থেকে চাল না কিনতেন তবে পশ্চিম বাংলার খাদ্যসমস্যা বা চালের দরবৃদ্ধি হত এক অতীতের ঘটনা। এই সৎ উপ-দেশ গণদেবতা শোনে না বলেই ত ফ্যাসাদ। এরজন্যই ত শ্রীপ্রফুল্ল সেন গদী হারিয়ে-ছেন। কাজেই, বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী বললেই কলকাতার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে অমনি রেশন-বরাদ্দ চাল খেয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন আর চোরাবাজারীদের উৎসাহ দেবেন না, এমন জমানা এখনও আসেনি। কাজেই কলকাতায় চাল আসবে, আর চালের দাম বাড়বে। বর্ষার জল জোর পড়তে সুরু করলেই আরও হু হু করে চালের দাম বাংলার সর্বত্রই বাড়তে থাকবে। এর নড়চড় হবে না।

কথা উঠবে, চালের উৎপাদন কম, আর ভোজনকারীর সংখ্যা বেশি। কিন্তু, তেল, ডাল, মশলাপাতির দাম বাড়ছে কেন? আগে বলা হত চালের দাম বাড়লেই সব জিনিষের দাম বাড়ে। কিন্তু গত শীতকালে চালের দাম কমেছিল কিন্তু মশলাপাতির দাম তখন ত কমে নি? এখন আবার বাড়তে সুরু করেছে। এই মশলাপাতির দাম ২১ দিনের মধ্যে কমিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এ অবস্থা সইতে পারা যাবে না। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাড়তি দাম আমরা প্রতিরোধ করবই। তাঁদের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের

ঊর্ধ্বমুখী দর-এর প্রতিবিধান করতে যুক্তফ্রন্ট সরকার বদ্ধপরিকর। তাই সরকারের পক্ষ থেকে পাইকারী ব্যবসায়ীদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণের হুমকিও এসেছে। ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের এই আকুলতা এবং দাম প্রতিরোধের আন্তরিকতা সাধুবাদের অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ দাম বৃদ্ধির প্রতিরোধের কথা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা বলছেন? জিনিসের দাম হালফিল যা বাড়তে সুরু করেছে, তাই কি প্রতিরোধ করবার কথা তাঁরা বলছেন? বক্তব্য থেকে অবশ্য তাই মনে হয়। কিন্তু শুধু যদি হালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দাম রুখবার কথাই তাঁরা বলে থাকেন তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এতদিন শনৈঃ শনৈঃ যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তার যৌক্তিকতা ফ্রন্ট সরকার মেনে নিচ্ছেন। আর রাজনৈতিক ভাবে বক্তব্যটা রাখলে একথা সুস্পষ্ট যে, দীর্ঘ কংগ্রেস আমলে দাম বল্গাহীন ভাবে বেড়ে বেড়ে যে পর্যায়ে এসেছে সেই উচ্চমূল্যের প্রতি বর্তমানে তাঁদের নৈতিক সমর্থন রয়েছে। কাজেই প্রশ্ন করতে বাসনা জাগে, তবে অতীতে এই দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন করেছিলেন কেন? কেন তরুণ নূরুল তার কিশোর প্রাণ অকালে ধুলোয় লুটোতে দিয়েছিল? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই ফ্রন্ট সরকার গদীতে আসার অব্যবহিত পূর্বেই গভর্ণর ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করেছিলেন।

ফ্রন্ট বক্তারা এই সুযোগ নিতে ছাড়েন নি। নির্বাচনে এই ট্রামভাড়া বৃদ্ধিকে একটি ইস্যু করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে নির্বাচিত হতে পারলেই তাঁরা এই ভাড়া কমিয়ে দেবেন। অবশ্য তাঁদের প্রতিশ্রুতি আংশিকভাবে তাঁরা রক্ষা করেছেন। এই একাংশ ভাড়া কমাবার ফলে এই কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে গভর্ণর সাহেব যে ভাড়া বৃদ্ধি করেছিলেন তার যৌক্তিকতা ছিল। সেটা থাকলে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে লাখ লাখ টাকা খয়রাতি দিয়ে ট্রামের কর্মীদের বেতন দিতে হত না। আর যেটাকা সরকারী তহবিল থেকে যাচ্ছে তা নিশ্চয়ই ফ্রন্ট শরিকদের জমিদারীর আয় থেকে আসছে না, আসছে আমজনতার পকেট থেকে। তাই বলছি ফ্রন্ট সরকার দ্রব্যমূল্যে প্রতিরোধ করার নাম করে ইতিমধ্যেই যে দাম আকাশচুম্বী হয়েছে তারই স্বীকৃতি দেওয়ার কথা পরোক্ষে ঘোষণা করেছেন। তাই দাঁড়াচ্ছে নাকি?

দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির সংগে পাল্লা দিয়ে বেতন বাড়ালে বাড়তি দামকে আয়ত্তে রাখা যায় না। একটা বিশেষ অবস্থা পর্যন্ত এ দাওয়াই চলতে পারে। কিন্তু প্রতিনিয়ত যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তাকে কোনমতেই এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে রোধ করা যায় না। এটা হচ্ছে অর্থনীতির গোড়ার কথা। বিশেষ করে সরকারের পক্ষে এটা মোটেই সম্ভব নয়। এ করতে গেলে ট্যাক্সের বোঝা জনতার ঘাড়ে চাপাতেই হবে। কিন্তু ফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই খানিকটা এ রকমের পন্থা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। এটা ভুল পথ। আর বেতনবৃদ্ধির পরিকল্পনা তবু শহুরে লোকদেরই অর্থাৎ মধ্যবিত্তের মুখবন্ধের প্রচেষ্টা। অন্যদিকে গ্রামের মানুষের দাম বৃদ্ধির ফলে নাভিশ্বাস উঠছে। কারণ, কৃষিজাত পণ্যের দাম বাজারে কম। আর ধান-চালের দাম সরকার যা বেঁধে দিয়েছেন তার সংগে অন্য পণ্যের মোটেই সামঞ্জস্য নেই। বিশেষ করে মরশুম যখন আসে তখন চাষীরা ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। এবারেও সেই অবস্থাই ঘটেছে। শীতের মরশুমে অন্য তরিতরকারি এবং আলু, কপির দাম এত পড়ে গিয়েছিল যে চাষীদের সারের দাম পর্যন্ত ওঠে নি। পরিশ্রমের কথা ত বাদই দিলাম। যে পরিশ্রম করে তারা ফসল ফলিয়েছিল, সেই মেহনত কোন কারখানায় করলে ফ্রন্ট সরকার তাদের শ্রমমূল্য কত টাকার ভিত্তিতে হিসাব করতেন তার হদিশ জন সাধারণ বিশেষ করে চাষীমহল পেলে যে খুব খুশী হবে একথা হলফ করে বলা চলে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে তখন এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি যাতে ঐ পড়ন্তি দাম প্রতিরোধ করে কৃষককুলকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। নিরপেক্ষ দর্শকের মত সরকার শুধু দাঁড়িয়ে এই সর্বনাশ দেখেছেন।

ফ্রন্ট সরকার প্রায়ই বলছেন কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও টাকা আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হবে, চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ধরে নিলাম, আরও টাকা দিল। কিন্তু সেই টাকা এলে আরও বেতন বৃদ্ধির দাবী উঠবে না সে গ্যারান্টি কোথায়? মাইনা বাড়াবার দাবীর যৌক্তিকতা নেই, সে কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু বাড়তি টাকা এলে চড়া বাজারের সংগে পাল্লা দিয়ে সেই টাকা আবার অতলে তলিয়ে যাবে। কাজেই এটা একটা গোলকধাঁধার মত। কিন্তু একটা সুস্থ চিন্তার মাধ্যমে এই বিপর্যয়কর অবস্থাকে প্রতিরোধ করবার জন্যে কেউ এগিয়ে আসছেন না। সকলেই সমস্যা দেখা দিলে তার ওপর প্রলেপ দিয়ে সাময়িক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাহবা নেওয়ার চেষ্টায় থাকেন। কিভাবে এই ক্রমবর্ধমান সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিরোধ করে প্রত্যেক মানুষের আর্থিক সঙ্গতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় সেদিকে কেউ নজর দেওয়ার চেষ্টা করছেন না। ফ্রন্ট সরকার আজ অবধি এই প্রশ্নের দিকে নজর দেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারও নীরব। আর অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী তবু বেতন বৃদ্ধির দাবির মাধ্যমে এই বর্ধিত মূল্যরূপে সিন্ধবাদ দৈত্যকে নিরস্ত করার চেষ্টায় রয়েছে। কিন্তু তাঁদের মাইনে বৃদ্ধির পরক্ষণেই দ্রব্যমূল্য আগুন হয়ে উঠে। তাতে যে বাড়তি পয়সা আসে তাই শুধু চলে যাবে না, আরও কিছু অর্থের সংকুলান করতে হয় চাহিদা মেটানোর জন্যে।

অবশ্য, এই দাম বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে হলে একা কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে তা পুরোপুরি করা সম্ভব নয়। এটা জাতীয় অর্থনীতির সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত। কাজেই জাতীয় ভিত্তিতে এই পণ্যমূল্যে বৃদ্ধির সংগে লড়াই চালাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করতে হবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সক্রিয় সহযোগিতা না পাওয়া যায় তবে আন্দোলনে নামতে হবে, তবু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরও বেশী টাকা চাই, এই ঋণাত্মক আন্দোলন খুব ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। কাজেই সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফ্রন্ট সরকার এগিয়ে গেলে অন্যান্য রাজ্যও পিছিয়ে থাকবে বলে মনে হয় না। কারণ, দরবৃদ্ধির কশাঘাতে প্রত্যেক রাজ্যই জর্জরিত হয়ে পড়েছে, বেতন বৃদ্ধির জন্য সকলেই কমিশন গঠনের সুপারিশ করে থাকেন। কিন্তু দাম বাঁধবার জন্য কেন "মূল্য কমিশন" গঠনের কথা কেউ বলছেন না? এটা ভাবতেও অবাক লাগে। কি কৃষি, কি শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমতা রক্ষা করার জন্য যদি "মূল্য কমিশন" সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে, তবে তা কার্যকর করলেই হয়ত প্রত্যেক রাজ্যই এই অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। না হলে নয়। আর দাম যেদিন থেকে, অর্থাৎ সেই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির গোড়ার দিক থেকেই, বাড়তে সুরু করেছে সেই প্রাথমিক অবস্থা থেকে পূর্ণাংগ তদন্ত করে বর্তমানে পণ্যমূল্য কি হওয়া উচিত তা স্থির করতে হবে। এবং একটি সময়ের ব্যবধানে তার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। নয়তো এই অশুভ অবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়াও এই ধরনের প্রতিরোধের ব্যাপারে জাতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নাহলে দ্রব্যমূল্যে প্রতিরোধ সম্ভব নয়, শুধু হুমকি দেওয়াই সার হবে, কাজের কাজ কিছু হবে না।

—সমদর্শী
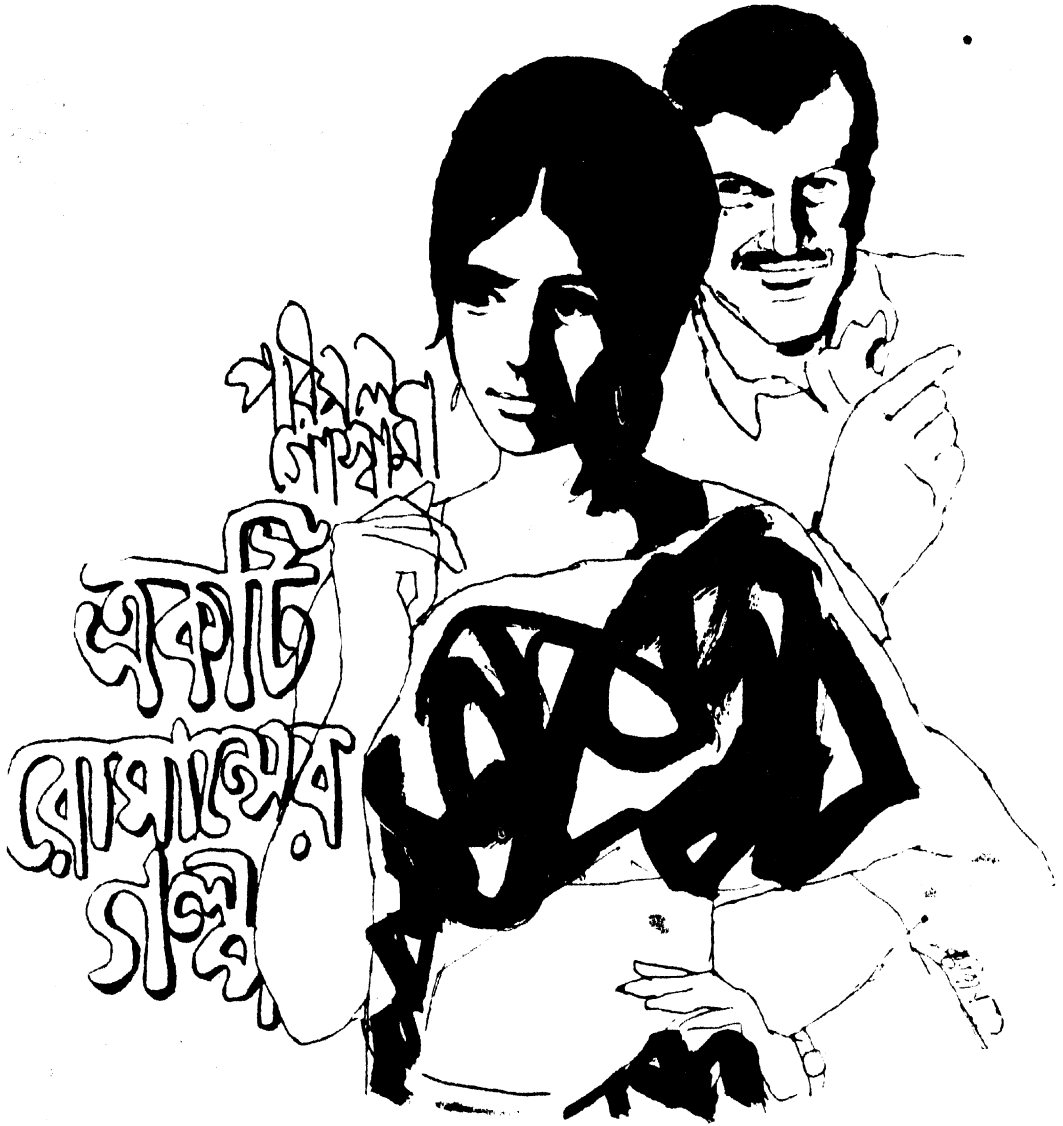
উপদেশ নিতে আসে অনেকেই। আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে এইরকম ধারণা তাদের। অভিজ্ঞতা মানে তো জীবনে যেসব ভুল করেছি তাই। ভুল করেছি ঠিকই, সবাই করে। আর সে জন্যই তো অন্যের ভুল বুঝতে পারি সহজেই। এবং চাতুরিও। এজন্য আমার উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়ছে। সহানুভূতির সংগে সবার কথা শুনলে সবারই এমন হয়। ভরসা করে অনেকেই মন খুলে আমাকে সব বলে, ফাদার কনফেসরের অবস্থা হয়েছে আমার।

কিন্তু নানা বিষয়ে উপদেশ দিলেও সেদিন বেশ একটা নতুন ধরনের উপদেশ নিতে এক যুবক এসে হাজির। ধরনটা আমার কাছে অবশ্য নতুন নয়, সে কথা গোপনে আগেই বলে রাখি। বিষয়টা একটি রোমান্স। উপদেশ নেওয়া তার ঠিক আমার কাছেই দরকার ছিল না। সে তার সমস্যার কথা বলেছিল তার এক বন্ধুকে, সেই বন্ধু ছিল আমার পরিচিত। সেই তাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। বলেছিল তুই তোর গোপন কথাও তাঁর কাছে বলতে পারিস, কোনো সংকোচ করিস না।

আমি থাকি হুগলীতে, আর সে যুবক থাকে কেষ্টনগরে।

ঘটনাটা আমি তার ভাষাতেই বলি। আমার অভয়দানের পরে লাজুক যুবকটি আমাকে বলতে লাগল—

'মেয়েটির নাম বকুল। বকুল বন্দ্যোপাধ্যায়। রানাঘাট স্টেশনে সে একটি বিপদে পড়ে। আমি কাছাকাছি ছিলাম। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে তার পার্সটা চুরি হয়ে যায়। চোর অলক্ষ্যে তার হাত ব্যাগটি হঠাৎ নিয়ে কিভাবে যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে এক রহস্য। বকুলকে অসহায় অবস্থায় দেখে বড় দুঃখ হল। আমি বুঝতে পারলাম, কাউকে কিছু বলতে পারছে না। তার মুখে একটা আতংকের ভাব। আমি এগিয়ে এসে সহানুভূতির সংগে জিজ্ঞাসা করতেই প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল তার ব্যাগ চুরি হয়ে গেছে, তারমধ্যে টাকা সামান্যই ছিল, কিন্তু কলকাতা যাবার

রেল টিকিটখানাও যে তার মধ্যে ছিল। সে এখন কি করে ফিরে যাবে।

"আমি বহু রকম সান্তনা দিয়ে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম। বললাম, কিছু মনে করবেন না, পরে যখন সুযোগ হয় টাকা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। একথা বলতে হল পাছে তার সম্মানে আঘাত লাগে সেই ভয়ে। আরো বললাম, অপরিচিতের কাছ থেকে টাকা নেওয়াটা লজ্জাকর বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনার এখন বিপদ ওসব কিছু ভাববেন না, আমার ঠিকানা রাখুন।—বলে আমি আমার ঠিকানা একখানা কাগজে লিখে তাকে দিলাম। সেও তার ঠিকানা আমাকে দিয়েছিল। সেটি একটি বড় অফিসের ঠিকানা। সেখানে আমি চিঠি দিয়েছিলাম, সে তার উত্তর দিয়েছিল এবং টাকা ডাকযোগে পাঠিয়েও দিয়েছিল। যে-কোনো ভদ্রমেয়ের পক্ষে এটি একটি স্বভাবিক ঘটনা।

এইখানে বাধা দিয়ে আমি যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাগ যখন চুরি যায় তখন তুমি কত দূরে ছিলে?"

"দু-হাত দূরে।"

"চোরকে ধরতে পারলে?"

"তাকে দেখিনি।"

"তার পর?"

যুবক একটু ইতস্ততঃ করে বলতে লাগল—

"আমার চিঠির ভাষা ছিল রুচিপূর্ণ, সুর ছিল অন্তরঙ্গতার। রুচিমান মানুষ সহজে আজকাল দেখা যায় না, সেজন্য খুব ভাল লেগেছিল তাকে। কিন্তু তার কৃতজ্ঞতার কাছে আমি হার মেনেছিলাম। সেই থেকে চিঠি লেখা আমাদের মধ্যে চলেছে প্রায় ছ মাস। এ রকম সম্পর্কের মধ্যে অহেতুক একটা আনন্দ আছে। সে আনন্দ মনের এবং দেহের স্বাস্থ্য দুইই বাঁচিয়ে রাখে। এতদিন ধরে চিঠির ভেতরে কত কথা কত গল্প। দুজনের সঙ্গে দুজনের কত পরিচয়। আচ্ছা এত অল্প সময়ে এমন আত্মীয়তা হতে পারে কি সবক্ষেত্রে?"

যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল।

আমি বললাম, "পরিচয়ে, অথবা পরস্পরকে চিনতে যথেষ্ট সময় লাগে, ওটা একটা কুসংস্কার। এক একটা মুহূর্তে এক একটা যুগ পার হয়ে যায় অনেক সময়। আপেক্ষিক ব্যাপার সবই।"

যুবক বলতে লাগল, "বকুলও একবার লিখেছিল দুদিন আগেও আপনাকে চিনতাম না, অথচ এরই মধ্যে আপনি কত আপনার। তার প্রত্যেক চিঠিতে আমার স্বাস্থ্য বিষয়ে, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে কত প্রশ্ন, কত ব্যাকুলতাই না থাকত। এ সব গভীর স্নেহের কথা। একটা অভিভাবকসুলভ মনোভাব। চিঠির কোনো বিরাম ছিল না। জীবনটা যেন একটা নতুন হাওয়ার ছোঁয়া লেগে সতেজ হয়ে উঠতে লাগল। আমি একবার রসিকতা করে লিখলাম, বকুলের গন্ধই পাচ্ছি—একবার দেখতেও চাই যে। ইচ্ছে করে দেখতে।

"সেও হাসতে হাসতেই লিখল, দূর থেকেই ভাল সম্পর্কটা ঠিক থাকে। দেখা নাও পেতে পারেন। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি?

"চিঠির এ সুরে অত্যন্ত বেদনার। মনটা হু হু করে উঠল। কিন্তু এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ চেপে গেলাম। কোথায় কার কি বাধা আছে তা আমার জানা কি দরকার? লিখলাম, তুমি তো অফিসে কাজ কর, ওটাকে একটা মরুভূমি মনে হয়। আর, মনে হয় তুমি তারমধ্যে একটি মরুদ্যান। এমন সজীব কি আর কেউ আছে সেখানে? মনে তো হয় না।

"কিন্তু এর উত্তর যা পেয়েছি সেইটি আমার বন্ধুকে দেখিয়েছি। অবশ্য এটি আমার কোনো সমস্যা নয়। বন্ধু বলল, নিশ্চয়ই এর অন্য কোনো অর্থ আছে। আমি কিন্তু সে অর্থ মোটেই জানতে চাই না। যেটুকু বাইরে পাওয়া যায়, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট তৃপ্তিকর। অন্যের চিঠির বেদনার সুরের আড়ালে কি আছে তাও জানতে আমার কৌতূহল নেই। এ কৌতূহল আমার এই বন্ধুর। খুব জড়িয়ে পড়েও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারি আমি, অভ্যাস হয়ে গেছে এ রকম।"

যুবকের বন্ধুটি আমাকে চিঠিখানা দিল। বলল, "পড়ে দেখুন।"

অনেক সাধারণ কথার পর লিখেছে "আমি মরুদ্যান নই। আমার গন্ধ বাতাসে বয়ে যায় শুধু, সে গন্ধ কখনো কাউকে খুশি করে—কারো বুকে হাহাকার তোলে। তবু আমি গন্ধ ছড়িয়ে যাই। মরুদ্যান কখনো হতে পারব কিনা জানি না।

"ভাল কথা আমি আগামী দিনদুয়েক একটি বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকব, তারপর সপ্তাহ তিনেকের জন্য বাইরে যাব, কোথায় যাব এখনও কিছুই জানি না। আপনার খোঁজ নিতে পারব না এজন্য বড় খারাপ লাগছে। আপনি আর এখন চিঠি দেবেন না। পরে ফিরে এলে তবে।"

চিঠি পড়া শেষ হল, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের সমস্যাটা কোথায় বুঝতে পারছি না তো?"

যুবক বলল, "আমি কিছুই ভাবিনি এ বিষয়ে। বন্ধু আমাকে বলছে এতদিন এতো সব খোলাখুলি লিখেছে এখন এমন ধাঁধা সৃষ্টি কেন? আমি বলেছি এসব বিষয়ে আমার কৌতূহল নেই। কিন্তু বন্ধু নাছোড়। সে কি বুঝেছে কে জানে? সে আপনার ব্যাখ্যাটাও শুনতে চায়, তাই আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে। আমাকে বলছে, কিন্তু "মরুদ্যান হতে পারব কি না জানি না" এতে কি মনে হয় না কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে? আমি যত বলি এ বিষয়ে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই সে তত চাপ দিতে থাকে। এ যেন তার নিজের সমস্যা, যেন এর উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, দেখুন কি রকম মানুষ আমার এই বন্ধুটি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তোমার কৌতূহল নেই কেন?'

যুবক বলল, "নেই কারণ আমি বাইরে থেকে যেটুকু পাই, সেই ভাল, খুঁচিয়ে আদায় করতে চাই না। এখন যা লিখেছে তাই আমার যথেষ্ট। আপনি শুধু আমার এই বন্ধুটির কৌতূহল যদি মেটাতে পারেন, তা হলেই আমি কৃতজ্ঞ হব। লোথারিওর কথা ছেড়ে দিন।"

আমি 'লোথারিও' শুনে চমকে উঠলাম। কিন্তু মনের ভাব চেপে বললাম, "বকুল ব্যানার্জির ঠিকানাটা আমাকে লিখে দাও, এবং কাল সন্ধ্যায় একবার আমার কাছে এসো।'

যুবক কিছু ইতস্ততঃ করতে আমি একটু আদেশের সুরে বললাম, 'যা বলি, কর।'

পরদিন সন্ধ্যায় ওরা দুজনেই এসে হাজির। যুবককে একখানা টেলিগ্রাম দিলাম। বললাম, এই দেখ বকুল জানিয়েছে '২৬শে মে।' —আর কোনো কথা নেই। আমি তোমার নামে আমার কেয়ারে একখানা প্রিপেড তার পাঠাই—শুধু লেখা ছিল 'তারিখ জানাও।'

যুবক বলল, 'এর অর্থ?'

"অর্থ পরিষ্কার। তুমি শুধু এখন ৮ নম্বরের একখানা গ্রীটিং টেলিগ্রাম পাঠাও। আজই পাঠাও। পরে কিছু উপহার পাঠিয়ে দিও তিন সপ্তাহের হানিমুন শেষে ফিরে এলে। যদি পৌরুষ থাকে, এ কাজটি কোরো। আর শোন, মানুষের জীবনকে বাইরের বহু ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে—ভিতরের এবং বাইরের। এরজন্য লজ্জিত হবার কারণ নেই। তাই সবদিক না ভেবে আমি হঠাৎ কাউকে বিচার করি না।"

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার সঙ্গে তার মিলনে বাধা ছিল?"

"ছিল। আমি বিবাহিত, এবং সে তা জানে।"

যুবকের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাইলাম। সে দৃষ্টি সে সহ্য করতে পারল না, চোখ নত করল। নকল লোথারিও স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর দুজনে নীরবে বিদায় নিল। কিন্তু দুপা যেতেই যুবককে ডাকলাম।

বললাম, "তুমি রোমান্স ভালবাস? তুমি নিজেকে লোথারিও বললে? চিঠির রোমান্স বুঝি ভালবাসা?'

"খুব বেশিরকম ভালবাসি।"

"বকুলের চেহারা কেমন?"

"অপূর্ব সুন্দরী।"

"সেইজন্যেই তার দুঃখে সাহায্য করেছিলে?"

"তা বলতে পারেন।"

"দুঃখের কারণও লোথারিও হয়েছিলে সে জন্যে?"

যুবক ভীষণভাবে চমকে উঠল। আমি শুধু বললাম, "তার ব্যাগটি এবারে ফেরত দিও।"
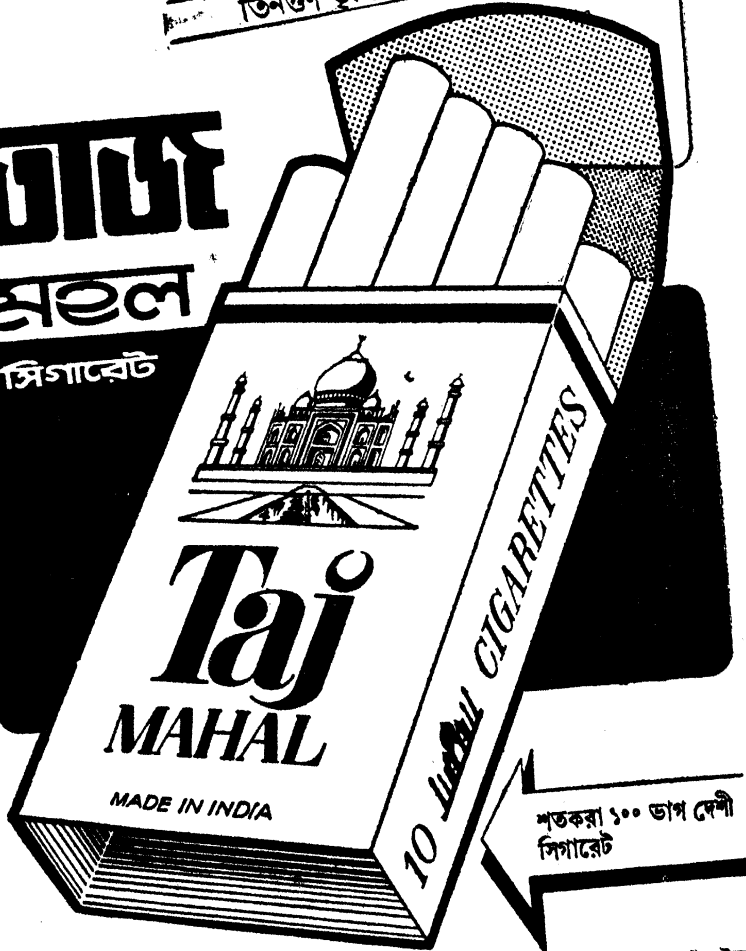
বিদেশীর চোখে রবীন্দ্রনাথ

স্বদেশে আজ রবীন্দ্রনাথকে কিঞ্চিৎ খর্ব করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। যাঁরা বাঙালী নন তাঁদের জন্যলাটা বোঝা কঠিন নয়, তবে কিছুসংখ্যক বাঙালীও রবীন্দ্র-প্রতিভাকে ম্লান করার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া করে চলেছেন যার কিছু কিছু পরিচয়। নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠকের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এত সব অপচেষ্টা এবং অপকৌশল সত্ত্বেও আজও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এমন মানুষ আছেন যাঁরা রবীন্দ্র-নাথের নব-মূল্যায়নে রত তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক পরম বিস্ময়।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিখ্যাত মার্কিন সমালোচক নরমান কাজিনস যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তিনি 'আওয়ার ডেট টু টেগোর' নামে যে ভাষণ দান করেন তাতে তিনি বলেছিলেন, কবির কাছে আমরা গভীরভাবে ঋণী। এখানে এসেছি সেই ঋণের স্বীকৃতি দান করতে। রবীন্দ্রনাথের মহান আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে কি বলতেন—

> "transcend yourself to your immediate concern and consider the fact that the servival of of mankind to-day is the issue of all people and values of mankind"

রবীন্দ্রনাথ আজ পৃথিবীর এই সংকট মুহূর্তে জীবিত থাকলে কি বলতেন সেই কথা চিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ যে কত বৃহৎ, কত মহৎ সে বিচার তুচ্ছ।

আইসল্যান্ড থেকে সিগুরদুর ম্যাগনুসন লিখেছিলেন তার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। তিনি যখন রেইকজাভিকের এক পাঠাগারে অতি অল্পবয়সে বই দেখছিলেন তখন একটা দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থ তাঁর চোখে পড়ে। সেই গ্রন্থের মুখপত্রে যে প্রবীণ মানুষটির ছবি ছিল সেই ছবি তাঁকে আকৃষ্ট করে। সেই অপূর্ব প্রোজ্জ্বল দুটি চোখ, সৌম্য মূর্তি, সাধুজনোচিত অপরূপ কান্তি, মাথায় তরঙ্গায়িত চুল এবং শুভ্র দাড়ি তাঁর সেই শিশুকালে মনের গভীরে ভীষণ আন্দোলন সৃষ্টি করে। এ এক অলৌকিক উপস্থিতি। কে এই সাধু মানুষটি? এই প্রশ্ন ম্যাগনুসনের মনে জাগে। তিনি শুনেছিলেন পৃথিবীর কোথাও নাকি আবার যীশুখৃস্টের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি তাই মনে করে-ছিলেন এই সেই নব-আবির্ভূত যীশু। তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর সেদিন মেলেনি, তবে এই নামটি তাঁর মনে গাঁথা রইল—রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর।

এর পর অনেক বছর কেটে গেল। শিশু ম্যাগনুসন বিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা শিখতে লাগলেন। তারপর একদিন একটি বই-এর দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেই পুরাতন পরিচিত নামটি চোখে পড়ল—রেইকজাভিকের রাজপথে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলেন ম্যাগনুসন। পকেটে যথেষ্ট অর্থ ছিল না, তথাপি সেই বইখানি তৎক্ষণাৎ কিনে নিয়ে গিয়ে যে বাড়িতে থাকতেন তার চিল-কামরায় বসে পড়তে শুরু করলেন। এই গ্রন্থটি ইংরাজী গীতাঞ্জলি।

ম্যাগনুসন লিখেছেন—

> "My knowledge of English was at a very primitive stage, but I started reading the lines and savoiring their contents. Far from comprehending the profound meaning of the text indeed often missing the literal meaning of whole phrases. I still did sense the unfamiliar and strangely beautiful words which breathed through the lines"

রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মবাদ সেদিন ম্যাগনুসনকে স্পর্শ করেছিল। আরো বয়স যখন বেড়েছে, জ্ঞান যখন বেড়েছে তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে সারা পৃথিবীতে যখন মহা-পুরুষের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছে তখন ভারতবর্ষে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবের আবির্ভাব কি করে সম্ভব হল?

লেখক বলেছেন যে, আমার প্রাথমিক উচ্ছ্বাস পরবর্তীকালে গভীরতা অর্জন করেছে এবং আমি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত কবিতাগুলি পাঠ করে অভিভূত হয়েছি। ম্যাগনুসন বলেছেন—আমার এক আইসল্যান্ডীয় বন্ধু ১৯২১-তে কোপেনহাগেনে পড়াশোনা করতেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন—

> "He was like a holy man come down from hermitage in the Himalays to greet his fellowmen. I shall always remember how he lifted his hands with quiet majesty and greeted us as if bringing us blessings from Heaven"

ম্যাগনুসন লিখেছেন কবির এই রূপ-মূর্তিই আমি আমার অন্তরে জাগিয়ে রেখেছি। আধুনিক ভারতের এক জটিল প্রতীক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্প্রতি চেকোশ্লোভাক লেখক মাইলো-স্লাভ ক্রাসারের প্র কা শি ত ব্য গ্রন্থ "Indo - Checkoslovak Encounters" থেকে একটি পরিচ্ছেদের ইংরাজী অনুবাদ আমাদের হাতে এসেছে। মাইলোস্লাভ রবীন্দ্রনাথের 'আবাহন' (১৯৩৯-এর ১লা এপ্রিল তারিখে রচিত) কবিতাটির দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছেদ শুরু করেছেন।

১৯৩০-এর শেষাংশে মানব-মনে অতি-সামান্য আশা-ই সঞ্চারিত করেছিল। এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপের ওপর ফ্যাসিস্ত লালসার কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল। উদ্বেগাকুল প্রতীক্ষার মুহূর্ত যখন চরমে উঠেছে এই সংকটময় বিপর্যয়ের কালে তখন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ভারতবর্ষে ইথার-তরঙ্গে এক বাণী প্রেরিত হল। রেডিয়ো প্রাহা থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম কার্ল চাপেক (১৮৯০—১৯৩৮) শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি এবং তাঁর স্বদেশ-

বাসীকে সম্বোধন করে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং মৈত্রীর স্পর্শ জ্ঞাপন করলেন। চাপেক অবশ্য তাঁর নিজস্ব চেক ভাষায় বেতার ভাষণ দান করেন। সেই ভাষণটির ইংরাজী অনুবাদ করেন প্রোফেসর লেসনী। চাপেক বলেছিলেন—

> "Tagore, a great master, a harmonious voice of the East, we greet you in your Shantiniketan. we greet you from Czechokoslovakia, where snow is falling, from a Europe in which we are feeling lonely, from the Western World where not even the most developed nations can shake one another's hand in brotherly greeting. And, yet, despite the distance between our countries and cultures, we are extending a fraternal hand to you, to you, poet of sweet wisdom, to your peacable Shantiniketan, to your great India, to your immense Asia, to that Asia, too, which is being laid waste by weapons invented in the West".

প্রোফেসর লেসনীকৃত মূলের অনুবাদটিও এত চমৎকার যে আমরা বঙ্গানুবাদ করে তার সৌন্দর্য ব্যাহত করার প্রয়াস করলাম না। আমাদের পাঠকদের কাছে এই দিনের সংবাদ হয়ত তেমন জানা নেই' এই বিবেচনায় দীর্ঘ উদ্ধৃতি দান করা গেল।

পৃথিবীর পূবে ও পশ্চিম প্রান্তে তখন উঠেছে কাল-বৈশাখীর ঝড়। কামানের আওয়াজে চারদিক প্রকম্পিত পশ্চিমী গণতন্ত্রের এক ক্ষীণ কন্ঠস্বর বৎসরের শেষলগ্নে ভারতের কবিকে আহ্বান জানালেন যাতে যে পৃথিবী সকলের সেই পৃথিবীতে সকলেই যেন সমান মান-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন, এই ছিল কার্ল-চাপেকের প্রার্থনা। পরবর্তী বৎসরে ১৯৩৮ হিটলার অস্ট্রিয়াকে কুক্ষিগত করলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন হল। ১৯৩৮-এর গ্রীষ্মকালে চলল চারদিকে প্রতিবাদ সভা ও আন্দোলন। নেহরু চেকোশ্লোভাকিয়ায় গেলেন চেকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য। তিনি জার্মানী বা ইতালীতে যাওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ৯ই আগস্ট ১৯৩৮-এ তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রায় এক সপ্তাহ চেকোশ্লোভাকিয়ায় ছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার যা দেখেছিলেন তা ১৯৩৮-এর ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েনে'র সম্পাদককে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

> 'I returned full of admiration for the admirable temper of Czechs and the democratic Germans, who in face of grave danger and unexampted bullying, kept calm and cheerful everything to preserve peace, and yet fully determined to keep their independence".

গান্ধীজীও তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে চেকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'প্রায়শ্চিত্ত' অতুলনীয়। এই কবিতাটি তিনি ১৯৩৮-এ রচনা করেন এবং পরের বছর প্রোফেসর লেসনীকে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> 'উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো
> নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
> ভূমিগর্ভের রাতে
> ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
> নিদারুণ সংঘাতে
> ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
> সভ্য নামিক পাতালে যেথায়
> জমেছে লুটের ধন।'

এই কবিতাটির সম্পূর্ণ অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন মাইলোস্লাভ ক্রাসা। সেই দুঃস্বপ্নের দুর্যোগময় অন্ধকারে ভারতবর্ষ তাঁদের সহানুভূতি জানিয়েছিল বলে তিনি কৃতজ্ঞ।

—অভয়ঙ্কর

A Chapter from Indo-Czechoslovak Encounters : by Miloslav Krasa. (Translated into English from Czech.)

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

পত্রিকা খুলতেই সংবাদটা চোখে পড়ল। কেমন যেন একটা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো মনটা। ঢাকার কাছে ফেনগাঁও স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সামনে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন ডঃ আবদুল হাই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ বৎসর। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও হিন্দি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার মরচা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ ও এম-এ প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', 'বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞান', 'বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রখ্যাত মারাঠি লেখক প্রহ্লাদ কেশব আত্রের মৃত্যুসংবাদটি এ সপ্তাহের আর একটি শোকাবহ ঘটনা। গত শুক্রবার, ১৩ জুন তিনি বোম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। ১৮৯৮ খৃঃ পুণা জেলায় তাঁর জন্ম হয়। পুণা থেকে বি-এ পাশ করার পর বি-টি পাশ করেন বোম্বাই থেকে। তিনি পুণার ক্যাম্প এডুকেশন সোসাইটির অধ্যক্ষ এবং ১৯২১ সাল থেকে 'শিক্ষা বিচার মন্ডলে'র মুখ্য সম্পাদক ছিলেন। মারাঠি ভাষায় প্রায় সত্তরটি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। মারাঠি সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্যারডির প্রবর্তক। মারাঠি ভাষায় তিনি বহু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। তাঁর "শ্যামচি আয়ে" নামক ডকুমেন্টারি ছবিটির জন্য তিনিই প্রথম ভারতে প্রযোজক-পরিচালক হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেন ১৯৫৩ সালে। "সংযুক্ত মহারাষ্ট্র" আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। তখনই তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। তিনি মহারাষ্ট্র বিধান সভার ১৯৫৭ সাল থেকে সদস্য ছিলেন। শ্রীআত্রের মৃত্যুতে মারাঠি সাহিত্য যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা অনেক হয়েছে। কিন্তু বেসরকারীভাবে লিটল ম্যাগাজিন প্রতিযোগিতা কোথাও হয়েছে কিনা, তা সঠিক জানা নেই। যাই

হোক, এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন ত্রৈমাসিক "শিল্পরূপ" পত্রিকা। এ'রা প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রকাশককে পঞ্চাশটি টাকা সমানভাবে ভাগ করে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীদিলীপ পাল সংশ্লিষ্ট সম্পাদক ও প্রকাশকদের ৩০ জুন, ১৯৬৯ এর মধ্যে গত এক বছরে প্রকাশিত তাঁদের প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কপিটি ৬ প্যারীমোহন সুর লেন, কলকাতা ৬, ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

দেওঘর থেকে সম্প্রতি "আদান্ত" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন কার্তিকনাথ গৌরীনাথ ঠাকুর ও কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী। এই পত্রিকায় বাংলা দেশের লেখকদের প্রতি দুটি কৌতূহলোদ্দীপক আবেদন প্রচারিত হয়েছে। প্রথমটিতে সই করেছেন বাইশজন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক এবং দ্বিতীয়টি এই পত্রিকার সম্পাদকীয়। আবেদন দুটির ভাষা মোটামুটি একই রকম। এ দুটি আবেদনে আছে "হে বাংলার লেখক সমাজ, আমরা হিন্দিতে আপনাদের রচনার অনেক অনুবাদ করেছি, কিন্তু আপনারা কিছুই করেননি। এবার আপনারা হিন্দির আরো আরো অনুবাদ করুন।" কথাটা শুনতে খুবই করুণ শোনালেও বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই এই সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। অর্থাৎ বাংলা দেশের কার কার রচনা হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে। বাংলার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের ভাল রচনা কটি অনূদিত হয়েছে হিন্দিতে? এই পত্রিকা থেকেই একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। ষাটের দশকের বাংলা গল্পের নমুনা হিসেবে জনৈক অনঙ্গকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের একটি গল্প অনূদিত হয়েছে। ইনি কে? তাহলে চিন্তা করে দেখুন, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহ হিন্দিতে কতদূর অনূদিত হয়েছে। আসলে হিন্দি ভাষায় বাংলার যত অনুবাদ হয়েছে, তার অনেকটাই বাংলার নিকৃষ্ট রচনার। এই পত্রিকার একজন লেখক শ্রীকান্ত ভার্মা গত বছর "দিনমান" নামক একটি সাপ্তাহিকে লিখেছিলেন, বাংলা সাহিত্য না কি এখনও রবীন্দ্রনাথকে সম্বল করে চলেছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা এরকম, তাঁদের কাছে আর কি প্রত্যাশা করবার আছে? বাংলা ভাষায় অনেক সাহিত্যের ইতিহাস এবং সংকলন গ্রন্থ আছে। সেগুলি একটু মিলিয়ে নিলেই ভাল রচনাগলি চোখে পড়তে পারে। হিন্দির বিশেষ কিছু অনুবাদ বাংলায় হয়নি, তা ঠিক নয়। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনেক অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে। অজ্ঞেয়, ধর্মবীর ভারতী, জগদীশ চতুর্বেদী থেকে আরম্ভ করে কিরণ জৈনের কবিতাও বাংলায় অনূদিত হয়েছে এবং হচ্ছে। অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তাই আজ ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন সাহিত্যিককে পরস্পরের সাহিত্য অনুবাদের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে ভাষা থেকে অনুবাদ হবে, সেই ভাষার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের লেখাই যেন অনূদিত হয়। নাহলে, সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বিদেশী সাহিত্য

ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিরা এককালে বিদ্রোহ করেছিলেন প্রাচীন বিশ্বাসের পুনর্জাগরণে। স্বপ্নের মধ্যেই ছিল তাঁদের মুক্তি। শিল্পীর আকাঙ্ক্ষায় ছিল অচেতনের অহংকার এবং চেতনের জন্য দুঃখবোধ।

প্রবন্ধকার চার্লস ল্যাম্ব একটি চিঠিতে বন্ধুর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, "ইয়ং ম্যান, কি ধরনের স্বপ্ন তোমার বুকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে?"

তার উত্তর পাওয়া যায় বায়রণের 'দি ড্রেম' কবিতায়। অনেকে বলেন, কবিতাটি হলো রোম্যান্টিক মেনিফেস্টোর কাব্যিক প্রকাশ। এই বিশ্বাসেরই রেখাচিত্র এ'কেছেন মিস আলেথি হেতার। তাঁর নতুন আলোচনার বই "অপিয়াম অ্যান্ড দি রোম্যান্টিক ইমাজিনেশান'-এ আফিংয়ের নেশা নাকি বড় নেশা। উচ্চতর রোম্যান্টিক কল্পনার সহায়ক। বইটির ভাষা মনোরম, বিশ্লেষণ চমৎকার। অনেক পরিশ্রম করে লেখিকা সংগ্রহ করেছেন ঐতিহাসিক নজীর।

শোনা যায়, সম্রাট চতুর্থ জর্জ নাকি আফিংকে কোনো ক্ষতিকর নেশা বলে মনে করতেন না। তাঁর কাছে আফিং ছিল মানুষকে 'শান্ত রাখার সিরাপ'-এর মতো। নেশার দিক থেকে সুলভ। এবং দামে বিয়ারের চেয়ে সস্তা। আজকের দিনে ডাক্তাররা যেসব ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন খাওয়ার কথা বলেন, তখনকার দিনে বদ্যিরা সেসব ক্ষেত্রে বিধান দিতেন অল্প পরিমাণ আফিং খাওয়ার।

মিস হেতার একালের মহিলা। তিনি জানেন আফিংয়ের প্রতিক্রিয়া। তখনকার দিনে নেশাখোররা আফিং খেয়ে খুঁজে পেতেন নিজের সঙ্গে বাস্তবজগতের দূরত্ব শব্দ ও ধ্বনির রহস্যময় জগৎ।

কাব্যের জগতে তাঁর প্রভাব পড়েছিল গুরুতর চেতনায়। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন কোলরিজের কবিতা, উইলকি কলিনস-এর নাম। বলেছেন টমাস দ্য কুইন্সির 'দি কনফেসান অব অ্যান ইংলিশ অফিয়াম ইটারের' কথা।

আজকের দিনের মদ্যপায়ী কবি-সাহিত্যিকরা বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারেন। মিস হেতার লিখেছেন, 'সকলকেই শেষ পর্যন্ত সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। নেশা করে বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। শিল্পের মতো, জীবনের কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই। প্রায় সবই লং টার্ম ব্যবস্থা।"

জাঁ ককতোর মতে, "স্বপ্ন দেখা হলো এক ধরনের শিক্ষার ফল।" সেভাবে শিক্ষিত হলে, কবি সাহিত্যিকরা বস্তুর জগতেও স্বপ্নের প্রতিরূপ দেখতে পাবেন। মানুষের মনেই তো লুকিয়ে আছে অতীতের স্মৃতি এবং অগামী দিনের সম্ভাবনা।

নামকরণের দিক থেকে যেমন, ভাবনার দিক থেকেও তেমনি, আধুনিক উপন্যাস চমকপ্রদ। উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যায় ডেভিস গ্রাবের নতুন উপন্যাসটি। লেখক তাঁর নাম রেখেছেন 'ফুলস প্যারেড'।

ঔপন্যাসিক হিসেবে গ্রাব খ্যাতিমান পুরুষ। ১৯৫৪ সালে বেরোয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি নাইট অব দি হান্টার'। ১৯৬২ সালে বেরিয়েছে 'দি ভয়েসেস অব গ্লোরি' নামে আরেকটি উপন্যাস। 'ফুলস প্যারেড'-এ কিছু কিছু অ্যাবসারডিটির লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জীবনী লেখা হয়েছে। লিখেছেন কার্লোস বেকার। সাধারণ জীবনীকারের মতো তথ্যের যোগান দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেননি লেখক। তুলে ধরেছেন মার্কিনী সাহিত্যিকের ট্র্যাজিক জীবনকাহিনী, উপকথার নায়কের অবিশ্বাস্যপ্রায় বাস্তবজীবন।

হেমিংওয়ের জীবনসত্যকে যাঁরা উপলব্ধি করতে চান, তাঁদের কাছে গ্রন্থটি শুধু মূল্যবান নয়, অপরিহার্য। সমালোচকের ভাষায়, "ইট ইজ সার্টেনলি অ্যান একজস্টিভ ওয়ার্ক, হুইচ উইল বি ইনডিসপেনসেবল টু অ্যানি ওয়ান উইথ অ্যানি ডিগ্রী অব স্পেশাল ইনটারেস্ট ইন হেমিংওয়ে।"

আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা: (আলোচনা গ্রন্থ): বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২, দাম: পনেরো টাকা।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতা এখন আর কোন বিশেষ ঘটনা নয়। কেননা বর্তমানে যারাই কবিতা লিখতে শুরু করেন তারাই আধুনিক কবিতার ঘরানাকে মেনে নিয়েই কাব্যচর্চা করেন। অ্যাকাডেমিক অর্থে স্কুল-কলেজের পাঠ্য তালিকায় যাঁরা 'আধুনিকতার দাবিদার' তাঁদের অনুসরণকারী এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে খাঁটি আধুনিক কবিতা লেখা একসময় বিশেষ আন্দোলন বলে পরিচিত হলেও বর্তমানে এটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আজকে কবিতা বলতে আধুনিক কবিতাই বোঝায়। এবং এর শিকড় সমাজ ও জীবনের গভীরে।

আধুনিক কবিতা আলোচনাও আজকাল মোটামুটি হচ্ছে। একাধিক গ্রন্থ বেরিয়েছে, হয়েছে গবেষণাও। এটা নিঃসন্দেহেই আনন্দের কথা। তবে বেশির ভাগ গ্রন্থই একপেশে আলোচনায় দুষ্ট। বাঁধা সড়কের বাইরেও যে কাব্য-আলোচনা চলতে পারে তার নজির মিলছে না কোন লেখকেরই আলোচনা-গ্রন্থে। প্রায় প্রত্যেকেই একটা সময়ের বা বিশেষ কয়েকজন কবির আলোচনার মধ্যেই তাঁদের বক্তব্যকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেন। এক কথায় একটি সময়ের গন্ডিতেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। ভাবটা এমন যেন গত বিশ-পঁচিশ বছরে নতুন কবিরা তেমন কিছুই দিতে পারেননি। অথচ বাস্তব অবস্থা তা নয়। যদি তাই হতো তবে, বর্তমানে আর বাংলাদেশে নিশ্চয়ই কবিতা লেখা হতো না এবং আলোচনা করবারও তেমন প্রয়োজন হতো বলে মনে করি না। সুতরাং এরকম ধারণাটাই ভ্রান্ত। কারণ এ ধরনের আলোচনা কবিতাপাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকতর করার বদলে সংকীর্ণতার বদ্ধ জলায় রুদ্ধ করে দেয়। দুঃখের বিষয় এরকমেরই নতুন আলোচনা গ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা'। গোটা বইটাই লেখক ব্যক্তিগত ভালো-লাগা-না-লাগার নিরিখে রচনা করেছেন। ফলে আলোচ্য কবিদের উপরও কখনো-সখনো অবিচার করা হয়নি। বিশেষ করে দিকদের প্রসঙ্গে লেখকের অসহিষ্ণুতাই কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপর আলোচনাটি ভালো হলেও খণ্ডিত। হুইটম্যানের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের যোগাযোগ দেখাতে লেখক যতটা শ্রম নিয়োগ করেছেন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং পরবর্তী কালের কবিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ধারণে ততটাই বিমুখ হয়েছেন। এ ছাড়াও লেখক এই গ্রন্থে যে সময়ের কবিদের আলোচনা করেছেন, সে সময়েরও অন্তত দু-তিনজন স্বতন্ত্র ধারার শক্তিশালী কবিকে কেন যে বাদ দিলেন তা বোঝা যায় না। পরবর্তী কালের তরুণ কবিরা তো আরো অপাংক্তেয়।

যাই হোক, এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে প্রকাশককে অভিনন্দন। বিশেষ করে যখন কবিতার পাঠক এমনিতেই সীমাবদ্ধ তখন এতো বড়ো একটি আলোচনার বই বের করে তিনি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতার পাঠকেরা এ জন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

●

পূর্ব বাঙলার গল্পসংগ্রহ —মিহির আচার্য সম্পাদিত। শুকসারী প্রকাশক। ১৭২।৩৭ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। দাম পাঁচ টাকা।

একদিন ছিল এক দেশ, এক মানুষ, এক ভাষা। আজ মাঝখানে পড়েছে একটি শক্ত রাজনীতির বেড়া। দুটি দেশ। দুই মানুষ। কিন্তু ভাষা তাদের এক। কথা বলা নিষেধ। চলাচল বন্ধ। মুখে ভাষা, বুকে উত্তেজনা। পরস্পর তাকিয়ে আছে। কিন্তু কথা বলবার কোন উপায় নেই। একই ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে দুই দেশে। আমরা ওদের খবর রাখি না। ওরা আমাদের খবর পায় না। মাঝে মাঝে উৎসাহী চিন্তাশীল মানুষের চেষ্টায় আমরা জানতে পারি ওপারের খবর, সাহিত্যকারদের নানান সৃষ্টির সংবাদ। শুনে মনে হয় এতো আমাদের ঘরের কথা, একই বাঙালী সমাজের আশ্চর্য শব্দরূপ।

সম্প্রতি পূর্ব বাঙলার গল্পের একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংগ্রহে লিখেছেন সরদার জয়েনউদ্দিন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনোয়ার রহমান, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্, শাহেদ আলী, দেবব্রত চৌধুরী, শওকত আলী, আহমদ মীর, হুমায়ুন কাদির, হায়াৎ মামুদ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হাসান আজিজুল হক এবং হুমায়ুন চৌধুরী। প্রবীণ এবং নবীন এই সমস্ত গল্পকার জীবনের অনেক কাছের মানুষ। সাহিত্যের সৌন্দর্য ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে কখনও তাঁরা গল্প বলার ট্রাডিসনকে টেনেছেন, কখনও ভেঙে ফেলে ব্যক্তিক অনুভূতির আলোয় সামাজিক সংকট নতুন প্রতীক ও ব্যঞ্জনায় মুক্তি দিয়েছেন। রূপকল্পনার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য সত্যিই বিস্ময়কর। ধর্মীয় চিন্তার বাইরে গিয়ে নতুন জীবন-সত্যকে উপলব্ধির প্রয়াস কয়েকটি গল্পে স্পষ্ট।

সম্পাদক শ্রীমিহির আচার্য এই গ্রন্থখানি সম্পাদনার জন্য বাঙালী মাত্রেরই সাধুবাদ পাবেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

নান্দীমুখ (তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংকলন এবং চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংকলন)—সম্পাদক স্বপন সেনগুপ্ত।

লিখছেন কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, স্বপন সেনগুপ্ত, বিজিতকুমার ভট্টাচার্য, রত্নেশ্বর হাজরা, তরুণ সান্যাল, সেবাব্রত চৌধুরী, রণেন্দ্রনাথ দেব, মৃণাল বসুচৌধুরী, পরেশ মণ্ডল, সজলকান্তি লস্কর, পীযূষ রাউত, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, প্রদীপবিকাশ রায় এবং আরো কয়েকজন। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত এই কবিতা পত্রিকা অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ছাপা, প্রচ্ছদ, রুচিসম্মত।

●

মানবমন (বর্ষ ৮, সংখ্যা ২)—সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১ বিধান সরণী, কলকাতা—৪। দাম: এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

নির্ভেজাল মনস্তত্ত্বের পত্রিকা বাংলা ভাষায় সম্ভবত একটিও নেই। মানবমন মনস্তত্ত্বপ্রধান পত্রিকা। ঘোষণা অনুসারে মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারায় পরিচায়ক ত্রৈমাসিক হিসেবেই এর আত্মপ্রকাশ। গত সাত বছর ধরে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধে প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই সমৃদ্ধ। অতীতে অনেক বিতর্কিত প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে পত্রিকাটিতে। এ সংখ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'ইয়ু ও উড়ন্তচাকী' প্রসঙ্গ। সত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন 'শিল্পসাহিত্য সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরী প্রশ্নোত্তর'-এর জবাব। মানবমনের পক্ষ থেকে বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। এ সংখ্যায় তাঁদের উত্তরের জবাব দিয়েছেন শ্রীযুক্ত ঘোষ। তাছাড়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা লিখেছেন নৃপেন্দ্র গোস্বামী, কালিদাস বসু, বিশু দাস, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, কনাদ শর্মা এবং মনোবিদ। আমরা পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

●

সারস্বত (মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫)—সম্পাদক অমিয়কুমার ভট্টাচার্য ।। ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৬।। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গত এক বছর ধরে সারস্বত প্রকাশিত হয়ে আসছে। মার্জিত রুচির আভিজাত্যে পত্রিকাটি এরই মধ্যে পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে নিবন্ধে প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই সমৃদ্ধ। এ সংখ্যার প্রধানতম আকর্ষণ 'মির্জা গালিব' সম্পর্কে অমূল্য দেবের একটি প্রবন্ধ, 'নির্বাচনোত্তর সংস্কৃতি চিন্তা' নামে নারায়ণ চৌধুরীর একটি আলোচনা এবং মির্জা গালিবের পঞ্চাশটি গজলের অনুবাদ। বিবয়বস্তুর বিচারে হয়তো অনেকে নারায়ণবাবুর প্রবন্ধটি সম্পর্কে একমত হবেন না। তবু একালের পাঠক চিন্তিত হবেন আলোচনাটি পড়ে। 'ভাষাতাত্ত্বিক পার্নিনি' সম্পর্কে লিখেছেন পরেশচন্দ্র মজুমদার। দুটো উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায় এবং কৃষ্ণ ধর। তাছাড়া প্রকাশিত হয়েছে লু সুন-এর একটি গল্পের অনুবাদ (পুরনো ভিটে)। চিত্ত ঘোষালের গল্প 'পতন', বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর 'ওরা তিনজন'। অশোক ভট্টাচার্য লিখেছেন 'পূর্ব বাংলার কবিতা' সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ। প্রচ্ছদে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা মির্জা গালিবের একটি ছবি ছাপা হয়েছে।

●

সহজিয়া : সম্পাদক শংকর দাশগুপ্ত। দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫৪এ মিডল রোড, এন্টালী, কলকাতা—১৪। দাম: ষাট পয়সা।

ছোটগল্প ও ছোটগল্পবিষয়ক আলোচনার ত্রৈমাসিক সংকলন। দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হল। এতে আটজন তরুণ গল্পকারের আটটি ভিন্নস্বাদের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন : শৈলেশচন্দ্র দে, সমরেন্দ্রনাথ দাস, দেবাশিস সেন, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন ঘোষ, সুজিত মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শংকর দাশগুপ্ত। এই সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন শংকর দাশগুপ্ত।

যাঁরা একদিন ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেছে জীবনের জয়গান, দেশের স্বাধীনতার জন্য লাঞ্ছিত হয়েছে, দ্বীপান্তরে গেছে, গেছে জেলে তাঁদের দেশবাসী ভোলে নি। ভোলে নি তার প্রমাণ বিপ্লব যুগের কাহিনীর বিপুল চাহিদা। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের 'সবার অলক্ষ্যে' এ বিষয়ে অগ্রপথিক। তাঁরই পথে এগিয়ে গেলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, বিনয়জীবন ঘোষ। এঁরা বিপ্লবকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। অনন্ত সিং-এর 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' বেরিয়ে গেছে। এবার বেরুল বিনয়জীবন ঘোষের 'বিপ্লবী মেদিনীপুর'। বাংলা দেশে বিপ্লবকাণ্ডের একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল মেদিনীপুর। চট্টগ্রামে মাস্টারদা, অনন্ত সিং, নির্মল সেন, প্রমুখেরা বৃটিশদের মধ্যে মহাত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন, মেদিনীপুরে করেছিলেন বিমল দাশগুপ্ত, যতিজীবন ঘোষ, প্রভাংশুশেখর পাল, নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোরের মতো ছেলেরা। ইংরেজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিন ম্যাজিস্ট্রেট ডাগলাস, বার্জ আর পেডিকে হত্যা করেছে। দোর্দণ্ড বৃটিশ সরকার রুখতে পারে নি তাঁদের মৃত্যু। মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেটকে যাঁরা হত্যা করেছেন লেখকের অনুজ নির্মলজীবন তাঁদের অন্যতম। লেখকদের সারা পরিবার ইংরেজের হাতে বার বার হয়েছে লাঞ্ছিত। লেখক এই বইয়ে মেদিনীপুরের বিপ্লবকাণ্ডের অনেক আজানা তথ্য তুলে ধরেছেন।

শৈলেশ দে'র **'বিনয়-বাদল-দীনেশ'** আর **'ক্ষমা নেই'**। শৈলেশ দে তাঁর হালের বই 'আমি সুভাষ বলছি'তে বিপ্লবযুগের অনেক কাহিনী লিখেছেন। 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' বইয়ে এই তিন বীর সন্তানের কাহিনী বলেছেন সুন্দর করে।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দ যুদ্ধের বিবরণ পড়লে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বীর বিপ্লবীদের অসম সাহসিকতা বিস্ময়বিমিশ্রিত সম্ভ্রম জাগায়।

বাংলাদেশে যেমন আমরা অগণিত দেশপ্রেমিক দেখেছি, তেমনি দেখেছি গুটিকয় বিশ্বাসঘাতককেও। বিপ্লবীদের হাতে তাদের ক্ষমা নেই। মৃত্যু তাদের অবধারিত। কোনো শক্তি তাদের রক্ষা করতে পারে নি। সেই সব বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তিদানের কথাই বলা হয়েছে 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থে।

একটি নাম সূর্য সেন। যে-নাম বাংলার ছেলে-মেয়েদের মনে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দিত এক সময়। আজও যাঁর নামে মাথা নুয়ে আসে, সেই সূর্য সেন। চট্টগ্রামের মাস্টারদা। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পাহাড়তলি অভিযান, গৈরালা সংঘর্ষ—তাঁর বীরত্বের কতো পরিচয়। মৃত্যুঞ্জয়ী এই বীর নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েছিলেন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারী ফাঁসি হয়েছিল তাঁর। সূর্য সেনের বিপ্লবকাণ্ডের এক মনোজ্ঞ কাহিনী 'বিপ্লবী সূর্য সেন।' লেখক বিশ্ব বিশ্বাস।

কবিতার বই খুব বেশি না হলেও বেরোয় বইকি মাঝে মাঝে। তেমনি একখানি বই 'এই জন্ম, জন্মভূমি'। লেখক মণীন্দ্র রায়। যে যুগে ভেঙে পড়ছে স্থিরভাবস্থা, বদলে যাচ্ছে মনের ভূগোল, সেই যুগসন্ধিক্ষণের কথাই রূপায়িত হয়েছে এই দীর্ঘ কবিতায়। এর সহজ সরল আবেদন এবং আবেগময় প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করার মতো।

শতাব্দীর ছবি : ভারতীয় চিত্রকলা

শেষ পর্যন্ত নাম দাঁড়ালো 'ভারতের শিল্পকথা ও আমার কথা'। ও সি গাঙ্গুলী মশায়ের এই অমূল্য আত্মকথা এক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল 'অমৃত'-এ তখন নাম ছিল 'আমার কথা ও ভারতের শিল্পকথা।' আরও দুটি-তিন নামের কথা উঠেছিল। তার মধ্যে একটা নাম ছিল 'চলার পথের দু'ধারে'।

বইটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, গাঙ্গুলীমশায় তো নিজের কথা বলেননি, শুনিয়েছেন অপরের কথা। সমালোচকরা ভিক্টর হুগোকে বলতেন, বড্ড বেশি নিজের কথা বলেন তিনি। ভিক্টর হুগো জবাব দিয়েছিলেন,

"When I speak of myself, I speak of yourselves, because there is no difference between you and me".

গাঙ্গুলিমশায়ের আত্মকথাও তাই। আত্মকথা তো নয়, ভারতের শিল্পচর্চার শতাব্দীর ইতিহাস। শুধু শিল্পচর্চার ইতিহাসই বা বলি কেন, কলকাতার সমাজ-বিবর্তনেরও ইতিহাস। ষাট-সত্তর বছর আগেকার কলকাতার বনেদি পরিবার, সমাজ, যাত্রা-তর্জা, বড়োবাজার একেবারে ছবি হ'য়ে উঠেছে। গাঙ্গুলিমশায়ের এ আত্মজীবনী লেখা না হ'লে দেশি-বিদেশী মনীষীদের কতো অমূল্য কথা, কতো ঘটনা, ভারতের শিল্পচর্চার ইতিহাসের কতোখানি পরিচয় যে কালের গহ্বরে তলিয়ে যেত তাই ভাবি।

গাঙ্গুলিমশায়কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কখন এবং কীভাবে এই আত্মকথা লেখার প্রেরণা পেলেন?'

বললেন, 'বন্ধুবান্ধবরা অনেকদিন থেকেই বলছিল, কিন্তু আমি তেমন গা করিনি। শেষে সুধার পিড়াপিড়িতেই যখন যেমন মনে এসেছে নানান ঘটনা বলে গেছি। সুধা সেই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি জুড়ে গেঁথে সাজিয়ে দিয়েছে কথায়। ও না থাকলে এই বই হ'তো না।'

সুধা মানে, শ্রীমতী সুধা বসু— গাঙ্গুলিমশায়ের কন্যাতুল্যা ছাত্রী। বর্তমানে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সময় তিনি গাঙ্গুলিমশায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে ভারতের প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই ঘুরেছেন তিনি। অজন্তা, ইলোরা থেকে মন্দিরগাত্রের ছবির মহিমাও বুঝে নিয়েছেন গুরুদেবের কাছ থেকে। গাঙ্গুলিমশায়কে দীর্ঘদিন কাছ থেকে দেখেছেন শ্রীমতী বসু। তাইতো, 'স্মৃতিলিখনে'ও গাঙ্গুলিমশায়ের ব্যক্তিমানসকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পেরেছেন। সেই মুহূর্তে ভাবছিলাম, শ্রীমতী বসু এখানে থাকলে আরও কথা জানা যেত! কপাল ভালোই বলতে হবে, গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলোচনা ক'রতে ক'রতেই শ্রীমতী বসু এসে গেলেন।

গাঙ্গুলিমশায় তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'এই যে সুধা, এসো। উনি 'অমৃত' পত্রিকা থেকে এসেছেন। বইটির ব্যাপারে জানতে চান।'

শ্রীমতী বসু বসতেই জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'আচ্ছা, কখন কীভাবে আপনি গাঙ্গুলিমশায়ের আত্মজীবনী লিখতে সুরু করেন?'

শ্রীমতী বসু বলতে লাগলেন, 'তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার সাহিত্য জীবন' বেরুনোর পর আমার মনে হয়, গুরুদেবেরও তো এরকম আত্মজীবনী বেরুনো দরকার। অনেকদিন বলেছি, কিন্তু উনি গা করেননি। সেটা বায়ান্ন সালের গোড়ার দিকের কথা। পুজোর ছুটিতে বরাবরই গুরুদেব কাশীতে যেতেন, ছুটিটা আমিও তাঁরই সান্নিধ্যে কাটাতাম। সেবার পুজো পড়েছিল অক্টোবর নাগাদ। কাশীতে গিয়ে ধ'রে পড়লাম, বলতেই হবে আপনাকে। আমি লিখে নেব। রাজী হ'লেন তিনি। সমস্যা দাঁড়ালো আর-একটি। ও'র কাছে লোকজন আসা-যাওয়া লেগেই আছে। শেষে যাঁরা আসতেন, তাঁদের হাত জোড় ক'রে বলেছি, সকালবেলাটা ও'কে একটু একলা থাকতে দিন। আমাকে কাজটি করতে দিন। কথায় কাজ হ'লো। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ১৯ অক্টোবর আমায় প্রথম 'সীটিং' দিলেন গুরুদেব। পাতা তিনেক লিখেছিলাম। তিনদিন নিয়মিত 'সীটিং' দিয়েছিলেন। সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত লিখতাম রোজ। কাজ বেশি দূর এগোলো না। তবু সুরু ক'রতে পেরেছি এই সান্ত্বনা নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।'

গাঙ্গুলীমশায়ের সামনে শ্বেতপাথরের মেঝেতে বসে শুনছিলাম বইটির জন্মকথা। ঘরে ঢুকতেই চেয়ার এনে দিয়েছিল, বসতে পারিনি। যিনি বিদ্যাসাগরমশায়ের তত্ত্বাবধানে মেট্রোপলিটান স্কুলে পড়াশুনা করেছেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে পার্সীভাল সাহেব এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে যাঁর শিক্ষালাভের সুযোগ হয়েছে, যিনি আজ থেকে উনসত্তর বছর আগে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে অনার্স পাস করেছেন, শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনায় একেবারে প্রথম সারিতে যাঁর স্থান সেই

জ্ঞানতাপস সরল মানুষটির সামনে চেয়ারে বসা যায় না। মাথা আপনি নুয়ে আসে। পঁচাশি বছরে পড়েছেন, তবু গায়ের গৌর রঙ সামান্যই ম্লান হয়েছে। আমি যাবার আগে মেঝেতে শুয়েছিলেন বোধহয়। বালিশটা তখনো রয়েছে। পরনে ধুতি। খালি গায়ে উপবীত শোভা পাচ্ছে। গাঙ্গুলীমশায়ও শুনছিলেন ছাত্রীর মুখে বইটির সৃষ্টিকথা।

শ্রীমতী বসু আনমনে বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে চলছিলেন, 'কলকাতায় এসে কিছুতেই গুরুদেবকে নিয়ে বসতে পারছি না। লোকজনের ভিড় তো আছেই, তার ওপর রোজ রোজ একটা-না-একটা অনুষ্ঠান লেগেই আছে। বইটির কাজ বন্ধ রইল অনেকদিন। ইতিমধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরীর আত্মকথা বেরিয়ে গেল। আমি দেখলাম, আর অপেক্ষা করা যায় না। '৬৪ সালে কাশীতে ৫৪ দিন ছিলাম। সেই সময় অনেক কাজ হলো। উনি যা বলছিলেন ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে তার সত্যতা যাচাই করে নিয়েছিলাম। কারণ, উনি বৃদ্ধ হয়েছেন, স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছে। শ'খানেক ফাইল ঘেঁটেছি আমি। ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে আরও অনেক কথা জানতে পেরেছি যা উনি আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেসব কথা মনে করিয়ে দিতেই সে সম্পর্কে বলে গেছেন আরও কথা। কাশী থেকেই 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে গাঙ্গুলীমশাই পত্রালাপ করলেন। '৬৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে এখানে বেরুতে থাকে। '৬৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লেখাটা চলে। তারপর বহুদিন পড়েছিল, বই আকারে বের করবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। অনেক প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। অনেকে তো সৌজন্য-মূলক সামান্য একটা জবাব পর্যন্ত দিলেন না। একজন প্রকাশক আট মাস কপি আটকে রেখে ফেরত দিলেন। শেষে সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এ মুখার্জি এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড থেকে '৬৯ সালে বইটি বেরোয়। গত ২ বৈশাখ গুরুদেবের হাতে এনে বইটি দিতেই আনন্দে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন তিনি সেদিন। উনি বইয়ের 'কপিরাইট' আমায় দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি তো সেজন্য লিখিনি। বইটি যে আমার গুরু-দক্ষিণা।' বলতে বলতে শ্রীমতী বসুর গলার স্বরও গাঢ় হয়ে এলো।

আমি তাঁর কথা শুনতে শুনতে 'রূপম' পত্রিকার পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম। কী তার মুদ্রণসৌকর্য, কী তার রচনা, কী তার বিন্যাস—সে সময় তো মুদ্রণশিল্প এতো উন্নত ছিল না। কী করে সম্ভব হলো এই আশ্চর্য সুন্দর পত্রিকা ছাপানো? আজকাল তো চোখে পড়ে না এমনটি। দেশবিদেশের কতো মনীষী যে রূপমের প্রশংসা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে 'রূপম' পেয়ে আমেরিকার একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট প্রেসকট চ্যাপলিন লস এঞ্জেলস থেকে লিখেছিলেন :

"I know of no western publication that is its equal"

আর রূপমের লেখক তালিকাটি শুনুন একবার। ডক্টর উইলিয়াম কোন (বার্লিন), ডক্টর ভোরেচ (নরওয়ে), ডক্টর ভিজার (হল্যান্ড), প্রফেসর ম্যাকডোনেল্ড (অক্সফোর্ড), জগদ্বিখ্যাত শিল্পবিদ ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী, বিলাতের স্যার জন মার্শাল, ভাস্কর এরিক গিল, জার্মানির পণ্ডিত ডক্টর স্ট্রীগুইস্ক, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ আরও অনেকে। এহেন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অর্ধেন্দ্র-কুমার গাঙ্গুলী, সংক্ষেপে ও সি গাঙ্গুলী। সে সময় পত্রিকাটির দাম ছিল দশ টাকা। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দশ হাজার টাকা করে বছরে সাহায্য দিতেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে পত্রিকাটি বেঁচে থাকতে পারল না। আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন, "Rupam must be survived". কিন্তু সে শুধু মুখের আশ্বাস। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অনেক লেখালেখি করেও ফল হয়নি কিছু।

রূপমের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি অপূর্ব ছবিতে গিয়ে আমার দৃষ্টি আটকে ছিল। গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'বিলেত থেকে ছবিটি ছেপে এনেছিলাম।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রতি সংখ্যা কতো করে ছাপতেন?'

'দেড়শো থেকে দুশো।' একটু হেসে আবার তিনি বললেন, 'কিন্তু তাতেও লোকসান হতো না।'

'আচ্ছা, বই ছাপা হবার পর কি আপনার মনে হয়েছে কোনো ঘটনা, বা কারু কথা বাদ পড়েছে।'

তাড়াতাড়ি গাঙ্গুলীমশাই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঋষি অরবিন্দ রূপমে লিখেছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম। তিনি 'রূপম'এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে। তাঁর কথাটা বাদ পড়ে গেছে। বুড়ো হয়েছি। স্মৃতি ফিকে হয়ে আসছে তো।'

'এখনকার চিত্রকলা সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?'

বললেন, 'এখনকার চিত্র ভারতের শিল্পঐতিহ্য থেকে সরে আসছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘানিতে ঘুরপাক খাচ্ছে তা। নিজের সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

বইটিতে ভারতীয় শিল্পরীতি এবং আধুনিক কয়েকজন শিল্পীর চিত্র নিয়ে আলোচনা করেন, বলেছেন কোন্ কোন্ যুগের শিল্পরীতি তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করত। তা ছাড়া রয়েছে গত শতাব্দীর পান্না, হীরে, চুনিদের কতো অজানা কথা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'চিত্রশিক্ষার গোড়ার কথা কী?'

হেসে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, 'দাদা-মশাইয়ের কাছে আমার চিত্রশিক্ষার হাতে-খড়ি। উনি চিত্রাঙ্কনের একটি প্রাচীন সূত্র মুখস্থ করিয়েছিলেন আমাকে। সূত্রটি হলো—'মুখ, মুঠো, ঘোড়া—এই তিন চিত্রের গোড়া।' আজও আমি তাই মনে করি।'

বইটির আরও মূল্য বাড়িয়েছে গাঙ্গুলীমশাই, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের আঁকা তিনখানি ছবি। এমন একটি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রকাশক ধন্যবাদার্হ হয়ে রইলেন। শুধু ইতিহাস নয়, লেখার গুণে বইটি সাহিত্যও হয়ে উঠেছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বইটি সম্পর্কে ঠিকই বলেছেন, 'যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসম্পূর্ণ স্বরচিত জীবনকথা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত —সেগুলোর পাশে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভারতশিল্প ও আমার কথা' বইখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে।'

ভ্রমণকাহিনী

দুর্লভ চক্রবর্তী

বিজ্ঞাপনের সেই ছবিটি নিশ্চয় অনেকেরই দেখা আছে, সেই যে—গাঁয়ের এক বটগাছের নিচে একজন সাধুব্যক্তি বসে আছেন, আর গাঁয়ের লোকজন তাঁকে ঘিরে দেশবিদেশের কথা শুনছে! হ্যাঁ, এককালে পরিস্থিতি এইরকমই ছিল। যখন দেশে রেল-স্টিমার ছিল না, মোটর বাস বা সাইকেল পর্যন্ত ছিল না, তখন গরুরগাড়ি আর নৌকোই ছিল সহায়। আর ছিল পায়ে হাঁটা। বরং পায়ে হাঁটাই ছিল প্রধান উপায়। উত্তরের কাশ্মীর থেকে দক্ষিণের কুমারিকা পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে মানুষ নেহাতই দুখানি পায়ের ওপর নির্ভর করে। সুদূরের পিপাসা তখন এমনি করেই টানত।

অবিশ্যি তখনকার দিনে দেশভ্রমণের প্রধান একটা আকর্ষণ ছিল তীর্থদর্শন। আর তীর্থস্থানগুলি সারা দেশে এমন করে ছড়ানো রয়েছে যে দেশটার আদ্যোপান্ত ভালো করে না ঘুরলে তার দর্শনলাভই সম্ভব নয়। বাস্তবিক আমার তো এক-এক সময় মনে হয়, তীর্থদর্শনের পারলৌকিক পুণ্যের দিকটাই হয়তো একমাত্র বিবেচ্য নয়, তার ইহলৌকিক ফলশ্রুতিও যথেষ্ট মূল্যবান। আর আর্যঋষিরা সে ব্যাপারটার বিষয়ে সচেতনও ছিলেন যথেষ্টই। এবং ঠিক সেইজন্যেই তাঁরা তীর্থস্থানগুলিকে ছড়িয়ে রেখেছেন সারা দেশে। সেটা হল এখন আমরা বলি যাকে ইমোশনাল ইন্টিগ্রেশান, অর্থাৎ কিনা ভাবগত সংহতিবোধ, তাই। পারলৌকিক পুণ্যের টানে দেশের লোকেরা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ছুটে বেড়াবে এটা ঋষিরা ভালোই জানতেন। আর বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে জন্ম নেবে ইহলৌকিক ভাব-সংহতি। নানা দেশের লোকজনদের সঙ্গে মিশলে, তাদের ভালো করে জানলে গোটা দেশটাকেই আপন মনে হওয়া স্বাভাবিক। দেশপ্রেমেরও মূল উৎস নিহিত আছে সেখানেই।

একালে অবিশ্যি চলাফেরা খুবই স্বচ্ছন্দ হয়েছে। রেল-স্টীমার-মোটর তো বটেই মানুষ এখন আকাশেও উড়তে পারে। কাজেই আগেকার দু মাসের রাস্তা এখন দু ঘণ্টায় পাড়ি দেওয়া চলে। আর যাঁরা তা পারেন ঝোঁকটা এখন তাঁদের সেইদিকেই। ইউরোপ আমেরিকার ধনীব্যক্তিরা সারা পৃথিবীময় উড়ে বেড়াচ্ছেন এখন ভ্রমণের নেশায় মত্ত হয়ে। এয়ারলাইনগুলিও এখন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে এমন প্রোগ্রাম নিচ্ছেন যাতে পনের দিনে, এমনকি সাত দিনে সারা পৃথিবী ঘুরে দেখা যায়। এবং আজকের মানুষের যেহেতু সময় কম, অতএব পৃথিবীভ্রমণের কনডেন্সড কোর্সের চাহিদাও বেড়ে চলেছে হুহু করে।

কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, এ ভ্রমণের মধ্যে গভীরতা থাকে কতোটুকু? এক দেশের রাজধানীতে ব্রেকফাস্ট, অন্য দেশে লাঞ্চ এবং আরো একটা দেশে গিয়ে ডিনার খেলে ভ্রমণতালিকায় টিক দেওয়া যায় বটে, দেশটাকে কি দেখা হয় কিছু? দুঃখের বিষয়, এ প্রশ্নের উত্তর হল মস্তবড় একটি না। দেশ বা দেশের মানুষজনকে জানবার কোনো সুযোগই ঘটে না এতে। আর তা ঘটে না বলেই ভ্রমণে যেন আগেকার মতো তৃপ্তিও নেই। বরং গতির বেগ যতো বাড়ছে, মনের অস্থিরতাও ততো বাড়ছে। কিম্বা মনের অস্থিরতা বাড়ছে বলেই গতির বেগও বাড়ছে। ধনী দেশের মানুষেরা যেন দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সারা পৃথিবীতে। দেখে সন্দেহ জাগে, ভ্রমণ হয়তো এখন আর ওঁদের আনন্দ নয়, কর্তব্য কর্ম। ফি বছর কয়েকটা দেশে পা ছুঁইয়ে না আসতে পারলে সমাজে বোধকরি ওঁদের মানসম্মান থাকে না। কেননা, সমাজের অন্য সকলেই এখন তাই করছেন। অতএব ব্যাপারটা এখন হয়তো প্রতিযোগিতামূলক।

তবু, এসব হাস্যকর উপসর্গের কথা বাদ দিলেও, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ঘরে বসে থাকার চেয়ে ঘুরে বেড়ানো ভালো। ঘুরে বেড়ালে মনের মধ্যে আবিলতা জমতে পায় না, মনের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আসলে মানুষ তো যাযাবর ছিল এককালে। ঘুরে বেড়ানোর টান তার রক্তের মধ্যে। আজকের জীবনযাত্রায় বহুকালের অভ্যাসের ফলে এক-জায়গায় থিতু হয়ে বসবাস করা সম্ভব হয়ে উঠলেও, পুরনো নেশা লোপ পেয়ে যায়নি একেবারে। তাইতো এখনও ছুটিছাটার দিনে মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে আমাদেরও। এবং আমরা, অর্থাৎ নেহাতই যারা ছা-পোষা বাঙালি বলে খ্যাত, তারাও মাঝে মাঝে বাক্সবিছানা নিয়ে রেলগাড়িতে চেপে বসি। অবিশ্যি বেশিরভাগেরই পরমাগতি ঘটে দেওঘর, মধুপুর, ঘাটশিলা এবং ইত্যাদি জায়গায়। কিন্তু তার বাইরেও যে আমরা পা বাড়াইনে তা নয়। বরং পরিসংখ্যান ঘাঁটলে হয়তো দেখা যাবে দক্ষিণের সেতুবন্ধ থেকে উত্তরের অমরনাথ পর্যন্ত ভারতের সবগুলি তীর্থস্থানেই গত ষাট-সত্তর বছরে বাঙালি যতো গেছে অন্য প্রদেশের মানুষ তার সিকিভাগও যায়নি। এবং বাঙালিরা এত বেশি সংখ্যায় যায় বলেই বেশিরভাগ তীর্থের পাণ্ডাশ্রেণীর লোকেদের সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এখন বাংলা।

কিন্তু সে যাই হোক, আমার আসল কথা হল, ভ্রমণের নেশা মানুষের মজ্জাগত। এবং তার সব থেকে বড় প্রমাণ এই যে, যাঁরা ভ্রমণ করেন না, তাঁরাও ভ্রমণকাহিনী পড়েন। বরং তাঁরাই বোধকরি আরো বেশি করে পড়েন।

পৃথিবীর অন্য ভাষার কথা বাদ দিলেও এক বাংলাতেই ভ্রমণকাহিনী বেরোচ্ছে যথেষ্ট। বইয়ের বাজারে শোনা যায় এখন মন্দা যাচ্ছে, নয়তো এ সংখ্যা যে আরো অনেক বাড়ত তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, আজকের জীবনে তো সেই বটগাছের তলায় বসা সাধুব্যক্তিটি নেই যে, তাঁর মুখ থেকে আমরা দেশবিদেশের কথা শুনব। আজকে তার জন্যে খুঁজতে হয় আমাদের ভ্রমণসাহিত্য। দিব্যি আরাম করে ঘরে বসেই যাতে ঘুরে আসতে পারি হিমালয়ের গ্লেসিয়ারে বা রাজপুতনার মরুভূমিতে এবং পৃথিবীর যেকোনো দেশে। হুয়েনসাং কিম্বা মার্কো পোলো, অথবা পিজারো বা ক্যাপ্টেন কুক, কিম্বা লিভিংস্টোন অথবা হিলারীর ভ্রমণকাহিনী তো এখন ইতিহাসেরই অংগ। অথচ চমকপ্রদ উপন্যাস হিসেবেও তার তুলনা মেলা ভার।

অবিশ্যি পৃথিবীর সবথেকে অত্যাশ্চর্য (পাঠক, এই ডবল সুপারলেটিভের প্রয়োগ স্বেচ্ছাকৃত) ভ্রমণকাহিনী যে লেখা হয়নি এখনো তা স্বীকার করতেই হবে। কেননা সেটি লেখা হবে সেইসব মহাকাশ যাত্রীদের দ্বারা যাঁরা চাঁদে নামবেন, এবং তারপর পাড়ি জমাবেন অন্য গ্রহে। মানুষের সাহস ও মনীষার কী অপরূপ আলেখ্যই না সেদিন উদ্ঘাটিত হবে!

(২৫) ভুতুড়ে শহরের রহস্য

[illegible] বোম্বাই এ'টো প্লেটডিস নিয়ে বেরিয়ে গেল গুল মহম্মদ। ভীম দত্ত আবার হেলান দিয়ে জাহাজী চিমনির মত ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। অঘোর আর [illegible] আবার ম্যাগাজিনে নাক ডুবোলো। [illegible] সুখ-শান্তি-আনন্দে ভরা একটা অনুপম গার্হস্থ্য ছবি।

একা অখন্ডর প্রাণে শান্তি নেই। বুকে তার বোম্বাই মেল, চিন্তায় কুয়াশা। উসখুস করতে করতে একসময়ে উঠে পড়ল। গেল রান্নাঘরে। বেসিনে প্লেটডিস ধুচ্ছে গুল মহম্মদ। ক্রিয়াকলাপ দেখে কেউ বলবে না, লোকটা বংশপরম্পরায় বাবুর্চি নয়। কল্পনাও করতে পারবে না—তার আসল নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র, পেশায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

"দাদা"', মৃদুকণ্ঠে অখন্ডর।

ঝটপট হাত মুছে এগিয়ে এল ছদ্মবেশী গোয়েন্দা—"এখানে নয়। গ্যারেজের আড়ালে যাও।" অখন্ড গেল ঘুপসি অন্ধকারে। ইন্দ্রনাথও এদিক ওদিক দেখে পেঁৗছোলো সেখানে। বলল—"কি হল?"

"ভোকাট্টা হল! যা ভেবেছি, সব ভুল। রেডিও শুনেছেন তো? দনু ঘোষ জলজ্যান্ত বেঁচে।"

"ভালই তো।"

"ভালই তো! নাক-কান কাটা গেল, আর আপনি নির্বিকার?"

"আগেই বলেছি, বাঁধাধরা থিওরী নিয়ে আমি চলি না। চলাটা ভুল।"

"এখন কি করি বলুন তো?"

"কি আবার করবে? কসম যখন খেয়েছো, নেকলেস তোমায় দিতেই হবে। আটটা বাজতে বিশেষ দেরি নেই।"

'আমরা কি তাহলে আগাগোড়া ভুল তদন্ত করলাম?

ইন্দ্রনাথ জবাব দেওয়ার আগেই মরু-

আগের ঘটনা

[চল্লিশ বছর আগের সেই তরুণ প্রেমিক আজ প্রবীণ জহুরী খেমচাঁদ। আর সেদিনের প্রেমিকা শর্মিষ্ঠা তারই দোকানে বেচতে এলেন অনন্ত স্মৃতিজড়ানো ব্রাজিল থেকে আনা বজ্রমণির কন্ঠহার। কিনছেন একালের বৃহৎ ব্যবসায়ী ভীম দত্ত। নেকলেশ বোম্বেতে ডেলিভারী দেবার কথা ছিল।...হঠাৎ ট্রাঙ্ক কল। রাজস্থানেই কন্ঠহার ডেলিভারী দিতে হবে—নয়া ফরমান। আর তাতে পাওয়া গেল রহস্যের আমেজ, বোঝা গেল ফেউ লেগেছে। মুস্কিল আসানের ভার নিয়েই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র কুঁজোর ছদ্মবেশে হাজির হলেন রাজস্থানে, ভীম দত্তের বাংলোয়। নাম তার এখন গুল মহম্মদ, জবরদস্ত খানসামা। অখন্ড আলাদাভাবেই এসেছে এই বাংলোয়। রহস্য ঘনীভূত। ভীম দত্তের পোষা হীরামন মারা গেছে ইতিমধ্যে। বাংলোর একটি দেয়ালে গুলির দাগ, মারা গেছে একটি মানুষ, উধাও হয়েছে ভীম দত্তের পুরনো পিস্তল। হারিয়ে যাওয়া বুলেট দুটোর খোঁজ পাওয়া গেল। সেঁকো বিষের খালি টিনও পাওয়া গেল খেঁকি উপেনের কাছ থেকে। কলকাতা থেকে ফিরল ভীম দত্তের প্রিয় খানসামা মেহের খান। কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢুকতে না ঢুকতে তাকেও কেন কে গুলি করে হত্যা করল। আরো একটি খুন হল। কে-এক দনু ঘোষ এবার শিকার হল ভীম দত্তর। রেডিয়োর রোশনারা খাতুনের কন্ঠ। অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া গেল নতুন খবর। দনু ঘোষ মারা যায়নি। সে বেঁচে আছে।

ভূমির আধো অন্ধকার থেকে যেন উড়ে এল একটা মোটরগাড়ি। প্রচন্ড আর্তনাদ করে ব্রেক কষল গেটের সামনে। একটা অতি-পরিচিত মূর্তি লাফ দিয়ে নামল নিচে। গেট খোলার তর সইল না। গেট টপকে ঢুকল ভেতরে। দেখেই বাঁই বাঁই করে দৌড়ে গেল অখন্ড।

"দাশরথীবাবু যে! কি খবর?"

দারুণ চমকে উঠল ছায়ামূর্তি—"আরে! আপনাকেই যে খুঁজছি!" দাশরথীর কণ্ঠ অবরুদ্ধ, স্বর উত্তেজিত।

'কি হয়েছে?'

'ভ্রমর! ভ্রমরকে দেখেছেন?'

'ভ্রমর! কোথায় সে?'

"সকালবেলা ওয়েসিস কাফেতে একসঙ্গে কফি খেলাম। ও গেল তামার খনিতে। দুপুর নাগাদ ফিরে আসার কথা। কথা ছিল, রাত্রে একসঙ্গে খেয়ে সিনেমা যাবো। কিন্তু ও এখনো ফেরেনি।"

ফটকের দিকে পা বাড়ালো অখন্ড—"চলুন, যেতে যেতে শুনবো—"

ইন্দ্রনাথ এগিয়ে এল। চাঁদের মরা আলোয় হাতে কি যেন চকচক করে উঠল—"আমার অটোমেটিকটা নিয়ে যাও। কাজে লাগবে।"

"দরকার নেই। আমার হাত আছে।"

"হীরের মালা?"

"ফিরে আসি, তারপর।" বলেই গেট টপকে উঠে বসল গাড়িতে। দাশরথী আগেই স্টিয়ারিং ধরেছিল। ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই বসবার ঘরের দরজা খুলে গেল। দোর-গোড়ায় আলোর পটভূমিকায় আবির্ভূত হল ভীম দত্তর বিশাল বপু।

"কে যায়?"

'ফ্যানটমাস যায়', মনে মনেই বলল অখন্ড। দাশরথীর পাকা হাতের মোচড়ে গাড়ি অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরল এবং প্যান্থারের মত লাফ মেরে এগিয়ে গেল সামনে।

অখন্ড বলল—"ভ্রমরের কি হয়েছে বলে মনে হয়?"

"বলা মুস্কিল। জায়গাটা ভাল নয় তো। মাঝে মাঝে কুয়োর মত গর্ত, ইট পাথরের স্তূপ। বিপদের কি আর শেষ আছে? এক একটা পাতাল সুড়ঙ্গ কয়েকশ ফুট গভীর—"

"জোরে, আরো জোরে।"

"এর বেশি স্পীড এ গাড়িতে ওঠে না। ভীম দত্ত নেকলেস পেয়েছেন?"

"না। এইমাত্র একটা ঘটনা ঘটল", বলে, রেডিওতে রোশনারার কথাগুলো বলল অখন্ড।

"ও নিয়ে পরে মাথা ঘামাব। এখন শুধু ভ্রমর," বলল দাশরথী।

ঠিক তখনি কক্ষচ্যুত উল্কার মত একটা গাড়িকে সামনে থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল। গা ঘেঁসে সাঁ করে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে পলকের মধ্যে দেখা গেল, গাড়িটা ট্যাক্সি।

দাশরথী বলল—"পেছনের সিটে কে যেন বসে।"

"ভীম দত্তর বাংলোয় আবার কে যাচ্ছে?"

"পরে দেখব। এখন শুধু ভ্রমর"

●

এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি পথে এসে পড়ল গাড়ি। লাফাতে লাফাতে নাচতে নাচতে ছুটল সনাতনী ফোর্ড। ড্যাশ-বোর্ডের আলোয় দেখা গেল দাশরথীর চিবুক কঠিন, আশ্চর্য উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ চোখ দুটোও কঠিন। শ্যামবর্ণ মূর্তিটি যেন কালো পাথরে খোদাই।

বেশ কয়েকটা পাকদন্ডী ঘুরে নেচে-কুঁদে গাড়ি পাহাড় পেরুলো। উঁচু রাস্তা থেকে দেখা গেল ভুতুড়ে নগরী। চাঁদের হলুদ আলোয় বিবর্ণ। দেখলে গা ছমছম করে।

অখন্ড বললে—"এমন ফুটফুটে মেয়েটা কেন যে মাঠেঘাটে এমনি একা-একা ঘুরে বেড়ায়। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই ওকে ঘরণী করে বাউন্ডুলে স্বভাব ঘোচায়?"

"সে গুড়ে বালি। ভ্রমর বলে, বিবাহ হল ভীরুতার লক্ষণ। একক থাকবার মত বুকের পাটা কজনের আছে?"

"তাহলে বাগদত্তা হতে গেল কেন?"

"কার বাগদত্তা?"

"শক্তিশেলের। নামতো নয়, যেন লোহার মটর!"

"শক্তিশেল!"

"আরে মশাই, ঐ লোকটাই তো আংটিটা দিয়েছে ভ্রমরকে।"

অট্টহাস করল দাশরথী। কিছু বলল না।

"হাসলেন যে বড়?" সন্দিগ্ধ কণ্ঠ অখন্ডর।

"আপনাকেও বোকা বানিয়েছে ভ্রমর। ও আংটি শক্তিশেলের নয়। মায়ের। রক্তমুখী চুণীটা শুধু নতুন সেটিংয়ে বসিয়ে নিয়েছে।"

"মায়ের আংটি!"

"হ্যাঁ। ওটা ওর বর্ম।"

"বর্ম!"

"যাতে ধিনিকেষ্টরা ওকে বিয়ে করার বায়না না ধরে।"

"অ," যেন, অখন্ডর নাভির মধ্যে থেকে অক্ষরটা বেরিয়ে এল। বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো কথা নেই। তারপর—"ও'র কাছে আমি তাহলে একটা ঢ্যামনা চরিত্র?"

"সেটা আবার কি?"

"নইলে ধিনিকেষ্ট বলবেন কেন?"

"আপনার সম্বন্ধে ওর ধারণা ওর মনের মত"। কিছুক্ষণ থেমে—"ভ্রমরকে নিয়ে প্ল্যান আছে নাকি?"

"আছে তো অনেক। জীবনটাকে নষ্ট করতে কে চায় বলুন।"

"তা তো বটেই।"

"আমি একটা গর্দভ। যেমন ধিনধিনু করে নেচেছি, ঠিক নামই হয়েছে। ধিনিকেষ্ট! খাসা নাম!" কিছুক্ষণ নীরবতার পর—"আর কদ্দূর?"

"এই তো" ছক্কর গাড়ি লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল প্রেত-নগরীর দিকে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল অখন্ড-নারায়ণ। এখানে সেখানে বড় বড় চিমনি। রাস্তার পর রাস্তা। বাড়ির পর বাড়ি। এখন ভাঙাচোরা। ধ্বংসস্তূপে বাদুড়ের বাসা। নিশাচরের আস্তানা। অথচ এক-সময়ে এই নগরীতে কর্মচাঞ্চল্য ছিল, ছিল ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা, বস্তা বস্তা টাকার খেলা। আজ কিছু নেই। অনন্ত-কাল প্রহরী অতন্দ্র সাক্ষী শুধু একটি সত্যের—মানুষ নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তার আত্মা।

একটা মাথাভাঙা বাড়ি দেখিয়ে দাশরথী বলল—"এককালে থিয়েটার হল ছিল।" তার পাশের বাড়িটা দেখিয়ে বলল—"দেখছেন তো, এতদিনেও এ বাড়ি আস্ত। আস্ত রাখার জন্যেই আগাগোড়া পাথরের গাঁথনি

করা হয়েছিল। কেন জানেন? জেলখানা বলে। তাম্রনগরীর কয়েদখানা।"

"জেল!"

"ওকী! আলো! তাই না?" অকস্মাৎ খাদে নেমে এল দাশরথীর কণ্ঠ।

সত্যিই একটা ম্যাড়মেড়ে আলো জ্বলছিল পুরোনো জেলখানার জানলায়। কিসের আলো? অলৌকিক নিশানা কি? শ্মশান থেকে উঠে আসা কঙ্কালসার কারাধ্যক্ষের হাতছানি?

কপোল-কল্পনার সময় ছিল না। অখন্ড বলল—"শুনুন। অস্ত্র যখন নেই, বুদ্ধি খাটাতে হবে। আপনি গাড়ি দাঁড় করান। আমি নেমে আড়ালে দাঁড়াই। যদি কেউ হানা দেয় আপনার ওপর, আমি আছি।"

থামল গাড়ি। টুক করে দরজা খুলে ওপাশে গা-ঢাকা দিল অখন্ড। প্রায় সংগে সংগে একটা কৃশ মূর্তি জেলখানার বাইরে এসে দাঁড়াল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল গাড়ির দিকে।

"কি চাই?" গলা শুনেই রক্ত ছলাৎ করে উঠল অখন্ডর। ঢোঁড়া বাসুকির অন্তর্ধান-রহস্য এবার পরিষ্কার হল।

দাশরথী চিমটি কাটল—"আমি তো জানতাম, কপার মাইনে প্যাঁচা আর বাদুড় থাকে। মানুষ থাকে জানতাম না তো। আশ্চর্য!"

ঢোঁড়া বাসুকি বলল—"খনি আবার চালু করা যায় কিনা, কোম্পানী ভাবছে।"

"নতুন তামা পাওয়া গেল নাকি?"

"চেষ্টা চলছে। আপনি সড়ক থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন। বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যান।"

"যাবার আগে খুঁজতে হবে তো।"

"কাকে?"

"এক ভদ্রমহিলাকে। সকালে এদিকেই এসেছিল। আপনি দেখেছেন?"

"এক হপ্তার মধ্যে কেউ এ অঞ্চল মাড়ায়নি।"

"তাই নাকি? যদি কিছু মনে না করেন তো জেলখানার ভেতরে ঢু মেরে যাই।"

"আর যদি মনে করি?"

"কেন করবেন?"

"আমার খুশি। আমি একা। কাজেই ঝুঁকি নিতে চাই না। ট্যাঁটিয়াপনা করবেন না। গাড়ি ঘুরিয়ে নিন।"

"ওকি? পিস্তল দেখাচ্ছেন কেন? আমি ছাপোষা—"

"ছাপোষা লোকের অত জাঁহাবাজি কেন? বলছি কেউ নেই এখানে—"

ঢোঁড়ার কথা আর শেষ হল না। আচম্বিতে গাড়ির পেছন দিকে লাফিয়ে উঠল একটা দীর্ঘ মূর্তি। চকিতে পিস্তল ঘোরালো ঢোঁড়া। তার আগেই ছায়ামূর্তির বজ্রমুষ্টি এসে পড়ল ঢোঁড়ার মণিবন্ধে। নির্জন নগরী কেঁপে উঠল পিস্তল-নির্ঘোষে। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পরমুহূর্তেই লোহার মত মুঠি দিয়ে কব্জি চেপে ধরে পিস্তলধার শুদ্ধ হাতটা এক ঝটকায় ঘুরিয়ে নিয়ে কাঁধের ওপর রাখল অখন্ড। এক সেকেন্ডও সময় না দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল নিচের দিকে। যুযুৎসুর মোক্ষম প্যাঁচ। খট করে একটা আওয়াজ হল। কঁকিয়ে উঠল ঢোঁড়া বাসুকি। রিভলবার শিথিল মুষ্টি থেকে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

টপ করে হাতিয়ার হাতে নিল অখন্ড। দাশরথীর হাতে পাচার করে দিয়ে বলল—"বুকের দিকে তাগ করে থাকুন। ঘাবড়াবেন না। কনুইয়ের হাড় খুলে দিয়েছি। তা সত্ত্বেও যদি ট্যাঁ-ফোঁ করে তো সোজা গুলি করবেন।"

গোঙাতে গোঙাতে ঢোঁড়া বাসুকি অশ্লীল গালাগাল দিল। সপেটা চপেটাঘাত করল অখন্ড। বলল—"অনেকদিন ধরেই এই সুযোগ খুঁজছিলাম। শিয়ালদা স্টেশন থেকে তোমার কেরদানি শুরু, কিন্তু এই শেষ। মাঝখানে আমার ঊনপঞ্চাশ টাকা গচ্চা করেছো। বেটা ছুঁচো কোথাকার—"

"খবরদার মুখ খারাপ করবেন না।"

আবার ঠাস করে চড় মারল অখন্ড—"তবে এস জামাইআদর করি। দরজায় নতুন তালা ঝুলছে দেখছি। চাবি কোথায়?"

"জেলে কিছু নেই বারবার বলছি—"

"সেটা আমি দেখব," বলেই পকেট-সার্চ করল অখন্ড। পাওয়া গেল একতাড়া চাবি। গাড়ি থেকে টর্চ নিয়ে পোঁছোলো জেলের দরজায়। তালা খুলে ঢুকল ভেতরে। প্রথমেই একটা বড় ঘর। এককালে অফিস ছিল। জানলা দিয়ে চাঁদের মরা আলো এসে পড়ল ধূলিধূসরিত একটা টেবিলে, আলমারিতে, সিন্দুকে। টেবিলে একটা খবরের কাগজ। টর্চের আলোয় তারিখ দেখল অখন্ড—এক সপ্তাহ পুরোনো।

ঘরের পেছনে লোহার পাত মারা দুটো ভারি দরজা। দুটোতেই নতুন তালা ঝুলছে। বাঁদিকের দরজাটা খুলল অখন্ড। ছোট্ট একটা ঘর। পায়রার খুপরির মত। উঁচু জানলায় মোটা মোটা গরাদ। টর্চের আলোয় দেখা গেল, একটি তন্বী মেয়ে। দীর্ঘাঙ্গী। রাজহংসী গ্রীবা। তেজী চেহারা। শান দেওয়া চোখ।

ছুটে এল মেয়েটি। এবার স্পষ্টই দেখল অখন্ড। সাহানা দেবী।

আঁটসাট কার্ডিগ্যানের অন্তরালে ফুলে উঠল সাহানার পীবর বক্ষ দুরন্ত উচ্ছ্বাসে। দুহাতে অখন্ডর হাত জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়ল কান্নায়—'আপনি?' মুহূর্তের মধ্যে ঔদ্ধত্য, অহমিকা, দম্ভ চূর্ণ হল গরবিণী সাহানার।

অখন্ড হকচকিয়ে গেল—'আরে! আরে! করেন কি? কোনো ভয় নেই।'

বলতে বলতেই ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে এগিয়ে এল আর একটি মেয়ে। কৃষ্ণকালো তনু তার। যেন নিকষ পাথরে খোদাই। বলল মিষ্টি হেসে শান্ত স্বরে—'এসেছেন? আমি জানতাম।'

ভুরু কুঁচকে অখন্ড বলল—'আসার কথা ছিল কিন্তু শার্লক হোমসের, ধীনিকেষ্ট বক্স-জঞ্জালের নয়।'

হাসল কৃষ্ণপ্রিয়া। বলল—'কি আস্পর্ধা দেখুন তো। সকালে এসে ছবি তুলছি, এমন সময়ে', চন্দ্রালোকিত রাস্তার ঢোঁড়া বাসুকিকে দেখিয়ে—'ঐ লোকটা এসে বলল ছবি তোলা চলবে না। আমি শুনলাম না। তখন আমাকে পিস্তল দেখিয়ে এখানে এনে আটক করল। এমনিতে দিব্বি ভদ্র, কিন্তু—'

'ভদ্র না হলে ওর চোয়ালটাও খুলে দিতাম', বলল অখন্ড। 'আসুন সাহানা দেবী। ভুতুড়ে ঘরে দম আটকে আসছে—'

কথা শেষ হল না। পাশের দরজায় কে যেন দুমদাম শব্দে লাথিঘুঁষি মারছে। হতভম্ব চোখে দুই তন্বীর দিকে তাকালো জহুরী-তনয়।

কৃষ্ণপ্রিয়া বলল—'তালা খুলে দিন।'

অখন্ড তালা খুলল। এক ধাক্কায় দুহাট করল পাল্লা। অন্ধকারের মধ্যে থেকে টর্চের আলোয় এসে দাঁড়াল একটি পুরুষ মূর্তি।

আঁৎকে উঠল অখন্ড। ত্রস্তে পিছু হটতে গিয়ে ধাক্কা খেল টেবিলে। বিহ্বল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল বারবার—'ভুতুড়ে শহর! ভুতুড়ে শহর।

●

মরু-বাংলো থেকে দাশরথীর বৃদ্ধ ফোর্ড তেড়েমেড়ে বেরিয়ে আসার সময়ে বিপরীত থেকে একটা ট্যাক্সি খসে-পড়া-তারার মত পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। চলন্ত ট্যাক্সির পেছনে আসীন মানুষটিকে অখন্ডনারায়ণ দেখেনি। দেখলে ভ্রমণের চিন্তা মাথা থেকে উড়ে যেত। গাড়ি ঘুরিয়ে বাংলোয় ফিরত।

ট্যাক্সির আরোহীও ফোর্ডের অখন্ডকে দেখতে পায়নি। শুধু দেখল বিস্তর গোলমাল করতে করতে বালি উড়িয়ে একটা সেকেলে গাড়ি উধাও হল পাশ দিয়ে। দুজনে দুজনকে দেখলে দুটো গাড়িই ব্রেক কষতো এবং মরুভূমির মাঝে নতুন নাটক জমত।

কিন্তু তা হল না। স্টেশন থেকে ছুটতে ছুটতে ট্যাক্সিখানা পৌঁছালো ভীম দত্তর বাংলোয়। ড্রাইভার নামল। ঠেলঠুলে ফটক খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু আরোহীর তর সইল না। তড়াক করে লাফিয়ে নামল নিচে। বলল—'থাক, থাক, ভাড়া কত হল?'

লোকটা যেন একটা চলমান জালা। সর্বাঙ্গে ভোগের লক্ষণ। ভোঁতা নাক। চিবুকে চর্বির ঝালর। চোখ নিষ্প্রভ। দেখেই বোঝা যায়, বুদ্ধিটাও মোটা। কিন্তু পোশাকে বিলক্ষণ পারিপাট্য আছে। ট্যাপসা চেহারাকে সযত্নে মুড়ে রাখা হয়েছে শান্তিপুরী ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি দিয়ে। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে পৌঁছোলো সদর দরজায়। গায়ের জোরে তিনবার গাঁট্টা মারল পাল্লায়।

বসবার ঘরে উপেন আর অঘোরের সঙ্গে কথা বলছিলেন ভীম দত্ত। গাঁট্টার প্রচণ্ড শব্দে বিরক্ত হলেন। উপেন উঠল। দরজা খুলতেই ওক চৌকাঠ সরিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকল চলমান জালা।

বলল—'আমি ভীম দত্তর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

সোফা ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়ালেন যক্ষপতি—'আমার নাম ভীম দত্ত। কি চান?'

নমস্কার করল আগন্তুক। বলল—'আমার নাম মরিচি বর্মা। কলকাতায় আপনি যে হীরের নেকলেস কিনেছেন, আমি তার অন্যতম মালিক।'

ভীম দত্তর বিরক্ত মুখে নিমেষে খুশির হাসি খেলে গেল। বললেন—'নমস্কার, নমস্কার। অখণ্ড অবশ্য বলছিল, আপনি আজ আসবেন—'

'অখণ্ডবাবু কি করে জানলেন আমি আসছি?'

'আপনিই যে আসছেন তা বলেনি। বলেছে, আজ রাত আটটায় হীরের নেকলেস পেঁছোবে—'

চোখদুটো গেঁড়ির চোখের মত বার করে ফেলল মরিচি বর্মা—'নেকলেস রাত আটটায় পৌঁছোবে মানে? নেকলেস তো এক হপ্তা আগেই কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে! অখণ্ডবাবু অ্যাদ্দিন কি ঘুমোচ্ছিলেন?'

'হোয়াট!' থর থর করে কেঁপে উঠল ভীম দত্তর বিখ্যাত আঁচিল, আরক্ত হল মুখ। 'সাতদিন আগে নেকলেস নিয়ে এসেছে অখণ্ড। অ্যাদ্দিন ধরে আমার সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছিল! ফক্কড় ছোঁড়া! তুলে আছাড় মারবো, আসুক ফিরে।'

ভীম-কণ্ঠের রণ-দামামা শুনেই চুপসে গেল মরিচি। হেঁ হেঁ করে হেসে বলল—'নেকলেস কিন্তু অখণ্ডবাবুর কাছে নেই।'

'কার কাছে আছে?'

'ইন্দ্রনাথ রুদ্রের কাছে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কোমরের বেল্টে বেঁধে এনেছে। সেই সঙ্গে ছদ্মবেশ পরেছে। কুঁজো মুসলমানের।'

স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন ভীম দত্ত। ক্রূর হাসিতে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল ঠোঁটের প্রান্ত। বললেন—'বটে! কুঁজো মুসলমানের কোমরের বেল্টে আছে হীরের নেকলেস। নাম তার ইন্দ্রনাথ রুদ্র, প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মিঃ বর্মা, মিনিট কয়েকের জন্যে আপনাকে পাশের ঘরে বসতে হবে। আমি ডাক দিলেই আসবেন।' বলে নিজেই চলমান জঞ্জালকে নিয়ে বসিয়ে এলেন পাশের ঘরে। ফিরে এসে সিংহনাদ করলেন—'গুল মহম্মদ!'

কড়িকাঠ পর্যন্ত কেঁপে উঠল সেই ডাকাতে-হাঁকে। গুটি গুটি ঘরে ঢুকল ন্যুব্জপৃষ্ঠ ডিটেকটিভ—'ইয়েস, স্যার?'

'গুল মহম্মদ, তোমার নাম তো গুল মহম্মদ, তাই না?' ভীম দত্তর পিংগল চক্ষু এবার রক্তাক্ত।

'ইয়েস স্যার।'

'তুমি পাকিস্তানে ছিলে, তাই না?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তুমি লরী চালাতে, রেলে কাজ করতে, তাই না?'

'ইয়েস, স্যার।'

'দাড়িটা তোমার নিজের, তাই না?'

'ইয়েস, স্যার।'

'কুঁজটা? ওটাও নিজের?'

'কি বলছেন, স্যার?'

'বলছি, তুমি একটা ফিচেল মিথ্যুক ফক্কুড়ির জায়গা পাওনি? ব্লাডি ফুল।'

ভাঙা চশমার আড়ালে গুল মহম্মদের চোখের পাতা একটুও কাঁপল না। সিল্কের মত মসৃণ গলায় শুধু বলল—'গালাগাল দেবেন না।'

'শাট আপ! মিঃ বর্মা!' হাঁকডাক শুনেই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল মরিচি। এখন সুট করে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই দাঁড়কাক-কাকলী করে উঠল—'এসব কি হচ্ছে ইন্দ্রনাথবাবু? সাতদিন আগে নেকলেস নিয়ে এসেছেন, এখনো দ্যাননি কেন?'

দুই চোখে ছুরি আর গলায় বরফের চাঙড় বসিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ—'সে-কৈফিয়ৎ তোমায় দেব না।'

'কেন দেবেন না? আমিও নেকলেসের মালিক।'

'হতে পারে। কিন্তু নেকলেস আগলাবার ভার তোমার মা আমাকে দিয়েছেন। তিনি না বলা পর্যন্ত আমি যা ভাল বুঝব করব।'

'মা চিঠি দিয়েছে আপনাকে, এই দেখুন' রাগের চোটে দাঁড়কাক-কাকলী এবার শঙ্খচিলের ডাক হয়ে গেল।

নির্বিকার মুখে চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিল ইন্দ্রনাথ। চোখ বুলোলো। তারপর জামা তুলে কোমরের বেল্টের খুপরি থেকে বার করল বজ্রমণির কণ্ঠহার। ভীম দত্তর হাতে তুলে দিয়ে বলল—'আমার কাজ ফুরোলো।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলেন ভীম দত্ত। পেছনে থেকে বিস্ময়বিস্ফারিত অঘোর মল্লিক বলল—'ওয়াণ্ডারফুল!' উপেনের পাথরের চোখও বুঝি সহসা জীবন্ত হয়ে উঠল।

ইলেকট্রিক আলোয় বর্ণচ্ছটার ঝলক ছড়াতে লাগল বজ্রমণির মালা। প্রভা-দ্যুতির আড়ালে রামধনু রোশনাই। ব্রেজিল থেকে আনা তেইশটা রক্ত-পাথরের কুঁচ—যেন করমচার মালা। কিন্তু অপার্থিব তার রঙ, রোশনাই, আকর্ষণ।

ভীম দত্তর সম্বিৎ ফিরল ইন্দ্রনাথের কথায়—'একটা রসিদ লিখে দিন।'

'নিশ্চয়' বললেন, ভীম দত্ত। 'রসিদ তৈরি করেই রেখেছি। সই করে দিচ্ছি।' টেবিলে নেকলেস রাখলেন ভীম দত্ত। ব্লটিং পেপারের ফাঁক থেকে বার করলেন টাইপ-করা এক তা কাগজ। ধীরেসুস্থে সই করে কাগজটা এগিয়ে দিলেন ইন্দ্রনাথ রুদ্রের দিকে।

আচম্বিতে একটা বিচিত্র আলো খেলে গেল ছদ্মবেশী গোয়েন্দার হীরক-উজ্জ্বল চোখে। এক হাতে সে রসিদ নিলে। পরক্ষণেই এক ঝটকায় টেবিল থেকে তুলে নিল হীরের নেকলেস। ভীম দত্তও ছোঁ মারলেন, কিন্তু তার আগেই রক্ত-হীরের মালা অদৃশ্য হল গুল মহম্মদের ঢিলাঢালা আলখাল্লার কোন এক রন্ধ্রে।

সাপের লেজে পা পড়লে যেমন ফুঁসে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে নিমেষে গর্জে উঠলেন ভীম দত্ত। 'তবে রে' বলেই ড্রয়ার টেনে ঝট করে তুললেন রিভলবার।

পিস্তল নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ভীম দত্তর রিভলবার ঠিকরে পড়েছে, হাত দিয়ে তাঁর রক্ত ঝরছে, আর ধোঁয়া-ওঠা রিভলবার উঁচিয়ে পাথরকঠিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। তার ডান পা'টা ভীম দত্তর পড়ে-থাকা রিভলবারের ওপর।

সিল্কের মতই মসৃণ কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের—'দুঃখিত, কিন্তু এতদিনে সত্যিই আমার কাজ শেষ হল। মরিচি, ঘরের ঠিক মাঝখানে চারটে চেয়ার পর পর সাজাও।'

সিংহ গলার প্রচণ্ড ধাক্কা এড়ানোর ক্ষমতা মরিচির ছিল না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে হুকুম তামিল করল।

ইন্দ্রনাথ বলল—'এবার আপনারা একে একে গিয়ে চেয়ারে বসুন। খবরদার চালাকি করলেই খোঁড়া করে দেব। অঘোর মল্লিক, আপনার পকেটে একটা রিভলবার আছে, ওটা পায়ের কাছে ফেলে যান। ঠিক আছে। উপেন নন্দী, পকেট থেকে রুমাল বার করুন। বেশ, বেশ। বসের হাতে থেকে রক্ত পড়ছে, বেঁধে দিন। ফাইন। মরিচি, তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না। বসে পড়ো। নইলে একটি গুলীতে তোমার মায়ের সব সম্ভাবনা নামিয়ে দেব। এই তো চাই। জেন্টেলমেন এখন সবাই জিরিয়ে নিন। অখণ্ডনারায়ণ ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এই বসলাম এখানে। দুহাতে দুটো রিভলবার দেখছেন তো? দুহাতেই সমান গুলী চলে একচুলও এদিক ওদিক হয় না। সুতরাং একটা আঙুলও নাড়াবেন না। গুড, ভেরি গুড।'

ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

[আগামী সংখ্যায় শনু ঘোষের আরো রহস্য]।
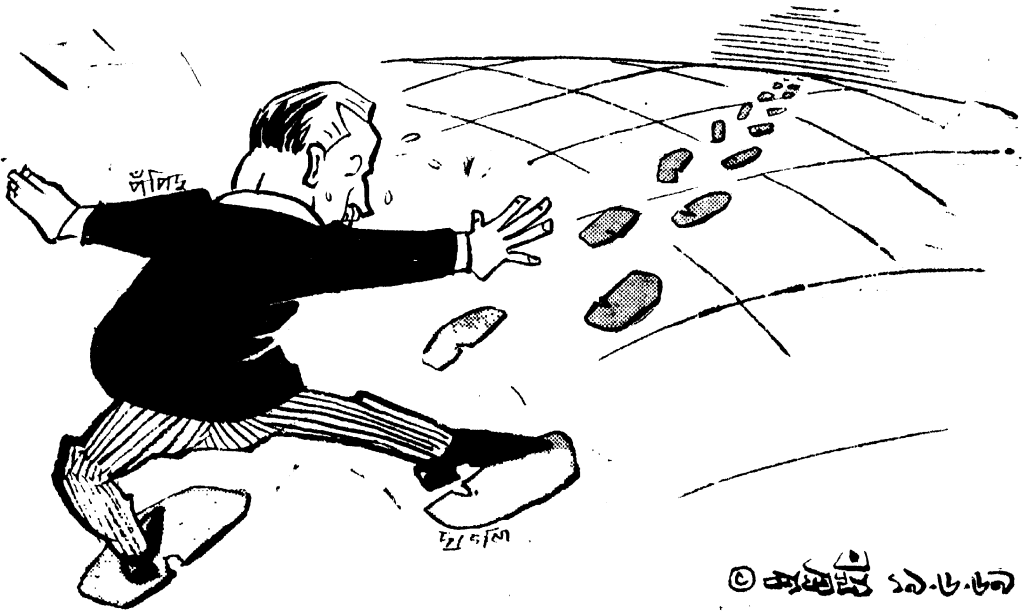
জেনারেল মানেকশ

ভারতের স্থলবাহিনীর প্রধানরূপে জেনারেল স্যাম হরমুসজি ফ্রামজি জামশেদজী মানেকশ-র নিয়োগ নানা কারণে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পাকিস্থানের সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে, প্রবীণতর অফিসারদের ডিঙিয়ে জেনারেল মানেকশকে সেনাপতি পদ দেওয়া হয়েছে। কেননা, তাঁকে না ... ঐ পদ দিতে হত একজন শিখ জেনারেলকে। ভারতে শিখরা হিন্দুদের দ্বারা কিরকম নিগৃহীত হচ্ছে তার গল্প রচনার পক্ষে পাকিস্থানী সংবাদপত্রের এই কাহিনী নিশ্চয়ই খুব উপযুক্ত। কিন্তু পাকিস্থানী সাংবাদিক উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন অথবা ইচ্ছা করেই চেপে গেছেন যে, মানেকশ হিন্দু নন, তিনি পার্শী।

অবশ্য জেনারেল মানেকশ হিন্দু অথবা পার্শী সেটা নিশ্চয়ই তাঁর নিয়োগের সময় বিবেচনার মধ্যে আসে নি। তবে, ভারতীয় সংবাদপত্রের জল্পনা-কল্পনা যদি ঠিক হয় তাহলে তাঁর নিয়োগ সম্পর্কে উপরের মহলে কতকটা দ্বিধাসংশয় ছিল। তার প্রধান কারণ হল এই যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে জেনারেল মানেকশ-র জনপ্রিয়তা ও অসামরিক জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর মেলামেশাকে উপরের মহলের কেউ কেউ সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। এমন একটা কথাও রটে গিয়েছিল যে, ভারতবর্ষে কোনদিন যদি সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে ওঠে তাহলে সেই অভ্যুত্থানের নায়ক হবেন জেনারেল স্যাম হরমুসজি ফ্রামজি জামশেদজী মানেকশ।

আজ বলে নয়, জেনারেল মানেকশকে ঘিরে অনেকদিন আগে থেকেই বিতর্ক চলছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনানায়ক সম্প্রতি সংবাদপত্রের প্রবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ মেনন যদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকতেন তাহলে সামরিক অফিসাররূপে মানেকশ-র আয়ু ফুরিয়ে যেত মেজর জেনারেলের পদে এসেই।"

মানেকশ-র প্রতি শ্রীমেননের বিরাগের সূচনার ইতিহাসটি নাকি এরকম।—তখন মানেকশ একটি ইনফ্যানট্রি ডিভিসনের অধিনায়ক ছিলেন। ঐ ডিভিসনের সৈনিকরা নিজেরা কতকগুলি ছাউনি তৈরী করেছিলেন। এই ছাউনিগুলির উদ্বোধন করার জন্য জেনারেল তিমায়াকে আমন্ত্রণ করা হবে বলে ডিভিসনের সৈনিকরা স্থির করলেন। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তখন ডিভিসনের সৈনিকরা তাঁদের অধি-

নায়ক মানেকশকে ঐ অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানাবার সিদ্ধান্ত করলেন। দেশ-রক্ষা-মন্ত্রী হিসাবে শ্রীমেনন নাকি সে সময় আশা করেছিলেন যে, ঐ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান হবে এবং সেই আমন্ত্রণ না আসায় তাঁর সঙ্গে মানেকশ-র মন কষাকষি হয়েছিল।

পরে মানেকশ যখন ওয়েলিংটনের স্টাফ কলেজের অধিনায়ক ছিলেন তখন তাঁকে যে সামরিক তদন্ত আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল সেটা নাকি মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর এই মন-কষাকষিরই ফল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি আনুগত্যহীন ও জাতীয়তাবিরোধী। একজন বিদেশী সামরিক অ্যাটাশি মানেকশকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কবে প্রমোশন পেয়ে দিল্লীতে আসছেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? দিল্লীতে উপরওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করুন।" এই উক্তির জন্যই আনা হয়েছিল মানেকশর বিরুদ্ধে আনুগত্যহীনতার অভিযোগ। স্টাফ কলেজের মেসে তিনি বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল ও জেনারেলদের ছবি টাঙিয়ে রাখতে দিয়েছেন, এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তা-বিরোধিতার অভিযোগ।

সামরিক তদন্ত আদালতের সভাপতি লেঃ জেনারেল যোগীন্দর সিং সাক্ষ্যপ্রমাণাদি শুনে মানেকশকে সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। আদালত পরিষ্কার রায় দেন—মানেকশ আনুগত্যহীনও নন, জাতিদ্রোহীও নন। সামরিক অফিসারকে প্রমোশন দেওয়ার মালিক দিল্লীর উপরওয়ালারা, এই কথা বলার মধ্যে ভুল বা অন্যায় কি আছে সেটা তদন্ত আদালত বুঝতে পারেন নি। বৃটিশ সেনাপতিদের ছবি রাখা সম্পর্কে মানেকশ-র কৈফিয়ৎ ছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিশেষ করে এই স্টাফ কলেজের সঙ্গে অতীতের সম্পর্কযুক্ত এইসব বৃটিশ সেনাপতির ছবি বেলুচিস্থানের কোয়েটায় অখন্ড ভারতের স্টাফ কলেজের সম্পত্তি ছিল এবং ভারত বিভাগের পর সেগুলি ভারতের ভাগে পড়েছে। ওয়েলিংটনের স্টাফ কলেজের মেসের দেওয়ালে ঐ তৈলচিত্রগুলি প্রথম থেকেই রয়েছে। অবশ্য, মানেকশকে তদন্ত আদালতে সোপর্দ করার আগে কখনও সেবিষয়ে আপত্তি শোনা যায় নি।

"স্যাম" মানেকশই ভারতের প্রথম স্থল সেনাপতি যাঁর মাথায় গোর্খা টুপি। "ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট" পাকিস্থানের ভাগে পড়ার পর থেকে তিনি গোর্খা-বাহিনীর সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন, তারই স্মারক ঐ টুপি। "স্যাম" মানেকশ সম্পর্কে আর একটি "প্রথম" হচ্ছে, তিনিই প্রথম সেনাপতি যিনি ভারতীয় মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে তালিম পেয়েছেন। তাঁর আগে আর সব ভারতীয় সেনাপতিই তালিম নিয়েছেন বৃটেনের স্যান্ডহার্স্টে।

৫ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৫৫ বছর বয়সের এই পেশাদার সৈনিকের চোখে সব সময় কৌতুকের হাসি, মুখে বুরুশের মত একজোড়া গোঁফ, ছিমছাম, পাতলা চেহারা। ১৯৩৪ সালে "কমিশন" লাভ করার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি বর্মায় লড়াই করেছেন। বর্মার লড়াইয়ে দুবার তাঁর শরীরে চোট লাগে। একবার তাঁর পেটে গুরুতর আঘাত লাগে। কাশ্মীরে লড়াইয়ের সময় তিনি সামরিক যানবাহন চলাচলের পরিচালক ছিলেন। কাশ্মীর সম্পর্কে তিনি শ্রীবি এন রাওয়ের সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন। স্থলবাহিনীর সদর দপ্তরে সামরিক শিক্ষণের ডিরেক্টর এবং চীনা আক্রমণের অব্যবহিত পরে নেফার কোর কম্যান্ডারের পদও তিনি অধিকার করেছিলেন। ভারতের স্থল-বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে যাওয়ার আগে জেনারেল মানেকশ ছিলেন পূর্বাঞ্চলের সামরিক বাহিনীর জিও সি-ইন-সি। বর্মার যুদ্ধে জাপানীদের সঙ্গে লড়াইয়ে কৃতিত্বের জন্য তিনি মিলিটারি ক্রস পেয়েছেন এবং ১৯৬৭ সালে নাথুলা ও চোলায় চীনা হুমকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ব্যাপারে কৃতিত্বের জন্য পেয়েছেন "পদ্মভূষণ"।

জেনারেল মানেকশ তাঁর অধস্তন সৈনিকদের সঙ্গে মিশে আনন্দ পেয়েছেন। গোর্খা বাহিনীর সেনাপতিরূপে তিনি শুধু গোর্খালি ভাষা বলতেই শেখেন নি, গোর্খালিতে গান গাইতেও শিখেছিলেন। আজও তিনি গুর্খা ব্রিগেডের প্রেসিডেন্ট ও অষ্টম গুর্খা রাইফেলস বাহিনীর কর্ণেল। সম্প্রতি তিনি নাথুলায় গিয়েছিলেন। সেই বিজন, বন্ধুর, শীতার্ত পর্বতচূড়ায় জওয়ানরা যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে দেশরক্ষার দায়িত্ব পালন করছেন তা দেখতে গিয়ে সেনাপতি অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা লাভ করেন। সেখানে শিখবাহিনী মানেকশ-র জন্য "চাট" ও গরম জিলাপির ভোজসভার আয়োজন করেন। শারীরিক পটুতা সম্পর্কে সচেতন জেনারেল মানেকশ সাধারণত মিষ্টি খান না; কিন্তু জওয়ানদের আন্তরিকতা সেদিন তাঁকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে তিনি সেই ভোজসভায় জওয়ানদের সঙ্গে একসঙ্গে পাতা পেড়ে বসেছিলেন।

অমৃতসরের চিকিৎসক ডাঃ এইচ এফ মানেকশ-র পুত্রও পিতার বৃত্তি অনুসরণ করার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি অমৃতসরে মেডিক্যাল কলেজে পড়ছিলেন। সেই সময়ে তিনি হঠাৎ সংবাদপত্রে দেখেন, ডেরাডুনে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। তিনি যদি সেদিন আবেদন না করতেন তাহলে "স্যাম" মানেকশ-র নাম আজ এত সুপরিচিত হত না।

স্যাম মানেকশ ও তাঁর স্ত্রীর দুটি কন্যা। বড় কন্যার বাস কলকাতায়, তাঁর নাম কোরি। দৌহিত্রীর নাম ব্র্যান্ডি। দুষ্টু হাসি হেসে "স্যাম" বলেন "আশা করি, উপপ্রধানমন্ত্রীর আপত্তি নেই।"

বৃটিশ যুবরাজের অভিষেক

ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথের জ্যেষ্ঠ-পুত্র চার্লস রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আগামী নভেম্বর মাসে তাঁর ২১ বছর বয়স হবে। তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার আয়োজন শুরু হয়েছে। আগামী মাসে পশ্চিম ওয়েল্‌সের একটি পুরানো নর্মান আমলের দুর্গে তাঁকে "প্রিন্স অব ওয়েলস" পদে অভিষিক্ত করা হবে। ৪০০ বছর যাবৎ ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স নামেই পরিচিত হয়ে এসেছেন।

কিন্তু এবার অভিষেকপর্ব নির্বিঘ্ন হবে বলে মনে হচ্ছে না। মিশরের শেষ রাজা ফারুক বলেছিলেন, "শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে মাত্র পাঁচজন রাজা অবশিষ্ট থাকবেন—তাসের চার রং-এর চার রাজা ও ইংল্যান্ডের রাজা। সেই ইংল্যান্ডেও রাজতন্ত্রের জাদু ফুরিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। কথা উঠেছে, ইংল্যান্ড যখন অর্থ-নৈতিক সমস্যায় ধুঁকছে কি দরকার তখন যুবরাজের অভিষেকের নামে অজস্র অর্থ ব্যয় করার? "মর্যাদাসম্পন্ন, বর্ণবৈচিত্র্যময় ও বৃটেনের উপযুক্ত" এই অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় হবে আড়াই লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং। কেরনারভনের নর্মান দুর্গ আলোকসজ্জায় সাজিয়ে রাখা হবে ৭ জুন থেকে তিন মাস। "স্বাগত, ৬৯" নাম দিয়ে বছরজোড়া গান-বাজনার অনুষ্ঠান হবে সারা ওয়েলসের আনাচেকানাচে। একবিংশ শতাব্দীর রাজার জন্য কি শোভা পায় এইসব আড়ম্বর?

ওয়েলস জাতীয়তাবাদের আপত্তি আরও গুরুতর এবং সেই আপত্তির কারণও ভিন্ন। ওয়েলস জাতীয়তাবাদীরা ওয়েলস-এর উপর ইংল্যান্ডের আধিপত্যের অবসান ঘটাতে চায়। ইংল্যান্ডের যুবরাজের "প্রিন্স অব ওয়েলস" খেতাবটি সেই আধিপত্যের জাজ্বল্যমান স্মারক। তাই জাতীয়তাবাদী ওয়েলসদের যত রাগ ঐ খেতাবের উপর ও তার সঙ্গে জড়িত সব অনুষ্ঠানের উপর। কিছুকাল আগে "ফ্রি ওয়েলস আর্মি" নামক একটি সংস্থার নয়জন সদস্য অভিষেকের সময় যুবরাজকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রসহ বিভিন্ন অপরাধে কারাদন্ড লাভ করেছে। যদিও এইসব "জাতীয়তাবাদী" ওয়েলস সংখ্যায় খুব বেশী ভারী নন তাহলেও তাঁরা যথেষ্ট উৎপাত চালিয়ে থাকেন। ইংরেজ আধি-পত্যের প্রতীক ইংরেজী ভাষা। সুতরাং সেখানেও এক ধরনের "আংরেজী হঠাও" আন্দোলন চলছে—আংরেজী হঠাও আর তার জায়গায় বসাও ওয়েলসের ভাষা। আন্দোলন মানে রং-এর বালতি হাতে বেরিয়ে রাস্তার ইংরেজী নাম সব মুছে দেওয়া, ইংরেজীতে লেখা বার্থ সার্টি-ফিকেট নিতে অস্বীকার করা, ইংরেজীতে লেখা লাইসেন্স ফর্ম পূরণ করতে [illegible] এবং সেজন্য জেলে যাওয়া) ইত্যাদি। আগামী মাসে যুবরাজের অভিষেক পর্ব এই জাতীয়তাবাদীদের ক্ষোভ দেখাবার একটি উপযুক্ত অবসর। তৈরী হচ্ছেন ইংরেজ সরকারও। ২৭৫৫ পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে কেরনারভন প্রাসাদ পাহারা দেওয়ার জন্য।

এইসব আয়োজন ও হুমকির মধ্যে কি ভাবছেন ইংল্যান্ডের ভাবী রাজা, বর্তমান ইউনিভার্সিটি কলেজ অব ওয়েলসের ছাত্র প্রিন্স চার্লস? "জাতীয়তাবাদী"দের হুমকিতে তিনি বিচলিত নন। অর্থ অপ-ব্যয়ের অভিযোগের উত্তরে প্রিন্স চার্লসের বক্তব্য, "তা যদি বলেন, টুরিস্টদের কাছ থেকে আমরা টাকা পাব, অথবা আগ্রহী আমেরিকানরা অর্থ লগ্নী করতে পারে।"

●

"দেশের দশ হাজার রেলওয়ে ট্রেন একুনে দিনে যত মাইল দৌড়োয় তাতে চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বের তিন গুণ পথ অতিক্রম করা যায়", বলেছেন রেলওয়ে মন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিং।

এশিয়ার 'যৌথ নিরাপত্তা"

'আমাদের অভিমত এই যে, ঘটনার গতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নটা একটি বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হচ্ছে।'—প্রায় ২০ হাজার শব্দের দীর্ঘ ভাষণে মাত্র এই একটি বাক্য। এই একটি বাক্যই অনেক জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিচ্ছে। ঠিক কি বলতে চেয়েছেন সোভিয়েট কমুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি লিওনিড ব্রেজ-নেভ? কার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা? এই নিরা-পত্তার গ্যারান্টি কি হবে?

মস্কোতে যে কমুনিস্ট শীর্ষ সম্মেলন হচ্ছে সেখানে বক্তৃতা করার সময় ব্রেজনেভ ইউরোপের নিরাপত্তার প্রশ্ন আলোচনা করতে করতে অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে এশিয়ার 'যৌথ নিরা-পত্তার' ঐ প্রশ্নটির অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। এর কোন বিস্তারিত ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এখনও রাশিয়ার তরফ থেকে পাওয়া যায় নি।

চীনের তরফ থেকে ব্রেজনেভের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া এসেছে তাতে সন্দেহ থাকে না যে, চীন নিজেকেই রাশিয়ার এই 'যৌথ নিরাপত্তার' লক্ষ্য বলে মনে করে। চীন বলেছে যে, সুয়েজের পূর্ব দিক থেকে সরে যাওয়ার যে পরিকল্পনা বৃটেন গ্রহণ করেছে সেদিকে তাকিয়ে রাশিয়া এশিয়ায় বৃটেনের স্থান গ্রহণ করতে চাইছে এবং তার তা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে চীনের প্রভাব বৃদ্ধির রাস্তা আটকে দেওয়া।

যে উদ্দেশ্যেই রাশিয়া এই প্রস্তাব দিয়ে থাক সেটা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হচ্ছে না। ব্রেজনেভের প্রস্তাব হচ্ছে মূলত একটি সামরিক জোট গঠনের প্রস্তাব। ভারত ও অন্যান্য জোট নিরপেক্ষ দেশ সামরিক জোট গঠনের বিরোধী। এখন রাশিয়ার দিক থেকে প্রস্তাব এসেছে বলেই সেই বিরো-ধিতা দূর হয়ে যাবে এমন মনে করার কারণ দেখা যাচ্ছে না। ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্থানের কথা বলতে গেলে চীনের সঙ্গে তার আঁতাত যেরকম গভীর তাতে সে চীনের বিরুদ্ধে একটা জোটে যোগ দিতে রাজী হবে বলে মনেই হয় না। আর এশিয়ার যে সব দেশ জোট নিরপেক্ষ নয় এবং চীনের দিকে যাদের পাকিস্থানের মতো ঝোঁকও নেই সেইসব দেশ তো সীয়াটো ও 'সেন্টো' গোষ্ঠীর মধ্যে আছেই। 'সীয়াটো' বা সেন্টো জোটের সঙ্গে ব্রেজনেভের প্রস্তাবিত জোটের তফাৎটা কি হবে তা রাশিয়া পরিষ্কার করে বলে নি। আর এই যৌথ নিরাপত্তার পরিকল্পনার পিছনে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত গ্যারান্টি গড়ে তোলা রাশিয়ার উদ্দেশ্য হয় তাহলে প্রশ্ন উঠবে, চীনের বিরুদ্ধে রাশি-য়ার সঙ্গে একজোট হয়ে এই ধরনের গ্যারান্টি দিতে আমেরিকা কি বর্তমানে উৎসাহিত হবে? ভুললে চলবে না যে, আমেরিকা এখন চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সচেষ্ট।

*

এলাহাবাদ শহরে "শিক্ষিত বেরোজগার সেনা" নামে একটি নতুন সেনা তৈরী হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য হবে চাকরী পাওয়ার জন্য লড়াই করা।

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[গ্রাম চেনবার নেশা ছিল বিকাশের। শহুরে যুবক প্রমোশন নিয়েই এল তাই পাড়াগাঁর ব্যাঙ্কে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্ককাকার বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। বিস্ময়ের আশ্রয়। মনীষা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত মনীষার, দ্বিতীয় উপস্থিতি।

চারদিকে টানাপোড়েন। চোরাবালি। ক্ষোভে-ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছে সবাই। মূল্যবোধও বিপর্যস্ত। ঘুনপোকা।

বিকাশের সামনেও কানাগলি। মনীষার প্রতি হৃদয়ের রঙ। সোনালির প্রতিও একধরনের আকর্ষণ। স্বপ্ন।

মুক্তি চায় বিকাশ। নোংরা গ্রাম্য রাজনীতির আওতা থেকে, শশাঙ্ক নিয়োগীর বিবর থেকে। আশ্রয় চায় সে মনীষার।

আনতে হবে তাকে। বাঁধতে হবে ঘর। মনীষার চাকরির জন্যে চলে তাই উমেদারি।

মাঝে সোনালি। আরেক অধ্যায়।

রাত। বিবর্ণতার আলো। শুয়েছে বিকাশ। ঘরে ঢুকল সুনু—সোনালি। স্বপ্নের আমেজ।

বিকাশের কণ্ঠ 'তোমাকে ভুলব না সুনু, তোমাকে ভোলা যায় না।'

সোনালির গালে এখন রঙ পড়ে। চোখে কেমন নির্ভরতার আলো। মাদকতা। বিকাশের গভীরে দোলাচল। শাঁখের করাত। মনীষা আর সোনালি। এবার পালাতে চাইল নিয়োগীবাড়ি থেকে। কিন্তু যাবে কোথায় বিকাশ? ব্যাচেলরকে ঘর-ভাড়া দেবে কে? শেষ পর্যন্ত শরণ নিতে হল জাঁদরেল ব্যবসায়ী কানাই পালের। আশ্বাস মিলল। ঘরের। মনীষার চাকরির। বিকাশ এলো কলকাতা। সোনালিও। মনীষার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হবে তার। দেখাও মিলল। বিকেলে কথা। সব হিসেব-নিকেশ তখন। সময় গড়াল। কিন্তু মনীষা নেই। কলকাতা ছেড়ে পালাল। বিকাশ বুঝল, সে তার হাত এড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে।]

।। একুশ ।।

মোহনলাল স্ট্রীট থেকে হাঁটতে হাঁটতে দেশবন্ধু পার্ক।

কিছুক্ষণ পার্কের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল রেলিং ধরে। সামনের বিবর্ণ আকাশে বেলা পড়ে আসছে। পাতা ঝরছে শুকনো হাওয়ায়। কাকের ডাকাডাকি শুরু হয়েছে ক্লান্ত গলায়। একটু দূরে তোলা উনুনে একটা লোক চীনেবাদাম আর মটর ভাজছে, তার তপ্ত গন্ধ আসছে একটা। সামনে দিয়ে গাড়ির আনাগোনা। একটা কাটা-ঘুড়ির পেছনে ছুটন্ত ক'টি রাস্তার ছেলে। কোন্ কারখানার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা ছোট একটা মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল তাদের শ্লোগান : 'জুলুমবাজী বন্ধ্ করো—বন্ধ্ করো—'

কাটা-কাটা ছবির মতো বয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। ফুটে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কোনো অর্থ নেই, কোনো ছাপ রাখছে না। সারা কলকাতাই এই রকম। অনেকগুলো ফিল্মের টুকরো একসঙ্গে জুড়ে একটা অবিচ্ছিন্ন প্রোজেক্শন। সব মিলে মানে হয় না, কোনো কিছুরই মানে হয় না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন হাঁটু টনটন করতে লাগল, তখন মনে হল, ছ'-সাত বছর আগেও এমনিভাবে মনীষার জন্যে অপেক্ষা করত সে। কোনো নির্দিষ্ট বাস-স্টপে, কোনো সিনেমার সামনে, কোনো রাস্তার মোড়ে। এক-একদিন অনেক বেশি দেরী হয়ে যেত মনীষার। অধৈর্যে আর নিরাশায় মাথার ভেতরে যখন আগুন জ্বলছে, তখন দূর থেকে দেখা যেত বাসন্তী রঙের আঁচলটি। তখন ওই একটা রঙ নিয়মিত ব্যবহার করত মনীষা—এমন করে তার বেশে-বাসে নিরাসক্তির শুভ্রতা লাগেনি।

'বড্ড দেরী হয়ে গেল, না?'

'আজ না এলেই চলত।'

'খুব রাগ হয়েছে—কেমন? কিন্তু কী করব বলো। বাড়িতে একটা কাজে এমন আটকে যেতে হল, যে—'

'বাড়ির কাজটাই তোমার সব। আমি কেউ নই।'

'তোমাকে বাদ দিয়ে আমার কিছুই নেই। তবু বোঝো তো—'

বরাবর। বাড়ির দাবি, সংসারের দাবি। সব সময় আড়াল তৈরি করেছে, বাধা দিয়েছে। একটা অপচ্ছায়ার মতো চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

একটা ব্যর্থ দিনের স্মৃতি কাঁটার মতো এসে বিঁধল হৃৎপিণ্ডের ভেতর। তার আগের দিন ছেলেমানুষি খুশিতে মনীষা বলেছিল, তার মিল্ক চকোলেট খেতে ভালো লাগে।

দুটো চকোলেট নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল বিকাশ। চিররুগ্ন বাবার কী একটা অসুখের ঝঞ্ঝাটে মনীষা এসে আর পৌঁছায়নি সেদিন। রাত ন'টার সময় চকোলেট দুটোকে রাস্তার আবর্জনার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বাড়ি ফিরেছিল।

চিরদিন। এক বাধা। এক শত্রু।

তারপর—কলেজের সীমা পেরোলে, পথে দেখার পালা শেষ হল। মনীষা ঢুকল চাকরিতে, অর্থাৎ তার নিজের ওপর জোর এল অনেকখানি। তখন বাড়িতে আসা-যাওয়া। দুজনের সম্পর্কের চেহারাটাও অজানা ছিল না মনীষার মা-বাবার।

বিকাশ জানে, তাঁদের ভালো লাগেনি, অন্তত মনীষার বাবার কখনো নয়। স্বার্থ, নিরঙ্কুশ স্বার্থ। তিনি নিজে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। ছেলেরা ছোট। তাঁদের এই মেয়েটির ওপর ভর দিয়েই বেঁচে থাকতে

হবে। সেখানে বিকাশ একেবারে দস্যুর মতো এসে পড়েছে। মেয়েটিকে যেদিন সে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সেদিন তাঁদের ভাতের গ্রাসেও টান পড়বে।

তবু কিছু বলবার নেই। তবু হাসি-মুখে অভ্যর্থনা করতে হয়। কারণ, রোজগেরে মেয়ের বন্ধুকে কিছু বেয়াড়া বলে ফেললে বিপদের ভয় আরো বেশি। এক টানেই ছিঁড়ে যেতে পারে শিকলটা।

এই টানা-পোড়েনের ভেতরেই কাটছিল বছরের পর বছর। দু'জনেই নিঃশব্দে মেনে নিচ্ছিল ভাগ্যকে—স্বীকার করে নিচ্ছিল এই হেরে যাওয়াটাকে। মনীষা একটু একটু করে আরো কালো, আরো ক্লান্ত, আরো শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, আর বিকাশ কখনো রবীন্দ্রনাথের হরিপদ কেরানীর মতো ভাবত: 'ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য যাওয়া-আসা।' যেদিন থেকে মনীষার চাঁপা রঙের শাড়ীটি নিরাসক্তির শুভ্রতায় হারিয়ে গেল, সেদিন থেকে সে-ও জানত, আর কিছুই নেই।

কিছুই নেই—শুধু দুটো সমান্তরাল রেখা।

পাশাপাশি বয়ে যাবে, কোনোদিন মিলবে না। আবার সেই রবীন্দ্রনাথেরই গান: 'থাকুক দুধারে থাকে দুজনে, মেলে না তো কাকলী ও কূজনে।' একটা অন্ধকারের নদী চিরকাল আলাদা করে রাখবে দুজনকে।

সেই একটা শূন্যতা — নিরুপায় রোমান্টিকতা দিয়ে যার ফাঁকটাকে জোর করে ভরে দিতে হয়—তাই নিয়েই হয়তো আরো অনেক বছর কেটে যেত। কিন্তু বিকাশকে যেতে হল বাইরে। তাতেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নিয়োগীবাড়ী তার সমস্ত স্নায়ুগুলোকে যেন পিষে দিতে চাইল মুঠোর ভেতরে। হঠাৎ কোথা থেকে ফুটে উঠল সুনু—সুবর্ণা—সোনালি।

তারপর—

তারপর বিকাশ বুঝল আর দেরী করা চলে না। তার নিজের জন্য, মনীষার জন্য। যখন নিজের মতো করে সব একটা গুছিয়ে নেবার আয়োজন করে এনেছে, তখন—একটা কথাও না বলে সরে গেল মনীষা।

যে আসবে না, তাকে জোর করে আনা যায় না। যে-মন অনেকদিন আগেই নিভে গেছে, তাকে নতুন করে জ্বালাতে যাওয়া বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভালোবাসাও ক্লান্ত হয়, জীর্ণ হতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে মরে যায় একদিন। সেই মৃত্যুটা প্রথমে বুঝতে পারা যায় না—একটা অভ্যাস, নিছক অভ্যাস তার শবটাকে বয়ে বেড়ায়; তখনো সেইসব কথারা আসে, সেইসব সঙ্গগুলো থাকে, তখনো স্বপ্নেরা মধ্যে মধ্যে আসে যায়। কিন্তু তারপর—কোনো উলঙ্গ জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার যাচাই করলেই চোখে পড়ে—জীবনের পালা শেষ করে দিয়ে কবে যেন অভিনয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন মনে হয়—এইবারে যবনিকা ফেলে দেওয়া যাক, আর কেন!

সংসারকে ছেড়ে যেতে হবে, চলে যেতে হবে নতুন দায়িত্বের ভেতরে, যেতে হবে সত্যভাবে শুরু করতে—এই সত্যগুলো কঠিন হয়ে সামনে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনীষা সেই মৃত্যুটাকে চিনে নিয়েছে। অভিনয়ের জের টেনে বিপদের বোঝা আর সে বাড়াতে চাইল না। এই পুরোনো, একঘেয়ে, বিস্বাদ নাটকটাকে থামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মঞ্চের বাইরে। অতঃপর—

অতঃপর একটা কুৎসিত ক্লান্ত কলকাতা। দেশবন্ধু পার্কের ওপর ধোঁয়াটে সন্ধ্যা। শুকনো পাতা ঝরে যাচ্ছে এলোমেলো হাওয়ায়। সামনের রাস্তার মস্ত গর্তে হোঁচট খেয়ে একটা লক্কড় লরির হাড়-পাঁজরাগুলো হাহাকার করে উঠল। বাতাসে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো উড়তে উড়তে এসে বিকাশের পায়ে জড়িয়ে নিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকল।

মনীষার নাটক না হয় শেষ হয়েছে, কিন্তু তারও?

মাথার ভেতরটা ফাঁপা। কিছু ভাববার নেই, করবার নেই, বলবার নেই। জুতোর নীচে কতগুলো চীনেবাদামের খোলাকে মাড়িয়ে যেতে যেতে অদ্ভুত একটা ধর্ষকাম অনুভূতি জাগল তার। পথে দু-দিক থেকে দুটো গাড়ি আসছিল উন্দাম বেগে—বিকাশ কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল শ্বাস বন্ধ করে, একটা কুটিল অভীপ্সা নিয়ে—এই দুটো গাড়িতে যদি মুখোমুখি কলিশন হয় এখন?

হল না। দু-জোড়া ব্যাক-লাইটের রক্তাক্ত আলো দু'দিকে ছিটকে চলে গেল।

বিকাশ ঢুকল পার্কের ভেতর। এক জায়গায়—একটু আবছায়ার ভেতরে দুটি তরুণ-তরুণী অন্তরঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল, ইচ্ছে হল একটা ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারে ওদের দিকে কিংবা কটু মন্তব্য করে একটা, কিংবা অশ্লীলভাবে শিস দিয়ে ওঠে একবার।

আর একটু এগিয়ে, পুকুরটার ধারে, একমুঠো মরা ঘাসের ওপর বসে পড়ল বিকাশ। ঘাসটা নোংরা। কিন্তু ভালোবাসার প্রথম মোহের মতো একটা অস্পষ্ট অন্ধকার এখন—ঘাসের ওপর কোনো আবর্জনা চোখে পড়ছে না। বিকাশ আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

তখন মাথার ওপর তারা। ওদিকে নীল উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে বৃহস্পতি। কার যেন চোখের কথা মনে হয়। সুনুর?

বিকাশ জোর করে নিজের চোখদুটো বন্ধ করে ফেলল। মনীষা—সুনু। সব সমান।

সব সমান। তবু দায়িত্ব নিয়ে আসতে হয়েছে। পরদিন সকালে সুনুকে নিয়ে যেতে হল অপ্‌টিসিয়ানের চেম্বারে। ডাক্তার দেখে বললেন, 'চশমা নিতে হবে। মাইনাস টু।'

'এত?'

'আরো আগে দেখানো উচিত ছিল।'

শশাঙ্ককাকা দেখাননি। আনাড়ী ডাক্তারেরা চোখ নষ্ট করে দেবে—সেই ভয়ে।

বিকাশ তাকিয়ে দেখল সুনুর দিকে। জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে এক কোণায়। ছোট মেয়েটিকে একমুঠো দেখাচ্ছে এখন। আসবার সময় আপত্তি করেছিল।

'আমার ভয় করছে বিকাশদা।'

'ভয় কেন?'

কেন ভয় করছে, তার উত্তর এল : ভীষণ ভয় করছে।'

'কী আশ্চর্য! চোখের ডাক্তার কি তোমায় অপারেশন করবেন নাকি?'

সুনন্দ চুপ। মা-ই জবাব দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত।

পথে আসবার সময় ট্রামে চুপ করে বসেছিল সুনন্দ। চোখ পরীক্ষার সময় যখন ভেতরের ঘরটায় ডাক্তার তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন, তখন পা আর তার চলতে চায় না।

'বিকাশদা, আপনিও আসুন।'

'আমার চোখে তো একজোড়া চশমা রয়েছে সুনন্দ। আবার চশমা নিলে কোথায় পরব?'

তারপর চোখ দেখা হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন : মাইনাস টু। আরো আগে দেখানো উচিত ছিল।

'সুনন্দ, তোমাকে চশমা পরতে হবে।'

সুনন্দ সাতঙ্কে বিকাশের দিকে তাকালো।

বিকাশ বললে, 'তারপর তোমাকে ভীষণ গম্ভীর আর ভারিক্কি দেখাবে।'

এতক্ষণে একটুখানি হাসি ফুটল সুনন্দর মুখে : 'ধোৎ!'

ডাক্তার বললেন, 'চশমা করে দেব তা হলে?'

'নিশ্চয়।'

'পরশু কিন্তু ওকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

'কালকেই রেডি করে দেব—' ডাক্তার ফ্রেমের বাক্সগুলো নামিয়ে এগিয়ে দিলেন সুনন্দর দিকে : 'যাও, পছন্দ করো।'

সুনন্দ আবার বিব্রতভাবে বিকাশের দিকে তাকালো। বিকাশ হেসে বললে, 'ওকে দিয়ে হবে না। দিন, আমি দেখছি।'

একটা ফ্রেম চোখে পরে, আয়নার দিকে তাকিয়েই খিলখিল করে হেসে ফেলল সুনন্দ।

'এ মা, কিরকম দেখাচ্ছে আমাকে!'

'ঠিক তোমাদের স্কুলের বড়দির মতো। এরপর থেকে আমি তোমাকে আপনি বলে ডাকব।'

আবার হাসির ঝংকার। বাইরে থেকে একটা হাওয়ার জোয়ার এসেছিল ঘরে, বিকাশের মনে হল, কলকাতায় বসন্ত আসতে আর দেরী নেই। সুনন্দর হাসিতে তার খবরটা নিশ্চিতভাবে পৌঁছে গেল এবার।

কালকে দেশবন্ধু পার্কের সন্ধ্যাটা এখন কোথাও ছিল না। এখন সকালের আলোয় কলকাতা ঝকঝক করছিল।

চশমার পাট মিটিয়ে পথে নামল দুজন।

বিকাশ বললে, 'এখনো ভয় করছে?'

সুনন্দ হাসল : 'না।'

'কিন্তু চশমা চোখে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাবে, তখন?'

'সবাই ঠাট্টা করবে।'

'কেউ করবে না—ভীষণ খাতির করবে তোমাকে। আর যদি কেউ ঠাট্টা করতে আসে, তখন চশমাটা তুলে—তার তলা দিয়ে একটুখানি কটমট করে তাকাবে। দেখবে, কী দারুণ ভয় পাবে সবাই।'

সুনন্দ আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

'বা-রে, আপনি কী করে জানলেন?'

'কেন, আমিও তো চশমা পরি।'

'তা নয়। আমাদের সংস্কৃত দিদিমণি কাউকে বকবার আগে ঠিক অমনি করে তাকায়।'

'এবার থেকে তুমিও ওইভাবে সংস্কৃত দিদিমণির দিকে তাকিয়ো। তাহলে আর বকবার সাহসই পাবেন না।'

'যাঃ!'

সুনন্দ সহজ, স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। নিয়োগীবাড়ির বাইরে এসে, এই কলকাতার মুক্তিতে, এই আলো-বাতাসের স্রোতে! এখানে তিলে তিলে মৃত্যুর কথা ভাবে মনীষা, আর—

মনীষাকে মনে পড়ল বিশ্রী বেসুরো-ভাবে। এতক্ষণ একটা স্নিগ্ধ মধুরতার আবরণ তৈরি হয়েছিল, এই মেয়েটি বসন্তের প্রসন্নতা বইয়ে দিয়েছিল চারদিকে, জীবনের কাঁটাগুলোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ কালকের যন্ত্রণা একটা তীরের ফলার মতো হৃৎপিণ্ডে সজাগ হয়ে উঠল।

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সুনন্দ বললে, 'কী হল বিকাশদা?'

'কিছু না। চলো—আর একটা কাজ আছে।'

'আবার ডাক্তার না তো?'—ভয় চকচক করে উঠল সুনন্দর চোখের তারায়।

এই মেয়েটি, সরল এই ছোট্ট মেয়েটি সেই কঠিন যন্ত্রণাটাকেও মধ্যে মধ্যে ভুলিয়ে দিতে পারে। বিকাশ হাসতে চেষ্টা করল।

'না, আর ডাক্তার নয়। এবার তোমার সেই সেতারটা।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'সেতারটা দেবে আজকে?'

'সেইরকমই তো কথা আছে। আমি চিঠি দিয়েছিলুম।'

'কী মজা!'—আনন্দে হাততালি দিল সুনন্দ : 'আপনি আমাকে বাজাতে শেখাবেন?'

'নিশ্চয়। আমি ছাড়া আর কে শেখাবে?'

'কী মজা!'

বিকাশ একটা ট্যাক্সি ডাকল।

গাড়ি চলতে লাগল ধর্মতলার দিকে। সুনন্দ এই বার অনর্গল কথা বলছে খুশিতে। কলকাতা ভালো, ভীষণ ভালো। আমরা কালকে চিড়িয়াখানায় যাব—না? একটা বায়োস্কোপ দেখব যে। আজ সন্ধ্যায়? আচ্ছা। জেঠিমা যাবেন না? আমি জোর করে নিয়ে যাব। ভিক্টোরিয়ায় কাল হবে? আর দক্ষিণেশ্বর? পরশু? কিন্তু পরশু রাতেই বুঝি ফিরে যেতে হবে? আমার এত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না বিকাশদা। কত দেখবার জিনিস আছে কলকাতায়। কলকাতা কী ভালো, কী ভীষণ ভালো!

কিন্তু কলকাতাও কাউকে কাউকে গ্রাস করে। কলকাতাও একটু একটু করে কাউকে কাউকে শুষে নেয়। কলকাতা দস্যুর মতো মুঠো বাড়ায় কারো কারো দিকে। কেউ কেউ তখন ছুটে পালায় বর্ধমানে—একটা ঠিকানা পর্যন্তও রেখে যায় না।

আবার বিস্বাদ যন্ত্রণা। আবার কালকের সন্ধ্যাটা। এই কলকাতায় সুনন্দকে থাকতে হলে একদিন হয়তো তারও চোখের রঙ মুছে যাবে, এই শহরের সব জীর্ণতা ধীরে ধীরে প্রবেশ করবে তার মনে, সেও একটা ধুলোর স্তূপের মধ্যে ডুবে যেতে থাকবে দিনের পর দিন। তখন—

'আমি কলকাতায় চলে আসব বিকাশদা।'

বিকাশ চমকে উঠল : 'আাঁ?'

'আমি হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলকাতার কলেজে পড়ব বিকাশদা। আপনি বাবাকে বললে বাবা ঠিক রাজী হয়ে যাবে।'

অতখানি বিশ্বাস শশাঙ্ককাকাকে করা যায়? কিন্তু এই খুশি আর উজ্জ্বলতার মুহূর্তে সুনন্দর স্বপ্নটাকে আঘাত করতে ইচ্ছে করল না।

অন্যমনস্ক গলায় বিকাশ বললে, 'আচ্ছা।'

রাত্রে খাওয়ার পর মা এলেন বিকাশের ঘরে।

'তোর শরীরটা কিন্তু একটু শুকিয়ে গেছে বুবু।'

বুবু বিকাশের ছেলেবেলার ডাক-নাম। ও-নামে কেউ আর ডাকে না এখন—কেবল মা ছাড়া। মনীষা আগে ঠাট্টা করত। 'বুবু!' শুনলেই মনে হয় ছোট্ট খোকাটি, মুখে একটা ফীডিং বটল।'

মনীষাকে মন থেকে কিছুতেই সরিয়ে দেওয়া যায় না। সে সব পালা মিটিয়ে দিয়ে স্টেজের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু বিকাশের মুক্তি আসছে না কিছুতেই। রাগ করে নয়, অভিমান করে নয়—কিছুতেই নিস্তার মিলছে না যন্ত্রণার কাছ থেকে।

মা বললেন, 'কিরে, কথা বলছিস না যে?'

লজ্জিত হয়ে বিকাশ বললে, 'কিছু বলছিলে? শুনতে পাইনি।'

একটু চুপ করে মা ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'তোর মনটা ভালো নেই, না রে বুবু?'

বিকাশ হাসল : 'কী আশ্চর্য, মন ভালো থাকবে না কেন? কে বলেছে তোমাকে ও-সব কথা?'

'কেউ বলেনি। তোর চেহারাটা যেন কেমন কেমন লাগছে বুবু।'

'তোমার মন-গড়া দুশ্চিন্তা, মা। কিছু ভেবো না, আমি খাসা আছি।'

আবার একটু চুপ করে থাকলেন মা।

'একটা কথা বলব বাবা?'

তাঁর বলার ভঙ্গিতে অস্বস্তি বোধ হল বিকাশের।

'কী?'

'এবার তুই বিয়ে কর।'

জ্বলে উঠল বুকের ভেতর। সে তো চেয়েই ছিল। কিন্তু মনীষা সরে দাঁড়িয়েছে। সে-কথা মা-কে বলা যায় না।

মা আস্তে আস্তে বললেন, 'তুই মণির জন্যে অপেক্ষা করে আছিস। আমি জানি।'

জ্বালাটা বাড়ছে। মা-র না জানবার কথা নয়। মনীষা অনেকবার এসেছে বাড়িতে। গরীবের সংসারের এই কালো মেয়েটিকে মা-র খুব পছন্দ ছিল তা নয়। কিন্তু ছেলের মন বুঝে নিঃশব্দে মেনে নিয়েছিলেন।

যে-কথাটা বিকাশের বলবার ছিল, সেইটিই বেরিয়ে এল মা-র মুখ দিয়ে।

'মিথ্যেই কষ্ট পাচ্ছিস বাবা। মণি বিয়ে করবে না।'

'মা!'—চেয়ার ছেড়ে বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিষণ্ণভাবে মা বললেন, 'এই তো সেদিন বিনুর সঙ্গে যাচ্ছিলুম কালীঘাটে। পথে দেখা। বললুম, একি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তোমার—চেনা যায় না যে! অসুখ নাকি? উত্তরে বললে, আমায় কিছু বলবেন না—এখন তাড়াতাড়ি মরতে পারলেই বাঁচি। ও বিয়ে করবে না খোকা, কক্ষনো না।'

কথা বলা যাচ্ছিল না, যেন দম আটকে আসছিল। ধরা গলায় বিকাশ বললে, 'এসব থাক মা।'

'কিন্তু তোর জন্যে তো আমায় ভাবতে হয়, বুবু।'

'আমার জন্যে ভেবো না মা, বেশ আছি আমি।'

বাইরের বারান্দায় কলকূজন শোনা গেল। সুনু আর বিনু কথা বলছে। আলোচনাটা চলছে প্ল্যানেটোরিয়ম নিয়ে। মুগ্ধ সুনুকে এম-এস-সি-র ছাত্র বিনু অ্যাস্ট্রোনমির রহস্য বোঝাতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে। সুনু উল্লসিত হয়ে উঠছে : 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখেছি স্যাটার্নকে। রিংটা কিরকম বন-বন করে ঘুরছিল ওর পাশে।'

'ওই রিংটা হল, ম্যানে—সায়েন্সে ওকে—'

গম্ভীর হয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছে বিনু।

মা আস্তে আস্তে বললেন, 'শশাঙ্ক ঠাকুরপোর এই মেয়েটি কিন্তু বেশ। দেখতেও ভালো—স্বভাবেও ভারী লক্ষ্মী।'

বিকাশ আর একবার চকিত হল। মা কোনো আভাস দিতে চাইছেন?

কিন্তু মেজদার কথায় রক্তে যে ঢেউ উঠেছিল, সেটা এখন আর জাগল না। এখন সমস্ত বুকের ওপর একটা পাথরের মতো জমাট হয়ে রয়েছে মনীষা। তার পাণ্ডু মুখ, তার গায়ের টেম্পারেচার, তার ক্লান্তি—সব এসে বিকাশকে আচ্ছন্ন করছিল এখন। মনীষা বর্ধমানে চলে গেছে। মরবার আগে বুনো জন্তুরা দল ছেড়ে চলে যায়—কোনো একটা নিভৃত মরণের কেন্দ্রের দিকে নিঃসঙ্গ শিথিল পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে—তেমনি করেই কি চলে গেল মনীষা? আর একটা স্বার্থপর লোলুপতা নিয়ে এখন সে সুনুকে ঘিরে ঘিরে স্বপ্ন গড়তে চাইছে?

বিকাশ হঠাৎ অধৈর্য স্বরে বললে, 'এখন আর কিছু ভালো লাগছে না মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

মা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে তখনো গ্রহ-নক্ষত্রের আলোচনা চলছে সুনু আর বিনয়ের মধ্যে। মা একবার চেয়ে দেখলেন সুনুর দিকে। শান্ত সৌন্দর্যে টুকটুক করছে মুখখানা।

তারও আগে—তারও অনেক আগে মা সুনুর চোখের দৃষ্টি দেখেছিলেন। সে-দৃষ্টি বুঝতে মা-র ভুল হয়নি। এই ছেলে-মানুষ মেয়েটা বিকাশকে ভালোবাসে।

মা-র নিশ্বাস পড়ল একটা।

সুনু বললে, 'জেঠিমা!'

মা থেমে দাঁড়ালেন।

'কাল আমরা দক্ষিণেশ্বর যাব কিন্তু। আপনি যাবেন তো?'

মা হাসলেন : 'যেতে হবে বইকি।'

'কিন্তু বিনুদা যেতে চায় না। বলে, ও-সব মানে না। এ-সব বললে পাপ হয় না জেঠিমা?'

মা সস্নেহে বললেন, 'হয়। কিন্তু এরা সব এ-কালের ছেলেমেয়ে, পাপে ওদের ভয় নেই।'

'নেই বুঝি? কিন্তু বিনুদা, তুমি যে ঠাকুরকে মানছ না, দেখো পরীক্ষার সময় কী হয়।'

'ফেল করব?'—বিনু হেসে উঠল। হেসে উঠল সুনুও।

বিকাশের ঘরের দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। এত জোরে আওয়াজটা এল যে বারান্দার এই তিনজনই চমকে উঠল একসঙ্গে।

বিষাক্ত জর্জরিত স্নায়ু নিয়ে বিকাশ বাইরের হাসি-জীবন-উজ্জ্বলতাকে আর সইতে পারছিল না।

(ক্রমশ)

পোশাক বিচিত্রায় আসাম

উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে ফারাক বিস্তর। খাবার-দাবার আচার-ব্যবহার, চলায়-বলায় এবং সাজ-পোশাকে। দক্ষিণে ভীষণ টক, ভীষণ ঝাল। পূর্বদেশ আসামে না জেনেশুনে 'তাম্বুল' খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ার উপক্রম। ঠাণ্ডা-গরমে পাহাড়ে জামা-কাপড়ের আধিক্য আর সমতলে গরমের ঠেলায় বাহুল্য পুরোপুরি বর্জিত। একই দেশের এত বৈচিত্র্য কল্পনাতীত। জামা-কাপড়ে শুধু বাহুল্য-বর্জন বা আধিক্যের প্রশ্নেই নয় সাজ-পোশাকও কত বিচিত্র। দক্ষিণের মহিলারা কাছা দেন আর পুরুষেরা কাছাবিহীন। আবার অসমীয়া নারীরা মেখলায় অপরূপে হয়ে ধরা দেন। তবু কিন্তু শেষ হলো না। সাজ-পোশাকের আরো অনেক রহস্য এখনো অধরা। গারো, কাছারী, লুসাই, নাগাদের পোশাক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এক্ষেত্রে ওরা ভিন্ন চালে চলে। ওদের মনমেজাজের মতোই ওদের সাজ-পোশাক। তেমনি আবার সমতলের উপজাতিদের। ওদের সাজ-গোজও কোন বিধিনিষেধ মেনে চলে না। মন যেমন চায়, ওরা তেমনি চলে। টকটকে লাল জবা মাথায় গুঁজে যৌবনের হিল্লোলিত ছন্দে পথ হাঁটে। যে-কারো পক্ষে এক নজর থমকে বা পিছু ফিরে দেখতে হয়।

এটাই হচ্ছে আসামের আসল বৈচিত্র্য। এখানে সবাই আমরা মনের দুয়ার খুলে দিয়েছি। কোন সংস্কার বা চিন্তার বিচার করিনি। যা আমরা আয়ত্ত করেছি, তাই অবশ্য ক্রমে সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। আর দূরে ঠেলতে পারিনি। রক্তমাংসের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। পুরোপুরি। তবু আমাদের মন গ্রহণবিমুখ নয়। সংঘাতে সংঘাতে যেদিন নতুন আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয়নি। উথাল-পাথাল ঢেউ ওঠানামা। অশান্ত হয়ে বাইরে তাকিয়েছি। গ্রহণ করেছি এবং বর্জনও। এমনি ভাবেই চলেছে আমাদের জীবনেতিহাস।

কটকে কটকী শাড়ি বড় মনোহর। ওড়িশার কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেবদেউলের সঙ্গে আরেকটি জিনিসের কথা মনে পড়ে। কটকী শাড়ি। না হলে বেড়ানো ঠিক জমে না। শুধু কি শাড়ি চাই, এক টুকরো ব্লাউজ-পিস। চমৎকার মানানসই। তবে তো বেড়িয়ে আনন্দ। শুধু বেড়ানো নয়, ঘরে বসেও আমাদের এ-আবদার চিরকাল। আর এখন তো কোনকিছুই খুব একটা অসুবিধা নয়। হাত বাড়ালেই বন্ধু। কটকী শাড়ি-ব্লাউজ যদি হলো আরেকটুর জন্য মন খারাপ করে লাভ নেই। চাই রুপোর ফিলিগ্রি গয়না। সাজটা জমবে ভাল। মনের সাধও পুরো হবে ষোল আনা।

বললাম বটে ওড়িশার কথা। কিন্তু এমনি প্রায় আমাদের প্রতিটি রাজ্যে। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ঘরানা আছে। নিজের নিজের বিশিষ্টতায় সবাই সমান। কমবেশি পরের কথা। ফ্যাশানের বিচারে সে-কথা মনেও থাকে না। বরতনু উজ্জ্বল হলো কিনা সেটাই বড়ো কথা। আর সব পরের চিন্তা। কথায় কথা বাড়ে। মনে পড়ে শাড়িতে বাংলাদেশের সেই রবরবা। মসলিনের যুগ বাদ

দিয়ে ধনেখালি, টাঙ্গাইল আর শান্তিপুর মহিমায় অম্লান। শাড়ির বাহারে এদের নিজস্ব অবদান রয়েছে। একখানা শান্তিপুরী অথবা ঢাকাই জামদানী পরে বেরলে একই ঘরানার স্বতন্ত্র মহিমা বড় মধুর ঠেকে। খাল-বিল আর জল যেমন আমাদের চিরসাথী, তেমনি কল্পনামাধুর্যকে বিদায় দিতে পারিনি কোন সময়েই। কল্পনার ভূত কাঁধে চেপে রয়েছে। সাজতে চেয়েছি, সাজাতে চেয়েছি। কতবার ঢেলে সাজিয়েছি। মন মানে না। চোখ স্থির বাঁধে না। আবার বদল করেছি। আবার, আবার। এখনো এই ভাঙাগড়া অব্যাহত। এটাই বোধহয় কালের যাত্রার স্মারক। এখানে সবাই চলে, আমরাও চলি। তবে হুজুগে নয়। মোটামুটি ভেবেচিন্তেই।

আবার যদি পুব ছেড়ে দক্ষিণে পাড়ি জমাই, তবে আরো মজা। সারা দেশে কত যে মজার ভাণ্ডার জমা আছে হদিশ না পেলে বোঝা যায় না। এ প্রসঙ্গে একটা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা মনে পড়ে গেল। অবশ্যই শোনা কাহিনী। স্বদেশে আমরা যেমন-তেমন। কিন্তু বিদেশে মন বড়ো আনচান। স্বদেশী কাউকে দেখলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। দু দণ্ড বসে কথা বলি। মনের ভার একটু হালকা করি। যদি সবটা সম্ভব না-ও হয়। এমনি ইচ্ছে ছিল সেই ভদ্রলোকের। দূর থেকে নজর করলেন, দক্ষিণী শাড়ি-পরিহিতা এক ভদ্রমহিলা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। দেখেই তিনি হনহন করে এগিয়ে আসছেন। অনেক দিন দেশী লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। মনটা উঠেছে। কথা বলার একটু সুযোগ পাওয়া গেল। অবশ্য সাউথ ইন্ডিয়ান। তাহলেই বা স্বদেশী তো। তিনি এসে সরাসরি শুরু করেন ইংরাজীতেই। ভদ্রমহিলা কিন্তু প্রথম নজরেই ঠাহর করেছিলেন এ বাঙালী না হয়ে যায় না। ইংরাজী প্রশ্নের জবাব তিনি দিলেন বাংলায়। ভদ্রলোক তো অবাক। সবিনয়ে জানালেন, দক্ষিণী শাড়িই এই বিভ্রান্তির কারণ। কাহিনীর অবতারণার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু, অনেক বাঙালী মহিলা দক্ষিণী শাড়ির সঙ্গে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন। আর এ-কথা অনস্বীকার্য ছাপার বাহারে দক্ষিণী হ্যান্ডলুম যত উন্নতি করেছে তেমনটি আর কেউ নয়। তাই মনও জয় করেছে অনেকেরই। এঁদের শাড়ির নামডাকও খুব। আর নিত্যনতুনের মাহাত্ম্যে এদেশ অনেককেই টেক্কা দিয়ে চলে। অন্তত এই সেদিন পর্যন্ত জানি, বঙ্গললনাদের কাছে দক্ষিণী শাড়ির কদর ছিল দারুণ। এখনো যে খুব একটা ভাটা পড়েছে এমন মনে করার খুব একটা কারণ নেই। বাজারের হালচাল দেখলেই এ-কথা টের পাওয়া যায়।

সে-তুলনায় পূর্বদেশ আসাম বরং বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। আসামের মেখলা-পরা মেয়ে বিহু উৎসবের রঙ-বেরঙের মধ্যেই নিজেকে এখনো সংবৃত করে রেখেছে। বাইরে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে, প্রচার পায়নি। সমুদ্র যেমন মেখলে ধরা, তেমনি আসামের মেখলা-পরা মেয়ে। চৈত্র-সংক্রান্তির সেই মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। বিহুর উদ্দাম পরিবেশ। ঘর ছেড়ে মন বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায়। সেদিন তার অঙ্গে শোভে মেখলা। জাতীয় উৎসবে জাতীয় পোশাক। আর কিছু সেদিন দূরে পড়ে থাকে। ওরা মেতে ওঠে রঙের খেলায়।

মেখলা বাদ দিয়ে শাড়ির বৈচিত্র্যেও আসাম ভরপুর। কতরকম শাড়ির সমারোহ। সঙ্গে মানানসই ব্লাউজ। পুরো সেট। মায় হাতের ব্যাগ পর্যন্ত। কিন্তু আসামের রহস্য শাড়িতে নয় যতখানি মেখলায় আর উপজাতীয় পোশাক-বৈচিত্র্যে। নাগা, লুসাই, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো সবাই পোশাকে এক-একটি দিগন্ত। এসবের সমন্বয় আজ হচ্ছে অনেকখানি। আদান-প্রদান চলছে। অদূরভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে, এর ফলে জগৎ-মনোহারী কোন পোশাক। এখন স্বতন্ত্রভাবে যা আছে তাই বা কম কিসে। শিলংয়ের পথে দেখা সেই সে লুসাই মেয়েটি। স্কার্ট-ব্লাউজ পরা, মাথায় পালক গোঁজা টুপি। সুন্দর পা ফেলে গুটি গুটি চলছিল। স্কার্ট-ব্লাউজ ততটা নয় যতখানি এই পালক-গোঁজা টুপি। সম্পূর্ণ পাহাড়ী সৌন্দর্য একেবারে ফুটে বেরুচ্ছে। আসামের পার্বত্য পথে এমনি দৃশ্য হামেশাই চোখে পড়বে। আবার শীতের সোনালি রোদ্দুরে সেই যে মেয়েটি চাদর জড়িয়ে বসেছিল। সুন্দর লাগছিল। চাদরটির বাহারেই মন মজে যায়। এটি নাগা চাদর। সমতলের অধিবাসীদের মধ্যেও নাগা চাদর ইদনীং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কলকাতার দোকান-বাজারেও এ-চাদরের আধিক্য। সংস্কৃতির আদান-প্রদান। মন দেওয়া-নেওয়ার পালা। সমতল আর পাহাড়ের আত্মীয়তা।

হাফলং শহরের সেই ভদ্রমহিলার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি নিজে একটি হ্যান্ডক্রাফট সেণ্টারের পরিচালনা করেন। সখেদে জানালেন, আধুনিক পোশাক আমরা গায়ে তুলেছি ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ বাড়ির মেয়েরা আজও ব্লাউজ পরতে লজ্জা করে। আসলে এটা সংস্কার। দীর্ঘদিন এমনি চলেছে আর আজ হঠাৎ সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারছে না। চিরাচরিত পোশাকই এরা পছন্দ করে বেশি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় নাগাদের উৎসবের পোশাক। কি তার মেজাজ আর আমেজ। তার পাশে ওরা যখন আধুনিক পোশাক পরে, তখন কিরকম সাদামাটা মনে হয়। ওদের ঘরে ঘরে তাঁত। সে-তাঁতে ওরা বুনে চলে নিজেদের মনোমত পোশাক।

পোশাকে পোশাকে আজ দারুণ মিশ্রণ। একা কোন পোশাকের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই চাই পাণ্ড। হচ্ছেও। আসামের পাহাড়ী পোশাকের সঙ্গে সমতলের ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ুক। মেখলা-পরা মেয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ুক সকলের মধ্যে। সত্যি কথা বলতে, পোশাক-বিচিত্রায় আসাম নিজেই এক সম্পূর্ণ জগৎ। এখান থেকে আমাদের নেবার জিনিস আজো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। শাড়ি, মেখলা, পাহাড়ী পোশাক ছাড়াও আসাম হ্যান্ডিক্রাফটস-এর বিভিন্ন শাখায় অনেকের তুলনায় বেশি উন্নত। এর নিজস্ব ঘরানায় এমন অনেক জিনিস মজুত আছে যা রূপেগুণে সবাইকে মজায়। শীতের রাতে লাইশ্যাম্পির উত্তাপ আমাদের ঘুমে নতুন স্বপ্ন আনে। আর কিছু না হোক, আসাম ঘুরে এলে একটা লাইশ্যাম্পি আপনাকে আনতেই হবে। আর মনে মনে ভাবতে হবে এর সম্মিলিত উপত্যকার প্রাণপ্রাচুর্য—যা এর হ্যান্ডিক্রাফটসে প্রকাশিত। যা নিয়ে পাহাড়-সমতল হাত ধরাধরি করে নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারে।

শিথিল কবরী বাঁধিও

সুকেশা সুন্দরীরা, যাঁরা দীর্ঘ, ঘন কেশভার নিয়ে বিব্রত এবং কিছুটা অধৈর্য, যাঁদের দিনের পর দিন না আছে কবরীর জন্য যথেষ্ট সময় দেবার, না আছে বিউটি সেলুনে গিয়ে কেশ পরিচর্যার, তাঁদের জন্য একটা সুখবর আছে।

একটি মার্কিন ফার্ম সম্প্রতি বাজারে এক ধরনের কেশ পরিচর্যা যন্ত্র বের করেছেন। যন্ত্রটি সামান্য সময়ের মধ্যে যে-কোন ঢং-এ চুল বেঁধে দিতে পারে। এমন যন্ত্র পৃথিবীতে এই প্রথম।

যন্ত্রটি অবশ্য ইলেকট্রিসিটিতে চলে। এর মধ্যে ২০টি রোলার আছে, যেগুলি খুব আস্তে আস্তে গরম হয়। তাপমাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে এলে একটি ইন্ডিকেটারের মাধ্যমে তা জানা যায়। তখন বুঝতে হবে, যন্ত্রটি ব্যবহারযোগ্য হয়েছে। যন্ত্রটি আকারে ছোট, নাড়াচাড়া করার ঝামেলাও নেই। সঙ্গে আছে একটি ছোট ম্যাগনিফাইং আয়না।

অতঃপর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে মহিলারা তাঁদের অগোছাল কেশরাশি ইচ্ছেমত গুছিয়ে নিতে পারবেন। —প্রমীলা

ভারতীয় গেজেটিয়ার

গেজেটিয়ার হোল ভৌগোলিক সূচক বা ভৌগোলিক অভিধান। বিস্তৃততর পরিধিতে এর রচনা-সীমা ব্যাপ্ত। একটি দেশ বা দেশবাসীর জীবনের নিখুঁত আলেখ্য গেজেটিয়ার। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ গেজেটিয়ারে স্থান পায়। একদিকে যেমন প্রশাসকের প্রয়োজন মেটায়, তেমনি জনসাধারণের যাবতীয় জ্ঞানতৃষ্ণা পূরণ করে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে গেজেটিয়ার একটি তথ্যভাণ্ডার। অথচ কোন দুর্বোধ্য আলোচনার সংগ্রহ নয়। গেজে-টিয়ার যত পুরোন হোক না কেন, তার দাম কমে না। কারণ ঐ বিশেষ সময়কার দেশের অবস্থা জানতে গেজেটিয়ারই হোল একমাত্র অবলম্বন।

গেজেটিয়ার রচনা শুরু হয় ইউরোপে গত শতকের প্রথম দিকে। আধুনিক গেজেটিয়ারের পথপ্রদর্শক হলেন জার্মানীর ভূগোল বিজ্ঞানী যোহান হাসেল। ১৮১৭ খৃঃ তাঁর বই প্রকাশের পর ইউরোপে গবেষণা ও অনুসন্ধানের সাড়া পড়ে যায়। নানা জায়গায় গেজেটিয়ার প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে কয়েকটি আদর্শস্থানীয় এবং সেগুলি সর্বজনের স্বীকৃতি পায়। আমেরিকায় গেজেটিয়ার রচনা অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা হলেও ১৯৫২ খৃঃ লিজিনকট গেজেটিয়ার প্রকাশিত হলে পৃথিবীময় দারুণ সমাদৃত হয়। ইউরোপে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ের গেজেটিয়ার-গুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোল জনস্টনের গেজেটিয়ার (১৮৫০ খৃঃ), ব্ল্যাকির গেজেটিয়ার (১৮৫০ খৃঃ), বুইঃ ইর গেজেটিয়ার (১৮৫৭ খৃঃ), লংম্যানের গেজেটিয়ার (১৮৯৫ খৃঃ), গ্যারোলোর গেজেটিয়ার (১৮৯৮ খৃঃ)।

আধুনিক অর্থে গেজেটিয়ার না হলেও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে আছে প্রাচীন ভারতের বহু মূল্যোবান তথ্য। মেগাস্থিনিস, ফা হিয়েন, হুয়েন সাঙ, সিলাক্স, আহিয়াল, টলেমি, অল বিরুনী, ইবন বতুতার নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কৌটীল্যের অর্থ-শাস্ত্রে মৌর্য যুগের প্রয়োজনীয় তথ্য মেলে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী আধুনিক অর্থে গেজেটিয়ারের অনেক কাছাকাছি।

ভারতে আধুনিক গেজেটিয়ার রচনা শুরু ব্রিটিশ আমলে। শাসন কাজের সুবিধার জন্য বিভক্ত জেলাগুলির প্রাচীন ও সাম্প্রতিক তথ্যসংগ্রহের পর এই সমস্ত বই লেখা হোত। সিপাহী বিদ্রোহের আগে থেকেই গেজেটিয়ার রচনার কাজ শুরু হয়েছিল। এডওয়ার্ড থর্নটন ১৮৫৪ খৃঃ চার খণ্ডে একটি গেজেটিয়ার সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। কিন্তু ইংরেজ জনসাধারণ ও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের ভারত সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য আরও বিস্তৃত তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন ঘটে। বিশেষ করে কোম্পানীর পরিচালকদের ভারত সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করা তখন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ১৮৫৮ খৃঃ থর্নটনের গেজেটিয়ার অফ দি টেরিটোরি অফ দি গভর্নমেন্ট অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অ্যান্ড আদার নেটিভ স্টেটস অফ দি কন্টিনেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা এবং সুপরিকল্পনা এই গেজেটিয়ারটির সাফল্যের অন্যতম কারণ। যাদের জন্যে এই গেজেটিয়ার সম্পাদিত ও সংকলিত হয়েছিল, তাদের প্রয়োজন কতখানি মিটেছিল জানা নেই। তবে এই গেজেটিয়ারের খণ্ডগুলি আজও অতুলনীয়। দাম ছিল খুব কম। সহজ বহনযোগ্য এবং সব সময় ব্যবহারযোগ্য।

এর পরের উল্লেখযোগ্য গেজেটিয়ার সার উইলসন হাণ্টার রচনা করেন ১৮৮৫-৮৭ খৃষ্টাব্দে। তার নাম দি ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া। এর সংশোধিত পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ছাব্বিশ খণ্ডে ১৯০৮ খৃঃ। একটি খণ্ডে ছিল মানচিত্র। রাজ্যভিত্তিক গেজেটিয়ার বেরোয় ১৯০৮-৯ খৃঃ। এর পর গেজেটিয়ার সম্পাদনার কাজ ছিল সুপরিকল্পিত। ১৯১০-২১ খৃঃ মধ্যে বিভিন্ন জেলার সরকারী কর্মচারীদের সংগৃহীত তথ্য গেজেটিয়ারে প্রকাশিত হতে থাকে। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের মানচিত্র খণ্ডটি পরিবর্ধিত আকারে বেরোয় ১৯৩১ খৃঃ। এর পর দীর্ঘদিনের নীরবতা নেমে আসে। ভারত এবং বিশ্বের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই নীরবতার মূল কারণ। ব্রিটিশ রাজশক্তি নিজেদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে শংকিত হয়ে ধীরে ধীরে নিজেদের গুটিয়ে ফেলছিল।

ইংরেজ আমলে প্রকাশিত গেজেটিয়ার-গুলির মধ্যে বিশেষ করে ও' ম্যালীর গেজেটিয়ারের কথা উল্লেখ করতে হয়। রচনাগুণ এবং নিখুঁত তথ্যে এই গেজেটিয়ার এখনও প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। যে কোন যুগে এর উপাদান স্বীকৃতি পাবে। এইসব গেজেটিয়ারের সাফল্যের মূলে ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অনলস পরিশ্রম, উৎসাহ এবং জ্ঞানস্পৃহা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ'রা সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়ে যেতেন। সেই সঙ্গে খুলে দিতেন দুটি চোখ। স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে তাদের গুণগত ঐতিহ্য উপলব্ধির চেষ্টা করতেন। ঐ সমস্ত জায়গার তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহে অসামান্য কর্ম-দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন তাঁরা। একটা নিখুঁত পরিকল্পনাও ছিল এর জন্য। ম্যাজিস্ট্রেটদের অধস্তন কর্মীদের সুদক্ষ সহযোগিতা গেজেটিয়ার রচনার ধারাকে করেছিল মসৃণ। স্থানীয় কর্মীদের সংগৃহীত সত্য বিবরণের ওপর নির্ভর করে গেজেটিয়ার রচিত হওয়ায়, নির্ভুল তথ্য পরিবেশনে সক্ষম হয়েছিলেন সে সময়কার গেজেটিয়ার রচনাকারেরা। এই সমস্ত গেজেটিয়ার আজকাল দুষ্প্রাপ্য। তাছাড়া রচনাভঙ্গী ও তথ্য পুরোন হয়ে পড়েছে। সেজন্য প্রয়োজন নতুনভাবে গেজেটিয়ার সম্পাদনা ও রচনা।

দেখা যাচ্ছে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে গেজেটিয়ার রচনার ঐতিহ্য ছিল সুস্পষ্ট। একটি ধারাও অনুসৃত হোত। কিন্তু একশ বছর আগে গেজেটিয়ারগুলি বিদেশী শাসক দেশ শাসনের তাগিদে রচনা করেছিল। তাদের দৃষ্টির সঙ্গে আজকের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিরাট। একমাত্র প্রশাসনিক প্রয়োজনে আবদ্ধ গেজেটিয়ার-গুলিকে দেশবাসীর প্রয়োজনে মুক্তি

দেওয়ার অনুভূতি দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল।

দেশ স্বাধীন হলো। ভারতের জনগণের জীবনে এবং চিন্তায় আমূল পরিবর্তন এল। সে পরিবর্তন কতখানি পুরাতনের সঙ্গে জট বাঁধা, আর কতখানি মুক্ত সে বিচার রাজনীতির চোখ না নিয়েও করা যায়। কতখানি ঐতিহ্য-অনুরাগী সনাতনপন্থী আর কতখানিই বা চিন্তার ক্ষেত্রে, জীবনের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন-কামীতাও বিশ্লেষণের দরকার। শিক্ষার সম্প্রসারণ ও শিল্পের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে আমরা আশান্বিত হতে পারি। দেশের মধ্যে যুগান্তর বয়ে যাচ্ছে, এমন ধারণা গড়ে ওঠাও অসম্ভব নয়। কিন্তু দেখতে হবে জনগণের নৈতিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে কতখানি। চিন্তার ক্ষেত্রে, দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে আমরা কতখানি আত্মস্থ স্বাধীন। একশ বছর আগে যেভাবে আমরা চিন্তা করেছিলাম, আজ সে পথ বদলেছে। জনসংখ্যা বেড়েছে। দেশবাসীর জীবন ও জীবিকা হয়েছে প্রশস্ততর। দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হয়েছে মৃত্তিকা গহ্বর থেকে মহাশূন্যে। যে চোখ নিয়ে শতবর্ষ আগে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, আজ প্রয়োজন তার আমূল পরিবর্তন।

গেজেটিয়ার সম্পাদনায় দরকার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। তাছাড়া আর একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন এই সমস্ত কাজে কোন যোগাযোগ না থাকলে বহু পরিশ্রমসাধ্য উপাদান মূল্যহীন হয়ে পড়বে। স্থির হয় সংকলন প্রস্তুতের কাজ হবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে। এক ধাঁচে যদি রচনা করা হয়, একই পরিকল্পনার ভিত্তিতে যদি বিভিন্ন রাজ্যের কাজ এগিয়ে চলে, তবে সমগ্র ভারতের জীবন্ত ছবি স্পষ্ট হবে গেজেটিয়ারে। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে হবে। অতি অল্প সময়ে কম পরিশ্রমে বিদেশী বা ভারতীয় প্রত্যেকেই দরকারী তথ্য খুঁজে পাবেন। তাছাড়া নতুন গেজেটিয়ারগুলি যাতে কেবলমাত্র প্রশাসকদের প্রয়োজনোপযোগী না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখার দরকার। বহু ভাষা ধর্ম আচার ব্যবহারে বৈচিত্র্যময় দেশ ভারত। সব সম্প্রদায় ও মানুষের ধর্ম সংস্কৃতির সমাচরণ, সম্মান প্রদর্শন, একটা প্রধান নীতি হিসাবে নির্ধারিত হয়। গেজেটিয়ার যাতে সুসমৃদ্ধ দেশের বৈচিত্র্যময় প্রতিচ্ছবি হয় সেদিকে সরকারের লক্ষ্য সজাগ।

১৯৫৫ খৃঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধিদের (এক্সপার্ট কমিটি) এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে স্থির হয় কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ান এম্পায়ার খন্ডগুলি সংশোধন পরিবর্তন পরিবর্ধন ও প্রকাশ করবেন। রাজ্য সরকার জেলা গেজেটিয়ার নিয়ে কাজ করবেন। সেই কাজ শেষ হলে হাত দেওয়া হবে রাজ্য গেজেটিয়ারগুলি রচনার কাজে। তিনশতাধিক গেজেটিয়ার রচনার কাজ সত্যিই দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রমের ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন গবেষকের এবং নিরলস কর্মীর পরিশ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতা।

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজ শুরু করেছেন। এর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থও বরাদ্দ হয়েছে। রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন সময়ে কাজ শুরু হওয়ায় কাজের মধ্যে কোন সমতা নেই। তবু ষাটখানার ওপর গেজেটিয়ার ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ এগিয়েছে অতি মন্থরভাবে। গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া ঃ ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন-এর প্রথম খন্ড 'দেশ ও মানুষ' (কান্ট্রি অ্যান্ড পিপ্‌ল) প্রথম খন্ড 'দেশ ও মানুষ' মাত্র প্রকাশিত হয়েছে এতদিনে। দ্বিতীয় খন্ড 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার), তৃতীয় খন্ড 'অর্থনৈতিক কাঠামো ও কর্মপ্রচেষ্টা' (ইকনমিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিজ) এবং চতুর্থ খন্ড 'প্রশাসন ও জনকল্যাণ' (গভর্নমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কতদিনে প্রকাশিত হবে জানা যায়নি।

কয়েকটি রাজ্যের কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের থেকেও মন্থর। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা বোম্বাই-এর। ১৯৪৯ খৃঃ কাজে হাত দিয়ে ১৯৫৪ খৃঃ এঁরা পুণা খন্ডটি প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গে সেন্সার রিপোর্টগুলি ভূমিকাসহ প্রকাশের ব্যবস্থা হয় ১৯৫১ খৃঃ। ১৯৬১ খৃঃ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। ১৯৫২ খৃঃ কাজে হাত দিয়ে বিহার ১৯৫৭ খৃঃ গয়া ও হাজারিবাগ দুটি খন্ড প্রকাশ করেন। মাদ্রাজে কাজ শুরু হয় ১৯৫৪ খৃঃ তাঞ্জোর সম্পর্কিত খন্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খৃঃ। তারপর ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে গেজেটিয়ার সম্পাদনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের জন্য পৃথক দপ্তর খোলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৫ খৃঃ জিতেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্তের সম্পাদনায় জেলা গেজেটিয়ারের পশ্চিম দিনাজপুর খন্ডটি প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর পরে সরকারী-কর্মীরা গেজেটিয়ার রচনার কাজে হাত লাগান। কিন্তু যতটা দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল, উপযুক্ত কর্মীসমাবেশেও সে কাজ বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারেনি।

পশ্চিম দিনাজপুর খন্ডটি বৃহদায়তন না হলেও জেলাটির আনুষঙ্গিক প্রায় সমস্ত বিষয়কেই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে আধুনিক ইতিহাস, জনসংখ্যা, ভাষা, ধর্ম, সমাজজীবন, কৃষি, জলসেচ, শিল্পায়ন, ব্যবসাবাণিজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বনিয়াদ, সাধারণ প্রশাসন, কর ব্যবস্থা, আইন প্রশাসন ও বিচার, স্বায়ত্ত-শাসন, শিক্ষা সংস্কৃতি, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন এবং বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানের ওপর বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণ জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই প্রয়োজন মেটাবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার। শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গেজেটিয়ার সম্পাদনা করছেন। সময়োপযোগী এবং নতুনভাবে রচনার কাজে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ইউনিটটি মোটামুটি কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে এই সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য। ইতিহাস, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতিতত্ত্ব, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ের ওপর অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত সংগৃহীত উপাদান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাঁকুড়া জেলা ভারত ইতিহাসের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় স্থান। সভ্যতার বিকাশ, উত্থান-পতনের বর্ণনায় ঐতিহাসিক নিষ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গেজেটিয়ারের বর্তমান সংস্করণে। প্রাগ্‌ ঐতিহাসিককাল থেকে প্রাচীন-মধ্য ও আধুনিককালের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঁকুড়ার ভূমিকা বিশেষ করে অহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রামে বাঁকুড়ার অংশগ্রহণ, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অগ্রগতির নানাচিত্র কঠোর পরিশ্রমে সংগৃহীত হয়েছে।

এই দুটি খন্ডে পশ্চিমবঙ্গের গেজেটিয়ার সম্পাদনায় গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট। আরো কয়েকটি খন্ড ছাপা এবং সম্পাদনার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রকাশে বিলম্ব না ঘটলে পশ্চিমবঙ্গ যে এ কাজে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নির্মল চৌধুরী

মানুষগড়ার ইতিকথা
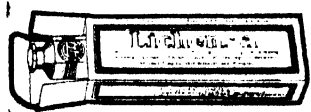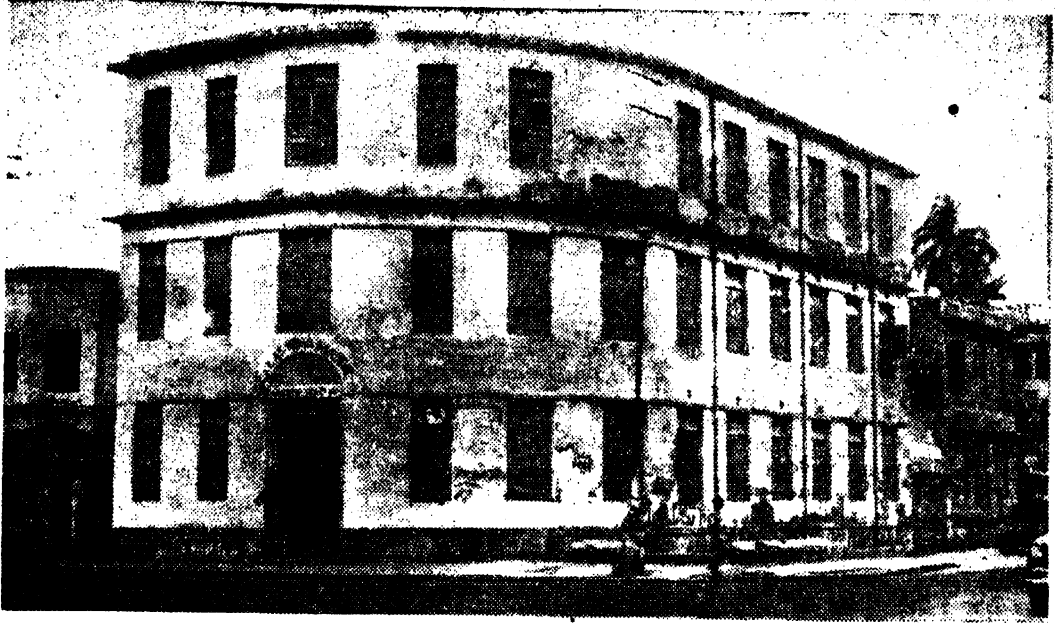
কৈলাস বিদ্যামন্দির

দক্ষিণমুখী ৩৩ নম্বর বাস শেষ প্যাসেনজারকে নামিয়ে দেবে চেতলা সেন্ট্রাল রোড আর প্রথাল আঢ্য রোডের জংশনে। বাস থেকে নামতে নামতেই চোখে পড়বে একটা তিনতলা বাড়ি। গায়ে বড় বড় হরফে লেখা কৈলাস বিদ্যামন্দির, স্থাপিত ১৮৫০। ঐতিহ্য শতবর্ষ প্রাচীন হলেও বর্তমান বাড়িটি নেহাতই আধুনিক। কৈলাস বিদ্যামন্দির আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, শুরুতে সেখানে ছিল না। টালির ছাউনিতে যে মহৎ আকাঙ্ক্ষার সূচনা, অনেক ভাগ্যবিপর্যয় ও আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাই আজ ফলবতী হয়ে উঠেছে শতাব্দীকাল পেরিয়ে। ফিরে যাওয়া যাক সেই সুদূর অতীতে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল এই গোটা দেশটার শাসক, মহারাণীর রাজত্বকালের কোন ক্ষীণ আভাষ পশ্চিম সাগরপারেও দেখা যায়নি। তখন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ড্যালহৌসী।

আদি গঙ্গার পশ্চিম পারে চেতলা। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই রামতনু লাহিড়ীর কলকাতায় আসা ও পড়াশুনা শুরুর ব্যাপারে বলতে গিয়ে প্রাচীন চেতলার যে বিবরণ দিয়েছেন, তার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি। প্রসঙ্গত বলা দরকার বারো বছর বয়সে রামতনু লাহিড়ী তাঁর বড়দা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। কেশবচন্দ্র থাকতেন চেতলায়। "বর্তমান সময়ের ন্যায় তখনও চেতলা বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংলণ্ডে যে সকল চাউলের রপ্তানী হইত চেতলা সে সকল চাউলের সর্বপ্রধান হাট ছিল। এতদর্থে সুদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলপী প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত চাউলের নৌকা ও শালতী আসিয়া কালীঘাটের সন্নিকটবর্তী টালির নালা নামক খালকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। সুতরাং পূর্ববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝি প্রভৃতিতে চেতলা পরিপূর্ণ ছিল।"

"১৮২৬ খৃষ্টাব্দে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তী কালী-ঘাটের সন্নিকটস্থ চেতলা নামক স্থানে নিজ জ্যেষ্ঠের বাসাতে আসিলেন। জ্যেষ্ঠ কেশব-চন্দ্র ভ্রাতার শিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত করেন, এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। তখন চেতলার সন্নিকটে ইংরাজী স্কুল ছিল না।"

স্কুলের অভাবেই সেদিন রামতনু লাহিড়ীকে কেশবচন্দ্র কলকাতায় এনে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। তারপরে কেটে গেছে দু যুগ। ততদিনে উত্তর কলকাতায় হিন্দু, হেয়ার, ওরিয়েন্টাল সেমি-নারী, জেনারেল অ্যাসেমব্লি, ডাফ কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স রীতিমত সুপ্রতিষ্ঠিত। শতাব্দীর মাঝ বরাবর মেয়েদের জন্য বেথুন সাহেব খুলে দিলেন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (আজকের বেথুন স্কুল)। শহরের উত্তরে ছেলে-মেয়েদের পড়বার স্কুল-কলেজের তখন আর কোন অভাব নেই। কিন্তু দক্ষিণে, বিশেষ করে চেতলার অবস্থা তখন কি? শিক্ষার কোন পরিবেশই তখনো গড়ে ওঠেনি চেতলায়। ঠিক এই সময়ে চেতলার দৈন্যদশা ঘোচানোর জন্য যে ভদ্র-লোক এগিয়ে এলেন তিনি কোন বিত্তশালী জমিদার বা দেশ-বিখ্যাত শিক্ষাবিদ নন—একজন সামান্য আয়ের কর্মকার। নাম কৈলাসচন্দ্র দাস। নিজের বাড়ির এক অংশে টালির ছাউনীতে খুলে দিলেন 'গোপাল-নগর শিশু বিদ্যালয়'। একজন পণ্ডিত-মশাই এই পাঠশালাটি চালাতেন। এইভাবেই কেটেছে কুড়িটি বছর। ১৮৭০ সালে স্কুল পেল সরকারী অনুমোদন ও সাহায্য। এর ন' বছর পরে স্কুলের নাম পাল্টে রাখা হল 'গোপালনগর গভর্ণমেন্ট এইডেড মিডল ইংলিশ স্কুল'। তিন শব্দের নাম ছ'টি শব্দে পরিণত হওয়ার মাঝে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাও বেড়েছে প্রচুর। টালির ছাউনীতে আর জায়গা হয় না। স্কুলকে বাড়বার সুযোগ দেওয়ার জন্য কৈলাসচন্দ্র নিজের কামারশালাই ছেড়ে দিলেন। চেতলা ব্রীজ রোড আর জজকোর্ট রোডের মোড়ে ছিল এই কামারশালা।

নিজের সবস্ব দিয়ে তিলে তিলে কৈলাসচন্দ্র তাঁর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। বার-বার বাধা পেয়েছেন কিন্তু কখনো পিছু হটেন নি। যদি ভাগ্যের কাছে মাথা নীচু করতেন তাহলে আজ হয়তো কৈলাস বিদ্যামন্দিরের শতবর্ষের কাহিনী লিখবার প্রয়োজন হোত না। কারণ ১৯০০ সালে ছাত্র ও অর্থের অভাবে স্কুল প্রায় উঠে যাওয়ার যোগাড় হয়েছিল। চারদিকে অজস্র দেনা, অথচ কোথাও সাহায্যের কোন আশা নেই। নিজে কৈলাসচন্দ্র তখন গভর্ণমেন্ট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে মেকানিকের কাজ করতেন—মাইনে পেতেন ষাট টাকা। কুড়ি টাকায় সংসার চালিয়ে চল্লিশ টাকা দিতেন স্কুল টিঁকিয়ে রাখার জন্য। পঞ্চাশ বছর ধরে একটা একটা মানুষ একটি প্রতিষ্ঠানকে নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা

করে চলেছেন, বোধহয় তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হোত। ঠিক সেই সময়ে এলেন এক নিঃস্বার্থ কর্মযোগী শিক্ষাব্রতী। ১৯০১ সালের ১১ জানুয়ারী যাদবচন্দ্র ঘোষ এই স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলেন।

শুরু হল স্কুলের ইতিহাসে এক নতুন যুগ। মাত্র দু' মাসের চেষ্টায় যাদবচন্দ্র স্কুলের সব দেনা শোধ করে দিলেন। ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশ থেকে বেড়ে হল দেড়শো। পনেরো টাকার বদলে স্কুল সত্তরো টাকা করে সরকারী সাহায্য পেতে লাগল। শুধু তাই নয়, কলকাতা করপোরেশনের কাছ থেকেও আর্থিক সাহায্য পেয়ে স্কুলের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হয়ে উঠল। নববর্ষের শুরুতে আর একবার নাম পাল্টাল স্কুলের। নতুন নাম হল 'চেতলা গোপালনগর গভর্ণমেন্ট এইডেড মিডল ইংলিশ স্কুল।'

লর্ড ডালহৌসীর আমলে যার সূচনা, পঞ্চাশ বছর পরে লর্ড কার্জনের আমলে সবে যখন তার অবস্থা সামান্য ফিরেছে তখনই আবার শুরু হল উল্টোরথের পালা। কলকাতা করপোরেশনের গোখানার জন্য কৈলাসচন্দ্রের কারখানা সরকার রিকুইজিশন করলেন। কৈলাসচন্দ্রের বসতবাড়ির উপর গড়ে উঠলো প্রেসিডেন্সী জেল। রিক্ত কৈলাসচন্দ্র হলেন গৃহহীন, সেই সঙ্গে স্কুল হারাল তার বাস্তুভিটা।

সব হারিয়েও অপরাজেয় কৈলাসচন্দ্র। যার নিজের মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, তখনো তাঁর মাথায় শুধু একই চিন্তা—স্কুল বসবে কোথায়? যাদবচন্দ্র, হেমমোহন ও যদুগোপাল রায়ের সাহায্যে কৈলাসচন্দ্র আলিপুর জজকোর্ট রোডে—স্বাধীনতার সময়ে যেখানে ছিল রেশন অফিস—নিয়ে এলেন তাঁর স্কুল। সেই তাঁর শেষ চেষ্টা। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৈলাসচন্দ্র মারা যান।

কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যুর পর স্কুলের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন যাদবচন্দ্র। স্কুলের সেক্রেটারী হলেন কৈলাসচন্দ্রের ছেলে চন্দ্রকান্ত দাস। যাদবচন্দ্রের তখন একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান—স্কুলকে কি করে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। পঞ্চাশ বছরে তিন-তিনবার বাড়ি পাল্টেও স্কুলের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। অথচ স্থায়ী প্রতিষ্ঠার জন্য সবার আগে চাই নিজস্ব জমি ও বাড়ি। কৈলাসচন্দ্রের অসমাপ্ত ব্রত সমাপনের উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করলেন যাদবচন্দ্র। তাঁর এই একলব্য-সাধনার পাশে থেকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁরা হলেন প্রিয়নাথ মল্লিক কৈলাসচন্দ্র বসু ও গিরীশচন্দ্র বসু।

কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যুর তেরো বছর পর প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে কলকাতা কর্পোরেশন রাখাল দাস আঢ্য রোড ও চেতলা সেন্ট্রাল রোডের মোড়ে সাত কাঠা জমি, কাঠাপিছু পাঁচ সিকে মাসিক খাজনায় নিরানব্বই বছরের জন্য স্কুলকে লীজ দিলেন। ঠিক এর পনেরো বছর আগেই করপোরেশন স্কুলকে বাস্তুহারা করেছিল। স্কুল জজকোর্ট রোড ছেড়ে উঠে এল তার আজকের ঠিকানায়। ঠিকানা বদলের প্রায় সব খরচই বহন করেছিলেন যাদবচন্দ্র।

দোয়াত আছে, কলম নেই। জমি আছে, বাড়ি নেই। জমি হওয়ার সাত বছর পরেও স্কুলের বার্ষিক বিবরণীতে সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছিলেন—"কলিকাতা করপোরেশনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের স্যানিটারী ওয়ার্কসের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু আজিও স্কুলের নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ সম্ভব হয় নাই।"

বাড়ি নেই, অথচ এক তীব্র আর্থিক সঙ্কটে স্কুলের তখন প্রায় উঠে যাওয়ার যোগাড়। দিন আর চলে না। নিরুপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় এডুকেশন সোসাইটির হাতে তুলে দিলেন স্কুলের পরিচালন-দায়িত্ব—১৯২৮ সাল। সোসাইটির সুযোগ্য পরিচালনায় চোদ্দ বছরের মধ্যে সমস্ত আর্থিক সঙ্কট কেটে গিয়ে তৈরী হল স্কুলের নিজস্ব বাড়ি। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় স্কুলের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হল "আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে স্কুলের সুপ্রশস্ত দোতলা বাড়ি নির্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে।"

একটা প্যারাগ্রাফে একটি প্রতিষ্ঠানের চোদ্দ বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখা সহজ, কিন্তু যাঁদের অপরিসীম নিষ্ঠায় ও কর্তব্যবোধে কৈলাসচন্দ্র ও যাদবচন্দ্রের স্বপ্ন স্থায়ী চেহারা পেল চেতলা-গোপালনগরের সেই অগণিত নিঃস্বার্থ শিক্ষাব্রতীদের কঠোর পরিশ্রমের প্রকৃত চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য। আলাদা করে কারুর নাম উল্লেখ করে কাউকে ছোট করতে চাই না। তবে অন্ততপক্ষে কৈলাসচন্দ্রের ছেলে চন্দ্রকান্ত ও পরবর্তী সম্পাদক জয়চন্দ্র চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই দুজন শিক্ষাব্রতীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে স্কুলের ইতিহাসে।

জমি হল, বাড়ি হল। এবার স্কুল কমিটির চোখ পড়ল স্কুলের নামের দিকে। স্কুলের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের ঠিক পরের বছর (১৯৫১ সাল) স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির ১১ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সপ্তম সভার বিবরণী থেকে জানা যায় যে "স্কুলের নাম পরিবর্তন বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে যে প্রতিষ্ঠাতার নাম ইহার সহিত যুক্ত করিতে হইবে এবং মিডল ইংলিশ স্কুলের পরিবর্তে বিদ্যামন্দির বা অনুরূপ কোন নাম ব্যবহৃত হইবে।" তখন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ জ্ঞানরঞ্জন মিত্র, সম্পাদক অধ্যাপক জগৎচন্দ্র মিত্র। শতবর্ষ পথ পরিক্রমা শেষে 'গোপালনগর শিশু বিদ্যালয়' তার স্থায়ী আবাসে অধিষ্ঠিত হয়ে ললাটে ধারণ করল প্রতিষ্ঠাতার নাম—কৈলাস বিদ্যামন্দির।

নাম পরিবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে মান পরিবর্তনের প্রয়াস। এতদিন এই স্কুলের ছেলেরা ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়বার সুযোগ পেত। ম্যাট্রিক দিতে হলে তাদের ছুটতে হোত প্রতিবেশী চেতলা হাই স্কুলে। এই অভাব দূর করার জন্য বিদ্যামন্দিরে শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের বছরেই খোলা হোল ক্লাস সেভেন। চার বছর পরে এই স্কুলের ছেলেরা প্রথম বসল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায়। এর ঠিক সাত বছর পরেই স্কুল হায়ার সেকেণ্ডারীতে রূপান্তরিত হল। ১৯৬৪ সালে বিদ্যামন্দিরের ফার্স্ট ব্যাচ হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করেছে।

লর্ড ড্যালহৌসী থেকে লালবাহাদুর শাস্ত্রী—প্রায় এক কুড়ি একশো বছরে পাঠশালা স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিকে রূপান্তরিত হওয়ার মাঝে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অভাবিত রকম বেড়ে গেছে। এই শতাব্দীর সূচনাবর্ষে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ। শতবর্ষ পূর্তি বর্ষে ঐ সংখ্যা চৌদ্দগুণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় সাতশো পঞ্চাশ। আজ এই সংখ্যা হাজারের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। শুধু প্রাইমারীতেই পড়ে চারশো ছেলে।

সেকেণ্ডারী সেকশনের দু'শো ছেলের একটা বড় অংশ আসছে স্থানীয় করপোরেশন স্কুল ও বিদ্যামন্দিরের প্রাইমারী সেকশন থেকে। এই ছাত্ররা ছড়িয়ে আছে প্রধানত চেতলায় ও আশেপাশে। কিছু আসছে কালীঘাট, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ থেকে ও আদিগঙ্গার উপর কাঠের সেতু পার হয়ে। বাকিটা নিউ আলিপুর ও আলিপুর থেকে। এসব স্ট্যাটিসটিকস পেয়েছি টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারী অমিয়ভূষণ গুপ্তর কাছে। নিউ-আলিপুর, আলিপুর শুনে যেন মনে করবেন না আমাদের ছেলেরা আসছে বিত্তশালী ঘর থেকে—পাছে কোন ভুল ধারণা নিয়ে ফিরি তাই শ্রীগুপ্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—আসলে সামান্য কয়েকটি ছেলের বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভাল। তাছাড়া শতকরা নব্বুই ভাগ ছেলে আসছে এমন ঘর থেকে যেখানে মুখে আনতে পান্তা ফুরোয়। বলতে বলতে টকটকে ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠল—আমি ছেলেদের অনেকের বাড়িতেই গেছি। বলতে গেলে কারুরই কোন নিজস্ব পড়ার ঘর নেই। পড়ার ঘর দূরের কথা, বই আছে কটা ছেলের? খেতেই পায় না বই কিনবে কোত্থেকে?

অথচ মজার ব্যাপার এখন যিনি স্কুলের প্রশাসক তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২৪-পরগণা জেলার ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার দপ্তরের ডিস্ট্রিক্ট অফিসার। বছর চারেক আগে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির ইলেকশন নিয়ে এক বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। দলাদলি, মামলা ইত্যাদির ফলে স্কুল পরিচালন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। তখন বোর্ড থেকে এই স্কুল চালানোর জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসানো হয়। ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং ইয়ুথ ওয়েলফেয়ারের ডিস্ট্রিক্ট অফিসার যে স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সেই স্কুলের শতকরা নব্বুই ভাগ ছেলেকে খালি গায়ে দাঁড় করালে বুকের পাঁজরা গোনা যাবে। ব্যাপারটা করুণ নয়কি!

বই নেই, পড়ার জায়গা নেই, নেই পেটের খাবার—তবু এই স্কুলের ছেলেরা পাশ করে। শুধু পাশ করে না, স্কলারশিপও পায়। ১৯৫৯ সালে এই স্কুলের ছাত্র অনুপম ভৌমিক জুনিয়র স্কলারশিপ পেয়েছিল স্কুল ফাইন্যালে। স্কুল ফাইন্যালের নটি বছরে গড়ে এই স্কুলের

পরীক্ষার্থীদের শতকরা একাত্তর ভাগ পাশ করেছে। হায়ার সেকেণ্ডারীতে গত পাঁচ বছরে পাশ করেছে শতকরা একষট্টিজন। সায়েন্স, কমার্স ও হিউম্যানিটিজ মিলিয়ে এবছর নিরানব্বুইটি ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে। এ-লেখা যখন ছেপে বেরুবে ততদিনে হয়তো রেজাল্ট আউট হয়ে যাবে—অবাক হব না যদি ঊনসত্তরের ব্যাচ আগের ফলাফলকেও ম্লান করে দেয়।

সে আশা পোষণ করেন সবাই। শিক্ষকরা, হেডমাস্টার মশাই সবাই বিশ্বাস করেন তাঁদের ছেলেরা অনেক ভাল ফল দেখাতে পারে যদি তারা একটু সুযোগ পায়, যদি সরকার একটু সহানুভূতি দেখান। জিজ্ঞাসা করলাম, সরকারী সহানুভূতির কথা আসছে কেন? ম্লান হেসে হেডমাস্টার মশাই হেমেন্দ্রনাথ বসু রায় বললেন, আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন স্কুলের চেহারায়। চলুন আপনাকে দেখাই আমাদের স্কুল।

আজ কৈলাস বিদ্যামন্দিরের দু-দুটো বাড়ি। মেন বিল্ডিং তিনতলা। পাশে চেতলা সেন্ট্রাল রোডের উপর বছর পাঁচ-ছয় আগে আরো দু কাঠা জমি কেনা হয়েছিল। ঐ দু-কাঠার উপর দাঁড়িয়ে আছে সায়েন্স বুক। দাঁড়িয়ে আছে বলা ভুল। এটি একটি হঠাৎ ভেঙে-যাওয়া ঘুমের সমাপ্তিহীন স্বপ্ন। দুটো তলা উঠতে না উঠতে সরকারী সাহায্য হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৬২-র স্যাংশনড টাকা সাত বছরেও সরকারী দপ্তর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ আদায় করতে পারেননি। তাই সায়েন্স বুক ইন-কমপ্লিট হয়ে রইল। আজ দুটো বাড়ি মিলিয়ে সবশুদ্ধ ঘর আছে আঠারো-উনিশটি। এর মধ্যে হেডমাস্টার মশায়ের ঘর, অফিস এবং শিক্ষকদের বসবার ঘর বাদ দিলে ক্লাসের জন্য থাকে মাত্র পনেরোটি ঘর। সায়েন্স বুক ইনকমপ্লিট, তাই জায়গার অভাবে মেন বিল্ডিংয়ের তিন তলায় পাশাপাশি দুটি ঘরে বসানো হয়েছে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরী। মাস্টারমশাইদের মতে ঐ দুটো ঘরে ছেলেদের দাঁড়ানোর জায়গা হওয়াই দুঃসাধ্য, এক্সপেরিমেন্ট ওরা করবে কি করে? তিন তলার ঘরদুটো বাদ দিলে ক্লাস ফাইভ থেকে ইলেভেন, সাতটি ক্লাসের ছ'শো ছেলের জন্য থাকে মাত্র তেরোটি ঘর। একফালি করিডারের দুপাশে যখন একসঙ্গে সবকটি ক্লাস চলতে থাকে তখন ক্লাস ইলেভেনের মাস্টারমশাইয়ের পড়ানো ক্লাস নাইনের ছাত্রের মগজে বার-বার ধাক্কা মারলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

জায়গার অভাবে গাদাগাদি করে ছেলেদের ক্লাসে বসতে হয়। ইকুইপমেন্টের অভাবে ল্যাবরেটরীর কাজ সম্পূর্ণ হয় না। যেমন ওয়ার্কশপের অভাবে ক্র্যাফট টীচার বই থেকে ছবি দেখিয়ে ছেলেদের শেখান—হাতে কলমে নয়।

জায়গা ও ইকুইপমেন্টের অভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান যেমন ছাত্রদের অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তেমনি উপযুক্ত লাইব্রেরীর অভাবে ছাত্রদের পড়ার আকাঙ্ক্ষা কখনোই মেটেনি। মিটবে কি করে? বিল্ডিং গ্রান্টের মত বুক গ্রান্টের অনুমোদিত অর্থের একটা বড় অংশ আজও রাজকোষ থেকে এসে পৌঁছয়নি। সাকুল্যে লাইব্রেরীতে বই আছে হাজার খানেকের মত। এর মধ্যে দুশো বই হেডমাস্টার মশায়ের নিজস্ব লাইব্রেরীর, যার সুযোগ অন্যান্য মাস্টার-মশাইরা পান। শ-তিনেক বই আছে টিচার্সদের জন্য। আর হাজার ছাত্রের জন্য আছে মোটে পাঁচশো বই। বইগুলো পুরোনো ও ছেঁড়া বলে আজকাল আর ইস্যু করা হয় না। গ্র্যান্ট-ইন-এডের টাকায় চলে স্কুল। নিজস্ব টাকা কোথায় যে বই কিনবে? ক্লাস ফাইভের মাইনে পাঁচ টাকা, ইলেভেনে সাত টাকা। টিউশন ফীর টাকায় হেডমাস্টার মশাই সমেত তিন-বাইশজন শিক্ষকের মাইনেই হয় না—গভর্ণমেন্টের কাছে হাত পাততে হয়। তাই সরকারী সাহায্য না পেলে স্কুল বই কিনবে কি করে?

এই সামর্থ্যের অভাবেই হাজার ছেলের স্কুলে খেলার কোন সুযোগ নেই—কারণ মাঠ নেই। থাকার মধ্যে আছে এক চেতলা পার্ক। ঐ ছোট্ট পার্কটুকুর উপর গোটা চেতলার মানুষ নির্ভর করে আছে। তাই জায়গার অভাবে স্কুলে খেলাধুলোর কোন সুযোগ নেই।

পড়বার জায়গা নেই, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, খেলার মাঠ নেই তবু এই স্কুলের ছাত্রদের অদম্য জীবনীশক্তি। শত নেই নেইর মধ্যেও তারা ফি বছর সরস্বতী পুজোর সময় একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে। হেড-মাস্টার মশাই বললেন এটা এখন রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে।

খেলার মাঠের অভাব ছেলেরা মিটিয়ে নিয়েছে অন্যভাবে। আমার ছেলেদের অনেকেই ভাল মুষ্টিযোদ্ধা, বললেন হেমেন্দ্রবাবু—বিভিন্ন কমপিটিশনে ওরা কাপ মেডেল পেয়েছে। তাই হেডমাস্টার মশায়ের ইচ্ছা আছে ছেলেদের যখন খেলার মাঠ দিতে পারেননি, তখন স্কুলের এক কোণে একটা জিমন্যাসিয়াম গড়ে তুলবেন। ফুটবল, ক্রিকেট তাঁর স্কুলের ছেলেরা খেলতে না পাক একটু আধটু শরীরচর্চা ত করতে পারবে।

কিন্তু জিমনাসিয়াম আগে না প্যান্ট্রিন, ইউরিন্যাল আগে? মুস্কিলে পড়ে গেছেন হেডমাস্টারমশাই। জায়গা ও সরকারী আনুকূল্যের অভাবে এতবড় স্কুলের প্রয়োজনোপযোগী ব্যবস্থা নেই। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে স্কুলের ছেলেদের খাওয়ার জলের অভাব মেটানোর জন্য স্থানীয় অধিবাসী অমূল্যধন আঢ্য নিজের খরচে কল বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দিন পাল্টে গেছে। গ্র্যান্ট-ইন-এডের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা স্কুলের জন্য কেইবা আজ এগিয়ে আসবেন সাহায্য করতে? আবার সরকারী টাকা এলে পৌঁছতে একটা গোটা পাঁচশালা পরিকল্পনা কেটে যাবে। স্থানীয় সাহায্যের বাতায়ন আজ রুদ্ধ, অথচ সরকার উদাসীন।

●

এই ঔদাসীন্যের ফলেই উঠে গেছে এই স্কুলের একটি অত্যন্ত ভাল প্রাচীন প্রথা। ছাত্রপিছু প্রথমে মাসে বারো আনা পরে এক টাকা করে ফি নিয়ে প্রতিদিন দুপুরে ছাত্রদের স্কুলের তরফ থেকে টিফিন দেওয়া হোত। কোনদিন লুচি আলুর দম, কোনদিন দুটো বিস্কুট একটি কলা। এগারো বছর চলার পর পঁয়ষট্টি সালে এ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেল। পুরোনো ম্যানেজিং কমিটি স্কুলের হাজার অসুবিধার মধ্যেও ছাত্রদের টিফিন দেওয়ার জন্য অর্থব্যয় করতে কখনো কার্পণ্য করেন নি। শুনলাম টাকার অভাবেই নাকি প্রথাটি উঠে গেছে। স্কুলের ভরতুকি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অথচ কলকাতার সরকারী স্কুলগুলোতে দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীরা মাসিক তিন টাকা ফির বদলে নিয়মিত টিফিনে নামী দোকানের মিষ্টি বা নোনতা খাবার পায়। সরকারী আর এইডেড, বৈষম্যের দুস্তর সমুদ্র ব্যবধানে এ দেশের একদল ছাত্র যেসব সুযোগসুবিধা পায় অপর দল হয় তার থেকে বঞ্চিত।

এই বঞ্চনার ইতিহাস শুধু ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। শিক্ষকরাও ফলভোগ করছেন। শিক্ষকদের বেতনের কথা না তোলাই ভাল। সে ত সারাদেশ জুড়ে একই সমস্যা। কিন্তু বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকদের একটি বক্তব্য আজ বিশেষভাবে শোনা দরকার। তাঁরা বলছেন এই মাটিতেই সোনা ফলানো সম্ভব যদি আরো কয়েকজন শিক্ষক বাড়ানো হয়, যদি ইনকমপ্লিট সায়েন্স বুক কমপ্লিট করা হয়। ছেলেদের তাঁরা মনের মত করে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু সুযোগের অভাবে তাঁদের সব আকাঙ্ক্ষাই পাশের আদি গঙ্গার মত স্রোতের অভাবে শুকিয়ে আসছে। তীব্র অভিমানে ফেটে পড়লেন বিদ্যামন্দিরের মাস্টারমশাইরা—জানেন চেতলায় সবচেয়ে পুরোনো স্কুলে ক্লাস এইট থেকে নাইনে প্রমোশন পেলে ভাল ছেলেরা চলে যায় অন্য স্কুলে। সায়েন্সের ল্যাবরেটরীর অবস্থা ত স্বচক্ষেই দেখলেন, এরপর কেন ভাল ছেলেরা পড়ে থাকবে এই স্কুলে। আমরাই বা কি বলে ওদের আটকাব?

এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। যাঁদের জানা আছে তাঁদের কাছে এ প্রশ্ন পৌঁছলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। টালির ছাউনীতে যে মহৎ আকাঙ্ক্ষার সূচনা হয়েছিল, শতাব্দী পেরিয়ে আজ তা ফলবতী হয়ে উঠলেও কোথায় যেন বঞ্চনার তীব্র বেদনা রয়ে গেছে। জানি না কবে এ বেদনার অবসান হবে। শুধু বিশ্বাস করি দেহের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়ে যে মানুষ এই স্কুল গড়েছিলেন তাঁর স্বপ্ন কোনদিন ব্যর্থ হতে পারে না—আজ না হোক কাল তা সার্থক হয়ে উঠবেই।

—সন্দীপবন্ধু

পরের সংখ্যায় :
মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (মেন)

দেখতে শুনতে ভাল আছিস; খাসা ছেয়ালো, ভর-ভরন্ত। একটু হাসবি, কইবি, ঢং করে দুটো ছেনালীর কথা বলবি, আর তো কিছু নয়—

আর তো কিছু নয়! —মনে মনে ভ্যাংচালো মালতি। যেন আর কিছুই নয়। শয়তান বুড়ো কোথাকার। যেন সুবিধে পেলেই খিমচে, চিমটে ধরে না লোকে। যেন গুঁতো দেয় না কনুই দিয়ে, হাঁটু দিয়ে। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে ধরে না পা। যেন তুমিই ছেড়ে কথা কও বাগে পেলে। আর ঐ মেয়েগুলো পাজীর পা ঝাড়া,—পাহারা দেখলেই মালতির পিছনে ছুটবে। আর কাজ মিটে গেলে পয়সা দেবার বেলাতেই ওমনি আজ নেই, কাল নেই, খুব হল তো চারটে টাকা উশুল হয় রোজ।

দরজাটা খুলে ফেললো মালতি।

গাড়ি থেমে আসছে। সামনেই বড় ইস্টিশন। এখান থেকেই দেখা যায় প্লাটফরমে ভিড়। সারি সারি খাকি পোশাক। বেঁটে বেঁটে লাঠি হাতে। দরজার হ্যাণ্ডেলটা ধরে শরীরের প্রায় আধখানা বাড়িয়ে ধরলো মালতি। বাঁকা কোমর, উচকো বুক, ওপাশের দরজায় সীতেশ। মুখটা ঘুরিয়ে নিল মালতি। এইখানেই তার আসল কাজ।

দল পার করতে হবে, নেমে পড়ল টপ করে।

চিড়-বিড়িয়ে একটা গালাগাল দিয়ে উঠলো সীতেশ। মহারাণী একেবারে। ভাব দেখ না।—যেন আমার মুখ দেখলে পাপ হবে। যেন নোংরা মাখানো আছে আমার মুখে। করছেন তো ঢলামো। দলের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইলে পাপ হয় ওনার। মান খসে যায়। স-সাবিত্তিরী রে,—

এই এই সীতে, পা-দানী থেকে ডাকলো জগা। ছোট্ট একটা লাফ মেরে উঠে এল গাড়িতে। আরে বাঃ তুই এখানে! আর ওদিকে তো পালে বাঘ পড়েছে; সেই কানা আজ এসেছে আবার। মালতি বললো তোকে খবর দিয়ে......আরে একি! নীচু হয়ে ঘাড় গুঁজে আচমকা ছুঁড়ে মারা রুন্দাটা সামলালো সে। এ আবার কিরে—

গুল ঝাড়তে এসেছিস?

না। দেখগে যা, সেই লোকটাই এসেছে আবার।

এসেছে তো আমি কি করবো? ওতো মালতির কাজ। আমি ওখানে যাবো কি করতে রে?

মুখ খারাপ করবিনি সীতে। ওদিকে কি করবি এখন দেখগে যা। মালতি বল্লে ওর কাছে ও যাবে না। ও লোকটা নাকি ওকে একদিন—স্পষ্ট বলে দিল তোকে বলতে, যা পারিস তুই কর।

বটে! ভেঁপোয়ে উঠলো সীতেশ। পয়সা মারবেন তিনি, আমরা মাল বইব, রুন্দা গুঁতো খাবো, আবার ও'নার ঝামেলাও সামাল দেবো, আর তিনি কোমর নাচিয়ে মস্তানী করবেন, আর পয়সা কামাবেন।

পয়সার কথা বলবিনি, বুঝলি সীতে। গম্ভীর হল জগা।

কেন শুনি?

পয়সা কে দেয়রে ওকে? কেউ দেয় ঠিক মত? তুই দিস? আমি দিই বল?

স্থির দৃষ্টিতে চাইলো সীতেশ। হুঁ, খুব যে আঠা দেখছি?

আঠা-টাঠা কিছু নয়। মালতি আমাদের পাড়ার মেয়ে। জানিস, ও দস্তুরমত লেখাপড়াও জানে। ঘরে বড় ভাই বেকার। আণ্ডাবাচ্চা একপাল। তাই এসেছে এ কাজে, বুঝলি?

বুঝলাম। ভ্যাংচালো সীতেশ। সাবিত্তিরপনা করে কেন তাহলে। তার আবার—

এই সীতে। গলা চড়ালো জগা।

ধমক দিবিনে শালা, ধমক দিবিনে বলে দিচ্ছি।

তুই বলবিনে যা-তা।
বলব, কি করবি তুই?

দু জোড়া চোখ স্থির হয়ে চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে। তারপর সুর নরম করল আগে জগাই। আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে, যা বলবি বল। তোদের ব্যাপার তোরা বুঝবি। আমার কি। কিন্তু ওদিকে কি হবে সেটা তো আগে বলবি।

নরম হল না সীতেশ। পা দিয়ে গাঠরীটাকে ঠেললো, বেঞ্চির তলাপানে ঢুকিয়ে দিল খানিকটা। তারপর একটা কোণ নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে বললো, আমি জানি না। যার কাজ সে করবে।

শুধু শুধু মেজাজ খারাপ করছিস। আাই সীতে—

মেলা ড্যাজ ড্যাজ করবিনে জগা, ড্যাজ ড্যাজ করবিনে বলে দিচ্ছি। যা ভাগ এখান থেকে।

জ্বালারে ব্যাওরা; ঠিক আছে বাবা, বলে দিচ্ছি আমি গিয়ে মালতিকে।

বলে দিচ্ছি আমি গিয়ে মালতিকে—তবে আর কি, আমার মাথাটাই কাটা যাবে একেবারে। যার কাজ সে করবে। আমি করতে গিয়ে ধরা পড়ে মরি আর কি। আর ঐ কানা চোখোটা,—ব্যাটা আবার লম্বা-চওড়া কথা বলে। খেটে খেতে পার না, সৎ পথে চলতে পার না, যেন এ কাজে খাটুনি নেই। যেন মান ইজ্জতের কাজকর্মের জোগাড় থাকলে এ পথে আসে কেউ। বাপে লেখাপড়া শেখালো না, সে যেন আমার দোষ। আর ঐ যে মিলিটারীরা নিলে না ফিরিয়ে দিলে ওজন কম আর ছাতি ছোট বলে, সেও যেন আমিই শিখিয়ে দিয়েছিলাম তাদের। যেন না খেয়ে কারুর আটচল্লিশ ইঞ্চি ছাতি হবে, ভুট্টার দানা আর কচুশাকের ঘ্যাঁট খেয়ে হবে তিন মণ তিরিশ সের ওজন, শু-সা-লা,—নিকুচি করেছে সব—

নিকুচি করেছে, ছিটকে সরে এল মালতি। উঃ চোখে জল এসে গেছে একেবারে। ঘেন্নায় গলা অবধি জ্বলতে থাকে তার। ভাবে কি ওরা তাকে। মুখপোড়া, অনামুখো, রাককোস সব। উঃ যেন মাংসশুদ্ধ তুলে নিয়েছে। ইস্, যা'ব না আর, যাব না আমি। কিছুতেই যাব না; যা হয় হোক। দলশুদ্ধ পড়ুক ধরা সব। জানিনে আমি কিছু। অসহায়, অপমানে যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে কাঁদে মালতি।

নাগাড় অনেকক্ষণ ধরে গলা বার করে থেকেও কুমি কিংবা মালতি কাউকে দেখতে পেল না কুসুম। কি হবে? আজ একটা কিছু হবে নিশ্চয়ই। ওই লোকটা যেদিনই আসে, দুরঘটন ঘটে একটা। ভয়ে গলা অবধি শুকিয়ে এলো তার। ঠাকুর রক্ষে কর। সা-জোয়ান মেয়ে আমার। আর কটা দিন থাক, হাতের পয়সাকড়ি সামলে নিই, ওর বিয়ে দেব আমি। নিশ্চয়ই দেব। সোনার মতন মেয়ে আমার। কি ধীর, ঠাণ্ডা, কিনমী নরমে ভাব—ঠাকুর মুখ তুলে চাও। মা হয়ে পেটের সন্তানকে এ পথে এনেছি সে বড় দুঃখে। গুটিয়ে সুটিয়ে আবার কোণ পানে ঠেসে বসল কুসুম। বাইরে প্ল্যাটফরমে তখনও চিৎকার চেঁচামেচি কান্না; ওগো ছেড়ে দাও, ওগো ছেড়ে দাও। ও বাবু পায়ে পড়ি তোমার।

গা-গতর হিম করে বসে থাকে কুসুম, কি উপায় হবে। কি যে এল ঐ অনামুখো রাক্কস। উঃ চোখের দিষ্টি কি,—যেন আস্ত গিলে খাবে। সব্বস্বটি ঢেলে না দিলে পেট ভরে না ওনার, নইলে কুসুম তো জানে, কম দিন তো হল না তার এ লাইনে। আরও কত আছে, কত ভাল ভাল ভদ্দরলোকের ঘরের ছেলেরা আছে এই কাজে; করবে কি, একটা দুটো পাশ করেও বসেই আছে, বসেই আছে। চাকরিই পায় না, চাকরিই পায় না। ওইতো সেদিন বিশ্বেস বাড়ির সেজছেলেটা—পড়বি তো পড় একেবারে মুখোমুখি। কুসুম তো লজ্জায় সারা। ভাল থাকতে ওদের ভাগ-জোত করত নগেন। পাল-পাব্বনে কত গেছে এসেছে ও বাড়িতে। সেই কিনা একেবারে—

তা সে ছেলে বললে, ভয় নেই খুড়ি, আমি থাকতে কেউ কিছু বলবে না তোমাকে। তা, বলেওনি কেউ কিছু। সেইতো ছিল দলের বড়, কি বলে কয়ে দিল সবাইকে। তাকে দেখেও যেন দেখত না কেউ এমনি ভাব। আহা বেঁচে থাক সোনার চাঁদ ছেলে সব। তা সে কোথায় যেন অন্যদিকে গেল বদলি হয়ে। তার বদলে এসেছে ঐ ট্যারা চোখো। পেরান আ-তিষ্ট করে দিল একেবারে, মরণ আর কি,—তা নিবি তো নে দু-চার আনা নে, সে অমন সবাই নেয়; তা নয় একেবারে মোটামুটি চাই ওর। ওইতো সেদিন কুসুমকে মুচড়ে আদায় করেছে দেড়টাকা। উপায় কি দিতেই হয়, পার পাবার যো আছে নইলে। তার ওপরে ব্যাভার...মেয়েমানুষ দেখলে...ঘেন্না, ঘেন্না...কুসুম যে কুসুম তার গায়েও কিনা—। মালতি পর্যন্ত ভয় খায় ওকে। আর এইদিনে আজকেই কিনা কুমি পোড়ারমুখী কাছছাড়া হয়ে ছিটকে পড়ল। মনে মনে আর একবার যেন শিউরে উঠল কুসুম। মালতি পর্যন্ত ঘেঁষতে চায় না ওর কাছে। আর ওইতো মেয়ে হাবা-গবা। আর পাঁচটা মেয়ের মত চোখলো মুখলো তো নয়। ওই দেখ না মালতি। বাবা গড় করি মা। মেয়ে তো নয় যেন গোরা সেপাই। মুখে বুলি ফুটছে কি, চড়বড়, চড়বড়। আর কি যে বেহায়াদের মত গা-গতর খুলে খুলে দেখায়, লজ্জায় মাথা যেন কাটা যায় কুসুমের। বলি ব্যবসা তো তারাও করছে, কৈ অমন ধারা তো না বাপু। কুমি যে অমন হয়নি, সে বরাতের ভাগ্যি। আর কটা দিন যাক, এই অঘ্রানে ওকে আমি পার করবুই। বর দেখাই আছে। দিব্যি ঘর ভরন্ত ছেলে, দুচার বিঘে ধান জমি আছে। হাল বলদ। উঁচু দুয়োরী ঘর। একটু পড়া-লেখাও নাকি জানে। তবে খাঁই একটু বেশি। সাইকেল চায়, রেডিও একটা,—তা আর কি করা যাবে। ভাল ঘর বর দেখতে গেলে খাঁই হবে বৈকি! নগেন বলেছিল দরকার নেই, ছাড়ান দে সেজবৌ। শাঁখা শাড়ির জোগাড় নেই, ওসব সাত সামিগ্গিরী জোটাবি কোত্থেকে। তার চেয়ে আমরা যেমন তেমনি দেখে দিগে যা। আনে খায় এমন হলেও যথেষ্ট।

যথেষ্ট—রাগে গা জ্বলে যায় কুসুমের। তা আর না। মেয়েটার কপাল না পোড়ালে চলবে কেন তোমার। আনে খায় তেমনি ছেলে—যেন আনলে খেলেই হল। অদিনের অবীরের সম্বল দেখতে হবে না। আনা-খাওয়া ঘরের সুখ যে কত কুসুম তা তো বুঝছে হাড়ে হাড়ে। উঞ্ছবিত্তি করে জীবন গেল, সে হবে না। যত খরচই হোক, আর যাই হোক কুমিকে আমি ভাল ঘরে দেবই। নিজের যা হল হল, মেয়ে যেন কষ্ট না পায়। সেই একমাসের ছেলে বুকে করে কুসুমকে বেরুতে হয়েছে এই ধিক-জীবুনী কাজে। মেয়েকে যেন আর তা না করতে হয়। মুখে বলেছিল,—খরচ-খরচা নিয়ে তোমাকে তো ভাবতে আমি বলিনি বাপু, সে যা করবার আমি করবো। তুমি পড়ে আছ, পড়ে থাকগে, টাকাপয়সা লাগবে যে বুঝব আমি—

সেই বুঝতে গিয়েই তো আজ এই—ভয়টা যেন শীতের মত হয়ে ভেতরে ভেতরে আর একবার গুড়-গুড়িয়ে উঠলো কুসুমের। এই ছ্যাঁচড়ার কারবার করে যা হয় তা তো পেটে খেতেই কুলোয় না। তায় মেয়ে পার করা...তাই তাই—হে ঠাকুর কেউ জানে না, কাক নয় পক্ষী নয়, শুধু তুমি অন্তর্যামী...এত্তটুকু একদলা জিনিস, কাগজে মুড়ে, কাপড়ে জড়িয়ে...মেয়ে আমার সরল কিছু জানে না, যা দিয়েছে রেখে দেয় সরল বিশ্বাসে জামার ভেতরে, বুকের মধ্যে, জানেও না কি জিনিস, কেন, কি বিত্তান্ত।

মতলবটা দিল প্রথম ছিনাথ সাধুই। বললে, টাকা টাকা করে মাথা খারাপ করে ফেলছো কুমির মা, তা মেয়ের বিয়ে দেবার টাকা কি আর এ কাজ করে জুটিয়ে উঠতে পারবে তুমি? তার চেয়ে আমি বলি আর একটা নতুন কাজ আছে কর না কেন। এ কাজে পয়সা বেশি, ঝামেলা কম,—জিনিস-টুকু পৌঁছে দেবে,—এইটুকু তো জিনিস। নগদ দশটা টাকা রোজ। তবে বাপু ভয়ও একটু আছে, সে কথাও বলে দিচ্ছি। ধরা পড়লে জেল নিগ্ঘাত। তবে ধরা বিশেষ পড়ে না কেউ। এইটুকু তো জিনিস। আঁচল চাদর চাপা দিয়ে গায়ের মধ্যে করে নেবে। কে আর দেখছে।

তবু ভয় পেয়েছিল কুসুম। কে জানে বাবা কি হতে কি হবে, শেষকালে কি—

ছিনাথ বলেছিল, আরে বাপু অত ভয়টা কিসের শুনি? আমার লোকজন সব আছে, তারাই দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেবে—কি করে কি করতে হয়। আর তাছাড়া মাল তুমি নিজে রাখবে কেন? কুমিকে নাও না সঙ্গে। ঘর থেকে ডেলিভারী নেবে তুমি, পথে এসে দিয়ে দেবে মেয়ের হাতে। ও ছেলেমানুষ, কাঁচা বয়স, কচি মুখ, নিরীহ মতন আছে, সন্দ করবে না কেউ। আর বলি এত যে টাকা টাকা করছো, সে তো ওর জন্যেই। তা দুদিন না হয় খাটলো মেয়ে।

রোজ দশ টাকা। মানে দশদিনে একশ, মাসে তিনশ টাকা। মাথাটা যেন ঘুরে গিয়েছিল কুসুমের। শুধু মেয়ের বিয়ে কেন, আরও অনেক কিছু করে ফেলতে পারবে সে মাস মাস এতগুলো টাকার মুখ দেখতে পেলে।

রাজি হয়ে গিয়েছিল কুসুম। কুমিকে নিয়ে বেরুচ্ছিল তারপর থেকেই, কিন্তু আজ—কি হবে মা, কেন মরতে হাতের পুঁটুলিটা দিল ওর হাতে। ওইটের জন্যেই হয়তো পড়বে ধরা। আর......কুমির কাছে কখনও মাল দেয় না কুসুম। খালি হাতেই যাতায়াত করে সে টিকিট কেটেই, পাছে বিনা টিকিটের যাত্রী বলে ধরা পড়ে। আজ কি মতিভ্রম হল কুসুমের—আসলে এদানীং সে নিজেও যেন আর টানতে পারছিল না। বুকে পিঠে পুঁটুলী, কোলে এই ছেলে তার ওপরে পেটেও যে আর একটা,—মরণ দশা আর কি। শ্যাল কুকুরের পাল বাড়লেই হল। শত্তুর, শত্তুর,—কাঁটা সব। কতদিন আবার ঘরে বসিয়ে রাখবে কুসুমকে কে জানে। আর মেয়েরই বা কি আক্কেল, ইস্টিশানের পর ইস্টিশান যাচ্ছে, একবার এদিক পানে আসে না গা—। দাঁড়াচ্ছিল গাড়ি,—এগিয়ে গিয়ে আর একবার গলা বার করে ঝুঁকলো কুসুম।

গলা বার করে অনেকক্ষণ চারদিকে চেয়ে দেখলে সীতেশ। না কারুর পাত্তা নেই। পালে বাঘ পড়েছেই বটে। দলশুদ্ধু সব গেল কোথায় রে বাবা। ঘুরে এসে বসে পড়ল আবার। ফোঁস ফোঁস করে তখনও কাঁদছিল মালতি। মুখটা ঘোরালো, পিঠটা খালি ফুলে ফুলে উঠছিল এক একবার।

এই! ডাকলো সীতেশ।

সাড়া দিল না মালতি।

শুনছো, এই শোন না—

ফোঁপানিটা বাড়ল একটু। ঘাড়টা গুঁজে গেল। যেন জানলার পাল্লায় আড়াল হবে মুখ।

এবার বিরক্ত হল সীতেশ। ধমক দিয়ে বললো, বলি কি হয়েছে বলবে তো? নাকি কেঁদেই যাবে। জিজ্ঞেস করছি তখন থেকে, কেয়ার হচ্ছে না, না? এইবার মুখ ঘোরালো মালতি। লাল চোখ, ফুলে ওঠা মুখ। ভারী ধরা গলায় বললো,—তোমাকে বলে কি হবে?

আমাকে বলে কি হবে! চেষ্টা করেও গলায় যথেষ্ট রাগ আনতে পারলো না সীতেশ। তাই যদি তবে আমার কাছে কেঁদে মরছো কেন তখন থেকে। যাও, নিজের জায়গায় বসে কাঁদগে।

মুখটা আবার ঘুরিয়ে নিল মালতি। ফোঁপানীটা বাড়ল, দ্বিগুণ হল, সঙ্গে মৃদু অস্পষ্ট শব্দ। বিব্রত হল সীতেশ; কি মুশকিল। অপ্রতিভ গলায় বললে, আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, আমারই অন্যায়। কিন্তু তুমি তো বলবে আমাকে,—কি হয়েছে।

এক ঝটকায় মুখ ফেরালো মালতি। না, বলব না, বলে কি হবে শুনি। তুমি কি করবে। কিছু করার ক্ষমতা আছে তোমার। তোমার তো খালি লম্বা লম্বা কথা, আর

ক্স্যামাঙ্কো ॥

শিশিরকুমার দাশ

নাচো উন্মাদ মধ্যরাত্রি দেহতরঙ্গ অবাধ্য আজ
সরাইখানার আলোবিহ্বল শঙ্কাবিহীন ক্স্যামাঙ্কো সুর।

এখনও কোথাও দূরে প্রান্তরে ছুটেছে বল্গাবিহীন অশ্ব
শস্যক্ষেত্রে তারই কম্পন মঞ্চে কম্পিত নক্ষত্রেরা।

নাচো চঞ্চল দেহসমুদ্র চরণ আঘাত হোক দুর্বার
সাহসিনী হও আজকে বেহুলা, শবদেহে আজ মেলবে নয়ন।

শঙ্কাবিহীন জাদু ক্স্যামাঙ্কো, চোখে বিদ্যুৎ, হে মদালসা
ভাঙো বন্ধন সরাইখানার বাইরে অবাধ বিশাল বিশ্ব।

পাহাড়ের নীচে এল-ডোরোডোর স্বর্ণস্বপন ঘুমে চুলুচুলু
মোহিনীমায়ার স্বপ্নভঙ্গ করো উদ্দাম মধ্যরাত্রি।

দূরে টলেডোর নিভৃত গীর্জা, তার ঘণ্টার চেয়েও ক্ষিপ্র
পৌঁছতে হবে স্বর্গের কাছে, হে মোহিনীমায়া জাদু ক্স্যামাঙ্কো।

আত্মার প্রতিধ্বনি ॥

মন্মথ বসু

সবুজে বলটার মতো—
লাফিয়ে, বাধাগুলো দূরে,
কিম্বা হরিণ হয়ে
অরণ্য হাতছানিতে সাড়া।

বিরাট মাঠ, মস্ত বিল, দুরন্ত নদী—
সব পেরিয়ে, নয়তো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে,
আমি আকাশের গানগুলো শূন্যযানে শুনব।
জীবনটাকে দেখব, মোড়ক খুলে দেখব।

টেবিলে ঠিকরে পড়া আলোর
চলমানে চিন্তাগুলো সপ্রাণ,
অথবা নির্ঝরের মতো—
বাধাহীন ছন্দের প্রকাশ।

কি এবং কেন (২)ঃ

লেসার

আজকাল বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী অনেকের মুখেই 'লেসার' কথাটি শোনা যায়। কিন্তু লেসার বস্তুটি আসলে যে কি তা আমাদের অনেকের সঠিকভাবে জানা নেই। 'লাইট অ্যামপ্লিফিকেশন বাই সিমুলেটেড এমিশান অফ রেডিয়েশন' এই ইংরেজি বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে লেসার। অর্থাৎ উদ্দীপিত বিকিরণের ফলে আলোকরশ্মির পরিবর্ধনের যে প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় লেসার। এটি হলো আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অপূর্ব আবিষ্কার।

লেসারের প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আলোকরশ্মির উৎপত্তি ও শক্তির কণিকাবাদ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আমরা জানি, আলোক হচ্ছে একরকম শক্তি এবং তাপশক্তিও হচ্ছে আলোকশক্তির অন্তর্গত। প্লাংক ও আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে আলোক ও তাপশক্তি অবস্থা বিশেষে কণিকাধর্ম অবলম্বন করে সঞ্চালিত হয়। পরবর্তীকালে (১৯১৩) বিজ্ঞানী বোর পরমাণুর স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আলোক-কণিকার বিকিরণ কিভাবে ঘটে তার ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে পরমাণু-কেন্দ্রের বহির্ভাগে যেসব ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়, তারা এক কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাবার সময় আলোক-কণিকা বিকিরণ বা শোষণ করে। কক্ষ থেকে কক্ষের দূরত্ব যত বাড়ে, কক্ষস্থ ইলেকট্রনের শক্তিও তত বাড়তে থাকে। তাই যখন কোনো দূরের কক্ষ থেকে কেন্দ্রের কাছাকাছি কক্ষে ইলেকট্রন গমন করে, তখনই একটি শক্তি কণিকারূপে (কোয়ান্টাম) আলোকের বিকিরণ ঘটে। আবার যখন কেন্দ্রের কাছাকাছি কক্ষ থেকে কোনো ইলেকট্রন দূরের কক্ষে চলে যায়, তখন আলোক শক্তির শোষণ ঘটে।

আজকাল প্রতিপ্রভ-বাতির (ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্প) খুব ব্যবহার দেখা যায়। এই প্রতি-প্রভার উৎপত্তির সঙ্গে লেসার রশ্মির উৎপত্তির অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। একরকম পদার্থ আছে, যাদের ওপর আলো পড়লে তাদের অণু-পরমাণু আলোকশক্তি শোষণ করে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই পদার্থগুলিকে বলা হয় প্রতিপ্রভ পদার্থ। প্রতিপ্রভার সঙ্গে লেসারের যেমন অনেকটা সাদৃশ্য আছে তেমনি কিছুটা প্রভেদও আছে।

চুনি লেসারের সাহায্যে ধাতু ছেদন

নিদ্রা ও স্বপ্ন প্রসঙ্গে

মানুষের জীবন ধারণের জন্য জল-বাতাস ও খাদ্য যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি নিদ্রাও একান্ত প্রয়োজনীয়। কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস না ঘুমিয়ে কোনো কোনো মানুষ কাটিয়ে দেন, কিন্তু একেবারে না ঘুমিয়ে কোনো মানুষের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

নিদ্রার অভিজ্ঞতা সব মানুষেরই আছে। মানুষ তার জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত নিদ্রা সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান করা হয় নি। এর কারণ এই নয় যে, বিজ্ঞানীরা ইচ্ছা করেই এই বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। আসল কারণ হলো নিদ্রা সম্পর্কে হাতে-কলমে পরীক্ষা করার কোনো পন্থা এতদিন জানা ছিল না। অতি সম্প্রতি নিদ্রা সম্পর্কে পরীক্ষামূলক গবেষণা শুরু হয়েছে।

এতদিন নিদ্রা ও স্বপ্ন সম্পর্কে যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্যে অল্প কয়েকটি যন্ত্রপাতি ও পন্থা জানা ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে শুধু এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই কমপক্ষে ২৫টি নিদ্রা-গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে এবং তার অধিকাংশ আছে বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালে। এখানে ছাত্র, অধ্যাপক ও আগ্রহী নাগরিকেরা স্বেচ্ছায় গবেষণাগারের পরীক্ষায় যোগদান করেন। তাঁরা সাধারণত রাত ১০টার কিছু আগে গবেষণাগারে এসে হাজির হন, পোশাক বদলান এবং রাত্রিকালীন পরীক্ষার জন্যে নিজেদের দেহের সঙ্গে তার জড়িয়ে নেন।

এই 'ওয়্যারিং' বা 'তার-জড়ানো' বলতে বোঝায় ক্ষুদ্রাকার ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বার ও অন্যান্য সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি যা দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে দেহের ও চোখের সঞ্চালন, নাড়ির গতি, রক্তচাপ শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দনের হার দৈহিক তাপমাত্রা, ত্বক ও মস্তিষ্ক তরঙ্গের (মস্তিষ্কে ক্ষীণ বৈদ্যুতিক স্পন্দন স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয় এবং এই স্পন্দনের মাধ্যমে গবেষকরা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সূত্র খুঁজে পান) বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়।

তারপর স্বেচ্ছাব্রতীরা একটি ঘরে শান্তভাবে বিছানার ওপরে আরামে ঘুমান। কিন্তু ঘরের বাইরে তারের প্রান্তভাগ যন্ত্রপাতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যার সাহায্যে গবেষকরা পর্যবেক্ষণ চালান।

১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিদ্রাসংক্রান্ত গবেষণার প্রখ্যাত

বিশেষজ্ঞ ডঃ কাীলিটম্যানের নেতৃত্বে যে গবেষণা পরিচালিত হয় তা থেকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়। ডঃ কালিটম্যান-এর অন্যতম গবেষক ছাত্র অ্যাসেরিনস্কি তাঁর পর্যবেক্ষণে দেখেন, প্রায় সকল নিদ্রিত মানুষ ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের ব্যবধানে অতি দ্রুত চক্ষু সঞ্চালন করেন ১৫-২০ মিনিট ধরে।

এর আগে অন্যান্য গবেষকরাও এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন, কিন্তু তাঁরা এই ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন নি। অ্যাসেরিনস্কি-ই প্রথম বললেন, নিদ্রিত মানুষ যখন স্বপ্ন দেখেন তখনই তাঁর চোখের পাতা সঞ্চালিত হয়।

অ্যাসেরিনস্কির এই মতবাদে তাঁর সহকর্মীরা প্রথমে সমর্থন জানান নি। তখন অ্যাসেরিনস্কি তাঁর যন্ত্রে যখনই দ্রুত চক্ষু সঞ্চালনের সংকেত পেলেন, সেই মুহূর্তে একটি মাইক্রোফোনের সাহায্যে নিদ্রিতকে জাগিয়ে তোলেন। প্রায় সব জাগ্রত ব্যক্তিই জানালেন, তাঁদের ঘুম ভেঙে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁরা কি কি স্বপ্ন দেখছিলেন তা-ও সবিস্তারে জানালেন। এতে অ্যাসেরিনস্কির সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া গেল।

এই সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তা যাচাই-এর জন্যে অ্যাসেরিনস্কি নিদ্রিত স্বেচ্ছাব্রতীরা যখন চোখের পাতা নাড়েন না, তখন মাঝে মাঝে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই জানালেন, ঘুম ভেঙে যাবার পূর্বমুহূর্তে তাঁরা কোনো স্বপ্ন দেখেন নি।

পৃথিবীর অন্যান্য অংশে অনুরূপ পরীক্ষায় অ্যাসেরিনস্কির সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া গেল। এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, প্রায় প্রত্যেক লোকই প্রতি রাত্রে তিন-চার বার স্বপ্ন দেখেন। অবশ্য বেশির ভাগ লোকই পরের দিন সকালে এই স্বপ্নের কথা মনে রাখতে পারেন না এবং অনেকে কোনো স্বপ্ন দেখেন নি বলে দাবি করেন।

নিদ্রিত অবস্থায় মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ পরিমাপের জন্যে ইলেকট্রোড লাগানো।

এইভাবে অ্যাসেরিনস্কির গবেষণা স্বপ্নরহস্য উদ্ঘাটনের একটি নতুন দ্বার খুলে দেয়। দ্রুত চক্ষু সঞ্চালনকে বিজ্ঞানীরা সংক্ষেপে 'রেম' (র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট) বলে অভিহিত করেছেন। বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দ্রুত চক্ষু সঞ্চালনের সময় দেহের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের পরিমাপও পরিবর্তিত হয়। রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার, দৈহিক তাপমাত্রা এবং মস্তিষ্ক-তরঙ্গের ধারা সব কিছুই বৃদ্ধি পায়।

নিদ্রিত অবস্থায় সামগ্রিককালে প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে এই সমস্ত পরিমাপ রাতের পর রাত একটি চক্র অনুসরণ করে এবং সকল স্বাস্থ্যবান লোকের চক্র একই রকম হয়।

নিদ্রিত অবস্থার প্রথম দু ঘণ্টা সময়ে দৈহিক তাপমাত্রা শ্বাসক্রিয়া ও রক্তচাপ ক্রমশ কমে আসে। তারপর গাঢ় নিদ্রিত অবস্থার পর থেকে ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত বাকি সময়ে হার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য দ্রুত চক্ষু সঞ্চালনকালে হারের তারতম্য ঘটে থাকে। নিদ্রার গভীরতা অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা নিদ্রা-চক্রকে চারটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

ডঃ কালিটম্যানের অপর একজন গবেষক-ছাত্র ডঃ ডিমেন্ট এই পর্যবেক্ষণকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ডঃ কালিটম্যান এবং তাঁর সহযোগীরা দেখেছেন, যাঁরা দীর্ঘকাল ঘুমান না তাঁদের মেজাজ খিটখিটে হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগ হ্রাস পায় এবং তাঁরা প্রায়ই অলৌকিক ঘটনা দেখেন। তাঁদের এই মানসিক অবস্থা অবশ্য অস্থায়ী, এবং স্বাভাবিক নিদ্রা হলেই এ সব চলে যায়।

ডঃ ডিমেন্ট পরীক্ষায় স্বেচ্ছাব্রতী লোকদের নিদ্রা থেকে বঞ্চিত করে পর্যবেক্ষণ
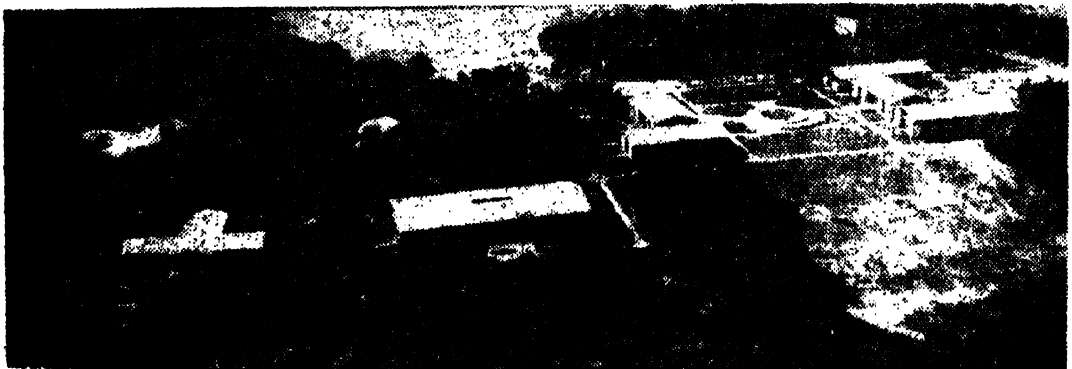
বিনা জ্বালানীতে তাপ উৎপাদন : পিটর্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ, যেখানে তাপ উৎপাদনের অভিনব পদ্ধতি চালু হয়েছে।

করেন। যখনই তাঁদের কেউ দ্রুত চোখের পাতা নাড়তে থাকেন, তখনই তিনি তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন। কয়েকদিন এভাবে তাঁদের নিদ্রা থেকে বঞ্চিত করার পর দেখা যায়, অনিদ্রাগ্রস্ত লোকদের মতো তাঁরাও রূঢ় মেজাজ ও অস্থিরতা প্রকাশ করেন।

এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ থেকে বহু বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, নিদ্রার মতো স্বপ্নও একটি জৈবিক প্রয়োজন এবং নিদ্রা যে দেহমনের একটি বিশ্রাম অবস্থা এই প্রচলিত ধারণা ভুল। যদিও নিদ্রিত অবস্থায় লোকে অচেতন হয়ে থাকেন, কিন্তু তার মস্তিষ্ক সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলে এবং দেহের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ অতি সামান্যভাবেই বিঘ্নিত হয় বা একেবারেই হয় না। তাই নিদ্রা ও স্বপ্ন শুধুমাত্র বিশ্রাম ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য সম্পাদন করে।

একটি মতবাদ অনুযায়ী মস্তিষ্ক ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সঞ্চয় করে যার ফলে ক্লান্তি আসে। নিদ্রা এবং সম্ভবত স্বপ্ন এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে প্রশমিত বা রোধ করে। কিন্তু এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির অস্তিত্ব যদি সত্যসত্যই থাকে তা হলে সেগুলি কি তা এখনও জানা যায় নি।

নিদ্রা ও স্বপ্ন সম্পর্কে আর একটি তত্ত্ব হলো, অব্যবহারের ফলে পেশী ও স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। নিদ্রাকালে এই অবস্থার স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়। তাই স্বপ্ন হচ্ছে সহজাত পদ্ধতি যা মাঝে মাঝে অব্যবহারকালে স্নায়ুতন্ত্রকে সতেজ করে তোলে। নিদ্রা ও স্বপ্ন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যে সব গবেষণা হয়েছে তাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর ফল লাভ করা যায় নি। তবে এমন অনেক কিছু জানা গেছে যা মানসিক ও দৈহিক চিকিৎসায় মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। মস্তিষ্কের অবাঞ্ছিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে নিদ্রা সরিয়ে দেয় এই তথ্য যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে ওষুধ ইঞ্জেকশান করে বা বড়ি খেয়ে নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা যাবে। এবং মানুষ তার বাড়তি সময় আরও বেশি কাজে, জ্ঞানার্জনে বা অবসর-বিনোদনে ব্যবহার করতে পারবে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

*

রেডিও অ্যাস্ট্রনমি

অজানাকে জানার সাধ মানুষের চিরকালের। অবশ্যই সেই সাধের সঙ্গে সাধনাও যুক্ত করেছে সে।

আদি কালের প্রথম মানুষ মহাকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্ররাজি দেখে কি ভেবেছিল, কে বলতে পারে; তবে সব দেশের সব ধর্ম ও ধর্মের মনগড়া উপাখ্যানে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রাধান্য ও প্রভাব অসামান্য। মনগড়া-ভাবনা শুধু নয়; সত্য কি,—তা জানতে হবে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মানুষের এই একনিষ্ঠ উদ্যমের জন্য মানুষ আজ জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধিকারী হতে পেরেছে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বয়স খুবই প্রাচীন। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্যে মানুষকে খালি চোখের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে বহু কাল। মাত্র ১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও নভোপর্যবেক্ষণের কাজে দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে কাজে লাগালেন। একটি যন্ত্রের সাহায্য পাওয়া গেল এই প্রথম। তারপর থেকে মানুষ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যত উন্নতি করতে পেরেছে, তার জ্ঞানের পরিধিও তত বেড়েছে। এ ব্যাপারে গ্যালিলিও, নিউটন ও হার্শেলের নাম পথিকৃৎরূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমানে মানুষের তৈরি সর্ববৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র হল প্যালোমার অবসারভেটরির দুশ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র দেখতে বা তাদের ছবি তুলতে পারা গেছে। আর আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খালি চোখে দেখি মাত্র তিন হাজারের মত নক্ষত্র। দুশ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সতের হাজার আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র দেখা গেছে। এক আলোকবর্ষ দূরত্ব বলতে বোঝায় ছ'লক্ষ হাজার কোটি মাইল। চোখে দেখা আলোর সাহায্যে যতদূর পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব সে পথে একদিন মানুষ শেষসীমায় পৌঁছেছে।

মহাকাশের কথাদি জানবার ভিন্ন পথ মানুষের আয়ত্তে এসেছে সম্প্রতি একেবারে।

ভিন্ন পথ নয়, ধ্বনিবর্তী সমগোত্রীয় বলা চলে। এ পথটা চোখে-দেখা আলোর পথ নয় বেতার-তরঙ্গের পথ। ইংরেজীতে রেডিও অ্যাস্ট্রনমি নাম দেওয়া হয়েছে এই নতুন পথের। চোখে-দেখা আলোর তরঙ্গ এবং যে বেতার তরঙ্গ থেকে ধ্বনি সৃষ্টি করে নিয়ে আমরা কানে শুনি, তা সমগোত্রীয় কথাটা একটু ভেঙে বলি।

আলো কি? আলোর সৃষ্টি হয় কিভাবে? আলো কিভাবে উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়ে? এসব কথার শেষ কথা আজও বলা সম্ভব হয় নি যদিও এসব নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন নিউটন প্রায় তিন শ' বছর আগে। আজও গবেষণার অন্ত নেই।

মোট কথায় ব্যাপারটা এই। জলে ঢিল ফেললে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং তরঙ্গ ক্রমাগত কিনারার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোও সে রকম তরঙ্গ সৃষ্টি করে সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ তরঙ্গের নাম ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ। তরঙ্গ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হতে পারে সেই রকম ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গও বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয়। এই তরঙ্গ যেমন সর্ববৃহৎ এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যেরও হতে পারে তেমনি আবার সর্বক্ষুদ্র এক সেন্টিমিটারের দশ কোটির এক ভাগের চেয়েও ক্ষুদ্র হতে পারে। এই বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের মধ্যে মাত্র :০০০০৪ সেন্টিমিটার থেকে :০০০০৭২ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলিকে আমাদের চোখ আলো হিসাবে ধরতে পারে। এই নির্দিষ্ট ব্যাপ্তির বাইরের কোন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আমাদের চোখে কাজ করতে পারে না। কাজেই, সেগুলি আলোর তরঙ্গ নয়।

কিন্তু এই আলো তরঙ্গ ব্যাপ্তির বাইরের তরঙ্গকে মানুষ নানা পরীক্ষা দ্বারা চিনতেও পারে এবং নানা কাজেও লাগায়। দৈনন্দিন কথায় আমরা যাদের বেতার তরঙ্গ বলি তাদের দৈর্ঘ্য দশ হাজার মিটারের চেয়েও বেশি এবং এক মিটারের চেয়েও কম হতে পারে। এগুলিও ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ। তাই বলছিলাম আলোর তরঙ্গের সমগোত্রীয় হল বেতার তরঙ্গ। এতদিন আলোর তরঙ্গের সহায়তায় মানুষ নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করে এসেছে। সাম্প্রতিক বেতার তরঙ্গের সাহায্যে তা পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছে।

সমস্ত ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের গতিবেগ একই। আমরা জানি, আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। বেতার তরঙ্গের গতিবেগও তাই। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের তারতম্যের ফলে আমরা কয়েকটি অদৃশ্য রশ্মির সন্ধান পেয়েছি, যেমন ইনফ্রা-রেড রশ্মি, আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি (এক্স রে), গামা রশ্মি, কসমিক রশ্মি। এ সব রশ্মিই সমগোত্রীয় একই ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রশ্মির রকমফের।

পৃথিবীর গায়ে একটা জামা আছে সে জামার নাম বায়ুমণ্ডল; ইংরেজীতে একে বলে অ্যাটমস্ফিয়ার। এই বায়ুমণ্ডলের স্বভাব একটু বেয়াড়া—সমস্ত দৈর্ঘ্যের ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গকে বায়ুমণ্ডল তার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে দেয় না। তবে কিছু দাক্ষিণ্যও আছে। আলোর তরঙ্গকে প্রবেশ করতে দেয় আর দেয় মাত্র সেই বেতার তরঙ্গকে যার দৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তি কুড়ি মিটার থেকে সিকি সেন্টিমিটার। ইনফ্রা-রেড, আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ নিষেধ। এরা বায়ুমণ্ডলের একটি স্তরে আটকে যায় এই স্তরের নাম আয়নোস্ফিয়ার। আমরা কিন্তু পৃথিবীতে বসে ইনফ্রা-রেড, আলট্রা-ভায়োলেট

প্রভৃতি রশ্মি তৈরি করে নিতে পারে। আমরা জানি গ্রহ উপগ্রহদের নিজস্ব কোন আলো নেই, কিন্তু নক্ষত্রদের আছে; অর্থাৎ নক্ষত্রগুলি আলোর উৎস। গ্রহ উপগ্রহকে একটানা উজ্জ্বল দেখায় সূর্যের প্রতিফলিত আলোর জন্যে; আর নক্ষত্রগুলো মিটমিট করে, যা থেকে বোঝা যায় ওরা নিজেরাই আলোর উৎস। সূর্য একটি নক্ষত্র এবং পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র। সূর্য থেকে আলো পাই। আলো তো ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য-ব্যাপ্তির তরঙ্গ মাত্র। কাজেই আলোরূপ তরঙ্গ যখন পাই, তখন অন্য দৈর্ঘ্য-ব্যাপ্তির তরঙ্গ অর্থাৎ বেতার তরঙ্গও পাওয়া যেতে পারে সূর্য বা অন্য নক্ষত্র থেকে।

এডিসন ১৮৯০ সনে এবং স্যার অলিভার লজ ১৮৯৪ সনে এরকম পরীক্ষা করেন যে সূর্য থেকে বেতার তরঙ্গ ধরা যায় কিনা। কিন্তু তাঁদের পরীক্ষা সফল হতে পারে নি যন্ত্রাদি তেমন শক্তিশালী ছিল না বলে। ১৯৩১ সনে কার্ল জেন্সকি ছায়াপথ (মিল্কি ওয়ে) থেকে আগত বেতার তরঙ্গ ধরতে প্রথম সফল হলেন। প্রথমে এই বেতার তরঙ্গের উৎস সূর্য বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু পরে এর উৎস ছায়াপথ বলে বোঝা যায়। কিন্তু এঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রায় দশ বছর ধরে অবহেলিত পড়ে ছিল। একমাত্র গ্রোট রেবের নামে একজন আমেরিকান রেডিও অ্যামেচার এবিষয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিরাট সুযোগ এনে দিল। যুদ্ধে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য বেতার যন্ত্রসমূহের প্রভূত উন্নতি সাধিত হল। রাডার ও অ্যানেটনার উন্নতি হল। এদের কাজ হচ্ছে বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি করে কোন নির্দিষ্ট দিকে বা লক্ষ্যে বর্ষণ করা এবং সে তরঙ্গ যখন কোন বস্তুতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, তখন সেই ফিরতি তরঙ্গকে ধরতে পারা। দৃষ্টির মধ্যে আসার আগেই যাতে বিপক্ষের বিমান আক্রমণের কথা জানতে পারা যায়,—এই কাজে রাডার ও অ্যানটেনার ব্যবহার করেছিলেন যুদ্ধ-বিজ্ঞানীরা। এই সময়ে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, তাঁদের যন্ত্রে এমন তরঙ্গ ধরা পড়ছে যা কোন প্রতিহত ফিরতি-তরঙ্গ নয়। এর উৎস মহাকাশের কোন অঞ্চল।

যুদ্ধ থামলে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের এই নতুন শাখায় গবেষণার কাজে লাগলেন। ইংলন্ডে ম্যানচেস্টারের কাছে বিখ্যাত জড্রেল ব্যাংক রেডিও অ্যাস্ট্রনমিক্যাল অবসারভেটরি স্থাপিত হল এবং মহাকাশ থেকে আগত বেতার তরঙ্গের সন্ধানকার্য শুরু হল। প্রথমে তাঁরা ছায়াপথের কোন অঞ্চল থেকে বেতার তরঙ্গ আসছে তার হদিস করতে পারছিলেন; কিন্তু ক্রমেই এই শাখার উন্নতি হতে এখন কোন্ তরঙ্গের উৎস কোন্ বিশেষ নক্ষত্র তাও বহু ক্ষেত্রে বলতে পারেন। কিন্তু কাজটি খুবই কঠিন।

১৯৬১ সনে মাত্র প্রথম চিহ্নিত করতে পারা গেল সূর্য ছাড়া একটি নক্ষত্র (অঞ্চল নয়) যার বেতার তরঙ্গ বিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন। এই নক্ষত্রের নাম থ্রি-সি ফর্টিএইট। বর্তমানে অবশ্য অনেক একক নক্ষত্রকে চিহ্নিত করতে পারা গেছে, যার বেতার তরঙ্গ বিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য কাছের যে সব গ্রহাদি আছে তাদের এবং চাঁদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছেন রেডিও অ্যাস্ট্রনমি মারফত, অর্থাৎ ঐ লক্ষ্যে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে এবং প্রতিহত বেতার তরঙ্গ ধরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হাতে এই নতুন পথ এনে দিয়েছে জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার। তাঁরা বেতার তরঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে মহাকাশের নতুন মানচিত্র অংকনে উদ্যোগী।

গোলোকেন্দু ঘোষ

ল্যাকটোন

উদ্ভিদজাত প্রোটিন থেকে দুধ তৈরীর এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছে মহীশূরের সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট। বড় বড় শহরে—যেখানে টাটকা দুধের একান্ত অভাব, সে সমস্ত জায়গায় 'টোনড-মিল্ক' ব্যবহার করা হয়। এর জন্য যে সরতোলা গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করা হয়, তার বেশীর ভাগই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে চীনাবাদাম থেকে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তাকে গ্লুকোজ, কিছু ধাতব লবণ আর প্রয়োজনীয় ভিটামিনের সঙ্গে মিশিয়ে কৃত্রিম দুধ তৈরীর কাজে ব্যবহার করা যায়। গুঁড়ো দুধের বদলে এই জলীয় দ্রবণকে মিশিয়ে 'টোনড-মিল্ক' তৈরী করা হয়। নাম দেওয়া হয়েছে ল্যাকটোন। সাধারণ 'টোনড-মিল্ক' ও ল্যাকটোনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

চীনাবাদামের ময়দা জলের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড-এর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এর বিষাক্ত অংশে নষ্ট করে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড পৃথক করে দেওয়া হয়। অ্যাসিডের সাহায্যে দ্রবণ থেকে প্রোটিনকে অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। বাদামের বিশ্রী গন্ধকে তাড়ানোর জন্যে স্টীম ব্যবহার করা হয়। দ্রবণে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যার ফলে প্রতি ১০০০ লিটার দ্রবণ থেকে ৪৫ কেজি প্রোটিন অধঃক্ষেপ পাওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে এখন ৫০ কেজি গ্লুকোজ দ্রবণ আর প্রয়োজনীয় ধাতব লবণ মিশিয়ে দিলেই 'প্রোটিন দ্রবণ' তৈরী হয়ে গেল।

নির্ধারিত মানের টাটকা দুধের সঙ্গে এই 'প্রোটিন দ্রবণ' যান্ত্রিক উপায়ে ভালভাবে মেশানোর পর প্রয়োজনীয় ভিটামিন যোগ করা হয়। তারপর দুধটাকে জীবাণুমুক্তকরণ ও আরও কয়েকটি পদ্ধতির পর বোতলে ভর্তি করে ছেড়ে দেওয়া হয় বাজারে।

ল্যাকটোন সাধারণ দুধের মতই পুষ্টিকর। এর মধ্যে সুষম মাত্রায় রয়েছে ১০টি ভিটামিন আর প্রোটিন। 'টোনড-মিল্ক' অপেক্ষা এর প্রোটিন আরও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

ল্যাকটোনকে কফি, চা বা যে-কোন পানীয়ের সঙ্গে ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। এ থেকে দই বা অন্যান্য খাবার তৈরী করা যেতে পারে। ছোট বাচ্চারাও এ-দুধ খেতে পারে। এর মধ্যে মোটামুটি রয়েছে :

ফ্যাট —		২ শতাংশ
প্রোটিন —		৪ শতাংশ
ভিটামিন এ	—	১৫০ ১ ইউ
ভিটামিন বি	—	১৬ ১ ইউ
ভিটামিন সি	—	৩ মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি-১২	—	·২৭ মিলিগ্রাম

তাছাড়া রয়েছে আরও অনেক ভিটামিন ও লবণ।

দিনে ১০,০০০ লিটার উৎপাদনক্ষমতা-সম্পন্ন একটি প্ল্যাণ্ট তৈরীতে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বাবদ খরচ পড়বে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। উৎপাদন প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ। সাধারণ ডেয়ারীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ছাড়া এর জন্যে বিশেষ কয়েকটি মাত্র যন্ত্রপাতির প্রয়োজন।

ল্যাকটোন-এর ব্যবহার চালু হলে অনেক সুবিধা হবে। দুধের সরবরাহ বাড়ানো যাবে, 'টোনড মিল্ক' তৈরীতে যে গুঁড়ো দুধ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, সেটার প্রয়োজন হবে না। ফলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। 'টোনড-মিল্ক' অপেক্ষা ল্যাকটোন উৎপাদনে খরচও পড়বে অনেক কম।

বাঙ্গালোর ও মহীশূরে ইতিমধ্যেই উৎপাদন আরম্ভ হয়ে গেছে। মাদ্রাজে মাধবরাম ডেয়ারিতে একটি উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয়েছে—শীঘ্রই এটা চালু হবে। এর উৎপাদন হবে দৈনিক ১০০০ লিটার। পর্যাপ্ত পরিমাণে এর উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হলে দেশে দুধের অভাব কিছুটা মিটতে পারে।

বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমো প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

কিছুদিন বাদেই গেলেন কলকাতা এলেনও ফিরে। শোনালেন সেখানের হাল-চাল। ইউরোপের যুদ্ধ বাঙলা দেশের দিকে ছুটে আসছে। প্রথম ব্ল্যাক আউটের মহড়া হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে গোটা কলকাতা জুড়ে। যুদ্ধ দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। রাজদিয়ার মাটিতে ভালোবাসা। ঘর বানানোর আকর্ষণ। অবনীমোহন কিনলেন তাই জমি, রাজদিয়ার মাটি। ইতিমধ্যে যুগলের বিয়ের তারিখও এসে গেল। নতুন ঘর উঠছে। ধান কাটাও শুরু। স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল বিনু। কলকাতার বিনয় কুমার বসু। তখন ডিসেম্বর।

।। বিয়াল্লিশ ।।

ধান কাটার মধ্যে সময় করে একে একে সুধা, সুনীতি এবং ঝিনুককেও ভর্তি করে দিলেন হেমনাথ। সুধা-সুনীতিকে কলেজে, ঝিনুককে মেয়েদের স্কুলে।

স্থির হয়েছে, আপাতত ঝিনুক এই বাড়িতেই থেকে যাবে। এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে। পরে যা-হয় ভেবে ঠিক করা যাবে। ভবতোষও এতে রাজী হয়েছেন। না-হয়ে উপায়ই বা কী? তাঁর কলেজ খুলে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে ঝিনুককে কার কাছে রাখবেন? কে তাকে দেখবে? সবদিক বিবেচনা করে এই ব্যবস্থাই ভবতোষের ভাল মনে হয়েছে।

সবাই ভর্তি-টর্তি হয়ে যাবার দিন-কয়েক পর এক সন্ধেবেলায় লারমোর এসে হাজির। এ বাড়িতে তাঁর অনিয়মিত যাতায়াত নিয়ে স্নেহলতার অভিমান আছে। অবশ্য সে অভিমানের ভেতর জ্বালা নেই; স্নিগ্ধ কৌতুকের আভায় তা ঝলমলে।

অনেকদিন পর লারমোর আজ এবাড়ি এলেন। দীর্ঘকাল না আসার জন্য যথারীতি অনুযোগ করলেন স্নেহলতা, ঠাট্টা-টাট্টাও করলেন।

হাত জোড় করে পুরোপুরি আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গিতে লারমোর বললেন, 'এইবার—এইবারটা শুধু ক্ষমা করে দিন ঠাকরুণ। ক'দিন পর থেকে দেখবেন, রোজ আসছি।'

লারমোরের সারল্য, কাঁচুমাচু মুখভঙ্গি, করুণ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—সব মিলিয়ে এমন একটা আবহাওয়ার তৈরী করল যাতে সবাই হেসে উঠল। স্নেহলতা কিন্তু হাসলেন না। তীক্ষ্ণ চাহনিটিতে লারমোরকে বিদ্ধ করতে করতে বললেন, 'যেদিন থেকে সাহেব তোমার সঙ্গে আলাপ সেদিন থেকেই তো ঐ কথা শুনে আসছি। তা প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর হতে চলল।'

'যা হবার হয়ে গেছে। এবার থেকে আমি সুবোধ বালক হয়ে যাব।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'কতবার তো প্রতিজ্ঞা করা হল! সে যাকগে, এতদিন পর কোত্থেকে উদয় হলেন? করছিলেন কী?'

'রুগী-টুগী ছিল। তার ওপর ধান-টান উঠছে। নানা ঝঞ্ঝাটে আর আসা হচ্ছিল না।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'আজ হঠাৎ কী মনে করে?'

লারমোর একটু যেন অবাকই হলেন; আহতও। বললেন, 'বা রে, সব ভুলে গেছেন!'

তবু মনে করতে পারলেন না স্নেহ-লতা। অপ্রস্তুত মুখে বললেন, 'কী বলুন তো?'

হেমনাথ খানিক দূরে বসেছিলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'পরশু পঁচিশে ডিসেম্বর; বড়দিন। তাই তো?'

'হ্যাঁ।' আস্তে করে মাথা হেলিয়ে দিলেন লারমোর।

স্নেহলতা লজ্জিত, বিব্রত। বললেন, 'সত্যি, আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। মন আজকাল কি বেভুলো হয়ে যাচ্ছে!'

হেমনাথ বললেন, 'বড়দিনের নেমন্তন্ন করতে এসেছ বুঝি লালমোহন?'

লারমোর বললেন, 'হ্যাঁ। পরশুদিন আমার ওখানে সবাই যাবে।'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'গীর্জা পরিষ্কার-টরিষ্কার করিয়েছ? চারধার যা নোংরা করে রেখেছিলে।'

'না। কোথায় আর করানো হল!' লারমোর বলতে লাগলেন, 'ধানকাটা শুরু হয়ে গেল; তাই নিয়ে মেতে উঠলাম।'

'চমৎকার!' হেমনাথ অত্যন্ত রেগে গেলেন, 'পরশু বড়দিন, এখনও নাকে তেল দিয়া ঘুমোচ্ছ! গীর্জা ধোয়ামোছা মাজা-ঘষা হবে কবে?'

'কাল সকালবেলা তুমি যদি একবার আসো—'

'যেতেই হবে। ভাবছি যুগলকে নিয়ে যাব।'

'তাহলে খুব ভাল হয়; আমার ওখানে মা আছে। সবাই হাত লাগালে কতক্ষণ আর লাগবে!'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'যা দেখছি, গীর্জা সাফটাফ করে সাজিয়ে-গুছিয়ে কাল আর আমার ফেরা হবে না।'

'কাল তোমাকে ফিরতে দিচ্ছে কে? তুমি ফিরবে পরশুদিন বিকেলে।' বলতে বলতে লারমোরের হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'ভাল কথা—'

'কী?'

'আমরা না-হয় পরিষ্কার-টরিষ্কার করব। গীর্জা সাজানর ভার সুধাদিদি সুনীতিদিদিকে দিলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল, খুব ভাল—'

'তা হলে কাল বিকেলে সুধা-সুনীতিকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বাকি সবাই পরশু যাবে।'

'আচ্ছা।'

একধারে বসে বসে চুপচাপ সবার কথা শুনে যাচ্ছিল বিনু। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'কাল সকালে দাদুর সঙ্গে আমি যাব।'

সুরমা ওধার থেকে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না। কাজের মধ্যে গিয়ে তোমাকে আর

ঝঞ্ঝাট করতে হবে না। আমাদের সংগে তুমি পরশুদিন যাবে।'

বিনুর মুখখানা কালো হয়ে গেল।

লারমোর বিনুকে লক্ষ্য করছিলেন। সস্নেহ গলায় বললেন, 'না-না, পরশুদিন নয়। কালই তুমি যাবে।'

ঝিনুক এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। বিনুর যাবার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে দেখে হিংসুটি মেয়েটা আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। কান্নার মতন সরু গলায় হঠাৎ বায়না জুড়ে দিল, 'বিনুদাদা গেলে আমি যাব, আমি যাব।'

অত্যন্ত বিরক্ত চোখে বিনু ঝিনুকের দিকে তাকাল। মেয়েটা তার পেছনে সব সময় প্রায় জোঁকের মতন লেগে আছে।

লারমোর বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাবি। নিশ্চয়ই যাবি।'

সুধা-সুনীতিও এ ঘরেই ছিল। সুধা হঠাৎ বলল, 'বড়দিনে আমাদের ক্রিসমাস কেক খাওয়াবেন তো লালমোহন দাদু?'

লারমোর হাসলেন, 'এই গ্রামদেশে কেক কোথায় পাব দিদি! তবে—'

'কী?'

'চমচম খাওয়াব, পাতক্ষীর খাওয়াব, রসগোল্লা খাওয়াব। দেখব, কে কত খেতে পারিস।'

সুধা কিন্তু খুঁত-খুঁত করতে লাগল, 'বড়দিনে কেক না হলে ভাল লাগে না।'

পরেরদিন ভোরবেলা ফীটন পাঠিয়ে দিলেন লারমোর।

ধান কাটা এখনও চলছে। একশ কানি জমির ফসল তো অল্পসল্প ব্যাপার না যে মুখের কথা খসতেই ক্ষেত থেকে উঠে এল।

ঠিক হল কৃষাণদের সংগে জমিতে গিয়ে অবনীমোহন আজকের দিনটা ধান কাটা তদারক করবেন। কাল ভোরবেলা যুগল ফিরে আসবে। যুগল ফিরলে অবনীমোহন বাড়ির বাকি সবাইকে নিয়ে গীর্জায় যাবেন। কালকের দিনটার ধান কাটা দেখাশোনার ভার থাকবে যুগলের ওপর।

যাই হোক এত ভোরে রোদ ওঠেনি। কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। পৌষের হাওয়া এত ঠাণ্ডা, মনে হয়, বরফের দেশ থেকে ছুটে আসছে। ভেজা মাটি থেকে এমন হিম উঠছে যে পা ফেলা যায় না।

সারা গায়ে গরম জামা-কাপড়; তবু শীত কাটে না। হি-হি কাঁপতে কাঁপতে বিনু ঝিনুক হেমনাথ এবং যুগলের সঙ্গে ফীটনে গিয়ে উঠল।

গীর্জায় পৌঁছতে পৌঁছতে রোদ উঠে গেল। শীতের রোদ—নিস্তেজ, উত্তাপহীন। তবু তো রোদ। পকেট থেকে হাত বার করে সিঁটনো আঙুলগুলো সেঁকে নিতে লাগল বিনু।

গীর্জায় এসে এক মুহূর্তও বসলেন না হেমনাথ। যুগল আর লারমোরকে সংগে নিয়ে ঝাড়পোঁছ শুরু করে দিলেন। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে সারাদিন ধোয়ামোছা চলতে লাগল।

বিকেলে সুধা-সুনীতি এল। ততক্ষণে ঘষে-মেজে গীর্জাকে ঝকমকে করে তোলা হয়েছে। চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

সুধারা আসতে না আসতেই বিনুকে সংগে নিয়ে যুগল বেরিয়ে পড়ল। ঘুরে ঘুরে রাজ্যের ফুল-লতা-পাতা যোগাড় করে গীর্জার সামনে স্তূপাকার করল। নদী-পারের মনিহারি দোকান থেকে লাল-নীল-সবুজ নানা রংগের কাগজ কিনে আনল।

লারমোর বললেন, 'সুধাদিদি সুনীতি-দিদি, আর কী লাগবে বল—

সুধা-সুনীতি একই সংগে বলল 'আর কিচ্ছু নয়।'

'এবার তা হলে সাজাতে শুরু কর।'

দু বোন কোমর বেঁধে লেগে গেল। ফুল-লতা-পাতায় চমৎকার নক্সা করে গেট সাজাল, তিন-চারটে তোরণ বানাল। লাল-নীল কাগজ কেটে অসংখ্য শিকলি বানিয়ে চারদিকে টাঙিয়ে দিল। চারদিকে মনোরম আলপনা আঁকল। একটা ক্রিসমাস-ট্রী বানাল; তার তলায় কাগজ-টাগজ দিয়ে বুড়ো সান্তাক্রুজ তৈরী করে দাঁড় করিয়ে দিল। সব চাইতে সুন্দর করে সাজাল যীশুখৃষ্টের ছবিখানা। অবশ্য যুগল-লারমোর-বিনু-ঝিনুক, যার যেমন সাধ্য সুধা-সুনীতিকে সাহায্য করেছে।

রাত পোহালেই বড়দিন। কোথায় কত শতাব্দী আগে বেথেলহামের আকাশে উজ্জ্বল তারাটি দেখা দিয়েছিল। তারপর এই ধূলি-ধূসর মর্তে আবির্ভাব হয়েছিল মানব-পুত্রের। আপন রক্তে এই রিপুতাড়িত জগৎকে তিনি শুদ্ধ করে গেছেন।

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষটিকে কৃতজ্ঞ মানুষ আজও ভোলেনি। বহু শতাব্দী পরও রাজদিয়া নামে বসুন্ধরার এক অখ্যাত প্রান্তে তাঁর পুণ্য-জন্মদিন স্মরণ করে তারা ধন্য হচ্ছে।

লারমোর ঘুরছেন, ফিরছেন আর সুসজ্জিত গীর্জা-বাড়িটাকে দেখছেন, যীশুর ছবিখানা দেখছেন। দেখে দেখে আশ যেন তার মেটে না।

দেখেন আর ঘন আবেগের গলায় লারমোর বলেন, 'চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে রাজদিয়ায় আছি। সব বছরই তো বড়-দিনের উৎসব হয়। কিন্তু কোনবার এমন করে গীর্জাবাড়ি সাজাতে পারিনি। ভাগ্যিস সুধাদিদি সুনীতিদিদিরা রাজদিয়ায় এসেছিল। কি আনন্দ যে আমার হচ্ছে!'

ক' ঘণ্টা পরই বড়দিন। গীর্জাবাড়িটার চারধারে ক'টি মানুষ তার জন্য হৃদয় বিছিয়ে রেখেছে।

গীর্জা সাজাতে সাজাতে অনেক রাত হয়ে গেল। তারপর খেয়ে দেয়ে সবাই শুয়ে পড়ল। কতক্ষণের জন্যেই বা শোওয়া! খানিক পরে, তখনও রাতের অন্ধকার রয়েছে লারমোররা উঠে পড়লেন। এমন যে ঘুম-কাতুরে বিনু, সে-ও শুয়ে থাকতে পারল না।

শীতের এই শেষ রাতে চারদিক যখন বরফের মতন ঠাণ্ডা, পেছনের নদী থেকে লারমোর এবং হেমনাথ স্নান করে এলেন। সুধা-সুনীতিও স্নান করতে চেয়েছিল, হেমনাথ করতে দেননি। অভ্যেস তো নেই। শেষে অসুখ-বিসুখ করে যেতে পারে। দু-একখানা বেশি জামা-কাপড় নিয়ে এসেছিল ওরা। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিল।

এত ঠাণ্ডায় প্যান্ট-জামা বদলাতে ইচ্ছা করছিল না বিনুর। হেমনাথ বললেন, 'কি ছেলে রে তুই! উৎসবের দিনে কেউ বাসি জামা-টামা পরে থাকে! যা-যা, পরিষ্কার জামা-প্যান্ট পরে নে—'

অগত্যা কি আর করা! চটকানো বাসি জামাটামা ছাড়তেই হল বিনুকে। দেখাদেখি ঝিনুকও চট করে ফ্রক বদলে নিল।

এদিকে যীশুর ছবির সামনে অসংখ্য মোমবাতি দিয়েছেন লারমোর। তারপর সবাইকে ডেকে পবিত্র শুদ্ধ মনে চোখ বুজে আশ্চর্য সুরেলা গলায় বড়দিনের প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। যীশু-বন্দনার পর বাইবেল থেকে তাঁর প্রিয় ক'টি পদ আবৃত্তি করলেন:

Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands.
Serve the Lord with gladness;
Come before his presence with singing;
Know ye that the Lord he is God, it is he that hath made us,
And not we ourselves; we are his People, and the sheep of his pasture.

আবৃত্তি হয়ে গেলে অসংখ্য পবিত্র প্যারাবেল শোনালেন লারমোর। ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট থেকে অনেক কথা শোনালেন। যীশুর জন্ম থেকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত পুণ্য জীবনকাহিনী বললেন। বুড়ো সান্তাক্রুজের কথা বললেন। হেমনাথ-সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুক সবাই অভিভূত হয়ে শুনতে লাগল।

যীশুভজনা শেষ হতে হতে ভোর হয়ে গেল; ঘন-করে-বোনা কুয়াশার ভারী পর্দাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে রোদ উঠল।

রাত থাকতে থাকতেই যুগল বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। তাকে আবার কৃষাণদের সংগে মাঠে যেতে হবে।

বেলা বাড়লে সুরমা-স্নেহলতাকে নিয়ে অবনীমোহন গীর্জায় এলেন। শিবানী আসেন নি; ক'দিন ধরে তাঁর জ্বর। তা ছাড়া সবাই চলে এলে তো হয় না; বাড়ি পাহারা দেবার জন্য এক-আধজন থাকা দরকার।

শুধু হেমনাথদের বাড়ির লোকজনই না, বেলা যত চড়তে লাগল, রাজদিয়া এবং দূর-দূরান্তর গ্রাম-গঞ্জ থেকে কত মানুষ যে আসতে লাগল গীর্জায়! চেনা-জানা যাকেই পেয়েছেন তাকেই নেমন্তন্ন করে-ছিলেন লারমোর।

যে আসছে তারই হাতে ফলটল মিষ্টি টিষ্টি দিচ্ছেন নারমোর ; ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত গীর্জাবাড়ি দেখাচ্ছেন আর বলছেন, 'কেমন দেখলে বল তো?'

'চোমৎকার কতকাল থইরা এই গীর্জায় বড়দিন দেখতে আছি। কিন্তুক এমুন সাজান-গুছান কোনদিন দেখিনি।'

'কোত্থেকে দেখবে? আমরা কি সাজাতে-টাজাতে জানতাম?'

'এইবার তাইলে এমুন সোন্দর সাজাইলেন কেমনে?'

'আমরা কি সাজিয়েছি!'

'তয়?'

'আমার নাতনীরা সাজিয়েছে।' বলে সুধা-সুনীতির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে সগর্বে সবাইকে দেখাল।

সারাদিন লোক আসছে। একদল যায় তো আর একদল তক্ষুনি এসে পড়ে। জন-স্রোতের আর বিরাম নেই। এ-তো শুধু খৃষ্টানদেরই উৎসব নয়, সমস্ত মানবজাতির কাছেই এক পরম পবিত্র দিন। অন্তত রাজদিয়ার মানুষ এইভাবেই দিনটিকে গ্রহণ করেছে।

লোক আসছে, যাচ্ছে। হেমনাথরা কিন্তু ছাড়া পেলেন না।

বেলা অনেকখানি চড়লে স্নেহলতা একবার বললেন, 'বড়দিনের উৎসব তো মিটল। এবার আমরা বাড়ি যাই?'
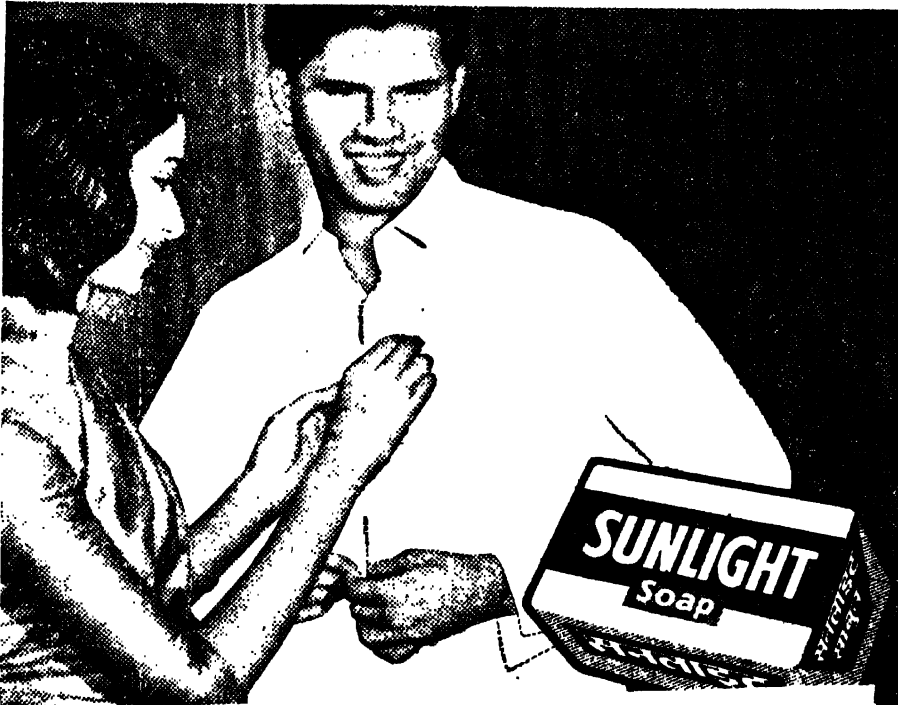
তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই চেঁচা-মেচি জুড়ে দিলেন লারমোর। 'কোথায় মিটল। আজ সারাদিনই বড়দিন।'

'তার মানে কী বলতে চান আপনি?'

'বলতে চাই আজ সারাদিন এখানে থাকতে হবে।'

কপাল কুঁচকে কপট শঙ্কার গলায় স্নেহলতা বললেন, 'সারা দিন!'

'হ্যাঁ, সারাদিন।' লারমোর ঘাড় হেলিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা গল্পগুজব, খাওয়া-দাওয়া, এবং হাল্কা সুরের ঠাট্টা-টাট্টা চলল। স্নিগ্ধ মনোহর একটি দিন কাটিয়ে অনেক রাত্তিরে ঝিনুকো ফিরতে উঠল। এতক্ষণে বাড়ি ফেরার অনুমতি মিলেছে।

●

দিনকয়েক পরে এক সকালবেলায় পুবের ঘরের তক্তপোষে বসে ছিল বিনু। নাকের ডগা এবং চোখদুটো বাদ দিলে সারা গা গরম চাদরে ঢাকা। একটা পুঁটুলির মতন দেখাচ্ছিল তাকে। বাতাস এমন কনকনে যে চাদরের ভেতর থেকে হাত-পা বার করতে ইচ্ছে হয় না।

একটু আগে ঘুম ভেঙেছে বিনুর। স্কুলে ভর্তির সমস্যাটা মিটে যাবার পর আজকাল বইটই ছুঁচ্ছে না সে। বিনু জানিয়ে দিয়েছে, নতুন বছরে নতুন ক্লাস শুরু না হলে সে আর পড়ছে না।

দাদুর কাছে যদিও সে শোয়, ইদানীং এত ঠান্ডায় ভোরবেলা আর উঠতে চায় না। হেমনাথও টানাটানি করেন না। শীতকালটার জন্য সূর্যস্তব স্থগিত আছে।

যাই হোক, এখন বেশ বেলা হয়েছে। আকাশের খাড়া দেয়াল বেয়ে বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে।

জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল বিনু। উঠোন ভর্তি এখন শুধু ধান আর ধান, হেমনাথের ক্ষেতের ধান—সোনার পাহাড়ের মতন স্তূপাকার হয়ে আছে। উঠোনের পর বাগান, তারপর পুকুর। অঘ্রানের গোড়াতেই পুকুরের ওপারের মাঠ থেকে জল নেমে গিয়েছিল। এখন ওখানকার মাঠ একেবারে নিঃস্ব। কৃষাণেরা ধান কেটে নিয়ে চলে গেছে। ধান কাটা ফাঁকা মাঠ এখন কেমন যেন ধূসর দেখায়। শস্যকণার খোঁজে ঝাঁকে ঝাঁকে মোহনচূড়া পাখি আর বুলবুলি সেখানে চক্কোর দিয়ে ফিরছে। এছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।

হেমনাথ ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, 'কী করছিস বিনুদাদা?'

দূর মাঠের দিকে চোখ রেখেই অন্যমনস্কের মতন বিনু উত্তর দিল, 'বসে আছি।'

কৌতুকের গলায় হেমনাথ এবার বললেন, 'ফাঁকা মাঠের শোভা দেখছিস—' বলে শব্দ করে হাসলেন।

বিনু কিছু বলল না।

একটু পর পেছন দিকে শব্দ হতে বিনু মুখ ফেরাল। তার চোখে পড়ল, তক্তপোষের তলা থেকে প্রকাণ্ড স্টীলের বাক্স বার করে খুলে ফেলেছেন হেমনাথ। এবং খুব তন্ময় হয়ে ভেতরের কী সব দেখছেন!

আগেও বারকয়েক এই বাক্সখানা খুলে বিভোর হয়ে হেমনাথকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে বিনু। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

আজ পৌষ মাসের এই অলস সকালে হঠাৎ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল বিনু। ডাকল, 'দাদু—'

হেমনাথ প্রথমটা শুনতে পাননি। আরো দু-চারবার ডাকাডাকির পর মুখ তুললেন, 'কী বলছিস?'

'বাক্সের ভেতর কী দেখছ?'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই দেখবি?

বিনুর কৌতূহল ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। বলল, 'হ্যাঁ।'

'আয়—'

জানলার পাশ থেকে উঠে পড়ল বিনু; পায়ে পায়ে হেমনাথের কাছে চলে এল।

বাক্সের ডালাটা পুরোপুরি মেলে ধরলেন হেমনাথ। বললেন, 'দ্যাখ—'

ভেতরে চমৎকার চমৎকার সব জিনিস স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বেতের সাজি, নক্সা-করা কাশ্মীরী শালের পাড়, বহু বর্ণময় ময়ূরের পালক, অসংখ্য ছবি, মাটির পুতুল, পট, ডাকের সাজের অগণিত নমুনো, কারুকাজ করা প্রাচীন কাঁথা, নানারকমের রং-চঙে পাথর, মণিপুরী চাদর, মোটা আর্ট পেপারে ঘন কালো কালির মনোহর হস্তাক্ষর, কাঠের এবং হাড়ের রমণীয় শিল্প-কার্য—এমনি কত কী।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'এসব কার দাদু?'

হেমনাথ বললেন, 'আমার। একটা বাক্স দেখলি তো?'

'হ্যাঁ।'

'এই রকম আরো পাঁচ-ছটা বাক্স আছে। এখন আমার বয়েস পঁয়ষট্টির মতন। কুড়ি পঁচিশ বছর বয়েস থেকে এসব জিনিস জমাচ্ছি। যেখানে যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর চোখে পড়েছে, চেয়ে-চিন্তে কিংবা পয়সা দিয়ে কিনে এনেছি।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, কোত্থেকে হঠাৎ ঝিনুক এসে হাজির। এক পলকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সুর টেনে টেনে বলল, 'বিনু দাদাকে কী দেখাচ্ছ গো?'

বাক্সের ভেতরটা দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এই সব—'

'বিনু দাদাকে দেখালে আমাকেও দেখাতে হবে—' ঝিনুক নাকে-কান্না জুড়ে দিল।

'কাঁদছিস কেন; দ্যাখ না—'

এই এক মেয়ে হয়েছে। বিনু যা করবে, যা দেখবে, যেখানে যাবে, তারও তাই করা চাই, দেখা চাই, সেখানে যাওয়া চাই।

মনে মনে ঝিনুকের ওপর খুব রেগে গেল বিনু; একবার ইচ্ছা হল ঝুঁটিটা টেনে ছিঁড়ে দেয়। কিন্তু কিছুই করল না। ঝিনুককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে বলল, 'এত সব জিনিস জমিয়েছ কেন?'

হেমনাথ বললেন, 'এমনি, সখ।' একটু চুপ করে থেকে দূরমনস্কের মতন আবার বললেন, 'ঠিক শখ না। ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর জিনিস জোগাড়ের নেশা থাকলে মন খারাপ দিকে যায় না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'মাঝে মাঝে কোন কারণে বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে থাকলে বাক্স খুলে বসি। এসব দেখতে দেখতে সব ভার চলে যায়!'

হেমনাথের শেষ কথাগুলো খানিক বুঝল বিনু; অনেকখানিই অবোধ্য থেকে গেল। বিস্ময়ের মতন তাকিয়ে থাকল সে।

হেমনাথ আবার বললেন, 'জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুধা-সুনীতিকে বলব, যেন সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে রাখে।'

●

দেখতে দেখতে ইংরেজি নতুন বছর পড়ে গেল। আজ থেকে বিনুদের ক্লাস শুরু হবে। একা বিনুর না, সুধা-সুনীতি এবং ঝিনুকেরও।

চারজনেরই স্কুল আর কলেজ কাছা-কাছি। খেয়েদেয়ে দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমে পড়ে মেয়েদের স্কুল। সেখানে ঝিনুককে রেখে বাকি তিনজন এগিয়ে গেল। ঠিক হল, ফেরার পথে ঝিনুককে তারা নিয়ে যাবে।

ঝিনুকের পর বিনুর স্কুল। সুধা-সুনীতি তার স্কুলে আর এল না। বড় রাস্তা ধরে সোজা কলেজের দিকে চলে গেল। বিনু ডানদিকের মাঠের ওপর দিয়ে স্কুলবাড়ির দিকে চলল।

মাঠের মাঝামাঝি আসতেই বিনু শুনতে পেল, পেছন থেকে কেউ ডাকছে। এখানে কে ডাকতে পারে তাকে? সবাই তো অচেনা। ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল, হেডমাস্টার মোতাহার হোসেন চৌধুরী সাহেব আসছেন।

কাছে এসে মোতাহার সাহেব সস্নেহে হাসলেন, 'স্কুল খোলার দিনই চলে এসেছ!'

বুকে ঢিব ঢিব করছিল বিনুর। চোখ নামিয়ে আবছা গলায় বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'গুড, ভেরি গুড।' বিনুর কাঁধে একখানা হাত রেখে মোতাহার সাহেব বললেন,

'কখন এলে?'
'এইমাত্র।'

'এখনও তা হলে ক্লাসে যাও নি।'
'আজ্ঞে না।'

'এসো আমার সঙ্গে—' বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে মোতাহার সাহেব তাঁর ঘরে গেলেন।

সেদিন ঘরে ঢুকেছিল, এ ঘরখানা হেড মাস্টার সাহেবের জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট। কিন্তু আজ দেখা গেল, অন্যান্য মাস্টার মশাইরাও এখানে বসেন। মোট কথা, এটাই রাজাদিয়া হাই স্কুলের 'টীচার্স' কমনরুম'।

এখনও স্কুল বসার সময় হয় নি। যে সব মাস্টার মশাই এর মধ্যেই এসে পড়েছেন তাঁদের সবার সঙ্গে বিনুর আলাপ করিয়ে দিলেন মোতাহার সাহেব। ঐ যে লম্বা রোগা মতন প্রৌঢ়টি, তাঁর নাম আশু দত্ত—ইংরেজির টীচার। উনি সোমনাথ সাহা, অঙ্কের টীচার। উনি রজনী চট্টরাজ, ভূগোলের টীচার। ইত্যাদি—

মাস্টার মশাইদের পরিচয়-টরিচয় দিয়ে মোতাহার সাহেব বললেন, 'এই ছেলেটির নাম বিনয়—বিনয়কুমার বসু। আমাদের হেমদাদার ভাগনীর ঘরের নাতি। এ বছর ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছে। আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন। ছেলেটা বেশ ব্রাইট।'

হেমনাথের নাতি এবং হেডমাস্টার সাহেবের প্রশংসা শুনে সবাই বেশ আগ্রহান্বিত হলেন। বিনুরা আগে কোথায় ছিল, হঠাৎ রাজাদিয়ায় এসে ভর্তিই বা হল কেন, এমনি নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন মাস্টার মশাইরা; বিনু উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

কথায় কথায় ক্লাসের সময় হয়ে গেল। দপ্তরী বাইরে ঘন্টা বাজিয়ে দিল।

মোতাহার সাহেব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ক্লাস এইটের প্রথম ক্লাস কার?'

ইংরেজির টীচার রোগা লম্বামতন আশু দত্ত বললেন, 'আমার—'

'বিনয়কে একটু আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। ছেলেমানুষ, আজ নতুন এসেছে—'

আশু দত্ত বিনুর দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'এসো—'

ক্লাসে আসতে দেখা গেল বেঞ্চিগুলো বোঝাই হয়ে গেছে; ছেলেরা আগেভাগে সেগুলো দখল করে বসে আছে।

বিনু লক্ষ করল, বেশির ভাগ ছেলেই তার চাইতে অনেক অনেক বড়। পেছন দিকে যারা বসে আছে তাদের মুখ দেখে মনে হল, নিয়মিত দাড়িগোঁফ কামায়। দু-একজন বিনুর সমবয়সী থাকতেও পারে। কিন্তু এত ছেলের ভিড়ে এই মুহূর্তে তাদের খুঁজে বার করা অসাধ্য।

ক্লাসের দিকে তাকিয়ে আশু দত্ত বললেন, 'তোমাদের নতুন এক বন্ধু এসেছে। আজই এর সঙ্গে সবাই আলাপ-টালাপ করে নেবে।' বলে বিনুকে দেখিয়ে দিলেন। তারপরেই হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে খুব দ্রুত আবার বলে উঠলেন, 'তবে হ্যাঁ, দু-জন এর সঙ্গে মিশবে না, কথাও বলবে না।' বলেই ডাকলেন, 'রুস্তম—পতিতপাবন—'

সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকের বেঞ্চি থেকে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের দুই গাট্টাগোট্টা জোয়ান উঠে দাঁড়াল। এত বড় বড় ধেড়ে ছেলে যে ক্লাস এইটে পড়তে পারে, বিনুর কাছে তা এক অভাবনীয় ব্যাপার। হতভম্বের মতন তাকিয়ে থাকল।

আশু দত্ত বললেন, 'তোমাদের দু-জনকে সাবধান করে দিলাম, বিনয়ের পেছনে লাগবে না। ওর সঙ্গে মিশবে না।'

'আইচ্ছা স্যার—' রুস্তম এবং পতিতপাবন দু-জনেই ঘাড় হেলিয়ে আবার বসে পড়ল।

ইংরাজির টীচার কেন যে রুস্তম আর পতিতপাবনকে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিলেন বিনু ভেবে পেল না।

বেশিক্ষণ সেই ভাবনাটা নিয়ে থাকা গেল না। সামনের বেঞ্চের ছেলেদের একটু চেপেচুপে বসে বিনুকে জায়গা করে দিতে বললেন আশু দত্ত। বিনু বসলে বললেন, 'রোজ তুমি ঐ জায়গায় বসবে।'

'আচ্ছা স্যার—' বিনু মাথা নাড়ল।

অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর নতুন বছরে আজই প্রথম স্কুল বসেছে। এখনও ছেলেদের বই-টই কেনা হয় নি। বই কেনা হবে কোত্থেকে? এখনও বুকলিস্টই দেওয়া হয় নি। কাজেই গল্প করে সময় কাটানো ছাড়া কাজ নেই।

অলস মন্থর গতিতে একটার পর একটা ক্লাস গড়িয়ে চলল। তারপর একসময় টিফিনের ঘন্টা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতন স্কুলবাড়ির সবগুলো ঘর থেকে হুড়মুড় করে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ল। স্রোতে গা ভাসিয়ে বিনুও বাইরে এল।

ছেলেরা ছোটাছুটি করছে। একদল সামনের মাঠে 'দাড়িয়াবান্ধা'র কোর্টে নেমে পড়েছে। আরেকদল খেলছে 'গোল্লাছুট'। তবে বেশির ভাগই শীতের রোদে পিঠ দিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

কারো সঙ্গেই এখনও ভালো করে আলাপ হয় নি। চারদিকে আলতোভাবে ভেসে বেড়াতে লাগল বিনু। একবার দাড়িয়াবান্ধা'র কোর্টে একবার 'গোল্লাছুটে'র আসরে—ঘুরতে ঘুরতে কখন যে মাঠের প্রান্তে সারি সারি কাঠ বাদাম গাছগুলোর কাছে এসে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

হঠাৎ চাপা গলায় কারা যেন ডেকে উঠল 'বিনয়—'

চমকে এদিক-সেদিক তাকাতেই বিনু দেখতে পেল, ডান দিকে শেষ বাদাম গাছটার তলায় রুস্তম, পতিতপাবন এবং তাদের বয়সী আরো দু-তিনটে জোয়ান ছেলে বসে আছে।

মাস্টার মশাই তার সঙ্গে রুস্তমদের মিশতে বারণ করে দিয়েছেন। নিষেধটা একতরফা না। রুস্তমরা যেমন তার সঙ্গে মিশবে না; তাকেও তেমনি ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। বিনুর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। কাঠ-বাদাম গাছটার তলায় রুস্তমদের কাছে যাবে কি যাবে না, ঠিক করে উঠতে পারল না।

তার মনোভাবটা রুস্তমরা যেন বুঝতে পারল। বলল, 'ডর নাই, এইখানে মাস্টার মশাই আসব না। আসো—আসো—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখন যে রুস্তমদের কাছে এসে বসেছে, বিনু টের পায় নি।

রুস্তম বলল, 'কইলকাতায় থাইকা আইছ?'

'হ্যাঁ—' বিনু মাথা নাড়ল।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ করেছে, রাজাদিয়া আসার পর যার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, প্রথমেই তারা কলকাতার কথা জানতে চেয়েছে। কলকাতা সম্বন্ধে তাদের মনে অপার অসীম বিস্ময়।

রুস্তমরাও কলকাতা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল; অবাক হয়ে বিনুর মুখে অজানা রহস্যময় দেশটির নানা চমকপ্রদ কাহিনী শুনল। তারপর পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বার করে সবাই একটা করে ধরিয়ে নিল। বিনুর দিকেও একটা বাড়িয়ে দিল।

বিনু চমকে উঠল। প্রথমত, স্কুলের ছেলেরা বিড়ি খায়, এমন দৃশ্য আগে আর কখনও দ্যাখেনি। তার পক্ষে এ এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। তার ওপর তাকেও বিড়ি সাধছে! বিনুর বুকের ভেতরটা ঢিব-ঢিব করতে লাগল। বলল, 'না-না—'

'বিড়ি বুঝি খাও না?'

'না।'

'তয় কী খাও? সিগ্রেট?'

'না—না—'

বিস্ময়ে চোখ গোল হয়ে গেল রুস্তমের, 'বিড়ি খাও না' সিগ্রেট খাও না, কী কইলকাত্তার পোলা!'

বুক ঢিব-ঢিব করছিল; এখন মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। বিনু বলল, 'আমি এখন যাই—'

খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলে রুস্তম বলল, 'আরে যাইবা কই। বসো—বসো—আলাপ-পরিচয়ই হইল না। বিড়িতে একখান টান দিয়াই দ্যাখ না; এমুন সুখ আর কিছুতে নাই—'

'না-না, আমাকে ছেড়ে দিন—'

'আরে কী আশ্চর্যা, আমাগো 'আপনে' 'আইজ্ঞা' কইরা কও ক্যান। এক লগে পড়ি, 'তুমি' কইরা কইবা। 'তুই'ও কইতে পার।'

বিনু স্তম্ভিত। পড়লই বা এক ক্লাসে, দামড়া মোষের মতন তাগড়া তাগড়া ঐ জোয়ানগুলোকে কখনও 'তুমি' কি 'তুই' বলা যায়! বিনু উঠবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

রুস্তম বলল, 'এমুন কর ক্যান? আমরা বাঘ না ভালুক?

বিনু ফস করে বলে ফেলল, 'মাস্টার মশাই আমার পেছনে আপনাদের না লাগতে বারণ করে দিয়েছেন?'

তাচ্ছিল্যের গলায় রুস্তম বলল, 'মাস্টার মশাইরা অমুন কত কথা কয়! হেই ধইরা বইসা থাকলে চলে নিকি? আমাগো লগে মিশো, মজা পাইবা?'

'কিসের মজা?'

রুস্তম উত্তর দিল না। পতিতপাবনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বলল, 'তুই-ই কইয়া দে—'

পতিতপাবন কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকল। তারপর খুব চাপা গলায় ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'রুস্তইমার তিন বিবি; আমারও বউ আছে। মেলা রসের কথা আমাগো জানা; তোমারে শিখাইয়া-পড়াইয়া চালাক কইরা দিমু—'

কথাগুলো ঠিক যে বুঝল বিনু তা নয়। তবে টের পেল ওর ভেতর নোংরা অশ্লীল গন্ধ আছে। তার নাক-কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

রুস্তমরা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল। অর্থাৎ টিফিন শেষ।

টিফিনের ঠিক পরের ক্লাসটাই আবার আশু দত্তের। ক্লাসে ঢুকেই তিনি হুংকার দিলেন, 'রুস্তম, পতিতপাবন—'

শেষ বেঞ্চ থেকে দুজন উঠে দাঁড়াল।

আগের গলায় আশু দত্ত আবার বললেন, 'কী বলেছিলাম তোদের?'

ভীত চোখে একবার মাস্টার মশাইকে দেখে ঘাড় নীচু করল রুস্তমরা। আবছা স্বরে বলল, 'আইজ্ঞা—'

'তোদের না বলেছিলাম, বিনয়ের পেছনে লাগবি না! নিজেরা তো জাহান্নামে গেছিসই, বছর বছর ফেল করে একেকটা দামড়া বলদ হয়ে উঠেছিস! নিজেরা যা খুশি কর, ছোট ছোট ছেলেগুলোর সর্বনাশ করা কেন?'

'আমরা তো কিছু করি নাই।'

'করিস নি! আবার মিথ্যে বলা হচ্ছে!' রাগে চিৎকার করে উঠলেন আশু দত্ত, 'ভেবেছিস, আমার চোখে কিছুই পড়েনি! টিফিনের সময় বাদাম গাছের তলায় বিনয়কে ডেকেছিলি কেন? বলু হারামজাদা বদের ধাড়ীরা—'

রুস্তম, পতিতপাবন—দুজনেই এবার চুপ। মুখ তুলে মাস্টার মশাইয়ের দিকে তাকাবার সাহসটুকুও তাদের আর অবশিষ্ট নেই।

রুস্তম আর পতিতপাবনের চেহারা অসুরের মতন। অথচ রোগা দুর্বল আশু দত্তর সামনে ভয়ে তারা সিঁটিয়ে গেছে। দৃশ্যটা খুবই মজাদার; বিনুর খুব ভাল লাগল।

আশু দত্ত থামেন নি, 'তোরা হলি দাগী আম; একসঙ্গে থাকলে বাকি-গুলোরও বারোটা বাজাবি। স্কুল থেকে তোদের তাড়াতে হবে, দেখছি। যা, এখন ক্লাসের বাইরে গিয়ে 'হাফ নীল ডাউন' হয়ে থাক—'

রুস্তম এবং পতিতপাবন সুড়সুড় করে বাইরে চলে গেল; তারপর ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে 'হাফ নীল ডাউন' হয়ে রইল।

বিনুর খুব হাসি পাচ্ছিল। বাড়ি ফিরে প্রথমদিনের অভিজ্ঞতাটা রঙচঙ ফলিয়ে বলবার জন্য তার আর তর সইছিল না।

●

পৌষ মাস থাকতে থাকতেই মাঠ-গুলোকে শূন্য করে দিয়ে ধান উঠে গেল। বাড়ির উঠোনে এখন সোনার পাহাড় সাজানো।

যে পঁচিশজন কৃষাণকে হেমনাথ কাজে লাগিয়েছিলেন তারা আজকাল আর চকে যায় না। খড়সমেত যে ধান তারা কেটে এনেছে সারাদিন ঝেড়ে ঝেড়ে তার থেকে শস্যের দানাগুলোকে আলাদা করে; তারপর রোদে শুকিয়ে ডোল বোঝাই করতে থাকে। আর খড়গুলো দিয়ে পালা সাজায়।

এদিকে অবনীমোহন মজিদ মিঞার যে জমি কিনেছেন তার ধানও উঠে গেছে। ফসল কেটে নিয়ে যাবার পর মজিদ মিঞা অবনীমোহনকে জমির দখল দিয়ে দিয়েছেন।

দেখতে দেখতে পৌষ সংক্রান্তি এসে গেল। সংক্রান্তির দিন বিনুদের স্কুল আর সুধা-সুনীতির কলেজ ছুটি। এই দিনটিতে এ দেশে অনেকেই বাস্তুপুজো করে থাকে। হেমনাথরাও করেন। অবনীমোহন নতুন জমি কিনেছেন; ঠিক হয়েছে তিনিও বাস্তুপুজো করবেন।

আগের দিনই দুজন পুরুত এবং দুজন ঢাকীকে খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল। সংক্রান্তির দিন সকালবেলা তারা এসে হাজির।

বাস্তুপুজোর প্রথাটি বেশ। প্রথম পুজোটি হয় বাড়ির মধ্যেই। পুরুতঠাকুর চরু রেঁধে বাস্তুদেবতাকে উৎসর্গ করে। তারপর যেখানে যেখানে জমিজমা আছে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে পুজো হয়।

এবার দুই পুরুত, দুই ঢাকী এসেছে। কেননা হেমনাথ আর অবনীমোহনের আলাদা আলাদা পুজো হবে।

বাড়ির পুজো সেরে দুই পুরুত দুদিকে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির মানুষেরা দুভাগ হয়ে দুই পুরুতের পিছু পিছু চলল। আর দুই ঢাকী ঢাক বাজাতে বাজাতে আগে আগে চলল।

শুধু বিনুদেরই না, এখানে ঘরে ঘরে বাস্তুপুজো। চারদিকের মাঠ জুড়ে কত ঢাক যে বাজছে! কত পুরুতের মন্ত্রোচ্চারণ যে শোনা যাচ্ছে! একদল আধনেংটো কালো কালো ছেলেমেয়ে একটু প্রসাদের আশায় এ খেত থেকে ও খেতে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

ঢাকের বাজনা শুনতে শুনতে, বাতাসে চরুর মধুর সুঘ্রাণ নিতে নিতে এবং জমিতে জমিতে ঘুরে পুজো দেখতে দেখতে পৌষের বেলা হেলে গেল। সারাদিনের ক্লান্তি গায়ে মেখে বিনুরা যখন বাড়ি ফিরল, শীতের সন্ধ্যে নেমে গেছে।

●

মাঘ মাসের প্রথম দিকেই সব ধান ডোলে তুলে খড় দিয়ে সারি সারি পালা সাজিয়ে চরের মুসলমান কামলারা চলে গেল।

তারপর একটানা অলস মন্থর দিন-যাপন। যুগল-করিমকে এখন আর মাঠে যেতে হয় না। হেমনাথের অবশ্য কাজের শেষ নেই। বাড়ির কাজ তাঁর যত, তার হাজারগুণ বাইরের কাজ। ইদানীং স্কুল-বাড়ির জন্য গঞ্জে গঞ্জে ঘুরে টাকা তুলে

বেড়াচ্ছেন। নাওয়া-খাওয়ার ফুরসতটুকু পর্যন্ত তাঁর নেই।

নতুন ধান উঠবার পর এ বাড়িতে পিঠে-পায়েস বানাবার ধুম পড়ে গেছে। চালও অঢেল, দুধেরও অভাব নেই। কাজেই পিঠে-টিঠে না বানিয়ে কি থাকতে পারেন স্নেহলতা?

পিঠেও কি এক আধ রকমের? পাটি-সাপটা, চিতুই, সিদ্ধ পুলি, ভাজা পুলি—রকমের আর লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া পায়েস আছে, চসি আছে।

এরই মধ্যে এক রবিবার, স্কুলে যাবার তাড়া ছিল না বিনুর; দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর রোদ পোয়াচ্ছিল। কোথায় যেন খেজুর গুড় জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল। বাতাসে তার সুঘ্রাণ ভেসে আসছে। হঠাৎ যুগল এসে সামনে দাঁড়াল, 'কী করতে আছেন ছুটোবাবু?'

বিনু বলল, 'এই তো বসে আছি।'

'শুদাশুদি বইসা থাইকা কী করবেন? লন, চকে যাই। এই সময় চকে গেলে কাউঠ্যা পাইবা হয়। খাইতে যা লাগে ছুটোবাবু, কী কমু! যেমুন সোয়াদ, তেমুন ভালো।'

বিনু লাফিয়ে উঠল, 'চল—'

কবেই ধান কাটা হয়ে গেছে। শীতের দুপুরে এখন মাঠ জুড়ে শুধু শূন্যতা। ফসল নেই, ধান গাছের গোড়াগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, সব কিছু বর্ণহীন। ঠিক বর্ণহীন নয়, ধূসর। শীতের আদিগন্ত মাঠের ওপর অসীম বিষাদ ঘন হয়ে আছে।

মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে চড়াই আর বুলবুলি উড়ছিল। মাঝে মাঝে তারা নীচে নেমে মাটিতে ঠোকর দেয়। কিন্তু বৃথাই। কেউ তাদের জন্য একদানা শস্যও ফেলে রেখে যায় নি।

একটা বুড়ো গোসাপ আলের ওপর দিয়ে পেট টেনে টেনে ধীর মন্থর গতিতে যাচ্ছিল। ধান কাটার সময় সাপটাকে এই মাঠে আরো অনেকবার দেখেছে বিনু। আজ কী হয়ে গেল, চট করে একটা মাটির ঢিল কুড়িয়ে নিল। ছুঁড়তে যাবে, যুগল হাতটা চেপে ধরল, 'করেন কী ছুটোবাবু, করেন কি? ও হইল এই চকের দ্যাবতা, ওরে মারলে সর্বনাশ হইয়া যাইব।'

ঢিলটা আস্তে আস্তে ফেলে দিয়ে বিনু শুধলো, 'কী সর্বনাশ হবে?'

'জমিনে আর ফসল ফলব না। এইখান-কার মাইনষেরে জিগাইয়া দেইখেন।'

মানুষের বিশ্বাসের ওপর কথা নেই। বিনু আর কিছু বলল না। গোসাপটাকে ডান দিকে রেখে তারা এগিয়ে চলল।

সারা দুপুর খোঁজাখুঁজির পর মোটে তিনটে ছোট ছোট সুন্দি কচ্ছপ পাওয়া গেল। তাদের পা বেঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে যুগল বলল, 'একখান কথা ছুটোবাবু—'

আনন্দ, লজ্জা—সব মিলিয়ে যুগলের মুখের ওপর দিয়ে পর পর অনেকগুলো ঢেউ খেলে গেল। তারপর খুব আস্তে করে সে বলল, 'কাইল গোপাল দাস আসব—'

'কে বললে?'

'লোক পাঠাইছিল।'

'আমি তো দেখিনি।'

'আপনে তখন ইস্কুলে—'

সত্যি সত্যি পরের দিন ভাটির দেশ থেকে পাখির বাপ গোপাল দাস আর যুগলের বোনাই ধনঞ্জয় এসে হাজির। প্রথমে তারা পণের আট কুড়ি টাকা গুনে গুনে নিল; তারপর বিয়ের দিন ঠিক করল। মাঘ মাসের চব্বিশ তারিখে বিয়ে। এ-ও স্থির হল, বিয়ে করতে অতদূরে ভাটির দেশে যেতে হবে না। মেয়ে নিয়ে একেবারে ধনঞ্জয়ের বাড়িতে চলে আসবে গোপাল দাস; সেখানেই শুভ কাজ সারা হবে।

যুগলের বিয়ে নিয়ে বিরাট কাণ্ড করে বসলেন হেমনাথ। রাজদিয়ার হেন বাড়ি নেই, হেন মানুষ নেই যেখানে নেমন্তন্ন গেল না। দেখেশুনে কে বলবে, যুগল হেমনাথদের বাড়ির কামলা!

কেউ কেউ বলে, 'কামলার বিয়ায় এত ঘটা ক্যান?'

হেমনাথ বলেন, 'যুগলকে তো আমি কামলা ভাবি না; ও আমার বাড়ির ছেলে। তা ছাড়া আমাদের বাড়িতে বহুকাল শুভ কাজ হয় না। বিয়েটা উপলক্ষ করে ঘটা না হয় করলামই।'

বিয়ের আগের দিন থেকেই নিমন্ত্রিত-দের আনাগোনা শুরু হল। বরণকুলো সাজিয়ে জনাকুড়ি এয়ো জুটিয়ে অধিবাসের গান শুরু করে দিলেন স্নেহলতা :

আইজ রামের অধিবাস কাইল রামের
　　বিয়াগো কমলা,
আমরা জল ভরিতে যাই,
　　সই আমরা জলে যাই।
তোমার রামের অধিবাসের
　　রাণী সময় গেল।
গা তোল কৌশল্যা রাণী
　　নিশি পরভাত হইল।
তোমরা সখি আন গো হলুদ, আন গো
　　হলুদ সকলে।
আমার রামেরে সিনান করাও
　　অতি সকালে।'

একটু থেমে আবার শুরু হয় :

'বরণকুলা আনো সখি, বরণকুলা আনো
　　আমরা শ্যামের ঘাটে যাই।
　　আমরা জল সইতে যাই।
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও সখি,
　　ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও।
ধান দিয়া, দুর্বা দিয়া, রামের ওই
　　বরণডালা সাজাও।
　　আমরা জল সইতে যাই।
　　আমরা ফুল তুলতে যাই।'

এয়োদের মধ্যে যারা স্নেহলতার সমবয়সিনী তারা বলে, 'পরের পুতের লেইগা এই! নিজে তো আর বিয়াইলেন না দিদি; বিয়াইলে না জানি কী করতেন?'

স্নেহলতার ছেলেমেয়ে নেই। নিমেষের জন্য তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে। তারপর স্নিগ্ধ হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠেন, 'না বিয়োলে বুঝি ছেলে হয় না? রাজদিয়া জুড়ে এত ছেলেমেয়ে তবে কার?'

'হেয়া ঠিক, হেয়া ঠিক—'

পরের দিন বিকেলবেলা বরযাত্রী আর বরকে নিয়ে রওনা হলেন হেমনাথ। বরযাত্রীদের ভেতর সুধা-সুনীতি, বিনু-ঝিনুকেও রয়েছে।

বর্ষাকাল হলে ডুবন্ত মাঠের ওপর দিয়ে নৌকোয় যাওয়া যেত। কিন্তু এই শীতে জল সরে গিয়ে ডাঙা জেগেছে; ডাঙার ওপর দিয়ে তো নৌকো চলে না। তাই হেঁটেই চলেছেন হেমনাথরা।

রাজদিয়া থেকে ধনঞ্জয়ের বাড়ি মাইল তিনেকের মতন। কোণাকুণি মাঠ পাড়ি দিলে কতক্ষণ আর লাগবে!

যেতে যেতে কৃষাণ গ্রাম চোখে পড়ে। কৌতূহলী কেউ কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শুধোয়, 'কিসের মিছিল—'

বরযাত্রীদের ভেতর থেকে কে উত্তর দ্যায়, 'বিয়ার—'

'কার বিয়া?'

'হ্যামকত্তার বাড়ির যুগলার।'

'আমরা যামু?'

'আসো।'

নানা গ্রাম থেকে দুজন চারজন করে এসে এসে বিরাট এক জনতা তৈরী হল; তারা বরযাত্রীদের পিছু পিছু চলতে লাগল।

সন্ধ্যের কিছু পরে বিনুরা ধনঞ্জয়ের বাড়ি পৌঁছে গেল।

(ক্রমশঃ)

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ লাহিড়ী ১৯২৯ সনে শেষবারের জন্য কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেবকে আমার নাম করে এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, হরেন শীল, কালী পাল, ধীরেন বসু প্রভৃতি খাঁ সাহেবের পুরোনো শিষ্যদের নিয়ে চাঁদা তুলে তাঁর একটা স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। আমি তখন গৌরীপুর থেকে কলকাতায় মাসাধিককাল অবস্থানের জন্য এসেছিলাম; আমার সঙ্গে ছিলেন আমার জ্ঞাতি সম্পর্কে দাদা স্বর্গীয় জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। ক্ষিতীশ লাহিড়ী, আমি ও আমার দাদা—এই তিন-জনে খাঁ সাহেবের চাঁদার তহবিলে ৬০০ (ছয়শত টাকা) দিয়েছিল; এই তিনজনের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রধান ছাত্র; রবাবী ঢংয়ের আলাপ শিক্ষাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞানদাকান্ত ও আমি উভয়েই স্বরলিপি লিখনে অভ্যস্থ ছিলাম; কিন্তু খাঁ সাহেব আমাকে বললেন, "আপনারা বহু ওস্তাদের গৎ, গান ও আলাপের স্বরলিপি লিখেছেন, আমাদের ঘর থেকেও শতাধিক গৎ সংগ্রহ করেছেন; তবে আলাপ ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে হলে কয়েকটি বাঁধা তান লিখে রাখাই যথেষ্ট। তারপর ওস্তাদের বাজনা শুনে বাদ্যপদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করা এবং স্বয়ং ওস্তাদকে বাজনা শোনানো—এই হলো আলাপ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।" খাঁ সাহেব আমাকে কাগজ কলমের মায়া পরিত্যাগ করে সজাগভাবে তাঁর বাজনা শুনতে বললেন। তিনি প্রত্যহ সকালে আমাদের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে সরোদসহ দুই-তিন ঘন্টা অতিবাহিত করতেন। ঐ সময়ে সংগীতের নানা কাহিনী আমাকে শোনাতেন, সংগীত বিষয়ে আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন ও সর্বোপরি অন্ততঃ এক ঘন্টা সরোদে নানা রাগ বাজিয়ে সেগুলির ভেদ প্রদর্শন করতেন। এসব সত্ত্বেও তিনি বলতেন যে আমার পক্ষে এক মাস ধরে অন্ততঃ একটি রাগ ভাল করে শিখে বাজাবার অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাকে একটি রাগ নির্বাচন করতে বলায় আমি পঞ্চমরাগের কথা তাঁকে বললাম; পঞ্চম দুই প্রকার আছে; শুদ্ধ পঞ্চমে 'পা' ও কড়ি মা নাই। এই রাগটি খাঁ সাহেবের বিশেষ প্রিয় ছিল; আবার এই রাগ থেকে রেখাব বাদ দিলে শুদ্ধকোষ রাগ গঠিত হয়। আমি মাসাধিক-কাল খাঁ সাহেবের কাছ থেকে শুদ্ধ পঞ্চম-রাগের তালিম নিই ও সংগীত সভায় বাজাবার জন্য সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে এই রাগটি অভ্যাস করতে থাকি। এই রাগের তালিম দেওয়া ছাড়াও খাঁ সাহেব আমাকে নানা রাগ অবলম্বনে রবাবী ঘরাণার বন্দেজী তান শোনাতেন। কতকগুলি মামুলি রাগ ছাড়া নানা বিশিষ্ট রাগে ১২ সুরের অতিরিক্ত শ্রুতির ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয়। যেমন শ্রীরাগের রেখাব, ধৈবত হয় অতি কোমল। ললিতের ধৈবত তীব্র কোমল; ভীমপলশ্রীর গান্ধার তীব্র কোমল ইত্যাদি। তাছাড়া প্রতি রাগেই এক, দুই, তিন বা ততোধিক স্বরে সমাবেশের পর পর একটু যতি বা বিরাম প্রয়োগ কর্তব্য। এইসব স্থলে স্বরকে অক্ষর বলা হয়। যেমনঃ—এক সুরের পর পর যতি দিলে সেই রাগের লক্ষণ হলো একাক্ষরাবৃত্তি, দুই স্বরের...দ্ব্যক্ষরাবৃত্তি; এইরূপে ত্র্যক্ষরাবৃত্তি, চতুরক্ষরাবৃত্তি, পঞ্চাক্ষরাবৃত্তির রাগ বিদ্যমান। আলাপে অক্ষরাবৃত্তি প্রভৃতি নিয়ে প্রতি রাগেরই বিভিন্ন ছন্দ প্রকাশিত হয়। অনিবদ্ধ রাগালাপে তালের স্থান না থাকলেও ছন্দের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ বিশেষ আবশ্যক। বিশেষতঃ রবাব অঙ্গের আলাপে বিলম্বিত হতে আরম্ভ করে রাগ আলাপের সকল অঙ্গেই ছন্দের ব্যবহার প্রদর্শিত হয়। এখানেই অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে রবাবের পার্থক্য পরিস্কাররূপে ফুটে ওঠে।

কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেব তাঁর অতি অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কালী পাল, হরেন শীল ও শেষের দিকে শ্রীযুত ক্ষিতীশ লাহিড়ীকে সংগীতের যেসব গুহ্য তত্ত্ব শিখিয়েছিলেন, আমাকেও তা শেখাতে শুরু করেন। আমাকে তাঁর গুরু-ঘরের শিষ্যজ্ঞানে আমার কাছে সংগীতের কোন বিষয়ই গোপন রাখেননি। তাঁর পিতা নগমাৎ-য়ে-নিয়ামৎ নামে একটি হস্তলিখিত পুস্তক লিখে গিয়েছিলেন। ঐ পুস্তকটি তিনি মাঝে মাঝে আমায় পড়ে শুনাতেন; ঐ পুস্তকে স্বর, রাগ, বাদ্য ও তাল সম্বন্ধে তাঁর পরমগুরু সংগীত নায়ক বাসৎ খাঁ সাহেবের অনুমোদিত অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। বাসৎ খাঁ সাহেবের স্বাক্ষর-যুক্ত মন্তব্যে তিনি লিখেছেন যে, নিয়ামৎ-উল্লা খাঁ সাহেব (কেরামৎউল্লার পিতা) যা-যা লিখেছেন, তা শাস্ত্রসম্মত। থিয়োরী ছাড়াও ঐ পুস্তকে নানা রাগের রূপ ও চলন, সর্গম ও গানের স্বরলিপি লিখিত আছে। ঐ পুস্তকটি বর্তমানে জলপাইগুড়ির নবাব জব্বরের ওস্তাদ ওমর খাঁ সাহেবের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। ঐ পুস্তকে রাগের সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে, হাফেজ আলী খাঁ সাহেব কয়েক বৎসর পূর্বে কলকাতার কোন সঙ্গীত সম্মিলনীতে ঐ একই মত প্রকাশ করেন। রাগের পরিচয় সম্বন্ধে প্রাচীন গুরুদের মতে অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের চারটি তান রাগের স্বরূপ প্রকাশ করে। বিস্তারের ব্যাপার রাগের আসল কথা নয়। নিয়ামৎ-উল্লার পুস্তকে প্রতি রাগের চারিটি করে তান আছে। তিনি ও হাফেজ আলী একই মত প্রকাশ করেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুরের বিস্তার আসল ওস্তাদের পরিচয় নয় এবং খণ্ড মেরুর তান বাহুল্য হলো অঙ্কশাস্ত্রের বিষয়। কেরামৎউল্লা তাই বলতেন 'বারহংকি-কাম গিন্ডিকি চিজ, ওসমে ইসমে রাগ-দারিকি মজা নেহি হ্যায়'। হাফেজ আলী খাঁ সাহেব সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর একই মন্তব্য প্রকাশ করে কলকাতার অর্ধশিক্ষিত সংগীত সমাজে হাসি, ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র হন। যাহোক বাসৎ খাঁ-র পুত্র মোহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের দেহান্তের পর কেরামৎউল্লা উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে যে-সব তত্ত্ব আমায় শিক্ষা দেন, তার মূল্য অসামান্য। তিনি আলাপ ও ধ্রুপদের চারটি বাণী সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সরোদ যন্ত্রে তিনি সে-সব দেখাতেন।

তিনি বলতেন, বীণার মধ্য তান ও রবাবের জোড় ঐ দুই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। রবাবের জোড়ের অনুকরণে তিনি সরোদে আট প্রকার জোড়ের কায়দা দেখাতেন। যথা ঃ ১। লহর, ২। ডহর, ৩। উগর, ৪। ঠাণ্ডার, ৫। গমক, ৬। কিরায়, ৭। আঁশ, ৮। ছুট। কেরামৎউল্লা ও হাফেজ আলীর সরোদ যন্ত্র তাঁদের পূর্ব গুরুদের প্রবর্তিত আকারে গঠিত। ঐ প্রকার সরোদে রবাবের গাম্ভীর্য ও সুরশৃঙ্গারের মাধুর্য অনেকটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, কিন্তু বর্তমান সময়ে সরোদ পুনর্গঠনে ক্ষুদ্রতর আকারের যন্ত্রে লঘু ও নানাপ্রকার বৈচিত্র্যযুক্ত অলংকার যতই প্রকাশ পাক না কেন, আমাদের কানে তার আবেদন অনেক পরি-মাণেই হালকা হয়ে ওঠে। আমাদের রুচি প্রাচীন সংগীতের উপযোগী এই সমালোচনা সত্ত্বেও আমি একথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, বর্তমানের উচ্চাঙ্গ সংগীত এখনও প্রাচীনের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়নি। সেজন্য যে সাধনা ও মানসিক ক্রমোন্নতির আবশ্যক তা বর্তমান জীবনের হালকা পরিবেশে সম্ভব হতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে প্রগতির পথ যথেষ্ট প্রশস্ত, কিন্তু আর্টের রাজ্যে পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রাচীন কলা বিকাশের সৌন্দর্যে যথেষ্ট সজাগ, কিন্তু আমাদের দেশে নূতন সৃষ্টির অজুহাতে প্রাচীন কলাবিদ্যার অবমাননা একটা বাহা-দুরির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাকে একমাস ধরে শিক্ষা দেওয়ার পর খাঁ সাহেব তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্যদের নিয়ে একটি সংগীতের জলসার আয়োজন করেন। কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ দত্ত-ভবনে এই জলসা অনুষ্ঠিত হয়; তাঁর এক মাসের তালিমের ফলে আমার সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে কতটা উন্নতি সাধিত হয়েছে—বিশিষ্ট গুণীসমাজে তার প্রদর্শনই খাঁ সাহেবের জলসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেখানে গোয়াবাগানের গোবরবাবু, হেদুয়ার তারাপ্রসাদ ঘোষ, হরেন শীল, ক্ষিতীশ লাহিড়ী, শ্রীরাধিকা-মোহন মৈত্রের প্রথম সরোদী-গুরু আমীর খাঁ ও দত্ত-ভবনের মালিক উপস্থিত ছিলেন। আমি সুরশৃঙ্গারে প্রথমতঃ শুদ্ধ কেদারা ও পরে পঞ্চম রাগ বাজিয়েছিলাম। উভয় রাগের আলাপেই বিলম্বিত, জোড় ও ঝালা এই তিন অঙ্গই আমি বাজিয়ে শোনাই।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১৫)

চিত্রকল্পনা- প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে- চিত্রসেন

আজন্ম যারা পরস্পরের শত্রু তারা দেশমাতার আহ্বানে এখন মিলিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা ক্ষান্ত নয়। কিন্তু সে প্রতিযোগিতা এখন বীরত্বের। যেখানে বিপদ সব চেয়ে বেশী, সেখানেই হয় দুর্জয় দল তেজসিংহ সর্বাগ্রে উপস্থিত।
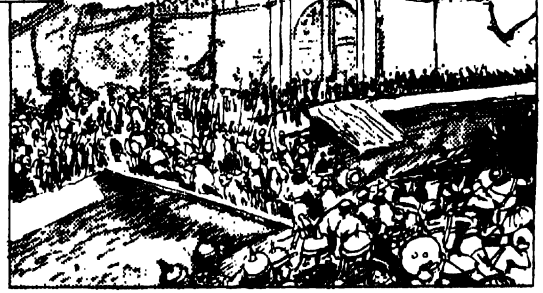
কিন্তু দীর্ঘ অবরোধে শুধু খাদ্য ও পানীয়ের অভাবেই দুর্গরক্ষা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠল। তারপর এক দিন নিশীথরাত্রে কয়েকজন দুঃসাহসী ভীলকে নিঃশব্দে গোপনে একটি কাষ্ঠাধার দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে দেখা গেল।
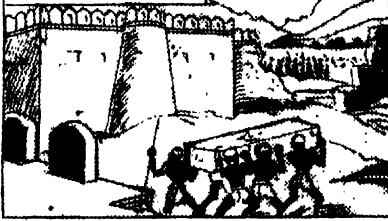
দুর্গম বনপথে তাদের দেখা গেল, তারপর।

কাষ্ঠাধারে কি বা কাকে নিয়ে চলেছে ভীলেরা ?

এক বিরাট পর্বত কন্দরে কাষ্ঠাধারটি এনে খোলবার পর তার মধ্যে দেখা গেল পুষ্পকুমারীকে।

অজানা অদ্ভুত এ পরিবেশে পুষ্পকুমারী প্রথমে বিহ্বল হ'ল আতঙ্কে তারপর এক নারীমূর্তি তার চোখে পড়ল।

তিনি যে কে সে পরিচয় খানিক বাদেই পেল পুষ্পকুমারী। সেই সঙ্গে চিতোরের মহারাণীর স্নেহার্দ্র আশ্বাস।

সেদিন এ দৃশ্য দেখতে আর কেউ কি উপস্থিত ছিল না সে গুহায়?

আপনার আচরণ-ভব্যতা কেমন?

ভব্যতাযুক্ত আচরণ আমাদের প্রত্যেকেরই সম্পদ। যে যতোখানি ভব্যতা শেখে, তার সম্পদ বেশি। একইভাবে সৌজন্যপূর্ণ আচরণ নিয়ে সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারলে আমরা বন্ধুলাভ করতে পারি, মর্যাদা, সম্ভ্রম এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারি।

নীচের মনোপ্রশ্নচর্চাটিতে প্রত্যেক প্রশ্নে আপনি আন্তরিকভাবে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে যান। তারপরে সবশেষে পয়েন্ট হিসাবের যে নিয়ম দেওয়া আছে, সেই মতো হিসাব করে দেখুন, কত পয়েন্ট পেলেন অর্থাৎ আপনার আচরণ কতোখানি ভব্য বা অভব্য।

১। সবাই যাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে তার জন্যে আপনি কি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন?

২। যখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে বসেন, তখন কি আপনার আচরণ দিয়ে প্রকাশ করেন যে, আপনি খাবার-দাবার খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছেন?

৩। যখন আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেন, তখন আপনি কি রেডিও বন্ধ করে দিয়ে কথা বলেন?

৪। আপনি কি বলেন যে, আপনি উঁচু মহলের আদবকায়দা খুব রপ্ত করে ফেলেছেন?

৫। আপনার বাড়ীর পরিবারবর্গের সকলের কথাই কি সহানুভূতি দিয়ে বিবেচনা করে সেইমতো আচরণ করেন?

৬। দোকানের কর্মচারী বা রেস্টুরেন্টের বয় যারা আপনাকে যত্ন করে তাদের প্রতি মিষ্টি ব্যবহার করার জন্যে কি আপনি সচেষ্ট হন?

৭। আপনার ভুল হয়ে গেছে দেখামাত্রই আপনি কি তৎক্ষণাৎ মাফ চেয়ে নেন?

৮। আপনি কি ঘরেবাইরে প্রায়ই 'ধন্যবাদ' এবং 'করে দিলে ভাল হয়'—এই ধরনের সৌজন্যপূর্ণ কথা বলেন?

৯। লোকে যাতে কোনো অসুবিধা ভোগ না করে, তার জন্য আপনি কি দরকার হলে নিজের কাজের ধারাও বদলে নেন?

১০। আপনি কি ফলাও করে কথা বলা কিংবা জাঁকজমক দেখানো এড়িয়ে চলেন?

১১। লোকে যখন কথাবার্তা বলছে তার মাঝখানে বাধা দিয়ে কথা বলতে কি আপনার ইচ্ছে হয়?

১২। কেউ আপনাকে উপহার পাঠালে আপনার সন্তোষ জানিয়ে তাঁকে খবর পাঠাতে আপনি কি মাঝে মাঝে দেরী করে ফেলেন?

১৩। কারুর কোনো অনুরোধ যদি আপনি না রাখেন, তাহলে কি তিনি মনোকষ্ট পেয়েছেন বলে আপনি লক্ষ্য করেন?

১৪। কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলে আপনি কি প্রকাশ্যে খুব গর্ব প্রকাশ করেন?

১৫। আপনি কি কখনো রাস্তার মাঝখানে সিগারেটের বাক্স কিংবা কাগজের মোড়ক ছুঁড়ে ফেলেন?

১৬। আপনি যখন বেশ চতুরভাবে কোনো কথা বলেন, তখন তা মানুষের মনে আঘাত দেয় বলে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন?

১৭। কোনো জায়গায় যাবার কথা থাকলে আপনি কি প্রায়ই সেখানে যেতে দেরী করে ফেলেন?

১৮। যখন কারুর কাজেকর্মে আপনি বিরক্ত হন, তখন কি অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন?

১৯। আপনি কি পোর্টেবল ট্রানজিস্টর রেডিওসেট নিয়ে এমন জায়গায় বাজান যেখানের লোকজন রেডিও শোনা পছন্দ না করতেও পারে?

২০। আপনি কি মাঝে মাঝে 'ধূমপান নিষেধ', 'নো পার্কিং', 'কীপ টু দি লেফ্‌ট', 'ঘাসের উপর হাঁটিবেন না'—এইসব ধরনের নোটিশ কোথাও দেখলে না মেনে চলে যান?

●

আপনি এই মনোপ্রশ্নচর্চাটিতে কত পয়েন্ট পেলেন, এবার হিসাব করে দেখুন।

প্রথম দশটি প্রশ্নের প্রত্যেকটিতে 'হ্যাঁ' জবাব দিয়ে থাকলে আপনি ৫ পয়েন্ট করে পাবেন এবং ১১নং থেকে ২০নং প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটিতে 'না' জবাব দিলে পাবেন ৫ পয়েন্ট করে।

মোট ৭০ পয়েন্ট কিংবা তার বেশি পেলে বোঝা যাবে, অন্যের প্রতি মাধুর্য এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাপকাঠিতে আপনি সন্তোষজনক বিকাশলাভ করেছেন। ৫০ থেকে ৬৫ পয়েন্ট পেলে মনে করতে হবে বিনয়-নম্রতা মোটামুটি আছে, তবে মাঝে মাঝে অবিবেচক হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

যদি ৪৫ পয়েন্ট বা তারও কম পেয়ে থাকেন কেউ তাহলে সত্যি সত্যি পাঁচজনের প্রতি তাঁর মনোভঙ্গীর আমূল সংস্কার করার চর্চা এখনি শুরু করতেই হবে।

●

ভব্যতাকে সহানুভূতির অভিপ্রকাশ বলা যেতে পারে। অন্যজনে কিসে সুখ-তৃপ্তি পায়, আর কিসে অস্বস্তি বোধ করে, তার প্রতি সহানুভূতি যার জাগে তারই আচরণে ফুটে ওঠে ভব্যতা। এই সহানুভূতি এবং সমবেদনা যার মনে যতো সূক্ষ্ম হবে, তার ভব্যতাপূর্ণ আচরণ ততোই মধুর মনোরম হবে।

আপনি যদি আপনার আচরণকে আরও ভব্যযুক্ত করতে চান, তাহলে মানুষের মনের তৃপ্তি এবং অস্বস্তির কথা আরও বেশি করে বোঝবার চেষ্টা করুন। খুবই সামান্য একটি সৌজন্যপূর্ণ কথা বা একটুকু মিষ্টি আচরণ মানুষকে হৃদয়ভরা তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে; আপনি চারিদিকে নজর রাখলেই এরকম আচরণ কৌশলের নমুনা অজস্র পেয়ে যাবেন, শিখে নিতে পারবেন।

আলোর বৃত্তে

নট-নাট্যম্

করুণা কোরোনার একটি দৃশ্য।

বাংলাদেশে আজ যে নব-নাট্য আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে, তার প্রায় সবটুকু ঊর্মিমুখরতা বোধহয় কলকাতার প্রাণচাঞ্চল্যকে ঘিরেই। এ-সত্যকে স্বীকার করেও বলতে হবে যে নতুন আঙ্গিকে এবং নতুনতর আবেগে নাট্যচর্চার উদ্দাম প্রবাহ শুধু কলকাতার সীমারেখাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, তা ছুটেছে এই শহর থেকে দূরের ব্যাপ্তিতে। প্রকৃত নাট্যানুরাগী যেখানেই আছেন সেই প্লাবনে তাঁরাও মেতে উঠেছেন, তাঁদেরও অনুভব উত্তাল হয়ে উঠেছে জীবনের গভীরতম আলোয় সমৃদ্ধ নাটক মঞ্চে পরিবেশন করার আকুলতায়। কলকাতা এবং তার চারপাশের নাট্যচর্চার এই সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মধ্যেই বাংলাদেশের সামগ্রিক নাট্যআন্দোলনের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ বিধৃত। সুতরাং নাট্যানুরাগীর দৃষ্টি যেমন কলকাতার নাট্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রযোজনায় নিবদ্ধ থাকে, তেমনই শহর থেকে দূরের নাট্য-সংস্থার অনুশীলন তাঁদের উপলব্ধির প্রহরে আসা উচিত।

কথাগুলো মনের গহনে ভিড় করে আসছিল যখন হাওড়ার প্রগতিশীল নাট্য-সংস্থা 'নট-নাট্যমে'র বিশিষ্ট দুজন সভ্যের সঙ্গে তাঁদের সংস্থার এগিয়ে যাওয়ার কথা আলোচনা করছিলাম। দূরত্বের বিচারে হাওড়া কলকাতা থেকে খুবই কাছে, কিন্তু সেখানকার নাট্যগোষ্ঠীদের বিভিন্ন প্রযোজনার কথা কলকাতার নাট্যরসিক মহলে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় কি? কিন্তু এর মধ্যে দু-একটি সংস্থা আছে যার শিল্পীরা বহুদিন ধরে নাট্যচর্চায় বিভোর হয়ে আছেন এবং এ-বিষয়ে তাঁদের আন্তরিকতায় কোন শৈথিল্য আসেনি। এই প্রসঙ্গে 'নট-নাট্যমে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে এর শিল্পীরা চেষ্টা করে আসছেন হাওড়ার মানুষদের নাট্যচেতনাকে সমৃদ্ধ করতে, হাওড়ার প্রাণস্পর্শকে কলকাতার নাট্য-আন্দোলনের ধারার সঙ্গে আত্মিকভাবে জড়িয়ে দিতে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের সামগ্রিক নাট্য-আন্দোলনের ধারাকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে। হাওড়ায় এইরকম দীর্ঘস্থায়ী সংস্থা আর আছে বলে জানা যায় না। সতেরো বছরের ঝড়ঝঞ্ঝা যখন এঁরা অতিক্রম করে এসেছেন, তখন এঁদের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বেশ কিছুটা দৃঢ় ও দীপ্ত বিশ্বাস সংগত কারণেই জাগতে পারে।

সময়টা ছিল ১৯৫২। কলকাতায় তখন নবনাট্য আন্দোলনের ধারা সঞ্চারিত হোতে শুরু করেছে। 'বহুরূপী' নতুন আঙ্গিকে জীবনধর্মী নাটক পরিবেশন করে বাংলা নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাসে যুগান্তর এনেছেন। সেই আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে আরো কয়েকটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠার কামনায় আকুল, আন্দোলন আর আলোড়ন জেগেছে কলকাতার প্রায় প্রতিটি মানুষের মনে। এই একটা অভূতপূর্ব উত্তেজনা থেকে হাওড়া সেদিন কিছু দূরেই ছিল বলতে হবে। কিন্তু হাওড়ার প্রতিটি মানুষের অন্তরের অতলে এই ঢেউকে প্রসারিত করতে হবে, না হোলে বাংলার নাট্যশিল্পের

গৌরবময় ইতিহাসের অধ্যায়ে হাওড়ার অবদানের কথা লেখা হবে না, সে-বেদনা হবে অসহ্য,—ভাবলেন সেখানকার কয়েক-জন 'উৎসাহী যুবক, যাঁদের নাট্যানুরাগ সেদিনকার প্লাবনে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। এ'রা ভাবতে থাকলেন কি করে একটি স্থায়ী গোষ্ঠী করা যায়, যার মধ্য দিয়ে কলকাতায় ব্যাপ্ত এই নাট্য-আন্দোলনের মর্মকথাকে ভাষা দেওয়া যায়। ভাবনায় ভাবনায় কয়েকটা দিন গড়িয়ে গেলো। একটি বৃষ্টি ঝরো-ঝরো দিনে ভাবনা নিলো সার্থক রূপ। সৃষ্টি হোল 'নট-নাট্যম্'।

প্রাথমিক পর্যায়ে 'নট-নাট্যমে'র প্রতিষ্ঠাতা কয়েকজন ভাবলেন একের পর এক বহু নাটকই অভিনয় করতে হবে। তাই প্রতিষ্ঠার বছরেই অভিনীত হোল জ্যোতির্ময় রায়ের 'উদয়ের পথে', শরৎচন্দ্রের 'রমা', রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। এরপর ১৯৫৭ পর্যন্ত পাঁচ বছর বহু নাটক অভিনীত হোল। এ-তালিকায় রয়েছে : রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', বীরেশ্বর মুখো-পাধ্যায়ের 'মানুষ' (কেদারনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'কোষ্ঠীর ফলাফল' অবলম্বনে রচিত) ও 'ঘরে ঘরে' (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'বাঙালী' নাটক অবলম্বনে), রাখাল নাহার 'ইঙ্গিত', শ্রীবাস্তবের 'মহা-যুদ্ধের একাঙ্ক', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন', অমিয় মুখোপাধ্যায়ের 'চক্রান্ত', জগমোহন মজুমদারের '১৮০৭' রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার', 'সম্পত্তি সমর্পণ' ও শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'।

বলতে পারেন ১৯৫৭ পর্যন্ত 'নট-নাট্যম' শুধু একের পর এক নাটক করে হাওড়ার মানুষদের নাট্যকৌতূহল বাড়াতে চেষ্টা করেছে, বলেছেন সংস্থার নাট্যকার-নির্দেশক জগমোহন মজুমদার। কিন্তু এর পর থেকেই সিরিয়াস নাটকের প্রয়োজনায় ব্রতী হোলেন শিল্পীরা। এই পর্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অভিনীত হোল 'ওরা কাজ করে' নাটক। জো কুরীর 'হিউয়ার্স অফ কোল' নাটকের ভাবানুসারে এই নাটকটি রচনা করেছেন জগমোহন মজুম-দার। কয়লাখনির শ্রমিক-জীবনের কথাচিত্র এ-নাটক। বিলু, বিশু, বীরু, সর্দার, অন্ডা —এই পাঁচজনকে নিয়েই নাটক। তিল তিল করে এরা সবাই মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে আর একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করছে। এই নাটকের অভিনয় থেকেই 'নট-নাট্যমে'র প্রয়াসের কথা বিস্তৃতি পেতে লাগলো।

এরপরে অভিনীত হোল আগাথা ক্রিস্টি থেকে মুরারিমোহন সেন কর্তৃক রূপান্তরিত 'ডার্করুম', জগমোহন মজুমদারের 'ওদের চেতনা হোল?' (হারমন উল্ড থেকে রূপান্তর), ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'কানাগলি' ও 'জ্যোতির্গময়'। (ভিক্টর হিউগো থেকে রূপান্তর)

১৯৬০-এ অভিনীত হোল জগমোহন মজুমদারের মঞ্চসফল নাটক 'করুণা কোর না'। প্রায় ৬৫টি রাত্রি অভিনীত হয়েছে এ নাটক এবং বহু প্রতিযোগিতায় এ নাটক অনেক পুরস্কার এনেছে। একটি দরিদ্র-লাঞ্ছিত স্কুল-শিক্ষকের মর্মান্তিক জীবনই এই নাটকে বিবৃত হয়েছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাকে এসে দাঁড়াতে হয়েছে ফুট-পাতে, চারদিককার অসহ্য নিপীড়নে নিজের হাতে মারতে হয়েছে সন্তানকে। শেষ পর্যন্ত সমাজের কাছে সে চেয়েছে বিচার—করুণা নয়। এই বছরেই 'নট-নাট্যমে'র শিল্পীরা অভিনয় করেন বিভূতি মুখো-পাধ্যায়ের 'বরযাত্রী'। ১৯৬১-তে একটি মাত্র নতুন নাটক হয়, নাটকের নাম 'নষ্টনীড়'। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে এটি নাট্যরূপ দিয়েছেন জগমোহন মজুমদার।

'নট-নাট্যমে'র চলার ইতিহাসে ১৯৬২ একটি কর্মমুখর বছর। এই বছরেই সংস্থার শিল্পীরা হাওড়ার আর একটি গোষ্ঠী 'ঋত্বিক'এর সংগে যুক্ত হয়ে যৌথভাবে হাওড়া টাউন হলে নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করেন। এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এই বছরেই চীনের ভারত আক্রমণ, তাই দেশের জনসাধা-রণকে দেশাত্মবোধে জাগরিত করার জন্য সেদিন বাংলার কয়েকটি নাট্যসংস্থা দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয় করে-ছিলেন, তাদের মধ্যে 'নট-নাট্যমে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ'রা চীনের ভারত আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত দুটি নাটক 'আহ্বান' ও 'শপথ' গ্রামে ও শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করে দেশবাসীকে দেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এর পরে ১৯৬৩তে অভিনীত 'অলীক' নাটক এই একই পটভূমিকায় রচিত। 'আনন্দমঠে'র নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করার নেপথ্যেও দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টা স্পষ্ট।

এই সময়ে শ্রেষ্ঠ নাটক হোল জগমোহন মজুমদারের 'পাখীর বাসা'। নাটকটি ৩০ রাত্রির বেশী অভিনীত হয়েছে এবং লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এই শতকের চতুর্থ দশকে কলকাতার কোন এক অখ্যাত বর্ষায় এই নাটকের গল্পের শুরু ও শেষ। চরিত্র বলতে আছেন আদর্শভ্রষ্ট শেখরনাথ, এক অসুখী দম্পতি মোহন ও শোভা, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পথহারানো সুরেন, আর শেখরনাথের চরম ব্যর্থতার এক সফল সাক্ষী ভুজঙ্গ। 'পাখীর বাসা' নাটকটির নামকরণ প্রতীকি হোলেও প্রকৃতপক্ষে নাটকটি আধুনিক জীবন-যন্ত্রণারই একটি বিয়োগান্ত প্রতিরূপ।

সমাজ-জীবনের এক কঠিন প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে। এ শতকের নারী প্রশ্ন করেছে, প্রেম না প্রয়োজন, কি দরকার তাদের? সুচিন্তিত সংলাপ, ঘটনা, নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বে এ নাটক নিঃসন্দেহে একালের এক রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্ম।

'পাখীর বাসা'র অভূতপূর্ব সাফল্যের পর 'নট-নাট্যমে'র শিল্পীরা দ্বিগুণ উৎসাহিত হোলেন এবং তাঁদের স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত নাট্যানুশীলন সম্পর্কে বহু লোকের কৌতূহল জাগলো। নাট্য-প্রয়োজনাও পেল ব্যাপ্তি। প্রথমে পরিবেশিত হোল উদ্দেশ্যজনক কয়েকটি প্রহসন—দায়ে পড়ে দারগ্রহ (মলেয়ারের 'মারিয়াজ ফোর্সে' থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত), 'বিজ্ঞাপন' 'চতুষ্টয়' (আয়ানেস্কো থেকে)। 'বিজ্ঞাপন' একটি হাল্কা হাসির পালা সত্যি, কিন্তু এর মধ্যে মানুষের বিচিত্র অর্থলালসাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। 'চতুষ্টয়' নাটিকাটি বোধহয় শীর্ষ সম্মেলনের নিষ্ফল পরিণতির আশঙ্কায় রচিত হয়েছে।

'নট-নাট্যম' প্রযোজিত আর নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে জগমোহন মজুমদারের 'মেক-আপ', 'মেয়েটির নাম', 'বাসনার মৃত্যু', 'সংকর', 'ভেজাল', 'সাপুড়ের বাঁশী', রমেন লাহিড়ীর 'রাজযোটক' (আন্তন চেকভ অবলম্বনে)। 'বাসনার মৃত্যু'তে মূলত ব্যক্তিমানসের আশাভঙ্গের মধ্য দিয়ে সম্ভবত করুণ সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চেয়েছেন নাট্যকার : মানুষের ছোট সুখ, ছোট আশাও কি ব্যাহত হবে বিবেকহীন ধনীর অবিচারে—গিরিধারীলালের ডাক আর কতদিন সাড়ার অপেক্ষায় থাকবে? ...'সংকর' নাটকে সংখ্যালঘুদের নিয়ে ঘৃণ্য দলীয় রাজনীতির কথা বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে যেটা একটা বেদনাময় অভিজ্ঞতা। নাট্যকার এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন : 'মানুষের মুক্তি কিসে? রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে না পরস্পরের মিলনে? উগ্র ধর্মবোধ না মানবপ্রেম, কোনটা আজকের মানুষের কাছে বড় হয়ে দেখা দেবে? এ নাটক লেখার আগে এসব কথাই ভাবছিলাম।'

হিসেব করলে দেখা যাবে যে ১৯৫২ থেকে আজ পর্যন্ত 'নট-নাট্যমে'র শিল্পীরা মোট ৪০০ রাত্রির বেশী অভিনয় করেছেন। এই থেকেই শিল্পীদের তৎপরতা বিশেষভাবে অনুমেয়। শুধু হাওড়ায় নয়, কলকাতার বিশ্বরূপা, মিনার্ভা, থিয়েটার সেণ্টার, নিউ এম্পায়ারেই এ'রা বেশীর ভাগ নাটক অভিনয় করেছেন। 'মিনার্ভা'য় এ'রা নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন। বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে বহুবার এ'রা বিভিন্ন নাটক অভিনয় করেছেন। এ'দের অভিনয় পরিবেশিত হয়েছে উড়িষ্যায়, বিহারে, লক্ষ্ণৌতে, দার্জিলিং, কালিম্পং-এ ও শিলিগুড়িতে ও আসানসোলে।

'নট-নাট্যমে'র বিভিন্ন ধরনের প্রগতিমূলক কাজের সঙ্গে যাঁরা জড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোলেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, চিত্রাভিনেতা অমর মল্লিক, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রলাল সিংহ, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নট-নাট্যমে'র শিল্পীরা বাংলা ও বাংলার বাইরে বহুবার ন্যাট্যপ্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অনেক পুরস্কার অর্জন করেন। কিন্তু তবু নাটক অভিনয়ের মধ্যেই এ'দের নাট্যচর্চা সীমাবদ্ধ নয়, আরো কিছু এ বিষয়ে গঠনমূলক কাজ এ'রা করে থাকেন। প্রায়ই নাট্যবিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাতে বর্তমান নাট্য-আন্দোলনের ধারা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকসম্পাত হয়ে থাকে। এ'রা নাট্যবিষয়ক একটি মননশীল পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে সেটা প্রায় চালু রাখতে পারেননি। কিন্তু চেষ্টা চলছে যাতে এই পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ হোতে পারে।

'নট-নাট্যমে'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পাদক ব্রজমোহন মজুমদার বলেছেন : আমরা নাটকে রাজনীতি প্রচার করতে চাই না, আমাদের মনে হয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাজনীতি এলে নাটকের শিল্পধর্ম ব্যাহত হোতে বাধ্য। আমরা এমন নাটকই পরিবেশন করতে চাই যেখানে জীবন আছে, জীবনের গ্লানি থেকে উত্তরণের নির্দেশ আছে।

'নট-নাট্যমে'র উৎসাহী শিল্পীরা এখন অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে চলেছেন কি করে হাওড়া অঞ্চলে একটি স্থায়ী মুক্তঅঙ্গন মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এবিষয়ে এ'রা এগিয়েছেন অনেক দূর। দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে স্বপ্নকে একটু একটু করে সফল করে তুলছেন এ'রা। সামনের দিনগুলো হয়তো আরো অনেকদিন প্রতিবন্ধকতায় ভরা থাকবে। তবু এ'রা আশাবাদী, চলমানতার মধ্যেই অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে নেবার স্বাদ পেয়েছেন এ'রা। 'আমাদের পথ খুব সুগম নয়। সম্মুখে কাঁটা ঝোঁপ, ভাঙা কাঁচ শামুকের খোলা। প্রতি পদক্ষেপে হয়তো রক্তাক্ত হবে পদযুগল, তবু আমাদের অগ্রসর হোতেই হবে।'

—দিলীপ মৌলিক

গানের প্রতি মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। কিন্তু কেবল গানের প্রতি আকর্ষণ থাকলেই গাইয়ে হওয়া যায় না। তার জন্য আলাদা প্রতিভা থাকা দরকার, এবং সে প্রতিভাও অনেকটা সহজাত। আবার কেবল প্রতিভা থাকলেই গাইয়ে হওয়া যায় না। তার জন্য সাধনা দরকার, শিক্ষা দরকার। আর সেই শিক্ষার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন।

আমাদের মতো দুর্ভাগা দেশে, যেখানে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতেই মানুষের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়, সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষাই থাকে অপূর্ণ, অবহেলিত সেখানে শিক্ষক রেখে গান শেখার বা শেখানোর চিন্তা অনেকের কাছেই অসম্ভব চিন্তা। তাই অনেক প্রতিভাই নীরবে নিভৃতে নষ্ট হয়ে যায়, তার সন্ধান কেউ রাখে না। অনেক সম্ভাবনারই অকালমৃত্যু ঘটে, তার জন্য কেউ বিচলিত হয় না।

তবু বোধ করি তাদেরই জন্য কলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ প্রতি রবিবারে একটি সাপ্তাহিক সংগীতশিক্ষার আসরের আয়োজন করেছেন। বহুকাল ধরে এই আসর প্রচারিত হয়ে আসছে। কতকাল ধরে, হঠাৎ বলা শক্ত। আগে এই আসরের জন্য সময় বরাদ্দ ছিল ৩০ মিনিট, এখন বরাদ্দ হয়েছে ২৫ মিনিট। যবে থেকে সকাল ৯টায় ৫ মিনিটের একটা অতিরিক্ত নিউজ বুলেটিন প্রবর্তিত হয়েছে তবে থেকে সংগীতশিক্ষার আসরের সময় ৩০ মিনিট থেকে ২৫ মিনিট হয়েছে। সপ্তাহে মাত্র ২৫ মিনিটের শিক্ষায় (পুরো ২৫ মিনিটও নয়, এর একটা বড়ো অংশ চিঠির উত্তর ও অন্যান্য কাজে ব্যয় হয়ে যায়) কতখানি শেখা সম্ভব তা শিক্ষার্থীরাই ভালো বলতে পারবেন, আমার পক্ষে বলা বোধহয় সমীচীন নয়, কারণ আমি শিক্ষার্থী নই।

কিন্তু সত্যিই এই সংগীতশিক্ষার আসরের কোনো প্রয়োজন আছে কি? এই আসরে অধিকাংশই রবীন্দ্রসংগীত শেখানো হয়। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের জন্য দুটি আসর থাকবে কেন? শনিবার ও রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্য পাঁচটি দিন বেলা সাড়ে ১২টায় কত বছর ধরে যে একই রেকর্ড বাজানো হচ্ছে তা থেকে অনেকেই রবীন্দ্রসংগীত শেখার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কয়েকজন শিল্পীর নির্দিষ্ট কয়েকখানি রেকর্ডে মোট ৭০।৮০ খানা (কিংবা আরও বেশি) গান পালা করে বাজানো হয়ে থাকে। কতদিন ধরে হচ্ছে, আমি জানি না। এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, "আমিও জানি না কতদিন ধরে। আমার ঠাকুরদা বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি মারা গেছেন।"

যে গানগুলির দীর্ঘকাল ধরে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে তা থেকে সব গানই তো সবাই শিখে নিয়েছেন, এবং অন্তত হাজারখানেক টিয়াপাখির মুখেও সেইসব গান শোনা যাচ্ছে। যাঁদের রেডিও নেই, শুনেছি তাঁরা ঐসব টিয়াপাখি কিনে বাড়ির মেয়েদের দিচ্ছেন। মেয়েরা পাখির কাছ থেকে সহজে গান তুলে নিচ্ছেন। তাই বলছিলাম, দুটি সংগীতশিক্ষার আসরের দরকার কী?

রবিবার সকাল ৯টা ৫ মিনিটের সংগীতশিক্ষার আসরটি অনায়াসেই তুলে দেওয়া যায়। তাতে সরকারের কিছু টাকা বাঁচে। এবং তার জায়গায় টেপ রেকর্ডে কিছু নাকী কান্নার আধুনিক গান বাজানো যায়। নাকী কান্নার আধুনিক গানের প্রতি তো সংগীত বিভাগের প্রবল আকর্ষণ আছে, তা না হলে দিনের পর দিন এত নাকী কান্নার আধুনিক গান প্রচারিত হবে কেন?

...রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীর ও রেকর্ডের কি খুবই অভাব যে, পালা করে জনকয়েক শিল্পীর একই রেকর্ড ঘন ঘন বাজাতে হবে? কয়েকজন শিল্পী আছেন, তাঁদের নির্দিষ্ট একখানি কি দুখানি গান প্রায় প্রতিবারই বাজবেই। এইরকম শিল্পীদের মধ্যে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী শ্রীলা সেন প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এতে করে ঐসব শিল্পীর প্রতি অবিচার করা হয়, শ্রোতাদের মনে তাঁদের সম্বন্ধে একটা অনভিপ্রেত ধারণা জন্মাতে দেওয়া হয়।

আর একটা কথা, এখন রবীন্দ্রসংগীত শেখাটা যেমন অনেকটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি শোনাটাও। কিন্তু এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা সত্যিই রবীন্দ্রসংগীত ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে ফ্যাশানটা কিছু না। কিন্তু তাঁদের অনেকেই সাড়ে ১২টার রবীন্দ্রসংগীত থেকে বঞ্চিত হন কারণ তাঁরা তখন স্কুলে-কলেজে অফিসে-আদালতে বা অন্য কোনো স্থানে কর্মব্যপদেশে নিযুক্ত থাকেন। রবিবার ছুটির দিন, সেইদিন সাড়ে ১২টায় তাঁরা মুক্ত। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রসংগীত হয় না। কর্তৃপক্ষ যদি সেদিনের আধুনিক, শ্যামাসংগীত, রাগপ্রধান প্রভৃতির পরিবর্তে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবস্থা করেন তাহলে ঐ বঞ্চিত শ্রোতাদের বঞ্চনাটা কাটে। আর সপ্তাহে একদিন সাড়ে ১২টায় যদি ঐসব গান শোনাতেই হয় তাহলে অন্য কোনোদিন শোনানো যেতে পারে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

গত মাসে তিনজন মার্কিন নভশ্চর অ্যাপোলো—১০ মহাকাশযানে করে পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চাঁদের দেশে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন অ্যাপোলো থেকে চন্দ্রযানে করে চাঁদের ১০ মাইলের মধ্যে গিয়ে একেবারে কাছে থেকে চাঁদকে দেখে এসেছেন।

সামনের মাসেও তিনজন মার্কিন নভশ্চর চাঁদের দেশে যাচ্ছেন—একেবারে চাঁদের মাটিতে নামছেন।

রাশিয়ানরাও এ বছরের শেষে অথবা আসছে বছরের গোড়ায় চাঁদে যাবেন।

মানুষের এই যে বিরাট সাফল্য, এর পিছনে অনেকগুলি দেশের ৭০ বছরের যৌথ চেষ্টা আছে। মহাকাশ যাত্রার এই যে আধুনিক চিন্তা, এটা প্রথম মাথায় আসে জিওলকোভস্কি নামে একজন রাশিয়ানের—আজ থেকে ৭০ বছর আগে। এর ২০ বছর পরে গডার্ড নামে একজন অ্যামেরিকান আধুনিক রকেট নির্মাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। গডার্ডই প্রথম তরল জ্বালানির রকেট উৎক্ষেপ করেন। কিন্তু রকেটকে ওড়ার মতো করে তৈরি করেন একটি জার্মান দল। সেই দলের নেতা ছিলেন ওয়ার্নার ফন ব্রন। দশ বছরের পরিশ্রমের পর ১৯৪২ সালে ৩রা অক্টোবর ফন ব্রনের ১৩ টন ওজনের এ-৪ রকেট বর্তমান পূর্ব জার্মানীর অন্তর্গত বাল্টিক সাগরের ধারে মাছ ধরার গ্রাম পিনেমান্ডের নিকটবর্তী ইউজডম দ্বীপের এক রকেট কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়। ১৪ মিটার উঁচু এই রকেটটি আকাশে ৯০ কিলোমিটার উঁচুতে উঠে দূরে বাল্টিক সাগরে গিয়ে পড়েছিল। মানুষের তৈরি কোনো উড়ন্তবস্তু এই প্রথম এত উঁচুতে উঠল।

পরবর্তীকালে হিটলার এই রকেটের নাম দেন ভি-২ রকেট, এবং যুদ্ধের সময় লন্ডনের উপর নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে এই রকেটই এখন মহাকাশ যাত্রার মূল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। এই রকেটের উন্নতি সাধন করে মানুষ এখন চাঁদে যাচ্ছে।

মানুষের অনেক আগে থেকে পাখিরা আকাশে উড়ছে। চাঁদের সঙ্গে অনেক পাখির সম্বন্ধও আছে। কিন্তু পশুদের? তাও কিছু কম নয়। চাঁদে যাবার ব্যাপারে পশুপাখিরা যে মানুষের চেয়ে কম নয়, ১৩ই জুন সকালে শিশুমহলে শ্রীবিশ্বনাথ সান্তারা (ঘোষণায় সান্তারা বলা হল, আসলে সাঁতরা নয় তো? আমি জানি না।) তাঁর একটি গল্পে সেই কথাই শোনালেন।

মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, কথাটা পশুপাখিদের কানেও গেছে। তারাও মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কিন্তু তাদের রকেট নেই, স্পেসক্রাফট নেই। না থাকুক, তাদের ইচ্ছে আছে, বুদ্ধি আছে। পরীক্ষানিরীক্ষা করল, চাঁদে যাবার আগে আকাশে-মহাকাশে উড়ে গিয়ে খোঁজখবর নিল। শেষে খরগোশকে চাঁদে পাঠানো নিয়ে কেমন করে কী হয়ে গেল, ভারি মজার করে তা এই গল্পে বলা হয়েছে।

গল্পটি শুধু গল্পই নয়, এর মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, তথ্য আছে—শিক্ষণীয় জিনিস আছে। গল্প বলার ছলে শিশুদের অনেক কিছু শেখানো হয়েছে। সেই দিক দিয়ে গল্পটির সার্থকতা অনেক।

এই মহলে পরে 'বাপুজীর গল্প' বললেন শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ। বাপুজীর জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা তিনি শোনালেন শিশুমহলের শ্রোতাদের। বাপুজী সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। কিন্তু যতখানি বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল ততখানি বোধহয় নয়, কারণ শিশুদের আকৃষ্ট করার জন্য যে সরসতা ও গল্প বলার ভঙ্গি দরকার তা তাঁর বলার মধ্যে বিশেষ ছিল না। তিনি যে শিশুদের কাছে বলছেন সেটা মনেই হয় নি।

বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে [illegible] সঙ্গীত সুর বর্জিত শোনালেন শ্রী[illegible] নারায়ণ বর্মন। সুন্দর লাগল, মনে হল যেন পল্লীরই কোনো দরদী শিল্পী গাইছেন।

বেতারের আধুনিক গানের শিল্পীদের মধ্যে শ্রীঅজিতেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নাম শ্রোতাদের কাছে বেশ কিছুটা পরিচিত। এই পরিচিতি তার গানের জন্য কতটা, তার ঘন ঘন প্রোগ্রাম করার জন্য কতটা তা শ্রোতারাই বিচার করুন। তাঁর গান শ্রোতাদের কতখানি আনন্দ দেয়, কতখানি কাঁদায় তা-ও তাঁরাই নির্ণয় করুন। ১৭ই জুন রাত সাড়ে ১০টায় তাঁর আধুনিক গানে কান্নার ভাব দেখে কোনো শ্রোতা কেঁদেছেন কিনা এখনও খবর পাওয়া যায় নি। বেতারের আধুনিক গানে কান্নার ভাব আনতেই হবে, এমন কথা কোনো রসজ্ঞ শ্রোতা বলেছেন বলে জানা যায় নি। অথচ দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বেতারের আধুনিক গান অকারণে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

১৬ই জুন সকাল ৮টায় লোকগীতি গাইলেন শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস। তিনি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সকাল সাড়ে ৯টায় 'সংবাদ বিচিত্রা' বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে না পারলেও পরিচ্ছন্ন, শ্রবণ আকর্ষণ করার মতো।—রাত ৮টায় 'বাংলা কাব্যের ধারা' এই পর্যায়ে 'পুনশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করলেন ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য। আলোচনায় সারবস্তু ছিল, আলোচনার ধারাটিও ছিল অ্যাকাডেমিক। ডঃ ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর গম্ভীর। কিন্তু কথিকাটি আর একটু ধীরে, অনুধাবনের জন্য আর একটু সময় দিয়ে পড়লে ভালো হত।

ঐ দিন রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে শ্রীরামকমল চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গানের বিশেষ প্রশংসা করা গেল না। অতুলপ্রসাদের গানে সুরেরই প্রাধান্য—সুরই মনকে আকর্ষণ করে বেশি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন করল না।

শ্রীরামপুর কলেজের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৭ই জুন সকাল সাড়ে ৯টায় 'বিচিত্রায়' একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হল। রচনা ও গ্রন্থনা শ্রীদিলীপ সেন। রচনা কথাটি এই অনুষ্ঠানে সুপ্রযুক্ত বলে মনে হল না। অনুষ্ঠানটি ছিল প্রধানত সাক্ষাৎকারমূলক—প্রশ্নোত্তরের আকারে। মাঝে মাঝে শ্রীসেন শুধু টীকা দিয়েছেন।

শ্রীরামপুর কলেজের খ্যাতি শুধু কলেজ হিসাবেই নয়, বাংলা সাহিত্য ও শিক্ষার ইতিহাসে এর একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা কী এবং কেমন করে তা পালিত হয়েছে, এই অনুষ্ঠানে তা বিবৃত করা হয়েছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

যে কলেজ একদা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ছিল আজ তার সেই বিশিষ্ট ভূমিকার কথা অনেকেরই অজ্ঞাত। 'বিচিত্রায়' তা নতুন করে আলোচনা করে একটা [illegible] কাজ করা হয়েছে। আলোচনা তথ্যপূর্ণ, প্রাঞ্জল। কিন্তু শ্রীসেনের গ্রন্থনা কিছুটা নিস্তেজ, নীরস।

—শ্রবণক।
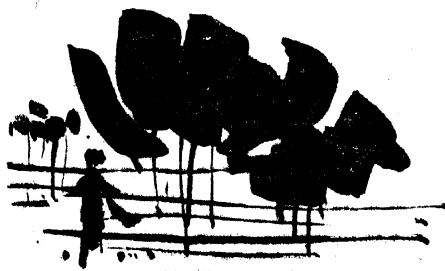
উদয়শংকর কালচারাল সেণ্টার প্রযোজিত ''বাসবদত্তা''

'পরিচয়' ও 'অর্ঘ্য'র পর শ্রীমতী অমলা-শংকরের পরিচালনায় উদয়শংকর কালচারাল সেণ্টারের তৃতীয় অবদান 'বাসবদত্তা' শিক্ষার্থীদের বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং শ্রীমতী শংকরের সৃজন প্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বোধিসত্ত্ববিধান কল্পলতা উপাখ্যান অবলম্বনে বুদ্ধশিষ্য উপগুপ্তের শান্তি-মন্ত্রের পরশমণিতে নর্তকী বাসবদত্তার জীবনের গতি-পরিবর্তন ও মহৎ রূপান্তর—নৃত্য ও সংগীতের ভাষায় এক চিত্রকল্পময় সৌন্দর্য পরিণতিতে পৌঁছেছে। নৃত্য-রচনায় গতানুগতিক ধারা বর্জন করে শ্রীমতী শংকর সম্পূর্ণ শংকর কল্পনায় আপন কারিগরী কুশলতা মিশিয়ে যে সর্বাঙ্গসুন্দর 'কোরিওগ্র্যাফী' সৃষ্টি করেছেন তা শুধু কলারসিকদের আনন্দের উৎসই হয়ে ওঠেনি—নৃত্যশিল্পীদের অনুধাবনেরও বস্তু। কথাকলির পাশ্চাড়ী, ভারতনাট্যমের জাতিস্বরম্ বর্ণম, তিল্লানা, নাগা মালাবারের লোকনৃত্য-র ক্ষণস্পর্শ আছে—কিন্তু তা বিশেষ দেশ ও কালের গণ্ডীমুক্ত হয়ে শ্রীমতী শংকরের নিজস্ব ভাষা হয়ে উঠেছে—প্রয়োগকুশলতার সার্থক শিল্পকর্মে। নাম-ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং অমলাশংকর। নটীজীবনের বিলাসমত্ত চঞ্চল্য, লাস্যময়ীর কটাক্ষ, হাসি—উপগুপ্ত সন্দর্শনে বিস্ময়, আহত সম্মানবোধ, চিত্ত-বিক্ষিপ্ততার দ্বন্দ্ব ও পরিশেষে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত চরণে আত্মনিবেদনের আকুতি ও বেদনা। নৃত্য ও অভিনয়ে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। উপগুপ্তের প্রশান্তি, বাসবদত্তার উদ্দাম-আমন্ত্রণ-বিনীত প্রত্যাখ্যান এবং ক্ষমাসুন্দর করুণায় বাসবদত্তার দুঃখলগ্নে ত্রাণকর্তার ভূমিকা সংযত সুন্দর হয়ে উঠেছে সাধন গুপ্তের মর্যাদাপূর্ণ অভিনয়ে। টীমওয়ার্ক এমন ত্রুটিহীন যে বিশেষ কোনো শিল্পীর কৃতিত্ব উল্লেখ করা কঠিন। তবে বিভিন্ন নৃত্যে মমতাশংকর ও চম্পক জৈনের স্বাভাবিক সুষমা ও সুষ্ঠু গতি-বিন্যাস আপন যোগ্যতায় দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন রবীন দাস। তার সঙ্গে উপযুক্ত সহযোগিতা করেন শম্ভু মুখোপাধ্যায়, সৌমেন দে ও গোপেশ্বর দত্ত। কখনও শুদ্ধকোষ, কখনও পটদীপ, ভৈরবী, বাহার, দরবারী কানাড়া ও লোক-সংগীতের অবতারণায় নাটকের সঞ্চারী-ভাবকে অব্যাহত রেখে, বিভিন্ন মুডকে সুরের ভাষায় ব্যক্ত করার কৃতিত্ব সংগীত-শিল্পীদের অবশ্যপ্রাপ্য। সজ্জা-পরিকল্পনায় শংকর ঘরাণার উচ্চমান সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছেন শ্রীমতী শংকর। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। প্রধান অতিথি শ্রীঅশোক সরকার। উভয়েই শ্রীমতী শংকরের সাধনাকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান।

নজরুল ছাড়া গীত

বিদ্রোহী কবি নজরুল অগ্নিমন্ত্রের উপাসকই শুধু ছিলেন না। তাঁর অজস্র প্রেমসংগীতে ও ভক্তিগীতিতে বাংলার সংগীতজগৎ সমৃদ্ধ এ তথ্যও সংগীতরসিক মাত্রেরই জানা। কিন্তু এই বহুমুখী প্রতিভার আর এক দিকে আলোকপাত করেছে সম্প্রতি হিন্দুস্থান ডিস্কে প্রকাশিত জপমালা ঘোষের দুটি ছড়া গান—'প্রজাপতি, প্রজাপতি' ও 'নামতা-পাঠ'।

শিল্পীর সতেজ কণ্ঠের আনন্দ ও উচ্ছলতায় বয়োজ্যেষ্ঠরাও যেন মুহূর্তের জন্যও শিশুচিত্তের আনন্দ খুঁজে পান। দুটি গানই উপভোগ্য।

সি, এল, টি'র 'রামায়ণ'

কলামন্দিরে সংগীত কলা-মন্দির নিবেদিত সি এল টি সভ্যদের 'রামায়ণ' গত সপ্তাহের সাংস্কৃতিক জগতের এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান। বালকৃষ্ণ মেননের নৃত্য-পরিকল্পনা এবং তিমিরবরণের সংগীত পরিচালনায় এক অপূর্ব আলেখ্য সি এল টি রামায়ণ মহাকাব্যের বিরাট পটভূমিকার প্রতি যথাযোগ্য আলোকপাত করেছে। কল্পনার ঠাস-বুনোনির মত নৃত্য ও গীতের সমন্বয়ে টীন-এজার্সদের গোষ্ঠীগত সাফল্যের জন্য সমর চট্টোপাধ্যায়, অসিত মিত্র এবং সি এল টির অন্যান্য কর্মী সুধীজনের অকৃত্রিম সাধুবাদ অর্জন করেছেন।

শিশুচক্র ক্লাবের রবীন্দ্র-জয়ন্তী

উত্তর কলিকাতার 'শিশুচক্র' ক্লাব সম্প্রতি তাদের কালাচাঁদ সান্ন্যাল লেনের সীমিত মঞ্চে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন—এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে। আবৃত্তিতে ছিলেন দেবাশীষ, দিব্য-দীপ, ঈপ্সিতা, রাজসী, বেবী, ঋতুরঙ্গ নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন শ্রাবন্তী, তপস্যা, ডালিয়া, অঞ্জনা। 'সূক্ষ্ম-বিচার', 'মাঞ্জা-চুরী' নাটকের শিল্পী এঁরাও। প্রতিটি অনুষ্ঠান দেখবার মত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমণীন্দ্র-কুমার ঘোষ।

নৃত্যভারতীর নৃত্যের আসর

অভিজাত প্রতিষ্ঠান 'নৃত্যভারতী' পরিবেশিত নৃত্য-গীত ও নাট্যের এক পরিচ্ছন্ন সুন্দর অনুষ্ঠান শিক্ষানৈপুণ্যে এবং পরিবেশনা-শৃংখলায় দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মনোজ মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সংগীত দিয়ে। নৃত্যই ছিল অনুষ্ঠানসূচীর প্রকাশ-মাধ্যম—গায়ত্রী ও মধুমিতা 'কৃষকদম্পতি' নৃত্যের পরই আমেরিকান শিক্ষার্থী কুমারী বেথ হিলিকস-এর সারিনৃত্য। অতঃপর পট-পরিবর্তন ঘটল 'ঋতুবিচিত্রা'র 'নমঃ নমঃ হে বৈরাগী' নৃত্যে। নৃত্যাংশে ছিলেন পারভিন, মধুমিতা, মধুচ্ছন্দা, চিত্রাঙ্গদা, রত্না, মধুশ্রী, অনুরাধা, মউ, শর্মিষ্ঠা, সংগীতা, সর্বাণী, সুদেষ্ণা, সুজাতা ও দীপশ্রী ঠাকুর। সংগীতে ছিলেন ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়, সীমা, অর্চনা সরকার। 'বাকি আমি কিছু রাখব না' গানের নৃত্যে ইন্দ্রাণী দাস ও 'নূপুর বেজে যায় রিনিঝিনি'-তে রূপদান করেন আলো দাস ও রীণা খান্না। 'ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে' ও 'ফাগুন লেগেছে' সংগীত-সংগতে নৃত্য পরিবেশন করেন সাধ্বীশ্রী, সাথী, নার্গিস, পারভিন ও মঞ্জুশ্রী টেগোর। গীতিশ্রী গায়ত্রী দেবের পরিচালনায় যন্ত্র-সংগীতে অংশগ্রহণ করেন বিজয় গায়েন, কৃষ্ণা পাল, সুকন্যা চৌধুরী, শিপ্রা, শুভা রায় ও মায়া মুখোপাধ্যায়। বিশেষ আকর্ষণ ছিল দ্বিতীয় দিনে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় থিয়েটার ইউনিটের 'চার দেওয়াল' নাটক।

•

সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের দশম বার্ষিক নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা বালিগঞ্জস্থিত তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক প্রতিযোগী এবছর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

যে সকল প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের নাম দেওয়া হল :

খেয়াল—কৈকেয়ী রায়, সীমা চ্যাটার্জি, শীলা চ্যাটার্জি, ইরা মুখার্জি, সঞ্জয় দাশগুপ্ত। ভজন—উমা পাল, স্বপ্না মুখার্জি, কেয়া রায়, ইরা মুখার্জি, বিপুল দে। রাগপ্রধান—কৈকেয়ী রায়, অনুরাধা সেনগুপ্ত, শীলা চ্যাটার্জি, ইরা মুখার্জি, জগন্নাথ মুখার্জি। রবীন্দ্র-সংগীত—অপর্ণা সেন, শাশ্বতী গুপ্ত, উজ্জয়িনী সেন, তমালিকা গুহ, প্রশান্ত সরকার। আধুনিক—অম্বিকা ব্যানার্জি, অনুরাধা সেনগুপ্ত, লেখা ঘোষ, ইরা মুখার্জি, অভিজিৎ মজুমদার। শ্যামা-সংগীত—রীতা বসু, বাণী সমাদ্দার, কেয়া রায়, হাসি মল্লিক, রথীন মুখার্জি। পল্লীসংগীত—অম্বিকা ব্যানার্জি, চন্দনা মুখার্জি, মালবিকা ব্যানার্জি, রীণা মণ্ডল অধিকারী, রথীন মুখার্জি। অতুলপ্রসাদের গান—অম্বিকা ব্যানার্জি, চন্দনা মুখার্জি, কেয়া রায়, রীণা মণ্ডল অধিকারী, দীপংকর চৌধুরী। হিমাংশুগীতি — মালবিকা ব্যানার্জি, তমালিকা গুহ। গীটার—পুতুল ভট্টাচার্য, আরতি ঘোষ, শিবনাথ সাহা।

—চিত্রাঙ্গদা

কাবেরী বোস সত্যজিৎ রায়ের অরণ্যের দিন-রাত্রি এবং অন্যান্য কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করছেন। ফটো ঃঅমৃত

হিন্দী ছবির নির্মাতাদের প্রতি

সবিনয় নিবেদন

এই যে, আপনারা এখনও পর্যন্ত উদ্ভট কল্পনালোকে বিচরণ না করে আপনাদের চারপাশের বাস্তব কঠিন পৃথিবীর দিকে নজর দিন। জানি, চলচ্চিত্র হচ্ছে প্রধানতঃ দর্শকের প্রমোদোপকরণ; নইলে রাজ্য সরকার এর উপর প্রমোদ-কর ধার্য করবেন কেন? প্রমোদোপকরণের অর্থ হচ্ছে মনকে খুশী করবার জিনিস। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, দর্শকচিত্তবিনোদনের মাত্র একটিই পথ নেই। কেউ গান শুনতে ভালোবাসে, কেউ নাচ দেখতে; আবার কেউ সুষ্ঠু অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়। এমন লোকেরও অভাব নেই, যিনি নাচ-গান-অভিনয়—তিনটিই সমান ভালোবাসেন। কিন্তু এই গূঢ় তত্ত্বটি আপনাদের নিশ্চয়ই জানা নেই: মানুষ সবচেয়ে ভালোবাসে নিজেকে দেখতে এবং এই সংগে সে নিজের জীবনে যা পারনি, যা হতে পারেনি, ছবির মধ্যে তারই মতো লোককে তা পেতে, তাই হতে দেখতে। জানবেন, প্রতিটি মানুষই স্বপ্নবিলাসী। আমরা দেখেছি, যে নিত্য ভিক্ষা করে খায়, সেও লটারীর টিকিট কেটে লাখ টাকা পাবার স্বপ্ন দেখে। তাই আপনাদের কাহিনীর চরিত্রগুলিকে বাস্তবের পট-ভূমিকায় রাখুন: জীবনসংগ্রামে তাদের অধিকাংশই যখন পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়, আপনাদের কাহিনীর নায়ক বা নায়িকাকে তখন বারংবার পরাজয়েও ভেঙে পড়তে না দিয়ে সংগ্রামী বীরের মতো শেষ পর্যন্ত জয়মাল্য পরান। কিন্তু দেখবেন, এই চূড়ান্ত জয় যেন বিশ্বাস্যভাবে আসে: সার্থকতার মধ্যেও যেন যুক্তি থাকে। আপনাদের নায়ক-নায়িকা নিশ্চয়ই আনন্দে গান গাইবে; এমন কি, দুঃখের গান গাওয়াও তাদের পক্ষে অন্যায়ভাবে মারাত্মক হবে না। এবং তেমন তেমন পরিস্থিতি হলে তারা নেচেও আনন্দ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সব সময়েই লক্ষ্য রাখবেন, কোনো পরিস্থিতিই যেন সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম না করে। আরও লক্ষ্য রাখবেন, কাহিনীটির মধ্যে যেন একটি দ্বন্দ্বের ভাব সুপরিস্ফুট হয়—দৈবে ও পুরুষাকারে দ্বন্দ্ব, বাস্তবে আদর্শবোধে দ্বন্দ্ব, সংস্কারে ও সত্যবোধে দ্বন্দ্ব। কাহিনীর মধ্যে এই দ্বন্দ্বই, এই সংঘাতই দর্শকের কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখে—কে হারে, কে জেতে। এবং আর একটি জিনিস সব থেকে বেশী স্মরণ রাখবেন যে, চলচ্চিত্র আজ একটি বিশিষ্ট শিল্পকলা বলে সর্বজনস্বীকৃত এবং প্রতিটি শিল্পকলারই লক্ষ্য রসসৃষ্টি। কাজেই আপনারা কোনো কাহিনীকে যখন চিত্রায়িত করবেন, তখন সেই চিত্র দর্শকমনে রসসৃষ্টি করে স্পন্দন জাগাতে সক্ষম হচ্ছে কিনা, সেইটি হবে আপনাদের প্রধান লক্ষ্য।

জানবেন, দর্শকচিত্তে অভীষ্ট রসসৃষ্টি করতে পারার মধ্যেই নিহিত আছে তার প্রমোদোপকরণ যোগানোর প্রচেষ্টার যথার্থ সার্থকতা।

হিন্দী চলচ্চিত্র জগতেও বাঙালী ও বাঙলা পাঠকের অভাব নেই—এটা জানা আছে বলেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

চিত্র সমালোচনা

বোম্বাই থেকে আর একখানি চকমকে রঙীন ছবি

আঠারো রীল দীর্ঘ ইস্টম্যান কলার ছবিটিতে একটি গান আছে, যার একটি লাইন হচ্ছে : আয়া সাওন ঝুমকে। অনুমান করছি, ছবিটির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এর নির্মাতারা এই বিশেষ লাইনটিকে পছন্দ করেছিলেন ছবিটির নামকরণের জন্যে। এই বিশেষ নামে ছবিটিকে চিহ্নিত করবার একমাত্র কারণ হচ্ছে, ছবির প্রায় মধ্যপথে নায়ক জয়শংকরের জীবনে চতুর্দিক থেকে বিপদের ধাক্কা নেমে আসে। কিন্তু সে বোধ হয় জানত, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের সূর্য। তাই সমস্ত বিপদকে সে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত জীবনের দাবা-খেলায় জয়লাভের আশায়; কারণ সে যে শিবের বরপুত্র—জয়শংকর!

ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শচীন ভৌমিক। ছবির আরম্ভেই দেখা গেল জনৈকের মদ্যপান ও নারী-ধর্ষণের চেষ্টা। ছবিটিতে বহু চরিত্রের সমাবেশ, বহুতর ঘটনার আমদানী। মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশুনায়ককে সন্তানের মতো পালন করলেন যে নিঃসন্তান দম্পতি, তাঁদের ঘরে পরে জন্মাল একটি মেয়ে। এরা যখন পূর্ণ যুবক-যুবতী—দাদা ও বোন, তখন একদিকে বোনের হয়েছে বিয়ে, আর দাদার ঘটল এক সুন্দরীর সংগে পরিচয়। সেই সুন্দরীর আছে কলেজে-পড়া ছোট বোন ও স্কুলে-পড়া ছোট ভাই। হাসি-নাচ-গানের ভিতর দিয়ে নায়ক-নায়িকা যখন প্রেমের পথে পরস্পরের সম্মুখীন, তখনই নায়কের মোটরের তলায় পড়ে নায়িকার পিতা প্রাণ হারালেন। নায়িকার কলেজে-পড়া ছোট বোন মালা তারই কলেজ-বন্ধু দীপকের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পৃথিবী অন্ধকার দেখতে লাগল। শিশুকাল থেকে একসংগে লালিতপালিত ভগ্নী সীতার স্বামী রাকেশ হোটেল-নর্তকী রীতার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে স্ত্রীর সংগে বিবাহ-

তপন সিংহ পরিচালিত সাগিনা মাহাতো চিত্রে স্বরূপ দত্ত। —ফটো : অমৃত

বিচ্ছেদের মতলব আঁটছেন। এবং ওই সংগে নায়ক প্রথম জানতে পারল, যাঁকে সে এতদিন পিতা বলে জেনে এসেছে, তিনি আসলে তার পালক-পিতা; সে হচ্ছে একটি কুড়োনো ছেলে। —একসংগে কি করে এতগুলি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে নায়ক জয়শংকর জয়যুক্ত হল, তাই নিয়েই কাহিনীর শেষাংশ রচিত।

কিন্তু ছবিকে দীর্ঘায়িত এবং বহু ভিন্ন রুচির দর্শকের মনোরঞ্জক করবার জন্যে এত অবাস্তব পরিস্থিতির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, অকারণে এত নাচগানের অবতারণা করা হয়েছে যে, প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, দর্শকমাত্রকেই চিত্রনির্মাতারা সুস্থ মস্তিষ্কবিশিষ্ট মানব বলে মনে করেন কিনা? আজও কি উদ্ভট কল্পনা পরিহার করবার দিন আসেনি?

অভিনয়ে আশা পারেখ, ধর্মেন্দ্র, নাজির হোসেন ও নিরুপা রায় আরতি: জয়শংকর, পালক-পিতা ও জয়শংকরের মা মায়ার ভূমিকায় তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। রাজেন্দ্রনাথ 'সাধুজরণ সুধ' নামে একটি হাসির চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে দর্শকসাধারণকে অজস্র হাসিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় রবীন্দ্র কাপুর, সুন্দর, লক্ষ্মীছায়া, নাজ, অরুণা ইরাণী প্রভৃতি সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে রঙীন চিত্রগ্রহণে ও দৃশ্যসংস্থাপনায় চমৎকার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিতে সাতটি গান আছে। তাদের মধ্যে প্রথম গান : নজর উয়ো যো দুশমন, সাথিয়া নহী মানা, ইয়ে লম্বা তো জলী রোশনীকে লিয়ে—এই গান তিনখানি রচনা, সুর এবং উপস্থাপনার দিক দিয়ে উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে।

ফিল্ম যুগ-এর রঙীন ছবি "আয়া সাওন ঝুমকে"র প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এর শিল্পীদের সু-অভিনয়।

স্টুডিও থেকে

'তের বছর বাদে কলকাতায় এলাম, দেখছি পরিবর্তন হয়েছে অনেক।'

—কি রকম।

'এই, বাইরের পরিবর্তনটাই বেশী চোখে পড়ছে।'

—স্বাভাবিক।

'তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি—দিন দিন বাঙালীরা চিপ এন্টারটেনমেন্টের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। হিন্দী ছবিতো বাজার ছেয়ে ফেলেছে।'

—কেন, মাদ্রাজে কি হিন্দী ছবির পপুলারিটি কম? ওখানের স্টুডিওতেই তো হিন্দী ছবি তৈরি হচ্ছে।

'চাহিদা আছে ঠিকই, তবে পপুলারিটি বলতে যা বোঝায় তা নেই। বরং লক্ষ্য করেছি বাংলা ছবির ব্যাপারে এদের একটা প্রেস্টিজগত সংস্কার আছে। বাংলা ছবি গেলেই তাই সব লোক ভেঙে পড়ে, আর সত্যজিৎবাবুর ছবি হলে তো কথাই নেই...'

কথা হচ্ছিল সত্যজিৎবাবুরই নতুন ছবি 'অরণ্যের দিন-রাত্রি'র চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী কাবেরী বোসের সঙ্গে। শুনলাম—আপনি নিজেই এখন সত্যজিৎবাবুর ছবিতে অভিনয় করছেন।

কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করায় জানালেন 'সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে কাজ করছি কাজেই বিশেষ উত্তেজনা আছে। ছবি করব আবার এটাই ভাবিনি, তাই সেদিক থেকেও উত্তেজনা আছে।'

'রাইকমল', 'শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক' বা 'শ্যামলী'র কাবেরী বোসকে এখন বেশ ভারী মনে হচ্ছিল। শুধু দেহে নয় মনেও। তের-চোদ্দ বছর বাদে আবার ফিরে এলেন লাইমলাইটে। এর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে অনেক।

কাঁচবাবু (সুবোধ মিত্র) প্রথম যখন 'রাইকমলে' কাবেরী বোসকে নেবেন ঠিক করলেন তখন বাড়ীতে ঠাকুরমা-ঠাকুরদার আপত্তি ছিল ভীষণ, কিন্তু, মা-ই সব ঠিক করে ফেললেন। ও'রই কথায় সিনেমা লাইনে এলেন শ্রীমতী বোস। নাচ-গান অভিনয়ে স্কুলে তার জুড়ি ছিল না। প্রথম ছবিই হিট। তারপর একে একে ছবির সংখ্যা বাড়ল। বাড়ল সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা।

ছেদ পড়ল অকস্মাৎ। প্রজাপতির ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে চলে যেতে হল সুদূরে দক্ষিণ মাদ্রাজে। কাবেরী বোস সেইদিন থেকে লিজেন্ড হয়েই ছিলেন। গতবার প্রতিবারের মত ছুটিতে বেড়াতে এসে আবার জড়িয়ে পড়লেন ছবির জগতে।

অভিনয় করার ইচ্ছে মনে মনে ছিল। প্রযোজক অসীম দত্ত উসকে দিলেন একটু। উনি এসেই প্রস্তাব জানিয়েছিলেন অভিনয় করার জন্য। তারপর স্ক্রিপট শুনে রাজী। সত্যজিৎবাবুও চরিত্র অনুযায়ী অভিনেত্রী খুঁজে পেলেন।

—বুঝলেন, রাজী তো হলুম কিন্তু আমার দেহটাই বড় বিশ্রী। এখন যা দেখছেন তার ডবল ছিলুম। কি করি, ঐ ফিগারে তো ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে চলবে না।'

হাসলুম একটু।

শ্রীমতী বোস বলে চলেছেন—'সত্যজিৎবাবু তো বললেন হ্যাঁ-হ্যাঁ এতেই চলবে। কিন্তু আমার মন তো মানে না। কুমড়ো পটাশের মত চেহারা নিয়ে সিনেমায় নামব তা হয় না। দুবেলা নাচতে শুরু করলুম।'

—হেসে উঠলেন শ্রীমতী বোস আবার।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন অফিস ফেরত ক্লান্ত শ্রীবোস। পরিচয় শেষে তিনিও কাছাকাছি এলেন, বাংলা দেশ, কলকাতা, টালিগঞ্জের স্টুডিও, বাংলা ছবি সব নিয়ে আলোচনা চলল অনেক। বুঝলাম আর পাঁচজনের মত কলকাতাকে ভালবাসেন দুজনেই—তাই ফিরে এসেছেন আবার।

'রাইকমলে'র সেই তিলক কাটা খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী ফিরে এসেছে আবার 'অরণ্যের দিন-রাত্রি'র মাঝে। অভিনয় করার ইচ্ছে এখনও পুরোপুরি। শুনলুম শ্রীদিলীপ মুখার্জী তাঁর নতুন ছবির স্ক্রিপট ইতিমধ্যে শুনিয়েছেন কাবেরী বোসকে। শ্রীমতী বোস রাজী হয়েছেন কিনা জানি না, তবে চরিত্র পছন্দ হলে রাজী না হবার কোন কারণ নেই।

নতুন করে নতুনভাবে আবার ফিরছেন উনি। নায়িকার অভাব এ'কে দিয়ে কতখানি মিটবে সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও শিল্পীর আগমন হিসাবে স্বাগত জানাতে আপত্তি নেই অবশ্যই।

ওঠবার সময় নমস্কারের প্রত্যুত্তরে শ্রীমতী বোস বলে উঠলেন—'পোলা স্মা'।—

কি বললেন?

'পোয়েটা বাড়ে।'

—বুঝতে পারলাম না কিছু। মুচকি হেসে বললেন—'বললাম, শুভেচ্ছা রইল আবার আসবেন।'

মনে পড়ল উনি তো মাদ্রাজে ছিলেন তেরো বছর। ভাষাটা রপ্ত করতে না পারুন, শিখেছেন কিছু।

আমিও জোরে হেসে বলে উঠলাম—'পোলা স্মা'।

এক ফুল দো মালি/ সাধনা এবং সঞ্জয়

মঞ্চাভিনয়

রঙমহলে মাসে একদিন করে অভিনীত হয় 'কথা কও'। আগামী ২৬ জুন এই মাসের ঐ দিনটি। এক খবরে জানা গেল, সম্পূর্ণভাবে নতুনভাবে সাজান হচ্ছে ঐ নাটকটি। এবং এখন থেকে 'কথা কও' নাটকে অংশগ্রহণ করবেন—হরিধন, অজিত চট্টো, মৃণাল, অমরনাথ, ইন্দ্রজিৎ, মানস, মিণ্টু, সুজিত, বাসুদেব, দীপক, সঞ্জয়, বামদেব, জিতেন, সন্ধ্যা দে, মঞ্জু, মমতা বন্দ্যোঃ, কমলা, ইন্দিরা ও বাসবী নন্দী। মাসের প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিন যথারীতি হাসির নাটক 'সেমসাইড' অভিনীত হবে। সেমসাইড-এর চরিত্রলিপিতে যথারীতি আছেন জহর রায়, হরিধন, সন্ধ্যা বন্দ্যো, অজিত চট্টো, মৃণাল, অমরনাথ, মিণ্টু, ইন্দ্রজিৎ, সুজিত, মানস, সমরজিৎ, কার্তিক, ইন্দিরা দে, বাসবী নন্দী ও মঞ্জু দেবী। 'সেমসাইড' এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গত ১৪ জুন নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট মঞ্চে শচীন ভট্টাচার্য রচিত 'সোনার হরিণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে 'মুখার্জি এণ্টারপ্রাইজের' কর্মীবৃন্দ। অভিনয়ের দিক থেকে নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন—রথীন ঘোষ, শ্যামল ভট্টাচার্য, ননী দেব এবং লক্ষ্মণ দাস। নাটকটির পরিচালনা করেন অজিত দে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথি ছিলেন শেলী সান্যাল। দলগত অভিনয়গুণে নাটকটি দর্শকদের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন দিলীপ ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন মুখার্জি, তপন চ্যাটার্জি, মমতা চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ মুখার্জি ও চপল ঘোষ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীঅসিত বক্সী।

অষ্টম বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে এস. বি. স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন বালিগঞ্জ শাখা, গত ১৬ জুন সন্ধ্যায় শ্রীশম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি মঞ্চস্থ হল 'স্টার থিয়েটারে'।

'গান্ধার' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি 'মুক্তাঙ্গনে' 'তারায় শোনে না' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। চাণক্য সেন রচিত এই অপূর্ব নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন অসিত মুখোপাধ্যায়। তিনটি চরিত্রে গীতা চক্রবর্তী, অচিন্ত্য চক্রবর্তী ও অসিত মুখোপাধ্যায় অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই নাটকের আর তিনজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী হোলেন শ্যামল মুখোপাধ্যায়, মলি মুখোপাধ্যায় ও সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাস্কর মিত্রের সংগীতনির্দেশনায় নাটকীয় মুহূর্তগুলো যথার্থভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। নাটকে একটি নৃত্যাদৃশ্যের পরিকল্পনা করেন সুরেশ দত্ত। তবে আলোক-সম্পাতে হয়তো নাটকের এগিয়ে যাওয়ার গতিকে ব্যাহত করেছে।

বারমা শেল রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পী সদস্যরা সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে 'কর্ণার্জুন' নাটক পরিবেশন করেছেন। নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনায় এক অভিনব রীতি প্রযুক্ত হয়। কয়েকটি ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেন মলয় মুখার্জি (কর্ণ) দুর্গাদাস ব্যানার্জি (দুর্যোধন), প্রতিমা পাল (নিয়তি), হরেন বিশ্বাস, বিকাশ চ্যাটার্জি, গীতা দে, বাসন্তী চ্যাটার্জি, সুতপা ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের আরবান ড্রেনেজ রিক্রিয়েশন ক্লাব সম্প্রতি 'বিশ্বরূপায়' ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্যঘন নাটক 'এক পেয়ালা কফি' মঞ্চস্থ করেছেন। সত্যেন ব্যানার্জি নির্দেশিত এই

নিতাই পরিচালিত বন্ধন-এর একটি দৃশ্যে প্রশান্ত ও গীতাঞ্জলি।

ধীরেন দে, সত্যজিৎ রায় এবং মিসেস কপফ

নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন— সুনীল মণ্ডল, শ্যামেন্দ্র লাহিড়ী, তড়িৎ বসু, জগদীশ ধর, অসীম বোস, শৈলজা লাহিড়ী, জহর পোদ্দার, জয়শ্রী কর, প্রতিমা চক্রবর্তী, দীপালি ঘোষ, শচীনন্দন কুণ্ডু, তপন ঘোষ।

বিবিধ সংবাদ

বার্লিন উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীসত্যজিৎ রায় গত সোমবার ১৬ জুন জার্মানীর পথে রওনা হয়েছেন। ওঁর ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' প্রতিযোগিতা বিভাগে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হবে ছাব্বিশ তারিখে। শ্রীরায় ছাড়াও প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্ত, শ্রীঅসীম দত্ত, শ্রীমতী রায়, শিল্পী শ্রীরবি ঘোষ ও শ্রীতপেন চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। শ্রীরায়ের যাত্রার প্রাক্কালে রবিবার সন্ধ্যায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে জার্মান কনসালের স্ত্রী শ্রীমতী কপফ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বার্লিন উৎসবের সাফল্য কামনা করেন।

বারাণসীতে রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে ছয়দিনব্যাপী রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করা হল স্থানীয় থিওজফিক্যাল সোসাইটি হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী। জয়যাত্রা সব পেয়েছির আসর শিশুতীর্থ নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীতুফান রফাই-এর চিত্রপ্রদর্শনী। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় ডঃ অশোক গুপ্তের বাসভবনে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ভারতকলা ভবনের ডিরেক্টর পদ্মশ্রী রায়কৃষ্ণ দাস। মোট ১৮টি রচনা প্রদর্শিত হয়। কাগজ কেটে ক্যানভাসের উপর পেস্ট করে কোলাজ জাতীয় এ চিত্রপ্রদর্শনীটি দর্শনীয় হয়েছিল। অপর এক সংস্থা বঙ্গীয় সমাজের রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করে বাঙালীটোলা ইন্টার কলেজ প্রাঙ্গণে। প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন নাট্যকার শ্রীদিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষে অনুষ্ঠিত কর্ণকুন্তি সংবাদ নৃত্যনাট্যে লিলি মৌলিক ও কল্পনা চক্রবর্তীর নৃত্য প্রশংসনীয় হয়।

দক্ষিণ হাওড়া রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন বাণী-নিকেতন হল-এ গত ১৪, ১৫ ও ১৬ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দিনে সঙ্গীতে কমলা বসু, মায়া সেন, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা মৈত্র, কীর্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপর্ণা চৌধুরী, সাগর সেন, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অশোক ভট্টাচার্য ও শিল্প শিবিরের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। 'ইসকাস' ও অভ্যুদয়-গোষ্ঠী 'বদনাম' ও পুরাতন ভৃত্য অভিনয় করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ পালাগান ভানুসিংহের পদাবলী গেয়ে শোনান। যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন ভি, বালসারা ও সাঁত্রাগাছি মিউজিক একাডেমি।

সম্প্রতি বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন মঞ্চে তপন চক্রবর্তীর প্রযোজনায় এবং শ্রীকমলেশ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় যাদুকর-চক্রের সদস্য ঐন্দ্রজালিক শিশিরকুমার রায় যাদু-বিদ্যা প্রদর্শন করলেন। যাদুকর রায় ভারতের মন্দির, শান্তির দূত, পুতুল ঘরের রাণী, বিবি গেল কোথায়, বালিকার বিচার, দুধের রহস্য, প্রমুখ খেলাগুলি সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বিখ্যাত যাদু সাংবাদিক সুশীল চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

গত ৮ জুন রবিবার রাত্রে পশ্চিম-বঙ্গ নাট্যসংরক্ষণ সমিতির আহ্বানে প্রখ্যাত অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক শোকসভা লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তা তাঁর অভিনয় শিল্পপ্রতিভার ও জীবনের নানা তথ্য পরিবেশন করেন। সভাপতি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে স্বর্গত গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচিতির কথা উল্লেখ করে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সভান্তে, উপস্থিত সকলে দু'মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন।

ভারতীয় শিল্পী পরিষদের অনবদ্য মঞ্চসৃষ্টি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত অতীনলাল পরিকল্পিত 'শ্রীচৈতন্য' নৃত্য-নাট্যের আগামী অভিনয় ৬ জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে।

সু-পরিচিত প্রেস ফটোগ্রাফার শ্রীরমা-দাস বসু দি টমসন ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ পেয়ে ইউ কে যাত্রা করছেন। ভারতে সর্ব-প্রথম তিনিই এই সম্মানের অধিকারী হলেন। ৬৮।৬৯এর ইয়ার বুক অফ দি ওয়ারল্ডতে শ্রীবসু গৃহীত দুটি ছবি সন্নিবেশিত হয়েছে।

গত ১৪ জুন বিকালে 'তরুণের ডাক' সংস্থার উদ্যোগে মধ্য হাওড়া রবীন্দ্র সাংস্কৃতিক সম্মেলন খুরুট ষষ্ঠীতলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুমিত্রা সেন, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই রায়চৌধুরী, রবি রায়, সুশীল দে, পাপিয়া দাস, মালা দাস, সুমিতা শেঠ অংশ নিয়ে দর্শকদের প্রভূত আনন্দদান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরি-চালনা করলেন দেবীপ্রসাদ সেনশর্মা, রবীন ঘোষ, ইন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

গত ১৪ জুন পাতিপুকুর সরকারী আবাসিকবৃন্দের সহযোগিতায় একটি মধুর রবীন্দ্র সন্ধ্যা উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রামচন্দ্র নন্দী। ঐদিন ঋণা লাহিড়ী ও সুনন্দা সাহার পরিচালনায় "ঋতুরঙ্গ" নৃত্যনাট্যটি বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সংগীত ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন, শিশির সরকার, শংকর ঘোষ, সমরেশ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন লাহিড়ী, অশোক মণ্ডল, প্রদীপ রায়, ঝুমুর বসু, শান্তি দাস, স্বপন ঘোষ, শিখা চক্রবর্তী, দীপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়।

বহুরূপীর

বর্বর বাঁশী

এবং সম্মিলিত

অভিনয়ে

রক্তকরবী

চলমান প্রতিটি দৃশ্যের আলোয় নিজেকে যখন চেনা যায়, বোঝা যায়, আত্মোপলব্ধির সেই দীপ্ত আবেগেই বাঁশির মতো বেজে উঠি আমরা। কিন্তু চিরন্তন এই সত্য আজকের প্রশ্নমথিত সমাজের পটভূমিকায় বিপর্যস্ত, আমরা জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত; আত্মশক্তির ওপরে বোধহয় আস্থাহীন। তাই বাঁশিতে আজ যে সুর, তাতে আছে অবক্ষয়ের বেদনা, ক্ষোভ আর পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার গ্লানি। বাঁশি বুঝি তাই হয়ে উঠেছে বর্বর। সম্প্রতি নিউ এম্পায়ারে 'বহুরূপীর' নতুন নাটক 'বর্বর বাঁশি' দেখতে দেখতে মনের গভীরে এই কথা-গুলোই এক আশ্চর্য দ্যোতনা আনছিল আর সেই সূত্রেই 'রক্তকরবী', 'রাজা' আর 'রাজা ওয়াদিপাউসে'র পর কেন 'বর্বর বাঁশি'র উপস্থাপনা, তার তাৎপর্য স্পষ্ট মনে হয়েছে 'বহুরূপী'র সুদীর্ঘ নাট্যচর্চায় যে জীবনানুসন্ধান, জীবনের মৌলধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তা বোধহয় 'বর্বর বাঁশি'তে বিপর্যস্ত হয়নি। এ নাটকে যে জীবন বিবৃত, তা বড় বাস্তব, বলিষ্ঠ; এ জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা কোথায় আছি; বুঝতে পারি কি এক অর্থহীন নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে লালিত হচ্ছে আমাদের প্রতিটি অনুভব; উপলব্ধি করতে পারি আমাদের বিবেকের দংশন কি তীব্র, অনুতাপের জ্বালা কি তীক্ষ্ণ এবং গভীর। এ জীবনকে চিনতে হবে, এ জীবনকে উত্তীর্ণ করে যাওয়ার জন্যই। নীতিশ সেনের 'বর্বর বাঁশি' এই দিক দিয়ে কি আমাদের জীবন সম্বন্ধে সার্থক শিল্পবোধে আমাদের উন্নীত করে না?

একটি ক্ষয়িষ্ণু নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে আজকের সমাজে যে মূল্যহানি ঘটছে তার আভাস স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে এ নাটকে। এই পরিবারে আছেন বৃদ্ধ পিতা, যিনি চলতি সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচক, আছে বিবাহিত মেয়ে যে প্রেমের তিলক কপালে পরে সুন্দর একটা জীবন চাইতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আছে বড় ছেলে, কারখানার শ্রমিক হয়েও যার কর্মোদ্যম প্রতিমুহূর্তেই এই ঘুণধরা সমাজব্যবস্থাকে আঘাত দিয়ে নতুন এক সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াসে উদ্বেল হোতে চেয়েছে, আছে মেজো ও ছোট ছেলে— একজন হয়েছে গুণ্ডা আর একজন জীবিকা অর্জনের জন্য নেমেছে শঠতার পথে। এই নিয়েই একটা সংসার। বলা যেতে পারে সবাই এরা জ্বলছে সবাই এরা অস্থির। যে যেভাবে আলোর সন্ধান চাইছে তা সে হাতের কাছে পাচ্ছে না। তাই ক্ষোভের এতো উত্তাল ঝড়।

কেন এমন হোল এর উত্তর আভাসে দিয়েছেন নাট্যকার। তিনি সম্ভবতঃ বলতে চান যে আজকের সমাজব্যবস্থায় যে বড় রকম একটা ঘুণ ধরেছে তার মূলে রয়েছে সমাজের ওপর তলায় যে সব মানুষের বাস তারা। এরাই অন্যদের মনকে বিষাক্ত করে সুস্থ জীবনযাত্রার স্বপ্ন মন থেকে মুছে দিতে চায়। অবশ্য একথা ঠিক, নবনাট্য আন্দোলনের নাটকে একথা প্রায়ই সোচ্চারে ধ্বনিত হয়ে থাকে এবং সেদিক দিয়ে 'বর্বর বাঁশি' কোন নতুন কথা বলেনি; কিন্তু উপস্থাপনায়, চরিত্রের সংঘাতে এ বক্তব্য যথার্থ নাটকের মেজাজ এনেছে, শুধুমাত্র বক্তৃতায় পর্যবসিত হয়নি।

কথা উঠেছে বস্তীর পরিবেশে গড়ে ওঠা একটি পরিবারের অসুস্থ পরিবেশে সবাই যেখানে প্রায় অসৎ, সেখানে পরিচয়ের (বড়ো ছেলে) মতো সৎ ছেলে থাকা না কি অসম্ভব। কিন্তু সত্যি কি তাই? চারপাশে যেখানে চেয়ে না পাওয়ার অন্ধকার, যেখানে পথ চলতে গিয়ে সবাই হোঁচট খাচ্ছে, সেখানে এদের সামনে 'পরিচয়' হোল আদর্শ। এ যদি সৎ না হয়ে গড়ে উঠতো তাহলে অনসূয়ার (মেয়ে) বাঁচা সম্ভব হোতনা, অচিনের (মেজো ছেলে) দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা সম্ভব হোতনা, মৃত্যুঞ্জয়ের (পিতা) মৃত্যু ঘটতো অনেক আগে। সবাই এরা 'পরিচয়'কে বিশ্বাস করে এই জন্য যে সে জানে কাজের মধ্য দিয়ে স্বপ্ন দেখতে, আন্তরিকতা দিয়ে জীবনসংগ্রামকে নতুন অর্থ দিতে। এমন একটি কর্মী মানুষের মর্মান্তিক বিলাপ, 'আমরা কি শুধু হেরে যাবো' তা কি 'মেলোড্রামার দাবীটুকুই' শুধু পূর্ণ করেছে, আর কিছু নয়?

নাটকটির মধ্যে যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা আছে, একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে তা একটি পরিপূর্ণ বোধ থেকেই এসেছে। স্বীকার করি এর মধ্যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার, অসামাজিক প্রেম, গুণ্ডামি, ছিনতাই, ধর্মের নামে ছলনা সবই আছে এই নাটকে, কিন্তু তাই বলে সব মিলে এটা কি একটা হিন্দী সিনেমার গল্পের মতো মনে হয়? যে সমাজজীবনকে তুলে ধরা হয়েছে নাটকে তাকেই মঞ্চের আলোয় মূর্ত করে তোলার জন্য আপাতদৃষ্টিতে 'অগোছাল' ঘটনার অবতারণা। তবে দু-একটি জিনিস বিসদৃশ লেগেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দিয়ে দেশের চলতি সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রূপ করতে গিয়ে দু'একটি সংলাপ শ্রুতিকটু লেগেছে, ওটা পরিহার করলে নাটকের বক্তব্য ব্যাহত হোতনা। ছেলের পকেট থেকে সিগারেট নিতে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব একটা অর্থবহ বলে মনে হয়নি। প্রতিমার মিসেস মালহোত্রায় রূপান্তরও বোধহয় স্বাভাবিকতার সীমা কিছুটা লঙ্ঘন করেছে।

এবার নাট্যপ্রযোজনার দিকে ফিরে আসি। 'বহুরূপী'র প্রতিটি নাটকই প্রয়োগ পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে, এই প্রযোজনায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শ্রীশম্ভু মিত্রের অসাধারণ নির্দেশনায় নাটকে এসেছে দুরন্ত গতি; তাঁর শিল্প-

বোধ যে কত্যে সমন্বিত তা চিহ্নিত হয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে এ নাটকে। কয়েক দু-একটি মুহূর্ত সৃষ্টিতে তাঁর প্রয়োগ নৈপুণ্য আমাদের বিস্মিত করেছে, শেষ দৃশ্যের কম্পোজিশন ভোলা যায় না। খালেদ চৌধুরীর দৃশ্যসজ্জায় [illegible] সংসারের দীনতা আরো স্পষ্ট হয়েছে, একটি দৃশ্যের মধ্যে এতো স্বাভাবিকতা আনা সচরাচর চোখে পড়ে না। আলোকসম্পাতে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ ঘোষ আশ্চর্য সুন্দরভাবে কয়েকটি মুহূর্তের অপূর্ব নাটকীয় সংঘাতকে বাঙ্ময় করে তুলতে পেরেছেন।

নাটকটিতে অভিনয় করেছেন 'বহুরূপী'র সব নতুন শিল্পীরা, কিন্তু অভিনয়ে 'বহুরূপী'র পূর্ব গৌরব *নিঃসন্দেহে* অটুট থেকেছে। 'পরিচয়' চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন কালীপ্রসাদ ঘোষ; এমন সংযত চরিত্রচিত্রন রীতিমতো বিস্ময়ের বস্তু। 'মৃত্যুঞ্জয়' চরিত্রে শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় নিজের অভিনয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন। দুরন্ত আত্ম-বিশ্বাসে 'অচিন' চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। অঞ্জলি সেন 'অনসূয়া'র মর্মবেদনাকে আরো গভীরতর করে তুলেছেন তাঁর অভিনয়ে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর চক্রবর্তী; বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন সরকার, শিখা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, উৎপল ভট্টাচার্য [illegible] ঘোষ।

●

রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যে 'রক্তকরবী' এক অনন্য সৃষ্টি। পূর্বে এ নাটক গীতি-ময়তায় পরিবেশিত হোত বলে সাধারণ লোকের একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে রবীন্দ্রনাটকে কোন ঘাতপ্রতিঘাত নেই, মঞ্চ-রূপায়ণে এর কোন মাধুর্য নেই, শুধু পড়াতেই আনন্দ পাওয়া যায়। কালের নাট্যআন্দোলনের ধারার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা নিশ্চই জানেন বহুরূপী 'রক্তকরবী' নাটকের অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করেছেন এবং সেই সূত্রে বাংলা নাট্যপ্রযোজনার ইতিহাসে এনেছেন রূপান্তর। 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে এঁরা আবিষ্কার করেছেন আধুনিক জীবনের নিগূঢ় সংঘাত, জটিলতা আর মর্মবেদনা। অর্থের দিক দিয়ে তাই 'রক্তকরবী' যেমন নতুন প্রাণের প্রতীক, আন্দোলনের ইতিহাস বিচারে তা আবার নবনাট্যের সার্থক নির্দেশক।

সম্প্রতি 'বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' আয়োজিত বাংলা নাট্যমঞ্চ সংস্থানের সাহায্যার্থে 'কলামন্দিরে' 'রক্তকরবীর' এক সম্মিলিত অভিনয় পরিবেশিত হোল। এধরনের অভিনয় পূর্বে 'নাট্যমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা সমিতির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবে একবার হয়েছে। সম্মিলিত অভিনয়ে অংশ নেন 'বহুরূপী', 'নান্দীকার' আর 'রূপকারে'র শিল্পীরা। এর আগে নবীন নাট্যকর্মীরা একত্রে সম্মিলিত কোন অভিনয় করেছেন বলে জানা যায় না। বাংলা নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে এর যে একটা সুগভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। সম্মিলিত অভিনয়ের জন্য এ নাটকের নির্বাচনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অহমিকা আর নিজের সংস্কার দিয়ে গড়ে তোলা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে চিরন্তন প্রাণের প্রতিমা নন্দিনীর উচ্ছলতার কাছে এসে পৌঁছনোর মধ্যে যে জীবনবেগ আছে, যে মহত্তর আলোয় উত্তরণের আবেগ আছে, তা 'রক্তকরবী'র মতো আর কোন্ নাটকে এতো স্পষ্ট হোতে পেরেছে? আর তা ছাড়া নাট্যআন্দোলনে যে নাটকের অভিনয় একটা নতুন বোধের জন্ম দিয়েছে, নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করার মতো একটা দুরূহ কাজ করতে গিয়ে এ নাটকের প্রযোজনাই তো সর্বদিক দিয়ে শুভ।
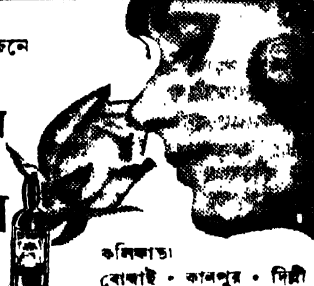
'রক্তকরবী' নাটকের সম্মিলিত অভিনয় কিরকম হবে সে সম্পর্কে প্রথমে মনে একটা আশঙ্কাই ছিল। কিন্তু নাটক দেখার পর তা যে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে, একথা নিঃসংকোচে বলতে পারি। নাটকটির অন্তর্নিহিত ভাবমাধুর্য শ্রীশম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় মঞ্চে এতো নিটোলভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যে তা থেকে নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে একটি মুহূর্তের জন্যও সরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। সর্বাসম্মত এই দুঃসাধ্য নাটকের স্বাভাবিক শিল্পসম্মত প্রযোজনায় শ্রীমিত্র নিঃসন্দেহে তাঁর অসাধারণত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জা ও তাপস সেনের আলোকসম্পাতও 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চ-রূপায়ণকে এক নতুন শিল্পসুষমায় বিভূষিত করতে পেরেছে।

'নন্দিনী'র ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় 'রক্তকরবী' নাটকের এক অমূল্য সম্পদ সে কথা নাট্যানুরাগীদের কাছে প্রতিষ্ঠিত। চরিত্রের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করার নজীর শ্রীমতী মিত্র যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তা নিঃসন্দেহে এক গবেষণার বিষয়। নন্দিনীর ছন্দোময় উপলব্ধির গভীরতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাণ-ধর্মকে রূপ দিতে চেয়েছেন, শ্রীমতী মিত্রের চরিত্রচিত্রন তাকেই মানসিক অনুভবলোক থেকে দর্শকের অনুভবের সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর চলা, কথা বলার ভঙ্গিমা প্রতিটি মুহূর্তে দর্শকের মনকে যক্ষপুরীর প্রাণহীনতা সম্পর্কে সচেতন করেছে আর সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়েছে পৌষের বিহ্বল মেলায় যেখানে প্রাণস্পন্দিত জীবনের লাবণ্য টলমল করছে। জালে ঘেরা রাজার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা আর সংঘাত শ্রীশম্ভু মিত্র তাঁর অসাধারণ বাচন ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। শুধু কথা বলে একটি দুরূহ চরিত্রকে দর্শকের কাছে নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট করে তোলার নজীর খুব বেশী চোখে পড়ে না। এবিষয়ে শ্রীমিত্র আজো বোধহয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফাগুলাল' একটি স্বাভাবিক এবং সার্থক চরিত্রচিত্রন, তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, এ ভূমিকায় অভিনয়েও তা প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীসবিতাব্রত দত্ত 'বিশু-পাগলে'র জীবন-যন্ত্রণা যেমন সংলাপে মূর্ত করে তুলেছেন, তেমনই তাঁর গানে নন্দিনীর সেই 'অগম পারের দূতী'র আভাস সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। আগের তুলনায় 'অধ্যাপক' চরিত্রে শ্রীগঙ্গাপদ বসুকে একটু নিষ্প্রভ বলে মনে হোল। অভিনয়ের দিক থেকে কুমার রায়ের 'গোঁসাই' আর দেবতোষ ঘোষের 'সর্দার'ও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন : সন্তোষ দত্ত, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সরকার, আরতি মৈত্র, কেয়া চক্রবর্তী, শিখা মুখোপাধ্যায়, সমীর চক্রবর্তী, হিমাংশু চ্যাটার্জি, পবিত্র সরকার, দেবব্রত মুখো-পাধ্যায়, বলাই গুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি বসু, অমিল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করেছেন কুমারী উইলমা রুডলফ

খেলার কথা

রোম অলিম্পিক সম্রাজ্ঞী উইলমা

ক্ষেত্রনাথ রায়

শৈশবের ভগ্ন স্বাস্থ্য মানুষের পরবর্তী জীবনে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয় না, তার নজির অনেক আছে। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কয়েক ধরনের কাজ দীর্ঘকাল চালিয়েও নেওয়া যায়। কিন্তু খেলাধুলার আসরে ভগ্নস্বাস্থ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায়। কারণ দৈহিক শক্তিই সেখানে সাফল্যলাভের প্রধান উৎস। আজ যে শিশুটি পঙ্গু অথবা যে হামেশাই অসুখে ভুগছে, ভবিষ্যত জীবনে সে যে বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় হবে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে কেউ সাহস পান কি? তবে বাস্তবক্ষেত্রে তাও যে সম্ভব, তার নজিরের কখনও অভাব হবে না।

আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত মহিলা এ্যাথলীট শ্রীমতী উইলমা রুডলফ এ ব্যাপারে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। টেনেসির সেণ্ট বেথলেম শহরে ১৯৪০ সালের ২৩শে জুন এক দুঃস্থ নিগ্রো পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন পিতার ১৬শ সন্তান। তাঁর বাবা দু'বার বিয়ে করেছিলেন। মাত্র চার বছর বয়সে উইলমা পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাঁ পায়ের চলৎশক্তি হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েন। আরও দুশ্চিন্তার কারণ হল আহারে তাঁর ভাল রুচি ছিল না। মাতৃস্নেহের অনেকগুলি ভাগীদার থাকলেও উইলমা ছিলেন তাঁর মায়ের নয়নের মণি। মেয়ের জন্যে তিনি কি কঠোর পরিশ্রম এবং দুঃখ-কষ্ট বরণ না করেছেন! চিকিৎসার জন্যে ৪৫ মাইল দূরের এক ক্লিনিকে তাঁকে উইলমার সঙ্গে যেতে হত। চিকিৎসকদের নির্দেশ সত্ত্বেও আর্থিক অনটনের কারণে তাঁদের পক্ষে প্রতিদিন ক্লিনিকে যাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে তাঁরা দু' বছর ক্লিনিকে হাজিরা দিয়েছিলেন। তার বেশী সম্ভব হল না। তখন বাড়িতেই উইলমার পঙ্গু পায়ে 'ম্যাসেজ' করার ব্যবস্থা করতে হল। এই কাজের ভার নিলেন তাঁর মায়ের সঙ্গে তিন বোন। আট বছর বয়সে উইলমা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে এক বিশেষ ধরনের জুতো পায়ে হাঁটার অভ্যাস করতে লাগলেন। সেবা-শুশ্রূষাতে আরও তিনটে বছর কেটে গেল। তারপর একদিন এই দুঃস্থ পরিবারের দিকে ঈশ্বর মুখ তুলে তাকালেন। ১১ বছর বয়সে উইলমা তাঁর পঙ্গু পা সহজ অবস্থায় ফিরে পেয়ে লেখাপড়া এবং বাস্কেটবল খেলায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সেরা বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসাবে উইলমার নাম সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বাস্কেটবল খেলা দেখেই

ইউনিভার্সিটি ডিপ্লোমা হাতে উইলমা

রোম অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণপদক বিজয়িনী উইলমা রুডলফ

অলিম্পিক গেমসের একই বছরে মেয়েদের বিভাগে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে স্প্রিণ্টে 'ডাবল' খেতাব জয় করেছেন তাঁকে নিয়ে চারজন মহিলা এ্যাথলীট। তাঁর পূর্বসূরী হলেন : ১৯৪৮ সালে ফেনী ব্ল্যাংকার্স কোয়েন (নেদারল্যাণ্ডস), ১৯৫২ সালে মার্জোরি জ্যাকসন (অস্ট্রেলিয়া) এবং ১৯৫৬ সালে বেটি কাথবার্ট (অস্ট্রেলিয়া)।

১৯৫৮ সাল থেকে আবার তাঁর জীবনে দুঃসময় নেমে আসে—অসুস্থতা এবং পায়ের যন্ত্রণায় তিনি কাবু হয়ে পড়েন। এমনকি ১৯৬০ সালের অলিম্পিক গেমসের কয়েকমাস আগেও টনসিল অপারেশনের ফলে তাঁকে বেশ কিছুদিন বিছানা নিতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সকল রকমের প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে রোম অলিম্পিক গেমসে তিনটি স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন—তাঁর নতুন নামকরণ হল 'রোম-অলিম্পিক সম্রাজ্ঞী'।

আর বিবাহিত জীবনে হলেন শ্রীমতী উইলমা ওয়ার্ড—বর্তমানে তিন সন্তানের জননী।

উইলমার বিশ্ব রেকর্ড

১০০ মিটার : সময় ১১·২ সেঃ
জুলাই ১৯, ১৯৬১

২০০ মিটার : সময় ২২·৯ সেঃ
জুলাই ৯, ১৯৬০

উইলমার বিশেষ সম্মান লাভ

তিনিই আমেরিকার পক্ষে সর্বপ্রথম ইতালীর ক্রিস্টফার কলম্বাস সোসাইটি প্রদত্ত "ক্রিস্টফার কলম্বাস এওয়ার্ড" লাভ করেন।

টেনেসী স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তাঁকে দুবার 'আমেরিকার সেরা মহিলা এ্যাথলীট' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

প্রখ্যাত কোচ এডওয়ার্ড টেম্পল ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এই মেয়েই একদিন এ্যাথলেটিকসে জগৎজোড়া নাম করবে। এডওয়ার্ড টেম্পলের কাছেই উইলমার এ্যাথলেটিকসে হাতেখড়ি এবং তাঁর স্নেহ, শিক্ষা ও উপদেশই উইলমাকে বিশ্বখ্যাতি লাভে প্রভূত সাহায্য করেছে।

উইলমা তাঁর মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিক গেমসে অংশ গ্রহণ করেন। অলিম্পিক গেমসে তাঁর এই প্রথম যোগদানের বছরে তিনি মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। ২০০ মিটার দৌড়ের প্রথম রাউণ্ডেই তিনি বিদায় নেন। তবে তিনি মেলবোর্ন থেকে একেবারে শুধু হাতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেননি—রিলে রেসে আমেরিকার তৃতীয় স্থান লাভের সূত্রে তিনিও একটি ব্রোঞ্জ পদক পান।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক গেমস উইলমা রুডলফের অসাধারণ সাফল্যে অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উইলমা তিনটি স্বর্ণপদক জয় করেন—১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড় এবং ৪×১০০ মিটার রিলেতে। ১০০ মিটার দৌড়ে তিনি দু'বার অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছিলেন—সেমি-ফাইনালে ১১·৩ সেকেণ্ড সময়ে এবং ফাইনালে ১১·০ সেকেণ্ড সময়ে। ২০০ মিটার দৌড়ের হিটে তিনি ২৩·২ সেকেণ্ড সময়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করলেও ফাইনালে বেশী সময় (২৪·০ সেকেণ্ড) নিয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

'ক্রিস্টফার কলম্বাস এ্যাওয়ার্ড' পাওয়ার পরই উইলমা সোজা ছুটে এসেছেন তাঁর প্রিয় বাস্কেটবল খেলা দেখতে। তাঁর ডান দিকে ইতালীর কনসুল জেনারেল।

১৯৬৯ সালের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের **আসর :** ডানদিকে বিজয়ী বরিস স্পাস্কি এবং বাঁদিকে তিগ্রান পেত্রোসিয়ান। স্পাস্কি **২** পয়েন্টের ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে বিশ্ব খেতাব পেয়েছেন।

দর্শক

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা

মস্কোর ভ্যারাইটি থিয়েটারে ১৯৬৯ সালের ব্যক্তিগত বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে বরিস স্পাস্কি ২ পয়েন্টের ব্যবধানে গত ৬ বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান তিগ্রান পেত্রোসিয়ানকে পরাজিত করে বিশ্ব খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। স্পাস্কি দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় এই প্রথম বিশ্ব খেতাব পেলেন। ১৯৬৬ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে পেত্রোসিয়ানের কাছে তিনি ২ পয়েন্টেরই ব্যবধানে হেরেছিলেন। সুতরাং তাঁর এবারের জয়লাভ পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ বলা যায়।

সাংবাদিক স্পাস্কির বর্তমান বয়স ৩২ বছর। তিনি তাঁর মাত্র ৯ বছর বয়সে লেনিনগ্রাদের পাইওনিয়ার ক্লাবে দাবা খেলায় হাতেখড়ি নিয়েছিলেন এবং ১৯ বছরের আন্তর্জাতিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'গ্র্যাণ্ডমাস্টার' খেতাব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রতি তৃতীয় অর্থাৎ দু' বছর বাদ দিয়ে বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার আসর বসে। তিগ্রান পেত্রোসিয়ান উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬৩ ও ১৯৬৬) বিশ্ব খেতাব জয়ের সূত্রে ৬ বছর ধরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। পেত্রোসিয়ান ১৯৬৩ সালে মিখাইল বোটভিনিককে ৩ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করে বিশ্ব খেতাব পেয়েছিলেন।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মোট গেম সংখ্যা ২৪টি। পয়েন্টের ভিত্তিতে এখানে জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। খেলার পয়েন্ট বণ্টনের নিয়মে—বিজয়ী খেলোয়াড় ১ পয়েন্ট এবং অমীমাংসিত খেলায় উভয় খেলোয়াড় ½ পয়েন্ট করে পেয়ে থাকেন। ২৪টি গেম যে খেলতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই। তার কম খেলায় জয়লাভের নির্দিষ্টসংখ্যক পয়েন্ট যদি কোন খেলোয়াড় সর্বাগ্রে সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে বাকি খেলাগুলি বাতিল হয়ে যায়। যেমন এবার ২৩টি খেলায় জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়ার ফলে ২৪নং খেলার আর প্রয়োজন হয়নি। প্রতিযোগিতায় খেতাব জয়লাভের ব্যাপারে নির্দিষ্টসংখ্যক পয়েন্টের প্রয়োজন এইভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে : চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়ের বেলায় ১২ পয়েন্ট এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষেত্রে ১২½ পয়েন্ট সর্বাগ্রে পেতে হবে। চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় আর একটা বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন। যেমন ২৪টা গেম খেলার পরও যদি উভয় খেলোয়াড়ের পয়েন্ট সংখ্যা সমান দাঁড়ায় তাহলে সেক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়কেই পুনরায় বিশ্ব খেতাব বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

১৯৬৯ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ২৪টি খেলার প্রয়োজন হয়নি, ২৩টি খেলায় জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। বরিস স্পাস্কি ৬টি এবং তিগ্রান পেত্রোসিয়ান ৪টি খেলায় জয়ী হন। বাকি ১৩টি খেলা ড্র যায়। চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে স্পাস্কি যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে খেতাব জয়ী হয়েছেন। প্রথম খেলায় পেত্রোসিয়ান জয়ী হয়ে ১ পয়েন্টে এগিয়ে যান। ২য় এবং ৩য় খেলা ড্র যাওয়াতে পেত্রোসিয়ানের ১ পয়েন্টের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। ৪র্থ এবং ৫ম খেলায় স্পাস্কি জয়ী হয়ে খেলার ফলাফল প্রথমে সমান (২—২ পয়েন্ট) করে ৩—২ পয়েন্টে অগ্রগামী হন। স্পাস্কি ৮ম খেলায় জয়ী হয়ে তাঁর ১ পয়েন্টের অগ্রগতি বাড়িয়ে ২ পয়েন্ট করেন। তাঁর এই ২ পয়েন্টের ব্যবধান ৯ম ও ১০ম গেমে কমে গিয়ে ১ পয়েন্ট দাঁড়ায়। ৯ম গেমে পেত্রোসিয়ান জয়ী হন এবং ১০ম গেম ড্র যায়। খেলার এই অবস্থায় স্পাস্কির ৫½ পয়েন্ট এবং পেত্রোসিয়ানের ৪½ দাঁড়ায়। ১১তম খেলায় পেত্রোসিয়ান জয়ী হলে দুজনেরই সমান পয়েন্ট (৫½—৫½) দাঁড়াল। ১১তম খেলা থেকে ১৬তম খেলা পর্যন্ত দুজনের পয়েন্ট সমান ছিল। এর মধ্যে ৫টা খেলা (১২তম থেকে ১৬তম) ড্র যায়। ১৭তম খেলায় স্পাস্কি জয়ী হয়ে খেলার গতি সম্পূর্ণ স্বপক্ষে টেনে আনেন। তখন খেলার অবস্থা ছিল—স্পাস্কির ৯ পয়েন্ট এবং পেত্রোসিয়ানের ৮ পয়েন্ট। স্পাস্কি ১৯তম খেলায় জয়ী হয়ে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়বার ২ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে যান। পেত্রোসিয়ান ২০তম খেলায় জয়ী হলে স্পাস্কির ২ পয়েন্টের অগ্রগতি কমে ১ পয়েন্টে দাঁড়ায়। কিন্তু পরবর্তী তিনটি খেলায় (২১—২৩) স্পাস্কি ২ পয়েন্টের

ব্যবধানে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব খেতাব জয়ী হন। ২৩টি খেলার মধ্যে পেত্রোসিয়ান মাত্র প্রথম তিনটি খেলায় ১ পয়েন্টের ব্যবধানে অগ্রগামী হয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের প্রথম খেলায় চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়ের পক্ষে জয়লাভ কি তাঁর খেতাব হাতছাড়া করার পূর্বাভাস? ১৯৬৩ সালে মিখাইল বোটভিন্নিক এবং ১৯৬৯ সালে তিগ্রান পেত্রোসিয়ানের ক্ষেত্রে তা ঘটেছে।

এখানে উল্লেখ্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় (১৯৪৮-৬৯) একমাত্র রাশিয়ার খেলোয়াড়রাই বিশ্ব খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। এই সময়ে মিখাইল বোটভিন্নিক ৩ বার (১৯৪৮, ১৯৫৮ ও ১৯৬১) বিশ্ব খেতাব জয়ের সূত্রে দীর্ঘ ১৩ বছর বিশ্ব খেতাব হাতে রেখেছিলেন।

চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের চূড়ান্ত ফলাফল

আরম্ভ এপ্রিল ১৪ : শেষ জুন ১৭

খেলোয়াড়	জয়	হার	ড্র	পয়েন্ট
স্প্যাস্কি	৬	৪	১৩	১২½
পেত্রোসিয়ান	৪	৬	১৩	১০½

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েষ্ট ইন্ডিজ

ইংল্যান্ড : ৪১৩ রান (জিওফ বয়কট ১২৮, টম গ্রেভনী ৭৫, জন এডরিচ ৫৮ এবং বেসিল ডি'ওলিভিয়েরা ৫৭ রান। শেফার্ড ১০৪ রানে ৫ উইকেট)

ও ১২ রান (কোন উইকেট না পড়ে)

ওয়েষ্ট ইন্ডিজ : ১৪৭ রান (ক্লাইভ লয়েড ৩২ এবং কেরু ৩১ রান। স্নো ৫৪ রানে ৪ এবং ব্রাউন ৩৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৭৫ রান (ফ্রেডারিক্স ৬৪, বুচার ৪৮ এবং সোবার্স ৪৮ রান। ব্রাউন ৫৯ রানে ৩, স্নো ৭৬ রানে ২ এবং নাইট ১৫ রানে ২ উইকেট)

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ডট্রাফোর্ড মাঠে ইংল্যান্ড বনাম ওয়েষ্ট ইন্ডিজের ১৫তম টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ১০ উইকেটে জয়ী হয়েছে। ওল্ডট্রাফোর্ড মাঠে এই দুই দেশের ৭টি টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল দাঁড়াল : ইংল্যান্ডের জয় ৩, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ২ এবং খেলা ড্র ২। ইংল্যান্ডের মাটিতে এই দুই দেশের এই নিয়ে ২৯টি টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ১৩, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ৯ এবং খেলা ড্র ৭। এপর্যন্ত ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে যে ৫৬টি টেস্ট ম্যাচ হয়েছে তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ১৯, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ১৬ এবং খেলা ড্র ২১। ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে ইংল্যান্ড ৩টে বেশী খেলায় জয়ী হয়েছে। বর্তমান ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের জয়ের সংখ্যা স্পর্শ করা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আর মাত্র ২টো টেস্ট ম্যাচ খেলতে বাকি।

বেসিল ডি'ওলিভেরা

ইংল্যান্ড দলের নব-নির্বাচিত অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ খুবই পয়মন্ত। তিনি টসে জয়ী হন এবং স্বদেশকে জয়যুক্ত করেন।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ২৬১ রান সংগ্রহ করেছিল। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৯০ (কোন উইকেট না পড়ে) এবং চা-পানের সময় ১৭৪ (২ উইকেটে)। ইংল্যান্ডের প্রথম উইকেট জুটিতে জিওফ বয়কট এবং জন এডরিচ দলের ১১২ রান সংগ্রহ করে দলের ভিত খুবই শক্ত করেন। বয়কট চা-পানের পর দিবসের বল বাউন্ডারীতে পাঠিয়ে তাঁর শত রান পূর্ণ করেন। তাঁর এই শত রানে ছিল ১৫টা বাউন্ডারী। সেঞ্চুরী করতে তাঁর ২৮৫ মিনিট সময় লাগে। টেস্ট ক্রিকেটে বয়কট এই নিয়ে ৫টা সেঞ্চুরী করলেন—ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে তাঁর

জিওফ বয়কট

ডেভিড ব্রাউন

এই প্রথম সেঞ্চুরী। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে বয়কট (১২৮ রান) এবং গ্রেভনী ১৪২ মিনিট খেলে দলের ১২৮ তুলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের ১০ মিনিট আগে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ৪১৩ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ড তার বাকি ৭ উইকেটে এই দিন ১৫২ রান সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৪০০ রান উঠেছিল ৯½ ঘণ্টার খেলায়। এই দিন লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৩৩৪ (৫ উইকেটে)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তারা ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১০৪ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় 'ফলো অন' থেকে অব্যাহতি পেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরও ১১০ রানের প্রয়োজন হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের সূচনাতেই বিপর্যয় ঘটে যায়—ইংল্যান্ডের বোলার জন স্নো খেলার সূচনা করেন এবং তাঁর প্রথম বল খেলতে গিয়ে ওপনিং ব্যাটসম্যান ন্যাটো খেলোয়াড় রে ফ্রেডারিক্স ফাস্ট স্লিপে টম গ্রেভনীর হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে আউট হন। মাত্র দুটো ওভারের খেলাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুটো উইকেট পড়ে যায়। রানের ঘরে জমা পড়ে মাত্র ৫ রান।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংস ১৪৭ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৫ মিনিট ব্যাট করে তাদের বাকি ৪ উইকেটের বিনিময়ে ৪৩ রান তুলেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষপর্যন্ত 'ফলো অন' করার হীনতা থেকে অব্যাহতি পায়নি—ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৪১৩ রান থেকে ২৬৬ রানের পিছনে পড়ে তারা দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। এই দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ২১৫ রান সংগ্রহ করে

তাদের হারানো সুনাম কিছুটা ফিরিয়ে আনে। ইংল্যান্ডের একমাত্র অশ্বেতকায় টেস্ট খেলোয়াড় বেসিল ডি'ওলিভিয়েরাকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসে এক সময় বল করতে দেওয়া হয়। তাঁর বল দেওয়ার প্রাক্কালে সারা মাঠের দর্শকেরা তাঁকে বিপুলভাবে হর্ষধ্বনি দিয়ে অভিনন্দিত করেন—ইংল্যান্ডের রানীর জন্মদিনে তাঁর 'ও-বি-ই' খেতাব পাওয়া উপলক্ষে এই অভিনন্দন।

চতুর্থ দিনে বৃষ্টির ফলে নির্দিষ্ট পুরো সময় খেলা সম্ভব হয়নি—মাত্র ৯০ মিনিট খেলা হয়েছিল। সকাল দিকে খেলা আরম্ভের ৪৫ মিনিট পর বৃষ্টি নেমে খেলোয়াড়দের মাঠ থেকে প্যাভিলিয়নে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ছিল ২৩২ (৪ উইকেটে)—অর্থাৎ পূর্বদিনের ২১৫ রানের (৪ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ১৭ রান যোগ হয়েছে—ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৪১৩ রানের থেকে তখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৪ রানের পিছনে পড়ে। এইদিনের লাঞ্চের আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩টে উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের সময় স্কোর ছিল ২৫৮ রান (৭ উইকেটে)। লাঞ্চের পর আর খেলা হয়নি। খেলার এই অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে আরও ৮ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ছিল ৩টে উইকেট।

পঞ্চমদিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংস ২৭৫ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ডের জন স্নো এবং ডেভিড ব্রাউন মাত্র ২ রানের বিনিময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ ৩টে উইকেট পান। ইংল্যান্ড খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১০ রান সংগ্রহ করতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৫ ওভারের খেলায় ১২ রান তুলে ১০ উইকেটে জয়ী হয়। হোল্ডারের বলে জন এড্রিচ উপর্যুপরি দুটো বাউণ্ডারী করলে ইংল্যান্ডের জয়সূচক রান উঠে যায়। ইংল্যান্ডের ডেভিড ব্রাউন ৯৮ রানে ৭টা এবং জন স্নো ১৩০ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের জয়লাভের পথ প্রশস্থ করেছিলেন।

নগদ পুরস্কার

ওল্ড ট্রাফোর্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দিয়ে প্রথম পুরস্কার (১০০ স্টার্লিং পাউণ্ড) লাভ করেছেন ইংল্যান্ডের দুজন খেলোয়াড়—ব্যাটিংয়ে জিওফ বয়কট (প্রথম ইনিংসে ১২৮ রান) এবং বোলিংয়ে ফাস্ট বোলার ডেভিড ব্রাউন (৯৮ রানে ৭টা উইকেট—৩৯ রানে ৪ এবং ৫৯ রানে ৩ উইকেট)।

দ্বিতীয় পুরস্কার (৫০ স্টার্লিং পাউণ্ড) পেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রয় ফ্রেডারিক্স (দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৪ রান) এবং মিডিয়াম পেস বোলার জন শেফার্ড (প্রথম ইনিংসে ১০৪ রানে ৫ উইকেট)।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৬৯ সালের ৮৩তম উইম্বলেডন আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা গত ২৩শে জুন থেকে আরম্ভ হয়েছে। যোগদানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার করে চিরাচরিত প্রথায় খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকা সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই বাছাই তালিকায় পুরুষদের সিংগলস বিভাগে শীর্ষস্থান পেয়েছেন গত বছরের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান প্রখ্যাত পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) এবং মহিলাদের সিংগলস বিভাগে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া)। পুরুষদের সিংগলস বিভাগের বাছাই তালিকায় যে ১৬ জন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ৭ জন (১, ২, ৪, ৬, ৯, ১১ ও ১৩নং), আমেরিকার ৫ জন, দক্ষিণ আফ্রিকার ২ জন, নেদারল্যান্ডসের ১ জন (৩নং) এবং স্পেনের ১ জন খেলোয়াড় আছেন।

মহিলাদের সিংগলস খেলার বাছাই তালিকায় আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং দ্বিতীয় স্থান পাওয়াতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। শ্রীমতী কিং এই প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৬৬-৬৮) সিংগলস খেতাব পেয়েছেন। গত বছর সিংগলস খেতাব ছাড়াও মহিলাদের ডাবলস খেতাব পান। এ বছর তাঁর খেলায় কিছুটা ভাটা পড়েছে। তবে তাঁর অনুরাগী মহলের জোর গলায় বলবার মুখ আছে যে, বাছাই তালিকায় কোন স্থান না পেলেও শ্রীমতী কিংয়ের কোনই আসে-যায় না। ১৯৬২ সালে তিনি তাঁর কুমারী জীবনে (তখন তিনি বিলি জিন মোফিট) বাছাই তালিকায় কোন স্থান না পেয়েও প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ১নং বাছাই খেলোয়াড় কুমারী মার্গারেট স্মিথকে (বর্তমানে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট) পরাজিত করে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৯৩ বছরের (১৮৭৭-১৯৬৯) ইতিহাসে একজন অবাছাই খেলোয়াড়ের কাছে প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই ১নং বাছাই খেলোয়াড়ের পরাজয়ের দ্বিতীয় নজির নেই। অবাছাই খেলোয়াড় হিসাবে আন্তর্জাতিক টেনিস আসরে এরকম অঘটন তিনি আরও কয়েকবার ঘটিয়েছেন। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী কিং বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন—উপর্যুপরি ৩ বার সিংগলস খেতাব জয় (১৯৬৬-৬৮), ডাবলস খেতাব জয় ৫ বার (১৯৬১-৬২, ১৯৬৫, ১৯৬৭-৬৮), মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় ১ বার (১৯৬৭) এবং একই বছরে তিনটি খেতাব জয় ১ বার (১৯৬৭)।

টেনিস খেলার পণ্ডিতমহল এবং লণ্ডনের টেনিস খেলার বুকিরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, রড লেভার পুরুষদের সিংগলস খেতাব এবং অস্ট্রেলিয়ার টেনিস সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট মহিলাদের সিংগলস খেতাব পাবেন। ইতিপূর্বে রড লেভার তাঁর অপেশাদার খেলোয়াড়-জীবনে উপর্যুপরি ৪ বার (১৯৫৯-৬২) উইম্বলেডনের সিংগলস ফাইনালে উঠে উপর্যুপরি ২ বার (১৯৬১-৬২) সিংগলস খেতাব জয়ী হয়েছেন এবং পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে গত বছর সিংগলস খেতাব পেয়েছেন। ১৯৬২ সালে বিশ্বের চারটি প্রধান টেনিস প্রতিযোগিতায় (অস্ট্রেলিয়া, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান) পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে রড লেভার দুর্লভ 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়ী হন। এ বছরও তাঁর এই 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তিনি ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ সিংগলস খেতাব হস্তগত করেছেন; বাকি আছে উইম্বলেডন এবং আমেরিকান খেতাব। অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্টও এ বছর 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়ের অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছেন—তাঁরও বাকি শুধু উইম্বলেডন এবং আমেরিকান সিংগলস খেতাব জয়। কুমারী জীবনে (মার্গারেট স্মিথ নামে) তিনি ২ বার (১৯৬৩ ও ১৯৬৫ সালে) সিংগলস খেতাব পান এবং ২ বার অল্পের জন্যে 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম' খেতাব হাতছাড়া করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ
১ম খণ্ড

১১ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 18th July 1969. শুক্রবার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৭৬ 40 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীশৈলেন সাহা

নববর্ষ সংখ্যা

৫ই আষাঢ়-এর অমৃতে বাঁব হকের চিঠিটা পড়লাম। তাঁর সঙ্গে আমিও একমত। খুব স্বাভাবিক তাঁর বক্তব্যের আচরণ। অপূর্ব হয়েছে নববর্ষ সংখ্যা অমৃত। সুন্দর পরিকল্পনার জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের গল্প ছেপে খুবই ভাল কাজ করেছেন। একালের পাঠকরা জগদীশ গুপ্তের লেখার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত। অধিকাংশ লেখকের গল্পই সুনির্বাচিত হয়েছে। সংখ্যাটি বাঁধিয়ে রাখার মতো। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্তত আলোচনার ভার শক্তিমান পরিণত সাহিত্যজ্ঞানসম্পন্ন লেখকের উপর অর্পিত হওয়া উচিত ছিল।

পরিশেষে একটি ব্যাপারে অমৃতের একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি। এ যুগের সার্থক গাল্পিকদের তালিকায় ঠিক ভারসাম্য রক্ষা হয়নি যেন। কয়েকজন শক্তিমান তরুণতর সাহিত্যিকও বাদ পড়েছেন। নববর্ষ সংখ্যা অমৃতের মতো কোন ছোটগল্প সংকলনে তাঁরা বাদ পড়েছেন—এটা ভাবতেই পারা যায় না।

এসব ত্রুটি সত্ত্বেও ঐ সংখ্যাটির জন্য আপনারা ধন্যবাদার্হ। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রইলো ওটা।

কমল দত্ত চৌধুরী
শিলং—৪।

বেতারশ্রুতি ও ফলশ্রুতি

'ফল' অর্থে ফলশ্রুতি শব্দের ভুল প্রয়োগ সম্পর্কে শ্রবণক যে আপত্তি তুলেছেন তা যথাযথ। কিন্তু এই ভুল সম্ভবত কয়েক যুগ ধরেই হয়ে আসছে এবং অনেক বাঘা বাঘা সাহিত্যিকদের রচনাতেও 'ফল' অর্থে ফলশ্রুতি প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁদের দেখে সাধারণ লোকও এখন এই নতুন অর্থ গ্রহণ করে নিয়েছেন। বস্তুত অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে ফলশ্রুতি শব্দের বিকল্প অর্থই অথবা প্রচলিত অর্থই দাঁড়িয়েছে 'ফল'। এখন আর যুক্তিতর্ক দিয়ে এর পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব কিনা সন্দেহ। অর্থের এইরূপ পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যেমন, 'অপর্যাপ্ত' মানে 'পর্যাপ্ত নয়'। কিন্তু বর্তমানে 'অপর্যাপ্ত' মানে হচ্ছে পর্যাপ্তের চেয়ে বেশী। অর্থের এইরকম প্রসারকে ভাষার অলংকার বলে মেনে নেওয়া হয়। 'ফলশ্রুতি' শব্দের ভ্রমাত্মক প্রয়োগেও বোধহয় অলংকার হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। সান্ত্বনা হিসেবে শব্দটির ব্যুৎপত্তি এইরকম মনে করা যেতে পারে—ফলশ্রুতি অর্থাৎ শ্রুতির ফল, পুণ্যফল শ্রবণে শ্রোতার যে পুণ্যফল অর্জিত হয় সেই ফল।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
কলকাতা—১৯।

বেতারশ্রুতি

আমরা আপনাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত' নিয়মিতভাবে পড়ি। এতে যেসব বিষয়ে লেখা হয় প্রায় সমস্তই আমাদের ভাল লাগে। তার মধ্যে বেতারশ্রুতি বিভাগ আমাদের খুবই ভালো লাগে। অমৃত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ শুক্রবার সংখ্যায় বেতারশ্রুতি বিভাগ ৫৯৪ পৃষ্ঠায় অনুরোধের আসর সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে আমাদের মনে হয় তা খুবই সত্যি। আমরা এবং আমাদের স্থানীয় শ্রোতারা বহুবার কলিকাতা বেতার দপ্তরে চিঠি লিখে আমাদের প্রিয় গানগুলি বাজানোর অনুরোধ করেও কখনও আমাদের নাম রেডিওতে শুনতে পাইনি। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় 'যদুরহাটি' নামক স্থানের অনুরোধকারী শ্রোতাদের নাম প্রায় প্রত্যেক অনুরোধের আসরে শোনান হয়। যদুরহাটি স্থানটি নিশ্চয় কোন বিখ্যাত স্থান নয়। কারণ সে স্থানের নাম কখনও শুনিনি। সেখানকার রেডিও শ্রোতার সংখ্যা কত তাও জানি না। তবে আমাদের মনে হয় যে বহুদিন যাবৎ যদুরহাটির শ্রোতাদের নাম অনুরোধের আসরে এমনভাবে প্রচারিত হচ্ছে যে সেখানকার প্রত্যেক শ্রোতারই হয়ত নিজেদের নাম রেডিওতে শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের এই সৌভাগ্যে আমরাও খুব খুশী এবং যাঁর বা যাঁদের কৃপায় যদুরহাটির শ্রোতাদের এই সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে, তাঁকে বা তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বা তাঁরা যে কলকাতার বেতারদপ্তরের ক্ষমতাবান ব্যক্তি তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ প্রায় প্রত্যেক অনুরোধের আসরে যদুরহাটি শ্রোতাদের নাম রেডিওতে প্রচার করা যার তার কাজ নয়। আজ রাত্রে এইমাত্র অনুরোধের আসর শুনলাম। ভেবেছিলাম আজ হয়ত যদুরহাটির কোন শ্রোতার নাম নাও থাকতে পারে। কিন্তু দেখা গেল এ বিষয়ে অনুরোধের আসরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন নি এবং যথারীতি যদুরহাটি শ্রোতার নাম আজও শুনলাম। আপনি দয়া করে বেতার দপ্তরে খবর নিয়ে যদুরহাটি বিষয়ে আমাদের এই সকল কথা যদি সত্য বলে মনে করেন তবে আপনার বেতারশ্রুতি বিভাগে এ বিষয়ে আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করলে আমরা বাধিত হব। কোন যাদুকাঠির মহিমায় যদুরহাটি শ্রোতাদের নামের এত প্রচার হচ্ছে সে সম্বন্ধে দয়া করে কিছু লিখবেন।

আমরা একটা কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। তা এই যে আমরাও মনে করি "শ্রোতাদের অনুরোধের চিঠি পড়েই দেখা হয় না, অনুরোধের আসরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁর খুশিমতো গান নির্বাচন করে মনগড়া গানের তালিকা পেশ করেন—" (দ্রঃ পৃঃ ৫৯৪ বেতারশ্রুতি বিভাগ, অমৃত, শুক্রবার ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬)।

প্রশান্তকুমার বসু, মায়ারাণী বসু, শিপ্রা বসু, প্রদীপকুমার বসু, প্রণবকুমার বসু, সিন্দ্রি, বিহার।

কেয়াপাতার নৌকো

এর আগে 'পূর্ব-পার্বতী', 'আলো-ছায়াময়' প্রভৃতি প্রফুল্ল রায়ের অন্যান্য রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু 'কেয়াপাতার নৌকো' পড়তে পড়তে যে তৃপ্তিকর অনুভূতি, এরকম অনুভূতি এর আগে কখনও উপলব্ধি করিনি। ব্যক্তিগত জীবনে আমি প্রবাসী। সেই কোন শৈশবে যশোর-খুলনা ছেড়ে এসে এপারে চব্বিশ পরগণার এক প্রত্যন্ত গাঁয়ে কিছুদিনের জন্য থেকে রুজি ও রোজগারের ধান্দায় জীবনাবর্তের অজস্র সমস্যায় ভাসতে ভাসতে বিলাসপুরে এসে নোঙর ফেলেছি। মাঝে মাঝে কখনও বাংলাদেশে যাবার সময় বম্বে মেল বাংলাদেশের সীমানায় পড়লে মনে মনে যে একটা নস্‌টালজিক অনুভূতি আসে, প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' পড়তে পড়তে ঠিক সেইরকম একটা অনুভূতির গভীরে তলিয়ে যাই। যেন মনে মনে অনেকগুলো নিরালোক তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে শিহরিত কোন একটা প্রান্তরে পৌঁছে যাচ্ছি!

মনে পড়ে, শৈশবের সেই করুণ রঙীন দিনগুলির কথা। দেশভাগের কাল থেকে এই এতদিনকার রক্তের মধ্যে বয়ে বেড়ানো যুদ্ধের দামামা, মানুষের দুর্বলতা স্বেচ্ছাচারিতা, নগ্ন ব্যভিচার, মানুষকে নরকে ঠেলে দেওয়ার উত্তাল উল্লাস এসব কিছুই আর তখন মনে থাকে না। তখন বরং

হৃদয়ের প্রত্যন্তদেশ পর্যন্ত শিকড় বিস্তার করা শৈশবের হারিয়ে যাওয়া কতকগুলো রাগিণীর অব্যক্ত আনন্দ-যাতনাময় শত শত বুদ্বুদের ওঠানামায় মন আলোড়িত হয়। মনে করিয়ে দেয়, যশোর-খুলনার দিনগুলোর কথা।... মনে পড়ে শ্যামলা বাংলা মাকে। সেই আনন্দযজ্ঞে অনুপস্থিতি আমার অনেকদিনের মনবেদনার কারণ। প্রফুল্ল রায়ের লেখা পড়তে পড়তে হৃদয়ের কোন নিষিদ্ধ বাতায়ন খুলে চকিতে দেখা দিয়ে যায় সেই সব খেলার সাথী নাদাদু, শরৎডাক্তার, যুগলকাকা, কেনারাম বাগদী প্রভৃতির স্মৃতি। সেই মুচিপাড়ায় ভাসান গান, মুসলমানপাড়ায় লায়লি-মজনু, হিন্দুপাড়ার দোল-দুর্গোৎসব-চড়কপুজো, হরিঠাকুরের দাওয়ায় পাঁচালীর সুর, কীর্তন প্রভৃতির স্মৃতি। সেই আবেগমধুর সমর্পিত স্বপ্ন নরম আলোর মিষ্টি রোদ্দুর, গাছগাছালি, পাখীর কিচিরমিচির। মন্টুদা, বকুলদি, টুনিমাসীরা সব দৃশ্যপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন কোথায় হারিয়ে গেছে।...

এখন এই অচেনা নতুন দৃশ্যে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির পুনরাবৃত্তি খারাপ হয়ে যাওয়া পুরোনো কল থেকে একটানা জলপড়ার শব্দের মতন বিরক্তিকর জীবনযাত্রা। এখন প্রবাসজীবনে প্রতিদিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গোলামী জীবনের কথা মনে পড়লে জ্বরো রোগীর ঠোঁটে তিক্ত অরুচির মত একটা অগাধ বিস্বাদ অনুভূতিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং এরই মধ্যে প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' পড়তে বসলে আবার সেই নস্ট্যালজিক অনুভূতি, আনন্দ-বেদনার দুটি পরস্পরবিরোধী ভিন্নমুখী স্রোত সজোরে এসে আছড়ে পড়ে আমার বুকে। কেমন একটা শিহরিত করুণ অনুভূতি মনের মধ্যে নিঃশব্দে নানান জাদুর খেলা দেখিয়ে আমাকে স্তব্ধ করে দেয়! এ ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

এখন কোনদিনই আর হয়ত গাঁয়ে যাওয়া হবে না। তবু প্রফুল্ল রায়ের লেখা পড়ে সেই বর্ণাঢ্য উত্তরণগুলো প্রাচীন সঙ্গীদের আবছা-উজ্জ্বল মুখগুলোকে ঘিরে, হেমনাথ, অবনীমোহন, লারমোর, যুগল, ঝিনুককে ঘিরে অজস্র আলোকবিন্দুময় সোনালী সকালের সঙ্গে প্রাচীন সুখের দিনগুলোতে ফিরে যেতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। মরমী কথাসাহিত্যিক প্রফুল্লবাবুকে ধন্যবাদ। 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকেও অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

পশুপতি তরফদার
বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশ।

(২)

'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসের লেখক শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। পূর্ববঙ্গের বহু স্মৃতিবিজড়িত ফেলে আসা দিনগুলির কথা বলে শ্রীরায় আমাদের মনে আলোড়ন তুলেছেন। প্রতিটি সংখ্যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। অমৃত সংখ্যাটি প্রাপ্তিমাত্র 'কেয়াপাতার নৌকো'র প্রতিটি শব্দ ও লাইন পাঠ করি।

আজকের যুগে যে উপন্যাস আমাদের কাছে সাহিত্য মাত্র, পরবর্তী যুগে তা হয়ে দাঁড়াবে ইতিহাস। পূর্ব বাংলাকে আমরা ভুলতে বসেছি। শ্রীরায় উপন্যাসের ধারায় পূর্ব বাংলার মাঠ, ঘাট প্রান্তর, বেদেনী যুগলা, মজিদ মিঞা ও স্কুল প্রভৃতিকে সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে বর্ণনা ও তথ্যকে প্রায় ইতিহাসের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। ইতিহাস সত্য। কল্পনার স্থান সেখানে নেই। কিন্তু কেবল চরিত্রসৃষ্টির বেলাতেই নয় স্থান ও প্রতিষ্ঠান বিষয়েও শ্রীরায় কিঞ্চিৎ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন আমাদের মনে তাই খটকা লেগেছে।

শ্রীরায়ের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ নিম্নলিখিত বিষয়ে কিছু আলোকপাত করে তাঁর সুন্দর উপন্যাসটির তথ্যগত মর্যাদা রক্ষা করুন।

(১) শ্রীরায় লিখেছেন 'রাজদিয়াতে স্টীমার এসে ভিড়লো'। আমি আশৈশব বিক্রমপুরে ছিলুম। যতদূর জানি রাজদিয়াতে লঞ্চ ছাড়া কোন স্টীমার যেত না। ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদীর জল অগভীর, তাই ঢাকা মেল মুন্সীগঞ্জ—মীরকাদিম (কমলাঘাট) হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত যেত।

(২) শ্রীরায় লিখলেন বিনু (বিনয়কুমার বসু) রাজদিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হল অষ্টম শ্রেণীতে। রাজদিয়ার হাইস্কুল সুপরিচিত, কিন্তু সুধা, সুনীতি কলেজে ভর্তি হল, কলেজ নিকটেই, ওরা হেঁটেই যাতায়াত করে। এটা ঠিক নয়। আমি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলাম। যতদূর জানি, বিক্রমপুরে কোন কলেজ ১৯৪৭ সন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কলেজ ছিল মুন্সীগঞ্জে 'হরগংগা কলেজ'। বিক্রমপুরবাসী বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী সেখানে অধ্যয়ন করতে যেতো। বিক্রমপুরে প্রাইমারী ও হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল অসংখ্য, কিন্তু কোন কলেজের নাম আমরা শুনিনি। শ্রীরায়ের নিকট সবিনয় নিবেদন এ বিষয়গুলোর দিকে আলোকপাত করেন।

নারায়ণ গাঙ্গুলী,
জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ

'যখন তুমি'

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত ৯ বর্ষ, ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যায় বীরেন্দ্র দত্তর যখন তুমি গল্পটি পড়লাম। বীরেন্দ্র দ আপনাদের পত্রিকার একজন নিয়মি লেখক। আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠিকা আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর সব গল্প পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাছ যতদূর মনে পড়ে তাঁর গল্প সংকলনও ইতি মধ্যে আমি পড়েছি।

যখন তুমি গল্পটি সত্যিই সুন্দর গল্পটি একান্তই দুটি বোনের প্রেম অনুভূতিসংক্রান্ত এবং প্রেমবঞ্চন আঘাত বিষয়েই লেখা। ছোট বোন মিল বাস্তবাভিত্তিক প্রেম এবং তারই বড় বে নীলুর কাল্পনিক প্রেমের স্বপ্নসৌধ রচ করার মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর অসাধার সজনীপ্রতিভারই পরিচয় দিয়েছে গল্পটিতে যখন ক্লাইম্যাকস তখনই বাড় প্রচন্ড আঘাত দুজনের স্বপ্ন ভে চূর্ণ করে দিয়েছে—যা মনে গভীরভাবে দ কেটে যায়। গল্পটির সমাপ্তিতে মিলুর এ নীলুর কান্না সাংসারিক কাজকর্মে অন প্রকাশ ইত্যাদি গল্পটিতে এক নতুন স্বা ইংগিত দেয়।

এর আগেও দুইবোন নিয়েও বাং সাহিত্যে গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রসং তাই বিমল করের 'দুই বোন' ও সমরেশ বসুর 'অকাল বস গল্পের কথা মনে পড়ে য তবে দুটি গল্পেই ঈর্ষার প্রাধান যা বীরেন্দ্র দত্তের গল্পে অনুপস্থি বাস্তবিকই বীরেন্দ্র দত্তের 'যখন ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক শৈল্পিক রসের আস্ দেয় বলেই তা নিঃসন্দেহে একটি ভা গল্প।

পত্রটি আপনাদের চিঠিপত্র বিভ ছাপলে অত্যন্ত বাধিত হবো। তরুণ ব সাহিত্যিক বীরেন্দ্র দত্তকে আমার আন্ত ধন্যবাদ জানাবেন। আপনারা এরকম প্রকাশনের জন্য যে সাংস্কৃতিক দায়িত্ব প করছেন তার জন্য আমার ধন্যবাদ জানা

প্রতিভা (
চক্রধরপুর, বিহ

সাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল, এই দুই রাজ্যেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, সরকারের প্রধান শরিক সি-পি-এম'-এর সঙ্গে, বিচার বিভাগের একটা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়া ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়ার লক্ষণ-গুলি হল,

(১) কায়েমী স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে আদালতের ভূমিকার সমালোচনা করে সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সংবাদ-পত্রে প্রকাশ্য মন্তব্য করছেন।

(২) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখা উচিত বলে শ্রীদাশগুপ্ত অভি-মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, কম্যু-নিস্ট রাষ্ট্রাদর্শে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক করার কথা নেই। একথা লক্ষ্য করা হয়েছে যে, শ্রীদাশগুপ্তের এই কথা যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বিরোধী, ফরওয়ার্ড দল-ভুক্ত বিচারমন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল যে ঘোষণা করেছেন তার সঙ্গে সঙ্গতিহীন ও যুক্তফ্রন্টের অনুমোদন-বহির্ভূত। যুক্ত-ফ্রন্টের সভায় অন্য দলের প্রতিনিধিরা যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন সি-পি-এম প্রতিনিধি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, অর্থাভাবের কারণেই প্রমোদবাবু বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কাজে আপাতত ঢলে দিতে বলেছেন। কিন্তু প্রমোদবাবু তাঁর মন্তব্য পুনরায় প্রকাশ করেছেন এবং রেখে-ঢেকে বলার চেষ্টা করেন নি।

(৩) আদালতের কয়েকটি রায়ে সম্প্রতি সরকারের আচরণ ও নীতির নিন্দা করা হয়েছে।

যেমন, সম্প্রতি একটি রায়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এ পি দাস ও বিচারপতি কে কে মিত্র প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, শাসন বিভাগের একথা বোঝার সময় হয়েছে যে, বিচার বিভাগ সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট তার আপন ক্ষেত্রে কাজ করে এবং বিচার বিভাগ যাতে তার নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে কাজ করতে পারে এবং আদালতের আদেশ-গুলি যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা শাসন বিভাগের পবিত্র কর্তব্য।'

যে মামলায় এই রায় দেওয়া হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকজন সেক্রেটারি ও ডেপুটি সেক্রেটারির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এসেছিল যে, জঙ্গল সাঁওতাল ও আরও পাঁচজন তাঁদের উপর প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন ও সেই আপীলের শুনানী যখন চলছিল সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের মুক্তি দিয়ে আদালত অবমাননা করা হয়েছে। অভিযুক্ত সরকারী অফিসাররা আদালতে মার্জনা ভিক্ষা করায় আদালত তাঁদের উপর থেকে মামলা তুলে নেন।

রায়ে বিচারপতিদ্বয় বলেছেন, 'জন-জীবনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যখন দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করছেন তখন একথা বলার সময় এসেছে যে, জনসাধারণ তাঁদের জন্য সংবিধানে আইনের শাসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আদালতকে যতদিন কাজ করতে দেওয়া হবে ততদিন তাঁরা জনসাধারণের পবিত্র অধিকারগুলিকে রক্ষা করবেন ও জনসাধারণের অধিকারে হস্তক্ষেপ সহ্য করবেন না, কয়েদীদের অধিকারের কথা তো ওঠেই না।'

(৪) আর একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীআর এন দত্ত ও বিচারপতি শ্রীবি ব্যানার্জি বলেছেন, 'আদালতের আদেশ পালন না করার এবং নিজেদের সুবিধামত যে কোন সময়ে ঐ আদেশ কার্যকর করার জন্য অধস্তন পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দেবার কোন অধিকার উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারের নেই।'

ঐ মামলায় গার্ডেন রীচ থানার এক-জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছিল। কেন না, গার্ডেন রীচের একটি কারখানায় কয়েকজন অফিসারকে ঘেরাও থেকে মুক্ত করে আনার জন্য আদালতের নির্দেশ পেয়েও ঐ পুলিশ অফিসার সেই নির্দেশ পালন করেন নি। পুলিশ অফিসার আদালতে তাঁর কৈফিয়তে বলেছেন যে, তিনি তাঁর উর্ধ্বতন অফিসারের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন, রাত্রের মধ্যে আদালতের আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজন নেই।

হাইকোর্ট ঐ পুলিশ অফিসারকে দোষী সাব্যস্ত করে দুমাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন; কিন্তু তিনি নিঃশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাঁর দণ্ডাদেশ মকুব করা হয়।

(৫) এর আগে আর একটি আদালতের রায়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ঘেরাও হাইকোর্ট কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পর এখন ঘেরাও ভেঙে দেওয়ার জন্য পুলিশের আর আদালতের আদেশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, ঘেরাওয়ের খবর পেলে নিজের থেকেই পুলিশকে সেখানে যেতে হবে, এই হচ্ছে আইনের নির্দেশ।

এবার দখা যাক, কেরলে কি অবস্থা। সেখানকার খবর হচ্ছে :—

(১) মন্ত্রী ও অন্যান্য জননায়কদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের প্রাথমিক বিচারের ভার বিচারপতির হাতে তুলে দিতে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি রাজী নন, কেন না, তাঁদের মতে, আইনসভার আস্থা-ভাজন মন্ত্রীদের বিচারের ভার বিচারপতি-দের হাতে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ আইন বিভাগের উপর বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। এটা মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা মেনে নিতে পারেন না।

(২) অন্যদিকে, পি-পি-আই বলছেন, আদালতে সম্প্রতি কয়েকটি ক্ষেত্রে মার্কস-বাদী পার্টির যে বেইজ্জতি হয়েছে সেকথা মনে রেখেই সি-পি-এম বিচার বিভাগের দ্বারস্থ হতে ভরসা পাচ্ছেন না।

সম্প্রতি কেরল হাইকোর্টের একটি রায়ে একজন পুলিশ অফিসারের উপর থেকে সাসপেনসনের আদেশ তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঐ রায়ে বলা হয়েছে, উক্ত পুলিশ অফিসারকে পার্টির অন্যায় প্রভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

বিচার বিভাগের সঙ্গে সি-পি-এম-এর এই ঠাণ্ডা লড়াই কত দূর গড়াবে অথবা যুক্তফ্রন্টে ঐ পার্টির অন্যান্য শরিকরা ঐ লড়াইয়ে তাঁদের সঙ্গে কতখানি থাকবেন বোঝা যাচ্ছে না। তবে একথা বোধ হয় অনুমান করা চলে যে, বিরোধটা যদি বেশী দূর গড়ায় তাহলে একটা সাংবিধানিক সংকট দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়।

দেশে বিদেশে

বিহারের পথে মধ্যপ্রদেশ ?

মধ্যপ্রদেশে শ্রীশ্যামাচরণ শুক্লের মন্ত্রিসভার বয়স এখনও তিন মাস পার হয় নি। এরই মধ্যে এই মন্ত্রিসভায় ফাটল ধরার উপক্রম হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

বিহারে সর্দার হরিহর সিংহের মন্ত্রিসভার পতন হয়েছিল ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন জোটে ভাঙনের দরুন। মধ্যপ্রদেশে অবশ্য সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের দলীয় মন্ত্রিসভা। সেখানে গোলযোগটা হচ্ছে দলের ভিতরেই। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, আইনসভার কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব থেকে শুক্লজীকে সরাবার জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিরা উঠেপড়ে লেগেছেন। সেই কারণেই শুক্লজী নিরাপদ বোধ করছেন না।

খবরে প্রকাশ যে, ইতিমধ্যে দলের ভিতরে শ্রীশুক্লের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান চলছে। মধ্যপ্রদেশের দুজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র ও শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংহ এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীমূলচাঁদ দেশলহেরা শ্রীশুক্লের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে হাত মিলিয়েছেন। অথচ, মজা এই যে, শ্রীসিংহই অতীতে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্রীমিশ্রের মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছিলেন। আর দ্বারকাপ্রসাদ ও মূলচাঁদের মধ্যে গত ২০ বছর ধরে তো প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ১৯৬৬ সালে মূলচাঁদ কংগ্রেস ছেড়ে জন-কংগ্রেস গঠন করেছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংহের সঙ্গে একযোগে কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আসনে এসে বসার জন্য দিন গুনছেন শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র। তিন মাস আগে শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংহের মন্ত্রিসভার যখন পতন হল এবং শ্রীসিংহ ও তাঁর অনুগামীরা যখন কংগ্রেসে ফিরে এলেন তখনই মিশ্রজী যদি পারতেন তাহলে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর একটা অসুবিধা ছিল। অসুবিধাটা হল এই যে, বিধানসভায় মিশ্রজীর নির্বাচন সম্পর্কে আদালতে একটি মামলা চলছে। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট তাঁর নির্বাচন অসিদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন। আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট এই আপীলের আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে মিশ্রজীকে আগ... ছয় মাস বিধান সভার সদস্য থা... অনুমতি দিয়েছেন। আগামী ২৩শে জুলা... সুপ্রীম কোর্টের রায় দেওয়ার কথা। আছে ঐ রায় যদি মিশ্র মহাশয়ের অনুকূলে য... তাহলে তিনি শুক্লজীকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আসনে গিয়ে বসার জন্য বড়রকমের চে... করবেন বলে অনুমান করা যায়। শ্রীমিশ্রে... অনুগামীরা চাইছেন, তাঁর রাস্তাটা আ... থেকেই কতকটা পরিষ্কার হয়ে থাকুক। য... দিন না মিশ্রজী নেতৃত্বের আসনে আস... পারছেন ততদিন পর্যন্ত একজন অপেক্ষাকৃ... দুর্বল কোন সদস্যকে গদীতে বসিয়ে র... হোক যাতে সময়মত তিনি মিশ্রজীকে জায়... ছেড়ে দেন। এই হচ্ছে মিশ্রজীর অনুগামী... পরিকল্পনা।

শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংহ ও তাঁর ... র্থকরা যে হিসাব করে শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ ... ও তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে... সেটা হচ্ছে এই রকম:—দলত্যাগী মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হবে ... বলে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের যে সিদ্ধ... আছে তার দরুন শ্রীসিংহ বা ... গোষ্ঠীর কেউ শুক্ল মন্ত্রিসভায় প্র... করতে পারছেন না। তাঁদের মতে, কং... হাইকম্যাণ্ডের সিদ্ধান্তের অর্থ এই যে, ত্যাগীরা কংগ্রেসে ফিরে আসার পর প্রথ... মন্ত্রিসভা গঠিত হবে তাতে ঐ দলত্যা... স্থান পাবেন না; কিন্তু পরবর্তী ... মন্ত্রিসভায় তাঁদের নিতে বাধা নেই। ক... নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি এই ... মেনে নিয়েছেন। সুতরাং, গোবিন্দনারা... গোষ্ঠীর আশা এই যে, মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রি...

ইন্দোনেশিয়া পরিভ্রমণকালে জাকার্তায় 'রামায়ণ' ব্যালের নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
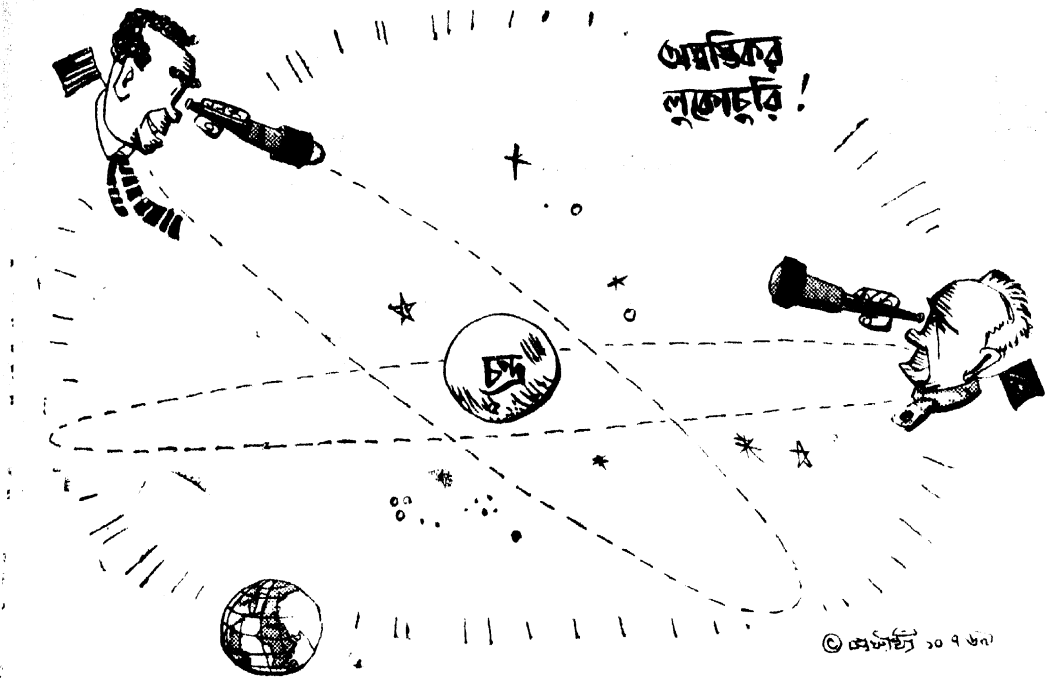
নগঠিত হলে তাঁরা ক্ষমতায় ফিরে আসতে রবেন।

দলের মধ্যে সমর্থন সংগ্রহ করার পক্ষে কটি ভাল অস্ত্র শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের হাতে য়েছে। মিশ্রজী কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন মিটির সদস্য। নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন কে দেওয়া হবে কাকে দেওয়া হবে না তা স্থির করেন এই কমিটি। কংগ্রেস দলের সদস্যর একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই শ্রীমিশ্রের ক্ষে যথেষ্ট।

• দলের ভিতর যাঁরা শ্রীশুক্লের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন তাঁরা ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ খাড়া করেছেন। রাজ্যে সম্প্রতি দুটি উপনির্বাচনে কংগ্রেস হেরে গেছে, ইন্দোরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা মধ্যপ্রদেশের নাম খারাপ করছে, নর্মদার জল নিয়ে মধ্যপ্রদেশের দাবীর মীমাংসা হয় নি—এই সব ঘটনাই এখন শুক্লজীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবী শ্রী শ্যামাচরণ শুক্লের পক্ষে উত্তরাধিকারের দাবী। তাঁর পিতা শ্রীরবিশঙ্কর শুক্ল দীর্ঘদিন ঐ আসন অধিকার করে ছিলেন। পুত্র শ্যামাচরণও সহজে বা বিনাযুদ্ধে তাঁর অধিকার ছাড়বেন না। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তিনি সব ঘটনা জানিয়েছেন।

রেওয়ার মহারাজার সঙ্গে কংগ্রেসের যে সব এম-এল-এ রয়েছেন তাঁদের সমর্থন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তিনি মহারাজার সঙ্গে দেখা করেছেন। শ্রীগোবিন্দনারায়ণ সিংহের সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীসিংহের সাৎনার বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন—যদিও এই সাক্ষাৎকারে কোন ফল হয় নি। শুক্লজী নিদলীয় ও বিরোধী সদস্যদের কিছু কিছু অংশের সমর্থনও সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

ভূপালে সাংবাদিকদের কাছে শ্রীশুক্ল বলেছেন যে, তাঁর সরকার বেশ মজবুত এবং দলের ভিতরকার অসন্তুষ্টদের প্রচারে তিনি মোটেই বিচলিত নন। তিনি বলেছেন, 'তাঁরা যদি দলের নেতা বদল করার চেষ্টা করেন তাতে আমি কিছু মনে করি না। কিন্তু প্রকাশ্যে মন্ত্রিসভার নিন্দা করার অর্থ খোলাখুলি দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা। এই ধরনের বিভেদপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আমি হাইকম্যাণ্ডের কাছে আবেদন জানাব। দলের ভিতর এঁদের সহ্য করা উচিত নয়।' তিনি এই আশাও প্রকাশ করেছেন যে, বিক্ষুব্ধরা দলের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবেন না এবং কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডও দলত্যাগীদের মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে রাজী হবেন না।

ভারত-নেপাল সম্পর্ক

এক দেশের রাষ্ট্রনেতা অন্য দেশে আনুষ্ঠানিক সফর করতে গেলে সেই সফর উপলক্ষে দুই দেশের পারস্পারিক সম্পর্কের বিষয়ে যেসব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা হয় সেগুলি প্রায়শই যে কত অর্থহীন হয়ে থাকে তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল ভারত-নেপাল সম্পর্কের সাম্প্রতিক ঘটনায়।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং সম্প্রতি নেপালে সফর করে এলেন। এই উপলক্ষে ভারত-নেপাল ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে মামুলি কথাগুলি পুনর্বার উচ্চারিত হল। এবং যদিও একথা গোপন করা গেল না যে, সুস্তা সীমান্ত নিয়ে সমস্যার মীমাংসা হয় নি এবং ভারতের মধ্য দিয়ে নেপালের বহির্বাণিজ্য চালাবার অধিকার থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলিরও কোন ফয়সালা হয় নি তাহলেও শ্রীসিং বললেন, তাঁর এই সফর দুই দেশের মধ্যে শুভেচ্ছার সম্পর্ক উন্নয়নে সাহায্য করবে বলেই তিনি মনে করেন।

এই মামুলি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঘোষণা যে কতটা অন্তঃসারশূন্য সেটা কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ পেল। আর কেউ নন, স্বয়ং নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীকীর্তিনিধি বিস্তা ভারতের কাছে এমন কতকগুলি দাবী করে বসলেন যেগুলি থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৫০ সালের চুক্তি অনুযায়ী এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যে 'বিশেষ সম্পর্ক' রয়েছে তার মূল ভিত্তিকেই তিনি স্বীকার করছেন না। নেপালের প্রধানমন্ত্রী দাবী করলেন :—

(১) নেপাল-চীন সীমান্ত চৌকিগুলি থেকে ভারতীয়দের সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(২) নেপালে যে ভারতীয় সামরিক সংযোগকারী দল রয়েছে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(৩) ভারতের সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্কের' কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

(৪) ১৯৬৫ সালের অস্ত্রসাহায্য চুক্তি আর চালু নেই।

(৫) নেপাল 'সীমাবদ্ধ সার্বভৌমত্ব' মেনে নিতে আর রাজী নয়।

আশ্চর্য এই যে, প্রধানমন্ত্রী বিস্তা সাধারণ কূটনৈতিক প্রণালীর মধ্য দিয়ে এই দাবীগুলি তুললেন না, 'রাইজিং নেপাল' নামে কাঠমাণ্ডুর একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে তিনি কথাগুলি তুললেন।

ভারত ও নেপালের মধ্যে যে 'বিশেষ সম্পর্কের' কথা নেপালের প্রধানমন্ত্রী অস্বীকার করতে চাইছেন সেই 'বিশেষ সম্পর্ক'-এর ভিত্তি তৈরী হয়েছে ১৯৫০ সালে সম্পাদিত দুই দেশের মধ্যে 'শান্তি ও মৈত্রীর চুক্তি'-কে অবলম্বন করে। ভারত ও নেপালের মধ্যে সীমান্ত যে সম্পূর্ণ অরক্ষিত ও বাধামুক্ত, নেপালী নাগরিকরা যে বিনাবাধায় সীমান্ত পার হয়ে এদেশে এসে কাজ নিতে পারেন ও সম্পত্তি সংগ্রহ করতে পারেন, নেপালে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য যে ভারতে অবাধে চালান দেওয়া যেত পারে এবং ভারত যে নেপালকে বৈষয়িক সাহায্য দিচ্ছে সে-সবই সম্ভব হচ্ছে ঐ চুক্তির দ্বারা।

স্পষ্টতই ঐ চুক্তির একটা সর্ত আর একটার সঙ্গে জড়িত। একটা বাদ দিয়ে আর একটার কথা বিবেচনা করা যায় না। যেমন, সাড়ে চার শ মাইল দীর্ঘ নেপাল-ভারত সীমান্ত যে অরক্ষিত রাখা হয়েছে তারই আর একটি দিক হচ্ছে নেপাল-তিব্বত সীমান্তের ৫২টি ভারতীয়-পরিচালিত চৌকি। ভারতীয় বলতে অবশ্য ভারতীয় সৈন্য নয়, শুধু ভারতীয় বেতার-পরিচালক। প্রকৃতপক্ষে কাঠমাণ্ডুতে "ইণ্ডিয়ান মিলিটারি লিয়াজোঁ গ্রুপ"এর ২৩ জন ছাড়া আর একজনও সৈনিক নেপালের মাটিতে নেই। সুতরাং, ভারতবর্ষ নেপালে সামরিক ঘাঁটি তৈরী করে বসে আছে বলে নেপালী রাষ্ট্রনেতারা যে ধারণার সৃষ্টি করছেন সেটি ভুল।

নেপালের দাবী অনুযায়ী নেপাল-তিব্বত সীমান্তের চৌকিগুলি থেকে যদি ভারতীয়দের সরিয়ে আনা হয় ও কাঠমাণ্ডুর "ইণ্ডিয়ান মিলিটারি লিয়াজোঁ গ্রুপ" যদি গুটিয়ে নেওয়া হয় এবং তার পরও যদি ভারত-নেপাল সীমান্ত উন্মুক্ত থাকে তাহলে তার অর্থ হবে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকাকে চীনা আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। নয়াদিল্লীর পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, নেপাল যদি তার উত্তর সীমান্ত থেকে ভারতীয়দের চলে যাওয়ার দাবী করে ও সংযোগরক্ষাকারী ভারতীয় সামরিক অফিসারদের কাঠমাণ্ডু ছেড়ে যাওয়ার কথা তোলে তাহলে ভারতবর্ষের তরফ থেকেও পাল্টা দাবী তোলা হবে ভারত-নেপাল সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। ১৯৫০ সালের চুক্তির কোন অংশ যদি নেপাল তার সুবিধামত সংশোধন করার চেষ্টা করে তাহলে ভারত বলবে, উভয় পক্ষের সুবিধা অনুযায়ী গোটা চুক্তিটাই পুনর্নিবেচনা করা হোক।

কেনিয়ায় হত্যাকাণ্ড

আততায়ীর গুলী কেনিয়ায় জোমো কেনিয়াট্টার সবচেয়ে সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর মৃত্যু ঘটাল। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে টম এমবোয়ার মৃত্যুতে একজন খ্যাতিমান আফ্রিকান নেতা কেনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মুখর রাজনীতির অঙ্গন থেকে অপসৃ[illegible] হলেন।

টম এমবোয়া লুও উপজাতির মানুষ কেনিয়ায় এটি দ্বিতীয় বৃহৎ উপজাতি[illegible] বৃহত্তম উপজাতির নাম কিকুয়ু। কেনিয়া[illegible] রাষ্ট্রপতি জোমো কেনিয়াট্টা এই উপজাতি[illegible] মানুষ। এমবোয়ার পিতা ছিলেন কেনিয়া[illegible] একটি সিসল আবাদের একজন দরিদ্র কর্মী[illegible] ১৯৩১ সালে এমবোয়ার জন্ম হয়। নাই[illegible] রোবি শহরে একজন স্যানিটারি ইনস্পেকট[illegible] হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করে কিছুদিনে[illegible] মধ্যেই তিনি রাজনীতির দিকে আকৃ[illegible] হন। কেনিয়া তখন বৃটিশ শাসনে[illegible] অধীনে। এমবোয়া কেনিয়া আফ্রিকান ই[illegible] নিয়নে যোগ দেন। কেনিয়া আফ্রিকান ই[illegible] নিয়ন বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পর ১৯৫[illegible] সালে তিনি কেনিয়া ফেডারেশন অ[illegible] লেবারের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫[illegible] সালে তিনি কিছুদিন কলকাতায় ইন্টার[illegible]

মানিকতলা থানার কাঁকুড়গাছি সেকেন্ড লেনে এক ফাঁকা জায়গায় তিন বাক্স বন্দুক পাওয়া যায়। প্রাপ্তি-স্থানে পুলিশ কমিশনার শ্রীপি কে সেন এবং উত্তর কলকাতার ডি-সি শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য বন্দুকগুলো পরীক্ষা করে দেখছেন।

ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউ-নিয়নসের কলেজে ক্লাস করেন। পরে তিনি বৃত্তি নিয়ে অকসফোর্ডে পড়াশুনা করেছেন এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন।

কেনিয়ায় যখন মাউ মাউ বিদ্রোহ চলছিল, জোমো কেনিয়াট্টা যখন বৃটিশের কারাগারে, শত শত আফ্রিকান দেশ-প্রেমিককে যখন ফাঁসিকাঠে ঝোলান হচ্ছে তখন টম এমবোয়া জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে একটু তফাতে সরে গিয়ে শ্রমিক সংগঠন করছিলেন। এজন্য তাঁকে কিছু কটু সমালোচনাও শুনতে হয়েছে। তাঁকে "কালো সাহেবও" বলা হয়েছে। কিন্তু এই সমালোচনার প্রভাব কাটিয়ে উঠে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে তাঁর বেশী সময় লাগে নি। তিনি তাঁর শ্রমিক সংগঠনের মারফত কেনিয়ার ক্রীতদাসসদৃশ শ্রমিকদের মধ্যে নূতন চেতনা এনেছিলেন। শুধু তাই নয়, জাতির জনকতুল্য জোমো কেনিয়াট্টা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর টম এমবোয়া তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়েছিলেন। কেনিয়া আফ্রিকা ন্যাশনাল ইউনিয়নের (সংক্ষেপে কে এ এন ইউ বা কানু) নেতা হচ্ছেন জোমো কেনিয়াট্টা আর দীর্ঘকাল ঐ দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন টম এমবোয়া।

দলের মধ্যে টম এমবোয়ার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ওডিঙ্গা। এমবোয়ার মতো ওডিঙ্গাও লুও উপজাতির মানুষ। কিন্তু এমবোয়া উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রী আর ওডিঙ্গা উগ্রপন্থী বিপ্লবী। ওডিঙ্গার পিছনে চীনের সমর্থন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমর্থনই তাঁর কাল হয়েছিল। পিকিং রেডিও ওডিঙ্গাকে সমর্থন করতে গিয়ে কেনিয়াট্টাকে কুৎসিত গালাগালি করে। এতে কেনিয়ার মানুষ ক্ষিপ্ত হয় এবং ওডিঙ্গা অসুবিধায় পড়েন। জোমো কেনিয়াট্টা প্রথম দিকে এমবোয়া-ওডিঙ্গা রেষারেষিতে নিরপেক্ষ থাকলেও চীনের এই ভুল চালের পর তিনি টম এমবোয়ার পক্ষ সমর্থন করলেন। ওডিঙ্গা দল ও সরকার ছাড়তে বাধ্য হলেন।

এমবোয়ার হত্যা এই ওডিঙ্গা-এমবোয়া রেষারেষিরই পরিণাম কিনা তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় আর একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, একজন লুও উপজাতির মানুষের প্রভাব বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন কিকুয়ু উপজাতির কিছু লোক এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছে। এই সম্ভাবনা সত্য হোক বা না হোক, এই ধারণা ছড়িয়ে গেলে লুও-কিকুয়ু বিরোধ ছড়িয়ে পড়তে পারে। কেনিয়া থেকে ইতি-মধ্যে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, এই উপজাতীয় বিরোধ বাধার একটা সম্ভাবনা রয়েছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

গত সপ্তাহে কলকাতার একদল ছাত্র কলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্র অফিসের উপর আক্রমণ চালিয়ে প্রত্যক্ষভাবেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেছে। এই দুঃসংবাদ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। ছাত্রদলের অভিযোগ এই যে, কোনো কোনো সংবাদপত্রে তথ্য গোপন ও তথ্যের বিকৃতি হচ্ছে, যা তাদের মতে, যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। দুর্ভাগ্যের কথা, ছাত্রসমাজের বৃহৎ অংশ এই হামলাবাজির সমর্থক না হলেও মুষ্টিমেয় আক্রমণকারীদের তাঁরা নিবৃত্ত করতে পারেননি।

সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত। তথ্যবিকৃতি সংবাদপত্রের নীতি-বিরোধী। কিন্তু এই অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ না দিয়ে যারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চায়, তারা গণতন্ত্রকেই বিদায় দিতে চাইছে। যুক্তফ্রন্টের অনেক শরিক দল এই হামলার নিন্দা করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, তিনি এই আক্রমণে অসুখী এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হবে না বলে তিনি আশা করেন। কিন্তু এই আশা প্রকাশ যথেষ্ট নয়। এর প্রতিকারের জন্য সরকারকে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে তাঁদের অনুগামীদের সংযত করতে হবে।

সব দেশেই নানা মতের সংবাদপত্র আছে। তারা সকলেই কোনো একটা সরকারের সমর্থন করে চলে না। সংবাদ পরিবেশনে যেমন তথ্যভিত্তিক নিরপেক্ষতা স্বীকৃত, তেমনি স্বীকৃত সংবাদপত্রের মন্তব্যের স্বাধীনতা। এর যে-কোনোটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার জনসাধারণের আছে। কিন্তু কলমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কলমই, ডান্ডাবাজি নয়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ও লজ্জার কথা সমাজের আশা-ভরসার স্থল ছাত্রদেরই একাংশের এই মতিচ্ছন্ন আক্রোশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হতে চলেছে। ছাত্র-সমাজের পক্ষে এটা গৌরবের কথা নয়। রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় এতে নেই। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি এবং সরকারের কাছে দাবী করি এর প্রতিকার।

দুই বাংলার কবি

বাংলাদেশ ভাগ হলেও তার সংস্কৃতি একসূত্রে গাথা। এই কথা আরও বেশি করে মনে হয়েছিল সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের বর্ষীয়ান কবি জসিমুদ্দিনের কলকাতা আগমনে। বাংলার পল্লী-কবিতাকে তিনি নূতন রূপ দিয়েছিলেন। লোকগাথা, লোকসংস্কৃতি ও লোকসংগীতের প্রতি শিক্ষিত শহরবাসী বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি তাঁর অনুপম কবিতাগ্রন্থ 'রাখালী' 'নকসীকাঁথার মাঠ' 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' প্রমুখ সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু শুধু এজন্য নয়, পূর্ব পাকিস্তানে এই কবির প্রতি পশ্চিমবাংলার মানুষের আকর্ষণের অন্যতম কারণ হল বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির যে অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আমরা বাঁধা, জসিমুদ্দিনকে পেয়ে তাঁর মারফৎ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে সে কথাই যেন আবার নূতন করে জানানো।

এই কবি এবং এখানেও সংস্কৃতিমান ব্যক্তিরা মনে করেন, রাজনৈতিক ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির যে-ঐতিহ্য এতকাল ধরে গড়ে উঠেছে উভয় বাংলাই তার উত্তরাধিকারী। সেই উত্তরাধিকার বহন করতে উভয়ের সাহায্য, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক ভাববিনিময় প্রয়োজন। সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেন কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা তাঁরা বিশ্বমানবতার পূজারী। কোনো কৃত্রিম রাজনৈতিক বন্ধন বা ভৌগোলিক সীমায় শিল্পের আবেদন আবদ্ধ থাকতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাভাষার যে নবজাগরণ ও সমৃদ্ধি তার মূলে আছে, সেখানকার সাধারণ মানুষের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ এবং সংস্কৃতিমান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনলস প্রয়াস।

রবীন্দ্রসদনে সম্বর্ধনার উত্তরে কবি জসিমুদ্দিন যথার্থই বলেছেন, কোনো দেশের সত্যিকারের সাহিত্য যা মানুষের ভালবাসার কথা বলে তা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না। পল্লীর কবি বলে তাঁর এই সম্মান বাংলাদেশের অগণিত গায়ক-কবিয়াল, মেঠোচাষী গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রাপ্য। কারণ, কবির ভাষায়, 'মেঘনা-পদ্মা আর ধলেশ্বরীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সাধারণ মানুষই হচ্ছে আমার সাহিত্যকর্মের সবচেয়ে বড় গুরু।' বাংলার এই সাংস্কৃতিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে উভয়ের চিন্তাধারা ও সাহিত্যকর্মের আদান-প্রদান হওয়া বাঞ্ছনীয়। উভয় বাংলার মানুষই এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। কিন্তু সরকারী অনুমোদন ও সহযোগিতা না পেলে তা করা সম্ভব নয়। আমরা আশা করি, উভয় দেশের সরকার মানবপ্রীতি ও সৌহার্দ্যের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যে বাধানিষেধ আছে তা দূর করবেন।

চন্দ্রমুখী ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

ইচ্ছেও প্রবলা. আর উত্তরণবাসনাও খাঁটি।
বিরোধী রক্তের গতি। এ-জীবনে তাই নানা পার্টি।
স্বাক্ষর সত্ত্বেও তারা মেলেনি.—সে কহন না যায়।
বিবেক শুভার্থী বটে কিন্তু তারো আছে নানা দায়।
ব্যর্থ করে নিরাপত্তা বহুমুখী আসক্তির সেনা।
শান্তি নয়, যুদ্ধ নয়.—এ কেবলি আপোষের দেনা।

আসক্তি মাংসেরই গতি। শারীরিক। যৌগিক ব্যায়ামে
বরফে বরফে তাকে কে হাঁটাবে দুর্গম পাহাড়ে?
যাক্ সে নৈমিষারণ্যে—মেলে যদি কোনো তপোবন
বিশুদ্ধতা না পেলেও সম্ভব তো বিরোধ-দমন।
স্বাস্থ্যের জন্যেই চাই মানুষের সুদূর ভ্রমণ
অবশেষে তাই চাঁদে চলে যায় পৃথিবীর মন।

শরীরে শোকের চিহ্ন ॥

অনন্ত দাশ

শরীরে শোকের চিহ্ন প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে ওঠে
উন্মাদগন্ধ জানুস্বর, চোখের গভীরে কালো দাগ
রক্তের দ্রবণে বৃষ্টি, ছায়াময়
উঠান ছাড়িয়ে দুরারোগ্য পথে
বিশাল যৌবন ছত্রাকার।

ডানার উপরে সূর্য, তাৎক্ষণিক বোধে
মানুষ অভিজ্ঞ হয়, অভিজ্ঞানে উড়ে যায় পাখি
নাসারন্ধ্রে দপ্দপ্ ক্রোধ
রোদের ফলায় জাগে স্মৃতি
ক্রমেই দূরত্ব বাড়ে হাঁটাপথে
শেষ দেখা হয় না কখনো অন্ধকারে
নিঃশ্বাসের প্রতিধ্বনি ভাসে।

ত্রস্ত হরিণীরা হাঁটে রৌদ্রে চারপাশে
বহুদূর ওরা চলে গেলে—
জন্মের কতটা তাপ পায়রাদের বুকে ওঠে?
শোকের কতটা চিহ্ন ফোটে মুখে?
অভিজ্ঞানে উড়ে যায় পাখি
যামিনী না যেতে আমি জেগে উঠি
পুনর্বার মঞ্চে, শোকালয়ে।

টর্চ

মানবেন্দ্র পাল

আমি লোকটা দিন দিন কেমন যেন ভোঁতা মেরে যাচ্ছি। কলুর বলদের মতো কেবলই একটা বাঁধা ছকের চারিদিকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘুরছি আর ঘুরছি। নতুন কোনো প্রেরণা নেই, আশার কোনো মরীচিকাও নেই—শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসছি, স্ত্রীর পাশে শুচ্ছি—আর সোমবার ভোর হলেই কলকাতায় ছুটছি। কেউ কেউ আছে যাদের প্রশংসা করে বলা হয়—এত বয়েস, তবু দেখতে ইয়ং। আমার ক্ষেত্রে তার উল্টো ব্যাপার। এরই মধ্যে কেমন যেন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছি। ভুঁড়ি হয়েছে, জুলপির দুপাশে পাকা চুল পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। এখন রোজ দাড়ি কামাতেও ইচ্ছে করে না, ধোপভাঙা জামা-কাপড় তোলাই থাকে বিশেষ কোনো উৎসবের দিনের জন্যে। সে-উৎসব আর আসে না।

আমি নিজে কোনো আনন্দ পাই না, বাড়িতে এসেও বোধহয় কাউকে আনন্দ দিতে পারি না। বুড়ি মার কথা বাদ দেওয়া যাক, সহোদর ভাইটিও চালের কারবার করে করে চালের বস্তার মতো জড়পদার্থ হয়ে গেছে—একটা বিয়ে করার অবসর পর্যন্ত পেল না। আমার মনে হয় ঘোতনটা যদি বিয়ে করত, তাহলে রমা—অর্থাৎ আমার স্ত্রী একটা সঙ্গী পেত, গল্প করার মানুষ খুঁজে পেত। আমি খুব ভালো করে আমার স্ত্রীকে জানি। খুব আমুদে। উপযুক্ত সঙ্গী পেলে ও আর-এক মানুষ। বিয়ের আগে তো দেখেছি। আর এখনো দেখছি। এই ক'দিন হল আমার পিসতুতো ভাই বলু এসেছে, আর রমার প্রাণ খুলে গেছে। বলু যত বাড়ি কাঁপিয়ে হাসছে, রমা ততই হাসির ঝংকার তুলছে। কাঁদনেই বাড়ি মাৎ! মা যে মা—তিনিও মুখ টিপে টিপে হাসছেন। বলুকে তো বলি, মাঝে মাঝে এলেই পারিস। দেখছিস তো তুই এলে সবাই কত খুশি। বলু হাসে; বলে, দাঁড়াও, পরীক্ষাটা আগে দিই।

রমা অমনি ঠাট্টা করে বলে, আহা, পরীক্ষা দিয়ে ওঁর যেন আর যাবার জায়গা নেই। কী বলো ঠাকুরপো, কত সুন্দরী সুন্দরী কলেজে-পড়া মেয়ে পথ চেয়ে আছে।

বলে বলুর দিকে তাকিয়ে এমন সুন্দর চোখের একটা ভঙ্গি করে যে, আমার এই ঠান্ডা-মেরে-যাওয়া নাড়ীতেও বিদ্যুৎ খেলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপও হয়—অমন

বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষের খেলা আমার ভাগ্যে কখনো তো জোটেনি।

জুটবেই বা কেন? আমি কি বলুর মতো ওকে কখনো আনন্দ দিতে পেরেছি? আমি যে ছকে-বাঁধা কলুর বলদ। নিয়ম-মতো আসি, ঘড়ি ধরে হাতমুখ ধুই, ঘড়ি ধরে শুই। তারপর? তারপর সেই একই দাম্পত্যলীলা—লীলাও বলা চলে না, ক্রীড়া। পুরনো জুতোজোড়ার মধ্যে যেমন অক্লেশে পা গলিয়ে যায়—এতদিনের দাম্পত্য-জীবনটাও যেন তেমনি অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

অবশ্যই চিরদিন কিছুই নতুন থাকে না। সে-কথা কে না জানে। কিন্তু এটাও জানতে হয়, পুরনো হয়ে যাওয়া মানেই ফুরিয়ে যাওয়া নয়। ফুরিয়ে যাওয়াটা তো অনেকটা নিজের ব্যাপার। ফুরিয়ে যেতে দেব কেন? কত বিচিত্র উপায় আছে পুরনো দাম্পত্যকে চাগিয়ে রাখবার। আদরের ভঙ্গি, আলাপের ভঙ্গি, আসনের ভঙ্গি।। এসবই আমি বুঝি। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পারি না। কেমন লজ্জা লজ্জা করে। এইখানে বলুর সঙ্গে আমার কত পার্থক্য। ও কী সহজ—কী নিঃসঙ্কোচ। কী সুন্দর হাসতে হাসতে আমারই সামনে ও দিব্যি রমার গলা জড়িয়ে ধরে, পিঠের ওপর হাত রেখে ঘাড়ের নীচে সুড়সুড়ি দেয়—রমা তো এতটুকু আপত্তি করে না? তাই দেখে হঠাৎ আমিও একদিন অনেক কষ্টে দিবালোকে রমার গলা জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রমা এমন একটা মুখভঙ্গি করে ছিটকে গেল যে, সেটাকে কিছুতেই বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষের কাছাকাছি কিছু বলেও মনে হল না। নিজের অযোগ্যতায় নিজেই আরও লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

কাজেই আমি জানি, সপ্তাহে একটা দিন আর দুটো রাত্রি থেকে নিজে আনন্দ পাই না, স্ত্রীকেও আনন্দ দিতে পারি না।

তবে একটা জিনিস তাকে দিতে পারি, তা হচ্ছে সাহস।

সাহস—স্থূল অর্থেই সাহস। এর ওপর কোনো ব্যঞ্জনা চড়াচ্ছি নে।

ব্যাপারটা হচ্ছে—প্রত্যেক বছরই, বিশেষ করে এই বর্ষার সময়টা এখানে চোরের বড়ো উপদ্রব হয়। মফস্বল। পথঘাট কাঁচা, ইলেকট্রিক আলোর দাক্ষিণ্য এখনো এখানে পৌঁছয়নি, বাড়ির পিছনে বন, সামনে মাঠ—ন'টা বাজতে না বাজতেই একেবারে নিশুতি রাত। আনাচে-কানাচে শেয়াল ডেকে বেড়ায়, তালগাছের মাথায় বসে হঠাৎ গভীর রাতে প্যাঁচা ডেকে ওঠে। একা ঘরে শুয়ে রমা চমকে ওঠে। বাড়িতে তিনটি তো প্রাণী। তাও তিনজনে তিন ঘরে। কতবার রমাকে বলেছি, আমি যখন থাকি না, মাকে নিয়ে তো শুতে পার। রমা শুনে যায়, কোনো মন্তব্য করে না। এখন অবশ্য বুঝতে পেরেছি, মাকে নিয়ে শুতে ওর আপত্তি কেন। মা বুড়োমানুষ—রাতে তিন-চারবার ওঠে, রমার তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আহা, এই ঘুমটুকুই তো ওর শান্তি—ঐটুকুই তো আরাম।

আমি অবশ্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি রাখিনি। দরজায় খিলের ওপরও তালা, ঘরের কোণে মোটা একগাছা লাঠি, মাথার কাছে বল্লম, লণ্ঠন তো সারা-রাত জ্বলছেই—পুড়ুক কেরোসিন, পরোয়া করি না। এছাড়া পাঁচ ব্যাটারির লম্বা একটা টর্চ। আমি ওকে বলেছিলাম, টর্চটা কিন্তু সব সময়ে মাথার কাছে রেখো। বোধহয় জীবনে ও আমার এই একটা কথা শুনেছিল।

তবু ভয় কি এতে কাটে? ভয়ের সময়ে একমাত্র ভরসা মানুষ। একটা পাঁচ বছরের বালক কাছে থাকলেও যেন বাঁচা যায়—সেখানে আমি তো অনেক সাবালক।

আমি এলে সেদিন আর ওকে ঘরে খিল দিতে হয় না, তালা লাগাতে হয় না, খাটের তলা গলিখুঁজি টর্চ ফেলে ফেলে দেখতে হয় না। সেদিন ওর ছুটি। সেদিন ও নিশ্চিন্ত। সেদিন সব দায়িত্ব আমার।

শ্রাবণ মাস। শনিবারে যথারীতি বাড়ি এসেছি। বাড়ি ঢুকতেই কানে এল কলহাস্য। বুঝতে পারলাম বলু এসেছে। বলু এলেই রমার গলায় অত সুন্দর হাসির লহর খেলে। বুঝতে পারি, শুধু বয়েসের মিল নয়, দুজনের মেজাজের মিলও আছে। রমার ঐ স্বভাবসিদ্ধ হাসির ফোয়ারার মুখে আমি জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছি।

বলুর আসার কথা ছিল শুনে [illegible] ছিলাম। এই সময়ে এখানে মহিষমর্দিনীর বিশেষ পুজো। চারদিনব্যাপী পুজো। মেলা বসে, অন্নসত্র হয়, যাত্রাগানে পুজোগুলো মাৎ হয়ে যায়। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক আসে দেখতে। বলুকেও আসবার জন্যে রমা বারে বারে পত্রাঘাত করেছিল। পুজো শেষ হয়ে গেছে। বলু চারদিন এখানে ছিল। আজই চলে যাবার কথা। রমা আটকেছে। আজ যখন শনিবার, তখন আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেই হয়। বলু বিচক্ষণ, আর সম্ভবত আমাকে ভালোও বাসে—তাই রমার কথা ঠেলতে পারেনি।

রাত্রে দরজায় যথারীতি খিল এঁটে, তার ওপর তালা ঝুলিয়ে, খাটের তলা তন্ন তন্ন করে দেখে, অতি সন্তর্পণে মশারি তুলে শয্যামন্দিরে প্রবেশ করলাম।

দুজনের তুলনায় খাটটা যথেষ্ট বড়ো। তারই এক প্রান্তে আমি, অপর প্রান্তে রমা। ধবধব করছে বিছানার চাদর। পরিপাটি করে পাতা—কোথাও এতটুকু কোঁচকানো নেই। দুটো দুটো করে মাথার বালিশ। তার ওপর সুন্দর কাজ-করা ঢাকা। দুজনের জন্যে দুটো লম্বা মোটা পাশবালিশ। এগুলো আগে ছিল না। কবে যে বিছানায় ঢুকেছে, তা আমার খেয়াল নেই। পাশ-বালিশ পেয়ে আপত্তিও করিনি। বরঞ্চ বেশ আরামই পেয়েছিলাম। যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। রমাও পাশবালিশটাকে বেশ কাজে লাগাচ্ছে।

অন্যদিন বিছানায় শুয়ে বিশেষ কথা-বার্তা হয় না, কিন্তু আজ রমা খুব কথা বলছিল। সে-কথা বলুকে নিয়েই। বললে, পুজোর চারটে দিন খুব হৈ-চৈ করা গেল। আমার তো বেরোন হয় না, বলুই একরকম জোর করে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গেল। উঃ কী ভিড়! আমি যত বলছি ঠাকুর [illegible] ঠাকুর দেখে কাজ নেই, ও ততই বলে, ভয় কি এসোই না।

আমি বললাম, ভাগ্যি ভিড়ে হারিয়ে যাওনি।

—হারাব কি! হারাতে দিলে তো। ও তো সব সময়ে আমার হাত ধরে।

রমা একটু থামল। তারপর বলল, শুধু কি একদিন? তিনদিনই। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল পুতুলনাচ। সেখানেও প্রচণ্ড ভিড়। তারপর বেঁটে মানুষ—দেখতে পাই না, বলু যে কী কাণ্ড করে আমায় দেখলে......

এমনি আরোও কত গল্প করে যাচ্ছিল। আমি চোখ বুজে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলাম। ও হঠাৎ বললে, তুমি ঘুমোচ্ছ—কিছু শুনছ না।

আমি অস্ফুট একটা শব্দ করে পাশ-বালিশ আঁকড়ে শুলাম।

ও যেন একটু ক্ষুব্ধ হল। সেই ক্ষোভ প্রকাশ পেল অন্য কথায়।—এই নাও বাপু তোমার টর্চ। শুধু শুধু রোজ মাথায় করে রাখা।

এই বলে হঠাৎ লম্বা ভারী পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা আমার দিকে ঠেলে দিল। টর্চটা গড়াতে গড়াতে আমার গায়ে এসে ঠেকল।

ঘুম কিন্তু সত্যিই আসেনি। আমি মনে মনে রমার কথাই ভাবছিলাম। ওর কি আশ্চর্য ক্ষমতা! রমার মতো একগুঁয়ে জেদি মেয়েকেও বাড়ি থেকে বের করতে পেরেছে। তাও একদিন নয়, তিনদিন! শুধু বেরোনেই নয়, ভিড়ের অসুবিধেও ছিল। তবু স্বচ্ছন্দে রমা ওর হাত ধরে ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল। আমি হলে ওকে বার করতে পারতাম না। ও আমার সঙ্গে কিছুতেই বেরোত না।

এইরকম চিন্তা করতে করতে নিজের যোগ্যতার ওপর ক্রমশঃ আমার অশ্রদ্ধা জন্মাচ্ছিল, এমনি সময়ে টর্চটা গড়াতে গড়াতে আমার গায়ে এসে ঠেকল। আমি টর্চটা হাতে নিয়ে মাথার কাছে রাখতেই অসাবধানে বোতামে চাপ পড়ে গেল। অমনি হঠাৎ অন্ধকার ঘরের মধ্যে এক ঝলক আলো ঠিকরে পড়ল। রমা চমকে উঠে বলল, কি হল?

—না, কিছু না। বলে টর্চটা সাবধানে রেখে চোখ বুঁজলাম।

টর্চটা হাতের কাছে পেতেই আমার হঠাৎই দুটো ব্যাপার মনে পড়ে গেল। সেই পুরনো ব্যাপার মনে পড়তেই বেশ প্রফুল্ল বোধ করলাম। এতক্ষণ নিজের ওপর যে ধিক্কার জন্মাচ্ছিল, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে তা দূরে হল।

প্রথমেই মনে পড়ল, আমার এক বন্ধু গল্প করেছিল তার ফুলশয্যার রাত্তিরে যখন সবাই যে যার ঘরে চলে গিয়েছিল তখন তার সেজ বৌদি চুপিচুপি হাসতে হাসতে কোথা থেকে টুপ করে এসে একটা ছোটো টর্চ তার হাতে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ ও ভাবে টর্চটা গুঁজে দেওয়ার তাৎপর্য সেদিন চব্বিশ বছরের গ্রাম্য তরুণ বর কিছুই বুঝতে পারেনি। এ নিয়ে আর কোনোদিন মাথাও ঘামায়নি। ভুলেই গিয়েছিল ব্যাপারটা। তারপর যেদিন হঠাৎ বুঝতে পারল সেদিন তার প্রচণ্ড হাসি পেল, সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপও হল। এখনও ঘর অন্ধকার থাকে, পাশে স্ত্রীও শোয় কিন্তু অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে টর্চ জ্বেলে প্রথম আবিষ্কার করার মতো কিছু আজ আর নেই।

বন্ধুর এই কথাটা মনে পড়তেই এই নিশুতি রাতে আমার মাথায় একটা বদ খেয়াল চাপল। ঘর তো আজ আমারও অন্ধকার, সুন্দরী অর্ধাঙ্গিনীও নাগালের মধ্যে, টর্চও হাতের মুঠোয়—হোক না পুরনো, তবু আবিষ্কারের অনুকরণটাতেও তো রোমাঞ্চ আছে।

রমার দিকে একবার মিটিমিটি করে তাকালাম। দেখলাম বেচারি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আজ থাক্—আর একদিন বরং এই নতুন উদ্যম দিয়েই দাম্পত্য-লীলা শুরু করা যাবে।

এর পরেই আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। তখন আমি কলেজে পড়ি। আমার এক পিসতুতো দিদির বিয়েতে গেরিডি গিয়েছি। অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছে। তার মধ্যে সকলের আকর্ষণ বিশেষ একজনের ওপর। একটি আনকোরা বিবাহিত দম্পতি এই উৎসবে এসেছিল। সকলের আকর্ষণ বউটির দিকে। আমিও কৌতূহলী হয়ে একটু দেখে নিলাম। শ্যামবর্ণ রং, কপালে একটি টিকলি ঝুলছে, কাজলপরার গুণেই হোক কিম্বা চোখেরই গুণে—ভারী সুন্দর লাগছিল। চোখ দুটির মধ্যে একটা চপলতা ছিল। ওই মধ্যে বউটি কয়েকবার আমাকে দেখে নিল। এত দ্রুত দেখল যে আমি দৃষ্টি ফেরাবার অবসরটুকুও—পেলাম না।

আমি ওখান থেকে সরে এলাম। কিন্তু কেবলই ওর ঐ চাউনির কথা মনে হচ্ছিল। ও অমন করে তাকালো কেন? ও কি আমায় চেনে? কিম্বা দেখেছে কোথাও এর আগে?

নদীর ধারে খানিকটা ঘুরে যখন বাড়ি ফিরলাম বেলা তখন প্রায় বারোটা। খুব হৈ চৈ হচ্ছে। কিছু বুঝতে না পেরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন জাপটে ধরে মুখে হলুদ মাখিয়ে দিল। ফিরে দেখি নব-বধূটি। তারও কাপড়-চোপড় মুখ চোখ হলুদে মাখা। টিপটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। ছেড়ে দেবার পাত্র আমিও নই। তারই হাত থেকে হলুদ নিয়ে তারই মুখে বেশ করে মাখিয়ে দিলাম।

তাতে ও বিরক্ত তো হলই না—চোখ টিপে তার খুশী জানিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

বৌটি এবার আমার মন অধিকার করে বসল। জেনে নিলাম। ওর নাম যমুনা। আসানসোলে বিয়ে হয়েছে। সেখান থেকেই আজ এসেছে। ওর স্বামীকেও দেখলাম। চমৎকার চেহারা। কিন্তু একটু চুপচাপ—একটু যেন গম্ভীর প্রকৃতির। আলাপ করি নি। কারণ আলাপ কেউই করে দেয়নি। যমুনাও আলাপ করেনি—যা করেছে তা একটা খেলা—উচ্ছ্বাস।

সন্ধ্যের পর বিয়ে বসেছে। ঘরের ভেতরে নিমন্ত্রিতের ভিড়। দরজাগুলোয় লোকে ঠাসা। আমি একেবারে পিছনের দিকে রকের জানলায় দাঁড়িয়ে বিয়ে দেখছিলাম, হঠাৎ পিছনে চুড়ির শব্দে চমকে উঠে দেখি যমুনা! কী অপূর্ব সেজেছে—যেন ও নিজেই এইমাত্র বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে এসেছে। যমুনা তার সেই আশ্চর্য চোখ দুটো টিপে মিটি মিটি হাসছে।

—তুমি এখানে! আর তোমায় আমি কোথায় না খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেলাম। বললাম, আমায় বলছেন?

—হ্যাঁ।

বলতে বলতে ও আরও কাছে এগিয়ে এল।

—তোমার নাম কি? আমার নাম যমুনা।

আমি নাম বললাম। ও বললে, তুমি নাম ধরে ডেকো, আমিও তোমার নাম ধরে ডাকব। কেমন?

আমি সম্মতি দিলাম।

—কতক্ষণের জন্যেই বা ডাকাডাকি? তুমি বোধহয় কালই চলে যাবে

আমি মাথা দোলালাম।

—আমরাও বোধ হয় কাল যাব। তোমার ঠিকানাটা কিন্তু চাই।

বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, থাক কালকের কথা কাল—আজ যতটুকু পাই ততটুকুই আনন্দ করে নেওয়া যাক।

আমি নিরুত্তরে তার সেই চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ও আরও কাছে এসে বললে, নদীর ধারে বেড়াতে যাবে?

আমি চমকে উঠলাম। —এখন!

ও হেসে বললে, এখনই তো বেশ। ভিড় নেই—একেবারে ফাঁকা।

—যদি কেউ দেখে ফেলে?

যমুনা হঠাৎ ডুকরে হেসে উঠল। বললে, দেখে ফেললেই বা। আমরা কি কোনো অপরাধ করতে যাচ্ছি।

আমি তবু কোনো সাড়া দিতে পারলাম না।

যমুনা খপ করে আমার হাত ধরে টান দিয়ে বললে, কী ভাবছ?

আমি ঢোক গিলে বললাম, নদীর ধারটা বড্ড অন্ধকার। ওখানে যাওয়াটা—

—ভীতু কোথাকার! আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই যেন গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে তরতর করে ও ফিরে গেল। জানলা থেকে দেখলাম ও দিব্যি দুহাতে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে বিবাহবাসরের মধ্যে একেবারে কনের সামনে গিয়ে বসল।

আমার তখন নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। একটা মেয়ের যা সাহস আছে আমার তা নেই! আমি সত্যিই ভীতু।

বিয়েবাড়ির আনন্দ মুহূর্তে আমার কাছে নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম কোমর বেঁধে পরিবেশন করব তার আর উৎসাহ পেলাম না। এমন কি খেতে পর্যন্ত ইচ্ছে করল না। চুপচাপ একটা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

মনটা খুবই ভারী হয়ে ছিল। আমার যৌবনের ঠিক প্রারম্ভেই যমুনাই সম্ভবত প্রথম যে আমাকে বিচলিত করেছিল। কিন্তু তার কাছেও উপহাসের পাত্র হয়ে গেলাম!

নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত অন্ধকার ঘর। বোধহয় মালীদের ঘরই হবে এটা। সারাদিনের ক্লান্তি. তার ওপর এই গ্লানি—নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হচ্ছিল। চোখ বুজিয়ে কেবলই যমুনার কথা ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে বিবাহবাসর থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল—কখনো পরিবেশনকারীদের হাঁকডাক। আমার ওসব কিছুই ভালো লাগছিল না। আমার সমস্ত চিন্তা—সমস্ত কল্পনা—সমস্ত ভাবনা এখন যমুনাকে নিয়ে। তখন আমার বয়েস উনিশ কুড়ি। কুমারী মেয়ের প্রতি হয়তো বা আকর্ষণ ছিল—কিন্তু বিবাহিতা নারীকে নিয়ে কিছু ভাবতে প্রবৃত্তি হত না। কোনো মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর দেখলে দশ হাত তফাত দিয়ে চলতাম। মনে হত ওকে দিয়ে আর কিছু হবে না—ও আর একজনের হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু যমুনা হঠাৎ আমার সেই সংস্কারের ওপর প্রথম আঘাত হানল। সদ্যবিবাহিতা হয়ে এই যে একটি অপরিচিত কলেজে-পড়া ছেলের ওপর ওর ব্যবহার—এটা কী? না, না, তার জন্যে আমি দুঃখিত নই, আমি শুধু আশ্চর্য! যমুনা কি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিল? আমি সেদিন সকাল থেকে যা যা ঘটনা ঘটেছিল—এমন কি যমুনার দৃষ্টিপাতগুলি পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে বিচার করতে লাগলাম। ও আমায় নির্জন রাত্রে নদীর ধারে যেতে বলল কেন? এ তো স্বাভাবিক কথা নয়। এই কি তাহলে ভালোবাসা? কিন্তু যমুনার মতো সুন্দরী মেয়ে সে আমায় ভালোবাসবে কেন? আমার কী আছে! তার ওপর সে তো বিবাহিতা মেয়ে। তার স্বামী সঙ্গে আছে—রূপবান গুণবান স্বামী। তবে? তবে কি ও আমাকে নিয়ে মজা করছিল? আমাকে একটু খেলাচ্ছিল?

একথা মনে হতেই সর্বাঙ্গে যৌবনের দুর্দমনীয় তেজে জ্বলে উঠল। আমি মনে মনে ভাবলাম ওর সঙ্গে নদীর ধারে যাইনি ভালোই করেছি।

এমনি সময়ে ঘরের মধ্যে কে যেন চুপি চুপি ঢুকল। পায়ে ঝুমঝুম তোড়ার শব্দ—সেণ্টের গন্ধে চারিদিক ভুরভুর। আমি চমকে উঠলাম। দেখি পায়ে পায়ে যমুনা অন্ধকারে সাঁতার কাটতে কাটতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি উঠতে যাব—ও হঠাৎ আমার দুহাত চেপে ধরে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, এখানে শুয়ে আছ যে! খাবে না?

আমি বললাম, শরীরটা ভালো নেই।

—না না, শরীর ঠিক আছে। চলো খাবে চলো।

আমি বললাম, বিশ্বাস করো আমার এতটুকু খেতে ইচ্ছে নেই।

—তবে আমিও খাব না।

বলে চৌকির ওপর আমার পাশে বসতে যাচ্ছে এমনি সময়ে অন্ধকার ঘরে এক ঝলক আলো এসে যমুনার মুখের ওপর পড়ল।

—এখানে কী করছ?

যমুনা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিবর্ণ মুখে বললে, একে খেতে ডাকছিলাম।

এবার টর্চের আলো আমার মুখে এসে পড়ল।

যমুনার স্বামী নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভদ্র। তিনি আর কোনো কথা বললেন না। আলো নিভিয়ে ফিরে গেলেন। যমুনাও অমনি যাকে বলে 'ছায়েবানুগতাম্বচ্ছা' হয়ে স্বামীর পিছনে পিছনে চলে গেল।

হ্যাঁ, এ ঘটনা অনেকদিন আগের। ভুলেই গিয়েছিলাম। আজকে ভাগ্যি রমা টর্চটা আমাকে দিয়েছিল—তাই সেই বিস্মৃত যুগটা ফিরে পেলাম।

আমি অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়ে পড়ে রইলাম। মনে বেশ একটা খুশির রেশ।... কোনো একদিন কেউ একজন আমাকেও ভালোবেসেছিল!...

...বাইরে বোধহয় প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হল। পাশের বাড়ির টিনের চালে চড়বড় চড়বড় করে শব্দ। আমার ঘুম ভেঙে গেল। জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া দরকার ভেবে উঠে বসলাম। কিন্তু রমা কই?

মশারি তুলে খাট থেকে নামলাম। টর্চ জ্বাললাম। দেখি খিল খোলা।

একটু অবাক হলাম। গেল কোথায়? নিশ্চয় বাথরুমেই গেছে। কিন্তু অন্যদিন ও উঠলেই আমায় ডাকে। আজ কি ডেকেছিল? নিশ্চয় ডেকেছিল। আমি হয়তো তখন যমুনার সুখস্বপ্নে বেহুঁস ছিলাম।

এমনি সময়ে অতি সন্তর্পণে দরজার দুই কপাট চেপে পা টিপে রমা ঘরে ঢুকল। আমি নিতান্ত অকারণে, বোধহয় নিজের অজ্ঞাতেই সেই পাঁচ ব্যাটারি টর্চটা জ্বেলে ফেললাম। রুপোলী ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মতো কতকগুলো আলোর ছটা রমার মুখের ওপর ছিটকে গিয়ে পড়ল।

রমা চমকে উঠল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কোথায় গিয়েছিলে?

ও আলো থেকে মুখ সরাবার জন্যে ছটফট করতে করতে বললে, বাথরুমে।

যেমন সহজ প্রশ্ন তেমনি সরল উত্তর। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করার রইল না। কিন্তু টর্চের আলোয় রমার চমকে ওঠা মুখখানা বহুদিন আগের আর একজনের ভীতি-বিহ্বল মুখের সঙ্গে যেন আশ্চর্যভাবে মিলে গেল।

রমা তখন অতি ধীরে অভ্যাসমতো পাপোষে ভালো করে পা দুটি মুছে গুটি-গুটি বিছানায় ঢুকছে। আমিও অনুসরণ করলেই পারতাম। বিশেষ এই ঘনবর্ষার রাতে বন্ধুর সেই পরামর্শ মতো টর্চের খেলা শুরু করলেও করা যেতে পারত। কিন্তু আমি টর্চ নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়েই রইলাম। আমার সমস্ত শরীরের ওপর তখন যেন কী একটা সন্দেহের কালো সরীসৃপ কিলবিল করছে। ইচ্ছে করল এখনই রমাকে বিছানা থেকে টেনে বার করে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে জেরা করি।

কিন্তু তা পারলাম না। যমুনার স্বামীও সেদিন কোনো জেরা করেনি।
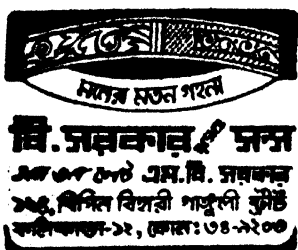
গোল টেবিল বৈঠকের কাছে বহু লোকের বহু আশা ছিল। তা নইলে ও বৈঠক বসত না, ওতে কংগ্রেসের উপস্থিতি অবশ্যপ্রয়োজনীয় হতো না, তার জন্যে গান্ধী আরউইন চুক্তির নজীর স্থাপন করতে ব্রিটিশ প্রভুরা সম্মত হতেন না।

আশাভঙ্গের জন্যে কে দায়ী, কে দায়ী নয়, কে কতটুকু দায়ী, এ বিচার ইতিহাসের ওপর ছেড়ে দিয়ে শুধু তার ফল কী হলো তা দেখা যাক।

ফল হলো এই যে দেশীয় রাজারা আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেলেন। ফেডারেশনে যোগ দিতে তাঁদের সত্যিই কোনো তাগিদ ছিল না। কর্তারাই তাঁদের ধরে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারী ব্লকের মতো একটা আজ্ঞাবহ ব্লক গঠন করা হয়। সেই ছিদ্র দিয়ে কে জানে কখন দেশীয় রাজ্যে গণতন্ত্র ঢুকবে, আর রাজাদের কর্তৃত্ব যাবে এই ভয়ে তাঁরা ক্রমে ক্রমে বিমুখ হলেন।

বাকী থাকে পরিকল্পিত মাইনরিটি ব্লক। কিন্তু তাকে দিয়ে কংগ্রেসকে ব্যালান্স করতে হলে এত বেশী ওয়েটেজ দিতে হয় যে মেজরিটি মাইনরিটি সমান সমান হয়ে যায়। যাকে বলে প্যারিটি। তা হলে দাঁড়িপাল্লা থেকে যায় বড়লাটের হাতে। তার নাম স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস কখনো তাতে রাজী হতে পারে না।

তাছাড়া ও জিনিস মাইনরিটিদের শিবিরে হরিজনদের না ঢোকালে সম্ভব নয়। সেটা করতে গেলে হিন্দুসমাজের বল কমে যায়, অস্পৃশ্যতাও আইনসিদ্ধ হয়। গান্ধীজী তার প্রতিরোধ করতে দৃঢ়সংকল্প। অথচ সেটা যদি না করা হয় তবে মাইনরিটি ব্লক কংগ্রেসের সমকক্ষ হতে পারে না।

কংগ্রেসকে তা হলে ব্যালান্স করবে কে? কেউ যদি না করে তবে ফেডারেশন হয়ে দাঁড়ায় কংগ্রেসরাজ। ফেডারেশনের আইডিয়াটা এসেছিল মুসলমানদের মহল থেকে। তাঁরা চেয়েছিলেন হিন্দুপ্রধান ভারতে হিন্দু মেজরিটি রাজত্ব করতে পারবে না, যদি খেলার নিয়মটা পাল্টে দেওয়া হয়, যদি মেজরিটি আর মাইনরিটি সমান ওজন হয়। কিন্তু মহাত্মার অনশনের পরে দেখা গেল হরিজন বিনা তাঁরা ওজনে হালকা। হরিজন সমেত কংগ্রেস ওজনে ভারী।

তাই যে-মুসলমান মহল একদিন ফেডারেশন দাবী করেছিলেন তাঁরাই আরেকদিন ফেডারেশন প্রত্যাহার করে পার্টিশনের প্রস্তাব তুললেন। অখন্ড ভারত আর নয়। এখন চাই মোসলেম ভারত। যার নাম পাকিস্তান।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তান কথাটির উৎপত্তি ওই গোল টেবিল বৈঠকের সময়ই। বৈঠকের বাইরে রহমৎ আলী বলে এক-জন ছাত্র মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির নামের আদ্য অক্ষর মিলিয়ে ওই পেটেন্ট শব্দটি উদ্ভাবন করেন। সে সময় মুসলিম জননায়করা কেউ ওতে গুরুত্ব আরোপ করেন নি। সবাই তাঁরা ছিলেন অখন্ড ও অবিভাজ্য

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভারতে বিশ্বাসী। তাঁদের অবিশ্বাস ছিল শুধু ব্রিটিশ রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে কংগ্রেসরাজের উপর। কারণ কংগ্রেসরাজ কার্যত হিন্দুরাজই হবে। তাঁদের ভরসা ছিল যে আলাপ-আলোচনা ও চুক্তির সূত্রে এমন এক মীমাংসায় পৌঁছানো যাবে যেটা মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য, অথচ কংগ্রেসের বর্জনযোগ্য নয়। গান্ধী যদি তাতে রাজী হয়ে যান ব্রিটেনকে রাজী করানোর দায় অন্যেরা নেবেন। তাঁরাও তো চান ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি। তবে তার আগে চান সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত।

ওইখানেই কাঁটা। সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত আর রাজনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে কোনটা এক নম্বর ও কোনটা দু নম্বর এই প্রশ্নের উত্তরে গভীর মতভেদ। কংগ্রেসের কাছে, গান্ধীজীর কাছে স্বরাজ হচ্ছে এক নম্বর ও সাম্প্রদায়িক দু নম্বর। মুসলিম নেতাদের কাছে, ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হচ্ছে এক নম্বর, স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে দু নম্বর। এ মতভেদ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতীয় রাজনীতির একটা ফান্ডামেন্টাল রিয়ালিটি। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটা আরো প্রকট হয়। মতভেদের উপসাগরের উপর সেতুবন্ধ করেছিলেন ঝীণা। তাঁর পেছনে ছিলেন টিলক। কিন্তু তাঁদের সেই লখনউ চুক্তির পর দেখা গেল উপসাগর আরো প্রশস্ত হয়েছে, সুতরাং আরো প্রশস্ত সেতু চাই। এবার কিন্তু কংগ্রেস বা গান্ধী সেদিক দিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না, কারণ পরে সেই উপসাগর আরো বেশী প্রশস্ত হবে, আরো বেশী প্রশস্ত সেতুর দরকার হবে। অমন করে যে সমাধান হয় সেটা চূড়ান্ত নয়। আর তাতে সাম্রাজ্যের অন্ত হয় কোথায়? লড়তে তো হবেই বার বার। লড়াইয়ের সময় মুসলিম লীগ কোথায়?

লড়ুয়ে মুসলমানদের নিয়েই গান্ধীজী রাজনীতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যে কাজ আর কেউ কোনদিন পারেন নি। খেলাফতীদের সর্দার হবার পরেই তিনি কংগ্রেসীদের সর্দার হন। খেলাফতীরা এর মধ্যে পিছিয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও লড়ুয়ে মুসলমান বড়ো কম নেই গান্ধীজীর শিবিরে। গান্ধীজীর মন পড়ে রয়েছিল স্বদেশের অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত সংগ্রামে। হিন্দু মুসলমানের সংগ্রামী একতায়। গোল টেবিল বৈঠকের উপর তাঁর আস্থা থাকলে তিনি বড়ো বড়ো কংগ্রেস নেতাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। তা বলে মানবপ্রকৃতিতে তাঁর অবিশ্বাস ছিল না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সবাই মিলে একবার দেখতে হবে গোল টেবিলে সম্মানজনক মিটমাট হয় কিনা। অহিংসাবাদী কখনো সম্মানজনক মিটমাটের সুযোগ ছাড়েন না। সুযোগ পেলে গ্রহণ করেন, প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ব্যর্থতাও সিদ্ধির সোপান।

তারপর অহিংসাবাদী সুযোগ পেলেই তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে প্রতিপক্ষের অন্তঃপরিবর্তনে প্রয়াসী হন। গোলটেবিল বৈঠক তাঁকে অভূতপূর্ব সুযোগ দেয়। বৈঠকের সভাপতি লর্ড স্যাঙ্কি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—

"How Mr. Gandhi managed to stand the physical and mental strain of that Conference has always been a marvel to me. Without fail he was there at the beginning and he remained till the end of the day's work. A note made at the time tells me that on some days as many as 80,000 words were spoken. But Mr. Gandhi's real task only began when the Conference adjourned. Hour after hour till late in the night, and early in the morning, he was engaged in conversations and interviews with the different interests, doing his best to get them into line and to bring them to his own way of thinking. Prime Ministers and Dictators have means and opportunities of imposing their views on their peoples, but it is doubtful whether there has ever been any man, other than Mr.

Gandhi, who has in his lifetime won so many millions of men over to his side by his own efforts and example".

সাধারণত তিনি দিনে একুশ ঘণ্টা খাটতেন। তাঁর মতে গোল টেবিল বৈঠকের বাইরেই আদত গোল টেবিল বৈঠক। তাঁর কাজ কেবল জনাকয়েক রাজনীতিককে নিয়ে নয়, সর্বস্তরের ইংরেজকে নিয়ে। ইংরেজ জাতিকে নিয়ে। সেইজন্যে তাঁর আস্তানা ওয়েস্ট এন্ডের সম্ভ্রান্ত হোটেলে নয়, ইস্ট এন্ডের গরিবপাড়ায় অবস্থিত কিংসলী হল নামক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে। যাকে বলা হয় সেটলমেন্ট। কতকটা আশ্রম, কতকটা ক্লাব। যুদ্ধে নিহত কিংসলী লেস্টারের বোন মুরিয়েল তার পরিচালিকা। আমার বন্ধুর বন্ধু। এর বছর দুই আগে আমিও সেখানে গেছি। উপর তলায় কয়েকটি সেল দেখেছিলুম, যেমন মঠবাড়ীতে থাকে। সাধক কর্মীদের জন্যে। তারই একটিতে গান্ধীজী তিনমাস থাকেন। মীরা বেনকে নির্দেশ দেন তাঁর খোরাকের জন্যে দিনে দেড় শিলিং বা এক টাকার বেশী যেন খরচ না হয়। বিলেত গিয়েও তিনি তাঁর বেশভূষা বদলান না। সেই অর্ধ উলঙ্গ ফকির।

কাজকর্মের সুবিধের জন্য তিনি নাইটসব্রিজ অঞ্চলে রাখেন ছোট একটি আপিস। অসংখ্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বা তিনি তাঁদের সঙ্গে। বার্নার্ড শ তাঁদের একজন। শ বলেন গান্ধী হচ্ছেন 'মহাত্মা মেজর' আর তিনি 'মহাত্মা মাইনর'। শ আরো বলেন, 'আপনি ও আমি পৃথিবীর একটি অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোক।'

চার্চিল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, চার্চিলেরই এক সম্পর্কিত ভাগিনী ক্লেয়ার শেরিডান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সরোজিনী নাইডুর সহায়তায় মহাত্মার মূর্তি মডেল করার অনুমতি পান। গান্ধীজী সহজে রাজী হননি। উনি পোজ করবেন না।

মিসেস শেরিডান লেনিনেরও মূর্তি মডেল করেছিলেন। এগারো বছর আগে। তখন লেনিনও একই রকম শর্ত করেছিলেন। দু জনের মধ্যে কৌতূহলপ্রদ সাদৃশ্য ছিল।

"The first time I found myself in his presence, the Mahatma said (just as Lenin had said), "I cannot pose, you must let me go on with my work, and do the best you can".

Gandhi squatting upon the floor proceeded with his weaving. Lenin in his office chair went on reading.

I sensed—on both occasions—a silent resentment, but in each case it ended on terms of great mutual friendship. One day Gandhi, in almost the same words and with the same ironical smile as Lenin, observed:

"So you are a cousin of Mr. Winston Churchill"

It was the same old joke: Winston's relation fraternising (yes?) with his arch enemy! And Gandhi pursued:

"You know he refuses to see me? But you will tell him, won't you, from me how glad I am to see you."

Lenin in much the same way: "You will tell cousin......etc."

And when their respective heads were finished and I asked one and the other the question: "What do you think of it?" they answered identically. "I don't know—I cannot judge my own face, and I know nothing about Art—but you have worked well!"'

লেনিনের সঙ্গে গান্ধীর এই সাদৃশ্যের বর্ণনায় মনে পড়ে লেনিনের মৃত্যুর কিছুদিন বাদে লেনিন ও গান্ধী বলে একখানি বই বেরোয়। লেখক একজন অস্ট্রিয়ান। রেনে ফ্যুলপ-মিলার। এ যুগে এক বন্ধনীভুক্ত করবার মতো নাম ওই দুটিই। যদিও মতবাদ ভিন্ন।

কিংসলী হলে আমোদ আহ্লাদের সময়েও গান্ধীজীকে ডাক পড়ত। প্রায় লোকনৃত্যস্থলে উপস্থিত থাকতেন। 'মিঃ গান্ধী, আপনি কি আমাদের সঙ্গে নাচবেন না?' শ্রমিক নরনারীর এই অনুরোধে গান্ধীজী বলতেন, 'নিশ্চয়। আমার হাতের ছড়ি হবে আমার সঙ্গিনী।'

এটা হলো ওদের নির্দোষ বিনোদন। ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে গেলে এতে যোগ দিতে হয়।

এ নিয়ে গান্ধীজীর এক পিউরিটান অনুবর্তী প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'যাদের সঙ্গে আমরা মিশতে চাই তাদের জীবনের ধারা বুঝতে হবে, তার সমঝদার হতে হবে। ভুলে যেয়ো না লোকনৃত্য হচ্ছে ইংরেজ জাতির একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত প্রথা।'

সময় করে তিনি দিন দুই কাটিয়ে আসেন ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল মজদুরদের সঙ্গে। যারা তাঁরই বয়কট আন্দোলনের দরুণ বেকার। তাদের সমবেদনা জানিয়ে তিনি বোঝান যে বেকার হলেও তারা বুভুক্ষু নয়, যেমন ভারতের কর্মহীন ও অর্ধকর্মহীন নরনারী। তারা কি ভারতের কাটুনি ও তাঁতীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেরা সমৃদ্ধ হবে। তারা বোঝে ও তাঁর সঙ্গে একমত হয়। তাঁর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ফোটো তোলায়। চীয়ার দেয়। বেশীর ভাগই মজুরনী। তাদের মাঝখানে পড়ে গান্ধী যেমন সহাস তেমনি লজ্জাকুল।

একদিকে যেমন ইংলন্ডের দীনদুঃখীদের সঙ্গে মেলা অন্যদিকে তেমনি ধার্মিক, বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী, গুণী তথা রাজনীতিকদের সঙ্গে। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।' এমনকি রাজা পঞ্চম জর্জের বাকিংহাম প্রাসাদেও। সেখানেও সেই ফকিরের বেশ। রাজা বলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনাকে আমি দেখেছি। তখন ও তারপরেও ১৯১৮ সাল অবধি আপনি তো একজন ভালো মানুষ ছিলেন। পরে আপনার মাথা কিছু একটা বিগড়ে যায় বলে মনে হয়।' গান্ধী তাঁর সঙ্গে তর্ক করেন না। নীরব থাকেন। পরে যখন রাজা আরো বলেন যে, বিদ্রোহ বরদাস্ত করা হবে না, দমন করা হবে, রাজসরকারকে চালু রাখতে হবে তখন গান্ধীজী ভদ্রভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রতিবাদ করেন।

ধার্মিকরা তাঁকে তাঁদেরই মতো একজন খ্রীস্টান বলে আপনার করে নেন। মড রয়ডেনের মতে শ্রেষ্ঠ খ্রীস্টান। যীশু খৃস্টের তিনি যত কাছাকাছি আর কেউ তত নন। আরনেস্ট বারকারের মনে হলো যে গান্ধী হচ্ছেন এ যুগের সেন্ট ফ্রান্সিস তথা সেন্ট টমাস আকুইনাস। তাঁর মধ্যে যেমন এ দুয়ের মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি একজন প্র্যাকটিক্যাল কাজের লোকের। মিশ্রণটাই সারকথা। অবিমিশ্র হলে ফল হতো না।

অক্সফোর্ডের পরম সম্মানিত অধ্যাপকগণ—তাঁদের মধ্যে ছিলেন বেলিয়লের অধ্যক্ষ, গিলবার্ট মারে, মাইকেল স্যাডলার, পি সি লায়ন—তাঁকে তিন ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড টমসন লিখেছেন—

"The conviction came to me, that not since Socrates has the world seen his equal for absolute self-control and composure; and once or twice, putting myself in the place of men who had to confront that invincible calm and imperturbility, I thought I understood why the Athenians made the 'martyr-sophist' drink the hemlock."

ঘরে ফেরার পথে গান্ধীজী সুইটজারল্যান্ডের ভিলনভ গ্রামে রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে মিলিত হন। রলাঁ তাঁকে স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করেন, যদিও স্বয়ং অসুস্থ। আট বছর আগে রলাঁই 'মহাত্মা গান্ধী' লিখে তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করে দিয়েছিলেন। মীরাবেনকেও গান্ধীসকাশে পাঠিয়েছিলেন তিনিই। পরের দিন রলাঁ বলেন, 'আমার তো ভয় ছিল যে এ জীবনে আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। তার পূর্বেই চলে যেতে হবে।'

শোবার ঘরেই কথাবার্তা হয়। দেয়ালে দৃশ্যমান এই কজনের মস্তকের আলেখ্য—গোটে, বেঠোফেন, টলস্টয়, গর্কি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, লেনিন ও গান্ধী। সেই গান্ধীই আজ উপস্থিত। কিন্তু লেনিন আর নেই। রলাঁর মহা খেদ লেনিনের সঙ্গে গান্ধীর কোনোদিন সাক্ষাৎ হলো না। 'যে লেনিন আপনার মতোই কোনোদিন সত্যের সঙ্গে আপস করেননি।' অর্থাৎ সত্যের থেকে নড়েননি।

ফরাসী বিপ্লবের মানস পুত্র রলাঁ টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন। যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে'। যুদ্ধের সময় থেকে সুইটজারল্যান্ডেই রয়েছেন। চার বছর আগেও আমি তাঁকে যুদ্ধবিরোধী দেখেছি। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে তিনি ধীরে ধীরে শান্তিবাদ অতিক্রম করে যেখানে উপনীত হন সেটা যদিও লেনিন-

বাদ নয় তবু লেনিনের দেশের বিপ্লবকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখার বজ্রকঠোর সংকল্প। তার মানে দরকার হলে যুদ্ধ।

হিংসা অহিংসা আর তাঁর কাছে মুখ্য ইস্যু নয়, যেমন ছিল 'মহাত্মা গান্ধী' রচনার কালে। এখানকার মুখ্য ইস্যু হচ্ছে বিপ্লব প্রতিবিপ্লব। গান্ধীর থেকে তিনি দূরে সরে গেছেন। কিন্তু যে গান্ধী সত্যনিষ্ঠ সে গান্ধীর কাছ থেকে নয়। সত্যই উভয়ের যোগসূত্র। সত্য নিয়ে দুজনের আলোচনা হয়। ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা নিয়ে রলাঁ যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না অবস্থার সঙ্গে খাপ খাবে কোন্ ব্যবস্থা।

'হিংসার উত্তর না দিয়ে সহ্য করার বীরত্ব যদি কোনো নেশনের থাকে তবে সেইটেই হবে সবচেয়ে কার্যকর শিক্ষা। কিন্তু তার জন্যে চাই অখন্ড বিশ্বাস।' ইতি গান্ধী।

'কোনোকিছুই আধাআধিভাবে করা উচিত নয়, তা সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক।' ইতি রলাঁ।

গান্ধীর অনুরোধে রলাঁ তাঁকে বেঠোফেনের পঞ্চম সিম্ফনি পিয়ানোতে বাজিয়ে শোনান। এমনি করে পাঁচদিন অতিবাহিত হলে রলাঁ তাঁকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে বিদায় দেন। দুজনে দুজনের কাঁধে গাল রেখে মাথায় গাল ঠেকিয়ে সাদরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন। 'ওটা হচ্ছে সেন্ট ডমিনিক ও সেন্ট ফ্রান্সিসের চুম্বন।' উপমাটা রলাঁর:

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

রাজনৈতিক দল

রয় এফ নিকলস একজন বিশিষ্ট মার্কিন ঐতিহাসিক। তাঁর মার্কিন গণতন্ত্র-বিষয়ক একটি গ্রন্থ পুলিটজার প্রাইজে সম্মানিত হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন রাজনৈতিক দলের বিবর্তন বিষয়ে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। মার্কিন রাজনৈতিক দলের এই বিবর্তন এক জটিল প্রসঙ্গ। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের সবচেয়ে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের জন্য, আমরা ১৯৬৭-র পর এইসব ক্ষুদ্র দলগুলির মধ্যে দৃঢ়তার অভাব দেখে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বেগ প্রকাশ করি। সেই কারণে মার্কিন গণতন্ত্রে কিভাবে মাত্র দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছে, এই বিষয়ে জানার কৌতূহল রাজনীতি-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই থাকা উচিত। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, মার্কিন মুলুকের এই দুই-পার্টি ব্যবস্থা কিন্তু পূর্ব-পরিকল্পিত নয় এবং এর পিছনে কোনো গঠনতান্ত্রিক সমর্থন নেই।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন হ্যালেট ছিলেন মাসাচুসেটসের অধিবাসী। তিনি ডানিয়েল ওয়েবস্টারকে জব্দ করার বাসনায় তাঁর রাজ্যে ডেমোক্রাটিক দলকে সংঘবদ্ধ করেন। নিকলস বলেছেন, ফ্রাঙ্কলিন হ্যালেট ছিলেন তেরটি বোনের পিঠে একমাত্র ভাই এবং তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে এই ক্রমবিকাশের পিছনে আছে বহু শতাব্দীর বিবর্তনী নীতি। মার্কিন মুলুকের রাজনৈতিক বিন্যাস ব্রিটেনের প্রাচীন অধিবাসীদের মতই প্রাচীন। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় সংস্কার ব্যবস্থারও পূর্বেকার রীতিনীতি-এর সঙ্গে বিজড়িত। মার্কিন দল বিন্যাস নাকি যে প্রথম জাহাজ ইংলন্ডের উপকূল থেকে যাত্রীদল নিয়ে এসেছিল সেই সঙ্গেই শুরু হয়েছে। অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আজ যেভাবে দল বিভাগ দেখা যায়, সেইভাবে দল সংগঠন সম্ভব হয়েছে গৃহযুদ্ধের প্রাক্-মুহূর্তে। সেই রাজনৈতিক যন্ত্র কিভাবে সার্থকতা লাভ করেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন রয় নিকলস তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'দি ইন-ভেনসন অব দি আমেরিকান পলিটিক্যাল পার্টিস' নামক গ্রন্থে। মিঃ নিকলস পেনি-সিলভ্যানিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং একদা আমেরিকান হিসটরিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। গণতন্ত্রের বিষয়ে তিনি কয়েকখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইতিহাসের দিক থেকে মার্কিন গণতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসনের উৎপত্তি অ্যাংলো-মার্কিন। কোনোদিন এর পরিকল্পনা করা হয়নি, কিংবা এটা প্রকল্প হিসাবে গৃহীত হয়নি। আইনবিধির মধ্যে এই দল বিভাগের বিস্তারিত বর্ণনা নেই। অথচ এই পদ্ধতির প্রচলন ডেমোক্র্যাসির যন্ত্রে লীন হয়েছে।

সূত্রপাত থেকেই আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্ত শাসন-ব্যবস্থা ছিল না, তবে অতলান্তিকের কূলে কিছু পরিমাণ স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল এবং সঞ্চালকদের নির্বাচনে অধিবাসীরা অংশ গ্রহণ করতেন। ইংলণ্ডস্থ তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পছন্দ-মত মানুষকে নির্বাচনের নীতি তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। মার্কিন মুল্লুকে এসে তাঁরা অনেকটা সেই নীতিই মেনে চলেছেন।

অতলান্তিক গণতন্ত্র বহু মানবের ব্যবহার ও মনোভঙ্গীর দ্বারা একটি রাজনৈতিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে দীর্ঘকালের ব্যবধানে। একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক যন্ত্র সৃষ্টির জন্য বহু প্রতিভাধর মানুষকে নানাবিধ উদ্ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করতে হয়েছে। মার্কিন রাজনৈতিক ধারার বহুবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে একটি নীতি গড়ে উঠেছে যেটা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক। স্বায়ত্তশাসন-ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করার কাজ ক্রমশ জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

এই সমন্বয় সাধনে যে-যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, তা এক অপরূপ বস্তু। মার্কিন রাজনৈতিক যন্ত্র দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে দ্বি-দল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থার সাফল্যের ফলে নিয়মমাফিক নির্বাচন সম্ভব হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এর পিছনে কোনো সংগঠনতন্ত্র-সম্মত স্বীকৃতি নেই।

নিকলস তাঁর প্রথম পরিচ্ছেদটির নামকরণ করেছেন 'সেনচুরিস অব ইভলিউসন্‌' অর্থাৎ বহু শতাব্দীর বিবর্তন। এই রাজনৈতিক যন্ত্রের অনেক অংশ সুপ্রাচীন, কারণ, তার উদ্ভব প্রাচীন ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডের উপকূল থেকে বাস্তুহারা হয়ে যাঁরা 'আমেরিক্যান সেট্‌লার্স' হিসাবে অতলান্তিকে এসেছিলেন, তাঁরা এই প্রাচীন বৃটিশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে এই ধারা সঙ্গে এনেছিলেন। সম্রাট আলফ্রেডের আমলের অ্যাংলো-স্যাকসন ক্রনিকাল পরবর্তী কালের ইতিহাসকারগণ সংশোধন করে পরিশুদ্ধ করেছেন। ইংরাজ উপনিবেশিকরা নতুন দেশে বাস করতে এসে তাঁদের স্বদেশের নির্বাচনী নীতিটুকুও সঙ্গে এনেছিলেন। এ যেন স্বদেশের তুলসী গাছকে নতুন দেশের মাটিতে এনে বসানো হল।

প্রকৃতপক্ষে শাসন-ব্যবস্থার কথা কেউ চিন্তা করেননি। নিকলস বলেছেন, টেমসের ব্ল্যাকওয়াল থেকে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর যাঁরা জাহাজে উঠেছিলেন, সেই জাহাজের কেবিনে এবং ডকেই মার্কিন রাজনৈতিক আচরণবিধি সৃষ্টি হয়েছিল। আমেরিকায় বাণিজ্যিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই লন্ডন এবং প্লাইমাউথের ব্যবসায়ীরা পাড়ি দিয়েছিলেন। প্লাইমাউথের দল বিপর্যয়মূলক শীতের প্রকোপে পলায়ন করতে বাধ্য হন কিন্তু লন্ডনগোষ্ঠী শেষপর্যন্ত টিঁকে থেকেছিলেন আর তাঁরাই স্থায়ী হয়েছেন।

তিনটি ছোট জাহাজে একশ'জন পুরুষ ও চারটি বালক নিয়ে গঠিত এক দলকে নতুন অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য সন্ধানে পাঠানো হয়। তিনজন ক্যাপ্তেন প্রথমটায় জানতেন শুধু জাহাজ চালনাই করতে হবে, কিন্তু স্থলে অবতরণ করে সীলমোহর-করা খাম খুলে দেখলেন, তার ভিতর কিভাবে সরকার গঠন করে শাসন-ব্যবস্থা চালাতে হবে তার নির্দেশনামা।

সুদীর্ঘ যাত্রা, কঠিন পথ, এডওয়ার্ড উইংফিল্ড আর জন স্মিথের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ বাধল। উইংফিল্ড মিউটিনির অপরাধে জন স্মিথকে লোহার শিকল দিয়ে জাহাজে বন্দী করলেন। এই ব্যক্তিগত কলহের পিছনে

একটা রাজনৈতিক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল এবং উত্তরকালে তা বিশিষ্ট ধারার সূত্রপাত করে। উইংফিল্ড কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি হলেন এবং জন স্মিথ হলেন সংগ্রামী জনতার প্রতিনিধি। এই মৌলিক ধারাই উত্তরকালের রাজনৈতিক দল গঠনে বার বার মাথা তুলেছে। এই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব পরবর্তী কালে গঠিত শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে এই ভার্জিনিয়া জাহাজের কর্তাদের নিয়ে কাউন্সিল ফর ভার্জিনিয়া গঠিত হয়। এ'রা যদিও কোম্পানীর অংশীদার, তবু এ'দের পিছনে ছিল সম্রাটের আশীর্বাদ। তাঁরাই সম্রাটের প্রতিনিধি। ভার্জিনিয়ার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক নীতি অনুসারে তাঁরা সাতজনকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করলেন। এ'রাই সঞ্চালক। এডমিরাল নিউপোর্টের কাছে ছিল সীল-করা বাক্স, তবে নির্দেশ ছিল আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করার পূর্বে তা খোলা নিষিদ্ধ।

চেসাপীকে এক এপ্রিল মাসের সন্ধ্যায় ঝড়ের মুখে জাহাজ নোঙর ফেলল। সেইখানে সীল ভেঙে সাতজনের শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনামা পাওয়া গেল। সেই নির্দেশ অনুসারে স্মিথও সাতজনের একজন. কিন্তু তখন কঠিন শৃংখলে তিনি বাঁধা। কোম্পানীর কর্মচারী তিন ক্যাপ্টেন এবং উইংফিল্ড সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই ভার্জিনিয়া কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হলেন উইংফিল্ড, আর স্মিথকে সকল শলা-পরামর্শ থেকে দূরে রাখা হল।

এই দলটি আবিষ্কারের অভিযানে বেরিয়ে জেমস টাউন নামক এক জলাভূমি আবিষ্কার করে সেইখানে তাঁবু ফেললেন। নিউপোর্টকে পরবর্তী গ্রীষ্মকালে দেশে ফিরতে হবে। তিনি দেখলেন উইংফিল্ড আর তাঁর সহযোগীরা দুর্বল এবং কোনো-রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। স্মিথের মধ্যে একটু রোমান্টিক ভাব থাকলেও তাঁর কর্ম-ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব গ্রহণের শক্তি ছিল। নতুন অধিবাসীদের কাছে কাউন্সিল বেশ অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কোনোরকম মিটমাট করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই তাঁর যাত্রার সময় আসন্ন হওয়ায় তিনি স্মিথকে কাউন্সিলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর নির্দেশ গৃহীত হল, নিউপোর্ট চলে গেলেন। উইংফিল্ড এখন এমন এক কাউন্সিলের সভাপতি যেখানে নিউপোর্টের মত ঠান্ডা-মস্তিষ্কের মানুষ নেই আর, ক্যাপ্টেন জন স্মিথ বিরোধী দলের দলপতি। অবস্থাও চরমে উঠেছে। আহার্য হ্রাস পেয়েছে, স্থানীয় ইন্ডিয়ানরা বিরোধী, অতিরিক্ত গরম, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা, আর কোথাও স্বর্ণের সন্ধান নেই। কিছুসংখ্যক উপ-নিবেশবাসী ম্যালেরিয়ায় ভুগে মারা গেল। আর বাকী কিছু ইন্ডিয়ানদের হাতে নিহত হল। ফলে জর্জ কেনডালকে কাউন্সিল থেকে বিতাড়িত হলেন। ক্যাপ্টেন গসনোলড জ্বররোগে মারা গেলেন আগস্টে। মাত্র চারজন রইলেন কাউন্সিলে। উইংফিল্ড অপদার্থ। এখন স্মিথের সুযোগ এল। স্মিথ আর জন মার্টিন দুজনে কোম্পানী-বিরোধী দলের প্রতিনিধি। তাঁরা দুজনে মিলে উইংফিল্ডকে সরিয়ে র‍্যাটক্লিফকে প্রেসিডেন্ট করলেন। একদিন প্রভাতে উইংফিল্ডের তাঁবুতে সবাই সই করে একটি অভিযোগপত্র দিলেন। অভিযোগ অনেক। চুরি, সরকারী খাদ্য অপচয়। অপরে যখন অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, তখন তিনি সরকারী খাদ্য নিয়ে ভোজ দিয়েছেন। নাস্তিক এবং কলোনির একটি মাত্র জাহাজ নিয়ে পলায়ন চেষ্টায় স্প্যানিশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাঁকে বরখাস্ত করা হল। স্মিথের নেতৃত্বে তিন-শাসক আদালত গঠন করে তাঁর বিচার করতে বসল। উইংফিল্ড রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়ায় তাঁরা তাঁকে বন্দী অবস্থায় জাহাজে তুলে দেশে পাঠালেন। এদিকে অন্নাভাবের জন্য স্মিথ অন্ন সন্ধানে অভিযানে বেরোলেন। তখন আবার তাঁকে হটিয়ে স্মিথের শত্রু গ্যাব্রিয়েল আর্চারকে দলে নেওয়া হল। এ'রা কোম্পানীর বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে একটি জনপ্রিয় নির্বাচিত শাসকগোষ্ঠী তৈরী করলেন। আমেরিকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির এই প্রথম পদক্ষেপ।

নিকলসের গ্রন্থটি সুবৃহৎ এবং অজস্র তথ্যে পরিপূর্ণ।

—অভয়ঙ্কর

THE INVENTION OF AMERICAN POLITICAL PARTIES: By Roy F. NICHOLS: Published by SCIENTIFIC BOOK AGENCY: 22, Raja woodmunt Street, Calcutta.-1. Price—Rupees Eight only.

আজকের কথা

ভাষার যে সামাজিক কৃত্য—পরস্পর যোগাযোগসাধন, তার জন্য নতুন করে কোন একটি ভাষার উপর অযথা শ্রম ও অর্থব্যয় অনাবশ্যক। প্রচণ্ড অপব্যয়। ঐ কাজটা ইংরেজি ভাষা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করছে, সেই ব্যবস্থা ভণ্ডুল করার কিছুমাত্র কারণ ঘটেনি। ইংরেজি ভাষা সমৃদ্ধ, অতিশয় নমনীয়, ভাব-প্রকাশের উৎকৃষ্ট বাহন। এছাড়া আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি। ইংরেজি ভাষা জেঁকে বসেছে, সেটা সৌভাগ্য বলেই মনে করি। 'ইংরেজি হঠাও' মানে আজকের দিনে বাইরের দুনিয়ার জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া। ক্ষেত্রান্তরে এই নিয়ে বিস্তর বলেছি, আজ আর কথা বাড়াব না।

গুণিসমাজে আর একটি প্রসঙ্গ তুলছি। আমাদের সাহিত্য ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না—তাদের বিপক্ষে কড়া রকমের কিছু না লিখলেই হল। সাহিত্য তখন অর্থকরী পণ্য নয়, সাহিত্য-সাধকের তপস্যার সামগ্রী। সরকারী ঔদাসীন্যের মধ্যেই মহৎ ও মহামূল্য বঙ্গ-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর সাহিত্যেও স্বদেশী সরকারের দৃষ্টি পড়ল। সাহিত্য আকাদেমি গড়া হল নয়াদিল্লীতে। উদ্দেশ্য : সাহিত্যকর্মে উৎসাহদান, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মীয় - চেতনার উজ্জীবন। তপশিলভুক্ত প্রতিটি ভাষায় একজন করে সাহিত্যকার প্রতি বছর পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার পান। তদতিরিক্ত খেতাব খেলাত রাজসভায় আসনদান ইত্যাদি ব্যবস্থাও আছে। দেখাদেখি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও রবীন্দ্র-পুরস্কার নামে ঐরকম পাঁচহাজারী পুরস্কার চালু করলেন—একটা নয়, তিন-তিনটে। আকাদেমি পুরস্কার তবু রাজনীতি-নিরপেক্ষ সাহিত্য আকাদেমির মারফতে দেওয়া হয়, রবীন্দ্র-আকাদেমি পুরস্কার একেবারে সরাসরি সরকারী আওতায়। মতলব আরোপ করছিনে, সম্ভবত সাধু ইচ্ছার তাড়নাতেই পুরস্কারের প্রবর্তনা।

কিন্তু শিব গড়তে হনুমান হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা বিবেচ্য। এক অনুজ-সাহিত্যিক বলতেন, পৃথিবী বীরভোগ্যা নেই এখন, তাম্বিরভোগ্যা। কথাটা পুরস্কার ব্যাপারেও যেন প্রজোজ্য না হয়। মাঝে মাঝে অবশ্য বেয়াড়া কথাবার্তা কানে আসে। শুধুমাত্র কানাকানি নয়, কাগজেও লেখা-লেখি হয়েছিল ক'বছর আগে। পুরস্কার নিয়ে রেষারেষি ঈর্ষাবিদ্বেষ—সেটা তো চোখেই ঠাহর পাচ্ছি। আমাদের শান্ত সুস্থ লেখক-পরিবারে ফাটল ধরার উপক্রম। উত্তম সৃষ্টিকর্ম বাতিল হয়ে আজেবাজে জিনিস

মনোজ বসু

যদি শিরোপা পায়, স্বভাবতই সন্দেহ জাগে, ভাল লেখাই বুঝি সবকিছু নয়, এমনকি প্রধান বিচার্যও নয়, পিছনের ভিন্ন বিবেচনা আছে। পুরস্কার যিনি পেলেন, তাঁর অবশ্য পাথরে পাঁচ-কিল—অন্য যে অসংখ্য লেখক পেলেন না, তাঁদের গণ্ডদেশে নিঃশব্দ চপেটাঘাত : কিছুই হয়নি তোমার মশায়, তিন (অথবা পাঁচ) বছর ধরে ভেরেণ্ডা-ভর্জন করে গেছ শুধু। সরলমতি অনেক পাঠক অদ্যাপি বর্তমান, পুরস্কারের নিরিখে যাঁরা লেখক বিচার করেন। লেখকদের পাঠকের চোখে খাটো করে সাহিত্যের কোন উপকারটা হচ্ছে বুঝিনে। আবার মান্যগণ্য বহু লেখক আছেন অত্যুৎকৃষ্ট লেখা তাঁরা আগেই লিখে ফেলেছেন, তিন (বা পাঁচ) বছর সময়সীমার মধ্যে সে লেখা পড়ে না। তাঁদের গৌরব-মধ্যাহ্নে পুরস্কারের রেওয়াজ ছিল না। অতএব সরকারী স্বীকৃতি তাঁরা পাবেন না। যদিই বা পান, আইন বাঁচিয়ে এমন বইয়ের উপর দেওয়া হবে যার বহুল প্রচারে লেখক নিজেই লজ্জা বোধ করবেন।

সাহিত্য-পুরস্কার যদি রাখতেই হয়, নতুন লেখকের সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ লেখক-দের পুরানো সাহিত্যকৃতি বিচার করে তাঁদের জন্যও পৃথক স্বীকৃতি-পুরস্কারের ব্যবস্থা আবশ্যক। এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি-মূলক যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্ব নেবেন রাজনীতি-নিরপেক্ষ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সর্বমান্য জ্ঞানী-গুণীরা যার নেতৃত্বে থাকবেন। অর্থাৎ দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জন্য পৃথক আকাদেমি।

রাজধানীর সাহিত্য আকাদেমি ও সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান—পনেরটি ভাষাগোষ্ঠী নিয়ে তাঁদের কাজকারবার। কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠী সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু করা সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে। ধরুন, বাংলা তামিল বা হিন্দীতে প্রতি বছর সহস্রাধিক বই বেরোয়। আবার এমন ভারতীয় ভাষাও আছে বছরে যেখানে দশখানা বইও বেরোয় না। সাহিত্য আকাদেমির কাছে সকলেরই তুল্য মূল্য এবং পুরস্কারও একটি মাত্র। পদে পদে তাঁদের নিক্তি হাতে নিয়ে চলতে হয়—তাছাড়া উপায়ও নেই। বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির সমস্যা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। বাংলা খণ্ডিত হয়ে সমস্যা আরও জরুরী হয়ে পড়েছে। ভারত ও পাকিস্তানে রাজনৈতিক অনৈক্য—এমনকি বাইশ দিন-ব্যাপী একটা লড়াইও হয়েছিল। একটা ক্ষেত্রেই কেবল রাজনৈতিক খড়্গ পড়েনি, সংহতি সেখানে অটুট। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সেই কারণে সমস্ত ভাষার মধ্যে বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং স্থিতিশীলতা একটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ঢাকার বাংলা আকাদেমি বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্য নিয়ে অতুলন কাজ করে যাচ্ছেন। প্রস্তাবিত বঙ্গ-সাহিত্য আকাদেমিও এপারের বাংলায় অনুরূপ কাজ করবেন, আশা করা যায়। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্য এপারের বাঙালী ওপারের বাঙালীর মধ্যে যোগাযোগের সেতু—বাঙালী জাতির ধ্বংসরোধের একটি মাত্র পথ এই। এ-জিনিসের উপর যে-কোন আঘাত আমরা বুক পেতে রুখব। গত বছর হায়দরাবাদে নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল। স্বচক্ষে দেখে এলাম, তেলেগুভাষীরা নিজস্ব আকাদেমি গড়েছেন, ভূতপূর্ব মন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম্ তার সভাপতি। এই একটি মাত্র নয়, রাজ্য আকাদেমি আরও আছে। ১৯৬৭ অব্দে সভা করে আমরা মুখ্যমন্ত্রী অজয়-কুমার মুখোপাধ্যায়ের সামনে প্রস্তাব তুলে-ছিলাম, যুক্তিবত্তা স্বীকার করে তিনিও পরিকল্পনা দিতে বলেছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের রাষ্ট্রিক অব্যবস্থার দরুন কাজ এগোয়নি। প্রস্তাবটা এখন আবার সরকারের উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন।

সাহিত্য শাখারূঢ় হয়েও এতাবৎ সমস্যার কথাই বললাম শুধু, সাহিত্যের কথা একটিও নয়। চালাকিটা ধরেই ফেললেন তো। কবুল জবাব দিই : অধমের নিতান্তই পাণ্ডিত্যাভাব। গল্প-উপন্যাস লিখে রুজি-রোজগার, সে-জিনিস বিলকুল মিথ্যে। শাস্ত্রবাক্য : শতং বদ মা লিখ। আমরা পাষণ্ডের দল, মিথ্যে শুধু লিখিই না, ছেপে দিয়ে হাজারে হাজারে পাঠক ভোলাই। আর এক মুশকিল রবীন্দ্র-শরতে পৌঁছেই তো আমায় নিশ্চুপ হতে হবে, তারপরে আর মুখ খুলতে পারব না। তারপরে তো আমরাই। বিস্তরকাল লিখে লিখে এবারে অস্তাচলের পানে তাকাচ্ছি, অনুজেরা এসে আসর নিচ্ছেন। সকলে মিলে একই সাহিত্য-পরিবারের লোক আমরা। নতুন সাহিত্য ভাল বললে আপনারা ভাববেন : দেখেছ, আত্মপ্রশংসা করছে কেমন নির্লজ্জের মতো। আবার বিপরীতে, দশের মধ্যে খামাকো আত্মনিন্দা করতে যাব কেন? বাঘা বাঘা সাহিত্য-পণ্ডিতেরা উপস্থিত আছেন—ঐ কর্মটি তাঁরাই করুন। নিন্দেমন্দ বড্ড বেশি হতে থাকলে চুপিসারে আমি চিনারের ছায়াতলে পালিয়ে বসে থাকব।

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

প্রখ্যাত তেলুগু কবি ও গল্পলেখক শ্রী কে, ভেঙ্কটরাও গত ৫ জুলাই গুন্টুরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর। তেলুগু সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসে তিনি একটি স্মরণীয় নাম। তেলুগু সাহিত্যে তিনিই নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেন। মাত্র দেড় বছর আগে 'অমৃতে'র প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল হায়দারাবাদে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শ্রীঅসওয়াল্ড কাউলড্রের শিষ্য। কাউলড্রে ছিলেন ইংলণ্ডের লোক। অথচ অন্ধ্রের শিল্প ও সাহিত্যজীবনের পুনরুজ্জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য।

আগামী ১৯, ২০ ও ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় সর্বভারতীয় ছোট পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা 'রাইটার্স ওয়ার্কসপ' ও 'রূপাম্বরা' পত্রিকাগোষ্ঠী। এই সময় তিনটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ছোট পত্র-পত্রিকার বর্তমান সংকট-জনক অবস্থায় এই প্রদর্শনী কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার করবে বলে আশা করি।

ভারত সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত "সপ্তম সর্বভারতীয় বেসিক লিটারেচার" প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় লেখকদের কাছে পাণ্ডুলিপি এবং বই আহ্বান করা হয়েছে। যে সব বিষয় নিয়ে লেখা বই বা পাণ্ডুলিপি পাঠান চলবে, তা হল—(ক) গান্ধীজীর দৃষ্টিতে পঞ্চায়েতীরাজের মাধ্যমে রাজনৈতিক গণতন্ত্র; (খ) গান্ধীজীর দৃষ্টিতে সমবায় ও পঞ্চায়েতীরাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র; (গ) সমন্বয় সাধনে ছাত্রসমাজের কর্তব্য ও দায়িত্ব; (ঘ) যুব-সমাজ ও পঞ্চায়েতীরাজ শিক্ষায়তন; (ঙ) পঞ্চায়েতীরাজের অধীনে শিশু ও নারীর উন্নতি ইত্যাদি। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা ২১টি পুরস্কার পাবেন। প্রতিটি পুরস্কারের মূল্য এক হাজার টাকা। অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, গুরুমুখী, হিন্দি, কানাড়া, কাশ্মীরী, মালয়ালম, মারাঠি, ওড়িয়া, সিন্ধি, তামিল, তেলুগু এবং উর্দু ভাষায় রচিত রচনাসমূহই একমাত্র বিবেচিত হবে। রচনা দশ হাজার শব্দের মধ্যে হতে হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। বিস্তৃত বিবরণের জন্য—ডাইরেকটর, কৃষি-খাদ্য ও সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রক, কৃষি ভবন, নয়াদিল্লী—এই ঠিকানায় লিখতে হবে।

সম্প্রতি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কাশ্মীরে। এর ফলে বাংলা এবং কাশ্মীরের কবি ও লেখকরা আরো নিকটতর হবেন বলে আশা করি। আমাদের অনেকের ধারণা, বোধহয়, কাশ্মীরের শিল্প সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ নয়। হয়ত একথা ঠিক, ভারতীয় অনেক ভাষার মত কাশ্মীরের সাহিত্যের বহুদূর প্রসারিত অতীত নেই। কিন্তু বর্তমানকালে যাঁরা লিখছেন, তাঁদের রচনা কিন্তু খুবই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে কাশ্মীরী কবিরা ভারতের অনেক ভাষার চেয়ে ভাল লিখছেন। একালের দুজন প্রখ্যাত কাশ্মীরী কবি হলেন আমীন কামিল ও দীননাথ নাদিম। কাশ্মীরী সাহিত্যের সর্বকালের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসেবে আমীন কামিল এরই মধ্যে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। প্রকৃতির কবি হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। প্রসঙ্গত তাঁর "পুষ্পিত টিউলিপ" কবিতার কয়েক পংক্তির অনুবাদ এখানে তুলে ধরা যাচ্ছে।

> "টিউলিপ উঠেছে ফুটে
> মাঠে আর নদীর কিনারে;
> বসন্ত কি তবে মাতোয়ারা
> মুক্তি পেয়ে বরফ-থাবার,
> না কি সব প্রেমিকের
> যৌবনের উজ্জ্বল আভায়
> রঙে রঙে চতুর্দিক করেছে রঙীন?

দীননাথ নাদিমের জন্ম ১৯১৬ সালে। প্রগতিশীল কবি হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। বর্তমানে অধ্যাপনা করেন। তাঁর কবিতার অবয়ব নির্মাণ কৌশলটিও অভিনব। 'সকাল' কবিতায় তিনি সকালবেলার শুকতারাকে লক্ষ্য করে বলছেন, জ্যোতির্ময় সহযাত্রীরা তাকে নিঃসঙ্গ রেখে চলে গেছে। আর হতভাগ্য শুকতারাটি খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গীদের। শেষ পর্যন্ত উদার পৃথিবী জানাল তাকে আমন্ত্রণ। টিউলিপের কুঁড়ি হয়ে সে ফুটে উঠল গাছে গাছে।

> "যে ছিল আকাশে একা,
> মাটিতে হল সে বহু;
> স্বাগত মিতালি করেছে সুদূর
> উচ্চের অভিমান।
> হাজার ফুলের একটি যে ফুল,
> বাতাসে দোলান মুণ্ডু,
> মাটির বাগানে শিখেছে এবার
> জীবনের মহাবাণী।"

বিদেশী সাহিত্য

দীর্ঘ এগারো বছর পর আমেরিকায় ফিরে গেছেন এজরা পাউণ্ড। হয়তো অনেকের কাছেই এটা সুসংবাদ। কবির নিজের কাছেও। স্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দেশবাসী সম্পর্কে তিনি এখন উদাসীন। কথাবার্তা বলেন না বিশেষ কারোর সঙ্গেই।

মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট সরকারের পক্ষ নিয়ে মার্কিণ-বিরোধী বেতার প্রচারের জন্যে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় ১৯৪৬ সালে। আদালতের রায়ে প্রমাণিত হল, তিনি বদ্ধ উন্মাদ। এজন্য তাঁকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বারো বছর পাগলাগারদে থাকতে বাধ্য করা হয়। মুক্তি পান এলিয়ট এবং হেমিংওয়ের নেতৃত্বে যুরোপ-আমেরিকার প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের আবেদনে। কিন্তু সেই দুঃখ ভুলতে পারেননি পাউণ্ড। মুক্তির পর ঘোষণা করলেন, সারা আমেরিকাই একটা উন্মাদাগার।

তারপর দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন আমেরিকার বাইরে। কয়েক মাস আগে আমরা অমৃতে তাঁর এই নির্বাসিত অবস্থার খবর দিয়েছিলাম। 'টাইম' ও 'লাইফ' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে দুটো লেখা বেরিয়েছিল। তখন তাঁকে দেখা যেতো ভেনিসের নির্জন পথে কিংবা ইতালির পল্লী অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ। মাথায় বড় ইংলিশ টুপি। পরিচিত কাউকে দেখলে, মুখ আড়াল করতেন ঐ টুপি দিয়ে।

কয়েকদিন আগে নিউইয়র্কের হ্যামিলটন কলেজের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় পুরোনো ছাত্র হিসেবে। তিনি উপস্থিতও হন। ছাত্র অধ্যাপকেরা ঘন ঘন হাততালি দিতে থাকেন। মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে রইলেন বিগতদিনের মুখর কবি। সকলেই অনুরোধ করলেন কিছু বলার জন্য। কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ

করতে সম্মত হননি এজরা পাউন্ড। মনে হয়, বাকি জীবনটা তিনি নীরবেই থাকতে চান। এখন তাঁর বয়স ছিয়াশি বছর। ......

গত জুন মাসের ২৮ তারিখে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ইন্দো-চেকোশ্লোভাক সাংস্কৃতিক কর্মসূচী অনুসারে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্যোক্তা ছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার কলকাতাস্থ কনসুলেট জেনারেল। মাস দুই আগে অনুরূপ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল নতুন দিল্লীতে। প্রখ্যাত ভারতবিদ মিরোস্লাভ ক্রাসা এ উপলক্ষে লেখেন : "মধ্যযুগ থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং সাহিত্যের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার গভীর যোগাযোগ আছে। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ দু-দুবার প্রাগ পরিদর্শন করেন। উদয়শঙ্করের ভারতীয় নৃত্য এবং রবিশঙ্করের সেতার অনুষ্ঠান সেখানে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গত বিশ বছরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওখানে অন্তত দু'শটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া অনূদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ, আব্বাস, জাফরি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, শিবশঙ্কর পিল্লাই, মুলকরাজ আনন্দ, কমলা মার্কণ্ডেয় প্রমুখের বিখ্যাত গ্রন্থ।"

সমকালীন ভারতবর্ষ এবং এদেশের সাহিত্য সম্পর্কে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ বিশেষভাবে 'উৎসাহী'। এখানকার বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠছে ইন্দো-চেক ভ্রাতৃসঙ্ঘ। ভারতীয় ভাষা শিক্ষার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে ওখানে সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, উর্দু, বাংলা, তামিল এবং মালয়ালাম ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

একালের প্রেমের কবিতা [সংকলন]— দীপ্তি ত্রিপাঠী সম্পাদিত ।। বিশাখা, ২৮।১এ, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা—১৯ ।। দাম : চার টাকা।

বিভিন্ন সময় পরিধির ভেতর কবিতার প্রকাশপদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতে বাধ্য। জীবনের মূল্যবোধ এবং প্রেম সম্পর্কে ধ্যানধারণার নিয়ত বদল হচ্ছে ঐ একই কারণে। সেকালের মানুষ নরনারীর সম্পর্ককে যে-মানদণ্ডে বিচার করতো, আজকের দিনে সেই দৃষ্টিভঙ্গী আর নেই। দীপ্তি ত্রিপাঠী প্রেমের এই সময়াশ্রিত অভিব্যক্তিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর সংকলনে। পঞ্চাশের কবিরাই ছিলেন তাঁর সংকলনের উৎস।

এ-সংকলনে গৃহীত হয়েছে দুজন মহিলা-কবির কবিতা, বাকি সকলেই যুবক। রাজলক্ষ্মী দেবী এবং কবিতা সিংহ মহিলা কবিদের ট্র্যাডিশন ভঙ্গ করেছেন। তাঁদের কবিতা জোরালো এবং তীক্ষ্ণধার।

সম্পাদিকা লিখেছেন, 'ফণিমনসায় ঘেরা চোরাবালিতে নয়, পঞ্চাশের কবিরা আমাদের নিয়ে এসেছেন এক বর্ণাঢ্য উদ্যানে, যেখানে উটপাখির বদলে নাচে সূর্যাস্ত—রঙিন ময়ূর, সোনার হরিণ চরে, ক্যাকটাসের বদলে উদ্ভিন্ন হয় ঋজু ইউক্যালিপটাস—রঙিন কারনেশন—গোলাপ বকুলের সুরভিত সমন্বয়।'

এই মন্তব্য আংশিক সত্য বলে কেউ কেউ স্বীকার করবেন। শরীরী প্রেম ও অসুখের বিপুল উত্তাপ লক্ষ্য করা যায় অনেকের কবিতায়। অরবিন্দ গুহ প্রেমের স্পর্শ পেয়েছেন অতর্কিতে, কখনো কখনো ঘটনা উপলক্ষে স্মরণ করা যায় কয়েকটি পংক্তি : 'ভয়ে বুক কাঁপে, আর থাক। মনে মনে তার নাম / গান হয়। অসুখের ছলে তার যেটুকু নিলাম, / তা অনেক। হে ঈশ্বর তাকে তুমি ভীষণ অসুখ / দাও। ম্লান করো, ম্লান অপরূপ করো / তার মুখ।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতাটি (চোখ বাঁধা) গৃহীত হয়েছে এ-সংকলনে। জৈবপ্রেমের গভীর আর্তি লক্ষ্য করা যায় তাঁর কবিতায়। শান্তিকুমার ঘোষ, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, তারাপদ রায়, উৎপল বসু, বিনয় মজুমদার লিখেছেন বিভিন্ন মেজাজের শাণিত, উজ্জ্বল কবিতা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় মূলত লিরিক মেজাজের কবি। আধুনিকতার আকস্মিক উচ্চারণে তিনি পাঠককে চমকে দেন। শঙ্খ ঘোষ, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের বেশ কয়েকটি ভালো কবিতা জায়গা পেয়েছে এ-সংকলনে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রেমের কবিতাতেও এক ধরনের ছদ্ম-দার্শনিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন। অনেক কাল মনে থাকবে আলোক সরকারের কয়েকটি পংক্তি। 'তোমার বাড়ির দরজা কেন তুমি বন্ধ করে রাখো? / দরজা যদি খোলো / হলুদ পাখির চোখ তোমার নয়নে কেন? প্রীত অনুচ্ছ্বাস / কাছে ডাকে, জ্যোৎস্নার দিঘির কণ্ঠ অকম্পিত বিলীন আবেশ। / আমাকে জাগাও কেন বসন্তের বিশুদ্ধ নিয়মে? / স্থির সমারোহে চোখ তোলো।'

তরুণ সান্যালের 'প্রতিহারীর বিলাপ' এবং 'চলাচল' দুটি সুন্দর প্রেমের কবিতা। তিনি লিখেছেন : 'নিরবধি বুকে আছো, তুমি নীল, তুমি ঘননীল— / তুমি সন্ধ্যাবেলা দূরে : তুমি সন্ধ্যা : ফিরোজা নীলায়, / এমন গভীর চন্দ্রালোকে যাও, চলেছো কোথায় / বেদনা, আমার দুঃখ কার দূরে, ধীর পদব্রজে!' সিদ্ধেশ্বর সেন গত কয়েক বছরের কবিতায় অনেক সংবৃত, রহস্যময় এবং জনপ্রিয় : প্রথম যৌবনেও তিনি উত্তাপহীন নন।

তবু প্রশ্ন থেকে যায় শ্রীমতী ত্রিপাঠীর নির্বাচন সম্পর্কে। নিরপেক্ষ থাকতে পারেননি তিনি। নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের নিরিখেই কবি ও কবিতার বিচার করেছেন। তা না হলে কি কেউ একই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েও আট-ন' পৃষ্ঠার বিস্তৃত পরিসরে স্বচ্ছন্দ, কেউ-বা একপৃষ্ঠা সওয়া পৃষ্ঠার আয়তনে কোণঠাসা হতে পারেন?

কিন্তু এসব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করতে পারলে অনেকেই সংকলনটি হাতে পেয়ে খুশী হবেন। আমরা তাঁর উদ্যমকে একটা অভিনন্দনযোগ্য কাজ বলেই মনে করি। মনে পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'প্রেম যুগে যুগে'। গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আবু সঈদ আইয়ুবের সম্পাদনায় 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা', মণীন্দ্র রায় সম্পাদিত 'উজান যমুনা' এবং অবন্তী সান্যালের সম্পাদনায় 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতা' নামে তিনটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। এ-ধরনের সংকলন যতো বাড়ে পাঠকের দিক থেকে ততোই সুবিধে।

চমৎকার আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীরূপ গুহঠাকুরতা।

●

শ্রীশ্রীদুর্গাপুরীদেবীর স্বরূপ আলেখ্য (জীবনী)—লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। ২৩-বি থর্ন হিল রোড। এলাহাবাদ-১। দাম চার টাকা।

শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবীর পুণ্য জীবন-কথা লিখেছেন তেজেশচন্দ্র ঘোষ। করুণাময়ী জননীর জীবনের ঘটনাবলী ও অমূল্য বাণীর যে আলেখ্য তিনি উপহার দিয়েছেন, ধর্মজিজ্ঞাসু প্রতিটি মানুষ তা সাগ্রহে পাঠ করবে। বইটির প্রচ্ছদ মনোরম। ছাপা সুন্দর।

জসীমুদ্দিন। ফটো ঃ অমৃত
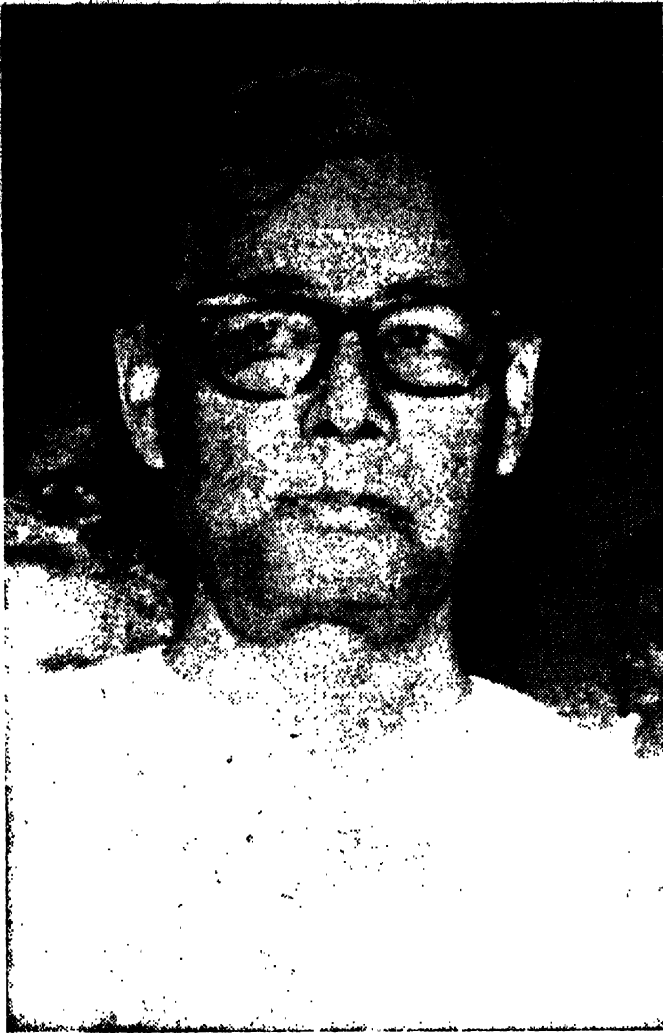
খবরটা শোনামাত্রই একটা অস্থির উন্মাদনা জেগে উঠল মনে। চোখের সামনে ভেসে উঠল 'নক্সী কাঁথার মাঠে'র একটা অস্পষ্ট ছবি। শুনতে পেলাম পদ্মা-মেঘনার জলকল্লোলের ধ্বনি।

কবি জসীমউদ্দীনকে এর আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু তাঁর কথা মনে হতেই যেন 'ময়মনসিংহ গীতিকা' আর 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সহজ সরল মমতা জড়ানো আত্মনিবেদন কবির মূর্তি মনে মনে ফুটে উঠল।

পল্লী বাংলার সার্থক রূপকার কবি জসীমউদ্দীন। তিনি আর এদেশের কবি নন। যে ভাষায় আমরা কথা বলি, যে ভাষায় গান শুনে মনে আনন্দ পাই, সেই বাংলা ভাষারই একজন লেখক হয়েও তিনি আমাদের কাছে বিদেশী। অথচ একটা অদ্ভুত অন্তরের টান অনুভব করলাম তাঁর জন্য। মনে হল, তিনি যেন আমাদেরই অত্যন্ত আত্মীয়, আমাদের সাহেবের শিল্পী।

তাই খবরটা পাওয়া মাত্রই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

দীর্ঘ সাত আট বছর পর তিনি আবার কলকাতায় এসেছেন। উঠেছেন সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুর বাড়িতে। থাকবেন দিন দশ। পরিচয় দিতেই তিনি যেন এক মুহূর্তে আপন করে নিলেন আমাদের। হাসি আর গল্পে একটা আন্তরিক আবহাওয়া তৈরি করে ফেললেন দেখতে দেখতে। ঘর ভর্তি লোক—নানান বয়সের। কেউ ছোটবেলার বন্ধু, আবার কেউ গুণমুগ্ধ পাঠক। আর কয়েকজন সংবাদপত্রের রিপোর্টার। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানালেন—'এবার এখানে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আগেও তো কতবার এখানে এসেছি— কিন্তু তখন আমাকে নিয়ে এত আগ্রহ লক্ষ্য করিনি।' কি যেন একটু ভেবে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—'আমার মনে হয়, কেবল আমার জন্যই এ আগ্রহ নয়। আসলে, (ঢাকায় যে নতুন আত্মপ্রত্যয়ের সংগ্রাম চলেছে, আমি তার প্রতিভূ হয়ে এসেছি বলেই এত আগ্রহ।'

এরপর তিনি তাঁর জীবনের কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন আমাদের। কিন্তু খুব উন্মনা হয়ে বলতে পারছিলেন না। বারবার বাধা পড়ছিল কথার মধ্যে। দু'তিন মিনিট পরে পরেই ফো আসছিল। এক একবার উঠে গিয়ে ফো ধরছেন—আবার যেই ফিরে আসছেন ফো রেখে, সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন বেজে ওঠে তবু এরই মধ্যে তিনি শোনালেন তাঁ জীবনের অনেক অলিখিত কাহিনী।

জন্ম ১৯০৩ খৃঃ। বাবা ছিলেন একজ স্কুলমাস্টার। ফরিদপুর জেলার গোবিন্দ পুর গ্রামটিই তাঁর জন্মভূমি। তিনি বললে —'যখন ক্লাশ ফোর-এ পড়ি, তখন এ তান্ত্রিক সাধু এল আমাদের গাঁয়ে। তাঁ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের কাহিনী আমা বেশ আকর্ষণ করত। শেষে হল তাঁর প্রভাবে আমি মাছ-মাংস, পেঁয়া রসুন খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম। ঘা হয় এই সময়েই আমাদের বাড়ি নদী ভেঙে গেল। আমরা টাউনের কাছে এক বাড়িতে এসে উঠলাম। এই সময়ে শ্রীশচ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসি। এই কারণে, হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে আমি প্রচু জ্ঞানলাভের সুযোগ পাই।'

ছোটবেলার এই অভিজ্ঞতাই বোধ তাঁর মানবতাবোধকে সঞ্জীবিত করেছি অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পা

সংস্কৃতির প্রভাব। একটি পল্লীগীতির দুটো লাইন আবৃত্তি করলেন তিনি ঃ

'নানান বরণ গাভীরে
একই বরণ দুধ,
আমি জগৎভরিয়া দেখলাম
একই মায়ের পুত।'

জসীমউদ্দিনের সাহিত্য রচনার পেছনেও এই মানসিকতা কাজ করেছে। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি সমস্ত মানুষকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর 'স্মৃতির পট' বই-এর এক জায়গায় ১৯৪১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, তার একটি মর্মান্তিক বর্ণনা আছে। তিনি লিখেছেন—'প্রয়োজন হইলে জীবন দিয়াও আমি এই দাঙ্গা থামাইব। একবার আমি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করি, অমনি মুসলিম ছাত্ররা ইঁট পাটকেল ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। আবার মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে গিয়ে তাহাদিগকে থামাই। হিন্দু ছাত্ররা আক্রমণ আরম্ভ করে।'

আপনার সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত কখন থেকে?—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—'লেখার অভ্যেস ছিল ছোটবেলা থেকেই। এরই জন্য যখন নাইন কি টেনে পড়ি, তখন চলে এলাম কলকাতায়। ভর্তি হলাম ন্যাশান্যাল স্কুলে। খরচ চালাবার জন্য খবরের কাগজ বিক্রী করতে শুরু করি। কিন্তু এতে কি আর চলে? তাই মাত্র ২০ দিন পরেই চলে এলাম গ্রামে। গ্রামের লোকদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমার লেখার স্টাইল বদলে গেল। আগে 'প্রবাসী'তে একটা কবিতা বেরিয়েছিল। কবিতাটির নাম 'বৈশাখ শেষের মাঠ'। কিন্তু পরিবর্তিত স্টাইলে কেউ আর লেখা ছাপত না। ফরিদপুরে তখন 'কল্লোল' পত্রিকাটি বিক্রী করতাম। ঐ পত্রিকায় আমার 'বেদের মেয়ে' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে আমি লিখলাম কল্লোল সম্বন্ধে। দীনেশবাবু এই সময় সি আর দাশ সম্পাদিত কাগজের 'তিলক সংখ্যায়' একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে নজরুল আর আমার কথা উল্লেখ করেন। দীনেশবাবুর তখন খুব প্রভাব। তাঁর ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পরেই আমি কবি হিসেবে পরিচিত হয়ে গেলাম। লেখা ছাপাতে তখন আর বিশেষ অসুবিধা হত না।'

'কিন্তু শুনেছি,' আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনার নক্সীকাঁথার মাঠ' দীর্ঘদিন পড়ে ছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়?'

জসীমউদ্দিন বললেন—'হাঁ, অনেকদিন পড়েছিল। দীনেশবাবুকে একথা জানালে তিনি বললেন বই আকারে প্রকাশ করতে। তাঁর কথামত তো বইটি প্রকাশ করলাম। কিন্তু বিক্রী হয় না। আবার লিখলাম দীনেশবাবুকে। তিনি বিচিত্রা পত্রিকায় একটা 'রিভিউ' লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গে বইটি প্রখ্যাত হয়ে গেল।'

অনেকের মতে 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কবি জসীমউদ্দীনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এর ভূমিকা লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই বইটির অনুবাদ হয়েছে। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মিসেস মেরী মিলফোর্ড। জর্মন ভাষায় অনুবাদ করেন কানাইলাল গাঙ্গুলী। বইটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। শ্রীগাঙ্গুলি মারা যাওয়ার পর প্রকাশক 'হপম্যান এ্যান্ড কোং', একজন জর্মন কবিকে অনুবাদগুলি পাঠিয়েছেন। জসীমউদ্দিনের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। এর মধ্যে আছে কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকথা, স্মৃতিকথা ও সারগর্ভ প্রবন্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ওগো পুষ্পধনু' (কবিতাকারে লিখিত রূপক নাটক), 'জলের লেখন' (প্রেমের কবিতা), 'মা যে জননী কান্দে' (কাহিনীকাব্য), 'স্মৃতির পট' (স্মৃতিকথা), 'রাখালী' (কিশোর কবিতা), 'পল্লীর বধু', 'মধুমালা', 'নক্সীকাঁথার মাঠ' (কবিতা), 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' প্রভৃতি। সোজন বাদিয়ার ঘাট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"তোমার 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' অতীব প্রশংসার যোগ্য। এই বই যে বাংলার পাঠক সমাজে আদৃত হবে, সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই।" এই বইটির অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে বারবারা পেণ্টার।

কথায় কথায় সময় চলে গেল। বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। তারই মধ্যে তাঁর কাছে পূর্ব বাংলার বর্তমান সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলাম। কিছুটা ভেবে নিয়ে তিনি বললেন—'পূর্ব বাংলায় এখন খুব ভাল গদ্যসাহিত্য হচ্ছে।' কবিতা একই রকম।' জিজ্ঞেস করলাম—'খুব ভাল বলতে কি বোঝাচ্ছেন?'

প্রশ্নটার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে তিনি বলে চললেন—'ভাল গদ্যের নমুনা হিসেবে শহীদুল্লা কাইছারের 'সংসপ্তক' খন্দকার ইলিয়াসের 'কত ছবি কত গান', দিলারা হোসেনের 'ঘর-মন-জানালা', সৈয়দ ওয়ালিউল্লার 'লাল শালু', আসরাফ সিদ্দীকি, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সামসুল হক, সওকৎ ওসমান প্রমুখের ছোটগল্প ও উপন্যাস উল্লেখ করা যেতে পারে।'

'কবিতার দিক থেকে খুব একটা পার্থক্য পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম বাংলার মধ্যে আপনার চোখে ধরা পড়ছে না। গল্প-উপন্যাসে এই পার্থক্যটা কিভাবে আপনি বিশ্লেষণ করেছেন?'

উত্তরে তিনি জানালেন—'পূর্ব বাংলার গদ্য সাহিত্যে গণজীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। পশ্চিম বাংলার গদ্য সাহিত্যের সঙ্গে এখানেই ব্যবধান।'

সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি আরো জানালেন—'ঢাকায় এখন পাড়ায় পাড়ায় সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিন চারজন একসঙ্গে হলেই একটা পত্রিকা প্রকাশ করে। থিয়েটার সিনেমারও অসম্ভব উন্নতি হয়েছে।'

আর সময় ছিল না কথা বলার। তাই নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম। পথে আসতে আসতে চোখের সামনে ফুটে উঠল, পূর্ব বাংলার পল্লী প্রকৃতি। হয়ত উভয় বাংলাতেই তাঁর চেয়ে বড় কবি আছেন। কিন্তু তাঁর এই সহজ সরল প্রকৃতির সাম্রাজ্যে তিনিই সম্রাট। মনের মধ্যে তাঁরই লেখা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন প্রতিধ্বনির মত বাজতে লাগল—

'রূপের ভার আর বইতে নারে
কাঁখখানি তার এলিয়ে পড়ে,
কোনরূপে চলছে ধরি
মাটির ঘড়া জড়িয়ে ধরে।
রাখাল ভাবে কলসীখানি
না থাকলে তার সরু কাঁখে
রূপের ভারেই হয়ত বালা
পড়ত ভেঙে পথের বাঁকে।

[illegible]

জসীমউদ্দীনের কবিতা

হলুদ বাটিছে মেয়ে

হলুদ বাটিছে হলুদ-বরণী মেয়ে,
হলুদের পাটা হাসিয়া গড়ায় রাঙা অনুরাগে নেয়ে।
দুই হাতে ধরি কঠিন পুতারে ঘষিছে পাটার পরে,
কাঁচের চুড়ি যে রিনিকি ঝিনিকি নাচিছে খুসীর ভরে,
দুইটি জঙ্ঘা দুই ধারে মেলা কাঠগড়া কামনার,
তাহার উপর উঠিতে নামিতে সোনার দেহটি তার:
মর্দিত দুটি যুগল শারসী শাড়ী-সরসীর নীরে,
ডুবিতে ভাসিতে পুষ্পধনুরে স্মরিতেছে ঘুরে ফিরে।

হলুদ বাটিছে হলুদ-বরণী মেয়ে,
রঙিন ঊষার আবছা হাসিতে আকাশ ফেলিল ছেয়ে।
মিহি-সুরী-গান গুন গুন করে ঘুরিছে হাসিল ঠোটে,
খুসীর ভোমরী উড়িয়া মুখের পদ্মের দল লোটে।
বিগত রাতের রভস-সুখের মদিরা-জড়িত স্মৃতি,
সারাটি পাটার হলুদে জড়ায়ে গড়ায়ে রাঙিছে ক্ষিতি।
গাছের ডালে যে বুলবুলী বসি ভরিয়া দুখানা পাখ
লিখিয়া লইতে তারি এতটুকু মেলিছে সুরেলা ডাক।

হলুদ বাটিছে হলুদ-বরণী মেয়ে,
হলুদে লিখিত রঙিন কাহিনী গড়াইছে পাটা বেয়ে।
ডোলভরা ধান, কোলভরা শিশু বুকভরা মিঠে গান,
কোকিল-ডাকান আম্র-ছায়ায় পাতার কুটির খান।
চাঁদিনী রাতের জ্যোছনা আসিয়া গড়ায় বেড়ার ফাঁকে,
কৃষাণ কণ্ঠে বাঁশীটি বাজিয়া আকাশেতে প্রীতি আঁকে।
অর্ধেক রাত নকসী কাঁথাটি মেলন করিয়া ধরি,
অতি সযতনে আঁকে ফুললতা মনের মমতা ভরি।
ঘুম যেন আসি গড়াইয়া পড়ে, সুরের লতালী ফাঁদে,
মাটির ধরায় টেনে নিয়ে আসে গগন-বিহারী চাঁদে।

গাঁয়ের পথে

আবার যাইব তোমারে সঙ্গে করে,
ছায়ামায়া ঘেরা মমতা জড়ান মোদের গাঁয়ের ঘরে।
পদ্মার তীরে কাঁপে বেনুবন নতুন চরের বায়,
ফোঁটায় ফোঁটায় রোদের পুঞ্জো যে নাচিছে মাটির ছায়।

তার দক্ষিণে ছোট বাড়ীখানি আম্রবনের তলে,
কুটুম পাখিয়া আড়াআড়ি ডাকে কুটুম আসবে বলে।
সেথায় রয়েছে মাটির কলসী সুশীতল জল ভরে,
মেঝের বিছান ইন্দ্রপুরী যে নকসী কাঁথার পরে।
ফুলঝুরি আর কদম্বকেলি সাগরের ফেনা আর,
রঙিন শিকায় শুন্যেরে যেন দোলায় খুশীতে কার।
উঠানের পাশে ডালিম গাছটি হেলিয়া ফুলের ভরে,
এ বাড়ীর বউ হেসে কুটিকুটি গড়ায়ে মাটির পরে।

সেথায় অনেক বিরাম রাত্রি, এলে নদীটির তীরে,
[illegible] পারে বাঁশের সাঁকোটি পার হয়ে যায় ধীরে।

সাদা বালুচর এঁটেল মাটির মৃদু আবরণে ঢাকা,
তাহার উপর নানা রকমের পাখিদের পাউ আঁকা।
বন্যার ঢেউ খেলিতে চলিতে তাহার বুকের পরে,
কত রকমের আলপনারেখা এঁকে গেছে থরে থরে।
কোথাও ফাটলে ফাটিয়া যে মাটি কোঁকড়ায়ে নানা ছাঁদে,
কত রকমের পুতুল হইয়া গড়াইছে মনসাধে।
এখানে ওখানে পাখির পালক রঙিন ঝিনুক আর,
সারা চর ভরি চিত্র এঁকেছে কে বা যেন ছবিকার।
সেইখান দিয়ে চলিতে চরণ কাঁপে যে মাটির গায়
পাছে বা তাহারি আঘাতে কোন বা নকসা ভাঙিয়া যায়।

একটু উপরে দুলিতেছে চর রাইসরিষার ভারে,
বাতাস আসিয়া ফুলের অঙ্গে বিলি দেয় বারে বারে।
মাঝে মাঝে ফুটে মোটরের ফুল রঙিন বধুর মত,
সোহাগে সোহাগে নাকের নোলক নাড়িতেছে অবিরত।
সেইখানে বসি আমরা দুজন বাঁশীতে ভরিয়া সুরে,
হলুদ পরীর দেশেতে পাঠাব লেখন যে সুমধুরে।

ও বাড়ীর মেয়ে

ওদের বাড়ীতে না আসিয়া যদি আসিতে মোদের ঘরে
সিঁদুর পড়িলে তোলা যায়-মেঝে রাখিতাম সাফ ক'রে।
সেইখান দিয়ে রঙিন পায়েতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া যেতে,
কত রকমের নাচের নকসা যাইতে যে তুমি পেতে।
জানালায় পোষা শুকশারী তোমা শোনাইত সুশকথা,
তোমার খোঁপার লাগিয়া উঠানে ফুটিত ঝুমকো লতা।
সুশীতল জল কলস জুড়িয়া গাহিত সুখের গান,
সুশীতল ছায়া উঠান জুড়িয়া দুলিত শাখীর দান।
নকসী কাঁথার ইন্দ্রপুরী যে রহিত বিছানে আঁকা,
রঙিন সিকার লহরে খেলিত দু'খানি তালের পাখা।

তুমি যদি আজ মেয়ে না হইয়া হলুদে পাখিটি হয়ে
মোদের বাগানে হলুদ চিঠিটি আনিতে পাখায় বয়ে,
আমরা তোমার গান শুনে শুনে লিখিতাম কত ছড়া—
তোমার মুখের মমতা জড়ান ওমনি আদর ভরা।

তুমি ও বাড়ীর মেয়ে না হইয়া ফুলটি হইয়া হাসি
মোদের বাগানে পাতার আড়ালে উঁকিঝুঁকি দিতে আসি,
মোদের ঘরের রাঙা প্রজাপতি পাখায় বাতাস ধরি—
গুন গুন করে গান শোনাইত মনের মতন করি।
তুমি যদি এলে, ও-বাড়ীতে কেন মেয়েটি হইয়া এলে,
লক্ষ যোজন দূর সেই বাড়ী চাহিলে দেখা না মেলে।
কি এমন হত এ-বাড়ীতে এলে আঁখির কাটিক ঘরে,
কাজলরেখার দেয়ালী রচিয়া রাখিতাম তোমা ধরে।
হায়রে, ও-বাড়ী দূর-দুরান্ত অন্তবিহীন পথ,
শ্রান্ত আমার জয়ের জীর্ণ মনলোকের রথ।

[অমৃত প্রথম বর্ষ থেকে কবিতা তিনটি পুনর্মুদ্রিত]

ড্রীমল্যান্ড

নির্মল সরকার

লেজারটা ঠেলে রেখে সনৎ উঠে পড়ল। কাজ করতে কোনদিনই তার ভাল লাগেনি। প্রথম যখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ কাজটা পেল, তখনই ওর মনটা বিরূপ হয়ে গিয়েছিল। একে সরকারী অফিস তার উপর কম মাইনে—অবশ্য এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। যখন বি-এস-সি অনার্স নিয়ে পাশ করেছিল তখন সে ভেবেছিল দাদার মত ডাক্তার না হলেও একটা কিছু করতে পারবে হয়ত—তা হল না। এমনকি, সামান্য অজুহাতে এম-এস-সিতে জায়গা পর্যন্ত জোটানো গেল না। আশ্চর্য হয় নি সনৎ মুখার্জি। তার জীবনে আশাভঙ্গের পুনরাবৃত্তি প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সনৎ। দাঁড়াতে বা চলতে তার কষ্ট হয়। ডান পাটা, বাঁ পায়ের চেয়ে প্রায় তিন ইঞ্চি ছোট, শুধু তাই নয়, পায়ের মাংসপেশীগুলো শুকিয়ে পাটা সরু হয়ে গিয়েছে বিসদৃশভাবে। সবল বাঁ পায়ের পাশে এ শুষ্ক পাটা সর্বক্ষণ দুটোর তফাৎ রূঢ়ভাবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিশুকালে তার পোলিও হয়েছিল। ডাক্তারবাবুরা তার এই সামান্য ক্ষতিতে নাকি পুলকিত হয়েছিলেন! এত অল্পেতে কেউ ছাড়া পায় না এমনই তাঁদের বিশ্বাস।

[illegible] উপর ভর দিয়ে [illegible] মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সনৎ। দেহের ভারসাম্য সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে তার সময় লাগে। দুটো পায়ের উপর সমানভাবে জোর দিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। একটা সূক্ষ্ম তারতম্য আছে, সেটা ওলটপালট হলেই তাকে লজ্জায় পড়তে হবে—অবশ্য লজ্জায় এখন আর সে পড়ে না, তবে অপ্রস্তুত হয় বৈকি। ট্রামে, বাসে তাকে অনেকে সহানুভূতি দেখায়, সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, এটা সনতের ভাল লাগে না। মুখে ধন্যবাদ জানালেও, মনে মনে সে বিরক্ত হয়, কুণ্ঠিত হয় নিজের অক্ষমতার জন্যে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোণের সিটের দিকে নজর দিল সে—না, সুপর্ণার চেয়ার খালি রয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই তাকে সিটে দেখেছিল সনৎ। সুপর্ণার সঙ্গে অফিসের ছুটির পরই সে বেরিয়ে পড়ে। কিছুদূর হাঁটার পর তবেই ট্রামে ওঠার চেষ্টা করে। সুপর্ণার একটু সুবিধে আছে। লেডিজ ট্রামে আর কিছু নাহোক ওঠা যায়। সুপর্ণা চলে যাবার পর সনৎ এসপ্ল্যানেডের কোণ ধরে মেট্রো সিনেমার পাশে একটা ছোট চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে নেয়। রোজ সে এই নিয়মেই চলে, এক-একদিন ব্যতিক্রম হয় না। ভিড় পাতলা হয়ে এলে [illegible] ট্রাম বা বাসে উঠবার চেষ্টা

করে সে। যতক্ষণ না সে সৌভাগ্য হয় ততক্ষণ সে চলতে থাকে ধীরে ধীরে। তার চলার একটা ছন্দ আছে। দুর্বল পায়ের একটা উঁচু হিলের বুট পরে সে। সেটা যেন তার বেদনারই সরব—চলার সংগে সংগে আওয়াজ হয়ে আলো জ্বালে। পাড়ার লোকেরাও বুঝতে পারে তার আগমনের সংবাদটা। ছন্দের কথা বাদ দিলে কষ্টের কথাটাই মনে হয় বেশী করে। বাড়ীর গেটটা পার হলেই সনতের মনে হয় পাথর বেছানো ড্রাইভটার ওপরই বসে পড়তে। রুগ্ন পা-টা ও পথ চলার প্রথম থেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত তার সর্বাংগ ওই পাটার মত বিরোধিতা করে, সুযোগ নেয় অন্যায়ভাবে।

একতলায় দুটো ঘর সে নিয়েছে। অফিসে এমনিই তাকে সিঁড়ি ভাঙতে হয়, তাই সে ইচ্ছে করেই একতলার ঘর দুটো নিয়েছে। তার ঘরের দরজা-জানলায় মোটা-গাঢ় সবুজরংগের পর্দা লাগানো আছে—সবুজ রং ভালো লাগে সনতের। ঘরের একপাশে চওড়া ধরনের ডিভানের উপর একটা সুদৃশ্য চাদর পাতা। মাঝে একটা টেবিল—সংগে কাঠের দুটো চেয়ার। অদূরে সেলফের উপর থাকে থাকে বই সাজানো—প্রায় সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত। যদিও সনৎ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল তবু বরাবর তার ঝোঁক ছিল সাহিত্যের দিকে। তার আয়ের একটা বড় অংশ খরচ হয়ে যায় বই কিনতে। অনেক সময় নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিস-গুলো বাদ দিয়েও সে এ নেশার বশ্যতা স্বীকার করেছে। অপরদিকে সাইড টেবিলের উপর কয়েকটা কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল—সাধারণত সেগুলো বাজারে পাওয়া যায় সে রকম নয়। সনৎ কয়েকটা ছবি থেকে এই মূর্তিগুলো তৈরী করিয়ে নিয়েছে। তার মধ্যে একটা আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সুন্দরীর—হয়ত মেরী আন্তোনিয়েৎ-এর। তার পাশে বাঁকুড়ার মন্দিরের টেরাকোটার হুবহু অনুকরণ আর আছে তিব্বতী মুখোশ কয়েকটা। যদিও সেগুলো পোড়ামাটি দিয়ে তৈরী তা হলেও প্রত্যেক শিল্পেরই একটা সার্থক রূপ ফুটে উঠেছে। তিব্বতী মুখোশগুলো ঐ পুতুলের মধ্যে বেমানান। তাদের বীভৎস রূপ কিন্তু সনৎকে আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী। প্রত্যেক মুখোশটা সে হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন দেখে, তারপর সযত্নে যথাস্থানে রেখে দেয় আবার।

রবিবার সনতের লেখার দিন। কয়েকটা সাময়িক পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে ছোটগল্পের সংখ্যাই বেশী। কবিতাও বেরিয়েছে মাঝে মাঝে। প্রবন্ধের সংখ্যা অবশ্য কম। সনতের এই একতলার দুটো ঘরে বড়একটা কেউ বিরক্ত করতে আসে না। এমনকি সে খাবার জন্য ডাইনিং রুমেও যায় না। তার খাবার একজন বেয়ারা তার লেখার টেবিলেই এক পাশে রেখে দিয়ে যায় নিয়মিতভাবে।

সেদিন রবিবার। সনতের লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় দাদার গাড়ীর আওয়াজ পেল সে। একটু সরিয়ে জানলার পর্দাটা সরিয়ে দেখল লনের পাশে গাড়ীটা দাঁড়িয়েছে। গাড়ী থেকে প্রথমে তার বৌদি নামল, তারপর দাদা। দুজনে কি যেন বলল। তারপর দাদা এগিয়ে গেল লনের দিকে। নতুন কয়েকটা ফ্লাওয়ার আজ কদিন লাগান হয়েছে। সনৎ অনুমান করল দাদা সেগুলো রোজকার মত দেখে তারপর নিজের দোতলার ঘরে উঠে যাবে। সনৎ তাড়াতাড়ি তার চেয়ারে এসে বসল, কারণ এবার বৌদি সিঁড়িতে ওঠার আগে তার ঘরে একবার এসে কুশল সংবাদ নেবে। এটা তার দৈনন্দিন কাজের তালিকার মধ্যে একটা। সনতের মনে পড়ল বৌদির সংগে তার প্রথম পরিচয়ের দিনটার কথা। চার বছর আগে নারসিংহোম উদ্বোধনের উৎসবে তার দাদা ডাক্তার দীনাস্বরূপের সংগে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। পাঞ্জাব ইউনি-ভার্সিটি থেকে ডাক্তারী পাশ করে দীনা-স্বরূপ দিল্লীতে সরকারী চাকরী নিয়েছিল। দিল্লীতে স্বরূপদের কয়েক পুরুষ বাস। দীনার বাবা পোস্টাল অফিসার, তাঁকে অবশ্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াতে হত সরকারী কাজে। ডাক্তার দীনা-স্বরূপ সুন্দরী, সাধারণত কলকাতায় যে পাঞ্জাবী মেয়েদের মার্কেট বা পার্ক স্ট্রীটে দেখা যায় সেরকম নয়। একটা বৈশিষ্ট্য আছে দীনায়। সোজা ধরনের চুলটা, শুভ্র ঘাড়ের উপর একটু কুঞ্চিত হয়ে পড়েছে। মুখের ভাবের মধ্যে ডাক্তার দীনার কোথায় যেন একটা বাঙালীসুলভ লালিত্যের ইংগিত আছে। ছোট কপালের উপর চুলের একটা গুচ্ছ এসে পড়েছে। অবশ্য এটা তৈরী করেছে দিল্লীর এক বিখ্যাত হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে। কিন্তু এর ফল ভালই উতরেছে। পাঞ্জাবী মেয়েদের সাধারণত যেমন উন্নত খড়্গের মত নাক হয়, দীনার কিন্তু সেরকম নয়, মুখের সংগে সামঞ্জস্য আছে। নাকের তীক্ষ্ণতা অত প্রকট নয়। চোখ দুটো দীনার সবথেকে বড় সম্পদ—দীর্ঘ ঘন পল্লবঘেরা শান্ত-শীতল দীঘির মতন। দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য নেই, মদিরতা নেই, কিন্তু গভীরতা আছে—নিস্তরংগ গভীরতা। সনতের মনে পড়ল প্রথম দর্শনে সে বুঝেছিল ওদের মধ্যে একটা সান্নিধ্যের নিবিড়তা রয়েছে। একটু পরেই পর্দাটা নড়ে উঠল। দীনা সনতের ঘরে ঢোকবার আগে অনুমতির জন্য এটা করে থাকে।

'এসো' বলল সনৎ।

—ফিলিং অল রাইট ছোড়দা? দীনার কথায় কোন টান নেই।

—ফাইন: থ্যাংকাস্। এত দেরী তোমাদের?

—আর বোলো না, হসপিটাল থেকে নারসিংহোম, সেখানে দুটো অপারেশন। তারপর কেস দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটাটা কখন ঘুরে গেল তা আর খেয়াল নেই।

—আজ অপারেশন করল কে? সনৎ তাকাল দীনার দিকে।

—তোমার দাদা আবার অপারেশন করল কবে? ওতো অ্যানেসথেশিয়া দেয়— ভ্রূটা কুঁচকোলো ডাক্তার দীনা মুখার্জি।

—এ তোমার অন্যায় বৌদি, বলল সনৎ—আমি লক্ষ্য করেছি দাদাকে তুমি সার্জন হিসেবে স্বীকারই করতে চাও না!

—কেন করব, ওকি আমার মত ডি-জি-ও করেছে? আমি গাইনোকলজিতে ডকটরেট পেয়েছি। ও তো ডকটর অব অ্যানসথেশিয়া— অজ্ঞান করাবার ডাক্তার।

—তোমাকে দেখে তাই মনে হয়— আস্তে কথাটা বলল সনৎ।

—তার মানে, সরিৎ আমায় অজ্ঞান করে রেখেছে? হাসল দীনা। তারপর এগিয়ে এসে ডিভানটার উপর বসে বলল, বিলকুল গলত, আমিই তোমার দাদাকে বেহুঁস করেছি, ওকে যাদু করেছি.—কি ঠিক না?

—বেশ তাই। মেনে নিল সনৎ।

—কি লিখছ আজ?

—গল্প।

—আমায় নিয়ে একটা গল্প লেখ না কেন। হিরোইন হিসেবে আমি কম কি? আমার দিকে দেখ। চেহারা আমার অনেক ফিল্ম স্টারের চেয়েও ভাল, কি ঠিক না?

—ঠিক।

—গলা প্রায় লতার কাছাকাছি। কি, চুপ করে রইলে কেন?

—হ্যাঁ মানছি।

—মানছ! বটে, তবে হাফহার্টেডলি; তাছাড়া আমার গলায় রবীন্দ্রনাথের গান সুচিত্রাকেও হার মানায়—আমি কি গ্রেস-ফুল নই?

—হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ—হেসে ফেলল সনৎ।

—তোমাদের এই 'গো' কথাটা আমার খুব ভাল লাগে ছোড়দা। আজ তোমাকে একটা পাঞ্জাবী রান্না খাওয়াবো—কাড়ী-ডালে ছোট ছোট বাসনের বড়া—লাভলি খেতে— উঠে পড়ল দীনা। দরজার দিকে যেতে যেতে ঘাড়টা ফিরিয়ে আবার বলল—আমায় যে গল্পের হিরোইন করবে তার হিরোর নাম কি দেবে জান?

—কি?

সনৎ—হেসে উঠল দীনা।

—লাল হয়ে উঠল সনতের মুখটা; আবার দুষ্টুমি?

—দুষ্টুমি কোথায়? সরিতের আগে তোমার সঙ্গে আলাপ হলে, আমি তোমাকেই বিয়ে করতাম।

দীনা চলে গেল। সনৎ বাথরুমে স্নান করতে ঢুকল। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা দেখল অনেকক্ষণ। চেহারা তার ভাল; মুখটা একটু লম্বা ছাঁচের কিন্তু নাক চোখ সব মিলিয়ে ভালই বলবে লোকে; একটু শীর্ণতার আভাস রয়েছে অবশ্য কিন্তু এ যুগে ওটা দোষণীয় নয়। তার মাংস-পেশী পুষ্ট আর সবল, রঙও বেশ ফরসা। হাতের মাংসপেশীগুলো পরীক্ষা করল সনৎ টিপে টিপে। লোহার মত শক্ত পেশীগুলো। খুশী হল সনৎ। কিন্তু নীচু হয়ে তাকাতেই তার পা দুটোর উপর নজর পড়ল। মনটা বিষাদে ভরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সুস্থ সবল [illegible] পাশে শীর্ণ পাটা বিসদৃশ। দুটোই তার পা অথচ একটার পাশে আরেকটা কত বেমানান! ঠিক দাদার পাশে তার মত। একজন নামজাদা ডাক্তার আর একজন অফিসের সামান্য কেরানী; একজন সুস্থ-সবলের পাশে একজন পঙ্গু। হ্যাঁ, কেরানী বৈকি। একটা গালভরা ডেজিগনেশন থাকলেই সে একটা কেউকেটা তা নয়। দাদার নার্স কেতকী যা রোজগার করে তার অর্ধেক সে পায় কিনা সন্দেহ। তা হোক, এইটেই তার অবলম্বন। দাদার ঘাড়ে বোঝা হয়ে নেই, সেইটে সবচেয়ে বড় কথা। অশ্রদ্ধা বা দয়ার অন্ন যে তাকে খেতে হয় না সেজন্য তার মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ আছে। সাওয়ার খুলে সনৎ স্নান করল তৃপ্তি ভরে। জলের ধারার নীচে দাঁড়িয়ে দেহের ক্লান্তি আর মনের অবসাদ দূর হল তার। তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলল সর্বাঙ্গ এমন কি দুর্বল অকর্মণ্য পাটা পর্যন্ত। এই পাটার উপর তার একটা জাতক্রোধ আছে, দারুণ বিতৃষ্ণা আর বিরূপতা আছে। যদি সম্পূর্ণভাবে পাটা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত তাহলে খুশী হত সে—মুক্তি পেত বয়ে-বেড়াবার এই যন্ত্রণা থেকে। দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাকে সাহায্য করে, সহযোগিতা করে অকৃপণভাবে; কেবল করে না এই বিসদৃশ পাটা। সে শুধু রয়েছে তাকে মনে করিয়ে দিতে তার অক্ষমতার কথা, ওটা যেন তার অযোগ্যতার সাক্ষাৎ প্রমাণ—তাকে সর্বদা মনে করিয়ে দেয় সাধারণ সুস্থ লোক সে নয়। একটা পায়জামা আর পাঞ্জাবী পরল সনৎ। ধুতি সে পরে না, হয় পায়জামা নয় প্যান্ট। ধুতি পরলে সরু পাটা দেখা যায়। পায়জামা আর প্যান্টের ঝুলটা একটু বড়; তার মোটা আর ভারী বুট জুতো দুটো ঢাকা পড়ে তাতে। পাঞ্জাবীটাও একটু অসাধারণ। হাফ হাতা আর মোটা কাপড়ের তৈরী। কাপড় বদলে টেবিলের সামনে বসল সনৎ। মনে হল একটু চা পেলে মন্দ হত না। কিন্তু কাকে বলবে— ধারে-কাছে কেউ নেই। বেয়ারা চলে গিয়েছে ভেতরে। সাহেব মেম এলে তাকে পাওয়া দুষ্কর! টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা টিনের বাক্স বের করল সনৎ। এতে কয়েক রকমের লজেন্স আর টফি থাকে তার। একটা বেছে নিয়ে মুখে দিল সে। এটা তার আর একটি বিলাস। অফিসেও ঐ ধরনের কৌটোতে তার এ জিনিস পাওয়া যাবে। যখন-তখন কাজের ফাঁকে, বাড়ীতে বা অফিসে, সে একটা করে মুখে ফেলে, এতে সে অদ্ভুত তৃপ্তি পায়। অভ্যাসটা তার অনেক দিনের। মনে আছে, তখন তার বাবা বেঁচেছিলেন। বাবা ইঞ্জি-নীয়ার ছিলেন। মুখার্জি এ্যান্ড সন্স তখনকার নামজাদা আর্কিটেকট। অফিস ছিল খোদ ডালহৌসীতে—মুখার্জি এ্যান্ড সন্স—বিল্ডারস এ্যান্ড কনট্র্যাকটারস। বেশ সুনাম ছিল কোম্পানীর। অর্থাগমও ছিল। প্রচুর। শিলং-এর মিলিটারী ব্যারাকস তৈরী করতে গিয়ে বিপর্যয় ঘটল। মাল খারাপের অজুহাতে মিলিটারী ব্যারাক ধূলিসাৎ করে দিল তখনকার বৃটিশ গভর্নমেন্ট। একচোটে কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে গেল। সেই শেষ। মা আগেই গিয়েছিলেন এবার বাবা শয্যা-শায়ী হলেন। সনতের সেই সময়টা এখনও দুঃস্বপ্নের মধ্যে দেখা দেয় মাঝে মাঝে। জেগে থাকলেও সে সব কথা মনে পড়ে যায় সময় সময়। মনে আছে বাড়ীর সেই আশঙ্কা, অবসাদ আর দুশ্চিন্তাময় পরিবেশ সনতের শিশু মনকে পীড়িত করত অসহনীয়ভাবে। নিজেকে সে আরও দুর্বল আর অসহায় ভাবত। একে পঙ্গু তায় মনের উপর এই অসহ্য চাপে সনৎ প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ত। গলা শুকিয়ে যেত বার বার ভয়ের প্রকোপে। মুখ আর গলাটা সরস রাখার জন্য সনৎ লজেন্স মুখে রাখত একটা করে। তাতে উপকার পেত সে। মিষ্টি স্বাদটা তার শিশুমনের ভয় ভুলিয়ে দিত কিছুক্ষণের জন্যে। মুখ আর গলাও সরস থাকত ঐ সঙ্গে। এ অভ্যাস সনতের থেকে গিয়েছে। কোন মানসিক চাঞ্চল্যে, একটু উত্তেজনায় সনতের মনে পড়ে যায় লজেন্সের কথা। একটা অদৃশ্য যন্ত্রের মত তার জীবনে সেটা কাজ করে চলে। এটা তার সহায় এমন কি অবলম্বনও বলা চলে। একটু পরে বেয়ারা চা দিয়ে গেল। এক পেয়ালা চা, দুটো টোস্ট আর আপেল একটা। চা খাওয়া শেষ হলে আবার লেখাটা নিয়ে পড়ল সে।

—সনৎ। দাদা এসেছে একেবারে ঘরের মধ্যে।

উঠতে চেষ্টা করল সে—

—না না, বোস, উঠো না—বলল সরিৎ— আমি তোমার সঙ্গে একটা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলব। আমাদের নার্সিং-হোমে যে ভদ্রলোক অ্যাকাউন্টস দেখতেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন — তাতে অসুবিধে হচ্ছে খুব—তুমি কি ওটার ভার নিতে পারবে?

—হ্যাঁ, পারব, তবে সপ্তাহে দু দিন আর রবিবার।

—তোমার কিছু অসুবিধে হবে না?

—না এমন আর কি?

—স্ট্রেন হবে না তো? সরিৎ তাকালো সনতের দিকে।

না, কিছু হবে না—দুর্বলতার ইঙ্গিতে বিরক্ত হল সনৎ।

তাহলে তুমি কালই খাতাপত্তর বুঝে নিও, আমি বিধুবাবুকে বলে দেব; আর তুমি সন্ধ্যেবেলায় বাড়ীতে চুপ করে বসে থাক কেন?

কি করব—সারাদিন অফিস করার পর ক্লান্ত লাগে।

তাহলে গাড়ী করে একটু বেড়িয়ে আস না কেন; এই সময় ত গাড়ী তোলাই থাকে, ড্রাইভারকে কাল বলে দেব।

এখন থাক—দরকার হলে পরে বলব।

তোমার সঙ্কোচটা একটু কমাও সনৎ, ওটাতে আমি আর দীনা দুজনেই আঘাত পাই।

না—সঙ্কোচ নয়, শুধু শুধু তোমরা আমার জন্যে যেভাবে ব্যস্ত হও তাতে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি, মনে হয় আমার অক্ষমতাই এর জন্য দায়ী।

এ কমপ্লেক্সটা তোমার মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে দেখছি—তুমি [illegible] নিজেকে অক্ষম আর দুর্বল ভেবে নিয়ে ভুল করছ।

তুমি নিজে রোজগার কর, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছ -

হেসে উঠল সনৎ, বলল—ওকথা বলো না, আমার একটা পা খোঁড়া, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো বেশ কষ্টকর।

ডোণ্ট টেক ইট অ্যামিস — লিটারেল মানেটা ধরছ কেন? আর তাছাড়া লক্ষ্য করছি তুমি একটু স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছ — এটা কিন্তু কমপ্লেক্সেরই কুফল। একবার হীনমন্যতা এসে গেলে বিপদ হবে তাকে তাড়াতে—সে যাক তুমি যা ভাল বোঝ কর—সরিৎ চলে গেল বাইরের দিকে।

নিজের উপর বিরক্ত হল সনৎ। কথা-গুলো ওভাবে না বললেও চলত তার। দাদার বাড়ীতে থাকতে আপত্তি নেই, গাড়ী চড়তে তাহলে বাধাটা কোথায়? এর পর হয়ত কোন দিন দাদার সঙ্গে রূঢ় আরও অশোভন ব্যবহার করে ফেলবে। না তাকে সংযত হতেই হবে। অভদ্রতা নিশ্চয়ই তাকে মানায় না। পর্দাটা নড়ে উঠল আবার—

আসতে পারি—

এসো বৌদি—আবার কি হল।

কেন আসতে নেই, এলে তুমি বিরক্ত হও—কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল দীনা।

গুড হেভেনস বৌদি, তুমি এলে বিরক্ত হবে এমন লোক এখনও জন্মায় নি।

রিয়েলি? আচ্ছা ছোড়দা, তুমি বিয়ে কর না কেন?

কাকে করব—?

কেন, এত মেয়ে কারুর সঙ্গে ভাব করে ফেল।

আমার একটা পা খোঁড়া—

বায়রণেরও ছিল, অথচ লেডি কিলার নাম্বার ওয়ান—কি ঠিক না? ওসব তোমার বাজে কথা।

ঠিক বলেছ ওটা বাজে কথা। আসল কথা হল কোন মেয়েই তোমার পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত নয়।

খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল দীনা-বলল—আ-হা নাউ ইউ আর টকিং—তাহলে বিয়ে করতে হবে না তোমার।

কেন?

কারণ তুমি ত দেবর, মানে দ্বিতীয় বারের বর—আই না?

অঃ বৌদি আবার। যাইহোক তুমি কিন্তু একথা বলার জন্য আসনি আমার ঘরে।

রাইট, আমি এসেছি অন্য কারণে। 'আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।' —উল্টো হ'ল না?—তাহোক শোনো ছোড়দা কাল আমায় মার্কেটে নিয়ে যেতে হবে।

আমি তোমায় মার্কেটে নিয়ে যাব!—দোহাই তোমার বৌদি তার চেয়ে বরঞ্চ বল বিয়ে করতে, রাজী আছি—অসহায় ভঙ্গী করল সনৎ।

হেসে উঠল দীনা সনতের কথা শুনে বলল, কেন, আমায় মার্কেটে নিয়ে যেতে তোমার আপত্তিটা কি?

কিছুমাত্র নেই, তবে পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘন করতে বলছ।

হোয়াট ন্যাস্টি—ওটার মানে কি হ'ল।

মানে, খোঁড়া লোককে পাহাড় পেরোতে বলছ আর কি। তোমারা কর্তা-গিন্নীতে কি ভাবছ বলত?

হু ইজ গিন্নী? আমি কি মোটা থপ থপে মাথায় ঘোমটা করে সিঁদুর দিয়ে কচর কচর পান খাই না আমি বড়ি—চওড়া-পেড়ে হ্যান্ডলুমের শাড়ীতে ভারি চাবি বেঁধে চাকরদের গালাগালি দিই অযথা—কি বল কোনটা।

আই বেগ ইওর পার্ডন—ওয়ার্লড বিউটি রীতা ফারিয়াও তোমার পায়ের ধুলোর যোগ্য নয়—তুমি বহ্নিশিখা—তুমি কাশের গুচ্ছ—তুমি শরৎ-সন্ধ্যার শেফালী—তুমি মোহময়ী স্বপ্ন—ভাবের আতিশয্যে চোখ বন্ধ করল সনৎ।

ব্যস ছোড়দা আর নয়, এটা আগে হজম করি। হাউ নাইস—বাঙালীরা এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে—তুমি জাননা ছোড়দা, কি যে ভাল লাগে আমার—।

দিল্লীর লোকেরা পারে না?

রাম কহ, ওরা কইবে কথা, তাহ'লেই হয়েছে, ওরা প্রেমের কথা শুরু করলে পাশের বাড়ীর লোকে বলে, দাদা অনেক রাত হয়েছে একটু ঘুমোতে দাও।

আর বাঙালীরা—সনৎ তাকায় কৌতুক-ভরে—

হোয়াট—তার মানে আমি অনেক বাঙালীর সঙ্গে প্রেম করেছি বলতে চাও।

না মানে, দাদার কথা মিন করছি। আচ্ছা বৌদি দাদা তোমায় খুব ভাল ভাল কথা বলে—

বলে বৈকি—এই ধর ব্লাডপ্রেসার কমে গেলে ডেরিটল দেব না কোরামিন দেওয়া উচিত—আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশন কখন দেব, এই সব আর কি। দীনার মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল।

বল কি, স্রেফ এই?

তুমি কি আমার 'কনফেসান' চাইছ ছোড়দা? শুরু করব নাকি।

ইস—না না যাঃ—তুমি এমন উল্টো-পাল্টা কথা বল—লাল হয়ে উঠল সনৎ। বলল—ঠিক আছে আমি কাল তোমায় নিয়ে মার্কেটে যাব হল ত। আচ্ছা এখন বল, তোমরা দুজনে মিলে আমাকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য পরামর্শ করেছ কিনা?

করেছি; সরিৎ আর আমার দুজনেরই মত হচ্ছে—

ডাক্তার হিসেবে ত, বাধা দিল সনৎ।

বেশ, তাই—আমাদের মত হচ্ছে—

তা আগে একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে—আবার বাধা দিল সনৎ।

বেশ বল—বাঁকা ভ্রূদুটো মনোরম ভঙ্গীতে তুলল দীনা।

আমার মতে, তোমরা দুজনেই ডাক্তার নও।

সে কি!

হ্যাঁ; দাদা অজ্ঞান করায়; ওটার কোন প্রয়োজন নেই আমায় আর তুমি ত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ—তুমি আমার কি করবে? সুতরাং তোমরা দুজনেই আমার কাছে ডাক্তার নও।

কিন্তু ধর, তুমি বিয়ে করলে—তখন? দুষ্টুমি-ভরা চোখে তাকাল দীনা।

তখন কি?

তখন আমায় দরকার হতে পারে—নকল গাম্ভীর্যের একটা ভাব মুখে আনল দীনা তারপর বলল—এ্যাপার্ট ফ্রম জোকিং তুমি আমায় একটা সত্যি কথা বলবে—

নিশ্চয়—।

তাহলে তুমি আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দাও—নাম্বার ওয়ান—তুমি কোন মেয়েকে পছন্দ কর কিনা—।

করি, তবে একজনকে নয় দুজনকে।

ভেরি গুড। নাম্বার টু—তাদের কি ভাল লাগে?

লাগে।

মানে দুজনকেই?

হ্যাঁ, দুজনকেই।

তাহলেই তো বিপদ—গালে হাত দিয়ে মুখটা গম্ভীর করার চেষ্টা করল দীনা—বলল—এদের কি কারুর বিয়ে হয়েছে—

হ্যাঁ, হয়েছে একজনের।

তাহলে সে বেচারীকে দয়া করে রেহাই দাও।

দুজনেই জোর গলায় হেসে উঠল এক সঙ্গে।

(ক্রমশঃ)

কি এবং কেন (৪):

ইলেকট্রনিকস

বর্তমান যুগকে বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের বিচারে একদিক দিয়ে যেমন ব-া যায় মহাকাশ-বিজ্ঞানের যুগ অপরদিক থেকে তেমনি বলা যায় ইলেকট্রনিকস্-এর যুগ। এই ইলেকট্রনিকসেরই বিস্ময়কর অবদান হচ্ছে কম্প্যুটার, লেসার, মেসার, ট্রানজিস্টর, বেতার, বেতার-দূরবীক্ষণ, সেমি-কন্ডাকটর, রাডার, টেলিভিশন। আজ যে মহাকাশ অভিযানে আমরা বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখছি তার মূলেও রয়েছে এই ইলেক্-ট্রনিকস্।

এখন 'ইলেকট্রনিকস্' বলতে কি বোঝায় তা দেখা যাক। পরমাণুর আভ্যান্তরীণ গঠন সম্পর্কে আমরা জানি, পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন এবং কেন্দ্রের বাইরে ঘুরে বেড়ায় এক বা একাধিক ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রন বা প্রোটন হচ্ছে বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ-কণা এবং নিউট্রন হচ্ছে বিদ্যুৎশূন্য। কোনো পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন কোনোরকমে বিচ্যুত হলে তাতে ধনবিদ্যুতের মাত্রা বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ বস্তুটি হয়ে পড়ে ধনাত্মক। এই বিদ্যুৎ ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর বাইরে ঘুরে বেড়ায়। পাশাপাশি যে পরমাণুতে বা বস্তুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা কম, ইলেকট্রনগুলো সেদিকে ধাবিত হয় ও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। কোনো বস্তুর পরমাণু থেকে ইলেক্-ট্রন বিচ্যুত করে নানা কাজে লাগানো এবং তাদের বিভিন্ন ধর্ম পর্যবেক্ষণ করা বিজ্ঞানের একটি শাখায় পরিগণিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যায় এই শাখাকে 'ইলেকট্রনিকস' নামে অভিহিত করা হয়।

গ্রীষ্মকালে আকাশের গায়ে যে বিদ্যুৎ-রেখা খেলে যায় তাতে আমরা ইলেকট্রনের ধর্মের আভাস পাই। বিদ্যুৎপাতের সময় মেঘ ও পৃথিবী তড়িতাহত হয়, অর্থাৎ একটিতে ধনবিদ্যুৎ এবং অপরটিতে ঋণ-বিদ্যুতের মাত্রা বেড়ে যায়। কারণ এইসময় ঘর্ষণজনিত সংস্পর্শের ফলে মেঘ ও পৃথিবীপৃষ্ঠ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। যে বস্তুতে ঋণবিদ্যুতের মাত্রা বেড়ে যায়, সেখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে। সেই ইলেকট্রনগুলো অপর ধনাত্মক দেহের দিকে মিলিত হবার জন্যে ছুটে যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্রিয়ায় এবং মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে বায়ুমন্ডলে সর্বদাই কিছু মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। তড়িতাহত পৃথিবী ও মেঘের মাঝখানে যে বাতাস থাকে তার পরমাণু-গুলো বর্ধিত বেগে ধাবিত সেই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর ধাক্কায় ধনাত্মক বা আয়নিত হয়ে যায়। সেই পরমাণুদের ইলেকট্রনগুলো তখন আগেকার ইলেকট্রন-দলের সঙ্গে সম্মিলিত হয় এবং ধনাত্মক মেঘ বা পৃথিবীর দিকে ছুটে চলে। এদিকে আয়নিত বায়ু-পরমাণুগুলো ঋণাত্মক দেহের দিকে ছুটে যায়। এই আয়নিত বায়ু-পরমাণু-গুলোর ভর বেশি হওয়ার দরুন তাদের গতি হয় মন্থর। তাদের যাত্রাকালে বিপরীতধর্মী ইলেকট্রন-গুলোর কতকাংশ তাদের সঙ্গে প্রায়ই মিলিত হয়ে বিদ্যুৎশূন্য বায়ু-পরমাণু সৃষ্টি করে। এই সম্মিলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা তেজের বিকিরণ হয় এবং বিজলীর আলোরূপে আমরা তা দেখতে পাই।

আমরা জানি, পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রনের দল বিচরণ করে। আয়নিত বায়ু-পরমাণুর কোন্ কক্ষে পথিক ইলেক্-ট্রনটি মিলিত হয় তার ওপর বিদ্যুতালোকের তীব্রতা ও বর্ণ নির্ভর করে। ইলেকট্রনের মিছিল ধনাত্মক দেহের দিকে বিদ্যুৎস্রোতের মতো প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ বায়ু-পরমাণুগুলোকে সবেগে বিক্ষিপ্ত করে। তাদের গতি বেড়ে যাওয়ায় অধিকতর তাপ-মাত্রার সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় বায়ুমন্ডল প্রসারিত হয়ে পড়ে। তখন চারদিকে যে চাপ বর্ধিত হয়, তাতে আমরা বজ্রের শব্দ শুনতে পাই। এই ক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহিত মেঘ ও পৃথিবীর স্থৈতিক শক্তি আলো, তাপ ও শব্দরূপে নির্গত হয়ে যায়। তখন পৃথিবী ও মেঘ উদাসীন বা বিদ্যুৎশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতির এই ইলেকট্রনিক বিচ্ছুরণের মতো মানুষও ইলেকট্রনকে পরমাণু থেকে বিচ্যুত করে নানা পরীক্ষায় ও কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে। মানুষের হাতে ইলেকট্রনিকস-এর উদ্ভব খুব বেশিদিনের নয়। বাস্তবক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকসের যে প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই তার উদ্ভব মাত্র ৬৫ বছর আগে, যদিও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপে এর আবির্ভাব আরও আগে। ১৯০৪ সালে আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং যখন 'ইলেকট্রনিক ভাল্ব' উদ্ভাবন করেন সেদিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনিকস যুগের সূচনা। প্রথম প্রথম বেতার টেলি-গ্রাফির মধ্যে ইলেকট্রনিকস-এর প্রয়োগ সীমিত ছিল। তারপর ১৯২২ সালে বেতার-বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিকসের ব্যাপক প্রয়োগ হতে থাকে। অর্ধশতাব্দী কালেরও কম সময়ে ইলেক্-ট্রনিকস-এর যে দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে তা অভাবনীয়। 'বেতারের ক্ষেত্র' থেকে ইলেক-ট্রনিকস ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, গণনা, দূরপাল্লায় বার্তাবিনিময় ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে শিল্পবাণিজ্য, পরিবহণ, যোগা-যোগব্যবস্থা, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ অভিযান বা বিজ্ঞানের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে কোনো না কোনোভাবে ইলেক্-ট্রনিক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। তাই বর্তমান যুগকে 'ইলেকট্রনিকস যুগ' রূপে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না।

শতাব্দীর স্বপ্ন আজ সার্থকতার পথে

আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। তারপর বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক চন্দ্র-অভিযান পরম সার্থকতার পথে উপনীত হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ গ্রহান্তর যাত্রার যে স্বপ্ন দেখে এসেছে তার ঐতিহাসিক অধ্যায় রচিত হচ্ছে আগামী ২১ জুলাই—যে শুভদিনটিতে আমাদের মর্ত্যভূমির একজন মানুষ চন্দ্রের বুকে প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কিত করবেন।

আমরা আগেই জেনেছি, অ্যাপোলো—১১ মহাকাশযানযোগে তিনজন মার্কিন মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অ্যাল-ড্রিন এবং মাইকেল কলিনস্ ১৬ জুলাই চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করে ২১ জুলাই চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণের চেষ্টা করবেন। এই তিনজন মহাকাশচারীর মধ্যে কলিনস্ থাকবেন মূল মহাকাশযানে এবং চন্দ্রযান থেকে প্রথমে আর্মস্ট্রং ও তারপর অ্যালড্রিন চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করবেন। তাঁদের এই চন্দ্রে অবতরণ ঘিরে সারা বিশ্বের মানুষের মনে আজ গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে তাঁরা চন্দ্রের বুকে অবতরণ করবেন তা জানার জন্যে আমরা সকলেই আজ সমুৎসুক। এই ঐতিহাসিক অভিযান যাঁরা পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা মহাকাশচারী দুজনের চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণের একটি মনোজ্ঞ (সম্ভাব্য) বিবরণ প্রকাশ করেছেন। আমরা এখানে সেই বিবরণটি তুলে ধরছি।

২১ জুলাই পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ে চন্দ্র-যানে (লুনার মডিউল) করে আর্মস্ট্রং এবং অ্যালড্রিন ধীরে ধীরে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামবেন। চারটি সরু পায়ার ওপর ভর দিয়ে চন্দ্রযানটি চন্দ্রের বুকে দাঁড়িয়ে থাকবে। মহাকাশচারী দুজন চন্দ্রযান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত হবেন। যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করার পর তাঁদের সর্বপ্রথম কাজ হবে, যানটির সমস্ত যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা। কারণ, চন্দ্রে তাঁরা যতক্ষণ বা যতদিন থাকবেন, ততক্ষণ বা ততদিন এই যানটিই হবে তাঁদের কাজ-কর্মের ঘাঁটি ও আশ্রয়।

এরপর খাওয়াদাওয়া শেষ করে চন্দ্র-যানের মধ্যে তাঁরা পুরো ৪ ঘণ্টা ঘুমিয়ে
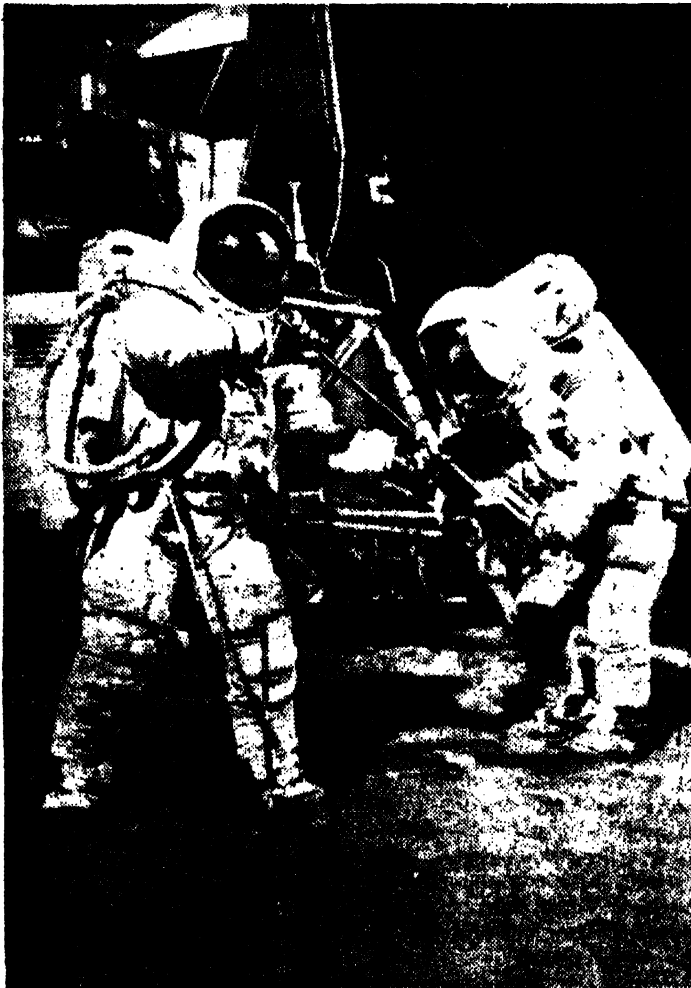
চন্দ্রে অবতরণের অভিযাত্রীরা (বাঁ দিক থেকে) : নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স এবং এডুইন অ্যালড্রিন।

নেবেন। তাঁদের সামনে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটসংকুল কাজকর্ম রয়েছে, সেসব সম্পাদনের জন্যে এই বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রামের পর চাঙা হয়ে নিয়ে মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের উপযোগী বিরাট পোশাক পরে নেবেন। যানটি থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামার চূড়ান্ত নির্দেশ আসবে পৃথিবীস্থিত সংযোগ-রক্ষণকেন্দ্রে এই অভিযানের প্রধান পরিচালকের কাছ থেকে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে নামার আগে মূল মহাকাশযানের সহযাত্রী কলিনসের সঙ্গে এবং পৃথিবীস্থ কেন্দ্রের সংযোগরক্ষাকারী দলের সঙ্গেও তাঁরা বার্তা বিনিময় করবেন। তারপর প্রধান পরিচালকের কাছ থেকে চূড়ান্ত নির্দেশ পেয়ে তাঁরা চন্দ্রযানের দরজা খুলবেন। বিরাট পোশাকের জন্যে মন্থরগতি আর্মস্ট্রং প্রথমে এই ছোট দরজা দিয়ে বার হয়ে একটি সরু মঞ্চের ওপর একটি একটি করে পা রাখবেন। সরু মঞ্চের নাম দেওয়া হয়েছে পর্চ। মঞ্চ থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ পর্যন্ত একটি সরু মই লাগানো থাকবে। সেই মইটির ওপর পা রেখে আর্মস্ট্রং ধাপে ধাপে নীচে নেমে আসবেন। তাঁর একটি পায়ের মোটা জুতো চন্দ্রতল স্পর্শ করবে। আরেকটি পা নামানোর পর পৃথিবীর প্রথম মানুষ আর্মস্ট্রং চন্দ্রের বুকে এসে দাঁড়াবেন।

তখন ওপরে চন্দ্রযানের খোলা দরজায় থাকবেন অ্যালড্রিন। আর্মস্ট্রং ঘুরে তাঁর দিকে তাকাবেন। তারপর দুজনেই তাকাবেন ওপরের দিকে। দেখবেন এক অপূর্ব দৃশ্য! বিরাট সূর্যমণ্ডল একেবারে কোণাকুণি রয়েছে। সূর্যের অস্বস্তিকর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়ছে চন্দ্রমণ্ডলে। নভোমণ্ডলে সূর্যের এইরকম অবস্থিতির সঙ্গে তাল রেখেই চন্দ্রে নামার সময়টি ইচ্ছাকৃতভাবে স্থির করা হয়েছে। এইভাবে সূর্যের ছায়া সুস্পষ্টভাবে পড়বে চন্দ্রের ওপর। তাতেই অভিযাত্রীরা পাহাড়পর্বত, বিপদসংকুল গহ্বর আর সম্ভাব্য সমস্ত বাধা স্পষ্ট দেখতে পাবেন এবং নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে পারবেন।

এইবার আর্মস্ট্রং চন্দ্রের বুকে প্রথম পদক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত হবেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটা পৃথিবীতে হাঁটার মতো নয় কারণ, চন্দ্রের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের তুলনায় ৬ ভাগের একভাগ মাত্র। মহাকাশচারীর পোশাকের ওজন ৫৪ পাউন্ড আর তাঁর পিঠে যে অক্সিজেনের আধারটি

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মাটি ও উপলখণ্ডের নিদর্শন কিভাবে সংগ্রহ করা হবে তার মহড়া দিচ্ছেন আর্মস্ট্রং এবং অ্যালড্রিন।

থাকবে, তার ওজন ১২০ পাউণ্ড। কিন্তু চন্দ্রে ঐ ওজন গিয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর ৫৫ পাউণ্ড ওজনের মতো। কাজেই চন্দ্রপৃষ্ঠে পৃথিবীর মতো হাঁটতে গেলে মহাকাশচারী পড়ে যেতে পারেন। পৃথিবীতেই তাঁরা এ-বিষয়ে সুদীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটার জন্যে অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং প্রথমে একটি লাফ দেবেন, তারপর আর একটি, আবার আর একটি। এই-ভাবেই ছোট এক-একটি লাফ দিয়ে তিনি এগোতে থাকবেন।

এবার পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্যে আর্মস্ট্রং চন্দ্রপৃষ্ঠের উপলখণ্ড সংগ্রহ করবেন। ইতিমধ্যে অ্যালড্রিনও চন্দ্রযান থেকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন। এরপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে তাঁরা দুজনে যন্ত্রপাতি স্থাপন করবেন। তাঁরা স্থির ও চলচ্চিত্র তুলবেন এবং একটি টেলিভিশন ক্যামেরাও চালু করবেন। এই ক্যামেরার সাহায্যে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ তাঁদের এই অভাবনীয় অভিজ্ঞতার পরিচয় পাবেন। তাঁরা যা দেখবেন তাবৎ মানুষকেই তা দেখতে দেওয়া হবে। তাঁরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করবেন সমস্ত মানুষকেই তা জানানো হবে।

একদিন মাত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে অবস্থানের পর মহাকাশচারী দুজন পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রস্তুত হবেন। চন্দ্রযানের রকেট চালু করে তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠ ছেড়ে ওপরে উঠবেন এবং তারপর মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলিত হবেন। চন্দ্রের কক্ষপথে কয়েকবার পরিক্রমার পর মূল মহাকাশযান পৃথিবীর অভিমুখে যাত্রা করবে এবং ২৪ জুলাই প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবতরণ করবে।

পরে আরও চন্দ্র অভিযান হবে এবং অন্যান্য মানুষও চন্দ্রে গিয়ে নামবেন। এই-সব পরবর্তী অভিযাত্রীরা দীর্ঘতর সময় চন্দ্রে কাটাবেন। তাঁরা আরও বেশি উপলখণ্ড সংগ্রহ করবেন, আরও ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবেন এবং চন্দ্রের আরও বিস্তৃত অঞ্চল ঘুরে দেখবেন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত কৃতিত্বের প্রারম্ভে থাকবে অ্যাপোলো-একাদশের অভিযাত্রীদের এই অনন্য সম্মান। কেননা, তাঁরাই প্রথম চন্দ্রের বুকে পদার্পণ করেছিলেন।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমানী হিমবাহ ••••••••••••••••••••

যদি এক্ষুণি এই মুহূর্তে স্কিন-টাইট জামাকাপড় পরে বিস্তৃত বরফে ঢাকা ময়দানে স্কিয়িং অথবা স্কেটিং করবার ইচ্ছে জাগে, তবে কলকাতায় সেই ইচ্ছে পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। শুধু এখনই নয়, চরম হাড় কাঁপানো শীতেও কলকাতায় তা অসম্ভব, কারণ কলকাতার ময়দানে বরফের চাদর তো দূরের কথা, সামান্যতম হিমবৃষ্টি হবার কোন সম্ভাবনা নেই—এমন কি সুদূর ভবিষ্যতে কোন সম্ভাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। তাই শীত-বিলাসীর দল আইস-স্কেটিং করবার জন্য পাড়ি জমাচ্ছেন কাশ্মীর সিমলা কুলুভ্যালীর পথে যেসব অঞ্চল বেশীর ভাগ সময়েই বরফে ঢাকা থাকে।

কথাচ্ছলে জেনে রাখা ভালো, সাধারণতঃ উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল অথবা উঁচু অক্ষাংশের জায়গাগুলোতে বরফের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাইত দেখা যায়, উত্তর হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলের বেশীর ভাগ অংশই সারা বছর তুষারাবৃত থাকে। যে উচ্চতা রেখার ওপরে তুষারের রাজ্য সারা বছরই বিরাজ করছে তাকেই হিমরেখা (স্নো লাইন) বলে অভিহিত করা হয়। হিমরেখার নীচে বরফের অস্তিত্ব থাকে না, বরফ গলে সৃষ্টি হয় অসংখ্য নির্ঝরিনী। সাধারণতঃ হিমালয়ের পাহাড়ে হিমরেখার উচ্চতা ১৩০০০ ফিট থেকে ১৮০০০ ফিট পর্যন্ত দেখা যায়। [illegible] উপত্যকা থেকে [illegible] হিমরেখা [illegible] ওপরে উঠে যায়। আবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেমে আসে সমতলের দিকে। তুষারের ঘন চাদরে আবৃত হয়ে যায় পথ, ঘাট, মাঠ-ময়দান সব কিছু। আর সেই বরফের রাজ্যে আমদানি হয় শীতবিলাসী পুরুষ রমণীর। রং বেরংয়ের মেলা বসে যায় শ্বেতশুভ্র তুষাররাজ্যে।

প্রথম অবস্থায় তুষার থাকে ঝুরঝুরে পেঁজা তুলোর মত। আরো তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তুষারগুলো ওপরের চাপে জমাট বেঁধে মোটামুটি শক্ত বরফ জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই বরফ জাতীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক (ফরাসী) নাম নেভে', প্রকৃতিতে বরফ ও তুষারের মাঝামাঝি। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে এর মধ্যে স্তরবিন্যাস নজরে পড়বে। মনে হয় বরফের মধ্যে ধুলোবালি জাতীয় পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থানের জন্য স্তরবিন্যাস। আরো বেশী চাপ পড়লে এই নেভে'ই ধীরে ধীরে পরিণত হয় শক্ত নিরেট কেলাসিত বরফে। এই বরফের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট নীলাভ দ্যুতি জড়িয়ে থাকে। পাহাড়ী অঞ্চলের বরফের আস্তরণের সবচেয়ে নীচের স্তরে থাকে কঠিন নিরেট বরফ, তারপর নাতিকঠিন নেভে'র স্তর। আর সবচেয়ে ওপরে ছড়িয়ে থাকে নরম পেঁজা তুলোর মত তুষারকণা।

প্রকৃতির রাজ্যে কোন কিছুই নিস্তব্ধ নিশ্চল হয়ে বসে নেই। একই সঙ্গে চলেছে ভাঙ্গা গড়ার পালা। তাই বরফের ঢালে জমে থাকা পুরু বরফের আস্তরণও গতিশীল হয়ে উঠেছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে। এই চলমান বরফের চাঁইকে বলা হয় হিমবাহ (Glacier). উপত্যকার আঁকাবাঁকা সর্পিল পথেই হিমবাহ চলনশীল। হিম-

বাহের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে দেখা গেছে, হিমবাহের মধ্যাঞ্চল সবচেয়ে দ্রুত চলমান। দু' ধারের অনেকগুলি উপত্যকার দেওয়ালে বাধা পায় বলে মধ্যবর্তী অংশের মত দ্রুত এগোতে পারে না। এই অসমান গতির ফলেই হিমবাহের গায়ে দেখা দেয় নানা ধরনের ফাটল। সাধারণতঃ হিমালয় অঞ্চলে হিমবাহের গতি দিনপ্রতি এক ইঞ্চি থেকে তিন ফুট পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। তবে কখনো কখনো স্থানকালপাত্র বিশেষে হিমবাহের গতি দিনে দশ-বিশ ফুট পর্যন্তও হতে পারে। হিমবাহের গতি ও অবস্থান অনেক পরিমাণে নির্ভর করে হিমরেখার ওপরে। হিমরেখার নীচে কখনও হিমবাহের অস্তিত্ব থাকে না, কারণ হিমরেখার নীচে সমস্ত হিমবাহই গলে জলে পরিণত হয়, সৃষ্টি করে স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণীর। এমনিভাবেই হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নদনদীর।

আকৃতি প্রকৃতি ও অবস্থান অনুসারে হিমবাহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রীনল্যাণ্ড বা আণ্টার্কটিকায় দেখা যায় ঘন পুরু বরফের আস্তরণে পাহাড় পর্বত প্রায় সারা বছরই আবৃত থাকে। এই জাতীয় পুরু বরফের চাদরকে বলা হয় আইস শীট বা বরফের চাদর। এই জাতীয় বরফের চাদর আইসল্যাণ্ডেও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। সমুদ্র খুব কাছে হলে এই বরফের চাদরই মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ে সাগরের উত্তাল বুকে। আর সমুদ্রবক্ষে ভাসমান এই বরফের চাঁইগুলিই হিম-শৈল নামে পরিচিত। আরেক ধরনের হিমবাহের দেখা মেলে উপত্যকার সর্পিল আঁকাবাঁকা পথে। উপত্যকার দু-পাশের পাহাড়ের দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে বলে এর নাম উপত্যকাবাহী হিমবাহ। হিমালয়ের বেশীর ভাগ হিমবাহই এই জাতের। হিমালয় অঞ্চলের মধ্যে গঙ্গোত্রী (১৬ মাইল লম্বা), কেদারনাথ (৯ মাইল), কুমারুণ ও জেমুর (১৬ মাইল) হিমবাহগুলি উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘতর হিমবাহের দেখা পাওয়া যায় আরো উত্তরে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীতে, যেখানকার বায়াফো (৩৭ মাইল লম্বা), বালটোরো (৩৬ মাইল), হিসপার (৩৮ মাইল) ও শিয়াচানের (৪৫ মাইল) হিমবাহের নাম উল্লেখ না করলে হিমবাহের তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। ৮০ মাইল লম্বা পৃথিবীর দীর্ঘতম হুবার্ড হিমবাহের সন্ধান পাওয়া গেছে আলাসকায়। পাহাড়ের উপত্যকাগুলি বেয়ে নেমে এসে দুটি বা ততোধিক হিমবাহ পাহাড়ের পাদদেশে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে তৃতীয় ধরনের হিমবাহের যার বৈজ্ঞানিক নাম পিয়েডমণ্ট গ্ল্যাসিয়ার বা পর্বত পাদদেশী হিমবাহ। আলসকার ম্যালাসপিনা বা বেরিং হিমবাহ এই শ্রেণীর। এই বিশাল হিমবাহের আস্তরণকে আপাতঃদৃষ্টিতে নির্দোষ মনে হলেও মোটেই তা নয়। হিমবাহের প্রবাহে ভূপৃষ্ঠের ওপরে অহরহই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটছে। বরফের সঙ্গে জমাটবাঁধা পাথরের ঘর্ষণে পর্বতদেহ অনবরত ক্ষয়িত হয়ে ধীরে ধীরে উপত্যকা গভীরতর হতে থাকে ও ক্রমে ইংরেজি ইউ আকৃতি ধারণ করে। এছাড়াও আর একভাবে পাহাড় পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে ক্ষয়িত হয়। গরমের দিনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে হিমবাহ গলতে শুরু করে, আর সেই গলিত জল পাহাড়ের ফাটল বেয়ে পাথরের ভেতরে চলে যায়। রাত্রিবেলা তাপমাত্রা কমে এলে সেই বরফগলা জলই আবার জমে নিরেট শক্ত বরফে পরিণত হয়। একথা সবারই জানা যে, জল জমে বরফ হলে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। আয়তন বৃদ্ধিজনিত অতিরিক্ত চাপের ফলে পাহাড়ের ফাটল আরও বৃদ্ধি পায়। তারপর অতর্কিতে একদিন সশব্দে পাথরের চাঁই হুড়মুড় করে ভেঙে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবেই সৃষ্টি হয় হিমানী সম্প্রপাতের। যখন বিশাল পাথরের চাঁই বরফের সঙ্গে মিশে উদ্দাম গতিতে ছুটে আসে ঢালের দিকে, ধ্বংস করে পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা কত গ্রাম-জনপদ।

হিমবাহ যেমন একদিকে ভাঙনের খেলায় মেতে রয়েছে, তেমনি আর একদিকে নিঃশব্দে করে চলেছে গড়বার কাজ, সৃষ্টি করছে নতুন পাথর। হিমবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত থেকে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন আকারের পাথর বাহিত হয়ে আসছে নীচের দিকে। পথ চলতে চলতে হিমবাহ নিজের পথের পেছনে ফেলে যায় অতিরিক্ত পাথরের বোঝা। হিমবাহের পথের মাঝে জমে থাকা এই উপলখণ্ডের সমষ্টিকে বলা হয় মোরেন। হিমরেখার নীচে পৌঁছলে যখন বরফ গলতে সুরু করে, সেই হিমবাহ গলিত জল থেকে সৃষ্টি হয় নির্ঝরিণী তটিনীর। আর হিমবাহ বাহিত বাকী সমস্ত পাথরের টুকরো জমে জমে সৃষ্টি হয় টিলাইট পাথরের। এই টিলাইট পাথরের মধ্যে ছোট বড় নানা আকারের পাথর থাকে, যার মধ্যে হিমবাহ বহনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অংকিত থাকে ঘর্ষণের দাগগুলি, যা দেখে অনুমান করা যায় যেন পাথরগুলো অচিন দেশের জগৎ থেকে অনেক পাহাড়-পর্বত, বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে এসে পৌঁছেছে বরফহীন এক দেশে।

টিলাইট পাথর ছাড়াও আর এক ধরনের ডোরাকাটা মাটি রংয়ের ভার্ভড কোল পাথর তৈরীর পেছনে রয়েছে হিমবাহের অবদান। হিমবাহের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বালি বা মৃত্তিকাকণা বয়ে বয়ে আসে, তা থেকে ঋতু বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জমে জমে সৃষ্টি হয় এই বিশেষ ধরনের কোল পাথর।

একথা শুনলে হয়ত অনেকেরই অবাক লাগবে যে প্রাগৈতিহাসিককালে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে গণ্ডোয়ানা যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের অনেক স্থান যেমন উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের বহু অঞ্চল হিমবাহের আস্তরণে ঢাকা ছিল বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য এই বরফের রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সে বরফের দেশ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, কিন্তু পৃথিবীর বুকে রেখে গেছে তার সাক্ষ্য যার সাহায্যে আজকের বিজ্ঞানী উদ্ঘাটন করতে পারছে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অতীতদিনের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস। তুষারমৌলী হিমালয়ের বুকে যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, সেই হিমেল হাওয়ার রাজ্য নিয়ে মানুষের ঔৎসুক্যের বিরাম নেই। প্রকৃতির রহস্য ভেদ করে বিচিত্র জ্ঞানে ক্রমশঃ উন্মীলিত হচ্ছে মানুষের তৃতীয় নয়ন। সেই তৃতীয় নয়ন উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে আশা হয়, সেদিনকার মানুষ প্রকৃতির বিচিত্র লীলাকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারবে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অহেতুক ভয় না করে লাগাবে মানুষের কল্যাণকর কাজে। সেদিনই হবে প্রকৃতির মানুষের মৈত্রীর প্রথম শিলান্যাস।

[illegible]

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[গ্রাম চেনবার নেশা ছিল বিকাশের। শহুরে যুবক প্রমোশন নিয়েই এল তাই পাত্তাগাঁর ব্যাঙ্কে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্ককাকার বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। বিস্ময়ের আশ্রয়। মনীষা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত মনীষার, দ্বিতীয় উপস্থিতি।

চারদিকে টানাপোড়েন। চোরাবালি। ক্ষোভে-ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছে সবাই। মূল্যবোধও বিপর্যস্ত। ঘুনপোকা।

গ্রাম্য রাজনীতির বীভৎসতা।

সোনালির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ। বিকাশের চোখেও সে যেন দেখতে পেল নির্ভরতার আলো। অথচ মনীষা তার অস্তিত্ব জুড়ে।

সে পালাও ফুরলো। মনীষা হারিয়ে যেতে চাইল।

একা।

বিকাশ বিপর্যস্ত। অফিসেও অশান্তি। একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে শেষে তুলকালাম। বিকাশের ক্ষমা প্রার্থনা। বিষিয়ে রইল মন। শূন্যতার খাঁচায় বন্দী। ফিরল অফিস থেকে। সোনালির মুখোমুখি।

।। চল্লিশ ।।

প্রভাকর আস্তে আস্তে পা দোলাচ্ছিল তার ইজি চেয়ারটায় বসে। তারপর পিঠটা সোজা করে একটু ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। নিকোটিনের গাঢ় বাদামী রঙধরা তর্জনী আর মধ্যমা বার করে বাজাতে চেষ্টা করল বেতের টেবিলটার ওপর।

'কী আশ্চর্য, একবার ডাক্তারও দেখাতে চাইলেন না ভদ্রমহিলা?'

'না।'

'তোকে কিছু না বলেই চলে গেলেন তিন চারদিনের জন্যে?'

বিকাশ জবাব দিল না।

আবার নিজের মনে আঙুল বাজাতে লাগল প্রভাকর—তার ডাক্তারী বিদ্যে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটার যেন সমাধান খুঁজছে একটা। পেলো না। তারপর স্থূলভাবে বলল, 'যেতে দে। মেয়েরা ওই রকমই। দুদিন তোকে নাচালো, তারপর—'

কথাটা অশ্লীল, কথাটা মিথ্যে। কিন্তু প্রতিবাদ করারও উৎসাহ নেই। মনীষার মতো মেয়েদের প্রভাকর কখনো দেখেনি, কখনো তাদের সে বুঝবে না।

'দ্যাখ্‌গে, আর কারুর সঙ্গে প্রেম করে—'

'প্রভাকর, থাক এ-সব।'

প্রভাকর তার নিজের মতো করে বুঝে নিলে। বললে, 'হাঁ, ও-সব কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। এবার মনের মতো একটা মেয়ে দেখে চটপট বিয়ে করে ফ্যাল। কিন্তু আবার সাত বছর ধরে প্রেম করতে যাসনে—শেষকালে সব রস [illegible] হয়ে যাবে এই রকম।'

প্রভাকর বন্ধু, প্রভাকর হিতৈষী, কিন্তু আজ তাকে সহ্য করা যাচ্ছিল না। ক্লান্ত মাথাটার তার দু হাতের ওপর রেখে বিকাশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সামনের দিকে। বারান্দার [illegible] ফাঁকের তলা দিয়ে হাস-পাতাল দেখা যায়, দুটো নারকেল গাছের পাতা হাওয়ায় দুলছে তা চোখে আসে; দুজনের পথ দিয়ে [illegible] তা দেখা যায়। কিন্তু বিকাশ কিছু দেখছিল না, [illegible]

যদি একবারও আভাস দিত যে বিকাশ এতখানি অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে, তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই—

প্রভাকর আবার কথা বলল।

'তুই চলে যেতে চাস কেন এখান থেকে? এই ব্যাপারেই?'

'না।'

'ব্যাঙ্কের সেই গণ্ডগোলটা হয়েছে বলে? আরে, আজকালকার হাওয়াই ওই রকম, কাউকে যদি তুই অনেস্টলি কাজ করতে বলবি, সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ খারাপ—মৌলিক অধিকারে ঘা লাগে। কাজ কি [illegible] একার ডিউটিফুল হয়ে? সবাই ফাঁকি দিচ্ছে, তুই দে। চাকরি করছিস, রোজ তাই কর না।'

আর একটা বিশ্রী প্রসঙ্গ। না, ব্যাঙ্কের ঘটনায় বিকাশের কিছু আসত যেত না। [illegible] সঙ্গে যদি তার ভুল বোঝাবুঝি ঘটে থাকে, [illegible] মাপ চাইতে হয়ে থাকে তার জন্যে, তাতে তার মান যায়নি। কিন্তু [illegible] অবিচার [illegible] তার ওপরে? বিপ্লবী ছিলেন এক-সময়, [illegible] পড়েছেন, [illegible]

রাজনীতির চর্চাও করেন—কী করে তাঁর ধারণা হল যে কানাইবাবুর কাছে বাসাভাড়া চেয়েছে বলেই সে দালাল?

আসলে, এখানে না এলেই তার ভালো হত। এখানে আসবার পরেই অকারণে জট পাকিয়ে যাচ্ছে সমস্ত!

প্রভাকর আরো কী বলছিল, বিকাশের কানে গেল না। নীচের ঠোঁটটা একবার কামড়ে ধরে বললে, 'এসব কিছু না। আমার এখানে ভালো লাগছে না।'

'তা বলতে পারিস—' প্রভাকর মাথা নাড়ল: 'কোনো ভদ্রলোকের এখানে ভালো লাগতে পারে না, লাগা উচিত নয়। তুই তো বাইরের থেকে কেবল দলাদলি দেখছিস, কিন্তু ভেতরে পচন যে কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে তা [illegible] বুঝতে পারবি না। বুঝলি, পুরো শহর আর পুরো গ্রামের একটা নিজস্ব চেহারা আছে, কিন্তু যা না-শহর, না-গ্রাম, সেখানে দুটোর যা কিছু [illegible] এসে জড়ো হয়। একদিকে ছোটো দলাদলি, আর একদিকে শহরের আবর্জনা। [illegible], আবার হিন্দী ফিল্মের ধরনে প্রেম। ডাক্তার হিসেবে এপাড়ায় দু-একটা মামলা

ফ্যামিলির এমন স্ক্যান্ডাল তোকে শোনাতে পারি—'

'থাক।'

'হুঁ, তুই এখনো সেইরকম পিউরিটান রয়ে গেলি। কিন্তু নামজাদা কন্‌জারভেটিভ ফ্যামিলির বাল-বিধবাকে যখন ডি-ডির ইনজেক্‌সন দিতে হয়—'

'প্লীজ প্রভাকর, যথেষ্ট হয়েছে।'

'ঠিক আছে, আমি থামছি। কিন্তু চোখ বুজে জীবনকে আইডিয়ালাইজ করলেই রিয়্যালিটি ক্ষমা করে না। বরং চোখ বন্ধ করে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে যে হাঁটছে, তাকেই অন্ধকার গর্তের ভেতরে আছড়ে পড়তে হয়। লুক অ্যাট্ ইয়োর মনীষা। তুই তো ভেবেছিলি সাবেকী বাংলা উপন্যাসের নায়িকার মতো সারাটা জীবন সে তোরই ধ্যান করে কাটিয়ে দেবে, কিন্তু নতুন কোনো শাঁসালো মক্কেল জোটবার সঙ্গে সঙ্গে—'

'প্রভাকর, আমার ভালো লাগছে না।'

একটু রূঢ় শোনালো কথাটা। প্রভাকর থেমে গেল।

'সরি, তোর সেণ্টিমেণ্টে আমি ঘা দিয়েছি। কিন্তু আমি বলছিলুম, টেক্ এভরিথিং ঈজি।'

'এভরিথিং ঈজি!'

'একজ্যাকটলি। মনীষা গেছে, যাক। ব্যাঙ্ক এতদিন যেমন চলছিল তেমনি চলুক—তোর কী দায় পড়েছে যে দাড়িওলা একটা মূর্তিমান বিবেকের মতো সেখানে নাক গলাতে যাস? ভিলেজ পলিটিকস্? মরুক না কুকুরের মতো কামড়া-কামড়ি করে। তুই পার্টি হয়ে থাক এদের ভেতরে, যেদিকে হাওয়ার জোর বেশি—সেদিকে ভেসে পড়বি। আর তক্কে তক্কে থাকবি, যদি ফাঁক পাস, কিছু জমিজমা সস্তায় কিনে ফেলবি গ্রামের দিকে। একটা দোকানও করে ফেলতে পারিস বাজারের ভেতর—অফ-টাইমে সেখানে বসবি।'

মনের ভেতর মেঘ, কিন্তু প্রভাকরের কথার ভঙ্গিতে বিকাশ হেসে ফেলল।

'আমার এই অবস্থায় তুই ঠাট্টা করছিস?'

'ঠাট্টা নয়, খুব সিরিয়াসলি বলছি।'

'তোর জমিটমি কেনা হয়ে গেছে?'

'পৈতৃক কিছু জলরেত্তি বোধ হয় আছে এখানে। কিন্তু জ্ঞাতিরাই তা ভোগ করে থাকেন, দু-এক বস্তা ধান-চাল যে টেনে নিয়ে আসব সে যোগ্যতাও আমার নেই। আসলে ডাক্তারী করেই সময় পাই না—ও-সবে মন দেব কখন? কিন্তু তুই তো কমার্সের ছাত্র, তার ব্যাঙ্কের চাকুরে, হিসেব-পত্তর ভালো বুঝিস, ইচ্ছে করলেই আখের গুছিয়ে নিতে পারবি।'

'উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। আজ উঠি।'

'আর এক পেয়ালা চা?'

'না, দরকার নেই, সাড়ে আটটা বাজে।'

বিকাশ উঠে পড়েছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রভাকরের স্ত্রী অমলা।

'বাসা ভাড়া হয়ে গেছে আপনার?'

বিকাশ একবার অমলার দিকে তাকালো। সুখী, পরিতৃপ্ত। গোল ভরাট ধরনের মুখখানা একটা চাপা খুশিতে ঝলমল। সেই খুশির আভাতেই সিঁথের চওড়া সিঁদুরের রেখাটাও যেন ঝকমক করছে। এখনকার মেয়েরা এমন করে সিঁদুর পরে না কেউ, কিন্তু এই মেয়েটি প্রবাসিনী বলেই বোধ হয় ষোলোআনা বাঙালী ঘরের বউ হতে চাইছে। ডাক্তার প্রভাকরের অনেকটাই সময় বাইরে বাইরে কাটে, কিন্তু অমলার অতৃপ্তি নেই, তার রেডিয়ো আছে, তার বাংলা উপন্যাস আছে, আর—আর বাস্তব মানুষ প্রভাকরের সহজ স্বাভাবিক ভালোবাসা আছে।

কিন্তু অমলার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা জিনিস বোঝা গেল তৎক্ষণাৎ। সে কেন বাসা ভাড়া করতে চেয়েছিল, অমলা তা জানে। প্রভাকর নিশ্চয় মনীষার কথাটা বলেছে তাকে।

একবারের জন্যে প্রভাকরকে হিংসে করতে ইচ্ছে হল তার। তারপর বললে, 'না, বাসা ভাড়া করার কথা আর ভাবছি না আপাতত।'

অমলা যেন আশ্চর্য হল একটু।

'কিন্তু—লেকিন—'

'লেকিন কিছু নেই ভাবীজী।'—জোর করে হাসল বিকাশ: 'বাসা ভাড়া করতে চাইলেই কি পাওয়া যায়, না ভাড়া পেলেই তা নেওয়া যায় সব সময়?'

অমলার চোখের তারা দুটো বড়ো হয়ে উঠল।

'বাঃ, আপনি দিল্লাগী করছেন।'

'দিল্লাগী-টিল্লাগী বুঝি না। বাসা ভাড়া নিচ্ছি না—ব্যাস।'

অমলা সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে রইল। বিকাশ হাসতে চেষ্টা করল আবার।

'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বাসার দরকারটা খুব যদি বেশি হয়ই, তাহলে আপনার এখানেই তো এসে ওঠা যাবে। নেমন্তন্ন তো আপনি দিয়েই রেখেছেন।'

'সে তো নিশ্চয়। কিন্তু—'

'হাঁ, একটা কিন্তু আছে। তার আগে বাংলাটা আরো একটু ভালো করে রপ্ত করে নিন। অত লেকিন আর দিল্লাগী চলবে না। আসি তবে—নমস্তে জী।'

প্রভাকর শব্দ করে হেসে উঠল। অপ্রতিভ হাসিমুখে অমলা বললে, 'নমস্কার।'

বিকাশ পথ চলল, নিজের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে। ভাবনারও বিশেষ কিছু নেই, কেবল নীরস অবসাদ খানিকটা। এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া নিষ্কৃতি নেই তার। কিন্তু দু-মাসের মধ্যেই বদলি হওয়া যাবে? গিয়ে তদ্বির করা দরকার। বলা দরকার, প্রমোশন চাই না, অফিসার হয়ে দরকার নেই, হেড অফিসে যেমন ছিলুম, তাতেই আমার সুখে কেটে যাবে।

এখান থেকে চলে গেলে, এই সব বিস্বাদ দিনগুলোও হারিয়ে যাবে আস্তে আস্তে। মিলিয়ে যাবে কানাই পাল, শশাঙ্ক নিয়োগীদের কথা—দশ বছর পরে সব কিছুকে মনে হবে কতগুলো স্বপ্নের টুকরোর মতো। শুধু সুনু-সোনালি-সুবর্ণা—

'এই যে।'

বিকাশ চেয়ে দেখল। হেডমাস্টার কুমুদ সেনগুপ্ত। তাঁর বাসার সামনে নামছেন রিক্‌শ থেকে।

'তোমাকে নাকি ঘেরাও করেছিল সব?'

আবার সেই অরুচিকর প্রসঙ্গটা।

'আজ্ঞে না—সেরকম কিছু নয়।'

'এই হয়েছে আজকাল—ঘেরাও। টেস্‌টে তিন সাবজেক্টে ফেল করেছে—অ্যালাউ করা হয়নি, অমনি হেডমাস্টার ঘেরাও।'—বিরক্ত হতাশ মুখে কুমুদবাবু বললেন, 'বদমাস বেয়াড়া ছেলেকে স্কুল থেকে টি-সি নিতে বলা হল, সঙ্গে সঙ্গে ঘেরাও। এ-সব পোলিটিক্যাল পার্টিগুলি দেশের জন্যে কী করছে জানি না, কিন্তু ছেলেগুলো তো এমনিতেই গোল্লায় যাচ্ছিল—আরো সর্টকাট দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের।'

রাজনীতির আলোচনায় বিকাশের উৎসাহ ছিল না। সে দেখছিল, রিকশ বোঝাই একরাশ পুরোনো বই। রিক্‌শওলা তার কিছু কিছু করে এক একবারে দিয়ে আসছিল হেডমাস্টারের বাইরের ঘরে। বইগুলো থেকে ধুলোর গন্ধ, পুরানো চামড়ার গন্ধ।

তার চেয়েও বড়ো কথা এ-সব বই যার এক জায়গায় থাকতে পারে, সেই একটি ঘরে। সেখানকার মানুষটা আজ এ-সব বই পড়তে ভুলে গেছে—মধ্যে মধ্যে পাতাগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে, অথচ বইগুলো সম্পর্কে যার অদ্ভুত মমতা। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছিল না, তবু বিকাশ নিশ্চয় জানে, মোটা মোটা বাঁধানো বইগুলোর পেছনে সোনার জলে লেখা আছে পি-কে নিয়োগী—প্রদোতকুমার নিয়োগী।

হেডমাস্টার বলছিলেন, 'যদি প্রদীপ মুস্তাফির কথা বলো, আমার স্কুলেই তো ছাত্র ছিল সে। বুঝলে, আগে বেশ বিনীত আর ভক্তিমান ছিল, লেখাপড়াতেও মন্দ ছিল না। কিন্তু কলকাতায় পড়তে গিয়েই—'

'এই বইগুলো শশাঙ্ককাকার জোগাড় —না?'

'সেদিন এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো সম্পর্কে হেডমাস্টারের কোনো সংকোচ ছিল না, কিন্তু

আজ এই আকস্মিক প্রশ্নটায়...প্রায় চমকে উঠলেন তিনি।

'এই, মানে—'

'নিজেই দিলেন?'

'তা কি আর দেয়? পাগলের খেয়াল—আমাকে তো দেখলেই তেড়ে আসে। তাই অন্যভাবে জোগাড় করে আনতে হল। কী করা যায় বলো, এক একটা বই এমন রেয়ার যে হাজার টাকা দিলেও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নিজেও তো হিসাবী লোক—বুঝি এ-সবের কদর।'

'আনলেন কী করে?'

'শশাঙ্কবাবু হেলপ করেন। উনি—মানে—' একটা বিরূপ মন্তব্য সামলে নিয়ে হেডমাস্টার বললেন, 'যদিও একটু বৈষয়িক লোক, তা হলেও এ-সব ব্যাপারে বেশ রিজনেবল।'

নিঃসন্দেহে রিজনেবল শশাঙ্ককাকা—বিকাশ ভাবল। আরো টাকার গন্ধ আছে যেখানে।

অপ্রতিভভাবে হেডমাস্টার বললেন, 'লোকটা ভালো ছাত্র ছিল একসময়, পড়াশোনা করত, কিন্তু এখন তো মগজে গাঁজার ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু নেই। দিনের পর দিন কেবল নষ্ট হচ্ছে বইগুলো। এভাবে বইগুলো বাঁচাবার রাস্তা নেই কোনো, সে তো বুঝতেই পারছ।'

'আজ্ঞে হাঁ, তা বটে।'

হেডমাস্টারের যুক্তির প্রতিবাদ করার কিছু নেই। বইগুলোর দুর্গতি তো নিজের চোখেই দেখেছে সে।

বিকাশ বললে, 'আচ্ছা স্যার, আসি।'

'ভালো কথা। আমার সায়ান্স টীচারের কোনো খবর পেলে?'

কলকাতায় গিয়ে দিনগুলো কিভাবে যে তার কেটেছে কুমুদবাবুকে সে-সব বলা যায় না। বলা যায় না ও-কথাটা তার মনেই ছিল না।

'আমি খোঁজ করছি স্যার।'

'কোরো-কোরো। আমি হয়রান হয়ে যাচ্ছি।'

'আমি দেখব স্যার।'

বিকাশ এগিয়ে চলল। তবু ভালো যে হেডমাস্টার মনীষার চাকরির কথাটা আর তোলেননি।

মনীষার কথা মনে হলেই যন্ত্রণা। জোর করে ভাবনাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে বিকাশ। তার জায়গায় মেজদা এসে দাঁড়ালো।

ওই পাগলকে দেখলে বিকাশের যে খুব একটা আনন্দ জাগে, তা নয়। এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ওই মেজদাই তার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। তারপরে যেভাবে সেদিন গলা টিপে ধরতে এসেছিল, তাতেও মেজদাকে ভালো লাগবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। কাকিমার মমতা আছে মেজদার জন্যে। সুনুর চোখেও জল আসে, কিন্তু ও লোকটা এই বাড়ীতে না থাকলেই বিকাশ খুশি হত।

তবু—তবু ওর বইগুলো—

দামী দামী দুর্লভ বইকে পাগলের খেয়ালে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না, খুব খাঁটি কথা। শশাঙ্ককাকা বইগুলো বিক্রী করে যা পান তাই লাভ। কিন্তু হেডমাস্টারমশাইয়ের তো অন্তত কতগুলো প্রিনসিপল আছে। তিনি তো জানেন, নিজের জিনিস রাখবার কিংবা নষ্ট করে ফেলবার যে-কোনো লোকের অধিকার আছে, অবশ্য যে উদ্দেশ্যেই তার জিনিসে হাত দিক, তাকে চুরি ছাড়া আর কিছুই বলে না। পরীক্ষার হলে মাত্র দুটো অংক টুকতে পারলেই একটি ছাত্র তরে যেতে পারে—একটা বছর তার নষ্ট হয় না—কিন্তু এই যুক্তিতে হেডমাস্টার কি তাকে অংক দুটো নকল করতে দেবেন?

আসল কথা—কাউকে শ্রদ্ধা করা যাচ্ছে না এখানে, কাউকে না। কানাই পাল, শশাঙ্ক নিয়োগীদের সম্পর্কে কেউ কিছু আশা করে না, কিন্তু বুড়ো হেডমাস্টারও এইভাবে চুরি করবেন? কোনো ছাত্র যদি বলে আধভাঙা এই বেঞ্চিটা স্কুলের কোনো কাজে লাগছে না, কাঁধে বয়ে বাড়ী নিয়ে যাই—রাজী হবেন হেডমাস্টার? না, কাউকে শ্রদ্ধা করা যায় না। আর প্রিয়গোপাল—যিনি এত আদরে তাকে কীর্তন শোনবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, যাকে সে এখানে একমাত্র হিতৈষী বলে মনে হয়েছিল, তিনিও—

কলকাতা নিষ্ঠুর, কলকাতা স্বার্থপর, কলকাতা কুটিল। তবু সেই সব নিষ্ঠুরতা-স্বার্থপরতা-নীচতার একটা স্পষ্ট চেহারা আছে, তাকে চেনা যায়। কিন্তু এখানকার মানুষগুলো অদ্ভুত। বাইরে থেকে মসৃণ সবুজ ঘাসের মতো মনে হয়, কিন্তু ভেতরে গোড়া শাপের গর্ত—ছোবল দিয়ে লুকিয়ে যায়, টেরও পাওয়া যায় না।

বাড়ীর সামনে, পুকুরের ধারে, সেই নারকেল গাছগুলোর তলায় আজ অন্ধকার। কিন্তু একটু দূরে থেকেই বিকাশ দেখতে পেলো। একটা গাছের তলায় জটাবাঁধা চুল আর জংলা দাড়ি নিয়ে মেজদা পা ছড়িয়ে বসে আছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল একবারের জন্যে, চমকে উঠল বুকটা। আজো আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি কাঁধের ওপর? কিন্তু সেই ভয়ে কাপুরুষের মতো পিছিয়ে যাওয়া যায় না, কিংবা ভীতু বাচ্চার মতো চেঁচিয়ে ডাকা যায় না: 'কাকা বেরিয়ে আসুন একবার, এখানে মেজদা বসে রয়েছে।'

সাহসে ভর করে এগোল কয়েক পা। আর তখন কানে এল চাপা কান্নার শব্দ। মেজদা কাঁদছে।

বিকাশ আস্তে আস্তে এসে পাশে দাঁড়ালো। অন্ধকারে জটা-ভরা দুটো জ্বলজ্বলে চোখ তুলে মেজদা তাকালো তার দিকে।

ফোঁপানো গলায় মেজদা বললে, 'তুই চোর।'

বিকাশ জবাব দিল না।

ভাঙা গোঙানির মতো আওয়াজ করে মেজদা বলতে লাগল: 'তোরা সবাই চোর—সবাই ডাকাত। আমার সমস্ত বই তোরা চুরি করে নিয়েছিস। তোদের সকলকে আমি খুন করব।'

খুন করার লক্ষণ অবশ্য দেখা গেল না। আবার কান্না আরম্ভ করল। হাতের তেলোয় চোখ মুছতে লাগল ছোট ছেলের মতো।

লোকটা পাগল? না, তার চাইতেও করুণ। একটা শিশুর হাত থেকে খেলনা ছিনিয়ে নেবার নিষ্ঠুরতা অনুভব করল বিকাশ, আরো একবার তার বিজ্ঞ-বিচক্ষণ হেডমাস্টারকে অত্যন্ত খারাপ লাগল।

'আর তুই?'—জলভরা চোখ দুটো এবার দপদপ করে উঠল: 'তুই তো এসেছিস সুনুকে খুন করতে।'

বিকাশ আর দাঁড়ালো না—প্রায় ছিটকে সরে গেল মেজদার কাছ থেকে।

সামনের উঠোনেই পায়চারী করছিলেন শশাঙ্ককাকা। গুন গুন করে রামপ্রসাদী সুর ভাঁজছিলেন: 'আয় মন—বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।—'

মেজাজ প্রসন্ন। হেডমাস্টার কিছু বেশি টাকা দিয়েছেন নিঃসন্দেহ। আর টাকা পেলে কে না খুশি হয়? কিন্তু মেজদার কান্না কানে বাজছে তখনো, কাকাকে অত্যন্ত বীভৎস লাগল বিকাশের।

কাকা বললেন, 'বিকাশ বাবাজী নাকি?'

মেজদা ওদিকে তারস্বরে ডুকরে উঠল হঠাৎ। কাকা ভুরু কোঁচকালেন।

'নুইসেন্স একটা। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিই, কিন্তু আত্মীয় হাজার হোক। লোকে কী বলবে তাই বলো।'

ইচ্ছে করলেও যে মেজদাকে তাড়ানো যায় না, বাড়ীঘর জমিজমায় তারও যে অংশ আছে এই অপ্রীতিকর কথাটা বলতে গিয়েও বিকাশ সামলে নিলে।

শশাঙ্ককাকা আবার বললেন, 'পাগলটা আজ কোনো অসভ্যতা করেনি তো তোমার সংগে? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব তাহলে।'

বিকাশ কাকার মুখের দিকে চাইল। আরো বীভৎস দেখাচ্ছে এখন। আর সব উড়িয়ে দেওয়া যায়, সব কথা ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু একথা কিছুতেই ভোলা যায় না এই লোকটা স্ত্রীকে মারে।

যেন একটা তিক্ত ওঠার স্বাদ তার জিভটাকে একেবারে তেতো করে দিল। শুকনো স্বরে বিকাশ বললে, 'উনি ওঁর বইগুলোর জন্যে কাঁদছিলেন।'

'পাগলের কাণ্ড!'—কাঁধে একটা গামছা

ছিল, তাই দিয়ে মশা তাড়ালেন শশাঙ্ক-কাকা : 'নিজে সব ছিঁড়েছুঁড়ে ফেলে এখন—'

'সব নিজে ছেঁড়েননি—' সেই পিত্ত-ওঠা স্বাদটা আরো কদর্য হয়ে উঠল বিকাশের মুখে : 'একটু আগেই তো ও'র এক রিকশা বই নিয়ে গেলেন স্কুলের হেডমাস্টারমশাই।'

একটু চমকালেন শশাঙ্ককাকা।

'তো-তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি?'

'হাঁ। তিনিই বললেন।'

শশাঙ্ককাকা চুপ করে রইলেন। তার পর বললেন, 'হ্যাঁ—মানে কিছু বই আমি স্কুলকে দান করেই দিলুম। ভালো ভালো বইগুলো এখানে পড়ে তো পাগলের হাতে নষ্টই হচ্ছে, হেডমাস্টারেরও খুব আগ্রহ দেখলুম, বললুম—নিয়ে যান কিছু, বরং সৎকাজে লাগবে।'

কোনো দরকার ছিল না বলবার, কিন্তু মুখের সেই তেতো আস্বাদটার জন্যেই বিকাশ কথাটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

'কিন্তু হেডমাস্টারমশাই বললেন: বইগুলো উনি টাকা দিয়ে আপনার কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন।'

যেন বাজ পড়ল, এইভাবে কিছুক্ষণ থ হয়ে রইলেন শশাঙ্ককাকা। এবং তারও পরে, সেই আবছা অন্ধকারে তাঁর বীভৎস মুখটা একেবারে পিশাচের মতো বিকৃত হয়ে গেল।

উৎকট গলায় শশাঙ্ককাকা বললেন, 'হেডমাস্টার বলেছে, আমি বই বিক্রী করেছি? আচ্ছা বদলোক তো! আমি ভালো বুঝে বইগুলো সৎকাজে দান করলুম, আর এখন এ-সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমার নামে। লেখাপড়াজানা লোক, বুড়োমানুষ, কিন্তু কী স্কাউনড্রেল বলো দেখি একবার। বুঝেছ—ওই হেডমাস্টারটাও কানাই পালের দলের লোক, আমার নামে স্ক্যাণ্ডাল রটিয়ে আমার পজিসন নষ্ট করে দিতে চায়।'

বিকাশ আবার বলে ফেলল : 'ও'র ঘরে আমি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সেটও দেখেছি।

'এন্‌সাইকো—' অসহ্য ক্রোধে শশাঙ্ক নিয়োগী পুরো নামটাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। ফেটে পড়লেন তার বদলে।

'তোমারই বা এত কৌতূহল কেন বাবাজী? সব ব্যাপারে কেন তুমি নাক গলাতে যাও? এখানে চাকরী করতে এসেছ, তাই করো। কিন্তু তার বদলে তোমায় গোয়েন্দাগিরি করতে কে বলেছে?'

বিকাশ এক পা পিছিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে স্নেহ-সৌজন্য মিষ্টি কথার খোলসটা খসে পড়েছে কাকার মুখের ওপর থেকে। একটা মাংসাশী জন্তুর কতগুলো ধারালো দাঁত বেরিয়ে এসেছে ক্ষিপ্তভাবে।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিলেন শশাঙ্ক-কাকা।

সেই অভিনেতার সেই আশ্চর্য সংযম।

হঠাৎ বিকাশের কাঁধে একটা থাবড়া মেরে শশাঙ্ককাকা হা-হা করে হেসে উঠলেন।

'কিছু মনে কোরো না বাবাজী। হেড-মাস্টার তোমায় ঠাট্টা করেছে, আমিও একটু ঠাট্টা করলুম। ও-সব ছেঁড়াখোঁড়া বইয়ের আর দাম কী—পয়সা দিয়ে কেউ কেনে ওসব? যাও-যাও, বাড়ীর ভেতরে যাও, হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করো গে।'

(ক্রমশঃ)

মানুষ গড়ার ইতিকথা

শ্যামবাজার এ ভি. স্কুল

"দে বাবা, তাই দে। একদিন তো এই স্কুলে পড়েছিলি। তোর স্কুলেরই জমি হবে, বাড়ি হবে। দে দুখানা ইটেরই দাম দে।" পঞ্চম জর্জের মুকুটমুখ লালদুয়ানি ট্যাঁকে গুঁজে পন্ডিতমশাই চললেন আর এক ছাত্রের কাছে। স্কুলের সময়টুকু বাদ দিলে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটে তাঁর রাস্তায় রাস্তায়, পুরোনো অতিপুরোনো ছাত্রদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে। পাড়ায় পাড়ায় জগবন্ধু পন্ডিত ঘুরে বেড়ান ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে। স্কুলের জন্য সাহায্য ভিক্ষে করে ফেরেন জগবন্ধু মোদক। মহারাজা থেকে মুদি কাউকেই রেয়াৎ দেন না পন্ডিতমশাই। একদিনও যদি কেউ পড়ে থাকে এই স্কুলে, তাঁর কাছে গিয়েও দাঁড়াবেন তিনি। অপরিসীম বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা হাত দুখানি বাড়িয়ে বলবেন, "দে বাবা, তাই দে। একদিন তো এই স্কুলে পড়েছিলি। তোর স্কুলেরই জমি হবে, বাড়ি হবে। দে দুখানা ইটেরই দাম দে।" দাতারা জানেন গ্রহীতা সাক্ষাৎ বুনো রামনাথ, নিজের জন্য কোনদিনই কিছু চান নি। তাঁর প্রার্থনা, তাঁর স্বপ্ন, সব কিছু ঐ একটা মাইনর স্কুলকে ঘিরে, সুদূর বা অদূর অতীতে যেখানে তাঁরা পড়েছেন ঐ মানুষটির কাছে। তাই সামর্থ্যের সঙ্গে শ্রদ্ধার সমস্ত নির্যাসটুকু ঐ নির্লোভ মানুষটির হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন—স্কুলের জমি হবে, বাড়ি হবে।

জগবন্ধু মোদকও কেমন নিশ্চিন্ত বোধ করেন। শত পরিশ্রমেও ক্লান্ত হন নি। কারণ জানেন আজ তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরই দিকপাল ছাত্ররা—ফণীন্দ্র, ভূপেন, মন্মথ। চল্লিশ বছরেরও উপর কেটেছে এই স্কুলে। কুমোরটোলা আর রাজবল্লভপাড়ার বস্তির মাঝে একতলা এই ছোট বাড়িটার কত হাজার হাজার ছাত্র জীবন গড়ার প্রথম পাঠটুকু পন্ডিতমশায়ের কাছে নিয়েছে। তাঁর কত ছাত্র আজ কৃতী। তাঁদের কৃতিত্বে সারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। গোটা দেশটা আজ যে আলোয় উজ্জ্বল তারই আলোটুকু জোগান দিয়েছেন জগবন্ধু পন্ডিত, তাঁর গোটা জীবনের বিনিময়ে। এই জীবনের কত পরিবর্তনই তো [illegible]। [illegible] অতীতের ইতিবৃত্ত। সেই সব [illegible] খোঁড়া হাতিয়ারের পর পর সাজালে একটা গোটা ইতিহাস তাঁর স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে ওঠে। শুরুতে কত সামান্যভাবেই এক অসামান্য সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল।

সাল ১৮৫৫। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির তখন তোড়জোড় চলছে। দেশটা তখন কোম্পানীর শাসনে। কোম্পানীর শাসন দপ্তরে কলকাতায় তখন এক নীরব বিপ্লব ঘটে চলেছে। শিক্ষায় বিপ্লব। যুগ যুগ সঞ্চিত অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নতুন যুগের আন্দোলন রুখে দাঁড়িয়েছেন। অন্ধবিশ্বাসে কোন প্রথাকেই মানুষ আর মেনে নিতে চায় না। আর চায় না বলেই শিক্ষার [illegible] [illegible] ছড়িয়ে পড়ছে। এই শহরের পাড়ায় পাড়ায় তখন নিত্য নতুন স্কুল খোলার উৎসব চলছে। ঠিক এই সময়ে উত্তর কলকাতার ধনী জমিদার বিশ্বম্ভর মৈত্রের সখ হল তিনিও একটি স্কুল খুলবেন। উত্তরে তখন স্কুল বলতে ছিল শুধু ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। ঐ একটা স্কুলের পক্ষে গোটা এলাকার চাহিদা মেটানো ছিল অসম্ভব। বিশ্বম্ভর মৈত্র ঐ অভাব, দূর করতে এগিয়ে এলেন।

১২ নম্বর রামচন্দ্র মিত্র লেনে মৈত্র-মশায়ের পূর্বপুরুষের ভিটে। ওরই কাছে শ্যামবাজারের বস্তির মাঝে একটা একতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে শুরু হল একটি পাঠশালা। আজ থেকে একশো চোদ্দ বছর আগে। এই একশো চোদ্দ বছরে গোটা এলাকাটার চেহারা বিলকুল পাল্টে গেছে। যে জায়গা জুড়ে একসময় ছিল বিশাল বস্তি, আজ তার কোন চিহ্ন নেই। বস্তি-টস্তি তুলে দিয়ে সেখান দিয়ে গেছে শহর কলকাতার অন্যতম খাঁটি রাজপথ—সেন্ট্রাল অ্যাভিনু। সেন্ট্রাল অ্যাভিনু, ভুল [illegible], যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনু আর শ্যামবাজার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে

জমিদার বিশ্বম্ভর মৈত্র প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটি। বর্তমান নাম শ্যামবাজার অ্যাঙলো-ভার্ণাকুলার স্কুল। সংক্ষেপে শ্যামবাজার এ ভি স্কুল।

মৈত্রমশাই বিত্তশালী লোক। তাঁর চোখের পাতা পড়বার আগেই সখ মেটানোর সব ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু স্কুল তো আর খেয়াল-খুশী নয় যে "লাও" বললেই এনে দেওয়া যাবে। তার জন্য চাই ডেডিকেটেড টিচার। সেদিন স্কুল গড়তে সহযোগী হিসাবে বিশ্বম্ভর মৈত্র যাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি বাংলা দেশের অক্ষয়কীর্তি নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসুর পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু। শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের শতবর্ষের ইতিহাসে কৈলাসচন্দ্র ও অমৃতলালের অবদান অবিস্মরণীয়। পুত্রের প্রসঙ্গ যথাসময়ে আসবে, তার আগে পিতার কথা বলা যাক।

শুরুতেই কৈলাসচন্দ্র পাঠশালার দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেন। বছরকয়েক তিনি এই পাঠশালায় পড়িয়েছিলেন, পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে চলে যান। কিন্তু এই অল্প সময়েই স্কুলটির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। স্বল্প বেতনে দরিদ্রঘরের ছেলেরা পড়বার সুযোগ পেত এই স্কুলে। দু-আনা বড়জোর চার আনা ছিল মাইনে। কি বাবদ যা আদায় হোত রোজ সন্ধ্যায় মাস্টারমশাইরা তা জমিদারী সেরেস্তায় জমা দিয়ে আসতেন। মাসের শেষে ঐ সেরেস্তা থেকেই তাঁরা মাইনে পেতেন। দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে চলল। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে স্কুলও বাড়তে লাগল।

কৈলাসচন্দ্রের সমসময়ে আর একটি মানুষ এই স্কুলে পড়াতে এসেছিলেন। নাম তাঁর ক্ষেত্র পন্ডিত। যতদূর জানা যায় ক্ষেত্র পন্ডিত প্রায় পনেরো বছর এই স্কুলে পড়িয়েছেন—শুরু থেকে আঠারো শ সত্তর সাল পর্যন্ত। তাঁর সময়ে পাঠশালা পর্যায় থেকে স্কুল একবার হাইস্কুলে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রস্বল্পতা কি স্বাচ্ছল্যের অভাব, যে কোন কারণেই হোক সত্তর যুগের শুরুতে স্কুলের অ্যাফিলিয়েশন কাটা যায়। হাইস্কুল পরিণত হল মাইনর স্কুলে। ঠিক সেই সময়ে স্কুলের পন্ডিত হয়ে এলেন জগবন্ধু মোদক।

বিশ্বম্ভর ও কৈলাসচন্দ্র যদি স্কুল-প্রতিমার কারিগর হন তাহলে মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা জগবন্ধু। বাহান্ন বছর এই স্কুলে জগবন্ধু মোদক কাজ করেছেন। এই বাহান্ন বছরের মধ্যে বাহান্নটি দিনও বোধহয় পন্ডিতমশাই নিজের জন্য ব্যয় করেন নি। করবেন কি, এই স্কুলই ছিল সব। মায়ের স্নেহ-মমতায় জগবন্ধু পন্ডিত এই স্কুল গড়ে তুলেছেন। এই গড়ার সাধনায় কখনো তিনি সাহায্য পেয়েছেন তাঁর সহকর্মীদের, কখনো তাঁর ছাত্রদের কখনো স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের।

জগবন্ধু পন্ডিত যখন এই স্কুলে নিযুক্ত হয়ে আসেন তখন সহকর্মী হিসাবে যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন বাংলা থিয়েটারের মঞ্চসজ্জার পথিকৃৎ ধর্মদাস সুর। গত শতাব্দীর সত্তরের যুগ বাংলা দেশের থিয়েটারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। ন্যাশনাল থিয়েটার তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর মত সর্বকালের সেরা নট ও নাট্যকারের আবির্ভাবে থিয়েটারের তখন চূড়ান্ত রবরবা। থিয়েটারের প্রয়োজনেই ধর্মদাসকে অনেক সময় স্কুল ফেলে ছুটতে হোত স্টেজে। পাছে স্কুলের কোন ক্ষতি হয় তাই অমৃতলাল ও অর্ধেন্দুশেখর এসে পালা করে ধর্মদাসের অনুপস্থিতির অভাবটুকু মিটিয়ে দিতেন। যদিও অমৃতলাল কোনদিনই এই স্কুলের বেতনভোগী শিক্ষক ছিলেন না তবু বন্ধুর জায়গায় প্রক্সি দিতে দিতে ছাত্রদের কাছে তিনি এই স্কুলের শিক্ষক হিসাবেই পরিচিত হয়েছিলেন। গত শতাব্দীর স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি সিন্ডিকেটের সদস্য রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু নিজেকে অমৃতলালের ছাত্র হিসাবেই পরিচয় দিতেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এই স্কুলের নাড়ির যোগ। শুধু যে একদা ধর্মদাস বা অমৃতলাল এখানে পড়িয়েছেন তাই নয়, এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন গত শতাব্দীর বিখ্যাত অভিনেতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন এরই দুযুগ আগে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্র ছিলেন আধুনিক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রাণপুরুষ গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সহযোগী অমৃতলাল।

এই সত্তরের যুগে আরো যে সব ছাত্র এই স্কুলে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দুটি নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐ সময়ে এই স্কুলেই পড়েছিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র যখন জগবন্ধু পন্ডিতের ছাত্র ছিলেন তখনো তিনি মহরাণী স্বর্ণময়ীর সম্পত্তি পান নি। ছেলেবেলায় সাধারণ অবস্থার মধ্যেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে বিপুল বৈভবের অধিকারী হয়েও কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র শৈশবের দিনগুলির কথা ভোলেন নি। ভোলেন নি তাঁর পন্ডিত-মশায়ের কথা। জগবন্ধু পন্ডিত যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মণীন্দ্রচন্দ্রের বাড়িতেই থেকেছেন। আজ যে জায়গায় মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ দাঁড়িয়ে আছে বছর পঞ্চাশ আগেও সেখানে ছিল পুরোনো রাজবাড়ি। ঐ বাড়িরই একটি ঘরে গোটা এলাকার সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক জগবন্ধু পন্ডিত থাকতেন।

অবিশ্যি ঘরে থাকতেন জগবন্ধু আর কতটুকু সময়। বেশীরভাগ সময়ই তাঁর কাটত স্কুলে। এই স্কুলই তাঁর ধ্যান, তাঁর জ্ঞান। তাঁর যৌবনের বৃন্দাবন, বার্ধক্যের বারাণসী। তিনি ছিলেন এই স্কুলের পন্ডিত, হেডমাস্টার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট সব। কি করলে স্কুলের ভাল হয় এই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা। অনেক খুঁজেপেতে মাস্টারমশাই জোগাড় করতেন জগবন্ধু। তাঁর পছন্দ যে কখনো অসার্থক হয় নি তারই জ্বলন্ত উদাহরণ পূর্ণচন্দ্র দত্ত। ১৮৯৮ সালে পূর্ণবাবু এই স্কুলে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। পুরোনো স্কুল রেকর্ড ঘাটলে দেখা যায় জগবন্ধু পন্ডিত নিজের হাতে লিখে রেখেছেন—"অদ্য হইতে পূর্ণচন্দ্র দত্তকে দশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইল।"

এর বেশী বেতন দেওয়া সেদিন স্কুলের ক্ষমতা ছিল না। মাইনর স্কুলের ছাত্র-বেতন আনায় গোনা হত। টাকার প্রশ্নই উঠত না। পূর্ণবাবু দশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়ে যে অমূল্য সাহায্য স্কুলকে করেছেন তার হিসাব অর্থের নিক্তিতে কোনদিনই সম্ভব নয়। প্রায় ছাপ্পান্ন বছর পূর্ণবাবু এই স্কুলে শিক্ষক হিসাবে কাজ করে গেছেন। এই ছাপ্পান্ন বছরে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে স্কুলের জীবনে। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও অনড় অটল ছিলেন পূর্ণ দত্ত। শিক্ষকতা ছিল তাঁর পেশা ও প্যাশন। এ সত্যটুকু শ্যামবাজার এলাকার প্রায় সব বাসিন্দাদেরই জানা ছিল। তাই বৃদ্ধ পিতামহ, যিনি পূর্ণবাবুর কাছে পড়েছেন, নাতিকে পূর্ণবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বলতেন : মাস্টারমশাই আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। ছেলেও পড়েছে আপনার কাছে। নাতিকে দিয়ে গেলাম। ওকে মানুষ করে দিন। কত আস্থা সেদিন সাধারণ মানুষের ছিল শিক্ষকের উপর যে অনায়াসে তাঁরা দাবী করতে পারতেন যে ছেলেকে মানুষ করে দিন। এই আস্থা একদিনে অর্জিত হয়নি। এর পেছনে ছিল জগবন্ধু পন্ডিত, পূর্ণ দত্তের মত মানুষের সারা জীবনের সাধনা।

কি অপরিসীম নিষ্ঠায় জগবন্ধু, পূর্ণ দত্তরা যে তাঁদের স্কুল গড়ে তুলেছিলেন তার কোন ইতিহাস নেই। কোনদিনও লেখা হবে কি না জানি না, শুধু জানি অজস্র প্রাক্তন ছাত্রের হৃদয়-মণিকোঠায় এঁদের স্মৃতি আজও অম্লান। সময় থাকতে এই ইতিহাস রচিত না হলে, ভবিষ্যতে এঁদের হয়তো আমরা ভুলেই যাব। উত্তরসূরীরা জানবেনও না যে কোন দধীচির আত্মত্যাগে তাঁদের হাসিখুশীর স্বর্গ রচিত হয়েছে।

এই স্বর্গ রচনার প্রধান দায়িত্ব বহন করেছেন জগবন্ধু মোদক। এই দায়িত্ব বহন করতে গিয়েই পন্ডিতমশাই উপলব্ধি করেন যে সবার আগে দরকার স্কুলের নিজস্ব জমি ও বাড়ি। তাই শুরু হয়ে গেল তাঁর শেষজীবনের সাধনা—স্কুলের জমি ও বাড়ির জন্য অর্থসংগ্রহ। ছুটে গেলেন প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে। দাও তোমরা তোমাদের স্কুলকে সাহায্য দাও। যার দৌলতে তোমরা আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাকেই এবার সাহায্য কর তোমরা। গুরুকে

আবেদন ব্যর্থ হয় নি। এগিয়ে এলেন প্রাক্তন ছাত্ররা। এক কথায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দিলেন পাঁচ হাজার টাকা। ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও দিগম্বর মিত্রের ছেলে কুমার মন্মথনাথ দিলেন আড়াই আড়াই পাঁচ হাজার। সবশুদ্ধ উঠল দশ হাজার। কিন্তু জায়গার দাম মিটিয়ে স্কুলের উপযোগী বাড়ি তুলতে হলে লাগবে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। কোথা থেকে আসবে বাকি বিশ হাজার? কোমর বেঁধে লাগলেন ষাট বছরের বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই। ঘুরতে লাগলেন প্রাক্তন ছাত্রদের দরজায় দরজায়।

অর্থ জোগাড় হলে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হল সব টাকা। ট্রাস্টের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং ভূপেন্দ্রনাথ। রেজিস্ট্রেশনের সময় কথা উঠল স্কুলের নাম কি হবে? কারণ প্রতিষ্ঠার পর বার কয়েক এই স্কুলের নাম পাল্টেছে। কখনো বলা হত শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয় কখনো বলা হত শ্যামবাজার এ ভি স্কুল। গত শতাব্দীতে সাধারণ লোকে এটিকে বাংলা স্কুল বলত। কারণ এখানে পঠনপাঠনের মাধ্যম ছিল বাংলা। কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের সময় ভূপেন্দ্রনাথ বললেন তাঁর পাঠদ্দশায় স্কুলের নাম ছিল শ্যামবাজার এ ভি স্কুল। তখন বাংলা ও ইংরেজী দুই পড়ানো হত। ভূপেন্দ্রনাথের ইচ্ছায় স্কুলের ও ট্রাস্টের নাম পাকাপাকিভাবে রাখা হল শ্যামবাজার এ ভি স্কুল। এসব প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের ঘটনা।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ও ট্রাস্ট গঠিত হওয়ার বছর চারেক আগেই স্কুলের প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়। বিশ্বম্ভর মৈত্রের ছেলে মন্মথ মৈত্র ছিলেন প্রথম ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হলেন অমৃতলাল। বছর দুয়েক বাদে কোন এক কারণে মন্মথ মৈত্র কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। তাঁর জায়গায় সেক্রেটারী হলেন অমৃতলাল। প্রায় দু যুগ অমৃতলাল সেক্রেটারী হিসাবে স্কুলের সেবা করেছেন।

ম্যানেজিং কমিটি হয়েছে, ট্রাস্টও হল। এবার শুরু হল স্কুলের নিজস্ব আস্তানা গড়ে তোলার কাজ। প্রায় ষাট বছর যে ভাড়া বাড়িতে স্কুল বসেছে, তাই কিনে নেওয়া হল সামনের উঠোনটুকু সমেত। পুরোনো একতলা বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে তোলা হল নতুন তিনতলা বিল্ডিং। এই তিনতলা বিল্ডিংয়ের চিলেকোঠার যে ঘরটি আজ সায়েন্সের স্টোররুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ঐ ঘরেই শেষের দিনগুলি কাটিয়েছেন জগবন্ধু পণ্ডিত। ছোট্ট এই ঘরটিতে একটা মানুষেরই চলাফেরার জায়গা হোত না। কিন্তু জগবন্ধু পণ্ডিত এখানে বসতেন বলে, ছাত্র, শিক্ষক, [illegible] ভিড় সর্বদাই এই ঘরে লেগে থাকত। অমৃতলাল বলতেন —ওটা [illegible]। কখনো কখনো ঘরটির [illegible] দিকে [illegible] করে বলতেন, [illegible] নয় কোর্ট। [illegible] জীবনের শেষ [illegible] জগবন্ধু পণ্ডিত এই ঘরে বসেই স্কুল চালাতেন। সারাজীবনের পরিশ্রম তাঁর সার্থক হয়েছে—স্কুলের নিজস্ব জমি, বাড়ি হয়েছে। এই সাফল্যের মধ্যদিনেই নেমে এল মৃত্যুর শীতল অন্ধকার। বাহাত্তর বছর একটানা পরিশ্রমের পর একদিন চাকা নিশ্চল হয়ে পড়ল। শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের প্রাণপুরুষের প্রাণ চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল স্কুলের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়।

জগবন্ধু পণ্ডিত এই স্কুলের বনিয়াদ গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বনিয়াদ বলতে শুধু স্কুলের নিজস্ব বাড়ি, জমির কথা বলছি না। বলছি স্কুলের সুনামের কথা। কলকাতার মাইনর স্কুলগুলির মধ্যে নামের দিকে থেকে যে কটিকে মেজর বলা হত তার অন্যতম ছিল শ্যামবাজার এ ভি স্কুল: তখনকার দিনে এমন একটা বছরও যেত না যে বছর এই স্কুলের ছেলেরা বৃত্তি পরীক্ষায় শুধু হাতে ফিরেছে। ফি বছর গোটা কয়েক

বৃত্তি স্কুলের বাঁধা ছিল। হবে নাই বা কেন? স্বয়ং জগবন্ধু পণ্ডিত ও পূর্ণ দত্ত ছাড়াও যেসব নামকরা শিক্ষক তখন এখানে পড়াতেন তাঁরা হলেন পুলিনবিহারী রায়-চৌধুরী, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নুটু-বিহারী রায়, মন্মথনাথ গুপ্ত প্রভৃতি।

পুরোনো দিনের মাস্টারমশাইদের কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন স্কুলের বর্তমান সেক্রেটারী অধ্যাপক সুধাংশুকুমার সান্যাল। সুধাংশুবাবু প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। বছর পাঁচেক এখানে পড়েছেন। ত্রিশের যুগের শেষদিকে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন এই স্কুলে। দীর্ঘদিন ম্যানেজিং কমিটি ও ট্রাস্টের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী। পঞ্চাশ বছর আগের স্কুলজীবনের অনেক ঘটনাই তাঁর আজও মনে আছে। মনে আছে জগবন্ধু পণ্ডিতকে তাঁরা কী ভীষণ ভয় পেতেন। ভয় পেতেন তাঁরা নুটবিহারী রায়কেও। অসম্ভব রাগী ছিলেন নুটুবাবু। রেগে গেলে কোন দিশে থাকত না। হাতের কাছে যা পেতেন তাই দিয়েই মারতেন ছেলেদের। ভূগোলের ক্লাসে সামান্য অমনোযোগিতার জন্য সেরা ছাত্রও পার পেত না তাঁর কাছে। অন্য কিছু না পেলে ঝোলানো ম্যাপের রড ছিঁড়ে নিয়ে পিটতেন নুটুবাবু। আবার তিনিই ছেলেদের সামান্য সাফল্যে তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

আজও সুধাংশুবাবুর মনে আছে কেমন করে নুটুবাবু তাঁদের নদীর গতিপথ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ক্লাসরুমে অনেকক্ষণ পড়িয়েও যখন দেখলেন ছেলেরা তা বুঝতে পারছে না হঠাৎ সব ছেলেকে নিয়ে ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে এলেন নুটুবাবু। তখন স্কুলের পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তোলা হচ্ছে। ১৯১৮ কি ১৯ সাল। উঠোনে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে ভিতের মাটি। পাশে চৌবাচ্চায় ইট ভিজোতে দেওয়া হয়েছে। নুটুবাবু উঠে গেলেন মাটির ঢিবিতে। বললেন এই দেখ পাহাড়। ঢিবির উপরটা দেখিয়ে বললেন এই হল পাহাড়ের চূড়া, নদীর জন্ম এখানে। হাত দিয়ে মাটির ঢিবির গায়ে নালা কেটে জুড়ে দিলেন চৌবাচ্চার সঙ্গে। তারপর চৌবাচ্চার জল ঘটি ঘটি ঐ নালা দিয়ে গড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে দিলেন নদীর গতিপথের রহস্য। ছাত্রদের জন্য কতখানি ভালবাসা থাকলে মাস্টারমশাই এমন করে ছাত্রদের বোঝাতে চান বা পারেন। ভালবাসতেন বলেই, হাজার মার খেলেও ছাত্ররা তাঁকে কোনদিনই অসম্মান করেনি। আর পূর্ণবাবু—তিনি তো ছিলেন দেবতার মত মানুষ, বললেন সুধাংশুবাবু। কি সুন্দর ছিল তাঁর হাতের লেখা। নিজে ছেলেদের খাতায় লাইন টেনে দিতেন, অক্ষর লিখে দিতেন। ভুল হলে বারবার শুধরে দিতেন। মাস্টার-মশাইরা এত ভালবাসতেন, এত যত্ন নিয়ে পড়াতেন বলেই এ ভি স্কুলের ছেলেরা বছর বছর বৃত্তি পেত বৃত্তি পরীক্ষায়।

বছর বছর বৃত্তি পেত বলেই সরকারের নজরে ছিল শ্যামবাজার এ ভি স্কুল। তাই মাইনর স্কুলের হাইস্কুলে পরিণত হওয়ার আর্জি সহজেই সরকারী স্বীকৃতি পেয়ে-ছিল। এই স্বীকৃতি পাওয়ার পেছনে রয়েছে একটি সুন্দর ঘটনা। তখন স্কুলের তিনতলা বাড়ি হয়ে গেছে। সে সময় ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথ বিলেত যাচ্ছিলেন। ঠিক হল স্কুলের তরফ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হবে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন তৎকালীন ডি-পি-আই ডঃ হর্নেল। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে ডঃ হর্নেলকে অনুরোধ করে বললেন: আমাদের সাধ্যানুযায়ী সবরকমে এই স্কুলকে গড়ে তুলতে আমরা চেষ্টা করেছি। সেই চেষ্টার ফলেই আজ স্কুলের নিজস্ব জমি ও বাড়ি হয়েছে। স্কুলের রেজাল্ট যে চিরকালই ভাল এ সত্য সরকারের অজানা নয়। তবু আজও এই স্কুল মাইনর পর্যায়ে রয়ে গেছে। আমি বিলেত যাওয়ার আগে ডঃ হর্নেলকে অনুরোধ করে যাচ্ছি তিনি যেন দয়া করে স্কুলটিকে হাইস্কুলের রেকগনিশন দেন।

মানীলোকের অনুরোধে ফল হল। ডঃ হর্নেল হাইস্কুলের জন্য স্কুলকে এস্টিমেট সাবমিট করতে বললেন। অমৃতলাল প্রায় ষাট হাজার টাকার একটি এস্টিমেট দাখিল করলেন। দরখাস্ত মঞ্জুর হল। সরকার স্কুল-বাড়ির সামনের বস্তিটা অ্যাকুয়ার করে দিলেন স্কুলকে। ঐ জায়গাতেই স্কুলের বর্তমান মেন বিল্ডিং তৈরী শুরু হল—১৯২২ সাল।

দু বছরের মধ্যে স্কুলের নতুন আর একটি তিনতলা বিল্ডিং তৈরী হয়ে যেতেই, রেকগনিশন এসে গেল। ১৯২৫ সালে এই স্কুলের ছেলেরা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসে। স্কুলের এই উন্নতি জগবন্ধু পণ্ডিত দেখে যেতে পারেন নি। এর তিন বছর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর অবর্তমানে স্কুলের যাবতীয় দায়িত্ব যে মানুষটি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তিনি হলেন অমৃতলাল। অমৃতলালের অপরিসীম পরিশ্রমেই মাইনর স্কুল হাই-স্কুলে পরিণত হয়। হাজার কাজের মাঝেও সময় পেলেই ছুটে আসতেন অমৃতলাল তাঁর স্কুলে। আজ স্কুলের সায়েন্স ব্লকের গায়ে যেখানে জবা গাছটি রয়েছে সেখানে ছিল অমৃতলালের নিজের হাতে লাগানো আঙুরলতা। আঙুরলতার জন্য বাঁশের মাচা করে দিয়েছিলেন। রোজ বিকেলে আঙুর-লতার তলায় বসে ফর্সী টানতে টানতে বৃদ্ধ অমৃতলাল স্কুলের দৈনন্দিন প্রয়ো-জনের হিসাব নিতেন। স্কুলের প্রতিটি খুঁটিনাটি ছিল তাঁর নখদর্পণে। স্কুলকে এত ভালবাসতেন অমৃতলাল যে কোনরকম বিদ্রূপ তো দূরের কথা সামান্যতম অজ্ঞতাও তাঁর সহ্য হোত না। কতখানি স্পর্শকাতর ছিলেন অমৃতলাল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ছোট্ট ঘটনায়।

১৯২৮ সাল। স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রি-বিউশন উৎসবে যোগদান করতে এসে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ আর্কুহার্ট তাঁর ভাষণে বলেন: আশা করব একদিন এই স্কুলের ছাত্রই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য হবে। ডঃ আর্কুহার্টের ভাষণ শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালেন অমৃতলাল। স্কুলের সাম্প্রতিক পরিচয়লিপি জানানো শেষ করে ভাষণের উপসংহারে বললেন: মাননীয় উপাচার্যের অবগতির জন্য জানাই যে ইতিমধ্যে এই স্কুল দু দুটি উপাচার্য উপহার দিয়েছে দেশকে। ডঃ আর্কুহার্ট যা জানতেন না তা হল ক্যালকাটা ইউনি-ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও নাগপুর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার বিজয়কৃষ্ণ বসু এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন।

শুধু ভূপেন্দ্রনাথ, ফণীন্দ্রনাথ বা বিজয়-কৃষ্ণ এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তা নয়। এই স্কুলেরই ছাত্র প্রখ্যাত পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, তাঁর ভাই উপাচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা করপোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও তাঁর ভাই অনিলবিহারী গাঙ্গুলী আই-সি-এস প্রভৃতি।

সামান্য মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিত হয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন জগবন্ধু মোদক তা সার্থক হয়ে ওঠে খ্যাতকীর্তি ছাত্রদের সাফল্যমণ্ডিত জীবনে। বেশী কিছু চাননি জগবন্ধু পণ্ডিত, চেয়েছিলেন মানুষ গড়তে। মানুষগড়ার চাবিকাঠি যে ঐ মানুষটির হাতে আছে একথা সে যুগে অভিভাবকরা বিশ্বাস করতেন। পরম নিশ্চিন্ততায় পণ্ডিতমশায়ের হাতে ছেলেকে তুলে দিয়ে অনুরোধ জানাতেন: মানুষ করে দিন। এই বিশ্বাস ছিল বলেই অতীতে, [illegible]

এই বিদ্যালয়ের ভিত প্রতিষ্ঠায় জগবন্ধুর উত্তরসূরীদের অবদান কোন অংশে কম নয়।

সুরেন্দ্রমোহন দত্ত, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বা উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মত শিক্ষক পেলে যে কোন স্কুলই গৌরব বোধ করবে। সুরেন্দ্রমোহন ছিলেন হাইস্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক। সুরেন্দ্রমোহন সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ডঃ বিশ্বনাথ বসু স্কুল ম্যাগাজিনের একটি প্রবন্ধে একবার লিখেছিলেন : আত্মভোলা এস এম দত্তের মত হেডমাস্টার বিরল। ......তাঁর ইংরাজী পড়াবার ধরণ অতি উচ্চাঙ্গের ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে অনেক বিখ্যাত শিক্ষকের কাছে পড়ে দেখেছি আমাদের হেডমাস্টারমশায়ের পড়ান কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।

পড়ানোর সুনামই যুগে যুগে ছাত্রদের টেনে এনেছে এই স্কুলে। এমনও ছাত্র আছে যার প্রপিতামহ একদিন এই স্কুলে পড়েছেন কৈলাসচন্দ্র বা ক্ষেত্র পণ্ডিতের কাছে। স্কুল তখন ছিল পাঠশালা। পিতামহ পড়েছেন মাইনর স্কুলে জগবন্ধু পণ্ডিত বা পূর্ণ দত্তের কাছে। বাবা পড়েছেন সুরেন্দ্রমোহন দত্ত বা পুলিনবাবুর কাছে—তখন শ্যামবাজার এ ভি হাইস্কুল। ছেলে পড়ছে চণ্ডীবাবুর কাছে—এখন এটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।

এই ত সেদিন স্কুল হায়ার সেকেণ্ডারীতে পরিণত হল। তখন হেডমাস্টার ছিলেন উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬০ সালে সায়েন্স আর হিউম্যানিটিজ এই দুটি স্ট্রীম নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী কোর্স চালু হয়। চার বছর পরে কমার্স সেকশন খোলা হল। প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী মিলিয়ে প্রায় সাড়ে সতেরো শ ছাত্র আজ এই স্কুলে পড়ে। জায়গা হয় না বলেই প্রাইমারীর ক্লাস বসে সকালে। সেকেণ্ডারীর সায়েন্স সেকশন বসে জগবন্ধু হলের বাড়িতে। আর কমার্স ও হিউম্যানিটিজের ক্লাস হয় চারতলা মেন বিল্ডিংয়ে। তেরো বছর আগেও এই বাড়িটি তিনতলা ছিল। ১৯৫৬ সালে এর চতুর্থ তলাটি তৈরী হয়েছে। দুটো বাড়িতেও আজ স্কুলের কুলোয় না। কুলোয় না বলেই বছর ছয়েক আগে সায়েন্স ব্লকের লাগোয়া শশী ঘোষ লেনের চার কাঠা জমি কেনা হয়েছে। কিন্তু সেই জমি আজও পড়ে আছে। কারণ পজেসন পেলেও, জমির দলিল আজও পায় নি স্কুল।

কিন্তু যে মানব-জমিনের দখলদারী স্কুলের, সেই মাটিতে ফসল কেমন ফলেছে? জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তর দিলেন নন্দবাবু। নন্দদুলাল মুখার্জি। সংস্কৃত ও বাংলা পড়ান। সাত বছর এই স্কুলে পড়াচ্ছেন। [illegible] ও [illegible] রেজাল্ট রেকর্ড সামনে মেলে দিয়ে বললেন দেখুন। এতেই পাবেন ১৯৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত স্কুলের ম্যাট্রিক, স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেণ্ডারীর ফলাফল। [illegible] খুঁটিনাটি রেকর্ড [illegible] যে তথ্য পেয়েছি তাই এখানে তুলে দিচ্ছি। স্কুল ফাইন্যাল চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত সাতাশ বছরে মোট নশো সাতানব্বইজন ছেলে ম্যাট্রিক দিয়েছে। পাশ করেছে সাতশো বিয়াল্লিশজন। একশো তিরানব্বইজন পেয়েছে ফার্স্ট ডিভিশন। এই পিরিয়ডে স্কলারশিপ জুটেছে সাতটি। দুবার স্ট্যাণ্ড করেছে এই স্কুলেরই ছাত্র—সাঁইত্রিশ সালে ইলেভেন্থ হয়েছিলেন কমলকুমার বসু ও বিয়াল্লিশে নাইনথ হন বনমালী দাস।

স্কুল ফাইন্যালের এগারো বছরে মোট নটি স্কলারশিপ পেয়েছে এ স্কুলের ছেলেরা। হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে চুয়ান্ন সালে এই স্কুলেরই ছাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্কুল ফাইন্যালে সেকেণ্ড হন। ষাট সালে কুমারকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও প্রদ্যোৎকুমার পাল স্কুল ফাইন্যালে প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন।

হায়ার সেকেণ্ডারীতেও স্কুল তার সুনাম বজায় রেখেছে। গত ছ বছরে সায়েন্সের পাশের হার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ। হিউম্যানিটিজের রেজাল্ট অপেক্ষাকৃত খারাপ। কমার্স স্ট্রীমে গত দু বছরে মোট পরীক্ষা দিয়েছিল আটত্রিশজন—পঁয়ত্রিশজনই পাশ করেছে।

স্কুলের রেজাল্ট রেকর্ড থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলাম নন্দবাবুকে, আপনাদের ছেলেদের খেলার রেকর্ড কি রকম? আমার প্রশ্ন শুনে মনে হল যেন খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন : ছাপ্পান্ন থেকে ষাট পর পর পাঁচ বছর আমাদের স্কুলের ছেলেরা নর্থ ক্যালকাটা ফুটবল লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বছরই ফুটবলে কলকাতার কোন না কোন ট্রফি আমাদের ছেলেরা নিয়ে আসে। কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশন টিমগুলোতে আমাদের অনেক ছাত্র খেলেছে, এখনো খেলছে। অসীম মৌলিক, রাম দাস, মানিক মিত্র, সুশান্ত চক্রবর্তী, বিমান সোম, চণ্ডী ঘোষ এরা সবাই আমাদের ছাত্র। শুধু কি ফুটবল? হকিতেও এই স্কুলের ছাত্র জি, ঘোষের নাম ময়দানের দর্শকদের জানা আছে। নামী সাঁতারুদের মধ্যে আছে দুলাল মণ্ডল ও নিতাই ঘোষ। শুধু সমতলের খেলাতেই চৌখস নয় শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের ছাত্ররা। তাঁরা আজ পাহাড়েও উঠছে। চৌষট্টি সালের কামেডোম অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য সুবিমল দে এই স্কুলেরই ছাত্র।

নন্দবাবু তাঁর স্কুলের খেলার ফলাফলের ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন আর আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম এঁদের ছেলেরা খেলে কোথায়? নিজস্ব মাঠ বলতে যে সামান্য উঠোনটুকু স্কুলের আছে তাতে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট দূরে থাক গোল্লাছুট খেলারও জায়গা হয় না। নিজেদের মাঠ নেই বলে এই স্কুলের ছেলেরা দমেনি কখনো। শ্যাম স্কোয়ার বা দেশবন্ধু পার্কে অন্যান্য স্কুল ও ক্লাবের হাজার হাজার ছেলের সঙ্গে জায়গা ভাগাভাগি করে প্র্যাকটিশ করে, ম্যাচ খেলে। ঐ সামান্য সুযোগেই তারা খেলা রপ্ত করে। যদি এঁদের নিজেদের মাঠ থাকত?

মাঠ থাকলে কি হত তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করা যায়। কিন্তু শিক্ষকরা যদি আরো একটু সুযোগসুবিধা পেতেন তাহলে? কারণ নিজের চোখে দেখেছি সেকেণ্ডারী সেকশনের পঁয়ত্রিশজন শিক্ষক একফালি একটা ঘরে কোনরকমে ঠাসাঠাসি করে বসেন। তাঁদের হাত পা ছড়িয়ে একটু আরাম করার সুযোগ নেই। সুযোগ নেই ক্লাস-ঠাসা রুটিনে একটু দম ফেলার। আর মাইনে? সে ত সব এইডেড স্কুলের যা এঁদেরও তাই। তবু ক্লান্তি নেই। শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করেও এঁরা ফসল ফলিয়ে যাচ্ছেন। সেই ফসল দুহাত ভরে কুড়িয়ে নিচ্ছে এদেশ। বিনিময়ে শিক্ষকদের ভাগ্যে কি জুটেছে?

কি আবার জুটবে। পূর্ণচন্দ্র দত্ত এই স্কুলে পড়াতে এসেছিলেন দশ টাকা মাইনেতে। নন্দবাবুরা গড়ে আড়াইশো টাকাও পান না। কিন্তু সত্তর বছরে চালের দাম যে প্রায় চল্লিশ গুণ বেড়ে গেছে। এই নিদারুণ সত্য কি কোনদিনই আমরা বুঝব না?

ব্যথা-বেদনা সব আড়ালে রেখে শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের শিক্ষকরা হাসিমুখে মানুষ গড়ার ব্রত পালন করে চলেছেন। কারণ এটাই তাঁদের ট্র্যাডিশন। এই ট্র্যাডিশন যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা আজ সকলের নমস্য। বিশেষ করে সেই মানুষটি, যিনি তাঁর স্কুলের জন্য ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সবার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন। বলেছেন : "দে বাবা, তাই দে। একদিন ত এই স্কুলে পড়েছিলি। তোর স্কুলেরই শ্রী হবে, বাড়ি হবে। দে দুখানা ইটেরই দাম দে।"

পরে সংখ্যায় : গার্ডেনরীচ মুদিয়ালী হাইস্কুল।

—সন্দিৎসু

[illegible]

[illegible]! এখনো হাতটা আমার জ্বলছে! গালের এইখানটায় এখনো যেন একটা জ্বালার রেশ রয়ে গেছে। কী ছেলে বাবা! কী ক্ষ্যাপা ছেলে। লজ্জা-দ্বিধা-সংকোচ নেই! যা মনে হল অমনি তাই প্রকাশ করে বসবে! যা-কিছু ভালো লাগবে তার উপর ওর দাবী এ কেমন কথা! মেয়েরা তো ওই-রকম [illegible] দাবী করতে পারে না, সব [illegible] পারে না। অথচ ক্ষ্যাপা, তুমি পারো! আমাকে ভালো লাগে এ কি [illegible]! [illegible] কেউ যদি বলত ভালো লাগে না, তবেই কিনা একটু অবাক-টবাক হতাম। তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাইছ যখন তখনই বুঝেছি তোমার মাথা ঠিক-ঠাক নেই। উত্তেজনায় মাথায় তো সবাই ক্ষেপে যায়। তুমি নিশ্চয় ক্ষেপে গিয়েছ। ক্ষেপে গেলে কি মাথার ঠিক থাকে!

বাবাঃ! ভাবতে গেলে এখনো বুক ধড়ফড় করে। চারদিকে লোক, তার ভেতর ওইরকম জোরে বলা: 'স্বপ্না, শোনো: শোনো স্বপ্না। তোমাকে ক'দিন ধরে খুঁজছি স্বপ্না! তুমি যেদিন বাড়ী এসেছ, সেইদিন থেকে খুঁজছি। শোনো কথা আছে।' আমি তো ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেছি। কী করব এখন! চারদিকে লোকজন, ও যা ক্ষ্যাপা, এদের মধ্যে কিছু না বলে-করে ফেলে! কিন্তু ওকি থামবে! একেবারে হাত টেনে ধরার উপক্রম। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম: 'এসব কী হচ্ছে!' —'শোনো'—: ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেলাম: বললাম: 'পরে।' ও হাত ধরে টেনে বলল: 'পরে? 'পরে কি তোমাকে পাওয়া যাবে

স্বপ্না ?...এইরকম আমাকে ফাঁকি দেয়া চলবে না, স্বপ্না ! আমি মরে যাব।'

আমি কোনোমতে বলতে পারলাম : 'হাত ছাড়ো।'

ও হাত ছাড়ল। কিন্তু পথ রোধ করে দাঁড়াল। বীথি, মণি, রুপা ওরা তো থ ! ওরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পাড়ার ছেলেরা, চলতি লোকেরা দাঁড়িয়ে গিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে। আহ্, কী ফ্যাসাদ ! অথচ ঠাস করে একটা চড় কষাতে পারছি না তো ! হাত উঠছে না, মুখ খুলছে না, বুদ্ধিও খেলছে না। কী করে এইরকম হল !

'আমাকে ছাড়া তোমার বিয়ে হতে পারে না। তুমি অন্য জায়গায় বিয়ে করতে পারো না...'

চুল উশকো-খুশকো। চোখদুটোর ক্যাপাটে আগুন। ও বলছে : 'স্বপ্না, আমি সুইসাইড করব।'

আমি ঢোক গিলে বললাম : 'বিয়ে ! কই না তো !'

খাড়া-কলার তাপস কড়াস্বরে বলল : 'স্বপ্না ! তুমি ভাবছ আমি কিছু জানি না ? সব জানি। আমাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করো না। আমার কাছে তোমার গাদাগাদা চিঠি আছে। আমি ফাঁস করে দেব।'

আমার মাথায় এই প্রথম একটু বুদ্ধি খেলল। বললাম : 'তাপস ! তুমি আমার বাড়ী গিয়ে বলো। রাস্তায় এ-রকম হেনেস্তা কেন।'

'হ্যাঁ, তাই বলব। তুমি প্রস্তুত থেকো স্বপ্না। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না। প্রয়োজন হলে তোমাকে ডাকাতি করে নেবই।'

ওকে অস্ত্রধারী উন্মাদ বলে মনে হল। ওর চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছিল। আমি ভয় পেলাম। ততক্ষণে লোক জমে গেছে। ও তক্ষুনি ছেড়ে চলে গেল এবং আমিও নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরলাম, তবে কী করে তা মনে নেই।

বাবাঃ ! এখনো বুক আমার সজোরে উঠানামা করছে !

ছেলেটা আমাকে খুব বেকায়দায় ফেলবে মনে হয়।...কিছু একটা একুনি করার দরকার। কিন্তু কী করি। এক্ষুনি কাছে যদি বীথি থাকত, তাহলে একটু আলোচনা করা যেত। কিন্তু ও বড্ড ভড়কে গেছে। 'আমাকে এর মধ্যে টানিস নে স্বপ্না' ও একশোবার বলেছে আজ সন্ধ্যায়। অথচ বীতুকে আমি যা চিনি, বলা যেতে পারে এটা তার এড়িয়ে গিয়ে গা-বাঁচানোর প্রচেষ্টা। পলুকে পড়ে অনেক কিছুই করা যায়, শেষ সামলানো এমনিই দায়। কী করি ! ও-ই তো পঞ্চাশ ভাগ দায়ী এই ব্যাপারে। ও মহা-মিটমিটে মেয়ে। সাপ-খেলানোতে এককালে ওর কী না ভূমিকা ছিল ! শ্যামল ওকে এমনি দুবেলা দিয়ে গেছে যে, এখনো ও চুপসে আছে। অল্প-কিছুতে ওর এখন ভয়। ও-ই আমাকে ছেলেদের ব্যাপারে প্রথম তাতিয়ে তুলেছিল। আমি তো আগে এরকম ছিলাম না। জেপে-টেপে চলতাম। কোনোদিকে অত চাইতাম না। তখন এই পাড়ার ছেলেরা পেছন থেকে, পাশ থেকে কত কী যে করত। আমি সেই রূপকথার নায়কের মতো পেছন কি পাশে ফিরতাম না, ভস্ম হয়ে যাবার ভয় ছিল যেন। ও বলত : 'ন্যাকা ! একটু চালু হতে শেখ ! দু-একটা নাচা !' আমি বলতাম : 'বাবাঃ ! আমার ভয় করে বীতু !' ও বলত : 'তোর মতো দেখতে হলে আমি ওদের নাচাতাম !' আমি বলতাম : 'কী লাভ।' ও বলত : 'লাভ-টাভ রাখ তো।...আমার ভালো লাগে।' ওর তখন পার্থর সঙ্গে বেশ ভাব। ছেলেটা কলেজ পালিয়ে আমাদের স্কুলে-যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকত। ও বলত : 'জানিস, আমাকে একবার না দেখলে নাকি ওর লেকচারে মন বসে না !' শেষ-পর্যন্ত পার্থ একদিন বীতুর কাকার কাছে কী মারটাই খেয়েছিল !...তারপর এই পাড়ার মস্তানরা পার্থকে তো শহর-ছাড়াই করে ছাড়ল। মস্তানরা পাড়ার মেয়েদের ওপর বাইরের ছেলেদের 'সুদৃষ্টি' সুনজরে দেখে না। এসব নাকি কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা-বণ্টনের মতো জটিল ব্যাপার ওদের কাছে। ...হ্যাঁ, তারপর থেকে বীতুর একটা আন্ত-র্জাতিক নাম হয়ে গিয়েছিল। ওর নাকি কোয়ালিফিকেশন বেড়েছিল—কারণ, ওর প্রেমে পড়ে একটা ছেলে মার খেয়েছে ! ওর পেছনে তখন কতজনের লাইন। সুনন্দ, প্রকাশ, বিভোর, রণেন, কতজন। আর কো-এডুকেশন কলেজে ঢুকে ও আরো মেম্বার বাড়িয়ে ফেলল। ও বলত, 'আমার নাচাতে ভালো লাগে, জানিস স্বপ্না !' ওই তাপসটা আমাদের ওই পাড়ার ছেলে। সকালে-বিকেলে দুবেলা দেখা হত। আমার পিছুও নিত। ওর একগাদা চেলা-চামুণ্ডা ছিল। শুনতাম ও-ও নাকি বীতুর পেছনে লাইন দিয়েছে। তবে ওর রোল নম্বর অনেক বেশী ছিল। কেন জানি না, ওই ছেলেটাকে আমার ভালো লাগতো। কারণ, ওর সাহস ছিল। চোখে চোখ পড়লে দ্বিধা-ভয়ে চোখ সরিয়ে নিত না। আমি একদিন ওর পানে চেয়ে একটু হেসে দিয়েছিলাম। সেই থেকে ও পেয়ে বসল।...আমি তখনো কথা বলিনি। শুধু মধ্যে মধ্যে ওকে দেখে একটা দীর্ঘ-বিদ্যুতের মতো হেসে দিতাম। ও দলবল নিয়ে বিচরণ করত। একদিন দোকান থেকে একা-একা ফিরছি, রাস্তায় ও ঘিরে ফেলল। আমার তো ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয় আর কি। ও বলল : 'সত্যি করে বলো দেখি, তুমি আমাকে দেখে হাসো না ?' এ কেমন-ধারা প্রশ্ন ! 'এরা জোটে বিশ্বাস করতে চায় না। এ বলে, ওকে দেখে নাকি হেসেছ। সত্যি করে বলো। ওর জন্যে যদি সত্যিই হেসে থাকো, আমি মনে কিছু করব না। ওকে ছেড়ে দেব।' আমি ততক্ষণে ঘামতে-ঘামাতে আমাদের বাড়ীর দশ গজের মধ্যে এসে গিয়েছি। আমি কয়েকটা লাফ-জাতীয় দ্রুততায় বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলাম। আর ওরা ১৪৪ ধারা ভাঙার ভয়ে এগোল না। এই ঘটনাটার পরে সারারাত আমি হেসেছি। ছেলেরা কী বোকা ! কী ছেলেমানুষি !

ঘটনাটা আমি বীতুকে না বলে পারলাম না। বীতু বলল : 'তুই ডুবে-ডুবে জল খেতে শিখেছিস, তা-তো জানিনি ! যাক, কন-গ্র্যাচুলেশন। রাখ, আমি ব্যবস্থা করছি। তুই চিঠি দে।'

'চিঠি ! ওরে বাবা !'

'দে-না। কেউ টের পাবে না। শ্যামলকে চিনিস ? ডাক্তারী পড়ছে। খুব ভালো ছেলে। কী জলি ছেলে, কী দুরন্ত ! এরকম ছেলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে হয়। ও এখন আমার বন্ধু। তাপসটাও তাই। পিছিয়ে যাসনে।'

'যদি কিছু হয় !'

'কিছু হবে না। বুঝলি, লিমিট—লিমিট আছে এ-সব ব্যাপারে একটা। সেই লিমিটের ওই পাশে না-গেলেই হল। কিছু না। আমি তোকে বুঝিয়ে দেব কখন কী করতে হয়।'

'কী লিখব।'

'লেখ : 'তাপস, আমি তো তোমার নই। আমি তো একজনের দিকেই তাকিয়ে হেসে-ছিলাম।' বাস ! খুব মজা হবে। শোন, এসব ব্যাপারে বেশী কথা লিখতে নেই। ওতেই হবে। শ্যামলকে দিয়ে ওটা পাঠাব। এইসব চিঠিতে নাম-সই করবিনে, খবরদার !'

আমি লিখে দিয়েছিলাম। তারপর দিন বীতু ডেকে পাঠিয়েছিল। বলল : 'এটা তাপসের চিঠি। অনেক লিখেছে। ছেলেটার কাব্য আছে। এসব ছেলে নাচে ভালো। দ্যাখ, কী কাব্য করে লিখেছে। চিঠিটা পড়ে আমার কাছে দিয়ে যাবি। তুই যা অ-চালু, ধরা পড়ে যেতে কতক্ষণ...জানিস, আমার খুব ভালো লাগে প্রেমের চিঠি সংকলন করতে।...শোন্, শ্যামলটা তোর রূপের বাখানি করছিল। খবরদার, ওর দিকে চেয়ে যেন তুই হাসিসনে ! ওদিকে গেছ তো, আমি তোমার সবকিছু ফাঁস করে দেব।'

'না-না। আমি তোমার শ্যামলকে চাইনে।'

'বেশ। পড়া হয়ে গেলে চিঠিটা আমাকে দিয়ে যাস।'

সেই থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমার খুব ভয় করত। আমার মনের কোণে চিরকাল একটা নীতির বেড়া, বিবেকের পাহারা ছিল। এইরকম ঘটনার মধ্যে কী একটা অন্যায় পাপ আছে যেন। আমি

অহরহ ভাবতাম। তখন বিবেকের দংশন টের পেতাম। সত্যি বলছি, প্রার্থনা করতাম ঃ 'হে ভগবান, দোষ নিয়ো না। আমি ওকে সত্যিই ভালোবাসব।' সেইজন্যেই মনে হয় বীতুর সেন্সর লুকিয়ে আমি কেবলমাত্র দুটো চিঠি দিয়েছিলাম তাপসকে। একটাতে লিখেছিলাম ঃ 'তাপস, তুমি কী ভীতু! সব সময় দলবল নিয়ে থাকো কেন? একা থাকতে পারো না? জানো, তোমার ওই দলবল আমার ভালো লাগে না।' সেই থেকে দেখতাম, ওর দলবল সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমি খুব গর্ব অনুভব করতাম। দ্বিতীয়টাতে লিখেছিলাম ঃ 'তাপস, আমি তোমাকে খেলাচ্ছি না—আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে বিয়ে করব।' সেই থেকে তাপসটা দেখতাম বেশ শান্ত-টান্ত হয়ে গিয়েছিল। দেখেও ভালো লাগত আমার।

হ্যাঁ, তাপস এই চিঠির কথা বলে আজ আমাকে ভয় দেখিয়েছে। বীতু তো জানে না, আমি এমন দুটো মারাত্মক চিঠি দিয়েছিলাম। জানলে হয়তো এতটা এড়াতো না।

...কখন কী যে ঘটে জীবনে! তাপসের ব্যাপারটা কী করে যে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছেছিল। এটা নিশ্চয় তাপসের কোনো বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা। তারপর বাড়ীতে অনেক বকুনি খেয়েছিলাম। আমি বারেবার বলেছিলাম, 'কই না-তো। তাপসের সঙ্গে আমার কোনো কথাবার্তা নেই তো।' কিন্তু মা আমার বড্ড চালাক। আমাকে সেই থেকে ষাট মাইল দূরে মামাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানকার মেয়ে-কলেজে আমাকে বাকি দু' বছর পড়তে হল। দুই বছর।...সবকিছু ভুলেই গিয়েছিলাম। স্বীকার করি নতুন নতুন খুব মনে পড়ত। কান্না পেত। কার জন্যে? বীতুর জন্যে, কণার জন্যে, তাপসের জন্যে। তাপসের জন্যে। সত্যি, তাপসকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। মধ্যেমাঝে বাড়ী এসে দূর থেকে ওর খোঁজ নিতাম। কোনো খবর পেতাম, কিম্বা পেতাম না। এমনি করেই আস্তে আস্তে ওকে ভুলে গিয়েছি।

দুই বছর আগের সেই পুলক তো আমার নেই। এখন আর ওইসব ছেলে-মানুষি ভালো লাগে না। এখন একজন পুরুষ আমি চাই। যার সামর্থ্য আছে, বেশ নাম-ডাক আছে, টাকা-পয়সা প্রতিষ্ঠা আছে। আজকাল তো আমি এইসবই ভাবছি।

আজ সন্ধ্যায় এই স্বপ্নের ওপর প্রচণ্ড হানা দিয়েছে তাপস।...তাই তো! তাপস আবার এইরকম অশান্ত উন্দাম হয়ে উঠেছে কেন। ও জীবনে এখনো কিছু পারনি। ও বেকার। ও ভীষণ বোকা সমাজের। ওর জন্যে আমার খুব মায়া হচ্ছে।...কী করব। কী করতে পারি। আমি ওকে সমবেদনা জানাই।

ওহ্‌! কাল যে কী হবে! তাপস দলবল নিয়ে আমার বাড়ী আসবে। আমার যে কী হবে!...উজ্জ্বলবাবু আমাকে কী যে ভাববে! ভগবান! আমাকে বাঁচাও।

তাপস

আর এক নয়া পরশুরামের মতো সমস্ত মায়ীজাতটা যদি আমি সাবাড় করে দিতে পারতাম! শুধু তাই নয়, সব সুখী লোক-দের খুন করে ফেলতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

আমার মনটাই একটা প্রচণ্ড বোমা হয়ে আছে। আমার দুঃখ-বেদনা, অভাববোধ—আমার হিংসা ঈর্ষা ক্রোধ সবকিছু মিলেই সেই প্রচণ্ড বোমাটা। সেই বোমাটা ফাটিয়ে কাউকে খুন করতে পারলাম না, শুধু নিজেই ভেঙেচুরে ছত্রখান হয়ে গেলাম।

ইয়ার-বন্ধুরাও আজ আমাকে বিপদে ফেলে কেটে পড়ল। ওরা ঠিক-ঠাক থাকলে আমি স্বপ্নাকে লুঠে নিয়ে আসতাম ঠিকই। চণ্ডী ভোম্বল ওরা গেলই না, তবু ভরসা ছিল ইন্দ্র ঝণ্টু ওরা। কিন্তু ওরাও কেটে পড়ল, আর আমাকে...উহ্‌, ব্যথা!—ব্যথা কেমন চনচনিয়ে উঠছে দেখেছ!

ভেবেছিলাম দলবল নিয়ে স্বপ্নার বাবাকে মৃদু ঘেরাও করে কয়েকটি হুমকি দিলেই কাজ হয়ে যাবে। ইন্দ্রটা বলেছিল, 'ভয়ে মত দিয়ে দেবে। ভাবিস না।' আমি বলেছিলাম ঃ 'জানিস ইন্দ্র, মেয়েটাকে জোর করে অন্যখানে বিয়ে দিচ্ছে। ও আমাকে খুব ভালোবাসে। জান দিয়ে লড়ে যাব স্বপ্নার জন্যে।' ঝণ্টুও খুব মাথা ঝাঁকিয়ে ইন্ধন যোগাচ্ছিল। ভোলাটা বলেছিল, 'তাপস, খুব বিনয়ের সঙ্গে অ্যাপ্রোচ করিস। দেখবি রাজি হয়ে যাবে।' কিন্তু ওই বিনয়েই সব গণ্ডগোল করল। আমাদের কথা শুনেই মেজাজ যেন এক লাফে কুটনাক্ষে পৌঁছে গেল 'তোমার সাহস তো বলিহারি!' আমি বললাম, 'ওর সঙ্গে আমার প্রেম আছে। চিঠি আছে। ও কথা দিয়েছিল।' —তখন, বিশ্বাসই করা যায় না, ক্ষেপে গিয়ে বলে কিনা ঃ 'বেরোও বাড়ী থেকে! বেরোও! যত সব জংলী-জানোয়ারের দল। বিয়ে করার সাধ জন্মেছে। বেরোও!' সেই সময় আমি রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। 'খবরদার!' পাশের লোকটা—চিনি না—আমার গালে ঠাস-ঠাস করে চড় কষাল। আমি পেছন ফিরে দেখি ওরা হাওয়া। ক্ষোভে-দুঃখে আমি কয়েক রাউণ্ড ঘুষি চালানোর পর দেখি ওরা সংখ্যায় আরো ক'জন একসঙ্গে আমাকে চেপে ধরেছে—উহ্‌, ব্যথা—এ-পাশটা জখম হয়ে গেছে নাকি—

চণ্ডীটা বলেছিল, 'এ কি টাকা-পয়সা যে হানা দিয়ে তুই লুট করবি? এ হল মেয়ে-টেয়ের ব্যাপার। মেয়েটা বেরিয়ে আসুক, ওইখানে অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করে ফ্যাল, তারপর আমি দেখব।' ভোম্বল বলেছিল, 'তুই বিয়ে করে খাওয়াবিটা কী। বেকার-টেকারের আবার ওই সাধ কেন।' আমি ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলাম, 'বেকার-টেকারের বুঝি হার্ট নেই?...শোন, শোন, তোরা আমাকে হেল্প না করলে আমি মরে যাব। আমি ওকে ভালোবাসি।' সেই সময় গুণ্ডা বুকে হাত দিয়ে পদাবলী আওড়ে-ছিল। সব গর্দভ! এককালে আমি যা বলেছি তা-ই এরা শুনেছে। এখন এদের পাখা আর মগজ গজিয়েছে। ভোলাই শুধু পাশে ডেকে বলেছিল, 'শোন্‌, কিছু করতে হবে না। কাল যখন আমরা যাব, দেখবি স্বপ্না গটগট করে নেমে আসবে। ও-ই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসবে।'—গদগদ কণ্ঠে ও বলল, 'সিনেমায় দেখিস নে? ওইরকম হবেই। প্রেমের টান, বুঝলি!' আমি ওকে গদগদ কণ্ঠে বললাম, 'জানিস ভোলা, তুই কবিতা লিখিস, তা-ই আমার মনের কথাটা তুই বুঝেছিস!' উহ্‌! ব্যথাটা বাড়ছে মনে হয়—

ভোলাটাকে কাছে পেলে এখন গলা টিপে মেরে ফেলতাম। মিছেকথার ফিরিস্তি দিয়ে কবিতা লেখা, গল্প লেখা, না? ধোঁকা দেয়া, না?

উজ্জ্বল মজুমদার। ভাগ্যবান লোক নিশ্চয় স্বীকার করি। এমন একটা আস্ত জুয়েল ওর ভাগ্যে হোল! লোকটা কেমন দেখার দরকার নেই। নিশ্চয় খুব সুখী লোক। সুখে আছে। টাকা-পয়সা চাকরি প্রতিষ্ঠা আছে নিশ্চয়ই। ইচ্ছে করে এদের সবগুলোকে খুন করে দিই। আমাদের পাড়ার মেয়ের পেছনে অন্য ছেলে লাইন দিতে এলে কতবার যে পেঁদিয়েছি! একে কিন্তু ঠেকাতে পারছি না। এদের গায়ে রক্ষাকবচ আছে। এদের দাম আছে। এরা তো রাস্তা বেয়ে আসছে না, আকাশ থেকে নেমে মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছে। এদের ঠেকাব কী করে। আমাদের কারবার রাস্তা নিয়ে, মাটি নিয়ে। ওরা উঁচু আকাশচারী।...রাখ! আমার মাথায় যেন একটা আইডিয়া আসছে। আইডিয়া! একখানা উড়োচিঠি দিলে কেমন হয়! বেশ আইডিয়া। এক ঢিলে দুই পাখি মারব। আমাদের কত স্বপ্ন কল্পনা আবেগ

ঢেলে মেয়েটাকে এত বড়ো হতে দিয়েছি—তুমি কোত্থেকে এসে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে হে! রাখো, তোমাকে ফুটাচ্ছি।

স্বপ্না, হাজার চেষ্টা করেও তোমার ওপর রাগতে পারছি না কেন। অথচ তোমার ওপর আমার অভিযোগের স্তূপ। তুমি গটগট করে বেরিয়ে এলে না-তো! তুমি সিনেমার নায়িকার মতো বেরিয়ে এলে না-তো। তাহলে কী হত। কী-ই বা হত না! আমি এইরকম উচ্ছন্ন যেতাম না। ভালো হতাম। 'ভালো' এই কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে অনুভব করার মতো। 'ভালো!' সবাই আমাকে ভালো বলে না। আমি খারাপ। আমি খারাপ। মানুষের চলার একটা স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ পথ আছে : কেউ আমাকে কর্তব্যবোধে গড়ে তুলবে, আমিও একসময় কিছু কর্তব্য নিয়ে অপরকে গড়ে তুলব—আমি একটা সুন্দর দুনিয়া রচনা করব—আমার যা-কিছু ভালো জিনিস আছে, সবটুকু ঢেলে একটা সুন্দর উদ্যান রচনা করব—সেই পথ থেকে আমি ছিটকে গিয়েছি। কী একটা নির্মম বাধা সেই পথ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই জীবনের অর্থ খুঁজে পাইনে! কোনো কোনো সুখে-থাকারা আমাদের কোনো কথাই শুনতে চায় না—কোনো সুখে-থাকারা আমাদের নিয়ে অনেক কথা কপচে প্রসিদ্ধও হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই সহজ পথটা খুঁজে পাইনি।

স্বপ্না, তোমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। তোমার মা-বাবাদের ওপরই আমার রাগ। আর রাগ ওই উজ্জ্বল মজুমদারের ওপর।

আমি যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে আমি তোমার কাছ থেকে অনেক পেয়েছিলাম। সেই দূরে-পড়া দূরে-থেকে পাওয়া নিয়েই আমায় খুশী থাকতে হচ্ছে। একদা-পাওয়া নিয়েই আমার ইতি। আমি যেন এমন একজন যার আছে কতকগুলো সুন্দর স্মৃতির অতীত,—না আছে বর্তমান, না আছে ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ মানেই তো সম্মুখের রাস্তা, বর্তমান মানেই তো পায়ের নীচের মাটি। এ-দুটো যখন নেই, তখন আমার অবস্থিতি কেমন হতে পারে!

তবু তুমি কাছে থাকলে আমার কেমন যেন একটা দীপ্তি থাকত। আমার ভেতর একটা আগুন বেঁচে থাকত। আগুন নিয়ে আমি চেখে বেড়াতাম কর্মহীন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার রোদ, বাতাস আর ওই আকাশ। আমি মেঘ দেখতাম, নারকেল-পাতার সিরসিরানি অনুভব করতাম, আবহাওয়া কি ঋতুচক্রের খোঁজ রাখতাম। দেখতাম এই কর্মচঞ্চল জন-চাঞ্চল্য। আমার কর্মহীনতা সান্ত্বনা দিত। এখন? সবকিছু যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমি নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছি।...উঃ, ব্যথা!—আমি তোমাকে দেখে নেব। উজ্জ্বল মজুমদার, রাখো—আর, আর—

এই যন্ত্রণার চাইতে আরেকটা যন্ত্রণা, চাড়া দিয়ে ওঠে—একলাই এই যন্ত্রণাটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আমাকে স্বপ্না সকলের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। আমি দলবল নিয়েই শহরটার মধ্যে একটা পরিমণ্ডল তৈরি করে ফেলেছিলাম—সেই পরিমণ্ডলে আমি ছিলাম হিরো। কিন্তু স্বপ্না, ওই স্বপ্নার ভেতর এমন একটা মাদক-কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম যে, তারপর থেকে আমাকে—কী আশ্চর্য, দলবল থেকে একা-একা বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। ও তখন প্রথম কলেজে ঢুকেছে, আমি আমার ক্লাশ কামাই করে ওর প্রবেশ-প্রস্থান অনুধাবন করতাম। ওর ক্লাশ-রুটিন আমার মুখস্থ ছিল। ওর সঞ্চারপথও। আমি মধ্যে মধ্যে ওকে কোনো নির্জনে নিয়ে যেতে চাইতাম। ও মুখে বলত, 'সত্যি, কী মজা পাওয়া যাবে তাহলে!' কিন্তু কেন জানি না, হয়তো ওর ভয় করত, ও শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে যেত। ও খুব ভীতু এবং লাজুক এই বলে আমি সান্ত্বনা পেতাম। আমার এই দুর্দান্ত চরিত্রে কেন জানি না ভীতু আর লাজুক মেয়েদের জন্যে একটা পক্ষপাতিত্ব রয়ে গেছে!...

স্বপ্না, তোমার কি মনে নেই সেই হরতালের দিনের ঘটনাটা! হঠাৎ সেদিন আমাদের শহরের যানবাহন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন তুমি বাড়ী থেকে মাইল-দুই দূরে বীতুর সঙ্গে আটকা পড়ে গিয়েছিলে। আমি কিন্তু তোমার নাগালের মধ্যেই ছিলাম। বীতু তোমাকে পৌঁছে দেবার ভার দিয়েছিল আমার ওপর। সত্যি, বীতু মেয়েটা খুব ভালো, অন্তত পুরুষের মনের কথাটা বোঝে। সেদিন ছিল আমার জীবনের স্মরণীয় দিন।

দু-একটা ঘটনা কেন যে জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে এইরকম জড়িয়ে যায়—কেনই যে তাকে কোনোক্রমে জীবন থেকে তাড়ানো যায় না!

স্বপ্না, তুমি কী করে ভুলতে পারলে এতগুলো উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্বাদ! কী করে ভুলে গেলে স্নায়ুর ভেতর এত বীণা-ঝংকার, রক্তের ভেতর এমন প্লাবনের ক্ষুধা। তোমার তীর-বেঁধা চোখের মণিদুটো আজো আমার বুকের ভেতর খোঁজ করলে পাওয়া যায়; তোমার ঠোঁটের উষ্ণতা এখনো রোদ্দুরের ভেতর খুঁজে পাই। তুমি আর আমি অনেকক্ষণ ধরে সেদিন একই সুরে বেজে-বেজে উঠেছিলাম শহরের নদীর ধারে।

তুমি প্রথম প্রথম কেমন গঙ্গা-ফড়িং-এর মতো লাফাচ্ছিলে, আমি তোমার পেছনে-পেছনে একগাদা সবুজ-নীল মাকড়শার জাল বিস্তার করে ছুটছিলাম। আমি একসময় তোমাকে ধরেছিলাম। আমার দুখোলা ডানা দিয়ে তোমাকে ধরেছিলাম।

স্বপ্না, তুমি কী করে ভুলে গেলে।

এখন আকাশে দপদপ করে তারা জ্বলছে। দেবদারুর পাতা মধ্যে মধ্যে জানলা দিয়ে উঁকি দেয়া যাচ্ছে। আমি এখন নিঃসঙ্গ উন্মাদ, জ্বরের আতিথ্য।

কিন্তু আবার পৃথিবীতে রোদ উঠলে সুখী-নিশ্চিন্ত লোক দেখলে আমার ভেতরটা বিষিয়ে যাবে। আমি যেন কোনো-মতে বলতে পারব না : 'যারা সুখে আছে, সুখে থাকুক।'

উজ্জ্বল মজুমদার

সত্যি, যখন চারপাশের সমবয়সী বা কমবয়সীদের দিকে তাকাই, দেখি ওদের সঙ্গে আমার মিল নেই। ওরা দলে দলে যেড়ে অগুনতি। ওরা দলে দলে ক্ষুব্ধ, দাবী-দাওয়ায় সোচ্চারিত। কখনো কখনো ওরা কেমন ম্লান হয়ে যায়, মনে হয় এরা বিমর্ষ কোনো পাপ। মধ্যে মধ্যে এরা যখন ক্ষেপে যায় (জেগে ওঠে বলা যায় না) তখন আমার খুব ভয় করে। আমার বন্ধুরা কেউ কেউ বিরক্ত হয়, ভয়ানক বিরক্ত। তাদের কাছে এরা অবাঞ্ছিত, এরা জঞ্জাল। আমি দেখেছি ওরা বিরক্ত হয়ে টাইট দেয়ার চেষ্টা করে, কেউ কারণ খোঁজে না।

আমি যখন আমার গণ্ডীর বাইরে চোখ মেলাই, ওদেরকেই বেশী চোখে পড়ে। আমি কিছুতেই ওদেরকে খারাপ ভাবতে পারি না, পারলে এইরকম একটা নাছোড়-বান্দা সহানুভূতি ওদের জন্যে কি লেগে থাকে! তাই, ওরা যখন ক্ষেপে ওঠে, আমি ভয় পাই, বিরক্ত হই নে। আমার যেন মনে হয় এরা মিণ্টু-বাবলু-তাতারদের দল, যারা এককালে আমার খুব বন্ধু ছিল—আজ জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে ওখানে ভিড় জমিয়েছে। ওরা যখন চুপচাপ থাকে, মনে হয় ওরা নিজেদের কথা চিন্তা করে, তখন সত্যিই ওদের তেজ নিভতে থাকে। আর, যখন ওরা নিজেদের কথা ভাবে না, ভাবে আমাদের কথা, তখনই ওরা হিংস্র হয়ে ওঠে। ওদের তেজ ঠিকরোতে থাকে। আমি ভয়ে ভয়ে ভাবি : 'গেল গেল, ভেঙে গেল সুখের পরিমণ্ডল!'

ওদের কেউ কেউ যখন কেবল একা তার নিজের জন্যে কিছু চাইতে আসে, আমি দেখেছি ওরা কী গদগদ কাকুতিভরা বিনয়ী। সম্মিলিতভাবে ওরা যখন কিছু দাবী করতে আসে, সত্যিই বলছি, আমি ভয় পাই।

কিন্তু এই যে ব্যাপারটা আজ ঘটেছে, এর মধ্যে ভয়-কি-বিপদের কোনো কারণ দেখছি না বলেই মনে হয়। কোনো-এক তাপস আমার কাছে একটা চিঠি দিয়েছে। উড়ো চিঠি বলে তুচ্ছ-করা যাচ্ছে না। কারণ, এই জয়পরাজয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে হাজারটা তাপসের অস্তিত্ব থাকারই কথা। কিন্তু সে তাপসরা সম্মিলিত হয়ে আসে নি, এ একজন তাপসের কণ্ঠস্বর। আমি ইচ্ছে করলেই এটা তুচ্ছ বলে এড়িয়ে যেতে পারি। তাতে ভয়ের কিছুই থাকতে পারে না।

যে চিঠিটা এসেছে তাতে কোনো হুমকি নেই। আছে অনুরোধ। স্বপ্না মেয়েটাকে আমি যেন বিয়ে না করি। এমনভাবে লেখা যেন পত্রপ্রেরক আমাকে উপকার করতে চায়। স্বপ্না মেয়েটার এমনি একটা ছবি সে

খাড়া করতে চেষ্টা করেছে যাতে আমার মনে বিতৃষ্ণা আসে, ঘৃণা আসে।

শুধু এই নয়। স্বপ্নাদের বাড়ীতে যে একটা ঘটনা ঘটেছে কাউকে মারা নিয়ে, তা অনেক ফুলে-ফেঁপে বর্ধিত আকারে আমাদের বাড়ী পেঁাছেছে। আমার বাড়ীর লোকে হাজারটা মন্তব্য করেছে মেয়েটার ওপর। বাবা বলেছেন, 'ওখানে বিয়ে চলবে না।' মা বলেছেন, 'এমন খারাপ মেয়ে তা-তো জানতাম না! বাইরে এমন আলো, ভেতরে ওর এত অন্ধকার! ছিঃ ছিঃ!' আমি মুখ খুলি নি।

এর পরেও এই চিঠিটা এসেছে। আমি এই চিঠির কথা বাড়ীতে বলি নি।

মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি নিজেই পছন্দ করেছি। এতদিন আমি ওকে নিয়ে অনেক কল্পনাও করেছি। এখন এইসব ঘটনা আমার কাছে একটা ষড়যন্ত্রের মতো মনে হচ্ছে।

যতই স্বপ্নার কথা ভাবছি, ওর লজ্জা-লজ্জা হাসিমুখখানা আমাকে চারপাশ থেকে স্নিগ্ধ স্বপ্নে ঘিরে রাখছে। এমন মেয়ে খারাপ হবে কী করে! আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। বড়োরা যে কী কসাই-এর মতো চিন্তাভাবনা করে!

স্বপ্নার কথা ভাবতে আমার ক্লান্তি নেই, বরং আগ্রহই আছে। আমার আগ্রহ যেন তিনগুণ বেড়ে গেছে। ওই মেয়েটা কত ছেলেকে পুড়িয়েছে সেটা কি ওর ক্রেডিট নয়! এইসব ঘটনা যেন ওর খ্যাতিই দিয়েছে। বৃথা গালি দিলে তো চলবে না। আমি অনুভব করতে পারছি : ও কতজনের আশা-কামনা এবং ভালো-লাগা পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছিল, হাজারটা মেয়ের মধ্যে ও নিজেকে নায়িকা করে তুলেছিল—এবং শেষ পর্যন্ত, আমি কী তা আমি জানি না, আমাকে নায়ক করে তুলেছে।

আমার মা-বাবা অমন করে মূল্যায়ণ করছেন কেন তা আমি জানি, আমার মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু এটুকু ওরা বোঝেন নি কেন যে, হাজার যুবকের চিত্তদলন করে আমার দিকে যখন সে বরণমালা এগিয়ে দিয়েছে, সে কি সঙ্গে করে আনে নি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা, দ্বিধাহীন স্বীকৃতি?

হায় শ্যামলী! আমি এইভাবে জীবন-সঙ্গিনীর মূল্যায়ণ করতাম না। এইরকম চিন্তাভাবনার জন্যে মনে হয় তুমিই দায়ী।

তোমাকে ঘিরে এক অনন্য ভালোবাসা রচনা করেছিলাম। তোমার শান্ত-সমাহিত মূর্তি ঘিরে আমার ছিল পুজোর ফুলের মতো ভালোবাসা। আমি ভুলেও কখনো অন্য মেয়ের কথা চিন্তা করিনি, আমার হৃদয় থেকে বাধা উঠত। আমি শান্তশিষ্ট থাকতাম, চঞ্চল-রক্তদের 'মেষ-শাবক' গালি সয়েও আমি শান্তশিষ্ট থাকতাম। আমি শুধু ভাবতাম তোমার শান্ত-সমাহিত মূর্তির কাছে পেঁাছতে হলে আমার চরিত্রকে ওইরকম করে গড়ে তোলার দরকার। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতাম মেপে মেপে, অল্প একটা দুটো। আমি মনে মনে ভাবতাম তুমি আমাকে নিশ্চয় ভালোবাসো।

কিন্তু কোথায়? আমি ভুল ভেবে-ছিলাম। তুমি একদিন চঞ্চলের সঙ্গে চলে গিয়েছিলে।

সেই থেকে আমি অনেক ভেবেছি। আমি, চঞ্চল আর তুমি—শ্যামলী,—আমরা যোগ্যতায় সমশ্রেণী হলেও চঞ্চলের মধ্যে উৎপাতের ভাগ বেশী ছিল, তুমি উৎপাতকে স্বীকৃতি দিলে।

আমি আমার ঘরবাড়ী দামী চাকরি নিয়ে জীবনকে ভারী মনে করছিলাম। স্বপ্নার কল্পনায় ইদানিং নিজেকে হালকা করে নিয়েছিলাম। স্বপ্নাকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। অন্তত শ্যামলীর স্মৃতিভারটা আমি নামাতে পেরেছিলাম।...

শুধু এখন নয়, অনেকবার মনে হয়েছে স্বপ্না আমার ঘরবাড়ী দামী চাকরির জন্যেই আমাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। কেমন লাগছে ভাবতে। তবু সেইটাই তো সত্যি। আমার মা-বাবাও তো এইসব দেখিয়েই আমার দাম বাড়াচ্ছেন!

স্বপ্নার কথা ভাবতে, আবার সেই লজ্জামুখখানা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। ঠিক সেই সময় দেখি মা চা-হাতে ঘরে ঢুকলেন।

আমি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বললাম, 'মা, ওই জায়গায়ই বিয়ে হবে আমার।'

মা অবাক হলেন। বললেন, 'সেকি! ওই মেয়েকে বিশ্বাস করা যায়?'

আমি আর কোনো কথা বললাম না। পায়ে জুতো গলাতে গলাতে ভাবছিলাম : শ্যামলী আর চঞ্চলদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েই স্বপ্না আমার ঘরে আসছে। কেমন একটা তৃপ্তিবোধ আমার।

অনেক সিঁড়ি ভেঙে অতঃপর আমি রাস্তায় নামলাম।

সাগরপারের খবর

ফ্রান্স ও জার্মানী পাশাপাশি দুটো দেশের সুনাম-দুর্নাম যা নিয়ে তা হচ্ছে পানীয় দ্রব্য। ফ্রান্স বলতেই ফরাসী মদের কথা বোঝেন সকলে। ফরাসী মদের মতন জার্মান বিয়ার ইউরোপময় সুপরিচিত। ফরাসীরা যেমন মদখেকোর জাত তেমনি জার্মানরা বিয়ার-এর।

আঙুর থেকে তৈরী হয় মদ আর বার্লি থেকে বিয়ার। ফ্রান্সে যত আঙুরের চাষ হয় ততটা হয় না জার্মানীতে। তবে পশ্চিম জার্মানীর রাইন ও মোজেল নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে আঙুরের চাষ হয়। তার থেকে যে মদ তৈরী হয় সেগুলোর খ্যাতি ইউরোপময়। তবে জার্মান মদের উৎপাদন ফরাসীদের মতন নয়। অনেক কম। জার্মানীতে যেমন আঙুর থেকে মদ হয় তেমনি ফ্রান্সেও বার্লি থেকে বিয়ার তৈরী হয়। তবে ফরাসী বিয়ার জার্মানদের মতন বিখ্যাত নয়।

জার্মান বিয়ারের খ্যাতি ইউরোপ জোড়া। সেই জার্মান বিয়ারের বাজারে এবার 'কমন মার্কেট' কর্তৃপক্ষ খবরদারি করা শুরু করে দিয়েছে বলে জার্মান বিয়ার প্রস্তুতকারিরা প্রতিবাদ জানিয়েছে। বছর কয়েক আগে ফরাসী মদ নিয়ে কমন মার্কেট দেশগুলোর মধ্যে হৈচৈ হয়েছিল। এবার জার্মানদের পালা।

'কমন মার্কেট' কার্যকরী পরিষদ জার্মান বিয়ার প্রস্তুতকারীদের জানিয়েছে যে তারা যেন এখন থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় বিয়ার প্রস্তুতকারীদের মতন বিয়ার তাদের দামে বেচে। এই প্রস্তাব জার্মানরা মেনে নেয়নি।

ইউরোপের মদের বাজারে যেমন কঠিন প্রতিযোগিতা তেমনি বিয়ারের বাজারে। প্রতিযোগিতা যাতে আরও কঠিন না হয় এবং বিয়ারের দাম সব দেশে সমানভাবে হয় তার জন্যেই কমন মার্কেটের এই প্রচেষ্টা।

জার্মানদের কাছে বিয়ার পান যা-তা জিনিস নয়। দৈনন্দিন জীবনে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মতনই একটি বিশিষ্ট দ্রব্য। জার্মান বিয়ারের সঙ্গে জার্মানদের মান-সম্মান জড়িত। তাই তারা জার্মান বিয়ারের মান বজায় রাখতে রুখে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে জার্মান বিয়ার প্রস্তুতকারীরা তাদের বিয়ার প্রস্তুত-প্রণালী সঠিকভাবে বজায় রেখে চলেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নুরেমবার্গ ও মিউনিখের বিয়ার ব্যবসায়ীরা প্রতিজ্ঞা সনদে স্বাক্ষর করে যে, তারা কোনোদিন বিয়ার-এ বার্লি, জল ও "হপ্স" ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করবে না। ভেজাল বা রাসায়নিক দ্রব্য তারা তাই ব্যবহার করে না। এবারে 'কমন মার্কেট' কর্তৃপক্ষ তাদের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়ায় তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কমন মার্কেট বলেছে, রাসায়নিক দ্রব্য মেশালে বিয়ারের গুণ নষ্ট হয় না বরং দাম কমবে। দাম কমালে জার্মান বিয়ারের বাজার জমবে ভাল ইউরোপে।

এক পশ্চিম জার্মানীর সাড়ে তিন কোটি লোক দুবেলা বিয়ার পান করে। অর্থাৎ সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা আটাত্তর জনই বিয়ারখোর। এহেন বিয়ারখোর জার্মানদের যদি বলা হয় যে, তোমরা বিয়ারে ভেজাল মেশাও, তাহলে জার্মানরা তো চটবেই। ব্যাভেরিয়ার প্রিন্স কন্সটান-টাইন তো সোজাসুজি জার্মান স্বাস্থ্য-মন্ত্রীকেই সরকারীভাবে প্রশ্ন করেছে, কমন মার্কেটের উপদেশে জার্মান বিয়ারের জাত খোয়াতে হবে কেন? জার্মানীর বিয়ারের অপমান তো নয়, জার্মান জাতের অপমান।

পশ্চিম জার্মানীর বিয়ার প্রস্তুতকারী সমিতির সম্পাদক মিঃ পিটার স্টীল জানিয়েছেন, কমন মার্কেট দেশগুলোয় যত বিয়ার প্রস্তুত হয় ও সেগুলোর সদ্ব্যবহার হয়, তার দুই-তৃতীয়াংশ হয় পশ্চিম জার্মানীতে। সেই জার্মানীর বিয়ারের মান নীচু করার প্রশ্নই ওঠে না। ভেজাল দিয়ে

দিলীপ মালাকার

জার্মান বিয়ার তারা বাজারে কিছুতেই ছাড়বে না। তাতে তাদের লোকসান হয় হোক। কিন্তু কমন মার্কেটের কাছে তারা মাথা নত করবে না। এই নিয়ে জার্মানীতে এখন প্রবল বিক্ষোভ চলেছে।

জার্মানীর আরেকটি মজাদার খবর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটি কোনো খাদ্যবস্তু নয়। সমাজের আদিম সমস্যা। বিবাহ সমস্যা। জার্মান সমাজে বিবাহ সমস্যা আমাদের মতন নয়। সেখানে জাত-পাতের বিরোধ নেই।

জার্মানদের বর্তমান সমস্যা পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা বেশী। বয়স্ক মহিলাদের বিয়ে হচ্ছে না বলে তারা এখন প্রজাপতি অফিসের শরণাপন্ন হয়েছে। আগে তেমন সমস্যা ছিল না। জার্মান সমাজে ঘটকের ব্যবস্থা ছিল না। অবিবাহিতা মহিলাদের বিয়ে করার জন্যে গজিয়ে উঠেছে পশ্চিম জার্মানীর বহু প্রজাপতি অফিস। এবং তারা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ ব্যবসাটা বেশ জাঁকিয়ে তুলেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বহু পুরুষ হতাহত হয়েছে জার্মানীতে। পশ্চিম জার্মানীর ছয় কোটি লোকসংখ্যার মধ্যে বিশ লাখ নারী উদ্বৃত্ত। এবং তাদের বয়স এখন ছেচল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে। এই বয়সের মেয়েদের নিয়েই জার্মানীর সমস্যা। এই বয়সের মেয়েদের নিয়ে প্রজাপতি অফিসের ব্যবসা জেঁকে উঠেছে। যুদ্ধের আগে সমগ্র জার্মানীতে ছিল প্রজাপতি অফিস মাত্র দশটা। আজ একমাত্র পশ্চিম জার্মানীতে আড়াইশ'টি। এবং এই আড়াইশ'টি প্রজাপতি অফিস বছরে ব্যবসা করে দশ কোটি টাকার।

প্রজাপতি অফিসগুলোর ব্যবসার মাধ্যম এখন সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন। প্রায় সব জার্মান সংবাদপত্রেই আজকাল 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন দেখা যায়। নিঃসঙ্গ পুরুষ ও নারীদের এখন সহায়-অবলম্বন প্রজাপতি অফিসগুলো। তবে বেশী বয়সের কুমারীরাই এইসব অফিসের খদ্দের নয়। অল্প বয়সের অনেক কুমারীরাও প্রজাপতি অফিসের সাহায্য নিচ্ছে। তবে প্রজাপতি অফিস মারফৎ সব বিয়েই সার্থক হয় না। এর মধ্যে অনেক জালজচ্চুরি হয়। যেমন একটি পুরুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিচয় দিয়ে কয়েকজন মহিলাকে প্রতারণা করেছে। এমনি বহু ব্যক্তি ও প্রজাপতি অফিসে হানা দিয়ে জার্মান পুলিশ অনেককে হাজতে পাঠায়। আড়াইশ'টি প্রজাপতি অফিসের একশ' বিয়াল্লিশটি অফিস এখন জার্মান পুলিশের কালো খাতায়।

জার্মান প্রজাপতি অফিস কেমন করে চলে তার একটা উদাহরণ দেওয়া গেল। কলোন শহরের দি মডার্ন ম্যারেজ প্রিপারে-শান ইন্সটিট্যুট-এর মালিক শ্রীমতী রিবেন্সহ্যাম্ বলেছেন, তার খদ্দেরকে পাঁচশ' টাকা জমা দিয়ে নাম লেখাতে হয়। এই টাকা থেকে তার হয়ে প্রজাপতি অফিস খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, অফিসের ফাইল রাখার খরচ, ডাক খরচ, টেলিফোন ধরা হয়।

খদ্দেরের বয়স, শিক্ষা অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রী খুঁজে কয়েকটি ছবি দেখান হয়। তাদের মধ্যে কাউকে পছন্দ হলে ছেলে ও মেয়েকে একদিন ডেকে অফিসের ঘরে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। তাদের পছন্দ না হলে আবার কিছুদিন পরে আরেকটি পাত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। যদি তাদের দুজনের পছন্দ হয়, তাহলে অতি উত্তম। এবং একপাত্র পানীয়ের মধ্যে হয় সেই পর্বের শেষ।

শ্রীমতী রিবেন্সহ্যাম্ বলেছেন, অল্প-বয়সী পাত্র-পাত্রীদের বিয়ের ব্যাপারে শত-করা সত্তর ভাগ কৃতকার্য হন। চল্লিশ বছরের ওপরে যাদের বয়স, তাদের নিয়েই যত অসুবিধে। তাদের ব্যাপারে শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ কৃতকার্য হন তারা। চল্লিশোর্ধে মহিলাদের তিনজনের মধ্যে একজন পান বর।

যাই হোক জার্মান প্রজাপতি অফিস এখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের ব্যবসাও বেশ জোগে উঠেছে।

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ার বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-রুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

কিছুদিন বাদেই গেলেন কলকাতা এলেনও ফিরে। শোনালেন সেখানের হাল-চাল। ইউরোপের যুদ্ধ বাঙলা দেশের দিকে ছুটে আসছে। প্রচুর ব্ল্যাক আউটের মহড়া হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে গোটা কলকাতা জুড়ে। যুদ্ধ দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। রাজদিয়ার মাটিতে ভালোবাসা। ঘর বানানোর আকর্ষণ। অবনীমোহন কিনলেন তাই জমি রাজদিয়ার মাটি।

প্রথম বড় দিনের অভিজ্ঞতাও লাভ করল তারা। স্কুলে যেতে লাগল বিনু। সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। দেখতে দেখতে যুগলের বিয়ের দিন। এলাহি ব্যাপার। যুগলের সঙ্গে বাসর রাতও কাটাল বিনু। সে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

দ্বিরাগমনে গিয়ে যুগল আর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরল না।

যুদ্ধের খবর নিয়েই সবাই মশগুল। দেখতে দেখতে জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সেই দুঃসংবাদ। 'রবীন্দ্রনাথ আর নেই।'

।। পঁয়তাল্লিশ ।।

গত বছর পুজোর ছুটির পর সেই যে হিরণ ঢাকায় গিয়েছিল, সেই থেকে তার আর খোঁজখবর ছিল না।

হিরণ যাবার পর তাকে নিয়ে এবাড়িতে আলোচনা কম হয়নি।

হেমনাথ বলেছেন, 'বাঁদরটা ঐরকম। কাছে থাকল তো দিনরাত মাখামাখি ; যেই চোখের আড়াল হল অমনি সব ভুলে গেল।'

একদিন সন্ধ্যেবেলায় সুধা-সুনীতি-বিনু, তিন ভাই-বোন পড়তে বসেছিল। চারদিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় সুনীতি সুধাকে বলেছিল, 'এমন মানুষকে মন দিলি ভাই, একবার খোঁজও নেয় না।'

সুধা ঠোঁট উল্টে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল, 'খোঁজ নেয় না বলে তো আমি একেবারে মরে গেছি!'

'গেছিসই তো—'

'তোকে বলেছি?'

'না বললে কী ; তোর মুখ দেখে বুঝতে পারি না ভেবেছিস?'

'ও বাবা—' সুধা গালে হাত রেখে বলেছিল, 'কবে থেকে অন্তর্যামী হলি রে দিদি!'

সুনীতি বলেছিল, 'যেদিন হিরণচন্দরের সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে সেদিন থেকে—' একটু চুপ। তারপর সুনীতিই আবার শুরু করেছিল, 'ঐ ভদ্রলোকটি কিন্তু বেশ, কলকাতা থেকে ঠিক চিঠিপত্তর দিয়ে যাচ্ছে।'

সুধা মুখ টিপে হেসেছিল, 'তোর কথাই আলাদা। মনের মতন মনের মানুষ পেয়েছিস।'

'তোরটা বুঝি মনের মতন নয়?'

'বিচ্ছিরি।'

'আয় তাহলে বদলা-বদলি করে নিই।'

'বদলা-বদলির দরকার নেই ; দুটোকেই তুই নিয়ে নে—'

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল সুনীতির। ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, 'তুই ভারি অসভ্য হয়ে উঠেছিস সুধা।'

সুধা উত্তর দেয়নি ; হেসে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঢাকা থেকে হিরণ এসে হাজির।

পুবের ঘরে সুধা-সুনীতি-বিনু আর হেমনাথ বসে ছিলেন। হিরণকে দেখে হেমনাথ প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে কালাচাঁদ যে, আয় আয়—'

হিরণ ছাতা নিয়ে এসেছিল। ছাতাটা মুড়ে বাইরে রেখে ভেতরে এসে বসল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'কী ব্যাপার, এতদিন খবর নেই বার্তা নেই, একবার আসিসও নি। ঢাকায় বসে কী করছিলি?'

হিরণ খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'সরস্বতীর আরাধনা।'

হেমনাথ ভ্রূকুটি হানলেন, 'তার মানে?'

'তার মানে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। মাসে মাসে আমার পেছনে কতগুলো করে টাকা ঢালছ, খেয়াল আছে?'

হেমনাথ কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

হিরণ বলল, 'অন্তত একটা ফার্স্ট ক্লাশ যদি না পাই, তুমি আমাকে আস্ত রাখবে?'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তা রাখব না। শুধু কি তা-ই, আমার কলেজে চাকরিও দেব না।'

'তা হলেই বুঝে দেখ, ঢাকা থেকে হুট-হুট ছুটে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'না-ই বা এলি। মাঝে মধ্যে চিঠি লিখলেও তো পারিস!'

'চিঠি লেখা আমার কুষ্ঠিতে নেই ; তা তো তুমি জানই।'

'তোর কুষ্ঠিতে নেই। এদিকে আরেকজনের দিকে যে তাকানো যায় না। মুখে সব সময় মেঘ জমে আছে।'

'কার?'

আঙুল বাড়িয়ে সুধাকে দেখিয়ে দিলেন হেমনাথ। হিরণ-সুধা বা সুনীতি-আনন্দর মধ্যে যে হৃদয়রাগের খেলা চলছে, এবাড়িতে তা বিশেষ গোপন নেই। এ ব্যাপারে হেমনাথদের কিছু প্রশ্রয়ও আছে। তাঁদের স্নেহের ছায়ায় চারটি উন্মুখ তরুণ মনে উৎসব শুরু হয়ে গেছে যেন।

যাই হোক হাত-পা নেড়ে একেবারে চেঁচামেচি জুড়ে দিল সুধা, 'আহা-হা, আহা-হা—'

এই সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো হেমনাথ। গলার সুরে টেনে টেনে বললেন, 'আহা আহা কাঁদিস না সোনা ভাই।' বলেই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান ধরলেন :

'নয়ন-নীরে কি নেভে মনের অনল
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল ।।
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি সেবে,
ধারাজল বিনে তার সকলই বিফল ।।
মনে যারে চেয়ে দেখি, হারিয়ে বারিয়ে আঁখি,
সেই নীরে নিভে যদি অনল প্রবল ।।

সুধা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। আবার মুখে বলল, 'এরকম করলে আমি কিন্তু চলে যাব দাদু—'

হাত ধরে সুধাকে তক্তপোষে বসিয়ে দিতে দিতে হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, এই গান থামিয়ে দিলাম। তোরা গল্পটল্প কর। আমাকে একটু বেরুতে হবে। হিরণ, তুই এখানে খেয়ে যাবি। হোম ডিপার্টমেন্টে বলে যাচ্ছি।'

হিরণ ঘাড় হেলিয়ে জানাল, খেয়েই যাবে।

বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কী মনে পড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন হেমনাথ। হিরণের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'হ্যাঁ-রে—।

'কী বলছ?'

'পুজো তো এসে গেল।'

'হ্যাঁ।'

'গেলবারের মতন এবারও নাটক-টাটক করবি তো?'

হিরণ বলল, 'এবার পুজোর ছুটিতে আমি আসছি না। ঢাকাতেই থাকব।'

একটু অবাক হলেন হেমনাথ, 'কেন রে!'

'ছুটির পর কতটুকু আর সময় পাওয়া যাবে। তারপরই তো পরীক্ষা—'

'তাই তো; আমার খেয়াল ছিল না। না-না, ছুটিতে তোর আসার দরকার নেই। 'পরীক্ষা আগে; জীবনে ফুর্তি করার ঢের সময় পাওয়া যাবে। আচ্ছা এখন যাচ্ছি।'

হেমনাথ বেরিয়ে যাবার পর মুখ নীচু করে নিঃশব্দে নখ দিয়ে তক্তপোষে আঁকিবুকি কাটতে লাগল সুধা। হিরণের সঙ্গে কথা-টথা যা বলবার, সুনীতিই বলল; তার এতদিন ডুব দিয়ে থাকা নিয়ে ঠাট্টা-টাট্টা করল; প্রাণখুলে হাসির ফোয়ারা ছোটাল। তারপর এক সময় ছল করে উঠে গেল।

তখন ঘরের ভেতর ওরা তিনজন। সুধা, হিরণ আর বিনু। বিনু জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল। আকাশ জুড়ে শুধু মেঘ আর মেঘ; চরাচর আচ্ছন্ন করে ধূসররেখার বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে। ধানখেতের দিক থেকে হঠাৎ দমকা বাতাস ছুটে আসে; বাগানের সুপুরি গাছগুলো নুয়ে পড়ে। জামরুল আর কালোজাম গাছদুটো পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ফিস-ফিস গলায় কী পরামর্শ করতে থাকে।

এদিকে অনেকক্ষণ নীরবতার পর হিরণই প্রথম কথা বলল, 'কেমন আছ সুধা?'

সুধা উত্তর দিল না।

হিরণ আবার বলল, 'খুব রাগ করে রয়েছ, না?'

এবার সুধা ভারী গলায় উত্তর দিল, 'না। শুনিতে—'

'শুনিতে কী?'

'অনেক রয়ে আছি?'

[illegible] হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে এক-আধবার [illegible] ছিল। কিন্তু এখন [illegible]—'

'খুব খারাপ অভ্যেস— এতক্ষণ সুধার গলা ভারী ছিল, এবার কাঁপতে লাগল, 'মরে গেছি কি বেঁচে আছি; খোঁজ নেওয়াও দরকার মনে করেন না—ওদিকে আমেন—'

'কী?'

'আনন্দদা সপ্তায় দুটো করে চিঠি লেখে দিদিকে—'

'আনন্দবাবু লেখে দুটো করে, ঢাকায় গিয়ে এবার থেকে আমি চারটে করে লিখব—'

'ইয়ার্কি' হচ্ছে!'

'না-না—' হিরণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'তুমি দেখে নিও—'

সুধা ভয় পেয়ে গেল যেন, 'দোহাই আপনার, অত চিঠি লিখবেন না। দিদি জানতে পারলে আমাকে খেপিয়ে মারবে। মাঝে-মাঝে এক-আধটা লিখলেই আমি খুশী—'

কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল হিরণ, হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, 'এই সুধা—'

'কী বলছেন?'

'আমরা তো খুব প্রাণের কথা চালিয়ে যাচ্ছি। ওদিকে—

'ওদিকে কী?'

'ঘরের ভেতর বিনু রয়েছে না—'

এক পলক বিনুকে দেখে নিয়ে সুধা বলল, 'ওটা একটা হাবা গঙ্গারাম; জানলার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টিই দেখছে; আমাদের কথা কানেও যাচ্ছে না। ভারি অন্যমনস্ক ছেলে—'

হাবা গঙ্গারামটির চোখ অবশ্যই জানলার বাইরে ছিল, কিন্তু ধ্যানজ্ঞান ছিল ঘরের ভেতরে। কান খাড়া করে হিরণদের প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছিল বিনু।

সুধা বলা-সত্ত্বেও সন্দেহ গেল না হিরণের। সংশয়ের গলায় বলল, 'যদি শুনে থাকে—'

সুধা বলল, 'কিচ্ছু শোনেনি; আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিরকম অন্যমনস্ক দেখবেন?' বলেই ডাকল, 'এ্যাই বিনু—'

বিনু প্রথমটা সাড়া দিল না। বৃষ্টির লম্বা-লম্বা ধূসর রেখাগুলি এবং তাদের একটানা ঝম-ঝম শব্দ ছাড়া জগতের আর কোন দিকে তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ আছে বলে মনে হল না।

সুধা আবার ডাকল। বারকয়েক ডাকাডাকির পর চমকে ওঠার ভান করে বিনু ঘুরে দাঁড়াল, 'কী বলছিস,'

'কী করছিস, জিজ্ঞেস করছিলাম—'

'বৃষ্টি দেখছি।'

'আমি তোকে কবার ডেকেছি বল্ তো?'

'এই তো একবার।'

'আমরা কী বলছিলাম, শুনেছিস?'

'না তো—'

'ঠিক আছে, তুই বৃষ্টি দ্যাখ—'

বিনু আবার জানলার বাইরে আচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাল।

আর সুধা হিরণকে বলল, 'দেখলেন তো?—'

হাতেনাতে এত বড় প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও বিনুর সম্পর্কে সতর্ক হয়ে গেল হিরণ। যতখানি সম্ভব গলাটা অতলে

নামিয়ে সে ফিস-ফিস করতে লাগল। সংগে-সংগেই কিনা কে জানে, সুধাও গলা নামাল।

আর জল-বাঙলার ক্লান্তিহীন বর্ষণ দেখতে দেখতে উৎকীর্ণ বিনু ঘরের ভেতরে দুটি অন্তরংগ গাঢ় গলার ফিসফিসানি

●

শুনতে লাগল।

দেখতে দেখতে আরেক পুজো এসে গেল।

এই সেদিনও আকাশ জুড়ে কালো মেঘ জমাট হয়ে ছিল। এখনও মেঘ আছে; তবে তার রঙ গেছে বদলে।

সারা বর্ষার জলে ধুয়ে আকাশখানি এখন আশ্চর্য নীল। এত চকচকে, এত ঝকঝকে যে মনে হয়, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত একখানা নীল আয়না কেউ টাঙিয়ে রেখেছে। তার গায়ে থোকা থোকা সাদা মেঘের ভেলা ভাসানো।

আশ্বিন মাস পড়তেই খাল-বিল-নদী-পারের কাশবন সাদা হয়ে গেছে। হিজল গাছগুলোর পাতা আর দেখা যায় না, শুধু ফুল আর ফুল।

বর্ষার সময়টা এই জল-বাঙলা থেকে সব পাখি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। দিনরাত একটানা বৃষ্টির ভেতর তারা বেরোয় কী করে? আশ্বিনের শুরুতে যেই বৃষ্টি থামল, মেঘ কেটে ঝলমলে সোনালী রোদ দেখা দিল, অমনি নিরুদ্দেশ পাখির ঝাঁক রাজদিয়ার আকাশে ফিরে আসতে লাগল। দিবানিশি তাদের কিচির-মিচিরে চারদিক এখন মুখর। আর এসেছে পতংগেরা—ফড়িং প্রজাপতি, নানারকম পোকা।

পুকুর ধানক্ষেত, দূরের মাঠ, মাঠের মাঝখানে ছোট ছোট কৃষাণ গ্রাম—বর্ষায় সব ভেসে গিয়েছিল। মাঠের জল, ধানখেতের জল, খাল-বিলের জল—সব জায়গার জল এখন স্থির। কৃষাণ গ্রামগুলোকে দ্বীপের মতন দেখায়। দূরে দূরে মাঠের মাঝখানে ভেসাল জাল পাতা। ভেসালের বাঁশে শঙ্খ-চিল কি কানিবক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকে। নিস্তরংগ জলে ধানগাছের ছায়া, মুত্রার ছায়া, নল-ঘাস এবং খড়ের ছায়া, সারাদিন স্থির হয়ে থাকে। শুধু উড়ন্ত পাখিদের ছায়া দুলতে দুলতে ধু-ধু দিগন্তের দিকে চলে যায়।

কটা মাস একটানা বর্ষার স্যাঁতসেঁতে সিক্ত থাকার পর রোদে-বাতাসে-আলোয় এবং উত্তাপে জল-বাঙলা আবার যেন সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

হেমনাথ আর অবনীমোহন এবার জমিতে আউশ ধান দিয়েছিলেন, পাটও বুনেছিলেন। শ্রাবণের শেষাশেষি আউশ উঠে গেছে। বর্ষায় পাট জাগ দিয়ে রাখা হয়েছিল। কামলারা এখন বার-বাড়ির বাগানে বসে পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছে।

জমিজমা নিয়ে একেবারে মেতে উঠে-ছেন অবনীমোহন। দিনরাত ধান-পাট, কামলা-কৃষাণ, এসব নিয়েই আছেন। কে বলবে, মাত্র ক'মাস আগে জমি কিনেছেন। দেখেশুনে তো মনে হয়, চাষবাসই তাঁর জীবনের সারাৎসার। নিরবধি কাল ধরে এই কাজই করে যাচ্ছেন।

খরার দিনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জমি চৌরস করিয়েছেন অবনীমোহন; বর্ষার নতুন জল এলে বীজ বুনিয়েছেন। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আউশধান আর পাট কাটিয়ে-ছেন। এখন যে পচা পাট থেকে আঁশ ছাড়ানো হচ্ছে, তাও সারাদিন সামনে বসে থাকেন। কৃষি-জীবন তাঁকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ধান-পাট ছাড়া আর কিছুই আজকাল ভাবতে পারেন না অবনীমোহন। অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেবার মতন যথেষ্ট সময়ও তাঁর নেই।

হেমনাথ কিন্তু তাঁর নিজস্ব নিয়মেই চলছেন। বাড়ি থেকে একবার বেরুতে না পারলে তাঁর ঘুমই হয় না। এই রাজদিয়া কিংবা আশেপাশের গ্রামগঞ্জগুলোর খোঁজ নেওয়া চাই-ই। জষ্টির পর থেকে এত যে বর্ষা, এত যে জল, তবু তাঁকে কেউ বাড়িতে আটকে রাখতে পারেনি; ছাতাটি মাথায় দিয়ে ঠিক বেরিয়ে পড়েছেন।

আশ্বিন মাস পড়বার পর একদিন দুপুরবেলা কোত্থেকে বাড়ি ফিরে হেমনাথ বললেন, 'পুজোর ছুটি পড়ে গেছে। আজকের স্টিমারে কলকাতা থেকে রাজেন গুহর ছেলে-বৌ এল।'

স্নেহলতা বললেন, 'কে, অশোক?'

'হ্যাঁ।'

'গুহবাড়ির ছেলে তো এল। অন্য বাড়ির কেউ আসেনি?'

'এখনও আসেনি। দু-একদিনের ভেতর এসে পড়বে।'

পুজোর ছুটি পড়তেই গৃহকোণ-লোভী প্রবাসী সন্তানেরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে রাজদিয়া ভরে যাবে। এখানকার মৃদু স্তিমিত বেগবর্ণহীন জীবন সরগরম হয়ে উঠবে।

একেক দিন একেক জনের খবর নিয়ে আসেন হেমনাথ। কোনদিন এসে বলেন, 'আজ মল্লিকবাড়ির সরোজরা এল।' কোন-দিন বলেন, 'আজ নাহাবাড়ির অমুকরা এল।' কোনদিন বলেন, 'আজ রুদ্রবাড়ির মহিমরা এল।'

হেমনাথ যখন খবর নিয়ে আসেন, সুধা-সুনীতি-বিনুরা অসীম আগ্রহে কাছে এসে দাঁড়ায়।

একেক দিন একেকজনের কথা বলেন হেমনাথ; কিন্তু ঝুমাদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন না।

এই নিয়ে সুধা-সুনীতি চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে ফিস-ফিস করে। সুধা বলে, 'কি-রে দিদি—'

সুনীতি বলে, 'কী?'

'দাদু শিশিরমামাদের কথা একবারও তো বলছেন না।'

'ও'রা আসেনি, তাই বলছেন না।'

'ও'রা এলে—'

'এলে কী?'

'আনন্দদাও আসবে।'

'প্রত্যেকবার আসবে, তার কি কিছু ঠিক আছে।'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুধা বলে, 'আসবে রে, আসবে। তুই এখানে পড়ে আছিস, চিঠিতে কত আর মনের কথা লেখা যায়! বিধুমুখ দেখতে না পেলে—'

তার পিঠে দুম করে এক কীল বসিয়ে সুনীতি বলে, 'খুব ফাজলামি শিখেছিস!'

পিঠ বাঁকিয়ে খানিকক্ষণ 'উ-উ-উ' করে সুধা। তারপর ঘন গলায় বলে 'আনন্দ-দা এলে বেশ হয়, না?'

সুনীতি বলে, 'জানি না, যা—'

পুজোর সপ্তাখানেক আগে একদিন বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে হেমনাথ চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'কই গো, কোথায় গেলে সব।'

সবাই ছুটে এল। স্নেহলতা বললেন, 'কী হয়েছে, অত চিৎকার করছ কেন?'

হেমনাথ বললেন, 'খুব খারাপ খবর।'

উদ্বিগ্ন মুখে স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী?'

'আজ রামকেশবের সংগে দেখা হয়ে-ছিল। ও কী বললে জানো?'

'কী?'

'শিশিররা এবার পুজোয় দেশে আসছে না।'

'কেন?'

'শিশিরের বড় মেয়ে ঝুমার খুব অসুখ। ডাক্তার নাড়াচাড়া করতে বারণ করেছে। তাই—'

স্নেহলতা বললেন, 'কী অসুখ?'

হেমনাথ বললেন, 'টাইফয়েডের মতন—'

সত্যিই খুব খারাপ খবর। হিরণটা পরীক্ষার জন্যে আসতে পারবে না; শিশিররা আসবে না। এবারকার পুজোয় তেমন আনন্দ হবে না।'

একধারে সুধা-সুনীতি দাঁড়িয়ে ছিল। সুধা চাপা গলায় বলল, 'এই দিদি, তোর মুখটা এমন কালো হয়ে গেল কেন রে?'

শিশিররা আসবে না শুনে সুনীতির মুখখানা সত্যিই ভারি করুণ হয়ে গিয়ে-ছিল। সুধার কথায় হাসবার চেষ্টা করল সে; 'কোথায় কালো হয়েছে?'

সুধা বলল, 'আমাকে তুই ফাঁকি দিতে চাস দিদি?'

সুনীতি উত্তর দিল না।

একটু চুপ করে থেকে ভারী গলায় সুধা বলল, 'একজন ঢাকা থেকে আসতে পারবেন না, আরেকজন কলকাতায় পড়ে থাকবেন। না আসুক গে—'

সেদিনই রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঝুমার কথা ভাবছিল বিনু। আগের বছর পুজোর সময় তার সঙ্গে নৌকোয় করে ভেসে-যাওয়া মাঠের মাঝখানে চলে গিয়েছিল ; সেখানে কাউ ফল পাড়তে গিয়ে পড়েছিল অথৈ জলে। ডুবেই যেত ; ঝুমাই সেদিন তাকে নৌকোয় টেনে তুলেছিল।

শুধু কি তাই, ঝুমার পাশে বসে থিয়েটার দেখেছে। ঝাপসা রহস্যময় জ্যোৎস্নায় যুগলের নৌকোয় উঠে সুজনগঞ্জে যাত্রা শুনতে গেছে। নিশিন্দার চরে গেছে চড়ুইভাতি করতে। দুঃসাহসী মেয়েটার অসংখ্য মনোহর স্মৃতি নানা দিক থেকে বিনুর চারপাশে ভিড় করে আসতে লাগল।

হঠাৎ ঝিনুক ডাকল, 'বিনুদা—'

বিনু চমকে উঠল, 'কী বলছ?'

'ঝুমারা এবার আসবে না।'

'হুঁ।'

'এবার থিয়েটারের সময় তোমার জন্যে আমি জায়গা রাখব।'

অন্যমনস্কের মতন বিনু বলল, 'হুঁ—'

ঝিনুক আবার বলল, 'সুজনগঞ্জের হাটে রাত্তিরবেলা নৌকোয় করে যাত্রা শুনতে যাব।'

হুঁ—'

●

হিরণ আসেনি, শিশিররা আসেননি। তবু পুজোয় সমারোহ কম হল না। অন্যবারের মতন এবারও ধুনুচি-নাচের, ঢাকের বাজনার প্রতিযোগিতা হল, নাটক হল, যাত্রা হল, ভাসান গান হল, জারি-সারি-কাচ-নাচের আসর বসল, একদিন ধুমধাম করে বাইচ খেলাও হয়ে গেল।

নিয়ম মতন সবই হল কিন্তু মানুষের মন এবার বড় অস্থির, বড় চঞ্চল। পুজো-মণ্ডপে, জারি-সারি-ভাসান গান কি যাত্রার আসরে—সর্বত্রই এক কথা, এক আলোচনা।

'যুদ্ধ লাগছে; কী যে হইব!'

'এইবার আর রক্ষা নাই।'

'জিনিসপত্তরের দাম যা বাড়তে আছে তাইতে আর বাচতে হইব না।'

'জিনিসপত্তর আর পাইবা নিকি ; বাজার থিকা চাউল-ডাইল সগ উধাও হইয়া যাইতে আছে। ট্যাকা-পয়সা যার আছে হ্যায়ও (সেও) না খাইয়া মরব, অন্য মাই মান তো মরবই।'

কলকাতা-প্রবাসী কেউ কাছাকাছি থাকলে আলোচনাটা আরো জমে ওঠে। কলকাতার মানুষ অনেক বেশি জানে-শোনে, অনেক বেশি খবর রাখে। তারা যুদ্ধ সম্বন্ধে এমন এমন সব কথা বলে যাতে ভয়ে আতঙ্কে রাজদিয়াবাসীদের বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায়।

মোট কথা, সবাই আশংকা করে আছে, কিছু একটা ঘটবে। নিশ্চয়ই ঘটবে। নিদারুণ বিপজ্জনক, অনিবার্য কিছু। সারা দেশ, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তারই আয়োজন চলছে। রাজদিয়া-বাসীরা ভাবে, যুদ্ধ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে ; এই রাজদিয়ারও নিস্তার নেই।

দুর্গাপুজোর পর কোজাগরী লক্ষ্মী-পুজো। তারপর রাজদিয়া আবার ফাঁকা হয়ে গেল। একে একে কলকাতার চাকুরেরা ফিরে যেতে লাগল। ক্ষণিকের জন্য রাজদিয়া উৎসবে, উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠেছিল ; তার ওপর আবার স্তিমিত নিরুচ্ছ্বাস বর্ণহীন দিন নেমে আসতে লাগল।

লক্ষ্মীপুজোর পর কালীপুজো।

কালীপুজোর রাত্তিরে একটা মজার ঘটনা ঘটল। মজার এবং বিস্ময়করও।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বিনু আর ঝিনুক হেমনাথের ঘরে শুতে আসছিল। স্নেহলতা ঝিনুককে ডাকলেন।

ঝিনুক দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কী বলছ?'

স্নেহলতা তার কথার উত্তর না দিয়ে বিনুকে বললেন, 'তুই শুতে চলে যা দাদাভাই—'

বিনু বলল, 'ঝিনুক যাবে না?'

'না।'

ঝিনুক এইসময় চেঁচিয়ে উঠল, 'বা-রে, আমার বুঝি ঘুম পায় না!'

স্নেহলতা বললেন, 'ঘুম পেয়েছে তো আমার বিছানায় শুয়ে থাক গে—'

ঝিনুক অবাক, 'তোমার বিছানায় শোব কেন?'

'আজ থেকে আমার কাছেই শুবি।'

'না-না, দাদুর কাছে শোব, বিনুদাদার কাছে শোব—' ঝিনুক হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

বড় বড় চোখ পাকিয়ে কঠিন গলায় স্নেহলতা বললেন, 'না।'

ঝিনুক বা বিনু স্নেহলতার এ চেহারা আগে আর কখনও দ্যাখেনি, এমন কণ্ঠস্বরও শোনেনি। নিমেষে ঝিনুকের হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ হল কিন্তু জেদটা একেবারে গেল না। ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে আর সমানে বলতে লাগল, 'কেন ওদের কাছে শোব না, কেন?'

খুব শান্ত গলায় স্নেহলতা এবার বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়ে গেছ, তাই—'

ঝিনুক বিহ্বলের মতন প্রতিধ্বনি করল, 'বড় হয়ে গেছি!' বলে নিজের দিকে তাকাল, তাকিয়েই রইল।

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ।'

ঝিনুক কী বুঝল, কে জানে। কিছুই বলল না।

আর বিমূঢ় বিনু অবাক চোখে ঝিনুককে দেখতে লাগল। গেলবার পুজোর সময় তারা রাজদিয়া এসেছে। এই আরেক পুজো গেল। এক বছরের ভেতর কখন কোন্ ফাঁকে মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, সে ভেবেই পেল না।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে এক সময় একাই হেমনাথের ঘরে চলে গেল বিনু।

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলল। মাঝখানে মোটে দেড়টি মাস; তারপরেই অ্যানুয়েল পরীক্ষা।

সারা রাজদিয়া জুড়ে এখন পড়ার মরসুম চলছে। আজকাল যে-বাড়িতেই

যাওয়া যাক, সকালে-সন্ধ্যায় কচি কচি গলায় একটানা বিচিত্র সুর কানে আসে, 'থ্রী সাইডস্ অফ এ ট্রায়েঙ্গল—' অথবা 'জলস্পর্শ করব না আর চিতোর রাণার পণ, বুঁদির কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ।' ইত্যাদি ইত্যাদি। জিরান্ড, ভার্বেল নাউন, বহুব্রীহি সমাস, জ্যামিতির কঠিন কঠিন উপপাদ্য, এ্যালজেব্রার ফরমুলাগুলো চারদিক জুড়ে এখন রাজত্ব করে চলেছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা দক্ষিণের ঘরে বিনুরা পড়তে বসেছে। বাইরের বারান্দায় অবনীমোহন, হেমনাথ খবরের কাগজ নিয়ে আসর জমিয়েছেন। ইচু মণ্ডল, ইসমাইল চৌকিদার, কুমোরপাড়ার হাচাই পাল, সুধাই পাল—এমনি অনেকে ঘন হয়ে বসে নিশ্বাস বন্ধ করে যুদ্ধের খবর শুনছে।

হঠাৎ বাগানের দিক থেকে রাজদিয়া স্কুলের ইংরেজির টীচার আশু দত্তর গলা ভেসে এল, 'হেমদাদা আছেন?'

পড়তে বসেই ঢুলুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিনুর; চোখ বুজে আসছিল। বার বার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ছিল সে।

আশু দত্তর গলা পেয়ে ঝিমুনি ছুটে গেল। খাড়া হয়ে বসে শেষ পর্দায় গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বিনু পড়তে লাগল, 'আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকায় পিগমি নামক জাতি বাস করে। ইহারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মানব, মাত্র চার ফুট দীর্ঘ। এই অঞ্চলের তীব্র সূর্যতাপের জন্য—

চোখ বইয়ের পাতায় আছে ঠিকই কিন্তু কান রয়েছে বাইরে।

হেমনাথ বারান্দা থেকে সাড়া দিলেন, 'আছি। কে, আশু?'

'হ্যাঁ।'

'আয়, আয়—'

আশু দত্ত এলে একটা জলচৌকিতে তাঁকে বসানো হল। হেমনাথ বললেন, 'কী ব্যাপার আশু, হঠাৎ রাত্তিরবেলা কি মনে করে?'

আশু দত্ত বললেন, 'একটু খোঁজখবর নিতে এলাম।'

'কিসের?'

'আপনার না; আমার ছাত্রের।'

'মানে বিনুর।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জিজ্ঞাসু সুরে হেমনাথ বললেন, 'বিনু তো ভালই আছে। ঐ যে পড়ছে। কিন্তু—'

আশু দত্ত হেসে বললেন, 'আপনার চিন্তা নেই। আমি পড়াশোনারই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। বুঝতেই তো পারছেন, এ্যানুয়েল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। ছেলেগুলো পড়ছে কি ঘুমুচ্ছে, দেখতে হবে না?'

হেমনাথও হেসে ফেললেন, 'তা তো ঠিকই। বিনুকে ডাকব?'

'ডাকতে হবে না; আমিই ঘরে যাচ্ছি।'

'যা—'

আশু দত্ত ঘরের ভেতর এলেন। গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে দিল বিনু।

আশু দত্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু পড়া শুনলেন। তারপর ডাকলেন, 'বিনয়—'

স্কুলে বিনয় নামটাই চালু। বিনু বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'আজ্ঞে—'

'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

রাজদিয়া ছোট জায়গা। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। সুধা-সুনীতির সংগে আগেই আশু দত্তর পরিচয় হয়েছিল।

সুধাটা চিরকালের বিভীষণ। সে বলল, 'কোথায় পড়া; এই তো একটু আগে ঢুলছিল।'

কটকট করে সুধাকে একবার দেখে নিয়ে মিনমিনে গলায় বিনু বলল, 'ঢুলছিলাম না স্যর।'

আশু দত্ত বললেন, 'মন দিয়ে পড়। ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার আর গ্রামারটা কিন্তু তোমার ঠিকমতো তৈরি হয়নি। ওগুলো দেখে রাখবে।'

'মুখে বললে হবে না, কাজে দেখাতে হবে। পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছ কিনা, দেখতে আমি আবার আসব।'

'কবে আসবেন?'

'তা কি বলে আসব! যে-কোনদিন আসতে পারি।'

আশু দত্ত ঘরের বাইরে যেতে হেমনাথ বললেন, 'বোস্ বোস্, চা খাবি?'

আশু দত্ত অবাক, 'আপনার বাড়িতে চা ঢুকেছে নাকি!'

হেমনাথ হাসলেন, 'জামাইয়ের চায়ের অভ্যেস। চা না ঢুকিয়ে কী করি বল্—'

'তাহলে খেয়েই যাই।'

একটু পরে চা এল। খেয়েই উঠে পড়লেন আশু দত্ত।

হেমনাথ বললেন, 'এক্ষুনি যাবি? আরেকটু বোস্ না। খবরের কাগজ এসেছে; [illegible] অনেক যুদ্ধের খবর আছে। শুনে যা।'

'আমার কপালে [illegible] সেই হেমদাদা।'

'কেন, তোমার কী এমন রাজকাজ?'

'আর বলবেন না। লাহিড়ীবাড়ি যেতে হবে, নন্দীবাড়ি যেতে হবে, [illegible]দের বাড়ি যেতে হবে।'

'কেন?'

'ওদের বাড়ির ছেলেরা পড়ায় বড্ড ফাঁকি দ্যায়। এখন থেকে যদি পেছনে না লেগে থাকি ম্যাট্রিকে স্কুলের রেজাল্ট ভাল হবে কি করে? আমি চাই রাজদিয়ার প্রত্যেকটা ছেলে লেখাপড়ায় ভাল হোক, মানুষ হোক।' একটু থেমে আশু দত্ত আবার বললেন, 'যুদ্ধের খবর শুনবার জন্যে বসতে বলছেন? শুনে কী করব? যুদ্ধ তো আর আমি ঠেকাতে পারব না। যা হবার তাই হবে।'

আশু দত্ত চলে যাবার পর অবনীমোহন সবিস্ময়ে বললেন, 'রাত্তিরবেলা উনি ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াবেন!'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। ছেলেদের চিন্তায় আশুটা পাগল। কে পড়ছে, কে পড়ছে না, কার কী অসুবিধা হচ্ছে—এসব দেখে না বেড়ালে ওর ঘুমই হয় না।'

অসীম শ্রদ্ধায় অবনীমোহন উচ্চারণ করলেন, 'সত্যি, এরকম শিক্ষক আগে আর কখনও দেখিনি।'

●

এ্যানুয়েল পরীক্ষার ক'দিন আগে খুব হৈ-চৈ। জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পার্ল হারবার, সিঙ্গাপুরে, ম্যানিলায় বোমা ফেলেছে। 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' আর 'রিপালস্' নামে দুটো বড় বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

ভয়, উত্তেজনা, আতঙ্ক এবং রকমারি গুজবের মধ্যে বিনুদের পরীক্ষা হয়েও গেল।

এ্যানুয়েল পরীক্ষার কিছুদিন পর খবর কাগজ আরো মারাত্মক সংবাদ বয়ে আনল। জাপানীরা ঘরের কাছে বর্মার নাকি এবার বোমা ফেলেছে। শুধু তাই না, বর্মা থেকে দলে দলে লোক পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল পেরিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলে আসছে।

একদিন হেমনাথ বললেন, '[illegible] সেনের নাম শুনেছ তো?'

স্নেহলতা বললেন, 'যে [illegible] থাকত?'

'হ্যাঁ। তারা আজ রাজদিয়ায় [illegible] এসেছে।'

(ক্রমশঃ)

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১৮)

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন
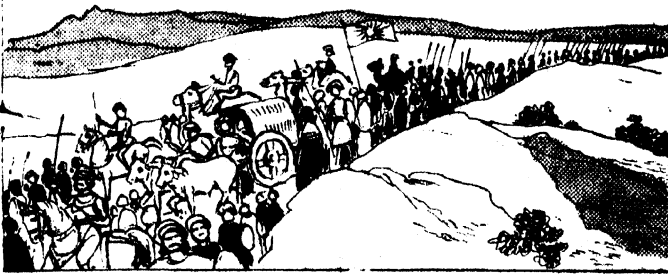
আপনি কতখানি ধীর স্থির রাশভারী?

যিনি ধীরস্থির রাশভারী, তাঁর আত্মবিশ্বাস প্রচুর। তিনি নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশতে জানেন, তাঁদের মধ্যে কাজ করতেও পারেন স্বচ্ছন্দে।

এ-ধরনের মানুষের মন ছড়িয়ে থাকে বহু মানুষের মাঝে এবং সেইজন্যেই তাঁরা রাশভারী হলেও আত্মসচেতন নন।

এরকম মানুষ পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করে আনন্দের ভাগ নিতে জানেন এবং দায়িত্বকে মোটেই ভয় করেন না, সুতরাং নিজের ওপর ভরসা তাঁদের খুবই।

নীচের মনোপ্রশ্নচর্চাটিতে যোগ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কতখানি ধীরস্থির রাশভারী লোক। প্রশ্নগুলিতে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে যান। সবশেষে সঠিক জবাবের হিসাব দেওয়া আছে, এখন সেদিকে তাকাবেন না।

১। আপনার কথা যাতে লোকে শোনে, সেজন্যে আপনি কি কখনো গলা চড়িয়ে কথা বলেন?

২। আপনি কি বুঝতে পারেন, লোকে যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে কিংবা তর্কাতর্ক করে, তখন তাদের শান্ত করবার মতো প্রভাব আপনার আছে?

৩। লোকে কি আপনাকে মাঝে মাঝে বলে যে, তারা আপনাকে পছন্দ করে এই কারণে যে, আপনি সব সময়ে সমানভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন, মেজাজ দেখান না?

৪। যখনি প্রয়োজন হয়, তখনি কি লোকে আপনার সঙ্গে কাজ করতে পেলে খুশি হয় বলে মনে করেন, এমনকি আপনি হুকুম করলেও?

৫। আপনি কি সংগঠনের কাজে বেশ দক্ষ, অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে দিতে, কিংবা কোনো অনুষ্ঠানের জোগাড়যন্তর করে দিতে খুব ভালোভাবে পারেন?

৬। হুড়মুড় দুড়দাড় করে কোনো কাজ কেউ আপনাকে করতে দিলে আপনি কি সে-কাজ বাদ দিয়ে দেন?

৭। আপনি যেভাবে কাজ করেন, সেটা কি বেশ নিয়মমাফিক সিসটেমেটিক—সুন্দরভাবে শুরু করেন, ধীরেসুস্থে প্রত্যেকটি পর্যায়ে এগুতে থাকেন শেষ-পর্যন্ত?

৮। প্ল্যানমতো কোনো কাজ ঠিকভাবে না চললে আপনি কি অবিচল থাকেন?

৯। অন্য লোকে তাদের নিজস্ব কোনো ধারণার বশে গোঁড়ামির জন্যে মেজাজ খারাপ করলে আপনি কি নির্বিকার নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করে যেতে পারেন?

১০। আপনি কোনো একটি সিদ্ধান্ত করেছেন এবং আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি ঠিকই ভেবেছেন। সে-ব্যাপারে অন্য কেউ যদি তাঁর সমালোচনা, এমনকি শত্রুতা করে, তাহলে কি সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করে চলতে পারেন?

১১। দারুণ রেগে গিয়ে মেজাজ খারাপ করে ফেলা কি আপনার স্বভাবের বাইরে?

১২। আপনি কি গোলমেলে অবস্থা, জটিল পরিস্থিতি, ভুল বোঝাবুঝি এবং অন্য লোকের সমস্যাগুলিকে আপনার সমস্যার সঙ্গে মিশিয়ে না ফেলে ঠিক ঠিক-মতো বেছে নিয়ে আলাদাভাবে মোকাবিলা করতে পারেন?

১৩। লোকে কি মাঝে মাঝে আপনাকে জিগ্যেস করে—আপনি কি ভাবছেন?

১৪। হঠাৎ কোনো জরুরী অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলে আপনি কি নিজে মাথা ঠাণ্ডা রেখে অন্য সবাইকে শান্ত করে রাখতে পারেন?

১৫। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে আপনি কি লোকজনের সঙ্গে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশা করতে পারেন?

১৬। নতুন অপরিচিত কোনো লোক এলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আপনার কি বেশ ভালো লাগে?

১৭। আপনি কি এ-কথা বলতে পারেন যে, অধিকাংশ লোক এবং অধিকাংশ অবস্থার সঙ্গেই আপনি মানিয়ে চলতে পারেন?

১৮। কোনো বিষয়ে সফল হলে, তাই নিয়ে আনন্দে উগমগ হয়ে নৃত্য-উল্লাস না করে আপনি সহজ স্বাভাবিকভাবে সেটির তৃপ্তি আস্বাদন করতে পারেন?

১৯। ঠিক এর উলটো দিকটা—কোনো বিষয়ে আপনি বিফল হলে। তাই নিয়ে ঐভাবে মনমরা না হয়ে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন কি?

২০। আপনার কি বেশ ভালো ঘুম হয়, এবং যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো সময়ে আপনি কি বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে নিতে পারেন?

●

প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ' জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন। ৭০ পয়েন্ট পেলে চমৎকার; ৬০ থেকে ৭০ ভালো; ৫০ থেকে ৬০ বেশ। ৫০-এর নীচে ভালো নয়।

যিনি প্রশান্ত ধীরস্থির, তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ লোক। তিনি তাঁর নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কারণ, তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপার সঠিকভাবে সঠিক পরি-স্থিতিতে যাচাই করে নিতে জানেন এবং তার ফলেই তিনি কখনো অত্যধিক উল্লসিত বা ভয়ানক মনমরা হয়ে পড়েন না।

রাশভারী হওয়া মানেই অনাবশ্যক গম্ভীর হয়ে থাকা বোঝায় না। প্রফুল্ল প্রশান্তি বজায় রেখে আপন মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।

ধীরস্থির প্রশান্ত হয়ে থাকার পথে একটি প্রধান অন্তরায় হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং দুর্বলতাবোধ। এর ফলে মন চঞ্চল হয়ে থাকে বিফলতার আশংকায়।

কিন্তু আপনি যদি বিফলতা বা সফলতা সবকিছুকেই যা ঘটবার তাই ঘটেছে বলে সহজভাবে মেনে নেওয়ার অভ্যাস করতে পারেন, তাহলে নিশ্চয়ই দেখবেন, আপনি ক্রমেই প্রশান্ত মনের অধিকারী হয়ে উঠছেন।

যতই আপনার মন প্রশান্ত হবে, যতই আপনার ভালো-মন্দ সবকিছুতেই ভরসা জাগবে, ততই আশংকা-বিচলিত অস্থিরতা কমবে। সুখে-দুঃখে সমানভাবেই মন কাজ করবে। আপনার চোখে-মুখে ফুটে উঠবে একটা গভীর প্রত্যয়ের স্নিগ্ধতা; প্রকৃত রাশভারী লোকের লক্ষণ তো তাই।

সুখলতা রাও

স্মরণে

রাতে বেতার মারফৎ খবরটা প্রচারিত হতে চমক লাগল। হ্যাঁ, বয়স হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চলে যাবেন বুঝতে পারিনি। আমরা প্রিয়জন সম্বন্ধে তাই ভেবে থাকি।

রক্তের আত্মীয়তা নয়, আত্মার আত্মীয়তা। কোন ছোটবেলা থেকে তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁকে নিজের মনের মানুষ করে নিয়েছি তার ঠিক নেই। শৈশবে যেদিন তাঁর বই হাতে পড়েছে, সেদিন থেকেই তিনি আমাদের আত্মীয়।

বড় হয়ে জেনেছি তাঁর পরিচয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিনি জ্যেষ্ঠা সন্তান, সুকুমার রায়ের তিনি সহোদরা। শৈশব কেটেছে পিঠোপিঠি এই দুটি ভাই-বোনের কত ছবি আঁকা আর খেলায়। সে সম্পর্কে অনেক হাসির গল্প তাঁর কাছে আমি শুনেছি। বিরাট ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যিক পরিবারের সন্তানটির বিবাহ হল পাত্র-সংস্থায়ই আর একটি স্বনামধন্য পরিবারে। উড়িষ্যার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক ভক্তকবি মধুসূদন রাওয়ের পুত্র ডাঃ জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে। বাংলা ও উড়িষ্যার দুই সাহিত্যিক পরিবারের মধ্যে প্রীতির গাঁটছড়া বাঁধা হল এই বিবাহে। ১৮৮৬ সালে সুখলতা দেবীর জন্ম, বিবাহ ১৯০৭ সালে, তারপর মৃত্যু এই দীর্ঘ-জীবনের উপর তার কাল যবনিকা টেনে দিল ৯ জুলাই। কিন্তু সুখলতা দেবী সাহিত্যসেবায় বিরত থাকেননি কখনও। গল্প, কবিতা, ছড়া এবং ভাল ছবি আঁকতে পারতেন তিনি। ইংরাজীতে 'বেহুলা' বলে যে বইটি লিখেছিলেন তার সব ছবিই ছিল তাঁর নিজের আঁকা। রবীন্দ্রনাথ এই বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা সোনার ময়ূর, নানান দেশের রূপকথা, ঈশপের গল্প প্রভৃতি বহু শিশুপাঠ্য পুস্তক তাঁকে শিশুমনের চিরস্থায়ী আসন করে দিয়েছে। তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তক 'নিজে শেখ' আর 'নিজে পড়'র নাম সর্বজন-পরিচিত। এই বইয়ের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। শুধু সাহিত্য নয়, সমাজসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কাইজার-ই-হিন্দ পদকও লাভ করেছিলেন।

ঠিক ক'বছর আগে মনে নেই, এই অমৃত সাপ্তাহিকের মহিলা বিভাগের জন্যই তাঁর কাছে বেশ কয়েকদিন পর পর যেতে হয়েছিল তাঁর কীড স্ট্রীটের বাসায়। ডাঃ জয়ন্ত রাও তখন বেঁচে। অসুস্থ। সেই সময় পুরানো দিনের 'গল্পের ঝুলি' তিনি কিছুটা খুলেছিলেনও। কথার ফাঁকে ফাঁকে উঠে যেতেন স্বামীর ঘরের দিকে, আবার এসে বসতেন। শুধু সাহিত্য নয়, নানা দিক সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তাঁর। বেশ চমৎকারভাবে গল্প করতেন তিনি। পুরানো দিনের কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, খেই হারিয়ে ফেলতেন। আবার মনে পড়ত, উজ্জ্বল মুখে বলতে বসতেন।

এর পরেও গেছি লেখার জন্য। বলে-ছিলেন, এদিকে সেদিকে ছড়ানো আছে কিছু। সময় করে খুঁজে রাখবার চেষ্টা করব, তুমি এসো।

নানা কারণে ঠিক তখনই লেখাটা পাইনি, কিন্তু সময় করে লেখা আনা আর হয়ে ওঠেনি। লীলা মজুমদার ঠিকই বলেছেন—'দিতে চাইতেনও, আমরাই কাজের তাগাদায় সময় করে নিইনি।'

—বিশেষ প্রতিনিধি

প্রসাধন : বিরাট পর্ব

একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একজনের কাছে শোনা। যার সার কথা কিনা, মরতে রাজি, তবু সাজগোজ ছাড়তে পারবো না। এমনি এর মাহাত্ম্য। যতদিন রূপরসগন্ধ আছে ততদিনই চাকচিক্য অম্লান রাখার জোর চেষ্টা। সেখানে কোন ত্রুটি রাখতে কেউ প্রস্তুত নয়। তাই শেষ পাফের প্রলেপ আলতোভাবে চালাতে চালাতে মনের কোণে ভাবনা জমে, সব হলো তো? এ হলো প্রসাধনের দ্বিতীয় মাহাত্ম্য। সব শেষ না হওয়ার ভাবনায় সময় নেয় অনেক। তাই গুছিয়ে সাজগোজের পরেও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সময় কেটে যায় বেশ কয়েক মুহূর্ত। ঘুরেফিরে নিজেকে দেখি। বার-বার। আশ মিটিয়ে। যখন আপনি আপনাতে বিভোর তখনই শেষ দৃষ্টিপাত। খুশি খুশি মনে হাঁফ ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াই।

কেউ কেউ আরো ভাগ্যবান। মনের মতো সাজান। অনেকক্ষণ ধরে। একসময় প্রসাধনপর্ব সমাপ্ত হয়। ডাক পড়ে আর একজনের। তার মনের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। প্রসাধনের সুরুচি তখন আরো সুরভিত। খুশির আমেজে অপরূপ রূপে যেন কথা কয়। অনেকক্ষণের সাধনা সার্টিফিকেট পেয়েছে। এ আনন্দ রাখবার জায়গা নেই। যদি এটুকু না পাওয়া যায় তবে বৃথাই খাটাখাটুনি। গুচ্ছের শিশিবোতল আর কৌটা সাজিয়ে সাজতে বসা। তাই সার্টি-ফিকেট চাই। নিজের মনের মতো সাজের সঙ্গে আর একজনের মন মিলিয়ে নেবার লোক যার নেই তিনি আশা করবেন অন্য-কিছু।

সেজেগুজে বেরিয়েছেন। আলতো পায়ে রাস্তায় চলেছেন। আনমনা। কিন্তু চোখ সতর্ক। কান খাড়া। কেউ ওর দিকে হয়তো পরিপূর্ণ নয়নে তাকালেন। তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। অনেকখানি অবজ্ঞার ভাব। কিন্তু সেই পথচারীর মুখের মৃদু হাসিটি তার নজর এড়ায়নি। আর তখনই তিনি পরিপূর্ণ। সন্তোষ এবার উপচে পড়ে। রূপচর্চা সার্টিফিকেটই হলো আসল। কেউ যদি না তাকায়, মন খুলে প্রশংসা না করে, তাহলে অত করে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় খুইয়ে সেজেগুজে কি সার্থকতা হলো! সে আকাঙ্ক্ষাটুকু মিটে গেলে রূপগর্বিতা প্রসাধিতা নারীকে আর পায় কে। ফুরফুরে হাওয়ায় তিনি প্রজাপতির মতো ডানা মেলে দেন। কোন ক্ষোভ নয়, বেদনা নয়, কেবল আনন্দ। সেই আনন্দে তিনি নিজে মাতেন, আরো দশজনকে মাতান।

'লেডিজ স্পেশ্যালে'র সেই ভদ্রমহিলার সঘন দীর্ঘশ্বাস বড় করুণ। এমনিতেই তিনি একটু বেশি সাজগোজ করেন। শখ বেশ স্পষ্ট। কিন্তু পরিমাণ জানেন না। তাই পুরু প্রসাধনেও তিনি বেমানান। একদিন মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেই ফেললেন, এত যে সাজগোজ করি কেউ ফিরেও তাকায় না। তার কথায় হাসির খোরাক। আশে-পাশের মেয়েরা হেসে কুটিপাটি। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। তিনি হাসিতে যোগ দেন। অনেক দুঃখে যে কথাটা বললেন তার মর্মার্থ কেউ নিতে পারেনি। একজনই তিনিও হাসছেন। তার হাসির মাত্রাটা সকলের চেয়ে বেশিও বটে।

প্রসাধনে মাত্রাজ্ঞানই সারাৎসার। এ বোধ যার আছে তিনি বাজিমাৎ করলেন। আর যার সাতে হয় না তার সতেরো ছেড়ে

সাতাশেও হয় না। তাকে এমনি আক্ষেপ করে যেতে হয়। অথচ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের পাল্লাটা তার দিকেই বেশি ভারি। আবার পরিমিতিবোধ সেই মেয়েটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কত সুন্দর মনে হয়েছিল মেয়েটিকে। একটু খুটিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। কাছে যাই। না, বেশ বড় রকমের খুঁৎ আছে চেহারায়। কিন্তু সব ছাপিয়ে গেছে। সহসা ধরাই যায় না। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। জেনে নিতে রূপচর্চার গোপন তথ্য। দু' এক কথার পর এ প্রসঙ্গে আসতেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। কথা অন্য খাতে বইলো। সবকথা জানাতে তিনি রাজী কিন্তু এ প্রসঙ্গে নয়। রূপচর্চার প্যান্ডোরা বক্সের চাবিকাঠির সন্ধান কাউকে দিতে নারাজ। শুধু ছোট্ট হেসে বললেন, মাত্রাজ্ঞান। ভদ্রমহিলার হাসিতেও সে কথাই স্পষ্ট।

গাদা গাদা প্রসাধনে বাজার ছেয়ে গেছে। রূপবতীদের সাজাতে রূপকারদেরও ব্যস্ততার সীমা নেই। তাই প্রসাধনে প্রসাধনে ছয়লাপ। রূপচর্চার টেবিলে প্রসাধন-সামগ্রীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে। উপকরণের ভীড়ে মাথা ঘুরে যায়। কোনটা ফেলে কোনটা রাখি। পরস্পরে আলাপ-আলোচনা চলে। প্রসাধন ঠিক হয়। কয়েকজন মিলেমিশে একই জিনিষ কেনে, তাতেই সাজে। তবু ওরা বিভিন্ন। শেষ টানে সবাই জাদু সৃষ্টির চেষ্টা করে। আর এখানেই একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ। বলে বটে, শেষ টানেই তফাৎ। আসলে কিন্তু তা নয়। তফাৎ শুরু হয় গোড়া থেকেই। আর তাই গিয়ে দাঁড়ায় শেষ টানে। অর্থাৎ রূপচর্চার প্রকার চিন্তায় একজনের সঙ্গে অন্যজনের আকাশ-পাতাল তফাৎ। ব্যাকরণে ব্যাকরণে গুরুতর প্রভেদ। এই স্বাতন্ত্র্যের স্বাদটুকুই আসল। এ না থাকলে সব নীরস হয়ে যেতো। পাখির গান, ফুলের বাসনাই, নদীর কলতান সব অর্থহীন হতে বাধ্য। এজন্যই স্বাতন্ত্র্য। একজনের সঙ্গে আরেকজনের মেলে না। জনে জনে এবং বহুজনে তফাৎ তাই বিস্তর।

আমরা প্রসাধিত হই। অঙ্গরাগ। পরিমার্জনা। ঘষামাজা করে ধোয়ামোছা। 'বেস ওয়ার্ক' করতে করতেই সময় নেয় বিস্তর। বাড়ির যেমন ভিৎ প্রসাধনে তেমনি বেস ওয়ার্ক। এখানে কাজ কাঁচা হলে সবকিছু কেঁচে যাবে। শত অলঙ্করণেও তাকে দাঁড় করানো যাবে না। সর্বশেষ পরিণতি, পপাত ধরণীতলে। তাই সবকিছুর আগে এদিকে নজর দিতে হবে। অনেক সময় নিক ক্ষতি নেই। তবু কাজটা গুছিয়ে করতে হবে। তারপর চলবে রূপচর্চা। এখানে যিনি নিখুঁত রূপচর্চায় তিনি পরিপাটি। তার অঙ্গরাগে সবাই মুগ্ধ হবেন। সেই সুবাসে ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করবেন। ঈপ্সিত সার্টিফিকেটও ছড়াছড়ি যাবে।

প্রসাধনে আমরা অতীত ধারা বজায় রেখে চলেছি। প্রসাধন সামগ্রীতে নয়, প্রসাধনের মৌল রূপে। সেদিন রূপবতী সায়রে গা ডুবিয়ে যখন উঠতো তার যৌবনভার অপেক্ষা করতো প্রসাধনের। দীর্ঘ কেশভার এলিয়ে সে বসতো। ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকুতো। সুগন্ধে মেঘবরণ কেশ আমোদিত। তারপর অগুরু, চন্দনে অঙ্গরাগ। কুসুমে কুসুমে পরিচর্যা সমাপ্ত। সেদিন পোষাক ছিল স্বল্প তাই প্রসাধন এতো দীর্ঘ। অবশ্য তালিকায় নয়। স্বল্প প্রসাধনেই দেহ জুড়ে অপরূপ লাবণ্য। এরপর রূপগর্বে ডগমগ সে বসতো কুসুমিত উদ্যানে অথবা তরু-শোভিত মর্মর আসনে। সেখানে বসে প্রত্যক্ষ করতো অস্তগামী সূর্যের রঙের খেলা। বাহারে বাহারে পশ্চিম দিগন্তের উল্লাস। কাজলটানা দু'চোখ তার বেদনার ঝনাৎকার। প্রিয়মিলনের আকাঙ্ক্ষা। প্রসাধনে আমরা সেই ঐতিহ্যই বয়ে নিয়ে চলেছি। সেদিনের সঙ্গে আজকের প্রকারভেদ অনেক। কিন্তু মৌল তফাৎ নেই। সেখানে অতীত এবং বর্তমান একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যা কিছু হচ্ছে তা শুধু ডেভেলপমেন্ট। পেছনের কোন ব্যাপার নেই। শুধুই এগিয়ে যাওয়া। তাই সাজতেসুজতে এ সময়। বেস ওয়ার্কের পর পাউডার, স্নো রুজ, সুর্মা, লিপস্টিক। ভুরু আঁকা, আই শেড। সর্বশেষ আবার পাউডার-পাফ প্রসাধন শেষ। হাত-পা ছড়িয়ে টান টান হয়ে এবার দুচোখ মেলে দেখে নেওয়া। পরি তৃপ্তির শ্বাস। এবার বেরুনোর পালা নিজের সুবাসে নিজে আমোদিত। আরে অনেকের মাতোয়ারা হবার পালা। সেই ভদ্রমহিলার আক্ষেপ। এত সাজের পরও কেউ যদি ফিরে না তাকায়। ফিরে তাকালেই সার্থক। নাহলেই ফক্কা।

সারাদিন ঘামে প্যাচপেচে। তাই বিকেলের দিকে একটু ধাতস্থ হতে না পারলে নিজেরই খারাপ লাগে। বয়স অনু-যায়ী সকলকেই একটু গুছিয়ে নিতে হয় এটা চিরকেলে রীতি। এটা স্বাভাবিক কোথাও যাওয়ার প্রশ্ন উঠলেই একটু ভাল করে নিজেকে সাজানোর প্রশ্ন আগে

—প্রমীল

রূপসজ্জায় চিত্রাভিনেত্রী নন্দিতা বসু।
ফটো : অমৃত

কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে বাসুদেব দাস ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই অবধি তাঁর জল ও তেলরঙের কুড়িখানি ছবির যে প্রদর্শনী করলেন তাতে কয়েকটি বিভিন্ন স্টাইলের কাজ থাকলেও তাঁর নিজস্ব স্টাইলের চেহারাটা খুব স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিয়েছিল এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

শ্রীদাসের জলরঙের ছবির মধ্যে ভিজে কাগজের ওপর কাজ করার ঝোকটাই বেশী। কিন্তু তাতে টোনের বৈচিত্র্য আনার চাইতে কতকটা একঘেয়েমির ভাবটাই বেশী করে চোখে পড়ে—বিশেষ করে তাঁর হলুদ ও সবুজের ব্যবহার। তবু এর মধ্যে তাঁর 'বুল' ও 'গোট' নং ১ (৭) ছবি দুটি চোখে পড়ার মত।

তেল রঙের কাজের ভেতর ফিগারের কাজগুলি কতকটা শান্তিনিকেতন শৈলীর নিম্নস্তরের ছবির অনুরূপ—যেমন তাঁর "দি ফ্রেশ অ্যান্ড দি লাস্ট" বা "স্টাডি" ছবির মধ্যে এই চেহারাটা পরিস্ফুট। তবে তাঁর ঘাটশীলার সুবর্ণরেখার তিন চারটি স্টাডির মধ্যে কিছুটা মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। ছাগলের ফর্ম নিয়ে কয়েকটি এক্সপেরিমেন্টাল ছবির মধ্যে পরিণতির লক্ষণ বিশেষ পরিস্ফুট নয়।

●

সরকারী কলাবিদ্যালয় থেকে অল্পদিন হল পাশ করে শিবপ্রসাদ করচৌধুরী আকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তাঁর একক প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। ৩ থেকে ৯ জুলাই ধরে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে শিল্পী ২১ খানি ড্রইং ও পেন্টিং উপস্থিত করেন। শ্রীকরচৌধুরী একনিষ্ঠভাবে নন-ফিগারেটিভ রীতির চর্চা করেছেন। তাঁর পেন্টিং-এর মধ্যে কতকটা ক্যালিগ্রাফি ও কতকটা জ্যাকসন পোলক মার্কা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের আমেজ প্রকট। তাই ছবির পরিচয় নম্বরে পর্যবসিত।

কয়েকটি পেন্টিং-এ এক একটি রঙের জমির ওপর বিভিন্ন বর্ণের রেখার সঞ্চালন দেখা গেল। ছবির ফ্রেমের কাজের জমিটুকু ছেড়ে এই ধরনের কাজ অনেকসময় আধুনিক টেক্সটাইল প্রিন্টের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রঙের হার্মনির দিক দিয়ে ৭, ৮, ১২ প্রভৃতি ছবিগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ৭ খানি নাতিবৃহৎ পেন্টিং ছাড়া বাকি ছবিগুলি সবই ড্রয়িং। এখানে ক্যালিগ্রাফিক ফর্ম আরো স্পষ্ট। শুধু বিভিন্ন ধরনের রেখা বা কালির ছোপ দিয়ে কয়েকটি বেশ স্মার্ট ডিজাইন সৃষ্টি করেছেন শিল্পী। দু' একটি ক্ষেত্রে রেখা ও একরঙের ওয়াশের সঙ্গে সামান্য একটু মূর্তির আভাস এনে একঘেয়েমি ভাঙার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রেখা ও ডিজাইনের নিছক স্মার্টনেসের মধ্যে কেমন একটা কমার্শিয়াল কাজের আমেজ যেন বড় বেশীরকম পরিস্ফুট হয়ে পড়েছে। ড্রয়িং-এর মধ্যেও তাঁর চারদিকে সাদা মার্জিন ছেড়ে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সব মিলিয়ে কোথায় যেন একটা ভিস্যুয়ালাইজারের লে-আউট তৈরীর গন্ধ সারা প্রদর্শনীতে ছড়িয়ে আছে বলে মনে হল।

●

স্বাধীনতালাভের পর থেকে আমাদের দেশের লোকশিল্পের বৈচিত্র্য ও বৈভবের দিকে স্বদেশ ও বিদেশের লোকের দৃষ্টি একটু বেশীভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মুষ্টিমেয় যে কজন এই লোকশিল্পের ঐশ্বর্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে সচেতন করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন এবং গুরুসদয় দত্তের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। ঠাকুর-বাড়িতে বাংলার লোকশিল্পের সমাদর অনেকটা তাঁরই আগ্রহে প্রচলিত হয়েছিল এবং অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ লোক-শিল্পের সংগ্রহে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ত্রিপুরার রাজবাড়ি ও আশুতোষ মিউ-জিয়ামে রক্ষিত আছে এবং গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহ গুরুসদয় মিউজিয়ামে। এখন মেদিনীপুর শহরে বাংলার লোকশিল্প ও গৃহস্থালীর একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রাঙ্গনে সংগ্রহশালা স্থাপনের ব্যবস্থা হচ্ছে। দীনেশচন্দ্রের স্মরণে এটিকে দীনেশচন্দ্র লোকশিল্প সংগ্রহশালা নাম দেওয়া হয়েছে। কাঁসাইয়ের অববাহিকায় বিরাট একটি বাংলাদেশের খড়ের চালার অনুরূপ গৃহে এই সংগ্রহশালা তৈরী হবে। এখানে ঘাটাল, দাসপুর, দশগ্রাম, মুগদা, চন্দনপুর ইত্যাদি গ্রামগুলির পিতলের বাসন ও মূর্তি, নাড়াজোলের চিত্রিত মাটির পাত্র আর পুতুল, সবং-এর পট, মাদুর, রামগড় রাজবাড়ির পুঁথির পাটা, বিনয়পুরের খাদ, পটুয়ার আঁকা পট, গোপীবল্লভপুরের গোঁসাইবাড়ির অপূর্ব কাঠের কাজ, দাঁতনের গালার পুতুল, বেলপাহাড়ী ও কাঁসী-ডাঙ্গার পাথর ও লোহার বাসন, লোহাদার পোড়ামাটির কাজ ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা হবে। ছবি ও মডেলের সাহায্যে চকমন

মেদিনীপুর জেলার আমদাবাদ গ্রামের কৃষ্ণলীলা পট।

করের গ্রামজীবনের আলেখ্য দেখানো হবে। এছাড়া দীনেশচন্দ্রের পুস্তকাবলী ও তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্রও এখানে সংরক্ষণ করা হবে। শিল্পী ও মিউজিয়ামবিশেষজ্ঞ শ্রীসুধাংশুকুমার রায় এই মিউজিয়ামের পরিকল্পনা করেছেন এবং জেলার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ দিয়ে এই সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

●

প্রায় বছরখানেক আগে ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি একটি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করবার চেষ্টা করেন। তাঁরা আশা করেন আগামী নভেম্বর নাগাদ একটি লিওনার্দো উৎসব আয়োজন করতে পারবেন। তবে তার আগেই লিওনার্দোর পঞ্চশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৫২ সালে ইউনেস্কো যে প্রিন্ট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন সেগুলি পাওয়ার ফলে তাঁরা ৯ থেকে ১৮ জুলাই চৌরঙ্গীর শিল্পবিদ্যালয় ভবনে একটি লিওনার্দোর ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী করলেন।

প্রদর্শনীতে প্রায় আশিটির মত ছোট ও মাঝারি উচ্চাঙ্গের প্রিন্ট দেখানো হয়েছে। লিওনার্দোর গোড়ার দিকের ছবি থেকে শেষদিকের কাজ পর্যন্ত সবেরই কিছু কিছু নমুনা রয়েছে। মুদ্রিত পুস্তক মারফৎ এর প্রায় সবগুলিই শিল্পানু-রাগীদের সুপরিচিত। এই ছবিগুলির প্রিন্টের অধিকাংশই বিলেতের ট্রাস্টিদের

শিল্পী : শিবপ্রসাদ কর চৌধুরী।

ব্রাসেলের রাজকীয় সংগ্রহশালা থেকে নেওয়া। লিওনার্দোর ফ্লোরেন্স, মিলান ও রোমে বসবাসের সময়কার অনেকগুলি ড্রয়িং ও ছোট ছোট স্কেচ এখানে দেখানো হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ড্রয়িং-এর মধ্যে দ্বিতীয়বার ফ্লোরেন্স বাসের সময়কার অ্যাঙ্গিয়ারীর যুদ্ধে কতকগুলি অপূর্ব স্টাডি, মিলানে থাকার সময়কার শেষ ভোজন চিত্রের কতকগুলি চমৎকার স্টাডি এবং ভার্জিন ও সেণ্ট অ্যান ছবির স্টাডিগুলি বহু প্রদর্শিত হলেও পুরাতন হয় না। তবে রয়্যাল অ্যাকাডেমির ডিপ্লোমা গ্যালারীর বিখ্যাত কার্টুনটির কোন প্রতিলিপি দেখা গেল না। বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধানী লিওনার্দোর অনেকগুলি যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধাস্ত্রের স্কেচ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় আঁকা গাছ ও ফুলের স্টাডি এবং মানুষের অ্যানাটমির অনেকগুলি ড্রয়িং এখানে রাখা হয়েছে। তাছাড়া তাঁর আবাল্য অনুসন্ধানের অন্যতম বস্তু জল, জলস্রোত ও বন্যার অনেকগুলি ছবি রাখা হয়। তাঁর শেষজীবনের অন্যতম বিখ্যাত ড্রয়িং মহাপ্রলয়ের অনেকগুলি বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা দেখা গেল। কিন্তু তাঁর ব্যোমযান সংক্রান্ত অনুসন্ধানের কোন ছবিই রাখা হয়নি।

মহৎ শিল্পী যখন কোন শিল্পকর্মে হাত দেন তখন তার নেপথ্য প্রস্তুতিটা হয় অনেকখানি। আর লিওনার্দোর মত বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি যখন এ কাজে নামেন তাঁর প্রস্তুতির ব্যাপকতা কতখানি হয় তার কিছু পরিচয় এই ছোট প্রদর্শনীতেই পাওয়া যায়। তাঁর অনেক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূলে আছে এই চিত্রনির্মাণের প্রস্তুতি। যেমন গর্ভস্থ ভ্রূণ, উদ্ভিদজীবন, জলের ধারা ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তিনি কেবলমাত্র "লেডা অ্যান্ড দি সোয়ান" ছবি আঁকার জন্যে। ঘোড়ার পেশী সংস্থান নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হয় তাঁর অসম্পূর্ণ "অ্যাডোরেশন অব দি কিংস" এবং দুটি অশ্বারোহী মূর্তির ভাস্কর্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যেতে তাঁর মত অনুসন্ধিৎসু মনের বেশী সময় লাগতো না তাই তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ফলে মূল কাজটিই অসম্পূর্ণ থাকতো, তাই তাঁর অঙ্কিত চিত্রের সংখ্যা এতো কম কিন্তু ড্রয়িং ও স্কেচ এবং নোটবুকের পাতা এতো বেশী।

●

গত ৬ই জুলাই ৮৬ বছর বয়সে বোস্টন শহরে ওয়াল্টার গ্রোপিয়াসের মৃত্যু হল। বর্তমান শতাব্দীর সুরুতে যন্ত্রশিল্পের প্রভাবে প্রাচীনপন্থী শিল্পীরা যখন শিল্পের ভবিষ্যৎরূপ কি হবে তাই নিয়ে চিন্তিত এবং নবীনপন্থীরা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা চিন্তা করছিলেন তখন গ্রোপিয়াস চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও জীবনযাপনের সমগ্র উপাদানগুলির নতুন রূপসৃষ্টির উদ্দেশ্যে জার্মানীতে যে বাউহাউস আন্দোলন সৃষ্টি করেন তার ফল আধুনিক বাস্তুবিদ্য ও শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

১৮৮৩ খৃস্টাব্দে বার্লিনের এক শিল্পী-পরিবারে ওয়াল্টার গ্রোপিয়াসের জন্ম হয়। স্থাপত্যবিদ্যা অধ্যয়নের পর তিনি নিজেই স্থপতির অফিস খুলে বসেন। এই সময়ে তিনি বাড়ির ডিজাইন ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের নতুন ধরনের আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার উপকরণ ইত্যাদির ডিজাইনও সৃষ্টি করেন। ক্রমে তাঁর ধারণা হয় যে যন্ত্রশিল্পকে বাদ দিয়ে স্থাপত্য-শিল্প সম্ভব হবে না। স্থপতিকেও বৈজ্ঞানিক এঞ্জিনীয়ার ও নির্মাতার অংশ গ্রহণ করতে হবে। ১৯০৯ সালেই তিনি প্রি-ফেব্রিকেটেড হাউস তৈরী করেন এবং তাঁর ১৯১৪ সালের সৃষ্টি হ্যালেন্ডারের ফাগুস ফ্যাক্টরীর বাড়ি আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের গোড়ার যুগের একটি বিখ্যাত নিদর্শন। এখানেই তিনি স্টীল, কংক্রীট, কাচ ইত্যাদির সাহায্যে আধুনিক রুচি-সম্মত নতুন ধরনের বৃহৎ কারখানা সৃষ্টি করেন। ১৯১৯ সালে তিনি প্রথম বাউহাউস শিল্প বিদ্যালয় পত্তন করেন। এটি ১৯২৫এ ডেসাউএ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি কোন সাধারণ শিল্পবিদ্যালয় ছিল না—এটি ছিল যাকে বলে একটি শিল্প-আন্দোলন। এখানে শিল্পী স্থপতি ভাস্কর ইত্যাদি সকলে একত্রে কাজ করতেন ও নিত্যব্যবহার্য বস্তুগুলির নতুন রূপদানের চেষ্টা করতেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের সৃষ্টিও এখান থেকে হয়। এখানে একদা ক্লে, কান্দিনস্কী, ফাইনিঙ্গার প্রমুখ শিল্পীরা কাজ করেছেন।

হিটলারের অভ্যুত্থানের পর বাউহাউস তুলে দেওয়া হয় এবং গ্রোপিয়াসকে প্রথমে ইংলন্ডে পরে আমেরিকায় চলে যেতে হয়। ১৯৩৬এ তিনি হার্ভার্ডে যোগ দেন এবং পরবর্তী বেশ কয়েক বৎসর সেখানকার স্থাপত্য বিভাগের প্রভূত উন্নতিসাধ[ন] করেন। শেষজীবনে নানা প্রতিষ্ঠান থে[কে] বহু উপাধি তিনি লাভ করেন এব[ং] হার্ভার্ড থেকে তাঁকে অনারারি ডঃ অ[ফ] আর্টস উপাধি দেওয়া হয়। বর্তমা[ন] স্থাপত্যের দ্রষ্টা ও শিক্ষাদাতা হিসে[বে] আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে গ্রোপিয়া[স] একটি অনন্যস্থান অধিকার করে আছেন

●

গত ৪ থেকে ১০ জুন বোম্বাই[য়ের] র‍্যামপার্ট গ্যালারীতে বাংলার সমকালী[ন] তরুণ শিল্পীদের একটি ছোট চিত্র প্রদর্শন[ী] হয়ে গেল। প্রদর্শনীর আয়োজন করে[ন] শুভকৃত শিল্পশাখার পক্ষ থেকে অসি[ত] পাল ও রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রাফিক[স], ড্রয়িং ও পেণ্টিং-এর এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন সেখানকার জে জে শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীএ কে চ্যাটার্জি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীআমবেরক[র] বাংলাদেশের শিল্পীদের স্বাগত জানান এব[ং] এই প্রদর্শনীর ফলে বোম্বাই ও বাংলা[র] শিল্পীদের মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে এব[ং] পরস্পর পরস্পরকে আরো ঘনিষ্ঠভা[বে] জানতে পারবেন। প্রদর্শনী ছাড়াও এ[ই] শিল্পীগোষ্ঠী বোম্বায়ের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় শিল্পীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠি[ত] আলোচনাসভায় যোগ দেন। প্রদর্শনীতে বাংলার যে সব শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে[ন] তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী সুনীল দা[স], গণেশ পাইন, প্রকাশ কর্মকার, বিকা[শ] ভট্টাচার্য (এঁর ছবি বোম্বায়ে উচ্চপ্রশংসি[ত] হয়েছে) সনৎ কর, সুহাস রায়, অমরেন্দ্রলা[ল] চৌধুরী, শ্যামল বোস, মনু পারেখ, [ম]... রাঠোর, তপন ঘোষ, অমিতাভ সেনগুপ্ত, বিজন চৌধুরী, লালুপ্রসাদ সাউ, অমলনা[থ] চাকলাদার, লিপিকা গুপ্ত, আলো[ক] চৌধুরী, রতন ব্যানার্জি ও অসিত পাল।

—চিত্রর[সিক]

আজকাল প্রায় সমস্ত কাগজেই চিঠিপত্র বিভাগ বলে একটা বিভাগ থাকে। এই বিভাগে পাঠকদের চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। রেডিওতেও একটা চিঠিপত্র বিভাগ আছে। শ্রোতাদের চিঠিপত্রের বিভাগ। কাগজের চিঠিপত্র বিভাগ আর রেডিওর চিঠিপত্র বিভাগে একটু পার্থক্য আছে। কাগজের পত্র-লেখকরা চান, তাঁদের চিঠিটা শুধু ছাপা হবে, আর কিছু না। তাঁরা কাগজের তরফ থেকে তাঁদের চিঠির কোনো উত্তর চান না। কিন্তু রেডিওর পত্র-লেখকরা তাঁদের চিঠির উত্তর চান রেডিওর কাছে। তাই রেডিওর চিঠিপত্র বিভাগ শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তরের আসর। তার নাম "সবিনয় নিবেদন"।

কাগজের চিঠিপত্র আর রেডিওর চিঠিপত্রে আরও একটা বড়ো পার্থক্য আছে। কাগজে যে-কোনো বিষয়ে চিঠি লেখা যায়, ঐ কাগজ সম্পর্কে না হলেও চলে। কিন্তু রেডিওর চিঠিপত্র লিখতে হয় রেডিও সম্পর্কেই—রেডিওর নানারকম সমালোচনা, প্রশংসা, নিন্দা, সুপারিশ, প্রস্তাব, মন্তব্য ইত্যাদি সবই রেডিও নিয়ে।

বড়ো বড়ো কাগজে প্রতিদিন এত চিঠি আসে যে, তার সবগুলো ছাপার কথা কল্পনাও করা যায় না। কারণ, স্থানাভাব। তবে দৈনিক পত্রিকাগুলির একটা সুবিধা আছে—প্রতিদিনই পাঁচ-সাত-দশটা করে চিঠি ছেপে অপেক্ষাকৃত অধিক পত্র-লেখককে খুশি করা যায়। সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকাগুলির সে-সুবিধা নেই।

রেডিওর সবিনয় নিবেদনের আসরে শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া হয় সপ্তাহে মাত্র একদিন, পনের মিনিট—ঠিক পনের মিনিটও নয়, ঘোষণা ইত্যাদির জন্য কিছু সময় বাদ দিয়ে হাতে সাড়ে চোদ্দ মিনিট-মতো থাকে। অথচ রেডিওয় প্রতিদিন গাদা-গাদা চিঠি আসে, এবং প্রায় সকলেই চিঠির উত্তর আশা করেন।

কাগজে স্থানাভাব ও রেডিওয় সময়াভাবের কারণে বহু চিঠিই বাতিল হয়ে যায়। যাঁদের চিঠি বাতিল হয়, তাঁরা যে খুশি হন না, সে-কথা না বললেও চলে। কিন্তু সকলকে তো খুশি করা সম্ভব নয়।

কাগজে ও রেডিওয় যাঁরা চিঠি লেখেন, তাঁদের একটা বড়ো অংশ নিজেদের নাম ছাপার অক্ষরে দেখার ও দেখানোর এবং বাতাসে শোনার ও শোনানোর জন্য লেখেন। তাঁদের চিঠিতে সারবস্তু বিশেষ থাকে না, চিঠির বিষয়বস্তু মোটেই চিন্তার উদ্রেক করে না। বলা বাহুল্য, এইরকম বহু চিঠি স্বাভাবিক কারণেই বাতিল হয়ে যায়।

কিছু চিঠি আসে যেগুলোর ভিতরে যেমন সারবস্তু থাকে, তেমনি তা চিন্তার উদ্রেক করে। এই চিঠিগুলো থেকেই সম্পাদককে বাছাই করে নিতে হয় এবং স্থানাভাব ও সময়াভাবের কথা স্মরণ রেখে এই বাছাই সব সময় খুব সহজ হয় না। ফলে প্রকাশযোগ্য বা প্রচারযোগ্য অনেক চিঠিই বাদ পড়ে যায়। তবে সর্বাধিক সংখ্যায় এই জাতীয় চিঠি নির্বাচনের জন্য চেষ্টা থাকে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কলকাতা বেতারকেন্দ্রে এই চেষ্টাটা তেমন লক্ষিত হয় না। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সবিনয় নিবেদনের আসরের পত্র-লেখকদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা, রেডিওর প্রশস্তি না থাকলে সে-চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না, এবং যদি কেউ রেডিওর সমালোচনা করে চিঠি দেন ও রেডিও কর্তৃপক্ষ সেই সমালোচনার কিছু কৈফিয়ৎ দিতে পারেন, তবে মধ্যে-মধ্যে সেই চিঠিরও উত্তর দেওয়া হয়। যদি কৈফিয়ৎ না থাকে, তাহলে চিঠি প্রায়শঃই চাপা পড়ে যায়।

এই ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক নয়, তা দিনকয়েক অভিনিবেশসহকারে সবিনয় নিবেদনের আসর শুনলেই বোঝা যায়। সবিনয় নিবেদনের আসরে যতগুলি চিঠির উত্তর দেওয়া হয়, তার একটা বৃহৎ অংশ প্রশস্তিপত্রের উত্তর। তার পরের অংশ কিঞ্চিৎ সমালোচনামূলক পত্রের বিস্তৃত কৈফিয়ৎ এবং তাতে সমালোচনা নস্যাৎ করার প্রয়াস। কৈফিয়ৎ নেই এমন সমালোচনামূলক চিঠিও নিশ্চয় অধিক সংখ্যায় রেডিও দপ্তরে যায় (কাগজে রেডিও সমালোচনা বিভাগে এমন চিঠির সংখ্যাই অধিক), কিন্তু সবিনয় নিবেদনের উত্তরে এই রকম চিঠির সংখ্যা খুবই নগণ্য। এই রকম চিঠির উত্তর একেবারে বাদ দেওয়া উচিত নয় ভেবেই হয়তো মাঝে মাঝে দু-একখানার জবাব দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলোকে সঠিক জবাব বলা চলে না কোনোমতে। এই রকম সব চিঠির উত্তরে প্রায়শঃই পত্র-লেখককে বলা হয় : 'আপনার কথা আমাদের মনে থাকবে' কিংবা 'এ-বিষয়ে আমরা ভেবে দেখব' অথবা এই রকম কিছু।

আর যখন কৈফিয়ৎ দেওয়া শুরু হয়, তখন সময়ের হিসাব থাকে না, সেই কৈফিয়ৎ কতখানি বাস্তব আর কতখানি অবাস্তব তা চিন্তা করে দেখা হয় না। অনাবশ্যক অনেক জ্ঞানও দেওয়া হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু অবাস্তর কৈফিয়ৎ আর জ্ঞান শোনার জন্য কেউ এই বিভাগে চিঠি লেখেন না নিশ্চয়!

২২শে জুন রাত ৮টায় সবিনয় নিবেদনের আসরে প্রথম চিঠিখানির উত্তর দেওয়া হল প্রায় সাড়ে নয় মিনিট ধরে। রেডিওয় সাড়ে নয় মিনিটে পৃথিবী জয় করে ফেলা যায়। অত্যন্ত দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রেডিওয় যেসব 'টক' হয়, তাতেও সাধারণত সাড়ে নয় মিনিটের বেশি সময় দেওয়া হয় না।

এদিন এই সাড়ে নয় মিনিটের উত্তরে বা কৈফিয়তে উত্তর-দাতা এক সময় বললেন, 'শ্রোতাদের ভালো করে বোঝানোর জন্য বেশি বলতে হয়।' কিন্তু রেডিওর লোকেরা কি শ্রোতাদের স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র পেয়েছেন যে, এক কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বার বার করে না বললে তাঁরা বুঝতে পারবেন না? শ্রোতাদের বোধশক্তি সম্বন্ধে তাঁদের এমন সন্দিহান হবার হেতু কী? শ্রোতাদের বোধশক্তি সম্বন্ধে এমন নিচু ধারণা প্রকাশ করার অধিকার তাঁদের কে দিয়েছে?

এদিন পনের মিনিটের আসরে মাত্র সাতখানি চিঠির উত্তর দেওয়া হয়েছে। (সাধারণত সাত-আট-নয়-দশখানা মতো চিঠিরই উত্তর দেওয়া হয়।) যথাযথভাবে 'টু দি পয়েন্ট' সঠিক উত্তর দিলে নিশ্চয় পনের মিনিটে এর আড়াই গুণ কিংবা তিন গুণ চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব। গড়পড়তা একখানা চিঠির উত্তরে পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডের বেশি লাগা উচিত নয়। পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড রেডিওয় বড়ো কম সময় নয়। কোনো কোনো চিঠির উত্তরে যেমন এক মিনিট-দেড় মিনিটও লাগতে পারে, তেমনি অনেক চিঠির উত্তর বিশ-তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে উত্তর 'প্রেসি' করার দরকার হয়। এবং এ-সম্বন্ধে উত্তরদাতার জ্ঞান থাকা দরকার।

বর্তমানে যিনি চিঠিপত্রের উত্তর দেন, তাঁর উত্তর দেবার গতি অত্যন্ত মন্থর, ভঙ্গি একঘেয়ে, ভাব নীরস—স্বরে ওঠানামা নেই। চিঠি লেখা যেমন একটা আর্ট, উত্তর দেওয়াও তেমনি একটা আর্ট। রেডিওর উত্তরদাতার এই আর্ট বেশি করে আয়ত্ত করা দরকার।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৮ই জুন রাত্র ৮টা ৪৫ মিনিটে 'গান্ধী-জীবন ও দর্শনের বিভিন্ন দিক' এই পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করলেন শ্রীমতী করুণাকণা গুপ্ত, ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমনকুমার সেন। আলোচনাটা স্পষ্ট, মনোজ্ঞ। কিন্তু যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল, অসমাপ্ত রয়ে গেল। আরও কিছু যেন বলার ছিল, সময়াভাবে যেন বলা হল না। কিন্তু সময়টা তো পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। তাহলে?

২১শে জুন সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে 'অস্পৃশ্যতা ও স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে বললেন স্বামী অক্ষজানন্দ। ভাষা সুন্দর, গম্ভীর, মর্যাদাসম্পন্ন। বলার ভঙ্গিও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। কথিকাটি যেমন চিন্তাপূর্ণ, তেমনি শ্রুতিমধুর। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বহুকাল থেকে আমাদের দেশে আন্দোলন হচ্ছে, কিন্তু আজও এ-পাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়নি। এখনও অস্পৃশ্যতার কবলে অনেক নিষ্কলুষ নিরপরাধ হতভাগ্যকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠ নতুন করে, বার বার করে শোনানো দরকার। কিন্তু সরকারী প্রচারযন্ত্রে এ-বিষয়ে একমাত্র গান্ধীজীর কণ্ঠই শোনা যায়—তাঁর কথা, তাঁর বাণী, তাঁর আচরণ। দিল্লীর হিন্দী-ওয়ালাদের কাছে স্বামীজী বোধহয় কেউই নন। তাই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় আন্দোলনে স্বামীজী থাকেন অনুল্লেখিত। কলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ কি এ-বিষয়ে কিছু করতে পারেন না?

২২শে জুন বিকেল সাড়ে ৫টায় গল্প-দাদুর আসরে 'উত্তরায়ণের ঘরোয়া কথা' বললেন শ্রীনন্দী দত্ত।...সত্যিই ছোটো ছোটো ঘরোয়া কথা। শুনতে বেশ ভালো লাগল। তবে বক্তা যদি স্ক্রিপ্ট পড়ার ভঙ্গিটা পরিহার করতে পারতেন, আর একঘেয়ে ভাবটা কাটাতে পারতেন, তাহলে আরও ভালো লাগত।

এই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় 'শ্রীভবনে' তরজা শোনালেন শ্রীগোপালচন্দ্র নস্কর ও তাঁর 'সঙ্গীসাথীরা'। এত অল্প সময়ের মধ্যে তরজা ভালো জমে না। তবু শিল্পীরা চেষ্টা করছেন, এবং অনেকখানি সফলও হয়েছেন। ...এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। রেডিওর ভাষায় শ্রীভবন 'পল্লী অঞ্চলের মা-বোনেদের জন্য অনুষ্ঠান'। অর্থাৎ এটি মহিলা মহলেরই দোসর, তবে জোর পল্লী অঞ্চলের উপর। কিন্তু মহিলা-দের অনুষ্ঠানে পুরুষদের তরজা গান কতখানি মানায়? পল্লী অঞ্চলে তরজা গানের খুব কদর আছে, প্রচুর শ্রোতা আছে। পল্লী অঞ্চলের মহিলারাও তরজা গানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। কিন্তু মহিলাদের অনুষ্ঠানে মহিলাদের দ্বারা অনুষ্ঠানই তো বাঞ্ছনীয়। মহিলামহলে যেমনটি হয়ে থাকে।

২৫শে জুন রাত ৮টায় যুব গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানটির শিরোনাম ছিল— 'যুবাদৃষ্টিতে যুবগোষ্ঠী'। এই অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীরা তাঁদের আধুনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে-ছেন। তাঁরা যেমন আত্মসমীক্ষা করেছেন, তেমনি সমাজটাকেও ভালোভাবে পরখ করে দেখেছেন। এই আলোচনা থেকে বর্তমান সমাজে যুবক-যুবতীদের যেসব সমস্যা রয়েছে, সে-সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব জানা গেছে। এই জানার দরকার ছিল। দেশে একের পর এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে, তার মধ্যে যুবক-যুবতীদের কল্যাণ-সাধনের পরিকল্পনাও থাকছে।। কিন্তু যাঁদের সমস্যা, এইসব পরিকল্পনা রচনার আগে সেই সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব কী, সেটা জানা থাকলে সেই রচনার পূর্ণতা পেতে সুবিধা হয়।...এদিনকার এই যুব-গোষ্ঠীর আলোচনা পরিচালনায় শ্রীনবনী-হরণ মুখোপাধ্যায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

২৬শে জুন রাত ৮টায় 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসাও' একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। আজকের বিজ্ঞান দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার সঙ্গে তাল রাখা খুব সহজ নয়। তবু সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগে। সেই জিজ্ঞাসা মেটাবার জন্য রেডিওর 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা'র আসর। আসরটি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।...এদিনকার অনুষ্ঠানে এই জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত হল। শ্রোতারা অনেক নতুন নতুন প্রশ্ন করেছেন, কৌতূহলো-দ্দীপক প্রশ্ন। আর বেশ স্বচ্ছন্দ ভাষায় সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ডঃ বংশী-ধর হাজরা ও ডঃ অসিতকুমার সরকার। তাঁরা বেশ আন্তরিকভাবেই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব ব্যাখ্যা করে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যাঁদের বিজ্ঞানের ভিত্তি আছে কিছুটা তাঁদের কাছে স্পষ্ট তো হয়েছেই, যাঁদের নেই তাঁরাও যে কিছু কিছু বোঝেননি এমন নয়।

২৭শে জুন বেলা সওয়া ৩টেয় নজরুলগীতি গাইছিলেন শ্রীমতী সুনীতা শীল। মনে হয় নতুন শিল্পী, এখনও পরি-পক্বতা আসেনি। কিন্তু তাই বলে তাঁর শেষ গানটা শেষ না হতেই কেটে দেওয়া ঠিক হয়নি।

সম্প্রতি খবরের কাগজে আত্মহত্যার ভয়াবহ সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে একটি খবর বেরিয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বোধহয়, ২৭শে জুন রাত সওয়া ১০টায় ইংরেজী নিউজ রীলে অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব পাবলিক হেল্থ অ্যাণ্ড হাইজিনের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আত্মহত্যা বিষয়ে আকাশবাণীর প্রতিনিধির একটি আলোচনা প্রচারিত হয়েছে। আলোচনাটি খুবই সময়োপযোগী এবং দরকারী। এই আলো-চনায় আত্মহত্যার প্রধান প্রধান কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কোন্ কোন্ রাজ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি, তার একটা হিসেব দেওয়া হয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান বিচারে আত্মহত্যার দিক দিয়ে মাদ্রাজ (অধুনা তামিলনাড়ু) প্রথম স্থান অধিকার করেছে, পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। মানুষ নানা কারণে আত্মহত্যা করে, বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিশেষভাবে যদি এই কারণ-গুলো জানা যায় এবং সেগুলো দূর করার চেষ্টা হয়, তাহলে অনেক অনাবশ্যক মৃত্যু ঠেকানো যেতে পারে। রেডিও কর্তৃপক্ষ সেই কারণগুলো জানাবার চেষ্টা করে একটা সৎ কাজই করেছেন। কিন্তু এ-কাজ নিউজ রীলের স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নো-ত্তরের মধ্যে দিয়ে সমাধা না করে এ-বিষয়ে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ একটা আলোচনার ব্যবস্থা করলেই বোধহয় ভালো হত।

এই নিউজ রীলের আর একটি বিষয় ছিল বহরমপুরে নবনির্মিত টুরিস্ট লজের উদ্বোধন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান সপর্কে বহরমপুর থেকে পাঠানো আকাশবাণীর বিশেষ প্রতিনিধি শ্রী আর সি দে-র একটি রিপোর্ট এই নিউজ রীলে পড়ে শোনানো হয়েছে। লজটির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া গেছে এখানকার কয়েকটি ইণ্টারভিউ থেকে। এই প্রসঙ্গে আকাশ-বাণীর একজন ঘোষিকা পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনমন্ত্রীর নাম বললেন বরদা মুকু-মণি। ভদ্রমহিলা বাঙালী কিনা জানি না, তবে ইংরেজীতে ঘোষণা করলেও তিনি যে ইংরেজ নন, তা হলফ করে বলতে পারি, কারণ কোনো শিষ্ট ইংরেজই কায়দা দেখানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কারও নাম বিকৃত করেন না। যদি অজ্ঞানতাবশত কখনও করে ফেলেন এবং পরে ভুল বুঝতে পারেন, তাহলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

এই দিন রাত ৮টায় অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে প্রচারিত নাটক 'আপেক্ষা'। মূল ইংরেজী রচনা শ্রী আর কে নারায়ণ, বাংলা অনুবাদ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সরকার।

গোড়ায় নাটকটি শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, গান্ধীজীর জীবনের কোনো একটা দিক হয়তো এতে চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু খানিক পরে ভুল ভাঙল। দেখা গেল, গান্ধীজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের পটভূমিতে শ্রীরাম ও ভারতীর প্রেম-কাহিনী এটি। হঠাৎ অন্তরের কোন্ তাড়নায় কর্তৃ-পক্ষ এই প্রেম-কাহিনী শোনাবার প্রয়োজন অনুভব করলেন, বোঝা গেল না। আর তার জন্য গান্ধীজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন, তাঁর শ্লোগান, তাঁর বাণী, তাঁর উপদেশ প্রভৃতি এত জরুরী হল কেন, তা-ও না।

এটি কোন্ অর্থে নাটক? নাটকের কোন্ ধর্ম এতে পালিত হয়েছে?

—শ্রবণক

প্রেক্ষাগৃহ

অভিনেত্রী অপর্ণা সেন   ফটো : অমৃত

সেই চিরন্তন প্রেমকথা

চিত্ররূপ নিবেদিত, দুলালী চৌধুরী প্রযোজিত ও হীরেন নাগ পরিচালিত 'চেনা-অচেনা'র নায়িকা তামসী সেন কেন যে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল এজেন্সী নামক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সামান্য কেরাণী মানস রায়কে ভালোবেসেছিল এবং তার প্রতিপালক ধনকুবের ত্রিদিব সেনের মনোনীত ধনী সন্তান কেতাদুরস্ত অরিন্দমকে ভালোবাসতে পারে নি, তার কি কোনও কৈফিয়ত আছে, না, চাওয়া যায়? মানসের মধ্যে তামসী কি পেয়েছিল এবং অরিন্দমের মধ্যে কি পায় নি, এ প্রশ্ন নিরর্থক। প্রেম অন্ধ, এই কথাটাই আবার করে স্মরণ করা ভালো। মানস তার মানসী তামসীকে যতখানি চিনেছিল, তার চেয়ে বেশী চিনতে পারে নি; তামসী তার কাছে চেনা হয়েও অচেনা। মানস জানত তামসী তারই মতো নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, তামসী অন্তত নিজের সেই পরিচয়ই দিয়েছিল এবং আরও জানিয়েছিল, প্রৌঢ় ধনী ত্রিদিব সেনের দেখাশুনোর ভার তার ওপর তো আছেই, তা ছাড়া তাঁর নির্দেশমত তাকে অনেকটা একান্ত সচিবের (প্রাইভেট সেক্রেটারীর) কাজও করতে হয়। ভদ্রলোক তামসীর বাইরে যাওয়া একেবারেই পছন্দ করেন না; অফিস থেকেও টেলিফোনে খোঁজ নেন, সে বাড়ীতে আছে কিনা। অথচ তামসীকে প্রতি দিন বিকেলে বেরুতেই হয় গঙ্গার ধারের সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে মানসের সঙ্গে মেলবার জন্যে। মানস সময়ে সময়ে উত্যক্ত হয়ে ওঠে; জিজ্ঞেস করে— এ কেমন ধারা চাকরী? এ-চাকরী করছ কেন? চব্বিশ ঘণ্টা ধনীর দাসত্ব করতে হয় না, এমন কাজ পাওয়া তোমার মত বিদুষী মেয়ের পক্ষে কি সম্ভব নয়? তামসী বার বার একই উত্তর দেয় : তার মত নিরাশ্রয়া, অভিভাবকহীনা মেয়ের পক্ষে এই চাকরী সবচেয়ে নিরাপদ ও কাম্য; তাছাড়া ভদ্রলোক ছেলেবেলা থেকে তাকে মানুষ করেছেন, পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস তো আছে! কিন্তু যেদিন মানসের কাছে দেওয়া-কথা খেলাপ করে সুসজ্জিতা তামসী বিরাট মোটর থেকে নেমে মিঃ সেনের সঙ্গে সঙ্গীত সম্মিলনীর অধিবেশন দেখতে ঢুকল তারই চোখের সামনে, সেদিন মানসের মনে হল, ধনীর দুলালী তামসী এতদিন তার সঙ্গে ছলনা করেছে। কিন্তু এই ধারণা যে কতখানি ভ্রান্ত তা প্রমাণ করবার জন্যে তামসী শেষ পর্যন্ত কি করেছিল, তাই বিধৃত হয়েছে ছবির শেষ পর্বে।

মানস-তামসীর প্রেমের পথে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যন্ত মামুলী প্রথায় মিঃ সেন ও তাঁর নির্বাচিত অরিন্দমকে দিয়ে। কিন্তু এ-বাধা তামসীর কাছে আদৌ কার্যকর হত না এবং শেষ পর্যন্ত হয়ও নি, যদি না মানস নিজে তামসীকে ভুল বুঝত। অবশ্য এ ধরনের ভুল বোঝার ঘটনাও বাঙলা চলচ্চিত্রে নতুন নয়। তামসীর কাছে অরিন্দমের বারংবার কাকুতিমিনতি দর্শক-মনে যতখানি বিরক্তির সৃষ্টি করেছে, তার চেয়ে অস্বস্তিকর হচ্ছে বধূবেশে সজ্জিতা তামসীকে অপ্রত্যাশিতভাবে নিজের সম্মুখবর্তী দেখে মানসের আচরণ ও কথাবার্তা। তামসী সম্পর্কে মানসের মনে যতখানি ভ্রান্ত ধারণাই থাকুক না কেন, বিবাহলগ্নে নববধূর [illegible] [illegible] তামসীকে

বিবাহ বাড়ী থেকে বহু দূরে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় তারই সম্মুখে উপনীত হতে দেখে মানস যে তার প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ না হয়ে পারে না, প্রেম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই একথা স্বীকার করবেন।—এই ত্রুটি বাদ দিলে 'চেনা-অচেনা' একটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী প্রেমের ছবি হিসেবে দর্শকদের পরিতৃপ্ত করবে।

অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হচ্ছেন সুমিত্রা সান্যাল। তাঁর সুমিষ্ট বাচন, অঙ্গ ও গতি-ভঙ্গী, বিশেষ করে তাঁর ভাবপ্রকাশক চাহনি দ্বারা তিনি নির্দ্বিধায় প্রমাণিত করেছেন, বাঙলা ছবির রোমান্টিক নায়িকারূপে তিনি আদৌ উপেক্ষণীয় নন। বলতে বাধা নেই, একমাত্র তাঁর অভিনয়কুশলতা প্রত্যক্ষ করবার জন্যেই 'চেনা-অচেনা' দেখা উচিত চিত্ররসিক মাত্রেরই। নায়কের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুঅভিনয় করেছেন। অনেক দিন বাদে ধীরাজ দাসকে দেখা গেল ইউনাইটেড কমার্শিয়াল এজেন্সীর মালিক মিঃ ঘোষের ছোট্ট ভূমিকায় অত্যন্ত সুঅভিনয় করতে। অপরাপর ভূমিকায় বিকাশ রায় (ত্রিদিব সেন), ছায়া দেবী (মানসের মা), অজয় গাঙ্গুলী (অরিন্দম), ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় (মারওয়াড়ী মালিক), সুনন্দা (ফার্মের মালিক) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে আলোকচিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় নিপুণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছবির চারটি গানের মধ্যে 'ও আমার সোনা বন্ধু রে' এবং 'একই পথ যেন একটি বাঁকে এসে' গান দুটি শুধু সংগীতই নয়, অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত বলে হৃদয়কে স্পর্শ করে।

চিত্ররূপা নিবেদিত 'চেনা-অচেনা' সুমিত্রা সান্যাল অভিনয়দীপ্ত একটি ঝরঝরে প্রেমচিত্র।

ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট আয়োজিত ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব :

৩ থেকে ১০ই জুলাই (মাঝের ৭ জুলাই বাদে)—সাতদিন ধরে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে এবং ফরাসী দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কৃত্যকের সহযোগিতায় যে ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল, তাতে ছ'খানি কাহিনীচিত্র দেখানো হল। উৎসবটির উদ্বোধন উপলক্ষে ভাষণদান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী বলেছিলেন : ফরাসী জাতির সঙ্গে বাঙালীর একটি চরিত্রগত মিল আছে এবং সেটি হচ্ছে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে উভয়ের বিদ্রোহী মনোভাব কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রেই এই মনোভাব প্রকট। প্রধান বক্তা হিসেবে চিদানন্দ দাশগুপ্ত ফরাসী ছবির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : 'ন্যুভেল ভাগ' আন্দোলনের পরবর্তী বর্তমান দশকের ফরাসী ছবিগুলিকে 'সিনেমা অব ইলিউশন'-এর (মায়াজাল বিস্তারকারী চলচ্চিত্রের) বিরুদ্ধবাদী এবং 'সিনেমা অব অ্যাওয়ারনেশ' (জাগ্রত চৈতন্যের চলচ্চিত্র) আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এবং ফরাসী বাণিজ্যদূত অভ্যাগতদের জানিয়েছিলেন, সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের পক্ষে চলচ্চিত্র হচ্ছে বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকরী বাহন। তিনি আরও বলেছেন, এ-বছর অক্টোবর মাসে সরকারী-ভাবে যে ফরাসী চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হবে, তাতে থাকবে বর্তমানের ফরাসী চলচ্চিত্রজগতের যথার্থ প্রতিনিধিস্থানীয় ছবি।

যে ছ'খানি কাহিনীচিত্র এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলি হচ্ছে : (১) টেরেসা, (২) লা মিজারেবল—১ম ও ২য় খণ্ড, (৩) দি মোনাস্টারি অব পার্মা, (৪) দি ইমমর্ট্যাল (৫) ব্রেথলেস এবং (৬) ডোণ্ট টাচ্ দি মানি।

উদ্বোধন দিবসে প্রদর্শিত ছবি জর্জেস ফ্রাঁজু পরিচালিত 'টেরেসা' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা গেল সংখ্যার প্রেক্ষাগৃহভুক্ত 'বিবিধ সংবাদ'-এ 'পারিবারিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিন, ৪ জুলাই তারিখে দেখানো হয় অমর ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগো রচিত 'লা মিজারেবল'-এর প্রথম খণ্ড। উনিশ বছর কারাবাসের পরে জাঁ ভলজীন-এর মুক্তিলাভ থেকে শুরু করে ফ্যান্টাইন-এর মৃত্যু এবং জাঁ ভলজীন কর্তৃক তার বাচ্চা মেয়ে কোসেটকে থেনার্ডিয়েদের দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘটনা দেখানো হয়েছে।

* ছবিটি ১৯৫৮ সালে তোলা হলেও এর সাদা-কালো ফোটোগ্রাফী এবং চিত্রনাট্যের বিস্তারকে যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ের বলে মনে করতে পারলুম না। জাঁ ভলজীন-এর চরিত্রে বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা হ্যারী বার তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের চূড়ান্ত নিদর্শন রেখেছেন। তাঁকে আমরা বহুদিন আগে এই 'লা মিজারেবল'-এর একটি পূর্ববর্তী সংস্করণে—সেটিও দু'খণ্ডে বিভক্ত ছিল—এমনই সুন্দর অভিনয় করতে দেখেছি।

[illegible] সর্বশেষে দেখানো হয় বর্তমান ফরাসী চলচ্চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠতম পরিচালক জে. এল. গদার-এর প্রথম ছবি 'ব্রেথলেস'। ছবিটির নায়ক মিচেল হচ্ছে একজন বেপরোয়া সমাজ-পরিপন্থী লোক। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সে পরের মোটর-গাড়ী চুরি করে পালায়, প্যাট্রিসিয়া নামে একটি মেয়ের সঙ্গে খুশীমত প্রেম করে। শেষ পর্যন্ত মিচেল পুলিশ দ্বারা নিহত হয়।

শুধু সাধারণ সমাজরীতির বিরুদ্ধে নয়, প্রচলিত চলচ্চিত্ররীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব ছবিটিতে সুস্পষ্ট হলেও মনে হয়, গদার কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত; যেন তিনি তাঁর ঠিক পথটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু পাননি। আমেরিকান ওয়েস্টার্ন ছবি দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তিনি বাস্তববোধকে আঁকড়ে ধরে আছেন। মিচেল ও প্যাট্রিসিয়ার মধ্যে যেমন কোনো নীতিবোধ নেই, তেমনই নেই কোনো ভাবাবেগ। ছবিখানি ১৯৬০ সালে তৈরী।

১০ জুলাই, শেষ দিনে জ্যাকস্ বেকার পরিচালিত গ্যাংস্টার ফিল্ম 'ডোণ্ট টাচ্ দি মানি' দেখানো হয়েছিল। হলিউডে নির্মিত এই ধরনের ছবির তুলনায় ছবিটির গতি প্রথমদিকে অত্যন্ত শ্লথ। এবং আগাগোড়াই এ-সব ছবিতে যে-ভাবে সাসপেন্স তৈরী হয়ে থাকে, তারও অপটু প্রয়োগ দেখা গেল। শাদাকালো ফোটোগ্রাফী কিন্তু একটি বিশেষ আকর্ষণ।

কালো চামড়া নিয়ে জন্মানোর অপরাধ

লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড-এর একটি বিদ্যালয়ের ঘটনা। সেখানকার ছেলেমেয়েরা কোনো মতেই একজন নবনিযুক্ত নিগ্রো শিক্ষককে বরদাস্ত করতে চাইছে না। ভদ্রলোক ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেও কোনো উপযুক্ত চাকরী না পেয়ে দায়ে পড়ে শিক্ষকতা করতে এসেছেন। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে ক্রমাগতই পাচ্ছেন অসদাচরণ, ব্যঙ্গবিদ্রূপের ডালি। ভদ্রলোক যথেষ্ট প্ররোচনা সত্ত্বেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে নানারকম কৌশল উদ্ভাবন করবার চেষ্টা করে চলেছেন ছাত্রছাত্রীদের বশে আনবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই সাফল্যলাভ করতে পারছেন না। শেষটা তিনি খুব হিসেব করে ভয়ানক রেগে যাবার অভিনয় করলেন এবং তাতে কাজ হল। একটি দুরন্ত ছেলে তাঁকে বক্সিং-এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার আহ্বান জানাল; তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃত হলেন। প্রথমটা অনেকক্ষণ ধরে তার মুষ্টি সহ্য করবার পরে তিনি তাকে অতর্কিতে একটি মোক্ষম নক-

গুরু বাগচী পরিচালিত সমান্তরাল/মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং মাস্টার মলয়

আউট রো ঝাড়লেন; বাছাধন কাৎ হল এবং তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ল। এইভাবে কঠিনে-কোমলে ছেলেমেয়েদের যখন তিনি জয় করে এনেছেন, সেই সময়ে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে তিনি একটি বড়ো চাকরী পেয়ে শিক্ষকতার পদে ইস্তফা দিলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছে। দুঃখিতচিত্তে তারা তাঁর বিদায়-অভিনন্দনের ব্যবস্থা করল এবং তাঁকে যে-উপহার দিল, তার মোড়কের উপর বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখল—টু সার, উইথ লাভ। এর পর আর ভদ্রলোকের যাওয়া হল না। সিডনী পয়টার এবং ছেলেমেয়েদের আশ্চর্য অভিনয়েভরা কলম্বিয়া পিকচার্স নিবেদিত 'টু সার, উইথ লাভ' ছবিখানি গেল ১১ জুলাই থেকে মিনার্ভা সিনেমায় দেখানো হচ্ছে।

স্টুডিও থেকে

যাত্রিকের যাত্রা হয়েছে শুরু আবার নতুন করে। প্রথম শুরু হয়েছিল উনিশশো উনষাটে 'চাওয়া পাওয়া' ছবি নিয়ে। তারপর ছবি করেছেন আরও কয়েকটা যেগুলোর নাম বাংলার ছবির ইতিহাসের পাতায় থাকার মত। সবশেষে 'পলাতক' করার পর ছেদ পড়েছিল অকস্মাৎ। আবার আত্মপ্রকাশ করলেন কিছুদিন আগে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয়।

যাত্রিকের প্রায় প্রত্যেকটা ছবিই সুপার-হিট। সুচিত্রা-উত্তম জুটিকে নিয়ে 'চাওয়া পাওয়া' সব থেকে উল্লেখযোগ্য। তারপর দ্বৈতভূমিকায় ঐ সুচিত্রা সেনকে নিয়েই তোলা 'স্মৃতিটুকু থাক' এর কথা মনে আছে সবাইএর। তারপর এল 'কাঁচের স্বর্গ'। বাংলা ছবিতে বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল এ ছবি। ধরাবাঁধা ছকের বাইরে বাস্তবের কঠিন পরিবেশের পটভূমিতে যে সুন্দর পরিচ্ছন্ন শিল্পসমৃদ্ধ ছবি হতে পারে যাত্রিকের 'কাঁচের স্বর্গ' তারই অন্যতম পদক্ষেপ। শুধু বিষয়বস্তুই নয় ছবির বলার ভঙ্গীও অপূর্ব। তার ওপর দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের মুখ্য চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের কথা নিশ্চয়ই স্মরণে আছে অনেকের। পরবর্তী সময়ে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অন্য কোন ছবি দেখতে বসে 'কাঁচের স্বর্গে'র কথাই মনে আসত। যাত্রিকের পরের ছবি 'পলাতক'। এ ছবি বাংলাদেশের সাধারণ দর্শকদের মধ্যে যে কি আলোড়ন তুলেছিল তার প্রমাণ এখনও রুমা গুহঠাকুরতার গাওয়া ঐ ছবির গান বেজে ওঠে। সঙ্গে ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত আর অনুপকুমারের অনবদ্য অভিনয়। কিন্তু দুঃখের কথা যাত্রিকের এতবড় সাফল্য তাদের নতুন পথে নিয়ে গেল না। যে কারণেই হোক, তখনই সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়েছিল যাত্রিক। গোষ্ঠীর তরুণ মজুমদার স্বাধীনভাবে পরিচালনার কাজে চলে এলেন। দিলীপ মুখোপাধ্যায় শুরু করলেন প্রযোজনার কাজ। 'আকাশ ছোঁয়া', 'সন্ধ্যা দীপের শিখা' ছবি দুটি ও'রই। গোষ্ঠীর অপর শরিক শচীন মুখোপাধ্যায়ও কাজ শুরু করলেন একক পরিচালক হিসাবে।

বেশ কিছুদিন পর আনন্দের কথা বিচ্ছিন্ন যাত্রিক আবার মিলেছে। এবার অবশ্য শরিক তিনজন নয়, দুজন। দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও শচীন মুখোপাধ্যায়। তাদের এ নতুন যাত্রাপথ শুরু হচ্ছে প্রফুল্ল রায়ের 'এখানে পিঞ্জর' উপন্যাস দিয়ে। বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আগেই বলেছি যাত্রিক নতুনত্বের পরিচয় দেয়। এবারও দেবেন।

এক লেখাপড়া জানা ছেলে ভদ্রভাবে বাঁচার কোন পথ না পেয়ে বাধ্য হয়েছিল নোংরা জীবনকে বেছে নিতে। হঠাৎ এক উঠতি সাহিত্যিক দয়াপরবশ হয়েই তাকে উদ্ধার করে সে অবস্থা থেকে। কিন্তু তিমিও তাকে সুস্থ জীবনযাপনের কোন হদিস দিতে পারলেন না বরং বলা যেতে পারে দিলেন না। সাহিত্যিকের একটুখানি বিশ্বাসের অভাব সে হতভাগার' জীবনে নিয়ে এল শেষ মুহূর্ত। এর পর সাহিত্যিক তার ভুল বুঝতে পারল বটে, কিন্তু করার কিছু নেই। সারাটা জীবন তাকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়েছিল ছেলেটার সংসারের একজন হয়ে।

প্রফুল্ল রায়ের গল্পের অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে অনেক। (প্রশান্ত দেব তৈরী করেছেন চিত্রনাট্য, সংলাপও তাঁর লেখা।) একটু তলিয়ে দেখলে হয়ত বা 'কাঁচের স্বর্গে'র

প্রথম বসন্ত/অজয় গাঙ্গোপাধ্যায় পরিচালক নির্মল মিত্র এবং অঞ্জনা ভৌমিক।
ফটো : অমৃত

মূল সুরের সঙ্গে কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে, তবে আগের চাইতেও বলিষ্ঠ ছবি হবে—এটা বিশ্বাস।

ক'দিন আগে দেখা হয়েছিল দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ভারতী'র লবিতে। কথায় কথায় উনি জানালেন ছবির নায়িকা এখনও ঠিক হয়নি। কথা চলছে। তবে প্রধান দুটো চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। বেকার যুবকের ভূমিকায় দিলীপবাবু নিজে আছেন। সাহিত্যিকদের চরিত্রে উত্তমকুমার সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। ইতিমধ্যে ছবির কাজ হয়েছে কয়েকটা দিন টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। আবার শুরু হচ্ছে এ মাসের মাঝামাঝি। দিলীপবাবুর সঙ্গে কথাবার্তায় এটুকু বুঝলাম যাত্রিকের এই নতুন যাত্রাপথে আশা ও লক্ষ্য অনেক।

'রাম আউর শ্যাম'-এর অভাবনীয় সাফল্যের পরে মাদ্রাজের বিজয়া ইন্টার-ন্যাশনাল এবার যে-বিচিত্র ছবি সাধারণ্যে উপহার দিচ্ছেন, সেটি হচ্ছে ইস্টম্যান কলার রঞ্জিত 'নানহা ফরিস্তা'। বি, নাগী রেড্ডী প্রযোজিত এই ছবিখানি পরিচালনা করছেন টি, প্রকাশ রাও।

অদ্বিতীয়া ছবির প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরী তাঁর এ আর সি প্রোডাকসন্সের হয়ে যে দ্বিতীয় ছবির কাজ শুরু করছেন—তার নাম "রূপসী"। অজিত গাঙ্গুলী রূপসীর শুধু পরিচালক নন কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকারও। ছবির অধিকাংশ অংশই তোলা হবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আশা করা যায়, এই বহির্দৃশ্য প্রধান ছবিটি বাঙলা চিত্রজগতে আনবে নতুন সুর আর ছন্দ। জানা গেল এপর্যন্ত যাঁরা অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তাঁরা হলেন সন্ধ্যা রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শমিত ভঞ্জ।

অনিল বাগচী ছবির সংগীত পরিচালনা করবেন। এন-এ ফিল্মস্ ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

কার্তিক বর্মন প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ নিবেদন শক্তিপদ রাজ-গুরুর কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত "মুক্তিস্নান"এর চিত্রগ্রহণ কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। অজিত গাঙ্গুলী ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন। রাজেন সরকার এতে সুর দিয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টো-পাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন, জহর রায়, অজয় গাঙ্গুলী, শ্যামল ঘোষাল, কালী বন্দ্যো-পাধ্যায়, গীতা দে, ছায়া দেবী, শোভা সেন, মাঃ মলয়, কানু, সমর, মিণ্টু ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়। গীতরচনা করেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। নর্মদা চিত্র ছবিটির পরিবেশক।

বেবী জুন প্রোডাকসনের প্রথম ছবি "কলঙ্কিত নায়ক"-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের সাড়া জাগানো উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্র-নাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত। সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়-এর সুরে ছবিটিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ও বাসবী নন্দী। অমিয় মুখোপাধ্যায় ছবিটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। চরিত্রচিত্রণে আছেন—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, অনুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তরুণকুমার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সেন ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এ, বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

চাভিনয়

নাটকের অন্যতম দায়িত্ব যদি হয় ণ মানুষকে সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে ; সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা তাহলে ক' গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা সম গোর্কির 'মা' নিঃসন্দেহে উল্লেখ- । নাট্য আন্দোলনের গতিকে আর এক এগিয়ে নিয়ে যেতে 'পথিক' সংস্থার নির্বাচন যেমন শিল্পসচেতনতার য় বহন করে তেমনই এই নাটকের প্রযোজনাও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের তবাহী। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন ট রাজনৈতিক মতবাদকে সোচ্চারে তুলে রে উপন্যাসভিত্তিক নাট্য রূপায়ণের পালনে বিষ্ণু চক্রবর্তী যথার্থ বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তদানীন্তন য়ার যে চিত্র গোর্কি তাঁর 'মা' উপ- উপস্থিত করেছেন তার যথাযথ ন্তরণের দিকে দৃষ্টি রেখে নাট্যকার টি চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার মূল বক্তব্যকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ তেই সচেষ্ট ছিলেন। আর সেই জনাই ক' প্রযোজিত 'মা' নাট্য-আন্দোলনের একটি বলিষ্ঠ সংযোজন। স্বামী ইল ভ্লাসবের অত্যাচারে জর্জরিতা ছেলে পাভেল ভ্লাসবের কাছেও তেন ভোগ করেছেন। কিন্তু পারি- র্বকতার নানান আবর্তে ঘূরপাক খেয়ে ভলের জীবনে যে পরিবর্তন দেখা ন তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে ত লাগলেন 'মা'। ঘটনার অংশীদার সে একে একে আন্দ্রে, নাতাশা, শাশা, লাই, ইয়েসার, রীবিন, ইশাই, পেত্রো- , ইন্সপেকটর, পুলিশ এমনি আরও চরিত্রের সমাবেশ ঘটলো। উপেক্ষিতা নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত আর বিবর্তনের দিয়ে সজীব, সাবলীল এবং সম্পূর্ণ উঠলো নাটকের শেষ দৃশ্যে। সুগ্রথিত নাটকের দলগত অভিনয় নৈপুণ্য এক য় অমূল্য সম্পদ। নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে কারা এমনই নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন ই একবারও মনে হয়নি যে একটি নাটক ভনীত হচ্ছে বরং নাট্যরস সৃষ্টিতে কবৃন্দ বিস্মিত হয়েছেন। নাটকের মুখ্য ত্রগুলির দায়িত্ব পালনে রূপকাররা সত্যিই রিকতার পরিচয় দিয়েছেন আর তাঁদের ভাভাবে সাহায্য করেছেন পার্শ্ব- অভিনেতাগণ। তাই বিশেষভাবে কাউকে হ্নত করা একটু অসুবিধে হয় তবু ন্ত মতিলাল, গোপাল দে, শিবনাথ দ্যাপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীল সুর, সমৎ বসু, জ্যোতিপ্রকাশ, ন্ময় রায়চৌধুরী, কল্যাণ কর্মকার, ব বল, অনুপম বাগচী, রবীন্দ্র বন্দ্যো- ধ্যায়, দীপা হালদার সু-অভিনয়ের জন্য ংসা কুড়িয়েছেন প্রচুর। এঁদের তুলনায় গাঙ্গুলী, মণি মানী, সুপর্ণা চট্টো- ধ্যায় অনেকখানি নিষ্প্রভ। শ্রমিকদের দৃশ্যগুলি প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য প্রতিটি শিল্পীর নিখুঁত শিল্পবোধ স্মরণ- যোগ্য। 'মা' চরিত্রে শেফালী দে সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। চরিত্রটির গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন বলেই তিনি নাটকের মূল সুরকে এতটুকু ব্যাহত হতে দেন নি। ধীরে ধীরে 'মা' চরিত্রের উত্তরণ এতো স্বাভাবিক অভিনয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন যা সমস্ত প্রেক্ষাগৃহকে আবিষ্ট করে রাখে। নাট্য নির্দেশক জ্যোতিপ্রকাশ সম্পূর্ণ নাটকটির প্রযোজনার প্রতি যে যথেষ্ট শিল্প- বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা আঙ্গিক থেকে শুরু করে সামগ্রিক অভিনয়ের গুণগত সাফল্য বিচার করলেই ধরা পড়বে। আঙ্গিকের বাহুল্যতা বর্জন করে বৈশিষ্ট্য- পূর্ণ অভিনয় রীতির প্রয়োগই 'মা' নাটকের অসামান্য সাফল্যের কারণ। মঞ্চসজ্জা শিল্প- সম্মত। আলোকসম্পাতের কাজ আরো হৃদয়গ্রাহী হওয়া উচিত ছিলো। বাহুল্য- বর্জিত শব্দপ্রক্ষেপণের ব্যবহার নাটকের ভারগম্ভীর পরিবেশের মাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে। সব মিলিয়ে 'পথিক'-এর 'মা' এক অনবদ্য সৃষ্টি।

সম্প্রতি 'কল্পতরু' নাট্যসংস্থার শিল্পীরা ভিন্ন স্বাদের দুটি একাঙ্ক 'পরমপুরুষ' ও 'পরাজিত পৃথিবী' পরি- বেশন করলেন বিশ্বরূপা মঞ্চে। বসন্ত ভট্টাচার্য রচিত এ দুটি নাটক আগে এ'রা স্বার্থকতার সঙ্গে বহু জায়গায় অভিনয় করেছেন। এই প্রযোজনাতেও সেই বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে। দুটি নাটকের শিল্পী- তালিকায় ছিলেন—সুশীল মন্ডল, শীতল সান্যাল, সন্তু দা, বসন্ত ভট্টাচার্য, মমতা দাস, কাজল বর্ধন, সুকুমার মিত্র, সাধন দত্ত, বিশ্বনাথ বসাক, পরাশর হালদার, জয়ন্ত সিংহ, রাজকুমার বসু।

চিত্তরঞ্জনের প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'নাট্য- রূপা' সম্প্রতি স্থানীয় শ্রীলতা মঞ্চে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নিষাদ' ও তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করলেন। সংস্থার শিল্পীরা ইতিপূর্বে 'নিষাদ' নাটকটি শিলিগুড়ি, হাওড়া, কুলটি প্রভৃতি জায়গায়

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত বনজ্যোৎস্না চিত্রে শমিত ভঞ্জ এবং মীনাক্ষী দত্ত।
ফটো : অমৃত

পরিবেশন করে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। এবারেও পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। 'পথিক' নাটকটি মঞ্চস্থ করার ব্যাপারেও শিল্পীরা তাঁদের স্বকীয়তা আরোপ করতে পেরেছেন। নাট্য নির্দেশনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন গিরিজা দত্ত। নাটক দুটির উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হোলেন : গিরিজা দত্ত, প্রদীপ দাস, তাপস ব্যানার্জি, মনোজ দত্ত, অচিন্ত্য ভাদুড়ী, অমরেশ সান্যাল, মায়া ঘোষ, ইলা ঘোষ।

কিছুদিন আগে কটকের ইয়ং ড্রামাটিক ক্লাবের শিল্পীরা চতুর্থ বাৎসরিক অনুষ্ঠানে রামচন্দ্র মিশ্রের 'গোধূলি লগ্ন' নাটকটি অভিনয় করেন। অভিনয়ে অংশ নেন শুক্লা বোস, সন্ধ্যা নায়েক, প্রফুল্ল নায়েক, প্রতাপ নায়েক, সুভাষ ত্রিপাঠী, প্রশান্ত সাহু, নিরঞ্জন প্রধান।
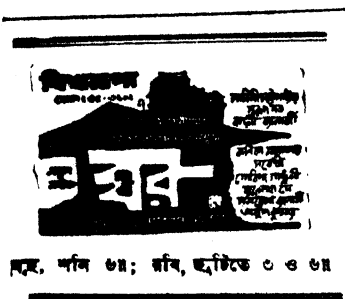
হোম ডিপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি সলিল সেনের 'মৌচোর' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। অরুণ মুখার্জির নির্দেশনায় নাটকটি উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। কয়েকটি ভূমিকায় স্বাভাবিক অভিনয় করেন অমর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ মুখার্জি। কৃষ্ণদাস মন্ডল, শশধর মুখার্জি, হীরেন বসু, মমতা চট্টোপাধ্যায়, ছন্দা দেবী, ইন্দিরা দে।

গত ২১ জুন, বেহালা মিতালী সঙ্ঘের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' নৃত্যনাট্য এবং জগদীশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'প্রতিনিধি' নাটক অভিনীত হয়। আবোল-তাবোলের পরিকল্পনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং নৃত্য পরিচালনা করেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'প্রতিনিধি' নাট্যানুষ্ঠান অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করেন। এর মধ্যে প্রমিত চ্যাটার্জি, সুদীপ চক্রবর্তী, পার্থ মুখার্জি এবং তপন চৌধুরীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। আলোকসম্পাত এবং রূপসজ্জায় ছিলেন যথাক্রমে দুলাল সিংহ ও রবিন ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুধাংশু দাশগুপ্ত এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীজোছন দস্তিদার।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান অয়েল রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন হিন্দী হাইস্কুল মঞ্চে। সু-অভিনীত এই নাটকটিতে অভি… দক্ষতার ছাপ রেখেছেন হরিগোপাল স… বীরেশ্বর চক্রবর্তী, আরতি ঘোষ, স… ব্যানার্জি ও আশিস সেন। পরিচা… বিপুল ব্যানার্জির কাজ প্রশংসার্হ। ম… সজ্জা সুন্দর। প্রারম্ভে বিমল কা… মনোজ্ঞ ভাষণ দেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত প… বেশন করেন উদয় গুপ্ত, চিত্রা মুখার্জি… ভানু সরকার।

গত ৫ জুলাই আদি মৈত্রী সং… সভ্যরা নৈহাটী পৌরসভা ভবনে অভি… করলেন, সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কো… আলো' ও সলিল সেন রচিত মনীশ গ… সম্পাদিত 'মৌ-চোর'। অভিনয় করে সু… অর্জন করেছেন সর্বশ্রী অলোক চট্টোপা… মণীশ গুপ্ত, অশোক গুহ, পীযূষ গ… সঞ্জীব দে, সলিল ধারা, স্বপন বোসচৌ… অমল সরকার, বিপ্লব দত্ত, বিমান দত্ত… লাল্টু ও দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দে… ছিলেন অলোক চট্টোপাধ্যায় ও অ… গুপ্ত।

'বাণীরূপা'র শিল্পীরা আগামী … জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় মুক্ত অ… এদেরই পূর্ব অভিনীত দুটি একাং… বাবলু দাশগুপ্ত রচিত 'কেন এই অ… ও শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ঝুমু… পুনরাভিনয় করবেন। নাটক দুটির নি… শনা, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনার দ… আছেন বাবলু দাশগুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ

পশ্চিম বার্লিন আন্তর্জা… চলচ্চিত্রোৎসব প্রতিযোগিতায় কম্যু… দেশগুলি থেকে একমাত্র প্রতিযোগী যুগোশ্লাভিয়ার জেলিমির জিল… পরিচালিত ছবি "রানি রাডোভি" সব… পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র বলে বি… হওয়ায় 'স্বর্ণ ভল্লুক' (গোল্ডেন … পুরস্কার লাভ করেছে। প্রতিযো… যোগদানকারী বাইশটি ছবির মধ্যে ছ'খানি ছবি বর্তমান যুগের নব… প্রচন্ড বিক্ষোভকে কাহিনীর উপাদা… ব্যবহার করেছে, তাদের মধ্যে যুগো… ভিয়ার 'রানি রাডোভি'ই শ্রেষ্ঠতম। উ… বিচারকমণ্ডলী জিলনিককে যে-তী… সঙ্গে তিনি কম্যুনিস্ট আদর্শ থেকে বাস্তব রূপায়ণকে সমালোচনা ক… তার জন্যে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ব্রেজিল, ইতালী, সুইডেন, জার্মানী এবং ইউ-এস-এ—এরা … 'রৌপ্য ভল্লুক' (সিলভার বিয়ার) পুরস্কৃত হয়েছে নিম্নলিখিত ছবি… জন্যে : (১) ব্রেজিল অ্যানো (ব্রেজিল), (২) উন্ গ্রাণ্ডিকলো পো… ক্যাম্পাগ্না (ইতালী), (৩) মেড… সুইডেন (সুইডেন), (৪) ইথ বীণ এলিফাণ্ট, মাডাম (পশ্চিম জার্মানী… (৫) গ্রিটিংস (আমেরিকা)।

ভারতের পক্ষে সত্যজিৎ রায় … চালিত "গুপী গাইন বাঘা বাইন"

…হেশ্বরীর "নীলকমল" প্রদর্শিত হবার …ছিল। কিন্তু আমাদের বৈদেশিক …গের চিরাচরিত গয়ংগচ্ছ ভাবের জন্যে … আদৌ পৌঁছুতেই পারেনি। …কি প্রথম ছবির পক্ষে শ্রীরায় ছাড়া …ক নেপাল দত্ত উপস্থিত থাকলেও …র কাছে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর …হ্যান্ড-আউট ছাড়া একখানি স্টীল- … পর্যন্ত ছিল না। আন্তর্জাতিক …চ্চোৎসবে যোগদান করবার জন্যে … থাকতে যে-প্রস্তুতির প্রয়োজন, …দের বৈদেশিক দপ্তর সে সম্পর্কে …র্ণ অজ্ঞ, এ পরিচয় এ'রা বারংবারই …ন।

…হিন্দী সাংস্কৃতিক সংস্থা 'জনামিকা সঙ্গম' 'লোকমঞ্চ' নামে একটি নতুন …গ খুললেন সম্প্রতি এমন সব …ায়িক বা অন্যাবিধ প্রতিষ্ঠানের জন্যে, …কার কর্তৃপক্ষ তাঁদের দ্বারা নিয়োজিত …জীবী কর্মীদের উচ্চাঙ্গের অভিনয়- …ও সংশ্লিষ্ট চারুকলার সঙ্গে পরিচিত … চান। বছরে ছ'টি থেকে আটটি …ঠান এ'দের জন্যে বিশেষভাবে করা …লে সঙ্গম কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি …ছেন।

সঙ্গম-এর পতাকাতলে ভারতীয় …তি সংসদ গেল ৫ ও ৬ জুলাই …পীয়ার সরণিস্থ কলামন্দিরে "কুরুক্ষেত্র …রাজঘাট" নামে একটি কাব্যকথা …বেশন করেছিলেন। গান্ধী শতবার্ষিকী …ক্ষে প্রচারিত এই কাব্যকথায় আবৃত্তি …নের মাধ্যমে গান্ধীদর্শনকে প্রতিফলিত …র চেষ্টা করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রে …ক্ষের কৌরব শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ …চালনার কৌশলের সঙ্গে বর্তমান যুগে …তকে স্বাধীন করবার জন্যে ইংরাজের …দ্ধে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন পরি- …নাকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা …র সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর প্রিয় রামধুন …ত বহু হিন্দী ভজন, গীত প্রভৃতির … বাঙলা দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যুক্ত … সংগীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের …চালনাধীনে পরিবেশন করা হয়। …তিভাগ আরও অল্প ও বৈচিত্র্যপূর্ণ … এবং গানগুলি কিছুটা ছন্দোবদ্ধ …র ব্যবধানে পরিবেশিত হলে …ষ্ঠানটি সার্থকতর হয়ে উঠত।

…সায়েন্স ফিকসান সিনে ক্লাব গেল …বার, ১০ জুলাই কুর্ট মের্টজিগ পরি- …ত জার্মান ছবি "দি সাইলেণ্ট প্ল্যানেট" …াবার ব্যবস্থা করেছিলেন ম্যাজেস্টিক …জ-এ। পৃথিবীর মানুষের বুধ গ্রহে …ড় দেওয়া এবং সেখানকার বিচিত্র ও …াণান্তক অভিজ্ঞতার পরে ফিরে আসা … ছবিটির বিষয়বস্তু।

…উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট সংস্থা উদয়- …মের সপ্তম বার্ষিক উৎসব ২০ থেকে … জুন অনুষ্ঠিত হয় গিরিশ পার্কে। …ষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির …দ গ্রহণ করেন শ্রীরাজনারায়ণ দত্ত ও …শাজিৎকুমার দত্ত। তিন দিনের ঐ অনু-

…শান্তি/পরিচালক স্বদেশ সরকার, দিলীপ রায় এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।
ফটো : অমৃত

ষ্ঠানে নান্দীকরের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' ও রূপান্তরীর 'কাণক' নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয়। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বশ্রী নির্মলেন্দু চৌধুরী, সমীরণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাধব মিত্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, অলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত, গোপা ভট্টাচার্য, নিতাই গোস্বামী, কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ দাসগুপ্ত ও অশোক ভট্টাচার্য।

গত ২৮ জুন খিদিরপুরের প্রখ্যাত সংগীত ও সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সুরবিতান' 'বন্দেমাতরম্' শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠান মাধ্যমে ঋষি বঙ্কিম জন্মদিবস পালন করে এবং পরদিন সকালে এ'রা যথাক্রমে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন এবং কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুদিন পালন করে শান্ত এবং নিষ্ঠাপূর্ণ ঘরোয়া অনুষ্ঠান মাধ্যমে। সংস্থাধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্র বসু অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন এবং সময়োচিত ভাষণ দেন এবং সাংস্কৃতিক সংগীত পরিবেশন করেন 'সুরবিতান' শিল্পিবৃন্দ।

বাংলাদেশে বর্তমান নাট্য আন্দোলনের সারথীদের মধ্যে আর একটি নতুন নাট্যসংস্থা সংযোজিত হল, নাম—'ক্রাস থিয়েটার'। নতুন নাটকের নাম এ'রা শীঘ্রই ঘোষণা করবেন।

গত ১৩ ও ১৪ জুন গান্ধী আশ্রম প্রাঙ্গণে ধুলিয়ান নিবেদিতা সংঘের সভ্যবৃন্দের পরিচালনায় রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। শ্রীমতী মীরা সেনগুপ্তা, মমতা গুপ্তা ও সান্ত্বনা গুপ্তার প্রচেষ্টায় এই দুই দিনের সুন্দর অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে কবিগুরুর 'ডাকঘর' নাটকটিতে সুন্দর অভিনয়ের জন্য সংঘের কাবেরী সেন, পিয়ালী রায়, শিপ্রা সাহা, কৃষ্ণা দাস, আল্পনা সিংহ রায়, চন্দনা সাহা ইত্যাদি সবাই সুনাম অর্জন করেন।

গত ১৫ জুন রবিবার কাঞ্চনতলা শহীদ নলিনী ভ্রাতৃসংঘের সাংস্কৃতিক বিভাগের পরিচালনায় শৈলেশ নিয়োগীর 'কলেজ হোটেল' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটক আরম্ভের পূর্বে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নেন শ্যামসুন্দর দাস, সুজন দাস, নির্মলেন্দু সিনহা, প্রদীপ ঘোষ। কলেজ হোস্টেল নাটকটিতে শিল্পীদের সুন্দর ও সাবলীল অভিনয় উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে বিজন রায়, মনোজ সরকার, সুভাষ রায়-চৌধুরী, পীযূষ দাস, সুনীল দাস, রাজু জৈন, প্রভাত কুন্ডু, প্রবীর ব্যানার্জি, অসীম তেওয়ারী, মোবারক হোসেন, কৃষ্ণ দাস পূর্ণেন্দু সরকার ও আশুতোষ সাহার নাম উল্লেখযোগ্য।

আশীষ রায় প্রযোজিত এলিট মুভীজ-এর প্রথম নিবেদন 'স্বীকৃতি' ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কণক মুখোপাধ্যায়। সুরকার অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরে ছবিটির কয়েকটি গানও ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১

ভ্যালেণ্টিনো

এমন একদিন গেছে যখন ছায়াছবির নায়কদের জন্য মেয়েরা পাগল হয়ে যেত। শুধু ছবির পর্দায় নায়ককে দেখে তাদের মন ভরত না। শুধু স্বপ্ন দেখেও ভালবাসার স্বাদ মিটত না। মন চাইত আরও বেশি কিছু পেতে। সেই পাওয়ার জন্য কত মেয়ে যে তাদের প্রিয় নায়কের কাছে ছুটে ছুটে গেছে, তার কোন হিসেব-নিকেশ নেই। একটুখানি সঙ্গ পাবার জন্য সেইসব সঙ্গিনীরা যে কত কাতর মিনতি জানিয়েছে তারও ইয়ত্তা নেই। এমনও হয়েছে সঙ্গ না পেয়ে সঙ্গিনীরা সবকিছু ছেড়ে সংসার-বিবাগী হয়েছে। কখনও করেছে আত্মহত্যা।

সেইসব দিন আজও আছে। থাকবেও চিরদিন। বরং নায়কের জনপ্রিয়তা দিন দিন আরও বাড়ছে। নায়কের মোহ বড় মোহ। এ-মোহ ভোলা যায় না। এমন বহু মেয়েকে দেখা গেছে যারা নিজের প্রিয়তমর মধ্যে নায়কের গুণাবলীকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছে। নায়ক হিসেবে ভেবে নিয়েছে। তাই নায়ক যতদিন বেঁচে থাকবেন, মেয়েরা ততদিন স্বপ্ন দেখবেই। উতলা হবেই।

এ যেন এক রূপকথার রাজ্য। এ-রাজ্যের রাজার রাজা, নায়কের নায়ক যেন রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষ নন। যেন অন্য কিছু। এমনি এক নায়কের কথা আজ বলব। নাম রুডলফ ভ্যালেণ্টিনো। হলিউডের এই ভুবনবিখ্যাত নায়ককে নিয়ে একদিন সারা দুনিয়ার মেয়েরা মেতে উঠেছিল। উতলা হয়েছিল। এমন রূপ ছবির পর্দায় এর আগে নাকি দেখা যায়নি। সবার মুখে মুখে তখন একটিই নাম শোনা যেত—ভ্যালেণ্টিনো, ভ্যালেণ্টিনো...।

ভ্যালেণ্টিনোর আসল নামটা কিন্তু অনেক বড়। রোডোলফো অ্যালফোনংসো র‍্যাফায়েলো পিয়ের ফিলিবার্ত গাগ্লিয়েলেসি ডি ভ্যালেণ্টিনো দ্য অ্যাগটনগুয়োল্লো। চার্চের দেওয়া ধর্মীয় নাম কিনা, তাই এত লম্বা-চওড়া। চলচ্চিত্রে অবশ্য ভ্যালেণ্টিনো নামটাই জনপ্রিয়। ইটালীর ছেলে। জন্ম ১৮৯৫ সালে। রয়েল অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারের ছাত্র হয়েও পরবর্তী জীবনে অভিনয়কেই পেশা হিসেবে বেছে নিলেন ভ্যালেণ্টিনো। পেশার জন্য পরবাসী হলেন। ইটালী ছেড়ে এলেন আমেরিকায়।

হলিউডে তখন বাঘা-বাঘা নায়ক-নায়িকারা আসন জুড়ে রয়েছেন। রবার্ট হ্যারন থেকে শুরু করে ডগলাস ফেয়ার ব্যাংকস, মেরি পিকফোর্ড, লিলিয়ান গিশ এবং মেবেল নরম্যাণ্ড-র মত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাশে একজন নতুন নায়ক ভ্যালেণ্টিনোকে কেউ তেমন আমল দিতে চাইলেন না। কিন্তু তাই বলে ভ্যালেণ্টিনো হাল ছাড়লেন না। স্টুডিওর আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি শুরু করলেন। দু'-একটা ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগও পেয়ে গেলেন। এর মধ্যে 'অল নাইট'

ভ্যালেণ্টিনোকে প্রথম দেখা গেল।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ভ্যালেণ্টিনে রূপ এবং বলিষ্ঠ চেহারা দেখে কেউ এসে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করার দিলেন না। তবে মেয়ে বলেই কিনা না, ভ্যালেণ্টিনোকে প্রথম দেখেই পেরেছিলেন মেট্রো-গোল্ডেন-মায়ারের চিত্রনাট্যকার জুন ম্যাথিস। তখন যুদ্ধের পটভূমিকায় তোলা ছবিগুলো দেখে দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নতুনত্বের স্বাদ আনতে যুদ্ধবিরোধ তোলার জন্য ম্যাথিস মেট্রো স্টুডিওর কর্তাদের 'দি ফোর হর্সমেন অ অ্যাপোকেলিপস্' ছবিটি নির্মাণ করা পরামর্শ দেন। এবং এ-ছবির প্রধান ভ্যালেণ্টিনোকে নেবার জন্য তিনি ভাবে সুপারিশ করেন। কিন্তু ণ্টিনোকে নির্বাচন করতে কেউ

ন না। বরং এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ভয় পেলেন।

টনাচক্রে এই সময় ভ্যালেণ্টিনোর সঙ্গে রা অভিনেত্রী জেরাল্ডিন ফারারের প হয়ে যায়। ফারার তো ভ্যালেণ্টিনোর দেখে মুগ্ধ। এমন স্মার্ট হিরো-হিরো া দেখে তিনি আবার কর্তাব্যক্তিদের ণ্টিনো সম্পর্কে ভেবে দেখতে ন। ফারারের কথায় শেষপর্যন্ত কাজ একটা বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়েও লক রেক্স ইংগ্রাম 'অ্যাপোকেলিপস্' চ নায়কের চরিত্রে ভ্যালেণ্টিনোকে চন করলেন। কিন্তু ছবি যখন মুক্তি তখন সবাই ভ্যালেণ্টিনোর অভিনয়-া দেখে অভিভূত। বিশেষ করে র দৃশ্যে ভ্যালেণ্টিনোর এমন আকর্ষ-অভিনয় দেখে মেয়েরা তো মুগ্ধ। ত। এই এক ছবিতেই ভ্যালেণ্টিনো বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

রপর নায়ক হিসেবে ভ্যালেণ্টিনোর নি সম্ভাবনা আছে এ-কথা এম জি ঝার আগেই প্যারামাউণ্ট তাদের ী ছবিতে অভিনয় করার জন্য ণ্টিনোকে দিয়ে সই-সাবুদ করিয়ে 'দি শেখ' ছবিতে ভ্যালেণ্টিনো য় করলেন। সেই এক ফলাফল। বরং বেশি আলোড়ন। রাতারাতি ণ্টিনো ম্যাটিনী আইডল হয়ে । ব্যবসায়িক সাফল্যে এ-ছবি দু' মধ্যেই প্যারামাউণ্টকে দশ লক্ষ লাভ দিল। ১৯৩৮ সালের সবাক 'দি শেখ' ছবিটিতে সঙ্গীত এবং যোগ করে প্যারামাউণ্ট আবার কা রোজগার করেছিল। তখনও সেই জনপ্রিয়তা। এরপর ১৯২২ সালে অ্যাণ্ড স্যাণ্ড' ছবিতে নায়িকা নিটা র বিপরীতে অভিনয় করে ভ্যালে-র খ্যাতি বিশ্বভুবন ছড়িয়ে পড়ল। তুন জুটির প্রশস্তিতে সবাই তখন । এরপর ধাপে ধাপে উত্তরণ। ার ইতিহাস। একের পর এক ছবি: দি রকস্, মঁসিও বুকেয়ার, দি দি কনকারিং পাওয়ার, ফ্যামিলি, অফ দি লেডি, দি সেন্টেড ডেভিল, ফ দি শেখ প্রভৃতি অনেক ছবি।

বচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই সময় . ডি মেলো, ম্যাকসেনেট এবং চার্লি নের মত চলচ্চিত্রের স্তম্ভস্বরূপ তাদের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ণ্টিনো নায়ক হিসেবে নিজের আধি-বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

্যালেণ্টিনোর জীবনে বহু নারীর ভ ঘটেছিল। বহু বিবাহের অপরাধে অভিযুক্তও হয়েছিলেন। এমনকি ীর কাঠগড়ায় পর্যন্ত তাঁকে দাঁড়াতে । জিন একার থেকে শুরু করে এল

একটি ছবিতে ভ্যালেন্টিনো এবং নীতা নালদি

উইনিফ্রেড হুডনাট, নাটাশা র‍্যামবোভা, পলা নেগ্রী, অ্যালা নাজিমোভার প্রভৃতি কত মেয়ে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত নাটাশাই টিকেছিলেন। ভ্যালে-ণ্টিনোর সঙ্গে তিনি 'হোয়াট প্রাইস বিউটি' ছবিতে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

দেখতে দেখতে একদিন ভ্যালেণ্টিনোর যুগও শেষ হয়ে এল। সবাক যুগের নতুন নায়করা এলেন। তবু ভ্যালেণ্টিনোর নাম মুছে গেল না। সূর্যের মতই তিনি উজ্জ্বল হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ একদিন সকলের মায়া কাটিয়ে ভ্যালেণ্টিনো পরলোকে যাত্রা করলেন। সেই দিনটির কথা ভোলা যায় না। শুধু আমেরিকা নয়, সারা পৃথিবীর দর্শকরা নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। শেষ দেখা দেখবার জন্য সেদিন কি আকুলতা। কি কান্না। যেন একটা গৃহ-যুদ্ধ বেধেছে। মেয়েরা সেদিন কেউ ঘরে ছিল না। প্রিয় নায়কের শোকে তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার আত্মহত্যাও করেছে।

এই যাবার বেলায়ও বোঝা গিয়েছিল ভ্যালেণ্টিনোর কি জনপ্রিয়তা। আজকের দর্শক সে-কথা কি মনে রেখেছে?

—জাতিস্মর

যদু ভট্ট সংগীত সমাজ

ভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতের স্বর্ণ যুগে প্রায় সমান্তরাল ধারায় বাংলাদেশেও এক সমৃদ্ধি-উজ্জ্বল উচ্চাঙ্গসংগীতের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল যা শাস্ত্রীয় সংগীতের সকল নিয়ম ও শাসন অনাহত রেখেও বাংলার পরিবেশ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, বাংলার ধ্রুপদী সংগীতের উন্নতমান ও চরিত্র। যদু ভট্ট, অঘোর চট্টোপাধ্যায়, বামাচরণবাবু, রাধিকা গোসাই এবং আরও অনেক গুণীর সাধনায় কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে ধ্রুপদ আধ্যাত্মিক শুচিতায়, শাস্ত্রীয়সংগীতের ধ্যান ও শুদ্ধতায় এক "মর্যাদাগম্ভীর" ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ধ্রুপদ ভেঙে খেয়ালের সৃষ্টি হওয়ার পর রঙিন চটকদার তানকর্তব এবং খেয়ালের অন্যান্য মনোহারিত্বে শ্রোতৃসমাজ এবং শিল্পীদল মেতে উঠলে কিছুদিনের জন্য ধ্রুপদ একেবারে বিস্মৃতির গহ্বরে অবলুপ্ত না হলেও, অবহেলিত হয়েছিল। সম্প্রতি আবার ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদের প্রতি গুণীজনের শ্রদ্ধালু অনুসন্ধিৎসা এবং ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

বাংলার নিজস্ব সংগীতধারার লুপ্তপ্রায় গৌরবকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার মানসে এবং উচ্চাঙ্গসংগীতের ক্ষেত্রে বাঙালী শিল্পীদের অবদান সম্বন্ধে সংগীতরসিকদের অবহিত করবার উদ্দেশ্যে সেনী ঘরাণার শিল্পী সংগীতশাস্ত্রী কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্প্রতি **"যদু ভট্ট সংগীত সমাজ"** নামে এক নতুন সংস্থার পত্তন করেন। গত সপ্তাহে ৮৮।বি দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে শ্রীবিজয় ভট্টাচার্যের গৃহসংলগ্ন বিরাট হলে এই সংসদের উদ্বোধন উৎসব পালিত হয়। প্রারম্ভে স্বস্তিবাচন পাঠ করেন কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য। সংস্কৃত স্তোত্রের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে শ্রীমতী লক্ষ্মী রায়ের উদ্বোধন-সঙ্গীত "নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা" গানটি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ রচনা করে। গানটি উৎসবের অন্তর্নিহিত সুরের সঙ্গেও সুন্দর সঙ্গতি রেখেছিল। কারণ কবিগুরু সঙ্গীতরচনার প্রথম যুগে বাংলার প্রাচীন উচ্চাঙ্গসংগীতের রাগ ও তাল অনুসরণ করে যে কয়েকটি আধ্যাত্মিকতাসমৃদ্ধ গান রচনা করেছিলেন এ গানটি সেই মূল্যবান গীতিগুচ্ছেরই অন্যতম। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রবীণ ধ্রুপদী উদয়ভূষণ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় তাঁর সুযোগ্য শিষ্যাদ্বয় শ্রীমতী ইতু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইলা মুখোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ ও ধামার রাগ 'মিঞাকী-মল্লার' ও আড়ানা। প্রধানত ইতু বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন—তাঁর সঙ্গে সুযোগ্য সহযোগিতা করেছেন ইলা মুখোপাধ্যায়। আলাপ এবং বিলম্বিত বিস্তারের সকল অঙ্গর সুষ্ঠু বিশ্লেষণ এবং ধ্রুপদী আরাধনার ভাবচিত্রণে গুরুর যথার্থ শিক্ষা এবং শিল্পীজনোচিত এস্থেটিক সেন্সের এক উজ্জ্বল উদাহরণ পেশ করলেন যুগ্মশিল্পী। এঁদের নিষ্ঠা আছে, সুকণ্ঠ আছে উপযুক্ত শিক্ষা ত আছেই লয়জ্ঞানও উল্লেখযোগ্য—বিশেষ বাটের কাজে। এঁদের সঙ্গে চৌতাল ও সুরফাক তালে জিতেন সাঁতরার পাখোয়াজ সঙ্গত অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এমন যোগ্যশিল্পীরা 'রেডিও' থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন বলে সত্যকিঙ্করবাবু প্রমুখ উপস্থিত গুণীরা ক্ষোভপ্রকাশ করেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠানে ধ্রুপদ গেয়ে শোনালেন সংগীতার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। যন্ত্র এবং কণ্ঠসংগীতে শ্রীভট্টাচার্যের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সংগীতরসিক সমাজের শ্রদ্ধার বস্তু। ইনি পরিবেশন করলেন রাগ "দরবারী কানাড়া"। বিষ্ণুপুর ঘরাণার অভিজাত গায়কীর সঙ্গে ইনি আলাবন্দে খাঁ ও উজীর খাঁর শিষ্যের শিল্পসৌন্দর্যপূর্ণ বিন্যাসে বৈদগ্ধ্য ও পরিশীলিত সংগীতশিক্ষার এক চিত্তগ্রাহী স্বাক্ষর উপহার দিলেন। এঁর সঙ্গে সুযোগ্য পাখোয়াজ সঙ্গত করেন শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র। সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী … বাংলার নিজস্ব সংগীত-ঐতিহ্যকে … সমাজে তুলে ধরাই এই সঙ্ঘের … এতদুদ্দেশ্যে প্রতি মাসে একটি … সংগীতোৎসবের আয়োজন করা হবে … ধ্রুপদে যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীতের … শিল্পীদের অনুষ্ঠান হবে অপরিহার্য … এ ছাড়া টপ্পা, শ্যামাসংগীত এবং … সংগীতে বাংলার শিল্পীদের চিন্তা… ধারাকে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে … শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠানও থাকবে। … জন্ম পঞ্জাবে হলেও বাংলার মৃত্তিকার … এবং নিধুবাবুর কল্পনার রঙে টপ্পা … এক সৌন্দর্যরঙিন রূপে পরিগ্রহ ক… একান্তই বাংলার সম্পদ। এই … সংগীতানুষ্ঠানের শিল্পমূল্য এবং … মূল্য উভয় দিক যাতে বজায় থাকে … লক্ষ্য রাখা হবে বলে শ্রীরায়… জানালেন। সংস্থা সম্পাদক … ভট্টাচার্য তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে উ… সংগীতে বাংলার অবদান সম্বন্ধে আ… করে বলেন তখনকার দিনে সকল শি… কাছে বিষ্ণুপুর তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ … বাংলাদেশে বড় বড় ওস্তাদ এলে … বিষ্ণুপুর ঘুরে যাওয়াটা ছিল তাঁদের … কর্তব্য। শ্রীরায়চৌধুরী এবং কৃষ্ণকা… উভয়েই উচ্চাঙ্গসংগীত প্রচার ও প্র… কার্যে শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তি ঘোষ পা… সংস্কৃতি অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতার … উল্লেখ করেন এবং উচ্চাঙ্গসংগীত প্র… ভূমিকায় অমৃতবাজার-যুগান্তর, অ… উৎসাহ ও সহযোগিতার প্রতি কৃ… জ্ঞাপন করেন। যদু ভট্ট সঙ্গীত স… পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আছেন … তুষারকান্তি ঘোষ, মন্মথ ঘোষ, … ভট্টাচার্য, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, স্বামী প্র… বনবিহারী মল্লিক, টি এল রাণা, … দবীর খাঁ, ওস্তাদ ওমর খান, যোগী… বন্দ্যোপাধ্যায়, গোকুল নাগ, ওস্তাদ … আলি খাঁ, গোবরবাবু, নী… বন্দ্যোপাধ্যায়।

●

গত ১৪ জুন শনিবার ওস্তাদ … উদ্দিন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের বর্ত… প্রাক্তন ছাত্রদের প্রচেষ্টায় ডেভিড … নার্শারী এন্ড কিন্ডারগার্টেন স্কুল… "বর্ষামঙ্গল" উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। … উৎসবে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদে… পাপিয়া ভৌমিক ও সুজাতা প… কণ্ঠসংগীতে এবং গীতশ্রী বন্দ্যো… গীটারে যথেষ্ট উৎকর্ষতার পরিচ… এই উৎসবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে … বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিপিপাঠ এবং … রায়চৌধুরী ও প্রশান্ত বন্দ্যোপা… সহযোগিতায়। —চি…

এ্যামেচার মেজাজী হেমেরী

ব নব রেকর্ডের খতিয়ানে ভরা সিকো ওলিম্পিকের কথা এখন প্রায় র মন থেকে সরে রয়েছে। যেসব মেক্সিকোতে হতগৌরব হয়ে ফিরে ছ, তারা সম্মান ফিরিয়ে আনার পরি- া নিচ্ছে। তেমনি কীর্তিমান এ্যাথ- ও কীর্তি রক্ষা বা উদ্ধারের কাজে নিয়োগ করেছে। মিউনিক ওলিম্পিকের তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এমনিতেই দেখা য়ে ওলিম্পিকের পরবর্তী বছরটি ধুলার জগতে যেন নতুন একটা উৎসাহ পনা নিয়ে আসে। রোম ওলিম্পিকের রী বছর ১৯৬১ সালে এগারটা র রেকর্ড ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং ও ওলিম্পিকের পরবর্তী বছর ১৯৬৫ ১৪টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড হয়। ৯ সালেও সেই একই ধারা আবর্তিত চলেছে—জুন পর্যন্ত ছ' মাসের বে অন্ততঃ তারই সূচনা দেখা যায়। মেক্সিকো ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক ী পোলভল্টার বব সিগ্রেণ তার নিজের উন্নত করেছেন ১৭ ফুট ৯ ইঞ্চি রে। অস্ট্রেলিয়ান দৌড়বীর রালফ ৮৮০ গজ দৌড়ে নতুন রেকর্ড ন এক মিনিট ৪৭'৯ সেকেণ্ড সময় হাই হার্ডল চ্যাম্পিয়ন উইল নপোর্ট ১২০ গজ ইণ্ডোর হার্ডল সেকেণ্ডে দৌড়ে নতুন নজীর ছেন।

কিন্তু এইসব চ্যাম্পিয়ানদের গৌরবকেও করে দিয়েছেন এক অজ্ঞাত নিগ্রো ীর কার্টিস মিলস। তিনি ৪৪'৭ ণ্ডে ৪৪০ গজ দৌড়ে নতুন রেকর্ডের করেছেন। এই দৌড়ের বিশ্ব-রেকর্ড সেকেণ্ড দু' বছর পর্যন্ত কেউ স্পর্শ পারেননি। আমেরিকায় নেশভিল এই অখ্যাত তরুণ কোয়ার্টার মাইল র খ্যাতনামা এ্যাথলীট লি ইভান্স ও জেমসকে হারিয়ে এই রেকর্ড করে কে বিস্মিত করেছেন। আর একজন নীয়া মার্টিন লিকোরি সম্প্রতি এক দৌড় প্রতিযোগিতায় জিম রিউনের খ্যাতনামা দৌড়বীরকে পরাজিত করে-

আরও এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন ভল্টার জন পেনেল। সম্প্রতি আমে- স্যাক্রামেণ্টোতে তিনি ১৭ ফুট সোয়া ঞ্চি ডিঙিয়ে নতুন বিশ্ব-রেকর্ড করে- প্রচলিত বিশ্ব-রেকর্ডের চেয়ে সোয়া ইঞ্চি বেশি উঁচুতে উঠে। পেনেল এক- ক্ষ পোলভল্টার কিন্তু ভাগ্য তাঁর প্রতি নয়। ১৯৬৪ সালে টোকিও পিকের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পেনেল একাদশ স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে তিনি প্রবল অনুশীলন চালান এবং ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো ওলিম্পিকে তিনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেছিলেন। ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক জয় করলেন সীগ্রেণ ১৭ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি অতিক্রম করে। পেনেলও ঐ উচ্চতা অতিক্রম করলেন। দুঃখের বিষয় পোলভল্টিং-এর পোল বা দণ্ডটি উচ্চতা-নির্ধারক বারের তলা দিয়ে চলে যায়। ফলে তাঁর লম্ফন বাতিল করে দেওয়া হয় এবং তিনি প্রতি- যোগিতা থেকে বঞ্চিত হন। আরও দুঃখের কথা যে বিধানের নজীরে তাঁর লম্ফন বাতিল করা হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ১লা মে থেকে সেই বিধান প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। তাই বড় খেদে পেনেল বলেছেন, "নতুন বিশ্ব-রেকর্ড করবার সৌভাগ্য হলেও ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক ভাগ্যে আছে বলে মনে হয় না। ১৯৭২ সালে মিউনিক ওলিম্পিকে যোগ দেওয়া সম্ভবপর নাও হতে পারে। তবে ১৭ ফুট উচ্চতা সর্বপ্রথম আমিই জয় করেছি এবং এখন ১৮ ফুট যাতে সকলের আগে পেরোতে পারি সেই সাধনায় ব্রতী হব।"

শঙ্করবিজয় মিত্র

এ্যাথলিট বা খেলোয়াড়েরা সকল দেশেই এমনিভাবে প্রস্তুত হচ্ছে, সব সময়ে তারা এগিয়ে চলবার চেষ্টা করছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের ক্রীড়াকৃতির বিষয়টিকে অবলম্বন করেই অর্থোপার্জনেরও প্রয়াস পাচ্ছে। ওলিম্পিকের আদর্শ অপেশাদার খেলাধুলো এখন কথার কথায় পর্যবসিত হয়েছে। আজকের এ্যাথলিট বা খেলোয়াড়দের অভিমত, "আমরা যেভাবে খেলাধুলোর ব্যাপারে সর্বাত্মকভাবে আত্ম- নিয়োগ করি, তাতে আমাদের রুজি- রোজগার হবে কোথা থেকে এবং আমাদের সংসার চলবে কেমন করে? আবার অনেকের মতে অপেশাদার খেলাধুলো আর চলতে পারে না, বিংশ শতাব্দীতে এটা সেকেলে হয়ে পড়েছে, কাজেই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। তাছাড়া বেশির ভাগ এ্যাথলীট নামে- মাত্র অপেশাদার—খুঁটিয়ে দেখলে খেলা- ধুলার কৃপায় তাঁরা যেভাবে দু হাতে পয়সা রোজগার করেন, তাতে তাঁদের আর অ- পেশাদার আখ্যায় ভূষিত করা চলবে না।

এই যখন অবস্থা তখন কিন্তু অন্ততঃ এমন একটি এ্যাথলিট আছেন যিনি ধ্যানে- জ্ঞানে, চিন্তায় ও মেজাজে পুরোপুরি অ-পেশাদার। ইনি হচ্ছেন মেক্সিকো ওলিম্পিকের চারশো মিটার হার্ডল রেসের স্বর্ণপদক বিজয়ী দৌড়বীর ডেভিড হেমেরি। তিনি খেলাধুলোর ব্যাপারে একটি পয়সাও গ্রহণ করেন না। মেক্সিকো ওলিম্পিকে অসাধারণ কৃতিত্ব ও সাফল্যের পর তিনি ব্রিটেনে ফিরে এলে যখন তাঁকে একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হয় এবং তার জন্যে টাকা দেবার প্রস্তাব রাখা হয়, তখন তিনি তা সরাসরি- ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। খেলাধুলোয় 'এ্যামেচার'-এর একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও আনন্দ আছে। হেমেরি অনুভব করেন যে আজকের দিনে তাঁর এ-মনোভাব অনেকের কাছে বিস্বাদ লাগবে এবং তারা তাঁকে সমালোচনা করতে পারেন। তবুও তাঁর মতে এ্যামেচাররা যেন এ্যামেচারই থাকে। এ্যামেচাররা পয়সা রোজগারের দিকে মন দিলে এ্যামেচারের মেজাজ ও মান দুই-ই নষ্ট হবে। খেলাধুলোকে তিনি একটা 'হবি' হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই চারশো মিটার হার্ডলের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড স্থাপন করেও তিনি শুধু এই রেসকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাইছেন না। তিনি খেলাধুলোকে পুরোপুরি আস্বাদ করার জন্যে ডেকাথলন প্রতিযোগিতার জন্যে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

জীবনের প্রতি পরিপূর্ণ আনন্দের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তাঁর এই মেজাজ গড়ে উঠেছে। ভাঙ্কুবারে ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ব- বিদ্যালয়ে জনশিক্ষার সহায়তা বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠনের জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রথমে তিনি শিক্ষকতার ট্রেনিং নেবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও ব্যাপকতর বিষয়ে আত্মনিয়োগের কথা ভেবে তিনি জনশিক্ষায় সহায়তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জীবনের প্রতি কাজ থেকে আনন্দ আহরণ ডেভিড হেমারিকে পরিপূর্ণ এ্যামেচার মেজাজ এনে দিয়েছে। কি শিক্ষা- ক্ষেত্রে, কি ক্রীড়াক্ষেত্রে এই আনন্দই তাঁকে উজ্জীবিত করে রাখে। বিজয়ী হওয়ার চেয়ে খেলতে পারাটাই তাঁর কাছে বড় কথা। ওলিম্পিকের মহান আদর্শে তাই তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী।

ডেভিড এই মেজাজ পেয়েছেন উত্তরা- ধিকার সূত্রে পিতা পিটার হেমেরির কাছ থেকে। পেশাতে তিনি একজন একাউণ্ট্যাণ্ট। ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য কয়েকবার তিনি বেশ খানিকটা সময় দেন এবং নিজের পেশা থেকে এতেই বেশি আনন্দ পান। পিটার একজন অল রাউণ্ড স্পোর্টসম্যান এবং

অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালীন তিনি উচ্চ লম্ফনে সেখানকার এ্যাথলীট মহলে নিজের একটা স্থানও করে নিয়েছিলেন। পিতাকে অনুসরণ করেই ডেভিড বেশ অল্পবয়সেই খেলাধুলোয় ঝু'কে পড়ে এবং ন' বছর বয়স থেকেই প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ে যোগ দিতে থাকেন। ল্যাংকাস্টারসায়ারের অন্তর্গত সাইরেন সেণ্টারে ১৯৪৪ সালে হেমেরির জন্ম হয়। হেমেরি আমেরিকায় হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন এবং প্রায় দশ বছর আমেরিকায় কাটায়। তবে ব্রিটেনে ১৯৫৬ সাল থেকে খেলাধুলোয় হেমেরির দক্ষতা প্রকাশ পায়। এগার বছর বয়সে ৪৪০ গজ দৌড়ে তিনি স্বাতন্ত্রের পরিচয় দেন ৬৮·৭ সেকেণ্ড সময় নিয়ে। ১৯৬৩ সালে ১১০ গজ হার্ডল রেসে ১৪·৭ সেকেণ্ডের সময় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে হেমেরি ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঐ বছরই হেমেরি মিডল্যান্ড চ্যাম্পিয়ানসিপের দৌড়ে ৪৪০ গজ হার্ডল রেসে ৫৮·৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পায়ে চোট লাগার ফলে পরের বছর হেমেরি দৌড়ে যোগ দেননি। তবে এই সময় আমেরিকায় বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান এবং সেখানকার ছাত্রজীবন তাঁর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। বোস্টনে থাকাকালীন খেলাধুলো সম্পর্কে যে ট্রেনিং হেমেরি লাভ করেন পরবর্তী জীবনে তাঁর পক্ষে সেটা সম্পদে পরিণত হয়। এরপর থেকেই হার্ডল রেসে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৬৬ সালে ১২০ গজ হার্ডলে এবং ১৯৬৮ সালে ৪৪০ গজ হার্ডলে হেমেরি চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৬৮ সালে ৪০০ মিটার হার্ডলে তাঁর সময় ছিল ৪৯·৬ সেঃ এবং ৪৪০ গজ রিলে রেসের অন্যতম দৌড়ানিয়া হিসেবে তাঁর সময় ছিল ৪৬·৮ সেকেণ্ড।

মেক্সিকোর ওলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রে হেমেরির অসাধারণ দক্ষতা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ৪০০ মিটার হার্ডল রেসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়ানিয়াদের হারিয়ে দিয়ে ৪৮·১ সেকেন্ড সময়ের নূতন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন। মেক্সিকো ওলিম্পিকের এই দৌড়টির মান এবার সর্বকালের সেরা মান বলে প্রমাণিত হয়েছে—কারণ প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকারীরা সকলেই পূর্বেকার রেকর্ড সময়কে কমিয়ে এনেছেন। হেমেরি পূর্ব বিশ্বরেকর্ড থেকে ·৭ সেকেন্ড সময় কম নিয়েছেন। তাঁকে পাল্লা দিতে হয়েছে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ভ্যান্ডারস্টক, মার্কিন চ্যাম্পিয়ান হুইটনি, ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ান রবার্টো ফিনোলি, টোকিও ওলিম্পিকের ফাইন্যালিস্ট গেরি নোক প্রভৃতির সঙ্গে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রবলভাবে লড়েই হেমেরিকে স্বর্ণস্বীকৃতি আদায় করতে হয়েছে।

অবশ্য এর জন্য তাঁকে শ্রম ও সাধনা করতে হয়েছে অসাধারণ রকমের। মেক্সিকো ওলিম্পিকে যোগদানের জন্যে তাঁকে ৬০ সপ্তাহের অবিচ্ছিন্ন শিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়েছে। এই ট্রেনিংয়ে অনেক কিছুই করতে হয়—বৃত্তাকার মাঠে ঘুরপাক খেতে হয়েছে অনেক, অনেকবার। মাঝে মাঝে একঘেয়েমি কাটানর জন্য লম্ফন, পোলভল্ট ইত্যাদি করতে হয়েছে। মেক্সিকো থেকে ফেরার পর বেশ কিছুদিন আনন্দউৎসবে, হৈহুল্লোড়ে, পার্টিতে ও জলসায় কেটেছে। ব্রিটেনবাসীরা তাদের প্রিয় হেমারিকে সম্মান ও ভালবাসা বর্ষণ করেছে প্রচুর। তাদের হেমেরি ক্রীড়াক্ষেত্রে বৃটেনের নাম আরও উজ্জ্বল করবে। এখন থেকেই তারই প্রস্তুতি চাই এবং কি ধরনের প্রস্তুতি হচ্ছে তা নিয়ে অনন্ত কৌতূহল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই কৌতূহলের জবাবেই জনৈক বন্ধুর কাছে হেমেরি বলেছেন—"ওলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয় ও বিশ্বরেকর্ড ভাঙার পর সেই একই বিষয়ে কিছু করতে যাওয়া মানেই পিছু হটা ছাড়া কিছু নয়। হয়ত ১৯৬৯ সালে কোন রেসে নিজের করা বিশ্বরেকর্ডের সময় আরও কিছুটা নামান সম্ভব হতে পারে, ৪৮·১ সেকেন্ডের জায়গায় ৪৭·৮ সেকেন্ড করা যেতেও পারে। কিন্তু তা করতে গেলেও সেই ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৮ সালের মতই প্রচন্ড ট্রেনিং নিতে হবে। এক সেকেন্ডের তিন দশাংশ সময় হ্রাসের জন্য আমার এত খাটাখাটুনি ভাল লাগে না। তবে আর একবার ৪০০ মিটার হার্ডলে প্রয়াস পাবার ইচ্ছে যে না আছে তা নয়। কিন্তু আপাততঃ ওটা বন্ধ রেখেছি।

বলতে বলতে মেজাজী ভাবটা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—"ডেকাথেলনটা আমার বেশ ভাল লাগে। দশ দশটা বিষয়, নানা বিভাগে দক্ষতা বাড়ে। ক্রীড়ানৈপুণ্যের সম্যক পরিচয় এই ডেকাথেলন। যখন যেটা ভাল লাগে তত সেটা অনুশীলন কর, একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার মহৌষধ বলা চলে। তা ছাড়া আমার কতকগুলো সুবিধেও রয়েছে। ১১০ মিটার হার্ডল, ৪০০ মিটার দৌড় বা ১৫০০ মিটার দৌড়েও আমার অসুবিধা নেই। আর হাইজাম্পেও ঐ ফসবেরির কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারলে সাড়ে ছ' ফুট লাফান অসম্ভব হবে না। ফসবেরির ঐ ক্লপটা যাতে আকাশে চিৎ হয়ে লাফ খাওয়া যায় সেটা আমার খুব ভাল লাগে। গত ট্রেনিং-এর সময় বোস্টনে আমার বে বিলি স্মিথ একঘেয়েমি দূর করবা পাল্টা রুটিন হিসেবে এই ফসবেরি কায়দা শিখিয়েছিলেন, ওটা আমা লাগেনি।"

এই বলে ডেকাথোলনের তালি নিজের সম্ভাব্য সাফল্যের একটা প্রবৃত্ত হলেন হেমেরি—'১০০ মিটা ১০·৮ সেকেণ্ডের কম সময়ে ৪০০ ৪৬·৫ সেকেণ্ডের মত, ১৫০০ দৌড়তে লাগবে এই ধরুন ৪ মিনি সেকেণ্ড, হাই হার্ডল ১৩·৮ লংজাম্প সাড়ে চব্বিশ ফুট পারবো। এক পোলভল্টটা আমার সম্পূর্ণ নূতন। তবে জোর ট্রেনিং ১১ ফুট লাফানো অসম্ভব হবে ব হয় না। তবে আমার প্রধান দুর্ব হলো ছোঁড়াছুড়ির বিষয়গুলো। শরীরটা একটু মোটাসোটা করে হবে, কিছু ওজন বাড়াতেই হবে। হয় সটপুটে ৪০ ফুট, ডিসকাসে ফুট এবং বর্শা ছোঁড়ায় ১৯৬ ফুট পারবো। জেভেলিনে ২০০ ফুট যাওয়া খুব একটা অসম্ভব কি হয় না।"

কথায় কথায় হেমেরি বলেছেন, সালে মিউনিক ওলিম্পিকে ডেক প্রতিযোগিতায় নামবার ইচ্ছে রয়েছে সেটা অনেক দূরের কথা। আপাততঃ যে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানসিপ যোগিতা এগিয়ে আসছে তাতে প্রধান বিষয় হবে ১২০ মিটার হার্ড ৪×৪০০ মিটার রিলে। এডিনবরায় কমনওয়েলথ গেমসে হেমেরি দুই প্রতিযোগিতা করার ইচ্ছে প্রকাশ ক

সাধারণতঃ ওলিম্পিকের স্বর্ণ সেরা সম্মান নিয়ে ফিরে এসে এ নিজের নিজের বিষয়ে আরও করেন এবং নিজের প্রভাব ও অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করে থাকেন। রীতি। হেমেরি সেদিক থেকে ব ক্রীড়াকৃতির পুরস্কারই তাঁর কাছে যে খেলায় আনন্দ এনে দিতে প্রতিযোগিতার জন্যই শুধু প্রতি সে খেলায় তাঁর মন সায় না। তাঁর এ্যামেচার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আহরণের উদ্দেশ্যে খেলা—এই দৃ বর্তমান বিশ্বের দুর্লক্ষ্য। ওলিম্পিকের আদর্শ আজ তাঁর মত মুষ্টিমেয় এ দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
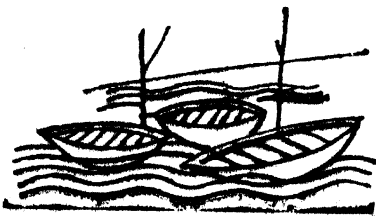
দর্শক

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় কোন খেতাব পাওয়ার গুরুত্ব টেনিসে বিশ্ব-খেতাব জয়। তবে সিংগলস খেতাব জয়ের কৃতিত্বই সব থেকে বেশী। বিভিন্ন দিক থেকে সদ্যসমাপ্ত ১৯৬৯ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার পর্যালোচনা এই সংখ্যায় করা হল।

অস্ট্রেলিয়ার বিরাট প্রাধান্য

১৯৬৯ সালে লেভারের সিংগলস খেতাব জয়লাভের ফলে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা গত ১৪ বছরের খেলায় (১৯৫৬—৬৯) মোট ১১বার এবং গত ৯ বছরে (১৯৬১—৬৯) ৮বার পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ী হলেন। লেভারকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ১০জন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ বছরের ইতিহাসে এপর্যন্ত ১৭বার পুরুষদের সিংগলস খেতাব পেলেন। এখানে উল্লেখ্য, উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম বিদেশী খেলোয়াড় হিসাবে পুরুষদের সিংগলস খেতাব পেয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ারই নরমান ব্রুকস, ১৯০৭ সালে। যুদ্ধোত্তর কালের ২৪টি প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬—৬৯) পুরুষদের সিংগলস খেতাব পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া ১২বার, আমেরিকা ৯বার এবং একবার করে ফ্রান্স, ইজিপ্ট এবং স্পেন।

বাছাই খেলোয়াড়দের বিপর্যয়

পুরুষদের সিংগলসের কোয়ার্টার ফাইনালে যে ৮জন খেলোয়াড় খেলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন ৭জন—১নং, ২নং; ৩নং; ৫নং ৬নং, ৭নং এবং ৮নং। বাছাই তালিকার ৭নং খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেননি। সুতরাং বাছাই তালিকা যাঁরা তৈরী করেছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী শতকরা নিরানব্বুই ভাগ মিলে যায়। সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলায় কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনার ছড়াছড়ি দেখা গেল। সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করলেন ১নং, ২নং ৫নং এবং ৬নং খেলোয়াড়। আর ফাইনালে উঠলেন ১নং এবং ৬নং খেলোয়াড়।

মহিলাদের সিংগলসের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ৮জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন এই ৬জন—১নং ২নং ৪নং ৫নং ৭নং ও ৮নং খেলোয়াড়। এঁদের মধ্যে সেমি-ফাইনালে উঠলেন তিনজন বাছাই খেলোয়াড় (১নং, ২নং এবং ৪নং)। আর ফাইনালে গেলেন ২নং এবং ৪নং বাছাই খেলোয়াড়।

১৯৬৯ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিংগলস খেতাব বিজয়িনী বৃটেনের শ্রীমতী অ্যান জোন্স।

বাছাই তালিকা অনুযায়ী যেখানে প্রতিটি বিভাগের ফাইনালে ১নং এবং ২নং বাছাই খেলোয়াড়ের খেলবার কথা এবং খেতাব জয়ের কথা ১নং খেলোয়াড় বা ১নং জুটির, সেখানে কি বিপর্যয় ঘটেছে তা ফাইনাল খেলার তালিকা দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়।

শেষ পর্যন্ত খেতাব পেয়েছেন পুরুষদের সিংগলসে ১নং বাছাই রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া), মহিলাদের সিংগলসে ৪নং বাছাই শ্রীমতী এ্যান জোন্স (বৃটেন), পুরুষদের ডাবলসে ১নং বাছাই জুটি জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া), মহিলাদের ডাবলসে ১নং বাছাই জুটি শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট এবং জুডি টেগার্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং মিকসড ডাবলসে ৪নং বাছাই জুটি শ্রীমতী এ্যান জোন্স (বৃটেন) এবং ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খেতাব জয়ের ব্যাপারে মাত্র দুটিক্ষেত্রে দারুণ বিপর্যয় ঘটেছে—মহিলাদের সিংগলস এবং মিকসড ডাবলস খেলায়।

লেভারের গ্রান্ড স্ল্যাম খেতাব

১৯৬৯ সালের উইম্বলেডন সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভারের দ্বিতীয়বার একই বছরে বিশ্বের চারটি প্রধান টেনিস প্রতিযোগিতার (অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান) সিংগলস খেতাব জয়ের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ১৯৬৯ সালে রড লেভার ইতিমধ্যেই তিনটি খেতাব পেয়েছেন, বাকী শুধু আমেরিকান খেতাব।

১৯৬২ সালে অপেশাদার খেলোয়াড়-জীবনে রড লেভার নীচের চারটি প্রতিযোগিতার সিংগলস ফাইনালে জয়ী হয়ে তাঁর প্রথম 'গ্র্যান্ড স্লাম' খেতাব পেয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ান সিংগলস—রড লেভার ৮-৬, ০-৬, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে রয় এমার্সনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ফ্রেঞ্চ সিংগলস—রড লেভার ৩-৬, ২-৬, ৬—৩, ৯—৭ ও ৬—২ গেমে রয় এমার্সনকে পরাজিত করেন।

উইম্বলেডন সিংগলস—রড লেভার ৬-২, ৬-২ ও ৬-১ গেমে মার্টিন মুলিগানকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

১৯৬৯ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার
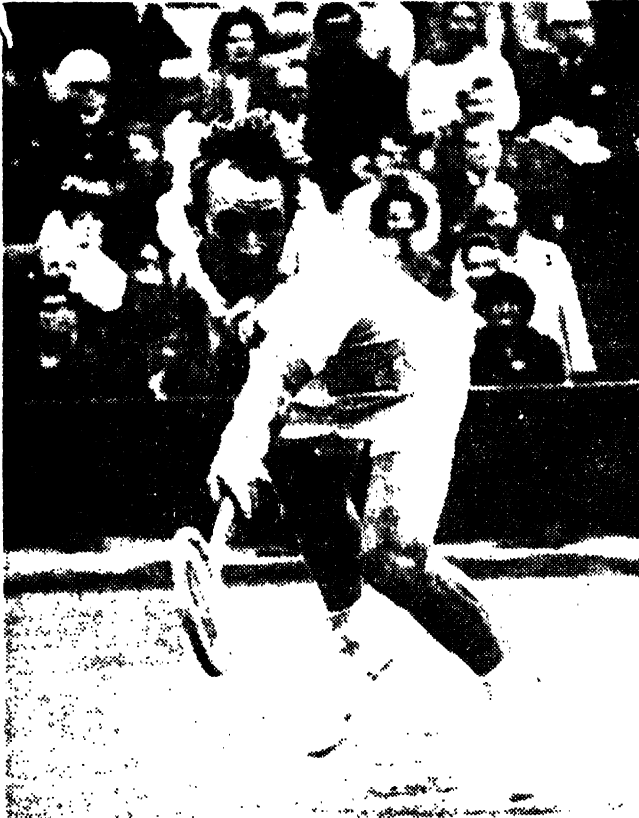
আমেরিকান সিঙ্গলস—রড লেভার ৬-২, ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে রয় এমার্সনকে পরাজিত করেন।

ন্যাটা খেলোয়াড়দের খেতাব জয়

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৯৩ বছরের ইতিহাসে মাত্র নীচের চারজন ন্যাটা খেলোয়াড় মোট ৮ বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। এ'দের মধ্যে আছেন অস্ট্রেলিয়ারই তিনজন এবং সর্বাধিক চার বার খেতাব জয়ী হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা খেলোয়াড় রড লেভার।

(১) ১৯০৭ ও ১৯১৪ সালে পরলোকগত স্যার নর্ম্যান ব্রুকস (অস্ট্রেলিয়া)।

(২) ১৯৫৪ সালে জরোশলাভ ড্রবনি (ইজিপ্ট)।

(৩) ১৯৬০ সালে নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)।

(৪) ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)।

সদ্যসমাপ্ত ১৯৬৯ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রধান পাঁচটি খেতাবের মধ্যে এই তিনজন ন্যাটা খেলোয়াড় চারটি খেতাব জয়ের সূত্রে ন্যাটাদের বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন —পুরুষদের সিঙ্গলসে রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া), মহিলাদের সিঙ্গলসে শ্রীমতী এ্যান জোন্স (বৃটেন), পুরুষদের ডাবলসে টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া) এবং মিক্সড ডাবলসে শ্রীমতী এ্যান জোন্স (বৃটেন)।

উইম্বলেডনের সুদীর্ঘ বছরের ইতিহাসে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে দুজন ন্যাটা খেলোয়াড় পরস্পর খেলেছেন এমন নজির আছে মাত্র দুটি—১৯৬০ সালের ফাইনালে রড লেভার এবং নীল ফ্রেজার (দুজনেই অস্ট্রেলিয়ার) এবং ১৯৬৮ সালের ফাইনালে রড লেভার এবং টনি রোচ (দুজনেই অস্ট্রেলিয়ার)।

পেশাদার বনাম অপেশাদার

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা শুধু অপেশাদার খেলোয়াড়দের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। ১৯৬৮ সালে উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় পেশাদার খেলোয়াড়রা তাঁদের যোগদানের প্রথম বছরেই অপেশাদার খেলোয়াড়দের একেবারে কোণঠাসা করে দেন। মোট পাঁচটি প্রধান খেতাবের মধ্যে গত বছর পেশাদার খেলোয়াড়রা পেয়েছিলেন চারটি খেতাব। এ বছর তাঁরা পাঁচটি খেতাব জয় করে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করেছেন।

টেনিস সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী জোন্স

১৯৬৯ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে বৃটেনের শ্রীমতী এ্যান জোন্স আজ আন্তর্জাতিক টেনিস আসরে সম্রাজ্ঞীর আসন লাভ করেছেন। তাঁর মানসিক এবং দৈহিক দৃঢ়তা নিঃসন্দেহে শ্রীমতী জোন্সকে দুর্দমনীয় মনোবল, সহিষ্ণুতা এবং সাধনার প্রতিমূর্তি বলা যায়। তাঁর চারিত্রিক গুণপনা অনুকরণযোগ্য। উইম্বলেডন আসরে গত দশ বছর তিনি সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে খেলেছেন ৮ বার এবং ফাইনালে ২ বার। ১৯৬৭ সালের ফাইনালে তিনি শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের কাছে হেরেছিলেন। এ বছর ফাইনালে শ্রীমতী কিংকে পরাজিত করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন। এ বছর খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় তাঁর স্থান ছিল ৪র্থ। সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পথে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন সেমিফাইনালে এক নম্বর বাছাই শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং ফাইনালে শ্রীমতী কিং (আমেরিকা)। শ্রীমতী কোর্ট সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন দুবার (১৯৬৩ ও ১৯৬৫) এবং শ্রীমতী কিং পেয়েছেন উপর্যুপরি তিনবার (১৯৬৬—৬৮)। অথচ শ্রীমতী জোন্সের উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয় এই প্রথম।

এখানে উল্লেখ্য, গত ৩৩ বছরের প্রতিযোগিতায় (১৯৩৭—৬৯) বৃটেনের পক্ষে মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন মাত্র এই তিনজন খেলোয়াড়—১৯৩৭ সালে ডোরথি রাউন্ড, ১৯৬১ সালে এ্যাঞ্জেলা মর্টিমোর এবং ১৯৬৯ সালে শ্রীমতী এ্যান জোন্স। সুতরাং শ্রীমতী জোন্স এই আন্তর্জাতিক টেনিস খেলায় বৃটেনের হৃত গৌরব আজ উদ্ধার করেছেন।

আন্তর্জাতিক টেনিস আসরে শ্রীমতী জোন্সের এই প্রথম খেতাব জয় নয়। তিনি ফ্রেঞ্চ খেতাব পেয়েছেন ২ বার এবং ইতালীয়ান খেতাব ১ বার। তাছাড়া আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি দুবার ফাইনালে খেলেছেন। হুইটম্যান কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি বৃটেনের পক্ষে ২১ বার খেলে সর্বাধিক বার খেলার রেকর্ড করেছেন।

শ্রীমতী জোন্সের আর এক পরিচয় আছে। তিনি তাঁর কুমারী জীবনে (এ্যান হেডন নামে) আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস আসরে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৯৫৭ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি তিনটি বিভাগের ফাইনালে

খেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত টেবল টেনিসের থেকে লন টেনিস খেলাই তাঁর খেলোয়াড়-জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে।

এ বছরের ইংরেজী নববর্ষে তাঁকে যে এম বি ই (মেম্বার অব দি বৃটিশ এম্পায়ার) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয় তিনি তার যথার্থতার পরিচয় অক্ষরে অক্ষরে দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের ভূমিকা

এ বছরের প্রতিযোগিতায় এই তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড় নাম দিয়েছিলেন—রামনাথন কৃষ্ণান, প্রেমজিৎলাল এবং জয়দীপ মুখার্জি। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণান নাম প্রত্যাহার করে নেন। জয়দীপ মুখার্জি প্রথম রাউন্ডেই আমেরিকার ডেনিস রলস্টোনের কাছে হেরে যান। ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় প্রেমজিৎলাল প্রথম রাউন্ডে আমেরিকার স্টীলকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউন্ডে এ বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান এবং এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রড লেভারের কাছে পরাজিত হন। তবে তাঁর পরাজয় মোটেই অগৌরবের নয়। তিনি প্রথম দুটি সেটে লেভারকে পরাজিত করে ২—০ সেটে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় তৃতীয় সেটে প্রেমজিৎলালের জয়লাভের অর্থ প্রতিযোগিতা থেকে লেভারের বিদায়। কিন্তু সেটের খেলার সময়ে প্রেমজিৎ লাল মাথায় পঙ্গু হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী তিনটি সেটে হেরে যান।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৩৬৯ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা বর্তমানে এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, তা মোটেই সুস্থ পরিবেশ বলা যায় না। ফলে একটা বাধা পড়ে নির্দিষ্ট খেলা বন্ধ হয়েছে। সুতরাং এ বছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার কপালে কি লেখা আছে তা একমাত্র বিধাতা পুরুষই বলতে পারেন। গত বছর প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড খেলার চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নি। সেদিক তাকিয়ে অনেকেই এ বছরের লীগ খেলা সম্পর্কে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

কথা আছে, লীগ তালিকার প্রথম চারটি দল 'সুপার লীগ' খেলায় অংশ গ্রহণের অধিকার পাবে। এ সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নি। তবে ইতিমধ্যে চারটি দল 'সুপার লীগ' খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে—ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, পোর্ট কমিশনার্স এবং বাটা স্পোর্টস ক্লাব। এই চারটি দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের এখনও একটি করে খেলা বাকী আছে। উভয় দলই ১৫টা করে ম্যাচ খেলেছে এবং সমান পয়েন্ট করে পেয়েছে। এদের পরস্পরের খেলা বাকী। পঞ্চম দল হিসাবে সুপার লীগ খেলবার সম্ভাবনা আছে ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং বি এন আর দলের। ইস্টার্ণ রেলওয়ে ১৬টা খেলে ২০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তার কোন খেলা বাকী নেই। তার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী বি এন রেলওয়ের ১৫টা খেলায় ১৯ পয়েন্ট উঠেছে। খেলার এই অবস্থায় বি এন আর তার শেষ খেলায় জিতলে সুপার লীগ খেলবার অধিকার পাবে। বি এন আর দলের হার হলে ইস্টার্ণ রেল দল অগ্রগামী হবে আর খেলা ড্র হলে উভয় দলের পয়েন্ট সমান হবে।

দাবার আসর

গত সপ্তাহে স্পাসকির জীবনী নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছি।

স্পাসকির সামনে ভবিষ্যত এখনো বহুবিস্তৃত। দাবাজগত তাঁর বহু সুন্দর সুন্দর খেলা দিয়ে সমৃদ্ধতর হবে, এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়। এবার তাঁর কয়েকটি খেলা দিলাম। প্রথম খেলাটিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডেনমার্কের বেন্ট লারসেন। সতেজ খেলোয়াড় হিসেবে লারসেনের নাম আছে। খেলাটিও তাই হয়েছে বেশ চিত্তাকর্ষক। শেষ পর্যন্ত লারসেনের ঘোড়া দূরে গিয়ে বসে থাকাতেই কাল হোলো। প্রথম আটটা চাল বেশ শান্তিপূর্ণ। তারপরেই ৯নং চালে স্পাসকি গজ ঘোড়া ওয়ে ওঠার সংগে সংগে সুরু হয়ে গেল চোরা চালের খেলা। দুজনেই খেলায় প্রচন্ড রিস্ক নিলেন। তাড়াতাড়ি করতে গেলেই কালোর হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যেমন, কালো আপাতমধুর চাল হিসেবে ২৫...... ঘ রা ৭ কিঃ হলে ২৬ ন×ঘ—ম×ম ২৭ ন×ন কিঃ ইত্যাদি হতো।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সাদার ৩১ নং চাল ন-গ ১ হবার পরে কালো মন্ত্রী বদলালো না। তাহলে হয়তো কালো আলগা মন্ত্রী বড়ের বিরুদ্ধে সাদা হয়তো খেলা পেত। শেষ পর্যন্ত সাদা হার মেনে নিল কারণ যদি (৪১) ম ঘ ২ কিঃ, রা ন ৩, (৪২) ম×ন—ম ঘ ৮ কিঃ মাঃ।

সাদা—বেন্ট লারসেন (ডেনমার্ক)
কালো—বোরিস স্পাসকি (রাশিয়া)
ইংলিশ ওপনিং

(১) ব ম গ৪—ব রা ৪ (২) ব রা ঘ ৩—ঘ ম গ ৩ (৩) গ ঘ ২—ব রা ঘ ৩ (৪) ঘ ম গ ৩—গ ঘ ২ (৫) ব রা ৩—ঘ রা ২ (৬) রা ঘ রা ২—০০ (৭) ০-০—ব ম ৩ (৮) ব ম ৪—ব×ব (৯) ব×ব—গ ঘ ৫ (১০) ব গ৩—গ গ ৪ (১১) ব রা ঘ ৪—গ গ ১ (১২) গ গ ৪—ব ম ৪ (১৩) ঘ গ ৫—ব ঘ ৩ (১৪) ঘ ঘ ৫—গ ম ন ৩ (১৫) ঘ×ব —গ×ঘ (১৬) ম×গ —ঘ×ব (১৭) ম ম ৩—ন গ ১ (১৮) ব×ব—ব×ব (১৯) গ রা ৩—ঘ (২)-গ ৩ (২০) ঘ ন ৬—ন রা ১ (২১) রা ন রা ১—ঘ রা ৩ (২২)
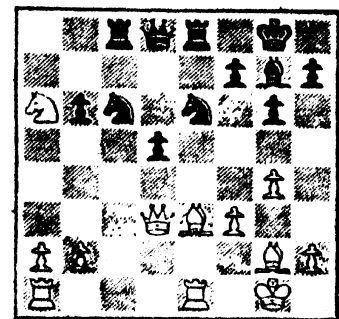
স্পাসকি

লারসেন

কালোর ২১ নং চালের পরের অবস্থা

ব গ ৪—ম ন ৫ (২৩) গ×ঘ ব—গ×ব (২৪) ম ন ঘ ১—ঘ×ব (২৫) ম রা ঘ৩—ম গ ৩ (২৬) ব ঘ ৫—গ ম ৫ কিঃ (২৭) রা ন ১ —ন×ন কিঃ (২৮) ন×ন—ম গ ৪ (২৯) ন রা গ ১—গ×গ (৩০) ন×ঘ —ম রা ৪ (৩১) ন গ ১—ন রা ১ (৩২) ম রা গ ৩—ঘ ম ১ (৩৩) ম ম ঘ ৩—গ রা ৬ (৩৪) গ×ব—ঘ রা ৩ (৩৫) ঘ ঘ ৪—ম×ব (৩৬) ঘ গ ৬—ঘ গ ৫ (৩৭) গ গ ৩—গ গ ৪, (৩৮) ম গ ২—ন রা ৬ (৩৯) ম ঘ ১—ম×গ (৪০) ম ঘ কিঃ—রা ঘ ২। সাদার হার স্বীকার।

দ্বিতীয় খেলাটি স্পাসকির একটি সুন্দর আক্রমণাত্মক খেলা।

সাদা — স্পাসকি
কালো — ইভান্স

কিংস ইন্ডিয়ান ডিফেন্স। ভার্না ১৯৬২।

(১) ব—ম ৪ ঃ ঘ—রা গ ৩ (২) ব—ম গ ৪ ঃ ব—রা ঘ ৩ (৩) ঘ—ম গ ৩ ঃ গ—ঘ ২ (৪) ব—রা ৪ ঃ ব—ম ৩ (৫) ব—গ ৩ ঃ ব—গ ৩ (৬) গ—রা ৩ ঃ ব—ম ন ৩ (৭) ম—ম ২ ঃ ব—ম ঘ ৪ (৮) ০—০—০ ঃ ব×ব?

ম গ ঘরে কালো তখনি বড়ে বদলাবে যখন এই চালটির ফলে খুলে যাওয়া ম ঘ ফাইলে কালোর খেলা সুরু হয়ে যাবে। বর্তমান ক্ষেত্রে এই চালের ফলে সাদার গজটাই একটী ভাল ঘরে উঠে এল।
(৯) গ×ব ঃ ০—০ (১০) ব—রা ন ৪! ঃ ব—ম ৪?

ছকের কেন্দ্রে এই বিপরীত আক্রমণ বড় দেরী হয়ে গেছে। কালোর উচিৎ ছিল ১০...ব—রা ৪ চালটী দিয়ে দেখা।

(১১) গ—ঘ ৩ ঃ ব×ব (১২) ব—ন ৫! সাদা নিজের বড়ে খোয়া যাচ্ছে বলে মোটেই ভয় পাচ্ছে না। সে তার বড়ের শিকলের সব কটী বড়েই খাইয়ে দিয়ে আক্রমণাত্মক টেম্পি লাভ করছে।

১২...ব×গ ব (যদি ১২...ঘ×ব, তাহলে ১৩ ব—ঘ ৪ ঃ ঘ—গ ৩ ১৪ গ—ন ৬। ১৩...ঘ—ঘ ৬ হলে ১৪ ন—ন ৩)।

(১৩) ন ব×ব ঃ ন ব×ব (১৪) গ—ন ৬ ঃ ব×ব (১৫) ন—ন ৪

ইভান্স
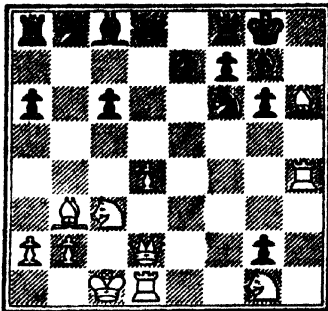
স্পাসকি

সাদার ১৫নং চালের পরের অবস্থা।

(১৫)...ঘ—ঘ ৫। [যদি ১৫...ঘ—ম ৪, তবে ১৬ গ×গ ঃ রা×গ ১৭ ম—ন ৬+, রা—গ ৩ ১৮ ন—গ ৪+ ঃ ঘ×ন ১৯ ঘ—রা ৪+ঃ রা—গ ৪ ২০ ম—ঘ ৫+ ঃ রা×ঘ ২১ ম—রা ৫ + +। অথবা, ১৮...গ—গ ৪ ১৯ ঘ—রা ৪+, রা—রা ৩ ২০ ন×গ ঃ রা×ন ২১ ম—ন ৩+ এবং ২২ ম—গ ৩ + +]

(১৬) গ×গ ঃ রা×গ (১৭) ম×ব ঃ ঘ ন ৩ (১৮) ঘ—গ ৩ ঃ ঘ—গ ৪। (তা নাহলে সাদা ১৯ ম ন—ন ১ এবং ২০ ম—ম ২ অথবা ১৯ ঘ—রা ৫ এবং গ×ব চাল দিত।)

(১৯) ন—ন ২ ঃ ম—ম ৩ (যদি ১৯ ঘ—রা ৬ তাহলে ২০ ম—ঘ ৫। চালেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। অন্যদিকে, ১৯...ন—ন ১ চাল হলে আসত ২০ ম ন—ন ১ ঃ ন×ন ২১ ম×ন ইত্যাদি)

(২০) ঘ—রা ৫ ঃ ঘ—ম ২ (২১) ঘ—রা ৪ ঃ ম—গ ২ (২২) ম ন—ন ১ ঃ ন—রা ঘ ১ (২৩) ন—ন ৭+ ঃ রা—গ ১ (২৪) ন×ব+ঃ রা—রা ১ (২৫) ম×ব! ঃ ঘ×ঘ (২৬) ন—গ ৮+ কালোর হার স্বীকার।

সব শেষে উপস্থাপিত করছি পেত্রো-সিয়ান বনাম স্পাসকির ১৯৫৬ সালের একটি খেলা। এই খেলাটি আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত ক্যান্ডিডেট্‌স্‌ টুর্ণামেন্টে হয়েছিল। তখন এঁরা কেউই বিশ্ব-চাম্পিয়ন হন নি। খেলাটিকে টুর্ণামেন্ট বইতে ডঃ ম্যাক্স ইউভে বলেছেন, দাবার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ খেলাগুলির অন্যতম।

সাদা — পেত্রোসিয়ান
কালো — স্পাসকি
আমস্টার্ডাম, ১৯৫৬

(১) ঘ—রা গ ৩, ঘ—রা গ ৩ (২) ব—ম গ ৪, ব—রা ঘ ৩ (৩) ব—রা ঘ ৩, গ ঘ ২ (৪) গ—ঘ ২, ০—০ (৫) ০—০, ব—ম ৩ (৬) ঘ—ম গ ৩, ঘ—ম গ ৩ (৭) ব—ম ৩, ব—ম ন ৩ (৮) ঘ—ম ২, ন—ঘ ১ (৯) ব—ম ন ৩, ঘ—রা ১ (১০) ব—রা ৩, গ—ম ২ (১১) ম—গ ২, ব—রা গ ৪ (১২) ব—ম ঘ ৪, ব—রা ৪ (১৩) গ—ঘ ২, ব—রা ঘ ৪ (১৪) ঘ—ম ৫, ঘ—রা ২ (১৫) ঘ×ঘ+, ম×ঘ (১৬) ব—গ ৪, ঘ গ ৩ (১৭) ম ন—রা ১, ব—ন ৩ (১৮) ঘ—গ ৩, ঘ—ন ২, (১৯) গ—মগ, ৩—ন(ঘ ১) রা ১ (২০) ম—ঘ ২, গ—রা গ ৩ (২১) ব—ঘ ৫!,

স্পাসকি
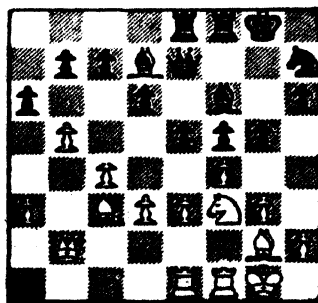
পেত্রোসিয়ান

সাদার ২১ নং চালের পরের অবস্থা

২১...ন ব×ব (২২) ব (ম গ ৪) ম ঘ ২ (২৩) ব×রা ব, ম ব×ব (ব—ম ৪!, ব—রা ৫ (২৫) ঘ—রা গ×ঘ (২৬) ব×গ, গ—রা ৩ (২৭) ব ৪, ম—ঘ ৩ (২৮) ম—ঘ ১, গ—ম (২৯) ব×ব, ন×ব (গ ৪) (ন×ন, ম×ন (৩১) ম—ম ১, ম—ব (৩২) ম—ন ৫, ন—রা ২(৩৩) গ—ন ব—ঘ ৫ (কালো সাদার একনিষ্ঠ আ ব্যাহত করার জন্য একটি বড়ে বিস দিচ্ছে।) (৩৪) গ×ব, ন—ঘ ২ (ব—ন ৩, ম—রা ২ (৩৬) গ—ঘ ৪, ২ (৩৭) রা—ন ১? (এতক্ষণ ন খেলার পর এই চালকে ট্রাজিডি আর কি বলব? ন—ম ১ চালে সহ জয় হোত।) (৩৭)...গ—রা ৩ (ন—ম ১, গ×গ! (৩৯) ম×গ, ম (৪০) ব×ম, ঘ—ঘ ৫ (৪১) রা—ঘ ঘ—রা ৩ (৪২) রা—ন ৩, ন—গ (৪৩) ব—ঘ ৫, ব×ব (৪৪) রা—ঘ ব—ঘ ৩ (৪৫) ব—ন ৪ (রা ন ৫ চাল বোধ হয় আরো ভাল ছিল), রা—ঘ (৪৬) রা—ন ৫, ব—ঘ ৫ (৪৭) রা রা—ঘ ৩ (৪৮) ব—ন ৫, ৪ ব×ব (৪ গ×ব, ন—গ ৭ (৫০) গ×ব (সা জয়ের জন্যে শেষ চেষ্টা), ঘ×গ (৫ ন—ম ৬+, রা—ঘ ২ (৫২) ব—ঘ ঘ—রা ১ (৫৩) ন—ম ৮, ন—ম ঘ (৫৪) ন×ঘ, ন×ব (৫৫) রা—গ ৪, গ ২ (৫৬) ন—ম ন ৮, রা—রা ২ (৫ ন—ন ৭+, রা—রা ১ (৫৮) রা×ব, ন ৪+, (৫৯) রা—গ ৫, ন—ঘ ৬ (৬ ন—রা ঘ ৭, ন—ঘ ৩ (৬১) ব—রা রা—গ ১ (৬২) ন—ম ন ৭, ন—ঘ (৬৩) ন—ম ৭, রা—রা ১ (৬৪) ন—ম ন—ঘ ৪ (৬৫) ন—রা ন ৬, ন—ন (৬৬) ন—ম ঘ ৬, রা—রা ২ (৬ ন—ঘ ৭+, রা—রা ১ (৬৮) রা—গ ন×ব (৬৯) রা—রা ৬, রা—গ ১ (৭ ন—ঘ ৮+, রা—ঘ ২ (৭১) রা—ম রা—গ ২ পারস্পরিক সম্মতিতে ড্র।

—গজানন্দ ঘো

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধাবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১ম বর্ষ ১ম খণ্ড

১২ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 25th July, 1969 শুক্রবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৭৬ 40 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

বইকুণ্ঠের খাতা

আমি আপনাদের অমৃতে পত্রিকার একজন গ্রাহক। এখন পত্রিকাটির অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমি এবং আমার বন্ধুরা "বইকুণ্ঠের খাতার" লেখাগুলি বিশেষভাবেই উপভোগ করছি। বিশেষ প্রতিনিধি মহাশয় মাঝে মাঝে বেশ মজার খবর দেন। এই সংখ্যায় পড়লুম, ও সি গাঙ্গুলি মহাশয়ের 'ভারত শিল্পকথা' ও 'আমার কথা' বইটির লেখার কথা। আমি তাঁর নাম শুনেছি কয়েক মাস আগে তাঁর রাগ ও রাগিণী নামে একটি বই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আপনাদের বিশেষ প্রতিনিধির লেখা পড়ে এই বৃদ্ধ মানুষটির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আগের সংখ্যায় যোগেশ বাগল মহাশয়ের সম্পর্কে একটা লেখা আপনারা প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ প্রতিনিধি মহাশয় বেশ রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দেখার চোখ আছে। শহরের মধ্যে থেকেও বাগল মহাশয় যে মনের দিক দিয়ে শহুরে হয়ে যাননি তা তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। শিয়ালদহ থেকে নব ব্যারাকপুরের দূরত্বের ইঙ্গিত তিনি ভালভাবেই তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ও সি গাঙ্গুলি মহাশয় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি 'রূপম' পত্রিকা সম্পর্কে এতকথা কেন লিখেছেন। বুঝতে পারলুম না। তবে ভদ্রলোকের লেখার ভাষাটি চমৎকার। আমি সাহিত্যিক নই। মাঝে মাঝে গল্প ও কবিতা পড়ি। তরুণদের লেখা পড়ে আমি আনন্দ পাই। বিশেষ প্রতিনিধি মহাশয়কে অনুরোধ করি তিনি তাঁদের সম্পর্কে যদি লেখেন তাহলে বেশ ভাল হয়, এবং আনন্দ পাই।

সঞ্জয় রায়চৌধুরী
কলিকাতা—৪২

সূর্য কাঁদলে সোনা

শ্রীমতী মল্লিকা মৈত্রের ২৬শে আষাঢ় সংখ্যার অমৃত-এ প্রকাশিত চিঠিটি পড়ে আমার মত সাধারণ পাঠক একটু বোধহয় বিভ্রান্তই হবেন এ চিঠির উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে।

পেরু সম্বন্ধে একাধিক বই নিশ্চয় লেখা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রবাদটি 'সূর্যের ঘাম সোনা' এইভাবে কোথাও দেওয়া আছে, এমন একটি প্রমাণও উপস্থিত করলে আমরা উপকৃত হতাম। তা না করে শুধু সেসব বই দেখতে পারলে হয়ত কোথায় কি পাওয়া যেতে পারত এ ধরনের নিরর্থক জল্পনাকল্পনা আমাদের শুনিয়ে লাভ কি?

Conquistadores দের প্রথম পদার্পণের সময় সেদেশে 'লিমা' বলে কোনো শহর ছিল না—প্রেমেন্দ্রবাবুর এ উক্তি সম্বন্ধে লেখিকার 'সে কথা হয়ত ঠিক' মন্তব্যটিও বিস্ময়কর। 'হয়ত ঠিক' বলবার মত অনিশ্চিত ব্যাপার এটা ত নয়। যেকোনো Reference বই দেখলেই সত্য নির্ণয় সম্ভব। প্রেমেন্দ্রবাবুর উত্তরটি পড়বার পর আমি 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'তেই পেয়েছি,—

'Lima was founded as the city of the Kings by Francisco Pizarro on June 17, 1535 on the left bank of the Rimac'

সে দেশের নাম যে তখন পেরু ছিল না এ তথ্য পরিবেশনেরও প্রয়োজন বুঝলাম না। সেরকম কোনো প্রশ্ন ত ওঠেনি। পেরুর নাম যে তখন 'তাভানতিনসুয়ু' ছিল 'সূর্য কাঁদলে সোনায়' বহুবার তার উল্লেখ পেয়েছি।

অমলকুমার সেন
কলকাতা—১৯

সাহিত্যের সংগী

আপনারা যাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' পড়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি পারিবারিক ছবি। এর মধ্যে রয়েছেন কবির মেজদা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিদাদা—অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং কবির সাহিত্যের অনুপ্রেরণাদায়িনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী।

এই ছবিটিরই বিপরীত দিকে আর একটি 'ছেলেবেলা'র ছবি আছে। এর মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, সোমেন্দ্রনাথ, শ্রীকণ্ঠ সিংহ এবং কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। কবি এই ছবিটির 'শ্রীকণ্ঠ সিংহ' ও 'আমরা তিনটি বালক' এই নামকরণ করেছেন।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল প্রথম ছবিটি। প্রথম ছবিটিকে নিয়ে আমার মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকদের অবগতির জন্য এই আলোচনার অবকাশ।

সংশয় উপস্থিত হয়েছে একই 'ফোটো'র দুটি রূপ দেখে। যাঁরা বিশ্বভারতী প্রকাশিত সপ্তদশ খণ্ড রচনাবলী পড়েছেন তাঁরা উপরোক্ত ছবিটির 'সাহিত্যের সংগী' ক্রমানুযায়ী পরিচিতি দেখবেন এইভাবে—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (পিছনে) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাদম্বরী দেবী। আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণেও ফোটোটির ক্রমানুযায়ী নাম রয়েছে একইভাবে। কিন্তু দুটি ছবি 'নেগেটিভে'র দুই বিপরীত দিক থেকে নেওয়ায় একই ব্যক্তিকে দুটি ছবিতে দুটি নামে পরিচিত করা হয়েছে। যেমন, বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রচনাবলীতে যাঁকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বলে অভিহিত করা হয়েছে জন্মশতবার্ষিক সংস্করণে তাঁকেই কাদম্বরী দেবী বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবেই কাদম্বরী দেবী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বলে অভিহিত হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ফোটো'র মধ্যস্থলে থাকায় তাঁদের কেবল ডান বাঁয়ের হেরফের হয়েছে।

এখন আমার বক্তব্য হল—আমরা যাঁরা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বা কাদম্বরী দেবীর মুখের আদলের সঙ্গে পরিচিত নই তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য দুই প্রকাশনের মধ্যে কোন্ ছবিটির পরিচিতি ঠিক এবং কোন্‌টি ভুল তা জানিয়ে দিতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তথা রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদকদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

শিশিরকুমার সিংহ
রিসার্চ স্কলার, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়।

মানুষ গড়ার ইতিকথা

সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠিকা। সাগরপারের দূর প্রবাসে এক একটি সংখ্যা অমৃত যখন হাতে এসে পড়ে, তখন কি আনন্দে যে সারা মন ভরে উঠে বলে বোঝান যাবে না। নতুন বছরের ২রা জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা থেকে মানুষ গড়ার ইতিকথা নামে আপনারা যে নতুন বিভাগটি শুরু করেছেন তা' নিঃসন্দেহে অনবদ্য। সন্ধিৎসুর সাবলীল আর দরদী লেখার গুণে বিদ্যায়তনগুলির ইতিবৃত্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এক একটি বিদ্যায়তন সত্যিই জাতীয় জীবনে এক একটি দীপশিখা, অনেক ঘরে জেলেছে যে অমরতার অম্লান জ্যোতি। জাতির নবজাগরণের ধারাকে অনুসরণ করতে হলে তাই তার এই অজানা ইতিহাসকে জানার প্রয়োজন আছে। মানুষ গড়ার ইতিকথায় সেই বিস্মৃত স্বল্পালোকিত অতীতকে আজকের যুবমানসের সামনে ধরে দিয়ে অমৃত পত্রিকাগোষ্ঠী বিশেষ করে সন্ধিৎসু এক পথিকৃতের ভূমিকা নিলেন। এই আগমনকে স্বাগত জানাতে পেরে নিজেই গৌরবান্বিত বোধ করছি।

মিত্রা দাস,
অটোয়া, কানাডা।

রাজপুত জীবনসন্ধ্যা প্রসঙ্গে

রমেশ দত্তের রাজপুত জীবনসন্ধ্যার চিত্ররূপ আমরা প্রথম থেকে পড়ে আসছি। এই ধারাবাহিক উপন্যাসটির প্রতিটি চরিত্রই যেন জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটির সঙ্গে যে অনেক পুরনো ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। উপন্যাসটির চিত্ররূপ পড়ে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও চিত্র সেনকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এইরকম আরও গল্প ও উপন্যাস যদি অমৃতে নিয়মিত প্রকাশিত হয় তাহলে অতি সহজেই অমৃত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আশা করি।

অর্ধেন্দু ব্যানার্জি, নারায়ণ মুখার্জি,
কলাবাড়ী চা-বাগান, জলপাইগুড়ি।

সাধনা সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ

অমৃত বর্তমান সংখ্যায় অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য লিখিত সাধনার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ পড়লাম। অমিত্রসূদনবাবুর প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। বিভিন্ন স্কুলের পরিচয় লিখন মানুষ গড়ার ইতিহাসের মতো, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের কথা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলে আরও ভাল হয়।

সাহিত্যে স্থায়ী আসন সবই পান না, কিন্তু এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা শুধু সাহিত্য সৃষ্টিই করেন না, উৎকৃষ্ট সাহিত্য প্রকাশের দায়িত্ব বহন করে চলেন, তাঁদের ভুলে গেলে তাঁদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা হবে।

বাংলার বহু পত্রপত্রিকা আছে, যা শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেই চলেনি, সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রও তৈরি করে দিয়েছে। এই সব প্রচেষ্টা যাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে তাঁদের ভুলে গেলে চলবে না। তাঁদের তুলে ধরতে হবে। এবং এর জন্যই দরকার বিভিন্ন কালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের নিয়ে সুষ্ঠু সুন্দর আলোচনা।

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত,
ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে

কিছুদিন পূর্বে 'অমৃতের' (৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা) সম্পাদকীয় বিভাগে আপনি 'দেশবিদেশে রাষ্ট্রভাষা' নামক প্রবন্ধে হিন্দী ভাষার জবরদস্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তার স্বপক্ষে আমি এখানে একটি ঘটনা বিবৃত করব—যা আপনার আলোচনার যথার্থতা প্রমাণ করবে। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি অল ইণ্ডিয়া স্পেশ্যাল সামার ইনস্টিটিউট (ফর কলেজ টিচার্স)-এ যোগ দিতে হিন্দী এলাকার কোনও একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। ছ' সপ্তাহের এই ইনস্টিটিউটের শেষভাগে হঠাৎ একদিন ডিরেক্টর মহোদয় ক্লাসে এসে বললেন, যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে নাকি হিন্দীতে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নির্দেশ এসেছে। পরদিন যথারীতি ক্লাসে এসে তিনি ফিজিক্সের একটি বিষয়ের উপর হিন্দীতে বক্তৃতা শুরু করলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হওয়া মাত্র দক্ষিণ অঞ্চলের দু'জন সদস্য ক্লাস ত্যাগ করে চলে গেলেন (এতে পরে হিন্দীভাষীদের উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা গেছে)। আমরা পূর্বাঞ্চলীয় ক'জন বোকার মত বক্তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। বক্তৃতার দু' একটি ইংরাজি শব্দ ছাড়া একটি বর্ণও আমাদের বোধগম্য হয় নি। আমরা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি, কিসের জন্য সর্বভারতীয় এই ইনস্টিটিউটে হিন্দীতে বক্তৃতা দেওয়ার এই প্রচেষ্টা। এতে কি জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হচ্ছে না? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এই নির্দেশ কি ভারতের সংবিধানবিরোধী নয়?

বিজয়কুমার ধর,
এস. এস. কলেজ,
হাইলাকান্দি, আসাম।

দাবার আসর

গত শুক্রবার ৪ঠা জুলাই তারিখে প্রচারিত 'দাবার আসর' বিভাগটি খুব ভাল লাগল। বর্তমানে প্রচারিত অন্য কোন পত্রিকায় এই ধরনের বিভাগ চোখে পড়েনি, তাই অমৃত পত্রিকার এই নতুন বিভাগটি অভিনব মনে হল। আমাদের মত যাঁরা নতুন দাবা খেলা শিখেছেন তাঁদের কাছে আশা করি এই বিভাগটি খুব শিক্ষাপ্রদ হবে। আপনাদের পত্রিকায় প্রচারিত এই নূতন বিভাগটি খোলার জন্য অজস্র ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি এই বিভাগটি আপনারা চালু রাখবেন।

শ্রীস্বপন সরকার
নিউ আলিপুর
কলকাতা—৫৩

ঘটমান বর্তমান

আমি অমৃত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। প্রায় ৬।৭ বৎসর যাবত পড়তেছি। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে বসে থাকি। এই পত্রিকায় ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা আমার খুব পছন্দ হয়। গত ২০।৬।৬৯ তারিখে অজিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "ঘটমান বর্তমান" গল্পটি পড়ে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। বিনীতার চরিত্রটি আমার পছন্দ হয়েছে। সত্যিই এই সামান্য ছোটগল্পের মধ্যে এই সুন্দর সৃষ্টি করে আমাদের অজিতবাবু বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যাইহোক লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। এই পত্রিকার প্রচুর প্রচার ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

রঞ্জনকুমার মুখোপাধ্যায়,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,
কটক—২।

অ লোকপর্ণা

সুপ্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'আলোকপর্ণা' ধারাবাহিকভাবে 'অমৃতে' পড়ছি। মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী বিকাশ কর্তব্য ও প্রেমের টানা-পোড়েনে রক্তাক্ত মনীষা, সূর্যমুখী সুবর্ণা, পাগলা মেজদা, পড়ন্ত বনেদীয়ানার প্রতিনিধি শশাংক নিয়োগী, ভুঁইফোড় বড়লোক কানাই পাল ইত্যাদি অনেক চরিত্র ও তাদের মানসিকতা মনে দাগ কাটে। মফঃস্বল শহরের দলাদলি লেখক নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত, এসব শহরে ঘোঁট পাকানো ও দলাদলি করা একটি অতি সুপরিচিত দৃশ্য এবং এতে রাজনৈতিক নেতৃগণও সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করেন। তবে এসব শহরের বাসিন্দাগণ আদর্শ ও গঠনমূলক কাজের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ও উৎসাহী – তাও ভুললে চলবে না। মফঃস্বল শহরের পড়ন্ত বনেদীয়ানার চিত্রটিও একেবারে খাঁটি। সেখানে পলেস্তারা-খসা বিশাল পুরানো ভাঙ্গা বাড়ীতে শশাংক নিয়োগীর মতো লোকেরা নিজেদের জগতে বাস করেন এবং কানাই পালের মতো ভুঁইফোড় বনেদীয়ানাহীন বড়লোকদের সঙ্গে প্রতি পদে তাদের শত্রুতা জন্মে। এসব বাড়ীতে সুবর্ণার মতো কত ফুল দৃষ্টির অগোচরে ফোটে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই উপন্যাসটিতে মফঃস্বল শহরের চিত্রটি সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। উপন্যাসটির আঙ্গিকও চমৎকার এবং ভাষা সংবেদনশীল ও ঝরঝরে।

অজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়,
কলকাতা—৪০।

অন্য চোখে

বাংগালোর অধিবেশনে কংগ্রেসের নেতৃত্বের কোদল আদর্শগত লড়াইয়ের রূপ পরিগ্রহ করে সংগঠনের মধ্যে যে সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছিল, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নাটকীয়ভাবে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের হাত থেকে অর্থমন্ত্রক কেড়ে নিয়ে সেই ঠান্ডা লড়াইকে প্রকৃত ক্ষমতাদখলের সংগ্রামে রূপান্তরিত করেছেন। এখন আর পরোক্ষ সংগ্রাম নয়, একেবারে সম্মুখ সমর। একেবারে Frink war policy গ্রহণ করে শ্রীমতী গান্ধী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হল আগেই আক্রমণ করে বসা। প্রধানমন্ত্রী মনে হয় সেই সুবর্ণপন্থাই গ্রহণ করে তাঁর বিরোধীদের ঘায়েল করার চেষ্টা করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় পদক্ষেপ আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনকে প্রায় দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশে দুই বিরোধী শক্তির অন্তর্দলীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা যাচাই করেও নেওয়া হয়েছে। লক্ষণ দেখে মনে হয়, ক্ষমতাকে আয়ত্তে রাখার ঘোষিত যুদ্ধে ঠিক এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর শিবিরই শক্তিশালী। তথাকথিত সিন্ডিকেটের বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা এ ধারণাকে স্বভাবতই আরও জোরালো করে তুলছে। অবশ্য দলের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে সিন্ডিকেটের সমঝোতার চেষ্টা একটি রাজনৈতিক কৌশলও বটে। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী রাষ্ট্রপতির পদে বৃত না হওয়া পর্যন্ত সিন্ডিকেট যে খুব ধীরে স্থৈর্যের সঙ্গে অভীষ্ট পথে এগিয়ে যাবে এতেও কোন সন্দেহ নেই।

সিন্ডিকেট চক্রকে ব্যর্থ করার জন্য স্বর্গত পন্ডিত নেহরু কামরাজ পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য যে চক্র দানা বেঁধে উঠেছিল তাকেই সমূলে উৎখাতের জন্যে শ্রীনেহরু সোজা পথে না এগিয়ে সুকৌশলে কামরাজ পরিকল্পনার জন্ম দিয়েছিলেন। কেবিনেটের অভ্যন্তরে নেহরু-বিরোধীরা যে আওয়াজ তুলছিলেন ঐ পরিকল্পনার ফলে তাকে স্তব্ধ করে দিয়ে শ্রীনেহরু নিরুপদ্রব ক্ষমতা ভোগ করে গেছেন। অবশ্য তখন শ্রীনেহরুই ছিলেন কংগ্রেস। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস সংগঠনের চিন্তা করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও শ্রীনেহরু সরাসরি কোন মন্ত্রীকে অপদস্থ করেন নি। সংগঠনের উচ্চ আদর্শের ধুয়ো তুলে সংগঠনকেই পুরোপুরিভাবে কাজে লাগিয়ে শ্রীনেহরু তাঁর বাসনা চরিতার্থ করেছিলেন। কেউ প্রতিবাদ করার সুযোগ পর্যন্ত পান নি। অন্তরে দাবদাহ নিয়ে অনেককেই গদীর মায়া কাটিয়ে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল। বিরোধতা করে সত্যিকারের 'কংগ্রেসসেবী নয়' এই কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে নিতে কেউই সাহস করেন নি। করতালির মধ্যেই অযাচিতভাবে সংগঠন-দরদী সেজে স্বস্থানে তাঁদের প্রস্থান করতে হয়েছিল।

শ্রীমতী গান্ধী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেন নি। তিনি সোজাসুজি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁর বিরোধীদের প্রায় হতবাক করে দিয়েছেন। সংগঠনের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর এমন ক্ষমতা নেই যাকে প্রয়োগ করে তিনি একাজ হাসিল করতে পারেন। আর তাঁর এমন ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্বও নেই যার জোরে বিরোধীদের স্তব্ধ করতে পারেন। অতএব, তাঁর পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রয়াগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুধু তিনি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন একটি ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে ক্ষমতার লড়াইকে একটি আদর্শগত লড়াইয়ে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই নয়াদিল্লীর তথা সারা ভারতের আকাশে-বাতাসে একটি কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল যে শ্রীমতী গান্ধী যে কোন মুহূর্তেই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হতে পারেন। সোজাসুজিভাবে সিন্ডিকেট এই প্রস্তাব আনতে সাহসী না হলেও পরোক্ষে এমন অবস্থার সৃষ্টি করছিলেন যে তিতি-বিরক্ত হয়ে শ্রীমতী গান্ধীর বানপ্রস্থ অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রতি পদক্ষেপেই সিন্ডিকেট প্রমাণ করছিলেন যে তাঁরাই সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁদেরই আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হবে—না হলে পদত্যাগ। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নের প্রশ্নে শ্রীমতী গান্ধীর পরাজয় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। দলের উপর আধিপত্য নেই এমন এক সুদুঃসহ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী থাকা যায় না। বিশেষ করে বিশ্বের দরবারে এহেন প্রধানমন্ত্রীর পাত্তা পাওয়াও কঠিন। দলের কাছে যার সম্মান নেই বিদেশী রাষ্ট্রনায়করা কি করে তাঁর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত আসতে পারেন? আবার আমেরিকার কর্ণধার প্রেসিডেন্ট নিকসনের ভারত সফর আসন্ন। কাজেই দলের মধ্যেকার এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী কোন মুখ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা টেবিলে বসবেন সে প্রশ্নও ইন্দিরাজীকে হয়তো বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলেছিল। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে কুপিতা ইন্দিরাজী ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত দংশন করেছেন। আর তাঁর কঠোর আঘাত প্রমাণ করল তিনি একটি শক্ত মানুষ। দরকার হলে নারীচরিত্রের কোমল অভিব্যক্তি তাঁকে দুর্বল করতে পারে না।

ইন্দিরাজী আগেই জানতেন, তাঁর মনোনীত প্রার্থী রাষ্ট্রপতিপদে কংগ্রেসের মনোনয়ন পাবেন না। কিন্তু তবুও সংঘর্ষকে এড়িয়ে না গিয়ে শক্তিকে সংহত করার জন্যে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তাঁর কৌশল খেটে গিয়েছে। কিন্তু এই সম্ভাব্য পরাজয়ের কথা ভেবেই বাঙ্গালোর অধিবেশনে তিনি আগে থেকেই কংগ্রেসের অর্থনৈতিক পলিসির উপর একটি সুনির্দিষ্ট নোট পাঠিয়েছিলেন। ইন্দিরাজী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রশ্নে কি নীতি হবে একথা জানতেন না এমন নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও ব্যাঙ্কের আশু জাতীয়করণ চান একথা হলফ করে বলতে পারবেন না। কারণ, কংগ্রেসের 'ইকনমিক পলিসি' ঠিক করাই আছে। দলের যে আদর্শগত সিদ্ধান্ত, ইকনমিক পলিসি তার বিপরীতমুখী হতে পারে না। কাজেই ইন্দিরাজীর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সমাজবাদের ঝাঁঝালো প্রবক্তা সাজবার মূলে যে তাঁর একটি গভীর উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে। দেখা যায়, পরাজিত ব্যক্তি সব সময়েই আদর্শের কেতন উড়িয়ে নিজেকে শহীদ হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে চান। কাজেই বলা যায়, আগে-ভাগে ভিত্তিভূমি রচনা করে শ্রীমতী গান্ধী আদর্শের

লড়াইয়ের জন্যে সুকৌশলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মোরারজী দেশাইকে অপসারণ করে তাই ইন্দিরাজী বিশেষ বেকায়দার এখনও পড়েন নি। কারণ ব্যাংক জাতীয়করণের মত একটি জনপ্রিয় ইস্যুকে সামনে রেখে ইন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রী গদী আপাতত পাকা করে রাখলেন। শত্রুর আক্রমণকে আগেই নিরস্ত করে দিলেন।

সিন্ডিকেট এখনই কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলে শো-ডাউনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। কারণ তাহলে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন হবে এবং এক নতুন কংগ্রেস জন্মলাভ করবে। এমন কি ইন্দিরাজী লোকসভা ভেঙে দিয়ে জাতির সামনে গণতন্ত্রের চরম পরীক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতেও হয়ত দ্বিধা না করতে পারেন। অবশ্য এই পথে তিনি যে অগ্রসর হবেন না, তার ইংগিত তিনি দিয়েছেন। মোরারজীকে অর্থ-মন্ত্রক থেকে বঞ্চিত করার কিছুক্ষণ আগেই দলের নীতির প্রতি কঠোর আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে সমর্থন জানাবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। দলের একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে মতান্তর থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক নিয়ম হচ্ছে সেই গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা, কিন্তু এই ঘোষণার আগে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে যে রণহুঙ্কার দিয়েছিলেন তা দলীয় শৃংখলা ভংগের সমতুল। কংগ্রেসের নেতৃপদে এবং দলের প্রতিভূ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত থেকে কী করে তিনি এই রণোন্মাদনা দেখাচ্ছিলেন তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, শ্রীমোরারজী দেশাই ত সিন্ডিকেটের সদস্য নন কিম্বা তার সমর্থকও নন। তবে ইন্দিরাজী তাঁকে আঘাত করলেন কেন? সাধারণ কথায় বলতে গেলে, এই আঘাত বৌকে মেরে ঝিকে শেখানোর মত। সিন্ডিকেটের সদস্য বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী এস কে পাতিল, নিজলিঙ্গাপ্পা, কামরাজ, অতুল্য ঘোষ এবং সঞ্জীব রেড্ডী। মোরারজী দেশাই নিজস্ব পথে চলেন। তিনি যা বোঝেন তাই করেন। কোন প্যাঁচের ধার ধারেন না। শ্রীচ্যবন সুচতুর লোক। হাওয়া বুঝে মত পরিবর্তন করেন। শ্রীজগজীবন রাম তাঁর অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকসভা সদস্যদের দলবদ্ধ করে তুরুফের তাস হাতে নিয়ে বসে আছেন, যাতে কেউ তাঁকে আক্রমণ করে পদচ্যুত করতে না পারেন। শ্রীমোরারজীর সমর্থক বলতে আছেন গুজরাটের হিতেন্দ্র দেশাই আর উত্তর প্রদেশের চন্দ্রভান গুপ্ত। গুপ্ত মহাশয় ইন্দিরাজীকে সমর্থন জানালেও মোরারজীর অপসারণের পর তিনি যে প্রতিক্রিয়ার আভাষ দিয়েছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমতী গান্ধীর কর্মকান্ডকে গুপ্ত মশায় দুর্ভাগ্যজনক ও দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে কিছু "কংগ্রেসী বামপন্থী" আছেন। অর্থমন্ত্রীকে অপসারণের আগে শ্রীমতী গান্ধী এমন বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন যে কংগ্রেসের কারও পক্ষে এখন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব নয়। যদি কেউ সাহস করেন তবে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত হবেন। যে পদ্ধতিতে শ্রীদেশাইকে অপদস্থ করা হলো, এটাও ইন্দিরাজী ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছেন। কারণ সিন্ডিকেটকে এখন এই ঘটনা নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু করার মত সুযোগ করে উঠতে পারবে না। আর ইন্দিরাজী এও ইঙ্গিত দিলেন যে দরকার হলে অন্য সকলের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে পারে, অতএব—সাবধান।

অন্যদিকে ইন্দিরাজী আবার প্রগতি-শীল বামপন্থীদের সাহায্যও পেলেন। মোরারজীর অপসারণের সংগে সংগেই প্রায় সকল বামপন্থী দলই এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেন। বক্তব্য দেখে মনে হয় ইন্দিরাজী ভারতবর্ষে সমাজবাদ প্রায় কায়েম করে দিলেন। এতদিন তবু পথের কণ্টক ছিলেন শ্রীদেশাই। ইন্দিরাজী সেই কণ্টক সরিয়ে দিয়ে মুক্তিদাত্রীর আসনে অধিষ্ঠিতা হয়ে গেলেন। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা এই বক্তব্য রেখেছেন দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ-মেনন, শ্রীকে ডি মালব্য, ইস্তেক শ্রীচন্দ্র-শেখর, শ্রীমোহন ধারিয়া পর্যন্ত অনেককেই তাঁরা খুঁজে বার করেছেন। এবার শ্রীমতী গান্ধী স্বয়ং প্রগতিশীলদের সংখ্যা বৃদ্ধি করাতে দক্ষিণপন্থীদের আনন্দ হওয়ারই কথা। তত্ত্বগত দিক থেকে চিন্তা করলে দক্ষিণপন্থীরা অবশ্য ঠিকই বলছেন। কারণ বিশ্ববিপ্লবের হোতা স্বয়ং সোভিয়েট রাশিয়াই বলতে গেলে এখন "Palace Coup' এ বিশ্বাসী। অতএব কংগ্রেসের সকল নেতাই যদি একে একে ইন্দিরাজীর মত সমাজবাদী ও প্রগতিশীল হয়ে পড়েন, মেনন-মালব্যের বরণীয় পথে অনুগমন করেন, তবে কত সহজেই না বিপ্লব সাধিত হয়! কিন্তু অন্য বামপন্থী দলও কিভাবে তালে তাল দিতে শুরু করলেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। একটি উলংগ ক্ষমতার লড়াইকে প্রগতিপন্থী কর্মকান্ডের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে বামপন্থীরা তাঁদের মনের অবচেতনলোকে কংগ্রেসের প্রতি যে নিহিত প্রীতিভাব আছে তারই পরিচয় দিলেন। আর নিজেদের স্বাধীন চিন্তা করার মত ক্ষমতা যে তাঁরা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছেন তারও একটা প্রকৃষ্ট নজীর রাখলেন।

যে সন্ধ্যায় ইন্দিরাজী মোরারজী-নিধন নাটকের মহিয়সী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, সেদিন রাত্রেই ভারতবর্ষব্যাপী তুমুল আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। এই মুহূর্তেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অর্ডিন্যান্স জারী হলো বলে। ভারতবাসী যেন এক বিপ্লবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আর চারিদিক যেন রোমাঞ্চ লাগে—এ রকম এক অনুভূতি। কিন্তু কোথায় সেই অর্ডিনান্স। খবর হলো, ও-সব কিছু এখন হবে না। ভারতবর্ষের মানুষ রাতারাতি কোন লোককে হিরো করতে দ্বিধা বোধ করে না। এমন কি মুহূর্তের মধ্যে অতীতের কার্যকলাপ ভুলে গিয়ে বরমাল্য নিয়েও অপেক্ষা করতে শুরু করে। তারপর যখন মোহভঙ্গ হয় তখন নির্জীব হয়ে পড়ে। এগোনোর ক্ষমতা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এটাই সবচেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি। অবশ্য অক্ষমতাই এহেন ভাবের জন্মদাতা।

যে প্রশ্ন তুলে গদী পাকা করার জন্য ইন্দিরাজী পদক্ষেপ শুরু করেছেন, অবস্থার চাপে পড়ে হয়ত তাতে তাঁকে ব্যাংক জাতীয়করণের পন্থা ভাবতেও হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কংগ্রেস সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যদি তা না চান, ইন্দিরাজীর পক্ষে একা এই কর্মকান্ড সম্পাদন করা সম্ভব হবে কি? সেই নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব তাঁর আছে কি? সমদর্শীকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তবে উত্তর হবে এক কথায় "না"। নতুন কংগ্রেস সৃষ্টি করে বামপন্থীদের সাহায্য নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী হয়ত একাজ সম্পন্ন করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রেও সমদর্শী হলফ করে বলতে পারে, ইন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রীর গদীর গ্যারান্টি চাইবেন এবং কেবলমাত্র সেই আশ্বাস পেলেই তিনি অগ্রণী হতে পারবেন। না হলে নয়।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই ক্ষমতার লড়াই কারও উপকারে না এলেও বিভিন্ন রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির যথেষ্ট সহায়ক হবে। কারণ, সবল, একাত্ম কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব যুক্তফ্রন্টের পক্ষে বিপজ্জনক বলে ফ্রন্টবাসীরা মনে করেন। অতএব, কেন্দ্রে অনৈক্যের ভাব যতই প্রবল হয়ে উঠবে, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তত বেশী ঐক্যের ভাব জাগবে।

ইতিমধ্যেই অবশ্য জোড়াতালি দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে একটা মিটমাট করবার চেষ্টা চলছে। সমদর্শীর মনে হয়, শ্রীমতী গান্ধীও এটাই চেয়েছিলেন। এখন প্রশ্নটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ইন্দিরাজী রাজী না হলে কোনকিছুরই মীমাংসা সম্ভব নয় এবং বিশ্ববাসী দেখছে, ইন্দিরাজী কত শক্তি-শালী। তাঁর ক্ষমতার কাছে সংগঠনের শক্তি নিতান্তই তুচ্ছ। কাজেই বিশ্বদরবারে তাঁর যে প্রেস্টিজ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তা আবার পুনরুদ্ধার হলো। সকল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকেই এখন তাঁর কাছে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। তাঁকে অবজ্ঞা করা যে কত কঠিন কাজ তিনি তা টের পাইয়ে দিয়েছেন। এখন প্রধানমন্ত্রীর গদীতে নিরুপদ্রবে আসীন থাকতে পারবেন এই আশ্বাস পেলেই সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। শুধু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে আগুন জ্বলল তাই ধুমায়িত হয়ে থাকবে। আনুকূল্য পেলেই সে আগুন আবার লেলিহান শিখা বিস্তার করে সংগঠনকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। কতোকাল সেই ভয়াবহ দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে বলা কঠিন।

—সমদর্শী

চাঁদের পথে পাড়ি
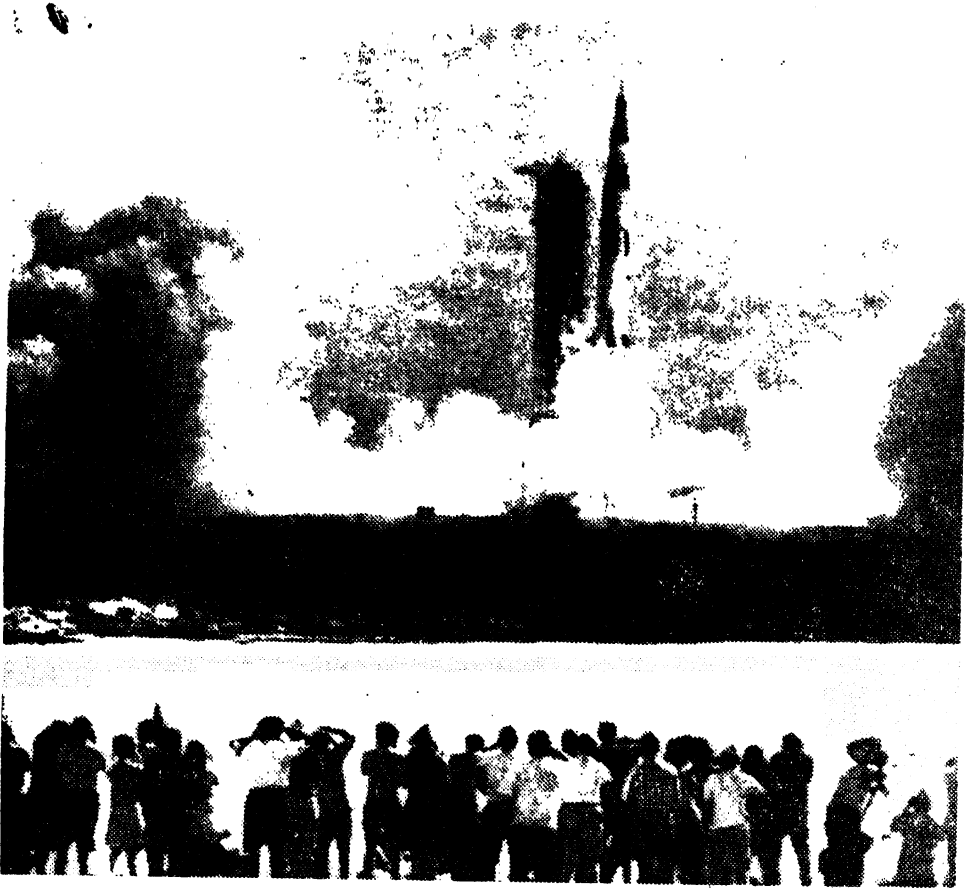
গত ১৬ এপ্রিল কেপ কেনেডি থেকে অ্যাপোলো-১১ উৎক্ষেপণের দৃশ্য আগ্রহী দর্শকেরা লক্ষ্য করেন। মানবজাতির এক নতুন ইতিহাস শুরু হবার শুভ মুহূর্তে আমরাও জানাই অভিযাত্রীত্রয়কে আন্তরিক শুভ কামনা। 'অমৃতে'র আগামী সংখ্যায় ত্রয়ী বীরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হবে বিশেষ নিবন্ধের আকারে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে উপলক্ষ করে এবার দেশের রাজনীতিতে যেরকম টালমাটাল চলছে ইতিপূর্বে আর কখনও আর কোন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে এমন টালমাটাল হয়নি। এই একটি নির্বাচনকে ঘিরে যে বিতর্ক ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে শুধু রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও লোকসভার স্পীকার প্রভৃতি জড়িয়ে গেছেন, কংগ্রেস দলের মধ্যে গভীর ফাটলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং অকংগ্রেসী শিবিরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ও উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরে এসেছেন, স্পীকার শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি তাঁর পদ ছেড়ে দিচ্ছেন এবং এমনকি যে পরিস্থিতির মধ্যে উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রিসভা থেকে সরে এলেন সেই পরিস্থিতির সঙ্গেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত এই বিতর্কের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ একই সঙ্গে রাষ্ট্রের চারটি উচ্চপদ থেকে তিনজন ইস্তফা দিলেন এই একটি নির্বাচনকে উপলক্ষ করে। ইতিপূর্বেও ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, এমনকি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অনভিপ্রেত প্রার্থীকে তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতি পদে বসান হয়েছে। কিন্তু সেজন্য এমন একটার পর একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রবাহ সংকটের দিকে এই দেশের রাজনীতিকে টেনে নিয়ে যায়নি।

যদিও বিস্ফোরণটা কতকটা আকস্মিকভাবেই ঘটেছে তা হলেও তলায় তলায় তার প্রস্তুতিটা সম্ভবত কিছুকাল আগে থেকেই চলছিল। আর-এস-পি নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী বলেছেন, গত জুন মাসের মাঝামাঝি ত্রিবান্দ্রমে যখন তাঁদের পার্টির একটি সভা চলছিল তখন প্রধানমন্ত্রীর

ইন্দিরা গান্ধী

একজন বার্তাবহ তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করেন রাষ্ট্রপতির পদের জন্য শ্রীমতী গান্ধী যদি তাঁর প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য লড়াই করেন তাহলে তিনি বামপন্থী দলগুলির সমর্থন পাবেন কিনা। তাঁর এই কথা যদি সঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপার নিয়ে দলের ভিতর একটা শক্তিপরীক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী কিছুকাল আগে থেকেই তৈরী হচ্ছিলেন।

এই শক্তিদ্বন্দ্বের একদিকে "সিন্ডিকেট" নামে পরিচিত কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের উপরতলার জোট আর একদিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এই দ্বন্দ্ব যে ধূমায়িত হচ্ছিল তার কিছু কিছু ইঙ্গিত ইতিপূর্বে পাওয়া যাচ্ছিল। রাজ্যসভায় শ্রীচন্দ্রশেখর যখন শ্রীমোরারজী দেশাই সম্পর্কে কতকগুলি অপ্রিয় কথা বলেন এবং শ্রীদেশাই এ সম্পর্কে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টির ভিতরে শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন শ্রীদেশাইয়ের শিবির থেকে এমন ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্রয়েই শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীদেশাই সম্পর্কে এমন কথা বলতে সাহস পেয়েছেন। বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রাক্কালে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বৈষয়িক নীতি সম্পর্কে শেষ মুহূর্তে যে নোট পাঠালেন তার মধ্য দিয়েও প্রকাশ পেল যে, শ্রীমতী গান্ধী দলের ভিতর তাঁর শক্তির যাচাই করার জন্য শ্রীদেশাই, শ্রীপাতিল, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা প্রমুখ কংগ্রেস সংগঠনের শক্তিধরদের সঙ্গে সামনাসামনি মোকাবেলায় নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা খোলাখুলি বেরিয়ে পড়ল যখন রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নের ব্যাপারে বিতর্কটা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ করে দিলেন। ১২ জুলাই তারিখে বাঙ্গালোরে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড শ্রীমতী গান্ধীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে ও ভোটের জোরে শ্রীসঞ্জীব

মোরারজী দেশাই

রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে গ্রহণ করলেন। সেদিন শ্রীমতী গান্ধী সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুললেন না। সরকারীভাবে পার্লামেণ্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্ত সেদিন ঘোষণাও করা হল না। বোর্ডের ভিতরকার বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করার জন্য সম্ভবত সময় নেওয়া হল। পরদিন ১৩ জুলাই কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী গান্ধীও সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে, কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড যে পদ্ধতিতে প্রার্থী মনোনয়ন করলেন তাতে তিনি দুঃখিত হয়েছেন।

তিনি একথাও বললেন যে, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির মনোনয়ন তাঁকে বিস্মিত করেছে। তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের কোন কোন সদস্য তাঁকে সমর্থন করার কথা দিয়েও সেই কথা রাখেন নি। বোর্ডে তিনি শ্রীজগজ্জীবন রামের নাম প্রস্তাব করেছিলেন, একথা উল্লেখ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, বিভিন্ন বিরোধী দল ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর ধারণা হয়েছে, হয় শ্রী ভি ভি গি'র অথবা শ্রীজগজ্জীবন রামের পক্ষে ঐকমত্য রয়েছে। অনেকে একথাও মনে করেছিলেন যে, গান্ধী শতবার্ষিকীর বছরে একজন হরিজন রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হলে ভাল হবে। যেহেতু দেশে এখন নানা ধরনের সরকার আছে সেহেতু রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনয়নে একটা ঐকমত্য হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেছেন এবং এই কারণেই বিভিন্ন দলের সঙ্গে কথা বলেছেন।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে ও পরে বাঙ্গালোর থেকে দিল্লীতে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী যেসব কথাবার্তা বললেন তাতে বোঝা গেল যে, কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী হিসাবে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানাতে বা তাঁর জয়ের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করতেও তিনি প্রস্তুত নন।

ঐ ১৩ জুলাই তারিখেই নয়াদিল্লীতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৭৪ বছর বয়স্ক শ্রী ভি ভি গিরি ঘোষণা করলেন যে, তিনি একজন নির্দলীয় প্রার্থীরূপে রাষ্ট্রপতির পদের

নয়া দিল্লীতে উল্কাপিণ্ড!

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে এক হাজার শব্দের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে তিনি বললেন যে, লোকসভার স্পীকারকে মনোনয়ন দিয়ে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড "দেশের প্রতিও সুবিচার করেন নি, তাঁরা যে প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন তার প্রতিও ন্যায়বিচার করেন নি।"

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর বিবৃতিতে বললেন যে, তাঁর দীর্ঘ জনজীবনে যখনই তিনি বুঝেছেন যে, তাঁর কোন পদে থাকাটা তাঁর বিবেকের নির্দেশের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখনই তিনি বিনা দ্বিধায় সেই পদ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর বিবেকের নির্দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছেন এবং "এই নির্দেশ ও কর্তব্যবুদ্ধিই আমাকে রাষ্ট্রপতির পদের জন্য প্রার্থী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।"

তাঁর বয়সের জন্য যে আপত্তি উঠেছে সে বিষয়ে ইঙ্গিত করে শ্রীগিরি তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, দু' বছর আগে যখন তাঁকে উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত করা হয় তখন তো তাঁকে পুরা পাঁচ বছরের মেয়াদেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। সুতরাং "এখন বয়সের প্রশ্ন তোলাটা আজব ব্যাপার।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগ করেন, "আমার সৌভাগ্য এই যে, আগাগোড়াই আমার স্বাস্থ্য ভাল এবং এখনও আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।"

শ্রীমতী গান্ধীর সাংবাদিক সম্মেলনের বিবৃতি ও রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে দেওয়া শ্রীগিরির বিবৃতি, দুটিই এদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ইতিহাসে নূতন নজীর সৃষ্টি করল। এর আগে আর কখনও কোন প্রধানমন্ত্রী নিজের দলের এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য সমালোচনা করে কোন বিবৃতি দেন নি। এর আগে আর কখনও রাষ্ট্রপতি শাসকদল কংগ্রেসের মনোনয়ন না পাওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনে দাঁড়ান নি এবং রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন নি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষ করে ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে বিভেদের রেখাগুলি যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছে সেটাই এই দুটি ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

এবার রাষ্ট্রপতির পদে যিনি নির্বাচিত হবেন তাঁকে আগামী ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সম্ভবত এমন একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যা ইতিপূর্বে আর কোন রাষ্ট্রপতিকে করতে হয় নি। ঐ নির্বাচনে কেন্দ্রে যদি কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করতে পারে তাহলে সরকার গঠনের ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি হবে। কংগ্রেসকে ক্ষমতা রাখবার জন্য সম্ভবত অন্যান্য পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনে আসতে হবে। এই কোয়ালিশন গঠন করার জন্য কংগ্রেস সুযোগ ও সময় পাবে কিনা সেটা পরবর্তী রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করবে। আবার কংগ্রেস যদি ক্ষমতাচ্যুত হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি ভবনে যিনি অবস্থান করবেন তাঁর রাজনৈতিক চরিত্র ও রাজনৈতিক যোগাযোগগুলির উপর দেশের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নের প্রশ্নটি বিভিন্ন মহল থেকে বিচার করা হচ্ছে। স্পীকার হওয়ার আগে পর্যন্ত শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি কংগ্রেসের "সিণ্ডিকেটের" সদস্য ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলে সিণ্ডিকেটের মাতব্বররা যতটা নিরাপদ বোধ করবেন শ্রীমতী গান্ধী ততটা বোধ করবেন না। এটাই হচ্ছে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নের বিতর্কে মূল প্রশ্ন।

●

১৭৯১ সালে ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই যখন বিদ্রোহীদের এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য ভারেনেস-এ থেমেছিলেন। ঐ মধ্যাহ্নভোজে তিনি ২৪টি কাটলেট খেয়েছিলেন। আর ঐ ভারেনেস-এই তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। একথা বলেছেন খাদ্যরসিক ও ফ্রান্সের জোর্ণ পত্রিকার লেখক রবেয়ার কুর্তিন। (নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা থেকে)

> **মানুষের সাধনা চন্দ্রলোক স্পর্শ করেছে। চাঁদের মাটিতে মানব-মহিমার বিজয়কেতন উড়িয়েছেন আজ আমস্ট্রঙ এবং অলড্রিন। সারা পৃথিবীরই কোটি কোটি নরনারী আজ পরম গৌরবে উচ্চারণ করবে 'ধন্য হে ধন্য, এ জীবন ধন্য।' আমরাও জানাই আমাদের জয়ধ্বনি।**
>
> ২১-৭-৬৯

চন্দ্রজয়ের সাধনা

এ সপ্তাহে পৃথিবীর সব মানুষ তাকিয়েছিলেন চাঁদের দিকে। চাঁদই হল এখনকার সবচেয়ে বড় খবর। পৃথিবীর মানুষের কাছে চাঁদ বরাবরই এক বিস্ময়ের ও আকর্ষণের বস্তু। চাঁদকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মানুষের স্বপ্ন, তার ভালবাসার প্রতীক হল চাঁদ। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই চাঁদ তার মায়াবী জ্যোৎস্নালোকে মানুষের মনে এনে দেয় স্বপ্নলোকের হাতছানি। মহাকাশের অসীম শূন্যে চাঁদই হল আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। কোন আকর্ষণে চাঁদ পৃথিবীর কাছে চিরকালের জন্য ধরা পড়ে গেছে বিজ্ঞানীরা এখনও সঠিকভাবে তা বলতে পারেন না। চাঁদের বুকে মানুষ পা দিয়ে বিজ্ঞানের সেই অজানা তত্ত্বকে মানুষের আয়ত্তে আনবে। মহাকাশে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য উদ্ধারে এ হল মানুষের সফল পদক্ষেপ।

মহাকাশ গবেষণায় রাশিয়া এবং আমেরিকা এই শতাব্দীতে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা দুই-ই চাঁদের বুকে যাবার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছিল এক দশক আগে থেকে। আমেরিকাই প্রথম চাঁদের বুকে পৃথিবীর মানুষ নামাবার দুঃসাহসিক ও বিস্ময়কর প্রচেষ্টায় অগ্রণীর ভূমিকা নিল। এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব মানুষ বহু শতাব্দীর অনুশীলনে, অধ্যবসায়ে এবং প্রতিভার বিকাশের দ্বারা উপার্জন করেছে। বিগত কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ তার সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথ ধরে যত জ্ঞান সংগ্রহ করেছে মহাকাশে চন্দ্রজয় তারই পরিণতি। আট বছর আগে মার্কিন দেশে চন্দ্রযাত্রার কার্যসূচীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি বলেছিলেন "আমরা এই দশকে চাঁদে যেতে ও অন্যান্য কাজ করবার দায়িত্ব নিয়েছি এই বলে নয় যে কাজটি সহজ, নিয়েছি এই জন্য যে কাজগুলো কঠিন এবং এই কারণে যে এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দক্ষতা ও শক্তিকে সংগঠিত ও পরিমাপ করা যাবে।"

মানুষের হাতে তৈরী বস্তু, তার যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বাক্ষর ইতিপূর্বে চাঁদের বুকে এবং আরও অনেক দূরতর গ্রহ ভীনাসের বুকে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু মানুষ নিজে চাঁদকে ছোঁবার প্রয়াস এই প্রথম। এই প্রয়াসের সাফল্য সে কারণেই গণ্য হবে তুলনাহীন। অ্যাপোলো-১১ আকাশে পৃথিবীর মানুষের বিজয়-পতাকা বহন করে নিয়ে গেছে। পৃথিবীর ১৩৬টি জাতির পতাকাই নিয়ে গেছেন মার্কিন মহাকাশচারীরা। তার মধ্যে মার্কিন দেশের পতাকার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে রাশিয়ার পতাকা, পেয়েছে ভারতেরও। মানব-সহযোগিতা ও মৈত্রীর নিদর্শনরূপে মার্কিন মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং, কলিন্স ও আলড্রিন সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন মৃত রুশ মহাকাশচারী য়ুরি গাগারিন ও ভ্লাদিমির কোমারোভের নামাঙ্কিত দুটি স্বর্ণপদক। তাই একে শান্তির জয়যাত্রা বলেই চিহ্নিত করি আমরা। প্রতিযোগিতা যা আছে তার মধ্যেও রয়েছে মানব-প্রতিভার কৃতিত্ব দেখাবার প্রতিযোগিতা।

এই কৃতিত্বের পিছনে বহু কর্মীর অক্লান্ত সাধনা কাজ করেছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, অ্যাপোলো-১১ চন্দ্রযান তৈরী করতে এবং তাকে নিরাপদে চাঁদে নামিয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার কাজে চার লক্ষেরও বেশী বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, প্রয়োগবিদ ও অন্যান্য কর্মীর অতন্দ্র সাধনা যুক্ত। শুধু তাই নয় মানুষের এই দুঃসাহসিক অভিযানে পৃথিবীর আরও কত দেশের বিজ্ঞানী সারাক্ষণ সযত্ন দৃষ্টি রেখেছে তাঁদের প্রতিমুহূর্তের সঠিক তথ্য সংগ্রহে ও সরবরাহে। বৃটেনের জডরেল ব্যাঙ্ক মানমন্দির, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে স্থাপিত বিরাটকায় রেডিও টেলিস্কোপ, রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণাগার সর্বত্রই চন্দ্রযান সম্পর্কে আগ্রহ সমান। রাশিয়ার প্রেরিত লুনা-১৫-র কৃতিত্বের জনাও মানুষের আগ্রহ কম নয়।

এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হবে তখন অ্যাপোলো-১১ ও লুনা-১৫-এর চন্দ্র অভিযানের সর্বশেষ বার্তা পৃথিবীর মানুষ জেনে যাবে। তাঁদের সাফল্য সকলের কাম্য। পৃথিবীর মাটিতে মানুষ এখনও এক হতে পারে নি। কিন্তু মহাকাশের অজানা রহস্য আবিষ্কারের সাফল্য যদি পৃথিবীর মানুষকে প্রীতি ও মৈত্রীতে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে তাহলে সেটাই হবে এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক সাফল্য। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বহু রহস্য এখনও অনাবিষ্কৃত। চন্দ্রজয় সেই রহস্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেবে আমাদের সামনে। সেই স্বর্ণদিন মানবসভ্যতাকে মৈত্রীর আলোকে স্নিগ্ধ ও মহিমান্বিত করে তুলুক, এই প্রার্থনা।

অল্পে সুখ নেই ॥

অমিতাভ দাশগুপ্ত

তোমরা সবাই শুয়ে ছিলে।
যেভাবে শাখার রন্ধ্রে আ-ফোটা কুঁড়ির গোটা
যজ্ঞ-অনলের পরে হাতে হাত স্তূপের সবুজ
দীর্ঘ প্রবাসের পর শরীরে শরীর ভেঙে
প্রমোদে বঙ্কিম শুয়ে থাকা।

এখন বিপিনে, বনে পদধ্বনি। তাতার-বাতাসে
কস্তুরির চাপা ঘ্রাণ করতল কাঁটায় জর্জর
নম্র করবীর কোল নষ্ট ক'রে রৌদ্র চলে যায়,
জ্বর গায়ে, উদাসীন পায়ে
গ্রন্থি ছিঁড়ে ছিঁড়ে কতো আয়াস-বিহীন পারাপার
নাগরিক ছায়াবাজি, অন্ধ অজ গাঁয়ের দঙ্গল।

অল্পে সুখ নেই। কোনো অর্বাচীন হঠকারিতায়
নিজের সীমানা ছিঁড়ে নিজেই বিশাল হতে গিয়ে
ভেঙে ফেটে খানখান.
তপ্ত কৃষ্ণ-হরিণের দল
ফলাফলহীন ছোটে কঙ্কালী-কঙ্করে—
যদি জল ফুঁসে ওঠে!

কবি ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কবিই জানেন
তীর পিঠে বেঁধে একা ও নির্জন হতে
একা ও নির্জন
আত্মায় জাগ্রত রেখে ত্রিকাল বিম্বিত স্বচ্ছ বোধি
তিনি চলেছেন পথে
উলংগ ঝুঁটিতে গোঁজা পাখির পালক
চোখে শব্দভেদী তীর
চলেছেন তিনি
কপালে প্রোজ্জ্বল সূর্য
উদ্ভাসিত আত্মপর যাহার প্রভায়
প্রথম মানুষ তিনি
পদচিহ্ন মুছে মুছে চলেছেন একা
অথচ সমগ্র বিশ্ব তাঁরই চোখ থেকে অগ্নি চুরি ক'রে আনে

আমি

মিহির আচার্য

আমাদের সংসারে এতদিন মৃত্যু প্রবেশ করেনি। বোধহয় মৃত্যুও আমাদের করুণা করত। যেহেতু আমাদের প্রতিদিনের বেঁচে-থাকার মধ্যে লড়ায়ের কোনো শপথ ছিল ... সেইহেতু আমাদের জীবনহীন প্রাত্যহিকতায় মৃত্যু হস্তক্ষেপের কোনো প্রেরণা পায়নি।

আমরা অভাববোধের বিলাসিতার মধ্যে বাস করতাম। যথার্থ অভাব আমাদের ছিল না। কিন্তু অভাবগুলো দূর করবার জন্যে যে উদ্যোগ এবং সক্রিয়তার প্রয়োজন, সেটা বাবার চরিত্রে ছিল না। গ্রামাঞ্চলে কিছু ধানজমি ছিল, যা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেল। বাবার সৌখিন ওকালতি ব্যবসা আমাদের নির্দিষ্ট কোনো ভরসা দেয়নি।

বাবা একদা জীর্ণ হয়ে ক্ষয় হয়ে গেলেন। তখন দেখলাম একটা পুরনো ভাঙা বাড়ি, আলমারিতে অব্যবহৃত কিছু আইনের বই, এবং একটা আরামকেদারা ছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা আর কিছু পাইনি।

বাবার জীবনধারণ সম্পর্কে এই শান্ত অনাগ্রহ মনোভাব আমাদের কাছে বিস্ময়ের। অথচ আমাদের বৃদ্ধা মা ছাড়াও সংসারে আমরা গোটাছয়েক ভাই-বোন। পৃথিবীতে আমাদের আগমনের কোনো কারণ আমরা নিজেরাই বুঝতাম না। কারণ 'আমরা এসেছি'—এই বোধ আমাদের নিজেদের মধ্যেও ছিল না।

অথচ বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে মনে হচ্ছে আমার কিছু কর্তব্য আছে। মার ইদানীং মনোভাবও তাই। মাকে একদিন স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করলাম: 'বাবা কী আমার জন্যে কিছু বলে গেছেন?' মা বললেন: 'না।' তাহলে আমার কর্তব্য আমি কীভাবে নির্ধারিত করব। মাকে পরদিন বললাম: 'তুমি বলবে কী করতে হবে আমাকে।' মা ধূসর চোখে তাকিয়ে রইলেন। বিড়বিড় করে বললেন: 'আমার ষাট বছরের জীবনে কখনো কিছু বলিনি।' বললাম: 'কিছু না বলে তোমার জীবন কাটল। আজ বাবা নেই, তুমি আছো, আমরা সকলেই তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে।' মা কিছু না বলে ঠাকুরঘরে চলে গেলেন।

আমার কাছে সংসারটা ধাঁধার মতো মনে হল। আমাদের কী করতে হবে কে বলে দেবে। বাবার শান্ত, অনাগ্রহ জীবনধারণাকে কী কুপুত্রের মতো ভাঙব। বাবা স্বর্গ থেকে কী কষ্ট পাবেন না! বাবার ছাঁচটাকে ভাঙবার কী অধিকার আমাদের আছে!

মা বললেন, 'খোকা, সপ্তাহের রেশনটা আজই তুলতে হবে।'

আমি একটা বাস্তব কাজ পেয়ে বেঁচে গেলাম। 'টাকা দাও।'

'টাকা!' মা অবাক হলেন।

বললাম: 'বারে, টাকা ছাড়া কী দোকানী মাল ছাড়বে?'

মা বললেন, 'তার আমি কী জানি।'

অবাক হলাম মার দিকে চেয়ে। তাহলে কে জানে। বাবা জানেন না, মা জানেন না। আমাকে জানবার শিক্ষাটা কেউ দিয়ে যায়নি। না-জেনে আমাকে জানার ভান করতে হবে। মা কী আমার অশিক্ষিতপটুত্বের ওপর আস্থা রেখেছেন।

'তাহলে কী তুমি বলতে চাও এখন আমাকেই এসব জানতে হবে?'

মা বললেন, 'সংসারের এই নিয়ম। তোমার বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন...'

বললাম: 'মা, তুমি একথা বলতে পারছ?'

মা বললেন, 'আমি কেন, ওদের জিজ্ঞেস করো, ওরাও একথা বলবে।'

ভাই-বোনদের মৌনতা মার কথারই সমর্থন।

নিশ্বাস ফেলে বললাম: 'ব্যাগ আর কার্ডগুলো দাও।'

মা বের করে দিলেন।

রাস্তায় নেমে প্রথমে সুশীলের বাড়িতে হানা দিলাম।

'এই, গোটা-কুড়ি টাকা দে—'

সুশীল হাসল। 'টাকা কী হবে?'

'রেশন আনতে হবে।'

সুশীল টাকা দিল। 'এইভাবে কতদিন চলবে? একটা কিছু কর।'

হতাশ হয়ে বললাম, 'তুইও এই কথা বলছিস। আমার বাবা শুনলে কষ্ট পেতেন।'

'তোর ভাই-বোনদের বাঁচাবি কী করে?'

'কেন বেঁচে আছে তো।'

'তুই বড্ড ভেঙে পড়েছিস। বাবা কী চিরকাল কারুর থাকে রে?'

বললাম: 'থাকা না-থাকার কথা নয়। আজ সকালে মা বললেন রেশন আনতে। তাতেই বুঝলাম মা চাইছেন বাবার কাজগুলো আমাকে দিয়ে করাবেন। আমি তো নাও করতে পারি, বল্ পারি কিনা?'

সুশীল বললে, 'পাগলামো।'

'বাবা কখনো একথা বলতেন না। আমরা দেখেছি কতদিন রেশন ব্যাগ নিয়ে গিয়েও তিনি শূন্যহাতে ফিরে এসেছেন। আমরা কেউই প্রশ্ন করিনি। সন্ধ্যে রাত্রিতে অন্ধকার করে আমরা মুখ বুজে শুয়ে পড়েছি। কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারিনি।'

সুশীল বললে, 'তোমার বাবা সংসারী মানুষ ছিলেন না।'

'অথচ আমরা জন্মালাম।'

'সেটা অন্য ব্যাপার। দ্যাখ এমন কতকগুলো প্রশ্ন রয়েছে তার উত্তর খোঁজাটা অশালীন।'

'বোধহয় তাই হবে। আচ্ছা চলি।'

মাকে বললাম: 'মা, একটা কিছু করতে হবে।'

মা বললেন: 'কী করতে চাও?'

বললাম: 'আমি গ্রামে যাচ্ছি। জমিজমা দেখাশোনা করি।'

মা শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি পালাতে চাও?'

'মানে?'

'আমরা তোমার ওপর নির্ভর করে আছি।'

'আমার ওপর! কেন? আমি কার ওপর নির্ভর করব?'

'তুমি উপযুক্ত হয়েছ। বি-এ পাশ করেছ।'

'তুমি আমাকে কী করতে বলো?'

'জনার্দনবাবুর কাছে যাও। হয়তো একটা চাকরির ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।'

বললাম: 'বাবা বেঁচে থাকলে কোনদিন আমাকে এ-আদেশ করতেন না। বাবা কখনো চাকরি করেন নি। পরের গোলামিকে তিনি ঘৃণা করতেন।'

মা অকারণে কাঁদতে লাগলেন। মা'র কান্না বড় বিশ্রী লাগল আমার কাছে।

বললাম: 'বাবার ছাঁচটা তুমি এ বাড়ি থেকে দূর করে দিতে চাও। জানিনে বাবার ওপর তোমার না আমাদের কার বেশি অধিকার! বাবার এই জটিলতাহীন সরল জীবনে তুমি কী সুখী ছিলে না? বাবা কী জানতেন তোমার এই বিরোধিতা? যখন লড়াই করার দরকার ছিল তখন কেন তুমি আমাদের পক্ষে নাও নি? আজ বাবা নেই, বিরোধিতাও নেই। তাহলে আমরা একটা মিথ্যার সঙ্গে লড়াই করে যাব?'

মা তবু কেঁদে চললেন।

অসন্তোষ প্রকাশ করে বললাম: 'তোমার কান্না দেখে লোকে ভাববে আমি ছেলে হয়ে তোমাকে আঘাত দিচ্ছি। যে কথাটা তোমাকে বোঝাতে চাইছি সেটা এই: আমাকে ঐতিহ্য রক্ষা করতে হবে, উত্তরাধিকারের পতাকাকে নিঃশব্দে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। লোকে আশীর্বাদ করে বলে: বাবার মতো হও। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গ নিঃস্ব করে ভবিষ্যতের অন্ধ দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দেবে না?'

মা অসহায় গলায় বললেন, 'আমি আর কী করতে পারতাম। আমাকে মুখ বুজে সবকিছু এড়িয়ে চলতে হয়েছে।'

বললাম: 'কী এড়িয়েছ তুমি? তাহলে কী তুমি বলতে চাও বাবার মতকে তুমি কোনদিন পছন্দ করো নি? এই দীর্ঘ বছরেও বাবা তোমার কাছে সত্য ছিলেন না? আজ তুমি সন্তানকে বাবার বিরুদ্ধে যেতে বলছ? বাবাকে অশ্রদ্ধা করতে বলছ?'

মা কী বলতে চাইলেন।

বাধা দিয়ে বললাম: 'তুমি কী বলতে চাও, বাবা তাঁর মতগুলো আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন? দেন নি তো। আলো-বাতাস-রোদের মতো আমরা সেগুলিকে স্বাভাবিক ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম। বাবার বিশ্বাস ছিল আমরা তাঁর জীবনধারণাকে গ্রহণ করব। বাবার এই কর্তৃত্বহীন কর্তৃত্ব আমাদের অবশ্য শিক্ষণীয়। আমার বেশ মনে পড়ে: ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাশের খবরে বাবাকে প্রণাম করতে গেলাম। বাবা অস্ফুটে আশীর্বাদ করলেন। নিজের চেষ্টায় কলেজে ভরতি হলাম। কী কী সাবজেক্ট নেবো, অনারস্ থাকবে কিনা, আমার মতো অনভিজ্ঞকে কেউ চালিত করলেন না। পাস কোরসে বি-এ পাশ করে যখন অনারস না নেয়ার জন্যে নতুন করে অসুবিধেটা বুঝতে পারলাম, বাবার ওপর রাগ হয়েছিল। বাবা হেসে উত্তর দিলেন: অনারস নিলে না কেন? এই আমাদের বাবা, কর্তৃত্বহীন কর্তৃত্ব। বাবা নিশ্চয়ই আমার ওপর খুশি হয়েছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষার মতো মূর্খতা যে আমার জীবনকে ভারাক্রান্ত করে নি, এইটেই ছিল তাঁর কাছে সান্ত্বনার কারণ।'

মা বিবর্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বোধকরি পিতৃত্বের গৌরব-রক্ষায় আমার পবিত্র জেদকে তিনি লক্ষ্য করছিলেন। বাবা মাকে তাঁর জীবনবৃত্তে টেনে আনতে পারেন নি, এই আঘাত আমার কাছে প্রচণ্ড। আমি এখন কী করি, বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে আমার কর্তব্য গুরুতর। ছোটরাও যেন আমার সমালোচক, ওরা দেখতে চায় আমি কী করি। ওরা আমার সঙ্গে নেই, এই বোধ আমায় কাছে পীড়াদায়ক। বাবার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই গোটা বাড়িটা যেন বাবার প্রতি নিষ্করুণ হয়ে উঠল। অথচ বাড়ি তো ইঁট-কাঠ নয়, বাড়ি মানে বাবা। এখনো লোকে 'উকিলবাবুর বাড়ি' বলে।

নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'মা, তুমি আমাকে নৈরাজ্যের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছ। বাবা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রেখে গেলে নিশ্চয়ই এত অকরুণ হতে না। আমরা ক্রমশ অনেক ছোট হয়ে পড়ছি। পারিবারিক পবিত্র সম্পর্কগুলোর মধ্যে আর্থিকতার চড়া সুর আনতে চাইছি। বাবার জীবনে আমরা অংশগ্রহণ করি নি, তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, তিনি গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী। আমরা কেউ তাঁকে বুঝি নি, বুঝতে চাই

নি। বাবা শেষ জীবনে হয়তো এই বেদনা নিয়ে চলে গেলেন। বাবার দিকটা কোনদিন ভেবে দেখেছ? শৈশবে মাতা-পিতৃহীন শিশু, দূর সম্পর্কের পিসিমার মিথ্যা ছায়ায় মানুষ। বাবা নিজেকে কোনদিন প্রতিষ্ঠিত ভাবতে পারেন নি। স্নেহহীন শুষ্ক রসে তিনি জন্মাবধি শুকিয়ে গিয়েছিলেন। কোথাও কোন আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন নি। বাবা এই সংসারে অবাঞ্ছিত অতিথি। বাবা কারুর কাছে কিছু দাবী করতে পারেন নি। নিরাশ্রয় সঙ্কোচে তিনি কুণ্ঠিত জীবনের ভার একা বহন করে গেছেন। ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, কারুর জীবনেই তিনি জোর করে প্রতিষ্ঠার আসন পাততে চান নি। বাবাকে আমরা আরো-একটু ভালোবাসতে পারতাম আরো অধিক ঘনিষ্ঠ হতে পারতাম। বাবাকে আমরা বুঝতে পারি নি বলেই প্রাণপণে অস্বীকার করে গেছি।'

মা আর দাঁড়ালেন না। আঁচলে চোখ মুছতে-মুছতে সরে গেলেন।

জনার্দনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার কথাই ভাবছিলাম। প্রমদারঞ্জন নেই, এখন তোমাকেই সংসারের ভার নিতে হবে।'

বিনীত গলায় বললাম: 'বাবা কী এ-সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলে গেছেন?'

জনার্দনবাবু হাসলেন। 'সে-পাত্রই তোমার বাবা নন। সংসার সম্বন্ধে কোনোরকম অভিজ্ঞতাই ও'র ছিল না। এ যুগে এমন শিশুর মতো সরল, নির্বোধ...'

'কাকাবাবু, মা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন—'

'এসে পড়েছ যখন একটা ব্যবস্থা হবেই। সেটা বড় কথা নয়।' জনার্দনবাবু বললেন: 'আজকের কালে এমন বিচিত্র মানুষ কল্পনাও করা যায় না। একটি দিনও ও'র কপালে একটা চিন্তার রেখা দেখলাম না। অথচ আমরা বেঁচে থেকেও সব সময় ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছি। প্রত্যেকটি ছেলের জন্যে ব্যাঙ্কে আলাদা করে ফিকসড ডিপোজিট করে রেখেছি। ইনকাম ট্যাক্স বাঁচাতে কত কৌশল করে বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে টাকা রাখতে হচ্ছে। পিতা বলে তো একটা দায়িত্ব আছে।'

বললাম: 'কই বাবার তো কোনো পাশবুক আমরা খুঁজে পাই নি কাকাবাবু। ইনসিওরেন্স পর্যন্ত নয়।'

'কী করে থাকবে বলো? উনি এসবের কোনোটাই বিশ্বাস করতেন না।'

'বাবার কথা আপনার কাছে শুনতে ইচ্ছে করে। আপনি বাবার দীর্ঘদিনের বন্ধু। বাবা কী বিশ্বাস করতেন, কাকাবাবু?'

জনার্দনবাবু বললেন, 'উনি পরিপূর্ণ নাস্তিক ছিলেন। কেবল তুড়ি মেরে হেসে বলতেন: চলে যাবে। তা উনি সত্যিই চলে গেলেন, কিন্তু তোমাদের জন্যে কী করে গেলেন?'

চিন্তিত গলায় বললাম: 'বাবা কী কোনোদিন কিছু করার কথা ভাবেন নি? এ সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু জানতে ইচ্ছে হয়।'

জনার্দনবাবু বললেন, 'উনি কিছু করার লোকই নন।'

বললাম: 'বোধ হয় আপনাদের করাগুলো দেখে বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন।'

'কী বলছ?'

'কী জানি, আমার ভুল হতে পারে, কাকাবাবু।'

'ও'কে বারে ঢোকবার সময় বললাম ক্রিমিনালে চলে আসুন, এটা একটা ক্রিমিনাল ডিসট্রিক্ট, উনি সিভিলে পড়ে রইলেন। বরদাবাবু ক্রিমিনালে লাল হয়ে গেলেন। উনি প্রফেশানটাকেও সিরিয়াসলি নেন নি।'

'আপনি বলছেন বাবা ক্রিমিনালে সাইন করতে পারতেন?'

'আরে, কায়দা করতে পারলে টাকা তো এইখানেই। কেন আমি করি নি? তোমার বাবা সারা জীবন অ্যামেচার কাটিয়ে গেলেন। কত বদমায়েস মক্কেল ঠকিয়ে গেল। একটু ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে পারলেই হল, চার টাকা-পাঁচ টাকায় উনি পেশার নষ্ট করতে লাগলেন।'

বললাম: 'বাবা আপনাদের মতো এ-লাইনে উপযুক্ত ছিলেন না, কাকাবাবু—'

জনার্দনবাবু বললেন, 'ও'র জন্যে এ-সংসারে কোনো লাইনই ছিল না। আমরা অ্যাসোসিয়েশন থেকে বহুবার ও'কে সতর্ক করেছি, উনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন।'

বললাম: 'আমরা জানি আপনি বাবার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। আপনি বন্ধুর মতোই বাবাকে ক্রিমিনালে টানবার চেষ্টা করেছিলেন...'

জনার্দনবাবু বললেন, 'বললাম যে ও এক ধরনের অসুস্থতা। জীবনকে সোজাভাবে না-দেখা আর কী। আমাকে বলে কী জানো? চোর-খুনে-জোচ্চর-জালিয়াত নিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে নাকি আমরাও তাই হয়ে যাচ্ছি।'

'বাবা আপনাকে জোচ্চর-জালিয়াত...'

অনুচিত হাসিকে থামাতে গিয়ে আমি খুক খুক করে কেশে উঠলাম।

জনার্দনবাবু বললেন, 'ছেলেমানুষ আর কাকে বলে। অবশ্য আজ আর প্রমদারঞ্জন নেই। কাজেই ও'র সমালোচনা করে আমাদের লাভ নেই। এখন তোমার একটা ব্যবস্থা করাটাই জরুরি। তুমি তো পাশ-কোরসে বি-এ তাই না? একটা কাজ করো দু-তিন মাসের মধ্যে টাইপটা শিখে ফেলো। ডিসট্রিক্ট জজকে বলে...।'

'আমি তাহলে আজ উঠি।'

'একটু চা খেয়ে গেলে না?'

'আজ থাক।'

'যে ক'দিন চাকরি না হয় আমার কাছে মাঝে-মাঝে এসো। আমার কিছু নথিপত্র কপি করে দেবে। বাইরের লোককে কেন টাকা দেবো, ঘরের লোক থাকতে।'

'আসব।'

বাড়িতে পা দিতেই মা বললেন, 'কিছু হল?'

বললাম: 'না।'

'তাহলে?'

আমি তোয়ালে কাঁধে কুয়োতলায় চলে গেলাম।

স্নান সেরে বারান্দায় ফিরে আসতেই বাড়িটাকে ভীষণ গুমট ঠেকল। এবং মুখ-বন্ধ। আমি কোন দিকে তাকাব, কী করব বুঝতে না-পেরে আমার দুস্তর লজ্জা করতে লাগল। যেন জীবনে প্রথম মঞ্চে উঠে সংলাপ ভুলে গেছি। আর, কালো কালো মাথাগুলো দৃশ্যপটে দুলছে। আমি জীবনে সর্বপ্রথম নার্ভাস বোধ করতে লাগলাম। আমার ভীষণ ভয় করছে। এই গুমট পরিবেশটা বুঝি এখুনি ফেটে পড়বে।

আমি দেয়ালে ধরে দাঁড়ালাম।

'দাদা—'

'কিছু বলবি?'

'তোমার কী অসুখ করেছে?'

'সময় কোথায়?'

'অসুখের আবার সময়-অসময় কী? ঊর্মিলাদি তোমাকে আজই একবার দেখা করতে বলেছেন। ভয়ঙ্কর প্রয়োজন।'

'ঊর্মিলাদি!' বোনের মুখের দিকে অর্থহীন কী-অন্বেষণ করতে চাইলাম।

'আহা, চেনো না যেন। তোমরা ছেলেরা সব এমনি স্বার্থপর...'

'কী বলছিস?'

'তবে মিছিমিছি ওকে কথা-দেয়া কেন?'

'কথা!'

আমি ক্লান্ত হয়ে বাবার আরাম কেদারায় বসলাম।

বাইরে উজ্জ্বল ভাদ্রের রোদ। চিত্রার্পিত দৃশ্যাবলী।

ঊর্মিলা। মা যখন ভেতর থেকে এখনো ডাকেন নি তখন আজ অরন্ধন। ওরা কী পিছন থেকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আমাকে নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে। গ্রীষ্মের এই অগ্নি-শালায় এখন আমি আর ঊর্মিলা। ধরা যাক ওই তক্তপোশে উপুড় হয়ে শুয়ে ঊর্মিলা। ওর লম্বা চুলের ভার খসে পড়েছে মেঝের বুকে। ওর উচ্ছ্বসিত রক্তিম ঠোঁট, সর্বাঙ্গ নেয়ে-ওঠা ঘামে জবজবে। মাঝখানের দরজাটা কী বন্ধ করে দেবো? দরজার আড়ালে ফিসফাস। 'তুমি একেক সময় এমন গম্ভীর হয়ে যাও...' (ঊর্মিলা ঘরটা এখন অগ্নিশালা) 'তুমি এমন করলে আমি একদিনও বাঁচতে পারিনে। লক্ষ্মীটি, আমাকে একটু বাঁচতে দাও।' (ঊর্মিলা, বাতাসে বারুদের গন্ধ পাচ্ছ? আজ নয় কাল আমরা এক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছি) 'আমার মনের আদলটা অনেক ছোটো। বড় রকমের ইতিহাস সেখানে ধরা পড়ে না।' (ঊর্মিলা, পথটা এখানে দু ভাগ হয়ে গেছে, এ পথটায় অনেক খানাখন্দ, তুমি ওপাশে যাও। ঊর্মিলা...)

কোত্থা থেকে একটা প্রকাণ্ড চিৎকারের শব্দ আমাকে গ্রাস করল। আমি মুমূর্ষু চিৎকার করে উঠলাম : মা—। চিৎকারটা যেন অনেক গভীর জলশূন্য খাদ থেকে ভেসে এল। আর, ভয়ঙ্কর নির্জনতায় আমি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম।

জামা গায়ে গলিয়ে আমি বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

ঊর্মিলা বলল : 'ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি। তুমি আমাকে বাঁচাও।'

আমি নির্বাক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তোমাকে বহুবার বলেছি। শোন নি। বাবা আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাকা কথা দিয়ে দিয়েছেন। অঘ্রানেই আমার বিয়ে।

আমি বধির। দাঁড়িয়ে রইলাম।

'এখনো চুপ করে আছো? বলো আমি কী করব?'

বললাম : 'আমি কী করতে পারি?'

'যা, তুমি পুরুষ নও? এই জন্যেই কী নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে এতদিন মিশেছি? আমাদের এত প্রতিশ্রুতি, এত...'

আমি নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

'বুঝেছি। তোমার মতো কাপুরুষের সঙ্গে এতদিন নিজেকে যুক্ত রেখে আমি মস্ত ভুল করেছি। আমি মানুষ চিনি নি, চিনতে পারি নি। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আমাকে ঠকিয়ে তুমি কোনোদিন জীবনে সুখী হবে না।'

আমি টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম।

চতুর্মুখ রাস্তার কেন্দ্রবিন্দুতে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমার চার পাশ দিয়ে ঘন জনস্রোত। রাস্তার ট্রাফিক পুলিশ এখন বাম দিকের রাস্তাটা মুক্ত করে দিল। এই রাস্তাটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? বাঁধরোড, কৃষ্ণচূড়া, রেনট্রি, আর্ত মহানন্দা।

কে ডাকছে আমার নাম ধরে? আশ্চর্য, আমার একটা নাম আছে আমি ভুলে গিয়ে-ছিলাম। আমার নাম ধরে ডাকার লোকও ফুরিয়ে আসছে।

'জীমূত, এই জীমূত—'

আমার পিছন ফিরে তাকাতে সাহস হল না। কী জানি যদি নামডাকাটা বন্ধ হয়ে যায়।

'জীমূত, এই শুনতে পাচ্ছিস নে?'

শক্ত থাবা আমার কাঁধে। 'কী রে, অমন ছুটছিস কেন?'

আমাকে থামতে হল। আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। একটা অস্পষ্ট অনুমান...

'আমি—' বীরেশ্বর হাসল : 'তোকেই গরু-খোঁজা করছি।'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'আর কথা আছে। ভীষণ জরুরি।'

বীরেশ্বর আমাকে টানতে টানতে রেস্তোরাঁয় ঢোকাল।

'কী খাবি?'

'না। কিছু খাব না।'

'তা কী হয়। কতদিন পরে দেখা।'

বীরেশ্বর একরাশ অর্ডার দিল।

'দ্যাখ অতো ভেঙে পড়লে চলে না। বাবা কারুর চিরকাল থাকে না।' বীরেশ্বর মুরগির হাড় চিবোচ্ছিল : 'তোকে আমার ভীষণ দরকার। এই রকম একটা বিশ্বস্ত বন্ধু খুঁজছিলাম। জানিস তো আমার ব্যবসাটা এক্সপ্যান্ড করছি। বালুরঘাটে কতকগুলো টেন্ডার পেয়েছি। ওখানে আপিস না-করলে চলছে না। ভাই, তোকে ওখানকার ভারটা নিতে হবে।'

'আমি!'

'জানিস তো আমাদের কাজের ধারা। কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই। আর এ-লাইনে যা কম্পিটিশন, একবার কাজটা হাতছাড়া হয়ে গেলে...। রাজি হয়ে যা ভাই। দ্যাখ ভগবানই যোগাযোগ করে দিয়ে-ছেন : আমার লোকের দরকার আর তোরও প্রয়োজন। বাইরের লোক স্টেপুটে খাবে তার চেয়ে বন্ধুদের জন্যেই [illegible] করা ভালো। আমি তোদের [illegible]?'

'একটু ভেবে দেখি।'

'তা ভাব। কিন্তু আগামী সপ্তাহেই তোকে শিফট করতে হবে। মোক্তারপাড়ায় আমি তোর জন্যে বাড়ি দেখে রেখেছি। ইচ্ছে করলে বাড়ির সকলকে নিয়ে যেতে পারিস। এই নে, খামটা রাখ ওর মধ্যে পাঁচশো টাকা আছে, প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলো তো তোকে করতে হবে। এ ছাড়া কাজের ওপর একটা কমিশন তো আছেই...'

সন্ধ্যেবেলা বীরেশ্বরের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলাম।

'মা—'

উত্তর নেই।

'মা কোথায় রে?'

'মা দত্তদের বাড়ি গেছেন।'

'এখন এই অসময়ে।'

'মা ওদের রাত্রির রান্নাটা করে দেন।'

'কী বলছিস?'

'ওরা কুড়ি টাকা করে দেবে।'

আমি ক্লান্ত হয়ে বাবার আরাম-কেদারায় আছড়ে পড়লাম। 'জীমূত, এই জীমূত—' আহা, কতদিন পর আমার নামটা কানে শুনতে পেলাম। আমার একটা নাম আছে আমিই ভুলে গিয়েছিলাম। 'জীমূত, জীমূত...' পকেটে খামে-মোড়া পাঁচশো টাকা কারেন্সির নোট।

'দাদা, দাদা...' ভয়ার্ত বোনের কণ্ঠস্বর। 'সর্বনাশ হয়েছে। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

ও আমার গা ধরে অমন পাগলের মতো ঝাঁকুনি দিচ্ছে কেন। আমি কী উদ্ভিদ হয়ে গেছি।

'ও দাদা, তুমি ঊর্মিলাদিকে কী বলে এসেছিলে? ওঠো শিগগির, তোমার এখুনি একবার ও বাড়িতে যাওয়া দরকার। ঊর্মিলাদি গায়ে আগুন জেবলে আত্মহত্যা করেছে।'

আমার শরীরের রক্তগুলো কী সাপের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? আমি উঠতে পারছিনে কেন। বোনটি, আমাকে একটু টেনে তোল। আমি একবার দাঁড়াই, পায়ের জোর পরখ করি। তারপর আমাকে ছুটতে হবে।

আমি কখন বারান্দা থেকে রাস্তায় স্খলিত হয়ে পড়েছি। আমি কী ছুটছি। সামনে অনেক পথ। আমাকে আরো ছুটতে হবে। এই কে আছো, আমি কী ঠিক রাস্তায় চলেছি। এই দিবমুখ রাস্তাটা কোথায় গেছে? এখানে কোনো বসতি নেই কেন। কাঁটা ঝোপ জঙ্গলে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। লতাগুলো আমার পা জড়িয়ে ধরছে। জীমূত, এই জীমূত... আমার নামটা এখন ঘুমের মতো, স্বপ্নের মতো...। আমি কী পথ হারিয়ে ফেলেছি। না কি এই বুনো অস্তিত্বটা তীব্র উদ্ভিজ্জ গন্ধসহকারে আমার পায়ে পায়ে হেঁটে আসছে। ঊর্মিলার সরু সিঁথির মতো এক-ফালি রাস্তাটা কোথায় হারিয়ে গেল। আমার চারপাশে কে কালো দেওয়াল খাড়িয়ে চলেছে। আমি ক্রমশ বধির হয়ে যাচ্ছি আমার চোখ-জোড়া অন্ধকার হয়ে আসছে।

আমি প্রাণপণ প্রয়াসে একটা মুক্ত জগতের দিকে ছুটতে লাগলাম।

(১৩)

যীশুর সবচেয়ে কাছাকাছি বলেই বোধহয় ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ গান্ধীজীকে দর্শন দেন না। তবে তাঁর খাতিরে ভাটিকানের গ্যালারিগুলো খুলে দেওয়া হয়। অপূর্ব শিল্পসম্পদের মাঝখানে তিনি হারিয়ে যান।

রম্যা রলাঁ সতর্ক করে দিয়েছিলেন বলে তিনি রোমে ফ্যাসিস্টদের অতিথি হন না। কিন্তু মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর মুখের উপর বলে আসেন যে তিনি শুধু একটা তাসের কেল্লা গড়ছেন।

ব্রিন্দিসি থেকে জাহাজের ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যাত্রা করেন গান্ধীজী। পেছনে পড়ে থাকে ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলন্ডের, তিন মাস। সেই তিন মাসে যা তিনি করেছেন তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভারতের কাজ ও অহিংসার কাজ। ভারতের কাজে যেমন বিশ্রাম নেই, তেমনি অহিংসার কাজেও। পশ্চিমকে তিনি অহিংসার বাণী শোনাবেন।

হায়! তখনকার দিনের ইউরোপে কেই বা অহিংসার বাণীতে কান দেবে! যখন ভারতেই চলেছে হিন্দু মুসলমানের অন্তহীন হানাহানি। আর থেকে থেকে সন্ত্রাসবাদী হামলা। আর ইউরোপের সংকট তখন এমন গভীরভাবে ঘনিয়ে আসছে যে হিংসাকেই মনে হচ্ছে একমাত্র পন্থা। তা সে যতই বর্বর হোক। যতই অমানুষিক হোক।

ইউরোপকে তার স্বকীয় আধ্যাত্মিকতার উপর ছেড়ে দিয়ে গান্ধী ফিরে আসেন ভারতে। যেখানে সারা দেশ অধীরভাবে অপেক্ষা করছে নেতার জন্যে। নেতাবিহীন জনতা ঠিক যুদ্ধবিরতির নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলেনি, এখানে ওখানে শান্তিভঙ্গ করেছে। আর সরকারপক্ষও যে মান্য করেছে তা নয়। চুক্তিতে সরকারের প্রেস্টিজ হানি হয়েছে, তাই কড়া হতে সমঝিয়ে দিতে হয়েছে যে সরকারই বলবান। সন্ত্রাস-বাদীরাও যথেষ্ট কারণ দিয়েছে দমননীতি অনুসরণের। গোটা তিনেক অর্ডিনান্স জারি করতে হয়েছে তিনটি প্রদেশে।

দু'পক্ষেই যুদ্ধং দেহি। সুতরাং যুদ্ধ বেধে যেতে সাতটা দিনও লাগে না। গান্ধীজীকে ধরে নিয়ে বন্দী করে রাখা হয় পুনার য়েরওয়াদা জেলে। কংগ্রেস নেতারাও বন্দী হন। কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হয়। আরো দশটা অর্ডিনান্স জারি করা হয়। খুব সম্ভব সেগুলি তিন মাস ধরে সরকারী কারখানায় তৈরি হচ্ছিল। যেমন তৈরি হচ্ছিল কংগ্রেসের আইন অমান্য পরিকল্পনা। যুদ্ধে নেমে নালিশ করা চলে না যে এটা অন্যায়, ওটা আইনবিরুদ্ধ।

আমরা সেদিন লক্ষ্য করি যে কোনো পক্ষই আইনকে কানাকড়ি দাম দিচ্ছে না। কংগ্রেস তো সোজাসুজি আইনভঙ্গের প্রোগ্রামই নিয়েছে, হিংসা এড়ানো ভিন্ন তার আর কোনো দায় নেই। আইনের শাসনবলে বৃটিশ শাসকদের যে গর্ব ছিল সেটাও আর আইনের নয়, অর্ডিনান্সের শাসন। জেল, জরিমানা তো তুচ্ছ কথা, বেত্রদন্ডও বিহিত করা হলো। ঘরবাড়ী, জমিজমা, ব্যাংক

অন্নদাশংকর রায়

ব্যালান্স, মোটরগাড়ী যেটা খুশি কেড়ে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করলেই হলো। সবচেয়ে আজব কান্ড নাবালকদের অপরাধের জন্যে তাদের গুরুজনের শাস্তি।

চার্চিল পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন যে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে এমনতর কঠোর দন্ডবিধির প্রয়োজন হয়নি। আর সার স্যামুয়েল হোর তো সাফ কথা শুনিয়ে দিলেন যে, এবার যেটা হবে সেটা অমীমাংসিত যুদ্ধ নয়।

তবে গান্ধীজী যে বলেছিলেন এবার শুধু লাঠি চার্জ নয়, বুলেটের সম্মুখীন হতে হবে, সেরকম কিছু ঘটল না। যত গর্জায় তত বর্ষায় না। সরকারকেও সব ক'টা অর্ডিনান্স সর্বতোভাবে প্রয়োগ করতে হয়নি। কংগ্রেসের আন্দোলনও তেমন গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছয়নি।

"ব্যাপার কী, বলুন তো?" আমার এক ইউরোপীয় সহকর্মী বিস্মিত হয়ে সুধান। "এবারকার আন্দোলনটা হঠাৎ এমন ঠান্ডা মেরে গেল কেন? আমরা তো ভেবেছিলুম অনেকদিন ধরে গড়াবে। কংগ্রেসের দম যে এত কম অ কে জানত।'

ও'দের আফসোসটা আন্তরিক। আন্দোলনটা জোর চলেছে দেখলেই ও'রা যুদ্ধের স্বাদ পেতেন। সে স্বাদ ও'দের জোগায় সন্ত্রাসবাদী দল। কিছুতেই তারা নিরস্ত হয় না।

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হলো হিংসার সঙ্গে হিংসার দ্বন্দ্ব বাধতে না দেওয়া। তার পরিবর্তে হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ্ব বাধানো।

সাধারণ যুদ্ধ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে হিংসার দ্বন্দ্ব। আর সত্যাগ্রহ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ্ব। ইতিহাসে এটা নতুন। যুদ্ধ যেখানে হাজার হাজার বছরের সত্যাগ্রহ সেখানে মাত্র পঁচিশ বছরের। যুদ্ধের নিয়মকানুন সকলের জানা। কিন্তু সত্যাগ্রহের নিয়মকানুন সত্যাগ্রহীদের নিজেদেরই অজানা।

সুতরাং কোনো পক্ষকেই দোষ দেওয়া যায় না। খেলার নিয়ম না জেনে খেলতে গেলে ভুলচুকও যেমন হয়, বাড়াবাড়িও তেমনি হয়। আন্দোলনটাকে অমন কঠোর হস্তে দমন না করলেও চলত। কারণ ওর পরমায়ু সত্যি বেশীদিন ছিল না। যে কারণেই হোক মুসলমানরা দু' তিনটি প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র সরে দাঁড়িয়েছিল। যোগ দিতে যাদের দেখা গেল তাঁরা অন্তত বাংলাদেশে মুষ্টিমেয়। গণ আন্দোলন, অথচ গণই নেই, কারণ অধিকাংশ জেলায় গণ বলতে বোঝায় মুসলমানগণ।

একজন হিন্দু আর একজন মুসলমানকে আমি এক সঙ্গে জেলে আটক করতে পাঠিয়েছিলুম। অকারণে নয় অবশ্য। ইংরেজ জেলাশাসক মুসলমানটিকে পত্রপাঠ ছেড়ে দেন ও বলেন, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই।"

ডিভাইড অ্যান্ড রুল। তবে কিছুদিন বাদে হিন্দুটিকেও সতর্ক করে দিয়ে ছেড়ে দেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছিল। কত সহজে আয়ত্তে এল যখন ভাবি তখন আমারও আফসোস হয় যে কেন অত কড়াকড়ি করা।

তেরোটা অর্ডিনান্সে যা পারেনি একা ম্যাকডোনালডের রোয়েদাদ তা পারল। দিল অতি সুস্পষ্ট আভাস যে বাংলাদেশের বরাতে আছে ইউরোপীয় সমর্থিত মুসলিম

মেজরিটি গভর্নমেণ্ট। তা তুমি যতই লাফাও আর যতই চ্যাঁচাও আর যতই সাহেব নিপাত কর।

মুসলমানেরা যে ক'জন যোগ দিয়েছিলেন তারাও প্রায় সকলেই সরে গেলেন। কোথায় গান্ধীজীর সাধের স্বপ্ন যে তাঁর গণ-সত্যাগ্রহে সব সম্প্রদায়ের লোক সমানে ঝাঁপ দেবে। আর কোথায় অপ্রীতিকর বাস্তব! আন্দোলনটাকে নির্মুসলমান করাই ছিল কর্তাদের উদ্দেশ্য। আর গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল তার বিপরীত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যর্থ। ইংরেজের কূটনীতি বাংলাকে তুলে দেয় ইউরোপীয় সমর্থিত মুসলিম মেজরিটির হাতে।

ওটা ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দুরস্ত করতে না পেরে হিন্দুদের—বিশেষ করে বর্ণ হিন্দুদের শায়েস্তা করার উপায়। কেমন? আর লাগবে আমাদের সঙ্গে? হুঁ! আমাদের এতকালের গদী আমরা তোমাদের ছেড়ে দিয়ে যাব!

এখানে বলে রাখা দরকার যে ১৯১৬ সালে লখনেউ চুক্তি যখন সম্পাদিত হয় তখনো বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু চুক্তি অনুসারে বাংলার মুসলমানদের খরচে বিহার, যুক্ত-প্রদেশ ইত্যাদির মুসলমানদের ওয়েটেজ দেওয়া হয়' আর ওইসব প্রদেশের হিন্দুদের খরচে বাংলার হিন্দুদের ওয়েটেজ দেওয়া হয়। ম্যাকডোনাল্ড যদি লখনেউ চুক্তিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নতুন করে ভাবতেন তা হলে একরকম হতো। কিন্তু লখনেউ চুক্তিকে মোটামুটি বহাল রেখেই তিনি তার ব্যালান্স নষ্ট করলেন। ব্যালান্স গেল মুসলমানদের অনুকূলে। যেখানে তারা মাইনরিটি সেখানে তাদের জন্যে ওয়েটেজ। যেখানে তারা মেজরিটি সেখানে হিন্দুদের জন্যে ওয়েটেজ নয়। তবে পাঞ্জাবে শিখদের ওয়েটেজ অব্যাহত। সেখানে মুসলমান অমুসলমান সমান সমান।

রোয়েদাদের এইদিকটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু মরণপণ অনশন করা অনুচিত। অনিষ্ট যেটা সেটা লখনেউ চুক্তিই করে রেখেছিল স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকার করে। শুধু স্বীকার করে নয়, তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে। মর্লি মিণ্টো যা করতে সাহস পাননি তখনকার দিনের কংগ্রেস নেতারাই তা করেছিলেন। এখন তথাকথিত অস্পৃশ্যরাও যদি দাবী করে যে তাদের জন্যেও স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা হোক ম্যাকডোনাল্ড কোন্ যুক্তিবলে প্রত্যাখ্যান করবেন? তিনি মর্লি মিণ্টোর অনুসরণে কতক জায়গায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ও কতক জায়গায় যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মতে ওটা হিন্দুসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। মাত্র গোটা কয়েক আসন স্বতন্ত্র। আর সব তো একত্র।

মর্লি মিণ্টোর সময়ও তো ছিল মাত্র কয়েকটি আসন মুসলমানদের বেলা স্বতন্ত্র। আর সব একত্র। আরম্ভটা একই রকম। পরিণতিটাও তো একই রকম হবে। ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়। একবার ওটা উপলব্ধি করার পর কেমন করে ওর প্রশ্রয় দেওয়া যায়? হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি যথেষ্ট অশান্তিকর। বর্ণহিন্দু অবর্ণহিন্দু ভেদবুদ্ধি কি আরো অশান্তি-কর হবে না? এতে শুধু রাষ্ট্র নয়, সমাজও দুর্বল হবে। সমাজসংস্কার বাধা পাবে। অস্পৃশ্যতা কতক লোকের পক্ষে লাভজনক হয়ে কায়েমী স্বত্ব হয়ে দাঁড়াবে।

রাজনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক কারণে গান্ধীজী স্থির করেন তিনি আমরণ অনশন করবেন। এটা যে রোয়েদাদের পর তাঁর মাথায় আসে তা নয়। গোল টেবিল বৈঠকেই তিনি এর আভাস দিয়েছিলেন, পরে ভারতসচিবকে জেল থেকে চিঠি লিখে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর অনুভূতির গভীরতা কেউ পরিমাপ করেননি। সত্যি কি তিনি অমন তুচ্ছ কারণে আমরণ অনশন করবেন?

দেশবাসীদের অনেকের মতেও ওটা তেমন কিছু গুরুতর নয়, যেমন গুরুতর রোয়েদাদের অন্যান্য অংশ। মহাত্মার আমরণ অনশনের জন্যে বিশেষ কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। খবরটা তাই বোমার মতো ফেটে পড়ে। দেশময় উদ্বেগের স্রোত বয়ে যায়। ম্যাকডোনাল্ড জানিয়ে দেন যে, ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি নিজেদের মধ্যে একমত না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য হয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে হয়েছে, সিদ্ধান্তের রদ-বদল একতরফা হবে না, হবে যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলি একমত হয়।

অর্থাৎ নিজেরাই স্থির করে নিজেদের গ্রহণযোগ্য একটা বিকল্প। ম্যাকডোনাল্ড সেটা মেনে নেবেন। যেমন লখনেউ চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন মণ্টেগু চেমসফোর্ড।

অনশনরত মহাত্মাকে ঘিরে দরবার বসে যায়। সরকার অনুমতি দেন। এবার কেন্দ্রীয় পুরুষ হচ্ছেন আম্বেদকর। মহাত্মার জীবন-মরণ তাঁরই হাতের মুঠোয়। তিনি যদি পাষাণ হন তো মহাত্মার প্রাণের আশা নেই। তাই আম্বেদকরের হৃদয়ের উপর চাপ পড়ে। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক তা বলে অভিভূত হয় না। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন ছেড়ে দেন বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে আদায় করে নেন অনেক বেশী আসন। সেসব আসনের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এমন এক পদ্ধতিতে যে হরিজন প্রার্থীদের হরিজনরাই প্রথমে ভোট দিয়ে মনোনয়ন করবে, তারপরে হিন্দুরা সমবেতভাবে ভোট দেবে। পুনা চুক্তি হিন্দুরা সবাই মেনে নিলে ব্রিটিশ সরকারও সেই অনুসারে রোয়েদাদের সংশোধন করেন।

লখনেউ চুক্তির সঙ্গে পুনা চুক্তির পার্থক্য এইখানে যে একটাতে যেমন স্বতন্ত্র নির্বাচনের নীতিটাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই ভিত্তির উপরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল অপরটাতে তেমনি সেই নীতিটাকে অস্বীকার করে আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে বর্ণহিন্দু ও অবর্ণহিন্দুদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। হায়! এ বুদ্ধি কেন ১৯১৬ সালে কারো মাথায় আসেনি। কেউ কেন হৃদয়ঙ্গম করেননি যে স্বতন্ত্র নির্বাচন মেনে নেওয়া মানে মুসলমানকে অমুসলমানের থেকে ও অমুসলমানকে মুসলমানের

থেকে স্বতন্ত্র করে উভয়কে সাধারণের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা। আর সাধারণকেও প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা।

ম্যাকডোনাল্ড আমাদের একটি প্ল্যানির থেকে মুক্ত করলেন। আমাদের আর অমুসলমান বলে পরিচয় দিতে হলো না। তার বদলে 'সাধারণ' শব্দটি চলতি হলো। বলা বাহুল্য মুসলমান বাদে ও শিখ বাদে সাধারণ। মাইনরিটির সংখ্যা ওই দুটিতেই সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় মাইনরিটির কথা বলছি।

গান্ধীজী এখন থেকে তথাকথিত অবর্ণহিন্দুদের নিয়ে ব্যাপৃত রইলেন। তাদের নতুন নামকরণ হলো সরকারী মতে তপশীলী জাত আর গান্ধীজীর মতে হরিজন। নামটা কিন্তু তাঁর নিজের উদ্ভাবন নয়। এক অস্পৃশ্য পত্রলেখকের কাছে ওটি তিনি পান। গুজরাটের প্রথম কবিসন্ত নাকি ওটি প্রথমে ব্যবহার করেন কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে।

'হরিজন' বলে যে পত্রিকার উদ্বোধন হয় তার জন্যে আম্বেদকরকে একটি বাণী পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। তার উত্তরে তিনি বাণী দেন না, দেন তাঁর অভিমত। তিনি বলেন,

> "The outcaste is a by-product of the caste system. There will be outcastes as long as there are castes. And nothing can emancipate the outcaste except the destruction of the caste system."

গান্ধীজী তখনো জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু অস্পৃশ্যতায় না। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর বিশ্বাস বদলায়। তিনিও তখন জাতিহীন সমাজের পক্ষপাতী হন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট। সেটি অস্পৃশ্য বলে কাউকে কোনো সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। মন্দির প্রবেশেও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ থাকবে না।

এই যেমন লক্ষ্য তেমনি পদ্ধতি হলো বর্ণহিন্দুদের স্বতঃপ্রণোদিত অন্তঃ-পরিবর্তন। তার জন্যে অবর্ণহিন্দুদের সত্যাগ্রহ বা অন্যপ্রকার আন্দোলন করতে হবে না। যা করবার তা বর্ণহিন্দুরাই করবে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে অবশ্য দু'রকম মত ছিল। সংস্কারকামী ও সংস্কারবিরোধী। যাতে দ্বন্দ্ব না বাধে তারই উপর ছিল গান্ধীজীর দৃষ্টি।

হরিজন আন্দোলন উপলক্ষে গান্ধীজী-কে আরো একবার অনশন করতে হয়। এটা সরকারের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে নয়, সংস্কার-বিরোধীদের আচরণে মর্মাহত হয়ে। অনশনের কারণ জানতে পেরে সরকার তাঁকে বিনাশর্তে খালাস দেন। তিনি তখন জেলের বাইরে গিয়ে তাঁর অনশন সমাপন করেন। একুশদিনের অনশন।

এর পরে তিনিও ভদ্রতা করে গণ-সত্যাগ্রহ এক মাসের জন্যে বন্ধ রাখেন। উদ্দেশ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। কথাবার্তা সফল হলে তিনি গণসত্যাগ্রহ একেবারেই বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতেন। অবশ্য নেতারা রাজী হলে। কিন্তু আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব শুনে সরকারপক্ষ জানিয়ে দেন যে সর্বপ্রথমে গণসত্যাগ্রহ বিনাশর্তে প্রত্যাহার করতে হবে। তার মানে পরাজিতের মতো অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। বিজিত দেশের সেনাপতি বিজেতা দেশের সেনাপতির কাছে যেমন তরবারি সমর্পণ করেন।

না, তেমন কিছু করবেন না গান্ধীজী। হিংসার তরবারি বহু পূর্বেই বিজেতা ইংরেজের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে। তার উপর যদি অহিংসার অস্ত্রটিও সমর্পণ করা হয় তবে হাতে রইল কী? তিনি তাঁর বেদনাভরা অন্তর দিয়ে অনুভব করছিলেন যে, অর্ডিনান্সের প্রহারে দেশবাসী জর্জর। শাস্তির বোঝা বইতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। মনের জোর ভেঙে যাচ্ছে। চাই এখন সম্মান-জনক সন্ধি। তা বলে অস্ত্র সমর্পণ! না, কদাচ নয়।

জেলের বাইরে সে সময় যেসব সহকর্মীকে পাওয়া গেল তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিশেষে এই স্থির হলো যে গণসত্যাগ্রহ তুলে নেওয়া হবে, ব্যক্তিসত্যাগ্রহ চালিয়ে যাওয়া হবে। গান্ধীজী তখন সবরমতী যান, আশ্রম গুটিয়ে নেন, তেত্রিশ জন সহচর নিয়ে যাত্রা করেন রাস অভিমুখে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আবার সেই য়েরওয়াদা জেলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয় এই আদেশ দিয়ে যে পুনায় অবস্থান করতে হবে। তিনি সে আদেশ মান্য করবেন না বলায় তাঁর বিচার হয়, বিচারে এক বছরের কারাদণ্ড।

এবারেও তিনি জেল থেকে হরিজন আন্দোলন চালাবার অনুমতি চান, কিন্তু পান না। কারণ এবার তিনি আটক বন্দী নন। দণ্ডিত কয়েদী। তিনি আবার অনশন করেন। তখন তাঁকে বিনাশর্তে খালাস দেওয়া হয়। এই বেড়াল ইঁদুর খেলা তাঁর ভালো লাগে না। তাঁর প্রাণ চায় হরিজনদের কাজ নিয়ে থাকতে। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ তার সঙ্গে বেখাপ। তিনি নিজের জন্যে বেছে নেন এক বছরের হরিজন সেবা। কিন্তু অপরের জন্যে ব্যক্তিসত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা হয় না।

সেকালের পরিব্রাজকদের মতো তিনি পদব্রজে ভারতের অস্পৃশ্যবহুল অঞ্চলগুলি পর্যটন করেন। বুদ্ধের মতো প্রচার করেন অস্পৃশ্যদের মুক্তির বাণী। সেটাও তো স্বরাজের অংগ।

।। এক ।।

কর্মজীবন আর সংসারজীবনের দুটি গোলপোস্টের মাঝখানে দায়িত্ব-কর্তব্যের ফুটবল পেটাতে পেটাতেই অধিকাংশ মধ্যবিত্তের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। কিছু মানুষের বিচরণ-ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত, আরো রঙীন। কিছুটা বিস্তৃত, কিছুটা রঙীন হওয়া সত্ত্বেও সমাজ-সংসারে এদের নোঙর বাঁধা। চৌরঙ্গীর অলিতে-গলিতে ঘোরাঘুরি বা সন্ধ্যার অন্ধকারে মিউজিয়ামের পাশে লুকিয়ে রিক্সা চড়ে যৌবনের অলকানন্দা-অমরাবতী ভ্রমণের মেয়াদ কতটুকু, মীর্জাপুর বা রাসবিহারী এভিন্যুর ঘরবাড়ী ছেড়ে বোম্বে সেলস অফিসের মিস সোন্ধিকে নিয়ে মেরিন ড্রাইভ বা চার্চ গেটের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করারই বা স্থায়িত্ব কতক্ষণ?

দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে স্বাধীনতা উপভোগের পর্ব শেষ হয়। সূর্যাস্তের পর সব পাখী ফিরে আসে ঘরে। শনি-মঙ্গল-রাহুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতেই একদিন সব খেলা থেমে যায় প্রায় সবার।

ডিপ্লোম্যাট-কূটনীতিবিদরা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। মীর্জাপুর বা রাসবিহারী এভিন্যুর ছেলে হয়েও সারা দুনিয়ায় তাঁদের বিচরণ, তাঁদের সংসার। বিশ্ব-সংসারের কত রং-বেরং-এর নারী-পুরুষের সঙ্গে তাঁদের লেনদেন। দেশে-দেশে ছড়িয়ে থাকে এঁদের স্মৃতি, প্রাণের মানুষ, মনের টুকরো টুকরো স্বপ্ন।

তরুণ মিত্র যেদিন ফরেন সার্ভিসে ঢুকে কূটনীতিবিদদের তালিকায় নিজের নাম জুড়েছিলেন, সেদিন উনি সত্যি তরুণ ছিলেন। সেদিনের পর মিসিসিপি-ভলগা-গঙ্গা বেয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। অনেক জল-ঝড়, অনেক বসন্ত পিছনে ফেলে এসেছেন।

ফায়ার প্লেসের ধারে রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বাকি হুইস্কীটা হঠাৎ গলায় ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তরুণ মিত্র। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে খালি গেলাসটা হাতে নিয়ে চলে গেলেন স্টাডিতে। অতি পরিচিত পৃথিবীর মানচিত্রের সামনে দাঁড়ালেন। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ, মহাসাগরের 'পর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর ল্যান্ডিং এয়ারক্রাফটের কমান্ডারের মত খুঁজতে লাগলেন রানওয়ে। অনেক দিনের অনেক স্মৃতির বোঝা নিয়ে মনের বিমান ল্যান্ড করাতে গিয়ে অনেক-গুলো এয়ারপোর্টের অনেক রানওয়ের হাজার হাজার নীল আলো জ্বলে উঠল। দিল্লী ......কায়রো ......লন্ডন...... মস্কো ...নিউইয়র্ক ...হংকং ...টোকিও এবং আরো কত। একসঙ্গে যেন সমস্ত কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ল্যান্ডিং সিগন্যাল আর নির্দেশ পেলেন ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্র।

আরো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দুপা ডানপাশে সরে এলেন। চোখের সামনে নজর পড়ল দিল্লী।

●

'সো, ইউ হ্যাড অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টে ইন ঘানা'......

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও ইউনাইটেড নেশানস ডিভিশনের হেড পরমেশ্বরন হাসতে হাসতে ছোট্ট মন্তব্য করলেন।

তরুণ মিত্র বলল—হ্যাঁ স্যার।

মুহূর্তের জন্য দুজনেই চুপচাপ। তরুণ আবার বলে, আক্রার পোস্টিং পেয়ে মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ভালই......

পরমেশ্বরন ওয়ারলেস ট্রানসক্রিপ্টের ফাইলটা সরিয়ে রেখে বললেন, ব্ল্যাক আফ্রিকায় পোস্টিং না পেলে কোন ডিপ্লোম্যাটই ঠিক পুরোপুরি ডিপ্লোম্যাট হতে পারে না।

'আজ সত্যি সত্যিই সেকথা বিশ্বাস করি।'

......রেঙ্গুন থেকে ঘানা। তরুণ মোটেও খুশী হতে পারেনি। ভেবেছিল কন্টিনেন্টে পোস্টিং পাবে। কিছুদিন আগে ফরেন সার্ভিস ইন্সপেক্টরেটের এক-জন ডেপুটি সেক্রেটারী রেঙ্গুনের ইন্ডিয়ান এম্বাসী ভিজিট করতে এসে বলেছিলেন, ঠিক মনে নেই, বাট সামওয়ান টোল্ড মী যে তুমি এবার কন্টিনেন্টে কোন পোস্টিং পাবে।

ফরেন সার্ভিসের অধিকাংশ নবীন কূটনীতিবিদদের মত ব্ল্যাক আফ্রিকার নাম শুনেই তরুণের পিত্তি জ্বলে উঠেছিল। একটু ঘুরিয়েফিরিয়ে স্বয়ং অ্যাম্বা-সেডরকে পর্যন্ত মনের কথা জানিয়েছিল। অ্যাম্বাসেডর তরুণের কথা শুনে শুধু মুচকি হেসেছিলেন, মুখে কিছু বলেন নি। প্রায় মাসখানেক পরে অ্যাম্বাসেডর একদিন তরুণকে ডেকে বললেন, স্পেশাল সেক্রেটারী তোমাকে ঘানাতেই চান।

সুতরাং আর অযথা বাকাবায় না করে তরুণ কোকো আর সোনার দেশ ঘানা গিয়েছিল। গিনি উপসাগরের পাড়ের আক্রায় কাটিয়েছে তিন বছর। কিন্তু গিনি উপসাগর বা দূরের দক্ষিণ অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের গর্জন ছাপিয়ে কানে এসেছে প্রেসিডেন্ট নক্রুমার তীব্র অহমিকার অসহ্য গর্জন।

স্নিগ্ধ, শান্ত, বিচিত্র প্রকৃতির ছোট্ট কালো দুরন্ত ছেলে হচ্ছে ঘানা। সমুদ্রের পাড় ঘেঁসে চলে গিয়েছে তুলনাহীন বালুকা-ময় বেলাভূমি। সেই সুন্দর সুদীর্ঘ বেলাভূমি কখন যেন হারিয়ে যায় ঘন-কালো বনানীর মধ্যে। এই সীমাহীন অরণ্য আর বালুকাময় বেলাভূমিতেই লুকিয়ে আছে সোনার সংসার। তাইতো নাম ছিল গোল্ডকোস্ট! পশ্চিম আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নেবার পর এলো ডেন আর ডাচরা। ফেরিওয়ালা সেজে ব্যবসা করতে এলো ইংরেজ। দেখতে দেখতে এক-দিন ফেরিওয়ালাই হলো মালিক।

তারপর প্রায় একশ বছর ধরে চলল ইংরেজের লুটপাট। জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে গেল ম্যাঙ্গানিজ আর কোকো। শত শত বছরে প্রকৃতির আশীর্বাদে যে

বনানী গড়ে উঠেছিল, জাহাজ বোঝাই করে তাও নিয়ে গেল। হাজার হাজার সিন্দুক বোঝাই করে নিয়ে গেল সোনা আর হীরের তাল।

ইংরেজ যখন গোল্ডকোস্টের অনন্ত সম্পদ লুটপাটে মত্ত, তখন সবার অলক্ষ্যে চব্বিশ বছরের এক স্কুলমাস্টার পাড়ি দিলেন আমেরিকা। নিঃসম্বল এই কৃষ্ণকায় রোমান ক্যাথলিক যুবক নিদারুণ শীতের রাতে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে কাটিয়েছেন। "ব্ল্যাক নিগার' বলে ধিকৃত হয়েছেন দ্বারে দ্বারে। কিন্তু তবুও সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। দুটি ব্যাচিলার্স আর দুটি মাস্টার্স ডিগ্রী নেবার পর এলেন অ্যাটল্যান্টিকের এপারে, ভর্তি হলেন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে।

এমনি করে বারো বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম ও সাধনার পর ছত্রিশ বছরের নক্রুমা ১৯৪৭ সালে ফিরে এলেন নিজের জন্মভূমিতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেশায় মাতাল করে তুললেন সত্তর লক্ষ দেশবাসীকে। সত্তর লক্ষ কৃষ্ণকায় সিংহের বজ্রমুষ্টিতে ইংরেজ না পালিয়ে পারল না।

সেদিন এই সত্তর লক্ষ মানুষ হাসিমুখে নিজেদের ভবিষ্যৎ তুলে দিল রাষ্ট্রনায়ক নক্রুমার হাতে।

ঘানার মানুষগুলো কালো কিন্তু বড় হাসি-খুশী ভরা। আনন্দে মেতে উঠতে বোধকরি এদের জুড়ি সারা আফ্রিকায় নেই। দূরাগত মানুষদের এরা বড় ভালবাসে, বড় সমাদর করে। নিমন্ত্রণ করে বাদামের সুপ খাওয়ায়।

ঘানায় না গেলে কি তরুণ এসব জানত? জানত না। ঘানায় না গেলে আরো অনেক কিছু জানতে পারত না। আক্রা যে এত সুন্দর, এত আধুনিক শহর, তাও জানত না। অন্তরে অন্তরে নিজেদের ঐতিহ্যের জন্য অস্বাভাবিক গর্ববোধ করা সত্ত্বেও ঘানার মানুষ ভয়ে ভয়ে পাশ্চমী আধুনিকতাকে দূরে ঠেলে রাখেনি। তাই তো আক্রায় রয়েছে লা রন্দির মত বিখ্যাত নাইটক্লাব।

তিন তিনটি বছর আক্রায় কাটিয়ে এসে তরুণের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই।......

মিঃ পরমেশ্বরন লাইটার দিয়ে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন। তরুণের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে একটু হাসলেন। প্রশ্ন করলেন, প্রেসিডেন্ট নক্রুমাকে কেমন লাগলো?

'অফিসিয়ালি অর আন-অফিসিয়ালি জানতে চাইছেন?'

'তুমি সত্যি ডিপ্লোম্যাট হয়েছ। টেল মী ইওর পার্সোনাল ওপিনিয়ন।'

'একজন অসামান্য প্রতিভা, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তবে......'

'তবে কি?'

'যেভাবে চলছেন তাতে কিছুই বলা যায় না।'

'তার মানে?'

'প্রায় তিনশ' কোটি টাকা ধার নেবার পরও যে দেশের অর্থনীতি টলমল করছে,

সেই দেশের প্রেসিডেন্ট যদি উনিশ-কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজের মর্মরমূর্তি তৈরী করতে যান, তাহলে দেশের মানুষ কতদিন বরদাস্ত করবে তা বলা কঠিন।'

'ইউ আর রাইট মাই বয়।'

এবার তরুণ হাসি মুখে বলে, 'তবে স্যার, প্রেসিডেন্ট নক্রমা ইজ এ চার্মিং পার্সোনালিটি। এমন ব্যক্তিত্ব যে কেউটে সাপকেও বশ করতে পারেন।

'সাপুড়ে কিন্তু সাপের ছোবলেই মরে, তা জান তো?'

'দ্যাটস রাইট স্যার।'

তরুণ মিত্র সম্পর্কে পরমেশ্বরনের হৃদয়ে বেশ কিছুটা কোমল জায়গা রয়েছে। কনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে তরুণকে ভালবাসার অনেক কারণ আছে। স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, ইন্টেলিজেন্ট। যে কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাছাড়া কূট-নৈতিক দুনিয়ার গোপন খবর জোগাড় করতে তরুণের জুড়ি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে খুব বেশী নেই।

কেন, সেবার? টোকিও থেকে প্যান আমেরিকান ফ্লাইটে দিল্লী ফেরার পথে দুজন পাকিস্থানী ডিপ্লোম্যাট ওর সহযাত্রী ছিলেন। পাকিস্থানী ডিপ্লোম্যাটরা ভাবতে পারেননি তাঁদের পিছনেই ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের তরুণ মিত্র বসেছিলেন। ও'দের কথাবার্তায় তরুণ জানতে পারে, ইউ এস এয়ার ফোর্সের একদল সিনিয়র অফিসার মাস খানেকের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্থানের সীমান্ত দেখতে আসবেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই কয়েক হাজার অফিসারের কোয়ার্টার তৈরী করা সম্ভব হবে? তাও আবার গিল-গিট-পেশোয়ারের মত জায়গায়!

জহুরীর কাছে কাচ আর হীরের পার্থক্য ধরতে যেমন কষ্ট হয় না বুদ্ধিমান ডিপ্লোম্যাটের কাছেও তেমনি এই সব টুকরো টুকরো খবরের অনেক দাম, অনেক গুরুত্ব। তরুণ বেশ অনুমান করতে পারল পাকিস্থানে নাটকীয় কিছু ঘটছে।

পালামে যখন ল্যান্ড করল তখন সন্ধ্যা সাতটা। অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। এয়ার পোর্ট থেকেই জয়েন্ট সেক্রেটারীকে টেলি-ফোন করল কিন্তু পেল না। খবরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিনাদ্বিধায় স্বয়ং ফরেন সেক্রেটারীকেই ফোন করল, স্যার মাপ করবেন, বাট দেয়ার ইজ সামথিং ভেরী ইম্পর্টান্ট। জয়েন্ট সেক্রেটারীকে না পেয়ে আপনাকেই বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি।

পালাম থেকে ট্যাক্সি নিয়ে তরুণ ছুটে গিয়েছিল আকবর রোডে ফরেন সেক্রেটারীর বাড়ী। বলেছিল, 'স্যার ওদের কথা শুনে মনে হলো ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয়। সন্দেহটা আরো গাঢ় হলো যখন দেখলাম ওরা ব্যাংককে নেমে সিঙ্গা-পুরের প্লেন ধরতে ছুটে গেলেন। আই অ্যাম সিওর ওরা কে-এল-এম ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর থেকে কলম্বো হয়ে করাচী গেলেন।'

ডিনারের সময় হয়েছিল কিন্তু ডিনার না খেয়েই বাইরে বেরুবার জন্য তৈরী হলেন ফরেন সেক্রেটারী। ড্রাইভারকে গাড়ী আনার কথা বলেই ভিতরের ঘরে গিয়ে প্রাইম মিনিস্টারকে টেলিফোন করে শুধু বললেন, খুব জরুরী ব্যাপার। এক্ষুনি একটু দেখা করতে চাই স্যার।

ফরেন সেক্রেটারী তরুণকে নিয়ে তক্ষুনি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে গেলেন। আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে উঠে এলেন প্রাইম মিনিস্টার। সব শুনে বেশ চিন্তিত হলেন। ছোট্ট একটা মন্তব্য করলেন, ইন্টেলিজেন্স কিছু সন্দেহ করছিল বেশ কিছুকাল ধরেই।

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডাই-রেক্টরকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠান হলো প্রাইম মিনিস্টার্স হাউসে। তিনজনে মিলে শলা-পরামর্শ শুরু হবার আগেই তরুণ বিদায় নিল।

এ খবর ফরেন মিনিস্ট্রীর অনেকেই অনেক কাল জানতেন না। পরে অবশ্য অনেকেই জেনেছিলেন। স্টালিনের রাজত্ব-কালে মস্কোর ইন্ডিয়ান এম্বাসীতে পরমেশ্বরন যখন পলিটিক্যাল কাউন্সেলার তরুণ তখন তাঁর অধীনে কাজ করেছে এবং একবার নয়, অনেকবার কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

পরমেশ্বরন তরুণকে নিজের কাছে রাখতে পারলেই সব চাইতে সুখী হন। সব সময় তা সম্ভব হয় না। তবে ঘানা থেকে ফেরার আগেই তরুণকে ইউনাইটেড নেশনস পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন পরমেশ্বরন।

"জান তো এবার তুমি ইউনাইটেড নেশনস-এ যাচ্ছো?"

হাসি হাসি মুখে তরুণ উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ স্যার।'

'বছর দুই-তিন ওখানে থাকলে তুমি একটা কমপ্লিট ডিপ্লোম্যাট হবে।' পরমেশ্বরন একটু থেমে আবার বলেন, 'মেন পলিটিক্যাল কমিটিতে কাজ করলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতি তোমার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

টেলিফোন বেজে উঠল। কথা বললেন। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

তরুণ বলল, মেন পলিটিক্যাল কমিটিতে তো পার্লামেন্টের একজন মেম্বার থাকবেন।

'হ্যাঁ একজন এম-পি থাকবেন। তবে তিনি তো তোমাদেরই তৈরী বক্তৃতা শুধু রিডিং পড়বেন। তবে ও'দের নিয়ে কোন ঝামেলা হয় না। ও'রা সরকারী পয়সায় কয়েক মাস নিউইয়র্কে থাকতে পারলেই মহা খুশী। তারপর খবরের কাগজের পাতায় যদি দু' প্যারা বক্তৃতা ছাপা হয় তাহলে তো কথাই নেই।'

তরুণ মুচকি মুচকি হাসে। বিদেশে থাকবার সময় কয়েকজন ঐ ধরনের লোকের দর্শনলাভ হয়েছেও ঐ সামান্য অভি-জ্ঞতাতেই......

যাই হোক সারা পৃথিবীর টপ ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে মেশবার এমন সুযোগ আর পাবে না। লিফট-এ উঠতে-নামতে, ক্যাফেটেরিয়াতে চা-কফি-লাঞ্চ খেতে খেতে দু-চারজন ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হবেই।

দিল্লীতে আসতে না আসতেই তরুণ আবার ইউনাইটেড নেশনস-এ যাচ্ছে শুনে অনেকেই চমকে উঠলেন। ডিপ্লোম্যাটদের কাছে এর বিরাট মর্যাদা।

সন্ধ্যার পর কনস্টিটিউশন হাউসের ঐ একখানা ঘরের আস্তানায় তরুণ পা দিতে না দিতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

'কনগ্রাচুলেশনস।'

তরুণ চমকে গেল। এরই মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেছে? টেলিফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল, হয়ত কাল ভোরেই দালালের দল হাজির হবে। বলবে, এক্সকিউজ মী স্যার! আপনি তো আবার বিদেশ যাচ্ছেন। আপনার টেপ রেকর্ডার, টানজিস্টার, ক্যামেরা, বাইনোকুলার, ডিনার সেট, ওভার কোট, টেরিলিন সার্ট ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু কিনতেই আমরা রাজী।

ভাবতেও গা-টা ঘিন-ঘিনিয়ে উঠল!

কিন্তু কি করবে? এর নাম দিল্লী! দেওয়ালে গান্ধীজীর ফটো লটকিয়ে ফ্রীজে বিয়ার লুকিয়ে রাখাই এখানকার সামাজিক মর্যাদার অন্যতম নিদর্শন। অতীত দিনের বনেদী বাঙালীর বাড়ীর বৈঠকখানায় যেমন আলমারি ভর্তি 'সবুজপত্র' দেখা যেত, তেমনি আজকের দিল্লীর সম্ভ্রান্ত মানুষের ড্রইংরুমে দেখা যায় ওয়াইন গ্লাস আর ডিক্যান্টার-এর প্রদর্শনী। সারা পৃথিবীর মধ্যে দিল্লীই একমাত্র শহর যেখানে ড্রইং-রুমে ফ্রীজ রেখে প্রচার করা হয় ঐশ্বর্যের মহিমা!

এসব দেখতে ভারী মজা লাগে তরুণের। কূটনীতিবিদদের কদর সব দেশেই আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ কূটনীতি-বিদ বা এম্বাসীর কর্মী দেখলে একটু যেন বেশী গদ-গদ হয়ে পড়ে। টাটা কোম্পানী বা বার্মা শেলের অফিসার এবং ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারদের চাইতে রেঙ্গুন বা ওয়াশিং-টন ভারতীয় দূতাবাসের কেরানীর মর্যাদা এখানে অনেক বেশী। সত্যিকার ডিপ্লোম্যাট হলে তো কথাই নেই! হবে না? ও'রা যে বিদেশে ঘুরে বেড়ান, টেপ রেকর্ডার-টানজিস্টার-টেরিলিনের সার্ট আনতে পারেন! ভারতবর্ষের মানুষ নাকি ত্যাগ-তিতিক্ষার আদর্শে দীক্ষিত। অথচ একটা সুইস ঘড়ি বা জাপানী ক্যামেরা দেখলে তো অধিকাংশ মানুষেরই জিভের জল গড়ায়!

তবে হ্যাংলামিটা যেন দিল্লীতেই বেশী।

'গুড মর্ণিং!'

'গুড মর্ণিং!

'মিস ভরদ্বাজ বলছি। চিনতে পারেন?'

'মাই গড! যাকে দেখলে অ্যাম্বাসেডররা পর্যন্ত গাড়ী থামিয়ে লিফট দেন, তাকে তরুণ মিত্র ভুলবে?'

মিস ভরদ্বাজ কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু বেশ বোঝা গেল বড় খুশী হয়েছে। ছোট্ট একটু মিষ্টি হাসির রেশ ভেসে এলো টেলিফোনে।

তরুণ মিত্র আবার বলেন, বলুন কি খবর? কেমন আছেন?'

'মেনি থ্যাংকস। ভালই আছি।'

ইতালীয়ন এম্বাসীর এক ককটেল প্যার্টিতে মিস ভরদ্বাজের সঙ্গে তরুণ মিত্রের প্রথম আলাপ। ইন্টিরিয়র ডেকরেটর মিস ভরদ্বাজ আজে-বাজে খদ্দেরের কাজ পছন্দ করেন না। শুধু বিদেশী ডিপ্লোম্যাটদের কাজ করেন উনি। ইতালীয়ন অ্যাম্বাসেডরের সিটিংরুম ও ড্রইংরুমও ডিজাইন করেছেন মিস ভরদ্বাজ। এ কাজ খুব বেশী দিন করছেন না। নতুন বিজিনেশ শিকারের আশায় কূটনৈতিক দুনিয়ায় নিত্য ঘোরাঘুরি করছেন।

দিল্লীর ইন্টিরিয়র ডেকরেটররা শুধু ড্রইংরুম বা অফিসরুমই সাজিয়েগুছিয়ে দেন না, মনে হয় ভাল ভাল খদ্দেরদের মনের অন্দরমহলও সাজিয়েগুছিয়ে দিতে ভালবাসেন। তাছাড়া দেশী-বিদেশী ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে একটু নিবিড় করে মেলামেশায় ওদের ও আরো অনেকের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মিস ভরদ্বাজ সবে এই পথে পা দিয়েছেন। মিস প্রমীলা কাউলের মত নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি অর্জনে এখনও অনেক দেরী।

মিস কাউলকে নিয়ে কত বিদেশী ডিপ্লোম্যাট যে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন, তার হিসাব দেওয়া মুশকিল। জংপুরার বীরবল রোডে মিস কাউলের ফ্ল্যাটে যান। সকালে, দুপুরে, বিকেলে—যখন ইচ্ছা। সব সময়ই দু-চারজন ডিপ্লোম্যাটকে দেখতে পাবেন। অবশ্য সন্ধ্যার পর মিস কাউলকে আর পাবেন না। পার্টি, ককটেল, ডিনার। সব শেষ করে বাড়ী ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়। একটা, দেড়টা, দুটো, আড়াইটে। উইক-এণ্ডের পার্টিগুলো থেকে ফিরতে কখনও কখনও আরো দেরী হয়। মিঃ পার্কার, মিঃ বার্গম্যান বা আরো অনেকে অজন্তা-ইলোরা বা খাজুরাহোর প্রাণহীন মর্মরমূর্তি দেখতে যাবার সময় প্রাণচঞ্চল মন-মাতানো মিস কাউলকে পাশে পাশে না পেলে শান্তি পান না।

দিল্লীবাসী বিদেশী ডিপ্লোম্যাটদের অনেকেই সামারে পাড়ি দেন নিজের নিজের দেশে। বিদেশী কূটনীতিবিদদের চারপাশে উপগ্রহের মত যাঁরা নিত্য ঘুরপাক খেয়ে থাকেন, তাঁদের তখন রোদন ভরা বসন্ত। মিস কাউলের মত যাঁরা পার্কারের সঙ্গে একই প্লেনে সামার-কোর্সে যোগ দেবার জন্য সেই সুদূর সাগর পারের অচিন দেশে যেতে না পারেন, তাঁরা তখন চেমসফোর্ড ক্লাবে বিজিনেশম্যান আর কন্ট্রাক্টরদের সুধা পান করেন। হয়ত মুসৌরী বা নৈনীতাল ঘুরে আসেন।

মিস ভরদ্বাজ অবশ্য এখনও বিদেশী ইউনিভার্সিটির সামার কোর্সে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পাবার মত হতে পারেননি। তবে—। যাক গে সেসব।

কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, কখনও আবার কিছু না বলেই মিস ভরদ্বাজ তরুণের কাছে আসা-যাওয়া শুরু করলেন।

'কি ব্যাপার?' তরুণ মিস ভরদ্বাজকে অভ্যর্থনা জানাতে জানাতে প্রশ্ন করে।

'কেন ডিসটার্ব করলাম নাকি?'

মাই গড! ব্যাচিলার তরুণ মিত্রের ফ্ল্যাটে আপনার মত অতিথির বিশেষ আগমন হয় না তো, তাই......।

'সো হোয়াট?'

তরুণ মিস ভরদ্বাজকে অভ্যর্থনা করে ড্রইংরুমে বসায়। গাড়োয়ালী ভৃত্যকে কফি দিতে বলে।

তরুণের ধারণা দিল্লীর মেয়ে আর মাছির চাইতে অসভ্য কিছু হতে পারে না। এরা যে কোথা থেকে কিসের জীবাণু-বীজাণু এনে ছড়িয়ে দেবে, তা কেউ টের পাবে না। মিস ভরদ্বাজ নিবিড়ভাবে মিশতে চাইলেও তরুণ পারে না নিজেকে বিলিয়ে দিতে। মামুলি কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টা আর কফির পরই ইতি টানতে চায় সে। 'এক্সকিউজ মী মিস ভরদ্বাজ, একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে......। সী ইউ এগেন।'

মিস ভরদ্বাজ তবু তরুণের আশেপাশে ভনভন করতে ছাড়ে না। সময় সুযোগ পেলেই হাজির হয়। এমনি করেই একদিন থলি থেকে বেড়ালছানা বেরিয়ে পড়ে।

'আই ওয়াজ টয়িং উইথ দি আইডিয়া অফ গোয়িং টু দি স্টেটস।'

তরুণ খুশী হয়ে বলে, আমেরিকা যাবেন? খুব ভাল কথা।

'কিন্তু...।'

'কিন্তু আবার কি?'

'ইউ মাস্ট হেলপ মী।'

'বলুন না কি সাহায্য করতে হবে?'

'ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনে একটা টেম্পোরারী অ্যাপয়েন্টমেন্ট...।'

আই অ্যাম সরী মিস ভরদ্বাজ, ও তো আমার ক্ষমতার বাইরে। তাছাড়া......।'

'তাছাড়া আবার কি?'

তরুণ মিত্র মিস ভরদ্বাজকে খুশী করেনি। কিন্তু বছর খানেক পরেই এই অনন্যার দেখা পেয়েছিলেন নিউইয়র্কে।...

তরুণের ভারী মজা লাগে দিল্লীর কথা ভাবতে। আজকের মত তখন কার্জন রোডে এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স হস্টেল আশেপাশের এম-পিদের বাংলোগুলোকে উপহাস করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। কার্জন রোডের নোংরা স্যাঁতসেঁতে ব্যারাক কন্সটিটিউশন হাউস নাম নিয়ে তখন আভিজাত্যের বড়াই করত। হরেক-রকমের নারী-পুরুষের বাস ছিল এই কন্সটিটিউশন হাউসে। রাত দশটা-সাড়ে দশটায় ডাইনিং হলের সার্ভিস বন্ধ হতো কিন্তু ঘরে ঘরে অমৃতরসধারা পানের উৎসব শুরু হতো তার পরে। সাধারণ মানুষের আসা-যাওয়ার পালা বন্ধ হতো, শুরু হতো অস্বাভাবিক অসাধারণদের আবির্ভাবের পর্ব। সামনের রিসেপশন কাউণ্টার এড়িয়ে ওঁরা যাতায়াত করতেন মাঝরাতের আবছা আলোয়। ঐ রাতের অন্ধকারে কতজনের সৌভাগ্যসূর্য উঠত, আবার অস্ত যেতো।

চেক ন্যাশনাল ডের পার্টি অ্যাটেণ্ড করে মিঃ ভোঁসলের বাড়ীতে ডিনার খেয়ে ফিরতে ফিরতে তরুণের অনেক রাত হয়ে গেল। কনস্টিটিউশন হাউসের বড় বড় আলোগুলো তখন নিভে গেছে ফাঁকা দিল্লী শহরটা প্রায় গ্রামের মত নিঝুম হয়ে পড়েছে। আবছা আলোতে ঘরের চাবিটা দেখবার সময় স্ফুলিঙ্গের মত এক টুকরো হাসির ঝলক তরুণের কানে আসতেই—

মিস ভরদ্বাজ বললেন, দাও টু ব্রুটাস!

'তার মানে?'

'এত সহজ কথাটা বুঝলেন না?'

'আই অ্যাম সরি মিস ভরদ্বাজ।'

ঐ আবছা আলোতেই মিস ভরদ্বাজকে বিদ্রূপ হাসি ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্রের দৃষ্টি এড়াল না। করিডরের পিলারটায় হেলান দিয়ে মিস ভরদ্বাজ বললেন, আপনিও তাহলে মাঝরাতের খদ্দের।

মিথ্যা তর্ক করে সময় নষ্ট করেনি তরুণ মিত্র। একটু ভুল হলো মিস ভরদ্বাজ। আপনার মত আমি মাঝরাতের খদ্দের নই, 'আমি দোকানদার। খদ্দের আসে, কিন্তু ফিরিয়ে দিই......। আচ্ছা, গুড নাইট।'

সে রাতে তরুণ মিত্র আর কিছু জানতে পারেননি, কিন্তু স্থির জানতেন মিস ভরদ্বাজ আমেরিকা যাবেনই।

কি করবে মিস ভরদ্বাজ! শেরওয়ানী-চাপকান পরা পার্লামেন্টারিয়ানগুলো যেন এক-একটা নেকড়ে বাঘ। শিকার ধরতে এদের জুড়ি বোধকরি ভূ-ভারতে নেই। জুডাসের জন্ম না হলে যেমন খৃস্টানদের কোন শুভ কাজ হয় না, আমাদের দেশেও তেমনি পলিটিসিয়ান না হলে কোন কর্ম বা অপকর্ম সম্ভব নয়। এক্সিবিশন ওপন করতে এসে বনবিহারীলাল মিস ভরদ্বাজের পিঠ চাপড়ে বললেন, এই ওয়াণ্ডারফুল ডেকরেশন করেছে এই সুইট ছোট্ট মেয়েটা।

বাহাদুর শার পর বনবিহারীলালই দিল্লীর সর্বময় অধিশ্বর হয়েছেন। তাঁর এই প্রশংসায় জেনারেল সেক্রেটারী মিসেস খান্না পর্যন্ত গলে গেলেন, হা জী, এহি লেড়কী আকেলা সব কুচ......

সেই হলো শুরু। শেষ? সেকথা তরুণ মিত্র জানে না। যে দেশে বাঈজীবাড়ী আর ধর্মশালা প্রায় সমান সমান, সে দেশের পবিত্র মাটিতে মিস ভরদ্বাজের কাহিনী যে কোথায় শেষ তা সে জানে না। ডিপ্লোম্যাট তরুণ মনে মনে ভাবে, ডিপ্লোম্যাসী রপ্ত করার জন্য পয়সা খরচা করে জেনেভায় যাবার কোন অর্থ হয়? দেশের অসংখ্য মেয়েগুলোর সর্বনাশ করেও যাঁরা দেশনেতা বলে পূজা, বেবী ফুডে ভেজাল দেবার পরও যাঁরা ধর্মশালা গড়ে হাততালি আদায় করতে পারেন, তাঁদের চাইতে বড় ডিপ্লোম্যাট আর কোন দেশে পাওয়া সম্ভব?

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারতীয় ভাষায় কোষগ্রন্থ

কোষগ্রন্থ বা এনসাইক্লোপিডিয়া উন্নত দেশসমূহে বিশেষ জনপ্রিয় এবং মূল্যবান সম্পদ। ভারতীয় ভাষায় কোষগ্রন্থ প্রণয়ন ব্যয়সাধ্য এবং পরিশ্রমসাধ্য তাই একমাত্র বাংলা ও মারাঠী ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় কোষগ্রন্থ রচিত হয়নি।

সতেরটি ভাষা সরকারী স্বীকৃতিলাভে ধন্য—এর মধ্যে হিন্দির স্থান সবার ওপর। হিন্দিভাষা জনপ্রিয় করার জন্য ভারত সরকার প্রতি বৎসর কোটি টাকা ব্যয় করেন অন্য ভাষাগুলি সেইদিকে দীনের মত ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু বাংলাভাষার গৌরব অসীম। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু 'বিশ্বকোষ' সম্পাদনা করেছিলেন, এনসাইক্লোপিডিয়ার ক্ষেত্রে এই প্রথমতম প্রচেষ্টা, এর পূর্বে আর কোনো ভারতীয় ভাষায় এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা হয়নি। এই গ্রন্থ বাইশটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। তখনকার দিনে সরকারি সহায়তা ছিল না, তথাপি সীমিত শক্তি নিয়ে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিশ্বকোষ সম্পাদনা করে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আরও বিস্ময়ের বিষয় যে নগেন্দ্রনাথ বসু হিন্দিতে তাঁর 'বিশ্বকোষ' অনুবাদ করেন, সেই কোষগ্রন্থগুলি পঁচিশটি খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং ১৯১৬ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। নগেন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে 'ভূমিকা'য় লিখেছিলেন—"যে হিন্দি ভাষা সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত এবং যার অধিকতর প্রচলন দেখা যায় একদিন যে-ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হবে—ঈশ্বর এই প্রচেষ্টা সার্থক করুন—সেই ভাষার কোনো কোষগ্রন্থ নেই। রাষ্ট্রভাষার কোনো এনসাইক্লোপিডিয়া নেই এ অতি দুঃখ এবং লজ্জার কথা।"

১৯১৬-তে এই কথাগুলি লিখিত হয়, ১৯৬০-এ হিন্দি বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

নগেন্দ্রনাথের পর পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় "বঙ্গীয় মহাকোষ" প্রকাশ করেন। কিন্তু 'মহাকোষে'র 'অ' অক্ষরটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। বিদ্যাভূষণ এর পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবও দীর্ঘজীবী ছিলেন না। এই দুই মহাপণ্ডিত যদি দীর্ঘজীবন লাভ করতেন তাহলে হয়ত কোষগ্রন্থের ব্যাপারে বাংলাদেশ সারা ভারতকে পথনির্দেশ করতে পারত।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনাব হুমায়ুন কবীর যখন দিল্লীর মশনদে আসীন ছিলেন তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কোষগ্রন্থ প্রকাশের জন্য কিছু মোটামুটি আর্থিক সাহায্য লাভ করেন। তাঁরা আজ কয়েক বছরে কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ করেছেন। খণ্ডগুলি সম্পর্কে সংবাদপত্রে অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি, অনেক সময় যে সব ত্রুটীর উল্লেখ হতে দেখেছি তার খণ্ডনে কেউ প্রত্যুত্তরও দেননি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন একটি প্রামাণিক কোষগ্রন্থ প্রকাশের, আশা করি তাঁদের সেই প্রচেষ্টা ফলবতী হবে, কারণ এখন এই কর্মে একমাত্র তাঁরাই ব্রতী আছেন। বঙ্গদেশের আর কোনো প্রতিষ্ঠান বা বঙ্গদেশীয় সরকারের এই বিষয়ে কোনো আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এই সূত্রে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছোটদের জন্য যে 'শিশুভারতী' সম্পাদনা করেন তার প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস গ্রন্থগুলি প্রকাশ ব্যাপারে কোনোরূপ কার্পণ্য করেন নি। এখন পর্যন্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'শিশু-ভারতী'ই একমেবাদ্বিতীয়ং হয়ে আছে, অবশ্য সম্প্রতি পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ছোটদের জন্য কোষগ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হয়েছেন।

মৌচাক সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার ছোটদের জন্য কোষগ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর শেষ জীবনে অনেকখানি সময় ব্যয় করেছিলেন, তাঁর কাজও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল বলে জানি, হয়ত তিনি জীবিত থাকলে এতদিনে ছোটদের জন্য আরেকটি কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হত।

ডাঃ শ্রীধর বেঙ্কটেশ কেটকার ২৩ খণ্ডে মারাঠী জ্ঞানকোষ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি খণ্ড ভারত বিষয়ে এবং বাকী খণ্ডগুলি সারা বিশ্ব-সংক্রান্ত। ৬ষ্ঠ খণ্ড থেকে ২২ খণ্ড পর্যন্ত বর্ণানুক্রমিক, শেষ খণ্ডটি সূচী। ডাঃ কেটকর তাঁর এই কোষগ্রন্থ হিন্দি ও গুজরাতিতে অনুবাদের প্রয়াস করে সফল হতে পারেন নি। তিনি কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে এই কাজ সম্পন্ন করে-ছিলেন। অনেকদিন সামান্য বা পাঁউরুটি ভিন্ন অন্য আহার্য সংগ্রহ করতে পারেন নি।

প্রাক্-স্বাধীনতাকালে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটি উর্দু কোষগ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস করেন, তার কাজ যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

তামিল ও তেলেগু ভাষায় বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হয়েছে। মোতুরী সত্যনারায়ণ সম্পাদনা করেছেন "অন্ধ্র সারস্বতমু", এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তেলেগু ভাষা সমিতি। বারোটি খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বিশ্বকোষের প্রতিটি খণ্ড হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রথম দুই খণ্ডে আছে বিশ্ব-ইতিহাস ও অন্ধ্র রাজ্যের কথা, পরে অবশ্য বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো। এই গ্রন্থগুলির হিন্দি অনুবাদের পরিকল্পনা আছে।

পেরিয়াস্বামী থুরান সম্পাদনা করেছেন "তামিল কলাই কালানজী"। এই গ্রন্থগুলি দশটি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের অনেক বৈজ্ঞানিক কথার পরিভাষা করা হয়নি ইংরাজী প্রতিশব্দই রাখা হয়েছে। নতুন পরিভাষা সাধারণের কাছে তেমন পরিচিত নয় তাই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

বারাণসীর নাগরী প্রচারিণী সভা ত্রিশ খণ্ড সম্পূর্ণ একটি হিন্দি বিশ্বকোষ বাইশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। সাত খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এখনও অনেক কাজ বাকী।

ওড়িষ্যার রাষ্ট্রীয় সরকার ওড়িয়া ভাষায় একটি বিশ্বকোষ প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছেন। মালয়ালম ভাষায় একটি বিজ্ঞানকোষ সম্পাদনা করেছেন কে. পিল্লাই।

মহারাষ্ট্র জ্ঞানকোষ সম্পাদনা করার এক বিরাট পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে ব্যাপারটি নাকি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। সম্পাদকদের ভিতর কলহ শুরু হয়েছে।

পাঞ্জাবী ভাষা বিভাগ পাঞ্জাবী ভাষায় একটি বিশ্বকোষ প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। আসাম এবং গুজরাতেও অনুরূপ আয়োজন চলেছে।

কানাড়ায় শিবরাম কর্ণাট একটি শিশুদের বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছেন।

কেরলের সরকার মালয়ালম ভাষায় একটি বিশ্বকোষ প্রকাশের জন্য ডাঃ ক, এম, কর্ণকে নিযুক্ত করেছেন। ডাঃ জর্জ সাহিত্য আকাদেমির দক্ষিণ ভারতীয় শাখার আঞ্চলিক সেক্রেটারি ছিলেন। নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ জর্জ মালয়ালম ভাষায় 'বিশ্বকোষ' প্রকাশের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং আশা করা যায় যে সরকারি সমর্থনে সে প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এই প্রবন্ধের কিছু তথ্যাবলীর জন্য আমি ডাঃ প্রভাকর মাচয়ের কাছে ঋণী। তিনি আক্ষেপ করেছেন যে আজ ভারতীয় ভাষায় সহজলভ্য, সুলভ বিশ্বকোষ কেন পাওয়া যাবে না। আজ যখন সদ্য-স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা বাড়ছে তখন এই জাতীয় গ্রন্থাবলীর প্রয়োজন সর্বাধিক।

বাংলাদেশের পুরাতন ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে লাভ নেই। সে বঙ্গদেশ আজ নেই। তখন একজন নগেন্দ্রনাথ বসু বা একজন অমূল্য বিদ্যাভূষণ চিন্তা করতে পারতেন যে কিভাবে কোষগ্রন্থ করা যায় এবং সেই কাজে তাঁদের কৃতিত্ব ও সাফল্য প্রদর্শন করেছেন।

সেইকালে অসুবিধা ছিল অনেক, অর্থাভাব ছিল প্রচণ্ড, তথাপি নিষ্ঠা এবং আগ্রহের অভাব ছিল না। আজ দেশ স্বাধীন হলেও মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের কোনো একটি মহৎ কর্তব্য সম্পন্ন করার সামর্থ্য যেন নিঃশেষিত।

সরকারি সাহায্য বা উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। সেই কর্মকে সফল করার জন্য মানুষ চাই। আমাদের প্রকাশকদের কল্পনাশক্তি সীমিত এবং জনকল্যাণের জন্য তাঁদের অতি সামান্যই চিন্তা। যদি তাঁদের শুভ-বুদ্ধি থাকত তাহলে আজ 'চেম্বার্স' কিংবা পিয়ার্স'র মত একখণ্ডে সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব হত না।

ছোটদের জন্য একখণ্ডে সম্পূর্ণ সচিত্র কোষগ্রন্থ প্রকাশ করলে যে কোনো প্রকাশক বংশানুক্রমে লাভবান হতে পারেন এই কথা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। জনকল্যাণে ব্রতী প্রতিষ্ঠান বা সরকারের এই বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। ভারতীয় ভাষায় সকল রকম শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হওয়া উচিত এই বলে সভায় আমরা গলা ফাটাই কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে সকল রকম শিক্ষাদানের জন্য আমাদের উদ্যোগের অভাব বিশেষ পরিতাপজনক।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

কবি জসীমউদ্দীন এখন কলকাতায়। প্রায় নয় বছর পর তাঁকে পেয়ে কলকাতার সাহিত্যদরদী ও রসিক সমাজ যেভাবে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন, তা ইদানিংকালে আর কোনও কবিকে নিয়ে হয়েছে কিনা সন্দেহ। তিনি মনোজ বসুর বাড়িতে আছেন। সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি দর্শনার্থীর একটানা ভিড়। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বড় সম্বর্ধনা সভারও আয়োজন হয়ে গেছে। গত ১০ জুলাই রবীন্দ্র-সদনে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ডাঃ জে সি সেন-গুপ্ত কবিকে রবীন্দ্ররচনাবলী উপহার দেন। এই অনুষ্ঠানে বিষ্ণু দে, অন্নদাশংকর রায়, মন্মথ রায় প্রমুখ বহু খ্যাতনামা কবি-নাট্যকার উপস্থিত ছিলেন। ১৪ জুলাইও একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্বর্ধনার উত্তরে কবি বলেন,—'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল চিরকাল লড়াই করেছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। অথচ আজ দুজনেই তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বলি। আজও দুই বাংলায় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িকতা বাংলার এই দুই কবির বাণীকে লাঞ্ছিত করছে।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'জোড়াসাঁকোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আবাল্যের। রবীন্দ্রনাথের রঙীন তুলি আর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা তাঁর জীবনকে কিশোর বয়স থেকেই উজ্জ্বলিত করেছিল। তাঁদের জীবনের নিষ্ঠা, একাগ্রতা নিজের জীবনেও তিনি বারবার প্রতি-ফলিত করতে চেষ্টা করেছেন।' রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে বলেন যে, কবি জসীমউদ্দীন আমাদের একান্ত নিকটজন, আপনার মানুষ। কলকাতা পৌরসভা পৌরসম্বর্ধনার আয়োজন করেন ১৫ জুলাই। পৌর কর্তৃপক্ষ কবিকে রৌপ্যাধারে মানপত্র উপহার দেন। জসীম-উদ্দীনকে নিয়ে এইসব সম্বর্ধনার কথা লিখতে লিখতে বারবার শুধু মনে পড়ছে, দুই বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের দেয়াল কি এভাবেই চিরকাল উদ্ধত মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের পরিচালনায় গত ১১ ও ১২ জুলাই কলকাতায় দুদিনব্যাপী 'নিখিল

ভারত সাংবাদিকতা কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'প্রচার' বিষয়ক আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করেন গৌতম ঘোষাল, সুসেন সাহা এবং এন্টনী থেয়াসর্ণ। পরের দিনও দুটো আলোচনা সভার আয়োজন হয়। প্রথম আলোচনার বিষয় ছিল 'প্রেস' ও দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় ছিল 'জনসংযোগ'। এ দুটি সভায় আলোচনা করেন মণিশংকর মুখোপাধ্যায়, জলি কাউল প্রমুখ।

মারাঠি ভাষায় সম্প্রতি ঋক্‌বেদের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ডঃ সিদ্ধেশ্বরী শাস্ত্রী চৈতরভ। সম্প্রতি পুণা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এর জন্য 'ডি-লিট' সম্মানে ভূষিত করেন। ঋক্‌বেদের অনুবাদ ছাড়াও তিনি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রখ্যাত মনীষীদের জীবনী অভিধানও প্রকাশ করেছেন। মারাঠি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তেলুগু ভাষায় সাম্প্রতিককালে কথা-সাহিত্য বিভাগটিই বোধ করি সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। যদিও কে পি পুত্তাপ্পা বা শ্রী শ্রীর মত কবি আছেন, তবু কথা সাহিত্য বিভাগেই রচনার প্রাচুর্য লক্ষণীয়। ডঃ বিশালাক্ষ্মীর 'বিশ্বিপ্তিজি' নামে একটি নতুন উপন্যাস সম্প্রতি তেলুগু সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বইটি আকারে খুবই ছোট। এতে অশালীন মানসিকতারও কোন পরিচয় নেই। তৎসত্ত্বেও বইটি এত আলোড়ন সৃষ্টি করল কেন? আসলে গণ-জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই এই গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে এত জনপ্রিয়তা। একজন বাল-বিধবার বিবাহ সমস্যার বিষয় নিয়ে এই উপন্যাস রচিত। অবশ্য লেখক কোন সমাধানের ইঙ্গিত দেন নি।

বিদেশী সাহিত্য

সাহিত্যিকরা সাধারণত ইচ্ছে করে আইন-আদালতের শরণ নেন না। কখনো কখনো দুচারজন ভুখোড় সাহিত্যিক প্রকাশকদের কাছ থেকে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য মামলা-টামলা করে বসেন।

তবু মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত আঘাত আসে পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে। অশ্লীলতার দায়ে কিংবা মর্যাদাহানির অভিযোগ আসে তাঁদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি হুবার্ট সেলবি অভিযুক্ত হয়েছেন, তাঁর 'লাস্ট এক্‌জিট টু ব্রুকলিন' বইটির জন্যে।

বইটির প্রকাশক একজন ছোটখাট দোকানের মালিক। শোনা যায়, এই মামলা চালাতে গেলে নাকি প্রায় চার লক্ষ টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়) খরচা হবে। অথচ, এত অর্থ ব্যয় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

খবরে প্রকাশ, তাঁর এই দুর্দশায় ইংলণ্ডের কয়েকজন ছোট এবং মাঝারি গোছের প্রকাশক এক সঙ্গে মিলে একটা সমিতি তৈরী করেছেন। তার নাম দিয়েছেন 'শিল্প সাহিত্যের সংরক্ষণ সমিতি'। মামলার খরচখরচা চালাবেন এখন এই সমিতিই। কয়েকজন লেখকও নাকি এই সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন বলে জানা গেছে।

কয়েক দিন আগে চিরায়ত শিশু-সাহিত্য ও শিল্প সপ্তাহ পালিত হয়ে গেছে বুলগেরিয়ায়। লেখক, চিত্রকর, সঙ্গীতকার ও চলচ্চিত্র শিল্পীরা এই সময় শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান এবং শিশু পাঠকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তাছাড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। নাট্যসংস্থাগুলো শিশুনাটক মঞ্চস্থ করেন সারা দেশে। সিনেমা হলগুলিতে শিশুদের জন্য বিশেষ-ভাবে তৈরী চলচ্চিত্র দেখানো হয়। প্রকাশকরা বইয়ের বাজারে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

গত পঁচিশ বছরে বুলগেরিয়ায় শিশু-সাহিত্য ও শিল্পের প্রসার নাকি নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। তবু এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে চার হাজার তিন শত রকমের শিশুপাঠ্য বই। এ সময়ে শিশু-সাহিত্যের প্রচারসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় আট কোটি। অবশ্য লেখকদের মধ্যে অর্ধেক হলেন বুলগেরিয়ার মানুষ, বাকি অর্ধেক বিদেশী।

দুশোর বেশি নাটক এবং সাড়ে তিন হাজারের ওপর গান শিশুদের জন্য লেখা হয় ওই সময়ের মধ্যে।

বই প্রকাশের ব্যাপারে রুমানিয়া এখন সারা পৃথিবীকে টেক্কা দিয়েছে। সর্বশেষ হিসেব থেকে জানা যায়, বর্তমানে ওখানে মাথাপিছু তিনটিরও বেশি বই ছাপা হচ্ছে প্রতিবছর। সারা পৃথিবীতে বই প্রকাশের হার এখন মাথাপিছু বার্ষিক দুটোর বেশি নয়।

১৯৬৫ সালে রুমানিয়ায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন হাজার তেত্রিশটি। ১৯৬৮ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার আটশ পঞ্চান্নটি। রুমানিয়ার তরুণ লেখকরা এখন নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় সমান উৎসাহ দেখাচ্ছেন। বইয়ের প্রচার সংখ্যাও কম নয়। ১৯৬৮ সালে বই বিক্রীর সংখ্যা ছিল সাত কোটি আঠাশ লক্ষ সতের হাজার। প্রত্যেক বছর প্রায় ছাব্বিশ লক্ষাধিক স্কুলপাঠ্য বই রুমানিয়ায় ছাত্র-দের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করা হয়।

খবরে প্রকাশ, পৃথিবীর চৌত্রিশটি দেশে গত তিন বছরে প্রায় ২৮৮টি বই অনুবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ১৩টি ভাষায় প্রকাশিত ২৬টি কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ।

গত কয়েক বছরে প্রাগ, রোম, হাভানা, ওয়ারশ, বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, লিপজিগ এবং সোফিয়াতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইয়ের মেলা ও প্রদর্শনীতে রুমানিয়া সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

পশ্চিম জার্মাণীর দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্টার্ণে'র প্রধান সম্পাদক এবং তাঁর সহকর্মীরা আন্দোলন শুরু করেন কয়েক মাস আগে। দীর্ঘদেহী, সোনালি চুলওয়ালা প্রধান সম্পাদক বলেন, 'সংবাদপত্র কিংবা সাময়িকপত্রের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা রকম। কলকারখানার নিয়ম-কানুনের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।' এজন্যে তাদের অনেক স্বাধীনতা চাই। লেখা নির্বাচন, এবং অন্যান্য ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা না থাকলে কাজ করা যায় না। এই সত্য পত্রিকা-মালিকদের বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত সম্পাদকীয় দপ্তরের ১৫০ জন কর্মীর ধর্মঘটের হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মালিককে সে দাবী মেনে নিতে হয়। তাঁদের এই সাফল্য ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্মাণীর সর্বত্র বিশেষ-ভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। এই একই অধিকারের দাবীতে প্যারিসের প্রখ্যাত দৈনিক ফিগারোর (প্রচার সংখ্যা ৫২০০০০) কর্মীরাও সম্প্রতি আন্দোলনে নেমেছেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (আলোচনা)—শিশির কুমার মিত্র। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬, বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম তিন টাকা।

ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত ১৭৮৪ খৃঃ কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরুণ উৎসাহী কর্মীদের প্রচেষ্টায় এবং স্যার উইলিআম জোন্সের উৎসাহ ও প্রেরণায় ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শন সংগৃহীত হতে থাকে। সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস প্রকাশের পর পণ্ডিত ব্যক্তিদের ইতিহাস গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়। পরে ভারতীয়দের পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে গৌরবোজ্জ্বল অতীতের পুনরুদ্ধারের কাজে অগ্রসর হলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সম্মিলন ঘটল। ঊনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতের অতীত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণে নতুন গতি সঞ্চার করেন। তাঁর পথ অবলম্বনেই পরবর্তীকালের গবেষকরা ভারত ইতিহাসের অন্ধকারময় অধ্যায়ে আলোকপাত করেছেন। রাজেন্দ্রলাল ইতিহাস ব্যাখ্যায় সমাজ ও লোক সংস্কৃতির প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবানুগ সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রেখে গেছেন। একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টি ও বিস্তৃত গবেষণা শৈলী নিয়ে তিনি চল্লিশ বছর কাজ করেছিলেন। বিশাল পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশীলতা তাঁকে সমকালীন ভারতীয়দের মধ্যে অনেক উঁচু স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর প্রভাবে পরবর্তীকালে ভারতে বিদ্যাচর্চার পথ সুগম হয়।

ছাত্র জীবনে রাজেন্দ্রলাল নানান প্রতিকূলতায় চিকিৎসা ও আইন অধ্যয়নের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৮৪৬ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক হন। এখানে বিদগ্ধ পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর জ্ঞানস্পৃহা নতুন প্রেরণা পায়। প্রাচীন গ্রন্থাবলী ও পুঁথি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার শিক্ষা তাঁর পাণ্ডিত্য বিকাশের পথকে সুগম করে। ১৮৫৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের ডাইরেকটর হন। পঁচিশ বছর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময় সোসাইটির সম্পাদক সভাপতির কাজও করেন। ক্রমে এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৯১ খৃঃ রাজেন্দ্রলাল ইংরেজি ফরাসী জার্মাণ ভাষায় পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল উপাদান ভিত্তিক তত্ত্ব অবলম্বনে অধিকাংশ গ্রন্থাবলী রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত পুঁথির বর্ণনামূলক গ্রন্থপঞ্জী রচনা পরবর্তীকালে গবেষণা কাজে সাহায্য করেছে। অনেক মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কার করেন। রাজেন্দ্রলাল ভারত তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান সংরক্ষক ও ধারাবাহিক বর্ণনায় রাজেন্দ্রলাল অতুলনীয় কাজ করে গেছেন। বৈদেশিক পালি, বৌদ্ধ গ্রন্থাদি সম্পাদনা করেছেন। মূল্যবান টীকা রচনা করেছেন দুষ্প্রাপ্য এবং আবিষ্কৃত বই-এর। স্থাপত্য ভাস্কর্য শিলালিপি ও তাম্রশাসন বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষভাবে খাঁটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রাজনীতি সংস্কৃতি বিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৮১ খৃঃ এই প্রবন্ধের বাছাই করা দুটি সংকলন 'দি ইন্দো-এরিয়ান্স' নামে প্রকাশিত হয়। মুদ্রাতত্ত্বে তাঁর গবেষণা স্বীকার্য। শিল্পকলা এবং স্থাপত্য নিয়ে তাঁর গবেষণাও স্মরণযোগ্য। অবশ্য অধিকাংশই ইংরেজিতে লেখা। তবে বাংলাতেও বেশ কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করেছেন। ১৮৫১ খৃঃ সচিত্র পত্রিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা সম্পাদনা করে বাংলা সাহিত্য ভাষার প্রসারের পথকে সুগম করেন। ইতিহাস, প্রকৃতি বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ থাকত এই পত্রিকায়। রহস্য সন্দর্ভ পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে পাঠ্য বই লিখেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের লেখা বই-এর সংখ্যাও কম নয়।

শিশিরকুমার মিত্র স্বল্প পরিসরে এই মনীষীর সামগ্রিক জীবন আলোচনা করেছেন। গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম থাকার ফলেই তাঁর পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় রাজেন্দ্রলালের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ হিসটোরিক্যাল স্টাডিস-এর একটি আলোচনা সভায় ইংরেজিতে শ্রীমিত্র রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, বর্তমান আলোচনাটি তারই ভাষান্তর। বইয়ের শেষে রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত গ্রন্থপঞ্জী, গ্রন্থাবলী, ইংরেজি গ্রন্থ বাংলা গ্রন্থ, মানচিত্রাবলী, প্রবন্ধাবলীর সুদীর্ঘ তালিকা আছে। জীবনী পঞ্জী এবং বংশ তালিকাও দেওয়া হয়েছে। বাঙালী মনীষীর এই জীবন কথা প্রত্যেকেরই সংগ্রহ করা উচিত।

পাতার বাঁশি (সংকলন) — শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত। এভারেস্ট বুক হাউস। এ-১২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

শ্যামাপ্রসাদ সরকার এর আগেও একখানা ছোটদের উপযোগী বই সম্পাদনা করেছিলেন। 'পাতার বাঁশি' সম্পাদনায় তাঁর সেই পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় আবার পাওয়া গেল। কিশোরদের জন্য গল্প, কবিতা এবং ছড়ার এই সুদৃশ্য সঙ্কলনে যাঁদের লেখা আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়, সুকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, শঙ্খ ঘোষ, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুনীলচন্দ্র সরকার, ঊর্মিলা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ সরকার। ঝরঝরে ছাপা আকর্ষণীয় লেখায় বইখানি হাতে নিলে মন ভরে ওঠে। রঘুনাথ গোস্বামীর আঁকা এক-রঙা ছবিগুলি বইখানির অন্যতম সম্পদ।

মৃত্যু কোকনদে— (কবিতা) সুনীথ মজুমদার। প্রতিবিম্ব, ৪ডি প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা-২৬। দাম তিন টাকা।

এতদিনে আধুনিক কবিতার অগ্নি-পরীক্ষা শুরু হল। এখন কলম ধরেই যে কোনো তরুণ কবি দুছত্র আধুনিক কবিতা লিখে দিতে পারেন। কিন্তু কবিতার পাঠক তাতে পৌনঃপুনিকতার আস্বাদ পেয়ে ক্লান্ত বোধ করেন। কাজেই প্রকৃত অর্থে আধুনিক কবিতা লেখা এখন ভয়াবহ রকম দুরূহ হয়ে উঠেছে। কেন না তা করতে হলে কবিকে সবার আগে ত্যাগ করতে হবে তৈরি ছক, এবং নির্ভর করতে হবে নিজের অভিজ্ঞতার ওপর।

শ্রীসুনীল মজুমদারের কবিতা এমনিতে সুরেলা এবং নির্দোষ হলেও পূর্বোক্ত বাধা-পথ অনুসরণের জন্যে কেমন যেন অস্পষ্ট ও নীরক্ত মনে হয়। তিনি শব্দ-সচেতন এবং অনুভূতিশীল। তাছাড়া সত্যিকারের একটি কবিমন যে তাঁর আছে তাও অনেকগুলি কবিতা পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি যদি নিজের চারপাশে তাকিয়ে নিজের কথা লেখেন, অচিরেই আশা করা যায় তিনি অধিকতর সার্থকতা খুঁজে পাবেন।

অন্যগ্রহ, ভিন্ন প্রতিভা

মধ্যযুগের ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসে ফ্রাঁসোয়া ভিয়োঁর আবির্ভাব একটি চাঞ্চল্যকর এবং স্মরণীয় ঘটনা। এত বড় অসচ্চরিত্র প্রতিভা বর্তমান যুগের মহৎ নাট্যকার জাঁ জেনে ছাড়া অন্য কারুর মধ্যে কোন দেশে কোন কালে লক্ষ্য করা যায়নি। দুর্নীতির বিশৃঙ্খল তাণ্ডবে ভিয়োঁ তার চারদিকে সর্বনাশের উৎসব রচনা করেছিল। বিশুদ্ধ সূর্যালোকে তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না, পাপের অন্ধকার এবং কর্দম সে মহানন্দে সর্বাঙ্গে লেপন করেছে। চুরি, রাহাজানি, লুণ্ঠন, খুন, ব্যভিচার, মত্ত নেশা, জুয়ার উত্তেজনা, গণিকালয়ে দেহ-বিনোদন, প্রতারণা, নারী-ধর্ষণ—বিচিত্র পাপের উল্লাসে ভিয়োঁর জীবন কেটেছে। অন্যদিকে ছিল দারিদ্র্যের দুঃসহ নির্যাতন। ভিয়োঁর দিকে তাকালে আতঙ্ক এবং করুণার এক মিশ্র অনুভূতি জন্মাবে। তীক্ষ্ণ মুখশ্রী এবং দর্পিত তারুণ্য দারিদ্র্যের পেষণে নুয়ে পড়েছে, শীর্ণ শরীর অস্থিসার, নোংরা পোশাক, ধারালো ছুরির টানে ঠোঁট দুভাগ হয়ে ভয়ংকর বিকৃত, অনাচারের কালো-কালো ছাপ চোখের কোটরে জমে আছে। সমকালীন প্যারি শহরের এই সেরা অসচ্চরিত্র মানুষটিই আবার আশ্চর্য রকম-ভাবে ফরাসি দেশের সবচেয়ে সেরা কবি। সাধারণ জীবনযাত্রার সংগে তাঁর বিন্দুমাত্র সৌহার্দ্য নেই। একটি ভিন্নতর নিষিদ্ধ গ্রহের অধীশ্বর ভিঁয়ো। তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর কাব্যের উদ্ভব। ভিঁয়োর কাছে কবিতা জীবনের রসেই ভরে ওঠে। তাই সে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকেই নির্দ্বিধায় কাব্যে উন্মোচিত করেছে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা একটু ধ্যানস্থ হয়ে শব্দে-অক্ষরে রূপান্তর করে নিলেই তো কবিতা। কবিতার বাকি সবকিছুই তো মেকি। আর অক্ষর তো অভিধানের কোন কায়েমি সম্পদ নয়—জীবনটা বিস্ফোরণে যখন শব্দ করে ওঠে, আঘাতে কম্পনে যখন বেজে ওঠে, অক্ষর তো সেই শব্দেরই প্রতিধ্বনি। সেখানে মধুর ক'রে তোলার জন্য সংগীত, সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তোলার জন্য অলংকার, এ সবকিছুই তো প্রতারণা। ভিঁয়ো তাই নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনিকেই কবিতা ভেবেছে। এরকম ভাবনা থেকেই রচনা করেছে তিন সহস্রাধিক আশ্চর্য ছত্র। 'দি লিগ্যাসি' বা 'দি লিটল টেস্টামেন্ট', 'দি টেস্টামেন্ট', 'এপিটাফ ভিঁয়ো' এবং কিছু 'ব্যালাডে'র মধ্যে তাঁর এই কবি প্রতিভার বৈদ্যুতিক শক্তি প্রকাশিত। 'দি টেস্টামেন্ট' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ভিঁয়োর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দারিদ্র্য, অপমান, উল্লাস, কারা-যন্ত্রণা, বিষণ্ণতা, হতাশ প্রেমের দীর্ঘশ্বাস, মৃত্যুভয়, তারুণ্যের অপসরণের কষ্ট, দুর্বিনীত জীবনের উন্মাদতা সব কিছু পুঞ্জিভূত হয়ে মহৎ রচনার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এসব যেমন একদিকে তাঁর আত্ম-সমাচার, অন্যদিকে সর্বকালের যন্ত্রণা-বেদনা-উল্লাসের প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা। ভিঁয়োর আত্ম-কথন সর্বজনীন কণ্ঠস্বরের দুর্লভ মর্যাদা লাভ করেছে। ভিঁয়োর যেমন গুরু

—মোহিত চট্টোপাধ্যায়

নেই, তেমনি শিষ্যও নেই। গোত্রহীন, উত্তরাধিকারী শূন্য এই নিঃসঙ্গ শিল্পী নিষিদ্ধ অন্ধকারের এক অর্ধোন্মাদ চরিত্র হলেও তাঁর রচনার মধ্য থেকে ঘনিষ্ঠ সহোদরের মতো হাত বাড়িয়ে সে তাকায়।

ভিঁয়োর জন্ম ১৪৩১ সালের প্যারি শহরে। যোয়ান অফ আর্ককে এই বৎসরেই ফ্রান্সে জীবন্ত পোড়ানো হয়েছিল। তাছাড়া শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতি নগরীর সর্বাঙ্গে। ক্ষুধার আর্তনাদে চতুর্দিক উচ্চকিত, মহামারীতে হাজার হাজার লোক মরছে, চুরি ডাকাতি আর খুনের যেন উৎসব লেগেছে তখন। সব মিলিয়ে এক নৈরাজ্যের আধিপত্য। এরকম ভাঙাচোরা আর বীভৎস প্যারি নগরে ভিঁয়োর জন্ম। তার নিষিদ্ধ জীবনের পূর্বাভাষ সমাজের মধ্যেই ছিল। তখনকার প্যারিই যেন তার যথার্থ মাতৃগর্ভ। ভিঁয়োর কবিতা থেকে জানা যায়, তার মা ছিলেন অত্যন্ত গরিব। কোন রকম লেখা-পড়া জানতেন না। বাবার কাছ থেকেও তেমন কিছু পায়নি ভিঁয়ো। দরিদ্র পিতা তাকে কেবল জন্মাবার পর একটি নাম উপহার দিয়েছিলেন ফ্রাঁসোয়া—এটাই ভিঁয়োর আদি নাম। পরবর্তী কালে এ-নামটি তিনি বর্জন করেন। তাঁর পরম হিতৈষী এবং পালক পিতা গিয়ম দ্য ভিঁয়ো নিজের নামানুসারে তাকে ফ্রাঁসোয়া ভিঁয়ো নামে গ্রহণ করেন। এই ভিঁয়োকেই পৃথিবী চিনেছে। বাবা মারা যাবার পর ভিঁয়োর মা তাঁদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এক যাজকের কাছেই তাঁকে রেখে যান। দারিদ্র্যের প্রচণ্ড চাপে ভিঁয়োর মা নিজের সন্তানটিকে বুকে আঁকড়ে রাখার সুযোগ পাননি। এই দয়ালু ভদ্রলোক ভিঁয়োকে আপন সন্তানের মতো লালন করতে চেয়েছেন। লেখাপড়া শেখার বন্দোবস্ত করেছেন, অসৎ পথ থেকে তাকে ফেরাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কারাবাস থেকে মুক্ত ক'রে এনেছেন। কিন্তু পালক-পিতা যাজকের সমস্ত চেষ্টা এবং সদিচ্ছাকে তুচ্ছ করে ভিঁয়ো দিনের পর দিন তার অপরাধের রাজ্যটাকে বাড়িয়ে চলেছে।

প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিঁয়ো কিন্তু খুব সহজেই স্নাতকোত্তর উপাধি পেয়ে গেল। ভিঁয়োর জীবনে এই শিক্ষা-পর্ব একটি অর্থহীন অধ্যায়—কোন কাজেই লাগেনি দীর্ঘকালের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। কলেজের শিক্ষকদের খুব সহজেই মন থেকে মুছে ফেলেছে ভিঁয়ো। আসলে সে খুঁজছিল মনের মতো গুরু। পেয়েও গেল। একজন নয়, দুজন—কলিন এবং রেজনার। কলিন একজন তালা-মিস্ত্রীর ছেলে। বাবার পেশা তার পছন্দ হয়নি, তবে কেমন করে সবরকম তালা খুলতে হয় সে-বিদ্যাটি কেবল শিখে রেখেছিল। প্যারিতে এরকম কোন তালা ছিল না যা সে মুহূর্তের মধ্যে খুলতে পারত না। এই গুরুটিকে ভিঁয়োর পছন্দ হোল। অন্যজন অবশ্য ভদ্র পরিবারের ছেলে। কিন্তু এরকম বহুমুখী অসচ্চরিত্র প্রতিভা তখন নিতান্তই বিরল ছিল। প্রচণ্ড সাহসে এবং বিচিত্র পরমোৎসাহে পাপের পতাকা তুলে রেজনার প্যারী শহরকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। ভিঁয়ো একেও পরমোৎসাহে গুরু-বন্দনা জানিয়েছে। ভিঁয়োর যথার্থ শিক্ষাদাতা দুজনেই অবশ্য খুব দ্রুত ফাঁসি কাঠে ঝুলে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল।

গুরু হিসাবেও মাস্তানদের অভাব হয়নি ভিঁয়োর। তারা সব মদ্যশালার গেলাসের উপর ঝুঁকে ছিল, পথের আনাচে-কানাচে অন্ধকারে ছুরি হাতে ইয়ার-দোস্তরা অনুপম হাতছানিতে ডাকতো, একা-পথের যুবতী মেয়েদের শরীরের গোলাপি ত্বকের লেখার বড় টান [illegible]। ভিঁয়ো [illegible] [illegible] দিন দিয়ে [illegible] পায়ে [illegible] পালাত। [illegible] এক-একটা দিন [illegible]

আগলে দাঁড়াতো। স্নেহ আর শঙ্কায় মেশানো গলায় বলত, 'ভিঁয়ো, এই কুৎসিত পথটা তুমি ছেড়ে দাও, ভিঁয়ো। আমরা সুন্দরের সন্তান, সুন্দরের কাছে ফিরে এসো।' এক-একবার ভিঁয়ো ভেবেছে, এবার সব ছেড়ে দেবে। আর ঠিক ছাড়বার মুহূর্তে কে যেন তার কানে কানে ফিসফিস করে বলতে থাকে—'ভিঁয়ো, এই ভিঁয়ো। ছেড়ে দিচ্ছ, ভালো কথা! আচ্ছা, ছেড়ে দেবার আগে মিউল টাভার্নের কাছে দাঁড়ানো ঐ মেয়েটাকে জোর করে একটা শেষ চুমু খেলে দোষ কি! আর এক ঢোক, আর এক ঢোক কড়া ঝাঁঝালো মদ! আর হাতের ছুরিটার ধারটা কেমন আছে শেষবারের মতো একটু জেনে নেবে না?'

এই শেষের পালা গাইতে গিয়ে ভিঁয়ো পুরনো পালাটাতেই ডুবে যেত। একবার ভিঁয়োর জীবনে অবশ্য নতুন জীবনের স্বপ্ন জেগেছিল, সুন্দরের দিকে দৃষ্টি লুব্ধ হয়েছিল। মুক্তির সমাহিত শান্তিকে প্রার্থনা করেছিল। দিনটি ১৪৫৫ সালের জুন মাসের পঞ্চম দিন। খৃষ্টীয় উৎসবের শোভা-যাত্রা নগরের পথে। পবিত্র সঙ্গীতে সারাপথ সকলে মুখর করে তুলেছে। প্রতিটি জানালায় মোম জেলে দেয়ালির উৎসব। সোনার কাজ করা ভেলভেটের চাঁদোয়ার নিচে যীশুর মূর্তি। পুণ্যের সুগন্ধ ভাসছে প্রশান্ত বাতাসে। রাতের খাবারের টেবিলে বসে ভিঁয়ো এই মহান দৃশ্যটি দেখছিল। মনের মধ্যে একটি ধর্মীয় কবিতা অনেকক্ষণ ধরেই গুঞ্জন করছিল। হঠাৎ ভিঁয়ো টের পেল, তার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছে। সেই সুন্দর তাকে ডাকছে, কোন এক পুণ্যের একটি ধূপ জ্বলতে জ্বলতে তার বুকের মধ্যে এসে থমকে গেল। ভিঁয়ো বাইরে বেরিয়ে আসে। না, ট্যাভার্নের দিকে আর নয়। পথের ধারের পাথরের বেঞ্চটায় বসল। একটা নতুন আলো তার চোখে, মুক্তির নতুন আনন্দ তার শিরায় উপশিরায়। এবার ভিঁয়ো একটি নতুন মানুষ হয়ে ঘরে ফিরবে। বেঞ্চতে আর দুজন এসে বসল—একজন পাদ্রী, অন্যজন এক তরুণী। মেয়েটিকে নিয়ে পাদ্রী ভদ্রলোকের সঙ্গে ভিঁয়োর কিছু কথা কাটাকাটি হোল। এক সময় ভিঁয়ো পাদ্রীর উপর ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চক্ষের নিমেষে একটা খুন ঘটে গেল। নিজের ছুরিতেই ভিঁয়োর ঠোঁট দু-ফাঁক হয়ে তখন ঝুলছে। মুক্তি আর সুন্দরের উপাসনা এইভাবেই শেষ হোল। তবে ভিঁয়োর মনে এ সময়টাতেই, দীর্ঘ-স্থায়ী সুন্দর জায়গা পেয়েছিল। কিন্তু প্যারী থেকে এবার পালিয়ে যাওয়াই সে উচিত মনে করল। জিনিষপত্র গুছিয়ে সে প্যারী ত্যাগ করল। পুলিশ তার পিছু নিয়েছে। পালানো ছাড়া পথ নেই।

এবার ভিঁয়ো এল নগরের বাইরে একটি কুখ্যাত আড্ডায়। অল্পকালের মধ্যে সে ওঁর সঙ্গীদের বন্ধু হয়ে গেল। মায়ের মতো আদরে স্নেহে ওদের লালন করেছে ভিঁয়ো। [illegible] নির্বিকার ভাবে অশ্লীল হেসে উঠছে। এ-পল্লী থেকে ও-পল্লী ঘুরছে তখন ভিঁয়ো। কখনো সে পকেটমার, কখনো জুয়োর আড্ডায় মাতাল, কখনো ঝুটো মুক্তো বেচছে কিংবা কোন মেয়েকে প্রলুব্ধ করে শরীরটাকে খুশি করছে। মাঝে মধ্যে কারুর কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে কবিতা লিখছে, চাষী-বৌদের সঙ্গে একটু মজা করছে, কুঁড়েঘরগুলোর পাশ দিয়ে গান গাইতে গাইতে আবার ফিরে আসছে নিজের ডেরায়।

ছ-মাস পরে দণ্ডাজ্ঞা থেকে ক্ষমা পেয়ে সে আবার প্যারীতে ফিরে আসে। দুটি মেয়েকে পড়াবার জন্য এবার তার ভূমিকা শিক্ষকের। কিন্তু ভিঁয়োর কাছে এ-কাজ যেন পর-ধর্ম। ঐ বাড়িরই ক্যাথারিন নামে অন্য এক মহিলাকে ভিঁয়ো ভালোবেসে ফেলল। প্রচণ্ড আবেগে ভিঁয়ো প্রায় মত্ত হয়ে উঠল। তার শরীর-মন নেশায় যেন আচ্ছন্ন। কিন্তু ক্যাথারিন ভিঁয়োর থেকেও ভালোবাসত টাকা-পয়সা। নানারকম বিরোধের শেষ পর্যন্ত একটা মর্মান্তিক পরিণাম ঘটল। ক্যাথারিনের অন্য এক প্রেমিকের হাতে প্রচণ্ড মারধর খেল ভিঁয়ো। তাকে ঘিরে চারদিক থেকে উপহাস আর ঠাট্টা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। স্থির করল, আবার প্যারি ছাড়বে। জিনিষপত্র গোছাল। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিল। একটু বাদেই মত বদলে আবার প্যারীতেই থেকে যায়। এবার সে যোগ দিল কলেজ দ্য নাভারের কুখ্যাত ডাকাতির পরিকল্পনায়। সফল হোল ওদের পরিকল্পনা। এবং আরো সফলভাবে পুলিশের হাতের বাইরে থাকল ভিঁয়ো। পুলিশ ভিঁয়োকে অভিযুক্ত করার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পেল না। এর পরেই অর্থকষ্টে ভিঁয়ো প্যারি ত্যাগ করতে বাধ্য হোল। ঠিক এই মুহূর্তেই সে তার প্রথম উল্লেখ-যোগ্য কবিতা 'দি লিটল টেস্টামেন্ট' (১৪৫৬) রচনা করে।

পাঁচ বছর ধরে ফরাসি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিঁয়ো ঘুরে বেড়াতে লাগল। যত্র-তত্র ঘুমোয়, চুরি-জোচ্চুরি করে অর্থের প্রয়োজন মেটায়। মাঝে-মধ্যে সমবেত শ্রোতাদের কবিতা শোনায়—আর ঐ মুগ্ধ কোন শ্রোতারই পকেট মেরে মজা পায়। এই সময় ডিউক অফ অরলিয়াঁ চার্লসের সাময়িক পৃষ্ঠপোষকতা সে লাভ করে। চার্লস নিজেও প্রচলিত রীতির উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। একবার এখানকার জেলেই ভিঁয়োকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়। ডিউকের মেয়ে হবার আনন্দোৎসবের কারণে কয়েদখানা থেকে সে হঠাৎ মুক্তিও পেয়ে যায়। ভিঁয়োর উপর মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা ছিল। ১৪৬১ সালের গ্রীষ্মটি তাকে কাটাতে হয় জেলে। অর্লিয়াঁর বিশপের কৃপায় এবার তার মুক্তি। দুঃসহ কারাবাসের জীবন, অর্থ-কষ্ট, দুর্নীতি, অপরাধের পিপাসা, মানসিক অস্থিরতার প্রবল কম্পন 'দি টেস্টামেন্ট (১৪৬১-৬২) নামে তার শ্রেষ্ঠ কবিতার দীর্ঘ, গভীর, সৌম্য কণ্ঠে প্রকাশিত হোল। এসময় সে প্যারিতে ফিরে এসেছে।

'দি টেস্টামেন্ট' তার দীর্ঘকালের জীবন-যাপনের মর্মান্তিক অনুভূতির কথা আছে। স্ফীতকায়া মার্গোতের ঘরে সে অর্থের প্রয়োজনে চাকরের কাজ করেছে। মার্গোত-এর জন্য দালাল হয়ে লোক খুঁজেছে। রাত্রে ওর কাছে এক সময় শুতে পেয়ে ভিঁয়ো তার পাওনা অর্থ চাইতো। নিঃসহায় মার্গোতকে সে ক্ষমা করতে পারত না। অসহ্য রাগে তার পোষাক খুলে ফেলত, এগুলো বেচে যে পয়সা পায় সে তাই নেবে। মার্গোত কে মারধর করতে শুরু করত। মার্গোত তখন ঈশ্বরকে ডাকত না, শয়তানকে ডেকে বলতো, 'দ্যাখো—আমাকে বাঁচাও!' তবুও এখানেই কিছুকালের জন্য ভিঁয়ো তার সুখের ঘর-এর আস্বাদ পেয়ে-ছিল। দুজন পাপে নিমজ্জিত নারী-পুরুষ পাঁক-কর্দমের পুতিগন্ধে সিক্ত হয়ে এক ধরনের ভালোবাসার স্বাদ পেত।

নভেম্বর, ১৪৬২-র প্যারিতে ডাকাতির অভিযোগে সে আবার ধরা পড়ে। যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে প্রায় ছাড়া পেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এসময় হঠাৎ ছ-বৎসর আগের সেই কলেজ দ্য নাভারের মামলাটা নতুন করে বিচারে ওঠে। ১২০টি গোল্ড ক্রাউন শোধ দেবার শর্ত-পত্রে তাকে স্বাক্ষর করতে হয়। এর কয়েক সপ্তাহ পরেই তার নামে রাস্তায় ভয়ংকর রকম মারপিটের অভিযোগ আসে। পুলিশ এই বিশিষ্ট অপরাধীকে আর সামাজিক পরিবেশে রাখতেই ইচ্ছুক হোল না। কারণটা গুরুতর না হলেও, তার ফাঁসির হুকুম হোল। জেলখানায় সে ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল। মৃত্যুর বিকট ছায়া তার অস্তিত্বকে চুরমার করে দিন-রাত শিহরিত করে রাখত। মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতেই সে তার বিখ্যাত 'এপিটাফ ভিঁয়ো' রচনা করে। সে আশা না রেখেও মুক্তির জন্য একটা আবেদন করে-ছিল। ভিঁয়োকে আনন্দে চমকিত করে আকস্মিকভাবে মুক্তির প্রার্থনা মঞ্জুর হোল। তবে এর বদলে তাকে প্যারি এবং তার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে দশ বছরের জন্য নির্বাসন মেনে নিতে হোল। ১৪৬৩ সালের ৫ জানুয়ারী পর্যন্ত ভিঁয়ো সম্পর্কে এই হচ্ছে শেষ সংবাদ। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঐ দিনই ভোরের কুয়াশা ঠেলে, শীর্ণ, রুগ্ন, বিষণ্ণ এবং কাতর ভিঁয়ো কোন অজ্ঞাত পথে যাত্রা করল। সেই শীতের কুয়াশা ক্রমে ভিঁয়োকে ঢেকে ফেলে—প্যারি কিম্বা পৃথিবী এর পরে আর তাকে কোনকালে দেখেনি, কোন সংবাদ পর্যন্ত পায়নি। সেই কুয়াশা আজো কাটেনি।

সংগ্রামের ইতিহাস এবং ইতিহাসের সংগ্রাম

হঠাৎ দেখা হলো বলতে পারি না। শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ রায়কে দেখার প্রতীক্ষা আমার অনেক দিনের। এতদিনে উৎকণ্ঠার শেষ হলো। সে সুযোগ করে দিলেন বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ। সুপ্রকাশবাবুর প্রায় সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তাঁরাই।

এমন কিছু বয়স হয়নি তাঁর। দেখলেই বোঝা যায় বেশ পোড়-খাওয়া চেহারা। বয়সের চেয়ে মুখের ওপরে অভিজ্ঞতার ছাপ বেশি। লক্ষ্য করা যায়, সময়ের স্বাক্ষর। বিভিন্ন ঘটনা থেকে শিক্ষা-গ্রহণ করেছেন তিনি। কাউকে উপেক্ষা করেননি। কালের পাঞ্জার ছাপ পড়েছে সারা শরীরে। টান টান শিরার গভীরে ইতিহাসের শেকড় প্রসারিত। অনেক দেখেছেন তিনি, অনেক শুনেছেন। নানারকম আন্দোলনে যোগ দিয়ে কাটিয়েছেন জীবনের অধিকাংশ সময়।

মনে পড়ে, তাঁর একটি বইয়ের নাম। ইতিহাসের বই নয়, পরিভাষা কোষ অভিধান। শুনেছি, এখন ছাপা নেই। এককালে বইটি আমার কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছিল। এখনো সমানভাবে তার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করি। তখন টাকাকড়ির টানাটানিতে কেনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বারবার গভীর উৎসুক্য নিয়ে পাতা উল্টে দেখেছি। লোভীর মতো বইটিকে আত্মসাৎ করার কথাও মনে হয়েছিল কয়েকবার। একজন ঐতিহাসিকের জীবন-চেতনায়, বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করেছিলাম তখন।
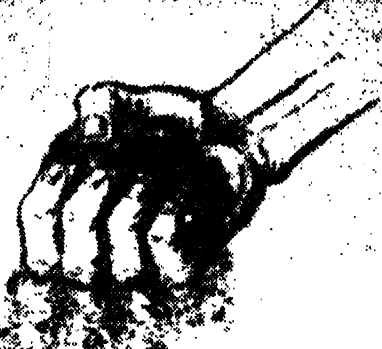
তারপর, সুপ্রকাশবাবুর অনেক লেখা পড়েছি—অনেক বই এবং আলোচনা। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, ভারতবর্ষের কোন্ ইতিহাস আপনি লিখতে চান? এ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

বললেন, 'আমি ভারতবর্ষের সত্যিকারের ইতিহাস লিখতে চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক এবং তাঁদের অনুসরণকারী দিশী ঐতিহাসিকদের বিকৃত লেখায় আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের পরিচয় ঢাকা পড়ে গেছে। ঐ বিকৃত ইতিহাসই আমাদের স্কুল-কলেজে অবশ্যপাঠ্য। স্বদেশের এবং দেশবাসীর মিথ্যা পরিচয় নিয়েই এদেশের ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে ওঠে। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে কেবল রাজা-রাজড়াদের মারামারি কাটাকাটি নিয়ে সত্যিকারের ইতিহাস হতে পারে না।'

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একটি বড় কাজ—'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'। সুপ্রকাশবাবু আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বইটির পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। বোধহয়, আমার উদ্দেশ্যটা তিনি আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। পাঁচ-ছটি পাতা উল্টে এসে এক জায়গায় তিনি থামলেন। স্থির ও কঠোর মনে হলো তাঁর উচ্চারণ। বেশ দৃঢ়তায় তিনি শোনালেন মানব-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। হুবহু ভাষা মনে নেই। তিনি বললেন, 'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করে পরীক্ষা দিই, তা নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, কোথা থেকে কারা এল, কাটাকাটি মারামারি পড়ে গেল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন নিয়ে টানাটানি চলতে লাগল। একদল যদি বা যায়, কোথা থেকে আরেকদল ওঠে পড়ে—পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলে মিলে এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করে তুলেছে। এই রক্তরঞ্জিত পরিবর্তনশীল স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেখলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা যায় না। ভারতবর্ষ কোথায়, এ সকল ইতিহাস তার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নেই, কেবল যারা কাটাকাটি খুনোখুনি করেছে, তারাই আছে।

সুপ্রকাশবাবু থামলেন। বিশুদ্ধ গদ্যে তিনি তাঁর বই লিখেছেন। বলেও যাচ্ছিলেন ঐ ভাষাতেই। আমি কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছি। লক্ষ্য করলাম, তাঁর দৃষ্টি জানলা-পথে দূরেমনস্ক। যেন বর্তমানের ভেতর দিয়ে তিনি ইতিহাসের গতিপথ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন। হালকা নীল আকাশে কী একটা পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল।

সামান্য সময়ের বিরতি। চা নিয়ে এল একজন। আলতো করে চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি বর্তমানে ফিরে এলেন। আবার বলতে শুরু করলেন তিনি। বললেন, 'মানব-সভ্যতার মূলেবনিয়াদ কৃষি। প্রাচীনকালে চীন, মিশর, ভারতবর্ষ—কৃষিতে খুব উন্নত ছিল। সেজন্যে তাদের সভ্যতা ছিল উন্নত। পরবর্তীকালে এই তিনটে দেশের কৃষিসম্পদ লুঠ করে নিয়েই গড়ে উঠেছে য়ুরোপের যন্ত্রশিল্প। তারই পরিণতিতে, কৃষকদের একটা বড় অংশ মজুরির বিনিময়ে তৈরী হলো কারখানার শ্রমিক।'

আমার কাছে নতুন মনে হচ্ছিল তাঁর এই বিশ্লেষণ। স্কুল-কলেজের পাঠ্য ইতিহাসে কৃষকের কথা পড়েছি সামান্যই। ফলে, অনভ্যাসের জড়তা কাটিয়ে আমি নতুনভাবে ইতিহাসকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। রাজা-জয়ের কাহিনী নয়, কৃষি-সংগ্রামের অনধিত অধ্যায়।

বললেন, 'কৃষিকে ভিত্তি করেই প্রথম নিপীড়িত ও উৎপীড়কের সৃষ্টি হয়েছে। আর উভয়ের মাঝখানে তৈরী হয়েছে আরেকটা নতুন সমাজ—আজকের দিনে আমরা তাদের বলি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সেজন্যেই কৃষিকে বাদ দিয়ে, কৃষককে বাদ দিয়ে কখনো ইতিহাস হতে পারে না—বিশেষ করে, ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে। আমি আমার বইতে তাদের কথাই তুলে ধরেছি, যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বদেশের সত্যিকারের ইতিহাস জানতে পারে। ভাবী ঐতিহাসিকেরা হয়তো তার থেকেও নতুন ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাবেন।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আর একটা কথা কি জানেন, মানুষ যতদিন উৎপীড়ন থেকে মুক্তি না পাবে, ততদিন শুধু মানুষকে বেঁচে থাকার জন্যই সংগ্রাম করতে হবে। এই অবস্থায় কারো স্বাধীন অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব নয়।'

জিজ্ঞেস করলাম, এ বই লেখার প্রথম প্রেরণা আপনি পেলেন কোথায়? কোনো প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা কি আপনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, ১৯৩৯ সালের দিকে আমি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। তখন আমার প্রধান কাজ ছিল নদীয়ার কৃষকদের নিয়ে। বয়সে বৃদ্ধ এমন অনেক চাষী আসতেন। তাঁদের দেখেছি, চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। দু-চার জন ছিলেন নীল-বিদ্রোহের আমলের লোক। তাঁদের কাছে প্রায়ই সেই সংগ্রামের কাহিনী শুনতাম। গোরা সেপাইদের সঙ্গে লড়াই করার একটা অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা। গাছ কেটে আলগা করে রেখে দিত সকলে মিলে। একজন পাহাড়া দিত অন্য গাছের ওপরে শাঁখ হাতে করে। গোরা সেপাই দেখলেই শাঁখ বেজে উঠতো। সঙ্গে সঙ্গে দড়ি টেনে গাছগুলো ফেলে দেওয়া হতো ওদের ওপর। অনেক সময় থালা-বাসন কেটে অস্ত্র তৈরী করেছে তারা। চাষীদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বহুবার ইংরেজ সৈন্যরা এঁটে উঠতে পারতো না। তাঁদের কথা শুনে কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস লেখার ইচ্ছা তীব্র হয়ে ওঠে আমার মনে।'

বললাম, এ বই লেখার সাহায্য পেয়েছেন আপনি কোন্ কোন্ সূত্র থেকে?

—'সে কথাই বলছি। কাজে নেমে নানান অসুবিধায় পড়লাম। কৃষক সংগ্রামের কথা ইংরেজ—এমন কি আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত লিখে যাননি। প্রামাণ্য বইপত্তরের অভাব রয়েছে যথেষ্ট। এশিয়াটিক সোসাইটি আর ন্যাশনাল লাইব্রেরী ঘুরে ঘুরে পেলাম কিছু কিছু বই, কাগজপত্র। পেলাম, পুরোনো দিনের জেলা গেজেটিয়ার আর সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র। সরকারী বেসরকারী দলিল ঘাটাঘাটি করেও মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করেছি। অমৃতবাজার পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলি আমার খুবই কাজে লেগেছে। নীল-বিদ্রোহের বেশির ভাগ সংবাদই আমি পেয়েছি অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে। ১৮৭৪ সালের ২২শে মে (?) সংখ্যায় অমৃতবাজারই প্রথম নীল-বিদ্রোহকে বৃটিশের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর প্রথম বিপ্লব বলে স্বীকৃতি দেয়। 'নীল দর্পণ' নাটকে কৃষকদের দুর্দশার কথা খানিকটা আছে। কিন্তু তাদের সংগ্রামের কথা নেই। কৃষক সংগ্রামের কথা কিছুটা আছে মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ'-এ।'

আলোচনায় ছেদ পড়ল খানিকক্ষণ। টেবিলের ওপর ফোনটা বেজে উঠল। এক ভদ্রলোক উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন যেন কার সঙ্গে। চুপ করে রইলেন সুপ্রকাশবাবু। আমি ভাবছিলাম, বইটার বিষয়বস্তু এবং লেখকের নিষ্ঠার কথা। কত আন্দোলন হয়ে গেছে আমাদের দেশে। সন্যাসী বিদ্রোহ, মেদিনীপুরের কৃষক বিদ্রোহ, ত্রিপুরা জেলার সামশের গাজীর বিদ্রোহ, সন্দীপের বিদ্রোহ, ১৭৭০-৮০ সালের জন্তুবার সংগ্রাম, চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহ, নীল চাষীদের বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ, যশোর-খুলনার বিদ্রোহ, বীরভূম-বাঁকুড়ার পাহাড়ী বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের গারো জাগরণ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী বাংলার জয়ন্দময় ইতিহাস।

তিনি বলেছেন, সব বিদ্রোহই মূলত একই সূত্রে গাঁথা। ১৭৬৩ সালে কৃষকরা বে-দাবি ও বদলি নিয়ে সন্যাসী বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন, তাই ছিল সব বিদ্রোহের মূল উৎস। জমিদার শ্রেণীর হাত থেকে ভূমিসত্ব উদ্ধার এবং সবরকম শোষণ উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাই ছিল এইসব বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। কৃষকরা লাঞ্ছিত হয়েছে বহুবার, কিন্তু কোনদিন আপোস করেনি কখনো। স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই বিদ্রোহ গুলিতেই প্রথম দেখা যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, বইটা লিখতে আপনার কত সময় লেগেছে?

—প্রায় বারো বছর। প্রথমে বছর চারেক কাজ করার পর পারিবারিক ঝামেলায় কাজ বন্ধ থাকে। পরে বিদ্যোদয়ের দীনেশবাবুর উৎসাহে আবার কাজ শুরু করি। তারপর আরো আট বছর সময় লেগেছে বইটি শেষ করতে।

আমি তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে—তীক্ষ্ন বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। চশমার আড়ালেও তাঁর চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল মনে হলো।

জিজ্ঞেস করলাম, দ্বিতীয় খণ্ড লিখেছেন কি? তাতে কি থাকবে?

—লিখছি। ১৯০১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় উনসত্তর বছরের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস। দিনাজপুরের আদিনা মসজিদ থেকে কৃষকদের লড়াই, ময়মনসিংহের জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এবং নকশাল বাড়ির ইতিহাসও থাকবে এই খণ্ডে। আদিনা মসজিদের নেতারা কেউ সি আর দাশ, কেউ গান্ধী নামে পরিচিত হয়েছিলেন।'

কবে নাগাদ বেরোতে পারে?

—বছর দেড়েকের আগে তো নয়ই। কাজ করে যাচ্ছি। বিশ শতকের আগেকার ইতিহাস তবু খানিকটা পাওয়া যায়। এ আমলের লিখিত নজির কম। সবই রয়েছে লোকের মুখে মুখে। যারা বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করছি। ১৯২৩ সালে ময়মনসিংহের জমিদার কৃষ্ণবাবুদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়, তার মামলার বাদী-প্রতিবাদী দুই তরফের কৌসুলীর খোঁজ করে তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রামের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি।

প্রকাশক বললেন, ওঁর 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' বেশ সাড়া জাগিয়েছে। শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোচ্ছে। আয়তনে বাড়ছে দ্বিগুণ।

সুপ্রকাশবাবু বললেন, 'আমার বই থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক যাত্রা নাটক লেখা হচ্ছে। সবচেয়ে খুশি হয়েছি সাঁওতালদের মধ্যে বইটি জনপ্রিয় হওয়ায়। ওরা বাংলা পড়তে পারে না। বাবুদের ধরে পড়িয়ে নেয়, আর পূর্বপুরুষের সংগ্রামের কথা শোনে। অনেকে দল বেঁধে চাঁদা তুলে বইটি কিনছে।'

বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। কথায় কথায় কখন রাত হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। তা হোক, মনে হল যেন বাংলা দেশকে আজ নতুন চোখে দেখলাম।

—বিশেষ প্রতিনিধি

ড্রীমল্যান্ড

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ড্রীমল্যান্ড নার্সিং হোম পার্ক স্ট্রীট ধরে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই রডন স্ট্রীটের উপরেই দেখা যাবে। অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশ বটে, কিন্তু বাড়ীটা পুরোনো প্রায় সেকেলে বলা চলে। আগের দিনে রিটায়ার্ড একজন বৃটিশ কর্ণেলের বাসস্থান ছিল এটা। জায়গাটাকে দীনা যথাসাধ্য মডার্নাইজড করেছে—বিসদৃশ কাঠের কড়ি-বড়গাগুলোকে ঢেকে দিয়েছে কাঠের সিলিং দিয়ে। রঙচটা দেওয়ালগুলো রিপ্লাস্টার করে স্নিগ্ধ রঙ লাগিয়েছে মনোমত। হাল্কা আর সৌখিন ছোটখাট ফার্ণিচারে ঘরগুলো সাজিয়েছে সুন্দরভাবে। ডাক্তার দীনা মুখার্জির সুরুচির প্রশংসা সকলেই করে। একটা লম্বা হলের মধ্যে দুধারে দশটা করে কুড়িটা বেড। তাছাড়া ছোট ছোট কয়েকটা কিউবিকলে ভাগ করা কয়েকটা কেবিনও আছে। নার্স কেতকী ছাড়া আরও দুজন নার্স আছে। সব বেডগুলো দেখাশোনা করার ভার এই তিনজনের উপর।

তিন নম্বর কেবিন থেকে বেরিয়ে এল কেতকী। আজ সকালেই অপারেশন আছে, সুতরাং বেশ ব্যস্ত রয়েছে সে, সিজারিয়ান কেস—বড়লোকের স্ত্রী সুতরাং অল্পতেই কাতর হয়ে পড়েছেন। যন্ত্রণা অবশ্য রয়েছে কিন্তু কেতকী এ ধরনের কেস অনেক দেখেছে। প্রথম প্রসবে এ ধরনের যন্ত্রণা হতেই পারে। ভিজে তোয়ালেটা নিয়ে ঘরে

ঢুকল কেতকী শিখা দত্তের মুখটা মুছিয়ে দেবার জন্য।

কখন আসেন আপনাদের ডাক্তার—শিখা দত্ত অস্থির হয়ে পড়েছে।

এখনই এসে পড়বে — আশ্বাস দেয় কেতকী।

আমার বড় খারাপ লাগছে, ওঁকে একবার ডেকে দিন। কেতকী ওয়েটিং রুম থেকে মিঃ দত্তকে ডেকে দিয়ে বাইরে দাঁড়াল। একটু পরেই সরিৎ আর দীনা এসে পড়ল। সরিৎ পাশের ছোট ঘরটায় গিয়ে দাঁড়াল। কেতকী এসে তার কোট খুলে নিয়ে একটা হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখল তারপর একটা ড্রাম থেকে স্টেরিলাইজড অ্যাপ্রন আর মাস্ক্ বার করে পরিয়ে দিল সরিৎকে। একটু নীচু হল সরিৎ। তা না হলে কেতকী হাত পাবে না। সাধারণের থেকে একটু বেশী লম্বা সরিৎ মুখার্জি।

আরও নীচু হব—হাসিমুখে তাকাল সরিৎ।

না হয়েছে—অ্যাপ্রনের পিছনের ফিতে-গুলো বাঁধল কেতকী।

থ্যাঙ্ক ইউ—রুগী কি বলছেন?

সারা রাত জ্বালিয়েছে।

কেন, ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয় নি?

হয়েছে, কিন্তু অল্পই ঘুমিয়েছেন।

তাহলে যন্ত্রণা হয়েছে নিশ্চয়ই।

না তা নয়, অল্পতে অস্থির হন—সাধারণত বড়লোকদের যা হয়ে থাকে আর কি, সহ্যশক্তি কম।

অপারেশন থিয়েটার রেডি?

হ্যাঁ।

দীনা ঢুকল ঘরের মধ্যে। তারপর সাবান দিয়ে হাতটা কনুই পর্যন্ত ধুতে লাগল এক মনে। বলল—লোকটাসুদ্ধ ব্যস্ত করছে।

ব্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক—উত্তর দিল সরিৎ। উৎকণ্ঠা হয় বৈকি।

হ্যাঁ তা হয়, তা বলে রুগীর কাছে আবোল-তাবোল বকলে সে আরও নার্ভাস হয়ে যায়—তাই না। যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন, রুগী তো টেবিলে।

ও কে—হেসে চলে গেল সরিৎ অপারেশন থিয়েটারে। এবার কেতকী আর একটা অ্যাপ্রন আর মাস্ক্ বের করলো ড্রাম থেকে। ব্রাশ দিয়ে নখগুলো ঘষতে লাগল দীনা—তারপর হাতের জলটা শুকিয়ে গেলে অ্যাপ্রনটা পরে নিল। কেতকী অ্যাপ্রনের দড়িগুলো বেঁধে দিল, একটার পর একটা।

কোমরে আর একটু টাইট কর। —থ্যাঙ্ক ইউ—। বেড নাম্বার দশের টেম্পারেচার কমেছে?

হ্যাঁ, টেরামাইসিন ইঞ্জেকসানের পর কমেছে।

কেতকী এবার রবারের স্টেরিলাইজড জুতোটা বের করল চিমটে দিয়ে।

মিসেস পোচকানওয়ালার কি খবর?

আবার ঝামেলা লাগিয়েছে।

কি হল আবার?

এবার খাওয়া যাচ্ছে বলে সোরগোল তুলেছে।

তাই নাকি? তাহলে এক কাজ কর; ওর পছন্দমত কোন ভাল হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে দাও।

কিন্তু—চুপ করে গেল কেতকী।

খরচের কথাটা ভেব না। এ ধরনের পেসেন্টের জন্য যা পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশী খরচ করতে হয়।

তাতে লাভ কি? কেতকী তাকাল ওর দিকে।

পার্শী কমিউনিটির অনেক কেস পাবে যদি মিসেস পোচকানওয়ালাকে খুশী করতে পার। ওটা ড্রীমল্যান্ড নারসিং হোমের বিজ্ঞাপন খরচ বলে ধরে নিতে হবে।

বেশ—। কিন্তু তিন নম্বর কাল যেতে চাইছে। ওর কোন আত্মীয়ার যেন বিয়ের ঠিক হয়েছে।

যান—আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে হিসেবটা নিজে দেখে নিও।

হ্যাঁ, প্রায় দেড়শো টাকার মত পাওনা হয়েছে।

না, একশো সত্তর। কুড়ি টাকা আরও ওষুধে লেগেছে।

লজ্জিত হল কেতকী। ডাক্তার দীনা মুখার্জির সব দিকে নজর আছে। তাছাড়া কাজ করতে ভালবাসে সে। এক মিনিটও চুপ করে থাকতে পারে না। সর্বদাই প্রাণ-চঞ্চল। সব কাজেই তাঁর সমান উদ্দীপনা আর উৎসাহ। অপারেশান থিয়েটারে গিয়ে ঢুকল সে। এবার তার হাতে একটু পাউডার ঢেলে দিল কেতকী। তারপর দু হাতে স্টেরিলাইজড গ্লাভস পরে নিল ডাক্তার দীনা মুখার্জি।

সরিৎ আগেই এসে রয়েছে রোগিণীর মাথার কাছে ছোট টুলটায়। শিখা দত্তের শিরায় কিছুক্ষণ আগেই সে পেন্টোথাল ইঞ্জেকশান দিয়েছে—অল্প ঘোর এসেছে শিখা দত্তর। এবার তার মুখ আর নাকের উপর রবারের মাস্কটা রাখল সরিৎ। মাস্ক থেকে রবারের নল গিয়েছে অক্সিজেন আর নাইট্রাস-অক্সাইডের সিলিণ্ডারের উপর। একবার কেশে উঠল শিখা। সরিৎ তাড়াতাড়ি এয়ারওয়েটা পরিয়ে দিল তার মুখের মধ্যে অন্যথায় জিবটা তালুতে আটকে যেতে পারে, শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে সেই কারণে। হাতে লাগান ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রের পারার ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করল সরিৎ। স্বাভাবিকই রয়েছে সেটা। রোগিণীর পেটের উপর অপারেশনের জায়গাটা বাদ দিয়ে বাকী সবটা স্টেরিলাইজড টাওয়েল দিয়ে ঢাকা রয়েছে। উন্মুক্ত জায়গাটায় স্পিরিট আর আয়োডিন পেইন্ট করা হল। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে দীনা একবার তাকাল সরিতের দিকে, বলল—হ্যাপী ডক্টর?

ও কে স্টার্ট—উত্তর দিল সরিৎ।

স্ক্যালপেল—বাড়ানো হাতের উপর ছুরিটা দিল কেতকী। দেহে মধ্যরেখার ঠিক পাশেই ছুরি দিয়ে টান দিল দীনা সুদক্ষ শিল্পীর ভঙ্গীতে। ত্বকটা কেটে গেল—কে যেন লাল রঙ দিয়ে একটা লম্বা রেখা টানল নিখুঁতভাবে। ছুরিটায় আর একটু চাপ দিল দীনা—ভেতরের হলদে চর্বির আস্তরণটা কেটে গেল এবার — জায়গাটা লিপস্টিকরঞ্জিত ঠোঁটের মত দেখাল।

আর্টারি ফরসেপ — হাত বাড়ালো দীনা। রক্তমুখী শিরার মুখগুলো ফরসেপ দিয়ে টিপে বন্ধ করে দিল এক একটা করে। তারপর গজ দিয়ে জায়গাটার রক্ত মুছে নিল সযত্নে। এবার শিরার মুখগুলো এক একটা করে বেঁধে নিল নির্ভুলভাবে। সঙ্গে সঙ্গে আর্টারি ফরসেপগুলো খুলে নিল। এতক্ষণে জায়গাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। জরায়ুটা দেখা গেল এবার, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে সেটা।

হ্যাপি ডক্টর?—দীনা তাকাল সরিতের দিকে।

ও কে গো অন—উত্তর দিল সরিৎ। তার দৃষ্টি কিন্তু রোগিণীর মুখের ওপর নিবদ্ধ। শ্বাসের গতিটা একাগ্র মনে লক্ষ্য করছে সে। সিলিণ্ডারের পাশে ঝোলানো, ব্লাডারের মত রবারের থলিটা রোগিণীর শ্বাসের সঙ্গে ফুলে উঠছে বারবার। জরায়ুর উপর একটা ইঞ্জেকশান দিল দীনা রক্তস্রাব

কম করার জন্য। এবার জরায়ুর উপর ছুরি দিয়ে কাটল সে। জরায়ুর বিভিন্ন স্তর এ অবস্থায় পাতলা হয়ে থাকে; সুতরাং খুব সন্তর্পণে লম্বালম্বিভাবে সে ছুরিটা চালাল তার উপর। শিশুটিকে দেখা গেল কুঁকড়ে ছোট হয়ে শুয়ে রয়েছে পরম নিশ্চিন্তে। তুলে ফেলল সেটাকে এবার। নাড়ীর ওপর পাশাপাশি দুটো ফরসেপ দিয়ে টিপে দিয়ে মাঝখানে কাঁচি দিয়ে কেটে দিল সে। শিশুটিকে কেতকী পাশের নার্সের হাতে দিয়ে দিল। চিৎকার করে কেঁদে উঠল সেটা। ঠাণ্ডাতে বিরক্ত হয়েছে নিশ্চয়। কয়েক সেকেণ্ডে পরের কাজগুলো সেরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল তৃপ্তিভরে। মুখ থেকে মাস্কটা সরিয়ে নিল সরিৎ। ব্লাডপ্রেসারটা চেক করল আর একবার, তারপর হাত থেকে ব্যাণ্ড খুলে নিয়ে বাক্সে রেখে দিল; সেটার আর প্রয়োজন নেই। শিখা দত্ত স্বপ্ন দেখছে হয়ত এখনও। শ্বাসটা কিন্তু তার স্বাভাবিক হয়ে আসছে একটু একটু করে। হাত থেকে রবারের গ্লাভস দুটো খুলে দীনা ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোর উপর ফেলে দিল। কেতকী হুকে টানান গজগুলো আগেই গুণে নিয়েছে কয়েকবার। যতগুলো নিয়ে কাজ করা হয় তার সঠিক সংখ্যা সেলাই করার আগেই গুণে মিলিয়ে নিতে হয় নয়ত ভুলক্রমে পেটের মধ্যে একটা থেকে যাওয়াও অসম্ভব নয়। রক্তের সংগে মিলিয়ে গেলে তাকে চেনা শক্ত হয়ে পড়ে তাই এই ব্যবস্থা। পাশের টেবিলে ব্লাডব্যাঙ্ক থেকে আনা রক্ত রয়েছে দু বোতল। সেই দুটো কাজে লাগাতে হয় নি। রক্তস্রাব সামান্যই হয়েছে।

গেটিং ফর ইওর কফি—সরিৎকে বলল দীনা।

যাচ্ছি, তুমি যাও—অ্যানেসথেসিয়া সেট ভালভাবে গুছিয়ে দিয়ে সরিৎ যখন ছোট ঘরটায় পৌঁছুল তখন দীনা অ্যাপ্রন ছেড়ে হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে আছে। দু কাপ কফি দিয়ে গেল কেতকী। দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে কফি খেতে লাগল ওরা।

অপারেশনে ক' মিনিট লাগল—জিজ্ঞেস করল দীনা।

সাঁইত্রিশ মিনিট—উত্তর দিল সরিৎ।

নট ব্যাড, কি বল?

হ্যাঁ ভালই, তবে এগার নম্বর বেডের কেসটার কথা ভাবছি।

কি [illegible]

দুটো অপারেশন এক সংগে হবে—অ্যাপেণ্ডিসাইটিস আর হিস্টেরেক্টমি।

তাতে কি? অ্যাপেণ্ডিসাইটিস দশ মিনিট আর ইউটেরাস বাদ দিতে বড় জোর আধ ঘণ্টা—সবসুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ মিনিট—কি এমন।

ভুলে যাচ্ছ দীনা ভদ্রমহিলার স্বাস্থ্যের আর বয়সের কথা।

সরিৎ—ইউ আর লুজিং ইওর নার্ভ—দীনা তাকাল ওর দিকে।

নো, আই অ্যাম নট—প্রতিবাদ করল সরিৎ। আমি ভাবছি আমার দায়িত্বের কথাটা।

আমাদের বল। দায়িত্ব তোমার একার নয়। সে যাই হোক আপাতত অ্যানিমিয়ার ট্রিটমেণ্ট চলুক ত তারপর ভাবা যাবে। অনর্থক বাজে ভাবনা ভেবে মনটা ভারী করে লাভ কি?

তা বটে—কফিটা শেষ করল সরিৎ, বলল—আজ ফিরতে দেরী হবে আমার।

কেন আবার কোথায় যাবে?

নর্থ ক্যালকাটায় ডাক্তার দত্তর থোরাকোপ্লাসটি আছে আজ। সেখান থেকে যাব ডাঃ অসীম ব্যানার্জির কেসে।

কি কেস?

সেই যে জিপ অ্যাক্সিডেণ্টে বালঘাদ থেকে আনা হয়েছে।

সিরিয়াস?

নিশ্চয়। হাত, পা, পাঁজর আর কিছু আছে কিনা কে জানে? দিল্লী থেকে আসছিলেন ভদ্রলোক।

দিল্লী থেকে? উৎসুক হল দীনা।

হ্যাঁ। তুমি যে দেশের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়লে একেবারে! পুরানো কথা মনে পড়ে গেল নাকি—হাসিমুখে তাকাল সরিৎ।

প্লিজ—ডোণ্ট পুল মাই লেগ সরিৎ—পুরানো কথা আবার কি?

কপট রাগের একটা ভংগী করল দীনা।

তা আছে কি না আছে, তুমিই জান, আমার ত বলনি আর—রাগাবার চেষ্টা করল সরিৎ।

বাজে কথা ছাড়। কোথায় লাঞ্চ করবে?

আজ আর বরাতে কিছু জুটবে বলে মনে হচ্ছে না, তবে যদি সময় পাই তাহলে একটা হোটেলে ঢুকে পড়ব।

না, ওসব চলবে না; হোটেলে গেলে, আমি লক্ষ্য করেছি তোমার শরীর খারাপ হয়।

তাহলে বুফেতে আমায় সেদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিল কেন? তা যাই বল সেদিন কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। আর তোমায় যা মানিয়েছিল না, ঠিক মনে হচ্ছিল পরস্ত্রী।

সরিৎ, প্লিজ, তুমি যখন ওসব শুরু কর তখন আর তোমার জ্ঞান থাকে না।

স্বাভাবিক; আমার মত সুন্দরী বৌ ক'জনের আছে? সরিৎ তাকাল দীনার মুখের দিকে। লজ্জায় আর আনন্দে দীনার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সংগে সংগে।

ছোড়দা আসছে না? হঠাৎ সনতের ভারী বুটের আওয়াজটা শোনা গেল করিডরে।

হ্যাঁ, ওকে অ্যাকাউণ্টসটা দেখতে বলেছি।

ভাল করেছ, কিন্তু ফাঁকি দিও না যেন।

তার মানে?

মানে বিনামূল্যে খাটিয়ে নিও না। সনতকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করল দীনা।

এস ছোড়দা—সনৎ আরও কাছে আসতে চুপি-চুপি বলল—তুমি আসবে, এই চোরটা বলে নি আগে।

আগে জানালে কি করতে?

লাল কার্পেট বিছিয়ে দিতাম; মালা এনে রাখতাম তোমার জন্যে—হাসল দীনা।

ভাল, শুধু ব্যাণ্ড বাজনাটাই বাদ গেল তাহলে—উত্তর দিল সনৎ।

সরিৎ হাতঘড়িটা দেখে উঠে পড়ল ওদের কথার মধ্যে সে থাকলে রসভঙ্গ হতে পারে।

সরিৎ চলে গেলে সনৎকে একতলার ছোট অফিস ঘরে নিয়ে গেল দীনা। বিধুবাবুকে সনতের সংগে আলাপ করিয়ে দিয়ে তার আসার উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে দিল সে। তাকে সেখানে রেখে এবার রাউণ্ডে গেল দীনা। প্রত্যেক রুগীর চার্ট দেখে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাবিধি এবং পথ্য সম্বন্ধে নির্দেশ লিখে দেওয়া এই সময়েই সে করে থাকে।

প্রথমেই এগারো নম্বর বেডের কাছে গেল দীনা।

ভালভাবে পরীক্ষা করে বলল—কেমন আছেন?

পেটের ব্যথা রয়েছে তবে আগের চেয়ে কম—স্বীকার করলো রুগী।

ইঞ্জেকশনটা নিতে আপত্তি করছেন কেন?

বড্ড লাগে।

তা বললে হবে না—একটু সহ্য করতে হবে তা না হলে সারবেন কি করে? আর যত দেরী হবে ততই বেশী খরচ হবে আপনার।

তা হলে নেব—রাজী হলেন তিনি।

মিসেস পোচকানওয়ালা একটা ড্রেসিং গাউন পরে বসেছিলেন খাটের উপর। ওভারীতে তাঁর টিউমার হয়েছে। কিন্তু মুসকিল হয়েছে একটা—ইউরিনে সুগার পাওয়া গেছে আর পরিমাণেও সেটা নেহাৎ কম নয়।

গুড মর্ণিং মিসেস পোচকানওয়ালা।—দীনা বেডের উপর তারই পাশে বসে পড়ল। ইউ আর লুকিং ফাইন—চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে আজ।

থ্যাংক ইউ—কিন্তু—

আই নো—তোমার ডায়েটের অব্যবস্থার জন্য খুবই দুঃখিত। আমাদের গোয়ানীজ কুকটা চলে যাওয়াতে এই বিপদ হয়েছে। কেতকী, ফ্লাওয়ারভাসে ফুল নেই কেন? ভ্রূ কুঞ্চিত করল দীনা—।

মালীটার অসুখ করেছে, তাই বোধ-হয়—

ওসব আমি শুনতে চাই না, এখুনি ড্রাইভারকে দিয়ে মার্কেট থেকে ফুল আনিয়ে দাও।

না-না থাক—ব্যস্ত হয়ে বললেন মিসেস পোচকানওয়ালা।

বাঃ আপনার ড্রেসিং গাউনটা ত চমৎকার! এখানকার বলে ত মনে হচ্ছে না।

ঠিক ধরেছেন, আমার ভাই অস্ট্রেলিয়া থেকে পাঠিয়েছে—মিসেস পোচকানওয়ালা এবার রীতিমত খুশী হয়ে পড়লেন।

দীনা এবার নীচে চলল, চলনটা তার বেশ দ্রুত। জুতোর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয় ঘরে ঘরে। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে নার্স আর বেয়ারা।

দীনা হঠাৎ কিচেনের মধ্যে ঢুকে পড়ল—

এটা কি?

চিকেন স্টু, মেমসাব। উত্তর দিল ওসমান। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

মাখন দিয়েছ?

জী।

পর্সাল পাতা?

জী নেহি।

কেন?

মিলা নেহি।

কেতকী, বিধুবাবুকে ডাক।

কেতকী চলে গেল তাকে ডাকতে।

পাশের ঘরে গেল দীনা। এখানে দিশী রান্না করে মালতী। মধ্যবয়সী মহিলা। কি রাঁধছ মালতী।—জিজ্ঞেস করল দীনা।

শুক্তো।

তেতো?

হ্যাঁ।

আর মাছের ঝোল? এ রান্নাটা দীনার প্রিয়।

রেঁধেছি। তাছাড়া শাকের ঘন্ট, পেঁপের চাটনিও আছে।

ভে-রি-রি গুড—খুশী হল সে। তোমার কিছু বলতে হয় না। আচ্ছা মালতী, তোমার ছেলে কেমন আছে?

জবর নেই, তবে কাশিটা বন্ধ হচ্ছে না বাবলুর।

কটা ইঞ্জেকশন হল?

চল্লিশটা হয়েছে।

কেতকীর কাছ থেকে একটা কাশির সিরাপ নিয়ে যেও, আমি বলে দেব। আর দুধ নিচ্ছ ত।

হ্যাঁ, রোজ একপো দুধ কেতকীদি দেন।

ওতেই হবে উপস্থিত। ভয় নেই, সেরে যাবে। কত বয়স যেন তোমার ছেলের?

পঁচিশ বছর—মালতী মনে মনে হিসেব করে বলল।

চিন্তা কোরো না মালতী, তোমার ছেলেকে এখানেই কাজ দেব। লেখাপড়া জানে?

হ্যাঁ, একটা পাশ করেছে।

বেশ, তাহলেই হবে।

কৃতজ্ঞতায় মালতীর চোখে জল ভরে এল। কোন কথাই বলতে পারল না আর।

বিধুবাবু এসেছেন।

এই যে বিধুবাবু, আপনিই ত বাজার যান।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বুধনকে নিয়ে আমিই যাই।

পর্সাল পাতা আনা হয় নি কেন?

পাওয়া গেল না—আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন বিধুবাবু।

কটা বাজার ঘুরেছেন?

একটা—।

একটু কষ্ট করতে হয় বিধুবাবু, তা না হলে কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত এবার আমাকেই বাজারের ভার নিতে হবে তাহলে।

আজ্ঞে—আজ্ঞে না, আমিই ব্যবস্থা করব—ব্যস্ত হলেন বিধুবাবু।

ভাল— তাহলে এখুনি আনিয়ে দিন। ড্রাইভার মার্কেটে ফুল আনতে যাবে ওকেই বলে দিন না হয়।

দীনা এবার ফিরে গেল শিখা দত্তকে দেখতে। জ্ঞান হবার সময় হয়ে আসছে তার। কিছুদিন আগে একজন নতুন নার্স জ্ঞান হবার পরই একজন রুগীকে জল খাইয়ে বিপদ করেছিল। বমি হওয়ার জন্য ক্ষতি হয়েছিল তার। সেই থেকে দীনা প্রত্যেকটি কেসই নিজে তদ্বির করে অপারেশনের পর। মিসেস শিখা দত্তর এখনও জ্ঞান হয় নি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে রয়েছে। মুখটা ফ্যাকাসে আর প্রাণহীন যেন। ঘাম পড়ছে স্বাভাবিক ভাবে। হাতটা নিয়ে পালস্ অনুভব করল দীনা। নাঃ নরম্যাল রয়েছে। গায়ের চাপাটা নিজেই টেনে দিল গলা অবধি। তারপর পাশের নার্সকে জিজ্ঞেস করল—বমির ভাব আছে?

না, এখনও শান্ত হয়ে রয়েছেন।

ভাল, তবে একটু নজর রাখতে হবে—আর জল যেন না দেওয়া হয়।

আজ্ঞে না—মেয়েটি মাথা নাড়ল।

কেতকীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল

দীনা—মিস্টার দত্তকে শুভ সংবাদটা জানিয়েছ?

হ্যাঁ, মিষ্টি কিনতে গেলেন তাড়াতাড়ি। তার আগে খুব অস্থির হয়ে সকলকেই জ্বালিয়েছেন।

হ্যাঁ তা আর বলতে? ঘরময় সিগারেটের টুকরো ছড়িয়েছেন সারা রাত ধরে। হাসিমুখে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গেল দীনা। মনটা তার প্রফুল্ল হয়ে রয়েছে। বারান্দা থেকে লনের দিকে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। সবুজ ঘাসের রংটা তার ভাল লাগে। মনে হয় কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করে তার ওপর। কিম্বা শুয়ে থাকে চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

সনৎ আজ অফিস থেকে বেরিয়ে অপেক্ষা করল সুপর্ণার জন্য। একটু পরেই সুপর্ণা এসে গেল। মুখটা তার ঘর্মাক্ত হয়ে রয়েছে। সারা দিন অফিসের পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। পা আর চলতে চায় না যেন। তবুও বাড়ী যেতে হবে তাড়াতাড়ি, তা না হলে বিপদ আছে। মায়ের শরীর বরাবরই খারাপ। ইদানীং বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন খুব। সেই কারণে মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে আছে। দেরী হলে ছোট ভাইটা হয়ত না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। তাকে আবার ঘুম থেকে তোলা মুস্কিল। কিন্তু বাবাকে নিয়ে তার সবচেয়ে বেশী ঝামেলা। ভদ্রলোক মুখে কিছু বলেন না বটে কিন্তু বললেই ভাল হত বোধহয়। কিছুদিন আগের কথা—বাবার সাবানটা নিয়ে মা কলঘরে গিয়েছিলেন। দরকারের সময় সেটা পেলেন না তিনি। রাগও করলেন না, বিরক্তও হলেন না। কিছুক্ষণ পরে সবাই অবাক হয়ে দেখল দশ-বারোটা সাবান দড়ি দিয়ে বাড়ীর নানাস্থানে ঝুলছে। এইটেই তার প্রতিবাদের বিচিত্র পন্থা। এতে কিন্তু সুপর্ণা অস্থির হয়ে পড়ে আরও। তার চেয়ে মায়ের বকুনি ভাল, জ্বালা বেশিক্ষণ থাকে না। এমন কি জোরালো উত্তর দিয়ে অনেক সময় মনটা হাল্কা হয়ে যায় তার।

সনতের সঙ্গে দেখা হতেই এগিয়ে গেল সুপর্ণা, বলল—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?

না, এই তো এলাম। উত্তর দিল সনৎ।

আজ আবার টিউশনি আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুপর্ণা।

তাহলে নর্থপোল টু সাউথপোল বলুন।

যা বলেছেন। বাড়ী যাদবপুর আর টিউশনি শ্যামবাজার। ভাবছি সব ছেড়ে দেব।

কষ্ট স্বীকার না করলে আমাদের চলে না সুপর্ণা দেবী।

আপনার কথা আলাদা। দাদা ডাক্তার টাকার অভাব নেই।

বেশ কথাই বললেন—হাসল সনৎ। আপনি ত সাম্যবাদের চূড়ান্ত করে ছেড়ে দিলেন।

লজ্জিত হল সুপর্ণা, বলল—না, আমি সেভাবে বলছি না। অন্তত বাড়ী গিয়ে আপনাকে রাত নটার সময় হাঁড়ি তো ধরতে হবে না।

তা ধরতে হবে না বটে। কিন্তু তা হলেই যে শান্তি থাকবে, তার কোন মানে নেই। সে যাক, কিন্তু গান শেখাতে কি ভাল লাগছে না? সারা দিন অফিসের পর বারো বছরের মেয়েকে বেসুরো হারমোনিয়ামে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতে কেমন লাগে তা আপনি বুঝবেন না।

দুজনে মিলে ওরা হাঁটতে লাগল ফুটপাথের ওপর দিয়ে। সুপর্ণার একটু জোরে চলার অভ্যাস, কিন্তু সনতের সঙ্গে সে ধীরে ধীরেই চলতে থাকল।

সনতের সঙ্গে এই অফিসেই তার আলাপ। প্রায় চারবছর আগে ওরা দুজনে একসঙ্গেই অফিসে ঢুকেছিল। সনতের কাছে ওর সিট ছিল প্রথম দিকে। কাজ সম্বন্ধে সনৎ তাকে গোড়া থেকে সাহায্য করে আর তালিম দিয়ে এসেছে। লোকটার আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা তাকে আকর্ষণ করে। সনৎ যে ছোটখাটো একজন সাহিত্যিক একথা জেনে সুপর্ণা খুশী হয়েছিল। সে নিজেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে নাম করেছে বেশ। রেডিও বা ছোটখাটো জলসায় তার ডাক পড়ে মাঝে মাঝে। কিছুক্ষণ চলার পর সুপর্ণা বলল—আপনার গল্পটা পড়লাম, খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু, ও-কাগজে দিলেন কেন?

অন্য কাগজ নেবে কেন আমার মত লেখকের লেখা।

অন্যায়; শুধু নিজেদের গ্রুপের লোকেদের নিয়ে চলবে ওরা, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না!

বিচার কোথায় আছে? প্রত্যেক পদে পদে আপনাকে অবিচার মেনে নিতে হবে মাথা নীচু করে। তা নাহ'লে ধুলোয় মিলিয়ে যেতে হবে, নিঃশেষ হয়ে যাবেন এক নিমেষে। সনতের কথায় শ্লেষের ছোঁয়াচ রয়েছে।

সুপর্ণা তার দিকে তাকিয়ে বলল—দেখুন বিচার আর অবিচারের এই দুটো কথা সম্বন্ধে এত ভেবেছি যে এখন মনে হয় ওকথা দুটোর কোন মানেই নেই। আমাদের মত লোক যারা দিবারাত্র শুধু লড়াই করে বেঁচে আছে তাদের কাছে ওসব চিন্তা হাস্যকর। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সনৎ।

কি হ'ল? ফিরে তাকাল সুপর্ণা।

পা'টায় একটু লাগছে যেন। অপ্রস্তুতের হাসি হাসল সে।

তাহ'লে চলুন, মাঠে একটু বসা যাক্—।

দুজনে মিলে ওরা মাঠের উপর গিয়ে বসল।

দেখুন, কত অসহায় আমি। পুরুষ হয়ে নিজেকে সামলাতে পারি না। সুপর্ণা তাকিয়ে রইল অপরদিকে। কোন লোকের দুর্বলতা সামনাসামনি সহ্য করতে পারে না সে, নিজেরই লজ্জা হয়। কপালের চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিল—তারপর বলল—

সামনে রবিবার একটা ফাংসানে আমায় গান গাইতে হবে, আপনি যাবেন? যাব; অফিসের আর কাউকে বলেছেন। সনৎ তাকাল সুপর্ণার দিকে। না, আর কাকে বলব? যাবেই না হয়ত কিংবা বিদ্রূপ করবে আমার আড়ালে।

ঐ চিন্তাটা মনে থাকলে কিন্তু খুব কষ্ট হয়। আমার যেমন পা'টার জন্য হয় সর্বক্ষণ।

তাই যদি হয় তাহ'লে মন থেকে সেটা দূরে রাখতে চেষ্টা করেন না কেন?

করি বৈকি, উত্তর দিল সনৎ। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। অগ্রাহ্য করার মত শক্তি আমার নেই। আমি জানি আমি দুর্বল। কয়েকটা কমপ্লেক্স জীবনের সঙ্গে আমার জড়িয়ে আছে। এড়িয়ে যেতে পারি না কোনমতেই।

সনৎ সুপর্ণার দিকে তাকাল। নার্স কেতকীর রংটা প্রায় দীনার মতই গৌরবর্ণ। অত লম্বা নয়, স্বাস্থ্যও অত সুন্দর নয়। কিন্তু দীপ্তিময় একটা সৌষ্ঠব আছে। গতকাল নার্সিং হোমে যখন সে আকাউণ্টস্ দেখছিল তখন কেতকী তাকে কফি দিতে এসেছিল। দীনা এর আগেই তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। কেতকীর মধ্যে একটা বেশ বলিষ্ঠতা আছে, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই সনৎ তা লক্ষ্য করেছে। সুপর্ণার ভেতরে ওধরনের বলিষ্ঠতার প্রকাশ দেখেনি সনৎ। সুপর্ণার চেহারাটা তার চরিত্রের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। ওর মধ্যে একটা স্নিগ্ধ লালিত্যের ভাব সুপরিস্ফুট।

গানের টিউশনি শেষ করে সুপর্ণা সেদিন একটু দেরীতেই বাড়ী ফিরল। বাবা অনেক আগেই ফিরেছেন। মা বিছানায় তার ছোট ভাইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ীর আবহাওয়া থমথমে—অনুভব করে সে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। সুপর্ণা বুঝল বাবার চা খাওয়া হয়নি। তাহ'লে এতক্ষণে তিনি খবরের কাগজটা আবার গোড়া থেকে পড়তে শুরু করতেন। ভবতোষবাবুর কাগজ পড়ার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ছোট একটা পেন্সিল নিয়ে তিনি কাগজের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো দাগ দেন পড়ার সময়। বিশেষ জায়গা বলতে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে প্রিন্টারের নাম পর্যন্ত প্রায় সবেরই নীচে দাগ থাকে। পুরানো কাগজগুলো একটা দেখবার মত জিনিস হয়। সুপর্ণা কাপড় না ছেড়েই আগে স্টোভে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিল। তারপর মায়ের ঘরে ঢুকল খুব সন্তর্পণে। মা জেগেই ছিলেন, বললেন, কি ব্যাপার তোমার এত দেরী হ'ল কেন?

টিউশনি ছিল তাই,—আস্তে আস্তে উত্তর দিল সুপর্ণা।

তা ত ছিল, কিন্তু এদিকে সামলাবে কে? সেই দুপুর থেকে আমি পড়ে আছি, মণ্টু চা করতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে, আর তোমার বাবা বিকেল থেকে ঠায় বসে আছেন চুপ করে।

চা পান নি, তাই রেগে গেছেন হয়ত।

সে আর বলতে, দেখ, যদি ঠাণ্ডা করতে পার।

দাঁড়াও, তোমার পায়ে একটু মালিশ করে দিই আগে।

না না, সারাদিন খেটে এসে তোমাকে

আর আমার সেবা করতে হবে না। —গলার স্বরটা মোলায়েম হয়ে এল এবার।

ভবতোষবাবু বেকার। এককালে অবশ্য স্কুলের মাস্টার ছিলেন। তাঁর অদ্ভুত কতকগুলো গুণ আছে বলে শুনতে পাওয়া যায়। ভদ্রলোকের নাকি একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। অনেক সময় এমন কথা বলেন যা শুনলে আশ্চর্য লাগে। কি করে যে বলেন তা কেউ বলতে পারেন না। কিছুদিন আগে পাড়ার অমরেশবাবুকে বলেছিলেন যে তিনি দশ দিনের মধ্যে সত্তর হাজার টাকা পাবেন। অমরেশবাবু করপোরেশনের কেরানী। কথাটা শুনে তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সত্তর হাজার টাকাই পেয়েছিলেন তিনি ঐ সময়ের মধ্যে। এক মুমূর্ষু বৃদ্ধা মাসীকে দেখতে গিয়ে তিনি টাকাটা পেয়ে গেলেন আকস্মিকভাবে। এত টাকা বৃদ্ধার থাকার কথা নয়। তারপরও এক কাণ্ড হ'ল। টাকা পেয়ে অমরেশবাবু যখন গরদের চাদর আর মিষ্টি নিয়ে ভবতোষবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এলেন, তখন তিনি অমরেশবাবুকে চিনতেই পারলেন না। এমনকি তার দেওয়া কিছুই তিনি স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না। অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন অভদ্রভাবে। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ ধরনের ব্যাপার কয়েকবারই ঘটেছে। অনেকেই এসব কথা জানে, কিন্তু এবিষয়ে আলোচনা করতে গেলে ভবতোষবাবু রীতিমত বিরক্ত হন। তিনি কোষ্ঠী বিচারও করেন। আঁকাজোকা, লেখালেখি নয়, কোষ্ঠীটা শুধু একবার গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত পড়ে যান, তারপর স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ। সে সময়ে তাঁকে ডাকলে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। এরপর তিনি ধীরে ধীরে কথা বলেন সদ্য নিদ্রোত্থিতের মত।

কয়েকটা পুরানো পঞ্জিকা আর শত-ছিন্ন কতকগুলো বই নিয়ে চুপ করে বসে আছেন ভবতোষবাবু। সুপর্ণা চায়ের পেয়ালাটা সামনে রেখে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—বাবা, আবার আমাদের অফিসে ঘেরাও হচ্ছে। কথাটা শুনে মুখতুলে তাকালেন ভবতোষ-বাবু। রাজনৈতিক সংবাদে তাঁর বিলক্ষণ ইণ্টারেস্ট আছে। সামনে ধূমায়িত পেয়ালা লক্ষ্য করলেন। তারপর সেটা তুলে নিয়ে বললেন, কেন, হঠাৎ ঘেরাও কেন?

না বাবা, হঠাৎ নয়, অনেক অভিযোগ আছে।

তোমাদের অভিযোগের শেষ নেই—ঘরে-বাইরে শুধুই অভিযোগ।

এ আমাদের ন্যায্য পাওনা বাবা।

ন্যায্য কাজ কর কি? তোমাদের কর্তব্যের কতটুকু তোমরা কর। কেবল দলাদলি, রাজনীতি আর সিনেমার গল্প নিয়েই মেতে আছো। তোমরা কাজ কর কখন? ভবতোষবাবু তাকালেন সুপর্ণার দিকে।

সুপর্ণা প্রথমে জবাব দিল না। পরে একটু ভেবে বলল—আমাদের কাজ করার ওপর ত অভিযোগ নির্ভর করছে না।

বাঃ, বেশ বললে—হেসে উঠলেন ভবতোষবাবু। তাহ'লে তোমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ স্বীকার কর তোমরা।

না বাবা করি না। আমরা সাধ্যমত কাজ করি কিন্তু কাজ করার মত পরিবেশ নেই, মনে সাচ্ছন্দ্য নেই—ভবিষ্যতের আশা নেই।

আবার হেসে উঠলেন ভবতোষবাবু—বললেন—পরিবেশ তোমরাই সৃষ্টি করবে; মনের সাচ্ছন্দ্যর জন্য দায়ী অফিস নয়, আর ভবিষ্যতের আশা জেনেই কাজ নিয়েছিলে এখন উল্টোকথা বললে হবে না। ভবতোষ-বাবুর মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করে খুশী হ'ল সুপর্ণা। এতক্ষণে তিনি স্বাভাবিক হয়েছেন। মনের আনন্দে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন তিনি, তর্কে উৎসাহ প্রকাশ পাচ্ছে।

এতক্ষণে পরে কেতকী অ্যাপ্রনটা খোলার সময় পেল। প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছে। তাই খাবার আর ইচ্ছে নেই। ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে পড়ল সে। নার্সিং হোমেই একটা ছোট ঘরে সে থাকে। ঘরটা এত অপরিসর যে খাটটা ছাড়া অন্য কিছুই সে রাখতে পারেনি। ঘরের কোণে ছোট একটা টেবিলে মেয়েলী টুকিটাকি জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাপড়টা পাল্টে নিয়ে একটা টোস্ট আর এককাপ কফি খেয়ে নিল কেতকী। ওবেলা কিছু খেয়ে নিলেই চলবে। তাছাড়া আজকাল তার খাবার স্পৃহা যেন কমে গিয়েছে। এর-জন্য হয়ত সে নিজেই দায়ী খাটতে হবে জেনেও সে এই নার্সিংহোমে কাজের ভার নিয়েছে। এছাড়া অনেক ভাল চান্সও সে পেয়েছিল বটে কিন্তু তাতে তার লোভ নেই। টাকার জন্য সে লালায়িত নয়। যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী নিয়ে করবেই বা কি? ব্যাঙ্কে জমাবে? দত্তপুকুরে জমি কিনে বাড়ী করবে? কার জন্যে? একলা একটা বাড়ী নিয়ে বাস করার মত ইচ্ছা তার কোনদিনই নেই। এমনকি ভাড়া দিয়ে মাসে মাসে টাকা নিতেও তার বাধবে। তাতে কোথায় যেন একটা অহমিকার স্পষ্ট ছোঁয়াচ থাকে। অহমিকা কোনদিনই কেতকী সহ্য করতে পারে না—অসহ্য লাগে।

ড্রীমল্যান্ড নার্সিং হোমে সে নিজেই এসেছে। সরিৎ তাকে কোন আহ্বান জানায়নি। মেডিকেল কলেজে সরিতের সঙ্গে কেতকীর প্রথম আলাপ। ডক্টর অব অ্যানাসথেসিয়া পাশ করে বিলেত থেকে আসার পর সে মেডিকেল কলেজেই প্রথম চাকরী পায়। কেতকী তখন ওখানকার স্টাফ নার্স।

সরিতের কাজের প্রশংসা সকলেই করেছে। তার নিষ্ঠা, নতুন পদ্ধতি, তার ব্যবহারিক প্রক্রিয়াগুলো যেমনই নিখুঁত তেমনি ফলপ্রসূ। সরিতের চালচলন, কথাবলা কিংবা কাজের ভঙ্গিগুলো যে লক্ষ্য করে সহজে সে ভোলে না। মেডিকেল কলেজে সরিতের সঙ্গে সে বরাবর কাজ করে এসেছে। সার্জন, অ্যানেসথেটিস্ট আর স্টাফ নার্স এ কজনের টিমওয়ার্ক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সবসময়ই প্রশংসা পেয়েছে অকুণ্ঠভাবে, একথা সে জানে।

তখন আর এখনকার সরিতের পার্থক্যের কথা মনে পড়ল কেতকীর। চেহারা প্রায় একরকম রয়েছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা শ্লথভাবের ছোঁয়াচ এসেছে। সেই চঞ্চলতা, ছটফটে ভাব যেন অদৃশ্যপ্রায়। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলার অভ্যাস সরিতের এখনও অবশ্য রয়েছে। কপালে সামনের দিকে তির্যক কাটা দাগটা এখনও সেইরকমই আছে। কেতকীর মনে পড়ল সরিতের অ্যাকসিডেন্টের কথা। গাড়ী চালিয়ে সে হসপিটালে আসছিল। তিনটে পরপর কেস ছিল সেদিন। কলেজ স্ট্রীটের মোড়েই ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লেগে-ছিল তার গাড়ীর। কেতকীর মনে পড়ল কপালে গভীর ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত দেখে সে দারুণ ভয় পেয়েছিল। ছ'টা স্টিচ্ করতে হয়েছিল। কিন্তু তারপরও সরিৎ তিনটে কেসই অ্যাটেন্ড করেছিল। তার কর্মবোধ আর সহনশীলতার সকলেই প্রশংসা করেছিল। মাথার চোট সামান্য জিনিস নয়। বুদ্ধিভ্রংশ না হোক স্নিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় সরিৎ দেয় না—এটাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কেতকীর মনে পড়ল আরেকটা কেসের কথা। মেডিকেল কলেজের কেস। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ভদ্রমহিলা মারা যাচ্ছিলেন। সবরকম চিকিৎসা যখন বিফল হ'ল তখন সরিতের ডাক পড়ল। মনে আছে কেতকীর সেই রাতের কথা—সন্ধ্যে থেকে সকাল হয়ে গিয়েছিল। সরিৎ যখন কেসটা হাতে নিল তখন রুগীর সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গিয়েছিল। পাল্‌স অদৃশ্যপ্রায়। হার্টের গতিও স্তিমিত। শ্বাস পড়ছে অনেক পরে পরে। সরিৎ দেরী না করে মাস্ক পরিয়ে চাপযুক্ত অক্সিজেন চালিত করল রোগিণীর লাংসে। কেতকী সরিৎকে সাহায্য করছিল। এগিয়ে দিচ্ছিল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। এরপর কয়েকটা ইনজেকসন দিল সরিৎ রোগিণীর বাহুমূলে। কেতকী লক্ষ্য করছিল সরিতের নিরুত্তাপ দক্ষতা। কোনদিকে তার দৃষ্টি ছিল না। সে যেন কঠিন তপস্যারত এক যোগী। সরিতের কাজের সময় তাকে ডাকলে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করলেও তার মনযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সারারাত যুদ্ধ করে রোগিণীকে বাঁচিয়েছিল সরিৎ। কাজের শেষে সরিতের মুখের চেহারাটার কথা এখনও মনে আছে কেতকীর। ক্লান্তি আর জয়ের মিলিত সুস্পষ্ট ছাপটা সরিতকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল। ......এই সেই সরিৎ—এখন ড্রীমলান্ড নার্সিং হোমের পরিচালক আর পাঞ্জাবী মেয়ে দীনার স্বামী। না—আশ্চর্য সে হয়নি। সরিতের দীনাকে বিয়ে করা কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। সে নার্স আর দীনা ডাক্তার তার উপর সুন্দরী! শুধু সুন্দরী নয় সবদিক দিয়ে সে কাম্য, লোভনীয়—তা কেতকী জানে। না—এসব বাজে চিন্তা না করাই ভাল। অবান্তর কথাগুলো ভেবে শুধু নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার মত দুর্বুদ্ধি যেন তার না হয়। তার চেয়ে কাজ নিয়ে থাকাই ভাল। প্রাণপণে সে কাজ করে যাবে। (ক্রমশঃ)

কি এবং কেন ঃ

ইলেকট্রনিকস (২)

ইলেকট্রনকে পরমাণু থেকে বিচ্যুত করে বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষায় ও কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। কাচের নলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে ঋণ ফলক থেকে আমরা এইরকম ইলেকট্রন রশ্মি বা ক্যাথোড রশ্মি পেয়ে থাকি। এই ইলেকট্রন রশ্মি প্লাটিনামের মতো ধাতব ফলকে আহত হলে সেই ধাতু পরমাণুর ইলেকট্রন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বিদ্যুৎ পাতের সময় আয়নিত বায়ু পরমাণুতে ইলেকট্রন যুক্ত হলে আমরা যেমন বিদ্যুতালোকরূপ তেজ দেখতে পাই, তেমনি প্লাটিনামের ইলেকট্রন ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে আমরা রঞ্জনরশ্মি বা একস-রে পেয়ে থাকি। এই রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘের চেয়ে ছোট বলে এই রশ্মি অদৃশ্য।

কোন ধাতব তারের তাপমাত্রা বর্ধিত হলে তার দেহ থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়—এই ব্যাপারকে তাই ইলেকট্রনের ব্যাপারে বিচ্ছুরণ আখ্যা দেওয়া হয়। উচ্চ গলনাঙ্ক সমন্বিত টাংস্টেন ধাতুর সরু তার উচ্চ তাপমাত্রার বহু সংখ্যক ইলেকট্রনের মুক্তি দেয়। কোনো বায়ুশূন্য কাচপাত্রে টাংস্টেন তারকে ঋণফলকরূপে রেখে ধন ফলকটিকে বিভিন্ন বিদ্যুৎবিভবে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পৃথক বিদ্যুৎবর্তনীর দ্বারা এই তারকে উত্তপ্ত করলে ইলেকট্রন রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এই ব্যবস্থায় দুটি ইলেকট্রোড ঋণ ও ধন ফলকরূপে ব্যবহৃত হয় বলে একে 'ডায়োড' নামে অভিহিত করা হয়। ডায়োডের তার এবং ধনফলকের মধ্যবর্তীস্থানে বহু ইলেকট্রন 'স্পেস চার্জ' রূপে ছড়িয়ে থাকে এবং তারের পাশাপাশি জায়গায় এদের ভীড় খুব বেশি। তাই তার থেকে নির্গত ইলেকট্রোন স্রোতকে এরাই এবার স্বাভাবিক বিকর্ষণ ধর্ম বলে তারের দিকে ফিরিয়ে দেয়।

ডায়োডের ইলেকট্রোন স্রোত একমুখী বলে ডায়োড পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহকে সরল প্রবাহে পরিণত করতে সক্ষম হয়। ডায়োডে তার ফলকের মধ্যে 'গ্রিড' নামে একটি ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বার নিয়োজিত করে বিজ্ঞানী ডি ফরেস্ট 'ট্রায়োড' ভালব্ আবিষ্কার করেন। ট্রায়োডের গ্রিডটি তারের জালিকা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। তার থেকে ধন ফলকের দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবার সময় গ্রিডের বিদ্যুৎ বিভবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। গ্রিডটিকে পৃথক বিদ্যুৎকোষ দিয়ে ধনবিভবে রাখলে স্পেস চার্জ কমে যায় এবং ধনফলকমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহ বেড়ে যায়। ট্রায়োডকে তিনটি কাজে ব্যবহার করা হয়। ডায়োডের মতো ট্রায়োডেও পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহকে একমুখী করে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রিডের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহকে সম্প্রসারিত করে। তা ছাড়া ট্রায়োড ভালবকে 'অসিলেটর' বা আন্দোলকরূপে ব্যবহার করে পরিবর্তী বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়।

এইরকম বিভিন্নভাবে চার, পাঁচ বা ততোধিক ইলেকট্রোড দিয়ে টেট্রোড, পেন্টোড বা মাল্টি ইলেকট্রোড ভালব প্রস্তুত করা যায়। বায়ুশূন্য ও বিভিন্ন গ্যাসপূর্ণ বহু প্রকারের এইসব ভালবের দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে স্পন্দনশীল তরঙ্গের সৃষ্টি, পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহের সরলীকরণ, তরঙ্গের সম্প্রসারণ সম্ভব হয় বলে এইসব ভালব বেতারযন্ত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়।

ইলেকট্রনের তাপীয় বিচ্ছুরণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ বিরাট রূপান্তর ঘটিয়েছে। তাই ইলেকট্রনিকস বিজ্ঞানে তাপীয় বিচ্ছুরণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য উপায়েও ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ হয়। এইসব উপায়ের মধ্যে আলোকবিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ প্রধান। এছাড়া আরও দুটি উপায় আছে, যথা (১) মাধ্যমিক বিচ্ছুরণ, এবং (২) তড়িৎ-ক্ষেত্র বিচ্ছুরণ।

দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুপৃষ্ঠে আহত হয়ে নতুন ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ ঘটায়। একে মাধ্যমিক বিচ্ছুরণ বলা হয়। প্রথম ইলেকট্রনিকে প্রাথমিক এবং দ্বিতীয়টিকে মাধ্যমিক আখ্যা দেওয়া হয়। এইরকম বিচ্ছুরণ সমন্বিত ইলেকট্রনিক টিউব কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে আমরা দেখি, ইলেকট্রনগুলো ধাতুপৃষ্ঠে যে শক্তির দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তাপ বা বেগবান ইলেকট্রন দ্বারা সেই শক্তির অপহৃব ঘটিয়ে বস্তুর ইলেকট্রনকে বাইরে আনা যায়। তেমনি অতি শক্তিশালী বিদ্যুৎক্ষেত্র প্রয়োগ করে অল্প তাপমাত্রায়ও ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ হয়। তাকে তড়িৎক্ষেত্র বিচ্ছুরণ বলা হয়। কোল্ড ক্যাথোড টিউব এই উপায়ে প্রস্তুত করা হয়।

আলোক বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণের মূল কথা হচ্ছে, তাপ বা বিদ্যুতের মতো আলোকের তেজকণা বা 'ফোটন' যখন বিশেষ কোনো ধাতুপৃষ্ঠে আহত হয় তখন সেই পৃষ্ঠে থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়। সিরিয়াম, সেলেনিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি বিশিষ্ট ধাতু থেকে এইরকম বিচ্ছুরণ হয়। এই প্রক্রিয়াকে ফটো ইলেকট্রিক এমিশন বা আলোক বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ বলা হয়। টেলিভিশন বা দূরেক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে এই প্রক্রিয়া থেকে।

ইলেকট্রনিকস-এর পরিধি বহু বিস্তৃত। এখানে ব্যাপকভাবে সবকিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়। বেতার যন্ত্র, রেডার, টেলিভিশন, ট্রানজিস্টর, কম্পুটার, সেমিকন্ডাকটর, বেতার দূরবীক্ষণ ইত্যাদি অসংখ্য যন্ত্র প্রস্তুতিতে ইলেকট্রনিকস-এর অবদান বিস্ময়কর। আজকের রোমাঞ্চকর মহাকাশ অভিযানেও ইলেকট্রনিকস-এর অবদান অপরিসীম।

চন্দ্র অভিমুখে মহাকাশযান রুশ লুনা—১৫

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ অবতরণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত মার্কিণ মহাকাশযান অ্যাপেলো—১১র যাত্রার ঠিক তিনদিন আগে অর্থাৎ ১৩ই জুলাই সোভিয়েৎ রাশিয়া চন্দ্র অভিমুখে একটি মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান লুনা—১৫ প্রেরণ করেছে। বলা হয়েছে, চন্দ্র সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের জন্যে লুনা—১৫কে উৎক্ষেপ করা হয়েছে। কোনো কোনো মহল মনে করছেন, লুনা—১৫ চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণ করবে এবং সেখানকার কিছু মাটি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। তা যদি সত্যিই হয়, তাহলে চন্দ্রপৃষ্ঠের মাটি সংগ্রহের কৃতিত্ব হবে সোভিয়েৎ রাশিয়ার। এবং সেটি রুশ বিজ্ঞানী ও কারুবিদদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের পরিচায়ক হবে নিঃসন্দেহে।

চন্দ্র-প্রত্যাগত মহাকাশচারীদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা

বিজ্ঞানীদের স্থির বিশ্বাস চন্দ্রলোকে কোনোরকম জীবনের অস্তিত্ব নেই। তবু তাঁরা যথাসম্ভব স্থির নিশ্চিত হতে চান, চন্দ্রপ্রত্যাগত অভিযাত্রীদের আশ্রয় করে কোনোরকম মারাত্মক সংক্রাতিসংক্রা জীবাণু পৃথিবীতে এসে ছড়িয়ে না পড়ে। এজন্যে অ্যাপোলো একাদশের দুজন মহাকাশচারী চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পর পৃথিবীতে ফিরে এলে তাঁদের জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে এবং তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হবে। সমুদ্রে অবতরণের পর প্রায় তিন সপ্তাহ তাঁদের একান্তে থাকতে হবে—পরিবারপরিজন, বন্ধুবান্ধব তাঁদের স্পর্শ করতে পারবেন না এবং তাঁদের অপর কাউকে স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না। এই সময় তাঁদের নানাভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহাকাশচারীরা জীবাণু-নিরোধক যে ধরনের পোশাক পরবেন।

হাওয়াই দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবতরণের পরই একদল উদ্ধারকারী মহাকাশচারীদের এক বিশেষ ধরণের পোশাক (যা কোনো জীবাণুকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে) পরতে সাহায্য করবেন। এই পোশাক তাঁদের আপাদমস্তক ঢেকে রাখবে এবং জীবাণুর নিষ্ক্রমণ রোধ করবে। এমন কি পোশাকে সংযুক্ত একটি ফিল্টার মহাকাশচারীদের ত্যাগ করা নিঃশ্বাস পরিশ্রুত করে দেবে।

মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে ভেলায় আরোহণ করামাত্র যানটির গবাক্ষ বন্ধ করে সেটিকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে জল থেকে তুলে নিকটবর্তী উদ্ধারকারী জাহাজে নিয়ে যাওয়া হবে।

মহাকাশযানটির বহির্ভাগে দূষিত কিছু থাকতে পারে না, কারণ সেটি চন্দ্রপৃষ্ঠে নামে নি। চন্দ্রযানটি (লুনার মডিউল) শুধু চন্দ্রে নেমেছিল এবং সেটি পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। তা ছাড়া, যানটি যখন পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশ করবে তখন বহির্ভাগে ঘর্ষণজনিত যে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হবে তাতে জীবন্ত কোনো কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না।

জাহাজে উপনীত হয়েই মহাকাশচারীরা বিশেষভাবে নির্মিত একটি ঢাকাওয়ালা যানে প্রবেশ করবেন। এটি হলো স্থানান্তরের যোগ্য বিচ্ছিন্নকরণ ব্যবস্থা এবং এর চতুর্দিক সযত্নে আটকানো। পোশাকের মতো এই যন্ত্রটি থেকেও কোনো জীবাণু বেরিয়ে যেতে পারবে না এবং যে বাতাস এ থেকে নির্গত হবে তাও পরিশুদ্ধ হয়েই বেরোবে।

কারেকদিনের জন্যে এই যানটিই হবে মহাকাশচারীদের ঘরবাড়ি। তবে যানে শুধু তিনজন মহাকাশচারীই থাকবেন না, একজন চিকিৎসক থাকবেন তাঁদের পরীক্ষা করার জন্যে আর একজন যন্ত্রবিদ থাকবেন যানের যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্যে।

উদ্ধারকারী জাহাজ বন্দরে পৌঁছনোর পর যানটিকে একটি ট্রাকে আটকে নিয়ে যাওয়া হবে বিমান বন্দরে এবং সেখান থেকে মালবাহী বিমানে করে টেকসাসের হিউস্টন মহাকাশ অভিযান কেন্দ্রে।

সেখানে একটি ট্রাকে চাপিয়ে যানটিকে নিয়ে যাওয়া হবে বিশেষভাবে নির্মিত একটি ভবনে। এই ভবনটি হচ্ছে চন্দ্র-প্রত্যাগত ব্যক্তি বা বস্তু অভ্যর্থনা কেন্দ্র। মহাকাশচারীরা প্লাস্টিক নির্মিত একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে এখানে প্রবেশ করবেন।

মহাকাশচারীরা প্রবেশ করামাত্রই ধাতুনির্মিত দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁরা ও তাঁদের সঙ্গীরা বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবেন। মহাকাশচারীদের নিঃশ্বাসের বাতাস পরিশ্রুত করার পরই বাইরে ছাড়া হবে এবং তাঁদের মলমূত্রও স্থানান্তরের পূর্বে পরিশ্রুত করে নেওয়া হবে। এই ভবনে কেউ ঢুকতে পারবেন না, বা কেউ বেরোতে পারবেন না।

তবে সেখানে মহাকাশচারী ও তাঁদের সঙ্গীদের জন্যে থাকবে অফিসঘর এবং চিকিৎসক, জীবাণু বিশেষজ্ঞ ও কারিগরী-বিশারদদের জন্যে গবেষণাগার। মহাকাশচারীদের জন্যে কাঁচে ঢাকা একটি দেখা-সাক্ষাতের ঘরও থাকবে সেখানে। কাঁচের আড়াল থেকে মহাকাশচারীরা পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে ও কথা বার্তা চালাতে পারবেন, তবে কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারবেন না।

চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগের সময় ২১ দিন পর্যন্ত মহাকাশচারীরা এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবেন এবং তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষাপর্ব শেষ হবার পর তাঁদের অবাধে চলাফেরা মেলামেশার এবং পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ দেওয়া হবে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষগড়ার ইতিকথা

গার্ডেনরীচ মুদিয়ালী হাইস্কুল

এধারে চব্বিশ পরগণা ওধারে হাওড়া। মাঝে গঙ্গা। পুব পাড়ে হাওড়া। মাঝে গঙ্গা। .. পুব পারে কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমে যেখানে নদী বাঁক নিয়েছে তারই মুখে গার্ডেনরীচ। এপারে দাঁড়ালে চোখে পড়ে ওপারের বোটানিক্যাল গার্ডেন। গার্ডেনের মুখোমুখি, মাঝে শুধু এক-নদী ব্যবধান। এত কাছে বলেই জায়গার নাম গার্ডেনরীচ।

কলকাতার লাগোয়া হয়েও গার্ডেনরীচ ভিন্ন-স্বাদ। কর্পোরেশন এলাকার বাইরে পাঁচ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে ছড়ানো গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটি। ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী লোকসংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজার—গত ন' বছরে এই সংখ্যা কম করেও হাজার কয়েক বেড়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। কলকাতাকে বাদ দিলে বর্গমাইলপিছু জনসংখ্যায় গার্ডেনরীচের জুড়ি গোটা পশ্চিমবঙ্গে মেলা ভার। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলা চব্বিশ পরগণায় এত ঘন-বসতি শহর আর দ্বিতীয় নেই।
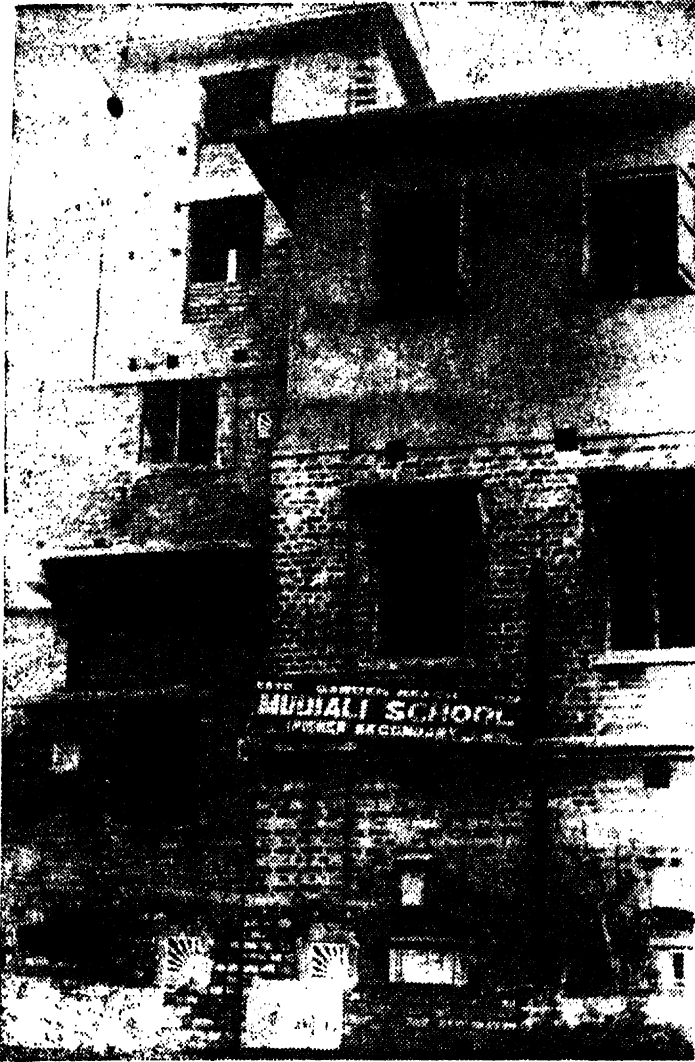
এসব আজকের কথা। গার্ডেনরীচের অতীত কাহিনী কিন্তু অন্য কথা বলে। তখন কোথায় এত লোকজন, ফার্ম-ফ্যাক্টরী, সুতো-কল, পাট-কল? সামান্য কয়েক ঘর রইস ইংরেজের সাজানো-গোছানো বাংলোবাড়ি গঙ্গার ধারে গড়ে উঠেছে। তাও হত না যদি পলাশীর যুদ্ধের এক বছর আগে এক ছোকরা ইংরেজ রাইটার—তখন সদ্য-কেরানী—কলম ছেড়ে দাক্ষিণী যুদ্ধে তরোয়াল ধরে একটু নাম করেছে—সুবে বাংলার নবাবী ফৌজকে হটিয়ে দিয়ে কলকাতা পুনরুদ্ধার না-করত। ধুরন্ধর ইংরেজ রাইটারটি আমাদের ইতিহাস বইয়ের পাতায় লর্ড রবার্ট ক্লাইভ নামে পরিচিত। হারানো কলকাতা পুনর্দখলের সময় ক্লাইভ কোম্পানীর কলকাতার বাইরে গঙ্গার ধারে একটা পুরোনো দুর্গ দখল করেছিলেন। ঐ পুরোনো ক্ষুদে মাটির বুরুজ বা কেল্লার নামেই জায়গাটি ছিল সবার পরিচিত—মাটিয়া বুরুজ বা মেটেবুরুজ।

আঠারো শতকের শেষাশেষি ঐ মাটির বুরুজের আশপাশে পেল্লায় সব বাড়ি বানিয়ে কলকাতার নামী-দামী ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বসতি গড়ে তুললেন। পুরোনো কলকাতার নিউ আলিপুর হয়ে উঠল গার্ডেনরীচ। তখন অবিশ্যি ঐ নাম ছিল না। উল্টোদিকে গঙ্গার পারে তখনো বোটানিক্যাল গার্ডেনের পত্তন হয় নি। তবে নামকরণের জন্য অপেক্ষা করতে হয় নি বেশীদিন। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক তিরিশ বছর পরেই আরেক রবার্ট এই বাগান গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরও পদবীর শুরুতে রয়েছে ইংরেজী একাদশতম বর্ণটি—রবার্ট কীড।

রবার্ট ক্লাইভ থেকে রবার্ট কীড, তিরিশ বছরে গার্ডেনরীচের চেহারা গেল পাল্টে। সুতানটি, গোবিন্দপুর, কলকাতার মতই মুদিয়ালী, রাজাবাগান, বটতলা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। এই গড়ে-ওঠার পেছনে গার্ডেনরীচের বিচালীঘাটের দানটুকু স্বীকার করতেই হবে। নাম থেকেই মালুম হবে যে এই ঘাট দিয়ে ব্যবসায়ীরা নৌকা বোঝাই খড় আমদানি-রপ্তানি করতেন। তাই দিশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় গার্ডেনরীচের। ঐ গ্রাম তিনটি ও বিচালীঘাট নিয়েই দুশো বছর আগে বর্তমান গার্ডেনরীচের পত্তন শুরু হয়।

মুদিয়ালীর পুরোনো বাসিন্দাদের তালিকা ঘাটলে আজও যে কটি পদবী মেলে তাঁরা হলেন ঘোষ, পাল ও ব্যানার্জি। এই তিনটি ফ্যামিলী শুধু প্রাচীন কৌলিন্যের দাবীদার নন, আধুনিক গার্ডেনরীচের গড়ে ওঠার পেছনে এঁদের অবদান অসামান্য। সেই অসামান্য অবদানের সূত্রপাত কিন্তু খুব সামান্যভাবেই হয়েছিল।

তখনো অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ তাঁর নবাবী হারিয়ে গার্ডেনরীচে এসে আশ্রয় নেন নি। সিপাহী বিদ্রোহের আগুনে আভায় ভারতের পশ্চিম দিগন্তে

তখনো দেখা যায় নি। ভারতের গভর্নর-জেনারেল তখন লর্ড ডালহৌসী। সে সময় ভারত-ইতিহাসের সুপরিচিত বিদেশী শাসক ওয়ারেন হেস্টিংসের জমিদারী কিছুটা ছিল গার্ডেনরীচে। ঐ জমিদারীর দেখাশোনা করতেন পল গ্রেগরী মিলিটাস—এ দুজন ইংরেজ সিভিলিয়ান।

মিলিটাস সাহেবের জমিদারী সেরেস্তার সেরেস্তাদার ছিলেন মুদিয়ালীর পাল ফ্যামিলির কর্তা — তারিণীচরণ পাল। তারিণী পালের সোয়া শ বছরেরও বেশী পুরোনো বসত ভিটে আজও আছে মুদিয়ালী ফার্স্ট লেনে। ঐ রাস্তায় পালেদের বাড়ির উল্টোদিকে ছিল ঘোষেদের বাড়ি (আজও আছে)। ঘোষেরা তখন দু ভাই—গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ও শিবচন্দ্র ঘোষ। গোবিন্দ ঘোষ পড়াশোনা করতে পারেন নি। বড় সাধ ছিল লেখাপড়ার। নিজের অপূর্ণ সাধ মিটিয়েছিলেন ছোট ভাই শিবচন্দ্রকে পড়াশোনা করিয়ে। তবু তাঁর অতৃপ্তি বুঝি মেটে না। নিজের গাঁয়ের যেদিকেই তাকান সেদিকেই শুধু দারিদ্র্য ও দুঃখ। সে সময় গোটা মুদিয়ালী গ্রামে ছিল মোটে আটটি পাকা বাড়ি। মনে মনে ঠিক করলেন গোবিন্দ ঘোষ যেমন করেই হোক এই দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করে প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দেবেন। এই প্রতিজ্ঞা থেকেই উৎপত্তি ছোট্ট একটি পাঠশালার—গার্ডেনরীচের প্রথম স্কুল।

নিজের বাড়িতে একটা একচালা তুলে দিলেন গোবিন্দ। জনা-তিরিশেক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হল পাঠশালা। মাইনে লাগত না। পাঠশালার সমস্ত খরচ-খরচা ঘোষ-মশায়ের। গোবিন্দ ঘোষের পাঠশালা খোলার আয়োজন সেদিন যাঁদের সাহায্য ও সহ-যোগিতায় সম্পূর্ণ হয়েছিল তাঁরা হলেন তারিণীচরণ পাল, নবীনচন্দ্র পাল ও শিবচন্দ্র ঘোষ। দুজন মাস্টারমশাই পড়াতেন এই পাঠশালায়।

দেখতে দেখতে পাঠশালায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে চলল। বছর কয়েকেই এই সংখ্যা পঞ্চাশের কোঠা ছুঁয়ে ফেলেছে। এত ছাত্র-ছাত্রীর জায়গা হয় না ঘোষমশায়ের বাস্তুভিটার একচালায়। তখন প্রতিষ্ঠাতারা পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে পাঠশালার জন্য বড় একটা চালা দরকার। কিন্তু জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? মুশকিল আসানের চিরাগ নিয়ে এগিয়ে এলেন স্থানীয় এক অবাঙালী গোলদারী ব্যবসায়ী—লালা শম্ভুলাল। বর্তমান পাহাড়পুর রোড ও মুদিয়ালী রোডের মোড়ে সাড়ে পাঁচ কাঠা জায়গা সেদিন দান করেছিলেন এই গোল-দারী ব্যবসায়ী।

এই জায়গায় স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে একটা গোলপাতার চালাঘর উঠল। পাঠশালার নতুন চালায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলল। ফলে শিক্ষক হল তিনজন। স্কুলের তখন নিজস্ব আয় বলতে কিছুই নেই। কারণ সম্পূর্ণ অবৈতনিক। মাস্টারমশাইদের খাওয়া, পরা ও থাকার সব ব্যয় বহন করতেন স্থানীয় বাড়ুয্যেরা—যদুনাথ, কৈলাশ ও কাশীনাথ।

শুধু মাস্টারমশাইদের ব্যবস্থা করলেই তো চলবে না, স্কুলের নিজস্ব কিছু খরচ তো আছে। কোথা থেকে এই খরচ মেটানোর টাকা আসবে? ঘোষ, পাল ও বাড়ুয্যেরা নিজেদের ক্ষমতার বাইরে গিয়েও স্কুলকে সাহায্য করছেন, তবু আরো দরকার। তাই তারিণী পাল গিয়ে ধরে পড়লেন মিলিটাস সাহেবকে—স্কুলের জন্য কিছু সাহায্য দাও। তারিণী পালকে অত্যন্ত ভালবাসতেন সাহেব। বিশ্বস্ত কর্মচারীর এক কথায় তিনি রাজী হয়ে গেলেন। সেই রাজী হওয়ার কথা পালমশাই তাঁর ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন। সেই পুরোনো ডায়েরী আজও আছে পালমশায়ের নাতি, এই স্কুলেরই প্রাক্তন সেক্রেটারী সূর্যকান্ত পালের কাছে। সপ্তাহ তিনেক আগে যখন মুদিয়ালী হাইস্কুলের ইতিহাস জানতে গার্ডেনরীচ গিয়েছিলাম, সেদিন সত্তর বছরের বৃদ্ধ সূর্যকান্ত ঠাকুর্দার ডায়েরীর পাতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করে আমায় শোনান: জন্য পাল সাহেব গোলদারী দান তিন টাকা লিখিয়া দেন, ৯ই মার্চ ১৮৫৬।

স্কুলের লিখিত ইতিহাসের প্রথম কটি লাইন শুরু হয়েছে তারিণী পালের ডায়েরীর ঐ পাতাটি থেকে। বাকী ইতিহাস কিছুটা শোনা, কিছুটা অনুমান। তাই ১৮৫৬ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সব প্রমাণ হাতের কাছে মজুদ থাকা সত্ত্বেও স্কুল কিন্তু ঐ তারিখটিকেই প্রতিষ্ঠাদিবস বলে পালন করে আসছে।

এই ১৮৫৬ সাল গার্ডেনরীচের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় বছর। এই বছরেই অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ নবাবী হারিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে গার্ডেনরীচে বসবাস শুরু করেন। নবাবের সঙ্গে যাঁরা সেদিন এসেছিলেন তাঁরাও আশ্রয় পেলেন গার্ডেনরীচে। সেই থেকেই উল্টোরথের পালা শুরু হল। বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ২৪ পরগণা জেলা অংশে গার্ডেনরীচের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে গেজেটিয়ারের সম্পাদক এল এস এস ও'ম্যালী বলছেন: অযোধ্যার নবাব তাঁর দলবল নিয়ে মেটিয়াবুরুজে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সময় থেকেই গার্ডেনরীচের জনপ্রিয়তার স্রোতে ভাটা দেখা দিল। হাজারটা অসুবিধা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ইউরোপীয় ধনী ব্যবসায়ীরা ক্রমশ গার্ডেনরীচ ছেড়ে আলিপুর ও বালিগঞ্জে চলে যেতে লাগলেন। তাঁদের ফেলে-আসা বাড়িগুলোতে নানা ধরনের কলকারখানার অফিস বসল। পাটকল, সুতা-কল গড়ে উঠতে লাগল গার্ডেনরীচে। কল-কারখানার প্রয়োজনে দলে দলে শ্রমিক আসতে লাগল বাইরে থেকে। ধীরে ধীরে গার্ডেনরীচের পুরোনো শান্ত, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন চেহারাটাই গেল পাল্টে। তার বদলে কল-কারখানা, সরু সরু গলি, আবর্জনাভরা বস্তিতে ছেয়ে গেল গার্ডেন-রীচ।

পরিবর্তনের এই বিপরীতমুখী স্রোতের টানে কিন্তু ঘোষ, পাল, বাড়ুয্যেদের স্বপ্ন হারিয়ে যায় নি। শক্ত হাতে সেদিন তাঁরা হাল ধরেছিলেন বলেই ছোট্ট একটি পাঠশালা থেকে বর্তমানের মুদিয়ালী হাইস্কুল গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান থাক, অতীতেই ফিরে যাই।

অতীত তখন অগ্নিগর্ভ, অফুরন্ত সম্ভাবনাময়। সিপাহী বিদ্রোহের কাল-বৈশাখী শান্ত হয়ে এলে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সাধনা শুরু হল। প্রতিষ্ঠিত হল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। এর দু' বছরের মধ্যেই পাঠশালার চেহারা গেল পাল্টে। মিডল ভার্নাকুলার স্কুল বলে মুদিয়ালী পাঠশালা সরকারী স্বীকৃতি পেল। ক্লাস সিকস পর্যন্ত পড়ানো শুরু হল। পঠনপাঠনের মাধ্যম বাংলা। ক্লাস বাড়তে ছাত্র বাড়ল, প্রয়োজনে শিক্ষক-সংখ্যাও হল ঊর্ধ্বমুখী। তিনজনের জায়গায় চারজন শিক্ষক পড়াতে লাগলেন। এতদিন বিনা মাইনের শুধু খাওয়া, পরার বিনিময়ে মাস্টারমশাইরা পড়িয়ে এসে-ছেন। এবার থেকে সামান্য হাত-খরচা (মাইনে নয়) তাঁদের জন্য বরাদ্দ হল। ফলে বাধ্য হয়েই পড়ুয়াদের জন্য সামান্য টিউশন ফি ধার্য হল। অবৈতনিক স্কুলের প্রথম মাইনে হল মাথাপিছু চার আনা। প্রসঙ্গত বলা দরকার এ সময় হেয়ার স্কুলের মাইনে ছিল মাসিক পাঁচ টাকা।

এইভাবেই চলল পনেরো বছর। ততদিনে স্কুলের হাল ধরেছেন তারিণীচরণ পাল। শুধু কি স্কুলের? গোটা গার্ডেন-রীচের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষারও প্রতিনিধি ছিলেন তারিণী পাল। যেবার পাঠশালা মিডল ভার্নাকুলার স্কুল হল তার বছর চারেক পরেই বেহালা, টালিগঞ্জ, গার্ডেনরীচ নিয়ে তৈরী হল সাউথ সাবারবন মিউনিসিপ্যালিটি। পালমশাই মিউনিসি-প্যালিটিতে দীর্ঘদিন গার্ডেনরীচের প্রতি-নিধিত্ব করেছেন। জমিদারী সেরেস্তার কাজ, নিজের বৈষয়িক ব্যাপার, মিউনিসি-প্যালিটির হাজার ঝামেলার মধ্যেও পাল-মশায়ের কড়া নজর ছিল স্কুলের উপর। নজর না রেখেও উপায় নেই। মাইনে দিয়ে, সে যত কমই হোক, স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠাতে কজন অভিভাবক সেদিন উৎসাহী ছিলেন? সামান্য অছিলাতেই কামাই করা শুরু হত। তারপর আস্তে আস্তে আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তারিণী পাল নাছোড়বান্দা। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে ছেলেমেয়েদের খোঁজ নিতেন। গার্জেন মাইনে দিতে না পারলে পালমশায়ের পকেট থেকেই পয়সা জমা পড়ত স্কুল অ্যাকাউন্টে। অবশ্য ব্যাপারটা ছাত্রের গার্জেন ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব হত না। বছর পনেরোর চেষ্টায় তারিণী পাল স্কুলের চেহারাটা অনেকটা বদলে দিলেন।

বদলানো মানে এম ভি স্কুল হল এম ই স্কুল। মিডল ইংলিশ অর্থাৎ ক্লাস সিকস পর্যন্ত ইংরেজী পঠন-পাঠনের সরকারী নির্দেশ মিলল ১৮৮০ সালে। ইংরেজী চালু হতে স্থানীয় বাসিন্দাদের টনক নড়ল। মাইনে দিয়েও ছেলেমেয়েদের তারা স্কুলে পাঠাতে লাগলেন। কারণ ততদিনে গার্ডেন-রীচ হয়ে উঠেছে কল-কারখানার শহর। পাটকল, সুতোকলে কলম পিষতে হলে ইংরেজী জানা দরকার। প্রয়োজনের তাগিদে গোটা গার্ডেনরীচ এবার যেন চোখ মেলে তাকাল মুদিয়ালী স্কুলটির দিকে। গোটা তল্লাটে কোথাও তখন আর কোন স্কুল নেই যেখানে ছেলেমেয়েরা দু পাতা ইংরেজী শিখতে পারে। দলে দলে ছাত্র আসতে লাগল।

স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে গোটা কয়েক সমস্যা দেখা দিল। এতদিন ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে এই স্কুলে পড়েছে। সংখ্যা বাড়তে গোলপাতার চালায় আর জায়গায় কুলোয় না। জায়গা সমস্যার সমাধান কিছুটা হল বিদেশী মিশনারীদের সাহায্যে। শুধু-মাত্র ছাত্রীদের জন্য চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড মিশন একটা স্কুল খুললেন মুদিয়ালীতে। ছাত্রী নেওয়া বন্ধ হল মুদিয়ালী এম ই স্কুলে।

মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল হলেও জায়গার সমস্যা পুরোপুরি মিটল না। প্রায় চল্লিশ বছর আগে বানানো গোলপাতার চালাঘরে সত্তর-পঁচাত্তরটি ছেলের কোন-মতেই জায়গা হওয়া সম্ভব নয়। তখন স্কুলের সেক্রেটারী তারিণী পালের মেজো

ছেলে শ্যামাচরণ পাল। নিরুপায় হয়েই শ্যামাচরণ শরণ নিলেন ক্লাইভ জুট মিলের ম্যানেজার গর্ডন সাহেবের। জাতে স্কচ গর্ডন শ্যামাচরণের অনুরোধ রাখলেন, গোলপাতার চালার পিছনে একটা টিন সেড তুলে দিলেন।

ঐ গোলপাতার ঘর আর টিন শেডে আধুনিক গার্ডেনরীচের অনাধুনিক কালের ইতিহাস নীরবে রচিত হয়েছে। পাঁচ যুগ ধরে হাজার হাজার ছাত্র জীবনগড়ার প্রথম পাঠ পেয়েছে ঐ গোলপাতার ঘর আর টিন-শেডে। এই পাঠ দিতেই এসেছিলেন অবিনাশবাবু। অবিনাশচন্দ্র সুরাই। প্রায় চল্লিশ বছর পড়িয়েছেন এই স্কুলে অবিনাশবাবু। ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন। নেসফিল্ডের গ্রামার আর ছাত্রদের নাম তাঁর সমান মুখস্থ ছিল। পড়া না পারলে বার বার বুঝিয়ে দিয়েও কখনো ক্লান্ত হন নি। ক্লান্তি তাঁর ছিল না পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ছাত্রদের খোঁজ নেওয়ায়। কেন কেউ স্কুলে এল না সব খোঁজ নিতেন অবিনাশবাবু। সূর্যবাবু মানে সূর্যকান্ত পাল এঁর কাছে পড়েছেন বর্তমান শতাব্দীর একেবারে গোড়ার বছরগুলোতে। প্রায় ষাট বছরের পুরোনো স্মৃতি যেন আজও তাঁর সারাটা হৃদয় জুড়ে রয়েছে। স্কুলের অতীত ইতিহাসের মলিন বিবর্ণ স্মৃতিময় পাতাগুলো একটির পর একটি উল্টে যেতে যেতে থেমে গেলেন মাস্টারমশায়ের অংশে এসে। বললেন : মাস্টারমশায়ের কথা হলেই আমার মনে পড়ে যায় গোল্ড স্মিথের ভিলেজ টিচারের কথা। ছাত্রদের উপর তাঁর ভালবাসার কোন তুলনা ছিল না। দেখুন একদিন এই স্কুলে আমি পড়েছি, পড়িয়েছিও বহুদিন, প্রায় এক যুগ এই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলাম। কিন্তু অবিনাশবাবুর মত শিক্ষক আর চোখে পড়ে নি।

অবিনাশবাবুর প্রায় সমসময়েই এসেছিলেন যদুনাথ মজুমদার। ভার্নাকুলার ট্রেন্ড যদুনাথবাবু বছর খানেক খিদিরপুর একাডেমীতে পড়িয়েছিলেন। তারপর চলে আসেন এই স্কুলে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রায় সাঁইত্রিশ বছর পড়িয়েছেন তিনি। এমনিতে সাদাসিধে অতি ভালমানুষ, কিন্তু স্কুলের ব্যাপারে ছিলেন কড়া ডিসিপ্লিনের ভক্ত। নিয়ম-কানুনের ব্যতিক্রম সইতে পারতেন না। যদুনাথবাবুর মেজাজের কথা ছাত্রদের জানা ছিল। জানা ছিল বলেই স্কুলের ডিসিপ্লিন ভাঙতে কোনদিনই কোন ছাত্রের সাহস হয় নি।

অবিনাশ, যদুনাথের মত আদর্শ নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষকদের সেবা ও সাহায্য না পেলে কোনদিনই এই স্কুল আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেখানে পৌঁছতে পারত না। এই স্কুলের রেজাল্ট শুরু থেকেই চমৎকার। বছর বছর এখানকার পড়ুয়ারা বৃত্তি পেয়েছে। তাই মিডল ভার্নাকুলার থেকে মিডল ইংলিশে রূপান্তরণের সময় সরকার স্কুলের জন্য অনুদান মঞ্জুর করলেন। আঠারো শ' আশী সাল থেকে দীর্ঘ সত্তর বছর এই স্কুল সরকারী সাহায্য পেয়েছে। সরকারী সাহায্য আজকের মত এত সুলভ সেদিন ছিল না। ভাল ফল দেখাতে না পারলে স্কুলের গ্রান্ট কাটা যেত। কিন্তু সত্তর বছর ধরে সাহায্যের যে স্রোত অব্যাহত ছিল তাই প্রমাণ করে এই স্কুলের সুনাম ও ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য ও সুনামের পেছনে অবিনাশবাবু ও যদুনাথবাবুর ছাত্রদের সাধনার কথা উল্লিখিত হওয়া দরকার। প্রায় সোয়া শ বছরের পুরোনো এই স্কুলের অতীতের দলিল যা পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, ১৯০৩ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে চব্বিশজন ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলেন।

উপরের লাইনটি থেকে দয়া করে কেউ যেন মনে না করেন যে, তেত্রিশ সাল পর্যন্ত বুঝি এই স্কুলের ছেলেরা বৃত্তি পেয়েছেন—তারপর বলার মত আর কিছু নেই। কেন তেত্রিশ সাল বেছে নিয়েছি তার কারণ যথাসময়ে বলব, তার আগে আরো কিছু অতীত দলিল ঘাঁটার প্রয়োজন আছে।

আগেই বলেছি সাউথ সাবারবন মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়েছিল বেহালা, টালিগঞ্জ ও গার্ডেনরীচ নিয়ে। এই মিউনিসিপ্যালিটিতে তারিণীবাবুই ছিলেন দীর্ঘদিন গার্ডেনরীচের একমাত্র প্রতিনিধি। গার্ডেনরীচ কিন্তু বেশীদিন তিন শরিকের মিউনিসিপ্যালিটিতে থাকে নি। আঠাশ বছর একসঙ্গে থাকার পর ১৮৯৭ সালে আলাদা হয়ে যায়। স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি হল শুধু গার্ডেনরীচ নিয়ে। এর ছ বছর পরেই মারা যান তারিণী পাল। মৃত্যুর আগেই তিনি দেখে যেতে পেরেছেন তাঁর স্কুল ও পল্লীর সাবালক চেহারা।

এই সাবালকত্বের পূর্ণ পরিচয় মেলে ও'ম্যালী সাহেবের ২৪-পরগণা জেলার গেজেটিয়ারে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক মুখে মুখে গার্ডেনরীচের লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার—হিন্দু মুসলমান প্রায় আধাআধি। এবং এককালের ধনী ইউরোপীয় বণিকদের ফ্যাশানেবল পাড়া গার্ডেনরীচ ততদিনে হয়ে উঠেছে একটা কল-কারখানার শহর। এই প্রসঙ্গে আরো দু-একটি তথ্য জানা দরকার। এই সময় গোটা চব্বিশ পরগণায় মোট সাঁইত্রিশটি হাইস্কুলে সাড়ে সাত হাজার ছাত্র পড়ত; বাষট্টিটি মিডল ইংলিশ স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার। তখন প্রায় দুশো ছাত্র পড়ত মুদিয়ালী এম ই স্কুলে। গোলপাতার ঘর ও টিনশেডেই সেদিন গার্ডেনরীচের ছেলেরা পড়াশুনা করেছেন।

স্কুল তখন প্রতিদিনই বাড়ছে। জায়গার অভাবে বহু ছাত্রকে ইচ্ছে থাকলেও কর্তৃপক্ষ ভর্তি করতে পারতেন না। গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটির প্রায় সব পাড়া থেকেই ছেলেরা পড়তে আসত এই স্কুলে। কল-কারখানায় খেটে-খাওয়া অধিকাংশ নিম্নবিত্ত মানুষের প্রধান ভরসাস্থল তখন এই স্কুল। অল্প মাইনের ছেলেরা এখানে পড়াশুনার সুযোগ পেত এটাই বড় কথা নয়, গার্জেনরা নিশ্চিন্ত হতেন এই স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করতে পেরে। কারণ মুদিয়ালী স্কুল সেদিন ছিল গার্ডেনরীচের 'হিন্দু বা হেয়ার'। সগর্বে কথাগুলো বলে সূর্যবাবু সম্মতির আশায় সতীর্থ ননীবাবুর দিকে তাকালেন। ননীলাল দাস মুদিয়ালীতে আছেন প্রায় সত্তর বছর। নিজে এই স্কুলে পড়েছেন, ছেলেকেও পড়িয়েছেন। ছেলে আজ কৃতবিদ্য, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। ননীবাবুর ছেলে প্রশান্তকুমার দাস। ইচ্ছা করলেই ননীবাবু অনায়াসে আজ তাঁর নাতিকে কলকাতার বেশী মাইনের নামী স্কুলে পড়াতে পারেন। কিন্তু শিক্ষাদাত্রী মাকে বড় ভালবাসেন ননীবাবু। তিন জেনারেশন ধরে যে স্কুলের নুন খেয়েছেন তার গুণ গাইতে বৃদ্ধ মানুষটি মুখর হয়ে উঠলেন। সতীর্থের স্টেটমেন্টে পুরো সায় জানিয়ে বললেন : এই স্কুল আমাদের গর্ব, গার্ডেনরীচের গর্ব। আর এই স্কুল যাঁরা গড়েছেন ঐ তারিণীবাবু, তাঁর ছেলে শ্যামাচরণবাবু এঁরা না থাকলে, আজ যে গার্ডেনরীচে এত স্কুল-কলেজ দেখছেন, তার কিছুই হত না। ও'রা বীজ বুনে গিয়েছিলেন, এখন ফসল উঠছে। জেনারেশন আফটার জেনারেশন আমরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি ও'দের কাছে। দেবতার মত মানুষ ছিলেন তারিণীচরণ পাল।

এই একই কথা বলেছিলেন রসময় মিত্র আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে। হিন্দু স্কুলের স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক রায়বাহাদুর রসময় মিত্র উনিশ সালে এই স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করতে এসে গোলপাতায় ছাওয়া চালাঘর দেখিয়ে বলেছিলেন : এই চালাঘরই আমার দেবালয়।

আধুনিক বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক যে চালাঘরটি দেখিয়ে বলেছিলেন এই চালাঘরই আমার দেবালয়, সেই চালাঘর আজ আর নেই। দেবালয়ের বহিরঙ্গ আমূল পাল্টে গেছে। এই পরিবর্তনের মূলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবার আগে যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হলেন তিরিশের যুগে এই স্কুলেরই সেক্রেটারী অবিনাশচন্দ্র পাল। পদবী শুনে মনে হতে পারে ইনিও বুঝি তারিণীবাবুরই বংশধর। আদতে পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর কোন রক্ত-সম্বন্ধ নেই। কিন্তু চিন্তার জগতে একই পথের পথিক। জায়গার অভাবে স্কুলের উন্নতি থমকে আছে দেখে ঠিক করলেন, যেভাবেই হোক এই অভাব দূর করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলেন সাহায্য ভিক্ষা করে। সবার দানে অবিনাশবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে চালাঘরের জায়গায় তৈরী হল স্কুলের প্রথম পাকাবাড়ি—উপর-নীচ মিলিয়ে ছখানা ঘরের দোতলা বাড়ি। টিন-শেড রয়ে গেল। এসব ১৯৩৩ সালের কথা।

নতুন বাড়িতে জায়গা বেশী হল। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাও বেড়ে গেল। যে স্কুলে দুশোর বেশী ছাত্র পড়তে পারত না এখন সেখানে পড়তে লাগল প্রায় তিন শ জন।

নতুন বাড়িতে তিনশো ছাত্রের জীবন গড়ার দায়িত্ব নিয়ে এই স্কুলের হেডমাস্টার হলেন রাজেন্দ্রনাথ পাল। উনিশ শো চার

সালে এই স্কুল থেকেই বৃত্তি পেয়ে বৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। তিরিশ বছর পরে সেই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক হলেন। দীর্ঘ সতেরো বছর এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন রাজেনবাবু। এই সতেরো বছরে আরো কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। এম ই স্কুল থেকে একসটেনডেড এম ই স্কুল হয়েছে মুদিয়ালী স্কুল। দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক দু বছর পরেই ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি স্কুল পেল। চৌত্রিশ থেকে উনপঞ্চাশ সাল, এই পনেরো বছরে প্রায় বারোটি ছাত্র এই স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়েছেন।

এম ই স্কুল একসটেন্ডেড এম ই হয়েছে। ইতিমধ্যে বিচালীঘাটের কিনারা বেয়ে ঘোলাগঙ্গার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অনেকগুলি দিন, মাস, বছর। ১৮৯৭ সাল থেকে বর্তমান শতাব্দীর বিশের যুগের শুরু পর্যন্ত গার্ডেনরীচ ছিল স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি। কিন্তু কুড়ির শুরুতেই কলকাতা করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হল গার্ডেনরীচ। কিন্তু এক যুগও পার হল না, রব উঠল—কুইট করপোরেশন। কারণ করপোরেশনের সুযোগ-সুবিধা পেতে গেলে ট্যাক্সের বোঝাও বইতে হবে বেশী পরিমাণে। দরিদ্র দরজি, শ্রমিক অধ্যুষিত গার্ডেনরীচের সেদিন সে ক্ষমতা ছিল না। তাই ঠিক যে বছর মুদিয়ালী স্কুলের পাকাবাড়ি উঠল, তার পরের বছর গার্ডেনরীচ আবার আলাদা হয়ে গেল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কলকাতার প্রায় হাতার মধ্যে সম্পূর্ণ অবহেলায় অবজ্ঞাত হয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে টিম-টিম করে টি'কে রয়েছে গার্ডেনরীচ।

অনাদর অবহেলা যে গার্ডেনরীচবাসীদের ভাগ্যলিপি। না হলে আপগ্রেডিংয়ের সময় বাংলাদেশের প্রায় সব স্কুল সরকারী সাহায্য পেলেও মুদিয়ালী স্কুলের ভাগ্যে কানাকড়িও জোটে না। কনডিশনাল আপগ্রেডিংয়ের অজুহাতে সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হল এই স্কুল। থাক সে কথা। পরে বলা যাবে। তার আগে বলা যাক কবে এই স্কুল হাইস্কুল হিসাবে বোর্ডের রেকগনিশন পেল, সেই কথা।

উনপঞ্চাশে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়ানোর অনুমোদন পেয়েছিল স্কুল। ঠিক তার তিন বছর পরেই বোর্ডের অনুমোদন জুটল স্কুলের। ১৯৫২ সাল। তখন প্রায় চারশো ছাত্র পড়ে এই স্কুলে। বর্তমানের অন্যান্য স্কুলের তুলনায় সংখ্যা আদৌ বেশী নয়। কেন বেশী নয় তার কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে যা তা হল মুদিয়ালী স্কুলের একক অস্তিত্বের দুর্বিসহ দিনগুলির অবসান হয়েছে—আরো স্কুল গড়ে উঠেছে গার্ডেনরীচে। শিক্ষাবিস্তারের পবিত্র দায়িত্বভার বহনের যোগ্য উত্তরাধিকারী এগিয়ে এসেছে। মজার ব্যাপার গার্ডেনরীচের প্রায় সবকটি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল একই জায়গায় আজ ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা গার্ডেনরীচের পাঁচটি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের মধ্যে চারটির ঠিকানা মুদিয়ালী রোড ও পাহাড়পুর রোডের মোড়ে সীমাবদ্ধ। মাত্র দু'বিঘা জমির উপর এই চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত। স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে বলে মুদিয়ালী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা আশানুরূপ বাড়ে নি অনুমান করা যেমন সঙ্গত তেমনি গার্ডেনরীচের প্রাচীনতম স্কুল হয়েও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে হাইস্কুলের রেকগনিশন পেয়েছে বলেও বহু গার্জেন স্থানীয় অন্যান্য স্কুলে তাঁদের ছেলেদের ভর্তি করেছেন এই স্কুলে না এসে। তা ছাড়াও রয়েছে স্পেস প্রবলেম। ছ' কামরার দোতলা বাড়ি আর টিনশেডে সাড়ে চারশোর বেশী ছেলেকে বসানো যায় না।

এই স্পেস প্রবলেম কিছুদিন হল সামান্য পরিমাণ মিটেছে। ছ বছর আগে মুদিয়ালী হাইস্কুল হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে পরিণত হয়। শুরুতে ছিল শুধু হিউম্যানিটিজ স্ট্রীম। চৌষট্টিতে খোলা হল বিজ্ঞান শাখা। এক বছর পর কেন বিজ্ঞান শাখা খোলা হল তার কারণ জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে শুনলাম স্কুলের জায়গা ছিল না ল্যাবরেটরীর বা উঁচু ক্লাসের ছেলেদের বসতে দেওয়ার। তাই আগে বাড়ি তুলতে হল। পুরোনো দোতলা হল তিনতলা। টিনশেড তুলে দিয়ে সে জায়গায় বানান হল নতুন আর একটা তেতলা বাড়ি। এ সবই হয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য ও দানে। গভর্ণমেন্ট কানাকড়িও দিয়ে সাহায্য করেনি। স্কুলের শত আবেদনেও সরকারী দাক্ষিণ্যের বরফ গলে নি। একমাত্র গ্রান্ট ইন এডের টাকা কটা ছাড়া এই স্কুল বিনা সরকারী সাহায্যে নিজের চেষ্টায় যতটুকু করা যায় তাই করে যাচ্ছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে এটি কোন মিশনারী স্কুল নয় যে মিশনের বাড়তি সাহায্য এর ঘাটতি মেটাবে। টিউশন ফির সামান্য হারে সম্ভব নয় স্কুলের প্রয়োজন মেটানো। সবচেয়ে বড় কথা গার্ডেনরীচ কলকাতা নয়—স্বল্প আয়ের নিম্নবিত্ত বাসিন্দাদের ক্ষমতাও সীমিত। ইচ্ছা থাকলেও তারা নিরুপায়। তাই সরকার যদি এগিয়ে না আসে তবে মুদিয়ালী হাইস্কুলগুলির অভাব কোনদিনই মিটবে না।

উপরের কথাগুলি আমার নয়। বলেছেন মুদিয়ালী হাইস্কুলের হেডমাস্টার প্রবীর পাল। প্রবীরবাবু তারিণী পালের প্রপৌত্র। বছর আটত্রিশ বয়স হবে। বুদ্ধিদীপ্ত ঐ মুখে সেদিন লক্ষ্য করেছি ক্লান্তি ও অভিমানের ছাপ। থমথমে গলায় বললেনঃ চেষ্টার কোন ত্রুটি আমরা করি নি যে তার প্রমাণ পাবেন স্কুলের রেজাল্টে। গত তিন বছরে মোট সাতাত্তরটি ছাত্র এই স্কুল থেকে সায়েন্সে অ্যাপীয়র হয়েছে। পাস করেছে উনষাট জন। হিউম্যানিটিজে পাশের হার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (এ হিসাবের মধ্যে কম্পার্টমেন্টালের ফল ধরা হয় নি)। স্কুলে হয়তো আরো ভাল ফল দেখাতে পারতো) বললেন প্রবীরবাবু, যদি এই স্কুলের প্রাক্তন কৃতী ছাত্ররা তাঁদের সন্তানদের এখানে পড়তে পাঠাতেন। আশ্চর্য ব্যাপার বাপ-কাকা যে স্কুলে পড়ে সংসার সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, ছেলেরা আজ আসে না সেই স্কুলে পড়তে। একি স্কুলের দোষ না ভ্রান্ত অহমিকার স্বভাব-পরিণতি?

আজ প্রায় সাড়ে সাতশো ছাত্র পড়ছে মুদিয়ালী স্কুলে। অধিকাংশ ছাত্রের জোটে না পড়ার বই। পড়ার বই তো দূরের কথা, যে ন্যূনতম সুযোগ ছাড়া কোন শিশু দেহে-মনে সুস্থ নাগরিক হয়ে বেড়ে উঠতে পারে না সেটুকুই জোটে কটি ছাত্রের? একে নেই সুযোগ, তার উপর হায়ার সেকেন্ডারী কোর্সের প্রচণ্ড চাপ, ছেলেরা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। তবু হাল ছাড়েন নি প্রবীরবাবু ও তাঁর বাইশজন সহকর্মী। সাহায্য তাঁরা পান বা না পান শিক্ষার এই বেগবতী ধারাকে তাঁরা শুকিয়ে যেতে দেবেন না। প্রতিজ্ঞার উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রতিটি মুখ উদ্ভাসিত। এ প্রতিজ্ঞার পেছনে রয়েছে এক প্রাচীন ঐতিহ্য। চার জেনারেশনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই ঐতিহ্য।

সোয়াশো বছর আগে বসতবাড়ির ভিটের একটা চালাঘরে যখন 'পাঠশালা খুলে দিয়েছিলেন গোবিন্দ ঘোষ তখন কি তিনি জানতেন যে সেই পাঠশালা কালে কালে কত বড় হয়ে উঠবে? তারিণী পালই কি ভাবতে পেরেছিলেন যে একটা সামান্য পাঠশালা থেকে ভবিষ্যতে আরো কত নতুন নতুন শিক্ষায়তনের জন্ম হবে? আজ গার্ডেনরীচের প্রায়-দেড় লক্ষ বাসিন্দার জন্য রয়েছে প্রায় চল্লিশটি প্রাইমারী স্কুল। এর প্রায় গোটা তিরিশেক মিউনিসিপ্যালিটির। এ ছাড়া আছে পাঁচটি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল ও একটি কলেজ। এ সবকিছুরই মূলে সেই ছোট্ট পাঠশালাটি। কিন্তু যাঁদের চেষ্টায় গার্ডেনরীচের ঘরে ঘরে আজ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে তাঁদের কি গার্ডেনরীচ মনে রেখেছে? সেই প্রশ্নই আমি রাখছি গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটির কাছে। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ও তারিণীচরণ পালের কাছে কি আমাদের কোন ঋণ নেই? এমন কোন উপায় কি নেই যাতে টাকা খরচ না করেও এই দুটি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো যায়? আমি ত জানি একটি খুব সহজ উপায় আছে, যে উপায় সব জায়গায় গৃহীত হতে আমরা দেখতে পাই। এক পয়সাও খরচ হবে না। মুদিয়ালী ফার্স্ট লেন বেরিয়েছে মুদিয়ালী রোড থেকে, যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, মুদিয়ালী হাইস্কুল। দিন না ঐ রাস্তা দুটির নাম পাল্টে। পাল্টে কি নাম রাখতে হবে নিশ্চয়ই তা বলার আর দরকার নেই।

—[illegible]

বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যের জন্য ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারিয়েট অফিসের রিসার্চ অফিসার শ্রী[illegible] নাগ-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরবর্তী সংখ্যায়ঃ আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়।

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[গ্রাম চেনবার নেশা ছিল বিকাশের। শহুরে যুবক প্রমোশন নিয়েই এল তাই পাড়াগাঁর ব্যাঙ্কে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্ককাকার বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। বিস্ময়ের আশ্রয়। মনীষা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত মনীষার, দ্বিতীয় উপস্থিতি।

চারদিকে টানাপোড়েন। চোরাখাদ। কোন্তে-ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছে সবাই। মূল্যবোধও বিপর্যস্ত। ঘুণপোকা।

গ্রাম্য রাজনীতির বীভৎসতা।

সোনালির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ। বিকাশের চোখেও সে যেন দেখতে পেল নির্ভরতার আলো। অথচ মনীষা তার অস্তিত্ব জুড়ে।

সে পালাও ফুরলো। মনীষা হারিয়ে যেতে চাইল।

একা।

বিকাশ বিপর্যস্ত। অফিসেও অশান্তি। একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে শেষে তুলকালাম। বিকাশের ক্ষমা প্রার্থনা। বিষিয়ে রইল মন। শূন্যতার খাঁচায় বন্দী। ফিরল অফিস থেকে। সোনালির মুখোমুখি।

শশাঙ্ককাকারও ভালো-মানুষি মুখোশটা ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে বিকাশের কাছে।]

।। পঁচিশ ।।

সেতারটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখল সুনু। মুখে চাপা ভয়ের ছায়া একটা।

'কী হল? সাধা হয়ে গেল এর মধ্যে?'

'জানেন বিকাশদা, কাল রাতে একেবারে ঘুমোতে পারিনি। এত ভয় করছিল।'

'কেন? কিসের ভয় আবার?'

স্বপ্ন দেখলুম একটা। মনে হল, বাইরে খুব ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে আর ছোট মাসিমা এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে।' —সুনুর গলার স্বর কাঁপতে লাগল: 'আমাকে বললে, আয় সুনু—বাগানে যাই, অনেক আম পড়েছে হাওয়ায়, দু'জনে মিলে কুড়িয়ে আনি। আমি আর ছোট মাসী অমনি করে আম কুড়োতুম কিনা। চমকে জেগে উঠলুম। এত ভয় করতে লাগল, কী বলব।'

বিকাশ হাসল: 'স্বপ্ন স্বপ্নই। কোনো মানে নেই ওর।'

'কী জানি।'—সুনু শিউরে উঠল: 'দিনের বেলা কিছু হয় না, কিন্তু একটু রাত হলে, ওই ঘরটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার কেবল মনে হয়, কখন যেন দরজা খুলে ছোটমাসী বেরিয়ে আসবে। জিভটা ঝুলে পড়েছে, নাকের দু'পাশে রক্ত—' বলতে বলতে থমকে গেল সুনু: 'কলকাতায় গিয়ে বেশ ছিলুম তিনটে দিন জেঠিমার কাছে।'

বাইরে রাত। বাগানে ঝাঁ-ঝাঁ করে ঝিঁঝির ডাক। মেজদার পোড়োমহল থেকে আবার পায়রাদের চঞ্চল পাখা-ঝটপটানির আওয়াজ ভেসে এল একটা।

একবারের জন্যে ছোট মাসিমার কথা ভুলে গেল সুনু। চমকে উঠে বললে, 'ঈস্, আজকেও ভাম এসেছে। পায়রাগুলোকে খেয়ে শেষ করে দিলে। সকালে ছেঁড়া পালক আর রক্তের ফোঁটা পড়ে থাকে, এত কষ্ট লাগে যে কী বলব।'

'ভাম? ভাম কী?'—কলকাতার ছেলে বিকাশ নতুন নাম শুনল একটা।

'ভাম চেনেন না?'—সুনু আশ্চর্য হল: 'মস্ত মস্ত বেড়াল একরকমের—বন-বেড়াল। অন্ধকারে হলদে চোখগুলো বাঘের মতো জ্বলে। দেখলেই ভয় করে।'

'আসে কোত্থেকে?'

'কেন, চারদিকেই তো জঙ্গল আর বাগান। তাতেই বাসা। জানেন, ছোটমাসীর মুখোমুখি একটা পড়েছিল একবার, ছোট-মাসী একটা কাঠ কুড়িয়ে মারতে গিয়েছিল তাকে—সেটা ফ্যাঁস করে কামড়াতে এল।'

প্রসঙ্গটা সরে গিয়েছিল, কিন্তু আবার ফিরে এল ছোটমাসী। একটু চুপ করে থেকে সুনু বললে, 'কী সুন্দর ছিল দেখতে ছোটমাসী—আর কী ভীষণ ভালো। জানেন, খুব ভালোবাসত আমাকে।'

জামাইবাবুর কথা, প্রভাকরের কয়েকটা টুকরো মন্তব্য আর অমলার কিছু বিবরণ—সব মিলে সেই আত্মহত্যার একটা আভাস আছে বিকাশের মনে। আজকে সুনুর ভয় আর বেদনায় ভরা বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা এগিয়ে এল প্রশ্নটা।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব সোনালি?'

সুনু চোখ তুলে তাকালো, একটুখানি রক্তের ছোঁয়া লাগল গালে। বিকাশ তাকে সোনালি বলে ডাকলেই এই রঙটা দেখা দেয়।

'তোমার ছোটমাসীমা কেন ও-ভাবে আত্মহত্যা করলেন?'

মুখের রঙটুকু মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ভয় আর যন্ত্রণা দেখা দিল আবার।

'আপনি জানেন না—না?'

'ছাড়া-ছাড়া দু-একটা কথা শুনেছিলুম। তা থেকে কিছু বোঝা যায় না।'

একটু চুপ করে থেকে সুনু আস্তে আস্তে বললে, 'সেদিন সন্ধ্যেবেলায় না—বাবা একটা চাবুক দিয়ে মেরেছিল ছোট-মাসীকে।'

'সে-কি!'—বিকাশ খাবি খেলো: 'হাত তুললেন অত বড়ো মেয়ের গায়ে!'

'সে তো বাবা প্রায়ই তুলতেন—চড়-চাপড় দিতেন। আমার দাদু-দিদিমা কেউ তো নেই, মায়েরা কেবল দুই বোন। দিদিমা মরে যাওয়ার পর খুব ছোট্টবেলা থেকে ছোটমাসী থাকত আমাদের কাছে। বাবাই তো গার্জেন ছিল, জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি—সব বাবাই দেখত।'

'ছেলেবেলা যা করেছেন করেছেন, তাই বলে এত বয়সে—'

হ্যাঁ, কুড়ি-একুশ বছর বয়েস হয়েছিল মাসীর। মাসী বলেছিল, রজতকাকাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না—তাই—' সুনু মাথা নামালে।

'কে রজতকাকা?'

'বাবার যেন কেমন ভাই হয়। কী চাকরি করত জানি না, এখানে ট্যুরে আসত মধ্যে মধ্যে, উঠত আমাদের বাড়ীতে। আর মাসীর সঙ্গে—' আবার মাথাটা নেমে এল সুনুর, গাল লাল হল : 'মাসীর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল।'

'তা বিয়েটা হলো না কেন?'

কিশোরী সুনু যেন একটু একটু করে বড়ো হয়ে উঠেছিল : 'বাবা বলল, সগোত্র। সগোত্রে কি বিয়ে হয়?'

'বুঝেছি।'—একটু চুপ করে থেকে বিকাশ বললে, 'কিন্তু সেটা তো কোনো কারণ নয়। আজকালকার আইনে তো তা আটকায় না।'

'রজতকাকাও তো তাই বলেছিল বাবাকে। বাবা মানল না। বললে, আইন বদলে কি ধর্মকেও বদলে দেওয়া যায়? নাকি দেশটা বিলেত হয়ে গেছে যে খুড়তুতো বোনকেও বিয়ে করা চলে? বাবা যাচ্ছেতাই গালাগাল করল রজতকাকাকে, তারপর বললে, এ বাড়ীতে তুমি আর কখনো এসো না।'

'তাতে ছোটমাসীকে চাবুক মারবার দরকার হল কেন?'

জবাব না দিয়ে সুনু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে। কিশোরী মেয়েটির মুখে এখন যৌবনের বিষণ্ণ গভীরতা। এই গভীরতাই ঝর্ণাকে নিয়ে আসে নদীতে, তারপর নদীকে নিয়ে যায় সমুদ্রে। আলোর মধ্যে ছায়া পড়তে থাকে, দোলা লাগে কান্নার অতলে।

সুনুর মুখে লজ্জার আভাটা আর নেই, সেই বিষণ্ণতাটাই থমকে রয়েছে। একটু পরে সুনু বললে, 'মাসী দিনকতক কাঁদল দরজা বন্ধ করে। তারপর একটা চিঠি লিখল রজতকাকাকে। লিখল, তুমি আমাকে নিয়ে যাও এখান থেকে, আমি তোমার সঙ্গে পালাব। আমার কুড়ি-একুশ বছর বয়েস হয়েছে, আমি যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারি। কিন্তু চিঠিটা ডাকে দেবার আগে বাবার হাতে পড়ল। রেগে আগুন হয়ে গেল বাবা। বললে, তিনদীঘির মল্লিক-বাড়ীর মেয়ে হয়ে তুই যার-তার সঙ্গে পালাবি, কুলে কালি দিবি! তোকে আজ—! তারপর—' সুনুর চোখে জল টলটল করতে লাগল : 'মা ঠেকাতে গিয়েছিল, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে। আর চাবুক দিয়ে—'

সুনু থামল। এবং এর পরে আর বিকাশের জানবার দরকার ছিল না।

মাথা নামিয়ে বসে রইল সুনু। একটা চোখের জলের ফোঁটা টপ করে পড়ল সেতারটার ওপর, সুনু ব্যস্ত হয়ে আঁচল দিয়ে সেটা মুছে ফেলতে চাইল, তীব্র একটা বেসুরো আওয়াজ উঠল তারগুলো থেকে। বিকাশ দাঁতে-দাঁত চাপল। প্রভাকরের স্ত্রী অমলার কথাগুলোই মনে পড়ছিল তার। আসলে সগোত্র-টগোত্র ওগুলো সব বাজে ওজর। শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি, জমি-জমা দুই বোনের নামে, শ্যালী বিয়ে করে সরে গেলেই অর্ধেক দাবি তার। রজত কেন—কারো সঙ্গেই হয়তো তিনি মেয়েটির বিয়ে দিতেন না। তা নইলে মোটামুটি শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং অবস্থাপন্ন মেয়েকে তাঁর কুড়ি-একুশ বছর পর্যন্ত আইবুড়ো রাখবার দরকার ছিল না,—বিশেষ করে নিজের পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েটির বিয়ের কথা যখন এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছেন তিনি।

আত্মহত্যা করে মেয়েটি তার পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়ে গেল। কী চিঠি সে লিখে গিয়েছিল কেউ জানে না, শশাঙ্ক নিয়োগী আগেই সেটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

এবং—এবং—যদি সে আত্মহত্যা না করত, তাহলে শশাঙ্ক নিজেই হয়তো খুন করে বসতেন তাকে। অসম্ভব নয়, সব পারেন এই ভদ্রলোক। আর পারেন যে, সে খবর বাইরের লোকের কাছ থেকে জানতে হয় না, শত্রুপক্ষের কুৎসাতেও না—সুধাময়ী দেবীর মুখের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়। বেঁচে থেকেও মানুষ যে কিভাবে মমি হয়ে যায়, কাকিমাই তার প্রমাণ।

কিংবা—কিংবা, কে বলতে পারে, কাকাই মেয়েটিকে খুন করে, তারপর ফাঁসিতে—

হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠল বিকাশ।

তার সামনে এই মেয়েটি—সকালের আলোর মতো, সূর্যমুখীর মতো; সুনু-সুবর্ণা—যার নাম সে দিয়েছে সোনালি। এই সোনালিকেও কি একদিন এমনিভাবে হত্যা করা হবে? তাই কি স্বপ্নে তার ছোটমাসী—স্বেচ্ছায় নয়, আর কেউ বলালো।

'সুনু, চলে যাবে এখান থেকে? এই বাড়ী ছেড়ে?'

সুনুর চোখ দুটো দেখা গেল না, যেন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে। অস্পষ্ট গলায় সুনু বললে, 'যাব। আমার আর একদিনও থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'যদি আমি নিয়ে যাই?'

'বেশ হবে।'—মেঘলা মুখে আলো ফুটতে গিয়েই আবার ছায়ায় ডুবল : 'কিন্তু বাবা কি আর যেতে দেবে? চশমার জন্যে পাঠিয়েছিল একবার, কিন্তু আর—'

'যদি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাই আমি?'

বলেই বিকাশ চমকালো, নিদারুণভাবে চমকালো। বিদ্যুতের মতো সামনে ঝলকে উঠল মনীষা। একটা ধারালো হাসির শব্দ শোনা গেল : 'জানতুম, আমি তোমার মনের চেহারাটা সব জানতুম। তাই আমি নিজেই তোমায় মুক্তি দিয়ে চলে গেছি।'

আর একবার থরথর করে কেঁপে উঠল সুনু। সিঁদুরের মতো টকটকে রাঙা হয়ে গেল মুখ, পাথর হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে, হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। কোল থেকে ঝনাৎ করে সেতারটা আছড়ে পড়ল মেজেতে, কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকালো না সুনু, একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো ঘর থেকে।

ছি-ছি-ছি।

বিকাশ চোখ বুজলো। এরপরে আর সুনুর কাছে সে সহজ হতে পারবে না, কোনোদিন না।

ব্যাঙ্কের হাওয়াটা আবার থমথমে। পা দিয়েই বুঝতে পারা গেল সেটা। আসতে আজ মিনিট কুড়ি দেরী হয়েছিল, ঘরে ঢুকতেই বোঝা গেল, কয়েক জোড়া চোখের চাউনি সাপের মতো অপলক হয়ে আছে তার দিকে।

এমন সম্ভাবনার হেতু ছিল না কিছু। ক্ষমা চাইবার পর থেকে একটা বিজয়-গর্বই দেখা যাচ্ছিল সকলের মুখে-চোখে; শব্দ করে হাসছিল, চেঁচিয়ে কথা কইছিল প্রদীপ মুস্তাফি—গালভর্তি করে পান চিবুচ্ছিল। কিন্তু আজ আবার নতুন কিছু ঘটেছে কোথাও। প্রত্যেকটা মুখ লোহার মতো শক্ত, প্রত্যেকের চোখে হিংস্র বিদ্বেষ, চকচকে ঘৃণা।

'আপনি কেন? প্রিয়গোপালবাবু আসেন নি।'

প্রত্যেকটি কলম, প্রত্যেকটি হাত এক-সঙ্গে থেমে গেল। যেন একটা বিদ্যুৎ বইল ঘরের ভেতর।

ধনঞ্জয় দত্তের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কী একটা বলতে চাইছিল, বলতে পারল না। তার বদলে প্রদীপ মুস্তাফি উঠে এল চেয়ার ছেড়ে। সোজা দাঁড়ালো বিকাশের মুখো-মুখি।

'প্রিয়গোপালবাবুর কী হয়েছে, জানেন না আপনি?'

যেমন উদ্ধত স্বর, তেমনি ভঙ্গি।

কিছুতেই ধৈর্য হারাব না, এই নিশ্চিত

প্রতিজ্ঞায় বিকাশ স্থির হয়ে রইল। তারপর প্রদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি কি করে জানব? তিনি তো আমাকে কোনো খবর দেন নি।'

'তাঁর তো খবর দেবার কিছু নেই। আপনি নিজেই সব ভালো করে জানেন।' —বিন্দু বিন্দু করে বিষ পড়তে লাগল প্রদীপের গলা দিয়ে।

'আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না? আপনি আর আপনার মুরুব্বি কানাইবাবু কি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লেন? আজ ভোরে এখানে ক'জনকে পি-ডি অ্যাক্টে এ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যে প্রিয়গোপালদাও রয়েছেন—সে খবরটা কি আপনাদের অজানা?'

'প্রিয়গোপালবাবুকে—' বিকাশ আশ্চর্য হয়ে গেল: 'পি-ডি অ্যাক্টে।'

'হ্যাঁ স্যার, পি-ডি অ্যাক্টে।'—বিনয়ে যেন বিগলিত হল প্রদীপ। 'বুড়ো, অসুস্থ মানুষ, কিছুর মধ্যে থাকেন না, কেবল অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাই তাঁকে এই বয়সে ঠেলে জেলে পাঠানো হল।'

নির্বোধের মতো বিকাশ বলে ফেললো: 'কে পাঠিয়েছে?'

'কানাই পাল আর তার দালালেরা। সেই দালাল আমাদের মধ্যেও রয়েছে, তাকে আমরা চিনি।'—প্রদীপের চোখ দিয়ে আগুন
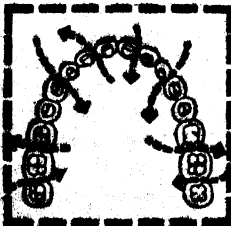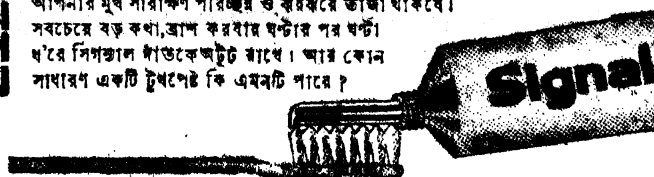
ছিটকে পড়তে লাগল : 'ভেবেছেন, পার পাবেন আপনারা? একদিন এর পুরো হিসেব নেব আমরা, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

চেয়ারের মধ্যে বিকাশ শক্ত হয়ে রইল। এত বড়ো বীভৎস মিথ্যারও কোন জবাব দেওয়া গেল না।

হঠাৎ গলা চড়িয়ে প্রদীপ চীৎকার করে উঠল : 'প্রিয়গোপালদা জিন্দাবাদ!'

কেরানী-বেয়ারারা —সাত-আটটি গলা একসঙ্গে সুর মেলালো : 'জিন্দাবাদ!'

'চক্রান্তকারী আর দালালেরা—'

'নিপাত যাক—নিপাত যাক!'

'ইনকিলাব—'

'জিন্দাবাদ!'

এই ধ্বনিগুলো বিকাশও তুলেছে, আজও তোলার জন্যে সে তৈরী। কোনো রাজনৈতিক দল তার নেই, কিন্তু সব মানুষের ন্যায্য লড়াইয়ের সেও শরিক, তাদের দুঃখের সমান অংশীদার। কিন্তু আজকের এই অবস্থাটা অদ্ভুত। কোনো কারণ নেই, অথচ সে দালাল; কোনো অপরাধ নেই—তবু সে শত্রুপক্ষ। দরকারী কাজগুলো করা হয় নি বলে প্রশ্ন তুলেছিল, অতএব সে প্রতিপক্ষ; ক্যাপিটালিস্ট কানাইবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় আছে—সুতরাং তাকে নিঃসন্দেহে ছাঁটাই করতে হবে।

অকারণ প্রতিহিংসা কেবল বুর্জোয়াদেরই? অবিচার আর কোথাও নেই? আর এই কি সংহতিবদ্ধ সংগ্রামের রাস্তা? কেউ অফিসার হলেই সে ব্রাত্য, কাজ করতে বললেই রিঅ্যাকশনারী?

মাথার প্রত্যেকটা কোষে কোষে তার কণায় কণায় আগুন জ্বলতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটু আসছি।'

কেউ জবাব দিল না।

সে পা বাড়াতেই পেছন থেকে সেদিনের মতো আজও ভেসে এল মন্তব্য। ধনঞ্জয়ের গলা। 'মুস্তাফি, তোমার পালা এবারে। খবর দিতে চললেন!'

প্রদীপ কিছু একটা জবাব দিল, কিন্তু কানে গেল না বিকাশের। মাথার ভেতরে ভেতরে সেই আগুনের যন্ত্রণা নিয়ে সে বেরিয়ে এল রাস্তায়। একটা রিক্‌শ নিল, সোজা রওনা হল কানাইবাবুর বাড়ীর দিকে। কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু আপাতত— এই মুহূর্তে এছাড়া কিছু আর সে ভেবে পেল না।

কানাইবাবু স্নান করতে গিয়েছিলেন। চাকর বললে, 'বসুন, বাবু আসছেন।'

দোতলার সেই বারান্দা নয়, অন্তরঙ্গ চায়ের আসর নয়. কানাইবাবুর অফিস। ঝকঝকে, ফিটফাট। ম্যাকভর্তি সাজানো ফাইল। দেওয়ালে দেশনেতাদের ছবি। এনলার্জ করা একটা বড়ো ছবিতে শুকনো মালাগলায় আর একজন কেউ আছেন। কে? যোগেন পাল? অথবা কানাইবাবুর বাবা?

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে দু-একটা ফাইল, পেপারওয়েট, কলমদানি, লাল-নীল পেন্সিল। বিদেশী মদের নাম-লেখা মস্তবড়ো অ্যাশ ট্রে। পেছনের রিভলভিং চেয়ারে অম্লান শুভ্র তোয়ালে। সব মিলে প্রাচুর্য, রুচি, আভিজাত্য। এই বাড়ী, এই অফিস—আধা-শহর আম্রাগঞ্জের এই অসংলগ্নতায় কোথাও মানায় না।

বসে থাকতে থাকতে বিকাশের মনে হল, কোনো মানে হয় না অসময়ে এখানে আসবার, অকারণে এখন কানাইবাবুকে বিরক্ত করবার। প্রিয়গোপালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাকে দালাল বলা হয়েছে, তাতে কী করবার আছে কানাইবাবুর? ভাবছিল, চাকরটাকে একবার বলে সে এখান থেকে উঠে পড়বে, ঠিক সেই সময় জুতোর শব্দ উঠল।

গেঞ্জি গায়ে, সিল্কের লুঙ্গিপরা কানাইবাবু ঢুকলেন। একটা চাপা সুগন্ধের উচ্ছ্বাস উঠল। ভালো পাউডারের, দামী সাবানের।

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো : 'নমস্কার।'

'নমস্কার —নমস্কার।' —কানাইবাবু প্রসন্ন মুখে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ এ সময়ে?'

'আপনার খাওয়ার সময় বিরক্ত করলুম।'

'কিছু না, কিছু না— দুটোর আগে আমার খাওয়া হয় না। ব্যাপারটা কী, বলুন দেখি? ব্যাঙ্কের কাজ ফেলে একেবারে আমার কাছে?'

জবাব দেবার আগে বিকাশ একটা ঢোক গিলল, কথাটা কোনখান থেকে যে আরম্ভ করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। কিছুক্ষণ হুইস্কির নামলেখা অ্যাশ-ট্রেটার দিকে অস্বস্তিভরে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বললে, 'শুনেছেন বোধ হয়, আমাদের ব্যাঙ্কের প্রিয়গোপালবাবুকে আজ সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পি-ডি অ্যাক্টে।'

কানাইবাবুর মুখের পেশীগুলো শক্ত হল একটু।

'শুনেছি, শুধু প্রিয়গোপাল নয়, আরো তিন-চারজনকে সেই সঙ্গে।'

'কিন্তু প্রিয়গোপালবাবু তো ভাল মানুষ। এক সময় দেশের কাজে আন্দামান পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন, কিন্তু আজ তো তিনি এসবের বাইরে।'

'তাই নাকি?'—বাঁকা এক টুকরো হাসির রেখা দেখা দিল কানাইবাবুর ঠোঁটে: 'আপনিও সে-কথা মনে করেন? ব্যাঙ্কে ঘেরাও হবার সেই অভিজ্ঞতার পরেও?'

'ওটা ছেড়ে দিন—' ম্লানভাবে বিকাশ বললে, 'ও একটা মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এর ব্যাপার। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ওঁকে পি-ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হল।'

'আপনার সব কথা বোঝবার দরকার নেই, আপনি বাইরে থেকে এসেছেন। দ্য পোলিশ নো দেয়ার জব।'

আবার একটা ঢোক গিলল বিকাশ।

'কিন্তু অফিসে ওরা কী বলছে জানেন? আপনার-আমার যোগ-সাজসে—'

রিভলভিং চেয়ারে কড়াং করে শব্দ উঠল একটা। একটু পাশ দিয়ে বসেছিলেন কানাই পাল, এবার সোজা ঘুরে গেলেন বিকাশের দিকে।

'দে সে—লেট দেম সে!'—বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বাণীটি উচ্চারণ করলেন তিনি : কিন্তু বিকাশবাবু, পুলিশ চোখ বন্ধ করে ঘুমোয় না, দেশটা এখনো কমিউনিস্টদের রাজত্ব হয়ে যায় নি। জানেন আপনি, কী চলছে গ্রামের ভেতর? জানেন, পরশুই একটা ধানের গোলা লুট হয়ে গেছে আমার?'

'প্রিয়গোপালবাবু নিশ্চয়ই সে ধানের গোলা লুট করতে যান নি।'

কানাই পালের দৃষ্টিতে উগ্রতা ফুটে বেরুল।

'যান নি, কিন্তু উস্কানি দিতে বাধা নেই। আপনি কিছু জানেন না এখানকার, কিছু বোঝেন না।'

'কিন্তু প্রিয়গোপালবাবু—'

'লেট মি স্পীক—'অসহিষ্ণু কানাই পাল : 'দ্যাট প্রিয়গোপাল ইজ মাই সোর্ণ এনিমি। আয়্যাম হ্যাপী যে, এতদিনে ওকে এ্যারেস্ট করা হয়েছে, অ্যাট লাস্ট দে হ্যাভ ডান সামথিং র‍্যাশনাল, দো ইট'স এ বিট লেট!'

বিকাশ আবার কথা খুঁজতে লাগল।

'ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। বাড়ীতে বুড়ো মা। তাকে উনিই দেখাশোনা করেন।'

'বয়েস যদি হয়ে থাকে তাহলে এটাও বোঝা উচিত ছিল যে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে।'

'আপনি ওঁর জন্যে কিছু করতে পারেন না—না?'

'আমি কী করতে পারি? বীয়িং অ্যান এজুকেটেড ম্যান—' স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে বেরুল কানাইবাবুর মুখে :

'একথা আপনি কী করে বলছেন? পুলিশ কেন শুনতে যাবে আমার কথা? আর তাছাড়া কী ইন্টারেস্ট আমার?'—কড়াগলায় কানাইবাবু বললেন, 'প্রতিদিন আমার নিন্দে করবে, কুৎসা করবে, আমার শত্রুদের উস্কানি দেবে, আর আমি তাকে সাহায্য করতে যাব—মাপ করবেন মশাই, অতখানি ফিলানথ্রপি আমার নেই।'

'কিন্তু ব্যাঙ্কের ওরা বলছে, আমি আপনাকে নিয়ে—'

'বলছে, বলুক।'— কর্কশভাবে কানাইবাবু বললেন, 'এত টাচি কেন আপনি?'

'আমি অপমানিত বোধ করছি।'

'এত সূক্ষ্ম অপমানবোধ নিয়ে আপনি এসব জায়গায় থাকতে পারবেন না মশাই।'—স্পষ্ট নগ্নগলায় কানাইবাবু বললেন, 'আয়্যাম সরি, আই কান্ট হেল্‌প্ ইউ।'

রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে কানাইবাবু বললেন, 'আচ্ছা আসুন, নমস্কার।'

সে গলা বাগানবাড়ীর কানাই পালের নয়। বিকাশ একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালো, বুঝে নিলে অপমানের আসল চেহারাটা, তারপর উঠে পড়ে বললো, 'নমস্কার।'

(ক্রমশঃ)

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

জন্মঃ ১৮৮৫ খৃঃ ১০ জুলাই বসিরহাটের পেয়ারা গ্রাম। পশ্চিমবঙ্গ।
মৃত্যুঃ ১৯৬৯ খৃঃ ১৩ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। পূর্ববঙ্গ।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের নিরলস গবেষক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাজনৈতিক বেড়াজালে ওপারের বাঙলায় আবদ্ধ হয়ে ছটফট করেছেন মাতৃভূমি দেখবার প্রেরণায়। কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি। প'চাশি বছরের বৃদ্ধ আজ বহু দূরলোকের অধিবাসী। একটি চিঠিতে একবার লিখেছিলেন : "দেশান্তরে থাকিলেও যেমন জননী বদলায় না, সেইরূপ জন্মভূমিও বদলায় না। আমি একবার জন্মভূমিতে গিয়া তোমাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু নানা কারণে তাহা ভাগ্যে ঘটিবে কিনা জানি না।" রাজনীতির এমনই পরিহাস, আমৃত্যু তা সম্ভব হয় নি।

শহীদুল্লাহ্‌কে আমরা সাহিত্যসাধক হিসেবেই জানি। দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ তিনি। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে তখন দেশব্যাপী আন্দোলন চলছিল। অথচ রাজনীতি থেকে দূরে সরে থেকেছেন। তাঁর মত মনীষীর এই রাজনীতি বিরুদ্ধতার কারণ কি? তিনি মনে করতেন, সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণ জাগরণ দরকার, তা না হলে রাজনৈতিক চিন্তার পরিণতি আসতে পারে না। আজীবন হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন শহীদুল্লাহ। তিনি বলেছেন : "আপাত-দৃষ্টিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বিদ্যমান। মনে হয় ইহাদের কোনও মিলনভূমি নাই। কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করিলে উভয়ের মধ্যে অনতি-বিলম্বেই মূল ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মই পরধর্মসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়—এই সহিষ্ণুতা অন্য ধর্মমতের শ্রদ্ধা হইতেই প্রসূত, পরন্তু ঔদাসীন্য হইতে নহে। হিন্দু ও মুসলমান নামে দুই মহান জাতি ভারতবর্ষে বসবাস করিবে ইহা বিধাতার ইচ্ছা। ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে সম্বন্ধ হইয়া নিরূপিত মহান উদ্দেশ্যসমূহ পৃথিবীতে সুসিদ্ধ করিবার জন্য হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর পরস্পর সদ্ভাব বিদ্যমান থাকা অতীব প্রয়োজন।" তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের সাহিত্য যেন স্বতন্ত্র না হয়। তাকে দেখতে হবে একই মায়ের সন্তানের মত। দেশবিভাগ পূর্ব ও পরবর্তীকালে এই অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একান্তই দুর্লভ দৃষ্ট।

ধর্মে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও, শহীদুল্লাহের কিন্তু ধর্মান্ধতা ছিল না। সুফী পীরবংশের সন্তান। সমস্ত কুসংস্কার সরিয়ে ধর্মের মূল সত্যকে তিনি জেনেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে প্রকৃত সত্য ও ন্যায়ের পথ পান। মনকে কখনও গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখতে পারেন নি। উদারপ্রাণ এবং মুক্তচিন্তা তাকে মহৎ মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। একমাত্র তার মত মানুষের পক্ষেই তাই বলা সম্ভব [illegible]

পূর্বে হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল তাহা নিশ্চিত। ধর্মকে নিয়ে ব্যবসার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। চারদিকের ঘোরতর অনাচার নোংরামি দেখে বলেছিলেন : ইসলাম আজ যে রূপ নিয়েছে, তাও একটা বাঁধন বইকি। অর্থ বোঝা নেই, কেবল শব্দের আবৃত্তি অনুষ্ঠান আছে, নাই তার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য; বাহ্যিকতা আছে, নাই আন্তরিকতা, এসব ভণ্ডামি, এর চেয়ে সাফ নাস্তিক হওয়া ভাল। হাফিজ; তুমি মদ খাও, নাগরপানা কর, স্ফূর্তি কর, যাই কর; কিন্তু লোক ঠকাবার ছল করো না।" অনেকে তার ওপর রুষ্ট ছিলেন। জ্ঞানহীন ভক্তি আর প্রেমহীন ধর্ম শহীদুল্লাহের মতে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের মূল কথা ছিল—সংস্কারমুক্ত হয়ে সত্যকে আবিষ্কার করা। আজকের দ্বন্দ্ব হিংসা হানাহানির একমাত্র কারণ অশিক্ষা। অশিক্ষিত মানুষ সত্যধর্মকে জানে না। সে হিন্দু মুসলমান যেই হোক না কেন। তাদের ভুল পথ দেখান হয়। বিধর্মীকে হিংসা করে তারা। তারপর আসে সাম্প্রদায়িক সংঘাত। "সকল কাজের উপর শিক্ষাবিস্তার। মূর্খ জাতির কোন ধর্ম নাই, কর্ম নাই: উদার শিক্ষার সঙ্গে উদার ধর্মের সম্মিলন এই-ই-চাই।"

এই ধরনের মানুষ দেখা যায় খুব কমই। আর এ'রাই জীবনকে দৃষ্টান্ত হিসাবে রেখে যান বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের মানুষের সামনে। গোঁড়া মুসলমান রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য ধর্মের প্রতি যে মহত্ব দেখিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে স্মরণ-যোগ্য। আরোপিত রাজনৈতিক বিভেদকে সব সময় মন দিয়ে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। অথচ এমনই পরিহাস, এ তাকে মেনে নিতে হয়েছিল আরো অনেক হতভাগ্য বাঙালীর মত।

ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের, দেশহিতৈষিতা এবং উন্নত জীবনাদর্শের অননুকরণীয় মহৎ প্রাণ মানুষ তিনি। ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে শহীদুল্লাহ সাহেবের জীবন ও সাহিত্যচর্চার মধ্যে বাঙলা সংস্কৃতি, ঐস্লামিক ঐতিহ্য ও আধুনিক মানবিকতা-বোধের অবিস্মরণীয় প্রকাশ ঘটেছে। তিনি সেই বাঙলার মানুষ যে বাঙলা অবিভক্ত। যে বাঙলায় বাস করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। যাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত শহীদুল্লাহ। এই মানুষটিকে কোন বাঙালী ভুলে থাকতে পারে না। এপারের বাঙলায় তিনি প্রায় বিস্মৃত। অথচ এই বাঙলায় তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছে। কর্মজীবনের প্রথম দিকের সঙ্গে কলকাতার যোগ অতি নিবিড়। পাণ্ডিত্যের এই দুর্লভতম প্রতিভা ওপারের বাঙলায় ছিলেন অতি সম্মানিত পুরুষ। তাঁর কর্মজীবনে সেই কোন চটকদার ঘটনার প্রবাহ। [illegible] তাঁর কাছে মানুষ হিসাবে

যদিও গবেষণা করেছিলেন বিদেশী ভাষায়, ইংরেজিতে বই লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, তবুও বাঙলা ভাষাই ছিল তাঁর কাছে সব থেকে প্রিয়। কারণ এ তাঁর মাতৃভাষা। শহীদুল্লাহ বলেছিলেন : "বাঙলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষার সকল সেবকই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। পশ্চিমবঙ্গের সহিত আমাদের রাজনীতিগত পার্থক্য আছে, কিন্তু ভাষাগত তো শত্রুতা নাই। যে বাংলা ভাষা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহা কাহারও কথায় আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।" মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা তাঁর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলে-ছিলেন : "মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি—এই তিনটিই প্রত্যেক মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু।" এখানে হিন্দু মুসলমান আবার কি! তারা বাঙালী। এই তাদের একমাত্র পরিচয়। আর তাদের মাতৃভাষা বাঙলা। শহীদুল্লাহ ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। তাই মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়। বাঙলা ভাগ হলেও বাঙালী ভাগ হতে পারে না। একই ভাষায় তারা কথা বলে। তাদের সৃষ্ট সাহিত্য এক ভাষাকেই সমৃদ্ধ করছে। এই বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন : "রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভা বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে উচ্চস্থানের অধিকারী করিয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের দুইটি বিশিষ্ট প্রদেশের হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রতিভা ইহাকে একটি বিশ্বভাষায় (World Language) পরিণত করিবে।"

সানন্দে অভিনন্দিত করেছিলেন। বাঙলা অক্ষরের আরবীকরণের [illegible] ছিলেন তিনি। সরকারী [illegible] প্রস্তাব [illegible] প্রত্যাখ্যান করেছেন। শহীদুল্লাহ সাহেব লিখেছিলেন : "যেমন আমরা বাংলায় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের ভাষা বাংলাও এক মিশ্রিত ভাষা।......আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা ছুঁৎমার্গের কোনও স্থান নেই।

"ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-পারসীঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আরএক-দল চাচ্ছে 'জবে' করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।

"নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (Style) ও গতি কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না।... মানুষে মানুষে যেমন তফাৎ প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষাদীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোটকথা ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি (Style) হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর ও মধুর।...... আমাদের দুটি কথা স্মরণ রাখা উচিত—ভাষা ভাবপ্রকাশের জন্য, ভাব গোপনের জন্য নয়; আর সাহিত্যের প্রাণসৌন্দর্য, গোঁড়ামি নয়।

"...স্বাধীন পূর্ববাঙলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন যে নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ববাঙলার বাইরে বাংলাদেশ না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সংগীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়; তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্তু আরবীকে এতগুলি নতুন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা যে কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে, তা বোধহয় না।......

"...এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে ধান্যে, জ্ঞানে গুণে, শিল্পবিজ্ঞানে পৃথিবীর যে-কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যম স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।" (পূর্ব পাকিস্তান বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণের অংশ, ঢাকা; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮)।

শহীদুল্লাহের যুক্তিবাদী মন আর বিশ্লেষণধর্মী প্রতিভা বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর পাণ্ডিত্যে কোথাও অহমিকা ছিল না। তিনি ছিলেন সরল অথচ জ্ঞান-গম্ভীর, প্রাঞ্জল অথচ প্রগাঢ়। মোট তেরটি ভাষা জানতেন। বহু ভাষাবিদ শহীদুল্লাহ নানান ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন অজস্র। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও শিশুসাহিত্যের জন্যও কলম ধরেছিলেন তিনি। গল্প ও কবিতা লিখেছেন। কতক-গুলি সাহিত্য পত্রিকা ও ধর্মবিষয়ক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় বেরিয়েছিল। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এইসব পত্রপত্রিকার রয়েছে বিশিষ্ট ভূমিকা। বাংলা সংস্কৃতি, ইসলামী ঐতিহ্য এবং রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ঐতিহ্য এই তিন ধারায় বিভক্ত তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি। তা দুই বাঙলার নয়, এক বাঙলারই সম্পদ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন তিনি। এম-এ পড়তে চান সংস্কৃতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ধর্মের অজুহাতে প্রচন্ড বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। বাধ্য হয়ে সংস্কৃত পড়তে পারলেন না ঠিকই। কিন্তু পরবর্তীকালে সে ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এম-এ পাশ করেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ খৃঃ ১৫ জুন তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ভার দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। কলকাতায় তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯২১ খৃঃ ২ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হন। ঢাকায় যোগদানের পর জার্মানীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের বৃত্তি পেয়েও সেখানে যেতে পারেন নি। ১৯২৬ খৃঃ প্যারিস যান। প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। এই সময় বেশ কয়েকটি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা তাঁকে শিখতে হয়েছিল। ১৯২৮ খৃঃ ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিশ বৎসরের ওপর যুক্ত ছিলেন। বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কিছুকাল। কিন্তু অবসর নেওয়ার পরও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন আমৃত্যু।

কলকাতায় অধ্যাপক জীবনের শুরু থেকে তিরাশি বছর বয়সে গুরুতর অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত সব সময় লিখে গেছেন। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে সে সময়ে ও পরবর্তীকালে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। সে সব প্রবন্ধের বেশির ভাগই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। মোট [illegible]খানি বই বেরিয়েছে এ পর্যন্ত। এর মধ্যে আছে ভাষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম, শিশুসাহিত্য সম্পর্কে বই। কতকগুলি পুরোন পুঁথিও সম্পাদনা করেছেন। লোক-গাথা, লৌকিক ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, পুঁথি সংগ্রহ, প্রাচীন সাহিত্যের বিতর্কিত বিষয়ে আলোকপাত, উর্দু অভিধান সম্পাদনা, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা, আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান সম্পাদনা শহীদুল্লাহের অন্যতম কীর্তি। বিগত অর্ধ-শতাব্দী ধরে অসংখ্য সভাসমিতিতে ভাষণ দিয়েছেন। সবই যে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এমন নয়। নিজেকে ঠাট্টা করে বলতেন 'জ্ঞানানন্দ স্বামী'। জ্ঞানের চর্চা জড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর অস্থিমজ্জার সঙ্গে। 'জ্ঞান যেন তাঁর অস্তিত্বে আকাশ এবং কবিতা। দিগন্তের ইচ্ছার মতো যেন তা বিপুল প্রশান্তির জয়ের অনিবার্যতা।'

কিছুদিন হোল বিশিষ্ট কবি জসীমুদ্দিন কলকাতায় এসেছেন। ডঃ শহীদুল্লার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক সাক্ষাৎ-কারে তিনি বলেন, "ডঃ শহীদুল্লাহের মত জ্ঞানী ও মধুর স্বভাবের মানুষ জীবনে কোথাও দেখিনি। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে তাঁকে দেখেছি। একদিনও অসুস্থ হননি একদিনও মুহূর্তের জন্য হতাশ হতে দেখিনি। ডঃ শহীদুল্লাহ ছিলেন মধুর স্বভাবের অতিথিপরায়ণ পণ্ডিত, বিদগ্ধ একজন মানুষ। গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি গ্রন্থাগারে ডুবে থাকতেন।

"আদর্শ শিক্ষকের দুর্লভ সকল গুণ নিয়েই জন্মেছিলেন ডঃ শহীদুল্লাহ। একবার ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডঃ শহীদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেন বিজয় সিং যে বাঙালী ছিলেন এ সম্পর্কে তাঁর কাছে কোন তথ্য আছে কিনা। ডঃ শহীদুল্লাহ বলেন, বিজয় সিংহ বাঙালী বলে তাঁর সন্দেহ আছে। তবে বিজয় সিংহ যে বাঙালী তার পক্ষেও অনেকের যুক্তি আছে। আমি তাঁকে শেষ দেখি দুমাস আগে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। ডঃ শহীদুল্লাহ তখন অসুস্থ। আমায় দেখে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

"কত কথাই আজ মনে পড়ছে। ডঃ শহীদুল্লাহ যে কতবড় পণ্ডিত ছিলেন তা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ধর্ম-মঙ্গলের ভূমিকা না পড়লে বোঝা যায় না। বহু ফরাসী গল্পের বাংলা অনুবাদ ছাড়াও হাফিজের কবিতা ও ওমর খৈয়ামের কবিতার অনুবাদের দ্বারা ডঃ শহীদুল্লাহ সুধীজনের অভিনন্দন লাভ করেন। কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর প্রীতির। তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের গভীর বেদনার।"

— [illegible] চৌধুরী

মনে মনে এক ধরনের আশঙ্কা আর ক্ষোভ থাকলেও তোমার প্রতি বিশ্বাস হারাতে পারিনি। বরং তোমাদের ঘিরে ভবিষ্যত রঙীন জীবনের একটা ছক গড়েছি। ফলে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দীর্ঘ দশ বছর কিভাবে কেটে গেছে টেরও পাই নি। প্রথম দিকে তুমি ঘন-ঘন দেখা করতে আসতে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে। কথাবার্তায় সময় খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেত। হাসিমুখে তুমি বিদায় নিতে। তোমার গমন পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম যতক্ষণ না তোমার লম্বা ছিপছিপে দেহটা দেয়ালের আড়ালে মিলিয়ে যেত।

আমি সবার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতাম। বাবা কেমন আছেন? আমার খোঁজখবর নেন কিনা। মার শরীর এখন কেমন। মার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রেখো। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়লে, অবহেলা না করে মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেও। মাঝে মাঝে বাবার জ্বর হোত। মাঝরাত্রে ঘুম থেকে হঠাৎ কাশতে কাশতে উঠে পড়তেন। তাঁকে ওষুধ খেতে বলবে। নিয়মিত। আর আমার নোটনের খবর কী? উঃ কতদিন যে নোটনকে দেখি না! মনে হয় এক যুগ। আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স বছর খানেক। এখন অনেক বড়সড় হয়েছে নিশ্চয়ই। কী বলছ?

ক্লাস সিক্সে উঠেছে। আমার কথা কী জিজ্ঞেস করে? ওকে বল, আমি শিগ্গির ফিরে আসছি। না, ওকে এখানে নিয়ে এসো না। এখানে কেউ আসবে না, একমাত্র তুমি ছাড়া।

শেষের দিকে তুমি আসা একরকম বন্ধ করে দিয়েছিলে। আমার খুব খারাপ লাগত। বিশ্বাস কর সুষমা। আমি অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। উত্তর পেয়েছিলাম বেশ কিছুদিন পর। উত্তরটাও ছিল দায়সারা গোছের। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। তুমি ঘরেবাইরে কাজের চাপে খুব ব্যস্ত জানিয়েছিলে। বলা বাহুল্য এতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। জানি, শুধু ঘরের কাজকর্ম নয়; তোমাকে দশটা পাঁচটা অফিস করতে হয়, ছেলের পড়াশুনোর দিকে লক্ষ্য রাখা, স্কুলে পৌঁছে দেওয়া...... তোমার যে অনেক কাজ, সে কি আমি জানিনি! কিন্তু তোমার মুখ সপ্তাহে একবার না দেখলে আমার দিন কাটতে চায় না। আমি সাহস পাই না। জেলের ভিতর দিনগুলি রাতগুলি অসহনীয় হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে কথা বলতে বলতে তুমি হঠাৎ কথা বন্ধ করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতে আমার মুখের দিকে। আমি সঙ্কুচিত হয়ে মুখ নীচু করতাম। মনে হোত তুমি আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছো না। ফলে অনেকটা দম আটকে আসত আমার। অন্য কারুর কথা বিশেষ ভাবিনি। আর কেউ না বুঝুক, অন্তত তুমি আমাকে ভুল বোঝনি, এটা আমার ধারণা ছিল। সবাই আমাকে অন্যরকম ভাবছে। হয়ত আমার সম্পর্কে তাদের নানারকম ধারণা। খুব খারাপ ধারণা। কিন্তু তুমি কী তাই বিশ্বাস কর?

সবাই জানে আমি খুনের দায়ে অভিযুক্ত আসামী। বাবা মা হয়ত তাই বিশ্বাস করেন। আমি প্রথম থেকেই অস্বীকার করে আসছি যে, পরিতোষকে খুন করিনি। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি আমার কথা। রিভলবারের ট্রিগারে আমার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। তাছাড়া মার্ডার কেসে সবচেয়ে আগে যা দরকার অর্থাৎ স্বচক্ষে খুন করতে দেখা কোন সাক্ষী, দুর্ভাগ্যক্রমে সেরকম একজনকে পাওয়া গিয়েছিল। ফলে অমোঘ দণ্ড নেমে এল আমার কাঁধের ওপর। ফাঁসি হবার কথা ছিল। শুধু ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন। বিচারক কি ভেবে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা না দিয়ে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। ঈশ্বরের করুণা আর কী!

স্বামী হিসেবে আমাকে তুমি বছর তিনেকের বেশি পাওনি। কোনদিন কী তোমার মনে হয়েছে আমি নিষ্ঠুরপ্রকৃতির মানুষ? আমার দ্বারা কী কাউকে খুন করা সম্ভব? জীবনে কাউকে একটা চড়চাপড় পর্যন্ত মারিনি। পিঁপড়ে মারার সাহসও আমার ছিল না। ছাপোষা ধরনের মানুষ আমি। মোটামুটি একটা চাকরী, স্ত্রী-পুত্র মা বাবা নিয়ে মিলেমিশে বাঁচার চেষ্টা—মাসে একটা সিনেমা, ছুটির দিনে মাংস ভাত, দিবানিদ্রা, বিকেলে স্ত্রী-পুত্রের সান্নিধ্যে গল্প করতে করতে চা-পান, এই তো আমার জীবন!

আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পরিতোষকে তুমি জান। শুধু ঘনিষ্ঠ বলতে সব বোঝায় না। পরিতোষ আমার চোখের সামনে আদর্শ পুরুষ ছিল। সমস্ত দিক থেকে কৃতী-পুরুষ। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি উচ্চশিক্ষিত বনেদী বংশের ছেলে। বড় পোস্টে কাজ করত। ছেলেবেলার বন্ধু। ও অনেক উঁচুতে উঠলেও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের চিড় খায়নি। যদিও পরিণত বয়সে পৌঁছে ওর সামনে নিজেকে বড় বেশি ছোট মনে হোত। একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই মিশতাম। কিন্তু পরিতোষ আচার-ব্যবহারে বা কথাবার্তায়, অন্তত আমার সঙ্গে, নাক-উঁচু ভাব দেখাত না। সহজভাবে মিশত। আমি দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলেও বারবার পরিতোষ কাছে টেনে নিত আমাকে।

সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ প্রতি শনিবার, এ ছাড়া ছুটিছাটার দিনেও মাঝে মধ্যে, সন্ধ্যের দিকে পরিতোষের ওখানে যেতাম। আমার যাতায়াত ছিল নিয়মিত। তুমি ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখতে না। তীব্র আপত্তি জানাতে। আমি শুধু হাসতাম। তোমার অমন আপত্তির কারণ ছিল পরিতোষের স্ত্রী সুষমা। আমি সরল মনে সুষমার কথা জানাতাম তোমাকে। তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুষমা সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করতে। সুষমা কতটা সুন্দরী, আমার সঙ্গে কী জাতীয় কথাবার্তা বলে, একসঙ্গে বেড়াতে যাই কিনা ইত্যাদি। শুনে আমি আরও জোরে হেসে উঠতাম। তুমি মুখ কালো করে ঘর ছেড়ে চলে যেতে।

সুষমা সম্পর্কে তুমি মনে মনে কী ভেবেছিলে জানি না। তোমার সন্দেহ বা ধারণা যে কতটা অমূলক, কোনদিন তোমাকে তা বোঝাবার চেষ্টা করিনি। কেননা পরিতোষের ওখানে নিয়মিত যাতায়াত থাকলেও সুষমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা কম হোত। কারণ কী বলছি।

হ্যাঁ, সুষমা অসাধারণ সুন্দরী। প্রথম দিন পরিতোষ আলাপ করিয়ে দিলে আমি সম্মোহিতের মত তাকিয়ে দেখেছি সুষমাকে। ওর রূপ বর্ণনা আমার সাধ্য... [illegible] আমার তো মনে হোত সুষমার মত রূপবতী রমণী আর একটিও চোখে পড়েনি।

সুষমা প্রথম থেকেই আমাকে পাত্তা দেয়নি। ওর ব্যবহারে সেটা প্রকাশ পেয়েছিল। দায়সারা গোছের দু'একটা কথাবার্তা বলে উঠে যেত। সাধারণত ড্রইংরুমে বসে আমি আর পরিতোষ আলাপ করতাম। শোবার ঘরে সুষমার হাসি, কথাবার্তার টুকরো অংশ, কানে ছিটকে আসত। পরিতোষের মুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে উঠত। কখনও ওর মুখে গাঢ় বিষাদের ছায়া লক্ষ্য করতাম। কখনও ওর চোখের দৃষ্টি ক্রূর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠত। এইসব মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়া কেমন থমথমে হয়ে যেত। পরিতোষ কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করত। পায়চারী সুরু করত ঘরের মধ্যে। ভুলে যেত আমার উপস্থিতি।

বাড়ি ফেরার পথে পরিতোষের বিবর্ণ মুখ মনে পড়ত। ঐ লোকটাই বা কে? মধ্যবয়স্ক সৌম্যদর্শন। সুসজ্জিত পোশাকে ঐ লোকটা ড্রইংরুম পেরিয়ে সোজা শোবার ঘরে চলে যেত। সুষমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কী ধরনের? নানারকম কথা ভাবতাম। কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করিনি পরিতোষকে। আর পরিতোষও সুষমার বিষয়ে আমার সঙ্গে কোনরকম আলোচনা করত না।

এই শহরে আমি বহুকাল বসবাস করছি। আমি দেখেছি সাধারণত যাঁরা উঁচুদরের চাকুরে, যাঁরা সমাজের একটা আলাদা অংশ, তাঁদের অধিকাংশই মদ্যাসক্ত। পরিতোষও উঁচুতলার মানুষ। পরিতোষও সন্ধ্যাবেলায় মদের গ্লাস হাতে করে আমার মুখোমুখি বসে কথা বলতে পারত। কখনো বেমানান কিছু হোত না। আমার কাছে স্বাভাবিক ঠেকত। কিন্তু পরিতোষ মদ তো দূরের কথা, সিগারেট পর্যন্ত খেত না। হ্যাঁ, একটা নেশা ছিল। পান খেত। কথা বলার সময় ওর মুখ থেকে সুন্দর গন্ধ ভেসে আসত। দামী জর্দার গন্ধ। মাঝে মধ্যে দু'একটা চেয়ে খেতাম।

পরিতোষের আর একটা নেশা ছিল। নিয়মিত পড়াশুনোর চর্চা করত। ড্রইংরুমে বই-এর আলমারির দিকে আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতাম। নানা বিষয়ের ওপর বই। আমার পড়াশুনোর পাট কলেজ ছাড়ার পরই চুকে গিয়েছিল। পরিতোষের অধ্যয়নরত মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হোত, ও যেন তপস্যা করছে। আমি চুপচাপ বসে থাকতাম। শোবার ঘর থেকে সুষমার চাপা হাসি ভেসে আসত। সেই সঙ্গে ভরাট পুরুষ কণ্ঠস্বর। পরিতোষ চমকে উঠত যেন। বই বন্ধ করে জানালার সামনে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াত। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত। আমি পালিয়ে আসতে চাইতাম। ভয় করত আমার। অস্বস্তি লাগত। কে লোকটা? সুষমার কাছে রোজ রোজ আসে কেন? ওরা একসঙ্গে কোথায় বেরিয়ে যায়?

তারপর সেই অভিশপ্ত সন্ধ্যা। আমি তোমাকে ভুল বুঝে করেছি। আমি [illegible]

হয়ত লোকের চোখে হেয় হয়ে থাকব। তারা জানবে আমি খুনী। তারা জানবে আমি বাল্যবন্ধুকে হত্যা করেছি তার সুন্দরী স্ত্রীর জন্যে। এর চেয়ে রসিকতা আর কিছু নেই। মিথ্যে একটা জঘন্য অভিযোগের জের টানতে হবে চিরকাল। কিন্তু তুমি যদি আর পাঁচজনের মত তাই বিশ্বাস করে ঘৃণার চোখে দেখ আমাকে তাহলে হয়ত সত্যি সত্যি ভয়ংকর একটা কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে চিরকালের জন্যে চোখের আড়াল হব। কেননা তাহলে আর আমার কিছুই থাকবে না। সব নিঃশেষ হয়ে যাবে চোখের সামনে।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলা পরিতোষের ওখানে গিয়েছি। ড্রয়িংরুমে ঢুকে পরিতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছি। দু'চোখের নীচে কালি। একমুখ দাড়ি। চোখের দৃষ্টি ভয়ংকর। আমি এক পলক তাকিয়ে মাথা নীচু করেছি। শরীর খারাপ করেছে কিনা পরিতোষকে জিজ্ঞেস করলাম। ও অস্ফুটস্বরে কী বলল শুনতে পেলাম না। ওর পরনে ওভারকোট। হাতে রবারের দস্তানা। সেদিন খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। আমি গরম চাদরে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে চেয়ারে বসেছি। একটু আগে চাকর গরম কফি দিয়ে গেছে। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে পরিতোষকে দেখছিলাম। কেমন এক ধরনের অস্থির ছটফটানি ওর। শোবার ঘর থেকে সুষমার হাসি শুনতে পাচ্ছিলাম না। সুষমা কী নেই? হয়ত ওই লোকটার সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছে। লোকটা কে?

পরিতোষকে দেখলাম শোবার ঘরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। আমি এক পলক ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকালাম। আটটা বাজে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব ভাবছিলাম। হঠাৎ শুনলাম সুষমার আর্ত চিৎকার। আর একটা ভারী জিনিস পড়ে যাবার শব্দ। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। কী করবো বুঝতে পারলাম না। ধড়ফড় করে পা কাঁপছে টের পেলাম। ছুটে গেলাম শোবার ঘরে।

বিস্ফারিত সুষমার দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সে পরিতোষের রিভলবার ধরা ডান হাত দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। পরিতোষ বাঁ-হাত দিয়ে সবেগে আঘাত করে চলেছে সুষমার মুখে। সুষমার ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। চোখ ফুলে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে আসছে ওর গলা চিরে।

—পরিতোষ! কী করছিস? আমি পরিতোষকে সরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। তিনজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ গুলির শব্দ। পরিতোষের বিশাল শরীর মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। ওর হাতের রিভলবার ছিটকে গেল ঘরের কোণে। হতভম্ব অবস্থা কাটতে একটু সময় লাগল। সুষমা কখন যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে টের পাইনি। মনে হল কে যেন আমাকে পেছন থেকে আঘাত করল। মুখ ঘুরিয়ে দেখি সেই লোকটা। কথা বলার আগেই একটা প্রচণ্ড ঘুষি এসে পড়ল আমার চোখের ওপর। তারপর চোখের সামনে নেমে এল চাপ চাপ অন্ধকার।

জান সুস্মিতা, রীতিমত গোয়েন্দা কাহিনী। আরে মজার ব্যাপারটা শোন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম একটা চেয়ারের ওপর আমি বসে। আমার সর্বাঙ্গ দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর পায়ের নীচে রিভলবার। ঘরভর্তি লোকজন। পুলিশ অফিসারকে ঐ লোকটা কী সব যেন বলছে। পুলিশ অফিসার নোটবইতে সেই সব টুকে নিচ্ছে। তারপর যা যা ঘটল তা তোমার অজানা নয়।

আজও ব্যাপারটা আমার কাছে রীতিমত রহস্যময়। পরিতোষ কী আত্মহত্যা করেছে? ধস্তাধস্তির সময় অসতর্ক মুহূর্তে রিভলবার থেকে গুলি বেরিয়ে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার মনে হয় পরিতোষকে খুন করা হয়েছে। এবং প্রকৃত খুনী কে তা আমি আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না। কেননা রিভলবারের ট্রিগারে আমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়াও কোর্টে জানিয়েছে সুষমা যে, আমি ওকে রেপ করার চেষ্টা করেছি। পরিতোষ বাধা দিতে এলে ওকে গুলি করেছি। সুষমা স্বচক্ষে আমাকে গুলি করতে দেখেছে।

আমার সঙ্গে দেখা করতে বাবা কোনদিন আসেননি। মা শুধু একদিন এসেছিলেন। জলভরা দু'চোখে আমার দিকে তাকিয়েছেন। আমি মাথা নত করেছি। মনে মনে বলেছি, 'অমনভাবে তাকিয়ো না মা। আমি কোন অন্যায় করিনি। বিশ্বাস কর মা—আমি নিরপরাধ!' সেই একদিন মাত্র। আর কোনদিন আসেননি মা।

দীর্ঘ দশ বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে গেটের বাইরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি। এদিক-সেদিক তাকিয়েছি। কেউ নেই। কেউ আসেনি। আমি আশা করেছিলাম তোমাকে। তোমাকে আগে থাকতেই জানান হয়েছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকি। মনটা একটু খারাপ হয়ে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে তোমাদের কথা ভাবছিলাম। নতুন করে জীবন শুরু করার কথা মনে পড়ছিল। চারপাশের সবকিছু কেমন অচেনা ঠেকছিল। মনে হচ্ছিল এই শহরে প্রথম পা দিয়েছি। আগন্তুকের দৃষ্টিতে মানুষজনের ভীড়, ট্রাম-বাস ঘোড়ার গাড়ি, সুসজ্জিত দোকান ইত্যাদি দেখছিলাম।

চাকরী তো আর পাব না। ব্যবসা করব। রোজগার না করলে...স্টেডি ইনকাম হলে তোমাকে আর চাকরী করতে দেব না... নোটন কী আমাকে দেখে চিনতে...হাসি পেল কেননা ওর যখন এক বছর বয়স তখনই আমি জেলে...।

গলির মোড়ে পরিচিত চায়ের দোকানের কাছে আসতেই শ্যামবাবু কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি একটু হেসে শ্যামবাবুর দিকে তাকাই। তারপর তাড়াতাড়ি সরে আসি। আরও দু-একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম। সবাই বিশেষ এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখল। ব্যাপারটা কী? পরক্ষণেই বুঝতে পেরে দু'চোখ জ্বালা করে উঠল। এরপর আমি আর কারুর মুখের দিকে তাকালাম না।

দোতলায় দু'ঘরের ফ্ল্যাট আমাদের। বহু বছর ধরে এ বাড়িতে আছি। আমার জন্ম এখানে। হয়ত আমার মৃত্যুও হবে এখানে। একঘরে বাবা-মা থাকেন। অন্য ঘরটা আমাদের।

আজ তো ছুটির দিন। ফলে তুমিও বাড়িতে আছ ভেবেছি। আমি নোটনকে দেখবার জন্যে ছটফট করছিলাম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। বারান্দায় চেয়ারে বসে বাবা চশমা চোখে কাগজ পড়ছিলেন। পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকাল। আমি মাথা নীচু করে বাবাকে প্রণাম করলাম। উনি চশমার ফাঁক দিয়ে এক পলক আমাকে দেখে নীরবে ঘরে ঢুকে যান।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম বাবার এমন অদ্ভুত আচরণের অর্থ কী। বাস্তবিক এরকম অভ্যর্থনার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। একটু পরে মা এলেন।

—মা! আমি ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মা কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। শুধু অস্ফুট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এল।

মার ভাবলেশহীন মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। চোখে চোখ পড়তে মা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন আমি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। না, মা আশ্চর্যরকম নীরব। এতদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছি—ভাল-মন্দ একটা কথাও বলছেন না দেখে চোখে জল এসে গেল। ঠোঁট কেঁপে উঠল থরথর করে। মা এক পলক তাকিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ান।

আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে কেউ নেই। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে মনে হল ভুল করে অন্য কোথায়ও চলে এসেছি। আমার মনের মধ্যে ঘরের যে ছবি ছিল তার সঙ্গে মেলাতে পারছি না। খাটের কিছুটা দূরে ছোট্ট একটা তক্তপোষ। এটা আগে ছিল না। ড্রেসিংটেবিলের ওপর আমাদের যে যৌথ ছবি ছিল সেটা নেই। সেখানে রয়েছে একটি বালকের বিভিন্ন বয়সের কয়েকটা ছবি। আমি সাগ্রহে ছবিগুলি দেখতে থাকি। আমার নোটন এত বড় হয়েছে! কিন্তু নোটন কোথায়?

সন্ধ্যার বেশ পরে তুমি নোটনকে নিয়ে এলে। আমাকে দেখে তোমার মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। অনেকটা অপ্রস্তুত ভাব। নোটনকে আমি দু'চোখ ভরে দেখলাম। গায়ের রঙ থেকে তাকানোর ভঙ্গি সব তোমার মত। ও আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। আমি ওর কাছে এসে দাঁড়াতে ও তাড়াতাড়ি সরে গেল তোমার পিছনে।

—দ্যাখ, ছেলে বাপকে চিনতে পারছে না। আমি হেসে নোটনকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলাম, শুনে যাও। বল তো, আমি তোমার কে?

—নোটন, হাত-মুখ ধুতে যাও। তুমি গম্ভীর গলায় বলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু বিমর্ষভাবে হাসলে। নোটন মাথা নীচু করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

—আমি আশা করেছিলাম তুমি...। কোথায় গিয়েছিলে?

—নোটনকে অনেকদিন ধরে বলছিলাম চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব...তুমি কখন ফিরলে?

—দুপুরে। নোটনকে ডাকলাম...ছেলেটা ঠিক তোমার মত দেখতে...ডাকলাম অথচ এল না।

—এই প্রথম দেখল। দুদিন যাক ঠিক হয়ে যাবে।

লক্ষ্য করছিলাম, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ না, কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে উঠছো। মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছো। এতদিন পর বাড়ি ফিরেছি, দীর্ঘ দশ বছর, বাবা মা'র মত তুমিও জিজ্ঞেস করলে না, আমি কেমন আছি। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, আমি এ বাড়িতে অবাঞ্ছিত আগন্তুক। অথচ দশ বছর আগে আমাকে খুশি করবার জন্যে তোমাদের সকলের...।

—ছবিটা কোথায়?

—কোন্ ছবি। তুমি এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলে। তোমার স্বাস্থ্য চেহারা চকচক করছিল। মনে মনে ভাবলাম বেশ সুখেই আছ। অতিরিক্ত সুখের মধ্যে থাকলে বোধহয় মুখের চামড়া এমন মসৃণ টানটান হয়ে ওঠে।

—বাঃ বিয়ের পর যে ছবি তুলেছিলাম...ওই তক্তপোষটা আবার কবে কিনলে?

—নোটন শোয়। ছবি বাক্সের মধ্যে। তুমি চা খেয়েছো?

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে তুমি। মনে হল আমার, সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তোমার। চা বানাবার অছিলায় পালিয়ে গেলে।

আমি অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে একা বসে রইলাম। তোমার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলব—আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল তোমাদের সকলের অদ্ভুত ব্যবহার দেখে। একা ঘরে বসে অনেক কথা মনে পড়ছিল। এই দিনটির জন্যে কত না ভেবেছি। ফিরে আসার পর তোমাদের হাসিমুখ দেখব, তোমরা আমাকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত হবে, আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, বার বার বলবে বড় রোগা হয়ে গেছি, আমাকে ঘিরে থাকবে তোমাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলি—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তা ছিল আমার স্বপ্ন, আমার অলীক কল্পনা!

নরম পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি নোটন। গুটি গুটি পায়ে বই হাতে করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি ওকে ডাকলাম। ও একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। উঃ কী আতঙ্ক ওর দু চোখে! যেন কোন দৈত্যের সামনে আচমকা পড়ে গিয়েছে।

—শোন। আলতো হেসে নোটনের দিকে এক পা বাড়াতেই হঠাৎ অদ্ভুত এক কান্ড ঘটল। নোটন কেঁদে ফেললো। তারপর ঝড়ের বেগে আমার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

তুমি একটু পরে এক কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকে ম্লান মুখে বললে, এই নাও।

—আচ্ছা, নোটনকে ডাকতেই ওভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল কেন? আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে তোমার মুখ দেখতে থাকি।

কিছুক্ষণ তুমি কোন জবাব দিলে না। আমার মুখ দেখছিলে মাঝে মাঝে। দু-একবার চোখাচোখিও হল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে, মনে মনে এক ধরনের রাগ আর বিরক্তি, অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করছিলাম।

—ওর কোন দোষ নেই। আসলে...কী বলবো...বুঝতেই পারছো...।

বাবা-মা কী আজও বিশ্বাস করেন... সুমিতা, আমার চোখের দিকে তাকাও, কী নিষ্ঠুরভাবে সবকিছু বদলে গিয়েছে!

—থাক ওকথা। তুমি ফিরে বাবার জন্যে পা বাড়ালে আমি ভগ্নকণ্ঠে তোমার নাম ধরে কয়েকবার ডাকলাম।

তুমি ভাবলেশহীন মুখে আমার দিকে তাকালে। আমি একসঙ্গে এত কথা বলতে চাইলাম যে, কোন আওয়াজ বেরোয় না, থরথর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট। তুমি নীরবে বেরিয়ে গেলে।

একা ঘরে অসহ্য লাগল। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলাম। রান্নাঘর থেকে তোমার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। আমি আস্তে আস্তে বাবার ঘরে ঢুকলাম। বাবা চিৎ হয়ে শুয়ে। নোটন মেঝেয় বসে পড়ছে।

—আপনার কাশিটা কী কমেছে বাবা?

চমকে উঠলেন যেন বাবা। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি দু চোখ নত করলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। কোন কথা বললেন না বাবা। দেখলাম উনি পাশ ফিরে শুয়েছেন। নোটন আমার উপস্থিতি গ্রাহ্যই করল না। মাথা নীচু করে পড়তে লাগল।

তারপর মাত্র কয়েকদিন আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। না থাকলেই ভাল হোত। কেননা এ কয়েকটা দিন আমার অপমানের ইতিহাস। আমি বার বার এগিয়ে গিয়েছি তোমাদের সকলের কাছে। বার বার তোমরা নীরবে দূরে ঠেলে দিয়েছো আমাকে। পাঁচটা কথা বললে একটা কথার উত্তর পেয়েছি। তোমাদের এমন পরিবর্তনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। রাত্রে ঘুমোতে পারি নি ঘুম ভেঙে গেলে মশারী তুলে বাইরে এসেছি। তুমি নীচে বিছানা পেতে শুয়েছো। নোটন তক্তপোষে। খাট ছেড়ে দিয়েছো আমাকে। আমি তোমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি অনেকক্ষণ। মশারি তুলে যে ভেতরে যাব, তোমার পাশে গিয়ে শোব, তোমাকে জড়িয়ে একটু আদর করব, সে সাহসও পাই নি। অথচ তুমি পরস্ত্রী নও। ভেবে দ্যাখ সুমিতা, কী আশ্চর্য প্রহসন!

তুমি যদি অন্যপুরুষে আসক্ত হতে, আঘাত পেতাম, রাগ করতাম, নানারকম ভয় দেখাতাম তোমাকে। বাবা-মা যদি আমাকে তিরস্কার করতেন, কান্নাকাটি করতেন, সেও ভাল ছিল। কিন্তু এসব কিছুই নয়। সবাই তোমরা কেমন আশ্চর্য-রকম নীরব হয়ে গিয়েছিলে।

ভালো লাগা

না, ভালো লাগে না। একালের মানুষের এই এক অভিযোগ, ভালো লাগে না। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় কোনো সময়েই সাড়া জাগে না মনে। অদ্ভুত এক ধরনের বিস্বাদ, অনির্দিষ্ট এক জাতের অস্থিরতা গ্রাস করে আছে সমস্ত চেতনা। সব কিছুর মধ্যে থেকেও সে যেন দলছাড়া, কোথায় সে যেতে চায় তা না জেনেও কোথাও যেন সে দাঁড়াতে পারছে না এক মিনিট। কিছুতেই তার ভালো লাগে না।

অথচ ভালো লাগানোর মতো আয়োজন রয়েছে চতুর্দিকেই। আজকের সিনেমা-থিয়েটার, নাচঘর, পানশালা, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, সবই ভালো লাগার জন্যেই। তাতেও যদি মন না ভরে, বেরিয়ে পড়ুন দেশ-ভ্রমণে—হাইকিং বা ক্রুইজিঙে। কিম্বা চলে যান কোনো ভরাইয়ের পথে ট্রেকিঙে অথবা বরফ-ঢাকা পাহাড়ী ঢালুতে স্কেটিং-এ। উপচারে কোনো ত্রুটি নেই, ডালা সাজানো রয়েছে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই। তিক্তে তবু সুখ নেই মানুষের। কোনো হাতছানিতেই আর তরঙ্গ ওঠে না মনে। সে শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সবকিছু, ব্যাপৃত রাখে নিজেকে। মনে হয় বুঝি, বেশ আছে, ভালোই আছে। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে যদি জানতে চান তার খবর, অমনি শুনবেন সে ভালো নেই, কিছুই আর তার ভালো লাগে না।

আমাদের মতো গরীব দেশে ভালো না লাগার কথা শুনলে, প্রথমেই মনে আসে টাকা-পয়সার কথা, অভাব অনটনের কথা। নুন আনতে যার পান্তা ফুরোয়, ভালো লাগা যেন তার বিলাসিতা। কিন্তু না, আমি দারিদ্র্য ব্যাপারটাকে ছোটো করে দেখছি না, আর্থিক টানাটানি যে মানুষকে আন্তরিকভাবেই উদ্‌ভ্রান্ত করে রাখে তা আমি জানি। তা সত্ত্বেও ঘটনা হল এই যে, অর্থ-কষ্ট মিটলেই মনঃকষ্ট মেটে তা বলা যায় না। অন্তত ইউরোপ আমেরিকার যেসব দেশে আর্থিক সম্পত্তি যাকে বলে উথলে পড়ছে, সেসব দেশের ইতিহাস অন্য কথাই বলে। কোটি কোটি ডলার ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে সারা দুনিয়াটা চষে বেড়াচ্ছে সেসব দেশের মানুষ, কিন্তু পরিসংখ্যানে বলে, মনস্তাপের ফলে আত্মহত্যার হিড়িক সেখানেই বেশি। হেন কাজ নেই যা ওরা না করে দেখেছে। যুদ্ধ কিংবা শান্তি ব্যাবসা কিম্বা বৈরাগ্য, কিছুতেই যেন তাদের মন ওঠে না। আজকের ভালো লাগাতে কাল অরুচি ধরে। মদের পাত্র শূন্য হলে আসে মারিজুয়ানা, মারিজুয়ানা পুরনো হতে না হতেই ডাক পড়ে হয়তো হাশিসের, কিম্বা হয়তো এল এস ডি-র। কাজেই প্রচুর আয়োজন থাকলেই যে প্রচুর সুখী হওয়া যায়, এ তর্ক ধোপে টেকে না। অবিশ্যি, কিছু না থাকলেই যে সুখের পাত্র উপচে পড়ে, তাও নয়। বরং আগেই যা বলেছি, টাঁকে কিছু না থাকলে সুখী হবার সম্ভাবনা আরোই কম। কিন্তু মুশকিল এই যে, কিছু না থাকার থেকে থাকার দিকে যেতে যেতে সীমারেখা ঠিক কোথায় টানতে হবে কিছুতেই তার হদিশ পাই না আমরা। সারাটা জীবন তাই কাটে আমাদের অনির্ণেয় একটা ছটফটানির ভেতর দিয়ে। কিছুই আমাদের ভালো লাগে না।

দুর্লভ চক্রবর্তী

অনেকে হয়তো মনে করেন, এককালে আমাদের এই অস্থিরতা ছিল না। এক হিসেবে কথাটা হয়তো সত্যি। সুখের আয়োজন তখন কম ছিল, সময় চলত তখন ঢিমে তালে। আমরা ভাবতাম, বেশ আত্মতুষ্টির মধ্যে কাটছে বুঝি দিনগুলো। কিন্তু তলায় কি তার কোনো অশান্তিই ছিল না? তাহলে আর বদলালো কেন সেদিনের বাঁধা পথের ছক? বদলালো, কারণ আমরা সেই পুরনো ছকের মধ্যে থাকতে চাইনি, থেকে স্বস্তি বোধ করিনি। অর্থাৎ সুখী ছিলাম না আমরা, যতোটা সুখী দেখাতো ততোটা সুখী ছিলাম না। আমরা কখনো কখনো স্পষ্ট করেই বলে ফেলতাম সে কথা। বলতাম,

> শুধু দিনযাপনের
> শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
> শরমের ডালি,
> নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে
> ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
> ধূমাঙ্কিত কালি,
> লাভ-ক্ষতি-টানাটানি,
> অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ
> কলহ সংশয়—
> সহে না সহে না আর
> জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
> দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

এবং ইত্যাদি। খুব একটা সুখকর পরিস্থিতি বলা চলে না। তবে হ্যাঁ, সেকাল থেকে একালে অসুখী হবার মাত্রা বেড়েছে আরো হাজার গুণ। আর ভালো না লাগাটাই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন 'অর্ডার অব দি ডে'।

তার মানে অবিশ্যি এ নয় যে, ভালো না লাগাটাকে আমি মেনে নিচ্ছি। কিম্বা বলছি, এইটেই আমাদের নিয়তি। মোটেই তা নয়। আমার সিদ্ধান্ত বরং উল্টো দিকে। আমি বলব, ভালো লাগা মন্দ লাগার ধারণাটাই আমাদের আপেক্ষিক। আগের চেয়ে বেশি করে ভালো না লাগার মাত্রা বেড়েছে, তার মানে নিশ্চয় এও তো যে ভালো লাগার নিরিখটাও গেছে আমাদের বদলে? আগে যেমন ঘুড়ি উড়িয়ে কি বাই-নাচ দেখে আমাদের ভালো লাগত, এখন আর তা লাগে না। এখন ভালো লাগার জটিলতা বেড়েছে, সূক্ষ্মতা বেড়েছে, এবং বেড়েছে তার গভীরতাও। আর তা যে বাড়তে পেরেছে, সে তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই। অর্থাৎ এক ধাপ উঠেই তো পরের ধাপের জন্যে পা বাড়াতে পেরেছি।

কিন্তু এসব হল তত্ত্বকথা। এ দিয়ে মন ভরে না, তা আমি জানি। আমি তাই বলব, আমরা পার হচ্ছি একটা যুগসন্ধির ভেতর দিয়ে। আমরা পাড়ি জমাতে যাচ্ছি চাঁদের দিকে, গ্রহান্তরের দিকে। নতুন এক সম্ভাবনার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। আমাদের ভবিষ্যতে যা আছে তার তুলনায় এতদিনের মানবসভ্যতা মনে হবে যেন পাঠশালার হাত মক্স করা। অতএব, হে পার্থ, ক্লীবতা পরিহার করো; ওঠো, জাগো, প্রাপ্য বরকে অর্জন করে নাও। ভালো লাগাবে, তখন নিশ্চয়ই ভালো লাগবে আমাদের। ভালো লাগার জন্যেই তো এত সাধনা।

আগের ঘটনা

[চট্টগ্রামের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।
কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ও'রা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের খবর, চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিনিসপত্রের দামও আকাশছোঁয়া।

এমন সময় এল সেই মারাত্মক সংবাদ। জাপানীরা বোমা ফেলেছে বর্মায়। সেখান থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে ভারতে। রাজদিয়াতেও জান্ নিয়ে ফিরে এসেছে একটি পরিবার।]

।। ছেচল্লিশ ।।

স্নেহলতা বললেন, 'ত্রৈলোক্য সেন একাই এসেছে?'

হেমনাথ বললেন, 'একা আসবে কি, ছেলেপুলে নাতি-নাতকুড়—সবাইকে নিয়ে এসেছে। তাদের কোথায় রেখে আসবে?'

'হঠাৎ চলে এল!'

'বা রে, তুমি কি কিছুই খোঁজ রাখো না?'

একটু অবাক হয়ে স্নেহলতা বললেন, 'কিসের খোঁজ!'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'বর্মায় জাপানীরা বোমা ফেলেছে। অনেক লোক মরেছে। বাড়িঘর রাস্তাঘাট, সব ধ্বংসস্তূপ। বোমা পড়তেই রেঙ্গুন শহর থেকে লোক পালাতে শুরু করেছিল। শহর এখন একেবারে ফাঁকা।'

কোথায় বর্মা, কোথায় জাপান, কোথায় শ্বেতসাগর, কোথায় ডানজিগ-সেবাস্টিপুল-মস্কো, কোথায় বলকান-যুগোশ্লাভিয়া-পোলান্ড—ভূগোলের কোন প্রান্তে এই জায়গাগুলো পড়ে আছে, দুই গোলার্ধের কোথায় কোথায় বোমা পড়ছে, কত লোক মরছে, মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য কারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, এ সব কোন খবরই রাখেন না স্নেহলতা। এই রাজদিয়া, হাচাই পালের মেয়ের মাঘমন্ডলের ব্রত, নাটাই চন্ডীর ব্রত, নীলপুজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, বাস্তুপুজো, কারো বিয়ে হলে জলসইতে যাওয়া, বাসর জাগা—এ সবের মধ্যেই তাঁর ভূমণ্ডল, তাঁর জগৎ। এতকাল এর বাইরের কোন কিছু সম্বন্ধেই তাঁর বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনা ছিল না।

ভীত সুরে স্নেহলতা বললেন, 'তাই নাকি; এত কান্ড হয়েছে!'

'হ্যাঁ। ঐরকম অবস্থায় মানুষ কখনও বর্মায় পড়ে থাকতে পারে?'

'তা তো ঠিকই।'

হেমনাথ বললেন, 'ত্রৈলোক্যদের যা দুর্গতি হয়েছে কি বলব—'

'তবে এল কি করে?'

'হেঁটে।'

'বর্মা তো শুনেছি অনেক দূর!'

'হ্যাঁ। ছেলেপুলে নাতি-নাতনীর হাত ধরে পাহাড়-পর্বত-বন জঙ্গল পেরিয়ে আসাম এসেছে। সেখান থেকে ট্রেনে রাজদিয়া।'

একটু ভেবে স্নেহলতা বললেন, 'হেঁটে তো এসেছে। জিনিসপত্র কিছু আনতে পেরেছে কি?'

হেমনাথ জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'কিছু না, কিছু না। নিজের নিজের হাত-পা আর পরনের জামা-কাপড় ছাড়া কুটোটুকুও আনতে পারে নি।'

'আহা রে, কী কষ্ট!'

একটু চুপ।

তারপর স্নেহলতা আবার বললেন, 'অনেককাল পর ত্রৈলোক্য সেনরা রাজদিয়া এল, তাই না?'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। তা বছর তিরিশেক হবে।'

'বর্মায় ওরা তো বেশ ভালোই ছিল?'

'ভাল বলে ভাল। বিরাট অবস্থা করে ফেলেছিল ত্রৈলোক্য। এক রেঙ্গুনেই তিনখানা বাড়ি, প্রোমে ছিল একখানা। তা ছাড়া জমিজমা, নারকেল বাগান। নগদ টাকা পয়সাও প্রচুর।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নেহলতা বললেন, 'কিছুই আনতে পারল না। সর্বস্ব কেমন বিদেশে পড়ে রইল।'

হেমনাথ বললেন, 'বাড়িঘর যাক। নিজের নিজের প্রাণটুকু নিয়ে যে আসতে পেরেছে, এই ঢের।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে স্নেহলতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ভালো কথা—'

'কী?'

'অনেককাল ওরা ছিল না। রাজদিয়ায় এদের বাড়ি তো জঙ্গলে ঢেকে গেছে। তা উঠল কোথায়? আমাদের বাড়ি নিয়ে এলেই পারতে। যদ্দিন না কিছু একটা ব্যবস্থা হয় এখানেই থাকত।'

হেমনাথ বললেন, 'ভালো জায়গাতেই উঠেছে, সে জন্যে চিন্তা নেই। স্টিমারঘাটা থেকেই রামকেশব ত্রৈলোক্যদের নিজের বাড়ি নিয়ে তুলেছে।'

'আপাতত ওখানেই থাকছে তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'কাল একবার যাব।'

'হ্যাঁ, যাওয়া দরকার।'

ম্যাপ বইতে বর্মার মানচিত্র দেখেছে বিনু। ভারতবর্ষের ঠিক গায়েই ব্রহ্মদেশ। আরাকান, ইরাবতী, পেগু, মান্দালয়—সে দেশের নদ-নদী শহর বন্দরের নাম ভূগোল বইয়ের কল্যাণে তার মুখস্থ। ম্যাপে যত কাছে মনে হয়, ব্রহ্মদেশ আসলে তত কাছে নয়—সে কথা বিনু জানে। ভারতবর্ষ, বিশেষ করে এই রাজদিয়া থেকে বর্মা শত শত মাইল দূরে।

রাজদিয়া নামে জলবাংলার এক অখ্যাত নগণ্য মফস্বল শহরের লোক বর্মায় গিয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর ছিল, জাপানী বোমায়

ভয়ে এতকাল পর সপরিবারে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আবার জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। একধারে দাঁড়িয়ে ত্রৈলোক্য সেনদের কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চোখে আর পলক পড়ছিল না বিনুর। বুকের ভেতর শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল 'তোমার সঙ্গে আমিও যাব দিদা—' ত্রৈলোক্য সেনদের দেখবার জন্য মনে মনে সে অস্থির, উৎসুক হয়ে উঠেছে।

বিনু যেতে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুকও সুর ধরল, 'আমিও যাব ঠাম্‌মু (ঠাকুমা)।'

দেখা গেল সুধা-সুনীতি, এমন কি সুরমা-শিবানী-অবনীমোহনেরও এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহ। বর্মা ফেরত মানুষগুলোকে দেখার জন্য সকলে পা বাড়িয়ে আছে।

স্নেহলতা বললেন, 'সবাই যাবে।' বলেই হেমনাথের দিকে ফিরলেন, 'ওদের জিজ্ঞেস করেছ ?'

হেমনাথ বললেন, 'কী ?'

'টাকা পয়সা কি অন্য কিছুর দরকার আছে কিনা ?'

'না। সবে এসেছে। তা ছাড়া, রামকেশব নিজের বাড়ি নিয়ে গেছে। এক্ষুনি জিজ্ঞেস করাটা খারাপ দেখায়।'

একটু চুপ করে থেকে স্নেহলতা বললেন, 'আমি কিন্তু কাল ত্রৈলোক্যঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করব।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন 'কোরো। তবে রামকেশবের সামনে না।'

'তা তোমাকে বলে দিতে হবে না। আমার ঘটে সেটুকু বুদ্ধি আছে।' স্নেহলতা হাসলেন

'আছে নাকি!' হেমনাথও হাসলেন।

বাকি দিনটা ত্রৈলোক্য সেনদের আলোচনাতেই কাটল।

ত্রৈলোক্য সেনের বাবা ছিলেন নামকরা কবিরাজ, লোকে বলত স্বয়ং ধন্বন্তরি। অম্বিকা কবিরাজ ছুঁলেই নাকি রোগ অর্ধেক সেরে যেত। কবিরাজি তাঁদের কৌলিক ব্যবসা, বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল। বিপুল পশার ছিল অম্বিকা কবিরাজের। ঢাকা-বরিশাল-ময়মনসিং দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর ডাক আসত। প্রচুর পয়সাও করেছিলেন। লোকে সম্মান করত ভক্তি করত।

জলবাংলার দূর-দূরান্ত থেকে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিখতে অম্বিকা সেনের কাছে ছাত্ররা আসত। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও নিজের ছেলেকে কুলবিদ্যা ধরাতে পারেননি অম্বিকা সেন। বংশগত ব্যবসা না করুক, ছেলে অন্তত লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। এই আশায় ত্রৈলোক্যকে ইংরেজি স্কুলে পাঠিয়েছিলেন অম্বিকা কবিরাজ। তখন ইংরেজির খুব রবরবা, তার তোপের মুখে ভারতবর্ষের যত প্রাচীন বিদ্যা উড়ে যাচ্ছে। এক-আধ পাতা 'এ বি সি' শিখলেও করে খেতে পারবে।

কিন্তু দু-চার বছরের বেশি ইংরেজি স্কুলে যাতায়াত করেন নি ত্রৈলোক্য সেন। আসলে লেখাপড়ায় মনই ছিল না। যৌবনের শুরুতেই বেছে বেছে খারাপ সঙ্গী জোগাড় করেছিলেন। কুসঙ্গে পড়ে নেশা-টেশা ধরেছিলেন, মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটিয়ে আসতেন। অনেকবার যুগীপাড়া, তেলীপাড়া থেকে মার খেয়ে এসেছেন।

ছেলের চরিত্র শোধরাবার জন্য কম বয়েসেই বিয়ে দিয়েছিলেন অম্বিকা সেন। সে আমলে মেয়েদের ছোটবেলাতেই বিয়ে হত। ঘরে যাতে ছেলের মন বসে, তাই খুঁজে খুঁজে যুবতী পুত্রবধূ এনেছিলেন। তাতে কাজও হয়েছিল। ত্রৈলোক্য সেন আর বাড়ি থেকে বেরুতেন না।

ছেলেকে তরুণী মেয়ে ঘুষ দিয়ে নিজের ইচ্ছামতন হয়তো চালাতে পারতেন কিন্তু তার আগেই অম্বিকা সেন মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর যা কিছু সঞ্চয় ভেঙে ভেঙে খেলেন ত্রৈলোক্য সেন। তারপর একে একে দেড়শ কানি ধানজমি বেচলেন। পৈতৃক বাড়িখানা ছাড়া যখন আর কিচ্ছু নেই সেই সময় একদিন ছেলেপুলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সুদূর বর্মায় পাড়ি দিলেন ত্রৈলোক্য। এত রাজ্য থাকতে কেন যে মগের মল্লুকে গেলেন, তিনিই জানেন।

সে কি আজকের কথা! তিরিশ বছর আগে, তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয় নি ত্রৈলোক্য সেন বর্মা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হেমনাথকে একখানা মোটে চিঠি লিখেছিলেন, তারপর এতকাল রাজদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানী বোমার ভয়ে দেশে ফিরে আসতে হল তাঁকে।

ভাগ্যের সন্ধানে বর্মায় গিয়েছিলেন ত্রৈলোক্য সেন। ভাগ্য তাঁকে ছলনা করে নি দশ হাতে ঢেলে দিয়েছিল। কাঠের ব্যবসা করে অজস্র পয়সা করেছিলেন বাড়ি-ঘর করেছিলেন। কিন্তু জীবন এমন ব্যঙ্গরসিক যে সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে।

পরদিন বিকেলবেলা বিনুরা রামকেশবের বাড়ি গেল।

ত্রৈলোক্য সেনরা যে জাপানী বোমার ভয়ে চলে এসেছেন, সে খবর জানতে কারো বুঝি বাকি নেই। সারা রাজদিয়া যেন রামকেশবের বাড়িতে ভেঙে পড়েছে। রাজদিয়া কেন, আসে-পাশের গ্রাম-গঞ্জ থেকেও অনেকে এসেছে। সবার চোখে-মুখে আগ্রহ, বিস্ময় ভয় এবং আতঙ্ক।

বিনুরা যেতেই সাড়া পড়ে গেল। চারপাশের ভিড়টা বলাবলি করতে লাগল 'হ্যামকত্তার বাড়িত থনে আইছে'

'ভিতরে যাইতে দাও।'

খবর পেয়ে রামকেশব ছুটে এলেন সম্ভ্রমের সুরে বললেন, 'আসুন, আসুন বৌ-ঠাকরুণ। কাল হেমদাদা এসেছিলেন, তাঁর মুখে নিশ্চয়ই ত্রৈলোক্যদাদার খবর পেয়েছেন—'

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো ছুটে এলাম।'

'তা জানি—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন স্নেহলতা।

রামকেশব আবার বললেন, 'ত্রৈলোক্যদাদা এসেছেন বলে গরীবের বাড়ি আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।'

চোখ কুঁচকে মাথা নেড়ে নেড়ে কপট রাগের গলায় স্নেহলতা বললেন, 'আমি বুঝি আসি না ?'

'কই আর আসেন! কদ্দিন পর এলেন নিজেই হিসেব করে দেখুন।'

'হিসেব আমার করাই আছে।'

'তবে তো ভালই হয়েছে। কতকাল পর এলেন, চট করে বলে দিতে পারবেন।'

রণে ভঙ্গে দিলেন স্নেহলতা। হাসতে হাসতে বললেন, 'হিসেব-নিকেশ ভবিষ্যতের জন্যে থাক। এখন সেনঠাকুরপোর কাছে নিয়ে চলুন।'

কৌতুকের গলায় রামকেশব বললেন, 'অমন মোহনহাসি হাসলে চলবে না। কোমর বেঁধে ঝগড়া করব, তবে ছাড়ব।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আমি তার জন্যে তৈরী।'

'দেখা যাবে।'

রামকেশব তাঁদের নিয়ে দোতলার একটা ঘরে এলেন। এ ঘরে সব চাইতে বেশি ভিড়। একটি লম্বা মতন সুপুরুষ বৃদ্ধকে ঘিরে রাজদিয়াবাসী অনেক লোকজন বসে আছে।

বৃদ্ধ কিছু বলছিলেন। আর চারধারের জনতা উদগ্রীব হয়ে শুনছিল; শ্বাস টানতে পর্যন্ত তারা ভুলে গেছে।

ঢুকেই রামকেশব ডাকলেন 'সেনদাদা—'

বৃদ্ধটি তাকালেন, 'কী বলছ ?'

বোঝা গেল উনিই ত্রৈলোক্য সেন। রামকেশব বললেন, 'আপনার আরো কিছু শ্রোতা এসেছে।' বলে স্নেহলতাকে দেখিয়ে দিলেন, 'ওঁকে চিনতে পারছেন ?'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ত্রৈলোক্য। ধীরে ধীরে বললেন, 'চেনা-চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।'

রামকেশব বললেন, 'আমাদের বৌ-ঠাকরুণ। হেমদাদার—'

চোখের তারায় আলো নেচে গেল ত্রৈলোক্যর, 'আর বলতে হবে না। ওঃ, কতকাল পর আপনাকে দেখলাম। চিনবার কি উপায় আছে, চুলটুল সব পাকিয়ে ফেলেছেন।'

'চুল পাকবে না! আয়নায় নিজের চেহারাখানা দেখেছেন! আপনিও কিন্তু আর নবীন যুবকটি নেই।'

'তা যা বলেছেন।' বলতে বলতে উঠে এসে স্নেহলতাকে প্রণাম করলেন ত্রৈলোক্য।

বিব্রতভাবে পিছোতে পিছোতে স্নেহলতা বললেন, 'থাক থাক, আবার প্রণাম কেন?'

ত্রৈলোক্য বললেন, 'আপনি আমাদের প্রণামের পাত্রী তাই—'

রামকেশব এরপর একে একে অবনীমোহন, সুরমা, সুধা-সুনীতিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

পরিচয়-পর্ব চুকলে ত্রৈলোক্য বললেন, 'বেশ বেশ। বসুন বৌঠাকরুণ, বোসো বাবা অবনী, সুরমা তোমরাও বোসো।'

সবাই বসবার পর স্নেহলতা বললেন 'আপনাকে তো দেখছি। আমার 'বোন, ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনীরা কোথায়?'

'বড় নাতি ছাড়া আর সবাই আমাদের বাড়ি দেখতে গেছে।'

'আপনাদের বাড়ি কি আর বাসের যোগ্য আছে?'

'কি করে থাকবে বলুন। কতকাল আমরা দেশছাড়া। বাড়ি-ঘর এখন জঙ্গলে ভর্তি, সাপ-খোপের আস্তানা হয়ে উঠেছে। আজ থেকে কামলা লাগল। বাড়ি সারিয়ে-সুরিয়ে যেতে হবে তো। রামকেশবের ওপর কদ্দিন আর জুলুম করব!' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়তে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'শ্যামল কোথায় রে, শ্যামল—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় যে ছেলেটি এসে দাঁড়াল তার বয়েস চোদ্দ পনেরর মতন। বিনুর সমবয়সী হবে। কি বছর খানেকের বড়।

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, লম্বাটে মুখ, ভাসা-ভাসা বড় চোখ, গায়ের রঙখানি উজ্জ্বল শ্যাম। সব মিলিয়ে চেহারাটি ভারি মিষ্টি, তাকালেই চোখ স্নিগ্ধ হয়ে যায়। ছেলেটির শ্যামল নাম সার্থক। নামের সঙ্গে চেহারার এমন মিল কদাচিৎ দেখা যায়।

ত্রৈলোক্য ডাকলেন, 'আয়—'

ছেলেটি ভেতরে এল। ত্রৈলোক্য বললেন, 'এই আমার বড় নাতি।' স্নেহলতাদের দেখিয়ে শ্যামলকে বললেন, 'ইনি ঠাকুমা। উনি হলেন মাসিমা, উনি মেসোমশায়, ওরা দিদি—, যাও প্রণাম কর।'

ঢিপ ঢিপ করে স্নেহলতা-সুরমা-অবনীমোহন-সুধা-সুনীতির পায়ে কপাল ঠেকিয়ে বিনুর পাশে গিয়ে বসল শ্যামল।

এদিকে ঘরের অন্য লোকজন যারা আগে থেকে বসে ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কিছু অবশ্য বলছে না। তবে মুখ-টুখ দেখে তা টের পাওয়া যায়।

স্নেহলতা লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, 'আমরা আসবার আগে কী কথা হচ্ছিল সেন-ঠাকুরপো?'

'এই বর্মার কথা বলছিলাম সবাইকে।'

রামকেশব বিনুদের পৌঁছে দিয়ে চলে যান নি, একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'সেনদাদা কাল থেকে কতবার যে বর্মার কথা বলছে, লেখাজোখা নেই। সারাদিন লোক আসছে, সারাদিনই বকবকানি চলছে। বকতে বকতে মুখে ফেনা উঠবার জোগাড়।'

ত্রৈলোক্য হাসলেন, 'কি আর করা যাবে। লোকে এত আগ্রহ নিয়ে আসছে। না শুনিয়ে পারি কখনও?'

স্নেহলতা বললেন, 'আমরাও কিন্তু বর্মার গল্প শুনতে এসেছি।'

ত্রৈলোক্য বললেন, 'নিশ্চয়ই।' বলে ভিড়টার দিকে তাকালেন, 'বৌঠাকরুণ এসেছেন। তা হলে গোড়া থেকে আবার শুরু করা যাক।'

দেখা গেল, এ ব্যাপারে কারো আপত্তি নেই। সবাই মাথা নেড়ে বলল, 'হ-হ হেই ভাল। আরেকবার শুনা যাইব।'

ত্রৈলোক্য আরম্ভ করলেন। বেশ সুখেই ছিলেন তাঁরা বর্মায়। হঠাৎ কেন যে যুদ্ধ লাগল। আর লাগবি না লাগ পৃথিবীতে ঢের জায়গা পড়ে ছিল। সেসব ছেড়ে জাপানী ব্যাটারা এসে বর্মার ওপর বোমা ফেলল। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না, পলক পড়তে না পড়তেই বহুকাল ধরে তিল তিল সাধনায় গড়ে-ওঠা মনোরম জনপদ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতন কাত হয়ে পড়ল, রাস্তায় রাস্তায় প্রকাণ্ড গর্ত। আহত মানুষের চিৎকার, স্তূপাকার মৃতদেহ, ঘন ঘন সাইরেনের শব্দ, ঝাঁক ঝাঁক জাপানী প্লেনের আক্রমণ—সব মিলিয়ে বর্মা যেন নরকের আরেক নাম।

ত্রৈলোক্য বলতে লাগলেন, 'বোমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুন টেঙ্গুন থেকে পালানোর হিড়িক লেগে গেল। কিন্তু যাবে কোথায়? বার্মীজরা গ্রামের দিকে পালাল। আর ইন্ডিয়ানরা ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু আসতে চাইলেই তো আসা আসা যায় না। দশ দিন বারোদিন পর একটা করে কলকাতার জাহাজ। দামের তিন গুণ দিয়েও তার টিকিট পাওয়া যায় না। এদিকে রেঙ্গুনে বসে থাকা মানে নির্ঘাত মৃত্যু। অগত্যা বহু মানুষ হাঁটা পথ ধরল, আমরাও পা দুখানার ওপর ভরসা করে রওনা হলাম।'

স্নেহলতা বললেন, 'তারপর?'

'সে যে কী কষ্ট, বলে বোঝাতে পারব না বৌঠাকরুণ। পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে দিনের পর দিন হাঁটছি তো হাঁটছিই। হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে গেল। কত লোক যে আসতে আসতে রাস্তায় পড়ে মরেছে, তার হিসেব নেই। সে যাই হোক, খাদ্য নেই, জল নেই। খিদের জ্বালায় পেট পুড়ে গেছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে। কোথাও ঝর্ণা দেখে হয়তো ছুটে গেছি। কাছে যেতেই চোখে পড়েছে, দা হাতে মগেরা দাঁড়িয়ে আছে। দশ টাকা করে দিলে এক বাটি জল পাওয়া যাবে। ভয়ে ভয়ে ফিরে এসেছি। কোথাও বনের ভেতর কলা ফলে আছে। সেখানেও দা হাতে মগ। হাঁটতে হাঁটতে বাচ্চাগুলোর জ্বর হয়ে গেল। তাদের কাঁধে তুলে চলতে লাগলাম।'

স্নেহলতা বললেন, 'আহা রে—'

বর্মা থেকে রাজদিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ পথের ভয়াবহ নিদারুণ বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগলেন ত্রৈলোক্য, 'রাস্তায় কতবার যে ডাকাতের হাতে পড়েছি তার হিসেব নেই। শুধু আমরা তো নই, বর্মা থেকে আরও অনেক মানুষ আসছিল। ডাকাতরা যদি টের পেয়েছে, কারো সঙ্গে টাকা-পয়সা সোনা-দানা আছে, গলার কাছে রামদা ধরে সব কেড়ে কুড়ে নিয়েছে। দিতে না চাইলে স্রেফ কেটে ফেলেছে। এ ভাবে যে কত লোক প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব নেই বৌঠাকরুণ।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনে যাচ্ছিল বিনু। হঠাৎ পাশ থেকে কে ডাকল, 'এই—'

চমকে সে দিকে তাকাল বিনু। দেখল সেই ছেলেটা যার নাম শ্যামল। চোখাচোখি হতেই শ্যামল হাসল। বলল, 'তোমার নাম কি ভাই?'

বিনু স্কুলের ভালো নামটাই বলল, 'বিনয়কুমার বসু—'

শ্যামল বেশ সহজ সাবলীল ছেলে। লজ্জা, সঙ্কোচ-টঙ্কোচ তার নেই বললেই হয়। হাসতে হাসতে বলল, 'ও তো ভালো নাম, মস্ত বড়। ডাক নাম নেই তোমার?'

'আছে। বিনু—'

'সুন্দর নাম তো।'

বিনু বলল, 'তোমার নামটাও সুন্দর।'

শ্যামল বলল, 'তাই নাকি।'

'হ্যাঁ।'

'সবার সঙ্গে দাদু আলাপ করিয়ে দিয়েছে, শুধু তোমার সঙ্গেই বাদ।'

কথাটা ঠিক। বিনু বলল, 'হয়তো খেয়াল করেননি।'

শ্যামল বলল, 'সে যাক গে, তোমার সঙ্গে আমি কিন্তু সেধে আলাপ করলাম। রাগ করলে না তো?'

'বা রে, রাগ করব কেন?'

'তুমি কোন্ ক্লাসে পড় ভাই?'

'এবার নাইনে উঠেছি।'

শ্যামল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'রেঙ্গুনে আমি ক্লাস এইটে পড়তাম। এ বছর নাইনে উঠবার কথা ছিল। ভালই হল, এখানে নাইনে ভর্তি হব, তোমার সঙ্গে পড়ব।' একটু থেমে বিমর্ষ সুরে আবার বলল, 'কিন্তু বিনু—'

'কী?'

'আমাকে কি এখানে ক্লাস নাইনে নেবে।?'

'কেন নেবে না?'

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

সকল কাজে নারী

পাঁচ বছর মাত্র সময়। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮। মেয়েদের কাজকর্মের সুযোগ প্রচুর বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সময় হচ্ছে, মোট সিগনিফিকান্ট। ১৯৬৩ সালে প্রথম রিপোর্ট বেরোয়। তারপর থেকেই সমীক্ষা করা হয়েছে। এবং ফলাফল অত্যন্ত আশাপ্রদ।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রগতির পশ্চাতে কতকগুলি জাতীয় আইন বিশেষ সহায়ক-ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নারীর অধিকার মর্যাদা পেয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে আমেরিকান নারী সমাজের মর্যাদা লাভের মাত্রা বেশ আশাতিরিক্ত।

যে সকল আইনের বিধিবদ্ধতা মহিলাদের ক্রমবর্ধমান অধিকার আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছে তার মধ্যে তুলনামূলক কাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান বেতন, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা আইন, সুষম শ্রম বন্টন আইন। আর আছে ১৯৬৪ সালে গৃহীত সিভিল রাইটস অ্যাক্ট। এই পাঁচ বছরের মধ্যেই এই সব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে অথবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে।

সকল মহিলা উপকৃত হয়েছে বিশেষভাবে ১৯৬৪ সালে গৃহীত সিভিল রাইটস অ্যাক্টে। এই আইনের সপ্তম ধারায় বলা হয়েছে, চাকরির ব্যাপারে 'সেক্স, রেস, কলার, ক্রীড অব ন্যাশনাল অরিজিন' নিয়ে কোন বৈষম্যের সৃষ্টি করা চলবে না। এ

নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পদ বলে বুঝেছেন ?

অনেক লোককে দেখে আমরা বলি, 'লোকটা নিজেই নিজের ক্ষতি করলো।' আমরা জানি, কথাটার মানে হলো, লোকটির নিজের মধ্যে যেসব গুণবৈশিষ্ট্যের অমূল্য সম্পদ আছে, সেগুলিকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারে নি।

হয়তো তার চেহারাই তার শত্রুতা করছে। অথবা সে পাঁচজনের সঙ্গে ভুল আচরণ করে খিটিমিটি বাঁধিয়ে বসছে।

অনেক ক্ষেত্রেই খানিকটা চেষ্টা করলে এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে আর একটু মনোরম, পরিচিত মহলে আরও একটু মধুর করে তোলা যায়, মেলামেশার কাজটা সহজ করে আনা যেতেও পারে।

যে লোকের ব্যক্তিত্বের এমন ত্রুটি আছে মনে হয়েছে, নিজেকেই নিজের শত্রু বলে বোধ হচ্ছে, সে যদি নিজের মধ্যে কি কি দোষ রয়েছে সেগুলিকে চেনবার একটু চেষ্টা করে এবং সেগুলির সংশোধন করে ফেলে, তাহলে আর অমন একেবারেই মনে হবে না।

নীচে একটি টেস্ট দেওয়া হয়েছে, সেটিতে আপনি যোগ দিতে পারেন এবং তাহলে নিশ্চিতভাবে বুঝে নিতে পারবেন যে, লোকে আপনাকে কেউ দোষ দিতে পারে কিনা—'লোকটা নিজের গুণগুলো নষ্ট করছে।' এই মনোপ্রশ্নচর্চাটিতে যোগ দেবার ঠিক পরেই দেখবেন, আপনার নিজের কতকগুলি আচরণ গুণ-বৈশিষ্ট্যকে আরও উন্নত করে তোলার একটা তীব্র আকুলতা মনের মধ্যে জাগবেই জাগবে।

প্রশ্নগুলিতে নিজের বিচার-বিবেচনা মতো 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে চলুন। সবশেষে পয়েন্ট হিসাব করবার নিয়ম দেওয়া আছে—এখন সেদিকে লক্ষ্য না দিয়েই পরপর প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া শুরু করে দিন।

১। আপনি কি নিজের সম্পর্কে বিশেষভাবে যত্ন নেন, আপনার দেহ, চুল, নখ, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পরিপাটি থাকার ব্যাপারে? আপনি কি সত্যি সত্যি বলতে পারেন যে, আপনাকে বেশ ভালো দেখায়?

২। আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত নিজস্ব দোষত্রুটি কিছু না কিছু থাকেই। সেগুলোকে ভালো করে তোলার জন্যে যা কিছু করার, সব কি আপনি করেছেন? ওগুলি সংশোধন করার জন্যে যে পরিমাণ সময়, অর্থ, সাহস এবং চেষ্টা কাজে লাগানো দরকার, তা করার জন্যে আপনি কি প্রস্তুত?

৩। কি রঙের কোন্ স্টাইলের পোশাক-আশাক আপনাকে মানায়, তা কি আপনি জানেন?

৪। আপনার জামাকাপড়ের আলমারীটা কি এমনভাবে সাজিয়ে রাখেন যাতে সব রকম উপলক্ষ্যের মানানসই পোশাক আপনি পরতে পারেন?

৫। এমন পোশাক পরলেন যে, অন্য সকলের পোশাক ম্লান হয়ে গেল, কিংবা সবাই হাঁ করে আপনার দিকে তাকিয়ে রইল, অথবা সকলে বিরক্ত হলো, তা না করে আপনি কি এমনভাবে সাজেন যাতে সত্যি আপনাকে আপনার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের উপযোগী মনোরম দেখায়?

৬। 'বেশ ভালো করেছেন, খুশি হলুম,' 'ধন্যবাদ'—এইসব কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন কি?

৭। আপনি কোনো কথা বলবার আগে অন্য লোকের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকেন কি?

৮। চলার পথে আপনি কি লোককে আপনার সামনে এগিয়ে যেতে দেন কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে কোনো কিছু বিলি-ব্যবস্থার সময়ে অন্যকে এগিয়ে দিয়ে আগে নিতে দেন—অথচ সেটা করেছেন বলে জাহির করার ভাব গোপন করেন?

৯। যখন কোনো দরজা দিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক পেছনে আর একজন আসছেন, তখন কি আপনি দাঁড়িয়ে থেকে দরজার পাল্লা খুলে ধরে পেছনের লোকটিকেও আসবার পথ করে দেন?

১০। কিভাবে খেতে হয়, কিভাবে খাওয়ার সময়ে ভদ্র আচরণ মেনে চলতে হয়, তা কি আপনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে অভ্যাস করেন?

১১। আপনাকে কি সব সময়ে সমানভাবে দেখা যায়? যেমন ধরুন, সকালে সকলের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করছেন, আবার সন্ধ্যাতেও হালকাভাবে সবার সঙ্গে ঘুরছেন ফিরছেন?

১২। কোনো রকম উগ্রতা না দেখিয়েও আপনি কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকতে পারেন?

১৩। লোকের সঙ্গে যখন আপনার মতের অমিল হয়, তখনও কি আপনি তা নিয়ে মিষ্টি প্রীতিপূর্ণ রসিকতা করতে পারেন?

১৪। যখন সবাই মন দিয়ে আপনারই কথা শুনছে, তখন যেমন তৃপ্তি উপভোগ করেন—আপনি সবার পেছনে থেকে কারুর কথা শোনবার সময়েও কি তেমনি তৃপ্তি উপলব্ধি করতে পারেন?

১৫। পাঁচজনে যখন আপনাকে কোন কিছু করতে বলে কিংবা তাদের কোনো কাজে আপনাকে হাত লাগাতে বলে, তখন তাদের উৎসাহে ভাঙন ধরিয়ে না দিয়ে কিংবা আপনার অনিচ্ছা প্রকাশ না করে আপনি কি সহযোগিতা করেন?

১৬। আপনি কি বুঝতে পারেন তখন আপনার চুপ করে যাওয়া উচিত এবং অন্য পাঁচজনের ভাব-আবেগ প্রকাশের পথ করে দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে?

১৭। কারুর সঙ্গে মতের অমিল দূর করার জন্যে আপনি কি নিজের অভিমতকে আট আনাই বদলে ফেলতে পারেন?

১৮। কথা দিলে কথা রাখেন?

১৯। সহানুভূতি, প্রশংসা, স্নেহ-ভালোবাসা, ভালো কাজে সমর্থন জানানো আপনার যা কিছু অর্থ সম্পদ আছে, সে-সব ব্যাপারে আপনি কি খুব উদার?

২০। আপনি কি বেশির ভাগ লোকের সঙ্গেই মেলামেশা করতে আনন্দ পান? আপনি মেয়ে হলে পুরুষদের সঙ্গে এবং পুরুষ হলে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার সময়ে স্বচ্ছন্দ আনন্দ বোধ করেন?

*

প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ' জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন। ৮০ পয়েন্ট পেলে চমৎকার; ৭০ থেকে ৮০ ভালো; ৬০ থেকে ৭০ বেশ। ৬০-এর নীচে ভালো নয়।

যিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পদ বলে বুঝেছেন, তিনি তাঁর বাইরের রূপটির দিকে যত্ন নেন, গর্ব অনুভব করে থাকেন। সবার কাছে মনোরম হয়েই তিনি উঠতে চান।

তিনি মানুষজনকে ভালোবাসেন, তাই লোকের অসুবিধা-অস্বাস্থ্য বুঝে নেওয়া, নম্র বিনয়ী হওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই শক্ত কাজ নয়। আর, এই জন্যেই, তিনি যে শুধু সবার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারেন, তাই নয়—সবাই তাঁকেও ভালোবাসে এবং তাঁর সঙ্গে মেশবার জন্যে এগিয়েও আসে।

শেষ স্বাক্ষর।

গান্ধার

'আমি প্রথমে আলো সহ্য করতে পারছি না, এককালে পারতাম, অনেক আলো, অনেক, অনেক আলো আমি চেয়েছিলাম, চাইতাম কিন্তু সে বহুদিন আগে, যখন আমি অন্য-আমি ছিলাম সেই আমি।'

•

'উপন্যাস লিখবো কি করে? জীবন নিয়ে সত্যিকারের কিছু লিখলে তবে তো উপন্যাস। বাংলাভাষায় তা কি হবার জো আছে? এই যে এ'রা সব বসে আছেন, মাধবী, এ'রা কি সত্যিকে সহ্য করবেন? করবেন না। এ'দের দুহাত ভরে মিথ্যে দাও, হাসিমুখে ঘরে বয়ে নিয়ে যাবেন। একটুকরো সত্যি দিতে যাও, ভয়ে ছুটে দেবেন।'...

•

'আকাশে এক ফালি চাঁদ। আর অসংখ্য তারা। গাছের পাতা নড়ছে। ঘুমন্ত হাত স্বপ্নের সন্ধানে ছেঁড়া শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সুধা খুঁজে বেড়াচ্ছে। খোকন কাঁদলো। বিছানায় পেচ্ছাপ। খোকন হাঁদুরে মার বুকে চুকচুক। আবার ঘুম। আবার স্বপ্ন এতে নাটক নেই?'...

•

'চিনলো না, কেননা চেনা যায় না, কেউ কাউকে চেনে না, চেনা-জানার বাইরে এই মানুষ, এই অতি আশ্চর্য, অতি অসফল, অতি হাস্যকর বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আমার রচিত উপন্যাসের মতো কোটি কোটি অপরিচিত, অপরিচেয়।'...

•

বিক্ষিপ্ত কিছু সংলাপ। জীবন-জিজ্ঞাসার এলোমেলো কয়েকটি প্রকাশ। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতির দর্পণে আজকের জীবনযন্ত্রণার কয়েকটি বিশ্লেষণ। অন্ধকার মঞ্চে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো যখন সমাপ্তির পর্দা নামলো তখন ধ্বনিত হোল: 'তারারা বধির। তারারা শোনে না। মানুষ মূক। কথা তার নেই।' ———

নাটকের নাম 'তারারা শোনে না'। নাট্যকার চাণক্য সেন বলছেন: 'এটা না-নাটক না-উপন্যাস। ধরুন ন-নাটক, ইংরাজীতে যাকে বলে অ্যান্টি-প্লে। আগে থেকেই বলে রাখছি এতে প্লট নেই, এটা হোচ্ছে যা-তা নাটক। পড়বার নাটক, একটু ভাবলে বুঝবেন এ নাটকের হিরো কিংবা হিরোইন নেই। যদি কেউ এ নাটকে থেকে গেছে, সে আপনি, আপনার জীবনের খণ্ডিত ছায়া।'

এই অদ্ভুত নাটকটিকে আশ্চর্য শিল্প-কুশলতার সঙ্গে মঞ্চে মূর্ত করে তুলেছেন 'গান্ধার' নাট্যগোষ্ঠী। আজকের যে নাট্যচর্চা তা নিশ্চয়ই বিগত দিনের গতানুগতিক চিন্তা আর বোধে আচ্ছন্ন নেই, তা নিয়ত নতুন নতুন সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। 'গান্ধারে'র শিল্পীরা যে এ ধারার সঙ্গে সমান ছন্দে চলতে পারছেন, তার প্রমাণ 'তারারা শোনে না' নাটকের পরিবেশনা। শুধু এ নাটক নয়, এর আগে দীর্ঘ সাত বছর ধরে এ'রা যে ধরনের নাট্যপ্রযোজনা করেছেন তার মূল্যায়ন করলেও দেখা যাবে যে চিন্তাসমৃদ্ধ নাটকের মঞ্চরূপায়ণের দিকেই এ'দের প্রচেষ্টা আবর্তিত হয়েছে। আজ 'গান্ধার' তাই বাংলাদেশের একটি প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠীর মর্যাদা পেয়েছে।

কল্লোলমুখর কলকাতা শহরেই 'গান্ধারে'র প্রথম আবির্ভাব। সময়টা ছিল ১৯৬২। গোষ্ঠী গড়ে তোলার ব্যাপারে যাঁদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হোলেন: 'জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অমর বসু, রাজা চক্রবর্তী, গীতা চক্রবর্তী, প্রণব মিত্র, শংকরীনাথ চৌধুরী। গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে এ'রা বলেছেন: 'গন্ধর্বপ্রিয় গান্ধার রূপ ও রাগ শ্রেষ্ঠ। আশ্চর্যসুন্দর এই গান্ধার আমাদের প্রাণপ্রিয় এবং চৈতন্যময়। গান্ধার রূপে ভাস্বর হোক প্রাণশিখার প্রদীপ্তি। ভাব ও সুরতরঙ্গে উচ্ছসিত হয়ে উঠুক হৃদয়পুরে।'

বাংলাদেশে তখন নাটক নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। বিষয়বস্তু ও প্রয়োগপরিকল্পনায় নাটক অতীতের ঐতিহ্য থেকে সরে এসে নতুনত্বের এক চিন্তার বৃত্তে হয়েছে উদ্ভাসিত। প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, মানসিক যন্ত্রণা ও সমাজ-ব্যবস্থার স্বরূপে এবং সর্বোপরি মানুষের অনুভবে গড়ে তোলা স্বপ্নসাধনার সঙ্গে নিষ্ঠুর বাস্তবতার মর্মান্তিক সংঘর্ষ—এরই মাঝে নাট্যকার তখন তাঁর স্বকীয় চিন্তা-চেতনাকে ভাষা দিতে শুরু করেছেন। সে সময়ে প্রগতিশীল যে সব নাট্যগোষ্ঠী ছিল, তার উৎসাহী নাট্যানুরাগী শিল্পীরা এমন ধরনের নাটক মঞ্চে উপস্থিত করতে থাকেন যার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে জীবন ও সমাজ-সচেতনতা আছে। 'গান্ধার' এই গভীরতর নাট্যবোধে সমৃদ্ধ পরিবেশে আবির্ভূত হয়ে নিজের প্রয়াস সম্পর্কে প্রথমেই সচেতন হয়ে ওঠে। এর শিল্পীরা শুরুতেই বিশ্বাস করে ছিলেন যে নাটকে মানবতার জয়গান বিঘোষিত হয় যে নাটকই মঞ্চস্থ করতে হবে এবং রূপায়ণের মধ্য দিয়ে আঙ্গিকবৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করে তুলতে হবে। সাত বছরের পথ-পরিক্রমায় 'গান্ধার' এই সত্যকেই অনেক বেশী উজ্জ্বলতায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' নাটক দিয়ে 'গান্ধারে'র যাত্রা হোল শুরু। প্রথম নাটকেই শিল্পীরা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করলেন এবং সেই সাফল্য তাঁদের উদ্যমকে দিল গভীরতর বেগ। এর পর একের পর এক নাটক পরিবেশন করতে শুরু করলেন। এই বছরেই অভিনীত হোল শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ'। এ প্রযোজনাতেও শিল্পীরা নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করলেন। এর পর একের পর এক অনেক নাটক নতুন প্রয়োগপরিকল্পনায়

এ'রা মঞ্চে উপস্থাপনা করে চললেন। নাট্য-প্রযোজনার তালিকায় এলো : অমরেশ ঘোষের 'শেষ স্বাক্ষর' অমর বসুর 'দশটি বছর' (সমরসেট মম্-এর 'দি লেটার'-এর ছায়া অবলম্বনে), বনফুলের 'বৈতরণী তীরে' অবলম্বনে চিত্ত গুহঠাকুরতা নাট্য-রূপায়িত 'অদেখা দিক', আলো দাশগুপ্তের 'সুখের পায়রা', মধু গুপ্তের 'কবর থেকে বলছি', রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'নতুন তারা' ও চাণক্য সেনের 'তারারা শোনে না'।

'গান্ধারে'র 'দশটি বছর' নাটকের প্রযোজনা নানাদিক দিয়ে অভিনবত্বের দাবী রাখে। রহস্যাত্মক কাহিনীর ভিতর দিয়ে নাটকে একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখা হয়েছে। স্বামী তার স্ত্রীকে দেবীর মতো ভালো-বেসেছিল, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর কাছে কোন-দিনই দেহগত সুখ পায়নি। আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও নারী যে আরো কিছু চায় এবং সেটা না পেলে যে অনর্থ সৃষ্টি হোতে পারে তারই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে এই নাটকে।

'অদেখা দিক'ও 'গান্ধারে'র আর একটি বলিষ্ঠ প্রযোজনা। মানুষ কতো দুঃখ-যন্ত্রণায় পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়—নাটকের চরিত্রগুলোর মুখ দিয়ে তাই বলানো হয়েছে। বিন্দি বাইজী বলছে : 'সম্ভব হোলে ছ্যাকরাগাড়ীর ঘোড়াগুলোও আত্মহত্যা করতো—পারে না, তাই করে না।' 'কবর থেকে বলছি' নাটক প্রসঙ্গে এ'রা বলেছেন : 'ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জীবনের এক্স-রে প্লেট 'কবর থেকে বলছি' তুলে ধরা হোল আপনাদের কাছে। দুর্ভোগ-রোগ মুক্তির নিদান-বিধানের, ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার গুরুদায়িত্বভার আপনাদের, সারা বাংলার মানুষের। নাটক-চরিত্র সতোনের অশ্রুরুদ্ধ মর্মবাণী 'বাঙালী মরেনি, বাঙালী মরতে পারে না'—সোচ্চার হোক প্রত্যেক বাঙালীর অন্তর-শঙ্খে।'...

তারারা শোনে না।

নাট্যনির্বাচনে 'গান্ধার' কোন বিশেষ মতবাদকে প্রাধান্য দেয় কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে নির্দেশক অসিত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'যে কোন ধরনের নাটক আমরা করতে রাজী আছি যদি তাতে প্রকৃত নাটকীয়তা থাকে। এ বিষয়ে আমাদের কোন গোঁড়ামি নেই। বিশেষ করে যে নাটক জীবনের কথা বলবে, জীবনকে উন্নত করবার আশ্বাস তুলে ধরবে, আমরা সেই নাটকই করবো।' শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানতে পেরেছি 'গান্ধারে'র শিল্পীরা মহলাকক্ষে প্রায়ই চলতি নাটক এবং বর্তমান বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। মাঝে মাঝে এই আলোচনায় বাইরের দু' একজন শুভানুধ্যায়ী এসে যোগ দেন। সম্প্রীতিভরা আলোচনায় একটি পরিপূর্ণ নাট্যবোধ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়।

আজকাল কিছু কিছু নাট্যগোষ্ঠী বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করছেন, নাটকের মূল-ধর্মের দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু সেই মত-বাদকে সোচ্চার করে তোলার দিকেই প্রবণতা দেখা দিচ্ছে বেশী। বলতে দ্বিধা নেই যে, এতে সার্থক নাটকের শিল্পধর্ম ক্ষুন্ন হোচ্ছে। আনন্দের কথা 'গান্ধারে'র শিল্পীরা চিরন্তন নাটকের মৌলধর্ম সম্পর্কে সচেতন আছেন। কোনরকম বিশেষ 'ইজম্'এ এ'রা বিশ্বাস করেন না, নাট্যশিল্পের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভা-বনেই এ'দের সবটুকু প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ। রসসৃষ্টিই এ'দের একমাত্র উদ্দেশ্য, এ'দের প্রযোজিত প্রতিটি নাটকে তাই শিল্পচর্চার একটি নিটোল প্রয়াস চিহ্নিত।

কলকাতার অন্যান্য নাট্যসংস্থার সংগে মিলেমিশে কাজ করবার জন্য 'গান্ধার' যে বিশেষ আগ্রহী তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'রূপকারে'র সংগে সম্মিলিত নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজনে; 'শৌভনিকে'র শিল্পীদের সাহায্যে 'শেষরক্ষা' নাটকের অভিনয়ে এবং 'আনন্দলোকের বঙ্কিম ঘোষের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায়। 'গান্ধার' প্রতিটি নাট্য-গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, বিশেষ করে এ'দের মতে 'গান্ধার' কৃতজ্ঞ থাকবে 'শৌভনিক', 'রূপকার' ও 'আনন্দলোকে'র কাছে। নাট্যনির্দেশক শ্রীমুখোপাধ্যায় সংস্থা গড়ে ওঠার ব্যাপারে পূর্বের পরিচালক অমর বসু ও সম্পাদক প্রণব মিত্রের আন্তরিকতার কথা শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করেন। 'গান্ধারে'র শিল্পীদের নাট্য-চেতনাকে সুস্থ বিকাশের পথ দিয়েছেন শ্রীবসু ও শ্রীমিত্র, নানারকম ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে সংস্থার শিল্পীদের ঐক্য ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখেছেন।

বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের ধারাকে 'গান্ধার' অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীর মতো যে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিতে পেরেছে, এ সত্যকে আজ হয়তো অস্বীকার করা যাবে না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই যে 'গান্ধার' বাংলাদেশের নাট্যানুরাগীদের মনে একটি বিশেষ স্থান করে নিতে পেরেছে তার মূলে রয়েছে শিল্পীদের আন্তরিক নাট্যচর্চা। আগামী দিনে এ'রা যে আরো মহত্তর তীর্থে উন্নীত হোতে পারবেন সে বিশ্বাস আমাদের আছে। কেননা এ'দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নাট্যশিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণতার আলোয় উদ্ভাসিত করার কামনা : 'আনন্দ স্বর্গ সৃষ্টির অমৃত স্বপ্ন নিয়ে আমাদের রসযাত্রা সংস্কৃতিলোকে, নাট্যভুবনে। সেই সৃষ্টি প্রত্যক্ষ জীবনকে অস্বীকার করে নয়, নয় বাস্তবের নির্মমতাকে উপেক্ষা করে। যা সত্যকারের সত্য, তা হাজার অপ্রিয় হোলেও সকল সময়ের জন্য চিন্তাগ্রাহ্য। বন্ধ এবং রুদ্ধ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে সংস্কারের শুভাগ্নি জ্বলে উঠুক। অভিশপ্ত শতাব্দীর আত্মা বিশুদ্ধি এবং প্রশান্তি লাভ করুক আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে।'

—দিলীপ মৌলিক

সংবাদ আর সাহিত্য এক নয়। এ দুটিকে আপাতদৃষ্টিতে এক বলে মনে হলেও এদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য। এদের ধর্মই আলাদা। তাই আবেদনও আলাদা। তবু সংবাদপত্রে সাহিত্যের স্থান হয়। সংবাদের মধ্যে অথবা সংবাদের সঙ্গে সাহিত্য স্থান লাভ করে। আবার পৃথক স্থানও বরাদ্দ থাকে। প্রতি রবিবার সাহিত্য-বিষয়ক একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। সাময়িকী।

রেডিও সংবাদপত্র নয়। রেডিওয় সংবাদ আছে, সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু আছে, যেগুলো সংবাদের ধর্ম মানে না, বরং অনেকটা সাহিত্যের ধর্ম মানে। তাই রেডিওয় সাহিত্যের জন্য অধিকতর পরিমাণে স্থান থাকা দরকার। আছেও। বিভিন্ন আসরে, মহলে, ভবনে ও এমনি ছুটছাটভাবে গল্প কবিতা প্রবন্ধ আলোচনা সমালোচনা রম্যরচনা ইত্যাদি অনেক কিছুই শোনা যায়। কিন্তু এগুলির মর্যাদা সংবাদের সঙ্গে সাহিত্যের মর্যাদার মতো, সাময়িকীর পৃষ্ঠায় সাহিত্যের মর্যাদার মতো নয়।

সংবাদপত্রে বিশুদ্ধ সাহিত্যের জন্য যেমন সাময়িকী একটি আলাদা বিভাগ তেমনি রেডিওয় শুধু সাহিত্যের জন্য সাহিত্য-বাসর একটি আলাদা বিভাগ। অন্যান্য বিভাগের সাহিত্যের চেয়ে এই বিভাগের সাহিত্যের মর্যাদা বেশী। এই বিভাগে কেউ স্থান পেলে তিনি সাহিত্যিকের মর্যাদা অনুভব করেন। তাই এই বিভাগে গল্প কবিতা প্রবন্ধ রম্যরচনা প্রভৃতি পাঠ করার জন্য নতুন-পুরাতন, উঠতি-পড়তি সকল সাহিত্যিকেরই আগ্রহ।

আবার শ্রোতারাও সাহিত্যবাসরকে ভিন্ন মর্যাদা দিয়ে থাকেন। সাহিত্যবাসরের শ্রোতারাও একটু ভিন্ন শ্রেণীর। তাঁরা নিছক সাহিত্য শোনার জন্য এই বাসর শোনেন না, এই শোনার মধ্যে সাহিত্যিককে 'দেখার' ইচ্ছাও থাকে। নিছক গল্প কবিতা প্রবন্ধ রম্যরচনা তো সাহিত্যপত্র আর ছাপা বইতেই পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে সাহিত্যিককে দেখা যায় না। সাহিত্য ও সাহিত্যিককে একসঙ্গে পাওয়া যায় মুখোমুখি মজলিশে ঘরোয়া পরিবেশে। কিন্তু সে সুযোগ তো সকলের হয় না। তাই টেলি-ভিশন। টেলিভিশন এখনও আমাদের এখানে আসে নি, তাই রেডিও।

রেডিওর সাহিত্যবাসরে তাই সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্যিকের প্রতিই আকর্ষণ বেশী। অনেকে লিখতে পারেন ভালো, কিন্তু ভালো পড়তে পারেন না আবার অনেকে পড়তে পারেন ভালো, কিন্তু ভালো লিখতে পারেন না। একবার রেডিওতে বাংলা দেশের একজন খ্যাতিমান স্যাটায়ার ও হিউমার লেখককে তাঁর রচনা পড়তে দেখেছিলাম। তিনি যে স্টুডিও থেকে পড়ছিলেন আমি তার পাশের ঘরে ছিলাম। মিনিট দশ-বারো ধরে তিনি তাঁর কৌতুক রচনাটি পড়লেন, আমার মনে বিন্দুমাত্র কৌতুক সঞ্চার হল না, এতটুকু রসোপলব্ধি না। কিন্তু পরে সেই রচনাটি যখন 'বেতার-জগতে' ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল তখন সমস্ত মন আমার কৌতুকে-আনন্দে নেচে উঠেছিল, রসসিক্ত হয়েছিল। আমি জানতাম, তিনি যেমন ভালো লিখতে পারেন তেমন ভালো পড়তে পারেন না। তবু তাঁর মুখে তাঁর রচনা শোনার জন্য সারাক্ষণ পাশের ঘরে কাঁচের বিরাট জানলা দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

সুতরাং পরোক্ষতার চেয়ে প্রত্যক্ষতার একটা পৃথক মূল্য আছে। সেই প্রত্যক্ষতা সাহিত্যবাসরে সাহিত্যিকদের মুখে তাঁদের রচনা শুনে অনেকখানি লাভ করা যায়। তাই বলে খুব ঘন ঘন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ রম্যরচনা ইত্যাদি প্রচার করা বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সাহিত্যবাসরে এই বাঞ্ছনীয় জিনিসটিই দেখা যায় বেশী। নিয়মিত সাহিত্যবাসর শুনলে মনে হবে, বাংলা দেশে সাহিত্যিকের 'দুর্ভিক্ষ' রয়েছে। অথচ বইয়ের দোকানে আর পত্র-পত্রিকার স্টলে দেখা যাবে প্রাচুর্য। বাংলা দেশে নতুন-পুরনো অনেক সাহিত্যিক আছেন, কিন্তু রেডিওর আছেন গোটা-কয়েক। এ এক দারুণ রহস্য।

নিয়মিত সাহিত্যবাসর শুনলে দেখা যাবে, এই বিভাগের জন্য একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে। সেই গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরাই ঘুরে-ফিরে ঘন ঘন আমন্ত্রিত হন। সেখানে গোষ্ঠীবহির্ভূত নতুনের স্থান কম, পুরাতন উপেক্ষিত। বেশী নয়, গত এক বছরের কিম্বা ছ মাসের বেতারজগৎ বিশ্লেষণ করলেই এই অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই অভিযোগ নতুন নয়। এই অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা হয়েছে, চিঠিপত্র বেরিয়েছে। তবু কর্তৃপক্ষ হিমালয়ের মতো অনড়।

এই যে এই বিভাগে গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েম হয়েছে, বহু সমা-লোচনা সত্ত্বেও একটি গোষ্ঠীকেই তোষণ করা হচ্ছে সে কি শুধু শুধু? যাঁরা খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা বলেন এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত যিনি, এই গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা বেশি, এবং এই ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ফলেই বিভাগটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই অভিযোগ গুরুতর অভিযোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত এই অভিযোগের পূর্ণ তদন্ত করে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করা, এবং অনেকটা নিঃস্বার্থ ও যোগ্য ব্যক্তির হাতে এই বিভাগের পরিচালনভার অর্পণ করা।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২৮ জুন রাত সাড়ে ৮টায় অতুল-প্রসাদের গান শোনালেন শ্রীমতী বন্দনা সরকার। যেমন মিষ্টি গলা তেমনি আন্তরিকতায় ভরা।

২৯ জুন বেলা ১টায় রূপ ও রঙের আসরে প্রচারিত হল শ্রীশৈল চক্রবর্তী রচিত কৌতুক নাটিকা 'পেয়িং গেস্ট'।

প্রৌঢ় স্বামী-স্ত্রী, শখ হয়েছে বেড়াতে বেরুবেন। কিন্তু তার জন্য টাকার দরকার। স্থির হল, বাড়ির বাড়তি ঘরটায় একজন

পেয়িং গেস্ট রাখা হবে। গিন্নীর রান্না অপূর্ব। কর্তার দৃঢ় বিশ্বাস, একবার কেউ তাঁর গিন্নীর রান্না খেলে এ বাড়ি ছেড়ে আর যাবে না।

কর্তা-গিন্নী দুজনেই পৃথক পৃথকভাবে পেয়িং গেস্টের সন্ধান করতে লাগলেন। কর্তা পেলেন এক রূপসী তরুণী, গিন্নী পেলেন এক রূপবান তরুণ। আগে থেকে কেউ কারও কাছে এই পাওয়ার কথা কিছু ভাঙলেন না।

নির্দিষ্ট দিনে মালপত্র নিয়ে তরুণী এসে হাজির হল। তরুণীকে দেখে গিন্নী রান্নাঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এদিকে কর্তা তরুণীকে দেখে উল্লসিত। উল্লাসভরে তিনি ছুটলেন রান্নাঘরে চায়ের ফরমায়েশ দিতে। গিয়ে দেখলেন গিন্নী ব্যাজার। তাঁকে না জানিয়ে তরুণী পেয়িং গেস্ট ঠিক করায় তিনি রুষ্ট। কর্তা বোঝালেন, তাঁকে সারপ্রাইজ দেবেন বলে জানান নি।

এদিকে তরুণীটি যখন সব দেখেশুনে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে বসেছে তখন তরুণটি এসে উপস্থিত। কর্তাকে না জানিয়ে গিন্নী তরুণ পেয়িং গেস্ট ঠিক করায় এবার কর্তা ব্যাজার। কিন্তু তাঁর বলার কিছু নেই, কারণ তিনিও ঐ অপরাধ করেছিলেন।

কিন্তু এখন একখানা ঘরে দুজন তরুণ-তরুণীকে রাখা যায় কী করে? কেউ-ই ফিরে যেতে রাজী নয়। দুজনেই তাদের পূর্ব স্থান চিরতরে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। শেষে তাদেরই পরামর্শে স্থির হল, কর্তা-গিন্নী তাঁদের নিজেদের ঘরটি ছেড়ে দিয়ে ছাদের চিলে-কোঠায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন।

রাত্রে কর্তা ছাদে শুয়ে মশার কামড় খাচ্ছেন, আর গিন্নী নিচে আড়ি পেতে তরুণ-তরুণীর বাক্যালাপ শুনছেন। এক সময় তিনি ছুটতে ছুটতে এসে কর্তাকে জানালেন: ওরা দুজনে দুজনকে আগে থেকেই চেনে। কীসব কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে।

গিন্নীর টানে কর্তাও নিচে নেমে আড়ি পাতলেন। তরুণ-তরুণীর কথা থেকে জানা গেল, তারা এক সময় স্বামী-স্ত্রী ছিল। এখন ডিভোর্সড। ঘটনাচক্রে এখানে দেখা হয়ে গেছে।...আবার তারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে, আবার তাদের একসঙ্গে ঘর বাঁধার বাসনা জাগছে।

সব শুনে গিন্নীর মনে আনন্দ আর ধরে না। বিয়ে করা বউ ফেলে পেয়িং গেস্ট থাকা! কর্তার কাছে তিনি সংকল্প ঘোষণা করলেন, কাল সকালেই তিনি তাদের মজা দেখাবেন, দুজনকে একঘরে চালান করে দিয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের ঘরে ফিরে যাবেন।

কর্তাও খুশিতে উদ্বেল। তাঁরও মনে যৌবনের ছোঁয়া লেগেছে।

নাটিকাটি বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। এতে নাটকীয় উৎকণ্ঠা তেমন না থাকলেও কিছু কৌতুক ছিল, সরলতা ছিল। শুনতে ভালোই লেগেছে। অভিনয়ও ভালো। কর্তার ভূমিকায় শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাভাবিক কৌতুকতায় সারাক্ষণ মাতিয়ে রেখেছিলেন।

এইদিন রাত সাড়ে ১০টায় রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করলেন 'সুরঙ্গমার' শিল্পিবৃন্দ। ভালো টিমওয়ার্কের পরিচয় পাওয়া গেল, ভালো অনুশীলনের।

৩০ জুন সকাল সওয়া ৮টায় আধুনিক গান পরিবেশন করলেন শ্রীমতী অসীমা ভট্টাচার্য। কণ্ঠ মধুর, মার্জিত—ন্যাকামি নেই, কান্না নেই। সুন্দর লাগল।...কিন্তু এর আগে ৮টায় শ্রীপ্রদ্যোতনারায়ণের কণ্ঠে লোকগীতি মোটেই খুশি করতে পারল না। সুর, গায়কী কোনোটাই মনে দাগ কাটল না।

১ জুলাই সকাল সাড়ে ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদে বলা হল, 'আকরিক খনিজ লোহা...।' আগে দিল্লীর বাংলা সংবাদ পাঠক-পাঠিকারা সকলেই ইংরেজী 'আয়রন ওর' অর্থে বাংলায় 'লৌহ আকর' বলতেন। এ নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। আকর শব্দের অর্থ কী, 'আয়রন ওর'-য়ের বাংলা কী, তাও বহুবার বলা হয়েছে। এবং বহুবার বলার পর এখন শোনা যাচ্ছে 'আকরিক খনিজ লোহা'।... অজ্ঞতারও একটা সীমা থাকা উচিত। সমালোচনার পরও অভিধানটা উল্টে দেখতে আপত্তি আছে? শিখিয়ে দিলে শিখব না, অভিধানও উলটে দেখব না—এর জবাব কী? এঁদের শাসন করার কি কেউ নেই এত বড়ো একটা প্রতিষ্ঠানে?

৩ জুলাই সকাল সওয়া ৮টায় শ্রীপিন্টু ভট্টাচার্যের আধুনিক গান অসহ্য। গানের নামে একরাশ নাকী কান্না।

এইদিন রাত ৮টায় ডঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় 'সাগরতলের রহস্যকে জানুন' শীর্ষক একটি কথিকা পাঠ করলেন। কথিকাটি তথ্যপূর্ণ, সাগরতলের অনেক রহস্যই এতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সাগরতলের মোটামুটি একটা চিত্র এতে পাওয়া গেছে। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন অনুসন্ধানীরা 'সিল্যাব' নামক জাহাজে করে সমুদ্রের তলদেশে নেমে দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর অনুসন্ধানের আয়োজন করেছেন তারও উল্লেখ থাকা উচিত ছিল এই কথিকায়। তাহলে কথিকাটি আপ-টু-ডেট হ'ত।...কথিকাটি যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। সব কিছুরই একটা কনক্লুশন থাকে—পরিসমাপ্তি, তা এতে পাওয়া গেল না। আর ভদ্রমহিলা যে দূরত্বের পরিমাপ দিতে গিয়ে ফিট বললেন, তিনি কখনও কি মাইলস বলেন? ফুট বহুবচনে ফিট হয়, তাই এক ফুট, দুই ফিট—এই নিয়ম ধরলে তো এক মাইল, দুই মাইলস বলা উচিত, কারণ মাইলের বহুবচন মাইলস। কিন্তু তা কি তিনি (এবং অন্য কেউ) কখনও বলে থাকেন?

এইদিন রাত ১০টা ৫ মিনিটে কলকাতা থেকে প্রচারিত খবরে নেতা শব্দের বহুবচনের দুটি রূপ পাওয়া গেল—নেতাগণ ও নেতৃবৃন্দ। কিন্তু নেতাগণ শব্দটা ঠিক নয়। যে কারণে নেতাবৃন্দ ঠিক নয়, সেই একই কারণে নেতাগণ ঠিক হওয়া উচিত নয়। হওয়া উচিত নেতৃগণ।

৪ জুলাই সকাল ৮টায় গৌড়ীয় গীতি-সংস্থা পরিবেশিত লোকসংগীতের অনুষ্ঠানটি ভালো লাগল।

৫ জুলাই রাত ৮টায় বিচিত্রায় পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অনুষ্ঠানটি একেবারে মামুলী—গতানুগতিক। কোনো রকম বৈচিত্র্য পাওয়া গেল না। স্টুডিওর বাইরে বিভিন্ন নর-নারীর সঙ্গে আকাশবাণীর প্রতিনিধির কথোপকথনের অংশের রেকর্ডিং খারাপ। খারাপ রেকর্ডিংয়ের জন্য কয়েক জায়গায় ভালো বোঝা যায় নি। তবে এই নর-নারীদের কারও কারও মুখে স্যামি, সিস্, কন্সেটসিস্টে প্রভৃতি স-য়ের আতিশয্য বেশ লেগেছিল।

৬ জুলাই বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে ঘোষণা শোনা গেল, 'এখন বাঁশিতে ধুন শুনবেন, শিল্পী অমৃতলাল রায়।'...এই হিসেবে সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার নামটি 'অমৃত' না লিখে লেখা উচিত 'অমৃৎ'। ঠিক কিনা?

৭ জুলাই সকাল সাড়ে ৭টায় দিল্লীর খবরে ঘোষক 'সুয়েজ উপসাগরে' লড়াই হবার কথা ঘোষণা করলেন। সুয়েজ উপসাগরও একটা আছে নাকি? কোথায়? কোন দেশে? ঘোষক আরও ঘোষণা করলেন, মার্কিন মহাকাশচারীরা আপেলো-১১ মহাকাশযানে করে চাঁদে যাচ্ছেন। ঘোষকের আপেলের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে অ্যাপোলোকে আপেলো বলা বোধ হয় তাঁর উচিত নয়।

অনেকদিন আগে একটা নাটক দেখেছিলাম। তার নায়ক কলকাতার এক প্রেসের কম্পোজিটর। তার প্রেমিকা থাকে বর্ধমানে তার (নায়কের) মামার দেশে। তাই তার মনটা সব সময় তার মামার দেশেই পড়ে থাকে। মামার দেশের কথাই সে সব সময় চিন্তা করে। তার কাজেও তার প্রেম আর মামার দেশের প্রতিফলন ঘটে। একটা নিমন্ত্রণপত্রে 'শ্রমমন্ত্রী' আর 'আমার দেশ' এই দুটি কথা ছিল, প্রুফ কারেকশনের পরও প্রতিবারই সে কম্পোজ করে 'প্রেম-মন্ত্রী' আর 'মামার দেশ'। শেষ পর্যন্ত মালিক তাকে বরখাস্ত করেছিলেন কিনা মনে নেই, তবে তাঁর ভর্ৎসনা যে করেছিলেন তা স্পষ্ট মনে আছে।

তবে ঘোষক নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তাঁর আপেলের জন্য প্রতিবারই অ্যাপোলোকে আপেলো বলায় তাঁর চাকরি তো যাবেই না, তিনি ভর্ৎসিতও হবেন না, কারণ এ নিয়ে তাঁর ওপরওয়ালারা মাথা ঘামান না।

—শ্রবণক

প্রেক্ষাগৃহ

সমান্তরাল : মাধবী চক্রবর্তী। ফটো : অমৃত

চিত্র সমালোচনা

ভবের ভাবী স্বপ্নের কারবারী

সত্যনিষ্ঠা ধর্মের পথে মানুষকে নিয়ে যায় আবার অন্য দিকে ধর্মনিষ্ঠাও মানুষকে ধর্মের পথে ঠেলে দেয়। কোন বিশ্বাসের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকলে সেই বিশ্বাস মানুষকে লক্ষ্যপথে নিয়ে যাবেই। আজকের হিন্দী ছবিতে এ ধরনের মানবিকতাপূর্ণ 'সপ্নো কা সওদাগর' অনেকটা ব্যতিক্রম।

ছবির নায়ক রাজু (রাজকাপুর) ভবঘুরে। ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস আছে তার। আর আছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উজ্জ্বল আশা। সে জায়গা থেকে জায়গায় নিজের সেই আস্থাকে বিশ্বাসকে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। সকলকে ডেকে বলছে বর্তমানকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন, সামনে তোমার সুন্দর সোনাভরা দিন। প্রেম ভালোবাসা রাজুর কাছে স্বগীয় এক অনুভূতি। প্রতিটি মানুষকে তাই ভালবাসার জয়গান গাইতে বলেছে সে। জীবনের রক্ত তার দিয়ে যাওয়া শুধু ফিরে নেওয়ার প্রত্যাশা তার নেই এতটুকু।

অবশ্য সেই পাগলাভোলা ভবঘুরে রাজু প্রেমে পড়েছে জিপসী মেয়ে মহির। তাও এক নাটকীয় ঘটনা। আনন্দপুর গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার ঠাকুর হরনাম সিংয়ের বাগান থেকে আম চুরির অপরাধে কতগুলি যুবক দ্বারা আক্রান্ত হয় মহির। রাজু উদ্ধার করে তাকে কোন হিংসাত্মক কাজ না করেই। মহিরের দুর্বলতা আসে রাজুর উপর। কিন্তু রাজু নির্বিকার, নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত। নারীর ভালবাসার প্রতিদান সে দিতে জানে না। প্রেমের ছলাকলায় হাতেখড়ি হয় তার মহির কাছেই। বাসা বাঁধবার স্বপ্ন দেখে মহির রাজুকে ঘিরে। কিন্তু স্বপ্নের সওদাগর 'বাহির করেছে ঘর'। কোনো বাঁধনে ধরা দিতে সে রাজী নয়।

জটিলতা শুরু হয়েছে এখানে, তারও আগে চিত্রনাট্যের জটপাকানো হয়েছে ঠাকুর হরনাম সিংয়ের কুরূপা কন্যা রঞ্জনার ভাবী বর এক রাজকুমারকে কেন্দ্র করে। রাজুকে ভুলক্রমে হরনাম সিং রাজকুমার ভেবে নেয়, কিন্তু প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবারই ঈশ্বরের প্রতি 'বিশ্বাস' তাকে বাঁচিয়ে দেয় (এমন কি ট্র্যাক চাপা পড়া সত্ত্বেও)। রঞ্জনার বিয়ে হয়ে ওঠে না রাজকুমারের সঙ্গে। রাজু এদিকে এক দুর্বল মুহূর্তে রঞ্জনাকে কথা দিয়ে বসে কোন রাজকুমার যদি তার জীবনে সত্যিই না আসে তবে সে নিজেই তাকে বিয়ে করবে।

এ খবর শোনার পর মহির মধ্যে জাগে প্রতিহিংসা। বহু চেষ্টাতেও রাজুকে বিবাহে রাজী করাতে না পারায় নতুন পথ ধরে সে। পঞ্চায়েতের আশ্রয় নেয়। সবাইকে জানায় সে রাজুর আগামী সন্তানের মা, অথচ সে তাকে বিয়ে করতে চাইছে না। ধর্মের অবতার বিশ্বাসের প্রতিভূ রাজুর সম্মান শ্রদ্ধা তখন মাটির ধুলোয়। সেই নাটকীয় মুহূর্তে (চিত্রনাট্য খাজা আহম্মদ আব্বাসসাহেব কৃত) শুধু রাজু মহির সমস্যার সমাধান হয় না, রঞ্জনার জীবনে রাজকুমার আসে, ঠাকুর হরনাম সিংয়ের অতীত ইতিহাস খুলে যায়, বেরিয়ে যায় রঞ্জনার জন্ম-ইতিহাস, দেখা যায় মহির আসলে ঠাকুর হরনাম সিংয়ের মেয়ে আর রঞ্জনা হরনাম সিংয়েরই ঔরসে এক জিপসী মেয়ে।

মাদ্রাজের খ্যাতনামা প্রযোজক বি- অনন্তস্বামী ছবিকে মনোগ্রাহী করে তুলতে কোন ত্রুটি রাখেন নি। পরিচালক মহেশ কাউল চিত্রনাট্যকে সঠিক দিকে ও [illegible]। প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই কোথাও অহেতুক

অরণ্যের দিন-রাত্রি : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষ। পরিচালক : সত্যজিৎ রায়। ফটো : অমৃত

মারামারির দৃশ্য নেই, সে ব্যাপারে শ্রীকাউল যথেষ্ট (চিত্রনাট্যকারও) দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির প্রধান আকর্ষণ মহিষরূপী বি-অনন্তস্বামীরই আবিষ্কার হেমা-মালিনী। চরিত্রের প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে কোথাও অতি নাটকীয়তা এলেও জিপসী চরিত্রে তিনি অনবদ্য। প্রথম ছবিতে এমন সুন্দর কাজ খুব কমই চোখে পড়ে। তার চোখে-মুখে বদনে তেজদীপ্ত বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠেছে। হেমা মালিনীর এ চরিত্র চিত্রণ তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাথেয়। রাজু হয়েছেন রাজকাপুর। আপন-ভোলা, সরল বালকসুলভ ভঙ্গী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে আকর্ষণীয় হয়েছে পর্দায়। চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চেহারা (কিন্তু পোশাক অমন স্কাউটদের মত কেন?) মিলেছে সুন্দর। অপরাপর চরিত্রে জয়ন্ত, তনুজা, নিরূপা রায়, দুর্গা খোটে, ডেভিড যথাযথ। শঙ্কর জয়কিষণ কৃত সঙ্গীত কয়েকটি শ্রুতিসুখকর। সব মিলিয়ে 'সপ্ন কা সওদাগর' পরিচ্ছন্ন আকর্ষণীয় ছবি।

চাঁদে যখন ঘর হবে

উনিশশো উনসত্তর সালের জুলাই যখন সত্যি সত্যিই চাঁদ মামার কোলে পৌঁছতে পেরেছে তখন একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বর্ষে মানুষের এই মহাকাশ অভি-যানের সাফল্য তাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছবে এরই সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন প্রযোজক-পরিচালক স্ট্যানলি কুব্রিক তাঁর '২০০১-এ স্পেস অডিসি' ছবিতে। মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারস নিবেদিত ও বর্তমানে জ্যোতি সিনেমায় প্রদর্শিত '২০০১-এ স্পেস্ অডিসি' ছবি-খানিকে একটি কাহিনীচিত্র বললে অত্যন্ত ভুল করা হবে এবং ছবিটিরও প্রতি অন্যায় অবিচার করা হবে। অথচ এটি কি একটি তথ্যমূলক ছবি—না, তাও নয়। দু হাজার এক সালে মানুষের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তাকে কোন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নিয়ে গিয়ে পৌঁছবে তা আজকে অনুমানেরই বস্তু, আজ থেকে বত্রিশ বছর পরের আনুমানিক ঘটনাকে তথ্যের সম্মান দেওয়া যায় না কোন মতেই। ছবিটাকে সত্যই যদি কিছু আখ্যা দিতে হয় তাহলে বলা উচিত এটি হচ্ছে একটি বিজ্ঞাননির্ভর ফ্যানটসী। মানুষ চাঁদকে যখন ঘরবাড়ী করে ফেলেছে তখন সে যদি বৃহস্পতি গ্রহ অভিমুখে সত্যই এগিয়ে যেতে চায় তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু কেমন সে মহাকাশ যান যার ওপর নির্ভর করে এই পৃথিবীর পাঁচটি মানুষ সেই বৃহস্পতির প্যানে এগিয়ে যাবে। এটি হচ্ছে নিছক বৈজ্ঞানিকের কল্পনার বস্তু, সাধারণের নয়। স্ট্যানলি কুব্রিক তাই বহু বৈজ্ঞানিকের সহায়তা নিয়েছেন তাঁর এই সুদীর্ঘ পুরো আড়াই ঘন্টাব্যাপী ছবিটির প্রতিটি পর্যায়কে রূপায়িত করবার জন্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পৃথিবীস্থ এপ-ম্যান প্রথম যখন মৃতের অস্থিকে অস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করতে শিখেছিল সেই দিন থেকে সহসা ঐ অস্থিই যেন মহাকাশযানে পরিণত হয়েছে। তাই দেখিয়ে স্ট্যানলি কুব্রিক তাঁর বৃহস্পতি অভিযানের শুরু করেছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এই অভিযান পরিচালনা করছেন ফ্রাঙ্ক পুল, দেপ সেমান এবং তাদের সহযোগী হিসাবে মানুষের চেয়েও নিখুঁত একটি যন্ত্র—কম্পিউটার ৯০০০। এই কম্পিউটার কথা কয়, মানুষেরই মত তার প্রবল অনুভূতি আছে, কর্মক্ষমতা আছে, স্মৃতিশক্তি আছে। মানুষ দুটি যখন যান্ত্র ঠোঁট নেড়ে কোন রকম কাজ না করে নিজেদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র করল ঐ কম্পিউটারের বিরুদ্ধে তখন তা ঐ যন্ত্রের দৃষ্টিও এড়াল না, বুদ্ধিরও অগম্য রইল না। এর পর দেখা গেল কম্পিউটারের সঙ্গে মানুষের লড়াই ঐ অভিযানের ভিতরেই। একটি মানুষ নিঃসীম মহাকাশে স্পেসশিপ থেকে তার বহিরংশের মেরামতির জন্য বেরিয়ে আর ঢুকতে পারল না, প্রাণ হারাল। দ্বিতীয় লোকটি প্রমাণ করল সে কম্পিউটার থেকেও শক্তিশালী, কিন্তু কম্পিউটার ও মানুষ এক-যোগে বৃহস্পতি গ্রহের নিকটবর্তী হলো বটে কিন্তু তার চতুর্দিকে অনবরত প্রদক্ষিণকারী খান্তোটি চাঁদের কক্ষ ভেদ করে বৃহস্পতি গ্রহে পৌঁছবার আগেই তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল একটি সমকোণ ভেলার প্রতি। যে ভেলার অনুরূপ জিনিষ দেখতে পাওয়া গেছে পৃথিবীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং চন্দ্রলোকে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে। ঐ ভাসমান ভেলা যেন চুম্বকের মতন আকর্ষণ করে নিয়ে চলল ঐ অভিযাত্রীসহ মহাকাশযানটিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে উপবিষ্ট দর্শকদেরও। সে যে কি গতি কি শব্দ, কি বর্ণবৈচিত্র্যের সমারোহ তা মাত্র অনুভূতিসাপেক্ষ ভাষায় বর্ণনা করা অতীত বস্তু। এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা চলচ্চিত্র জগতে। মিঃ কুব্রিক হয়তো শেষ পর্যন্ত বলতে চেয়েছেন বিশ্বনিয়ন্তার তুলনায় মানুষ কতটুকু, তার জ্ঞানের পরিসরই বা কতটুকু। তাই তিনি আবার আমাদের ফেরৎ এনেছেন শিশু পৃথিবীর সামনে যেখানে শিশুর দেহ নিয়ে পৃথিবী ভাসছে।

'২০০১—স্পেস অডিসি' সাধারণ মানুষকে কতখানি খুশী করবে জানি না কিন্তু মানুষের মহাকাশ অভিযান প্রচেষ্টাকে আশ্রয় করে এতবড় বিজ্ঞানভিত্তিক ফ্যানটাসী চিত্র আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি এবং আর কোন দিন হবে কিনা সন্দেহ।

স্টুডিও থেকে

স্টুডিও পাড়ায় পুরোনো হাওয়া আবার কিছুটা ফিরে এসেছে। জোরে জোরে বস্তি, রাজপ্রাসাদ আবার রাস্তার ফুটপাথেরও সেট্ পড়েছে। দরজা ঠেলে ঢুকলেই এখন আগের শূন্যতাকে বোঝা যায় না। ইন্দ্রপুরী, টেকনিসিয়ান, ক্যাল-কাটা মুভিটোন নিউ-থিয়েটারের ক্যানটিন শিল্পী কলাকুশলীর গল্প-গুজব সরগরম। ইন্ডিয়া ল্যাবের ক্যানটিন শিল্পী কলা-কুশলীর গল্প-গুজব, চিৎকার ফিসফিসা-নিতে মুখর।

সকাল ন'টা থেকে শুরু হয় জোরে জোরে হাতুড়ি-করাতের কাজ। দশটা বাজতেই পরিচালক আর কুশলীরা এলেই স্যুটিং শুরু। প্রথম টেকের আগে লাইটিং

এপার-ওপার : অপর্ণা সেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরিচালক : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

নিয়ে মাপামাপি, ক্যামেরা এগিয়ে আধো অন্ধকার ফ্লোরে কাজ চলে। দিন বাড়ে। বিকেল হয়। কাজ চলে। যখন ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আসে সবাই, তখন অন্ধকার নেমেছে সারা টালিগঞ্জ জুড়ে। এরই ফাঁকে 'লাঞ্চ' হয়েছে শিল্পী আর পরিচালকের। বুমম্যান লাইটম্যানদের 'লাঞ্চ' নেই। অন্ধকার ঘুপসী কোণে বিড়ি ফুঁকেই লাঞ্চ-আওয়ার কাটিয়ে দিয়েছে।

কাজ চলছে তবুও।

●

ক'দিন আগে টেকনিসিয়ানের ফ্লোরে ঢুকেছিলাম একটা ছবির সেটে। ঢোকবার মুখেই আকাশের গোমরা মুখ দেখেছি। ঢুকে দেখি ক্যামেরাম্যান অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে আলোর মাপ ঠিক করছেন। একবার ডানদিক, একবার বাঁ-দিক, একবার ওপরের এক-একটা আলো জেলে ডেপথ মাপছেন। কোনোটার গায়ে ফিল্টার চড়িয়ে, কোনটাকে প্যান বা টিল্ট করিয়ে আলো ঠিক করলেন। পঁয়ত্রিশ মিনিট কেটে গেছে ততক্ষণে। পরিচালকের ডাকে শিল্পী দুজন এলেন। সহকারী ডায়লগ পড়িয়ে রিহার্সাল দেওয়ালেন বারকয়েক। স্যুটিং জোনের মাঝে দাঁড় করিয়ে ক্যামেরাম্যান ফ্রেম ঠিক করে নিলেন। পরিচালকের নির্দেশে লাইট সাউণ্ড সব রেডি।

অমনি টিনের চালে ঝমঝম শব্দে শুরু হল শ্রাবণের ধারা। পরিচালক চিৎকার করে উঠলেন 'কাট...কাট'। কাজ বন্ধ হল। এক ঘণ্টার বেশী একটা শট টেকের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বৃষ্টির জন্য বসে থাকতে হল আড়াই ঘণ্টা। মাইক্রোফোন বৃষ্টির শব্দ ক্যাচ করছে তাই কেঁচে গেল কাজ। শুধু সেদিনই নয়, আরও বহুবার বহু জায়গায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখেছি। সারাটা বর্ষাকালেই সব স্টুডিওতেই প্রায় এমনি অবস্থা। বহু চেষ্টা করেও সারা দিন হয়ত তিনটে কি চারটের বেশী শট টেক করা গেল না।

শুনেছি শব্দ বিভাগে কলাকৌশলের উন্নতি হয়েছে অনেক, কাজেই এভাবে সময় ও অর্থ অপচয়ের কথাটা ভাববার আছে বলেই মনে হয়।

●

সত্যজিৎ রায়ের 'সমাপ্তি'র অপর্ণা আজ বাংলা চিত্রজগতের সব চাইতে ব্যস্ত নায়িকা। ওঁর হাতে এখন খানসাতেক ছবি প্রায় আরও কথা চলছে। এদিকে এত ছবি হাতে নেওয়ার ফলে ঠিকমত ডেটও দিতে পারছেন না সবাইকে। 'পদ্মগোলাপে'র আউটডোরের কাজ শেষ হতে না হতেই টেকনিসিয়ানে কাজ শুরু করেছেন। ওঁর অভিনীত আগামী ছবিগুলো হলো 'অপরিচিত', 'কলঙ্কিত নায়ক', 'পদ্ম গোলাপ', 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও আরও দু'খানা।

গত বুধবারে বিকেলে ইন্দ্রপুরীতে নতুন যে ছবির মহরৎ হোল তারও নায়িকা অপর্ণা সেন। নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সমরেশ বসুর কাহিনী 'এপার ওপার' নিয়ে 'তিন ভুবনের পারে' ছবির পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ শুরু করলেন সেদিন। কুশল প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে এ ছবির অন্য দুই প্রধান শিল্পী হলেন সমিত ভঞ্জ ও অরূপ বসু।

সেদিন আরও দুটো ছবির মহরৎ হয়েছে। ছবির শিল্পী তালিকা ও কলা-কুশলীদের নাম দেখে এটুকু বেশ মনে হল স্টুডিও পাড়ায় এখনও সুস্থ হাওয়া বইতে শুরু করে নি। কিছুদিন আগের সেই ঘটনার জের চলেছে এখনও হয়ত বা চলবে আরও কিছুদিন। কিন্তু কতদিন?

সরকার এগিয়ে এসেছেন চিত্রজগতের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে। এখন আর দলাদলির প্রবণতা কেন?

মঞ্চাভিনয়

মোহরের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে জাল ওষুধ আবিষ্কার

কেঁচো প্রাপ্তির আশায় গর্ত খুঁড়ে সাপের সাক্ষাৎ। ঠিক সেই রকম মোহরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে জাল ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। দক্ষিণ কলকাতায় থিয়েটার সেন্টারে বর্তমানে অভিনীত ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত হাস্যপ্রধান নাটকের নাম 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' অনেকটা সেই ভাবনারই প্রকাশ।

বর্তমানে বোধ করি সারা বিশ্বই রঙ্গ-মঞ্চকে আশ্রয় করে লেখকদের সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি প্রবল হিড়িক চলেছে। ফলে অ্যারিস্টটল, কসক, এগার প্রভৃতি নাট্য ধুরন্ধরদের প্রবর্তিত নাট্যসূত্রে প্রায় কোন নাটকেই অনুসৃত হতে

দেখা যায় না। ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ'এও এই সূত্র সোচ্চারভাবে অনুপস্থিত। একটি অখ্যাতনামা স্টেশনের অদূরবর্তী একটি বটগাছের কাছাকাছি তিনটি বাড়ীতে তিনটি পরিবারের একসঙ্গে আবির্ভাব ঘটল। একটি পরিবারে আছেন বাবুজী, হেমদি, জামাই, প্যারীমোহন এম-এস-সি ও মিস নীনী। দ্বিতীয় পরিবারে আছেন বিধবা মা সুকেশিনী ও তাঁর ছেলে আদিত্য বসু এবং তৃতীয় পরিবারে আছেন একমাত্র গোকুলচন্দ্র রায়বর্মণ। প্রথম পরিবারভুক্ত প্রতিটি চরিত্রই উৎকেন্দ্রিক। এই উৎকেন্দ্রিকতা অভিনয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু নাটকে এরা কতখানি সার্থক সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। দ্বিতীয় পরিবারভুক্ত আদিত্য বসু তার টাকমাথা মাকে গৃহের মধ্যে বন্দী রাখতে চায় কেন বা তাকে পাগল প্রতিপন্ন করায় তার কি লাভ হবে এসব প্রশ্নের বোধ করি আর কোন সদুত্তর নেই একটি ছাড়া এবং সেটি হচ্ছে দর্শক সাধারণের দৃষ্টিতে আসল অপরাধীর দিক থেকে সরিয়ে রেখে একটা বিভ্রান্তি আনার চেষ্টা। একদিকে নাট্যকার প্রতি দুটি আসল দৃশ্যের মাঝে ঊর্ণনাভ জালের আলোছায়ার সৃষ্টি করে জাল ওষুধের বাক্সগুলিকে ইতস্তত বহন করিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি রহস্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। এবং অপর দিকে প্রধানত হাস্যরসাত্মক উৎকেন্দ্রিক চরিত্রগুলির অর্থহীন কার্যকলাপের মাঝে মিস্ নীনী নামধারিণীর সঙ্গে অপর দুই বাড়ীর দুই যুবকের গোকুল এবং আদিত্যের প্রণয় প্রচেষ্টাকে উপস্থাপিত করে দর্শকচিত্তকে রসবৈচিত্র্যের আস্বাদ দিয়েছেন। নাটকের কাহিনীই বা কি, বক্তব্যই বা কি তা বুঝতে না বুঝতেই নাটকের অভিনয় শেষ ধাপে এসে উপস্থিত হয় এবং দেখা যায় যে, ঝা-কুড়-কুড় ঝা-কুড়-কুড় মুরগী মাছের ঝোল' ইত্যাদি গুপ্তমন্ত্র সুকেশিনী দেবীকে মোহর প্রাপ্তিতে সাহায্য না করে জাল ওষুধ আবিষ্কার করে বসে যার মালিক হচ্ছেন মিস নীনীর অন্যতম প্রণয়প্রার্থী।

নাটক সম্পর্কে যাঁরা একটি বিধিবদ্ধ ধারণা নিয়ে বসে আছেন তাঁরা এর মধ্যে কোন নাটকের সন্ধান না পেলেও এতে রঙ্গরসের কিছুমাত্র অপ্রাচুর্য নেই। বিশেষ করে প্যারীমোহন এম-এস-সি বেশে তরুণ রায়কে দেখতে পাওয়া আমাদের দর্শকজীবনে একটি নবতর অভিজ্ঞতা। কুমীরের অভাবে টিকটিকির দেহ থেকে ওষুধি তৈলের আবিষ্কর্তা প্যারীমোহনকে যে ভাব ভঙ্গী বিকৃত কণ্ঠস্বরবাহিত সংলাপ ও বিচিত্র হাস্যপ্রবাহসহযোগে তিনি মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন তা তাঁর নাট্যনিপুণতার একটি নতুন দিগন্তকে উদ্ভাসিত করেছে। মাত্র এই প্যারীমোহন এম-এস-সি'কে দেখবার জন্য আমরা নাট্যরসিকদের ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' দেখতে অনুরোধ জানাই। হেমলতা ওরফে হেমদি চরিত্রটি চিত্রিত করেছেন দীপান্বিতা রায়। পক্ককেশা প্রৌঢ়া এই চরিত্রটি আচারে-আচরণে সুঅভিনীত হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি কণ্ঠস্বরেও বার্ধক্যের ছাপ দেওয়া যেত তাহলে চরিত্রায়ন যে আরও মনোমত হত সন্দেহ নেই। টাকমাথাওয়ালা সুকেশিনী চরিত্রে অবতীর্ণা হয়েছেন ইলা চট্টোপাধ্যায় নামে এক নবাগতা। গোকুল চরিত্রটিকে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মঞ্চের এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ছোটখাট ভঙ্গীর মধ্যে যোগেশ দত্তের শিক্ষাগুণ লক্ষনীয়। বাবুজী, জামাই ও ডাক্তার সুরেন সান্যাল যথাক্রমে মন্মথ ঘোষ, অজিত মিত্র ও শঙ্কু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা অভিনীত হয়ে স্টাইলাইজড অ্যাক্টিং-এর নজির রেখেছেন। মিস নীনী চরিত্রে মিস পলীন-এর অভিনয় অত্যন্ত সজীব ও প্রাণোচ্ছল। অপরাপর চরিত্র যথাযথ। মঞ্চ পরিকল্পনায় বিখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী তাঁর শিল্পধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ভুষুণ্ডির কাক মঞ্চাভিনয়ে এক নবযোজনা। আবহসংগীত ভি বালসারার সৃষ্টি।

বিবিধ সংবাদ

আমরা শোকাহত

গত ১৬ই জুলাই নান্দীকারের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীবরুণ সেন আকস্মিক পরলোকগমন করেন। নান্দীকারের ভারতবর্ষব্যাপী সাফল্যের মূলে যে কয়জন সদস্যের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করা যায় বরুণ সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীসেন গত ১৫ বছর যাবৎ অভিনয় জগতের সংগে যুক্ত ছিলেন এবং নান্দীকারের প্রায় শুরু থেকে বিভিন্ন মুখ্য চরিত্রে কৃতিত্বের সংগে রূপদান করেন।

১৯৬৮ সালে শ্রীসেন নান্দীকারের সম্পাদকপদ অলংকৃত করেন এবং এই বছরেই নান্দীকার এঁর নেতৃত্বে অপেশাদার নাট্য-সংস্থাগুলির মধ্যে বার্ষিক সর্বোচ্চ সংখ্যায় [১৩২টি] অভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে। শহর, গ্রাম থেকে অন্য প্রদেশ—পাটনা, এলাহাবাদ, বোম্বাই, দিল্লী সফরে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত

ওবারহাওজেন চলচ্চিত্র উৎসব

ডেনিশ ছবি 'তুলে

ওবারহাওজেনে অনুষ্ঠিত সাত দিনের এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবটির একটি বিশেষ অবদান আছে। চলচ্চিত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যম হল শর্ট ফিল্ম। তরুণ পরিচালকরা এখানে যতটা দুঃসাহসী হতে পারেন, কাহিনী-চিত্রে অনেক সময়েই সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ সেখানে ঝুঁকি অনেক বেশী। লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে প্রস্তুত কাহিনী-চিত্রে গুণোগুনেতি জনখানেক পরিচালক আছেন, সারা পৃথিবীতে যাঁদের নামে ছবি চলে। তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন প্রথম শ্রেণীর ফেস্টিভ্যালে একাধিকবার স্বর্ণ-ভল্লুক বা স্বর্ণসিংহ জয় করে। তাঁদের কথা বাদ দিলে যে সব ছবি সাধারণত জার্মানীর ছবিঘরে প্রদর্শিত হয়ে থাকে, তার মান এত নিচু যে ভুলে যেতে হয় সিনেমা আদৌ একটা শিল্পমাধ্যম।

চলচ্চিত্রের এই দৈন্য দশায় ফেস্টিভ্যাল-গুলোর দৌলতে অন্ততঃ কিছু উন্নত শিল্পমানের ছবি দেখার সুযোগ ঘটে। চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে আজ সারা ইউরোপে চলেছে এক নতুন আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের প্রতিফলন হচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত শতাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে। স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিকে জনমানসে উপস্থিত করার এক গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে চলচ্চিত্র উৎসবগুলো। উৎসবের পুরস্কার করে তোলে অজ্ঞাত পরিচালককে রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত। ভারতের সত্যজিৎ রায়কে বিশ্ববিখ্যাত করে প্রথমে কান ও পরের বছর ভেনিসের পুরস্কার; ইংমারবার্গমানও প্রথমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান কান উৎসবে; '৫১ সনে ভেনিসের স্বর্ণসিংহ জাপানের কুরোসওয়াকে রাতারাতি করে বিশ্ববিখ্যাত; আজকের ইউরোপের সবচেয়ে বিতর্কিত পরিচালক জ'লুক গোদারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মূলে রয়েছে বার্লিন উৎসবের পুরস্কার। এমন ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে।

গতবার ওবারহাওজেন উৎসবে ভারতের ফিল্ম ডিভিশন নির্মিত ৬০ সেকেন্ডের একটি ছবি দেখান হয়েছিল। ছবিটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এবার ভারতের কোন ছবি ছিল না। ওবারহাওজেনে বরাবরই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে আসছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল পোল্যান্ড, চেকশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া।

গত বছর থেকেই বিভিন্ন শহরের ছাত্র আন্দোলন ও গণ-বিক্ষোভের ছায়া চলচ্চিত্র উৎসবেও পড়েছে। তরুণরা দাবী করেছে ফেস্টিভ্যালের গঠন ও পরিকল্পনায় আমূল সংস্কার।

এবার মনে হল ওবারহাওজেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ডাইরেক্টর হের হিলমার হফমান তরুণদের দাবী মেনে নিয়েছেন অর্থাৎ তরুণ পরিচালকরা যে যাই ছবি তুলে পাঠিয়েছে, তাই মূলে প্রতিযোগিতায় দেখান হয়েছে। যার ফলে সাংবাদিকদের অসংখ্য বাজে ছবি দেখতে হয়েছে।

ইউরোপে একদল স্বাধীনচেতা পরিচালক আছেন যাঁরা কোন পরিবেশক সংস্থা বা প্রযোজকের বাধ্যবাধকতায় কাজ করেন না। এ'দের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন হাইনরিস ফিল। তিনি ছাত্র আন্দোলনকে ভিত্তি করে আন্ডার-গ্রাউন্ডে যে ছবিটি তুলেছেন তার নাম হলো 'ফ্রম রিভল্ট টু রিভ্যুলশন'। ছবিটি উৎসবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হয়। প্রশ্ন জাগে হাইনরিস ফিলের মত অন্যান্য স্বাধীনচেতা পরিচালকরা; যাঁরা সাধারণত ১৬ মিঃ মিঃ ক্যামেরা নিয়ে স্টার ও স্টুডিও সম্পূর্ণ বর্জন করে রাস্তাঘাট, কাফে'-রেস্তোরাঁয় ছবি তুলছেন তাঁরা কি প্রতিযোগিতায় টি'কতে পারবেন? তাঁদের ছবি কি নিয়মিতভাবে ছবিঘরে প্রদর্শিত হবে?

আজকের পাশ্চাত্য জগতে যে প্রচণ্ড বিকৃত যৌনচিন্তায় ঢেউ চলছে তার প্রভাব এবার ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত অনেক ছবিতেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এরকম একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে এ ধরনের রুচি-বিকৃতিহীন ছবি দেখান হয় কেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছবি ইউরোপের ফেস্টিভ্যালে বেশ জনপ্রিয়। তথাকথিত আণ্ডারগ্রাউণ্ড আঁতেলেকচুয়াল যেমন ওয়েরল, ব্যাকেজ, সেকাস প্রভৃতি ছবির রস উপলব্ধি করা স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। হয়ত বা এই বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা ও চিন্তা উপলব্ধির জন্য বিশেষ ধরনের মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন আবশ্যক। সেকাসের 'নোটস অন সার্কাস' একটা উদাহরণ মাত্র।

রিচার্ড বারলট পরিচালিত 'বিটার গ্রেপস' দেখে বিখ্যাত চেক ছবি ডেইসিস-এর আমেরিকান সংস্করণ মনে হল।

হান্স কুকস-এর 'ফিল্ম-৬৮' একটি মনোরম চিত্রসম্ভার। ডাথাউ-এর পটভূমিকায় গৃহীত এই ছবির একটি গান 'ইন দাখাউ দ্য রায়েন দি বুমেন' (ডাথাউ তে ফুল কি সুন্দর ফোটে) গানটি বার বার শোনার মত।

সোভিয়েট রাশিয়ার ছবিগুলোতে বীরপূজা ও দেশভক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সাম্প্রতিক রুশ চিত্র ইউরোপের অন্যান্য ফেস্টিভ্যালেও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে।

মনোরম চিত্র উপহার দিয়েছেন হাঙ্গেরীর লাজলো লুগসি, ছবিটির নাম 'স্ট্রেঞ্জ মেলোডি', ডেনমার্কের একটি চিত্র সমালোচকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ওবারহাওজেন উৎসবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মূল্য ৫০০০ মার্ক দেওয়া হয় কারেল ভাচেক পরিচালিত চেক ছবি 'ইলেকটিভ অ্যাফিনিটিস' ও জন সাভানকসের পরিচালিত আমেরিকান চিত্র 'দি অ্যাপার্টম্যান্টকে'।

তরুণ জার্মান পরিচালক হাইনরিস ফিলও এই পুরস্কার পান তাঁর 'ফ্রম রিভল্ট টু রিভ্যুলুশন' ছবির জন্য।

দ্বিতীয় পুরস্কার মূল্য ২৫০০ মার্ক দেওয়া হয় যুগোশ্লাভ ছবি 'দি ডেইস উইল কাম' ও হাঙ্গেরীর চিত্র 'ব্রিসফুল'।

আন্তর্জাতিক সাংবাদিক পুরস্কার পান ফরাসী প্রযোজক ও পরিচালক পাস্কাল অবি তাঁর কাহিনীচিত্র মর্শিয়ে 'জ' ক্রদ ভাসিনি'র জন্য। তরুণ চেক পরিচালক সানডোর আলকেটের স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র 'দি ট্র্যাপ'কে দেওয়া হয় ক্যাথলিক পুরস্কার।

—সৈকত ভট্টাচার্য

যেন ভুলে না যাই

ক্যাথারিন হেপবার্ন

ক্যাথারিন হেপবার্ন যখন থিয়েটার থেকে সিনেমায় এলেন তখন গ্রেটা গার্বোর সেকি জনপ্রিয়তা! গ্রেটা ছাড়া আর কোন নায়িকার স্তুতি তখন শোনা যেত না। গার্বো ছাড়া আর কিছু ভাবা যেত না। তাই প্রথম প্রথম ক্যাথারিনের অভিনয় দেখে দর্শকরা ভেবে নিয়েছিলেন, ক্যাথারিন হেপবার্ন নাকি গ্রেটা গার্বোকে নকল করেন। আসলে গার্বোর অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্যই ক্যাথারিনকে এই অপবাদের খেসারৎ দিতে হয়েছিল। পরে অবশ্য দর্শকরা হেপবার্নের আপন অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁদের ভুল ধারণাকে শুধরে নিতে পেরেছিলেন। দর্শকরা চিরদিনই ঐরকম অন্ধভক্ত হন। একবার যাকে নিয়ে মেতে ওঠেন, তাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারেন না। ফলে নবাগত নায়ক-নায়িকাদের এই নকল করার দুর্নাম প্রথম জীবনে ঘাড়ে এসে চাপে। তারপর অবশ্য দুয়েকটা ছবি হিট করলে সেই দুর্নামের বোঝা কাঁধ থেকে নামে। তখন আবার তাঁকে নিয়েই দর্শকদের নতুন করে মাতামাতি শুরু হয়ে যায়।

যেমন হয়েছিল ক্যাথারিন হেপবার্নের বেলায়। একবার তো এক সাংবাদিক ক্যাথারিনকে কোথাও ধরতে না পেরে হলিউড থেকে তাঁকে পাকড়াও করবার জন্যে ছুটলেন। হেপবার্ন তখন এক পাহাড়ের চূড়ায় ত্রিগার ছবির শুটিং করছিলেন। সাংবাদিক তাঁর সাক্ষাৎকারের জন্য এসেছেন। কিন্তু কিছুতেই কোন কথা বলতে রাজি হচ্ছেন না তিনি। সাংবাদিকও নাছোড়বান্দা। হেপবার্নের মুখ থেকে কোন কথা না শুনে তিনিও এখান থেকে উঠবেন না। এমনি এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পড়ে সাংবাদিক তাঁকে রাগিয়ে দিয়ে কথা বের করবার জন্য বলে ফেললেন, আপনি তো গ্রেটা গার্বোকে নকল করেন।

আর যায় কোথায়! ক্যাথারিন তো আর রাগ সামলাতে পারলেন না। সব কিছু ভুলে গিয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন, দেখুন! গার্বো একজনই আছেন। ও'কে কেউ নকল করতে পারে না। তাছাড়া, আমি যদি কথা না বলে ভাব দিয়ে অভিনয় করি, তাহলে কি গ্রেটা গার্বোকে নকল করা হবে? যদি বিশেষ রকমের জামা পরি, তাহলেই কি আমি মার্লেন ডিট্রিচ হয়ে গেলাম। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। আদর্শ আছে। আমার যা কিছু তা একেবারেই নিজের। নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে পরের ধার করা জিনিসকে কেন অনুকরণ করতে যাব? কারো নকল করে আমি নাম করতে আসিনি। অভিনয়কে ভালবাসি বলেই ছবিতে নেমেছি। আমি সব সময় অভিনয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই। শুধু অর্থ কিংবা নামের মোহের জন্য এ জগতে আমি আসিনি। আমার সংসার আছে। উপোস করে থাকব না। আমি যেদিন ফুরিয়ে যাব, সেদিনও অনুভব করব, আমার জীবন আমারই অন্য কারো নয়।

ক্যাথারিনকে সেদিন এইভাবে রাগিয়ে দিতে না পারলে সাংবাদিকের কাছ থেকে আমরা তাঁর কোন কথাই জানতে পারতাম না। ক্যাথারিন কিছুতেই নিজের জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে চাইতেন না। তিনি যে কত বড় শিল্পী ছিলেন, তা তাঁর এ উক্তি থেকে বোঝা যায়। অভিনয়কে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে অভিনয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। বাইরের জগতে বড় একটা যোগাযোগ ছিল না। তিনি নিজেকে কখনই প্রচার করতে চাইতেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব এত প্রখর ছিল যে কখনই তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে নড়ানো যেত না। তিনি ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতীক। যা বলে বোঝান যায় না।

১৯০৯ সালে ক্যাথারিন হেবার্নের জন্ম। কানেক্টিকাটের হার্টফোর্ড শহরে। ক্যাথারিনের বাবা ছিলেন সার্জন। হার্টফোর্ড কলেজ থেকে শিক্ষা শেষ করে ক্যাথারিন হেপবার্ন অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি প্রথম মঞ্চে যোগদান করে ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করতে শুরু করেন। তারপর নিউইয়র্কের মার্টিন বেক থিয়েটারে 'নাইট হোস্টেস' নাটকে হোস্টেস-এর চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের নজরে পড়েন। কিন্তু তখনো সে-রকম জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। তখন ও'র নাম ছিল ক্যাথারিন বার্নস। প্রথম প্রথম মঞ্চে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁকে কম অপমান হতে হয়নি। একবার তো লেসলি হাওয়ার্ডের বিপরীতে 'দি অ্যানিম্যাল কিংডম' নাটকে তেমন ভাল অভিনয় করতে না পারায় লেসলির কাছ থেকে চরম অবমাননা সহ্য করতে হয়েছিল। ভাগ্যিস সেই সময় ও'র আর একটি নাটক 'ওয়ারিয়রস হাজব্যান্ড' জনপ্রিয় হওয়ায় ক্যাথারিন- এ অপমান থেকে রক্ষা পেলেন। এই সময় ক্যাথারিন অভিনীত 'উইদাউট লাভ' নাটকটি খুব জনপ্রিয় হয়। নানান ব্যর্থতার মধ্যেও একদিন আপন প্রতিভার বলে ক্যাথারিন হেপবার্ন মঞ্চের জগতে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

মঞ্চের সাফল্যে চলচ্চিত্রে যোগদান করার আহ্বান এল। ক্যাথারিন হলিউডে যোগ দিলেন। চলচ্চিত্রাভিনয় শুরু হল। ১৯৩৩ সালে 'মর্নিং গ্লোরি' ছবিতে অভিনয় করে অস্কার প্রতিযোগিতায় 'শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী' হিসেবে জীবনে প্রথম সম্মানিত হলেন ক্যাথারিন হেপবার্ন। আশ্চর্য রকমের অভিনয় ক্ষমতা দেখে দর্শকরাও হেপবার্নের প্রেমে পড়ে গেলেন। কি বলিষ্ঠ অভিনয়! অথচ চেহারা দেখলে মনে হবে অতি দুর্বল। এমন বহু অভিনেতাকে দেখেছি, ক্যাথারিনের পাশে ম্লান হয়ে যেতে। তাঁদেরই বরং দুর্বল মনে হত।

সব রকমের চরিত্রে ক্যাথারিন হেপবার্ন সমান অভিনয় করতে পারতেন। নায়িকা-চরিত্রে এমন প্রাণ-ঢালা অভিনয় করতেন যে তাঁর পাশে নায়ককে বড় বেমানান মনে হত। উপযুক্ত নায়ক খুঁজে বের করতে পরিচালকদের বেশ সময় লেগেছিল। ১৯৪২ সালে 'উওম্যান অফ দি ইয়ার' ছবিতে আমরা প্রথম ক্যাথারিনের উপযুক্ত নায়ক স্পেনসার ট্রেসিকে দেখতে পাই। জুটি হিসেবে পরবর্তী ছবিগুলিতে এ'রা দুজন খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

ক্যাথারিন হেপবার্ন অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল : সিটি ফ্যায়ার, ব্রেক অফ হার্টস, শিলভিয়া স্কারলেট, কোয়ালিটি স্ট্রীট, মেরি অফ স্কটল্যান্ড, অ্যালিস অ্যাডামস, স্টেজ ডোর, ব্রিঙ্গিং আপ বেবি, হলিডে, ফিলাডেলফিয়া স্টোরি, উওম্যান অফ দি ইয়ার, ড্রাগন সীড, কীপার অফ দি ফ্লেম, স্টেজডোর ক্যান্টিন, উইদাউট লাভ, আন্ডার কারেন্ট, সং অফ লাভ, দি আফ্রিকান কুইন, সামার ম্যাডনেস, দি রেইনমেকার, সাডনলি লাস্ট সামার, লং ডেজ জার্নি ইন্টু নাইট, অ্যাডামস রিব প্রভৃতি।

ক্যাথারিন হেপবার্নের শেষ ছবি আপনারা হয়ত অনেকেই দেখেছেন। কিছুদিন আগে কলকাতায় এটি দেখান হয়েছিল। ছবির নাম 'গেস হুজ কামিং টু ডিনার'। এ ছবিতে তাঁর প্রিয় নায়ক স্পেনসার ট্রেসি ছিলেন। অবশ্য দুজনেই নায়িকার বাবা এবং মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মায়ের চরিত্রে হেপবার্নের অভিনয় ভোলা যায় না। অতীতের নায়িকা আজও অম্লান। শুধু বয়সের যা হেরফের। যৌবনটাই শুধু ফেলে এসেছেন, আর কিছু নয়। এ ছবিটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারবেন ক্যাথারিন হেপবার্ন কত শক্তিশালী অভিনেত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের অস্কার পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন ক্যাথারিন এ ছবির জন্য। শেষ বেলাকার এই সম্মানটুকু তাঁর জীবনে কম মূল্যবান নয়।

চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে করতে যখনই সময় পেয়েছেন তখনই ক্যাথারিন হেপবার্ন মঞ্চে ছুটে গিয়ে অভিনয় করেছেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলি হল : দি লেক, ধেমর, উইদাউট লাভ, ফিলাডেলফিয়া স্টোরি, অ্যাজ ইউ লাইক ইট প্রভৃতি। ১৯৫৫ সালে ওল্ডভিক দলের সঙ্গে তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে শেকসপীয়রের অনেক নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন।

অভিনয় ছাড়া আর কিছুতেই ক্যাথারিনের মন সায় দিত না। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেওয়া যেত না। একবার তাঁর অটোগ্রাফ নিয়ে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। সেই ঘটনাটা বলেই এবারকার মত ক্যাথারিন-প্রসঙ্গ শেষ করব। ক্যাথারিন তখন একটা ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য হলিউড থেকে বাইরে গেছেন। শুটিং-এর সময় একটা ছোট ছেলে এসে তাঁর কাছ থেকে অটোগ্রাফ

নেবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ক্যাথারিন কিছুতেই অটোগ্রাফ দিলেন না। ছেলেটি তখন নিরাশ হয়ে বলল, আপনাকে আবার যদি ধরতে পারি তাহলে কি অটোগ্রাফ দেবেন? ক্যাথারিন হাসতে হাসতে বললেন, দেব, তবে আমাকে আর তুমি ধরতে পারবে না। যদি পার তাহলে শুধু অটোগ্রাফ নয়, তার সঙ্গে তোমাকে পঞ্চাশ সেন্ট পুরস্কার দেব।

ছেলেটি খুব খুশি হয়েছিল। এমনি স্বভাবের ছিলেন ক্যাথারিন হেপবার্ন। সমালোচক জন ম্যাসন ব্রাউন তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, মিস হেপবার্ন ইজ নট অ্যান অ্যাকট্রেস ইজি টু ডেসক্রাইব। —প্রতিজ্ঞর

জলসা
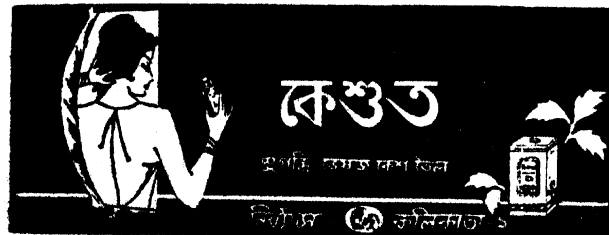
কল্যাণী রায়

বিদেশ সফরান্তে কল্যাণী রায়

ভারত সরকার-আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক সফরে শ্রীমতী কল্যাণী রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সুপরিচিত সেতারবাদিকারূপে একক অনুষ্ঠান পরিবেশনার্থে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সফরের অন্তর্ভুক্ত ছিল হংকং, ম্যানিলা, ব্যাংকক, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে কত্থক-নৃত্যে ছিলেন শ্রী ও শ্রীমতী প্রতাপ পাওয়ার, সংগতে মানিক দাস (তবলা), দুর্গালাল (পাখোয়াজ), রাজকুমার (নৃত্যের সংগে সেতার ও কণ্ঠসংগীত সংগতে)।

‘প্রত্যেকটি জায়গায় শুধুমাত্র রাজসিক সম্মান নয়, এত আন্তরিকতাপূর্ণ আপ্যায়ন পেয়েছি যে, মনেই হয়নি বাইরে কোথাও গেছি।’—উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন শ্রীমতী কল্যাণী রায়। হংকং-এ টেলিভিশন ছাড়াও ১৫টি অনুষ্ঠানে বাজিয়েছি। ওখানে ‘ইন্ডিয়া ফেস্টিভেলে’ বাজাবার পর রাগ-সংগীতমুগ্ধ শ্রোতারা অস্থির আবেগে হাই-কমিশনার এবং প্রেসিডেন্ট সিদ্ধার্থ চারয়ার কাছে প্রতিবছর অন্ততঃ দুবার ভারতীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করবার সম্মতি আদায় করেন।

পণ্ডিত রবিশংকরের পর শ্রীমতী রায় ওখানের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ আকর্ষণকারী ভারতীয় শিল্পী। অন্য কোন ভারতীয় শিল্পী (রবিশংকর ছাড়া) এখানে এর আগে বাজান নি এবং কোনো উৎসবে এমন দর্শক-সমাগম হয় না বলে শ্রীমতী রায় জানালেন।

ম্যানিলাতে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সংগে লেডী মারকোস, ফার্স্ট লেডি অভ ফিলিপাইন, শ্রীমতী কল্যাণীকে তাঁদের এক লক্ষ টাকা পরিকল্পিত আর্ট কাউন্সিল উদ্বোধন করার আহ্বান জানান।

এখানেরই প্রেস-ক্লাব আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ওদেশের জনপ্রিয় প্রেম-সংগীত ‘দাহিল সা আইও’ রাগসংগীতাংকে সেতারে বাজিয়ে কল্যাণী রায় দুই দেশের সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করে সকলের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন।

‘সলিটারী ড্যাড’ নামে ওখানকার শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্মেলনে তাঁর বাজনার পর স্থানীয় বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য হোলো ‘সি সিংগস থ্রু হার সিটার।’

ব্যাংককের ন্যাশনাল থিয়েটারেও পণ্ডিত রবিশংকরের পর তিনিই একমাত্র ভারতীয় শিল্পী।

‘সবচেয়ে অভিভূত হয়েছি ইন্দোনেশিয়াতে ‘জয়জয়ন্তী’ বাজানোর পর শ্রোতাদের অনেকের চোখে জল দেখে।’ শ্রীমতী রায় বললেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানে মানিক দাসের তবলাসংগত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। আরও একটি মজার খবর শ্রীঅদ্রিজা মুখোপাধ্যায় গিয়েছিলেন শ্রীমতী কল্যাণী রায়ের সংগে তানপুরো সংগত করতে। কিন্তু একে একে তাঁর ওপর দলের

ওস্তাদ আলী আহমেদ খাঁ

ইন্টারপ্রেটার - কাম-টেপ - রেকর্ডার-কাম-ফটো-গ্রাফার-এর দায়িত্ব এসে পড়ে এবং কাগজে কলমে লীডার না হয়েও তিনি লীডারের সম্মান পান।

ওস্তাদ আলি আহ্‌মেদ খাঁর জন্মোৎসব

ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁর ৬৪তম জন্মোৎসব পালন উপলক্ষ্যে ১০৩বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে ৩০ জুন এক চিত্তস্পর্শী সংগীত সন্ধ্যা উপহার দিলেন আলাউদ্দিন সংগীত সমাজের শিক্ষার্থীরা। ওস্তাদ আলি আহমেদ সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সংগীতসেবকের অন্যতম যিনি শুধু শিল্পীই নন—জীবনব্যাপী নিষ্ঠা ও সাধনা দ্বারা উচ্চাঙ্গসংগীত—বিশেষ আলাউদ্দিন ঘরানার যুগান্তকারী যন্ত্র-সংগীতের ধারাটি সংগীতসমাজের গোচরে আনার কাজে ব্রতী আছেন। সেদিনের সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ওস্তাদের এই নীরব সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই খাঁ সাহেবের গুণমুগ্ধ ভক্ত। ওস্তাদের স্নেহের পাত্র। পারস্পরিক এই মধুর শ্রদ্ধাস্নেহের স্পর্শে এমন এক আবেগবিহ্বল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো যা একান্তই উপলব্ধির বস্তু। সকলের বিশেষ অনুরোধে ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ সেতার বাজিয়ে শোনালেন। রাগ ‘ব্রহ্মজ্যোতি’। বহুদিন আগে ১৯৫৫ খৃঃ রঙ-মহলে অনুষ্ঠিত আলাউদ্দিন সংগীত সমাজের সংগীত সম্মেলনে এই রাগ বাজিয়ে খাঁ সাহেব সেদিনের গুণীসমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন। সেই স্মৃতির পটভূমিকায় এদিনের বাজনা আরো জমে উঠেছিল। একটি আনন্দোজ্জ্বল দিনের গৌরবভরা সংগীতকৃতি। অপরটি যেন স্মৃতিচারণের কারুণ্যে মধুর সংহত। কল্যাণ ঠাটের এই রাগ কখনও গমকের আবেগে কখনও ধীরচ্ছন্দী বিস্তারে মীড়খন্দতানে এক ভক্তিঘন পরিবেশ রচনা করে। বাজাতে বাজাতে শিল্পী মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলছেন, “আমি অযোগ্য, অধম, বাজাবার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু আপনাদের স্নেহভালবাসাকে অমান্য করবার সাহস আমার নেই। তাই বাজাতে হচ্ছে।”

—চিত্রাঙ্গদা

টেনিসের নার্শারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শ্রীমতী এ্যালথিয়া গিবসন ডারবেনের নির্দেশ—"সর্বদাই বলের ওপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখবে।"

নিগ্রো টেনিস খেলোয়াড়

ক্ষেত্রনাথ রায়

দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও যথেষ্ট সংখ্যক নিগ্রো খেলোয়াড় অলিম্পিক এ্যাথলেটিকস এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে বিশ্ব-খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলার আসরে নিগ্রো খেলোয়াড়দের সাফল্য কিন্তু খুবই নগণ্য। এ পর্যন্ত লন টেনিস খেলায় আন্ত-র্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন মাত্র এই দুজন আমেরিকান নিগ্রো টেনিস খেলোয়াড়—কুমারী এ্যালথিয়া গিবসন এবং আর্থার এ্যাস। এ'দের মধ্যে কুমারী গিবসনের খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবথেকে বেশী। উপর্যুপরি দু বছর (১৯৫৭-৫৮) উইম্বলেডন এবং আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে কুমারী গিবসন আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলার আসরে 'সম্রাজ্ঞী' খেতাব পেয়েছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত উইম্বলেডন এবং আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় নিগ্রো খেলোয়াড়দের পক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

নিগ্রো টেনিস খেলোয়াড় আর্থার এ্যাস—তাঁর হাতে ১৯৬৮ সালের আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পুরস্কার।

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার খেতাব জয়ের গুরুত্ব বে-সরকারীভাবে টেনিস খেলায় বিশ্ব খেতাব জয়। এই উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি ১৯৫৭ সালের ফাইনালে স্বদেশের ডারলিন হার্ডকে ৬-৩ ও ৬-২ গেমে এবং ১৯৫৮ সালের ফাইনালে বৃটেনের এ্যাঞ্জেলা মার্টিমোরকে ৮-৬ ও ৬-২ গেমে পরাজিত করে সিঙ্গলস খেতাব জয় করেন। কুমারী গিবসন উপর্যুপরি তিন-বার (১৯৫৬-৫৮) উইম্বলেডন ডাবলস
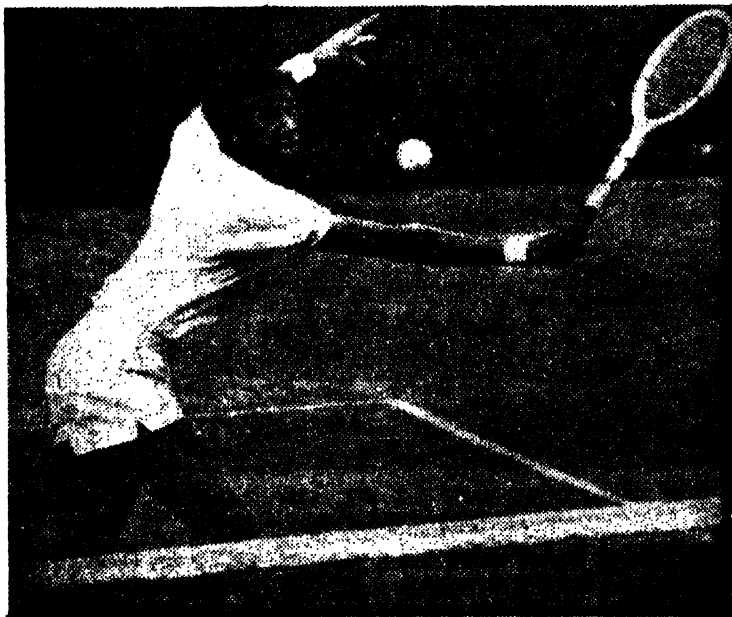
এক ঐতিহাসিক অভিনন্দন : ইংল্যান্ডের উইম্বলেডন টেনিস কোর্টে নিগ্রো খেলোয়াড় কুমারী এ্যালথিয়া গিবসনকে (আমেরিকা) তাঁর ১৯৫৭ সালের উইম্বলেডন সিংগলস খেতাব জয় উপলক্ষে তাঁর ফাইনাল খেলার শ্বেতাংগী প্রতিদ্বন্দ্বিনী কুমারী ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

খেতাবও পান—১৯৫৬ সালে কুমারী বাক্সটন, ১৯৫৭ সালে কুমারী ডারলিন হার্ড এবং ১৯৫৮ সালে ব্রেজিলের কুমারী মারিয়া বুনোর জুটিতে।

আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি উপর্যুপরি দু বছর সিংগলস খেতাব জয়ী হন—১৯৫৭ সালের ফাইনালে বিশ্ব-বিশ্রুতা খেলোয়াড় লুই ব্রাউকে ৬-৩ ও ৬-২ গেমে এবং ১৯৫৮ সালের ফাইনালে ডারলিন হার্ডকে ৩-৬, ৬-১ ও ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। ১৯৫৬ সালের ফাইনালে কুমারী গিবসন ৩-৬ ও ৪-৬ গেমে ১৯৫৬ সালের উইম্বলেডন সিংগলস চ্যাম্পিয়ান শার্লি ফ্রাইয়ের কাছে হেরে যান।

১৯৫৮ সালে উইম্বলেডন এবং আমেরিকান খেতাব জয়ের পর কুমারী গিবসন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় দলে যোগ দেন এবং ১৯৬০ সালের পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতায় বিশ্ব খেতাব জয়ী হন। পেশাদার এবং অপেশাদার টেনিস খেলায় বিশ্ব খেতাব জয়ের পর টেনিসে তাঁর উৎসাহ অনেক কমে যায়। তখন তিনি চিত্তবিনোদন এবং জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন সংগীত এবং গলফ খেলা। তিনি একজন সার্থক সংগীতশিল্পী—তাঁর গানের রেকর্ডগুলি যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। রংগমঞ্চে তিনি অভিনয় করেছেন। এমন কি একখানা বইও লিখেছেন। তাঁর রচিত বইখানার নাম—'আই অলওয়েজ টু বি সামবডি'।

কি বৈচিত্র্যময় জীবন কুমারী গিবসনের! একজন নগণ্য ব্যক্তির কন্যা কুমারী গিবসন যে একদিন বিশ্ববিশ্রুতা হবেন—এ কেউ স্বপ্নেও দেখেনি। এক বছর বয়সে কুমারী গিবসন তাঁর মা-বাবার সংগে নিউইয়র্ক শহরে আসেন। এইখানেই তিনি লেখাপড়া এবং টেনিস খেলায় হাতেখড়ি নেন। তাঁর স্কুল-জীবন নির্বিঘ্নে কাটেনি। স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর মাথায় ঝোঁক চাপে বড়দের মত

ক্রীড়ারত আর্থার এ্যাস—বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়।

কুমারী এ্যালথিয়া গিবসন—তাঁর হাতে ১৯৫৭ সালের আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পুরস্কার

চাকরী করে স্বাধীন-জীবন যাপন করবেন। সত্য-সত্যই একদিন তিনি স্কুলের পড়া অসমাপ্ত রেখে চাকরী করতে নামলেন। চাকরীও করলেন নানা জায়গায়—রেস্তরাঁ, বটন ফ্যাক্টরী, ডিপার্টমেন্ট স্টোর এমন কি বুচার সপ পর্যন্ত। শেষে ঘাড় থেকে দুষ্ট সরস্বতীকে চিরকালের মত বিদায় দিয়ে পড়াশুনায় মন দিলেন এবং স্কুলের চার বছরের কোর্স তিন বছরে শেষ করলেন। এরপর ফ্লোরিডা অ্যাগ্রিকালচার এ্যান্ড মেকানিকাল কলেজ থেকে স্নাতক উপাধি এবং ফিজিক্যাল এডুকেশনে বি-এস ডিগ্রী পান। তিনি মিশৌরীর জেফারসন শহরে লিনকলন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন' বিষয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

১৯৫৭ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয় উপলক্ষে কুমারী গিবসনকে নিউইয়র্ক সিটিতে 'টিকার-টেপ' প্যারেডে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল। নিগ্রো মহিলাদের পক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেন।

আমেরিকান খেলাধুলার আসরে 'বছরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়'—এই পর্যায়ে ১৯৫৭ সালের পুরস্কারটি লাভ করেন কুমারী গিবসন।

কুমারী গিবসনের খেলোয়াড়-জীবনের বড় সাফল্য শুধু খেতাব জয় নয়। নিজের পরাজয়কে সহজভাবে স্বীকার করা এবং প্রতিপক্ষের জয়োল্লাসে অংশ নেওয়া—এই দুই বিষয়ে তিনি অনুকরণযোগ্য উদারতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন।

বিবাহ-সূত্রে তিনি আজ এ্যালথিয়া গিবসন-ডারবেন। 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকা কুমারী গিবসনের একটি ঐতিহাসিক খেলা সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন 'তিনি শুধু নিগ্রো জাতিরই গৌরব নন, টেনিস খেলার অনুরাগী এবং সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ খেলোয়াড়দেরও গৌরবের কারণ।'

আর্থার এ্যাস বর্তমান বিশ্বের এক-নম্বর অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়। গত বছর তিনি আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। নিগ্রো খেলোয়াড়দের পক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন। আর্থার এ্যাস উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি দু'বছর (১৯৬৮-৬৯) পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে খেলেছেন। তাঁর বর্তমান বয়স ২৪ বছর।

১৯৬৮ সালের আমেরিকান জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় আর্থার এ্যাসের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের ফলে জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকা তার হৃত-গৌরব ফিরে পেয়েছে—দীর্ঘ ১২ বছর পর নিগ্রো খেলোয়াড় এ্যাসের হাত দিয়ে আমেরিকান খেলোয়াড়ের পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়। এইখানেই শেষ নয়; চার বছর পর ১৯৬৮ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আমেরিকার ডেভিস কাপ জয়ের যে কৃতিত্ব তার সিংহভাগ আর্থার এ্যাসের। আমেরিকার ডেভিস কাপ দলে এ্যাসই প্রথম এবং আজও একমাত্র নিগ্রো খেলোয়াড়। অথচ এমন দিন গেছে এ্যাসকে তাঁর জন্মভূমি রিচমণ্ডে শ্বেতকায়দের টেনিস ক্লাবে খেলতে নেওয়া হত না। কারণ তিনি যে নিগ্রো।

ক্রীড়ারতা কুমারী এ্যালথিয়া গিবসন

লিডসে ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান জন এডরিচ রান-আউটের হাত থেকে খুব জোর বেঁচে গেছেন। এডরিচ শেষপর্যন্ত প্রথম ইনিংসে ৭৯ রান করে আউট হন।

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যান্ডঃ ২২৩ রান (জন এর্ডরিচ ৭৯ এবং বেসিল ডি'ওলিভেরা ৪৮ রান। হোল্ডার ৪৮ রানে ৪ এবং শেফার্ড ৪৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৪০ রান (ডি'ওলিভেরা ৩৯ রান। সোবার্স ৪২ রানে ৫ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজঃ ১৬১ রান (বুচার ৩৫ এবং হোল্ডার ৩৫ রান। নাইট ৬৩ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৭২ রান (বুচার ৯১ এবং ক্যামাচো ৭১ রান। আণ্ডারউড ৫৫ রানে ৪ উইকেট)

লিডসের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৩০ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করার সূত্রে ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে ২-০ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' এবং 'উইসডেন ট্রফি' জয়ের গোরব লাভ করেছে। ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে সরকারীভাবে টেস্ট ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে ১৯২৮ সালে। প্রথম ১০টি টেস্ট সিরিজে (১৯২৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত) বিজয়ী দেশকে শুধু বলা হয়েছে 'রাবার' জয়ী, কোন ট্রফি দিয়ে তাদের সম্মানিত করা হয়নি। ১৯৬৩ সাল অর্থাৎ উভয় দেশের একাদশ টেস্ট সিরিজ থেকে 'রাবার'-বিজয়ী দেশকে 'উইসডেন ট্রফি' দ্বারা পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত 'উইসডেন ট্রফি' পেয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ উপর্যুপরি ২-বার (১৯৬৩ এবং ১৯৬৬) এবং ইংল্যান্ডও উপর্যুপরি ২-বার (১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৯)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এই উইসডেন ট্রফি পেয়েছে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ১৯৬৩ সালে এবং গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালে। অপরদিকে ইংল্যান্ড ১৯৬৭-৬৮ সালে কলিন কাউড্রে এবং ১৯৬৯ সালে রে ইলিংওয়ার্থের নেতৃত্বে 'উইসডেন ট্রফি' জয়ী হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার দান নেয়। বৃষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ সম্ভব হয়নি, ৮০ মিনিট দেরীতে খেলা সুরু হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের নিখুঁত বোলিংয়ের সঙ্গে লড়াই করে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের রান সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল—লাঞ্চের সময় ৩৭ রান (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১১২ রান (৩ উইকেটে)। দলের ১৬৫ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছিল। জন এডরিচ ২০০ মিনিট খেলে তাঁর ৭৯ রানে ৬টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের শেফার্ড মারাত্মক বল দিয়েছিলেন। চা-পানের পর খেলার এক সময় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল—ওভার ১০, মেডেন ৪, রান ১৬ এবং উইকেট ৩।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ড ৭ উইকেট খুইয়ে ১৯৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ২২৩ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন তারা ৫৫ মিনিট খেলে বাকি তিন উইকেটে ২৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১ম ইনিংস দ্বিতীয় দিনেই মাত্র ১৬১ রানের মাথায় শেষ হয়ে যায়। চা-পানের সময় তাদের রান ছিল ১০৫, ৬টা উইকেট পড়ে। ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসের ২২৩ রানের ভিত্তিতে ৬২ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দ্বিতীয় দিনের শেষ ৩৫ মিনিটের খেলায় ১ উইকেট খুইয়ে ১৩ রান সংগ্রহ করে সর্বসমেত ৭৫ রানে এগিয়ে যায়। হাতে জমা থাকে ২য় ইনিংসের ৯টা উইকেট। দ্বিতীয় দিনটিকে নিঃসন্দেহে বোলারদের সাফল্যের দিন বলা যায়। এই দিনে ২০৩ রানের বিনিময়ে ১৪টা উইকেট পড়েছিল—ইংল্যান্ডের ৪টে (১ম ইনিংসের ৩ এবং ২য় ইনিংসের ১) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের ১০টা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা ১ম ইনিংসের খেলায় ইংল্যান্ডের বোলারদের যথেষ্ট সমীহ করে খেলেছিলেন। খেলার এক সময় ইংল্যান্ডের বেরী নাইটের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল—ওভার ১৮, মেডেন ৫, রান ৪২ এবং উইকেট ৪।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বেসিল বুচার তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৩,০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের খেলায় ২১৪ রান (৯ উইকেটে) দাঁড়ায়। এইদিন তারা আরও ৮টা উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১৩ রানের সঙ্গে ২০১ রান যোগ করে। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৫৩ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৪২ (৫ উইকেটে)। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ইংল্যান্ড ২৭৬ রানে অগ্রগামী এবং তাদের হাতে দ্বিতীয় ইনিংসের মাত্র একটা উইকেট জমা। তবে তৃতীয় দিনের খেলায় রান সংগ্রহ করতে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট খাটতে হয়েছিল। [illegible] তৃতীয় দিনের খেলায়

৪টে উইকেট পেয়েছিলেন। খেলার শেষে দেখা গেল তিনি ৫টা উইকেট পেয়েছেন ৩৬ রানে।

চতুর্থ দিনে বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস ২৪০ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের শেষ ১০ম উইকেট জুটি ব্রাউন এবং স্নো দলের মূল্যবান ৩৭ রান সংগ্রহ করেছিলেন। খেলার এই অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে জয়লাভের জন্যে ৩০৩ রানের প্রয়োজন হয়। খেলার সময় ছিল ১১ ঘণ্টা ৫ মিনিট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চতুর্থ দিনে তাদের ২য় ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ২৪০ রান তুলেছিল—জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩০৩ রানের থেকে ৬৩ রান কম। তাদের হাতে জমা ছিল ২য় ইনিংসের ৩টে উইকেট এবং একদিনের পুরো খেলা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে জয়লাভের পথে এগিয়ে চলেছিল। চা-পানের সময় রান ছিল ১২১ (২ উইকেটে)। অপরাজিত ছিলেন ক্যামাচো এবং বুচার। এরপর খেলার এক সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩টে উইকেটের বিনিময়ে ২১৯ রান সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ জয়লাভের জন্যে আর ৮৪ রান দরকার এবং হাতে জমা ৭টা উইকেট। খেলার এই অবস্থায় আকস্মিক এবং নাটকীয়ভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। ইংল্যাণ্ড মাত্র ৯ রানের বিনিময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৪টে উইকেট পায়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২১৯ রানের মাথায় ৪র্থ, ২২৪ রানের মাথায় ৫ম, ২২৮ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম উইকেট পড়ে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক সোবার্স শূন্যহাতে পর-পর বিদায় নেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ক্যামাচো (৭১ রান) এবং বুচার (৯১ রান) দলের ১০৮ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

পঞ্চম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৭৫ মিনিট স্থায়ী ছিল—২৭২ রানের মাথায় তাদের শেষ উইকেট পড়ে যায়। জয়লাভের জন্যে তাদের ৩০৩ রানের প্রয়োজন ছিল।

নগদ পুরস্কার

তৃতীয় টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্যের স্বীকৃতি হিসাবে নগদ পুরস্কার লাভ করেছেন—

ব্যাটিংয়ে ৫০ স্টার্লিং পাউণ্ড করে এই তিনজন: ইংল্যাণ্ডের জন এড্রিচ (৭৯ রান) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বেসিল বুচার (৯১ রান) এবং স্টেভ ক্যামাচো (৭১ রান)।

বোলিংয়ে ১০০ স্টার্লিং পাউণ্ড পেয়েছেন গ্যারী সোবার্স (২য় ইনিংসে ৪২ রানে ৫ উইকেট) এবং ৫০ স্টার্লিং পাউণ্ড ইংল্যাণ্ডের বেরী নাইট।

সিরিজের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়

ইংল্যাণ্ডের উইকেট-কিপার এ্যালান নট ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে ১১ জন খেলোয়াড়কে ধরাশায়ী করে সিরিজের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে ২০০ স্টার্লিং পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেছেন।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬৯ সালের লিডস মাঠের টেস্ট খেলাই কি গারফিল্ড সোবার্সের খেলোয়াড়-জীবনের শেষ টেস্ট খেলা—এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে আজ উদয় হয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে ব্র্যাডম্যানের মতই সোবার্সের শেষ টেস্ট খেলাটি বেদনা-দায়ক নজির হয়ে থাকবে। ১৯৪৮ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ডন ব্র্যাডম্যান তাঁর শেষ টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে এরিক হোলিজের বলে বোল্ড আউট হয়ে শূন্যহাতে টেস্ট খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এই খেলার পরিস্থিতিতে তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস খেলার সুযোগ আসেনি। সোবার্স সদ্যসমাপ্ত লিডস মাঠের ৩য় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ১৩ রান করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে বেরী নাইটের বলে বোল্ড আউট হয়ে শূন্যহাতে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। সোবার্স যদি আর টেস্ট খেলায় নির্বাচিত না হন অথবা এই অবস্থায় টেস্ট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন তাহলে তাঁর শেষ টেস্ট ইনিংসের রানের ঘর শূন্যই থেকে যাবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স নিঃসন্দেহে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ডার। ক্রিকেটের প্রতিটি বিভাগে আজও কোন অলরাউণ্ডার তাঁর সমান বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেননি। একজন দক্ষ অধিনায়ক হিসাবেও তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন; কিন্তু টেস্ট সিরিজে তাঁর সাফল্যের পরিমাণ সমান দাঁড়িয়েছে—সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যে ৭টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে তার ফলাফল: ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ৩, পরাজয় ৩ এবং ড্র ১। এই ৭টি টেস্ট সিরিজের ২৯টি টেস্ট খেলার ফলাফল: ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৯, পরাজয় ১০ এবং ড্র ১০।

১৯৬৪ সালে স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল টেস্ট খেলা থেকে অবসর নিলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়কপদ লাভ করেন গারফিল্ড সোবার্স। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সোবার্সের নেতৃত্বে উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়—১৯৬৪-৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলকে বে-সরকারী-ভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বলা হয়েছে। তখন তারা পৃথিবীর দুর্ধর্ষ ক্রিকেট দল। এরপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দলের পতন শুরু হল ১৯৬৮ সাল থেকে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ইংল্যাণ্ড এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে তারা হেরে যায়। নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজটি তারা কোনরকমে ড্র রেখে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে পরাজিত হয়েছে।

আই এফ এ পরিচালিত কলকাতার দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতি-যোগিতায় ১৯৬৯ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান কুমারটুলী দল। আগামী বছর এই দলটি প্রথম বিভাগে খেলবে।

দাবার আসর

এই সংখ্যায় যে দাবা খেলাটির বিবরণ দিলাম তা গত বছরের রাশিয়ান স্পার্টাকিয়াডের, অর্থাৎ রাশিয়ান টিম চ্যাম্পিয়ানশীপের। এই খেলার বিজেতার নাম ভ্যাসিলি স্মাইস্লভ এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম লিবারজন। স্মাইস্লভ ১৯৫৭-৫৮ সালে মাত্র এক বছরের জন্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ছিলেন এবং তাঁর এই খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী লিবারজন রাশিয়ার একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়। খেলাটি ভাল করে বোঝাবার জন্যে লেখার সঙ্গে যে-সব টীকা দেওয়া হল, সেগুলি স্মাইস্লভেরই।

এই খেলাটি সম্পর্কে স্মাইস্লভের মন্তব্য—'গত পাঁচ বছরে আমার শ্রেষ্ঠ খেলা।'

ইংলিশ ওপনিং

সাদা : স্মাইস্লভ্

কালো : লিবারজন্

খেলার স্থান ও তারিখ : রিগা, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

(১) ব—ম গ ৪ : ব—রা ৪ (২) ঘ—ম গ ৩ : ঘ—ম গ ৩ (৩) ব—রা ঘ ৩ : ব—রা ঘ ৩ (৪) গ—ঘ ২ : গ—ঘ ২ (৫) ন—ঘ ১

[টীকা : এই চালটায় আমি আগেও খেলেছি, উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রীর দিকে বড়েগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।] (৫)...ব—ম ৩ (৬) ব—ম ঘ ৪ : ৬...... ঘ—ম ন ৩।

[টীকা : কালোর পক্ষে এই চালটা না দেওয়াই ভাল ছিল। এর ফলে সাদা পরে নিজের সুবিধা করে ম ন ফাইল খুলে নিতে পারবে। কালোর পক্ষে এই চালেই ব—গ৪ দেওয়া উচিত।]

(৭) ব—রা ৩ : ব—গ ৪ (৮) রা ঘ—রা ২ : ঘ—গ ৩ (৯) ব—ম ৩ : ০-০ (১০) ০—০ : গ—ম ২ (১১) ব—ম ন ৪

[টীকা : সাদা (৫) ন—ঘ ১ চালে যে প্ল্যান নিয়েছিল, সেই প্ল্যানে ফিরে গেল।]

(১১)...ন—ঘ ১ (১২) ব—ঘ ৫ : ব×ব (১৩) ন ব×ব : ঘ—রা ২ (১৪) গ—ম ন ৩ : গ—রা ৩ (১৫) ম—ঘ ৩

[টীকা : সাদা নিজের মন্ত্রী বড়েটা এগুবার ব্যবস্থা করল এবং একই সঙ্গে কালোর বিপরীত আক্রমণ (১৫)...ব—গ ৪ চালটা নিরস্ত করল। কারণ এই চালটা দিলে কালো একটা বড়ে খোয়াবে। সাদার উত্তর হবে (১৬) ব×ব (চলতি বড়ের মার) : ব×ব (১৭) ম×ন : ম×ম (১৮) ন×ম : ন×ন (১৯) গ×ম ব।]

(১৫)...ব—ঘ ৩ (১৬) ঘ—ম৪ : ব—রা ৫ (১৭) ব—ম৫ : গ—গ ২ (১৮) ঘ—ম ৪ : ম—ম ২ (১৯) গ—ঘ ২

[টীকা : শুরুর লড়াই শেষ হয়ে গেল। সাদা একটু বেশী জায়গা পাচ্ছে বটে কিন্তু পজিশনটা আটকে গেছে। একমাত্র খোলা ফাইল ম ন ফাইলটা দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ম ন ৩ ঘরে সাদার গজটা এই ফাইলটাকে বন্ধ করে রাখছে। গজটাকে বরং ম ঘ ২ ঘরে নিয়ে এলে সাদা ম ন ১ ঘরে একটি নৌকো বসাতে পারে এবং গজটাও এই নৌকোটাকে জোর দিয়ে রাখতে পারে। সাদা তাই বলগুলিকে ফের গুছিয়ে নিচ্ছে।]

(১৯)...ব—ঘ৪ (২০) ঘ (গ৩)—রা২ : রা—ন ১ (২১) ন—ন ১ : ঘ—ঘ ৩ (২২) ব—গ ৪।

[টীকা : কালোর আক্রমণ অংকুরেই বিনষ্ট হল। কালোর ২২...ঘ ব ব চালের জবাবে সাদা চালবে (২৩) ঘ (রা ২)×ব : ঘ×ঘ (২৪) ন×ঘ এবং কালোর দুর্বল রা গ বড়েটিকে সাদা আক্রমণের সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, কালো ২২...ব—ঘ ৫ চাল দিলে রাজার দিকটা অনেকক্ষণ বন্ধ থাকবে এবং সাদা নির্ভয়ে মন্ত্রীর দিকে আক্রমণ চালিয়ে যাবে (২৩) ন—ন ৭ চাল দিয়ে।]

(২২)...ব×ব (চলতি বড়ের মার) (২৩) ন×ব : ঘ—রা ২ (২৪) ঘ—গ ৬ : ম ন—রা ১ (২৫) ঘ (রা ২)—ম৪ : ঘ (গ ৩) ×ব।

[টীকা : কালো মুস্কিলে পড়ে গিয়ে খেলাটিকে প্যাঁচালো করতে চাইছে। কালোর খেলায় যে-ভাবে চাপ আসছে তা থেকে মুক্তি পেতে গেলে এরকম চালই বোধহয় সবচেয়ে ভালো।]

(২৬) ব×ঘ : গ×ব

(২৭) ঘ×ব!

[টীকা : এই বিপরীত আক্রমণেই খেলাটা সাদার হাতে চলে এল। এখন কালোর (২৭)...গ×ম চাল দিলে হবে না কারণ (২৮) গ×গ কি : রা—ঘ ১ (২৯) ঘ (গ ৬)×ঘ কি : ন×ঘ (৩০) গ×ন : রা×গ (৩১) ন—ন ৮কি ইত্যাদি। অন্যদিকে ২৭...ঘ×ঘ (গ ৪) (২৮) ম×গ : গ×গ (২৯) ন (ন ১)—রা গ ১ চালে কালোর একটা ঘোড়াই কম থাকবে।

(২৭)...ন×ঘ (২৮) গ×গ কি : রা—ঘ ১।

[টীকা : সবচেয়ে ভাল চাল। সাদা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। (২৮)...রা×গ

স্বাগত মর্ত্তবাসী! "আপনাদের চিত্তবিনোদনের জন্য দাবার আসর পেতে বসে আছি।"
(চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণ উপলক্ষে)

লিবারজন
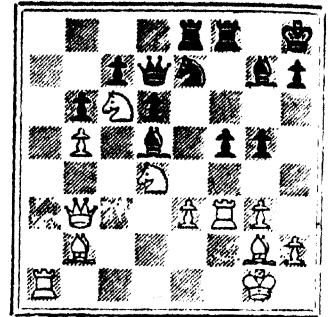
স্মাইস্লভ্

কালোর ২৬নং চালের পরের অবস্থা। এই অবস্থায় সাদার হয়ে কি চাল দেবেন?

চালটা দুর্বল হোত কারণ (২৯) ম—গ ৩ কি : রা—ঘ ১ (৩০) ন×ন : ম×ন (৩১) ন—রা গ ১ : ম—রা ৩ (৩২) ন—গ ৬ চাল হোত। সাদা এখন মন্ত্রী ছেড়ে গিয়ে কালো রাজাকে সরাসরি আক্রমণ করে বাজী জিতে নিচ্ছে।]

(২৯) ন×ন! : গ×ম (৩০) ন×ব : ঘ—ঘ৩ (৩১) গ—ন ৬ : ম—রা ৩

[টীকা : কখনই (৩১)...ন×ব চাল নয়, তাহলে (৩২) ন—ঘ কি : ব×ন (৩৩) গ×ন।]

(৩২) ব—ন ৪! ম×ব কি (৩৩) রা—ন ২ : ম—ম গ ৬ (৩৪) ন—রা গ ১ : গ—গ ৫ (৩৫) ন—গ ২ : ম—রা ৮ (৩৬) ন (ঘ ৫)—রা গ ৫ : গ×ব (৩৭) গ—ম ২ : ম—ম ঘ ৮ (৩৮) গ—ম ৫ কি : রা—ন ১

[টীকা : (৩৮)...রা—ঘ ২ (৩৯) ন—গ ৭ কি : রা—ন ১ (৪০) গ—ম গ ৩ কি : ঘ—রা ৪ (৪১) ঘ×ঘ—ব×ঘ (৪২) ন×গ ব এবং অবশ্যম্ভাবী চাল আসবে (৪৩) গ×ব কি এবং (৪৪) ন—রা গ ৮ কিস্তিমাৎ ১৬টি ঘর পেয়েও কালো মন্ত্রী একেবারেই অকেজো]

(৩৯) গ—ম গ ৩ কি : ঘ—রা ৪ (৪০) গ×ঘ : ব×ঘ (৪১) ন×ব। কালোর হার স্বীকার।

—গজানন্দ বোড়ে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ ২য় খণ্ড

অমৃত

১৩ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 1st AUGUST 1969 শুক্রবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

'বৈকালী-নাচঘর' প্রবোধ গুহ প্রসঙ্গে

আমি আপনার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই একজন নিয়মিত পাঠক। এবং প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকি। সাম্প্রতিক (শুক্রবার ২৬ আষাঢ় ১৩৭৬) সংখ্যাটিতে 'প্রেক্ষাগৃহ' শীর্ষক বিভাগে স্বর্গত প্রবোধচন্দ্র গুহ প্রসঙ্গে যে তথ্যপূর্ণ শ্রদ্ধানিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে, ভবিষ্যতে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষকদের কাছে সেটি খুবই প্রয়োজনীয় হবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে সামান্য কয়টি তথ্যগত বিভ্রান্তি আমার চোখে পড়ায়, বিনীতভাবে সেইগুলি সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। খুব সম্ভব অসতর্ক মুহূর্তেই এই বিভ্রান্তিটুকু ঘটে গেছে ; কিন্তু ইতিহাসে ত্রুটি থাকতে নেই—এই বিশ্বাসেই এই পত্রাঘাত। বিভ্রান্তিটি 'বৈকালী' ও 'নাচঘর' পত্রিকা সম্বন্ধীয়।

'বৈকালী' পত্রিকাটি ছিল দৈনিক পর্যায়ের, সাপ্তাহিক নয়। প্রত্যহ বিকালে এটি প্রকাশিত হত। মূলত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলের মুখপত্র রূপেই 'বৈকালী'র প্রকাশ ; শিশির সম্প্রদায়ের পক্ষে কিংবা আর্ট থিয়েটার্সের বিপক্ষে প্রচারের জন্যে নয়। দেশবন্ধু এবং নির্মল-চন্দ্র এই দৈনিক পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন এবং নির্মলচন্দ্র সম্পাদক বিজ্ঞাপিত হতেন। এই অধম পত্রলেখক দেশবন্ধুর অসীম প্রীতিভাজন ও নির্মল-চন্দ্রের বন্ধুতার সূত্রে সম্পাদনার সকল ভার পেয়েছিলেন। আমিই আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও হেমেন্দ্রকুমার রায়কে সহযোগী করে প্রত্যহ পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকি। তিন বন্ধু প্রত্যেকে মাসিক একশত টাকা করে পারিশ্রমিক পেতাম স্বয়ং দেশবন্ধুর নির্দেশে। এবং তৎকালে এই পারিশ্রমিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ছিল অবিশ্বাস্যরকম বেশি পাওয়া। পরে কাজের চাপের জন্যে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কেও টেনে আনা হয় আমাদের সহকর্মী হিসাবে। 'বৈকালী'র নিজস্ব মুদ্রণব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে বৌবাজারের 'বসুমতী' পত্রিকার রোটারী যন্ত্রের শরণ নিতে হয়েছিল। 'বসুমতী'র প্রকাশনায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি যাতে না হয়, তারই জন্যে 'বৈকালী'র বৈকালিক প্রকাশপর্ব। কাজের সুবিধার জন্যে বসুমতী ভবনেরই এক কোণে ছিল 'বৈকালী'র দপ্তর।

অ্যাটর্নী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন আর্ট থিয়েটার্সেরও অন্যতম কর্ণধার। সেই সুবাদে প্রবোধচন্দ্রের কর্মদক্ষতায় ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাই কিছুকাল চলার পরে 'বৈকালী'র ব্যবসায়িক দিকটা দেখাশোনা করবার জন্যে তিনি প্রবোধচন্দ্রকে কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সম্পাদন ভারপ্রাপ্ত আমরা তিন 'প্রমুখ (প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও প্রসাদ রায়—ওরফে হেমেন্দ্রকুমার রায়) ছিলাম শিশিরকুমারেরও বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। এবং শিশিরকুমারের এই সাংস্কৃতিক অভিযানকে আমরা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক হাতিয়ার বলেও ভাবতাম। তাই 'বৈকালী'র রাজনৈতিক রূপ সত্ত্বেও আমরা তার মারফৎ শিশির সম্প্রদায়ের নবনাট্য আন্দোলনকে প্রচার করবার সুযোগও ছাড়িনি। হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন চারুকলার বিদগ্ধ সমালোচক ও রসগ্রাহী। তাঁর লেখনী নিঃসৃত নাট্য-সমালোচনা শিশির সম্প্রদায়ের প্রতি বাঙলার শিল্পরস-পিপাসু জনগণকে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল, সন্দেহ নেই।

আর্ট থিয়েটার্সের একমাত্র সক্ষম এবং নিঃসন্দেহে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শিশির সম্প্রদায়ের পক্ষে এই প্রচার প্রবোধচন্দ্রের মনঃপূত হয়নি। এই প্রচারকে তিনি আর্ট থিয়েটার্সের ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকর জ্ঞান করলেন এবং প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। আমাদের অজানিতেই তিনি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে দিয়ে শিশিরের ত্রুটি প্রদর্শন করে বিরূপ সমালোচনা 'বৈকালী'তেই ছাপিয়ে দিলেন। এই ঘটনাকে বাধলো বিরোধ। আমরা এটাকে আমাদের সম্পাদকীয় স্বাধীনতায় অনধিকার হস্তক্ষেপ বলে মানলাম এবং প্রতিবাদ করলাম। প্রবোধচন্দ্র তাঁর নীতিতে অনড় রইলেন। আমি গিয়ে স্বয়ং নির্মলচন্দ্রকে সমস্ত ঘটনা জানালাম এবং প্রতিকার প্রার্থনা করলাম। কিন্তু নির্মলচন্দ্র যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করলেও আর্ট থিয়েটার্সের ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রবোধচন্দ্রকে চটাতে চাইলেন না। এমন কি শিশিরকুমার স্বয়ং দেশবন্ধুর স্নেহধন্য হলেও নির্মলচন্দ্র এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষ নিতে তাঁর অসহায়তা প্রকাশ করে, পক্ষান্তরে আমাদের ঐ ব্যাপারে চোখ বুজে থাকতেই বললেন। ইতিমধ্যে শচীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত শিশির-বিরূপ প্রবন্ধ আরও কয়েকটি 'বৈকালী'তে বেরিয়ে গেল। প্রতিবাদে 'বৈকালী' ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

এর পর প্রবোধচন্দ্র 'বৈকালী'র ছাপাখানা তুলে নিয়ে যান 'চেরী প্রেস' নামে এক মুদ্রণালয়ে এবং শচীন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় বিভাগের ভার পান। প্রবোধচন্দ্রের কর্মধারা আমাদের কাছে যেন প্রচণ্ড এক 'চ্যালেঞ্জে'র রূপ ধরে এলো, আমাদের আর চুপ করে থাকা চলে না ; কিন্তু ইচ্ছামত লিখবার কাগজ কোথায়? তাই 'নাচঘর' নাম দিয়ে নিছক রঙ্গজগৎ সম্পর্কীয় এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করা হল। বন্ধু সুধীরচন্দ্র সরকারদের ছিল পারিবারিক প্রকাশন ব্যবসা। তাকেই উদ্বুদ্ধ করা হল প্রকাশন ব্যয় এবং ছাপাখানার ভার বহন করার জন্যে। 'নাচঘর' বেরোলো হেমেন্দ্রকুমারের সম্পাদনায়। প্রথম সংখ্যাতেই আমি প্রবোধচন্দ্রকে আঘাত করে প্রবন্ধ লিখেছিলাম, মনে পড়ে। সুধীরচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছুকাল 'নাচঘর' চলার পর ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষের ভাই ধীরেন ঘোষও প্রকাশকরূপে 'নাচঘর' ছাপাতেন। আমার কাছে একখণ্ড 'নাচঘর' আছে ; ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা ; তখন এটি মাসিক রূপ নিয়েছে—সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়, তারিখ আষাঢ় ১৩৪৪। এই সংখ্যাটিতে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা "আমাদের থিয়েটারের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধও আছে। কিছুকাল এই মাসিক আকারে চলার পর 'নাচঘর' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালের যশস্বী চিত্র-পরিচালক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়ও 'নাচঘরে'র বিভিন্ন পর্যায়ে তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে আমার স্মরণ আছে।

এই বিরোধের কাহিনী জেনে কেউ যেন মনে না করেন যে, এর ফলে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে বুঝিবা আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কালে কিন্তু সেরকম কিছু হত না। মত-বিরোধকে হার্দ্য সম্পর্কের বিধ্বংসী শক্তিরূপে দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। অপরদিকে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে আমার মাতৃকুল-সম্পর্কিত আত্মীয়তাও ছিল। আমার মা কাদম্বিনী দেবী ছিলেন বরিশালের চাঁদশীর বসুবংশের কন্যা। শিশুকাল থেকেই প্রবোধচন্দ্রকে আমি দাদা ডেকে এসেছি। সেই আত্মীয়তা আমৃত্যু বজায় ছিল। তাঁর মনোমোহন থিয়েটার কিংবা নাট্য-নিকেতনের আড্ডায় আমার ছিল নিয়মিত আসা-যাওয়া। তার ফলে প্রায় সব অভিনেতা-অভিনেত্রীর

সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল অতি হৃদ্য সম্পর্ক। তাছাড়া তিনি প্রায়ই রঙ্গালয়ে করতেন মহাভোজের আয়োজন, সে সব আসরে আমার থাকতো 'পার্মানেন্ট' নিমন্ত্রণ। শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্মদিনের উৎসবের প্রতিটি আসরেই ছিলাম অভ্যাগত। কত পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বাৎসরিক মিলন হ'ত সেই দিনটিতে; একে একে সকলেই তাঁরা চলে যাচ্ছেন। শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের মধুর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। পরবর্তী যুগে আমি যখন দৈনিক 'ভারতের' সম্পাদক, তখন শচীন্দ্রনাথকে আমার অন্যতম প্রধান সহযোগী করে নিয়ে আসি। মনের মণি-কোঠায় সঞ্চয় হয়ে রইলো সেই মধুর স্মৃতিগুলি—যতদিন আর বাঁচবো!

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
কলিকাতা—২।

বেতারশ্রুতি প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃত' সাপ্তাহিকের জন্মসংখ্যা থেকে অদ্যাবধি গ্রাহক ও পাঠক। 'অমৃত'এর প্রতি আমার আকর্ষণের কারণ—এর সম্পাদকীয়, উপন্যাস, রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও সংবাদ পর্যালোচনা, বিজ্ঞানের কথা, অঙ্গনা, প্রেক্ষাগৃহ এবং সর্বোপরি কোনও সমালোচনামূলক লেখা ইত্যাদি। প্রতিটি লেখা আমার ভাল লাগায় 'অমৃত'এর প্রতিটি খণ্ড সযত্নে বাঁধিয়ে রাখছি। এই দীর্ঘ নয় বৎসরে চিঠিপত্র পৃষ্ঠায় বহু আলোচনা হয়েছে। সবগুলির সঙ্গে একমত না হতে পারলেও কোনদিন প্রতিবাদ করিনি। এবারও ভেবেছিলাম প্রতিবাদ করব না। কিন্তু ঘটনাটি আমার মনে এমনই রেখাপাত করেছে যে না লিখে পারলাম না।

গত ২১।৩।৬৯ তারিখের সংখ্যায় 'বেতারশ্রুতি' বিভাগে 'শ্রবণক' মহাশয় ২৬।২।৬৯ তারিখ রাত সাড়ে ১০টায় 'বেতারে' প্রচারিত শ্রীরথীন ঘোষ ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দের পদাবলী কীর্তন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন—তার বিরুদ্ধে গত ১৮।৪।৬৯ তারিখের সংখ্যায় শ্রীমন্টু গাঙ্গুলী মহাশয়ের কয়েকটি আপত্তিজনক মন্তব্যে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। গত ২।৫।৬৯ তারিখের সংখ্যায় 'শ্রবণক' মহাশয়ের যথোপযুক্ত উত্তরের পর ভেবেছিলাম ব্যাপারটার এখানেই সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু বর্তমান ১৬।৫।৬৯ তারিখের সংখ্যায় দেখিতেছি শ্রীঅমিতাভ মোদক মহাশয় শ্রীগাঙ্গুলীর মতের সঙ্গেই একমত হয়ে—'শ্রবণক' মহাশয়ের বিরুদ্ধতা করেছেন। আমিও একজন পদাবলী কীর্তন-পিপাসু। ছোটবেলায় এর জন্যে গুরুজনদের দ্বারা তিরস্কৃত হলেও সে সকল স্মৃতি মনে পড়লে বর্তমানে দুঃখের বদলে গর্বই বোধ করি। আকাশবাণীর প্রতিটি কীর্তনের অনুষ্ঠান আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি।

প্রতিদিন যাতে কীর্তনের অনুষ্ঠান থাকে সেইজন্যে আকাশবাণীর সঙ্গে পত্রযোগে আমার একপ্রকার ঝগড়াও হয়ে গেছে। আমি লিখেছিলাম অন্যান্য প্রাত্যহিক গানের চাইতে কীর্তন যে কোনদিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়। অথবা শ্রোতার সংখ্যাও কম নহে, তা মানতে কারও আপত্তি থাকলে আমার বক্তব্য প্রমাণ করতে আমি আগ্রহী। আরও লিখেছিলাম—যেদিন বেতারশিল্পীদের অনুষ্ঠান থাকবে না, সেদিন 'সংগীতাঞ্জলি' অনুষ্ঠানে অবশ্যই কীর্তন দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীঘোষের সেইদিনের কীর্তন আমিও শুনেছিলাম। যদিও শ্রীঘোষ আমার প্রিয় শিল্পীদের একজন, তবু আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলছি, সত্যিই আমার ভাল লাগেনি—হয়ত কীর্তন কাকে বলে এবং কয়প্রকার, এটা জানা ছিল না বলেই। 'শ্রবণকের' মতে যা কৌশল—তাকে আমি 'সুরের মুন্সিয়ানা' বলে বলতে চাই 'কীর্তন-শ্রোতাদের' মধ্যে শ্রীগাঙ্গুলীর মত কয়জন আছেন তা বোঝে। তাই পরিশেষে বলতে চাই—যে শিল্পীর কীর্তন আমাকে একদিন আকর্ষণ করত—সেই শিল্পীর কীর্তন আমাকে এখন আর আকর্ষণ করে না। এটা কী শ্রোতার মতিভ্রম বলবেন?

নন্দলালচন্দ্র কংসবণিক,
চুঁচুড়া।

> প্রবাসের জন্য প্রেরিত সব চিঠিরই নাম এবং ঠিকানা চাই। লেখক না চাইলে ছদ্মনামেও চিঠি প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু আমাদের দপ্তরে তাঁর নাম ঠিকানা থাকা অত্যাবশ্যক। প্রকাশিত চিঠির মতামতের জন্যে, বলাই বাহুল্য সম্পাদক দায়ী নন। অঃ সঃ

মানুষ গড়ার ইতিকথা

বর্তমান 'অমৃতের' গত কয়েক সংখ্যা ধরে 'মানুষ গড়ার ইতিহাস' নামে একটি ফিচার লেখা হচ্ছে। এই রচনাটি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় এবং শিক্ষামূলক। রচনাগুলি দেখে মনে হয় যে বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা দিবস ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখক রচনাগুলি লিখছেন। কাজেই উল্লেখ করি, হেয়ার স্কুলের কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৮২৩ সালে মতিলাল শীলস্ ফ্রি কলেজ (স্কুল) নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুল চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এর উপর অবস্থিত ফায়ার ব্রিগেডের বিপরীত দিকে। আশা করি সঙ্ঘিৎসু এই বিষয়ে খোঁজ নেবেন।

—স্বপন দত্ত ও আরো অনেকে; মতিলাল শীলস্ ফ্রি কলেজ (স্কুল)
(এই স্কুলের বিষয়ে নিশ্চয়ই লেখা হবে। অঃ সঃ)।

(২)

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকাটির আমি একজন নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক। এর প্রতিটি সংখ্যার জন্য আমি উৎসুক হয়ে থাকি। আপনারা আধুনিক উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও নতুন নতুন যে ফিচারগুলি প্রকাশ করছেন তাতে অমৃতের সুনাম বৃদ্ধি পাবে বলেই আশা করি। বর্তমানে 'মানুষ গড়ার ইতিকথা' নামক যে ফিচারটি প্রকাশ করছেন সত্যি তা অভিনব সংযোজন। এক একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলার পেছনে যে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তা এভাবে বর্ণনা না করলে হয়তো কোনদিনই জানা সম্ভব হতো না। এজন্য লেখক শ্রীসঙ্ঘিৎসু সবার আগে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। তিনি নিজে যেভাবে কষ্ট করে প্রতিটি বিদ্যালয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরছেন সেজন্য তাঁকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাছাড়া প্রত্যেকটি ফিচর লেখার মধ্যে লেখকের রচনার মৌলিকত্ব রয়েছেন। যাহোক, আমার এ বিষয়ে লেখকের কাছে কিছু বক্তব্য রাখছি। আশা করি তিনি আমার বক্তব্যটুকু অনুধাবন করবেন। প্রথমত তিনি বর্তমানে শুধু শহরের বিদ্যালয়গুলির কথাই তুলে ধরছেন। কিন্তু গ্রাম বাংলায় এমন বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে সেগুলির অবদানও কম নয়। তাই লেখকের কাছে আমার অনুরোধ তিনি যেন গ্রাম বাংলার বিদ্যালয়গুলির পরিচয়ও জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। এজন্য লেখকের কষ্ট সহ্য করতে হবে কোন সন্দেহ নই। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই পর্যায়ের লেখাগুলি শেষ করে কলেজগুলির ইতিহাস জানাতে চেষ্টা করলে তিনি সকলের আরও কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন। আশা করি আমার বক্তব্যের সঙ্গে লেখক একমত হবেন।

—ক্ষিতীশ দত্ত, শিক্ষক। কমলপুর, ত্রিপুরা।

সাদা চোখে

যুক্তফ্রণ্টের তথা পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমানে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক 'ভাল'। শ্রীমুখোপাধ্যায় দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই এই উক্তি করেছেন। রাজধানীতে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সংবাদপত্রের খবরে যতদূর জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধারদ্বয় ইন্দিরাজীকে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে যে বাড়তি অঙ্কের অর্থ জনকল্যাণের কাজে পাওয়া যাবে তার আনুপাতিক অংশ রাজ্যের ভাগে অবিলম্বে বরাদ্দের জন্যও অনুরোধ করেছেন। এমনকি সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে যোজনার পরিবর্তনের সুপারিশও করেছেন। আলোচনা যে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। একটি মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বলেই শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীবসু ইন্দিরাজীর সঙ্গে টেলিভিশনে মানুষের গ্রহান্তরে অবতরণ দৃশ্য অবলোকনে রাজী হয়েছিলেন। নাহলে মর্ত্যে এই মনোরম ছবি দেখা যেত না।

কেবলমাত্র চৌদ্দটি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেই ইন্দিরাজী বামপন্থীদের মধ্যে সেরা বামপন্থী হয়ে গেছেন। সমস্ত বিদেশী ব্যাঙ্ক শুদ্ধ যদি ব্যাঙ্ক শিল্প জাতীয়করণ করে সমস্ত পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে নিতেন তিনি, তবে হয়ত বামপন্থীরা নিজেদের দল উঠিয়ে দিয়ে ইন্দিরাজীর নেতৃত্বকে আরও শক্ত ও সবল করার জন্য হয়ত কংগ্রেসে যোগদানের কথা বিবেচনা করতেও দ্বিধা করতেন না। ইন্দিরাজীর স্বর্গত পিতা পণ্ডিত নেহেরু অবকাশ পেলেই সমাজবাদ স্থাপনের কথা বলতেন। অনেক বামপন্থীই সোচ্চার না হলেও মনে মনে পণ্ডিতজীকে সমাজবাদের একজন মশালচী বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা যাতে নেহেরুজীকে দুর্বল না করতে পারেন, সেজন্য কিছু কিছু কংগ্রেস নেতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন। তাঁদের ধারণাটা ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় প্রত্যেক মন্ত্রীই নিজ নিজ দপ্তরের জন্য স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ করে থাকেন এবং তাকে আপন খুশিমত কার্যকর করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে কংগ্রেসের সার্বিক নীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না —এহেন এক সিদ্ধান্তে আসার সব সময়েই চেষ্টা করা হয়েছে। এবং পুরোদমে এখনও তা চলছে।

এহেন যুক্তিহীন সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে নন্দজী, মোরারজীভাই চক্ষুশূল হয়েছিলেন। কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে চৈনিক আক্রমণের পরে বা অব্যবহিত আগে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল, নন্দজীই একমাত্র তাঁর জন্য দোষী পরিগণিত হয়েছিলেন। মোরারজী ভাইয়ের আগেও এ-দশা ঘটেছিল। বর্তমানে চ্যবন সাহেব আবার বামপন্থীদের কোপানলে পড়েছেন। ভাব দেখে মনে হয়, বামপন্থীরা একে একে তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীলদের নিধন করে কংগ্রেস শুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। অবশ্য, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে এটি একটি সুবর্ণ মাস বলে অনেকেই মনে করতে পারেন। কারণ, ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে যেখানে বামপন্থীদের সংগঠন সমুদ্রে বুদ্বুদের মত সেখানে বিশাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরস্থ প্রতিক্রিয়াশীলদের যদি ধ্বংস করে দেওয়া যায়, তবে সমাজবাদের ধারকদের মুক্ত করে অনায়াসে মনের মাধুরী মিশিয়ে রাষ্ট্র-কাঠামো পরিবর্তনে সুবিধা হবে বৈকি! তাই বোধহয় আংশিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেও ইন্দিরাজী আসমুদ্র হিমাচল এত প্রশংসা কুড়োতে পারলেন। মিছিলে মিছিলে ইন্দিরাজীর জয়ধ্বনি উঠল। গোটা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পিছনে ফেলে উল্কার মত ইন্দিরাজী দেদীপ্যমান হয়ে উঠলেন।

বামপন্থীদের মধ্যে সেরা বামপন্থী মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিও ইন্দিরাজীর হৃদয় পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন। শ্রীঅজয় মুখার্জি অকুণ্ঠ ভাষায় ইন্দিরাজীকে স্বাগত জানালে কোন রাজনৈতিক ভাষ্যকারই হয়ত মন্তব্য করবেন না। কারণ, ইন্দিরাজীর মধ্যে শ্রীমুখার্জি নিজের প্রতিবিম্ব আংশিক প্রতিফলিত দেখে যদি উদ্বেল হয়ে উঠেন, তবে তা একটি স্বাভাবিক ঘটনাই হবে মাত্র। কিন্তু মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি সুন্দরায়া সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, ইন্দিরাজী সম্পর্কে তাঁদের খুব মোহ নেই। কিন্তু তবুও ইন্দিরাজী এবং তাঁর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের নীতিকে পরাস্ত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়াস পান, তবে মার্কসিস্টরা কোমর বেঁধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। এবং শুধু তাই নয়, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলকে সংঘবদ্ধ করে 'এ লড়াই জিততে হবে' বলে ময়দানে মহড়া দেবেন।

ইন্দিরাজীকে ধন্যবাদ। তিনি এক ঢিলে দুই পাখী বধ করলেন। দলের আভ্যন্তরীন শত্রুকেই তিনি শুধু কোণঠাসা করে ছাড়েননি। অধিকন্তু বামপন্থীদেরও তিনি রাতারাতি অনুগত করে তুললেন এবং তাঁদের নেতৃত্বও দিলেন। কিন্তু যে-প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ইন্দিরাজী নিঃশব্দ বিপ্লব করলেন, তা যথাযথ রয়েই গেল। শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত হতে দেবেন না বলেই শ্রীমতী গান্ধী রণহুঙ্কার দিয়েছিলেন। কারণ, শ্রীরেড্ডি ইন্দিরা তথা প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী গোষ্ঠীচক্র সিণ্ডিকেটের প্রার্থী। কিন্তু আখেরে ইন্দিরাজী স্বয়ং শ্রীরেড্ডিকে সমর্থন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন। আর শ্রী ভি ভি গিরিকে বামপন্থীদের কাঁধে তুলে দিয়ে ইন্দিরাজী নিজের গদী পাকা করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে গেলেন। বামপন্থীরা শ্রীগিরিকে নিয়ে খুশী, কারণ স্বয়ং শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন যিনি ইন্দিরাজী ও বামপন্থীদের মধ্যে দূতিয়ালী করছেন, তিনি নাকি পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট কর্ণধারদের বৈঠকে বলেছেন:—

"Indira will engage some of her boys to work for Mr. Giri."

বিশ্বাস করুন, শ্রীমেনন পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্টকে এই কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে এবং দলীয় অনুশাসনের ভয়ে ইন্দিরাজী রেড্ডি মহাশয়ের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন না। তলে তলে গিরিকে সমর্থন জানাবেন। অতএব, এটা সুস্পষ্ট, ইন্দিরাজী দুমুখো রাজনীতির খেলায় মেতে উঠেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইন্দিরাজীর এই কৌশলের ফলে বামপন্থীরা হয়ত কিছু আপাতলাভ করতে পারেন। কিন্তু আখেরে ফল ভাল হবে কি? বামপন্থীরা প্রায় সকলেই শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব দলগত কর্মসূচী আছে। যুক্তফ্রণ্টের কর্মসূচীভিত্তিক ঐক্য থেকে বোঝা যায়, দরকার হলে আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কর্মসূচীর ভিত্তিতে তাঁরা কংগ্রেস-বিরোধী লড়াইয়ে সংঘবদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেস খারাপ, ইন্দিরাজী

ভাল. এ কোন্ ধরনের রাজনীতিক চিন্তা? অন্ততপক্ষে যাঁরা রাজনীতির আঙিনায় ঘোরাফেরা করেন, তাঁদের এটা বুদ্ধির অগম্য। বামপন্থীরা যুক্তি দেখিয়ে হয়ত বলবেন, রাজনীতিতে গণ্ডারবৃত্তি অচল। কাজেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এসব কথা মেনে নিয়েও বলতে হয়, দু-একটা তথাকথিত প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই লোকের শ্রেণী-চরিত্র পাল্টে যায় এমন কথা অন্তত মার্কসীয় অভিধানে আছে বলে শোনা যায়নি। কাজেই সমদর্শী মনে করে ইন্দিরাজীর অজস্র প্রশংসা করে বামপন্থীরা জনতার সামনে প্রধানমন্ত্রীকে নবকলেবরে উপস্থাপিত করে তাঁদেরই খাটো করলেন মাত্র। আর ইন্দিরাজী বামপন্থীদের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়ে নিজের নৌকার গতিবেগ বাড়াতে সমর্থ হলেন। ফলে, কংগ্রেসের লাভ বই ক্ষতি হল না। যে-উদ্দেশ্যে বামপন্থীরা এই কৌশল অবলম্বন করলেন, তাঁদের সেই আশা ব্যর্থ হবে বলেই ধারণা। আমে-দুধে মিশে যাবে—আঁটিই শেষপর্যন্ত গড়াগড়ি যাবে।

বামপন্থীরা যে রাজনীতি করছেন, সেটা অন্যায় রাজনীতি। আদর্শ বিচ্যুতির রাজনীতি। ডিফেকসানের রাজনীতি। এ ভুল পথ। এর ফলে সমাজবাদ ত্বরান্বিত হওয়ার চেয়ে গতিবেগ দিশেহারা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। জনতার মনে এই কুটিল রাজনীতি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে মাত্র।

যা হোক, ইন্দিরাজীর এই একটি কর্মকাণ্ডেই যদি পশ্চিমবঙ্গ ফ্রন্ট সরকারের সম্পর্ক কেন্দ্রের সঙ্গে 'ভাল' হয়, তবে সেটা সুখেরই বিষয়। কারণ, গদীতে আসীন হওয়ার পর থেকেই ফ্রন্ট প্রায় কেন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব দেখাচ্ছিলেন। রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা যুক্তফ্রন্টের এই মনোভাবকে কখনও বিষ নজরে দেখেনি। কারণ, ফ্রন্ট কর্মসূচী অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যাবে, কেন্দ্রের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করা একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু অর্থপ্রাপ্তির জন্য ঐ জঙ্গীভাব গ্রহণ করা হয়েছিল—এ-কথা বললে আদর্শগত বিচ্যুতির সম্ভাবনা থেকে যায়। আরও অনেক মৌলিক প্রশ্ন এ-মনোভাবের সঙ্গে জড়িত ছিল। যদিও ফ্রন্ট তখনও এই বিষয়ে সরাসরি কোন বক্তব্য রাখেননি, তবু এ-কথা বলা যায়, একবার সংশয়ের বীজ উপ্ত হলে তখনই আন্দোলন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, স্তিমিত হতে শুরু করে, আর আখেরে স্তব্ধ হয়ে যায়। ফলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পথ হারানো অনিবার্য। তবে এ-কথা বলা হচ্ছে না যে, যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রের সঙ্গে একটা 'State of War বজায় রাখুক। কিন্তু সুবিধামত নীতি অবলম্বিত হলে জনগণকে সঙ্গে রাখা যায় না। তাঁদের মধ্যে নেতৃত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাস ঘনীভূত হতে থাকে।

পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট একটি সাময়িক সংস্থা হলেও, বিরাট এক রাজনৈতিক দায়িত্বকে নতুন এক সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে জন্মলাভ করেছে। শুধু গদীতে থাকার মোহ নিয়ে যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরঞ্চ নতুন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সারা ভারতে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিলাষ ফ্রন্ট পোষণ করে। এ-বক্তব্য সমদর্শীর নয়। ফ্রন্ট নেতারা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের অভিভাষণের মাধ্যমে এই ইঙ্গিত করেছেন। কাজেই শক্ত হাতে হাল ধরে তাঁরা ফ্রন্ট কর্মসূচীকে ভিত্তি করে উদ্দিষ্ট পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবেন—এ-আশা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাখে। কিন্তু ফ্রন্ট কংগ্রেস-লালিত কিছু সংখ্যক তথাকথিত সমাজবাদের প্রবক্তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কুটিল রাজনীতিতে পা দেবেন এ-কথা কেউ চিন্তা করতেও ভরসা পায় না।

কৃষ্ণ মেননের বক্তব্য শোনার পরই ফ্রন্ট বৈঠকে মিলিত হয়ে গিরি সাহেবকে সমর্থন জানাবার সিদ্ধান্ত করে। অনেক দলের মন যে এহেন রাজনীতির ফাঁদে পা দিতে চাইছিল না, তাদের পরবর্তী বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। মার্কসিস্ট কম্যুনিস্টদের 'কোন মোহ নাই' উক্তি আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি। ভবিষ্যতে পলায়নের রাস্তা ঠিক রাখার জনাই এই কৌশল। অন্যদিকে এস ইউ সি আরও একটু বিপ্লবাত্মক ভূমিকা বজায় রাখবার জন্য বলেছেন শ্রীগিরিকে তাঁরা আদৌ প্রগতিশীল মনে করেন না। তবুও কংগ্রেসকে পরাস্ত করবার জন্য তাঁরা শ্রীগিরিকেই সমর্থন জানাচ্ছেন। এসব কথা শুনলেও হাসি পায়। কারণ, শ্রীগিরি ভোট-যুদ্ধে জয়ী হলেই যেন বামপন্থীদের সমাজবন্ধুদের লড়াই এক ধাপ এগিয়ে যাবে!

শ্রীরেড্ডি যদি জেতেন, তবে ভারতবর্ষের রাজনীতি একটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করবে। কারণ শ্রীরেড্ডির মত ও পথ কারও অজানা নয়। বামপন্থীরাও কংগ্রেসের ভূমিকা সেই ক্ষেত্রে পুরোপুরি অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন, এবং চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকবে কম। কিন্তু বর্তমানে কুটিল রাজনীতির আবর্তে পা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সুবিধাবাদের আশ্রয় নিলেন। ইন্দিরাজী যদি আরও খানিকটা প্রগতিশীলতার ঝোঁক দেখান, তবে এ-কথা হলফ করে বলা চলে, ইন্দিরাজী যুক্তফ্রন্টে ফাটল ধরাতে সম্পূর্ণ সমর্থ হবেন। আন্তর্দলীয় কোন্দলের সুযোগ গ্রহণ করে হয়ত সেদিন ফ্রন্টের অনেক শরিকই ইন্দিরাজীর হাত মজবুত করার জন্য উল্কাবেগে কংগ্রেসের দিকে ধাবিত হবেন। তখন প্রতিক্রিয়াশীল বলে অন্যরা যতই রাজনৈতিক হল্লা সৃষ্টি করুন না কেন, তা জনতার মনে কতটুকু রেখাপাত করতে সমর্থ হবে সেটা সাগ্রহে লক্ষ্য করার বিষয় হবে।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের এই ভ্রমাত্মক রাজনীতি দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদেরই জয় সূচিত করল। মার্কসবাদীরা দক্ষিণপন্থীদের সম্পর্কে এই বলে কটূক্তি করেন যে, কেরালায় কংগ্রেসের হয়ে তাঁরা যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার কাজে ব্রতী হয়েছেন। মার্কসবাদীরা আরও সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, সুযোগ পেলে দক্ষিণপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্টকেও ছোবল মারতে কসুর করবেন না। এবং তাঁরা সুযোগের অপেক্ষাতেই আছেন। এত বিদ্বেষ পোষণ করা সত্ত্বেও মার্কসবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটি অনেক বিচার বিবেচনা করে শেষপর্যন্ত 'ডাঙ্গে-চক্রের' থিসিসকেই মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের' প্রসারণে অংশীদার হয়েছেন। আদর্শবাদী মার্কসবাদীরা ভেবে দেখতে পারেন বক্তব্যে ভুল আছে কিনা।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে
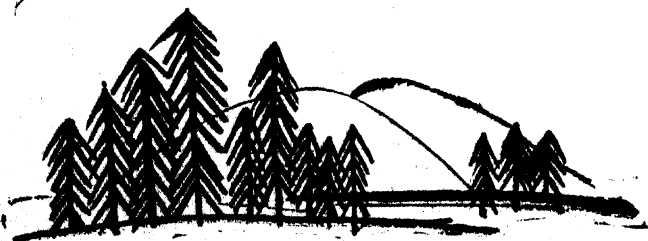
নয়াদিল্লীতে হাওয়া বদল ?

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের কাছ থেকে অর্থ দপ্তরের ভার নিয়ে নেওয়ার পর যেরকম আকস্মিকভাবে নয়াদিল্লীর হাওয়া গরম হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই রকম আকস্মিকভাবেই যেন সেখানকার হাওয়া জুড়িয়ে গেছে। বাঙ্গালোরে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের বৈঠকের পর কংগ্রেসের ভিতরে যে সংঘর্ষ অনিবার্য ও আসন্ন বলে মনে হয়েছিল সেই সংঘর্ষ এখনও হয় নি। যে সংকট অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়েছিল সেই সংকট এখনও দেখা দেয় নি। শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভা অটুট আছে, শ্রীদেশাইয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেখান থেকে কেউ ইস্তফা দেন নি (যদিও সেরকম ঘটবে বলে রটনা ছিল), কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিতে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে নি, বরং তিনি সেখানে সমর্থন পেয়েছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও ঝড় ওঠে নি, কমিটি শুধু কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে দলের ভিতরকার বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন।

মাত্র এক সপ্তাহ আগে রাজধানীতে যে একটা গেল-গেল রব উঠেছিল তার সঙ্গে তুলনা করলে এই নিস্তরঙ্গ শান্তি আশ্চর্যজনক বলে মনে হবে। রাজধানীতে কি সব গোল মিটে গেল? ঝড়ঝাপ্টা সব কি এমনিই রয়ে গেল? অথবা এই নিস্তব্ধতা নূতন আর একটা ঝড়ের পূর্বাভাষ মাত্র? এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। তবে যে কথাটা এখনই নিঃসংশয়ে বলা যায় তা হল এই যে, কংগ্রেসের উপরতলার বিরোধ মেটে নি অথবা কোন এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার করেন নি। শক্তির পরীক্ষায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পয়লা বাজী জিতেছেন মাত্র এবং তাঁর প্রতিপক্ষ আপাতত চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন।

এই ক্ষমতার খেলায় শ্রীমতী গান্ধী নিঃসন্দেহে নিজেকে অধিকতর কুশলী খেলোয়াড় বলে পরিচয় দিয়েছেন। বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের বৈষয়িক নীতি সম্পর্কে তাঁর নোট দেওয়া, রাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর একটা সংকট সৃষ্টি করার চেষ্টা, কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন থেকে তাঁর অর্থনৈতিক

> **অনুরোধ**
>
> রেজিস্টার্ড ডাকযোগে যাঁরা লেখা পাঠাবেন, তাঁদের অনুরোধ, কারো ব্যক্তিগত নামে লেখা পাঠাবেন না। সম্পাদক অমৃত—এই নামে লেখা পাঠাবেন।

সংস্কারের প্রস্তাবগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া, নয়াদিল্লীতে ফিরে এসে নাটকীয় দ্রুততার সঙ্গে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের দপ্তরচ্যুতি ঘটনা এবং সবশেষে আরও চমকপ্রদ দ্রুততার সঙ্গে ১৪টি বেসরকারী ভারতীয় ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভাকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া—এই সবই যেন শ্রীমতী গান্ধী নিজের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় একটির পর একটি সুচিন্তিত ধাপ। দলের ভিতর যাঁরা তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর পর পর এই ধরনের পা ফেলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রীমতী গান্ধী অনেক ভেবে-চিন্তে ও অতিশয় তৎপরতার সঙ্গে কাজগুলি করেছেন বলেই টেক্কা দিতে পেরেছেন।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, শ্রীমতী গান্ধী সব বিষয়েই জিতেছেন। প্রতিকূল হাওয়ার মুখোমুখি পাল তুলে নৌকা চালান যায় না, একথা তিনি জানেন। এক জায়গায় মাটি ছেড়ে তিনি অন্য জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেসের মনোনয়ন দেওয়ায় তাঁর যে আপত্তি ছিল সেই আপত্তি তাঁকে হজম করে নিতে হয়েছে; এমন কি, তাঁকে শ্রীরেড্ডির নাম প্রস্তাব করে মনোনয়ন পত্র পেশ করতে হয়েছে। বাঙ্গালোরে তিনি যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন সেই মনোভাব আঁকড়ে থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা সহজ হত; সেই সুযোগ তিনি দেন নি। কিন্তু মাত্র এইটুকু নতিস্বীকার করে বিনিময়ে তিনি অনেকখানি পেয়েছেন — দেশাই মন্ত্রিসভা থেকে বাদ গেছেন এবং ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, দলের নেত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভার রদবদল করার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর একার। অর্থ দপ্তরের ভারচ্যুত শ্রীদেশাই যখন পদত্যাগ করতে চাইলেন তখন শ্রীচাবন ও অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রী যদি শ্রীদেশাইয়ের সঙ্গে যোগ দিতেন তাহলে শ্রীমতী গান্ধী অসুবিধায় পড়তে পারতেন। কিন্তু যে-কারণেই হোক শ্রীচাবন মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করাই ভাল মনে করলেন। শ্রীমতী গান্ধীও শ্রীচাবনকে ঐ ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। শ্রীচাবনের পরামর্শে দেশাইয়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত তিনি মুলতুবী রাখলেন। কিন্তু শ্রীচাবন, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা, শ্রীকামরাজ প্রভৃতির মিলিত চাপ সত্ত্বেও তিনি দেশাইকে অর্থদপ্তর ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। সমস্ত আলোচনা যখন ভেঙ্গে গেল এবং শ্রীদেশাইয়ের পদত্যাগপত্র যখন গৃহীত হল, তখন মনে হল, এবার শ্রীমতী গান্ধীর উপর একটি প্রত্যাঘাত ফিরে আসছে। শ্রীমতী
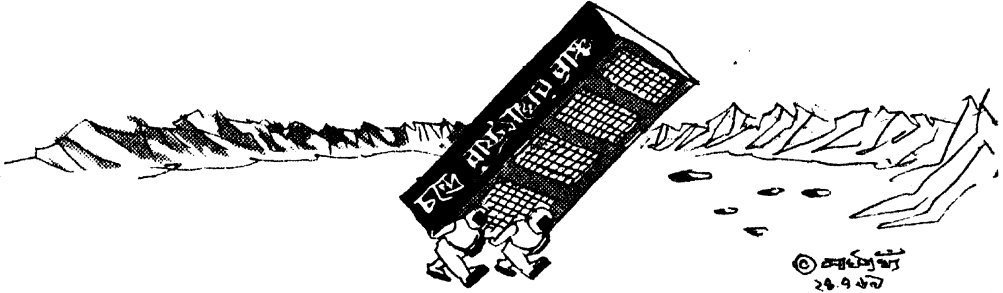
গান্ধীর প্রতিপক্ষ তখন হয়ত জানতেন না যে, প্রত্যাঘাত করার পক্ষে তখন বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে। কেননা, শ্রীমতী গান্ধী ইতিমধ্যে বে-সরকারী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন। শনিবার সন্ধ্যায় মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত এই সিদ্ধান্ত যখন ঘোষণা করা হয়ে গেল, তখন 'সিন্ডিকেট'-এর তরফে আর বিশেষ কিছু করার থাকল না। কারণ, তখন শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ দাঁড়াত ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করা। মাত্র কয়েকদিন আগে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে, সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা রাজনৈতিক দিক থেকে সমীচীনও নয়, সম্ভবও নয়। অতীতে যেমন বহুবার কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ফাইলে চাপা পড়ে থেকেছে, এবারও বৈষয়িক নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব শিকায় তোলা থাকবে, কংগ্রেসের একাংশ এমন আশা করে থাকলে তাঁদের যেমন দোষ দেওয়া যায় না, তেমনি এবার সেই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটায় কংগ্রেসের ঐ মহল যদি না পেরে থাকেন সইতে, না পেরে থাকেন বলতে, তাহলে সেটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্ত-টাই হয়েছে শ্রীমতী গান্ধীর ওস্তাদের মার। এই সিদ্ধান্ত সমগ্র পরিস্থিতিই বদলে দিয়েছে তাঁর অনুকূলে। মন্ত্রিসভায় ও কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রীকামরাজ থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেসের উপরতলার প্রায় সব নেতাই সেটা সমর্থন করেছেন। (সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন শ্রী এস কে পাতিল। তাঁর মতে, শ্রীমতী গান্ধী অযথা তাড়াহুড়া করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুধু মোরারজীকে অপদস্থ করার জন্য।)

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সিদ্ধান্ত যে নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে তাতে এমনকি মোরারজীর প্রতি ইন্দিরার আচরণের প্রশ্নটিও চাপা পড়ে গেল। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টির বৈঠকে প্রসংগটি তোলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী দলের নেত্রী হিসাবে তাঁর অধিকারের উপর জোর দিয়ে নিরস্ত হয়ে গেলেন। তারপর যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রসংগটি গেল, তখনও একটা সম্মুখ সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া হল এবং বিষয়টি শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার মধ্যে আলোচনার জন্য ছেড়ে দেওয়ার একটা মামুলি সিদ্ধান্ত করেই কমিটি তাঁদের বৈঠক শেষ করলেন।

শ্রীমতী গান্ধীর এত সহজে পার পেয়ে যাওয়ার একটা কারণ অবশ্য আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। শ্রীমতী গান্ধীর আপত্তি উপেক্ষা করে কংগ্রেসের যে-মহল শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতির পদে বসাতে চাইছেন, তাঁরা এখন শ্রীরেড্ডিকে জিতিয়ে আনার উপরই বেশী জোর দিচ্ছেন। তাঁরা এখন এমন কিছু করতে চাইছেন না যাতে দলের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয় ও রেড্ডির জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। সুতরাং নয়াদিল্লীতে এখন যে শান্তি দেখা যাচ্ছে, তার কারণ এই নয় যে, শ্রীমতী ইন্দিরার প্রতিপক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়েছেন; বরং এ-কথা বলাই ঠিক হবে যে, তাঁদের রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবেই তাঁরা আপাতত পশ্চাদপসরণ করেছেন। এটা প্রায় অবধারিত যে, আগামী ১৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর এই মুলতুবি লড়াই আবার কোন না কোন আকারে আত্ম-প্রকাশ করবে। শ্রীমতী গান্ধীর শক্তির প্রকৃত পরীক্ষা হবে তখনই।

●

পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্নার ভগ্নী মাদার-এ-মিল্লাত কুমারী ফতিমা জিন্নার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল এবং এ-ব্যাপারে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আয়ুবে খাঁর হাত ছিল। এ-কথা বলেছেন পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মুসলিম লীগ দলের নেতা হাসান এ শেখ।

এইখানে উড়েছে মানুষের বৈজয়ন্তী
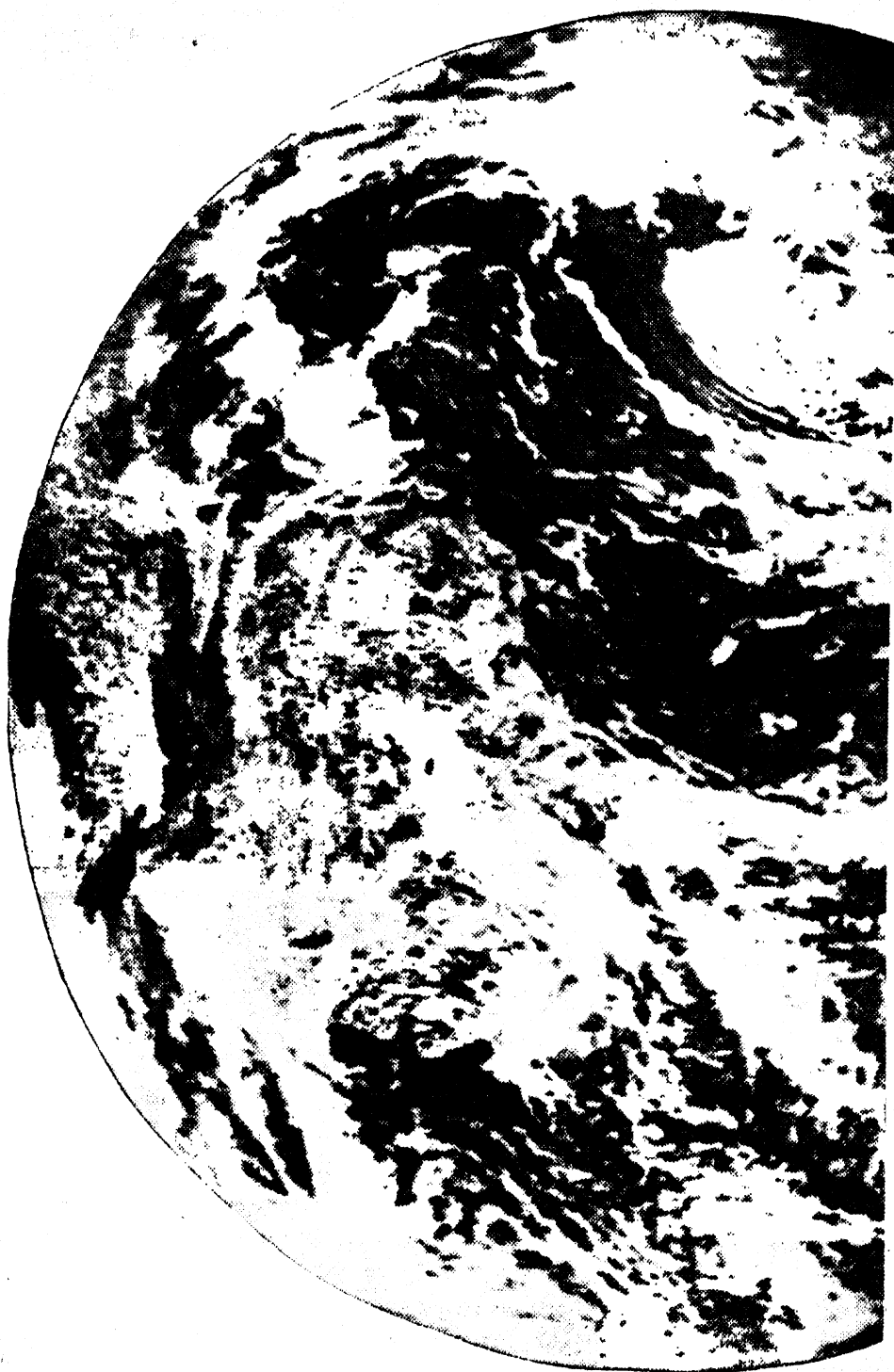
মানুষের গৌরবময় মুহূর্তে

ঘটনাটি আশ্চর্য হবারই মতো। আড়াই হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানসাধনার বিজয়কেতন চাঁদের বুকে প্রোথিত করে মর্তের মানুষ আবার ফিরে এসেছে পৃথিবীতে। নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন আলড্রিন আবার ফিরে এসেছে পৃথিবীতে। নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন আলড্রিন চাঁদের মাটিতে পদচারণা করে এসেছেন। তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন মাইকেল কলিনস্। এই অসমসাহসী বীর তিনজনের নাম মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে অম্লান অক্ষরে লিখিত থাকবে। পৃথিবীর মানুষ রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিল তাঁদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের। ২৪ জুলাই রাত্রিতে প্রশান্ত মহাসাগরে তাঁদের প্রত্যাবর্তন ছিল নিখুঁত এবং নির্ভুল।

এক দশকের কিছু আগে চাঁদে যাবার সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছিল। এর দুই প্রতিযোগী আমেরিকা ও রাশিয়া। প্রতিযোগিতায় আজ নিঃসন্দেহে আমেরিকা অগ্রগামী। কারণ, আগামী নভেম্বরে আবার চাঁদে মানুষ পাঠাবার সংকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে আমেরিকার পক্ষ থেকে। দূরগামী গ্রহলোকে মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান প্রেরণে সোভিয়েট ইউনিয়ন যতটা কৌতূহল ও দক্ষতা দেখাচ্ছে, চাঁদে মানুষ নামানোর ব্যাপারে ততটা নয়। অনেকের ধারণা, চাঁদে মানুষ নামানোতে চমক যতটা, বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ততটা নয়।

কিন্তু সে ধারণাও এখন পরিবর্তিত হবে বলে মনে হয়। চাঁদের বুকে খাবল দিয়ে যে মাটি, পাথর, নুড়ি ইত্যাদি চন্দ্রঅভিযাত্রীরা নিয়ে এসেছেন তার পরীক্ষা বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই মূল্যবান। চাঁদের জন্মরহস্যও এতে উন্মোচিত হবে। এবং চাঁদের মাটি ভেজা কেন, এ প্রশ্নেরও উত্তর বিজ্ঞানীদের দিতে হবে। চাঁদের বুকে ভূকম্পনের প্রথম হদিশও এইবারই পাওয়া গেল আর্মস্ট্রংরা যে ভূকম্পননির্ধারক যন্ত্র চাঁদের বুকে বসিয়ে এসেছিলেন তার মারফৎ। চাঁদকে যতটা মৃত ও কুশ্রী বলে ভাবতেন বিজ্ঞানীরা (কবি বা শিল্পীরা কিন্তু ন'ন) আর্মস্ট্রংদের বিবরণে চাঁদের সে কলংকও দূর হল।

এই আবেগ, উচ্ছ্বাস ও অভিনন্দনের পালা শেষ হলে যে প্রশ্নটি মানুষের মনে দেখা দেবে তা হল, চাঁদ নিয়ে ভবিষ্যতে মারামারি হবে না তো? চাঁদের বুকে মার্কিন পতাকা যেমন উড়েছে তেমনি লুনাও নেমেছে। আগামীকাল হয়তো সোভিয়েট পতাকাও সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। চাঁদের বুকেও ঠান্ডা লড়াই শুরু হবে নাকি? এসব চিন্তা অবশ্য পৃথিবীর রাজনীতিকরা আগেই করে রেখেছেন। রাষ্ট্রসংঘে ১৯৬৭ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যাতে আমেরিকা, রাশিয়া ও অন্যান্য সদস্যরা এই সম্মতি দিয়েছেন যে, চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হবে না। এই আন্তর্জাতিক চুক্তি যদি সবাই মনেপ্রাণে মেনে চলেন তাহলে অবশ্য স্বস্তির কথা। কিন্তু পৃথিবীতে শক্তি-শিবিরের দ্বন্দ্ব শেষ না হলে তার কলুষিত ছায়া যে একদিন চাঁদের বুকেও পড়বে না তার নিশ্চয়তা কি?

চাঁদের মালিকানা নিয়েও কি কোনোদিন প্রশ্ন উঠবে না। বিলাতের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যায়, ভারতের প্রধান বিচারপতি নাকি বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যাঁরা আগে চাঁদে যেতে পারবেন চাঁদ তাঁদেরই। জানি না আমেরিকানরাও তাই মনে করেন কিনা। শোনা গিয়েছিল পৃথিবীর সকল দেশের পতাকা তাঁরা বহন করে নিয়ে যাবেন। সেই পতাকাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আনা হয়েছে। এমন কি রাষ্ট্রসংঘের পতাকাটিও সেখানে রেখে আসা হয়নি। অবশ্য আর্মস্ট্রং সেখানে রেখে এসেছেন একটি ফলক "মানবজাতির শান্তির জন্য আমরা এখানে এসেছিলাম।" এই শান্তি ঘোষণা সার্থক হোক এটা সকলেরই কাম্য।

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ লিউইস মামফোর্ড সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, মহাকাশযাত্রা শুরু হয়েছিল সামরিক বিজ্ঞানের ফলশ্রুতি হিসেবে। ঐতিহাসিক টয়েনবি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, প্রযুক্তিবিদ্যায় মানুষের বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য অগ্রগতি হলেও তার নীতিবোধ, ও সামাজিক ব্যবহার অনড় অবস্থায় রয়ে গেছে। সেই কারণেই প্রযুক্তিবিজ্ঞান মানুষের পক্ষে ভয়ের কারণ। এই মনীষীরা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। মানুষের এই বিস্ময়কর সাফল্যকে তাচ্ছিল্য করার জন্য নয়। তাই মানুষের মহাকাশ অভিযানের গৌরবময় মুহূর্তে আমরা আশা প্রকাশ করি যে, এই সাফল্যকে সত্য সত্যই মানবকল্যাণে ও বিশ্বশান্তির কাজে ব্যবহার করা হবে। সেখানেই তার মহিমা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

চাঁদ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এ আমি আগেই জানতাম,
আর এও জানতাম
অনেক তৃষ্ণার মত এ জানার তৃষ্ণাও
আমাকে জেরবার করে ছাড়বে।

উদ্বেল কান্তির ঘরে গর্বের পালঙ্কে
আলস্য-লাস্যের ধবধবে বিছানায়
আমিই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম,
ঢেকে রেখেছিলাম কত নম্র আচ্ছাদনে
কত বিনোদ-বিন্যাসে, স্বপ্নের বেনারসীতে,
কত দুরূহ সূক্ষ্মতার কারুকার্যে।
কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়লেও সুভঙ্গাঙ্গী,
তোমার রহস্য ঘুমোয় না,
ঘুমোয় না আমার জিজ্ঞাসার পিপাসা।

আমি জানতাম, জানবার জন্যে আমাকে
উন্মাদ হতে হবে
বেগান্ধ হয়ে ছুটতে হবে দিকবিদিকে,
শেষ পর্যন্ত না পেঁাছে আমি ক্ষান্ত হব না—
শেষ পর্যন্ত পেঁাছুবার জন্যেই তো আমার জীবনযাত্রা।
জানতে হবে কোন সুদূরে-নিগূঢ়ে
গোপন সেই গহন উৎস
যার থেকে উচ্ছ্রিত তোমার এই মাধুরীর চাতুরী।
কোথায় কোন কক্ষে আকাঙ্ক্ষার আলো
কোন কক্ষে স্নান-মার্জন-প্রসাধন, লিখন-লেপন,
কোথায় বা সঞ্চিত বাসনার সোনার সিন্দুক।
জানতাম জানবার দুর্দান্ত আগ্রহে
আমাকে যেতে হবে চোর-কুঠুরির অন্ধকারে,
কোথায় তোমার সেই রহস্যের কুঞ্চিকা।

তাই ব্যগ্র হাতে তোমার আচ্ছাদন সরিয়ে দিতে চাইলাম
স্তরে স্তরে ক্রমাগত উন্মীলনে
সরলীকরণে।
ফুটন্ত ফুলকে তীক্ষ্ম নখে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে
দেখতে চাইলাম
কোথায় তার সুগন্ধের বাসা,
তার রঙের আলপনার সাজঘর—
তোমাকে নিয়ে এলাম সহজের মসৃণ অনাবৃতিতে।

তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম
নিথর পাথরে কোনো ভাষা লেখা আছে কিনা,
কোনো বা ভাষ্যের অবকাশ—
নেই, কিছু নেই, একটা বিসর্গ-অনুস্বারও নেই,
আদ্যোপান্ত শুধু এক নিস্তন্তু শূন্যতা।
লাবণ্যের বল্কল খুলে গেলাম আরো গভীরে
মেদমাংসেরও নিচে, রক্তের রাজস্ব পেরিয়ে,
কোথা থেকে আসে ওই প্রাণবিহঙ্গের কূহরন।
দেখলাম সেখানেও কেউ নেই, কিছু নেই—
তুমি শুধু এক অনিবার্য কঙ্কালের মালা।
তবু থামিনি,
নিয়ে এলাম রঞ্জনরশ্মি
দেখি কী ভেল্কি খেলছে তোমার হাড়ের মধ্যে,
তোমার মজ্জার নির্যাসে।
কিন্তু কী দেখলাম? দেখলাম শুধু এক খেলা
তোমার দেহময় শুধু এক অঙ্গার হবার অঙ্গীকার।
মনে হল এ তুমি নও
এ শুধু জানবার উন্মাদনার প্রচণ্ড পণ্ডশ্রমের পরিহাস।

তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনলাম
তোমার সহজ সৌন্দর্যে
আটপৌরে আবরণে, দূরত্বের সীমাশ্রীতে।
তুমি আবার সহসা অনন্তের জিনিস হয়ে গেলে।
হয়ে গেলে সেই মনোহরের বন্দর
যেখানে তোমাকে নিয়ে অফুরন্ত বাণিজ্য মধুর।

চাঁদের অভিকর্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম
আমার পৃথিবীর টানের মধ্যে।
তারপর মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে
দেখলাম জ্যোৎস্নায় সমস্ত সংসার ভেসে যাচ্ছে,
তাকালাম চাঁদের দিকে।
না, এ নয়, মহাকাশে যেখানে আমরা গিয়েছিলাম
সে এ চাঁদ নয়,
এ চাঁদে কোনো দিন যাওয়া যায় না
এ চিরকাল আমাদের কম্পাসের বাইরে,
আমাদের মনের মানচিত্রে।
এ যে তুমি, আমার সেই ঠিকানাহীন
রহস্যের রাজপুরী।।

শান্ত সমুদ্র, চাঁদ : চন্দ্রপৃষ্ঠে ঐতিহাসিক একটি মুহূর্ত। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করছেন। পিছনে বাঁদিকে চন্দ্রযান।
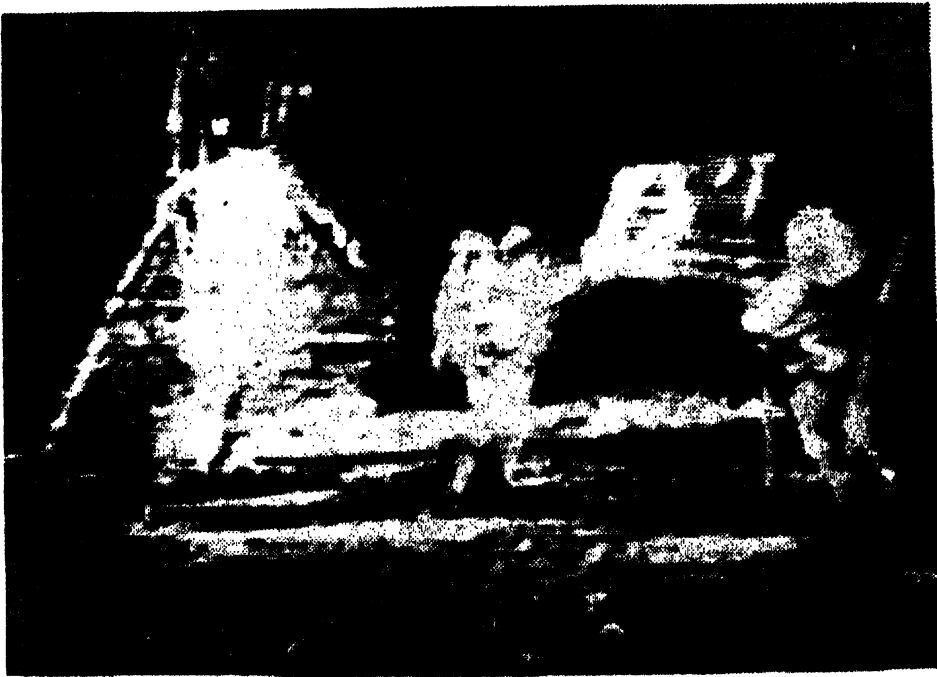
চাঁদ মানুষের চিরসাথী। তার সভ্যতার শুরুতেই সে লক্ষ্য করেছে চাঁদের কলাবৃদ্ধি বা ক্ষয়, যা থেকে মাস এবং চান্দ্রবছর গণনা সম্ভব হয়েছিল। তেমনি চাঁদের টানেই সমুদ্রে বা নদীতে যে জোয়ার-ভাটা খেলছে সেটাও সে বুঝেছিল। আর নক্ষত্রখচিত আকাশে চাঁদই একমাত্র বড়ো বস্তু যা খালি চোখে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

তাই চাঁদের কতই না আদর—চাঁদ মুখ বা চাঁদপানা ছেলে পিয়ামুখচন্দ যা শেষ অবধি পুরাণে চন্দ্রলোকের কথা বলা হয়েছে।

প্রায় সাড়ে চারশ বছর পূর্বে, ১৬১০ খৃস্টাব্দে ইতালীয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও প্রথম স্বরচিত টেলিস্কোপে চাঁদকে নিরীক্ষণ করে বুঝলেন যে, চাঁদ আসলে আর একটি 'পৃথিবী'—সেখানে পাহাড় পর্বত রয়েছে, আর উপত্যকার ঔজ্জ্বল্য দেখে ওদের সমুদ্র বলে ভুল হয়েছিল। রেনেসাঁর বৈজ্ঞানিকরা স্বভাবতই ইউরোপের পর্বতদের নামানুসারে নামকরণ করলেন 'এপেনাইন', 'আলপস প্রভৃতি, বাদ পড়লো হিমালয় বা আণ্ডিস, আর সমুদ্রদের নামাঙ্কিত করা হোলো 'বৃষ্টির সমুদ্র' 'শান্ত সমুদ্র' 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র' ইত্যাদি, যে নামে আমরা এখনও ডাকতে অভ্যস্ত, যদিও আমরা বহুদিন ধরেই নিশ্চিন্ত জানি যে, চাঁদে একফোঁটা জল নেই।

আসলে চাঁদ একেবারে মরা জগৎ বলেই আমাদের ধারণা 'অবশ্যই ঐ ধারণার সামান্য পরিবর্তন হয়তো করতে হতে পারে)। সেখানকার জলহীন ফলহীন পাণ্ডুর নরু-

ক্ষেত্রে আছে কেবল খাড়া খাড়া সুউচ্চ পর্বতমালা তার মধ্যে একটি হিমালয়ের চেয়েও উঁচু, বিরাট উপত্যকা, আর বেশ বড়ো হাঁ-করা গর্ত, নিভন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। এই নিভন্ত আগ্নেয়গিরির একটিতে, নাম তার পুরোনো গ্রীক দার্শনিকের নামানুসারে এরিস্টারকাস, কয়েক বছর পূর্বে একজন সোভিয়েট জ্যোতির্বিদ সামান্য অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন পেয়েছিলেন বলে দাবী করেছিলেন। দাবীটি গ্রাহ্য হয়েছে বলেই বলতে হচ্ছে যে, চাঁদ হয়তো একেবারে মরা জগৎ নয়।

তা বলে কি চাঁদে প্রাণ আছে? সাধারণত প্রাণ বলতে উদ্ভিদ বা প্রাণী-জগতের যে সংজ্ঞা আমরা ধরে থাকি, তাতে প্রাণ নেই। কিন্তু আজকাল বীজাণু, বিশেষ করে ভাইরাস জাতীয় বহু ধরনের প্রাণ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে জোর করে বলা যাচ্ছে না যে, চাঁদে কোনোরকমের ভাইরাস অবধি নেই। সেজন্যই যে দুজন মহাকাশচারী আরমস্ট্রঙ এবং এলড্রিন চাঁদের বুকে প্রথম নেমে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাটিয়ে এখন আবার মূল এপোলো-১১ ব্যোমযানে ফিরে এসে তাদের আর এক দোসর কলিনসকে নিয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করছেন (লেখার সময়ে তাঁরা এখনও প্রত্যাবর্তনের পথে)। তাঁদের তিনজনকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর

আর্মস্ট্রং (সামনে) ও অলড্রিন চাঁদে একটি কম্পনির্ধারক যন্ত্র ও লেসার রিফ্লেক্টর স্থাপন করেন। এর ফলে চাঁদের কম্পন এবং পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে সঠিক দূরত্ব নির্ধারণ সম্ভব হবে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে এই দুটি যন্ত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপনের যে মহড়া উভয়ে দেন চিত্রে তাই দেখানো হচ্ছে।

বেশ কিছুদিন একেবারে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কারণ কে জানে, তাঁরা সংগে করে চাঁদ থেকে আমাদের অজানা এমন কোনো বীজাণু বা ভাইরাস আনছেন কি, না যা থেকে আমাদের সমূহ বিপদ হোতে পারে।

তাঁদের এপোলো-১১ ব্যোমযান তো আর চাঁদে অবতরণ করেনি; যেটি অবতরণ করেছিল, ঈগল নামে ছোট একটি ডিঙি ব্যোমযান, সেটিকেতো তাঁরা মূল ব্যোমযানে ফিরে যাবার পরে আবার বিচ্ছিন্ন করে সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে অনন্তকালের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে সূর্যের একটি কৃত্রিম গ্রহের মতো বরাবর সূর্য-প্রদক্ষিণ করে চলবে।

যা হোক, এবারে চাঁদে মানুষের প্রথম পদাংকের বিস্ময়কর ও মানুষের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক দুঃসাহসিক অভিযানের মূল বৃত্তান্তে আসা যাক।

এপোলো ব্যোমযানদের অভিযান

চাঁদে মানুষের পদার্পণের প্রস্তুতি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে চলছে গত বছর থেকে। অবশ্য তার পূর্বেও মহাকাশ অভিযানের প্রথম লক্ষ্য ছিল নিশ্চয়ই চাঁদ, আর সেটা সম্ভব করতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তার শুরু গ্যালিলিও থেকে। একদিক থেকে ভাবতে গেলে গ্যালিলিও, নিউটন, কেপলার থেকে সিওলকভস্কি (প্রথম রকেট-বিজ্ঞানের আবিষ্কারক), গডার্ড এসনল-পেলতোঁর, হেরম্যান ওবের্থ থেকে মহাকাশে প্রথম মানুষ উইরি গাগারিন বা প্রতিটি মহাকাশচারী এবং তাঁদের প্রচেষ্টার পেছনে গত চারশ বছর ধরে অগণিত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মীর নিরলস সাধনা না থাকলে আজ আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা এবং ত্রয়ী বীর মহাকাশচারী, আরমস্ট্রং, এলড্রিন ও কলিনস মানুষের প্রশস্ত ললাটে এই জয়তিলক এঁকে দিতে পারতেন না।

আরো সুখের কথা যে, চাঁদে পদার্পণ করেই প্রথম যে কাজটি তাঁরা করেছেন, সেটি হল একটি স্মারকলিপি স্থাপন, যাতে লেখা আছে: 'আমরা পৃথিবী গ্রহের মানুষ জুলাই ১৯৬৯ সালে মানুষের শান্তির বাণী নিয়ে চাঁদে এসেছিলাম।' ইউনাইটেড নেশনসের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টও বলেছেন যে, চাঁদ বা গ্রহাদি এবং মহাকাশে অভিযান লব্ধ সমস্ত জ্ঞান সমগ্র মানবজাতিরই সম্পত্তি।

যা বলছিলুম, গত বছরে খৃস্টমাসের সময়ে প্রথম এপোলো-৮এর ত্রয়ী আরোহীরা চাঁদের জমির মাত্র ৬০ মাইল উর্ধ্বে চাঁদকে দশবার প্রদক্ষিণ করে বেশ কিছু ছবি তুলে, আবার পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে আসেন। যাত্রাপথটি ছিল খানিকটা বাংলা চার সংখ্যার মতো—পৃথিবীকে বার দুয়েক পাক দিয়ে, চাঁদকে দশবার পাক দিয়ে আবার ফিরে আসা। তাছাড়া, যাত্রাপথটি পৃথিবী থেকে প্রথম ২,১৬,০০০ মাইল যেন উঁচু পাহাড়ী পথে আরোহণ করে, তারপর চাঁদের দিকে শেষ ২৪,০০০ মাইল অবরোহণ করা। (আমরা 'অমৃত' পূজা সংখ্যা ও পরে এপোলো-৮-এর সময়ে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছি)।

এপোলো-১০ পৃথিবী থেকে যাত্রা করে চাঁদের দেশে যা সন্নিকটে পৌঁছে চাঁদকে প্রায় যখন ৬০ মাইল উচ্চে প্রদক্ষিণ করছে, তখন মূল ব্যোমযান থেকে আর একটি ছোটো ডিঙি ব্যোমযান (নাম দেওয়া হয়েছে লুনার মডুল) বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের জমির মাত্র ১০ মাইল উর্ধ্বে দুবার চন্দ্র প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে আবার মূল ব্যোমযানে ফিরে আসে।

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, জুলাই মাসে এপোলো-১১ ব্যোমযান থেকে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় আবার একটি ছোটো ডিঙি ব্যোমযান (নাম আগেই বলেছি 'ঈগল') চাঁদের বুকে 'শান্ত সমুদ্রে' অবতরণ করবে। কাজেই আগের এপোলো-১০ ব্যোমযানের লুনার মডুলকে দুবার ঐ 'শান্ত সমুদ্রের' উপর দিয়ে মাত্র ১০ মাইল উর্ধ্বে প্রদক্ষিণ করিয়ে সেখানকার ছবি তুলে অবতরণের স্থানটি একেবারে ঠিক করে ফেলা হয়।

অবতরণের বিশেষ সমস্যা

তথাপি ১০ মাইল উর্ধ্বে প্রদক্ষিণ করা এক জিনিস আর একেবারে চাঁদের বুকে নেমে পড়ে, সেখানে পায়ে হেঁটে চলা-ফেরা করা আরেক জিনিস। এবারে সেই বিশেষ সমস্যাটি একটু দেখা যাক।

এপোলো-১১ ব্যোমযান যখন প্রায় ৬০ মাইল উর্ধ্বে চন্দ্র-প্রদক্ষিণ করছে, তখন তার গতিবেগ থাকছে প্রায় ঘণ্টায় ২,০০০ মাইল। এই গতিবেগ নাকচ করে চাঁদের দিকে ৬০ মাইল অবতরণ করতে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের টানে তার পতনের গতিবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে নিশ্চয়ই। একেও নাকচ করে একেবারে হাল্কা পালকের মতো চাঁদের জমি ছুঁতে পারলে তবেই আরোহীদেরও প্রাণরক্ষা এবং আবার চাঁদ ত্যাগ করে মূল ব্যোমযানে ৬০ মাইল উর্ধ্বে উঠে আসা সম্ভব হবে।

এর জন্য চাঁদের জমির দিকে পতনকালীন প্রথমত ঈগল ডিঙি ব্যোমযানের লেজের দিকে যেন পেছু হেঁটে নামাতে নামাতে আবার রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে চাঁদের জমি থেকে উর্ধ্বে উঠবার একটা বিপরীত গতিবেগের ঝোঁক দিতে হবে। অর্থাৎ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ ঈগল ব্যোমযানকে টেনে নামাচ্ছে, আর ঈগলের চাঁদের জমির দিকে ফেরানো রকেট ইঞ্জিনের মুখ থেকে ধাক্কা দিয়ে গ্যাস নির্গত হওয়ায় ঈগল উচ্চে যাবার চেষ্টা করছে—এই দুয়ের টানা-পোড়েনে ঈগল আস্তে আস্তে নামতে পারবে। বলা বাহুল্য এই টানা-পোড়েনের হিসাবটি নির্ভুল হওয়া চাই। চাঁদে অবশ্য এক ফোঁটাও বায়ু নেই, কাজেই বায়ুর প্রতিবন্ধকতাকে কাজে লাগিয়ে যেমন ব্রেক করা যাবে না। তেমনি বায়ুর ধাক্কায় এদিক-ওদিক বিচ্যুত হবারও ভয় অবশ্য নেই।

অবতরণের মুহূর্তে তথাপি যাতে একটুও ধাক্কা না লাগে তার জন্য তিনটি
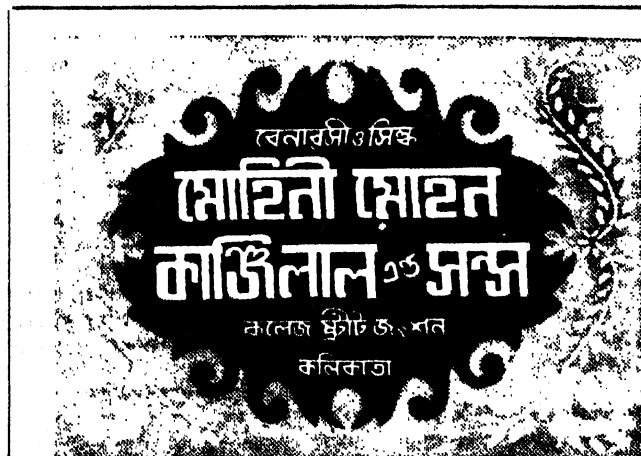
ফ্রেসনেডিল্লাস কেন্দ্রে ধরা হয়। ছবিতে চাঁকাকালে অ্যাপোলো-১১-র মূলযান থেকে গৃহীত এই টেলিভিশন চিত্রটি স্পেনের
ফ্রেসনোডিলল্লাস কেন্দ্রে ধরা হয়। ছবিতে চাঁদের 'ওয়েব' নামক বিরাট গহ্বরটি দেখা যা চ্ছে।
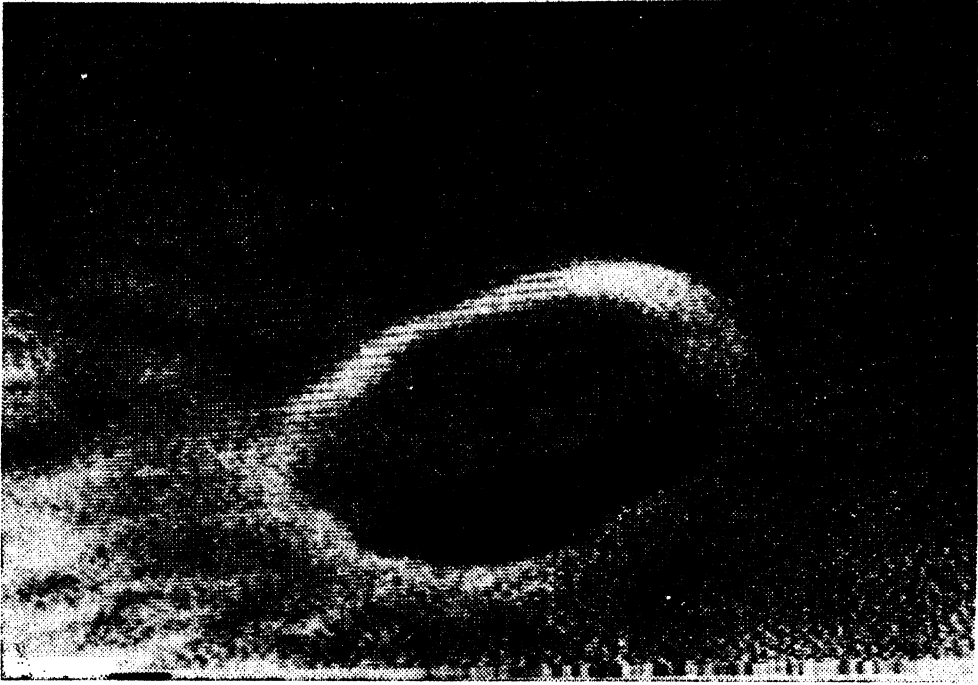
বা চারটি জোরালো স্প্রিংযুক্ত পায়ার উপর দাঁড় করিয়ে তাকে নামানো হয়েছে।

অবতরণের সমস্ত কাজটা ইলেকট্রনিক কমপিউটার যন্ত্রের ওপর ন্যস্ত থাকলেও চাঁদের জমির কাছাকাছি এসে দেখা গেল, অবতরণের স্থানটিতে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই রয়েছে। কাজেই রকেটকে চালিয়ে অবতরণের পূর্ব নির্ধারিত স্থান থেকে পাঁচ মাইল দূরে নামানো হয়েছে। যন্ত্রের চেয়েও যন্ত্রী যে বড়ো, তা প্রমাণিত হোলো। ভবিষ্যতে হয়তো একেবারে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাতে নির্ভর করেই অবতরণ করা সম্ভব, কিন্তু ঈগল-ব্যোমযানে মানুষ আরোহী ছিল বলেই শেষ মুহূর্তে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচা সম্ভব হোলো।

অবতরণের পর

আরোহীদ্বয় সবশুদ্ধ চাঁদে প্রায় ১৯ ঘন্টা কাটিয়েছেন, তার মধ্যে চাঁদের বুকে পাদচারণা করেছেন ২ ঘন্টা, ১৩ মিনিট, ২ সেকেন্ড। প্রথমে অভিযানের নেতা আরমস্ট্রঙ সিঁড়ি বেয়ে চাঁদের বুকে নামলেন ভারতীয় সময় ২১ জুলাই সকাল ৮-১৭ মিনিট। আমেরিকাতে তখন ২০ জুলাই বলে সারা আমেরিকাতে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করা হোলো ২০ জুলাই।

আরমস্ট্রঙ নেমেই প্রথমে চাঁদের জমির কিছু টুকরো একটা খুন্তির মতো যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর মহাকাশের পোষাকের থলের মতো পকেটে রাখলেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর গায়ে মহাকাশের পোষাক space suit পরা ছিল, আর তাতে অক্সিজেন নেওয়া, নিঃসৃত কার্বন ডাই-অকসাইডকে বার করে দেওয়া, রেডিও মারফৎ কথাবার্তা বলার সবরকম ব্যবস্থাই ছিল। ভুললে চলবে না যে, চাঁদে একফোঁটাও বায়ু নেই, কাজেই এই ব্যবস্থা।

চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র, কাজেই তাঁদের ওজন এখন কমে তাই দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর ওজন যদি পৃথিবীতে ছিল ১ মণ, ৩২ সের, (সাধারণ মানুষের ওজন), তাহলে সেটা এখন দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২ সের। অবশ্যই এই স্বল্প ওজন নিয়ে তাঁদের অত্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করতে হয়েছে। ঠিক তেমনি পৃথিবীতে ৪ ফুট লাফাতে পারলে চাঁদে তাঁরা ২৪ ফুট লাফাতে পারতেন এবং ২৪ ফুট থেকে নেমেও আসতেন অনেক ধীরে ধীরে। অবশ্যই উপস্থিত সে ছেলেমানুষি তাঁরা করেন নি। ভবিষ্যতে চাঁদে বৈজ্ঞানিকদের বাসোপযোগী কলোনী গড়ে উঠলে (চাঁদের জমির নীচে) হয়তো এসব করা যেতে পারবে।

চাঁদের ঐ টুকরো জমি যতোটুকু সংগ্রহ করা গেছে, সেটুকু সমগ্র মানবজাতির অমূল্য সম্পদ। চাঁদের জমির রাসায়নিক বর্ণালী ও অন্যান্য বিশ্লেষণ করে আমরা চাঁদের জন্মরহস্যের কথা হয়তো জানতে পারবো। আর চাঁদের জন্মের সঙ্গেই পৃথিবীর জন্মও জড়িয়ে রয়েছে। হয় চাঁদের জন্ম পৃথিবীর থেকে, আর নয়, যেটা বেশী সম্ভব, চাঁদ-পৃথিবী যেন যুগ্মগ্রহ, জন্ম তাদের একই লগ্নে।

কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও জলরাশির প্রভাবে অতীতের (৪৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর জন্ম) সমস্ত জন্মলক্ষণই আজ বিলুপ্ত, যেটা চাঁদে হয় নি। কাজেই চাঁদের জন্মরহস্যের ঠিক ঠিক হদিশ পেলে আমাদের পৃথিবী তথা সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তির কার্যকারণ সম্পর্কই হয়তো আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে।

ঠিক সেজন্যই তাঁরা একটি সিসমোগ্রাফ বা ভূকম্পন মাত্রা মাপবার যন্ত্র (এখানে চন্দ্রকম্পন বলা যেতে পারে) বসিয়ে এসেছেন।

চাঁদে মানুষের প্রথম পাদচারণাতে যে মহাযাত্রার শুরু, তার মধ্যপর্বে গ্রহান্তরে যাত্রা, তারপরে অন্য নক্ষত্রলোকের গ্রহান্তরে—এর অন্ত নেই।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অভিনন্দন জানাই আমরা ত্রয়ী বীর মহাকাশচারীদের, আমেরিকার বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান কর্মীদের।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগ যুগ ধরে মানুষ গ্রহান্তর যাত্রার যে-স্বপ্ন দেখে এসেছে এবং যাকে ঘিরে এইচ জি ওয়েলস, জুল ভার্ণ প্রমুখ লেখকেরা নানা কল্পকাহিনী রচনা করেছেন, আজ বিশ শতকের সপ্তম দশকে সেই স্বপ্ন সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হল। গত ২১ জুলাই মর্ত্যলোকের দুজন মানুষ চাঁদের বুকে তাঁদের পদচিহ্ন রেখে এসেছেন। কিন্তু এই বিস্ময়কর সাফল্য একদিন বা এক বছরের প্রচেষ্টায় অর্জিত হয়নি, ধাপে ধাপে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাফল্য ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সার্থক পরিণতি ঘটেছে। প্রায় এক যুগ ধরে একের পর এক সাফল্যজনক অগ্রগতির মধ্য দিয়ে কিভাবে আজ মানুষের শতাব্দীর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

প্রায় এক যুগ আগে ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর মহাকাশে মানুষের এই জয়যাত্রার শুভ সূচনা হয়। সেদিন সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম মানুষের হাতে-গড়া কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক—১ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে। ঊর্ধ্বাকাশের তেজস্ক্রিয়তা, বায়ুর চাপ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্যে এই মহাকাশযানে কতকগুলি যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল। স্পুটনিক—১-কে মহাকাশে পাঠাবার ঠিক এক মাস পরে ৩ নভেম্বর রাশিয়া আর মহাকাশযান স্পুটনিক—২ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে। এই মহাকাশযানে কেবল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিই রাখা হয়নি, সেই সঙ্গে লাইকা নামে একটি কুকুরকেও পৃথিবী পরিক্রমায় পাঠানো হয়েছিল। পৃথিবীর জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যে লাইকাই প্রথম মহাকাশযাত্রী। কয়েকদিন পরে অবশ্য লাইকা মারা গিয়েছিল।

১৯৫৮ সালের ৩১ জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম মহাকাশযান এক্সপ্লোরার—১ মহাকাশে প্রেরণ করে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর বিকিরণ বলয় (ভ্যান্ অ্যালেন বেল্ট) আবিষ্কার করে। ঐ বছরের ১৭ মার্চ দ্বিতীয় মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড—১ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই উপগ্রহের সাহায্যেই জানা যায়, পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়; কিছুটা ডুমুরের মতো। ১৯৫৮ সালের ১ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা (নাসা) গঠিত হয়। এই সংস্থাই আমেরিকার মহাকাশ কার্যসূচী রূপায়িত করেছে।

১৯৫৯ খৃঃ ১৩ সেপ্টেম্বর রুশ মহাকাশযান লুনা—২ চন্দ্রের মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে। এর কিছুকাল পরে রুশ মহাকাশযান লুনা—৩ মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে একটি অধ্যায় রচনা করে। চন্দ্রের যে-দিকটি চিরদিন পৃথিবী থেকে অদৃশ্য, সে-দিকটি পরিক্রমা করে তার সম্পর্কে নতুন তথ্য পরিবেশন করে।

এর প্রায় দু' বছর পরে রাশিয়া সর্বপ্রথম একজন মানুষকে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমায় প্রেরণ করে ১৯৬১ খৃঃ ১২ এপ্রিল। পৃথিবীর এই প্রথম মহাকাশচারী হচ্ছেন ইউরি গাগারিন। তিনি ভোস্তক—১ মহাকাশযানযোগে একবারমাত্র পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে ১০৮ মিনিট পরে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এর প্রায় ১ মাস পরে ১৯৬১ খৃঃ ৫ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রথম মহাকাশচারী অ্যালেন

শুক্র অভিযাত্রী রুশ অন্তর্গ্রহ স্টেশন ভেনাস-৪
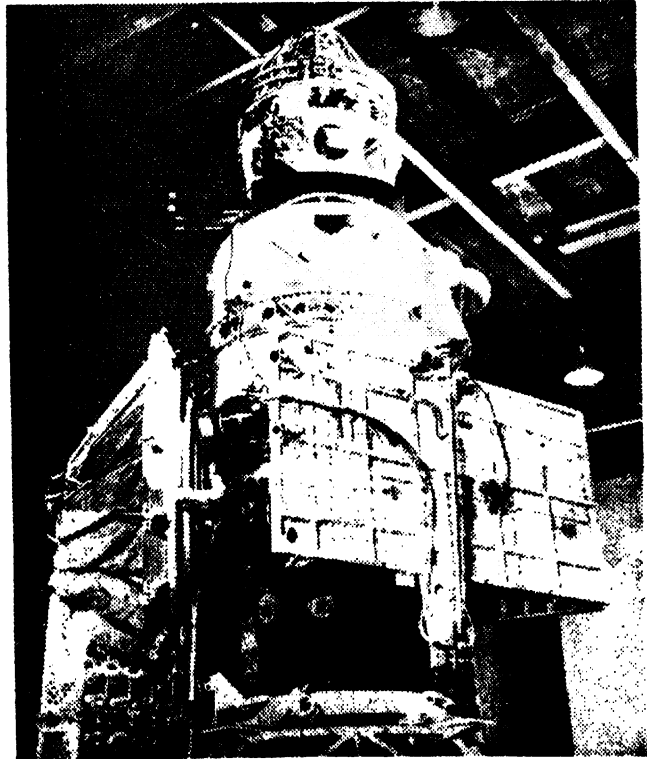
অ্যাপোলো-১১-র মূলযান থেকে গৃহীত এই টেলিভিশন চিত্রটি স্পেনের ফ্রেসনেডিল্‌লাস কেন্দ্রে ধরা হয়। ছবিতে চাঁদের সূর্যাস্ত দেখা যাচ্ছে।
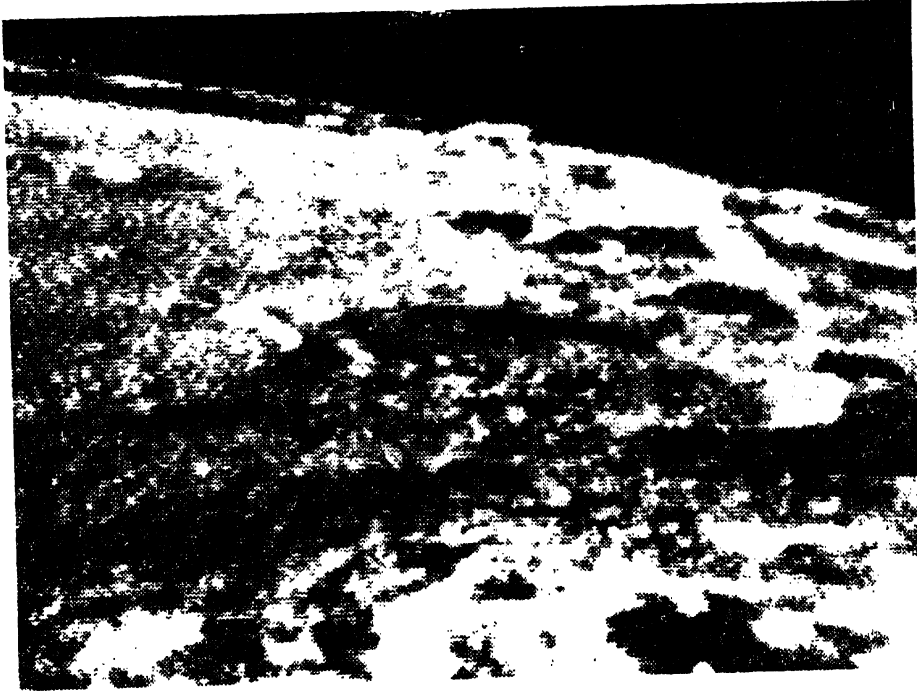
শেপহার্ডকে মহাকাশে প্রেরণ করে। তিনি পৃথিবী থেকে প্রায় ১৯০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে উঠে অর্ধবৃত্তাকার কক্ষপথে ১৫ মিনিট পরিক্রমা করে ফিরে আসেন।

১৯৬১ সালের ২৫ মে মার্কিন কংগ্রেসে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলেন, এই দশকের মধ্যেই আমেরিকা চাঁদের দেশে মানুষকে পাঠাবে এবং তাকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবে। চন্দ্র অভিযানের উদ্দেশ্যে অপরিমিত অর্থব্যয়ের প্রস্তাব কংগ্রেসের অনুমোদনের জন্যে পেশ করার সময় বলেন, 'এই দশকের মধ্যে মহাকাশ অভিযানের আর কোনো একটি পরিকল্পনা এর চেয়ে বেশি উত্তেজনাকর হবে না, অথবা এর চেয়ে আকর্ষণীয় হবে না, বা মহাকাশকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের দিক থেকে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে না এবং এর চেয়ে কঠিনতর বা অধিকতর ব্যয়সাধ্য আর কিছু না।' এই দশক শেষ হবার আগেই আজ আমরা দেখলুম, প্রেসিডেন্ট কেনেডির সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা সত্যে পরিণত হয়েছে।

১৯৬১ খৃঃ ৬ আগস্ট রাশিয়া আর একজন মহাকাশচারী গেরমান তিতভকে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমায় প্রেরণ করে। তিনি ২৫ ঘণ্টা মহাকাশে থেকে সাড়ে সত-বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসেন।

এরপর ১৯৬২ খৃঃ সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই মহাকাশ অভিযানে বিশেষ তৎপরতা দেখা যায়। ঐ বছরের ২০ ফেব্রুয়ারী মার্কিন মহাকাশচারী জন গ্লেন ৫ ঘণ্টা করে তিনবার পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করেন। আর আগস্ট মাসে মনুষ্যবাহী দুখানি রুশ স্পুটনিক যৌথ-ভাবে মহাকাশ পরিক্রমা করে। আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ প্রায় ৯৬ ঘণ্টা মহাকাশে ছিলেন। আর পাভেল পোপোভিচ মহাকাশ পরিক্রমা করেন ৭২ ঘণ্টা। মানুষ যে মহাকাশ পরিক্রমার অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে থাকতে ও কাজ করতে পারে, তা এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের যৌথ পরিক্রমার সাফল্যের মধ্য দিয়ে গেল।

এরপর আমেরিকা ও রাশিয়া কয়েকজন মহাকাশচারীকে একের পর এক মহাকাশে প্রেরণ করে। মার্কিন চন্দ্র-অভিযানে যে তিনটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আজ সার্থকতা লাভ করেছে, তার প্রথম পর্বটি অর্থাৎ মার্কারি পরিকল্পনার শেষ হয় ১৯৬৩ সালের ১৬ মে। এই পরিকল্পনার শেষ মহাকাশচারী গর্ডন কুপার ৩৪ ঘণ্টা মহাকাশে থেকে ২২ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। একজন অভিযাত্রীবাহী এই পরি-কল্পনায় ৬টি অভিযান সম্পন্ন হয়। এর ঠিক এক মাস পরে অর্থাৎ ১৬ জুন পৃথিবীর প্রথম নারী মহাকাশচারী ভালেন্তিনা তেরেশকোভা ভোস্তক—৬ মহাকাশযানে করে তিন দিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। ভোস্তক—৬ উৎক্ষেপণের আগে ভালেরি বিকভস্কি-চালিত ভোস্তক—৫ মহাকাশযান পাঁচদিন পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করে। মনুষ্যবাহিত মহাকাশ পরিক্রমার জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রচুর তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছিল বিকভস্কির পরিক্রমা থেকে।

১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত রাশিয়া 'ভোসখদ ১' নামে তিন যাত্রীবাহী মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করেন। এই মহাকাশযানে তিনজন যাত্রী ছিলেন কর্ণেল ভলাদিমির কোমারভ, কনস্তানতিন ফিওকতিস্তভ এবং বোরিশ ইয়েগোরভ। এই মহাকাশ পরিক্রমাকালে পদার্থপ্রযুক্তিগত এবং চিকিৎসাজীববিদ্যাসংক্রান্ত গবেষণার বিস্তারিত কর্মসূচী সমাধা করা হয়েছিল। ভোসখদ মহাকাশযানেই ধীর অবতরণ-কৌশল প্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল।

১৯৬৫ সালের ১৮ মার্চ রুশ মহাকাশ-চারী আলেকজেই লিভনোভ সর্বপ্রথম মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে মহাকাশে পদচারণা করেন। তার প্রায় এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ২৩ মার্চ দুজন যাত্রীবাহী মার্কিন জেমিনি পরিকল্পনার সূচনা হয়। এই পরিকল্পনায় মহাকাশ পরিক্রমাকালে এক

কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে মহাকাশযান চালনার কৌশল প্রথম পরীক্ষিত হয়। ঐ বছরেরই ৩ জুন মার্কিন মহাকাশচারী এডওয়ার্ড হোয়াইট জেমিনি—৪ মহাকাশ-যান থেকে বেরিয়ে এসে ২২ মিনিটকাল মহাকাশের বুকে পদচারণা করেছিলেন।

১৯৬৬ সালটি চন্দ্র-অভিযানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর। **ঐ বছর লুনা—৯ নামে স্বয়ংক্রিয় রুশ মহাকাশযান চন্দ্রপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম ধীরে ধীরে অবতরণ করে। এই লুনা—৯ পরীক্ষা-যান দিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠের সূক্ষ্ম গঠন লক্ষ্য করা হয়। ঐ বছর জোন্দ—৩ মহাকাশযানের সাহায্যে রুশ বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের অদৃশ্য দিকের চিত্র প্রথম সংগ্রহ করেন।** লুনা—৯-এর পরে আর একখানি রুশ মহাকাশযান এবং মার্কিন 'সারভেয়র' যান চন্দ্রের ঝটিকাসাগরে অবতরণ করেছিল। এছাড়া কয়েকখানি রুশ ও মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ চন্দ্রের কাছাকাছি কক্ষ ধরে প্রদক্ষিণ করে। এইসব মহাকাশযান চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন বিস্তারিত আলোকচিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। চন্দ্রপৃষ্ঠের এইসব আলোকচিত্রের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। এইসব চিত্রের সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের নিখুঁত মানচিত্র রচনা করা সম্ভব হয়।

মার্কিন চন্দ্রাভিযানের শেষ পর্যায়ের পরিকল্পনা হচ্ছে অ্যাপোলো, যার সার্থক পরিণতি সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৬৮ খৃঃ শেষদিকে অ্যাপোলোর মাধ্যমে এই পরিকল্পনার তিনজন যাত্রীবাহী মহাকাশযানের কার্যকারিতা প্রথম পরীক্ষা করে দেখা হয়। অ্যাপোলো—৭ মহাকাশযানে তিনজন মহাকাশচারী ১১ দিন মহাকাশ পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। যাত্রীবাহী এই অ্যাপোলো—৭ মহাকাশযানটি মহাকাশে প্রেরণের আগে যাত্রীবিহীন ঐ জাতীয় আরও ছ'টি যান মহাকাশে প্রেরণ করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। অ্যাপোলো—১-এর মহড়ার সময় মার্কিন মহাকাশচারী এডওয়ার্ড হোয়াইট, ভার্জিল গ্রিসম এবং রজার চাফে এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ১৯৬৭ খৃঃ ২৪ এপ্রিল 'সোয়ুজ—১' মহাকাশযানযোগে পরিক্রমা করার পর পৃথিবীতে অবতরণকালে রুশ মহাকাশচারী কোমারভও প্রাণ হারান। এই দুটি দুর্ঘটনার দরুন রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই মহাকাশ অভিযান কিছুকালের জন্যে স্থগিত রাখে।

তার আগে মহাকাশে দুটি মহাকাশযানের মিলন (ডকিং) ও আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া, মহাকাশে এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে গমন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উভয় দেশের মহাকাশচারীরা সম্পন্ন করেন।

এরপর ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ-অভিযান শুরু করে। চন্দ্রপৃষ্ঠের ১১২ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে থেকে অ্যাপোলো—৮ মহাকাশযানের তিনজন অভিযাত্রী চন্দ্রের কক্ষপথ ১০-বার প্রদক্ষিণ করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। আর এ-বছরের অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের গত মার্চ মাসে সম্পন্ন হয় চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণের মহড়া। সেটি ছিল একটি ক্ষুদ্র যান ও আর একটি বৃহৎ মহাকাশযানের পৃথিবীর কক্ষপথে মিলন। অ্যাপোলো—৯ মহাকাশযানের তিনজন মহাকাশচারী ১০ দিনব্যাপী মহাকাশ পরিক্রমাকালে দুটি যানের মিলন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ছোট যানটিকে বলা হয় 'লুনার মডিউল' বা চন্দ্রযান আর
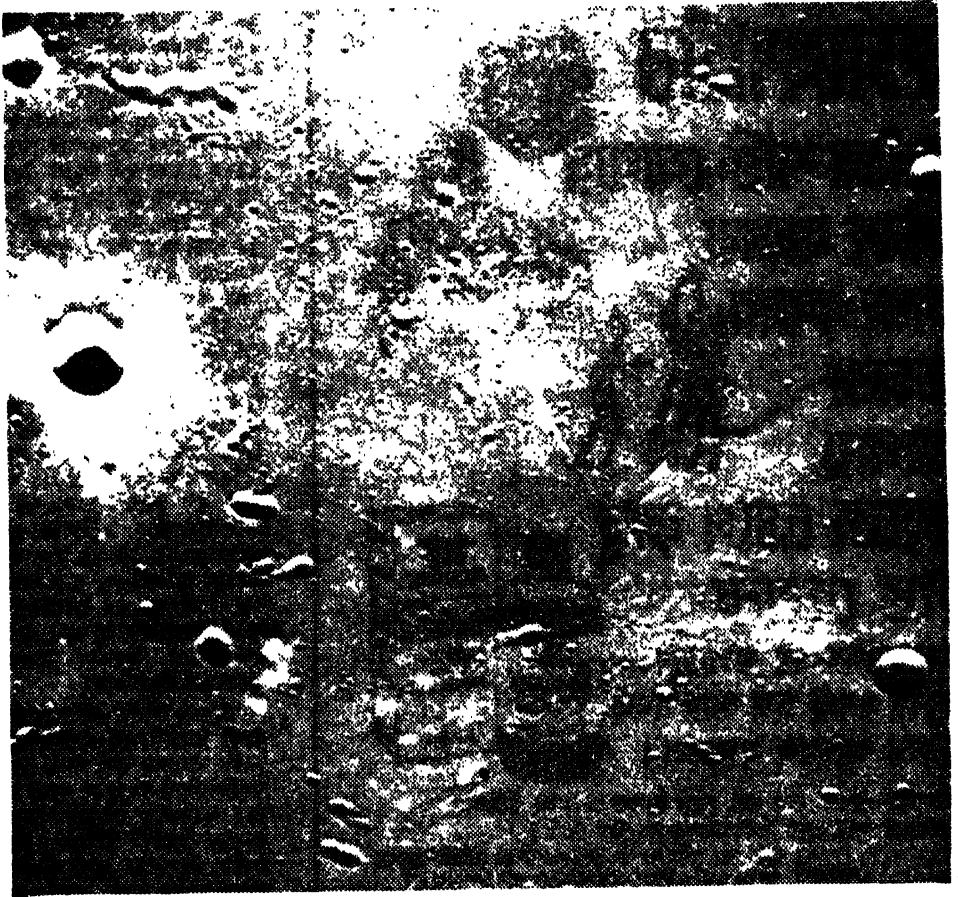
চাঁদের 'শান্ত সমুদ্রের' প্রান্তবর্তী স্থান যেখানে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চন্দ্রযান সহ নেমেছিলেন।

বৃহৎ যানটি হচ্ছে মাদার স্পেসক্র্যাফট বা মূল মহাকাশযান। অ্যাপোলো—৯ অভিযানে চন্দ্রযানটি মূল মহাকাশযান থেকে পৃথক হয়ে আবার তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

এরপর অ্যাপোলো—১০ অভিযানে তিনজন মহাকাশচারী চন্দ্রের কক্ষপথে এই বিষয়টি পরীক্ষার জন্যে গত মে মাসে চন্দ্র অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ যানের যাত্রীরা চন্দ্রের কক্ষপথে থেকে ৩০ বার চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন এবং দুজন যাত্রী মূল মহাকাশযান থেকে চন্দ্রযানে প্রবেশ করে চন্দ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি নেমে আসেন। এই দুজন যাত্রী চন্দ্রপৃষ্ঠের ৯ মাইল উর্ধ্বে থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে আবার মূল যানে ফিরে যান। তারপর তিনজনে মিলে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

অ্যাপোলো—১০ অভিযানের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অ্যাপোলো—১১ অভিযানে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী গত ১৬ জুলাই তিন মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং এডউইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিনসকে নিয়ে অ্যাপোলো—১১ মহাকাশযান চন্দ্র অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। আর গত ২১ জুলাই আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম পদার্পণ করে মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন। তাঁরা প্রায় ২২ ঘণ্টাকাল চন্দ্রপৃষ্ঠে অবস্থান করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এর পরবর্তী অ্যাপোলো অভিযানে আরও দীর্ঘ সময় অবস্থান করে চন্দ্রপৃষ্ঠে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ চালানো হবে। ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে, অ্যাপোলো—১২ আগামী নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি উৎক্ষিপ্ত হবে।

অ্যাপোলো—১১ অভিযান শুরু হবার ঠিক তিনদিন আগে রাশিয়া লুনা—১৫ মহাকাশযানকে চন্দ্র অভিমুখে প্রেরণ করে। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, লুনা—১৫ চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে নমুনা সংগ্রহ করেও পৃথিবীতে ফিরে আসবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, লুনা—১৫ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে তার কাজ শেষ করেছে। রাশিয়া এখনও পর্যন্ত কোনো মানুষকে চন্দ্রের বুকে প্রেরণ করেনি। তবে চন্দ্রের বুকে একাধিক মহাকাশযানকে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়েছে এবং একাধিক যানকে চন্দ্রের কক্ষপথে পরিক্রমা করিয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনিয়েছে।

চন্দ্র-অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই দূরান্তের গ্রহে বা গ্রহের কাছাকাছি তথ্যানুসন্ধানী মহাকাশযানকে পাঠিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে।

১৯৬০ সাল থেকে সোভিয়েত রাশিয়া শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে আন্তর্গ্রহ মহাকাশযান পাঠাচ্ছে। ১৯৬৪ সালে রাশিয়া ভেনাস—৩ মহাকাশযান শুক্রপৃষ্ঠে প্রথম নামিয়েছিল, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সেটি কোনো বেতার-সংকেত পাঠাতে পারেনি। ১৯৬৭ সালের ১৮ অকটোবর রুশ মহাকাশযান ভেনাস—৪ শুক্রপৃষ্ঠে অক্ষতভাবে অবতরণ করে এবং শুক্রের আবহমণ্ডলের চাপ, ঘনত্ব, তাপমাত্রা এবং রাসায়নিক সংযুতির পরিমাপ করে। আর এ-বছর (১৯৬৯) দুটি রুশ আন্তর্গ্রহ মহাকাশযান ভেনাস—৫ এবং ভেনাস—৬ গত জানুয়ারী মাসে ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে প্রায় চার মাস পরে গত ১৬ ও ১৭ মে শুক্র গ্রহের বুকে ধীরে ধীরে অবতরণ করে। এই দুটি মহাকাশযানের সাহায্যে শুক্র সম্পর্কে বহু মূলবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

আমেরিকাও শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে একাধিক মহাকাশযান প্রেরণ করেছে। ১৯৬২ সালের ২৭ অগাস্ট আমেরিকা শুক্র গ্রহ অভিমুখে মেরিনার—২ নামে যাত্রীবিহীন মহাকাশযান পাঠিয়েছিল। সেটি ১৬ সপ্তাহে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী শুক্রগ্রহের প্রায় ৩৫ হাজার কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে এবং ৮ কোটি ৭২ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে শুক্র সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ১৯৬৪ খৃঃ ২৮ নভেম্বর মঙ্গল গ্রহ অভিমুখে মেরিনার—৪ মহাকাশযান ভূপৃষ্ঠ থেকে যাত্রা শুরু করে ১৯৬৫ খৃঃ ১৫ জুলাই ২২৮ দিনে মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি এসে পৌঁছায় এবং ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে আলোকচিত্রসমূহ পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এরপর ১৯৬৭ খৃঃ ১৪ জুন মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার—৫ শুক্র অভিমুখে যাত্রা করে ঐ বছরের ১৯ অকটোবর শুক্রের ৪ হাজার কিলোমিটারের মধ্যে এসে পৌঁছয় এবং ঐ গ্রহ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরণ করে।

রুশ ও মার্কিন এই আন্তর্গ্রহ মহাকাশযানের সাহায্যে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গেলেও এদের সম্পূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে আরও প্রচুর অনুসন্ধান প্রয়োজন। আজ চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদার্পণ-অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় গ্রহান্তরের রহস্য অনুসন্ধানের পথ আরও প্রশস্ত হলো এবং আগামী ১০ বছরের মধ্যে গ্রহান্তর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কতদিক থেকে যে বেড়ে যাবে কে জানে!
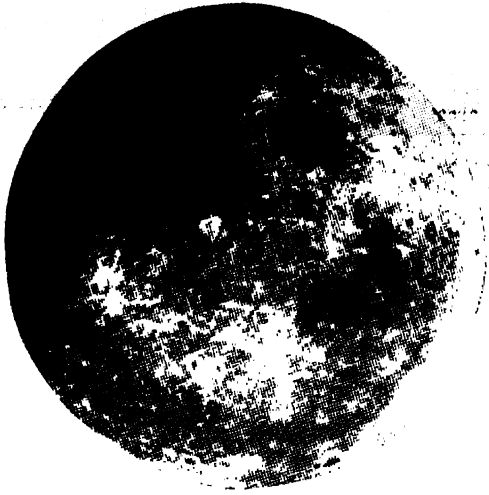
কলকাতার বিজ্ঞানীমহল বলেন

পৃথিবীর দুজন মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণের সংবাদ বিশ্বের অন্যান্য অংশের মতো কলকাতা মহানগরীর সর্বস্তরের মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর সাফল্যে তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এ-সম্পর্কে কলকাতার বিজ্ঞানীমহলের অভিমত জানার জন্যে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কাছে আমরা গিয়েছিলুম। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে এই জয়যাত্রার বিচার করে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

সত্যেন বসু

বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী জাতীয় **অধ্যাপক সত্যেন বসুর** কাছে আমরা প্রথমে যাই। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন : চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদার্পণ যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার একটি চমকপ্রদ কৃতিত্ব সন্দেহ নেই। সুসংবদ্ধ সংগঠনের দ্বারা মানুষ যে অসাধ্যসাধন করতে পারে এটা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে মানুষের ইতিহাসে এটি বৃহত্তম সাফল্য নয়। চন্দ্রলোকে মানুষকে পাঠাবার জন্যে যে বিপুল সম্পদ ও শক্তি নিয়োজিত হয়েছে তা মানব সভ্যতাকে ঠিক পথে এগিয়ে দেবার কাজে লেগেছে বলে আমি মনে করি না। আজ খোদ আমেরিকাতেও শতকরা ২০ ভাগ লোক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই শত শত লোক দুঃখকষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে এই বিরাট অর্থ যদি ব্যয়িত হত তাহলে মানুষের সভ্যতা অনেকখানি এগিয়ে যেত। দুর্গত মানুষের জন্যে যিনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন সেই গৌতম বুদ্ধ কিংবা মানুষের সেবার জন্যে যিনি আত্মদান করেছিলেন সেই যীশু খৃস্ট মানুষের সভ্যতাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছেন বলে আমি মনে করি।

মহাকাশচারীরা সারা মানুষজাতির শান্তির জন্যে চন্দ্রের বুকে একটি ফলক রেখে এসেছেন। এর আগে পৃথিবীর শান্তির জন্যে হিরোশিমা নাগাসাকির ওপর অ্যাটম বোমা ফেলা হয়েছিল। এই মারণাস্ত্র নিয়ে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলি কিভাবে শান্তি রক্ষা করেছেন তা আজ আমরা বেশ ভালোভাবে দেখতেই পাচ্ছি।

প্রিয়দারঞ্জন রায়

প্রবীণ রসায়নবিজ্ঞানী **অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ও** অধ্যাপক বসুর মতো সমদৃষ্টিতে এই সাফল্য দেখেছেন। তিনি বলেন : চন্দ্রপৃষ্ঠে সশরীরে মানুষের অবতরণ সভ্যতার ইতিহাসে এক অভাবনীয় বিস্ময়কর ঘটনা এবং মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি ও যন্ত্রকৌশল উদ্ভাবনে অতুলনীয় কীর্তি এ-কথা মানতে হবে। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা মানবাত্মার অন্তরতম প্রেরণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পৃথিবীবাসী মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং, এবং অলড্রিনের চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণের এই হলো তাৎপর্য। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্ঞানের আহরণ ও প্রয়োগের চরম উৎকর্ষেরও এটি একটি উদাহরণ। এতে প্রমাণ হয়, জ্ঞানের কোন সীমানা নেই এবং সতত অপসৃয়মান পরম সত্যকে লক্ষ্য করে চলেছে বিজ্ঞানের অফুরন্ত অনুসন্ধান—অসীমের সন্ধানে দেহের দেশকালে সীমাবদ্ধ মানবাত্মার অভিযান। মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রয়াসই হচ্ছে মানবাত্মার একটি স্বাভাবিক প্রেরণা। পৃথিবীরূপী ক্ষুদ্র গ্রহে আবদ্ধ হয়ে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। তাই ঊর্ধ্বাকাশে প্রয়াণে সে হচ্ছে অভিলাষী।

অন্যদিকে প্রশ্ন ওঠে—এতে মানুষের কি কল্যাণ সাধনের সম্ভাবনা? অপরিসীম অর্থব্যয়ে বিস্ময়কর অভিযানের মূলে রয়েছে সোভিয়েৎ রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা—একথা অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে নতুন সামরিক পরিস্থিতি ও পৃথিবীবাসীর পক্ষে পরমাণু বোমা আবিষ্কারের মত আরও একটি গভীরতর আতংক ও বিভীষিকার সৃষ্টি হবে না—একথা কে বলতে পারে? বিজ্ঞানের এই দ্রুত আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষের নৈতিক জীবন সমতা রক্ষা করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। তাই আজ আমরা পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় অক্ষম হয়ে দূরদূরান্তের গ্রহউপগ্রহে সর্বজাতির পতাকা রোপণ করে এই শান্তি ও মৈত্রীর অভিনয় করতে উদ্যোগী হয়েছি। যে অপরিমেয় অর্থ মহাকাশযানের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে তার শতাংশের একাংশও যদি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর নিরাশ্রয় কোটি কোটি পৃথিবীবাসী নরনারীর কল্যাণকল্পে ব্যয়িত হত তাহলে আজ মানুষের অনেক দুঃখ দৈন্য ঘুচে যেত।

যতীন্দ্রনাথ ভড়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিকস-এর অধ্যক্ষ **অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড়** বলেন : চন্দ্রলোকে মানুষের এই দুঃসাহসিক সফল অভিযান বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার সকল শাখার গবেষণার এক নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। এই সফল অভিযান বিজ্ঞানের বিশেষত রেডিও ফিজিকস ও ইলেকট্রনিকস-এর বিপুল ও বিস্ময়কর জয়যাত্রা।

ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার-এর অধ্যক্ষ **ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু** বলেন : এই সফল অভিযানে দুঃসাহসিক অভিযাত্রীরা যেমন সকল মানুষের অভিনন্দন পাবেন, তেমনি যেসব প্রয়োগকুশলী ও বিজ্ঞানীদের গৌরবময় কৃতিত্বের অবদানে এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে তাঁরাও ধন্যবাদের যোগ্য। মহাকাশচারীরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কথা জানার জন্য আজ পৃথিবীর সকল মানুষ গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

রেডিও ফিজিকস ও ইলেকট্রনিকস বিভাগের অধ্যাপক **ডঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত** (যিনি জোড্রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরে গবেষণা করেছেন) বলেন : আর্মস্ট্রং, আলড্রিন এবং কলিনস-এর চন্দ্র অভিযানের সফলতা এক নতুন যুগের সূচনা করলো। পৃথিবীর অভিকর্ষের বাঁধন কাটিয়ে কয়েক লক্ষ মাইল

দূরে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং রহস্যময় পরিবেশে বিচরণ করা মানুষের পক্ষে যে সম্ভব, দুঃসাহসিক এই অভিযান তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। এঁরা যে সাহসিকতা, মনোবল, ধৈর্য, দৃঢ় সংকল্প, পরম সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁদের সাফল্যে সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারী আজ বিস্ময়ে হতবাক, আনন্দে উল্লসিত। চাঁদের মাটিতে মানুষ পদার্পণ করলো, হাঁটাচলা করে সেখানকার কিছু মাটি এবং পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে নিরাপদে নির্ধারিত সময়ে এবং স্থানে আবার ধরিত্রীর বুকে ফিরে এলো। আমরা দেখতে পেলাম রূপকথার গল্পের বাস্তব রূপায়ণ। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ও কনট্রোল ইঞ্জিনীয়ারিং এর চরম উৎকর্ষই এই সফলতার কারণ। উপরন্তু হাজার হাজার বিজ্ঞানী এবং কর্মীর [illegible] সমন্বয় এই অনবদ্য সাফল্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। কিন্তু কেন এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা? অনেকের মনেই এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীদের মতে, চন্দ্র অভিযান, চাঁদের দেশে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, চাঁদের দেশের মাটি ও পাথরের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি চাঁদের জন্ম ও গঠনরহস্য, এর অতীত, বর্তমান, এমন কি ভবিষ্যতের বহুবিধ অজানা রহস্য সন্ধানে সহায়ক হবে। বায়ুহীন চাঁদের দেশ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি, ইনফারেড রশ্মি, বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান) গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে চাঁদের দেশে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযোগে বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষুদে সব মানমন্দির গড়ার পরিকল্পনা বিজ্ঞানীরা করেছেন এবং তাঁদের মতে এইসব নব্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা রহস্যের বহুবিধ অজানা রহস্যের সমাধানে সহায়ক হবে।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন অধ্যাপিকা **ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়** বলেন ঃ এই দুঃসাহসিক অভিযান সত্যই প্রশংসনীয়। চাঁদের বুকে মানুষের পদার্পণ গ্রহান্তর যাত্রার পথ **প্রশস্ত করবে** এবং আগামী বিশ বছরের মধ্যে অনেক কিছু অভাবনীয় ব্যাপার আমরা হয়তো দেখতে পাব।

—বিশেষ প্রতিনিধি

ওরা তিন জন

নীল অ্যালডেন আর্মস্ট্রং

১৯৬৯ খৃঃ সংবাদপত্র শিরোনামায় শ্রেষ্ঠ মানুষ। কারণ চাঁদে ভ্রমণকারী দুজনের তিনি একজন। আটত্রিশ বছরের এই মানুষটি লম্বায় পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, ওজন ১৬৫ পাউন্ড। মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং বিবাহিত এবং দুটি সন্তানের জনক। ছেলে দুটির নাম এরিক (১২) ও মার্ক (৬)। ১৯৬২ খৃঃ তাঁকে প্রথম মহাকাশচারী হিসাবে দেখা যায়। তার আগে তিনি আমেরিকার জাতীয় বিমানবিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থায় একজন অতি সুদক্ষ প্রথম শ্রেণীর বৈমানিক হিসাবে কাজ করছিলেন। তখন তিনি ছিলেন একস —১৫ নামে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানের চালক। ঐ সময়ে এক্স—১৫ কার্যসূচী অনুযায়ী রকেটের সাহায্যে অকল্পনীয় গতিতে একেবারে মহাকাশের সীমান্তে পৌঁছবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ১৯৬৬ খৃঃ ১৬ মার্চ জেমিনি—৮ মহাকাশযানের প্রধান চালক হিসেবে প্রথম মহাকাশ সফরকালে তিনি ও তাঁর সহকারী ডেভিড আর স্কট মহাকাশে পৃথিবী পরিক্রমারত আর একটি মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের সঙ্গে মিলন ঘটিয়েছিলেন। এই ছিল মহাকাশে দুই যানের প্রথম মিলন।

মাইকেল কলিনস্

মাইকেল কলিনস-এর উপরে চন্দ্রলোকগামী অ্যাপোলো—১১ যানটিকে মহাকাশে চালিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। —১৯৩০ সালের ৩১শে অক্টোবর ইতালীর রোম শহরে মাইকেল কলিনস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা মিসেস জেমস এল কলিনস রাজধানী ওয়াশিংটনের বাসিন্দা। ওয়াশিংটনের সেন্ট অ্যালবানস স্কুলে তিনি পড়াশুনো করেন এবং ১৯৫২ সালে নিউ-ইয়র্কের ওয়েস্ট পয়েন্টস্থিত মিলিটারী একাডেমী থেকে বি এস সি উপাধি লাভ করেন। বস্টনের প্রাক্তন প্যাট্রিশিয়া এম ফিনিগ্যানের সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কলিনস দম্পতির ৩টি সন্তান।

ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে স্নাতক হবার পর তিনি মার্কিন বিমানবাহিনীতে লেঃ কর্ণেল হিসাবে যোগদান করেন। মিঃ কলিনস কিছুকাল ক্যালিফোর্ণিয়ার এডোয়ার্ডস বিমানঘাটিতে অবস্থিত বিমানবাহিনীর ফ্লাইট টেস্ট সেন্টারে ফ্লাইট অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন।

জাতীয় বিমানবিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে মহাকাশচারীদের যে তৃতীয় দলটিকে নির্বাচিত করেন তাঁদের মধ্যে কলিনস ছিলেন অন্যতম। জেমিনি—৭-এর মহাকাশ সফরে তিনি ছিলেন প্রধান চালকের সহকারী।

এডুইন ই অ্যালড্রিন (জুনিয়ার)

মহাকাশচারী এডুইন ই অ্যালড্রিনের উপরে চন্দ্রযানটিকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়েছিল। ঐ যানটি দুজন মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিনকে নিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। আলড্রিন ১৯৩০ খৃঃ ২০ জানুয়ারী নিউজার্সির মন্টক্লেয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কর্ণেল অ্যালড্রিন নিউজার্সির ব্রিয়েলে বাস করেন। মহাকাশচারী অ্যালড্রিন উচ্চতায় ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। তাঁর দেহের ওজন ১৬৫ পাউন্ড। নিউজার্সির মন্টক্লেয়ারস্থিত হাইস্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন এবং ১৯৫১ সালে নিউইয়র্কের ওয়েস্ট পয়েন্টস্থিত মিলিটারী একাডেমী বা সামরিক বিদ্যালয় থেকে বি এস সি উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৬০ খৃঃ ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজী থেকে অ্যাস্ট্রনটিকস-এ ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে মিনেসোটার গস্টাভাস অ্যাডলফাস কলেজ তাঁকে অনারারী ডক্টরেট অব সায়েন্স উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। মিঃ ও মিসেস মাইকেল আর্চারের কন্যা জোয়ান এ আর্চারের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। অ্যালড্রিন দম্পতির মাইকেল, জেনিস এবং অ্যানড্রু এই তিনটি সন্তান।

কল্পলোকের চাঁদ

মহাশূন্যের দিকে যুগ যুগ ধরে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকার পর মানুষ চাঁদের দেশে পৌঁছেছে। দূরত্বের দুরধিগম্যতায় অনন্তকাল থেকেই মানুষের এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে আসছে। কিন্তু সে এখন চাঁদে পদার্পণ করেছে। এর নয়ন-লোভনীয় আভায় উদ্দীপিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ তার কবিতা ও গানের বিষয়বস্তু করেছে এই চাঁদকে, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিতে ভীত হয়ে বহু কুসংস্কারের জাল বিস্তার করেছে এর চারদিকে; আকাশে এর চমৎকার মূর্তিতে মুগ্ধ হয়ে করেছে একে পুজো, আর এর অলঙ্ঘনীয় যাত্রাপথের মাহাত্ম্যে মোহিত হয়ে জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদরা তার গতিকে করেছেন বিচারবিশ্লেষণ। মহাকাশ যুগের এই দ্বাদশ বৎসরে মানুষ চাঁদে নামতে ও সেখানে হাঁটাচলা করতে পেরেছে। তারপর সে দেশের নানা মাল মশলা সংগ্রহ করে সেগুলোর 'নমুনা' পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার জন্য সঙ্গে নিয়ে এল। চাঁদ দুর্জ্ঞেয় তথ্যাবলীর হদিশ দিতে পারে এই সম্ভাবনার হাতছানিতে অজানা বস্তু সম্পর্কে মানুষের সহজাত ঔৎসুক্যবোধে তাড়িত হয়ে তিনটি সাহসী মানুষ পৃথিবীর একমাত্র স্বাভাবিক উপগ্রহে অভূতপূর্ব অভিযান চালিয়েছেন।

এ'ত নেহাতই আধুনিক কালের কথা। কিন্তু কল্পনায় মানুষ চাঁদে গিয়েছিল দুহাজার বছরেরও আগে। বাঙালী মায়েরা সন্তানদের জন্য চাঁদকে পেড়ে এনেছিলেন ঘরের আঙিনায়। প্রযুক্তিবিদ্যায় আর বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরাছোঁয়ার বাইরে এ আশ্চর্য এক জগত। চাঁদে যাওয়ার আর ফিরে আসার দুঃসাহসিক কাহিনী শোনা শুরু হয় এক সময়। আজগুবি আর উদ্ভট কাহিনী হলেও বলা যায়, চাঁদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল এ'দেরই কাহিনী। আজকের চাঁদে যাওয়ার সাফল্যের মূলে এ'দের অবদান কম নয়।

১৫০ খৃঃ সিরিয়ার মানুষ লুকিয়েন লিখলেন চন্দ্রলোকের এক আশ্চর্য কাহিনী। সমুদ্রগামী জাহাজে নাবিক ঝড়ে দিগভ্রান্ত হয়ে গিয়ে হাজির হোল চাঁদের দেশে। সেখানকার অধিবাসী হিপেপাগিনিদের দেখতে মানুষের মত হলেও, আকারে অনেক বড়। তিন মাথাওয়ালা শকুনের পিঠে চড়ে নাবিক গিয়ে রাজার দরবারে হাজির। এই নাবিক চাঁদে একটি কুয়োর সন্ধান পায়। কুয়ো ওপর রাখা আয়নার মধ্যে পৃথিবীর সব শহরই পরিষ্কার

ওপরে জুল ভার্ণের কাহিনীর সঙ্গে চিত্রিত চন্দ্রযানের প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ এবং উদ্ধারের দৃশ্য। নীচে অ্যাপোলো যানের প্রত্যাবর্তনের সংগে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

টুকরো খবর

চাঁদে মানুষ পাঁঠাবার জন্য আট বছরের প্রস্তুতিতে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা (নাশা) এ যাবৎ খরচ করেছেন ২৪০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১৮০০ কোটি টাকা।

এরসঙ্গে তুলনীয় ভারতবর্ষের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ও বে-সরকারীক্ষেত্রে মোট লগ্নীর পরিমাণ — ১০৪০০ কোটি টাকা।

●

এ যাবৎ যে ১৯টি অ্যাপোলো মহাকাশ-যান তৈরী হয়েছে সেগুলির বাবদ খরচ হয়েছে ৭৯০ কোটি ডলার অর্থাৎ ৫৯২৫ কোটি টাকা —তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫ বছরে ভারত বিদেশ থেকে মোট যে সাহায্য পেয়েছে, তার চেয়ে ১৫০০ কোটি টাকা বেশী।

২৭টি স্যাটার্ণ রকেট তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৮৭০ কোটি ডলার অর্থাৎ ৬৫২৫ কোটি টাকা —বড় ও মাঝারি ধরণের সরকারী পরিকল্পনায় ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে খরচ হয়েছে তার দশগুণের বেশী।

●

চাঁদে থাকার প্রতি মিনিটের খরচ হল ১৫ কোটি ডলার। চন্দ্র অভিযানে মার্কিন মহাকাশ সংস্থার মোট খরচ হল ২৪০০ কোটি ডলার।

●

অ্যাপোলো —১১-এর যাত্রীরা চাঁদের যে মাটি পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন তার প্রতি পাউন্ডের জন্য দাম পাওয়া গেছে ৫০০০ পাউন্ড। এই দাম ঘোষণা করেছেন আটলান্টার রত্নব্যবসায়ী বেন হাইম্যান।

●

বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার প্রশাসক ও সরকারী কর্মচারী প্রযুক্তিবিশারদ ও কেরানী মিলিয়ে চার লক্ষেরও বেশী লোক মহাযানের নকশা আঁকা, নির্মাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চালনার কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

●

এ কাজের সব কিছুতেই শ্রেষ্ঠত্বের ছড়াছড়ি। মনে হয়, এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সবকিছুই হয় প্রথম, একমাত্র ও বৃহত্তম নয়, সর্বাধিক ভারী, শক্তিশালী ও ব্যয়-বহুল।

দেখা যায়। স্লুকিয়েন আরও একটা কাহিনী লিখেছিলেন। এই কাহিনীর নায়কের ছিল দুটি প্রকান্ড ডানা। এই ডানা দুটির একটি শকুনের আর একটি ঈগলের। ডানার ওপর ভর করে মানুষটি চলে গেল চাঁদের দেশে। মহাশূন্য সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না মানুষের। তাই নায়করা ঝড়ে বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে সহজেই চন্দ্রলোকে গিয়ে হাজির হোতে পারত।

এতদিনে মানুষের চিন্তাশক্তি বেড়েছে। দৃষ্টির প্রসার ঘটেছে। চাঁদের মা বুড়ির চাকা কাটার গল্প আর ভাল লাগে না। মিট্ মিট্ জ্বলা তারাগুলো কি? ঠান্ডা মিষ্টি আলোর চাঁদ মানুষকে কাছে টানছে। ১৬০৯ খৃঃ গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করলেন। জানা গেল চাঁদ একটা উপগ্রহ। একটা আলাদা জগৎ। কাহিনীকারদের দৃষ্টি গেল পাল্টে। গ্রহদের গতিসূত্রের আবিষ্কর্তা জোহান কেপলার লিখলেন 'সোমনিয়াম'। চাঁদ ভ্রমণের এই কাহিনীতে যাওয়াআসার বিজ্ঞানভিত্তিক পথ এড়িয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকসূত্রের কিছু কিছু সন্ধান এই কাহিনীতে মেলে। গ্রহণের সময় চাঁদের ওপর গিয়ে পড়ে পৃথিবীর ছায়ায়। ঐ ছায়া-পথে চলমান এক শক্তিশালী দৈত্যের পিঠে চড়ে গিয়ে কেপলার হাজির হলেন চাঁদের দেশে। সেখানকার বুদ্ধিমান প্রাণীরা চাঁদের বুকের গহ্বরগুলি সৃষ্টি করেছে রোদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য। পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়ার পথে সব জায়গায় বাতাস সমান নয়। শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে তাই যাত্রীকে এক ধরণের বেদনানাশক ওষুধ খেতে হবে। তার ইঙ্গিত রয়েছে কেপলারের কাহিনীতে। কেপলারের পঞ্চাশ বৎসর পরে আবিষ্কৃত হয় মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। কিন্তু তার কাহিনীতে পাই চাঁদের একটা চুম্বক আকর্ষণ আছে। তার কাছাকাছি গেলেই সেই আকর্ষণ যাত্রীকে চাঁদে টেনে নেবে। এর মধ্যে যেন মহাকর্ষতত্ত্বের ইঙ্গিত রয়েছে।

এর পর কিন্তু কাহিনীকাররা চাঁদে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন মনে হয়। কোন কোন কাহিনীতে মহাশূন্য ভ্রমণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে। ১৬৩৮ খৃঃ বিকাপ ফ্রান্সিস গডউইনের কাহিনীতে ডমিনিগো গঞ্জালেস ২৫টি রাজহাঁসের ভেলায় চেপে ১৭৫ মাইল বেগে চাঁদের দেশে পৌঁছায়। পৃথিবীর সঙ্গে সাদৃশ্য নেই এমন গাছপালা পশু-পাখী আর সাগরের সন্ধান মেলে চাঁদে। এই শতকের শেষে ফরাসী লেখক সাইরানো ডি বার্জেরাকের কাহিনীতে চাঁদে যাওয়ার কয়েকটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। শিশিরকণাভর্তি বোতল গায়ে বেঁধে নায়ক সূর্যতাপে অপেক্ষা করে। বাষ্পীভূত শিশিরকণা তাকে ঠেলে তোলে মহাশূন্যে। আবার কাচের গোলকের মধ্যে চেপে নায়ক মহাশূন্যে যেতে চায়। ভেতরের বাতাস উত্তপ্ত হয়ে গোলকের ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়। আর গোলক উঠে যায় মহাশূন্যে। আর একটি কাহিনীর যাত্রী একটি বাক্সে বসে। বাক্সের গায়ে বাঁধা কয়েকটি হাউই। হাউই-এ আগুন ধরিয়ে মহাকাশে যাত্রা করে যাত্রী। কিন্তু এই হাউই-ই আবার তাকে পৌঁছে দেয় পৃথিবীতে।

পরবর্তী কাহিনীকাররা চাঁদে কীভাবে যাওয়া যাবে সে সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন নন। তাঁরা চান চাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে। তাছাড়া ইতিমধ্যে বিজ্ঞান এই বিশ্ব-ভূমন্ডলের নানা তথ্য আবিষ্কার করছে। সে সবও ধীরে ধীরে কাহিনীর মধ্যে স্থান পাচ্ছে। কাহিনীকাররা আজগুবি ঘটনা নিয়ে মাতামাতি করতে সংকোচবোধ করলেন। এডগার অ্যালান পো, জুল ভার্ণ এবং এইচ জি ওয়েলস চাঁদে যাওয়ার গল্প লিখলেন। এই গল্প লেখা হয়েছে এমনভাবে, পড়লেই মনে হবে চাঁদে যাওয়া সম্ভব।

তখন বেলুন চেপে শূন্যে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পো এই বেলুনকে মাধ্যম করলেন। তার গল্পের নায়কের দেনা অনেক। হাইড্রোজেনের চেয়ে হালকা গ্যাস পূর্ণ বেলুনে চেপে সে চাঁদে পালায়। পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত হাওয়া থাকা চাই। হাওয়ার সম্ভাব্যতায় অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত পো বলেছেন, তার কাহিনীটা একেবারেই অলীক।

ওয়েলস চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছেন তাঁর কাহিনীতে। অনেক বর্ণনা আছে, তথ্য আছে।

কিন্তু চাঁদে ভ্রমণকে করতে হবে আরো বিজ্ঞানসম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য। জুল ভার্ণ একটা কাহিনী লিখলেন যার সঙ্গে আজকের চন্দ্রজয়ের যেন অনেক মিল রয়েছে।

হঠাৎ পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ থেমে গেল। সব জায়গায় শান্তি। কিন্তু বাল্টিমোর গান ক্লাবের সভ্যরা তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কিছুই কাজ নেই। কামান গুলি-গোলা তৈরি বন্ধ। অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে সকলে। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মিঃ ইম্পেকর্বিপেন তাঁদের সামনে এক আশ্চর্য পরিকল্পনা রাখলেন। তিনি বললেন—দেখুন চাঁদ সম্পর্কে আমরা অনেক কথা জানি। ওখানে আমরা যেতে চাই। এখান থেকে চাঁদের দূরত্ব হবে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল। সেকেন্ডে বারো হাজার গজ যেতে পারে এমন একটা গোলা আবিষ্কার করতে পারলে এই দূরত্ব কিছুই নয়। বিরাটকায় কামান 'কলাবিয়াড' তৈরি হোল। নশ ফুট লম্বা কামান। গোলা তৈরি হোল অ্যালমুনিয়মের। তার ব্যাস নয় ফুট, আর ওজন দুশ চল্লিশ মণ পঁচিশ সের। পৃথিবীর আকর্ষণের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে লাগবে তিরাশি ঘন্টা বিশ মিনিট। সেখান থেকে চাঁদে যেতে লাগবে তের ঘন্টা তিপ্পান্ন মিনিট। সব চিন্তা আর কল্পনা নিখুঁত। কোনটাই আজগুবি বা অবিশ্বাস্য মনে হবে না।

তুমুল হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল। ভয়ংকর ব্যাপার। চাঁদে যাচ্ছে মানুষ। এমন সময় ফিলাডেলফিয়ার কামান গোলা প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন নিকল চ্যালেঞ্জ করে বসলেন বার্বিকেনকে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক মিশেল আরদার আরদার মত গোলার ভেতরটা হোল ফাঁপা। তিনি যাবেন ঐ গোলার মধ্যে চেপে চাঁদের দেশে। বার্বিকেন বললেন, এ কি সংঘাতিক প্রস্তাব। আর কোনদিন আরদা ফিরে আসতে পারবেন না পৃথিবীতে। দুঃখ নেই তাতে আরদার। তিনি থেকে যেতে চান চাঁদের দেশে। প্রতি বছর পৃথিবী থেকে কামানের গোলায় ভরে তাকে খাবার পাঠালেই হোল।

এরমধ্যে নিকলসাহেব বার্বিকেনকে অপমানিত করায় একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যবস্থা হোল। কিন্তু আরদা প্রস্তাব করলেন—এই গোলা ছোঁড়াছুড়ি করে দরকার কি?—চলুন আমরা তিনজনেই চাঁদে যাই। তাঁরা রাজী হলেন।

এক পূর্ণিমার দিন। পরিষ্কার আকাশ। তিনজন পৃথিবীর মানুষ চড়ে বসল গোলায়। নির্দিষ্ট মুহূর্তে গোলা ছুটল মহাশূন্যে। কেম্ব্রিজের মান-মন্দির দুদিন পরে জানাল ও'রা ছুটে চলেছেন নির্দিষ্ট গতিতে, ঠিক পথে।

কিন্তু বই এখানে শেষ। লোকে ভাবল এ সত্যি ঘটনা। এমনই কলমের জোর। তাঁরা চাইল মানুষ তিনটির পরিণতি জানতে। বাধ্য হয়ে ভার্ণকে আরো একখানা বই লিখতে হোল। প্রথমখানি থেকে দ্বিতীয় বইটি বেশি মজাদার। কামানে বিস্ফোরণ ঘটবার পর ও'রা ছিটকে পড়ে এক হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করলেন। যাত্রাপথকে ভার্ণ বরাবরই নানান হাসির ঘটনায় পূর্ণ করেছেন। নিকল বললেন তিনি বার্বিকেনকে বাজীর টাকা দিয়ে দিতে রাজী। পৃথিবী ও'দের পেছনে হারিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। একটা প্রকান্ড উল্কা ছুটে আসছে। ও'রা ভাবলেন মৃত্যু এবার নিশ্চিত। প্রচন্ড ধাক্কায় জ্ঞান হারালেন তিনজনে। উল্কার সঙ্গে ধাক্কা লাগেনি। পাশ দিয়ে চলে গেছে মাত্র। তাতেই এই অবস্থা। জ্ঞান হলে দেখলেন একটা কুকুর মরে গেছে। বাইরে ফেলবার পর কুকুরটা উপগ্রহ হয়ে গেল। এর পরের অবস্থা জুল ভার্ণের বর্ণনায় বেশ রমণীয়। ভাবহীন এলাকায় এসে ও'রা দেখলেন চাঁদের রূপ। চাঁদের পাহাড়, খাল বিল, গর্ত। কিন্তু চাঁদে নামতে পারছেন না কেন? ঐ উল্কার প্রভাবে গতিপথ পাল্টে গেছে গোলার। চাঁদে ওরা নামতে পারবেন না কোনদিন। অনন্তকাল এইভাবে ঘুরতে হবে। আরদা এইভাবে মরার থেকে একটা পথ বাৎলে দিলেন। চাঁদের পিঠে নামার সময় গতি কমাবার জন্য রকেট ছিল তাঁদের। এই রকেট ছোঁড়া হবে, বৃহত্তর বাইরে যাওয়ার জন্য। তারপর কিন্তু গোলা আছড়ে পড়বে চাঁদে। তাও ভাল এই অবস্থার থেকে। রকেট তো ছোঁড়া হোল। কিন্তু এ কি! রকেট কিন্তু বৃত্তের বাইরে চাঁদের দিকে না এগিয়ে গোলা এল পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর আকর্ষণের সীমায় পৌঁছে গেছেন ও'রা। প্রবল গতিতে গোলা নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। তারপর এক সময় আছাড় খেয়ে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরে। কিন্তু অভিযাত্রীরা মরল না। কারণ এ যে গল্প।

১৮৬৫ খৃঃ জুল ভার্ণ চন্দ্রঅভিযানের কৃতিত্ব দিয়েছিলেন আমেরিকানদের। বাস্তবে কিন্তু তাই ঘটল। তাঁর বানানোর গোলা ছোঁড়া হয়েছিল ফ্লোরিডার স্টোন হিল থেকে। অ্যাপোলো-১১ যাত্রা শুরু করে ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার জানা পথে ভার্ণ যাত্রাপথের বহু প্রতিকূলতার সমাধান করেছেন। মহাকর্ষ কাটিয়ে ওঠবার জন্য যে নিষ্ক্রমণ বেগ (এসকেপ ভেলোসিটি) দরকার ৯০০ ফুট লম্বা কামানের গোলায় বার্বিকেন তা সমাধান করেছিলেন। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য গোলার মধ্যে অক্সিজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। ধাক্কা সামলাবার জন্য যান্ত্রিক কৌশলের ব্যবস্থা ছিল। ও'রা চাঁদে গেল কিনা জানবার জন্য বিরাট দুরবীন তৈরি হোল। আধুনিক কন্ট্রোল স্টেশনের মতো। গোলার গতিপথ পরিবর্তনের দরকার হয়েছিল চাঁদে নামার জন্য। একটি অলীক উপগ্রহ কল্পনা করে নেওয়া হয় এজন্য। আবার চন্দ্রের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য রকেটের ব্যবস্থা ছিল। অ্যাপোলো-১১-র সঙ্গে অনেক মিল। জুল ভার্ণের কাহিনীটা সংস্কার করে ছাপলে মনে হবে যেন অ্যাপোলো-১১-এরই অভিজ্ঞ কাহিনী।

সরযূ নদীর জলে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল থেকেই মনটা খুশী-খুশী। ভাল লাগছে সব কিছু। জানালায় রোদ, আকাশে পাখি এবং দূরের জলাশয়ে কিছু হাঁস উড়ে যাচ্ছে। সে চিঠিটা পড়ল ফের। নন্দিতার চিঠি। সে আসছে। সে বেলকনিতে বসে চিঠিটা পড়তে পড়তে সামান্য অন্যমনস্ক হল। পায়ে রোদ এসে পড়েছে। গাছ-গাছালি পার হলে দূরের মাঠ দেখা যাচ্ছিল, পার্কে বুঝি কেউ এসে এখন বসে আছে, খালি আকাশে সূর্য ওঠা দেখছে। আর এ সময় মনে হল, অলকা পর্দার ওপাশে মুখ বাড়াতে পারে। বলতে পারে, শিশিরকাকু, মা তোমাকে চা দেবে? অথবা সিঁড়ি পার হলে ওর সেই ঘর, ঘরের দেয়ালে নন্দিতার ফটো, দুই ছেলে অমল কমলের ফটো এবং সে নিজে। একটা ফটোতে সে এবং নন্দিতা, তখন নন্দিতার সঙ্গে ভালবাসাবাসির খেলা চলছে। নন্দিতা ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কপালে কাঁচপোকা টিপ, চুল বিনুনি করে বাঁধা, ঘাড়ের দু পাশে দু-গুচ্ছ চুলে শাদা মতো সামান্য ফুল ফলের শোভা। নন্দিতার তখন তেমন বয়স ছিল না। কোমলমতি নন্দিতা, অকারণ পুলকে সহসা এত বেশি হাসতে পারত, এত বেশি ছুটতে পারত যে বিয়ের পর শিশির ভয়ে ভয়ে ছিল। বুঝি একসঙ্গে মাঠ ভেঙে ওরা নদীর পারে পৌঁছাতে পারবে না। সে ছবিটা খুব যত্নের সঙ্গে নামাল। সামান্য ঝুল-কালি যা ছিল মুছে দিল—তারপর যেমন জলের নিচে মাছ আহার খুঁটে খুঁটে খায় সে তেমনি যেন নন্দিতার মুখ চোখ এবং অবয়ব খুঁটে খুঁটে খেতে থাকল।

নন্দিতা আসছে। সে এবং নন্দিতা দুই যুবক-যুবতী প্রায় বারো বছর হবে একসঙ্গে এক বিছানায় কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বড় হিসেবি নন্দিতা, বড় নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপর। আবার কোনো কোনো দিন মনে হয়েছে নন্দিতা না থাকলে তার আকাশে কে আর পাখি ওড়াতো। সেই নন্দিতা এখন একটা কলেজের চাকরি নিয়ে মফস্বল শহরে চলে গেছে। ছ মাসের ভিতর নন্দিতা দুবার এসেছিল। নন্দিতা তখন বড় বেশি ঝলমল করছিল—তায় উ'চু করে খোপা বাঁধা, চুলে রজনীগন্ধার ফুল, এসেই সোফাতে শরীর এলিয়ে দিয়েছিল, যেন সে এ-বাড়িতে বেড়াতে এসেছে অথবা কেন জানি শিশিরের মনে হয়েছিল সহসা এ-মেয়ে এসে দূরবর্তী জলাশয়ের দিকে হে'টে যাচ্ছে। যেন সে হাতে তার যৌবন ফিরে পেয়েছে। বুঝি নতুন সূর্য উঠছে কোথাও—বস্তুত নন্দিতা একেবারে ফুরফুরে পাখি হয়ে গেল। ওর দুই ছেলেকে নরেন্দ্রপুরে ভর্তি করে দিয়েছে। শিশিরের জন্য একজন লোক ঠিক করে দিয়ে গেছে। তা ছাড়া নিচে অলকা আছে, ওর মা আছে, সময়ে অসময়ে ওরাও দেখাশোনা করতে পারবে। ছুটির কদিন নন্দিতা শিশিরকে মুহূর্ত বিশ্রাম দেয়নি। যেমন নতুন ভালোবাসা হলে প্রাণপাখি কেবল কুরর কুরর করে ডাকে, নন্দিতা ছুটিতে এসে দরজা জানালা বন্ধ রেখে কেবল তেমন ডাকতে চাইত। আর কি আশ্চর্য সেই ভালোবাসার দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে—দ্যাখো আমি এক রাজরাণী, তুমি আমার রাজার মতো, রাজা এসো এবার আমরা বনবাসে যাই, বনবাসে সরযূ নদীর জলে সাঁতার কাটি। অথবা যেন বলার ইচ্ছা তুমি আমার রাজার মতো, রাজার জন্য রাতে রাণীর আঁখিতে ঘুম থাকে না। কি যে খেলা, এক নিত্য খেলা সখ এই মেয়ের এখন। অথচ নন্দিতা এই বারো বছর—প্রায় তাই হবে—বিয়ে হবার পর, তখন আর শিশিরের বয়েস কত, এই বিশ-বাইশ, নন্দিতার বয়স সতেরো-আঠারো, বড় ছোট বয়সে শিশির নন্দিতাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। আর কিনা বিয়ের মাস শেষ হতে না হতেই নন্দিতা কেমন কাঠ কাঠ হয়ে যেতে থাকল, চোখ মুখ শুকিয়ে গেল—সংসারজীবনে কেবল তিক্ততা। নন্দিতা এত সহজে বুঝি সন্তান পেটে আসুক, তার যৌবন হরণ করে নিক মনে মনে চায়নি। সেই থেকে দুই যুবক-যুবতী শিশির আর নন্দিতা সহসা বুড়ো-বুড়ি হয়ে গেল। সরযূ নদীর জলে সাঁতার কাটা গেল না বেশি সময়। ওদের ভালোবাসা মরে গেল। পর পর দুই সন্তান নন্দিতার যৌবন চুরি করে গায়ে পায়ে বড় হতে লাগল। সংসারের আয় তেমন ছিল না তখন। মা-বাবা ভাই-বোন আর এই সংসার নিয়ে শিশির প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেল। মাস গেলে মা-বাবার বয়স্ক ভাই-বোনের আবদার রেখে হাতে ওর তখন সামান্য টাকা, নন্দিতা সে টাকার সংসারে সমৃদ্ধি আনতে উঠে পড়ে লেগে গেল। কঠিন জীবনসংগ্রাম। নন্দিতা পর পর পাস দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ পার হয়ে গেল। নন্দিতা নিজের হাতে দুই ছেলে বড় করা, সংসার দেখা—পরীক্ষার পড়া তৈরী করা— ফলে শরীর আর শরীর থাকল না। খাই খাই ভাবটা কিন্তু শিশিরের এত করেও মরেনি। মাঝে মাঝে তিক্ততা এত বেশি যে নন্দিতা পাগলপ্রায় দুই সন্তান নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেত।

নন্দিতা আসছে। ওর তিনদিনের ছুটি। এই তিন দিন সে নিজেও ছুটি নেবে ভেবেছে। এই তিন দিন নন্দিতাকে নিয়ে সে কি কি করবে ভাবল। তারপরই গ্রীষ্মের ছুটি পড়বে নন্দিতার। তখন ত কথা নেই। সে দাঁত মাজতে মাজতে রা-রা করে গান গাইতে থাকল। অমল কমলকে নন্দিতা সেবার এসেই আনতে গিয়েছিল, ভালো দেখে বাজার করা, সংসারে এক উৎসব প্রায় সমারোহ—খেতে শুতে সব সময় নন্দিতা উৎসবের মতো মুখ করে রাখত। কিন্তু সেই ছুটির ক'দিন সে কাকে বেশি সময় দেবে—অমল কমলকে না শিশিরকে যেন সে সেটা ঠিক করে উঠতে পারত না। মফস্বলের জল-হাওয়ায় নন্দিতার কাঠ কাঠ চেহারা বর্ষার মতো সজীব হয়ে গেছে। দূরে গিয়ে নন্দিতার মনে হয়েছে শিশির মানুষটির মতো এমন আন্তরিক মানুষ আর হয় না, এমন সরল মানুষ আর হয় না অথবা মনে হয়েছে এই মানুষ কেবল নন্দিতাময় হয়ে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। নন্দিতাকে নিয়ে ছুটির কটা দিন ওর কি যে করতে ইচ্ছা যায়! রবিবার এলে নন্দিতার এসব বেশি মনে হয়। হোস্টেলের কেয়ারিকরা ফুলের বাগানে বসে থাকতে থাকতে মনের ভিতর মন নিয়ে ডুবে থাকতে থাকতে নন্দিতা শিশিরময় হয়ে যায়—চারিদিকে তখন জ্যোৎস্না, শাদা জ্যোৎস্না উঠে গেছে, কখন শেষ ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে এবং কখন ঠাকুর এসে ডাকছে—দিদিমণি খাবারের ঘন্টা পড়ে গেছে—কিছুই কেমন খেয়াল থাকে না। যত যাবার দিন কাছে চলে আসে তত সে ক্লাশে পড়াতে পড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বস্তুত নন্দিতা দূরে চলে গিয়ে শিশির নামক মানুষটিকে আবার নতুন করে ভালোবেসে ফেলল।

নন্দিতা আসছে। শিশির যে সব দাগ-গুলি ক্যালেন্ডারের পাতায় দিয়েছিল—তার সব কটি দাগ আজ কাটা হয়ে গেল। নন্দিতা চলে যাবার পর আবার নতুন দাগ সে কাটবে। নন্দিতার ঘরেও এমন একটা ক্যালেন্ডারের পাতা আছে। তার দাগ কাটা আজ শেষ। সকাল সকাল সে ঘুম থেকে উঠেছে। গত রাতে সব গোছগাছ করে রেখেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কেবল দাগটা কেটে দেওয়া। হাত-মুখ ধুয়ে এসে মুখ মুছতে মুছতে ওর নিশ্চয়ই দাগটা কাটার সময় শরীর শির-শির করছে—শিশির এমন ভাবল। এবার সে অমল কমলকে নিয়ে আসতে দেবে না। ওরা এলে নন্দিতা ওর অংশে ভাগের ভাগ একের তিন, সুতরাং তিন ভাগের এক ভাগ নিয়ে মনটা যেন সামান্য এই ছুটির কটা দিন ভরতে চায় না। একটা ভালো ব্যালে হচ্ছে রবীন্দ্রসদনে, রাশান ব্যালে—নন্দিতাকে নিয়ে সে ব্যালে নাচ দেখতে যাবে। এখন অলকা মুখ বাড়াতে পারে, শিশিরকাকা, মা তোমাকে চা দেবে? নিচের ঘরে, ছোট ঘর, অন্ধকার ঘরে আলো-বাতাস আসে না, অলকা সময় পেলেই এই বড় ঘরে উপর তলায় উঠে আসতে ভালো-বাসে, বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আলো-বাতাস এবং সূর্য ওঠা দেখতে দেখতে অথবা গাছ-পালা পাখি দেখতে দেখতে কেবল আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অলকার বাবা বছর চার-পাঁচ আগে মারা গেছে। ঘরে অলকা এবং তার মা। মা এই মানুষ শিশিরের কাছে নানা কারণে কৃতজ্ঞ। অলকার দাদাকে সে ওর কারখানায় চাকুরি ঠিক করে দিয়েছে। অসময়ে এই মানুষ একমাত্র সম্বল। শিশির ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকাল। এখন সব আসবাবপত্র সাজানোগোছানো থাকে না। অলকা মাঝে মাঝে এসে ঘর সাজিয়ে যায়। একমাত্র চাকর বলতে অথবা ঠাকুর বলতে যা, সে সাতটায় আসে। সারাদিন থাকে এবং রাতে আটটা না বাজতেই বস্তিতে ফিরে যায়। ওর খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। বেশি

রাত না হলে সে খেতে পারে না। খাবার সময় লোকনাথ অলকাদের ঘরে চাবি রেখে যায়। এই অলকাই প্রায় যেন সব। সে ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে। ওর ফ্রক পরা মুখ এবং উজ্জ্বল চোখ রাতের জোনাকির মতো। জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে। শিশির যেন চোখ দেখলে ভিতরে ভিতরে কি টের পায়। সেই দশ বছর বয়েস থেকে অলকার ছুটে ছুটে আসা, একটু আলো-বাতাসের জন্য এই ঘরে ছুটে আসা নন্দিতার পছন্দ হত না। তবু নন্দিতা মুখের উপর কিছু বলত না। কিন্তু ক্রমে এই মেয়ের চোখ মুখ, সারল্য এবং অকপট ভালবাসা নন্দিতাকে খুব কাছে টেনে নিল। নন্দিতা এই মেয়েকে সন্তানের মতো স্নেহ করত। নন্দিতা গত ছুটিতে আসার সময় এই মেয়ের জন্য একটা সিল্কের স্কার্ট এনেছে। সুন্দর একটা হাতির দাঁতের এস্ট্রে এনেছে শিশিরের জন্য—অমল কমলের জন্য সুন্দর দুটো চামড়ার মানিব্যাগ, বস্তুত শিশিরকে যেন নন্দিতা, অলকা এবং তার মার অধীনেই রেখে গেছে। বড় বেহিসেবি মানুষ। যা পায় তাই খায়। কোন বাছবিচার নেই। দেখে-শুনে রাখার মতো মানুষের দরকার।

শিশির হাত-মুখ ধুয়ে অন্যদিনের মতো দৈনিক কাগজটা খুলে বসল। কিন্তু মন দিতে পারল না। সে কাগজটা ওলট-পালট রেখে দিল। সে ভিতরে ভিতরে নন্দিতার জন্য অধীর, মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। যত নন্দিতার আসার সময় দ্রুত কমে আসছে তত সে অধীর হয়ে পড়ছে। তখন অলকার ফ্রক, নীল রঙের ফ্রক পর্দার ওপাশে দেখা যাচ্ছে। লোকনাথের আসতে দেরী হয়ে যায়। ভোরে ভোরে এক কাপ চা না পেলে মেজাজ খিঁচড়ে থাকে—অলকার মা এই ভারটি নিয়েছে। সকাল হলেই অলকা দরজার কড়া নাড়বে। পর্দা তুলে ডাকবে, শিশিরকাকু, তোমার চা। পর্দা সরালেই সেই মুখ যেন পর্দার ওপাশে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকে। শিশির তখন ডাকে, আয়, ভিতরে আয় অলকা। দুই বিনুনি ঝুলিয়ে মেয়ে এক হাতে ফ্রক টানতে টানতে ঘরে আসে। মেয়েটা ক্রমে চোখের উপর এত বড় হয়ে গেল। ফ্রক পরে আজকাল অলকা শিশিরের ঘরে আসতে সংকোচ বোধ করছে। শিশির ভাবল, সে আজই অলকার মাকে বলবে, বৌদি তুমি অলকাকে আর ফ্রক পরাবে না। এবার ওকে শাড়ি পরতে দাও। এবং বয়েস হিসাব করে বুঝল অলকার ভিতরে ভিতরে যৌবন এসে গেছে। গরীবের সংসারে যা হয়, যৌবন ধরে বেঁধে বালিকার মতো মুখ করে রাখা, অলকার মা, অলকাকে ধরে বেঁধে বালিকা করে রেখেছে। যেন স্কুলের গণ্ডি পার হলেই অলকার মুখ থেকে বালিকাসুলভ ছবি সরে যাবে। অলকা এ সময় চা রাখল টেবিলে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে। এই আলোটুকুর জন্য অলকার বড় লোভ। শীতের দিনে অলকা ছাদে অথবা বারান্দায় কাজে অকাজে উঠে আসবে। এখনও যেন মনে হয় এই খোলা-মেলা বাতাসের জন্য ওর নিচে নেমে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সে দুটো একটা কথা বলছিল, এবং কোথায় কি রাখলে মানাবে ভালো, কাকিমা এসে বলবে, অলকা তোরা থাকতে আমার ঘরদোর এমন হয়ে থাকে—অলকা সেজন্য যা পেল হাতের কাছে গুছিয়ে রাখল। বৃষ্টি হয়েছে গতকাল। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। খুব গরম হলে দরজা জানালা বন্ধ করে, আলো জ্বেলে—খোলা-মেলা এক উদ্দাম নাচের মতো, নন্দিতা পায়ে পায়ে কত লম্বা হয়ে যেতে পারে তখন, শিশির শ্বাস নিতে পারে না—বাঘের থাবা তুলে হাঁটু গেড়ে কান্না করার ইচ্ছা। ঠিক এক ব্যালে নাচ যেন, দ্রুত লয়ে কে কার উপর, অথবা অবলম্বন করে নিত্য দিনের বাঁচা—তখন পাখার হাওয়া পর্যন্ত বড় কম মনে হয়। ঘামতে ঘামতে চ্যাটচ্যাটে ঘাসের ভিতর ভাল লাগে না। আর ঠাণ্ডা থাকলে, শীতের দিনে অথবা বসন্তের দিনে দরজা জানালা বন্ধ করে নীল আলো জ্বেলে তারপর ভাঙা ভাঙা শব্দ, হাঁটু গেড়ে, কোমরে থাবা মেরে মরে পড়ে থাকা, তখন মনেই হয় না নন্দিতা বেঁচে আছে, নন্দিতা নীল আলোর ভিতর মরে পড়ে থাকতে বড় ভালোবাসে। সে নিজের জন্য দু গজ নীল রঙের সিল্ক এনেছিল এবং এই সিল্ক দিয়ে সে বোতাম খোলা গাউন করবে। অলকার মাথায় নীল রঙের স্কার্ট, নন্দিতার শরীরে নীল রঙের বোতাম খোলা গাউন। শিশির কেমন নিজের ভিতর আড়ষ্ট হয়ে গেল। কারণ মনের ভিতর নন্দিতার গোটা শরীর উলঙ্গ প্রায় নেচে বেড়াতে থাকল।

নন্দিতা আসছে। সে তাড়াতাড়ি স্নান করল আজ। দিনটা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। সে সেজন্য কাজের ভিতর ডুবে যাবার চেষ্টা করল। সে অফিস সংক্রান্ত কয়েকটা চিঠির পয়েন্ট ভেবে রাখল। অফিসে গিয়ে হাতের কাজ সে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবে। বস্তুত সে নন্দিতার কথা ভাবলে ভিতরে ভিতরে বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে যায় এবং গত ছুটির সময়ে নন্দিতা যেন জলজ্যান্ত মাঠ পার হয়ে এসেছে, যাদুকরের গন্ধ শরীরে, নন্দিতা সারাক্ষণ নীল আলো জ্বেলে সরযু নদীর জলে ভেসে মুখ থেকে জল ওগলাচ্ছিল—শিশির তখন আর পারে না, ভিতরে ভিতরে বলার ইচ্ছা—এমন তুমি কর না, আমি মরে যাব বাছা। অথবা যেন বলার ইচ্ছা, এমন তুমি করো না, তুমি মরে যাবে বাছা।

অলকা আবার এল। প্লেট কাপ তুলে নিয়ে গেল। ওপাশের বারান্দায় অলকা নিজের মতো একটা ছোট্ট টেবিলে বইপত্র গোছগাছ করে রাখে। বারান্দায় ওঠে আসতে শিশিরের ঘর পার হতে হয় না। বারান্দার এই অংশটা শিশির এবং নন্দিতা ইচ্ছা করেই যেন ওকে ছেড়ে দিয়েছে। শিশিরের ফিরতে রাত হয়ে যায়। অলকার বারান্দার আলোটা নেভানো থাকে। শিশির সেখানে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ভিতর নিঃশব্দে সিগারেট টানে। নিচে অলকার মা এবং সে নিজে, রমেনের জন্য বসে থাকে। ওদের দুটো একটা কথা কানে ভেসে আসে। রমেন এলেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে।

মন প্রসন্ন থাকলে যা হয়—রা-রা করে গান, সে চান করতে করতে গান গাইতে থাকল। সে খুশিতে আজ বেশি খেয়ে ফেলল। অফিসের কাজ-কর্ম যা ছিল হাতের কাছে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলল। যেন কোন কারণে অফিসে তাকে আটকে থাকতে না হয়। সেই রাত আটটা বাজলে নন্দিতা আসচে। অথচ ওর বার বার মনে হচ্ছে নন্দিতা চলে এল বলে। দু-চার জায়গায় সে ফোন করল। রাতে সে যেতে পারছে না, নন্দিতা আসছে, এমন বলল। অফিসের সকলে শিশিরের এমন চঞ্চলতা দেখেই ধরে ফেলল, নিশ্চয়ই আজ স্যারের বৌ আসছে। স্যার আজকে সকলের সঙ্গে প্রাণখোলা হাসি হাসছেন। এমন কি পিয়ন আদিনাথের সঙ্গে ওর দ্বিতীয় পক্ষের বৌকে নিয়ে সামান্য রসিকতা—এই সব দেখে স্যারের বৌ আসছে ছাড়া ওরা আর কিছু ভাবতে পারল না।

শিশির কিছু ভাউচারে সই করল। কিছু বিলে সই, এবং কিছু রিটার্ণে সই করতে দিলে বলল, আজ আর নয়, রেখে দাও। কাল হবে। এক দিনে এত কাজ করলে খাবে কে। বলে সে তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে নামতে যাচ্ছিল তখন এক গোলমাল, দুই বুড়োবুড়ি দারোয়ান ডিঙিয়ে সোজা অফিসের দিকে ছুটে আসছে। পিছনে দারোয়ান ছুটে আসছে, দারোয়ান এসে বলল, স্যার এক আদমি, এক জেনানা...! শিশির বুঝতে পারল আদমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে বলল, আসতে দাও। অন্য দিন হলে শিশির বলত, কোত্থেকে এসেছে? কেন এসেছে জিজ্ঞাসা কর? কি চায় জিজ্ঞাসা কর। কারণ সব উটকো লোক এসে ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। বেকার যুবক সাধ। এসব লোক হামেশা আসে, যখন তার হাতে কিছু করার থাকে না সে দেখা না করেই বলে দেয়, দরখাস্ত দিয়ে যেতে বল। তার কিছু করার না থাকলে ভাগিয়ে দিতে বল। কিন্তু আজ সে [illegible] মন নিয়ে [illegible] থেকে [illegible]

হয়েছে। যা কিছু আছে, গাছ ফুল পাখি—যা কিছু প্রাপ্য সকলের বিলিয়ে দাও। মাঝে মাঝে নন্দিতার সেই হাসি হাসি মুখ অথবা বড় বড় চোখ এবং টানা লম্বা ঘাড় গলা, প্রশস্ত পিঠ, ওর টান টান করে খোঁপা বাঁধা, সিল্কের শাড়ি প্রায় যেন এক যুবতী ঘোড়ায় চড়ে বড় মাঠ পার হয়ে আসছে—নন্দিতার মুখ ভাসলেই শিশির বড় অকপট সরল সহজ মানুষ হয়ে যায়। নন্দিতা এখন বাসে না ট্রেনে, সে ঘড়ি দেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। নন্দিতা এখন ট্রেনে। নন্দিতার মুখ এখন জানালাতে। নন্দিতা গ্রাম মাঠ দেখতে বড় ভালবাসে। দূরের নদী দেখতে ভালবাসে। সরযূ নদীর জলে ভেসে থাকতে ভালবাসে। ওর চুল যদি বাতাসে ওড়ে, যদি সে কিছু বসে বসে এখন ভাবে, ভাবতে ভাবতে ঘেমে যায়—নন্দিতার চিঠি দু বার আসে, সপ্তাহে শিশির দুবার চিঠি না দিলে অভিমানে নন্দিতার কান্না আসে। চিঠিতে কেবল নানা রকমের রঙিন স্বপ্নের কথা লেখা থাকে, সাদা জ্যোৎস্নার কথা লেখা থাকে। যখন ওর আর প্রকাশের ভাষা থাকে না—অথচ চারিদিকে এত ফুল ফল, গাছে গাছে লাল নীল রঙের পাখি, দূরে স্টেশনের হুইশেল, কি যেন চিঠিতে লিখতে চায়— লাল নীল রঙের পাখির ডাক, স্টেশনের হুইসেল সব মিলে তাকে অন্যমনস্ক করে দেয় বুঝি। তখন সে স্থির থাকতে পারে না, সে শুধু তখন কলেজের লাল নীল হলুদ রঙের ফুল ফোটার কথা লেখে— আমরা এবার দীঘাতে যাব, বালিয়াড়িতে আমরা হাত ধরে ছুটব—তারপর নির্জনে, এই ধর কিছু যদি ঝোপ-ঝাড় থাকে—কি যে হবে না! বাকিটুকু নন্দিতা — 'কি যে হবে না' দিয়ে শেষ করত। নন্দিতা সব সময় 'কি যে হবে না' এই শব্দ দিয়ে আমি সাগরে ডুবে যাব এমন কিছু প্রকাশ করতে চাইত। নন্দিতা যেন ওর সঙ্গে নতুন করে প্রেমে পড়ে গেল। সে ভাবল, বিকেলটা এখানে সেখানে কোন-রকমে কাটিয়ে দেবে। অফিসে সে বসে থাকতে পারছে না, বসে থাকতে তার ভাল লাগছে না। নন্দিতা আটটা দশের ট্রেনে আসবে। অলকাদের ঘরে চাবি আছে। ওর কাছেও একটা চাবি থাকে। সে এসে দেখবে লোকনাথ চলে গেছে। দুজনের মতো রান্না করে রাখবে আজ। নন্দিতা এসেই হয়ত পা ছড়িয়ে একটুক্ষণ বসবে, তারপর বাথরুমে সময় নিয়ে স্নান এবং শরীরে প্রসাধন মেখে জানালায় এসে যখন ওর জন্য প্রতীক্ষা করবে তখন শিশির চুপিচুপি সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাবে। নন্দিতা আসবে বলে সে আগে গিয়ে দরজা জানালা খুলে বসে থাকতে পারে না। বসে বসে সময় গুনতে ওর ভালো লাগে না। সে ভিতরে ভিতরে তার স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে। সুতরাং সে নটা বাজলে যাবে, গেলেই দেখবে—ওর সেই নির্জন নিঃসঙ্গ বাসা আলোতে ঝলমল করছে। নন্দিতা সব আলো জেলে ওর জন্য বসে আছে। নন্দিতা এক যুবতীর নাম—যত বয়স বাড়ছে তত নন্দিতা যেন নদীর পারে পারে ছুটতে ভালবাসছে—ভালোবাসায় চোখ কেবল কি যেন খুঁজছে, খুঁজতে খুঁজতে নদী অথবা অরণ্যে হরিণী হয়ে যাচ্ছে। দরজা খুললেই শিশিরের তর সইবে না। জামা কাপড় না ছেড়েই সে নন্দিতাকে সাপ্টে ধরবে। সে যেন সারাদিন, সারাদিন কেন, সেই গত ক'দিন থেকে—যত নন্দিতার আসার দিন ঘনিয়ে আসছিল তত সে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিল।

তখন সেই লোকটা, এক আদমি, এক জেনানা অথবা বলা যায় বুড়োবুড়ি—কি শীর্ণ চেহারা, বুড়িটা বুঝি অন্ধ, চোখে ঘসা কাচের চশমা, হাত ধরে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ির মুখে বসে পড়ল। সে চিনতে পারল লোকটাকে। লোকটা বিশ্ব-কর্মা পুজোর দিনে রান্নায় তদারক করেছে। রান্না খুব তারিফ করেছিল শিশির। এই লোক পায়ের কাছে উবু হয়ে বিনীত প্রার্থনা জানিয়েছিল, কারখানার কাজে ওর সন্তানের একটা হিল্লে হোক। সে এই বয়সে আর হাতা খুন্তি চালাতে পারছে না। কি কষ্টসহিষ্ণু মুখ এই মানুষের! শিশির ওর সন্তানকে একটা হেলপারের কাজে নিয়োগপত্র দিয়েছিল। বখাটে সেই ছেলের দুমাস যেতে না যেতেই কামাই। বিনা নোটিশে, কোন মেডিকেল রিপোর্ট নেই—সুতরাং চার্জসীট ফ্রেম করে আবার বিতাড়ন।

মনটা এত প্রসন্ন ছিল যে বুড়োবুড়িকে দেখে সে এই প্রথম বিরক্ত বোধ করল। এই প্রথম যেন ওর সারাদিন ফুরফুরে করে ওর যে মনটা উড়ছিল সেই মনে অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ল। সে বলল, আমি কিছু করতে পারব না। চার্জসীট ফেরৎ এসেছে, তোমার ছেলে চার্জসীট হাতে নিয়ে দেখা করলে কিছু করা যেত। এখন কিছু করার নেই।

অন্ধ মানুষের মুখের রেখা সুখে-দুঃখে বড় বেশি প্রকট মনে হয়। মনে হয় সংসারে, ইহসংসারে তার সব হরণ করে নিয়ে গেছে কারা! ভারি চশমা চোখে ভাঙা চশমা—অন্ধ বুড়িটা কেন এই ভাঙা চশমা পরে আছে! সে নুয়ে তাকাল। ঘসা চশমার ভিতর চোখ দুটো সে দেখতে পেল। শাদা ডিমের মতো চোখ। কালো মণি দুটো পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। অথবা দেখলে মনে হয় বাজপাখি মণি দুটো চোখ থেকে ঠুকরে তুলে নিয়ে গেছে। বস্তুত এই মুখেই যুবতীর চেহারা ছিল একদা। এই মুখে সূর্যের কিরণ পড়ত একদা। বৃদ্ধের মুখের রেখাতে এখন, এই যে শিশির বলে দিল, আর কোন উপায় নেই, কেন তোমার ছেলে এমন বাউণ্ডুলে—সে কোথায় চলে যায়, কামাই করে কেন এত বেশি—এমন সব ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শিশির এখন তাড়াতাড়ি বলে কোন প্রশ্ন করতে চাইল না। বাপু আমি কিছু করতে পারব না। আমার হাতে সময় নেই। নন্দিতা আসবে। মনে মনে বড় অস্থির হয়ে আছি। সে এলেই আমার ঘরে ফুল ফুটতে থাকে। পাখি উড়তে থাকে। আমি তাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি।

সে প্রায় যেন ছুটে বের হয়ে গেল। সে বাথরুমে পর্যন্ত গেল না। তোয়ালে বেয়ারাকে রেখে নিতে বলল। না হলে ওরা ওকে ঘেরাও করে ফেলত। ঘেরাও করে ফেললে ওর আজ সব যাবে। তাছাড়া সে বড় অসহায় মনে করল নিজেকে। তূণ থেকে শর নিক্ষেপ করে দিলে সব হাতের বাইরে। ফলভোগ যা কপালে আছে ভোগ করতেই হবে। বোধহয় এই অসহায় বোধ শিশিরকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে দিয়েছিল। ওর কিছুই ভাল লাগছিল না। সে বড় রাস্তায় নেমে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। সে চিৎকার করে এবার বলতে চাইল, ওহে মানুষেরা শুনছ, আমার নন্দিতা আসছে। ওর সঙ্গে আমি এক বিছানায় কতদিন এক-সঙ্গে এক বাসরে কাটিয়েছি। সে আমায় ছেড়ে গেল চলে, কি সব বাজে বকছি, ছেড়ে যাবে কেন, দূরে চলে গেছে বলে আবার সব কিছু নতুন মনে হচ্ছে। এখন এই যে ওর আসা যেন স্বপ্নের গাড়ি চড়ে সে আসছে। আমার যে এখন কি মনে হচ্ছে না! আমি খুলে সব বলতে পারছি না। তবে চুপিচুপি বলি, আমার এমন মনে হলে, প্রতিদিন এমন মনে হলে আমি মরে যাব বাছা!

সময় কাটানোর জন্য একটা হলঘরে ঢুকে সে সামান্য সময় বসে থাকল। কিছুক্ষণ যেন নানাভাবে সময় কাটানো। ঘরে ফিরলেই যেন দেখতে পায় শরীরের সর্বত্র জোনাকি জেলে নন্দিতা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। শিশিরকে দেখলেই শরীরের জোনাকিরা নন্দিতার সহসা বড় বেশি জ্বলে আর নেভে। ট্রেনে চড়ে চলে যাবার পর এটা ওর বেশি হয়েছে। জানালায় ওর সেই মুখ দেখলেই মনে হয় যেন এক সোনার হরিণ নন্দিতা, মরীচিকার মতো শরীরের অভ্যন্তরে

কি সব অলৌকিক বস্তু গোপন করে রেখেছে। অথবা নানারকমের ছবি, এত হিজিবিজি সব ছবির মুখ-চোখ যে ছবির আগাপাস্তালা সে কিছুই মনে আনতে পারছে না। তার থেকে থেকে কেবল নন্দিতার মুখ মনে পড়ছে। এবং সে চেষ্টা করছে নন্দিতার মুখ ভাববে না, কারণ মুখ এবং চোখের অথবা অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা ভাবলে শরীরের কষ্টদায়ক আরাম আরাম ভাবটা এসে মাথাচাড়া দিতে থাকে—তখন সব আগেই নেমে যেতে চায়, নেমে গেলে কি আর থাকে— তখন ত শুধু মরার মতো পড়ে থাকা। নন্দিতা মুখ ব্যাজার করে ওপাশ ফিরে শোয়। সুতরাং যতটা সম্ভব তখন আবার প্রতীক্ষার সময় গোনা, তারপর ধীরে ধীরে, বেশ ধীরে ধীরে কোন তাড়া নেই যেন, কেবল খুটেখুটে খাওয়া, অথবা ক্রমে পাহাড় শীর্ষে উঠে যাওয়া, উঠে যেতে যেতে বন-জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া। শিশির হারিয়ে যাবার মুখে বুঝি দেখল, দরজা জানালায় আলো জ্বলছে না, এখন নটা বাজে। ওর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

ওর ভিতরে ঢুকে মনে হল, নন্দিতা এই ঘরেই আছে। হয়ত অন্ধকারে লুকুচুরি খেলতে চায়। সে এক দুই করে আলো জ্বেলে দিল। না কোথাও নেই। সে প্রত্যেকটা ঘর খুঁজল। শিশিরকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য লুকুচুরি খেলতে পারে। সে খাটের নিচে উঁকি দিল। দরজা যখন খোলা, নিশ্চয়ই নন্দিতা আছে। সে বারান্দায় অন্ধকারে ছায়া ছায়া মূর্তি দেখল। ভীষণ গরম। ঠাণ্ডা বাতাস এই বারান্দায় এলে চুল উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। শাড়ি পরে সেই মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ভাবল, আর ডাকবে না। সেও যেন বাড়ি ফিরে আসেনি, এমন মুখে এদিকের আলো নিভিয়ে দিল। তুমি ভেবেছ বাছা আমি কম যাই। অন্ধকার ঘরে। সে দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে বারান্দায় টপকে এক লাফে ওদিকে চলে গেল। তারপর সিঁড়ির মুখে ওকে ঝাপ্টে ধরল। যেমন বাঘ থাবাতে শিকার পেলে টানতে টানতে কোথাও নিয়ে যায়, হুঁস থাকে না, মানুষ না গরু ঝোপের ভিতর থেকে ধরে এনেছে, মানুষ দেখলে সে যেমন আঁৎকে ওঠে, শিশিরও আলো জ্বেলে আঁৎকে উঠল। অলকা কেমন বোকার মতো ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শিশিরকাকু, আমি অলকা। ওর গলার কাছে কথাটা এসে আটকে গেল। সে কিছু বুঝতে পারল না। ওর গলা শুকিয়ে উঠছে। সে কেমন জল খাবার জন্য দুবার মুখ হাঁ করল। অলকার মুখ নীল নীল দেখাচ্ছে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই দপ-দপ করে জোনাকি জ্বলছে। শিশির প্রথম লজ্জায় কেমন গুটিয়ে আসছিল, কিন্তু অলকা নড়ছে না। বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে আছে। অলকা আজ শাড়ি পড়েছে। ভাবতেই সে প্রায় উন্মত্তের মতো, যেন কোন হুঁস ছিল না, পাহাড় শীর্ষে উঠে যেতে আরম্ভ করল। ক্রমে সেই অরণ্যের ভিতর হারিয়ে জলপানের নিমিত্ত কোন নদী তীরে প্রতীক্ষা করা। সে অলকাকে দেখল নদীর মতো এঁকে-বেঁকে পড়ে আছে। কোমল ত্বকে লাবণ্য উপচে পড়ছে। মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। তাকালেই যেন নদীর জলে এবার ডুবে যেতে হবে। খুব সুন্দর করে খোঁপা বেঁধেছে, ফুল গুঁজেছে মাথায়। শাড়ি টান টান করে পরেছে। শিশির অপলক দেখতে দেখতে কেমন এক পাগলের মতো ক্ষিপ্তপ্রায়, দাঁত মুখ খিঁচে—হায় এটা কি হচ্ছে শিশিরের ভিতর, ঘসা কাচের চশমার ভিতর সে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওর সারা মুখে রক্ত উঠে এসেছে। মেয়েটা এত নির্জীব এবং আশ্চর্য-ভাবে স্থির হয়ে আছে কেন, নড়ছে না! কেন সে দ্রুত এভাবে পতঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। শিশির ঝাপ্টে ধরতেই অলকা ওকে খামচে ধরল এবং বাধা দিতে চাইল। শিশির কিছুতেই আর পারছিল না। নন্দিতার মুখ ঘসা চশমার ভিতর সরে যাচ্ছে। মনে হয় এখন কেবল তালে তালে—এই যে তাল দেওয়া জীবনে, দিতে দিতে ডুবে যাওয়া—তারপর কোন নদীতীরে বুড়োবুড়ির সেজে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বসে থাকা, আমার গাভী কোনদিকে যাচ্ছে, এমন মুখ নিয়ে নদীর ওপারে তাকিয়ে থাকা, থাকতে থাকতে পাথর হয়ে যাওয়া—শিশির ক্রমে একা বালিয়াড়িতে ছুটতে ছুটতে নদীর জলে নেমে গেল। পাথরের মতো জলে টুপ করে ডুবে গেল।

তারপর আলো জ্বালালে দেখল জানালায় দাঁড়িয়ে অলকা কাঁদছে। শিশির এখন কি বলবে ভেবে পেল না। সে যেন কি এক নিদারুণ তৃষ্ণার নিমিত্ত জলপানে শক্তিহীন, আসক্তিহীন, ঘসা চশমার ভিতর সে অলকার মুখ দেখার চেষ্টা করছে। শাদা চোখ, ভ্রমরের মতো মণি দুটো সে উপড়ে নিয়েছে অলকার। সে ভয় পেল। ভিতরে তার জ্বর আসতে থাকল।

শিশির অলকার দিকে আর তাকাল না। মুক্তোবিন্দুর মতো জল চোখ থেকে গড়িয়ে নামছে। এই জল দেখলেই সে যেন ভয় পাবে। তার শরীরে আতসবাজি আর পুড়ছে না। সে হাল্কা অনুভব করছে। এবং নিজেকে বড় নির্বোধ মনে হচ্ছে। সে শুধু বলল, অলকা আমি জল খাব।

অলকা চোখ মুছে জল এনে দিল। সে নিচে নেমে যাচ্ছে। ওর পায়ের শব্দ এক দুই করে অন্ধকারে মিশে গেল। তারপর শিশির যেন কিছু শুনতে পাচ্ছে না, কেবল ঘুম পাচ্ছে। নন্দিতার ট্রেন লেট ছিল। সে ঘরে ঢুকে দেখল মানুষটা নির্বোধের মতো দরজা জানালা হাট করে ঘুমোচ্ছে। তার জন্য মানুষটা জেগে বসে নেই।

যখন ডেকে ডেকে তোলা হল, শিশির ঘুমের ঘোরে মনে করতে পারল না, নন্দিতা তার কে, কি তার সঙ্গে সম্পর্ক, সারাদিন সে কি ভেবেছে, নন্দিতা এলে তার সঙ্গে কি কি যেন করণীয় ছিল—সে কিছুতেই কিছু মনে করতে পারল না। সে ভালো ছেলের মতো খেয়েদেয়ে ফের শুয়ে পড়তেই ঘুম এসে গেল। তার কোন নদীর পারে কাশফুল ফুটে থাকার কথা মনে হল না, নদীর জলে ডুবে যাবার কথা মনে এল না। কেবল সেই দুই বুড়োবুড়ির মতো ঘসা কাচের চশমা চোখে নদীর পারে শীতের জন্য আগুন জ্বালাতে ইচ্ছা হল। নদীর জল এখন ঠাণ্ডা, বরফের মতো ঠাণ্ডা।

শিশির শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেই মনে হল নন্দিতার, মানুষটা বড় বোকা—সে এই মানুষের জন্য শরীরের ভিতর কত কিছু অলৌকিক বস্তু সংগ্রহ করে এসেছে। এক-বার চোখে পর্যন্ত দেখল না। নন্দিতা পাশে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু কাঁদল।

সরযূ নদীর জলে কিছু জোনাকি। পাকা ডানা গুটিয়ে ঠাণ্ডা জলের উপর বসে ভেসে যেতে থাকল। নন্দিতা সারারাত কিছুতেই ঘুমতে পারল না। সে সারারাত নদীর পারে বসে যেন মরা জোনাকিতে আলো জ্বালবার চেষ্টা করল। ঘুমের মানুষটা কিছুতেই কিছু টের পেল না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অতিপ্রাকৃত এবং উদ্ভট

যা চোখে দেখা যায় না, যা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, বাস্তবের ভিত্তিতে যার কোনও চিহ্ন আঁকা যায় না, সেই অলৌকিক লোকের কাহিনী কল্পনাকুশল শক্তিমান লেখক সাহিত্য রসসমৃদ্ধ করে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, যা অসম্ভব তাও সম্ভব হয়, চাঁদের অভিযানে তা প্রমাণিত। এই যে অসম্ভব, অতি-প্রাকৃত বা উদ্ভট কাহিনী, তার আকর্ষণও কিন্তু কম নয়।

বৈদিক পরবর্তী সাহিত্যে কিংবদন্তী ও নীতিকথার মধ্যে এমনই সব উদ্ভট ও অতি-প্রাকৃত কাহিনীর ছড়াছড়ি। এর মধ্যে বীভৎস রস নেই, সরল, সুন্দর, সরস, সহজ মুক্তছন্দ কাহিনী। তবে অসম্ভবের মধ্যে ভীতিরস আছে। কুচবিহারের মহারানী রবীন্দ্রনাথকে ভূতের গল্প বলার অনুরোধ জানালেন। বললেন—আপনি যে ভূত দেখেননি তা হতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর ভাড়াটিয়া ফিটন গাড়ির গল্প শুরু করলেন এবং 'গাড়ির ভিতর বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিতে' দেখলেন। মহারানী তখন নয়ন বিস্ফারিত করে আতঙ্কিতকণ্ঠে বললেন—"আঁ! সত্যি নাকি?"

সব অলৌকিকের এই দশা, প্রথমটা আমরা পরম আগ্রহে, রুদ্ধশ্বাসে, ভীতি-ঔৎসুক্য-শিহরণে কণ্টকিত হয়ে কাহিনীটি পড়ি কিংবা শুনি, তারপর মনে প্রশ্ন জাগে এ কি সম্ভব না অসম্ভব? এ যেন স্বপ্ন, কিংবা মায়া বা মতিভ্রম! রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, কঙ্কাল। অবনীন্দ্রনাথের 'পথে-বিপথে' বা প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি'-কে এই অতি-প্রাকৃতের পর্যায়ে ফেলা যায় নিঃসন্দেহে।

অলৌকিক কাহিনী মাত্রেই রোমান্স-ধর্মী। তার ভিত্তি রোমান্সে। সব সময়েই যে অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃত কাহিনী রোমান্সধর্মী হবে তা নয়, সোজাসুজি রিয়ালিস্টিক বা রোমান্টিক কাহিনীর সমগোত্রীয় হতে নাও হতে পারে, তবে গৃহীত অর্থ অনুসারে হয়ত অলৌকিক কাহিনীকে রোমান্টিক বলা চলে না। কিন্তু অলৌকিক কাহিনীর গায়ে আছে রোমান্সের স্পর্শ, আর সেইটুকুই তার প্রধানতম আকর্ষণ।

মানবিক অভিজ্ঞতার এক অস্বাভাবিক দিক অলৌকিক কাহিনীতে প্রকাশিত। তাই অলৌকিক গল্প অ-সাধারণ থেকে অতি-প্রাকৃত, অতি-প্রাকৃতিক থেকে উদ্ভট এবং শেষপর্যন্ত একটা আতংককর কাহিনী হয়ে ওঠে। তবে অতি-প্রাকৃত, ভৌতিক, অলৌকিক বা রোমহর্ষক রহস্য-কাহিনী, এমনকি গোয়েন্দা গল্প বা অপরাধভিত্তিক ক্রাইম স্টোরী সবগুলি কিন্তু একসূত্রে বাঁধা। একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে পরস্পরের মধ্যে।

এই সম্পর্কে এরিস্টটলের এক চমৎকার উক্তি আছে—

অসম্ভবকে সম্ভব মনে হবে, আর যা সম্ভব, তাকে মনে হবে উদ্ভট আর অসম্ভব।

এই কারণে বলা যায় যে, ফ্যানটাসটিক্ আর সুপারন্যাচারলের যোগসূত্র এক। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' রূপকথা জাতীয় ফ্যানটাসী। সেখানে কথা-মালার গল্পের মত গাছপালা, মাছ, ব্যাঙ, সাপ সবাই বেশ মানুষের মত কথা বলে। যেমন লুই ক্যারলের 'এলিস ইন দি ওয়ান-ডার ল্যান্ড'—। এইসব কাহিনী উদ্ভট বটে কিন্তু এর আকর্ষণ প্রবল। এর কারণ, চমক-প্রদ শ্লেষ এর মৌল উপাদান।

আমাদের বাংলাদেশে একদা আষাঢ়ে গল্প প্রচলিত ছিল। এক হিসাবে এইসব গল্প উদ্ভট কাহিনীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। জোনাথান সুইফট যে গালিভারের গল্পে লিখেছেন অতিকায় ব্রবডিংনাগ আর নাতি-কায় লিলিপুটদের কথা, সেও এক বিচিত্র ধরনের উদ্ভট গল্প। অবাস্তব মনে হতে পারে পাঠকের, তবে যতক্ষণ পড়বেন, ততক্ষণ মনে হবে এই অতিকায় এবং নাতি-কায়ের প্যারাডক্স যেন সত্যি। কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত শ্লেষ বা চরিত্রে আমাদের ব্যক্তি-চরিত্রের প্রতিফলন হয়ত পাওয়া যায় তাই এই কাহিনী ভালো লাগে।

পুরোন যুগের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বাইবেল এক অসম্ভবের উদ্ভট ইতিহাস। আমাদের রামায়ণ আর মহাভারত—তার সর্বপ্রধান আকর্ষণ এই উদ্ভটত্ব। হেমযুগের জন্য অসম্ভব বটে কিন্তু এই কাহিনীতে ত মোটেই বে-মানান নয়। সব গল্পের ঘটন সংস্থাপন এবং চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যহে গল্প সম্ভব বা অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে।

এলিজাবেথীয় যুগের নাটকাবলীর মধ্যে কি অসম্ভব, অবাস্তব, এবং অতি-প্রাকৃ রোমান্সের সংমিশ্রণ নেই? অসম্ভবে হোমারের 'ইলিয়াড' বা গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়! তখনকার দিনে লেখকরা সমকালীন সমাজ বা মানুষে নিয়ে কিছু লিখতেন না, সেক্সপীয়র একটি নাটকেও সমকালীন মানুষকে আঁক সাহস করেননি। গল্প, উপন্যাস, নাটকে সমকালীন চরিত্র যদি রূপায়িত হয়, তাহ কি তার মধ্যে বিয়োগান্ত প্রকৃতি ফোটা যায় না? উনিশ শতকে ডিকেন্স এবং প টমাস হার্ডি, দস্তয়ভস্কী বা বার্নার্ড এই অনুমান যে ভ্রান্ত, তা প্রমাণ করেছে

এডগার এলান পো-র বীভ অলৌকিক কাহিনী ত' সমকালীন সমাজে প্রতিচ্ছবি। ইংরাজী সাহিত্যে দুজন লে এই অলৌকিক কাহিনীকে রূপে-রসে সম করেছেন, একজন মার্কিন লেখক এলান আর অপরজন লুই স্টীভেনসন।

ওয়ালটার ডি লা মেয়ারের কাহি অতি সূক্ষ্ম। অনেকটা আমাদের অবনী নাথের মত। তাঁর ভৌতিক কাহিনী কা ধর্মী। ভূতদের মধ্যে আছে একটা ক ছিত্র। অন্ধকারের পারে আছে মধুর মৃ এঁদের রচনায় দেখা যায় অসম্ভব, অ প্রাকৃত অনুভূতি প্রকাশের প্রচে অলৌকিক কাহিনীর অসম্ভব দিকটা ব সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ভয়ের একটা নিজস্ব এসথেটিক আছে। হেনরী জেমস, মনটেগু ওয়ালটার ডি লা মেয়ার সেই দি সুন্দরভাবে অজস্র প্রমাণ দিয়েছেন। এ

একটা পরিমিতি বোধ থাকা প্রয়োজন। ভয়ের কাহিনী, অলৌকিক কাহিনীর তান লয় মান একটা বাঁধা পর্দায় থাকবে, তার সুর তেমন চড়া হবে না। অসম্ভব কাহিনী আমাদের উদ্দীপ্ত করবে। আমাদের মনের নিজস্ব ধারণায় তার প্রতিফলন ঘটবে কিন্তু আমাদের ধ্যান-ধারণাকে আহত, উত্তেজিত বা বিপর্যস্ত করবে না। সখ করে গল্প শুনতে বসে 'স্যাক্‌ড' হতে চাই না।

ঠাকুরমার ঝুলির কাল থেকে আজ আমরা অনেক দূরে এসে এগিয়ে এসেছি। কাহিনীর পটভূমিও একটা বাঁধা জায়গায় বসে নেই। তার পরিধি চারদিকে পরিব্যাপ্ত। অতি-প্রাকৃত বা অলৌকিক কাহিনী তাই ভৌতিক, বীভৎস বা আতঙ্ককর হবে, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

'মিড্‌ সমার্স নাইটস্‌ ড্রীম', ম্যাকবেথের ডাইনী, আর হ্যামলেটের ভূত—একই লেখকের কল্পনার ফসল। যাঁরা শুধু উপন্যাসই রচনা করে থাকেন, তাঁদের বিচরণক্ষেত্র বিশাল। বিরাট পটভূমি। তাঁদের কাহিনী বিলম্বিত লয়ে বিধৃত। কিন্তু অতি-প্রাকৃত কাহিনীর কাল সংক্ষিপ্ত। এখানে ঘটনা ঘটে যায় অতি দ্রুততালে। অভিব্যক্তির মধ্যে থাকবে কঠোর সংযম, বক্তব্য-বিষয় সংহত অথচ সংক্ষেপিত নয়।

সামগ্রিক ঘটনা ও চরিত্রের সমন্বয়ে রচিত একটা অখণ্ড কাহিনী। তার মধ্যে কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাত স্পষ্ট, তীক্ষ্ম এবং দ্রুত—এইসব গুণের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার ওপর অতি-প্রাকৃত কাহিনীর সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করে। কারণ, সেই যে তার একমাত্র আকর্ষণ।

বর্তমান কালে বাংলা সাহিত্যে অতি-প্রাকৃত বা উদ্ভট কাহিনীর অভাব ঘটেছে। পরীক্ষামূলক গল্পের প্রাচুর্যে স্বাভাবিক এবং হৃদয়গ্রাহী গল্প প্রায় অচল হতে বসেছে। বিমূর্ত শিল্প যেমন সহজ এবং বাস্তবধর্মী শিল্পকে গ্রাস করেছে, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন রীতি এবং নতুন পরীক্ষা আমাদের একটি মাত্র কাহিনীর সন্ধান দিচ্ছে যার নাম জীবনযন্ত্রণা। জীবন-যন্ত্রণার কাহিনীর মৌল উপাদান অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌন-বুভুক্ষা। উৎকট ভোগবাদ সাময়িকভাবে পাঠকের কাছে তৃপ্তিদায়ক হতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্যহীন কাহিনী নিস্তরঙ্গ নদীর মতো। এই নতুন পরীক্ষার ফলে ছোট গল্পের অপমৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।

ছোট গল্পের একটি বিশেষ দিকই এই আলোচনার অঙ্গীভূত, সুতরাং নতুন পরীক্ষার ভবিষ্যৎ বিষয়ে এইখানে চূড়ান্ত মন্তব্য করা সমীচীন নয়। পাঠকচিত্তে এই-সব প্রশ্ন জেগেছে বলেই অতি-প্রাকৃত উদ্ভট কাহিনী প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা হল। অতি-প্রাকৃত কাহিনীও যে আশ্চর্য রসোত্তীর্ণ সাহিত্যবস্তু হতে পারে, তার প্রমাণ জীবিত সাহিত্যকারদের অনেকেই দিয়েছেন। তাই মনে হয়, এই ধারাটি অবহেলিত না হলে বাংলা সাহিত্যে এডগার এলান পো বা ওয়ালটার ডি লা মেয়ারের আবির্ভাব হয়ত সম্ভব হত। পরিশেষে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই প্রবন্ধটি বর্তমান লেখকের একটি বৈতারিক আলোচনার ভিত্তিতে রচিত।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

ভারতীয় সাহিত্য

পূর্ব জার্মানীর তরুণ ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীমতী হেলগা আনটন তামিল ভাষা ও সাহিত্যের ওপর গবেষণার জন্য বিশেষ বৃত্তি নিয়ে এসেছিলেন ভারতে। দু বছর তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ডকটরেট উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল সুব্রাহ্মণ্য ভারতী। এই গবেষণার কাজ ছাড়াও তিনি এই সময়ে প্রাচীন তামিল সাহিত্যের কিছু কিছু অংশ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের মধ্যে কে ভি জগন্নাথন ও অখিলনের গ্রন্থসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য ভারতের প্রাক্তন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যাবার আগে এক সম্বর্ধনা সভায় তামিল ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন তিনি। কিন্তু দুঃখ করে বলেন—তামিল-ভাষীরা ইংরেজিকে যেন বেশি ভালোবাসে। যেখানেই গেছি, সেখানেই লোকে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে তামিলের পরিবর্তে ইংরেজিতে। মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা না করলে কেমন করে তার উন্নতি হবে।

ভারতীয় সাহিত্যরসিকরা আর একটি সংবাদ শুনে আনন্দিত হবেন যে 'ট্রানশ্লেটরর্স সোসাইটি অব ইন্ডিয়াকে 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ট্রানশ্লেটরস' অনুমোদন করেছেন। আন্তর্জাতিক এই সংস্থার কেন্দ্রীয় অফিস প্যারিসে। এর সভাপতি পি এফ কাইল। সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই অনুমোদনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

ভারতবিভাগ নিয়ে সম্প্রতি মালয়ালম ভাষায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের নাম টি সুকুমারন। স্বাধীনতা-লাভের আগের ও পরের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে এই উপন্যাসের কথাবস্তু গড়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে দেশের শুভবুদ্ধিকে বিপন্ন করেছিল, লেখক তাও নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। নায়িকার নাম অপর্ণা। থাকত ঢাকায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় একদল গুন্ডা তাদের বাড়ি আক্রমণ করে। এই গুন্ডাদলে ছিল অপর্ণার বাবার একজন বন্ধু। সে অপর্ণাকে বলে—'তুমি আমার। আমারই জন্য তোমার সৃষ্টি।' অপর্ণা সেখান থেকে কোনক্রমে পালিয়ে এসে কলকাতায় এসে কলকাতার একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে ওঠে। সেখানেই একজন সমাজসেবক তার শালীনতা হরণ করতে চায়। অপর্ণা তাকে হত্যা করে এবং বোম্বাই পালিয়ে যায় নিজেকে বাঁচাবার জন্য। এখানেই কাহিনীর শেষ। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই উপন্যাসে লেখক বেশ কিছুটা কল্পনাকে আশ্রয় করেছেন। যেভাবে তিনি কাহিনীর পরিবেশন করেছেন, তাতে তার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ফুটে উঠেছে। তবে আশার কথা মালয়ালম পত্র-পত্রিকাতেই এই উপন্যাসের বিপক্ষে অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হচ্ছে। মেকসিকো সরকার এই উপলক্ষে তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থগুলি হল (ক) মহাত্মা গান্ধীর জীবনী, (খ) সমকালীন ভারত, (গ) গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তা এবং (ঘ) ছবিতে গান্ধীর জীবনী। কেবল তথাকথিত অনুষ্ঠান না করে মেকসিকো সরকার তাঁর স্বদেশবাসীকে গান্ধীজীর জীবন ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা সত্যই অভিনন্দনযোগ্য।

বিদেশী সাহিত্য

সম্প্রতি বৃটেনে একটি জাল শিল্প-সামগ্রীর প্রদর্শনী হয়ে গেল। তাতে দেখা যায়, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর "সনেটস ফ্রম দি পর্তুগীজ" বইটির একটি জাল সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন টমাস জে ওয়াইজ।

অবশ্য একটিমাত্র বইয়ের জাল সংস্করণ প্রকাশ করে ভদ্রলোক ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রকাশ করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, টেনিসন, ডিকেন্স থ্যাকারে, স্টিভেনসন, প্রমুখ অনেকের বই।

উনিশ শতকের শেষভাগে ওয়াইজ এই অপকীর্তি চালিয়ে যান বেশ উৎসাহের সঙ্গে। জীবনের শেষ কয়েক বছর অবশ্য তিনি প্রকাশকমহলে যথেষ্ট শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বছর পরে ইংলন্ডের জনৈক প্রকাশক তাঁর এই জালিয়াতির ইতিহাস প্রকাশ করেছেন গ্রন্থাকারে।

তবে স্বীকার করতে হবে ওয়াইজের জালিয়াতি ধরবার সাধ্য ছিল না কারোর পক্ষে। বইয়ের প্রচ্ছদ ছাপা ও প্রকাশকের নাম, মুদ্রণকাল এমনভাবে তিনি নকল করতে পারতেন যে ধুরন্ধর গবেষকরা পর্যন্ত তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতেন।

সম্প্রতি তাঁর অপকীর্তি বিক্রী হয়েছে অসম্ভব রকমের চড়া দামে। বিশেষ করে তাঁর ব্রাউনিং সংস্করণ নাকি এখনো প্রথম বলে বিবেচিত হচ্ছে পাঠকমহলে।

উই, পোকামাকড়ের হাত থেকে পুরনো বই এবং পান্ডুলিপি রক্ষা করা একটা বিষম সমস্যা। অনেক সময় হালকা কালিতে লেখা পান্ডুলিপি কয়েক বছরের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে যায়। তার ওপরে আছে জলবায়ুর প্রভাব। একটু ঠান্ডা হাওয়া পেলে নানারকমের কীট ভেতরে ঢুকে পাতার পর পাতা কেটে দেয়।

এই সব সমস্যায় বিব্রত হয়ে বুলগেরিয়ার সিরিল ও মেথডিয়াস ন্যাশনাল লাইব্রেরী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছেন। গুদাম ও মহাফেজখানায় সংরক্ষিত পুরনো বইয়ের দীর্ঘায়ুলাভের জন্য তাঁরা সাহায্য নিয়েছেন কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীর। কোনো রকমের উই, পোকামাকড় যাতে বই কিংবা পান্ডুলিপির ভেতরে ঢোকার সুযোগ না পায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া শুরু হয়েছে মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে কীট অপসারণের কাজ। এখন কাগজের পাতায় ছিদ্রগুলোকে কয়েক মিনিটের মধ্যে পূর্ণ করে ক্ষতিগ্রস্ত পাতাগুলোকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ ধরণের পাতা ওল্টাবার যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং গত তিন-চার বছরে মহাফেজখানায় ঐতিহাসিক দলিলের এক লক্ষেরও বেশি পাতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীর সহায়তায়।

পশ্চিম জার্মানীর আটত্রিশ বছর বয়স্ক লেখক টমাস বের্নহার্ড-এর তিনটি গল্পের একটা সংকলন বেরিয়েছে সম্প্রতি। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক পদ্ধতিতে তিনটি গল্পই একই ধাঁচের। তাঁর অন্যান্য গল্প উপন্যাসের মতো এ বইয়ের মধ্যেও পাওয়া যায় সূর্যালোকহীন পৃথিবীর আরেক পরিচয়। বের্নহার্ড অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে তাঁর নায়ক নায়িকাদের জটিলতা এবং মানসিক দুঃখকষ্টের সংবাদ প্রেরণ করেছেন পাঠক-পাঠিকার অনুভূতির দরবারে। বাস্তবতা এবং রূপক প্রতীকের মিশ্র প্রয়োগে প্রতিটি রচনাই উল্লেখযোগ্য এবং দুঃসাহসী। বইটির নাম 'অ্যান দের বৌমগ্রেনজ'।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন : (জীবনকথা)—**লেখক—আর্ল মিজো ও স্টিফেন হেস। অনুবাদ—দীপক চৌধুরী। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম — তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।**

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রবার্ট নিক্সন এই সপ্তাহে ভারতবর্ষে আসছেন মিত্রতার সফরে। ঠিক এই মুহূর্তে আর্ল মিজো এবং স্টিফেন হেসকৃত নিক্সন জীবনীর অনুবাদ করেছেন দীপক চৌধুরী। একটি বিচিত্র দেশের এই বিশিষ্ট নেতার জীবন কৌতূহলপূর্ণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যাঁরা ছাত্র তাঁদের কাছে জীবনীটি বিশেষ আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই।

আইনের পরীক্ষায় সফল হয়ে নিক্সন হুইটিয়ারে ১৯৩৭-এ আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং অচিরেই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন। পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণ ঘটলে নিক্সন যুদ্ধের কাজে মেতে ওঠেন। নৌ-বাহিনীর এয়ার ট্রান্সপোর্ট বিভাগে তিনি কাজ পান। ১৯৪৫ থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার পর নিক্সন অ্যালজার হিসের নাম প্রথম শোনেন। এই অ্যালজার হিসের ঘটনা (১৯৪৮) নিক্সনের জীবনের এক বিশিষ্ট পর্বচিহ্ন। ১৯৫০ খৃঃ নিক্সন সেনেটের পদের জন্য প্রচার অভিযান চালান। প্রতিদ্বন্দ্বী হেলেন ডগলাসকে পরাজিত করার জন্য নিক্সন যে কৌশল অবলম্বন করেন তাঁর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সেটি একটি বহুল প্রচলিত কাহিনী। রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে যে স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলের প্রয়োজন নিক্সনের চরিত্রে সেই বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯৫২য় আইযেনহাওয়ারের সঙ্গী হিসেবে নির্বাচনে নিক্সনের প্রতিযোগিতা আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

নিক্সনের ক্যালিফোর্নিয়ার সমর্থক ১৯৫২তে একটি আঠারো হাজার ডলারের তহবিল গড়ে তোলেন। তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচনে অনেক সুবিধা সৃষ্টি করে দেয় এই তহবিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রথম যাত্রা শুরু করে পোমোনো থেকে। তহবিলের ব্যাপারে সারা দেশে আন্দোলন ওঠে। 'নিক্সন হটাও' আন্দোলনও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের

নাড়া দেয়। রাজনীতিতে নিক্সনের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালের তথাপি দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে আজ তিনি পৃথিবীর এক সমৃদ্ধিশালী উন্নত দেশের কর্ণধার। পরাভবকে নিক্সন পরবর্তী লড়াইয়ের হাতিয়ার বলে গ্রহণ করেন, সেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক জীবনও যে চিত্ত-চমকপ্রদ কাহিনীর মতো রোমাঞ্চকর হতে পারে এই গ্রন্থটি পাঠে তা জানা যায়। গ্রন্থটির অনুবাদ স্বচ্ছন্দ এবং সরস। মুদ্রণ এবং বাঁধাই প্রশংসনীয়।

●

চাঁদে যাবেন যাঁরা : (আলোচনা)—
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম চার টাকা।

চাঁদকে ঘিরে মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নেই বিচিত্র স্বপ্ন, অনন্ত কল্পনা মহাশূন্যের এই উপগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল অনেককাল আগেই। কিন্তু বর্তমান শতকের দ্বিতীয় ভাগে এসে মানুষ চাঁদকে নিয়ে নিদারুণ পরীক্ষায় মেতে ওঠে। ধীরে ধীরে দেখা দেয় মানুষের চাঁদে পদার্পণের সম্ভাবনা। সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ পেয়েছে গত ২০ জুলাই রাত্রে। পৃথিবীর দুই মানুষ মার্কিন নভশ্চর আর্মস্ট্রঙ এবং অলড্রিন চাঁদে পদার্পণ করে। হয়ত অদূর-ভবিষ্যতে মানুষের চাঁদে বেড়াতে যাওয়ার স্বপ্নও সফল হবে।

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চাঁদ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যপূর্ণ এই বইখানি লিখেছেন। চাঁদে কেন যাবে মানুষ? কেন এত অর্থব্যয়? কি সম্পদ আছে সেখানে? চাঁদের পরিবেশই বা কেমন? আরও অনেক বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। কিভাবে ধীরে ধীরে চাঁদের রহস্য উন্মোচিত হোল, বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রম কিভাবে রহস্যের দ্বার উন্মোচিত করল ডঃ ভট্টাচার্যের বর্ণনায় তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অ্যাপোলো—১১র আগেকার সমস্ত চন্দ্র অভিযান সম্পর্কে তথ্য এবং নানান কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নভশ্চরদের অভিযানের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা। লেখকের ঝরঝরে ভাষা এবং বর্ণনাগুণে চাঁদে যাবেন যাঁরা বেশ সুপাঠ্য হয়েছে। বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অভাব সুস্পষ্ট। বর্তমান বইখানি সে অভাব অনেকটা পূরণ করবে। বইটি সমাদৃত হবে।

●

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ : (ভগবৎ প্রসঙ্গ) — **অজাতশত্রু। রামকৃষ্ণ কৃষ্টি পরিষদ, ৫১ জয়পুর রোড, কলকাতা—৩০। দাম পাঁচ টাকা।**

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ-কাহিনী নিয়ে ভক্তজনেরা নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে সহস্র সহস্র ভক্তহৃদয়ে ভগবৎ প্রেরণা এনে দিয়েছে। ভক্তসঙ্গে সাক্ষাৎকারের অমিয় কাহিনী বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে চয়ন করে 'অজাতশত্রু' কাহিনীগুলিকে গেঁথেছেন আন্তরিকতায়। গ্রন্থের কাহিনী শুরু হয়েছে নেপাল রাজকর্মচারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়কে নিয়ে। শেষ হয়েছে বিবেকানন্দের প্রাণপ্রতিষ্ঠায়। এরই মধ্যে এসেছে আচার্য বিজয়কৃষ্ণ, বৈদান্তিক কেশবচন্দ্র, কর্মযোগী অশ্বিনীকুমার, বলরাম বসু, গোপাল-মা, যোগিনী-মা প্রমুখ অসংখ্য ভক্তজনের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ কাহিনী। লেখার গুণে এই সদ্গ্রন্থটি গল্পের মতো কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য হয়েছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কালি ও কলম (জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৬)—
সম্পাদক—বিমল মিত্র। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

কালি-কলমের বর্তমান সংখ্যায় স্বপন-প্রসন্ন রায়ের 'মীর্জা গালিব' প্রবন্ধটি সব থেকে উল্লেখযোগ্য। ছবি মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যের অন্তরালে শরৎচন্দ্র-স্মৃতিচিত্রণটি বেশ আকর্ষণীয়। গল্প, কবিতা লিখেছেন এবং কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন অজিতকৃষ্ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সুজিতকুমার ভট্টাচার্য, সুকোমল বসু, চন্দ্রকান্ত বক্সী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুধাংশু বৈশ্য, পুলিনবিহারী সেন। একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন বিমল মিত্র।

সময় (মে/জুন : ৬৯)—সম্পাদক : উৎপলকুমার গুপ্ত। ৩ গোয়ালপাড়া লেন। বহরমপুর। দাম এক টাকা।

মফস্বল বাঙলা বহরমপুর থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি সুসম্পাদিত এবং সুমুদ্রিত। লিখেছেন : মণীশ ঘটক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, আশিস মজুমদার, মৃণাল বসুচৌধুরী, উৎপলকুমার গুপ্ত এবং আরো অনেকে।

চতুষ্কোণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) — সম্পাদক : শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। ৭৭।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দাম এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় নগেন দত্তের সমাজ বাস্তববাদী সাহিত্যের মূলসূত্র নিবন্ধে নতুন ভাবনার পরিচয় রয়েছে। অমিতসূদন ভট্টাচার্যের আলোচনাটি তথ্যনির্ভর। অন্যান্য আছে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, আলোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

মধ্যাহ্ন (তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)—
সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য। ৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম : পঁচাত্তর পয়সা।

অনেকদিন ধরে মধ্যাহ্ন বেরোচ্ছে। সুন্দর প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ শোভনতার দিক থেকে পত্রিকাটি ভালোই। রচনা নির্বাচনেও সম্পাদকীয় রুচি মন্দ নয়। মাঝে মাঝে বেশ পাণ্ডিত্যগর্বী রচনাও বেরিয়ে থাকে দু-চারটে। এ সংখ্যায় কবিতা ও প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন দিলীপকুমার মিত্র, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, দুর্গেশ্বর শর্মা, দিনেশ দাশ, বিমলচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, শান্তিকুমার ঘোষ, মতেশ্বর হাজরা, গণেশ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং আরো কয়েকজন।

রাণার (দ্বিতীয় সংকলন)—**সম্পাদক বিমলকুমার দাস ও বরুণকুমার দাস। ১৪ রুস্তমজী স্ট্রীট, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯। দাম :** পঞ্চাশ পয়সা।

আগের সংখ্যার সুন্দর প্রচ্ছদ এ সংখ্যায় বজায় রইলো না। তবু দেখতে ভালোই লাগছে। এ সংখ্যায় নতুন লেখকের আধিক্য লক্ষণীয়। লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিমলকুমার দাস, বরুণকুমার দাস এবং আরো অনেকে। সম্পাদক আক্ষেপ করেছেন, 'রানার নতুন পত্রিকা। কবি সাহিত্যিকদের যথেষ্ট আস্থা অর্জন করতে পারেনি এখনো। অথচ, আমরা তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা চেয়েছিলাম।'

রক্ত স্বাক্ষর (প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা)—
সম্পাদক নির্মলাচার্য। ৭খি, বঙ্কিম ধর সরণী, বহুবাজার, কলকাতা-১২। **দাম** তিরিশ পয়সা।

চড়া লাল রঙের প্রচ্ছদওয়ালা এই পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। মাসিক রাশিফল থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ইতিহাস সবই আছে। লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই অনামী।

আধুনিক সাহিত্য (মার্চ, '৬৯)। সম্পাদক—রণজিৎ দেব। ১ ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহার।

এক বৎসরে পত্রিকাটির চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এবং ইতিমধ্যে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সংখ্যাটিও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এ সংখ্যায় কবিতা ও গল্প লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বাসুদেব দেব, অমিতাভ দাশগুপ্ত, নীরজ বিশ্বাস, নগেন্দ্রনাথ পাল এবং আরো কয়েকজন। 'উত্তরবঙ্গের পালাগান' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন নরেশ সরকার।

আসর পত্রিকা—(২০ বর্ষ বৈশাখ)
সম্পাদক—সত্যচরণ ঘোষ প্রকাশক আসর আর্ট প্রেস। দাম ১-৫০।

আসর পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটি বিশেষ নাটক সংখ্যা হিসেবে ঘোষিত। বলতে দ্বিধা নেই নাটক সম্বন্ধে লিখিত বিভিন্ন লেখকের রচনাগুলি তত্ত্বে এবং তথ্যে সমৃদ্ধ। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের নাট্যশিল্পের মহত্ত্ব গুণ, প্রদ্যোতকুমার ঘোষের নব-নাট্য আন্দোলন ও রোমাঁ রোলাঁর পিপলস থিয়েটার, মন্মথ ঘোষের অনূদিত নাটকের আর এক দিক। সাহিত্যের সত্য অন্বেষণে জোয়েল পার্লিতের প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে এই সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

সাহিত্যের সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালীর ভূমিকা

দৃঢ় কণ্ঠস্বর, কিন্তু উচ্চারণে সাবলীল, দীর্ঘদেহী, উন্নতবাহু শক্তিপদ রাজগুরুকে আমি দেখেছি কয়েকবার। কখনো কলেজ স্ট্রীটে, কখনো কোনো প্রকাশকের দোকানে। দূরে থেকে দেখলে খানিকটা ভারিক্কি মনে হয়, একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার যেন তাঁর সর্ব-শরীরে অতিরিক্ত বিস্ময়ের মতো মিশে আছে। আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করিনি। বোধহয়, জনপ্রিয় সাহিত্যিককে দূরে থেকে দেখার মধ্যে যে-আনন্দ আছে, তাকেই আমি উপভোগ করতে চেয়েছিলাম একদিন।

তবু একদিন আলাপ হয়ে গেল। অত-র্কিতে নয়, পূর্বব্যবস্থামত। এবার দূরে থেকে নয়, কাছ থেকে দেখলাম তাঁকে—একান্ত অন্তরঙ্গ মানুষের মতো। বাইরের ব্যক্তিত্বে ফাটল ধরেনি এতটুকু। বিশেষ করে 'রাজ-গুরু' পদবীর মধ্যে যে-আভিজাত্য প্রকট, তা যেন পুরোপুরি বজায় আছে দৈহিক কাঠামোর ভেতরে। আলাপ করতে গিয়ে খুঁজে পেলাম আরেক মানুষের পরিচয়। অপরিচয়ের সীমানা পেরিয়ে তিনি আমার কাছাকাছি চলে এলেন।

বছর কয়েক আগে তাঁর একটি উপ-ন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ দেখেছিলাম রুপোলি পর্দায়। মঞ্চে দেখেছি 'মেঘে ঢাকা তারা' 'জীবনকাহিনী' 'মনসদ' ও 'শেষাগ্নি'-র অভিনয়। প্রথম তিনটির নাট্যরূপ দিয়ে-ছিলেন তিনি নিজেই, শেষেরটি দেবনারায়ণ গুপ্ত।

আমি অবশ্য তাঁর এই নাটকীয় সাফল্যে বিশেষ উৎসাহ বোধ করিনি কোনোদিনই। কেননা, একজন লেখকের জন-স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তার সাহিত্যিক মূল্য নির্ণীত হয় বলে আমি মনে করি না। মঞ্চের প্রয়ো-জনে অনেক সময় উপন্যাসের সংলাপ ও প্রকাশভঙ্গি পালটে যায়। আমি তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' পড়ে যে-জীবনের স্পর্শ পেয়েছি, নাটকে উপস্থিত করা গেছে তার সামান্য অংশই। বিশেষ করে, বিষয়ের বিশ্লেষণে ও ঘটনার উপস্থাপনে যে-শিল্পময় সত্তার প্রকাশ পাঠকের কাছে স্পর্শ, নাটকের সংলাপময়তার দর্শকের কাছে তা-ই থাকে অনুপলব্ধ।

আমি পড়ছিলাম, তাঁর সর্বশেষ উপ-ন্যাস 'পরবাস'। কেমন যেন একটু কাব্যিক নাম। 'প্রবাস' শব্দটিকে ভেঙে প্রাচীন-পন্থী করা হয়েছে বিনাদ্বিধায়। অথচ শুনতে খারাপ লাগছে না এতটুকু। পুরোনো বিষয়কে নতুনভাবে পরিবেশন করায় এই

দক্ষতা শক্তিপদবাবুর অর্জিত গুণ নয়, সহ-জাত জীবনচেতনার স্বতন্ত্র প্রকাশ।

কোনোরকম ভূমিকা বা সংকোচ না করেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পরবাস' লিখলেন কবে? এর আগে কি কোনো পত্র-পত্রিকায় উপন্যাসটি বেরিয়েছিল।

—লিখেছি বছর দুয়েক আগে। আপ-নাদের অমৃতেই বেরিয়েছিল ক্রন্দসী নামে একটা ছোটগল্প। 'পরবাস' সেই কাহিনীর-ই উপন্যাসরূপ।

মনে পড়ল, বাংলা সাহিত্যে এমন নজীর আছে অনেক। প্রায় একই বিষয়বস্তু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটক। প্রয়োজনে শক্তিবাবুও ছোটগল্পের কাহিনীকে উপন্যাসের আয়ত পরিসরে মুক্তি দিতে পারেন নিশ্চয়ই। তবু জিজ্ঞেস করলাম, উপন্যাস এবং ছোটগল্পের শিল্পমাধ্যম কি এক? সংযত, সংহত কাঠা-মোর মধ্যে ছোটগল্প যতটা নিটোল, উপ-ন্যাসের মধ্যে কি সেই বৈশিষ্ট্য রাখা সম্ভব? আপনি 'ক্রন্দসী' লিখে সন্তুষ্ট হননি?

—উপন্যাস এবং ছোটগল্পের শিল্প-মাধ্যম এক, তা আমিও মনে করি না। তবে ছোটগল্পের চেয়ে উপন্যাসের প্রতিই আমার ঝোঁক বেশি। 'ক্রন্দসী' গল্পের মধ্যে আমি নীরদ নামে একজন যুবকের কথা বলেছি, কিন্তু তার জীবনসত্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। পরবাসের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি।

আপনার সাহিত্যবিবেক কি কোনো

—নিশ্চয়ই। আমি আমার সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়েই কিছু না কিছু বলতে চেয়েছি।

আদর্শের দ্বারা লালিত?

সত্য আর আদর্শকে বাদ দিয়ে কোনদিন সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। অবশ্য যুগের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ বদলায়। আজকের মানুষ জীবন-ধর্মের তাগিদে অন্য এক আদর্শকে মেনে নিচ্ছে। ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্য দিয়ে

এগিয়ে যাচ্ছে সকলেই। অন্য সবকিছুর ওপরে বাঁচার কথাটাই এখন মুখ্য। এরই মধ্যে সুন্দরভাবে বাঁচতে চায় সকলেই, নানারকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করে। আমার এই উপন্যাসে সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টা অন্যতম প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁকে জেরা করছিলাম। কোনো বিরক্তি লক্ষ্য করিনি তাঁর মুখেচোখে।

বললাম, প্রকাশকের তাগাদায় অনেকে ছোটগল্পকে উপন্যাস বানিয়ে দেন। আপনি সে-রকম কোনো মানুষের পাল্লায় পড়েননি তো?

—না, প্রকাশকের তাগাদায় আমি লিখি না। জলসাঘর মধ্যে আজকের দিনের বাঁচার প্রশ্নটি অঙ্কুরে ছিল। এখানে তাকে বিস্তৃত করেছি।

এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ভুবনবাবুকে তো পুরোনোপন্থী মানুষ বলেই মনে হয়। তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে গিয়ে আপনি নিজের মতামতকেও আরোপ করতে চেয়েছেন কি?

—না। ভুবনবাবুর প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। আসলে আমিও তো গ্রামের মানুষ, শহরে এসেছি চাকরীর প্রয়োজনে। ভুবনবাবুও তাই। তিনি শহরের লোক নন। সপ্তাহান্তে বাড়ি যান। গ্রামের সংস্কার ও পুরোনোর প্রতি আকর্ষণ তাঁর চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য। তারই ছেলে নীরদ সমাজের শাসন অস্বীকার করে আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। ভুবনবাবুর পক্ষে সহজভাবে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তবু শেষপর্যন্ত তিনি যতটা স্বীকার করতে পেরেছেন, নীরদের মা তাও পারেননি। ভুবনবাবু যুগের প্রয়োজনে তাঁর সংস্কার ও বিশ্বাসকে অনেকটা ভাঙতে পেরেছেন। আমিও তা ভাঙতে চাই।

অনেকে অভিযোগ করেন, আপনি শহুরে মানসিকতার জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, যাকে আমরা সফিস্টিকেশন বলি, তার স্বরূপ বুঝে উঠতে পারেননি। ভেতরের জটিলতা সাহিত্যের প্রকাশ ও ভাবাভঙ্গিকে জটিল করে। আপনার লেখায় তার প্রতিফলন কই?

—আমি গল্প লিখি সকলের জন্য। অহেতুক জটিল করে কি লাভ? পাঠক বুঝতে পারবে না। সাধারণ মানুষ কি এসব অন্তর্দ্বন্দ্বের খবরাখবর রাখে? তা ছাড়া বিষয় এবং ঘটনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে কোনো লেখাই জটিল হতে পারে না।

কলকাতার জীবন আপনার কাছে কেমন লাগে?

—অসহ্য এবং ভালো। জ্বালা ধরে যায় থাকতে থাকতে, কিন্তু এখানেও সৌন্দর্য আছে বৈকি। রাস্তাঘাট, ট্রামবাস, পোষাক-আষাক সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা আকর্ষণ বোধ করি। বিশেষ করে সন্ধ্যার কলকাতা তো মোহিনী বেশ ধারণ করে। এখানে আন্তরিকতা নেই! সবই মৌখিক ভদ্রতার কারবার। খাটো, খাও। নগদ নারায়ণের সংসার। যতদিন টাকা আছে, ততদিন সুখ আছে, আনন্দ আছে। যেদিন অর্থ যাবে সেদিন ছুঁড়ে ফেলে দেবে কলকাতা। কোনো মায়ামমতা নেই। যেদিন যৌবন যাবে, সেদিন চুষে চুষে ছিবড়ে করে ফেলে দেবে এই রাঙিনী কলকাতা। এখানে জৌলুসের দাম আছে, আন্তরিকতা মূল্যহীন।

পরবাসে কি আপনি এই যন্ত্রণার কথা বোঝাতে পেরেছেন?

—না। পরবাস আকারে প্রকারে ছোট বই। সবকথা খুলে বলার উপায় ছিল না। বড় স্প্যান পেয়েছিলাম 'মণিবেগম' 'অন্তরে অন্তরে' 'কেউ ফেরে নাই' প্রভৃতি বইতে। এখানে আমি বিশ্লেষণের সুযোগ পাইনি।

একই মানসিকতা থেকে আপনি আর কোন্ কোন্ বই লিখেছেন?

—'মেঘে ঢাকা তারা' 'বাসাংসি জীর্নানি' 'যদি জানতেম' প্রভৃতি। অবশ্য বইয়ের পটভূমিকা আলাদা, কাহিনী আলাদা। মিল আছে ভাব-বস্তুতে। বৃহত্তর দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল নিয়ে লিখেছি 'বাসাংসি জীর্নানি'। তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে আমার সেই যন্ত্রণা। শহর ক্রমশ গ্রাস করছে গ্রামকে। অর্থের লোভে গ্রামের চাষীরা কলকারখানার মজুর হয়ে গেল।

আপনি কি শহরজীবনের সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের কোনো বিরোধ আছে বলে মনে করেন?

—গ্রামের মানুষ শহর গড়েছে। আমার বিশ্বাস, গ্রাম থেকেই আবার বাঁচার নির্দেশ আসবে। শহর কাউকে বাঁচাতে পারে না। কলকাতায় কত মানুষ এসেছে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা থেকে—ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এসেছে গুজরাট থেকে, মারাঠা থেকে, পাঞ্জাব থেকে, দাক্ষিণাত্য থেকে। কিন্তু কাউকেই আপন করে নিতে পারেনি। বহু মানুষ আর বহু জাতির শহর হল কলকাতা। এখানে সমাজ নেই, ধর্ম নেই। আছে অর্থবিত্তের অহঙ্কার।

তারপর একটু ভেবে বললেন, আমি কোনো কিছুতেই বিশ্বাস হারাই না। প্রকৃতির মতোই মানুষ সর্বংসহা। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। উভয়ের সঙ্গে সমন্বয় হলে জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। আমি সুন্দরবনে বাস করেছি কাঠুরেদের সঙ্গে। দেখেছি, কত কষ্ট সহ্য করেই না তারা বেঁচে আছে। প্রকৃতির বাধানিষেধ ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা সংগ্রাম করেছে। আসলে, সব জায়গাতেই মানুষ মূলত একই রকম—কি বাংলাদেশে, কি উত্তর ভারতে, কি দক্ষিণ ভারতে। মানুষ বাঁচতে চায়। সুন্দরবনের মানুষ যেমন, কয়লাখনির শ্রমিকও তেমনি।

আপনার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সম্পর্কে কি আপনি সচেতন? তারা শহরের মানুষ নয়?

—হ্যাঁ। আমার চরিত্রগুলি সবই গ্রামের মানুষ। গ্রাম থেকে তারা শহরে এসেছে। শহর থেকে গ্রামে যায়নি। উপায় থাকলে আমিও গ্রামে ফিরে যেতাম।

আপনার ভেতরে কি কোনো রোম্যান্টিক চেতনা কাজ করে?

—কিছু কিছু করে বৈকি। জীবনের সফটনেসকে এখনো বিসর্জন দিতে পারিনি।

অনেকে বলেন, আপনার লেখা যতখানি অবজেকটিভ এবং গল্পের ততটা অন্তর্জগতের সংবাদ দিতে পারেননি। এ অভিযোগ কি সত্যি?

—আমি শুধু বাইরে নয়, গভীরে প্রবেশেরও চেষ্টা করেছি। কোনো চরিত্র সৃষ্টি করতে গেলে, তার ভেতরেও ঢুকে যেতে হয়। যখন যা লিখি, তখন তার মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। কোনো চরিত্রের যন্ত্রণাকে এড়িয়ে যেতে পারি না। আমিও যন্ত্রণা পাই। অনেক সময় সকালবেলা বাজার করতে যাই না আলু-পটলওয়ালার সঙ্গে কথা কাটাকাটির ভয়ে। তাতে লেখার ক্ষতি হয়।

লেখেন কখন?

—সাধারণত সকালে। কখনো কখনো রাত্রিতে লিখি। তবে খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারি। পরবাস লিখতে আমার দিন কুড়ি সময় লেগেছিল। তবে সব সময় লিখতে পারি না। মাঝে মাঝে দু-তিন মাস লিখি, তারপর দু-তিন মাস বন্ধ থাকে। সে সময় পড়াশোনা করি।

কথায় কথায় বললেন, পাকিস্থানে আমার কিছু বই চলছে। প্রথম প্রথম ওঁরা পারমিশন নিতেন। এখন আর সে বালাই নেই। পাকিস্থানী প্রকাশকরা ইন্টারন্যাশনাল কপি-রাইটের শর্ত মানেন না। শুনেছি, এখনো ওঁরা আমার বই ছেপে যাচ্ছেন।

পরবাস বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

—যে মানুষটার ঘর যেখানে, সেখানে তিনি থাকেন না। ভুবনবাবু মনেপ্রাণে গ্রামের বাসিন্দা। শহরে এসেছেন বাধ্য হয়ে। অবশেষে তাঁকে সেখানেই ফিরে যেতে হল। তাই এ পরবাস।

আধুনিক সমালোচকরা তো সাধারণত উপন্যাসের আলোচনায় আপনাকে এড়িয়ে যান। তাঁরা নাকি আপনার মধ্যে নতুনত্বের ছাপ খুঁজে পান না?

—আমি লিখি নিজের খুশির জন্যে। সমালোচকরা সব বই পড়েন না। না হলে তাঁরা আমার নিজস্ব রীতি ও দর্শনকে জানতে পারতেন। 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার 'কেউ ফেরে নাই' এবং 'তবু বিহঙ্গ' উপন্যাস দুটির সুন্দর আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের সেতুবন্ধনে যদি ইট কাঠ সরবরাহ নাও করে থাকি, তাহলেও স্বীকার করতে হবে কাঠবেড়ালীর মতো গায়ের ধুলো ঝেড়েছি।

তাঁর এই বিনীত, কিন্তু আন্তরিক স্বীকারোক্তিতে কোনো অহমিকা ছিল না, কিছুটা বিষণ্ণতার আভাস ছিল। নিজের দিক থেকে লজ্জিত হচ্ছিলাম, এমনি একটা প্রশ্নেরই জন্য। মনে পড়ল, এ প্রশ্নটা ছিল অবান্তর। কেননা, আমিও তো আধুনিককালেরই পাঠক, আমি তো শক্তিপদ রাজগুরুর অনেক উপন্যাসেই এ কালের পদধ্বনি শুনি।

—বিশেষ প্রতিনিধি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পেটে দুটো হাত দিয়ে টিপে কেতকী পাশের চেয়ারে বসে পড়ল হঠাৎ। সেই তীব্র ব্যথাটা আবার জেগে উঠেছে। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল কেতকীর। সংগে সংগে মুখটা রক্তশূন্য আর ঘর্মাক্ত হয়ে গেল এক মুহূর্তে। চিন্তার স্রোত অকস্মাৎ প্রতিহত হল, যন্ত্রণার রূঢ় আঘাতে। এ যন্ত্রণাটা আজকের নয়। প্রায় দু বছর আগে এটা শুরু হয়েছিল। তখন কিন্তু এর আক্রমণটা হত অনেকদিন পরে পরে। তীব্রতাও কম ছিল। কেতকীর মনে পড়ল সরিৎ আর দীমার তখন পূর্বরাগের পালা শেষ হয়ে সবেমাত্র বিয়ের ঠিক হয়েছে। না, ভয় পায়নি কেতকী। অনেক যন্ত্রণা আর ব্যথা নিয়ে নাড়াচাড়া সে করেছে। সত্যি কথা বলতে কি এটা তার কাছে তখন আবশ্যক বলে মনে হয়েছিল। যন্ত্রণার তীব্রতা তার মনকে জোর করে মোড় ঘুরিয়ে দিত, নিজের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য সে অন্তত ভুলতে পারত। নিষ্কৃতি পেত পীড়াদায়ক চিন্তা আর কঠিন নিষ্পেষণ থেকে। টেবিলের ওপর থেকে একটা ট্যাবলেট মুখে দিয়ে একটু জল খেল কেতকী। তারপর চুপ করে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে ওষুধের ক্রিয়া শুরু হতে যন্ত্রণার তীব্রতা যেন কমে আসতে লাগল। এ ধরনের ওষুধ কেতকী অনেকদিন ব্যবহার করেছে। এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। আর দেরী করা উচিত নয়। কাউকে দেখিয়ে রীতিমত চিকিৎসা করিয়ে নিতে হবে তাকে। একথাটা সে প্রত্যেকবারই ব্যথার সময় ভাবে, কিন্তু তারপরই ভুলে যায় কিংবা অন্য কাজে জড়িয়ে পড়ে। অন্যের যন্ত্রণার লাঘব করতে গিয়ে তার নিজের দিকে তাকাবার সময় হয়নি আর। এটাও এক ধরনের অহংকার। ডাক্তারের সংগে দিবা-রাত্র থেকেও সে নিজের রোগ পুষে রেখেছে। ওষুধ নিয়ে যার দিন-রাত্রির কারবার সে নিজেকে বঞ্চিত করলে এছাড়া অন্য কি বলা যায়। আলস্য আছে কিন্তু তার চেয়ে আছে রোগকে তাচ্ছিল্য করার বদখেয়াল।

ডাঃ দীনা মুখার্জিও আজ দুপুরে বাড়ীতে লাঞ্চ খেতে যায়নি। তার অনেক-গুলো কারণ আছে অবশ্য। সরিৎ আজও বাড়ীতে লাঞ্চ খেতে ফিরবে না। সুতরাং নিঃসঙ্গ লাঞ্চে পেট হয়ত ভরে কিন্তু মনের দিক দিয়ে কোথায় একটা বিরাট ফাঁক থেকে যায়। সে খাওয়াতে আনন্দ নেই—পাক-স্থলীটা পূর্ণ হয় বটে কিন্তু আহারের তৃপ্তি থাকে না। তাছাড়া কয়েকটা বিষয়ে তাকে অনুসন্ধান করতে হবে। ইদানীং নারসিং হোমের ওষুধের সম্বন্ধে কিছু গরমিল দেখা দিয়েছে। হিসেব মিলছে না ঠিকভাবে। বিশেষত মরফিন পেথিড্রিন জাতীয় ইনজেকশানগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রহস্যজনকভাবে। ওষুধগুলোর দাম বেশী নয়, কিন্তু যারা এগুলো নেশার জন্য ব্যবহার করে থাকে তাদের কাছে এগুলো অপরিহার্য। যে কোন মূল্যের পরিবর্তে তারা এগুলো সংগ্রহ করে থাকে। দোষীকে খুঁজে বার করতে হবে তাকে। নিয়ম আন্তর্বর্তিতার কথা নয় এমন কি আর্থিক প্রশ্নও নয়—মরফিয়া অ্যাডিক্ট যারা তারা

শুধু নিজেরাই বিপদে পড়ে না, অনেককেই জড়িয়ে ফেলে তার সঙ্গে।

চারিদিকে তাকিয়ে কেতকীকে দেখতে পেল না দীনা। কব্জির ঘড়িটায় লক্ষ্য করে দেখল আড়াইটে বেজে গিয়েছে। সময়টা দেখা মাত্র দীনার খিদে খাবার স্পৃহাটা বেড়ে গেল। মনে পড়ল, কোন্ সকালে সে মাত্র ডিম কর্ণফ্লেক্স আর দু পেয়ালা কফি খেয়েছে। করিডর পার হয়ে বড় হলটায় গিয়ে পৌঁছল সে। এই হলটায়ও রোগীরা থাকে। রোগীদের এটাই বিশ্রামের সময়। সেজন্য সন্তর্পণে চলতে লাগল দীনা। হঠাৎ নজরে পড়ল একজন রোগীর দিকে, উঠে বসে আছে সে। কাছে গিয়ে দাঁড়াল দীনা। মেয়েটির কম বয়স, কলেজে পড়ে। কিছুদিন যাবৎ পেটের যন্ত্রণা এবং অন্যান্য উপসর্গে ভুগছিল। অনেক চিকিৎসার পর লিপিকা ডাক্তার দীনা মুখার্জির শরণাপন্ন হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ড্রীমল্যান্ড নারসিং হোমে ভর্তি হয়ে লিপিকা যেন নিস্তেজ আর অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। দীনা এগিয়ে গেল লিপিকার দিকে।—

কি লিপিকা, বসে কেন?

মুখ তুলে তাকাল লিপিকা—এমনি, ভাল লাগছে না।

দীনা বেডের ওপর বসল তার পাশে। মন কেমন করছে?—লিপিকার পিঠের উপর হাতটা রাখল দীনা।

না—।

তা হ'লে ভয় করছে বোধহয়?

আমি বুঝতে পারছি না, কেন এমন হয়।

তুমি কি ডাক্তার যে বুঝতে পারবে। ভয়ের কিছু নেই, অপারেশন করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। তোমার পেটে টিউমার হয়েছে।

কেন হ'ল?

তোমার গালে ঐ আঁচিলটা হ'ল কেন?

হাতের আঙুল দিয়ে আঁচিলটা স্পর্শ করে লিপিকা বলল—কিন্তু ওতে ত কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

এতেও কোন ক্ষতি হবে না। শুধু ওটাকে অপারেশন করে বার করতে হবে। তোমার আঁচিলটা যদি বড় হত তা হলে সেটাও বাদ দিতে হত এইভাবে বুঝেছ? ওসব কথা থাক তুমি বই পড়তে ভালবাসো?

হ্যাঁ, বাসি।

তাহলে তোমায় আমি কতকগুলি বই আর মাসিক পত্রিকা পাঠিয়ে দিচ্ছি পড়। আজে-বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও, না হলে কি হবে জান—

কি?

মুখে রেখা পড়বে তা হলে বর পছন্দ করবে কি করে?

হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল লিপিকার। সম্প্রতি তার বিয়ের কথা চলছে।

দীনা উঠে চলে গেল। তার দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইল লিপিকা। কি করে এত গুণ একজনের মধ্যে থাকে তা বুঝে উঠতে পারল না সে। মাত্র একটু সময়ের জন্য আলাপ করার ফলে তার মনটা যেন হাল্কা হয়ে গিয়েছে। লিপিকা লক্ষ্য করে দেখল অনেকেই তার দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

কি হল? জিজ্ঞেস করলেন পাশের ভদ্রমহিলা।

না, কিছু হয়নি—মনটা কেমন ভার-ভার ঠেকছিল—তাই উনি আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

আচ্ছা আপনার ত অপারেশন হয়ে গেছে—প্রশ্ন করল লিপিকা। হ্যাঁ হয়ে গেছে। এবার ত প্রায় বাড়ী যাবার সময় হয়ে এল।

—হাসিমুখে উত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা।

কিরকম মনে হয়। লিপিকার এখনও ভয় ভাঙে নি।

কিছুই মনে হয় না; কারণ অজ্ঞান করে দেবেন ডাক্তার মুখার্জি। তুমি ডাক্তার মুখার্জিকে দেখেছ?

হ্যাঁ দেখেছি, খুব ভাল লোক।

উনিই অজ্ঞান করে দেবেন, তারপর—যখন তোমার জ্ঞান হবে তখন দেখবে তুমি এই বিছানায় শুয়ে আছ পরম নিশ্চিন্ত হয়ে।

কিন্তু এগারো নম্বর বেডের উনি অত কাঁদলেন কেন?

ওটা অন্য ব্যাপার। ওর আর ছেলে হবে না বলে মন খারাপ হয়েছে।

ছেলে নেই বুঝি? লিপিকা জিজ্ঞেস করল।

আছে, ছ-সাতটি ছেলেমেয়ে—হাসিমুখে উত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা।

বলেন কি! অবাক হল লিপিকা—তাহলে ভদ্রমহিলার এত দুঃখ কেন?

ওর ধারণা বছর বছর ছেলে না হলে স্বামী আর ভালবাসবে না। দুজনেই এক-সঙ্গে হেসে উঠল।

হলটা পার হয়ে দীনা বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে বেসিনের ট্যাপ খুলে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল কয়েকবার। এ অভ্যাসটা তার অনেকদিনের। কোন কারণে মানসিক চাঞ্চল্য হলে দীনা এটা করে থাকে। মুখটা তোয়ালে মুছে আরশির দিকে তাকাল সে। মুখটা তার রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছে। দেহের সব রক্ত যেন তার মুখে এসে জড়ো হয়েছে একসঙ্গে। মরফিন বা পেথিডিন এভাবে আগে আর কখনও অদৃশ্য হয়নি সুতরাং নতুন কোন লোকের দিকে তার নজর রাখতে হবে। খোঁজ করতে হবে কিভাবে সেগুলো চুরি যাচ্ছে। কে করতে পারে—নতুন নার্স? কিন্তু তার ওপরে ওসব ওষুধের ভার নেই। তবে কেতকী? তার কি প্রয়োজন? টাকা? কিন্তু এর চেয়ে অনেক মূল্যবান ওষুধকে কেউ স্পর্শ করেনি বলে মনে পড়ল তার। মুখটা মুছে কমপ্যাক্টের তুলিটা আলতো ভাবে বুলিয়ে নিল দীনা। শাড়ীটা গুছিয়ে নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে।

ডাঃ সরিৎ মুখার্জি কাজ সেরে যখন বাড়ী ফিরল তখনও সনৎ বাড়ী ফেরেনি। তার অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে সরিৎ উঠে গেল দোতলায়। বসবার ঘরে এসে কোটটা সোফার গায়ে ফেলে দিয়ে গা এলিয়ে দিল অসীম ক্লান্তিতে। চোখ দুটো বন্ধ করে রইল সে। তার মাথার ভেতর যেন হরেকরকমের অজানা বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে তাণ্ডবের ছন্দে। কানে তার একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ হয়ে চলেছে ক্রমাগত। বন্ধ চোখের পর্দায় নানারকম রঙের বিচিত্র সমাবেশ হচ্ছে। লাল, নীল, জরাচি, কালো রং-এর কতগুলো অজানা হরফ আর জ্যামিতিক রেখার সমন্বয় ঘটেছে একের পর এক। ডাঃ সরিৎ মুখার্জি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

কে? চমকে উঠেছে সরিৎ। দীনা এসে তার চিবুকটা স্পর্শ করেছে আলতোভাবে।

আমি, চমকে উঠলে যে। পাশে বসল দীনা।

হ্যাঁ চমকে উঠেছিলাম—সরিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভেবেছিলে অন্য কেউ। আড়চোখে তাকাল দীনা।

না, তা নয় ঘুম পাচ্ছিল।

এক্ষুনি চা আনছে। খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছ না।

তা হয়েছি বৈকি। অসীম ব্যানার্জির কেসটা করতেই দম বেরিয়ে গিয়েছে।

সেই অ্যাকসিডেন্ট কেসটা—বয়ের হাত থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিল দীনা।

হ্যাঁ, দিল্লীর নারানদাস এ্যাডভানী। ওকি করলে—কাপ থেকে চায়ের খানিকটা দীনার শাড়ীর উপর পড়ে গেল—।

হাতটা কেমন যেন পিছলে গেল—ন্যাপকিন দিয়ে জায়গাটা মুছে নিল দীনা, মুখটা তার রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

দীনা—ইউ নিড রেস্ট—চল বরঞ্চ কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসি।

বাজে বোকো না। বাইরে গেলে ড্রীম-ল্যান্ডে নাইটমেয়ার হবে।

তা ব'লে নিজের শরীর খারাপ করবে?

খারাপ কোথায় দেখলে—?

দেখেছি বৈকি, তোমার নার্ভ একটু উইক হয়েছে, একথা অস্বীকার করবে না নিশ্চয়।

একটা দুর্ভাবনায় পড়েছি—আস্তে বলল দীনা।

বল কি, তোমার আবার দুর্ভাবনা! সনৎ তো তোমার নামে কবিতাই ছাপিয়ে দিয়েছে 'সোনালী ঝর্ণা'।

না, মশায় ওটা আমায় উদ্দেশ করে নয়। অফিসের সেই মেয়েটি—সে যাক। কিন্তু প্রায়ই নারসিং হোম থেকে মরফিন আর পেথিডিন উধাও হয়ে যাচ্ছে—এ খবর রাখ?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সরিৎ তারপর বলল—কোন হদিশ করতে পাচ্ছ?

পাত্তা লাগিয়েছি, দেখি কি হয়। ধরা পড়বেই।

কি করে জানলে ধরা পড়বে? যারা এ ধরনের চুরি করে, তাদের নাগাল পাওয়া সহজ নয়। নেশা কি জিনিস তুমি জান না।

জানি বৈকি—একটু হাসল দীনা। তারপর চায়ের কাপটা নিয়ে উঠে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরেই সনৎ ফিরে এল। ঘরে ঢুকে কাপড়-জামা ছেড়ে সে চেয়ারে বসল। আজও নারসিং হোমে গিয়েছিল সনৎ। হিসেবের খাতাপত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে

বটে কিন্তু তার মন পড়েছিল অন্য জায়গায়। কেতকীর সম্বন্ধে সে যেন হঠাৎ বেশী উৎসুক হয়ে পড়েছে। এর কারণটা সে নিজেই বুঝতে পারেনি এ পর্যন্ত। গত কয়েকদিন ধরে সে শুধু কেতকীর কথাই ভেবেছে। কেতকী তাকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করছে যেন। তার পক্ষে এটা খুবই অস্বাভাবিক। তার পঙ্গুতা আর দারিদ্র্য যে কোন মেয়েকেই দূরে সরিয়ে রাখবে একথা সে ভাল করেই জানে। সুপর্ণার সঙ্গ তাকে আনন্দ দিয়েছে, বন্ধুত্বের মিষ্টি স্বাদ পেয়েছে সেই সঙ্গে। কিন্তু সুপর্ণা তার মনকে এভাবে নাড়া দেয়নি। তাকে ভুলিয়ে দেয়নি। তাকে ভুলিয়ে দেয়নি তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটিগুলো। অনিদ্রায় কাটাতে হয়নি তাকে কোনদিন, সুপর্ণাকে কল্পনা করে ইমারত গড়তে। নিজের উপর বিরক্ত হল সনৎ মুখার্জি, উঠে দাঁড়িয়ে রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে যেতে লাগল বারবার। এটা তার একটা বদঅভ্যাস। চিন্তার ভারে যখন সে পীড়িত হয়ে পড়ে তখন নিজের অজ্ঞাতেই সে এটা করে থাকে। হঠাৎ সাইডটেবিলের সামনে এসে তিব্বতী মুখোসগুলির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বীভৎস মুখোসগুলি যেন একসঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বলে মনে হল সনতের। তার সব চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হল এক নিমেষে। তার কাছে এগুলোরও অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। সনতের মনে হয় মুখোসগুলো যেন জীবন্ত। প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, প্রত্যেক ভঙ্গীরই একটা করে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে। এক-একটা করে মুখোসগুলো তুলে নিয়ে ভালভাবে নিরীক্ষণ করল সনৎ। তারপর কাপড় দিয়ে মুখে সাজিয়ে রাখল ঠিকভাবে। দরজার সবুজ পর্দাটা নড়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সনতের মনটা নেমে এল বাস্তবে। দরজার দিকে তাকিয়ে বলল এস বৌদি—।

ঘরে ঢুকল দীনা—তারপর সনতের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি চান করবে না?

না, আজ আর চান করব না ভাবছি।

কেন বলত, শরীর খারাপ।

না, এমনি, কুঁড়েমি লাগছে।

ছোড়দা, দিস ইজ ভেরি ব্যাড—সরিৎও দেখছি কেমন যেন ঢিলে হয়ে যাচ্ছে।

দাদা নিশ্চয় কাজে ফাঁকি দিচ্ছে না।

না, তা নয়, কাজ ঠিকই করছে কিন্তু কাজ করার পরেই যেন খুব টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

তোমার মতে, কাজ করার পরও লোকে ক্লান্ত হবে না।

হবে তবে এ বয়সে নয়। আসল কথা কি জান ছোড়দা—তোমরা একটু কুঁড়ে। এই দেখ না, সরিৎ আগে কসরৎ করত মানে ব্যায়াম করত—কিন্তু এখন বিলকুল ছেড়ে দিয়েছে। এরপর দেখবে ভুঁড়ি আর ডাবল চিন গজাবে; মাথার চুল উঠে টাক পড়বে।

অন্য দিকটাও ভাব—বাধা দিল সনৎ।

অন্য দিক? ভ্রূকুঞ্চিত করল দীনা।

হ্যাঁ, দাদাও ভাবতে পারে—তোমার ভুঁড়ি হবে, মুখটা পাঁচ নম্বর ফুটবল হবে—

একপাক ঘুরে গেল দীনা মুখার্জি বলল—ভুল, ছোড়দা ভুল। সাত বছর ধরে আমার ওজন এক—। কোমর হিপ, বুকের মাপ—

বৌদি, স্পেয়ার মি একটু চুপ করবে?

জান, নট অ্যান আউন্স অব ফ্যাট আর এই দেখ—পায়ের সেপ—শাড়ীটা একটু তুলে ধরল দীনা।

নির্লজ্জ বৌদি,—লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে গেল সনতের।

বিশ্বাস হল না, বেদিং কস্টিউম পরে আসব?

দোহাই তোমার বৌদি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে—ওদিক দিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তুমি অনন্যা।

ও কথাটার মানে? কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দীনা।

মানে, তোমার সঙ্গে কারও তুলনাই হয় না।

থাঙ্ক ইউ আর টকিং—একথা আগে বললেই হত।

বলতে সুযোগ দিলে কোথায়।

সে থাক। ছোড়দা তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এসেছি। ডিভানে বসল দীনা।

আমার সঙ্গে পরামর্শ—সনৎ তাকাল দীনার দিকে।

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে—এসব ব্যাপারে, তোমার পরামর্শই দরকার।

বল, পারলে যথাসাধ্য সাহায্য করব নিশ্চয়।

তোমায় একটু গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

জোরে হেসে উঠে সনৎ বলল—বৌদি, আমি আর যাই হই না কেন হাজার চেষ্টা করলেও, গোয়েন্দা হতে পারব না কিছুতেই।

কেন বলত?

আমি যেখানেই যাব, সকলেই পায়ের আওয়াজে টের পেয়ে যাবে যে গোয়েন্দা এসে পড়েছে। আবার হেসে উঠল সনৎ।

অপ্রস্তুত হল দীনা বলল—আগে তুমি সবটা শোন। ব্যাপার হল আমাদের স্টক থেকে প্রায়ই মরফিন আর পেথিডিন চুরি হচ্ছে। জিনিসটার দাম বেশী নয় কিন্তু—

বুঝেছি—কোন অ্যাডিক্ট হয়ত ওগুলো সরাচ্ছে—কি ঠিক না?

হতে পারে, কিংবা বিক্রি করে লাভ করছে হয়ত—উত্তর দিল দীনা।

তাহলে দুটো কারণ হল—আঙুলে গুনে বলল সনৎ।

যাঃ ছোড়দা, এবার তুমি মুখে একটা—পাইপ লাগাও, একেবারে শার্লক হোমস।

কিংবা শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বক্সীও—হেসে উত্তর দিল সনৎ।

আমার কিন্তু পেরী ম্যাসনকে ভীষণ ভাল লাগে। কি অদ্ভুত উপস্থিতবুদ্ধি, কোর্টসিনগুলো পড়লে একেবারে তন্ময় হয়ে যেতে হয়।—

দীনা গালে হাত দিয়ে একটা সুন্দর ভঙ্গী করল।

কিন্তু বৌদি, ডিটেকটিভ গল্প সাহিত্যে অচল—বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল সনৎ।

তুমি সাহিত্যিক, তোমার মতামতের মূল্য আছে জানি, কিন্তু কারণটা বলবে। না থাক, কারণ শুনতে চাইব না, তুমি হয়ত অনেক বড় বড় ফিরিস্তি আওড়াবে।

হ্যাঁ, তা সম্ভব।

কিন্তু তোমার কথা মানতে পারলাম না ছোড়দা। এ ধরনের ঘটনা রোজই হচ্ছে আর বাস্তব থেকেই সাহিত্যের জন্ম—একথা অস্বীকার করবে কি করে। জান ছোড়দা, আমি তখন পাঞ্জাবে মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমাদের বাড়ীর পাশে এক ভদ্রলোককে কে যেন মার্ডার করেছিল। সকালবেলা তার স্ত্রী মৃতদেহটা আবিষ্কার করলেন লাইব্রেরী-ঘরে। তিনি পুলিশ ডেকে পাঠালেন। আমরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মৃতদেহটা দেখেছিলাম। ভদ্রলোককে একটা লোহার রড দিয়ে পিছন থেকে মারা হয়েছিল। সেখানে আঙুলের ছাপ নেওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য সব ব্যবস্থাই ঠিক ডিটেকটিভ নভেলের অনুকরণে ঘটল। কিন্তু কই আমাদের কাছে কোন অস্বাভাবিক ঠেকেনি ত।

খুনের উদ্দেশ্য কি—এতক্ষণ পরে প্রশ্ন করল সনৎ।

সোনার ঘড়ি, রেডিও ইত্যাদি কয়েকটা জিনিস আর কিছু টাকা চুরি গিয়েছিল। প্রথমে সেটাই উদ্দেশ্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তা নয় চুপ করল দীনা।

তা নয়? উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল সনৎ।

না, তার স্ত্রীই তাকে হত্যা করেছিল।

কেন?

তা বলব না—তুমি বরঞ্চ আগাথা ক্রিস্টির মত এর উপরে একটা নভেল লিখে ফেল।

হেসে উঠল দুজনেই।

বেশ বৌদি, তোমার কেসের ভার আমি নিলাম। মরফিন পেথিডিন চুরির ব্যাপারে তুমি কাকে সন্দেহ কর?

একটু ভাবল দীনা। তারপর বলল—আমাদের নার্সিং হোমে মালতী বলে যে রান্নার কাজ করে, তারই ছেলেকে কিছুদিন হল ওখানে কাজ দিয়েছি—আমি তাকেই সন্দেহ করি।

কেন সন্দেহ কর?

ছেলেটাকে দেখলেই ক্রিমিনাল বলে মনে হয়। তাছাড়া ওর চাল-চলন ভাল লাগে না আমার।

আচ্ছা, দাদাকে এ ব্যাপারটা জানিয়েছ?

জানিয়েছি, কিন্তু আমরা মানে ডাক্তাররা ওদিকে মন দিলে কাজের অসুবিধে হবে। মন দিয়ে কাজ না করলে, শুধু প্রফেশনেরই ক্ষতি হয় না রোগীরও ক্ষতি হয় সেই-সঙ্গে। কথাটা বলে, উঠে দাঁড়াল দীনা। তারপর সনতের দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে আর দেরী কোরো না। এবার থেকে রোজই তোমায় নার্সিং হোমে যেতে হবে।

একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার দীনা মুখার্জি।

রোজ নারসিং হোমে যাবার সুযোগ পেয়ে খুশী হল সনৎ। কয়েকদিন যাবার পর কেতকীকে সোজাসুজি প্রশ্ন করল সে আপনাকে আজ একটু বিরক্ত করব—

হাসল কেতকী পরে বলল—কিছু জিজ্ঞেস করবেন? আমি কিন্তু অ্যাকাউন্টস সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

না, অ্যাকাউন্টস নয়—অন্য দু-একটা খবর জানতে চাই।

বেশ ত বলুন—সামনের চেয়ারে বসল কেতকী।

ডেটলজাতীয় কোন ওষুধের গন্ধ কেতকীর কাছ থেকে ভেসে এল তার দিকে। সনৎ একবার কেতকীর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। কাল চুলের একটা গুচ্ছ মাথায় লাগান টুপির পাশ থেকে বেরিয়ে শুভ্র কপালের উপর এসে পড়েছে। মুখে শুধু একটু পাউডার লাগিয়েছে কেতকী। অন্য কোন প্রসাধনের চিহ্ন নেই। চোখের পল্লব ভ্রূর মতই কালো আর সুবিন্যস্ত। চোখের নীচে যেন একটু কালচে ভাবের আভাস রয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য ক্লান্তির ফল হতে পারে। সুডৌল বাহুকে ঘিরে সাদা ব্লাউজের হাতাটা বেড় দিয়ে রয়েছে একান্তভাবে। শাড়ীর ছোট ছোট ভাঁজগুলো সুদৃশ্যভাবে কোমর থেকে কাঁধের উপর উঠেছে একের পর এক। গলার কাছে নীল শিরাটা বারবার তরঙ্গায়িত হচ্ছে শুভ্র ত্বকের পটভূমিতে। কেতকী সনতের দিকে তাকাতেই সনতের চমক ভাঙল, লজ্জিতভাবে বলল—আমি নারসিংহোমে অ্যাকাউন্টস দেখছি বটে কিন্তু অন্য আর একটা ভারও আমার উপর এসে পড়েছে।

কেতকী তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

সনৎ বলল—কয়েকটা ওষুধের হিসেবের গরমিলের খবর পেলাম।

ওষুধের গরমিল? কেতকীর চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হল।

হ্যাঁ, মিসেস মুখার্জি বলছিলেন, পেথিডিন আর মরফিন ইনজেকশনগুলো নাকি অদৃশ্য হচ্ছে রহস্যজনকভাবে।

কৈ, আমায় ত কিছু বলেননি তিনি—একটু থেমে মন্তব্য করল কেতকী।

আপনাকে বলবেন নিশ্চয়, তবে বোধহয় জিনিসটা বেশী জানাজানি করতে চাইছেন না।

তাহলে, আমায় কথাটা না জানালেই পারতেন। আমি কথাটা গোপন নাও রাখতে পারি।

আপনার ওপর সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে। নারসিংহোম সুষ্ঠুভাবে চালনার মূলে আপনার দানই সবচেয়ে বড় একথা ও'রা স্বীকার করেন।

ধন্যবাদ—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেতকী। এতক্ষণে সনৎকে ভাল করে লক্ষ্য করল সে। সনতের সঙ্গে সরিতের সাদৃশ্যটা হঠাৎ কেতকীর চোখে ধরা পড়ল যেন। একেবারে হুবহু সেই মুখ। পাঁচ বছর আগে মেডিকেল কলেজে সরিৎকে ঠিক যেমন দেখেছিল তেমনি। সেই প্রশস্ত কপাল, তার মাঝখান থেকে ত্রিভুজের মত চুলটা উঠে গিয়েছে উপর দিকে। মোটা ভ্রূ দুটোর মধ্যে সুগঠিত নাকটা সোজাভাবে নেমে এসেছে পাতলা ঠোঁটের ওপরে। সুদৃঢ় চিবুকের ওপর পাতলা ঠোঁটটা একটু যেন বেমানান মনে হয়। তবু সবটা মিলিয়ে একটা সুন্দর মুখের ছাপ চোখে পড়বে সকলেরই। অন্তত কেতকীর তাই মনে হয়। সনতের গলার স্বরটা ভারী আর চাপা ধরনের সরিতের মত। কথার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে। রূঢ়তা নেই তাতে কিন্তু কোথায় যেন একটা শক্তি লুকিয়ে আছে, তাকে এড়িয়ে যাওয়া বা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না। স্বরে আদেশের ঔদ্ধত্য নেই বটে তবে পৌরুষের ছাপটা অস্বীকার করা যায় না। কাছ থেকে কেতকী তাকিয়ে দেখল সনৎকে। অবিকল সরিৎ, এতটুকু তফাৎ নেই। মুখটা তার অকারণে রক্তিম হয়ে উঠল।

আপনি কাউকে সন্দেহ করেন? চমকে উঠেছে কেতকী সনতের গলার স্বরে।

না, মৃদু স্বরে উত্তর দিল সে।

নতুন কে একজন যেন কাজে লেগেছে—সনৎ তাকাল কেতকীর দিকে।

হ্যাঁ বাবলু, মালতীদির ছেলে।

কি রকম লোক?

অল্পবয়স, একটু গায়েপড়া ভাব আছে। ভ্রূ-কুঞ্চিত করল কেতকী।

বিরক্ত করে নাকি?

ঠিক বিরক্ত নয় তবে অযথা যখন-তখন এসে আলাপ করার সুযোগ খোঁজে।

একটু হাসল কেতকী।

কি কাজ করে।

বোধহয় অফিসে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। তাছাড়া হঠাৎ চুপ করে গেল কেতকী।

চাল-চলন ভাল নয়—কেমন? সনৎ কথাটা শেষ করল।

হাসল কেতকী বলল—দেখুন কারুর বিরুদ্ধে কিছু বলা আমার অভ্যেস নয়।

তাহলে উন্নতি করতে পারবেন না, সঙ্গে সঙ্গে বলল সনৎ। জানেন তো আমি অফিসের কেরানী। ওসব বিদ্যে আমাদের দস্তুরমত আয়ত্ত করতে হয়। তা না হলে প্রমোশন পর্যন্ত বন্ধ।

মন্তব্য শুনে হেসে ফেলল কেতকী। সরিৎও ঠিক একই ভাবে কথা বলে। অনেকদিন পরে কেতকীর মনের সজীবতা যেন ফিরে এসেছে। এতদিন একটা জগদ্দল পাথর তার বুকের ওপর বসেছিল। অকস্মাৎ সেটা কে যেন সরিয়ে দিল মন্ত্রবলে। পায়ের শিকলটাও খুলে গেল এক নিমেষে। আনন্দের আতিশয্যে কেতকী দেহের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করল। যন্ত্রণাটায় বেদনার—ইঙ্গিত আছে বটে কিন্তু নেশার আমেজও রয়েছে প্রচুর। তার ফলে তার সর্বাঙ্গ যেন অসাড় আর ঘর্মাক্ত হয়ে এল এক মুহূর্তে। নিজেকে জোর করে সামলে নিল কেতকী, এটা সে অভ্যাস করেছে। মানসিক বৃত্তিগুলোকে সে করায়ত্ত করার চেষ্টা করে প্রাণপণে। তাতে কষ্ট হয় সত্যি—অবসাদ আসে তার ফলে, তাও সে জানে। কিন্তু এতে যেন সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। জয়ের আনন্দ পায় নিগূঢ়ভাবে। আপনাকে একটু কফি এনে দেব—তখনও মুখটা জ্বালা করছে কেতকীর।

আবার কষ্ট করবেন?

না, কষ্ট আর কি। উঠে দাঁড়াল কেতকী তারপর এগিয়ে গেল পাশের ছোট ঘরটার দিকে।

কেতকীর অপসৃয়মান দেহটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সনৎ। কেতকীর সঙ্গে সে এতক্ষণ কি কথা বলেছে, কি উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেছে তাও যেন তার মন থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে নিজের অজ্ঞাতে। মনে মনে হাসল সনৎ। তার সাহিত্যসুলভ মন নিয়ে সে যে গোয়েন্দাগিরিতে সাফল্য লাভ করতে পারবে না তা সে আগে থেকেই জানত। নার্স কেতকী তাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছে তাদের আলাপের সময় এটা তার নজর এড়িয়ে যায়নি। সুপর্ণা কিন্তু তাকে ঠিক এভাবে নিরীক্ষণ করে না। তার দৃষ্টিতে সহানুভূতি আছে। সমবেদনা আছে এমন কি বন্ধুত্বেরও আভাস আছে। কিন্তু কেতকী তাকে সেভাবে দেখেনি। কেতকীর চোখের ভাষা ভিন্নধরনের। ঘন পল্লবের মধ্য দিয়ে কেতকীর দৃষ্টি সনৎকে মোহাচ্ছন্ন করেছে—অনুসন্ধান করেনি, যাচাই করেনি, শুধু দেখেছে।

কফি নিয়ে কেতকী ফিরে এল। কফিটা টেবিলের উপর রেখে শান্তস্বরে বলল—চিনি দিইনি আপনি ত চিনি ছাড়া খান।

হ্যাঁ তাই, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

আমি যে নার্স, লোকের সুবিধে অসুবিধে নিয়েই ত আমাদের কাজ।

সে ত রুগীর জন্যে, বিশেষত বড়লোক রুগীদের, নয় কি? সনৎ কফিতে চুমুক দিয়ে চমকে উঠল বলল—এ কি, মিষ্টি যে, চিনি নাকি?

না, স্যাকারিন—মিষ্টি হাসল কেতকী।

আমাদের এখানে অনেকেই চিনি খান না তাই স্যাকারিন রাখতে হয়। আর আপনি যে বললেন, আমরা শুধু বড়লোকদেরই সেবা করে টাকা নিই, সেটা ঠিক নয়।

আমার মত গরীবদের স্থান হয় আপনাদের নারসিংহোমে? সনৎ হাসিমুখে তাকাল কেতকীর দিকে।

(ক্রমশঃ)

মানুষগড়ার ইতিকথা

দিন-কয়েক আগে পুরোনো সুতানটির অতি-পুরোনো একটি পাড়ায় গিয়েছিলাম একটি স্কুলের বিষয়ে কিছু জানতে। বাসে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। একেবারে দক্ষিণ থেকে উত্তরে তো। তাই সময় কিছু বেশী লাগে। কালিঘাট, ভবানীপুর, চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে লালবাজার বাঁয়ে রেখে চিৎপুর ধরে বাস এগুতে লাগল। সরু, ঘিঞ্জি, নোংরা, জল-কাদায় প্যাঁচপেচে চিৎপুর। আজকাল নাম পাল্টে গেছে—রবীন্দ্র সরণি। রবীন্দ্রস্মৃতিময় রবীন্দ্র-ভারতী ডান হাতে। মিনিট কয়েক পরে রাস্তার একই ধারে পড়ল রবীন্দ্র-কানন। ওটা পোষাকী নাম। আটপৌরে নামেই ন্যাড়া মাঠটা সবার পরিচিত, বিডন স্কোয়ার। স্কোয়ার ছাড়াতেই বাঁ হাতে পড়ল ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ও হরি যা ভেবেছিলাম তা নয়। নোংরা চিৎপুর, সরু চিৎপুর, চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই-মার্কা চিৎপুর ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-ঠেলা-টেম্পো ঠাসা চিৎপুর এক নিমিষেই উধাও এই মোড়ে। সামনে আড়া-আড়িভাবে সরু চিৎপুরকে দাবিয়ে রেখে বুকের ওপর দিয়ে যে চওড়া বড় রাস্তা পূবে-পশ্চিমে ছুটে চলেছে তার নাম দেখলাম মোড়ের বড় বাড়িটার গায়ে একফালি টিনের গায়ে লেখা—বি কে পাল অ্যাভিন্যু।

অ্যাভিন্যু-সরণির মোড়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে চোখ ফেরাতেই চোখে পড়ল শ'খানেক গজ দূরে রাস্তার মাঝে ছোট একটি মন্দির। বুঝলাম ঠিকানা ঠিকই আছে। মন্দিরের কাছে যেতে না যেতেই চোখে পড়ল রাস্তার বাঁ ফুটপাথে বোঁচা-নাকি ডবল ডেকারের মত ঝুলবারান্দাহীন চারতলা বাড়িটি। ঢুকবার মুখে এতকলার মাথায় ত্রিভুজের মধ্যে বড় বড় হরফে লেখা আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়, স্থাপিত ১৮৫৯।

নাম মিলেছে, ঠিকানা মিলেছে। কবে স্থাপিত হয়েছে এক নিমেষেই তা জেনে গেছি। কিন্তু কে বা কারা এই মন্দির গড়েছিলেন? কেন গড়েছিলেন? তাই জানতে চাই। আমার জানার ইচ্ছাটুকু আগেই পত্র-মারফৎ জানিয়ে রেখেছিলাম স্কুল কর্তৃ-পক্ষকে। তাই বর্তমান সেক্রেটারী রমেশবাবু একরাশ পুরোনো বই-পত্তর এগিয়ে দিয়ে বললেন—এতেই পাবেন স্কুলের পুরোনো ইতিহাস। হেসে বললাম ইতিহাস জানার

আগে ভূগোল জানতে চাই, নইলে জানাটাই যে ব্যর্থ হবে।

আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় জায়গার নামটুকু শিরোধার্য করেছে। রমেশবাবুর পূর্বতন পুরুষ বলরাম দত্ত আজ থেকে তিনশ বছর আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এখানে এসে বসত গড়ে তুলে-ছিলেন। পুরোনো সুতানটি গ্রামের এই পাড়াটার নাম কালে কালে বাসিন্দাদের বৃত্তি-পরিচয় ধারণ করে সবার পরিচিত হয়েছে। অবাঙ্গালী গোয়ালারাই (আহির) এক সময়ে এই এলাকার বাসিন্দাদের প্রধান অংশ ছিলেন। তাই নাম হয়েছে আহিরী-টোলা। আহিরীটোলার আধুনিক ভূগোলের সীমারেখা রমেশবাবু বুঝিয়ে দিলেন—পশ্চিমে গঙ্গা, পূবে রবীন্দ্র সরণি, উত্তরে বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, দক্ষিণে নিমু গোস্বামী লেন। পনেরো-কুড়ি হাজার নাগরিক এই জায়গাটুকুতে আজ আশ্রয় নিয়েছেন।

স্পেস ও পপুলেশনের দিক থেকে ঢের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এই শহরে আজ দুর্লভ নয়। কিন্তু আহিরীটোলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন কলকাতার বনেদী বাঙ্গালীদের পয়লা নম্বরী পাড়ার অন্যতম আহিরীটোলা বাংলা দেশের শিক্ষার মানচিত্রে আধুনিক যুগের শুরু থেকেই তারকাচিহ্নিত হয়ে আছে।

এই ঐতিহ্যের বনিয়াদ যাঁরা গড়েছেন, তাঁদের মধ্যে বঙ্গ বিদ্যালয় প্রসঙ্গে যাঁর নাম সবার আগে মনে পড়ে তিনি কোন স্বনাম-খ্যাত মানুষ নন। কিন্তু যুগে যুগে নাম, খ্যাতি, যশের চূড়ায় যাঁদের নাম আমরা

আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়

পেয়েছি তাঁদের খ্যাতির সোপান রচনার প্রাথমিক কারিগর ছিলেন আমাদের যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন। সবাই বলত যদুপণ্ডিত। সারা জীবন কেটেছে পড়াশুনা নিয়ে। যে আনন্দ তিনি নিজে পেয়েছেন পুঁথি-পত্রের পাতায়, সে আনন্দ যাতে সবাই পায় তাই তিনি নিজের বাসায় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের ডেকে এনে পড়াতেন। নিমু গোস্বামী লেনে পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি। স্বল্পবিত্ত মানুষটির ছোট্ট বাসায় জায়গা হয় না, কচি-কাচার ঘর তখন উপচে পড়ছে। জায়গার অভাব মেটানোর জন্যই পল্লীবাসীদের শ্বারস্থ হলেন পণ্ডিতমশাই। সবার দানে দরিদ্র পণ্ডিতের ঝুলি ভরে উঠল। ভরা ঝুলি খালি করে যদুপণ্ডিত বর্তমান আহিরী-টোলা স্ট্রীটের উপর ষষ্ঠীতলার সামনে একটা আটচালা তুলে সেখানে নিয়ে এলেন তাঁর পাঠশালা। নভেম্বর, ১৮৫৯ সাল।

যদু পণ্ডিত যখন তাঁর পাঠশালা নিয়ে ব্যস্ত, তার বছর কয়েক আগে আর এক পণ্ডিত জীবনপণ করে নেমেছিলেন যুদ্ধে—দেশব্যাপী অশিক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সেই আজীবন সংগ্রামী পণ্ডিতের নাম আমরা সবাই জানি, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তাঁর বয়সই বা কত, বড়জোর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর কথার দাম না দিয়ে সে যুগে বিদেশী মহামান্যদেরও উপায় ছিল না। ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজে পড়বার সময় ঈশ্বরচন্দ্র দেখেছিলেন শিক্ষার মাধ্যম কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে জ্ঞানী-গুণীদের লড়াই। শেষ পর্যন্ত শিক্ষা কমিটির সভাপতি টমাস বেরিংটন মেকলের পরামর্শে বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রাজাজ্ঞা প্রচার করলেন—এদেশের শিক্ষার বাহন হবে ইংরাজী। পাশ্চাত্যপন্থীরা সেদিন তাঁদের মতের স্বপক্ষে সরকারী অনুমোদন পেয়ে খুশী হলেও কোথায় জানি একটু খোঁচা তাঁদের মনেও থেকে যায়। সেই খোঁচার কথা গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী-মনীষী রাজনারায়ণ বসুর বিখ্যাত মেদিনী-পুরের ভাষণে উল্লিখিত হয়েছে : 'লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের উক্ত বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারিণী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে, তাহাতে বাংগালা ভাষা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এই সময়াবধি ইংরাজি ভাষার প্রতি লোকদিগের আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অনেক স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল; সাধারণ লোকে ইংরাজি শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল; এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশী ভাষা বা একেবারে উৎসেদ দশাপ্রাপ্ত হয়।'

দেশী ভাষার 'উৎসেদ'-এর যেটুকু বাকী ছিল তারও নিকেশ করলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ সালে একটি ঘোষণার মাধ্যমে : সরকারী বিদ্যালয় থেকে যাঁরা পাশ করবে তাঁদের ভেতর থেকেই রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হবে। তখন সরকারী বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের মাধ্যম ছিল ইংরাজী।

হার্ডিঞ্জের ঘোষণার সাত বছর পরে বিদ্যাসাগরকে আমরা পেলাম সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে। সাত বছর ন' মাস বিদ্যাসাগর প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এই সাত বছর ন' মাস বাংলা দেশে শিক্ষা সংস্কার ও প্রসারের ইতিবৃত্তে একটি স্মরণীয় সময়। শিক্ষা-সংস্কারে বিদ্যাসাগরের বহুমুখী অবদানের কথা নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই এখানে। শুধু বলা দরকার যে, এদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের প্রবর্তক তিনিই। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার বনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্য যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই আমাদের, সেকথা এই মহাপুরুষ সেই সর্বইংরেজীময় যুগে অনুভব করেছিলেন। আর অনুভব করেছিলেন বলেই বাংলা শিক্ষার বন্ধ দুয়ার ভেঙে ফেলে ইংরেজী শিক্ষার রাজপথে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন দেশবাসীকে। মূলত তাঁরই পরামর্শে বাংলা দেশের প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে সরকারী শিক্ষানীতির ত্রুটি স্বীকার করে বলেন যে, 'বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না।' জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই যে দেশী পাঠশালাগুলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার হ্যালিডে তা স্বীকার করেন : 'বাংলা দেশে অসংখ্য পাঠশালা আছে। এদেশের ও বিদেশের দুই শ্রেণীর লোকের কাছে অনুসন্ধান করে আমি জেনেছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ যাঁরা সেখানে শিক্ষা দেন তাঁরা অধিকাংশই অতি অযোগ্য ব্যক্তি। এই পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতিসাধন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য সরকার শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের মতে সায় দিতে বাধ্য হন। হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের অসামান্যতা অনুভব করেই তাঁর উপর দক্ষিণ বাংলার মডেল স্কুলগুলো স্থাপনা ও পরিচালনার ভার দেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বাণী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই বিদ্যাসাগর এই মডেল স্কুলগুলি খুলেছিলেন। এসব স্কুলে পঠন-পাঠনের পরিকল্পনাও বিদ্যাসাগরের নিজস্ব। কেবল লিখন-পঠন, গণনা বা সরল অঙ্ক কষার মধ্যে বাংলা শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখতে তিনি চান নি। তিনি চেয়েছিলেন যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে। তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থ-বিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীর-বিজ্ঞান বাংলায় শিক্ষা দেওয়া বিদ্যাসাগর এ সব স্কুলে বাধ্যতামূলক করেন।

গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলা হল, সুপরি-কল্পিত পাঠসূচী অনুযায়ী পড়াশুনাও আরম্ভ হল। কিন্তু বিদ্যাসাগর দায়িত্ব থেকে অবসর নিলেন। কারণ বেশী দিন এই এক-গুঁয়ে মানুষটির একগুঁয়েমি সইবার মত ধৈর্য সেদিন বিদেশী শাসকের ছিল না। তাই হ্যালিডে-পরিকল্পনা রূপায়ণের তিন বছর পরেই বিদ্যাসাগর তাঁর কাজে ইস্তফা দিলেন, ১৮৫৭ সাল।

এর ঠিক দু বছর পরেই যদু পণ্ডিতের পাঠশালা আহিরীটোলা স্ট্রীটে ষষ্ঠীতলার সামনে আটচালায় স্থাপিত হল। বঙ্গভাষার 'উৎসেদ' রদ করে বিদ্যাসাগরী আদর্শে দিশী ভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই পাঠশালা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে যদু পণ্ডিত যে অযোগ্য ছিলেন না তাঁর সবচেয়ে বড় প্রমাণ স্বয়ং বিদ্যাসাগর এই পাঠশালার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজে যে পাঠশালার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, সেখানে যে তাঁরই পরিকল্পিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পঠন-পাঠনের কাজ চলতো, এ অনুমান নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়। কারণ শুধুমাত্র শোভাবর্ধনের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান, বিশেষত স্কুলের সঙ্গে জড়িত থাকার মত মনোভাব সেই অসাধারণ কর্মযোগীর ছিল না, একথা সবারই জানা আছে।

যদু পণ্ডিতের পাঠশালার সমসময়ে আহিরীটোলায় আর একটি পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালাটি চালাতেন পণ্ডিত সুরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাঠশালাটি বসত আহিরীটোলা স্ট্রীটে শম্ভুনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বাড়ির দালানে। সীমিত ক্ষমতায় চালাতে অসমর্থ হয়ে পণ্ডিতমশাই যদু-নাথের শরণ নিলেন। যদুনাথ এক কথায় রাজী। দুই পাঠশালা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে না রয়ে এক হয়ে গেল। একান্নবর্তী পরিবারে লোক বেশী, জায়গা কম। তাই আটচালা ছেড়ে পাঠশালা উঠে এল শম্ভু-বাবুর দরদালানে।

চাল নেই চুলো নেই, জমি নেই বাড়ি নেই পাঠশালার। কিন্তু সুনাম ছিল। গরীব পণ্ডিতের ছাত্ররা তাঁদের মাস্টারমশায়ের সুনাম বরাবর রক্ষা করেছেন। এই সুনাম সেদিন বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছড়িয়ে পড়েছিল গভর্নমেন্টের ঘরেও। তাই

সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন পাঠাতেই সাহায্য মিলল। পাঠশালা সরকারী অনুমোদনের সঙ্গে সরকারী সাহায্য পেয়ে জাতে উঠল।

দেখতে দেখতে কেটে গেল পনেরোটি বছর। ১৮৭৫ সালে বাংলা মধ্য-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া শুরু হওয়ার মুখে মুখে পাঠশালা অনুমতি পেল এই পরীক্ষায় ছেলে পাঠানোর। ক্লাস সিক্সের ছেলেরা এই পরীক্ষায় বসতে পারত। এই অনুমতি পেয়ে পাঠশালা হল 'মধ্য-ছাত্রবৃত্তি বাংগালা পাঠশালা'। আহিরীটোলা বাংলা পাঠশালার ছেলেরা ফি বছর বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাঠশালার মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

কালকেতুর মতই দিন দিন বেড়ে উঠছিল পাঠশালা। কিন্তু জাতীয় স্বভাব যাবে কোথায়? বৃত্তি পরীক্ষায় ছেলে পাঠানোর অনুমতি পাওয়ার পর সাত বছরও গেল না, হঠাৎ ঝগড়ার ঝড় উঠল। স্কুলের শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকায় শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে গিয়ে তৎকালীন এ্যাড হক কমিটির সম্পাদক সুবলচন্দ্র খাঁ তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখছেন : "কয়েক বৎসর এইভাবে চলিবার পর কোন কারণবশতঃ যদু পণ্ডিত মহাশয় এই বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র লইয়া 'আহিরীটোলা বাংলা পাঠশালা' নাম দিয়া একটি পৃথক পাঠশালা স্থাপন করেন। অবশিষ্ট ছাত্র লইয়া 'আহিরীটোলা গভর্নমেণ্ট সংক্রান্ত (এইডেডের অনুবাদ) বঙ্গ বিদ্যালয়' নামে এই বিদ্যালয়টি চলিতে থাকে। সম্ভবতঃ ইহা ১৮৮৩ সাল বা তাহার পূর্ববর্তী ঘটনা।"

ঝগড়ার ফলে স্কুল দু'টুকরো হয়ে গেল। স্কুলের শতবর্ষের ইতিহাসে বহুবার ঝগড়া হয়েছে পরিচালকদের নিজেদের মধ্যে। কিন্তু এত ঝগড়াঝাটির মধ্যেও সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার কথা হল এই যে স্কুল ধ্বংস হয়নি। বরং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে উন্নতির চরম সোপানে। কত সহজেই কথাগুলো লিখে ফেললাম। কিন্তু স্কুল যেদিন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন যাঁরা এর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা কি কোনদিনই ভাবতে পেরেছিলেন যে এই স্কুল একদিন শহর কলকাতার অন্যতম প্রধান স্কুলে পরিণত হবে।

স্কুল যখন দু'টুকরো হল, তখন আহিরীটোলা গভর্নমেণ্ট এইডেড বঙ্গ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন রায়বাহাদুর ডাঃ কানাইলাল দে। ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রমানাথ সাহা, ভোলানাথ চন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র শীল। যদু পণ্ডিতের পর যদি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আর কারুর নাম স্বীকার করতে হয়, তাহলে তাঁরা এই চারজন।

দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর কিছুদিন এই স্কুল গঙ্গানারায়ণ সেনের বাড়িতে বসে। সেনবাবুর বাড়ি থেকেই স্কুল উঠে যায় বৈদ্যনাথ দত্তের বাড়িতে। তখন প্রতিদিনই ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। সেখানেও জায়গা হয় না। পরিচালকরা সেদিন অনুভব করেছিলেন যে, বেদের মত স্কুল কখনো বার বার বাড়ি পাল্টে স্থায়ী হতে পারে না। তাই কানাইবাবুরা বাবুরাম ঘোষ লেনে একটা বাড়ি ভাড়া করে স্কুল উঠিয়ে নিয়ে এলেন। তখন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন পণ্ডিত গুরুনাথ সেনগুপ্ত।

প্রায় দু' যুগেরও বেশী সময় বাবুরাম ঘোষ লেনের ভাড়াবাড়িতে স্কুল বসেছে। এ-সময়ের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটেছে স্কুলের জীবনে। প্রথম বড় ঘটনা হল বিদ্যাসাগরের মৃত্যু (২৯ জুলাই, ১৮৯১)। শুরু থেকেই বিদ্যাসাগর এই স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। বিশাল বটের ছায়ায় থেকে স্কুল, শত তুচ্ছ আভ্যন্তরীণ ঝগড়া সত্ত্বেও এক জায়গায় নিশ্চিত ছিল যে, চরম বিপদে আশ্রয়ের অভাব হবে না। এবার সেই নিশ্চিত আশ্রয়টুকু হারিয়ে গেল। কিন্তু স্কুলের পরম সৌভাগ্য, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর স্কুল যাঁকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসাবে পেল, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর থেকে গত শতাব্দীর শেষপর্যন্ত মহেশচন্দ্র সভাপতি হিসাবে স্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শেষ বয়সে বাইরের কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তিনি স্বেচ্ছায় সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন।

মহেশচন্দ্রের অবসর গ্রহণের সময়েই স্কুল তাঁর অন্যতম শুভানুধ্যায়ীকে চিরকালের মত হারাল। আশীর যুগের গোড়া থেকে প্রায় ষোল বছর একটানা সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করার পর হঠাৎ রথের চাকা গেল থেমে। রায়বাহাদুর কানাইলাল দে মারা গেলেন ১৮৯৯ সালে।

ঐ বছরই মিডল ভার্ণাকুলার স্কুল অনুমতি পেয়ে হল মিডল ইংলিশ স্কুল। পরবর্তী কয়েক বছর এই স্কুলের ছেলেরা বাংলা মধ্য-ছাত্রবৃত্তি ও ইংরেজী মধ্য-ছাত্রবৃত্তি দুটি পরীক্ষায় বসেছে আলাদা আলাদাভাবে।

১৮৮৩ থেকে ১৮৯৯ এই সতেরো বছরে মোট আশীটি ছেলে এই স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়। এর মধ্যে ফেলের সংখ্যা ষোল ও স্কলারশিপের সংখ্যা সাতাশ। শুধু সংখ্যায় এই স্কুলের তৎকালীন প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার আসল রূপটি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। আসল সত্য হল এই যে স্থানীয় হাইস্কুলগুলির চোখে এই মিডল ভার্ণাকুলার স্কুলটি যথেষ্ট মর্যাদার আসনেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মর্যাদার ছবিটি ফুটে উঠেছে এই একটি সেনটেন্সে : "এই বিদ্যালয় হইতে যে সমস্ত ছাত্র মধ্য-বাঙ্গালা ও মধ্য-ইংরেজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদিগকে ডাফ কলেজের ও রিপন কলেজের অধ্যক্ষগণ অনুগ্রহপূর্বক বিনা বেতনে এনট্রান্স পর্যন্ত তাঁহাদিগের স্ব স্ব স্কুলে পাঠ করিতে দিবেন।"

উপরের লাইন ক'টি পেয়েছি এই স্কুলেরই ১৯০০ সালের অ্যানুয়াল রিপোর্টে। বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করতে গিয়ে তৎকালীন সম্পাদক বলাইচন্দ্র সেন ঐ ক'টি লাইন রিপোর্টের শেষে জুড়ে দেন। বলাইবাবু কানাইলাল দে-র উত্তরসূরী। অবিশ্যি যথাযথভাবে বলতে গেলে বলা উচিত উনি কালীকৃষ্ণ দে-র পরবর্তী সেক্রেটারী। কারণ কানাইবাবুর মৃত্যুর পর কালীবাবু স্কুলের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র বাইশ দিন তিনি সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে বলাইবাবু স্কুলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন।

কানাইবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় গড়ে ওঠা স্কুল কালীবাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে যে অনিশ্চিত অস্তিত্বের সম্মুখীন হয় তার হাত থেকে স্কুলকে শুধু রক্ষা করা নয়, স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা ও উন্নতিশীল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সবটুকু কৃতিত্ব প্রাপ্য এই মানুষটির। দায়িত্ব পাওয়ার মুখে মুখেই স্কুল এক নিদারুণ সংকটে পড়ে। সেই সংকটের বিবরণ ও তার থেকে উদ্ধারের কথা বলাইবাবুর নিজের জবানীতেই শোনা যাক। ১৯০০ সালের অ্যানুয়াল রিপোর্টে তিনি লিখছেন : "গত জুন মাস হইতে এই বিদ্যালয়ের কয়েকজন মেম্বর কতিপয় পণ্ডিতের সহিত যোগ দিয়া অসঙ্গত কারণে বুদ্ধিভ্রান্ত হইয়া একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এই বিদ্যালয়ের বিশেষ অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।"

আসল ব্যাপার কানাইবাবু, গোবিন্দবাবু, কালীবাবু অর্থাৎ যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরা পর পর এ-সময় মারা যান। স্কুল কমিটির নতুন মেম্বারদের নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু হয়। এবং উপরোক্ত "কয়েকজন মেম্বর" স্কুলের তৎকালীন হেডমাস্টার পণ্ডিত গুরুনাথ সেনগুপ্তকে নিয়ে 'আহিরীটোলা আদি বঙ্গ বিদ্যালয়' নামে

একটি নতুন স্কুল খুলেছিলেন। নতুন স্কুলের নামকরণের মধ্যে একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা হল আদি হোক আর নতুন হোক আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় নামটির একটি ম্যাজিক ছিল। যে নামে ছাত্র, গার্জেনরা আকৃষ্ট হতেন ও শহরের নামী হাইস্কুলগুলিতে বিনা বেতনে এনট্রান্স পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ মিলত। তাই আলাদা হয়েও প্রতিপক্ষ সেদিন পুরোনো নামটি ছাড়তে রাজী হননি।

যাই হোক, নতুন স্কুলের অস্তিত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তিন বছর পরেই বলাইবাবু স্কুলের অ্যানুয়াল রিপোর্টে লিখছেন : "...চালাইবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হওয়াতে উক্ত নূতন বঙ্গ বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। ...যাহা হউক এই বিদ্যালয় (নিজের স্কুল সম্পর্কে বলছেন) নানা কারণে উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।"

যদি প্রশ্ন করা যায় ঐ সময় এই স্কুল কতটুকু 'উন্নতি লাভ করিয়াছে বা করিতেছিল'? এর উত্তর মিলবে স্কুলের ইতিহাসে। সেই ইতিহাস বর্ণনা শেষ থেকেই শুরু করা যাক। ১৯২০ সালের স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়তে গিয়ে দেখি একটা কালো বর্ডার দেওয়া চতুষ্কোণের মধ্যে লেখা হয়েছে : "আমরা গভীর শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২৪-এ জানুয়ারী ১৯২১ সাল, বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারী ডাক্তার বলাইচন্দ্র সেন, এল-এম-এস মহোদয় অশীতিবর্ষ বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় বাইশ বৎসর কাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট ছিলেন।"

কিভাবে সচেষ্ট ছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পেশ করলাম। দায়িত্বভার পেয়ে যে বিপদের সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন, উত্তরসুরীদের যাতে কোনদিনও অমন বিপদের মুখোমুখি হতে না হয়, তাই বলাইবাবু স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে স্কুলটি রেজিস্ট্রি করান। এই রেজিস্ট্রেশনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল যাতে স্কুল ভাঙা-গড়ার খেলা চিরদিনের মত বন্ধ হয়। আর কেউ কোনদিন স্কুল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সাহসী না হয়।

রেজিস্ট্রেশনের অনেক আগেই আর একটি কাজ তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালের মে মাসে স্কুলের নিজস্ব জমি ও বাড়ির জন্য বলাইবাবু বিল্ডিং ফাণ্ড খোলেন। স্কুলের নিজস্ব জমি-বাড়ি না থাকলে কি হয়, সে-কাহিনী আমরা হেয়ার স্কুলের ইতিহাসেই পেয়েছি। যে-বাড়িতে শুরু থেকে প্রায় কুড়ি বছর হেয়ার স্কুল বসেছে, হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর বাড়িওয়ালা এক নোটিশে স্কুলকে বাস্তুহারা করেছিল। তাঁর স্কুল যাতে ভবিষ্যতে কোনদিনও অমন অবস্থার সম্মুখীন না হয়, তাই বলাইবাবু স্কুলের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার আয়োজনে উঠে-পড়ে লাগলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে ফলবতী করতে সেদিন যাঁরা সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের সকলের নামের তালিকা দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই। তবু বলা দরকার যে বলাইবাবু স্কুলের জন্য বিল্ডিং ফাণ্ড খুলেছেন "এই সংবাদ প্রচারিত হইলে এই পল্লীস্থ বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দে মহাশয় ১০০০ এক হাজার টাকা ও শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দাস মহাশয় ১০০ এক শত টাকা দান করিয়া বিদ্যালয়ের স্থায়ী উন্নতি-সাধনকল্পে অগ্রসর হইয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।"

বিল্ডিং ফাণ্ড গঠনের উনিশ বছর পর বলাইবাবু যখন মারা গেলেন, তখন দেখা গেল স্কুলের বিল্ডিং ফাণ্ডে ততদিনে জমা পড়েছে আঠারো হাজার চারশো ছিয়াত্তর টাকা দু' আনা তিন পাই।

এত গেল জমি-বাড়ির কথা। ঐ বাইশ বছরে স্কুলের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে? বর্তমান শতাব্দীর সূচনা বর্ষে আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের ফলে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা শোচনীয়ভাবে কমে গিয়েছিল। বড় জোর শ'খানেক ছাত্র তখন পড়ত এই স্কুলে। বিদায় বর্ষে বলাইবাবু নিশ্চয়ই দেখে তৃপ্তি পেয়েছিলেন যে তাঁর স্কুল জমজম করছে—প্রায় তিনশো ছেলে তখন পড়ে এই স্কুলে। তিনশো সংখ্যাটি বর্তমানের যে-কোন সাধারণ স্কুলের ছাত্রসংখ্যার পাশে অত্যন্ত কম বলে মনে হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এটি ছিল একটি মাইনর স্কুল। এখানে ছেলেরা একটানা ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়বার সুযোগ পেত না। তবু স্কুলের সুনামের জনাই গার্জেনরা ব্রেক-জার্নির অসুবিধাটুকু অগ্রাহ্য করেই ছাত্রদের পড়তে পাঠাতেন এই স্কুলে।

কেন পাঠাতেন? তার কারণ মিলবে গুটিকয়েক সংখ্যাতত্ত্বে। উনিশশো চার থেকে উনিশ, এই ষোল বছরে মোট বত্রিশটি ছেলে এই স্কুল থেকে মিডল স্কলারশিপ পরীক্ষা দেয়; মোট ষোলটি ছেলে পায় স্কলারশিপ। এ-সময়ে স্কুলের পঠন-পাঠনের সুনাম ও ঐতিহ্যের বিবরণ শোনা যাক জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের জবানীতে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির টিচার্স ট্রেনিং বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল কে কে মুখার্জি ছেলেবেলায় এখানে পড়েছিলেন। স্কুলের শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে তিনি বলছেন : "ইংরাজী ১৯১৫-১৬ সালের কথা বলছি। ...স্কুলটি অবস্থিত ছিল ৪৯, শঙ্কর হালদার লেনের একটি ছোট্ট বাড়ীতে। (বলাইবাবুর আমলে স্কুল বাবুরাম ঘোষ লেন থেকে এই নতুন ঠিকানায় উঠে আসে। ষষ্ঠীতলার উল্টোদিকে শঙ্কর হালদার লেন।) আমার বয়স তখন মাত্র ছয়-সাত।

...স্কুলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলি। প্রথমেই মনে পড়ে—স্বর্গীয় কানাইবাবুর (কানাইলাল সাহা) কথা। তিনি আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশের সেকালের বড় বড় নাম-করা শিক্ষকের কথা উঠলেই আমরা রাগবি পাবলিক স্কুলের ডাঃ আর্ণল্ড কিম্বা আপিংহামের এডওয়ার্ড থ্রিং, এঁদের নাম করে থাকি। কিন্তু আমি বলি—আমাদের দেশে অন্তত ক্লাসে শিষ্টাচার ও শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে আমাদের কানাইবাবুর মতো শিক্ষক ওঁদের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিলেন না।

"মনে পড়ে সাধুবাবুর (সাধুচরণ বাছাড়) কথা। সাধুবাবু আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। সে কি প্রাণস্পর্শী হৃদয়-গ্রাহী শিক্ষা-প্রণালী। পাঠ্যবিষয়গুলিকে যেন গুলে খাইয়ে দিতেন। যে সকল ছড়া, যে সকল কবিতা ঐ বয়সে সাধুবাবু আমাদের মুখস্থ ও আবৃত্তি করিয়েছিলেন, আজও আমার অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। আবৃত্তি শেখার পক্ষে ছেলেবেলাই বোধহয় প্রকৃষ্ট সময়। আজকাল বি টি ক্লাসে নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান পদ্ধতি মাস্টারমশাইকে শেখাতে গিয়ে আমরা মুখস্থ বা আবৃত্তির দিকে ততটা বেশী জোর দিই না।...আমার বিশ্বাস,—না বুঝলেও অনেক ক্ষেত্রে মুখস্থ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।...এইখানে বলে রাখি যে, আমাদের সাধুবাবু মাথায় লম্বা লম্বা কোঁকড়ান চুল রাখতেন মুনি-ঋষির মত।

"সত্যই বঙ্গ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই সাধু ছিলেন। পড়ানোই এবং পড়াই যেন তাঁদের জীবনের ব্রত ছিল। কাজেই, সেকালে আমাদের স্কুল কলকাতার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। ...মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হলেও নামে, কার্যকলাপে, শিক্ষা বিস্তারে হাই স্কুলের সমকক্ষ ছিল।"

প্রাক্তন ছাত্র তাঁর ছেলেবেলার স্কুল সম্পর্কে যা বলছেন তার প্রতিটি কথাই যে সত্য, আবেগ-উচ্ছ্বাস নয়, সে প্রমাণ পাই স্কুলের অ্যানুয়াল রিপোর্টে। ১৯২০ সালের অ্যানুয়াল রিপোর্টে সেক্রেটারী পূর্ণচন্দ্র সেন বলছেন যে, "অত্রত্য সমাপিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগকে শিক্ষা-বিভাগের পূর্বনিয়মানুযায়ী ফ্রি-শিপ দিবার জন্য তাঁহারা স্কটিশ চার্চেস কলেজিয়েট স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, কুমার রাধাপ্রসাদ ইনস্টিটিউশন, সরস্বতী ইনস্টিটিউশন, এরিয়ান ইনস্টিটিউশন ও জোড়াসাঁকো হাইস্কুলে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবার সানুগ্রহ অনুমতি তত্রত্য কর্তৃপক্ষগণের নিকট পাইয়াছেন।" শুধু তাই নয় এখানকার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা হিন্দু ও হেয়ার স্কুলেও পড়তেন। ১৯২২ সালের অ্যানুয়াল রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হচ্ছে, 'আলোচ্য বর্ষে মধ্য-ইংরাজী-বৃত্তি-পরীক্ষার্থ এই বিদ্যালয় হইতে শ্রীমান প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র নির্বাচিত হইয়া উক্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে। এবং মাসিক ৪ টাকা বৃত্তিসহকারে বিনা বেতনে হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। আমরা

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, উক্ত বালক ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শনপূর্বক প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে।'

বলাইবাবু বাইশ বছরে স্কুলের জন্য যা করেছেন সংক্ষেপে তার ইতিহাস বর্ণনা শেষ করবার আগে তার একটি কথা বলা দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েই তিনি স্কুলের মাস্টারমশাইদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড খোলার ব্যবস্থা করে যান। তাঁর দূরদর্শিতার অমূল্য দিকচিহ্ন হিসাবে এই কীর্তিটি নিশ্চয়ই বর্তমানের শিক্ষকগণ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার করবেন।

বলাইবাবু বাইশ বছরে যা করে গেছেন, তারই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন পূর্ণবাবু পরবর্তী বারো বছরে। অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র সেন একলব্য-সাধনায় পূর্বসূরী নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়ে স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি করে গেছেন। তাঁর আমলে স্কুলের সুনাম আরো বেড়েছে। বেড়েছে ছাত্র সংখ্যা। বিল্ডিং ফাণ্ডে জমা পড়েছে আরো প্রায় এগারো হাজার টাকা। কিন্তু তিনিও স্কুলের নিজস্ব জমি বা বাড়ি করে দিয়ে যেতে পারেন নি। বিদায়বর্ষে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্কুলের অ্যানুয়াল রিপোর্টে তিনি লিখে গেছেন ঃ 'বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে যদিও এই বিদ্যালয় কলিকাতা নগরীর অতি-প্রাচীন বঙ্গ বিদ্যালয় এবং তিয়াত্তর বৎসর কাল এখানে অনেক কৃতবিদ্য, ধনী, যশস্বী ও মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তথাচ ইহার নিজস্ব বাটী নাই; এযাবৎ ভাড়া বাটীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ আধুনা প্রবর্তিত নূতন ও উন্নত প্রণালীতে শিক্ষাদান ভাড়াবাড়ীতে প্রায় অসম্ভব। বালকদিগের স্বাস্থ্যের জন্য প্রশস্ত বাটী নিতান্ত আবশ্যক।'

পূর্ণবাবু 'আধুনা প্রবর্তিত নূতন ও উন্নত প্রণালীতে শিক্ষাদানের' যে কথা বলেছেন তাহল এই যে, বিশের যুগের সূচনা থেকে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, ড্রইং ইত্যাদি ছাড়াও দেহতত্ত্ব, খাদ্য ও পানীয়তত্ত্ব এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করানো শুরু হয়। এই সময় থেকেই স্কুলে স্কুলে ছেলেদের ড্রিল করানো আরম্ভ হয়। ড্রিল আবশ্যিক হওয়ায় বঙ্গ বিদ্যালয়ে ড্রিলের পাশাপাশি খেলাধুলোর বিভাগ খোলা হয়। এ কাজটি পূর্ণবাবুই করে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী তিনি এ স্কুলেরই শিক্ষক, যামিনীরঞ্জন বিশ্বাস। আই-এ পাশ করে বিশ্বাসমশাই বাইশ সালে এই স্কুলের চাকরীতে ঢুকেছিলেন। পরের বছর থেকেই যামিনীবাবু স্কুলের সেক্রেটারী, অন্যান্য মাস্টারমশাই ও প্রাক্তন ছাত্রদের সাহায্যে 'আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় ক্রীড়া সমিতি' স্থাপন করেন। রোজ বিকেলে ছেলেদের নিয়ে হা-ডু-ডু ও বিভিন্ন দিশী খেলার আয়োজন করে সমিতি। শীতকালে ব্যাডমিন্টন খেলা হত। তবে হা-ডু-ডু'র কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার। কারণ কলকাতার অন্য কোন স্কুলে এই খেলা হত কিনা জানি না, তবে বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছেলেদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা হা-ডু-ডু। এই স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষক নবকুঞ্জ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত 'নবকুঞ্জ মেমোরিয়াল হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা' নিয়মিত আজও অনুষ্ঠিত হয়।

বলাইবাবু, পূর্ণবাবু যা করে যেতে পারেন নি এবং পারেন নি বলে যে আক্ষেপ নিয়েই তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, বঙ্গ বিদ্যালয়ের উনাশী বছরের পুরোনো সেই ক্ষোভ মিটেছে ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর মুখে। তখন স্কুলের সেক্রেটারী এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ মাণিকচন্দ্র চন্দ্র। পঁয়ত্রিশ সাল থেকে একটানা উনিশ বছর সেক্রেটারী হিসাবে মাণিকবাবু স্কুলের সেবা করেছেন। পূর্ণবাবুর বিদায় ও মাণিকবাবুর প্রবেশের মাঝে একটি বছর স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন চণ্ডীচরণ চন্দ্র। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় চণ্ডীচরণ সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন ও তাঁরই জায়গায় প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক মাণিকবাবু সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন।

পঁয়ত্রিশ সালে মাণিকবাবু সম্পাদক হলেন, ছত্রিশে স্কুল প্রায় আড়াই যুগের পুরোনো ঠিকানা শঙ্কর হালদার লেন ছেড়ে নাথেরবাগানে ৩এ সেন লেনে উঠে আসে। কারণ ঠিক এই সময়ে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গ্রে স্ট্রীট ডায়গোনাল নামে নতুন একটা চওড়া রাস্তা বানাবার জন্য দু পাশের জমি বাড়ি দখল করছিল। শঙ্কর হালদার লেনের বঙ্গ বিদ্যালয়ের পুরোনো ভাড়া বাড়ি রোড রোলারের তলায় চাপা পড়ে গেল।

ছত্রিশ সালে যখন সেন লেনে স্কুল উঠে যায় তখনো কি কেউ ভাবতে পেরেছিলেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই বলাইবাবু, পূর্ণবাবুর স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে? বোধহয় পারেন নি। পারেন নি স্বয়ং সম্পাদকমশাইও। কারণ এই বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্টে তিনি বলছেন ঃ এই বাটী আমরা মাত্র তিন বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়াছি। ইহা অবধারিত সত্য যে উক্ত প্রশস্ত রাজপথ সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হইবার অতি অল্প সময় পরেই আরও কতিপয় নূতন পথ প্রশস্ত হইবে; তাহার জন্য এই বর্তমান বিদ্যালয় বাটীও গৃহীত হইবে। যদি ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনাদের অর্থ সাহায্যে আমরা ইতিমধ্যে নিজস্ব বাটী করিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে বৎসরান্তে পুনরায় অপর এক বাটীতে বিদ্যালয়কে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।'

কথা রেখেছিলেন মাণিকবাবু। ঠিক তিন বছরের মাথায়-মাথায় ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন ডায়গোনাল রাস্তায় প্রতি কাঠা পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে সাড়ে সাতাশ হাজার টাকায় সাড়ে পাঁচ কাঠা জায়গা স্কুল কিনে ফেলল। রাস্তার নাম ডায়গোনাল—কেমন গোল পাকাচ্ছে না? যতই গোল বাধাক বটকৃষ্ণ পালের নামে পরিচিত বি কে পাল অ্যাভিন্যুর আদিতে ঐ নামই ছিল।

বি কে পাল অ্যাভিন্যুতে স্কুলের নিজস্ব জায়গা হল। এবার বাড়ি তুলতে হবে। তার জন্য তখনকার দিনেই প্রয়োজন ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা। কিন্তু বিল্ডিং ফাণ্ডে ছিল মোটে চল্লিশ হাজার টাকা। তারও প্রায় বারো আনা চলে গেছে জমি কিনতে। তবু পেছপা হন নি মাণিকবাবু। দশ হাজার টাকা ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। দু বছরের মধ্যেই স্কুলের নিজস্ব বাড়ি উঠল। সেন লেনের বাড়ি ছেড়ে যদু পণ্ডিতের পাঠশালা, কানাই দে, বলাই সেন, পূর্ণ সেনের বঙ্গ বিদ্যালয় বি কে পাল অ্যাভিন্যুর উপর সদ্য-গড়ে তোলা নিজস্ব তিনতলা বাড়িতে উঠে এল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জমে উঠেছে।

ঠিকানা বদলে স্কুলের রেজাল্ট রেকর্ডে কখনো চিড় ধরে নি। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলনের বছরে এই স্কুলের ছাত্র সোমনাথ শীল মধ্য-ইংরাজী বৃত্তি পরীক্ষায় গোটা কলকাতার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সেকেণ্ড হয়েছিলেন। পরের বছর অরুণচন্দ্র মল্লিক পেলেন থার্ড প্লেস। আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে কলকাতার অন্যতম সেরা এম-ই স্কুল ছিল আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়।

এই সেরা স্কুলের বনেদ যাঁরা গড়ে গেছেন তাঁরা কেউ কোনদিন একটি পয়সাও পান নি স্কুলের কাছ থেকে। পুরোপুরি অবৈতনিক কাজে নিজেদের সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলাইবাবু, পূর্ণবাবু, মাণিকবাবুরা। অবৈতনিক শব্দটির উপর একটু জোর দিয়ে ফেললাম। কেন? একটু পরেই তার কারণ বলব।

তার আগে মাণিকবাবু সম্পর্কে আরো দু-একটি কথা বলা দরকার।

দশ হাজার টাকা লোন করে স্কুলের বাড়ি উঠেছে। এই লোন তাড়াতাড়ি শোধ না হলে সুদের দায়ে স্কুলের বসত ভিটা বিকিয়ে যাবে একথা মাণিকবাবু জানতেন। এই ঋণ শোধ করা স্কুলের তখন ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু যাঁদের জীবন গড়েছে এই স্কুল তাঁদের সমবেত চেষ্টায় কি কোনদিনই এই ঋণ শোধ হবে না? হবে বলেই বিশ্বাস করতেন মাণিকবাবু। তাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের আহ্বান জানালেন রি-ইউনিয়নে। চুরাশী বছরের পুরোনো স্কুলের রি-ইউনিয়নে সভাপতিত্ব করতে এলেন পঁচাশী বছর বয়স্ক প্রাক্তন ছাত্র নরনারায়ণ চন্দ্র। গড়ে উঠল বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সম্মিলনী।

যে আশা নিয়ে মাণিকবাবু এই শম্ভুজননী গড়ে তুলেছিলেন, তা যে ব্যর্থ হয় নি স্কুলের পরবর্তী ইতিহাসই তার স্বাক্ষর। ঋণ শেষ হওয়ার আগেই স্কুল সব ঋণ মিটিয়ে ফেলে। ঋণ মিটিয়েই ক্ষান্ত হন নি মাণিকবাবু পাছে ভবিষ্যতে কোন আকস্মিক বিপর্যয়ে স্কুলের কোন ক্ষতি হয় তাই ম্যানেজিং কমিটিকে দিয়ে দশ হাজার টাকার একটা স্থায়ী বিল্ডিং ফাণ্ডের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। ফাণ্ডে গোড়ায় জমা পড়েছিল সাড়ে তিন হাজার টাকা।

মাণিকবাবু যে ফাণ্ড গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই টাকায় এতদিন পরে স্কুলের চারতলা উঠেছে। কিন্তু মাণিকবাবু আজ আর স্কুলে নেই। তাঁকেও পূর্বসূরীর মত বিদায় নিতে হয়েছে। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বোধহয় খুব স্বাধীনচেতা জবরদস্ত লোক পছন্দ করেন না। তার প্রমাণ এদেশের ইতিহাসে বিস্তর আছে। বিদ্যাসাগরকেও একদিন চাকরী ছাড়তে হয়েছিল। মাণিকবাবুর আগে চণ্ডীবাবুকেও সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিতে হয়। কারণ সেই একই—এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মর্জি। তবে সেটা ছিল পরাধীনতার কাল। মাণিকবাবুকে বিদায় করেছে স্বাধীন দেশের নব্য-শিক্ষা-কর্ণধাররা।

স্বাধীনতার পর সরকারী আদেশ পাঠান হল সব স্কুলে যে, নিম্ন প্রাইমারী পঠন-পাঠন এবার থেকে মাতৃভাষায় হবে। বঙ্গ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সার্কুলারটিকে শিক্ষার পরিপন্থী মনে করেন। তবু তাঁরা এ বিষয়ে ডিসট্রিক্ট ইনসপেকটরের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সামান্য একটা মাইনর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির এই ঔদ্ধত্য সেদিন ইনসপেক্টর বাহাদুরের সহ্য হয় নি। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সেদিন ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে সভায় বসতে রাজী হন নি।

এর পরেই শুরু হয়ে গেল উৎপাত। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। আর স্কুলের ব্যাপারে অধুনা বোর্ডকে চটালে বাহাত্তর ঘা অবশ্যম্ভাবী। সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফল হিসাবেই স্বাধীনতার ছ বছরের মধ্যেই মাণিকবাবুকে বিদায় নিতে হল। পুরোনো কমিটি বাতিল করে শিক্ষা বিভাগ নিয়োগ করলেন এ্যাড-হক কমিটি। উনিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবার বিনিময়ে পুরস্কার হিসাবে মাণিকবাবুর প্রাপ্য হল সরকারী ঘাড়ধাক্কা। এ অপমান তিনি নীরবে হজম করেন নি। তাই শুরু হয়ে গেল মামলা-মকদ্দমা। পুরোনো কমিটি ভার্সাস এ্যাডহক কমিটি।

চার বছর চলেছে এই মামলা। কোন নিষ্পত্তি হয় নি। শেষ পর্যন্ত আপোষে মীমাংসা হল।

এর মধ্যে স্কুলের চেহারা গেছে অনেক পাল্টে। সাতান্ন সালে মাইনর স্কুল হল একসটেনডেড এম-ই স্কুল। দু বছর পরেই যদু পণ্ডিতের পাঠশালার শতবার্ষিকী উদযাপিত হল। শতবর্ষ প্রাচীন এই বিদ্যালয় বাংলা দেশকে অজস্র কৃতী ছাত্র উপহার দিয়েছে। সেই বিস্তৃত তালিকা থেকে কয়েকটি মাত্র নাম এখানে তুলে ধরছি—স্বামী অভেদানন্দ, জানকীনাথ ভট্টাচার্য, আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মেজর পি কে বর্ধন, স্যার হরিশঙ্কর পাল, জাস্টিস ইউ সি লাহা, প্রিন্সিপ্যাল কে কে মুখার্জি।

উৎসবের আলোকসজ্জা নির্বাপিত হওয়ার আগেই শতবর্ষ প্রাচীন স্কুলের অত্যন্ত পুরাতন একটি প্রথার অবসান হল। এ্যাডহক কমিটি বাতিল করে বোর্ড স্কুলের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করল। প্রায় সাত বছর এই স্কুল ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অধীনে। এই সাত বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে স্কুলের। প্রথমে একসটেনডেড এম-ই স্কুল, হাইস্কুলের পারমিশন পায়। গত পঁয়ষট্টি সালে এই স্কুলের ছেলেরা প্রথম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। এর ঠিক দু বছর পরেই আপগ্রেডিংয়ের সুযোগ পেয়ে বঙ্গবিদ্যালয় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত হল। ঐ বছরই আবার নির্বাচনের মাধ্যমে স্কুলের নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়।

শুধু হিউম্যানিটিজ স্ট্রীম নিয়ে শুরু হয়েছিল হায়ার সেকেণ্ডারী সেকসন। গত বছর সায়েন্স স্ট্রীম খোলা হয়েছে। এ বছর থেকে বাণিজ্য শাখা খোলা হল।

সবই হয়েছে। একশো দশ বছরে পাঠশালা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত হয়েছে। আটাশ বছরের পুরোনো তিনতলা বাড়ি হয়েছে চারতলা। মাইনর স্কুলে পড়াতেন আটজন শিক্ষক আর আজ প্রাইমারী সেকেণ্ডারী মিলিয়ে শিক্ষক সংখ্যা প্রায় কুড়ি। সত্তর বছর আগে যে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল মোটে একশ আজ সেখানে পড়ছে সোয়া ছ'শ ছাত্র। সত্তর বছর আগে বছরে পৌনে তিন হাজার টাকায় স্কুলের খরচ-খরচা মিটত আর আজ শুধু ক্লাস ফোর পর্যন্ত প্রাইমারীরই বাৎসরিক খরচ প্রায় আঠারো হাজার টাকা। সেকেণ্ডারীর খরচ প্রাইমারীর প্রায় ডবল।

পুরোনো কাগজপত্র ইত্যাদি ঘাঁটা সারা হলে রমেশবাবুকে প্রশ্ন করলাম—অতীতের তুলনায় বর্তমানের এই বিপুল ব্যয় মিটছে কি ভাবে? বছরে সরকারী সাহায্যের বরাদ্দ কত? একটু হাসলেন রমেশবাবু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন বছরে বারো হাজার টাকা পর্যন্ত লাম্প গ্রান্ট হিসাবে সরকারী সাহায্য আমরা পেতে পারি। পুরো বরাদ্দ কখনো পাই নি। ছেষট্টিতে পেয়েছিলাম মাত্র আড়াই হাজার টাকা। স্কুলের খরচ প্রধানত আসে ছেলেদের মাইনে থেকে ও কিছু আসে ডোনেশন থেকে। বোর্ড আমাদের ওপর চটা তাই আমাদের আবেদনে ওরা সাড়া দেন না।

কেন? — রমেশবাবুর শেষ কথাগুলোয় চমকে উঠেছিলাম। জবাব এল : গত বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্টের এক জায়গায় লিখেছিলাম 'বেতনপ্রাপ্ত কাজ থেকে উৎসর্গীকৃত কাজের মূল্য অনেক বেশী'। কেন লিখব না বলুন? সাত বছর যিনি স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে কাজ করেছেন তিনিই ছিলেন কলকাতার ডিসট্রিকট ইনসপেকটর অব স্কুলস। আমরা ভার পেয়ে দেখি মাস্টারমশাইরা কুড়ি মাসের মাইনে পান নি। এ স্কুল এক-দু বছরের নয়, একশো বছরেরও বেশী পুরোনো। অতীতের পরিচালকরা সবাই অবৈতনিক ছিলেন। কৈ তাদের সময়ে মাস্টারমশাইরা কখনো এভাবে টরচারড হয়েছেন বলে তো শুনি নি। স্পষ্ট কথা খোলাখুলিভাবে লিখেছিলাম বলেই ওদের এত গোসা। স্কুলের আপগ্রেডিংয়ের সময় বিল্ডিং বা অ্যাপারেটাসের জন্য একটা পয়সাও দেয় নি বরং নানাভাবে আমাদের হ্যারাস করছে।

কি রকম? কিভাবে আপনাদের হ্যারাস করছে বোর্ড? জিজ্ঞাসা করলাম আমি। প্রশ্নের জবাবে তরুণ সম্পাদকের গলার স্বর ঈষৎ উত্তেজিত মনে হল : টিচারদের অ্যাপ্রুভাল সময় মত আসে না। বছর কেটে যায় ডিয়ারনেসের টাকা আদায় করতে। শুধু তাই নয় ম্যানেজিং কমিটির ডিসিশনের উপর ওরা নিজেদের মত চাপিয়ে দিতে চান। এতে কি স্কুলের কখনো ভাল হতে পারে? শিক্ষকদের বঞ্চিত করে, তাঁদের উপোসী রেখে ওরা কিভাবে শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখবেন জানি না, তবে আমরা মনে করি এতে স্কুলের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। তবে যত বাধাই ওরা দিন না কেন, সব আমরা মোকাবিলা করব। কারণ আমরা চাই এই স্কুল বড় হোক, আরো বড়। আমাদের ইচ্ছা আছে এখানে একটা কলেজ খোলার। পাশের ঐ যে জায়গাটা দেখছেন, ওটা আমরা কিনতে চাই। ছ কাঠা জায়গা আছে। ওটা পেলে স্কুলও হাত-পা ছড়িয়ে বাড়তে পারবে। এখানে একটা নাইট কলেজও আমরা খুলতে পারব।

সুতানটি থেকে বাসে ফিরতে ফিরতে রমেশবাবুর কথাগুলোই বারবার মনে পড়ছিল—আমরা চাই এই স্কুল বড় হোক। আরো বড়। আমরা এখানে একটা কলেজ খুলব। হে ঈশ্বর তাই যেন হয়। যদু পণ্ডিতের পাঠশালা অনেক বড় হয়েছে। যেন আরো বড় হয়। একদিন যেন এখানে আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছেলেরা কলেজে পড়বার সুযোগ পায়।

—সন্দীপন

পরবর্তী সংখ্যায়
সেন্ট পলস্ স্কুল

অলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[গ্রাম চেনবার নেশা ছিল বিকাশের। শহুরে যুবক প্রমোশন নিয়েই এল তাই পাড়াগাঁর ব্যাঙ্কে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্ককাকার বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। বিস্ময়ের আশ্রয়। মনীষা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত মনীষার, দ্বিতীয় উপস্থিতি।

চারদিকে টানাপোড়েন। চোরাবালি। ক্ষোভে-ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছে সবাই। মূল্যবোধও বিপর্যস্ত। ঘুনেপোকা।

গ্রাম্য রাজনীতির বীভৎসতা।

সোনালির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ। বিকাশের চোখেও সে যেন দেখতে পেল নির্ভরতার আলো। অথচ মনীষা তার অস্তিত্ব জুড়ে।

সে পালাও ফুরলো। মনীষা হারিয়ে যেতে চাইল।

একা।

বিকাশ বিপর্যস্ত। অফিসেও অশান্তি। একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে শেষে তুলকালাম। বিকাশের ক্ষমা প্রার্থনা। বিষিয়ে রইল মন। শূন্যতার খাঁচায় বন্দী। ফিরল অফিস থেকে। সোনালির মুখোমুখি।

শশাঙ্ক নিয়োগীর আসল চেহারাটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুনুর কাছেই জানা গেল তার ছোটমাসীর আত্মহত্যার কারণ।

পরদিন। অফিসে পা দিতেই ঝড়ের সংকেত আবার। সহকর্মী প্রিয়গোপালকে পি ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সকলের সন্দেহ বিকাশই ধরিয়ে দিয়েছে কানাই পালের সহযোগিতায়।]

।। ছাব্বিশ ।।

সন্ধ্যার পরে ঠাণ্ডা, কিন্তু দিনটা ধারালো হয়ে উঠছে ক্রমশ। সূর্যের তাপ গায়ে লাগে, অফিসে গিয়ে কোট খুলে ফেলতে হয়, কিছুক্ষণ পাখা চালাতে হয়, বন্ধ রাখতে হয় কিছুক্ষণ। পথে ধুলো ওড়ে, হাওয়ায় শুকনো পাতা পাক খেতে থাকে, চারদিক থেকে আমের মুকুলের গন্ধ বয়ে এনে দুপুরের বাতাস নেশা ধরায়। এদিকে-ওদিকে কয়েকটা শিমুল রাঙা হয়ে ওঠে। সন্ধ্যেবেলায় নিয়োগীপাড়ায় পথ দিয়ে ফিরতে-ফিরতে বুনো লতাপাতার সঙ্গে ভাঁটিফুলের গন্ধ মেশে, দিনে নাগকেশরের পরাগ ওড়ে। এই সব ফুলগুলো বিকাশের চেনা, ছেলেবেলায় শান্তিপুরে মামাবাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে এদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কোকিলের ডাক শোনা যায়—এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে যেতে দেখা যায় তাদের।

কলকাতায় ভাঁটিফুল নেই, নাগকেশরের কেশর ঝরে না, আম-গোলাপজামের মুকুল তীব্র-মধুর গন্ধ ভাসে না; গেরস্তবাড়ীর কোকিল থেকে থেকে ডুকরে ওঠে খাঁচার ভেতরে। দক্ষিণ সাগরের হাওয়া টবের ফুল থেকে গন্ধ ছড়ায়। কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে গায়ের ওপর টুপটাপ করে ঝরে-পড়া দু-একটা বকুল চমক লাগায় — কলেজ স্কোয়ারেও যে শিমুল ফোটে, এই খবরটা হঠাৎ জেনে নিয়ে কেমন ধাঁধা লাগে।

আর কলকাতার ময়দান আলো হয়ে যায় গুলমোহরে, এক-আধটা আকাসিয়ায় রঙ ফোটে। দক্ষিণের হাওয়ায় পায়ের তলায় বিমর্ষ নির্জীব ঘাসগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে—যেন আরব্য উপন্যাসের যাদুকরা গালিচার মতো উড়ে যেতে চায়। হাতের এক ঠোঙা আঙুর কিংবা মুঠোভরা চীনে বাদামের কথা আর মনে থাকে না—চোখে ঘোর লাগে, ট্রামলাইনগুলো আবছা হয়ে আসে।

এই সময় চাপা, শান্ত মনীষাও একটু আলাদা হয়ে যায়। গলার স্বরটা যেন জড়িয়ে আসে একটু।

'জানো, কাল চম্পার বিয়ে।'

'কে চম্পা?'

'বা-রে, আমার বন্ধু। কতবার তো দেখেছ আমাদের বাড়ীতে। সেই ফর্সা লম্বা চেহারা, খুব ভালো নাচতে পারে।'

'তা হবে, তার নাচ আমি কখনো দেখি নি।'

'নিজে পছন্দ করে বিয়ে করছে। ওর বর আর্টিস্ট। চম্পা বলে, কালি-ঝুলি মাখিয়ে এমন অদ্ভুত সব ছবি আঁকে, ভাই! একদিন দুটো গোলমতন কী এঁকে, তার একটাতে দুটো লম্বা লম্বা শিঙের মতো চোখ বসিয়ে বললে, তোমার পোর্ট্রেট। আমি শাসিয়ে দিয়ে বললুম, এ-যাত্রা ক্ষমা করেছি, কিন্তু বিয়ের পর যদি ও-রকম পোর্ট্রেট আঁকো আমার, তা হলে পরদিনই ডিভোর্সের মামলা করব আমি।' — যেন ঘুমে-জড়ানো এক টুকরো হাসি শোনা যায় মনীষার: 'রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হচ্ছে। ওরা বদ্যি তো, ছেলেটি আবার সিডিউলড কাস্টের। চম্পার বাবা খুব রেগে রয়েছেন।'

'চম্পা যা খুশি করুক। কিন্তু আমি আর একটি মেয়ের কথা ভাবছি। তার পাত্রটি পাশেই বসে রয়েছে। কাস্টের কোনো গোল-মাল নেই, রীতিমত সানাই বাজিয়ে মন্ত্র

পড়ে বিয়ে হতে পারে। আর পাত্রটি এই মর্মে কথা দিচ্ছে যে ছেলেবেলায় স্কুলের রাফ খাতায় মাস্টারমশাইদের ছাড়া আর কারুর ছবি সে কখনো আঁকে নি, ভবিষ্যতেও কখনো আঁকবে না।'

ঘোর কেটে যায়। মনীষা চুপ। এই গঙ্গা, ময়দান, পশ্চিমের আকাশে চাঁদের ফালি, হাওয়ায় গুলমোহরের উড়ন্ত পাপড়ি—বড়ো বড়ো অফিসের ছায়া ঝুলে আছে তার তিন দিকে। নিউ সেক্রেটারিয়েটের মাথার ওপর আলোটা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা রক্তনেত্রের মতো।

'মণি—'

'আর একটু সময় দাও আমাকে।'

সে সময় কখনো এল না। বাংলা দেশের জংগলে-জংগলে অনেক ভাঁট ফুটল, নাগকেশরের পরাগ ঝরল, শিমুল রাঙা হল; কলকাতার ময়দানে শুরু হল গুলমোহরের উৎসব—দক্ষিণের হাওয়ায় পায়ের তলার ঘাস রূপকথার ম্যাজিক কার্পেটের মতো উড়ে যেতে চাইল, কত চম্পা-নীলিমা-ডলি-ডালিয়ার বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু মনীষারই আর সময় হল না।

'নমস্কার স্যার—'

ব্যাঙ্কের বাড়ীটায় ঢুকতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল বিকাশ। মনীষা কোথাও নেই। সামনে দাঁড়িয়ে কানাই পালের সেই সরকার।

'নমস্কার।'

'একটা কথা ছিল।'

'বেশ তো, চলুন ওপরে। ওখানে বলা যাবে।'

'না, ওপরে নয়।' — একটু কিন্তু-কিন্তু করতে লাগলেন : 'এখানে বললেই ভালো হয়।'

বিকাশ ভুরু কোঁচকালো। এখানকার কোনো লোক একান্তে কোনো কথা বলতে চাইলেই তার খারাপ লাগে এখন। কেমন সন্দেহ নয়, নিশ্চয় বিস্বাদ বিরক্তিকর কিছু বলবে।

'বেশ, বলুন।'

সরকার একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলে।

'যদি কিছু মনে না করেন—'

অর্থাৎ মনে করতেই হবে এমন একটা অরুচিকর প্রসংগ। বলতে ইচ্ছে করল, 'আমার এখন সময় নেই, কিছু মনে করতে হবে এমন কথা শোনবারও একবিন্দু উৎসাহ নেই আমার—' কিন্তু সর্বশক্তিমান কানাই পালের লোককে চটানো যায় না। এবং—সেই দিনই কানাইবাবু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে প্রশ্রয় তিনি দিতে পারেন নিজের ইচ্ছে মতো, আবার রাশও টেনে নিতে পারেন যখন খুশি। তখন অনায়াসেই তিনি বলতে পারেন—আপনি অপমানিত হচ্ছেন সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, কিন্তু সেজন্যে কী করতে পারি। আমি কাজের লোক, এ সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত করবেন না।

বিরস গলায় বিকাশ বললে, 'বলুন না।'

'বাবু একটু রাগ করেছেন আপনার ওপর।'

অর্থাৎ প্রিয়গোপালের কথাটা, নিজের অসম্মানের কথাটা জানাতে গিয়ে মহামহিম কানাই পালকে অপমানিত করা হয়েছে। ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত রাগে জ্বালা করে উঠল বিকাশের।

'কেন, আমি তাঁর কী করেছি?'

কথার ভঙ্গিতে সরকার একটু চমকালেন।

'না, আপনি কিছু করেন নি। কিন্তু একটা কথা রটেছে।'

এখানে সব সময় সব কিছু রটতে পারে, না রটাই অস্বাভাবিক। বিকাশ কুটিল ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল : 'কী রটেছে? মানুষ খুন করেছি আমি?'

আরো বেশি চমক লাগল সরকারের। তিনি জিভ কাটলেন।

'আরে রাম রাম, ও-সব বাজে কথা কে বলছে! মানে—বাবু শুনেছেন যে আপনি বলে বেড়াচ্ছেন—'

'কী বলে বেড়াচ্ছি?'

সরকারবাবু থতমত খেলেন একবার।

'ইয়ে, মানে কথাটা ভালো নয়। আপনি নাকি নিয়োগীমশাইকে—'

'নিয়োগীমশাই?'

'মানে আপনার কাকাকে বলেছেন যে আমাদের বাবুই পুলিশের কর্তাদের বলে প্রিয়গোপালবাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন—কারণ পুলিশ এস-ডি-ও'র সংগে বাবুর খুব দহরম-মহরম, তাঁর ওখেনেই এঁদের মুর্গী আর ব্র্যাণ্ডির খানাপিনা চলে। আর নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে বাবু সব আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।'

বিকাশ হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। এমন একটা কথাও যে রটতে পারে, সব চাইতে উদ্ভট কল্পনাতেও তা ভাবা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখানে সব সম্ভব।

'আমি বলেছি এ-কথা?'

বিকাশের চোখের দিকে তাকিয়ে সরকার পিছু হটতে লাগলেন : 'মানে—আপনি স্যার নির্ঝঞ্ঝাট ভদ্রলোক, এ-সবের মধ্যে আপনি থাকবেন এ হতেই পারে না। কিন্তু শশাঙ্কবাবুই বলছেন এ-সব।'

'আপনি শুনেছেন নিজের কানে?'

'আজ্ঞে স্বয়ং বাবুই শুনেছেন।'

বিকাশের ভয় হতে লাগল, সরকারকে পাছে একটা চড় মেরে বসে সে।

'কোথায় শুনলেন?'

'পঞ্চায়েতের মীটিঙে। সেখানে নানা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি হচ্ছিল, গাঁয়ে দু-দুটো দল আছে জানেন তো। আর নিয়োগীপাড়ায় ওরা—ওরা তো বাবুদের জাত-শত্রু। সেখানেই ফস করে নিয়োগীমশাই একেবারে বাবুর মুখের ওপর—'

বিকাশ শক্ত হয়ে রইল। পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নেই।

'একথা বলেছেন শশাঙ্ককাকা?'

'আজ্ঞে বলেছেন বইকি। বাবু নিজের কানে শুনেছেন।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা একবার চেপে ধরল বিকাশ। তারপর বললে, 'কেউ যদি বানিয়ে-বানিয়ে যা-খুশি বলে বেড়ায়, তার জন্যে আমি কী করব! আমি তো দুনিয়া-শুদ্ধ লোকের মুখ চেপে বন্ধ করতে পারি না।'

'আজ্ঞে তা তো বটেই, তা তো বটেই—' গোটা-দুই খাবি খেলেন সরকার: 'কিন্তু আপনি শশাঙ্কবাবুর আত্মীয় বলেই—'

'বাজে কথা। আমি ও'র আত্মীয় নই। বাড়ীতে থাকি, এই পর্যন্ত। আচ্ছা চলি—' বিকাশ হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো: 'আমার দেরী হয়ে গেছে।'

'একটু দাঁড়ান—' সরকার ডাকলেন: 'একটা কথা শুনবেন আমার?'

দাঁতে দাঁত চেপে বিকাশ বললে, 'বলুন।'

'আপনি যদি একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করেন—'

তার মানে, গিয়ে চাটুকারিতা করতে হবে এখন! করযোড়ে বলতে হবে: 'হে এই গ্রামের মুকুটহীন অধীশ্বর জগদীশ্বরো বা—আমি আপনার একান্তই বশম্বদ অনুগত প্রজা। আপনার পবিত্র নামে কলঙ্কলেপন করতে পারি—এত বড়ো ধৃষ্টতা আমি পাব কোথায়! অতএব বিশ্বাস করুন—'

মুখে এসেছিল, আমি কোনো কানাই পালের খাস জমির প্রজা নই, তাঁর হুইস্কি বরদার নই অথবা অফিসের কর্মচারী নই যে, কথায় কথায় সেলাম বাজাতে হবে! কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই সব কথা বলা যায় না। বিকাশ বললে: 'যদি সময় পাই দেখা করা যাবে দু-চারদিন পরে। আচ্ছা আসুন তা হলে, নমস্কার। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিল সরকার তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে। আর যে কথা তার মনে ছিল, মুখে বলা হয় নি, তার সবটাই সরকারমশাই পৌঁছে দেবেন কানাই পালের কাছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে নিজের মনেই সাপের মতো গর্জন করল বিকাশ: চুলোয় যাক—চুলোয় যাক।

অফিসের কাজ চলল যন্ত্রের মতো। একটা নিঃশব্দ প্রতিরোধের প্রাচীর চারদিকে। অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, বিরূপতা। আসবার পর ক'দিনের মধ্যে এই মানুষগুলো কত ঘনিষ্ঠ, কত অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়গোপাল অভিভাবকের মতো উপদেশ দিতেন তাকে, প্রদীপ মুস্তাফি এসে বলত: 'কাজের আজ বড্ড প্রেশার আছে স্যার, আমাদের কিছু খাওয়াতে হবে।'

কিন্তু কী আশ্চর্যভাবে দেখতে-দেখতে সকলের শত্রু হয়ে গেল সে।

অফিসে সে একটা প্রতিপক্ষ, একজন বুর্জোয়া টাইর‍্যান্ট। মেজদার বইগুলোর কথা বলতে না বলতে শশাঙ্ককাকার কয়েকটা শ্বাপদ-দন্ত বেরিয়ে এসেছে: 'তুমি বাইরে থেকে এসেছ, সব ব্যাপারে নাক গলানোর দরকারটা তোমার কিসের হে!' আশা করা যাচ্ছে, এতক্ষণে কানাই পালের চোখেও হিংস্র নীল আলো জ্বলে উঠেছে।

চমৎকার।

দু হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বিকাশ ভাবতে লাগল, চমৎকার। এখানে কারো নির্বিবাদে দাঁড়িয়ে থাকার জো নেই, নোংরা-দলাদলিতে যে-কোনো একটা দিক বেছে নিতেই হবে। নইলে কারোই নিস্তার নেই, হয় রামবাণ, নইলে রাবণের হাতের শক্তি-শেল। ক্ষুরের ওপর বসতি আর কাকে বলে!

ট্রান্সফারের চেষ্টা ছাড়া গতি নেই। পালাতে হবে এখান থেকে। নইলে চাকরি ছেড়ে দেওয়া। বাড়ীতে গিয়ে না হয় মনোহারীর দোকানই খুলব একটা।

গ্রাম দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজের' শুধু বাইরেটাই বদলায়। নইলে ভেতরে এক কদর্যতা, এক আবর্জনা।

বদলাবে কারা? প্রদীপ মুস্তাফিরা? কিন্তু এত অসহিষ্ণু—এত অসংযত হয়ে?

এই সময় মনীষা কাছে থাকলে—

কিন্তু মনীষা কোথাও নেই, সে হারিয়ে গেছে।

বাড়ীতে যখন ফিরল, তখন কোথায় বেরুচ্ছিলেন শশাঙ্ককাকা। শার্টের ওপর ভাঁজকরা র‍্যাপার, সন্ধ্যের পর গায়ে চড়াবেন।

'এই যে বাবাজী।'

বিকাশ চট করে জবাব দিতে পারল না। ভদ্রলোককে দেখবামাত্র যেন একরাশ রক্ত ছুটে গেল তার মাথায়।

'সব ভালো চলছে?'

'আজ্ঞে।'

'ব্যাঙ্কে আর কোনো গোলমাল নেই?'

'আজ্ঞে না।'

কাকা যেন নিরাশ হলেন একটু। আরো খানিকটা গোলমাল পাকিয়ে উঠলে যেন খুশি হতেন তিনি। বিকাশের মনে পড়ে গেল, কাকা অন্যের মামলা-মোকর্দমার তদ্বির করে বেড়ান, মিথ্যে সাক্ষী জোটান, উকিলের টাউটগিরিও করে থাকেন। এ তাঁর পেশাও বটে, নেশাও বটে।

শশাঙ্ক আবার বললেন, 'মেয়েটা তা হলে সেতার শিখছে তোমার কাছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হবে কিছু মেয়েটার? মগজে পদার্থ আছে?'

'ভালোই হবে। সুরের কান আছে, চট করে বুঝতে পারে।'

'তুমিই বুঝবে বাবাজী—' শশাঙ্ক হঠাৎ উদাস হয়ে গেলেন: 'আমার আর কী! বয়েস তো হচ্ছে, আমরা আর ক'দিন। তখন সব ভাবনা তো তোমারই।'

মনে মনে একটা হোঁচট খেলো বিকাশ। কথাটার অর্থ যেন ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যাচ্ছে না। এত লোক থাকতে তাকেই সুনুর সব ভাবনা ভাবতে হবে কেন, এটা ঠিক স্পষ্ট হল না তার কাছে।

অন্য সময়, অন্য দিন হলে এই কথাটা একটা সুর তুলত তার মনে, বুকের তারে ঝিনঝিন করে উঠত একবার, চকিতের জন্যে সে মনীষার কথা ভুলে যেত, একটা অস্পষ্ট সম্ভাবনার দিগন্ত দেখা দিত কোথাও, একটা নতুন লেখা গান যেন গুনগুন করত রক্তের ভেতর। কিন্তু আজ সুনু ছিল না, কিছু ছিল না—কেবল কানাই পালের সরকার এসে দাঁড়াচ্ছিল তার সামনে।

বিকাশ হঠাৎ বলে বসল: 'একটা কথা বলব কাকা?'

মুহূর্তের মধ্যে সতর্ক হলেন শশাঙ্ক। মুখের ওপর মাখনের মতো একটা কোমল অভিব্যক্তি দেখা দিচ্ছিল তাঁর, প্রায় একটা স্মিতহাস্য দেখা দিচ্ছিল পানে রাঙানো ঠোঁট দুটোতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল শক্ত হল, ঠোঁট দুটো চেপে বসল একবার।

'কী বাবাজী?'

বাবাজী বলে ডাকলেন, কিন্তু মধু ঝরল না।

'আপনি পঞ্চায়েতের সভায় কিছু বলেছেন নাকি পালকে?'

মুখের মাখন পাথরের মতো জমাট বাঁধল।

শশাঙ্ক বললেন, 'নিশ্চয়ই বলেছি, কেন বলব না? এখানকার এই যে ছেলেগুলোকে পি-ডি অ্যাক্টে ধরে নিয়ে গেল — যায় ওই বুড়ো প্রিয়গোপালকে, এ-সব কার কাজ? পুলিশকে ঘুষ খাইয়ে যাকে ইচ্ছে—যে ওর শত্রু, তাদের এমনি করে ধরিয়ে দেয়, মিনিস্টার-ফিনিস্টার তো সব ওর পকেটে। সত্যি কথাই বলে দিয়েছি, আমার ভয় কাকে—?' সদ্য পান খেয়ে বেরিয়েছিলেন, উত্তেজনায় তাঁর রঙিন থুথু স্প্রের মতো বিকাশের নাকে-মুখে ছিটকে আসতে লাগল: 'পারলে ব্যাটা আমাকেও ধরিয়ে দিত, কিন্তু জানে তা হলে এখানে আর থাকতে হবে না বাছাধনকে, হাড়গুলো পর্যন্ত ওর গুঁড়ো হয়ে যাবে। আমিও শশাঙ্ক নিয়োগী—হুঁঃ! ওর মতো সতেরোটা কানাই পালকে আমি চরিয়ে খেতে পারি।'

বিকাশ বললে, 'আপনার নিজেদের মধ্যে যা খুশি করুন। কিন্তু আমাকে কেন জড়াচ্ছেন এর ভেতরে?'

'তোমাকে? তোমাকে কে জড়িয়েছে?'

বিকাশ স্পষ্ট গলায় বললে, 'আপনি বলেছেন যে আমি নাকি বলে বেড়াচ্ছি— কানাইবাবু নিজের ঝাল মেটাবার জন্যে প্রিয়গোপালবাবুকে ধরিয়ে দিয়ে ফাঁসাচ্ছেন আমাকে।'

'কে বলেছে তোমায়?'—শশাঙ্কর পান-চিবুনো বন্ধ হয়ে গেল।

'কানাইবাবুর সরকার।'

'শালা!' —হঠাৎ বিকাশের পিলে চমকে দিয়ে একটা গগনভেদী চিৎকার করলেন শশাঙ্ককাকা: 'শালা-শুয়োর কোথাকার!'

গালাগালিটা তাকেই দিচ্ছেন কিনা, সে কথা বোঝবার আগেই শশাঙ্ক আবার আকাশ ফাটিয়ে বললেন, 'মতলব বুঝতে পারছ না ছোটলোকটার? এ-সব তো রটাতেই হবে, নইলে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা তৈরী হবে কী করে?'

'এত বড়ো মিথ্যে কথা বলবেন উনি?'

'নইলে আমি মিথ্যে কথা বলছি?'—ঘোররবে শশাঙ্ক বললেন, 'তুমিও আমাকে অবিশ্বাস করছ নাকি? এমনিই হয় বাবাজী, কাউকে ভালোবাসলে—আপন করে নিলে এই রকমই প্রতিদান পেতে হয় তাকে। তোমার বাবা—সেই দেবতা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে শশাঙ্ক মিথ্যে কথা বলছে, একথাটা মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে পারতেন না তিনি।'

বলতে বলতে প্রায় গলা ধরে এল, মনে হল প্রায় কেঁদে ফেলবেন শশাঙ্ককাকা।

এই ঘোর সত্যবাদী আর দারুণ হৃদয়বান ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে, দেবতুল্য পিতার অপদার্থ পুত্র বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল। এবং এই ভয়ঙ্কর মনোবেদনায় শশাঙ্ককাকা কখন কেঁদে ফেলবেন, সেই শুভমুহূর্তটির জন্যে রোমাঞ্চিত দেহে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

কিন্তু শশাঙ্ককাকা কাঁদলেন না। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সব গৌরব ম্লান করে দিয়ে তৎক্ষণাৎ অভিব্যক্তি বদলে ফেললেন তিনি—বীররসে উদ্দীপ্ত হয়ে গেলেন।

'তুমি দেখো বাবাজী: আমি ওই কানাই পালটাকে কীচক বধ করব একদিন। তারপর যদি ওর রক্তপান না করি তো—'

এই রোমহর্ষক নাটকের মধ্যেও এক ধরনের অদ্ভুত কৌতুক বোধ হল বিকাশের। মনের সমস্ত যন্ত্রণা, সব বিরক্তি, সব ঘৃণা ছাপিয়েও তার বলতে ইচ্ছে করল, কাকা, একটু ভুল হচ্ছে বোধ হয়। যত দূর জানি, ভীম কীচকের রক্তপান করেন নি।

কিন্তু বলার দরকার হল না। তার আগেই আর এক অভিনেতা এসে পড়েছিল বাগানের ভেতর থেকে। শশাঙ্কের চিৎকারের আকর্ষণেই খুব সম্ভব। মেজদা।

চোখ দুটো ধক-ধক করছিল মেজদার। প্রেতের মতো দেখাচ্ছিল তাকে।

'আবার কার রক্ত খাবি রে শালা? আমার রক্ত খাচ্ছিস, বৌটাকে খাচ্ছিস, শালীটাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খেলি, নিজের বড়ো মেয়েটাকে দিলি ডাকাতের ঘরে—'

'চোপ রাও!'—দানবের মতো হাঁকলেন শশাঙ্ক।

মেজদা তাতে আর ভয় পেল না। বরং আরো কাছে এগিয়ে এল শশাঙ্কর: 'চোখ রাঙাচ্ছিস কাকে রে রাস্কেল? এর পর সুনুকে খুন করবি, এই ছোকরাকে নরবলি দিবি, কত রক্ত খাবি আর?'

শশাঙ্ক প্রায় বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন মেজদার ঘাড়ে। কাঁধের পাট-করা ব্যাপারটা ছিটকে পড়ল, বিকাশের গায়। তারপর শোনা গেল শশাঙ্কর জান্তব স্বর: 'খুন করব—খুনই করে ফেলব আজ।'

যেটুকু সময় গেল হতভম্ব অবস্থায়। তারপরেই চোখে পড়ল, মেজদাকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসেছেন শশাঙ্ক। দু হাতে গলাটা টিপে ধরে বলছেন: 'খুন করব—শেষ করে ফেলব!' মেজদার চোখ কপালে উঠেছে, ফেনা দেখা দিয়েছে দু কষে।

আর বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এসেছেন কাকিমা আর সুনু। কান্না উঠেছে কাকিমার গলায়।

শশাঙ্ককে টেনে তোলা যায় না—এমন অবস্থা!

মেজদা হাঁপাতে হাঁপাতে যখন ছুটে পালিয়ে গেল, তখনো বিকাশের হাত ছাড়িয়ে খ্যাপা মোষের মতো তার দিকে ছুটে যেতে চাইছেন শশাঙ্ক। রুদ্ধশ্বাসে বলে চলেছেন, 'শেষ করব — ও শালাকে আজ খুন করব—'

প্রভাকর বলেছিল, 'চলে আয়।'

বিকাশ বলেছিল, 'হ্যাঁ, কাল সকালেই চলে আসব। আর একদিনও ওখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব আমি।'

অমলা বলেছিল, 'কিছু ভাববেন না, কোনো অসুবিস্তা হবে না আপনার।'

হিন্দী 'অসুবিস্তা' শব্দটা নিয়েও আজ আর ঠাট্টা করা যায় নি অমলাকে। বিকাশ সব ঠিক করেই উঠে পড়েছিল। আর কিছু ভাববার নেই, কিছুই করবার নেই। সুনু? সোনালি? সুবর্ণা? কিন্তু তার নিয়তিকে ঠেকাবার সাধ্য নেই বিকাশের—সে তো বিধাতা-পুরুষ নয়।

তবু যন্ত্রণা। যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই কিছুতেই। কেন সে এল এখানে? কী দরকার ছিল?

এই ভাবনার মধ্য দিয়েই সে আসছিল। রাত দশটা বাজে—অন্ধকারে আর নির্জনতায় থমথম করছে নিয়োগীপাড়ার পথ। আসতে আসতে এক জায়গায় পিছিয়ে যেতে গেলে তার টর্চের আলোটা।

পথের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে রক্তমাখা একজন মানুষ।

হৃৎপিণ্ড থমকে গেল বিকাশের। মেজদা?

না—[illegible] শশাঙ্ক নিয়োগী।

যুদ্ধোত্তর বার্মিজ কথাসাহিত্য

ঠিক বছর তিরিশ আগেই নেমে আসে মৃত্যুর অভিশাপ। শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। জড়িয়ে পড়ে একের-পর-এক জাতি। দেশ। বর্মাও বাদ গেল না।

অবশ্য এখানে প্রত্যক্ষ সংগ্রামই শুধু হয় নি, চার বছর যুদ্ধ চলাকালীন তার মাটির দুবার হাত-বদলও ঘটেছিল। শোনা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্লিন ও বর্মা যেভাবে ধ্বংসের শিকার হয়েছিল এমনটি আর কোন দেশ নয়। তবে হিরোসিমা-নাগাসাকির কথা স্বতন্ত্র।

জাতীয় জীবনে একদিন যে ধ্বংসলীলা ঘটে গেছে তার ছাপ সাহিত্যে বর্তেছে। এ স্বাভাবিক. কারণ জীবনের প্রতিচ্ছবিই হল সাহিত্য। তবে যুদ্ধোত্তর বর্মার সাহিত্যকে জানতে হলে আমাদের যুদ্ধ-পূর্ব বার্মিজ সাহিত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার, বিশেষ করে ১৯৩০-এর, যেখানে থেকে আজকের নবকলেবর বার্মিজ সাহিত্যের শুরু হয়েছে।

এক অর্থে বর্মা দেশের সাহিত্যকে ভারতীয় সাহিত্যেরই ভিন্নরূপ বলা চলে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের মত নানা কাহিনী, রাজা-রাজড়ার গল্প ও রামায়ণকে অনুসরণ করেই সমৃদ্ধ হয় প্রথম দিকের বার্মিজ সাহিত্য।

পরিবর্তন হলো পরাধীন বর্মায় ইংরাজি সাহিত্যের নির্যাসকে আত্মসাৎ করে। পরাধীন ভারতবর্ষের মতই ইংরাজি সাহিত্যে অবগাহন করে বর্মীরা নতুন শৈলী ও ক্রান্তিকারী ভাবনার মধ্য দিয়ে নিজেদের সাহিত্যকে করে তুললেন আধুনিক। দেখা দিল জাতীয় চেতনা. সমাজ-পরিবর্তনের চাবিকাঠি। ১৯৩০-এ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যিক আন্দোলন, যার নাম দেওয়া হয় 'নব-যুগ-নিরীক্ষা' গড়ে উঠেছিল। একজন বিদেশী সমালোচক এই আন্দোলনকে মার্কিনী কবিতায় ইমেজিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ধারক ও বাহকেরা যুদ্ধ-পরবর্তীকালে সাহিত্যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের পথ তৈরি করেন। এই আন্দোলনের নেতারা সবাই রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। কবি উ লান ছিলেন প্রধান নেতা। তাঁর গভীর দেশাত্মবোধক কবিতা পড়ে বর্মার তরুণ-তরুণীদের রক্ত উত্তপ্ত, চঞ্চল হয়ে উঠত। আবার তলোয়ারের ধারাল ফলার মত তাঁর ব্যঙ্গ রচনাগুলি বিজয়ীর পদলেহীদের আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করত। বর্মা এবার যেন তার নেশাজড়িত চোখ খুলে তাকাল এবং আত্মস্থ হবার সঙ্কল্প নিল। এই দলের একজন হলেন উ নু। এ'রা একাধিক ছদ্মনামে লিখতেন। উদ্দেশ্য হল সে সময়কার সরকারের চোখে ধুলো দেওয়া ও নিজেদের সংখ্যাধিক্য প্রচার করা। এ'রা প্রচুর পশ্চিমী সাহিত্য পড়তেন এবং আধুনিক ক্রান্তি চিন্তার সঙ্গে ছিলেন গভীরভাবে পরিচিত।

বর্মায় মার্কসবাদ আমদানী হয়েছিল রাশিয়া থেকে নয়। ইংল্যাণ্ডে থেকে। অন্যদিকে, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ বর্মার রাজনীতিতে শুধু নয়, সাহিত্যেও এনেছিল চিন্তার নবতরঙ্গ।

এ সময়ে প্রচুর ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ হয়। বিদ্রোহী লেখকেরা যেমন লিখতেন তেমনি অনুবাদও করতেন। এ'রা প্রত্যেকে 'বর্মা এডুকেশন একসটেনশন অ্যাসোসিয়েশনে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এই অ্যাসোসিয়েশনের ম্যাগাজিন 'দি ওয়ার্লড অফ বুক'-এর জন্য লিখতেন। তখন এই পত্রিকার প্রচার নেহাৎ অল্প ছিল না. এবং এর পাতায় পাতায় আগামী দিনের সাহিত্যের নবজাগরণের বীজ বপন করা হয়েছিল।

এ ছাড়া উ নু সে সময়ে 'লেফট বুক ক্লাব'-এর পাশাপাশি 'নাগানি বুক ক্লাব' আরম্ভ করেছিলেন। 'নাগানি' অর্থ লাল ড্রাগন। এই বুক ক্লাবে জন স্ট্রেচারীর এবং অন্যান্য বই অনুবাদ করা হয়। বর্মী লেখকরা যাতে সামাজিক সমস্যা ও উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে মনোযোগ দেন তার জন্য তাঁদের উৎসাহিত করা হয়।

এ সময়ে বহু প্রচারধর্মী উপন্যাস লিখিত হয় যার বিষয়বস্তু হল খেটে-খাওয়া মানুষের দুঃখ, ক্ষোভ, ক্রোধ আর সমাজের নানা টানা-পোড়েন। কিন্তু বেশীর ভাগ বই-ই শিল্পের দিক থেকে ছিল জোরালো।

মানসী মুখোপাধ্যায়

ব্যতিক্রম হিসেবে প্রথমেই মনে পড়ে 'আধুনিক মংক'-এর কথা। উ নু এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দেন। লেখকের নাম তাইন ফে মিয়ান। এই গ্রন্থে বর্মার মংকদের প্রতি অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি ভীষণ অভিযোগ আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁরা সংঘের অনুশাসন যথাযথভাবে পালন করেন না। আজকাল তাঁরা বিষয়ী হয়ে উঠেছেন এবং গেরুয়া বস্ত্রের আড়ালে অন্যায় কাজে লিপ্ত হচ্ছেন।

দ্বিতীয় বই 'নারীর জীবন'। লেখিকা উ খিন খিন লে। গরীব কৃষকরমণীর জীবন, গ্রামের দুরবস্থা, কৃষকদের দুর্দশা এসবই হল এর বিষয়বস্তু। চরিত্র-চিত্রণে ও বর্ণনার গুণে বইটি খুবই উপভোগ্য। বর্মার সমালোচকরা এই বইটিকে পার্ল বার্কের 'গুড আর্থ'-এর সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

যুদ্ধোত্তর কালের সাহিত্যে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেন উ নু, বর্মার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী। ১৯৩০-এ যে বীজ বপন করা হয়েছিল এবার তা থেকে যেন অঙ্কুর দেখা দিল। বৃটিশ আমলে প্রথমে এ'র ছদ্মনাম ছিল কো নু, পরে তাখিন নু, এ'র লেখা 'ম্যান, দি উলফ অফ ম্যান' একটি বিখ্যাত বই। বইটির বিষয় সবিশেষ জানার আগে তৎকালীন বর্মার অবস্থার কথা উল্লেখ করা দরকার।

আমাদের মত বর্মীরা তখন বৃটিশের অধীনে থেকে তাদের শাসন ও শোষণে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। একদা আমাদের দেশে বণিক ইংরাজকে ডেকে এনে যেভাবে তার হাতে শাসনভার তুলে দেয়া হয় বর্মাদেশে জাপানী আধিপত্যের ইতিহাস অনেকটা তেমনি। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশী দেরী হয় নি। তখন সমস্যা হয়েছিল, মুক্তিদাতা হয়ে যারা এসেছে তাদের হাত থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যায়। 'ম্যান, দি উলফ অফ ম্যান' হল সেই স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। উ নু এই বই বন্দীদশায় তাঁর দীর্ঘ অবসরকালে লিখেছিলেন। বইয়ের বিষয়বস্তু হল, একজন বর্মী যুবকের চোখে আমলাতন্ত্রদের অবিবেকী শাসনের অভিজ্ঞতার কথা।

যুদ্ধ-পরবর্তীকালের একটি বাস্তব ছবি পাওয় যায় রেঃ রেওতা ধম্মা লিখিত 'বৌদ্ধ সাধনবিধি' বইটিতে। ইনি লিখছেন, 'বর্মা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিকার হয়। আধুনিক যুগের ভয়াবহতা ও তার বিনাশের ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। লোকে নিজের চোখে বড় বড় ভবন, বাজার, নগর, আর স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধকে চোখের নিমেষে ধ্বংস হতে দেখেছে। মৃত্যুপথযাত্রী লোকের আর্তনাদ ও আত্মীয়-স্বজনদের করুণ ক্রন্দন নিজেদের কানে শুনেছে। বিশ্বযুদ্ধের পরও লুঠপাট, হিংসা আর গৃহবিবাদ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হতে পারেনি বর্মা। এই সব ঘটনা দেশবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করে। তারা সংসারের দুঃখময়তা ও জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা অনুভব করতে থাকে। তাদের মনে জগতের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব উদয় হয়।'

এরকম অবস্থায় পড়লে সাধারণ মানুষ বেপরোয়া হয়ে আরো ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। অথবা যদি আত্মিক শক্তির ভিত্তি দৃঢ় হয় তবে সমাহিত হবার চেষ্টা করে। ভগবান তথাগতের করুণাশ্রিত, আজন্ম ধর্মের প্রভাবে পালিত বর্মীরা দ্বিতীয় পন্থাকে বেছে নেয়; সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী উ নু এই সাধনকেন্দ্রের প্রচার করেন।

বৌদ্ধভিক্ষু রেঃ রেওতা ধম্মার রচনাকে আবার স্মরণ করা যাক. 'এই সব কারণে বর্মা স্বাধীন হবার পর সারা দেশ জুড়ে সাধনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। সব স্তরের স্ত্রী-পুরুষ এই সব সাধনকেন্দ্রে গিয়ে ধ্যান-ধারণা শিখতে থাকেন। রেঙ্গুন, মান্দালয়ের মত বড় জায়গায় পঞ্চাশের ওপর সাধনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া বর্মায় এমন কোন জেলা বা তহশীল নেই যেখানে সাধনকেন্দ্র নেই। সরকারী কর্মচারীরা সাধনকেন্দ্রে যাবার জন্য ছুটি চাইলে বাধা দেওয়া হত না।...এ সময়ে সাধন-বিষয়ক ছোট-বড় শত শত গ্রন্থ রচিত হয়।'

উ নু এই সাধনকেন্দ্র স্থাপন করে যেমন তাঁর দেশবাসীকে গভীর হতাশার কবল থেকে রক্ষা করেছেন তেমনি বর্মা-দেশকেও। এ এক তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব।

তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ হল 'বার্মিজ ট্রানস্লেশন সোসাইটি' স্থাপন। জাপানী আমলে 'নাগানী বুক ক্লাব'-এর ওপর খুব দমননীতি চালান হয়েছিল। 'বার্মিজ ট্রানস্লেশন সোসাইটি' বর্মাদেশে সবচেয়ে বড় গ্রন্থ প্রকাশক। এই সোসাইটি থেকে টেকসট বুক, এডুকেশন্যাল মান্থলি ম্যাগাজিন, বার্মিজ এনসাইক্লোপিডিয়া ও জনপ্রিয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অন্যান্য ভাষায় যত সায়েন্স ও আর্টের বই আছে সব বার্মিজ ভাষায় অনুবাদ করাও এই সোসাইটির কাজ। বিদেশী সাহিত্যের ছায়া নিয়েও বই লেখা এই সোসাইটির দ্বারা হয়ে থাকে। আর একটি অবশ্যকর্ম এই সোসাইটি করে থাকে তা হল বার্মিজ ভাষায় শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করা। যেমন স্পুটনিক সৃষ্টি হওয়া ও তার নাম জানার সঙ্গে সঙ্গে বার্মিজ ভাষায় তাকে কি বলা হবে তা তৈরি করা হয়ে গেল। এক কথায় পরিভাষা তৈরি করা এর একটি বিশেষ কাজ। একাজে বর্মীদের খুব উৎসাহ। বর্মী সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করার জন্য এই সোসাইটি থেকে 'সাবুবে বাইমান' নামে এক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাহিত্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশংসনীয় কাজের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। লেখক মিন অং-কে তাঁর প্রশংসনীয় রচনা 'আকাশের নিচে মাটি'-র জন্য এই পুরস্কার প্রথম দেওয়া হয়েছে। এটিও একটি কৃষকের জীবন নিয়ে লেখা। কৃষকের পরোপকারী ছেলে ও কঠোরপ্রকৃতি জমিদারকে নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে।

পরের বছর লেখক উ অন পে, তাঁর 'সিভিল সারভেন্ট' বইটির জন্য এই পুরস্কার লাভ করেন। এ গ্রন্থে লেখক বৃটিশ অফিসারদের অসহনীয় ব্যবহার ও দুর্নীতি, যা বর্মাদেশের কোন কোন অংশে ছেয়ে গিয়েছিল, তার বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন।

বর্মীরা তাঁদের জাতীয় সৈন্যদের জন্য খুবই গর্বিত। জাতীয় সৈন্য-বাহিনীকে বিষয়বস্তু করে লেখক থা ড্ু একটি উপভোগ্য বই লেখেন এবং উক্ত পুরস্কার লাভ করেন।

উ নো থিনকে ১৯৬৪-এ এই পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁর বই প্রাচীন বর্মার গল্পের জন্য।

মহিলা লেখিকা মা মা লে তাঁর 'নট দ্যাট হি হেটস' বইটির জন্য উক্ত পুরস্কারে সম্মানিত হন।

পুরস্কারের টোপর না পেলেও যুদ্ধোত্তর কালে লেখা ব তাও-এর 'পানাদা মাসাউ' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে দেখান হয়েছে যুদ্ধের অভিশাপ গ্রামে তেমন লাগে নি এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বর্মীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ কেমনভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। গ্রাম-বর্মার কৃষা-জীবন লেখক অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সহজ করে গল্প বলার ঢঙে গ্রন্থটি তৈরি। এ বই লেখার পর ইনি বার্মিজ ভাষায় আরব্য উপন্যাস অনুবাদ করেন। এখন ইনি পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখে থাকেন। 'মিয়ুয়া', 'মিয়াবতী', 'উয়েতাও' ইত্যাদি ম্যাগাজিনে প্রায় প্রত্যেক মাসে এঁর লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। ইনিই প্রথম বর্মী লেখক যিনি নিজের রচনায় উর্দু শব্দ 'দুনিয়া' ব্যবহার করেছেন।

লেখক সোয়ে উ ডং 'দৃষ্টিমাত্র' নামে বৌদ্ধধর্মের ওপর বই লিখেছেন।

'আধুনিক যুবক'-এর লেখক তাইন ফে মিয়ন 'লড়াইয়ের যাত্রী' নামে একটি বই লিখেছেন। লড়াইয়ের সময় বর্মায় কি রাজনীতি চলেছিল, লোকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা কিভাবে এলো, আন্দোলন কিভাবে করা যায় ইত্যাদি হল এই বইয়ের প্রধান বিষয়বস্তু।

উ অন পে এখনো লিখছেন। বার্মিজ সাহিত্যের ওপর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ইনি বহু লিখেছেন ও লিখছেন।

ওপরে যতগুলি বইয়ের নাম উল্লেখ করা হল সবই বার্মিজ ভাষায় লেখা। বর্মা-দেশে বহু প্রতিভাশালী লেখক-লেখিকা আছেন যাঁরা ইংরেজিতেও লিখে থাকেন। ড অং Burmese Folk Tales ইংরেজিতে লিখেছেন। এছাড়া কিছু বার্মিজ নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। কবি উ থান জো ইনি 'K' এই একটি ইংরেজি অক্ষরে সারা বর্মায় বিখ্যাত, তাঁর উপভোগ্য আত্ম-জীবনী 'Burma in my life time' বার্মিজ সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। এটি একটি ইতিহাসমিশ্রিত আত্মজীবনী। উ নু-র 'ম্যান', 'দি উলফ অফ ম্যান' ও নাটক ইনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ড মং মং-র 'Burma in the Family of Nations' ইংরেজিতে লেখা। বর্মী রাজাদের ওপর উ মং মং পে তাঁর লঘু রসের প্রবন্ধ, স্কেচ এবং রচনা সবই ইংরেজির মাধ্যমে লিখেছেন।

উ নু-র "Burma under the Japanese" এবং ড মি মি-র "Burmese family" ভারতবর্ষে প্রকাশিত, ইংরেজিতে লেখা।

বলাবাহুল্য যুদ্ধোত্তর কালে প্রথম দশ বছরে যে গতিতে ও যত পশ্চিমী সাহিত্যের অনুবাদ হয়েছে, সারা বৃটিশ আমলের অনুবাদ তার তুলনায় নগণ্য। এর দ্বারা এই সময়ের বার্মিজ সাহিত্যের ওপর পশ্চিমী প্রভাব ও প্রতিপত্তি সহজেই অনুমেয়।

১৯৬২-তে বর্মা দেশে নে উইনের কর্তৃত্বে সমাজবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ-বাদ আর বার্মিজ সমাজবাদ এ দুয়ের মধ্যে বর্মীদের মতে, তফাৎ আছে। বার্মিজ সমাজ-বাদীরা ভগবান বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবনত। তাঁদের মতে ভগবান বুদ্ধ যা বলেছেন তাঁদের তাই মত, তবে তাঁরা বলেন জন্মের দ্বারা বৌদ্ধ না হয়ে ভগবান বুদ্ধের বাণী বুঝে বৌদ্ধ বার্মিজ হও। সমাজবাদীরা বিশ্বাস করেন যে ভগবান বুদ্ধ যে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার-চেয়ে বড় নৈতিক শিক্ষা আর নেই। এজন্যই সমাজবাদীরা বলেন যে, এ সমাজবাদ বর্মার নিজস্ব মত।

নে উইন ক্ষমতাসীন হবার পর নানা পরিবর্তনশীল কাজ করেছেন।

ওদেশে চলছে এখন সমাজবাদের ঢেউ। সমাজ পরিবর্তনের আদর্শকে সামনে রেখে যাঁরা এখন সাহিত্যচর্চা করছেন তাঁদের মধ্যে যুদ্ধপূর্বকালের লেখক তাইন ফে মিয়ানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি গরীব, চাষী, মজুর প্রভৃতির সমস্যা ও উন্নতির উপায় নিয়ে প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। নে উইন সরকার গঠন করার পর ভারতবর্ষের লোকেরা বর্মাদেশ ত্যাগ করে চলে আসতে থাকলে ইনি তার প্রতি-বাদ করেছিলেন।

সোয়ে উ ডং, উ অন প এঁরা নতুন ধারার সঙ্গে তাল রেখে নানা রকম প্রবন্ধ লেখেন।

মহিলা লেখিকা মা মা লে ও খিন খিন লে, যাঁদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, বর্তমানে খ্যাতির চূড়ায়। প্রথমজন সাধারণত সাম্যবাদের ওপর লেখেন। এঁর স্বামীর ভাবধারা অত্যন্ত আধুনিক ছিল। ইনি স্বামীর আধুনিক ভাবধারাকে সাম্য-বাদের ভাবনার সঙ্গে সংমিশ্রণ করে একটি উপন্যাস লিখেছেন। বইটির নাম 'তুয়ে দু'।

খিন খিন লে পুরনো ভাবধারাকে আধুনিক ছাঁচে ঢেলে লেখেন। এঁর স্বামীর নিজস্ব প্রেস আছে। মা মা লে-র স্বামীরও নিজের প্রেস ছিল। 'মা নয়ে পা জয়ে' খিন খিন লে-র সম্প্রতি কালের লেখা প্রসিদ্ধ বই। পাঠকদের মধ্যে খিন খিন লে এবং মা মা লে-র বই নিয়ে প্রায়ই তুলনামূলক বিচার হয়।

বার গু পারাগু, ইনি সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলা জানেন। হিন্দী ও সংস্কৃতে লেখা বই বার্মিজ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ণের লেখা প্রায় সব বই ইনি অনুবাদ করে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক নিজের ভাষায় অনুবাদ করে ইনি ভারত সরকারের কাছ থেকে এক হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেছেন।

উ ত জেন-ও বাংলা জানেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওলা', 'পোস্ট মাস্টার' ইত্যাদি বার্মিজে অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সব বই অনুবাদ করা হয়েছে। কিছু বাংলা থেকে কিছু ইংরেজি থেকে।

বর্মায় ছোটগল্প সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ১৯৩০-এর লেখকরা ছোটগল্প লেখা শুরু করেন এবং এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলাতে থাকে।

যুদ্ধোত্তরকালে অনেকে ছোটগল্প লিখে হাত পাকিয়েছেন এবং কয়েকটি ছোটগল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি-কালে লেখিকা সেন সোয়ে ছোটগল্প লিখতে সিদ্ধহস্ত। ছোটগল্পের জন্য ইনি যথেষ্ট সুনাম করেছেন এবং এজন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন।

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা. সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ও'রা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের খবর, চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিনিসপত্রের দামও আকাশছোঁয়া।

এমন সময় এল সেই মারাত্মক সংবাদ। জাপানীরা বোমা ফেলেছে বর্মায়। সেখান থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে ভারতে। রাজদিয়াতেও জান্ নিয়ে ফিরে এসেছে একটি পরিবার। পরদিন। সকলেই ছুটল ত্রৈলোক্য সেনের কাছে। শ্যামল রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে আসার মর্মান্তিক কাহিনী।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'আমার যে ভাই ওখানে এ্যানুয়াল পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট টার্টিফিকেট আনতে পারিনি। আনব কি করে বল, জাপানীদের বোমা পড়ল। সব ফেলে টেলে পালিয়ে আসতে হল—'

বিনু বলল, 'এখানে ভর্তি হতে হলে একটা এ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে। আমিও কলকাতা থেকে এসে এ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম।'

চিন্তিত মুখে শ্যামল শুধলো, 'খুব কঠিন পরীক্ষা নেয়?'

নিজের ফাঁড়া তো কেটে গেছে। মুরুব্বিয়ানা চালে বিনু বলল, 'তেমন কঠিন আর কি—'

শ্যামল বলল, 'খুব ভয় করছে।'

বিনু শ্যামলের সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই। কিন্তু তার কান দুটো ছিল ত্রৈলোক্য সেনদের দিকে। জাপানী বোমার ভয়ে দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে পালিয়ে আসার দীর্ঘ রোমাঞ্চময় বিবরণ শোনার মতন উন্মাদনাকর আর কী থাকতে পারে? প্রবল আকর্ষণে ত্রৈলোক্য বিনুকে তাঁর দিকে টানছিলেন।

বিনু যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, শ্যামল তা লক্ষ্য করেছিল। বলল, 'দাদুর কথা বুঝি ভাল লাগছে?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'দাদু আর কতটুকু বলছে। আমি তোমাকে পরে সব বলব। জাপানীরা প্রথম দিন এসে কেমন করে বোমা ফেলল, ইংরেজ সৈন্যরা তখন কী করছিল, আমরা কী করছিলাম, রেঙ্গুনের লোকেরা কী করছিল, আমরা কেমন করে এলাম—সব বলব। কত শুনতে পার তখন দেখা যাবে। শোনাতে শোনাতে কান একেবারে ঝালাপালা করে ছাড়ব। এখন আমার সঙ্গে গল্প কর দেখি।'

কি আর করা, ত্রৈলোক্য সেনের গল্পের আশা ছাড়তে হল বিনুকে। চোখ কান মেলে শ্যামলের দিকে তাকাল সে।

শ্যামল বলল, 'তখন কলকাতার কথা কী বলছিলে?'

বিনু বলল, 'আমরা কলকাতায় থাকতাম।'

'কবে এসেছ?'

'বছর দেড়েকের কাছাকাছি।'

'রাজদিয়াতে তোমরা কোথায় থাকো?'

কোথায় থাকে, বিনু বলল।

'তোমাদের বাড়ি একদিন যাব।'

'নিশ্চয়ই যাবে।'

'তোমাকেও কিন্তু আসতে হবে। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।'

'আসব। তোমাকে আমারও ভাল লেগেছে।'

দুজনের মধ্যে টুকরো টুকরো, এলোমেলো, অসংলগ্ন গল্প চলতে লাগল। কথা বলতে বলতে বিনুর হঠাৎ মনে পড়ল, ঝুমার সঙ্গে এখানেই তার আলাপ হয়েছিল। সেই দুঃসাহসী, লজ্জাহীন মেয়েটা। কতকাল তার সঙ্গে দেখা হয় না। ঝুমার কথা ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল বিনুর।

ওধারে এক সময় ত্রৈলোক্য সেনের বিচিত্র ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কাহিনী শেষ হল।

স্নেহলতারা ছাড়া একে একে অন্য শ্রোতার দল চলে যেতে লাগল।

সবাই চলে গেলে, ঘর যখন ফাঁকা, স্নেহলতা শুধোলেন, 'একটা কথা সেন-ঠাকুরপো—'

ত্রৈলোক্য সেন উৎসুক চোখে তাকালেন, 'কী?'

'মগের মুল্লুকে সবই তো ফেলে-টেলে এসেছেন। কিছুই আনতে পারেন নি।'

'হ্যাঁ।'

'টাকাপয়সার দরকার থাকলে কিন্তু বলবেন। একটুও লজ্জা করবেন না।'

'আপনাদের কাছে লজ্জার কিছু আছে নাকি। তবে—'

'কী?'

'টাকা-পয়সার এখন দরকার নেই বৌ-ঠাকরুণ।'

কিছুই আনতে পারেন নি অথচ পয়সা-কড়ির প্রয়োজন নেই—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না স্নেহলতা। বিমূঢ়ের মতন তিনি তাকিয়ে থাকলেন।

স্নেহলতার মনোভাব খানিক যেন অনুমান করতে পারলেন ত্রৈলোক্য। হাসতে হাসতে বললেন, 'তা হলে আপনাকে একটা কথা বলি—'

'কী?'

'হাজার বিশেক টাকা আমি আনতে পেরেছি।'

'কিভাবে?' বিস্ময়ে আর উত্তেজনায় গলা কাঁপতে লাগল স্নেহলতার; '[illegible] ধরে নি?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ত্রৈলোক্য সেন বললেন, 'সে একটা চালাকি করেছিলাম বৌ-ঠাকুরুন। [illegible] তা

দেখাবার জন্যে হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করে নিয়েছিলাম। ব্যান্ডেজের ভাঁজে ভাঁজে একশ' টাকার নোট রেখেছি। লোকের চোখে ধুলো ছিটোবার জন্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতাম। কি রকম ফন্দি খাটিয়েছিলাম বলুন তো?' চোখে মুখে গর্বের ভাব ফুটিয়ে ত্রৈলোক্য তাকালেন।

গালে হাত দিয়ে মাথাটি হেলিয়ে দিলেন স্নেহলতা, 'বাবাঃ, আপনার মাথায় এতও এসেছিল?'

ত্রৈলোক্য হাসতে লাগলেন, 'হাজার হোক ওরা মগ ডাকাত। আর আমি—'

'আপনি কী?'

'ঢাকাইয়া পোলা'। ' শব্দ দুটো পূর্ব বাঙলার টান দিয়ে উচ্চারণ করলেন ত্রৈলোক্য।

স্নেহলতা এবার হেসে ফেললেন।

কথায় কথায় বেলা ফুরিয়ে এল। শীতের অবেলায় রোদের রঙ যখন বাসি হলুদের মতন সেই সময় ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ, অন্য নাতি-নাতনীরা নিজেদের বাড়ি ফিরে এল।

অগত্যা আরো কিছুক্ষণ বসে যেতে হল বিনুদের। স্নেহলতা ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী, ছেলের বৌদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললেন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে নেমে এল। নদীর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসতে লাগল। হিমে-কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা, অস্পষ্ট। কাছাকাছি ঝোপঝাড়গুলোর ভেতর থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। আলোর ছুঁচের মতন অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে জোনাকিরা একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। সারা রাতের জন্য এই জ্বলা-নেভায় খেলা চলবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হলেন স্নেহলতা। বললেন, 'এবার আমরা যাই বোন।'

ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী বললেন, 'এখনই যাবেন দিদি?

'হ্যাঁ। রাতের রান্না পড়ে আছে; গিয়ে বসাতে হবে। তোমরা যেও—'

'বুঝতেই তো পারছেন দিদি, এখন যাওয়ার খুব অসুবিধে। নিজের বাড়িঘরে থিতি হয়ে বসি; তারপর যাব।'

'বাড়িতে যেতে কদ্দিন লাগবে?'

'আজই সবে কামলা লাগল। সাত-আটদিনের আগে সারাই-টারাই হবে বলে তো মনে হয় না।'

'বাড়ি গিয়ে বসবার পরই তা হলে যেও।'

'আচ্ছা। আপনারাও আসবেন।'

'আসব।' বলতে বলতে উঠে পড়লেন স্নেহলতা।

●

দিন কয়েক পর শ্যামল বিনুদের ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেল। এখন রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়। দিনের অনেকখানি সময় এক সঙ্গে কাটে দুজনের।

কলকাতা থেকে আসার পর এখানে বিশেষ বন্ধুটন্ধু পায় নি বিনু। ক্লাসের ছেলেরা অবশ্য ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে তেমন মিলত না।

বন্ধুর জন্য বিনুর প্রাণের যে জায়গাটা ফাঁকা পড়ে ছিল, শ্যামল এসে তা ভরিয়ে তুলল।

টিফিনের সময় কিংবা স্কুলের ছুটির পর বিনুরা নদীর পারে গিয়ে বসে; কখনও হাঁটতে হাঁটতে বরফকল, স্টিমারঘাটার দিকে চলে যায়।

এর মধ্যে বর্মার অনেক গল্প করেছে শ্যামল। রেঙ্গুন শহর, শোয়েডাগন প্যাগোডা, লেক, বর্মীদের জল-উৎসব, সাগরের জলে ভরপুর নীলকণ্ঠ ইরাবতী—এমনি কত কথাই না বলেছে।

একদিন গল্প করতে করতে শ্যামল বলল, 'জানো বিনু, দুজনের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়।'

'তারা কে?'

'সুব্রত আর মা-পোয়ে। সুব্রত ছিল আমার প্রাণের বন্ধু; রেঙ্গুনে আমরা এক রাস্তাতেই থাকতাম। বোমা পড়বার পর সবাই পালাচ্ছে, সুব্রতরা জাহাজের টিকিট পেয়ে গেল। ওরা কলকাতায় এসেছিল; তারপর কোথায় গেছে কে জানে। জীবনে আর হয়তো কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে শ্যামলের; চোখমুখ বিষণ্ণ দেখায়।

বিনু শুধোয়, 'মা-পোয়ে কে?'

একটা বার্মীজ মেয়ে। ওরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। ওর বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। আমাদের বাড়ি ওরা সবসময় আসত; আমরাও ওদের বাড়ি যেতাম। বোমা পড়বার পর মা-পোয়েরা মান্দালয়ের দিকে চলে গেল; আমরা এলাম এই রাজদিয়াতে।'

বিনু এবার কিছু বলল না।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামল বলল, 'মা-পোয়ের মা আর বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন। ও'দের খুব ইচ্ছে ছিল, বড় হলে মা-পোয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। আমার মা-বাবারও ইচ্ছে ছিল।'

একটা কথা মনে হতে বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'মা-পোয়েরা বার্মীজ না?'

'হ্যাঁ।'

'বার্মীজদের সঙ্গে বাঙালীর বিয়ে হয়?'

'অনেক হয়েছে। বর্মায় গিয়ে দেখে এস না—'

এরপর আর কিছু বলে না বিনু। শ্যামল উদাস চোখে অনেক দূরে নদীর ওপারের ধূ ধূ বনানীরেখার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

একদিন স্কুল ছুটির পর বিনুরা অলস পায়ে নদীর পারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল স্টিমারঘাটায় নতুন একটা স্টিমার এসে লেগেছে। গোয়ালন্দ থেকে রোজ সকালে যে শাদা ধবধবে স্টিমারটা যাত্রী নিয়ে আসে এ সেটা নয়। এর রঙ ধূসর; আকারেও অনেক বড়।

বিনুরা দেখল, অনেক লোক স্টিমার-ঘাটার দিকে ছুটছে। দেখাদেখি ওরাও ছুটল এবং মুহূর্তে এসেও গেল।

স্টিমারঘাটার জেটিটাকে ঘিরে মেলা বসে গেছে যেন। রাজদিয়ার যত দোকানদার-আড়তদার-মাছব্যবসায়ী, সবাই ছুটে এসেছে।

স্টিমার, এমন কি জেটির ওপরেও কারোকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অগণিত পুলিশ চারদিক ঘিরে রেখেছে। এগুতে চাইলেই লাঠি তুলে তাড়া করে আসছে।

ভিড়ের ফাঁক দিয়ে একসময় বিনুরা দেখে ফেলল, স্টিমার থেকে অসংখ্য সৈন্য নামছে।

চারদিকের ভিড়টা চাপা ভীতু সুরে বলাবলি করতে লাগল, 'সৈন্য আইছে। রাইজদিয়াতেও তা হইলে যুদ্ধ আইসা গেল!'

'হায় আল্লা, কী হইব!'

'হা ভগমান, কপালে কী যে লেখছিলা!'

(ক্রমশঃ)

সতর্ক হোন

মানুষ সন্তানরা যে হারে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে তা রীতিমত ভাবনার। এই হার যদি বজায় থাকে, তবে আগামী কয়েক বছরের ব্যবধানে পৃথিবী মানুষের ভারে টলমল করবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, তার পরের অবস্থা নাকি আরো সঙ্গীন। মানুষে মানুষে গা ঘেষাঘেষি করে বাঁচতে হবে। পৃথিবীতে স্থান অসংকুলান। বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না হলে নিজের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রশ্নে প্রতিটি মানুষ আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য। সেদিনের কথা আভাস-ইংগিতে বুঝিয়ে দেওয়াই তাই বুদ্ধিমানের। পুরো ছবি আঁকতে গিয়ে অযথা বহুজনের বিরাগভাজন হয়ে লাভ নেই। তবে সময় থাকতে সতর্ক হওয়া ভালো। এ কথা বোঝার দিন আজ এসেছে।

সব দেশই মোটামুটি উদ্যোগ নিয়েছে। আসন্ন জনসংখ্যার চাপ থেকে আত্মরক্ষা এর মূল উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে বর্তমান জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলাও এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। নবজাতকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নির্দিষ্ট খাদ্য, বাসস্থান, আলো, হাওয়ায় তার একটি ভাগ বসছে। আমাদের সম্পূর্ণ অজান্তে। জেনেও উপায় ছিল না। যাকে পৃথিবীতে আনা হচ্ছে তার ভাগ তো ছেড়ে দিতেই হবে। এতদিন এ ঘটনা যেমন ছিল আমাদের অজ্ঞাত তেমনি আমরাও কোন সোরগোল তুলিনি। কিন্তু আজ সমস্যা বড় তীব্র। তাই বাধ্য হয়ে বুঝতে হচ্ছে। এবং বোঝাতেও হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবার পরিকল্পনামাফিক হোক। এলোপাথাড়ি আর নয়।

জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আরো একটি দিক আছে। নিজের এবং সন্তান-সন্ততির মুখ চেয়েই এই নিয়ন্ত্রণ। সর্বোপরি, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা তথা স্বাস্থ্যরক্ষা। অনেক সন্তানে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। শরীরে নানা রোগের উপদ্রব শুরু হয়। আয়ু কমে যায়। এরকম বহু ঘটনা আমাদের জানা আছে। বহু সন্তানে প্রসূতি এবং নবজাতক দুজনের জীবনই বিপন্ন হতে পারে। হয়েছেও অনেক। আবার যদিবা নির্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো তারপরই আসে নানা রোগ। যা দুর্বল তাই। সন্তানও [illegible] ঝড়ঝাপ্টা দুজনের উপর দিয়েই বয়ে যায়।

কম সন্তান [illegible] [illegible] অনেক নিরাপদ। প্রসূতি এবং প্রসূত দুজনেরই পক্ষে।

তাছাড়া মানুষের জীবৎকাল বাড়ছে। মৃত্যুহারও হ্রাস পাচ্ছে। সবদিক চিন্তা করে তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনা আবশ্যক। পৃথিবীতে এসে কেউই চট করে সরে যেতে চায় না। সবাই চায় দীর্ঘ জীবন। বিজ্ঞানের দৌলতে এই দীর্ঘ জীবন আমাদের করায়ত্ত।

এক সমীক্ষায় জানা গেছে, আমাদের দেশে ১৯৫০ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩০ বছর। ১৯৬৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫৮ বছর। এথেকেই বোঝা যায়, ক্রমে আমরা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁচাচ্ছি যখন সুদীর্ঘ জীবনভোগ আর কোন সমস্যাই থাকবে না।

এ সবটাই হচ্ছে আশার কথা। কিন্তু এপথে একটা মস্ত সমস্যা দিনে দিনে দানা বাঁধছে। মানুষের আয়ু বাড়ছে আর মৃত্যুহার হাজার প্রতি ৪৮'৬ থেকে কমে ১৪ হয়েছে। প্রতি বছর ২১ মিলিয়ন নবজাতক পৃথিবীর আলো দেখছে। মৃত্যু হচ্ছে মাত্র ৮ মিলিয়নের। বছরে লোকসংখ্যা বাড়ছে ১৩ মিলিয়ন। এই বার্ষিক বৃদ্ধি অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আরো একটু আলোচনা করলেই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হারটা স্পষ্ট হবে। ১৯৬৬ সালে আমাদের লোকসংখ্যা ছিল ৫০০ মিলিয়ন। এই সংখ্যায় পৌঁছুতে কয়েক হাজার বছর লেগেছে। কিন্তু গত আড়াই বছরে লোকসংখ্যা বেড়েছে ৩৩ মিলিয়ন। বর্তমান বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে আগামী পঁচিশ বছরে ভারতের মোট জনসংখ্যা হবে ১০০০ মিলিয়ন। সংখ্যাটা শুনে শিউরে উঠতে হয়। কারণ, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ ভারতে বাস করে। কিন্তু বিশ্বের স্থলভাগের মাত্র ২'৪ শতাংশ এলাকা নিয়ে আমাদের দেশ। জনসংখ্যার এই স্ফীতি এবং আমাদের জাতীয় আয়ে ভীষণ বৈষম্য। বিশ্বের মানুষের মোট আয়ের ১-৫ শতাংশ ভারতীয়দের আয়। এদিক থেকে আমরা পরস্পরের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত।

তাই আমাদের চিন্তা করতে হবে জনসংখ্যার এই স্ফীতি প্রতিরোধের উপায়। তবেই আমরা দীর্ঘজীবন এবং সুস্থদেহ নিয়ে বাঁচতে পারবো।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। সে কথা মনে রেখেই বিশ্বের বৃহত্তম পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী আমাদের দেশে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তা রূপায়ণের চেষ্টা চলছে।

একথা অবশ্য মানা দরকার, জনসংখ্যা শুধু আমাদের একার সমস্যা নয়। বিশ্বের অনেক দেশই আজ এই সমস্যায় বিব্রত। অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা করছেন। অবশ্য স্বাভাবিক জন্মনিয়ন্ত্রণে কোন কোন দেশ সৌভাগ্যশালী। এদের কথা স্বতন্ত্র। অন্যান্য সকলের সঙ্গে আমরাও ভাবিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ১০০ মিলিয়ন দম্পতির জন্য একটা মাত্র উপায়ে সিদ্ধিলাভ সম্ভব কিনা? সেটা সম্ভব নয়। তাই সরকারী উদ্যোগে প্রচলিত সবরকম ব্যবস্থারই আয়োজন রাখা হয়েছে। যার যেমন প্রয়োজন এবং রুচি তাদের তাই গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। একে বলে, ক্যাফেটেরিয়া অ্যাপ্রোচ।

পরিবার পরিকল্পনার জন্য আয়োজন বিরাট। কনডোম, ফোম ট্যাবলেট, ডায়াফারম, লুপ প্রভৃতি নানা ব্যবস্থা এর অংগীভূত। পিলের বহুল প্রচলন হলেও সরকার এব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছে। পাশ্চাত্য দেশে পিলের বহুল প্রচলন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া বিরূপ। তাই এই সতর্কতা। আরো একটা ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তা হলো হরমোন ইনজেকশান। পরীক্ষায় সফল হলেই এব্যবস্থাও চালু হবে। ফলে পরিবার পরিকল্পনা অনেক সহজতর রূপ নেবে।

ভারতে ১৯৫৬ সাল থেকে এপর্যন্ত ৩৫০ মিলিয়ন কনডোম বিলি করা হয়েছে। হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে কনডোম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আরেকটি পরিকল্পনা চালু হবে অনতিবিলম্বে। শিক্ষক, ডাকপিওন, গ্রামপর্যায়ের কর্মী এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নামমাত্র মূল্যে কনডোম বিক্রি করা হবে। বিক্রির পয়সা পুরোটাই এ'রা কমিশন বাবদ পাবেন। এরই পাশাপাশি চলছে নির্বীজন অস্ত্রোপচার এবং লুপের ব্যবহার। এব্যাপারে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। ১৯৬৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৫'৬ মিলিয়ন নির্বীজন অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং এসময়ে ভারতীয় মহিলারা ২'৯ মিলিয়ন লুপ গ্রহণ করেছেন।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গর্ভপাতকে আইনত সিদ্ধ করার জন্য একটি বিল তৈরি করা হয়েছে। সংসদে তা পেশ করা হবে।

পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কার্যসূচী রূপায়ণের পুরোপুরি অর্থ সাহায্য দিয়ে এই কাজ চলছে। সেই সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিও একাজে এগিয়ে এসেছে। বর্তমানে ৪০০ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং স্বায়ত্তশাসন সংস্থা সরকারী উদ্যোগকে সফল করার জন্য সহযোগিতা করছে। এই সকল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো জন্মহার হ্রাস। বর্তমানে হাজার প্রতি ৩৯ জনকে কমিয়ে ২৫-এ দাঁড় করানো। তাহলে এই প্রচেষ্টায় অনেকখানি গতিবেগ সঞ্চারিত হবে।

সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাই এক্ষেত্রে আমাদের পথ দেখাবে। তাছাড়া, সুখী এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ সকলেরই কাম্য। জনসংখ্যার ভারে দেশ যদি নুয়ে পড়ে, তবে তা কোনদিনই সম্ভব হবে না। এজন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। আধুনিক জগতে বাস করে আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এর বিপরীত হলে সে চলতি দুনিয়ার অনুপযোগী। সে কথাও ভেবে দেখা দরকার। আবার সবাই যখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী তখন আমরাই বা পিছিয়ে থাকবো কেন? তাই আগামী দিনের দিকে চোখ রেখে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হবে। আর গড়ে উঠবে আমাদের স্বপ্নের সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ।

আইনজীবীর ভূমিকায়

চোগা-চাপকান পরিহিত একজন মহিলা অ্যাডভোকেট মাননীয় বিচারপতিকে সম্বোধন করলেন, মাই লর্ড এবং তারপর শুরু হলো তাঁর সওয়াল। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আর ঋজুভঙ্গিতে তিনি বক্তব্য রাখলেন। পরিশেষে, তিনি যোগ করলেন পূর্ববর্তী কেসের রেফারেন্স। মাননীয় বিচারপতি গম্ভীর হলেন। অপরপক্ষের অ্যাডভোকেটের উদ্দেশ্যে বললেন, এ কথা কিন্তু আপনার জানা নেই। কোর্ট শেষ হলো।

কথাটা ততক্ষণে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। বার লাইব্রেরীতে জোর জল্পনা-কল্পনা। অনেকেই মন্তব্য করলেন, ভদ্রমহিলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অত বড় একজন বাঘা আইনজ্ঞকে রেফারেন্সে পুরো বসিয়ে দিয়েছেন। এমনি টুকরো-টাকরা মন্তব্য। মুহূর্তে লাইব্রেরীতে ঢুকলেন তিনি। কেউ কেউ এগিয়ে এসে সম্বর্ধনা জানালেন। সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলেন। অল্পদিনে ভদ্রমহিলার এহেন সাফল্যে সবাই অকুণ্ঠ।

এ ধরনের ঘটনা হাইকোর্টের জীবনে প্রায় নতুন অভিজ্ঞতা। এক সময়ে অনেক কিছুর মতো এও ছিল মহিলাদের নিষিদ্ধ সীমানা। তবুও এরকম স্বীকৃতি হালফিলে ঘটছে। দিনে দিনে হাইকোর্ট এবং অন্যান্য কোর্টে মহিলা আইনজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রতিভাও চাবুক হানছে।

হাইকোর্টে নবাগত, সম্ভবত সর্বাপেক্ষা তরুণ আইনজীবী শ্রীমতী মীনাক্ষী রায়-এর ঘটনা এটা নয়। তবু জের টানতে হলো। প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে আরো বেশি। কথাবার্তায় তাই মনে হলো।

মাত্র সেদিন হাইকোর্টে যোগদান করেছেন। এই বছরে এবং এই মাসের গোড়ার দিকে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে একটি বিরাট হার্ডল তিনি অনায়াসে পেরিয়ে এসেছেন। কোর্টে জজসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সওয়াল করার পরীক্ষায় তিনি ফুল মার্ক পেয়ে পাশ করেছেন। ব্যাপারটা বিস্ময়ের। এটুকু অভ্যস্ত করতেই অনেকের দীর্ঘদিন কেটে যায়।

শ্রীমতী মীনাক্ষী ছেলেবেলা থেকেই আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। বিশেষ করে যখন বি-এ পাশ করলেন। সরাসরি আইন কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন। ছাত্রজীবন বরাবরই বেশ সাফল্যমণ্ডিত। আশুতোষ কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পড়াশোনা এবং খেলাধুলোয় দুটোতেই তিনি পারঙ্গম। কলেজে তিনি ছিলেন টেবিল-টেনিস চ্যাম্পিয়ন।

কলেজ পেরিয়ে আইন অধ্যয়নের সময়ও মনে হয়নি শ্রীমতী মীনাক্ষী একদিন সত্যি সত্যি হাইকোর্টে যোগদান করবেন, জজসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সওয়াল করবেন। কারণ, সবাই তো আর আইন পড়ে আইনজীবী হন না। তা ছাড়া এরকম মনে করার আরো কারণ আছে। শ্রীমতী মীনাক্ষীকে দেখে আজো মনে হয় না তিনি একজন অ্যাডভোকেট। চালচলনে কেতাদুরস্ত ভাব নেই। কথাবার্তায় অত্যন্ত আন্তরিক। অমায়িক। বন্ধুবৎসল। কাজের পরও বাড়িকে অবহেলা করেন না। হয়তো ভবিষ্যতে কাজের চাপে এদিকটা গৌণ হতে পারে। কিন্তু ঘরের কাজে যেরকম টান তাতে মক্কেলের ঝামেলা পুইয়েও এদিকটা তিনি বজায় রাখতে পারবেন মনে হয়। অবশ্য সংসারের দায়িত্ব এখনো তাঁর ওপর এসে পড়েনি।

কথায় কথায় শ্রীমতী মীনাক্ষী জানালেন, মাত্র সেদিন হাইকোর্টে গেছি। স্বাধীনভাবে মামলা চালানোর সুযোগ তাই এখনো পাইনি। কিন্তু কথাবার্তায় বোঝা গেল, শিগগিরই স্বাধীনভাবে মামলা চালানোর সুযোগ তাঁর হবে। তাঁর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যেই তা বেশ বোঝা যায়। এরকম আইনজীবীর মামলার অভাব।

শ্রীমতী মীনাক্ষী আরো উৎসাহিত। হাইকোর্টে এখন মহিলা আইনজীবীর সংখ্যা প্রায় শতাধিক। এ'দের মধ্যে অনেকেই বেশ সাফল্য অর্জন করেছেন। মেয়েরা যে ক্রমেই এদিকে বেশি সংখ্যায় ঝুঁকছেন। এতে তিনি আনন্দিত। কিন্তু একটা কথা ঠিক শতজন সহস্রজন হলেও তিনি নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে পারবেন অনায়াসে। জীবনের প্রারম্ভেই যে সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন তা অক্ষুন্ন রেখে পরিপূর্ণ গৌরবে পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে তাঁর খুব একটা সময় লাগবে না।

বিশেষ, এ পেশায় তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য নেই। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ। বাড়ির সকলেরই শুভেচ্ছা ছিল। সেই শুভেচ্ছা আর নিজের কৃতিত্বেই তিনি সব হার্ডল অতিক্রম করে সাফল্যের চাবিকাঠি করায়ত্ত করবেন আশা করা যায়।

সংবাদ

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় (প্রাইভেট) প্রথম এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন শর্মিলা পাল এবং সুচরিতা পাল। উল্লেখযোগ্য, এ'রা দুই বোন।

●

শ্রীমতী লীলা দাস এবার রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ (সোসিওলজি) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

●

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীমতী সাধনা রায় এ বছর এম-বি বি-এস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। উল্লেখযোগ্য গত দু বছর ধরে শ্রীমতী সাধনা খেলাধুলোয় বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন।

—প্রমীলা।

রমেশ দত্তের
রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (২০)
চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন

বইপত্র আপনি কতো ভালভাবে পড়তে পারেন ?

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই একটা মস্ত বড় অসুবিধে হলো, যা কিছু আমরা পড়বো বলে ইচ্ছে করি, তার সব কিছু পড়ে ফেলার সময় করে উঠতেই পারি না। আরও জিনিস পড়ে ফেলতে চাই, আরও বেশি মনে রাখতে চাই।

নীচের মনোপ্রশ্নচর্চাটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে নিপুণ-ভাবে বইপত্র, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়ার এবং তা থেকে যতটা বেশি পারা যায় আনন্দ-তৃপ্তি ও সুফল পাবার কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি প্রশ্নে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' জবাব দিতে থাকুন। তারপর মোট কত পয়েন্ট পেলেন হিসাব করুন এবং মাপকাঠি কাজে লাগান।

১। কোনো কিছু পড়বার গতি বাড়িয়ে তোলার জন্যে আপনি কি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন ?

২। কোনো প্রবন্ধ-আলোচনার বই পড়তে সুরু করার আগে আপনি কি বই-খানির বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবেন এবং সে-বিষয়ে আগে কিছু জেনেছিলেন, তা নিয়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করেন কি ?

৩। আপনি যখন কোনো বই পড়েন, তখন কি প্রথমে খুব তাড়াতাড়ি একবার পড়ে নিয়ে, তারপরে যত্ন করে ভেবে-চিন্তে আর একবার পড়েন ?

৪। একটা প্যারাগ্রাফ পড়বার সময়ে আপনি কি তার মধ্যেকার আদৎ মূল বক্তব্যটুকু ধরবার দিকে লক্ষ্য রেখে পড়তে থাকেন ?

৫। কোনো বই পড়বার সময়ে কয়েক পাতা অন্তর একবার করে থেমে এতক্ষণ কি পড়লেন, তা নিয়ে একটু চিন্তা করা কী আপনার অভ্যাস ?

৬। আপনি কী পড়বার সময়ে যাচাই করে, সমালোচনা করে পড়েন এবং বই-এর কিংবা খবরের কাগজের কথার বাইরে মনকে চিন্তা করবার জন্যে ছেড়ে দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত তৈরী করে নেন ?

৭। পড়বার সময়ে আপনি কি সর্বদা বেশ মন দিয়ে কোনটুকু তথ্য এবং কোনটুকু কেবল তত্ত্ব বা মতবাদ, তার মধ্যে পার্থক্য বোঝবার চেষ্টা করেন ?

৮। আপনি যে-খবরের কাগজ পড়েন, তাতে নানা ধরণের যে সব নিয়মিত আলোচনা অর্থাৎ ফিচার বেরোয়, সেগুলির যেটি আগে যেটি পরে পড়েন, প্রায় প্রত্যেকদিনই কী তেমনি নিয়মমাফিক পর পর পড়তে থাকেন ?

৯। পড়বার সময়ে, লেখকের কোনো গোঁড়ামী বা পাণ্ডিত্য-অভিমান থাকার সম্ভাবনা আপনার মনের কোণে জাগিয়ে রাখেন কি ?

১০। পড়তে পড়তে আপনি কি মাঝে মাঝে লেখার মধ্যে ভুলভ্রান্তি, সন্দেহ জাগবার মতো কথা এবং ভিত্তিহীন যুক্তি পেলে দাগ দিয়ে রাখেন ?

১১। আপনি কি কখনো কম আলোতে পড়বার চেষ্টা করেন ?

১২। আপনি কি সচরাচর বই-এর ভূমিকা পড়া বাদ দিয়ে যান ?

১৩। যেসব কথার মানে আপনি বুঝতে পারেন না সেগুলি বাদ দিয়ে পড়ে চলার দিকেই কি আপনার ঝোঁক বেশি এবং অভি-ধান খুলে কথাটির মানে জেনে নেওয়াটা ঝঞ্ঝাট বোধ করেন ?

১৪। যেসব বই পড়েন, তা থেকে কখনো কোনো নোট নেওয়া, কিছু টুকে রাখা, কিংবা খবরের কাগজ থেকে কাটিং কেটে রাখাটাকে আপনি কী ঝঞ্ঝাট বলে মনে করেন ?

১৫। মাঝে মাঝে প্ল্যান করে আপনি পড়াশুনোর প্রোগ্রাম ঠিক করার চেয়ে যখন যা পেলেন তাই পড়ে ফেলা পছন্দ করেন ?

১৬। পড়বার সময়ে যাতে অন্যমনস্কতা না জাগে, সেজন্য আপনি কি কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে পড়তে বসা অপছন্দ করেন ?

১৭। যা পড়েছেন, তা নিয়ে আপনি কি খুব কম আলাপ-আলোচনা করেন ?

১৮। একসঙ্গে একটানা অনেকগুলি কথা পড়ে না গিয়ে, একটি একটি করে কথা পড়ে মানে বোঝবার দিকেই আপনার কি বেশি ঝোঁক ?

১৯। কোনো কিছুই এক নাগাড়ে মিনিট দশেকের বেশি পড়তে থাকা কি আপনার স্বভাববিরুদ্ধ ?

২০। আপনি যা কিছু পড়েন, তার বেশির ভাগই কি হাল্কা ধরনের বিষয় ?

●

প্রথম দশটি প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' জবাব হলে ৫ পয়েন্ট করে পাবেন। শেষের দশটি প্রশ্নের উত্তরে 'না' জবাব দিয়ে থাকলে ৫ পয়েন্ট করে পাবেন।

৭৫ বা তারও বেশি পয়েন্ট পেলে বলতে হবে খুব চমৎকার, এবং ঐভাবে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারলে আপনার মানসিক দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলবে।

৬০ থেকে ৭০ পয়েন্ট পেলে মোটামুটি ভালো।

যদি ৫০ পয়েন্টেরও কম পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনার বইপত্র পড়বার অভ্যাসের উন্নতি করবার জন্যে একটা কিছু করতে হবে বলে বুঝবেন।

বইপত্র, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ ইত্যাদি থেকে নানাধরনের লেখা পড়ে আনন্দ-তৃপ্তি পেতে কে না চায় ? কিন্তু পড়তে ভালোই লাগে না অনেকের। সুতরাং যাঁরা কোনো কিছু পড়ে আনন্দ আহরণ করতে চান, তাঁদের মনে রাখতে হবে, পড়তে ভালো লাগানো আগে দরকার।

যদি পড়তে ভালো লাগার অভ্যাস সৃষ্টি করবার ইচ্ছে হয়, তাহলে এমন কিছু পড়া প্রথমে সুরু করতে হবে, যে-বিষয়ে নিজস্ব আগ্রহ অনুরাগ আছে প্রচুর।

যা পড়তে ভালো লাগে, তাই পড়তে পড়তেই বইপত্র পড়বার অভ্যাসটিকে ক্রমশ উন্নত করা সহজ হয়। আর, তার ফলে আপনার রুচির তৃপ্তিসাধন হয় বলেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে পারে সুন্দরভাবে।

চায়ের সরঞ্জাম। কিন্তু রামবাহাদুর আসেনি। আজকাল ওর আসাটা আস্তে আস্তে কমে আসছিল। ছবিওয়ালা সাহেবের মেমসাহেব আসার পর থেকেই রামবাহাদুর আগের মত আর ছুতোনাতা করে ভুটিয়া বস্তিতে নেমে আসতো না। অনুযোগ করলে বলেছে, মেমসাহেব আসায় কাজ বেড়েছে। মেমসাহেবকে খুশী করতে পারলে ওর হয়তো দু-পাঁচ টাকা মাইনে বাড়তে পারে। চাইকি তাই দিয়ে মাইলির জন্য রুপোর লবঙ্গ ফুলও গড়িয়ে দিতে পারবে। ঝিক্ করে হেসে উঠেছে মাইলির চোখ-দুটো। আর রামবাহাদুর অজস্র গল্প করেছে তার মেমসাহেবের। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একটু পরেই উসখুস করেছে ওঠার জন্য। একটুও ভাল লাগেনি মাইলির। তবুও যেতে দিতে হয়। আর তারপর থেকেই সুরু হয় প্রতিদিনের প্রতীক্ষা। এ তিনদিন কতবার একটু শব্দেই ছুটে গিয়ে খুলে দিয়েছে দরজা, কিন্তু আসেনি রামবাহাদুর। শুধু ঝড়ো হাওয়া পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে চলেছে। ক্ষোভে দুঃখে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে মাইলি। চোখ ফেটে জল এসেছে ওর।

এমনি করে আর একটি সকাল হোল, কিন্তু নিয়ে এল না কোন আলোর ইশারা। ঘন কুয়াশা, বৃষ্টি আর কনকনে ঠান্ডায় মনে হয় রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে দুর্যোগের সকাল। কেমন যেন চাপা একটা গুম্ গুম্ শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি-দুর্যোগে ওরকম শব্দ পাহাড়ে মাঝে মাঝেই শোনা যায়। দূরে বা কাছে পাথরের বড় বড় চাঙড় ভেঙে পড়া বা ছোটখাট ধস নেমে ছড়িয়ে পড়ার শব্দের প্রতিধ্বনি সমস্ত পাহাড়ময়।

সকাল হয়েছিল 'Dall's Dream' এ। ঠিক সকাল নয়। অন্ধকার যেন বৃষ্টি আর কুয়াশার ছদ্মবেশে সমস্ত শহরকে ঘিরে রেখেছিল। ভারি পর্দাটা সরিয়ে বৃষ্টি দেখছিল রমলা। এই আবহাওয়ার জন্য দার্জিলিং শহরটা যেন মুখ গোমড়া করে আছে। কিন্তু রমলার খুব—খুব ভাল লাগছে এমনি ঘরের উষ্ণ আরামে বসে বৃষ্টিকে উপভোগ করতে। শুধু দুঃখ হচ্ছে সখের ছোট্ট বাগানটার জন্য। নতুন লাগান স্কোয়াশের গাছগুলো একটাও নাই। গোলাপ আর ইন্দ্রকমলের গাছগুলোকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে হুহু করে বৃষ্টির জল নেমে চলেছে ঢালুর দিকে। 'চায়ে—না কফি?' প্রশ্নটায় ঘুরে দাঁড়াল রমলা। রাম-বাহাদুর তাকে জিজ্ঞাসা করছে। শান্তনুর দিকে এক-ঝলক তাকিয়ে উত্তর দিল রমলা, 'কফি।' একটু পরেই বাহাদুর গরম কফির সঙ্গে কিছু বিস্কুট নিয়ে এল। আর কিছু নেই? জানতে চাইল রমলা। নিঃশব্দে মাথা নাড়লে বাহাদুর। এ কদিন ও নীচে নামতে পারেনি, তাই বাজারেও যাওয়া হয়নি। শব্জী আছে? জী। উত্তর দেয় রামবাহাদুর। মুখ তুলতেই চোখাচোখি হল বাহাদুরের সঙ্গে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রমলার দিকে। ভাবলেশহীন পাথরের মত মূর্তি। ওর চোখ দৃষ্টিতে কিসের যেন ছায়া। মনটা কেমন ভারি হয়ে ওঠে রমলার। মাঝে মাঝেই অমন করে তাকায় ও, সাপের চোখের মত ঠান্ডা চাউনি মেলে। আর ঠিক তখনই ভেতরটা শিরশির করে ওঠে।

—আচ্ছা তুমি এখন যাও। ওকে সরিয়ে দিয়ে গরম কফিতে নিজেই দুধ মেশায় রমলা। মস্ত একটা মোটা অ্যালবামে চোখ রেখে বসেছিল শান্তনু। কফিটা এগিয়ে দিয়ে অনুযোগ জানায় রমলা,—যাই বল বাপু, তোমার ঐ বাহাদুর লোকটা যেন কেমন।

অ্যালবাম থেকে চোখ না তুলেই শান্তনু প্রশ্ন করে, কেন?

—বাঃ দেখ না, শিকারী চিতার মত কেমন নিঃশব্দে হাঁটাচলা করে।

—তা করুক, কিন্তু খুব একটিভ। তোমাকে তো সংসারের কিছুই দেখতে হয় না।

কি বিশ্রিভাবে চেয়ে থাকে দেখেছ? আবার অভিযোগ তুলে ধরে রমলা।

— তাই নাকি? একটা দুষ্টুমি ভরা হাসি ঝিলিক দেয় শান্তনুর ঠোঁটে। রমলা আর কথা না বাড়িয়ে খালি কাপগুলো তুলে নিয়ে কিচেনের দিকে চলে যায়।

নাঃ, শান্তনুকে বলে কিছু হবে না। অনেক দিনের পুরানো আর বিশ্বাসী বলে কি চোখেই যে দেখেছে বাহাদুরকে। নতুন বিয়ের পর "Dall's Dream" -এ এসে কি ভাল যে লেগেছিল রমলার, শুধু ঐ রামবাহাদুরটি যদি না থাকতো। কিচেনে এসে শব্জীর ঝুড়িতে উঁকি মেরে দেখে রমলা। সামান্য কিছু আলু পড়ে আছে। বারান্দা থেকে বাহাদুরকে ডাকে। নীচ থেকে উত্তর আসে, আর একটু পরেই মুরগীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রাম-বাহাদুর। ঘন বৃষ্টির মাঝে ঝাপসা দেখায় ওর মূর্তিটা। তবুও রমলা দেখতে পায় হাতে ওর মুরগী জবাই-এর বড় ছুরি। পোশাকের এখানে ওখানে রক্তের ছিটে। রমলা বলে, বিকালের দিকে বৃষ্টি যদি ধরে বাজারে যেও, শব্জি নেই। আরও কিছু দরকারী জিনিস আনার আছে। খুদে খুদে চোখ দুটো তুলে রমলার দিকে তাকায় বাহাদুর আর অস্পষ্ট গলায় বলে, 'জী'। তারপর আবার ঢুকে যায় মুরগীর ঘরে।

সারাটা দিন প্রায় একভাবে কাটে। খাবার টেবিলে বসে শান্তনু বলে, কি করি বলত? এমনি ভাবে আর কতদিন চলবে। হাতে টাকা পয়সা নেই। কয়েকটা অর্ডার আছে ওগুলো দিতে পারছি না।

ম্যালের কাছেই ওর একটা নিজস্ব ফটোর দোকান আছে। নিজের যত্ন পরি-শ্রমে গড়ে তুলেছে শান্তনু। সিজন টাইম বিশেষ করে এই পুজোর মুখে যথেষ্ট ভিড় হয়।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে আর সন্ধ্যা এগিয়ে চলে রাতের গভীরতার দিকে। শেলেট রং আকাশটার দিকে তাকালে ভয় করে। আজ বিকেল থেকে কলে জলও আসছে না। ফায়ার প্লেসের নিভন্ত আগুনের কাছে চুপ করে বসেছিল রমলা। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল শান্তনু। শার্সির ওপর থেকে পর্দাটা একটু সরালো। সূচী-ভেদ্য অন্ধকার। ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা আর বৃষ্টির একটানা কান্না। তাকিয়েছিল রমলাও। রাতের দার্জিলিং কোথায় হারিয়ে গেছে। যখন পাহাড়ের গায়ে আলোকিত বাড়ী-গুলো দেখে রমলার মনে হত রোজই দেও-য়ালীর উৎসব চলেছে।

ফায়ার প্লেসের আগুনটা একদম নিভে গেছে। ঘরের মধ্যে কন্‌কনে ঠান্ডা ভাব। শান্তনু বলে আমি একটু ডার্করুমে যাচ্ছি। 'না—না', আর্তনাদ করে ওঠে রমলা। বোবা আতঙ্কে ওর মনটা ছেয়ে আছে সন্ধ্যা থেকে একটা আসন্ন অশুভ কিছুর প্রত্যা-শায় কিছুতেই একা থাকতে চাইছে না। ভয়কি? কথাটা বলতে চেয়েছিল শান্তনু। কিন্তু বলা হোল না। তার আগেই দপ্ করে আলোটা নিভে গেল। শান্তনু... একটা ভয়ার্ত শব্দ বেরিয়ে আসে রমলার গলা দিয়ে। ঠিক সেই সময়ে দুলে উঠলো সমস্ত বাড়ীটা। কিচেনের দিকে প্রচন্ড শব্দ। অন্ধ-কারের মধ্যে গুম্ গুম্ শব্দে যেন হাজারটা মেলট্রেন ছুটে আসছে। আর্তনাদ... ... অন্ধকার।

ধস্—ধস্ নেমেছে। ওরা দুজনে ছুটে বেরতে চায় কিন্তু সামনের বারান্দা আর কিচেনটা নাই। একটা অসীম শূন্যতা সামনে হাঁ করে আছে। বা-হা-দু-র, গলা চিরে ডাকটা বেরিয়ে আসে শান্তনুর।

অসম্ভব দুলছে বাড়ীটা। হাত বাড়িয়ে শান্তনুকে ধরতে গেল রমলা। আর ঠিক তখনই মনে হলো, আকাশটা মাথার ওপর ভেঙে পড়ল বুঝি। চুন বালি আর কাঠের টুকরোর মধ্যে মেঝের একটা অংশে ঝুলছে রমলা। চোখের সামনে গলান আলকাতরার মত অন্ধকার। ওপরে নীচে, শান্তনু যেখানটা দাঁড়িয়েছিল সেখানটায় অতলস্পর্শী শূন্যতা নিয়ে হাঁ করে আছে অন্ধকার। কোথায় আছে ও, ঝুলছে কেন এমন করে কিছুই বুঝতে পারে না রমলা। পাতালের অন্ধকার ক্রমশঃ টানছে ওকে নীচের দিকে। শরীরের সমস্ত শক্তি আশ্রয় নিয়েছে দুটো হাতে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা জান্তব ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে রমলা। কিন্তু গলা দিয়ে শুধু একটা বিকৃত গোঙানি বেরয়। আর দুটো শক্ত হাত ওকে টেনে তুলতে চেষ্টা করে। ঈশ্বর...... ঈশ্বর আমি বাঁচবো........আমি বেঁচেছি। মনে মনে বলে রমলা, চেতনার শেষ বিন্দুকে আঁকড়ে ধরতে চায়। অন্ধকারের হাত দুটো ওকে মেঝের ওপর তুলে আনে। নিরাপদ আশ্রয়ে নিজের প্রাণস্পন্দনকে নিবিড় করে যেন অনুভব করে রমলা। 'মাইজী'—একটা ভাঙা অস্পষ্ট ডাকে চোখ মেলে তাকায় রমলা। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বাহাদুর ডাকছে। না। রমলা ভুল দেখেনি। দুর্যো-গের শেষ রাতের অস্পষ্ট আলোতেও ও দেখতে পায় বাহাদুরের খুদে খুদে চোখ দুটোতে জমে আছে অনেক উদ্বেগ অনেক মমতা। আস্তে আস্তে চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে আসে রমলার। কিন্ত ঠোঁট ওকি কিসের লোনা স্বাদ? সেকি ওর রক্তের না চোখের জলের? ঠিক বুঝতে পারে না রমলা।

১

এরিনার মঞ্চসজ্জা

১
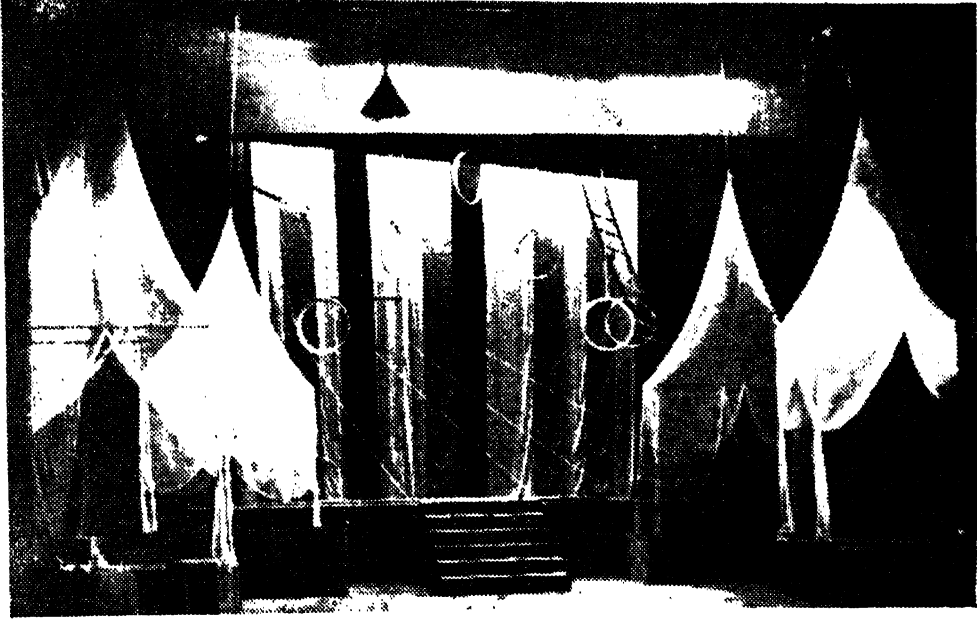
আলোর বৃত্তে

ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার

কিছু কিশোর ছাত্র একদিন অভিযোগ পেশ করলো কয়েকজন প্রখ্যাত প্রবীণ শিল্পীর কাছে—'আচ্ছা, আপনারা যদি শুধু অভিজ্ঞ শিল্পী নিয়ে নাটক করেন, আমরা তাহলে সুযোগটা পাই কেমন করে? আমাদের নিষ্ঠা আছে, সততা আছে, অভিনয়-শিল্পকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমরা মঞ্চজগৎকে ঘিরে বাঁচতে চাই, অথচ সামান্য একটু সুযোগের অভাবে ব্যর্থতার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের নিয়ে গড়ুন একটি নাট্যসংস্থা—হয়তো এমনও হোতে পারে কিশোর মনের চাহিদা নতুন সৃষ্টির উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগাবে।' প্রবীণ শিল্পীদের মন কিন্তু এতে এতটুকু ক্ষুব্ধ হোল না। কিশোরদের স্বতঃস্ফূর্ত নাট্যানুরাগকে জানালেন এঁরা আন্তরিক অভিনন্দন। এদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। কিশোরদের উন্মাদনা হোল সীমাহীন। এক আবেগদীপ্ত মুহূর্তের উদ্বেলতায় বহু সম্ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠলো একটি নাট্যগোষ্ঠী। সবার শুভেচ্ছা নিয়ে নাম পেলো 'ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার'। প্রবীণদের আশীর্বাদ আর কিশোরদের প্রাণোচ্ছল উচ্ছ্বাস দুই-ই আবির্ভাব-মুহূর্তটিকে স্মরণ করে রাখলো।

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে পরিণত চিন্তা আর আবেগ উদ্দীপনার অস্ফুট প্রথম প্রকাশের বিহ্বলতার মধ্যে সেতুবন্ধন করে একটি শৈল্পিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার ব্যাপারে যিনি প্রথম কর্ণধারের কাজ করেন, তিনি হোলেন গোষ্ঠীর সম্পাদক শীতাংশু চক্রবর্তী। এই প্রসঙ্গে নাট্যকার, নির্দেশক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'প্রথমেই এ-কথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারকে শুরু থেকে বর্তমান ধাপ পর্যন্ত সম্পাদক শীতাংশু চক্রবর্তী দৃঢ় পদক্ষেপে নিয়ে এসেছেন। শ্রীচক্রবর্তীর নির্ভীক নিষ্ঠা হয়তো সংস্থাকে বহু যোজন পার হোতে সাহায্য করবে।'

গোষ্ঠী তো প্রতিষ্ঠিত হোল। এবার নাট্যপ্রযোজনার পালা। শিল্পীরা প্রত্যেকেই সচেতন। তাঁরা যে পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রযোজনার কথা ভাবছেন, সেখানে নাট্যচর্চার গভীরতা সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে, আন্দোলন আর আলোড়নের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটক একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যে নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। এঁরা ভাবলেন তাই নাট্যানুশীলনের এই ব্যাপ্ত পটভূমিকায় এঁদের দায়িত্ব অনেক। নাট্যনির্বাচনে বহু চিন্তা, বহু সমীক্ষার প্রয়োজন। বেশ কিছু ভাবনা যেদিন অনেক প্রহর অতিক্রম করে সংহত হোল, সেদিন থেকেই শুরু হোল নাটকের মহড়া। মহড়া পূর্ণতা পেলে হোল মঞ্চরূপায়ণের আয়োজন। এমনি করেই চললো প্রযোজনার ধারা। নাটক হোল 'এরিনা', 'সূর্যচেতনা', 'এ দশকের কান্ড', 'বুট-পালিশ', 'সিগারেটের মৃত্যু' প্রভৃতি। প্রতিটি নাটকেই আকাশ আর সূর্যের মতো ভাস্বর হয়ে উঠলো জীবন।

ট্রাপিজের দোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত চলছে মরণ নিয়ে যে-খেলা তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এরিনা নাটক। যে মানুষগুলো মরণ হাতে নিয়ে এরিনার ঝলমলে আলোর নীচে বিচিত্র বেশে এসে দাঁড়ায়—একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় ঠিক আমাদের মতোই সামান্য একটু আশা আর স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা তাদের কতো প্রবল। এরিনাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে রয়েছে ছোট ছোট অসংখ্য তাঁবু। জানোয়ারের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে বেঁচে থাকে অনেক ছোট ছোট তাঁবুতে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু তাদের মানুষ বলে মেনে নিতে সার্কাস-মাস্টার ভুলে যায়। গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের জীবন মাস্টার ইলেক্‌ট্রিক হান্টারের ঘায়ে ঠিক জানোয়ারের মতো বশ করতে চেষ্টা করে মানুষগুলোকে। জীবন মাস্টার বলে—'এদের আবার সাধ-আহ্লাদ কি। দুমুঠো খেতে পেয়ে জানোয়ার যেমন খুশী, এদেরও তেমনি খুশী থাকতে হবে, নইলে—'জীবন মাস্টার

সূর্যচেতনা নাটকের দৃশ্য

ভুলে যায় দিনের পর দিন মুখ বুজে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে যন্ত্রণার রঙ বদলায়--- হয় সূর্যের মতো লাল---সেই সূর্যের শক্তি নিয়ে মানুষ একদিন বিদ্রোহ করে? এই নাটকটির বিষয়বস্তু প্রয়োগ-পরিকল্পনা বাংলাদেশের নাট্যানুরাগীদের বিস্মিত করে এবং 'ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারে'র নাট্য-প্রযোজনার রীতি নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।

'সূর্যচেতনা' নাটকটির প্রযোজনা ক্যাল-কাটা আর্ট থিয়েটারের আর একটি বলিষ্ঠ সৃষ্টি। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাকার চুদ্রা'র ছায়া অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছেন পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভল্গা নদীর পারে একদল পরিশ্রান্ত মানুষ থমকে থমকে নিশ্বাস টেনে ঘুমিয়ে আছে। মাথার ওপরে আকাশটা কতো বড়ো। উজাড় করে মুক্তির বাতাস প্রাণভরে ঢেলে দিচ্ছে আকাশটা। মানুষগুলো তবু বুক ভরে মুক্তির বাতাস টেনে নিতে পারছে না। তাদের কণ্ঠনালী অবরোধ করে রেখেছে অত্যাচারী শাসক কুজীন আজাজ। কিন্তু একদিন মেঘের অন্তস্তল ভেদ করে উঁকি মারলো সোনার রঙের সূর্য। ভল্গায় এলো জোয়ার: লাইকো জোবার ক্লান্ত মানুষগুলোর কানে ঢেলে দিলো নবজাগরণের উচ্ছ্বসিত গান--

চোখ মেলে দেখ এল জোয়ার
ঘুম ভাঙানোর এল জোয়ার
এল যে প্রাণের
জোয়ার, জোয়ার
জোয়ার

মানুষগুলো এসে দাঁড়ালো তখন নীলাভ আকাশের নীচে---বুকভরে টেনে নিতে চাইলো মুক্তির প্রশান্ত বাতাস।

যেসব নাটকগুলো নিয়ে ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার প্রস্তুতি চালাচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক নাট্যরূপায়িত 'মাটি আর নেই', ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদগ্ধ নটী', 'দর্পণে মিছিল', 'শহর কলকাতা'। 'মাটি আর নেই' এক আশ্চর্য জীবনরস-সমৃদ্ধ নাটক। বিচিত্র একদল মানুষ---না গৃহী, না যাযাবর। কোন্ অতীতে এদের চলা শুরু হয়েছে তার খোঁজ কেউ রাখে না। চলতে চলতে কখন এসে এরা বাসা বেঁধেছে কোন পথের ধারে---কখন আবার মালিক এসে তাড়িয়ে দিয়েছে এদের---দলের বুড়ো লখাই-এর ইতিহাসের ঝোলায় তার হিসেব রয়েছে। একদিন কখন এসে এরা দাঁড়িয়েছে সমুদ্রের মুখে-মাটির শেষ সীমানায়। আর তো এদের চলার উপায় নেই। এরপর জল। এরা এরপর কোথায় যাবে? এই চলার ইতিহাস নিয়েই 'মাটি আর নেই' নাটক।

ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার শুধু নাট্যাভিনয়ের মধ্যেই নিজেদের প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। নানারকম প্রগতিমূলক কাজ নাট্যোন্নয়নের তাগিদেই করতে এঁরা ব্রতী হয়েছেন। আজকে মঞ্চের অভাবে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর যে কি অসুবিধেয় পড়তে হয়, সে সম্পর্কে এর প্রতিটি শিল্পী, সভ্য সচেতন। তাই এঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন কিভাবে মুক্ত অঙ্গনের মতো আরো মঞ্চ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের শিল্পীরা দুর্গাপুরে নতুন একটি 'মুক্ত-অঙ্গন' প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে যান। 'সূর্য-চেতনা' নাটক দিয়ে এ-মঞ্চের উদ্বোধন হয়। আর্থিক চাহিদা মেটাতে নয়---শুধুমাত্র দুর্গাপুরে মুক্তঅঙ্গনটিকে চালু করার উদ্দেশ্যে এঁরা কয়েকটি রজনী 'সূর্যচেতনা', 'এ দশকের কাণ্ড' ও 'উজান' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করেন। রঙ্গালয়ের অভাবে কতো প্রতিভাবান শিল্পী, পরিচালক, নাট্যকার ও নাট্যসংস্থা দর্শকের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার সুযোগটুকু পাচ্ছেন না। তাঁদের বাসনা সবটা পূরণ করতে পারবে এমন দাবী ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার অবশ্যই করবে না--কিন্তু অন্ততঃ একটি 'মুক্ত-অঙ্গন' প্রতিষ্ঠা করার কাজে এঁরা এঁদের সমস্ত শক্তি আর উদ্যম নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন এ-গর্ব নিশ্চয়ই এঁরা করতে পারেন।

কলকাতার অনেক জায়গায় 'ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার' অভিনয় করেছে। সংস্থার শিল্পীদের নাট্যচর্চার আন্তরিকতা কল-কাতার প্রায় প্রতিটি দর্শকের অভিনন্দন কুড়িয়েছে। এবার এঁদের কাছে অভিনয় করার আমন্ত্রণ এসেছে সুদূর আসাম এবং বোম্বাই থেকে। আগামী সেপ্টেম্বরে 'এরিনা', 'সূর্যচেতনা', 'বিন্দুর ছেলে', 'বিদগ্ধ নটী' নাটক নিয়ে চলেছেন আসাম সফরে। আগামী নভেম্বরে এঁরা যাবেন বোম্বাই সফরে। সেখানে আগের নাটকগুলো অভিনীত হবে, আর সঙ্গে থাকবে ইবসেনের হেডা গ্যাবলার অবলম্বনে 'শকুন্তলা রায়' নাটক।

নাটক আর জীবন- দুয়ের সম্মিলন সম্পর্কে ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের ধারণা হোল-- নাটক জীবনের দর্পণ---সুতরাং জীবনের কথা অবশ্যই নাটক শোনাবে। এ-জীবন ছড়িয়ে আছে কলকারখানায়, খেতে-খামারে, পথে-প্রান্তে, ট্রামে-বাসে, ভাঁড়ের চায়ের দোকানে, কাফে-রেস্তোরাঁয়, মনুমেন্টের তলায়, হকার্স কর্ণারে, নিউ মার্কেটে, স্যাঁতসেঁতে বস্তীতে, এয়ারকণ্ডিশানড ঘরে, মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ, নিয়ন আলোর ভিড়ে আর প্রদীপের শিখায়।

একই ঘরে বসে ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের কোন সভ্য আবৃত্তি করে—

ওরে তুই ওঠ আজি
আগুন লেগেছে কোথা
কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎজনে...

আবার কেউবা গায়—

এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর হে সুন্দর।

'ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার' জীবনের ছবি এঁকে যাবে, বলেছেন পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ কোন মতবাদ প্রচারের অছিলায় নয়---কুৎসা রটনার প্রবৃত্তি নিয়ে নয়--সমাজে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে নয়---অন্ধকারের জীবনকে আলোর জীবনের কাছে পৌঁছে দেবার আশায়, মানুষের দরবারে মানুষের কথা পৌঁছে দেবার তাগিদে।

সময়ের হিসেব করলে 'ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার' নাট্যপ্রযোজনার কোন দীর্ঘ ইতিহাস মোটেই লিখতে পারেনি। তবে এ-কথা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে প্রথম প্রযোজনার পরই নিজেকে সে বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটার পিছনে রয়েছে এই গোষ্ঠীর প্রতিটি শিল্পীর নাট্যচর্চার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ আর বাংলা নাটককে একটি সার্থক-তম ব্যাপ্তি দেওয়ার আকুলতা। এঁরা আশাবাদী। তাই বিশ্বাস করেন অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর সামনে আজ যে কালো মেঘ আছে, তা একদিন নিশ্চয়ই অপসারিত হবে। ভবিষ্যতে বাংলা নাটকের ইতিহাসে অ-পেশাদার নাট্যগোষ্ঠীদের প্রয়াস হবে স্বর্ণাভ উজ্জ্বলতায় চিহ্নিত। সূর্যচেতনায় আজকের অন্ধকার আলোয় আলোয় ভরে উঠবে। গান উঠেছে আকাশে-বাতাসে---

'চোখ মেলে দেখ এল জোয়ার
ঘুম ভাঙানোর এল জোয়ার
এল যে প্রাণের
জোয়ার, জোয়ার
জোয়ার।।'

—দিলীপ মৌলিক

এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞান যত দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, এত দ্রুত পদক্ষেপ বোধ করি আর কখনও এগোয় নি। বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের এত কৌতূহলও আর কখনও জাগেনি। বিজ্ঞান এখন সাধারণ মানুষেরও জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে—প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে। কোনোটা সে বুঝতে পারছে, কোনোটা পারছে না। যে বিজ্ঞান এই মুহূর্তে অথবা অব্যবহিত পরের মুহূর্তে তার জীবনকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করছে না, সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তার কৌতূহল অপরিসীম। তাই তো সে রাত্রির আকাশে চাঁদের দিকে রহস্য-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছে; সবিস্ময়ে ভেবেছে ঐ যে দূরে ছোট্ট রূপোলী চাকতিটার বুকে যাবার জন্য মানুষে যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করেছে, গেছে, কী আছে ওখানে? ওখানে মানুষ গেল কী করে? যাবার জন্য মানুষকে কী করতে হয়েছে? এবং আরও অনেক অনেক প্রশ্ন।

সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে নিয়ন্ত্রিত করেছে, প্রভাবিত করেছে, অথবা এখনও কিছু করেনি, হয়তো করবেও না কোনোদিন এমন অনেক প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিচ্ছে, উত্তর না পেয়ে গুমরে গুমরে মরছে।

সাধারণ মানুষের কৌতূহল যাতে এমনি করে না মরে, তাদের জিজ্ঞাসা যাতে অপূর্ণ না থাকে তার জন্য বিজ্ঞান-জানা মানুষেরা, বিজ্ঞান-না-জানা অথচ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহশীল একটু অসাধারণ মানুষেরা সচেষ্ট হয়েছেন। তাই কাগজ খুললেই সাধারণ মানুষের কৌতূহল নিরসনের মতো বিজ্ঞান-বিষয়ক খবর আর রচনা চোখে পড়ে। শুধু খবরের কাগজেই নয়, সাহিত্যপত্রেও। খবরের সঙ্গে, সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞান এখন একাসনে বসেছে। সাহিত্য পাঠকদের মনেও এখন বিজ্ঞান আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। যারা চিরকাল বিজ্ঞানকে ভয়ের বস্তু বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে, বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা দেখলেই পাতা উলটে গেছে, তারাও এখন ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে, তাদের মনেও এখন প্রশ্ন জাগছে—এবং তারা সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে কাগজে আর রেডিওয়।

রেডিওতে বিজ্ঞানের এখন একটা নিশ্চিত স্থান হয়ে গেছে। সমীক্ষা-পরিক্রমা ছাড়াও পৃথক বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা আর কথিকা প্রচারিত হচ্ছে। সংখ্যায় হয়তো পর্যাপ্ত নয় অন্যান্য আলোচনা আর কথিকার তুলনায়—তবু এটা প্রশংসনীয় উদ্যম, আশার কথা।

কিন্তু এই সমীক্ষা, পরিক্রমা, আলোচনা, কথিকা এসব তো এক-তরফা ব্যাপার, মানে রেডিও কর্তৃপক্ষের পছন্দ করা। রেডিও কর্তৃপক্ষের পছন্দমতো বিষয়েই এইসব অনুষ্ঠান। অবশ্য নিশ্চয়ই তাঁদের চেষ্টা থাকে শ্রোতাদের জিজ্ঞাসু মনকে পরিতৃপ্ত করার। কিন্তু এইভাবে তা করা কি পুরোপুরি সম্ভব? শ্রোতাদের সাধারণ সব বিষয়ে জানার আগ্রহ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আন্দাজ করা যেতে পারে মাত্র, কিন্তু তাদের একান্ত নিজস্ব প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসার খবর তারা না জানালে আর কেউ জানবে কেমন করে? এক-একজনের তো এক এক ধরনের প্রশ্ন, কারণ এক একজনের মন আর শিক্ষা-দীক্ষার মান এক এক রকম।

শ্রোতাদের এমনিসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য রেডিওর বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার আসর। এই আসরে বিজ্ঞান বিষয়ে শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। শ্রোতারা তাঁদের নিজস্ব প্রশ্নগুলি এই বিভাগে পাঠান, কর্তৃপক্ষ জাত হিসাবে সেগুলি বাছাই করে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে উত্তর দেওয়ান।

আসরটি ইতিমধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়েছে, এবং শোনা যায় এত চিঠি আসে এই আসরে যে, সব চিঠির উত্তর দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এটা খুবই স্বাভাবিক, এবং আনন্দেরই কথা। এতে সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান সচেতনতার কথাই প্রমাণ হয়। বিজ্ঞানে তাদের কৌতূহলের কথা, বিজ্ঞান বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসার কথা।

কর্তৃপক্ষ যখন নিজেরাই স্বীকার করেন, এই আসরে বহু চিঠি আসে এবং সময়াভাবে সব চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না, তখন কি তাঁদের উচিত নয় আসরের সময় বৃদ্ধি করা? অথবা সংখ্যা বৃদ্ধি করা? মাসে দু-দিন এই আসর নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত নয়! গানবাজনা একটু কমিয়ে অনায়াসে এটাকে একটা সাপ্তাহিক আসরে পরিণত করা যেতে পারে। সপ্তাহে একদিনও যথেষ্ট নয় এই আসরের পক্ষে। দুদিন হলেই বোধ হয় ভালো হয়।

গানবাজনার চেয়ে এই আসর যে কম জরুরী নয় সে তো শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা থেকেই প্রমাণিত হয়। সুতরাং কর্তৃপক্ষ আপাতত এটিকে অন্তত একটা সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে পরিণত করুন।

এই আসরে বিশেষজ্ঞরা যেভাবে প্রশ্নের উত্তর দেন তাতে অনেক সময় বিজ্ঞানের ভিত্তি না থাকলে বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের বিশেষত্বই এটা। তাঁরা খুব কমই সাধারণের মতো করে বলতে পারেন। তাঁরা যেন ধরে নেন, যাঁরা প্রশ্ন করেন, বিজ্ঞানের মোটামুটি একটা ভিত্তি অর্থাৎ গোড়াটা তাঁদের থাকে। কিন্তু না, সব সময় তা থাকে না। আর সেইজন্যই এমনভাবে বলা দরকার যাতে বিজ্ঞান না জানা লোকেরাও বুঝতে পারেন। অবশ্য একথা সত্য যে, বিজ্ঞানের সামান্যতম জ্ঞান যাঁদের নেই বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁদের কিছু বোঝানো খুবই শক্ত। যিনি যা-ই বলুন, একেবারে পপিউলার সায়েন্স হয় না। একটুখানি শিকড় অন্তত থাকা চাই। কিন্তু শিকড় থাকা আর গোড়া থাকা এক কথা নয়। বিশেষজ্ঞরা যদি এই মনে করে বলেন যে, যাঁদের প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দিচ্ছেন, তাঁরা বিজ্ঞান জানেন না মোটে, এবং যতটা সম্ভব গোড়া থেকে সরল করে বলেন তাহলে ভালো হয়। আশা করি, বেতার কর্তৃপক্ষও তাঁদের সেই অনুরোধ করবেন।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১লা জুলাই সকাল ৯টায় পুনঃ-প্রচারিত 'বিচিত্রায়' মুর্শিদাবাদের কুটির-শিল্পের সঙ্কটগুলি বেশ প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেছে সরকারী সাহায্য ছাড়া এই শিল্পের বাঁচার আশা খুবই ক্ষীণ। কী নির্মম দারিদ্র্যের মধ্যে এই মূল্যবান শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের দিন কাটাতে হচ্ছে! এঁদের হাত-পাই শুধু দারিদ্র্যের দড়িতে বাঁধা নেই, স্বার্থপর সমাজের কূট জালে এ'দের সর্বাঙ্গ রয়েছে জড়িয়ে।

অনুষ্ঠানে খাগড়ার বাসনশিল্প সম্পর্কে একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেছে, কিন্তু রেশমশিল্পের চিত্রটি রয়েছে অসম্পূর্ণ। হাতির দাঁতের শিল্পটি ফুটেছে মোটামুটি। প্রযোজক যেন একটু তাড়াতাড়ি সেরেছেন। যাঁর চিন্তার অবকাশ পাননি। তাই তাঁর নিজের দিকটা রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ। সঙ্কটগুলি যে প্রাঞ্জল হয়ে ধরা দিয়েছে, সে ঐ শিল্পীদের জন্য।

অনুষ্ঠানের গ্রন্থনা বড়ো প্রাণহীন। অনুষ্ঠানটি রচনা (?) ও প্রযোজনা করেছেন শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়, আর গ্রন্থনা শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায়।

৩রা জুলাই সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে শ্রীবিমলভূষণ রবীন্দ্রসংগীত শোনালেন। না, বিশেষ খুশি হওয়া গেল না।

৭ই জুলাই বেলা সাড়ে ১২টায় শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে দুটি রেকর্ড বোধ হয় কাটা ছিল। প্রথম রেকর্ডটি প্রচারে একবার বিঘ্ন ঘটেছিল, দ্বিতীয় রেকর্ডটির প্রচারে তিনবার বিঘ্ন ঘটেছিল। প্রথম রেকর্ডটি বন্ধ করে দিয়ে ঘোষিকা বলেছিলেন, 'অনিবার্য কারণে এই রেকর্ডটির প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখিত।' এই দুঃখ প্রকাশের অল্পকাল পরেই যে আবার তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে এ বোধহয় তিনিও ভাবতে পারেন নি। পরের রেকর্ডটি সামলাতে তাঁকে বেশ হিমসিম খেতে হয়েছিল। যেন কিছুতেই ডিস্ক, ফেডার আর মাইক্রোফোন একসংগে এই তিনটি কন্ট্রোল করতে পারছিলেন না। যখন কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারলেন না তখন তিনি রেকর্ডটি বন্ধ করে দিয়ে আবার ঘোষণা করলেন, 'অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখিত।'

কিন্তু সত্যিই কি এটা অনিবার্য কারণ? এটা তো সম্পূর্ণ নিবার্য। প্রচারের আগে রেকর্ডগুলো শুধু একবার করে বাজিয়ে দেখে নিলেই 'কারণটা' নিবারণ করা যায়। এবং তার জন্য পরিশ্রম মোটেই নয়, একটু সময় দিতে হবে। ঘোষক-ঘোষিকারা বা অন্য কেউ যদি তা দিতে রাজী না থাকেন তাহলে বার বার অসত্য বলে দুঃখ-প্রকাশ করার যাতনা থেকে তাঁরা রেহাই পেতে পারেন।

এ নিয়ে আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। পরিচালকেরা জমিদারের মনোভাব নিয়ে বসে আসেন, প্রজাদের কান্না বৃথা হয়। এবারও যে হবে তাতে আশ্চর্য কী!

৯ই জুলাই বেলা আড়াইটেয় 'বিদ্যার্থীদের জন্য' অনুষ্ঠানে শ্রীঅমলকুমার লাহিড়ী 'র‍্যাডার' সম্পর্কে অনেক কথা কথা বললেন, কিন্তু বিদ্যার্থীদের কাছে এই জাতীয় কথিকা প্রচারে যে দায়িত্ব থাকা দরকার সে দায়িত্বের পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি। তিনি একেবারে গোড়াতেই ভুল করেছেন— Radar উচ্চারণ র‍্যাডার নয়, রেডার। বক্তা যদি বলেন, ঘোষিকা তাঁর ঘোষণায় আগে র‍্যাডার বলেছিলেন, তাই তিনি পরে র‍্যাডার বলেছেন, তাহলে সেটা বুদ্ধিমানের কথা হবে না। আবার বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁকে র‍্যাডার সম্পর্কে বলতে বলেছিলেন। এ কথাও বলা যাবে না, কারণ কনট্রাক্টটা ছিল ইংরেজীতে, এবং ইংরেজীতে Radar যে কেবল র‍্যাডারই হবে এটা ধরে নেওয়া ইংরেজী জানা কারও পক্ষেই ঠিক নয়।

১০ই জুলাই সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে শ্রীতড়িৎ চৌধুরীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম ছিল, আকাশবাণীর ঘোষিকার ঘোষণায় শোনা গেল 'তরিৎ' চৌধুরী। অথবা 'ত্বরিত' চৌধুরী? যা-ই হোক, তরিৎ আর ত্বরিত উচ্চারণে পার্থক্য বিশেষ নেই। কিন্তু রেডিও ঘোষণা যে আরও স্পষ্ট, সতর্ক ও নির্ভুল হওয়া দরকার সেটা তিনি বুঝবেন কবে?

৭ই জুলাইয়ের বেলা সাড়ে ১২টার সেই একই ঘোষিকাকে ১০ই জুলাই ঐ সময়েরই অনুষ্ঠানে ভিন্ন ভূমিকায় দেখা গেল। এবার আর কন্ট্রোলে হিমসিম খাওয়া নয়, এবার তিনি ধীর-স্থির। বেশ ধীর-স্থিরভাবেই তিনি এই অনুষ্ঠানের শেষ গানটি কেটে দিলেন। বলবেন, 'নিউজ ছিল?' নিউজ তো থাকবেই, এদিকে রেকর্ডের সময়ও তো পূর্বনির্দিষ্ট। তাহলে নিউজের জন্য রেকর্ড কাটতে হবে কেন?

এইদিন 'বিদ্যার্থীদের জন্য' অনুষ্ঠানে মার্টিন লুথার সম্পর্কে শ্রীঅমলেশ মজুমদারের স্ক্রিপ্টটি বেশ ভালো ছিল, তিনি পড়েছেনও ভালো। কিন্তু এর পরে আলোক-তরঙ্গ সম্পর্কে শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রের স্ক্রিপ্টটা ভালো হলেও এবং শোনার চেষ্টাটা থাকলেও পড়াটা খুব মনোগ্রাহী হয়নি। অনেকটা স্ক্রিপ্ট পড়ার মতো হয়ে গেছে। তাতে স্বচ্ছন্দভাবটা কেটে একটা কৃত্রিম ভাব এসেছে। রেডিওর কথিকা মনোগ্রাহী করতে এই স্ক্রিপ্ট পড়ার ভাবটা পরিহার করাই বড়ো কথা।

১১ই জুলাই সকাল ৮টায় লোকগীতি শোনালেন শ্রীবীরেন দাস। বেশ ভালো লাগল। পল্লীর মেজাজটা পাওয়া গেল। পল্লীর সুরটা।

এইদিন রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে সমীক্ষায় বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী বেশ কয়েক-বার আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ও আণবিক বোমা বললেন। ইংরেজীতে বললে তিনি কি মলিকিউলার আর্মস্ ও মলিকিউলার বম্ বলতেন? নিশ্চয় না। তবে? তবে কেন তিনি অ্যাটমিকের বাংলা আণবিক করলেন? অ্যাটম পরমাণু আর মলিকিউল অণু এতো বহুকাল থেকেই স্বীকৃত। এ নিয়ে দ্বিমত নেই, তর্ক নেই, সন্দেহ নেই। তাহলে কেন দিনের পর দিন রেডিও থেকে অ্যাটমিকের বাংলা করা হবে আণবিক? কেন সরকারী পয়সায় বাংলা দেশের বিজ্ঞানের ছাত্রদের অবাধ মস্তিষ্ক-ভক্ষণ চলবে? বিজ্ঞানের ডাক্তাররাও ভুল করছেন বলে রেডিও কর্তৃপক্ষের কি কোনো দায়িত্বই নেই? এত সমালোচনার পর কী করে তাঁরা চুপ করে বসে থাকতে পারেন? না কি ডাক্তারদের কিছু বলার সাহসই নেই তাঁদের?

Houston য়ের নামটি এখন চাঁদের কল্যাণে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়েছে। বানান দেখে মনে হয়, এর উচ্চারণ হাউসস্টন, এবং অনেক খবরে কাগজেও তা-ই লেখা হয়। কিন্তু ইংরেজী ভাষা বড়োই বিভ্রান্তিকর। বানান দেখে সব সময় সব ঠাহর করা যায় না। Home (বৃটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী) যে হিউম হতে পারে, এ কি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করা যায়? তবু হয়। কল্পনাকে হার মানিয়ে দেয়।

সেই রকম Houston হাউস্টন নয়, হিউস্টন। কিন্তু দিল্লীর বাংলা সংবাদ বিভাগ একে হুস্টন করে ছেড়েছেন। মাঝে মাঝে দিল্লীর বাংলা খবরে হুস্টন শোনা যাচ্ছে। ২৩শে-ই গেছে। Houston কে একেবারে হুস্টন কল্পনা করায় কল্পনার প্রসারতা প্রমাণিত হয় সত্যি, কিন্তু ভাষা জ্ঞানের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

—শ্রবণক

প্রেক্ষাগৃহ

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত গ্র্যান্ড হোটেলে এক সম্বর্ধনা সভায় ফরাসী চিত্রাভিনেত্রী বুলি অরগিয়ের। ফটো : অমৃত

চিত্র সমালোচনা

মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের সূর্য

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ মারা গেলেন বর্মায়; রেখে গেলেন তিন লক্ষ টাকা তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যে। এটর্ণী খুঁজে বার করলেন উত্তরাধিকারী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায়, যার বিধবা মা অপর্ণা নার্সের কাজ ক'রে ছেলেকে মানুষ করেছেন একান্ত যত্নে, অসীম স্নেহভরে। সার্থক ছেলে শঙ্কর; সে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন, ডাক্তারী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলাতে উচ্চশিক্ষা করতে যাবার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু বাদ সাধল মৃত শিবনাথের এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র। সে বললে শিবনাথ অপুত্রক মারা গেছেন। শিবনাথের প্রথমা পত্নী অপর্ণা যদি শঙ্করের মাথায় হাত রেখে বলতে পারেন যে, সে শিবনাথের ছেলে, তবেই সে ঐ তিন লক্ষ টাকার দাবি ছেড়ে দেবে। কিন্তু অপর্ণা পারলেন না; তিনি পারলেন না বলতে যে, শঙ্কর শিবনাথেরই ঔরসজাত পুত্র। শঙ্কর জানল, সে পিতৃ-পরিচয়হীন; সে শুধু তার মায়ের ছেলে। শুধু তিন লক্ষ টাকা নয়, তাকে ছেড়ে দিতে হ'ল স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাওয়ার আশাও। স্কলারশিপ ফর্মে সে কি পিতৃপরিচয় দেবে? কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কর্ণেল সত্যেন চৌধুরী বললেন, গুরু পিতৃতুল্য, শঙ্কর তাঁর নামটাই লিখে দিক পিতার নামের জায়গায়। কিন্তু শঙ্কর তার মায়ের সন্তান হয়েই বেঁচে থাকতে চায়, ধার-করা পিতৃনামের গৌরব সে চায় না। বেচারা শঙ্কর! তার এই ছোট্ট আশাটুকুও পূর্ণ হ'ল না। সে জেনে স্তম্ভিত হ'ল, অপর্ণা তার গর্ভধারিণী জননী নয়, তিনি শুধু তাকে মাতৃস্নেহে পালন করেছেন তার জন্মদিন থেকে। তবে? তবে সে কে? কোন্ আবর্জনা স্তূপ থেকে সে উঠে এসেছে?—এই প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছে আর ডি বনসল নিবেদিত ও সুধীর মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত 'আঁধার সূর্য'-এর সমাপ্তিভাগের উত্তেজক দৃশ্যগুলি।

উপরে লিখিত কাহিনী-চুম্বক থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, গৌরাঙ্গ-প্রসাদ বসু রচিত মূল কাহিনী থেকে একটি আবেগধর্মী সফল চলচ্চিত্রের জন্ম-লাভ সঙ্গতভাবেই সম্ভব ছিল। তা' যদি না হয়ে থাকে, তাহ'লে তার জন্যে প্রধান

দায়িত্ব হচ্ছে চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ-রচয়িতা গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর। চিত্রায়ণপর্বে কাহিনীটির উদ্ঘাটন কিভাবে হ'লে তা হৃদয়গ্রাহী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-কৌতূহল বজায় রাখতে সক্ষম হবে, সেই বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় তিনি এক্ষেত্রে দিতে পারেন নি। কাহিনী বর্ণনার জন্যে তিনি এমন সব ঘটনা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, যা বাস্তবতাবিরোধী ও গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী সংলাপ-রচনাতেও তিনি বহু স্থলেই ব্যর্থতাকে বরণ করেছেন।

আঁধার সূর্য/দীপ্তি রায়

যেখানে চিত্রনাট্য দুর্বল এবং কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের বহু ঘটনাকেই দর্শক প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, সেখানে দক্ষতা ও নাট্যনৈপুণ্য সত্ত্বেও শিল্পীরা দর্শকচিত্ত জয়ের পথে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেন না। ছায়া দেবী, কমল মিত্র, দীপ্তি রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির শক্তি সম্বন্ধে আমরা সকলেই অবহিত। কিন্তু মিসেস মজুমদার, মিঃ মজুমদার, অপর্ণা এবং কর্ণেল সত্যেন চৌধুরী বেশে এ'রা যদি আমাদের মনে যথেষ্ট রেখাপাত করতে না পেরে থাকেন, তাতে এ'দের অপরাধ কোথায়? মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও রীণা ঘোষ চিত্রনাট্যের তাগিদে যে-সব দৃশ্যাভিনয় করতে বাধ্য হয়েছেন, তার জন্যে তাঁদেরই বা দায়িত্ব কোথায়? শৈলেন মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্পর্কেও কি সমান কথা বলা চলে না?

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একমাত্র চিত্রগ্রহণ কার্যটি কিছুটা সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। দৃশ্যপটাদি সর্বত্র বাস্তবানুগ নয়। সম্পাদনায় যদি মস্তিষ্ক প্রয়োগ করা হ'ত, তাহ'লে ছবির দুর্বলতা অনেকখানি ঢাকা পড়তে পারত। ছবির আর একটি দুর্বল অংশ হচ্ছে এতে ব্যবহৃত কণ্ঠসংগীতগুলি। পাঁচখানির মধ্যে একটিও গান হৃদয় স্পর্শ করে না; এমনকি, ছবির 'থীমসঙ' হিসেবে যে গানখানিকে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই 'রাত নিঝুম, হোক না আঁধার কালো' গানখানিও ব্যর্থ হয়েছে আমাদের হৃদয় হরণ করতে। আবহসংগীত একান্ত মামুলি।

ইংরাজী ক্লাসিকের গীতিনাট্য রূপ

বার্নার্ড শ'-এর 'পিগম্যালিয়ান' নাটক 'মাই ফেয়ার লেডী', এই গীতিনাট্যে রূপান্তরিত হয়ে প্রথমে মঞ্চে ও পরে চলচ্চিত্রে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। জানি না, এরই দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে লাওনেল বার্ট চার্লস ডিকেন্স-এর অমর উপন্যাস 'অলিভার টুইস্ট'-কে গীতিনাট্য 'অলিভার'-এ রূপান্তরিত করেছেন কিনা! শুনেছি, এই 'অলিভার' গীতিনাট্যটিও ইতিমধ্যেই মঞ্চসাফল্য লাভ করেছে। চলচ্চিত্রাকারে 'অলিভার' সাতটি 'অস্কার' লাভ করেছে নিম্নলিখিত বিভাগে : (১) শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, (২) শ্রেষ্ঠ পরিচালনা (ক্যারল রীড), (৩) নৃত্যপরিকল্পনা (ওনা হোয়াইট), (৪) শিল্পনির্দেশনা (জন বক্স ও টেরেন্স মার্শ), (৫) দৃশ্যসজ্জা

অবশ্য অলিভার টুইস্টকে সম্পূর্ণভাবে গীতিনাট্যে পরিণত করা যায়নি। কিছু কিছু নাটকীয় জায়গাতে গদ্য সংলাপ সম্ভবত বাধ্য হয়েই রাখতে হয়েছে। তবু বলব, ছবিটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে, বিশেষ করে ঐ সুন্দর, গভীর আবেদনভরা দৃষ্টিসম্পন্ন বালক-অভিনেতা মার্ক লেস্টার-এর জন্যে। অলিভার চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে শ্রীমান্ লেস্টার-এর দ্বারা। এ'র পাশে আর যাঁরা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন রণ মুডি (ফ্যাগিন), অলিভার রীড (বিল সাইকস), হ্যারি সেকোম্বে (মিঃ বাম্বল), শ্যানি ওয়ালিস (ন্যান্সি) ও জ্যাক ওয়াইল্ড (ডজার)।

ভার্ণন হ্যারিস-এর চিত্রনাট্য অবলম্বনে অসওয়াল্ড মরিস ছবিটির সামগ্রিক পরিকল্পনা করেছেন এবং জন উল্ফ করেছেন প্রযোজনা।

মেঘ ও রৌদ্র-র সেটে পরিচালক অরুন্ধতী দেবী, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বরূপ দত্ত। ছবিটি এই বৎসর মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে। ফটো ঃ অমৃত
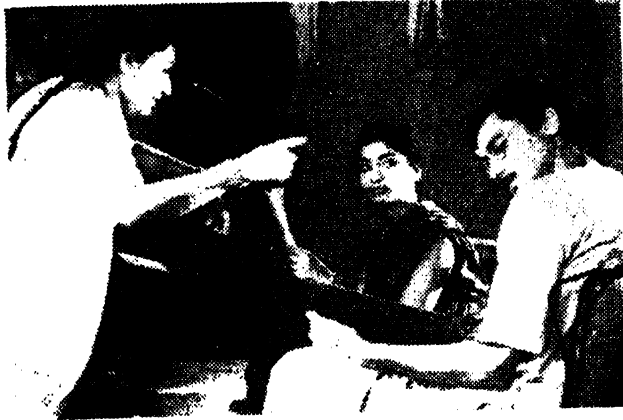
মঞ্চাভিনয়

সরকার ফুটওয়্যার রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি 'স্টার' থিয়েটারে রামপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ' কাহিনীর নাট্যরূপ পরিবেশন করেছেন। ইতিহাসভিত্তিক এই কাহিনীর সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন মণি দত্ত; নির্দেশনার দায়িত্বও ছিল তাঁর। নাটকটির প্রয়োগে শ্রীদত্তের নিষ্ঠার কোন অভাব ছিল না, কিন্তু শিল্পীরা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকটিতে প্রত্যাশিত গতিবেগ সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাই মঞ্চে প্রায় প্রতিটি সংঘাতের মুহূর্ত হয়েছে শৈথিল্যে মন্থর।

অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গিতে 'লালবাঈ' চরিত্রকে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন মিতা চ্যাটার্জি। মনে হয় তাঁর প্রাণবন্ত চরিত্র-চিত্রণই সমগ্র প্রযোজনাটির একমাত্র সম্পদ। বিমল সেনগুপ্তের 'রঘুনাথ', মলয় সরকারের 'রহিম খাঁ' ও গীতা দে'র 'হীরাবাঈ' মন্দ নয়। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন ঃ দিলীপ চক্রবর্তী, শ্যামল দাস, রবীন চট্টোপাধ্যায়: বিনয় সরকার, সমীর চট্টোপাধ্যায়, অনিল দাস; প্রদীপ চক্রবর্তী, প্রতিমা দাস ও মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী।

সম্প্রতি 'চেনা অচেনা' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা 'মুক্ত অঙ্গন' মঞ্চে তিনটি ভিন্ন-স্বাদের একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। নাটক তিনটি হোল অভিজিত রচিত 'রঙ বেরঙ', 'সংক্ষিপ্ত সমাচার', 'স্থানীয় সংবাদ'।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'রঙ বেরঙ'ই কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ দিতে পেরেছে। জেলখানার পটভূমিকায় কয়েকটি বাস্তব পরিস্থিতির কথা তুলে ধরা হয়েছে নাটকে। আর দুটি নাটকে উপস্থাপনাগত বৈচিত্র্য থাকলেও, বক্তব্য এবং চরিত্র বিশ্লেষণের সূত্রটি প্রায় একই। তবে একথা বিনাদ্বিধায় বলা যায় নাটক তিনটির নির্দেশনায় অসীম গুহের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ চিহ্নিত হয়েছে।

নাটক তিনটিতে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হোলেন গোরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলু মুখোপাধ্যায়, সৌরভ ঘোষ, সমর দত্ত, বাবু বসু, কৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বনাথ সাহা, তুষার ভট্টাচার্য, ব্যাসদেব দত্ত, অনুনা মল্লিক, শ্বেতা গুহ, অসীম গুহ, নীলিমা দাস ও মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ বছর কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শেষদিনে টেগোর হাউসে অভিনীত হয় 'অভিনয় নয়'। কাশ্মীরে এসেছেন নাট্যকার পরিচালক অভিনয় করতে। কিন্তু অভিনয় আরম্ভ হবার যথাপূর্বে নায়ককে খুঁজে না পাওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন নীরেন সেন। কাহিনীর অভিনবত্বে এবং উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে নাটকটি উপস্থিত দর্শকমন্ডলীর প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। নায়কের চরিত্রে অরুপরতন, নাট্যকার ও পরিচালকের ভূমিকায় নীরেন সেন এবং অন্যান্য চরিত্রে ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব লাহিড়ী, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখ্য অংশ গ্রহণ করেন।

গত ৪ জুলাই বিশ্বরূপায় 'মা' নাটকের সার্থক মঞ্চায়নের পর কলকাতার শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠী 'পথিক' তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী অভিনয়ের তারিখ ঘোষণা করেছেন ৮ আগস্ট সন্ধ্যায়। বর্তমান দেশ, কাল বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'মা' উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন—সুশীল সুর, জয়ন্ত মতিলাল, সনৎ বসু, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল দে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী দে, দীপা হালদার, মন্দিরা দাস প্রমুখ সংস্থার নিয়মিত শিল্পীবৃন্দ।
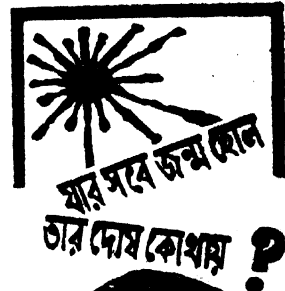
বিবিধ সংবাদ

'অক্ল্যারম্ভ শুভায় ভবতু (আজকের এই সূচনা শুভ হোক)' কর্মজীবন অবসানান্তে নিঃসম্বল দুঃস্থা মহিলা শিল্পীদের জন্য ক্রীত বাসভবনের উদ্বোধন উৎসবে বিশেষ অতিথি ডাঃ রমা চৌধুরী আবেগভরে বললেন—

'কানন দেবীর দুর্বার, দুর্দমনীয় প্রেরণায় আবেগে মহিলাশিল্পী মহলের
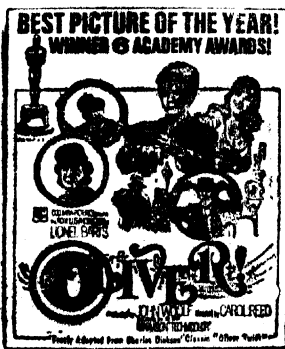
সরযূ দেবী, কানন দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, অমলা বড়ুয়া, চন্দ্রাবতী দেবী ও মলিনা দেবীকে দুঃস্থ অভিনেত্রীদের জন্য বাসভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে।

প্রতিটি শিল্পী দুঃস্থ শিল্পীদের আশ্রয়-দানের কাজে নীরবে আত্মদান করেছেন এবং কানন, সরযূ, চন্দ্রাবতী এবং অন্যান্য শিল্পীরা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম উদ্দীপনা এবং কল্পনার মাধুরী নিয়ে, তিল তিল করে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তা শুধু প্রগতিশীল নয়—এক বৈপ্লবিক কীর্তি—ভারতবর্ষে এই প্রথম মেয়েরা মেয়েদের আশ্রয়গৃহ নির্মাণ করল। এ কাজ দেশের প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু। শক্তি-স্বরূপা—জগজ্জননী এঁদের আশীর্বাদ করুন—আজকের দিনে এই আমার প্রার্থনা।'

সংস্থার বাৎসরিক সভানেত্রী শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী আনন্দউদ্বেল কন্ঠে বলেন, 'জীবনে আনন্দের মুহূর্ত বড় দুর্লভ—এবং সেই দুর্লভ মুহূর্তকে আজকের এই সহজ সুন্দর অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আস্বাদ করেছি। আজকের এই-দিনের স্মৃতি মহামূল্য রত্নের মত অন্তরের নিভৃতে সঞ্চিত রাখবার বস্তু।'

শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ কানন দেবীর আদর্শে অনুপ্রেরিত শিল্পীদের সংগঠন-শক্তি-ধ্যান ও নিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানিয়ে—তাঁর দিক থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সর্বশ্রী নির্মলকুমার ঘোষ, বাগীশ্বর ঝা, কালীশ মুখোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিল্পীদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান।

মহিলা শিল্পীমহল ও অভাবগ্রস্তা শিল্পীদের আবাসগৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে কানন দেবী নানান প্রতিকূল ঘটনার উল্লেখ করেন। এবং পরিশেষে বলেন, 'তবু সবাই মিলে লেগে পড়লাম। মঞ্জু, নমিতা, সাধনা অমানুষিক ছোটাছুটি করে এবং ১৫০ জন সভ্যের প্রত্যেকেই তাঁদের অনলস সাধনা দিয়ে যেন এই ব্রতে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথম শো হোলো মহাজাতি-সদনে। টাকার অঙ্ক আশার অতিরিক্ত। তার পরের ইতিহাস ত সবারই জানা।

'আজ আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরম মুহূর্তে সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দেশের জন-সাধারণ বিশেষ করে দেশের সমস্ত সাংবাদিকমহলের কাছে যে অকৃপণ ও উদার সহায়তা পেয়েছি তা কল্পনা করা যায় না। এঁদের সবার সহযোগিতায় এতবড় কঠিন কাজ কেমন করে সহজ হবে এল বুঝতেই পারিনি।—আজ সবার কাছে ঋণ স্বীকারের পুণ্যলগ্ন—এ ঋণ ভবিষ্যতে আরো বেড়ে উঠবে—এই আশাই আমরা রাখব।'

●

ভারত সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে দিল্লীতে গত সপ্তাহে। ঐ উৎসবকে কেন্দ্র করেই একজন ফরাসী পরিচালক ও একজন অভিনেত্রীকে নিয়ে এক ফরাসী চিত্র প্রতিনিধি দল ভারতের চারটি শহর সফরে এসেছেন। এঁরা দু'জন হলেন শ্রীজাঁ দ্যানিয়েল সিম' ও শ্রীমতী বুলি অরাগয়ের। গত সোমবার গ্রান্ড হোটেলে বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁদের এক সম্বর্ধনা জানানো হয়। শ্রীসিম' ঐ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানান ফরাসী চিত্রজগতে আজ দর্শকের পরিবর্তনের সঙ্গে চিত্র-প্রযো-জনার কাজেও বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে, তাই কোন নির্দিষ্ট 'ধারা' আজকের ফরাসী ছবিতে নেই। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীবিজন দত্ত ও কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীবি ঝা দু'জনকে আপ্যায়ন করেন। চিত্রজগতের সকল

তরুণ মজুমদার পরিচালিত রাহগীর/ শশীকলা

সাংবাদিক ছাড়াও অনুষ্ঠানে শ্রীসত্যজিৎ রায় ও শ্রীতপন সিংহ উপস্থিত ছিলেন। পরদিন (মঙ্গলবার) শ্রীসিম' তাঁর প্রথম ছবি 'অ্যাডিলেডে'র এক বিশেষ প্রদর্শনী করেন।

গত ৭ জুলাই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সিনে মেক-আপ আর্টিস্টস এসোশিয়েশনে'র বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল। ঐ সভায় চলচ্চিত্র জগতের সমস্ত রূপ শিল্পীদের সমাবেশ হয়। সভায় চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে রূপ-শিল্পীদের নানাবিধ সমস্যা এবং রূপ-শিল্পের মান উন্নয়ন সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা হয়। সভা পরিচালনা করেন শ্রী মদন পাঠক। সভায় এ বছরের সাধারণ নির্বাচনে নিম্নলিখিত কার্যকরী সদস্যগণ নির্বাচিত হন। সভাপতি—শ্রীশক্তি সেন, সহ-সভাপতি—শ্রীত্রিলোচন পাল, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীঅনন্ত দাস, সহ-সম্পাদক—শ্রীদুর্গা-চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅনাথ মুখোপাধ্যায় এবং উপদেষ্টা—শ্রীমদন পাঠক।

বার্লিন উৎসবে যোগদানের আগে শ্রী সত্যজিৎ রায় পূর্ব বার্লিনে গিয়েছিলেন তাঁর ছবি 'নায়ক'-এর প্রিমিয়রে উপস্থিত থাকতে। পূর্ব বার্লিনের নব-নির্মিত প্রেক্ষাগৃহে 'ইন্টারন্যাশন্যাল'এ 'নায়ক' ছবির মুক্তি অনুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানের দিনে ও-দেশের সাংস্কৃতিক ও বহির্বিষয়ক দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর স্বল্পকালীন সফরে ওখানকার ডফা স্টুডিও পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগাদানও করেন। বার্লিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন দু-দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বন্ধন নিঃসন্দেহে দৃঢ়তর হয়েছে। লিপজিগে ফিল্ম ক্লাবে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর এই সফর দু-দেশের বন্ধুত্বের এক যোগসূত্র হয়ে রইল।

জব্বলপুরে খামারিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠান প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ কবিপক্ষে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে নাট্যাভিনয়, নৃত্য ও গীতি-বিচিত্রা, জব্বলপুরে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা এবং নজরুল জন্মদিবস পালন করা হয়। ১৭ ও ১৮ মে স্থানীয় এ টি এস মঞ্চে অভিনীত হয় উৎপল দত্তর 'ফেরারী ফৌজ' নাটক। বিভিন্ন ভূমিকায় অমলেন্দু দেব, দেবকুমার ভৌমিক, তপন রায়চৌধুরী, তুষার বসু এবং ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়—যথেষ্ট প্রশংসিত হয়। অন্যান্য চরিত্রে ঝুনু রায়চৌধুরী জ্যোতি গুহ, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, অনন্ত দে, শৈলেন মণ্ডল প্রভৃতি সু-অভিনয় করেন। ২১ মে সংগীত, আলোচনা, আবৃত্তির মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্ম-উৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম' শীর্ষক গীতি-আলেখ্যর অনুষ্ঠান হয়। ২২ মে হতে শুরু হয় জব্বলপুরে একাংক নাটক প্রতিযোগিতার ২য় বার্ষিকী অনুষ্ঠান। জব্বলপুরের মৌসুমী নাট্যসংস্থা 'বিদিশ' নাটক অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে পুরস্কৃত হন।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক—মৌসুমী নাট্যসংস্থা (বিদিশ), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—দিলিপ রায় (জীবন-যৌবন), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—সুজিত ঘোষ (বিদিশ), ২৬ মে কবি নজরুলের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সংগীত আলোচনা ও আবৃত্তি-র একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।।

'[illegible]নিকা'র চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১১ জুলাই থেকে ১৩ জুলাই তিনদিন-ব্যাপী কয়েকটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উল্টাডাঙ্গা মেন রোডের '[illegible]নিকা'র নিজস্ব শিশু-উদ্যানে।

প্রথম দিনের শিশু উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মাস্টারমশাই' গল্পের নাট্যরূপ ও 'রবীন্দ্র চেতনায় প্রকৃতি' গীতি-নাট্যটি পরিবেশিত হয়। গীতি নাট্যের প্রায় প্রতিটি গানই সুগীত। নৃত্য-শিল্পীরাও ছিলেন সপ্রাণ। নৃত্য-পরিকল্পনা ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে ভোলানাথ রায় ও নিমাই বসু।

'মাস্টার মশাই' নাটকটি অজয় লাহিড়ীর সুনাট্যরূপ ও দক্ষ-পরিচালনার জন্য বেশ গতিসম্পন্ন ছিল, অভিনয়ের একটি মুহূর্তের কোথাও ক্লান্তিকর মনে হয়নি।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল তরুণ-তরুণীদের জন্য। সেদিন জোছনা দস্তিদারের 'অন্তরীণ' ও সুধাংশু ঘোষের রূপক আলেখ্য 'আলোক বর্ণা' নাটক দুটি অ[illegible]নীত হয়।

শেষদিনের অনুষ্ঠান ছিল প্রবীণ[illegible] এই উপলক্ষে প্রশান্ত চৌধুরীর 'ঘণ্টা [illegible] নাটকটি অভিনীত হয়। সার্থক নাটক ম[illegible] করার জন্য যে শিল্পবোধ ও দলগত [illegible] শক্তির প্রয়োজন হয় এ নাটকে অন্তত [illegible] দাবি মিটিয়েছেন শিল্পী এবং কুশলীর[illegible] নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন র[illegible] শ্যাম রায়।

যেন ভুলে না যাই

পল ম্যুনি

অভিনয় করার চাইতে অভিনয় দেখতে [আ]মার বেশি ভালো লাগে। এই ভালো [লা]গার কারণটা যে কি তা ঠিক বলে [বো]ঝাতে পারব না। তাছাড়া অভিনেতা [হি]সেবে যে সম্মান পেয়েছি তারজন্য [স]ত্যই আমার খুশী হওয়া উচিত ছিল। [কি]ন্তু সত্যি কথা বলতে কি আজ পর্যন্ত [অ]ভিনয় করে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট [হ]তে পারি নি। হয়তো একথা শুনে আপ[না]রা মনে করতে পারেন যে আমি খুব [বে]শি বিনয় করছি, আসলে তা নয়।

—এ কথাগুলো এক সাংবাদিক সম্মে[ল]ন বলেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা [প]ল ম্যুনি। বিশ্বচলচ্চিত্র ইতিহাসে পল [ম্যু]নির আবির্ভাব একটা বিশেষ সংযোজন [ব]লা যেতে পারেন। অভিনেতা হিসেবে তিনি [ছি]লেন এক প্রতিভা যার নজির মেলা ভার। [আ]র দুনিয়ায় এমন নায়ক নজরে পড়ে [না]। যাঁরা এঁর অভিনয় দেখেছেন তাঁরা [কো]নদিনই পল ম্যুনিকে ভুলতে পারবেন [না]। তাঁর সেই অভিনয় আজও চোখে [ভা]সে। সেকি প্রাণাবেগ! সেকি আকুলতা! [এ]ক একটা চরিত্রের মধ্যে তিনি নিজেকে [কি]ভাবে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছেন তা [না] দেখলে বোঝা যায় না।

পল ম্যুনির এই সাফল্য কিভাবে এসে[ছি]ল তা তিনি নিজেই বলেছেন—আমি [যে] চরিত্রে মনোনীত হই তারমধ্যে একেবারে [ডু]বে যাই, সমাহিত হয়ে পড়ি। এমনকি এই [চ]রিত্রের জন্য আমার কখন দীর্ঘ [দি]নও কেটে গেছে। যতক্ষণ না নিজে সন্তুষ্ট হতে পারছি ততক্ষণ সেই চরিত্রে আমি অভিনয় করি না! নিয়মিত অনু-শীলনের মধ্য দিয়ে যখন আমি বুঝি অভিনীত চরিত্রটির ভেতর একেবারে মিশে যেতে পেরেছি, যখন ভুলে যেতে পারি আমি পল ম্যুনি, তখনই আমি অভিনয় করি। তার আগে আমি দর্শকের সামনে উপস্থিত হই না।

নিজের অভিনয় সম্পর্কে পল ম্যুনির এই আত্মবিশ্লেষণ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই উক্তির মধ্যেই শিল্পী পল ম্যুনিকে আমরা চিনতে পারি। তাঁর নিজস্ব অভিনয়ধারাটি বুঝতে পারি।

অস্ট্রিয়ার লেনবার্গ শহরে ১৮৯৭ সালে পল ম্যুনির জন্ম। জীবনের প্রারম্ভে পল ম্যুনি তাঁর বাবা এবং মায়ের সঙ্গে আমেরিকায় চলে আসেন। পল ম্যুনির বাবা সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাই ছেলেকে সংগীত-কাররূপে গড়ে তোলবার একটা বাসনা তাঁর ছিল। এবং সেইজন্যেই তিনি আমে-রিকায় বসবাস শুরু করেন। তাঁর নিজের একটা ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দল ছিল। ছোটবেলা থেকেই এই শিল্পকর্মের মধ্যে মানুষ হয়েছেন বলে পল ম্যুনির শিল্পের প্রতি একটা অনুরাগ জন্মেছিল। পরবর্তী জীবনে এই পরিবেশ থেকেই তাঁর অভিনয়ের প্রতি প্রেরণা আসে। পল ম্যুনির অভিনয়-জীবনের শুরু খুব নাটকীয় বলা যেতে পারে।

একবার পল ম্যুনির বাবার ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারে একজন শিল্পী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন এমন কেউ শিল্পী ছিলেন না যে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করেন। উপায়ান্তর না দেখে সবাই একযোগে পল ম্যুনিকে সেই চরিত্রে অভিনয় করার জন্য মঞ্চে জোর করে নামিয়ে দিলেন। পল ম্যুনির কোন আপত্তি তাঁরা শুনলেন না। তাই বাধ্য হয়েই বাবার আশীর্বাদ নিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন পল ম্যুনি। সব কিছু ভুলে গিয়ে কিভাবে যেন চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে তিনি অভিনয় করতে শুরু করে দিলেন। সবাই অভিভূত হয়ে পড়লেন। একটা ছোট্ট ছেলের এই প্রথম অভিনয়ের প্রতিভা দেখে তাঁরা অবাক হলেন। তাঁরা ভাবতেই পারলেন না তাঁদের পল কী করে এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে। তখন পল ম্যুনির বয়স বারো বছর। এই বয়সেই তিনি প্রথম

অভিনয় করে সফল হলেন। নাটকটির নাম ছিল 'উই আমেরিকানস্'।

তারপর ১৯২৬ সালে পল মুনি গ্যাংস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করে সারা ব্রডওয়েকে চমকে দিলেন। তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। 'ফোর ওয়ালস' নাটকে সর্বপ্রথম তিনি সাফল্যলাভ করলেন। এবং তাঁর এই সফলতা থিয়েটার থেকে সিনেমায় ছড়িয়ে পড়ল। হলিউড থেকে ডাক এল ছবিতে অভিনয় করার জন্য। পল মুনি আনন্দের সঙ্গে এ আহ্বান গ্রহণ করলেন।

নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রে পল মুনি প্রথম অভিনয় শুরু করলেন। তখন ১৯২৮ সাল। 'দি ভ্যালিয়্যান্ট' ছবিতে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর মুক্তি পেল 'স্কারফেস' এবং 'আই অ্যাম ফিউজিটিভ ফ্রম এ চেন গ্যাংগ'। এইসব ছবিতে পল মুনির প্রথম অভিনয় দেখে হলিউডের দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে পড়ল। তাঁর এই বিরাট শিল্প-ব্যক্তিত্বের কাছে অনেক অভিনেতাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন। পল মুনির নিজস্ব অভিনয়ধারাটি ক্রমশ জনপ্রিয় হল। তাঁর অভিনয়ের বিশেষ ভঙ্গিমাটি চলচ্চিত্রের একটা নতুন যুগ সৃষ্টি করল। এই যুগপ্রবর্তক শিল্পী পল মুনি যদি এ পথে না আসতেন তাহলে অভিনয়রীতির এমন নৈপুণ্য কতখানি স্বকীয়তা লাভ করতে পারত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অভিনয়রীতির পরিবর্তন করে তিনি এক নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করলেন যা সম্পূর্ণ পল মুনির নিজস্ব। অভিনয়-শিল্পে এ এক ঐতিহাসিক সংযোজন বলা যেতে পারে।

১৯৩৬ সাল পল মুনির জীবনে একটি স্মরণীয় বছর। 'দি স্টোরি অব লুই পাস্তুর' ছবিতে নামভূমিকায় অভাবনীয় অভিনয় করে পল মুনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে একাডেমি এওয়ার্ড পেলেন। পল মুনির এই সাফল্যে সারা বিশ্বের দর্শকরা সেদিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। সাংবাদিকরা দলে দলে ছুটে আসেন পল মুনির কাছে। কিন্তু নিরহংকার এই মানুষটি কোনসময়েই এ'দের কাছে নিজের প্রচার চান নি। কোনরকম মায়াজাল বিস্তার করে নিজেকে মেলে ধরেন নি। বরং নীরব থেকেই নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন। ফলে সাংবাদিকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন পল মুনিকে প্রশ্ন করে বসলেন, তারকাদের ঢঙে আপনি নিজের প্রচার কেন অপছন্দ করেন? পল মুনি খুব শান্তভাবেই জবাব দিলেন, আমি তারকা হতে চাই না বলে। তাছাড়া অভিনেতা বলতে যা বোঝায় তা এখনো হতে পারিনি।

সাংবাদিকদেরও এইভাবে পল মুনি নিরাশ করেছেন।

পল মুনি অভিনীত স্মরণীয় কয়েকটি ছবি হল :—দি লাইফ অফ এমিল জোলা, জুয়ারেজ, ইউ আর নট এ্যালোন, সংগ টু রিমেম্বার, কাউন্টার অ্যাটাক, এঞ্জেল অন মাই শোল্ডার, প্রাওল এবং দি লাস্ট অ্যাংগরী ম্যান।

পল মুনি তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিনের শুভলগ্নে ড্যামেলমানস-এর 'দি লাস্ট অ্যাংগরী ম্যান' ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই উপলক্ষে পল মুনি একটা চমৎকার বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ ছবির গল্পটি আমাকে এতই মুগ্ধ করেছে যে অভিনয় না ক[illegible] থাকতে পারছি না। এ ছবির ভেতর দি[illegible] আমার অভিনয়ের বক্তব্যটা বেশ জোরা[illegible] করে তুলতে পারব বলেই এই পঞ্চা[illegible] এসেও নিজেকে খুব তরুণ মনে হচ্ছে।

১৯৪৯ সালে পল মুনি 'ডেথ অফ এ সেলসম্যান' নাটকে অভিনয় করেন। নাটকটি দেখে সমালোচকরা অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন, মঞ্চে এ ধরণের অভিনয়রীতির প্রয়োগ পল মুনি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পল মুনি হলিউডের একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। তাঁর অভিনয়ধারা ছিল নতুন আস্বাদন। সৃষ্টিধর পল মুনি জীবনদর্শন দিয়ে অভিনয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর অভিনয় অন্যসব অভিনেতা থেকে পার্থক্য ছিল। পল মুনির জীবনদর্শন ছিল ভিন্ন। তিনি মনে করতেন, বিশ্বকে নিজের চোখে দেখে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করতে পারে তা শুধু স্কুলকলেজের সীমাবদ্ধ শিক্ষায় সম্ভব নয়। একটা নির্দিষ্ট বয়সে এবং বিশেষ ধরনের শিক্ষাই শিক্ষায়তন থেকে লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু মহত্তর কোন প্রয়াসের জন্য চাই নিরলস সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে মানুষকে অনেকখানি মূল্য দিতে হয়। সত্যিকারের নিষ্ঠা না থাকলে কোন কাজেই মানুষের সাফল্য আসে না। যে কোন বিষয়ে সফল হতে গেলে সবার আগে চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা। এ সত্য উপলব্ধি পল মুনির ছিল বলেই তিনি সর্বকালের স্মরণীয় শিল্পী হতে পেরেছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, অভিনয়শিল্পে পল মুনি ছিলেন লাস্ট অ্যাংগরীম্যান। তিনিই প্রথম শিল্পী যিনি তারকাপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, প্রতিবাদ জানিয়ে অভিনয়ধারার এক নতুন পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর অভিনয়পদ্ধতি অন্যান্য শিল্পীদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন ধর্মী ছিল বলে তিনি 'দি লাস্ট অ্যাংগরী ম্যান' ছবিতে এত প্রাণবন্ত অভিনয় করতে পেরেছিলেন। এ ছবিটি দর্শকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে পল মুনির কাছে নিজের ভূমিকাটি বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ ছবিটি খুব ভালো লেগেছিল।

অভিনয় ধারার পরিবর্তন থেকে আজ পর্যন্ত এই শিল্পে যে লোকোত্তর প্রতিভাকে আমরা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে পল মুনি হলেন একজন। তাঁর অভিনয়স্পর্শে এক নতুন রীতির ধারা জন্ম নিয়েছে। সেই অভিনয় আলোকস্পর্শে আজ মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগৎ আলোকিত। উদ্ভাসিত। এই আলোকোজ্জ্বল দিনে আমরা যেন উত্তরসূরীদের ভুলে না যাই। ভুলে না যাই পল মুনিকে।

—চিত্রলেখা

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব / দুটি মত

এক ।। সরল সেন

"ছবি তুলতে গিয়ে আমি পারিপার্শ্বিকতা আর মানবিক অনুভূতির দিকে সবচেয়ে বেশী নজর রাখি। জানি না, আমার ছবিকে আপনারা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন। হয়ত বা খুঁজেলে এর মধ্যে এক নতুন আশ্বাস, এক অপরিচিত ছন্দের দেখা মিলতে পারে—ইউরোপের সিনেমা জগতে যা নতুনত্বের দাবী রাখে। এটা সম্ভব হয়েছে কেননা, আমার নিজের মধ্যেই আমি এক মিশ্র অনুভূতির দেখা পাই। আমার দেশ ভারত, কর্মক্ষেত্র ইংলন্ড। ভারতকে ভুলতে চাই না, ইংলন্ডকেও ছাড়তে পারি না, আর তার ফলেই সম্ভবতঃ আমার ছবিতে এক সংমিশ্রনের সাক্ষাত মেলে।"

"সত্যজিত রায়কে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। কারণ, সত্যজিতবাবু যে একাগ্রতা আর নিষ্ঠা নিয়ে ছবি তুলতে শুরু করেন, ছবির শেষ পর্যন্ত সেই একাগ্রতা আর নিষ্ঠায় কোন ছেদ পড়ে না। আর ভাল লাগে ফরাসী পরিচালক ক্লাউড চাব্রলকে। অর্থাৎ, বুঝতেই পারছেন, ধনুকের এই বিস্তৃত ছিলার কোন একখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি।"

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে একথা যিনি বলেন, তিনি হচ্ছেন আন্তর্জাতিক চিত্র শিল্পের দিগন্তে এক নতুন প্রতিভা-পরিচালক ওয়ারিশ হোসেন। সিনেমা জগতে এই প্রথম ওয়ারিশের আত্মপ্রকাশ। তাঁর ছবি 'এ টাচ্ অব লাভ' এবারের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অবশ্য পরিচালক হিসেবে ওয়ারিশ হাত পাকিয়েছেন বি-বি-সিতে। সেখানে তিনি ইতিপূর্বে জোয়ান অব আর্ক অবলম্বনে এক টেলিভিসন ছবি পরিচালনা করেছেন।

বার্লিনে 'এ টাচ্ অব লাভ' কোন সরকারী পুরস্কার পায়নি। কিন্তু দর্শকদের মনকে নাড়া দিয়ে গেছেন তরুণ ভারতীয় ওয়ারিশ, 'এ টাচ্ অব লাভ'-এ তিনি এক কুমারী মায়ের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছেন। নরনারীর অবাধ মেলামেশার ফলে পাশ্চাত্যে কুমারীর মাতৃত্ব বরণ এক সামাজিক সমস্যা। এই বাস্তব সমস্যাকে ওয়ারিশ এড়িয়ে যেতে চাননি, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

শুধুমাত্র 'এ টাচ্ অব লাভ' কেন, এবারের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে আরেকটি ভারতীয় ছবির ভাগ্যেও কোন পুরস্কার জোটেনি। ওয়ারিশ হোসেনের শিল্পগুরু সত্যজিত রায়ের 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'কেও বার্লিন থেকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। পশ্চিম বার্লিনের উনবিংশতিতম চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিতবাবুই বোধহয় একমাত্র পরিচালক যাকে কেন্দ্র করে চিত্ররসিকদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।
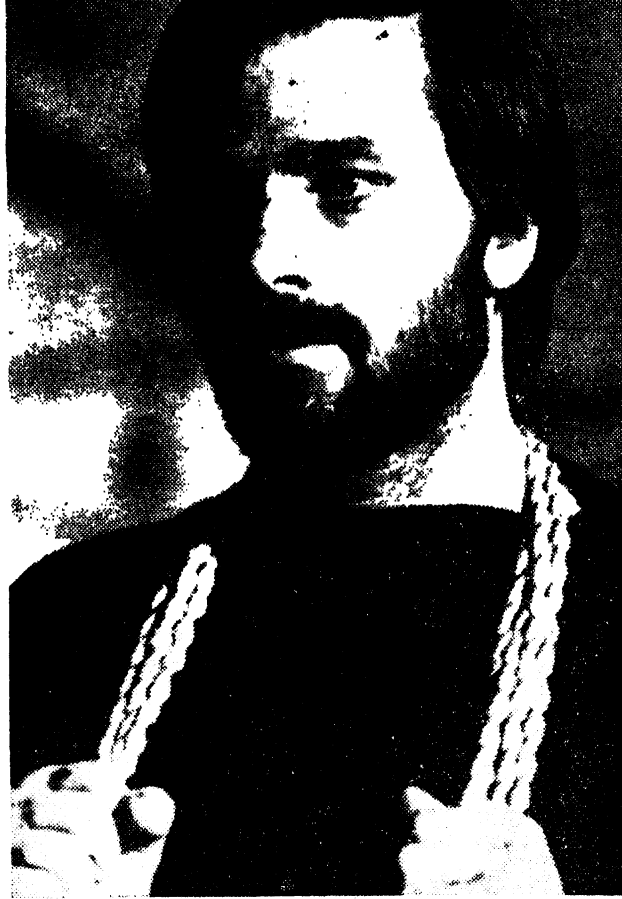
উৎসবের দ্বিতীয় দিনে 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' প্রদর্শনের পরে চিত্র সমালোচকরা যেন দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। এক গোষ্ঠী বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালককে নির্বিবাদে প্রশংসা করেছেন, অন্যদল 'গুপী গায়েন...' দেখে হতাশ হয়েছেন। একদল বলেছেন, সত্যজিত রায় তাঁর পরিপক্কতার সর্বোচ্চে আরোহণ করেছেন। অন্যদলের মন্তব্য, চলচ্চিত্রের যাদুকর সত্যজিতের শিল্পী-সূর্য অস্তমিত। এক পক্ষের বক্তব্য, রূপকের মাধ্যমে সত্যজিতবাবু অন্ন-বস্ত্র, যুদ্ধ-শান্তির সমস্যাকে অপূর্বভাবে তুলে ধরেছেন, যা 'ডকুমেন্টেশান' হতে পারত অথচ সত্যজিত রায়ের যাদু-কাঠির স্পর্শে শিল্পমাধুর্যে ভরে উঠেছে। অন্যপক্ষ অভিযোগ করেছেন, কেন এই পলায়ন? যেক্ষেত্রে শক্ত হাতে চাবুক ধরার প্রয়োজন, সেখানে ঘুমপাড়ানী রূপকথা কেন?

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প, যা বাংলা সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ, কোনদিন সত্যজিত রায়ের অবদানকে ভুলতে পারবে না। সত্যজিতের ঋণ অপরিশোধনীয়। কিন্তু

ইতালির ছবি উন গ্রীংকুইনো পোস্তো দি কাম্পানায় ফ্রাংকো নেরো অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছেন।

তা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন জাগে—রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জোয়ার এনেছিলেন, সত্যজিতবাবু কি বাংলা চলচ্চিত্রে সেই জোয়ার আনতে সক্ষম হয়েছেন?

সত্যজিতবাবু নিজেও সম্ভবতঃ এ সম্পর্কে সজাগ। তাই তিনি ফিল্ম ফেস্টি-ভ্যালের ঠাসা প্রোগ্রামের মধ্যেও ডিনার-ডান্স, প্রেস কনফারেন্স, আলাপ-আলোচনা থেকে সময় করে নিয়ে দর্শকদের কাছে হাজির হয়েছেন, তাঁদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এবারের বার্লিন উৎসবে প্রধান প্রদর্শনী ছাড়াও বার্লিনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিযোগী ছবিগুলি দেখান হয়েছে। ক্রয়েৎসবুর্গের শ্রমিক অঞ্চলে সত্যজিতবাবু গেছেন। ধৈর্যের সঙ্গে দর্শকদের কথা শুনেছেন, তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এখানে 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' প্রদর্শনীর শেষে একজন তরুণ দর্শকের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তার বক্তব্য, "এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এ হচ্ছে ওপরতলার লোকেদের জন্যে। টিকিটের দাম বেশী, আর টিকিট কেনার ঝামেলাও অনেক। তাই রায়ের মত একজন নামকরা পরিচালক এই মজুর পল্লীতে আমাদের সামনে আসবেন তা যেন অচিন্তানীয়।"

ভাবের আদান-প্রদান ছাড়া আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলির অন্য কোন সার্থকতা আছে কিনা, জানি না। দেশ-বিদেশের শিল্পী, পরিচালক আর সাংবাদিকরা এই ধরনের উৎসবে এসে চলচ্চিত্র শিল্পের হাওয়া কোনদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তার হদিশ নিয়ে যান। অন্যের অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেন, নিজের অভিজ্ঞতার ভাগ দেন সমধর্মী ও সহকর্মী-দের। সেদিক থেকে অতীতে যাই হোক না কেন, এবারের বার্লিন উৎসব অন্ততঃ সাফল্যের দাবী করতে পারে। এখানে ফিল্ম দেখিয়েই কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত থাকেন নি, যথাসম্ভব বিদ্রোহী তরুণদের সঙ্গে পরি-চালকদের আলোচনাসভার ব্যবস্থা করেছেন। তাই এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের সময় পশ্চিম বার্লিনের 'বিদ্রোহী' ছাত্ররা 'সীট-ইন' (সহজ বাংলায় 'ঘেরাও') করেন নি, মিছিলেও সামিল হননি।

আসলে এবারের বার্লিন উৎসবের কাঠামোতে সেই পুরোনো 'এসটাবলিশ-মেণ্টের' দমক যতই থাক না কেন, এই কাঠামোর ওপরে খড়-মাটি আর রঙের যে প্রলেপ পড়েছিল, তাতে বারুদের গন্ধ না থাকলেও বিদ্রোহের হাতছানি ছিল সুস্পষ্ট। তাই বার্লিনের উনবিংশতিতম চলচ্চিত্র উৎসবে যে ছটি ছবি সরকারী পুরস্কার পেয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র ইতালীর ছবিটি ছাড়া অন্য পাঁচটি ছবির বিষয়বস্তু বিশ্ব-ব্যাপী তারুণ্যের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আর এই ছবিগুলির পরিচালকরাও সকলেই বয়সে তরুণ,পূর্বসুরীদের সম্পর্কে মোহমুক্ত।

'গোল্ডেন বেয়ার' প্রাপ্ত যুগোশ্লা-ভিয়ার ছবি 'আর্লি ওয়ার্কস'-এর পরিচালক

যুগোশ্লাভ ছবি আর্লি ওয়ার্কস-এর নায়িকা মিলজা ভোজানো ভিক

জ্বোলিমির জিলনিকের বয়স মাত্র সাতাশ বছর। ইতিপূর্বে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ডকুমেণ্টারী ছবি তুললেও 'আর্লি ওয়ার্কস' জিলনিক পরিচালিত প্রথম ফিচার ছবি। ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও সকলেই বয়সে তরুণ, এখনো কলেজের পাঠ সাঙ্গ করেননি। তাই তরুণ মনের দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়েছে তাদের পক্ষে।

'আর্লি ওয়ার্কস'-এর নায়িকা সুন্দরী স্বর্ণকেশী যুগোশ্লাভা যেন বর্তমান যুগের জোয়ান অব আর্ক। সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায়, এক নতুন সুন্দর পৃথিবীর জন্যে সে অসি ধরেছে। নিজের দেহ সম্পর্কে সে নিরাসক্ত—যে কোন বন্ধুর শয্যাসঙ্গিনী হতে তার কোন আপত্তি নেই। যুগোশ্লাভা তার আরো তিনজন পুরুষবন্ধুকে নিয়ে নতুন বিশ্ব গড়ার শপথ নেয়। মার্কসের স্বপ্নকে সে সফল করবেই। সাধারণ মানুষের কাছে তারা বিদ্রোহের বাণী নিয়ে যায়; সাধারণ মানুষও তাদের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের সমর্থন জানায়। কিন্তু যুগোশ্লাভা যখনি তাদের ডাক দিল লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হতে, তখনি দেখা গেল যে তারা অদৃশ্য হয়েছে। কেউই নিজের গায়ে আঁচের ছোঁয়া লাগাতে চায় না। যুগোশ্লাভা ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ে। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে সে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে যুগোশ্লাভার বন্ধুরা তার দেহে পেট্রল ছড়িয়ে দেয়—লেলিহান বহ্নিতে বহ্নিময়ী যুগোশ্লাভা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। আকাশে তখন বজ্রের ধ্বনি।

এবারের বার্লিন উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরি-চালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কোন পুরস্কার দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে বিভিন্ন দেশের পাঁচটি ছবিকে দ্বিতীয় পুরস্কার 'সিলভার বেয়ার' দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি ছবির মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য সুইডেনের তরুণ পরিচালক জন বেরগেনস্ট্রালের 'মেড ইন সুইডেন'। এটি পরিচালকের প্রথম ছবি। চলচ্চিত্রশিল্পে হাতেখড়ির মুহূর্তে পরিচালক বেরগেন-স্ট্রালে প্রজ্জ্বলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করেছেন। পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলি নতুন পদ্ধতিতে অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করে

চলেছে। এই পদ্ধতিকে মোলায়েম ভাষায় 'সাহায্য' বলা হয়ে থাকে। 'মেড ইন সুইডেন' ছবিতে পরিচালক এই তথাকথিত 'সাহায্যের' মুখোশ খুলে দেখিয়েছেন যে, ধনী দেশগুলির একচেটিয়া কারবারীরা কিভাবে আরো ধনী হচ্ছে আর এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে কীভাবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর বুভুক্ষার একাধিপত্য চলেছে। কী বীভৎস সেই দারিদ্র্য, কী নগ্ন সেই ক্ষুধা!

'সিলভার বেয়ার' পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্রাজিলের ছবি 'ব্রাজিল আনো ২০০০'। তিরিশ বছর বয়স্ক পরিচালক ওয়াল্টার লিমা (জুনিয়ার) এই ছবি সম্পর্কে নিজেই বলেছেন : "তৃতীয় বিশ্বের মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা এই ছবির উদ্দেশ্য। শম্বুক গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত এই মধ্যবিত্ত সমাজ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে যে, রাজনীতি, নৈতিকতা আর জীবনযুদ্ধে তাদের একটি পথ বেছে নিতেই হবে।" তাই 'ব্রাজিল আনো ২০০০' ছবিতে মা মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পুরোনো জীবনকে বেছে নিয়েছেন, ছেলে মহাকাশচারী হওয়ার স্বপ্ন দেখে আর মেয়ে সব বাঁধনকে ছিঁড়ে মুক্তির প্রত্যাশায় ঘর ছেড়ে পথে নামে।

[illegible]টিনার ডেথরো ছবির দৃশ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'গ্রীটিংস' ছবিটিও হলিউড গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত। এই ছবির আটাশ বছরের পরিচালক ব্রেন পালমা ভিয়েতনাম যুদ্ধের পটভূমিকায় মার্কিন তরুণ সমাজের এক হতাশাব্যঞ্জক ছবি উপহার দিয়েছেন। কম্পিউটার এদের শয্যাসঙ্গিনী নির্বাচন করে, কোন এক ভবিষ্যৎ-বক্তা এদের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে, ভিয়েতনামে এরা মানুষ মারতে যায়, কিন্তু জানে না কেন। পিলসুজের নীচে কী নিদারুণ অন্ধকার!

পশ্চিম জার্মানীর ছবি পেটার জাডেক পরিচালিত আই অ্যাম অ্যান এলিফ্যান্ট, ম্যাডাম-এর একটি দৃশ্য

পশ্চিম জার্মানীর ছবি 'আই অ্যাম অ্যান এলিফ্যান্ট, ম্যাডাম' পরিচালক পেটার জাডেকের প্রথম ছবি। এই ছবির বিষয়বস্তু এসটাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিদ্রোহ।

ইটালীর 'সিলভার বেয়ার' প্রাপ্ত ছবি 'উন ট্রাংকুইলো পোস্তো দি কাম্পান্যা' একজন চিত্রশিল্পীর মানসিক দ্বন্দ্বের কাহিনী। গতানুগতিক ছবি কিন্তু ফ্রাঙ্কো নেরোর অভিনয় আর লুইগি কুভাইলার ফটোগ্রাফী অবিস্মরণীয়।

আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, একমাত্র বার্লিন উৎসবে চলচ্চিত্রের অপরিচিত পরিচালকদের সম্মান জুটেছে। পরিচিতদের মধ্যে সত্যজিত রায়ের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। জাপানের সুপ্রতিষ্ঠিত পরিচালক, সুসুমু হানি প্রণয়মধুর এক অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে তোলা ছবি 'আইডো, স্লেভ অব লাভ' এনেছিলেন; এ বছর বার্লিন উৎসবে ইংরেজ পরিচালক রিচার্ড লেস্টার, স্পেনের কারলো সাউরা নিরাশ হয়েছেন। ফ্রান্সের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিচালক জাঁ-লুক গদার মার্কস আর মাওয়ের কোটেশান দিয়ে বাজী মাৎ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কী নিদারুণ এই ব্যর্থতা! যে গদার কয়েক বছর আগেও ছিলেন বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি, যার পথ ছিল নির্দিষ্ট, আজ তিনি সত্যানুসন্ধানের জন্য অনন্ত সংগ্রহে বেরিয়েছেন।

কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিয়ে এ বছরের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবকে বিদ্রোহের জয়যাত্রা আখ্যা দিলে অন্যায় হবে না।

দুই ॥ সৈকত ভট্টাচার্য

জার্মানরা বলে 'বার্লিনের লুফৎ'। যার অর্থ বার্লিনের হাওয়া। অর্থাৎ বার্লিনের হাওয়ায় এমন একটা গুণ আছে যা জার্মেনীর অন্য কোথায়ও নেই। বার্লিনে বার মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। আন্তর্জাতিক উৎসব সংস্থার পরিচালনায় বার্লিনে সংগীত, নাটক, অপেরা, টি. ভি. ফিল্ম (এক বছর অন্তর) ও চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান, যার মূলে রয়েছে সজীব পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কৃতিত্ব। কান্ ও ভেনিসের উন্নাসিকতায় এশিয়ার ছবি আজ ইওরোপের ফেস্টিভ্যাল তালিকা থেকে মুছে যেতে বসেছে।

কান্ ও ভেনিস এককালে সত্যজিৎ রায় ও কুরোসওয়াকে বিশ্ববিখ্যাত করেছিল। কিন্তু আজ সেই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী বিলুপ্তপ্রায়। তা না হলে চারুলতা বা রেবিলিয়নের মত ছবি নির্বাচনে বাতিল হয় কি করে? বার্লিন সে দিক থেকে এখনও অনেক 'আন্তর্জাতিক'।

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের ডাইরেকটর ডকটর বাওয়ার গতবার ফেস্টিভ্যাল সংস্কার প্রসঙ্গে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবার তিনি তা অনেকাংশে পূরণ করেছেন। 'বিপ্লবী তরুণদের' জন্য ফেস্টিভ্যালকে অনেক ঘষামাজা করতে হয়েছে।

প্রথম দিনের ছবি ছিল পিটার হলের 'থ্রি ইনটু টু ওয়ন্ট গো'। পিটার হলের এক্সপেরিমেন্টাল ছবি 'ওয়র্ক ইজ এ ফোর লেটার ওয়র্ড' গতবার বার্লিনে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। আন্দ্রে ইউম্যানের কাহিনী অবলম্বনে বর্তমান ছবিটিতে হলের প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটেনি। পরের দিন অর্থাৎ ২৩ জুন ছিল সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'।

সত্যজিৎ রায় বার্লিনের নতুন অতিথি নন। ইতিপূর্বে অনেকবার তিনি বার্লিনে পুরস্কৃত হয়েছেন। পথের পাঁচালী থেকে গুপী গায়েন পর্যন্ত গত চৌদ্দ বছর যাবৎ তিনিই একমাত্র বিদেশে পরিচিত ভারতীয় চিত্রপরিচালক। গত দুই বছর তিনি বার্লিনে আসেননি এবং প্রতিযোগিতা শাখায় কোন ভারতীয় কাহিনীচিত্র দেখান হয়নি। কাজেই এবার সত্যজিৎ রায়ের আগমন চিত্ররসিকদের মনে স্বাভাবিক কারণেই বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

'গুপী গায়েন' দর্শকদের ভাল লেগেছে। একটা কিশোর কাহিনীর চমৎকার চলচ্চিত্রায়ণ সত্যজিৎ প্রতিভার এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে। চিত্রসমালোচকেরা কিন্তু অনেকেই গুপী গায়েনের রসাস্বাদন করতে পারেন নি। বিখ্যাত জার্মান দৈনিক ফ্রাংকুর্টার রুন্ডসাওয়ের চিত্রসমালোচক গুপী গায়েন প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এককালের প্রতিভাবান ভারতীয় পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের শৈল্পিক পতন ঘটেছে তাঁর বর্তমান চিত্র 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এ। 'নায়ক' থেকেই সত্যজিৎ রায় বক্স অফিস কম্প্রোমাইজ করতে শুরু করেছেন এবং আলোচ্য চিত্রটিতে তিনি তাঁর দেশের অন্যান্য পরিচালকদের মত গান ও অন্যান্য আনন্দোপকরণ জুগিয়েছেন।"

আরেকজন সমালোচক ফিল্ম ইন্টারন্যাশনেলে লিখেছেন, "গুপী গায়েন বাঘা বায়েন" রঙিন হওয়া উচিত ছিল। ছবিটি ওয়াল্ট ডিজনির ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু ডিজনির ছবিতে যে চার্ম আছে গুপী গায়েনে সেটা অনুপস্থিত।"

"রাজনীতি, আণবিক যুদ্ধ ও নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত সমাজের রূপ এবার বার্লিনে প্রদর্শিত প্রায় সব ছবিতেই দেখা গেছে। বিশেষ ব্যতিক্রম সত্যজিৎ রায়ের গুপী গায়েন বাঘা বায়েন। ছবিটি সত্যিকারের-রিলিফ দিয়েছে।" লিখেছেন জনৈক চিত্রসমালোচক।

বার্লিন উৎসবের আরেকজন বিশিষ্ট অতিথি হলেন জঁ লুক গদার। গদারের ব্রিদলেস, ম্যাসকুলিন ফেমেনিন, আলফাভিল, উইক এন্ড ইতিপূর্বে বার্লিনে দেখান হয়েছে।

এবার গদারের যে ছবিটি মূল প্রতিযোগিতায় দেখান হয়েছে তার নাম 'দি গে নোয়িং'। ছবিটি গদারের প্রথম টেলিভিশন ফিল্ম। তরুণ যুবক এমিল রুসো ও সুন্দরী তরুণী প্রাট্রিসা লুমুম্বা প্যারিসের কাফেতে মুখোমুখি বসে আলোচনা করছে—সাম্যবাদ, ছাত্র আন্দোলন, টি. ভি.র ভবিষ্যৎ, বিপ্লব, গেরিলা যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। কাহিনীতে ব্রেখটের ক্লাইস্টালিংগ্রেস্পেথের ছায়া পড়েছে। ছবিটি কি দর্শক কি সমালোচক কোন মহলেই বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। গদার নিঃসন্দেহে একজন মৌলিক চলচ্চিত্রকার। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলোতে স্বতঃস্ফূর্ততা যেন ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। অত্যধিক রাজনৈতিক প্রভাব তাঁর শিল্পপ্রতিভার বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্পেনের তরুণ পরিচালক কারলস সাওরাও বার্লিনে বিশেষ জনপ্রিয়। ৬৬ ও ৬৮তে তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য রৌপ্য ভল্লুক পেয়েছিলেন। এবার তিনি যে ছবিটি উপহার দিয়েছেন তার নাম হল 'দি ডেন'। ছবিটি মোটামুটিভাবে সবাইকে খুশী করেছে। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন গেরলেলেনডিন চ্যাপলিন ও পারওস্কারসন।

ইংমার বার্গম্যানের 'দি রাইট', লুই বুনুয়েলের 'দি মিল্কিওয়ে' ও গদারের 'ওয়ান প্লাস ওয়ান' দেখান হয় প্রতিযোগিতার বাইরে। পাঁচটি সিলভার বেয়ার দেওয়া হয়: 'মেড ইন সুইডেন' (সুইডেন), 'মাদাম, আই এম এম ইলিফেন্ট' (পঃ জার্মেনী), 'গ্রীটিংস' (যুক্তরাষ্ট্র), 'ব্রাজিল আনো ২০০০' (ব্রাজিল), 'ওয়ান লোনলি প্লেস' (ইতালী)। উৎসবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (গোল্ডেন বেয়ার) পায় যুগোশ্লাভ চিত্র 'রানিরাদো.বি' শ্রেষ্ঠ শর্ট ফিল্ম হিসাবে গোল্ডেন বেয়ার পায় ক্যানাডার ছবি 'টু সি অর নট টু সি', সিলভার বেয়ার পায় যুগোশ্লাভ চিত্র 'দি ফিলিং অফ ট্রেন্সপ্লেনটেশন'।

এবার বার্লিনে যুগোশ্লাভ ছবির জয়জয়কার। 'উইক অফ দি ইয়ং যুগোশ্লাভিয়ান সিনেমা' ছিল এবার উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ। তাতে পেভলোভিচের 'হোয়েন আই এম ডেড অ্যান্ড হোয়াইট' গোরদান মিহিচের 'ফেয়ারি টেল' বেরকোভিচের 'রোন্ডো', ইডানদার 'প্রেভিটেসন', ক্রোপচিচের 'সেড সিন' দারকোভিচের 'হরস্কোপ', দোরদ্রেভিচের 'ইয়ুতো' ও কয়টি শর্ট ফিল্ম দেখান হয়।

জাপানে সুসুমু হানি পরিচালিত আইটো স্লেভ অব লাভের নায়িকা মুরি সুগাসা

যুগোশ্লাভ পরিচালকরা যে এসকেপিস্ট নন, প্রতিটি ছবিতেই তার প্রমাণ রেখেছেন। চলচ্চিত্রকে শুধুমাত্র আমোদ উপকরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার না করে সমাজের দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং তার জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়, টেকনিকলার, বড় বড় তারকা, অগুনতি নাচ ও গান কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না তা প্রমাণ করলেন এবার বেলগ্রেডের তরুণ পরিচালকরা। এদের সাফল্য শুধুমাত্র উৎসবের পুরস্কারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, পশ্চিম ইওরোপের প্রায় সব দেশেই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলো টেলিভিশনে দেখান হবে। যার ফলে ছবিগুলোর আর্থিক সাফল্যও সুনিশ্চিত। ধন্যবাদ জানাই ডকটর বাওয়ারকে 'উইক অফ দি ইয়ং যুগোশ্লাভিয়ান সিনেমা'র জন্য। তরুণ পরিচালকদের এই সুযোগ দান বার্লিন উৎসবের স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রইল।

দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ভারতের তথ্য ও বেতার বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের যাঁরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে প্রতিনিধিত্বে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, অন্তত তাঁরা যেন দেখেও কিছু শেখেন।

খেলাধূলা

দর্শক

আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক্‌স্‌

লস এ্যাঞ্জেলস-এ সম্প্রতি (জুলাই ১৯—২০) আমেরিকান, রাশিয়ান এবং বৃটিশ কমনওয়েলথ দলের মধ্যে যে ত্রিদলীয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা হয়ে গেল তার পুরুষ ও মহিলা বিভাগের চূড়ান্ত তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে আমেরিকা। পুরুষ বিভাগের চূড়ান্ত ফলাফল ঃ—১ম আমেরিকা (১০৭ পয়েন্ট), ২য় রাশিয়া (৮২½ পয়েন্ট) এবং ৩য় বৃটিশ কমনওয়েলথ (৫০½ পয়েন্ট)। মহিলা বিভাগের চূড়ান্ত ফলাফল ঃ—১ম আমেরিকা (৬১ পয়েন্ট), ২য় রাশিয়া (৫৯ পয়েন্ট) এবং ৩য় বৃটিশ কমনওয়েলথ ২২ পয়েন্ট।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় তিন দলেই ১৯৬৮ সালের কয়েকজন অলিম্পিক পদক বিজয়ী এ্যাথলীট অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কয়েকজন নিজেদের সুনাম অনুযায়ী সাফল্য লাভ করতে পারেননি। যেমন ৮০০ মিটার দৌড়ে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং বিশ্ব-রেকর্ড স্রষ্টা রালফ ডাবেল (অস্ট্রেলিয়া) ২য় স্থান লাভ করেছেন।

পোলভল্টে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী বব্‌ সিগ্রীন (আমেরিকা) ৫·৩৫ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে প্রথম স্থান পেয়েছেন। তিনি গত ১৯৬৮ সালের অলিম্পিকে ৫·৪০ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ডাবল সম্মান

আমেরিকার দুই নিগ্রো এ্যাথলীট জন কার্লোজ এবং ১৫ বছরের কুমারী

লস্‌ এ্যাঞ্জেলসের ত্রিদলীয় আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার পোলভল্টে প্রথম স্থান অধিকারী বব্‌ সিগ্রীন (আমেরিকা)

আমেরিকা বনাম রাশিয়া—পয়েন্টের খতিয়ান

পুরুষ বিভাগ			মহিলা বিভাগ		
	আমেরিকার	রাশিয়ার		রাশিয়ার	আমেরিকার
বছর	পয়েন্ট	পয়েন্ট	বছর	পয়েন্ট	পয়েন্ট
১৯৫৮	১২৬	১০৯	১৯৫৮	৬৩	৪৪
১৯৫৯	১২৭	১০৮	১৯৫৯	৬৭	৪০
১৯৬০	অনুষ্ঠান বন্ধ		১৯৬০	অনুষ্ঠান বন্ধ	
১৯৬১	১২৪	১১১	১৯৬১	৬৮	৩৯
১৯৬২	১২৮	১০৭	১৯৬২	৬৬	৪১
১৯৬৩	১১৯	১১৪	১৯৬৩	৭৫	২৮
১৯৬৪	১৩৯	৯৭	১৯৬৪	৫৯	৪৮
১৯৬৫	১১২	১৮৮	১৯৬৫	৬৩½	৪৩½
১৯৬৬-৬৮	অনুষ্ঠান বন্ধ		১৯৬৬-৬৮	অনুষ্ঠান বন্ধ	
১৯৬৯	১০৭	৮২½	১৯৬৯	৫৯	৬১

বারবারা ফেরেল ১০০ এবং ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান লাভের সূত্রে 'ডাবল সম্মান' লাভ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের মেক্‌সিকো অলিম্পিকের ২০০ মিটার দৌড়ে জন কার্লোজ ব্রোঞ্জ পদক এবং ১০০

মিটার দৌড়ে কুমারী বারবারা ফেরেল রৌপ্যপদক জয়ী হয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে যে ৭-বার দ্বৈত এ্যাথলেটিক্‌স প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে তার ফলাফল : পুরুষ বিভাগে শীর্ষস্থান পেয়েছে আমেরিকা ৬-বার এবং রাশিয়া ১-বার। অপরদিকে মহিলা বিভাগে রাশিয়া সাতবারই শীর্ষস্থান লাভ করেছে। রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে দ্বৈত এ্যাথলেটিক্‌স প্রতিযোগিতার প্রথম আসর বসেছিল মস্কোতে ১৯৫৮ সালের ২৭শে এবং ২৮শে জুলাই।

বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা

প্রথম জুনিয়র বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় (ফ্রি স্টাইল) আমেরিকা ৫১ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মাত্র ১ পয়েন্ট কম পেয়ে ২য় স্থান পেয়েছে রাশিয়া। চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম আমেরিকা (৫১ পয়েন্ট), ২য় রাশিয়া (৫০ পয়েন্ট), ৩য় বুলগেরিয়া (৩৩ পয়েন্ট) এবং ৪র্থ জাপান (৩১ পয়েন্ট)।

স্বর্ণপদক পেয়েছে আমেরিকা ৫টি, রাশিয়া ৩টি এবং জাপান ২টি।

ডেভিস কাপ

১৯৬৯ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ অধ্যায়ে পেণছে গেছে। বর্তমানে এই তিনটি পর্যায়ের খেলা বাকি—ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল এবং চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড। ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার বিজয়ী দেশই শেষপর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকার সংগে খেলবে।

ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে এই চারটি দেশ উঠেছে—এশিয়ান জোন থেকে ভারতবর্ষ, ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপ থেকে বৃটেন ও 'বি' গ্রুপ থেকে রুমানিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকান জোন থেকে ব্রেজিল। ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা এইভাবে তৈরী হয়েছে : (১) ভারতবর্ষ বনাম রুমানিয়া এবং (২) বৃটেন বনাম ব্রেজিল।

ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপের ফাইনালে বৃটেন ৩—২ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে এবং 'বি' গ্রুপের ফাইনালে রুমানিয়া ৪—১ খেলায় রাশিয়াকে পরাজিত করে ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

আমেরিকান জোন-ফাইনালে ব্রেজিল ৪—১ খেলায় মেক্‌সিকোকে হারিয়ে ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য, নর্থ আমেরিকান জোন ফাইনালে মেক্‌সিকো অপ্রত্যাশিতভাবে ৩—২ খেলায়

শ্রীমতী নাদেজদা চিজোভা (রাশিয়া)—লস্ এ্যাঞ্জেলসের ত্রিদলীয় এ্যাথলেটিক্‌সে মহিলাদের সটপুট বিজয়িনী

শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে আমেরিকান জোনের ফাইনালে উঠেছিল। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া এবং মেক্‌সিকোর সাফল্যলাভের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অস্ট্রেলিয়া এপর্যন্ত ৩৭-বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ২২-বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। সর্বাধিকবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার এবং সর্বাধিকবার ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ারই। অপরদিকে মেক্‌সিকো মাত্র একবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে রানার্স-আপ হয়েছে। ১৯৬২ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়াই ৫—০ খেলায় মেক্‌সিকোকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল।

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ড ২—০ খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে 'রাবার' এবং সেই সূত্রে 'উইসডেন' ট্রফি জয়ী হয়েছে। সিরিজের ২য় টেস্ট খেলা ড্র গেছে।

সদ্যসমাপ্ত এই টেস্ট সিরিজে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় উভয় দলের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন ইংল্যাণ্ডের জিওফ বয়কট—খেলা ৩, ইনিংস ৬, নট আউট ১ মোট রান ২৭০, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৫৪·০০। এই তালিকায় ২য় স্থান পেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের স্টেভ ক্যামাচো—খেলা ২, ইনিংস ৪, মোট রান ১৮৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৭১ এবং গড় ৪৬·৭৫। সিরিজে ব্যক্তিগত মোট ২০০ রান করেছেন যেখানে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে একমাত্র জিওফ বয়কট (২৭০ রান) সেখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে করেছেন তিনজন খেলোয়াড়—বেসিল বুচার (২৩৮ রান), চার্লি ডেভিস (২০৮ রান) এবং রে ফ্রেডারিক্‌স (২০৪ রান)।

সেঞ্চুরী করেছেন মোট চারজন খেলোয়াড়—ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তিনজন—জিওফ বয়কট (১২৮ ও ১০৬ রান), রে ইলিংওয়ার্থ (১১৩ রান) এবং জ্যাক হ্যাম্পসায়ার (১০৭ রান)। অপরদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে মাত্র একজন—চার্লি ডেভিস (১০৩ রান)।

বোলিংয়ে ১০টি উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন পাঁচজন খেলোয়াড়। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তিনজন—স্নো (৪০৬ রানে ১৫টি), ব্রাউন (২৮৮ রানে ১৪টি) এবং নাইট (২৭৯ রানে ১১টি)। অপরদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে দুজন—শেফার্ড (২৬৬ রানে ১২টি) এবং সোবার্স (৩১৮ রানে ১১টি)।

বেসিল বুচার

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বেসিল বুচার ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজ খেলার সূত্রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৩০০০ রান পূর্ণ করেছেন। বর্তমানে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলায় মোট রান-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০৮৭। বর্তমানে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর পরিসংখ্যান এইরকম—খেলা ৪৪, ইনিংস ৭৮, নট-আউট ৫-বার, মোট রান ৩০৮৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৯ নট-আউট, সেঞ্চুরী ৭ এবং গড় ৪২·২৮।

বেসিল বুচারের ৭টি টেস্ট সেঞ্চুরী—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩টি, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২টি এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২টি। পাকিস্তান এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে তিনি সেঞ্চুরী করতে পারেননি। বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের

খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান ঃ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নট-আউট ২০৯ রান (নটিংহ্যাম, ১৯৬৬), ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৪২ রান (মাদ্রাজ, ১৯৫৮-৫৯), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১১৭ রান (পোর্ট অব স্পেন, ১৯৬৫), নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নট-আউট ৭৮ রান এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬১ রান।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার (১৯৬৯) প্রথম পর্যায়ের খেলা শেষ হয়েছে। এবার 'সুপার লীগ' খেলা হবে। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় যোগদানকারী দলের সংখ্যা ১৭টি। প্রতি দলের সঙ্গে একবার করে খেললে প্রত্যেক দলের খেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬টি। এই ১৬টি খেলার ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ের যে চূড়ান্ত লীগ তালিকা দাঁড়িয়েছে, তার প্রথম পাঁচটি দল—ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, পোর্ট কমিশনার্স, বি এন আর এবং বাটা স্পোর্টস ক্লাব 'সুপার লীগ' খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। প্রথম পর্যায়ের চূড়ান্ত লীগ খেলার তালিকায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অপরাজিত অবস্থায় শীর্ষস্থান পেয়েছে—জয় ১৩, ড্র ৩ এবং পয়েন্ট ২৯। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে মোহনবাগান—জয় ১২, ড্র ৩, হার ১ এবং পয়েন্ট ২৭। গত শনিবার ইস্টবেঙ্গল খেলার শেষ মুহূর্তে গোল দিয়ে মোহনবাগানকে ১—০ গোলে পরাজিত করার সূত্রে মোহনবাগানের থেকে ২ পয়েন্ট বেশী পেয়েছে।

ডেবী মেয়ার

আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুতা সাঁতারু কুমারী ডেবী মেয়ার ১৯৬৮ সালের 'সুলিভান ট্রফি' লাভ করেছেন। আমেরিকার খেলাধুলোর আসরে 'সুলিভান ট্রফি' জয় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। দীর্ঘ ৩৯ বছরের ইতিহাসে কুমারী ডেবী মেয়ারকে নিয়ে চারজন মহিলা এই ট্রফি পেলেন। ● ডেবী মেয়ার গত ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক সাঁতারে তিনটি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। তাঁর আগে কোন মহিলা বা পুরুষ সাঁতারু একই বছরের অলিম্পিক সাঁতারের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে তিনটি স্বর্ণপদক পাননি। সুতরাং ডেবী মেয়ার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং তারই স্বীকৃতিতে তাঁকে এই ট্রফি দেওয়া হয়েছে। এই ট্রফি দেওয়া সম্পর্কে ভোটের ফলাফল দাঁড়ায় ঃ ডেবী মেয়ার ১,২৩৭ পয়েন্ট, আলফ্রেড ওর্টার ১,১৬৫ পয়েন্ট এবং বিল টুমে ১,১১০ পয়েন্ট। আলফ্রেড ওর্টার উপর্যুপরি চারটি অলিম্পিকের ডিসকাস নিক্ষেপে স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর আগে অলিম্পিক এ্যাথলেটিক্‌সের কোন একটি বিষয়ে একজনের পক্ষে মোট চারবার স্বর্ণপদক জয় করাই সম্ভব হয়নি। বিল টুমে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক ডেকাথলনে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন এবং ৮,১৯৩ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছিলেন।

কুমারী ডেবী মেয়ার (আমেরিকা) ১৯৬৮ সালের 'সুলিভান ট্রফি' বিজয়িনী

কুমারী ডেবী মেয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রী এবং বর্তমান বয়স ১৬ বছর।

১৯৬৮ সালের অলিম্পিক সাঁতারের ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার এবং ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কুমারী ডেবী মেয়ার অসুস্থতার মধ্যেও নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক জয় করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময় ঃ ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ২ মিঃ ১০·৫ সেঃ, ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ৪ মিঃ ৩১·৮ সেঃ এবং ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ৯ মিঃ ২৪ সেঃ।

দাবার আসর

গত ২০শে জুলাই থেকে একটি দাবা প্রতিযোগিতা নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে শুরু হয়েছে। মোট ৫৪ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছেন। সুইস সিস্টেমে মোট বার রাউন্ড খেলা হবে। প্রতি রবিবার এবং বুধবার সন্ধ্যেবেলা একটি করে রাউন্ড খেলা হয়।

সুইস সিস্টেম প্রতিযোগিতা কিভাবে গঠিত হয় তা পাঠকদের জেনে রাখা দরকার। প্রথম রাউন্ডে লটারী করে স্থির করা হয় কোন খেলোয়াড় কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবে এবং কে সাদা বা কে কালো বল নিয়ে খেলবে। প্রথম রাউন্ডে যে সাদা নিয়ে খেলছে, পরবর্তী রাউন্ডে সে খেলবে কালো বল নিয়ে, তারপরের রাউন্ডে সাদা, তারপরে কালো—এইভাবে চলবে। অবশ্য সাদা-কালোর এই পর্যায়ক্রম সবসময় রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু কোন কারণেই কোন খেলোয়াড়কে পর পর দুই রাউন্ডের বেশী কালো বল নিয়ে খেলতে দেওয়া হয় না।

প্রথম রাউন্ডের খেলার শেষে যে-সংখ্যক প্রতিযোগী জয়লাভ করবেন, সেই সংখ্যক প্রতিযোগী পরাজিতও হবেন, এবং বাকীদের খেলা ড্র হবে। খেলোয়াড়দের প্রতি জয়ের জন্যে এক পয়েন্ট, প্রতি পরাজয়ের জন্যে শূন্য, এবং প্রতিটি ড্রয়ের জন্যে আধ পয়েন্ট দেওয়া হয়। দ্বিতীয় রাউন্ডে এক পয়েন্ট সংগ্রহকারী খেলোয়াড় আর একজন এক পয়েন্ট সংগ্রহকারী খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলে, আধ আধের সঙ্গে, শূন্য শূন্যর সঙ্গে।

দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে কিছু এক পয়েন্টের খেলোয়াড় দুই পয়েন্ট করবেন, কেউ ড্র করে দেড় পয়েন্ট করবেন, যাঁরা হেরে যাবেন, তাঁদের পয়েন্ট একই থাকবে। প্রথম রাউন্ডে আধ করেছিলেন, এমন খেলোয়াড়দের কেউ হয়ত দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে করবেন দেড় পয়েন্ট, কেউবা এক, কেউবা আধেই থেকে যাবেন। যাঁরা প্রথম রাউন্ডের শেষে শূন্য পয়েন্ট করেছিলেন, দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে তাঁদের কারুর পয়েন্ট হবে এক, কারুর আধ, কারুর বা শূন্যই থেকে যাবে।

সুতরাং, দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে অর্জিত পয়েন্টের শ্রেণীভাগ হবে এইরকম—দুই, দেড়, এক, আধ, শূন্য। তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় দুই দুইয়ের সঙ্গে

খেলবে, দেড় দেড়ের সঙ্গে, এক একের সঙ্গে, আধ আধের সঙ্গে, শূন্য শূন্যের সঙ্গে। চতুর্থ রাউন্ডে খেলবে তিন তিনের সঙ্গে, আড়াই আড়াইয়ের সঙ্গে, দুই দুইয়ের সঙ্গে, দেড় দেড়ের সঙ্গে, এক একের সঙ্গে, আধ আধের সঙ্গে, শূন্য শূন্যের সঙ্গে। হয়ত দেখা গেল তৃতীয় রাউন্ডের পর মাত্র একজন খেলোয়াড়ই তিন পয়েন্ট করেছেন, তাহলে চতুর্থ রাউন্ডে সেই খেলোয়াড় আড়াই পয়েন্টের কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যদি তিনজন খেলোয়াড় তিন করেন, তাহলে লটারী দ্বারা ঠিক হবে কোন দুজন পরস্পরের সঙ্গে খেলবেন, বাকীজন খেলবেন কোন আড়াই পয়েন্টের খেলোয়াড়ের সঙ্গে।

এইভাবে মোট বারো রাউন্ড খেলা হবে। যিনি সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট অর্জন করবেন, তিনি হবেন বিজয়ী।

সুইস সিস্টেমের দুটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এস্‌ বি পয়েন্ট (সনি-বোর্ণ পয়েন্ট) এবং শোকোলভ পয়েন্ট। এই দুই পয়েন্টের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলছি।

ধরুন ১২ রাউন্ড খেলার শেষে দেখা গেল, তিনজন খেলোয়াড় ৮ করেছেন, সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট করেছেন একজন খেলোয়াড়—৯ পয়েন্ট। ৮½ পয়েন্ট কেউই করেন নি। তাহলে যিনি ৯ পয়েন্ট করেছেন তিনি চ্যাম্পিয়ন হলেন। এখন তিনজন খেলোয়াড় ৮ পয়েন্ট করার ফলে কে দ্বিতীয়, কে তৃতীয় এবং কে চতুর্থ স্থান নেবেন? এই স্থান নিরূপণ করা হবে এস, বি পয়েন্টের দ্বারা।

ধরা যাক ক, খ, এবং গ তিনজনেই মোট আট পয়েন্ট করেছেন। প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়ে গেলে দেখা হবে, ক যে সমস্ত প্রতিযোগীকে হারিয়েছেন তাঁরা মোট কত পয়েন্ট পেয়েছেন। এবং যাঁদের সঙ্গে ড্র করেছেন তাঁরা মোট কত পয়েন্ট করেছেন। ক যাঁদের সঙ্গে জিতেছেন তাঁদের মোট পয়েন্ট ও যাঁদের সঙ্গে ড্র করেছেন তাঁদের মোট পয়েন্টের অর্ধেক—এই দুইয়ের যোগফল হল ক'র এস্‌, বি পয়েন্ট। একই পদ্ধতিতে খ এবং গ'র এস্‌, বি পয়েন্টও স্থির করা হবে। এই সব যোগের পর যদি দেখা যায় ক'র পয়েন্ট সবচেয়ে বেশী, তাহলে ক'ই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন; খ ও গ'য়ের মধ্যে যার এস্‌, বি বেশী তিনি হবেন তৃতীয়, বাকীজন চতুর্থ।

কিন্তু এমনও হতে পারে দুজন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় সমান পয়েন্ট অর্জন করেছেন এবং এস্‌, বি পয়েন্টেও সমান হয়ে গেছেন। তাহলে এক্ষেত্রে বিচারের মানদন্ড হবে শোকোলভ পয়েন্ট—অর্থাৎ ক যাদের কাছে হেরেছেন, তাঁরা মোট কত পয়েন্ট অর্জন করেছেন। এঁদের মোট অর্জিত পয়েন্ট ক'র এস বি পয়েন্টের সঙ্গে যোগ হবে। এর ফলে ক'র যত পয়েন্ট দাঁড়াল, তাকে বলে শোকোলভ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট পেয়েছেন, এমন খেলোয়াড়দের এস বি'ও সমান হলে যাঁর শোকোলভ পয়েন্ট বেশী, তিনিই উচ্চতর স্থানলাভের অধিকারী।

* *

বাংলা দেশের অনেক দাবা খেলোয়াড়ই মির সুলতান খানের নাম জানেন না। দাবা খেলায় সুলতান খানই আজ পর্যন্ত ভারতের এবং এশিয়ার (রাশিয়াকে বাদ দিলে) একমাত্র গ্র্যান্ডমাস্টার। তাঁর মনিব স্যার উমর হায়াৎ খান ১৯২৯ সালে তাঁকে বিলেতে নিয়ে যান। চার বছর ধরে ইউরোপের নানা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি পৃথিবীর একাধিক শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে হারিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন। যে তিনজন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড় ধরা হয়, তাঁদের মধ্যে জে আর ক্যাপাব্লাঙ্কা-ও সুলতান খানের কাছে একবার একটি খেলায় হেরেছিলেন। সেই খেলাটি এই সংখ্যায় দিলাম। এই খেলাটি হয়েছিল ১৯৩০-৩১ সালে ইংল্যান্ডের হেস্টিংসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়।

সাদা—সুলতান খান (ভারত)
কালো—ক্যাপাব্লাঙ্কা (কিউবা)
কুইন্স ইন্ডিয়ান ডিফেন্স।

(১) ঘ—রাগ ৩ : ঘ—রাগ ৩ (২) ব—ম ৪ : ব—ম ঘ ৩ (৩) ব—গ ৪ : গ—ঘ ২ (৪) ঘ—গ ৩ : ব—রা (৫) ব—মন ৩ : ব—ম ৪ (৬) ব×ব : ব×ব (৭) গ—ঘ ৫ : গ—রা ২ (৮) ব—রা ৩ : ০-০ (৯) গ—ম ৩ : ঘ—রা ৫ (১০) গ—রাগ ৪ : ঘ—ম ২ (১১) ম—গ ২ : ব—রাগ ৪ (ক) (১২) ঘ—ম ঘ ৫ : গ—ম ৩ (১৩) ঘ×গ : ব×ঘ (১৪) ব—রান ৪ (খ) : ন—গ ১ (১৫) ম—ঘ ৩ : ম—রা ২ (১৬) ঘ—ম ২ : মঘ—গ ৩ (১৭) ঘ×ঘ : গব×ঘ : (১৮) গ—রা ২ : ন—গ ৩ (১৯) ব—ঘ ৪ : রান—গ ১ (২০) ব—ঘ ৫ : ঘ—রা১ (২১) গ—ঘ ৪ (গ) : ন—গ ৮+ (২২) রা—ম ২ : ন (গ১) গ৭+ (২৩) ম×ন : ন×ম+ (২৪) রা×ন : ম—গ২+ (২৫) রা—ম ২ : ম—গ ৫ (২৬) গ—রা ২ : ম—ঘ ৬ (২৭) মন—মঘ ১ : রা—গ২ (২৮) রান—মগ ১ : রা—রা ২ (২৯) ন—গ ৩ : ম—ন ৫ (৩০) ব—ঘ৪ : ম—ম ২ (৩১) মন—মগ ১ : ব—মন ৩ (৩২) ন—রাঘ ১ : ম—ন ৬ (৩৩) ন (ঘ১)—মগ১ (ঘ) : ম—ম ২ (৩৪) ব—ন ৫ : রা—ম১ (৩৫) ন (গ১)—গ২ : ম—ন ৬ (৩৬) রা—গ ১ : ম—ন ৫ (৩৭) রা—ঘ ২ : ম—ন ৬ (৩৮) ন—গ ১ : ম—ন ৫ (৩৯) ন (গ
ম—ন ৬ (৪০) ব—ন ৪ : ম
রা—ন ৩ : ম—ন ৬ (৪২)
ম—গ ৪ (৪৩) গ—ন৪! (ঙ
(৪৪) ব—ন ৬ : ম—ম২ (৪
ব—ন৪ (৪৬) গ—ঘ৩ : ম—
গ—রাগ৪ : ম—ন৬ (৪৮)
ম—ঘ ৭ (৪৯) রা—ঘ ১ :
(৫০) রা—ন১ : ম—ঘ৭ (৫১
: ম—ন৬ (৫২) ন—রাঘ১
(৫৩) ন—গ৬ : ম—ন৫ (৫৪)
নগ১ : গ—ঘ৫ (৫৫) গ-
ম—ন৪ (৫৬) ন—রা১ : ম-
ন (রা১)—গ১ : ম—ন ৪ (৫
: ম—ন৫ (৫৯) গ—ঘ৩ : ম
রা—ম২ : ম—গ৪ (৬১) ন×
২ (৬২) ন—ঘ৭+ : রা-
ব—ঘ৬ : ঘ—গ৩ (৬৪) গ—ঘ
(৬৫) ন—ঘ৮ কালোর পরাজ

টীকা :—(ক) কালো সা
চালটি খেয়াল করে নি। ২১...ম
দেয়া খুবই উচিত ছিল।

(খ) কালোর মন্ত্রী ফাইলে
থাকায় তার খেলতে অসুবিধা
জন্যে সাদা ক্যাসল না করেই
বড়ে এগিয়ে আক্রমণ চা
তাছাড়া (১৪) ব—রান ৪ চ
সাদার মন্ত্রী গজটাও একটা
ভালভাবেই বসে থাকতে পার
এখন দুটো গজই বর্তমান থা
বেশ সুবিধাজনক।

(গ) সাদা ২১ ম×ব চাল
বড়ে পেত বটে, কিন্তু তা
খেলাটা খুলে যেত। কালোর
কিস্তি না দিয়ে ২১...ন(১
দেয়া। কালো দুটো নৌকার
নিতে গিয়ে খেলাটা হারল। মন্
দুটো নৌকা দিয়ে দেয়া
সময় খারাপ হয়।

(ঘ) এখন কালো ৩৩...
দিতে পারে না, কারণে তাহলে
ন—গ৭+ দিয়ে হয় গজটাকে
না হয় একটা নৌকার বদলে কালো
বল মেরে নেবে।

(ঙ) সাদা কালোকে বাধ্য করল
বড়েটা টিপতে। কারণ, (৪৩)...
(৪৪) ব—ঘ৬ উঠ কিস্তি : ম
ব×ব এবং সাদার বড়েটা মন্ত্রী হ

(চ) কালো (৪৯)...ম×
(৫০) গ—ন৫ : ম—ন৫ (৫১)

(ছ) কালো এখনো সাদার
বড়েটা নিতে পারে না। যথ
ম×ব+(৫৬) ন(৬) গ২ এবং
শীঘ্রই ষ্টেলমেট হয়ে যাবে। অন্য
পজিশানটি যেহেতু ভাল, সে
পক্ষে বল কাটাকাটি করা ঠিক

গজান

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।